কলকাতা বন্দর

১১ অগাস্ট ১৯৭৪
দাম ৭৫ পয়সা

CUK-171871-64-P35962

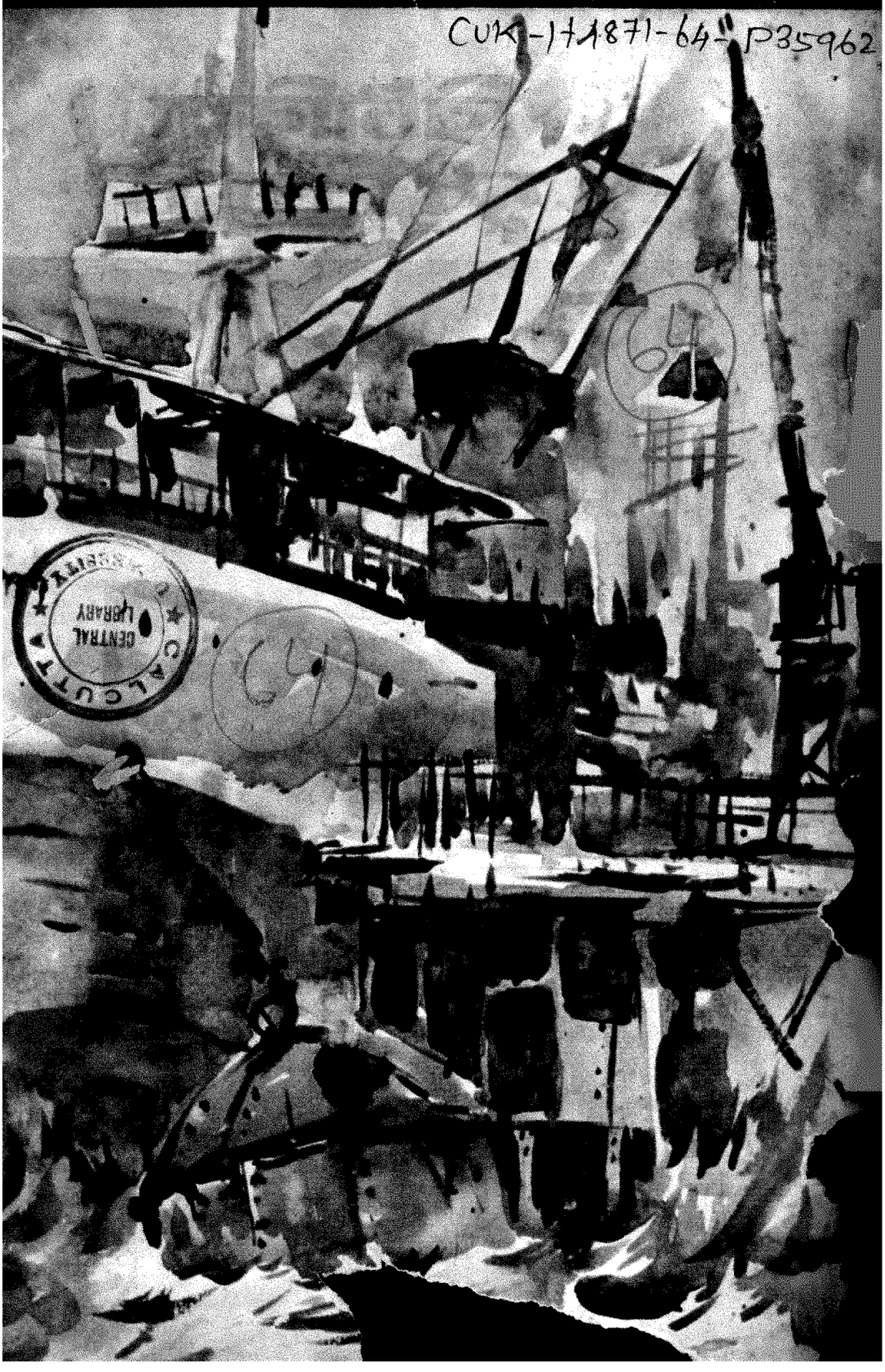

ব্রিটানিয়া
দুধ বিস্কুট

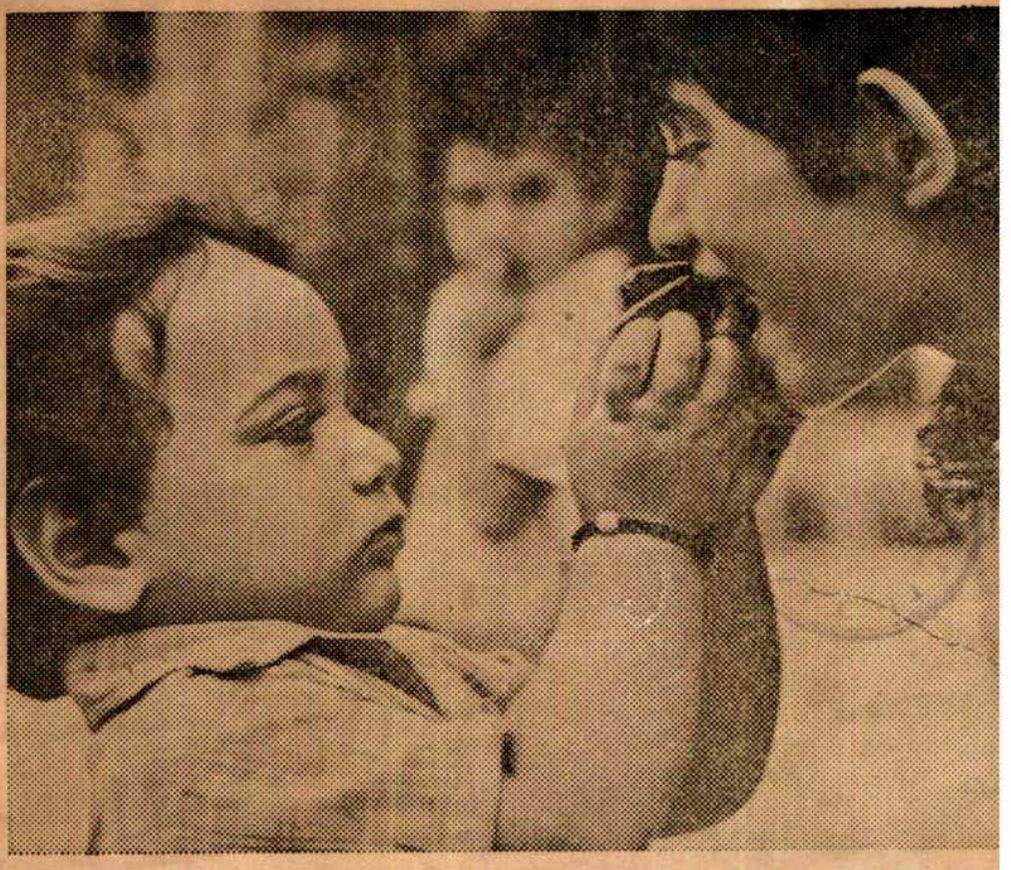

বাড়ন্ত বাচ্চার সুস্বাদু সাথী!

সুস্বাদু, পুষ্টিকর
ব্রিটানিয়া গ্ল্যাক্সো মিল্ক বিকিস

লিনটাস-BBC.GLXME

॥ বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ॥

আগামী ১৬ই আগস্ট, বুধবার আমাদের দ্বিতীয় কাউণ্টারের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ৮৪।১ মহাত্মা গান্ধী রোডের উক্ত কাউণ্টার হইতে আমাদের প্রকাশিত যাবতীয় পুস্তক সাধারণ ক্রেতাদের শতকরা ১৫ টাকা এবং পুস্তক বিক্রেতা বন্ধুগণকে তাঁহাদের প্রাপ্য কমিশনের উপর অতিরিক্ত ৫% কমিশন দেওয়া হইবে।

এ সুবিধা কেবলমাত্র এ দিনের জন্যই

—সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ—

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
কথা কল্পনা কাহিনী ১৬৲

সুধীরনাথ ঘোষের
সুদূরের পিয়াসী ৮৲

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
রক্তের বিষ ৭·৫০

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের
অর্জুনের অজ্ঞাতবাস ১৫৲

বিমল মিত্রের
জন-গণ-মন ১৬৲

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের
বিভ্রান্ত ৮৲

সমরেশ বসুর
আনন্দধারা ৬৲

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
কীর্তিহাটের কড়চা
দুটি খণ্ডে সমাপ্ত ৬৫৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তর
অজ্ঞাতবাস ৯৲

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের
ফিরে ফিরে চাই ১৬৲

স্বামী জ্ঞানানন্দ ভারতীর
হিমারণ্য ৮৲

প্রমথনাথ বিশীর
নূতনতম ও বৃহত্তম উপন্যাস

পনেরোই আগস্ট
পনেরোই আগস্ট
পনেরোই আগস্ট
পনেরোই আগস্ট

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের (১৯০৫—১৯৪৬) [illegible] লেখা এই উপন্যাসে সুধীমাত্র যে আন্দোলনের ইতিহাস বিবৃত হয়নি, সেদিনের যে জীবনমরণপণ সংগ্রাম আবেগ, সমস্ত যন্ত্রণা সর্বস্বত্যাগের আনন্দ ও সামরিক বিফলতার বেদনা মূর্ত হয়ে উঠে সেই পটি [illegible] ও অবিস্মরণীয় স্বাধীনতা সংগ্রামকে পাঠকের মনের মধ্যে জাগ্রত ও জীবন্ত করে তুলেছে। লেখক [illegible] সুখপাঠ্য প্রসাদগুণে ব।টিতে কৌতুক ও কৌতুহলের সহাবস্থান ঘটায় এটি রুদ্ধশ্বাস পাঠ্য হয়ে [illegible] কাহিনীর প্রথমাংশ "বঙ্গভঙ্গ" নামে পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল। আলোচ্য গ্রন্থ তারই পরবর্তী পর্ব। আন [illegible] মূল্য পঁচিশ টাকা।

স্বাধীনতা দিবসে প্রকাশিত হচ্ছে

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিঃ-৭৩। ৩৪৮০৯১
৮৬।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ ৩৪৩৪৯২

শারদীয়

অমৃত ১৩৮৫

রবি ঠাকুরের পাগলা ফাইল

বদ্ধ উন্মাদ, প্যাগল ও ছিটগ্রস্তদের রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠি। কেউ চাইছে পেপের বিচি, কেউ চাইছে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার সোজা রাস্তা, কেউ পাঠাচ্ছে সোনালী চুলের গোছা। শত শত চিঠি। রবীন্দ্রনাথ কী করেছেন সেই চিঠির তাড়া নিয়ে? এবার পুজোয় সবচেয়ে বড় আকর্ষণ শান্তিনিকেতনের আদুঘর থেকে অমৃত-র জন্য বিশেষভাবে আনা অমিতাভ চৌধুরীর এই সুদীর্ঘ সচিত্র রচনা।

লেখক যখন প্রেমিক

তখন ডায়রির পাতায় এক একটি শব্দ মানে স্মৃতির শুকনো বকুল। একজন বিশিষ্ট বাঙালী লেখক মধ্য বয়সে নিতান্ত সামান্য বালিকার প্রেমে পড়েছিলেন। লেখকের নামটি পরে প্রকাশ্য। এবারের সেরা শারদীয় চমক।

দি লাস্ট মুঘল

বিষয় আত্মদর্শন। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের পরিচিতি। লিখেছেন আকাদেমির একদা সচিব প্রখ্যাত ভারতশিল্পী ভবেশ সান্যাল। তাঁর আঁকা ছবি এই লেখায় অতিরিক্ত আকর্ষণ।

নরবলি এখনও আছে

ওড়িশার গাঁয়ে ঘুরে নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন সংকর্ষণ রায় —ছবি আর ইতিহাসে নিপুণ ধারাবিবরণী।

ছবি, অবনীন্দ্রনাথ এবং রাণী চন্দ

একদা অবনীন্দ্রনাথ রাণী চন্দকে সঙ্গে নিয়ে ছবি আঁকতেন—যে রাণী চন্দ ইতিপূর্বে কখনও কোন শারদ সংখ্যায় কিছু লেখেননি। ঐ বিষয়ে এটি তাঁর প্রথম শারদীয় রচনা।

শিশির ও বিশ্বনাথ

দুই ভাদুড়ীর ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ
লিখেছেন মধুসূদন মজুমদার
রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত
চিরন্তন ভারতীয়ের মূল রূপটি তুলে ধরেছেন একটি প্রবন্ধে।
সাহিত্যিক আড্ডা ঃ সুমথনাথ ঘোষের কলমে

উপন্যাস লিখেছেন

আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী
বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় এবং শচীন দাশ
বড়গল্প লিখেছেন
বিমল মিত্র, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
লীলা মজুমদার, নবনীতা দেব সেন ..
গল্প লিখেছেন

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু, গ[redacted]র মিত্র, বুদ্ধদেব গুহ, পরিতোষ সেন, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ, শৈবাল [redacted] আরো এক ডজন তাজা গল্পকার।

কবি[redacted]

অরুণ মিত্র, অপীন্দ্র রায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত [redacted]র, আলোক সরকার, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, সুনীল [redacted], পরমানন্দ, সরস্বতী, শংকর চট্টোপাধ্যায় এবং আরো ২০ জন বিশিষ্ট কবি।

দাম দশ টাকা ॥ রেজিস্ট্রি ডাকযোগে অতিরিক্ত দু টাকা পঁচিশ পয়সা

আপনার কপির জন্য হকার বা এজেন্টকে এখুনি বলে রাখুন। অথবা
লিখুন—সার্কুলেশন ম্যানেজার, অমৃত পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। কলকাতা—৩

P 3৪,৭৬২

অমৃত
১৮ বর্ষ
১৪ সংখ্যা
২৫ শ্রাবণ
১৩৮৫
11 August 1978.

সম্পাদক ৩
সাহিত্য ইত্যাদি ৪ মণীন্দ্র রায়
প্রচার ও দুর্লভ ৫
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
সাহিত্য পুরস্কার ৭ শৈবাল মিত্র
বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
রাজধানীর ইনসাইড স্টোরি ৮
পর্যবেক্ষক
বেবতীভূষণের কার্টুন ৯
রাজনীতি কলকাতা স্টাইল ১০
বেদব্যাস বৈদ্য
চিঠিপত্র ১১
প্রচ্ছদ কাহিনী ১২
কলকাতা বন্দর
নবেন্দু ভট্টাচার্য
প্রচ্ছদ শিল্পী শৈবাল ঘোষ
টেলিগ্র্যাফের কল (গল্প) ১৪
তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
কবিতা ১০ শ্যামলকান্তি দাশ,
আশিস সান্যাল, শক্তিপদ ব্রহ্মচারী
সহাবস্থান (গল্প) ২১
নির্মলকুমার দাশ
তরণী পাহাড়ে বসন্ত (উপন্যাস) ২৪
শৈবাল মিত্র
মুরগী, বতি এবং (গল্প) ২৯
শুচিস্মিতা দাশগুপ্ত
ভারতীয় সঙ্গীতে যৌবন ৩২
সুধীন মিত্র
সোনার হরিণ নেই (উপন্যাস) ৩৫
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
যশোদা ওঝার দুঃখ (গল্প) ৪০
গৌতম ভট্টাচার্য
হাওয়া গাড়ি (উপন্যাস) ৪২
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
ফার্স্ট বুকের প্যারীচরণ ৪৬
কাজল মিত্র
সমালোচনা ২৯
চিত্তবিনোদনে অতুলপ্রসাদ ৫১
সোমেন্দ্রনাথ গুপ্ত
শাক্য রাজধানী কপিলাবস্তু ৫৫
গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত
খেলা ৫৭
বোম্বাই সমাচার ৫৮
চিত্রধ্বনি ৬০

আগামী সপ্তাহে
স্বাধীনতা সংখ্যা

নতুন যুগের জন্মের শিশু

মানুষের অগ্রগতির ইতিহাসে আরো এক নতুন অধ্যায় সংযোজিত হল। গত সপ্তাহে লণ্ডনের এক হাসপাতালে পৃথিবীর প্রথম টেস্ট টিউব শিশুর জন্মগ্রহণে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর ক্ষমতাই আরো একবার প্রমাণিত হল।

নবজাতিকার জননী মিসেস ব্রাউনের ৩০ বছরের মাতৃত্বহীন জীবনে বিজ্ঞানের এই নবতম অবদান অপরিমেয় আনন্দ এনে দিয়েছে। এবং সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বের অজস্র সন্তানহীনা নারীর হৃদয়ে জাগিয়ে দিয়েছে নতুন ভবিষ্যতের সম্ভাবনা।

ডঃ প্যাট্রিক স্টেপটো এবং ডঃ বরার্ট এডওয়ার্ডস অবশ্য মিসেস ব্রাউনের ঐ শিশুটি জন্ম নেবার বার বছর আগে থেকেই গবেষণা করছিলেন, টেস্ট টিউব শিশুর জন্মকে সম্ভব করে তুলতে। পৃথিবীর বহু খ্যাতনামা বিজ্ঞানী যেমন সকৌতূহলে তাঁদের পরীক্ষার ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য রাখছিলেন, তেমনি কেউ কেউ আশঙ্কাও প্রকাশ করছিলেন। ডাঃ ম্যাকস পেরুৎস নামে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী এক বিজ্ঞানী ডঃ স্টেপটো ও ডঃ এডওয়ার্ডকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, তাঁদের ঐ পরীক্ষার ফলে যদি কৃত্রিমভাবে জন্ম-দেওয়া ঐ শিশু বিকৃত দেহ বা অস্বাভাবিক কোন বৈলক্ষণ্য দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহলে গবেষক দুজন মানবতার দরবারে অপরাধী হয়ে থাকবেন। বলা বাহুল্য ডাঃ পেরুৎস-এর এই হুঁশিয়ারীতে বিজ্ঞানীদ্বয় দ্বিধাগ্রস্ত হন নি, এবং পরীক্ষার কাজও থেমে যায় নি। কেননা, অনেক রকম বৈজ্ঞানিক গবেষণারই প্রাথমিক স্তরে অজস্র রকমের বিপদের সম্ভাবনা থাকে এবং অনেক সময় তা ঘটেও। কিন্তু সূচনার ঐ অসাফল্যের ওপরই গড়ে ওঠে সফল-সমাপ্তির জয়স্তম্ভ।

অবশ্য মিসেস ব্রাউনের শিশুটি স্বাভাবিক শিশুর মতই সব দিক থেকে যথাযথ, এবং স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে উঠছে সে। প্রথম মহাকাশে পাড়ি দিয়ে যেমন নভশ্চর গ্যাগারিন চিরস্মরণীয়তা অর্জন করছেন, মাতৃজঠরের বাইরে নিষিক্ত ভ্রূণ থেকে জন্মগ্রহণ করা ঐ নবজাতিকাও সেই রকম বিজ্ঞানের ইতিহাসে কেতনচিহ্ন হিসেবে গণ্য হবেন।

এই প্রসঙ্গে কোন কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে টেস্ট টিউবের মধ্যে মানব শিশুর জন্মকে অনৈতিক বলে যে আপত্তি জানিয়েছেন, তার কোন বাস্তব ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না। কেননা, স্বামীর শুক্রাণুকে কৃত্রিমভাবে স্ত্রীর জরায়ুতে ডিম্বাণুর সঙ্গে যুক্ত করে তাকে নিষিক্ত করার প্রথা তো আগে থেকেই চলছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে স্বামীর সম্মতিতে অন্য কোন শুক্রাণু দিয়েও স্ত্রীর ডিম্বাণুকে মাতৃগর্ভে নিষিক্ত করা হয়েছে। আমাদের দেশেও তো [illegible] জাতীয় ব্যবস্থার রকমফের হিসেবে নিয়োগপ্রথা প্রচলিত [illegible] আগে। এবং কোন ক্ষেত্রেই কেউ তাকে অনৈতিক বলেন [illegible] কাজেই উপরোক্ত ঐ আপত্তি যে যুক্তিসহ নয়, তা বলাই বাহুল্য।

কৃত্রিমভাবে জাত ঐ মানব শিশুটি চিকিৎসাবিজ্ঞানের সামনে কত নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিল, সেটাই বরং এখন অনুধাবন করে দেখার মত।

সাহিত্য ইত্যাদি...

মফঃস্বলের লেখক

বাইরে থেকে মাঝে মাঝে অল্পবয়সী লেখকরা এসে অনুযোগ করেন, তাঁদের কথা ভাবি না আমরা, তাঁদের লেখা পড়ি না।

কথাটা ঠিকও বটে আবার ঠিকও নয়।

ঠিক কেন সেই প্রসঙ্গটি আগে ফয়সালা করে দিই।

প্রথমত কলকাতার যাঁরা লিখছেন তাঁদেরও সব লেখা পড়া হয় না। প্রতি সপ্তাহে নতুন কাগজ, নতুন লেখক। কাগজ বার করার অসুবিধের কথা ভাবলে অবাকই লাগে, সম্পাদকদের অধ্যবসায় দেখে। তবু সব কাগজের সব লেখা নিছক সম্ভব নয় বলেই পড়া হয়ে ওঠে না।

দ্বিতীয়ত, এবং এটাই অনেক সময় সব থেকে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়, নতুন লেখকদের একটা বড় অংশ এত বেশি অস্থির যে লেখাটা ঠিক মতো হয়ে ওঠার আগেই প্রকাশের জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। ফলে ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়ায় অনেকটা সাজঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে নাট্যরসের আস্বাদ নেবার মতো।

অবিশ্যি কথা উঠতে পারে, কলকাতায় কি এ রকম লেখা বেরোয় না? বেরোয় বই কি! কিন্তু সংখ্যার অনুপাতে কম। কলকাতায় যদি দশটা লেখার মধ্যে চারটে হয় কাঁচা তো বাইরের নতুন লেখকদের দশটা লেখার মধ্যে সাতটাই অসার্থক।

তৃতীয়ত, বাইরের লেখার মধ্যে অভ্যস্ত ধাঁচের লেখার সংখ্যাও বেশি। কবিরাই এ ব্যাপারে বেশি জড়িত। লেখবার সময় তাঁর অব্যবহিত আগেকার কোনো জনপ্রিয় কবির সাফল্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁরই লেখার ঢঙ, এমনকি তাঁর এটিচ্যুড পর্যন্ত নিজের বলে গ্রহণ করে থাকেন তাঁরা। ফলে লেখাটি হয় কলে ছাঁটা চালের মতো খাদ্য প্রাণহীন এবং বিস্বাদ। সে লেখা পড়তে যদি রুচি না হয় কারো, দোষ দেওয়া যায় না বোধহয়।

কিন্তু তেতো ওষুধ এই পর্যন্তই। গুণের কথাটা বলি।

বছর কয়েক আগে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের জন্যে আগরতলায় গিয়েছিলাম। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে কবিতার উপর কিছু বলতে হয়েছিল। আগের দিন বিকেলে কয়েকজন স্থানীয় কবির সংকলিত কবিতার একটি বই হাতে এসেছিল। লেখকদের নাম মনে পড়ছে না এখন। কিন্তু বেশির ভাগই ভালো লেখা—চমৎকার বসোত্তীর্ণ কবিতা। সেকথাও উল্লেখ করেছিলাম আমার ঐ ভাষণে। বলেছিলাম, বঙ্গদেশ থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্নভাবে বাস করলেও, ভাষা-সাহিত্যের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের আমরা আর ত্রিপুরার কবিসাহিত্যিকরা একই জায়গায় রয়েছেন। তার প্রমাণ তাঁদের তরুণ লেখকদের কবিতা। কলকাতায় আমরা যেমন স্তরের কবিতা দেখি, এ কবিতা তার সমান স্তরের। বরং এখানকার লোকসংখ্যা এবং শিক্ষিত মানুষের অনুপাতের দিক দিয়ে তুলনা করলে বলতে হবে, ভালো কবিতা ত্রিপুরাতেই হয়তো বেশি।

ত্রিপুরার ছেলেরা যে কী পরিমাণ খুশি হয়েছিলেন সেটা টের পেলাম পরদিন বিকেলে। ইতিমধ্যে আগরতলার এক কাগজে বড় হেডলাইন দিয়ে ফলাও করে বেরিয়েছিল বক্তৃতাটির সারমর্ম। সভামণ্ডপের পেছনে তরুণ কবিদের কারো কারো নতুন কবিতা পড়তে হল এবং কৃতজ্ঞতা পিঠে হাত রেখে বোঝাতে হল, আমি যে তাঁদের আমন্ত্রণ মতো আরো দিন কয়েক থেকে যেতে পারছি না আগরতলায়, সেজন্যে আমার দুঃখও কম নয়।

হ্যাঁ, দুঃখিত হয়েছিলাম তাঁদের সঙ্গে আরো দিন কতক কাটিয়ে আসতে না পেরে। এর মধ্যে কোনো বানানো কথা নেই। নির্ভেজাল সত্যি।

কলকাতার বাইরে যখন কোথাও ভালো লেখা দেখি, সত্যিই মনটা আলোড়িত হয়ে ওঠে। আর শুধু আজ নয়, চিরকালই।

এইভাবেই তো একদিন চমকে উঠেছিলাম নৈহাটির এক নবযুবকের 'মরশুমের একদিন' বলে একটা গল্প পড়ে। সমরেশ বসুর সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়—সামনে নয়, লেখায়। আর দেখা মাত্র ভালবাসা। তারপর তাঁর সঙ্গে আলাপ হল, দিনে দিনে সে ভালোবাসা গভীর হল। বাংলা-সাহিত্যে সমরেশ বসু একালের একজন প্রথম শ্রেণীর লেখকের সম্মান পেলেন। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তখনো তিনি রয়ে গেলেন মফস্বলের মানুষ। নৈহাটিকে পরিত্যাগ করলেন না। বরং মফস্বলকে আপন করে নিতে পেরেছেন বলে ছড়িয়ে যেতে পারলেন বিশাল আমাদের এই দেশের গ্রামে-গঞ্জে, নদীতে-মেলায়—দেশের মানুষকে এমন করে চিনলেন।

সমরেশকে দেখার পর মফস্বলের লেখকের বিষয়ে নতুন করে ভাবতে শিখেছি। এবং তার ফলে লেখকদের কোনো উপকার না হলেও উপকৃত হয়েছি আমি নিজেই।

এইভাবেই আমি দেখতে পেয়েছি সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের প্রথম গল্প 'বন্যা'। মুর্শিদাবাদের এই লাজুক ছেলেটি হয়তো আরো কতোদিন আলকাফের দলে গান বাঁধতেন, বা কবিতা লিখতেন। কিন্তু ভালো একটি গল্প লিখে নতুন এক পরিচয় পেলেন, নিজের, আর আমাদেরও দেখিয়ে দিলেন রাঢ় অঞ্চল-এর একটা অচেনা দিক।

আরো কতো লেখক, কতো কবির নাম মনে পড়ে মাঝে মাঝে। কতো অজানা জীবন, অচেনা মানুষকে সামনে এনেছে তাঁরা। বাংলা ভাষাকে কতো নতুন চিত্ররূপে সাজিয়েছেন, নতুন মনোভাবে আলোকিত করেছেন। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তরুণ থেকে তরুণতম পর্যন্ত সকলের কাছেই আমি ঋণী। তাঁদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা মানে তো নিজেকেই খতম করে দেওয়া, তাই না!

বাইরের লেখকদের কাছে তাই আমার নিবেদন, তাঁরা অধৈর্য হবেন না, ক্ষুব্ধ হবেন না। সকলে হয়তো তাঁদের লেখা পড়েন না, কিন্তু কেউ কেউ পড়েন, নিশ্চয়ই পড়েন।

তাঁদের কথা ভেবেই না হয় তাঁরা লিখুন। আরো একটু মন দিয়ে লিখুন, নিজের মতো করে লিখুন। আমরাও তাঁদের নিজের করে নেব।

মণীন্দ্র রায়

নিতান্তই লজ্জাকর

অমৃতে (২৩শে জুন) প্রকাশিত বোলান গঙ্গোপাধ্যায়ের অবক্ষণীয়া নিবন্ধটি পড়ে ভাল লাগল। সভ্যতার বড়াই করেও আমরা কিন্তু কিছু কিছু বদভ্যাস এখনও পরিত্যাগ করতে পারি নি এবং সংক্রামক ব্যাধির মতই দীর্ঘকাল ধরে তা বহন করে আসছি। মেয়ে দেখার নাম করে পাত্রীর ওপর এখনও আমরা অত্যাচার করে চলেছি। বে, কায়দাটা একটু পালটেছে মাত্র। বি-এ পাশকরা মেয়েকে তার নাম বাবার নামটা কাগজে লিখে দিতে বলা এম-এ পাশকরা মেয়েকে সুকেতা রাজন ফর্মুলা জিজ্ঞাসা করা যে নিতান্ত লজ্জাকর—এবং মেয়েটিকে নিগ্রহেরই সামিল তা বোধ করি ইন্টারভ্যুয়ের সদস্যরা ভুলে যান কিংবা হঠাৎ পরীক্ষক হওয়ার সুযোগ কেউই আমরা হাতছাড়া করতে চাই না। উপরন্তু মেয়ের সামনেই লজ্জাহীনের মত বলা আপনার মেয়ে তো বেশ কাল, তা নিতান্তই অসভ্যতা বা মেয়েকে চরম অপমান করা, আমরা সেটা ভুলে যাই। আর এও দেখা গেছে দেনা-পাওনা নিয়ে মারাত্মক রকমের দরাদরি। অবশ্য টানাটানিতে পাত্রপক্ষই শেষ পর্যন্ত হার হন। কিন্তু পাত্রপক্ষ মোটেই ভাবেন না কি নিদারুণ ঘৃণাই না মেয়েটির মনে হয়। বর্তমান যুগে পাত্রপক্ষের এই ঘৃণ্য মনোবৃত্তি অবশ্যই ত্যাগ করা উ

—অমিতাভ মোদক, চন্দননগর, হু

প্রচুর ও দুর্লভ

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বেশ একটু বিস্মিত হয়ে পড়েছি।

সুদূর দাক্ষিণাত্যের একটি বড় তীর্থ-স্থান। তীর্থপতি নটরাজ শঙ্কর। দিবা-কালীন পূজা শেষ হয়ে এসেছে, এবপর বেশ কিছুক্ষণ কপাট বন্ধ থেকে, একেবারে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে আরতি।

শঙ্করের পূজা, উপাচারের আড়ম্বর, আদৌ নেই। দুটি আলোচাল, বিল্বপত্র—একটি হলেও চলে; আর একটু গঙ্গাজল। এর একটু চাই-ই চাই, নৈলে পূজা নিষ্ফল। শঙ্কর কোথায়, আর গঙ্গা কোথায়। ভক্তরা যা একটু যোগাযোগ ঘটাতে পারে।

উত্তর ভারতের যাত্রী যারা পারলে বয়ে আনতে তারা পারলে, নয়তো এখানেও ব্যবস্থা আছে। ফটকের বাইরে, আর সব উপচারের সঙ্গে গঙ্গাজলের ছোট, বড়, মাঝারি শিশি, এক ধরনের অস্বচ্ছ কাচের, কলসীর আকারের। অত্যন্ত মহার্ঘ। হয়তো সিকি ছটাকের সিকিও জল ধরে না এমন একটা শিশির মূল্য একটাকা।

আমার বিস্ময়টা কিন্তু এর জন্য নয়, হই না কেন গঙ্গার দেশের মানুষ। দেখছি একটি ভদ্রলোক ক্ষুদ্রতম একটি শিশি কেনবার জন্য অতিরিক্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। আমার যখন নম্বর পড়ল তখন যেন দর করেই দোকান থেকে বেরিয়ে এসে নিরুপায়ভাবে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করছিলেন, হঠাৎ এগিয়ে মেয়েপুরুষের একটি ছোট যাত্রিদলের সামনে গিয়ে হিন্দীতে কি বললেন। একটু চাপা গুঞ্জন স্বরে। পূজার শেষ সময়ের হট্টগোল, তাছাড়া একটু দূরেও রয়েছি, শোনা গেল না। তবে, ভদ্রলোক তখনই ডান হাতটা নিজের পকেটের মধ্যে গলিয়ে দিয়ে বাঁ হাতের তর্জনীটা উঁচিয়ে ধরায় বুঝলাম, ভিড়ে পকেট কাটা গেছে, একটি টাকা সাহায্য চান। একটি যে ক্ষুদ্র গঙ্গাজলের শিশির জন্য এটুকু বোঝাতে তর্জনীর ঊর্ধ্বাংশ চিহ্নিত করেও দেখাচ্ছেন। ওরা না বোঝায়, বা, গা না করায় আরও দু তিন জায়গায় চেষ্টা করলেন, একরু বা সদল, কথাও কখনও হিন্দী, কখনও ইংরাজী। নিষ্ফল হয়ে আবার ব্যাকুলভাবে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে হতাশ হয়ে এদিক-ওদিক চাইতে লাগলেন—কখনও মন্দির, কখনও আকাশ। আকাশের আলো কমে আসছে, মন্দিরের শেষ ভিড় চাপ বেঁধে উঠছে।

আমার বিস্ময় এর জন্যও নয়, বা, যেটুকু ছিল, ওঁকে অবস্থা বুঝতে পেরে সেটুকু কেটেও গেছে। আমার বিস্ময়ের কারণ সম্পূর্ণ আলাদা, কিন্তু কবে, কোথায় কিভাবে ব্যাপারটা ঘটেছিল কোন মতেই স্পষ্ট করতে পারছি না, এবং সেই জন্যই অত্যন্ত অন্যমনস্ক হয়ে পড়ায় একটু বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি। নয়তো, চেহারায়, সাজগোজে বাঙালীই বুঝতে পেরে আমারই এগিয়ে গিয়ে সাহায্য করার কথা।

চিন্তার মধ্যেই হঠাৎ যেন বিদ্যুৎ ঝলকে সমস্ত চিত্রটা আমার স্মৃতিতে স্পষ্ট হয়ে উঠল; পরিবেশের আমূল পরিবর্তনেই স্মরণে আসছিল না। ঠিক এই সময় উনি কি ভেবে যেন শেষবারের মতো মন্দির আর আকাশের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে দ্রুতভাবে সামনের দিকে পা বাড়াতে আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বললাম—'একটু শুনবেন?'

উনি চমকে উঠে ঘাড় ফিরিয়ে দাঁড়ালেন, প্রশ্ন করলেন—'আপনি, আপনি বাঙালী?'

বললাম—'হ্যাঁ। মনে হচ্ছে পকেট কাটা নিয়ে বিপন্ন হয়ে পড়েছেন।'

'হ্যাঁ....বিপন্নই বৈকি. আপনি....'

হঠাৎ থেমে গিয়ে এমনভাবে চাইলেন, বুঝলাম, বাঙালী, সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করে থাকবে, তাই লজ্জিত হয়ে পড়েছেন। আমি ওদিকটা চাপাই দিয়ে বললাম—'বিপন্ন—অর্থাৎ নটরাজের মাথায় একটু তো গঙ্গাজল দিতে পারছেন না। আর, সময়ও হয়ে এল।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ. আর যেখানে উঠেছি নিয়েও যে আসব টাকা তার সময় নেই। তবু ভাবছি, দেখি না হয় একবার চেষ্টা করে...'

ঘুরতেই যাচ্ছিলেন, প্রশ্ন করলাম—কতটা সময় নেবে?'

'তা আশা নেই....তবু....'

'আমি যদি দিই, আপত্তি আছে? এসব জায়গায় তো এরকম আখছারই হচ্ছে।'

'আপনি দেবেন? ...তা দিন—তা দিন। তীর্থস্থানে—তাঁর দোরগোড়ার যদি ভিক্ষা করানোই নটরাজের বাসনা হয়ে থাকে দিন আপনি, নোব—নোব...' বলতে বলতেই দুহাতে মুখ ঢেকে হুহু করে কেঁদে উঠলেন।

বললাম—'আপনার সে দুঃখই বা তিনি থাকতে দেবেন কেন? আমি সঙ্গে গিয়ে নিয়ে আসতে পারতাম সদ্যসদ্য, কিন্তু আজই চলে যাচ্ছি এখান থেকে, গাড়ির দেরিও নেই আমার। তা বেশ, তীর্থস্থানের ঋণ নাই বা রাখলেন; ঠিকানা দিচ্ছি, বাড়ি গিয়ে পাঠিয়ে দেবেন।'

প্রশ্ন করলাম—'কত গেছে আপনার?'

'গেছে মানে, কপাল দোষে আজ একটু বেশি নিয়েই বেরুই। আপনি কিন্তু একটি টাকাই দিন, সবচেয়ে ছোট শিশির যা দাম।'

'আমি বলি কি, বিদেশ-বিভূঁই, কিছু বেশি করেই রেখে দিন না।'

'আমার তো একটি টাকাতেই চলে যাচ্ছে, তাই কিনে চড়িয়ে দিই। ঐতেই সন্তুষ্ট থাকুন। হবে থাকতে; যা বাধা এনে ফেলেছেন পদে পদে বাবা, যা লজ্জায় ফেলেছেন।....তাছাড়া গঙ্গাজলই তো—ভাগবৎগীতা কিঞ্চিদ্ধিতা, গঙ্গাজল ইব কণিকাপীতা....'

—ম্লানভাবে হাসবার চেষ্টা করতে গিয়ে চোখদুটি আবার ছলছল করে উঠল।

বললাম—'নেশার ঘোরে তাণ্ডবনাচ, নিজের তাল সামলাতে পরের তাল থাকছে, কি, কাটছে খেয়াল থাকে না তো। আপনি বরং একটু ভালো করেই জল ঢালুন মাথায়।'

হেসেই ফেললেন। চাদরের খুঁটে চোখের জল মুছে নিয়ে বললেন—'এত দুঃখেও হাসিয়ে দিলেন আপনি; ....তা, দিন তাই, এও তো তাঁরই দয়া।'

নোটবুকে ঠিকানাটা লিখে, পাতাটা ছিঁড়ে নিয়ে একটা পঞ্চাশ টাকার নোটের সঙ্গে হাতে দিয়ে বললাম—'যান তাড়াতাড়ি, আর সময় নেই।'

এবার আসল বিস্ময়ের কথায় আসা যাক।

চেহারা কণ্ঠস্বরে কোন সন্দেহ ছিল না, তার ওপর উনি একটু জিদ করেই নিজের ঠিকানাটাও লিখিয়ে দিতে সমস্ত ব্যাপারটা একেবারে পাকা হয়ে গেল। হ্যাঁ, এই নৈহাটীই। আর, এই ভদ্রলোকই যে, তাতেও কোন ভুল নেই। ফেরিঘাটের নৌকা, হুগলী যাব। একটি ভদ্রলোক উঠে নৌকায় পা দিতে ছৈয়ের মধ্যে থেকে একজন নাম ধরে ডেকে নিলেন। এই নাম। আমি বাইরেই বসে ছিলাম, আমার পাশ দিয়ে ভেতরে চলে গিয়ে ওঁর কাছে বসলেন।

বর্ষার গঙ্গা, তার আগের দিনই পূর্ণিমার কোটাল গেছে, কূল ছাপিয়ে চারিদিকেই ছড়িয়ে পড়েছে নদী। যখন অর্ধেকটার ওপর পেরিয়ে এসেছি, হঠাৎ কানে গেল—'মা যে এবার আবার কী কাণ্ড করবেন!'

বাইরেই বেশি লোক। ছৈয়ের মধ্যে মাত্র চার পাঁচজন, পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে, বোধহয় একটু বেশি অন্তরঙ্গই। বিড়ির ধোঁয়ার সঙ্গে একথা সেকথা নিয়ে গল্প হচ্ছিল, মাঝে মাঝে কানে যাচ্ছিল, কখন গঙ্গার প্রসঙ্গে এসে পড়েছে। মাঝখানে এসে আরও একটা বিঘাটতর দিকচক্র নিয়ে নদীর থমথমে ভাব। বড় বড় ঢেউ উঠছে। দোলা লাগছে।

'আপনাদের মার আর কাজ কি? যা করতে আছেন—সৃষ্টি ভাসিয়ে দেওয়া।'

এতক্ষণ কানেই যা যাচ্ছিল, এবার নজরটা গিয়ে পড়ল ভেতরে। হাতে বিড়ি মুখে একটা ব্যঙ্গ-তাচ্ছিল্যের ভাব। গত বর্ষার কথা। বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ মনে হয়েছিল, তার চেয়ে খুব বেশি এগিয়েছেন যে, এমন নয়।

মনটা একটু ঐদিকে গিয়ে পড়ল। একজন বললেন—'একটু খাতির রেখে কথা বোল হে।'

অন্ধ প্রকৃতি, কখনও ভাঙছে, কখনও গড়ছে, তার আবার খাতির কি? বিজ্ঞান

হলছে—তার এই ধ্বংসের শক্তিটাকে কেড়ে নিয়ে দুজনের শক্তিটাকে কাজে লাগাতে হবে। নেচার ইজ টু সার্ভ ম্যান; যেখানে যেমন। তোমাদের গঙ্গা, তেমনি ওদের রাইন, তাদের নাইল। দেখে এসো, কীভাবে খাটিয়ে নিচ্ছে।'

'খাটতে মাকেও হয়; তা বলে কি....'

'বুঝেছি, তা বলে কি মা আর মাসি-পিসিকে এক সারিতে এনে ফেলতে হবে? তার সঙ্গে....থাক্, আরও চটবে।'

—হেসে উঠলেন। বিড়িটা জলে ফেলে দিয়ে বললেন—'না ভাই, মন কিছুতেই সায় দেয় না।'

'আমাদেরই সায় দেয় না শুধু।' —অন্য একজন মন্তব্য করলেন।

—'সেদিন দেখেছিলাম—কে একজন বিদেশী—ইংরাজ, এমরিকান, বা জার্মান জন্তু বলছেন—গঙ্গার উদ্দেশ্যেই—সি নট ওনলি কিনানেস বাট অলসো পিউরি-ফাইস।

'বলতে পারেন। কিন্তু আমি তো বলব—তিনি পিওর হয়েছেন, তাঁর মনটা পিওর বলে। মনের একটা সূক্ষ্ম শক্তি আছে, সে নিজে সূক্ষ্ম বলেই—এই বিরাট, স্থূল, অন্ধ শক্তি, যে নিজের পিওরিটিই রক্ষা করতে পারছে না তার মধ্যে এমন একটা সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক শক্তি লুকিয়ে থাকতে পারে....চলো, পারঘাট এসে গেছে।'

সবাই বেরিয়ে এসেছেন। মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটু ব্যঙ্গের হাসি হেসেই চাপা স্বরে বললেন—'কি হে দেখতে পাচ্ছ তোমাদের সেই সূক্ষ্ম শক্তি? পিউরি-ফাইস ওঃ!'

দুটো দিনের অভিজ্ঞতার মধ্যে কোন মিল খুঁজে পাচ্ছি না, সামঞ্জস্য করে উঠতে পারছি না। বিশেষ করে যেমন বিশ্বাসে তেমনি অবিশ্বাসে দুটোই এত স্পষ্ট যে, মাঝে মাঝে মনে এমন একটা সমস্যা সৃষ্টি করেছে যে, একটু শান্তি পাচ্ছি না। একটা যেন কি সূত্র আছেই, কিন্তু ধরা দিচ্ছে না।

বয়সটাই এমন—এই বয়সে মনটা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মধ্যে দোলা খায়, তারপর অনেকেই হঠাৎ বিশ্বাসের দিকেই ঝুঁকে পড়ে। তাই কি? অনেকে আবার বিশ্বাসটাকে অবিশ্বাসের কঠিন বর্মে লুকিয়েও রাখে। সেটা নাকি এক ধরনের সাধনার অঙ্গও। তাও তো হতে পারে।

মন কিন্তু কোনটাকেই নিতে পারছে না।

তারপর একদিন হঠাৎই পেয়ে গেলাম সমাধানটা।

তার যশটা নিল 'বটতলা সৎসাহিত্য প্রচারিণী লিমিটেড।' যেমন তাঁবাটে কাগজ, তেমনি ছাপা, তেমনি বাঁধাই। সর্বোপরি তেমনি বিষয়বস্তু। বই খুলে দু' পাতাও এগুনো যায় না।

তবে, আবার তারই মধ্যে 'বিদ্যাসুন্দর'-এর সঙ্গে 'অন্নদামঙ্গল', 'হরিদাসের গুপ্ত-কথা'র সঙ্গে 'হর-পার্বতী সংবাদ' আছে। সে আবার বেশ কৌতূহলজনক। পার্বতী একেবারে সেকেলে অক্ষরজ্ঞানহীনা মঙ্গলনা, সৃষ্টি-রহস্যের 'অ-আ-ক-খ'ও জানেন না। শিব প্রশ্নোত্তরছলে তাঁকে জ্ঞান দিয়ে যাচ্ছেন। বেশ সুড়সুড়ি দেয় মনে। একখানা হাতে পড়ে গিয়েছিল, পুরনো ছেঁড়া বই। ওলটাতে ওলটাতে এক জায়গায় এসে শুধু দেবীর নয়, তার সঙ্গে যেন আমার সমস্যাও মিটিয়ে দিচ্ছেন শিব।

আদ্যোপান্ত দরকার নেই; শুধু সেই-টুকুই এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

'পার্বতী ।। কিন্তু নাথ, আমরা যে নিজেদের সৃষ্টির মধ্যে নিজেদের ছড়িয়ে দিয়ে আছি: জলে-স্থলে-আকাশে, সর্বত্রই, অণু-মাত্র লুকিয়ে না রেখে। তাহলে এরা আমাদের তার মধ্যে চিনে নিতে পারছে না কেন? আমি জড়বুদ্ধি নারী, এ বিষয়ে আমার সংশয় দূর করুন প্রভু।'

শিব ।। (অনন্তচৈতন্যময়ীর এবংবিধ মূঢ়তার অভিনয়ে ঈষৎ হাস্য সহকারে) দেবী, ঐখানেই আমাদের ভুল হয়েছে। আমরা নিজেদের সৃষ্টির মধ্যে এত পূর্ণভাবে ওতঃপ্রোতঃ না হয়ে যদি সূক্ষ্মরূপে নিজেদের সংহরণ করে রাখতাম তো আমাদের এত অমর্যাদা হোত না। মানুষের জিজ্ঞাসা, কৌতূহল, ভক্তি, শ্রদ্ধা—যাই বল, তা ভাবে নয়, অভাবে, সুলভে নয় দুর্লভে, প্রকটে নয়, অপ্রকটে। তাই তারা বিরাটের মধ্যে আমাদের খুঁজে পায় না। তাই ভাব থেকে অভাবের দিকেই ব্যাকুল তৃষ্ণ নিয়ে ছোটে তারা—কোথাও এক টুকরো প্রস্তর খণ্ড, কোথাও কোন গহ্বর, কোথাও বা প্রাচীরের চতুষ্কোণে আবদ্ধ খানিকটা শূন্যতা মাত্র।'

(অতঃপর পরিহাসছলে)—'সুতরাং এসো, এদের পূজা পেতে হলে আর আমরা নিজেদের এত পরিব্যাপ্তভাবে ছড়িয়ে না রেখে....'

এরপর প্যাতাটা কোণাকুপি—একেবারে ছিঁড়ে যাওয়ায় পরিহাসটা পুরোপুরি রে কি তা বোঝা গেল না।

তবে, আমার সে অস্বস্তিটা মিটে গেছে। মুক্ত, অনন্তপ্রসারিত সেদিনের বিরাট গঙ্গা, আর ক্ষুদ্র-শিশি-বন্দিনী কয়েক বিন্দু গঙ্গাজলের রহস্যটা আর তেমন কিছু রহস্য নয় আমার কাছে।

সাহিত্য পুরস্কার

সাহিত্যিক বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়, নাট্যকার মনোজ মিত্র আরো কয়েকজন সাহিত্য পুরস্কার পেলেন অমৃতবাজার-যুগান্তর, মৌচাক প্রসাদ ও শৈব্যা পুস্তকালয় প্রভৃতি সংস্থা থেকে।

পুরস্কৃত লেখকদের রচনার কৃতিত্ব নিয়ে এই লেখায় আলোচনার সুযোগ কম। মনোজ মিত্রের নাটক, বিশেষতঃ চাকভাঙা মধু থেকে অতি সম্প্রতি সাজানো বাগান যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা জানেন মনোজ মিত্র কি জিনিস! যুরোপে জুমালে অসবোর্ণ বা হোকুথের মতো তাঁকে নিয়েও হৈ-চৈ হয়ে যেতো। তাঁর নাটকের সেই বিখ্যাত মোচড়গুলো এখনো সবসময়ে অনুভব করি। তাঁর নাটক দেখে সদাই মনে হয় যে, হাসি আর কান্নার সঙ্গে আসল ফারাকটা কি? 'বাহিরে যবে হাসির ছটা ভিতরে থাকে আঁখির জল।'

তিনিই এসময়ের সবচেয়ে ক্ষমতা-বান মৌলিক নাট্যকার। সমাজ জীবন এবং গোটা মানুষকে তিনি ধরেছেন। এ মানুষ বাম বা ডান চোখে দেখা মানুষ নয়। দুচোখে দেখা আস্তো মানুষ। মানুষের বাচ্চা মানুষ। তাই অনুবাদ, এ্যাবসার্ডিটির ভান কিংবা মেকী বিপ্লবের হুমকি তাঁর নাটকে নেই অথচ তাঁর মতো সমস্ত সচেতন, উদার, দরদী, রসিক নাট্যকার এ সময়ে আর কেইবা আছেন?

জীবন এবং পৃথিবী সম্পর্কে পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহ এবং অনুরাগ কম নয়। এ ভালোবাসা লোক দেখানো ফাঁকা দরদ নয়। রক্ত, ঘাম, পরিশ্রমে অর্জিত একটা অনুভূতি। প্রায় বিশ বছর নিজের মনে কবিতা লিখছেন। তিনি ইচ্ছে করলে তথাকথিত স্থাবরের স্তাবকতা করে সুযোগ সুবিধা পেতে পারতেন। তিনি তা করেন নি।

পবিত্র বাঁধাধরা ছক কিংবা বক্তব্যের শিল্পী নন। তাঁর কবিতায় চালাকি

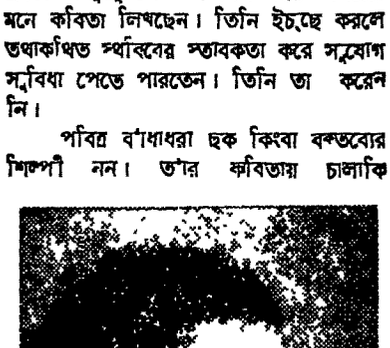

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

কিংবা অবহেলা নেই। সবচেয়ে বেশী অসন্তুষ্ট, অতৃপ্ত এবং পরিশ্রমে অনলস কবির নাম পবিত্র মুখোপাধ্যায়।

এমন কিছু মানুষ আছেন, সাদামাঠা বিচার এবং মাপকাঠিতে যাঁরা আসেন না। তাঁদের সম্পর্কে চটপট কোনো সিদ্ধান্ত নিলে বিপদে পড়তে হয়। বরেন গঙ্গো-পাধ্যায় সেই জাতের ব্যক্তিত্ব। তাঁর লেখারও এই চরিত্র। আবেগ, উচ্ছ্বাস এবং ন্যাকামির জগতের লোক তিনি নন। যুক্তি এবং বুদ্ধি তাঁর গল্প, উপন্যাসের মূল উপাদান।। পাঠকদের নিশ্চয়ই তোপ, কালবেলা, ক্ষুধা বা দধীচির হাড় ইত্যাদি গল্পের কথা মনে আছে। কিংবা সেই স্বয়ংসিদ্ধ উপন্যাস নিশীথ ফেরি। তাঁর গল্প উপন্যাস পড়ে পাঠকের বুকের মধ্যে জ্বালা করে। সেই অর্থে তিনি জননন্দিত নন। তাঁর গল্প, উপন্যাসের বই-এর সংস্করণ হয় না।

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

ইচ্ছে করলে তিনি ছেলেভুলোনো প্রেমের গল্প অথবা ছকে বাঁধা সিনেমা স্ক্রিপ্টের মাস্টার প্লটের টেলার হতে পারতেন। কিন্তু স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ো, ভ্রাত খোয়াননি। সস্তায় বাজিমাৎ করার চরিত্র তাঁর নয়। তাই পুরস্কার পেতে অনেক দেরী হয়।

মৌচাক পত্রিকা পুরস্কার পেয়েছেন পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়। পরলোকগত যোগীন্দ্রনাথ গুপ্ত পেয়েছেন রণজিৎ স্মৃতি পুরস্কার।

শৈবাল মিত্র

পয়সার জন্য সাহিত্য নয়

একেবারেই শিশুকাল বলতে যা বোঝায় ঠিক সেই অবস্থা। সবে যুক্তাক্ষরের হোঁচট সামলে একটু ভদ্রগোছের 'রিডিং' পড়তে শিখেছি। এক বাদলার বিকেলে বাড়িবন্দী অবস্থায় হাতে এল একখানা বই। নামটাও সরেস—'সব সরেস'। বেশ কিছু ছেলেদের ভাল লাগা গল্প জড়ো করা ছিল সে-বইখানার বড়-চঙে দু-মলাটের ভেতরে। সব কটাই সরেস গল্প ছিল কি না বলতে পারব না, তবে

বিশু মুখোপাধ্যায়

একখানা গল্প যে সরেস ছিল তা হলফ করে বলতে পারি। গল্পটির নাম বুনো। 'গা-গাঁ' নামে একটি বুনো মোষকে নিয়ে লেখা। শিশুকালের সেই সবে পড়তে শেখা মেজাজটাকে বেমালুম জবর দখল করে তিরিশের কোঠা ছাড়ানো বয়স অবধি মৌরসী পাট্টায় টিকে থাকার ক্ষমতা যাঁর অনায়াস দখলে তাঁর শক্তিতে শ্রদ্ধা রাখতেই হয়। সেই শক্তিমান লেখকটি ছিলেন বিশু মুখোপাধ্যায়।

এই বছর সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য অমৃতবাজার, যুগান্তর, অমৃত পত্রিকা গোষ্ঠী সেই বিশু মুখো-পাধ্যায়কে শিশিরকুমার পুরস্কারে সম্মানিত করেছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে এই প্রবীণ সাহিত্যিক শিশু সাহিত্যে তাঁর কৃতিত্বের জন্য মৌচাক পত্রিকার সুধীরচন্দ্র সরকার পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন এর আগেই।

বাঙলার সাহিত্য জগতে বিশু মুখো-পাধ্যায় একটি উল্লেখযোগ্য নাম। কল্লোলের কাল থেকে আজ পর্যন্ত তিনি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাকে সমৃদ্ধ করেছেন নানাভাবে। সুধীন দত্ত পরিচালিত পরিচয় এবং হুমায়ুন কবিরের চতুরঙ্গের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ঐ সময়ে আলফাঁস দোদের 'সাফো'র অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এক সময় তাঁর কবিতা পরিচয়, নয়শ্রী এবং নিবন্ধ কাগজেও প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর লেখা এবং সম্পাদনা করা বইগুলির মধ্যে 'রবীন্দ্র সাগরসঙ্গমে' 'কবি প্রণাম', 'সতেন্দ্রনাথ দত্তর গদ্যাবলী', 'বিখ্যাত হত্যা কাহিনী' 'বিখ্যাত দস্যু কাহিনী', 'বিশ্ববিখ্যাত গোয়েন্দা কাহিনী', 'নানা দেশের নানা গল্প', 'সমুদ্রে যারা ঘুরে বেড়ায়, কফিন জাহাজ, মিষ্টি হাসির গল্প' আডভেঞ্চার অব মার্কোপোলো উল্লেখযোগ্য।

বিশু মুখোপাধ্যায় জীবনে সততায় বিশ্বাসী। সাহিত্যের ক্ষেত্রে সত্য এবং সুন্দরের। পয়সার জন্য সাহিত্য নয়—একথা বেশ জোরের সঙ্গেই বলেন আমাও।

বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোন্ 'জাদু'তে দল থাকে ?

নতুন নতুন সংকট দেখা দিচ্ছে দুই কংগ্রেস দলে। জনতা পার্টির উদ্যত থাবার সামনে এই সব সংকট খানিকটা জটিল হয়েও উঠছে। ইন্দিরা কংগ্রেস এবং জাতীয় কংগ্রেসের একটা অংশ মহারাষ্ট্রে শারদ পাওয়ারের নেতৃত্বে জনতা পার্টির সঙ্গে সমঝোতায় সরকার গঠনে বেশ হকচকিয়ে গিয়েছে। জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে একটি গোষ্ঠী এখন প্রকাশ্যে বলাবলি করছেন যে জনতা পার্টির সঙ্গে হাত মিলিয়ে মহারাষ্ট্রে শারদ পাওয়ারের মুখ্যমন্ত্রী হবার পিছনে জাতীয় কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি চ্যবনের আশীর্বাদ ও সমর্থন আছে। শারদ পাওয়ারকে নেতা হিসাবে গড়ে তুলেছেন চ্যবন। মহারাষ্ট্রে তাঁর ক্ষয়িষ্ণু রাজনৈতিক প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে পাওয়ারই তাঁর একমাত্র ভরসা। মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে চ্যবন-নির্দিষ্ট পথেই পাওয়ার বিচরণ করেন। তিনি চ্যবনের অত্যন্ত অনুগত। মহারাষ্ট্রের ঘটনার পরও কোন বিরোধ বা মনোমালিন্য দেখা দেয়নি দুজনের মধ্যে। মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বসন্তরাও পাতিল সমেত কংগ্রেসের নাম নিয়ে রাজ্য জনতা পার্টির সঙ্গে হাত মিলিয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে পারলে খুব ভালো হত। চ্যবন-বিরোধী জাতীয় কংগ্রেসের একটা অংশের মতে সেটা যখন আপাততঃ সম্ভবপর হল না তখন শারদ পাওয়ার যা করলেন সেটা চ্যবন গোষ্ঠীর কাছে 'মন্দের ভালো।' মহারাষ্ট্রের ঘটনার পর নতুন করে ভেঙে পড়েছে জাতীয় কংগ্রেসের বেশ কয়েকজন নেতা এবং কর্মীরা। ধাক্কা খেয়েছে ইন্দিরা কংগ্রেস।

জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে আপাততঃ প্রধান তিনটি মতামতের সমর্থকরা তর্কের ঝড় তুলেছেন। এই বিতর্কমূলক মতগুলি এই রকম : (১) ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাও, (২) জনতা পার্টি ও ইন্দিরা কংগ্রেস থেকে সমান দূরত্ব রেখে চলো আর (৩) যেখানে সম্ভব জনতা পার্টির সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতার বিরোধীতা করো। এর সঙ্গে তেমন সোচ্চার না হলেও কিছু লোকজন গালে হাত দিয়ে রীতিমত চিন্তায় মগ্ন। এইরকম চিন্তিত ব্যক্তিদের কয়েকজন এই লেখককে বলেন : আমরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম নই। আমাদের অর্থবল নেই। আমাদের নেতাদের তেমন গ্ল্যামার নেই। এঁদের বিশ্বাস স্বরণ সিং, চ্যবন, বহ্মানন্দ রেড্ডি ইত্যাদির তুলনায় এখনও ইন্দিরা গান্ধীর লোক জড়ো করবার ক্ষমতা নাকি যথেষ্ট। এইরকম কমপ্লেকস্ এবং নেতৃত্বের মধ্যে সুসম্বন্ধ চিন্তার অভাবে জাতীয় কংগ্রেস হালভাঙা পৌষের মত আপাততঃ ভাসছে।

মহারাষ্ট্রে ইন্দিরা কংগ্রেসে সামান্য

রাজধানীর ইনসাইড স্টোরি

ভাঙন দলের কেন্দ্রীয় দপ্তরে একটা শক্ হিসাবে দেখা দিয়েছে। এই দলের এখন একমাত্র চেষ্টা হল মহারাষ্ট্রে অন্তর্বর্তী নির্বাচন যাতে হয় তার জন্য যেনতেন প্রকারেণ একটা ক্রাইসিস সৃষ্টি করা। ইন্দিরা , কংগ্রেসের ককাস এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ককাসের প্রতিপত্তি এখন খুব বেড়েছে। মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র এবং কর্ণাটকে ইন্দিরা কংগ্রেস দেশের রাজনৈতিক স্রোতে মাথা তোলবার পর থেকে ক্রমে ক্রমে ইন্দিরা গান্ধীর আত্মবিশ্বাস ফিরতে থাকে। আর সেই সঙ্গে পুরোন ককাসও আবার মাথা-চাড়া দিয়ে ওঠে। ইদানীং শুধু তাঁর পুত্র এবং পুত্রের সাকবেদরাই নয় উপরন্তু পরিচিত দুটি মুখ নির্দ্বিধায় আবার ভেসে উঠছে ইন্দিরা গান্ধীর অনুগত এবং তাঁর কাজকর্মের সমর্থক হিসাবে। এঁরা হলেন বংশীলাল এবং বিদ্যাচরণ শুক্লা। ইন্দিরা গান্ধীর বাড়িতে ফিলহাল এঁদের যাতায়াত বেড়েছে। প্রবীণ ও নবীনদের নিয়ে ককাস এখন পুরোমাত্রায় সার্বিক আদলে ফিরে এসেছে। আর এই ককাসের চাপ অন্ধ্র ও কর্ণাটকের রাজনীতিকে খানিকটা বিচলিত করে তুলছে। অন্ধ্র এবং কর্ণাটকের মন্ত্রীসভা যথাক্রমে চেন্না রেড্ডি এবং দেবরাজ আরস স্রেফ ইন্দিরা গান্ধী এবং তক্ষার ককাসের মর্জি মাফিক কাজ করতে চাইছেন না। চেন্না রেড্ডি এবং দেবরাজ আরস দুজনেই ধুরন্ধর রাজনীতিক। অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে ওঁরা নিজেদের তৈরী করেছেন। কারও বংশবদ হয়ে থাকা এঁদের ধাতে নেই। এঁদের ভাবটা হল সঙ্গে থাকতে পারি কিন্তু তাঁতে থাকব না। ইন্দিরা গান্ধীর মানসিকতায় এটা এখনও অসহ্য। উনি চটেছেন এঁদের ওপর। কোন রাজনৈতিক প্যাঁচে চেন্না রেড্ডি আর দেবরাজ আরসকে কব্জা করা যায় তারই শলা-পরামর্শ চলছে নয়াদিল্লিতে ইন্দিরা কংগ্রেসের খাস দপ্তরে।

চেন্না রেড্ডি তেলেঙ্গানার নেতা। তেলেঙ্গানার বাইরে অন্ধ্রের অন্যান্য অঞ্চলের লোকদের সঙ্গে তেলেঙ্গানার বাসিন্দাদের রয়েছে পুরোন কাল থেকে চলে আসা রেষারেষি। চেন্না রিড্ডির বিরুদ্ধে সেই রেষারেষিকে কাজে লাগাবার চেষ্টা চলছে। অন্ধ্র বিধানসভার প্রায় তিনশজন সদস্যদের মধ্যে শতকরা চল্লিশ শতাংশ হল তেলেঙ্গানার প্রতিনিধি আর বাকী ষাট শতাংশ অন্ধ্রের অন্যান্য এলাকার। জনতা পার্টির প্রায় পঞ্চান্নজন এবং জাতীয় কংগ্রেসের দশজনের সঙ্গে মিলে তেলেঙ্গানা প্রতিনিধিদের নিয়ে চেন্না রেড্ডির পক্ষে শারদ পাওয়ারের পন্থায় অন্ধ্রে সরকার গঠন করা অসম্ভব নয়। এমন সম্ভাবনার কথা স্মরণ করে চেন্না রেড্ডিকে নিয়ে ইন্দিরা কংগ্রেস খানিকটা বেকায়দায় পড়েছে।

অপর দিকে কর্ণাটকে দেবরাজ আরস মন্ত্রিসভায় ইচ্ছামত কিছু রদবদল করতে গিয়ে বড় রকমের বাধা পাচ্ছে ইন্দিরা কংগ্রেস। আরস মন্ত্রিসভার সদস্য গুন্ডু রাও হলেন ককাসের খুব কাছের লোক। এই গুন্ডু রাওকে উপ-মুখ্যমন্ত্রী করার জন্য ইন্দিরা কংগ্রেসের সাম্প্রতিক প্রচেষ্টাকে মুখ্যমন্ত্রী আপাতত বানচাল করেছেন। এ ছাড়া ইন্দিরা কংগ্রেস মনোনীত আরও চারজনকে মন্ত্রী করার প্রস্তাবও দেবরাজ আরস কানে তুলছেন না। কর্ণাটকে আরসের প্রতিপত্তি ও জনপ্রিয়তা যথেষ্ট। ইন্দিরা গান্ধীর মই নিয়ে তিনি কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী হন নি। তাই দেবরাজ আরস চান পূর্ণ স্বাধীনতা। ককাসের কারসাজি এখানে অনুকূল পরিবেশ এখনও খুঁজে পায় নি। ককাসের নাম ও খবরদারী তেমন অসহ্য হলে কোন কোন মহলের অনুমান ইন্দিরা কংগ্রেস ভেঙে দেবরাজ আরস নাকি কর্ণাটক কংগ্রেস নামে নতুন দলও খুলতে পারেন।

সুতরাং একদা ইন্দিরা কংগ্রেসের দুই শক্তিশালী দুর্গ—অন্ধ্র ও কর্ণাটকে ইদানীং আলোড়নের আভাস-ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে। আর মহারাষ্ট্রে আপাতত ইন্দিরা কংগ্রেসের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গিয়েছে।

এই সব সংকটের সঙ্গে দুই কংগ্রেস দলেই আবার নতুন এক প্রশ্নেরও উদয় হয়েছে। এই প্রশ্ন ওঁদের আকাশকুসুম রচনায় রীতিমত বাধ সাধছে। নয়াদিল্লির বায়সিনা রোড়ে জাতীয় কংগ্রেসের এবং আকবর রোডে ইন্দিরা কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় দপ্তরে এতদিন কেবল অংক কষা হত। ইন্দিরা কংগ্রেস থেকে জাতীয় কংগ্রেস এবং জাতীয় কংগ্রেস থেকে ইন্দিরা কংগ্রেসে কারা কবে যোগ দেবেন তারই হিসাব-নিকাশে মশগুল ছিলেন সকলে। কিন্তু মহারাষ্ট্রের ঘটনার পর এসব হিসাব জলাঞ্জলি দিয়ে দুই কংগ্রেসের নেতারা কোন জাদুমন্ত্রে দল বাঁচাবেন তাই নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করেছেন। জনতা পার্টির কাছে আসবার ঝোঁক ভবিষ্যতে বাড়তে পারে এমন সন্দেহ-মিশ্রিত ভয় ক্রমে পেয়ে বসছে। নানা সমস্যা এইভাবে ঘিরে ধরছে আর সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের অভাবে দুই কংগ্রেস দলই তাদের এ আই সি সি অধিবেশনের সময় পিছিয়ে চলেছে। বর্তমান অবস্থায় অধিবেশন ডাকলে গোলমাল তীব্রভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠবার নাকি আশংকা আছে।

পর্যবেক্ষক

ভেলপুরী সরকার
নিমকী
কংগ্রেস
বি.বি.পি
আর.বি.জে
পি.ডি.পি
জনতা
পাঁড়াপাঁ
কংগ্রেস (ইন্দিরা)
পি ডি এফ.

টানা পোড়েন

রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় বসেছেন প্রায় চৌদ্দ মাস। ছয় শরিকের এই মন্ত্রিসভার এক বছরের অগ্রগতি অন্যান্য রাজ্য সরকারগুলির তুলনায় আশ্চিঞ্চিৎকর নয়। মন্ত্রীদের সমঝোতা এবং শৃঙ্খলাবোধই এর অন্যতম কারণ।

কিন্তু বাস্তবদশা পার হয়ে সাবালকত্বের পথে পা বাড়াতেই নিরোগ এই মন্ত্রিসভায় একটা সংক্রামক ব্যাধির সূচনা হয়েছে। রাষ্ট্রমন্ত্রী রাম চ্যাটার্জীকে মন্ত্রিসভা থেকে সরাবার এবং শিল্পবী বাংলা কংগ্রেসের একমাত্র বিধায়ক গৌরাঙ্গ সামন্তকে মন্ত্রী করার দাবী উঠেছে। বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার এই যোগ-বিয়োগের প্রশ্নটা আচমকা মনে হলেও অভাবিত ছিল না। মন্ত্রিসভার গুরুমন্ত্রণে শরিক দলগুলির মধ্যে যে মতান্তর বা মতভেদ দেখা দেয়, এটা তার পরিণতিমাত্র। অবশ্যম্ভাবী এই পরিণতির কারণ খুঁজতে হলে নিকট অতীতের কিছু ঘটনা মনে রাখা দরকার।

প্রথমত স্বাস্থ্যসহ সমবায়, পূর্ত ও আবাসন, পঞ্চায়েত দপ্তরের উপর বড় শরিক সি, পি, আই (এম) দলের বিশেষ নজর ছিল। তাদের মতে গণ-সংযোগের মাধ্যম এই দপ্তরগুলির মারফৎ দলের ব্যাপক প্রসার সম্ভব। তাই তারা এই তিনটি দপ্তর হাতছাড়া করতে চাইল না। আর, এস, পি আর ফরোয়ার্ড ব্লক তাতে গররাজি। তারা যুক্তি তুলল, যুক্তফ্রন্টের আমলে এই তিনটির একটি দপ্তরও সি, পি, আই (এম) দলের হাতে ছিল না। আর, এস, পি প্রকাশ্যেই তখন ঘোষণা করলেন, স্বাস্থ্য দপ্তর তাদের ছেড়ে না দিলে তাদের পক্ষে মন্ত্রিসভায় যোগ দেওয়া সম্ভব হবে না। বিধানসভায় নিরঙ্কুশ একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হওয়া সত্ত্বেও বামফ্রন্টের ভাবমূর্তি ও ঐক্য অম্লান রাখার স্বার্থে তখন সি, পি, আই (এম)-কে আর, এস, পি'র দাবীর কাছে নতি স্বীকার করতে হয়।

দ্বিতীয়ত মন্ত্রিসভা গড়ার সূচনায় শরিক দলগুলির আভ্যন্তরীণ কোন্দলের চিত্রও খুব সুখকর ছিল না। বড় শরিকের কর্মকর্তাদের একাংশ প্রবীণ নেতা কৃষ্ণপদ ঘোষকে উপ-মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসাতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু উপদলীয় রেষারেষির ফলে তখন আর তা সম্ভব হয় না। উপ-মুখ্যমন্ত্রীর পদ সৃষ্টিতে জ্যোতি-বাবুদের কোন রকম সমর্থনও ছিল না। প্রবীণ নেতা কৃষ্ণপদ ঘোষ পার্টি সেক্রেটারি প্রমোদ দাশগুপ্তের নিকট-আত্মীয়। রাজনৈতিক ভাব-ভাবনা ও মানসিকতার বিচারে এই দুই নেতা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। তাই আরও মর্যাদাপূর্ণ কোন পদে কৃষ্ণপদবাবুকে বসাতে না পারায় [illegible] অনুগামী নেতা ও কর্মীদের মনে

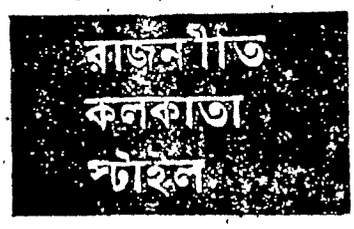

ছোট শরিক দলগুলিও এ ধরণের ঘরোয়া বিবাদ-বিসম্বাদ থেকে মুক্ত থাকে না। আর, এস, পি দলের একটা বড় অংশ যতীন চক্রবর্তীর পরিবর্তে বটতলার এম, এল, এ নিখিল দাশকে মন্ত্রিসভায় পাঠাতে চান। কিন্তু যতীনবাবুর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবুর ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতার দোহাই দিয়ে কর্মকর্তারা যতীন-বাবুকেই মন্ত্রিসভায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। এ নিয়ে তখন থেকে দলের এক শ্রেণীর নেতা ও কর্মী দারুণভাবে ক্ষুব্ধ। ঐ ঘটনার রেশ ধরে দলের তরুণ বিধায়ক তিমির ভাদুড়ীসহ প্রবীণ এবং যুক্তিবাদী বেশ কিছু নেতা এখনও কোণঠাসা। অর, এস, পির একদা সক্রিয় এবং সুবক্তারূপে পরিচিত কয়েকজন বিধায়ক বিধানসভায় আর এখন তেমন মুখ খোলেন না। মার্কস-বাদী ফরোয়ার্ড ব্লকের রাম চ্যাটার্জী আর সুহৃদ বসুমল্লিকের মধ্যে কোনজন মন্ত্রী-পদ অলঙ্কৃত করবেন তা নিয়েও কম জল ঘোলা হয়নি। ফরোয়ার্ড ব্লকের মন্ত্রী নির্বাচনেও সম্পাদক অশোক ঘোষকে যথেষ্ট কৌশল ও মেহনত করতে হয়েছে।

পাঞ্জাবের জলন্ধরে সি, পি, আই (এম) দলের পার্টি-কংগ্রেস। রাজ্যের ছোট-বড় সব নেতারাই সেখানে ছুটছেন। দলের মন্ত্রীরাও বাদ পড়লেন না। প্রবীণ মন্ত্রীদের মধ্যে অসুস্থতার জন্য শ্রমমন্ত্রী কৃষ্ণপদ ঘোষ কলকাতা থেকে গেলেন। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু শেখ আবদুল্লা কর্তৃক কাশ্মীর সফরে আমন্ত্রিত হলেন। স্থির হল জলন্ধরে পার্টি কংগ্রেস সেরে তিনি সেখানে যাবেন। ফলে, প্রায় দুই সপ্তাহ তাঁকে বাইরে থাকতে হবে। সি, পি, আই (এম) দলের রাজ্য কমিটির একাধিক প্রবীণ নেতা বললেন, মহাকরণ বেশী দিন মুখ্যমন্ত্রীহীন রাখা সম্ভব নয়। বিশেষ করে দলডক ফেরৎ উদ্বাস্তু নিয়ে রাজ্য যখন সঙ্কটের মুখে। প্রস্তাব এল, কৃষ্ণপদ ঘোষকে অ্যাকটিং সি, এম বা অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হোক। অর্থাৎ জ্যোতিবাবুর পর মুখ্যমন্ত্রী পদ কৃষ্ণপদের জন্য সুকৌশলে পাকা করার এক কূট চাল ছাড়া হল। কিন্তু সেবার সে চেষ্টাও ব্যর্থ হল। জলন্ধর হয়ে মুখ্যমন্ত্রী কাশ্মীর গেলেন। কৃষ্ণপদবাবুও নিয়মিত মহাকরণে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর কাজকর্ম করার দায়িত্ব আর তিনি পেলেন না। বরং জলন্ধর এবং কাশ্মীর থেকে সরাসরি ট্রাঙ্ক টেলিফোনে মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যসচিবকে প্রাত্যহিক নির্দেশ দিয়ে চললেন। ফলে প্রমোদবাবু-কৃষ্ণপদবাবুর অনুগামীদের

[illegible]

বেদব্যাস বৈদ্য

মন্ত্রিসভায় কিছু রাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়োগের জন্য বামফ্রন্ট বিশেষ করে সি, পি, আই (এম) দলের একটা মহলে চাপা গুঞ্জন শুরু হয়েছে। বড় শরিক দলের ঐ মহলের বাসনা, স্বাস্থ্য, পূর্ত ও আবাসন, পঞ্চায়েত এবং সমবায় দপ্তরের সঙ্গে একজন করে তাদের দলীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী জুড়ে দেওয়া হোক। ছোট শরিকরা অর্থাৎ ফরোয়ার্ড ব্লক, আর, এস, পি দল অবশ্য এ ধরণের প্রস্তাবের ঘোরতর বিরোধী। তাদের ধারণা, অন্যান্য শরিকদের ক্ষমতা সীমিত বা নিয়ন্ত্রিত করার এটা একটা নতুন চাল। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবু অবশ্য মন্ত্রি-সভার হ্রাস-বৃদ্ধি করতে খুব একটা আগ্রহী নন। তবে মুখ্যমন্ত্রীরূপে মন্ত্রি-সভার দায়-দায়িত্ব তাঁর থাকলেও বামফ্রন্ট কমিটি এবিষয় কঠোর বলে তিনি তা অমান্য করতে পারবেন বলে মনে হয় না। জ্যোতিবাবুর সমর্থকরাও অবশ্য পাশাপাশি আরেকটি প্রস্তাব খাড়া করেছেন। মন্ত্রি-সভায় শেষ অব্দি যদি রাষ্ট্রমন্ত্রী জুড়তেই হয়, তবে শ্রম দপ্তরও তা থেকে অব্যা-হৃতি পেতে পারে না। তাঁদের মতে শ্রম দপ্তরের কাজ-কর্ম আশানুরূপ নয়। বহু কল কারখানা বন্ধ হয়ে আছে। লে-অফ, লক-আউট, ধর্মঘট লেগেই আছে। শ্রমিক সঙ্কটও তীব্রতর। শ্রমমন্ত্রী নিজেও দীর্ঘদিন অসুস্থ।

জ্যোতিবাবুর সমর্থকরা শুধুমাত্র শ্রম দপ্তরের অকর্মণ্যতার অভিযোগ তুলে ক্ষান্ত হননি। অন্যতম শিক্ষামন্ত্রী পার্থ দেসহ একাধিক মন্ত্রীর বিশেষ বিশেষ কাজ-কর্মেরও সমালোচনা করেছেন। তাঁরা মনে করেন, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বাতিল এবং অন্যান্য কিছু অবিবেচনাপ্রসূত কাজের সুযোগে বিরোধী পক্ষ সরকারের সমালোচনার এবং মুখ্যমন্ত্রীকে একাধিকবার বেকায়দায় ফেলবার সুযোগ পান। প্রমোদ-বাবুর অনুগামীরা অবশ্য এই সব অভিযোগ অগ্রাহ্য করেন। উল্লেখ্য, কৃষ্ণপদ ঘোষ, পার্থ দে প্রমুখ মন্ত্রীরা প্রমোদবাবুর বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ঠ সহযোগী বলে পরিগণিত। তাই মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবুর উপর চাপ সৃষ্টির জন্য দলের উগ্রগোষ্ঠী এখন সক্রিয়। বাম চ্যাটার্জীকে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দেওয়া বা গৌরাঙ্গ সামন্তকে মন্ত্রী করার দাবী, কিম্বা ভক্তিভূষণ-দেববত্রত-যতীন চক্রবর্তীদের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযানের মূল লক্ষ্য অন্য কেউ নন—স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু।

আসলে সি, পি, আই (এম)-এর দলীয় কলহের ঢেউ এখন মন্ত্রিসভায় এসে আছড়ে পড়ছে। জ্যোতিবাবু এই সঙ্কট-সমস্যার মোকাবিলা কীভাবে করেন, সেটাই এখন দেখবার বিষয়। অনেকাংশে তার উপরই নির্ভর করছে বামফ্রন্ট এবং বর্তমান রাজ্য মন্ত্রিসভার ভবিষ্যৎ।

চিঠিপত্র

'অমৃত' তার খোলস ভেঙে বেরিয়েছে, এতে সকলেই খুশী। দু-একটি অনিয়মিত ভুলত্রুটি বাদ দিলে 'অমৃত' আমাদের অহংকার বাড়িয়েছে। আমাদের একটি দাবী, অমৃত আধুনিক বাংলা নাট্য আন্দোলনে অংশ নিক। শুধুমাত্র গ্রুপ থিয়েটারের নাটকের সমালোচনা বা কলেজদের দু-একটি প্রবন্ধে উহু আহা করলেই নাটকের প্রতি কর্তব্য মিটলো, এরকম ধারণা ভুলে। ধারাবাহিকভাবে অমৃতে বাংলা নাটক প্রকাশ করুন। আর পুজো, নববর্ষ, সাহিত্য, বিনোদন ইত্যাদি বিশেষ সংখ্যাগুলোয় সম্পূর্ণ নাটক থাক। আজ পর্যন্ত গ্রুপ থিয়েটার অভিনীত নাটকগুলির শতকরা আশিটিই হয় বিদেশী নাটকের অনুবাদ অথবা বহু অভিনীত পুরোনো নাটক অর্থাৎ চর্বিতচর্বন। এভাবে কোন দেশের নাট্য আন্দোলনই দীর্ঘজীবন পায়না, পাওয়া উচিত নয়। তাছাড়া, বাংলা সাহিত্য দেহের প্রায় সব অংশই যখন অল্পবেশী পুষ্ট, তখন একটি রুগ্ন প্রয়োজনীয় অঙ্গকে সারিয়ে তোলার তাগিদও অনুভব করা যেতে পারে।

যদিও বলা হয়, সময় কিছুর তোয়াক্কা করেনা, আজকের ক্ষতি যে-কাল দ্বিগুন বেগে পুষিয়ে নেবে, তবু বুঝে শুনেও এগোবেন না কে? আপনারা কিছু ক্ষমতার অধিকারী। তার সদ্ব্যবহার করুন। প্রকাশযোগ্য আধুনিক নাটক না পান (ধরা হলো) তো নিদেন পক্ষে অনুবাদকর্ম। মোদ্দা কথা, একটা ঢেউ তুলে দিন, নৌকো ভাসানোর কাজে কমতি হবে না।

—তিতউ রহমান। চারঘাট। মঙ্গলদপুর।

লেখা আর সমালোচনা এক নয়

লেখক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সুকুমারী বারবধূ' পড়লাম। লেখক হিসেবে শ্যামলবাবুর পরিচিতি সুবিদিত। তিনি সাহিত্যসেবী তাই সাহিত্য সমালোচক তাঁকে পেলে খুব বেশী আশ্চর্য হতাম না। কিন্তু তিনি যখন চিত্রসমালোচক হন তখনি ব্যাপারটা কৌতূহল ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। বলছি না, কাজটি অত্যন্ত কঠিন ও দুরূহ। কিন্তু তাঁর লেখা পড়ে ভারাক্রান্ত হলাম। লেখকের লেখা ও চিত্র সমালোচনা দুটি ভিন্ন জিনিস। গঠনে ও বিশ্লেষণে পার্থক্য প্রচুর। দুটি জিনিসকে দেখার দৃষ্টিও অন্যরকম। একটির দৃষ্টিভঙ্গিতে অন্যটি বিচার করলে বক্তব্যে যুক্তিহীনতা ও শিথিলতা আসা অসম্ভব নয়। ব্যাপারটি আরো পীড়া দেয় যখন এই অসংলগ্নতার প্রয়োগ ঘটে একটি ভাল ছবির ওপর। আশা করেছিলাম শ্যামলবাবু 'বারবধূ'র গল্প নিয়েই আলোচনা করবেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। যা করেছেন তাও সার্থক নয়। তাঁর এই লেখা বারবধূ-র দর্শকদেরই সচেতন করে তুলবে। যাঁরা ছবিটি দেখেন নি লেখাটি তাদের জন্য নয়। কারণ অল্প কথায় গল্প বলে ঘটনার বিশ্লেষণের দায়িত্ব তিনি এড়িয়ে গেছেন। ফলে অনেকের কাছেই লেখাটি দুর্বোধ্য ঠেকবে। অথচ ভাল ছবির আলোচনায় এমন হওয়া অনুচিত। বহু দর্শক আছেন যাঁরা ছবি দেখতে যান ছবি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল হয়েই। শ্যামলবাবুর লেখা তাঁদের হতাশ করবে। অবশ্য শুরুতেই বারবধূ-র কাহিনীকে তিনি বাংলা সাহিত্যের অমর সৃষ্টি রজনী পোস্টমাস্টার মহেশ ইত্যাদির সঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। কিন্তু কেন করলেন? বারবধূ কি আর পাঁচটি চলতি উপন্যাস থেকে স্বতন্ত্র? তার আবেদনে কি কোন বিশিষ্টতা আছে? একটি কুমারী পতিতা ভালবেসে তার নরক জীবন থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল। গল্পের মূল বক্তব্য হল এই। বিষয়টি নতুন নয়। বক্তব্যও প্রাচীন। কাঁসমো ও বিন্যাসের তফাতে এমন কাহিনী আমার অনেক পড়েছি। সুবোধ ঘোষের বারবধূ তাই বাঙ্গলীর স্মৃতিকে কতখানি শাসন করে তা বিচারাধীন। তাছাড়া ছবির টেকনিক্যাল কাজের যথার্থ সমালোচনা আদৌ হয়নি। ছবির প্রধান প্রধান দৃশ্যের গুরুত্বপূর্ণ সংলাপ পাঠকের সামনে তুলে ধরে তার সার্থক ব্যাখ্যা কোথায় আছে? কি কি সতর্কতা অবলম্বন করলে ছবির গুনগত ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পেত তার নির্দেশ কই? রাগাশ্রয়ী গানের শেষে নায়িকার অশ্রুমোচন—এমন দৃষ্টান্ত বাংলা চলচ্চিত্রে পুরোন প্রায়। শ্যামলবাবু এর মধ্যে নতুনত্ব কি দেখলেন? বিপদ বোধ করি তাঁর লেখার কয়েকটি অংশে ভাষার ব্যবহার দেখে। গীতা প্রসঙ্গে তিনি একজায়গায় লিখছেন তাঁর হাসি, তাঁর উন্মুক্ত উরুর মতোই একই সঙ্গে সাধারণ ও অসাধারণ। একি ক্লাসিক সাহিত্যের নজীর, নাকি ব্যবসায়িক বিজ্ঞপ্তি?....বার্ট ল্যাঙ্কাস্টারের বাবাও তা পারতেন না। লাইনটি কি কফি হাউসের টেবিল থেকে ধার করা? সবশেষে.... আমাকেও খুঁজে খুঁজে, এই ত্রুটিগুলো বের করতে হয়েছে। আমাকেও শব্দটি কেন জানি না বড় বেশী কানে বাজে। লেখার অধিকাংশ জায়গায় তিনি বক্তৃতা করেছেন। করেছেন শব্দ নিয়ে কারিকুরি ও ভাষা নিয়ে কালচার। কোথাও কোথাও আবেগ তাঁকে প্রশ্রয় দিয়েছে। তাই ছবি শেষে ভীড়ের মধ্যে দর্শকদের মুখের দিকে তাকিয়েই তিনি বুঝে নিতে পারেন সেখানে বারবধূ-র গীতার জন্য সামান্য হলেও তাদের কিছু বিস্ময় কিছু বিষাদ সঞ্চিত আছে। লেখক ও সমালোচকের তফাৎ বোধহয় এইখানে। তবে শ্যামলবাবুর কৃতিত্ব এই লেখার নামকরণে। বারবধূ বলতে প্রচলিত যে চিত্র আমাদের কল্পচোখে ভেসে ওঠে তিনি তাকে কুমারী বলে উল্লেখ করেছেন। তার মর্যাদা ও মহিমা আরো বেশী প্রতিষ্ঠিত হয় যেহেতু সে শুধু কুমারীই নয় 'সুকুমারী'।

বস্তুতঃ অমৃতের আভিজাত্য ও ব্যক্তিত্বের পক্ষে চলচ্চিত্র বিভাগটি যথেষ্ট উন্নতমানের নয়। বিগত কয়েক সংখ্যা ধরে পাঠক-পাঠিকার অভিযোগ ও চিঠিপত্র এই বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করে। চলচ্চিত্র একটি জনপ্রিয় শিল্প সন্দেহ নেই। দিনে দিনে তার চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমন একটি শিল্পের যথার্থ সংবাদ ও সমালোচনা যাতে এই পত্রিকার গুরুত্ব পায় তার জন্য সম্পাদক মশাইকে অনুরোধ জানাই। —উদয় বড়ুয়া। দুর্গাপুর—৯।

সিনেমার কথা মনে আসে না?

অমৃতে প্রকাশিত ও সদ্য বই আকারে প্রকাশিত আবিষ্কার বইটি পড়লুম। সাত ফর্মার নিকৃষ্ট সৌষ্ঠবের (প্রচ্ছদ চলনসই) বইটি কি আপনার সাহিত্য জীবনের এক মূল্যবান ফসল? গল্পের বিষয় বস্তুতে সাহিত্যরস ও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ বাদ দিলে চলতি হিন্দি সিনেমার কথা মনে আসে না? আশ্চর্য লাগে ও এই চিঠি লেখার প্রয়োজনীয়তা কোথ করি তখনই যখন দেখি উৎসর্গপত্রে লেখা বাবার পুণ্যস্মৃতিতে। বইটি কি সেই পর্যায়ের? আমার মনে হয় না। আপনার কুবেরের বিষয় আশায়, পরশুরাম নিরঙ্কুশ, সরমা ও নীলকান্ত অদ্য শেষ রজনী আরও কত কত তো আর পড়তে বাকি নেই। তবে অনিলের পুতুল, বহুবল্লভা দেখতেই পেলাম না। কুবেরের বিষয় তো বাবাকে দিলে পারতেন। অবশ্যই সেটা ব্যক্তিগত। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে বইটিতে বারদুই যুগান্তরের বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। তবুও আনন্দ কথা এই যে আজকাল যখন বেশীরভাগ বই-ই মনকে টানতে পারে না। সেখানে আপনি জিতে গেছেন।

—অমিয়রঞ্জন দাস। আপ্রকার গার্ডেনস

কলকাতা ১৮৬০

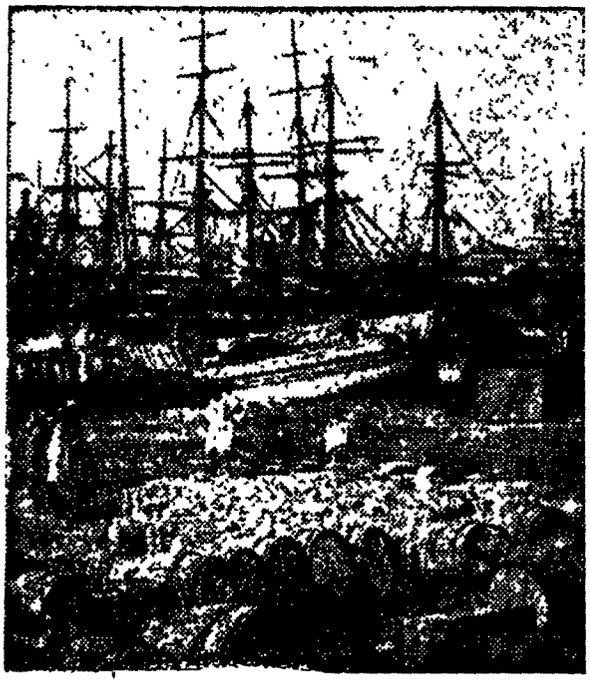

কলকাতা বন্দর

নীরদ ভট্টাচার্য

বর্তমান কলকাতা বন্দরের যা হাল হয়েছে তাতে যে কোন সময় তার মৃত্যু হতে পারে। কলকাতা বন্দরের আজ নাভিশ্বাস। পলি জমে জমে হুগলী নদীর অবস্থা আজ বড় করুণ। ভোরের ভাঁটায় নদীর ক্ষীণ কণ্ঠ—আমাকে বাঁচাও আমাকে বাঁচাও। সমুদ্রের মোহানা থেকে ওপরের দিকে সুদীর্ঘ একশো ছাব্বিশ মাইল ব্যাপী হুগলী নদীর যে কোন অংশে আমার মত আপনিও কান পাতলে শুনতে পাবেন—জল দাও, জল দাও। পর্যাপ্ত পরিমাণ জল দিয়ে তোমরা আমাকে বাঁচাও। আমি তোমাদের ঘরে ঘরে সম্পদ তুলে দেবো, তোমাদের মুখে হাসি ফোটাবো—আমাকে বাঁচাও। তাছাড়া তোমাদের সাহিত্য সংস্কৃতিকেও নতুনভাবে জগৎ সভায় আমি তুলে ধরবো। আমি তোমাদের রক্তের মধ্যে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসে একাকার মিশে আছি—তা কী তোমরা এতদিনেও বোঝ নি? তোমাদের সহায়-সম্বল, তোমাদের ভরসা এই আমিই। আমাকে বাদ দিয়ে তোমাদের অস্তিত্ব কতটুকু? আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র সুন্দর শহর এই কলকাতার কী দশা হবে একবার ভেবে দেখেছ? সমগ্র পূর্বাঞ্চল বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতার স্বার্থে, সাহিত্য সংস্কৃতির স্বার্থে—তোমরা আমাকে বাঁচতে দাও, আমাকে বাঁচাও।

মালবাহী জাহাজের ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে অসুস্থ হুগলী নদীর এই রকম আকুল আবেদন আমি যেন স্পষ্ট শুনতে পেলাম। সূর্য প্রায় ডুবুডুবু। সিন্দূরের রঙে রাঙান আকাশ। ঘোলা জলে তারই প্রতিচ্ছবি। এক ঝাঁক বেলে হাঁস উড়ে উড়ে দক্ষিণের দিকে চলে যাচ্ছে। আবার উড়ে আসছে স্বস্থানে। এটা ওদের অনন্দ, ওদের খেলা। আমি দেখছিলাম। ডেকে মাল উঠছে—মাল নামছে। কোনের লম্বা ডিঙি জাহাজের খোল থেকে [illegible] বন্দরের জেটিতে যাচ্ছে। বিদেশ থেকে নয়ে আনা ফসফেট, গন্ধক প্রভৃতি আরো কতশত জিনিস। এই কলকাতা বন্দরে খালাস হচ্ছে পেটি পেটি বিদেশী ভাষার বইপত্রও। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের শিল্প-সাহিত্যের বই ঘরে বসে আজ আমরা আমাদের হাতের কাছে পেয়ে যাচ্ছি—হয় সরাসরি না হয় ইংরাজী অনুবাদের মাধ্যমে। চেখব, ডস্টয়েভস্কি, মাঁ পল সার্ত্র, পুস্ত, ই, হেমিংওয়ে, ভিকটোরিয়া হল্ট আজ আমাদের একান্ত প্রিয় লেখক ঘরের লোক। এদিক দিয়ে বিচার করতে গেলে কলকাতা বন্দর আমাদের জীবন, আমাদের প্রাণ। এর স্থায়িত্বের ওপর আমাদের ভবিষ্যৎ একান্ত নির্ভরশীল।

চারদিকে এখন কেমন ছায়া ছায়া অন্ধকার। বিদেশী জাহাজের বিন্দু বিন্দু আলো দেখে আমার মনে হলো যেন কোন এক যাদুমন্ত্রে আকাশের তারাগুলো টুপটাপ এইমাত্র খসে পড়েছে। নদীর বুকে দ্বিতীয় অন্য আর এক আকাশ। তন্ময় হয়ে দেখতে দেখতে আমার বুকের মধ্যে হঠাৎ ইতিহাসের চোরা ঢেউ হুলাৎ হুলাৎ করে দুলে উঠলো। দুলতে দুলতে অনেক দূরে আমি পিছিয়ে গেলাম—আজ থেকে প্রায় তিনশো বছর আগে।

পালতোলা একখানা বিদেশী জাহাজ গার্ডেন রীচ থেকে হুগলী নদীর ভিতরে এগিয়ে আসছে। ছপ্ ছপ্ দাঁড় টানার শব্দ। নাবিকদের চোখে মুখে একাধারে ভয় এবং আনন্দ। তখনো পর্যন্ত হুগলী নদীর এই অংশ তাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত, অজানা। কখন কী হয়, কখন কী হয়। নদীকে তো আর বিশ্বাস করা যায় না। যে কোন মুহূর্তেই বিপদ ঘটতে পারে। সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এই দূর দেশে কে আর প্রাণ দিতে চায়? লাল মুখো ক্যাপ্টেনের কণ্ঠে অভয়বাণী—ভয় নাই। এগিয়ে চলো। 'ফালকন' নামে সেই বৃটিশ জাহাজের প্রত্যেকটি নাবিকই তখন প্রবল উৎসাহে বিরামহীন দাঁড় টেনে চলেছে। পালে হাওয়া লেগে জাহাজখানা তরতর এগিয়ে আসছে। ওদের বুকের মধ্যে তখন আবিষ্কারের নেশা, অভিযানের আনন্দ, অর্থের আকাঙ্ক্ষা। সর্বোপরি অধিকার বিস্তারে, প্রভুত্ব লিপ্সায় তারা তখন বেপরোয়া। দাঁড় উঠেছে, দাঁড় নামছে—ছপ্ ছপ্ ছপ্ ছপ্।

শেষে স্টক্রান্ড ব্যাঙ্কে এসে "ফালকন" নোঙ্গর করল। নাবিকদের আনন্দ আর ধরে না। নাচ-গান, খানাপিনায় হুগলী নদীর বুকে সেদিন সত্যিকারের রসের বান ডেকেছিলো। বিদেশী নাবিকদের সঙ্গে সঙ্গে যুবতী নদীও অতিমাত্রায় গরবিনী। সেতারের গানে গানে, ঢেউয়ের তালে তালে ভাবই অভিব্যক্তি। বলা যায় সেইদিন থেকেই বৃটিশ জাতির ভাগ্য একটা নতুন খাতে বইতে শুরু করলো। কারণ তাদের ভবিষ্যৎ তখন তাদের হাতের মুঠোয়। হুগলী নদীকে এতদিনে তারা জানলো, তারা বুঝলো। ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে এবার তারা তাদের ভাগ্যকে সুদৃঢ় করে তুলবে। প্রায় চল্লিশ হাজার পাউন্ড মূল্যের সোনা রূপার বাট এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক দ্রব্যসামগ্রী স্টক্রান্ড ব্যাঙ্কে খালাস হলো। বিনিময়ে এদেশ থেকে তারা নিয়ে গেলো তাদের প্রয়োজনীয় নানা ধরনের মশলা, অপরিশোধিত রেশম, পাট, নুন, চিনি ইত্যাদি। পালতোলা সেই বৃটিশ জাহাজ "ফালকন"-ই কলকাতা বন্দরের ইতিহাসে সর্বপ্রথম জাহাজ। ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম জাহাজ ফালকন দিয়ে ভারতের সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান বন্দরের যাত্রারম্ভ। তারপর সেতারের মত দ্রুতগতিতে কলকাতা বন্দর অগ্রসর হতে লাগলো।

কিন্তু শুধুমাত্র ব্যবসা-বাণিজ্যের ভিতর দিয়ে কোন জাতি বড় হতে পারে না। কঠিন এই পৃথিবীর বুকে মেরুদণ্ড সোজা করে চলতে হলে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার পাশাপাশি শিল্প, [illegible] বিকাশ এবং উন্নতিও একান্ত

অপরিহার্য। না হলে মূল্যবান আমাদের এই মনুষ্যজীবন আলুনী হয়ে যেতে বাধ্য। পেটের ক্ষুধার সঙ্গে মনের ক্ষুধার সুষম সমন্বয়ে গড়ে ওঠে জাতীয় চরিত্র। এবং এটা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে পারস্পরিক আদান-প্রদান, দেয়া-নেয়ার ওপর। উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম পুরুষ, ভারতীয় সংস্কৃতির পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায় আপন অন্তরে যথার্থই এ-সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন পৃথিবীর অপরাপর বন্ধু ভাবাপন্ন দেশের সঙ্গে ভারতীয় চিন্তা-ভাবনা-সংস্কৃতির বিনিময় একান্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে একদিন কলকাতা বন্দর থেকে সুদূর পাশ্চাত্য অভিমুখে রওনা হলেন। জাহাজখানার নাম 'অ্যালবিয়ান'। ১৮৩০ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাস। সবে শীত পড়তে আরম্ভ করেছে। পাতলা কুয়াসার আবরণ ছিঁড়ে সূর্যের আলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আপন মনে যুবতী হুগলী নদীও বয়ে চলেছে সাগরের দিকে। কুঁচো কুঁচো ঢেউয়ের মাথায় শীতের রোদ্দুর। সেই মোহময় পরিবেশে রাজা রামমোহন রায়ের অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে গেলো। ভিতরে ভিতরে তিনি রোমাঞ্চ অনুভব করছিলেন। সে যুগে সমুদ্রভ্রমণ ছিলো এক ধরনের পাপ এবং প্রথাগত অভিশাপ। এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রাজা রামমোহনই প্রথম আঘাত হানলেন। তাঁর 'অ্যালবিয়ান' জাহাজ এক সময় তাঁকে নিয়ে সমুদ্রের বুকে ভেসে পড়লো। প্রকৃত পক্ষে পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির মিলন সেই থেকেই।

রাজা রামমোহন রায়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। বন্ধুর কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে এর ঠিক বার বছর পর ১৮৪২ খৃস্টাব্দের ৯ জানুয়ারী এই কলকাতা বন্দর দিয়ে 'ক্রাকত' নামে একখানা জাহাজে ইংল্যান্ড অভিমুখে রওনা হলেন প্রিন্স। উদ্দেশ্য সেই একই—সাহিত্য, সংস্কৃতির উন্নতি বিধান।

১৮৯২ সালে খিদিরপুর ডক তৈরী হলো। চব্বিশ বছর পর ১৯১৬ সালে ছ' নম্বর খিদিরপুর ডক থেকে কবি রবীন্দ্রনাথ "সোসামারু" জাহাজে চড়ে জাপান হয়ে আমেরিকা যাত্রা করলেন। সেদিনের সেই যাত্রার কথা কবির "জাপান যাত্রী" বইতে পাওয়া যাবে। কবি বলেছেন—'বোম্বাই থেকে যতবার যাত্রা করেছি জাহাজ চলতে দেরি করে নি। কলকাতার জাহাজে যাত্রার আগের রাত্রে গিয়ে বসে থাকতে হয়। এটা ভালো লাগে না। কেননা যাত্রা করা মানেই মনের মধ্যে চলার বেগ সঞ্চার করা। মন যখন চলবার মুখে তখন তাকে দাঁড় করিয়ে রাখা, তার এক শক্তির সঙ্গে তার অন্য-এক শক্তির লড়াই বাধানো। মানুষ যখন ঘরের মধ্যে জমিয়ে বসে আছে তখন বিদায়ের আয়োজনটা এইজন্যেই কষ্টকর, কেননা, থাকার সঙ্গে যাওয়ার সন্ধিস্থলটা মনের মধ্যে মুশকিলের জায়গা—সেখানে তাকে দুই উলটো দিক সামলাতে হয়, সে এক রকমের কঠিন ব্যায়াম।"....

এই প্রসঙ্গে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো কলকাতা বন্দরের তৎকালীন পোতাধ্যক্ষ এবং জাহাজ চালকের সহযোগিতা। বিশ্ব কবির দিনলিপি 'জাপানযাত্রী'র প্রথম কিছু অংশ কলকাতায় কবির পুস্তক প্রকাশকের দপ্তরে পৌঁছে দিয়েছিলেন সেই পোতাধ্যক্ষই। অনুরূপভাবে জাহাজ চালকও পরবর্তী কিছু অংশ পৌঁছে দিলেন। এখানে একটা কথা জানিয়ে রাখা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে হুগলী নদীর যে অংশটুকু কলকাতা বন্দরের অধিকারভুক্ত সেখানে সমস্ত জাহাজ চলাচলের দায়িত্ব বন্দর কর্তৃপক্ষের। সেইমত পোতাধ্যক্ষের অধীনে বন্দরের নিজস্ব চালক সমুদ্রের মোহানা থেকে প্রত্যেকটি জাহাজ নিরাপদে বন্দরে নিয়ে আসে এবং সমুদ্রে পৌঁছে দেয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে অর্থনৈতিক প্রাধান্যের পাশাপাশি সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কলকাতা বন্দরের গুরুত্ব অপরিসীম। আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে একে বাঁচিয়ে রাখা আমাদের পবিত্র কর্তব্য। একদা এই মহৎ উদ্দেশ্যেই ফরাক্কা বাঁধ পরিকল্পনা হয়েছিল। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু ১৬ আগস্ট ১৯৬২ সালে লোকসভায় বলেছিলেন—'এই সভার সদস্যগণ জানেন যে অন্যান্য পরিকল্পনার তুলনায় ফরাক্কা বাঁধ পরিকল্পনা কত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কলকাতা বন্দরকে মৃত্যুর হাত থেকে একমাত্র এই পরিকল্পনাই রক্ষা করতে পারে। এটা অত্যন্ত জরুরী ব্যাপার। ফরাক্কা বাঁধ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত না হলে কলকাতা বন্দর ধীরে ধীরে ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে মূল্যহীন হবে। তখন কোথায় থাকবে কলকাতা শহর?"

অবশেষে ফরাক্কা বাঁধ আজ সম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু কলকাতা বন্দর যে তিমিরে সেই তিমিরে। হুগলী নদী আজও তার প্রয়োজনীয় ৪০ হাজার কিউসেক জল পেলো না। সমস্যাটা রাজনীতির জটিল আবর্তে এখনো পাক খাচ্ছে। জলের ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাঙলা দেশের সঙ্গে সরকারী পর্যায়ে বৈঠকের পর বৈঠক বসছে—আলোচনা চলছে। একটা সন্তোষজনক মীমাংসার আশায় অধীর আগ্রহে আমরা অপেক্ষা করে রয়েছি। ৪০ হাজার কিউসেক জল পেয়ে হুগলী নদী নতুন গতিতে ছুটে যাবে সাগর সঙ্গমে। আবার ফিরে পাবে তার সেই নাব্যতা শক্তি। ফলে আরো বেশি বেশি জাহাজ কলকাতা বন্দরে আসা যাওয়া করবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হলে পূর্বভরতের কোটি কোটি মানুষ দু হাত তুলে আর একবার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাবে। আর আমরা? আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসী বিশেষ করে সাহিত্য-সংস্কৃতি পাগল কলকাতাবাসী রামমোহন-দ্বারকানাথ-রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি বিজড়িত কলকাতা বন্দরে পুণ্যস্নান করে বিশ্বকবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গেয়ে উঠবো—'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে। এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।'

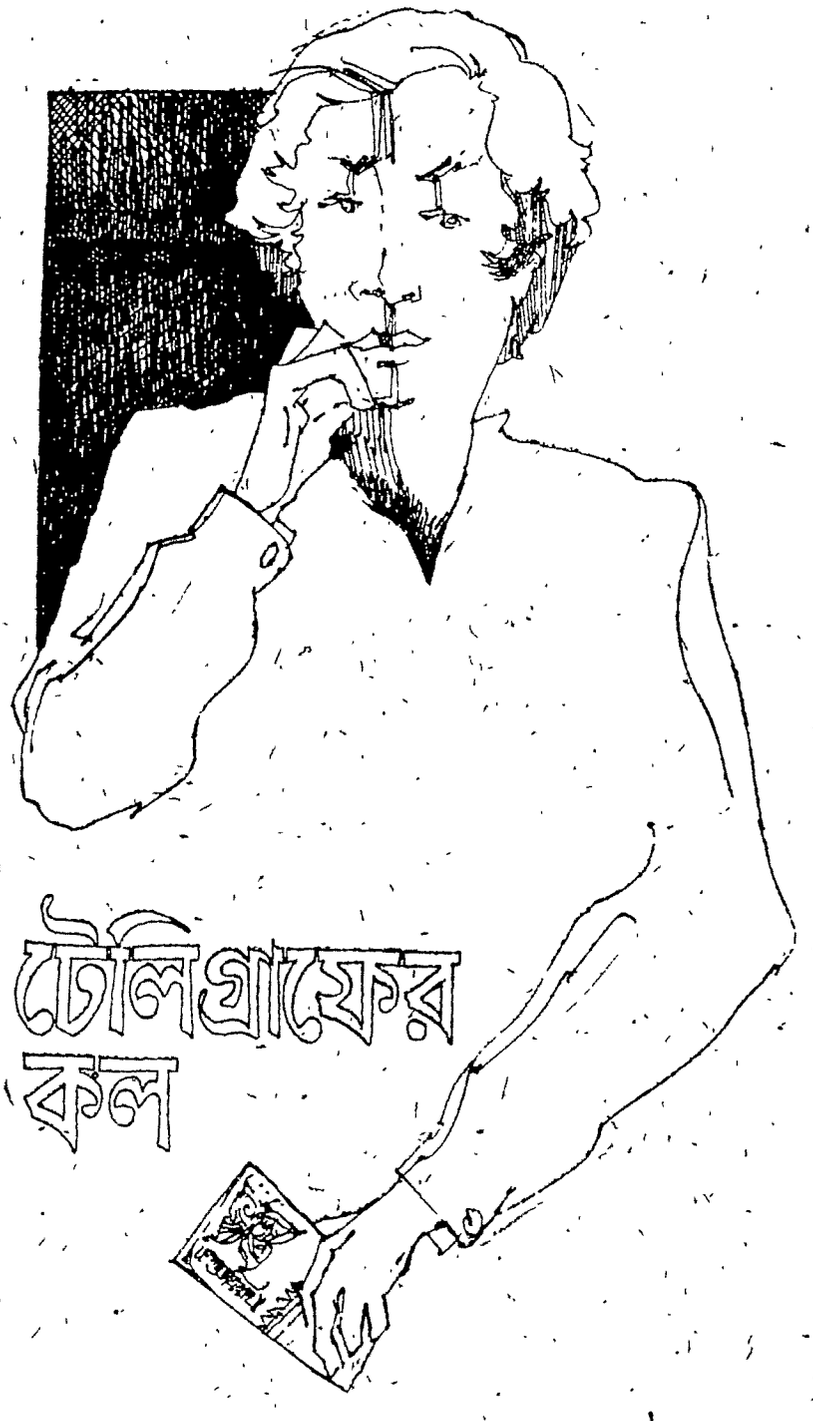

চৌলিগ্রামের কল

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার ছোটবেলাটা নিতান্ত আমারই ছোটবেলা। তেমন কিছু বৈশিষ্ট্যহীন, ধনাবিত্ত পরিবারের একটি শিশুর সাদামাটা ছোটবেলা। কিন্তু কোটিপতির সিন্দুকে জমানো টাকার পরিমাণের চেয়ে আমার সেই সাদামাটা শৈশবই আমার বেশি প্রিয়। হয়তো তা কেবল আমার কাছেই তার মূল্য। তা হোক, তবু পৃথিবীর কোনো ঐশ্বর্যের সঙ্গে আমার শৈশবস্মৃতির বিনিময়ে আমি রাজি নই।

থাকতাম ভাড়াবাড়িতে। এক বাড়িতেই চারঘর ভাড়াটে। দোতলার পূর্বদিকের ঘরগুলো ছিলো আমাদের। পুরনো যুগের কাদামাটির গাঁথনি দিয়ে তৈরি বাড়ি, তেমন ঝড় হলে সামান্য কাঁপতো। বৃষ্টি হলে নিচের উঠোনে একহাঁটু জল দাঁড়িয়ে যেতো—এবং সে জল একটু সরে গেলেই দেখা দিতো বিশ্রী কালো কাদা। উঠোনের একপাশে ছিলো গোয়াল, সেখান থেকে গোবরজল ধুয়ে এসে কাদায় মিশতো। বঙ্কিমবাবু কনট্রাক্টরের ইঁটের পাঁজা থেকে একতলার ভাঙাটেরা ইঁট হাতসাফাই করে এনে কাদায় পেতে সবু একটুখানি পথ বানাতো—তার ওপর দিয়েই আসাযাওয়া। এ বাড়ির কেবল একটাই গৌরব ছিলো, সেটা এর ছাদ। ফুটবল খেলার মাঠের মতো বিরাট ছাদে গরমকালের রাত্তিরে মেয়েদের আসর বসতো। পশ্চিমের ফ্ল্যাটের নাড়ুর ঠাকুমা ছিলেন এই আসরের মূল কর্ণধার। প্রচন্ড গরমের পর দিনাবসানের শান্ত ঠান্ডা হাওয়ায় বসে আমি হাঁ করে নাড়ুর ঠাকুমার গল্প শুনতাম। যদিও আড্ডাটা মূলতঃ মেয়েদের ছিলো, তবু আমার সেখানে স্থান হয়ে যেতো। আমার তখন এমন একটা বয়েস, যে বয়েসে শিশু ছেলেও নয় মেয়েও নয়—কেবলমাত্র শিশু।

পোবলা সেনের বিচুলীকলের টিনের শেডটার ওপর দিয়ে ভাঙা আধখানা চাঁদ গুঁড়ি মেরে আকাশে উঠে আসতো। বাড়ির পাশে একটুখানি জমিতে ছিলো পাঁচু রিক্সাওয়ালার কুঁড়েঘর। তার উঠোনে ছিলো দুটো মস্ত বড়ো তালগাছ। ছাদে বসে অপার্থিব আশ্চর্য চাঁদের আলোয় ঠাকুমার ভূতের গল্প শুনতে শুনতে দেখতাম তালগাছ দুটোর মাথাকে খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা ভূতের মুখের মতই যেন দেখাচ্ছে।

ঠাকুমা খুব নিখুঁত গল্প বলতে পারতেন। বিকেলবেলা আলো কমে এলেই মটরের দানার মতো একটি আফিংয়ের গুলি গালে ফেলে তিনি গল্প বলার মেজাজ তৈরি করতেন। বয়েস অনেক হয়েছিলো, বিরাশি-তিরাশি তো বটেই। কিন্তু বিশেষ কোনো দিন ভুগতে দেখিনি নাড়ুর ঠাকুমাকে। সকলে বলতো আফিংই বুড়িকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

একদিন এক মজার কান্ড হয়েছিলো।

গরমকাল। মাদুর-সতরঞ্চি নিয়ে মেয়েরা সবাই ছাদের আড্ডার যাবার জন্য [illegible] এমন সময় নাড়ুদের দিক থেকে একটা হই-চই শোনা গেল। রঙ্গিয়া দেখতে গেলেন কি ব্যাপার, আমিও সবার সঙ্গে পায়ে পায়ে গিয়ে হাজির হলাম। গিয়ে দেখি নাড়ুর ঠাকুমা শুয়ে আছেন বিছানায়, পাশে একটা ঢেঁবিলে হ্যারিকেন জ্বলছে। সেই হ্যারিকেনের ওপরে ভাঁজ করা কাপড় গরম করে ঠাকুমার হাতে পায়ে সেঁক দেওয়া হচ্ছে। নাড়ুর মা বললেন—দেখুন দিকিনি হঠাৎ কি হলো! দিব্যি সহজ মানুষ, বিকেলে কৌটো থেকে বের করে আফিং খেলেন—বললেন, ছাদে যাবো গল্প করতে। তারপরেই হঠাৎ দেখি শুয়ে পড়েছেন, কেবল হাই উঠছে, চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছে, হাত-পা ঠান্ডা। উনি গিয়েছেন ডাক্তার ডাকতে, দেখি, ডাক্তার এসে পড়লে এখন বাঁচি—

বলতে বলতে ডাক্তারবাবু এসে গেলেন। সবাই সরে গিয়ে জায়গা করে দিল। ডাক্তারবাবু নাড়ী দেখলেন, তারপর কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন রোগিণীর দিকে। বোধহয় উপসর্গ দেখলেন। তারপর ঠাকুমার

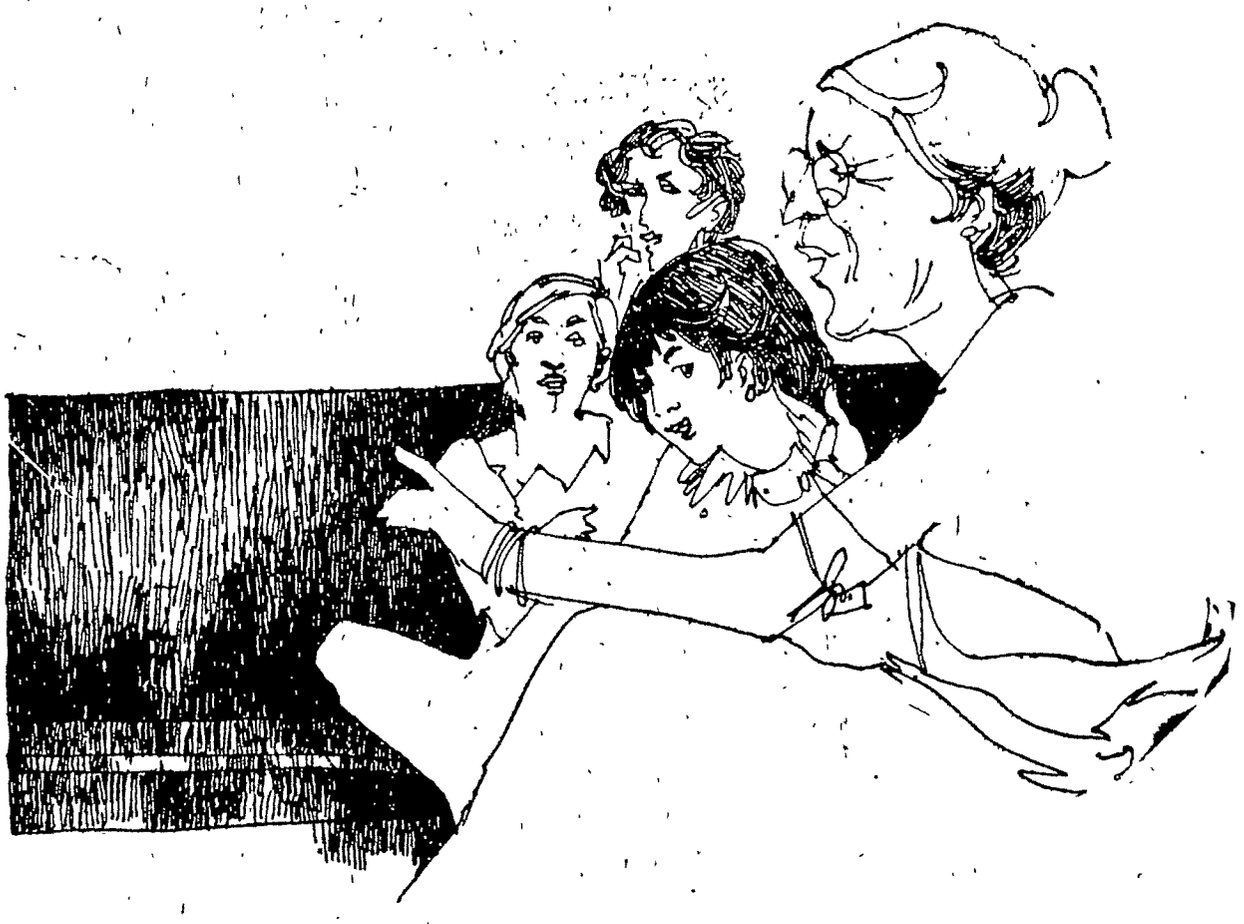

কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন—আজ কখন আফিং খেয়েছিলেন ?

পিট্‌পিট্‌ করে তাকিয়ে ঠাকুমা বললেন—বিকেলে।

—ঠিক খেয়েছিলেন তো ?

ঠাকুমা মাথা একদিকে হেলিয়ে জানালেন—হ্যাঁ।

ডাক্তার আর কিছু না বলে বিছানার চাদর, কাপড়-চোপড়ের মধ্যে হাতড়ে কি যেন খুঁজতে লাগলেন। একটু বাদেই গোলমতো কালো কি একটা দু-আঙুলে তুলে ধরে বললেন—ঠিকই আন্দাজ করেছিলাম তাহলে। দেখুন কাণ্ড! বুড়ি মানুষ, চোখে দেখেন না। মুখে দিতে আফিংয়ের গুলি এখানে গড়িয়ে পড়ে গিয়েছে। উনি বুঝতে পারেন নি। ভেবেছেন—খেলুম বোধহয়। তা বললে কি আর শরীর শোনে? এতদিনের নেশা বলে কথা। দিন এটা খাইয়ে, একটু পরেই শরীর ঠিক হয়ে যাবে এখন।

নাড়ুর বাবা একটু দুধ দিয়ে বড়িকে আফিংয়ের দলাটা খাইয়ে দিলেন। ঘন্টা-খানেকের মধ্যেই ঠাকুমা একদম সুস্থ। এই ব্যাপার নিয়ে নাড়ু আর আমি ঠাকুমাকে প্রায়ই ঠাট্টা করতাম। ঠাকুমা রেগে বলতেন—যা, যা, মেলা ইয়ে করিস না। নেহাৎ এখন চোখে দেখি না তার কি করবো ?

আমাকে তোরা হেঁজিপেঁজি পেয়েছিস নাকি? জানিস কত বড়ো বড়ো জায়গায় মানুষ হয়েছি আমি? আমার বাবা কুচবিহারের ধুবরাজকে বাড়িতে পড়াতেন। রাজবাড়িতেই ছিলো বাবার কোয়ার্টার। বয়েসকালে আমি গাউন অবধি পরেছি তা জানিস? ইংরিজিতে নাম সই করতে পারতাম —এখন অবিশ্যি হাত কাঁপে। বড়্ড চাট্টিখানি লোক নই আমি। চোখের জ্যোতিটা কমে গিয়েই হয়েছে বিপদ। ভাবলুম মুখেই দিয়েছি বুঝি—জল দিয়ে কোৎ করে গিললামও তো। কি গিললাম ভগবান জানে। সে যে পাশে গড়িয়ে পড়ে গিয়েছে, তা কি আমি বুঝতে পেরেছি ? তোদের খালি সবতাতেই ঠাট্টা।

এইভাবে ছোটবেলা কাটছিলো। এসব ঘটনা হয়তো এমন কিছু নয়। কিন্তু শৈশবের স্বপ্নের মোড়কে মোড়া বলেই হয়তো তা এত প্রিয়। সময়ের স্রোত আর কখনো উলটোদিকে বইবে না বলেই যত্ন করে হৃদয়ের গোপন আশ্রয়ে রেখে দিই এইসব স্মৃতি।

আমার ভাইবোন কেউ ছিলো না, আমি ছিলাম এক ছেলে। কিন্তু আমার সেজ-মাসীর ছেলেমেয়ের সঙ্গে আমি আপন ভাই-বোনের মতোই মানুষ হয়েছি। ওঁরা থাকতেন বিহারে, মেশোমশাই কাজ করতেন সেখানে। মাঝে মাঝে ছেলেমেয়েদের [illegible] পুজোর ছুটিতে পাঠিয়ে দিতেন আমাদের কাছে। বছরের মধ্যে সেই দু'তিনটে মাস যে কি আনন্দেই কাটতো! এখনও মনে পড়ে একদিনের কথা। সেদিন আমার মাসতুতো ভাইবোন শুভংকর আর মৃদুলা বিহার থেকে আসবে মামীর সঙ্গে। কে যেন হাওড়া স্টেশনে তাদের আনতে গিয়েছে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে গেল, সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত্তির। আমি দোতলার ঘরে বসে দাদুর পুরনো ছিন্ন মাস্টার্স ভয়েস গ্রামোফোনে কুন্দনলাল সে-র গান শুনছি—'ঘনতমসাবৃত অম্বর ধরণী।' গান শুনছি আর ছট্‌ফট্‌ করছি, কেন এখনো শুভংকর আর মৃদুলা এসে পৌঁছলো না। শেষপর্যন্ত যখন অনেক গান শোনা হয়ে গিয়েছে, আমার চোখ চুলে এসেছে ঘুমে—হঠাৎ একতলার সিঁড়িতে অনেক পায়ের শব্দ উঠলো, তার সঙ্গে শুভংকরের গলার চিৎকার—দাদা! আমরা এসে গেছি রে।

দাদু রোজ সকালে আমাদের তিনজনকে দু'আনা করে পয়সা দিতেন। তখন দু' আনার মূল্য অনেক। আমরা মাথা খাটিয়ে রোজ নতুন নতুন মেনু তৈরি করতাম। একআনার চানাচুর, দু'পয়সার হজমিগুলি, একআনার বাদামভাজা, তিনটে কিসমিস— এরকম অনেক জিনিস [illegible]

আমরা শিকার শিকার খেলতাম। খাটটা যেন আমাদের নৌকো, আর মেঝেটা যেন নদী। আমরা খাটে বসে নদী বেয়ে সাতরে আসা বাঘকে কাল্পনিক খেলনা বন্দুক দিয়ে গুলি করতাম। শিকারের ফাঁকে ফাঁকে বসদের ভাঁড়ার থেকে একটু একটু করে চানাচুর বাদাম বা এক কামড় কিসমিসের খাওয়া চলতো। স্থানটা আফ্রিকার জঙ্গল, কাজেই সঙ্গে রসদ না আনলে বা সে রসদ বুঝে না খরচ করলে চলবে কি করে?

ছোটবেলা থেকেই যন্ত্রপাতির ব্যাপারে শুভঙ্করের মাথা খুব ভালো খেলতো। দাদুর মাথার কাছে যাত্তিরে একটা ছোট টেবিলে নানারকম ওষুধপত্র এটা-সেটা রাখা থাকতো। অম্বলের জন্য ম্যাগ্নেসিয়া পাউডার, কাশির জন্য জেফ্‌রল সিরাপ, চশমার খাপ কাগজের মোড়কে কাটা হর্তকির টুকরো—এইসব। এ ছাড়াও থাকতো পুরনো আমলের জ্যাক্স কোম্পানীর একটা পকেটঘড়ি। এই ঘড়িটা খারাপ হয়ে যাওয়ায় কোলকাতার লিমটনের দোকানে সারাতে দেবেন বলে দাদু তাকে তুলে রেখেছিলেন। শুভঙ্কর একদিন কোথা থেকে একটা স্ক্রু-ড্রাইভার জোগাড় করে দুপুরবেলা আমাকে ডেকে বললো—দাদা চল্ আমরা ঘড়িটা খুলে দেখি ভেতরে কি আছে। দেখবি?

ব্যাপারটা যে ঠিক বৈধ হচ্ছে না এটা বুঝতে পেরেছিলাম এবং বোঝামাত্র বাজি হয়ে গেলাম।

সারাদুপুর শুভঙ্কর ঘড়ির যন্ত্রপাতি খুলে খুলে দেখল। আমি নীরব দর্শক হিসেবে পাশে বসে রইলাম। কলকব্জার ব্যাপার আমার ভালোও লাগতো না, বুঝতামও না। দাদুর দুপুরের ঘুম থেকে ওঠবার সময় হতে শুভ যাহোক করে ঘড়ির পেছনের কভারটা লাগিয়ে আবার তাকে রেখে এলো। এই ঘটনায় যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে শুভর কতখানি জ্ঞান বেড়েছিলো জানি না—কিন্তু ঘড়িটা আর সারানো যায়নি। লিমটন কোম্পানী থেকে মেরামতের অযোগ্য বলে ফেরৎ দিয়েছিল। কোলকাতা থেকে এসে দাদু কদিন মাঝেমাঝে আমাদের দিকে একটু সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতেন। আমরা অবোধ শিশু, কিছু বুঝিনে এমন মুখ করে ঘুরতাম। শেষপর্যন্ত দাদু কিছু সন্দেহ করতে পারেন নি।

আমার যখন দশ আর শুভর নয়, তখন গরমের ছুটিতে বিহার থেকে শুভ একটা আশ্চর্য কল তৈরি করে নিয়ে এলো। একটুকরো কাঠের ওপরে বিস্কুটের টিনের থেকে কাটা লোহা, পেরেক, কয়েকগজ তার ইত্যাদি দিয়ে যন্ত্রটা তৈরি। একদিকে একটা পুরনো টর্চের ব্যাটারীও লাগানো রয়েছে। আমি খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—এটা কি রে?

শুভ গর্বের সুরে বলল—এটা টেলিগ্রাফের যন্ত্র। আমি নিজে বানিয়েছি। আমি লিখেছিল কি করে বানাতে হয়। সঙ্গে ছবি ছিল। তাই দেখে দেখে বানিয়েছি।

আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ততদিনে আমি শিশু-ভারতী থেকে গ্রাহাম বেলের জীবনী, টেলিফোনের আবিষ্কার, স্যামুয়েল মর্শের টেলিগ্রাফ কোড এডিসনের জীবনী—সব পড়ে ফেলেছি। যদিও শুভর এটা মৌলিক আবিষ্কার নয়, তবু যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে আমার অসীম অজ্ঞতা ও ভীতি শুভকে আমার চোখে মর্স-বেল-এডিসনের সঙ্গে এক আসনে বসিয়ে ফেললো।

বললাম—এটা দিয়ে তুই কি করবি?

শুভ বললো—কেন, অনেক দূরে খবর পাঠাবো!

—কোথায়, কাকে খবর পাঠাবি তুই?

শুভ একটু থতমত খেয়ে বললো—তা জানি না, তবে অনেক অ-নেক দূরে কোথাও কাউকে পাঠাবো আরকি। দেখিস্ তুই—

দুদিনের মধ্যে কাঠকুঠো, তার পেরেক আর পুরনো ব্যাটারী দিয়ে আর একখানা অমন কল তৈরি করলো শুভ। তারপর আমরা দুভাই দুটো আলাদা ঘরে বসে সারাদিন টেলিগ্রাফের কল নিয়ে খেলতাম। আমি এখান থেকে চাবি টিপলে শুভর কলে খট্ করে শব্দ হতো—ওদিক থেকেও তাই। একটা সহজ সঙ্কেতলিপি বানিয়ে আমরা এ-ঘর থেকে ও-ঘরে খবর পাঠাতাম। অবশ্য তাতে 'হ্যাঁ' বা 'না' ছাড়া আর খুব কম শব্দই বোঝানো যেতো।

তারপর যেরকম স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকে, সাত-আটদিন খেলা করার পর জিনিসটা আমাদের কাছে পুরনো হয়ে গেল। কিশোরবয়ের একটা জিনিসে বেশী দিন মন লাগিয়ে থাকতে পারে না। শুভ ছুটির শেষে ফিরে যাবার সময় বললো—'সামনের বার একটা হেড-ফোন তৈরি করে আনবো দেখবি'। তখনো আমাদের বাড়িতে রেডিও আসেনি, রেডিওর এত চলও ছিলো না। একতলার নাগ-মশাইয়ের বাড়িতে একটা হেডফোন ছিলো, মাঝে মাঝে শুনতে যেতাম। নাগমশাইয়ের বড় ছেলে কাবলু আস্তে করে আমার মাথা গলিয়ে কানে লাগিয়ে দিতো, আমি অবাক হয়ে বসে শুনতাম। জিনিসটা খুব লোভের ছিলো। সেই হেডফোন শুভ তৈরি করে আনবে। পরের ছুটি অবধি খুব আশায় আশায় ছিলাম মনে আছে।

দিন কেটে যেতে থাকে। আমার বাবা বছর বরেসে ভাড়াবাড়ি ছেড়ে আমরা নতুন বাড়ি করে স্টেশনের কাছে উঠে আসি। খুব কষ্ট হয়েছিল পুরনো বাড়ি ছেড়ে আসতে। আসার কয়েকদিন আগে আমার জীবনের প্রথম ও সম্ভবতঃ শেষ মারামারি করি। মারপিট হয় নাড়ুর সঙ্গে।

ঘটনাটা এই—

আমাদের পাড়ার শেষের দিকে একখানা [illegible] খাপরা-খসা বাড়িতে সাধনারা থাকতো। সাধনার বয়েস নয়-দশ হবে, বর্ণনা করা কালো গায়ের রং। তবে স্বাস্থ্য ভালো হওয়ায় মন্দ দেখাতো না মেয়েটাকে, বরং বয়েসের তুলনায় বড়ই দেখাতো। আমাদের খেলবার সময়ে সাধনা এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে খেলা দেখতো। একদিন আস্তি-পাস্তি খেলবার সময় দল করতে গিয়ে নাড়ু বললো—সাধনাকেও দলে নে না, মেয়ে তো কি হয়েছে? আমি রাজি হলাম। নাড়ু বললো—সাধনা আমার দলে। আমি বললাম—তা কেন? ও আমার দলে—নাড়ু বলল—আমি সাধনাকে প্রেম করি, সাধনা আমার দলে। কিছু না ভেবেই বললাম—আমিও সাধনাকে প্রেম করি।

প্রেম সম্বন্ধে নাড়ুর বা আমার কারোই খুব পরিষ্কার কোনো ধারণা ছিলো না। সে বসেসে থাকবার কথাও নয়। কিছুদিন আগে মেয়েদের মজলিশে কে যেন আমাদের উপস্থিতি গেয়াল না করে গল্প করেছিল—ওপাড়ার অসিত বলে, ছেলেটা নাকি নিবারণবাবুর মেয়েকে ভ্রডিসে ধরে চুমু খেয়েছে। দুজনের খুব প্রেম চলছে।

অসিত আমাদের চেয়ে বয়েসে অনেক বড়ো ছিল। প্রেম করে সে আমাদের চোখে হিরো হয়ে গেল। আবছাভাবে বুঝতাম প্রেম করতে হলে একটি মেয়ে প্রয়োজন, এবং সেই মেয়েটিকে সুবিধেমত একবার জড়িয়ে চুমু খেতে হয়। মোটামুটি এই করলেই প্রেমের চূড়ান্ত করা হয়।

নাড়ু আর আমি কিছুক্ষণ পরস্পরের দিকে হিংস্র চোখে তাকিয়ে রইলাম। তারপর পাড়ার অন্যান্য ছেলেরা মাঝে পড়ে প্রস্তাব দিল—এভাবে ঝগড়া করে লাভ নেই। তোরা দুজনে লড়ে যা। যারপিঠে যে জিতবে সেই সাধনাকে পাবে। আমরা বিচারক থাকছি।

লড়াই শুরু হল, কিন্তু বেশিক্ষণ চললো না। নাড়ু একমিনিটের মধ্যে খ্যাক করে আমার হাতে কামড়ে দিল। আমি ব্যথায় চিৎকার করে বসে পড়তেই ছেলেরা হৈ-হৈ করে ছুটে এসে নাড়ুকে কাঁধে তুলে জয়ী বলে ঘোষণা করে দিল। যদিও প্রেমে এবং যুদ্ধে অবৈধ বলে কিছু নেই তবু হাতে কামড়ে দিতে যাওয়ার ব্যাপারে আমি খুব আপত্তি তুলেছিলাম। কেউ কান দিলো না।

কিন্তু মজাটা হলো তার পরে। যুদ্ধের জিতে নাড়ু সাধনার কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে ডাকলো—'আয় সাধনা'। সাধনা হঠাৎ 'আপদ কোথাকার! দূর হ'—বলে পেয়ারা খেতে খেতে বাড়ির দিকে রওনা দিল।

খানিকক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে নাড়ু আমার সঙ্গে ভাব করে ফেলল।

আমরা নতুন বাড়িতে উঠে আসার পরও বেশ কিছুদিন আক্ষরিক অর্থে আমার কৈশোর কাটেনি। বাইরের রহস্যময় পৃথিবীটার দিকে তখন আমার মুগ্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ। একটু করে পরিচয় হচ্ছে। সোফের

বেশ সবে দেখা দিয়েছে, ছেলেমানুষী তীক্ষ্ণ গলার স্বর ভেঙে পুরুষালী হয়ে আসছে। বাড়িতে কোনো উৎসব ইত্যাদিতে অল্প-বয়েসী কিশোরীদের সামনে গম্ভীর হয়ে বুক টান করে বারবার হাঁটাচলা করে পৌরুষ দেখাই। আবার পাড়ার সুভাষ লাইব্রেরী থেকে বাঁধাই করা পুরনো ছোট-দের মাসপয়লা বা বংমশাল পত্রিকা এনেও পড়ি। আসন্ন যৌবন এবং শেষ পর্যায়ের কৈশোরের মধ্যে তখনো একটা দড়ি টানাটানি চলছিল।

এই সময় মৃদুলা আরামবাগের একটা স্কুলে বোর্ডিংয়ে থেকে পড়ে। ছুটিছাটায় আমি গিয়ে নিয়ে আসি. আবার ছুটি ফুরোলে পৌঁছে দিই। শুভংকর নিজের পথ বেছে নিয়েছে, সে একটা পলিটেকনিক কলেজে মেকানিকাল এঞ্জিনীয়ারিং পড়ে। বিহারে মেসো-মাসী একা থাকেন কোয়ার্টারে।

ছোটবেলা কেটে যাওয়ার পর দিন যেন হু-হু করে চলে যায়। কবে যে বড় হয়ে গেলাম। কবে যে নিঃশব্দে হাত নেড়ে জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন কটি বিদায় নিয়ে গেল। ভালো করে বুঝতেই পারলাম না। ভালো করে সম্বিত ফিরতে দেখলাম একটা ইস্কুলে মাস্টারী করছি। এর চেয়ে বেশী অবশ্য আর কি আশা করতে পারি? কোনো টেকনিক্যাল বিষয়ে আমার মাথা খেলতো না, বিজ্ঞান নিয়ে পড়িনি। বস্তুতঃ গল্প-কবিতা লেখার চেয়ে কঠিন কোনো কাজ, করনো করেছি বলে মনে পড়ে না। কাজেই এই আমার অনেক।

বি-এ পাশ করে মৃদুলা কয়েকমাস আমাদের কাছে এসেছিল। এই সময় আমার কলেজের এক বন্ধুর সঙ্গে ওর বিয়ের সম্বন্ধ হলো। কি করে যে কখন কার বিয়ের ফুল ফোটে কে জানে। ছেলেটি সুদর্শন, ভালো চাকরি করে: আপত্তির কারণ ছিলো না। ছেলের বাপ-মা বললেন তাঁদের কোনো দাবী নেই। আমরা যেভাবে সাজিয়ে দিই তাতেই তাঁরা সন্তুষ্ট। চিঠি লিখে মাসী আর মেসোমশাইকে বিহার থেকে আনানো হলো। এর মধ্যে মেসো রিটায়ার করেছেন, শুভংকর ডি ভি সিতে তাঁরই জায়গায় কাজ পেয়েছে। মাসী এবং মেসো পাত্রের দাবী নেই শুনে রাজী হয়ে গেলেন।

কিন্তু মানুষ চিনতে তখনো আমার অনেক দেরি আছে।

মৃদুলার আশীর্বাদ হয়ে গেল। পাত্রের বাড়িশুদ্ধ লোক এসে সারাদিন হই-চই এবং খাওয়া-দাওয়া করে গেল। এর দশদিন বাদে বিয়ে। নিমন্ত্রণপত্র ছাপিয়ে বিলি শুরু হয়েছে। শুভংকর তখনো এসে পৌঁছতে পারেনি। তার নতুন চাকরি ছুটি নেই। সে বিয়ের দিন এসে পৌঁছবে।

বিয়ের চারদিন আগে পাত্রের বাবা এবং কাকা হঠাৎ এসে উপস্থিত। আমরা একটু অবাক হলেও সমাদর করে বসালাম। চা-জলখাবার ইত্যাদি চুকলে পাত্রের কাকা কেশে গলা পরিষ্কার করে বললেন—তা, ইয়ে—আপনারা দিচ্ছেন টিচ্ছেন কি?

আমরা আমাদের ক্ষমতা জানালে তাঁরা দুজন যেন ভয়নাক দুঃসংবাদ শুনেছেন এমন মুখ করে বসে রইলেন। মেসোমশাই ভড়কে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন— আপনারা কি কিছু বলবেন?

কাকা লোকটি বাবার চেয়ে তুখোড়। অহ' ধরনের একটা শব্দ করে বললেন—বলবো আর কি? বলার কি কিছু থাকলো?

—মানে?

—মানে, এইমাত্র জিনিস দিয়ে আপনারা মেয়ের বিয়ে দেবেন বলে ঠিক করেছেন নাকি?

মাসী এবং মেসো ভয় পেয়ে বললেন—কিন্তু দেওয়া-থোওয়ার ব্যাপার তো আপনারাই আমাদের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন—

—হ্যাঁ কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তার সুযোগ নিয়ে আপনি আমাদের সম্মান নষ্ট করবেন!

—আজ্ঞে, সম্মান নষ্ট কি বলছেন?

—তাছাড়া আর কি? আমাদের সোনার চাঁদ ছেলে, ফিরিস্তি যে একমুঠো জিনিসের দিলেন, তা পাড়ায় গিয়ে নামবে টি-টি পড়ে যাবে না? আপনারা সম্মান রাখবেন এই আশা করেই সমস্ত কিছু আপনাদের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলাম—

মেসোমশাই একটু সাহস সঞ্চয় করে বললেন—আপনারা তাহলে এখন চাইছেন কি?

তখন পাত্রের কাকা এবং বাবা আমাদের এক দীর্ঘ তালিকা দিলেন। সোনার পুর মেসোমশাই সামান্য চুপ করে থেকে হাত-জোড় করে বললেন—তাহলে আমাকে মাপ করতে হবে, এত দিয়ে মেয়ের বিয়ে দেবার সাধ্য আপাতত আমার নেই—

কাকা লোকটি চটে বললেন—তা বললে কি করে হয়? আশীর্বাদ হয়ে গিয়েছে, আমরা সব নেমন্তন্নর চিঠি বিলি করে ফেলেছি, এখন কি আপনি বিয়ে বন্ধ করতে চান নাকি?

—কি করবো বলুন? আপনারা আগে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। এখন বিয়ের চারদিন আগে এসে অন্যায্য চাপ দিচ্ছেন। আমার উপায় নেই—

এখানে কাকা একটি সুন্দর চাল দিলেন। বেগে বেরিয়ে যাবার জন্য উঠতে উঠতে বললেন—বেশ অন্যায্য চাপ যদি মনে করেন, তাহলে দেবেন না কিছু। শুধু

১৫০ টাকার বই
মাত্র ৭৫ টাকায়

মাও রচনাবলী ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৩০.০০ টাকা

॥ মাত্র ৪০০ গ্রাহক করা হবে ॥

যাঁরা এককালীন ৭৫.০০ (পঁচাত্তর) টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হবেন, কেবল তাঁরাই ১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ) টাকার বই মাত্র ৭৫.০০ (পঁচাত্তর) টাকায় পাবেন। টাকা জমা দেওয়ার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ৪০০ জন পর্যন্ত গ্রাহক করা হবে। শারদোৎসবের আগেই সমগ্র রচনাবলী সরবরাহ করা হবে।

* ডাকযোগে বই সংগ্রহকারীদের ক্ষেত্রে ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

নবজাতক প্রকাশন, এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-৭

সিঁথা-সিঁদুর দিয়েই মেয়ে পাঠাবেন। আমরা ভদ্রলোক কথা যখন দিয়েছি এইখানেই বিয়ে হবে। তবে বিয়ের পরে ফুটফরমাস রাখা বা মেয়েকে বাপের বাড়ি পাঠানো ইত্যাদি ব্যাপারে দয়া করে কোনো ত্রুটি ধরবেন না—সেকথা বলেই যাচ্ছি।

ব্যাপার পরিষ্কার বোঝা গেল। এখন সত্যি পিছিয়ে যাওয়াও কঠিন। লোকজন জানাজানি হয়েছে, নেমন্তন্ন শেষ। কেলেঙ্কারীর একশেষ হবে। সেটা বুঝেই ওরা চাপ দিয়ে গিয়েছে।

রাত্তিরে জরুরী আলোচনা সভা বসলো। সে আলোচনায় শেষ অবধি বিয়ে দেওয়াই ঠিক হইলো বটে, কিন্তু আমার মা বললেন—ওরা যা যা চেয়েছে সব দিয়েই বিয়ে দেবো।

মেসোমশাই বললেন—কোথা থেকে দেবো? আমার সঙ্গতি নেই।

মা বললেন—তুমি যদি না পাবো তাহলে আমি দেবো। যেখান থেকে পারি দেবো।

তার দুদিন বাদে জোড়া-খাট এলো, স্টীলের আলমারী এলো, আরো অনেক ভারী ভারী গয়না এলো—কিন্তু কিভাবে যে এলো। মায়ের গলা ও হাত খালি হয়ে গেল এসব করতে। মৃদুলা একবার আপত্তি করেছিল, মা থামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—তুই আমারও মেয়ে ভুলে যাস না।

বিয়ের দিন বরযাত্রীরা বোধহয় ট্রেনিং পেয়েই এসেছিল। তারা যথেষ্ট উপদ্রব করে, যথেষ্ট অপমান করে, আতিথেয়তা ও খাওয়া-দাওয়ার নিন্দে করতে করতে পান চিবিয়ে বাড়ি ফিরে গেল। বাসর ভালো জমলো না। এরপরে জমা সম্ভবও না। তবু আমি আর শুভ মুখে হাসি টেনে গিয়ে বসেছিলাম, কারণ আজ আমাদের মৃদুলার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। সেই কোন সুদূর শৈশব থেকে কত স্মৃতি মনে এলো। কে জানে বিয়ের পরে সম্পর্ক কি রকম থাকবে।

কয়েকজন বরযাত্রী বাসরে থেকে গিয়েছিল। তারা সারারাত নানারকম প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ করলো আমাকে আর শুভকে লক্ষ্য করে। মৃদুলা খুব শক্ত আর চাপা মেয়ে, দেখলাম নীরবে ঠোঁট দাঁত দিয়ে কামড়ে ও চুপ করে আছে। শেষরাতে একবার আমি আর শুভ বাসর থেকে বেরিয়ে গলির মোড় পর্যন্ত পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ালাম। শীত গিয়ে ক্যালেন্ডার অনুযায়ী এখন বসন্তকাল। কিন্তু শেষরাতে একটু একটু ঠাণ্ডা পড়েছে। আকাশে এখনো অনেক তারা। আমি আর শুভ সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগলাম। শুভ বলল—একটু বাদেই সকাল হবে। আমি বললাম—শুভ, তোর সেই টেলিগ্রামের কুলটার কথা মনে আছে? ছোটবেলায় তুই বানিয়েছিলি? বলেছিলি অনেক দূরে কোথাও খবর পাঠাবি?

শুভ একটু হাসলো। আমি আবার বললাম—এখানে মৃদুর বিয়ে দেওয়াটা বোধহয় ভুলই হয়ে গেল রে—

শুভ আবার সামান্য হাসলো। বললো—যা হবার, পৃথিবীতে তাই হয়ে থাকে। এখানে খুকীর বিয়ে হওয়া তুই-আমি ঠেকাতে পারতাম না। অনেক কিছুই মানুষের নিজের হাতে নয়।

—তবু চেষ্টা করলে হয়তো কিছুটা বদলানো যায়।

—না, যায় না।

তারপর সমস্ত ব্যাপারটা ঝেড়ে ফেলবার ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বলল—যাদ দে। চল, একটু হেঁটে আসি। যাবি?

—কোথায়?

—আমাদের পুরনো বাড়ির দিকে চল। ওখানে তোর আমার জন্ম। বোনের বিয়ের দিন জানিয়ে আসি যে আমরা ওকে ভুলিনি।

আবছা অন্ধকারে বাড়িটার পলস্তারা-খসা, ইঁট বের করা মূর্তি ঐতিহাসিক ধ্বংসস্তূপের মতো দাঁড়িয়ে আছে। পূব-দিকের ওই ঘরটায় একবছর আগে-পরে আমার আর শুভর জন্ম। ওর ছাদে আমাদের কতো ছেলেবেলার অবোধ খেলা—কতো উৎসবের স্নান হয়ে আসা স্মৃতি—কে যেন বলেছিল বাড়িতে লোহা পোঁতা থাকলে ভূমিকম্পে বাড়ির কিছু হয় না। তাই শুনে একদিন দুপুরে আমি ছোট্ট একটা এক ইঞ্চি পেরেক ছাদের আলসের হাতুড়ি দিয়ে পুঁতে দিয়েছিলাম। আজও নিশ্চয় খুঁজলে পাওয়া যাবে পেরকটা।

হঠাৎ বুঝতে পারলাম এই বাড়িটা আমার সমস্ত শৈশবের, শৈশবের সারল্যের প্রতীকে পরিণত হয়ে গিয়েছে। চারদিকে বদলে যাচ্ছে পৃথিবী, কঠিন হয়ে যাচ্ছে। ছোটবেলার সরল মূল্যবোধ ভেঙ্গে গিয়ে আমি চালাক হয়ে উঠছি একটু একটু করে। কিন্তু এই বাড়ি চিরকাল স্থির হয়ে থাকবে আমাদের শৈশবে।

বললাম—চল ফিরি। শেষরাতে অন্য লোকের বাড়ির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে পুলিশে ধরবে।

শুভ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললো অন্য লোকের বাড়িই বটে। চল—

পরের দিন বিকেলে বর-বৌ বিদায় হলো। আমি আর শুভ সঙ্গে গেলাম পৌঁছে দিতে। না গেলেই বোধহয় ভালো হতো। প্রথমতঃ সেখানে অনেকক্ষণ আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে হল একদিকে, কেউ এগিয়ে এসে আপ্যায়নও করলো না, বসতেও বললো না। পরে ওদেরই বাড়ির বড় জামাই—তার কিঞ্চিৎ বুদ্ধিশুদ্ধি আছে—ব্যাপারটা খারাপ দেখাচ্ছে বুঝে দুখানা ডেকোরেটরের ফোল্ডিং চেয়ার আমাদের বসবার জন্য পেতে দিয়ে গেল। বরণ শেষ করে বৌ ঘরে তুলে বোনের শ্বাশুড়ী এসে দাঁড়ালেন আমাদের সামনে। আমরা দুজনে উঠে দাঁড়ালাম। উনি ঠাণ্ডা গলায় বললেন—এদিকে এসো।

উঠোনের এককোণে ইঁট দিয়ে তৈরি একটা যজ্ঞিবাড়ির বড় উনুন ছিলো। আঙুল দিয়ে সেটি নির্দেশ করে বললেন—দেখছো?

দেখবার কি আছে বুঝতে না পারলেও আমরা মনোযোগ দিয়ে দেখার ভান করলাম। উনি বললেন—দেখলে?

—হ্যাঁ—

—কি দেখলে?

—আজ্ঞে, উনুন—

—হ্যাঁ, ভালো করে দেখ। কাল রাত্তিরে বাবোটায় এই উনুনে আঁচ দিয়ে তোমাদের বাড়ি-ফেরৎ সমস্ত বরযাত্রীকে আবার রান্না করে খাওয়াতে হয়েছে। শুনলাম তোমাদের ওখানে নাকি কোনো ব্যবস্থা ছিলো না বললেই চলে। তা, ক্ষমতা যখন ছিলো না তখন আগে বললেই পারতে, কিছু কম করে বরযাত্রী পাঠাতাম—

আমরা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছি। জীবনে এমন অন্যায় কটু কথা আমাদের কেউ কখনো বলেনি। এক উঠোন লোক অবাক হয়ে দেখছে আমাদের। এর ভেতর কালকের বরযাত্রীও কেউ আছে কিনা কে জানে। শুভ রাগী ছেলে, আমার খালি ভয় হচ্ছিল শুভ এক্ষুনি রেগে উঠে কিছু একটা বলে ফেলবে।

কিন্তু আমরা কেউই কিছু বললাম না। এখানে আমরা বোনের বিয়ে দিয়েছি। আর কিছু না হোক, তার স্বার্থেও আমাদের চুপ করে থাকতে হবে। খালি ভয় হচ্ছিল, ভেতর থেকে মৃদুলা আমাদের অপমান দেখতে না পায়। তাহলে তার মন ভেঙ্গে যাবে।

বৌভাতের দিন এরপর আর আমরা দুজন যাবো না ঠিক করেছিলাম। কিন্তু না গেলে মৃদুলাকে ওরা কথা শোনাবে এই ভয়ে যেতেই হলো। খাবার সময় সেই কাকা এসে দাঁড়ালেন সামনে। —এই, কে আছিস? এদের দুজনকে আরো মাছ দে—

—আজ্ঞে না আর নেবো না—

—নেবে না কেন? নিতেই হবে। এই ঢাল এখানে—দুখানা কেন? দশখানা দে—

তাঁর গলায় একটা বিশ্রী প্রতিশোধের সুর। অম্লেস ভেলা গলায় আটকে আসে। বিনীত হয়ে বললাম—আর দেবেন না, আর পারবো না খেতে—

দাঁত বের করে হেসে কাকা বললেন—নাও, নাও। ভয় নেই, আমাদের অনেক আছে। আমরা যখন লোক নেমন্তন্ন করি, তখন ঠিকঠাক আয়োজন রাখি—নাও আরো—

মৃদু গলায় বললাম—ভগবান আপনাদের অনেক করবার ক্ষমতা দিয়েছেন ভালো কথা। কিন্তু আমাদের পেটের ক্ষমতা নিতান্ত সীমিত। দিতে পারেন, কিন্তু পড়ে থাকবে।

অনেক অপমান করা গিয়েছে ভেবে কাকা অন্যত্র গেলেন।

শুভর আরো তিনদিন ছুটি ছিলো। আমরা দু ভাই আসন্ন বসন্তের ঈষদুষ্ণ বাতাসের নির্জন দুপুরে বসে বসে সিগারেট খেতাম আর ছোটবেলার গল্প করতাম। কি করে যেন আমরা দুজনেই বুঝে গিয়েছিলাম যে মধ্যবিত্তের কাছে বর্তমান দুঃসহ ভবিষ্যৎ ভীতিজনক ও অনিশ্চিত—একমাত্র অতীতই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে যা একটুখানি আলোর বিন্দুর মতো ফুটে রয়েছে।

আবার দিন কাটে। ইস্কুলে যাই, পড়াই। মাঝে মাঝে অসুখে ভুগি, সেরে উঠে ম্যানেজিং কমিটির সঙ্গে লড়াই করে বকেয়া মাইনে আদায় করি। পুরনো বন্ধুরা পুরনো দিনের মতোই অতীত হয়ে আসে।

আর লিখি।

এক একদিন বৈশাখের বাতাস বেশ গরম হয়ে উঠে গায়ে হলকা বুলিয়ে যায়। জানালা দিয়ে দেখি নিমগাছে দুটো কাক বাসা বানাচ্ছে। বৈশাখের শেষে তারা ডিম পাড়বে। নিঃসঙ্গ নির্জন দ্বিপ্রহর ঝিমঝিম করে। কেউ নেই কোথাও। আমি বুঝতে পারি আমার অভিজ্ঞতা সীমিত—মমু-এর মতো জোসেফ কনরাডের মতো আমি সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিনি, দেখিনি আশ্চর্য মানুষ, আশ্চর্য দেশ। কুইন্স-ল্যান্ডের মরুভূমিতে কিম্বা আমাজন রকেস প্রান্তে বৃক্ষ মাটিতে তাঁবু ফেলে নক্ষত্র-মরী নীরব রাত্রির রূপ আমি দেখিনি। হিমালয় পর্বতে সম্রাট দরায়ুসের শিলা-লিপির ওপর হাত রেখে আমি দেখিনি সূর্যকে দূর সমুদ্রের বুকে ডুবে যেতে। তবু আমি যা পেয়েছি নিজের অন্তরে, তাই বা কম কি? সেই নোনা ভাঙাবাড়িতে কাটানো আমার শৈশব, ঠিক এমনই নির্জন দুপুরে সমনের রাস্তা দিয়ে দূরে বিলীয়মান শিল-কাটাওয়ার ডাক শোনা, নাড়ুর সঙ্গে বড় রাস্তার ধারের গাছ থেকে ঘুর্ণি-ফল কুড়োতে যাওয়া—ভোরবেলা প্রথম আলোর স্পর্শ পেয়ে মায়ের পাশে ঘুম ভেঙে জেগে ওঠা—এসব কি কম?

এই নিয়েই আমি লিখি। সমস্ত পৃথিবী দেখা হল না, কিন্তু ক্ষুদ্র অথচ বৃহৎ অনুভূতিতে সমগ্রের যে অধিকার ছায়া পড়েছে, তার কথা লিখি।

বন্ধুরা সরে গেছে দূরে। দোষ নেই কারো, জীবনপ্রবাহ এবং উপজীবিকার টানে কে কোথায় ছিটকে পড়ে ঠিক কি? নাড়ু এখন দিল্লীতে ভালো চাকরি করে। চিঠির যোগাযোগও কমে এসেছে।

আমার বিয়ে ঠিক হয়। বাতাসে হঠাৎই ফুলের গন্ধ পাই। শুভকে চিঠি দিই। সে না এলে আমার কোনো উৎসবই সম্পূর্ণ নয়। শুভ উত্তর দেয়—সে আসছে।

বিয়ের ছ' সাতদিন আগে, তখনও শুভ এসে পৌঁছোয় নি, একদিন বিকেলে গাঢ় হয়ে এলে চুপিচুপি আমার জন্মস্থান দেখতে আমাদের সেই পুরনো ভাঙাবাড়িতে ফিরে যাই। নাড়ুর বাবা বাড়ি করে অন্য জায়গায় উঠে গিয়েছেন, নাগমশাইও তাই। কেবল নীচে দত্তবাবুদের ব্যাচেলার মেসটা এখনো আছে। গিয়ে বাইরে থেকে ডাকলাম—কাকা আছেন?

—কে?

দত্তবাবু বেরিয়ে এসে আমাকে দেখে অবাক হয়ে বললেন—আরে, তুমি! কি ব্যাপার?

—এলাম একটু। অনেকদিন আসিনি এদিকটায়—একটু ছাদে যাবো কাকা?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—যাও না, তার আর কি?

—জানি না তো এখন কারা আছে, কিছু বলে যদি?

—কেউ কিচ্ছু বলবে না, চলে যাও। তোমাদের ফ্ল্যাটটা তো ফাঁকাই পড়ে আছে; গত মাসে ভাড়াটে উঠে গেল।

ছাদে গিয়ে দাঁড়াই।

এই আমার সেই ছোটবেলার ক্রীড়া-ভূমি। নোনা, ছাদটা এমন খুব বড়ো আর কোথায়? অথচ ছোটবেলায় কতো বড়োই না মনে হতো। পুরনো আমলের পেটা ছাদ—এক জায়গায় একটা ফাটল দেখা দিয়েছিল বলে আমি নাড়ু স্টেশনের কাছে পি ডবলিউ ডি-র গুদাম থেকে একতাল পিচ কুড়িয়ে এনে ফাটলটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। ওই তা এখনো ঘুঁটের মতো হয়ে কালো পিচ ছাদে লেপ্টে রয়েছে। কার্নিশের ধারে গিয়ে হাত দিয়ে অনুভব করি। হ্যাঁ, রয়েছে এখনো পেরেকটা, হাতে লাগে।

সবই ঠিক তাই আছে, কেবল সময় গিয়েছে চলে।

কিছুক্ষণ একা ছাদে দাঁড়িয়ে দেখি একটা একটা করে তারা ফুটে উঠছে আকাশে। ঠিক সেই বাইশ-তেইশ বছর আগেকার দিনগুলোর মতো। কিন্তু কোথায় আজ নাড়ুর ঠাকুমা? কারা আর আজ বিকেলে গা ধুয়ে ছাদে উঠে আসবে মাদুর হাতে আসর বসাতে? আর তাদের সঙ্গের সেই অবোধ ছেলেটি? তালগাছের মাথাকে যার ভূতের মুখ বলে মনে হতো? সে কোথায়?

পরে দিন উৎসবের জন্য জিনিসপত্র এদিক-ওদিক করা শুরু হয়। খাট-তক্তাপোষ তোরঙ্গ-বাক্স বাড়ির নানা কোণে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। উৎসবের আগে যা হয়।

এইভাবে কুড়ি বছর পরে টেলিগ্রামের কলটা আবার আমি হাতে পেলাম। কোথায় পড়েছিল খাটের তলায়।

কলটা হাতে নিয়ে আমি আমার ঘরে এসে দাঁড়াই। নিমগাছের পেছন থেকে নবমীর উজ্জ্বল চাঁদ উঠে আসছে। ঝির-ঝিরে বাতাস দোলা দিচ্ছে নিমের পাতায় পাতায়। আমার হাতে ছোটবেলার কল।

কে যেন আমার নাম ধরে ডাকে অনেক দূর থেকে। যেন চিনি তার গলা, যেন চিনি না।

শুভ বলেছিল এই কল দিয়ে অনেক দূরে খবর পাঠানো যায়। আমার জীবনের এক শুভদিনের প্রাক্কালে আমার হঠাৎ সরাইকে খবর পাঠাতে ইচ্ছে করে। ব্যাটারি নেই আমার কলে, মরচে পড়ে পুরনো হয়ে গিয়েছে। তবু আমার দৃঢ়বিশ্বাস হয় এই যন্ত্রে আমি অনেক, অ—নেক দূরে খবর পাঠাতে পারবো।

টেলিগ্রাফের কলে আমি শব্দ তুলি—খট্ খট্, খট্ খট্ খট্—

বার্তা ছড়িয়ে যায় শৈশবে। এই গাঁও থেকে ওই গাঁয়ে। ভাঙাটে বাড়ির এঁদো গলি থেকে পৃথিবীর সুদূরতম সুন্দরতম প্রান্তে। আমি খবর দিই শুভকে, নাড়ুকে—তোরা চলে আয়। আমি ভালো আছি, তোরা? আমি তোদের কথা মনে করি। তোরা? খবর পাঠাই জীবনের পরপারে নাড়ুর ঠাকুমাকে—ঠাকুমা, আমি ভালো আছি, তুমি? আমি তোমাকে মনে করি। তুমি? খবর পাঠাই সমস্ত বন্ধুদের—আমি তোমাদের ভুলিনি। তোমরা? তোমরা? তোমরা?

ফুল গাছ

শ্যামলকান্তি দাশ

জলগুলি অভিভূত, কাদাগুলি থকথকে, ঝিম
মাছগুলি ভেঙে ভেঙে কীভাবে কোথায় যায়
ঘুমহীন মাছেদের প্রাণগুলি কোথায়, কীভাবে....
হে ছোটো লতাব গাছ, ফুলগাছ, এই হিম,
শিকড়ে শিকড়ে তুমি হাপরাও বোস ছায়া
রামধনু, মন খুলে কথা বলো, চাষ করো, শতমুখে
গেয়ে ওঠো গান—
আর ভাবো সোনার কঠোর পিতা কবে যেন
হারিয়ে এসেছে, ধাতুময় জঙ্গলে তুমি তাকে
নতুন চোখের জলে তুলে নেবে
আর ভাবো ক্ষারে ক্ষারে করুণায় পিতা কী মহান।

মেলাতে পারিনি

আশিস সান্যাল

মেলাতে পারিনি কিছু। তাই একা নিভৃতে এখন
বিষাদ নিওবে দেখা গড়ছি প্রতিমা
বুকের ভেতরে ক্ষত। চারদিকে নিরুপায় রক্তিম ধূসর
ঝরে ঝরে শব্দহীন দূরের নীলিমা
কেবলই বিমর্ষ আজ। পরিণামে যেদিকে তাকাই
জড়ানো কুটিল ছায়া, গাঢ় অন্ধকার—
মেলাতে পারিনি তাই অসহায় সবুজে হলুদ
হলুদে সবুজে বাখি দেখ বেদনার।

তবে কি হারিয়ে যাবো? একদিন নীরব অন্তিমে
চুপে কবে চলে যাবো সমস্ত সঞ্চয়?
বলে দাও অবিভূত বলো সুখ মহতো মহান্
কে দেবে আমাকে ফের দীপ্র বরাভয়?

সেই কবিতা কামেশ্বরী

শক্তিপদ ব্রহ্মচারী

সেই কবিতা কোথায়, যাকে বুকের ভিতর লালন করি
লালন, মানে লালন ফকির চিনেছিলেন অচিন পাখি
খাঁচার ভিতর প্রাণেশ্বরী
আধখানা আধারে মেশা, আধখানা তার গন্ধ মাখি

সেই কবিতা কোথায়, সে কি ঘাসের উপর শিশিরপাতে
জোনাকিটার সঙ্গে মাতে
সে কি তবে মেলায়-খেলায় নাগরদোলার বালক বয়স
সঙ্গদোষের জঙ্গী তাপস
জলার জলে দাঁড়িয়ে-থাকা এক-ঠেঙা সেই বক ধেয়ানী
গন্ধ ভেঙে ছন্দ টানি

রহস্যময় ফ্লকের ভিতর পায়রা ভীরু, বাঁধছে বাসা
পড়ার টেবিল, উল্টে দিয়ে কালির আঁখর সর্বনাশা
রাত জেগে রয়,
মন খারাপের সেই সময়
এবং কিশোর আর কিশোরী
সেই কবিতা কামেশ্বরী।।

নৌকা

শুভশঙ্কর ভট্টাচার্য

ঐ যে সে-নৌকাটি চ'লে যায়।
অগোপন ধূলি-ঝড়-ঝঞ্ঝায়
গুণ্ঠন খুলে মেয়ে গান গায়—
ঐ যে সে-নৌকাটি চ'লে যায়।

গান শুনে কথা আমি ভুলি নি,
নিচু কাঁধ, ঝরা জবা তুলে নিই;
বলীয়ান গুণ্ঠনও খুলি নি—
গান শুনে কথা আমি ভুলি নি।

ঐ মেয়ে দেখেছে কি আমাকে—
ঢাকা আছি বিষে আর তামাকে।
ঢেকে আছি প্রায় জলধারাকে—
ঐ মেয়ে দেখেছে কি আমাকে!

ঐ যে সে-নৌকাটি চ'লে যায়।
প্রেমিকেরা বলে, 'এ কী অন্যায়!'
কোন্ মদে সে-অসতী বন্যায়
কোন্ প্রেমে উন্মাদ—গান গায়?

ঐ যে সে-নৌকাটি চ'লে যায়....

সহাবস্থান

নির্মলকুমার দাস

P 3297 62

আটাকলের ঝাঁপ এবেলার মত ফেলে বাড়ীর উদ্দেশ্যে রাস্তায় পা ফেলতেই রতিকান্ত দেখল, রাস্তার উল্টোদিকের বাস স্টপের কাছে দাঁড়িয়ে বোল্টমদা লোক জড়ো করার চেষ্টা। কবে চেঁচাচ্ছে, আসেন বাবুরা, দ্যাখেন দ্যাখেন, সাপের মুখের সাথে মাইনষের মুখের মিলন দ্যাখেন—'

সেই একই ভঙ্গীতে একই সুরে গলা ফাটাচ্ছে বোল্টমদা। তার ডান হাত পেঁচিয়ে আছে কালো রঙের সেই আদ্যিকালের সাপটি। দুজনেই বয়সকালের বুড়ো। রতিকান্তকে ওদিকপানে তাকিয়ে থাকতে দেখে ক্লবের কর্মচারী ছোকরা গণেশ বলল, 'সেই তখুন থেকে ডাঁইবে ডাঁইবে চেঁচাচ্ছে।

'তার মানে বোজগারপাতি এখনো কিছু হয়নি, হবেও না —চ।'

রাস্তার এপাশ দিয়ে যেতে যেতে রতিকান্ত গলা তুলে বলল, 'নতুন খেলা চালু করো বোল্টমদা। ও খেলা পচে গেছে।'

ওকে দেখে বোল্টমের বুকে একটু আশা জেগেছিল। হয়ত কিছু দেবে। কিন্তু না। অবশ্য কিছু যে দেবে না এটা ওর জানা। তা সত্ত্বেও ভুল। মানুষ দেখলেই ওর আশা জাগে।

পিছন থেকে রতিকান্তকে মনে মনে একচোট গালাগাল দিয়ে ও বলল, 'শালা জ্ঞান খাডাচ্ছে, জ্ঞান। নতুন খেলা চালু করো, ও খেলা পচে গেছে।—আহা, বাপের ব্যাটা হোস একটু পথ্য কর না দেখি বুকের কত পাটা—' ওর গজরানো নিঃসন্দেহে আরো কিছুক্ষণ চলত কিন্তু এইমাত্র কাঁচড়াপাড়া-বারাকপুর রুটের একটি যাত্রীবোঝাই বাস ওর সামনে বেক কষে দাঁড়াতেই ও থেমে গেল। এবং যুগপৎ আশা ও উৎসাহে ডানহাত তুলে সাপটি দেখিয়ে লোকজনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চেঁচাতে লাগল, 'আসেন, আসেন বাবুরা, দ্যাখেন সাপের মুখের সাথে মাইনষের মুখের মিলন দ্যাখেন.....'

বাস চলে গেল।

যারা নামল, তাদের কেউই ওর খেলা দেখার জন্য থামল না। লোকজনের এমন মুখ ফিরিয়ে চলে যাওয়া দেখে বোল্টম ভাবল, দিনকালের একটা মাহাত্ম্য আছে। কি অদ্ভুতভাবে এই লোকগুলো আজ একে উপেক্ষা করে চলে যাচ্ছে। অথচ কয়েক বছর আগে এরাই আঠার মত লেগে থাকত। বাস খালি করে যাত্রীরা নেমে শরীরের লোম খাড়া করে খেলা দেখে পয়সা ছিটিয়ে ফিরে গেছে, এমন দিন-সংখ্যা ছিল অগুনতি। একবার তো এক বরষাত্রীর বাস পুরো আধ ঘন্টা থেমে ছিল। আর আজ? দিনকালের একটা মাহাত্ম্য সত্যিই আছে।

এই অঞ্চলের এক ম্যাজিকওলা সর্বক্ষণ ওর সঙ্গে আম-কাঁঠালের মাছির মত লেগে থেকে বলত, 'কি করে দেখাও বোল্টমভাই?'

উত্তর না দিয়ে বোল্টম শুধু হাসত, গর্ব এবং অহংকারের হাসি। ম্যাজিকওলা হাল ছাড়ত না। শেষকালে কিছু হবার নয় দেখে বলেছিল বিষধর না ভাই। শাল্প দাঁত ভাঙা সাপকে কে না পারে সোহাগ করতে?

শুনেই বোল্টম ক্ষেপে গিয়েছিল। সজোরে ম্যাজিকওলার হাত টেনে বলেছিল, 'হাত পাত, দ্যাখে দাঁত আছে কিনা।'

তার তখন 'বাবাগো' 'মাগো' বলে পরিত্রাহি চীৎকার। বোল্টম এই দেখে হাহা করে ভুবন কাঁপিয়ে হেসেছিল।

শুধু ম্যাজিকওলারই নয়, প্রত্যেকের কাছে এ এক বিস্ময়, এক প্রশ্ন,—সাপের মুখের খাপে নিজের মুখ ঠেকায় কি করে? শুধু কি ঠেকানো। তার আবার কত রকম। লোকজড়ো হতেই হাতে পেঁচানো সাপটির মুখ মুঠোয় ধরে একচোট নাচোন-কোঁদন চলত। তারপর ভিড় ভালোমত ধরতেই ও নাচ থামিয়ে বলত, 'এটা আমার কে, বলেন দেখি আপনেরা? সকলে চুপ। বোল্টমের মিটিমিটি হাসি। ওদের রহস্যের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে।

হাসি থামিয়ে ও বলত, 'এটা হল শিয়ে আমার বউ। তা মশায়রা ফুলশয্যে এখনো হয়নি। এইবার হবে। ফুলশয্যেতে কি হয়, মুখের মিলন হয় না?'

দর্শকবৃন্দের মজা চরমে।

'তা এইখেনে আপনেদের সম্মুখে হবে।'

সকলে তারিয়ে তারিয়ে বোল্টমের রঙচঙ উপভোগ করত। বিচিত্র ভঙ্গীতে নাচানাচির পর ও নিজের মুখটা ধীরে ধীরে সাপের মুখের কাছে নিয়ে যেত। এবং যেতে যেতেই এক ঝটকায় ডান হাত সবিয়ে তফাৎ বচনা করে বলত, 'বউ আমার লজ্জে পাচ্ছে গো।'

আবার হাসির রোল। মেয়েরা একে অপরের গা টেপাটেপি করে ফিসফিস করে বলত, 'দ্যাখ, সব জানে—।'

এইরকম কিছুক্ষণ চলার পর আচমকা ও কয়েকবার খপ্ খপ্ করে চুমু খেত। ভিড়ের মধ্যে থেকে একদিন একটা লোক বলে উঠেছিল, লাগিয়ে রাখো—

কানে যেতেই বোল্টম লোকটিকে বলেছিল, 'আপনি তো ডেঞ্জিরাস লোক মশায়। ফুলশয্যেতেই অতক্ষন লাগিয়ে রাখা যায় নাকি। বউয়ের লজ্জে করে না? আগে একটু পুরনো হোক।'

বেশকিছু সময়ের পর ও বলত, 'এই দ্যাখেন বউ আমার পুরোনো হয়েছে। আর লজ্জে করে না। এই দ্যাখেন—' বলে সাপের মুখের অর্ধেকটা অবলীলায় নিজের মুখের মধ্যে ভরে নিত। এবং উপভোগের বিচিত্র ভঙ্গী করত। দর্শকবৃন্দের তখন মনে হত, বোল্টম যেন এইমাত্র ওদের সকলকে এক আদিম ঠান্ডা ঘরের মধ্যে বন্দী করে ফেলেছে। নড়চড় করার শক্তিটুকু পর্যন্ত নেই। সকলে পাথর।—এই বুঝি দিল। কিন্তু আশ্চর্য। কেউ মুখ টেনে নিতে বলত না। মৃত্যুর কাছাকাছি খেলাগুলো দেখতে মানুষ ভীষণ ভালোবাসে। সেই খেলাই যখন পুরোনো হয়, কেউ দাঁড়ায় না। যে খেলা দেখিয়ে বোল্টম এবং ওর সাপ বুড়ো হল, সেই খেলাকে মানুষ এখন বর্জন করেছে। কারণ আর শিহরণ জাগে না। সকলেই উপদেশ দেয়, 'নতুন খেলা চালু করো—।'

মাস দেড়েক আগে বেলা দশটার সময় ভাটপাড়া হাই ইস্কুলের বড়শিবনাথবাবু সাইকেল রিক্সায় চেপে ইস্কুল যাওয়ার পথে বোল্টমকে দেখে থেমে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'খেলাটেলা এখন আর দেখাচ্ছিস নে?'

ব্যাজার মুখে বোল্টম বলেছিল, 'আজ্ঞে দেখাতে তো চাই, কেউ আর দেখতেই চায় না।'

বড়শিবনাথবাবু খানিকটা তাচ্ছিল্য করে বলছিলেন, 'দূর দূর, ঐ এক খেলা বছরের পর বছর কেউ দেখতে চায় নাকি। বেশ ভালো দেখে একটা নতুন খেলা আমদানি কর দেখি। দুর্গাপুরের বড় জামাই,—সেই যে তোর খেলা দেখে দুটো টাকা দিয়েছিল, সে প্রায় খোঁজ করে তুই কোনো নতুন খেলা দেখাচ্ছিস কিনা।'

বোল্টম খানিক অবাকের গলায় বলেছিল, 'এর চেয়ে আর কি ভালো খেলা হবে বাবু?'

—হয় না বুঝি। বড়শিবনাথবাবু বলেছিলেন,— হুঁ, হয়। এই ধর তুই সাপটা গিলে ফেললি, আবার বের করলি—

—গিলে?'

'পুরোটা না হয়,—অর্ধেকটা। তবে মুখটা ভিতরে যাওয়া চাই। নইলে খেলবে কেন।'

উপদেশ দিয়ে চলে যেতে বোল্টম খুব অবাক হয়ে ভেবেছিল, মেলা বিদ্যা জানা লোকটা সাপ গিলে ফেলার কথা বলল কি করে? শুধু এই অঞ্চলের না, আশপাশের এমনকি দূরের লোকেরাও বলে নতুন খেলা আমদানি করার কথা।

কিন্তু কি আর নতুন বিপজ্জনক খেলা ও দেখাবে। যখন হয়েছে ওরা ভালো করে চেঁচাতে পারে না। একনাগাড়ে হাঁটতে হাঁপ ধরে যায়। কিন্তু ইদানিং ও নতুন খেলা আবিষ্কারের জন্য ভাবতে শুরু করেছে। অন্যথায় বেঁচে থাকা যাবে না।

ইতিমধ্যে আরো কয়েকটি বাস যাওয়া-আসা করেছে। বেলাও হয়েছে ঢের। ভাটপাড়া হাই ইস্কুলে এইমাত্র ফার্স্ট টিফিনের ঘন্টা পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুপুরের শোয়ের টিকিট দেওয়া শুরু হবে। চারপাশে কত লোক। অথচ কেউ ওকে আজ চিনতে পারছে না। দিনকালের একটা মাহাত্ম্য আছে না?

এমন গভিক দেখে বোল্টমের মনে একটি ভয়ার্ত জিজ্ঞাসা মাথা চাড়া দিল, আজকের দিনটাও কি গত দুদিনের মত উপোস যাবে? কিন্তু আজ পেটে কিছু না পড়লে যে বাঁচা দায়।

যে করেই হোক,—জোর চাপতেই ওর মনে এল, খেলা দেখানো ছাড়া আর কোনো উপায় ওর আয়ত্তে নেই।

বাসস্টপে আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর সাপটি ঝাঁপির মধ্যে ভরে ও হেঁটে গেল সিনেমা হলের দিকে। উল্টোদিকের চালকল গেটের সামনের বটতলায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ চেঁচাল। কিন্তু বড় ক্ষীণ কণ্ঠস্বর। পায়ের ওপর ভর করে আর দাঁড়িয়েও থাকা যাচ্ছে না। ক্ষিদের শরীরটায় আর কোনো বল নেই।

স্টপে একেকটা বাস থামতেই লোকজন ছুটে আসছে। ওদের দেখে, হাতে বারো আনা দামের টিকিটের গোছা নিয়ে ব্ল্যাকাররা চেঁচাচ্ছে, 'পানসিকি, পানসিকি—'

যার সামর্থ্য আছে, সে কিনছে, বাকিরা ছুটছে অন্য সিনেমায়। কেউ সাপখেলার কাছে ভিড়ছে না। অথচ টিকিট না পাওয়া লোকগুলো একদিন খেলা দেখে বাড়ী গেছে।

শো শুরু হতেই, জায়গাটা একেবারে যেন শ্মশান হয়ে গেল। আর কোনো আশা নেই। বেলা দুটো বাজে। এখন আর কোথায় যাবে?

একটা ব্ল্যাকার এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কিগ্যে স্বামী-স্ত্রীতিতে শুধু চুমু খাওয়া-খাওয়ি হয়। আর কিছু হয় না?'

শুনে মাথায় রক্ত চলকে উঠল। কিন্তু কিছু বলাটা বৃথা।

আর কিছুক্ষণ দেখে ও বাড়ীর দিকে হাঁটা শুরু করল। সামনের চটকল বস্তিতে ওর আস্তানা।

কয়েক পা হাঁটতেই ওর মনে হল, ও যেন অনন্তকাল ধরে হাঁটছে। বয়সকালের অচরিতার্থ ক্ষিদে থেকে থেকেই মৃত্যুর কাছাকাছি নিয়ে যাচ্ছে ওকে। দড়িতে ঝোলানো হাতে সাপের ঝাঁপিটির ওজন যে কত। এই সাপটিকে নিয়ে সে একসময়.. সেইসব দিনের কথা ভাবতে ভাবতে ও কোনক্রমে আস্তানায় এল। মেঝেতে ঝাঁপিটি রেখেই চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। বুক ফেটে জল এল ওর। কাউকে জড়িয়ে হাউহাউ করে কাঁদতে ইচ্ছে হল খুব।

কিছু সময় মরার মত মেঝেয় পড়ে থাকার পর চোখ খুলতেই ঘরের দরোজায়

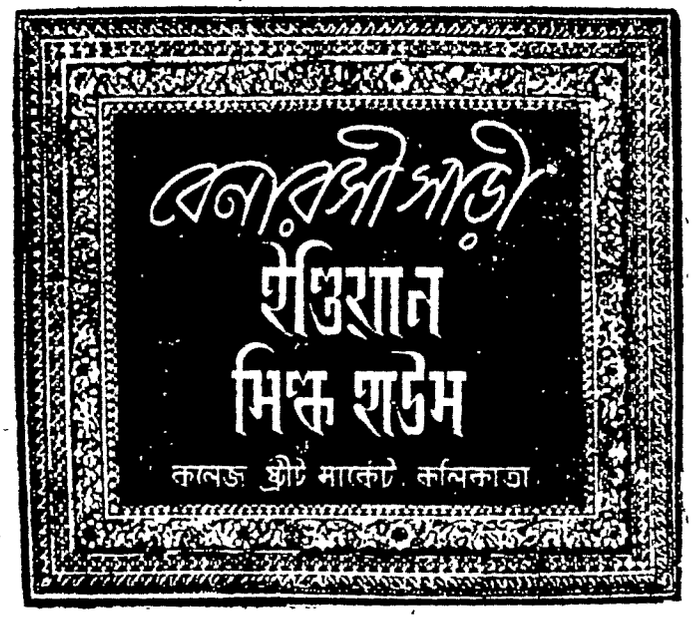

পাশে রাখা কলাইকরা থালাটি ওর নজরে এল। এবং অসা মাত্রই মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। এখনো একটি কাজ বাকি আছে। পাশের ঘরের এক দেহাতী চটকল মিস্তিরি ওর সাপের জন্যে রোজ এক থালা করে ভাতের ফ্যান দেয়। ও যেখানেই থাকুক না কেন, সে দরোজায় নারকোল দড়ির ফাঁস খুলে ঘরে রেখে যায়।

বোল্টমের উঠতে ইচ্ছে করছে না। শক্তিও বোধহয় হারিয়ে ফেলেছে। তবু উঠে বসল। ফ্যানের থালা এবং সাপের ঝাঁপিটি কাছে টেনে নিল। ঝাঁপির ডালা খুলতেই সাপটি শরীরের অর্ধেকটা সোজা করে, ফণা তুলে দুলতে লাগল। আনন্দে। এটা ওর খাওয়ার সময়। বোল্টম ওর মুখের সামনে থালাটি ধরবে, আর ও চুকচুক করে খাবে। এটাই নিয়ম। বহুদিন ধরে চলে আসছে।

কিন্তু আজ বোল্টমের সবকিছু কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। ঝাঁপি খুলে ফ্যানের থালাটি দু হাতে ধরতেই ও থমকে গেছে। লোভাতুর চোখে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে আছে ও থালাটির দিকে। ওর সামনে ক্ষিদে মেটানোর জন্যে দুলছে একটি সাপ এবং ওর পেটের ভিতর একটি ক্ষিদের সাপ তিনদিন ধরে মোচড় দিচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর সম্বিত ফিরে পেতেই ওর মনে হল না এটা বড় পাপ হবে।

কিন্তু মাথায় এই পাপবোধ থাকা সত্ত্বেও ও অবাক হয়ে দেখল, ওর হাত কিছুতেই সরছে না। বরং সাপটি চুমুক দিতে এলেই, বড় আশ্চর্যভাবে হাতদুটো পিছিয়ে আসছে।

এদিকে সাপটি আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারছে না। বোল্টমও অধৈর্য হয়ে পড়ছে। কি করবে ঠিক করে উঠতে পারল না। চরম দোটানার মধ্যে পড়ে গেল।

সাপটি ফোঁস ফোঁস করে ক্রোধ প্রকাশ করছে দেখে বোল্টম তীক্ষ্ণ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি যদি দুদিন না খেয়ে থাকতে পারি, তুই একদিন পারবি না কেন?'

দুজনেই সেই কোনকাল থেকে একসঙ্গে বসবাস করছে, উচিত তো দুজনেরই ক্ষিদে ভাগ করে নেওয়া।—এইসব ভাবনা ওর কাছে বেশ যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হল। থালাটির দিকে তাকাল একবার, তারপর দেখে নিল আশেপাশে কেউ আছে কিনা। কেউ নেই দেখে ঝটিতি এক চুমুকে সবটুকু ফ্যান শেষ করে ফেলল।

—আ—:

পরম তৃপ্তির সঙ্গে ঢেকুর তুলে পুনর্জন্ম লাভ করে ও কোনো দিকে না তাকিয়ে সটান শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। ঘুমের মধ্যেই চেষ্টা করতে লাগল, একটি নতুন খেলা আবিষ্কারের।

এদিকে সাপটি ওর কাণ্ড দেখে প্রথমটায় খুব অবাক হল। এবং তারপর ভীষণ ক্ষেপে গেল।

ঐ থালাটিতে যা থাকে, সেটা ওর প্রাপ্য। কিন্তু আজ—।

মানুষের হাতে পড়ে ও নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে গেছে বহুকাল। এই সময়টা ওর ক্ষিদে মেটানোর সময়। অথচ—।

নিজেকে ও আর ধরে রাখতে পারল না। ও বুঝে ফেলেছে, ওর খাবার আজ ঐ লোকটা খেয়ে ফেলেছে। কেন?

ভীষণ ক্রোধে ও ঝাঁপি থেকে ধীরে ধীরে নেমে এল। ঘুমের মধ্যে নতুন খেলা আবিষ্কারের চেষ্টায় রত বোল্টমের মাথার ঠিক পিছনে, এক-হাত সোজা হয়ে ফণা তুলে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। রক্ত-বর্ণ চোখ দুটি ভীষণ রকমের উত্তেজিত এবং অস্থির। চেরা জিভটি ভিতর বাইরে ছটফট করছে। বোল্টম জানে না, এই মুহূর্তে কি ঘটতে চলেছে। এ পাশ-ওপাশ দুলে দুলে লক্ষ্য স্থির করতে করতে সাপটি হঠাৎ ছোবল, লোকটাকে ছোবল মেরে ও যাবে কোথায় এবং কিভাবে। যে জঙ্গলে ওর জন্ম, যেটা ওদের রাজ্য—সেখান থেকে বহুকাল হল ও সরে এসেছে। জঙ্গলের পথ এখন ওর অচেনা এবং দুর্গম। এটা শহর। এখানেই কেটেছে ওর জীবনের বেশীর ভাগ সময়। ঘরের বাইরে কোলাহল, যানবাহনের শব্দ। ছোবল মেরে বাইরে বেরোতেই আশপাশের লোকজন ওকে ঘিরে পিটিয়ে মেরে ফেলবে। তাহলে? সাপটি দোটানায় পড়ল। মুহূর্তে ক্ষেপে যাচ্ছে, মুহূর্তে মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে পড়ছে।

কিছুক্ষণ পর, যেমন ফোঁস ফোঁস করতে করতে ও ঝাঁপি থেকে নেমে এসেছিল, দংশন করতে পারল না বলে, তার চেয়ে শতগুণ বেশী শব্দে ক্রোধ প্রকাশ করতে করতে ও ফিরে গেল ঝাঁপিতে। বাইরে বৈশাখের প্রখর রৌদ্র, পেটে ভীষণ ক্ষিদে এবং মাথায় দুর্দান্ত এক ক্রোধের আগুন, তবু মেজাজ ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করে ও ঝাঁপিতে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকল।

এই পৃথিবীতে ও বেঁচে থাকতে চায়।

সংসদ

বাঙালী চরিতাভিধান

[প্রায় সাড়ে-তিন হাজার জীবনী সম্বলিত আকরগ্রন্থ]

প্রধান সম্পাদক : ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত।

সম্পাদক : শ্রীঅঞ্জলি বসু।

ঐতিহাসিক কাল থেকে ফেব্রুয়ারি '৭৬ পর্যন্ত প্রয়াত বাঙালী জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁরা উল্লেখ্য ভূমিকা রেখেছেন, তাঁদের তথ্যসমৃদ্ধ জীবন-চরিত। লাইনো হরফে মনোলিথো কাগজে সুমুদ্রিত। [৪০·০০]

আচার্য সুনীতিকুমার বলেছেন :

...প্রকাশিত চরিতাভিধানের মত একখানি পুস্তকের বিশেষ অভাব বাঙালী পাঠক সমাজে অনুভূত হইয়া আসিয়াছে।...এই চরিতাভিধানখানি 'সাহিত্য সংসদের মর্যাদা' পূর্ণভাবে রক্ষা করিবে।

আনন্দবাজার পত্রিকা বলেন :

..এই মুহূর্তে হাতের কাছে সাড়ে-তিন হাজার বাঙালীর জীবনী এমন সাজানো গোছানো আকারে পাব কোথায়?...সংহত, নিখুঁত ব্যবহার্য, সুমুদ্রিত শোভন গ্রন্থ এটি।

যুগান্তর বলেন :

...বাঙালী চরিতাভিধানের মত একখানি বিপুল গ্রন্থ প্রকাশের আলোয় উপস্থিত করার জন্য প্রকাশক, প্রধান সম্পাদক এবং সম্পাদককে ধন্যবাদ।

সাহিত্য সংসদ ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলিকাতা ৭০০ ০০৯

শৈবাল মিত্র

তরণী পাহাড়ে বসন্ত

কি একটা ঘোরের মধ্যে তখন কয়েক দিন কাটে। পৃথিবীটা রোজ অচেনা হয়ে যায়। ক্যাবে সকলে ওকে খাতির করে। গাঁজা খেতে বলে না। দেশের রাজনৈতিক হালচাল জানতে চায়। বরুণ মাঝে মাঝে বিবেকানন্দের রচনাবলী পড়ে শোনায়। ব্যাখ্যা করে—ভয় পাইও না। কারণ মনুষ্য জাতির ইতিহাসে দেখা যায়, যত কিছু শক্তির প্রকাশ হইয়াছে, সবই সাধারণ লোকের ভিতরে। জগতে যত বড় বড় প্রতিভাশালী পুরুষ জন্মেছেন, সবই সাধারণ লোকের মধ্য হইতে, আর ইতিহাসে একবার যাহা ঘটিয়াছে, পুনরায় তাহা ঘটিবে। কিছুতেই ভয় পাইও না। তোমরা অদ্ভুত অদ্ভুত কর্ম করিবে।

ঘরের হাওয়ায় বরুণের গলা পাক খায়। চাপ চাপ ধোঁয়া। জাঙ্গিয়া পরা আদুল চেহারা। উঁচু টেবিলের ওপর ও বাবু হয়ে বসেছে। লাল চোখ। কিছু বুঝলি? ও কানাই-এর দিকে তাকায়। কানাই ঢুলছিল। সে বিড়বিড় করে — অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য করিবে।

অজিত একদিন লেনিনের লেখা রাষ্ট্র বিপ্লব বইটা আনল। রাষ্ট্র হল একটা শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীর ওপর শোষণ ও জবরদস্তি চালানোর হাতিয়ার। অজিত ব্যাখ্যা দেয়। কিভাবে রাষ্ট্র কাজ করে। ইতিহাস আর সমাজবিকাশের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক কি। ঘরের মধ্যে একটা সজাগ ভাব। বইটা শেষ হতে তিন দিন লাগে। এক ভোরে বরুণ তার বাড়ীতে হাজির। দিশাহারা চোখ। অগোছাল চুল। কপালে খড়ি উঠছে। রাতে হয়ত ঘুমোয় নি। বইগুলো দে—বরুণ বলে অজিতের ঘরের র‍্যাক আলমারি ঘেঁটে মার্কসবাদের গোটা দশেক বই কাঁধের ঝোলায় ঢোকায়। চা খায়। সারাক্ষণ পা নাচায়। ঘন ঘন সিগারেট ধরায়। দু-চারবার টেনে ফেলে দেয়।

তারপর প্রায় মাসখানেক দেখা নেই। অজিত এক সন্ধ্যেতে ব্যাঙাচি ক্যাবে যায়। ঘরে আর বেরালো আলো। সকলেই হাজির। ফিটফাট জামা কাপড়। ধোঁয়া নেই। গাঁজার গন্ধ নেই। বরুণের হাতে লেনিনের বই—হোয়াট ইজ টু বি ডান। ও পড়ছে। বাংলায় ব্যাখ্যা দিচ্ছে। দাড়িগোঁফ কামানো। খুব ধীর-স্থির ভঙ্গী। অজিতকে দেখে লাজুক হাসল। তারপর কবে যেন বরুণ তাদের সঙ্গে মিলে গেল।

ব্যাঙাচি ক্যাব উঠে কাগজের অফিস হল। বছর দুয়েক ওই ঠিকানায় অজিতের কাগজ বেরিয়েছে।

বরুণের সঙ্গে অনেক দিন পরে দেখা হল। বরুণ বদলেছে।

অন্ধকার পেছল রাস্তা। কিছু দেখা যায় না। মোতি বলে—সাবধান। ঝড়-বাদলে হ্যারিকেন চলে না। টর্চ নেই। ব্যাটারি জোগাবে কে? মাঝে মাঝে পুলিস ক্যাম্প বসেছে। রাতে তারা সজাগ থাকে। আকাশ ভর্তি মেঘ। ঘন কালো রঙ। জমাট, নড়ে না। আবার বৃষ্টি হবে। সামনে অনেকটা ফাঁকা, ধুধু মাঠ। তারপর ধান ক্ষেত, আলপথ। ওরা আজ রাতে তাঁতলাইতে থাকবে।

গোটা জেলা জুড়ে সাজ সাজ আওয়াজ। বরুণ একটা সাধারণ রিপোর্ট দিলো। সব থানাতেই পার্টি কমরেডরা শেকড় চারিয়েছে। আগামী দুচার মাসের মধ্যেই পুরো জেলা ফেটে পড়বে।

রামপুরহাটে ঘাঁটা গ্রামে এ্যাকশান হয়েছে। রামপুরহাট কলেজের ছেলেরা রেডগার্ড এ্যাকশান করেছে। তিনশো একাশি আপ অণ্ডাল আসানসোল ট্রেনে আগুন দিয়েছে। ওই ট্রেনে গোলাবারুদ যাচ্ছিলো।

কলকাতায় তুলকালাম কাণ্ড। বরুণ বললো—স্বয়ং বি এম ছিড়লা কাগজে বিবৃতি দিয়েছে—যুবক হলে আমিও নকশাল হতাম। বরুণ রিজিওনাল কমিটির লোক। এই এলাকার প্রতিনিধি। কিশোরই পাঠিয়েছে। আরো অনেক খবর ও দিলো। জেনারেল মানেকশ কলকাতায় এসেছে। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নিয়ে আলোচনা চলছে। বোলপুরে এর মধ্যে একদিন ইন্দিরা গান্ধী সভা করে গেছে। এসব খবর তাঁতলাই বা বাহেন্দায় আসে না। সিউড়িতে রিজিওনাল কমিটির সভায় বরুণ শুনেছে। রাজ্যে চল্লিশ হাজার সৈন্য নামছে।

বরুণের সঙ্গে অনেক বিষয়ে ওর মেলেনি। অজিতের মতে কয়েকটা ঘটনা জোড়াতালি দিয়ে মেলানো হয়েছে। এর কোনো দরকার ছিলো না।

সিউড়িতে নব কংগ্রেস কর্মী যদুগোপাল রায় খুন হলো। বরুণ বললো—এটা পার্টির কাজ নয়। নব কংগ্রেসের ঘরোয়া কোন্দল। দুই হবু এম, এল, এর ডুয়েল। তারাই এটা পার্টির ঘাড়ে চাপালো। কাগজপত্রও তাল দিলো।

পার্টির প্রতিবাদ করা উচিত ছিলো —অজিত বলে।

দরকার কি—বরুণ কথাটা উড়িয়ে দেয়—এরকম ডজন ডজন ঘটনা পার্টির ঘাড়ে চাপবে। অতো প্রতিবাদপত্র লিখতে গেলে একটা চিঠি লেখার অফিস খুলতে হবে। পার্টি ও লাইনে বিশ্বাস করে না। তাছাড়া এটা তো ভালোই। পার্টির প্রচার হচ্ছে।

অজিত থমকে যায়। এ প্রচারের মানে কি? ও বুঝতে পারে না।

বরুণ কথাটা বলেই একটু দ্বিতিয়ে যায়। ভুল শোধরায়—পুলিস জানে এটা আমাদের পার্টির কাজ নয়। তেরোই ফেব্রুয়ারীর কাগজে পুলিসের এক ওপর-ওলার স্টেটমেণ্ট আছে—সিউড়িতে যদুগোপাল রায় এবং যাদবপুরে শ্রীনিতাই মুখার্জীর খুন সম্পর্কে তাঁদের নিশ্চিত খবর যে ওই কাজ নকশালীদের নয়। তাছাড়া সব কজন পুলিস খুনের পেছনেও নকশালরা নেই।

অজিত চুপ করে থাকে। মানব মুখ খোলে। ও আছে খয়রাশোল থানায়। মানব বলে—পুলিসের স্টেটমেণ্ট যথেষ্ট নয়। যদুগোপাল রায়ের ঘটনাকে উদাহরণ করে হেমন্ত বসু, পীযুষ ঘোষ, নেপাল রায়

মারা পড়লো। হয়তো এগুলোও পার্টির কাজ নয়। কিন্তু পার্টির ঘাড়ে চেপেছে।

বরুণ জবাব দেয় না। রিজিওনাল কমিটিতে যাওয়ার পর ওর মধ্যে একটু মাতব্বরি ভাব এসেছে। অজিত মনে মনে হাসে।

বরুণ প্রসঙ্গ বদলায়—অজিতের হোমিওপ্যাথির বাক্সটা দেখিয়ে বলে—অর্থনীতিবাদ। ওষুধের লোভ দেখাচ্ছো।

বরুণের কথাটা হয়তো রসিকতা, তবু অজিতের খটকা লাগে। পার্টির লাইন অনেক সময় ওকে ধাঁধায় ফেলে। কিন্তু কিশোরের সঙ্গে আলোচনা হয় না। পার্টি লাইনে ও অন্ধ। অন্তত বাইরে থেকে তাই মনে হয়। ওর যেন কি হয়েছে। অন্য গ্রুপ থেকে এসেছে বলেই হয়তো এরকম কঠোর ক্যাডার মূর্তি। যে করেই হোক পার্টির বিশ্বাস আর আস্থা পেতে হবে।

খতমের লাইন নিয়ে অজিতের দ্বিধা আছে। রক্তের মধ্যে থেকে হামলে ওঠা ক্ষোভ, ঘৃণায় লখাই খতম করেছে নফর জানকে। এটার একটা মানে আছে। কিন্তু দু দশ ঘন্টা রাজনীতি বুঝিয়ে খতম করাটা কতোটা ঠিক? গরীব মানুষেরা না বুঝে রক্ত ঝরায় না। এটা ঠিক। আবার ভালোবাসার চাপে তারা অন্ধ। আমাদের ওরা ভালোবাসে। সুখে দুঃখে আমরা ওদের সঙ্গে লেগে আছি। তাই আমাদের পরামর্শ ওরা এড়াতে পারে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোথায় দাঁড়াবে বলা মুস্কিল।

কিশোর বলে—এটাই একমাত্র রাস্তা। প্রতিক্রিয়া আর সংশোধনবাদকে এ যুগে শুধু তত্ত্ব দিয়ে ঘায়েল করা যায় না। খতম হলো তত্ত্বেরই পরিণত চেহারা। তত্ত্ব এবং রক্ত জুড়লে হয় খতম। রাজনীতি প্লাস রক্ত ইকোয়াল টু যুদ্ধ ওয়ার। গরীব কৃষক এটা চায়। যুদ্ধে তাদের নেতৃত্বও এভাবে তৈরী হয়। অনেক শ্রেণীঘৃণা তাদের মনে জমে আছে।

আজ বরুণও সে কথা বললো—শ্রেণীশত্রু খতম সূচক বিন্দু। আমাদের থানায় এখনই শুরু করা দরকার। রিজিওনাল কমিটির সভায় লজ্জায় মাথা নীচু হয়ে গেছে।

গত পাঁচ মাসে জেলায় বত্রিশটা খতম হয়েছে। সিউড়িতে তেরো, বোলপুরে ছয়, রমপুরহাটে সাত, ময়রাশোল, সাঁইথিয়া ইলামবাজার, মথুরেশ্বর কোথাও বাকী নেই। একশো ছাব্বিশটা বন্দুক দখল হয়েছে। ফর্দে কোথাও আমাদের এলাকার নাম নেই। শুধু প্রচারের নামে এখনো আমরা আঙুল চুষেছি। কি লজ্জা। নেহাৎ লখাই একটা কাজের কাজ করেছিলো। ওটা বলে মুখ রাঁচিয়েছি।

মোতি বলে—কিন্তু প্রচারটাও তো দরকার। তাছাড়া গাঁয়ের শ্রেণী বিশ্লেষণ।

বরুণ ঝেঁঝে ওঠে। জানে এসব কিশোরের শেখানো কথা। খতমের সমর্থক সেজে কিশোর খতমের বিরোধিতা করছে।

বরুণ বলে—শত্রু পাওয়া যাচ্ছে না এটা বাজে কথা। খতম অভিযানে শত্রুর জমি বা সম্পত্তি বড়ো কথা নয়। তার চরিত্রের নিষ্ঠুরতাই আসল। নানা কায়দায় সে শোষণ করে। গরীব মানুষ তাকে ঘেন্না করে। এটাই যথেষ্ট। নফরজানের ঘটনা এর উদাহরণ।

হয়তো তাই। অজিত ঠিক ধরতে পারে না। খতমের পর কি? সৈন্যবাহিনী তৈরী হবে। শত্রু সৈন্যের সঙ্গে মোকাবিলা হবে। গরীব মানুষ কি করবে? তারা খাবে কি? জমি দখল, নতুন ভূমি সম্পর্ক কি ভাবে তৈরী হবে? কতোদিন এ লড়াই বাঁচবে? এখানে কি মুক্ত অঞ্চল গড়া যায়? এই তরণী পাহাড়... দুমকা ভাগলপুরের জঙ্গল, টিলা কি লাল রাষ্ট্রশক্তিকে বাঁচাতে পারে।

এসব প্রশ্ন তুললে, সকলে ভাববে, ও ভয় পেয়েছে। লড়াই শুরু করতে চায় না। এখন তো ওদের ধারণা অজিত সাঁওতাল হয়ে যাচ্ছে। সাঁওতাল মেয়ের প্রেমে পড়েছে। তাকে বিয়ে করবে। ঘর-সংসার হবে। তাই ঝামেলা এড়াতে চায়।

অজিত নিজের মনে হাসে। ওরা এখানকার মানুষকে চিনতে পারে নি। এদের রাগ আছে, শ্রেণীঘৃনা আছে। পাশাপাশি এরা বড়ো নিরীহ, শান্ত। মাদল বাজায় গান গায়। হাড়িয়া খেয়ে নাচে। গায়ে গা লাগলে হেসে গড়িয়ে পড়ে। কিশোর বা বরুণ জানে না কেন ওরা হাসে। আড়ালে বসে নীচু গলায় ওরা কি আলাপ করে। অজিত জানে। বুড়োবুড়ি অন্ধকারে জ্বলন্ত চুলোর দিকে তাকিয়ে কেন বসে থাকে। লালমুনি আজ পর্যন্ত ওর সঙ্গে দশটা কথা বলেছে। দুলহাবের কথা নয়। মাটি আর ঘাস ফুলের গল্প। বজলার ডাঁটা কেন সে খোঁপায় গোঁজে না। এইসব।

মোতি নীচু গলায় ওর বাড়ী ফেরার গল্প বলছিল। বাবা ভাবছিল, আমি বোধহয় আবার হারিয়ে যাবো। দাওয়া থেকে উঠছিলো না। লুকিয়ে দেখছিলো আমাকে। বিকেল হতেই নিয়ে গেলো কোম্পানীর অফিসে। সঙ্গে কদিনের বোনা কাপড়। বারাও মজুরী নেওয়া শুরু হয়ে গেছে। কোম্পানীর মাইনে করা হিন্দুস্থানী কর্মচারী বাবাকে ধমকায়—এ্যা ক্যা হুয়া। এ্যায়সা হোনে সে তুমলোকগকো কাম নেহি মিলেগা। আমার সামনে বাবা লজ্জা পায়। রাস্তায় বলে—বুড়ো আঙুল বেচলে ইজ্জতও বেচতে হয়। বাবা এককালের নামী তাঁতশিল্পী। হঠাৎ যেন ফতুর হয়ে গেছে। দুদিন বাড়ীতে ছিলুম। তাঁতে হাত দিলুম না। বাবাকে বললুম—আমি রাজনগরের ডাক্তারের কম্পাউন্ডার। শুনে প্রথমটা বাবা বিশ্বাসই করে নি। পরে দারুণ খুশী।

'ভালোই হয়েছে। তাঁতিদের যুগ শেষ—বাবা বলে। গলায় কোনো কষ্ট নেই। অথচ এই মোতির ছেলেবেলায় বাবা কতোবার বলেছে—বড়ো শিল্পী হতে হবে তোকে।

জানেন অজিতদা, আমার কিন্তু মাঝি গাঁয়ে থাকার কথা। [illegible] দিকে তাকিয়ে আমি রাজনগরে থাকলুম। ডাকতাবদাও ছেড়ে দিতে রাজী ছিল। আমি যাই নি। অথচ আমার প্রথম গাঁয়ে ঢোকার সিদ্ধান্ত ছিল। মোতির গলায় কষ্ট।

তাতে কি হয়েছে—অজিত বলে—তোর বাড়ীর যা অবস্থা।

মাঝে মাঝে দারুণ কষ্ট হয়—মোতি বিড়বিড় করে—দেশ বড়ো না সংসার বড়ো? দেশ অনেক বড়ো। কিন্তু দেশের কথা ভাবতে গেলেই বাবা মা ভাই বোনদের মুখ ভেসে ওঠে। কেন এমন হয়? আমি মুখ্যু লোক। বুঝতে পারি না।

অজিত বলে—হতেই পারে। তোর বাড়ীঘর সংসার থেকেই দেশের শুরু। আমারও তাই। মাধুর কি খবর—অজিত জানতে চায়।

আকাশে মেঘ ডাকে। বিদ্যুৎ চমকায়। মোতি বলে—আসার আগে দেখা হয়নি।

বিয়ে কর—অজিত জানায়।

দিবাকর কাকা রাজী হবে না।

তুই কি দিবাকর কাকাকে বিয়ে করবি—অজিত বিড়ি ধরায়।

মোতি সাড়া করে না। এবড়োখেবড়ো সরু রাস্তা। সাবধানে চলতে হয়। হঠাৎ মোতি হুমড়ি খেয়ে পড়ে। জলভর্তি গর্ত। পা ঢুকে গেছে। মোতি কুঁকড়ে ওঠে। প্রথম বর্ষার জল দেখে ব্যাঙেরা খুশী। তারা ডেকে যায়।

অজিত বলে, কি হলো। মোতির ডান পা গর্ত থেকে বার করে। মোতি এখন চুপ। দুহাতে পা চেপে আছে। বিরাট খোঁদল—অজিত বলে।

মোতিকে ধরে দাঁড় করায়। মোতি কঁকিয়ে ওঠে। আবার বসে। হোমিওপ্যাথির বাক্স খুলে বিড়ির আলোয় অর্নিকার শিশি বার করে। মোতিকে এক ডোজ দেয়। অন্ধকারে মোতির পায়ে হাত রাখে। মোতি শিউরে ওঠে। পা ফুলছে। এখনো প্রায় দু মাইল হাঁটতে হবে। সামনে বিলকান্দি। ভদ্রলোকের পাড়া। গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে ওরা যাবে না।

হাঁটতে পারবি—অজিত জিজ্ঞেস করে।

মোতি দাঁড়াতে চেষ্টা করে। পারে না। আমার কাঁধে ভর দে—অজিত বলে। মোতিকে প্রায় কোলে তুলে নেয়। মেঘ, অন্ধকারে চরাচর ঢাকা। একছিটে আলো নেই। অজিতের মনে হয়, একটা অনন্ত কানা সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে ও হাঁটছে। মোতির পায়ে ব্যথা বাড়ে। ও গোঙায়। অজিতের কপালে ঘাম। ঘনঘন শ্বাস পড়ছে।

কাল এলাকা কমিটির সভা। অ্যাকশানের সিদ্ধান্ত হবে। ভোর হওয়ার আগেই পৌঁছোনো দরকার।

বাইরে অন্ধকার। রাত বেড়েছে। এলাকা কমিটির সভা চলছে। সারাদিন বৃষ্টি হয়েছে। চারপাশ ভিজে। ঠান্ডা হাওয়া বইছে। ঝিঁঝির ডাক। ব্যাঙের কাতরানি। অন্ধকার ঘরে দুটো বিড়ি [illegible]

খুন- আর ব্যাঙের ছাতার খিচুড়ি। মাঝি গাঁয়ে বর্ষায় চাল থাকে না।

চারপাশের মাঠে লকলকে কাঁচ ধানের চারা। তলা ফেলা শেষ। জোতদাররা দু-চারজন গাঁ থেকে কেটেছে। বাকীরা এখনও দেখছে, কি হয়। এই মরশুমে ফসলের পূর্বাভাস ভালো। এসব ছেড়ে যাওয়া যায় না। কিষাণরা ভাবে, এবার বজরার আশা ছেড়ে দাও। জান বাঁচাও।

বজদা এলাকা কমিটির সম্পাদক। রিজিওনাল কমিটিতেও আছে। গোটা জেলার রিপোর্ট মুখস্ত। গড়গড় করে বলে যাচ্ছে। গাঁ শহরে ঢেউয়ের পর ঢেউ উঠছে। লড়াই ছড়িয়ে পড়ছে। বোলপুরে ব্যবসায়ী খতম। বন বাঁট অফিসে আক্রমণ, তিনটে বন্দুক দখল। কেন্দুয়ার মেন ক্যাম্পের কাছে একজন কনস্টেবলকে গেরিলারা মেরেছে। একটা বন্দুক এসেছে।

বীরভূম পুলিশ লাইসেন্সধারীদের সব বন্দুক জমা দিতে বলেছে। কিন্তু জোতদাররা রাজী নয়। ফসল কাটার মরশুম আসছে। মথুরেশ্বর থানার দক্ষিণ গ্রামে দুজন জোতদার খতম। কলকাতার উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় সিং নাহার পুলিসকে পুরো ক্ষমতা দিয়েছে। সাতদিনের মধ্যে আমাদের নির্মূল করার স্কীম তৈরী করতে বলেছে। রামপুরহাটের আদল-পাহাড়ী গাঁয়ের কাছে সেদিন একটা মজার ঘটনা হয়েছে। বাসের মধ্যে তিনজন পুলিস ছিল। সঙ্গে তিনটে বন্দুক। আমাদের কয়েকজন সাঁওতাল কমরেডও সেই বাসে ফিরছিলো। আদলপাহাড়ীর কাছে বাস আসতেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো পুলিসদের ওপর। তিনটে বন্দুকই এসে গেলো।

আমরা জিতছি। কিন্তু শত্রুরাও বসে নেই। আই, জি বীরভূম ঘুরে গেছে। প্রতিরোধ বাহিনী তৈরী হচ্ছে। তারা অহিংসায় বিশ্বাসী। কিন্তু তাদের ছোরা, তীরধনুক দেওয়া হবে।

অন্ধকারে আবছা মানুষগুলো হাহা শব্দে হেসে ওঠে। বজদা রেগে করে—সি আর দাশের নাতি পশ্চিমবঙ্গের সমস্যার মোকাবিলার ভার পেয়েছে।

মোতি বললো—সে তো প্রধানমন্ত্রীর ভাইভার।

রিপোর্ট শেষ করার আগে বজদা গম্ভীর গলায় জানায়—কমরেডস্ কঠিন সময় আসছে। গেরিলা যুদ্ধের এলাকা বাড়াতে হবে। গেরিলা যুদ্ধের ঝড় তুলতে হবে।

বজদা থামে। আলোচনা শুরু হয়।

তাঁতলাই গাঁয়ের নারান কাপুরিয়াকে খতম করা হবে। এলাকার প্রথম গেরিলা এ্যাকশান। একটা বড়ো স্কোয়াড যাবে। পাঁচজন ঢুকবে কাপুরিয়ার বাড়ী। বাধন কম্যাণ্ডার। হেঁসো, ভোজালি আর ডাণ্ডা থাকবে। আগেই নীচু গলায় ফিসফিস করে ওরা এ্যাকশানের প্রস্তাবটা গাঁয়ের শরীর মানুষকে বলেছে। চুপচাপ ঘাড় নেড়েছে কেউ। কেউ গলা ফাটিয়ে সায় হয় নি। ওপর পাড়ার কাকপক্ষীতে জানে না। মালিপাড়ায় একটা চাপা উত্তেজনা ধিকধিক করে।

নারান কাপুরিয়াকে মারা যায়, এটা ওরা ভাবতে পারে না। কপুরিয়াই এতোকাল মেরে এসেছে। হাতে মেরেছে। ভাতে মেরেছে। মাঝিরা কেঁদেছে। জঙ্গলে লুকিয়ে থেকেছে। রা কাড়ে নি। সময় বদলেছে। আজ ওরা মারবে। হাওয়ায় দূরদূরান্তর থেকে খবর আসে। হুল শুরু হয়েছে। বোলপুর, সিউড়ি, নলহাটি, রামপুরহাটেও আদিবাসী, গরীবেরা হাতিয়ার ধরেছে। বাবুভাইরা, মহাজন, সুদখোররা ভয়ে অস্থির। দুচারজন কাটা পড়েছে। রবি হাঁসদা ছকটা পরিষ্কার করে— নরহরি মাল, উর বাড়ীর সুনিস। উ দুয়ার খুলবেক পথ দিখাবে।

নরহরি কুথা—বাঘা জিজ্ঞেস করে।

বাইরের দাওয়ায় নরহরি বসে আছে। পাশে লখাই। গাঁয়ের মানুষেরাও দেখে। সভা শেষ হওয়ার অপেক্ষা করছে। তারাও শুনতে চায়। গাঁয়ে যেন পরব লেগেছে।

অন্ধকারে আলাদা করে কাউকে চেনা যায় না। স্নান পাকা হয়। সভা শেষ হয়। এখন লাগাতার অভিযান চলবে। তাঁতলাই এর পর স্কোয়াড যাবে কাঠঘাড়, আম-জোড়া, মোসাবাণী। তিন গাঁয়ের প্রতিনিধিরা সভায় এসেছে। গোটা রাজনগর, রাণীশ্বর থানায় লড়াই ছড়াবে। ঘরের মধ্যে সবলে উঠে দাঁড়ায়। বাইরে আসে। ভিজে অন্ধকারে শালপাতার গন্ধ। কোথায় যেন শেয়াল ডাকে।

নরহরি দাওয়ায় মুখ গুঁজে বসেছিল। বছর পঁয়ত্রিশ বয়েস। অকালে বুড়িয়ে গেছে। সাঁওতাল, মাল, বাউড়িদের মধ্যে বুড়োলোক কম। বেশীর ভাগ পঞ্চাশ পেরোয় না। যৌবন পর্যন্ত তাজা, টগবগে চেহারা। তারপর একলাফে বুড়ো হয়ে যায়।

অন্ধকারে নরহরি নিজের দুঃখ বলছিল। বাপ পেতমোও মুকুন্দির মুনির খেটেছে। তাদের ঋণ শুধতেছি। উপায় নাই গো। না করলে ঘরবাড়ী বিচে দিবেক। আদালতের কাগজে সব লিখা আছে।

কিন্তু নোকরি রাখতে গেলে কর্তা থাকে না। এই নিয়ে ওর পাঁচটা হলো। ওর আগে চার চাকটে সোমত্ত বউ ঘরে তুলেছে। প্রথম বিয়েটা বেশ জাঁকজমক করেই হয়েছিল। তখনও বাপ ঠাকুর্দা বেঁচে। অবপর কোথা থেকে যে কি হয়ে গেল। বউ পালালো। নরহরি তবু হাল ছাড়ে নি। চার চারটে সাঙ্গা করেছে। বউগুলোকে সে ভালোবাসতে কসুর করে নি। মনির ঘরে ভালোমন্দ হলে কাপড়ের খুঁটে বেঁধে নিয়ে এসেছে। মালপাড়ায় কেউ এটা করে না। যতো দেখেছে জগাই, ফাগু বৌকে বেধড়ক ঠেঙায়। এমন কি মোড়ল দীনবন্ধু পর্যন্ত। সে একেবারে কমারের পিটুনি। তবু ওদের বৌগুলো কেমন মেনীমুখো বেড়ালের মতো গা ঘেঁষে বসে থাকে। এসব কথা সে কিশোরকে আগে বলেছিল। কে জানে কেন তার বৌ পালায়। রাতে সে বাড়ী থাকতে পারে না। মুনিবের ঘর পাহারা দেয়। বিশ্বাসী লোক। তাকে ছাড়া মুনিবের চলে না। অথচ মুনিব নারান কাপুরিয়া ডাকসাইটে মানুষ। বাড়ীতে বন্দুক আছে। সকলে ভয় পায়। নরহরি তার ঘরে না থাকলেও চলে। কাপুরিয়া ছাড়ে না—। বলে—তোর বাপ, এমনকি কত্তাবাবা পর্যন্ত আমাদের ঘরে কিরষেণ খেটেছে। রাতে থেকেছে। আর রাতের বেলায় মনিবের ঘরে শোওয়া তো সৌভাগ্যের কথা রে। বাড়ীতেও ভোঁস ভোঁস ঘুমোবি। এখেনেও তাই। লাভের মধ্যে পুজোয় নতুন কাপড়, দৈনিক দুখান রুটি, চা মুড়ি। কাপুরিয়া এক লহমা দেখে। যোগ করে— মাঝে মাঝে তোর বৌকে বেড়াতে নিয়ে আসবি।

নরহরি বৌকে নিয়ে আসতে চেয়েছিল। বৌ আসেনি। প্রথম বৌটা এসেছিল। সেই প্রথম, সেই শেষ।

অজিত ঘনঘন নিঃশ্বাস নেয়। পায়ের ব্যথা ভুলে মোতি উঠে বসেছে।

নরহরি বলে—কর্তা আমায় ছাড়ে না।

তবে ইবার সময় এসেছে—নরহরি হঠাৎ গরম হয়—ইবার সমুন্দিরে জবাই করবো। বরদা সোন্দরী রোজ রাতে আসে। আমাকে কপাট খুলতে হয়। কেউ জানতে পাবে না। এমন কি গিন্নীও না। আমার ছেঁড়া ক্যাতায় ওরা নৌকাবিহার করে। হাঁটুতে মুখ গুঁজে আমি গোয়ালে বসে থাকি। সারারাত্তির খাটুনি। বড়ো ঘুম পায়। ঘুমোতে পারি না। আল্লার মুখ মনে ভাসে।

আল্লা ওর নতুন বৌ। অজিত দেখেছে। আল্লার ঘরে পুঁইশা গিয়েছিল একদিন। চাঁদমুনিও গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরছে। মেয়েদেরও কাজ আছে।

নরহরি ঠোঁট চাটে। এক রাতে আমি পাঁচিল টপকে ঘরে গেলুম। আনন্দে বুক কাঁপছিল। বৌরে অবাক করে দেবো। দরজায় আস্তে টোকা দিলুম। আল্লা দরজা খুললো। সব শুনে বললো—তুমি আমার কাছে চুরের মতোন লুকিয়ে আইছো। তোমার সাথে আমি শুবো না। মাথা ঘুরে গেছে। এবার একটা এসপার ওসপার হোক। অজিত একটানে বিড়ির সুতো পুড়িয়ে দেয়।

আকাশে মেঘ ছিল। হাওয়া বন্ধ। যে কোনো সময়ে বৃষ্টি নামবে। দূরে তরণী পাহাড় আবছা দেখা যায়। বেলা প্রায় বারোটা। গাঁয়ের কুঞ্জিতে লোকজন কম। হাঁড়িয়াতে মুড়ি ভিজিয়ে লখাই খাচ্ছিল। কাঠের চুলোয় আল্লা ছোলা ভাজছে। বাড়ীতে অনেক লোক। নরহরি গেছে কাপুরিয়ার বাড়ী। এখন গরুর জাবনা দিচ্ছে ও। স্কোয়াড তৈরী হয়। লখাই বলে, আমিও যাবো। ওর চোখ দুটো লাল। নারানের বাড়ীর খিড়কি পথে বাঘা, বুধন আর রবি ঢুকবে। ওদের শরীরে চাদর জড়ানো। চাদরের তলায় হেঁসো, ভোজালি। লখাই, অজিত মোতি থাকবে

সদর দরজায়। নরহরি দুদিক খোলা রাখবে।

কিশোর, বরুণ আর গাঁয়ের চার পাঁচজন কুলিতে নামে। স্কোয়াড এগিয়ে যায়। ওরা পেছনে থাকে।

অজিত লখাই আর মোতি বাড়ীতে ঢোকে। নারানের মুখোমুখি হয়। নারান ভয় পায়। অনেক খবর সে পেয়েছে। মোটা কাল্লো লোকটা ছলছল তাকায়। কি চাই— জিজ্ঞেস করে। ঠিক তখনই পেছনের দরজা দিয়ে রবিরা ঢোকে। প্রথম কোপটা দিলে বুধন। বামদার মোক্ষম ঘা। ঘাড় থেকে মাথাটা ঝুলে যায়। কাপুরিয়া টু শব্দ করে না। ঘন, লাল রক্তে মাটি ভাসে। দোতলায় নারানের বৌ। সে দেখে। একটা ভয়ঙ্কর চীৎকার তুলে বেহুঁশ হয়। রবি আর বাঘা পর পর দুটো কোপ মারে। রক্ত দেখে লখাই এর নেশা ছুটে গেছে। দুহাতে চোখ মুছে সে খোলা দরজা দিয়ে দৌড়োয়। কিশোররা তাকে দেখতে পায়। নাম ধরে ডাকে। কোনো সাড়া নেই। লখাই ভিজে মাঠের ওপর দিয়ে পাগলের মতো ছুটছে।

ওরা গাঁয়ে ফেরে। খবর শুনে খুশীর ঢেউ ওঠে। চা মুড়ি আসে। দিম দিম মাদলের শব্দ। উৎসব লেগে যায়। আশপাশের গ্রাম থেকে ভোজ খাওয়ার ডাক আসে।

কিশোর ভাবে, এখনই বসা দরকার। বিন্দু ভাঙলো। এবার ঝড় উঠবে। তার আগে সবকিছু গুছিয়ে নিতে হবে।

অজিত মাদলের বোলে পা মিলিয়ে নাচছিল। মোতির গোড়ালির ব্যথা কমেনি। ও মুড়ি চিবোচ্ছে। বাঘা ঘরে গেছে। বরুণ এগিয়ে আসে—এখনি বসে নাও। ধাক্কা আসছে। আটকাতে হবে। কিশোরের একটা হাত ও চেপে ধরে। কিশোর তাকায়। বরুণ বলে—এতো ভালো রাজনৈতিক প্রচার আর কোথাও হয়নি। এখানকার লড়াই মরবে না।

কিশোরের যোগাযোগেই বরুণ বাগদোগরায় এসেছে। মশানজোড় থেকে তাঁতিপাড়া পর্যন্ত প্রায় সব গাঁয়েই কিশোরের যাতায়াত। গরীব মানুষেরা তাকে চেনে। কিষণ বইহা ডাকে। বাঘা ফিরলো। বুধন কোথায়—কিশোর জিজ্ঞেস করে। নাচের আসরে বা আশপাশে বুধনকে দেখা যায় না। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে। বড়ো বড়ো ফোঁটা। ঠাণ্ডা হাওয়া ছোটে। নাচের দল পালায়। নিমেষে কুলি ফাকা। অদূরে শালের জঙ্গল। কে যেন ছুটে আসছে। কাছে এলে বোঝা গেল লখাই—তার শরীরে কাপুনি থামেনি। হাওয়ায় ভিজে পাতার গন্ধ। কিশোর বলে—বুধন কুথা? লখাই তাকায়। কিশোরের কথা যেন শুনতে পায় না।

বৃষ্টির মধ্যেই ওরা বুধনকে খুঁজতে বেরোয়। বাঘার বাড়ীর দাওয়ায় লখাই বসে আছে। একা থাকলে আজকাল ওর ভয় লাগে। জ্ঞান ডানের ভয়। মানুষ খুন করলে হাত শুকিয়ে যায়। [illegible]

নিজের হাতটা দেখে। কুসুমকে ঘরে রেখে এসেছে। কুসুম থাকলে বুকে বল আসে। দুমকা থেকে ঝুমরী ফিরলেই তিলকচুরি। তারপর বিয়ে। সোস্তাগীর নিলে এগিয়ে এসেছে।

গঙ্গার বাইরে ইঁট বাঁধানো জাহির থান। একটা পুরোনো শাল গাছ আছে। গাছের ডালে দড়িতে ঝুলছে ছোটো বড়ো অনেক ইঁট। তলায় রঙ করা মালসা। একটা মোটা শেকড়ের ওপর বুধন বসে আছে। দু হাঁটুতে মুখ ঢাকা। গাছের ডাল থেকে তোড়ে জল পড়ছে ওর মাথায়। শরীর ভিজে। চারপাশ কি নিঝুম ফাঁকা।

কিশোর ডাকে—বুধন।

এক ডাকেই বুধন সাড়া দেয়। চোখ দুটো লাল। ঘরকে চল্—অজিত বলে। বুধনের হাত ধরে। কিশোরকে বলে জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

বাঘার বাড়ীতে নরহরি এসেছে। কিশোরকে দেখে খুশীতে সে লাফাতে থাকে। বলে—তুমাদের পার্টিতে আমাকে নাও। আমি লড়বো। আমার নৌ বলেছে—আমি না লড়লে সে ঘর করবে না আমার সঙ্গে।

কিশোর নানাভাবে বুধনকে চাঙ্গা করে। অজিত ওকে এক ডোজ ডাল ক্যামেরা খাওয়ায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্কোয়াড ভেঙে ওরা সরে যায়।

এই একটা ঘটনাতেই গোটা এলাকার মূর্তি বদলায়। দু তিনটে থানা জুড়ে হৈচৈ। গরীব মানুষ জেগেছে। উত্তেজনায় ফুটছে। সমস্টকেও ঘোড়া থেকে নামানো যায়। অপমান, অত্যাচারের জবাব তারা নিজেরা দিতে পারে। পায়ের তলায় পিষে যাওয়া মানুষগুলোর ইজ্জতবোধ জাগে। ওরা আত্মবিশ্বাস ফিরে পায়।

দ্বিতীয় এ্যাকশানের পরিকল্পনা পাশ হলো। বাঘা কম্যাণ্ডার। রবি ছক করে। ওর লড়াই-এর ইতিহাস আছে। চেতনাও পরিষ্কার। দলমতনির্বিশেষে গাঁয়ের মানুষ জড়ো হয়। কিশোর বলে—বিপ্লবী কমিটি গড়তে হবে। একটা জিনিস পরিষ্কার হয়। লড়াই শুরু হলে পার্টির আড়াল থাকে না। বাম, ডান, কমুনিস্ট, কংগ্রেস সব দলের নীচের তলায় গরীবেরা জোট বাঁধে। মেকী রাজনীতি নিজেদের স্বার্থে ফারাক জিইয়ে রাখে। গরীব মানুষের একতা তারা চায় না। অথচ গাঁয়ের গরীব মানুষেরা এক। তাদের দুঃখ দুর্ভাগ্য সমান। তবু তারা আলাদা থাকে। শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় না। তাদের নেতারা কে বন্ধু আর কে দুশমন, এটা চেনায় না। তাই গাঁয়ের কৃষক সভা কৃষক আন্দোলনের নেতা হয় ধনী চাষী বা জোতদার। এ ব্যাপারে বামপন্থী বা দক্ষিণপন্থীতে কোনো তফাৎ নেই। নতুন হাওয়ার সাজানো সংগঠনগুলো উড়ে যায়। কায়েমী দলগুলোর নেতারা কিশোরদের ওপর চটে যায়। তারা জোট বাঁধে।

আমজোড়া গাঁ বাগদোগড়ার কাছেই। বাগদোগড়ায় সভা হয়। এ সভায় [illegible] এসেছে। পেল্লাদ মণ্ডলের নাম উঠতে আগুনে ঘি পড়ে। আমজোড়া আর আশপাশের দু-দশটা গাঁয়ের হাজার হাজার গরীব মানুষকে ও ছিবড়ে করে দিয়েছে। ওর বিষদাঁত ভাঙতে হবে।

এখানকার সভায় ঠিক বক্তৃতা হয় না। গল্পগুজব, গান বাজনা মিলিয়ে সভা। অনেকে হাড়িয়া খায়।

জিয়ন মুর্মু বলছিলো তাঁতজুই-এর খবর। নারান কাপুরিয়ার লাশ নিতে দারোগা এলো। সঙ্গে দলবল, ভ্যান গাড়ী। গাঁয়ের কিষাড়হরেরা ভীড় লাগিয়েছে। তারা লাশ নিতে দিবেক না। বলছে—আগে কুকুর আনো বটে। খুনীদের পাকড়াও। তবে লাশ পাবে। দারোগা পালাবার জন্যে ছটফট করছিলো। বন্দুক বাগিয়ে সিপাহিরা গুল হয়ে খাড়া আছে। দারোগার গোঁসা হয়। খেঁকিয়ে উঠে—কুকুর আনবো না আমার ইয়ে আনবো। আকাশের দিকে আঙুল তুলে বললো—কুকুর তোমাদের বাঁচাতে লাববে গো। ভগবানকে ডাকে। দারোগার গলা কাঁপছিলো। জিয়ন দারোগার গলা নকল করে। বলে—ভগবান তো আছেন বটে। তবে বহুৎ দূরে তিনি থাকেন। আমাদের ডাক শুনতে পান না।

ডগর কিসকু জানালো—পেল্লাদ আজকাল ঘর থেকে বেরোয় না। সব কিষাড়হরের এক হাল। ঘরের মধ্যে কাঁড়ে হাগে। কেউ হোলা বানিলেছে।

রাতে ভোজ ছিলো। গরুর মাংস আর ভাত। জিয়নের বাড়ীর দাওয়ায় ওরা খেতে বসেছে।

পচা মাংস। গা ঘুলোনো গন্ধ। কিশোর তাকায় বরুণের দিকে। বরুণ নীচু গলায় বলে—পেল্লাদ মোড়লের মরা গরু। কাল রাতে মরেছে। ভাগাড়ে ফেলে দিয়েছিলো। গাঁয়ের লোকজন শকুন তাড়িয়ে

এক অভিনব ও দুঃসাহসিক প্রয়াস!

শুধুমাত্র মহিলাদের লেখা নিয়ে

মাসিক বাংলা পত্রিকা

বিশেষ স্বাধীনতা সংখ্যা

....১৫ই আগষ্ট বেরোচ্ছে!

ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র "সাহিত্য সুধা"-র শারদ সংখ্যা বেরোচ্ছে ১৫ই সেপ্টেম্বর।

লেখক/গ্রাহক/এজেন্ট "পদ্ম - গঙ্গার" ঠিকানায় লিখুন।

লেখিকা/গ্রাহক/এজেন্ট [illegible]

মাংস এনেছে। হুসহাস জিভ টানার শব্দ। মাংসের গন্ধ শুঁকছে কেউ। চুলোর ফ্যাকাশে আলোয় ঝলমলে মুখ।

যে সে গরুর মাংস নয়—বরুণ বলে—বেঁচে থাকতে অনেক অমৃতির জিলিপি আর মিছরি খেয়েছে। মাঝিপাড়ার লোকজন গরুটার মৃত্যুর জন্যে ওৎ পেতে বসেছিলো।

হাপুস হুপুস খাওয়ার শব্দ। শালপাতা ঝোলে ভেসে যাচ্ছে।, জিয়নের গরম গা সে কিশোরের পিঠে হাত রেখে বলে—তু খাচ্ছিস না কেনে?

বুড়োর দু চোখ স্নেহে নরম। কিশোরের আর গন্ধ লাগে না।

বরুণ নীচু গলায় বলে—অজিত কি রকম হাঘরের মতো খাচ্ছে। হাঁড়িয়ার এফেক্ট।

দাওয়ায় পারকম পেতে গাঁয়ের বুড়োরা বসেছে। দাঁড়ির চৌপায়া। বুকে হাত রেখে অনেকে জোহর করছে জীয়নের দাদুকে। হাতে হাতে শালপাতার কুরিয়া হাড়িয়া খাচ্ছে ওরা।

সাঁওতাল গাঁয়ে ঝুপ করে মাঝরাত নামে। কোনো ঘরেই কেরোসিন নেই। রাতে আলো জ্বলে না। সন্ধ্যের পরেই রাত। ঘন, মধ্যরাত। বর্ষায় অকাল, অভাব। তখন দিনরাত অন্ধকার। মাদলগুলো দেওয়ালে ঝোলে। আজ সন্ধ্যেতে সব বদলে গেছে। মেলা বসেছে যেন। তেল চুকচুকে কালো খোঁপায় সাকামরাহা লাগিয়ে মেয়েরা ঘুরছে। মুখে ধবধবে হাসি। এখনি নাচগান হবে। হাওয়ায় সাকামরাহার গন্ধ।

সরণ যা বলে—এই কেরাকুরি তুরা শুরু কর।

কমবয়েসী ছেলেমেয়েরা হেসে গড়িয়ে পড়ে। তারপর দল বেঁধে কুলিতে যায়। অন্ধকারে দিম দিম মাদল বেজে ওঠে। তার সঙ্গে বাঁশীর উদাস সুর।

হেশফ বুথা খেশফ থেবা বইসি দাইকো দুরুপ আকন বাবা দাইকো তালাকাড়ে ইএ দায়এগা দশ টাকা আম দায়এগা ইশি টাকা বাবা দাএলো রাবা রুয়ারে লড়াই।

অনেক গলায় গানে চারপাশ গমগম করে। প্রেমের জন্যে নায়ক-নায়িকাকে জরিমানা দিতে হয়েছে। গানের সুরে সেই দুঃখ। গরম বা পারফমে বসে হাতে তালি বাজায়।

সাঁওতালরা সংঘবদ্ধ সম্প্রদায়। জাতীয় চেতনাও খুব প্রখর। কিন্তু ধ্যান-ধারণায়, মনের দিক থেকে পেছিয়ে আছে। সাংস্কৃতিক বিকাশ হয় নি। পুরোনো দিনগুলো কিশোরের মনে আছে। ভারত-বর্ষ, পৃথিবী বোঝাতে ঘাম ছুটতো। চীন, রাশিয়া, আমেরিকা, বৃহৎ শক্তি, বিপ্লব শব্দগুলোর কোনো মানে নেই ওদের কাছে। অজিত বলতো, সময় লাগবে। অনেকদিন সময়। ধীরে ধীরে বোঝানোই ভালো। বরুণ বলতো—কি দরকার ওসব বুঝিয়ে। পার্টি বলেছে, পতনের জন্যে রাজনীতি। প্রচারটাও সেইভাবে হোক। কিশোর শুনেছে। কিন্তু ওদের কথা মানেনি।

দুনিয়ার অর্থনীতি, রাজনীতির যে জটিল ছক, তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে। কাজ হয়েছে। দুদশজন নতুন সংগঠক বেরিয়েছে। বাউড়ি, মাল, বাগদীরা সম্প্রদায় হিসেবে সংগঠিত নয়। কিন্তু সাঁওতালদের চেয়ে অনেক সচেতন। বহু খবর রাখে। নিজেদের সমাজের বাইরেও তাদের মেলা-মেশা আছে। হয়তো জাতি হিসেবে দুর্বল বলেই এতোটা বাস্তবমুখী। তাছাড়া মহাজন জোতদার বাবুভাইয়াদের ঘরে ওরা নোকরি চাকরী পায়। নানা খবর শোনে। ওরা তো আর অতোটা অচ্ছুৎ নয়। হাড়ি, বাগদী, ডোম, মাল, বাউড়ীদের মধ্যে তাই চটপট কাজ হয়। এক ঝাঁক কর্মী বেরিয়ে আসে। তারা আবার সাঁওতাল গাঁগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে।

মেয়েদের একটা স্কোয়াড চাই। আন্নার সঙ্গে পরিচয়ের পর চিন্তাটা দানা বাঁধে। সাহসিনী মেয়ে। ও পারবে। ওর বাপ সিউড়ির এক কারখানার মজুর। পুঁইশা, লালমণি উজানী আর আন্নাকে নিয়ে শুরু করা যায়। সাঁওতাল মেয়েদের কারো নাম নেই। বাপ-মা নাম রাখে না। দরকারও হয় না। অমুকের বিটি বা অমুকের বন্ধু বলেই চেনে। তারপর দুলহাস হয়। প্রেম পরিণত হলে। খেয়াল খুশী মতো প্রেমিক একটা নাম দেয়। পুঁইশা বা উজানীও সেইভাবে এসেছে। এই নামে তাদের বাপ মা ভাই-বোনেরা চিনবে না। বেবার মুখ কিশোরের মনে পড়ে। কলকাতায় ও কি করছে কে জানে? এখানে থাকলে অনেক কাজ হতো। কিন্তু পার্টির নিষেধ। মেয়েদের আর গাঁয়ে যাওয়ার দরকার নেই। মেয়ে থাকলে কিছু অন্য ধরনের কাজ শুরু করা যেতো। চিন্তা চেতনার মান বাড়াতে হবে। গল্প, গান, নাটক কবিতায় মনের অন্ধকার ঘুচে যায়। দশটা সভা বৈঠকেও যে কাজ হয় না একটা নাটকে তার দশগুণ কাজ হয়। ওগুলো মনের অনেক গভীরে দাগ কাটে। চিন্তায় শেকড়ে টান দেয়। কিন্তু কাকে বলবে এসব? পার্টির লাইন এখন লক্ষ্য ভেদ। গরীব মানুষের ক্রোধের বারুদে আগুন লাগানো। সেখানে এসব কাজ অর্থ-হীন। তবু ও মেয়েদের একটা স্কোয়াড গড়ার কথা ভাবে। প্রথম কাজ সবকটা মেয়ের নামকরণ। একটা করে নাম দিতে হবে সকলকে। আধ ঘুমের মধ্যে ও মেয়েদের মুখগুলো ভাবে। কাল পরশুর মধ্যেই জনাসাতেক মেয়ের একটা স্কোয়াড ও গানাবে। মেয়েদের মধ্যেও সংগঠনের দরকার। সংগঠনটাই পার্টির প্রাণ। এ প্রশ্নে বরুণ তার সঙ্গে একমত নয়। কলকাতার গণপত্রিকাও ওর কথায় বিবর্তিত হয়েছে। দিন কয়েক আগের ঘটনা। এক সভায় বরুণ বললো সংগ্রামকে ছোরার মতো ছুড়ে দিতে হবে। তার জন্যে দরকার জঙ্গী ক্যাডার। লড়াকু কর্মী। একজন সচেতন সংগঠকের চেয়ে একজন জঙ্গী যোদ্ধার দাম এখন অনেক বেশী। এটা লড়াই-এর পার্টি। লড়ায়ের [illegible] পার্টি বাড়বে। চেতনা জাগবে। প্রচারকের কাজ এখন শেষ। কিশোর বুঝতে পারে একটা নতুন সময় আসছে। এরপর সংগঠকেরা হয়তো আর পাত্তা পাবে না। অজিতটাও যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। সব সময়ে চুপচাপ। আলোচনাতেও মুখ খোলে না। মালকুটে হুল্লোড়বাজ ছেলেটা কি এক অচেনা অলৌকিক নেশায় বুঁদ।

খোঁচালে বলে—মাথায় ঢুকছে না। পার্টির সিদ্ধান্ত মেনে নেবো। বরুণ মজা করে বলে, হাঁড়িয়া গিলে গিলে তুই ভোঁতা হয়ে গেছিস।

অজিত হাসে। বলে—আমি সাঁওতাল হয়ে গেছি। আমার বুকের মধ্যে সবসময়ে মাদল বাজে। কথা বলতে পারি না। কথা ভুলে যাচ্ছি।

বরুণ বলে—কমুনিস্টরা তলিয়ে যায় না।

অজিত শিশুর মতো হাসে।

রাতে কিশোর একটা স্বপ্ন দেখলো।

পৃথিবীতে তখন শুধু জল, মহা-সমুদ্র। ভগবান চান করতে নামলো। ভগবান আর ভগবতী। দুই বুড়োবুড়ি আকাশ থেকে ঝুলোনো সুতো বেয়ে সমুদ্রের বুকে এক পানসিতে নামতো। এক শীতের দিনে দুজনে খুব নাইছে। বুড়োর শরীর রগড়ে এক ডালা ময়লা বেরিয়েছে। বুড়ি দুটো পাখী বানালো। ভগবানকে বললো জীবন দাও। ভগবান প্রাণ দিলো। এদের নাম হাঁস আর হাঁসি।

মহাসমুদ্রে বসার জায়গা নেই। হাঁস-হাঁসি উড়ে উড়ে ক্লান্ত। ললেজ ওপর শিবের মাথা ঠেকেছিল। সেখানে ওরা বাসা বাঁধলো। হাঁসি দুটো ডিম দিলো। দুটো বাচ্চা হলো।

ভগবান জিজ্ঞেস করলো—দেখতে কেমন?

ভগবতী ট্যারা-বাঁকা দেখাইচে

ভগবান—মানুষই বটে।

মানুষের জন্যে মাটি দরকার। সমুদ্রের তলা থেকে কেঁচো মাটি তুলতে রাজী হলো। সমুদ্রের বড়ো মাছেদের হাত থেকে কেঁচোকে বাঁচাবার জন্যে ঢ্যামনা সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে বসলো। তার ভেতর দিয়ে কেঁচো জল নামলো। কেঁচো খাচ্ছে আর উগরে দিচ্ছে। চারদিকে থলথলে কাদা-মাটি। ভগবান ঘাসের বীজ ছড়িয়ে মাটি শক্ত করলো। ঘাস হলো।

মানুষ দুজনের নাম হলো—ফিলচু হাসাম আর ফিলচু বুড়ী। তাদের নয় ছেলেমেয়ে তাদেরই অংশ বংশ বেড়ে পৃথিবীর যাবতীয় মানুষ।

কি একটা শব্দে কিশোরের ঘুম ভেঙে যায়। চোখের সামনে সীমাহীন অন্ধকার অকূল সমুদ্র। অনেক দূরে তারা ঝলমল আকাশ। মেঘ নেই। গাছপালায় ঝিমঝিম শব্দ। হাওয়ায় অনেক গানের মিহি সুর। অন্ধকার রাতে একটা গ্রামোফোনের মতো পৃথিবী জেগে ওঠে। বাজতে থাকে। তারায় তারায় শব্দের বিদ্যুৎ ছুটে বেড়ায়।

(চলবে)

নিরুদ্দেশ

শ্যামলী দাশগুপ্ত

রত্তি বারান্দার কোণ ঘেঁষে দাঁড়াল। দীর্ঘ উঠোনের শিউলি গাছটার নীচেই যতো ছায়া। নানকু সেই ছায়াটার তলায় বসে মুরগী কাটার তোড়জোড় করছে। চারটে মুরগী আনার কথা ছিল। হয়তো পায়নি অথবা ইচ্ছে করেই দুটো কিনেছে। হৃষ্টপুষ্ট মুরগী দুটোকে নানকু দড়ি খুলে ছেড়ে দিচ্ছে। রত্তি বুঝতে পারে না ব্যাপারটা। ওদের তো কাটবেই নানকু তবে দড়ি খুলে দিচ্ছে কেন? নানকুর আচার-আচরণগুলো আশ্চর্য লাগে রত্তির। কিছুদিন থেকেই নানকু যেন রহস্যময় হয়ে উঠছে। ওর সমস্ত মুখ-চোখে একটা অজানা ছাপ স্পষ্ট—যাকে চেনে না—বুঝতেও পারে না। নানকু নিজেকে মাঝে-মধ্যে জানকু মস্তান বলে। বলে কি সুখ পায় ভাগবানই জানে।

বকে তাবা আড্ডা দেয় দিনরাত। ওদের স্কুলে যখন ঘণ্টা পড়ে তখন থেকে বা তার বেশ কিছুক্ষণ আগে থেকেই ওরা রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বাড়িদের স্কুলে যেতে হলে ওদের প্রায় গা ছুঁয়ে যেতে হয়। ওরা যে এটাই চায় তাও জানে রতি। এসাই আবার বিকেলে স্কুল ছুটির ঘণ্টা শুনেই চারিদিকে ছড়াকার হয়। এইসব মস্তানদের সঙ্গে নানকুর কোথাও মিল নেই। ও বাস্তায় ভাড়ুতা মারে না, মারামারি করে না, শুধু একান্তভাবে রতির কাছে দাঁড়ালেই ওর শরীর অস্থির হয়। মুখচোখ পালটে যায় রতির। নানকুরও। রতি দেখেছে নানকুর তৃষ্ণার্ত মুখ কেমন লালচে হয়। তখন রতির ভারী ইচ্ছে করে নানকুকে একটু ছুঁয়ে দেয়, কিন্তু ভারী লজ্জা হয় অথচ । কাল নানকু ওর কতো কাছে এসেছিল, ইচ্ছে করলেই ও রতির রতি নম কিশোরীর লজ্জা নিয়ে অপেক্ষা করছিল। নানকু আলতো করে আঙুল ছুঁয়ে ছিল রতির। ওহ্ কিছুতেই ভাবতে চায় না সে দৃশ্য রতি। ভাবলেই শরীর অস্থির হয় রক্ত ছোটাছুটি করে। নানকুর টেনিস বলটা যখন ওপর থেকে দ্রুত ছোটাছুটি করে। কাল রাতে রতি একটা বিচ্ছিরি স্বপ্ন দেখেছে। এ স্বপ্নের অর্থ বোঝে রতি। মা বোঝার বয়েস তার নয়। সামনের ফাল্গুনে পনেরোতে পা দেবে রতি। মা অবশ্য এখনও ওকে তেরো বলেই চালিয়ে দিচ্ছে। মা তাকে সব সময় সাবধানে থাকতে বলে। এখন নাকি তার বিপদ সামনে। নিজেকে বেশ করে রক্ষা করতে হবে। নানকু ছাড়া রতি আর কোন ছেলের সঙ্গে কথা বলে না—বলতে পারে না, মার নিষেধ। নানকু নেহাতই আত্মীয়ের মধ্যে তা নইলে ছুঁতো । মা তো কত কিছুই নিষেধ করে, কিন্তু রতি লুকিয়ে লুকিয়ে কদিন ধরে ফয়েডের বই পড়ছে তাও কি মা জানে? মা বলে মাকে-মধ্যেই : বই-এ কোন দোষ নেই রতি— যেভাবে তুমি গ্রহণ করবে দোষটা তারি ওপরে নির্ভর করে। গ্রহণ কদাকারি বোঝে না রতি, তবে এটুকু বোঝে যা বুঝতে পারছে, তাদের সম্পর্ক যে রকম হওয়া উচিত, সে সেইভাবে নিতে পারছে না। রতির হাসি পাচ্ছে নানকুকে দেখে। এখন দাখো চেয়ে নানকুকে, কে বলবে এই ছেলেই রতির মুখোমুখী কেমন লজ্জায় নুয়ে পড়ে। কোথায় যেন পড়েছে রতি, মেয়েরা নাকি সেক্সের ব্যাপারে ছেলেদের চেয়ে বেশী পাকা। জিভ কাটল রতি, যেন ওর ভাবনাটুকু কেউ পড়ে ফেলবে মন থেকে। ইস্ কি ভাবছে রতি তখন থেকে। আবার হাসি পেলো রতির। নাহ্ ফয়েড পড়ে পড়ে সত্যিই মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে, তা না হলে মাস্তিরের স্বপ্নটা ...মা বোধহয় ঠিকই বলেছে। কেন বাবা, রতি তো ফয়েড পড়ে অন্যরকম চিন্তা ভাবনাও করতে পারে, এই যেমন.....

আবে আবে মুরগী দুটো যে রান্নাঘরের ধাপে উঠে পড়ল। বেশ হয়েছে একদুনি নানকু মার খাবে। নাহ্ রতি ভেবেই পাচ্ছে না, কেন নানকু ওদের এভাবে ছেড়ে দিচ্ছে.. তবে কি ওদের বেঁচে থাকবার শেষ স্বাধীনতা দিচ্ছে নানকু? কিন্তু এভাবে রসিয়ে-কসিয়ে মুরগী কাটবে নানকু! ইস্ রতির বুকটা মুচড়ে এলো। ইচ্ছে হল একবার চীৎকার করে নানকুকে বারণ করে দেয়। কিন্তু তার আগেই মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। মার তাড়া খেয়ে দেখো মুরগী দুটো-কেমন হেলতে দুলতে আবার শিউলিতলাটায় গিয়ে বসল। ইস্ এমন সুন্দর দুটো মুরগী ইতিউতি চাইছে, রোদটার আঁকি-বুকি ওদের গায়ে রতি মুগ্ধ হয়ে দেখছিল সকালটা আর মুরগী দুটো।

.. আই ...আই রতি. ..নানকুর প্রথম ডাক রতির কানে যায় না। মা আবার বাথরুমে গেল। জল ন্যাতা দিয়ে রান্নাঘরটা আবার মুছবে মা। মার বহুৎ ছোঁয়াছুয়ি আছে।

আই রতি রতি ফিরে তাকাল নানকুর দিকে। মজা দেখবি রতি, এই মুরগী দুটোর একটানে কেমন গলা ছিড়ে ফেলি। নানকুর কথায় রতির মুখ সাদা হয়ে যায়।

কি নিষ্ঠুর! নানকুকে এই মুহূর্তে দাগী আসামীর মতো লাগছে। রতি চীৎকার করে উঠতে চায়; কিন্তু উত্তেজনায় গলার স্বর বেরোয় না। নানকু ওর উত্তরের অপেক্ষা করলো না। সেকেণ্ডের মধ্যে কি হয়ে গেল বুঝলো না রতি। শিউলি গাছটার তলায় রক্তের স্রোত। মুরগী দুটোর গলা মুচড়ে নানকু দূরে ছুঁড়ে ফেলছে। আলো আধারির খেলায় মুরগীর রক্ত জবে ভিজে মাটিতে সিঁদুরের মতো লেপ্টে রয়েছে। মুণ্ডহীন অসহায় পালক শুধুধু শরীর দুটো এখন নানকুর হাতে। রতির চোখে জল ভর্তি হল। আপনা থেকে হাত উঠে এল। নিজের গলায় হাত দিয়ে কি দেখল, কে জানে। শিউলি-গাছটার তলায় রক্তে ভাসা এই মুরগীর সঙ্গে তবে কি তার কোন মিল আছে? এরকম কথা যেন মনে হয় রতির, কে জানে। ও দাঁড়িয়ে থাকতে চাইছে না, অথচ নিপুণ হাতে পালক ছাড়ান না দেখেও যেতে পারছে না। নানকু কি মনযোগের সঙ্গেই না মুরগীর নরম পালকগুলো ছাড়াচ্ছে। রতির চোখে বোধের ঝিলিক লাগলো। নানকুর ধারাল ছুরিটা আলোয় ঝলসে উঠল। হঠাৎই চমকে উঠল রতি, ওকি। নানকু মুরগীর পেট চিরে কি বার করছে? বিস্ময়ে আতঙ্কে রতি মোহাবিষ্ট! আশ্চর্য খেলনার মতো ছোট ছোট দুটো ডিম। রতির পা গুলিয়ে উঠল। সামান্য ওয়াক্ শব্দে নানকুর মনো-যোগ বোধহয় বিচ্ছিন্ন হল। সে মুখ উঁচু করে রতির দিকে তাকিয়ে হাসল। রতির হাসিটা ভাল লাগলো না. .কেমন যেন একটা নাংরামি খেলা করছে নানকুর চোখে।

.. দেখলে রতি, দেখলে, নানকু চেঁচিয়ে উঠল। ঘেন্নায় লজ্জায় রতি অস্ফুট স্বরে বোধহয় নিজেরি অজান্তে বলে উঠল— জানোয়ার। নানকু শুনতে পাবে না জানে রতি। ও আবার নিজের কাজে মন দিয়েছে। এক ঝলক হাওয়াতে মুরগীর পালকগুলো উঠোনে ছড়িয়ে গেল। বাতাসে একটা মাংসল গন্ধ ভেসে এল। রতির আবার বমির ভাব এল। মুখে জল কাটছে। তবু সরে যেতে পারছে না। রোদে নানকুর পিঠে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ফর্সা পিঠটায় নাইলনের গেঞ্জিটা সেঁপ্টে বসেছে। ওর দু হাত ভর্তি মুরগীর রক্ত। মাংসগুলো চাক চাক করছে নানকু। রতির শরীরে আবারো কেমন অস্বস্তি ছুঁয়ে গেল। ও বেলিংএ চিবুক রেখে নানকুকে দেখতে চাইছিল। এমন সময়ে নানকু আবার মুখ উঁচু করে রতিকে দেখল। কি বুঝল কে জানে। হেসে বললো, দাঁড়া আসছি একদুনি।' এখন শিউলিতলাটায়ও বেশ রোদের তেজ, জমাট রক্তের ছবি, বাতাসে বুনো গন্ধ আর পালকের ওড়াওড়ি। আর অন্য কোন গন্ধ পেল না রতি। সকালের একটা তাজা গন্ধ থাকে যা রতি বোজই গরম খবরের কাগজে পায়, সে গন্ধটা মুরগীর রক্তের বুনো গন্ধে চাপা পড়ে গেছে। এই মুহূর্তে উঠোনটা দেখে রতির এ টেল অব টু সিটিস-এর গিলোটিনের কথা মনে পড়ল, কে জানে, কেন। এখন রতি ইচ্ছে করলেই ঘরে চলে আসতে পারে। মুরগী কাটা শেষ। ভোলা উঠোনটা পরিষ্কার করে ওখানেই স্টোভ এনে দেবে। নানকু ওদের মুরগীর মাংস রেঁধে খাওয়াবে। মা তো মুরগী ছোঁবে না। উঠোনে জল পড়তেই রক্ত লাল একটা স্রোত বয়ে গেল। আর ভালো লাগছে না রতির। ঘরে এল সে। টেবিলের ওপর থেকে একটা ট্যাবলেট নিল। গা বমি ভাবটা তাহলে কমবে। চোখের পাওয়ার যতো বাড়ছে, বমির ভাবটাও বাড়ছে। ট্রামে বাসে উঠতে গেলেই বমি পায়। তাই রেগুলার রতি একটা করে ট্যাবলেট খায়। এখন নিজেকে বেশ ঝরঝরে লাগছে। ট্যাবলেটটা খেয়ে বমি ভাবটাও চলে গেছে। এমন রোববারের সকাল, একটা সিনেমা দেখলে হত। মর্নিং শোতে মেট্রোতে ভাল বই চলছে। কিন্তু ওরে বাবা, আজ বাদে কাল পরীক্ষা—মা যেতেই দেবে না। পরীক্ষার কথা মনে হতেই রতি একটু চঞ্চল হলো। নাহ্, মুরগী কাটা দেখতে গিয়ে বহুক্ষণ সময় নষ্ট করেছে রতি। অঙ্কগুলো আজ করতেই হবে, নাহলে বিকেলে স্যারের

গম্ভীর মুখ। রতি খাতা টেনে নিল। চেয়ারে বসে বইটা হাটকাল একটু। বড়ই বোরিং সাবজেকট অঙ্ক। মাথায় ঢোকে না রতির। ঘাড়ের কাছে জোড়া মুরগীর ডাক চমকে উঠল রতি। নানকু। নানকু হাসছে—দেখলি কেমন মুরগীর ডাক ম্যানেজ করেছি। রতি কথা বললো না। ওর ভাল লাগছে না নানকুকে। ভারী বিশ্রী একটা গন্ধ বেরোচ্ছে ওর গা থেকে। রতিদের পাড়ার মাংসের দোকানের ঝন্টুদার গায়েও এমনি গন্ধ। রাস্তা দিয়ে গেলেই টের পায় রতি। একে কি কসাই গন্ধ বলে? নানকু সুযোগ বুঝেই ওপরে এসেছে। তা জানে রতি। রোববারের সকালে বাবা তাস খেলতে যায়, ফেরে প্রায় বারোটায়। মার একটার আগে রান্নাই হয় না। ভোলাও মার ফাইফবমাস খাটতে ব্যস্ত। একা ওপরে রতি। নানকু ঝপ্ করে চেয়ারে বসে পড়ে। রতি আড় চোখে তাকিয়ে দেখল তাকে। নানকুর বিরাট লম্বা চওড়া বুকটায় কি ঘাম। বুকের ঘনচুলে নিশ্চয়ই মুরগীর রক্ত লেগে আছে, না হলে বিন্দু বিন্দু জলের ছিটে, রতির চোখে অস্বস্তির শুরু হল। শরীরটায় একটা মৃদু ঝাঁকুনি লাগল। তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিল। নানকুর গায়ের গন্ধ ছুঁয়ে ছুঁয়ে বাতাসটা রতির চুলগুলোকে নাড়িয়ে দিল। —দেখি কি অঙ্ক ঝঞ্ঝিস? বোধহয় নানকুও স্বাভাবিক হতে চাইল। রতি হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

হাঁ দেখনা নানকুদা এই অংকগুলো কিছুছু মাথায় ঢুকছে না, একটু করে দিবি? নানকু তাকাল রতির দিকে। রতির দৃষ্টি আঁটকে গেল চোখে। থির থির করে কেঁপে উঠল চোখের পাতা।

—অংকগুলো করে দিলে আমাকে কি দিবি?

রতি একটু কেঁপে উঠল। নানকু ওই রকমভাবে তাকিয়ে আছে কেন? ওকি জানে না, ওভাবে তাকালে রতি নিজেকে স্থির রাখতে পারে না। আলতো ঠোঁটে নির্দোষ অজান্তে রতি যেন কখন উত্তর দিয়ে ফেলেছে। —তুই যা চাইবি।

উহু, চমকে উঠল রতি। নানকু তার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। রতি মন্ত্রমুগ্ধের মতো উচ্চারণ করে উঠল—নানকুদা। ওর ঠোঁটে আলতো করে আঙুল ছোঁয়ালো নানকু। বৃত্তের মতো আঙুল ঘোরাতে ঘোরাতে রতিকে দুটো হাতে জড়িয়ে ধরে নানকু। মুগ্ধের মতো চোখ ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় দুজনে। উঃ নানকুর চোখে কী নীল আলো। রতির শরীর অস্থিরতায় ছটফট করে উঠলো। নানকু পাঁজাকোলা করে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিল। রতি বাধা দেবে না; বাধা দেবার ক্ষমতা তার নেই। নানকু আস্তে আস্তে ওর শরীরে নিজের শরীর বিছিয়ে দেয়।

চড়াৎ করে চাবুক খেল রতি। সমস্ত মুগ্ধতা কেটে গেল। দু হাতে যাবতীয় শক্তি সঞ্চয় করে নানকুকে ঠেলে দিল রতি। চোখের সামনে দুলে উঠল কিছুক্ষণ আগে দেখা মুরগীর পেট চেরা ছোট ছোট ডিম হাতে নানকুর বাঁকা হাসিটা। ভেসে এল নাকে মুরগীর রক্তের গন্ধ... ছুঁয়ে গেল পালকের মৃদু ওড়াওড়ি। নানকু অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। রতির কান্না এলো ভীষণ। দু-হাতে মুখ ঢাকল। কান্না ভাসা কণ্ঠস্বর দু-হাতের ফাঁক দিয়ে গলে পড়লো।... তুই কসাই কসাই নানকুদা.. মুরগী দুটোর গলা মুচড়ে, নানকুর কাছে এই মুহূর্তে রতি অসম্ভবভাবে রহস্যময়। ও কিছুছু বুঝতে পারলো না কিন্তু আদি বালিকার মতো ঐ পবিত্র মেয়েটির নারীত্বের দিকে তাকিয়ে রইলো।

কোলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর করুন... দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন

প্রতিবার খাওয়ার পর কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। আপনার দাঁতকে সুরক্ষিত করার জন্যে সারা পৃথিবীতে দাঁতের ডাক্তাররা এই উপদেশই দেন।

দাঁতের ফাঁকে খাবারের টুকরো থেকে গেলে রোগ-জীবাণুর সৃষ্টি হয়। ফলে, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ আসে, পরে দাঁতে যন্ত্রনাদায়ক ক্ষয়রোগ শুরু হয়।

প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। দাঁতকে সাদা ঝকঝকে করে তুলে, নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয় রোধে কোলগেটের অসাধারণ ক্ষমতা বহুবার প্রমানিত হয়ে গেছে।

জীবাণুমুক্ত নির্মল শ্বাসপ্রশ্বাস ও ঝক্ ঝকে সাদা দাঁতের জন্যে সারা পৃথিবীতে লোকে সবচাইতে বেশি কেনে কোলগেট টুথপেস্ট।

কোলগেটের নির্ভরযোগ্য ফরমুলা কিভাবে কাজ করে:

নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয়ের জীবাণু জন্মায় দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের টুকরো থেকে।

কোলগেটের প্রচুর ফেনা দাঁতের ভেতরে গিয়ে আটকে থাকা খাবারের টুকরো ও রোগজীবাণু দুইই দূর করে।

ফলাফল: সাদা ঝকঝকে দাঁত, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধের ভয় থাকে না, দন্তক্ষয় রোগের প্রতিরোধ।

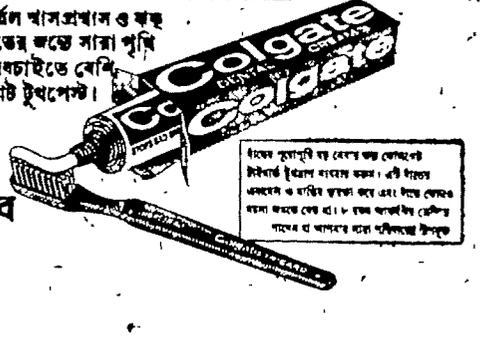

কেবল দাঁতের ডাক্তারই এরচেয়েও ভালোভাবে আপনার দাঁতের পরিচর্যা করতে পারেন

DC.GM 88

ভারতীয় সঙ্গীতে যৌবন

সুধীন মিত্র

যৌবন সৃজনীশক্তির মূলে উৎস। সৃষ্টি যেখানেই তার গতিতে শক্তিমান, সেইখানে যৌবনের অস্তিত্ব। নদীর ঢেউ-এ, আকাশের নীলিমায়, সবুজের আন্দোলনে, চাঁদের আলোয়—এমন আরও কত ক্ষেত্রে যে আমরা বিশ্বরচয়িতার যৌবনকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনুভব করি তার হিসেব মেলে না। নিউক্লিয়সকে কেন্দ্র করে যেমন পরমাণু তার শক্তি সঞ্চয় করে চলেছেন, যৌবনকে কেন্দ্র করে প্রকৃতি তেমনি তার প্রাণশক্তিকে সমৃদ্ধ করছেন অহরহ। জীবন সৌন্দর্যের সর্বাধিক উপলব্ধিই হল যৌবনের সার্থকতা। যৌবনের দৃষ্টিতে পৃথিবী মধুময় হয়ে ওঠে, বাতাস হয় মধুরতর, সিন্ধু মধু ক্ষরণ করে। বেঁচে থাকার সার্থকতা জীবনের এই পরম মুহূর্তগুলিতে স্পষ্টতম হয়। যৌবনশক্তির মধ্যে তাঁর ঐশ্বর্যকে উজাড় করে দিয়ে পরমস্রষ্টা যৌবনের জয়গানে মুখরিত হয়েছেন। কবিঃ যোগ দিয়েছেন সঙ্গে। কবিতার ছন্দে ছন্দে নেচে উঠেছে যৌবনের বিচিত্র হৃদয়। মৃত্যুকে জয় করে জীবনের স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছেন কবি। শিল্পী তার চিত্রে রঙে রসে যৌবনের অবয়বকে মূর্ত করে তুলেছেন। আমাদের সঙ্গীতসাধকেরা তার মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন একটি সজীব প্রাণ। রাগ-রাগিনীর ধ্যানকল্পনায় তারা যেন যৌবনের আরাধনায় বিভোর হয়েছেন।

আমাদের রাগ-রাগিনীর ধ্যানমন্ত্র তার স্বরসংযোজনায় কিন্তু আসলে এই গভীর বোধটিই আত্মগোপন করে আছে। পরম-বিস্ময়ের সঙ্গে একথা লক্ষ্যণীয়, যে বিরহ-আনন্দ ও প্রেম সঙ্গীতসাধকদের ধ্যান-কল্পনায় রসবোধে দীপ্ত হয়ে উঠেছে, আমাদের সঙ্গীতে তার আধার কিন্তু যৌবন। রাগ-রাগিনীর অন্তস্থলে তারা কিন্তু মানবসত্তাকেই স্থাপন করেছেন। এরা সুন্দরের অন্বেষণে ব্রত। কেউ গম্ভীর বেদনার মধ্যে সুন্দরকে অনুভব করছেন, কেউ আনন্দের মধ্যে, কেউ প্রেমের বিরহের ও মিলনের মধ্যে, রহস্য ও বিস্ময়ের মধ্যে কেউ বা। নায়ক এবং নায়িকা উভয়েরই দেহে এবং মনে ভরা যৌবন। এই ধ্যানবর্ণনার তাৎপর্য কিন্তু ব্যাপক। আমাদের সঙ্গীতকারেরা সত্যদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন, তাই তাঁদের কাছে যে কথা পরমসত্যের মতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল তা হল, সুন্দরের দর্শন যৌবনের মধ্য দিয়েই লাভ করতে হয়।

কতকগুলি ছবি দৃষ্টান্ত হিসেবে সামনে রাখা যাচ্ছে। তাহলেই মনে হয় উপরের বক্তব্যগুলি আরও সহজ হয়ে উঠবে।

'মেঘ' রাগ বর্ষাপ্রকৃতি। প্রিয়জন বিরহের হৃদয়-ব্যাকুলতাকে শান্ত ও সংযত স্বর-সুষমায় প্রকাশ করে সে। 'মেঘ' রাগের বর্ণনায় পণ্ডিত দামোদর বলেছেন নীলোৎপলাভবপুরিন্দু সমানচৈলঃ গীতাম্বর-স্থগিত চাতক যাচমানঃ।

পীযূষমন্দহাসিতো মনসধ্যাবর্তী বীরেতু রাজতি যুবা কিল মেঘঃ।।'

মেঘ বয়সে যুবক। পীতবর্ণের বস্ত্র পরেছেন তিনি। তার সমস্ত শরীর জলভারাক্রান্ত। তাই তৃষ্ণার্ত চাতকদের দল তার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে জলভিক্ষা করছে। নীলপদ্মের মতো তার দেহের দ্যুতি। আধারে মধুর হাসি। স্মিত সেই হাস্যকর্ণিকা থেকে অমৃত ক্ষরণ হচ্ছে। মেঘলোকবিহারী প্রবল পরাক্রান্ত বীর তিনি। তাঁর শরীরেতে শোভে মল্লবিরের রূপভাতি। কারণ মল্লার যে তার নায়িকা।

এখানে মেঘরাগের সমস্ত বৈভব ও সৌন্দর্যের গভীরতা যেন তার যৌবনের মধ্যেই নিহিত। তার বাসস্থান মেঘলোকের অসীমে। তার হাসির মাধুর্য, দেহের শোভা, পীত বস্ত্র,—সবই যৌবন সঞ্জীবনীসুধায় অভিষিক্ত করে অনন্ত নন্দনে তাকে উত্তীর্ণ করছে। মেঘরাগের স্বরমুদ্রার এবং এক স্বর থেকে অন্য স্বরে কণ্ঠক্ষেপণের মধ্য দিয়ে ঘনঘটাচ্ছন্ন বর্ষাবাদলের রুদ্রমূর্তির পাশাপাশি তার কোমল প্রশান্তির রূপের মধ্যে একটি প্রেমকরুণ আবেদনকে উপলব্ধি করা যায়।

অপরদিকে মেঘ-প্রিয়া মল্লার সাক্ষাৎনার প্রতিচ্ছবি। যৌবনের আকুল বেদনারই অপর নাম বোধহয় মল্লার। 'মল্লার' কথাটিকে বিশ্লেষণ করলে দুটি শব্দ পাওয়া যায় ঃ মল+হার। অর্থাৎ রৌদ্রতাপজনিত অবসন্নতাকে সে হরণ করে। পরিবর্তে মেঘমালাকে আমন্ত্রণ জানায় প্রকৃতিকে শান্ত ও সুশীতল করবার জন্যে। শান্তির প্রতীক মল্লার। যৌবনের আকুতি মল্লারের মধ্যে যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বিরহে রোদন করছে মল্লার। বর্ষণ-মুখরিত নিঃসঙ্গ রাত্রি। স্মৃতি বেদনার মালা গাঁথছে বসে বসে। একাকিনী নায়িকা নায়কের সঙ্গে মিলন-প্রতীক্ষায় দিন গুনছেন। বর্ষার মেঘে আবেগস্খলিত তার হৃদয়। বর্ষার বারবার তোলপাড় করছে নায়িকার হৃদপিণ্ডের স্পন্দনকে। বর্ষার ছন্দকে মনে হচ্ছে প্রিয়জনের পদধ্বনি। মল্লারের এই যে প্রতীক্ষা, এ বুঝি বিশ্ব-প্রেমের জন্যে বিশ্বের প্রতীক্ষা। যৌবনের তন্দ্রাদায়ী মর্মব্যথা মল্লারের মূর্ছনায় মূর্ছনায় আত্মপ্রকাশ করে আছে। সংগীত-তরঙ্গকার রাধামোহন সেন যে কবিরূপম ভাষায় মল্লারের ছবি এঁকেছেন, তার আবেদন কিন্তু আধুনিক কালেও নিঃশেষ হয়ে যায় নি। মল্লারিকা যৌবনবতী, রূপ-লাবণ্য তার অঙ্গের প্রতিটি তরঙ্গে বিভাষিত। চাঁপা ফুলের সঙ্গেই তার গায়ের রঙের তুলনা করা যায়। সর্বাঙ্গে চম্পককুসুমের অলঙ্কার। মেঘের জন্য তার অন্তরের স্তুতি, নতি, গতি ও মতি বিলাপের ভাষায় ব্যাকুল।

'শোকবৃক্ষ ডালে বসি দুঃখপিক ডাকে,
উহু শব্দে কুহুধ্বনি বোধ হৈল তাকে।'

নায়কের বিরহে নায়িকার যৌবনভাবা-বেগকে এমন ভাষায় তিনিই তুলে ধরতে পারেন যৌবন যাঁর কাছে সহনীয়।

রবাটী রাগিনীর রূপবর্ণনায় পণ্ডিত সোমনাথ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন,

'তরুণী বনে সকরতণ; গবেষয়ন্তী
পতিং ভৃশং গৌরী।
নীলাম্বরা রবাটী সুবতরুসুমোল্লাসং
সুষমা।।

এখানে দেখি, রবাটী রাগিনী নীলবস্ত্র পরিহিতা, তরুণী ও পরমসৌন্দর্যবতী। পতির বিরহে কাতরা হয়ে তিনি অন্বেষণ করছেন পতিকে। কুসুমভূষণ অঙ্গে ধারণ করে তিনি অপূর্ব সুষমাময়ী। যৌবনের বিচ্ছেদভাবে তিনি বিহ্বলপ্রায়।

যৌবন শুধু প্রেমকে রোদন-ভারাক্রান্ত করে না, বীরত্বও তেজের দীপ্তিকেও সেই যৌবনই রূপ দেয়। মালকোষ বা মালব-কৌশিক বীর, তাই তার যুবকের বেশের প্রয়োজন। মালকোষের বীরত্ব সংহত ও সংযত। সুতরাং সে শান্ত-গম্ভীর। সঙ্গীত-কারের ভাষায় "মালবকৌশিকের মদনমোহনের রূপ, যুবকের বেশ, শান্ত-গম্ভীর, মদ্যপানে মত্ত, গলায় মুক্তার মালা, পরিধানে নীলবস্ত্র।"

কেদারা রাগের ছবি অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে এঁকেছেন রাধামোহন সেন তাঁর

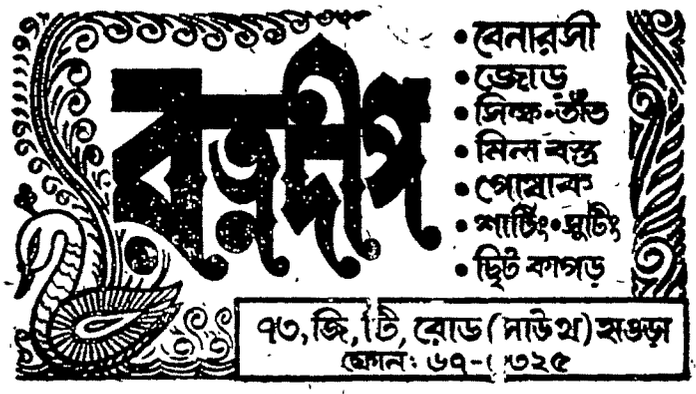

সীত তরঙ্গ গন্ধে।' 'কেদারা যুবতী, বলয়ান্বিত কেশদামে সর্পভূষণ, মস্তকের পার্শ্বে জাহ্নবীধারা প্রবাহিত। ললাটে দ্রকলা, পরিধানে গৈরিক বসন, নবীনা রাগিনী। কেদারা তার নায়ক দীপকের কান্ত প্রিয় নায়িকা।"

পাশেই নায়কের ধ্যানচিত্রকে তুলে ধরা হয়েছে রাগনিরূপণকার নারদের ভাষায়' 'দীপ্তৈঃ পৃথৎ প্রবিলীনদীপে গৃহেহন্ধকারে ভবনে প্রবৃত্তঃ।

তস্যাঃ শিরোভূষণরত্নদীপৈর্প্রজ্বাং
সসর্জ্জাং কৃতবান্ প্রদীপ্তঃ।।

তপনদেবের নেত্র থেকে দীপকরাগের সৃষ্টি কল্পনা করা হয়েছে। দীপক নবীন যুবক। তাঁর পরিধানে রক্তবাস, গলায় পক্ষমুক্তার মালা। তরুণ তরুণীদের সঙ্গে তিনি সর্বদা রঙ্গরসে মাতোয়ারা। একটি হস্তীতে আরোহণ করে দীপক নিশাকালে গিরিপ্রান্তর পরিভ্রমণ করেন। তিনি গান করেন ও গানের সুর প্রবাহে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। সেই অগ্নিতে পর্বতের সকল বৃক্ষলতাও প্রজ্বলিত হয়।

দীপকের ধ্যানমূর্তির প্রাঞ্জল বর্ণনায় একথা বলেছেন সংগীত তরঙ্গকার।

দীপকের সঙ্গে কেদারের যে প্রণয়, এ প্রণয় উচ্ছল যৌবনের ভরা গঙ্গায় ত্যাগের নৌকো ভাসিয়ে পরিপূর্ণতার দিকে যাত্রা করা। "নবীন যোগিনী" কেদারাও ভোগ-বিমুক্ত দীপক। অর্থাৎ ভোগের সঙ্গে ত্যাগের প্রণয়, গতির সঙ্গে স্থিতির। সৃষ্টিতত্ত্বের মূল বক্তব্যই হল স্থিতি ও গতির মিলন। স্থিতি ও গতির ভারসাম্যের ফলেই সৃষ্টি এত নিয়মানুবর্তী। এই ভারসাম্য বজায় রাখতে হলে যৌবনের আরাধনা করতেই হবে। এত বার্ধক্যের জরা মনে নিয়ে সম্ভব নয়। যৌবনের নবীনতা আর সুরুজের সমারোহই একে ঠিক পথে পরিচালিত করতে সক্ষম। যৌবনই দীপক হয়ে কামনা-বাসনার আগুন জ্বালায়। কেদারিকা হয়ে যৌবনই এই আগুনে স্নিগ্ধ করে। একথা আমাদের দেশের সংগীতজ্ঞরা আজ থেকে বহু সহস্র বছর আগে কেমন সহজ অনুভবের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছিলেন ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। যৌবনকে তাঁরা তাই ভালবেসেছিলেন। রাগ-রাগিনীর ধ্যানমূর্তি রচনা করে সঙ্গীত সাধকের যৌবনের পূজারী হতে বলেছিলেন।

জীবনের সতৃষ্ণ অন্বেষণ, সৌন্দর্য পিপাসার তীব্র আকর্ষণ—এও বুঝি যৌবনের দান। এবং দান বলেই "খাম্বাবতী রাগিনী অতিশয় রূপলাবণ্যবতী ও যুবতী। তাঁর পরিধানে অরুণ বর্ণবিশিষ্ট বাস। একটি চিত্রের প্রতি তিনি তন্ময় দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছেন। দিবারাত্র সুমধুর গীতে মাতোয়ারা।"

যৌবন বিরহকে মধুর করে তোলে, মিলনের কথাও কিন্তু সেই বলে। হিন্দোল ও গৌরী রাগিনীতে দুটি মিলনের চিত্র ভারতীয় সঙ্গীত সাধকেরা আমাদের উপহার দিয়েছেন। শ্যামবর্ণা ও তরুণী গৌরী বধূবেশে নায়কের সঙ্গে মিলনরত। এ মিলন যেন শেষ না হয়। 'অবগুণ্ঠিতা নববধূর কালো চোখে নেমেছে কিসের আলো। গোধূলির দিগন্ত রেখাটির মতই বাঁকা তার আঁখিপল্লব। পরনে তার কুসুম রঙের শাড়ী। কপালে নিটোল টিপ। ইসারার ভাষায়, চুম্বনের ভাষায় সে তার নায়কের কাছে নিজের মনকে মেলে ধরতে চায়। মনটি তার বেনুবনের উপর ডালের পাতা, কেবলি ঝিরঝির করে কাঁপছে।'

'হিন্দোল' কিন্তু চঞ্চল। রাধামোহনের ভাষায়, (হিন্দোল) অভিনব যুবক। মনোমোহন বেশ, সুন্দরী যুবতীগণবেষ্টিত, রসের সাগর। তরুণী নায়িকার সঙ্গে তিনি হাস্য পরিহাস করছেন।

এই দুই মিলনদৃশ্যে আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে নায়ক-নায়িকার যৌবন-মনস্তত্ত্ব পরিস্ফুট হয়েছে। সাংগীতিক মূল্য বাদ দিলেও শুধু কাব্যের দিক দিয়েও এর মূল্য অপরিসীম।

নব বসন্তের সমাগমে বিশ্বজগতের কানায় কানায় যৌবন বয়ে যায়। সমস্ত সুন্দর যেন বিশ্বপ্রকৃতির মাঝখানে আপনাকে উজাড় করে দেয়। এমন দিনে কোকিলের সুরে সুর মিলিয়ে যদি কেউ বসন্ত রাগে আলাপ করেন, আমরা পার্থিব মানুষ কাজকর্ম ভুলে গিয়ে সেই আলাপের সঙ্গে যোগ দিই। সঙ্গে রাখি কোনও ধ্যানচিত্র। সংগীত তরঙ্গকারের ভাষায় এমন একটি ধ্যানকল্পনা বর্ণিত হয়েছে: "বসন্ত পুরুষ বেশ ধারণ করেছেন। নবদূর্বাদল শ্যামবর্ণ, মস্তকে শিরোস্ত্রাণ ও শিখিপুচ্ছ, গলায় মালতী-ফুলের মালা, দক্ষিণ হস্তে রসাল অর্থাৎ আম্রমুকুর, বামকরে পূর্ণ অম্বুল। নব-যৌবনে উজ্জ্বল হয়ে গৃহকর্মে বিরত ও শ্রীকৃষ্ণ যেমন গোপিগণের সঙ্গে নিকুঞ্জ বনে খেলা করছেন, তেমনি নায়ক বসন্তও সহচরীদের সঙ্গে প্রমোদকাননে খেলায় মত্ত।"

পণ্ডিত দামোদরের ভাষায় শ্রী রাগ তেজপ্রদীপ্ত ক্ষিতিপাল তিনি "অষ্টাদশ বর্ষঃ স্মরচ্চারুতনুর্মূর্তিঃ ধীরৈরুল্লসৎপল্লব কর্ণপূরঃ। ষড়জাদিসেব্যোহরুণ বস্ত্রধারী।" শ্রীরাগ আঠারো বছরের যুবক। তাই যৌবনোচ্ছল কমনীয় সৌন্দর্য তার দেহ ও মনে। একদিকে তিনি ধীর, অন্যদিকে শান্ত ও গম্ভীর প্রকৃতি। কর্ণে ঈষৎ উৎফুল্ল পল্লবের অলংকার। অরুণবর্ণের বস্ত্রপরিহিত। ষড়জ আদি সাতস্বর তাঁকে সেবা করছেন। শ্রীরাগ নবীনতা ও প্রধানতার প্রতীক। দুটি বিরোধী সত্তাকে তিনি ধারণ করে আছেন। তিনি শিল্পী ও সমাহিত চিত্ত। শ্রীরাগের যৌবনবিকাশ পার্থিব সৌন্দর্য এবং শান্ত ও সংযত প্রকৃতি অপার্থিব সৌন্দর্যের প্রতীক। তিনি কঠোর ও কোমল। শ্রীরাগের স্বর-সংযোজনায়ও ধীর রস ও সংহত করুণরসের ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে।

উদাহরণ এমন আরও অনেক আছে। এ থেকে একটা কথা পরিষ্কার বোঝা যায়, ভারতীয় সঙ্গীতরচয়িতারা শিল্পী ও সাধকদের যৌবনদীক্ষায় দীক্ষিত হতে বলেছেন এই ধ্যানমন্ত্রের মধ্য দিয়ে। শিল্পী জীবনের চরম লক্ষ্য হল অপার আনন্দ-লাভের আস্বাদন লাভ করা। তা সে মিলনের মধ্য দিয়েই হোক বা বিরহের মধ্য দিয়েই হোক। এবং এই আনন্দলাভের পথে সাধককে অনেকগুলি স্তর অতিক্রম করতে হয়। আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, মিলন-বিরহের অনুভূতি দিয়ে ঘেরা সৃষ্টার এই যে মানসজগৎ—একে স্বীকার করে নিতে হবে। কেন না বাস্তবকে অস্বীকার করে বাস্তবের ঊর্ধ্বে ওঠা সম্ভব নয়। আবার বাস্তবের কতকগুলি উপস্থিত মোহ আছে, যাতে তার পরিধি থেকে সাধারণত বেরিয়ে আসাও সম্ভব হয় না। এর জন্য প্রয়োজন একটি প্রবল শক্তির। যৌবন হল সেই শক্তি। কাজেই যৌবন যদি আমাদের সঙ্গী হয় তবে তার প্রচণ্ড গতিতে আমরা চরম লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব। যৌবন মিলনকে ভালবাসে, বিরহের কাছ থেকে শিক্ষা নেয়। সুখে উত্তেজিত হওয়া ও

|| অধ্যাপক শ্যামসুন্দর মাইতি সম্পাদিত তিনটি কবিতার বই ||

বলেন্দ্র কবিতা সমগ্র

বর্তমান সংগ্রহে আছে বলেন্দ্রনাথের সমস্ত কবিতা ও গান * সম্পাদক লিখিত ভূমিকা, বলেন্দ্র প্রসঙ্গ, বলেন্দ্র-সাহানা সম্পর্ক * বলেন্দ্রনাথের কবিতা সম্পর্কে বিশিষ্ট সমালোচকগণের অভিমত * বলেন্দ্রনাথের ব্রহ্ম সংগীত দুটির কাওজীচরণ সেন এবং পংকজকুমার মল্লিক কৃত স্বর-লিপি * বলেন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্র-প্রিয়া সাহানার দুষ্প্রাপ্য অলোকচিত্র।

কাব্য-চয়নিকা • দেবেন্দ্রনাথ সেন

কাব্য-চয়নিকা • অক্ষয়কুমার বড়াল

* কবি-পরিচিতি * কাব্য-পরিচিতি * কবির আলোকচিত্র *

মূল্য প্রতিটি দশ টাকা।

দে বুক স্টোর: ১৩, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—৭৩

দুঃখে ভেঙে পড়া দুর্বল মানুষের পক্ষেই স্বাভাবিক, যৌবনের ধর্ম তা নয়। বর্তমানের ব্যর্থতাকে যৌবন ভবিষ্যতের সার্থকতার সোপান বলে মনে করতে পারে। এবং পারে বলেই তা আমাদের সঙ্গীত-স্রষ্টার উদার ও আধুনিক মনের কাছে আদরণীয় বলে মনে হয়েছিল। সেই মনে হওয়াটাকেই তাঁরা উচ্ছ্বসিত যৌবন-স্তুতির মধ্য দিয়ে ঘোষণা করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি।

বস্তুত আমাদের সঙ্গীতে স্বরসৃষ্টির রূপকথার পটভূমিকাকে যদি আমরা মনো-বৈজ্ঞানিকী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করি তাহলে আরও অবাক হতে হয়। এখানেও যৌবনের জয়জয়কার। ভারতীয় সঙ্গীতের সাতটি স্বরের মধ্যে ষড়্‌জ মধ্যম ও পঞ্চমই হল আদি স্বর। মধ্যমই এদের মধ্যে প্রথমে জন্ম নিয়েছে—শিক্ষাকার নারদের এই সতটিকে মোটামুটি সকলেই স্বীকার করেন। ষড়্‌জ স্বরটির উৎপত্তি ময়ূরের ডাকের অনুসরণে, মধ্যম ক্রৌঞ্চের ডাকের অনুসরণে এবং পঞ্চম কোকিলের। এরা সকলেই আর্ণবিক কম্পনের পরিণতি তাই এদের একটি করে বর্ণ আছে। ষড়্‌জ 'কমলা' বর্ণের, মধ্যম শুভ্র এবং পঞ্চম কৃষ্ণবর্ণের। তান্ত্রিক বীজ অনুযায়ী এদের দেবতা যথাক্রমে ষড়্‌জের পৃথিবী, মধ্যমের অপঃ বা বরুণ আর পঞ্চমের মরুত বা সূর্য। এই তিনটি স্বরের ষড়্‌জ কেন্দ্র স্বর, মধ্যম সর্বোচ্চ সীমা এবং পঞ্চম সর্বনিম্ন। সঙ্গীতের আর্চিক যুগে সৃষ্টি হয় মধ্যমের, গাথিক যুগে মধ্যমের সঙ্গে পঞ্চম এল। ষড়্‌জ, মধ্যম ও পঞ্চম—এই তিনটি স্বরকে আমাদের সঙ্গীতে সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এদের সর্বাধিক গুরুত্ব বিবেচনা করে। পঞ্চমের দেবতা সূর্য তেজ ও শক্তির বিকাশ ঘটায়, আর মধ্যমের দেবতা বরুণ ব্যাপকতা ও স্নিগ্ধতার প্রতীক। শক্তিকে যদি ব্যাপকতার মাঝ-খানে ছড়িয়ে দেওয়া যায় তবে তার উগ্র তীব্রতা স্নিগ্ধ হয়। ষড়্‌জের দেবতা পৃথিবী সেই স্নিগ্ধ শক্তিকে গ্রহণ করে সৃষ্টিকে যৌবনবতী করে তোলে। কারণ পৃথিবীর মধ্যেও একটি যৌবনকামনা লুকিয়ে আছে। মধ্যমের বর্ণ সকল বর্ণের সংহত রূপ পঞ্চম বর্ণের লীন অবস্থার প্রতিচ্ছবি। ষড়্‌জ এই দুই বর্ণের স্থিতাবস্থা বজায় রাখে। একথা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে মধ্যমের অব্যবহিত পরেই পঞ্চম স্বরের সৃষ্টির পেছনে একটি গভীর তাৎপর্য লুকিয়ে আছে। কৃষ্ণবর্ণ পঞ্চমের বামপার্শ্বে শুভ্রবর্ণ মধ্যম যেন রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিহ্বল যৌবনমহিমাই প্রকাশ করছে। যদিও বৈষ্ণব কবিদের কল্পনায় রাধাকৃষ্ণের ভাবমূর্তির দানা বেঁধে ওঠবার অনেক পূর্বেই এই স্বর-গুলি আবিষ্কৃত, তবুও এই ধ্রুবপদের একটা ভাবরূপ আমাদের স্বরস্রষ্টাদের মনে যে উদয় হয়েছিল, এ ধারণাকেও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মধ্যমের ব্যাপকতায় পঞ্চমের বিরহ যৌবনকে কাঁদিয়ে তোলে, যে কান্না সমস্ত প্রেমিকেরই চিরন্তন কামনা। আগেই বলা হয়েছে পঞ্চম কোকিলের স্বরের অনুসরণে সৃষ্ট, ষড়্‌জ ময়ূরের এবং মধ্যম ক্রৌঞ্চের। কোকিল এবং ময়ূর—উভয়েরই যৌবনের স্বপ্ন আনে। ষড়্‌জ ও পঞ্চমের পারস্পরিক ব্যবহার সেই কারণেই বোধহয় দিন ও রাত্রির প্রায় সকল সময়েরই রাগরাগিনীতেই দেখা যায়। ক্রৌঞ্চ যৌবনভাবাবেগের ইতিহাসে শাশ্বত আকুলতার প্রতীক। কিংবদন্তী বলে, আদিকবি বাল্মিকী রচিত অনুষ্টুপ ছন্দে জগতের প্রথম যে কবিতা বিশ্বমানব মনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বেদনাকরুণ কম্পন তুলেছিল তাও মৈথুনরত ক্রৌঞ্চদম্পতির যৌবনলীলাকে কেন্দ্র করেই।

এইভাবে সহজেই প্রমাণিত হয় যে, যৌবন আপন শক্তিতে ভারতীয় সঙ্গীতের আসরে তার স্থানটিকে স্থায়ী করে নিয়েছে। বলা হয়ে থাকে আমাদের কলা-বিদ্যা মূলতঃ দার্শনিক ভাবধারায় অনু-প্রাণিত। রাগরাগিনীর ধ্যানচিত্র এজন্যে স্বাভাবিকভাবেই অধ্যাত্মচিন্তারই ফল-শ্রুতি। এবং প্রতিটি মূর্তিকল্পনার অন্তরালে একটি অধ্যাত্মভাব প্রচ্ছন্ন রয়েছে। একথা স্বীকার করে নিয়েও বলা চলে যৌবন অধ্যাত্মপথের অন্তরায় ত নয়ই, বরং সহায়ক। না-হলে এদেশের অষ্টাবক্র ঋষিরা যৌবনকে লাভ করবার জন্য সাধনা করতেন না। ভারতের সঙ্গীত সাধকেরা অপরূপের পূজারী। জগতের অনিত্যতা তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন, যেখানেই দেখেছেন সুন্দরের থেকে বিচ্ছিন্নতা। তাঁরা দেখেছেন, সুন্দরের মর্মটিকে। আবিষ্কার করেছেন সুন্দর কেন এত সুন্দর। ঘোষণা করেছেন, আনন্দ ও বেদনা দুই-ই সুন্দর হতে পারে যদি তাতে শক্তির আভাস থাকে, যদি যৌবন সেখানে হয় উপস্থিত। যৌবনকে স্বীকৃতি দিয়ে সুন্দরের এই রূপায়ণ, একে সুরের কেন্দ্রে বিন্দুতে বসিয়ে দিলেন তাঁরা। কারণ সুরকে অবহেলা করে কেবলমাত্র ধ্যানচিত্রকে নিয়ে উচ্ছ্বাস—সে তো মূঢ়তার লক্ষণ ধ্যানকল্পনাকে গতিস্পন্দিত করে সুরে ঝঙ্কার। সঙ্গীতজ্ঞদের দেওয়া রাগরাগিনী-দের এই রূপ যৌবনের শাশ্বত বাণী। আবার বাণী কেবলমাত্র কানের ভেতর দিয়ে মর্মে প্রবেশ করে আকুল করত না যদি না সঙ্গীতের স্বরগুলি একে মর্যাদা দেবার জন্যে এর সঙ্গে যুক্ত হত।

বস্তুতঃ বাণী যেমন সুরকে বাদ দিয়ে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না, সুরও পারে না আপনসত্তা থেকে বাণীকে বিযুক্ত করতে। তাতে নিজেরই মূল্য অনেক কমে যায়। মাটির প্রতিমার মধ্যে হৃদয়ের মিনতিকে সঞ্চারিত করে সাধক দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। সুরেরও মূল উদ্দেশ্য বাণীর সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রেমের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা। সঙ্গীতের জন্ম লগ্নে প্রথমে এসেছে স্বর, তারপর তাকে সুসংস্কৃত করে সৃষ্টি হয়েছে রাগরাগিনীর শব্দময় রূপ। কিন্তু এই রূপেই সঙ্গীতের সব নয়, এরও পেছনে আছে আর একটি সূক্ষ্মরূপ, ভাবময়রূপ। এই ভাবময়রূপই মূর্তি-কল্পনার অনুপ্রেরণা। তর্থাৎ শব্দময় রূপের যুগলমিলনেই রসের জন্ম। ভরত বলেছেন—অনুভূতির বস্তু রস। শিল্পী যখন কোনও রাগ-রাগিনীর আলাপের মধ্যে ডুবে যান তখন রূপের ধারণা ধীরে ধীরে মনোজগতে বিকশিত হয়ে ওঠে স্বরবিন্যাস ও রসসৃষ্টির গুণে। তাঁর মানসমূর্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে তার চেতনার পর্দায়। সার্থক হয় রসসৃষ্টি।

ভোজরাজের মতে রস একটি-ই ও সেটি প্রেম। অতএব সমগ্র মূর্তি কল্পনার ও ধ্যানচিত্রের লক্ষ্য হল রসসৃষ্টির মাধ্যমে আনন্দ দেওয়া এবং প্রেমকে সুরে সুরে চিরন্তন করে রাখা। প্রেমকে অক্ষয় করে রাখতে হলে যৌবনের ভূমিতে তাকে স্থাপন করা দরকার। কাজেই যৌবনের আবেদনকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করতে আমাদের সঙ্গীতকারেরা ধ্যানমন্ত্রের মাধ্যমে যেমন যৌবনের রমণীঅবয়ব রচনা করেছেন, স্বরসৃষ্টির ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাকে গুরুত্ব দিয়ে তেমনি তাঁরা যৌবনকে প্রাণবন্ত করেছেন। যৌবনের সুর ও চিত্রকে নিয়ে তাঁরা প্রেমের সঙ্গীত রচনা করেছেন। বিশ্বহৃদয় পারাবারে রাগ-রাগিনীর যে দরবার পাতা আছে, সেখানে যৌবনের সেই সঙ্গীতই নিরন্তর ধ্বনিত হয়ে চলেছে—এই গভীর সতটি যতই আমরা উপলব্ধি করতে পারব যৌবনের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার ভাবটি ততই মূল্যবোধে হয়ে উঠবে ভাস্বর।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সোনার হরিণ নেই

।। একুশ ।।

এক ঘুমে ভোর।

চোখ তাকিয়ে বাপী নিজেই অবাক। জানলা দিয়ে বানারজুলির নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে। তার গায়ে ধূসর পাহাড়ের দেয়াল। বাপীর লোলুপ দু চোখ সেদিকে স্থির হয়ে রইল খানিক।

দু রাত আগে বুকের তলায় যখন রক্ত ঝরছিল, এই বানারজুলি তখন মায়ের মতো হাতছানি দিয়ে ওকে ডেকেছিল। বানারজুলি সত্যিই আশ্রয় দেবে ওকে? নইলে এমন একটানা শান্তির ঘুম এলো কোত্থেকে?

কিন্তু এই ক্লাবে থাকা পোষাবে না। পাঁচ-ছ বছরে ক্লাবের ভোলও একেবারে বদলে গেছে। একতলা বিশাল লম্বা দালান এখন। ছোট-বড় দুটো হল ঘর। বাইরের অতিথি অভ্যাগতদের দুই-এক রাত থাকার মতো মাঝারি ঘরও আছে কয়েকটা। ভাড়া লাগে না কিন্তু কর্তাব্যক্তিদের সুপারিশ লাগে। সাজানো গোছানো ঘর। একদিকে গদির শয্যা, দেয়ালের গায়ে ড্রেসিং টেবল, আলমারি। অ্যাটাচড বাথ। সেখানেও বেসিন আয়না, ও বাথ-টাব, মাথার ওপর শাওয়ার;

গায়ত্রী বাইয়ের ম্যানেজার ক্লাবের ম্যানেজারকে ঘরের কথা বলেই রেখেছিল। এখানে তাকে ম্যানেজার কেউ বলে না, ছোট-বড় উঁচু-নিচু সকলেরই সে ডাটাবাবু। বাপী পরে জেনেছে ভদ্রলোকের নাম বাবুলাল দত্ত—সকলের মুখে মুখে ডাটাবাবু হয়ে গেছে।

মুখ দেখে বয়েস আঁচ করা শক্ত। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে যে কোনো বয়েস হতে পারে। ঢ্যাঙা, রোগা, ফর্সা। পরনে ঢিলে-ঢালা ট্রাউজার, গায়ে ঢোলা কোট। হাসি-হাসি মুখ, চটপটে হাব-ভাব।

লোকটা আবুকেও খাতিরই করে বোঝা গেছে। বেয়ারার মারফৎ খবর পেয়ে এসেই অন্তরঙ্গ সুরে বলেছিল, বদিনই ভাবছি আবুসাহেবের একেবারে দেখা নেই কেন।

একটা চোখ একটু ছোট করে ঠাট্টার সুরে আবু জিগেস করেছিল মালে টান পড়েছে?

পাশে অচেনা লোক দেখে ডাটাবাবু, সপ্রতিভ সৌজন্যে বাপীকে নমস্কার জানিয়েছেন—মিস্টার তবফদার? মিস্টার চালিহা আপনার কথা বলে গেছেন, সব ঘরই খালি—যেটা খুশি নিতে পারেন।

সব শেষের এই নিরিবিলি ঘরটাই বেছে নিয়েছে বাপী।—বিকেলে একটু ভারী খাওয়া হয়েছিল, ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ খুব ছিল না। কিন্তু আবুর কাছে পার নেই। আজকের দিনটা অন্তত বাপীভাই তার আদরের অতিথি, ক্লাব ক্যানটিনের খানা ভালো, ওই ক্যানটিন চালিসেই বাবু ডাটা লাল হয়ে গেল, নইলে ম্যানেজার হিসেবে তার মাইনে-কড়ি কিছু নেই—ক্যানটিনে দুজনে একসঙ্গে ডিনার সারবে, আর খাওয়াবে।

ডিনারের আগে ক্লাব দেখিয়েছে আবু, ক্লাবের গল্প করেছে। সব কটা চা-বাগানের মালিক আর কর্তাব্যক্তিরা জোট বেঁধে বাড়তি লাভের কড়ি থেকে এই নতুন ক্লাব করেছে। নইলে এই পেল্লায় দালান তুলতে আর সব ব্যবস্থা করতে খরচ যা হয়েছে তার সবটাই ইনকাম ট্যাক্সের পেটে গিয়ে ঢুকত। ভাগাভাগি সব টাকাই কোম্পানী-গুলোর খরচের খাতায় উঠেছে।

ক্লাবে সাজ বা সরঞ্জামের ত্রুটি নেই। তকতকে বিলিয়ার্ড টেবল, দু সেট টেবল-টেনিস বোর্ড, গোটা তিনেক ক্যারম বোর্ড মাঝারি হলঘরের একদিকে অনেকগুলো ছোট ছোট টেবিল, চারদিকে শৌখিন চেয়ার। এখানে তাস দাবা জুয়ার আড্ডা। অন্যদিকে দুটো বড় বড় টেবিলে খবরের কাগজ আর রংচঙা জার্নাল ম্যাগাজিন ছড়ানো।

রাত্রি সাড়ে দশটার কাছাকাছি। তখনো জুয়ার আসর জমজমাট। দু-পাঁচজন আধ-বয়সী মহিলাকেও দেখা গেছে এখানে। খবরের কাগজ বা জার্নালের দিকে কেউ নেই। চার-পাঁচটা টেবিলে তিন তাস বাজি পোকার চলেছে। ওদিকে সকলেই গম্ভীর, জোরালো আলোর নিচে সিগারেটের ধোঁয়া পাক খাচ্ছে। ব্যস্ত শুধু কয়েকটা তরুণ পরা বেয়ারা। অর্ডার মাফিক ড্রিংক সাপ্লাই করে যাচ্ছে আর হিসেবের খাতায় সই নিচ্ছে।

হিসেবের ফয়সলা হয় প্রত্যেক মঙ্গলবার অর্থাৎ শুক্রবারে। শনি রবি দুদিন চা-বাগানের ছুটি। তাই শুক্রবার রাতে হোমরা-চোমরাদের নাকি দিল খোলা থাকে। ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারীর ইত্যাদি আছে। বুঝে শুনে বকমারি মদ আমদানির ব্যবস্থা এবং তদারক তারাই করে থাকে। মেম্বাররা কি দরে সেটা এখানে ভোগ করবে তাও তারাই হিসেব কষে ঠিক করে দেয়। এ ব্যাপারে ডাটাবাবু শুধু জিম্মাদার, সার্ভিস চার্জ ছাড়া আর বেশি কিছু লাভ করতে পারে না। তবে আবুর ধারণা বাজারে শুধু খালি বোতল বেচেই লোকটা মন্দ কামায় না। তার আসল লাভ ক্যানটিন থেকে। খানা ভালো কিন্তু গলা-কাটা দাম। শুক্রবার শনি এই দুটো দিন ডাটাবাবুর লক্ষ্মীবার। চা-বাগানের রইস মানুষেরা সপরিবারে ওই দু রাতে এখানেই ডিনার সারে।

অল্প আর মাঝারি আদের খদ্দেরদের জন্য ডাটাবাবুর ডে-ক্যানটিন খোলা থাকে। তখন কম খরচেও লাঞ্চ মেলে। আর যা মেলে সেটা ডাটাবাবুর নিজস্ব কারবার। কম দামে দিশী ভালো মালের যোগানদার ডাটাবাবু। সবাই তো আর হোমরা-চোমরা চাকুরে নয় এখানে। লাঞ্চ খেতে এসে বা এমনিতেও সন্ধ্যে ডোবার আগে এসে তারা আস্ত বোতল কিনে নিয়ে যায়। একটু অসুবিধে, ইচ্ছে করলেও এ জিনিস এখানে বসে খাবার হুকুম নেই। এখানকার বড় সাহেবসুবোদের সঙ্গে গায়ত্রী বাইয়ের ম্যানেজারের খাতির বাজারের থেকে সস্তায় নামী-দামী মাল যোগানোর দৌলতে আর ডাটাবাবুর কাছে আবু সাহেবের খাতিরও অনেকটা একই কারণে। আবু বর্ডারের

বাইরে গেলেই কম দামের দিশী মাল পাবার আশায় হাঁ করে থাকে ডাটাবাবু। বর্ডারের ওধারে হরেক-রকমের দিশী মালেরও ছড়াছড়ি। এই দিশী মাল মানে হাড়িয়া পচাই নয়, তার থেকে ভদ্দরলোকের জিনিস।

এহেন যায়গায় কিনা বাপী তরফদার! এরকম জায়গায় রাতটা অঘোর ঘুমের মধ্যে কেটে গেল সেটাই আশ্চর্য। আরো কদিন ক'রাত থাকতে হবে কে জানে। এখানে বানারজুলির বাতাস নেই, বানারজুলির মাটির গন্ধ নেই। এর থেকে আবুর জঙ্গলের ঘরের একটাতে থাকতে পেলেও বেশি স্বস্তি বোধ করবে।

মুখ হাত ধোয়া হতেই চায়ের তেষ্টা। আর তক্ষুনি বুকের তলায় মোচড়। এই দুটো কান আর দুটো চোখ যেন একটা যন্ত্রণা বয়ে নিয়ে আসছে। ....এমনি সকালে খুপরি ঘরের নড়বড়ে দরজা বাইরে থেকে ঠেলে খোলার ক্যাচ করে শব্দ।....এক হাতে রুটি বা বিস্কুট, অন্য হাতে গরম চায়ের গেলাস....ঘুমের দাগে ফোলা ফোলা এক-খানা শামলা মুখ।

দরজা খুলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো বাপী। বারান্দায় একটা বেয়ারার জিম্মায় বনমায়ার নতুন মাহুত লছমন তার বাকস আর বিছানা রেখে গেছে। আবু বলে গিয়ে থাকবে। এখানে এ দুটোর একটাও মানায় না। ঘরে ঢুকিয়ে দিতে বলে বাপী সোজা ক্যানটিনে। লম্বা লম্বা পা ফেলে আর এক দিক থেকে ডাটাবাবু সামনে এগিয়ে এলো। —গুড মর্ণিং স্যার, রাতে কোনো অসুবিধে হয়নি?

টাটে গোলাপ কি গাঁদা ডাটাবাবু সেটা দেখে না। বাপী জবাব দিল, কিছু না।

ঘুরে দাঁড়িয়ে হালকা শিস দিতে বেয়ারা ছুটে এলো। —সাবকা ব্রেকফাস্ট।

ডাটাবাবু হালকা চালে কিচেনের দিকে চলে গেল। এরপর শুধু চা আর টোস্ট অর্ডার দেয় কি করে। সঙ্গে একটা ডিমের পোচ বলল। কিন্তু এরই বিল দেখে বাপীর দু চোখ কপালে। চায়ের পাট শেষ হতে বিল সামনে রেখে বেয়ারা জিগেস করল, দুপুরে লাঞ্চ হবে কি না।

সুতী, পশম, সিল্ক, টেরিন
ফাচার লিকুইড ডিটারজেন্ট

Glitter

কনজিউমার প্রোডাক্টস
২৮এ, এস এন দাস লেন, কলি—৫০
পরিবেশক :
পাপু এন্টারপ্রাইজ
৪৭।৩৭, আর কে ঘোষ রোড, কলি-৫০

বাপী জানালো হবে। কিন্তু ভিতরে আবার আর এক চিন্তা। এখানে ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ ডিনার করতে হলে তার পুঁজি ফাঁক হতে কদিন আর। আবু আর তার মেম-সায়েব খাসা ব্যবস্থাই করল যা হোক।

এখানে সন্ধ্যের পর কাগজ আসে। বাপী বাইরে বসে আগের দিনের কাগজটা উল্টে-পাল্টে দেখছিল। কত দিন যাবত বাইরের জগৎটাকেই ভুলে বসেছিল। খবরের কাগজ হাতে নিয়েও দেখেনি। কিন্তু আজও একটু বাদেই আর ভালো লাগল না।

দূরে বানারজুলির জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। ওটা টানছে ওকে। আবু সকালে আসবে বলে গেছল। তার জন্য অপেক্ষা করতে না হলে বেরিয়েই পড়ত।

কিন্তু নটা বেজে গেল আবুর দেখা নেই। থাকা খাওয়ার ফয়সলাই আগে করে নেওয়া দরকার। জলপাইগুড়ির ললিত ভড়ের কল্যাণে বাপীর থাকাটাও সস্তা হয়েছিল নিজেরটা নিজেই করে নিতে পারে। এই কুলির ঘরে থাকলে সেটা সম্ভব নয়। একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই পেলে ওই গায়ত্রী রাই যদি মাসে একশ টাকা বাড়ি ভাড়া থেকে পঞ্চাশ টাকা করেও ওর হাতে দেয় তাহলে খাওয়া খরচটা অন্তত চলে যেতে পারে। ভালো খেতে ভালো লাগে না এমন নয়, কিন্তু গত পাঁচ বছরে বাপী এ ব্যাপারে অনেকখানি নিরাসক্ত হতে পেরেছে।....যাক বাড়ির দশ হাজার টাকা দাম পাবার পর মাসে মাসে খুদ কুড়নোর কথা আর ওঠেই না। বেচেই দেবে। এমন লোভনীয় দর পেয়েও কাল রাতে অমন নিস্পৃহ থাকতে পারল কি করে, সেটাই আশ্চর্য লাগছে এখন।

ওই দশ হাজারের অঙ্কটা সামনে রেখে বাপীর নিজেকে একটু চাঙা করে তোলার চেষ্টা। কিন্তু গত রাতে অমন নির্লিপ্ত ভাবখানা দেখিয়ে এসে আজই আবার নিজে থেকে বাড়ি বিক্রির প্রস্তাব নিয়ে ছুটে যেতে পারে না। পরিস্থিতি বোঝার জন্যেও কটা দিন সবুর করতেই হবে।

আবুর এখনো দেখা নেই। বিরক্ত হয়ে পাজামা পাঞ্জাবি বদলাবার জন্য ঘরে এলো। সাড়ে নটা বাজে, এবারে বেরিয়ে পড়বে।

মিনিট দশেকের মধ্যে বেরুতে গিয়ে দেখে ডাটাবাবুর কিচেন ঘর থেকে আবু রবরানী এদিকে পা বাড়িয়েছে। দরজার কাছে ডাটাবাবু দাঁড়িয়ে। অতটা দূরে থেকেও বাপীর মনে হল একটু যেন কাঁচুমাচু মুখ তার। আর বড় বড় পা ফেলে আবুর গম্ভীর চালের এই মুখ দেখলে কেউ বলবে না বানারজুলি জঙ্গলের বীটম্যান ও।

কাছে এসে ধমকের সুরে বলল, সকালে ব্রেকফাস্টের টাকা দিতে গেলে কেন? আর শুধু ভাল ভাত মাছের ঝোলের লাঞ্চ অর্ডার দিয়ে এসেছ কেন?

জবাব না দিয়ে বাপী চেয়ে রইল। এত দেরিতে এসেও প্রথমেই ডাটাবাবুর কাছে এই খোঁজ নিতে গেল, অবাক হবার কথা।

ঘরে পা দিয়ে আবু আবার বলল ডাটাবাবুকে বকে এসেছি আর তোমার অর্ডার বাতিল করে ফার্স্ট ক্লাস লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে এলাম, আর বলে দিলাম এরপর যে কদিন এখানে থাকবে ব্রেকফাস্ট বা লাঞ্চ-ডিনারের কোনো বিল যেন তোমার কাছে হাজির না করা হয়।

—সে কি। টাকা কে দেবে—তুমি?
—না, গৌরী সেন।

বাপীর স্নায়ু সজাগ। কিছু কি ঘটেছে এর মধ্যে...আর সেইজন্য আবুর আসতে দেরি। কিন্তু ওর মূর্তি দেখে কিছু বোঝা দায়।

পিছনের দরজা দুটো ভেজিয়ে দিয়ে আবু ডুবু কুঁচকে একবার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিল। —আমার দেরি দেখে সটকান দিচ্ছিলে?

—বসে বসে ভালো লাগছিল না। কিন্তু তোমার ওই—

—বোসো। আগে আমার কথার জবাব দাও। বয়সে আমি কত বড় হব তোমার থেকে?

এই গাম্ভীর্য দেখে বা এই প্রশ্ন শুনে বাপীর আবারও কেমন মনে হল সমাচার কিছু আছে। জবাব দিল, বছর ছয় হবে....

—তাহলে তুমি গুণে গুণে এই দু গালে তিন-তিন ছটা থাপ্পড় মারো, আর কান দুটো ছেঁড়ার কষে মুলে দাও।

কপট রাগ আর ধরে রাখতে পারল না। দু হাতে বাপীকে বুকে জাপটে ধরে আর দু গালে নিজের গাল ঘষতে লাগল। এরপর চুমুচুমুও খেয়ে বসতে পারে বাপীর নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা।

—বাপীভাই আমি একটা পাঁঠা—আমি একটা গরু—আমি একটা গাধা!

এরপর যেটুকু বাপীর কাছে অন্তত তা আর অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। তবু দুকান সজাগ রেখে মন দিয়েই শুনল। রাতে ব্যাজার মন নিয়েই আবু রবরানী ধরে ফিরেছে। দুলালিকেও বলেছে, মেমসায়েবের কাছে গিয়ে বাপীভাই বিসমিল্লায় গলদ বাঁধিয়ে বসেছে, এখন ওর নিজের গলা বাঁচলে হয়।

সকালে জঙ্গলে যাবার আগে বাপী-ভাইয়ের কাছে আসার কথা, কিন্তু তার আগেই লোক মারফৎ মেমসায়েবের তলব। জলদি যেতে হবে। অগত্যা আচ্ছা করে ঝাড়বে ধরে নিয়েই গিয়ে হাজির হয়েছে। মেমসায়েব বারান্দায় তার অপেক্ষাতেই বসে-ছিল। সামনে গিয়ে মন ভেজানোর মতো সেলাম ঠোকার সময়ও দিলে না। রকত জল করে দেবার মতো ঠাণ্ডা গলায় বলল, তোমার ওই লোক কুলি অমন কথা বলে

গেল। কেন—তার কাছে তুমি আমাদের সম্বন্ধে কি বলেছ?

নিরুপায় আবু তখন আল্লার দোহাই দিয়ে জানালো, দোস্ত যা বলে গেছে তার সবটাই তার নিজের মাথায় গজিয়েছে, সে এরকম বলতে পারে মনে হলে এই বিপাকে পড়ার জন্য তাকে মেমসায়েবের কাছে নিয়েই আসত না। রাতে এখান থেকে বেরুনোর পর দোস্ত-এর সঙ্গে তার এ নিয়ে একচোট ঝগড়াই হয়ে গেছে। আবু শুধু তার কাছে মিসিসায়েবের (ঊর্মিলার) এলেমদার বাপ-জানের স্লিপ অ্যাকসিডেন্টে অসময়ে করে তুললেন সেই সব গল্প করেছিল। ম্যানেজার চালিহা সাহেবের আদরে জোরের কথা বলেছিল আর মেমসায়েব এই ম্যানেজারকে নিয়ে বুদ্ধি আর সাহসের জোরে তার খসমের ব্যবসা এমন জমজমাট করে তুললেন সেই সব গল্প করে করেছিল। দোষের মধ্যে মেমসায়েব এখন আর একজন লেখাপড়া জানা ইমানদার লোক খুঁজছেন আর এ পর্যন্ত দুজন লোককে টায়েবল দিয়ে ছাঁটাই করেছেন এ খবরটাও দোস্তকে জানিয়েছিল। কারণ ও খুব আশা করেছিল দোস্তকে মেমসায়েবের পছন্দ হবেই। কারণ এমন বিদ্যাবুদ্ধি আর সাহস ও-বয়সে কম ছেলেই ধরে। কিন্তু এখানে এসে আর চালিহা সায়েবকে দেখে দোস্ত কি ভেবে আর কি বুঝে অমন বেমক্কা কথা বলে ফেলল সেটা এখনো ওর মাথায় আসছে না।

বরফ ঠাণ্ডা মুখ করে মেমসায়েব ওর সব কথা শুনে গেল। তারপর বলল, তোমার দোস্ত একটা হাড়-পাজী ছেলে—বুঝলে?

মেমসায়েবকে একটু তোষামোদ করার আশায় আবু মাথা নেড়ে প্রায় সায় দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই অবিশ্বাসা কিছু দেখল যেন। ঠোঁটের ফাঁকে হাসির মতো যেন কি। আর চোখেও একটু খুশির ঝলক।

আবু বিশ্বাস করবে কি করবে না ভেবে পেল না।

সঙ্গে সঙ্গে আবার মালকান-এর কড়া মুখ। ঝাঁঝালো গলায় আবুকে সাবধান করল, দোস্ত কাল রাতে এখানে কি বলেছে না বলেছে এ যেন কাক-পক্ষীতেও জানতে না পারে—জানলে দুজনেরই গর্দান যাবে। তারপর হুকুম করল, তাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো। তারপর নিজেই আবার বলল এখন থাক, সকালের দিকে চালিহার আসার কথা, বিকেল তিনটে-চারটের সময় যেন দেখা করে।

আবু রবরনীর বুদ্ধিসুদ্ধি যেন এক ঝাপ ধোঁয়ার মধ্যে সেঁধিয়েছিল এতক্ষণ। এবারে খোলসা। আনন্দে সেখানেই একটা ডিগবাজী খেতে সাধ গেছল তার। কিন্তু মেমসায়েবের মেরার শেষ নেই তার পরেও। ছেলেবেলায় কেমন দেখেছে দোস্তকে, একটু ঝড় হবার পর কেমন দেখেছে, পাঁচ বছর দেখেনি এর মধ্যে বন্ধুর স্বভাব-চরিত্র যে বিগড়ায়নি সে জানল কি করে—এই সব।

আবুও তখন লাগাম ছেড়ে বন্ধুর প্রশংসা করেছে। সত্যি মিথ্যে যা মনে এসেছে তাই বলেছে। বলেছে, পাঁচ বছরে স্বভাব বদলে থাকলে কলকাতার মতো আমোদ-আহ্লাদের জায়গা ছেড়ে সে এই জঙ্গলে ফিরে আসবে কেন। এতদিন বাদে দেখে কয়েকটার মধ্যে আবুর বরং ভয় ধরেছে বন্ধু বিবাগী-টিবাগী না হয়ে যায়। আর টাকার লোভ যে নেই সে প্রমাণ তো মেমসায়েব নিজেই পেয়েছেন। পকেটে দশ টাকা আছে কিনা সন্দেহ কিন্তু বাড়িটার জন্য নাকের ডগায় দশ হাজার টাকা দুলিয়েও তাকে লোভের জালে আটকানো গেল না।

বুকের তলার ক্ষতর ওপর আঁচড় পড়ল কটা। ওর স্বভাব-চরিত্রের খবর জানা থাকলে প্রশংসা করতে গিয়ে এই আবু রববানীরও জিভ আটকে যেত। প্রসঙ্গ ঘোরানোর জন্য বাপী তাড়াতাড়ি জিগ্যেস করল, আমার ক্লাব ক্যানটিনে খাওয়া-দাওয়ার খরচ চালানোর গৌরী সেন তাহলে তোমার মেমসায়েব?

হ্যাঁ। ভালো বর পেয়েছ কিনা খোঁজ করল। আমিও তক্ষুনি কাজ হাসিল করে নিলাম। বললাম, ভালো বর পেলে কি হবে, ওখানে ডাটাবাবুর খাওয়ার বিল মেটাতে তো এক হাত জিভ বেরিয়ে যাবে। মেমসায়েব তক্ষুনি বলে দিল, বিল সব আমার কাছে পাঠাতে বোলো। আবু হাসছে হি-হি করে। —এমনিতে মেমসায়েবের আঙুলের ফাঁকে জল গলে না, আমার যে এখনো ম্যাজিকের মতো লাগছে গো বাপীভাই!

এবারে বাপীও হাসল। —গায়ে পড়ে অত সত্যি কথা বলার দরকার কি ছিল এখন সেটা বুঝছ তাহলে?

আবু অকপটে মাথা ঝাঁকালো। হাড়ে হাড়ে বুঝছি। কাল দুলারির কাছে তোমাকে গালই পেড়েছি আর এই ভোজ-বাজীর কথা শুনলে ও-ত আমাকে বোকা-পাঁঠা বলবে।

ঘরের মধ্যে আর ভালো লাগছিল না। আবুর সঙ্গেই বেরিয়ে পড়ল। ও এখন জঙ্গলের কাজে যাবে। হেড কাটমান হিসেবেও দায়িত্ব তো একেবারে কম নয়। ওর সঙ্গে আগের মতোই জঙ্গলে কাটানোর তৃষ্ণা বাপীর।

পাশাপাশি পাকা রাস্তা ধরে চলতে-চলতে বাপী জিগ্যেস করল, আপাতত আমার এই ক্লাবে থাকাই ঠিক তাহলে?

আবু সানন্দে জবাব দিল, খাবে দাবে তোফা আনন্দে থাকবে—গাঁটের পয়সা খরচা না হলে এর থেকে ভালো জায়গা আর আছে নাকি?....তবে মেমসায়েব পাশের জমিতে তোমার ঘর তুলে দেয়ার কথাটা একেবারে ছেঁটে দেয় নি। আজও বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওই খালি জমিটুকু দেখে বলছিল, ঘর একটা-দুটো আরো তোলা যেতে পারে, কিন্তু এটুকুর মধ্যে মাঝখানে দেয়াল যা কাঠের পাঁচিল তুললে বিচ্ছিরি দেখতে হয়ে যাবে। এতে রাজি হবে না বোধহয়, কিন্তু তোমার থাকার ব্যবস্থা তো কিছু করে দিতেই হবে—বারো মাস ডাটাবাবুর বিল মেটানোর মেয়ে তো নয়।

বাপী জিগ্যেস করল, পাঁচিল তুলতেই হবে কেন, মেয়ের জন্য?

—আর কি, মেয়ের চার দিকে অষ্ট-প্রহর চোখের পাঁচিল তো দিয়ে রেখেছে। নতুন কিছু রসের খোরাক পেয়ে আবু দাঁড়িয়েই গেল।—ওই মেয়ের কাণ্ড-মাণ্ড তোমাকে কিছু বলা হয়নি—না?

বাপী সচকিত। শোনার লোভ নেই। কিন্তু সতর্কতার প্রয়োজন কতটুকু, জেনে রাখা দরকার। মাথা নাড়ল, বলেনি।

গোড়ায় এই কাণ্ডরও সবটাই আবুর সেই ভুটান পাহাড়ের বাংলোর ঝগড়ুর মুখে শোনা। হালে নিজে চোখেও কিছু দেখেছে আর তাই নিয়ে মা-মেয়ের মন কষাকষির ব্যাপারটা আঁচ করেছে।

মেমসায়েবের এই মেয়ে ঝগড়ুর চোখের মণি। ঊর্মিলার কথায় ঝগড়ুর কড়া নেশার মুখেও স্নেহ গলে গলে পড়তে দেখেছে আবু। ও তাকে আদর করে ঊর্মি বলে ডাকে। মেমসায়েবকে ভয়ও করে ভক্তিও করে কিন্তু ভালবাসে ওই ঊর্মিকে। মেয়েটার নাকি তার বাপের মতোই দিলখোলা দরাজ মন। মা-কে লুকিয়ে-চুরিয়ে ভালো মালের বোতল সময়-সময়

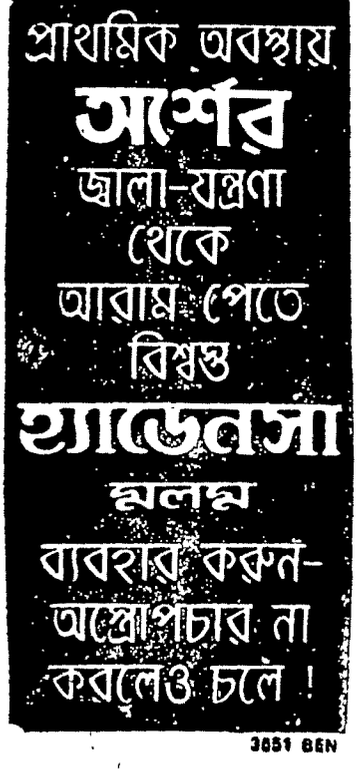

3651 BEN

ও-ই দিয়ে যেত ঝগড়ুকে। কিন্তু বরাত এমন, দেড় বছর হয়ে গেল ওই মেয়ের সকলের ওপর রাগ আর অভিমান।

উর্মিলা দার্জিলিং থেকে পড়াশুনা করত বরাবর। এবারে তার বি-এ পরীক্ষা দেবার কথা। কিন্তু মায়ের কড়া দাপটে পড়াশুনায় জলাঞ্জলি দিয়ে তাকে মায়ের সঙ্গে থাকতে হচ্ছে এখন। মায়ের স্যাফ কথা, বাড়িতে বসে পড়াশুনা করে প্রাইভেট পরীক্ষা দিতে পারো তো দাও, নইলে দিতে হবে না। মেয়েও রাগ করে ও-পাট বন্ধ করে বসে আছে।

মোদ্দা কথা, দার্জিলিঙের কাছাকাছি এক চা-বাগানের ছোকরা এনজিনিয়ারের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে উর্মিলা রাই। মেয়ে চালাক যেমন সেয়ানাও তেমনি। অনেক দিন পর্যন্ত ব্যাপারখানা সকলের চোখে গোপন ছিল। কলেজের ছুটি-ছাটায় মেয়ে মায়ের কাছে এসে থাকে আবার ছুটি ফুরোলে চলে যায়। ধরা পড়বে কি করে?

কিন্তু প্রেম পল্লবিত থাকলে চালাক ছেলে-মেয়েরাও বোকা হয়ে যায় আবার বেপরোয়াও হয়। এই জন্যেই দুনিয়ার কোনো প্রেমই শেষ পর্যন্ত চাপা থাকে না বোধহয়। মেয়ের ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পর লম্বা ছুটির মধ্যেই সব ফাঁস। উর্মিলা মাঝে মাঝে সকালে পাহাড়ের বাংলো থেকে নেমে আসে, দুপুরের খাওয়ার সময়ের আগে আর দেখা মেলে না। আবার খেয়ে-দেবে দুপুরে নামল তো সন্ধ্যার আগে আর দেখা নেই। মা বকাবকি করলেও চোখ উল্টে থাকে, নয়তো জবাব দেয়, ছুটির মধ্যে বাড়িতে ভালো লাগে না—পাহাড়ও আর জঙ্গল দেখে বেড়ায়।

মায়ের তাতেও দুর্ভাবনা, এসব জায়গায় একলা পাহাড় জঙ্গল দেখে বেড়ানোও নিরাপদ নয়। কিন্তু ঝগড়ুকে সঙ্গে দিতে চাইলে মেয়ে মুখ ঝামটা দেবে। সে আর কচিটি আছে নাকি এখন।

মায়ের হাতে পড়লে বকুনি খাবে ভেবে ঝগড়ু নিজেই অনেক সময় মেয়ের ফিরতে দেরি দেখে নিচে নেমে এসেছে। কিন্তু কাছে দূরে কোথাও তার দেখা মেলেনি। এদিকে মা তো আর সর্বদা ঘরে বসে থাকে না, দিন-রাতের বেশির ভাগ সময় তার মাথায় ব্যবসার চিন্তা। দু'চার দিনের জন্য আবার বানারজুলিতে বা অন্য কোথাও চলে যায়। বড় বড় পার্টির সঙ্গে নিজেরও অনেক সময় যোগাযোগ রাখতে হয় তার। মেয়ের জন্যও তখন পর্যন্ত কোনো চিন্তা-ভাবনা নেই। নিজের বাড়ি, ঝগড়ু আছে, চিন্তার কি আছে?

... মেয়ে একদিন সকালে নেবুলো, রাত পর্যন্ত দেখা নেই। তার খানিক আগে মালকান দুদিনের জন্য বাইরে চলে গেছে। উর্মি অবশ্য ঝগড়ুকে বলে গেছল, দুপুরে ফিরবে না, তার চেনাজানা কয়েকজন মেয়ে এসেছে, তাদের সঙ্গে হৈ-চৈ করে কাটাবে আর বাইরেই খেয়ে নেবে। কিন্তু সেয়ানা মেয়ে মা থাকতে একটি কথাও বলেনি। তারপর দুপুর গড়ালো, বিকেল আর সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হল, তার দেখা নেই। ভাবনা-চিন্তায় অস্থির হয়ে পাহাড় থেকে নেমে এলো ঝগড়ু। তাকে আর এ তল্লাটে না চেনে কে? শেষে অনেকটা দূরে সেই পাকা রাস্তার ধারের এক চালাঘরের বুড়ো সাহাজীর সঙ্গে দেখা। ঝগড়ুর দুশ্চিন্তার কথা শুনে সে যা খবর দিল, দুই চক্ষু ছানাবড়া। মিসি সাহেবকে নাকি মাঝে মাঝে জিপে করে এক ছেলের সঙ্গে হাওয়া খেতে দেখে সবা। এই রাস্তাতেই যাতায়াত তাদের। সুপুরুষপানা অল্পবয়সী ছেলে, কোন্ দিশী বলতে পারবে না. তবে স্বজাতের নয় এটা ঠিক—অর্থাৎ নেপালী নয়। সাদা চামড়ার সাহেব-সুবো বা ফিরিঙ্গি-টিরিঙ্গিও নয়। পরনে চেকনাই প্যান্ট শার্ট, নিজেই জিপ চালায়। পাশে মিসি সাহেব। সেই সকালেও এই রাস্তায় জিপে দুজনকে দেখেছে। অমন ফর্তির মুখ কে না চেনে। তাই তারা ভেবেছে ঝগড়ুর মালকান মেমের জন্য ভিন্-জাতের আদমী ঠিক করে ফেলেছে।

ঝগড়ু ফিরে এসেছে। কিন্তু বাংলোয় ওঠেনি। পাহাড়ে ওঠার রাস্তা আগলে নিচেই দাঁড়িয়ে ছিল। ওই জিপের দেখা মিলেছে, আরো ঘন্টাখানেক বাদে। রাত তখন কম করে নটা। আশপাশে জনমানব নেই।

সামনে এসে হেড লাইটের আলোয় ঝগড়ুকে পাথরখানার মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে উর্মিলার প্রেমের চটকা ভাঙল। ওদিকে সেই ছেলেরও মুখ শুকনো। জিপ থেকে নেমে উর্মিলা ছুটে এলো। তার প্রথম ত্রাস, মা হঠাৎ ফিরে এসেছে কিনা, নইলে ঝগড়ু এখানে এই মুখ করে দাঁড়িয়ে কেন?

মা আসেনি শুনে মেয়ের শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা। বলল, ফিরতে দেরি হবে বলেই তো গেছল, অত চিন্তার কি আছে। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় পড়ে দেরি হয়ে গেল, তাদের একজনের আত্মীয় পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছে।

প্রেমিকটিও জিপ থেকে নেমে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ঝগড়ু তখন রাগে ফাটছে। তাকে দেখিয়ে উর্মিলাকেই বলল, ফের মিথ্যে কথা বলবে তো তোমার সামনেই ওর মাথাটা ছিঁড়ে নিয়ে আসব। তোমার এই খেলা কত দিন ধরে চলছে আমার জানতে বাকি নেই—আসুক মালকান।

ঝগড়ুর মেজাজ জানে উর্মিলা, প্রেমিকটি রিঙ্ক নেড়ে কিছু বলতে গেলে হয়তো ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ওপর। ইশারায় চটপট তাকে সরে পড়তে বলল। তারপর বাংলোয় ফিরে ঝগড়ুকে নিয়ে পড়ল। তোয়াজ তোষামোদে কাজ হল না দেখে রাগ বিরাগ শুরু হয়ে গেল। মা কিছু জানবে না কথা দিতেই হবে। আর তা না হলে নিজের ওপর এমন শোধ নেবে যে ঝগড়ুকে চিরকাল পস্তাতে হবে। কি করবে রাগের মুখে তাও বলল। শেষে ছোট মেয়ের মতোই ওকে জাপটে মাপটে ধরে সে কি আদরের ঘটা। ঝগড়ুর কথা না দিয়ে উপায় কি? মদ দু' চোখের বিষ মালকানের, কিন্তু ম্যানেজার বা ব্যবসার সে রকম মানী অতিথি অভ্যাগতের জন্য ঘরে দামী মাল কিছু মজুত রাখতেই হয়। মেয়ের বুকের এত পাটা, তার থেকে একটা আস্ত বোতল সরিয়ে ওকে দিয়ে দিয়েছিল। আর পরদিন সেই ছেলেকে একেবারে পাহাড়ের বাংলোয় তুলে এনে ঝগড়ুর সঙ্গে মিতালি করিয়ে ছেড়েছে।

ঝগড়ু ভয়ে বাঁচে না। আরো পাঁচ জন আছে এখানে। মেয়েটার জন্য তাদের মিথ্যে বোঝাতে হয়েছে, মিথ্যে বলতে হয়েছে। নানা রকম বখেড়ার আনা-গোনা তো আছেই বাড়িতে। এ রকম এক দিন না. মালের অনুপস্থিতিতে আরো অনেক সময় ওই ছেলেকে এই পাহাড়ের বাংলোয় দেখা গেছে। উর্মিকে ঝগড়ু বকা-ঝকা করে, মায়ের কাছে বলে দেবে বলে ভয় দেখায়, নিজের বিপদের কথা বলে— কিন্তু কে কার কথা শোনে!

ছেলেটাকে অবশ্য ভালোই লেগেছিল ঝগড়ুর। মিষ্টি চেহারা। নাম বিজয় মেহেরা। পাঞ্জাবী। কিন্তু দাড়ি-গোঁপের বালাই নেই। কেতাদুরস্ত হাল ফ্যাশানের ছেলে। এনজিনিয়ারিং পাশ করে সবে শিলিগুড়ির চা-বাগানে ঢুকেছে। দার্জিলিং আর শিলিগুড়ির মাঝামাঝি জায়গা মিরিক। সুখিয়া পোখরির কাছে দল বেঁধে মেয়েরা পিকনিকে গেছল। সেখানে ওই ছেলের সঙ্গে উর্মিলার আলাপ। ঝগড়ু বলেছে প্রখর আলাপেই নাকি সেশ্ ঘন ঘনাপাল। তারপর ফাঁক পেলেই ওই ছেলের দার্জিলিং-এ ছোটা, আর ফাঁক পেলে মেয়েরও তেমনি হস্টেল পালিয়ে মিরিক বেড়াতে আসা। বিজয়ের হেপাজতে কোম্পানীর জিপ আছে একটা। তার ফলে দার্জিলিং থেকে মিরিক বা মিরিক থেকে দার্জিলিং কতটুকু আর পথ? তাছাড়া শনি বার সপ্তাহে দুদিন তো ছুটি।

দুঃসাধ্য রোগ

একজিমা, সোরাইসিস্, দূষিত ক্ষত, বক্তদোষ, বাতরক্ত, ফুলা, শ্বেত-দাগসহ আরও অনেক কঠিন চর্মরোগ হইতে স্থায়ী মুক্তিলাভের জন্য ৮৪ বৎসরের চিকিৎসাকেন্দ্রে চিকিৎসিত হউন। হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া-১, ফোন: ৬৭-২৩৫৯: শাখা: ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড (হ্যারিসন রোড), কলিকাতা-৯

সে-ও এক শনিবার। পড়বি তো পড় একেবারে বাঘিনীর মুখে। অর্থাৎ মায়ের মুখোমুখি। ঊর্মিলা তখন বি-এ পড়ে। গায়ত্রী রাই ব্যবসার কাজে নিজের ভ্যানে কার্সিয়াঙে এসেছিল। কাজ শেষ করে ফেরার মুখে বিপত্তি। একজায়গায় পথ আটকে একটা বাস বিকল হতে কতগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে। গায়ত্রী রাইয়ের ভ্যানও এসে থেমেছে। বাঁকা রাস্তার অদূরে একটা জিপ দাঁড়িয়ে। সেই জিপে চালকের পাশে তার মেয়ে বসে। দুজনেই হাসি-খুশিতে এত মশগুল যে কোনদিকেই চোখ নেই। নিজের চোখ দুটোকে বিশ্বাস করবে কিনা, গায়ত্রী রাইয়ের সেই বিস্ময়। কোথায় দার্জিলিঙের হস্টেল আর কোথায় কার্সিয়াঙ। কম করে পনের ষোল মাইল পথ।

ভ্যানে গায়ত্রী রাইয়ের পিছনে যে লোকটা বসে ছিল সেও এইখানে জিপে ওই ফিটফাট ছেলের পাশে মিসিসায়েবকে দেখে হকচকিয়ে গেছে। লোকটা পাহাড়ের বাংলোয় কাজ করে। বাইরে বেরুলেই অনেক সময়েই বাংলোর কেউ না কেউ মেমসায়েবের সঙ্গে থাকে। জিপের ওই ছেলেটাকে সে পাহাড়ের বাংলোয় দেখেছে। ঝগড়ু বলেছিল, মেম-সায়েবের খাতিরের খদ্দের। মেমসায়েবের এই মূর্তি দেখে আর তাকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে লোকটা সে-কথাও না জানিয়ে পারল না। কারণ এখানে ওই ছেলের পাশে মিসি-সায়েবকে দেখে তারও দস্তুরমতো খটকা লেগেছে।

তারপর বেড়াল যেমন ইঁদুর ধরে আনে সেই রকম করে জিপ থেকে মেয়েকে টেনে নামিয়ে নিজের গাড়িতে তুলল মেমসায়েব। মেয়ের তখন হয়ে গেছে। সেখান থেকে সোজা নিজের পাহাড়ের বাংলোয়। ঘরে এনে বার কতক ঝাঁকুনি দিতেই মেয়ে গলগল করে সব স্বীকার করে ফেলল, আর বি-এ পাশ করার পর ওই ছেলেকে তার বিয়ে করার সংকল্পের কথাও বলল। জবাবে মায়ের ঠাস ঠাস দুই থাপ্পড়ে সোফায় বিছানায় গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তে হল তাকে।

বাইরে থেকে মেমসায়েবের অলক্ষ্যে ঝগড়ু মেয়ের শাস্তি দেখেছে। তারপর নিজের শাস্তির অপেক্ষা করেছে।

ডাক পড়তে ঝগড়ু মেমসায়েবের মুখের দিকে তাকাতে পারেনি। কিন্তু বলার যা বলেছে। —তাকে যেমন খুশি শাস্তি দিতে পারেন। সব জেনেও ও কিছু জানায় নি বা জানাতে পারে নি, কারণ, তার মেয়ে দুর্গা মায়ের নাম করে তাকে শাসিয়ে রেখেছিল মা-কে কিছু বললেই পাহাড়ের ওপর থেকে

ঝাঁপ খেয়ে নিজেকে শেষ করবে আর শোধ নেবে। বলেছিল, সে ওই ছেলেকে বিয়ে করবে আর সময়ে সে-কথা মা-কে নিজেই জানাবে।

মা, মালকান ওকে কোনো শাস্তি দেয় নি বা কিছুই বলেনি।

পরদিন মেয়েকে নিয়ে নিজে দার্জিলিং চলে গেছে। সেখানে কি হয়েছে না হয়েছে তারাই জানে। মোট কথা এটুকু বোঝা গেছে, মেমসায়েব সেখানে বেশ কড়া ব্যবস্থাই কিছু করে এসেছিল।

কিন্তু প্রেমজ্বর ছাড়ানো মুখের কথা নয়। তিন-চার মাসের মধ্যে দার্জিলিং থেকে মেমসায়েবের নামে চিঠি এসেছে। সেটা কি চিঠি ঝগড়ু জানে না, ফলে আরও জানে না। তবে এটা ঠিক হস্টেল থেকে মেয়ের নামে কড়া নালিশ কিছু। চিঠি পেয়েই থমথমে মুখে মেমসায়েব দার্জিলিং চলে গেছে, আর বই-পত্র বাক্স বিছানাশুদ্ধ মেয়েকে নিয়ে চলে এসেছে। ব্যস, মেয়ের পড়ার পাট খতম। মা আর মেয়েকে কলেজে পাঠাবে না, মেয়েও প্রাইভেট পরীক্ষা দেবে না।

বিজয় মেহেরাকে আর স্বচক্ষে এই বানারজুলিতেই দেখেছে। দেখেছে মেম-সায়েবও। তাকে প্রাণের ভয় দেখিয়েছে পর্যন্ত। সাত-আট মাস আগে মেয়ে ভাগ করে বাড়ি থেকে পালিয়ে-ছিল। দুদিন দু রাত নিখোঁজ। এই আবুকে সঙ্গে করেই মেম-সায়েব শিরিকে চলে গেছল। যে চা-বাগানের এনজিনিয়ার সেই ছেলে, তার ম্যানেজারের কাছে নালিশ করেছিল। কিন্তু অপ্রস্তুত হয়ে ফিরতে হয়েছে। কারণ বিজয় মেহেরা সেখানেই তখন কাজে ব্যস্ত। ঊর্মিলা ঘর ছেড়ে পালিয়েছে শুনে সে হাঁ।

দুদিন বাদে ঊর্মিলার শিলিগুড়ির এক বান্ধবী এক রকম জোর করেই তাকে মায়ের হাতে পৌঁছে দিয়ে গেছে। দু রাত সে ওই বন্ধুর বাড়িতে বন্ধুর কাছে ছিল।

তারপর থেকে এ পর্যন্ত আর গোল-যোগ কিছু দেখা যায়নি। বাইরে মেয়েকে অনেকটা শান্তই দেখা যায়। মা তাকে সারা-ক্ষণ চোখে আগলে রাখে। যখন যেখানে যায়, সঙ্গে নিয়ে যায়। কিন্তু আবুর এখনো ধারণা, মেয়েটার ওই ছেলের ওপরেই মন পড়ে আছে। মায়ের চোখে ধুলো দেওয়া সহজ নয়, তবু তলায় তলায় কোন রকম যোগসাজশ আছে কিনা কে জানে। এদিকে বাইরের কোনো ভদ্রলোকের সঙ্গে মিশতে দেখে না তাকে। শহর থেকে গাদা গাদা ইংরেজি গল্পের বই আনায় আর পড়ে।

আবুর মুখ চলে তো পা চলে না। এতক্ষণে ওরা বনমায়ার আস্তানার রাস্তায়। ব্যাপী অন্যমনস্ক ছিল। এ গল্প যেমন পুরনো আবার তেমনই নতুন। ঊর্মিলা বাইরের মুখখানা খুঁটিয়ে দেখছিল। বুকের তলায় কোনো বড় ঝড় জমাট বেঁধে আছে মনে হয়নি। বরং চোখের কোণে স্বাভাবিক কৌতুক দেখেছে, ঠোঁটের ফাঁকে মজার ছোঁয়া লাগা হাসিও দেখেছে।

....তাহলে মা জিতেছে?

বনমায়ার ডাকে ঘুরে তাকালো। শুঁড় উঁচিয়ে সেলাম তুলেই আছে আর ডাকছে। একসঙ্গে দুজন আপনার জনকে কতকাল বাদে দেখল, এই ভাব। লছমন ওর মুখে কচি ভাল-পাতা গুঁজে দিয়ে তোয়াজ করছিল। বনমায়া শুঁড় দিয়ে ওকে পাশে ঠেলে সরালো।

ব্যাপীর হঠাৎ হাসি পেল। এই বন-মায়ার পায়ে কত বার কত না শক্ত পোক্ত বেড়ি লাগানো হয়েছে। কিন্তু সব বাধা-বন্ধ ঠেলে ওর অভিসার কেউ ঠেকাতে পারে নি।

কোনো ভদ্রলোকের মেয়ে বোধ হয় বনমায়া হতে পারে না।

(চলবে)

কণ্ঠসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত ও নৃত্য শিক্ষাকেন্দ্র
মেট্রোপলিটন
কলেজ
পরিচালনা ও শিক্ষাদানে
শ্রীচিন্ময় লাহিড়ী
ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁ
সুযোগ্য পুত্র
গোলাম সবীর খাঁ
ও
শ্রীঅখিলবন্ধু ঘোষ
রবীন্দ্রসঙ্গীত ও অন্যান্য বিষয়ের জন্য
বিশিষ্ট বেতারশিল্পী
২৪১/১, ডায়মণ্ডহারবার রোড, বেহালা
ফোন : ৪৫-০৯০৯

যশোদা ওরমার দুঃখ

গৌতম ভট্টাচার্য

যশোদা, জাবেদা, রামিয়া আর ওদের কর্তামা এই খুদে দলটি তাদের মেলায় গিয়েছিল। ছোট পীরের মেলায়। বাসুবাটীর জাতে। জাতের আদি পীর বাবা দোষা মাগুতে। বাজার মন্দা হচ্ছে ক্রমশই। রেট কমছে। আগে মিনসিপ্যাল অফিস থেকে খবর নিয়ে সারা শহরটা চক্কর দিত। লোকের হাতে পয়সা-কড়ি ছিল। ছেলে হলে নিদেন পঞ্চাশ টাকা মিলত আর মেয়ে হলে বাড়ির লোকের ব্যাজার মুখ। বিশেষ করে গিন্নীবান্নিদের। মেয়ে হয়েছে একেই গলার কাঁটা। তার ওপর সে কাঁটার জন্যে খরচাতি। তবু কিছু মিলত। নিদেন টাকা তিরিশেক বটেই। আর এখন সে জায়গায় যে বাড়িতেই যাও না কেন—দশ টাকার বেশি ঠ্যাকায় না। ছেলে হলে একটু বেশী। তাও বড়জোর পনেরো বিশ। টাকার সঙ্গে আগে পুরোন কাপড়টা চোপড়টা কিছু চাল-আলুও মিলত। আজকাল এমন হা-কার লেগেছে শুধু টাকাটাই ঠ্যাকায়। বাষনাকেরা ধরলে বলে বেশনের চাল মাপা চাল। নিজেদেরই একবেলা কোন মতে ভাত জোটে...ওসব চালটাল হবে না। বেশী সোবগোল মচাতে পারলে কোন কোন বাড়িতে দৈবাৎ সৈবাৎ পুরোন শাড়িটাড়ি যাহোক একটা ছুঁড়ে দেয়। তাড়াতাড়ি পাপ বিদায় করার মতো। আর মিনসিপ্যাল আপিস থেকে খবর মেলে কম। দু-চার দিনে দু-একটা বাড়ির পাত্তা মেলে। দশ বছরেই এমনটা হাল।

হিজড়ে কোঠীর বোল বোলাও এখন একেবারে ঠাণ্ডা মেরে গেছে। কর্তামার মাথায় হাত। দলের চারজনের পেটে দু মুঠো জুটবে কি করে। কাদন হল রামিয়া আর জাবেদা খান সাহেবের কোঠিতে দু-দশ রোজগারের ধান্দা চালাচ্ছে। যশোদা ওদের সঙ্গে ভেড়েনি। খান সাহেবদের ওর বড় ভয়। এক-একটা সব জন্তু। তা যে যাই রোজগারপাতি করুক না কেন সব এনে জমা পড়ার কথা কর্তামার কাছে। তা রামিয়ারা রাতে খান সাহেবদের কোঠি থেকে ফিরে কিছু কিছু গুঁজেও দেয় কর্তামার হাতে। সবটা দেয় না। নিজেদের পুঁটলি-প্যাটরায় লুকিয়ে রাখে। যশোদা টের পায়। কর্তামাও জানে বোধহয়। আগে হলে কর্তামা চুঁড়িয়ে লাথিয়ে ঠিক করে ছেড়ে দিত। এখন কর্তামার বয়স হয়েছে। সে হাঁকডাক রবরবা কোনটাই নেই। কজন তো আগেই দল ছেড়ে অন্য দলে ভিড়েছে। এরাও যদি চলে যায় তো এই বুড়ো বয়সে গতিটা কি হবে—একদিন পুরো একটা মড়া বনে পড়ে থাকতে হবে কোথাও নর্দমা-টর্দমার ধারে। মিনসিপ্যালিটির ধাঙড় এসে পায়ে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে ঠ্যালায় চাপাবে। নইলে পড়েই থাকতে হবে। মরা মুখের ওপর মাছি বসবে। কাগে এসে চোখ ঠোকরাবে। পিঁপড়েতে পচা শরীরের মাংস খাবে। —এসব সাত-পাঁচ ভেবেই কর্তামা চুপ মেরে থাকে, রামিয়াদের কিছু বলতে সাহসে কুলোয় না। তবু কর্তামার বেহাই মিলবে না। নিজের জমাপাত্তি বলে কিছুই নেই। দলের দরকারে বেদরকারে সব খসে গেছে। যশোদা কর্তামার মরা মাছ চোখের দিকে তাকালেই টের পেয়ে যায়, তারও এ দুর্দশা হাল হবে। যশোদার বুড়ি বুনতে

এখনও বছর পনেরো দেরী। তবু এখন থেকেই ওর হব হরদম ভয় ধরে যায়।— বাইরেগে এখন ওদের ভারী খারাপ সময় চলেছে। তাই গতবার আসতে না পারলেও এবার এসেছিল বাসুবাটীর জাতে। পীর বাবার দোয়া মাঙ্গতে। সারা রাত মেলাতেই কাটিয়েছে। রামিয়া জাবেদা দুজনে একটু তফাতে গিয়ে নেচেছে কুঁদেছে। কিছু কামিয়ে নিয়েছে। যশোদা ঠায় সারা রাতটাই প্রায় কত্তামার পাশাপাশি পীরের দরগায় বসে থেকে দোয়া মেঙ্গেছে। মাঝে একবার চোখের জলও ফেলেছে—হে বাবা পাগলা পীর, তুমহার দোষা মাঙ্গি বাবা, হে বাবা পাগলা পীর.. । কাল সারা রাত নিচাল উপোস দিয়েছে। তার ওপর শেষ রাতটা খুপরীতে জায়গা না পেয়ে ফাঁকা মাঠেই কাটিয়েছে। মাথার ওপর হিম পড়ে মাথাটা ভারী হয়ে আছে।

সে সবেরই জেরে আজ সকালে এই বাবার সময় ট্রেনের মধ্যেই যশোদার শরীরটা কেমন যেন দুর্বল ঠেকে। ঝিম মারা অবস্থা। শরীরের এরকমটা অবস্থাতে যশোদার মাঝে মধ্যেই যেটা ঘটে আজকে এই মুহূর্তে সেটাই ঘটল। উপলক্ষ থাকে যাহোক একটা। যেমন কোন কোন বাড়িতে গিয়ে, যশোদার হঠাৎ হঠাৎই মনে হয়, বাড়িটা যেন তার কতদিনের চেনা। হাসি-খুশি গিন্নীমাকে ওর কেমন যেন মা বলে ডাকতে ইচ্ছে যায়। হাই মা, মারে আমার, বলে ছুটে গিয়ে কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে দেয়—এরকমটা। যশোদার বয়েসী যখন কোন তরুণী বউ কি যুবতী মা বলে গিন্নীমার পাশে এসে দাঁড়ায় তখন তাকে দেখতে দেখতে যশোদার মাথাটা ঝিম ধরে বুকের মধ্যে মোচড় লাগে। গলায় কি একটা দলা পাকায়। কয়েক মুহূর্ত পরে হলেই ওর মাথাটা হালকা হয়ে যায়। ও তখন চরকি পাক খায়। রামিয়াদের থেকে বেশী হুল্লোড়বাজিতে মেতে ওঠে। কি— কখনও কখনও চ্যাংড়া ছেলে ছোকরার দল কি নিঘিন্নে বুড়ো ভামদের দল রাস্তায় ঘাটে পেছনে লাগলে। ও ব্যাপারটা হরবখত সহ্যই করতে হয় যশোদাদেব। সহ্যও তো হয়ে গেছে। গায়ে মাখে না ওসব। কিন্তু কোথাও কোথাও বাজে লোকদের দলভারি থাকলে যা তা কাণ্ড! শাড়ির আঁচল ধরে পেছন থেকে জোর-টান দেবে। একেবারে সদ্য ভৈরবী কাঁচা খিস্তির ফোয়ারা ছোটাবে.. এইসব। এরকমটা মাত্রাছাড়া কিছু হলেই যশোদার শরীরটা ঝিম মেরে যায়। ঐ অসুখটা ভর করে। প্রথমটা প্রচণ্ড দুঃখ। তারপরই পুরোপুরি স্বাভাবিক ফুর্তি। যশোদা তখন পাগলী বনে যায়। রামিয়াদের থেকেও অনেক অনেক বেশি যা তা করে। যশোদা নাচে। ঠমক দেয়। বহুত উল্টো-পাল্টা করে। তার কথা, নাচ, ভাব-ভঙ্গিমার নোংরামি এমন একটা চরম পর্যায়ে চলে যায় যে, পেছনে লাগা লোকগুলোও পর্যন্ত ভড়কে যায় দু-একজন কানেও আঙুল দেয়। শেষতক ওর নিজস্ব বাংলা-হিন্দী-উর্দুর মিকসচার বোলিতে তোড়ে গালি-গালাজ ছিটিয়ে দেয়। এই সময় যদি কেউ খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে তো দেখবে— যশোদার বদর্য মুখটায় কি রকমটা বিস্ময়-করভাবে একই সঙ্গে যন্ত্রণা ও হিংস্রতা মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়ে খেলা করে বেড়ায়।— অসুখটার এরকমটা সব ধরন-ধারণ।

—যাই হোক্‌গে, ট্রেনের কামরার মধ্যে এই মুহূর্তে অসুখটা এসে যশোদাকে আশ্রয় করল।

উপলক্ষটা হল গিয়ে—

যশোদা যে সিটটায় বসেছিল তার উল্টোদিকেই ওর মুখোমুখি একটা বৌ-মেয়েমানুষ বসেছিল।

প্রথমটা বেশ কিছুক্ষণ মানুষজন যেমনটা ওদের দেখে তেমনিভাবেই কামরা শুদ্ধ লোকগুলো হা-কত্তোর মতো ওদের দেখছিল। মোটা দাগের চাহনিতে ওদের জরিপ করছিল। নিঃশব্দ খ্যাক খ্যাক হাসিতে মুখ ভাসিয়ে। কারো কারো হাসি নিঃশব্দতার বেড়া ভেঙ্গে ধ্বনি তরঙ্গে পরিণতও হচ্ছিল। যশোদাদেরও যে মানুষের মন আছে, সে মনে লজ্জা ঘেন্না সবই পুরোপুরি না হোক অনেকখানিই বর্তমান— এটা ভুলে গেলে যতটা মোটা দাগের টিপ্পনী কাটা সম্ভব কারো পক্ষে—দু-একজন সে ধরনের টিপ্পনীও ছুঁড়ে মেরেছিল যশোদাদের লক্ষ্য করে। রামিয়া জাবেদা তাতে হয়ত ফুর্তি পেয়েছে। যশোদার কিন্তু রীতিমতই অস্বস্তিবোধ হয়েছিল। এসময়টা ও জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। সেখান থেকে মুখ ফেরাতে গিয়েই যশোদার নজরে পড়েছিল বৌ-মেয়েমানুষটা। কচি বয়েস। খুবসুরত চোখ-মুখ। বৌটার কোলে একটা বাচ্চা। মায়ের মতোই সুন্দর। আধো-ঘুমে আছে। ঠোঁট দুটো মাঝে মাঝে নড়ছে। মা-ষষ্ঠীর সঙ্গে বোধহয় কথা বলছিল। বৌটা ওর দিকেই তাকিয়েছিল ঈষৎ-ঘোমটার আড়াল থেকে। যশোদার আপাদমস্তক জুড়ে ওর নবম কোতূহলী দৃষ্টি বুলিয়ে যাচ্ছিল। যশোদার চোখ তার চোখে পড়তেই এবং চোখাচোখি হতেই বৌ-মেয়ে-মানুষটা লজ্জা পেয়ে গেল। কেন জানে না যশোদা নিজেও। ঠিক তখনই সেই স্বপ্নটা ওর বাইরের দৃষ্টিতে শূন্যগর্ভতা এনে দিল। স্বপ্নটা ও এই চার-পাঁচ বছর আগেও দেখত।—অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম হত না। শরীরটা কিরকম একটা জ্বালায় বিছানার ওপর ছটফট করত। তারপর সে জ্বালাটা একটু ঠাণ্ডা মেরে গেলেই যশোদা স্বপ্নটা দেখতে পেত। জেগে জেগেই।—সদ্য যশোদার বিয়ে হয়েছে। নতুন কনে-বৌ, মরদের পাশাপাশি কোথায় যেন যাচ্ছে। আধ-ঘোমটার আড়ালে তার লাজুক মুখ। কোন একটা ফাঁকা রাস্তায় লোকজন নেই দেখে মরদ তার হাত ধরল। কনে-বৌয়ের নরম-নরম শরীর কি একটা আবেশে অবশ। সুখের চোখানি খেলা করে যায় সর্বাঙ্গ জুড়ে। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই যশোদার কোল জুড়ে বাচ্চা আসে হামদা-গোবদা অ্যাতটুকুনটা তার শরীরটা...

হঠাৎ যশোদার স্বপ্নের সুতোটায় টান পড়ে। ছিঁড়ে যায়। বাচ্চাটা জেগে উঠেছে। কাঁদছে। বৌটা কান্না থামাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। বুকের আঁচলটা একটু সরিয়ে বাচ্চাকে দুধ খাওয়ায়। যশোদার বুকে শির-শিরানি। বাচ্চাটা দুধ খেতে খেতে মাঝে দ্যাখে। তারপরই বুক থেকে মুখ সরিয়ে হেসে ওঠে। ফোকলা মুখে একমুখ দ্যাখন-দার হাসি। শিরশিরানি ভাবটা এবার যশোদার সারা শরীরটা জুড়ে খেলা করে যায়। —বাচ্চাটাকে ওর কোলে নিতে ইচ্ছে করল। নিয়ে, ওর নরম খুদে শরীরটা চটকাতে আর হামা দিয়ে বুকভরে ওর মুখের দুধ-গন্ধের নিশ্বাস নিতে। —যশোদার কি হুঁস জ্ঞান হারিয়ে ফেলল? নইলে ও ওরকমটা, বেমালুম বাচ্চাটার দিকে ওর কালো কালো হাত দুটো কেন বাড়িয়ে দিল? চোখে ওরকমটা একরাশ খিদে নিয়ে?

বাচ্চাটার এবার ওর দিকে চোখ পড়ে। এমনিতেই যশোদার মুখে কোমলতার পোঁচটা খুবই কম। হনু ওঠা ঈষৎ পুরুষালি মুখ। তার ওপর চড়া রঙ করা। সব মিলিয়ে কুশ্রী। কাল আবার সারাটা রাত জেগেই কাটিয়েছে। ঘুম হয়নি। ওর কোটরাগত চোখ দুটো আরও ঢুকে গ্যাছে। সবমিলিয়ে যশোদার মুখ এখন বীভৎস। সেই বীভৎস মুখটা দেখেই বাচ্চাটা ভয় পেয়ে জোরে কেঁদে উঠে মাকে বেশী করে আঁকড়ে ধরল। মায়ের চোখে তখন ঘেন্না ও ভয়—দুটোই। যশোদার দিকে এক ঝলক গরম চাহনি ছুঁড়ে মেরেই বৌটা বাচ্চাটাকে আঁচল-ঢাকা করল।

ঠিক এই মুহূর্তেই যশোদার মাথায় অসুখটা এসে ভর করল। মাথাটায় ঝিম ধরে ছিল আগে থেকেই। এবার বুকের মধ্যে মোচড় লাগল। গলায় কি একটা দলা পাকিয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরেই অকারণ সেই ফুর্তির তোড়। যা যশোদার সব দুঃখ-কষ্টের জঞ্জালকে তোড়ে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায়।

যশোদা হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। প্রথম কাউন্ডে হাতে তালি দেয়। মার্কামারা ঢঙে। তারপর ঢোলকটা টেনে নেয়। মেয়েলি হেঁড়ে গলায়, ঈষৎ পুরুষালি ঢঙে গান গেয়ে ওঠে —আরে যে মাস্তানা, মেরে কিতনে সুরত দেখো... তার পরেই ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকে অশ্লীল ভঙ্গিমায়। —কামরা শুদ্ধ প্রথমে থ। তারপর মজা পায়। খ্যাক খ্যাক করে হাসে। বৌটা ভয় পায়। বাচ্চাটা আরও বেশি। ডুকরে কেঁদে ওঠে। যশোদার ফুর্তির তোড় বেড়ে যায়। ও আরও বেশি করে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গান গায়। এবং আরও বেশি করে অশ্লীল ঠমক-ঠামকে নেচে যায়। ভয়াবহ কদর্য হয়ে ওঠে। অশ্লীল থেকে অশ্লীলতর....।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

হাওয়া গাড়ি

।।আঠাশ।।

বাড়ি ফেরার পথে কালু ঘোষ বললো, সকাল সকাল বাড়ি ফিরলে পারো। তাতে ফ্যামিলি লাইফ সুন্দর হয়।

দিলীপ স্টিয়ারিংয়ে বসে পাকা ড্রাইভারের স্টাইলে গাড়ি চালাচ্ছিল। হাত আর পায়ের অর্কেস্ট্রা। খোলা চোখ রাস্তা দেখে যে খবর রেইনকে দেবে—সে-খবর মত রেইন হাত আর পায়ের অর্কেস্ট্রা চালু রাখবে। দিলীপ কোন জবাব দিলো না।

কালু ঘোষ আবার নিজের মত বলতে শুরু করলো। গাড়িটা তখন ভিক্টোরিয়া সেন্ট্রাল অ্যাভিনুতে লাল সিগন্যালের মুখে দাঁড়ালো। আমি যে ভুল করেছিলাম জীবনে—সে ভুল কোরো না দিলীপ। আমি ভেবেছিলাম—আগে প্রতিষ্ঠা হোক— আগে টাকা হোক—তারপর ফ্যামিলি লাইফ। ফলে শেফালীর মা আমার সঙ্গে মানাতে পারলো না।

এবারও দিলীপ কোন জবাব দিলো না। সন্ধের ভিড়ে বাতাসে ইণ্ডিকেটার-এ চাপ দিয়ে মিশন রো ধরে ইউ টি রাই বিল্ডিংয়ের দিকে চললো। বেড বোড ধরে।

ভালো কথা দিলীপ। একটা জিনিস বলাই হয়নি তোমাকে। সেদিন তো বেসমেন্টে আমায় গুডনাইট বলে লিফটে উঠলে—তুমিও ওপরে গ্যাছো—আর অমনি তোমার অ্যামবাসাডর থেকে গালপাট্টা এক ষণ্ডা মত লোক বেরিয়ে এ-গাড়ির সিট, বনেট—সব আতিপাতি করে তুলে তুলে দেখতে লাগলো। আমি তোমায়—দিলীপ—দিলীপ বলে ডাকলুম—তুমি শুনতেই পেলে না। অথচ একটু পেছন ফিরলেই সব দেখতে পেতে। শুনছো?

হুঁ।

লোকটা বোধহয় বেসমেন্টে আগেভাগেই লুকিয়ে ছিলো।

হুঁ।

হুঁ কি? তুমি শুনছোই না দিলীপ।

সব শুনেছি।

তাহলে?

লোকটা বেসমেন্টে ছিলো না—

তবে কোথায় ছিলো?

তোমার মাথায়!

বাবিশ। আমি নিজের চোখে দেখলাম। তোমার পেছন পেছন গেল। লিফট বন্ধ হয়ে যেতে ফিরে এলো।

বেশ তো। সেরকম কেউ হলে নিশ্চয় আবার দেখা হবে।

আমার নিজের চোখে দেখেছি দিলীপ।

তোমার আবার চোখ কোথায়।

সে-কথা আলাদা। কালু ঘোষ এখানে এসে ঝুমে গেল। তার শরীর নিয়ে কথা উঠলেই সে মিইয়ে যায়। শরীর হয়ে ভেসে উঠতে বেশ কষ্ট হয়। চাপ পড়ে কালু ঘোষের ওপর। প্রথমবার কন্যায়ে সাত পেগের পর কালু ঘোষ দিলীপের উল্টোদিকে ফাঁকা চেয়ারে ভেসে উঠেছিলো। তাও টেবিলের ওপরের দিকটায়, বুক থেকে মাথা অব্দি কালু নিজেকে ফুটিয়ে তুলেছিলো। তাতেই তার যথেষ্ট কষ্ট হয়েছিলো। আর দ্বিতীয়বার : সেই তেওড়ে কলাইয়ের ক্ষেতে দিলীপ সন্ধ্যেরাতে উপুড় হয়ে পড়ে গেলে একখানা হাত রেখেছিলো তার পিঠে—দিলীপের কন্ট ফিরিয়ে আনার জন্যে। তাতেই—

কালু ঘোষ নিজের ভেতরেই গজ গজ করছিলো। আমার চোখ নেই? হাত নেই? আমি ফুটে উঠলে তো তোমাদেরই অসুবিধে।

বেসমেন্টে গাড়ি রেখে দিলীপ লিফটে ওঠার মুখে বললো, তেমন কাউকে দেখলে ওপরে উঠে এসো কালুদা।

আমি তো কোনদিন ওপরে যাইনি।

কোন অসুবিধে নেই। ওই যে বোর্ডে নামের পাশে ফ্ল্যাট লেখা আছে। ফ্ল্যাট নম্বরও লেখা আছে। দেখে নিয়ে ওপরে উঠে এসে আমায় ডাকবে। গুড নাইট!

ডোরবেল টিপতে হোল না। আগে খোলা। কি ব্যাপার? রাণী তো এমন অসাবধানী নয়। ভেতরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল দিলীপ। তুমি গান গাইছো?

লজ্জা জিনিসটা অনেকদিন পরে রাণীকে আক্রমণ করলো। খোলা হারমোনিয়মের ওপর গানের খোলা খাতা। খাতাখানা বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালো। কি করবো? বাবর ছেলেটা নাছোড়। গান না গাইলে ঘুমোবে না—

ঘুমিয়েছে?

অনেকক্ষণ। অনেকদিন পরে পুরনো খাতাখানা নেড়েচেড়ে দেখছিলাম।

আমার নাতির ভাগ্যি তার দাদু করে আসে নি!

তুমি কিন্তু গান গাইতে বলতে পারবে না এখন।

এগুলো কোথায় ছিলো এতদিন?

ওই তো তোর খোপের পাশে। পুরনো শিশি বোতল বের করতে গিয়ে—

গান না গাও—একটা সুর বাজাও না রিডে—

রিডগুলো ভালো নেই।

তবু বাজাও না।

তুলে রাখছি—বলে রাণী নিজেই সব তুলে ফেললো।

তাহলে খালি গলায় একটা গান করো।

হাসবে না কিন্তু। বলে গুন গুন করে শুরু করলো রাণী। কিন্তু ধরতাইটা চড়ায় শুরু হওয়ায় দু কলি পরেই রাণীর গলা চিরে গেল। রাণী থামলো। থামতে গিয়ে কাশলো দু-বার। থেমে গিয়ে বললো, কুটু এখনো ফেরেনি।

গ্যাছে কোথাও। ফিরে আসবে নিশ্চয়ই।

রাণী আশা করেছিলো—দিলীপ আরেকটু উতলা হবে। কিন্তু কোথায় কি।

দিলীপ যে একদম নিশ্চিন্ত। কোন গরহিই নেই।

সকালে বেরিয়েছে।

তোমায় বলে গ্যাছে তো?

হ্যাঁ।

তবে চিন্তা কিসের।

বিশ্বনাথদের কী এক কম্পিটিশনে—সঙ্গে সঙ্গে গ্যাছে—

তাহলে তো নিশ্চিন্ত হলাম। জানা থাকল কার সঙ্গে ও গ্যাছে।

আচ্ছা তুমি কি রকম বাবা বল তো? কেন?

একমাত্র ছেলের কোন হদিশ নেই। বাঁচলো কি মরলো তা আমরা জানি না। মেয়েটা ভোরে বেরিয়ে এখনো ফেরেনি। আমি মা হয়ে একা আর কত দুশ্চিন্তা করবো? তোমার কি সংসার করতে একটুও আগ্রহ নেই? এখানে এসে রাণীর গলা শুকিয়ে গেল। আঁচলে চোখ চেপে ধরলো রাণী।

যাকে বলে বিমূঢ়—অফিস ফেরত সেই পোজে দিলীপ বসু তখন তার লার্জ লিভিং রুমের ডাইনিং টেবিলের তিন নম্বর চেয়ারে বসে। সে আস্তে আস্তে বললো, দাঁড়াও। তোমার ছেলের হদিশ পেলে তুমি খুশি হবে?

কোন কথা না বলে রাণী বড় চোখে তাকালো। তার মানে, হ্যাঁ। যদি জেনে থাকো বলোনি কেন এখনো।

দিলীপ তার বউয়ের চোখে এই ভাষাটা দেখেও নিজেকে অনেক কষ্টে বোবা করে রাখলো। তারপর বললো, বিশ্বনাথের সঙ্গে কুটু কোথায়—আমি হয়তো চেষ্টা করলে খুঁজে বের করতে পারি। কিন্তু খুঁজে পেয়ে কি কোন লাভ হবে? তোমার ইচ্ছের মত হাওয়া কি এখন উল্টো দিকে বইছে?

এবার রাণী সত্যি সত্যিই যাকে বলে স্ট্যাচু হয়ে নিজের চোখে জল আনলো। কোন কান্না নেই গলায়। শব্দ নেই। দিলীপ সে-কান্নায় কেন বাধা দিলো না। উঠে দাঁড়িয়ে আগে টেলিফোনের কাছে গেল। সেখানে সারাদিনে যেসব ফোন এসেছে—তাদের নাম আর নম্বর লেখা।

অনেকদিন পরে মেজর জেনারেল বাসবের নম্বর। রাণীর হাতের লেখা। দিলীপ ডায়াল করতেই পেয়ে গেল। আমি দিলীপ—

কোথায় ছিলে এতদিন? আসছো না কেন?

এখনো সময় হয় নি।

আমি কতদিন এ পোজিশন আগলে ফেলে রাখবো?

আর বেশি দেরি হবে না।

সন্ধেবেলা ক্লাবেও তো আসতে পারো দিলীপ।

এইবার যাবো। রাখছি—

রাণীর দিকে ফিরে বললো, মিছিমিছি চিন্তা করে শরীর খারাপ করছো। তোমার ছেলেমেয়েরা ভালোই আছে।

কুটি ভালো আছে?

রাণীর মুখে হাসি দেখে দিলীপ বললো, যতদূর জানি—থাকার তো কথা।

ও দুষ্টু। জেনেশুনে আমার কাছে খবরটা চেপে রেখেছো। বলতে বলতে অনেক দিন পরে রাণী দিলীপের গায়ের কাছে উঠে এলো। জানো, আজ খোকার মাথের ছবি কাগজে ছিলো। দেখে ঠিক চিনেছে—

কি ব্যাপারের ছবি?

এশিয়ান গেমস্ না কিসের জন্য ফরেনে যাচ্ছে। ইণ্ডিয়া গভমেণ্টের কাছে স্পোর্টস কাউন্সিল যাতায়াতের ভাড়া চেয়েছে।

এটা তো একটা সুখবর। কী বোকা মেয়ে। আমরাও তো খানিকটা দিতে পারি।

কোন দরকার নেই। নিজের বাচ্চাকে ফেলে রেখে গেছোমি। একটা পয়সাও আমরা দেবো না। রবি ফিরুক—তারপর আমি ছেলের ফিরে বিয়ে দেব। সেই একই নিঃশ্বাসে রাণী বললো, তুমি খেতে বোসো। আমি খাবারগুলো গরম করে আনছি।

এখন খাবো না। কুটু ফিরুক। সবাই একসঙ্গে খাবো।

অনেকদিন পরে খুব খুশি হোল রাণী। একসঙ্গে সবাই বসবে কি করে? খোকন তো অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে।

দিলীপ জামাকাপড় ছেড়ে এসে বসতেই রাণী নিজে থেকেই গাইতে শুরু করলো। একটা। দুটো। শেষে উঠে গিয়ে ভিজে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে গান ধরলো।

এই। থামো বলছি। তোমায় কি আজ গানে পেলো। ভিজে গায়ে চান্ডাল থেকো না। ভেতরে এসো। একরকম জোর করেই রাণীকে ভেতরে নিয়ে এলো দিলীপ। আজ তোমার কি হয়েছে?

কোন কথা বললো না রাণী। সেরফ কলকল করে হেসে উঠলো।

ঠিক এই সময় ডোরবেল বেজে উঠলো। দিলীপ উঠে গিয়ে খুললো। কুটু ফিরলো। তুমি এসময়? কখন ফিরলে বাবা?

আমারও সেই কৈফিয়ত কুটু। তুমি? এ সময়ে?

ওঃ। একটু দেরি হয়ে গেল। বিশ্বনাথ পৌঁছে দিতে দেরি করলো। ওর স্কুটারে—

এই তুমি রাস্তায় স্কুটারের পেছনে বসে?

না না। কোন ভয় নেই বাবা। ভালো চালায় বিশ্বনাথ। একদম বয়ান্ড নিউ স্কুটার।

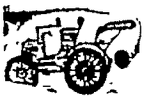

স্কুটার কিনেছে বুঝি।

এবার রাণী এগিয়ে এসে বললো, ভালো আছ করে এখন বিশ্বনাথ। খুব ভাল গাইছে দিলীপ বুঝলো, রাণী তার মেয়েকে এখন প্রোটেকশান দিচ্ছে। কী খায়?

কুটু খতমত খেয়ে বললো, সবরকম খায়। পপ সং।

কোথায় গায়?

আগে বারে গাইতো। হোটেলে। এখন সব জায়গায়। পোস্টারে ওর ছবি দিয়ে বিলিং হয় এখন।

আচ্ছা! তো ভালো কথা। চলো—সবাই খেয়ে নিই।

খেতে বসে অনেক ঠাট্টা ইয়ার্কি হোল কুটুর সঙ্গে। উঠবার আগে দিলীপ কুটুকে বললো—তোর বিশ্বনাথকে একটা চার চাকা কিনতে বল। দু-চাকার স্কুটার খুব বিপজ্জি।

তোমার অ্যামব্যাসাডরটা তো পথে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। ওকে বেচে দাও না। কিনে সারিয়ে নেবে একদম নতুন করে—

এখন আস্তে আস্তে সবই বেচতে হবে কুটু।

রাণী অবাক হয়ে তাকালো। খাওয়া প্রায় শেষ রাণীর।

মানে?

আমার চাকরি নেই আজ থেকে।

আমি সাসপেণ্ড হয়েছি বেফিসে। এখন অর্ধেক মাইনে পাবো কিছুদিন। তারপর—

রাণী বললো, আমি জানতাম। আজ দুপুর থেকেই আমার ডান চোখ লাফাচ্ছে।

কুটু চুপ করে ছিলো। আস্তে বললো, মা সব বলেছে আমায়। অনাথ জেঠু তো তোমায় কত ভালবাসতো। এমন তো ছিলেন না।

দিলীপ চুপ করে থাকলো।

কুটু বললো, অনাথ জেঠুও সাসপেণ্ড হয়েছে?

না। বলে কুটুর অবাক মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললো দিলীপ। রাত হয়ে গেছে। তুমি শুয়ে পড়া গিয়ে।

তুমি কি করবে এখন বাবা?

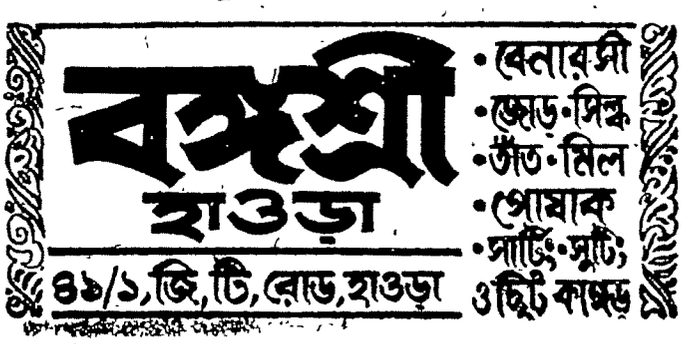

আমার বুদ্ধিতে শক্তিতে যতদূর সম্ভব তাই করবো।

তোমাকে এল্ সাসপেণ্ড করে থাকলে—তোমাকে অপমান করার জন্যেই করেছে।

তুমি শুয়ে পড়ো গিয়ে।

কুটু উঠে যেতে স্বামী-স্ত্রী অনেকদিন পরে মুখোমুখি বসলো। দিলীপ বাণীকে পরিষ্কার বললো, চিঠি যখন আমার হাতে ধরিয়েছে—তখন আমার যা করবার আমি তা করবো। ও কথা থাক্। আজ অনেকদিন পরে তুমি আবার তোমার গানের পুরনো খাতা খুলেছিলে। গান শেখানোর সেই দিন-গুলো ফিরে পাচ্ছিলে?

কার শেখানো?

সেই যে প্রবোধ নামে এক ভদ্রলোক—যে নাকি তোমায় চুমু খাবার চেষ্টা করেছিলো—

খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। একটা বয়সে অনেকের অনেককেই ভালো লাগে। সেটা তো দোষের কিছু নয়।

দোষের বলছি। রাগ করছো কেন? সেই দিনগুলো মনে আসছিলো?

যদি এসেই থাকে—তুমি বা আমি—কেউ তো তা আটকাতে পারবো না। আর—সে বেচারাকে নিয়ে এতদিন পরে এত টানা-টানি কেন? শিয়ালদা লাইন উঠে গিয়ে চাকরিটা নেই। বউ পালিয়েছে—

এতদিন পরে এতসব খবর জানলে কি করে?

বাণী সোজাসুজি তাকালো। দিলীপের চোখে চোখ রেখে বললো, তোমায় বলা হয়নি। একদিন এসেছিলো—

কবে গো?

তোমার তো খেয়াল থাকে না। ক' পেগ খেয়ে কোথায় কাকে কি বলো!

কেন? কি বলেছি—

কোন্ বারে নাকি তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো। বছর দুই আগে। তুমি কার্ড দিয়েছিলে নিশ্চয়। আমাদের কথাও বলে-ছিলে প্রবোধকে—

তাই বুঝি। কোথায়। আমাকে তো বলোনি কবে এসেছিলো।

বলা হয়নি। সেও তো বহু বছর আগের কথা প্রায়। আমি দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছি।

তা করলে কেন?

আমাকে দেখতে এসেছিলো। তাই তো বললো।

আর কি বলেছিলো গো?

আমার কি বলবে। বউ পালিয়েছে। বেল উঠে গেছে। চাকরি নেই। শেষে চা খেতে চেয়েছিলো এক কাপ। বললাম—গ্যাস নেই। ইলেকট্রিক স্টোভে প্লাগ লাগে। বললো, ইলেকট্রিকের বাল্ব জ্বালি—দাও সারিয়ে দিচ্ছি।

দিলে?

নাঃ। দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলাম। ভালো কথা—তোমার একখানা চিঠি এসে পড়ে আছে।

ফ্ল্যাটের তো।

হুঁ। লাস্ট বিমাইণ্ডার বোধহয়। বাণী উঠে গিয়ে চিঠিখানা এনে দিলীপের হাতে দিলো।

চলমাটা এনে দেবে কাইণ্ডলি?

চিঠিখানা পড়ে টেবিলের ওপর নুন-দানী দিয়ে চেপে রাখলো। তারপর বাণীকে বললো, তিন মাসের নোটিশ। কিন্তু এখন অত টাকা কোত্থেকে পাবো?

তাহলে কি হবে?

ঘড়ির সিবিয়াসনেস দেখে হেসে ফেললো দিলীপ। তাহলে বাস্তায় ভেসে যাবো।

এখন তো আর তুমি একা নও। তোমার একটি নাতি আছে।

একটি বউ আছে। এগিয়ে এসে গালে চুমুই খেয়ে বসলো দিলীপ। আজ সন্ধ্যে থেকেই তোমায় ভীষণ সুন্দর দেখাচ্ছে।

রাখো। হয়েছে—

আমরা যদি আগের মত হয়ে যাই তো কেমন হয় বাণী? এ-বাড়ির কিস্তি বয়ে কি হবে আর?

এতগুলো টাকা দিলে যে—

এখন কাউকে ট্রান্সফার করে দিলে সে আমাদের টাকাগুলো ফেরৎ দিয়ে দেবে—

তবু। পাকাপাকি একটা থাকবার জায়গা তো—

কিসের পাকাপাকি? কতদিনের পাকা-পাকি?

তাহলে তো বলতে হয়—সবই অনিত্য।

এতকাল কি আমরা এ-ফ্ল্যাটে বড় হয়েছি? ছেলেমেয়ের, বাবা হয়েছি এ-ফ্ল্যাটে?

তবু ছেলেমেয়ের জন্যেও তো—

কুটু তো বিয়ে হয়ে চলে যাবে। আর রবি—। থেমে গেল দিলীপ।

রবি ফিরে এসে থাকবে।

রবির কি এতটা জায়গা লাগবে?

আমরাও তো থাকবো। কুটু বিয়ের পরে কি আর আসবে না? আর—

আর কি?

রবির আমি ফিরে বিয়ে দেবো। নতুন বউ আনবো কচি দেখে।

সে আর এনেছো। রবি আগে ফিরুক তো।

এই যে বললে ভালো আছে।

হ্যাঁ। বেঁচে আছে। কিন্তু এ কজনের জন্যে এ ফ্ল্যাট না হলেই নয়?

টাকাগুলো তোমার হাতে পড়লে তো আবার গাড়ি কিনে বেড়াবে।

পাগল হয়েছো? আমাকে তো কোর্টে যেতেই হবে। তাছাড়া কুটুর বিয়ে আছে না।

এ টাকা তুমি আর কোর্টে [redacted] না।

আমাকে বাদ দিয়ে তোমার ফ্ল্যাট

এরপর আর কথা এগোলো না। দিলীপ উঠে গিয়ে সেই ভিজে ব্যালকনিতেই দাঁড়ালো। এখান থেকে কলকাতাকে দেখতে বড় সুন্দর। এখন ভিজে অন্ধকারে শহরের ফোলা ফোলা আলো। সেদিকে তাকিয়ে প্রথমেই যা মনে হোল দিলীপের—তা হোল, জীবন কত অল্প দিয়ে শুরু করেছিলাম। আস্তে আস্তে এই বিশ-বাইশ বছরে জীবনের কত জিনিস বেড়ে গেছে। দরকার পড়লে কমানোও যে কঠিন তা আজ সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলো। জীবনে শুরু ছিলো—নিজেকে নিয়ে। এখন কতদূর গড়িয়েছে। টিপ টিপ বৃষ্টি মাথায় নিয়ে সারা শহরটাকে কাবু করে ফেলেছে। দিলীপ অন্ধকারে তাকিয়ে ছিলো। দূরে ইঞ্জিনের বাঁশির আওয়াজ। মাঝেরহাট, কালীঘাট—নয়তো বেসরিজে মালগাড়ি সান্টিং হচ্ছে।

তার মাথার ভেতর একটা বেললাইন পাতা হয়ে গেল। যে-লাইনের পাটি তুলে ফেলা হয়েছে। কাঠের স্লিপারও উধাও। তবু ঘাসের প্যাটার্ন, জায়গায় ঢাল দেখে বোঝা যায়—এখানে একসময় বেললাইন ছিলো। এরকম একটা তুলে-ফেলা লাইনের ছাপ তার মাথার মধ্যে বসে যাচ্ছিলো।

দিলীপ জানে শিয়ালদা লাইনে বড় লাইনের পাটি বসানোর কথা চলছে কয়েক বছর ধরেই। কিন্তু বসানোর নাম নেই। ওদিককার ছোট বেল আগে মার খেতো বাসের হাতে। চণ্ডীতলা স্টেশনে একবার শীতকালের সকালে সিঙ্গাড়া খেয়েছিলো প্রবোধ কি চণ্ডীতলাতেই পোস্টেড্ ছিলো?

কথাটা জানবার জন্যে লিভিংরুমে ঢুকে দিলীপ বাণীকে পেলো না। ঠাকুমা গিয়ে নাতির পাশে শুয়ে পড়েছে।

দিলীপ আবার এসে ব্যালকনিতে দাঁড়ালো। বৃষ্টির টিপ টিপ থেমে নেই। সেই সঙ্গে ভিজে বাতাস। আকাশের সবটুকু কলিবাবান্দা থেকে দেখার উপায় নেই। মেঘ আর ফিনফিনে শীতের ভেতরেও আকাশের তলটা লালচে হয়ে আছে। এখান থেকে সবটা দেখাও যায় না।

দিলীপ শব্দ না করে সদর দরজা খুললো। আলতো করে ভেজিয়ে দিয়ে ওপরের সিঁড়ি ধরলো। ছাদে উঠে আকাশটা বোঝা গেল। বিরাট ছাদ। ডবল চিলেকোঠা। তারার ট্যাংকটা যেন কোন হাসপাতালবাড়ির। দুদিকের দুটো সিঁড়ি দিয়ে এ-ছাদে ওঠা যায়। তাছাড়াও সরু মত একটা চোরা সিঁড়ি আছে। এমারজেনসি স্কেপ। দরকারে দম-

লোক এ-সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে

দিলীপ . জলের ট্যাংকের কাছাকাছি য়ে ভিজে আকাশটা দেখছিলো। হঠাৎ র মনে হোল, ছাদে সে আর একা নয়। রও একজন কেউ আছে। এইমাত্র তার যা পড়েছে জলের ট্যাংকের শাদা দেওয়ালে -কা ছায়া। এত রাতে কে হতে পারে আর কোন ফ্ল্যাট থেকে তো কেউ সবে না। কে হতে পারে ?

একথা ভাবতে ভাবতে তার মনে পড়লো, লুদা তো কার কথা বলেছিলো। যে কিনা ড়ির সিট উল্টে আতিপাতি করে খোঁজে। লুদা হয়তো ঠিকই দেখেছে। বাপ্পিয়ে!

একটু করে সামনে লক্ষ্য রেখে দিলীপ লেকোচার দিকে পিছিয়ে যাচ্ছিলো। একবার সিঁড়ির মুখ পাশে ঠেকলেই ঘুরে ড়ে নাইনথ্ ফ্লোর।

খানিক পিছু হটার পরই দিলীপকে মকে থামতে হোল। প্রায় তার ওপর দিয়েই একজন দশাসই লোক ছুটে গেল। পাঞ্জাবি, রঙ্গু পাজামা—পায়ে নাগরা লোকটার। তার পেছনে এই লিকলিকে এক ছায়া প্রায় াঁপাতে হাঁপাতে চলে গেল। যাবার সময় কালু ঘোষের গলা পেয়ে দিলীপের কাছে ব্যাপারটা খানিক পরিষ্কার হোল।

ওই লোকটার কথাই বলেছিলাম—

আর শোনা গেল না কালু ঘোষের বলা। তখন সে এমারজেন্সি এক্সেপের সরু সিঁড়ি দিয়ে সেই দশাসই লোকটাকে ফলো করছে। দিলীপ ভাববার চেষ্টা করলো, কে এভাবে তার পিছু নিতে পারে ? সে তো কারও পাকা ধানে মই দেয়নি। তবে কি স্বাতীর আগের স্বামী সুধীর ? আমি তো স্বাতীকে বিয়ে করিনি। তবে এরকম লোক লাগানো কেন ?

কিংবা এও তো হতে পারে—

ওই লোকটাও আসলে আর নেই। এক-সময় ছিলো। কালু ঘোষের সঙ্গে এ-পৃথিবীতে ছিলো। কালু ঘোষ তাড়া-তাড়ি জায়গা বদলানোর খবর পায়নি হয়তো আগে। নিজে পটল তোলার পর লোকটা কালু ঘোষের সঙ্গেই তার পুরনো হিসেব পরিষ্কার করতে এসেছে।

তাই বা কি করে হয় ? তাহলে আমার পেছন পেছন ছাদে আসবে কেন ? দিলীপ কিছু বুঝতে না পেরে অন্ধকার এমার-জেন্সি এক্সেপের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো। সরু মত একফালি কাটা সিঁড়ি। ঘুরে ঘুরে নিচে নেমে গেছে। সেই সিঁড়ি অন্ধকারে এখন প্রায় পাতালের পথ। তার শেষদিকে দুপদাপ নেমে যাওয়ার শব্দ।

দিলীপ সেই পাতালের পথ ধরে নামতে লাগলো। টপ ফ্লোর থেকে গ্রাউণ্ড—সে প্রায় গোলোকধাঁধা। দেওয়াল ধরে নামতে নামতে দুবার ডাকলো, কালুদা। ও কালুদা—

তারপর আর তার কিছু মনে নেই। একবার আবছা মত মনে হোল—নিচে এই বড় বাড়িটার পেছন দিকটায় নতুন তৈরি বাগানে দুড়দাড় করে কে ফুলগাছ, চারাগাছ মাড়িয়ে দিচ্ছে।

তারপর সেই বাগানে সব গাছপালা সবুজ হয়ে গেল। ডাঁটো হয়ে গেল। ঋষি আর দিলীপ দুখানা বেতের চেয়ারে মুখো-মুখি বসে। ঋষির মুখে সেই আগেকার হাসি। আস্তে বললো, এই দিলীপ। ডিম-ভাজা খাবি ? কাঁচের প্লেটে ? গরম গরম ?

বানা দুটো।

রেডি আছে! বলে ঋষি বাগানের পাশে কাদের একটা রেডিমেড রান্নাঘর থেকে হাত বাড়িয়ে রেডিমেড দুটো ডিমভাজার প্লেট নিয়ে এলো। গরম গরম খেয়ে নে—

দিলীপ অত তাড়াতাড়ি খেতে পার-ছিলো না।

আচমকা চেঁচিয়ে উঠলো ঋষি। উঃ!

কি হলো ?

বড় একটা কাঁচালংকার কুচি। চিবিয়ে ফেলেছি।

বের করতো দেখি।

ঋষি মুখ থেকে বের করে কাচের প্লেটে রাখলো।

তা দেখেই দিলীপ চেঁচিয়ে উঠলো। আরে! এ তো বন্ধুতর—

বাঃ! এ তো অর্ডিনারি কাঁচালংকা তার একটা বড় কুচি—

বন্ধুতর চিবিয়ে ফেললে ঠিক কাঁচা-লংকার সেনসেসন হয়।

তাই নাকি ? জানতাম না তো। একই রং ? অনেকটা পাম্পার মেটুলির গন্ধ।

একদম এক। তবে বন্ধুতর দেখতে অনেকটা ডুমো ডুমো কাঁচালংকার মত।

সত্যি দিলীপ ? আমি জানতাম না। কিন্তু বন্ধুতরের রং একটু লালচে হয় বোধহয়।

তুই খেয়াল করিসনি ঋষি। চিবিয়ে ফেলেছিস তো—

কিন্তু ডিমভাজার সঙ্গে মিশে গেল কি করে ?

হয়তো ফিজে কাঁচালংকার সঙ্গে একই ট্রে-তে ছিলো। তাই লংকা তুলতে গিয়ে ভুল করে বন্ধুতর কুচি কুচি করে মিশিয়ে ফেলেছে। তারপর কাঁচাতেলে ভাজা। তাই তোর খেয়াল হয়নি ঋষি।

বাপ্পিয়ে! বন্ধুতর নিয়ে কে আর মাথা ঘামায় আজকাল। সবাই যে যার মত জীবন করে যাচ্ছে। এখানে বন্ধুতরের জায়গা কতটুকু! সবাই তো ব্যস্ত।

তবু বোধহয় জিনিসটার দরকার হয়। ধর ঋষি—তুই সব পেয়ে গেলি। তারপর তোর স্যাটিসফ্যাকশন ট্যাংকে একটা লিক বেরোলো। কোন্ পুলটিশ দিয়ে আটকাবি ?

তা ঠিক। ধর দিলীপ— যদি তোর মন জেদ দিয়ে আটকাতে যাই—রেজাল্ট কি হবে ?

আমার কি সবটাই জেদ ঋষি ?

তবে কি দিলীপ ?

কেন ? বন্ধুতর নেই ?

ওঃ! তোর সেই ডুমো লংকা!

দিলীপের ঘাড়ের নিচে কিসের অস্বস্তি লাগলো। একটা বিছে হেঁটে আসছিলো। দিলীপ উঠে বসলো। এটা বোধহয় সিক্সথ্ও কিংবা ফোর্থ ফ্লোর হবে। পাতাল সিঁড়ির শুরু থেকে সকাল বেলার আলো তখন ওপরে উঠে আসছিলো। আজ কোন বৃষ্টি নেই বোধহয়। কেন না আলোটা বেশ চকচকে।

(চলবে)

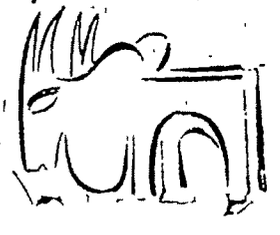

ফার্স্ট বুকের প্যারীচরণ

কাজল মিত্র

এখনো আবছা আবছা মনে পড়ে সেদিনের কথা। আমরা ভাইবোনেরা সন্ধ্যে হলেই ঠাকুমার কাছে আদর পেতে গোল হয়ে বসতাম পড়ার জন্যে। গলির গ্যাসের আলো সামনের বাড়ির দেওয়ালে এসে পড়ত। বোজ দেখতাম সেখানে কতকগুলো টিকটিকি লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে পোকা ধরে খাচ্ছে। ঠাকুমার কাছে আমরা পড়তাম —ওয়ান মন্‌কি আই মেট্ এ লেম ম্যান ইন এ লেন কোয়াইট্ মাই ফার্ম....। প্যারীচরণ সরকারের ফার্স্ট বুক অফ রীডিং। নীল মলাটওয়ালা লম্বা বই। ওপরে একটা পাখির ছবি। পাশে ছোট্ট করে লেখা সিলভার প্যারট। বইএর ভেতরে প্রথমেই বিদ্যাসাগরের ছবি। প্যারীচরণের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন বিদ্যাসাগর। সবচেয়ে ভাল লাগত ঘোড়ার পাতা। দীপু খুব দুষ্টু ছিল। কিছুতেই পড়তে চাইত না। ঠাকুমা তখন রাগ করে বলতেন—লেখাপড়া না শিখলে ভিক্ষে করতে হবে। তোদের বীরু জ্যেঠা ঘোড়ার পাতা অব্দি বিদ্যে নিয়ে রেলের চাকরী পেয়েছিল। শেষপর্যন্ত বড়বাবু হয়েছিল। অন্তত ওটুকুও শিখে রাখ।

প্যারীচরণের ফার্স্ট বুক এখন স্কুলের পাঠ্য তালিকা থেকে নির্বাচিত। বাজারে বহু খোঁজাখুঁজির পর যে বইটা পাওয়া যায় তার সঙ্গে আকারে আগের বই-এর মিল নেই। সেই নীল মলাট নেই। চেহারাটাও ছোট হয়ে গেছে। আজকের ছেলে-মেয়েদের কাছে ফার্স্টবুকের নাম, অজানা। সেই সঙ্গে তার লেখক আজন্ম শিক্ষাব্রতী প্যারীচরণও হারিয়ে গেছেন বিস্মৃতির অতলে। অথচ এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে প্যারীচরণ সরকারই উজ্জ্বলতম নাম। তিনি ছিলেন প্রথম থেকেই শিক্ষক। তাই সহজতম উপায়ে ইংরাজী শেখানোর জন্যে তিনি দীর্ঘ পরিশ্রমে লিখেছিলেন ফার্স্ট বুক অফ রীডিং। শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে এ বইয়ের পেছনে আছে গবেষকের অক্লান্ত সাধনা। সেই সাধনার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রতিটি পরিচ্ছেদের আগে তিনি শিক্ষকদের জন্যে যে সব অমূল্য নির্দেশ লিখে রেখে গেছেন সেইসব নির্দেশে। ফার্স্ট বুক এমন একখানা বই যার আদ্যন্ত অধ্যয়ন যে কোনও ছাত্রের ইংরাজী শিক্ষার পক্ষে যথেষ্ট।

প্যারীচরণের জন্ম ১৮২৩ সালের ২৩ জানুয়ারী চোরবাগানের মামার বাড়িতে। সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বীরেশ্বর দাস হুগলী জেলার তোড়া-আটপুর গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেন। এঁদের আদি বাড়ি ছিল কৃষ্ণনগরে। বীরেশ্বর ছিলেন মুসলমান শাসকদের আমলে তহসীলদার। পরে বাংলার নবাবের আমলেও সেই কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর গণিতে পারদর্শিতা আর জমিদারীর কাজে দক্ষতায় সন্তুষ্ট হয়ে নবাব তাঁকে সরকার খেতাব দেন। সেই থেকেই বীরেশ্বরের উত্তর পুরুষেরা সরকার পদবী ব্যবহার করে আসছেন। বীরেশ্বরের নাতি শিবরাম ১৭৯১ সালে কলকাতায় এসে চোরবাগানে বাড়ি তৈরী করেন। ১৭৯৭ সালে বীরেশ্বর দুই ছেলে তারিণীচরণ ও ভৈরবচন্দ্রকে রেখে মারা যান।

তারিণীচরণ ও ভৈরবচন্দ্র ইংরাজী শিখেছিলেন। সেই শিক্ষার ফলেই তাঁরা কলকাতার বই-এর ব্যবসায়ী থ্যাকার কোম্পানিতে চাকরী পান। কর্মকুশলতার জন্য তারিণীচরণকে ঐ কোম্পানির বেনিয়ানপদে নিযুক্ত করা হয়। ভৈরবচন্দ্র নিজের শ্রম আর অধ্যবসায় দিয়ে ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। চোরবাগানের গোকুল চন্দ্র বসুর একমাত্র নাতনী দয়াময়ীর সঙ্গে ভৈরবচন্দ্রের বিয়ে হয়। দান-ধ্যান আর পরার্থে স্বার্থত্যাগ ছিল ভৈরবচন্দ্রের আদর্শ। ১৮৩৮ সালে মাত্র ৪৯ বছর বয়সে ভৈরবচন্দ্রের মৃত্যু হয়। তাঁর ৩য় পুত্র প্যারীচরণের বয়স তখন পনেরো বছর।

প্যারীচরণের প্রাথমিক শিক্ষা বাড়িতেই শুরু হয় দাদা পার্বতীচরণ আর মায়ের কাছে। ভৈরবচন্দ্রের বিত্ত বলতে তেমন কিছুই ছিল না। তাই প্যারীচরণকে প্রথম জীবনে বেশ কষ্ট করেই লেখাপড়া শিখতে হয়। বাবার মৃত্যুর বছরেই তিনি জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় পাশ করে মাসিক আট টাকা বৃত্তি লাভ করেন। এর দু বছর পরে সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষাতেও তিনি মাসিক চল্লিশ টাকা বৃত্তি পেতে থাকেন। তখনকার দিনে লেখাপড়ার খরচ চালানোর পক্ষে এই টাকা যথেষ্ট ছিল। ভৈরবচন্দ্রের মৃত্যুর পরেই তারিণীচরণ ভাই-এর ছেলেদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন। ঠাকুর্দার বাড়ির অংশ নিয়ে এক নিদারুণ বিশ্বাসঘাতকতা করেন তিনি প্যারীচরণদের সঙ্গে। বাড়ি নিয়ে মামলা হয়। মামলায় প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্যারীচরণদের পক্ষ সমর্থন করেন।

১৮১৮ সালে ডেভিড হেয়ার রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুর ও স্কুল বুক সোসাইটির অন্যান্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদেরা কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। হেয়ার স্কুল ছিল এইসব স্কুলের মধ্যে একটি। হেয়ার সাহেব নিজে এই স্কুল পরিচালনা করতেন। তখনকার দিনে বাঙ্গালীর ছেলেরা ইংরাজী শেখার আশায় হেয়ার সাহেবের পাল্কির সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে ছুটতে বলত 'মী, পুওর বয়, স্যার।' হেয়ার সাহেবের স্কুলে [redacted] ওয়াটা একটা বিরাট গর্বের ছিল। প্যারীচরণ ছিলেন স্কুলের ছাত্র। প্রথম দিকে স্ক [redacted] ছিল ঝামাপুকুর-কর্ণওয়ালিশ স্ট্রী মোড়ে সিন্ধেশ্বরী মন্দিরের কাছে। ছিল স্কুল সোসাইটির স্কুল। ১৮৪ সালে এর নাম হয় কলুটোল [redacted] স্কুল। সবশেষে প্যারীচরণের [redacted] ওরাই শিক্ষক হেয়ার সাহেবের [redacted] অনুসারে এর নাম হয় হেয়ার স্কুল। প্যারীচরণ এই স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করে চলে যান বড়ভাই পার্বতীচরণের কাছে। সেখানে গিয়ে ঢাক স্কুলে ভর্তি হন। পার্বতীচরণ ছিলেন সেখানকার হেড মাস্টার। এর বছর ঢাকা স্কুলে পড়ার পর প্যারীচরণ ফিরে এসে আবার হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন। সেখানে তিন বছর [redacted] হেয়ার স্কুলে প্যারীচরণ ছিলেন [redacted] ছাত্রদের একজন। এখানেই হেয়ার সাহেবের সংস্পর্শে এসে শিক্ষা সম্পর্কে প্যারীচরণের যে দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে সেই দৃষ্টিভঙ্গীই পরবর্তীকালে তাঁকে বিশিষ্টতম শিক্ষাবিদ হতে সাহায্য করেছিল। হেয়ার সাহেব নিজের টাকা দিয়ে গরীব ছেলেদের বই কিনে দিতেন। তাদের স্কুলের মাইনে দিয়ে দিতেন। এমন কতদিন গেছে যেদিন তিনি নিজের খাবার থেকে গরীব ছাত্রদের খাইয়ে নিজে অভুক্ত থেকেছেন।

১৮৩৮ সালে জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় পাশ করে প্যারীচরণ হিন্দু কলেজে ভর্তি হলেন। হিন্দু কলেজে তখন যেমন মেধাবী ছাত্রের ভীড় ছিল তেমনি নামকরা অধ্যাপকও ছিলেন অনেক। ফরাসী গণিতজ্ঞ ভি এল রো ছিলেন গণিতের অধ্যাপক। ক্যা [redacted] ভি এল রিচার্ডসন ছিলেন ইংরাজীর অধ্যাপক। হিন্দু কলেজে প্যারীচরণের সহপাঠী ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ছেলে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর। ইনিই বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রথম ব্যারিস্টার হয়েছিলেন। এ ছাড়া ছিলেন গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা, আনন্দকৃষ্ণ বসু, রাজনারায়ণ বসু, মাধবচন্দ্র বসু প্রমুখেরা। ১৮৩৯-৪০ সালের বাংলার কাউন্সিল অফ এডুকেশনের রিপোর্টে দেখা যায় হিন্দু কলেজের থার্ড ক্লাশের পরীক্ষায় প্যারীচরণকে গণিতে শ্রেষ্ঠ ছাত্রের পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। এ ছাড়া ঐ রিপোর্টে আরও দেখা যায়, অন্যান্য সমস্ত বিষয়েই প্যারীচরণ শ্রেষ্ঠ ছাত্রের পুরস্কার লাভ করেছিলেন। হিন্দু কলেজের তদানীন্তন আর ছাত্রদের নানাভাবে পরীক্ষা করতেন, টমাস ব্যারিংটন মেকলে, ফ্রেডারিক মিলেট, অ্যাডভোকেট জেনারেল জে এডোয়ার্ড লায়াল, বাংলা সরকারের সচিব এফ জে হ্যালিডে, এডুকেশন

[redacted]লের সেক্রেটারী এফ জে মোয়াট [redacted]শিষ্ট শিক্ষাবিদ্।

স্কুলের ক্লাসে ঘুমিয়ে পড়া [redacted]চরণের একটা বদভ্যাস ছিল। এক-সুপ্রীম কোর্টের বিচারক স্যার [redacted]য়ার্ড রযান হিন্দু কলেজ পরি-নে আসেন। প্যারীচরণদের ক্লাসে তিনি দেখলেন অধ্যাপক রীজ [redacted]দের একটা কঠিন অংক বোঝাচ্-। ছেলেরা আগ্রহে সেই অংকটা ঝবার চেষ্টা করছে। কিন্তু শ্চর্যের বিষয়—প্যারীচরণ ডেস্কে [redacted]া রেখে বেমালুম ঘুমোচ্ছেন। স্যার [redacted]ান অধ্যাপক রীজকে বললেন. ঐ লেট কিন্তু ঘুমুচ্ছে।

অধ্যাপক রীজ একটু হেসে বললেন, [redacted]ঘুমে আমার কোনও চিন্তা নেই। [redacted]মোয়েও সব শুনেছে। এরপর [redacted] প্যারীচরণকে ডেকে বললেন, [redacted]ম্মী তুমি বোর্ডের অংকটা করে ও।'

প্যারীচরণ হাই তুলতে তুলতে [redacted]লা ব্ল্যাক বোর্ডের সামনে গিয়ে, কটুও চিন্তা না করে অংকটা করে বলেন।

১৮৪২ সালে প্যারীচরণ দ্বিতীয়বার [redacted]নিয়র স্কলারশিপ পান। এই স্কলার-শপের পরিমাণ ছিল মাসিক চল্লিশ [redacted]কা। সে বছর এই পরীক্ষায় ষষ্ঠ স্থান [redacted]লাভ করেছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় আর দ্বিতীয় শ্রেণী (এখনকার নবম) থেকে ইংরাজী সাহিত্যে মধুসূদন দত্ত (তখনো মাইকেল নন) ৫৩ নম্বরের মধ্যে ৩০ নম্বর পেয়েছিলেন। প্যারী-চরণ অবশ্য ইংরাজীতে পেয়েছিলেন ৫০এ. ৪৭। পরের বছরেও প্যারীচরণ প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। পর-পর তিন বছর প্যারীচরণ প্রথম স্থান অধিকার করে হিন্দু কলেজে এক রেকর্ড স্থাপন করে গেছেন। ১৮৪১-৪২এ প্রথম শ্রেণীতে (এখনকার দশম) পড়ার সময় ইংরাজী রচনা লেখায় প্যারীচরণ শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পান। পরের বছরেও আবার রচনায় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করেন।

১৮৪২ সালে হাটখোলার শিবনারায়ণ বসুর মেয়ের সঙ্গে প্যারীচরণের বিয়ে হয়। এর এক বছর পরেই পার্বতীচরণ মারা যান। প্যারীচরণকে এবার চাকরীর সন্ধান করতে হয়। কলেজের পড়াশুনো ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে হেডমাষ্টারের পদে পার্বতীচরণ নিযুক্ত ছিলেন। প্যারীচরণ সেই পদের জন্য আবেদন করলেন। কিন্তু বন্ধু ক্ষেত্রমোহন চ্যাটার্জি সেই পদের

ফান্ট বুকের একটি পাতা

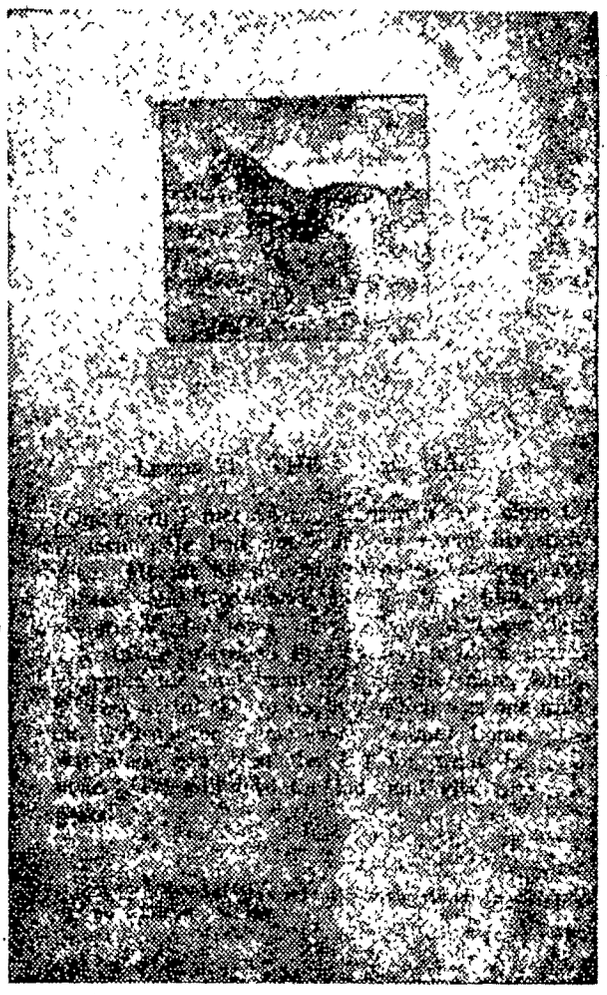

পার্থী ছিলেন বলে তাঁকে চাকরীটি দিয়ে প্যারীচরণ ঐ স্কুলেই দ্বিতীয় শিক্ষকের চাকরী নিলেন। ১৮৪৫ সালের ডিসেম্বরে প্যারীচরণ বারাসত গভর্ণমেণ্ট স্কুলের হেডমাষ্টারের চাকরী নিয়ে বারাসত চলে যান। মাহিনে ছিল দেড়শো টাকা। বারাসতের ম্যাজি-ষ্ট্রেট সি বি টেভর এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন। প্যারীচরণই ছিলেন প্রথম হেডমাষ্টার। তিন বছর পরে স্কুলের নতুন বাড়ি তৈরী হল। প্যারীচরণের অক্লান্ত পরিশ্রমে বারা-সত স্কুল ক্রমশ বাংলাদেশের একটা নামকরা স্কুল হয়ে উঠল। প্রতি বছর এখানকার ছাত্ররা জুনিয়র স্কলারশিপ পেতে লাগল।

প্যারীচরণ বারাসতে বাংলার প্রথম কৃষি বিদ্যালয়, প্রথম মেয়েদের স্কুল আর ছাত্রদের হোষ্টেল স্থাপন করে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুলে ধরলেন। এ কাজে তাঁকে যাঁরা সাহায্য করে-ছিলেন তাঁরা হলেন কালীকৃষ্ণ মিত্র আর তাঁর দাদা নবীনকৃষ্ণ মিত্র।

বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষার প্রবর্তক ডিংকেওয়াটার বেথুনের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে ১৮৫১ সালের ১১ ডিসেম্বর কলকাতায় বীটন সোসাইটি স্থাপিত হয়। মেডিক্যাল কলেজ হল-এ মাসে একবার বীটন সোসাইটির সভা হত। প্যারীচরণ বারাসতে বীটন সোসাইটির শাখা স্থাপন করেন।

বারাসত স্কুলে পাঁচটি ক্লাশ ছিল। জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষার জন্যে পাঁচ বছর পড়তে হত। কিন্তু প্যারীচরণ ভেবে দেখলেন, উপযুক্ত শিক্ষক থাকলে চার বছরের কম সময়ে এই পরীক্ষার জন্যে ছাত্রদের তৈরী করে দেওয়া যায়। কিন্তু ছোট ছেলেদের উপযুক্ত বই তখন ছিল না। প্যারী-চরণ তখন তাঁর ফাষ্ট বুক অফ রীডিং লেখার কাজ শুরু করলেন। অক্লান্ত পরিশ্রমে রাতের পর রাত জেগে ফাষ্ট বুক লেখা শেষ করে বারাসত স্কুলে পরীক্ষামূলক ক্লাশ খুলে তিনি নিজে পড়াতে শুরু করলেন সেই বই। সঙ্গে সঙ্গে লিখলেন। সেকেণ্ড বুক অফ রীডিং। ১৮৪৪-এর ১ আগষ্ট তিনি কলকাতা কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে বদলি

হয়ে আসেন। কিন্তু ততদিনে ফার্স্ট বুক ছেলেদের মন কেড়ে নিয়েছে।

হেয়ার স্কুলে প্যারীচরণ ৯ বছর ছিলেন। এই ৯ বছরে তিনি এখানকার শিক্ষাপদ্ধতিতে একটা বিপ্লবের সৃষ্টি করেন। হেয়ার স্কুল হিন্দু কলেজকে ছাড়িয়ে বাংলাদেশের সেরা স্কুল হিসেবে খ্যাতি লাভ করল। আর এই কৃতিত্বের সবটুকুই প্রাপ্য প্যারীচরণের। স্কুলের সুনাম বজায় রাখার জন্যে ছাত্রদের বেতন তিন টাকা থেকে বাড়িয়ে চার টাকা করা হয়। এন্ট্রান্স পরীক্ষায় হেয়ার স্কুলের ছেলেরা প্রথম দিকের সব ক'টা স্থান দখল করে নিল। প্যারীচরণের কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে তদানীন্তন শিক্ষা অধিকর্তা অ্যাডাম্‌সনের প্রস্তাব অনুযায়ী লেফ্‌টেনান্ট গভর্ণর স্যার জন পিটার গ্রান্ট তাঁকে ৫০০ টাকা পুরস্কার দিলেন। প্যারীচরণ হেয়ার স্কুলে আসার এক বছর আগেই সেখানে ফার্স্ট বুক অফ রীডিং পড়ানো শুরু হয়েছিল।

১৮৫৬ সালে স্কুল উন্নয়ন ও পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের জন্যে সরকার একটি কমিটি নিয়োগ করেন। কমিটির রিপোর্টে প্যারীচরণের ফার্স্ট বুকের শিক্ষাদান পদ্ধতির কার্যকারিতা সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এই বইয়ে নতুন শিক্ষকদের জন্যে প্যারীচরণ যে অমূল্য নির্দেশ দিয়েছিলেন তা নিয়ে সরকারের সঙ্গে কমিটির আলোচনা হয়। সেই অনুযায়ী কমিটি প্যারীচরণকে পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে বলেন। প্যারীচরণের বই শুধু বাংলাদেশেই নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গার স্কুলেও পড়ানো শুরু হয়।

প্যারীচরণের ফার্স্টবুক ও অন্যান্য বই স্কুলপাঠ্য হিসেবে গৃহীত হওয়ার প্রায় কুড়ি বছর পরে ১৮৭৩ সালে বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক স্কুলের ছেলেদের বইএর উপযুক্ততা বিচার করে দেখার নির্দেশ দেন। বাংলাদেশে একটি স্কুল বুক রিভিশন কমিটি গঠিত হয়। কমিটির বিশিষ্ট সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সি এইচ ট্যানি, এস ডাইসন, আর জার্ডিন, ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, স্যার রোপার লেথব্রীজ প্রমুখ ব্যক্তিরা। ১৮৭৪ সালের ২ মার্চ কমিটি তদানীন্তন শিক্ষা অধিকর্তা মিঃ অ্যাটকিনসনের কাছে যে রিপোর্ট দেন তাতে নীচু ক্লাসের জন্যে সেরা বই হিসেবে তাঁরা প্যারীচরণের ফার্স্ট বুকের নামই উল্লেখ করেন। দুর্ভাগ্যের কথা, এর পরের বছরেই প্যারীচরণ লোকান্তরিত হন। এর পর থেকে স্যার রোপার লেথব্রীজ ফার্স্ট বুক প্রকাশ করতে থাকেন।

১৮৬৩ সালে প্যারীচরণ চোরবাগানে মেয়েদের একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে উৎসর্গীকৃত প্রাণ প্যারীচরণ স্কুলের বাইরেও দৈনিক আট-দশজন ছাত্রকে তাঁর বাড়ীতে পড়াতেন। বলা বাহুল্য বিনা পারিশ্রমিকেই তিনি পড়াতেন। ছেলেদের মারধর করাকে তিনি পাপ বলে মনে করতেন। তাঁর পড়ানোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল বানান সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি। বানান লেখানোর জন্যে তিনি ফার্স্ট বুক অফ রীডিংএ অক্লান্ত পরিশ্রম করে যে নির্দেশ রেখে গেছেন তা অতুলনীয়। বর্ণমালার পরিচয় সম্পর্কে প্রথমেই তিনি ছবির মাধ্যমে রেখা, বৃত্ত আর অর্ধবৃত্তের যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন তা এক বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত। এর পর বিভিন্ন অক্ষর গঠনে সেই সব রেখা, বৃত্ত, অর্ধবৃত্ত প্রভৃতির ব্যবহার কী ভাবে হয় তাও তিনি দেখিয়ে গেছেন। কৃষ্ণদাস পাল তাঁর হিন্দু প্যাট্রিয়টে প্যারীচরণকে তাই, প্রিন্স অব ইণ্ডিয়ান টীচার্স' ও 'আর্নল্ড অফ দি ইস্ট' বলে বর্ণনা করেছিলেন।

বীডন স্ট্রীটের নতুন বাড়িতে আসার বছর দুয়েক আগে প্যারীচরণের বড় ছেলে মহেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় মাত্র আঠারো বছর বয়সে। প্ল্যানচেট করতে গিয়ে মহেন্দ্রনাথ একদিন হঠাৎ অচৈতন্য হয়ে যান। এর পরেই প্রবল জ্বর আসে। মহেন্দ্রনাথ অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রায় এক বছর চিকিৎসা চলে। তখনকার দিনের নামকরা চিকিৎসক ডাঃ বেরিগ্‌নি বহু চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারেন নি মহেন্দ্রনাথকে।

১৮৭২ সালে প্যারীচরণের মেজো ছেলে যোগেন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে যান।

ছোট ছেলে শৈলেন্দ্রনাথের বয়স মাত্র তিন বছর। এর পরই পর অসুস্থ হতে থাকেন। প্রথমে ডা বিটিস্, তারপর কার্বাংকল। সেই থে একটা হাতে পচন শুরু হয়। যন্ত্র শয্যাশায়ী প্যারীচরণের কাছে আসে ইংলণ্ডে যোগেন্দ্রনাথ পরীক্ষ পাশ করতে পারেন নি। রোগে ও মানসিক যন্ত্রণায় বিছানায় শুয়ে দিনগুলো গুনতে লাগলেন প্যারীচর তখনও তাঁর মা জীবিত।

১৮৭৫ সালের দুর্গাপুজোর বোধনের ক'দিন আগে একদিন সন্ধে প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি। প্যারীচরণ বিছান শুয়ে। বুকে আঁকড়ে ধরে আছে যোগেন্দ্রনাথের ছবি। হঠাৎ আকা ফাটিয়ে প্রচণ্ড শব্দে বাজ মাথার মধ্যে একটা নিদারুণ অনুভব করলেন প্যারীচরণ। বিদ্যু তীব্র শক আবার স্নায়ুকেন্দ্রে ধাক্কা মেরেছে। অচৈতন্য হয়ে গে প্যারীচরণ। কিন্তু তখনও অস্ফু স্বরে উচ্চারণ করে চলেছে যোগেন্দ্রের নাম। এইভাবে ক'দি কাটল। তারপর পুজো এল। খানিকট সুস্থ প্যারীচরণ। বাড়ির সকলের কথ উপেক্ষা করে বোধন বসালেন বাড়ির উঠোনে। দেবী দুর্গা আসছেন বোধনের বাজনা বেজে উঠল উঠোনের মণ্ডপে। ঘরের মধ্যে বিছানায় শুয়ে প্যারীচরণ। কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন। হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন। চীৎকার করে ডাকলেন—মা, যোগেশ পাশ করতে পারেনি জান? উঠোনে তখন বোধনের কাঁসর বাজছে ঢাকের তালে তালে। ডাঃ পার্টিজকে ডাকা হল। তিনি এসে প্যারীচরণের স্বাস্থ্য সম্পর্কে জানতে চাইলেন। শান্তভাবে উত্তর দিলেন প্যারীচরণ—'বেটার, থ্যাংক ইউ।'

আর কোনও কথা নেই। ডাঃ পার্টিজ প্যারীচরণের মুখের কাছে ঝুঁকে পড়লেন। কীযেন বলছেন তিনি। পার্টিজ শুনতে লাগলেন। অস্পষ্ট গলায় প্যারীচরণ কিছু বলছেন। বোঝা গেল না। শুধু শোনা গেল কয়েকটা নাম—যোগেন, বিচার্ডসন, হেয়ারি, মহেন্দ্র। পার্টিজ আবার ডাকলেন—মিঃ সরকার অনেক কষ্টে চোখ দুটো খুলে প্যারীচরণ বললেন—আই অ্যাম বেটার....গোয়িং টু মিট মহেন্দ্র.....। সংক্ষিপ্ত উত্তর। শেষ উত্তর। বোধনের বাজনা থেমে গেল। ফার্স্ট বুকের লেখক, বাংলার ছোট ছেলেদের প্রিয়তম শিক্ষক আর হেয়ার সাহেবের হীরের টুকরো ছাত্র প্যারীচরণ যাত্রা করলেন অমৃতলোকের পথে।

আলোচনা

গণশিল্পীর চোখে চীন

হারমোনিয়াম হাতে গায়ক দেবব্রত দাস আমাদের ভীষণ পরিচিত। কিন্তু লেখক কলম ধরতে পারেন এবং কলমের ধারে দাপট দেখাতে পারেন এটা জানা ছিল না। সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর লেখা ভ্রমণকাহিনী অন্তরঙ্গ চীন পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। ১৯৫৩ সালে ভারতীয় শান্তি মিশনের উনত্রিশ জন প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য হিসেবে তিনি চীনে যান। এই দলে বিলায়েত হোসেন, হীরাবাঈ বরোদেকরের মতো খ্যাতনামা শিল্পীও ছিলেন। চীন থেকে ফেরার পর তৎকালীন স্বাধীনতা পত্রিকায় কিস্তিতে এই লেখা ছাপা হয়েছিলো।

প্রায় পঁচিশ বছর আগে লেখা এই ভ্রমণকাহিনী আজও তাজা এবং সুখপাঠ্য। লেখক লম্বা চওড়া তত্ত্ব অথবা জ্ঞান দেওয়ার রাস্তায় হাঁটেন নি। নিজস্ব সাবলীল এবং মজলিসী ভঙ্গীতে তিনি লিখেছেন। সমাজতান্ত্রিক চীনের পুনর্গঠন এবং অগ্রগতি নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। দেশী বিদেশী সাংবাদিক ও পরিব্রাজকদের অসংখ্য বই বেরিয়েছে। কেউ বলেন, চীনের মানুষ খেতে পরতে পায়। কিন্তু কঠোর শাসন আর নিয়ন্ত্রণে পঙ্গু। স্বাধীনতা নেই। কারো লেখায় রয়েছে স্বাধীনতা আছে, কিন্তু বড়ো গরীব, জীবন ধারনের মান খুব নীচু। কারো মতে খাদ্যও আছে স্বাধীনতাও আছে। কিন্তু সব কিছু বড়ো যান্ত্রিক, তন্ত্রের ছকে বাঁধা। এডগার স্নো, বার্চেট, ইজরায়েল এপস্টিন বা এ্যানা লুই স্ট্রং-এর পাশাপাশি বিশ্বনাথ মুখার্জি, শৈল মুখার্জি বা মনোজ বসু পড়লে তফাৎটা ধরা পড়ে। বাস্তবিক ধাক্কায় এদেশী লেখকদের আবেগ ধূলিসাৎ। অথচ ম্যাক আর্থার বা জন ফস্টার ডালেস স্নো কিংবা বার্চেটকে টলাতে পারে না। গত দু-এক বছরে লেখা চীন সংক্রান্ত বইগুলোতেও তত্ত্ব আর গল্পের ফুলঝুরি। বিপ্লব আবেগ থেকে হঠাৎ কঠিন যুক্তি আর তর্কের প্রগলভ প্রদর্শনী। এই সংখ্যাহীন বই-এর মিছিলে দেবব্রত বিশ্বাসের অনুপম একটা বিরল ব্যতিক্রম।

একজন গণশিল্পীর উদারতা নিয়ে তিনি চীনের মানুষ, সৈখানকার জীবন ও সংস্কৃতিকে দেখেছেন। কোনো গোঁড়ামি নেই, আদিখ্যেতা নেই। বিভিন্ন গানের আসর, ভোজসভা, আলোচনা বৈঠকের বর্ণনা দিয়েছেন। হিন্দী চীনী ভাই ভাই গানটা যে কবি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা, এটা জানা ছিলো না। এই একটা গানের সুবাদে বিভিন্ন আসরে বন্ধুতার যে জোয়ার বয়েছিলো, তার বিবরণ রোমাঞ্চকর। বিপ্লবের আগে চীনের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাস বর্ণনাও মনোজ্ঞ। গানের আসরে ভীড়ের মধ্যে চেয়ারম্যান মাও সে তুং সাধারণের সঙ্গে সাধারণ চেয়ারে বসে আছেন। প্রধানমন্ত্রী চু এন লাই ভোজসভায় পিকিংয়ের লেখক, গায়ক অভিনেতাদের নাম ধরে ডাকছেন, কথা বলছেন। ভাবতে অবাক লাগে। পিকিং-এর অধিকাংশ রাজপ্রাসাদ এখন শ্রমিক, কৃষক সৈন্যদের বেস্ট হাউস। রাজপ্রাসাদের স্থাপত্যের অঙ্গ বেত্রাঙ্গের সিংহ আর ড্রাগন। বাঁড়িৎস তাদের চেহারা। সম্রাটরা ওগুলো সামনে রেখে প্রজা শাসন করতেন। লেখক বলেছেন 'হয়তো ভয় দেখাবার জন্যে এই নামের একটি কাল্পনিক জীবের সৃষ্টি হয়েছিল।'

প্রায় বিয়াল্লিশ দিনে লেখক এবং প্রতিনিধিদল পিকিং সহ পাঁচটি প্রদেশ ঘুরেছেন। ক্যান্টন, তিয়েনসিন, ন্যানকিং, সাংহাই, হ্যাংচাও। নতুন চীনের কল-কারখানা, কৃষি, শিক্ষা সংস্কৃতির নানা খবর এই বইয়ে আছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশী করে আছে মানুষের খবর। তাদের আন্তরিকতা, দরদ আর হৃদয়ে কোনো ভেজাল নেই। শেখানো বুলি বা মিলিটারি নিয়মে এটা হয় না। অন্তরঙ্গ চীন পড়ে এই কথাটা পরিষ্কার বোঝা যায়। চীন থেকে ফেরার পথে বিলায়েত হোসেন লেখককে বলেছিলেন দাদা, হাম অ্যায়সা কভি নেহি দেখা।

বইটির পাতায় পাতায় খালেদ চৌধুরীর অলংকরণ চিত্তাকর্ষক। বইটির ব্যাপক প্রচার কামনা করি। কেননা বইটির সর্বস্বত্ব লেখক অনাথ বালক বালিকাদের কল্যাণকর কাজে উৎসর্গ করেছেন।

শৈবাল মিত্র

অন্তরঙ্গ চীন। দেবব্রত বিশ্বাস। কথাশিল্প, ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩, মূল্য দশ টাকা।

কবিতার অনুবাদ

'কবিতা হল সেই জিনিস, যা অনুবাদে নষ্ট হয়'। এ ধারণা ছিল রবার্ট ফ্রস্টের। এজরা পাউন্ডের নিশ্চয় অনুরূপ ধারণা ছিল না। চীনা জাপানী কবিতার ঢঙে তিনি কবিতা লিখেছেন। অনুবাদ করেছেন। নানা দেশের নানা ভাষা থেকে শব্দ ও চিত্র ধার নিয়েছেন কম না। অথচ, আমরা জানি, শব্দের ব্যবহারে তিনি ছিলেন মিতব্যয়ী। শব্দের ওজন বুঝে, অভিপ্রায় জেনে, তিনি শব্দকে সুদূরে প্রেরণ করেছেন। এমনকি, তাঁর অঙ্কিত স্থিরচিত্রগুলি শব্দের লীন আভায় ও অনুরঙ্গে পাঠককে জড়ায় আবেশে।

তাঁর কবিতার নির্বাচন ও অনুবাদের সময়ে সুশীলকুমার দাশগুপ্ত এইসব নিক ও ইঙ্গিত সম্পর্কে সচেতন ছিলেন কিনা, আমাদের জানা নেই। তবে অনুবাদ সম্পর্কে তাঁর মতটা আমরা জানি। তাঁর মতে: 'ভাষাগত পার্থক্য সাহিত্যরস গ্রহণে কোনো বাধাই সৃষ্টি করে না। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কাব্য-সাহিত্যিক মনীষীর মধ্যে অনেকেই অনুবাদের ক্ষেত্রে নিজেদের নিয়োজিত করে বিশ্বসাহিত্যের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে রস গ্রহণের সুযোগ এনে দিয়েছেন।

দৃষ্টান্ত আছে অনেক। ডিভাইন কমেডি আর স্পানিশ গাথার অনুবাদ করেছেন লংফেলো। গোটে করেছেন সাইবেরিয়ান কবিতার। ভার্জিলের অনুবাদ করেছেন ড্রাইডেন। শ্লেগল করেছেন রামায়ণের ভাগবত গীতার। ওমর খৈয়ামের অনুবাদ করেছেন ফিটসজেরাল্ড। কিন্তু বাংলায় পাউন্ডের অনুবাদ বিশেষ হয়নি। সে অভাব পূরণের প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করেছেন সুশীলকুমার দাশগুপ্ত। সার্থকতা? এই উদ্দেশ্যের মধ্যেই নিহিত।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির বিভাগীয় প্রধান কৃষ্ণচন্দ্র লাহিড়ী বইটির 'মুখবন্ধে' লিখেছেন: 'মূল কবিতার ভাব মন্ডল ও পশ্চাৎপট উপলব্ধিতে শ্রীমান সুশীলকে একদিকে যেমন অসংখ্য রেফারেন্স বইয়ের পাতা ওল্টাতে হয়েছে এবং ভাষাবিদের সাহায্য নিতে হয়েছে, অন্যদিকে আবার পাউন্ডের ওপর বিভিন্ন সমালোচনা গ্রন্থ বিস্তারিত পড়তে হয়েছে। সুতরাং এটি স্পষ্ট যে পাউন্ডের ভাবজগতের গভীরে প্রবেশ করার দুঃসাহসিক ও আন্তরিক উদ্যোগ সে নিয়েছিল।....দি রিটার্ন, অপ্পারুইত, ড্যান্স ফিগার, সেস্তিনা: আলতাফোরতে ব্যালাড অফ দি গুড্ডাল ফির, দি রিভার মার্চেন্টস ওয়াইফ: এ লেটার—বিশেষভাবে এই অনবদ্য কবিতাগুলিতে যে ভাবরস ও সুর আছে, অনুবাদে তার কোনো অভাব আছে মনে হল না।.... পাউন্ডের প্রতিভা ও পান্ডিত্যের সমাহারে

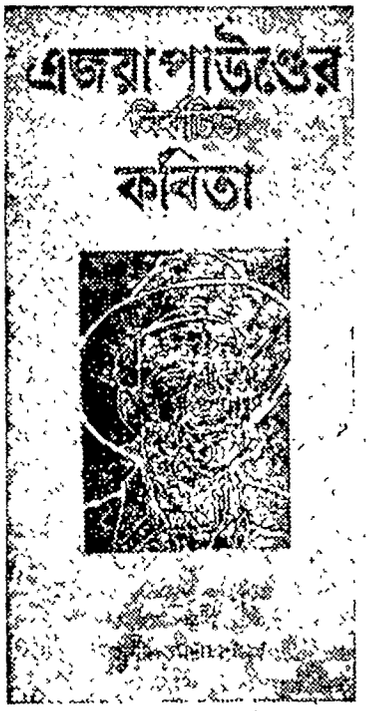

চিত্রময় ক্যান্টোস মহাকাব্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ সর্গের বিস্তৃত প্রতিচিত্র আঁকার সূত্রে সাহিত্যজগতে প্রথম আত্মপ্রকাশেই একটি বলিষ্ঠ ক্ষমতার পরিচয় সে দিতে পেরেছে বলে আমার বিশ্বাস।'

তাঁর এই বিশ্বাস পাঠকের মনে সঞ্চারিত হলে ভালোই। না হলেও ক্ষতি নেই। বঙ্গানুবাদের পাশাপাশি ঠাঁই পেয়েছে মূল ইংরেজি কবিতা। অনুবাদে অসন্তুষ্ট পাঠক মূল কবিতা পড়ে অনুবাদের দোষ শুধরে নিতে পারবেন। ভূমিকাটি সুলিখিত এবং তথ্যবহুল। পাউন্ড ও তাঁর কবিতাকে বুঝে নিতে সাহায্য করবে। এসব কারণে, আমরা বইটির বহুল প্রচার কামনা করি। সুবোধ দাশগুপ্তের প্রচ্ছদ মর্যাদাব্যঞ্জক।

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

এজরা পাউন্ডের নির্বাচিত কবিতা : অনুবাদ : সুশীলকুমার দাশগুপ্ত। রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩। তিরিশ টাকা।

আগাগোড়া প্রেমময়

আজকাল লেখকরা অনেক কিছুই লেখেন, কিন্তু প্রেমকে বাদ দিয়ে। ভুল বললাম, একেবারে বাদ দিয়ে নয়। প্রেম থাকে আর পাঁচটা সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে, গৌণভাবে। প্রেমই মুখ্য, এমন গল্প বা উপন্যাস হাতে গোনা। এর কারণটা কি? একটা কারণ হতে পারে, প্রকৃত প্রেম জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। এখন প্রেম মানে প্রয়োজন বা দেহের তাগিদে পরস্পরের কাছে আসা। আবার প্রয়োজন মেটার পরে দূরে সরে যাওয়া, তা শারীরিক বা মানসিক যে স্তরেই হোক। এই ভঙ্গুর ব্যাপারে লেখকের মন আর আকৃষ্ট হয় না। বরং জীবনের নানা জটিলতার দিকেই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ। প্রেম এখন বহু ব্যবহারে জীর্ণ।

তবু পৃথিবীতে প্রেম আছে। থাকবেও। আর প্রকৃত লেখক জীবনের কোন না কোন মুহূর্তে হৃদয়ের এই রঙিন নির্যাসের প্রতি দুর্বলতা অনুভব করবেনই। তা জ্যোৎস্নাময় বসুর 'যখন বৃষ্টি' এই রকমই একটি সৃষ্টি। আগাগোড়া প্রেমময়। উত্তম পুরুষে ঘটনাটি বিবৃত। নায়িকা স্বাতী। এই উপন্যাসের ভাষা অত্যন্ত গতিময়। সেই সঙ্গে স্নিগ্ধ অনুভব পাহাড়ী ঝর্ণার মতই ইতস্তত ঝিকমিক করে। মূল কাহিনীর সঙ্গে আছে আরও নানা চরিত্র। আছে তাদের রাগ-অনুরাগ। সব মিলিয়ে উপন্যাস এমন একটা সিম্ফনি বা ঐকতান সৃষ্টি করেছে, যা উদাসীন পাঠককেও চকিতে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এখানেই লেখকের কৃতিত্ব।

বিপুল গুহের আঁকা প্রচ্ছদ একঘেয়ে অনবদ্য।

বিজনকুমার ঘোষ

যখন বৃষ্টি—জ্যোৎস্নাময় বসু। লিপিকা, ৩০।১-এ কলেজ রো, কলকাতা-৯। দাম : আট টাকা।

পশ্চিমবঙ্গ

এই দুটি পত্রিকাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়ে থাকে। বর্তমান সংখ্যাদুটির সমস্ত রচনাই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত। লেখকেরা অনেকেই রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ রূপে সুপরিচিত এবং অনেকগুলি রচনাই মূল্যবান। কয়েকটি রচনা সম্ভবত স্থান-সংক্ষেপের ফলে অব্যাপ্ত এবং কিছুটা অপূর্ণাঙ্গ কয়েকটির রচনার বক্তব্য অতি পরিচিত এবং নিষ্প্রাণ। কিন্তু অতকগুলি রচনা সুরচিত, সুচিন্তিত এবং রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠকদের কাছে আদরনীয় হবে। 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকায় প্রকাশিত কোন প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্ম আলোচনার প্রধান বিষয় নয়। হিন্দু মুসলমানের ঐক্য ও বিরোধ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা, বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববোধ, বাংলার নবজাগরণের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা ইত্যাদি বিষয়েই প্রবন্ধগুলি রচিত। সম্ভবত সম্পাদক সুচিন্তিত ভাবেই সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা, রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের কর্মী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিত্বকেই পরিস্ফুট করে তুলতে চেয়েছেন। শান্তিদেব ঘোষের অন্ত বঙ্গভঙ্গীতে লেখা প্রবন্ধটি বাদ দিলে—বাংলার লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের স্থান সম্পর্কে এই রচনাটি অত্যন্ত সুখপাঠ্য এবং আমাদের লোকশিল্পের পুনরুজ্জীবনের ইতিহাসে মূল্যবান—যে রবীন্দ্রনাথকে আমরা এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে দেখি তিনি সমাজের নানা সমস্যায় চিন্তিত, সংস্কৃতির এবং শিক্ষার দিক পরিবর্তনের নিয়ত সজাগ, ভারতবর্ষের মানুষের রাজনৈতিক সংগ্রামের সতর্ক প্রহরী এবং সর্বোপরি সমস্ত ধর্মীয় কুয়াশার নির্মোক : উদার মণীষী।

ইংরেজিতে প্রকাশিত পত্রিকার প্রবন্ধগুলিতেও মূলত একই অবলম্বন করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের চিন্তা, সাধারণ মানুষের কবি রবী পল্লী উন্নয়ন ও রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি প্রবন্ধ পাওয়া যাবে এই সংখ্যাতে। এ রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার ইংরেজী অনুবাদ এবং রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কবি এবং রবীন্দ্রনাথের সংগীত সম্পর্কে বা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ২টি সংখ্যাতেই নেপা মজুমদারের দুটি রচনাই বিশেষ তথ্যপূ এবং রবীন্দ্র জীবনীর উপকরণ হিসে মূল্যবান। অনেকগুলি ছোট ছোট প্রবন্ধে চেয়ে কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ রচনা থাকলে পত্রি দুটি আরো আকর্ষণীয় হত। ইং পত্রিকাটি নিশ্চয় মূলত অ-বাঙালী কথা ভেবেই প্রকাশিত, সেক্ষেত্রে রবীন্দ্র নাথের জীবন ও কর্মের একটি সামগ্রি পরিচয় সম্বলিত রচনা থাকলে অবাঙালি পাঠকসমাজ লাভবান হতেন।

শিশিরকুমার দা

পশ্চিমবঙ্গ; বর্ষ ১১, ৪৪-৪৫ যুগ্ম সংখ্যা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৮৫। ওয়েস্ট বেঙ্গল খণ্ড ২০, সংখ্যা ১৭, ৯ মে ১৯৭৮ প্রধান সম্পাদক সুনীলকুমার সেনগুপ্ত

অন্ধজনে দেহ আলো

অন্ধ মানুষরা কাজ করছেন—হঠাৎ ভাবতে পারা যায় না। কিন্তু নিশাবীর পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রযোজনা দুটি জানিয়ে দেয়, কাগজ কলাই নয়—কাগজ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতাও তাঁদের আছে। পত্রিকাটির পরিচালনায় আছেন ওয়ার্কশপ ফর দি ব্লাইন্ড। পত্রিকাটি গল্প কবিতা কিছু ছাপা চক্ষুষ্মান পাঠকের কাছে এর আকর্ষণ অন্ধদের সংবাদের। যেমন, এখনো বেঙ্গল কর্নার লাইব্রেরীর উন্নতি ঘটেনি। অথচ শোনা যায়, দৃষ্টিহীনরা, প্রকৃতির ক্ষতিপূরণের জন্যেই তীক্ষ্ণ সংবেদনশীল। এই সংবেদনশীলতার ফলাফল কিন্তু নিশারীর সাহিত্যরুচিকে নিয়ন্ত্রিত করেনি। তার কারণ—তাঁদের দরকারী মাধ্যমটির অনুন্নত অবস্থা। কোনো পেশায় তাঁদের সংরক্ষিত আসন নেই—অথচ মানুষ অন্ধ হয়ে যাওয়া মানেই এই নয় যে পেশী-মন-মাথার আর চাহিদা নেই। অন্ধদের আরো-একটু অন্ধ করে রাখার এই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বা অব্যবস্থা সত্ত্বেও তাঁরা যে পত্রিকাপ্রকাশের মতো একটি শ্রমসাপেক্ষ জটিল কর্মে উন্মুখ ও পারঙ্গম—কেবলমাত্র প্রকৃত দর্শক যাঁরা তাঁদের পক্ষে এটাই একটা যথেষ্ট বন্ধুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ।

নিশারী পঞ্চম ও ষষ্ঠ বার্ষিক প্রচেষ্টা : সম্পাদনা : গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিচালনায় ওয়ার্কশপ ফর দি ব্লাইন্ড। বঙ্কিম শাসমল ছেপেছেন ৮।ডি, দমদম রোড থেকে।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

স্ত্রী বিনোদনে অতুলপ্রসাদ

নন্দনাথ গুপ্ত

জীবনের দীর্ঘ বাহাত্তর বছর উত্তর-শের লক্ষ্ণৌ শহরে কাটলেও বিলেত ত [illegible]রিস্টার ও স্থানীয় উর্দুভাষা রণী সভার অন্যতম বিশিষ্ট নমক অতুলপ্রসাদ সেন ছিলেন মনে-প্রাণে সম্পূর্ণ ঙালী। একদিকে যেমন পুরো সাহেবী া-চলন, মুখে চোস্ত ইংরিজি বুলি, লতি সাজ-সজ্জা ও আদব-কায়দায় শস্ত আবার অন্যদিকে পশ্চিম ভারতের ডদার, শৌরোয়ানি ও মাথায় পাগড়ী এ যাস উর্দুতে আলাপ-আলোচনায় পটু -এই দু-রকমের সম্পূর্ণ বিপরীত দৃশ্য খুবই মানুষটির সঙ্গে বাংলাদেশের নাড়ির যোগ আছে তা কল্পনা করা অনেকের ছেই দুঃসাধ্য ছিল। তাছাড়া তাঁর অসা-রণ ব্যক্তিত্ব গুরু-গম্ভীর চেহারা, ধীর চিন্তাশীল কথাবার্তা অপরের মনে একটা ভীর সম্ভ্রমের ভাব জাগিয়ে তুলতো। কন্তু যে মুহূর্তে তাঁর রসিক ও মজলিশী মনের পরিচয় অকস্মাৎ ফুটে উঠতো, সেই মুহূর্ত থেকে তিনি পরিচিত-অপরিচিত সকলের কাছে তাদের প্রাণের ও মনের একান্ত কাছের মানুষ হিসেবে গৃহীতও হতেন। কবি, গীতিকার, সুরকার, গায়ক উত্তর-প্রদেশের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ আইনবিদ, দান-বীর, দীনদরিদ্রের আশ্রয়স্থল, শিক্ষাব্রতী, ভগবদ্বিশ্বাসী, রাজনৈতিক নেতা, নামী-অনামী সকলেরই বন্ধুবিশেষ—অতুলপ্রসাদ সেনের চরিত্রের আরও অনেক বৈশিষ্ট্য। তাঁর বিবাহিত ও পারিবারিক জীবন দুর্ভাগ্যবশতঃ হয়েছিল দুর্বিসহ এবং বেদনাময়। কিন্তু [illegible]ধা-বেদনাকে আঁকড়ে না থেকে তাঁর মানসিক স্থৈর্য ও ধৈর্য না হারিয়ে কারো কাছে কোনও নালিশ না জানিয়ে এবং সব দুঃখ-ব্যথা তাঁর অপূর্ব গীতরচনার মাধ্যমে ভগবানকে নিবেদন করে : তাঁর লজ্জাট-লিখনকে মেনে নিয়ে নিজের মধ্যে একটি সুস্থ মজলিশী ও রসিক মনকে গড়ে তুলে-ছিলেন। আমার এই প্রবন্ধে আজ কেবল তাঁর গভীর রবীন্দ্রপ্রীতির কাহিনী সহ তাঁর রসিক ও মজলিশী চরিত্রের রূপটা ছোট ছোট বর্ণনার মাধ্যমে ফোটাতে চেষ্টা করব।

(এক)

তৎকালীন পূর্ববাংলার (এখনকার বাংলাদেশ) অন্তর্গত ঢাকা শহরে অতুল-প্রসাদ যেদিন ভূমিষ্ঠ হন, সে তারিখটা ছিল ১৮৭১ খৃস্টাব্দের ২০ অক্টোবর অর্থাৎ বাংলা ১২৭৮ সনের ৩ কার্তিক। বাবা ডাক্তার রামপ্রসাদ সেন তখন ঢাকার একজন বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রথম যুগের বাঙালীভাষার মাধ্যমে ডাক্তারী পড়ে পাস করে সরকারী চাকরী নিয়ে ঢাকাতে আছেন। প্রথম জীবনে ফরিদ-পুর জেলার এক গ্রামের পাঠশালায় সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিতমশাই-এর কাছে করতেন। তখন থেকেই সংস্কৃত শ্লোক রচনা করে এবং তাতে সুর বসিয়ে গান করা আবৃত্তি করা রাম-প্রসাদের নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম ছিল। বিবাহিত জীবনেও সেই অভ্যাস থাকার ফলে শিশু-পুত্র অতুলপ্রসাদও বাবার কাছে সেসব সংস্কৃত গান শুনে শুনে সবই শিখে ফেলেন। ঈশ্বরের দেওয়া তাঁর একটি মিষ্টি গানের গলা ছিল তাই অতুলপ্রসাদের পক্ষে ছোট্ট বেলা থেকেই গান শেখার প্রতি প্রচণ্ড ঝোঁক আপনা থেকেই এসে গিয়েছিল। সেই ছোটবেলা থেকেই অতুলপ্রসাদ তাঁর আত্মীয়স্বজন ও অন্যান্যদের মিষ্টি গলায় গান শুনিয়ে সকলের চিত্ত বিনোদন করতেন।

অতুলপ্রসাদ ৫৬ বছর বয়সে

তখন রবীন্দ্রসঙ্গীত বা দ্বিজেন্দ্রগীতির তেমন প্রচলন হয়নি। পূর্বেকার দিনের গীত-রচয়িতাদের রচিত ভাবসঙ্গীত এবং ব্রহ্ম-সঙ্গীতই তিনি গাইতে শিখেছিলেন।

(দুই)

সেকালে ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনী পুরো দমে চলছিল। ফরিদপুর জেলার মগরগঞ্জ-নিবাসী জনৈক দরিদ্র, বঙ্গজশ্রীয় হিন্দু বৈদ্য পরিবারভুক্ত কবিরাজের সন্তান হিসাবে রামপ্রসাদ কলকাতা শহরে ভাগ্যান্বেষণে এসে উপস্থিত হয়ে তৎকালীন ব্রাহ্ম-সমাজ নেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখের সঙ্গে পরিচিত হন এবং ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। উত্তরকালে তিনি পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্ম নেতা সাধু চরিত্রের মানুষ কালী-নারায়ণ গুপ্ত ও আনন্দা গুপ্তর প্রথমা কন্যা হেমন্তশশী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন ও ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন। কালীনারায়ণ এক-দিকে যেমন ঈশ্বরভক্ত : সাধু চরিত্রের, আবার তেমনি একজন ধনী জমিদার, সুগায়ক, গীতরচয়িতা, রসিক, কীর্তন-দলপতি, এবং দয়ালু মানুষ ছিলেন। মাত্র তেরো (১৩) বছর বয়সে হঠাৎ পিতৃহীন হয়ে অতুলপ্রসাদ তাঁর মা, ছোট তিন বোন এবং প্রায়সমবয়সী জ্যেঠতুতো দাদা সত্যপ্রসাদকে নিয়ে দাদা-মশাই (শ্বশুরমহ) কালীনারায়ণের আশ্রয়ে চলে আসেন এবং সাত-আট বছর ধরে দাদা-মশাই, দিদিমা ও মামাদের স্নেহময় সান্নিধ্যে ও পরিবেশে থেকে বর্ধিত হন। এর ফলে তাঁর দাদামশাইয়ের ও মামাদের অনেক মানসিক গুণ ও বৈশিষ্ট্য উত্তরকালে তাঁর চরিত্রে পূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করে। দাদুর সংসারে দাদা সত্যপ্রসাদ ছাড়াও নিত্যসঙ্গী ছিলেন তাঁর মেজো, সেজো ও ছোটমামা যথাক্রমে প্যারীমোহন, গঙ্গাগোবিন্দ ও বিনয় গুপ্তরা। মামাদের ও দাদা সত্যপ্রসাদকে নিয়ে অতুলপ্রসাদ বাল্যকালে প্রতিবছর শহরের বিখ্যাত জন্মাষ্টমীর মিছিল দেখতে যেতেন। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বহু হাতি, ঘোড়া, উট ও সং-এর দল বেরুত এবং সেসব দেখে তাঁরা দুই ভাই খুব আনন্দ পেতেন। সংদের মুখ থেকে শোনা ছড়া ও তাদের ভঙ্গী অতুলপ্রসাদ অনায়াসে নকল করে সবাইকে হাসাতেন ও আনন্দ দিতেন। তাছাড়া জন্মা-ষ্টমী উৎসব উপলক্ষে যেসব যাত্রাগান, কবি-গান, তরজাগান, কবির গড়াই প্রভৃতি হোত, অতুলপ্রসাদ সেসব শুনে শিখে নিতেন এবং বাড়ী ফিরে এসে বাড়ীর লোকজনকে ও সহ-পাঠী বন্ধুবান্ধবদের প্রচুর হাসি ও আনন্দের খোরাক জুগিয়ে সকলের চিত্ত বিনোদন করতেন। তাঁর মামাদের মধ্যে অন্যতম গঙ্গা-গোবিন্দ গুপ্ত খুব রসিক পুরুষ ছিলেন এবং নানা জীবজন্তুর এবং মানুষের নানা ধরনের মজার কণ্ঠস্বর নকল করতে পারতেন। সেসব শুনে শুনে অতুলপ্রসাদও অনুকরণ করে সবাইকে আনন্দ প্রিভিবেশন করতেন।

(তিন)

বাবার কাছে গান শেখার হাতে-খড়ি হলেও অতুলপ্রসাদ একজন সুগায়ক হবার সৌভাগ্য লাভ করেন তাঁর দাদামশায়ের সংস্পর্শে এসে। দাদামশায় কালীনারায়ণ গুপ্ত নিজে গান রচনা করতেন, গান গাই-তেন এবং কীর্তনের দল গড়ে তার দলপতি-গায়ক ছিলেন। অতুলপ্রসাদও এই কীর্তনের দলেই গান গাইতেন তাঁর দাদুর কাছে কীর্তন শিখে। তাছাড়া কালীনারায়ণ অনেক ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেছিলেন ও অতুল-প্রসাদের সেসব গান শেখার সুযোগ হয়ে-ছিল। নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে, পারি-বারিক উৎসবে এইসব কীর্তন ও ব্রহ্মসঙ্গীত প্রিভিবেশন করে তিনি শ্রোতাদের ভক্তিরসে

আপ্লুত করেছেন ও প্রচুর আধ্যাত্মিক রস বিতরণ করেছেন।

গান শুনিয়ে অপরের চিত্ত-বিনোদন করা ছাড়াও বাল্যবয়েস থেকেই অতুলপ্রসাদের ছিল। একটি বাঁধানো খাতায় তিনি তাঁর রচিত কবিতা-গুলি লিখে রাখতেন এবং সময় ও সুযোগ পেলেই সেই কবিতাগুলি গানে রূপান্তরিত করতেন। ছোট এক মাসতুতো বোনের জন্ম-দিন উপলক্ষে তিনি যে গানটি মাত্র তেরো বছর বয়সে রচনা করেন, সেটাই ছিল তাঁর জীবনের প্রথম গান রচনা, যার প্রথম কলিটি ছিল 'তোমারই উদ্যানে তোমারি যতনে উঠিছে কুসুম ফুটিয়া' ইত্যাদি। ঢাকায় স্কুলে পড়াকালীন এবং দাদামশায়ের আশ্রয়ে থাকাকালীন বাল্যাবস্থা থেকেই অতুল-প্রসাদের যেমন কবিতা ও গান রচনা করার অভ্যাস সযত্নে গড়ে উঠেছিল তেমনি কবিদের রচিত কবিতা পাঠ করার একটা অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে সর্বদাই জাগ-রূক ছিল। মাতামহের সান্নিধ্য ও শিক্ষাগুণে মাতার বিকাশ লাভ করলেও তাঁর কবিত্ব-শক্তিকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করেছিল তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথের রচনাসমূহ।

সম্ভবতঃ ১৯২৩ সালে কবি দ্বিজেন্দ্র-লাল রায়ের সুযোগ্য পুত্র সঙ্গীতাচার্য দিলীপকুমার রায় বিলেতে প্রায় বছর তিনেক কাটিয়ে 'সুরের বাউল' হয়ে দেশে ফেরেন। দেশে এসেই তিনি মেতে গেলেন যেমন নানা আসরে তাঁর গান শোনাতে, তেমনি আবার খোঁজ করতে লাগলেন কোথায় ভাল গায়ক-গায়িকা, কোথায় ভালো বাজিয়ে, সেতারী, বীনকার, ওস্তাদ। তাঁদেরই খোঁজে দিলীপ-কুমার একদা লক্ষ্ণৌতে এলেন। উঠলেন এসে তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু অধ্যাপক ও সঙ্গীত-পাগল ধূর্জটিপ্রসাদ মুখার্জির বাড়ীতে। ঔদার্য ধূর্জটিপ্রসাদের কাছ থেকে লক্ষ্ণৌর সব নামকরা গাইয়ে বাজিয়েদের খবরাখবর নেওয়া ও তাঁদের গানবাজনা শোনার। শুধু ওস্তাদি গান-বাজনা নয়, দিলীপকুমার বাংলাগানেরও একজন একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন কারণ তাঁর পিতৃদেব দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত বাংলাগান নানা আসরে গেয়ে তিনি বাংলা-গানের জগতে নিজের একটা স্থায়ী আসন অতদিনে করে নিয়েছেন। ধূর্জটিপ্রসাদ নিজে ছিলেন এক গানপাগল মানুষ, তাই তাঁর বৈঠকখানে উঠে দিলীপকুমার সঙ্গীত নিয়ে মেতে উঠলেন। এমন সময়ে কোন একটি সাময়িক পত্রের পাতা উল্টোতে গিয়ে তাতে প্রকাশিত 'পাগলা মনটারে তুই বাঁধ' নামে একটি গানের পুরো বাণী ও সুরের স্বর-লিপি তাঁর নজরে পড়ে। গান ও সুর বেঁধেছেন বলে নাম ছাপা হয়েছে শ্রীঅতুল-প্রসাদ সেন। দিলীপকুমার জানতেন যে অতুলপ্রসাদ সেন একদা তাঁর পিতৃদেবের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের

দিলীপকুমার রায়

মোড়াসাঁকোর বাড়ীতে যে 'খামখেয়ালী সভা' ছিল তার সদস্যরূপে তাঁর পিতৃদেব যখন হাসির গান গাইতেন, তখন এই অতুল-প্রসাদও উপস্থিত থাকতেন এবং দ্বিজেন্দ্র-লালের গাওয়া হাসির গানের সঙ্গে দোহার দিতেন। কিন্তু অতুলপ্রসাদ যে গান বাঁধ-তেন, সে-কথা দিলীপকুমারের সেদিন জানা ছিল না। স্বয়ং অতুলপ্রসাদের কাছ থেকে 'পাগলা মনটারে তুই বাঁধ' গানটি শেখবার প্রবল আগ্রহ দিলীপকুমারের মনে জাগায় তিনি ধূর্জটিপ্রসাদকে জিজ্ঞেস করলেন তাঁকে অতুলপ্রসাদের সঙ্গে পরিচিত করে দেওয়া সম্ভব হবে কিনা? ধূর্জটিপ্রসাদ বললেন, 'বিলক্ষণ, অতুলপ্রসাদের গৃহে সবারই অবারিত দ্বার, আর অজাতশত্রু তাঁর উপাধি। এমন মনিষ্যি দেশী দেখা যায় না, বিশেষ করে উকিল বাজারে। একেবারে পাকা আমটি—রসে ভরা, টস্ টস্ করছে।' আর সময় নষ্ট না করে একদিন ধূর্জটিপ্রসাদ সহ দিলীপকুমার এসে সোজা হাজির হলেন অতুলপ্রসাদের লক্ষ্ণৌর বাড়ীতে। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের পুত্র এই পরিচয় দিয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ দিলীপকুমারের সঙ্গে অতুল-প্রসাদের আলাপ করিয়ে দিতে অতুলপ্রসাদ বললেন, 'আরে, তুমি তোমার বাবার ছেলে? বলে হেসে হোঃ হোঃ করে হাসতে লাগলেন। পরে বললেন, 'জানো, তোমার বাবা হাসির গানে আমি সমনে দোহার দিতাম। যাহা, কং-গানই গাইতেন। আমি তাঁর সঙ্গে গাই-তাম 'নন্দলাল তো একদা একটা কং-কবিল ভীষণ পণ, স্বদেশের তরে যে করেই হোক্ রাখিবে সে জং-জীবন'—সে কী হাসি দিলীপ! কী গান! কী ভাবুক, দং-দরদী মন। আর কি মিলের জোলুষ। তাঁর সঙ্গে গাইতাম আমি—

'লিখে গেছেন পুরান-কর্তা স্বয়ং ভোলা
খেতেন ভাঙ,
খেতেন না হয় ভোলা কিম্বা পুরাণ-
কর্তা সুতরাং।'

এই ঈষৎ তোতলামি কিন্তু অতুলপ্রসাদের বিকাশের পথে বাধা হয়নি—অলঙ্কার হয়েছিল। এমন মধুর তোতলামি সচরাচর শোনা যায় না। তাঁর এই অর্ধ-উচ্চারণ শুনে অনেকেই মুগ্ধ হতেন।

(পাঁচ)

স্বভাবে অতুলপ্রসাদ ছিলেন লাজুক ও সুকুমার। এত সুকুমার যে তাঁর মা-স্নেহের নানা পেলব পরশে দিলীপকুমার মনে প্রায়ই বিচিত্র ভাবোদয় হোত্। এরকম অতি সুকুমার মানুষ দিলীপকুমার জীবনে বেশী দেখেননি পুরুষদের মধ্যে। গড়ন বলিষ্ঠ ও দীর্ঘাকৃতি হলেও স্বভাবে ছিলেন পেলব বা ডেলিকেট এবং বিফাইন্ড। অল্প গল্পে, রসিকতায় ও হাসিতে তিনি উজ্জ্বল হয়ে উঠতেন। হাসিতেও তাঁর জুড়ি মেলা ভার ছিল বাঙ্গা রসিকসমাজে। বাইরে ছিলে তিনি ফিস্টফাট, সুভদ্র, সুপুরুষ, স্বল্প ভাষী ও ঈষৎ তোতলা। তিনি একদিকে যেমন লক্ষ্ণৌর শ্রেষ্ঠ ব্যারিস্টার হিসাবে বহু টাকা উপায় করতেন আবার অফুরন্ত দানও করতেন। উদার বলতেন চমৎকার। অবাঙ্গালীদের মধ্যেও তাঁর বন্ধুর হিসাব ছিল না। যেমন উদার, তেমনি রসিক, তেমনি আতিথেয় ও বন্ধুবৎসল। লক্ষ্ণৌর প্রবাসী বাঙ্গালীদের তিনি ছিলেন সত্যিই মুকুট-মণি। বিবাহিত জীবনে অসুখী ও স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার জন্য তাঁর কুণ্ঠার সীমা ছিল না। কিন্তু এই বিরহকাতর মনের নিবিড় বেদনায় তাঁর গানের একটা গভীর দিক খুলে যায়। নিজের মনে গান বেঁধে সুর বসিয়ে নিজেই গাইতেন। কীভাবে তার সুন্দর ছবি এঁকেছেন তাঁর রচিত এই বাউলগানে—

'মিছে তুই ভাবিস্ মন, (তুই) গান লিখে
যা, গান গেয়ে যা আজীবন।'
পাখীরা বনে বনে, গাহে গান আপন মনে,
ওরে, নাইবা যদি কেহ শোনে, (তুই,
গান গেয়ে যা অকারণ।'

সুতরাং এহেন মানুষের সঙ্গে প্রীতির মালাবদল না হয়ে পারে? আলাপের ফলে দিলীপকুমার ভালবেসে ফেললেন অতুল-প্রসাদকে এবং তাঁর গীতোৎসুকতা ফুলে ফেঁপে উঠলো বানের জলের মত। দিলীপ-কুমারের সাঙ্গীতিক জীবনে অতুলপ্রসাদ শুধু যে অজস্র উৎসাহ দিয়েছিলেন তাই নয়—জুগিয়েছিলেন প্রাণের তথা গানের অপর্যাপ্ত খোরাক।

দিলীপকুমারের গান শুনে অতুল-প্রসাদ মহাখুসী। ঈষৎ সলজ্জে তিনি বললেন —আমি গং-গান বেঁধেছি দু চারটি। তাঁর এই ধরনের সুমিষ্ট ঈষৎ তোতলামি তাঁর স্বাভাবিক লাজুকতাকে ফুটিয়ে তুলত। অতুলপ্রসাদের দু-চারটি গান বাঁধার স্বীকারোক্তির রেশ টেনে দিলীপকুমার একটি আর্জি পেশ করলেন।—আপনার কাছে দু-একটা গান শিখব বিশেষ করে

নার, 'পাগলা মনটারে তুই বাঁধ'। শুনতে তাঁর স্বভাব কোমল মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে তোতুলামিও আরো স্ফুট। বললেন, 'ও গু-গানটি আমার বড়ো প্রিয় গান। তু-তোমার এত ভালো লেগেছে শু-শুনে কু-কী সুন্দর গাচ্ছে।' দিলীপকুমার জবাব দিলেন, 'বো আনন্দ হবে আমাকে শিখিয়ে দিলে।' দিলীপকুমারের পিঠে চাপড় দিয়ে বলে লেন অতুলপ্রসাদ, 'বাপ্ কা বেটা বটে। তিনিও এমনি সু-সহজে আলাপ জমান। তা শোনা—এ শাদামাটা ভৈরবী, তুমি স-সহজেই শিখে নিতে পারবে।' শুধু গান নয়, আরেকটি গানও সেদিন কণ্ঠস্থ করেছিলেন দিলীপকুমার। এই হোল দুজনের প্রথম পরিচয়ের মধ্যে প্রাথমিক আলাপের ভূমিকা। তারপর দিনের পর দিন সন্ধ্যে-সাঁঝ তাঁর বাড়ীতে গিয়ে দিলীপকুমার নেবা আসর জমাতেন। আগে নিজে গাইতেন পরে অতুলপ্রসাদ। গানও চলত, খাওয়া-দাওয়াও, সঙ্গে সঙ্গে গান শেখাও। দেখতে দেখতে দিলীপকুমার অতুলপ্রসাদের কাছ থেকে তাঁর রচিত পঁচিশ ত্রিশটি গান শিখে ফেললেন। দিলীপকুমারের কাছে অতুল-প্রসাদের গানের ভঙ্গি ছিল বিশেষ প্রিয়। বাংলা গানে হিন্দি ঠুংরির এ-আমদানী প্রথানে আপনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী'—এ-কথা একদিন ভোজে দিলীপকুমার বলতেন অতুল-প্রসাদকে উদ্দেশ্য করে।

'কু-কী যে বলো দিলীপ'—এই সসঙ্কোচোক্তি ছিল অতুলপ্রসাদের। একবার কলকাতায় এক গানের আসরে দুজনের দেখা হতেই অতুলপ্রসাদ দিলীপকুমারকে বললেন, 'তোমার কয়েকটি ছাত্রছাত্রী জুটেছে তাই তোমাকে উস্কে দিচ্ছি, তু-তুমি চলে যাও ঢাকায়। সেখানে রেণুকা সেনগুপ্ত বলে একটি মেয়ে আছে, সম্পর্কে সে আমার বু-বোন হয়। আহা কী গু-গান গায়। তাকে তুমি কিছু গু-গান শিখিয়ে যদি তোমার ছু-ছাত্র ছাত্রীদের দলে টানতে পার তো চু-চমৎকার হয়। অমন কণ্ঠ কু-কালে-ভদ্রে শোনা যায়। দিলীপকুমার যখন ঢাকাতে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বাড়ীতে অতিথি, তখন খোঁজ করে টিকাটুলিতে রেণুকার বাড়ী গিয়ে তার গান শুনে মুগ্ধ হয়ে সেদিন রেণুকা গেয়েছিলেন দিলীপ-কুমারের সেই প্রিয় অতুলপ্রসাদী গান—'পাগলা মনটারে তুই বাঁধ।' দিলীপকুমারের মতে রেণুকার ছিল খাঁটি কীর্তনের গলা, যেমন উদাত্ত তেমনি মধুর। এই কথা পরে অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল যেদিন গান-পাগল বাঙালীরা রেণুকা সেনগুপ্তর গাওয়া 'পাগলা মনটারে' আর অপর পিঠে শ্রীকৃষ্ণ গোকুলচন্দ্র গান দুটি স্বয়ং অতুল-প্রসাদের তত্ত্বাবধানে রেকর্ড হয়ে বাজারে বেরুল। বলা বাহুল্য, ঢাকাতেই রেণুকা দিলীপকুমারের ছাত্রীর দলে ভিড়ে ছিলেন ও সঙ্গে ছিলেন ঢাকার আরেকজন সুকণ্ঠী,

লক্ষ্ণৌর খানদানি সমাজের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে অতুলপ্রসাদ

তিনি উত্তরকালে সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুর স্ত্রী হন অর্থাৎ প্রতিভাদেবী। এঁরা দুজনে দিলীপকুমারের কাছে অজস্র গান—অতুল-প্রসাদের, কাজী নজরুলের এবং স্বয়ং দিলীপকুমারের রচিত গান শিখে ঢাকার আসর মাতিয়ে রেখেছিলেন।

(ছয়)

লক্ষ্ণৌতে অতুলপ্রসাদের সান্নিধ্য শুধু গানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, হাস্য-কৌতুক, পরিহাসে অতুলপ্রসাদ ছিলেন অদ্বিতীয়। রবীন্দ্রনাথের বাড়ীতে 'খাম-খেয়ালী সভায়' রসে-গানে-ভরা দিনগুলির প্রসঙ্গ উঠলে অতুলপ্রসাদ-দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান গাওয়ার ও সেই সঙ্গে তাঁর নিজের দোহার দেওয়ার স্মৃতিগুলি যেন জীবন্ত হয়ে উঠত। অতুলপ্রসাদ 'খাম-খেয়ালী সভাকে' একটা ডাক-নামে উল্লেখ করতেন—'ডাকাতে ক্লাব' বলে। একদিন গল্পচ্ছলে অতুলপ্রসাদ দিলীপকুমার ধূর্জটিপ্রসাদ প্রভৃতির উদ্দেশ করে বললেন, 'তোমাদের কাছে আগেই বলেছি—ডাকাতে ক্লাবের কথা। আজ একটি ঘটনার কথা হঠাৎ মনে পড়ছে।' আমি ছিলাম সে ক্লাবের সর্ব-কনিষ্ঠ মেম্বার। একদিন গানের আসর সে ক্লাবে দারুণ জমেছে। আমি শেষে গাইলাম যে গানটি সেই আসরে, সেদিন সেটি তোমাদের শেখালাম—বলেই ধরে দিলেন—'আমার মনের ভুল দুয়ারে সহসা তুমি কে গো, তুমি কে? নন্দন আভা-বেষ্টিত তনু উজ্জ্বল নিজ আলোকে, তুমি কে গো তুমি কে?'—একটা লাইন গেয়ে একটু থেমে অতুলপ্রসাদ আবার বললেন, 'তারপর কি হোল জানো? রবিবাবু খুশী হয়ে মাথা নাড়লেন, দ্বিজুবাবু হেসে বললেন,—ত্রিভঙ্গ রহো। আমার মন একেবারে আহ্লাদে আটাডোরখানা। বুঝতেই পাচ্ছ, আমি তখন সবে গান বাঁধা সুরু করেছি—সেখানে গেয়েছিলাম ভয়ে ভয়ে—ভুল হবে না? শ্রোতা কে? স্বয়ং রবিবাবু, গগনবাবু বাবু দ্বিজুবাবু, লোকেন পালিত, সুরেশ সমাজ-পতি, অবনবাবুরা সব ঠাকুর-বাড়ীর গুণীরা, লালচাঁদ বড়াল প্রভৃতি সব দিকপালেরা। আমার তখন সবে গোঁফ উঠেছে। আমি অল্পবয়সেই ব্যারিস্টারী সুরু করি তো। এহেন আমি, বুঝলে না? উচ্ছল হয়ে উঠলাম সকলের প্রশংসা ও হাততালি পেয়ে। মনে হোলো গানটি উৎরেছে বটে। এমন সময় ঘরের ওদিকে বারান্দায় বসে-ছিলেন নাট্যোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় —ডাকলেন আমাকে হাতছানি দিয়ে। আমি দুরু দুরু বক্ষে কাছে গেলাম—তিনিও বাহবা দেবেন—আমাকে আন পায় কে? আমি আসতেই তিনি আমার ঘাড় ধরে নিজের মুখের কাছে টেনে নিয়ে ফিসফিস্ করে বললেন—'কে-ব্যা?'—বলেই অতুলপ্রসাদ হো হো করে হেসে উঠলেন। সে প্রাণখোলা হাসি যে শুনেছে একবার সে জীবনে সে হাসি ভুলতে পারে না—মনের সব গুমোট কেটে যেত তাঁর হাসির এই দমকা হাওয়ায়।

(সাত)

অতুলপ্রসাদের এই বিখ্যাত আসর-কাঁপানো গম্ভীর গলার হো-হো শব্দে প্রাণ-খোলা হাসির কথায় আরেকটা ঘটনার কথা মনে পড়লো। তাঁর চেম্বারের যে দপ্তর বা অফিস ছিল, জনৈক মধ্যবয়সী এক বঙ্গ-সন্তান তার ভারপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। ভদ্র-লোকটি খুব ফিটফাট ও সৌখীন প্রকৃতির ছিলেন। রোজ অফিসে আসতেন ফর্সা কোঁচানো ধুতি, সার্ট-এর উপরে এবং সর্বোপরি গলাবন্ধ ইস্ত্রিকরা এক কোট গায়ে দিয়ে। কোটের উপরে এক কাঁধের উপর ভাঁজ করা ঝুলন্তো পাট করা ফর্সা উড়ুনী। এই ছিল তাঁর গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত নির্বি-শেষে একই পোশাক বা অফিসিয়াল ড্রেস। এহেন পরিধেয় গ্রহণ করে, পরিপাটি রূপে কেশ প্রসাধনান্তে মোটাসোটা, গোলগাল চেহারার এই ভদ্রলোকটির দেহ সৌষ্ঠবকে আরও উজ্জ্বল করার জন্য ঝকঝকে একটি, যেমন লম্বা তেমনি মোটা, সোনার হাত ঘড়ি

চেন পরে আসতে কোনদিন ভুলতেন না। ভদ্রলোকটির দপ্তরী নাম ছিল 'বড়বাবু'। তাঁর এই বিরাট সোনার চেনটির দৈর্ঘ্যের এক প্রান্তে একটি বড় গোল সোনার ঘড়ি বাঁধা থাকত এবং গলায় হার পরার মত চেনটি প্রথমে গলায় জড়িয়ে তারপর একটি হাতের তলা দিয়ে টেনে এনে বুকের উপর দিয়ে অন্য কাঁধকে বেষ্টন করে ঘড়িবাঁধা অংশটুক, কোটের সামনের দিকে বুক পকেটে ঘড়ি-সহ রাখা হোত। তাঁর বিচারে সোনার ঘড়ি ও সোনার চেনকে সাবধানে ও সন্তর্পণে রক্ষা করার এই কৌশলটা বিশেষভাবে বিপদ-নিরোধক ছিল। যাহোক, তাঁর এই সোনার চেন ও বাঁধার কৌশল বা কায়দাটি দপ্তরের অনেকের হাসির উদ্রেক করতো এবং বড়-বাবুর অজ্ঞাতে টীকা-টিপ্পনীরও অভাব হোত না। অবাঙ্গালী কর্মচারীরা তাদের মাতৃভাষায় যা বলতো তার অর্থ গিয়ে দাঁড়ায় গিন্নির হাতে সোনার চেনটির একপ্রান্ত ধরিয়ে দিয়ে অন্যপ্রান্ত নিজের গলায় বেঁধে সন্ধ্যায় গোমতী নদীর ধারে তাঁরা বিহার করতে যান। যাহোক, এই লম্বাচোটা সোনার চেন এবং সেটা পরার কায়দা দেখে অতুল-প্রসাদ মনে মনে হাসলেও কোনদিন বড়-বাবুকে কিছু বলেন নি বা প্রশ্ন করেননি। বড়বাবুর গৃহিনীর এদিকে আবার 'বন্ধন-পটিয়সী' বলে লক্ষ্ণৌয় বাঙ্গালী সমাজে নাকি খ্যাতি ছিল। তিনি নানা সুখাদ্য ও বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরি করে যাদের খাইয়েছেন তারা জীবনে আর ভোলেনি। বড়বাবুর গিন্নির খুব ইচ্ছা অতুলপ্রসাদকে একদিন বক্তৃতাতে নেমন্তন্ন করে এনে তাঁর নিজের হাতের রান্না খাওয়ান। হুকুম তামিল করতে স্বামী তথা বড়বাবু গিন্নির হয়ে আর্জি পেশ করলেন স্বয়ং অতুলপ্রসাদের কাছে। আর্জি মঞ্জুরও হলো এবং নির্ধারিত এক ছুটির দিনে সান্ধ্যভোজের নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য অতুলপ্রসাদ বড়বাবুর বাড়িতে উপ-স্থিত হলেন। কর্তা গিন্নী সসম্মানে অতুলপ্রসাদকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে বসালেন এবং যথাকালে তাঁকে ভোজনের টেবিলে নিয়ে গেলেন। অতুলপ্রসাদ দেখেন বিরাট ব্যবস্থা নানা ধরনের অন্ন, ব্যঞ্জন ও খাদ্য-সামগ্রীর। এত খাবার খেতে তিনি পারবেন না বলে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে কয়েকটা বিশেষ পদ খেতে শেষ পর্যন্ত বাকী হলেন। খাবার পরিবেশন করতে লাগলেন স্বয়ং গৃহকর্ত্রী। হঠাৎ অতুলপ্রসাদের চোখে পড়ল গৃহকর্ত্রীর বিরাট কোমরকে সাপের মত জড়িয়ে আছে একটি মোটা লম্বা সোনার গোট। পরদিন বড়বাবু যখন অতুলপ্রসাদের দপ্তরে এলেন, তিনি তাঁকে গতকালের ভোজের জন্য আবার অনেক ধন্যবাদ দিয়ে ও রান্নার খুব তারিফ করে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা বড়বাবু, আপনাকে রোজই দেখি একটা লম্বা মোটা সোনার চেন লাগিয়ে অফিসে আসেন। গতকাল আপনার বাড়ীতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে দেখলাম আপনার গিন্নীও ঐ ধরনের একটা মোটা সোনার গোট কোমরে বেঁধেছেন।' বড়বাবু সলজ্জভাবে বললেন—আজ্ঞে, আমি আমার পকেটে রাখা সোনার ঘড়িতে যে মোটা সোনার চেনটা পরে রোজ সকালে অফিসে আসি, বাড়ী ফিরে গিয়ে সেই সোনার চেনটাই আমার স্ত্রী কোমরে গোট হিসাবে পরেন পরদিন সকাল পর্যন্ত—বলেই বড়বাবু লজ্জায় লাল হয়ে ওঠেন। শুনে অতুলপ্রসাদ হো হো করে হেসে উঠে বড়বাবুকে বললেন—তাহলে দেখছি আপনার ঘড়ির চেন সকালে হয় 'হি-গোট' আর বিকেলে আপনার বাড়ীতে সেটা হয় 'শী-গোট'—বলেই আবার হাসিতে ফেটে পড়লেন।

শেষের দিকে অতুলপ্রসাদ রক্তচাপ বৃদ্ধি রোগে অনেকদিন ভুগেছেন এবং ঐ রোগেই ১৯৩৪ সালে ২৬ আগস্ট তাঁর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। রক্তের চাপ খুব বাড়ার ফলে যখন শয্যাশায়ী, তখনও তিনি ঠিক তেমনিই প্রাণখোলা সদানন্দ—কথায় কথায় হো হো করে হাসি। কাজের লোকেরা কতবার তাঁকে বলেছে আপনার এত জোরে হাসা উচিত নয়, ডাক্তাররা বারণ করেছেন। রক্তের চাপ এত বেশী। তিনি তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়েছিলেন—না হেসে পাঁচা হয়ে বাঁচার দরকারই বা কী বলো? শুনবে সারাকাল আমার কি মনে হয়? ভাবি যেদিন আমাকে খাটিয়াতে করে সবাই মিলে গম্ভীর মুখে শ্মশানে নিয়ে যাবে, সেদিন আমি একটিবার হঠাৎ টুপ করে উঠে বসে ফিক্ করে একগাল হেসে 'তবে শয্যা নেব—তার আগে নয়।' একথা বলার অধিকারী ছিলেন এই সদা প্রফুল্ল মানুষটি যিনি সকলকে চিরদিন আনন্দই পরিবেশন করে এসেছিলেন। বেদনাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন তাঁর মনের পর্দার আড়ালে। তিনি প্রায়ই এলা হুইলার উইলককস-এর সেই বিখ্যাত লাইনটি আবৃত্তি করতেন—'লাফ, অ্যান্ড দি ওয়ার্ল্ড লাফস উইথ ইউ, উইপ, অ্যান্ড ইউ উইপ এলোন।'

রসিক চূড়ামণি অতুলপ্রসাদের সরস মন ও তৎপরতার সঙ্গে হাস্যোদ্দীপক সূক্ষ্ম রসবোধের আরেকটি ঘটনার কথা এখানে বলি।

অতুলপ্রসাদের সঙ্গে বিলাতে সুবোধ-চন্দ্র নামে একটি বাঙ্গালী যুবকের পরিচয় হয় এবং সেটি ক্রমশঃ প্রগাঢ় বন্ধুতে পরিণত হয়। সুবোধচন্দ্র বিস্তারিত পরিচয় নীচে পাদটিকায় দেওয়া হোল। এখানে শুধু এঁদের দুজনের সম্বন্ধে এইটুকু বলেই হবে যে উভয়েরই পৈত্রিক দেশ ছিল সেকালের পূর্ববঙ্গে অর্থাৎ এখনকার বাংলাদেশে। বিলাতে আসার আগে তাঁরা দুজনেই কলকাতায় কলেজের ছাত্র ছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়তে পড়তে অতুল-প্রসাদের ডিগ্রি পরীক্ষা দেবার আগেই সুযোগ পেয়ে বিলাতে চলে আসেন, সুবোধচন্দ্রও ডিগ্রি পরীক্ষার অনেক পূর্বেই কলকা মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসা শাস্ত্র পাঠ গ্রহণ করার পূর্বেই বিলাতে আসেন। বয়সে চার সাড়ে চার বছর সুবোধচন্দ্র অপেক্ষা ছোট হলেও বিল অতুলপ্রসাদ সুবোধচন্দ্রের এক বছর অগ্রগামী ছিলেন, অর্থাৎ অতুলপ্র ব্যারিস্টার পড়তে ইংল্যান্ড হয়ে ১৮৯৩ সা ও সুবোধচন্দ্র ১৮৯১ সালে এডিনব বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজে চিকিৎসা শা পড়তে ইংল্যান্ড হয়ে স্কটল্যান্ড য ছাত্রাবস্থায় দুজনের যখন পরিচয় ও বন্ধু তখন অতুলপ্রসাদ সম্ভবত ২২।২৩ বছরে এবং সুবোধচন্দ্র ২৬।২৭ কিম্বা আর কিছু বেশী বয়স্ক যুবক। অতুলপ্রস ১৮৯৫ সালে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফি এলেও স্কটল্যান্ডে আত্মীয়াকে বিবা করতে আবার ১৯০০ সালে বি যা এবং ১৯০২ সালে সপরিবারে দেশে প্রত্যাগমন করেন। সুবোধচন্দ্র এডিনবর থেকে শারীর বিজ্ঞান (ফিজিওলজি অসামান্য কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ ও গবেষণ সাঙ্গ করে ও অতিরিক্ত তিন বছর কাল কাডাভিফ বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীর বিজ্ঞানের অধ্যাপকের কার্য শেষ করে দশ বছর পর ১৯০১ সালে চৌত্রিশ বছর বয়সে দেশে ফিরে এলেন। ১৯০২ সালের অক্টোবরের শেষাশেষি বহুদিন পর দার্জিলিং শহরে সেই বরফ পড়া ভীষণ শীতের দিনে বেড়াবার রাস্তায় হঠাৎ দুই বন্ধুর দেখা। দূর থেকে অতুলপ্রসাদ সেন, ফেল্টের ও বেশ পাওয়ারযুক্ত সদা কাঁচের চশমাধারী এবং ভারী ওভারকোট পরা ও মাথায় বিলাট টুপিকে দূর থেকে নুইয়ে কান ঢেকে এক বিশাল বহু ভদ্রলোক যাঁর পদক্ষেপে তাঁরই দিকে একটি ভদ্রলোক ভর দিয়ে পাহাড়ী রাস্তা বেয়ে উপরে উঠে আসছেন দেখে নিজের গতি একটু কমিয়ে দিলেন। কাছে আসতেই পরস্পর পরস্পরকে চিনতে পেরে পরস্পরকে আগে প্রীতির সঙ্গে আলিঙ্গন ও কুশল বিনিময়ের পালা শেষ করে একই প্রশ্ন করেন—এই শীতকালে আপনি এখানে? অতুলপ্রসাদই আগে প্রশ্নের জবাবে বলেন—আপনি হয়তো শুনে থাকবেন বিলাতে পাঁচ বছর থেকে ১৮৯৫ সালে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে এসেছিলাম দেশে এবং কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করার জন্য নামও লিখেছিলাম। কিন্তু বিধিবাম তাই ব্যবসা জমাতে না পেরে বিলেতে গিয়ে আইন ব্যবসা করবো ঠিক করে ১৯০০ সালে আবার লণ্ডনে ফিরে যাই। তাছাড়া বিলাতে দ্বিতীয়বার যাবার আরেকটি বিশেষ কারণও ছিল। আমার বাগদত্তা কন্যাটি তখন বিলাতে ছিলেন। তাঁকে কথা দিয়েছিলাম কলকাতায় ব্যারিস্টারীতে একটু পসার জমিয়েই তাঁকে বিবাহ করবো। পাঁচ বছরে পসার জমাতে পারলাম না ওদিকে অন্য পক্ষ থেকে তাগাদাও আসতে লাগলো।

(আগামী সংখ্যায় শেষ হবে)

শাক্য রাজধানী কপিলবস্তু

শ্রীরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

শাক্য রাজধানী কপিলবস্তুর অদূরে স্বর্ণী কাননে সিদ্ধার্থ বা গৌতম বুদ্ধের জন্ম কাহিনীর বহু বিবরণ বৌদ্ধ সাহিত্যে পাওয়া যায়। ভগবান বুদ্ধের জন্মের কয়েক শ বৎসর পর ২৪৯ খৃঃ পূর্বাব্দে মৌর্য সম্রাট অশোক তাঁর গুরু উপগুপ্তের সঙ্গে এই পবিত্র স্থানটি দর্শন করতে এসেছিলেন। এই তীর্থ ভ্রমণের সাক্ষ্যস্বরূপ তিনি এখানে একটি চৈত্য ও বুদ্ধের জন্মস্থান নির্দেশক শিলালিপি যুক্ত একটি স্তম্ভ স্থাপন করে গিয়েছিলেন। অশোকের এই তীর্থযাত্রা কালে লুম্বিনী একটি জনবসতি পূর্ণ স্থানে পরিণত হয়েছিল। সম্রাট অশোক এই গ্রামবাসীদের কর-ভার থেকে মুক্ত রেহাই পাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। বুদ্ধদেবের জন্মস্থান হিসাবে বহু শত বৎসর ধরে লুম্বিনী সমগ্র জগতের বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীদের পক্ষে একটি অবশ্য দর্শনীয় তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছিল। খৃষ্টিয় পঞ্চম শতাব্দীও সপ্তম শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ চীনিক পরিব্রাজকদ্বয় ফা-হিয়েন ও হিউ-এনসাঙ তাঁদের আরও একজনের সঙ্গে লুম্বিনী দর্শন করেন। তাঁদের স্ব-স্ব ভ্রমণ বিবরণীতে এর বিস্তৃত উল্লেখ আছে।

ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রায় অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধ জন্মস্থান লুম্বিনীর স্মৃতি জনমন থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। গত শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত স্থানটি ছিল ঘন জঙ্গল দ্বারা আবৃত। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে উৎখননের ফলে বুদ্ধ জন্মস্থান নির্দেশক অশোক নির্মিত ও ভগ্ন স্তম্ভও শিলালিপি থেকে এর অস্তিত্বের বিষয়টি পুনরুদ্ঘাটিত হয়। অশোক স্তম্ভটি হিউ-এন-সাঙের লুম্বিনী দর্শনের পূর্বেই বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ হয়েছিল। বর্তমানে শিলালিপি যুক্ত ১০২ ফিট উচ্চ অশোক স্তম্ভ ও এর পাশেই একটি শুধু সরোবর আছে। কথিত আছে এই সরোবর সলিলেই সদ্যোজাত সিদ্ধার্থকে স্নান করানো হয়েছিল। সরোবর তীরে একটি নাকি প্রাচীন মন্দির আছে—এটি মায়াদেবীর মন্দির নামে খ্যাত। মন্দিরস্থিত একটি প্রস্তর ফলকে সিদ্ধার্থের জন্ম বৃত্তান্তটি চিত্রায়িত হয়ে আছে। ঐতিহাসিকদের মতে এই ভাস্কর্যটি বর্তমান মন্দির থেকে বহু প্রাচীন। সম্ভবতঃ প্রাচীন মায়াদেবীর মন্দিরটি পুনঃ পুনঃ বৌদ্ধ সাহিত্য প্রসিদ্ধ লুম্বিনীর বর্তমান নাম রুম্মিনদেই। এটি বর্তমানে ভারত সীমান্ত থেকে অল্পদূরে নেপাল রাজ্যের বিথরী জেলায় অবস্থিত। পূর্বোত্তর রেলওয়ের নওগড় নৌতুলোয়া স্টেশনের থেকে এর দূরত্ব যথাক্রমে ২০ ও ১০ মাইল। এই দুই স্টেশন থেকেই লুম্বিনী যাওয়ার বাস পাওয়া যায়। আধুনিককালে লুম্বিনীতে আরও কিছু পুরাকীর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে।

বুদ্ধ জন্মস্থান লুম্বিনীর অবস্থিতি সঠিক জানা গেলেও শাক্য রাজধানী কপিলবস্তু কোথায় ছিল এটি ঠিক জানা যায়নি, অথচ ইতিহাসের প্রয়োজনে এটি জানা প্রয়োজন। রাজকুমার সিদ্ধার্থ এই কপিলবস্তুর রাজপ্রাসাদেই পিতা-মাতার স্নেহ-লালিত হয়ে যৌবনে পদার্পণ করেন। তারপর একদিন প্রায় ২৯ বৎসর বয়সে নবজাত পুত্র রাহুল, যুবতী পত্নী যশোধরা, বৃদ্ধ পিতা শুদ্ধোদন এবং প্রিয় প্রজাবৃন্দের মায়া কাটিয়ে কপিলবস্তু, প্রাসাদের ভোগ সুখ উপেক্ষা করে অজ্ঞাত আনন্দময় নির্বাণের উদ্দেশ্যে রাত্রির অন্ধকারে অজানা পথে পদক্ষেপ করেছিলেন।

লুম্বিনীর সন্ধান পাওয়ার পর থেকেই ঐতিহাসিক ও প্রত্নবিদেরা কপিলবস্তুর অবস্থিতি নির্ণয়ের চেষ্টা করে এসেছেন। এঁদের একদলের মত এই যে রুম্মিনদেই বা লুম্বিনীর থেকে ১৬ মাইল দূরবর্তী, তিলৌরাকোটই প্রাচীন কপিলবস্তু। এই স্থানটি নেপাল রাজ্যের তৌলিহাওয়া জেলায় অবস্থিত। এই স্থানটি পরিখা ও প্রাকারে বেষ্টিত দেখতে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে শত্রাবতী থেকে কপিলবস্তুর দূরত্ব ছিল ৮০।৯০ মাইল, এই সাক্ষ্যের ভিত্তিতে গত শতাব্দীর শেষ ভাগে ফুরার এবং পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তিলৌরাকোটকেই কপিলবস্তু রূপে ঘোষণা করেন। ইতিপূর্বে ১৮৬৩ খৃঃ কানিংহাম শত্রাবতীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেছিলেন।

হিউ-এন-সাঙের বিবরণের ভিত্তিতে ঐতিহাসিক ভিসেন্ট স্মিথও এই মতটির সমর্থক ছিলেন। ১৯৬২ খৃঃ বঙ্গ-মহিলা ডঃ দেবলা মিত্র কর্তৃক এই স্থানে উৎখননের ফলে যে সব প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছিল সেগুলি সবই বুদ্ধপরবর্তী সময় মৌর্য কালীন। বুদ্ধের সমসাময়িক কালের এমন কোন প্রত্নবস্তু এখানে পাওয়া যায়নি যার থেকে এই স্থানের সহিত কপিলবস্তুর অভিন্নতা প্রতিপন্ন হতে পারে। বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে অন্য একদল ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক তিলৌরাকোটের দাবী বরাবরই নস্যাৎ করে দিয়ে উত্তর-প্রদেশের বস্তী জেলায় অবস্থিত পিপরাওয়া নামক স্থানটিকেই কপিলবস্তুর অবস্থিতি স্থান বলে ঘোষণা করে আসছেন। এর কারণ এই যে পপ্রাওয়ার একটি ঢিপ খুঁড়তে গিয়ে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে একটি বিরাট প্রস্তরাধার বা পেটিকা উদ্ধার করা হয়। এই আধারের মধ্যে আরও পাঁচটি পেটিকায় মৌর্য যুগের বহু প্রত্ন নিদর্শন রক্ষিত ছিল, একটি পেটিকার প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপিতে কিছু লিখিত ছিল। প্রত্ন লিপিতত্ত্ববিদ ফ্লীট এই লিপির পাঠোদ্ধার করেছিলেন। তাঁর মত ছিল পেটিকার লিপির অর্থ এই যে এতে শাক্যদেবের দেহাবশেষ রক্ষিত। বুদ্ধদেবের পরিবর্তে শাক্যদেব এই পাঠ থাকায় অনেকেই এটি বুদ্ধদেবের দেহাস্থি বলে স্বীকার করেন নি। পিপরাওয়া থেকে প্রাপ্ত প্রস্তরাধার ও প্রত্ন বস্তুগুলি কলিকাতার মিউজিয়ামে রক্ষিত হয়েছিল। ফা হিয়েনের বিবরণে প্রদত্ত কপিল বস্তু ও লুম্বিনীর যে দূরত্ব তার সঙ্গে পিপরাওয়া ও লুম্বিনীর দূরত্বের ঐক্য আছে।

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডঃ দেবলা মিত্রের তিলৌরাকোট উৎখননের ফলে তিলৌরাকোট ও কপিল বস্তুর অভিন্নতা প্রতিপাদন করা সম্ভব হয়নি। শ্রীমতী মিত্র অতঃপর এই মত প্রকাশ করেন যে ফাহিয়েন প্রদত্ত কক্কুচ্ছন্দ বুদ্ধ ও কনক মুনির জন্মস্থল ও গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থল থেকে কপিলবস্তুর দূরত্বের হিসাবের সঙ্গে বর্তমান পিপ্রাওয়ার দূরত্বের হিসাব মিলে যাওয়াতে মনে হয় যে পিপরাওয়ার এবং সংলগ্ন গানওয়ারি গ্রামের উৎখনন থেকেই এর সঙ্গে কপিল বস্তুর অভিন্নতা প্রমাণিত হবে, কারণ এই দুই স্থানেই মাইলের পর মাইল সুউচ্চ ঢিপি রয়েছে, যা কখনও সম্যগভাবে উৎখনিত হয় নি। গত শতাব্দীর শেষ ভাগে ডাঃ পেপির আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুগুলির সাক্ষ্যও উপেক্ষনীয় নয়। অন্যতম বিভাগীয় অধ্যক্ষ ডঃ শ্রীমতী দেবলা মিত্রের এই মন্তব্যের পর ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ থেকে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমুরারি শ্রীবাস্তবের পরিচালনায় ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে পিপরাওয়াতে উৎখনন কার্য আরম্ভ হয়। উত্তর প্রদেশের বস্তি জেলার পিপরাওয়া একটি মহকুমা শহর। (তহশীল), এখানে পূর্বোত্তর রেলপথের একটি স্টেশনও আছে। উৎখননের ফলে কিছু দিনের মধ্যেই এখানে একটি সংঘারামের ধ্বংসাবশেষ ও লিপি যুক্ত পেটিকা আবিষ্কৃত হয়। এই বিশেষ পেপি পূর্বোক্ত প্রত্নবস্তুসমূহ উদ্ধার স্থানটি থেকেই ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে ডাঃ করেছিলেন। তবে এগুলি পাওয়া গিয়েছিল মৃত্তিকাস্তরের উপরের দিকে। এবার উৎখনন পরিচালিত হয়েছিল মৃত্তিকার গভীরতর স্তরে এবং প্রথম বৈজ্ঞানিক রীতিতে। প্রথম আবিষ্কৃত সংঘশ্রীবামটিকে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ পূর্ব সংঘবাম নামে চিহ্নিত করেছেন। কারণ এর পশ্চিমে-উত্তরে ও দক্ষিণে আরও তিনটি সংঘারামের ধ্বংসাবশেষ এই উৎখননের ফলে পাওয়া গিয়েছে। এই চারিটি সংঘারামের কেন্দ্র স্থলে উঠানের মত জায়গায় একটি স্তূপ পাওয়া গিয়েছে ঠিক এই স্তূপের উপরিভাগ থেকেই পেপি আবিষ্কৃত বিরাট প্রস্তারাধারটি পাওয়া গিয়েছিল। অনাবৃত স্তূপটির দিকে যাওয়ার জন্য দক্ষিণভাগে অবস্থিত সংঘারাম থেকে যাওয়ার জন্য চতুরটুকুও ইষ্টক নির্মিত দেখা গিয়েছে। এই ধ্বংসস্তূপ খননকালে ৮ থেকে ১০

হাত গভীর মৃত্তিকা থেকে সীল বা মাটির ছাপ পাওয়া গিয়েছে, এগুলিতে 'ও', দেবপুত্র বিহার, কপিলবস্তু ভিক্ষু সংঘধ্য' ইত্যাদি শব্দ উৎকীর্ণ রয়েছে। একটি পাত্রের ঢাকনাতেও কপিল বস্তু শব্দটি উৎকীর্ণ আছে। ভগবান বুদ্ধের দেহবসানের পর তাঁর ভস্মাবশেষ অধিকার নিয়ে ভীষণ কলহ উপস্থিত হয়, এই দাবীদারদের মধ্যে ছিলেন রাজগৃহের সম্রাট অজাতশত্রু, বৈশালীর লিচ্ছবি, পাবার মল্ল, কপিলবস্তুর শাক্য, রামগ্রামের কোলীয় ও পিপ্পলীবনের মৌর্যজাতি প্রভৃতি। দ্রোণ নামক এক ব্রহ্মণের মধ্যস্থতায় ভস্মাবশেষ ৮ ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। প্রত্যেকেই এই দেহাবশেষ স্ব স্ব রাজ্যে নিয়ে গিয়ে তার উপর স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন।

অনুমান করা যেতে পারে যে কপিল বস্তুর শাক্যগণের দ্বারা সংগৃহীত ভস্মাবশেষের উপর পূর্বোক্ত স্তূপ ও তার চারিপাশে চারিটি সংঘারাম নির্মিত হয়েছিল। এইবার উৎখননের সময় ও স্তূপের অভ্যন্তর থেকে ভস্মাধার সমন্বিত খড়ি পাথর নির্মিত একটি আর একটি পেটিকা পাওয়া গিয়েছিল। উৎখনন বিশেষজ্ঞদের মত এই যে বুদ্ধদেবের ভস্মাধারের উপর নির্মিত এই স্তূপটি স্থাপিত হওয়ার পর বারে বারে সংস্কৃত হয়েছে। খ্রীঃ পূঃ ২।৩ শতাব্দীতে বুদ্ধদেবের ভস্মাধারটিও জীর্ণ হয়ে যাওয়াতে বদলে দেওয়া হয়েছিল এবং এই জন্যই ডঃ পেপি আবিষ্কৃত ভস্মাধারের উৎকীর্ণ লিপিটি বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পরবর্তী কালের ব্রাহ্মী লিপি (খৃঃ পূঃ ২।৩য় শতাব্দী) বলে নির্দিষ্ট হয়েছিল। ডঃ পেপি আবিষ্কৃত ভস্মাধারের উপর ব্রাহ্মী লিপিতে এই কথাগুলি উৎকীর্ণ ছিল 'সুকিতি ভাতিনম্ স ভগিন্যকিনাম স পু দলনম ইয়ম সলিল নিধানে বুধস্য শকীয়নাম'। ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিত এর ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যাখ্যা করেছেন—তবে সাধারণ ব্যাখ্যা এই যে 'এটি গবান বুদ্ধের দেহাবশেষ, তাঁর ভ্রাতা ভ্রাতৃবধূ, ভগিনী, তাদের পুত্র কন্যাগণ ও তাঁর জ্ঞাতিগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।'

উৎকীর্ণ লিপির কালের সঙ্গে বুদ্ধদেবের মৃত্যুকালের ব্যবধান থাকায় এই ভস্মাধার ও পিপরাওয়া স্তূপের সঙ্গে বুদ্ধের সংস্রবকে যাঁরা অসম্ভব বলেছিলেন স্তূপটির পুনঃ পুনঃ সংস্কার সাধনের প্রত্যভাত্ত্বিক তাঁদের যুক্তি খণ্ডিত করে দিচ্ছে।

ডঃ পেপি আবিষ্কৃত ভস্মাধারের লিপিটি মূল ভস্মাধারের গাত্রে উৎকীর্ণ লিপিটিরই অনুসরণ ছিল এতে সন্দেহ নেই। স্তম্ভ চতুর্দিকস্থ বিহারগুলির মধ্যে একটি ধ্বংসাবশেষ থেকে 'ওঁ দেবপুত্র বিহার কপিলবস্তু' এই লিপি যুক্ত কয়েকটি ছাপ পাওয়া গিয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারমাইকেল অধ্যাপক—ডঃ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতে এই দেবপুত্র বিহারের উদ্দিষ্ট দেবপুত্র কুষাণ রাজ হুবিষ্ক (খৃঃ ১ম।২য় শতাব্দী) এই সময়ে শ্রাবস্তী অঞ্চলেও কুষাণ শক্তির প্রসার ঘটেছিল তার প্রমাণ আছে।

পিপরাওয়ার উৎখননের ফলে এটি প্রমাণিত হল যে এখানেই কপিলবস্তুর শাক্যগণ তাঁদের অংশ হিসাবে প্রাপ্ত ভগবান বুদ্ধের দেহাবশেষের উপর একটি স্তূপ নির্মাণ করেন এবং একে কেন্দ্র করেই এর চারপাশে উত্তরকালে বৌদ্ধ সংঘারামগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যার মধ্যে একটি এই দেবপুত্র বিহার। কোন স্থান নামে প্রসিদ্ধ সংঘরাম ঠিক সেই স্থানে অবস্থিত থাকে না, জনবহুল এলাকার বাইরেই সেটি প্রতিষ্ঠিত হয়, ইতিহাসের এই শিক্ষায় অভিজ্ঞ ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্মীরা এবার মূল কপিলবস্তু নগরের সন্ধানে তৎপর হয়ে উঠেন। পিপরাওয়ার উৎখনিত এলাকার এক মাইলের মধ্যে দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে উচ্চ ঢিপিতে আচ্ছন্ন এলাকায় রয়েছে বর্তমানের গানওয়ারি গ্রাম। ডঃ দেবলা মিত্রেরও লক্ষ্য ছিল এই এলাকার উপর। অতঃপর এইবার এই এলাকায় প্রত্ন বিভাগের পরিচালনায় উৎখনন আরম্ভ হয়। এর ফলে দুটি অতি বৃহদায়তন অট্টালিকা শ্রেণীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়ে পড়ে। পশ্চিম অংশের অট্টালিকা একটি সুবিস্তৃত অঙ্গনের চতুর্দিকে বিস্তৃত অলিন্দ সমন্বিত ২৮টি কক্ষযুক্ত। এই কক্ষগুলির তলদেশ বা মেঝে শক্ত ইঁট ও চুন দিয়ে বাঁধানো। এই কক্ষমালার একটি নিভৃত অংশে একটি কক্ষের গঠন চাতুর্য থেকে মনে হয় যে এটি ছিল অন্তঃপুরিকাদের স্নানাগার।

পশ্চিম অংশের এই অট্টালিকার চারিদিকে রয়েছে দুটি প্রাচীর। অট্টালিকার প্রবেশ দ্বার সংলগ্ন বহিঃপ্রাচীরটি প্রস্থে প্রায় সাড়ে ছয় ফুট, ভিতর দিকের বেষ্টনীর প্রাচীর প্রস্থে প্রায় পাঁচ ফুট। এই ধ্বংসাবশেষের কিছু দূরে উত্তর পূর্বভাগে আর একটি অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে—এটি ২১টি কক্ষযুক্ত। এখানেও একটি স্নানাগারের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। এই দুটি অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ থেকেই মাটির তৈরী মানুষ ও জীবজন্তুর মূর্ত (টেরাকোটা), মাটি নির্মিত চক্র, স্ফটিক নির্মিত মালা, বহু মূল্যবান ও কম মূল্যের মণিরত্ন, ছুরি, পাথরের ওজন, তাম্র ও রৌপ্য মুদ্রা, নারীদের ব্যবহার্য পায়ের মল, চীনামাটির বাসন ইত্যাদি দ্রব্য পাওয়া গিয়েছে। এই প্রত্নবস্তুগুলি সবই খ্রীষ্ট পূর্বকালীন বলে প্রমাণিত হয়েছে।

প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মনে করেন যে এই স্থানটি খ্রীষ্ট জন্মের আটশত বৎসর পূর্বকাল থেকেই জনঅধ্যুষিত ছিল, চিত্রিত মৃৎভাণ্ডসমূহ ও অন্যান্য প্রত্নবস্তুগুলি তার সাক্ষ্য বহন করেছে। খ্রীষ্টিয় চতুর্থ পঞ্চম শতাব্দী থেকে এ অঞ্চল জনশূন্য হতে আরম্ভ করেছিল। প্রত্নবিদদের এই অভিমতের সমর্থন চৈনিক পরিব্রাজকদের বিবরণ থেকেও সমর্থিত হচ্ছে।

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগীয় পণ্ডিতদের ধারণা এই যে পশ্চিম অংশের দুইস্তরের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ও ২৮টি কক্ষের বিভক্তিযুক্ত বৃহদায়তন অট্টালিকাটিই ছিল শুদ্ধোদনের প্রাসাদ। ভগবান বুদ্ধ এই প্রাসাদেই তাঁর জীবনের ২৯টি বৎসর কাটিয়ে একদিন অজানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। এর পূর্বভাগের প্রাসাদটি সম্ভবতঃ রাজপরিবারের অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বাসগৃহ ছিল।

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের এই উৎখননের ফলে বর্তমানে নিঃসন্দেহ হওয়া যেতে পারে যে পিপরাওয়া সন্নিহিত গানওয়ারি গ্রাম এলাকাতেই কপিল বস্তু নগর অবস্থিত ছিল—আর অদূরস্থ পিপরাওয়াতে ছিল শাক্যকুল স্থাপিত বুদ্ধদেবের স্মৃতি স্তূপ। ফা-হিয়েনের প্রদত্ত বিবরণানুসারে পিপরাওয়া তথা গানওয়ারিকে কপিলবস্তু বিহার ও কপিল বস্তুনগরবৃপে স্বীকার করতে কোন অসুবিধা নেই। অসুবিধা হচ্ছে এই যে হিউ-এনৎ-সাঙের বিবরণে লুম্বিনী থেকে কপিলবস্তুর যে দূরত্ব দেখানো হয়েছে তা গানাওয়ারি বা পিপরাওয়ার দূরত্ব থেকে অনেক বেশী। হিউ-এনৎ-সাঙের ভ্রমণ বিবরণ খুঁটিয়ে দেখলে সমস্যাটি আর অবশ্য সমস্যা থাকে না। ফা-হিয়েন লিখেছেন লুম্বিনী ও কপিল বস্তুর মধ্যে ব্যবধান ৯ মাইল, হিউ-এন সাঙের মতে ১৬ মাইল। হিউ-এন-সাং নিজে কিন্তু সোজা পথে যান নি, তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায় যে শব কূপ নামক স্থান হয়ে ছিল তাঁর ভ্রমণ পথ. এই জন্যই তাঁর হিসাবে প্রায় সাত মাইল দূরত্ব বেশী দাঁড়িয়েছে।

ভগবান বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই কোশলরাজ বিরূঢ়ক কপিলবস্তু নগর ধ্বংস করেন। শাক্যেরা সম্ভবতঃ এর পর কোন দিনই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। ফা-হিয়েন এখানে এসে কয়েকটি বৌদ্ধ-কীর্তি (সম্ভবত বুদ্ধের পৃতাস্থি স্তূপসহ) দর্শন করেন। সামান্য সংখ্যক বৌদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গেই তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। হিউ-এন-সাঙের বিবরণে ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরীর-জীর্ণ প্রাচীর, অট্টালিকার ভিত্তি ও সামান্য কিছু বৌদ্ধ কীর্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ ঘটেছিল তবে তারা সংখ্যায় ছিল নগণ্য।

কপিলবস্তু নগরীর সঠিক অবস্থান ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের উৎখননের ফলে জানা গিয়েছে এটা নিঃসন্দেহে সুসংবাদ। ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এখানে পুনরায় উৎখনন পরিচালিত হয়েছিল। এর প্রতিবেদন এখনও প্রকাশিত হয় নি।

খেলা

মারদেকা ফুটবল

কুয়ালালামপুরে ১৯৭৮ সালের ২২তম মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ৩ বছরের বিজয়ী দক্ষিণ কোরিয়া ২—০ গোলে ইরাককে পরাজিত করেছে। গত বছরও ইরাক রানার্স-আপ হয়েছিল।

লীগের খেলায় দক্ষিণ কোরিয়া সাতটা খেলাতেই জিতে ১৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল। অপর দিকে ইরাক রানার্স-আপ হয়েছিল ১১ পয়েন্ট সংগ্রহ করে (জয় ৫, হার ১ ও ড্র ১)।

মারদেকা আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতার সূচনা ১৯৫৭ সালে। এপর্যন্ত এই সাতটি দেশ মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় টুফি আবদুল রহমান কাপ জয়ী হয়েছে : মালয়েশিয়া ৭বার (এর মধ্যে যুগ্ম-বিজয়ী ১বার), দক্ষিণ কোরিয়া ৭বার (এর মধ্যে যুগ্মবিজয়ী ৩বার), বাংলাদেশ ৫বার (এর মধ্যে যুগ্মবিজয়ী ২বার), ইন্দোনেশিয়া ৩বার, তাইওয়ান ২বার (এর মধ্যে যুগ্ম বিজয়ী ১বার), হংকং ১বার এবং দক্ষিণ ভিয়েতনাম ১বার।

ভারত মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় প্রথম অংশ গ্রহণ করে ১৯৫৯ সালে, প্রতিযোগিতার তৃতীয় বছরে। গত দু বছর (১৯৭৭ ও ১৯৭৮) ভারত এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেনি। ভারত এ পর্যন্ত ১৩বার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে একবারও কাপ জয়ী হতে পারে নি; রানার্স-আপ হয়েছে ২বার (১৯৫৯ ও ১৯৬৫ সালে) এবং ৩য় স্থান পেয়েছে ৩বার (১৯৬৬ ও ১৯৭০ সালে)। বাকি বারে খেলায় ভারতীয় ফুটবল দল শোচনীয় ব্যর্থতা নিয়ে স্বদেশে ফিরেছে। যেমন ভারত ১৯৬৭ সালে ৮ম, ১৯৬৮ সালে ৫ম, ১৯৬৯ সালে ৮ম, ১৯৭১ সালে ১০ম, ১৯৭৩, ১৯৭৪ ও ১৯৭৬ সালে ৬ষ্ঠ স্থান পেয়েছিল।

ভারতীয় কিকেট দলের পাকিস্তান সফর

আগামী অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ভারতীয় কিকেট দলের পাকিস্থান সফরে যাওয়ার কথা আছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই সফরের তালিকা চূড়ান্তভাবে তৈরী হয়নি। খবরে প্রকাশ, ভারতীয় কিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কর্মকর্তারা শত চেষ্টা সত্ত্বেও পাকিস্থানের কিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কাছ থেকে ভারতীয় কিকেট দলের প্রস্তাবিত পাকিস্তান সফরের তালিকা সম্পর্কে কোন পাকা ব্যবস্থা করতে পারেননি।

এদিকে পাকিস্থান কিকেট কন্ট্রোল বোর্ডে দারুণ ওলট-পালট হয়ে গেল। পাকিস্তান কিকেট দলের সদ্য সমাপ্ত ১৯৭৮ সালের ইংল্যান্ড সফরের চরম ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্থান কিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি চৌধুরী মহম্মদ হোসেন পদত্যাগ করেছেন। অপর দিকে পাকিস্তানের নির্দেশে পাকিস্তান কিকেট কন্ট্রোল বোর্ড বাতিল হয়ে তিন সদস্যের এক এডহক কমিটি তৈরী হয়েছে। এই কমিটিতে আছেন প্রাক্তন জেনারেল কে এম আজহার, প্রাক্তন টেস্ট কিকেট অধিনায়ক জাভেদ বার্কি এবং প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড় ওয়াকার হোসেন।

পাকিস্তান কিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি চৌধুরী মহম্মদ হোসেনের পদত্যাগের ফলে ভারতীয় কিকেট দলের প্রস্তাবিত পাকিস্তান সফরে দারুণ অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। কারণ ভারতীয় কিকেট দলের এই প্রস্তাবিত পাকিস্তান সফরের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন পাকিস্তান কিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের পদত্যাগী সভাপতি চৌধুরী মহম্মদ হোসেন। এখন তাঁর অবর্তমানে বর্তমানের এডহক কমিটি এই প্রস্তাবিত সফরে কতখানি গুরুত্ব দেবে তা এখনও অজ্ঞাত। অনেকেরই সন্দেহ ভারতীয় কিকেট দলের এই প্রস্তাবিত সফর বাতিল হয়ে যেতে পারে। কারণ বর্তমান এডহক কমিটির সদস্য প্রাক্তন জেনারেল কে এম আজহারের সঙ্গে পাকিস্তান কিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের একসময়ের সভাপতি ও টেস্ট অধিনায়ক আব্দুল হাফিজ কারদারের দীর্ঘ-দিনের বন্ধুত্ব। ভারত বনাম পাকিস্তানের টেস্ট কিকেট খেলা পুনরায় চালু করার ব্যাপারে আবদুল হাফিজ কারদার ধরাবরই বিরোধী ছিলেন। সুতরাং বর্তমান এডহক কমিটির ওপর কারদারের প্রভাব ভারতীয় কিকেট দলের প্রস্তাবিত পাকিস্তান সফর স্তব্ধ বানচাল করে দিতে পারে।

সদ্য সমাপ্ত ১৯৭৮ সালের ইংল্যান্ড সফরে পাকিস্তান কিকেটদল যে-রকম হেনস্তা হয়েছে তাঁর নজির খুবই কম। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পাকিস্তান প্রথম টেস্টে এক ইনিংস ৫৭ রানে এবং দ্বিতীয় টেস্টে এক ইনিংস ১২০ রানে পরাজিত হয়। তৃতীয় টেস্ট বৃষ্টির জন্যে পরিত্যক্ত হয়। তাছাড়া ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এক দিনের দুটো আন্তর্জাতিক খেলাতেও পাকিস্তান শোচনীয়ভাবে হেরেছিল।

১৯৭৮ সালের ইংল্যান্ড সফরে পাকিস্তানের একমাত্র জয় সারে কাউন্টি দলের বিপক্ষে ৭ উইকেটে। এটা ঠিক খেলে জয়লাভ বলা যায় না। সারে দলের অধিনায়ক রজার নাইটের দয়া দক্ষিণেই পাকিস্তানের এই জয় সম্ভব হয়। ১৯৭৮ সালের ইংল্যান্ড সফরে পাকিস্তানের শেষ খেলা ছিল তৃতীয় টেস্ট। এই তৃতীয় টেস্টের ঠিক আগের খেলাটি ছিল সারে দলের সঙ্গে। সারে দলের সঙ্গে পাকিস্তান যখন খেলতে নামে তখন তাদের নামের ঘরে শূন্য জমা করছে। সারে দলের অধিনায়ক নাইট সাহেবের হৃদয় পাকিস্তানের এই শোচনীয় অবস্থা দেখে গলে গেল। তা না হলে। কোন যুক্তিতে তিনি প্রথম ইনিংস ১৭৩ রানের মাথায় (৩ উইকেটে) এবং দ্বিতীয় ইনিংস ৯৭ রানের মাথায় ৫৫ উইকেটে) সমাপ্তি ঘোষণা করেন? তাঁর এই সমাপ্তি ঘোষণার ফলেই তো পাকিস্তানের জয়-লাভের পথ অতি সহজ হয়ে যায়।

১লা জুন তারিখে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নামার আগে পাকিস্তানের ৯টা তিনদিনব্যাপী খেলা ড্র ছিল। বেশীর ভাগই বৃষ্টির কারণে। পাকিস্তানের নামী পাঁচজন টেস্ট খেলোয়াড় কেরী প্যাকারের বিশ্ব কিকেট দলে যোগদান করায় তাঁদের শূন্য স্থান পূরণ করার মত উপযুক্ত খেলোয়াড় পাওয়া যায় নি। তাছাড়া ১৯৭৮ সালের ইংল্যান্ড সফরে পাকিস্তানের পক্ষে যাঁরা খেলে-ছিলেন তাঁদের বেশীর ভাগেরই ইংল্যান্ডের জলবায়ুতে খেলার অভিজ্ঞতা ছিল না। এরকম একটা ভাঙ্গা দল নিয়ে পাকিস্তান কি শক্তিশালী ভারতীয় দলের বিপক্ষে টেস্ট খেলার ঝুঁকি নেবে?

ভারত বনাম পাকিস্তানের প্রথম টেস্ট কিকেট সিরিজ খেলা হয় ১৯৫২ সালে এবং শেষ সিরিজ ১৯৬০—৬১ সালে। উভয় দেশের তিনটে টেস্ট সিরিজে (১৯৫২, ১৯৫৪ ও ১৯৬০—৬১) যে ১৫টা খেলা হয় তার ফলাফল : ভারতের জয় ২, পাকিস্তানের জয় ১ এবং ড্র ১২।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

১৯৭৮ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলার লড়াইটা বর্তমানে গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল এবং রানার্স-আপ মোহনবাগানের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়েছে। মহমেডান স্পোর্টিং অনেক পিছনে পড়ে গেছে। মোহনবাগান বনাম মহমেডান স্পোর্টিংয়ের খেলাটি দ্বিতীয়ার্ধের ১২ মিনিটের মাথায় পরিত্যক্ত হয়। রেফারী মহমেডান স্পোর্টিং দলের বিপক্ষে একটা অফ সাইড দিয়েছিলেন। রেফারীর এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মহামেডান স্পোর্টিং দল খেলায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে রেফারী নিয়মমাফিক কিছু সময় অপেক্ষা করে খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। খেলা ভাঙ্গার সময় মোহনবাগান ২—০ গোলে এগিয়ে ছিল। আই এফ এ লীগ পরি-চালনা কমিটি মহমেডান স্পোর্টিং দলের খেলায় অংশগ্রহণ না করার অপরাধে মোহন-বাগানকে ২ পয়েন্ট দিয়েছে এবং হাওড়া ইউ-নিয়নের বিপক্ষে মহামেডান স্পোর্টিং দলের যে পরবর্তী খেলা ছিল তা বাতিল করে হাওড়া ইউনিয়নকে ২ পয়েন্ট দিয়েছে। এর ফলে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের ১৫টা খেলায় পয়েন্ট দাঁড়াল ২৩।

দেবব্রতনাথ রায় (দর্শক)

২৭।৭।৭৮

ফুল খিলে হ্যায় গুলশান ছবিতে ঋষিকাপুর ও মৌসুমী

বোম্বাই সমাচার

এখন এখানে

সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্। হিন্দী চলচ্চিত্রের শোম্যান রাজকাপুরের যাবতীয় পাবলিসিটি স্টান্টকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন বোম্বের দর্শকেরা। সেক্স-এর সুড়সুড়ি দিয়ে আজগুবি গল্পের গরুকে গাছে চড়িয়ে রাজকাপুর ভেবেছিলেন বকস্ অফিস সফলতায় স্বকৃত বাবকেও টেক্কা দিতে পারবেন তিনি এবং সেই ভেবেই পোস্টারে, ব্যানারে সংবাদে পাবলিসিটিতে এক অদ্ভুত ইলিউশান সৃষ্টি করেছিলেন দর্শকদের মনে। ভারতীয় সনাতন ধর্মের সারতত্ত্বের মূল মন্ত্র সম্বল করে সত্য, শিব ও সুন্দরের পূজারী সেজে বৈতরণী পার হতে চেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু চালাক রাজকাপুরকে বেচারা বানিয়ে বেচারা দর্শকেরা চালাক সাজলেন। আর একবার প্রমাণ হল দর্শক জাগছে এবং রাজকাপুর কৃত সত্যম্ শিবম্ সুন্দরমকে তাঁরা সেকস্ম শিবম সুন্দরম্ আখ্যা দিয়ে সিনেমা তান্ত্রিকদের সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীর এক বিয়োগান্ত সমাপ্তি ঘটালেন।

অপর দিকে দেখুন শ্যাম বেনেগলের লো বাজেট ছবি ভূমিকা, মন্থন, রাজশ্রী পিকচার্সের দুলহন ওহী যে পিয়া মন ভায়ে প্রভৃতি পরিচ্ছন্ন ছবি দর্শকমনে কি দারুণ সাড়া জাগিয়েছে। ভালো লাগছে এই ভেবে যে এবার থেকে ইমান ধরম ও সত্যম শিবম সুন্দরম্-এর অসফলতা চলচ্চিত্র প্রযোজক ও পরিচালকদের স্টার সিস্টেম, সেকস্ ও পাবলিসিটি স্টান্ট থেকে মুক্ত করতে সাহায্য করবে।

নিউ থিয়েটার্সের স্বর্ণময় গৌরব যুগের পর যে লোকটি বোম্বেতে বসেও ডাবল ভার্সানে বাংলা ও হিন্দী ছবি তৈরী করার স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং সাফল্যের স্বর্ণদুয়ার খুলতে পেরেছিলেন অনেক বাধা বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে, তাঁর নাম শ্রীশকৃতি সামন্ত। কমার্শিয়াল অথচ পরিচ্ছন্ন ছবি তৈরী করেন তিনি। আরাধনা, অমর প্রেম, কাটি-পতঙ্গ ও অনুরাগের পর ডাবল ভার্সান ছবি অমানুষ ও আনন্দ আশ্রম তাঁকে বহস্পতির তুঙ্গে পৌঁছে দিয়েছে। এবারে তিনি শকৃতিপদ রাজগুরুর 'অনুসন্ধান' উপন্যাস অবলম্বনে দার্জিলিং-এর চা-বাগানের পট-ভূমিকায় বাংলা অনুসন্ধান ও হিন্দীতে বরসাৎ কী এক রাতের সুটিং শুরু করে দিয়েছেন। কিছুদিন আগে দার্জিলিং-এর বিভিন্ন জায়গায় আউটডোর সুটিংএ ব্যস্ত ছিলেন। সুটিংএ অংশ নিয়েছিলেন রাখী গুলজার, আমজাদ খাঁ, প্রেমা নারায়ণ, মানিক দত্ত, তরুণ ঘোষ, শুব্রত মহাপাত্র, অমল সেন এবং কলকাতা থেকে এসেছিলেন অনামিকা, সুদীপা, বকুল, রাবিনা, সুতৃপ্তি ও আরো অনেকে। সুন্দর পরিবেশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মেলার ভীড়ে নৃত্য পরিচালক পি এল রাজের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিচালক শকৃতি সামন্তের নির্দেশে আলোকচিত্রশিল্পী অলোক দাশগুপ্ত তাঁর ক্যামেরায় তুলে রাখলেন এমন দুটি পৃথক সঙ্গীত যাতে ঠোঁট মেলালেন রাখী গুলজার, প্রেমা নারায়ণ ও অসংখ্য কুলি মেয়ে। চা-বাগানের মধ্যে দিয়ে সর্পিল রাস্তা বেয়ে যে গান সেদিন সেই আউটডোরে বসে শুনতে পেলাম রাখী ও অন্যান্যদের মুখে গৌরী-প্রসন্ন মজুমদারের লেখা ও আর ডি বর্মণের সুর দেওয়া সেই প্রথম গানটির প্রথম দুটি লাইন আপনাদের জানিয়ে রাখছি—

ওঠো ওঠো সুরজাইরে ঝিকিমিকি দিয়া
কালকে তুমি আঁধার রাতে কোথায় ছিলে গিয়া—

দ্বিতীয় বাংলা গানটিতে রাখী একটু ঠোঁট মিলিয়েছেন অর্থাৎ চলচ্চিত্রের পরিভাষায় ওটা ও'র সোলো গান যার শুরু এইভাবে—

—হায়রে পোড়াবাঁশী ঘরেতে,
রইতে দিলোনা ঘরেতে—

এ ছবির নায়ক অমিতাভ বচ্চন শশব্যস্ত অমিতাভ বচ্চনের এটাই সম্ভব প্রথম বাংলা ছবি যাতে আমরা তাঁকে ন হিসেবে দেখতে পাবো।

দার্জিলিংয়ের আউটডোর সেরে ম ফিরে এসেছেন বোম্বেতে সম্ভবত দ্বিত কিস্তীর আউটডোর আবার হবে ন ভেম্বর।

এ ছবির বাংলা সংলাপ লিখেছে শকৃতিপদ রাজগুরু ও শকৃতি সামন্ত স এবং হিন্দী সংলাপ লিখেছেন কমলেশ্ব

আমি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা নই বা কো চলচ্চিত্রের ভাগ্য নির্ধারণ করি না, তব সুটিং হয়ে যাওয়া সম্পাদিত যে চার র দেখেছি তা থেকে অন্তত এই কথাই ম হয়েছে যে এ-ছবি রিলিজ হলে অন্ত পশ্চিমবাংলায় শকৃতি সামন্ত আর জনপ্রিয় হবেন।

আসুন এবার কিছু অন্যান্য খবরাখব পরিবেশন করা যাক।

নির্মাতা এন এন সিপ্পী ও হৃষিকে মুখার্জি রূপম চিত্রের ব্যানারে নির্মীয়মা তাঁদের পরবর্তী ছবির নাম রেখেছে গোলমাল। বাংলা সফল ছবি 'কানামাছির হিন্দী চিত্ররূপ এই গোলমাল। শিল্প তালিকায় আছেন অমল পালেকর, বিন্দিয়া উৎপল দত্ত, মঞ্জু সিংহ, ডেভিড, শ্যাম খোটে, ইউনিস পরভেজ, দেবেন বর্মা ভৃতি গুলজারের লেখা গীতে সুরারোপ করছে আর ডি বর্মণ। আলোকচিত্রে আছেন জয়ন্ত পাথারে এবং শচীন ভৌমিকের লেখা চিত্রনাট্যে সংলাপ লিখছেন রাহী মাসুম রাজা।

পৌরাণিক ছবির পরিচালক চন্দ্রকান্ত ছবির জগতে আর কিছু করতে পারুক আর না পারুক, অন্তত পক্ষে চলচ্চিত্র জগতের বেশ কিছু তারকাকে একত্রিত করবার তার আছে।

অরবিন্দ সেনের প্রযোজনা ও প চালনায় প্রফুল্ল রায়ের কাহিনী এখন পিঞ্জরের হিন্দী চিত্ররূপ অতিথি শকৃতি পাচ্ছে বিভিন্ন চিত্রগৃহে। এ ছবিতে বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছেন শশী কাপুর, শাবানা আজমী, শত্রুঘ্ন সিনহা, বিদ্যা সিন্‌হা, উৎপল দত্ত, ভারতভূষণ, গায়ত্রী ও কুমারজিৎ। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব ছিল কল্যাণজী ও আনন্দজীর ওপর। আলোক চিত্রশিল্পী মার্শাল ব্রোগাঞ্জা। প্রফুল্ল রায়ের চিত্রনাট্যে সংলাপ লিখেছেন পণ্ডিত মুখরাম শর্মা।

আমাকে দেখুন

ফিল্মী নাম কুমার জিৎ। আসল নাম অজিত পরিতুণ্ড। বাবার নাম তুল পতিতুণ্ড। ঠিকানা ৯০এ হরিশ রোড, কলিকাতা-৭০০০২৫।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : বঙ্গবাসী থেকে বায়ো সায়েন্স নিয়ে বি এস সি পাশ। পরে পুণা ফিল্ম এণ্ড টেলিভিশন ইন-

ট্যুট থেকে অভিনয় শিক্ষার ডিপ্লোমা। ড়া বিভিন্ন নাট্য প্রতিষ্ঠানের অভিনয় ...উত্তরে যাবার এক বাণ্ডেল সার্টি-কট।

অভিনীত ছবি : ইনস্টিট্যুটে থাকা ীন কাজললতা (যে ছবি দেখে রাজশ্রী ডাকশন রামেশ্বরীকে দুলহন ওহী যো য়া মন ভায়ের জন্যে পছন্দ করেছিলেন) বমেধ আনটাইটেলড প্রভৃতি ছবি। পরে াশিয়াল বাজারে সুনীল বসু মল্লিকের স্কৃতিতে মণির ভূমিকায় (শুনেছি সবার লো লেগেছে—ওরকম বন্ধুবান্ধব বা ত্মীয় স্বজনেরা বলেই থাকে—বিচার বেন আপনারা প্রযোজক, পরিচালক ও কেরা) এবং অরবিন্দ সেনের হিন্দী ছবি তিথির একটি বিশেষ চরিত্রে।

আবেদন : কিছু কিছু কথাবার্তা ...আরও বেশী ছবিতে কাজ করতে ...খ করে দেখুনই না একবার মনে হয় ...মার্ক পেয়ে যাবো। ইনস্টিট্যুটের টিফিকেটের কোনো মূল্যই নেই যদি আপনারা মূল্য না দেন। বোম্বে কলকাতা রছি। আত্মপ্রত্যয় এখনও শক্ত ভিতের ওপরে। ভালো ছবিতে কাজ করবো বিভিন্ন চরিত্রে তাগিদ মেটাবো শুধু আপনার একটুখানি আমার দিকে তাকান, আমাকে দেখুন মনোমত না হলে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন জানেন কি?

○ আজকের অভিনেত্রী নীতু সিংয়ের মা ও একদালে নায়িকা হবার স্বপ্ন দেখতেন।

○ সুনীল দত্ত জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে এক সময়ে পুরোনো কাগজপত্তর কেনা বেচার ব্যবসা করেছেন।

○ মমতাজকে এক সময়ে চ্যাপ্টা নাকের জন্য অনেক প্রযোজক পরিচালক একেবারেই পাত্তা দিতে চান নি পরে ঐ নাককেই ...স সিম্বল বলে চিহ্নিত করলেন। বাই।

চিত্রনাট্যকার মোরারজী দেশাই

ভারতের প্রধানমন্ত্রী চলচ্চিত্রের জন্যে চিত্রনাট্য লিখেছেন। অবিশ্বাস্য হলেও এ-সংবাদের সত্যতা যাচাই হয়ে গেছে। লণ্ডন থেকে প্রকাশিত সানডে টাইমসের সংবাদদাতা ভারতীয় সাংবাদিকদের টেক্কা দিয়ে এ-খবর ছেপেছেন তাদের কাগজে। মোরারজী দেশাই তার নিজের প্রথম গল্পের চিত্রনাট্য তৈরী করেছেন এবং কিছু দিনের মধ্যেই সে ছবি দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রদর্শিত হবে। এ-ছবিতে অভিনয় করছেন শশী কাপুর, ঋষি কাপুর এবং ধর্মেন্দ্র।

চলচ্চিত্র প্রযোজক জয়গোপাল মোহলার কাছ থেকে প্রাপ্ত সংবাদ উদ্ধৃত করে সংবাদদাতা এ্যান্থনি হোলডেন লিখেছেন যে এ-ছবির গল্প ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনকে কেন্দ্র করে এবং কৃষ্ণ চরিত্রে রূপদান করছেন শশী কাপুর, অর্জুনের চরিত্রে ধর্মেন্দ্র এবং সহায়ক অন্য চরিত্রে থাকছেন ঋষি কাপুর ও বিনোদ খান্না। রামানন্দ সাগর পরিচালিত এ ছবির নাম যোগেশ্বর কৃষ্ণ।

কুমারজিৎ

মোহলার কথা মতো জানা গেছে যে উনিশ শো চুয়াত্তর সালে ষোল দিনের জন্য দেশাই কৃষ্ণকথার ইংরেজী অনুবাদের কাজ শুরু করেছিলেন। মোহলার ছেলেকে দিয়ে তিনি দিনে দুতিন ঘন্টা চিত্রনাট্য লেখাতেন কিন্তু দেশে জরুরী অবস্থা শুরু হয়ে যাওয়াতে তাঁকে জেলে যেতে হয় এবং মাঝ-পথেই চিত্রনাট্য লেখা বন্ধ করতে বাধ্য হন কিন্তু জেলে বসেই আবার তিনি এ কাজে নতুন করে হাত লাগান।

মোরারজী দেশাই যখন প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসলেন তখন মোহলা ভেবেছিলেন যে তাঁর পক্ষে হয়তো সময় বাঁচিয়ে চিত্রনাট্য লেখা সম্ভব হবে না কিন্তু দেশাই নাছোড়-বান্দা তিনি চিত্রনাট্য লিখবেনই। ওনারই কথায় যখনই আমি কোনো কাজের জন্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই তখন পিছুটানে আমি সাড়া দিই না বরং আমার জেদ বেড়ে যায় আর তাছাড়া এ কাজ তো ভারতীয় সংস্কৃতির স্বার্থে সনাতনী ঈশ্বর বিশ্বাসে'। প্রধান-মন্ত্রীর আসন অলংকৃত করবার পরেও প্রতি-দিনের রুটিন থেকে কিছু সময় বাঁচিয়ে পুরো চিত্রনাট্য লিখলেন।

এই বিষয়বস্তুর উপরে চিত্রনাট্য লেখানোর জন্যে প্রযোজক মোহলা সবার আগে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণানের কাছে গিয়েছিলেন কিন্তু শারিরীক অসুস্থতা ও ব্যস্ততার জন্যে নিজের অসামর্থ্যের কথা বলেছিলেন তিনি।

মোহলা এই চিত্রনাট্য লেখানোর জন্যে এমন একজন ব্যক্তিকে খুঁজছিলেন যিনি হবেন সম্মানীয়, সত্যবাদী এবং স্বচ্ছ মানবিক গুণে পরিপূর্ণ।

হঠাই মোহলা দেশাইয়ের কথা ভাবলেন যার সঙ্গে উনিশ শো তেষট্টি সাল থেকে পরিচয় ছিল। দেশাই তার নিজের লেখা গীতার ইংরাজী অনুবাদ শোনান মোহলাকে।

ব্যবহারিক ও বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে দেশইয়ের দেখা ও লেখা গীতা মোহলাকে মুগ্ধ করে এবং মোহলা তার ছবির চিত্রনাট্য লিখে দেবার জন্যে দেশাইকে অনুরোধ করেন এবং দেশাই রাজনীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য লেখায় আগ্রহী হন। ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এ-সংবাদ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

জ্যোতিপ্রকাশ রায়

চিত্রধ্বনি

চীনে বায়স্কোপ

তিয়েন আন মেন : কি সুন্দর নাম। আমরা বাংলায় বরং বলি স্বর্গদ্বার। কিছু দিন আগেও পিকিং-এ স্বর্গের সৃষ্টা তো সশরীরেই জীবিত ছিলেন। অবিশ্বাস্য, প্রায় অলৌকিক রূপকথা মনে হয় যে অশিক্ষা অনাহারে ক্লান্ত, রোগজীর্ণ জনসমুদ্রে তিনি মার্কসবাদ নামের সোনার কাঠিটি ছুঁইয়ে দিলেন আর তারা মৃত্যু থেকে অমৃতের অভিযানে অগ্রসর হল। মাও সে-তুং প্রকৃতই কবি, কবি ছাড়া কে এমন বাস্তবভাবে উপলব্ধি করেন নতুন পৃথিবী, অজস্র সুখ, সীমাহীন ভালবাসা, একটি কবিতা লেখা হয় তার জন্যে!

খবরের কাগজের পাতায় সামান্য চোখ বোলালেই বোঝা যায় চীন-ভারত সীমান্তের অস্বস্তিকর বরফ এবার সত্যিই গলতে শুরু করেছে। সেই সূত্রেই কলকাতার শিশির মঞ্চে গত ২৪ থেকে ২৭ জুলাই ফিল্ম ফেডারেশন ও ভারত-চীন মৈত্রী সমিতির যুগ্ম উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল চৈনিক চলচ্চিত্র উৎসব। ভারতবর্ষে এই অনুষ্ঠান প্রথম পালনের দায়িত্ব নিয়ে কলকাতা তার সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব বজায় রাখায় আমরা সুখী। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সুপরিচিত চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেন। প্রধান অতিথি ছিলেন পশ্চিম বাংলার আইন বিষয়ক মন্ত্রী হাসিম আবদুল হালিম। দিল্লীতে চীনা দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি লি চেঙ শেঙ ছিলেন বিশেষ অতিথি। সভানেত্রী মৈত্রেয়ী দেবী থেকে শুরু করে প্রত্যেক বক্তাই সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময় সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেন। কিন্তু সিনেমার কথাতে আসা যাক।

যে চারটি ছবি দেখান হয়েছে তাদের নাম যথাক্রমে হাই-সিয়া, তাই-চি এবং তার পিতৃব্বয়, বালিকা সাঁতারু আর তিয়েনশান পাহাড়ের লোহিতচছটা। এই সব কটি ছবির মধ্যে অন্ধকারোত্তীর্ণ আনন্দময় উচ্ছ্বল চীন ও তার জনসাধারণ নানাভাবে বর্ণনা করেছে সমাজতন্ত্রের মূল রহস্য। সন্দেহ নেই এসব ছবি দেখতে গেলে অন্য রকম চশমা পরতে হয় না হলে নজরে পড়ে না প্রকৃতি ও মানুষ কিভাবে ব্যাখ্যা করে শ্রমের সৌন্দর্য, কিভাবে বেজে ওঠে সমষ্টিগত জীবন যাপনের গান। ছবির গল্প জানিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য নয়, আমি শুধু লক্ষ্য করেছি প্রকৃতির বর্ণ-মুখর আলোকময়তা আর মানুষ : জীবনের অতিনগণ্য স্তর থেকে উঠে আসা মানব-পুত্রকে।

নদী থেকে সাগরে ছবিতে মিঠুন ও রুমকী

কিন্তু আমি অন্য রকম চশমা পরার কথা বললাম এ কারণে যে, বিশুদ্ধ কল্যা-কৈবল্যবাদ এসব ছবিকে গ্রহণ করে না, বলাই বাহুল্য, এই শিল্পচতুষ্টয়ে তথা-কথিত শিল্পের চাইতে অনেক বড় ভূমিকা নিয়েছে রাজনৈতিক শ্রেণীচেতনা, আত্মার আনন্দের চাইতে অনেক মূল্যবান হয়ে উঠেছে শিক্ষকতার গুরুত্ব। এবং আমরা যারা মনে করি সমস্ত শিল্পের শেষ কথা মানুষ, তাদের রাজনীতির প্রতি কোন রকম উচ্চকিত অনীহা থাকার কথা নয়।

আমি শুধু বলতে চাই যে, বুঝতে পারি নি কেন আমি মাও সে-তুং রচনাবলী অথবা এডগার স্নো পড়ার পরেও এসব ছবি দেখব। এটা তো মানতেই হবে শিল্প মানবিক উপলব্ধির একটি বিশেষ প্রকাশ। না হলে লেনিনেই চলত, মায়াকোভসকির কোন দরকার ছিল না। আমরা কিন্তু চীনের ছবিতে শিল্পের কোন বিপ্লব দেখ-লাম না। এ সমস্তই সোস্যালিস্ট রিয়া-লিজমের প্রথাগত পুনরাবৃত্তি। বিষয়ের মহত্ত্বকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তার পরেও মনে হয় সিনেমার আন্তর্জাতিক প্রবাহে চীন কোন নতুন স্রোত যুক্ত করতে পারে নি। চীনে আইজেনস্টাইন জন্মতে এখনও অনেক দেরী। সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

স্টুডিও থেকে

দিন আইবই

সম্ভব হবে কিনা জানি না শেফালী, ব্যাবারে নর্তকী শো অন্তরের সঙ্গে চাইছেন নিজের পাল্টাতে।

জীবনের দুঃখময় দিনগুলো কেটেছে কলকাতার হোটেলে হোটেলে রাত অব্দি নাচ দেখিয়ে। হাজার লোভি চোখের খোরাক হয়ে তাঁকে ক হয়েছে দিন-রাত-দিন-রাত-দিন। হিসেবে সুনামও পেয়েছেন।

এবং সেই সুবাদে ফিল্মের প্রয়ো প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে পর্দায় ডে শেফালীকে। তিনি কর্তব্য শেষ করে ব্যাস্! ঐ পর্যন্তই।

তারপর শেফালীকে আর মনে রা কেউ। না প্রযোজক-পরিচালকের দল দর্শক।

উল্টে দর্শক ধরেই নিয়েছে শে মানেয় পেট-বুক কাঁপানো শরীর শির করানো নাচ, শেফালীর ইমেজ তৈরি হ নাচিয়ে হিসাবেই।

তাই গত বছর যখন রামমোহন মঞ্চে
একটি নাটকের নায়িকা সাজলেন,
ক ভরা কুঁচকে ছিলেন।
ইতিমধ্যে শেফালী বিয়ে করলেন,
তিনি এল জীবনে। হোটেল-ক্লাবে নাচের
ছেড়ে দিলেন। ঠিক করলেন আর
বুক কাঁপানো নয়, "ভালো" মেয়ের
অভিনয় করবেন.
নায়িকার চরিত্র হলেও আপত্তি নেই।
নাচ আসে তাঁর কথায়, নাচ এসে
তাঁর চাউনিতে। কিন্তু অভিনয়ের
গও চাই সঙ্গে।
এখন মঞ্চ ছেড়ে তিনি সংসারী। তবুও
তের ডাকে সাড়া দিতেই হচ্ছে। নতুন
তৈরি করে 'আবদ্যলা-মর্জিনা'র অভি-
করছেন এখানে ওখানে সেখানে।
কিন্তু ইমেজ বদলাচ্ছে না। শেফালীর
প্রচার হবার সঙ্গে সঙ্গে সবাই জামা-
পরা শেফালীকে প্রায় সবাই
চাইছেন।
ইমেজের বিপদতো এখানেই। এখন
দরকার ফিমেল অরণ্যর। সেই কথাটি
তেই খাঁটি ঢুকাই সুরে শেফালী বলে
লেন 'একদিন দেখামুই আইজ তো আর
ব না, সময় আইবই।'

খানি চিঠি

সম্প্রতি পরিচালক অসীম ব্যানার্জির
ছ থেকে আমি একখানা অদ্ভুত চরিত্রের
ঠি পেয়েছি। সম্ভবত আরও অনেকেই
য়েছেন। সাংবাদিকের সঙ্গে পরিচালকের
লাপ অবশ্যই দোষের কিছু নয়,
াভাবিক।
কিন্তু এই চিঠিখানি একটু ভিন্ন
বরের। পাঠকরাই দেখুন।
য় মহাশয়,
আমি, অসীম ব্যানার্জি, নিম্নে
কারী জানাচ্ছি যে বাংলা ছবির সঙ্গে
সক্রিয়ভাবে কুড়ি বছর যাবৎ যুক্ত।
তমধ্যে আমার পরিচালনায় জন্মান্তর,
কোনো একদিন, হারানো প্রেম, বিবাহ বিভ্রাট,
য়না ইত্যাদি ছবিগুলি মুক্তি পেয়েছে।
আজকের দর্শকের কাছে আমার সামান্য জন-
প্রিয়তা ও পরিচয় সৃষ্টির দায়িত্ব আপনারাই
ালন করেছেন।
এখন আরও দুখানি ছবি আমি করছি।
একটি হল অশিক্ষা দূরীকরণ বিষয় নিয়ে
াঁশরী, অপরটির বিষয় হল বিশ্ব প্রেম ও
াদেশিক মনোভাবের দূরীকরণ—নাম
ফেরার।
আজ একথা সবাই জানেন সিনেমা গণ-
শিক্ষার একটি মাধ্যম এবং সিনেমা পরি-
চালকদের তাই নিজের সমাজের প্রতি একটি
বাড়তি দায়িত্ব থাকেই।
এই গুরু দায়িত্বের কথা মনে রেখেই
াঁশরী এবং ফেরার ছবি দুটি অত্যন্ত
আর্থিক কাস্টের মধ্যেও শেষ করবার চেষ্টা
করছি। বাঙালী, পাঞ্জাবি, মারাঠি কিংবা

বনবাসর ছবিতে সন্তু ও মহুয়া

অসমিয়া নামে আমাদের পরিচয় নয়, আমাদের প্রকৃত পরিচয় অমরা ভারতবাসী। ফেরার এই বক্তব্যকেই তুলে ধরবে।
আমার এই উদ্দেশ্য সফলের জন্য আপনার সহযোগিতা একান্তভাবে দাবী করি। আগেও আপনারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন. এবারেও প্রয়োজনে আপনার সদুপদেশ আমায় সাহায্য করবে।
ধন্যবাদসহ
অসীম ব্যানার্জি
পরিচালক

অসীমবাবুর কাছে আমাদের একটিই অনুরোধ—ভালো ছবি করুন, নিজের প্রতি সৎ থাকুন। বিকৃতি হবেন না, বাংলা ছবির শিয়রে এখন যমদূত দাঁড়িয়ে। আগে বাংলা ছবিকে বাঁচান, শুধু ব্যবসায়িক ছবি করে নয়, রুচিপূর্ণ ভালো ছবি দিয়ে এই কাজ করা যায়। কোনো এক দিন'এর অসীম ব্যানার্জিকে ফিরে পেতে চাই আমরা, নইলে তিনিই ফেরার হয়ে যাবেন।

পরিচালকও মাইনে পাওয়া সহকারী

অভিনেতাদের সবাই-ই অচেনা, চড়া মেক-আপের আড়ালে এক তরুণ বৃদ্ধ সেজে বসে আছেন চেয়ারে। ক্যামেরার পেছনে কালো কাপড় মুড়ি দিয়ে কে বসে আছেন বুঝতে পারছি না।
সেই তরুণ-বৃদ্ধের সামনে আরও এক তরুণ দাঁড়িয়ে। ওঁর মেক-আপ অতটা ভারি নয়, কিঞ্চিৎ স্বাভাবিক। পরিচালক সুশীল মুখার্জি দেখলাম তাঁকে বোঝা সেজে কি যেন বোঝাচ্ছেন। তিনিও বোঝার অভিনয় করে যাচ্ছেন হাত-পা নেড়ে চোখ ঘুরিয়ে।
রিহার্সালের পর টেক শুরু হল। ক্ল্যাপ বোর্ডের গায়ে দেখলাম লেখা রয়েছে 'গৌরী।' কিন্তু দৃশ্যটি দেখে বুঝতে অসুবিধা হল না যে স্বয়ংসিদ্ধার গল্পই ছবিতে তোলা হচ্ছে। ভাষাটা অবশ্য বাংলা নয়, ওড়িয়া। বেশীক্ষণ দাঁড়াইনি আর।

ফেরার থেকে বেরিয়ে আসার পথে দেখা ছবির প্রযোজক ধীর বিশ্বওয়ালের সঙ্গে। তিনি বললেন 'স্যুটিং দেখবেন না! প্রশান্তবাবু কাজ করছেন?'
—কে প্রশান্তবাবু?
মৃণাল সেনের মাটির মনিষ ছবির প্রশান্ত নন্দা, ওড়িয়া ছবির নায়ক—জবাব দিলেন ধীরবাবু।
জানতে চাইলাম—গৌরী আপনার ছবি?'
বললেন—হ্যাঁ। ডিরেকশনও দিচ্ছি।' চোখে ঘুরিয়ে ফেরারে দেখি সুশীল মুখার্জি তখনও ধীরবাবুর প্রক্সি দিয়ে চলেছেন।
একটু হাসি পেল। বললাম—প্রশান্ত-বাবুর সঙ্গে পরে দেখা করে নেব, এখন একটু কাজ আছে।
হাতে ব্যাগ নিয়ে ধীরবাবু আমার সঙ্গেই বেরিয়ে এলেন।
আর ফেরারে সারাটি দিনই হয়ত সুশীল মুখার্জিকে পরিচালকের সব দায়িত্ব পালন করে প্রধান সহকারীর মাইনেটুকু নিয়ে চুপচাপ হজম করতে হবে।
এই অবস্থাই চলছে, শুধু ওড়িয়ায় নয়, বাংলাতেও চলে। প্রযোজক পয়সার জোরে পরিচালকের কাঁধে চেপে নিজেই পরিচালক হন। এবং পয়সার অভাবেই পরিচালকরা নিজের নাম গোপন রেখে চোরা কিল সহ্য করে যান।
কিন্তু এই অবস্থা চলবে কতকাল? আর কতদিন? পয়সা থাকলে প্রযোজক হোন আপত্তি নেই, কিন্তু অযোগ্যের পরিচালক হবার সাধ কেন? যিনি নিজের বুদ্ধি আর পরশ্রম দিয়ে ছবিটি করবেন তাঁকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না কেন? অন্যের কাঁধে চেপে পাহাড়ে ওঠার শখ এখুনি বন্ধ করা উচিত। পৃথিবীর অন্য সোনালী দেশে এমন জোচ্চুরি হয় বলে আমার জানা নেই।
এই সব ঘটনার মূল কারণ যদিও

অর্থনৈতিক, কিন্তু এই ব্যবস্থা বেশী দিন চলতে দেওয়া উচিত কি? বাংলা চলচ্চিত্র জগতের কলাকুশলীরা কি বলেন।

নির্মল ধর

নাড়া দেওয়া নাটক গগন

মানুষের নিভৃত চেতনার ঝুঁটি ধরে নাড়া দিতে 'ফোকাস'-এর সাম্প্রতিক প্রয়োজনা 'গগন'। বেঁচে থাকার জন্যে মানুষের যতটুকু প্রয়োজন, তার বেশি পাওয়ার লোভটাই মানুষকে ক্রমশ টেনে নিয়ে যায় নিচে এবং এইভাবে যেতে যেতে এমন একটা সময় আসে যখন মানুষ আর মানুষ থাকে না, মানবিক বোধগুলি তার সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায় এবং লোভ চরিতার্থের জন্য যে-কোনো অমানবিক কাজ করা সম্ভব হয় অতি সহজেই। যতক্ষণ না এই লোভকে হত্যা করা হচ্ছে ততক্ষণ মানুষের মুক্তি নেই,—'গগন' নাটকের মূল কথা এই এবং মূল চরিত্র গগন, যার চোখে পাঁঠা এবং বারবনিতা দুইই সমান এবং এই দুজনেরই মাংস নিয়ে কারবারি হয়ে ওঠে সে। কিন্তু যেহেতু

তপনকুমার দে সম্পাদিত/বারো বছরের ঐতিহ্যবাহী/সাহিত্য, সিনেমা, যাত্রা/ এবং সংস্কৃতির প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা

তুলি

সাহিত্যের একটি অঙ্গ প্রেম। প্রেমের শুরু বিভিন্ন আঙ্গিকে। তরুণ প্রতিভাবান সাহিত্যিক বাদল ঘোষরায় প্রেম শুরু করেছেন শ্লোগান দিয়ে। তাঁর এই শ্লোগানে সাড়া দিয়েছেন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের সাহিত্য দরদী পাঠক/পাঠিকারাও। অজস্র পাঠক/পাঠিকার অভিনন্দন ধন্য হয়ে বাদল ঘোষ রায়ের নতুন উপন্যাস **শ্লোগানের থেকে প্রেম শুরু তুলিতে** ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। এছাড়া নিয়মিত ফিচার, দিলীপ রায়ের স্বরলিপি, মাধবী মুখার্জীর রূপালাবণ্য, ভৃগুমহাচার্যের রাশিফল, শেখর সেনের ফিল্ম দুনিয়া ইত্যাদি। প্রতি কপি ১-৫০। বার্ষিক গ্রাহক ১৮। নমুনা সংখ্যা পাঠান হয় না। পূজার লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ১৫ই আগষ্ট। সমস্ত রকম যোগাযোগের ঠিকানা : জ্যোতি লাহা/সহঃ সম্পাদক তুলি, ৭৩জি, আলিপুর রোড, কলিকাতা-২৭। সাংবাদিকতায় পারদর্শী মহিলা সাংবাদিক আবশ্যক।

পরবর্তী বিজ্ঞাপনে নজর রাখুন॥

নিউ গণেশ অপেরার 'সবুজ ফসল' পালার তপনকুমার

বারবনিতা ফুলমণি মূলত একজন মানুষ এবং লাভ-লোকসানের হিসেব করার ক্ষমতা তার আছে। তার সদ্ব্যবহার করতে গিয়ে শেষে একদিন নিহত হতে হয়, গগনের হাতে।

'গগন' নামে এই নাটকের বক্তব্য জোরালো এবং সময়ানুগ হলেও নাটা রচনায় এবং প্রযোজনায় কোন কোন জায়গা দুর্বল থেকে গেছে। প্রসঙ্গত নাটক শুরুর উল্লেখ করা যেতে পারে। আর একটি বিষয়, নাটকের কয়েকটি, বিশেষত গগন এবং ফুলমণির বেশকিছু সংলাপ কাব্যধর্মী, শুরু থেকে যদি সারাক্ষণ এর ধারাবাহিকতা বজায় থাকত, তাহলে নতুন কিছু করা না হলেও, একটা অর্থ স্পষ্ট হয়ে উঠত। সুতরাং কেন এই-রকম করা, মনে প্রশ্ন আসে।

দু ঢাকার প্রামাণিক ঠেলাগাড়িতে টেলিফোন বেজে ওঠার ঘটনাটি সাজানো হলেও, এত সহজে একজন অবাঙালী ব্যবসায়ীকে ধাপ্পা দেওয়া যায় কিনা নাট্যকার ভেবে দেখবেন। ভেবে দেখবেন, জেলখানায় গগন এবং হারামির হত্যাকার" ফাঁসীর দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কেলের মুখোমুখি হওয়ার দৃশ্যটি। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামীদের বড়া পাহাড়ায় অন্যত্র, একেবারে আলাদা রাখা হয়।

এসব বাদ দিলেও সংলাপ রচনায়, অভিনয়ে, প্রযোজনায় পরপরই এমন কিছু মুহূর্তের সৃষ্টি হয়েছে যা বিস্ময়কর এবং নাট্যকার, প্রয়োগপ্রধান ও গগন চরিত্রের অভিনেতা নিমাই ঘোষের কৃতিত্বের পরিচয় বহন করে।

অভিনয়ে যে এই গোষ্ঠীর সকলেই দক্ষ তা প্রমাণিত। বেবী সেনগুপ্তর উচ্চারণ, চাহনি ইত্যাদি ফুলমণির চরিত্র-চিত্রণে সহায়ক হয়েছে। কেলে, হারামি, পুরুত এবং বোবা-কালা কসাইয়ের চরিত্রে যথাক্রমে সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, অবনী মণ্ডল, রতন ব্যানার্জি ও অরূপ মুখার্জির অ উল্লেখযোগ্য। সুপরিকল্পনা সত্ত্বেও এবং ধ্বনি প্রক্ষেপণের ক্ষেত্রে সেদিন ক অঘটন ঘটেছে। আশা করি পরবর্তী নয়ে এই বিষয়ে 'ফোকাস' যত্ন নেবেন। আলোক পরিকল্পনা, বিশেষত নি একটু ভেবে নেওয়ার প্রয়োজন নিঃস আছে। যেমন একাধিক সময়ে চরিত্র এবং দুটি আলো,—অথচ চরিত্রের অন্ধকার। এইসব ছোটখাটো ভুল ভীষ হয়ে দাঁড়ায়,—ক্ষেত্রটি যখন হয় গ গিয়েটার।

নির্মলকুমার

দেবী বিসর্জন

গত ১৮ই জুলাই বিশ্বনা গণেশ অপেরা উপস্থাপনা করলেন এ বছরের প্রথম পালা দেবী বিসর্জন।

করুণ ও মর্মান্তিক প্রেমের নাটক বিসর্জন। এ পালার কাহিনী থেকে প্র ভূমিকায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই মহানায়ক ত কুমারের নাম। দর্শন শাস্ত্রে উচ্চশিক্ষি বুদ্ধিবান, সম্মানীয়, অর্থবান পিতার এ মাত্র ছেলের, এক ঝড়ের রাতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এ পাল ঘটনায় বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি থাকলেও নাটকের প্রধান বিষয়। একটু উঁচু ধরে নাটক তাই আবেগ আর স্থির মন নি করতে হবে বিচার। পালায় করুণ র নাটকীয় উপাদান, দর্শকরা মনপ্রাণ দি উপলব্ধি করতে পারবেন।

সমগ্র পালাটিতে তপনকুমারের অনব অভিনয়, প্রাণবন্ত ও হৃদয়স্পর্শী প্রতিটি অভিব্যক্তি ও বাচনভঙ্গী- নয়। সাবাস্ জানাতেই হয়। এ পালা একটি আকর্ষণ নবাগত নায়িকা দেবীর গীতাঞ্জলি ব্যানার্জি। এই বিয়োগান্ত তার আবির্ভাব ভবিষ্যতের পাথেয় নেপালের চরিত্রে রঙ্গলাল কর, রাধার চরি অঞ্জলি ভট্টাচার্য প্রশংসার দাবী করে দারুণ অভিনয় করেছেন হাবু রায়।

শংকর গঙ্গোপাধ্য

ছন্দখত্

সেদিন ছন্দখত্ আয়োজিত এক মার্গ সঙ্গীতের অনুষ্ঠান শুনলাম বিদ্যা মন্দির প্রেক্ষাগৃহে। অংশগ্রহণ ক ছিলেন কণ্ঠসঙ্গীতে শরাফৎ হোসেন খান যন্ত্রসঙ্গীতে বজেন বিশ্বাস। অনুষ্ঠা শু হয় বজেন বিশ্বাসের 'বজেতরঙ্গ' দি বজেনবাবুর স্বরচিত যন্ত্র, এঁর হাতে আ অন্য যন্ত্রও শুনেছি ই তবলা এবং মনজি বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে বাজাতে পারেন। ব কুড়ি আগে ৬'খ একটি বাজনার আয়ো করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। শে

ভাগই বিদেশী ছিলেন এবং তাঁরা শুনে মুগ্ধ তো হয়েছিলেন। কিছুটা হয়েছিলেন যে ঐ ছোট্ট একটি যন্ত্র [illegible] রকম বোল, বাণী বাজাতে সেদিন বজতরঙ্গ বাজিয়ে প্রমাণ ন যে, ওঁর ছন্দ ও তালের ওপর দখল আছে। সুরের ওপর তার কম দখল নেই।

[illegible]বাবু চোখে দেখেন না। কিন্তু এবং সৌন্দর্যবোধের ব্যাপারে ওঁর র দৃষ্টিশক্তি খুবই প্রখর। ভগবান এক দিকে যেটা দিতে পারে নি, আরেক দিক দিয়ে পুরোপুরি পুষিয়ে ন।

সামান্য বিরতির পর শরাফৎ হোসেন রাগ ছায়া-বেহাগ দিয়ে নিজের ন শুরু করেন। শরাফৎ হোসেন খাঁন [illegible] গ্রামকরা শিল্পীর থেকে অনেক [illegible], আতরাউলি ও রঙ্গীলা ঘরের [illegible] ওঁর মধ্যে থাকলেও ওঁর সব সময়েই ঘরানার তালিমের [illegible] ছাড়িয়ে যায়। ফৈয়াজ খাঁ র কাছে দীর্ঘদিন শিখলেও ওঁর সজস্বতার জন্যই আমরা ফৈয়াজ খাঁকে ভাবে খুঁজে পাই না। ওঁর নিজের ওঁকে সঙ্গীত জগতের আলাদা একটি ন্যালিটি বানিয়ে দিয়েছে — যে তত্ব একই ঘরের অন্য শিল্পীদের সম্পূর্ণ আলাদা। ওঁর পরিবেশিত বেহাগে সেদিন বেহাগের থেকে ছায়ার ই প্রয়োগই বেশী ছিল। কখনও সারে গামা মাপা যাচছিলেন। কখনও ধৈবত ও যাচছিলেন এবং ঐখান থেকে ফিরে ছলেন রেখাব। এর মধ্যে বেহাগের পামাগা-গামা প্রয়োগ করে রাগের ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। ৎ হোসেন খাঁর কণ্ঠ বলিষ্ঠ, খোলা ুর গলায় যে রকম দাপট আছে, সে ও আছে। তবে সেদিন বিস্তার চড়ার সুরগুলিই গলায় বেশী খুল- । মন্দ্র ও মধ্যসপ্তকের থেকে তার- ক পৌঁছনোর পর যেন গলাটি জমে এল। এঁর আলাপের গতি ধীর। এবং প্রতিটি স্বরের বিস্তারে এত সূক্ষ্মতার মধ্যে যান যে, সাধারণ তাদের মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে ই অলংকরণের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। ণ, সামান্য সূক্ষ্ম তফাৎ শুধু যাঁরা -বাজনা করেন তাঁরাই আলাদা করে তে পারবেন। সামান্য সম্পাদন করলে ধ হয় সর্বসাধারণ শ্রোতাদের হৃদয়কে ও বেশী নাড়া দিতে পারবেন।

ফৎ হোসেন খাঁ-এর পরে গাইলেন । মেঘ-এ উনি ওঁর ঘরোর একটি াত একতাল বন্দেস পেশ করেন। আগ্রা র মেঘ অন্য ঘরের মেঘের থেকে লাদা। এতে কোমল গান্ধারের প্রয়োগ কে। সেনী ঘরের মেঘেও কোমল গান্ধার থনও-সখনও পাওয়া যায়। কিন্তু তার য়োগে একটু তফাৎ আছে। সেনী ঘরের মল গান্ধার সবসময় অবরোহী বলে ম থেকে আসে। এরা কিন্তু কোমল গান্ধারকে রেখাব থেকে বেশীর ভাগ টানে। সেদিন গান যত সময় যেতে লাগল, ওঁর গলা আরও খুলতে লাগল। এবং গান আরও জমে উঠল। একটি অপূর্ব ভৈরবীর বন্দীশ দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করলেন। সৌন্দর্য রাগের ভাব ও ঠাস বুনুনির দিক দিয়ে শরাফৎ খাঁর ভৈরবী অপূর্ব। শরাফৎ খাঁর সঙ্গে তবলাতে সঙ্গত করেন দ্বিজেন ঘোষ, উনি নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে হাতের সীমাবদ্ধতাকে পূরণ করে দেন। সেদিন বিকেলে সব থেকে বিরক্তিকর লাগল শরাফৎ খাঁর পরিচয়ের বিবরণী। শ্রোতারা বেশীর ভাগ বাঙ্গালী হওয়া সত্তেও ভুল উচ্চারণে ইংরাজীতে পাঁচ-ছবার আটকে গিয়ে শ্রোতাদের বিরক্তির কারণ না হলেই বোধহয় ভাল হত। আরও আশ্চর্য ব্যাপার এই যে বেশ কয়েক মিনিটের এই বিবরণে কি রাগ উনি গাইবেন, সেটা শ্রোতাদের বলা হল না। এছাড়া অনুষ্ঠানের সব কিছু সুরেলা ও সুন্দর হয়েছিল।

ইউনুস হোসেনের গান

ইউনুস হোসেন খাঁর পিতা বিলায়েত হোসেন ছিলেন বিরাট পণ্ডিত—খেয়াল ছাড়াও প্রচুর ধ্রুপদ ধামার জানতেন। আগ্রা আতরাউলি ঘরানার হলেও সেনী ঘরের অনেক গান সংগ্রহ করেছিলেন। রাগ-রাগিনী নিয়ে নিয়মিত চিন্তা করতেন এবং বেশ কয়েকটি নতুন রাগ রচনা করেছিলেন যার মধ্যে যোগীকোষ বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ওঁর গান কিন্তু আমার কোন দিন ভাল লাগত না। হয়ত চিন্তা বেশী—ভাব কম বলে বা ছোটবেলায় ব্যাকরণ নিয়ে মাথা ঘামানোর মত বিদ্যে আমার ছিল না বলে। মোট কথা ওঁর গান আমার মনকে কখনই নাড়া দিতে পারে নি। এখন কিছুটা বুঝতে পারি যে সব জিনিস সবার কাছ থেকে আশা করা অন্যায়। ভাব কম থাকলেও বিলায়েত হোসেনের গানের টেপ আমার এখন খুব ভাল লাগে কারণ মনের ক্ষুধা না মেটালেও বেদনের ক্ষুধা উনি সম্পূর্ণভাবে মিটিয়ে দেন আর ওঁর রাগের ছবির থেকে শেখবার অনেক কিছু থাকে। ওঁর অগাধ পাণ্ডিত্য বুঝে মুগ্ধ হই।

সেদিন সন্ধ্যায় কলকাতা মিউজিক সার্কেলের মাসিক অনুষ্ঠানে ইউনুস হোসেন খাঁর গান শুনে বুঝলাম যে ইনি শুধু পিতার পাণ্ডিত্যের উত্তরাধিকারী নন—নিজেও যথেষ্ট চিন্তা করেন সুর নিয়ে—এঁর কণ্ঠও কর্কশ নয়—বলিষ্ঠ।

পর পর পুরিয়া কল্যাণ আনন্দি, সুরদাসী, মল্লার, মীরাবা ক মল্লার, রামদাসী মল্লার ও নিজের তৈরি মল্লারে একটি প্রকার গেয়ে প্রমাণ করেন যে, বিদ্যা ছাড়াও ওঁর সুরবোধ ও গলার দখল যথেষ্ট পরিমাণে আছে। পর পর এতগুলি রাগ সুরে গাওয়া কম কথা নয়। আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম ইউনুস হোসেন বোলতান-এর থেকে সাধারণ খেয়াল-এর তানের দিকেই বেশি নজর দেন। ইনি

শরাফৎ হোসেন খাঁন

নিজের ঘরাণাকে অন্ধের মতন অনুসরণ করেন না—প্রতিটি অঙ্গেই নিজের বিশেষত্বকে বেশী প্রাধান্য দেন কখনও ঘরাণার কাঠামোর মধ্যে, কখনও বা ঘরাণার সীমানা পেরিয়ে গিয়ে। এতে ওঁর কল্পনাশক্তি ও ব্যক্তিত্বের প্রমাণ আমরা পাই। রাগরূপ এর ব্যাপারেও একই জিনিস লক্ষ্য করলাম। ছোট জায়গার মধ্যে ঘুরলেও তার মধ্যেই অনেক সূক্ষ্ম মীড়ের মোড়ে আছে যেগুলো ইউনুস হোসেনের একান্ত নিজস্ব।

সুব্রত রায়চৌধুরী

বন্ধ হবে যেদিন গানের খেয়া

গত সপ্তাহে সুরসপ্তকের পক্ষ থেকে বাবুল বন্দ্যোপাধ্যায় নিবেদিত তিনদিনের উৎসবের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল প্রথম দিনের অনুষ্ঠান—রবীন মজুমদারের সম্বর্ধনা। কারণ আয়োজনের সীমিত পরিসরকে ছাপিয়ে এর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল একটি মহৎ অভিপ্রায়, অশ্রুভেজা আবেদন। বাংলা ছায়াচিত্রে যে স্বল্প কয়েকজন গায়ক অভিনেতা তাঁদের প্রতিভার ঐশ্বর্যে শিল্পরসিকের প্রাপ্তির ডালি ভরে দিয়েছেন, রবীন মজুমদার তাঁদেই একজন। তিনি দিয়েছেন অনেক। কাঙ্ক্ষিত পাননি কিছুই। আজ সকল দেওয়া-নেওয়ার পালা সাঙ্গ করে জীবনের গোধূলি লগ্নে যখন প্রায় এসে দাঁড়িয়েছেন সেই সময়েই এই সম্মান জানানোর আয়োজন করে বাবুল বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরসূরীর শ্রদ্ধা মেশানো প্রণাম তাঁকে পৌঁছে দিলেন। আর সেই সঙ্গে আমাদের সুযোগ দিলেন এক গুণীর কাছে নিজেদের ঋণ স্বীকার করার।

সভায় পৌরোহিত্য করেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। রবীন মজুমদারের শিল্পকৃতির প্রতি আলোকপাত করেছেন শিল্পী ও সমাকার ভূপেন হাজারিকা, ছায়াচিত্রের তরফ থেকে তরুণ মজুমদার ও সেবাব্রত গুপ্ত, সঙ্গীত ভক্তদের পক্ষ থেকে যুগান্তর ও অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিনিধি।

ছায়াছবির প্রয়োজনেই রবীন মজুমদার গেয়েছেন বেশীর ভাগ গান। কিন্তু কণ্ঠ-সম্পদে, ভাবসৌন্দর্যে ও কল্পনার মহত্তে চিরন্তন ক্ল্যাসিক সৌন্দর্যের দীপ্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর গাওয়া 'আমার আঁধার ঘরের প্রদীপ', 'মোর প্রেমগান হারায়েছে আঁখিধারে', 'এই কিগো শেষ দান', 'মোর অনেক দিনের আশা', 'চাঁদের আলোর দেশেগো'—এই রকম আরও কত গান। অভিনয়, গান, ভাবকারুণ্য সব কিছু মিলেই সার্থকতার তুঙ্গে তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কবি কথাচিত্রে তাঁর গাওয়া 'কালো কেশে রাঙ্গা কোমল' সিনেমা সাহিত্যে তাঁকে অমর করে রেখেছে। তাঁর সম্বন্ধে সকল বক্তার ভাষণে এই কথাটিই ঘুরেফিরে এসেছিল।

তরুণ মজুমদারের একটি বক্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য : রবীন মজুমদারের পরের যুগে কবি চিত্র পুনর্নির্মাণের সময় পরিচালনার দায়িত্ব নেবার অনুরোধ আমার কাছে এসেছিল। কিন্তু সে প্রস্তাব গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কারণ একটি চিন্তাই তখন আমায় শংকিত করেছিল—**আর একজন রবীন মজুমদার, আমি কোথায় পাব ?**

সম্বর্ধনার উত্তরে অভিভূত শিল্পী জানালেন জীবনে অনেক পেয়েছি। কিন্তু আজকের এই পাওয়ার রোমাঞ্চ আলাদা। আমার উত্তরযুগের মানুষ আমায় এমন করে মনে রেখেছে এটা আমার কাছে একটা বিস্ময়।

এরপর সকলের অনুরোধে তিনি গেয়ে শোনালেন সেই অতিপরিচিত গান **আমার আঁধার ঘরের প্রদীপ যদি নাই বা** জ্বলে! মনে হল প্রায় বিস্মৃত একটি যুগের পর্দা যেন সরে গিয়ে অতীতকে মূর্ত করে তুলল। সঞ্চারীতে যখন পৌঁছলেন।

বন্ধ হবে যেদিন গানের খেয়া
চুকবে সেদিন সকল দেওয়া নেওয়া,
পথের পরে ঝরবে শেফালিকা
দীর্ঘশ্বাসে মাতি—

আমাদের মনে প্রশ্ন জেগেছিল যৌবনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণেও কি এই দিনটির ছবি কোনো আনমনা মুহূর্তে তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল ?

এরপর মঞ্চস্থ হল কবি নৃত্যনাট্য যার মাধ্যমে রাগিনী সংস্থা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন তারাশংকরের 'কবি'র এই কালজয়ী নায়ককে।

উদাসী বাঁধনহারা নিতাই কবিয়াল পথে পথে ফেরে গান বেঁধে বেঁধে। ঘরছাড়া বলে পথই তার ঘর, কোনো বিশেষ বাঁধা নেই বলে সকলেই তার আপনার জন। এই

রবীন মজুমদারের হাতে শ্রদ্ধার্ঘ তুলে দিচ্ছেন তরুণ মজুমদার

নিতাইয়ের জীবনে এসেছিল দুই নারী—একজন শিশিরভেজা ফুলের মত নম্র নত ঠাকুর ঝি,—অপরজন চটুলা-পরিহাস-চঞ্চলা ঝুমুরদলের নর্তকী বসন। নিজের জীবনকে পীড়ন করেই তাকে জীবন চালাতে হত। সেই বেদনাই দাহ হয়ে নিষ্ঠুর বিদ্রূপে বিদ্ধ করত পারিপার্শ্বিক সকলকে। কিন্তু নিতাইএর সংস্পর্শে তার হৃদয়ে লুকানো চিরন্তন নারী জেগে উঠল। নিতাই ভাল বেসেছিল দুটি নারীকেই। কিন্তু দুজনকেই হারিয়ে তার মধ্যে জেগে ওঠে বেদনামথিত জীবনজিজ্ঞাসা—জীবন এত ছোটো কেনে ?—

তিন নরনারীর যন্ত্রণা জর্জর জীবনের সংঘাতকে নৃত্যে, গানে হৃদয়-ছোঁওয়া রূপ দিয়েছেন রাগিনীর শিল্পীগোষ্ঠি। নৃত্যরূপে ও গানের সুর-রচনার দায়িত্ব অসাধারণ যোগ্যতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন অসিত চট্টোপাধ্যায় ও অশোক রায়। নৃত্য পরিচালক অসিত চিরাদিন ছাপিয়ে ওঠেন নৃত্যশিল্পী অসিতকে। কিন্তু এবারে কে বড় ? বলা শক্ত। কারণ এই ধরনের সহজ, সরল গ্রাম্যচরিত্রে তাঁকে দারুন মানিয়েছিল। নৃত্যরচনাতেও তাঁর অন্তর্দৃষ্টি লক্ষ্য করবার মত। ঠাকুর-ঝি, কবিয়ালদ্বয় অথবা নিতাইয়ের নাচ লোকনৃত্যের ছাঁচে ঢালা তাদের গ্রাম্য জীবনকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার অভিপ্রায়েই। এরই মধ্যে কথাকলির ছোঁয়া লাগানো হয়েছে নাটকীয়ভাবকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য। গানের সুরেও কাফি (চাঁদ দেখে কলঙ্ক হবে বলে কে দেখেছে চাঁদ) পিলুর (নূপুর চরণে মোর) এবং আরো অনেক রাগের ছোঁওয়া থাকলেও বৃন্দের দোলায় গ্রামীণ মূর্ত। ঝুমুর দলের নাচ কথকের প্রয়োগে আসর সরগরম করে তু এ কৃতিত্ব অশোক রায়ের। মাসীর সঙ্গীত-সংলাপে নেপথ্যে অনবের কণ্ঠের ব্যবহারে বুদ্ধির উপভোগ্য। অবশ্য অসিত চট্টো অশোক রায়ের নৃত্য ও সঙ্গীত এমন রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠতে পারত না আরতি মজুমদার, গায়ত্রী চট্ আরতি মুখোপাধ্যায়, জটিলেশ্বরে শিল্পীরা নৃত্য ও সুরকে রূপময় তুলতেন। কানিষ্ক সেনের আলো হয়ে উঠেছিল অন্ধকারের যথাযথ স্থাপনায়।

শেষ দিনে, শ্যামমোহন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান ছাড়া ধরে রাখবার মত কিছু ছিল না। নন্দার নাচ খুবই ভালো। কিন্ত ছাড়া নাচের অসম্পূর্ণতা পী বিহার্সালের অভাব সৌন্দর্যভরা অভিব্যক্তি দিয়ে ভোলানোর প্রয়া তিনি অসফল হননি। কারণ তিনি ময়ী। কিন্তু ঘন ঘন শ্যামা, শ চিত্রাঙ্গদা—এদের প্রাণহীন করে দ্বিতীয় দিনে, কণিকা বন্দ্যো পরিচালনায় তরুণেশ্বর শিল্পীগোষ্ঠি বেশন করেছেন বাদল সাঁঝে। স্বপ্না ঘোষাল ও শৈলেন দাস, ঋতু গুহঠাকুরতা, বনানী ঘোষ, স্ব-বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। ভাষ্যপাঠে পার্থ ঘোষ, গৌরী ঘোষ ও কল্যাণ রা

সহধ

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

মূল্য ৭৫ পয়সা ; ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

মহাত্মা
শিশিরকুমার ঘোষ

প্রণীত

কয়েকটি অমূল্য লোক-চরিত
ও কাব্য-গাঁথা

এই অপূর্ব রচনাগুলি পাঠক-পাঠিকাদের
দেবে অমৃত পানের আনন্দ। তৃষিত শোকসন্তপ্ত
হৃদয়ে আনবে পরম শান্তি।

শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত ১ম—৬ষ্ঠ খণ্ড ২৬·০০

শ্রীনরোত্তম চরিত ৩·৫০ পঃ

শ্রীকালাচাঁদ গীতা ৩·০০

Lord Gouranga (Eng. Vol. 1) ৩·০০

গ্রন্থগুলি জনপ্রিয় হলেও এর মূল্য বৃদ্ধি করা হয়নি।
অবিলম্বে সংগ্রহ করুন।

প্রাপ্তিস্থান :
পত্রিকা হাউস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৭০০০০৩।

দে বুক ষ্টোর্স, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ও
নাথ ব্রাদার্স, ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট; কলিকাতা।

Regd. No. WB/NC-13
Gram : AMRITA Calcutta-700003

AMRITA

Friday 11th August, 1978
Phone 55-5231 (14 lines)

বিশুদ্ধ 'কুক্‌মী' গুঁড়া মশলার ক্রেতারা

সাবধান!

'কুক্‌মী' গুঁড়া মশলার জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে কলকাতার কয়েকটি গুঁড়া মশলা কোম্পানী তাদের নিজস্ব নিকৃষ্টমানের ব্রাণ্ডের সংগে জনপ্রিয় কুক্‌মীর নাম জুড়ে হুবহু কুক্‌মী (Cookme) নামের ষ্টাইল নকল করে আসল কুক্‌মী গুঁড়া মশলা বলে বাজারে চালাবার চেষ্টা করছে।

কেনার সময় দেখে নেবেন— 'কুক্‌মী'র প্যাকেটে কেবলমাত্র 'কুক্‌মী' (Cookme) ছাপই আছে,— অন্য কোন ব্রাণ্ডের নাম যুক্ত নেই।

11 AUG 1978

CENTRAL LIBRARY CALCUTTA

প্রস্তুতকারক :
কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
২৩৫ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা ৭০০০৭০ ● ফোন : ৩৩০৯৯৫, ৩২৬৬৩২
পোস্ট বক্স নং : বড়বাজার ৬৮৮৫ ● ফ্যাক্টরী : কাশীপুর

আততায়ী বাতাস

অমৃত

সম্পাদক প্রাতঃস্মারক
২৫ আগস্ট ১৯৭৮
দাম ৭৫ পয়সা

ঠিক যে তেলটি আমি চাই !

লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ
করা, অজস্র চিঠি পত্র
লেখা, সব বিষয়ে চটপট
সিদ্ধান্ত নেওয়া···সারাদিন
অফিসে কত কাজ !
এত কাজের মধ্যেও মাথা
ঠাণ্ডা রাখতে হয় আবার চুলও
পরিপাটি থাকা চাই ।
আর তাই আমার পছন্দ
মৃদু সুবাসিত

কেয়ো-কার্পিন

কেয়ো-কার্পিনে চুল
চটচটে হয় না।

Dey's
দে'জ
মেডিকেলের
তৈরী

PX/DM/KB-2/75

আগামী সপ্তাহে প্রকাশিত হচ্ছে—
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র রচনাসংগ্রহ

বিভূতি রচনাবলী সুলভ সংস্করণ

চতুর্থ খণ্ড

মূল্য গ্রাহকদের পক্ষে মাত্র কুড়ি টাকা
গ্রাহকগণ দয়া করে চতুর্থ খণ্ডের কুপন ও মূল্য কুড়ি টাকা দিয়ে নিম্নোক্ত কাউন্টার থেকে ঐ খণ্ড সংগ্রহ করুন।

যাঁরা রেজেস্ট্রী ডাকে নিতে চান তাঁরা চতুর্থ খণ্ডের কুপন ও মূল্য ডাকব্যয় সহ মোট ২৪ টাকা নিম্নলিখিত ঠিকানায় M. O. যোগে অথবা ব্যাঙ্ক ড্রাফট যোগে (কোম্পানীর সঠিক নামে) পাঠাবেন।

এই রচনাবলী ভিঃ পিঃ-তে পাঠানো যাবে না।

কাউন্টার থেকে সংগ্রহের সময়ঃ ছুটি ছাড়া প্রতিদিন ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৬॥টা শনিঃ বেলা ১২টা থেকে বেলা ২টা

সদ্য প্রকাশিত

প্রমথনাথ বিশীর

পনেরোই আগস্ট ২৫৲

স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত লেখকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি।

পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থ :—

নীহাররঞ্জন গুপ্তর

উত্তর ফাল্গুনী ১৫৲
জবাসন্ধর
লৌহকপাট (অখণ্ড) ৪০৲
সমরেশ বসুর
অবরোধ ১২৲
শংকর-এর
সীমাবদ্ধ ১২৲

বিমল মিত্রের
নতুন রাজনৈতিক উপন্যাস

জন-গণ-মন ১৬৲

আজ থেকে দুহাজার বছর আগে মহাকবি ভর্তৃহরি লিখে গিয়েছিলেন— 'বারাঙ্গনের নৃপতি রনেকরূপা'। অর্থাৎ রাজনীতি বারাঙ্গনাদের মতই বহুরূপী। বিমল মিত্র তাঁর এই জন-গণ-মন উপন্যাসে রাজনীতিকদের এই বারাঙ্গনাবৃত্তির স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দিয়েছেন। এই উপন্যাস শুধু যৌনতার প্রতিবাদ নয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমস্ত অন্যায়, অত্যাচার আর অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ। আর শুধু নিছক প্রতিবাদই নয়, এক অনন্য রক্তাক্ত প্রতিবাদ এই 'জন-গণ-মন' উপন্যাস।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের

বিভ্রান্ত ৮৲

পনেরো বছর আগে পরিত্যক্তা স্ত্রীর কাছে ফিরে এতদিনে কী দেখবে, তা সে জানত। তবু তাকে ফিরতে হল বুঝি নিজেরই এক অন্য সত্তার কাছে জবাবদিহি করতেই। সে তার ছেলেবেলার সহচর। তার স্ত্রী এখন এই দ্বিতীয় পুরুষটির অঙ্কশায়িনী। অথচ জেনে শুনে এই প্রত্যাবর্তন। মার্চের এক জ্যোৎস্নারাতে নিঃঝুম জীর্ণ বাড়িতে মুখোমুখি বসল স্মৃতিভারাক্রান্ত দুটি পুরুষ এবং একটি নারী। অস্তিত্বের তীব্র স্বাধীনতায় বিভ্রান্ত তিনটি মানুষের নাটকীয় এই বৈঠক অনিবার্যভাবে ঘটল চরম বিস্ফোরণ।

গ্রাহকদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ

সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী ও বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী

উপরোক্ত দুটি রচনাবলীর গ্রাহকদের প্রতি আমাদের বিনীত অনুরোধ যে, তাঁরা যেন পত্রোত্তরে নির্দিষ্ট [illegible] তাঁর গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করে তাঁদের পুরো ঠিকানাসমেত পত্র আমাদের দপ্তরে পাঠান।

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিঃ-৭৩। ৩৫৮৭৯১
৮৬।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ ৩৪৩৪৯২

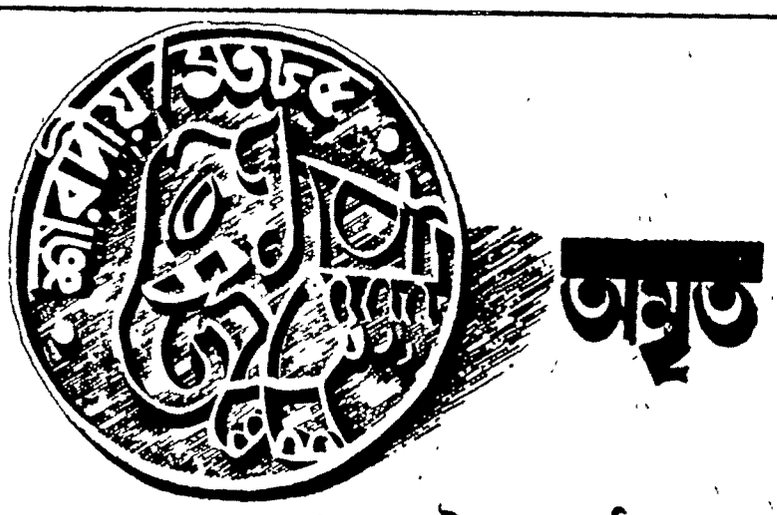

সুখের স্মৃতি দুঃখের স্মৃতি

রাণী চন্দ

গুরুশিষ্য ছবিতে যুগল-বন্দী। অবনীন্দ্রনাথ আর রাণী চন্দ। দু'জনে মিলে এক সঙ্গে এঁকেছিলেন শান্তিনিকেতনের অনেকগুলো রঙিন ছবি। সেই ছবি আঁকার অসাধারণ কাহিনী এই প্রথম লিখলেন অসামান্যা লেখিকা রাণী চন্দ। এই ধরণের পুজো সংখ্যায় তাঁর লেখাও এই প্রথম।

রবিঠাকুরের পাগলা ফাইল

অমিতাভ চৌধুরী

বন্ধ উন্মাদ, পাগল ও ছিট গ্রস্তদের রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠি। কেউ চাইছে পেঁপের বিচি, কেউ চাইছে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার সোজা রাস্তা, কেউ পাঠাচ্ছে সোনালী চুলের গোছা। শত শত চিঠি। রবীন্দ্রনাথ কী করেছেন সেই চিঠির তাড়া নিয়ে?

এবার পুজোয় সব চেয়ে বড় আকর্ষণ শান্তিনিকেতনের যাদুঘর থেকে অমৃতের জন্য বিশেষভাবে আনা অমিতাভ চৌধুরীর. এই সুদীর্ঘ সচিত্র রচনা।

লেখক যখন প্রেমিক

তখন ডায়ারির পাতায় এক একটি শব্দ মানে স্মৃতির শুকনো বকুল। একজন বিশিষ্ট বাঙালী লেখক মধ্য বয়সে নিতান্ত সামান্য বালিকার প্রেমে পড়েছিলেন। লেখকের নামটি পরে প্রকাশ্য। অন্যতম শারদীয়া চমক।

উল্লম্বনারী

ভবেশ সান্যাল

আসামের ছেলে ভবেশ সান্যাল চৌরঙ্গীর আর্ট স্কুলে ছবি আঁকতে এসে মডেলের খোঁজে ছুটলেন নিষিদ্ধ পল্লীতে। তখন ছবির জগতে রয়েছেন অবন ঠাকুর, যামিনী রায়। গল্পকে হার মানান ভাষায়, সেই সব মানুষ ও সময়ের কথা।

নরবলি এখনও আছে

অবিশ্বাস্য হলেও বিশ্বাস করতে হবে। ওড়িশার গাঁয়ে ঘুরে নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন সংকর্ষণ রায়—ছবি সহ ইতিহাসে নিপুণ ধারাবিবরণী।

শিশির ও বিশ্বনাথ

মধুসূদন মজুমদার

প্রখ্যাত নট শিশির ভাদুড়ীর ভাই বিশ্বনাথ ভাদুড়ীও কম যেতেন না। তাই নিশ্চে শিশিরবাবুর মধ্যে একটু ঈর্ষাও ছিল সম্ভবত। দুই ভাদুড়ীর ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ ফুটেছে এই লেখাটিতে।

উপন্যাস লিখছেন

আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, সরেন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, শচীন দাস।

বড় গল্প লিখছেন

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, লীলা মজুমদার, নবনীতা দেব সেন।

গল্প লিখছেন

মনোজ বসু, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, পরিতোষ সেন, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ. অমর মিত্র ও আরও অনেকে।

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের প্রবন্ধ
সুমথনাথ ঘোষের 'সাহিত্যিক আড্ডা'

কবিতা লিখছেন

অরুণ মিত্র, মনীন্দ্র রায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, কৃষ্ণ ধর, আলোক সরকার, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, সুনীল নন্দী এবং আরও অনেকে।

শ্রীদুর্গা ও শ্রীগৌরাঙ্গের রঙিন অফসেট ছবি

আপনার কপির জন্য হকার বা এজেন্টকে এখুনি বলে রাখুন অথবা লিখুন সার্কুলেশন ম্যানেজার; অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কলি-৩।

সেপ্টেম্বরেই বেরোবে

দাম ঃ দশ টাকা। রেজিষ্ট্রি ডাকে অতিরিক্ত দু টাকা পঁচিশ পয়সা

অমৃত

১৪ বর্ষ
১৫ সংখ্যা
৮ ভাদ্র, ১৩৮৫
25 August, 1978

সম্পাদকীয় ৩
সাহিত্য ইত্যাদি ৪ মণীন্দ্র রায়
তৃষ্ণায় ডুবে আছি ৫
সমীর চট্টোপাধ্যায়
সমালোচনা ৬
রাজধানীর ইনসাইড স্টোরি ৮
পর্যবেক্ষক
বেবতীভূষণের কার্টুন ৯
রাজনীতি কলকাতা স্টাইল ১০
বেদব্যাস বৈদ্য
শান্তিকুমার ঘোষ, দেবী রায়, সাধনা মুখোপাধ্যায়, আশিস দত্ত
কবিতা ১১
ভারত কী কবে ভাগ হল ? ১২
বিমলানন্দ শাসমল
প্রচ্ছদ কাহিনী ১৮
আততায়ী বাতাস
শিশিরকুমার নিয়োগী
প্রচ্ছদ শিল্পী মানুবাঠোর
এপার থেকে ওপারে ২১
পবিত্র মুখোপাধ্যায়
সোনার হরিণ নেই (উপন্যাস) ২৪
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
তরুণী পাহাড়ে বসন্ত (উপন্যাস) ২৪
শৈবাল মিত্র
সাবিত্রীর সতীদাহ (গল্প) ৩৩
বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
চিত্তবিনোদনে অতুলপ্রসাদ ৩৬
সোমেন্দ্রনাথ গুপ্ত
সাম্রাজ্ঞী (গল্প) ৩৯
সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
হাওয়া গাড়ি (উপন্যাস) ৪৮
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
কৃতি প্রতিভা : কিছু কথাবার্তা ৫০
চিঠিপত্র ৫৫
ভাগ্য গণনা ৫৬
পহেলে আপ, পহেলে আপ ৫৭
শান্তিপ্রিয় বন্দোপাধ্যায়
বড খেলার বড নাটক ৫৮
স্ট্রাইকার
খেলা ৫৯ দর্শক
চিত্রধ্বনি ৬০

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ কাহিনী
ফিল্মমেকার বুদ্ধদেব
লিখেছেন নির্মলকুমার দাশ
গল্প লিখেছেন গৌরীশংকর ভট্টাচার্য

এশিয়াটিক সোসাইটির ক্রনিক ব্যাধি

পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে কলকাতা নগরীতে যেসব সাংস্কৃতিক ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান আছে, সবগুলোই নানারকম ক্রনিক ব্যাধিতে আক্রান্ত। জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে শুরু করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এবং এশিয়াটিক সোসাইটি— কোনো প্রতিষ্ঠানই সুস্থভাবে চলে না। সম্প্রতি ঐ শেষোক্ত সংগ্রহশালা অর্থাৎ এশিয়াটিক সোসাইটিতে যা ঘটছে তাতে ব্যাধিটা যে কতো জটিল তারই প্রমাণ পাওয়া যাবে।

অভিযোগের তালিকা সুদীর্ঘ এবং বহুবিধ। ঊনিশ শতকে যেসব দেশী ও বিদেশী মনীষী এই প্রতিষ্ঠানের গোড়া পত্তন ঘটিয়েছিলেন তাঁরা ভাবতেও পাবেন নি, এত তাড়াতাড়ি এর বার্ধক্য দেখা দেবে। এখানে মূল্যবান পুঁথিপত্র অযত্নে নষ্ট হওয়া এবং খোয়া যাওয়া থেকে শুরু করে আর্থিক লেনদেনের বেহিসাবীপণা—সমস্ত অভিযোগই বহুদিনের পুরনো। এবং পুরনো ব্যাধি বলেই বোধহয় কোনোভাবেই এর কোনো নিরাময় ঘটানো যাচ্ছে না।

ইংরেজরা আমাদের দেশে আর কিছু পারুক না পারুক আমলাতান্ত্রিক মনোভাব, লালফিতের দাপট এবং আইনের কূটকৌশল ইত্যাদি ভালো করেই শিখিয়ে দিতে পেরেছে। প্রায় প্রতিটি সংকটকালেই আমরা এইসব প্রক্রিয়ার কোনো-না-কোনোটিকে অবলম্বন করে আত্মরক্ষা করতে অভ্যস্ত। দেখা যাচ্ছে, এশিয়াটিক সোসাইটির গোলযোগ নিয়েও ইতিপূর্বে যে তথ্যানুসন্ধানী কমিটি নিযুক্ত হযেছিল, নানারকম টেকনিকাল ত্রুটির জন্যে কিছুতেই তার রিপোর্ট সম্পূর্ণ হতে পারছে না।

প্রথমত যে অনুসন্ধান নিরপেক্ষ কমিটির মারফৎ করালে তার রিপোর্ট সর্বমতগ্রাহ্য হতে পারত, তা সোসাইটিরই নিজস্ব কাউন্সিলের দ্বারা করানোর ফলে এমনিতেই নানারকম গুঞ্জন শোনা গেছে। তার ওপর তদন্ত যদি বা শুরু হল, শেষ আর হয় না। কখনো সোসাইটির সভাপতি নাকি চিঠি দেন কমিটির চেয়ারম্যানকে, কখনো বা চেয়ারম্যানই হয়ে পড়েন অসুস্থ। তারপর দ্বিতীয় চেয়ারম্যান স্থির হলে তিনিও হন চক্ষুরোগে আক্রান্ত। ইতিমধ্যে রিপোর্ট পাওয়া এবং তার ভিত্তিতে কিছু সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে সোসাইটির কাজকর্মও নাকি অচল হয়ে পড়ছে। অতএব যে কোনো দিক দিয়েই বিচার করা যাক, অবস্থাটি খুব সংকটজনক। এবং সকলেই যা অপছন্দ করবেন, বর্তমান অচলাবস্থা থেকে সোসাইটিকে উদ্ধার করার জন্যে হয়তো শেষ পর্যন্ত দরকার হবে সরকারী হস্তক্ষেপ।

আত্মঘাত আর কাকে বলে।

সাহিত্য ইত্যাদি...

সৈয়দ মুজতবা আলির সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় চিঠিতে। পরে সামনা-সামনি। চিঠিটা প্রথম তিনিই দিয়েছিলেন, 'অমৃতে'র এক লেখার একটি ভুল শব্দ নিয়ে। কে যেন লিখেছিলেন, 'নাথুলা গিরিবর্ত্ম'। আলি সাহেব জানালেন, লা কথাটির মানেই হল গিরিবর্ত্ম'। জায়গাটার নাম নাথু। কাজেই 'নাথুলা' বলা আর চাক্ষুষ চোখে দেখা' বলা একই রকম ব্যাপার।

জবাবে আমি নমস্কার জানিয়ে বলেছিলাম, ভুল ধরিয়ে দেবার জন্যে ধন্যবাদ, যদিচ ভুলটা ঠিক আমারই ছিল না। কিন্তু কথাটা যে ভুল তা জানতাম না ঠিকই। কাজেই, ইত্যাদি....ইত্যাদি।

বেশ কয়েক বছর পর চাক্ষুষ দেখা হল তাঁর সঙ্গে। থাকতেন তখন বোলপুরে। কয়েকদিনের জন্যে কলকাতায় এসে ডেরা বেঁধেছিলেন মনোজ বসুর বাড়িতে। কী এক কাজের জন্যে সেখানে গিয়ে একেবারে সামনাসামনি দেখা।

প্রাথমিক নাম বিনিময়ের পর আমিই তুললাম সেই নাথুলা, অর্থাৎ তাঁর উপমায়, চাক্ষুষ চোখে দেখার বেফাবেন্স। বললাম, আপনি সেদিন জ্ঞানাঞ্জন শলাকার খোঁচায় এমন করেই চোখ ফুটিয়ে দিয়েছেন যে, তারপর থেকে কুয়াশাচ্ছন্ন আমার চোখে এখন কিন্তু শব্দ ধরা দিচ্ছে। আমার মনে পড়ছে ছেলেবেলায় আমাদের পাবনার গ্রামে একজন বর্ষিয়সী নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোক ছিল, যাকে গ্রাম সমাজের বেওয়াজ অনুযায়ী আমরা ঠাকুরদাদী পিসি বলে ডাকতাম—তার মুখে গিরিবর্ত্ম কাপড়' কথাটি শুনেছিলাম। এবং আমার কর্তামাকে প্রায়ই বলতে শুনেছি সেদ্ধান্ন ভাত (অর্থাৎ সিদ্ধান্ন ভাত), যাকে এপার বাংলার ইডিয়মে বলা হয়, ভাতে ভাত। কিন্তু পরে যখন বড় হয়েছি, কলকাতায় এসেছি, তখন বুঝলাম ডবল শব্দ বলা নিরক্ষর গ্রাম্য নারীদেরই একমাত্র স্বভাব নয়। শিক্ষিত মানুষরাও একই কাজ করেন, এবং সম্ভবত না জেনে। যথা, পাঁউরুটি। কথাটার সঙ্গে পায়ের কোনো সম্পর্ক নেই। সে তো আমার চেয়ে আপনি ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু অনেকেরই বোধহয় সেই-রকম ধারণা। না হলে হাত-রুটি কথাটি এল কেন। কে তাদের বোঝাবে যে আসল ব্যাপার অন্যরকম। 'পাও' কথাটির মানেই তো রুটি, আর সেটা পর্তুগীজ শব্দ, তাই না? কাজেই পাওরুটি কথাটার মানে দাঁড়াল রুটি-রুটি। ঠিক কিনা বলুন।

আলি সাহেব বসেছিলেন খাটের ওপর, আমি ছিলাম চেয়ারে। উনি হাত দিয়ে খাটের ওপর থেকে একটি থাবড়া দিয়ে বললেন, নেমে আসুন, একাসনে বসুন। আপনার সঙ্গে [illegible] মনে হচ্ছে।

তারপর প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে চলল শব্দ নিয়ে সশব্দ গবেষণা, সঙ্গে উচ্চহাসি। আমি ও-রসের রসিক হলেও, শ্রুতিধর নই। কাজেই প্রতিবেদন উপস্থিত করা গেল না। কিন্তু আলি সাহেব যে সত্যিই খুব ওয়াকিবহাল ব্যক্তি তা বুঝতে পেরেছিলাম।

যাহোক, সৈয়দ মুজতবা আলি আমার আসল বিষয় নন। আমার বক্তব্য হল, নিছক লেখার ব্যাপার ছাড়াও লেখকদের মধ্যে যদি অন্য কোনো প্রসঙ্গে কৌতূহল থাকে এবং থাকে সামান্য একটু ঝকঝকে পুইয়ে সে বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে জানার ইচ্ছে, তাহলে মানুষ হিসেবেই তাঁর কিঞ্চিৎ সৌরভ বৃদ্ধি ঘটে।

কিম্বা কথাটায় হয়তো ভুল থেকে গেল। লেখার ব্যাপার ছাড়া নয়, লেখার ব্যাপারের জন্যেই বোধহয় এটা দরকার। নাহলে লেখা জলো হয়ে যায়, একঘেয়ে লাগে।

বাংলা উপন্যাসকে শক্ত বনিয়াদে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন যিনি সেই বঙ্কিমের দৃষ্টান্ত ধরুন না। সংস্কৃত আর ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর দখল ছিল এতো জানা কথা। ধর্মতত্ত্ব আর মিল-বেনথাম না হয় বোঝা গেল। কিন্তু বাঙালির ইতিহাস আর কৃষক জীবন নিয়ে তাঁর এত বিস্তৃত জানার দরকার কী ছিল। তারপর ধরুন ঈশ্বর গুপ্তের ওপর সেই নিবন্ধটি। গুপ্ত-কবির সে মূল্যায়ন থেকে নতুন কথা এখন পর্যন্তও তো হাজির করতে পারলেন না কেউ। কী করে তা সম্ভব হল? এতো শুধু সাহিত্যবোধের কথা নয়। পুরনো যুগ আর নতুন দিনের সমাজ পরিস্থিতি আর মূল্যবোধের বিষয়ে বেশ একটা স্পষ্ট ধরনের মতামত না থাকলে এ কাজ সম্ভব হত না কখনো। আর তেমন মতামত সম্ভব হতে পারে শুধু একজন সর্বতোভাবে সজাগ আর অনুসন্ধিৎসু মানুষের পক্ষেই।

বঙ্কিম যে যুগপ্রবর্তক লেখক হতে পেরেছিলেন সে শুধু লিখনপটুত্বের জন্যেই নয়, নিছক সাহিত্য ছাড়াও জীবনের আর দশটা দিকে কৌতূহল ছিল বলেই।

তারপর রবীন্দ্রনাথ। তালিকা দিতে গেলে কয়েক ডজন প্রসঙ্গ হাজির করা যায়। কিন্তু লোকসঙ্গীত এবং বাউল গান সংগ্রহের ব্যাপারটা যে তবু ওর মধ্যেই একটু বিশেষ জাতের কৌতূহল তা উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। এবং বিজ্ঞান। রবীন্দ্রনাথের মতো রোমান্টিক কবি, যাকে এমন কি মিস্টিক বলেও মনে হয় [illegible] সময়, তিনি যে বিজ্ঞান নিয়ে অতো [illegible] শোনা করতেন কে জানত। আর শুধু পড়াশোনা নয়, নিজে একখানা বই লেখার মতো করে জানা। 'বিশ্ব পরিচয়' বইখানা সেদিক থেকে চোখ খুলে দেবার মতো। সাহিত্য নিয়ে থাকলে জীবনের কোনো দিকে নজর দেবার দরকার নেই বলে মনে করেন যাঁরা তাঁদের ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দেবার মতো ঘটনা।

আমি এমন বলব না যে, এ [illegible] লেখকরা কেউই কোনো ব্যাপারে কৌতূহলী নন। তবে লেখকের সংখ্যা যতো বেশি সে অনুপাতে আগ্রহী ব্যক্তিদের মাইনরিটিই বলতে হয়।

কিছুকাল আগে সন্তোষকুমার ঘোষ বাংলা বানান নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। সে প্রসঙ্গে প্রতাপকুমার রায়, এবং সম্ভোষের মনে পড়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। তাছাড়া জগন্নাথ চক্রবর্তী ও শুভেন্দু মুখোপাধ্যায় বানান ও লিপিসমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন দেখেছি। আর সুভাষ মুখোপাধ্যায় যে ব্যাপারে আগ্রহী তা তাঁর বাংলা বানান সংস্কার সমিতির সম্পাদক হওয়া থেকেই বোঝা যায়।

কয়েকদিন আগে একটি মিটিং বসেছিল '৮০ সালে' বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় বইখানির ১২৫ বছর উদযাপনের প্রস্তুতি উপলক্ষ্যে ড° নীহার রঞ্জন রায় সেই সভায় শিশু ও [illegible] শিক্ষার্থীদের জন্যে অপেক্ষাকৃত বড় টাইপ বই ছাপানোর ব্যাপারে বিদ্যাসাগরও যে কতো গভীরভাবে বিবেচনা করেছিলেন, সে কথার উল্লেখ করেন।

কিন্তু শুধু সাহিত্যই নয়। একালের লেখক অন্য বিষয়েও আগ্রহ দেখিয়েছেন কখনো-সখনো। যেমন ভারতীয় সেনা-বাহিনীর বিষয়ে সুবোধ ঘোষের অনু-সন্ধান। কিম্বা পাখির বিষয়ে বনফুলের কৌতূহল। এঁদের বইও আছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জ্ঞানকে ভিত্তি করে।

এরকম আরো কেউ কেউ উৎসাহ দেখিয়েছেন। তার প্রমাণও আছে তাঁদের বইয়ে। কিন্তু আগেই বলেছি, সংখ্যায় বড় কম।

জীবন সম্বন্ধে সেই ব্যাপ্ত কৌতূহলের বৃত্তটা কমেই যেন ছোটো হয়ে আসছে। সেইটেই দুঃখের।

মণীন্দ্র রায়

সাহিত্য এবং অনুসন্ধান

সুকুমার মিস্ত্রী সম্পাদিত

তটলিপি বেরিয়েছে

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার

সংস্কৃতি সংকলন

পোঃ মনিরতট, ২৪ পরগণা

দাম ২-৫০

রি-৭৫১৫

তৃষ্ণায় ডুবে আছি

সমীর চট্টোপাধ্যায়

অফিস থেকে বেরিয়ে সোমেন ভাবলো, যাবে? কফি-হাউসে যেতে ওর ভালো লাগে না। ওখানে সম্প্রতি বড়ো বিশ্রী অভিজাতের ভিড়। ভাবলো, অশোকের বাড়ি গেলে কেমন হয়! অশোকের ছোট বোন সোমেনের ব্যাপারে যথেষ্ট দুর্বল। গেলেই ভালো-মন্দ খাওয়াবে, ছুতোয়-নাতায় বেরুখানায় এসে গল্প জমাবে। কিন্তু সেখানে যেতেও ও এখন তেমন উৎসাহ পেলো না। হাঁটতে হাঁটতে বলেজ স্ট্রীটের মোড়ে এসে সাহিত্যের পত্র-পত্রিকা উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগলো সোমেন। এটা ওর বহুদিনের অভ্যাস। নিজে লেখালিখির ক্ষেত্রে মাইলের মধ্যে নেই, কিন্তু অনেক সাহিত্য-কর্মিয়ে বন্ধু-বান্ধব আছে, আছে সাহিত্য বোঝার নিজস্ব বুদ্ধি। ছোট বড় আর পত্র-পত্রিকা পড়ে ও নিজেই তৈরি করে নিয়েছে এক-একজনের মাপে সাহিত্যের সংজ্ঞা। আর, সাহিত্যের আখড়ায় অবিরাম যে গোষ্ঠির মারপ্যাঁচ তা তাবিয়ে ভাবিয়ে উপভোগ করে সোমেন হঠাৎ পকেট চিরুনি বের করে মাথায় ভাবিয়ে দেখে, হাতঘড়ি করে টাম থেকে নামছে বুঝতে পারে, গোটা আর অতনু। ওরা সোমেনের বন্ধু-স্থানীয়। সাহিত্যে একটু নতুন ধরনের। এসেই বললো, 'কি করছো এখন? চলো কই। তোমাকে দেখেই ধরেছিলাম—' আজ যাবেই না ভেবেছিল সোমেন। গোত্র ধরে ঝুলে থাকা ওর ভালো লাগে না। তবে কিছুদিন ধরে-বাঁধা জীবনযাপনের পর ওরও একটানা মনে হয়, ছাঁচ ভেঙে ফেলা উচিত, তখন নতুন নতুন লাগে, কিন্তু—। 'আজ সন্ধ্যে, চলো না, আজই ফাস্ট।'

অগত্যা—

অঘানে একসময় পরপর বারোটা দরজা খুলে যাওয়ায় বন্ধ ঘরটায় নিঃশ্বাস উঠলো পাঁচিল। সন্ধ্যে পর প্রত্যেকটা দরজা হয়ে গেলো চলমান। তবে, সেন্টার খাবসা সেই থেকেই ঐ একই বিশ্রী গন্ধে ভরে রয়েছে বহুদিন। ঢুকেই সোমেনের মনে হয়, বোধাইপূর্ণ পাতলা ধোঁয়া যেন ওকে ছুঁতে দিয়েছে। অথচ কী আশ্চর্য, নিজেদের মধ্যে এই হৈ-চৈ মনে হয় চিরকালীন সত্য। বোধায়, নিষ্পলিটের বন্ধু—সাই মনে হয়, প্রত্যেকেরই নাসারন্ধ্রে ছিদ্র। মাথার ভিতরে ইঁদুরেরা পাগলামী ধরে দাঁত প্রাস হলে বাঁদিকে সাজানো বোতলের মধ্যে সোনালী মদ, মনে হয় অপরিচ্ছন্নতাসহ বাস করে অভিজাতের দেহায়। বিশ্রিং বেসামাল।

এখানে সোমেন প্রথম থেকেই প্রিয়। সোমেন গাইতে জানে ভালো। অভিনয় জানে, তাকে ঘিরে ধরে কয়েকটি মহিলার মন ভোজাতে হয়। বন্ধুরা তাই ছাড়তে চায় না। টেবিলে বসার সঙ্গে সঙ্গে প্রশেপাশের টেবিলে ক্রমে ওঠে অনুরোধের ভিড়। সোমেনের মনে হয়, ছানা-কাটানো ওষুধের মতো মদ। পেটে পড়লেই ভুলে যেতে হয় অভিজাত্য, সম্মান, সম্মান এবং তাবৎ মধ্যবিত্ত মূল্য-বোধ। যতো শিরায় শিরায় ছড়াতে থাকে নেশা, রক্তচাপ যতো দ্রুত, মনে হয়, গোপন জলপ্রপাতের পাথর গেছে সরে। মানুষ যে বেসিক্যালি ন্যালাক্ষ্যাপা এটা বোঝা যায়। ঘোষালদার বয়স যখন কুড়ি কি একুশ তখন মায়ের কথা রাখতে না-জেনে না-শুনে বিয়ে করেছিলেন চোদ্দ বছরের এক বালিকাকে। কাশীতে। দুদিন আগে কল-কাতায় চিঠি পেয়ে বিয়ের দিন সকালে পৌঁছেছিলেন। মা দুঃখ পাবেন বেনে আজ প্রায় বাইশ বছর স্ত্রী থাকেন মায়ের সঙ্গে কাশীতে। মাঝে মাঝে যান ঘোষালদা। বাইশ বছরে ফসল মাত্র দুটি। অভিবিবৃত্ত পানাদির পর বেশি রাতে বাসায় ফিরে যান। বলে-ছিলেন একদিন—'কামড়াস বুঝলেন বিনা। কোনোদিন তো সে' অর্থে সংসার করতেই পারলাম না। শরীরের যে যে স্নায়ুগুলো যৌনতার কথা বলে অথবা স্নেহ-ভালোবাসা চায়, সেই গুলোনরে ঘুম পাড়িয়ে বাড়ি ফিরি।' আসেন ভট্টাচার্যিদার মতো লোক। প্রায় নিয়মিত। ধূসর চুল-দাড়িতে মনে হতে পারে ঋষি বাল্মীকি মদ্যপান করছেন কলকাতা কড়িয়ানায়। ১৯৭৮-এ। তেরিশ-চৌত্রিশ বছরের অভ্যেস। অবিবাহিত। বাবাসতে নিজের জমিতে নিজেই নিড়েন করেন। কী না করে-ছেন এই জীবনে। বিপুল অভিজ্ঞতা। ঋষি-রাজও জানেন ভালো। সোমেনের রাত্রে ঘুম হয় না ছেলে বলেছিলেন—'শুসনি শাব, একঝোলা বসন্ত সেদ্ধ করে গোত্র সকালে খেও যাবা। ঘুম হবে। দু'বেলা কোর্ট যাবা।' বাড়ি যেবার আগে সোমেনের গলায় শুনে নেয়—'বাচার ভিতর বাচিন পাখি' ভট্টাচার্যিদার প্রিয় গান। গান শোনাতে গিয়ে বিপদও হয়েছিল একদিন। ওরা বোধহয় ভালভাবে না মৌলাবাদিতে থাকে। হাই ভিড়ি-কিবি মেরে বলেছিলো—যে যে অভিজাত' কথায় কথায় তর্ক বেধেছিল তুমুল। মারিপিট এসে তুলে দিয়েছিল ওদের। যাই হোক গানটা নাগাদি নিউ সিনেমার সামনে আরো বেশ কিছু ছেলে নিয়ে পাকড়াও করেছিল সোমেনকে। সঙ্গে সেদিন ছিল শুভ্র গৌতম। বুদ্ধিমানের মতো পুলিশের কাছে গিয়ে সিকিউরিটি চেয়েছিল। তবু দু-চারটে চড়-চাপড় গায়ে পরেছিল। সোমেনের চোখ ফেটে জল বেরিয়েছিল সেদিন। 'মার খেয়েছি বলে নয়। কিন্তু অপমানটা বলো। সেই মুহূর্তের সম্মান আমাকে তো কেউ দিতে পারে নি। না পুলিশ, না মাতাল-সম্প্রদায়। আমার কী ভীষণ ইন-সিকিউরিটি—।' এরপর অনেক দিন ও-মুখো হয়নি। একদিন আমার গুটি গুটি—।

—কুমারেশ প্রশ্নের করেছিল একদিন, মদ খাস কেন, লিখিস বলে? লেখালিখির সঙ্গে মদের কী সম্পর্ক, তাই? লিখতে গেলেই মদ খেতে হবে, কে বলেছে তোমাকে?' স্পষ্ট বলেছিল বুলবুল, 'তবে কারো কারো ক্ষেত্রে এটা হয়তো একটা রিকোয়ারমেন্ট। যেমন আমার ক্ষেত্রে। যখন লিখি তার আগে পর্যন্ত আমার সব কিছুই তমসাচ্ছন্ন ভাবে নরমাল। আমার চারপাশে যা-কিছু আছে তা খুবই স্পষ্ট, খুবই মূর্ত। কিন্তু লেখা বেরুনোর পরই সব ওলট-পালোট হয়ে যায়। সব অভিজ্ঞতাই বিমূর্ত হয়ে আসে। আমি বিমূর্তে বিশ্বাস করি। এই অনুভূতি হয়তো কোনো কোনো লেখার ক্ষেত্রে সাংঘাতিক কাজ করে।

বন্ধু-বান্ধবরা বলে বিয়ে করতে। অথচ বিবাহে কোনো শ্রদ্ধা নেই ওর। প্রায়ই বলে, 'যার ঘটে এলাচি কি পাঁচ ঘটে পাঁচ মালের ঐ হুইস্কির বোতলটা বছর তিনেক বাদে আর নেশা ধরাবে না, অথচ ফেলা যাবে না, ন্যাড়াচাড়া করতে হবেই। এ উদ্যান বান্ধা বিটে, বাট ওয়াইন ডাজ নেভার। তবু মাঝে মাঝে দুঃখ হয়। হিংসে হয় বন্ধুদের-গৌতমদের ওপর। সব কিছু ফুটন-বাকনের পর বোঁচ থাকায় তো ওরাই। কিছু লিখতে ইচ্ছে করে সোমেনের, প্রথম কবিতা আসতো। দুর্নাম রটছে কেবল বিনিময়ে যশ তো জুটছে না। তবু মাঝে মাঝে বিষণ্ণ-মাঝরী জীবন ভালো লাগে না সোমেন। কোনো মুহূর্তের গা থেকে কাটাছেঁড়ার গন্ধ উঠে এলে ওর বিরক্ত লাগে। যে ঘুষরের চুল কখনো অবিন্যস্ত হয় না গোত্রা তমা এলোমেলো উঠে আসে না চোখের বাদ দিয়ে সিগ্ন কথা বলতে পারে না, হো হো করে প্রাণভরে হেসে উঠতে পারে না, তাদের শহুরে মনে হয় সোমেনের। অভিজাতের সংজ্ঞাকে শিরোধার্য গ্রহণ করেছে, এই মিশ্র অনুভূতিও ওর কাছে আনন্দদ। কমে কানে চুপিচুপি বলে—'১৬ মিঃ মিঃ-এ কলকাতা দেখিয়েছি মতো। আয়, মেম সাহেব সঙ্গে।' একদিন ৩৫ মিঃ মিঃ-এ কলকাতা দেখানোর বিরোধীদলীয়দের বলে—'আমিই একমাত্র যে এই শহরের ডিওগ্রাফি এবং অনাটমি সব চেয়ে ভালো করে জানি। যদি কখনো দিন যায়ই, পঙ্গপাল হয়ে উড়ে এসে তাদের সব খেয়ে যাবে, দেখবি কা সব নিখুঁত।'

একদিন একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছিল সোমেন। টালমাটাল পায়ে ফিরছে বাড়িতে। চোখেমুখে হেসে যাচ্ছে অবলীলায়। বেশ লম্বা সমস্ত মুখে ক্লান্তির ঝুলে এক বিষণ্ণ ছায়া হাঁটু নুয়ে পড়েছে, বিবর্ণ গোলাপী চর্ম মুখ মণ্ডল। সমস্ত মুখে ক্লান্তির ও পরাজয়ের ছাপ। করুণ প্রার্থনার ভঙ্গিতে চোখ তুলে সোমেনকে বলছে—আমি বড্ড স্টেটসম্যান। আজীবন আকণ্ঠ তৃষ্ণায় ডুবে আছি। আমাকে একটু মদ দিতে পারো বন্ধু?

সমালোচনা

বিতর্কিত কলকাতা

কলকাতা বিতর্কিত শহর। একথা বলেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, এই বইখানার মুখবন্ধে। মনে হয় কলকাতাকে বিতর্কিত শহর বলবার উদ্দেশ্যে হচ্ছে কলকাতার সুনামও আছে, দুর্নামও আছে। দুর্নামের জন্য খানিকটা কলকাতার পৌর সংস্থাকে দায়ী করা হয়। সে দুর্নামের স্বরূপ কি তা বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেছেন পৌরসংস্থার প্রশাসক শ্রীশিবপ্রসাদ সমাদ্দার। প্রধানতঃ যে সকল সমস্যা নিয়ে পৌরসংস্থার দুর্নাম, তা যথার্থভাবে আলোচনা করবার দাবী রাখেন তিনি। কেননা, পৌরসংস্থার প্রশাসক হিসাবে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যাঁর এ সকল সমস্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে। পৌরসংস্থা নানা সমস্যায় জর্জরিত। কালচক্রের বিবর্তনে কলকাতারও যেমন বিবর্তন ঘটছে মহানগরীতে, সমস্যাগুলিও তেমনই অধিকতর পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার মধ্যে মৌলিক সমস্যাগুলি হচ্ছে—শহরকে পরিষ্কার রাখা, রাস্তাঘাটের সংস্কার করা, পানীয় জল সরবরাহ করা, পয়ঃপ্রণালী কার্যকর রাখা, শহরবাসীর স্বাস্থ্যের উন্নতি করা, ও শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা। এ সমস্যাগুলি সমাধানের পথে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে পৌরসংস্থার সঙ্গতির অভাব। কেন এরূপ হয়েছে, তার উত্তর দিয়েছেন সমাদ্দার মহাশয় নিজে।

কলকাতার রাস্তাঘাটের সংস্কার বাবদ পশ্চিমবঙ্গ সরকার মোটর-গাড়ীর মালিকদের কাছ থেকে বার্ষিক একটা মোটা অংকের কর আদায় করেন। কিন্তু তার মাত্র সামান্য একটা অংশ (দশ লক্ষ টাকা) কর্পোরেশনকে দেওয়া হয়। (বোম্বাই কর্পোরেশন পায় ২৭ কোটি টাকা)। অথচ কলকাতার রাস্তাঘাট যেন তেন প্রকারেণ মেরামত করতে কর্পোরেশনের খরচ পড়ে বার্ষিক ৭৫ লক্ষ টাকা। কলকাতার রাস্তাঘাট সংস্কারের তুলনায় ৭৫ লক্ষ টাকা যে অতি নগণ্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কলকাতায় ৫১০ মাইল রাস্তা আছে। ৫১০ মাইল রাস্তা সংস্কারের জন্য, যে টাকাটা ব্যয় হয় সেটা যে অত্যল্প তা বলা নিষ্প্রয়োজন। এক সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে যে প্রতি বর্গ ফুট রাস্তা সংস্কারের জন্য খরচ করা হয়েছে মাত্র ৮৫ নয়া পয়সা। মূল্য-স্ফীতির যুগে এই সমস্যার ফয়সালা করা কর্পোরেশনের পক্ষে দিন দিন উৎকটতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ইদানীং কালে সবচেয়ে বড় সমস্যা যা পৌরসংস্থাকে বিব্রত করে তুলেছে, তা হচ্ছে যখন তখন ক্ষেত্র বিশেষে কর্মচারীদের কর্মবিরতি। তার ফলে রাস্তায় জমে উঠছে পর্বত প্রমাণ জঞ্জাল—যেটা হচ্ছে মহানগরীর প্রসূতিগার। সব সময় কর্মচারীদের দাবী মেটানো পৌরসংস্থার পক্ষে সম্ভবপর নয়। একাধিক ইউনিয়নভুক্ত পৌরসংস্থার কর্মী সংখ্যা হচ্ছে ৩৩,০০০। ১৯৭৪—৭৫ খ্রীষ্টাব্দে করদাতাদের কাছ থেকে কর্পোরেশনের আয় ছিল মাত্র ১০ কোটি টাকা আর ব্যয় হত ২৩-১২ কোটি টাকা। (বোম্বাইয়ের আয় ৬৩ কোটি ও দিল্লীর ২৭ কোটি টাকা)। কলকাতা পৌরসংস্থার ৭২ শতাংশ ব্যয়িত হয় কর্মচারীদের মাহিনা ও মজুরী বাবদ। সুতরাং অবশিষ্ট বাকী আয় নিয়ে পৌরসংস্থা যে এখনও তার

পৌরসেবামূলক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এটাই হচ্ছে পৃথিবীর নবম আশ্চর্য। পৌরসেবামূলক কাজ বর্ধনের জন্য কর্পোরেশনের অনেক কর্মসূচী আছে। কিন্তু সেগুলি রূপায়িত করবার সঙ্গতি কোথায়?

শহরের একটা বিরাট সমস্যা হচ্ছে—ফুটপাথ ও রাস্তা অধিকার করে শহরের সৌন্দর্যহানি ও লোক চলাচলের বাধা সৃষ্টি করা। এটা রোধ করবার জন্য সমাদ্দার মহাশয় অনেক চেষ্টা করেছেন কিন্তু সমর্থ হননি। তাঁর নিজের সত্যাগ্রহ করাই তার প্রমাণ। এই বিষয়ে শহরবাসী ও পুলিশের সহযোগিতা বিশেষভাবে কাম্য।

বইখানা প্রকাশ করে কর্পোরেশন একটা কাজের কাজ করেছেন। কর্পোরেশন কেবল গালিগালাজই খেয়ে এসেছে, কিন্তু কর্পোরেশনের একটা বলবার দিকও তো আছে। বিশেষ যৌক্তিকতার সঙ্গে সমাদ্দার মহাশয় যে বক্তব্যটা এই বইয়েতে বিশ্লেষণ করেছেন। বইটা অবশ্য এক নাগাড়ে লেখা হয়নি। বিভিন্ন সময়ে সমাদ্দার মহাশয় কর্পোরেশনের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় যে সমস্ত প্রবন্ধ লিখেছিলেন ও সংবাদপত্রসমূহে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের যে সমস্ত প্রতিবেদনসমূহ ছাপা হয়েছিল সেগুলিকে গুছিয়ে সুসংবদ্ধ করে বইখানিকে রূপায়িত করা হয়েছে। ৩২৪ পৃষ্ঠার এই বইখানিতে কি আছে তা এই স্বল্প পরিসর আলোচনার মধ্যে বলা অসম্ভব। এই শহর ও শহরের পৌরসংস্থা সম্বন্ধে সব কথাই এতে স্থান পেয়েছে। শুধু সমস্যা নিয়েই বইখানা লেখা হয়নি। এতে আছে শহর ও পৌরসংস্থার বিবর্তনের ইতিহাস কর্পোরেশন কি করেছে, কি করছে ও কি করবার মানস আছে, পৌরসংস্থার পরিচালনা জঞ্জাল থেকে কিভাবে জমির সার তৈরি হয় জল সরবরাহ, ড্রেন ও নর্দমা সমূহের উন্নতি রাস্তাঘাটের সংস্কার, পার্ক নির্মাণ, প্রসূতিগার স্থাপন প্রভৃতি ও ২০০ খৃষ্টাব্দে এসব সমস্যা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তার হিসাব ইত্যাদি অনেক কিছু এতে স্থান পেয়েছে। বইখানা পড়ে এইটুকু উপলব্ধি হয় যে কর্পোরেশন কলকাতাকে সুন্দর নগরে পরিণত করতে পারত যদি তার থাকত সঙ্গতি ও কর্মচারীবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতা। কলকাতা সম্বন্ধে কৌতূহলী সকল পাঠকেরই এই বইখানা অবশ্য পঠনীয়।

অতুল সুর

CALCUTTA IS. By Sivaprasad Samaddar. The Corporation of Calcutta. Rs. 40.

শুধু কি রাতের শব্দ

একটা স্প্রিং চেপে রাখা হয়েছে তার চেহারায় অসাধারণত্ব কিছু নেই, বেশ শান্ত শান্ত ধূসর কিন্তু নিরীক্ষণ করলে বোঝা যায় হাত দিলেও যে অনেকখানি বেগ তার মধ্যে জড়ো করা রয়েছে এবং চাপ সরিয়ে নেওয়া মাত্রই তা লাফিয়ে উঠবে। বস্তুত অরুণ মিত্রের কবিতা ঠিক এইরকম। বলবার কথা নিয়ে সব শব্দ, সব ধ্বনি আবেগকম্প্র হয়ে থাকে, যতটা বলে আভাস দেয় তার অনেক বেশী আর এক সমগ্রতায় টানটান হয়ে থাকে সব কয়টি পংক্তি তাঁর কবিতায়। অরুণ মিত্রর কবিতার বৈশিষ্ট্য এইখানেই।

'মঞ্চের ..বাইরে মাটিতেও পর অরুণ মিত্রর আর কোন কবিতার বই বেরোয়নি এতদিন। অবশেষে ১লা বৈশাখ ১৩৮৫-তে নবপত্র প্রকাশন থেকে বেরিয়েছে তাঁর পঞ্চম কবিতার বই 'শুধু রাতের শব্দ নয়'। বাংলা কবিতার যে কোন নিবিষ্ট পাঠকের কাছেই এ এক আনন্দ সংবাদ এতে অবশ্য দেখা যাচ্ছে তাঁর গত তিন বছরের কবিতারা নেই। তবু এই প্রাপ্তিও কম নয়।

অরুণ মিত্র শব্দের স্বয়ংসর্বস্বতার বিশ্বাসী নন। শব্দকে তিনি মানুষের সঙ্গে, তার জীবনের সঙ্গে, তার অবস্থার সঙ্গে, জড়িয়ে ব্যবহার করেন, তাঁর সেই অন্তরঙ্গ প্রয়োগের অভিজ্ঞতা আবার পাওয়া যায় এই বইটিতে।

ভালোবাসার জন্যে আমার বুকের দুই দরজা অভ্যর্থনা টাঙিয়ে রাখি। শিশু সেখানে হাত টুইয়ে আস্তে আস্তে মাথা রাখে, একঘর স্বপ্ন তার চোখের পাতার উপর, তার ঠোঁটের বাঁকে। কিন্তু যুদ্ধের দামামা কাছে আসে, আমি তা চাপা দেবার জন্যে যত স্নেহের ঢেউ তুলি, দেয়ালের ইঁটে তত জোর হুমকি ওঠে আর দুই বুকের উপর এসে কাটি পড়ে। আমার হৃৎপিণ্ডের শব্দে শুধু হাহাকার। এইরকম উচ্চারণে কোথায় যেন পাওয়া যায় খুব চেনা অথচ রহস্যময় ট্রিনিট্রোটের গন্ধ আর প্রতিদিনের পরিচিত রাস্তার এক নতুন সুরের অনুরণনে বদলে যায়।

অরুণ মিত্রর আপাতশান্তির নীচে থাকে যে প্রচণ্ড টান, সে যে বাইরে মানুষকে এত সংহত রাখতে পারে তার কারণ তার নাড়ি বাঁধা আছে এক নিহিত সত্যে। তার কারণ অরুণ মিত্র আপাত-দৃষ্টিকে অন্তরালবর্তী নিবিড় সত্যের প্রতীক হিসেবে দেখতে জানেন, দেখাতে জানেন আড়াল সরিয়ে। তাই যখন 'আলতো হাওয়া ছাইগাদায়' আমাদের মনে হতে পারতো শুধু 'হাঁটো ঘোরো দৌড়ও' মাটিতে কোন রং ছলকায় না। কিন্তু তিনি আমাদের দেখিয়ে দেন 'তবু ইতিমধ্যে পাঁচিলের গা থেকে ছবিগুলো খসতে শুরু করেছে। টুকরো টুকরো হাসিমুখ শহরের খাদের উপর ভাসছে হাওয়ায়।'

এই দেখা দেখতে পাওয়া তাঁর সম্ভব হয়েছে মানুষকে ভালোবাসায়, তার শুভ আস্তিক্যের প্রতি বিশ্বাসে। 'কষ্ট কি ছিল না? ভীষণভাবেই ছিল।' তবু তিনি বিশ্বাস করেছেন স্বপ্ন দেখেছেন 'এই সমস্তকে শুধরে নেওয়ার আর একটা সময়ের' আর এই বিশ্বাসই তাঁর কবিসত্তাকে ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষার মধ্যে নিয়ে গেছে বারবার। 'শুধু রাতের শব্দ নয়' বইটির অন্তর্গত কবিতাসমূহে ও সমগ্র এই রকম পরীক্ষার কথাই বলে।

আজকের নিস্প্রত্যয় জীবনে আত্ম-পীড়নের মরিয়া ঝড় অথবা স্বচ্ছলতালুব্ধ চিত্তবিনোদনকারী আত্মতুষ্টির বিজ্ঞাপনের ঘনঘটা—এই দুই প্রবণতার মাঝখানে অরুণ মিত্র সবসময় চেষ্টা করে গেছেন এক শুদ্ধতর আত্মস্থতায়, চেয়েছেন 'ঝড়ের কেন্দ্রে স্থির থাকতে'। সময়সময় থেকে বিচ্ছিন্ন কোন বিমূর্ততে তিনি পৌঁছতে চাননি, তার প্রতিটি যন্ত্রণা বহতে গ্রহণ করেছেন, অথচ বার বার 'উত্তীর্ণ' হয়ে গেছেন নিছক সমসাময়িকতাকে। সময় ও জীবনের অনুভব অভিজ্ঞতাকে তিনি ব্যবহার করেছেন, তার শিকার হননি। তবু মনে হয় এই বইটির কবিতা ও সময় তাঁকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় বেশী, যন্ত্রণা দিয়েছে বেশী। তার বিশ্বাসে পৌঁছতে। অর্থাৎ আমি বলতে চাই এই বইটি যতটা তাঁর দহনের কথা বলে ততটা স্পষ্ট দেখায় না পরিণতিকে যেমন দেখিয়েছে 'উৎসের দিকে' 'ঘনিষ্ঠতায়' বা 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে'। সবসময় যে দেখাতে হবেই তাও নয়। আমার শুধু মনে হয় এই বইটির নামকরণে যে স্পষ্ট আস্তিক্যের ঘোষণা আছে 'শুধু রাতের শব্দ নয়' সে ঘোষণা ভিতরকার কবিতার গভীরে তত নিঃসংশয় নয়। বরং ঐ নামেই লেখা প্রথম কবিতাটির শেষ দু পংক্তির আগে যে প্রশ্নটি আছে সেটাই এই বইয়ের মূল সুর 'শুধু কি রাতের শব্দ?'

অরুণ মিত্র তাঁর উদ্দেশ্য ও বিশ্বাসকে জানেন দীর্ঘদিন ধরে। কিন্তু এই সময় তাঁকে ভাবাচ্ছে পথটা নির্মে, সচেতন করে দিচ্ছে বহু বাধা নিষেধগুলোর ব্যাপারে। চারদিকের দেয়ালে মাথা ঠুকে দেওয়ার যে ষড়যন্ত্র চলছে, সেটা বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছে তাঁকে, তাই যদিও 'জন্মের জন্যই' তাঁর আসা তবু এই প্রশ্নই সবচেই তাঁর কাছে প্রবল হয়ে ওঠে 'কোনো হৃদয়ে বুঝি জলধারার দুঃখ নেই'। নয়ত দেখি তিনি প্রশ্ন করছেন 'তবে কি কোনো বলা ধমনীর ভিতরে নয়?/'নিশানের যত রঙ রাস্তিরে ধুয়ে যায়। এবং কোন উৎসে গান আছে তার জন্যে আমি মাথা কুটি।'

অরুণ মিত্র একজন প্রকৃত বড়ো কবি, শ্রেষ্ঠ কবির মতোই এইভাবে সমস্ত হট্টগোল এড়িয়ে নিঃশব্দে প্রবল যন্ত্রণায় শিরদাঁড়া বাঁকিয়ে নিজেকে নিজের অর্জিত সাফল্যকে অতিক্রম করে যেতে চাইছেন। আমাদের সৌভাগ্য আমরা সে অভিজ্ঞতায় সম্পন্ন হচ্ছি।

সুরজিৎ ঘোষ

শুধু রাতের শব্দ নয়: অরুণ মিত্র। নবপত্র প্রকাশন।

একটি আকর গ্রন্থ

'পরিচয়' হিরণকুমার সান্যাল, বিজন ভট্টাচার্য ও জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র 'স্মরণ সংখ্যা' প্রকাশ করে, আধুনিক বাংলাদেশের তিন প্রণম্য প্রতিভার প্রতি শুধুমাত্র আপন প্রীতি, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাই জানিয়েছেন নয়, বাংলার পাঠক সাধারণের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। অনেক সময় গবেষকের একক প্রয়াসে লিখিত গ্রন্থে যে গভীরতা ও প্রসাদ আনা সম্ভব হয় না, একটি পত্রিকার ঐকান্তিক প্রয়াসে প্রকাশিত 'বিশেষ সংখ্যা' তার চেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন হতে পারে—বর্তমান সংখ্যার 'পরিচয়' তার প্রমাণ।

স্মরণ সংখ্যাটির প্রথম ৩৮ পাতা জুড়ে আছেন হিরণকুমার সান্যাল। পরের ৮০ পাতা পর্যন্ত আছেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। ৮০ থেকে ১৭১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আছেন বিজন ভট্টাচার্য। ১৭১ থেকে ২৩৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অংশকে বলা চলে 'সংযোজন'। অপ্রকাশিত লেখা, চিঠিপত্র, স্কুলের মেয়েদের স্মৃতি উদ্‌যাপন, টুকটাক আরো নানান পরিচয়। এই অংশটি অনেকের কাছেই খুব ইন্টারেস্টিং মনে হবে।

স্মৃতিমূলক লেখাগুলিতে বিচার করার বিশেষ কিছু নেই। সবগুলিই ভাল। হিরণকুমার সান্যাল সম্পর্কে অধ্যাপক সুশোভন সরকারের স্মৃতিচারণটি সংযত, সম্ভ্রান্ত ও শ্রদ্ধা উদ্রেককারী। শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের 'হিরণ' লেখাটি চমৎকার।

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ও বিজন ভট্টাচার্য জীবনের নানা ক্ষেত্রে সহযোগী সৈনিক। অল্প কয়েকদিনের ব্যবধানে দুজনের তিরোধান, সম্ভবত প্রমাণ করে দিল 'বটুক ছিল সেই আপনজন'। অর্থাৎ আত্মার আপনজন। বিজন ভট্টাচার্যের ঐ নামের অসম্পূর্ণ রচনাটিতেও দুজনেই বাধা পড়ে রইলেন, চিরকালের জন্য। গণনাট্য সঙ্ঘের প্রাণপুরুষ জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের কর্মময় ও পরিশ্রমসঙ্কুল জীবনের সুন্দর পরিচয় আছে সাধন দাশগুপ্তের 'মধুবংশী বিবেকের প্রস্থান' প্রবন্ধে। বিজন ভট্টাচার্যের আত্মপ্রকাশ (নাট্যাভিনয়রূপে) এবং আদর্শগত অনুপ্রেরণার পশ্চাৎপটটি

সিদ্ধহাতে রচনা করেছেন দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা নাটকের শ্রেণী চরিত্র বদলে বিজনের ভূমিকা' প্রবন্ধে।

এত প্রবন্ধ, এত স্মৃতিচারণ সত্ত্বেও একটা গোটা মানুষ কত বেশি তাঁর রচনার মধ্যে বন্দী হয়ে থাকে তার পরিচয় আছে, বিজন ভট্টাচার্যের নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনারে পঠিত একটি ইংরেজী প্রবন্ধে এবং হিরণ সান্যালের ক্ষেত্রে দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত একটি কবিতায়। নানাদিক থেকে কবিতাটি গভীর অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ। যিনি উৎসাহী হবেন তিনিই মূল সংখ্যাটি সংগ্রহ করে দেখে নেবেন। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র তার চিঠিগুলিতে নিঃশেষে ধরা পড়েছেন। সংগ্রহে রাখবার মত সংখ্যা। তবে সম্পাদনা কর্ম খুব উচ্চ শ্রেণীর নয়।

অমল মুখোপাধ্যায়

পরিচয়। মাঘ-চৈত্র ১৩৮৪। হিরণকুমার সান্যাল/বিজন ভট্টাচার্য/জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র স্মরণ সংখ্যা। দাম তিন টাকা।

পেল সেফ

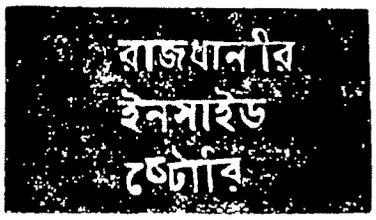

পর্যবেক্ষক

কেন্দ্রে জনতা পার্টির বিভিন্ন শরিক ও মন্ত্রীদের মধ্যে কোন্দল এখন পরোক্ষে কেন্দ্রীয় প্রশাসনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। কাজকর্ম এগোচ্ছে না। বলবার মত কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে না। সর্বত্র ঢিলে-ঢালা—নিরুৎসাহ ভাবটা প্রকট।

সাতাত্তরের নির্বাচনী ঝড়ে যখন কেন্দ্রে এসে বসলেন জনতা পার্টি তখন প্রথম ধাক্কা খায় আমলারা। গত ত্রিশ বছর ধরে কংগ্রেস রাজত্বে দলের নীতি ও মন্ত্রীদের সম্বন্ধে আমলাদের একটা আন্ডার-স্ট্যান্ডিং বানচাল হয়ে যাওয়ায় আমলারা স্বভাবতই গেড়ার দিকে থমকে যান।

সেই থমকানো অবস্থার রাজধানীর বিরাট বিরাট ইমারতের অসংখ্য কক্ষে ছড়িয়ে পড়া অফিসারকুলে একটা কথা চালু ছিল। সেই কথাটি হল : পাঁচ মিশালী জনতা সরকার বেশী দিন টিকবে না। আবার সেই কংগ্রেস ফিরে আসবে। কংগ্রেসপ্রীতির চাইতেও আমলা মহলের একটা বড় অংশের এমন ভাবনার পিছনে ছিল কংগ্রেস সরকারের অধীনে কাজ করবার পুরোন অভ্যাস। একটা বিশেষ মানসিকতা। কিন্তু নবাগতদের আবির্ভাবে দিল্লির মসনদ যখন টলমল হল না এবং ভোটবাক্সে কংগ্রেস ফিরে এল না তখন ওঁরা নতুন অবস্থার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

এই প্রস্তুতিপর্বে নেতৃত্ব দিলেন পররাষ্ট্র দপ্তরের আমলাকুল। সরকারী নীতি প্রণয়নে, তার যথাযথ প্রয়োগ ও ব্যাখ্যার কাজে আমলাদের ভূমিকা বিরাট। প্রভূত ক্ষমতা ও দক্ষতা নিয়ে নেপথ্যে এঁরাই কিন্তু দেশ চালিয়ে থাকেন। ভারতের আমলাতন্ত্রের সুনাম ইদানীং বিদেশেও ছড়িয়েছে। এক মার্কিন রাষ্ট্রদূত দেশে ফিরে ভারতীয় আমলাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে কিছু দিন আগে মন্তব্য করেছিলেন যে, উচ্চতম পর্যায়ের কয়েকজন আমলার দক্ষতার তুলনা নাকি আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টেও সচরাচর মেলা ভার। ভারতীয় আমলাদের সংখ্যা পারকিনসনের ফর্মুলা ধরে রীতিমত লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে। আর এই বৃদ্ধির সঙ্গে বাড়ছে দক্ষতা। ত্রিশ বছর আগে অর্থাৎ ১৯৪৭ সাল নাগাদ আই এ এস, আই পি এস ইত্যাদি পদে মাত্র ২৬ জনকে মনোনীত করা হত। বর্তমানে কেবল আই এ এস পদের জন্য প্রতি বছর মনোনীত করা হয় প্রায় দুশোজন অফিসার। এছাড়া অন্যান্য বিশেষ কয়েকটি বিভাগে আরও পাঁচ শতাধিক অফিসার নিয়মিত নিযুক্ত হয়ে থাকেন। এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই-ভাবে আমলাদের সংখ্যা অতীতের তুলনায় গত কয়েক বছরে দশ থেকে পনেরো গুণ বেড়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সব প্রশাসনিক প্রতিনিধিরা ছড়িয়ে আছেন দেশের সর্বত্র। নানা ধরনের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন এই আমলারাই এক কথায় দেশের সার্বিক চেহারা গড়ে তোলার ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা নিয়ে থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা-সেরা ছাত্রছাত্রীরা কেন্দ্রীয় সরকারের এই সব পদের জন্য কোমর বেঁধে পড়েন গত কয়েক বছর হল। পদার্থ ও রসায়ন শাস্ত্রের স্নাতক কিংবা স্নাতকোত্তর এবং এমন কি ইঞ্জিনীয়াররা পর্যন্ত ছুটছেন আই এ এস হবার জন্য। ইউরোপ-আমেরিকায় সরকারী চাকরীতে তেমন সামাজিক মর্যাদা ও জেল্লা নেই। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে উচ্চ পদ লাভই সে সব দেশে দক্ষতার পরিচয়। আমাদের দেশে এর ঠিক বিপরীত। পদমর্যাদা, ক্ষমতা এবং সর্বোপরি নিরাপত্তার পীঠস্থান হল আই এ এস, আই এফ এস ও আই পি এসদের জগৎ।

হাজার হাজার ছোট-বড়-মাঝারী অফিসারদের মধ্যে এখন একজন মাত্র অফিসার আছেন যিনি পুরোন আই সি এস কুলের। ইনি হলেন বর্তমান ক্যাবিনেট সেক্রেটারি, এন কে মুখার্জি। কোন আই এ এস অফিসার এখনও অবসর গ্রহণ করেন নি। এঁরা উন্নতির সোপান ধরে ধরে উপরে উঠছেন। ওপর তলাকার আমলাদের মধ্যে এখন প্রায় হাজার দুয়েক অফিসারেরা কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আছে। পদমর্যাদার দিক থেকে এই অফিসারেরা বেশ কয়েক স্তরে বিভক্ত : যেমন সেক্রেটারি, এ্যাডিশনাল সেক্রেটারি, জয়েন্ট সেক্রেটারি, ডিরেকটর এবং ডেপুটি সেক্রেটারি। সিদ্ধান্ত ও নীতি প্রণয়নের এই রকম ক্ষমতাসম্পন্ন অফিসারদের মধ্যে প্রায় ৭০০ জন আপাতত মোতায়েন থেকে রাজধানীতে। সুতরাং এই সব অফিসাররা কি ভাবছেন আর কি করছেন তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

আমলাদের একটা নিজস্ব সফিসটিকেশন আছে। এটা যে সর্বক্ষেত্রে ব্রিটিশ সাহেব গোছের এমন কথা বলা চলে না। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁদের এই বিশেষ ভাব-মূর্তির সঙ্গে বেশ কিছু নতুন মন্ত্রীদের হাবভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীর ঠিক খাপ খাচ্ছিল না। গোড়ার দিকে মন্ত্রী ও আমলাদের মধ্যে এর ফলে তাই একটা অবাঞ্ছিত দূরত্বের সৃষ্টি হয়। এছাড়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলীতে ৪৫ জন সদস্যের মধ্যে ৬।৭ জন বাদে বাকী মন্ত্রীদের কেন্দ্রে দপ্তর চালাবার কোন রকম পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। এমন কি প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চরণ সিংয়েরও না। এর ফলে অনেক মন্ত্রীই শুরুতে বুঝে উঠতে পারছিলেন না তাঁরা কতটা আমলাদের হাতের তলায় থাকবেন আর কি পরিমাণে আমলা-নিরপেক্ষ কায়দায় কাজ চালাবেন। এই রকম দোনামনা ভাব বিভিন্ন দপ্তরের কাজকর্মের ক্ষেত্রে কিছুটা অসুবিধারও সৃষ্টি করে। কিন্তু আসল কথা হল অফিসারদের মতামত ও সহযোগিতা বিনা কোন মন্ত্রীর পক্ষেই বেশী দূর একা-একা এগোন সম্ভব নয়। ভাল নেতা হলেই ভাল মন্ত্রী হওয়া যায় না। প্রশাসনিক দক্ষতা ও বিচার-বুদ্ধি সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। মন্ত্রীরাও ক্রমশ এটা উপলব্ধি করতে থাকেন। আর জনতা পার্টির মন্ত্রী ও আমলাদের মধ্যে ধীরে ধীরে একটা সমঝোতা গড়ে উঠতে শুরু করে। রাজধানীর নর্থ ব্লক, উদ্যোগ ভবন, রেল ভবন, কৃষি ভবন ইত্যাদি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের দপ্তরে জোর কদমে কাজের উৎসাহ দেখা দেয়। কিন্তু সেই উৎসাহ দানা বাঁধতে না বাঁধতে জনতা পার্টি ও মন্ত্রীদের মধ্যে মনোমালিন্য ও ঝগড়া প্রকাশ্যে ফেটে পড়ে। এই রাজনৈতিক ঝগড়া-বিবাদের ফলে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের যে কি পরিমাণ ক্ষতি হচ্ছে সেটা রাজনীতিকরা উপলব্ধি করছেন না। কোন ব্যাপারে বড় রকমের কোন সিদ্ধান্ত নিতে সর্বত্র গতমত মনোভাবটা এখন অত্যন্ত স্পষ্ট। ছোট-বড় মন্ত্রীরা কোন্দল পাকাতে ও কোন্দল থামাতে ব্যস্ত। কেন্দ্রীয় দপ্তরগুলির উচ্চ পর্যায়ের অফিসাররা এই অবস্থায় দায়িত্ব নিয়ে নতুন কোন কাজে হাত দিতে উৎসাহ বা সাহস পাচ্ছেন না। মন্ত্রীরাও বিশেষ মাথা ঘামাচ্ছেন না। আর আমলারাও চুপচাপ। অফিসাররা ফাইলে সুন্দর সুন্দর লম্বা মন্তব্য লিখছেন যার মধ্যে আর যাই থাকুক না কেন নতুন পথের ও কাজের কোন হদিস পাওয়া যায় না। অফিসার মহলের এখন মোক্ষম মন্ত্র হল কোন ইনিশিয়েটিভ নিও না। এগিয়ে এসে কোন কাজের দায়িত্ব নিলে বিপদের সম্ভাবনা থাকতে পারে। অনিশ্চয়তার মধ্যে আমলারা মার্কামারা হয়ে পড়বেন এমন একটা আশঙ্কাও আছে তাঁদের। সুতরাং এমন পরিস্থিতিতে শ্রেষ্ঠ উপায় হল : পেল সেফ। এই অবস্থায় শুধু কাগজে-কলমে নয় জনতা পার্টি যে একটি সুসংবদ্ধ রাজনৈতিক গোষ্ঠী সেই বিশ্বাস শরিকদের কাজকর্মে ও কথাবার্তায় আমলাদের মধ্যে ফিরিয়ে না আনতে পারলে প্রশাসনে যে গড্ডলিকা প্রবাহ শুরু হয়েছে তাকে রোধ করা যাবে না।

চিঠি ও চাপা-টি
হাটে হাঁড়ি ভাঙতে হলো
ভাঙতে হবে
ভাঙতে হবে
?
?
?
?
?
গোপন চিঠি বড়ই মিষ্টি
বড়ই মিষ্টি
বড়ই মিষ্টি
চিঠি চাপা চলবে না
চলবে না
চলবে না
পত্রাচার
(অতি গোপনীয়)
৭৪।।

প্রফুল্লবাবুর লবি আবার তুঙ্গে

রাজ্য জনতা দলের মাথা বদল হলেও মূল নীতির কোন পরিবর্তন হয়েছে বলা যায় না। বরং সভাপতির পদে ইস্তফা দিয়েও আড়াল থেকে অভিজ্ঞতার বশি টেনে প্রফুল্লবাবুই রাজ্য দলের মূল নীতি নিয়ন্ত্রণ করে চলেছেন। ফলে এতদিন যাঁরা প্রফুল্লবাবুর বিরোধিতা করে দলের ক্ষমতা কব্জা করার আশায় বাম-ঘেঁষা রাজনীতির স্বপ্ন দেখছিলেন, তাঁরা ক্রমে হতাশ হচ্ছেন। বুঝতে পারছেন, পরাশ্রয়ী হয়ে চমক আর চটকদারী বক্তৃতা করার চেয়ে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় নীতির লড়াই করার মূল্য অনেক বেশী।

রাজ্য জনতা দলের সভাপতি পদে কেন্দ্রীয় নেতারা ফজলুর রহমানকে বসিয়েছেন। প্রাক্তন সোসালিস্টদের একাংশ এবং ভারতীয় লোকদল রাজ্য জনতার সভাপতি পদে যথাক্রমে সুনীল দাস এবং সুশীল ধাড়াকে পেতে চেয়েছিলেন। দিল্লীর দরবারে তাঁরা এ নিয়ে কম তদ্বির করেন নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও পদত্যাগী সভাপতি প্রফুল্লচন্দ্র সেন তাঁর ভাবশিষ্য এবং বিশ্বস্ত অনুগামী ফজলুর রহমানকে তাঁর উত্তরসূরী করার কাজে সফল হওয়ায় বেশ বোঝা গেল, দিল্লির দরবারে প্রফুল্লবাবুর লবি আবার তুঙ্গে

প্রফুল্লবাবুর অনুকূলে দিল্লির নেতাদের কেন এই মত পরিবর্তন? তার কারণ খুঁজতে হলে পশ্চিমবাংলার সাম্প্রতিক পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল এবং মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের কথাটা মনে রাখা প্রয়োজন। এই দুটি ঘটনাই প্রফুল্লচন্দ্র সেনের দলহীন গণতন্ত্র শ্লোগানের সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করাতে কেন্দ্রীয় নেতাদের বিশেষ সাহায্য করেছে। চলতি বছরের গোড়ায়, বিশেষ করে পঞ্চায়েত নির্বাচনের মুখে প্রফুল্লবাবু দলহীন গণতন্ত্রের শ্লোগান তোলেন। সি. পি. আই (এম) পরিচালিত বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য আন্দোলন গড়ে তুলতেও তিনি উৎসাহ প্রকাশ করেন। কিন্তু দিল্লীর নেতারা তখন তাঁর ঐ শ্লোগান অথবা আন্দোলন অনুমোদন করেন না। বরং বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে সব রকমের সহযোগিতা ও সমঝোতা করে চলতে পরামর্শ দেন। বলা বাহুল্য গান্ধীবাদী নেতা প্রফুল্লবাবু দিল্লির পরামর্শ বা নির্দেশ মেনে নিতে পারেন না। এই প্রশ্নে তখন কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে প্রফুল্লবাবুর চরম নীতির লড়াই শুরু হয় এবং মতবিরোধ ক্রমেই ঘনীভূত হয়। এই সুযোগে রাজ্যের প্রফুল্লবিরোধী গোষ্ঠীর বিমান-সুশীলরা সি. পি. আই (এম) ছলেন নিবিড় সান্নিধ্য এবং আনুকূল্যের

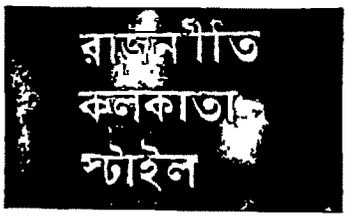

জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। মধু লিমায়ে প্রমুখ কয়েকজন প্রাক্তন-সোসালিস্ট নেতার প্রকাশ্য মদতে প্রফুল্লবিরোধী গোষ্ঠীর বামঘেঁষা কয়েকজন নেতা তখন অত্যন্ত সক্রিয় হন। ঐ গোষ্ঠীর অন্যতম নেতা বিমান মিত্র এক গভীর রাত্রে সি, পি, আই (এম)-এর সদর দপ্তর আলিমুদ্দিন স্ট্রীটে প্রমোদ দাশগুপ্তের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করার জন্য পর্যন্ত ছুটে যান। এবং তারপর থেকেই পঞ্চায়েত নির্বাচন পর্যন্ত প্রফুল্লবিরোধী প্রচারে নিত্যনতুন বিবৃতি দিয়ে রাজনীতির রসমঞ্চ চাঙ্গা রাখেন। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং রাজ্য জনতার একাংশের এই যৌথ প্রচার অভিযানের দিনে অবশ্য দলহীন গণতন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন তাঁর নীতি থেকে এক চুলও সরে দাঁড়াননি। বরং জনমতের বিরাট চাপ এবং নানা বাঙ্গ-বিদ্রূপ উপেক্ষা করে তিনি একলা চলবে নীতি আঁকড়ে থেকেছেন।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর অবশ্য রাজ্য রাজনীতিতেও বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। ফলাফল ঘোষণার পর প্রফুল্লবাবুর নৈতিক জয় সূচিত হয়। বামঘেঁষা নীতির সমর্থক বিমানবাবুরা বিজয়ীর সুদীর্ঘ তালিকায় আর নিজেদের প্রার্থীর নাম খুঁজে পান না। বরং দলহীন গণতন্ত্রী প্রফুল্লবাবুদের দেওয়া প্রায় হাজার তিনের প্রার্থী নির্বাচনে জয়ী হন। এই সংবাদ জানার পর রাজ্য রাজনীতিতে প্রফুল্লবাবুর গুরুত্ব সম্বন্ধে দিল্লির নেতাদের চৈতন্যোদয় হয়।

পশ্চিমবাংলার পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফল প্রকাশের সমসাময়িক সময়ে প্রায় কাকতালীয়ভাবেই মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটে। সেখানে জনতা দল ও তার অনুগামীদের সমর্থন সহায়তায় দুই কংগ্রেসের বিধায়কদের নিয়ে এক নতুন কোয়ালিশন সরকার গড়ে উঠে। ফলে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে বাদ দিয়ে সব কংগ্রেসীদের মিলনের বহুবিতর্কিত সম্ভাবনা আরও বাস্তবমুখী হয়। মহারাষ্ট্রের পরিবর্তিত এই রাজনীতির সঙ্গে যে প্রফুল্ল সেনের দলহীন গণতন্ত্রের ভাবভাবনার তেমন কোন তফাৎ নেই, কেন্দ্রীয় নেতারা তা বুঝতে পারেন। তাই প্রফুল্লচন্দ্র সেন এবং তাঁর দলহীন গণতন্ত্রের শ্লোগানের নবমূল্যায়নে কেন্দ্রের প্রবীণ নেতারা এগিয়ে আসেন।

বেদব্যাস বৈদ্য

এবং সেই সুবাদে দিল্লির দরবারে প্রফুল্ল-বাবু তাঁর হারানো ভাবমূর্তি নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পান। তারপরই তাঁর ঘন ঘন দিল্লি-অভিযান শুরু। দিল্লির রাজনীতিতে বর্তমানে প্রফুল্লবাবু যে কতটা অপরিহার্য হয়ে উঠেছেন, আগস্টের গোড়ায় আবার তার আরও একটা প্রমাণ পাওয়া গেছে। 'কংগ্রেস সেবা দলের' আদলে জনতা দলের প্রবীণ নেতারা 'সেবা দল' নামে একটি সংগঠন বিরাট ঘটা করে দিল্লিতে প্রতিষ্ঠা করেন। প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই এবং জনতা সভাপতি চন্দ্রশেখরের সঙ্গে প্রফুল্লবাবুও ছিলেন তার একজন অন্যতম হোতা। ঐ অনুষ্ঠানে প্রকাশ্যে চন্দ্রশেখর প্রফুল্লবাবুকে জড়িয়ে ধরে যেভাবে অভিনন্দিত করেন, রাজনৈতিক মহলের সতর্ক এবং কৌতূহলী দৃষ্টিতে তা এড়িয়ে যায়নি।

প্রবীণ রাজনীতিক প্রফুল্লচন্দ্র সেন দিল্লির রাজনীতি নিয়ে যতটা না উৎসাহী, তার চেয়ে অনেক বেশী উৎসাহী রাজ্য রাজনীতি সম্পর্কে। তাই তিনি আর এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চান না। রাজ্য রাজনীতির কট্ট করাকোস্টা তিনি যথাশীঘ্র সেরে ফেলতে চান। তাই রাজ্য জুড়ে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে বামফ্রন্ট সরকারের অগ্নিপরীক্ষায় তিনি উদ্যোগী হয়েছেন। সি. পি. আই (এম) দলের আগ্রাসী নীতি, আইনশৃঙ্খলার অবনতি ইত্যাদির অভিযোগ তুলে প্রফুল্লবাবু পুজোর আগে এক ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলতে তৎপর। দলহীন গণতন্ত্রের নায়ক প্রফুল্লচন্দ্র সেন তাই দুই কংগ্রেস, জনতা দল এবং গণতন্ত্র ও সমাজবাদে বিশ্বাসী সকল দলের নেতা ও কর্মীদের তার সামিল হতে আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর ডাকে চরন-কংগ্রেসের লক্ষ্মী-প্রিয় প্রদীপরা আগে থেকেই পা বাড়িয়ে আছেন। রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেসও সি, পি, আই (এম) বিরোধী আন্দোলনে গা ভাসাতে তৈরি। রাজ্য জনতা সভাপতি ফজলুর রহমান তাঁর নেতা এবং দাদার সমর্থনে উপযুক্ত সময়ে যে সদলে ঝাঁপিয়ে পড়বেন না, তা হলফ করে বলা চলে না। সি, পি আই, এস ইউ সি এবং বামফ্রন্টের ছোট শরিক দল ফরোয়ার্ড ব্লক ও আর এস পির একাংশও যে সি পি আই (এম) বিরোধী আন্দোলনের সামিল হতে আগ্রহী, মিডলটন স্ট্রীটের সঙ্গে তাদের নিয়মিত যোগাযোগ, সে খবর তাদের অজানা নয়। প্রফুল্লবাবুর নেতৃত্বের মহারাষ্ট্রের মন্ত্রিসভার মডেলে দলহীন গণতন্ত্রের ছত্রছায়ায় যে ব্যাপক রাজনৈতিক জোট তৈরি হতে চলেছে, বামঘেঁষা জনতা নেতা বিমানবাবুরা তাতে যেমন হতশ্রী, প্রমোদবাবু-জ্যোতিবাবুরাও তেমনি চিন্তিত।

এই পৌঁছলো ব'লে

শান্তিকুমার ঘোষ

হৃদয়ে উদ্ভিদ আজ মেলে দ্যায় পাতা
কুঁড়ি ধরবে তাতে—বালবের মতো
ভবরে পরাগ ছড়াবে কেশর
ভিতরে-ভিতরে শোনা যাচ্ছে পীত ঋতুর চ'লে-যাওয়া
আর এগিয়েই বা আসে কী মৌসুম
রাতারাতি রূপবান হ'য়ে বালবধূ
সজ্জিত নবীনাদের সঙ্গে মিলবে বনপথে
তাই নির্মল হ'য়ে উঠছে আকাশ
এবং স্থলে-জলে আগমনী
এই পৌঁছলো ব'লে বসন্ত-সেনা
আমার কাঙাল বসবে পঙক্তি-ভোজনে
উৎসব-রাজকে ঘিরে

সীতা

সাধনা মুখোপাধ্যায়

হাসি খেলি খাই দাই
সবই করি
অথচ আমি তো
আমাতে যেন নেই
কবিতাই বারবার
সাজানো অশোকবন করে ছারখার
ভুলিয়ে যে দিয়ে যায়
সাংসারিক খেই
কবিতা রাবণ যেন
আমি এক প্রকম্পিতা সীতা
আমারও স্বধর্ম আছে
সেই ধর্ম রাম
সেই ধর্মে রাবণই যে
করে ব্যর্থকাম
অথচ নিজেও কোন
উদ্যোগ আয়োজন
কবল না
সবার চক্রান্তে পড়ে
না ঘরের
না বনের
বিশেষত রাবণের
আমি হই জীবন্তে
অগ্নি সমর্পিতা

মনে রেখো

দেবী রায়

মানুষের যতো অপমান
জাগতিক যতো অবহেলা
কিছু ফেলো না—ভুলো না—
সব বুকে ধ'রে রাখো—

কে তোমায়, বাঁ-হাতে—
এগিয়ে দিয়েছিলো, সিগারেটের প্যাকেট
কে যে সেই, ঘরের ভিতর থেকে
অন্য গলায়, বলেছিলো 'নেই-ই'
মনে রেখো, স-ব—
জাগতিক প্রত্যেকটি অপমান....
ঝাঁটালাথি, অনাদর, উঁচু-তলার উপেক্ষা
নাক-উঁচু ব্যবহার....মনে রেখো
সব বুকে ধ'রে রাখো....
সব যন্ত্রণা-ই একদিন নদী হয়ে
দুকূল ভাসিয়ে নিয়ে যাবে
ততোদিন শুধু নিজেকে খোঁড়ো....।।

প্রাক মৃত্যু। উত্তর মৃত্যু।

আশিস দত্ত

মৃত্যুর আগে একটা মৃত্যু।
পরেও একটা।

টেবিলে দুটো রিসিভার।
ডিরেক্ট ডায়লিং। অফিস পি বি এক্স।
ডিরেক্টে এক্সচেঞ্জ ১৯। কিন্তু তারপর?
তিন-শূন্যের দোলনা ঝাপসা।
চার-শূন্যের প্রতিধ্বনিতে কল্পনাস্ কৃশকানেকশনের ঝক্ ঝক্!
পাঁচ-শূন্যের প্রাসাদে সিংহাসন। ম্যামীকরণও।
ছয়-শূন্যের চতুরে গোলকধোঁড।
সাত-শূন্যের শেষাংকে নীল শাড়ি নীল টিপ পরা দ্রুত লেখিকা
আদুরে আদুরে গলায় জানায়,
'আজ একটু আগে যাবো স্যার .. 'ডেট' আছে ...'
অতএব, হে প্রায় বনগমনযোগ্য বৈরাগী, পি বি এক্সেন
বিসিভারটাই তোলো
সেখানে আমি শুদ্ধ আমাকেই পাবো
আমিই চাপরাশধারী, আমিই এল ডি, আমিই সুপার।
আমাতেই সিদ্ধান্ত। আমাতেই উৎকোচ। আমাতেই তদন্ত আরোগ।
সেই-ই প্রথম মৃত্যু।
'ও-র কী আছে আমার যা নেই' ব'লে
যে সন্ধ্যা ধর্মপত্নী মেরেছিলো, ব'কেছিলো কেঁদেছিলো,
সেধেছিলো হেসেছিলো
সে সন্ধ্যা যখন হারিয়ে যায়
আরেক সন্ধ্যায় সমবেত হওয়া চিরতাজা
নাতিনাত্নী নাতজামাই নাতবৌদের ভিড়ে

বিমলানন্দ শাসমল

ভারত কি করে ভাগ হলো

এই সময়ে বাংলার বিপ্লববাদীরা এবং কংগ্রেস নেতারা আরও দুটি হঠকারিতার কাজ করলেন যার ফলে শুধু বাংলা নয় সমগ্র ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায় কংগ্রেসকে শত্রু মনে করতে লাগলেন।

আমরা মুজফ্ফর আহমেদের লেখায় দেখেছি সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা 'কংগ্রেস কর্মী সংঘ' নাম দিয়ে নিজেদের একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেছিলেন। এই কংগ্রেস কর্মী সংঘই চিত্তরঞ্জনের হিন্দু-মুসলিম চুক্তিকে ধ্বংস করতে না পেরে কৃষ্ণনগরে প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতি বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের উপর অনাস্থা প্রস্তাব আনেন এবং শেষ পর্যন্ত সম্মেলনটি ভেঙে দেন। কিন্তু তার পরে তাঁরা সক্রিয়ভাবে হিন্দু-মুসলিম চুক্তির বিরোধিতা করে আন্দোলন সুরু করলেন। হিন্দু-মুসলিম চুক্তির একটা শর্ত ছিল মসজিদের সামনে বাজনা বাজিয়ে শোভাযাত্রা করা চলবে না। এই শর্তটি অকেজো করে দেবার উদ্দেশ্যে বরিশালের নেতা সতীন সেন পটুয়াখালিতে এক 'সত্যাগ্রহ' আরম্ভ করলেন যাতে প্রতিদিন 'সত্যাগ্রহীরা' মসজিদের সামনে বাজনা বাজিয়ে শোভাযাত্রা করে যেতেন এবং এই বে-আইনী কাজ করে গ্রেপ্তার বরণ করতেন।

কংগ্রেস কর্মী সংঘ একটি 'পটুয়া-খালি সত্যাগ্রহ কমিটি' গঠন করলেন এবং সারা ভারত থেকে স্বেচ্ছাসেবক 'সত্যাগ্রহীরা' রোজ এসে পটুয়াখালিতে 'সত্যাগ্রহে' যোগ দেন। এই 'সত্যাগ্রহ' [illegible] এমন সাড়া জাগিয়েছিল

[illegible] বিপ্লবী বীর' রাসবিহারী বসু চৌকিও থেকে হিন্দুদের দান হিসাবে ৪০০ টাকা চাঁদা সত্যাগ্রহ কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেন। পটুয়াখালি সত্যাগ্রহ কমিটির সম্পাদক অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ছাপানো ইস্তাহারে ঘোষণা করেছিলেন যে বাংলার গ্রামে গ্রামে মুসলমান গুন্ডারা হিন্দু নারী ধর্ষণ ও হিন্দু মন্দির অপবিত্র করছে তারই প্রতিবাদে তাঁরা পটুয়াখালিতে মসজিদের সামনে বাজনা বাজিয়ে শোভাযাত্রা করে সত্যাগ্রহ করছেন।

কিন্তু পটুয়াখালি সত্যাগ্রহের প্রত্যক্ষ ফল হোলো এই যে পল্লী গ্রামের বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের সাধারণ অশিক্ষিত মুসলমান দাবানলের ভাবে ক্ষেপে গেলেন। এই আন্দোলনের ঢেউ সারা ভারতের মুসলমানের [illegible] ছড়িয়ে পড়লো। তাঁরা মনে করলেন কংগ্রেস কর্মীরা এইভাবে তাঁদের ধর্মীয় ব্যাপারে অন্যায় হস্তক্ষেপ করছেন।

সতীনবাবু সংগ্রামী লোক ছিলেন এবং বহুবার কারাবরণ করেছেন কিন্তু তাঁর এই পটুয়াখালি 'সত্যাগ্রহ' খুবই হঠকারিতার কাজ হয়েছিল। সারা পূর্ব বাংলায় এর ফলে সাম্প্রদায়িকতার আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এই সাম্প্রদায়িকতার অনলে [illegible] মুসলমানেরা এক হিন্দু শোভাযাত্রায় বাধা দেবার চেষ্টা করতে পারে এই আশঙ্কায় বরিশালের কলেক্টর অঞ্চলের পোনাবালিয়ায় ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট বন্যান্ডিস আদেশে ২০ জন নিরস্ত্র দরিদ্র মুসলমান কৃষককে গুলি করে মারা হয়। দেশের সমস্ত মুসলমান সমাজ এতে গভীরভাবে মর্মাহত ও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। মুসলমান নেতা স্যার আবদার রহিম বলেছিলেন : 'পোনাবালিয়ার গুলিবর্ষণ দ্বিতীয় জালিয়ানওয়ালাবাগ হিসাবে ইতিহাসে চিহ্নিত থাকবে।'

মুসলমানরা আরও ক্ষুব্ধ হলেন যখন সত্যাগ্রহের জনক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী পটুয়াখালিতে সত্যাগ্রহের এই প্রহসন দেখেও মৌনব্রত অবলম্বন করে মৌনীবাবা সেজে গেলেন। সারা ভারতের কোনো কংগ্রেস নেতা এই সত্যাগ্রহের নামে এই প্রহসনের কোনো নিন্দা করলেন না এবং সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের কথা যে পোনাবালিয়ার পুলিশের গুলিবর্ষণে নিরস্ত্র মুসলমান হত্যার নিন্দা কোনো কংগ্রেস নেতার মুখ থেকে শোনা গেল না। এমন কি ১৯২৭-এ বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর মাত্র অধিবেশনে (অন্যান্য কারণের সঙ্গে) রবীন্দ্রনাথ শাসমলের প্রেরণায় উত্থাপিত পোনাবালিয়ায় গুলিবর্ষণের ও পটুয়াখালি সত্যাগ্রহের নিন্দা প্রস্তাব থেকে নিজেদের পৃথক রাখবার জন্য সতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর মাত্র অধিবেশন বর্জন করেছিলেন।

অন্য ব্যাপারটি যা মুসলমানদের প্রচন্ডভাবে ক্ষুব্ধ করেছিল সেটি হচ্ছে ১৯২৮-এর বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধন আইন। ১৯২৮ এর পজাস্বত্ব সংশোধন আইন পাশ করবার সময়ে বাংলার কংগ্রেস নেতারা—সুভাষচন্দ্র বসু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, শরৎ বসু, বিধান রায় প্রভৃতি ৪২ বার গভর্নমেন্টের পক্ষে ঝানু ইংরেজ আই সি এসদের সঙ্গে একযোগে ভোট দিয়েছিলেন। এই আইনে চাষী-বর্গাদারকে উচ্ছেদ করবার অবাধ অধিকার দেওয়া হয়েছিল জমিদারকে এবং জমি বিক্রয় বা হস্তান্তরের সময়ে জমিদারের সেলামি বাবদ দামের শতকরা কুড়ি ভাগের বোঝা গরিব প্রজার ঘাড়ে চাপানো হয় (কংগ্রেস দল বোঝাটি শতকরা পঁচিশ ভাগ করতে রাজি হয়েছিলেন)। জমিদার শ্রেণী এতে খুব খুশি হয়েছিলেন। তবে বাংলার বেশির ভাগ জমিদার হিন্দু এবং পূর্ব বাংলার চাষী-প্রজা বেশির ভাগ মুসলমান। জমিদারের স্বার্থে কংগ্রেস নেতারা—যে গভর্ণমেন্টের সঙ্গে ভোট দিয়ে এই কালা কানুন পাশ করিয়েছিলেন এতে সাধারণ মুসলমান বিশেষ করে পূর্ব বাংলার মুসলমান চাষী কংগ্রেসের প্রতি চরমভাবে বিরূপ হয়ে ওঠেন। লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে আবুল কাসেম ফজলুল হক ঘোষণাই করেছিলেন : 'গত অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে এইটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইন এবং এই আইন পাশ হলে সমগ্র কৃষক সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে বাধ্য হবেন।'

প্রসঙ্গতঃ, এই চাষী-বর্গাদার বিরোধী আইনটি সমর্থন করে পাশ করিয়ে দেবার জন্য বাংলার কংগ্রেস দলকে জমিদারেরা চাঁদা হিসাবে যে ঘুষ দিয়েছিলেন সেই নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে কংগ্রেস কাউন্সিল পার্টির নেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের প্রবল মনান্তর হয়। পূর্ব বাংলার জমিদার-গোষ্ঠি যতীন্দ্রমোহনের হাতে তাদের দেয় চাঁদা দিয়েছিলেন আর পশ্চিম বাংলার জমিদার গোষ্ঠি দিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্রের হাতে। সুভাষচন্দ্র দাবি করলেন গোটা টাকাটাই প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাপ্য আর যতীন্দ্রমোহন দাবি করলেন গোটা টাকাটাই কংগ্রেস কাউন্সিল পার্টির প্রাপ্য। উভয়ের মধ্যে কেউই নিজের দাবি ছাড়লেন না এবং মনান্তর শেষকালে প্রচন্ড শত্রুতায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বাংলায় ও পাঞ্জাবে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও এই দুই প্রদেশের কংগ্রেস নেতারা বার বার ভ্রান্ত নীতি অবলম্বন করে মুসলমানদের কংগ্রেসের প্রতি বিরূপ ও বিরক্ত করে তুলেছিলেন। অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, ১৯৩০-এ গান্ধীজীর লবণ সত্যাগ্রহের সময়ে ভারতের অন্যতম সংগ্রামী নেতা মৌলানা মহম্মদ আলি বিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের কাছে চিঠি লিখে জানিয়ে ছিলেন : 'মহাত্মা গান্ধী এবং মতিলাল নেহরু হিন্দু মহাসভার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছেন। আমি আমার ক্ষমতার যতটুকু শক্তি [illegible] আপনাকে সরকারকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি।' (স্পীচেস এন্ড রাইটিংস অফ মহম্মদ আলি—ইংরেজির অনুবাদ)

১৯৩০-৩২-এ আইন অমান্য আন্দোলনে সাধারণ মুসলমান একেবারেই সমর্থন বা সাহায্য করেন নি। ১৯৩০-এ লবণ সত্যাগ্রহে গান্ধীজীর গোলটেবিল সংবাদে কলকাতা কর্পোরেশনের নিন্দা প্রস্তাবের উত্তর কলকাতার সময়ে ফজলুল হক বলেছিলেন : 'ভারতের সাত কোটি মুসলমানের মধ্যে ৭০ জনও কংগ্রেসের সমর্থক নয়। মিঃ গান্ধী যে রকম গন্ডগোলের সৃষ্টি করেছেন তাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করে রাখার জন্য আমি ভারত সরকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে বাংলায় ও পাঞ্জাবে কংগ্রেস মুসলমানদের ভোট একদম পায় নি। পাঞ্জাবে ইউনিয়নিস্ট দল মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। বাংলার কৃষক-প্রজা দল ও মুসলিম লীগ ভাগাভাগি করে মুসলমান ভোট পেলেন। কৃষক-প্রজা দলের নেতা ফজলুল হক কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা করতে চাইলেন। গান্ধীজী তাতে সম্মতি দিলেন না। তখন বাংলায় কৃষক-প্রজা ও মুসলিম লীগ দল মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। পরের বার মুসলিম লীগের সঙ্গে কৃষক-প্রজা দলের বিবাদ হোলো। ফজলুল হক শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। কিন্তু তা বেশি দিন চলে নি। ফজলুল হককে পদত্যাগ করতে হয়। তাঁর মতে তখনকার গভর্ণর স্যার জন হারবার্ট জোর করে তাঁর পদত্যাগপত্র আদায় করেছিলেন। পরে মুসলিম লীগের খাজা নাজিমুদ্দিন বাংলার প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। ১৯৪৬-এ ফজলুল হক মুসলিম লীগে যোগ দিয়েছিলেন।

ওদিকে ১৯৩৯ সালেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছলো। সুভাষচন্দ্র দেশত্যাগ করে প্রথমে জার্মানি ও পরে জাপানে গিয়ে মিত্র শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে জাপানের সঙ্গে যোগ দিলেন। জাপানে সুভাষচন্দ্র যুদ্ধ নেতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধে তাঁদের সাহায্য করতে রাজি করালেন বটে, কিন্তু জাপানের হয়ে অন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে লড়াই করবার জন্য সুভাষচন্দ্র তাঁর আজাদ হিন্দ যৌজের এক ডিভিসন সৈন্য জাপানী যুদ্ধ নেতাদের হাতে তুলে দিলেন। উইনস্টন চার্চিল তাঁর 'হিস্টরী অফ দি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার'—বইয়ের ষষ্ঠ খন্ডের ৩৬৫ পৃষ্ঠায় এর উল্লেখ করেছেন। বেসিল কলিবার্ড তাঁর 'ওয়ার ইন দি ফার ইস্ট' বইতেও একথা লিখেছেন।

সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্বন্ধে মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক টি. এইচ. সিলকক ও উর্দু আবদুল আজিজ এক প্রবন্ধে লিখেছেন : 'এটাতে গুরুত্ব দেওয়া খুব প্রয়োজনীয় যে [illegible]

আন্দোলনকে তাদের প্যান-এশিয়া আন্দোলনের আর একটি কূটনৈতিক হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল, ভারতীয়রা কিন্তু তাতে গভীরভাবে এবং ঘনিষ্ঠ, সবলভাবে সাড়া দিয়েছিল। এ বিষয়ে অল্পই সন্দেহ থাকতে পারে যে, ভারতীয় নেতারা ভাবতেন যে তাঁরা জাপানীদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছেন আবার জাপানীরাও ভাবতেন তাঁরা ভারতীয়দের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছেন।

ভারতীয় জনমতকে খানিকটা তুষ্ট করে এবং তাঁদের কিছুটা সত্যকার স্বাধীন কাজের অধিকার দিয়ে জাপানীরা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মিকে আবার পুনর্জীবিত করে তোলে এবং ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। কর্ণেল লোগানে এবং একটি কর্নেলদের কাউন্সিলের অধীনে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি পুনর্গঠিত হয়। অসামরিক সংগঠনটি এর নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন বল লাভ করলো। অবশেষে ১৯৪৩-এর অক্টোবরে সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ গভর্নমেন্ট স্থাপিত হোলো।

অনেক বছর ধরে এ বিষয় নিশ্চয় মতদ্বৈধ থাকবে যে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির আর্থিক সঙ্গতি জাপানী পুলিশ বাহিনীর সহায়তায় কতখানি জুলুম করে আদায় করা হোতো এবং 'কেম্পাইতাই'-এর জাপানী মিলিটারি পুলিশ—লেখক সহায়তায় কতখানি জবরদস্তি করে এর সৈন্য সংগ্রহ করা হোতো। জাপানী প্রচারের অর্থ গ্রহণে অভিজ্ঞ কারও পক্ষে 'সিওনান টাইমস' নামক সিঙ্গাপুরের সংবাদপত্রটি পুরানো পাতাগুলি উল্টে দেখলে এটা না বোঝা অসম্ভব যে অধিকৃত ধনশালী ভারতীয়দের উপর প্রচুর জবরদস্তির ব্যবস্থা ছিল; ভারতীয়দের জন্য কোনো নিয়মিত সরকারী কর ধার্যের ব্যবস্থা ছিল না। শুধু ছিল ধনশালী সম্প্রদায়ের নিকট থেকে জোর করে যতটা অর্থ আদায় করা যায় তার একটা অনিয়মিত সংগ্রহ ব্যবস্থা। তাছাড়া অনেক সময়ে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের সদস্য হতে চাওয়া হোতো কারণ এতে 'কেম্পাইতাই'-এর হাত থেকে খানিকটা রক্ষা পাওয়া যেতো। এবং আর্মির মধ্যে এমন খোলাখুলি স্বীকৃত হয়েছিল যে সাধারণ সেনানীদের অনেকেই প্রধানত খাদ্য-বেশনের সুবিধা পাবার জন্যই আর্মিতে যোগ দিয়েছে.. ...

ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি পরাজিত হোলো। এর নেতাজী নিহত হলেন এবং এর হাজার হাজার লোকও সেই সঙ্গে হত হলেন। ১৯৪৫-এর জুলাই মাসে সিঙ্গাপুরে এসপ্লানেডে তাঁদের জন্য যে স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করা হয়েছিল অন্য ভারতীয় সৈন্য দল বাবো দু' মাসের মধ্যেই সেখানে অবতরণ করলেন তাঁরাই ধ্বংসে করে ফেললেন। মালয়ের বেশির ভাগ অধিবাসীর কাছে জাপানী দখলের দিনগুলি অতীতের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন তাঁদের জন্য ভালোবাসার ভাব কারুরই নেই। এমন কি স্মৃতি স্তম্ভের জায়গাটিতে আগে যে রকম নিয়মিত ফুল দেওয়া হোতো তাও আর দেওয়া হোতো না।' (এশিয়ান ন্যাশনালিজম এন্ড দি ওয়েস্ট—ইনস্টিটিউট অফ প্যাসিফিক রিলেশানস্ কর্তৃক প্রকাশিত ২১৬ পৃ—ইংরেজির অনুবাদ। এই অধ্যাপকের লেখা যদি সত্য হয় তাহলে সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুর দখলকারী ভারতীয় সৈন্য দলের হাতেই নিহত হয়েছিলেন এবং তাহলে লাউন্ট ব্যাটেন সব কথা জানেন।

ভারতে জাপানী আক্রমণের একেবারে সন্নিকটে উইনস্টন চার্চিল স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্সকে ভারতে পাঠালেন এই প্রস্তাব দিয়ে যে, ভারতীয় নেতারা যদি জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করেন তাহলে যুদ্ধ শেষ হলেই ভারতকে ডোমিনিয়ন স্টেটাস দেওয়া হবে। গান্ধীজী সরাসরি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে বললেন : 'এটি একটি ভবিষ্যতের ব্যাংকের উপর ভবিষ্যতে ভাঙ্গানোযোগ্য চেক্।' জিন্না ও মুসলিম লীগও প্রস্তাবটি গ্রহণ করলেন না কারণ কংগ্রেস গ্রহণ না করায় এরা মুসলিম লীগ গ্রহণ করলে কিছু লাভ হোতো না। প্রস্তাবটি প্রত্যাহৃত হোলো।

তারপর এল ১৯৪২। গান্ধীজী ইংরেজের বিরুদ্ধে দাবি তুললেন 'ভারত ছাড়'। ৮ই আগস্ট বোম্বাইতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির মিটিং-এ প্রস্তাব পাশ হোলো—ইংরেজকে ভারত ছাড়তে হবে। ১ই আগস্ট প্রত্যুষে ভারত সরকার সারা ভারতের সকল কংগ্রেস নেতা ও কর্মীকে গ্রেপ্তার করলেন। তখনকার বাংলার গভর্ণর স্যার জন আর্থার হার্বার্ট বডলাট লর্ড লিনলিথগোকে এক গোপন চিঠিতে লিখেছিলেন যে তাঁর লোকেদের সঙ্গে কথা বলে ডাঃ বিধান রায় ও কিরণশংকর রায় জানিয়েছিলেন যে তাঁরা 'ভারত ছাড়' আন্দোলন সমর্থন করেন না। চিঠিটি ইংরেজ সরকার প্রকাশিত 'ট্রান্সফার অফ পাওয়ার' বইটির দ্বিতীয় খণ্ডে আছে। তাই সারা ভারতের সকল নেতা ও কর্মী গ্রেপ্তার হয়েছিলেন বটে, কিন্তু এই দুজন লোক গ্রেপ্তার হন নি। জিন্না ও মুসলিম লীগ 'ভারত ছাড়' প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন এই বলে যে ইংরেজ ভারত ছাড়লে হিন্দু প্রধান কংগ্রেসের হাতে শাসন-ক্ষমতা চলে যাবে।

নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে দেশময় আন্দোলন সুরু হোলো। বহু জায়গায় হিংসাত্মক কার্যাবলী অনুষ্ঠিত হোলো, আহমেদনগর বন্দীশালা থেকে ১৯৪৩-এর ১৩ই ফেব্রুয়ারি কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদ বডলাট লর্ড লিনলিথগোকে এক চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে দেশময় হিংসাত্মক কার্যাবলীর সঙ্গে কংগ্রেসের কোনো যোগসূত্র নেই—নেতৃবৃন্দের কুদ্ধ প্রতিবাদ। তিনি লিখেছিলেন : 'প্রিয় লর্ড লিনলিথগো : আপনার [redacted]ই জানুয়ারির চিঠিতে আপনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে হিংসা ও অপরাধের কোনো নিন্দা-বাক্য ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পাওয়া যায়নি.. সাধারণতঃ বাহ্যজগতের সম্পর্ক ছিন্ন করে আমাদের যতক্ষণ বন্দী দশায় রাখা হচ্ছে ততক্ষণ আমরা কোনো কথাই বলতে অনিচ্ছুক। সেই জন্য আমরা কোনো ব্যাপারেই মত প্রকাশ করিনি এবং আপনার সঙ্গে বা ভারত সরকারের কোনো পদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে পত্রালাপ কালীন যদিও মাঝে মাঝে আমাদের বিরুদ্ধে এবং আমরা যে-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করবার গৌরব রাখি তার বিরুদ্ধে চরমতম লাঞ্ছনাকর সব অভিযোগ করা হয়েছে। মহাত্মা গান্ধীকে লেখা আপনার সাম্প্রতিক চিঠিগুলির মধ্যে সেইসব অভিযোগগুলি আরও পরিষ্কারভাবে এবং গুরুত্বের সঙ্গে করা হয়েছে। এই চিঠিগুলির ভাব এবং বক্তব্য, বিশেষ করে আপনার ৫ই ফেব্রুয়ারির 'চিঠিটির এমন যে বোধহয় এবিষয়ে আপনাকে লিখলে কোনো কাজই আসবে না। তবুও আমরা একথা অস্বীকার করতে পারি না যে বর্তমান ভারত সরকারের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি এই সকল অভিযোগ করেছেন। সেই হেতু, আমি আপনাকে এই চিঠি লেখার সুযোগ দিচ্ছি। ..আমি নিজেকে বিশেষ করে শুধু একটি মাত্র প্রশ্নেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাই এবং ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগত ক্ষমতায় আমরা যতদূর জড়িত তাতে আমাদের প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এইটা পরিষ্কার করে দিতে চাই, আপনার অভিযোগ যে কংগ্রেস একটি হিংসাত্মক গুপ্ত আন্দোলনের প্রস্তুতি করেছিল, সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন। এই ফেব্রুয়ারির চিঠিতে আপনি আরও বলেছেন যে আপনার 'পর্যাপ্ত খবর আছে যে ধ্বংসমূলক কাজের প্রচারণা করা হয়েছিল নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নামে পরিবেশিত গোপন নির্দেশের মাধ্যমে। আপনার সংবাদ ঠিক কি তা আমরা জানি না, কিন্তু এটা জানি এবং সম্যক অধিকারের সঙ্গেই বলতে পারি যে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কখনও কোনো সময়ে এই ধরনের আন্দোলনের কথা কল্পনাও করেনি এবং কখনও এই ধরনের গোপন বা অন্য ধরনের নির্দেশাবলী জারি করেনি। আমাদের গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণা করা হয় এবং কার্যত প্রায় সকল প্রধান ও দায়িত্বশীল কংগ্রেস সদস্যকে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সকল সদস্য সমেত গ্রেপ্তার করা হয়। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অফিস ও অন্যান্য কংগ্রেস অফিস পুলিশ দখল করে নেয়। সুতরাং তাহলে, নিখিল ভারত

কোনো প্রকারের কাজ করা অসম্ভব ছিলো।

'আপনি বলেছেন একটি লুকোচুরিতে কংগ্রেস সংগঠন এখনও বিদ্যমান আছে এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির একজন সভ্যের পত্নী এর সদস্য। আমরা এই ধরনের কোনো সংগঠন সম্বন্ধে কিছুই জানি না এবং এসম্বন্ধে খোঁজ নেওয়াও আমাদের এই অবস্থায় সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা এবিষয়ে নিশ্চিত যে কোনো কংগ্রেস সংগঠন এবং কোনো কংগ্রেস সদস্য বা কংগ্রেস সদস্যা বোমাবাজির পরিকল্পনা বা অন্যান্য ধ্বংসমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারেন না। কংগ্রেস সেবকেরা, নিঃসন্দেহে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁদের ক্ষমতা অনুসারে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ করা তাদের কর্তব্য বলে মনে করে। কিন্তু তার সঙ্গে আপনি যেসব অভিযোগ করেছেন তার কোনো মিল নেই। এটা হতে পারে যে সাধারণ সরকারী বা পুলিশ কর্মচারীর মনে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের সঙ্গে বোমাবাজি ইত্যাদির বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু আমাদের মনে তিলমাত্র সন্দেহ নেই যে, আমরা আমাদের দেশের লোককে যতটা জানি তাতে কোনো দায়িত্বশীল কংগ্রেস-সেবক কোনো প্রকারেই বোমাবাজি এবং ধ্বংসমূলক কার্যাবলীর উৎসাহ দিতে পারেন না।' (এই চিঠিটিও আছে 'ট্রান্সফার অফ পাওয়ার' বইটির তৃতীয় খণ্ডে—ইংরেজি থেকে অনুবাদ)

গান্ধীজী ও মৌলানা আমাদের বক্তব্য অনুসারে বড়লাটকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন যে, ৯ আগস্টের পর দেশে যে সকল হিংসাত্মক কাজ হয়েছে তার সঙ্গে কংগ্রেসের কোনো সম্পর্ক ছিল না—ওসব ছিল জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ।

কয়েকদিনের গণ-বিক্ষোভ প্রবল পুলিশী গুলিবর্ষণে থেমে গেল। ইংরেজরা খুব হতাশাময় দুঃসময়ের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে ইয়োরোপ এবং এশিয়ার আবার দ্বিগুণ উৎসাহে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে ধীরে ধীরে জয়ের পথে এগোতে লাগলেন। ইয়োরোপে রাশিয়া এবং এশিয়ায় আমেরিকা ইংরেজের প্রধান সহায় হয়ে উঠলো। এই সময়ে ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে ভারতের বড়লাট নিযুক্ত হলেন ভারতের ভূতপূর্ব ব্রিটিশ সেনাধিনায়ক স্যার আর্চিবল্ড ওয়েভেল। বড়লাট নিযুক্ত হয়েই ইনি হলেন লর্ড ওয়েভেল।

লর্ড ওয়েভেল সম্বন্ধে ভারতবাসীর ধারণা খুব ভ্রান্ত এবং সাধারণভাবে একে ভারতবাসীর স্বাধীনতার বিরোধী হিসাবে চিত্রিত করা হয়ে থাকে। আমার বলতে দ্বিধা নেই যে, যে কজন ইংরেজ রাজপুরুষ ভারতের স্বাধীনতার জন্য সত্য সত্য লড়াই করেছিলেন ওয়েভেল তাঁদের মধ্যে একজন। ভারত ও ইংলণ্ডের ইতিহাসে যা অভূতপূর্ব তিনি তাই করেছিলেন—স্বয়ং উইনস্টন চার্চিলের সঙ্গে তর্ক করে তিনি বলেছিলেন যে ইংরেজরা আর ভারতবর্ষ রাখতে পারবে না অতএব যত তাড়াতাড়ি ইংরেজ ভারত ত্যাগ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার। ওয়েভেল সাহেবের প্রধান দোষ ছিল তিনি সত্য কথা বলতে কাউকে ভয় পেতেন না তা সে উইনস্টন চার্চিলই হোন বা মহাত্মা গান্ধীইহোন। ওয়েভেলকে বড়লাট নিযুক্ত করে চার্চিলকে পস্তাতে হয়েছিল, কারণ তিনি ভাবেন নি যে তাঁর নিযুক্ত প্রতিনিধিই তাঁর সামনে একদিন ভারতের স্বাধীনতার দাবি তুলে ধরবেন। আবার প্রথম সাক্ষাৎ থেকেই গান্ধীজী ও জহরলাল নেহরু তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে যান এবং পিছন থেকে কলকাঠি নেড়ে অবশেষে তাঁর অপসারণের ব্যবস্থা করেন। কংগ্রেস নেতারা যদি ওয়েভেলকে তাড়াতাড়ি অপসারণের জন্য কলকাঠি না নাড়তেন এবং তিনি যদি বড়লাট পদ হতে অপসারিত না হতেন তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওয়েভেল কখনই ভারত-বিভাগ হতে দিতেন না। এমনকি ওয়েভেলের জায়গায় মাউন্টব্যাটেন যদি ভারতের বড়লাট না হতেন তাহলেও হয়ত ভারত-বিভাগ এড়ানো যেত। ওয়েভেলের অপসারণ এবং মাউন্টব্যাটনের নিয়োগ ভারত-বিভাগের প্রথম সোপান এবং দুঃখের সঙ্গে হলেও বলতেই হবে যে, এর জন্য মূলত দায়ি হচ্ছেন স্বয়ং গান্ধীজী ও জওহরলাল নেহরু।

ওয়েভেল বড়লাট হয়ে দিল্লী আসার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার দুর্ভিক্ষপীড়িত লক্ষ লক্ষ মানুষের দুর্দশার কথা জানতে পেরে কলকাতা ছুটে যান ও মেদিনীপুর পরিদর্শন করেন। মিলিটারির হাতে সমস্ত দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের সেবার ভার তুলে দিয়ে তিনি দুর্ভিক্ষ-মোচনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

১৯৪৪-এর ৯ই ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের কাছে এক ঐতিহাসিক তারবার্তায় তিনি বলেছিলেন : 'বাংলার দুর্ভিক্ষ ব্রিটিশ শাসনাধীন জনগণের মধ্যে বৃহত্তম বিপর্যয়গুলির মধ্যে অন্যতম এবং এই দুর্ভিক্ষ ভারতীয়দের কাছে এবং ভারতবাসী বিদেশীদের কাছে ব্রিটিশ সুনামের অপরিমেয় ক্ষতি করেছে। দেশে এবং বিদেশে এর ফলাফল বিচার করবার ক্ষমতা আপনি বেশি রাখেন। আমরা যে (খাদ্য) সাহায্য চেয়েছি তা না নিলেও আমাদের চলতে পারে, স্বীকৃতভাবে ভ্রান্ত সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্যে মহামান্য সম্রাটের সরকারের এটা প্রমাণ করবার চেষ্টা। এখানে ভারতীয় ও ব্রিটিশ জনমত একেবারেই

প্রকাশিত হল

অনুভব ও উপলব্ধিতে সমৃদ্ধ

রামকৃষ্ণ সাধন পরিক্রমা

শ্রীমনোরঞ্জন বসু

দাম ১২ টাকা

প্রাপ্তিস্থান :

৫০।২; হালদারপাড়া রোড, কলিঃ ২৬

বি/৭৫০৮

সত্যকে প্রচার। কবিরার জন্য সমাজের বা বন্ধুবর্গের মধ্যে গঞ্জনা সহিতে হয় সহিব। কিন্তু তবুও সত্যকে খুঁজিব, গ্রহণ করিব।—ঐতিহাসিকের এই প্রতিজ্ঞাকেই যিনি জীবনের মূলমন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ভারতের বর্তমান ঐতিহাসিকগণের মধ্যে আজ যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত, সেই স্বনামধন্য 'ভারততত্ত্বভাস্কর' ইতিহাসাচার্য

রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের

জীবনব্যাপী সাধনার অন্যতম অবদান জন্মভূমির এই বিরাট ইতিহাস

বাংলা দেশের ইতিহাস

১ম খণ্ড : প্রাচীন যুগ : ২৭৬ পৃঃ, ৩১ চিত্র, ১৫-০০/২য় খণ্ড : মধ্যযুগ : ৫৬২ পৃঃ, ৬৫ চিত্র, ২৫-০০ / ৩য় খণ্ড : আধুনিক যুগ : ৬৭০ পৃঃ, ১৬ চিত্র, ৩৫-০০ / ৪র্থ খণ্ড : মুক্তিসংগ্রাম : ৬১২ পৃঃ, ৩ চিত্র, ৪০-০০

[চারটি খণ্ড একত্রে একটি সুদৃশ্য গিফ্‌ট কেসে পাওয়া যায়]

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত

১১৯, লেনিন সরণী, কলিকাতা-১৩

—

জেনারেল বুকস্

এ-৬৬, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭

অসমর্থনীয় মনে করে। দয়া করে আপনার সহকর্মীদের আর একবার সতর্ক হবে দেবেন যে সংখ্যাতত্ত্বের বাঁধাবুলির বিচার এখানে একেবারেই নিষ্ফল এবং এবিষয়ে আমার অভিমত সকল গভর্ণরের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলোচনার ও এগারটির মধ্যে সাতটি প্রদেশ ভ্রমণের ভিত্তিতে রচিত।

'আমি মহামান্য সম্রাটের সব কারণে সতর্ক করে দিচ্ছি যে তাঁরা যদি আমাদের (খাদ্যের) দাবি নাকচ করে দেন তাহলে তাঁরা বাংলার দুর্ভিক্ষের চেয়েও প্রভূত পরিমাণে বৃহৎ আর এক বিপর্যয়ের ঝুঁকি নেবেন। যাঁকে তাঁরা ভারতের সমস্যাবলী সম্বন্ধে তাঁদের উপদেশ দিতে নিযুক্ত করেছেন হয় তাঁর অভিমতের উপর আস্থা স্থাপন করবেন না হলে বদলি করে দেবেন।' (ইংরেজিতে অনুবাদ)

উইনস্টন চার্চিল প্রথমে ভারতে খাদ্য পাঠাবার প্রশ্নটি বিবেচনাই করতে চান নি। কারণ খাদ্য পাঠাতে হলে জাহাজ চাই এবং ভারতের খাদ্যের জন্য জাহাজ ছেড়ে দিলে সৈন্য চলাচলে বাধা পড়বে, তাতে যুদ্ধের ফলাফল খারাপ হতে পারে। কিন্তু, ওয়েভেল উইনস্টন চার্চিলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট বাংলাকে এক বৃহত্তর দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচিয়েছিলেন ব্রিটিশ সরকারকে প্রায় ১০০০০০০ টন খাদ্যশস্য ভারতে পাঠাতে বাধ্য করে। বাংলার ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে যে আবার দুর্ভিক্ষ হয়নি তার কৃতিত্ব ওয়েভেলের।

১৯৪৪-এর ২৪শে অক্টোবর ওয়েভেল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলকে তাঁর প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলকে তাঁর ঐতিহাসিক চিঠিটি লেখেন : '...এক বছরের ওপর বর্তমান পদে কাজ করে আমি অনুভব করছি যে মহামান্য সম্রাটের সরকার ভারতের সবচেয়ে সমস্যাগুলিকে অবহেলা এমনকি সময়ে সময়ে হীনভাবে চোখে দেখেন। সমস্যাগুলির জটিলতা আমি সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করি এবং ইঙ্গোয়োপের যুদ্ধের গুরুত্বের প্রয়োজনীয়তার কথাও জানি। আমি মোটামুটিভাবে আপনার এই মতও মেনে নিচ্ছি যে ভারতীয় পরিস্থিতির এক ভ্রান্ত অবলোকনে এবং এক অপপ্রতিষ্ঠিত ভাবনার উদ্দামনীতির অনুসরণে আমরা ১৫।৩০ বছর আগে ভারত সম্বন্ধে এক ভ্রান্ত পথ গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু আমরা ঘড়ির কাটা উল্টো ঘুরিয়ে নিতে পারি না এবং বর্তমান অবস্থা ও প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে সাবধান আমাদের নিতেই হবে। আমি এবিষয়ে খুব পরিষ্কার যে আমাদের বর্তমান মানসিকতা বিপক্ষকে বাড়তেই তুলছে'...

১৫।৩০ বছর আগে যখন আমরা ভারতে যখন আমরা যে পথ ধরেছিলাম তা থেকে এখন আমরা সরে আসতে পারি না। হয়ত সেটা ভুল পথ ছিল, এবং হয়তো অর্থনৈতিক উন্নতিবিধানের চেষ্টাটা আগে করলে আরও ভালো হোতো। কিন্তু পথ পরিবর্তনের পক্ষে এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। এবং ভারতকে পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন অর্পণ করবার সাধারণ নীতি এই কিছুদিন আগেও কিংগ্‌স্‌ প্রস্তাবের মাধ্যমে অনুমোদন করা হয়েছিল।

'আমি মনে করি যে পশুশক্তি দিয়ে ভারতকে আমরা কোনো প্রকারেই আর পদানত রাখতে পারবো না। ভারতীয়রা খুবই নিরীহ, এবং হয়ত অল্প পরিমাণ বলপ্রয়োগ নির্বিবাদে প্রযুক্ত হলে তাই যথেষ্ট হতে পারে। কিন্তু আমি এবিষয়ে নিশ্চিত যে ব্রিটিশ জাতি তার দমননীতির সঙ্গে জড়িত থাকলে স্বীকৃত হবে না, বিশ্বজনমতও তা অনুমোদন করবে না এবং এই দেশকে পদানত রাখবার জন্য ব্রিটিশ সৈন্যরা যুদ্ধের পর এদেশে অধিক সংখ্যায় থাকতে রাজি হবেন না। আমরা যদি ভারতকে ব্রিটিশ কমনওয়েলথে রাখতে চাই তাহলে ব্রিটিশ সংসদের ব্যাপারে তাদের স্বেচ্ছামূলক সমর্থন পাওয়া চাই।

'...বর্তমান ভারত সরকার বেশিদিন চালাতে পারবে না। যদিও মূলে দায়িত্ব এখনও মহামান্য সম্রাটের সরকারের হাতেই আছে তবুও মহামান্য সম্রাটের সরকারও এখন আর কোনো ভাৎপর্যমূলক কাজ করবার ক্ষমতা রাখেন না। আমরা ক্রমশঃ ব্যাপকতরভাবে এমন সব অর্থনৈতিক বাণিজ্যিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার দিকে ভেসে যাবো যে সবের জন্য ভারতই দায়ি, কিন্তু তার জন্য মহামান্য সম্রাটের সরকার নিন্দাভাজন হবেন।

'...আমরা যদি ভারতকে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের ইচ্ছুক সদস্য হিসাবে রাখতে চাই, তাহলে আর দেরি না করে আমাদের উচিত কোনো সুকল্পিত ও গঠনমূলক পন্থা গ্রহণ করা। গান্ধী এবং নেহরু ও তাঁদের অনুচরদের অবিশ্বাস ও অপছন্দ করবার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু, কংগ্রেস এবং লীগ দুটি দল ছিল, এবং মুসলমান ভারতে সর্বপ্রধান এবং থাকবেও তাই। তারা সংবাদপত্র-জগৎ, নির্বাচনী-যন্ত্র এবং বিত্তশালী সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করে এবং সুপ্রতিষ্ঠিত দল হিসাবে মর্যাদাবান। যদি গান্ধী ও জিন্নার কাল মৃত্যু হয়, পরামর্শ গ্রহণের জন্য তাঁদের চেয়ে বেশি নমনীয়তাশীল আর কাউকে আমি দেখি না। আমরা এই ধরনের কিছুটা-[illegible] আলোচনা চালিয়েছি, যেমন ধরুন, ডি ভ্যালেরা এবং লগলুল।....বিরাট ঝুঁকি না নিয়ে আমরা কোনো পন্থা গ্রহণ করতে পারবো না, কিন্তু সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হচ্ছে যে, যুদ্ধের পরে ভারতবর্ষ একটি দুষ্ট ক্ষত হয়ে উঠবে, এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সকল শক্তির অবক্ষয় ঘটাবে। আমার মনে হয়, এখনও ভারতকে ব্রিটিশ কমনওয়েলথে রাখা সম্ভবপর, যদিও সেটা খুব সহজ হবে বলে আমি মনে করি না। আমরা এ-বিষয়ে যদি কোনো চেষ্টাই না করি, তাহলে হয়ত আমরা আর কয়েক বছর ভারতকে কষ্টের সঙ্গে পদানত রাখতে পারবো কিন্তু পরিশেষে ভারতবর্ষ বিশৃঙ্খলার, এমনকি অপর দেশের অধীন হয়ে যাবে।

'কার্যকরী কিছু করতে হলে এমন কিছু করতে হবে যা ভারতীয়দের কল্পনাকে অভিভূত করতে পারে। ভারতকে যদি পশুশক্তির দ্বারা শাসন করতে না হয়, তাহলে মস্তিষ্ক চালনা করে নয়, পরন্তু হৃদয়বত্তা দিয়ে ভারত শাসন করতে হবে। আমাদের পদক্ষেপ নিশ্চয়ই আন্তরিক ও বন্ধুভাপূর্ণ হওয়া চাই এবং সেই অনুসারে ভারত সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করতেই হবে। আমি নতুন পদক্ষেপের জন্য প্রস্তাবাদি পাঠাতে প্রস্তুত আছি। এতে ঝুঁকি নিশ্চয়ই আছে কিন্তু এ-বিষয়ে অগ্রসর হবার সেইটাই হবে প্রকৃষ্ট পন্থা।....

'কিন্তু প্রকৃত প্রয়োজন হচ্ছে মানসিকতার পরিবর্তন যাতে সাধারণ শিক্ষিত ভারতীয় বিশ্বাস করতে পারে যে ব্রিটিশ সরকার তাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আন্তরিক এবং ভারতের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। সেটা খুব সহজ হবে না, কারণ, গভীরভাবে বদ্ধমূল সন্দেহের মনোভাবকে দূর করতে হবে। কিন্তু, এমন কিছু কাজ আমাদের করতে হবে যার দ্বারা বর্তমানের ব্যাপক অবিশ্বাস ও শত্রুভাব অনেকটা কমিয়ে দেওয়া যায়। বস্তুতঃ আমরা যদি ভারতকে যুদ্ধ শেষে ডোমিনিয়ন করে দেব বলে ঠিক করে থাকি, তাহলে এই মুহূর্তে তাকে ডোমিনিয়নের মত মর্যাদা দেওয়া উচিত। আমার প্রস্তাবমত, মহামান্য সম্রাটের সরকার যদি কিছু কিছু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন এবং মহামান্য সম্রাটের সরকারের অনুমতিক্রমে আমি যদি ভারতকে ব্রিটিশ সহানুভূতি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত করতে পারি, তাহলে আর বিশ্বাস, অবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে। (লম্বা চিঠিটির অংশবিশেষের ইংরেজি অনুবাদ দেওয়া হোলো)

(চলবে)

সুপার ৭৭৭

ময়লার বিরোধী, শুভ্রতার শক্তি

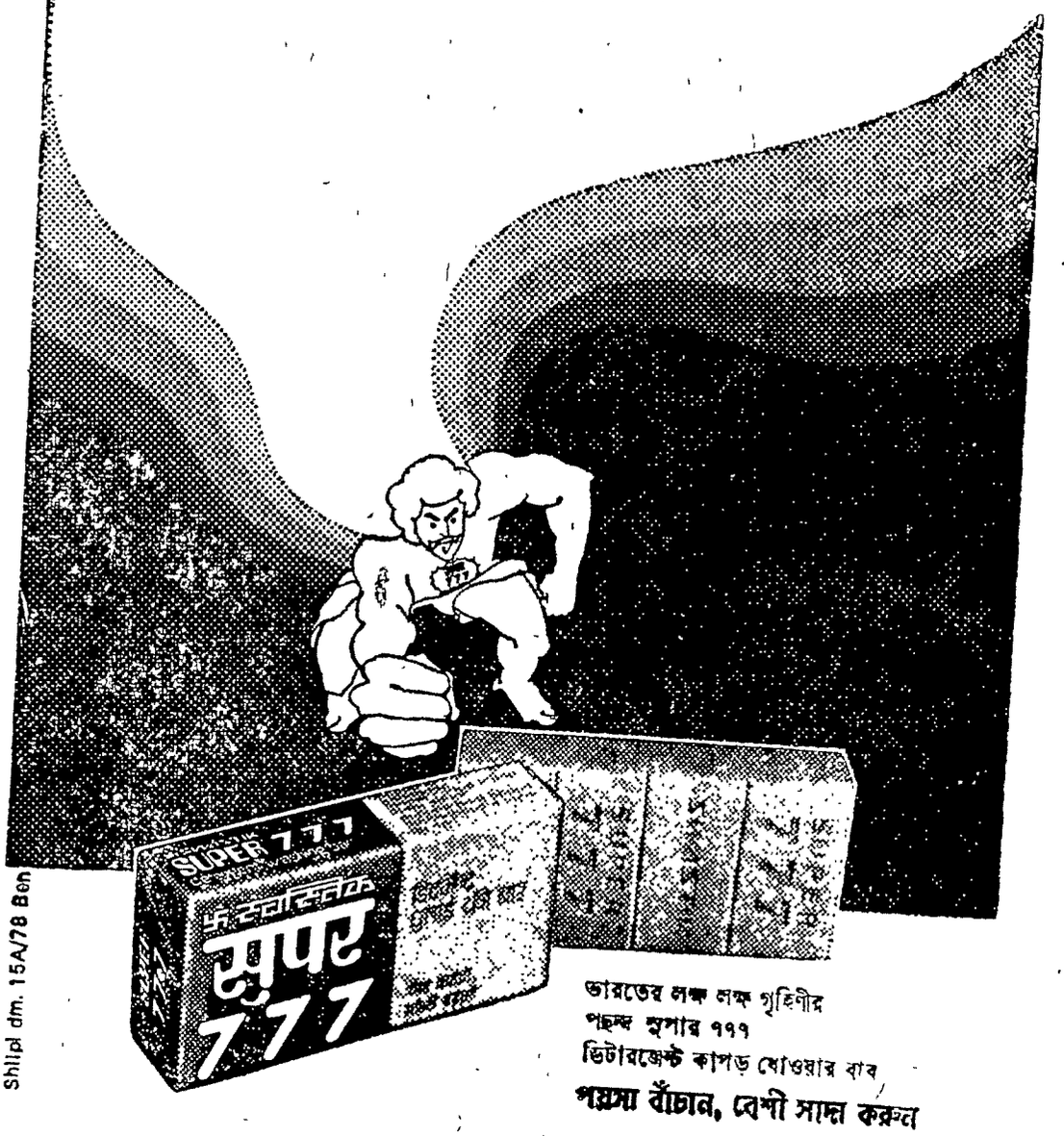

ভারতের লক্ষ লক্ষ গৃহিণীর
পছন্দ সুপার ৭৭৭
ডিটারজেন্ট কাপড় ধোওয়ার বার

পয়সা বাঁচান, বেশী সাদা করুন

Shilpi dm. 15A/78 Ben

JTTA ASSOCIATES ADVERTISING CONSULTANTS

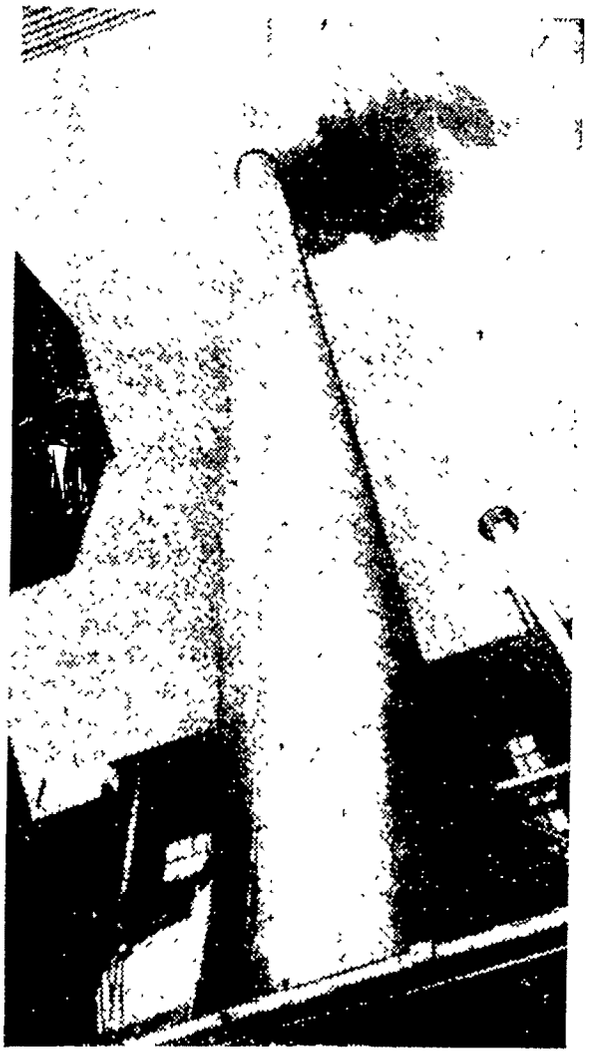

আততায়ী বাতাস

শিশিরকুমার নিয়োগী

এক ভদ্রলোক একটু মজা করেই বলছিলেন যে, আমাদের শহরগুলোয় হাওয়া-বাতাস যেভাবে দূষিত হচ্ছে, তাতে আর কয়েক বছর বাদে অক্সিজেন তৈরির কারখানাগুলো শহরের কাছাকাছি রাখা যাবে না। ভদ্রলোক যেন বলতে চান, অক্সিজেন তৈরির একমাত্র যে কাঁচামাল 'বাতাস', যার কুড়ি শতাংশই হোল অক্সিজেন, তাতেও এতো ধুলোবালি গ্যাস ধোঁয়া এসে মিশছে যে, কালে বাতাসে হয়তো অক্সিজেনই থাকবে না। কথাটা যদিও বিজ্ঞানসম্মত নয়, তবুও এটা জোর দিয়েই বলা যায়, কলকাতা শহরের বাতাস স্বাভাবিক বাতাস নয়—কলুষিত, কলকতা শহরের বাতাসের মধ্যে রয়েছে হাজারো রকমের ভেজাল, যে-ভেজাল নাকে, চোখে, মুখে প্রতিনিয়ত গেলে সর্বনাশ হতে সময় নেবে না বেশি দিন।

আমরা অনেক সময় বলি, আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান দেশ, এখানে কলকারখানার দাপট খুবই কম, মোটরগাড়ি ক'জনেরই বা আছে। সুতরাং দূষিত বাতাস নিয়ে গেল গেল রব তোলার সময় আসেনি। ঠিক এমনিই কথা উঠতো মাত্র কয়েক বছর আগেও পুণ্যতোয়া গঙ্গাকে নিয়ে। গঙ্গাজলের পবিত্রতা নিয়ে কতো কাহিনীই না প্রচলিত ছিল। কিন্তু আজ ? গঙ্গাজল তো মুখে দিলেই বিপদ—এমনকি কলকাতার কাছের গঙ্গার জল যে পরিমাণ কলুষিত, তাতে মামুলী পদ্ধতিতে এর ময়লা শোধন হবার নয়। বাতাসের বেলাতেও এই একই কথা। এমন দিন খুব কাছেই যখন মানুষ নোংরা জলের মতো নোংরা বাতাস নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়বে। কলকাতা, কানপুর, দুর্গাপুর, জামসেদপুর প্রভৃতি শহরের বাতাস ইতিমধ্যেই অনেক জায়গায় বিপদসীমার কাছে এসে গেছে। সর্বংসহা পৃথিবী ও তার বায়ু-মণ্ডল যেন চিৎকার করে বলছে, আর নয়—অনেক সহ্য করেছি, আর পেরে উঠছি না।

বাতাস দূষিত হচ্ছে বলতে আমরা বুঝি বাতাসের মধ্যে ধুলোবালি, ধোঁয়া, বাষ্প, গ্যাস, কুয়াশা, দুর্গন্ধ ইত্যাদি এতো পরিমাণে জমছে যে, এই বাতাস কেবলমাত্র মানুষের ক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য কীটপতঙ্গ-প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনেও আনছে বিপদ, ধ্বংস। ধুলোবালির মাধ্যমে রোগবীজাণু শরীরে ঢুকতে পারে, ফুসফুসের মধ্যে ধুলোবালি জমে গিয়ে ফুসফুসকে কর্মক্ষমতা করে তুলতে পারে। কিন্তু নানান ধরনের ধোঁয়া ও গ্যাস বাতাসের মধ্যে মিশে গিয়ে যখন আমাদের শরীরে যায়, তখন কী বিপদই না ঘটতে পারে।

বাতাসের মধ্যেকার দূষিত জিনিসগুলি কি কি ক্ষতি করতে পারে এবং তার প্রতিকারই বা কি—এ নিয়ে ভাবতে গেলে বিভিন্ন ধরনের বিশেষজ্ঞের যৌথ প্রচেষ্টা দরকার। ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, জলবিজ্ঞানী, প্রাণীবিজ্ঞানী, উদ্ভিদবিজ্ঞানী, কীটবিজ্ঞানী, আবহাওয়াবিশারদ ও নেশা-বিশেষজ্ঞের যৌথ উদ্যোগেই একটা কিছু করা সম্ভব।

দূষিত হাওয়ার প্রভাব মানুষের শরীরের ওপর নানান-ভাবে কাজ করে। বাতাসে দুর্গন্ধ থাকলে মানুষ অস্বস্তি অনুভব করে। কিন্তু, সেইদুর্গন্ধ মানুষের শরীরের কতোটা ক্ষতি করছে কি আদৌ করছে না—এটা এখনও একটা বিতর্কিত বিষয়। তবে মানুষের মানসিক অবস্থার সঙ্গে শরীরের যোগ থাকার ব্যাপারটা যদি মেনে নেয়া যায়, তবে ধরেই নিতে হবে যে, দুর্গন্ধ মানুষের ক্ষতি করছে। শীতকালের বিকেলে রাস্তায় বেরুলে ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করে—এটা একটা তাৎক্ষণিক অস্বস্তি, কিন্তু এই অস্বস্তি ক্রমাগত ঘটতে থাকলে শরীরের যে ক্ষতি হবে না কে বলতে পারে। ডাক্তারদের একাংশের মত—চোখে ছানি পড়া এই ধরনের অস্বস্তিরই পরিণাম।

কলকারখানার মধ্যে দূষিত হাওয়ায় কাজ করলে কয়েক বছরের মধ্যেই কর্মী নানান ধরনের শারীরিক অসুখ-বিসুখে পড়েন। পাটকলের পাটের সূক্ষ্ম আঁশ, গ্যালভানাইজিং মেসিনের ধুলোবালি, রাসায়নিক ধোঁয়া—এই সবকিছুরই একটা ক্ষতিকর আছে, যেটা মানুষ বুঝতে পারে—বেশ কিছুদিন বাদে শরীরে বিভিন্ন ধরনের রোগ প্রকাশের পরে। তাছাড়া সবসময় সর্দিকাশি লেগে থাকা, চোখ জ্বালা করা, অনিদ্রা এসব তো থাকতেই পারে। আবার কতকগুলি ক্ষেত্রে বাতাসে নোংরার পরিমাণ এতো বেশি থাকতে পারে যে, তার ফল শরীরে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই প্রকাশ পায়। সাপের লাইনের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে দূষিত গ্যাসে অনেকেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন, প্রাণও যায় অনেকের। কোবাল্ট সিলিণ্ডার লিক করে বিপদ ঘটে অনেক সময়। আর অক্সিজেনের অভাবে প্রাণ হারাতে পারেন কয়লাখনির কর্মীরা কয়লা-খাদের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে।

বাতাস যে নোংরা হচ্ছে তার কারণগুলো বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় যে, প্রকৃতি ও মানুষ এই দুয়ের কর্মকাণ্ডের ফলেই এই দুর্ঘটনা।

আগ্নেয়গিরির উদ্ভূত বাষ্প ও গ্যাস, গাছপালা থেকে উদ্ভূত ফুলের রেণু, তুলোর আঁশ ইত্যাদি, জমি ক্ষয়ের দরুণ সৃষ্ট ধূলিকণা, জলকণা এ-সবই হোল প্রকৃতির নিজস্ব সৃষ্টি।

আর এই ব্যাপারে মানুষের কর্মকাণ্ডের তো শেষ নেই। বিভিন্ন কলকারখানা থেকে উদ্ভূত গ্যাস, বাষ্প ও ধোঁয়া, মোটর ও বিভিন্ন যানবাহন থেকে সৃষ্ট ধোঁয়া-কালি, গ্রাম ও শহরের ময়লা পোড়ানোর চিমনি ও শ্মশানঘাট, কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত কীটনাশক ওষুধপত্র, বাড়িতে জ্বালানো উনুন এবং আমাদের সভ্যতার নবতম দান রেডিও অ্যাক্টিভ বিচ্ছুরণ—যেটা কেবলমাত্র বোমা-বাজিতেই হচ্ছে না, নিরীহ নিউক্লিয়ার পাওয়ার জেনারেটিং স্টেশন অর্থাৎ পারমাণবিক বিদ্যুৎ-কেন্দ্রেও তৈরি হচ্ছে, এগুলিই হল মানুষের সৃষ্ট আপদ।

এইসব দূষিত হাওয়া মানুষের শরীরের ওপর কিভাবে কাজ করে দেখা যাক। আগেই বলেছি—দূষিত বাতাস মানুষের চোখ, মস্তিষ্ক ও ফুসফুসের ওপর কাজ করে বেশি। ফলে এই সব শরীরযন্ত্রের কাজকর্মের ব্যাঘাত ঘটে। মানুষের শরীরে একটা স্বাভাবিক প্রতিরক্ষা ক্ষমতা আছে। বাতাসের মধ্যেকার খুব ছোট ধূলিকণাগুলি যার আকার ০.০১৫ ও ০.০২৫ মিলিমিটারের মধ্যে, সেগুলি শরীরে ঢুকবার আগেই নাকের মধ্যে বা গলার মধ্যে দেয়ালে আটকে যায়। আমরা প্রতি মিনিটে ১০০ লিটার বাতাস শরীরে ঢোকাই বা বার করে দিই। গলার মধ্যে অর্থাৎ বায়ুনালীর (কণ্ঠনালীও বলা যায়) মধ্যে দিয়ে যখন বাতাস যায়, তখন তার গতিবেগ থাকে বেশি। তাই তখন বাতাসের মধ্যেকার ময়লা কণাগুলি থিতিয়ে যেতে পারে না। কিন্তু, ফুসফুসের মধ্যে বাতাসের গতিবেগ কম। সেখানেই বাতাসের মধ্যেকার ধূলিকণা-গুলি থিতিয়ে পড়ার চেষ্টা করে। অবশ্য সবটাই থিতিয়ে যেতে পারে না। বেশির ভাগটাই নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে আসে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ বলরাম বসু হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, কয়লাখনিতে কাজ করলে একজন কর্মীর ফুস-ফুসের মধ্যে বছরে দেড় থেকে ১৫ গ্রাম কয়লাগুঁড়ো জমতে পারে। ফুসফুসের মধ্যেকার আচ্ছাদনগুলি এতো পাতলা ও নরম যে, বাতাসের মধ্যেকার ধূলিকণাগুলি ফুসফুসকে সহজে জখম করে। এর শেষ পরিণাম বিভিন্ন ধরনের রোগ, যেমন সিলিকোসিস, এ্যাসবেস্টোসিস ইত্যাদি। এই অবস্থায় খুব সহজেই যক্ষ্মা রোগ শরীরকে আক্রমণ করতে পারে।

বাতাস কতোখানি দূষিত সেটা মাপবার নানান পদ্ধতি বেরিয়েছে। আবার সেই বাতাস শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক কিনা তা নিয়েও গবেষণা করে একটা মানক সৃষ্টি করা হয়েছে। বাতাসের মধ্যেকার ধূলিকণা, ধোঁয়া এবং বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য মাপবার জন্য খুব সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি বেরিয়েছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে মেপে বলে দেওয়া যায়—বাতাসের মধ্যে প্রতি ঘনমিটারে কতো সংখ্যক ধূলিকণা রয়েছে এবং তাদের চরিত্রই বা কি।

বাতাসে ধোঁয়া ও কুয়াশার সংমিশ্রণ ঘটলে স্মগ বা ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়। এগুলির ওপর যখন সূর্যকিরণ এসে পড়ে, তখন বিচিত্র রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে যায়—বাতাসের নাইট্রোজেন ও সালফার বা গন্ধকের সহায়তায়। ধোঁয়াশা মারাত্মক হতে পারে। লণ্ডন, পেনসিলভ্যানিয়া ও মিউজ উপত্যকায় অতীতে এই ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়ে অনেক প্রাণহানি ঘটিয়েছে।

আমাদের দেশে ধোঁয়া বা ধুলোবালির সমস্যা নিয়ে এতোদিন বিশেষ কোনও গবেষণাই হয়নি। ধোঁয়া, ধুলো কিভাবে কমানো যায় বা ধোঁয়া ও ধুলো শরীরের কি ক্ষতি করতে পারে, তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হরচন্দ্র রাজার আগে কেউ সম্ভবতঃ ভাবেননি।

কয়েক বছর আগে কেন্দ্রীয় সরকারের গবেষণা সংস্থা নিরি **NEERI** কলকাতায় ধুলো ময়লা নিয়ে একটা বাস্তব-সম্মত সমীক্ষা চালিয়েছিলেন। কলকাতার রাস্তায় গাড়িঘোড়ার ধোঁয়া মাপতে গিয়ে দেখেন যে, এর মধ্যে কারবন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা পশ্চিমী দেশের শহরের তুলনায়ও অনেক বেশি। এটার কারণ হোল আমাদের দেশে খুব পুরোনো গাড়ির ব্যবহার। এই সব গাড়ির এঞ্জিনে পেট্রোলের দহন ঠিকমত হয় না। তাছাড়া ভিড়ের সময়ে যানবাহনের মন্থরগতিও এর জন্যে দায়ি।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ভারতের বড় বড় শহরগুলির বাতাসে ভাসমান ময়লা উপাদানের পরিমাণ বেশ বেশি। প্রতি ঘনমিটার বাতাসে ভাসমান ময়লার পরিমাণ মাইক্রোগ্রামের হিসাবে এইরকম—স্যানফ্রান্সিসকো (আমেরিকা)—৬৮, নিউইয়র্ক—১৩৪, লণ্ডন—২২১, বোম্বাই—২৩৮, কানপুর—৪৩৮, কলকাতা—৫২৭, দিল্লি—৭০৩, অবশ্য ভারতের অন্যান্য অনেক শহরের বাতাস এখনও খুব ভাল।

বাতাসে দূষিত হবার কারণ এবং দূষিত বাতাসের প্রকৃতি নির্ভর করে সেখানকার জনবসতি, শিল্প ও যানবাহনের ওপর। কলকাতার দূষিত হাওয়ার ব্যাপারে অঞ্চলগুলি মোটামুটি এইভাবে ভাগ করা যায় : মিশ্র অঞ্চল—হাওড়া-শালকিয়া, শিয়ালদহ-বেলিয়াঘাটা—মাণিকতলা, কাশী-পুর—চিৎপুর ও খিদিরপুর।

ব্যবসা অঞ্চল : চৌরঙ্গী, বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ, বড়-বাজার, এসপ্ল্যানেড। বাকিগুলি প্রধানতঃ ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল।

কলকাতা অঞ্চলের শিল্পকারখানাগুলির অধিকাংশই ছোট ও মাঝারি আকারের। সবগুলিই প্রায় সেকেলে ডিজাইনের। চিমনির উচ্চতা কম থাকার ফলে ধোঁয়া খুব ভালোভাবে ছড়িয়ে

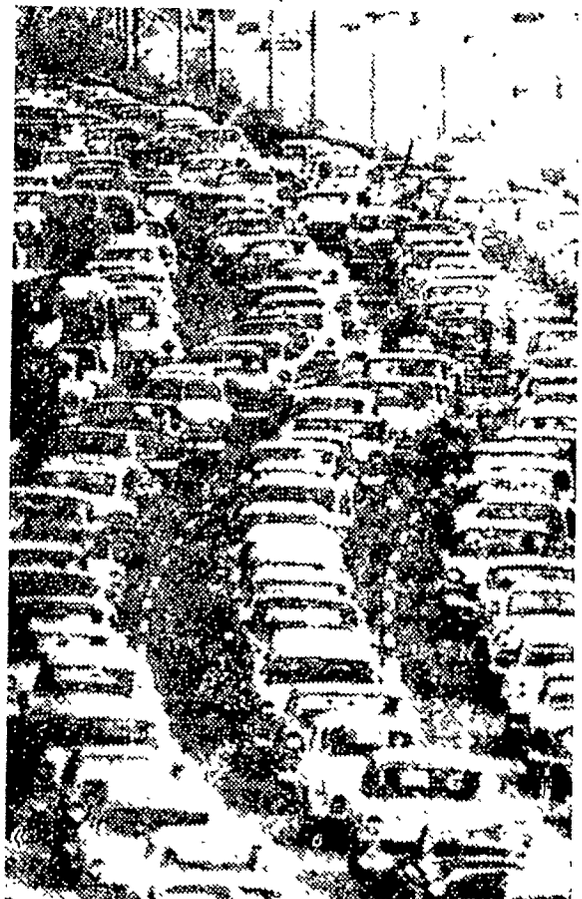

যেতে পারে না—ফলে কলকাতার আশেপাশেই গাছপালা বাড়িঘরের ওপর এইসব ধুলো ও ধোঁয়া জমে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯০৬ সালে তৈরি ধোঁয়া নিবারণী আইন রয়েছে। সেটাকে কলকাতা ও হাওড়ার জন্যে কয়েকবারই প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু তাতেও আশাপ্রদ ফল হচ্ছে না, তার কারণ—১) কলকাতা বা হাওড়ার সর্বত্র একই ধরনের আইন সমান কার্যকর নয়। চিমনির উচ্চতা জায়গাবিশেষ ও হাওড়ায় তোড়ের ওপর কম-বেশি হওয়ার দরকার। ২) এই আইন কেবলমাত্র শিল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কিন্তু কলকাতার বায়ু যাঁরা বিষিয়েছেন তাঁদের মধ্যে সাধারণ গৃহস্থের সংখ্যা কম নয়—আর আছেন মোটরগাড়িওয়ালা বাবুরা। তাঁরা এই আইনের আওতায় পড়েন না

দূষিত হাওয়া প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সরকারী প্রচেষ্টাও যেমন জোরদার হবার প্রয়োজন, তেমনিই প্রয়োজন জনসাধারণের সহযোগিতা। ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত সংস্থা ও শিল্পগোষ্ঠীকেও এগিয়ে আসতে হবে এই বিরাট কাজে। ১৯৭০ সালে জনসাধারণের উদ্যোগে সোসাইটি ফর ক্লিন এনভায়রনমেন্ট গঠিত হয়েছে বোম্বাই শহরে। তাঁরা সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও জনসাধারণের সাহায্য নিয়ে পরিবেশ বিষাক্তকরণের অনেক কাজ করেছেন। আর এই ব্যাপারে সবচেয়ে প্রয়োজন হোল জনসাধারণকে সজাগ ও সহযোগী করে তোলা। আর জনসাধারণকে সজাগ ও সহযোগী করে তুলতে পারলেই সমস্যাগুলির সমাধান করবার ওপর চাপ আসবে। তখন বিভিন্ন কলকারখানার মালিকরাও বাধ্য হবেন কিছু একটা করতে, আর সাধারণ মানুষ বিপদের কথাটা উপলব্ধি করে যতোটা সম্ভব চেষ্টা করবেন বাতাসকে কলুষতামুক্ত রাখতে।

তবে আমাদের মতো দেশে নিতান্ত অর্থনৈতিক কারণেও বহু প্রয়োজনীয় জিনিস করা যায় না। কয়লার দাম বেশি, সেটা কিনতেই নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত লোকের প্রাণান্ত, তার ওপর যদি কয়লার বদলে ধূমবিহীন কোক্ কয়লা বা ব্রিকেট ব্যবস্থা করতে বলা যায়, তবে সেটা অর্থনৈতিক কারণেই অনেকে মানতে পারবেন না। যে-দেশে নতুন গাড়ি কেনার সামর্থ্য খুব কম লোকেরই আছে, সেখানে পুরনো গাড়ি হাজার ধোঁয়া ছড়ালেও উপায় নেই। আর ছোট ছোট কলকারখানার মালিকরা তো তাঁদের হাজারো রকমের সমস্যার কথা তুলে হাওয়া দূষিত হবার সমস্যার কথাটা হাওয়া করে দিতে চাইবেন। আর হাওয়া বিষাক্তিকরণের ব্যাপারে ধনী ও দরিদ্রের জন্য আলাদা আইন হওয়াও সম্ভব নয়—অন্ততঃ আপাতঃচিন্তায়।

এই ব্যাপারে প্রচুর গবেষণার প্রয়োজন। গবেষণা করে কম খরচে একটা কিছু বাতলে দিতে পারলে তখন আইন করে হোক, জনমত গঠন করে হোক, একটা চাপ সৃষ্টি করা যায়। আমাদের গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য হবে কম খরচে কিছু একটা করা, সেটা উনুনের ধোঁয়া সম্পর্কেই হোক বা গাড়িঘোড়া, শিল্পকারখানা সম্বন্ধেই হোক। সব সময় যে প্রচলিত পদ্ধতির উন্নয়ন করেই সফলতা আসবে, তা নয়, নতুন নতুন দিকে চিন্তার প্রসার ঘটাতে হবে। আর একটা কথা খুব ভালোভাবে চিন্তা করে দেখবার সময় এসেছে। আমরা প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি গাছ কেটে ফেলছি—সেই তুলনায় নতুন গাছ হচ্ছেই না। অথচ বাতাসের কলুষতামুক্ত করার হাতিয়ার হিসাবে গাছের জুড়ি নেই। একটা সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে, এইভাবে চলতে থাকলে ৬০ বছর বাদে আমাদের মতো উন্নতিশীল দেশে সবুজ বলে কিছু থাকবে না। এখনই একটা কিছু করা দরকার। বিশ্ব-পরিবেশ দিবসে সবাইকেই মনে মনে শপথ নিতে হবে আমাদের প্রিয় পৃথিবীকে বাঁচাবার।

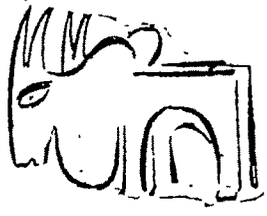

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

এপার থেকে ওপারে

বাবা আমার ৭ বছরে ধুলো মাখা গায়ে ঝামা ইঁট আস্তে আস্তে ঘষছিলেন পুকুর ঘাটে বসে। আট আনি কাছারির পুকুরে সবুজ জলের উপরে কাঠের তক্তা পাতা। দুপুরে স্নান করিয়ে দেন বাবা। সারা দিন খেলা আর খেলা। গল্পের পথঘাট পাকা নয়। একটু ঝিরঝিরে বৃষ্টিতেই কাদা হয়ে যায়। এক হাঁটু কাদার মধ্য দিয়ে বর্ষাকালে স্কুলে যাই। খেয়াঘাটে থকথকে কাদা। বই বগলে। মাথায় ছেঁড়া ছাতা, বা অসময়ে হঠাৎ বৃষ্টি নামলে রাস্তার ধারের মানকচু পাতা দিয়ে মাথা ঢাকি। খেয়া পেরিয়ে স্কুল। এপারে বাংলো। সাহেব-সুবো এসে থাকেন। পাশেই লঞ্চ-ঘাটা। কাঠের সিঁড়ি-নদীর জল ছুঁয়ে পড়ে আছে।

সারা দিনের ধুলো পরের দিন বাবা ঝামা ইঁট ঘষে তুলে দেন। সেদিনও দিচ্ছিলেন। হঠাৎ বললেন,—জানিস খোকা মারামারি শুরু হয়েছে। আমাদের গঞ্জ-শহরে মারামারি বলতে কখনো কিছু দেখি নি। বাবাই বললেন,—হিন্দু-মুসলমানে। কি যে হবে?

একথা বলেও বাবা যে খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন তা মনে হয় নি। যেন সাময়িক, নিতান্ত সাময়িক ব্যাপার। তার পরও ভোরে বাবার গীতা-চণ্ডী পাঠ, কাছারির বাগানে ফুল তুলতে যাওয়া, মামাদের স্কুলে পড়ানো, গরীব হাটুরেকে নাকের জলে চোখের জলে করা চলতে লাগলো। আমরা স্কুলে গেলাম। ছুটি হলে বাড়ি। রসিদ বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলো। গেলাম। হাটের দিন- মাদুরের উপর ছড়ানো নতুন বই-এর গন্ধ শুঁকলাম রসিদ আমি মনোহর। আমিনা, ক্লাসের একটি মাত্র মেয়ে পড়ুয়া কি যেন একটা বই চাইলো।

লক্ষ্মী পুতোয় ছেঁড়া চাদর গায়ে জড়িয়ে আছবফি মিঞা গামছার ছাদা বেঁধে নিতে যেতো—চিঁড়ে-মুড়ি, খই, কলা সন্দেশ। আছবদ্দি ভাই আমাদের বাড়ির ওধারে খালের ওপারে থাকতো। মাটি ঘটির গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে খা। দুধ দিয়ে যেতো সকালে। কোনো কোনো দিন মাছ। নতুন জল উঠেছে মাঠে। বোয়াল। জ্যোৎস্না রাত্রে বড় নদীতে জোয়ার এসেছে এখন, প্রচুর টেংরা, বগদা। শুধু আছবদ্দি মিঞা নয়, আরো অনেকে, তাদের নাম মনে নেই আজ।

এই সময়, সম্ভবত ছেচল্লিসের শেষ দিক, সতীন সেন বলে কোন নেতা আসছেন আমতলীতে। কালীবাড়ির মাঠে চেয়ার-

টেবিল পাতা হলো। তেরঙ্গা পতাকা উড়লো। অনেক মানুষের ভিড়। বন্দে মাতরম বললাম চেঁচিয়ে বার বার। ছ-সাত-আট বছরের ছেলের দঙ্গল। দড়িবাঁধা ইজের গায়ে, উদোম গায়ে, কি এক উত্তেজনায় বন্দেমাতরম বললাম, বলে চললাম। বড় দাদারা শিখিয়ে দিলেন। সবাই ব্যস্ত। বাঁশের কঞ্চির মাথায় তেরঙ্গা নিশান। আমরা নিশান বলতাম। সব বাচ্চাদের কাঁধে। কালীবাড়ির মাঠ ভরে গিয়েছিল সেদিন। কিন্তু সতীন সেন, মনে পড়ছে, কোন কারণে আসতে পারেন নি। বরিশাল থেকে অনেক নদী পেরিয়ে স্টিমার এসে পটুয়াখালিতে খালি হয়ে যায়। তারপর দোতলা অন্য স্টিমারে বরগুণা, সেখান থেকে উন্মত্ত পায়রা পাড়ি দিয়ে আমতলী। আমাদের গঞ্জ শহর। পৃথিবীর সঙ্গে একটা স্টিমারে যোগ। না হলে চারদিকে জল। বিচ্ছিন্ন।

সভা ভেঙ্গে গেল। দাদাদের কথায় আমরা কঞ্চির মাথায় নিশান উঁড়িয়ে থানা বাড়ির সামনে পেঁছে শ্লোগান দিতে লাগলাম। বন্দেমাতরম। ইংরেজ, ভারত ছাড়ো। এর অর্থ কি। ইংরেজ কি, স্পষ্ট করে জানতাম না, মনে পড়ে না রেজিস্ট্রি অফিস, থানা, তহশীল অফিস, সরকারী ডাক্তারখানা, কোথাও ইংরেজ বস্তুটিকে কখনও দেখেছি। তবে স্কুলে যেতে নদীর ধারে সুন্দর বাংলো বাড়ি। উপরে লাল টিনের চালা, বড় বড় দরজা-জানালা, ফার্ণিচার, এসব, এবং মাঝে মাঝে লঞ্চ এসে থানার ঘাটে থামছে, এ দৃশ্য দেখেছি।

তবুও ইংরেজকে ভারত ছাড়তে বলছিলাম আমরা। আর, যাদের এমনিতে পথে-ঘাটে দেখলেই পিলে চমকাত সেই সিপাইদের দেখলাম ছুটে আসতে। সঙ্গে সঙ্গে দৌড়। মাঠ পেরিয়ে যে যার বাড়ি। কখনও বয়স্ক কোন দাদার নেতৃত্বে গ্রামে গ্রামে নিশান কাঁধে ঘুরেছি। সঙ্গে কাপড়ের খুঁটে মুড়ি নারকেল। গ্রামের মানুষ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকেছে। কখনও কখনও সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা পথ হেঁটে এসেছে। তারপরে ফিরে গেছে।

আমার তখন গুরুদশা। মা মারা গেছেন। শ্রাবণের অঝোর বৃষ্টি। একটানা। বড়দের মধ্যে একটা উত্তেজনা লক্ষ্য করছি। প্রকাশ্যে কেউই কিছু বলছেন না। কিংবা বলছেন, আমি—বুঝতে পারছি না। শহরের পথে তোরণ উঠল। শহরের সেরা ব্যবসায়ী, হিন্দু—তার দোকানের সামনে। তোরণ চূড়ায় চাঁদ-তারা নিশান উড়তে দেখলাম। চিনে কাগজের শিকলি, লাল নীল হলদে সবুজ ছোট ছোট নিশান উড়ছে। ব্যান্ড পার্টি বাজছে।

তখন আমার এমন বয়স নয়, যখন তেরঙ্গা পতাকা না উড়িয়ে কেন চাঁদ-তারা ওড়ান হল তা নিয়ে ভাবব। বিশেষত উৎসবে শহরের সব হিন্দু বাড়ির সবাইকে দেখা-লাম। বাতাসা বিলোনো হল। অনেক দোকানের মাথায় চাঁদ-তারা উড়ছে, দেখলাম। শুনলাম, আমাদের দেশ এখন পাকিস্তান।

পাকিস্তান কি, এটা তখনও বুঝি নি। বুঝলাম একদিন স্কুলে গিয়ে। স্কুলের লাগোয়া টানা বোর্ডিং বাড়ি। সেটা যেখানে শেষ হয়েছে, তার সঙ্গে মসজিদের মতন একটি বাড়ি জুড়ে দেওয়া হল। মনোহর, আমার বন্ধুর বন্ধু, বলল, এবার এ স্কুলের ছেলেদের নামাজ পড়তে হবে। এখন যে আমরা পাকিস্তানে আছি।

জানিস আমরা চলে যাচ্ছি, কল-কাতায়। ওখানে বাবা দোকান দেবে। থাকলে নমাজ পড়তে হবে। আরও অনেক কিছু, সেদিন মনোহর বলেছিল। বাড়িতেও বড়দের মধ্যে ভয়-ভয় ভাব। সব কিছু ফেলে চলে যেতে হবে। সবার মুখেই, হিন্দুস্তান কথাটা শুনতে লাগলাম। আর একটা শব্দ কলিকাতা। ভূগোলের, সাধারণ জ্ঞানের বই থেকে উঠে কখন যেন মস্ত বড় শরীর নিয়েছে। সেখানে গেলে আমাদের মুসলমান হতে হবে না। হিন্দুদের দেশ সেটা।

ছলির মা নমঃশূদ্র পাড়ার মেয়ে। কবে মুসলমান হয়ে গেল। খালের ওপারে থাকে। নীল মোটা শাড়ি। হাতে মোটা রুপোর বালা। গলায় হসুলি। খালের ধরে বসে থালা-বাসন মাজত। আর লক্ষ্মী পুজোর রাতে আমাদের বাড়ি আসত। দাওয়ায় বসে প্রসাদ নিত ভক্তিভরে। সে, একদিন চেঁচিয়ে বলল, কি, মা ঠাউরাইন, হিন্দুস্তানে যাইবেন নাকি? ক্যান? আমরা তো আপনাগো কিছু করি নাই। আমরা আর আপনারা কি আলাদা? চোখে দু ফোটা জল দেখেছিলাম। আমরা নতুন জোয়ারের জলে সাঁতার কাটছিলাম তখন।

শহরের হিন্দু ব্যবসায়ীরা কলকাতার দিকে পা বাড়াচ্ছে, কানাঘুষো চলেছে। যেতে যে হবেই, এ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা বড়দের মধ্যে। রসিদ, বলল, তোমরা কি কইলকাতা যাবি? তোগো নামাজ পড়তে অইবে কইলো কেডা? আমার বাবারে জিগাইছি। সব বাজে কথা। আমার বাবার চোখের কোলে কালির টান। চুল দ্রুত শাদা হয়ে যাচ্ছে। পয়সার জোর নেই। বিদেশ বিভূঁইএ গিয়ে কি করে চলবে? বাপ-ঠাকুর্দার স্মৃতি হেলে অনির্দিষ্ট জগতে ঝাপ দিতে হবে এটা বুঝতে শুরু হয়েছিল।

ব্যাপারটা কত কঠিন। বন্দেমাতরম, টেলিগ্রামের পোস্ট ছিঁড়ে ফেলা, জেল খাটা, বঙ্গ আমার জননী আমার এই সব অজস্র ঘটনার পর সমূলে উচ্ছেদ। পুরস্কার। যারা এই পুরস্কার পেলেন, দুই বাংলার হিন্দু, মুসলমান, তাদের কাছে কেউ কৈফিয়ৎ দিতে এল না। আমাদের শহরের মূর্তি গড়ার পালমশাই, ছবি পাল। চোখে ভাল দেখতে পেত না। ঠাকুর গড়তো। হাঁড়ি-কলসি, হাজার সংসারী টুকিটাকি সাজিয়ে বসে থাকত নিশ্চিন্তে। দোকানের পাশেই বিশাল বট-গাছ। নিচে মন্দির। তাতে গ্রামদেবীর থান। পীরের সিন্নি দিত বছরে একদিন। মর্তমান কলা, খাঁটি দুধ, চিনি, কিসমিস আর চালের গুঁড়োর সিন্নি পুজো। সারা শহর নেমন্তন্ন সেদিন। কেউ প্রশ্ন তোলে নি—পীরের দরগা মুসলমানের। হিন্দু কেন যাবে? আর সত্যনারায়ণের সিন্নি দিতেন সাহা বাড়ির বাবু। মুসলমান দু-চারজনের কি ভক্তি! আসলে এরা সাধারণ। সাধারণ বলেই ভাব ছিল।

ভাবনা ওখানে বইতো না। দুর্গাপুজোর মন্ডপে পাঁঠাবলি। ঢাক বাজছে অবিরাম। বাঁশের ঘের তিনদিকে। নতুন জামা পরে বসিদ, সিদ্দিক সবারও এসেছে। ওদের বাবা, ছোট ছোট ভাই-বোন। বাঁশের বেড়ার এধারে বলি হচ্ছে। ওধারে অসংখ্য মানুষ। একই সঙ্গে মিলে মিশে দেখছে। উৎসব—তা সবার।

মৌলভি স্যার, একমুখ শাদা ধবধবে দাড়ি। মুখে সব সময় হাসি লেগে আছে। ধবধবে ধুতি, পাঞ্জাবী পরনে। মামার বৈঠকখানায় একের পর এক পান খাচ্ছেন। গল্প করছেন। হাসছেন। আমরা গলার শব্দ পেয়ে ঘরে ঢুকে প্রণাম করেছি। মামা নিষেধ করেন নি। উনিও ফিরিয়ে দেন নি। তিনি যখন মারা গেলেন, দৌড়েছিলাম জ্ঞানগম্যি হারিয়ে। বারান্দার টিনের চালার নিচে শোয়ানো রয়েছে। মানুষজন, সবাই তাঁর আত্মীয়। কোন দূরগ্রামে তাঁর বাড়ি, আত্মীয় স্বজনকে খবর পাঠানো হয়েছে। তাদের আসতে দেরী আছে। আমরাই আত্মীয়। সবার চোখে জল। এতো পাকিস্তান হবার পরের ঘটনা। কি এমন ঘটলো, যাতে ঐ আত্মীয়তা, রসিদ আর মৌলভি স্যার শত্রু হয়ে গেলেন? এই অংকের হিসবে এখনো মেলাতে পারি না তাদের অঙ্ক ঠিকই মিলেছিলো। ইংরেজদের তাড়াতে গিয়ে এতোবড়ো মূল্য দিতে হবে, হিন্দু, মুসলমান, মাটির সঙ্গে মিশে থাকা মানুষ যদি বুঝতো। একবার কি রুখে দাঁড়াতো না?

বছর তিনেক আগে বাগনান গিয়ে-ছিলাম। হিন্দু মুসলমান চাষী একসঙ্গে খামার করেছে। একজন মুসলমান চাষীর বাড়ি গেলাম। বাইরের ঘরে বসতেই, ডাব এলো। তারপর ভিতরের ঘরে গল্পসল্প। বললেন একজন স্কুল শিক্ষক, নানা অসুবিধের কথা। কিন্তু এরাও প্রতিবেশী হিন্দুর নামে নালিস শুনিনি। সেদিন বখরি-দ্বীদের দিন। গরু জবাই হচ্ছে, দেখলাম। নেমন্তন্ন করলেন। আমাদের তাড়া ছিলো। চলে আসবো জেনে ঘরে তৈরী খাবারে আপ্যায়িত করলেন। এগিয়ে দিলেন মাঠ পার হয়ে অনেকটা পথ এসে।

এইতো হওয়া উচিত। কেনো হয় না? চৌদ্দ পুরুষের হাজার স্মৃতি মাখানো ভিটে মাটি কাজ কারবার, প্রীতির বাঁধন কোন কূটনীতির ছুরিতে ফালাফালা হয়ে গেলো। কেন, মেনে নেবো, শিকার হবো ষড়যন্ত্রের? কেনো, খেটে খাওয়া সাধারণ

চাষী, ব্যবসায়ী, উকিলবাবু, মাস্টারবাবু শুধু জাত বাঁচাতে দেশ ছেড়ে পালাবে? তারপর দানে, খয়রাতে কিছুদিন টিকে থেকে ভিখিরির মতন মরবে, নয়ে পড়ে থাকবে? কেনো নিজের মাটি ও ভাষা ছেড়ে দণ্ডকারণ্যের পাথর ভেঙে ঘর-দোর বানাবে চাষের জন্য জল পাবে না? তারপর মাদুর বালিশ নিয়ে বগলে হাড়জিরজিরে শিশু, আর মুঠোয় ওরা বন্ধকে নিয়ে নিরাপদ হরিপদ স্টেশনে মাটির হাড়িতে কুড়নো বাড়ানো চাল সিদ্ধ করবে? তারপর বাষও যে নদীতে নামতে ভয় পায় তাতে নেমে সাঁতরে নদী পার হবে। দেশ বিভাগের তিরিশ বছর পরেও? এদেরই হাতে তেরঙ্গা পতাকা ছিলো! গলা মিলিয়েছে 'বন্দে-মাতরমে'। কি দোষ এদের? আমাদের? এসব প্রশ্ন এখন উঠছে। যদি, যারা দায়ী ছিলেন দেশ টুকরো করবার জন্যে, তারা দায়িত্ব পালন করতেন, তবে নিশ্চয়ই এতোদিন পরে আর উঠতো না। আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়াকে দেখেছি, বুকে কংগ্রেসের ব্যাজ এঁটে মহিলা সমিতি করতে। অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিলেন তিনি। স্বামী ছিলেন জমিদারী এস্টেটের নায়েব। বাঁধানো পুকুর, চণ্ডী মণ্ডপ, মনসা মণ্ডপ, বিশাল পাকা বাড়ি, কাছারি বাড়ি, জমি-জমা—সবই ছিলো তার গ্রামে। তিনি নাবালক ছেলেকে নিয়ে সাবডিভিশন শহরে থাকতেন। কংগ্রেস করতেন নিষ্ঠার সঙ্গে। দেশের নেতাদের অকৃত্রিম বিশ্বাস। দেশ ভাগের পর তিনি জমি জায়গা ছেড়ে কলকাতায় এলেন; সঙ্গে আমি। ইজের পরা আট বছরের ছেলে। গায়ে হাফসার্ট। ইজেরের তলায় একশো টাকার একটা নোট। অসংখ্য মানুষ 'মুকতি' পেতে চলেছে হিন্দুস্তানে। বাপ পিতামহের দেশ এখনো পরদেশ। কোনোদিন চোখেও দেখেনি, এমন একটি দেশ এখন পবিত্রাণের জেরুজালেম হতে চললো।

অনসার বাহিনী, বেল পুলিশ কিলবিল করা অসংখ্য উচ্চিংড়ে শংকাতুর মানুষের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। বেনাপোল আসতেই আতঙ্কে কাঁপছে কি হয়, কি হয়। পুলিশ উঠলো। হেনস্তা। অপমান। চীৎকার, গালাগালি।

তারপর শেয়ালদা। যাদের কেউ নেই, স্টেশনে। নবকঙ্কালে। কেউ না কেউ পরিচিত আছে যাদের, নিঃসম্বল বা সামান্য সম্বল নিয়ে সেখানে ওঠা। অসহায় মানুষদের নিয়ে শিকারী দালালের নীলাম হাঁকা। এই, এর চেয়েও চরম বেদনার ইতিহাস তিরিশ বছর ধরে চললো। তবু, এই তিরিশ বছরে পতাকা তুলেছে বাড়ির ছাদে, অফিসে, পার্কে পার্কে ছেলেমেয়েদের প্যারেড, ব্যান্ড-পার্টি। যারা ছিলমূল হয়ে এসেছিলাম, জলা বাঁজিয়ে বাঁশের বেড়ার বাড়ি বানিয়েছি, শাকসব্জির মাছের চাষ, লেখা-পড়া শিখে অনেকেই বাবু। সচ্ছলতা এসেছে, প্রতিষ্ঠিতও। তবুও, কাঁটার মতন বিঁধতে থাকে, দরজা থেকে তাড়া খাওয়া মানুষের দরদ দেখেই একের পর এক জামা বদলে যায়, আর পুববাংলা থেকে আবার আসতে থাকে অবশিষ্ট সব খোয়ানোর দল। এই এক সর্বনাশা খেলা।

তবু, স্বাধীনতা—এই স্বাধীনতা, অনেক কষ্টে চোখের জলে আমরা পেয়েছি তিরিশ বছর আগে। স্বাধীনতা তখনই সার্থক যখন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আসে, আর সামাজিক সম্পদ প্রত্যেকটি নাগরিকের নিরাপত্তা এনে দেয়। আমরা এখনো অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পাইনি। তবে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছি, যা ছিলো না বৃটিশ আমলে, নিজের দেশে থেকেও আমরা পরবাসী ছিলাম তখন। আবেদন নিবেদন করে জাতীয় জীবনের অনেকটা সময় ও শক্তি নষ্ট হয়েছে। এখন মোটর, স্টিল, ওষুধপত্র, দামী টেবিলিন টেরিকট আমরাই বানাতে পারি। রেলপথ বানাতে মধ্যপ্রাচ্যে যাই আমরা। মাথা উঁচু কোরে বিদেশে থাকতে পারি, চলাফেরা করতে পারি। আমাদের অর্থনীতি, বিদেশনীতি কারোর আঙুলের নির্দেশে চালিত হয় না। আমরা স্বাধীন, স্বতন্ত্র।

কিন্তু এর চেয়ে অনেক বেশী আনন্দ পেতাম, স্বাধীন ভারতে পারতাম যদি ইংরেজ আমলের চেয়ে দরিদ্রের সংখ্যা কমে যেতো। জাতপাত বিচার উঠে যেতো। উচ্চনীচ মানুষ একটু মাথা গুঁজে নিরাপত্তার সঙ্গে বাস করতে পারতো। এসব হয় নি। হবে একদিন, সব সমস্যার সমাধান হবে—এ ভরসা না রাখলে মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারায়।

বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি পরীক্ষা

অবশ্যই একটা লাভ

করুন

পুরস্কার

প্রবেশমূল্য নেই

আপনি অবশ্যই

একটি পুরস্কার জিতুন

উদাহরণ

মোট ৪২

১১	১৬	১৫
১৮	১৪	১০
১৩	১২	১৭

	১৮	
	১৬	
	১৪	

প্রায় এক হাজার পুরস্কার

দেওয়া হবে

(১) রাজদূত মোটর সাইকেল নতুন মডেল বা টেলিভিশন। দ্বিতীয় পুরস্কার (২) ওয়ার্ল্ড সাউণ্ড মার্শাল ট্রানজিস্টার গ্যারান্টেড হাই মিডিয়াম ওয়েভ দাম ২৬০ টাকা। তৃতীয় পুরস্কার (৩) সর্বভারতীয় হেভি ডিউটি ট্রানজিস্টার দাম ১৮৫ টাকা। পুরস্কারগুলি অর্ধেক দামে দেওয়া হবে। উদ্যোক্তাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ করুন যার যোগফল হবে ৪৮... খাড়াভাবে, সমানভাবে, কোণাকুণিভাবে যোগের সময় কোন সংখ্যা দুবার ব্যবহার করা যাবে না।

পুরস্কৃত ব্যক্তি পোস্টেজ, প্যাকিং ও লাইসেন্স ফি বাবদ ব্যয় বহন করবেন।

খেলার তারিখ ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮। আপনার প্রবেশপত্র পাঠাবার ঠিকানা—

স্টার ইণ্ডাষ্ট্রিস,

(A-24) 719/36A, G. N. St.

Delhi-3.

দিল্লী - ১১০০৩১

হিন্দী বা ইংরেজি নিজের ঠিকানা লেখা খামসহ প্রবেশপত্র পাঠান।

STAR INDUSTRIES—(A-24)

719/36A, G. N. St.

Gandhi Nagar

Delhi-31

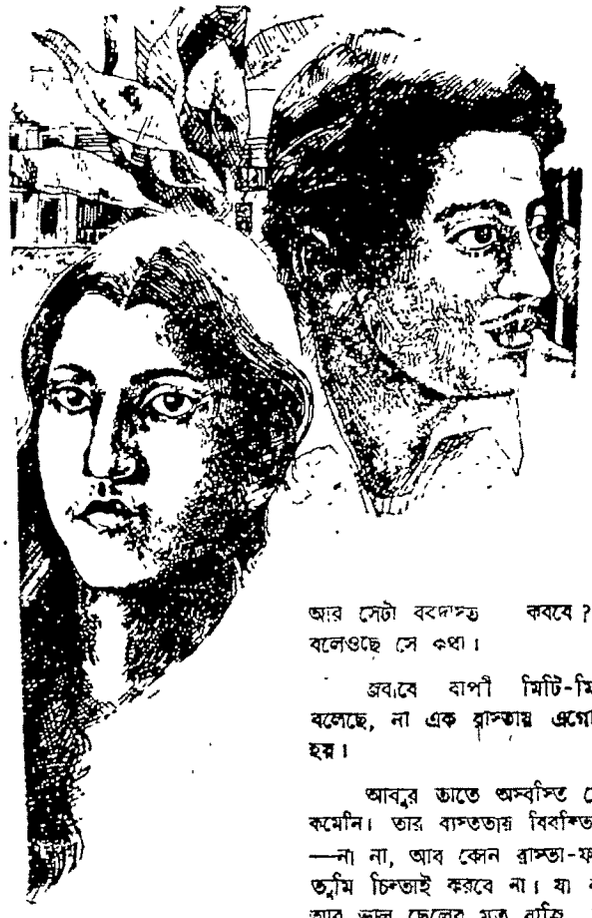

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সোনার হরিণ নেই

॥ বাইশ ॥

ঘড়ির দিকে চোখ ছিল না এমন নয়। হাত-ঘড়িটা হাতে পরাই আছে। তিনটে বাজতে দেখেছে, কাঁটা এর পর চারের দাগের কাছে এগিয়ে আসছে তাও লক্ষ্য করেছে। কিন্তু বাপীর যেন কোন তাড়া নেই। চিৎপাত শুয়ে আছে।

আবু বরখাস্ত ওকে জঙ্গল থেকে ছেঁড়েছে সাড়ে বারোটার পরে। তার আগে বার কয়েক মনে করিয়ে দিয়েছে মেম-সাহেবের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট তিনটের থেকে চারটের মধ্যে। চারটেটাটে, দরকার নেই, বাপীভাই যেন অবশ্য সাড়ে তিনটের মধ্যেই চলে যায়। সময়ের ব্যাপারে মেমসায়েব খাঁটি মেমসায়েব। পরিস্থিতি অনুকূল জেনেও আবুর মনে একটু উদ্বেগ লেগেই আছে। মেমসায়েবের মেজাজ জানে, আবার বাপীভাইয়ের মগজের খেলও যে নজির দেখেছে তাতেও তার দুর্ভাবনা। আবার কি বলে বসে সত্যিই সব বানচাল করে দেয় কি কিছু ঠিক আছে। একবার কিস্তি মাত হয়েছে বটে, কিন্তু বার বার সেই রাস্তায় এগোলে ডাকসাইটে ঠাকরোন কি আর সেটা বরদাস্ত করবে? বাপীকে বলেওছে সে কথা।

জবাবে বাপী মিটি-মিটি হেসে বলেছে, না এক রাস্তায় এগোলে কখনও হয়।

আবুর তাতে অস্বস্তি বেড়েছে বই কমেনি। তার ব্যস্ততায় বিরক্তির মিশেল —না না, আর কোন রাস্তা-ফাস্তার কথা তুমি চিন্তাই করবে না। যা বলে শুনবে আর ভাল ছেলের মত রাজি হয়ে যাবে। মগজে বুদ্ধি কেমন ধরো। সেটা ঠাকরোন ভালই বুঝেছে, আর সেই জন্যে এখন তোমার কদর. কিন্তু বেশি বুদ্ধির প্যাঁচ কষতে গেলে ভরা-ডুবি হবে বলে দিলাম। বুদ্ধির দাম পেয়েইছ, কিন্তু বিশ্বাসে এত-টুকু আঁচড় পড়ল তো ভোকাট্টা। ঠাকরোনের কাছে ওটির কদর সব থেকে বেশি।

আবুর ভয়টা কোথায় বাপীর বুঝতে বাকি নেই। বুদ্ধির ফুটো দিয়ে শেষে বিশ্বাস না গলে যায়। বাপী ভাবতে বারণ করেছে, আশ্বাসও দিয়েছে। কিন্তু বিক্ষেপের সাক্ষাতের ফলাফল না জানা পর্যন্ত ওর স্বস্তি নেই। দোস্তের মুখ দেখে মনে হয়েছে তার যেন খুব একটা গরজ নেই গল্প শুধু ওরই। বার-দুই বলেছে, খুব আশা করেছিল মেমসায়েব ওকেই হুকুম করবে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে। তা না বলার মানে, একলা দোস্তের সঙ্গে কথা বলতে চায়।

আবুর সেই জন্যেই কি-হয় কি-হয় ভাবনা।

বাপীর বুকের ওপর কেউ হাত রেখে দেখছে না। রাখলে বোঝা যেত ঘড়ির কাঁটা যত ঘুরছে বুকের তলার ধুপ-ধুপুনিও ততো বাড়ছে। আবার ঘড়ি দেখল, চারটে বাজতে সতের। জামা পা-জামা বদলে এক্ষুনি রওনা হয়ে পড়লেও চারটের পনের বিশ মিনিট পরে পৌঁছুবে। বানারজুলির ওই বাড়ি এই ক্লাব হাউস থেকে আড়াই মাইল পথ। আবু এখনও ওকে শয্যায় শয়ান দেখলে ক্ষেপেই যেত বোধ-হয়। ভাবত দোস্তের এতটুকু তাড়া বা গরজ নেই। কিন্তু তাড়া আর গরজ দুই-ই আছে বলে আজকের সময়ের হিসেবটা অন্য রকম। কলকাতার বুকলিনে মাস-কতক থেকেই গোলামির স্বাদ বুঝেছে। ঘাড়-নিচু ঘোড়ার পিঠে চাবুক বেশি পড়ে। দু পায়ে ভর করে দাঁড়ানোর প্যাটার্নটা শুরুতেই যতটা সম্ভব উঁচু করে নেওয়া দরকার। এই প্যাটার্নের বিচার টাকার অংকে নয়। এই এক রমণীর দৌলতে বাড়তি টাকা তো বেশ আরও কামাচ্ছে, আরও কত জনে কামাচ্ছে, দুপুরে আবু বলছিল, ঠাকরোনের সুনজরে আছে বলেই বেশমাও সুখের মুখ দেখেছে। কিন্তু বাপী আর সে রকম সুখের প্রত্যাশী নয়। এমন কি, টাকার মুখ আর সুখের মুখ সব থেকে বেশি দেখছে যে, সেই জাপটের ম্যানেজার রণজিৎ চালিহার মতও নয়। ঠিক কি যে প্রত্যাশা বাপী নিজেও জানে না। সদ্য-সদ্য আর একজনের চোখে যে উঁচু প্যাটার্নের ওপর শুরুতেই দুপা ভর করে দাঁড়াতে চায়—সেটা ওর নিজেরই সত্তা। টাকার নয়, দম্ভের নয়—শুধুই সত্তার।

তাই মন বলছে, আর একজনের মারফৎ আঙুল তুলে তু-করে ডাকা-মাত্র ঘড়ির কাঁটা ধরে গোলামের মত আজ অন্তত ছুটে যাওয়ার কোন দরকার নেই। কেন সময়ের অত খেয়াল ছিল না, হালকা চালের সে কৈফিয়তও মগজে ছকা হয়ে গেছে।। কৈফিয়ৎ তলব করার আগেই আবুর মেমসায়েব বা ঘরে যদি থাকে তো তার মেয়েরও কিছু দেখে দু চোখ হয়ত কপালে উঠবে।

আবুকে ছেড়ে জঙ্গল থেকে ক্লাব-ঘরে ফেরার পথে বনমায়ার নতুন মাহুত লছমনকে যা বলে এসেছিল, খুশি আর কৃতজ্ঞতায় ডগমগ লছমন মাথা ঝাঁকিয়ে তাতে রাজি হয়েছে।

চারটেই বাজল। বাপী এবার শয্যা ছেড়ে বাথরুমে গিয়ে সাবান দিয়ে বেশ করে মুখটা ধুয়ে এলো। তোরঙ্গ থেকে নতুন আর এক প্রস্থ গেঞ্জি পা-জামা আর পাঞ্জাবি বার করে পরল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পরিপাটি করে মাথা আঁচড়ে নিল। শেভিং-এর পর্ব ঘন্টাখানেক আগেই সেরে নিয়েছিল।

—বাঃ। তোকে একটা চুমু খেতে ইচ্ছে করছে যে রে।

চমকে উঠে হাত থেকে চিরুনি ফেলে দিয়ে আয়নার কাছ থেকে সরে এল বাপী তরফদার। শেভিংয়ের পর প্রথম যে-দিন স্নান সেরে মাথা আঁচড়ে এমনি এক সেট পা-জামা পাঞ্জাবি পরে সকালে চায়ের টেবিলে এসে বসেছিল, গৌরী বউদি বড়

ে ভেবে করে ওর দিকে চেয়েছিল, তখন
ই হাসির ফোটল ধরিয়ে বাচ্চু, এ
ন সামনেই ওই কথাগুলো বলেছে।

নিজের ওপরেই তিক্ত-বিরক্ত।
পিছুনের ঘা-বিছু পিছনেই পড়ে থাকে ন
লেও মনে পাড় দেন পড়ে দেন উ
ছনে। মনের ব্যামোয় বাক ঘুরতে দে
দেখে।

হনহন করে পা চালিয়ে সন্ধ্যা ন্ত্র
লক্ষ্মণের ঝুপড়ির দিকে চলে এল। দূর থেকে
লক্ষ্মণের ঝুপড়ি চোখে পড়ে। সে উঠোনে ঢিল
একা গাল হেসে এগিয়ে এসে। ও দিদি
আগেও বনমায়া যতবার দেখতে বেরিয়েছে
সেলাম বাজিয়েছে। মাঝে পাঁচটা বছর
অদর্শনের ফলে এখন তো আরও বেশি
সেলাম।

এই সকলটা লক্ষ্মণের কাছে যে
সুদিন। বনমায়া বন-বিভাগের
আর আবু বেমনটা চলে দিয়ে গেছে
এলাকায় হেড বাঁটম্যান। সেই সুবাদে গ্রাম
সর্দারের সে বাপোর পাত্র। বনমায়া মনে
পেলে আর দুজন মাহুতের মত ও
ভাব হয়ে যাবে—এই ভরসা দিয়েই গেছিল। বনমায়ার তো
দিন-রাতের লোক। তাতে একেবারে
ছয় নি এমন নয়। অন্য দুজন মাহুতের মত
বনমায়া ওকে একেবারে বরবাদ করে দেয়
নি। সময়ে অনেক সয়, বনমায়ারও এই
তোয় পেয়ে কিছুটা সয়ে এসেছিল। ভ
মন পাওয়ার প্যাপারে এই বাঙালী বাবু
বয়স আর যোবানী ওকে একদিনেই
অনেকটা এগিয়ে দিয়েছে।

দু-দুজন ভদ্রলোক মানুষকে এক
সঙ্গ দেখে এই বজ্জাত যখন শালুক দিয়ে
ওদের মেজে সাজে সাজিয়ে দিচ্ছিল,
হোস হোস করছিল—বাঙালী বাবু
কথায় আবু সাহেব তখন এক হাতে শালুক
আর এক হাতে ওকে ঠাডিয়ে ধরে কাছে
টেনে বনমায়াকে ধমকে-ধামকে বলেছে,
বলেছে, ওরা এখন মেহমান আছে।
বেশ্যার মতন কারসাজি ওদের সেজে না
মানুষ হাতে সেজে চায় নি, আবু সাহে
তখন বনমায়াকে আর যা বলে থাকুক
ধমকটা দিয়ে ওর হাত দিয়েই ঘরে
ভদ্রলোক মানুষের গায়ে ফুলের
আর ফোটা ফোটা এসব বাবুদের
জন্য আবু সাহেবকে হাতির পিঠে তুলে
নিয়ে লক্ষ্মণই মূলত মানুষের এদের ভক্তির
কাছের জায়গায় পৌঁছে দিয়ে এসেছে।

আবু সাহেবের ওপর লক্ষ্মণের খুব
একটা ভরসা ছিল না। কিন্তু বাঙালী
বাবু একদিনের মধ্যে তার কথা রেখেছে।
আর, এই এক সকালের মধ্যে চাকরী
খোয়াবার ভয়ও দূরে সরে গেছে। লক্ষ্মণ
তাই কৃতজ্ঞ যেমন, খুশিও তেমনি।

হাওদা সাজিয়েই রেখেছিল। বনমা
শালুক সেজে ওপর সঙ্গে সঙ্গে সে-ও উঠে
পড়ল।

প্রথম নজরে মনে হচ্ছে মানুষে
ছুতে ছুপেছে ে-রকম ভাবলে
এখনও বেশি পড় চলে। চটক দেখানোর
ভোগও তাও নয়। একটু বৈচিত্র্যের লোভ
অবশ্যই এর অন্তরে নিহিত। মূলতঃ ব
চেহারাটাও চাপা করার কথা।

ঘন আর পথ ভাঙা
আগে আগে চলে ছোট্ট
চলেছে, সেখান থেকে এক
ছিনেছে, কেমন। সবার
ছোট্ট বুনো বাহুতে
বলা। ইসা
চানো বন্দুকের
সেলাম বাজাতে
এমন গত সন্ধ্যায় অন্তত দেখে নি
দেখলে মনে থাকত। এমনও রোদ
সেই
ওদের।

বেলা সাঁঝ সূর্যের মুখ দেখে
হল। আবু বনমায়া, ও
দেখা দেখা না, সাপ নেচে। খালি হাত
সন্ধানী সাপের টাঁড়ে
নেচের মত সাপ কিলবিল করছে।
টাঁড়ে। গায়ত্রী
ভাঙত। কোন জন্তুর কটা সাপ খেলা
সেই হিসেব দাখিল
ঝক। কিন্তু শুধু সাপ
চলে। মুখ দেখা যেতে পারে
সেখানে সহজে। কিন্তু যে চাপে চলেছে
তার দাবিদার তাদেরকেও
টাঁড়ি কেউ একটানে
দেখা করতে, সঙ্গে আছে
একটু কে-কোথায় তার কি
ওপর একটা আক্রোশ
ভরবার দুগা চেহারা
ঘোড়া।

কিন্তু ও বেলায়ে কি হয়ে
একটু, এগোতে বনমায়া
কিছুদূর
ঘনিয়ে দেখেছে, এরপর দাঁড়াতেই
পথী পাকুড়ীর। এ
হাসি মস্করা
ওকে দেখে কাল
নিজের
—ও বাপাঙই সাঁঝা এত
দেখাচ্ছ, না এদিকে

ভালো তেমনই ছিল। সাজানো
তের মধ্যে কেন
ছিয়ে। দু হাত
ও তাদের দাঁড়ানোর
টল সাজে নয়না
এখানে এর
দেখে
নেই। এগোতে হবে বনমায়াকেই
টাঁড় হবে, মেয়েটার
কই যায়।

কি করবে না বুঝে লক্ষ্মণ
মফস্বলেই দাঁড় করাল
হাসি মুখে
এদিকে

—মেমসাহেব ও
মেমসাহেবের
ভাঁক। ছোট্ট
হাতটাতে
তুমি তে

মুহূর্তে
সাজা
ওরা
এখানে
হয়েছে।

—ও... ঠিক,
দেবে। — তোমার
দেখা হওয়া

এখন
চলেছে।

—ওদের ওই
ও, ছেড়ে কিছুদিন
তো তোমার
মিনসাহেবকেও
ওই ছেলেটি
ঠিক।

মেমসাহেবের
তোমার

—হ্যাঁ, বনমায়া
করে বোঝাপড়া
ভয় করে কথাও
চলল না। ছুটি
চলল
এসে
ওর
কি
খবর।
সঙ্গে
ওদের
ভয়
দিন।

বাসি
ওর
না,
মুখে

বনমায়া
চেয়ে
কিন্তু,
হাসি
এই

বনমায়া
নিজের
প্রায়ই
বাবুর
বাবুর
ঠিক।

বাবুর
মাথা
মেমসাহেব
ওকে
ওকে

কেন?....আমার এখন আর গিয়েই কাজ নেই তাহলে। তারপরেই দু চোখ বড় বড়। —তা মেমসায়েব ডেকেছে আর তুমি হাতিতে চেপে দেখা করতে চললে?

ওই খুশি আর এই বিস্ময়ের ফাঁকে মেজাজটার সরল দিকটার হদিস মিলল একটু। নইলে এরই মধ্যে ওর হাতের আর পায়ের রুপোর গয়নাও লক্ষ্য করেছে বাপী। প্যাঁচানো এক-জোড়া ঝকঝকে সাপ মুখোমুখি। ওগুলোর জেল্লা আর রেশমার চোখের জেল্লায় খুব যেন তফাৎ ছিল না এতক্ষণ।

বাপী সাদাসিধে জবাব দিল, হাতের কাছে পেয়ে গেলাম, হেঁটে লাভ কি।

এবারে রাস্তার মাঝখান থেকে সরে দাঁড়াল। হাতিতে চেপে মেমসায়েবের কাছে যাচ্ছে দেখেই হয়ত মুখে মজার ছোঁয়া লেগে আছে একটু।

বনমায়া আবার চলল। বাপী আর ওদিকে চোখ ফেরাল না। চোখ দুটো অবাধ্য হতে চাইছে বুঝতে পারছে। যে চাইছে তার গলা টিপে ধরলেও একেবারে শেষ হয় না কেন?

বাড়িটা আর পঞ্চাশ-ষাট গজের মধ্যে। সামনের বাঁক ঘুরলেই। বাপী লছমনকে দাঁড়িয়ে যেতে বলল। এর পরের হুকুম শুনে লছমনও অবাক। বাঙালীবাবু ওকে নামতে বলছে।

নামল।

গম্ভীর মুখে বাপী বলল, তুমি এখানে দাঁড়াও। আমি ওই নেপালী মেমসায়েবের বাড়ি যাচ্ছি। সেখানে বনমায়াকে ছেড়ে দেব। এখান থেকে লক্ষ্য রেখো, ও নিজে থেকে ফিরে না এলে পাঁচ-সাত মিনিট বাদে তুমি এসে ওকে নিয়ে চলে যেও।

নেপালী মেমসায়েবকে এখানে আর কে না চেনে-জানে। কিন্তু বাঙালীবাবুর এ-রকম আদেশের কিছু মাথামুণ্ডু ভেবে পেল না লছমন। সঙের মত দাঁড়িয়ে রইল।

মেয়ে বারান্দার সামনের দিকেই মুখ করে দাঁড়িয়ে। দূরের জঙ্গল বা মেঘ বা পাহাড় কিছু দেখছিল। আজ আর পরনে শাড়ি নয়, পা পর্যন্ত ধূসর রঙের গাউন। এই বেশে আরও কচি দেখায়। পিছনের টেবিলে মা ফাইল-টাইল কিছু দেখছে।

বনমায়া এসে লতা ছাওয়া বাঁশের বেড়ার ও-ধারে দাঁড়াতে ঊর্মিলা রাই যেন হতবাক প্রথম। তারপরেই পিছন ফিরে অস্ফুট বিস্ময়ে মায়ের মনোযোগ আকর্ষণ করল বোঝা গেল। তারও দু চোখ গোল একেবারে।

বাপী এটুকুই চেয়েছিল। ওই দুজনকে অবাক হতে দেখেই যেন ওর মুখে সহজ সরল হাসি। হাতির পিঠে উঠে দাঁড়িয়েই দু হাত কপালে তুলে গায়ত্রী রাইয়ের উদ্দেশ্যে নমস্কার জানাল। তারপর শুঁড় বেয়ে তর তর করে নেমে এল। শুঁড় ঠেলে তুলে চাপা গলায় পরিচিত ইশারা করতেই বনমালা একেবারে কপালের ওপর শুঁড় উঁচিয়ে ওই মা-মেয়ে দুজনকেই লম্বা সেলাম জানাল।

মেয়ে অবাক যেমন খুশিও তেমনি। মা-টি অপলক চোখে দর্শনীয় কিছু দেখছে।

শব্দ করে আর শুঁড় ঘুরিয়ে বাপী বনমায়ার মুখটা এবারে ওই বাঁকের দিকে ফিরিয়ে দিল। বারান্দার দুজনকে শুনিয়ে জোরে দুটো চাপড় মেরে বলল যা—এবার ঘরে যা শিগগীর।

ওকে ছেড়ে লতা-ঢাকা বাঁশের গেট পেরিয়ে হাসি মুখে সোজা বারান্দায় এসে উঠল। মা-মেয়ে দুজনেই ওকেই দেখছে এখনও নতুন কিছু দেখার আছে যেন। মেয়ের চোখে মুখে তেমনি মজা-লাগা বিস্ময়। মা-টি তেমনি অপলক গম্ভীর।

—ঘড়িতে কটা এখন? গায়ত্রী রাইয়ের গলার স্বরও নীরস।

ঘতমত খাওয়াটা গোপন করার দরকার নেই আর। হাতঘড়িতে সময় দেখে নিয়ে মুখের দিকে চেয়ে আরও একটু ঘাবড়ে গেল যেন।—পাঁচটা ...আমার একটু দেরি হয়ে গেছে বোধহয়।

—তোমাকে তিনটের থেকে চারটের মধ্যে আসতে বলা হয়েছিল। হাতি ছাড়া চলাফেরা করতে পার না?

ইয়ে, আবু বলেছিল হয়তো....আমি ঠিক খেয়াল করিনি। মুখে বিব্রত কিন্তু সরল হাসি। পিছনে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওই হাতির জন্যেই তো আরও দেরি—পাঁচ-ছ বছর বাদে দেখে শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে ফেলল—কিছুতে ছাড়বে না। শেষে ওর পিঠে চেপেই চলে এলাম।

ঊর্মিলা এগিয়ে এসে মায়ের কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল। উৎসুক একটু। জিগ্যেস করল, ও জঙ্গল আপিসের হাতি বনমায়া নয়?

বাপী মাথা নেড়ে সায় দিল।

ওখান থেকেই মেয়ে সকৌতুকে হাতিটাকে ভালো করে দেখে নিল একবার। —ও তো এক নম্বরের পাজী হাতি—প্রত্যেক বছর জঙ্গলের কোন্ একটা ইয়ের সঙ্গে পালাব শুনেছি। ফর্সা মুখ লাল একটু।—আপনার সঙ্গে ওর খুব খাতির বুঝি?

—হ্যাঁ, ও আমাকে খুব ভালবাসে। পাজী হাতি কথাটা বাপীর যেন একটুও পছন্দ হল না। সেই ভীমবাহাদুরের মতো করে বলল, পালালেও বনমায়া খুব ভালো মেয়ে।

ঊর্মিলা খিলখিল করে হেসে উঠল। পরনে শাড়ি নেই যে মুখ চাপা দেবে। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে হাসি চাপার চেষ্টা। অত হাসির কারণ বোঝার চেষ্টায় বাপীর মুখে বোকা বোকা হাসি। কিন্তু দৃষ্টি বেশির ভাগ গায়ত্রী রাইয়ের মুখের ওপর। মা-ও যেন মেয়ের অত হাসি দেখে অখুশি নয়। হয়তো ও-রকম হাসতে কমই দেখে। কিন্তু তার নিজের মুখের গাম্ভীর্য একটু শুধু হাল্কা হল, তার বেশি কিছু নয়।

হাসি শেষ হলেও তার রেশ একটু লেগেই থাকে। ঊর্মিলা উৎফুল্ল মুখে বলল, আমার একদিন আপনার ভালো মোষের পিঠে চড়ার ইচ্ছে—ব্যবস্থা করতে পারেন?

বাপী অম্লান বদনে মাথা নাড়ল, পারে।—আবুকে বললেই তো হয় যেদিন খুশি আপনারা দুজনে জঙ্গলে বেড়িয়ে আসুন, হাতির পিঠে জঙ্গলে বেড়ানোই বেশি ভালো লাগে।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের দুচোখ কপালে।—মায়ের সঙ্গে হাতিতে! ভাবলেও হেসে সারা হবার মতো কিছু যেন। এবারের হাসি সামলানোর তাগিদে তাড়াতাড়ি ঘরেই ঢুকে গেল।

বাপী আবারও লোকের মতো সেদিকেই চেয়ে রইল। গায়ত্রী রাই চুপচাপ ওকেই লক্ষ্য করছে জানে।...এই মুখে নিছক সরলতা ছাড়া আর কিছু পাবে না, তাও জানে। এবারে তার দিকে চেয়ে আন্তরিক প্রশংসার সুরে বলল, আপনার মেয়েও অবিকল বাঙালীর মতোই ঝরঝরে বাংলা বলেন।

—আমার মেয়ে নিজের ভাষার থেকেও ভালো বাংলা বলে। বাচ্চা বয়েস থেকে এ-দিকে থেকে বড় হয়েছে, শুরু থেকে স্কুল কলেজে বাংলা পড়ে এসেছে, বলবে না কেন।

তা হাতির পর তুমি ভাষা নিয়ে আলোচনা করবে না কাজের কথা কিছু হবে?

—চাকরি করবে?

আজ কোনো বাঁকা রাস্তায় না গিয়ে সোজা জবাব দিল—, আপনি নিলে খুশি হয়ে করব।

গায়ত্রী রাই কিছু বলার আগে ভিতর থেকে মেয়ে আবার এসে হাজির। সামনের দিকে একবার তাকিয়েই বলে উঠল, আপনার ভালো মেয়ে সত্যি নিজেই ঘরে চলে গেল নাকি?

বাপীর জবাব দেবার ইচ্ছে ছিল, শুনো হাতির সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে দূরের স্কুল থেকে ভালো মেয়ে তার খুশি মতো নিজেই আবার ঘরে ফেরে। কিন্তু আর হাল্কা কথার ধার দিয়েও গেল না। ঘুরে পিছনটা দেখে নিল একবার। বনমায়াকে আর দেখা যাচ্ছে না বটে। তবু কি ভেবে আধা-সত্যি কথাই বলল।—ওর মাহুত লছমনকে

আসতে বলেছিলাম, হয়তো নিয়ে গেছে.... নিজেও যেতে পারে।

মেয়ে মায়ের পাশের চেয়ারটা টেনে বসল। সেদিকে চেয়ে গায়ত্রী রায় বলল, আমরা দরকারি কথা বলছিলাম—

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরও ভ্রূকুটি।—বিজনেস না পারসোনাল ?

—বিজনেস। জবাবে বিরক্তি।

—এরপর তাহলে তোমার বিজনেসে মন দেওয়ার কথা আর বোলো না। চেয়ার ঠেলে উঠতে গেল।

—সীট ডাউন। মায়ের কড়া ধমক।—আমি যেতে বলিনি, বাজে কথা বলতে বারণ করছি।

মেয়ে আবার ঝপ করে বসে পড়ল। কনুই দুটো টেবিলের ওপর, হাত দুটো দুই ফোলা গালে।—অল রাইট, গো অ্যাহেড।

মায়ের ওপর মেয়ে বিরূপ কত, এটুকু থেকে কিছুটা আঁচ পাওয়া গেল।

মেয়ের দিকে চেয়ে গায়ত্রী রায় বলল, ও কাজ করবে বলছে, আমিও নেব্ ভাবছি।

ঊর্মিলা সেই রকম বসে, দুজনের মাঝখান দিয়ে সোজা সামনের দিকে চোখ। ঠোঁট উল্টে জবাব দিল, নেবে যে সে তো কাল রাতেই ঠিক করে ফেলেছ, তার অন্য কথা কি আছে, নিয়ে যাও—

—ও ভাল। মায়ের বুদ্ধি ঝপটা।—ডলি ডোন্ট বি সো ইমপসিবল্।

..মেয়ের ডাক নাম ডলি বোঝা গেল। চেহারার সঙ্গে এ নাম মন্দ মানায় না। ফুট-ফুটে বং লালচে ঠোঁট, ফোলা গাল, কাঁধ ছোঁয়া বব-কাট চুল। কিন্তু বাইরেটা দেখে ভিতরে ডল-এর ভাগে যে এত ঘাটতি ঠাহর করা শক্ত। হাসলে বিপদ। বাপীর গো-বেচারা মুখ।

তা সত্ত্বেও গায়ত্রী রায়ের দু চোখের উষ্ণ আঁচ একটু ওর ওপরেও এসে পড়ল।—নিয়ে নেবার ব্যাপারে তুমিই গোল পাকিয়ে রেখেছ। আজ সকালে চালিহার সঙ্গে কথা হল, ওয়েস্ট বেঙ্গল রিজিয়নের জন্য একজন লোককে ট্রেনিং দিয়ে ঠিক করে নেওয়া দরকার। বুঝিয়ে তাকে তোমার কথা বলেছি। কিন্তু চালিহা অন্য লোক দেখার কথা বলছে, তোমার কালকের ব্যবহারে সে একটুও খুশি নয়।

ওয়েস্ট বেঙ্গল রিজিয়ন শুনেই বাপীর বুকের তলায় নাড়াচাড়া পড়ল একপ্রস্থ। ততটুকু বুঝেছে এদের কাজের বিস্তার বেশির ভাগ উত্তর বাংলায় আর তার বাইরে। এখানে ওয়েস্ট বেঙ্গল বলতে খুব সম্ভব হয়তো কলকাতার বাসেরই আসল। কিন্তু আবার সেই কলকাতা! বিরক্তি চাপা দিল। চালিহাকে শুধু বোঝানো হয়েছিল কি-জন্যে লোক দরকার। আসলে কি-জন্যে দরকার তা এক চালিহা বাদে বাকি সকলেই জানে।

কিছু বুঝে নেবার মতো করে বাপী জিজ্ঞাসা করল, এ-কাজের জন্য আপনি যে আমাকে পছন্দ করেছেন সেটা কি মিস্টার চালিহা মোটামুটি আঁচ করতে পেরেছেন ?

—হ্যাঁ। আমি তাকে বলেছি, বাড়ির টানে ওইরকম টানা-হেঁচড়া করেছে আর যা বলার বলেছে। সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু চাকরির কথা উঠতে অনেক নরম হয়ে গেছে। এ-লাইনে ইন্টারভিউ করে মনে হয়েছে আমরা ভালো কাজ পাব, এ কথাও তাকে জানিয়েছি। তবু চালিহা খুব একটা সায় দেয়নি, আর একটু ভেবে দেখতে আর যাচাই করে নিতে পরামর্শ দিয়েছে আর এক দফা ইন্টারভিউর জন্য আজ আবার তুমি আসছ তাও সে জেনে গেছে।

একটু চুপ করে থেকে বাপী বলল, আপনি তাহলে এখন চান আমাকে নেবার ব্যাপারে তিনিও খুশি হয়ে সায় দিন ?

গায়ত্রী রায় অল্প মাথা নাড়লেন।—সে আমার বিজনেসের চিফ্, শুরু থেকে তোমার এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট আপত্তির চোখে দেখলে অসুবিধে, সায় থাকলে ভালো হত—

বাপীর এবারের জবাব নির্লিপ্ত, কিন্তু দ্বিধাশূন্য।—তাই হবে।

গায়ত্রী রায় ঠিক বুঝে উঠলেন না।—কি তাই হবে ?

—আমাকে নেবার জন্য দুই এক দিনের মধ্যে তিনিই আপনার কাছে সুপারিশ করবেন।

এবারে মেয়েরও যেন টেবিল ছেড়ে সোজা হয়ে বসে এই লোককে আর একটু ভালো করে দেখার দরকার হল। গায়ত্রী রায়ের চাউনি স্থির, কিন্তু মুখে সামান্য বিস্ময়ের আঁচও পড়েছে।—কি করে ?

একই সঙ্গে মেয়েও ফস করে জিজ্ঞাসা করল, আংকল্ চালিহাকে ঘুষ দেবেন ?

তার দিক চেয়ে বাপী হাসল একটু।—ঘুষ অনেক রকমের হয়, তবে আপনি যে ঘুষের কথা বলছেন তার টাকা আমার পকেটে থাকে না। মায়ের দিকে ফিরল।—কি করে, আমি এখনো সেটা জানি না, তবে আপনার সায় আছে এটা যখন তিনি বুঝে গেছেন, তারও সায় পাবার ব্যবস্থা আমি করতে পারব—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

এই জোর কোথা থেকে পেল বাপী জানে না, কিন্তু পেল যে তাতে নিজেরও এতটুকু সংশয় নেই। ওর মুখের দিকে চেয়ে মা-মেয়েও যেন এই জোরেরই হদিস খুঁজছে।

বাপীর ভিতরে ভিতরে হঠাৎ আবার শুরু থেকে সেই উঁচু পাটাতনে দু পা রেখে দাঁড়ানোর তাগিদ। কর্মী-কর্মচারী সম্পর্কটাকেই গোড়ায় নাকচ করার ঝোঁক। মুখখানা একটু কাঁচুমাচু করে তার দিকে তাকালো।—এবারে আমি একটা কথা বলেই ফেলি ?

তক্ষুনি মহিলার মালিকের মুখ, মালিকের চাউনি।—টাকা পয়সার কথা ?

বাপী অপ্রস্তুত যেন।—সে কি। আপনার ওপর ছেড়ে দিয়েছি যখন ও-তো আপনার ভাবনা। হাসল।—আমার চাওয়াটা তার থেকে অনেক কম। বিকেলে চায়ের অভ্যেস, এখন পর্যন্ত এক পেয়ালাও জোটে নি। ভাবছিলাম, বলাটা ধৃষ্টতা হবে কিনা—

মেয়ে ছেলেমানুষ, সে হেসেই ফেলল। তার গুরুগম্ভীর মা-টিকে এমন উল্টো-পাল্টা পরিস্থিতির মধ্যে আর কখনো পড়তে দেখেনি যেন। উঠতে যাচ্ছিল, ওই মা-ই ইশারায় নিষেধ করল। আর এক দফা সামনের ছেলের মুখখানা দেখে নিয়ে ভিতরের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে জোরেই ডাকল, কোয়েলা !

পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে যে রমণীটি সামনে এসে দাঁড়ালো তাকে দেখে বাপীর দুচোখ যেন বড় রকমের হোঁচট খেল এক প্রস্থ। কোয়েলা মানে যদি স্ত্রী-কোকিল হয় তাহলে মেয়ে-জাতের দিক থেকে আর গায়ের রঙের দিক থেকে মেলে অবশ্য। কিন্তু গায়ে-গতরে এমন জাঁদরেল মেয়ে মানুষ কমই চোখে পড়ে। বাপীর মনে হল তাকেও আলতো করে তুলে ধরে বারান্দার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে। পরনে তারও খাটো গাউন। কোমর বেরিয়ে একটা মোটা এপ্রন গোঁজা। বইয়ের পাতায় গান্ধী আদি-

মেয়েদের সাদা স্রাবে সকল অবস্থাতেই নির্শ্চিত আরোগ্য দানকরে

লিউকোরিয়া

লিউকোরিয়া বা সাদা স্রাবের রোগীদের বিশেষভাবে জানান হচ্ছে যে, **'লিউকোনেক্স'** ট্যাবলেটের সঙ্গে আপনার আক্রান্ত স্থানে 'ফেকটিন' লোশনটি ব্যবহার করলে আরোগ্যের ফললাভ আরও দ্রুত পাওয়া যাবে। আজই আপনার নিকটবর্তী দোকানে খোঁজ করুন অথবা সরাসরি যোগাযোগ করুন : এস সি কেমিক্যালস, ২৭নং শোভাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৫।

C.F.Advtg/S.c.c./78

বাসিনীর মূর্তি, প্রমীলা-পরিবারের প্রহরী হবার মতোই।'

নাম কোয়েলা।'

—তিন পেয়ালা চা।' কুইক।

নতুন মনুষ্যের মুখের ওপর একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে ছেলে-দুলে কোয়েলা আবার ভিতরে ঢুকে গেল। যাবার আগে সুইচটা টিপে দিয়ে গেল।' দিনের আলোয় টান ধরেছে। বাপী সোজা না তাকিয়েও লক্ষ্য করছে, তিন পেয়ালা শুনেই মেয়ে যেন মায়ের মুখে না হোক চোখে একটু প্রশ্রয়ের বিরল আভাস দেখতে পেয়েছে।'

সেটুকুও গোপন করার জন্যেই হয়তো গায়ত্রী বাই ভুরু কুঁচকে তাকালো। কিন্তু কথার ফাঁকে ওটুকু গোপন থাকল না। —শুধু চা, না এরপর বলবে খিদে পেয়েছে?

লজ্জা পেয়ে বাপী হাসল।—না তা বলব না, দুপুরে ভাটাবাবু ভালো খাইয়েছে।

গায়ত্রী বাই তক্ষুনি কাজের কথায় চলে এলো।—তোমার থাকার ব্যবস্থা কি হবে?

বাপী সবিনয়ে জবাব দিল, আমার সব ভার আপনি নিচ্ছেন, এটুকুও নিন... ওখানে এক রাত থেকেই আমার হাঁপ ধরে গেছে।

—কেন? ওখানকার অ্যারেঞ্জমেন্ট তো খুব ভালো শুনেছি, আর তোমার বিল তো আমিই পেমেন্ট করব বলে দিয়েছি?

—তা বলেছেন কিন্তু অত ভালো বলেই আমাদের মতো লোকের জন্যে অস্বস্তি। বুদ্ধি করে আরো একটু যোগ করল।—রাতে জানলা খোলা থাকলে লিকারের গন্ধ ঘরে আসে—

এই জবাবে অখুশি নয় মনে হল বাপীর।

কোয়েলা ট্রে-তে তৈরি চায়ের পট আর পেয়ালা রেখে গেল। ঊর্মিলা উঠে দাঁড়িয়ে পেয়ালায় চা ঢালল। যে যার পেয়ালা টেনে নেবার পর গায়ত্রী বাই বলল, কিন্তু এখানে আবার একটা পার্টিশন দিয়ে ঘর তুলতে গেলে বিচ্ছিরি হবে—

নিজের পেয়ালাটা হাতে করে বাপী উঠে দাঁড়াল। তারপর বারান্দার এদিকে এসে পাশের খালি জমিটুকু দেখে নিল। মায়ের সামনে এই সহজতাটুকুই যেন মেয়েটার লক্ষণীয় বস্তু। ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসে বাপী বলল, মাঝখানে কাঠ বা ইঁটের পার্টিশন দিতে গেলে বিচ্ছিরিই হবে, মালীকে দিয়ে মেহেদীর উঁচু ঝাড় সমান করে ছেঁটে নিয়ে বসালে খাবাপ দেখতে দিতে হবে না। পার্টিশনের কাজ হবে, আবার দুদিকে ফুলটুল ফুটলে দেখতেও ভালো হবে। সামনে একটা ঘর, পিছনে একটু কিচেন আর বাথ-এ সামান্য জায়গাই নেবে, মেহেদীর পার্টিশান করলেও দুদিকে কিছু জায়গা ছাড় থাকবে।

এরকম পার্টিশনের কথা গায়ত্রী বাই ভাবেন নি। এ ছেলের মাথা কতদিকে খেলে তাই দেখছেন। একটু চুপ করে থেকে বলল, সে যা হয় দেখা যাবে, চালিহার সঙ্গে পরামর্শ করে দেখি।' ঘর তুলে দিলেও তো আর দুদিন ঢারদিনে হচ্ছে না, আপাতত তোমাকে ওই ক্লাবেই থাকতে হচ্ছে।)

—থাকব।

—বাট্ সাপোজ, ঘর তুলে দিয়ে ও-দিকটা তোমাকে ছেড়ে দিলাম, আর এ-দিকটা যেমন আছে তেমনি আমি কিনে নিলাম ..তাহলে আপত্তি হবে?

এবারে লুব্ধ হবার মতোই প্রস্তাব বটে।' কিন্তু বাপীর হঠাৎ কেমন মনে হল এটা লোভের টোপ হতে পারে।' আবু এর কাছে ওকে নির্লোভের সার্টিফিকেট দিয়ে গেছে। মহিলার সেটা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে এই উদার প্রস্তাব কিনা বলা যায় না।' .. তাছাড়া, ভাগ্যের ছকে বড় দান যদি কিছু পড়ে থাকে তো এই পৈতৃক ভিটের দৌলতেই পড়েছে।' মন বলছে লোভে পড়লে ভুল হবে।)

বাপীর মুখে বিড়ম্বনার হাসি। খুব নরম করে জবাব দিল, বিক্রী করার দরকার হলে আপনাকেই আমি সবার আগে বলব।' .. আমার বাবা অনেক কষ্টে এখানে মাথা গোঁজার একটু ঠাঁই করেছিলেন, এই বাড়িতে আমি জন্মেছি.. বেচে দেব ভাবতে খারাপ লাগে। আপনি আপনার নিজের বাড়ি মনে করেই এখানে থাকুন না।

মেয়ে এবারে একটু শব্দ করেই বেতের চেয়ারটা ঠেলে উঠে দাঁড়াল।' বলল, ফার্স্ট ডিভিশন—।

মেয়ের হঠাৎ এই আচরণ বা মন্তব্যের জন্য প্রস্তুত ছিল না মহিলা। জিগ্যেস করল, কি ..?

—বলছি একেবারে ফার্স্ট ডিভিশন। ইউ নিডন্ট গো ফরদার, এবারে ছেড়ে দাও, হাঁপ ফেলে বাঁচুক। হাসি চাপার চেষ্টা।

—আঃ ডলি।' ডোন্ট বি সিলি।। কিন্তু মুখখানা যতটা কড়া করে তোলার চেষ্টা ততোটা পার পেল না যেন। আর অনুশাসনও বাপীর কানে তেমন জোরালো ঠেকল না।

(চলবে)

শৈবাল মিত্র

তরণী পাহাড়ে বসন্ত

দাঁতকপাটি লেগে যাবার একদিন বেহুঁশ হলো। আর জাগলো না। সেটা ছিলো রোববার ছুটির দিন। রেবা কাজে যায় নি। সাধ্যানজলে কাপড় ভিজিয়েছিল। উঠছে ছিল, কাচাকুচি করবে।

ছুটির দিন ছাড়া সময় হয় না। কিশোর যাওয়ার আগে দেখা করে নি। দাতির মুখে খবর দিয়েছিল। রেবা শুনেছে।

জ্যোৎস্না হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে—মেজদি, বাবা কেমন করছে। তেজানো কাপড় ফেলে রেবা ছুটে যায়। চটের আড়াল দেওয়া এক-টুকরো স্নানের জায়গা। তপতী চান করছিল। ভিজে কাপড়ে সে বেরিয়ে আসে। ঘোষালবাবুর তখন শেষ অবস্থা। নাভি-শ্বাস উঠছে। নাকে পিলে চমকানো ঘড়-ঘড় শব্দ। ছোট মেয়ে দুটো ভয়ে কাঁপছে।

ডাক্তার আসে। টিপেটুপে দেখে। বন্ধ চোখের পাতা টেনে খোলে। হলুদবাটা আধানো চোখের মণি। খসে পড়তে চায়।

ডাক্তার বলে—কিছু করবার নেই। মুখে গঙ্গাজল দিন।

ঘণ্টাখানেক বাদে বাবা মারা গেলো। জলবল নিয়ে বিশু শ্মশানে গেল। ভারী স্বভাবের লোকদের ঘেঁষতে দিলো না। বাড়ীশুদ্ধ লোকের আকাশফাটানো কান্না। রেবার চোখে জল নেই। ওর চোখ জ্বলে গেছে। ছোট ভাইটাও নির্বিকার। আপনমনে সে কাকের পালক চিবোচ্ছে। নাকে মুখ, বুক ভাসছে।

তপতী আর আলো শ্মশানে গিয়েছিল। রেবা বাড়ী সামলেছিল। তিন দিনে ওষুধ শেষ। চতুর্থ দিনেই কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে রেবাকে বেরোতে হলো। অনেক টেলিফোন জমে গেছে।

ইজিচেয়ারে আধশোয়া একজন মাঝ-বয়েসী লোক। দু হাতে ভাঁজ খোলা খবরের কাগজ। লোকটার মুখ রেবা দেখতে পায় না।

তুলোয় কটীম লাগিয়ে ও রিসিভার মোছে। স্পীকারে....ক্লেদ্র করে। এই মিষ্টি গন্ধটা নাকে লাগলেই আজকাল ওর গা গুলোয়। মাঝে মাঝে মনে হয়, সামনের ফোনটা হয়তো একদিন ঝমঝম করে বেজে উঠবে। অনেক দূর থেকে কেউ তাকে ডাকবে। দারুণ একটা খবর দেবে। দুনিয়া বদলে গেছে। তুমি যা দেখেছো তা নেই। বাইরে পা দিলেই বুঝবে। ন্যাড়া গাছগুলো সবুজ পাতায় হাসছে। তোমাদের অস্তিত্ব কাঁচা নর্দমায় এখন আর ময়লা ভাসে না। রেবা ইজিচেয়ারের দিকে তাকায়। খবরের কাগজের আড়ালে দুটো চোখ। ওকে দেখছে। কি ঠাণ্ডা দৃষ্টি। রেবা চমকে ওঠে। লোকটা আবার মুখ ঢাকে। হঠাৎ কিশোরের ওপর ভীষণ অভিমান ওর বুকে পাক খায়। লোকটা একদম আমার কথা ভাবে না। আমাকে ফেলে পালালো। এখন আমার মাথার ওপর একটা বিরাট পাহাড়। আকাশকে একচুল নড়ানো যাবে না। আমি পিষে যাবো। আর কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। সংসার তার লম্বা জিভ দিয়ে আমাকে চাটছে। কোনো আড়াল নেই। মা বিছানা নিয়েছে। আলো পালিয়েছে। বাবা মারা যাওয়ার পনেরো দিন পরের ঘটনা। এক সন্ধেতেও আলো ফিরলো না। বিশুও বেপাত্তা। বিশুর এক সাবরেদ এসে জানালো, আজ ওদের বিয়ে আর ফুলশয্যে। আপনারা কেউ যাবেন নাকি? অন্ধকার ঘরে যেন বজ্র পড়লো। কেউ সাড়া দিলো না। সাকরেদ মুখে একটা শব্দ করে চলে গেলো। যাওয়ার আগে বললো—কোলে বাচ্চা নিয়েই আলো আসবে। রেবার মাথায় মধ্যে বাঁ বাঁ করছিলো। নিজেকে ও প্রায়ই জিজ্ঞেস করে আমাদের কতদূর নামতে হবে? কিন্তু ভগ্ন ভগ্নীপতি। পেশা সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক। স্মাগলিং। সুযোগমতো ছিনতাই।

সেদিন রাত্রে একটা মিটিং ছিল। সাতটা নাগাদ প্রভাদির বাড়িতে গিয়ে দেখে কেউ আসেনি এ পাড়ায় কিছু আগে জোর দাঙ্গা হয়েছে। রাস্তা অন্ধকার। থমথম করছে চারপাশ। আজকাল বেশীর ভাগ মিটিং হয় না। গণপতি বলে—দরকার নেই। গোপন পার্টির এতো ঘন-ঘন মিটিং ভালো নয়। গেরিলা কায়দায় কাজ করতে হবে। সকলেই আজকাল গেরিলা কায়দায় কাজ করছে।

রেবাকে আজকাল পার্টির কাজ কিছুই করতে হয় না। অথচ সকলে দারুণ কাজ করছে। সকলের চোখে মুখে চাপা উত্তেজনা। ওরা কি করছে, কোথায় আছে, রেবা জানে না। জানার চেষ্টাও করে না। সেটা নিয়ম নয়। কিন্তু বোঝে ওরা এগোচ্ছে। সে পিছিয়ে পড়েছে। ওরা ভাবে, রেবাও বোধ-হয় গেরিলা কায়দায় কাজ করছে। গোপন সংগঠনের মজা এই। গুলি দিয়ে মাতৃভূমি করা যায়। রেবা সেটা পারে না। ভেতরে কষ্ট পায়। কখনও সখনও গণপতি আসে, হাতে একটা ছোটো চিঠি বা প্যাকেট দেয়। কোনো একটা ঠিকানায় পৌঁছে দিতে বলে। ব্যস্ ওই পর্যন্ত। পার্টির কাগজের অফিসে তালা বন্ধ হয়েছে। গোপনে বেরোয়। তাও অনিয়মিত। নন্দিতাকে একদিন এসপ্ল্যানেডে দেখলো। দারুণ সাজগোজ করেছে। জমকা প্রিন্ট নাইলন শাড়ী, চোখে রঙীন চশমা। গাঢ় লিপ্-স্টিক। স্যাম্পু করা এলো চুল হাওয়ায় উড়ছে। রেবা প্রথমটা চিনতে পারেনি। কাছে যেতে নন্দিতা বললো—পার্টির কাজ। রেবা আর দাঁড়ায় না। কিছুটা এগিয়ে পেছন ফিরে দেখে একটা বড়ো প্রাইভেট গাড়ীতে নন্দিতা উঠলো।

দিনকয়েক পরে কথায় কথায় ও নন্দিতার খবরটা গণপতিকে দিয়েছিল। গণপতির মুখ গম্ভীর। বললো—পার্টির সঙ্গে নন্দিতার কোনো সম্পর্ক নেই। ও পুলিশের লোক।

প্রভাদি বাড়ীতে নেই। রেবা দু-চার মিনিট অপেক্ষা করে। তারপর রাস্তায় নামে। বাঁদিকে এগোয় বাঁ দিকে মোড় ঘুরে কিছুটা গেলেই হাবুদের বাড়ী। বাড়ীর সামনে জটলা। আবছা আলোয় লোকজন চেনা যায় না। চাপা গলার কথা। বাড়ীর কাছাকাছি ও আসে। প্রভাদিকে চিনতে পারে। প্রভাদি ওকে দাঁড় করায়। নীচু গলায় জিজ্ঞেস করে—খুনেরা কি

প্রভাদির মুখ শুকনো। দুচোখ বসে গেছে। রেবা বুঝতে পারেন। হারুর মেজদা খুন হয়েছে—প্রভাদি বলে—শিবপুরে গঙ্গার ধারে। আরো দুটো ছেলের লাশ সেখানে পড়ে ছিল। দুদিন আগের ঘটনা।

পুলিশ আজ বিকেলে খবর দিয়েছে। লাশ আনতে হবে।

কারা করলো কথাটা রেবার মুখে আসে। জিজ্ঞেস করতে পারে না। জানা উত্তর। সবলেই জানে। আজকাল একথা জিজ্ঞেস করা বোকামি।

হারুদা দরজায় এসে দাঁড়ায়। খালি গা, লুঙ্গি। হারুদা তাকে হাত বুলোয়।

দিদি আপনি যাবেন তো—জিজ্ঞেস করে প্রতিভাদিকে।

হ্যাঁ, চলো—প্রভাদি সাড়া দেয়।

হারুদা শরীরে একটা জামা চাপায়। ঢলঢলে বড়ো জামা। বিড়বিড় করে—ডুবো জাহাজ নিয়ে হয়তো কেউ শত্রুতা করেছে।

প্রভাদি বলে আর দেরি করে লাভ নেই। হারুদার কাঁধে অলতো হাত রাখে। অন্য সময় হলে হারুদা লাফিয়ে উঠতো। আজ আর হারুদার কতকুতু লাগে না। সদর দরজার সিঁড়িতে বড়দা বসে আছে। চোখে মোটা কাঁচের চশমা। অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। কেমন এক ভোলানাথ ভঙ্গী। সমস্ত অঙ্ক যেন তার মাথা থেকে মুছে গেছে। হারুদাকে নিয়ে প্রভাদি চলে যায়। সকলে দাঁড়িয়ে থাকে। থানামুখো হতে আজকাল কেউ সাহস পায় না। প্রভাদি চলে গেলে, রেবার মনে পড়ে দাদার, দাদার কথা। অনেকদিন ওদের কোনো খবর নেই।

টেলিফোনের কাজ শেষ করে রেবা বলে—বাঁচা।

লোকটা সাড়া করে না। তখনো কাগজে মুখ ঢাকা। ফ্যাকাসে সাদা হাত নীল শিরা। রেবা আর দাঁড়ায় না। দুপুরে দুটোয় শিবানীর সঙ্গে দেখা করার কথা।

শিবানী একটা পার্ট টাইম কাজ দেখেছে ওর জন্যে।

বাস রাস্তায় অসীম মুখে লম্বা রক। অনেকগুলো ছেলে গুলবাজি করছে। পট করা ভেজা চুল। মুখে পান। সিগরেট টানছে। কলকাতার আর কিছু হলো না। এতো কুঁড়ে জাত আর নেই। শুধু বকতালা। তার সঙ্গে রাজনীতি।

মেড়ো খোট্টাদের মতো করে খাটতে পারে? বাংলাদেশ ব্যাপারটা কি? ওটা দখল করা দরকার। পাকিস্তান, নেপাল, সিকিম ভুটানও চাই। ইন্দিরা গান্ধী মাইনরিটি স্পেশ মেয়েমানুষ। এরকম লোক চাই।

দূর থেকেই রেবা কথাগুলো শুনছিলো। ওর হাঁটার তালে ওদের গলা ওঠে। একজন প্রায় ওর পায়ের কাছে একমুখ পানের পিক উগড়ে দেয়।

কে যেন ওকে দেখিয়ে বলে—খবা। ননসেন্স খরা।

হে ভারত ভুলিও না তোমার আদর্শ —হেঁড়ে গলায় কেউ হেঁকে ওঠে। মেঘলা আকাশ। বৃষ্টি নামার আগে ডালহৌসি পৌঁছুতে হবে। কদাকার ব্যস্ত ঘাট। হয়তে এখনি ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে যাবে। বৃষ্টি শুরু হলে কেনো গাড়ীতে ওঠা মুস্কিল। তিল ধারণের জায়গা থাকে না।

সংসারের ছোবড়া রোজ বেরিয়ে পড়ছে। এতো দুঃখ, এতো চাহিদা। রেবার হাঁফ ধরে। বাবার প্রভিডেন্ড ফান্ড, পেনসনের কিছু টাকার জন্যে তদ্বির চলছে। তপতী রোজ বাবার অফিসে যায়। তদবির করে। হয়তো ওখানে দিদির একটা চাকরীও হবে। কিন্তু দিন যে চলে না। মা ভুগছে। ভালো ডাক্তার দেখানো উচিত। একটু ওষুধ পথ্য। কোথা থেকে হবে। ছোট ভাইটাও যদি পুরো মানুষ হতো? রেবা জানে তার মতে অধমর্ণ, উপবাসী মানুষের সংখ্যা কম নয়। শতকরা পঞ্চাশজন মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে। কাগজে পড়েছে। সেটা কিরকম। হয়তো আরো খারাপ কিন্তু। কিন্তু, কিন্তু আর কি খারাপ হতে পারে। আস্তা কুড় ঘেঁটে খাওয়া শুরু হয়নি। মাথার ওপর ফুটোফাটা টালির চাল আছে। রেবা ভাবে আমরা কি মধ্যবিত্ত, মজুর না অন্য কোনো শ্রেণী? দু-তিন ঘর মজুর আছে। ছাপরা না ভাগলপুরে কাড়ী। চটকলে, রঙের কারখানায় কাজ করে। মেয়ে বৌরাও যায়। তাদের ঘরে পাখা, টুনাজলটোপ আছে। ছুটির দিন গোল হয়ে বসে বাদামুন, কাওয়ালি গায়। ঝকঝকে পেতলের কাঁসিতে সাদা দানার ভাত খায়। লোটার দুধ। গলা ছেড়ে হাসে ওরা মজুর, মজুরনী। তবে আমরা কি? আমরা কোথায় আছি। রেবা নিজের অবস্থানের হদিশ পায় না।

আশেপাশের ঘরে ভালো মন্দ রান্না হয়। মাছ মাংসের গন্ধে কখনো হাওয়া ভারী। ছোটো বোনগুলো ছুঁকছুঁক করে। রেবা দেখেছে। পরেশ দাসের বৌ তো একদিন বাসনাকে মেরেই বসলো। বাসনা ছোট বোন। বছর তেরো বয়েস। পরেশের ঘরে ঢুকেছিল। বৌ গিয়েছিল দোকানে। পরেশ মাংস রাঁধছিল। তখন বাসনার বুকে হাত দিয়েছিল। আর কি করেছিল। রেবা জানে না। পরেশের বৌ ফেরেনি শিশি নিতে ফিরে আসে। তারপর হৈ-চৈ। মারের চোটে বাসনার ঠোঁট কেটে গিয়েছিল। পরেশ সাড়া দেয়নি। চোখ বুজে শুয়েছিল। সেদিন কালুয়ার কাছে অপমানিত হয় জ্যোৎস্না কেঁদেছিল।

রেবা ওকে শান্ত করতে চেয়েছিল। আমাদের চেয়েও খারাপ অবস্থায় অনেক মানুষ আছে। না খেয়ে মরে যায়। থাকার জায়গা নেই। আমরা তো তবু ভালো আছি। তুই ভাববি মানদার কথা। রাস্তায় থাকে। সেফ একটা গাড়ীবারান্দার নীচে। শীতের রাতে কি ভাবে ঘুমোয়। বর্ষায় ভেসে যায়।

জ্যোৎস্না ফোঁস করে উঠেছিল। তুই থাম মেজদি। মানদা ছাড়াও দেখার মানুষ আছে। তারা পাকা বাড়ীতে থাকে। ভালো খায়। ভালো পরে। তুই তাদের দেখাস না কেন? শুধু দুঃখ অভাব দেখলে মনের ছোটো হয়ে যায়। আলোকে গাল দিয়ে কি হবে? বিশুদার চেয়েও খারাপ বর আলো দেখিয়ে দেবে।

রেবা কথা বাড়ায়নি। জ্যোৎস্না ঠাণ্ডা গোছের মেয়ে। দিদিদের কথা শোনে। কথার পিঠে কথা বলে না। সেও বদলে যাচ্ছে। জ্যোৎস্নার কথাটা তাকে ধাক্কা মারে। তাই তো শুধু নীচের দিকে তাকিয়ে মানুষ বাঁচবে কেন? চোখের মণিগুলো সেভাবে তৈরি নয়। ওপর নীচ চারপাশে ঘোরে। সব কিছু দেখে, দেখতে চায়। জ্যোৎস্নাও দেখেছে। আরো দেখবে। দেখার ব্যাপারটা একতরফা নয়। কিন্তু মা বাবারাও যে এইভাবে দেখতে শেখায়। সবচেয়ে সস্তা জামাটা এনে বাবা বলতো, অনেকের এই জোটে না। খালি গায়ে থাকে।

কথাটা সত্যি। চোখের সামনে উদোম ছেলেমেয়ে কম ঘোরে না। খাওয়া, শোওয়া সব কিছুতেই যে ওরা অনেকের চেয়ে ভালো এটা ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছে। জ্যোৎস্না হঠাৎ তাকে খোলাখুলি সত্যের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। রেবার বলতে ইচ্ছে হয় এ-সমাজে এটা হবে। এখানে ভীষণ গরমিল। সব কিছু তাই ঢেলে সাজানো দরকার। আমরা তো সেই চেষ্টা করছি। কিন্তু চুপ করে থাকে। এসব কথা বললে, ওরা হাসে। মাড়ালে বলে—শেখা বুলি। হিজ মাস্টারস ভয়েস।

দুটো বাস ছেড়ে দেয়। গাদাগাদি ভিড়। শেষ পর্যন্ত একটা ট্রামে ওঠে। ঝোড়ো হাওয়া বইছে। রাস্তার ধুলো, খোসা শালপাতায় হাওয়ার শুকনো ঘুরে ঘুরে নাচছে। ট্রামের জানলা দরজা বন্ধ হয়। ঢং ঢং ঘন্টা বাজিয়ে গাড়ীটা ছুটে চলে।

রেবা একটা জীবনের মধ্যে এখন অনেকগুলো জীবন খুঁজে পায়। একটা সজাগ জীবন। সে খোলা চোখে চারপাশ দেখে। সমাজ সংসারের সঙ্গে তাল রেখে চলে। অঙ্ক, ইতিহাসের নিয়ম মানে। বুদ্ধি, যুক্তির চৌহদ্দি ভাঙতে চায় না। তার আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্নের শেকড় আছে। সে মাটি ছাড়তে চায় না। এই জীবনের তলায় অনেকগুলো অদেখা জীবন ছটফট করে। তারা এই সজাগ জীবনটাকে মানে না। অথচ সেই জীবনের রস শুষে বেঁচে থাকে। দিনের মধ্যে অনেকবার তারা জেগে ওঠে। রক্ত, মাংস, কলিজার তৈরী জীবনটাকে তারা পাত্তা দেয় না। তারা অসংখ্য মিছে কথা বলে, ভান করে। সজাগ জীবনের ওপর মাতব্বরি করতে চায়। তারা নিজেদের পয়লা নম্বর বলে জাহির করে। সজাগ জীবনকে ঠাট্টা করে, মেটো, ছেঁদো জিনিস। জিগ্যেস করে—তুমি কি? কি তোমার ভূমিকা?

মানুষ তখন একটা কিছু করতে চায়। কেউ টাকা বানায়, বা গান করে। কেউ বিপ্লব করে। সজাগ জীবন ক্রমে ঘুরন্ত হয়ে যায়।

মেতে ওঠে। আড়ালের জীবনগুলো মূল স্রোতে মিশে যায়। মেতে ওঠে। আড়ালের জীবনগুলো মূল স্রোতে মিশে যায়। সে বেঁচে থাকে। জীবনের স্রোতগুলো যার খেলে না, সে কষ্ট পায়। শেষ হয়ে যায়। বেঁচেও আধমরা। শ্রেণীসমাজে এটাই জীবন। মানুষ এভাবেই বেঁচে আছে।

বাজারের সামনে সেদিন গণপতির সঙ্গে দেখা। গণপতির কাঁধে কিভস ব্যাগ। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। রাস্তার আলোর ঠিক নীচে দাঁড়িয়ে একজন মহিলার সঙ্গে কথা বলছে। ভদ্রমহিলার বয়েস হয়েছে। চেনা লাগে। রেবা এগিয়ে যায়। মিঠুর মা। মিঠু ওর বন্ধু। বিয়ে করেছে কল্যাণকে। কল্যাণ এখন জেলে।

মিঠুর মা গণপতিকে বলছিল, আজই দেখা করতে গিয়েছিলুম। বাড়ীতে কিছু খাবার বানিয়েছিলুম। কল্যাণ কিছুতেই নেবে না। জেলখানার সকলের খাবার আমি কি করে বানাই বলো।

মাসিমা, রেবা এসে দাঁড়ায়। মিঠুর মা ওকে দেখে। কাঁধে হাত দেয়। আমাদের বাড়ী আসিস না কেন?

মিঠু কোথায়—রেবা জিজ্ঞেস করে।

বাড়ীতে।

রেবাকে দেখে গণপতি হাসার চেষ্টা করে। আবার গম্ভীর হয়।

মাসিমা শুরু করে—টিফিন ক্যারিয়ারটা আর একজনকে দিয়ে এলুম। বললুম—তোমরা ভাগাভাগি করে খেও। এমনিতেই খাবার দেওয়া মুসকিল। অনেক ধরে করে রাজী করিয়েছিলুম। ফেরার সময় কল্যাণ সকলের সামনে আমাকে কি বললো জানো।

মাসীমার গলা ভার। চোখ প্রায় ভিজে ওঠে।

ওরা তাকায়।

কল্যাণ বলে জামাই-ফামাই ভুলে যান। আমাকে কমরেড ভাববেন। সেভাবে নিতে পরলে আসবেন। তা না হলে আসার দরকার নেই। মিঠু সঙ্গে ছিল।

রেবা এবার মাসীমার পিঠে হাত রাখে। গণপতি বলে—কল্যাণ ঠিকই বলেছে। এটা পার্টির লাইন।

রেবা অবাক হয়। জামাইকে কমরেড বলাটাও পার্টির লাইন—ওর মুখ ফসকে যায়। কঠিন চোখে গণপতি তাকায়। বলে—হ্যাঁ। রাজনীতি বাদ দিয়ে আত্মীয়তা হয় না। গণপতি এখন এলাকা কমিটির সেক্রেটারি। পুলিশ ওকে খুঁজছে। রেবা কথা বাড়ায় না। মাসিমা নির্বাক।

তোমার সঙ্গে কথা আছে—রেবাকে বলে। রেবার হাতে বাজারের থলে। কিছু কেনাকাটা আছে। আলু পেঁয়াজ, শাক ডাঁটা। ও ফিরলে রান্না হবে। মাসিমা চলে যায়।

গণপতি বলে, কিশোর পার্টি মানে না। আকাশ্যানের বিরোধী। পার্টির ভেতরে পার্টি বিরোধী চক্র বানাচ্ছে।

রেবার শরীর হিম হয়ে যায়। গণপতি বাঁকা চোখে তাকায়। জিজ্ঞেস করে—কলকাতাতেও এরকম কিছু লোক আছে। তারা কে?

রেবার কথা বলার শক্তি নেই।

আমরা জানতে পারবো। তুমি আপাততঃ ওর সঙ্গে যোগাযোগ রেখো না।

অনেক দিন বাদে রেবা যেন কিশোরকে পরিষ্কার দেখতে পায়।

জিজ্ঞেস করে, পার্টি আমাকে কোনো কাজ দিচ্ছে না কেন?

গণপতি দাড়িতে হাত বোলায়। সোজাসুজি তাকায়। বলে, আরো কিছুদিন ওটা চলবে। তোমার কাজের রিভিউ হচ্ছে। তারপর। এখন কোনো মিটিংয়েও তোমাকে ডাকা হবে না। আজকের মিটিং-এর খবরটা তোমায় ভুল করে দিয়েছিল। তাই মিটিং হলো না।

রেবার পায়ের তলায় মাটি দুলে ওঠে।

সাবধানে থেকো—গণপতি চলে যায়।

রেবার পা দুটো জমাট পাথর। কোনো মতে বাজার সেরে বাড়ী ফেরে।

কিশোর কি করছে? পার্টির সঙ্গে বনছে না কেন। গণপতি সব খবর পায়। ও এখন সূর্যদার কাছের লোক। পাশাপাশি থাকে। দূর্যদার সঙ্গে সোজাসুজি দেখা করা যায় না। গণপতি ঠিক করে কার দেখা করা দরকার। বাকীদের সঙ্গে গণপতিই কথা বলে। পলিটব্যুরোর একজন মেম্বারকে সূর্যদার সঙ্গে গণপতি দেখা করায়নি। সে নিজে উপদেশ, নির্দেশ দিয়েছে। এসব খবর কেন যে সূর্যদা জানতে পারে না। রেবার বুকে কি এক অস্বস্তি শিরশির করে।

আকাশে মেঘ ছিল না। রোদে ঝলমল করছিল চারপাশ। কদিন একনাগাড়ে বৃষ্টি হয়েছে। গাছ লতায় সবুজ আভা। ভিজে লাল মাটি। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। কচি ধানের চারা হাওয়ায় দুলছে। উঁচু জমিতে আখ ক্ষেত। তেজী ধারাল শরীর। রসে টইটম্বুর।

রাত থাকতেই জিয়ন উঠেছে। মায়াংবুরুর লনে সকলে আসবে। দু একজন করে জমতে থাকে। ভীড় বড়ো হয়।

চিলিকা আমদত্তু—বুকের কাছে মুঠো করা হাত। জোড়হাত করে। কুশল বিনিময় হয়। বুড়োরা জিজ্ঞেস করে—ওয়ারেন হয় ভাগী গিয়াসে বাং। বাড়ীর লোক ভালো আছে তো? দু দশটা মাথা গা থেকে মানুষ আসছে।

অনুর মেপেন কথা—কে যেন হাঁকে। খলখল হাসি। ডগব সাড়া দেয় না। মেপেনের আলোচনা করার এটা সময় নয়। স্কোয়াড তৈরী হয়। পাঁচজনের স্কোয়াড। নরহরি বলে, আমি যাবো। স্কোয়াড এগোয়। পুরো ভীড়টা পেছনে চলে। বরুণ আটকায়। ওরা শোনে না। কিশোর বোঝাবার চেষ্টা করে। কাজ হয় না।

সকলেই বলে—পেল্লাদকে খুন করবো। প্রত্যেকের হাতেই তীর ধনুক, কাটারি, বল্লম বা লাঠি। সামনে শালের বন। পায়ে চলা সরু রাস্তা। ভীড়টা আমজোড়ার দিকে এগোয়।

জঙ্গল শেষ হয়। তারপর মাঠ। ভীড়টা থেমে ওঠে। পেল্লাদ দাসের বাড়ী রাস্তা থেকে দেখা যায়। মাটির পাঁচিলে ঘেরা দোতলা মাঠকোঠা। মিস্তিরের সামনে জীবন আর বাড়ীর পেছনে ওরা পোঁছোয়। ডাঙ্গা জমিতে চমৎকার মরাই ফলেছে। মানুষজন নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। কেউ কিছু জানে না। খবর ফাঁস হয়নি। পেল্লাদের বাড়ীর খোলা খিড়কি দিয়ে হৈহৈ করে সকলে ঢুকে পড়ে। পেল্লাদ দাসের বন্দুক আছে। সদরে লোহার কোলাপসিবল গেট। বন্ধ করলে বেরোবার উপায় নেই। পেল্লাদ বুঝতে পারে নি। এক দৌড়ে সে

দোতলায় ওঠে। পেছনে বাঘা, রবি, জীবন তৎপর। পেল্লাদ দশাসই চেহারার মানুষ। ভালো বং। বাঘা ছুরি চালায়। পেল্লাদের পেটে ছুরি ঢোকে না। ছুরি বেঁকে যায়। পেল্লাদের মুখ ফ্যাকাসে। অজ্ঞান হওয়ার অবস্থা। বলে—আমাকে ছেড়ে দে। আমার সোনাদানা টাকাকড়ি তুরা নে। প্রাণে মারিস না। পেল্লাদের কান্না শুনে একতলায় ভিড় চেঁচিয়ে ওঠে—তার মাথা চাই। বন্দুক দে।

এসব কথা পেল্লাদ শোনে না। একটা ধারালো বল্লম ওর বুকে বেঁধে। ও মাটিতে পড়ে যায়। খিস্তিখেউড় দিয়ে বকতে ছোটে। পাশের ঘর দরজা বন্ধ। ভেতরে ওর বৌ ছেলেমেয়েরা চেঁচাচ্ছে। বাইরে ভিড়। মানুষজন নাচছে। জমিজমার দলিলপত্র কাগজপত্র জনতা আগুনে দিল। পুরোনো কাগজপত্রের মধ্যে একটা নোংরা ছবি ছিলো। গরীব মেয়েবৌদের নিয়ে তার যৌনলীলার ফটোগ্রাফ। সে ছবি গুলো দেখে ভিড়টা আবার ক্ষেপে ওঠে। মৃত পেল্লাদের ওপর দুজন ঝাঁপিয়ে পড়ে। শোপায়।

বন্ধকী তিনিসপত্র উদ্ধার হয়। লখাই আবার খোঁজে। বড়ো বড়ো গুড়ের চুবালা, মুড়ির হাঁড়ি পাশাপাশি সাজানো। লখাই পাচ্ছে শুধু ভোবাস। বনুই পর্যন্ত গুড় মাখামাখি। সেই হাত মুড়ির হাঁড়িতে ঢোকাতে ওর হাতটা মুড়িতে চাকা হয়ে যায়। ও লক্ষে আর চেটে চেটে খায়। বাকীরাও ছাড়ে না। মেলা লেগে যায়। সোনাদানা টাকা কড়ি কেউ ছোঁয় না। ঘন ঘন শ্লোগান ওঠে। রবুণ বলে—এবার ফিরতে হবে।

হাওয়ায় খবর ছোটে। চলে শুরু হয়েছে। দুমকা, ভাগলপুর থেকে বাসীন্দরা, রাজনন্দ এবসঙ্গে জেগে ওঠে। খবর এলো, মিলিটারি নামছে। আমোদপুর থানা থেকেই খবরটা একজন দিলো। সে পার্টির কাছের লোক। গ্রামে গ্রামে পুলিশ এসেছে। ক্যাম্প বসায় নি। ঘুরেফিরে একনজর দেখে চলে যাচ্ছে। ভয়ে তাদের মুখ কালো। পালাতে পারলে বাঁচে। দিল্লী, কলকাতা হোলপাড়। বীরভূম ডুবছে। পরিস্থিতি পুলিশ প্রশাসনের হাতের বাইরে। প্রথমে হাওয়া। জোতদার, মহাজনরা গাঁ ছেড়ে পালাচ্ছে। আতঙ্কিত সকলে। দুচারমাস বাদে ফিরে আসবে। কিন্তু পেছনে তাকানোর সময় বা সাহস ওদের নেই। আগে প্রাণ বাঁচুক, তারপর ধান।

কিশোর খবর আনে বড়ো হামলা আসছে। এবার মিলিটারি নামবে। অনেক রক্ত ঝরবে। কিন্তু মনে রাখবে, দুটো শ্রেণী মুখোমুখি লড়বে। রক্ত বাদ দিয়ে যুদ্ধ হয় না। সিনেমায় থিয়েটারে হয়। সে নকল যুদ্ধ। ধোঁকাবাজি। নকল যুদ্ধ যা হওয়া তাই সেটা ভেতাল। পৃথিবীর ইতিহাসে এর অনেক নজীর আছে। ভারতবর্ষেও আছে। কুরুক্ষেত্রের কিংবদন্তী আমাদের আশাপাশকে ধাক্কা দিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। সব শেষে।

সাঁওতাল কৃষকদের বড়ো পরিবর্তন এসেছে। ইতিহাসবোধ জেগেছে। আত্মবিশ্বাসে ওরা ভরপুর। ফসল পর ফসল যারা গুম করে বসে থাকতো, এখন তারা বলছে। নানা কথা। জীবনের হাজারো ছোটখাটো স্বপ্ন, আশায় তারা মশগুল। এমনিতেই সাঁওতালদের কথার ভাঁড়ার ছোটো। ব্যবহার না করে সেটা আরো শুকিয়ে গেছে। এভাবে চললে অর্ধেক শব্দভাণ্ডার হয়তো হারিয়ে যেতো হঠাৎ ঝড় করে আলো জ্বলে উঠেছে। অন্ধকার ভাঁড়ার আলোয় ভাসছে। ওদেরও কথার বাঁধ ভেঙে যায়। মুখে মুখে গান, কবিতা, ছড়ার ঢল নামে।

রবুণ আলোচনা আরম্ভ করে। যুদ্ধ শুরু হয়েছে। আমরা যুদ্ধের মধ্যে আছি। খতমের লাইন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের এডাই একলাফে অনেকটা এগিয়ে গেছে। সুদেশ শেষ পর্যন্ত লড়াই আছে। আজ জিতেছি। কাল মার খেতে পারি। তাতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। শেষপর্যন্ত আমরা জিতবো। শত্রুরা আমাদের ওপর এবার ঝাঁপিয়ে পড়বে। তারা তৈরী হচ্ছে। আক্রমণ মোকাবেলার জন্য সংগঠনকে মজবুত করা দরকার। এতো ডিড চলবে না। স্কোয়াড-গুলো ছোটো হবে। গ্রামভিত্তিক স্কোয়াড। গরীব কৃষকদের নিয়ে পার্টি হবে। আমরাও থাকবো। কিন্তু সিদ্ধান্ত ওরা নেবে। কিশোরের মাথায় রবুণের সব কথা ঢোকে না। প্রশ্ন তুললেই তর্ক লাগবে। রবুণ আজকাল যেন যেন তাকে সহ্য করতে পারে না। ভেতরে ভেতরে কিছু একটা হচ্ছে। কিশোর বুঝতে পারে না। চোখের সামনে দুটো খতম হলো। প্রতিপক্ষ তৈরী ছিল না। নিরস্ত্র অসহায় ভবী। একতরফা মার খেলো। শেষ হয়ে গেলো। এটা ঠিক যুদ্ধ নয়। একদল সশস্ত্র মানুষ লড়বে আর একটা সন্ত্রস্ত বাহিনীর সঙ্গে। এটাই যুদ্ধ। কিন্তু সেটা হলো না। গোবর্ধন বা পেল্লাদ তৈরী ছিলো না। মনের অগোচরে যেন ওদের কিছু বলার ছিলো। হয়তো দুহাত ছুঁড়ে বলতো—ক্ষমতা দখলে। একটা সুযোগ দাও। শেষ সুযোগ। ওদের কি বদলানোর সুযোগ ছিলো না? এলাকার গোতদার, মহাজনদের বাড়ীঘর দেখলে বুঝতে হয়। কিশোর আগে দেখেনি। এই দুটো ঘটনায় চিনলো। ছেঁড়া কাঁথা, মোটা কাপড়ের পোষাক। পুরোনো থালাবাসন। তক্তাপোষ, খাটিয়া ছাড়া আসবাব নেই। হয়তো মাটির তলায় টাকা পোঁতা আছে। শহরের ব্যাঙ্কে আছে সোনাদানা। কিন্তু দেখলে বুঝতে হয়। শহরের নিম্ন-মধ্যবিত্তরাও এদের চেয়ে ভালো আছে।

আসলে সংস্কৃতির অভাব। কাঁচায় জন্যও একটা রুচি দরকার। সেটা এদের নেই। এখানে একটাই হিসেব, টাকা জমাও। জমি বানাও। সেই সঙ্গে আছে ভয়। গাঁয়ের লোক হলে তো হিংসেয় জ্বলবে। গরীবদের চোখ টাটাবে। ডাকাতের হামলা তো লেগেই আছে।

অজিত একদিন বলেছিল—খতমের পর কি হবে?

কেন? জনযুদ্ধ। ক্ষমতার লড়াই—জবাব দিয়েছিল কিশোর। অজিত কথা বাড়ায়নি। বিমল বদলালো বললো—আমল প্রশ্ন শেষ। কি করে আনা যায়। কিশোর ওকে দেখে। বলে—কথা ঘোরাসনি। তোর হঠাৎ এটা কি হলো? খতমের লাইন কি ভুল? জিজ্ঞেস করে।

পোড়া দেশলাই কাঠিতে অজিত লাল মাটির ওপর নকশা আঁকে। বলে—খতমের ব্যাপারটা খুব সাময়িক। এটা কি বেশীদূর এগোবে? একজনের বিরুদ্ধে ওদের রাগ আছে। তাতিয়ে জ্বলে। এ্যাকশান হবে। শ্রেণীদরদ জাগবে। একজোট হবে। কিন্তু তারপর? বিপ্লব বা পার্টি সম্পর্কে এরা কি জানে? কতদূর ভাবে? কোথায় যাবো কিভাবে যাবো, সে ধারণাও পরিষ্কার নয়। পুলিশ, মিলিটারীর সঙ্গে এরা লড়বে। জান দেবে। পালাবে না। পালাবার জায়গাও এদের নেই। কিন্তু তারপর? সিধু, কানুরাও তো শেষ-পর্যন্ত লড়েছিল। অজিত একটা বিরাট প্রশ্ন ওর বুকে গেঁথে দেয়।

রবুণ বক্তৃতা শেষ করে—বিপ্লবী যুদ্ধ শুধু শত্রুর না, আমাদের ভেতরের বিষও ঝেড়ে দেব। আমরা আরও পরিষ্কার হই। কথাটা শেষ হতেই মোতি উঠে দাঁড়ায়। জিজ্ঞেস করে, আমরা কি কোনোদিন কম্যুনিষ্ট হতে পারবো না? গরীব কৃষক ক্ষেত-মজুরের পার্টি। খুব ভালো কথা। কিন্তু শহর বাজার থেকে যেসব মধ্যবিত্ত সব ছেড়ে গাঁয়ে এলো, তারা কি?

রবুণ বলে—তারাও কম্যুনিষ্ট। সংগঠক। কিন্তু তারা শ্রেণীসংগ্রামের নেতা নয়।

কম্যুনিষ্ট হলে নেতা হতে অসুবিধে কি—মোতি ছাড়ে না।

রবুণ পাশ কাটায়—এসব তাত্ত্বিক আলোচনা পরে হবে। কাজের কথায় এসো। মোতি খুশী হয় না। চুপ করে যায়। ওর মনে অনেক প্রশ্ন জমেছে।

রবুণ বক্তৃতা করে। জীবন বলে—তুমরা কাজ করিস না ক্যানে? বাইরে থাকিস ক্যানে? ওদের মনেও প্রশ্ন জেগেছে। শহরের ছেলেরা বোধহয় পাশ কাটাচ্ছে। মাঠের এক পাশে হুর্তি কড়াই-এর ক্ষেত। ডাল হয়। প্রচুর চাষ। মাটি সামান্য চষে ছড়িয়ে দিলেই হলো। মাঠ ভরে যাবে। বুধন এক আঁটি হুর্তি কড়াই ছিঁড়ে আনে। খোসাশুদ্ধ শুঁটি চিবোয়।

আশপাশের সব গাঁ থেকেই আজ প্রতিনিধি এসেছে। বুন্দারাম, বাসথালি টোরো মাদারপুর, বাহেসা, কালিকাপুর, দিঘুলিয়া। সব গাঁয়েই গেরিলা স্কোয়াড তৈরী। যে কোনো সময়ে তারা শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

তাঁতলুই আর টোরার মাঝখানে বিরাট শালবন। ভালুক আছে। হেড়েল বেরোয়। পাশে সিধ নদী। জঙ্গল কেটে কিছু চাষের জমি হয়েছে। এখানেই সভা বসেছে। গাঁয়ের মধ্যে আজকাল ওরা বসে না। মাঝি-পাড়ায় শত্রু নেই কেউ। এসব গাঁয়ে পুলিশ আসাও মুস্কিল। গাড়ী ঘোড়ার রাস্তা নেই। বর্ষায় পায়ে চলা পথ ধুয়ে যায়। তবু সাবধানের মার নেই। সিধ নদীতে জল বেড়েছে। একটানা স্রোতের শব্দ।

[চলবে]

সাবিত্রীর সতীদাহ

বিদ্যুৎ বসুমাপাধ্যায়

ভুণ্ডুবাবুর লোক থাকবে। সিগন্যাল না পেয়ে ট্রেনটা ওখানে বেশ খানিক গতি কমাবে। বস্তাটা আগে ফেলে দিয়ে কায়দা করে নেমে পড়বে শ্রীদাম। ব্যাস তাহলেই তার কাজ শেষ। ঝকঝকে জলছাপ দেওয়া নোট-গুলো পেয়ে যাবে পকেটে। মহাজন, দাগি কিংবা কাটা-ছেঁড়ার কারবার নেই কুণ্ডু-বাবুর। সব নতুন ঝকঝকে ফসকা কারবার। নোটগুলো জামার ভেতরের পকেটে রেখে আবার এই গাড়িতেই ফিরবে প্রাণমচন্দ্র। রাত সাড়ে দশটায় ঝাঁপানডাঙ্গা। সেখান থেকে মল্লিক বাঁধের ওপর দিয়ে কালিকাপুর পৌঁছতে আরও আধ ঘন্টা। রাতের ট্রেন-খানা যেমন দুরন্ত গতিতে ছোটে গাড়ির মাথার উপর হুমড়ি খেয়ে বসে থাকা শ্রীদামচন্দ্রের স্বপ্নের রেলগাড়ি ছুটে যায় তার চেয়েও দ্রুত গতিতে।

ট্রেনের মাথায় বসেই শ্রীদাম ভাবে। তার পথ চেয়ে বসে থাকবে সাবিত্রী। ঘুম নামবে না তার চোখে। মল্লিক বাঁধের ওপর দিয়ে ট্রেন যাওয়ার শব্দ শোনার প্রতীক্ষায় বাতাসে কান পাতবে। আকাশে জেগে থাকবে হিমভেজা মস্ত চাঁদ। উঠোনের ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছটার ডালপালায় ঝুলবে তার মরা আলো। হিম ঝরবে মাটিতে। নাকে এসে লাগবে হিম-ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধ। মল্লিক বাঁধের ওপর দিয়ে শেষ লোকাল যাওয়ার শব্দ পেলেই ঘুম জড়ানো চোখ দুটো রগড়ে নেবে সাবিত্রী। তারপর শ্রীদামের প্রতীক্ষায় সে চোখ মেলে রাখবে কাঁচা সড়কের ওপাশে। থেকে থেকে শেয়াল ডেকে যাবে কোপ ঝাড়ে। রাতচরা পাখি ডানা ঝাপটাবে গাছের মাথায়। হুম হুমা পাখিটা খানিকক্ষণ থেমে থেকে আবার ডেকে চলবে হুম হুম, হুম হুম। নিশুতি রাতে আচমকা ডাকটা শুনলে ভারি ভয় লাগে।

একসময় সাবিত্রীর পোড়া খাওয়া চোখের সামনে স্পষ্ট হবে একটা ছায়াশরীর। সামান্য জামদে ঝুঁকে দ্রুত হেঁটে আসা পরিচিত মানুষটাকে দেখেই লাফিয়ে নেমে আসবে সাবিত্রী। তার পর হাতমুখ ধুয়ে দাওয়ায় বসে কাঁসিতে করে সকালের বাসি ভাত আর টাটকা মাছের ঝাল খেতে খেতে সাবিত্রীর সঙ্গে কত কথা হবে। এবার পুজোয় কী রঙের শাড়ি চাই—ব্লাউজে কেমন ডিজাইনের— আরও কত কি!

অন্যদিন কালিকাপুরের একটা দলই থাকে এ গাড়িতে। নটবর, পটল, করালী, শম্ভুনাথের চটকদার মেয়ে আরতি, নেপাল কামারের অল্পবয়সী বিধবা মেয়ে সৌদামিনী আরো অনেকেই। আজ কেউই আসেনি। নতুনপুরে ধানকলের মাঠে আজ যাত্রা হবে। শুনতে যাবে সবাই। কয়াকাতার দল নিয়ে যাবার আসর বসবে সেখানে। শ্রীদাম সাবিত্রীকেও যেতে বলেছিল। অভিরামের মাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বলেছিল যাত্রা দেখতে। রাজী হয়নি সাবিত্রী। সরল চোখ-মুখে একটা চাপা হাসি ফুটিয়ে বলেছিল,

—তুমি সঙ্গে না থাকলে আমার কোথাও যেতে ভালো লাগে না।'

পালটা জবাব দিয়েছিল শ্রীদাম,

—আমারও তাই হয়েছে এদানি। তোমাকে সঙ্গে না নিলে আমারও কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে নাই। তাই ভাবছি হয় সিদিন আমাকে খবর করবেক সিদিন তোমাকেও নিয়ে যাব। তখন কিন্তুক যাব নাই বললে চলবেক নাই।

—হাঁ গো হাঁ যাবো। একশোবার যাব। আগেকার দিনে সতীরা স্বামীর সঙ্গে এক চিতেতে যেতো নাই। দেখো আমিও ঠিক যাব তোমার সঙ্গে। থাক এখন উসব অনাছিষ্টির কথা বাদ দাও দিনি। মল্লিক বাঁধের দিকে চেয়ে থাকা বুড়ো শিবের কাছে শ্রীদামের মঙ্গল প্রার্থনা করে নেয় সাবিত্রী।

ঝাঁপানডাঙ্গা ইস্টিশানে চালপাচারকারী দলটার আর কেউই সেদিন ওঠেনি। সবাই সেদিন নতুনপুরে মুখো। শ্রীদামও যেত না। নেহাত কটা টাকার দরকার। অনেকদিন থেকেই সাবিত্রীকে একটা জালবয়ের ডুরে শাড়ি দেবে বলেছে। এটা সেটা খরচা এসে পড়ায় আর টাকা কুলিয়ে উঠতে পারেনি। তাই আর দেওয়া হয়ে ওঠেনি। আজ ইস্টিশানে মুকুন্দ পালের দোকানে একেবারে পছন্দ করে রেখেই এসেছিল সে। বাহারী ডিজাইনের এক-খানা ডুরেশাড়ি। সিঁদুরে লাল রং। শ্রীদামের পছন্দের তারিফ করে পাল পর্যন্ত হাসতে হাসতে বলেছিল,

—হাসকেলাস শাড়িখানা নেবেক, করেছ বুঝলে শ্রীদাম। তোমার কচি বউটার ফর্সা শরীলে যা মানাবে না এখনা। তোমার বউটাকে দেখলে আমাদেরও এই বয়েসে ইচ্ছে করে অমন একটা বউ পাওয়ার। পাল নিজেই নিজের কথায় থাক থাক করে হাসে।

পালের এমনধারা কথাগুলো শুনে শ্রীদাম একটুও হাসে না। মানুষটা যেন কেমন। একটুও ভালো লাগে না শ্রীদামের: মেয়েদের দিকে কেমন যেন লোভী চোখে তাকায়। বড় লালসা-ধরা হাসি হাসে। একবার সাবিত্রীকে সঙ্গে করেই পালের দোকানে কাপড় কিনতে গিয়েছিল শ্রীদাম। দোকান থেকে বেরিয়েই সাবিত্রী বলেছিল,

—কেমন মানুষ গো তোমাদের পাল-মশাই। মেয়েছেলে দেখে নাই নাকি কুনুদিন। কত্তালের মত চোখ করে যেন গিলতে আসছে।

বুড়ো পালকে নিয়ে অনেক কথাই চাউড়ে আছে ঝাঁপানডাঙ্গা কালিকাপুর আর নতুনপুরে। ঝাঁপানডাঙ্গা বাজারে নাকি তার আলাদা ঘর ভাড়া করা আছে। নেপাল কামারের অল্পবয়সী বিধবা মেয়েটার নাকি সেখানে যাতায়াত। কখনও রাতে থাকেও নাকি সেখানে। নতুনপুরেও নাকি খোবপোষ দিয়ে একটা মেয়েমানুষ রাখা আছে পাল-মশাইয়ের। মোট কথা লোকটার স্বভাবচরিত্র তেমন সুবিধের নয়। তারপর আবার মনে পড়ে গেলে নেশা ভাঙও করে।

লিলুয়া ছাড়িয়ে ট্রেনখানা গতি নিতেই যেন চমক ভাঙ্গলো শ্রীদামের। আর খানিক দূর গিয়েই গাড়ির গতি কমে যাচ্ছে এখন। ওয়ার্কশপের বাঁদিকে লাইন পাতা হচ্ছে। লোকের মুখে শুনেছে শ্রীদাম। ওখানে নাকি রেলের নতুন সাইডিং হবে। দিন রাত কাজ চলছে। লাইনের ধারে ধারে জোরালো আলো টাঙানো। গাড়িগুলো এখন ওখানে গিয়েই গতি কমাচ্ছে।

সজাগ হল শ্রীদামচন্দ্র। এখানেই থাকবে ভুণ্ডুবাবুর লোক। ঠিক মত ফেলতে হবে বস্তাটা। বস্তাটার গায়ে একবার হাত বুলিয়ে নেয় শ্রীদাম। ঠিক মত বাঁধন আছে কিনা দেখে নেয়। বাঁধন ঠিকঠাক না থাকলে ওপর থেকে পড়ে সব চাল ছড়িয়ে পড়বে। চলন্ত ট্রেনের ছাদে খাড়া হয়ে দাঁড়াল শ্রীদাম। ছুটন্ত গাড়ির ছাদে ব্যালেন্স রেখে দাঁড়ানর কায়দাটা এ লাইনে নেমে রপ্ত হয়ে গেছে। দরকার হলে চালু গাড়ির ছাদে ছোটাছুটিও করতে পারে সে। শ্রীদাম একটু এগিয়ে যায় বস্তাটা নিয়ে। ওপাশ থেকে একটা মেলগাড়ি আসছে। বস্তাটা ছাদের কিনারায় রেখে সোজা

হয়ে দাঁড়ায় শীদাম। মাথার ওপর টাঙ্গানো তার সামান্য ছুঁয়ে ফেলে তাকে।

*

শেষ লোক্যালটা পার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কুয়াসা ছড়ানো মাঠ প্রান্তরে শিয়াল ডাকছে থেকে থেকে। হিম পড়ছে মাথার ওপর। হিমভেজা চাঁদটা ঝুলে আছে আকাশের গায়ে। এক ঠেঙে একটা বাজপড়া তালগাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে কাঁচা সড়কের বাঁকের মুখে। আচমকা চোখ পড়লে ভয় পেতে হয়। শেষ লোক্যালটা চলে যাওয়ার পর থেকেই পথের দিকে ঠায় চোখ পেতে রেখেছে সাবিত্রী। কিন্তু কৈ। মানুষটা আসছে না তো। কেমন যেন ভয় ভয় করে সাবিত্রীর। সারা শরীর ছম ছম করে ওঠে। এর পর তো আর গাড়ি নেই। না বলেও তো সে কোথাও রাত কাটাবার মানুষ নয়। আর দাওয়ায় বসে থাকতে পারে না সাবিত্রী। দরজায় শৈকল এঁটে স্টেশনমুখো হাঁটতে শুরু করে। কুয়াসায় সিবে রেখেছে চার পাশ। গাছের মাথায় মাথায় হিম ঝরছে। মল্লিক বাঁধের ওপর দিয়ে মালগাড়ি পার হওয়ার শব্দ আসছে। একটানা শব্দ উঠছে ঘটাং ঘট, ঘটাং ঘট।

কেমন যেন আচ্ছন্নের মত এগিয়ে চলছিল সাবিত্রী। পায়ে পায়ে কতটা পথ পার হয়ে এসেছে খেয়ালই পড়ে নি। বাঁধের মুখে রাস্তাটা যেখানে উঁচু হয়ে বাঁক নিয়েছে সেখানটায় আসতেই সম্বিত ফিরল তার। আর ঠিক তখনই যেন কুয়াশার পর্দা সরিয়ে মাটি ফুঁড়ে চোখের সামনে দাঁড়াল মানুষটা। তার নেশা জড়ান গলা শুনেই ভেতরটা হিম হয়ে গেল সাবিত্রীর। ঝাপানডাঙার স্টেশন বাজারের কাপড়ের দোকানদার সেই পালমশাই। মদ গিলে বেহেড মাতাল হয়েছে। ঠিকমত দাঁড়াতে পারছে না। সাবিত্রীকে দেখেই কিন্তু ঠিক চিনেছে পাল। জড়ান গলায় ডাক শুরু করেছে।

—এই যে গো সাবিত্তির উদিকে কোথায় যাচ্ছ। ইদিকে এসো। তোমার জন্যে আমি এতটা পথ ছুটে এলুম। টলতে টলতে সাবিত্রীর দিকে এগিয়ে যায় পাল।

—পথ ছাড়ুন, আমি ইস্টিশানে যাব। আমার স্বামী এখনও ফেরে নি। খবর করতে যাব। পথ ছাড়ুন।

—তোমার স্বামীর খবর দিতেই তো এলম গো বৌঠান। তোমার শ্রীদাম আর ফিরবেক নাই। ট্রেনের তার ছুঁয়ে শেষ হয়ে গেইছে লিঙ্গুয়ায়। সাড়ে নটার লোক্যালে খবর নিয়ে এসেছে ছানার ব্যাপারীরা। খবর শুনে শ্রীদামের বন্ধু-বান্ধবেরা সব গেল দশটার লোক্যালে। কি গো সাবিত্তির আবার উদিক কোথায় যাচ্ছ? আর খবর নিতে যাবার কী আছে?

শ্রীদাম তো শেষ। একদম ফিনিশ। রিলিফ-টিক চুল্লীতে একদম ফটাস। খ্যাক খ্যাক করে হাসতে হাসতে সাবিত্রীর দিকে এগিয়ে যায় মুকুন্দ পাল। পথ জুড়ে দাঁড়ায় প্রায় সাবিত্রীর শরীর ছুঁয়ে।

সাবিত্রীর মাথার মধ্যে তখন সমস্ত পৃথিবী ঘুরপাক খায়। কুয়াশার আস্তরণের চেয়েও গভীর কোন আস্তরণ যেন ঢেকে ফেলেছে পৃথিবীটাকে। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে। কোনমতে সমস্ত শরীরের বল একত্র করে একটা ঠেলা দেয় সে পালকে। নেশার বেসামাল পাল আচমকা ঠেলা খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। সাবিত্রী তীর বেগে বাঁধের দিকে ছুট লাগায়। হাল ছাড়ে না পাল। ঝেড়ে-ঝুড়ে উঠে সেও পিছু নেয় সাবিত্রীর। জড়িত গলায় চিৎকার করে, দাঁড়াও গো সাবিত্তির। অত সতীত্ব ফলিও না। দ্যাখ তোমার জন্যে কেমন একটা সোন্দর শাড়ি এনেচি। এক তাড়া নোট এনেচি। ভাবনা কি তোমার। আমি তো রইলম। খ্যাপা ষাঁড়ের মতই সাবিত্রীর পিছনে গোঁ নিয়ে টলমলে পায়ে ছুট লাগায় পাল।

ঝাপানডাঙার পথে বাঁধের পাড়ে উঠেই পিছনে তাকায় সাবিত্রী। মাতালটা প্রায় এসে পড়েছে। হাত সামনে এগিয়ে কঙ্কাটার মত ছুটে আসছে। বাঁধের উঁচু পথ ছেড়ে ঢালু পাড়ের এবড়ো-খেবড়ো পথটা দিয়ে নিচের দিকে নামতে চেষ্টা করে সাবিত্রী। হঠাৎ কেমন যেন ঘুরে যায় মাথাটা বাঁধের ঢালু পাড় বেয়ে গড়াতে গড়াতে গিয়ে পড়ে বাঁধের জলে।

পরদিন দুপুরের লোক্যালে চ্যাটাই মুড়ে শ্রীদামের জ্বলে যাওয়া শরীরটা নিয়ে যখন ফিরল তার বন্ধু-বান্ধবরা তখনই সাবিত্রীর লাস জ্বালানোর হুকুম দিয়ে ফিরে গেলেন ঝাপানডাঙার বড় দারোগা। বাঁধের লাল ধুলো উড়িয়ে তার জীপটা শ্রীদামের সঙ্গীসাথীদের সামনে দিয়েই চলে গেল। ওরা এগোচ্ছিল শ্রীদামের ঘরের দিকে। হঠাৎ দাঁড়াল বাঁধের পাড়ে লোকজন দেখে। খানিকটা এগোতেই ওদের নজরে পড়ল বাঁধের পাড়ের ঢালু জমিতে কে যেন পড়ে আছে। আরও খানিকটা এগোতেই ওরা দেখল সাবিত্রী সেখানে নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে শ্রীদামের প্রতীক্ষায়।

শ্রীদামের ছেলেবেলার বন্ধু বনমালী ধরা গলায় বলল—মাণিকে আর দেরি করিস না চিতা সাজা। এক চিতাতেই শুইয়ে দিই দুজনকে।

কণ্ঠসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত ও নৃত্য শিক্ষাকেন্দ্র

মেট্রোপলিটন কলেজ

পরিচালনা ও শিক্ষাদানে

শ্রীচিন্ময় লাহিড়ী

ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁ

সুযোগ্য পুত্র

গোলাম সবীর খাঁ

ও

শ্রীঅখিলবন্ধু ঘোষ

রবীন্দ্রসঙ্গীত ও অন্যান্য বিষয়ের জন্য

বিশিষ্ট বেতারশিল্পী

২৪১/১, ডায়মণ্ডহারবার রোড, বেহালা

ফোন : ৪৫-০৯৩৯

চিত্ত বিনোদনে অতুলপ্রসাদ

সৌম্যেন্দ্রনাথ গুপ্ত

যাঁকে বিবাহ করবো তিনি আমার ঘনিষ্ঠ, আত্মীয়া—যাদের মধ্যে বিবাহ বাংলাদেশের বিবাহ আইনের বহির্ভূত তাছাড়া সামাজিক অনুমোদনও নেই তাই আমরা স্কটল্যাণ্ডের একটা ছোট জায়গায় গিয়ে বিবাহিত হলাম। এক বছরের মধ্যে আমাদের বয়স্ক পুত্র সন্তান হয় এবং ছোট শিশু পুত্রকে ইংলণ্ডের মাটিতেই সমাধিস্থ করতে হোল। বিলাতেও পসার জমাতে পারলাম না তার উপর একটি ছেলেকে হারিয়ে আমার স্ত্রী খুবই শোকে অভিভূত হয়ে পড়লেন। বাধ্য হয়ে এ বছরে (১৯০২) সপরিবারে দেশে ফিরে এলাম। এসে দেখলাম এই বিবাহের জন্য আত্মীয়স্বজন, সামাজিক বন্ধু-বান্ধব প্রায় সবাই আমাদের সংশ্রব ত্যাগ করেছেন কেবল দু-একজন ছাড়া। রংপুরে কয়েকদিন চেষ্টা করে লক্ষ্ণৌতে গিয়ে বসলাম এবং এখানেই মনে হচ্ছে বিধাতা আমার উপর কৃপা দৃষ্টি দিতে সুরু করেছেন। শীতকালে দার্জিলিং-এ কোন আত্মীয়স্বজন বা পূর্ব পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা খুবই কম এই বিবেচনা করে সপরিবারে এই শীতেই দার্জিলিং-এ এসেছি। আপাততঃ আমার স্ত্রী ও বড়ছেলে বাড়িতে ফায়ার প্লেসে-এর ধারে বসে শরীরে তাপ লাগাচ্ছেন সেই অবসরে একটু বেড়াতে বেরিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে বহুদিন পর আপনার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।

মনোযোগ সহকারে অতুলপ্রসাদের সব বক্তব্য শুনে অহেতুক কোনও কৌতূহল-প্রসূত প্রশ্ন না করে সুবোধচন্দ্র এবার তাঁর বক্তব্য শুরু করে বলতে থাকেন—'ভাই, ১৮৬৭ সালের মার্চ মাসে আমি কলকাতায় আমার বাবা-মায়ের বড় ছেলে হিসাবে জন্মেছিলাম। ছোটবেলায় কলকাতা বয়েজ স্কুল (যার নাম পরে 'অ্যালবার্ট স্কুল' হয়)এ ছয় বছর বয়সে ভর্তি হই এবং চার বছর এই স্কুলে পড়ার পর দশ বছর বয়সে 'সিটি স্কুলে' ভর্তি হই। আমি এই স্কুলে পড়ার সময় প্রথম স্থান ছাড়া কোন দিন দ্বিতীয় হয়নি, সেজন্য ভাল পড়ুয়া ছেলে হিসাবে সেই দশ বছর বয়স থেকে নাম হয়ে গিয়েছিল। সিটি স্কুল থেকে ভালভাবে এণ্ট্রান্স পাশ করে কলেজে এসেম্বলিতে ভর্তি হলাম। বারো বছর বয়স থেকেই ইংরাজীতে ও বাংলায় বক্তৃতা দেবার ক্ষমতা জন্মায় কলেজে এসেম্বলি থেকে কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসা শাস্ত্র পড়ার জন্য ভর্তি হই। একুশ বছর বয়সে, ১৮৮৮ সালে ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এক কন্যা হিমানী দেবীর সঙ্গে আমার যখন বিবাহ হয় তখন আমি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। আমার পত্নী হিমানী দেবীর এক সহোদরা ভগিনী চারুবালার সহিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম পুত্র সুধীন্দ্রনাথের বিবাহ হয়—যাঁদের পুত্র উত্তরকালে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর নামে রাজনৈতিক মহলে খ্যাতিমান হন। আমার স্ত্রী অল্পকাল মাত্র জীবিত ছিলেন। নিঃসন্তান অবস্থায় তাঁর অকাল মৃত্যুর পর আমি মেডিক্যাল কলেজ পরিত্যাগ করে বিলাতে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাশাস্ত্র পড়ার জন্য দেশ ত্যাগ করে মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে ১৮৯১ সালে তথায় চলে যাই। কয়েক বছর এডিনবরায় ডাক্তারী পড়ার পর শারীর বিজ্ঞান বা ফিজিওলজি পড়তে শুরু করি। রয়্যাল কলেজ অফ ফিজিসিয়ানস অফ এডিনবরা-র রিসার্চ ল্যাবরেটরীতে কিছুকাল গবেষণা করে এবং সাত বছর এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন শেষ করে আমি বয়েল সোসাইটিতে ফেলো নির্বাচিত হই। এফ আর এস ই হবার পর তিন বছর কার্তিক ইউনিভার্সিটিতে শারীর বিজ্ঞানের অধ্যাপকের কাজ করি। আমি ধনীর সন্তান ছিলাম না, সেজন্য বিদেশে যখনই অর্থ কষ্ট হয়েছে তখনি আমি ছাত্র পড়িয়ে, ফটোগ্রাফ তুলে ও পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে কিছু উপার্জন করে ও আমার বাবার পাঠানো সামান্য মাসিক সাহায্য নিয়ে আমার বিলাতের খরচ চালাতে হয়েছে।' এইভাবে বিলাতে থেকে লেখাপড়া খুবই কৃতিত্বের সঙ্গে শেষ করে ও পরীক্ষা পাশ করে গত বছরে অর্থাৎ ১৯০১ সালে চৌত্রিশ বছর বয়সে দেশে ফিরেছি।

গত বছর অর্থাৎ ১৯০১ সালে দেশে ফিরে চাকুরীর চেষ্টায় আমি তৎকালীন বাংলার লাটসাহেব স্যার জন উডবার্নের সঙ্গে দার্জিলিঙে এসে দেখা করি ও তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে একটি শারীর বিজ্ঞান বিভাগ খোলার জন্য সব দায়দায়ীত্ব দেন। আপাততঃ যজ্ঞানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের চতুর্থ কন্যা মণিকা দেবীর সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির হয়েছে। বিয়ে হবে এই বছরের (১৯০২) ডিসেম্বর মাসে, কারণ মণিকা দেবীর দিদি সুনীতি দেবী অর্থাৎ কুচবিহারের মহারাণী বিলেত থেকে ফিরে এলে। আমি গতবছরে লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে দার্জিলিং-এ এসেছিলাম কিন্তু এবারের মত শীতে এত কষ্ট পাইনি। আমার হবু বধূ তাঁর ভাই-বোনের সঙ্গে আপাততঃ এখানে আছেন এবং ওঁদেরই আমন্ত্রণে এই শীতে এখানে এসেছি। জীবনে শীতে এত অসহ্য কষ্ট পাইনি।' এক একবার ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে কলকাতায় শীতের হাত থেকে বাঁচার তাগিদে কিন্তু এঁদের আদরযত্নে এমনই বাঁধা পড়ে গেছি যে কার্যতঃ পালাতে পারছি না। কিন্তু তাই সত্যিই আমি শীতে অত্যন্ত কাবু হয়ে পড়েছি।' অতুলপ্রসাদ সব কথা শুনে বললেন—'দাদা, দশ বছর ধরে ইয়োরোপের শীত প্রধান দেশ ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডে কাটিয়ে এসে দেশের শীত আপনাকে কাবু করেছে, খুবই আশ্চর্যের কথা। তা আপনি আপনার বিলাতের তৈরী শীতের পোশাক পরে বেরুলেই পারতেন।' মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সুবোধচন্দ্র প্রতিবাদ করে অতুলপ্রসাদকে বলেন—বিলেতের তৈরী গরম পোশাক? কি বলছেন আপনি, আমি পা থেকে মাথা পর্যন্ত সব বিলিতি ও গরম আচ্ছাদনে সর্বশরীর আবৃত করেও আমার এই দশা।' কি পরেছি দেখুন, পায়ে এই যে জুতো জোড়া দেখছেন, এর ওজন যে কী তা না পরলে বুঝতে পারবেন না। পায়ের তলা দিয়ে শীত যাতে প্রবেশ করতে না পারে সে-বিলেতে স্পেশ্যাল সোল ও শুকতলা

সব থেকে মোটা চামড়া দিয়ে এই জুতো জোড়া বানিয়েছিলাম। প্যান্টের পায়ের অংশ অল্প তুলে অতুলপ্রসাদকে দেখিয়ে বলেন, এই দেখুন একটু ব্রাউন ও একটা সাদা গরম উলে তৈরী পরপর দু জোড়া মোজা পরেছি। অঙ্গে আছে ২টি ফ্ল্যানেল-এর ড্রয়ার্স ও দুটো গরম গেঞ্জি, উপরে আছে গরম ফ্ল্যানেল-এর সার্ট, গলাবন্ধ করার জন্য গরম 'বো', সার্টের উপরে পরেছি টুইড-এর ওয়েস্ট কোট ও তার উপরে টুইড-এর গরম কোট। গরম প্যান্টটা তো দেখতেই পাচ্ছেন। এসবের ওপরে কত মোটা ভারী ও গরম ওভারকোট পরেছি—একবার ধরে দেখুন। হাতে একটা উলের দস্তানা তার উপরে মোটা চামড়ার হ্যাণ্ড-গ্লাভস, মাথায় পরেছি ফেল্ট হ্যাট, তাছাড়া একটা উলেন স্কার্ফ তো আছেই—সুতরাং গরম কাপড় জামার কিছু বাকী নেই আর পরবার।' অতুলপ্রসাদ খুব গম্ভীর হয়ে সুবোধচন্দ্রের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বলে ওঠেন—'দাদা, আমি তো সাধারণ শীত বস্ত্র পরে ওভারকোট, হাত-দস্তানা ছাড়াই ঘুরে বেড়াচ্ছি, আমার তো খুব একটা মারাত্মক শীত বলে মনে হচ্ছে না।' সুবোধচন্দ্র জবাব দেন—আপনি কম বয়সী ছোকরা মানুষ, আপনার এখন বয়ং ব্র্যাড, শরীর এমনিতেই গরম। আর আমি তো বয়োবৃদ্ধ। অতি কষ্টে হাসি চেপে অতুলপ্রসাদ—তা ঠিক, তা ঠিক বলে মৌখিক সমর্থন জানালেও মনে মনে তিনি ভাবলেন এই শীতকাতরে ভদ্রলোক দশ বছর ধরে বিলাতের মত স্থানের অসহ্য শীতে বাস করে এসে নিজেকে বৃদ্ধতর দোহাই পেড়ে নিজের মনকে সান্ত্বনা দিতে ব্যস্ত, অথচ ১৯০২-এ অর্থাৎ ঘটনার কালে সুবোধবাবুর বয়স ছিল বছর পঁয়ত্রিশ আর অতুলপ্রসাদের একত্রিশ। হঠাৎ অতুলপ্রসাদের রসিক মন বয়স জবাব দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য — [illegible]

সুবোধচন্দ্রকে বলেন—'সত্যি আপনার অবস্থা দেখে খুবই মনে কষ্ট হচ্ছে। ঠিকই তো, আপনি গরম কাপড়চোপড় দিয়ে সারা শরীরকে সব দিক দিয়েই মুড়ে ফেলেছেন, একটা ছিদ্রও নেই যার ভেতর দিয়ে ঠান্ডা ঢুকে আপনার এত বিলাতী গরম পোষাক পরা সত্ত্বেও দেহে কাঁপুনী জাগাতে পারে। তবে দাদা, একটা বিষয়ে আপনি সম্ভবতঃ নজর দিতে ভুলে গেছেন। আপনার চোখে সোনার ফ্রেমে কাঁচ লাগানো চশমা দেখছি। ধাতুর ফ্রেমে ও কাঁচে কাঞ্চনজঙ্ঘার মত বরফের পাহাড় ছুঁয়ে ঠান্ডা হিমেল ঋতাস এসে আপনার কাঁচশুদ্ধ সমস্ত চশমাটিকে হিমশীতল করে দিচ্ছে ফলে সেই ঠান্ডার পরশ আপনার সারা মুখে, চোখে, নাকে কপালে লেগে শীতের ভাবটা বাড়িয়ে দিচ্ছে, শুধু তাই নয়, আপনার চোখের তারা ভেদ করে হিমালয়ের হিমপ্রবাহ আপনার শরীরের ভিতরে ছড়িয়ে যাচ্ছে যার ফলে আপনি শীতে এত অস্থির বোধ করছেন। আপনি শীত থেকে রক্ষা পাবার জন্য এতসব গরম জামাকাপড় পরেছেন কিন্তু সেই সঙ্গে যদি একটা ফ্লানেল-এর চশমা পরে দার্জিলিঙে আসতেন'....কথাটা শুনে দু বন্ধুই প্রথমে খুব গাম্ভীর্যের সঙ্গে পরস্পরের দিকে মিনিটখানেক বটগট্ করে তাকিয়ে থাকলেন—তারপর একই সঙ্গে 'হো হো' শব্দে উচ্চ হাসিতে দুজনেই ফেটে পড়লেন। সুবোধচন্দ্রেরও রসজ্ঞান বিলক্ষণ ছিল—তিনি অতুলপ্রসাদের পিঠ চাপড়ে বলে উঠলেন—'ব্র্যাভো মাই ফ্রেন্ড, ভেরী ওয়েল সেড, আই ডু এ্যাডমায়ার এ্যান্ড অ্যাপ্রিসিয়েট ইয়োর বেডি উইট এ্যান্ড গুড সেন্স অফ হিউমার'—এই কথা বলে সুবোধচন্দ্র অতুলপ্রসাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গন্তব্যস্থানের দিকে যাত্রা শুরু করলেন আর অতুলপ্রসাদও তাঁর বাসার দিকে পা বাড়ালেন।

(আট)

উনিশ শতকের শেষে সবেমাত্র প্রথমবার বিলেত থেকে অতুলপ্রসাদ দেশে ফিরেছেন ব্যারিস্টার হয়ে তখন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় 'খামখেয়ালী সভার' মজলিশে যোগ দেবার জন্য বঙ্গ সংস্কৃতির বিদগ্ধ মানুষদের ডাক দেন এবং সে ডাকে সাড়া দিয়ে সঙ্গীত, নাটক, শিল্পী জগতের অনেক বিকপাল ও গুণী ব্যক্তিরা এসে রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে ভীড় করেছিলেন আসর জমাবার জন্য।' ইংরাজি শিক্ষাদীক্ষায় ও সাহেবীআনায় পাকাপোক্ত হলেও অতুলপ্রসাদ চিরদিনই ছিলেন বঙ্গ সরস্বতীর একনিষ্ঠ পূজারী ও সাধক। বাংলা ভাষা, সাহিত্য, কাব্য ও গান তাঁর ছিল আজীবনের একমাত্র ব্রত। আইনের আঙিনা কোন দিনই তাঁকে ততটা প্রলুব্ধ করতে পারে নি, যতটা সাহিত্য, কাব্য ও সঙ্গীতের মজলিশ তাঁর রসিক মনকে আকর্ষণ করতো। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে

পাদটীকা

* প্রফেসর ইমারিটস্

সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ মহাশয় ১৮৬৭ সালের ৪ঠা মার্চ (বাংলা ১২৭৩ সনের ফাল্গুন মাস) কলকাতা শহরে তাঁর পিত্রালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা জেলার (বর্তমানের বাংলাদেশ) অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণার পণ্ডসার গ্রাম নিবাসী 'গুরুচরণ মহলানবীশের তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন।'

গুরুচরণবাবু তৎকালীন পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের সামিল হন ও পরবর্তীকালে সস্ত্রীক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে কলকাতায় চলে এসে কর্ণওয়ালীশ স্ট্রিটের উপর (বর্তমানের বিধান সরণী) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের পাশে বাড়ী করেন। ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়, (স্যামাপুকুর লেনের) মহলানবীশ কোং নামক ঔষধালয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাতা গুরুচরণবাবু সেকালের একজন প্রথম সারির ব্রাহ্মসমাজ নেতারূপে পরিগণিত হন। গুরুচরণবাবুর যথাকালে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন—সুবোধচন্দ্র ও প্রবোধচন্দ্র এবং এই দুই ভাই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে যথেষ্ট কৃতিত্ব ও সুনাম অর্জন করেন। একুশ বছর বয়সে সুবোধচন্দ্র ও প্রবোধচন্দ্রের বিবাহ দেন। সুবোধচন্দ্র প্রথমে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক মাসীমাকে বিবাহ করেন কিন্তু বিবাহের পর স্বল্পকাল মাত্র জীবিত ছিলেন।' দ্বিতীয়বার ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের চতুর্থ কন্যা মণিকা দেবীকে বিবাহ করেন ও তাঁদের তিনটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেন। পুত্ররা অল্প বিস্তর সবাই কৃতী—বর্তমানে দ্বিতীয় ও কনিষ্ঠপুত্র জীবিত আছেন।' গুরুচরণবাবুর কনিষ্ঠপুত্র প্রবোধচন্দ্র স্যর (ডাক্তার) নীলরতন সরকার মহাশয়ের এক ভগিনীকে ২১ বছর বয়সে বিবাহ করেন এবং তাঁদেরও দুই পুত্র সন্তান ও চারটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। প্রবোধচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্ববিখ্যাত সংখ্যাতত্ত্ববিদ 'প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের নতুন করে পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। কনিষ্ঠপুত্র 'প্রফুল্লচন্দ্র—যিনি বুলা মহলানবীশ' নামে অধিকতর পরিচিত ছিলেন তিনি তাঁর পিতৃদেব প্রবোধচন্দ্র ও মাতুল ডাঃ নীলরতন সরকার কর্তৃক যৌথভাবে প্রতিষ্ঠিত সেকালের বিখ্যাত অভিজাত খেলার ও বাদ্যযন্ত্র সরঞ্জামের বিপণী 'কার এ্যান্ড মহলানবীশ (সংক্ষেপে কারনবিশ কোম্পানিতে পিতার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন ও ভাল বাঁশী বাজাতেন বলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয় ছিলেন। প্রবোধচন্দ্রের জামাতাদের মধ্যে পাটনার ডাকতার * শরদিন্দু ঘোষাল ও খ্যাতনামা বাধ্যপক সুশোভন সরকার মহাশয় বিদগ্ধ সমাজে সুপরিচিত।

সুবোধচন্দ্র স্কুলজীবন থেকেই যথাযথ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে বি-এস-সি ডিগ্রী লাভ করার পর এডিনবরার রয়েল কলেজ অফ ফিজিসিয়ানস-এর অন্তর্গত বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে কিছুকাল কাজ করেন ১৮৯৭ পর্যন্ত। তারপর এডিনবরার রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। ১৮৯৭-৯৯ পর্যন্ত ওয়েলস-এর অন্তর্গত কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীর বিজ্ঞানের বা ফিজিওলজির অধ্যাপকের কাজ করেন। তারপর কলকাতায় ফিরে এসে সাতাশ বছর যাবৎ ১৯০১—১৯২৮ পর্যন্ত প্রেসিডেন্সী কলেজে শারীর বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদে আসীন থাকেন। ১৯০৪ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' এবং ১৯১৬ থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হন। বোর্ড অফ হায়ার স্টাডিজ ইন ফিজিওলজির এবং হেড অফ দি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপার্ট অফ ফিজিওলজি, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি হিসাবে ১৯১৬ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত কাজ করেছেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের সরকারী চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি বহুকাল আর জি কর মেডিকেল কলেজে (তখন নাম ছিল কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ)এর ফিজিওলজির হেড অফ দি ডিপার্ট হিসাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯১৬-১৯১৮ পর্যন্ত প্রেসিডেন্সী কলেজের ফিজিওলজি ডিপার্ট-এর ডীন হয়েছিলেন। তিনি ফিজিওলজিক্যাল সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া-র ফাউণ্ডার প্রেসিডেন্ট, এবং ১৯৩৭—১৯৪০ পর্যন্ত বোটানিক্যাল সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়ারও সভাপতি ছিলেন। ১৯২০ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ সাইন্স-এর গভর্ণিং বডির সদস্যরূপে কাজ করেছেন। ১৯৩৮এ কলকাতায় অনুষ্ঠিত সায়েন্স কংগ্রেসের শারীর বিজ্ঞান শাখার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। বিদ্যা ও বিজ্ঞানের অঙ্গনের বাইরেও তিনি নানা কাজে জড়িত ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভাপতি হিসাবে ১৯৪০ সাল থেকে কয়েক বছর সভাপতির কাজ করে গেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ১৯০৮ সালে তাঁকে কেম্ব্রিজ-এ অনুষ্ঠিত চার্লস ডারউইন-এর জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসবে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। তিনি অনেক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ও বই রচনা করে গেছেন। তিয়াশি বছর বয়সে পার্ক স্ট্রিটের নিজের বাড়িতে ১৯৫৩ সালের ১লা আগস্ট শনিবার তারিখে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর সাধ্বী পত্নী মণিকা দেবী কয়েক বছর পূর্বেই প্রয়াত হয়েছিলেন।

তিনি 'খামখেয়ালী সভায়' কনিষ্ঠতম সভ্য হিসাবে যোগ দিলেন। নতুন ব্যারিস্টার হিসাবে তখন কলকাতার হাইকোর্টে পসার জমাবার জন্য যাওয়া-আসা করছেন। তখনকার দিনে বাঘা বাঘা সব পুরানো নামকরা ব্যারিস্টারদের সঙ্গে পাল্লা দেবার শক্তি তাঁর কোথায়? শুকনো আইনের খটাখটি তাঁর রসিক মনের সঙ্গে কিছুতেই যেন আর খাপ খায় না। তাই তিনি সুযোগ পেলেই হাইকোর্ট ছেড়ে-ছুটে চলে যেতেন রবীন্দ্রনাথের কাছে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে—সাহিত্য-সঙ্গীত-মধু আহরণের চেষ্টায়। এই সময় থেকে অতুলপ্রসাদের রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে নিয়মিত যাওয়া আসা শুরু হয় এবং সেখানে, রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর যেসব গুণীজনের সান্নিধ্য তখন ঘটেছে তাঁদের মধ্যে ছিলেন ঠাকুর পরিবারের দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ সমরেন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ প্রভৃতি এবং বহিরাগতদের দলে থাকতেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, জগদিন্দ্রনাথ রায়, লোকেন্দ্র পালিত, রাধিকামোহন গোস্বামী, লালচাঁদ বড়াল। গান শোনা, গান গাওয়া ছাড়া এঁদের মুখে সঙ্গীত, নাটক, সাহিত্য, কাব্য, দর্শন ও চিত্রশিল্প সম্বন্ধে আলোচনা শুনে অতুলপ্রসাদ মুগ্ধ হতেন। তখনও 'খামখেয়ালী সভায়' জন্ম হয়নি—যদিও খামখেয়ালীর মজলিশে এঁদের অধিকাংশ বাঞ্ছিত সদস্যরূপে উপস্থিত থাকতেন, একমাত্র কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ছাড়া। কারণ সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কিছু ভুল বোঝাবুঝির জন্য দ্বিজেন্দ্রলাল জোড়াসাঁকোর সঙ্গে সংস্রব ছিন্ন করেন, ১৩১২ বাংলা সনের আশ্বিন মাসে মহালয়ার দিন (সম্ভবতঃ ১৯২৫ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসে) এলাহাবাদস্থিত বিখ্যাত ইণ্ডিয়ান প্রেসের কাশী শাখার মুদ্রণালয় থেকে 'উত্তরা' নামে প্রবাসী বাঙালীদের প্রয়োজনে ও সমর্থনে একটি বাংলা সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করেন স্বয়ং অতুলপ্রসাদ সম্পাদকের দায়দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে নিয়ে। এই পত্রিকাটি প্রকাশনের ব্যাপারে তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছিলেন কাশীবাসী শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী নামে এক সাহিত্য-পাগল ভদ্রলোক। পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশের নানারকম পরিকল্পনা—প্রচ্ছদপট আঁকানো, রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আশীর্বাণী জোগাড় লেখকদের তালিকাপ্রস্তুত, পৃষ্ঠাব্যাপী বিজ্ঞাপন জোগাড় ব্যাপারে সুরেশবাবুর অনুরোধ মত অতুলপ্রসাদ তাঁর নিজের যোগাযোগ, পরিচয় ও বন্ধুত্বের মাধ্যমে সবকিছু করে দেন এবং প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীসমিও হালদারকে দিয়ে প্রচ্ছদপট আঁকানো, রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে রচনা ও কবিতা সংগ্রহ করে দিয়ে 'উত্তরা' প্রথম সংখ্যাটিকে খুবই চিত্তাকর্ষক করেন। সুরেশবাবুর 'উত্তরাকে' শ্রীমণ্ডিত ও সুধার্থ সাহিত্য পত্রিকারূপে

সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ

গড়ে তোলার অদম্য বাসনা ছিল এবং তার জন্য সব কাজই ছোটাছুটি করে চটপট কাজ সারতেন। অতুলপ্রসাদ সুরেশ চক্রবর্তীকে অত্যন্ত স্নেহের চোখে দেখতেন এবং তাঁর এই চটপট কাজ করার জন্য প্রশংসাও করতেন। অনেক সময় মজা করে অতুলপ্রসাদ সুরেশবাবুকে 'সুরেশ চক্রবর্তী' নামের বদলে 'সুরেশ চটপটি' বলে সম্বোধনও করতেন। উত্তরার প্রথম সংখ্যাটি যেদিন প্রকাশের পর কাশী থেকে সুরেশবাবু লক্ষ্ণৌতে অতুলপ্রসাদকে এনে দিলেন, সেদিন তাঁদের দুজনের কী আনন্দ। সেই খুশীর চোটে অতুলপ্রসাদও সবে প্রকাশিত তাঁর গানের বই—'কয়েকটি গান'-এর একটি কপি নিজের হাতে নাম সই করে সুরেশবাবুকে উপহার দেন। হঠাৎ অতুলপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করে বসলেন সুরেশবাবুকে—'আচ্ছা সুরেশবাবু তো তাঁর গানের বইগুলোর সুন্দর সুন্দর নাম দিয়ে থাকেন—যেমন, গীতালি, গীতালিপি এসব। মালবিকা, চন্দ্রালিকা, তমালিকা, কাননিকা আরও কি।

'বিসর্জনিকাটা' দেন নি না?'—বলে হি হি করে হেসে নিলেন। রাসভারী ব্যারিস্টার ও ধীর স্থির জননেতা অতুলপ্রসাদের রসরসে ভরপুর রসিক, চিত্তবিনোদিনী ও মজলিশী চরিত্রের ছবিটি অহরহ ফুটে উঠত। 'উত্তরা'র প্রথম সংখ্যায় অতুলপ্রসাদ রচিত গান—'তাঁহারে বলিব বল কেমনে'—ভগিনী সাহানা দেবী-কৃত স্বরলিপিসহ প্রকাশিত হয় যদিও পরে অতুলপ্রসাদের আরও কয়েকটি গানও পত্রিকাটিতে স্থান পায় তার মধ্যে 'এবনেতে বনমালী' গানটি অন্যতম।

(নয়)

এবার আরেকটি ঘটনার কথা বলি। অতুলপ্রসাদের কোর্টে যাবার সময় এগিয়ে এসেছে এমন সময় একদিন সকালে মধ্যবয়সী সুবেশ ভদ্রলোক এক সুসজ্জিতা মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে অতুলপ্রসাদের বাড়ীর গেট দিয়ে ঢুকে সোজা বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। গাড়ী বারান্দার সামনে অতুলপ্রসাদের কাজকরী গাড়ার মোটরগাড়ী তৈরী। পাশে উর্দিপরা ড্রাইভার প্রস্তুত। অন্য পাশে তাঁর নথিপত্র নিয়ে মুহুরীজীও দাঁড়িয়ে। এমন সময় ভিতর থেকে ব্যারিস্টারের পোশাকে সজ্জিত অতুলপ্রসাদের আবির্ভাব। আগন্তুকদের সামনে। 'আপনাদের তো ঠিক চিনতে পারলাম না'—বললেন অতুলপ্রসাদই প্রথমত পেয়ে ভদ্রলোক জবাব দেন—'সত্যিই আমরা খুব দুঃখিত, বড় অসময়ে আপনার কাছে এসে পড়েছি'—ভদ্রমহিলা এই উক্তিটির শেষ টেনে বলেন—'আপনার গান আপনার কণ্ঠে শোনার আমাদের বড় ইচ্ছে বহু দিনের, ভেবেছিলাম এ যাত্রায় সে সাধটি মিটিয়ে যাব। তা আর হোল কই? আমাদের যে আজকের ট্রেণেই কলকাতায় ফিরে যেতে হবে। এখুনি তো দেখছি আপনি বেরিয়ে যাচ্ছেন।'

'এখন তো আমার বসার সময় নেই—আপনারা যদি অন্য সময়ে...' এ কথা অতুলপ্রসাদের মুখে শুনেই অসহায় মহিলা কাতর কণ্ঠস্বরে আবার বলেন—'আজই তো এখান থেকে চলে যাচ্ছি আমরা, উপায় নেই থেকে যাবার।' তাই তো কথাটা উচ্চারণ করেই অতুলপ্রসাদ তাঁর গলার টাইটা একটু নেড়েচেড়ে আলগা করে নিয়ে ঐ বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রথমে গুণ গুণ করে পরে আর একটু উঁচু গলায় স্বরচিত গানের একটি পংক্তি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শেষ করে হাতজোড় করে অতিথিদ্বয়কে নমস্কার জানিয়ে হেসে—'এবার তাহলে চলি'—বলে দাতারী অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন। নিরাশার ঘন কুয়াশা এভাবে কেটে যাওয়াতে এবং আশাতীত ফল লাভ করে সঙ্গীত-পিপাসু এই শ্রোতা দুজন আনন্দধারায় স্নাত হয়ে তাঁদের গন্তব্য স্থানের দিকে পা বাড়ালেন।

(চলবে)

সাম্রাজ্ঞী

সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘটে গেল ব্যাপারটা। অথচ বীরেশ্বর ব্যাপারটার জন্যে একেবারে প্রস্তুত ছিল না।

সুনন্দা যখন তখন তার ঘরের মধ্যে কখনও আসে বসন্ত বাতাসের মত, তার ঘরের জিনিসপত্র আলতো আলতো ছুঁয়ে তার মনে খুসীর আমেজ ধরিয়ে দিয়ে যায়। আবার কখনও কখনও কালবৈশাখীর ঝড়ের মত আবির্ভূত হয়ে তার ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র সই খাতা তছনছ করে মনের উত্তাপ প্রকাশ করে তাকে সন্ত্রস্ত বিপর্যস্ত করে দেয়। তারপর সেই আবার বর্ষার সজল মেঘের মত বর্ষণধারা হয়ে নেমে এসে সব উত্তাপ সব ধুলোবালি মুছে দেয়। নিজেই তখন নিজে থেকে উপযাচিকা হয়ে, ছলছল চোখে ছড়িয়ে ফেলা জিনিসপত্র, সইখাতা সব আবার নিজেই গুছিয়ে দিয়ে যায়।

বীরেশ্বরের কাছে ব্যাপারটা কিছু নতুন নয়। এ সবই সে মানিয়ে নিতে পারে। কিন্তু সেদিন সেই সাধারণ অভ্যস্ত ব্যাপার থেকে অন্য রকম কিছু ঘটে গেল।

বাড়ির তেতলায় বীরেশ্বরের ঘর। ওই একখানাই ঘর তেতলায়। ঘরখানার সঙ্গে লাগাও মস্ত বড় ছাদ। সেই ছাদে এ বাড়ির পুরানো ঐশ্বর্যের ভিতর থেকে পরিত্যক্ত একখানা কার্পেটের টুকরোর উপর আসন করে তরুণ বীরেশ্বর যোগ-ব্যায়াম করে। খুব ভোরেই ওঠে সে। যোগ-ব্যায়াম শেষ করে কার্পেটটা পরিপাটি করে গুটিয়ে বগলে নিয়ে সে ঘরে ঢুকছিল। কিন্তু দরজার মুখে দাঁড়িয়েই সে দেখলে সুনন্দা তার সযত্নে গুছিয়ে রাখা বইখাতা-পত্র হাঁটকে দেখছে। দরজার দিকে পিছন ফিরে অস্থির হাতে সে সব ঘাঁটছে।

সুনন্দার এই রাগ মনের এই অস্থিরতা তার অজানা নয়। সে নিজে ধীরস্থির, বুদ্ধিমান মানুষ। সুনন্দার এই সব উপদ্রবে অস্থিরতা সে স্নেহ ও সহানুভূতির সঙ্গেই দেখে থাকে। সে জানে মনে মনে সুনন্দার প্রতি তার স্নেহ ও মমতা সম্পর্কে যখনই সুনন্দার মনে সন্দেহ হয় তখনই সুনন্দা অস্থির হয়ে উপদ্রব আরম্ভ করে। তখন সে একদিকে চারিদিকে বীরেশ্বরের তার প্রতি অবহেলা সম্পর্কে প্রমাণ খুঁজে বেড়ায় অন্যদিকে বীরেশ্বরের মুখ থেকে স্নেহ-সমাদরের দুটো মিষ্টি-মধুর কথা শুনে আশ্বস্ত হতে চায় অনুভব করতে চায় তার সব সন্দেহ মিথ্যা, অমূলক।

বহুবার পড়া বইয়ের বিষয়বস্তুর মত এ সবই বীরেশ্বরের জানা। তাই সুনন্দার অস্থিরতা দেখেও সে ব্যস্ত হল না। শুধু

দরজার মুখে দাঁড়িয়ে একটু হেসে বললে—তোমাদেরই কি হল? কি খুঁজছ এমন করে? এই সুনন্দা কি খুঁজছ আমাকে বল। আমি খুঁজে দিচ্ছি।

সুনন্দা কিছু চাইছে না। এমনকি সে যে বীরেশ্বরের কথা শুনতে পেয়েছে তাও মনে হল না তার ব্যবহার থেকে। তাই তার মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্যে আরও সহজ আরও সরস করে বীরেশ্বর বললে—ও সুনন্দা এত তন্ময় হয়ে কি খুঁজছ? এখন বলা খোঁজাখুঁজি দেখে তাদে এসে এখনও সন্ধ্যে ওঠেনি। তাই এখনও চাঁদ ওঠেনি। পূর্ণিমার চাঁদ কেমন আস্তে আস্তে প্রস্তুত যাচ্ছে দেখা এসে

এবার ধীরে ধীরে ফিরে দাঁড়াল সুনন্দা। অপ্রস্তুতের মত তার সুন্দর মুখ। সামনাসামনি দেখে সে তার বড় বড় চোখের বিস্ফারিত দৃষ্টি দিয়ে তাকে যেন বিদ্ধ করল। বিদ্ধ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে হাত দিয়ে বললে—তোমার চেয়ারে আছে?

বীরেশ্বর তাকাল এই সময়ে একটা কিছু খুঁজছে সুনন্দা। সে হেসে বললে—এই যে পাচ্ছ। তা আমার কী আগাপাস্ত ভাল না হাঁটলে আমাকে বললেই তো হত, আমি বের করে দিতাম।

বলে বইয়ের র‍্যাকটির ঘরের যে কোণে নির্দিষ্ট স্থানে সে খাতার ও নোটটা আছে সেখান থেকে একটা খাতা তুলে নিয়ে খাতাখানা তার হাতে দিয়ে বললে—এই নাও! এই তো ছিল।

কিন্তু সমস্তক্ষণ যে খাতাখানা বীরেশ্বরের হাত থেকে নিজে অস্থির হয়ে ওঠে সে খাতাখানার পাতা উল্টে যেতে লাগল। তারপর খাতাখানা বন্ধ করে তার চোখের উপর চোখ রেখে সে চোখ দিয়ে তাকে বিদ্ধ করে বললে—এখানা নয়।

তারপর নিজে দৃষ্টিকে মুক্ত করে নিয়ে বিছানার চোখ রেখে যেন নিশ্চিন্তই বিছু, তাপন মনে সুনন্দা। তারপর মুখ ফিরিয়ে একটি মৃদু হাস্য করে—মিথ্যেবাদী।

কিন্তু বীরেশ্বরের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। একবার তার মুখে কঠিন দৃষ্টি ফুটে উঠল। সে ধীর ধীরে বললে—এসব কি বলছ তুমি?

সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে উঠল সুনন্দা—মিথ্যে বলছি। মিথ্যেবাদী। সে খাতাখানা দেখি

আমাকে দেখা বীরেশ্বর বললে—আমার কোন খাতা

যে প্রশ্ন সুনন্দা তাকে করা উচিত হয়নি। এ খাতা তো তার নিজের খাতা। এ খাতা তো তার নিজের নয়। তবে কার খাতা? এ খাতা কার?

—প্রকাশ কার? কি বলছ তুমি সুনন্দা

—তুমি কি পাগল? তুমি কি পাগল? তুমি কি পাগল?

একটু চুপ করে থেকে সুনন্দা অত্যন্ত দৃঢ় শান্ত মৃদু কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল সুনন্দা আবার দৃঢ় শান্ত মৃদু স্বরে চীৎকার করে উঠল—বল সে খাতাখানা কোথায়? এখনি বলতে যেন মারমুখের দৃষ্টিতে পাশে পাশে এগিয়ে আসতে লাগল বীরেশ্বরের দিকে।

খানিকটা ভয় পেয়ে গেল বীরেশ্বর যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে খানিকটা সরে গিয়ে চৌকির উপর পড়ে থাকা বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে।

খানিকটা এগিয়ে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে বীরেশ্বরের মুখের দিকে তাকিয়ে সুনন্দা। দৃষ্টিতে দৃষ্টিতে কাছে বীরেশ্বর আরও একটু সরে গেল। একটি সুনন্দার মুখের ভাব। মুখে ঘৃণা, নিষ্ঠুর হাসি, ঘাড় বাঁকা উঠল। সে মোড় ঘুরিয়ে বিছানার দিকে। ঘুরে—তুমি বিছানায় শুয়েছিলে। শুয়েছিলে বালিশের তলায় খাতাখানা রেখে

কম্পমান ঠোঁটের মত সমস্ত শরীরটা হাসিতে ফেলে বীরেশ্বর হাতের একখানা বাঁকানো হাত তুলে নিষ্পলা বিদ্রূপের মত হাসতে হাসতে উপহাস করে বললে—তুমি নিশ্চয়বাদী নও? খাতাখানা তার হাত থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে বলতে বলতে দৃষ্টিতে ঘোরে বললে—ও বাবা তুমি মানুষ না সুনন্দা। দেখো না। আমার খাতা তুমি এখানে মিথ্যে দাও

ঠোঁট পাশের দিকে টেনে সুনন্দা বললে—তোমাকে বিশ্বাস করে দেব? না, দেব না।

বলতে বলতে সে খাতাখানা নিয়ে তার বিস্ফারিত দৃষ্টি সুনন্দার দৃষ্টির সামনে ধরে বললে—এই দেখ তোমার নাম লেখা রয়েছে। তুমি যে সে নও তা আমি জানি। তুমি ছদ্মবেশিনী। তুমি ছদ্মবেশিনী। তুমি ছদ্মবেশিনী।

সুনন্দা তখন খাতাখানার উপর থেকে পাশের বীরেশ্বরের দিকে চোখ ফেরাচ্ছে। ঠোঁটটা কাঁপছে। কাঁপতে কাঁপতে মুখের দিকে তাকিয়ে সে বললে—আমি এই সব এটুকু পাচ্ছি না তোমার?

একটু থমকিয়ে বিস্ময়ভাবে বীরেশ্বর বললে—না, লক্ষ্য করে দেখ। তার আগে তোমাকে কথা বলতে দেব না এখনই তুমি

সুনন্দা যেন পাগলিনীর মতো হয়ে উঠেছে। সে নিজের সমস্ত মুখখানা নিয়ে তার মুখের কাছে এগিয়ে বললে—না, না, তুমি এসব যখন এনেছ আমি তোমার কোন কথা শুনব না।

—কিন্তু আমি কিছুই জানি না। কিছুতে জানি না।

একটা চাপা কণ্ঠস্বর থেকে তার গলা তুলে চীৎকার করে উঠল সুনন্দা। বললে—আমি সব জানি, সব বুঝি! মিথ্যুক, লোভী, জঘন্য চোর তুমি!

বলে সে খাতাখানা সজোরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। তারপর ছুটে ঈষৎ বীরেশ্বরের মুখের দিকে বীরেশ্বরের চোখে তার চোখ মিলতেই বীরেশ্বরের মুখের ভাব সেন সাদা হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে কথা বন্ধ হয়ে এসে আসন্ন হল। আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল সুনন্দা। কাঁদতে কাঁদতেই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

অপরাধীর মত মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল বীরেশ্বর। চুপ করে রইল পাথরের মূর্তির মত। সুনন্দা তার কাঁধের উপর যেন আশী মণ ভার চাপিয়ে দিয়ে গিয়েছে। অপরাধের ভার। সেই ভারে তার সমস্ত সত্তা যেন নুইয়ে পড়েছে।

অনেকক্ষণ পর সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সমস্ত অবস্থাটা সম্পর্কে যেন সচেতন হয়ে উঠল। প্রথমেই সে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে খিল দিয়ে দিল। তারপর প্রায়ান্ধকার ঘরের কোণে কোণে খাতাখানা সে নিচে চোখের সামনে খুলে ধরল।

আবার সে ছেড়ে ছুটে গিয়ে তার দিকের জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে এল।

তারপর খাতার এক পাতায় পেন্সিলে লেখা এই দুটো বচনের পুনরাবৃত্তি করতে করতে সমস্ত শিরদাঁড়ায় হিম সমস্ত মুখে আর দাঁড়িয়ে আছে যেখানেই তাঁর তখন পা দেওয়া সে সব মূর্তিই ভুলে অন্যমনস্ক ভাবে প্রায় নগ্ন। সেই অবস্থায় বা প্রায় পূর্ণ নগ্নতায় ঘোরা দিয়ে যতটুকু তারই সেইটুকুই যেন ও নগ্নতাকে ঢাকবার সমস্ত চেষ্টা করেছে। সংকুচিত অবস্থা তাদের ঢাকা দিয়েছে ও দেহের তাদের চুলগুলিই ও দেহের কোমলতম স্থানগুলি যেন ঢাকা দিয়েছে।

পাশের চাপিয়ে রাখা প্রথমে ও পরে মাথা নীচু করে বসে, ও তার চারদিকে চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে বীরেশ্বর এই চরিত্রহীনের অন্তরের কথা যে নিজের মনের সে যেন বুঝতে পেরেছে। ঠিক সুনন্দা চলে যাবার পর সে যেন তার নিজের মনের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজের মনের কাছে সে যেন নিজেকে বিচার করছে। নিজের মনের কাছে সে যেন নিজেকে বিচার করছে।

॥ ২ ॥

ফরমাস খাটছে।

প্রথম খাবারের সময় সুনন্দা চোখে রাতজাগা ঝাঁপ করে বন্ধ করে। নিচে বীরেশ্বর তাদের জন্যে প্রস্তুত ডিমের ওমলেট লুচি নিয়ে বসে আছে।

খাবার খাওয়া পড়ে। সে গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে—কে?

চাকর ওপাশ থেকে সাড়া দেয়—আজ্ঞে আমি ভজহরিবাবু যে ঘরে থাকেন তাঁকে ডাকছেন।

চাকর উত্তর করে—আজ্ঞে ডাকছে

সুনন্দা যা ঘরখানিতে থাকার তাকে পাঠিয়েছেন। বীরেশ্বর একটু চুপ করে থেকে বললে—তুমি যাও আমি যাচ্ছি. একটু পরে যাচ্ছি।

দরজার এপাশ থেকে বীরেশ্বর বুঝলে উমেশ নেমে গেল পায়ের শিকার পট পট শব্দ তুলে। তার পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতেই ঘরের দরজা খুলে বীরেশ্বরও নেমে চলে গেল। চলে গেল একেবারে নীচেতলার অন্দর মহলের খিড়কির দরজা দিয়ে সে তাড়াতাড়ি চলে গেল পুকুরের সঙ্গে বাগানে।

সূর্য উঠেছে সদ্য। নরম নরম রাঙা আলো পড়েছে আম, জাম-বট আর লিচু-গাছের মাথায়. শিশিরভেজা ঘাসের উপরে বড় বড় আমগাছের মাথা পার হয়ে পড়েছে পুকুরের শান্ত স্থির জলে পানাড়ির পাতায় ওপর। ঘাসের পাতার মাথায় একলানা শিশিরে সেই আলোর ছটা সাতটা রং নিয়ে একবার ছিটিয়ে এসে লাগল বীরেশ্বরের চোখে। সে শিশির-ভেজা ঘাসের উপর দিয়ে হেঁটে পা ভিজিয়ে বাঁধানো ঘাটের কাছে দাঁড়িয়ে পায়ের তল, ভিজে ঘাসের কুটো ঝেড়ে ফেলতে লাগল।

ঘাটের বাঁধানো চাতালের দুদিকে মানুষপ্রমাণ উঁচু মর্মর মঞ্চের উপর দুটি নগ্ন মূর্তি। তরুণী নারীর মূর্তি। একটি অর্ধস্ফুট, অন্যটি পূর্ণ নগ্ন। প্রথম মেয়েটির ঊর্ধ্বাঙ্গ সম্পূর্ণ অনাবৃত, দুটি অপরূপ সুডৌল স্তন এবতনুর অপরূপ শোভাকে প্রকটিত করেছে। ঊর্ধ্বাঙ্গ ছেড়ে দেহের নিম্নভাগ সে তার হাতের কাপড় দিয়ে আবৃত করে আছে সুগভীর লজ্জায়। সেই সুকুমার লজ্জা তরুণ মুখখানির ঠোঁটে, চোখের দৃষ্টিতে ফুটেছে অপরূপ শোভায়।

অন্যটি আরও সুন্দর। সেটি একটি নবীন স্নানার্থীর মূর্তি. স্নানের পর নগ্ন দেহের বাঁ পাটি হাঁটু মুড়ে তার পিছনে চলন উঁচুতে তুলে তাতে ডান কনুইয়ের ভর দিয়ে দুই হাত মাথার উপর তুলে তার ভিজে চুলগুলি টেনে চুলের সিক্ততা দূর করছে।

বলার দরকার পড়ে না যে দুটি নারীই তরুণী। কবে কোন্ দুশো বছর কি তারও বেশী দিন আগে মূর্তি দুটি তৈরী হয়েছে। অথচ এখনও তারা চির তরুণী। তাদের জন্মের প্রথম দিন যেমনটি ছিল আজও তেমনটি আছে। তাদের বয়েস একদিনও বাড়েনি।

বীরেশ্বর আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে একটি ওদিক চেয়ে সেই নগ্ন মূর্তিটির কাছে খুব কাছে ঠিক নয়, একটু দূরেই দাঁড়াল যতদূর থেকে যতটা সম্ভব কাছ থেকে মূর্তিটি দেখা যায়। সে যে কতবার, কতবার অতৃপ্ত চোখে এই মূর্তিটি দেখেছে! তাই কোন্ জায়গা থেকে দেখার সবচেয়ে সুবিধে তা সে জানে।

সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সে আপনার হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ শুনতে, প্রতি রক্তকণায়

পরলোকে সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্যিক সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় আর আমাদের মধ্যে নেই। এগারোই আগস্ট অনেক রাত্রিবে তিনি চিরদিনের জন্য আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। আমরা তখন ঘুমিয়েছিলাম—জানতে পারলাম না সনৎদা চলে যাচ্ছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন স্বর্গত সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। প্রথম পুত্র। ছিলেন সফল এবং প্রশংসিত রাজকর্মচারী, খ্যাতিমান লেখক, কর্তব্যনিষ্ঠ স্বামী, স্নেহময় পিতা, নির্ভরযোগ্য বন্ধু—আরো কত কি! কিন্তু সব কিছুর ঊর্ধ্বে তিনি এক অম্লান প্রসন্ন মনুষ্যত্বের অধিকারী ছিলেন। সর্বদা মুখে হাসি, কোনো বেদনার আঘাতে কোনোদিন সেই হাসিকে ম্লান হতে দেখিনি। সেই সনৎদা চলে গেলেন—পেছনে ফেলে গেলেন অমর রচিত গল্পসম্ভার, নশ্বর দেহের বিনশ্চিত পরেও যা বহুকাল তাঁকে সহৃদয় বাঙালী পাঠকের হৃদয়ের কাছাকাছি রেখে দেবে। আর ফেলে গেলেন আমাদের—যারা তাঁকে ভালোবাসতাম, কিন্তু আর কখনো দেখতে পাবো না।

মৃত্যুর সময় তাঁর বয়েস হয়েছিল একষট্টি। মনে হতো না। প্রতি পয়লা বৈশাখে বইপাড়ায় তাঁর সঙ্গে দেখা হবেই। ঘর ফাটিয়ে হাসতে হাসতে ঢুকতেন—কই হে, আজ নববর্ষ, আমার মিষ্টি কই?'

সৎ মানুষ ছিলেন—নির্লোভ ছিলেন। কোনোদিন কেনেও বেশী করতে দেখিনি। সিগারেটটিও খেতেন না। রুগ্ন, দোহারা শরীর ছিল, রোজ অন্তত পঁচিশ করতেন। এমন মানুষের তো দীর্ঘজীবি হবার কথা। এত তাড়াতাড়ি কেন চলে গেলেন বুঝলাম না। আসলে কে যে কখন ওপারের হাতছানি দেখতে পায় বলা কঠিন।

আর কোনোদিন পত্রিকা অফিস থেকে বেরোবার মুখে সনৎদার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে না। আর, স্নেহার্দ্র গলায় প্রশ্ন শুনবো না—কি রে, এত তোরা হয়ে যাচ্ছিস কেন? প্রতি পয়লা বৈশাখে বইপাড়ার সেই অতুজ্জ্বল বুড়ো মানুষটি বাড়ন্ত থেকে যাবে।

অন্নদাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

উপরে তুলে যেখানে ডানদিকের কনুই ভর দিতে চাপ দেওয়ায় উরুতে ঢোল পড়েছে সেখানে তুলে যেখানে ডানদিকের কনুই ভর দিতে চাপ দেওয়ায় উরুতে ঢোল পড়েছে নর্মরমূর্তির সেই শুভ্র-কঠিন অংশে দুটি আঙুল স্পর্শ করলে। একবার চারিদিকে চেয়ে আবার হাত সরিয়ে নিলে সে।

যেন চোখের মত চুমু খেলে এই সৌন্দর্যকে উপভোগ করছে সে। কী তীব্র এর স্বাদ তা কে বুঝবে? তাই বোধ হয় তাকে সুনন্দা অমন করে বললে। সুনন্দা বোধ হয় তার মনের এই চেহারাটা ঠিক বুঝতে পেরেছে।

অথচ প্রথম দিন যখন সে এই মূর্তি দেখেছিল, সুনন্দাই প্রথম দেখিয়েছিল তাকে।

সেদিনের কথা মনে পড়ছে।

সে আজ ছ সাত বছর আগের কথা। হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা পাশ করে যেদিন এই বাড়ীতে সে প্রথম এসেছিল তার বাবার সঙ্গে, সেদিন আসার আধ ঘণ্টার মধ্যেই সুনন্দা তার হাত ধরে টানতে টানতে তাকে নিয়ে এসেছিল এখানে নিজেদের ঐশ্বর্য দেখাবার জন্যে। বীরেশ্বরকে সেদিন নিজেদের ঐশ্বর্য দেখানো জরুরী দরকার হয়ে পড়েছিল সুনন্দার পক্ষে।

সুনন্দার বয়স তখন আর কত? নয়, দশ কি এগারো। পাতলা, ছিপছিপে লম্বা চেহারার ফর্সা ফর্সা একটি মেয়ে, টকটকে। সুন্দর মুখের নীচে থেকে তার অপরিণত, পাতলা পায়ের গোছ হাঁটু একটু উপর থেকে দেখা যাচ্ছিল। অল্প বয়স, অপরিণত দেহ, মন সে অনুপাতে আরও অপরিপক্ক।

আর বীরেশ্বর? তার বয়স তখন সতেরো, পূর্ণ সতেরো, আঠারোর পা দিয়েছে সে তখন। পাতলা, লম্বা, শ্যামলা চেহারা। বর্ষার বৃষ্টির আনকুলো প্রথম কচিকচি নরম ঘাসের মত পাতলা গোঁফ আর দাড়িতে মুখ ভরে উঠেছে। তখনও ক্ষুরের প্রথম স্পর্শ লাগেনি তাতে। স্বভাবতই শান্ত গম্ভীর ছেলে। তার উপর নিজের ঐশ্বর্য সম্পর্কে বেশ খানিকটা সচেতন তার মন। তা ছাড়া সব চেয়ে বেশী করে অপরিচিত এক ধনীর বাড়ীতে সে তখন এসে পড়েছে।

সুনন্দার বাবা আর মা দুজনেই তাকে তার যোগ্য আদর দিয়ে বাড়ীতে নিয়ে করেছেন। করবেন না? যে ছেলে মফস্বলের এত ইস্কুল থেকে হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় সেকেণ্ড হয়েছে, তার আদর না হয়ে পারে? তার উপর খবরের কাগজে তার ছবি বেরিয়ে তাকে একদিনে দেশের মানুষের কাছে বিখ্যাত করে দিয়েছে। সেই খবর তার সেকেণ্ড হওয়ার খবর দিয়েই খবর শেষ হয়নি। তার সঙ্গে তার আরও একটা বিশেষ গুণের বিশেষ উল্লেখ ছিল। খবরের কাগজের প্যারাগ্রাফে বলা হয়েছিল, শ্রীমান বীরেশ্বর যে শুধু মেধাবী ছাত্র তাই নয়, শ্রীমানের হাতে আমরা সহর্ষ বিস্ময়ের সঙ্গে যে এক শিল্প-প্রতিভাকেও লক্ষ্য করেছি তাতে অসঙ্কোচভাবে বলা চলে শ্রীমানের মধ্যে এক ভাবী শিল্পীর প্রতিশ্রুতি আছে।'

এই খবরটাই তাকে আরও বিশেষ, অসাধারণ দুর্লভ করে তুলেছিল সেদিন। সে দুর্লভকে নিজের ভান হাতের ছোট্ট মুঠোয় কায়দা করা যায়, বাঁ-হাতের আঙুলের ফাঁক থেকে তাকে টেনে বের করে নিয়ে

গিয়েছিল সুনন্দা নিজেদের ঐশ্বর্য দেখাবার জন্যে।

তার হাত ধরে ছুটিতে পুকুরের পাড়ে বাগানে নিয়ে যাবার সময় তার ফর্সা, পাতলা, সুপুষ্ট লম্বা হাতখানার দিকে চেয়ে দেখেছিল বীরেশ্বর। যেতে যেতে সে বলেছিল—তুমি এত রোগা কেন?

ছুটতে ছুটতে থমকে গিয়েছিল সুনন্দা। সুন্দর নীলাভ চোখ দুটিতে অকপট বিস্ময়ও ও বিরক্তি প্রকাশ করে সে বলেছিল—রোগা হব কেন আমি

—তুমি রোগা নও? ভাল করে ভাত খাও না বুঝি?

অসহিষ্ণু হয়ে সুনন্দা বলেছিল—খাই, খাই! আমি রোগা কি মোটা তা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না, বুঝলে?

তারপর নিজের মুঠোয় ধরা বীরেশ্বরের পরিপুষ্ট মোটা মোটা আঙুলের দিকে চেয়ে বলেছিল—তোমার আঙুলগুলো বেশ মোটা মোটা। তুমি তো ব্যাটাছেলে। তা তুমি অনেক ভাত খাও বুঝি?

হেসেছিল বীরেশ্বর তার ছেলেমানুষী কথা শুনে। বলেছিল—ভাত যা খাবার তা খাই; তবে সেই সঙ্গে 'একসারসাইজ' করি। যোগব্যায়াম।

বলবার সময় তার আবার নজর পড়েছিল তাকে ধরা সুনন্দার লম্বা হাতখানার দিকে। রোগা, লম্বা হাত, পাতলা পলকা আঙুল, হাতের পাতার হাড়গুলো যেন গোনা যায়। আর সবু সবু হাতের মাঝখানে কনুইয়ের জোড়টা অস্বাভাবিক বড় দেখাচ্ছে, উঁচু হয়ে আছে।

ততক্ষণে নিজের ঐশ্বর্যের সামনে বীরেশ্বরকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে সুনন্দা। বললে—ওই দেখ।

তার ভাবটা যেন এই যে, তোমার যেমন অনেক আছে, আমারও কিছু কম নেই। দেখ সামনেই দেখ!

দেখে হাঁ হয়ে গিয়েছিল বীরেশ্বর। যেন জীবনে প্রথম ও আদি আশ্চর্যকে সে অপ্রত্যাশিতভাবে প্রত্যক্ষ করেছে। এ কী বিস্ময়! এ কী রূপ? একে কী করে রচনা করেছে?

সে স্তম্ভিত বিস্ময়ে হাঁ করে চেয়ে দেখতে লাগল। এই দেখার সামনে ওই রোগা পটকা, ফর্সা বাচাল মেয়েটা যেন অবলুপ্ত হয়ে গেল।

তার পাশে দাঁড়িয়ে তার ভাব দেখে সুনন্দা তখন হাততালি দিয়ে নাচছে আর হাসছে। অনেকক্ষণ পর সুনন্দার উচ্চকণ্ঠ কথায় তার মুখের দিকে চেয়েছিল বীরেশ্বর। কিন্তু তার দৃষ্টি থেকে সেই আশ্চর্য দর্শনের প্রথম মোহ তখনও সরে যায়নি।

সেই মুখের দিকে চেয়ে সুনন্দা সগর্বে হাসতে হাসতে চড়া গলায় বললে—কী, দেখে বোবা হয়ে গেলে তো? আগে এমন দেখেছ কখনও?

তার মুখের দিকে একটা নিশ্বাস ফেলে বীরেশ্বর মৃদুস্বরে বললে—না, কখনও দেখিনি!

তাকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে তার হাত ধরে আবার টানতে লাগল সুনন্দা। বললে—এখনও কত দেখার আছে, এস, দেখবে এস।

তারপর সুনন্দা তাকে ঘাটের বাঁধার পাশে পাশে বাতিদান হাতে গার্বেলের পরীদের দেখালে। দেখালে বড় বড় কলমের আম গাছ, লিচু গাছ আর জামরুল গাছ। কিন্তু বীরেশ্বরের মন বার বার ওই মূর্তিদুটোর দিকে ছুটে যেতে লাগল। বারে বারে ওইদিকে ফিরে ফিরে চাইতে থাকল সে।

তাই দেখে সেদিনের কচি মেয়েটা হি হি করে চপল হাসি হেসে বলেছিল—খুব ভাল লেগেছে বুঝি ওই স্ট্যাচু দুটো যে বারে বারে আড়চোখে চেয়ে দেখছ? তা ওরা তো থাকলই ওখানে। যখন খুশী, যতবার খুশী দেখবে পরে। দেখা তো আর পালাচ্ছে না।

বলে তাকে আবার টানতে টানতে বাড়ী ফিরেছিল সুনন্দা। বাড়ী ফিরে সে নিজের মা-বাবার কাছে এবং বীরেশ্বরের বাবার কাছে তার গ্রাম্যীণ মুগ্ধতার কথা বলেছিল হাসতে হাসতে। তাতে তাঁরাও হেসেছিলেন। কিন্তু বীরেশ্বরের কান মুখ সব ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছিল। চোখ জ্বালা করে যেন জল বেরিয়ে আসবে মনে হয়েছিল।

আজ আবার ছ'সাত বছর পরে সেই মূর্তির কাছে দাঁড়িয়ে, সুনন্দার আজকের তিরস্কারকে মনে রেখে নিজের মনটিকে উলটে পালটে দেখতে লাগল।

সেই প্রথম দিন থেকেই কি এক আশ্চর্য মুগ্ধতার মোহে সে আজ পর্যন্ত আচ্ছন্ন হয়ে আছে! তার চোখে যে আর কিছু ধরে না! এ সংসারে আর কোন রূপ, কোন সৌন্দর্যকে যে এর সমান মনে হয় না। একেই কি মোহ বলে? এ যদি তার এক সর্বআচ্ছন্নকারী মোহই হয় তা হলে এর আড়ালে কি আছে? কি দিয়ে তার এই মোহ তৈরী? শিল্পবোধসঞ্জাত রূপতৃষ্ণা? না, কাম? না কি দুইই মিলে মিশে একসঙ্গে সহাবস্থান করে একে অনোখ তীব্রতাকে বাড়িয়ে তুলেছে?

কে এর উত্তর দেবে? এর উত্তর সে নিজেও তো জানে না। সুনন্দা তো সুন্দরীই। তার সঙ্গে তার বিবাহ হবে এ তো ধরাবাঁধা কথা। তা সত্ত্বেও সে মনে মনে নিজের কাছে স্বীকার করলে এই অপরূপা মর্মময়ীর কাছে সুনন্দা কিছু নয়, কেউ নয়।

সে আবার একটা নিশ্বাস ফেলে মাথা নীচু করে নইল। পায়ের নীচে চাবিপাশের ঘাসের উপর শিশিরের সঞ্চয় আস্তে আস্তে মাটিতে টুপ টুপ করে খসে পড়ছে, ঘাসের গা দিয়ে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। তাতে সকালবেলায় ঘাসের সেই ঈষৎ ধোঁয়াটে সবুজ রং এখন ঘন সবুজ হয়ে চেহারা নিচ্ছে।

আম, লিচু আর জামরুল গাছের পাতায় পাতায় মৃদু বাতাস একবার বয়ে গেল ফিসফিসানি তুলে। যেন কোন অব্যক্ত, অস্পষ্ট, অথচ কোন অর্থগূঢ় সংকেত দিয়ে গেল। সেই অস্পষ্টকে অব্যক্তকে আরও স্পষ্ট, আরও ব্যক্ত করবার জন্য সেই বাতাসই বন্ধুর মত ছুঁয়ে গেল তাকে। তবু কোন উত্তর তার মনে ধরা পড়ল না।

এই সময় কাছ থেকে কে ডাকল—দাদাবাবু।

সে মুখ তুলে দেখল উমেশ। উমেশ কিছু বলবার আগেই সে এগিয়ে চলতে চলতে বললে—চল উমেশ্, আমি তো বলছিলাম, একটু পরে যাচ্ছি। আবার কেন এলে তুমি?

রাগ নয়, বিরক্তি নয়, মধুর ভদ্রতার সঙ্গেই জবাব দিলে বীরেশ্বর। উমেশ হেসে বললে—তা যদি বললেন তো বলি। এই মিষ্টি কথা শোনবার লোভেই এলাম। এই বাড়ীতে তো কেউ মিষ্টি বাক্য বলতে জানে না তাতো জানেন আপনি।

মৃদু তিরস্কার করলে বীরেশ্বর—ছি, অমন কথা বলে? ও কথা বলতেও নেই, শুনতেও নেই। এক এক মানুষ এক এক রকম করে সংসারে নিজেকে জানায়। ও সব এক-একটা ধরণ। তাই বলে কি কারও বুকে ভালবাসা কম থাকে?

হাসতে লাগল উমেশ। কথাটা বলে বীরেশ্বরের হঠাৎ মনে হল, সুনন্দা যে অমনভাবে তাকে খারাপ কথা বলে গেল তাও তো বেরিয়ে এসেছে মনের ব্যাকুলতা থেকেই। তাকে ভালবাসে বলেই তো এ ব্যাকুলতা!

খাবার টেবিলে গিয়ে বসল সে।

সুনন্দার মা আর সুনন্দা তার অপেক্ষায় ছিলেন। টেবিলে বসতে বসতে সে বললে—মেসোমশাই কই?

সুনন্দার মা মুখ ভার করে বললেন—তোমাদের কাণ্ডই আলাদা বাবা! তোমরা কি সব কচি খোকা যে ডেকে ডেকে খাওয়াতে হবে? তুমি এলে তো তার পাত্তা নেই। তিনি নাকি খুব ব্যস্ত কারখানার মধ্যে। এক লেদ মেশিনে কি যেন গোলমাল হয়েছে। মেকানিক এসে আসছেন।

বাড়ীরই এক অংশে কারখানা সেখানেই ব্যস্ত আছেন সুনন্দার বাবা হরিপদবাবু। সুনন্দার মায়ের কথা শেষ হতে না হতেই দরজার ওপার থেকে ভাঙা ভাঙা গলায় গান উঠল,—আমি এসেছি, এসেছি, এসেছি আমি হে—

বন্ধুর বদলে তিনি বুদ্ধি করে আমি বলেছেন টেবিলে মেয়ে সুনন্দা এবং বীরেশ্বর আছে জেনেই। যত বুদ্ধিমান তত আমুদে মানুষটা। পুরানো নতুন সব থিয়েটার দেখা মানুষ। তাই অনেক সময় থিয়েটারের ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করে থাকেন।

স্বামীর ভাঙা গলার গান [illegible] মনের খুশী চেপে সুনন্দার মা মুখে [illegible] দেখিয়ে স্বামীকে তিরস্কার করলেন—মেয়ে বড় হয়েছে। তার সামনে আর ন্যাকরা করো না। এস, চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে।

—হাতটা ধুয়ে আসি। বলে হরিপদ-

হাত হাতের তেল-কালি পরিষ্কার করবার জন্যে বাথরুমে ঢুকলেন।

সুনন্দার মা নিশ্চিন্ত মনে খেদ করতে লাগলেন—এমনি করে সংসার করা যায়?

বলে বীরেশ্বরের দিকে চেয়ে বললেন—এই দেখ না, তোমাকে ডাকবার আগে আমার মা ঠাকরুণকে ডাকতে গেলাম। গিয়ে দেখি—

এতক্ষণ বীরেশ্বর সুনন্দার দিকে চায় নি। চাইতে সাহস হয় নি। কেবল অনুভব করেছে সুনন্দা টেবিলের ওপাশে চেয়ারে আছে। এইবার সে চাইল সুনন্দার দিকে। দেখলে ভারী মুখে ফোলা ফোলা রক্তাভ চোখ মেলে চুপ করে বসে আছে সুনন্দা।

তার মানে তার কাছ থেকে চলে এসে সুনন্দা কেঁদেছে খুব এক চোট। মুখখানা দেখেই তার বুকের ভিতরটা ভয়ে একবার ধুক করে উঠল। সুনন্দা কি ওর মাকে এই নিয়ে বলেছে নাকি কিছু? ও যে রকম অদ্ভুত ধরণ খেয়ালী মেয়ে তাতে ওর পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নয়। অথচ বুদ্ধি-সুদ্ধি কিছু কম নেই। বাপের সব কনফিটেই পেয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ সময় ওর আদরে খেয়ালীপনা সে কনফিট আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। বীরেশ্বর একটু ভয় পেয়েই সুনন্দার মুখের উপর থেকে মুখ ফিরিয়ে ওর মায়ের কথা শুনতে লাগল।

সুনন্দার মা একবার মেয়ের মুখের দিকে সস্নেহে তাকিয়ে হেসে বীরেশ্বরকেই বললেন—জানো বাবা, ওর ঘরে গিয়ে দেখি মেয়ে খাটের ওপর আড়াআড়ি উপুড় হয়ে শুয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে। আমি তো দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। ধড়ফড় করে ওকে ঠেলে তুললাম।—সনু, এই সনু, কি হল তোর? অমন করে এই সকাল বেলায় ফুলে ফুলে কাঁদছিস যেন?

এই পর্যন্ত বলে সুনন্দার মা হাসতে লাগলেন সুনন্দার মুখের দিকে চেয়ে যে সুনন্দা কখনও লজ্জা পায় না, লজ্জার কারণ থাকলেও যার আদুরেপনায় সে বেঁকে ওঠে, সেই মেয়ে অনেক লজ্জা পেয়ে মুখ নামিয়ে নিলে।

সুনন্দার মা সস্নেহে বললেন—জানো বাবা, মেয়ে আমার ঘুমের মধ্যে দেয়ালা করে কাঁদছিল। আমি ধাক্কা দিতেই ধড়ফড় করে উঠে বসে আমার গলা জড়িয়ে ধরে এক মুখ হেসে বললে—মা! আমি শুধোলাম—কি হল রে যে এমন করে কাঁদছিলি? তা মেয়ে কি বললে জান? স্বপন দেখছিলাম মা, তুমি মরে গিয়েছ! শোন কথা বাবা মেয়ের।

বীরেশ্বর বুঝলে সুনন্দা তার আশ্চর্য দৃষ্টি বুদ্ধি দিয়ে আসল ব্যাপারটা চাপা দিয়েছে। সে মনে মনে নিশ্চিন্ত হয়ে একটা নিশ্বাস ফেলে হাসবার ভঙ্গি করে ডাকলে—মেসোমশাই, আসুন, চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে হাসি মুখে হরিপদবাবু বললেন—এই তো এসেছি হে।

সুনন্দার মা ধমকে উঠলেন—আবার?

হাসির ঝলক বসে গেল খাবার টেবিলে। এমন কি সুনন্দাও হাসল একটু।

চা খেতে খেতে বীরেশ্বর বললে—আপনার মেশিন ঠিক হয়েছে? না আমাকে গিয়ে দেখতে হবে?

—না হে, হয়েছে। তোমার মত বড় ইঞ্জিনীয়ারকে লাগবে না।

কথাটা হরিপদ গৌরবে বললেন। বীরেশ্বর ইঞ্জিনীয়ার নয়, ফিজিকসের ফার্স্ট ক্লাস এম এসসি। তবে সে যেমন ছবি আঁকতে পারে, তেমনি যন্ত্রপাতিও নড়া-চাড়া করতে পারে অবলীলাক্রমে নিজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির উপর নির্ভর করে।

হেমন্তের সুন্দর সকাল, আনন্দিত মন সবারই। কিন্তু চা খেতে খেতে আনন্দের সেই অগাধ সরোবরে বীরেশ্বর যেন ছোট্ট একটি পাথর ফেললে টুপ করে। বললে—মাসীমা, আমি কাল একবার দেশে যাব। ক দিনের জন্যে।

সুনন্দার মা-বাবা দুজনেই হা হা করে উঠলেন। বললেন—এখন আবার কেন বাড়ী যাবে? এই তো কিছুদিন আগেই ঘুরে এলে! পুজোর সময়!

তাঁরা জানেন বীরেশ্বর নিজের মত প্রকাশ করে নরম করে, কথা বলে নরম সুরে মরমে করে। কিন্তু তার আড়ালে একটা জোর আর জেদ থাকে সব সময়। তাকে টলানো যায় না। বোধ হয় পরের বাড়ীতে থাকে বলে বীরেশ্বরই সজ্ঞানে নিজের জেদকে টলতে দেয় না।

সুনন্দার মা বললেন—এই তো সামনে কালীপুজো। বাড়ীতে পুজো হবে। কারখানার লোকেরা সব যোগ দেবে। তুমি না থাকলে সব করবে কে?

বীরেশ্বর হেসে বললে—আমি তার অনেক আগেই ফিরে আসব!

হরিপদ হাসলেন—তোমার কথাই তো বাবা, এখানে হাইকোর্টের রায়। তাই যাও, বদিন খুরে এসো। তবে দাড়াও, কাল যাওয়া হবে কিনা দেখি। পাঁজিটা দেখি একবার।

এ বাড়িতে পদে পদে পাঁজির দরকার হয় আজও। টেলিফোন ডাইরেকটরির উপর থেকে পাঁজিটা নিয়ে দেখে-শুনে হরিপদ বললেন—কাল দিন মোটামুটি ভালই আছে। সন্ধ্যেতেও অনেকক্ষণ অমৃতযোগ আছে। তাই যাও। আমি যাই, ড্রাইভারকে ভোরে আসবার জন্যে বলে রাখি। এখনি ট্রেন তো বোধহয় সকাল সাতটায় ছাড়বে। ছটায় বেরুবে। এই সিথি থেকে হাওড়া যেতেও তো সময় লাগবে!

সুনন্দা এতক্ষণ কথাবার্তা শোনার সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প করে খাচ্ছিল চায়ে। কাপটা হঠাৎ তুলে চো চো করে সব চাটা একসঙ্গে গিলে কাপটা পিরিচের উপর ঠক করে নামিয়ে রাখলে। তারপর চেয়ার থেকে উঠে হন হন করে চলে গেল। ও। ফোন তখনও আধখানা বলা পড়ে রয়েছে।

সুনন্দার মা বললেন—দাঁড়া, দেখ, মেয়ের কাজ দেখ। না খেয়ে উঠে চলে গেল। সুনু, এই সনু!

হরিপদবাবু হা হা করে হেসে উঠলেন। স্ত্রীকে বললেন—এর মানে কি? মানে কি এই যে ব্যবস্থা সুনিশ্চিত হল না?

সুনন্দার মা প্রতিবাদ করলেন—কেন, ব্যবস্থাটা ওর পছন্দ হবেনা কেন?

হরিপদবাবু হাসি থামিয়ে বললেন—কেন আবার? আমি সেবার একবার, সঙ্গে মুসোরী বেড়াতে যাব ঠিক করে, তুমি বাধা দিয়েছিলে কেন? সেই মনে নেই?

মাঝপথে ধমক দিলেন সুনন্দার মা—তোমার কি কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছে? কোথায় কি বলতে হয়, কখন কি করতে হয় তা জ্ঞান গিয়েছে? ছি! ছি! ছি!

হরিপদবাবু আরও জোরে হেসে উঠলেন। এরই মধ্যে লক্ষিতে বীরেশ্বর দ্রুত পায়ে সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে বাঁচল। বাইরে বাগানের দিকে জানালা ফিরতে গিয়ে সে শুনতে পেলে হরিপদবাবু তখনও অট্টহাসি হাসছেন।

সুতী, পশম, সিল্ক, টেরিন
কাচার লিকুইড ডিটারজেন্ট

Glitter

কনজিউমার প্রোডাক্টস
২৮এ, এস এন দাস লেন, কলি—৫০
পরিবেশক :
পাপু এন্টারপ্রাইজ
৪৭।৩৭, আর কে ঘোষ রোড, কলি-৫০

বসুশ্রী
হাওড়া
৪১/১, জি, টি, রোড, হাওড়া
• বেনারসী
• জোড়-সিল্ক
• তাঁত-মিল
• গোয়াক
• সাটিং-সুটিং
ও ছিট কাপড়

যা নিয়ে আজকের ভোর থেকে এখন পর্যন্ত যত বিভ্রাট সেই পাথরের মূর্তিই তখন তাকে নেশার মত টানছে। এই হৈ-চৈ, সুনন্দার রাগ সব কিছু সত্ত্বেও সে চলল লিচুতলার কাছে, ঘাটের চাতালে সেই মূর্তি দুটির কাছে। যেন দুই যুগল প্রণয়িনী তার জন্যে লীলাভরে অপেক্ষা করে আছে।

।। তিন ।।

হরিপদবাবু মানুষটাই ওই রকম। তবে সুনন্দা ও বীরেশ্বরকে নিয়ে ও'র ওই হা হা হাসির মধ্যে অশালীন, অশোভন কিছু নেই। হয়তো তা একটু উচ্চকণ্ঠ, কিঞ্চিৎ প্রগলভ, তার বেশী কিছু নয়। কারণ এ তো স্থির হয়েই আছে যে, আর দু দিন বাদে বীরেশ্বরের সঙ্গে তাঁদের একমাত্র সন্তান সুনন্দার বিবাহ হবে। এই চোখ নিয়েই তো তাঁরা বীরেশ্বরের হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করার পরই বীরেশ্বরকে আদর করে নিজেদের বাড়ীতে ডেকে এনে রেখেছিলেন।

ব্যাপারটা হয়তো আরও একটু পরিষ্কার করে বলার প্রয়োজন আছে।

হরিপদ মিত্তির কলকাতার এক মস্ত অভিজাত ধনী পরিবারের সন্তান। তবে হরিপদর সম্পত্তি যেমন অনেক ছিল, তেমনি শরিকও অনেক ছিল। তার সঙ্গে ছিল পুরুষানুক্রমিক ঋণ। বীরেশ্বরের বাবা রাধারমন মিত্তির সম্পর্কে হরিপদর ভায়রা-ভাই। তবে সম্পর্কটি কাছের নয়, বেশ দূরের। তিনি কাজ করতেন হরিপদদের দপ্তরে। হরিপদর চেয়ে রাধারমন বয়সে বছর কয়েকের বড়। তবে হরিপদর বিয়ের আগে থেকেই তিনি তাদের স্টেটে কাজ করতেন। তাঁরই চোখের সামনে হরিপদর বিয়ে হল তার দূর সম্পর্কের এক শালীর সঙ্গে। তার ফলে দুই ভায়রার মধ্যে সম্প্রীতি গাঢ়তর হল। কিন্তু তাতে রাধারমন যে হরিপদদের স্টেটের কর্মচারী তা কোনদিন ভুলতেন না।

তার উপর রাধারমণ মানুষটা ছিলেন স্বভাব সৎ, সংযত চরিত্র। বীরেশ্বরের উপযুক্ত বাপ। তিনি হরিপদর ভায়রাভাই হয়েও যে নিজেকে তার থেকে অনেক নীচের মানুষ ভাবতেন তার কারণ তাঁর নম্র চরিত্র। হরিপদ মানুষটার ধাত ভিন্ন রকমের। বুদ্ধিমান হলেও তাঁর চরিত্রের ধাতুটা হাল্কা। স্বভাব আমুদে ও আমোদপ্রিয়। তাই ভায়রা হিসেবে হরিপদর সঙ্গে সম্প্রীতির সুযোগ নিয়ে হরিপদকে সৎ পরামর্শ দিতেন তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীর মত। হরিপদও বিশ্বাস করতেন রাধারমনকে। সম্পূর্ণভাবেই বিশ্বাস করতেন।

তাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থার পুরো চেহারা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার চেহারাটা পুঙ্খানুপুঙ্খ হরিপদকে বুঝিয়ে দিতে পেরেছিলেন রাধারমন। সম্পত্তি সুপ্রচুর, সেই সঙ্গে অংশীদার অনেক আর ঋণ ততোধিক।

এই সময়েই হরিপদর বাবা মারা গেলেন। পাণ্ডিত্যের মত অর্ধেক ত্যাগ করে হরিপদকে বাকী অর্ধেকটা বাঁচাবার পরামর্শ দিলেন রাধারমন। সেই অনুযায়ী দুই ভায়রা মিলে কাজ আরম্ভ করলেন। প্রথমেই সব শরিককে এক করে সম্পূর্ণ ঋণ শোধ করার ব্যবস্থা হল। কিছু সম্পত্তি বিক্রীও করতে হল তার জন্য। ঋণমুক্ত সম্পত্তি ভাগ হল অতঃপর। সেই বন্টনে নগদ লাখখানেক টাকা, সিঁথির একটা বাগান বাড়ী ভাগে পড়ল হরিপদর। রাধারমনের পরামর্শে ও সহায়তায় স্ত্রী ও এক বছরের মেয়ে সুনন্দাকে নিয়ে সিঁথির এই স্ট্যাচুওয়ালা বড়ীতে উঠে এলেন হরিপদ। সঙ্গে এলেন রাধারমন। রাধারমন তখন আর হরিপদর কর্মচারী নন। তিনি তখন হরিপদর অভিভাবক হয়ে উঠেছেন।

আবার নূতন পরামর্শ দিলেন রাধারমন। এই লাখখানেক টাকা নিয়ে বসে বসে খেয়ে কোন্ লাভ হবে? সুতরাং দু-তিনটে লোক বসানো হল বাড়ীরই বিশাল বাগানের এক পাশে, টিনের শেড করে। ছোট এক কারখানা চালু হয়ে গেল। আস্তে আস্তে চলতে লাগল বেশ। বুঝতেও পারা গেল, একটু যত্ন করলে ভালই চলবে।

এই সময়ে হরিপদকে বিস্মিত ও ব্যথিত করে রাধারমন একদিন হাসি মুখে বললেন—আমি এবার চললাম ভাই।

হরিপদ এবং তাঁর স্ত্রী দুজনেই বেদনার সঙ্গে বললেন—কেন যাবেন দাদা? আমরা কি অপরাধ করলাম?

রাধারমন বললেন — অপরাধ কিছু হয় নি ভাই। এখন তোমার কারখানা, তোমাদের জীবন দুই-ই গড় গড় করে চলবে। আমাকে বাদ দিয়েই চলবে। আমাকে আর লাগবে না। আমাকে এখন তোমরা ছেড়ে দাও। আমি দেশে গিয়ে আমার ফেলে-আসা সংসার নিয়ে পড়ি। একটা মাত্র ছেলে, শুনেছি বুদ্ধিসুদ্ধি আছে, দেখার অভাবে যদি নষ্ট হয়ে যায় তা হলে আর আফশোসের বাকী থাকবে না। জমিজমা যা আছে তাই নিজে দেখাশুনো করলে বেশ চলে যাবে আমার।

সেই চলে গিয়েছিলেন রাধারমন। দেশে গিয়ে নিজের জমিজমা দেখেছেন আর ছেলেকে মানুষ করেছেন। তা ছেলে মানুষ হল শেষ পর্যন্ত। যখন খবরের কাগজে ছেলে বীরেশ্বরের সেকেণ্ড হবার খবর বের হল তখন স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে হরিপদ চিঠি লিখলেন রাধারমনকে। প্রস্তাব করলেন বীরেশ্বর সিঁথিতে তাঁর বাড়ীতে থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজে বি, এসসিতে ভর্তি হোক।

সেই নিমন্ত্রণ পেয়ে রাধারমন ছেলে বীরেশ্বরকে নিয়ে হরিপদর সিঁথির স্ট্যাচুওয়ালা বাড়ীতে এসে উঠলেন। পিতা-পুত্রকে হরিপদর পরিবারটি পরম সমাদরে যেন বুকে তুলে নিলে। রাধারমন তার খুচ-খুচরো কথা তুলতেই হরিপদ আর স্ত্রী দুজনেই ব্যথিত হলেন। কিন্তু দুঃখিত হয়ে থাকা বেশীক্ষণ ধাতে সয় না হরিপদর। তিনি হেসে বললেন—আপনার যখন এতই কুণ্ঠা তখন বীরেশ্বর আমার সুনন্দাকে একটু লেখাপড়া দেখিয়ে দেবে। তাতে আপনি রাজী তো?

বলায় এবার নিমরাজী হলেন রাধারমন।

হরিপদ উৎসাহিত হয়ে বললেন—আমার মনে তো আরও ইচ্ছে রয়েছে দাদা। আপনি অভয় দেন তো বলি।

হেসে ভায়রার মুখের দিকে চাইলেন। অভয় দিয়ে বললেন—বল বল তুমি বলবে তাতে কথা কি?

এবার হরিপদর বদলে সুনন্দার-মা বললেন—আপনার বীরেশ্বরের, সঙ্গে আমার সুনন্দার বিয়ে দিতে হবে জামাইবাবু। আপনি না বললে আমরা চাইব না।

বিচক্ষণ রাধারমন অনুমান করেছিলেন যে এই প্রস্তাবই আসছে। তিনি হেসে বললেন— এতো ভাল প্রস্তাব। আমার অমত করার কি আছে? তবে এখন এসব কথা না ওঠাই ভাল। কারণ দুজনেই ছোট বড্ড ছোট। এখন ওরা বড় হোক, বেঁচে থাকুক, বীরেশ্বর ভাল করে লেখাপড়া শিখুক। তখন কথা তুলো। তার আগে নয়। তার আগে এসব কথা যেন ওদেরও কানে না যায়।

হরিপদ এবং সুনন্দার মা দুজনেই এ প্রস্তাবের বিচক্ষণতা বুঝে চুপ করে রইলেন।

রাধারমন বললেন—ওরা বেঁচে থাকুক বড় হোক, তখন যথাসময়ে এ কথা উঠবে। এমন কি তোমরা নিজে থেকে যদি কথা না তোল, আমি বীরেশ্বরের বিয়ে দেওয়া স্থির করলে সবচেয়ে আগে তোমাদের মত চাইব। তোমরা 'না' বলে তখন আমি অন্য কোথায় বিয়ের সম্বন্ধ করব।

এরপর আর কোন কথা থাকতে পারে? ওঁরা দুজনেই পরিতৃপ্ত ও নিশ্চিন্ত হয়ে হাসিমুখে চুপ করে রইলেন।

যাদের নিয়ে কথা সেই সত্তেরো আঠারো বছরের বীরেশ্বরকে হাত ধরে ন-দশ বছরের সুনন্দা তখন টানতে টানতে নিজেদের ঐশ্বর্য দেখাচ্ছে। স্ট্যাচু আর ঘাট-বাঁধানো পুকুরের ঐশ্বর্য দেখানোর পর সুনন্দা তাকে তাদের বাগান দেখাতে লাগল। দোপাটির গাছগুলো বড় হয়ে উঠেছে, কোথাও কোথাও ফুলও ধরেছে তাতে। মিনি বটগাছের মত দাঁড়িয়ে আছে তারা। দেখে বীরেশ্বরের মনে হল যেন বসো ভাবে টেটুমুরের চয়ে মাটি থেকে আর নড়তে পারছে না, থমকে আছে মাতালের মত ওরই পাশে পাশে কসমস গাছগুলো ছাড়তে ছাড়তে সরল রেখায় উঠেছে উপর দিকে মাথায় কুঁড়ি কি ফুলের পাখা মেলে। যেন এখনি মাটি ছেড়ে হলুদ পাখা মেলে কোথায় উড়ে যাবে তারা। ওদেরই পাশে পাশে প্রজাপতিগুলো উড়ছে জোড়ায় জোড়ায়। যেন যন্ত্রণা দিচ্ছে—আর কেন? এবার পাখা মেল। দেরী কিসের?

চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছিল বীরেশ্বর। সুনন্দা তার হাত ছেড়ে দিয়ে প্রজাপতি আর ফড়িংয়ের পিছনে তাড়া দিয়ে ফিরছে।

বীরেশ্বর মৃদু স্বরে বললে—ছি, অমন করে প্রজাপতিকে তাড়া করে না।

থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে পিছন ফিরে সুনন্দা অভিমানচোখে চেয়ে বললে—প্রজাপতি তাড়ালে কি হয়?

রসিকতা করে বীরেশ্বর হেসে বললে—তা হলে বিয়ে হয় না।

শুনে হি হি করে হেসে গড়িয়ে পড়ল সুনন্দা। বললে—আমি তো বিয়ের ভাবনায় মরে গেলাম। তোমার বুঝি বিয়ে করার খুব মন হয়েছে?

বলে আবার হি-হি করে হাসি।

বীরেশ্বর খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে গম্ভীর হল। বললে—আহা, ভগবানের জীব ওরা আপন মনে খেলে বেড়াচ্ছে, তুমি কেন ওদের তাড়া করে ভয় দেখাচ্ছ?

এবার কাজ হল। সঙ্গে সঙ্গে সুনন্দা বললে— তুমি তো শুনি খুব ভাল ছবি আঁকতে পার। কই আঁক তো দেখি কেমন আঁকতে পার।

—তা পারি। কি আঁকব?

—যা তোমার খুশী। যা হোক একটা কিছু।

—তা হলে কাগজ পেন্সিল আন। একটু মোটা কাগজ আর একটা বড় পেন্সিল আর একটা ছুরি নিয়ে এস। দেখি আঁকতে পারি কিনা। পারলে সঙ্গে একটা শক্ত মলাট দেওয়া খাতা এনো।

সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে ছুটতে ফুলের প্রান্ত বাতাসে ওড়াতে ওড়াতে অদৃশ্য হয়ে গেল সুনন্দা। বীরেশ্বর ইতিমধ্যে এদিক ওদিক দেখে ঘাটের সামনে চাতালে সেই মার্বেলের ভেনাস মূর্তির নীচে ইট-বাঁধানো জায়গাটা হাত দিয়ে ঝেড়ে পরিষ্কার করে রাখলে।

সুনন্দা এল হাতে কাগজ-পেন্সিল ছুরি নিয়ে, এক মুখ হাসতে হাসতে। একখানা শক্ত খাতাও এনেছে হাতে করে। সুনন্দাকে বসতে বললে বীরেশ্বর স্ট্যাচুটার নীচে।

—আমি বসে কি করব?

তোমারই ছবি আঁকব প্রথম।

খানিকটা লজ্জা খানিকটা কৌতূহল মিশিয়ে হাসতে হাসতে স্ট্যাচু নীচে বসল সুনন্দা। বসল আসনপিঁড়ি হয়ে।

দেখে বীরেশ্বর বললে— ও বসা হল না। অন্য রকম করে বস।

বিরক্ত হয়ে সুনন্দা উঠে দাঁড়াল। বললে—তবে কেমন করে বসব? ঐ স্ট্যাচুর মেয়েটার মত কায়দা করে?

শশব্যস্ত হয়ে বীরেশ্বর বললে— আরে না, না বাঁহাতটা মাটিতে রেখে পায়ের ওপর পা ছড়িয়ে পা টান করে বস। ডান হাতখানা রাখ তোমার কোলের ওপর।

তাই হল।

মৌমাছি আর ভ্রমরের গুঞ্জন, গাছের ডালে বাতাসের সরসর শব্দের মধ্যে গাছের মত, স্ট্যাচুর মত করে বসে রইল সুনন্দা। বীরে বরর তাকে দেখে দেখে এঁকে চলল।

কী খুঁটিয়ে তার দিকে চাইছে ছেলেটা বারে বারে। অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সুনন্দা। শেষে আর সেই চাউনী সহ্য করতে না পেরে সে হাঁটুর দু-তিন ইঞ্চি উপর থেকে ফ্রকটাকে টেনে নামাতে লাগল। এক সময় বললে—তুমি আমাকে অমন করে দেখছ কেন?

এক মনে কাগজের উপর পেন্সিল টানতে টানতে বীরেশ্বর বললে— না দেখলে আঁকব কি করে?

বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়াল। ছবি হয়ে গিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে নিজের আসন ছেড়ে সুনন্দা ছুটে এসে ঝুঁকে পড়ল ছবিটার উপর। কিছুক্ষণ অবাক হয়ে সে তাকিয়ে রইল ছবিটার দিকে। মাটিতে সে বসে আছে দুপা ভাঁজ করে একটার উপর অন্যটা রেখে বাঁহাত ভর দিয়ে আছে মাটিতে, ডান হাতখানা কোলের উপর। তার পিছনে স্ট্যাচুর থামটা, থামের মাথায় স্ট্যাচুটার নিটোল ডান পায়ের আর ভারী উরুর খানিকটা।

খুব মন দিয়ে ছবিটা দেখে সে মুখ বিকৃত করে বললে—এ মা আমি এমনি বিচ্ছিরি দেখতে?

—বিশ্রী কোথায়? এ তো বেশ সুন্দর!

—ছাই সুন্দর! এই আবার সুন্দর নাকি?

বলতে বলতে বীরেশ্বরকে চমকিত করে তার হাত থেকে ছবিখানা আচমকা ছিনিয়ে নিয়ে বীরেশ্বরকে সেইখানে ফেলে রেখে সে প্রজাপতির মতই যেন উড়ে চলে গেল। তারপর সেদিন সারাদিন ধরে সুনন্দা জনে জনে সেই ছবি দেখিয়ে দেখিয়ে ফিরেছে আর নিজেই বলেছে—দেখেছ আমাকে কি বিচ্ছিরি করে এঁকেছে?

তারপর সে ছবিটার আর কোন সন্ধান মেলেনি। বীরেশ্বর ফেরৎ চেয়েছিল ছবিটা। সুনন্দা মুখ বিকৃত করে বলেছিল— ওই বিচ্ছিরি ছবি আবার রাখে নাকি? সে আমি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি।

এরপর কখনও নিজের ইচ্ছায়, কখনও বা সুনন্দার হুকুমে এই কবছরে অনেক অনেক স্কেচ করেছে বীরেশ্বর। সে সব কয়েক ডজন খাতার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে।

প্রথম তার ছবি আঁকার পরই সুনন্দার হুকুমে তাকে পুকুরঘাটের চাতালের দু ধারে স্ট্যাচু দুটোর স্কেচ করতে হয়েছিল। বেশ কয়েকদিন ধরে বড় যত্ন করে এঁকেছিল ছবি দুটো। ছবি দুটো শেষ হলে ছবি দুটো সে তুলে দিয়েছিল সুনন্দার হাতে। বীরেশ্বরের ঘরে পড়ার টেবিলে বসে ছবি দুটো নিবিষ্ট মনে দেখতে দেখতে সে হঠাৎ মুখ তুলে বলে বসেছিল—মেয়ে দুটো কি মোটা! বড্ড ভারী শরীর!

তার মুখের দিকে চেয়ে বীরেশ্বর বলেছিল—ভারী শরীর নয়, ভরাট শরীর। যৌবনকালের শরীর। তাছাড়া ওরা গরীবের মেয়ে। তার ওপর নিশ্চয় পেট ভরে খেত, একসারসাইজ করত। তোমার মত তো নয় যে পেট ভরে খাবে না, একসারসাইজ করে শরীর শক্ত করবে না।

একবার চটে উঠে আবার সুনন্দা জিজ্ঞাসা করেছিল—আচ্ছা মেয়ে দুটোর বয়েস কত?

—তা কি করে বলব? তবে যুবতী মেয়ে। এই আর কি।

বলে বীরেশ্বর ছবির খাতাখানা বন্ধ করে কাছে টেনে নিয়েছিল। আর সুনন্দা দুম দুম করে পা ফেলে উঠে চলে গিয়েছিল সেখান থেকে। রাগ জানিয়ে।

এরপর দুটো বছর কাটল। বীরেশ্বর তখন থার্ড ইয়ারে আর সুনন্দা ক্লাস নাইনে উঠেছে। সেই সময়ে সুনন্দা ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরতে আরম্ভ করলে। মা-বাবার মতের ও ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এক রকম একা নিজের ইচ্ছায় শাড়ি ধরলে সে। ওর মা-বাবার ইচ্ছা ছিল মেয়ের এই তো সবে তেরো-চোদ্দ বছর বয়স, এখনও কিছুদিন ফ্রক পরুক। বলায় দারুণ চটে উঠেছিল সুনন্দা।

আর একটা মজার কথা। সেই প্রথম ছবির পর আর নিজের ছবি আঁকতে বলেনি কি আঁকতে দেয়নি বীরেশ্বরকে। বীরেশ্বর নিজে থেকে অনেক সময় তার সাজ-পোশাক দেখে খুশী হয়ে তার ছবি আঁকতে চেয়েছে। কিন্তু সে রাজী হয়নি। বীরেশ্বর জোর করলে সে রাগ করেছে। অথচ তারই অনুরোধে, অনুরোধের চেয়ে আদেশ বলাই বোধহয় ভাল, তার আদেশে একের পর এক বহু স্কেচ করেছে বীরেশ্বর। ফুল, পাখী, গাছ, পাতা, বাবা, মা অনেক অনেক কিছু।

স্কেচ দেখতে দেখতে স্কেচ সম্পর্কেও বুঝতে শিখেছে সে। কেমনভাবে স্ট্যাচুর সেই সানানোতে চুলএলানো নগ্ন মেয়েটার ছবির উরুর উপর কনুইয়ের চাপে যে টোলের সৃষ্টি করে শিল্পী কঠিন পাথরে সজীব দেহের কোমলতা এনেছেন সেই কোমলতাকে বীরেশ্বর কেমনভাবে স্কেচের মধ্যে উরুর উপরে কনুইয়ের চারপাশে পেন্সিলের ঝাপসা ছোঁয়া দিয়ে ফুটিয়েছে তা চিনতে পেরে তার সমূহ তারিফ করেছে সুনন্দা।

আর একবার আর একটা স্কেচের সে আরও তারিফ করেছিল। বর্ষার দিনের একটা আগাছা লতার স্কেচ করেছিল বীরেশ্বর। সে লতাটাও দেখেছিল সুনন্দা। সেই লতাটার প্রচন্ড বন্য সরসতা এত প্রবল যে দুপুরবেলা তার উপর সূর্যের আলো পড়ে তাদের চোখে তারই প্রতিফলিত ছটা লাগছিল। সেই ছটাটাকে আশ্চর্য কৌশলে স্কেচে চেহারা দিতে পেরেছিল বীরেশ্বর।

এত সব সত্ত্বেও সুনন্দা বীরেশ্বরকে নিজের স্কেচ করতে দেয়নি। আর কখনও বলেনি, ওই স্ট্যাচু দুটোর মতন স্কেচ কর।

অনেক ভেবেছে বীরেশ্বর এ নিয়ে। কিন্তু কোন কারণ আবিষ্কার করতে পারেনি। তার সামনে আসার সময় চঞ্চল, প্রগল্ভ সুনন্দা মুখে যত যাই বলুক, স্বরাবর [illegible]

বেশবাসে, এসেছে। যতটা পারে নিজের সর্বাঙ্গ আবৃত করে এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। তা সে বাবা-মায়ের সামনেই হোক, আর একা বীরেশ্বরের সামনে পড়ার টেবিলেই হোক। বরং পড়ার টেবিলে সে যেন নিজেকে বেশী ঢেকেঢুকে নিয়ে বসে। যেন এক তার মুখ ছাড়া আর কোথাও যে বীরেশ্বরের দৃষ্টি পড়ে এ সে চায় না।

বি. এস. সি কেন, শেষ পর্যন্ত এম. এস. সিরও ফল বেরিয়ে গেল।

বি. এস. সিতে ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট হয়েছিল বীরেশ্বর। এম. এস. সিতেও তাই। ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট। ফল বের হবার সঙ্গে সঙ্গে রাধারমন চলে এলেন কলকাতায়। ভায়রা-ভাই হরিপদ আর শ্যালিকাকে বললেন—এই তো আমি এসেছি। কথা দিয়েছিলাম, ছেলের বিয়ের কথা বলতে আগে আসব তোমাদের কাছে। তাই এসেছি।

হরিপদ আর সুনন্দার মা বিগলিত। হাসিমুখে হাতজোড় করে দুজনেই কৃতকৃতার্থতা জানালেন। সুনন্দার মা বললেন—তবে আপনার কাছে একটা আর্জি ছিল জামাইবাবু। অভয় দেন তো বলি।

রাধারমন হেসে বললেন—আমি যাকে ভয় করে চলি, তুমি আমার সেই স্ত্রীর সম্পর্কে ভগ্নী। তোমার আর আমার কাছে ভয় কি? অভয় তো দেওয়াই আছে। বল।

—সুনন্দার এই সামনেই ক'মাস পরে চূড়ান্ত সেকেণ্ডারী পরীক্ষা। পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই বিয়ে হবে।

—তথাস্তু। তবে কথাটা এখন আর ওদের জানিয়ে দরকার নেই। আর বীরেশ্বরের এখন এখানে না থাকাই ভাল। এই ক'মাস সে বরং বাইরে থাকুক।

হরিপদ-দম্পতি হাঁ হাঁ করে উঠলেন। বললেন—সে কি কথা! বীরেশ্বর কেন যাবে এখান থেকে? ও তো এখন সায়েন্সের রিসার্চ ফেলোশিপ পেয়ে সায়েন্স কলেজে যাচ্ছে প্রতিদিন। তাছাড়া ও চলে গেলে সুনন্দার পড়াশুনোর ক্ষতি হবে। তাছাড়া মন খারাপ করবে তার। তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমরা এই সম্বন্ধ পাকাপাকির কথা ওদের ঘুণাক্ষরে জানাব না।

রাধারমণকে সায় দিতে হল। তিনি শুধু একটু হাসলেন।

দেশে ফিরবার সময় তিনি সুনন্দাকে ডেকে আশীর্বাদ করলেন মাথায় হাত দিয়ে। জিজ্ঞাসা করলেন—কি মা, হায়ার সেকেণ্ডারীতে ভাল ফল করতে পারবে তো? তোমার মাস্টারের উপযুক্ত ছাত্রী তুমি তা প্রমাণ দিতে পারবে তো?

সুনন্দা অতি বাধ্য, অতি সুশীলা বালিকার মত গভীর শ্রদ্ধা ও গভীরতর লজ্জায় তাঁর সামনে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। একবার কোনক্রমে মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে জানালে—হ্যাঁ।

রাধারমণ আবার হাসলেন। হরিপদর স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে। যে হাসির অর্থ হল, না জানালেও মেয়ে তোমার সব জেনে গিয়েছে।

এমনি সময়ে একদিন।

দিনে রিসার্চের কাজ, সন্ধ্যায় সুনন্দাকে পড়ানো এই করেই বেশ চলে যাচ্ছিল বীরেশ্বরের। রাত্রিতে পড়াশুনো ও খাওয়া-দাওয়া সেরে বীরেশ্বর তেতলায় নিজের ঘরে চলে যায়, সুনন্দা দোতলায় বাবা-মার পাশের ঘরে পরীক্ষার পড়া করে। এদিকে বীরেশ্বর কোনদিন পড়াশুনো করে, কোনদিন রিসার্চের নোটগুলি দেখে, কোনদিন বা ছবি আঁকে।

সেদিন ছবি আঁকতে আঁকতে তেতলার ছাদে গিয়ে দাঁড়াল বীরেশ্বর। সুনন্দার ঘরে তখনও আলো জ্বলছিল। ছাদে দাঁড়িয়ে বাগানের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দেখলে সুনন্দার ঘরের আলো নিভে গেল এক সময়। সে হঠাৎ অনুভব করলে এই রাত্রিতে এই বাড়ীতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে তখন একমাত্র সে জেগে আছে। আর এই নক্ষত্রখচিত বৃহৎ নির্জনতার ও অন্ধকারের মধ্যে একা আত্মগোপন করে জেগে থেকে সে তাকিয়ে আছে আর একজনের দিকে। যার দিকে সে গোপনে তাকিয়ে আছে, সে নীচে পুকুরের ধারে, লিচুগাছের তলায় আত্মগোপন করে তার পরিপূর্ণ যৌবন নিয়ে একমাত্র তারই জন্য অপেক্ষা করছে।

কথাটা মনে হতেই তার বুকের ভিতরটা ভয়ে, উত্তেজনায় ও উদ্বেগে ধড়ফড় করে উঠল। পরমুহূর্তেই চোরের মত সন্তর্পণে পা টিপে টিপে সে নীচে নেমে গেল। তারপর এগিয়ে দাঁড়াল স্ট্যাচুটির কাছে।

একটা নেশায় পেয়ে বসল তাকে। চলতে লাগল দিনের পর দিন। দিনের পর দিন বললে বলা ভুল হবে। চলল রাত্রির পর রাত্রি। রাত্রিতে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ আর দিনে নেশার মত তারই চিন্তা সমস্ত কাজকর্মের অন্তরালে মনটাকে মাতিয়ে রাখে।

তার মনে কিন্তু একটা ভয় ছিল। ধরা পড়ে যাবার ভয়। অন্য কারও হাতে নয়, সুনন্দার হাতে। তবু সে নিজেকে সংযত করতে পারেনি। নেশায় তখন সে আকণ্ঠ ডুবেছে, তার থেকে উঠবে কি করে?

সে বাগানে নেমে গিয়েছে প্রতিটি রাত্রে। তারায় খচিত অন্ধকারের মধ্যে, আবার জ্যোৎস্নার আলো গায়ে মেখে। তারপর ঘরে ফিরে এসে কোন কোন দিন বসেছে স্কেচের খাতা নিয়ে। নেশার ঝোঁকে নিজের মোহিনীকে মনে মনে স্মরণ করে তারই ছবি এঁকে খাতার পাতা ভরিয়েছে।

ওরই মধ্যে এক এক দিন ওই মর্মর-মূর্তির অতি ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে লিচু গাছের ছায়ায় লুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অনুভব করেছে দোতলার ঘরের বাগানের দিকের জানলায়, ঘরের অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে সুনন্দা লক্ষ্য করছে তাকে। কিন্তু এই ঘটনার আগে পর্যন্ত তাকে এর মোকাবিলার সম্মুখীন হতে হয়নি।

আজ হল।

সকালের ঘটনার পর আর কি ঘটেছে। তবে বীরেশ্বর আশঙ্কা করছে আরও কিছু ঘটবে। যদিও সুনন্দা তার সামনে একা পড়লে লজ্জায় সময়ে জড়োসড়ো হয়ে মাথা নীচু করে বসে থাকে, তবু সে ভাল করেই জানে সুনন্দা তাকে বাক্সবন্দী করে, ডাইনীর মত তার সদাজাগ্রত চেতনা ও দৃষ্টি দিয়ে বন্দী করে রেখেছে। যতক্ষণ সে সিঁথির এই বাড়ীতে রয়েছে ততক্ষণ তার নিস্তার নেই এই পাহারা থেকে। তাই সন্ধেবেলায় নিজের ঘরের পড়ার টেবিলে বসে সে সুনন্দার সঙ্গে চরম এক সাক্ষাৎকারের জন্য অপেক্ষা করছিল।

যথাসময়ে খাতাবই হাতে সুনন্দা এসে ঢুকল ঘরে।

বীরেশ্বর প্রতিদিনের মত মৃদু হেসে বললে—এস।

পড়া শেষ হল। অঙ্ক কষার ছিল টেস্ট পেপার থেকে। তা শেষ হল। মাথা নীচু করে অতি মনোযোগের সঙ্গে কাজ শেষ করল সুনন্দা। তারপর বইখাতা গুছিয়ে সে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। বীরেশ্বরের মুখের দিকে বড় বড় চোখে একবার চেয়ে বললে—আমি যাই।

বীরেশ্বর শান্তভাবে নিজের স্বভাবমত একটু হেসে বললে—যাবে কেন? বস। ক'দিন তো আবার দেখা হবে না।

চলেও গেল না কি বসলও না সুনন্দা। চোখ বড় বড় করে তার মুখের দিকে চেয়ে রাগে বিদ্বেষে জ্বলে পুড়ে সাপের মত হিস হিস করে চাপা গলায় বললে—কি পায় পড়েছে আমার তোমার কাছে বসতে!

একটু থেমে সে নিদারুণ ঘৃণায় নিজের তরুণ মুখখানি বিকৃত করে তেমনি চাপা গলায় বললে—তুমি প্রতিদিন রাত্রে কি কর, কোথায় যাও আমি জানি না মনে কর?

তারপর নিজের মনের সমস্ত ক্রোধ ও ঘৃণায় তপ্ত ও বিষাক্ত করে শেষ কথাগুলো সে ছুঁড়ে দিলে তার গায়ে—ইতর, লম্পট, লোভী, নিষ্ঠুর কোথাকার!

বলে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল সুনন্দা। চেয়ারে স্থাণুর মত বসে বীরেশ্বর শুনতে পেলে সিঁড়ি দিয়ে সুনন্দার পায়ের চটির শব্দ অতি দ্রুততালে উঠে মিলিয়ে গেল।

সে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল।

সে মন স্থির করে নিয়েছে। সে এখান থেকে শুধু ক'দিনের জন্য নয়, বরাবরের জন্য চলে যাবে।

মন স্থির করে নিয়ে সে আস্তে আস্তে ধীর পায়ে নেমে গেল খাবার জন্য। খাবার টেবিলে সুনন্দা নেই। যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবে সে জিজ্ঞাসা করলে—সুনন্দা কই? খাবে না সুনন্দা?

সুনন্দার মা বললেন—পা বমি-বমি করছে বললে। শুয়ে পড়েছে কিছু না খেয়েই।

বীরেশ্বর নিঃশব্দে খেয়ে উঠে পড়ল। হরিপদ তাকে আশ্বস্ত করবার জন্যেই বললেন—আমি ভোরেই ডাক্তারবাবুকে আসতে বলে দিয়েছি।

॥ চার ॥

নিজের ঘরে এসে পাতা বিছানায় শুল না, যদিও উমাশা যত্ন করে বিছানা করে, মশারি টাঙিয়ে দিয়ে গিয়েছে। পড়ার টেবিলের পাশ থেকে চেয়ারখানা ঘরের এক-দিকে টেনে এনে সে বসল চুপ করে।

ভাবতে লাগল সে। সে অন্যায় করেছে? একটা পাথরের মূর্তির সৌন্দর্যকে ভাল লেগেছে, ভাল বেসেছে একথা ঠিক। তাতে কি হল? ওতো জীবন্ত কোন মানুষ নয় কিন্তু—

কিন্তু ওই পাথরের মূর্তিটাকে ও তো জীবন্ত স্ত্রীলোককে ভালবাসার মতই ভাল-বেসেছে। কত রাত্রিতে ওই মূর্তির কাছে দাঁড়িয়ে অন্ধকারের মধ্যে চোরের মত, ভীরুর মত কত সন্তর্পণে অতি ভয়ে ভয়ে ওর অনাবৃত পায়ের পাতায়, হাঁটুর উপর, উরুর উপর হাত রেখেছে। তাতে বুকের মধ্যে যে উত্তেজনা, যে আনন্দ অনুভব করেছে তা—

থাক। তা তাইই বটে; অস্বীকার করে কোন লাভ নেই। এ অবস্থায় এখানে থাকার কোন মানে হয় না। সে চলে যাবে, চলেই যাবে এখান থেকে। বলাইয়ের মতই চলে যাবে।

সে চেয়ার থেকে উঠে নিজের বইখাতা সব থাকে থাকে গুছিয়ে ঘরের কোণে যত্নে পাট করে রাখা দড়ি দিয়ে বাঁধতে লাগল। বইখাতা সব যত্ন করে বেঁধে, পড়ল বাক্স নিয়ে। বাক্স গোছাতে গোছাতেই শুনতে পেলে রাতটা বেড়ে গেল। দাঁচের ক্লকে টং টং করে রাতটা বাজছে।

স্কেচের গোপন খাতাখানা রাখলে বাক্সের জামাকাপড়ের তলায়।

একবার বিশ্রাম নেবার জন্যে উঠে দাঁড়াল। কুঁজোর জলে হাত ধুয়ে ফেলে জল খেলে খানিকটা। দেখলে দরজাটা খোলা রয়েছে। থাকুক। সে আবার বাক্সের দিকে এগিয়ে গেল।

এমন সময় হঠাৎ—

একটা শব্দ উঠল। সে চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখলে সুনন্দা আলুথালু হয়ে ঘরে ঢুকে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলে।

বীরেশ্বর সভয়ে চকিত হয়ে ব্যস্ত-সমস্তভাবে চাপা গলায় বললে—ও কী, ও কী করছ?

বন্ধ দরজার পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে সুনন্দা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে চাপা গলায় ধমক দিলে—বেশ করছি। চুপ করে থাক।

তারপর দরজা থেকে এগিয়ে এল তার কাছে। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে নিষ্ঠুরভাবে বললে—তুমি চলে যাবে, নয়? তা যাবার সময় ওই পাথরের ন্যাংটো স্ট্যাচুটা নিয়ে যাবে না?

বীরেশ্বর তাকে দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছে। সুনন্দার খোলা চুল ছুটকে ছিটকে কিছু কিছু তার মুখের উপর এসে পড়েছে শাড়ি আলুথালু, আঁচলটা বাঁহাত বেয়ে মাটিতে লুটোচ্ছে বুকের কাপড়ের তলায় বন্ধহীন ঊর্ধাঙ্গের উপর ব্লাউসের বোতাম গুলো সব বন্ধ নয়।

বীরেশ্বর সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে নিলে। তারপর সুনন্দাকে শান্ত করবার জন্য কিছু বলবার চেষ্টা করতেই আবার চাপা গলায় ধমক দিলে সুনন্দা—চুপ কর.

তারপর বীরেশ্বরের মুখোমুখি হয়ে চেয়ারে গিয়ে বসল। বসল সাম্রাজ্ঞীর মত পা দুখানা ঈষৎ তফাৎ করে প্রসারিত করে দিয়ে। বসতে গিয়ে খোলা চুল চামরের মত এসে লুটিয়ে পড়ল তার বুকের কাপড়ের উপর।

সাম্রাজ্ঞীর মহিমা নিয়ে সে বসে আছে চেয়ারে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে মুখ উঁচু করে তাকিয়ে। তার শাড়ির লম্বটানো আঁচলটা মেঝের ধুলো ছুঁয়ে আবার মেঝেতেই লুটিয়ে রইল।

তার সামনে বীরেশ্বর দাঁড়িয়ে আছে ভয়ে ভয়ে, বিচারপ্রার্থীর মত। সুনন্দার বড় বড় বিস্ফারিত চোখ দুটো এক আবকত দীপ্তিতে ঝকমক করছে। ফর্সা মুখখানা রক্তোচ্ছ্বাসে ভরে উঠেছে। এখন তার ভয় লাগছে সুনন্দাকে দেখে। ভয় পাবার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে সে আশ্চর্য হয়ে গেল এই ভেবে যে সুনন্দাকে কখনও এমন ভয়ের বস্তু মনে হয়নি!

বীরেশ্বরের মুখের দিকে চেয়ে সুনন্দা কৈফিয়ৎ তলব করার মত প্রশ্ন করলে—পাথরের তৈরি ভারী চেহারার ওই বুড়ী মেয়েটা খুব সুন্দর, সব চেয়ে সুন্দর? আমার চেয়েও সুন্দর?

বীরেশ্বর স্তম্ভিত, বাকহীন, বিমূঢ়। এর কি জবাব দেবে সে? সে বাকহীন হয়ে অসহায়ের মত সুনন্দার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

ভুরু কুঁচকে আবার শ্লেষের সুরে সুনন্দা বললে—কি, কথা বলছ না কেন? জবাব দাও।

কি জবাব হতে পারে এ কথার? বীরেশ্বর নীরব।

সুনন্দা বিচিত্র এক স্পর্ধিত হাসি হেসে বললে—দেখবে?

বলে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে বীরেশ্বরের মুখের দিকে চেয়ে রইল। ঠোঁট দুটোর একটা দিয়ে অন্যটাকে সে টিপে ধরেছে তার প্রাণের বিপুল স্পর্ধার বেগকে ধরে রাখার জন্য।

অকস্মাৎ সেই বাঁধ ভেঙে গেল। হাহাকারের মত এক নিদারুণ কান্নায় ভেঙে পরে সে বললে—দেখ, তবে দেখ!

বসতে বলতে ঊর্ধাঙ্গের কাপড় সে হাতের এক ঝটকায় সরিয়ে দিলে। আধ-খোলা ব্লাউজের বাকী বোতামগুলো খুলে দিয়ে নিজের কাঁধ আর বুককে সম্পূর্ণ অনাবৃত করে দিলে। তারপর পায়ের থেকে শাড়ির প্রান্ত গুটিয়ে তুলে দিলে হাঁটুর উপর পর্যন্ত। হাহাকার করে কাঁদতে কাঁদতে সে বললে—দেখ, তুমি দেখ কে বেশী সুন্দর।

সুনন্দা কাঁদছে হা হা করে আর তার দু চোখ দিয়ে অঝোর ধারে জল পড়ছে দুগাল বেয়ে। বীরেশ্বরের অভিভূত দৃষ্টির সামনে সেই গাল বেয়ে গড়ানো জল টপ টপ করে পড়ল তার নিটোল পরিপুষ্ট স্তনের উপর।

সে আর সুনন্দার চোখে চোখ রাখতে পারল না। চোখ নামিয়ে নিলে। কিন্তু তার নত চোখের সামনে ওকি?

সুনন্দার দুখানি পা।

সে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। সেই ন-দশ বছরের হাড়সর্বস্ব থানাখন্দভরা পা নয়। যৌবনের রসে মাংসে মজ্জায় সুঠাম নিটোল দুখানি পা। তার উপরে চোখ পড়তেই তার বুকটা ধক করে উঠল। একি দেখছে সে। এই রসপরিপূর্ণ সুঠাম পদ্মদলের মত দুখানি পায়ের উপর দুটি সুগোল পরিপুষ্ট, চিকণ হাঁটু পর্যন্ত আপনার বিপুল মহিমায় ও সৌন্দর্যে প্রকাশিত। শিল্পীর হাতের পাথরের চেয়েও মসৃণ, তা থেকে যেন আলো প্রতিফলিত হচ্ছে।

দেখতে দেখতে বিপুল এক অজানিত আবেগে তার গলা চোখ সব বন্যার স্রোতে প্লাবিত হতে চাচ্ছে। সে হঠাৎ সুনন্দার অনাবৃত পায়ের কাছে বসে তার একখানি হাঁটু করে কাঁদতে লাগল। ফুঁপিয়ে অনাবৃত পা দু হাত দিয়ে সবলে জড়িয়ে ফুঁপিয়ে, ফুলে ফুলে। চোখের জলে অনাবৃত পাদপদ্মখানি ভিজিয়ে দিলে। বার বার চুমু খেলে, মুখ ঘষলে চোখের জলে ভেজা সেই পায়ে। আর মানবপ্রাণের আদি মন্ত্রের মত ভাঙা ভাঙা এক আশ্চর্য সাদ্ধ্য ভাষায় অস্ফুট স্বরে বার বার উচ্চারণ করলে—তুমি সুন্দর, বড় সুন্দর, সবচেয়ে সুন্দর।

আর দু চোখের জলে ভাসতে ভাসতে হাসি মুখে সুনন্দা চেয়ারে বসে রইল। বীরেশ্বরের কাছ থেকে তার চোখের জল কর নিয়ে মৃদু হাসির প্রসাদ বিতরণ করে যৌবনের সিংহাসন অলংকৃত করে বসে রইল সাম্রাজ্ঞীর মত।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

হাওয়া গাড়ি

।। উনত্রিশ ।।

আজকের বোম্বাইয়ে বোন ধোঁয়া নেই। ঝুল নেই। কুয়াশা নেই। সকালবেলা অফিসে বেরোবার মতই মেজাজ দিলীপ। বেরোবার আগে হাসিমুখে দরজায় এগিয়ে এলো রবির ছেলে। তাড়াতাড়ি ফিরবে কিন্তু।

নিশ্চয়ই। তুমি যখন বলেছো—নিশ্চয় ফিরবো।

উকিল কোল ইণ্ডিয়ার চিঠিখানা মন দিয়ে পড়লো। তারপর বললো, একটা ভুল করেছেন আপনি।

কি ?

চড়টা মেরেই তো হেঁটে এই হাইকোর্টে পালাম চলে আসতে পারতেন। ক্যাবিফুটে না, পায়ে কোল ইণ্ডিয়া থেকে। তাহলে এমন একখানা চিঠি ঝাড়তাম—আপনাকে সঙ্গে সাসপেণ্ডও করতে পারতো না। আমার কথা মনে পড়লো না আপনার ?

আপনি মণিবাবু আমাদের অনেক-দিনের বন্ধু। কিন্তু তখন মাথায় আসেনি। তাছাড়া কোনদিন মামলা করিনি তো।

ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটের এক পারে হাইকোর্ট—আরেক পারে সব চেম্বার। খাবারের দোকান। সলিসিটারস হাউস। মাঝখানে নানা মেকের মোটর গাড়ি। জজের গাড়ি। ব্যারিস্টারের। উকিলের। মক্কেলের। তাদের মাঝখানে অস্টিন ট্যুয়েলটা মাথা খারাপ করা। জানলা দিয়ে দেখতে পাচ্ছিল দিলীপ।

মনিবাবুর এখন ঘোর পসার। দুজন মুনিষ। তার ভেতর একজন ফুলহাতার সাদা বুশ্যাউজ গায়ে মেয়ে উকিল। সেই মহিলার মক্কেলদের ভেতর একজন হুণ্ডিওয়ালা। কোন ছবিস্ব বিলিজ আটকাতে ইনজাংশন চাইছে। কেননা, প্রোডিউসার টাকা ফেরৎ দেয়নি। আরেকজন সান্ধ্য মাতাল বসে আছে—তার মামলা অগাধ জলে—সে কিছু টাকা চায়। এই বেশি না। বিশ-তিরিশ টাকা।

মনিবাবু মাঝে মাঝে উঠে যাচ্ছিলেন। মামলার নথি হাতে। তখন গায়ে কালো গাউন। আবার ফিরে এসে গাউনটা খুলে রেখে ট্যাউজারের চেইন নামিয়ে দিচ্ছিলেন। মোটাসোটা মানুষ। একটু ঢিলেঢালা হয়ে বসতে চান। মক্কেলের জন্যে একবার দাঁড়ালে তিনশো পঁচাত্তর টাকা নেন। টাইপিস্ট মহুরী বেয়ারা—মক্কেলে বোঝাই চেম্বার।

আমাকে কত দিতে হবে ?

এখন কিছু দিতে হবে না। কোল ইণ্ডিয়া তো একটা কোম্পানী।

গভর্ণমেণ্ট আণ্ডারটেকিং।

হোক না। তবু তো কোম্পানী নিশ্চয় আর্টিকেল অব অ্যাসোসিয়েশন আর্টিকেল অব মেমোরেণ্ডাম আছে। আপনি নারায়ণী বিল্ডিং-এ গিয়ে কোম্পানী রেজিস্ট্রারের কাছ থেকে কপি তুলুন।

কি রকম লাগবে ?

তা দুখানা মিলিয়ে দু'-ছাকশো টাকা। আর কেসের মুসাবিদা হয়ে গেলে তা পাঁচ কপি টাইপ করাতে হবে। তার দরুণ আরও দেড়শো রেখে যাবেন ক্লার্কের কাছে।

দিলীপ চুপ করে থাকলো।

মনিবাবু বললেন, হাসতে হাসতেই বললেন, আপনি ঠাস করে চড় কষিয়ে দিলেন। অফিস বসের গালে ? আপনি কীরকম লোক বলুনতো ?

দিলীপ চুপ করে থাকলো।

আপনারা চাকরীজীবী লোক। মাথা ঠাণ্ডা করে চলবেন তো। এখন কতকগুলো টাকার খরচান্তে পড়ে গেলেন। অবিশ্যি মামলা যখন হাতে নিয়েছি—আপনি পাবেন। অফিসের চিঠির জবাবটা বিকেলে এসে নিয়ে যাবেন। কাল ফার্স্ট আওয়ারে রসিদ করে জবাব পাঠিয়ে দেবেন।

রাস্তায় বেরিয়ে দিলীপ দেখলো, গাদা গাদা লোক এপাড়ায় মামলা লড়তে এসেছে। আপিল, ইনজাংশন, স্টে অর্ডার—নানান জিনিস। জবরজং রকমের লোক। কতরকমের খাবার। কতরকমের গাড়ি। বেলা দশটা থেকেই বাজার জমাট।

বেলা তিনটে নাগাদ শীতের বিকেল নেমে আসছিলো। ঠাণ্ডা শিরশিরে বাতাস। কাঁচের শোকেস এখন অন্ধকার অন্ধকার। একটু বাদে আলো জ্বলে উঠলে ঝলমল করবে। সবাই সবার কাজে ব্যস্ত। শুধু আমারই কোন কাজ নেই। উকিল, জজ, মক্কেল, ব্যারিস্টার সলিসিটারদের গাড়ি-গুলো একে একে বাড়ি ফিরতে শুরু করায় ট্রাফিকের দাগ টানা লাইনে অল্প কয়েক-খানা গাড়ির ভেতর অস্টিনটুয়াবার দাঁড়িয়ে। সাবা ডালহৌসি চক্করের মেবে দিলীপ দেখলো—বেলাবেলি বহুলোক নানা রকমের টিফিন খায়।

পৌনে চারটে নাগাদ জবাবখানা পকেটে নিয়ে দিলীপ স্টিয়ারিংয়ে বসলো। চিঠির অনেকটাই প্যাট কথাটা দিয়ে ভর্তি; কিছু হাসপাতালের কাছে এসে দেখলো ভিড়। রীতিমত ভিড়।

একজনকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলো, খতিরুক ঘটক শেষরাতে মারা গিয়েছেন। তাঁর শোকযাত্রা বেরোবে। মারা এসে গেছে। মৃণাল সেন ঐ যে। রোগীকে লরিতে শোয়ানো হচ্ছে। দিলীপ স্থানীয়কে দেখেছে। সে কতদিন আগে। তারপর কতকাল ভালো কী পায়া হয়নি। সত্যজিতের কত ভালো ছবি এলো। তার অনেকগুলোই সে দেখেনি।

আপনার আয়কর!
কী হিসাবে হবে?

আপনার পরিচয় যাইহোক না কেন নীচের হার-ছক আপনাকে সাহায্য করবে,

একক বা যৌথ*

১৯৭৮—৭৯ সালের হিসাব অনুসারে আয়কর হার এবং

১৯৭৮—৭৯ আর্থিক বছরে দেও অগ্রিম কর

আয়সীমা অনুসারে আয়কর		একক বা যৌথ প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রদেয় কর পরিমাণ (কলম তিনের অঙ্গীভূতদের ক্ষেত্রে নয়)		যৌথ পরিবারের ক্ষেত্রে একজনের মোট আয় ১০,০০০ টাকার বেশি হলে	
থেকে	প্রতি	আয়সীমা অনুসারে নির্দিষ্ট আয়কর	অতিরিক্ত আয় যথা	আয় সীমা অনুসারে নির্দিষ্ট আয়কর	অতিরিক্ত আয় যথা
১০,০০০ পর্যন্ত		×	×	×	
১০,০০১	১৫,০০০	×	টাঃ ৮,০০০ ওপরের জন্য আরও ১৫%	×	টাঃ ৮,০০০ ওপরের জন্য আরও ১৮%
১৫,০০১	২০,০০০	১,০৫০	টাঃ ১৫,০০০ ওপরের জন্য আরও ১৮%	১,২৬০	টাঃ ১৫,০০০ ওপরের জন্য আরও ২৫%
২০,০০১	২৫,০০০	১,৯৫০	টাঃ ২০,০০০ ওপরের জন্য আরও ২৫%	২,৫১০	টাঃ ২০,০০০ ওপরের জন্য আরও ৩০%
২৫,০০১	৩০,০০০	৩,২০০	টাঃ ২৫,০০০ ওপরের জন্য আরও ৩০%	৪,০১০	টাঃ ২৫,০০০ ওপরের জন্য আরও ৪০%
৩০,০০১	৫০,০০০	৪,৭০০	টাঃ ৩০,০০০ ওপরের জন্য আর ৪০%	৬,০১০	টাঃ ৩০,০০০ ওপরের জন্য আরও ৫০%
৫০,০০১	৭০,০০০	১২,৭০০	টাঃ ৫০,০০০ ওপরের জন্য আরও ৫০%	১৬,০১০	টাঃ ৫০,০০০ ওপরের জন্য আরও ৫০%
৭০,০০০	১,০০,০০০	২২,৭০০	টাঃ ৭০,০০০ ওপরের জন্য আরও ৫৫%	২৭,০১০	টাঃ ৭০,০০০ ওপরের জন্য আরও ৬০%
১০০,০০১ এবং অধিক		৩৯,২০০	টাঃ ১,০০,০০০ ওপরের জন্য আরও ৬০%		

সারচার্জ : ওপরের হার অনুসারে প্রদেয় আয়করের সঙ্গে, আয়করের ১৫% সমান সারচার্জ প্রদেয়।

* তাছাড়া, যার মোট আয় ১০,০০০ টাকার বেশি, কিন্তু মোট আয় ১০,৫৪০ টাকার বেশি নয়, সেক্ষেত্রে আয়কর ৭০% বেশি হবে না।

** তাছাড়া, যার মোট আয় ১০,০০০ টাকার বেশি, কিন্তু মোট আয় ১০,৬৯০০ টাকার বেশি নয়, সেখানে আয়কর ৭০% বেশি হবে না।

* হিন্দু অবিভক্ত পরিবার

কর ঠিকমত হিসাব করুন—তাড়াতাড়ি কর দিন

প্রচার করেছেন:
ডিরেকটর অফ ইন্সপেকশন
(রিসার্চ, স্ট্যাটিসটিকস অ্যান্ড পাবলিকেশন)
আয়কর বিভাগ
নতুন দিল্লি-১১০০০১

ডিএভিপি - ৭৮/২১১

হাসপাতাল পেরিয়ে দিলীপের মনে হচ্ছিলো, সে ঘুরন্ত চাকার বাইরে পড়ে গেছে। আমাকে সাসপেন্ড করলো? সে চাকাটার কিছুতেই উঠতে পারলো না। এই চাকাটা তার চোখের সামনে ঘুরছে। চাকার ওপর সব চেনাশুনো লোকজন নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত। চাকাটা ভীষণ জোরে ঘুরে যাচ্ছে। প্রত্যেক স্পোকে তিন চারজন করে চেনা লোক বসে। তারা দাঁত বের করে হাসছে। দেখেও তাদের ছুঁতে পারছে না দিলীপ।

কাল রাতে সেই লোকটা তোমাদের ছাদে উঠেছিলো।

দেখেছি কালুদা। তুমিও পেছন পেছন ছুটছিলে।

উঃ কী কান্ডই যে আমার ফুটে উঠতে ভরেছিলো। ওকে ফলো করার সময় তোমায় রুসন দিলাম।

ফুটতে গেলে কেন?

উপায় ছিলো না দিলীপ। ও তো আমার পরোয়াই করে না নাহলে। দিব্যি চিনে চিনে তোমার ফ্ল্যাটে উঠে গেল। পেছন পেছন গেলাম। সদর খোলা। সবাই ঘুমে। আলো জ্বলছে। অথচ তুমি নেই। তক্ষুনি লোকটা ছাদে উঠতে লাগলো। বুঝলাম, তোমায় খুঁজছে। তখন আর ঝুঁকি নিলাম না দিলীপ। অনেক কষ্টে ফুটে উঠলাম। কোন থার্ড পারসন দেখলে ও লোকটাও খারাপ কিছু করতে এগোবে না—

কিন্তু আমায় খুঁজছে কেন? আমি তো অমন কোন লোক জীবনে দেখিনি।

তোমার সঙ্গে কারও শত্রুতা আছে?

না। কারও সঙ্গে তো আমার শত্রুতা নেই।

স্টেঞ্জ। এই লোকটাই সেদিন গাড়ির সিট উল্টে-পাল্টে দেখছিলো।

কেন যে একটা লোক আমায় লুকিয়ে খুন করছে—একদম বুঝতে পারছি না কালুদা। বলতে বলতে দিলীপের মনে হোল—এই পৃথিবীতে কেউ কি তার বিরুদ্ধে গোপনে মারার ঘুঁটি সাজাচ্ছে? তাই বা কেন হবে? এমন তো কোচকানো ধাগারাগি কারও সঙ্গে তো নেই আমার।

বাড়ি ফিরে দিলীপ রেসিনের আয়নায় নিজের মুখ দেখলো। একদম কালি মেরে দেওয়া ফেস। যাকে বলে ডিফিট নামে একটা ক্রিম মাখানো।

সন্ধ্যেবেলা মণিবাবুর অফিসে ফোন করা চিঠিটা আরেকবার খুলে পড়লো। রানী রবির ছেলেকে সাজিয়ে গুজিয়ে টেবিলে পাঠালো। যাও, দাদাকে বলো—আমায় বেড়াতে নিয়ে চলো।

রবির ছেলে এখন ভালো হাঁটে। একটুও টলে না। রাতে মাংস রান্না হলে জেগে বসে থাকে। মাংস তার প্রিয় জিনিস। নতুন খেতে শিখেছে।

দিলীপ রানীকে বলেছে—এই সবে ও পৃথিবীর রস শোষণ শুরু করেছে। তারপর ওর চোখে জগতের রূপও ধরা পড়বে।

মহা পেটুক তোমার নাতি।

ওকথা বোলো না রানী। খেতে খেতে মানুষ পৃথিবীকে চেনে। খেতে খেতেই একদিন রূপ, গন্ধ সব ওর চোখে ধরা পড়বে। যেদিন রূপ, গন্ধ পার হয়ে যাবে—সেদিন জিনিসের ভেতরকার এলিমেন্ট ও দেখতে পাবে। বস্তুর আসল রূপ তখন অ্যাবসট্র্যাকট হয়ে ধরা পড়বে খোকনের চোখে। ততদিনে ও বুড়ো হয়ে যাবে—

ওসব অলুক্ষণে কথা এখন বোলো না। আমরাই এখনো বুড়ো হোলাম না—ওকি বুড়ো হবে।

আমি এইভাবে আজকাল অনেক জিনিসের ভেতরকার হাড়, ম্যাংসো— দেখতে পাই।

তুমি তো সাত বুড়ো। অকালপক্ক!

তা তো বলবেই। নয়তো সেই বউ পালানো লোকটা আবার ফিরে আসবে কেন?

একদম বাজে কথা বলবে না। আমার কাছ থেকে বেশি পেয়ে পেয়ে আমার মূল্য বোঝো না একদম।

আজ কিন্তু ওরকম কোন কথাই হেসে না। খোকন বেড়াবার কথা বলতেই দিলীপ রাজি হয়ে গেল। স্টিয়ারিংয়ে কচি ঠাকুর্দা। পাশে কচি নাতি। পেছনে কালু ঘোষ।

শীতের সন্ধ্যেরাতে কলকাতার আলো-বাতাস—কিছু ভারি। বাসগুলোর শ্লেষ্মা। খোকনের মাথায় উলের টুপি। গায়ে ডবল জাম্পার। পাশে উলেন মোজার ওপর কাপড়ের জুতো। গঙ্গারঘাটে জাহাজ দেখিয়ে দিলীপ বললো, জাহাজ দেখেছিস আগে?

ছবিতে।

একদিন এরকম একটা জাহাজে একদম চলে যাবো আমি।

আমি তোমার সঙ্গে যাবো।

হিঃ। এই বয়সে তোমার কোথাও যাওয়ার দরকার নেই।

এবার কালু ঘোষ পেছন থেকে বললো, আবেকটু খারাপ কথা বলো। মজা বোঝো। নাতি বেশ শিক্ষা দিলো তোমায়।

দিলীপ শুধু শুনতে পাচ্ছিলো। সে বাতাসটা পাতলা করে দিতে খোকনকে বললো, তোমার এখন কোথাও চলে যাওয়া চলবে না। তোমার বউ আসবে—

আমার তো বিয়ে হয়ে গেছে দাদা। তোমার বউয়ের সঙ্গে।

দিলীপ আর কি বলবে। সে মনে মনে নিজের ছেলেকে একটা গালাগালি দিলো। গাধা। এমন ছেলে রেখে দিয়ে পুলিশ হাজতে পচছিস। আরেকটু ওর খুনোখুনি।

উকিলের চিঠিখানা পরদিনই দিলীপ লোক দিয়ে অফিসে পাঠালো। পরদিন সাইকেল পিওন এসে চিঠি দিলো অফিসের। এ বিষয়ে তদন্তের জন্যে তুমি তেইশে ফেব্রুয়ারি পার্সোনেল ডিপার্টমেন্টে হাজির হবে বেলা দশটায়। সেখানে তোমার বক্তব্য জানাও। দরকার হলে তোমার সাক্ষী সঙ্গে নিতে পারো। তবে তাদের নাম আগে জানাতে হবে।

শীত যাবার আগে তেইশে ফেব্রুয়ারিকে বেছে নিলো। কোট প্যান্ট পরেই দিলীপ গেল। অনেকদিন পরে আবার অফিসে। এ অফিস তার আর কিছুতেই নিজের মনে হোল না।

তদন্ত মানে—অফিসেরই একজনকে বিচারক বানিয়ে তার কাছে কেস পেশ করা। এইটা নাকি বাইরের আদালতকে দূরে রাখার জন্যে ঘরোয়া এনকোয়ারি। এই নাকি লেবার ল।

খুব মজার ব্যাপার। অনাথ চক্কোত্তিকে ডাকা হয়নি। ডাকা হয়েছে শুধু তাকে। কোল ইন্ডিয়ার তরফে উকিল রয়েছে। দিলীপের তরফে শুধু দিলীপ। পুরো ব্যাপারটাই একতরফা। তবু দিলীপ থেকে গেলো। তদন্ত অফিসার, কোল ইন্ডিয়ার সিগ্নাল বিভাগের উকিল—সবাই দিলীপের জানা শুনো।

দিলীপ পুরো ঘটনাটা জানিয়ে যে স্টেটমেন্ট দিলো— তার চুম্বক অনেকটা এরকম।

অনাথ চক্কোত্তির কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তিনি আমায় এখানে আনেন। কিন্তু লোকটি গত দশ বছরে আগেকার সেলফ থেকে পাল্টে পাল্টে এখন এমন একটি মানুষ—যাকে আর মানুষ বলা কঠিন। আপনারা নিজের ছবি দেখেও মুগ্ধ হয়ে থাকেন। অফিসঘরটি তার ব্যক্তিগত বৈঠকখানা।

স্টেটমেন্টের পর অফিসের উকিল বললো, দিলীপবাবু—আপনার হওয়া উচিত ছিলো উকিল।

দিলীপ তার স্টেটমেন্টের শেষে বললো, এখানে এমনই একটি তদন্ত হোল—যেখানে অনাথ চক্কোত্তিকে আমার সোজাসুজি জেরা করার কোন রাস্তাই রাখা হয়নি। আমি খোলা আদালতে এ প্রশ্ন তুলবো।

এ তদন্তের কয়েক দিনের ভেতর দেখা গেল—কোল ইন্ডিয়া দিলীপের সঙ্গে ভাব করে নিতে চায়। কোল ইন্ডিয়ার কথা একটাই। আপনাকে তো অনাথবাবু ভালো-বাসেন। নিজেদের ভেতর আপনারা দুঃখ প্রকাশ করুন না। তাহলেই তো সব মিটে যায়। আপনাকে তো কোল ইন্ডিয়ার কাছে দুঃখ প্রকাশ করতে হচ্ছে না। করছেন—পার্সোনাল লেভেলে।

দিলীপের কথা একটাই। যে তদন্ত করলেন আপনারা—তার রিপোর্ট আগে প্রকাশ করুন।

কোম্পানী তা পারে না। হাইকোর্ট পাড়ায় উকিল মণিবাবু বললেন, তাহলে কোম্পানীর কেস দাঁড়ায় না।

সমস্যা বড় সুন্দর। শীত চলে গিয়ে বাতাসে একটু একটু তাপ। দিলীপ এখন কোল ইণ্ডিয়ার কোর্টে বল গড়িয়ে দিয়ে বসে আছে সে বল ওদিক থেকে সার্ভ করার কেউ নেই।

সাসপেনসানের সময় অফিসে ঢোকা বন্ধ হয়ে যায়। খুনী যেমন খুনের জায়গায় ঘুরে ফিরে যায়েই—দিলীপও তেমনি তার অপমানিত হবার জায়গাটা দেখতে গিয়ে দেখলো—অফিসে ঢোকার ব্যাপারে তার ওপর কোন নিষেধ নেই। সবই গোলমেলা।

ফেব্রুয়ারি গেল। মার্চ গেল। এপ্রিলের মাঝামাঝি। অনাথ চক্রবর্তীর হাতের ব্যাণ্ডেজ খোলা। নিজের ঘরেই ছিলো অনাথ। দিলীপকে ঢুকতে দেখেই বললো, সুন্দর গুরুদক্ষিণা দিয়েছো আমায়। দাখো। এখনো হাতটা পুরো তুলতে পারি না। হট অ্যাণ্ড কোল্ড—অলটারনেটিভ বাথ নিতে হচ্ছে।

দিলীপ চুপ করে থাকলো।

অনাথ বললো, আমরা দুজন তো দুঃখ প্রকাশ করে চিঠি একসচেঞ্জ করতে পারি। তাহলেই সব মিটে যায়—

চিঠি কেন? মেটাবার হলে তো মুখে মুখে দুঃখ প্রকাশ করতে পারি দুজনে। তাতেই তো মিটে যেতে পারে।

এটা তো একটা অফিস দিলীপ।

দুঃখপ্রকাশের চিঠিটা আপনার হাতে তুলে দিই—আর তার ওপর কোম্পানী অ্যাকশন নিক!

অ্যাকশন কেন বলছো দিলীপ। তোমার মত কর্মীকে বাইরে বসিয়ে রেখে কোম্পানীর লস।

শুধু লস বলছেন কেন? আমি তো ওপেন কোর্টে গিয়ে কোম্পানীকে নাস্তানাবুদও করতে পারি।

কোম্পানী কিন্তু তা চায় না। কোম্পানী চায় সাসপেনসন তুলে নিতে।

সে তো এখনো পারে।

এটা একটা অফিস দিলীপ।

ওঃ! আমার দুঃখপ্রকাশের চিঠিখানা আপনি ওদের হাতে তুলে দিলেই ওরা আমায় ক্ষমা করবে।

হ্যাঁ।

সেটাও তো একটা অ্যাকশন।

আমার দুঃখপ্রকাশের চিঠিখানা তোমার হাতে থাকছে দিলীপ।

আপনার চিঠি কোম্পানী ইগনোর করতেও পারে তো।

হোয়াই ডু ইউ সাসপেক্ট দিলীপ? এ আমার ভালো লাগে না।

এমন তো কথা ছিলো না অনাথদা। এর চেয়ে অনেক বেশি সাসপিসিয়নের কারণ আপনি।

কি ব্যাপারে?

আপনিই এ কথাটা স্যুট করেছেন। রসিদ প্রোমোশনে স্কেপে গিয়ে আমি এ কাজ করেছি। কোন পাগলও এটা বিশ্বাস করতো না। যদি না আপনি সেদিন আমার প্রোমোশনের কথা অতবার বলতেন। সেটাই আমার কাল হয়েছে। এখন কলকাতা সুদ্ধ লোক বিশ্বাস করে—রসিদ প্রোমোশনের দরুন স্কেপে গিয়ে আমি আপনাকে চড় মেরেছি। কেউ জানে না—আপনি আগে আমায় বারেবার চড় মেরেছেন। রসিদ মনটাও বিষিয়ে গেছে। সাসপেন্ড হওয়ার চেয়ে এটা অনেক অতিকায়ক—অনেক বেশি অপমানের।

তুমি তো তাই বলেছিলে—

কখোন বললাম?

তখন তুমি খানিকক্ষণের জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছিলে। তোমার কিছুই মনে নেই।

আমার সব মনে আছে। আমি বলতে চেয়েছিলাম—আমি যে এতদিন কাজ করলাম—তার কোন রেকগনিশন নেই?

ওই একই হোলো!

না। এক নয় অনাথদা। আমার নিজের কথা বলা—আর অন্যকে জড়ানো—একদম আলাদা কথা।

তুমি যে ভৌমিক খাদনে ঘরে ম্যানেজমেন্টকে পাণ্ডবেশ্বরে এরিয়াস খাটিয়ে রেখেছো। সেখানেই তো কাটা বিঁধে আছে।

নৃপেন কর্ণেল পশ্যতি। অনাথদা আপনারা যেমন বোঝেন—তেমন বুঝবে ম্যানেজমেন্ট! আপনারাই তো ম্যানেজমেন্ট। সাসপেন্ড হয়েছি—বেশ হয়েছি। কোর্টে বুঝবো। তিতলে ব্যাণ্ডপার্টি বাজিয়ে অফিসে ঢুকবো। কিন্তু ঈর্ষায় হেট পড়ে আপনাকে চড় মেরেছি—এই যদি চাউস হয় আপনার কল্যাণে—পুরনো বন্ধুর চেহারেও যদি ছোটো হয়ে যাই তাহলে আমি দাঁড়াই কোথায় বলতে পারেন?

তাহলে সাফাই বলো।

তাতে আমার একটুও আপত্তি নেই অনাথদা। কিন্তু আপনাকেও দাম দিতে হবে দেখবেন। হাইকোর্ট পাড়ায় উকিল বললো, তবু আপনি একটা ইনজাংশন নিয়ে রাখুন। ডোমেসটিক এনকোয়ারীর রিপোর্ট দেব করায় অসুবিধে থাকবে কোম্পানী অনেক সময় ডিসক্লোজ করে মাত্র ধুয়ে বসে থাকে। তখন গামলা অগাধ জলে।

বলুক যা ডিসক্লোজ। আমরা আর ওখানে কাজ করার মন নেই।

তাহলে আপনার ডিসমিসাল অর্ডার ডিসক্লোজ করে দেবো? এমনিতে ডিসমিসালের বিরুদ্ধে প্রিভেনটিভ ইনজাংশন পাই। তাতে ডোমেসটিক এনকোয়ারীর রিপোর্ট দেয় করার জন্যে শো-কজ নোটিশ ধরাই। সেটাও তো উচিত হবে।

তাই করুন।

হুজ্জতি না ঘুরতেই মাস্টারিং ডিসক্লোজ এক ফোনে। আপনারা দুজনে মিটিয়ে নিন না।

চিঠি দিয়েছেন আপনি। আপনারাই। বাড়ি বসে চাকরি পাবো। তারপর যতদিন না রেসট হয় ফাইভ পারসেন্ট ইনক্রিমেন্ট নিয়ে যাবো।

আবার হাইকোর্টে ইনজাংশন।

ডোমেসটিক এনকোয়ারীর নামে অপমানটা তো আর করবেন না।

আপনাদের দুজনের ব্যাপার—আপনারা বুঝুন। দাদা ভাইয়ের ঝগড়া।

এসব হোল গিয়ে [illegible]

কদিন পরে দিলীপ আবার অনাথের কাছে গেল। ঘরে দেখে বললো, [illegible] আবার একথা সেকথার পর দিলীপই বললো, অনাথদা বিনু, বৌদি তোমাকে খুব ভালোবাসে।

বাজারে একথাটা এতদিন পরেই শুনতে পাচ্ছি।

না। এটা কোন রসিকতা নয়। বিশ্বাস করো। আমি জানি বলেই বলছি। ওই ডিভোর্সে নে না।

তোর কি মনে হয় [illegible]

ঝগড়াঝাটির চেয়ে [illegible] সমস্যাই ভালো। তার আগের ব্যাপারে জানাশুনো। আগের কথা ভুলে যা।

তাই বলছিস।

হ্যাঁ।

দিলীপ বেরিয়ে [illegible] ঘরে পেলো। তখন [illegible] টেবিলের কাছে চেয়ার টেনে [illegible] আচড়াচ্ছিলো। মুখ [illegible] রাখলো। দেখে তুমি [illegible] আমরা দুজনে কি মিলিয়ে নিতে পারি না দিলীপ?

সবসময়ই [illegible] চাপাচাপি কি [illegible]

দুঃসাধ্য রোগ

একজিমা, সোরাইসিস [illegible] বক্তদোষ বাতরক্ত [illegible] দাগসহ আরও অনেক [illegible] হইতে স্থায়ী মুক্তি [illegible] বৎসরের চিকিৎসাভিজ্ঞ [illegible] হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর [illegible] ফোন, খড়্গপুর [illegible] ৬৭-২৫৫৯, শাখা : ৫, [illegible] রোড (হ্যারিসন রোড) কলিকাতা-৯

আমি দুঃখপ্রকাশ করে চলোয়ার চিঠি দিচ্ছি।

তাড়া কিসের। আমিও না হয় দেব এক-আনা।

কবে ?

অনাথ চক্কোত্তির আগমন দেখে দিলীপের হাসি পাচ্ছিলো। গম্ভীর হয়ে বললো, কাল।

বেলা দশটায়। অ্যাভেনটিনে ?

বেশ তো।

সেদিনই বিকেলে মনিবাবু দুঃখ-প্রকাশের মুসাবিদা করে দিলেন। ইংরাজিতে টাইপ করা দুঃখপ্রকাশের চিঠি।

পরদিন সকালে দশটার জায়গায় পৌনে এগারোটা হয়ে গেল দিলীপের। অ্যাভেন-টিনে ক'াচের দরজা। দিলীপ উঁকি দিয়ে দেখলো, একজন নবম গরিব চেয়ারে উসখুস করছে। সামনে দুটো ফাঁকা গ্লাস। একটায় সামান্য তলানী। শাদা জল। নয়তো জিন।

দিলীপ ঢুকতেই অনাথ দাঁড়িয়ে উঠলো। এত দেরি ? এসো এসো। কি খাবে ?

আপনি কি খাচ্ছিলেন ? বলতে বলতে দিলীপের মনে হোল—একটুতেই এত। এ লোকটাকে আমি আনন্দিত করতে পারি।

তুমি আমার পাশে এসে বোসো।

কেন ? এইতো বেশ আছি।

না। পাশে এসে বোসো। কতদিন তোমার সঙ্গে ঠিকমত কথা বলা হয় না।

দিলীপ নিজের মনের ভেতর নিজেকে বললো, একদা এক বাদের গলায় ক'াটা ফুটিয়াছিল। মনে মনে একথা বলে সে অনাথের পাশে গিয়ে বসলো। ফাঁকা বার। অনাথ দিলীপকে জড়িয়ে ধরে কপালে একটা চুমু খেলো। দিলীপ মনে মনে বললো, অনাথদা তো তাকে চুমু খেতেই পারে। এ স্নেহচুম্বন যেকোন দাদাই ভাই বা ভাই-এর মত লোককে দিতে পারে। আমি তো সব ব্যাপারেই অনাথদার চেয়ে ছোট। তাই—দোষের কি ?

সিলেকশন চিকেন দু' প্লেট।

গুরুগম্ভীর পোজে টাই গলায় একটা ছোকরা মুখ অর্ডার টুকে নিয়ে গেল। খাবারটা যখন এলো—তখনই সিলেকশন ব্যাপারটা বোঝা গেল। গরম মুরগীর মাংস ক'াচা লঙ্কার মাখো মাখো। চওড়া চামচ দিয়ে পাথরের প্লেটে চাপ দিতেই ক'া ক'া শব্দ তুলে ধোঁয়া উঠলো। দিলীপ অনাথদার সঙ্গে সঙ্গে হেসে ফেললো। একটা খাদার তার আওয়াজ দিয়ে যে গুমোট কাটিয়ে দিতে পারে—তা আগে জানা ছিলো না দিলীপের। দু' প্লেট উড়ে গেল। সঙ্গে জিন। আবার দু' প্লেট এলো। আর উড়েও গেল।

অনাথ চক্কোত্তি বিল মিটিয়ে বললো, দুঃখপ্রকাশ করাটা একটা রীতি মাত্র। আমরা অফিসে কাজ করি বলে তাই। নয়তো আমা-দের মধ্যে ভেতর কোন দুঃখ তো আর সত্যিই নেই। আমরা জানি—আমরা দুজন কোথায় কি ভুল করেছি—কি দোষ করেছি—তার শাস্তিও আমরা পেয়ে বসে আছি।

তবে আর লেখালেখি কেন অনাথদা ?

ওটা হোল গিয়ে আমরা দুজনই একটা অফিসে কাজ করি বলে। এই নাও কাগজ। এই হোল গিয়ে কলম—

দিলীপ পকেট থেকে কাগজ বের করে বললো, আমার উকিল টাইপ করে দিয়েছে।

অনাথ চক্কোত্তির অল্প টিপসি ভাব। একটু দুলে গিয়ে সে দিলীপের কাগজখানায় থাবা দিয়ে হাতে নিলো। তারপর দুমড়ে ফেলে দিয়ে বললো, আমাদের ভেতর আবার উকিল কেন ?

দিলীপের সন্দেহ হোল। আবার মনে হোল—মানুষ তো পালটায়। সবই তো জীবনে উকিলের কথায় ঠিক হয় না। মামলার বাস অনুযায়ী তো পৃথিবী ঘোরে না। তাহলে অনাথদাকে বিশ্বাস করায় দোষ কি ? দেখাই যাক না।

অনাথ চক্কোত্তি চোখ মুছলো। কত-দিন আমরা খুব খুলে কথা বলিনি।

দিলীপের একবার সন্দেহ হোল। জান ? নেশা ? না, সত্যি।

দিন আপনার কাগজ। লিখে দিচ্ছি অনাথদা।

দিলীপ কাগজ হাতে পেয়ে ঘস ঘস করে কি লিখে দিলো—তা আর চোখেও ধরা পড়লো না। কারণ, তখন দিলীপেরও দু' চোখ জলে ভরে গিয়েছে।

অনাথদাও দেখাদেখি কি লিখছিলো। দুজনেরই লেখা শেষ একসঙ্গে। অনাথ চক্কোত্তি তার চিঠিখানা দিলীপের হাতে তুলে দিল। দিলীপ তারটা দিল অনাথ চক্কোত্তিকে।

অনাথদার লেখা ইংরিজিতে। জড়ানো হাতের লেখা। দিলীপ কিছু পড়তে পারলো না।

দিলীপের হাতের লেখা পরিষ্কার। সব ক'টা লাইন অনাথ চক্কোত্তি পড়তে পারলো।

তুমি খেয়ে এসেছো দিলীপ ?

নাঃ। এখুনি তো বাড়ি ফিরে যাবো। আর এই তো খেলাম কত।

এ আবার খাওয়া নাকি! আর এখন বাড়ি যাবে কি ? এখন তো তুমি অফিসে যাবে। এই বেয়ারা। দুটো ফ্যামেড রাইস—হাফ করবে। আর দুটো সুইট অ্যান্ড সাওয়ার চিকেন দাও।

আর চিকেন নয় অনাথদা। আমি মুরগির গন্ধ পাই। মাছের কিছু বলুন।

বেশ তো। এরা তো ভেটকির ফিলেট দিয়েই কবিরাজি বানায়।

এখন অফিসে যাবো কেন অনাথদা ?

এখন তুমি রেস্ট করবে—

সাসপেনসন উইথড্রন হোক না এখনো।

গুলি মারো সাসপেনসন। আমরা তো তামাদের মন জেনে নিলাম চিঠিতে। আর একটা হাফপ্লেট নাও।

এখন কষ্ট হবে খেলে। বাইরে রোদে ভীষণ তাত।

খাও না।' বলে এগিয়ে এসে অনাথ চক্কোত্তি দিলীপের কপালে আরেকবার ঠোঁট ছোঁয়ালো। দিলীপ মনে মনে বললো, ক্ষমা করুন। আপনার গায়ে হাত তোলা আমার খুবই অন্যায় হয়েছে। ফাঁকা বার। খানিক বাদে লাঞ্চ টাইমে জমজমাট হয়ে উঠবে।

দিলীপ টের পেলো, তার চোখ অন্ধ-কার হয়ে যাচ্ছে। এ কি জিনের কারসাজি ? কিন্তু এমন তো কিছু খাইনি—যে, চোখে জল চলে আসবে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে সাড়ে বারো। দুজনে উঠবার মুখে অনাথ চক্কোত্তি বললো, তোমার কি লিখেছি পড়েও দেখনি। দাও তো একটু।

এ-চিঠি আর কি হবে। আপনিই রেখে দিন। তারপর হো হো করে হেসে উঠলো দিলীপ। রেখেই বা কি হবে ? ছিঁড়ে ফেলে দিন।

তাই ভালো। অনাথ চক্কোত্তি নিজের লেখা চিঠিখানা হাতে নিয়ে কুচি কুচি করে ছিঁড়তে ছিঁড়তে দিলীপের সঙ্গে অ্যাভেনটিন থেকে বেরিয়ে এলো।

তোমার গাড়ির ড্রাইভার কোথায় ?

অনেকদিন হোল ছাড়িয়ে দিয়েছি। নিজেই চালাই। চলুন না আমার গাড়িতে। আপনার ড্রাইভারকে একদম অফিসে চলে যেতে বলছি।

ওকি ? এই তোমার গাড়ি ?

হ্যাঁ অনাথদা। উঠুন। কোন ভয় নেই।

চলবে তো ?

দেখুন না বসে। কেমন জলের মত চলে বুঝবেন।

তোমার সবই অদ্ভুত দিলীপ।'

গাড়িতে বসে অনাথ চক্কোত্তি বলতে বাধ্য হোল, গাড়িটা চলে কিন্তু ফাইন।

একদিন আপনাকে আর ঋষিকে চড়িয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়াবো।

তোমার অ্যামবাসাডর কি হোল দিলীপ।

পড়ে পড়ে জং ধরে গেছে।

একদম চালাও না ?

চালানো হয় না অনাথদা। এবার ভাবছি বেচে দেব।

বেচবে কেন ? থাক না দুটো গাড়ি। তুমি বলতে পারবে—এটা হোল দি সেকেন্ড কার!

আজেই জয়েন করতে বলছেন ?, কিন্তু কোন চিঠিপত্র নেই আমার হাতে—

পরে রেগুলারাইজ করে নেওয়া যাবে।

দিলীপের মনে হোল—পৃথিবীটা আবার নতুন করে তার জন্যে শুরু হচ্ছে।

(চলবে)

কৃতি প্রতিভা : কিছু কথাবার্তা

অরুণ মুখোপাধ্যায়

কথায় কথায় অরুণ মুখোপাধ্যায় বললেন, 'ইচ্ছে আছে ঋত্বিককুমার ঘটকের 'বগলার বন্দর্শন' চিত্রনাট্যটি নাটকে করব।'

প্রশ্ন করলাম, 'আপনি নাটক করেন কেন?'

রাইটার্স বিল্ডিং। চারদিকে কর্মব্যস্ত মানুষ। আমার সামনের টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত ফাইল। 'চেতনা'র রাইটিং প্যাড। এবং ওপারে 'চেতনা'র দলপতি।

একটু ভেবে অরুণবাবু বললেন, 'ঠিক কোন সময় থেকে নাটকের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা সেটা আজ আর স্পষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। তবে মোটামুটি স্কুল জীবনেই নাটকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ি। মূলতঃ একটা ভালোলাগা কাজ করেছে। পরবর্তীকালে সেটাই ভালোবাসায় রূপান্তরিত হয়েছে। এবং আমি যে নাটক করতে পারি, এই বোধ, এই বিশ্বাস আমাকে নাট্যকর্মের সঙ্গে আরও বেশী করে জড়িয়ে ফেলেছে। আর তাছাড়া, জীবন সম্পর্কে একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠার পর মনে হয়েছে, নাটক শুধু নিজের এবং পরের ভালো লাগার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, জীবনের সত্যকে তুলে ধরে, মানুষকে সমাজকে নতুন করে সত্যের আলোকে বিচার করে মঞ্চে হাজির করার এর দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব পালন করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে বসেছি।' তাই আজ জীবনের সার্থকতা, বাঁচার সার্থকতা, সবকিছুর সঙ্গে নাটক করাটা একাকার হয়ে গেছে।'

যে বুদ্ধি দিয়ে গাড়ী ঘোড়ার ভেতর দিয়ে আপনি রাস্তা পার হন, নাটক করায় কি সেই বুদ্ধি প্রয়োগ করেন?'

'আবার বলুন।'

বললাম।

ভাবলেন। প্রশ্নটি নিয়ে কয়েকবার নাড়াচাড়া করলেন। তারপর বললেন, 'প্রশ্নটা খুব একটা বুঝেছি, তা জোর করে বলতে পারি না। দেখুন, একটা মানুষ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ বুদ্ধি প্রয়োগ করবেন, এটা ভাবা যায় না। কেউ সাহিত্যে গাবদর্শী কিন্তু অঙ্কে কাঁচা। যাই হোক, রাস্তা পার হওয়ার ক্ষেত্রে আলো চেনার মতো শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রেও কতকগুলি কৌশল জানতে হয়। দক্ষতা অর্জন করতে হয়। তবে একটা কথা বলা যায়, দৈনন্দিন জীবনে সাদামাটা বুদ্ধি নিয়ে কাজ চালানো যায় কিন্তু সৃষ্টিশীল জগতে তা চলে না। চলে নাই বা বলি কেন, চালাচ্ছেন তো অনেকেই—

'যেমন?'

'পেশাদারী মঞ্চে এ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বাংলা ছবির ক্ষেত্রেও বিরল নয়।'

গ্রুপ থিয়েটারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম।

অরুণবাবু জানালেন, গ্রুপ থিয়েটারের একজন কর্মী হিসেবে তিনি প্রচণ্ড আশাবাদী। বললেন, 'অবশ্য পেশাদারী মঞ্চের রমরমা এবং অপেরা পার্টির বাড়বাড়ন্ত যে আমাদের ভাবিয়ে তোলে না, এমন নয়। তবে বাংলাদেশের মাটিতে সুস্থ জীবনবাদী নাট্যচর্চার প্রসার ঘটবেই। এবং আমার ধারণা, পুরোপুরি পেশাদারী ভিত্তিতে কাজ না করতে পারলে কখনো এর পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটবে না।'

আমার পরের প্রশ্ন, 'নাটকের মাধ্যমে আপনি কি বলতে চান। কতটা বলতে পেরেছেন।'

'মানুষ সম্পর্কে, জীবন সম্পর্কে, আমার সময় সম্পর্কে, আমার যতটুকু জানার তাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করে মঞ্চে হাজির করাই আমার নাট্যচর্চার প্রধান উদ্দেশ্য। যে কটি নাটক আমি লিখতে পেরেছি এবং প্রযোজনা করতে পেরেছি তাতে আমার নাটক করার উদ্দেশ্য অনেকাংশে সার্থক হয়েছে বলে আমার ধারণা।'

'প্রেম এবং প্রতিবাদ,—কোনটিকে আপনি বেশী প্রাধান্য দেন এবং কেন?'

'আমার নাটকে প্রতিবাদের সুরই প্রধান। অন্যায়, অবিচার এবং শোষণ যতদিন আছে, ততদিন প্রতিবাদের প্রাধান্যই স্বাভাবিক। কিন্তু তার মানে এই নয়, জীবন থেকে আমরা প্রেমকে নির্বাসিত করতে চাই।'

পরের প্রশ্ন করতে গিয়ে থামতে হল। সম্ভবতঃ কলকাতার বাইরে থেকে তিন চার জনের একটি দল এসেছেন। কুশলশেষের জন্য। কথাবার্তা সেরে চলে যেতে প্রশ্ন করলাম, 'আজকের সমস্যাকীর্ণ মানুষের কাছে নাটককে মাধ্যম করে আপনি কি পৌঁছাতে পারবেন?'

'না পারলে উপায় নেই। এই ভাবেই করতে হবে। তবে পারবো না, এ প্রশ্ন উঠছে কিসে?'

'সমস্যায় জর্জরিত একটি বিরাট অংশ চাষী মজুর। কলকাতার মঞ্চে তাদের কথা বললে কি তাদের কাছে পৌঁছানো সম্ভব?'

'আমি তো তাদের কিছু বলতে চাই না। আমি বলতে চাই মধ্যবিত্ত সমাজকে। যে তোমরা কিছু না।' দেশের প্রধান হচ্ছে চাষী মজুর। তোমাদের অহংকার মিথ্যা।'

আমার পরের প্রশ্ন, 'বেশীর ভাগ নাটকে দেখা যায় জোতদার একেবারে খারাপ আর চাষী মজুর একেবারে ভালো। এটা কি বাস্তব?'

অরুণবাবু খানিকটা জোর দিয়ে বললেন, 'অভিযোগটা ভিত্তিহীন। সব নাটকেই মানুষকে একপেশে ভাবে চিত্রিত করা হয়, এটা ঘটনা নয়—'

'আমি সব বলিনি। বেশীর ভাগ—'

'যাই হোক ব্যাপারটা শ্রেণীগত অবস্থান দিয়ে বিচার করা হয়। যেহেতু একটা শ্রেণী আর একটা শ্রেণীকে শোষণ করতে বাধ্য। সেই হেতু শোষিত মানুষেরা স্বপক্ষে কথা বলতে গিয়ে শোষকশ্রেণীকে মানুষের শত্রু হিসেবে এবং শোষিতশ্রেণী যেহেতু আগামী দিনের চালিকা শক্তি, সেই হেতু তাদের বলিষ্ঠ এবং সুস্থ মানবিকতার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তাই বলে, জোতদার বা কারখানা মালিক হলেই তার মধ্যে সব রকম বদ গুণের সমাবেশ এবং শ্রমিক কৃষক হলেই তাদের দেবদূত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, এটা নেহাতই অপরিণত ধারণা। আসলে যিনি নাটক লিখছেন, তার ক্ষমতার ওপর এটা নির্ভর করে।'

আমার শেষ প্রশ্ন, 'বৈপ্লবিক পরিবর্তনের নানান কথা এবং পথ নাটকে দেখা যায়, তবু মানুষ জাগছে না কেন। কারণগুলো কি তাহলে বাস্তবসম্মত নয়?'

'দেখুন নাটক দেখে কেউ বিপ্লবী হয় না।'

ঠিক। কবির কবিতা পড়ে কেউ বোমা ফেলা চালাতে শেখে না।' তবে একটা নাড়া তো খায় এবং তারপর—'

'তার জন্যে আমি বলবো ... বাম রাজনৈতিক দল দায়ী। আমরা আমাদের কাজ ঠিক করে যাচ্ছি।'

দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রেমচন্দ অঙ্কিত 'মাধব' লোকটির কথা সর্বপ্রথম জানতে পারি মুন্সীজীর 'কফন' গল্পে। এবং কিছুকাল পূর্বে তার সাক্ষাৎ মেলে কলকাতার একটি নাটকে,—যা ঐ গল্পের ভিত্তিতে লিখিত। নাম, দান-সাগর।

কালিকলমে আঁকা 'মাধব' এতদিন পর কম-বেশী না হয়ে পুরোপুরি মঞ্চে উপ-স্থিত। মানুষ হিসেবে তাকে আমি প্রথমে 'মাধব' নামে চিনলেও, তাঁর আসল নাম, দ্বিজেন বন্দোপাধ্যায়। অভিনয় দেখার পর মেনে নিতে কষ্ট হয়।

তরুণ যুবক। ভদ্র। চাকরি এবং সংসার করেন। বর্তমানে শুদ্রক গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত এবং এই গোষ্ঠী প্রযোজিত 'অন্ধিযুগের' নাটকের প্রযোগ প্রধান।

নাটক করার জন্য গায়ে মুখে রং মেখে অসাধারণ দক্ষতায় 'মাধব' সেজেছিলেন।

কিন্তু কেন, পৃথিবীতে এতকিছু থাকতে বেঁচে বেছে নাটক করা কেন?

'হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছি গঙ্গার পাড়ে। জোয়ারের জলে ভেসে দাঁড়িয়ে আছে বিচুলি বোঝাই সার সার মহাজনী নৌকা। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হওয়া চুটন্ত বাতাস এবং প্রচণ্ড শীতেও ঔদ্যমী কেউ কেউ জলে সাঁতার কাটছে। পাশে মন্দির। সন্ধ্যায় নামসংকীর্তন হয়।

দ্বিজেনকে চুপ দেখে, আমি আবার প্রশ্ন করলাম। এবং দ্বিজেন সংকোচ ভরা গলায় বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'দেখুন আমি খুব অল্পদিন নাটক করছি। আপনার পত্রিকার মাধ্যমে আপনার প্রশ্নের উত্তর আর পাঁচজনের কাছে পৌঁছে দেবার মত পুঁজি আমার এখনো জমে নি। স্বাভাবিকভাবেই আমি এই ব্যাপারে কুণ্ঠিত।'

'তবু একটা কারণ তো নিশ্চয়ই আছে।'

দ্বিজেন ভেবে বললেন, 'এই মুহূর্তে অন্যান্য মাধ্যমগুলোর মধ্যে এই মাধ্যমটিতেই আমি আমার সীমিত ক্ষমতা দিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করতে পারি। এবং ভালো লাগে। এটাই হয়ত নাটক করার কারণ।'

মন্দিরের গা ঘেঁষে লাল রঙের ঝকঝকে বোষাক। গঙ্গার দিকে মুখ করে পাশাপাশি দুজনে বসলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি বলতে চান?'

'আমি আমার চারপাশের ভালো লাগা এবং ভালো না লাগার কথা বলতে চাই।'

'কতটা পেরেছেন?'

'আচ্ছা কতটা পেরেছি তার পরি-মাপ করার সময় কি আমার হয়েছে।'

'তবু?'

দ্বিজেন জানালেন, তিনি নিশ্চয়ই এগোচ্ছেন।

আমার পরের প্রশ্ন, 'যে বুদ্ধি দিয়ে গাড়ী ঘোড়ার ভেতর দিয়ে আপনি রাস্তা পার হন, সেই বুদ্ধি কি নাটক করায় প্রয়োগ করেন?

একটুক্ষণ ভাবলেন। চোখাচোখি হতেই হাসলেন। লক্ষ্য করেছি কিছুটা ইতস্তত ভাব সাক্ষাৎকার নেওয়াকালীন সময়ে ওর মধ্যে ছিল।

ভেবে উত্তর দিলেন, 'যে কোনো মানুষ-কেই বেঁচে থাকতে গেলে ঐ বুদ্ধি প্রয়োগ করেই বাঁচতে হয়। নাটকের ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন বুদ্ধির প্রয়োগ কি সঙ্গত হবে? কারণ আমা-দের নাটকগুলো তো মানুষেরই বেঁচে থাকার গল্প।

'এইসব মানুষের মধ্যে একটা বিরাট অংশ জুড়ে আছে চাষী মজুর। তাদের গল্প, তাদের স্বপ্ন, ইত্যাদি সবকিছু কলকাতার মঞ্চে বললে কি তাদের কাছে পৌঁছবে?' প্রশ্ন করলাম।

দ্বিজেন বললেন, 'আমি বিশ্বাস করি কলকাতার মানুষদেরও তাদের কথা জানার প্রয়োজন আছে।'

'না, না, আমি বলছি তাদের কাছে পৌঁছনোর কথা—'

কতকগুলো টেকনিক্যাল অসুবিধের জন্য ওদের কাছে পৌঁছনো সম্ভব হচ্ছে না। দ্বিজেন একথা জানালেন।

এর জোর দিয়ে বললেন, 'তবে এই ব্যাপারে কিন্তু আমাদের চেষ্টা করতেই হবে।'

'বর্তমানের সমস্যাকীর্ণ মানুষের কাছে আপনি কি নাটককে মাধ্যম করে পৌঁছতে পারবেন?'

'নিশ্চয়ই।'

'আচ্ছা আপনি তো একজন গ্রুপ থিয়েটারের কর্মী—'

'হ্যাঁ।'

'আপনার চোখে গ্রুপ থিয়েটারের ভবিষ্যৎ কি?'

'দেখুন গ্রুপ থিয়েটারের সমর্থকরা বলে থাকেন, যে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এবং আমিও তাই বিশ্বাস করি।'

চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বিশ্বাস করেন শুধু সমর্থকরা বলে থাকেন বলে?'

'না, না—তা কেন—

[illegible]?'

বেশ কিছু দিন পর সাম্প্রতিককালে নাটকের একটা জোয়ার এসেছে। তাই দেখে আমার এই বিশ্বাস।"

মাঝদুপুরে আমাদের এই দুই তরুণ যুবককে ঘাটের বোয়াকে বসে লেখালেখি করতে দেখে, বেশ কিছু কৌতূহলী স্নানার্থী গায়ে মাখার তেল, কেউ বা সাবান ঘষতে ঘষতে ঘিরে দাঁড়িয়েছে।

প্রেম এবং প্রতিবাদ,—নাটকের ক্ষেত্রে কোনটিকে দ্বিজেন বেশী প্রাধান্য দিয়ে থাকেন, এবং কেন জানতে চাওয়ায় জানালেন, প্রেমের জন্যই প্রতিবাদ। প্রেম আবহমান কাল ধরে শোষণের অত্যাচারে আক্রান্ত হচ্ছে। তার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ। এই সমাজ ব্যবস্থায় তাই প্রেম এবং প্রতিবাদের পাশাপাশি অব-স্থান, যে কোনো সার্থক নাটকেরই প্রতি-পাদ্য।

প্রশ্ন করলাম যে আদর্শের জন্য নাট্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল, সেই আদর্শ এখনো সকলের সামনে আছে কিনা। নাকি পথ ঘুরে গেছে এস্টাব্লিশমেন্টের দিকে।

দ্বিজেন বললেন, 'আদর্শ সকলের সামনে আছে কিনা সেটা বিবেচ্য নয়। তবে নাট্য আন্দোলনের সেই আদর্শ আছে এবং থাকবে। আর যে কোনো শুভচেষ্টারই তো পরিণতি এস্টাব্লিশমেন্টে। তবে কথাটা হচ্ছে সেই এস্টাব্লিশমেন্ট কার সপক্ষে।'

'বেশীর ভাগ নাটকে দেখা যায় জোতদার মাত্রই একেবারে বাজে এবং চাষীমজুর মাত্রই নিপাট ভালো মানুষ,—এটা হয় কি করে? আমি বলতে চাইছি তারাও তো মানুষ—'

'দেখুন 'চাক ভাঙা মধু' এবং 'দানসাগর' নাটকে একটি মহাজন আছেন, যিনি দাক্ষিণ্য দেখান। আসল কথা, এই সামাজিক বিন্যাস মানুষের লোভ, দয়া-দাক্ষিণ্য নির্ভর করে তাদের শ্রেণীর অব-স্থানের ওপর। স্বাভাবিক ভাবেই একটা মহাজনের বেঁচে থাকার এবং একজন অভাবি মানুষের বেঁচে থাকার মধ্যে সিংহ ভাগ দখল করে থাকে শোষক এবং শোষিতের সম্পর্ক। এখন একটা দু ঘন্টার নাটকে ৮০ বছর বয়সী একজন জোতদারের একদিনের দয়া বা এক ঘন্টার দাক্ষিণ্য দেখানো সম্ভব কিনা, সেটা নির্ভর করে নির্দিষ্ট নাটকটির বিন্যাসের ওপর।'

আমার শেষ প্রশ্ন, 'নাটকেই দেখতে পাই বিপ্লবের পথ, বাঁচার পথ নানা ভাবে দেখানো হয়। তবু মানুষ জাগছে না কেন? ওগুলো বাস্তবসম্মত নয়?'

দ্বিজেন উত্তর দিলেন, 'সবকিছু মিলিয়েই মানুষকে জাগায়। একা নাটক নয়, নাটক সাহায্য করে মাত্র। এবং আমি মনে করি নাটক তার ঠিক পথ ধরেই এগোচ্ছে। অন্যান্য ব্যবস্থা ঠিকমতো কাজ করছে না।'

'সেটা কি? সামাজিক, রাজ-নৈতিক—?'

'দুটোই। তবে এমন নাটকও তো আছে, যার পথ বাস্তবসম্মত নয়।

[illegible]

চিঠিপত্র

মিথ্যাচরণ আমার ধর্ম নয়

গত ২১।৭।৭৮ তারিখের অমৃত পত্রিকায় মুদ্রিত, 'পংকজকুমার স্মরণে' শীর্ষক চিঠিটিতে শ্রীসুবোধ মিত্র বলেছেন, গত মার্চ মাসে, পংকজবাবুর স্মরণসভায়, শ্রদ্ধা নিবেদনের সময় আমি যা পড়ে শুনিয়েছিলাম এবং পরে যা কাগজে ছাপা হয়েছিল, তার মধ্যে দু-একটি 'ভুল তথ্য' আছে। তার একটি হল :—পংকজবাবু সদলে 'পরিচয়' ছবির গান নির্বাচনের জন্য শান্তিনিকেতনে নাকি আদপেই যান নি, গিয়েছিলেন শ্রীযুক্ত সাইচাঁদ বড়াল মহাশয়। ছবির সঙ্গীত পরিচালক যে কে ছিলেন তা আমি সঠিক জানি না। কিন্তু একথা আবার বলছি যে, পংকজবাবু গান সংগ্রহের জন্য সদলে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নির্দেশ মত। গুরুদেবের নির্দেশে তিনি গান নির্বাচন করেছিলেন আমার সঙ্গে বসে। নির্বাচনের পর সন্ধ্যায় আমি যখন গুরুদেবের কাছে গিয়ে গানগুলির কথা তাঁকে বলি তখন তিনি গানটির প্রসঙ্গ তুলে পংকজবাবুর নামই উল্লেখ করেছিলেন।

দ্বিতীয় অভিযোগ হল :—'হে মোর দুর্ভাগা দেশ' কবিতাটির সুর আমার নয়। একই অভিযোগ, পংকজবাবুর জীবিতকালে, বছর দু-এক পূর্বে, কলিকাতার একটি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পত্রিকার পরিচালকগণ বিষয়টি আমার গোচরে যখন আনেন তখন আমি তার প্রতিবাদ করি এবং পত্রিকাটির পরবর্তী সংখ্যায় তা মুদ্রিতও হয়েছিল। এবারে, একই অভিযোগের পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করলাম শ্রীসুবোধবাবুর পত্রটিতে। শ্রীসুবোধবাবু, দেশবাসীর কাছে পংকজবাবুকে যে, প্রকারান্তরে মিথ্যাচরণের দোষে দোষী করলেন তা তিনি বোধহয় বুঝতে পারেন নি।

পংকজবাবুর সঙ্গে নানা সূত্রে বহুবার আমার যোগাযোগ ঘটেছিল। কিন্তু, তাঁর যে এইরূপ মিথ্যাচরণের স্বভাব ছিল তার এতটুকুও পরিচয়, তাঁর আচরণে বা কথাবার্তায় আমি কখনো পাইনি। অত্যন্ত বিনয়ী ও সৎপ্রকৃতির মানুষ হিসেবে আমি তাঁকে জেনেছিলাম। যাঁরা পংকজবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে মিশেছেন, তাঁরা সে পংকজবাবুর এ দুটি গুণের জন্য তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন, তাও আমি জানি।

আমার প্রদত্ত সুরটি পংকজবাবু কয়েক দিন ধরেই স্টুডিয়োতে বিরাট কণ্ঠবাহিনীকে শিখেছিলেন। পরে রেকর্ডটি যখন বিশ্বভারতীর মিউজিক বোর্ডের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়, তখন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমার প্রদত্ত সুরে গানটি গাওয়া হয়েছে জেনে, মিউজিক বোর্ড থেকে গানটির অনুমোদনের জন্য অনুমতি দেন।

পংকজবাবু যদি নিজে সুর দিয়ে গাইতেন, তাতে আমার দিক থেকে আপত্তির কি থাকতে পারে? সে যুগে তিনি প্রখ্যাত সুরকার, গায়ক এবং গুরুদেবের 'দিনের শেষে' কবিতাটিতে সুর যোজনা করে প্রচুর প্রশংসা পেয়েছিলেন। সুতরাং গুরুদেবের অন্য কবিতায় সুর যোজনার অধিকার তাঁর নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু, রথীন্দ্রনাথের নির্দেশমত, 'হে মোর' গানটি আমার প্রদত্ত সুরে গাইতে তিনি একটুও দ্বিধা করেন নি।

মিথ্যাচরণ করা বা মিথ্যাচরণকে সমর্থন করা আমার ধর্ম নয়। পংকজবাবু যদি গানটি নিজের সুরে গাইতেন, তবে রথীবাবু, আমার প্রদত্ত সুরে গানটি গাওয়া হয়েছে বলে, আমার সম্মতি কখনই পেতেন না এবং আমিই রথীবাবুকে বলতাম সুরকার হিসেবে পংকজবাবুর নাম রাখতে।

সে যুগে, গানের ক্ষেত্রে রথীবাবুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গোলযোগ করবার সামর্থ্য বিশ্বভারতীতে আর একজনেরও ছিল না। তিনি যা স্থির করতেন তাই হোতো। রবীন্দ্রসদনে আমার লিখিত বক্তৃতায় আমি রথীন্দ্রনাথের নামই উল্লেখ করেছিলাম। কাগজে প্রকাশ কালে ভুলক্রমে সম্পাদন প্রমাদ ঘটে, তা রবীন্দ্রনাথ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কাগজের পরবর্তী সংখ্যায় সে ভুলের সংশোধন করা হয়েছিল।

শান্তিদেব ঘোষ, শান্তিনিকেতন

মাড়ির গোলমালের প্রথম লক্ষণ

প্লেক (Plaque)
এক জীবাণুর এক আস্তর পর্দা যা আপনার দাঁত আর মাড়িতে অলক্ষ্যেই জড়িয়ে থাকে। অবহেলা করলে, ক্রমে ক্রমে পুরীভূত হয়।

ক্যালকুলাস
দাঁতের গোড়ায় জমে, ফলে মাড়ি জ্বালা করে আর ফুলে ওঠে। পরে মাড়ি আর হাড় ক্ষয়ে গিয়ে দাঁত পড়ে যেতে পারে।

মাড়ি থেকে রক্ত পড়া
ব্রাশ দিয়ে দাঁত সাফ করবার সময় ফুলন আর কোলাবোঁপা মাড়ি থেকে রক্ত পড়তে পারেন এতে বাধা না পেলেও গুরুতর সমস্যা দেখা দিতে পারে।

দাঁতের ডাক্তাররা বলেন:
নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করুন আর মাড়ি মালিশ করুন; তাহলে মাড়ির গোলমাল আর দাঁতের ক্ষয় রোধ করতে পারবেন।

দাঁতের সঠিক যত্নের জন্যে রোজ রাতে আর সকালে সঠিকভাবে দাঁত ব্রাশ আর মাড়ি মালিশ করুন ফরহান্স দিয়ে। আর, মাড়ি মালিশ করার সঙ্গে সঙ্গে দাঁত পরিষ্কার করার জন্যে বিশেষভাবে ডিজাইন করা ফরহান্স ডবল-অ্যাকশন টুথব্রাশই ব্যবহার করুন।

মাড়ি খারাপ হলে স্বাস্থ্যও খারাপ

ফরহান্স
টুথপেস্ট
দাঁতের
ডাক্তারদের তৈরী

পাওয়ারের বন্ধু বৃহস্পতি

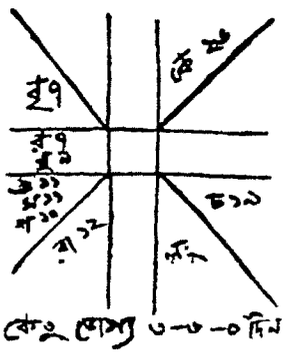

সিংহ রাশিতে শনির অবস্থান সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে কয়েকবার আলোচনা করেছি। আর আমাদের সেই আলোচনার মধ্যে যে ইঙ্গিত ছিল তার অন্ততঃ কিছুটা বাস্তবরূপ হতে চলেছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কর্কট রাশিতে শনির অবস্থান বিশেষ করে পুষ্যা নক্ষত্রে যেমন রাজনীতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে—আনে পরিবর্তনের ঘটনা, দেয় নতুনত্বের অভিনব আমেজ। তেমনই সিংহ রাশিতে মঘা নক্ষত্রের শনি চুপচাপ বসে সন্দেহের জাল বুনে যায়, সৃষ্টি করে ঘাত প্রতিঘাত, ঘটনা দুর্ঘটনা এবং কার্যকারণের মধ্য। ফলে এক অস্থিরতার দুঃসহ পরিবেশ থাকে রাজনীতি ক্ষেত্রে। দুর্যোগ আনে সমাজজীবনে। এই অশুভ ফলগুলিকে কার্যকর করতে শনি যদি মঙ্গল অথবা বাহুর সাহায্য পায় তবে তো সোনায় সোহাগা। ঘটনাগুলো সময়ের মত দ্রুত ঘটে যায়, সঙ্গে আনে হানাহানি রক্তক্ষয়, প্রাকৃতিক বিপর্যয় দুর্ঘটনা, সমাজবিরোধীদের প্রাধান্য। অশুভ শক্তি এবং স্বার্থান্বেষী পায় সুযোগ, ওঠে মাথাচাড়া দিয়ে। অর্থাৎ শনি গ্রহের প্রভাব এবং কার্যকারিতা মঘার রাশির অন্তর্গতি ভারতের কি রাজনীতি, কি সমাজক্ষেত্রে কি প্রকৃতিকে বহুলাংশে লক্ষ্যণীয়।

সিংহ রাশিতে মঘা নক্ষত্রে অন্যান্য কেতুর নক্ষত্রে শনির অবস্থান এবং তার সঙ্গে মঙ্গলের মিলন গত জুন-জুলাই মাসের ঘটনাগুলি আমাদের অন্ততঃ কিছুটা সেই অভিজ্ঞতাই এনে দিয়েছে। পথমতঃ দিল্লীর রাজনীতিতে—তারপর মহারাষ্ট্রের পট পরিবর্তন। আমরা সাধারণ নাগরিক যাই ঘটুক না কেন—আমরা চাই স্থিরতা, শান্তি, রাজনীতিতে সুস্থ পরিবেশ—যাতে থাকবে দেশ ও দশের কল্যাণে। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে গত ১৮ জুলাই মহারাষ্ট্রের শারদ-পাওয়ার মন্ত্রিসভার স্থগিতির এবং শুভাশুভের। বৃশ্চিক লগ্ন, ধনুরাশি, মঘা নক্ষত্রে শপথ নিয়েছে মহারাষ্ট্রের পাওয়ার মন্ত্রিসভা। আগের পাতিল মন্ত্রিসভার স্থগিতিকাল ছিল মাত্র চার মাসের মধ্যে পাওয়ার মন্ত্রিসভা শপথকালে কতগুলি শুভযোগ যে না পেয়েছে তা নয়। চন্দ্র এবং বৃহস্পতির অবস্থান অল্প-বিস্তর যোগের সৃষ্টি হয়েছে। লগ্নপতি মঙ্গলগতে স্থিত রাশিতে, লগ্নস্থান লগ্নপতি দ্বারা দৃষ্ট। উপরোক্ত যোগগুলি মন্ত্রিসভার পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক এবং শুভ ফলদাতা। আবার চন্দ্র লগ্ন থেকে দেখলেও কতগুলি শুভ যোগ পাওয়া যায়। যেমন বৃহস্পতির অবস্থান। বহু লোক পালনের চেষ্টা, কঠিন সমস্যাতে স্থির বুদ্ধি রাখতে সচেষ্ট থাকা এবং সমস্যার মোকাবিলাতে দৃঢ়তাবজায়। কেতুর নক্ষত্রে চন্দ্র থাকাতে কূটকৌশলে এবং অভিনব বুদ্ধি পারদর্শিতা ইত্যাদি। মন্ত্রিসভা অর্থনীতি সম্পর্কে প্রথমে সুবিধাগুলি হলেই সাধারণের উন্নতিতে সচেষ্ট হবে। বৃহস্পতির প্রভাবে চলন মুহূর্তেও উচ্চপ্রভাবশালীর সহায়তালাভে সমর্থ হবে এই মন্ত্রিসভা।

কিন্তু লক্ষ্য করবার মত রাশিচক্রে কেতু আছে শনির নক্ষত্রে আবার শনিগ্রহ আছে কেতুর নক্ষত্রে। ১৮ নভেম্বর গোচরে বাহুর ঐ শনির সঙ্গে মিলন জ্যোতিষী-দৃষ্টিতে মোটেই শুভজনক নয়। ২৩ অক্টোবর মঙ্গলগ্রহ লগ্নস্থ হওয়া এবং রবি গ্রহের নীচস্থ স্থান লাভ। ২৭ ডিসেম্বর শনির বক্রী হওয়া এবং ১১ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলের কুম্ভ রাশিতে সঞ্চার পাওয়ায় মন্ত্রিসভা সম্বন্ধে উদ্বেগের কারণ হয়ে রইল, তার ওপর বর্তমানে কেতুর মহাদশায় বাহুর অন্তর্দশা, যা চলবে '৭১ সালের ৬ জানুয়ারী পর্যন্ত। এই দশা অন্তর্দশা ও অন্তর্টা সুবিধের নয়। একমাত্র শুভ সঞ্চার হচ্ছে ৫ আগস্ট বৃহস্পতির। বৃহস্পতি ৫ আগস্ট কর্কট রাশিতে বহুলাংশে মন্ত্রিসভার পক্ষে শুভদায়ক, রক্ষাকবচের মত হবে। '৭১ সালের জানুয়ারীর পর বৃহস্পতির অন্তর্দশা ও মন্ত্রিসভার পক্ষে সহায়ক।

এবার সম্ভাব্য ব্যক্তিগত রাশিফল বলছি। সপ্তাহটি ইংরাজী ২৫ আগস্ট শুক্রবার থেকে আরম্ভ। গ্রহসন্নিবেশ অনুযায়ী ভারতের রাজনীতি চাঞ্চল্যের দিকে ঘড়ির কাঁটার মত এগিয়ে যেতে পরে। রাজনীতিতে চাঞ্চল্য থাকবে।

মেষ : কার্যক্ষেত্রে মনের সাহস বৃদ্ধি পাবে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গেও বোঝাপড়া ভাল থাকবে। কোন ব্যাপারে যশ, খ্যাতি পেলেও স্বাস্থ্য উৎপাত করতে পারে। সোম মঙ্গলবার শুভ।

বৃষ : কর্মস্থানে বহুদিনের কোন ঝামেলা এবার কেটে যাবে। প্রতিশ্রুতিও পাবেন, কোন ভ্রাতৃসূত্রে আয় বৃদ্ধি পাবে। বুধ বৃহস্পতি শুভ।

মিথুন : অত্যধিক উত্তেজনা ক্ষতির কারণ হতে পারে। কাউকে অপ্রিয় কথা বলা এবং টাকাকড়ির ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করাও ঠিক হবে না। পক্ষান্তরে, লেখক-সাহিত্যিক, শিল্পীদের পক্ষে সপ্তাহটা অনুকূল।

কর্কট : যদিও টাকাকড়ির ব্যাপারটা এখনও স্থিতিশীল নয়, কিন্তু কোন দ্রব্য-প্রাপ্তির যোগ আছে। কোন ঘটনায় চলন মুহূর্তে কারোর সাহায্য পাবেন। শুক্র, শনি শুভ।

সিংহ : আগের চাইতে ঝামেলা বহুলাংশে কমে গিয়ে আপনাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করবে কিন্তু ব্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় আর্থিক চাপ থাকবে। বুধ, বৃহস্পতি ছাড়া সপ্তাহটি মন্দ নয়।

কন্যা : ব্যবসাতে পসার বৃদ্ধি পাবে পুরনো পাওনা আদায় হবে। কিন্তু চাকুরেদের কর্মস্থানে অশান্তি দেখা দেওয়া অসম্ভব নয়। শনি, রবিবার কোন সিদ্ধান্ত না নেওয়াই ভাল।

তুলা : আয় বৃদ্ধি পাবে। কিছু স্থিতি ও অসম্ভব নয়। কর্মস্থানে কোন পোড় লোকের ব্যবহারে মানসিক অশান্তি দেখা দিতে পারে। মঙ্গলবার অশান্তি। বৃহস্পতিবার শুভ।

বৃশ্চিক : কর্মস্থানে নতুন মুখ থেকে সতর্ক থাকা উচিত হবে। আইন সংক্রান্ত ব্যাপার থেকেও কিছুদিন দূরে থাকা ভাল। কিন্তু ভাগ্য পরিবর্তনের ইঙ্গিত পেতে পারেন। বৃহস্পতি অশুভ।

ধনু : মনের দুর্বলতায় কারোর ক্ষতি হতে পারে। ব্যবসাও ঢিমেতালে চলবে। ভাতৃস্থানীয়দের সঙ্গে বিবাদ অসম্ভব নয়। দূরের সংবাদ আনন্দ দেবে। মঙ্গলবারের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাজ সেরে নিন।

মকর : আর্থিক ব্যাপারে নতুন আলোকপাত হবে। অসমাপ্ত কাজগুলোও এগিয়ে যাবে। কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির ব্যবহার উত্তাপ করতে পারে। শুক্র শনিবার এড়িয়ে চলুন।

কুম্ভ : বহুদিনের প্রতীক্ষিত কাজ-কর্মগুলো এবার রুটিনমাফিক চলবে। হাতে কিছু অর্থও থাকবে। কিন্তু বন্ধুবান্ধবের স্বাস্থ্য গোলমাল করতে পারে। সোম, মঙ্গল অশুভ।

মীন : সাংসারিক এবং ব্যবসাতে শুভ ফল পাবেন। কোথায়ও ভ্রমণে যেতে পারেন। জমানো টাকায় হাত পড়তে পারে। শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত লক্ষ্যণীয়।

শ্রীমাণিক্য

আগামী সংখ্যায়
শংকরপ্রসাদ মিত্র

পহেলে আপ, পহেলে আপ

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলার আগে যে-কাণ্ড ঘটে গেল তার নজির ভূ-ভারতে আছে কিনা সন্দেহ। ভূ-ভারতই বা বলি কেন—সমস্ত বিশ্বেও যে ঐ ঘটনাটি অদ্বিতীয়। এমন ঘটনা আগে কখনো ঘটে নি। তবে ভবিষ্যতে আরো ঘটবে কিনা বলা যায় না। স্মরণ পথ তো দেখানো হয়ে গেল। দেখিয়েছেন কলকাতা ময়দানের খোদ দুই প্রধান—মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গল।

খেলা ছিল মোহনবাগান মাঠে। কিন্তু কে আগে নামবে? আপ পহেলে, আপ পহেলে করে ওঁরা দিব্যি পঞ্চাশটি মিনিট কাটিয়ে দিলেন। একবার ভাবলেনও না যে গ্যালারিতে হাজার হাজার দর্শক তাঁদের জন্য প্রতিটি মুহূর্ত গুনছেন, টিভির সামনে হা-পিত্যেশ বসে আছেন অসংখ্য আবাল-বৃদ্ধবনিতা, আর রেডিওর ধারে কান পেতে আছেন তো কাশ্মীর থেকে কন্যা-কুমারিকা পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ ফুটবল উৎসাহী। যাঁদের খেলা দেখার জন্যে, যাঁদের কথা শোনার জন্যে এতো উৎসাহ, এতো উৎপত্তা —তাঁরা কিন্তু দিব্যি দুই শিবিরে বসে 'আপ পহেলে, আপ পহেলে' করে চলেছেন।

ঘড়ির কাঁটা যে ঘুরে চলেছে, বিলম্বে বিরক্ত রেফারি যে মাঠ ছেড়ে চলে আসতে চাইছেন— সে দিকে তাঁদের নজর নেই। তাঁরা নিজেদের সংস্কার নিয়েই ব্যস্ত।

কি আশ্চর্য। ফুটবল মাঠেও যে এমন হয়—আগে তো জানা ছিল না!

মোহনবাগানের কাছে নাকি নিজেদের মাঠটা দারুণ অপয়া। ১৯৬৯ সালের পর থেকে এ মাঠে তারা ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে জিততেই পারে নি। আর যতোবার তারা আগে মাঠে নেমেছে ততোবারই হেরেছে। সুতরাং এবার তারা কিছুতেই আগে নামবে না। ইস্টবেঙ্গল তাদের মাঠের অতিথি। তারাই আগে নামুক।

ইস্টবেঙ্গলেরও জেদ। তাঁরা কিছুতেই আগে নামবে না। আর তাই নিয়ে দুই শিবিরে চললো জেদাজেদি। কর্তাব্যক্তিরা গেলেন, নিজের দলের খেলোয়াড়দের বোঝাতে। মুখ চুন করে ফিরে এলেন তাঁরা। এ আই এফ এফের এক কর্তা গেলেন, ফিরে এলেন তাড়া খেয়ে। গেলেন দুই মন্ত্রী। অপদস্থ হয়ে ফিরে আসতে হল তাঁদেরও। ওদিকে গ্যালারিতে দর্শকরা ফুঁসছেন। কি হচ্ছে ব্যাপারটা—তাঁরা বুঝতে পারছেন না। তবে একটা কিছু যে হচ্ছে—সে বিষয়ে তাঁরা নিশ্চিত।

তাঁরা দেখলেন রেফারি রেগে মেগে বল হাতে নিয়ে মাঠ থেকে বেরিয়ে যেতে গেছেন। তাঁকে আবার বুঝিয়ে সুঝিয়ে মাঠের মধ্যে নিয়ে এলেন পুলিশরা। পুলিশের ভয়, মাঠের অবস্থা অগ্নিগর্ভ। খেলা যদি সত্যিই না হয় তাহলে হয়তো দাঙ্গা বেধে যাবে। দু পক্ষে শত্রু হয়ে যাবে খণ্ডযুদ্ধ।

কখন টেনশানে, টেনশানে দর্শকরা তখন উত্তেজনায় টগবগ করছে। তাঁরা চাইছেন যা হোক একটা কিছু এসপার-ওসপার এই মুহূর্তেই হয়ে যাক। বড় খেলার জন্যে তাঁরা একটি একটি করে দিন গুনেছেন। আজ সেই অতি প্রত্যাশিত লগ্নটি মুঠোর মধ্যে এসে গেছে। তাকে ফস্কে যেতে দিতে রাজী নন কেউই।

ইস্টবেঙ্গলের সমর্থকরা জানেন, তাঁদের পাবার কিছু নেই। লীগ চলে গেছে নাগালের বাইরে। মরশুমের গোড়ায় উয়াড়ীর কাছে হার আর পোর্টের কাছে একটি পয়েন্ট নষ্ট করা তাঁদের সব স্বপ্ন ভেস্তে চুরমার করে দিয়েছে। এই মরশুমে তাকে আবার নতুন করে গড়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। এতটুকুও সম্ভাবনা নেই লীগ বিজয়ীর খেতাব লাভ করার।

আছে শুধু একটা জিনিস—যা তাঁদের কাছে লীগ বিজয়ের চেয়ে অনেক বড়। আর মূল্য তাঁদের কাছে অপরিসীম—সেই মর্যাদার প্রশ্নটি। মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলাটি মর্যাদার লড়াই, গোলাপের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে যদি ইস্টবেঙ্গল জিততে পারে তাহলে লীগ বিজয়ী হতে না পারার সব দুঃখ ঘুচে যাবে।

ওদিকে তিন পয়েন্ট এগিয়ে থেকে মোহনবাগান তখন নীতিমত সুবিধাজনক অবস্থায়। ইস্টবেঙ্গলের কাছে হারলেও বিশেষ আসে যায় না। লীগ চ্যাম্পিয়ন তারা হবেই। কিন্তু ইস্টবেঙ্গলকে হারাতে না পারলে সে আনন্দ যে পুরো হয় না। কিছুতেই মন খুলে হাসা যায় না। সুতরাং এবার ওদের হারাতেই হবে। তাই বা হবে না কেন? দল হিসেবে মোহনবাগান যে অনেক ভালো। সব দিক দিয়েই শ্রেষ্ঠ। সুতরাং এই মর্যাদার লড়াই মোহনবাগানকে জিততেই হবে। সেই দৃশ্য দেখার জন্যেই তো কর্তার সমর্থকরা হাজির হয়েছেন মাঠে। বসে আছেন টি ভি কিংবা রেডিওর পাশে।

কিন্তু দু দলের খেলোয়াড়রা যে খোকাপনার জেদ ধরেছেন। কেউই আগে নামবেন না। নিজেদের দুর্বলতা, নিজেদের সংস্কারের কাছাকে তারা ঢেপে রাখতে পারেন নি প্রকাশ করে ফেলেছেন, বড় নির্লজ্জভাবে। এই নজির শেষ না ফুটবলের মধ্যে দুষ্টক্ষত সৃষ্টি করে বসল।

শেষ কালে দেখা গেল মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা মাঠের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। সকলেই ভাবলেন যে ওঁরা বুঝি মাঠে নামছেন। না তা মোটেই নয়। ওঁরা ওঁদের জেদ থেকে এক বিন্দুও সরলেন না। ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়রাও জেদ ছাড়লেন না। শেষকালে ঠিক হল, দুই অধিনায়ক কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক সঙ্গে মাঠে নামবেন এবং তাঁদের পেছনে আসবেন দু দলের অন্য খেলোয়াড়রা।

দীর্ঘ সময় প্রতিক্ষার পর দুই বন্ধু মোহনবাগানের অধিনায়ক প্রসূন বানার্জি ও ইস্টবেঙ্গলের ক্যাপ্টেন সুব্রতজিত সেনগুপ্ত একসঙ্গে মাঠে নামলেন। আর তাঁদের পেছনে অন্যরা।

ঘড়ির কাঁটা ততোক্ষণে চারটে পঞ্চাশে ঘুরে গেছে। খেলা শুরু হবার সময় ছিল চারটে। দু দল মাঠে না এলে রেফারি কি করবেন?

ফুটবল খেলার আইন-কানুনে তা নিয়ে কিছু লেখা নেই। কারণ কেউ তো কোনদিন ভাবেন নি যে এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। কিন্তু আই এফ এর নিয়ম হল দু দল মাঠে না এলে রেফারি মিনিট দশেক অপেক্ষা করে খেলা পরিত্যক্ত বলে ঘোষণা করে চলে যাবেন।

কিন্তু সেদিন তা করা হয় নি। বিলম্বে বিরক্ত রেফারিকে নির্ধারিত সময়ের পঞ্চাশ মিনিট পরে খেলা শুরু করতে হয়েছিল। এবং কলকাতা ময়দানে যা সৃষ্টি করলো নজির বিহীন এক সমস্যা। তাকে আরো বাড়িয়ে তুললেন, আই এফ এর গভর্নিং বডি। তাঁরা বললেন। ঐ ব্যাপারে তাঁদের কিছু করার নেই।

এখন দেখা যাক কলকাতা ময়দানের দুই প্রধানের দৃষ্টান্তে উজ্জীবিত হয়ে ছোট ছোট দলগুলো কি করে?

ঐ ব্যাপারটার জন্যে মোহনবাগান কর্তাদের পক্ষ থেকে অবশ্য ক্ষমা চাওয়া হয়েছে। এবং ভবিষ্যতে যাতে ঐ ধরনের ঘটনা না ঘটে তার জন্যে প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে। তাতে অবশ্য ঘটনাটার গুরুত্ব বিন্দুমাত্রও কমবে না। কিন্তু অন্য পক্ষ এখনো চুপ। চুপ করে থেকে তাঁরা যে তাঁদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারবেন না।

কারণ ঐ ঘটনা জনমানসে প্রতিক্রিয়ার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। স্বভাবতই ধিক্কার জানাচ্ছেন ক্রীড়াসংস্থাগুলিকে মনোভাবকে। কিন্তু তাতে কি হবে—ওরা দিব্যি কি আর মাছ ধরা হাত?

বড় খেলার বড় নাটক

সম্প্রতি কলকাতা মাঠের দুই সেরা দল মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গল মাঠে নেমেছিল শক্তি পরীক্ষায়। সিনিয়র ডিভিসন ফুটবল লীগ ঘিরে দুই প্রধানের এ আসরে অতিরিক্ত উত্তেজনার কিছু ছিল না—যদিও ইস্টবেঙ্গলের ক্ষেত্রে বিশেষ করে এ লড়াই ছিল অস্তিত্বের লড়াই। কেননা লীগ দৌড়ে ইস্টবেঙ্গল পিছিয়ে ছিল পরিষ্কার তিন পয়েন্টের ব্যবধানে। কাজেই এ খেলা চ্যাম্পিয়নশীপ নির্ধারণের খেলা ছিল না। অপরদিকে মোহনবাগানকে হারিয়ে তার দাঁতে খানিকটা দমড়ে দেওয়াই ছিল ইস্টবেঙ্গলের দিক থেকে লড়াইয়ের মূল ব্যাপার। আর তাদের সে লক্ষ্য আগে ইস্টবেঙ্গলের কৃতিত্বে সম্ভবত খানিকটা বাড়তি বল জুগিয়েছিল সাবির আলি। বছর খানেক ডাউপেটের নাড়ভুঁড়ি টানাপোড়েন ছাড়িয়ে সদ্য সদাই তিনি বল-কাঠা মাঠে নামার গ্রীনসিগন্যাল পেয়েছিলেন। ওঁতাদ খেলুড়ে সাবিরকে দলে পাওয়ায় ইস্টবেঙ্গলের সমর্থকেরাও যথেষ্ট বল-ভরসা পেয়েছিলেন। অন্তত খেলার আগে তাদের কথাবার্তায় এটা স্পষ্ট ছিল। তাঁরা যেন বলতে চাইছিল—মোহনবাগান যেন ইলাদ রাখে তাদের দলে সাবির নামছে।

মাঠেহাক ময়দানের বড় খেলা ঘিরে অসংখ্য ক্লাসিকাল বাঙালী কল্পনা-কল্পনা আর পরিকল্পনাকে পাশ কাটিয়ে সময় ঠিক ঠিক পৌঁছে গিয়েছিল রবিবারের বিকেলে। ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় চারটে। মিনিট পাঁচেক আগেই হেডোরি সুধীন চ্যাটার্জি সহযোগী দুই লাইনসম্যান সঙ্গে নিয়ে মাঠে ঢুকেছিলেন। দর্শকে ঠাসা গ্যালারী প্রায় উপচে পড়ছিল সবুজে ঘাসেরা মাঠে নেমে আসার চেষ্টায়। প্রতিটি মুহূর্ত তখন দর্শকের বুকের ধড়িতে নির্মম ঘা মারছিল। তাদের চোখ তখন বঙ্গমঞ্চের উইংসের দিকে। যেখান থেকে রেফারি আসবে সবুজে মেখনে আর লাল-হলুদের ফুটবলার পরে আজকের মহা নায়ক। কিন্তু বাকসা পরিবেদনা। শূন্য মাঠে রেফারি আর দুই লাইনসম্যান। ঘন ঘন ঘড়ি দেখছিলেন তাঁরা। পাঁচ দশ মিনিট করে সময় গড়িয়ে যাচ্ছিল। সাদে-মেখনে কিংবা লাল হলুদ বাদলাই দেখা নেই। দর্শকের মধ্যে উত্তেজনা। মোহনবাগান মাঠের বাকিটে গ্যালারি নিচে তখন নাটক জমে-ক্ষমাট। কোন্ দল মাঠে আগে নামবে তাই নিয়ে তুমুল বাদানুবাদ প্রচলিত সংস্কার নাকি এই মাঠে যে দল আগে মাঠে নামে তারাই হার স্বীকার করে। সংস্কারের বেড়া ডিঙিয়ে তাই কোন দলই আগে-ভাগে মাঠে ঢুকতে রাজি নয়। খেলার আগে ঝলীঘাটে পুজো দেওয়া ইত্যাদি অনেক আচার-আচরণ তারকুর বেঙ্কটেশ নিয়ে যাওয়া-বল সম্পাদকের বাড়িতেই সম্বন্ধ ছিল এতকাল। এই এটিপেথির এবার ইতিস্ম পড়ল প্রকাশ্য ময়দানে। রবিবার বড় খেলা দেখতে আসা অগুনতি মানুষ প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট দাঁতে দাঁত ঘষে দেখলেন প্রচণ্ড বলতের নাটক অথবা বলা যায় মূল খেলার আগে আর এক মজাদার খেলা। এরই মধ্যে রেফারি সুধীন চ্যাটার্জি চারটে উনচল্লিশ মিনিট নাগাদ মাঠ থেকে প্রায় বেরিয়ে আসছিলেন—বাধা পেলেন একজন পুলিশ অফিসারের অবরোধে। সুধীনবাবু সাফ জানিয়ে দিলেন প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট অপেক্ষা হয়েছে, আর নয়। দর্শকরাও গ্যালারী থেকে সম্ভবত সেনাপতির সেই পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্তের সঙ্গে সুরে অভিনন্দন জানালে। কিন্তু সেই পুলিশের ডি-সি ভদ্রলোক মাঠে ঢুকে হতে পারে আশঙ্কায় রেফারী সুধীন-বাবুকে আরও খানিকটা অপেক্ষা করতে বললেন।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে আগে কেবা প্রাণ কারিকে দান যোদ্ধের এক জটিল সমস্যার মীমাংসা ঘটিয়ে দুটি ক্লাবই মাঠে নামল একসঙ্গে। মাঠে ঢুকল আগে মোহন-বাগান পিছনে ইস্টবেঙ্গল।

এবার প্রশ্ন কলকাতা মাঠের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলায় দুই দলের এ আচরণ কী সমর্থনযোগ্য? ভারতীয় ফুটবলের কর্ণধারদের দুটি দল এমন একটি বড় খেলায় এ ছেলেখেলা কেন করলেন? রেফারিই বা কেন তাঁদের অপেক্ষা করার সময় ছাড়িয়েও অতক্ষণ মাঠে রইলেন? শেষেই কি দর্শকদের দাবী ঠেকানোর জন্য! দর্শকরাও কি তাঁদের প্রিয় দল দুটির বেআড়া আচরণে মনে মনে বিব্রত হয়ে ওঠেননি? মোহন-বাগান ইস্টবেঙ্গল না খেলে যদি সিনিয়র ... নিয়ে তলার দুটি দল এমন ঘটনা ঘটাতো তবে বেফারি কি অপেক্ষা করতেন এতক্ষণ? সাধারণ দর্শক হিসেবে এসব প্রশ্নগুলো বড় মাথা চাড়া দিচ্ছিল সেদিন। মাথাও লাগছিল ভার। মনে পড়ছিল ভারতীয় ফুটবলের সেরা আজ বড় সুদিন যাচ্ছে না, বরং বেশ দুর্দিনই বলতে গেলে। অন্তত ঠিক আসরে যাবার আগেই হোঁচট খাচ্ছি নির্বাচনী খেলায়। অলিম্পিক, বিশ্বকাপ ... ওসব কথা থাক। শুধু বড় দলের বড় খেলোয়াড়, আর কর্মকর্তাদের সমিলনে বলতে ইচ্ছা করে ভাল খেলা আর খেলার ফুটবলের মান উঁচু করায় এমন ভেদ ধরে জবা লড়াই চালান না। আমরা প্রাণ ভরে দেখি।

এবার আসি খেলার কথায়। মোহন-বাগান-ইস্টবেঙ্গলের ফুটবল খেলা কখনই তেমন উত্তেজনার হয় না। খেলোয়াড়দের ওপর স্নায়ুর চাপ থাকে প্রচণ্ড। সেদিনের খেলাতেও সে ব্যাপার হেরফের হয়নি। খেলার চেহারা ছিল নিতান্ত সাদামাটা। বলা যায় না যে খেলা আগের পঁয়তাল্লিশ মিনিটের অসমাপ্ত নাটক হয়তো অনেকটাই ছায়া ফেলেছিল খেলোয়াড়দের মানসিকতায়। তারই ফলশ্রুতিতে খেলার অমন চেহারা। সত্যি কথা বলতে কি খেলোয়াড়ী সততায় শ্যামের ঐ গোল করানো গোলটি ছাড়া আর তেমন কিছু কি ঘটেছিল বড় খেলার আসরে? প্রথম তিন ঘণ্টা থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর্যন্ত মোহনবাগানই খেলেছে দাপটের সঙ্গে। এই সময় একাধিক গোলের সুযোগ এসেছিল তাদের সামনে। সে সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি মোহন-বাগানের ফরোয়ার্ডরা। দ্বিতীয়ার্ধে গোল খেয়ে ইস্টবেঙ্গল খানিকটা রুখে উঠেছিল গুলি-খাওয়া বাঘের মেজাজে। অবশ্য তার জন্য মোহনবাগানের রক্ষণভাগকে কৃতিত্বও অনেকটাই দাবী। তবে ইস্টবেঙ্গলের সে রুখে ওঠায় কোন পরিকল্পনা দেখিনি। এবং সত্যি কথা বলতে কি দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া মোহন-বাগানের রক্ষণভাগকে তারা হারই মানাতে পারেনি।

বড় খেলার বড় গোলটি যিনি করেছেন সেই শ্যাম থাপার কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। তবে গোলটির ক্ষেত্রে সুভাষ ভৌমিকেরও খানিকটা অবদান ছিল বৈকি। তিনি ষেভাবে মাঝমাঠ থেকে বল নিয়ে ছুটে বক্ষণভাগের সত্যজিৎকে বেমালুম ফাঁকি দিয়ে সেন্টারটি করেছিলেন তা অবশ্যই প্রশংসনীয় ছিল শ্যামের ওই ঝলকে ওঠা সটটির জন্যে। আর শ্যাম সম্পর্কে বলা যায় তিনি যেভাবে সট-টি নিয়েছিলেন সে প্রয়াস কলকাতা মাঠে ইদানিং প্রায় বিরল। শূন্যে পড়ে চকিতে প্রায় ব্যাকভলির ঢঙ-এ যে সটটি ইস্টবেঙ্গলের শিবিরে বিষাদ ডেকে আনল তা যেন ছবি হয়ে গেঁথে গিয়েছিল সেদিনে মাঠে আসা অগুনতি দর্শকের চোখে। খেলার শুরুতেও শ্যাম এমনি একটি ব্যাকভলি করেছিলেন। ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে সেটিতেও গোল হতে পারত। এবং ঘটনাচক্রে সেই সট-টির ক্ষেত্রেও শ্যাম বল পেয়েছিলেন সুভাষের থেকে। বর্ষীয়ান সুভাষ সেদিন তাজা তরুণের মতই লাফিয়ে খেলেছেন। মাঝমাঠ থেকে বল নিয়ে ইস্টবেঙ্গল সীমানায় ঢুকে বিপদ ঘনিয়ে ওঠার মুহূর্তে তৈরী করেছেন বারবারই। মোহনবাগানের পক্ষে বড় খেলায় গৌতম খেলেছেন প্রাণ দিয়ে। শ্যামল ব্যানার্জী সুব্রত ভট্টাচার্য ও নিজের নিজের জায়গায় দায়িত্বশীল ছিলেন। ইস্টবেঙ্গল পক্ষে সুব্রতর আক্রমণভাগে খেটে খেলার চেষ্টা করেছিলেন। একবার তো প্রায় গোলই করে ফেলেছিলেন। উলগা কিংবা নিহিবও তেমন উজ্জ্বল ছিলেন না। বক্ষণভাগে সত্যজিৎ মিত্র, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং প্রশান্ত ব্যানার্জী খানিকটা খেলার চেষ্টা করেছিলেন। আর যাকে নিয়ে তুমুল সোর-গোল সেই সাবির আলিই তেমন যেন মিইয়ে গিয়েছিলেন বড় আসর নেমে। অন্তত ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের বড়ো আশা ছিল সাবিরকে মালধন করে মোহনবাগানকে খানিকটা নাড়া দেবে। কিন্তু কলকাতা মাঠ বড় শক্ত ঠাঁই। এর চরিত্র বুঝে এর মেজাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে অন্তরঙ্গ হতেই বেশ কিছুটা সময় যায়। সাবির আলির সেই অন্তরঙ্গতা সম্ভবত এখনো ঘটেনি।

স্ট্রাইকার

খেলা

কমনওয়েলথ গেমস্

কানাডার এডমণ্টন শহরে আগস্ট ৪ তারিখে একাদশ কমনওয়েলথ গেমসের আসর বসেছে। এই ক্রীড়ানুষ্ঠানের উদ্বোধন করেছেন ইংল্যাণ্ডের রাণী এলিজাবেথ (দ্বিতীয়)। দশদিনের এই ক্রীড়ানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিতে বিরাট সাড়া পড়ে গেছে। আন্তর্জাতিক খেলাধুলার আসরে অলিম্পিক গেমসের পর এই কমনওয়েলথ গেমসের জনপ্রিয়তা। কানাডার মাটিতে এই নিয়ে তিনবার কমনওয়েলথ গেমসের আসর বসলো। এর আগে বসেছে ১৯৩০ সালে প্রথম এবং ১৯৫৪ সালে পঞ্চম কমনওয়েলথ গেমস। প্রথম দিকে এর নাম ছিল এম্পায়ার গেমস। ১৯৫৪ সালে নতুন নাম হল ব্রিটিশ এম্পায়ার এ্যাণ্ড কমনওয়েলথ গেমস। এম্পায়ার কথাটায় অনেক দেশের আপত্তি থাকায় শেষ পর্যন্ত ১৯৭০ সালে দ্বিতীয়-বার নামের পরিবর্তন হয়ে দাঁড়ালো ব্রিটিশ কমনওয়েলথ গেমস। সংক্ষেপে কমনওয়েলথ গেমস।

প্রতি চতুর্থ বছরে কমনওয়েলথ গেমসের আসর বসার কথা। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দরুন দুবার আসর বসেনি ১৯৪২ ও ১৯৪৬ সালে। ভারত এই ক্রীড়ানুষ্ঠানে প্রথম যোগদান করে ১৯৩৪ সালে। ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত কমনওয়েলথ গেমসের পদক জয়ের তালিকায় ভারত ছিল ষষ্ঠ স্থানে ঃ মোট পদক ৪১—স্বর্ণ ১৪, রৌপ্য ১৬ এবং ব্রোঞ্জ ১১। ১৯৭৪ সালের ১০ম কমনওয়েলথ গেমসে ভারত পেয়েছিল মোট ১৫টি পদক—স্বর্ণ ৪, রৌপ্য ৮ এবং ব্রোঞ্জ ৩। ১৯৭৪ সালের আসরে ভারতের এই ৪টি স্বর্ণ পদকই সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন এই চার কৃতিত্ববীর।—সুদেশ কুমার (ফ্লাইওয়েটে), প্রেমনাথ (ব্যান্টাম-ওয়েটে), জগরূপ সিং (লাইটওয়েটে) এবং রঘুনাথ পায়ার (ওয়েল্টারওয়েটে)।

১৯৭৪ সালের কমনওয়েলথ গেমস আসরে শ্রেষ্ঠতরুর পরিচয় দিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার মাইক ওয়েল্ডেন। তিনি এই আসরে ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল সাঁতারে স্বর্ণ পদক জয়ের সূত্রে এই বিভাগে উপর্যুপরি তিনবার স্বর্ণপদক জয়ের গৌরব লাভ করেন। উপর্যুপরি তিনটি কমনওয়েলথ গেমস আসরে তাঁর পদক সংখ্যা দাঁড়ায় মোট ১৩—স্বর্ণ ৯, রৌপ্য ৩ এবং ব্রোঞ্জ ১। ১৯৭৪ সালের অ্যাথ-লেটিকসে ১০০ মিটার এবং ২০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণ পদক জয়ের সূত্রে 'ডাবল' সম্মান লাভ করেন পুরুষ বিভাগে জামাইকার ডন কুয়ারী এবং মেয়েদের বিভাগে অস্ট্রেলিয়ার আর বয়েল।

১৯৭৮ সালের ১১শ কমনওয়েলথ গেমস ৬ দিন হল শুরু হয়েছে। ১৯৭৪ সালের ১০০ মিটার ও ২০০ মিটারের স্বর্ণ পদক বিজয়ী ডন কুয়ারী এবারও ১০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণ পদক জয়ী হয়েছেন। তাঁর ২০০ মিটার দৌড়েও স্বর্ণ পদক জয়ের আশা আছে। এবারের অ্যাথ-লেটিকস আসরে প্রধান আকর্ষণ হলেন কেনিয়ার হেনরী রোনো। তিনি দীর্ঘ দূরত্ব ৩০০০ মিটার, ৫০০০ মিটার, ১০,০০০ মিটার দৌড় এবং ৩০০০ মিটার স্টিপলচেজ বিভাগের বিশ্ব রেকর্ডধারী। রোনো ইতিমধ্যেই ৩,০০০ মিটার স্টিপল-চেজে স্বর্ণ পদক জয়ী হয়েছেন। তাঁরও একাধিক স্বর্ণ পদক জয়ের সম্ভাবনা আছে।

সাঁতারে পাল্লা দিয়ে চলেছে কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়া। ইতিমধ্যেই কানাডা ১১টা এবং অস্ট্রেলিয়া ৭টা স্বর্ণ পদক জয়ী হয়েছে। সাঁতারে ব্যক্তিগত সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন পুরুষ বিভাগে কানাডার গ্রাহাম স্মিথ এবং অস্ট্রেলিয়ার রন ম্যাক্কিয়োন। এ পর্যন্ত গ্রাহাম স্মিথ চারটে এবং রন ম্যাক্কিয়োন তিনটে করে স্বর্ণ পদক জয়ী হয়েছেন।

ভারত এ পর্যন্ত মাত্র দুটো পদক জয়ী হয়েছে ভারোত্তোলনে—একটা স্বর্ণ এবং একটা রৌপ্য। ভারতের পক্ষে স্বর্ণ পদক জয়ী হন ৫২ কেজি বিভাগে এগাত্তুর করুণাকরণ এবং রৌপ্য পদক পান ৫৬ কেজিতে তামিল সেলভন।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

মোহনবাগান ১৯৭৮ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার পথ নিষ্কণ্টক করে নিয়েছে। তারাই যে ১৯৭৮ সালের লীগ চ্যাম্পিয়ান সরকারী-ভাবে তার ঘোষণার যা অপেক্ষা। মোহন-বাগান এ পর্যন্ত ২০টা খেলায় ৪০ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। এবারের লীগের খেলায় একমাত্র তারাই এখনও পর্যন্ত সমস্ত খেলায় জিতেছে। তাদের আর মাত্র দুটো খেলা বাকি—জর্জ টেলিগ্রাম এবং হাওড়া ইউনিয়নের সঙ্গে। লীগ চ্যাম্পিয়ান-সীপের দৌড়ে মোহনবাগানের নিকট প্রতি-দ্বন্দ্বী গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল তাদের খেলায় পাঁচ পয়েন্ট নষ্ট করে অনেক পিছিয়ে গেছে। মোহনবাগান বনাম মহমেডান স্পোর্টিংয়ের দ্বিতীয়ার্ধের খেলার ৬ মিনিটের মাথায় রেফারীর দেওয়া একটা অফ্সাইড সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে মহমেডান স্পোর্টিং খেলায় অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। রেফারী এই ব্যবস্থায় নিয়মমাফিক কিছু সময় অপেক্ষা করে খেলা পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন। এই সময় মোহন-বাগান ২—০ গোলে এগিয়ে ছিল। আই এফ এ-র লীগ সাব-কমিটির সভায় এই দিনের খেলার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মোহন-বাগানকে দু পয়েন্ট দেওয়া হয়। তাছাড়া পরবর্তী একটি খেলায় মহমেডান স্পোর্টিং দলকে শাস্তি হিসাবে যোগদান থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। এর অর্থ মহমেডান দলের আরও দুটো পয়েন্ট নষ্ট। লীগ সাব-কমিটির এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মহমেডান স্পোর্টিং দলের পক্ষ থেকে আই এফ এ-র গভর্নিং বডির কাছে যে আবেদন করা হয়েছিল তার এখনও নিষ্পত্তি হয়নি বলেই মোহনবাগানকে সরকারীভাবে এই মুহূর্তে ১৯৭৮ সালের লীগ চ্যাম্পিয়ান বলা যাচ্ছে না। মোহন-বাগান যদি তার বাকি দুটো খেলায় অন্তত দুটো পয়েন্ট সংগ্রহ করে নেয় তাহলে আই এফ এ-র গভর্নিং বডির কাছে মহমেডান স্পোর্টিং দলের আবেদনের ফলাফল নিয়ে মোহনবাগানের সমর্থকদের আর কোন রকমের মাথা ব্যথা থাকবে না। এমনিতেও কি আছে? কারণ আই এফ এ-র গভর্নিং বডি কি যুক্তিতে মহমেডান স্পোর্টিং দলের বিপক্ষে লীগ সাব-কমিটির সিদ্ধান্ত (২—০ গোলে অগ্রগামী মোহন-বাগানকে ২ পয়েন্ট দেওয়া) অগ্রাহ্য করবেন?

মোহনবাগান এর আগে প্রথম বিভাগের লীগের খেলায় ১৫ বার লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে—১৯৩৯, ১৯৪৩-৪৪, ১৯৫১, ১৯৫৪-৫৬, ১৯৫৯-৬০, ১৯৬২-৬৪, ১৯৬৯ ও ১৯৭৬।

দর্শক

১১।৮।৭৮

চিত্রধ্বনি

আস্তান মঙ্গল কাব্য

মাসকয়েক আগে আমার একজন বুদ্ধিজীবী বন্ধু জানিয়েছিলেন, চিত্রনাট্যকার সালিমজাভেদ গল্পের উপাদান সংগ্রহের জন্য মাঝেমাঝে সুইজারল্যাণ্ড যান। কথাটির মধ্যে কিছুটা শ্লেষ ছিল। ডন দেখবার পর আমি বুঝতে পারছি বন্ধুটির হরটিকালচার সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই। 'গোবরে পদ্মফুল'—বললেই তো হল না, সালিম-জাভেদের মস্তিষ্কে ডন জাতীয় পদ্মফুল ফোটবার জন্য যে ধরনের তাপমাত্রা, বায়ুর চাপ ইত্যাদি লাগে তা হয়ত সুইজারল্যাণ্ডেই মেলে। এতে নিন্দার কি আছে? অতএব আমি নির্ভয়ে ডন-বন্দনা শুরু করি।

হায়!! ছোটবেলার সেই মহিলা কবি দীর্ঘ দিন পরলোকগতা যিনি ব্যথাতুর প্রশ্ন রেখেছিলেন—আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে? কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে। তিনি আজ বেঁচে থাকলে কত খুশী হতেন। ডন ও ভর্মের ছদ্মবেশী পুলিশ এজেন্টের ভূমিকায় শ্রীঅমিতাভ বচ্চনই তো সেই ছেলে যে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার-মন্ত্রীর সঙ্গে সেক্স অ্যাণ্ড ভায়োলেন্স বিষয়ে কাজে তর্ক করে না বরং সশব্দে ভাজা মাছটি উল্টে খায় অর্থাৎ ঠাণ্ডা মাথায় গুলিগোলা চালায় এবং তারপরে হেলেনের বস্ত্রহরণ পর্ব সমাপ্ত হলে পুলিশের সামনে দিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায়; শেষ দৃশ্যের আগে পর্যন্ত চোর পালিয়ে যাওয়ার পর পুলিশের বুদ্ধি বাড়তে শুরু করে। কম কথা, বেশী কাজ—এই তো চাই। প্রসঙ্গত বলে রাখি পুলিশের সদর দপ্তরে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর হাস্যময়ী রূপ দেখে বোঝা গেল ডন জরুরী অবস্থার আরেকটি সুফল।

যুগপৎ বিড়াল ও ইঁদুরের ভূমিকায় অভিনয়কালে এক মুহূর্তের জন্যেও অমিতাভ ভারতীয় বধূ-সমাজকে হতাশ করেন নি। তবে পান খেয়ে বিচ্ছিরী ভাবে পিক না ফেললেই তিনি ভাল্যে করতেন: দেশ জুড়ে মেয়েরা কষ্ট পাবে। আমার পাঠিকাদের অবশ্য জানিয়ে দিচ্ছি অমিতাভ নির্দোষ। এসব পরিচালকের নির্দেশ তো তাঁর কি করার থাকতে পারে?

নায়িকা শ্রীমতী জীনত আমন নায়কের উপযুক্ত অর্ধাঙ্গিনী। তবে আচরণ ও পরিধেয় থেকে তাঁর লিঙ্গ নিরূপণ করা ঈষৎ মুস্কিল। ভরসা একমাত্র এই যে তাঁকে একবার সুইমিং কস্টিউম পরিহিতাও দেখা গেছে।

বিলেত ফেরত হওয়ায়

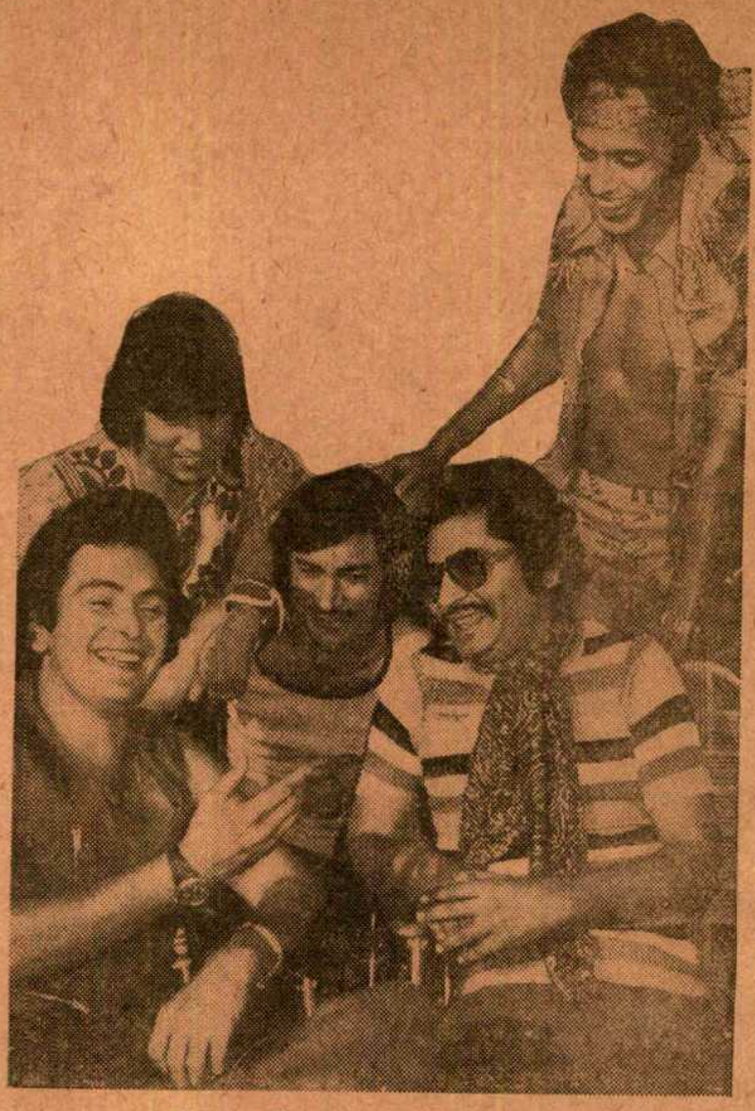

সুরেন্দর কাপুর প্রযোজিত ফুল খিলে হ্যায় গুলশান গুলশান ছবির একটি দৃশ্যে ঋষি কাপুর, পেইন্টাল, আসরানী, মিঠু ও জনৈক

এই ছবিতে পুলিশের পদমর্যাদা একটু বেড়েছে। ঘটনাস্থলে একজন ডি এস পি উপস্থিত ছিলেন। আর একজন ইন্টার পোল অফিসারকে আমরা বন্দী দেখেছি। এতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। হাতকড়া পরাতে হাজির হতে হয়েছে সেই গোঁয়ো যোগী ইন্সপেকটর সাহেবকেই।

কল্যাণজী-আনন্দজীর সুরারোপ তেমন উচ্চবাচ্যের দাবী রাখে না। ছবিটি অন্ততঃ আমাদের ক্রিকেটারদের অবশ্য দ্রষ্টব্য। অমিতাভ, জীনত এবং প্রাণ ডায়েরি নিয়ে যেভাবে লোফালুফি খেলেছেন তা দেখলে, আমি নিশ্চিত যে, মাঠে তাঁরা আর ক্যাচ ফসকাবেন না।

আবার জেমস বণ্ড

কোন দিনই ভূগোলের ভাল ছাত্র ছিলাম না আর বিদেশেও যাই নি। কিন্তু একই দিনে ডন আর দ্রি ম্যান ইউথ দ্রি গোল্ডেন গান দেখে আমার মুহূর্তে মালুম হয় বোম্বাই ও নিউইয়র্ক নেহাৎ কম দূর নয়। দুটি ছবিই মূলত সরস্বতীর প্রসাদ-বঞ্চিত লক্ষ্মীর বরপুত্রদের সম্পত্তি তবু এই জেমসবণ্ড পর্যায়ের নবম ছবিটির পরিচালক শ্রীগাই হ্যামিলটন এমন সতর্কভাবে হেঁটেছেন যে গোবরে পদ্মফুল না ফুটুক, গু অন্ততঃ ছিটকে এসে তাঁর দেহের তিন জায়গায় লাগে নি এবং আমরা চট করে বলার সুযোগ পাচ্ছি না যে তিনি বোকা।

এমনিতে ছবিটি, বিশেষভাবে যারা বিদেশী অ্যাকশন চিত্রমালায় অভ্যস্ত তাদের পক্ষে, তেমন উল্লেখ্য কিছু নয়। সর্বশক্তিমান জেমসবণ্ড যথানিয়মে তার সুকেশিনী বান্ধবীসহ বিপদসমুদ্র পাড়ি দিয়েছেন। এ-ক্ষেত্রে বণ্ডের লীলাভূমি দূরপ্রাচ্য এবং সে বেশ প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক সমস্যার সঙ্গে জড়িত। পৃথিবীকে এনার্জি ক্রাইসিস থেকে উদ্ধারকল্পে তাকে দুরাত্মা স্কারামাংগোরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়েছে। অনেক টেনশন ও মিতমাত্রায় মোন্ন ক্ষমতা ব্যয় করার

পরিণামে অবশেষে হাতে এসেছে বহুমূল্য সোলক্স এ্যাজিটেটর।

কেন জানি না বন্ড বললেই আমার মনে পড়ে সিন কনোরির মুখ। এখানে রোজার মুরকে তাই তত দৃষ্টিনন্দন মনে হল না। যেমন কিস্টোফার লীকে যারা ডাকুলা জাতীয় আতঙ্কে স্বাভাবিক ভাবেন তারা বেশ অবাক হবেন ফকারামাংগারের ভূমিকে অবতীর্ণ হতে দেখে। বন্ডের প্রণয়িনীর ভূমিকায় বিটে একল্যান্ড যৌন আবেদনের পরিকল্পনা আংশিক সফল করেছেন।

এই ছবির মূলপ্রাপ্য দূরপ্রাচ্যের আবহাওয়া ও বিশিষ্ট রণকৌশল সম্পর্কে সাম্প্রতিক পাশ্চাত্য আগ্রহ। মার্কসবাদীরা অবশ্য সুপারম্যান নির্মাণের অপচেষ্টা ও বেশ কিছু প্রগতি বিরোধিতা খুঁজে পেতে পারেন, তা আমার আলোচ্য নয়।

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

খাপছাড়া ছবি

সোহাগী নিষিদ্ধ পল্লীতে বারবণিতা কুসুমের কাছে বড় হতে থাকে। ভদ্রবংশের মেয়ে। কুসুম হাসপাতালেই ওকে নিজের মতো শিশুকন্যার সঙ্গে পালটে নিয়েছিল। সোহাগী এখন যুবতী। কুসুম চায় তাকে নিজের কাজে লাগিয়ে বিশ্রাম নিতে। ওর বয়স হচ্ছে। সোহাগী চায় ভদ্রজীবন যাপন করতে। ঘটনার স্রোত তাকেও অভদ্র করে দেয়। জন্ম নেয় জাবরকন্যা চাঁপা। এই চাঁপাকে কিভাবে সে পাপের পথ থেকে উদ্ধার করে ছবির বাকি অংশ তারই বিবরণ রয়েছে।

পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় নদী থেকে সাগরের এই মামুলী গল্পকে জমাতে পারেন নি। মূল ঘটনার থেকে ছবি প্রায়ই সরে এসেছে। সোহাগী চেয়েছিল আর দশটা ভদ্র মেয়ের মত বাঁচতে। পারল না। তার জীবনের এই অপূর্ণতা সে চাঁপার মধ্যে দিয়ে কিভাবে পূরণ করতে চাইল সেই দিকটায় জোর দিলেই ছবি জমত। কিন্তু অনেক অপ্রাসঙ্গিক ঘটনা এসে পড়ে ছবিকে খাপছাড়া করে দিয়েছে। সোহাগীর জন্মবৃত্তান্ত পরিচালক অনায়াসে বাদ দিতে পারতেন। শ্যামাপদর স্ত্রীর চরিত্রই বা কিসের দরকার ছিল? তাকে ত মরতেই বা মারতেই হল। ছবির চরিত্রগুলোও তেমন পরিষ্কার নয়। যে ভবদাসীর অন্তঃকরণ এত বড়, সে কি করে মেয়ে বদলানোর কাজটা অত সহজে সেরে ফেলে? আর সোহাগীর বাড়ির পরিজন তেনেও চুপ করে বসে থাকে? শ্যামাপদও তাই। সোহাগী কি ধরনের বারবণিতা? তাকে ত শুধু খদ্দেরদের গান শোনাতেই দেখা গেল। পরিবেশনাও বেশ নিম্নমানের। একটি ভাবগম্ভীর পরিবেশে সোহাগীর প্রশ্নের উত্তরে শ্যামাপদ দম করে গান গেয়ে উঠল। অন্য এক জায়গায় বিদ্যাপতির পদ গাইবার সময় শ্যামাপদর সঙ্গে অশিক্ষিতা সোহাগীও নির্ভুল কথায় তানে যোগ দিল। থাক। এবার শিল্পীদের কথায় আসি। শ্যামাপদর চরিত্রে সৌমিত্র এবং সোহাগীর চরিত্রে সন্ধ্যা রায়কে ভাল লেগেছে। সন্ধ্যা এমন চরিত্রে আগেও অনেক করেছে। ছায়া দেবী যথারীতি ভাল। সেইসঙ্গে শমিতা বিশ্বাসও। ছবির নায়ক নায়িকা সৌমিত্র-সন্ধ্যা পরে চরিত্র শিল্পীতে রূপায়িত হলে সেই স্থান পূরণ করেছে মিঠুন-রুমকী। ওরা ভালই করেছে। মিঠুনকে বেশ খাটতে হয়েছে। একটি খল চরিত্রে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা গেছে। যে হাসিটা তিনি বরাবর হেসে থাকেন, এখানেও তা শোনাতে ছাড়েন নি। রবি ঘোষ এবং অনুপকুমার ভাঁড়ামো করলেও কিছুটা রিলিফ দিয়ে গেছেন।

ভাল লেগেছে এ ছবির গানগুলো। কোন একটি গান হেমন্ত খালি গলায় গেয়েছেন। আর তা কি সুরে। গানটি শিল্পীর অতীত কণ্ঠকে মনে করিয়ে দিয়েছে।

কোন মাথামুণ্ডু নেই

নিশান-এ আছে বিজয় ও বিক্রম নামে দুই জমজ ভাই। এদের মধ্যে বিক্রম একটু অস্বাভাবিক ধরনের। বিজয়ের সুখ-দুঃখ সে সমানভাবে অনুভব করে। যেমন বিজয়কে চাবুক মারলে সেও আঘাত পায়। যদিও বিজয় খেলে বিক্রমের পেট ভরে কিনা জানা যায় নি। যাই হোক, প্রেমের ব্যাপারেও একই ভাবে বিজয়ের প্রেমে বিক্রম সুখী হতে পারত। কিন্তু তা করলে ত ছবি জমে না। অতএব বিক্রম বিগড়ে গেল। তাই প্রেমিকা রঞ্জনাও (আরতি) পালাল। ছবির ভিলেন জোরাওয়ার সিং (শেখর)। বিজয়-বিক্রমের বাবার সে হত্যাকারী। সেই জোরাওয়ারই আবার পরে রঞ্জনাকে জোর করে বিয়ে করতে চলে। এরপর সবকিছু ফরমুলা মাফিক। জোরাওয়ার মরল। বিক্রমকে মরতে হল। বিজয় রঞ্জনাকে ফিরে পেল। বিক্রমের সমাধিতে মন্দির গজিয়ে উঠল।

তিলোত্তমা ছবিতে বিকাশ রায়

কাহিনী সেই যুগের। যে সময়ে খবর দেওয়া নেওয়া হত পোষা পায়রার পায়ে চিঠি বেঁধে। যখন ঘোড়া ছিল একমাত্র পরিবহণ। রাজা ছিল। রাণী ছিল। মন্ত্রী-সৈন্য-রাজপ্রাসাদ এসব ত ছিলই। নিশ্চয়ই আজকের কথা নয়। নিশান-এ এগুলো দেখানো হয়েছে। সঙ্গে এ যুগেরও কিছু ঢুকে পড়েছে। যেমন নায়িকা ইলেকট্রিক সুইচ বন্ধ করে অন্ধকারের মধ্যে পালাবার চেষ্টা করেছে। ডাকতার বাড়িতে বসে এমন সার্জারি করেছে যাতে জোড়া দেহের যমজ শিশু নিখুঁতভাবে আলাদা হয়েছে। কোনো হাসপাতালের দরকার হয়নি। এছাড়া ডাকতার একটা কালো রঙের ওষুধ দিয়ে বিজয়কে একবার ইচ্ছেমত মেরে ফেলেছে। কিছু পরে পাল্টা ওষুধ দিয়ে তার প্রাণকে ফিরিয়েও এনেছে। এই হল জেমিনির প্রথম বাংলা ছবি। পরিবেশনারও কোন জবাব নেই। আসলে পরিচালক যুক্তির কোনো ধার ধারেন নি। সদ্যজাত দুই শিশু ছ-সাত দশার পর দুই উত্তমকুমার হয়ে উঠেছে। পঁচিশ বছরের জোড়া উত্তমকুমার মেকআপ এবং কালারও যা বিশ্বাস করাতে পারে নি। ওদিকে পঁচিশ বছর পরেও শেখর চট্টোপাধ্যায় একই চেহারা নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। আর গানের মধ্যে বেশভূষা বদলে যাওয়া সম্বন্ধে নতুন কি বলার আছে। সেইসঙ্গে স্টুডিওর চাঁদ, ফুল গাছপালা তো আছেই। তবু যদি গানগুলো জমত। (কোনো একটি গানকে পরিচালক জাতীয় সংহতির কথা ভেবে প্রয়োগ করেছেন কিনা জানা নেই) ছবিতে নাচ আছে। আরতি এবং অন্যান্যদের। পুরো বোম্বাই চঙে। এসব ছাড়া টেকনিক্যাল দিকটাই বা এমন কি। এ্যাকশান দৃশ্যগুলো তো তেমন জমল না।

যমজ ভাইয়ের দ্বৈত চরিত্রে উত্তমকুমার অনেক কিছু করার সুযোগ পেয়েছেন। কেবল অভিনয় ছাড়া। যে দু-একটি দৃশ্যে পেয়েছেন সেখানে ভাল করেছেন। তাঁকে নানা মেকআপে দেখা গেছে। তার মধ্যে গ্রহবীর বেশে তাঁকে সবচেয়ে ভাল লেগেছে। বিজয়ের মেকআপ ভাল হয়নি। বিক্রম তো পুরো ব্লাউন। আরতিকে এই প্রথম কালারে দেখা গেল। তাকে ভালই লেগেছে। শেখর চট্টোপাধ্যায়কে ভিলেন হিসেবে মানিয়েছে। এরা ছাড়া মুকুল ঘোষ এবং নাজির হুসেন ভাল অভিনয় করেছেন।

ভালভাবে গল্প ফাঁদতে পারলে সকলই শুনবে। তা সে যত গাঁজাখুরিই হোক। আসলে জমিয়ে বলতে হবে। নিশান ছবির মাধ্যমে পরিচালক এস এস বালন সেদিক থেকে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর ছবিতে চিতাবাঘ আছে। ঘোড়দৌড় আছে। সুন্দর লোকেশন আছে। কালার-নাচ-সোর্ড-ফাইট আছে। সবের ওপর উত্তমকুমার আছেন। তবুও কোনো মাথামুণ্ডু নেই।

অসিতবরণ মিত্র

ড্যানি

পর্দায় ছবি ভাসছে সামনে দর্শক। হাততালি। টিটকিরি। সিটি মারা। নায়ক-নায়িকা পিছনে ফেলে দর্শক বেরিয়ে এল। ভালো লাগা আর না লাগা কয়েক দিনের আলোচ্য বিষয় হয়ে থাকল। কিন্তু পর্দায় যারা মান-অভিমান ক্রোধ মিলিয়ে একটি কাহিনী সৃষ্টি করে গেলেন, তাদের দিনরাত কেমন। পর্দার নায়ক নায়িকার প্রেমটা কি সত্যিই প্রেম? আর ভিলেনের চরিত্রে অভিনয় করতে করতে মানুষ কি সত্যিই ভিলেন হয়ে যায়। খুনী বা দুশমন চরিত্রে যাকে আমরা দেখছি সব সময়, সে মানুষটা সত্যি কী দুশমন?

ধরুন, ড্যানি। ছবিতে মানুষটির পরিচয় যেমন, ব্যক্তিজীবনে অন্য মানুষ। অতি শান্ত, ভদ্র ও স্নেহপ্রবণ। বেড়াতে ভাল বাসে পাহাড়ী বালকদের মত। ঘরের আনন্দ ওর কাছে স্টুডিও থেকেও অনেক বেশি। এরকম আরও অনেক মানুষ আছেন।

ছবি করতে করতে ছবি হয়ে পড়া মানুষদের জীবনেও যে সাধারণ মানুষের মত ঝড় ওঠে, সুখ ও আনন্দ আছে, তার অনেক খবরই পাওয়া যায় না। পাওয়াও কঠিন। যা মেলে তাই পর্দার অন্তরালের আকর্ষণীয় কাহিনী হিসাবে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

রূপে/ লেখায়/ ছবিতে/ ফিচারে/ অতুলনীয় ॥ বিভিন্ন পাঠককে আকৃষ্ট করার বিষয় বস্তু নিয়েই প্রত্যেক মাসে প্রকাশিত হয়, সাহিত্য/ সিনেমা/ যাত্রা/ সংস্কৃতির বহুল প্রচারিত জনপ্রিয় মাসিক পত্রিকা

তুলি

বাংলা সাহিত্যের তরুণ লেখিকা শ্রীমতী সুলেখা চট্টোপাধ্যায়ের একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী রচনা **"হটপ্লেট"** ॥ **শ্রীমতী সুলেখা চট্টোপাধ্যায়** এর **"হটপ্লেট"** আজ প্রায় প্রত্যেক ঘরে ঘরে "রীমা এবং স্নেহময়" যে প্রশ্ন তুলেছে তা কিন্তু সত্যি ভাববার সময় এসেছে আজ। তা না হলে ওরাই ডেকে আনবে ধ্বংসের তান্ডব লীলা" পূজা সংখ্যায় 'হটপ্লেট' আলোড়ন সৃষ্টি করবেই বলে মনে হয় ॥

* বাংলায় পারদর্শি মহিলা সাংবাদিক আবশ্যক ॥ প্রধান সম্পাদকের সংগে সাক্ষাৎ করার সময় যেকোন দিন সকাল ৭টা হইতে ৯টা ॥

যোগাযোগের একমাত্র ঠিকানা :-

তপনকুমার দে
প্রধান সম্পাদক—'তুলি'
৭৩ডি/ আলিপুর রোড/কলিকাতা-২৭
(চেতলা)

* আগামী বিজ্ঞাপনে নজর রাখুন :

প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য

যেমন ধরুন, জয় মুখার্জির একটা ছবির কাজ চলছিল। তর্ক বাধল মালা সিনহা আর শর্মিলায়। কথায় কথা বাড়ে। কেউ হারতে চায় না। সাধারণত যেসব ভাষায় কথা বলে, তার বাইরের অনেক শব্দ চালা-চালি হল দুজনায়। শেষ-মেষ এর মধ্যে দিয়ে কতকগুলি বিড়াল বেরিয়ে পড়ল। গোপনীয় তথ্য জানল অনেকে। এটাই ওদের লাভ।

বিদ্যা সিনহা

কথাটা ঠিক নয়

খাট্টা-মিঠার সৌপাজয়ন্তী হয়ে গেল বোম্বে। এই ছবির সাফল্যের পর রোমু সিপ্পির পরবর্তী ছবি দো লড়কে দোনো করকে' ছবিও শেষ করেছেন। তার জুহুর বিন্দিয়ার ব্যাংলোয় এক বিরাট পার্টি হয়ে গেল সেই উপলক্ষে। ছবির পরিচালক বাসু চ্যাটার্জি এবং সহ-প্রযোজক মৌসুমীর বেটার-হাফবাবুও ছিল অনুষ্ঠানে। মৌসুমী নায়িকা, নায়ক চরিত্রে অমল পালেকর। ছবির সঙ্গে জড়িত প্রায় প্রত্যেকেই সেদিন হাজির ছিল; সোলেখাত বিজু খোটে এই ছবিতেও একটি দামি চরিত্রে আছে। অমল ছিল সস্ত্রীক। আসরানী অনুষ্ঠানে ছিল না। পরিচালককে জানিয়ে দিয়েছিল সেদিন সন্ধ্যায় ও লণ্ডন যাচ্ছে। কথাটা ঠিক নয়। কারণ, সেদিন আসরানী ফিল্মস্তান স্টুডিওতে একটি ছবির স্যুটিং-এ ব্যস্ত ছিল। মৌসুমী অতিথিদের অভ্যর্থনা যত্ন করেছেন। প্রত্যেকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আলাপ করে, আর মিষ্টি এগিয়ে দেয়। খাট্টা মিঠার মত রোমুর এছবিও নাড়া দিয়ে যাবে।

হেমা

বোম্বের ছবির জগতে হেমামালিনী টপ হিরোইন। অথচ এই মহিলাকেই এক সময় দক্ষিণ ভারতের ছবিজগত ত্যাগ করেছিল। কোন পরিচালকই তাকে ছবিতে জায়গা দেয় নি। সে সময় এক অনুরাগী ক্ষুব্ধ হয়েই বলেছিল, হেমাকে দেখতেই এক সময় হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে। কথাটা যে পুরো-পুরি ফলেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সোনিয়া সাহানী কয়েক দিন আগে বলছিলেন, হেমা একটু নরম স্বভাবের মেয়ে। ক্ষতি করে না কারো। আমরা একসঙ্গে ছবি করেছি। এসে ও গল্প-গুজব করেছে। ওর মনটা বেশ পরিষ্কার। যদিও সব কথা খুলে বলে না সব সময়।

সেদিন ৪০০ টাকায়

অনেকেই জানেন না, লতা একটি গান গাইতে নিয়ে থাকেন ৭,০০০ থেকে ৮,০০০ টাকা। অঙ্কটা বিরাট ঠিকই। তবে, কোন প্রতিভাকেই টাকা দিয়ে মাপা যায় না। অঙ্কটা লতাজীকে সম্মান জানাবার পক্ষে যথেষ্ট কিনা বলা কঠিন। কিন্তু এমন দিনও গেছে, যখন গান গেয়ে পয়সা মিলত কম। যশ ছিল অভাব জড়িয়ে। তালাত মামুদের কণ্ঠস্বরের প্রশংসা করেছেন সকলেই। ওর মত গুণী শিল্পী কমই জন্মেছেন। অথচ একটি গানের জন্য পেতেন ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা। অভিনেতা তালাত মামুদ বেঁচে থাকবেন কতকাল বলা কঠিন, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর কেউ ভুলবে না।

গরম খুন

'গরম মশলা'র পর এবার আসছে গরম খুন। পরিচালক এ সালাম। জয় প্রোডাকসনের এই ছবির লোকেশান ছিল বোম্বের নানা জায়গা। বিনোদ খান্না, সুলক্ষণা পন্ডিত অজিত, বিন্দু, ইমতিয়াজ আছেন গোটা খুনোখুনির মধ্যে।

অনন্যা রিংকু

এই শর্মিলাকে মারাত্মক প্রশংসা করেছেন শশীকাপুর। শশী বলেছেন, অপুর সংসার দেখেই রিংকুর ওপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। যশ চোপরাকে বলেছিলেন, রিংকুকে নিয়ে কোন ছবি করলে আমি বিনা পয়সাতেও কাজ করব। তার ফলেই 'ওয়াক্ত।' সূচনা থেকেই রিংকু প্রতিভাময়ী। ভাল পরিচালক, উৎকৃষ্ট চিত্রনাট্য পেলেই রিংকু অনন্যা।

রতন দত্ত

আসরে হিমঘ্ন রায়চৌধুরী

টপ্পায় নতুন নাম হিমঘ্ন

রবীন্দ্র সদনে অরূপ শিল্পী গোষ্ঠী নিবেদিত দুশো বছরের বাংলা টপ্পার একক শিল্পী ছিলেন হিমঘ্ন রায়চৌধুরী। শিল্পীকে সহযোগিতা করেন রায় বাহাদুর কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রতাপ পাল ও কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়।

প্রাচীন বাংলা গানের এক উল্লেখযোগ্য ধারা টপ্পা গান আজ আমরা শুনতে পাই না বললেই চলে। পাঞ্জাব থেকে আহৃত এই সংগীত ধারা এক সময় বাংলাদেশে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল কালী মির্জা ও নিধুবাবুর প্রচেষ্টায়। বোধহয় বেশী কঠিন বলেই রবীন্দ্র যুগ আসার পর থেকেই বাংলা টপ্পার প্রচলন কমতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ নিজে কিন্তু টপ্পার দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হলেন এবং ভালো টপ্পার কিছু কিছু অংশ আমরা টপ্পা অঙ্গের রবীন্দ্রসংগীত পেয়ে থাকি।

প্রচলন কমলেও সেই যুগে ভালো টপ্পা গায়কের অভাব বাংলাদেশে হয়নি। রাণাঘাটের নগেন ভট্টাচার্য, কালোবাবু, জীতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কালীপদ পাঠক নিজের নিজের জায়গায় উজ্জ্বল তারকার মত জ্বলতে থাকলেন। কিন্তু এ বোধহয় প্রদীপ শিখা নিভে যাওয়ার আগে জ্বলে ওঠার মতই। এদের মৃত্যুর পর বাংলা টপ্পা লোপ পেতে বসেছে। সংগীতের থেকে শিল্পী বেশী জনপ্রিয় হলে এই রকম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

পাঞ্জাব থেকে এলেও বাংলা টপ্পা হুবহু পাঞ্জাবী টপ্পার মতন নয়। বাংলা টপ্পার নিজস্বতা বেশী। শুধু সুরের ওপর দৌড়ঝাপ করে না। প্রায়ই বিস্তার অংগের বিরতি থাকে। এই বিরতিগুলো এমন সুন্দর স্বর সমষ্টির ওপর হয় যে গতি ও সুরের সৌন্দর্যই কণ্ঠের দক্ষতা ও মাধুর্যের পূর্ণ প্রকাশ এতে হতে পারে। তান অংগের বোঝা কে বিস্তার অংগের শান্তি দিয়ে হাল্কা করাই বোধহয় বাংলা টপ্পার বিশেষত্ব। ভাষার মিষ্টত্ব কে হয় বাদই দিলাম। বাংলাদেশের বিপুল সংগীত ঐশ্বর্যের আংশিক ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরার জন্যেও অরূপ শিল্পী গোষ্ঠীকে ধন্যবাদ দিতে হয়। সেদিন প্রেক্ষাগৃহ প্রায় পূর্ণ দেখে বুঝলাম কলকাতার শ্রোতাদের কান এখনো ভেজাল সুরে বেসুরো হয়ে যায়নি। ভালো গান-বাজনা শুনতে তারা যথেষ্ট আগ্রহী। শিল্পীর গ্ল্যামার ছাড়াও ভালো সংগীত ও ইতিহাস তাদের আকৃষ্ট করে।

হিমঘ্ন রায়চৌধুরী সেদিন পরের পর আঠারোটি টপ্পা অংগের বাংলা গান গেয়েছিলেন যার মধ্যে ছিল নিধুবাবু, শ্রীধর কথক, দাশরথি, গোবিন্দ অধিকারী, মুকুন্দদাস, কালী মির্জা, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, নজরুল, সৌমেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ এর গান। এই গানগুলি বিভিন্ন রাগরাগিণীর ওপর ছিল যার ফলে বৈচিত্র্যের অভাব কখনই হয়নি। 'বেহাগ খাম্বাজ' দিয়ে আরম্ভ করে পর পর 'দেশ' 'কাফি' মিশ্র ধাহার ইত্যাদি রাগ টপ্পা অংগে গেয়ে হিমঘ্ন রায়চৌধুরী নিজের কণ্ঠের ওপর দখল, রেওয়াজ, তালিম ও সুর বোধের পরিচয় দেন। কখনো সুরের বিচ্যুতি ঘটেনি। এতগুলি রাগ পর পর সুরে গাওয়া কম কথা নয়। উনি যে পরিশ্রম করেন তা বুঝতে অসুবিধা হল না।

হিমঘ্ন রায়চৌধুরীর গানে সব থেকে লক্ষণীয় জিনিস ছিল ওঁর কণ্ঠের বলিষ্ঠতা। যা করছেন দাপটের সংগে করছেন। তাতে কোন দ্বিধা নেই। স্বরগুলি পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে। কখনো গলা মেলবার সময় একটি সুরের সংগে আর একটি সুর জড়িয়ে যাচ্ছিল না। বিনা কারণে গিটকিরি মুড়কি দিয়ে গানকে অলংকারের বোঝায় ভারাক্রান্ত করছিলেন না যেরকম আজকাল অনেকে করে থাকে। প্রবীণ বাকতিত্বপূর্ণ তবলা বাদকদের সংগে নিজেকে মানিয়ে নিয়েও উনি খুব উঁচু দরের শিল্পী মনের পরিচয় দেন। এই শিল্পী মন ও গাম্ভীর্য পূর্ণ সংগীত চিন্তা হিমঘ্নবাবুকে সুর এর জগতে অনেক দূর অবধি নিয়ে যাবে।

সেদিনের অনুষ্ঠানের স্টেজ সাজানো সুন্দর হয়েছিল। এই সবদিকে অনেকে নজর দেন না। কিন্তু শ্রোতাদের মনে চোখে দেখা ও কানে শোনা মিলিয়ে আবেগের সৃষ্টি হয়। গানের আগে টপ্পা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল যার ফলে শ্রোতারা টপ্পা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারেন। শ্রোতা তৈরি করার দায়িত্ব যে সংগীত সংস্থা ও শিল্পী উভয়েরই আছে এটা আমরা অনেক সময় ভুলে যাই। রায় বাহাদুর কেশব বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বর্ধনায় প্রবীণের প্রতি শ্রদ্ধার ত্রুটি ছিল না। রাধামোহন ভট্টাচার্যর সহজ সরল অথচ শিক্ষামূলক বক্তব্য অনুষ্ঠানকে আরো সুন্দর ও জমজমাট করতে সাহায্য করে।

ফাল্গুনী মিত্র

আতা হোসেন খান সংগীত সংস্থার মাসিক অধিবেশনে ফাল্গুনী মিত্রের আলাপ ও ধ্রুপদ শুনলাম। পর পর 'মেঘ', 'সুরাট', 'মিয়া মল্লার' ও 'কাফী কানাড়া' গেয়ে প্রমাণ করেন যে রাগরূপ ও কণ্ঠের ওপর ওঁর যথেষ্ট দখল আছে। ভালো গায়কের অভাবে ধ্রুপদ প্রায় লোপ পেতে বসেছে। যে দু-একজন ভালো ধ্রুপদ গায়ক আছেন তারাও নিজেদের বংশের বাইরে বিশেষ ছাত্র তৈরি করেছেন বলে আমার জানা নেই। ফাল্গুনী মিত্রের অবশ্য সম্পূর্ণ সংগীত শিক্ষা নিজের পিতার কাছে, কাজেই শেখার ব্যাপারে কোন অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়নি। পিতা বিখ্যাত দাগর খয়ের পুরানো শিষ্য এবং প্রকৃত গুণী মানুষ যাঁর শিক্ষায় ফাল্গুনীর শুধু কণ্ঠই তৈরি হয়নি রাগরূপের গভীরতাও এসেছে আর এসেছে আত্ম বিশ্বাস যে আত্মবিশ্বাস ছাড়া খেয়াল ঠুংরির যুগে ধ্রুপদ গাওয়া যায় না।

হাল্কা ধরণের গান বাজনা করে হাততালি পাবার ইচ্ছে না থাকলেও

এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাটক—৬০০ রজনীর দ্বারপ্রান্তে
প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার ৬॥টায় ও রবিবার এবং ছুটীর দিন ৩টা ও ৬॥টায়

নাটক।পরিচালনা।সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রেঃ- বিকাশ, সত্য, প্রদীপ, ইরা, সান্তনা, গিরীশ, রবীন, মিহির, সুনীল, নিখিল, শংকর, অরুণ, দীপংকর, উশীনর, শৈলেন, মধু, গণেশ, স্বপন, অলোক, তিমির এবং
রত্না ঘোষাল ও তরুণকুমার

ফাল্গুনীর সংগীত চিন্তা ও স্বর প্রয়োগ আধুনিক ও প্রগতিশীল। 'মেঘ' গাইবার সময় ধ্রুপদ গাইছেন বলে আমীর খাঁর প্রভাব জোর করে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেননি। আবার সৌন্দর্যের জন্য সরগম-এর ব্যবহার করেছেন যা অনেক ধ্রুপদ গায়ক করে না। এই ধরনের চিন্তা ধারা ধ্রুপদ গায়কদের মধ্যে আগে এলে ধ্রুপদের এই দুরাবস্থা হোত না।

ফাল্গুনীর সবচেয়ে বড় গুণ ওঁর গানের মিষ্টতা ও পরিমিতি বোধ। বীর রসের নামে চিৎকার করেন না। শাস্ত্রের অজুহাতে কয়েকটি স্বর নিয়ে লেবু কচলিয়ে তেতো করেন না। এই জন্য ওর গান শ্রুতি মধুর। দক্ষতা কখনই সুর বোধ ও সৌন্দর্য বোধকে ছাপিয়ে যায় না। লয়ের ওপর দখল ভালো চৌতাল, ধামার, ঝাপতাল এর গান সমান দক্ষতার সংগে গেয়ে থাকেন। বিমলদাস গুজরাটির ভালো পাখোয়াজ সংগত সেদিনে ফাল্গুনীর অনুষ্ঠানকে আরো সুন্দর করে।

গীতাঞ্জলি বিদ্যামন্দির

সম্প্রতি বিড়লা একাডেমিতে টালিগঞ্জ-এর গীতাঞ্জলি বিদ্যামন্দিরের বার্ষিক সংগীতানুষ্ঠান হয়ে গেল। অনুষ্ঠানে সভানেত্রী ছিলেন শ্রীমতী অমিতা ঠাকুর ও প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীমতী নীলিমা দাশগুপ্তা।

ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বোধনী সংগীতের পর তৈবত কণ্ঠে খেয়াল পরিবেশন করেন শুভ্রা দেবনাথ ও বাঁশরী গুহ। সংস্থার অধ্যক্ষ গৌরাঙ্গ সাহার গান শোনার সুযোগ আগে আমার কখনো হয়নি। তবে শুনে-ছিলাম যে অনেক কষ্ট করে খুব কঠিন পথ পেরিয়ে ধৈর্য নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে সংগীত জগতে নিজের স্থান করে নিয়েছেন।

সুরেলা কণ্ঠে ইনি প্রথমে গাইলেন রাগেশ্রী রাগে খেয়াল ও তারানা। রাগ বিস্তার তান ও লয়কারীতে ওঁর সমান দখল। এটা বোধহয় ওঁর সংগ্রামী জীবনের অপরিসীম সাধনার ফল।

শ্রোতাদের অনুরোধে ইনি শেষে গাইলেন একটি ভজন ও একটি স্বরচিত ঠুমরী। পাতিয়ালা ঘরাণার প্রভাব লক্ষ্য করলাম। আর লক্ষ্য করলাম ওর সৌন্দর্য বোধ।

তবলা সংগত শিল্পীর পুত্র সুজিত সাহা তাঁর গুরু কেরামত খান সাহেবের সংগতের ধারা অনুসরণ করেন। পরিমিতি বোধ ও সংযত বাজনা গানকে আরো সুন্দর করেছিল ও সুরের কাজের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে সাহায্য করছিল। সুজিতের হাত পরিষ্কার ও মিষ্টি। আশা করা যেতে পারে যে পরিশ্রম ওকে সংগীত-এর বাস্তবে অনেক দূরে নিয়ে যাবে।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব ছিল নৃত্য-নাট্য রবীন্দ্রনাথের 'শাপমোচন'। নৃত্যে শিপ্রা গুহঠাকুরতা, নীহার গুহঠাকুরতা, ইন্দ্রানী বন্দ্যোপাধ্যায় ও গীতালী চক্রবর্তী অংশ গ্রহণ করে। কণ্ঠে অংশ গ্রহণ করে অদিতি সেনগুপ্ত, শ্যামল সাহা, সুজাতা সাহা ও মিতা চন্দ।

সংগীত ও নৃত্য পরিচালনায় যথাক্রমে শ্যামল সাহা ও সুমিতা চক্রবর্তী সংগঠন ক্ষমতা ও পরিশ্রমের পরিচয় দেন।

উত্তরপাড়া সঙ্গীত চক্র

গত ১০ জুন উত্তরপাড়া সঙ্গীত চক্র নবাবা আয়োজিত এক ত্রৈমাসিক অনুষ্ঠানে মেঘনাদ চট্টোপাধ্যায়ের তবলা লহরা শুনলাম। তিনি ঐ অনুষ্ঠানে উঠান, রেলা, পেশকার কায়দা চক্রধর, টুকরা ও পরে অতি দ্রুত লয়ে ত্রিতাল বাজিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করেন। মেঘনাদ চট্টোপাধ্যায় প্রথমে প্রফুল্ল হাজরা, পরে কাশীনাথ মিশ্র এবং বর্তমানে শ্রীশংকর ঘোষ মহাশয়ের নিকট নাড়া বেঁধে শিক্ষা গ্রহণ করছেন। ওনার সঙ্গে হারমোনিয়ামে সহযোগিতা করেন সুশীল দাস। সুব্রত রায়চৌধুরী

যাত্রা সংবাদ

অনামিকা যাত্রা ইউনিট

স্বনামধন্য অভিনেতা দিলীপকুমার এবার সোরাব রুস্তম ও বড়দিদি এ দুটি পালায় আসর মাত করবেন, আশা রাখেন। দুটি পালার মহড়া এগিয়ে চলেছে। প্রখ্যাত অভিনেতা মহেন্দ্র গুপ্ত হলেন সোরাব

শিল্পী মহলে ঠাকুরদাস মিত্র

তপোবন অপেরার গীতা চৌধুরী

রুস্তম পালার নাট্য উপদেষ্টা। অভিনয়ে বিশিষ্ট শিল্পী ছাড়াও থাকবেন শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী মধুশ্রী দেবী। প্রয়োজন হলে এঁরা বেণারসী পাপাটিও আসরস্থ করতে পারবেন। দিলীপবাবুর আশা, সবগুলি পালাই নাকি হিট করবে।

শিল্পী মহল

এ দল এবার নটসম্রাট মহেন্দ্র গুপ্তের নির্দেশনায় উপস্থাপনা করবেন কৃষ্ণ শিশু-পাল' এ পালায় বিশেষ কিছু দৃশ্য চমক আনবে। এদের আরও দুটি পালা 'কার পারে' ও বজ্রেন দের 'সম্রাট জাহান্দার শাহ'। বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করবেন—নট নায়ক সুজিত পাঠক, ভক্ত মল্লিক, ঠাকুরদাস মিত্র, শর্মিলা দাস, মায়া পাল এবং আরও অনেকে। দলের হাল ধরেছেন প্রখ্যাত দল পরিচালক অভয় সাহা। দলের মহড়া চলছে।

রবীন্দ্র জয়ন্তী

সঙ্গীত সাধনায় শিল্পীদের রবীন্দ্র জন্মোজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল কেদার আশ্রমে। বিভিন্ন শিল্পী সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন। পঙ্কজ ভট্টাচার্য, পার্বতীকুমার রায়, মিহির গুপ্ত, তপন ভট্টাচার্য, শিশির দাশ, চন্দনা ব্যানার্জী, শীলা দাশ, দীপা ভট্টাচার্য, জয়া মিত্র ও দীপান্বিতা রায়। সঙ্গতে-তপন মন্ডল। সবশেষে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের সংকলনায় ও পঙ্কজ ভট্টাচার্যের গ্রন্থনায় এবং পার্বতী-কুমার রায়ের পরিচালনায় নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠানটি বিশেষ উপভোগ্য হয়েছিল।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পাইকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা ৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

মূল্য ৭৫ পয়সা। ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

বিনামূল্যে!

卐 স্বস্তিক
নিম সাবান

卐 স্বস্তিক
ডিটারজেন্ট পাউডারের
১ কিলো প্যাক
কিনলে

তাড়াতাড়ি আসুন!
স্টক সীমিত!

স্বস্তিক ডিটারজেন্ট কাপড় ধোওয়ার পাউডার
দামে কম সবার চেয়ে... কাজে ভাল ফেনুল খুবে

Regd. No. WB/RC-13
Gram : AMRITA Calcutta-700003

AMRITA

Friday 25th August, 1978
Phone 55-5231 (14 lines)

নিম্নমানের 'কুকমী' গুঁড়া মশলার ক্রেতারা

সাবধান!

'কুকমী' গুঁড়া মশলার কলিকাতার নির্ধারিত গ্রাহকদের কাছে কয়েকটি গুঁড়া মশলা কোম্পানী আমাদের হিসাবে নিম্নমানের ব্রাণ্ডের, নকলে অনধিক কুকমীর নাম যুক্ত বর্তমান কুকমী (Cookme) নামযুক্ত মাঝারি নকলে আসল কুকমী গুঁড়া মশলা থেকে সাবধানে চালাবার চেষ্টা করছে।

কেনার সময়
দেখে নেবেন—
'কুকমী'র প্যাকে
কেবলমাত্র 'কুক
(Cookme) -ছ
আছে,— অ
কোন ব্রাণ্ডের
নাম যুক্ত নে

23 AUG 1978

প্রস্তুতকারক :

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ

২৩৫ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭০০০৭০ ● ফোন : ৩৫০৬৯৫, ৩২৬৬৩২
পোষ্ট বক্স নং : বড়বাজার ৬৮৮৫ ● ফ্যাক্টরী : কানপুর

iaa 590

অমৃত

শারদীয়া ১৩৮৫

কম খরচে
জীবনে আনুন আনন্দ

সুকান্ত

আপনাকে সহায়তা করবে

আমাদের সহজ কিস্তি পরিকল্পনায়
আজই আপনার কাম্য জিনিষগুলির
মালিক হতে পারেন।
দামের সামান্য অংশ এখন দিন।
বাকীটা দীর্ঘমেয়াদী সহজ কিস্তিতে।
(নগদেও কিনতে পারেন, অবশ্যই।)
ইচ্ছামত বেছে নিন আমাদের
বিপুল পণ্যসম্ভার থেকে :

রেফ্রিজারেটর, ওয়াটার কুলার, গীজার,
এয়ার কণ্ডিশনার, বিজলি পাখা,
টি.ভি., টেপ রেকর্ডার, রেডিয়ো,
স্টিরিয়ো, সেলাইকল, ওয়াশিং মেশিন,
প্রেসার কুকার, গ্যাস তন্দুর-চুল্লি,
আলমারি, ফাইলিং ক্যাবিনেট,
টাইপরাইটার, ক্যালকুলেটর,
স্কুটার,
এবং বাড়িতে আর অফিসে ব্যবহারের
জন্য আরো অনেক জিনিষ।

আজই আসুন আমাদের
শীতাতপনিয়ন্ত্রিত শো রুমে।

সুকান্ত

- ৫৬, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭১
  ফোন : ৪৪ ০২৫৪/৪৩ ১৯৭৬
- ৩৪, আশুতোষ মুখার্জি রোড,
  কলকাতা-২০ ফোন : ৪৭ ৮০৮৪
- হিল কার্ট রোড, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং।
  ফোন : ২১১৪৪

সুকান্ত
কেনাকাটার
আনন্দ

নটরাজন-এর চাঞ্চল্যকর রচনা

লালবাজার ২০

থানার মাটি নোনা ১৬

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সার্থক উপন্যাস

শেষ বিচার ১৮

স্বাতী ও দীপু ১২

শ্রীকৃষ্ণের যৌবনলীলা এবং দ্বারকা ও বেট-দ্বারকার কৃষ্ণলীলা-স্থল পরিক্রমা অবলম্বনে বাংলা সাহিত্যের প্রথম ভ্রমণ কাহিনী

শঙ্কু মহারাজ-এর

মন-দ্বারকায় ১২

শ্রীকৃষ্ণের শৈশব ও কৈশোর লীলা এবং বিশ্বের প্রাচীনতম পদ-যাত্রা ব্রজ-পরিক্রমার ওপরে রচিত বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তম ভ্রমণকাহিনী, এই লেখকের

মধু-বৃন্দাবনে

তিন শ' পৃষ্ঠার তিনটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ পর্বে সমাপ্ত। প্রতিটি পর্ব আলোকচিত্র, মানচিত্র, পথপঞ্জী ও বিষয়সূচীসমৃদ্ধ। মূল্য প্রতি পর্ব বারো টাকা।

এই লেখকের

চতুরঙ্গীর অঙ্গনে ১৫

শৈলেশ দে'র অবিস্মরণীয় সৃষ্টি

গান্ধীজী ও নেতাজী ২০

ব্রজমাধব ভট্টাচার্যের সাম্প্রতিকতম উপন্যাস

ত্রিভুবনের বাইরে ১৮

শক্তিপদ রাজগুরুর উপন্যাস

অনুসন্ধান ১৫

কাশীকান্ত মৈত্রের

গণতন্ত্র

মুখোশ ও মুখশ্রী ১৫

নারায়ণ সান্যালের

বিহঙ্গ বাসনা ১০

গজমুক্তা ১০

সুবোধ ঘোষের

গল্প মনিঘর ১৪

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

আকাশে আয়না ১০

একাল চিরকাল ১০

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের

গোমুখীর পথ ১৬

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

থৈথৈ হাহাকার ১৮

অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সুবর্ণশীর ২০

নিখিলচন্দ্র সরকারের

সজনে নির্জনে ১২

দুঃখেসুখেবাঁচা ১০

কলহনের

খবরে প্রকাশ ১০

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের

প্রেম ঘৃণা দাহ ৮

শ্রীহংস-এর

লাস্ট ওয়ার্ড ৮

গাইনিক ওয়ার্ড ৮

রবীন্দ্র লাইব্রেরী

১৫।২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০০৭৩

ফোন ঃ ৩৪-৪৩৫৬

সম্পূর্ণ ক্যাটলগের প্রয়োজন হলে লিখুন।

সূচীপত্র

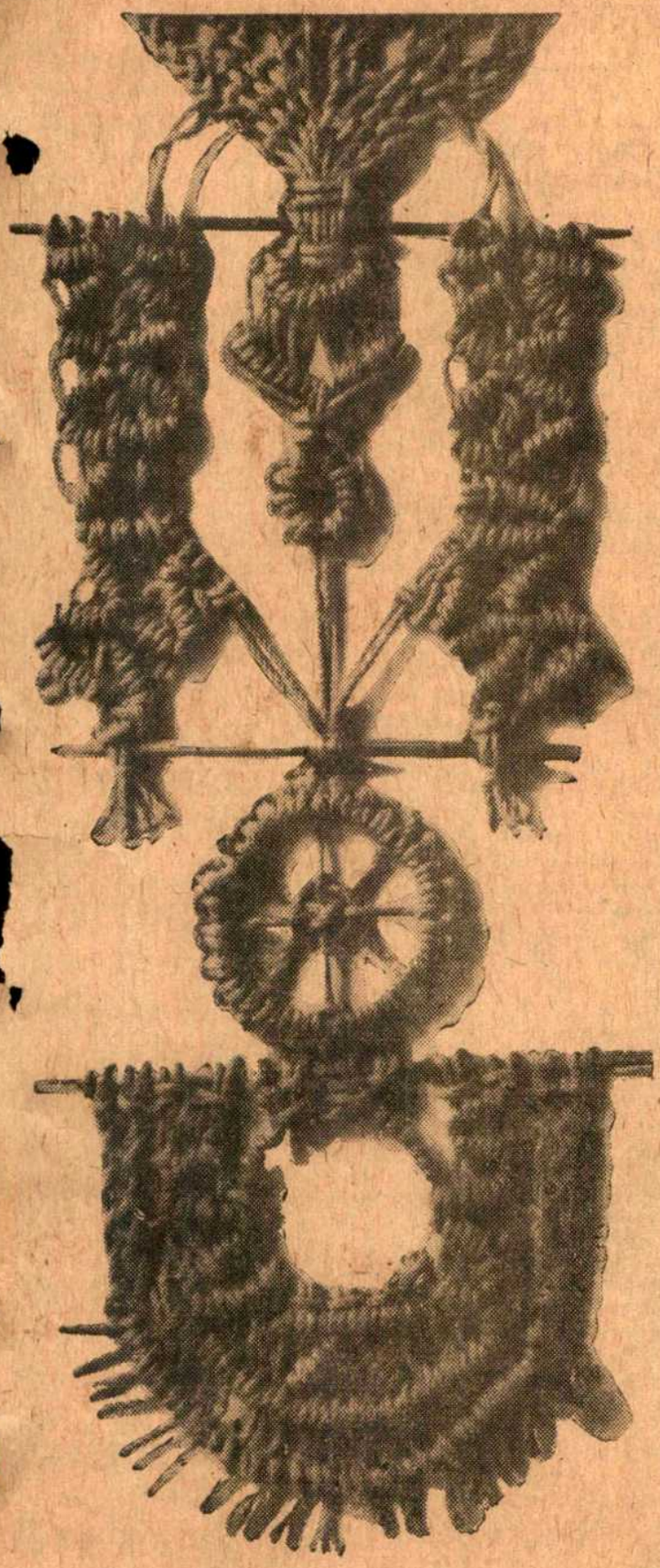

ভারত কা করে ভাগ হল ॥ ৩০
বিমলানন্দ শ্যামল

মহাত্মা গান্ধী ॥ ৬
রমেশ মজুমদার

পিছু হটার পালা ॥ ১০
নীহাররঞ্জন রায়

ভারতের ভাগ্যগণনা ॥
শ্রীমাণিক্য

বাড়তির পথে ভারত ॥ ১৪
অতুল সুর

আর্থিক উন্নতি :
তিন দশকের খতিয়ান ॥ ২০
ভবতোষ দত্ত

কী চেয়েছিলাম/কী পেয়েছি

দেশবিভাগ : ২৪ পরগণা
ও নদীয়ার রূপান্তর ॥ ৭৪
কমল চৌধুরী

নির্বাসিতা তুমি ॥ ৭৭
অমিতাভ চৌধুরী

খুলনা-যশোর ইতিহাস-
ভূগোলের খেলা ॥ ৬৯
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

কৃতী প্রতিভা/কিছু কথাবার্তা

প্রচ্ছদ এবং অঙ্গ সজ্জা

পরিকল্পনা : শৈবাল ঘোষ

প্রচ্ছদ শিল্পী : মকবুল ফিদা হুসেন

অঙ্গ সজ্জা : মালবিকা সেনগুপ্ত, নৃপেন না
ডালিম বসাক, শৈবাল ঘোষ

প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ছবি শ্রীমতী জ্ঞানবতী
লাঠ এবং শ্রীমুকুন্দ লাঠের সৌজন্যে
প্রাপ্ত হুসেনের আঁকা ছবির একটি
অংশ বিশেষ।

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
দাম তিন টাকা

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY

প্রকাশিত হল

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের

একটি বিশিষ্ট ধরণের বই

পালকি চলে দুল্‌কি তালে

দাম ৫৲

একদা এই কলকাতাতেই গরু কাঁপিয়ে ঘন্টাঘোষে হুমরাহো করে চলত পালকি। সেই পালকি যে কত রোমান্টিক হতে পারে, তার অনেক বিচিত্র কাহিনী ও ছবি তুলে ধরেছেন লেখক। দাদু নাতনী সকলেই এই পালকি চড়ে কলকাতা পরিক্রমা করতে পারবেন। এই লেখকের আরো দুটি বই এখনই পড়ে দেখা দরকার। ডিহি কলকাতা থেকে বাবু গৌরবের কলকাতায় পৌঁছুতে গেলে এই দুটি অবশ্য অপরিহার্য।

ডিহি কলকাতা ছাড়িয়ে

দাম ১৩৲

বাবু গৌরবের কলকাতা

দাম ১৬৲

নাট্যকার দীনবন্ধুকে নিয়ে এই লেখকের রয়েছে আরেকটি অসামান্য গ্রন্থ। নবজাগরণের বিস্তৃত পটভূমি, মানবিকতাবাদের ব্যাখ্যা এবং সেই আলোকে সমস্ত নাটকের ওপর বিশদ আলোচনা। একালের সমালোচনার ইতিহাসে এটি যেমন একটি উল্লেখ্য সংযোজন, তেমনি লেখককে এটি এনে দিয়েছে গবেষকের সম্মান।

নবজাগরণ ও মানবিকতাবাদের ভূমিকায় দীনবন্ধুর নাটক

দাম ২২৲

অমরেন্দ্র দাস —এর

(সম্পাদনায় শিউলি দাস)

আদিনারায়ণের কলকাতা

দাম

আনন্দ রায় সম্পাদিত

বুদ্ধদেব বসু: নানা প্রসঙ্গ

দাম ১৫৲

রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বলতম গ্রহ-নক্ষত্র বুদ্ধদেবকে কেন্দ্র করে অনেকগুলি সরলা সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ, ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার এবং অন্যান্যদের লেখা নিয়ে একটি মূল্যবান গ্রন্থ সম্পাদিত হল। বুদ্ধদেব বসুর ওপর এই ধরণের বই এর আগে প্রকাশিত হয় নি।

ডঃ অমরেন্দ্র গলাইএর বাংলা সাহিত্যের উত্তরাধিকার ও শরৎ চন্দ্র

দাম ১০৲

শরৎচন্দ্রের শিল্প ব্যক্তিত্বে পূর্ববর্তী কবি নাট্যকার ও উপন্যাসিকদের উত্তরাধিকার ও প্রভাব নির্ণয় এবং শরৎচন্দ্রের ভাষা-শিল্পের বিশ্লেষণ।

পানিত্রাসে শরৎচন্দ্র

নীরেন্দ্র দত্ত

দাম ১০৲

শরৎচন্দ্রের বেশ কয়েকের রচনাবলীর ভিতর পানিত্রাস গ্রন্থটির মধ্যে তাঁর তীব্র রক্তের আত্মীয়তা। এই গ্রন্থে পানিত্রাসের পটভূমি, সমর সংকটের সম্ভাবনাকে প্রত্যেকটি কাহিনী, ঘটনা, অন্যান্য প্রসঙ্গ সাবধানে রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রসঙ্গ উপস্থাপিত। পরিণত বয়স, মন ও মনস্কা একজন লিপিকার ক্ষেত্রে তাঁর এই রচনাবলীর পরিবেশনা ও সর্বস্তরের মানুষজন কোন কোন দিক থেকে প্রভাবিত করে তাঁর লিপিকর্মের শ্রেষ্ঠ রচনাটিকে 'ঘরে ওঠার' পথে সহায়তা করেছে। বৃদ্ধি ও বিচক্ষণ কি ভাবে একাত্ম হয়েছেন তারই পরিচয় আছে এ গ্রন্থে।

কমলকুমার সান্যাল বাংলা নাটক সমীক্ষা

দাম ১০৲

কলকাতার সামাজিক পট পরিবর্তনের পট ভূমিকায় বাংলা নাটকের সমাজ-তাত্ত্বিক মূল্যায়নে ও বিশ্লেষণে পরিচয় দেখান অনেক মূল্যবান চরিত্রের এক।

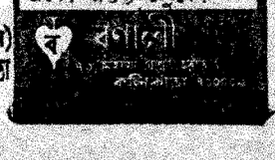

বরুণ সেনের

কালো টাকা

দাম ১০৲

কংগ্রেস শাসনকালে কংগ্রেস শাসনে সর্বস্বান্ত লোককে বঞ্চিত করে কালো টাকা কিসের গোপনতম গর্ভে কিভাবে বেড়েছে? সেই বিষের গোপনীয় কথা এবং কালের সাক্ষে জড়ো রোমাঞ্চকর চিত্র।

এই লেখকের

গরিবী হটাও

দাম ১৫৲

ক্রীড়া সাংবাদিক

চিরজীবের

খেলাধূলার নেপথ্যে দাম ১০৲

গ্রামের ছেলেদেরকে কিভাবে খোঁজা হয়। সরকারী টাকা খেলোয়াড়দের হাতে পৌঁছবার আগেই অদৃশ্য। খেলায় দুর্নীতির ওরুনায় তন ভাঙার ক্ষমতা কারুর পরিচালকের নেই। বাজারে খেলাধূলা চলেছে ধাপে ধাপে। বাংলার মাই- সে দুঃখ জমাদারে খেলা। কীড়ামন্ত্রী শ্রীমন মোহন, খেলোয়াড়। অবশেষে বলছেন, 'কিন্তু করার জো নেই।' খেলাধূলায় বিচারক মন্ত্রিমণ্ডলীর সাতজনো তিরিশ টাকা দুশো টি জেলায় কীড়া অধিকার নেই।

এই লেখকের দুটি বই

স্মরণীয় খেলা বরণীয় খেলোয়াড় দাম ৯৲

পদ্মা আমার মা

গঙ্গা আমার মা দাম ১২৲

নিখিল চন্দ্র সরকারের

নদী মখন সাগরে

দাম ২০৲

অনেক খুঁত তুল ভ্রান্তি পেরিয়ে মানুষ কিভাবে একসময় বিরাট ওজন মহৎ এক উপলব্ধিতে পৌঁছোয়, এ উপন্যাস ঠিক তাই। লেখক গভীর মমতা আর সহানুভূতি দিয়ে সুন্দর রসের জগৎ সৃষ্টি আর মানুষের ভুল ত্রুটিকে এঁকেছেন। সার্থক কি ব্যর্থ, তার বিচারে পাঠকরাই ওপর। তবে ঔপন্যাসিকের উদ্যম এ যে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তা সম্বন্ধে বলা যায়।

সাংবাদিক

নিশীথ দে'র

পালা বদলের নায়ক দাম ১২৲

কে সেই নায়ক?

পশ্চিমবাংলায় চল্লিশ বছরের রাজনীতির নায়ক আজকের কর্ণধার জ্যোতি বসু। সাতান্ন বছর রাজনীতির উত্থান পতনে নায়কের ভূমিকা নিয়েছেন প্রফুল্ল সেন। পালাবদলের নায়ক এঁরাই।

এই লেখকেরই আরেকটি বই

জয়প্রকাশ

দাম ৯৲

সম্রাট সেনের সপ্তদুর্গার উদয়াস্ত

দাম

১ম ১৮৲

২য় ২০৲

সম্রাট সেন বাংলা উপন্যাস জগতে এক অনায়াস উচ্চারিত নাম। তার লেখায় কাব্য-বোধ ও পরিমিতি বোধ সর্বোপরি চরিত্র চিত্রণ নিখুঁত ভাবে প্রতিফলিত। এক ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের জীবনে সুখ দুঃখ কামনা বাসনা, লোভ হিংসা ও বিরহ-মিলনের এক অনবদ্য খতিয়ান। নবতম ইতিহাস ভিত্তিক উপন্যাস সপ্তদুর্গার উদয়াস্ত।

এই লেখকেরই

নেপথ্যে নাটক

দাম ১২৲

সাংবাদিক ধ্রুব মজুমদারের

সাংবাদিকের সংবাদ

দাম ১২৲

সত্যযুগ: সাংবাদিক জীবনের সত্যটুকু। একমাত্র হিরণ্ময়ের ধন্যবাদ করা চলে সাংবাদিকরা আর কোন ও কাজ করে। এই বই পড়ে তা মনে হবে না।

ত্রেতাযুগ: সাংবাদিকদের নিয়ে ঘনিষ্ঠ রচনা। সাংবাদিকদের ভূমিকাকে তুলে ধরা হয়েছে। দ্বৈত সত্যের যুগ। অন্য মানুষের কাছে আড়ালে একরকম পাঠক পাঠিকা ওরকম ধ্রুব মজুমদার ও তাদের মেলে অন্যের মনে হবে।

এই লেখকের কৈলাস মানস সরোবর ভ্রমন কাহিনী

সো মাভাং ২৲

বাংলা ভাষায় এই জাতীর সাংবাদিকী বই প্রথম প্রকাশিত হল।

পৃথ্বীরাজ সেনের

প্রচণ্ড চাঞ্চল্যকর বই

কেস অফ পয়জন

দাম ১২৲

সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি কারী কুখ্যাতি জঘন্য বিষ-হত্যার নেপথ্য ও কলঙ্কিত কাহিনী।

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়

টাওয়ার অফ সাইলেন্স ১৫৲

চিরজীব সেনের

হেড লাইন

দাম ১২৲

খুলো বন্ধ ঘরে বুদ্ধিহীর রিপোর্টার দৈনিক সংবাদপত্রে যে সব খবর পরিবেশন সৃষ্টি করে তাদের দেও লাইনের মর্মকথা অর্জন সংগ্রহের পর থেকে রিপোর্টার খবরের সংকলন এই লেখকেরই

ইলেকট্রা যৌবনা

দাম ১০

সামুয়েল

আমার স্বর্গ আমার সুখ ৮৲

বাণিক রায়

কালো গান ৭৲

সমরজিৎ কর

সমুদ্রের চোখ ১২

জাঁ গুলশ ৮৲

ডেড সাইলেন্স

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫

টুকুনের অসুখ

রত্না সেনদত্ত

দর্পণে একাকী ৮৲

গোবিন্দ শর্মণ

স্নানঘর ১০৲

বীরু চট্টোপাধ্যায় ৯৲

নীল প্রতিহিংসা

ফাহিয়েন ছো ১১৲

কুহকিনি কুগতী

সম্পাদকীয়

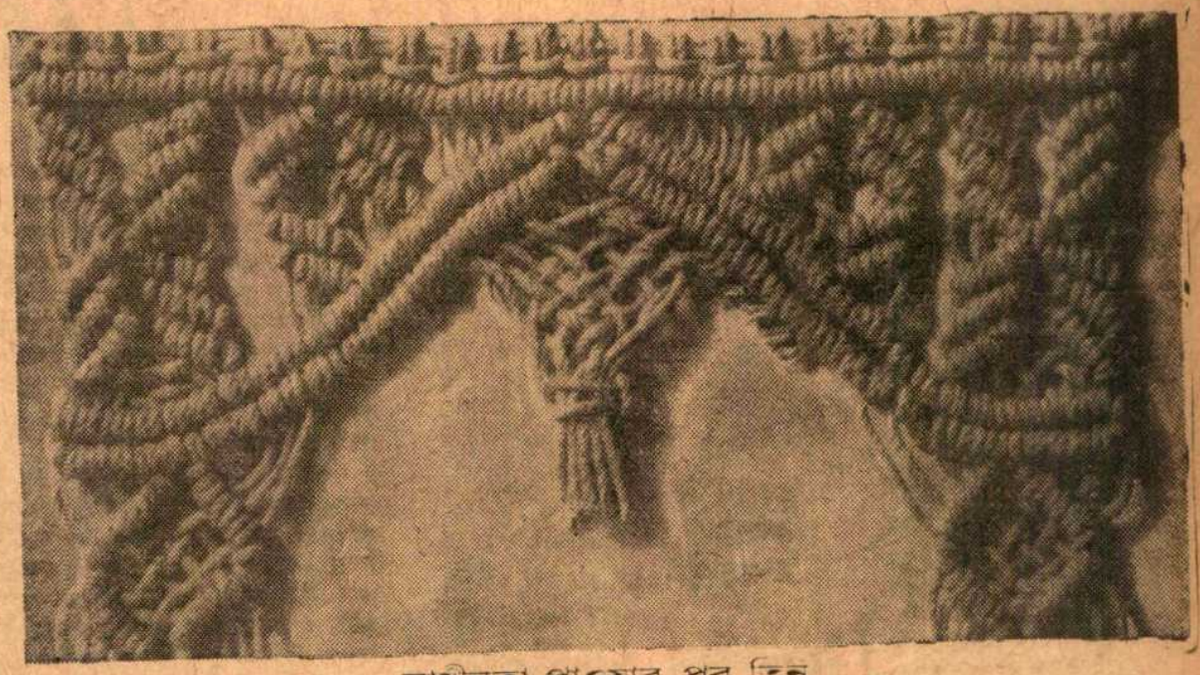

স্বাধীনতা পাওয়ার পর তিন
দশকেরও বেশি পার হয়ে এসেছি আমরা। কিন্তু
দেশভাগ সংক্রান্ত সমস্যা থেকে এখনো আমরা অব্যাহতি পাইনি। সম্প্রতি দণ্ডকারণ্য
থেকে দলে দলে উদ্বাস্তু পরিবার পশ্চিমবঙ্গে চলে আসার পর সমস্যাটি যে কতো
গভীর সেটাই বরং আরো স্পষ্টতর হল। রাজনীতির প্রয়োজনে একটা দেশের
সীমারেখা যেমন-তেমন ভাবে পরিবর্তিত হতে পারে,
কিন্তু সামাজিক এবং
সাংস্কৃতিক জীবনকে অতো সহজে নতুন আদলে গড়ে তোলা যায় না।
অন্যদিকে, তিরিশ বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃত্বে
বিশেষ একটি দল
হিসেবে কংগ্রেসের অস্তিত্বও কম সমস্যা জমিয়ে তোলেনি দেশে।
সম্প্রতিকালে যে নতুন দল শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন
সেই জনতা সরকারের পক্ষেও
তাই গোটা পরিস্থিতিকে এখন নতুন ভাবে বিচার করে দেখতে হচ্ছে।
অন্যত চেষ্টা করেছে সেই মূল্যায়নের কাজে অংশ গ্রহন করতে। ভবিষ্যতের
পরিকল্পনা যাতে সার্থক ভাবে রূপায়িত হতে পারে, 'অমৃত'ও থাকতে চায় সে
কাজে সক্রিয় সহযোগী।

রমেশ চন্দ্র মজুমদার

মহাত্মা গান্ধী

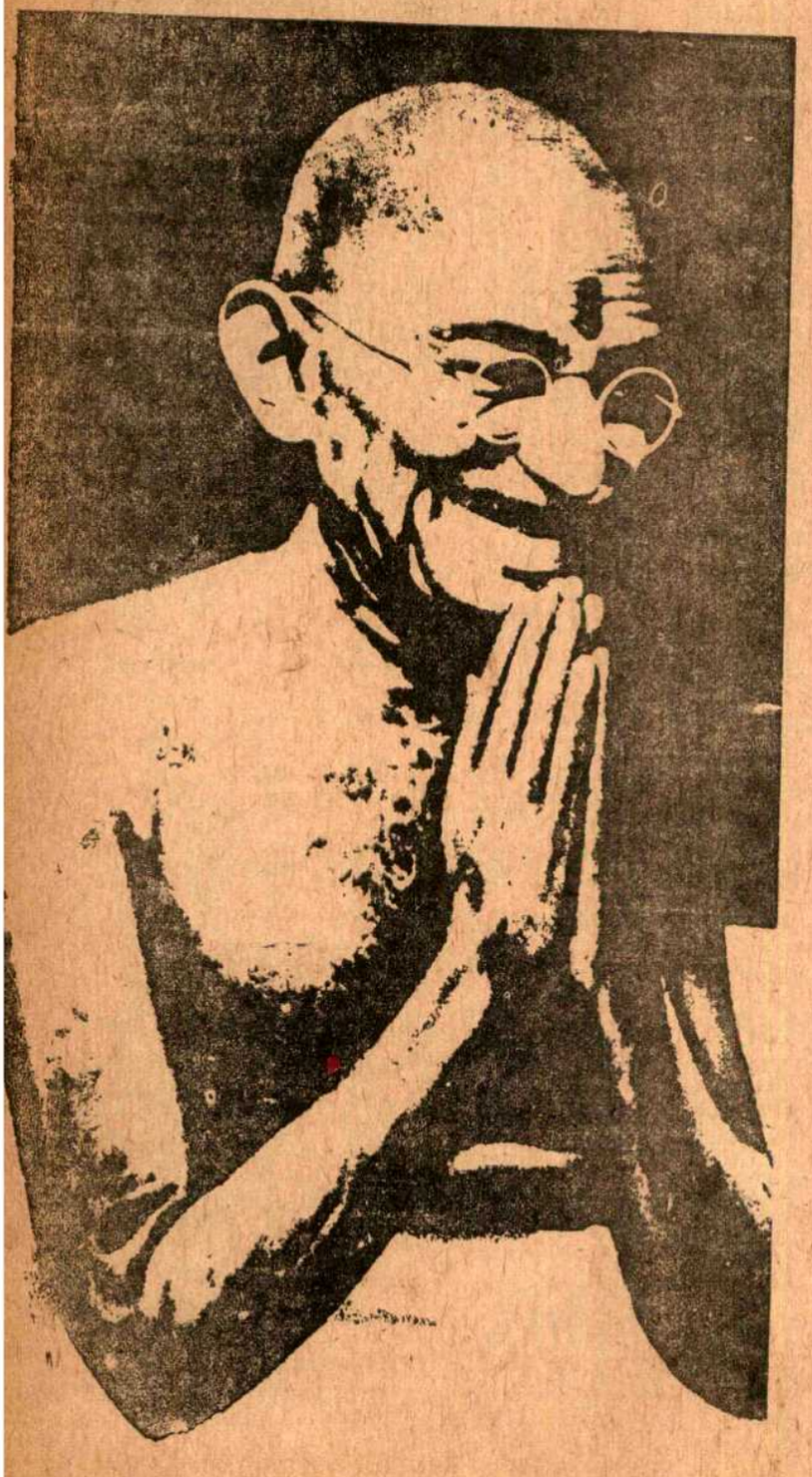

আমাদের স্বাধীনতা লাভের পর তিরিশ বছর কেটে গেছে। প্রধানতঃ কি উপায়ে বা কি কারণে ইংরেজ রাজত্বের অবসান হল এবং আমরা স্বাধীনতা পেলাম তা ধীরভাবে আলোচনা করার সময় এসেছে। সর্ব সাধারণের মধ্যে একটি বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে মহাত্মা গান্ধীই ইংরেজের অধীনতা থেকে আমাদের দেশকে মুক্ত করেছেন। এই প্রচলিত ধারণা কতদূর সত্য তা বিচার করার সময় এসেছে।

বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকের আরম্ভ থেকেই গান্ধীজী ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের নায়ক বলে খ্যাতি লাভ করেন। কিন্তু এই ধারণা কতদূর সত্য তা যথাযথ-ভাবে বিচার করতে হলে ঐ তারিখের পূর্বে ভারত এ বিষয়ে কতদূর অগ্রসর হয়েছিল তার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা আবশ্যক।

গান্ধীজীর পূর্বে

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে সমগ্র বঙ্গদেশে যে জাতীয় চেতনার উদ্ভব হয় সে সম্বন্ধে কয়েকজন নেতার অভিমত উল্লেখ করিতেছি।

গোখেল বলেন—'বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমেই যে ভারতের প্রকৃত মুক্তির সন্ধান পাওয়া যাইবে, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।'

মাদ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ নেতা জি সুব্রহ্মনিয়া আয়ার বলেন—'এই আন্দোলনের ফলে জাতীয় জীবনে যে নতুন আদর্শ জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা আজ সমগ্র ভারতে নবজীবনের সূচনা করিয়াছে—ইহা যে সকল প্রদেশে সকল শ্রেণীর মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।'

মাহাত্মা গান্ধী ১৯০৮ খ্রীঃ লিখিয়াছিলেন: 'বঙ্গভঙ্গের পরেই ভারতের প্রকৃত নবজাগরণ ঘটিয়াছে। এই বঙ্গ বিভাগই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভাগের কারণ হইবে। বঙ্গভঙ্গের অবসানের দাবি প্রকৃতপক্ষে ভারত শাসনের (হোম রুল) দাবি। এ পর্যন্ত আমাদের ধারণা ছিল যে আমাদের ক্ষোভের বা অসন্তোষের কোন কারণ ঘটিলে রাজার দুয়ারে প্রতিকারের প্রার্থনা করিব। প্রতিকার না পাইলে আমরা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব অথবা আবার আবেদন করিব। বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পর লোকে বুঝিয়াছে যে আবেদন সকল করিতে হইলে তাহার পশ্চাতে শক্তির বলপ্রয়োগের এবং কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতার নিদর্শন থাকা চাই।'

এই যে নতুন ভাবের ও মনোবৃত্তির

গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্র

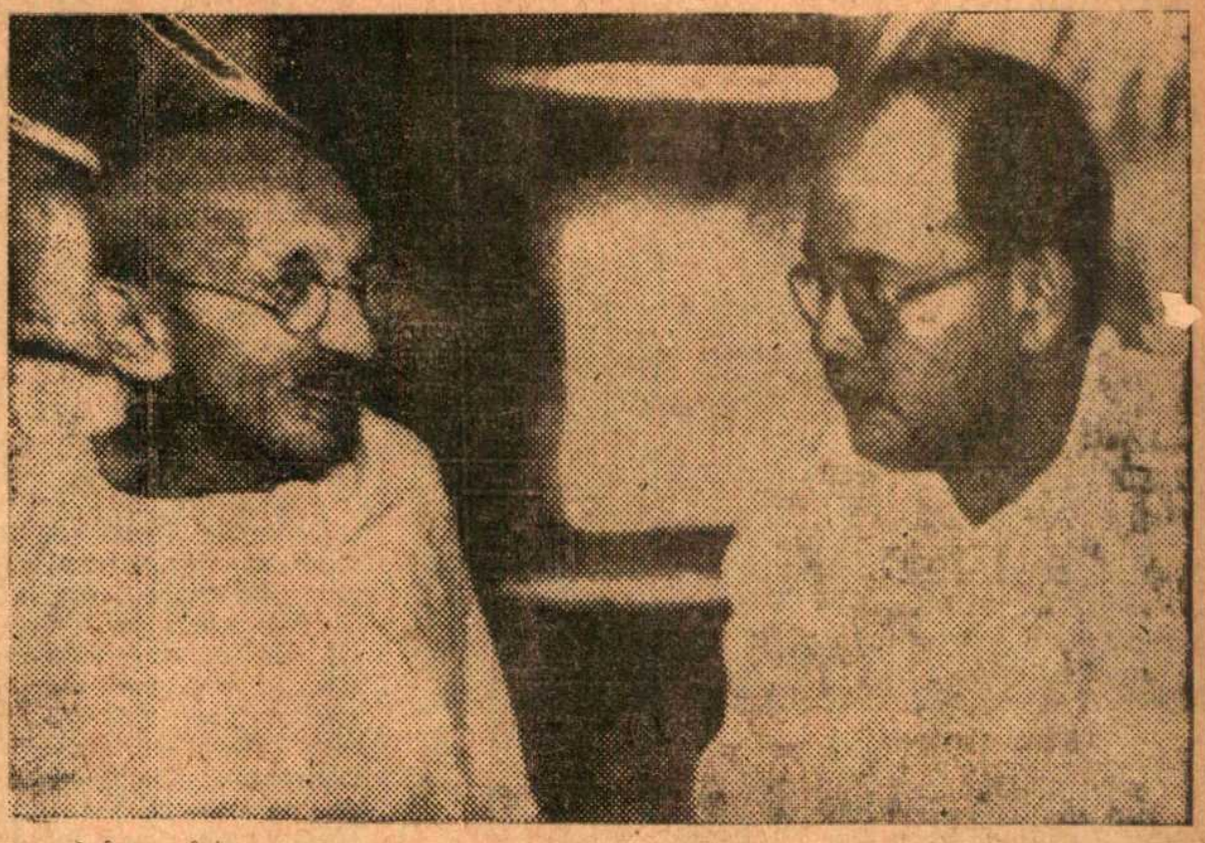

উদ্ভব হইয়াছিল গান্ধীজীর মতে তাহার বৈশিষ্ট্য ছিল কার্যদণ্ড ভয়ের বিলোপ। এই নতুন মনোবলের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল সংবাদপত্রে নির্ভীক মতামত প্রকাশে। এখন লোকে গোলযোগের সৃষ্টি করিতে বা জেলে যাইতে কিছুমাত্র ভয় পায় না। আবেদন নিবেদন আর এই নতুন মনোবৃত্তির মধ্যে প্রভেদ বেশ গুরুতর। এই মনোবৃত্তি বঙ্গদেশে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু পাঞ্জাব হইতে কুমারিকা পর্যন্ত তাহা ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

পরবর্তীকালে গান্ধীর মতবাদ যেরূপ সক্রিয়ভাবে কার্যকর হইয়াছিল অরবিন্দ ঘোষ বহু পূর্বেই তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তিনি ১৯০৭ খ্রীঃ ইংরেজী পত্রিকায় যে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহার সার মর্ম নিম্নে দিতেছি।

'সরকারের সহিত বিরোধ দুই প্রকার—অহিংস ও হিংসাত্মক। বলপূর্বক দাবি আদায় করার নাম সহিংস প্রতিরোধ। গভর্ণমেন্টকে সর্বপ্রকার সাহায্য হইতে বিরত থাকার নাম অহিংস প্রতিরোধ। শেষোক্ত উপায় (প্যাসিভ রেসিসটেন্স) অবলম্বন করিয়া শাসনকার্য অচল করা—ইহাই ছিল চরমপন্থীদের কর্মপদ্ধতি। ইহার মূল কথা—বিদেশ দ্রব্য বর্জন, সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন, সরকারী আদালত ও অন্যান্য শাসন বিভাগ বর্জন প্রভৃতিতে বাঞ্ছিত ফল না পাইলে সরকারী খাজনা দেওয়া বন্ধ করিতে হইবে।

মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে মহাত্মা গান্ধীর যে অসহযোগ আন্দোলনে সমগ্র দেশ মাতিয়া উঠিয়াছিল বারো বৎসর পূর্বেই অরবিন্দ তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছিলেন।

ইহাও বলা আবশ্যক যে পরবর্তীকালে গান্ধী যে স্বায়ত্তশাসনের দাবীর জন্য আন্দোলন করিয়াছিলেন তাহা তিলক ও অ্যানি বেসান্টের অনুরূপ 'হোম রুল আন্দোলনের' প্রচারের পরবর্তীকালে।

রামপ্রসাদ জীবনী ও রচনাসমগ্র ২০৲
সম্পাদনা ঃ ডঃ সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু রচনাবলী
তিন খণ্ডে সমাপ্য। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত
তিন খণ্ডের সাধারণ মূল্য ৬০৲, গ্রাহক মূল্য ৩৬৲।
সম্পাদনা ঃ ডঃ নির্মল দাশ
রামেন্দ্রসুন্দর রচনাসমগ্র
চার খণ্ডে সমাপ্য। তিন খণ্ড প্রকাশিত।
চার খণ্ডের সাধারণ মূল্য ৪০৲; গ্রাহক মূল্য ৪৮৲।
সম্পাদনা ঃ ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
গ্রন্থ মেলা
এ।১২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭০০০০৭

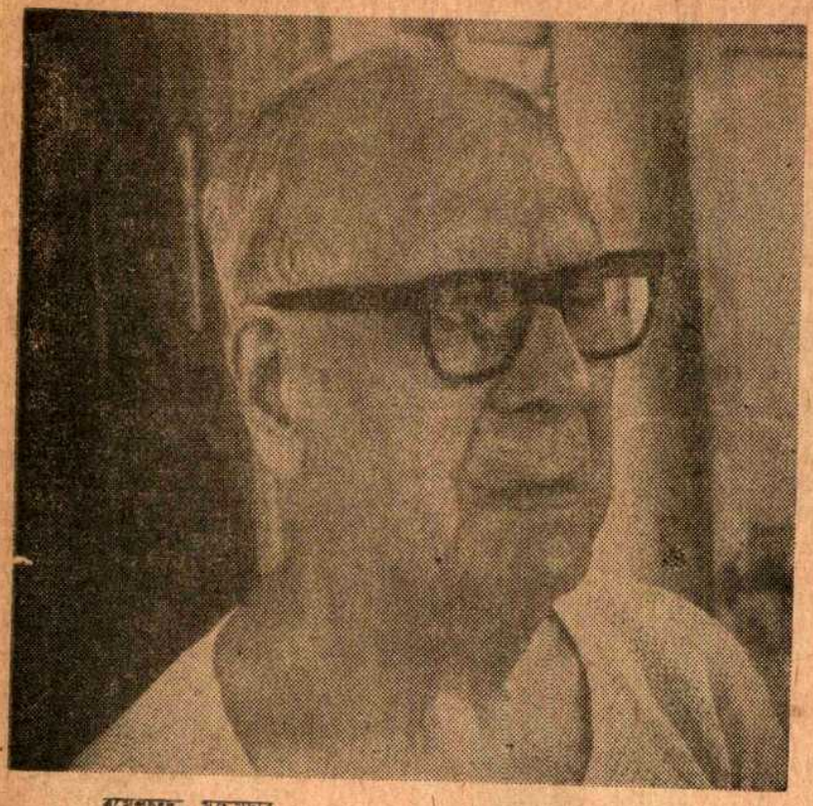

রমেশচন্দ্র মজুমদার

গান্ধীর যুগ

১৯১৯ খ্রীঃ ভারত সরকার যে নতুন শাসন সংস্কারের প্রস্তাব করেন অমৃতসহরে কংগ্রেসের অধিবেশনে তাহার আলোচনায় গান্ধী সর্বপ্রথম রাজনীতি ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখ অনেকে ইহা অসার ও গ্রহণের যোগ্য নহে বলিয়া মত প্রকাশ করেন কিন্তু গান্ধী ইহার প্রতিবাদ করিয়া এই সংস্কার গ্রহণের পক্ষে বিতর্ক করেন ও ভোট দেন।

ইহার পর দেখা যায় ভারতের স্বাধীনতা অপেক্ষা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত তুরস্কের সুলতানের বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষ যে সমুদয় ব্যবস্থা করেন তাহার বিরুদ্ধে মুসলমানদের সঙ্গে সহানুভূতি প্রদর্শনেই গান্ধী অধিকতর আগ্রহ দেখাইতে লাগিলেন। কেন্দ্রীয় খিলাফৎ কমিটি ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে যে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব করিল হিন্দু নেতারা সহানুভূতি প্রকাশ করিলেও তাহাতে যোগ দিলেন না। কিন্তু গান্ধী এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া নিখিল ভারতে হরতাল ঘোষণা করিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সাহায্য করিবার জন্য 'গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে যে সকল পদক পাইয়াছিলেন তাহা ফেরত দিয়া বড়লাটকে লিখিলেন, 'আমার মুসলমান ভাইদের ধর্মবিশ্বাসে যে আঘাত লাগিয়াছে তাহা দূর না হওয়া পর্যন্ত এই সব মেডেল ব্যবহার করিতে আমার বিবেকে বাধে। সুতরাং আজ হইতে খিলাফৎ আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে যে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইল তাহার নির্দেশে আমি এইগুলি ফেরৎ পাঠাইলাম। ও আপনার গভর্ণমেন্ট পঞ্জাবের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নিয়াছেন তাহাও আমার গভীর অসন্তোষের আর একটি কারণ।'

গান্ধীজীর চিঠি হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় তুরস্কের প্রতি মিত্র পক্ষের আচরণই ভারতে গান্ধীর নেতৃত্বে যে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয় তাহার প্রকৃত ও মুখ্য কারণ। পঞ্জাবের অত্যাচার অন্যতম কারণ হইলেও তাহা গৌণ। ইহার কিছুদিন পরে ভারতের দুজন নেতা বিজয় রাঘবাচারী ও মতিলাল নেহরুর অভিপ্রায় অনুসারে 'ভারতের স্বাধীনতা লাভ' অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম কারণ বলিয়া গান্ধী নির্দেশ করেন। প্রকৃত গান্ধীকে বুঝিতে হইলে এবং ভারতের মুক্তি সংগ্রামে গান্ধীর অবদানের যথার্থ মূল্যায়ন করিতে হইলে এই সময়ের কৃমটি স্মরণ রাখা আবশ্যক।

এই প্রসঙ্গে গান্ধীর মুসলমান প্রীতির আর একটি নিদর্শনের উল্লেখ করিব। ১৯২১ সালের ১৯ ডিসেম্বর—যখন চিত্তরঞ্জন দাস ও অন্যান্য বহু লোক অসহযোগ আন্দোলনের জন্য জেলে ছিলেন—তখন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বড়লাটের দূতরূপে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া অনুরোধ করিলেন ব্রিটিশ যুবরাজের ভারতে আগমন উপলক্ষে হরতাল বন্ধ করা হউক, তাহা হইলে সরকার অন্যায়ভাবে কারারুদ্ধ ব্যক্তিগণকে মুক্তি এবং দমন-নীতি প্রত্যাহার করিয়া সকল দলের প্রতিনিধি লইয়া একটি গোল টেবিল বৈঠক আহ্বান করিতে প্রস্তুত আছেন। চিত্তরঞ্জন ও আবুল কালাম আজাদ (ইনিও জেলে ছিলেন) এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া গান্ধীকে তারবার্তা পাঠাইলেন। গান্ধী দাবি করিলেন অসহযোগ আন্দোলনের পূর্বে আদালতের বিচারে দণ্ডপ্রাপ্ত মহম্মদ আলি, শওকৎ আলি ও তাঁহাদের সঙ্গীগণকে মুক্তি দিতে হইবে এবং সভার ফল সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়া পর্যন্ত অসহযোগ বন্ধ করা হইবে না। গান্ধীর এই মারাত্মক ভুলের জন্যে চিত্তরঞ্জন কারাগৃহে রোষে, ক্ষোভে ও অন্তর্বেদনায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন 'জীবনের এই এক সুবর্ণ সুযোগ আমরা হারাইলাম।'

অসহযোগ আন্দোলনের ফলে প্রায় চল্লিশ হাজার কংগ্রেস কর্মী কারারুদ্ধ হইল। ইহা হইতে বোঝা যায় যে ১৯২০—২১ সনে গান্ধীর নেতৃত্ব গ্রহণের পূর্ব হইতেই দেশ অসহযোগের জন্যে তৈরী হইতেছিল। এই আন্দোলনের ফলে স্কুল-কলেজ বর্জন কিছুদিন কয়েক স্থানে সাফল্য লাভ করিলেও মোটের উপর ব্যর্থ হইয়াছিল। যদিও চিত্তরঞ্জন ও মতিলাল ওকালতী ত্যাগ করিয়া এক অপূর্ব আত্ম-ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ছিলেন, মোটের উপর ইংরেজ আদালত বর্জন সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছিল। অকস্মাৎ একটি তুচ্ছ ঘটনায় এই আন্দোলন বন্ধ হইয়া গেল। সোবঙ্গীপুরের নিকট চৌরীচৌরা গ্রামে জনতার সহিত পুলিশের সংঘর্ষের ফলে অগ্নিদগ্ধ হইয়া ২২ জন পুলিশের মৃত্যু হয়। ইহাতে মর্মাহত হইয়া গান্ধীর নির্দেশে এই আন্দোলন বন্ধ করা হইল (২২ ফেব্রুয়ারি ১৯২২)। চিত্তরঞ্জন কারাগারে এই সংবাদ পাইয়া ক্ষুব্ধ হইলেন এবং বলিলেন, এত বড় বৃহৎ দেশে চৌরীচৌরা ঘটবেই। তার জন্য সমস্ত প্রদেশে আন্দোলন বন্ধ করবার কোন মানে হয় না। গান্ধীজীর অন্ধ ভক্তবৃন্দ ছাড়া আর সকলেরই যে এইরূপ মনোভাব ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এরপরে গান্ধীর নেতৃত্বে ১৯৩০ খ্রীঃ আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়। ঐ বৎসর ১২ মার্চ তারিখে গান্ধীর নেতৃত্বে ৭৯ জন স্ত্রী পুরুষ আইন অমান্য করিয়া সমুদ্রের জলে লবণ প্রস্তুত করিবার জন্য সমুদ্রতীরে দান্ডি নামক স্থানে পৌঁছিলেন। ভারতবর্ষের সর্বত্র নানাভাবে আইন অমান্য করিয়া বহু সহস্র লোক কারারুদ্ধ হইলেন। মাঝে একবার গান্ধীজীর সঙ্গে বড়লাটের এক আপোস হইল। এই আপোসের সর্ত শুনিয়া জওহরলাল বিমূঢ় হইলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে গান্ধীজী যে চুক্তি করিবেন তাহাতে 'ইংরেজের হস্তে যে সমস্ত বিষয়ের ক্ষমতা থাকিবে তাহার তালিকা পড়িয়া আমি বিমূঢ় হইলাম (গেভ মি এ টিমেন্ডাস শক).....আমি আমি দেখিলাম আমাদের লক্ষ্য ও মূল উদ্দেশ্য—পূর্ণ স্বাধীনতা—তাহাও বিলীন হইল। ইহার জন্যই কি এক বছর ধরিয়া আমার দেশবাসী বীরের মত লড়িয়াছিল? এত যে বড় বড় কথা (বেভওয়ার্ডস) ও দুঃসাহসিক কাজ (বেভ ডিডস)—তাহার পরিণাম কি এই?

কিন্তু বড়লাটের সহিত চুক্তি

করিয়া বিলাতে গোল টেবিলে যোগ দিয়াও গান্ধী বিশেষ কোন ফল লাভ করিতে পারিলেন না। দেশে ফিরিয়া আসিয়া আবার আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। সরকার কঠোর হস্তে তাহা দমন করিল। ১৯৩৪ সনে আইন অমান্য আন্দোলন শেষ হইল।

গান্ধীর রাজনীতিক জীবনেরও এই খানেই শেষ হইল বলা যাইতে পারে। কারণ ১৯৪২ সালে যে আন্দোলন হয় তাহা আরম্ভ করিবার পূর্বেই গান্ধী ও তাঁহার সহচরগণ কারারুদ্ধ হইলেন। অবশ্য সারা দেশে কেবল অহিংস নহে সহিংস বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু গান্ধী নিজেই বলিয়াছেন যে এই আন্দোলনের সহিত তাঁহার কোন সংশ্রব নাই এবং তিনি ইহার নিন্দাই করিয়াছেন। ১৯৪২ সালের আন্দোলনও এক বৎসরের মধ্যেই সরকার কঠোর হস্তে দমন করিলেন।

গান্ধীর প্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্বে তাঁহার সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা বলিতে চাই।

১৯২১ সালে সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসার জন্য গান্ধী প্রস্তাব করিলেন কংগ্রেস সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে এই আশ্বাস দিতেছে যে ভবিষ্যতে কোন সাম্প্রদায়িক সমস্যার প্রস্তাবিত সমাধান সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলির নিকট সম্পূর্ণ সন্তোষজনক না হইলে কংগ্রেস তাহা গ্রহণ করিবে না।'

মনুষ্য চরিত্র সম্বন্ধে যাহাদের বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে তাহারাই বুঝিতে পারিবে যে এই প্রস্তাবের ফলে মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় তাহাদের দাবির সংখ্যা ও পরিমাণ ক্রমশঃই বাড়াইতে থাকিবে। একথা বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি হইবে না যে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সুদৃঢ় ভিত্তি গড়িয়া দিল।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা স্বীকৃত হইয়া প্যাটেল ও নেহরু যখন সরকারের সহিত আপোসের প্রস্তাব মানিয়া লইলেন তখন আবুল কালাম আজাদ গান্ধীকে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনিও কি ঐ প্রস্তাব মানিয়া লইয়াছেন। গান্ধী উত্তর করিলেন—'এ তো অদ্ভুত প্রশ্ন—আমি জীবিত থাকিতে ভারতের বিভাগ হইবে না (হোয়াট এ কোশ্চেন টু আস্‌ক? সো লঙ অ্যাজ আই অ্যাম অ্যালাইভ আই উইল নেভার এগ্রি টু দি পার্টিশন অফ ইণ্ডিয়া; নট উইল আই, ইফ আই ক্যান হেলপ ইট, অ্যালাউ কংগ্রেস টু অ্যাকসেপ্ট ইট)—
কিন্তু কয়েকদিন পরেই গান্ধী এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

উপসংহার

উপরে আমি ভারতের মুক্তি সংগ্রামে গান্ধীর অবদান সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়া আমার 'বাংলা-দেশের ইতিহাস'-এ (৪র্থ খণ্ড, ৭৯৭-৯৮ পৃষ্ঠা) লিখিয়াছিলাম : '১৯০৩ সনে আইন অমান্য আন্দোলন ব্যর্থ ও পরিত্যক্ত হওয়ার পরে গান্ধী ভারতের মুক্তি সংগ্রামে আর কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নাই। অপর দিকে সুভাষচন্দ্র কর্তৃক আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন ও সারা ভারতবর্ষে স্বাধীনতার অগ্রদূত বলিয়া ইহার সংবর্ধনায় ইংরেজ যখন বুঝিতে পারিল যে, ভারতীয় সিপাহীদের সাহায্যে তাহারা ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিল, এত দিন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, সেই সিপাহীদের উপর আর নির্ভর করা চলে না। সেই দিনই সর্বপ্রথম তাহারা ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিবার প্রতিশ্রুতি দিল এবং তাহার জন্য ব্যবস্থা আরম্ভ করিল।'

বলা বাহুল্য আমার এই অভিমত গান্ধী-ভক্তদের মনঃপূত হয় নাই। কিন্তু আমার এই মতটিই যে সত্য তাহার অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছি। আমার গ্রন্থে উপরোক্ত মতের উল্লেখ করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ চক্রবর্তী আমার এই গ্রন্থের প্রকাশককে লিখিয়াছেন :

'আমি যখন অস্থায়ী রাজ্যপাল ছিলাম, তখন লর্ড অ্যাটলি ভারতভ্রমণে আসিয়া কলিকাতা রাজভবনে দুই দিন অবস্থান করেন। আমি তাঁহাকে সরাসরি প্রশ্ন করিয়াছিলাম যে গান্ধীর কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট তো ১৯৪৭ সালের বহু পূর্বে মিথাইয়া গিয়াছিল, ১৯৪৭ সালে এমন কোন পরিস্থিতি বর্তমান ছিল না যাহার জন্য ইংরেজের তাড়াহুড়া করিয়া এদেশ ছাড়িয়া যাওয়ার প্রয়োজন ঘটিয়াছিল—তবে তাহারা গেল কেন? উত্তরে অ্যাটলি কয়েকটি কারণের উল্লেখ করিয়াছিলেন। সেগুলির মধ্যে প্রধান ছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু পরিচালিত ভারতের স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীভুক্ত দেশীয় সেনানীদের ইংরেজ শাসনের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তি শিথিল করিয়া দেওয়া।' আলোচনার শেষের দিকে আমি লর্ড অ্যাটলীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ইংরেজদের ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্তে গান্ধীর কার্যকলাপের প্রভাব কতটা ছিল? অ্যাটলির ওষ্ঠদ্বয় একটা অবজ্ঞাসূচক হাস্যে বিস্তৃত হইল এবং তিনি চিবাইয়া চিবাইয়া বলিলেন, মি-নি মাল।

বিলাতের প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি রক্ষণশীল দলের নেতা চার্চিলের প্রভূতির আপত্তি সত্ত্বেও ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। সুতরাং ইংরেজ ভারতকে স্বাধীনতা দিল কেন ইহার সম্বন্ধে অ্যাটলির উক্তিই যে অকাট্য ও চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মহাত্মা গান্ধী ছিলেন সত্যের উপাসক। আশা করি তাঁহার প্রকৃত ভক্তেরা আমার সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া মানিয়া লইবেন।

শংকর-এর

এক যে ছিল
৮ম মুদ্রণ প্রকাশিত হল
দাম : ৮-৫০

পাত্র পাত্রী
১৪শ মুদ্রণ প্রকাশিত হল
দাম : ৫-৫০

এপার বাংলা ওপার বাংলা
৩৭শ মুদ্রণ ১৫-০০

চৌরঙ্গী
২৫শ মুদ্রণ ২৫-০০

দিলীপকুমার রায়ের

শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে
দাম : ১৫-০০

প্রেম অভয়
নতুন উপন্যাস ১৫-০০

বিনয় ঘোষের

কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত
সচিত্র সংস্করণ ৪৫-০০

বিমল মিত্রের **এরনাম সংসার** ১০-০০

সতীনাথ ভাদুড়ীর **জলভ্রমি** ৩-০০

ডঃ পঞ্চানন ঘোষালের **অপরাধতত্ত্ব** ১২ ২৫-০০

অন্নদাশঙ্কর রায়ের **নামের আড়ালে** দাম : ৫-০০

সৈয়দ মুজতবা আলীর **শ্রেষ্ঠ গল্প** দাম : ৮-০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের **নিশিপদ্ম** দাম : ১-৫০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের **বিশেষজ্ঞ** দাম : ৮-৫০

বনফুলের **প্রথম গরল** দাম : ৮-০০

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের **হরিলক্ষ্মী** দাম : ২-৭৫

বাক-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

নীহাররঞ্জন রায়

পিছু হটার পালা

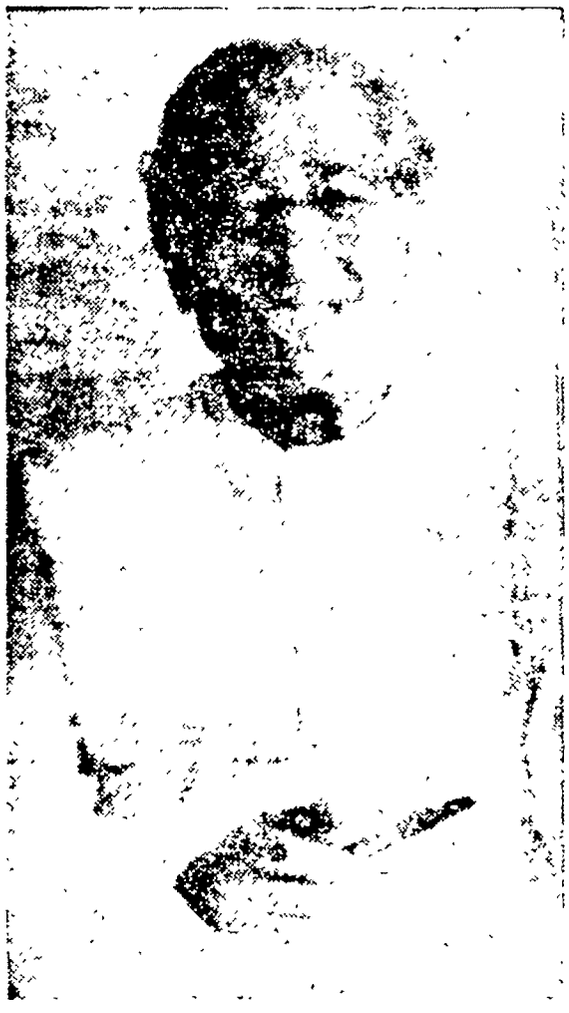

রামমোহন থেকে ঊনিশশো সাতাত্তর অবধি আমাদের এই দেশের প্রধান চিন্তা ও মনন একটি খাতে প্রবাহিত হয়ে এসেছিল। সেই ধারাকেই ভারতীয় মননের প্রধান প্রবাহ। এখন তার গতি পরিবর্তন হয়েছে। তথ্য হিসেবে একথা সত্য যে জনতা সরকার কিছুদিন গণতন্ত্রের ক্ষতি হয়। জনগণ পরিবর্তন সূচিত করে। কিন্তু এরপর যা ঘটছে এই পরিবর্তন কি আমরা চেয়েছিলাম?

প্রশ্নটি তুলে শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় একবার জানলা দিয়ে কলকাতার দিকে তাকালেন। মাথার ওপরে কাঁধানো সিলিংয়ে দুটি বড় সূর্যমুখী। সামনেই দেয়ালে টাঙানো একটি সৌরজগতের ছবি। তিনি বলছিলেন, আমি রামমোহনের ছেলে। বয়স কম বলে কলকাতায় পড়তে এসেছিলাম।

গত অর্ধশতাব্দীর ওপর ভারতচিন্তার এই প্রবীণ চর্চাকারের বলার ভঙ্গিকে কাজ করেছে। প্রচলিত সাক্ষাৎকারের প্রথাবদ্ধ এমন লোককে পুরোপুরি ভুলে রাখা দুঃসাধ্য।

তিনি বলছিলেন, রাজনীতির মানুষ অদলবদল দেখেছেন কিন্তু সাধারণ মানুষের কোন অদলবদল হয়নি। আগের তুলনায় সাধারণের জীবন সহজতর হয়নি। এরা গণতন্ত্র থাকল কি গেল তা নিয়ে মাথা ঘামান না।

আমি বিচলিত। কোন রাজনীতিক কারণে আমি বিচলিত নই। রাজনৈতিক কারণগুলো তো বদলায়। আমিও পরিবর্তনে খুশী হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম—পাল্টাবে। কিন্তু দেখছি—আমি এখন বিচলিত। এই বিচলিতভাব বাড়ছেই। কারণটি সাংস্কৃতিক। ব্যক্তিগতভাবে আমি যে সাংস্কৃতিকভাবে অভ্যস্ত তা হল সেই চিন্তা-ভাবনার শুরুতে রামমোহন—মধ্যে বিদ্যাসাগর—এ প্রান্তে রবীন্দ্রনাথ—এই তিন খুঁটি—শিক্ষিত নগরনিভর বাঙালি যে আদর্শে অভ্যস্ত—যে ভাবচিন্তার উত্তরাধিকারী জওহরলাল নেহেরু। শহুরে নাগরিকের এই চিন্তাভাবনা আধুনিক পৃথিবীর সমগোত্রীয়। এই পথের প্রধান কথা যুক্তি ও বিজ্ঞাননির্ভর সত্য মেনে চলা। সবকিছু যুক্তি দিয়ে বিচার করা। বিজ্ঞান নিয়ে কাজে লাগানো। মধ্যবিত্তরা সামাজিক গতিতে দিয়ে আসছেন। প্রাগ্রসর চিন্তার দরজা ওরা খুলে রেখেছেন। নতুন চিন্তাকে বিদেশী বলে আমরা কখনো উড়িয়ে দিইনি। আমি এই সাংস্কৃতিক জীবনের শরিক। যাদুবিদ্যায় বিশ্বাসী হতে পারি কিন্তু এই ম্যাজিক আমার জীবন চালায় না। আধুনিকতার ছাপ আমাদের মনে। আমরা পেছনে ফিরে যেতে পারি না।'

এখন আমাদের নেতারা এমন কিছু কথা বলছেন যা পড়ে ও শুনে আমি বিচলিত।

দৃষ্টান্ত : কিছুদিন আগে—এই পনের দিনের ভেতর ভারতীয় বিদ্যাভবনের একটি আলোচনাচক্র বসেছিল। এই প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টি পেছনের দিকে। শভনিস্টিক দৃষ্টি যা নিলে হল—আমাদের সংস্কৃতি, দর্শন ও সাহিত্যে সবই আছে—অন্যত্র যাবার দরকার নেই। এই আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই। আলোচনাচক্রের নাম ছিল : অ্যানসিয়েন্ট ইনসাইটস অ্যান্ড মডার্ন সাইনটিফিক ডিসকভারিজ।' বলা হচ্ছে—মুনি-ঋষির দর্শনে এখনকার সব আবিষ্কারও ছিল। যেমন—তাঁরা অ্যাটমিক সাইন্সও জানতেন।'

বলছেন প্রধানমন্ত্রী। এজন্যেই আমি বিচলিত। আধুনিক বিজ্ঞান সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। বিজ্ঞান মানে যা পরীক্ষা করে দেখা যায়। যা রিপিটেবল্। কিন্তু ইনসাইট মানে—যা-কিনা স্বতঃসিদ্ধ।

ওষুধের মেডিসিনের সমালোচনা চলছে। আঠারশো চল্লিশ সালে প্রথম মেডিকেল কলেজ হয়। স্বাস্থ্য দপ্তরের বাজেটের নব্বই শতাংশ ওষুধের মেডিসিন বাবদে ব্যয় হয়। উনবিংশ শতক থেকেই আমরা পশ্চিমী বিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। আজ ইউনানী বা বনৌষধির সেদিন আর নেই। ঐতিহ্যসিক কারণেই নেই। একজন কবিরাজ বহু রোগীর প্রয়োজনে কতটাই বা চ্যবনপ্রাশ বানাতে পারেন। তাঁরা যদি পশ্চিমী টেকনোলজি নিতেন তাহলে কোন সমস্যা হত না।

নেতারা তিন মাসের ট্রেনিং দিয়ে হাতুড়েকে গ্রামে পাঠাতে চান। রাজনারায়ণ উঠতে বসতে ডাকতারদের নিন্দা করতেন। কিন্তু অসুখ করলে তিনি ও চরণ সিং সেবা হাসপাতাল ও নার্সিং হোমের ব্যবস্থা। মোরারজী শিবাম্বু খাচ্ছেন। তাঁর বেলায় এটা খাটতে পারে। কারণ, তিনি খাঁটি জিনিস খান। খাঁটি দুধ। তাজা ফল। কিন্তু অন্যদের শিবাম্বু খেলে বিপদ ঘটতে পারে। শিবাম্বু কি পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে?

ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এ সংযম কোন রাস্তা নয়। আমাদের সমস্যা হল সংখ্যা। দু হাজার খৃস্টাব্দে জনসংখ্যা শূন্যতে নামিয়ে আনতে না পারলে বিপর্যয় দেখা দেবে। কোন্ দেশে ধমক্-ধামক না দিয়ে ফ্যামিলি প্ল্যানিং সফল করা সম্ভব হয়েছে? সবচেয়ে মূর্খ বলেই বাড়াবাড়ি করেছিল। অন্যদেশে দুটি বাচ্চা পরেই লাইগেশন করবেই। উনিশ শ ছেয়াত্তর সাতাত্তর সালে ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর সাফল্য নব্বই শতাংশ। আটাত্তর সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে দশ শতাংশ।

পশ্চিমবঙ্গে বিঘায় কম পক্ষে বার মণ ধান চাই। চাই কেমিক্যাল সার। প্ল্যানে জোর দেওয়া হচ্ছে এখন এগরিকালচারের ওপর। ইণ্ডাস্ট্রির ওপর জোর কমিয়ে। নেহেরু কৃষিকে ইণ্ডাস্ট্রি করতে চেয়েছিলেন।

ভাষার প্রশ্নে অবস্থা আরও মারাত্মক। নেহরু কথা দিয়েছিলেন—যতদিন না হিন্দি গ্রহণযোগ্য হচ্ছে অলটার্নেটিভ ল্যাঙ্গোয়েজ হিসেবে ইংরেজী থাকবে। ধরুন না ভারতে প্রায় নব্বই লক্ষ অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানের ভাষা ইংরেজী। তাছাড়া মিজোরাম ও নাগল্যাণ্ডেও ইংরেজী চলে। এদের কাছে হিন্দি মানে হিন্দুইজমের পুনরুজ্জীবন। আমরা পুনরুজ্জীবনে বিশ্বাসী নই।

টাইম ক্যাপসুল নিয়ে যত চেঁচামেচি হয়েছিল পরে কণ্ঠ আর তত উঁচু নয় কেন?

হিন্দি বেল্টের প্রায় তিরিশ কোটির কাল্ট-মেন্টালিটির লোড-রোলার চালাবার চেষ্টা চলছে। এখান থেকেই যুক্তিহীনতা, রক্ষণশীলতা ও গোঁড়া হিন্দুভাবের শুরু।

রাজা রাধাকান্ত দেব অ্যান্টি-রামমোহন ছিলেন। শেষের তর্কচূড়ামণি রাজনারায়ণের ভাষায় কথা বলতেন। বঙ্কিম সমাজে হিন্দুধর্মোদ্ধারী ছিলেন। মদনমোহন মালব্যও এদেরই প্রতিনিধি।

এখন এরা মাথা চাড়া দিচ্ছে। এদের এতদিন কোন অস্তিত্ব ছিল না। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, মুসলমানরা এদেশের লোক নন। বাঙালির গর্ব হিন্দুমহাসভা আগে এখানে ভোট পায়নি। এখন হাওয়া উল্টোদিকে। এই প্রবণতা ঠেকাতে না পারলে বাঙালির সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব থাকবে না। আজ পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক প্রার্থী নির্বাচিত হন। ছ বছর আগে তা সম্ভব ছিল না। এটাই হল সাংস্কৃতিক সংকট।

পশ্চিমবঙ্গ ভোটের জন্য মার্কসবাদীরা এদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। এতদিন জনতন্ত্র মার্কসবাদ যাকে শিখিয়েছে। সেদিন বেহালায় দেখলাম হাজারখানেক বাচ্চা ভিড় করেছে, একজন অবাঙালি আর এস এস কর্মী কুচকাওয়াজের আদেশ দিচ্ছেন। আগে এটা ছিল না। রাজনৈতিক সুবিধাবাদ ভোট পেতে এদের এখন সাহায্য করছে। বাঙালি চায় মডার্ন অ্যাকসেপ্ট ইন লাইফ।

হিন্দি-ডম ও হিন্দুডম প্রায় অভিন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে; সাময়িকভাবে এ অবস্থা থাকলেও সাংস্কৃতিকভাবে দেশের ক্ষতি হবে।

ধরা যাক সি, এস, আই, আর-এর কথা। কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ-এর স্বয়ম্ভু উনত্রিশটি গবেষণাগারকে এখন বিভিন্ন মন্ত্রকের লেজুড় ডিপার্টমেণ্ট হিসেবে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। স্বাধীন গবেষণার অবসান ঘটেছে।

এই তো অবস্থা। এখন পিছু হটার পালা।

বৈকুণ্ঠ পাঠক

বিতর্কিত পুরুষ

গ্রন্থ ও

জীবন সঙ্গীত কাব্যের লেখক-কবি

অধ্যাপক করুণানিধান রায়

— বিতর্কিত পুরুষ —

বিতর্কিত পুরুষ ! ঐ আসছে। জানাচ্ছে নাগরিক জনতায় স্বশ্রদ্ধ প্রণাম। অনুরোধ, হোন সাবধান। বিতর্কিত পুরুষের গায়ে এ কি। এতো ঘা কেন, এতো রক্ত কেন, না, না, ঘা নয়। রক্তের কালিতে লিখেছে সে আপনার দেহে বিতর্কিত সমাজের সব বিতর্কিত কথা—বিতর্কিত প্রেম, বিতর্কিত রমণীর ভালবাসা, বিতর্কিত সমাজব্যবস্থা, বিতর্কিত রাজনীতি, বিতর্কিত, নেতৃত্ব, বিতর্কিত শিক্ষা আর বিতর্কিত ভাস্বতী, মাণিক-মানব হৃদয়।

পুরুষ শাসিত সমাজব্যবস্থায় সারা বিশ্বে ঘুন ধরে গেছে। কাঠামো ভেঙ্গে যাচ্ছে দ্রুত গতিতে, ভারতে তো বটেই। নারীর মূল্যবোধের নতুন মূল্যায়ন ও সমাজব্যবস্থায় নারীর সমান মানবিক অধিকার স্থাপনই একমাত্র ভাবী আদর্শ। সমাজের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারবে নিশ্চয়।

ঘুন পোকাকে আটকান; দেরী করবেন না যেন। ঘুন পোকার ইতিবৃত্ত অভিসার ও সংহার আছে বিতর্কিত পুরুষের ইঙ্গিতে। কবি, সাহিত্যিক, অর্থনীতিবিদ, প্রেমিক পুরুষ ও রাজনীতিবিদ, অধ্যাপক করুণা নিধান রায়, (এম, এস, ম্যানেজমেণ্ট নিউইয়র্ক, এ, সি, এ, পি, এ, রাজনীতি, ওয়াশিংটন) তাঁর জীবন সেতারে একান্ত করে দেখা আমেরিকা, ইংলণ্ড, কানাডা ও ভারতের সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু মূলতঃ ভারতকে কেন্দ্র করে প্রেম, নারী, সুরা, বেশ্যাবৃত্তি, প্রতারণা, স্বর্গীয় ভালবাসা, অর্থ, যশ, নেতৃত্ব, সমাজ, সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতির শিক্ষা ও পুরুষের মৌলিক সমস্যা তার সমাধানের সূত্র যেটা কঠিন সনাতন প্রেম ও বিরহ ও মানসিক তীব্র অনুভূতির সুরে লেখা বক্তব্যের সাবলীলতার আঙিনায় প্রচণ্ড বিপ্লব ও ভয়ানক বিতর্ক এনে দেবে।

মোট ৩৫টি সাহিত্য প্রবন্ধ ও পদ্যের সুরে লেখা গদ্য এই সংকলনে স্থান পেয়েছে—জীবনসঙ্গীত, দিন বদলের পালা, বিতর্কিত পুরুষ, অভিমান, বিরহ, সাহিত্য ও সমাজ, শিল্পসাহিত্য অভিমান, সভ্যতা ও পলিমাটি, আমি বাঁচতে চাই, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও পৃথিবী, যুগযন্ত্রণা না অভিসার, শেষ কোথায়, গরীব জনতা তোমরা জাগো, ভারতীয় রাজনীতি ও সমাজসংস্কার, বিশ্বধর্ম ও শিবচেতনা, প্রসঙ্গ, ভারতীয় যুবসম্প্রদায় ও রাজনীতি, ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ও রূপরেখা, ইন্দিরার বিচার প্রসঙ্গের শেষ চাই, নেতৃত্বের ইশারা, পাশ্চাত্য দেশ ও ভারতীয় রাজনীতির রূপরেখা এডনাউলসনের প্রেম—দুপুরের কান্না, এডনা স্মৃতিতে ভাস্বর, অথবা প্রিয়তমা, প্রথম প্রেম, সংকট, নেতা, ইত্যাদি।

অভিমান গদ্যকাব্যে বলা হয়েছে যে ওরা মধ্যবিত্ত সমাজব্যবস্থায় একজোড়া স্বামী-স্ত্রী, ওরা একই বাড়ীতে থেকেছে অনেক দিন ধরে,—কাছাকাছি পাশাপাশি তবু বহু দূরে, হৃদয়ের আঙিনায়। কখনো যা পূর্ণ স্পর্শহীন, এক গৃহকোণে।

প্রখ্যাত এক দৈনিক পত্রিকার পাত্র-পাত্রী বিজ্ঞাপনের পাতার বহস্য ভেদ করে উঠে এসেছে প্রথম দর্শনে 'সতী' প্রিয়তমা রূপী, মুখে বঙ মাখা, এক পরম রূপসী স্ত্রী, তার রূপে কিছুটা খাদ ছিল, তেমনি নায়কও ছিল কিছুটা ধূসর প্রতিভা, 'রূপের খাদ' আর 'ধূসরতা' ওরা বিয়ের আগে জানত না, পরে অভিমান সুরু হল নারীর হৃদয়ে, নারী তখন সেজেছে 'প্রেমহীন পতিব্রতার সাজে'। নেতৃত্বের ইশারা' প্রবন্ধে শোষক পর্যায়ভুক্ত কিছুটা সমাজ সংগঠনকারী এক মধ্য বয়সী যুবকের নেতা হবার রূপরেখার অঙ্গীকার ফুটে উঠেছে। সে বলেছে আমি হব নেতা, আমি হব পরম পুরুষ। তাঁর নেতৃত্বে কেউ যদি বাধা দেয় সে হবে "নীলকণ্ঠ"। বিষ শুধু তার কণ্ঠেই থাকবে না সারা অঙ্গে থাকবে ছড়িয়ে সর্পসম দংশন করতে প্রতিপক্ষের নেতা বা যে কোন নাগরিককে। তার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে সে বলেছে, সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও অর্থ সে লুটে নেবে এবং প্রয়োজনে শৌর্যবীর্যে সে নারীর প্রেমকেও কেড়ে নেবে, হৃদয়বৃত্তির তাড়নায়, নেতা হবার পরে সেই যুবক অনেকটা পালটে গেছে, কিছুটা আদর্শ ফিরে পেয়েছে তার জীবনে। বলেছে সে পরম-পুরুষ নয়।

'অথবা প্রিয়তমা' প্রবন্ধে এমনকি বেশ্যা রমণীকেও সুস্থ মানবিক মূল্যবোধে একটা সামাজিক নির্দিষ্ট স্থান দেবার কথা বলা হয়েছে। শ্রদ্ধা ও অপ্রীতির মাঝামাঝি তাদেরও কোন একটা স্থান হওয়া উচিত। সেই অথবা প্রিয়তমার সামাজিক ন্যায় নীতির নিরপেক্ষ তুলাদণ্ডে "প্রেমহীন পতিব্রতার" রূপকে মলিন করে দেয়।

অধ্যাপক রায় ও কবি-সম্পাদক-সম্পাদিকাগণ :—

বাঁদিক থেকে ডাইনে পেছনের সারি সাংবাদিক পিনাকীপ্রসাদ রায়, অধ্যাপক করুণানিধান রায়। সামনে পিয়া মুখোপাধ্যায়, গীতিকা চক্রবর্তী (ঝুনু) কৃষ্ণা ঘোষ ও স্বপ্না ঘোষ।

'ইন্দিরার বিচার প্রসঙ্গের শেষ চাই' প্রবন্ধে তথাকথিত ন্যায় নীতি ও রাজনীতির ঊর্ধ্বে শ্রীমতি ইন্দিরাকে একজন দেশপ্রেমিকা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। প্রবন্ধে বলা হয়েছে, ইন্দিরা তুমি ভারতীয় নাগরিক-বান্ধবী ও বিশ্বজন সখী। পুরুষ তোমরা যদি পেয়ে থাক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপ, প্রীতি আর ভালবাসার পূর্ণ অনুভূতি, সম্পূর্ণ স্বীকৃতি। হেরো ঐ! ইন্দিরা আছে শ্রীরাধিকার সঙ্গে শিবসুন্দর চক্ষে ইন্দিরার জন্য জাতীয় ক্ষমা প্রার্থনা করে একটি ভাবী বিতর্কিত বিচার ব্যবস্থার শেষ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটা ভারতীয় নাগরিকদের স্বার্থেই হবে। 'পুলিশ জনগণের প্রকৃত বন্ধু' প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে পুলিশ ও জনগণের মধ্যে শুভেচ্ছার জন্য, উভয়কেই স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসতে হবে।

'শিবচেতনা ও বিশ্বধর্ম প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে শিবের প্রেমময় রূপ, শান্তির প্রতিচ্ছবি, অন্যায়ের ধ্বংসের দেবতা বা সুন্দর পুনঃ প্রযোনন দেবতার রূপ আজকে শিল্প সাহিত্য ও সমাজের আদর্শ ধর্ম বাহক হিসাবে কাজ করতে পারে, বিশ্বশান্তিকামী সর্বদেশের রাজনৈতিক পরমপুরুষদের ধ্যান ধারনা শিব চেতনার মাঝে রূপক হতে পারে।

এমনই রয়েছে নানান প্রবন্ধ এবং সাহিত্য সংগ্রহ ও সংগ্রন, ভারতীয় সমাজ ও সাহিত্যে বৈপ্লবিক সুর এনে দেবে এবং জনচিত্তে প্রবল বিতর্ক সঞ্চার করবে অবশ্যই। 'প্রথম প্রেম' গল্পে এক প্রায় রূপহীন, অনেকটা বিত্তহীন ও সামাজিক অব্যবস্থার মধ্যে মেঘের মতো ঢেকে থাকা এবং জীবনের অনেক বয়সেও সামাজিক চাপে নারী বর্জিত হয়ে থাকার চাপে, গল্পের নায়ককে এক তথাকথিত কলঙ্কিত রমনীর (বেশ্যা) সান্নিধ্যে প্রথম প্রেমের একটা স্বাদ ও বাস্তব অভিসারকে আঙ্কিক করতে সাহায্য করেছে। নায়ক বলেছে, আমার জীবনের প্রথম প্রেম, উত্তপ্ত চুম্বন, হে নারী তা তোমাকেই আমি দিলাম, তুমি আমার স্মৃতির পাতায় হারিয়ে রয়েছ, ছড়িয়ে রয়েছ, রয়েছ সতী হয়ে ভাস্বতী মানিক আমার।

'ঝানু ও ঝুনুর' অভিসার গল্প সংগ্রহে বলা হয়েছে যে, ঝানু সুশ্রী, গৌরবর্ণা, রূপবতী, লাবণ্যময়ী চিত্র-তারকার মত, ও সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের কন্যা ও প্রতিভূ। বাড়ী, গাড়ী, টেলিফোন, ফ্রিজ, আর স্বচ্ছিল বিছানা, তার জীবনের অনেকটা কামনা, কোন কারণ বা অকারণে ঝুনুর জীবনে 'ঝানু ও ঝুনুর' বন্ধুত্ব ঘন সিঁদুর মেঘের রঙের মত জমাট হয়ে উঠল। ঝুনু তা বুঝতে চায় না, একেই হয়ত বলে একতরফা প্রেম। ঝুনু ঝানুকে তীব্র আকর্ষণের বাস্তবিকতায় এক্ষুনি বেঁধে ফেলতে চায়, কিন্তু, ও যে সত্যই ঝানু। সুন্দরী, তন্বী, গৌরবর্ণা, কিশোরী এমন অনেক কিশোরীই ঝানুর বড় ভালো লাগে। প্রাক দাম্পত্য প্রেমকে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা এখনই ঝানু দিতে চায় না ঝুনুকে। কেননা কিশোরীরা ভাল লাগে, ঝানু ভাবেআরও তীব্র সৌন্দর্যের প্রতীকি হয়ে অন্য কোন জনও (নারী) তো আসতে পারে ওর জীবনে নতুন অর্ঘ্য নিয়ে। ঝানু গাত্রবর্মে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মত, সে ধনী, সুবিধাবাদী, অনেকটা পরমপুরুষ, ঝানু চতুরতায়ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রায় ছাড়িয়ে গেছে,—হয়ত বা ছাড়িয়ে যায় অজানা কোন শৃগালকেও। তাই তো ঝানু এখনই কোন সুপক্ক বন্ধনে আটকা পড়তে চায় না, কিন্তু তাই বলে কোন তন্বী কিশোরীকে কি ছেড়েও দেওয়া যায়, তাই তো ঝানু ঝুনুকেও স্বপ্নাবিষ্ট করে রাখে—অনন্ত প্রতীক্ষার মাঝে, গল্পে উচ্চচিত্ত ও মধ্যবিত্ত সমাজের মানসিকতা ফুটে উঠেছে। ঝানু তার সামাজিক অর্থ ও সমৃদ্ধির পূর্ণ সুযোগ নিতে চায়। একি বিষম সমস্যা, ঝুনুর প্রতীক্ষা যে প্রণয়ের প্রতীক্ষা। কিন্তু ঝানু জমাট বরফের মত অস্বীকারহীন, দুঃখ লাগে, লেখক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন অবস্থার গুরুত্ব অনুভব করে। ঝানুর সমৃদ্ধি হোক, সত্বর অচিরে ঝানু-ঝুমু আসুক কাছাকাছি পাশাপাশি শুভ বিবাহ বন্ধনে, ত্বরিৎ গতিতে, দাম—১২, গ্রাহকমূল্য আগস্ট পর্যন্ত—১০ টাকা, আমাদের দশ লক্ষ কপি বিক্রির প্রস্তাবনা রয়েছে, সত্বরে সত্বরে। বিশ্ব ও ভারতীয় ভাষাগুলোতে অনুবাদের পর আরো কয়েক লক্ষ কপি বিক্রী হবে। দশ হাজারের বেশী কপি বিক্রীর কমিশন ৬০%, পাঁচ হাজারের বেশী বিক্রীর জন্য ৫০% ও এর কম বিক্রী হলে ২৫% কমিশন দেওয়া হবে, সত্বর যোগাযোগ করুন। প্রথম মুদ্রণের পর প্রকাশন কপিরাইট-এর জন্যও লিখতে পারেন।

— জীবন সঙ্গীত —

(২) অধ্যাপক রায়ের মহাকাব্যের সুরে লেখা কাব্যগ্রন্থ 'জীবন সঙ্গীত' ভারতীয় সাহিত্যে আবহমানকালের সোপানকে ধরে রাখবে আরো অনেক কাল, জীবন-সঙ্গীত গদ্য কাব্যে বলা হয়েছে যে, জীবন-সঙ্গীত রচিত হবে জীবনের সুরে কখনো বা পরম হরষে, কখনো বা চরম বিষাদে, বিশ্বনাগরিকে কবিতে আলিঙ্গন, কবিতার সুরে নয়, কবিতা মিশে যাবে জীবনের সুরে, লেখক বলেছেন, নাগরিক লও মোদের আলিঙ্গন অধর-মিলন, সশ্রদ্ধ প্রণাম—বিদ্রুষার বিরহের সুরে, আগমনী বার্তা ঐ আবার আবার আসিবে ফিরে, জীবনের আঙিনায়। দাম—১৫, সেপ্টেম্বরে প্রকাশ, গ্রাহকমূল্য—১২ টাকা। উভয় সংকলনে বাস্তবধর্মী ও জীবনদিশারী আঙ্কিক জুগিয়েছেন, কবি সম্পাদক-সম্পাদিকা, সর্বশ্রী বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সুসাহিত্যিক পিনাকীপ্রসাদ রায় (সত্যযুগ ও গাণ্ডীব), অভিনেত্রী কৃষ্ণা ঘোষ, চঞ্চলা কিশোরী ছাত্রী গীতিকা চক্রবর্তী, মধ্যবিত্ত সমাজের ঘরনী স্বপ্না ঘোষ, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজের প্রতিনিধি মিস ম্যাবিয়ান খাবে ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্র-দৌহিত্রী পিয়া মুখোপাধ্যায় কলগার্ল শ্যামলী মিত্র, সমাজসেবী ও পুরোহিত বৈদ্যনাথ ঘোষাল, চাষী-সুর-শিল্পী নিশিকান্ত ঘরামী, দর্পণ ও কালান্তর খ্যাত সাহিত্যিক ও শ্রমিক নেতা বাদল রায়, এবং শ্রমজীবি শেখর পালচৌধুরী, অধ্যক্ষ নন্দদুলাল ভট্টাচার্য, উদ্বাস্তু সমাজের প্রতিনিধি মনোজিত লাহিড়ী, আকাশবাণী ও দূরদর্শন শিল্পী ও বিশিষ্ট সাংবাদিক শরদিন্দু দত্ত, মানস ব্যানার্জী (মৃগান্তর), সাংবাদিক দিগ্বিজয় চৌধুরী (দৈনিক বসুমতী)। ক্রেতা ও এজেন্টগণও সত্বর লিখুন, রিফর্মস ইন্টার ন্যাশনাল পাবলিকেশনস ১৭ তলা এন্ডারেস্ট ৪৬সি, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা—৭১, ফোন : ৪৪-০০৮৭/৪৪-৬৪৯৬, ৭২-৫৩৯৫, দৈনিক 'আনন্দবাজার' ও অন্যান্য সংবাদপত্রে বিশেষ বিবরণ দেখুন।

অতুল সুর

বাড়তির পথে ভারত

স্বাধীনতা লাভের তিরিশ বছর পরে আমাদের দেশের তথাকথিত নেতারা হঠাৎ একটা তত্ত্ব আবিষ্কার করে ফেলেছেন। সেটা হচ্ছে, এই তিরিশ বছরে আমাদের দেশের নাকি কিছুই উন্নতি হয় নি। এটাকে স্বীকার করে নেবার আগে, তত্ত্বটাকে ভালভাবে খতিয়ে দেখা উচিত। আমি এখানে তত্ত্বটাকে মোটামুটি অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে খতিয়ে দেখবার চেষ্টা করব। প্রসঙ্গত দু-একটা সামাজিক প্রসঙ্গও এসে পড়বে, কেননা, একেবারে সামাজিক প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে অর্থনীতি সম্বন্ধে কিছুই লেখা যায় না।

গত তিরিশ বছরের মধ্যে দেশের অর্থনৈতিক রূপ যে একেবারে পাল্টে গেছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। চারদিকে তাকালেই সেটা বুঝতে পারা যায়। বস্তুত আজকের ভারত আর সেদিনকার ভারত, এই দুইয়ের মধ্যে তফাৎ যে, আজকের ভারতকে দেখে, আগেকার ভারতকে চিনবার কোন উপায় নেই।

প্রথমেই স্মরণ করুন, দেশে বিভাগের পর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেশের কি ঘটেছিল। ভারতে রইল কলকারখানাগুলো, আর তাদের কাঁচামাল সরবরাহের সূত্রগুলো রয়ে গেল পাকিস্তানে। সকলের চেয়ে বেশী বেশী মার খেল পশ্চিমবঙ্গ, কেননা, এখানেই অবস্থিত ছিল দেশের শিল্পগুলির ২৫ শতাংশ। বিশেষ করে মার খেল পশ্চিম-বঙ্গের চটকলগুলি। চটকলগুলো রইল এখানে, আর পাট সরবরাহের আড়তগুলো রয়ে গেল পূর্ব পাকিস্তানে। চটকলগুলো চালাবার জন্য আমাদের প্রয়োজন হত আনুমানিক ৭০ থেকে ৮০ লক্ষ গাঁট পাট। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে পাটের উৎপাদন পরিমাণ ছিল মাত্র ছয় লক্ষ গাঁট। সুতরাং পশ্চিম বঙ্গের চটকলগুলির কর্মিষ্ঠতা ও কর্ম-নিযুক্ততা বজায় রাখবার জন্য সরকার মনযোগ দিলেন পাট চাষ প্রসারের দিকে। আশাতীত ফল পাওয়া গেল তিন বছরের মধ্যে। তিন বছরের মধ্যেই আমরা উৎপাদন করতে সক্ষম হলুম ৩৩ লক্ষ গাঁট পাট। আজ আমরা এর দ্বিগুণ পাট উৎপাদন করছি।

দেশ বিভাগের ফলে আমাদের খাদ্য-শস্যের যথেষ্ট ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। এ ঘাটতি আরও উৎকট হয়ে দাঁড়াল যখন লক্ষ লক্ষ হিন্দু উদ্বাস্তু ভারতে অনুপ্রবেশ করল। কিন্তু সরকারী প্রচেষ্টার ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদন পরিমাণ এরূপ আশা-ব্যঞ্জকভাবে বেড়ে গেল যে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে আমরা সাহস পেলাম সাধারণ লোককে রেশনিং প্রথার নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে।

তারপর ওই ১৯৫১ খৃষ্টাব্দ থেকেই আমরা যাত্রা শুরু করলুম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসমূহ রূপায়ণের পথে। আজ পর্যন্ত আমরা পাঁচটা পঞ্চবার্ষিকী পরি-কল্পনার কর্মসূচী গ্রহণ করেছি। এর মধ্যে আবার ঢুকে গিয়েছিল তিনটে বার্ষিক পরিকল্পনা। পাঁচটা পঞ্চবার্ষিকী ও তিনটে

নোটঃ 'বিশ্বধর্ম ও শিবচেতনা সম্মেলন'—১৯৭৮

রিফর্মস ইন্টারন্যাশনালের সৌজন্যে ও ইন্টারন্যাশনাল শিব কনশাসনেস এন্ড ওয়ার্ল্ড বিলিজিওনস (একই উপরোক্ত ঠিকানা) এর উদ্যোগে গ্র্যান্ড হোটেল কলিকাতা, ২০শে আগষ্ট রবিবার সকাল ৯টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত, ব্যাংকোয়েট হলে। সবাইকে নিমন্ত্রণ রইলো। বিশিষ্ট নিমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ : মাননীয় মন্ত্রী শ্রীভক্তিভূষণ মন্ডল, পঃ বঃ সরকার, লোকেশ্বরানন্দ (শুভেচ্ছা জানিয়েছেন), হোম সেক্রেটারী পঃ বঙ্গ শ্রীবরীন সেনগুপ্ত, শ্রীবরুণ সেনগুপ্ত (আনন্দবাজার) সাংবাদিক শ্রীশরদিন্দু দত্ত (আনন্দবাজার), মাননীয় বিচারপতি শ্রীএন সি মুখার্জী (কলিকাতা হাইকোর্ট), শ্রীমতী দিলীপ চক্রবর্তী এম-পি, শ্রীসন্দীপ দাস এম-এল-এ, শ্রীরবিশঙ্কর পান্ডে এম-এল-এ, শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র এম-এল-এ, সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, মানস ব্যানার্জী (যুগান্তর), সুশান্ত মুখার্জি (পরিচালক-অধ্যক্ষ, ইনস্টিটিউট অব মর্ডান ম্যানেজমেন্ট, কলিকাতা), অধ্যাপক এম সি চন্দ (অধ্যক্ষ, আইন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়), শ্রীরামকৃষ্ণ সরেগী, সত্যনারায়ণ রুনরুনওয়ালা, সাংবাদিক প্রশান্ত সরকার (ষ্টেটসম্যান), শ্রীএন সি মুখার্জি (ইন্ডিয়ান অকসিজেন লিমিটেড), জি এম পিল্লাই, ডাঃ ডি এন ঘোষ, শ্রীমতী এস এ এম, হাবিবুল্লাহ, সাংবাদিক পিনাকীপ্রসাদ রায় (সত্যযুগ ও গান্ডীব)

স্বাঃ উদ্যোক্তাদের পক্ষে অধ্যাপক করুণানিধান রায়
(বিতর্কিত পুরুষের লেখক)

(২) অধ্যাপক করুণানিধান রায়—রিফর্মস ইন্টারন্যাশনালের সৌজন্যে, গ্র্যান্ড হোটেল ব্যাংকোয়েট হলে, ২০শে আগষ্ট বিকেল ৪টা থেকে ৬টা, 'দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা প্রেস ক্লাব' কর্তৃক 'মেট্রোপলিটন শহর ও মফঃস্বল সাংবাদিকদের কর্তব্য ও সমস্যা' নিয়ে আলোচনাচক্র। সকল সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিল্পী ও নাগরিককে খোলা নিমন্ত্রণ রইলো। উদ্বোধক মাননীয় মন্ত্রী শ্রীবিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী, পঃ বঃ সরকার। অতিথি সাহিত্যিক সুনীল গাঙ্গুলী।

বার্ষিক পরিকল্পনার পিছনে আমরা ব্যয় করলুম ১২,২,৪৯৭ কোটি টাকা। প্রথম পরিকল্পনায় (১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৫৫-৫৬ পর্যন্ত) আমরা খরচ করেছি ৩,৭৬০ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় (১৯৫৬-৫৭ থেকে ১৯৬০-৬১ পর্যন্ত) ৭,৭৭২ কোটি টাকা, তৃতীয় পরিকল্পনায় (১৯৬১-৬২ থেকে ১৯৬৫-৬৬ পর্যন্ত) ১২,৬৭৭ কোটি টাকা, চতুর্থ পরিকল্পনায় (১৯৬৯-৭০ থেকে ১৯৭৩-৭৪ পর্যন্ত) ২৫,১৮১ কোটি টাকা, পঞ্চম পরিকল্পনায় (১৯৭৪-৭৫ থেকে ১৯৭৮-৭৯ পর্যন্ত) ৬৬,৩৫১ কোটি টাকা। তিনটে বার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৬৬-৬৭ থেকে ১৯৬৮-৬৯ পর্যন্ত) ৬,৭৫৬ কোটি টাকা। এই বিপুল অর্থ ব্যয়ের ফলে, দেশের অর্থ-নীতির কি রূপান্তর ঘটেছে, তাই এবার বলব। তবে এই বিপুল অর্থ ব্যয়ের ফলে অনেকটা মূল্যস্ফীতি ঘটেছে, কিন্তু তা নিয়ে আমি এখানে আলোচনা করব না, কেননা মূল্যস্ফীতি এখন আন্তর্জাতিক ব্যাপার।

অর্থনৈতিক রূপান্তরের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের দেশের শতকরা ৮০ জন লোক গ্রামে বাস করে। সুতরাং গ্রামের উন্নতি না ঘটলে, এদেশের কোন বাস্তব উন্নতি ঘটতে পারে না। বলাবাহুল্য, গ্রামের লোকেরা কৃষিনির্ভর। সুতরাং কৃষিক্ষেত্রে কি উন্নতি হয়েছে, সেটাই প্রথমে বলব।

১৯৪৮-৪৯ খৃষ্টাব্দে আমাদের চাষের ভূমির পরিমাণ ছিল ৯ কোটি ৮৪ লক্ষ হেক্টার। কিন্তু একই জমিতে বছরে একাধিকবার চাষের দরুণ মোট কর্ষিত ভূমির পরিমাণ ছিল ১১ কোটি ১৯ লক্ষ হেক্টার। ১৯৬০-৬১ খৃষ্টাব্দে ওর পরিমাণ যথাক্রমে দাঁড়ায় ১৩ কোটি ৩২ লক্ষ ও ১৫ কোটি ২৮ লক্ষ হেক্টার ও ১৯৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দে গিয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৪ কোটি ২৭ লক্ষ হেক্টার ও ১৬ কোটি ৯৫ লক্ষ হেক্টারে। (এর পরের পরিসংখ্যান এখনও পাওয়া যায় নি)। এর মধ্যে সেচিত জমির পরিমাণ ছিল ১৯৪৮-৪৯ খৃষ্টাব্দে ১ কোটি ৮৯ লক্ষ হেক্টার, ১৯৬০-৬১ খৃষ্টাব্দে ২ কোটি ৪৭ লক্ষ হেক্টার ও ১৯৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দে ৩ কোটি ২৬ লক্ষ হেক্টার। চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষি-পণ্যের উৎপাদন বেড়ে গিয়েছে। কি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, তা নীচের তালিকা থেকে বুঝতে পারা যাবে—

পণ্য	১৯৫০-৫১	১৯৬০-৬১	১৯৭৬-৭৭
	(মিলিয়ন টনে প্রদর্শিত)		
চাউল	২০.৫৮	৩৪.৫৭	৪৫.০
গম	৬.৪৬	১১.০০	২৭.৫
অন্যান্য খাদ্যশস্য	১৫.৩৭	২৩.৭৫	২৯.০
ডাল কলাই	৮.৪১	১২.৭০	৯.৫
মোট খাদ্যশস্য	৫০.৮২	৮২.০২	১১১.০
ইক্ষু	৫.৭১	১১.২৪	১৫.০
তৈলবীজ	৫.১৬	৬.৪৮	৮.৬
তুলা *	২.৮৮	৫.২৯	৬.০
পাট *	৩.৩১	৪.১৩	৫.৩

* ১৮০ কেজি পরিমিত মিলিয়ন গাঁটে প্রদর্শিত।

তার মানে ১৯৫০-৫১ খৃষ্টাব্দে আমরা যেখানে ৫০.৮২ মিলিয়ন টন খাদ্য-শস্য উৎপাদন করেছিলাম, ১৯৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দে উৎপাদন করেছিলাম ১১১.০ মিলিয়ন টন। অনুরূপভাবে আমরা ইক্ষু ৫-৭১ মিলিয়ন টনের স্থলে উৎপাদন করেছিলাম ১৫-০০ মিলিয়ন টন, তৈলবীজ ৫-১৬ মিলিয়ন টনের স্থলে ৮-৬ মিলিয়ন টন, তুলা ২.৮৮ মিলিয়ন গাঁটের স্থলে ৬ মিলিয়ন গাঁট ও পাট ৩.৩১ মিলিয়ন গাঁটের স্থলে ৫.৩ মিলিয়ন গাঁট। তাহলে কথাটা দাঁড়াল এই যে, ১৯৫০-৫১ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আমাদের খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ বেড়েছে ২১৮.৪ শতাংশ, ইক্ষুর উৎপাদন বেড়েছে ২৬২.৬ শতাংশ, তৈলবীজের উৎপাদন বেড়েছে ১৬৬-৬ শতাংশ, তুলার উৎপাদন ২০৮.৩ শতাংশ ও পাটের উৎপাদন ১৬০.১ শতাংশ। সুতরাং কৃষিক্ষেত্রে যে একেবারে কিছু হয় নি, তা নয়। অনেক কিছু হয়েছে। এক্ষেত্রে সকলের চেয়ে বড় কথা এই যে, উন্নতশীল বীজ ও রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে জমির ফলনের উৎকর্ষতা হেক্টার প্রতি অনেক বেড়ে গিয়েছে। শুধু, স্থূল কথাটাই বললুম, এ সম্বন্ধে বিশদ বিশ্লেষণ করবার অবকাশ এই অল্প পরিসর প্রবন্ধের মধ্যে নেই।

এবার গ্রাম সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। ১৯৬১ সালে ভারতে ছিল ৫৬৭,৩৩৮ গ্রাম, তার জনসংখ্যা ছিল ৩৬ কোটি ৫ লক্ষ। ১৯৭১ সালে গ্রামের সংখ্যা ছিল ৭৭,৯০০ ও তার জনসংখ্যা ছিল ৫১ কোটি ৯০ লক্ষ। ইদানীংকালে এদেশে শহরের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে, গ্রামের সংখ্যাও বাড়ছে। সুতরাং ভারত যে গ্রামবহুল দেশ, সে বাস্তব সত্যটা রয়েই গিয়েছে। কিন্তু, গ্রামের রূপের একটা পরিবর্তন ঘটেছে। বাসস্থানের রূপান্তর ঘটেছে, জীবনযাত্রার মান খানিকটা উন্নত হয়েছে, মৃত্যুহার কমেছে, অনেক গ্রাম বিদ্যুতিকরণ হয়েছে, ভূমির সেচের জন্য অগভীর নলকূপ বসান হয়েছে, পথঘাটের উন্নতি হয়েছে ও শিক্ষিতের সংখ্যা বেড়েছে। সুতরাং একেবারে যে কিছু হয় নি, এটা সত্যি কথা নয়।

গ্রন্থাগারের যোগ্য বই

গিরিশ রচনাবলী

পাঁচ খণ্ডে সমগ্র রচনা [প্রতি খণ্ড টাঃ ২৫.০০]

তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ

৩ খণ্ডে সমগ্র ছোট গল্প (প্রায় ২০০)। [প্রতি খণ্ড টাঃ ৪০.০০]

বঙ্কিম রচনাবলী

২ খণ্ডে সমগ্র রচনা। ১ম—উপন্যাস (১৪) [২০-০০]
২য়—সাহিত্য [২২.৫০]

মধুসূদন রচনাবলী

১ খণ্ডে ইংরেজি ও চিঠিপত্রসহ সমগ্র রচনা। [২২.৫০]
[প্রতি রচনাবলীতে জীবনী ও সাহিত্যকীর্তি আলোচিত]

- চীন-ভারত ও ভারত-চীন পরিব্রাজকবৃন্দ [১০.০০]
- স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে [২০.০০]
- প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য [২৫.০০]
- বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা [১৫.০০]
- কালিকট থেকে পলাশী [৬.৫০]
- বাংলার কীর্তন ও কীর্তনীয়া [১০.০০]
- সংস্কৃত নাটকের গল্প [৮.০০]
- রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি [১০.০০]
- ঠাকুরবাড়ীর কথা [১২.০০]
- রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী [৪.৫০]
- বীর সংগ্রামী সতীন্দ্রনাথ সেন [১০.০০]
- উদ্বাস্তু [১০.০০]

সাহিত্য সংসদ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা—৭০০০০৯

এবার আমরা শহরের দিকে আসতে চাই। শহরের প্রসঙ্গটাকে জড়িত হয়ে আছে শিল্পসমূহ। শিল্পক্ষেত্রে যে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে, তা আমরা একটা জিনিস থেকে বুঝতে পারি। আগে আমাদের ভোগ্যপণ্যসমূহের অধিকাংশই বিদেশ থেকে আসত। এখন প্রায় সবই এদেশে তৈরী হচ্ছে। বস্তুত যে সব শিল্প গঠন এদেশে আগে কল্পনার বাইরে ছিল, সে সব শিল্পও আজ এদেশে গঠিত হয়েছে। অবশ্য গোড়ার দিকে এ বিষয়ে আমরা বৈদেশিক সহযোগিতার সাহায্য নিয়েছিলাম, কিন্তু আজ আমরা এত দূরে এগিয়ে গিয়েছি যে, আমরাই তৃতীয় জগতের অন্যান্য দেশসমূহকে শিল্প গঠনে কারিগরী বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে সাহায্য করছি। সব শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করা এখানে সম্ভবপর নয়। তবে কতগুলো বড় শিল্পের উৎপাদন গত ৩০ বছরে কি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, তা নীচে দেখান হল—

শিল্প	১৯৫০-৫১	১৯৬০-৬১	১৯৭৬-৭৭
কয়লা (ক)	৩২.৮	৫৫.৫	১৩৪.৯
আকর লৌহ (ক)	৩-০	১৬-৬	৪৩-০
কাঁচা লৌহ (ক)	১.৬৯	৪.৩১	১০১
ইস্পাত পিণ্ড (ক)	১.৪৭	৩.৪২	৮.৪
তৈরী ইস্পাত (ক)	১.০৪	২.৩৯	৬.৯
এলুমিনিয়াম (খ)	৪-০	১৮-৩	২১০?০
তামা (খ)	৭১.	৮.৫	২৩.৭
মেশিন টুলস (গ)	৩.০	৭০.০	১১৩.৭
মোটর গাড়ী (ঘ)	১৬.৫	৫৫.০	৯১.০
মোটর সাইকেল (ঘ)	—	১৯.৪	২২৯ ০
বিদ্যুৎচালিত পাম্প (ঘ)	৩.৫	১০.৯	৩০.৭
বাইসাইকেল (ঘ)	৯.৯	১০.৭১	২৬০.০
ইলেকট্রিক মোটর (ঙ)	৯.৯	৭২.৮	৩৬০.০
সার (খ)	১.৮	১৫.৪	২৩২.০
সিমেন্ট (ক)	২.৭	৮.০	১৮.৮
চট (খ)	৮৩৭	১০৯৭	১২০০
সুতা (চ)	৫৩.৪	৮০.৬	৯৭.২
সুতী কাপড় (ছ)	৪২১৫	৬৭৩৮	৮৪০০
চিনি (জ)	৩০.০	৩০.০	৪৭.০
কাগজ (খ)	৪০	৩৫০	৮৯১
বনস্পতি (খ)	১৭৪	৩৪০	৫৩৮
চা (চ)	২৭৮	৩৩২	৫১৯

চিহ্নার্থ : (ক) মিলিয়ন টন, (খ) হজার টন, (গ) মিলিয়ন টাকা, (ঘ) হাজার সংখ্যা, (ঙ) হাজার হর্সপাওয়ার, (চ) মিলিয়ন কেজি, (ছ) মিলিয়ন মিটার, (জ) লক্ষ টন।

এ ছাড়া আরও অনেক শিল্প আছে, যাদের উৎপাদন অনুরূপভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের মধ্যে আছে জুতা, সাবান, দাড়ি কামাবার ব্লেড, বাসায়নিক পদার্থ, বেয়ন, ডিজেল ইঞ্জিন, সেলাইয়ের কল, ইলেকট্রিক ফ্যান, বেতার গ্রাহক যন্ত্র, টেলিফোন গ্রাহক যন্ত্র, রেফ্রিজিরেটর, তাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, বৈজ্ঞানিক অনুশীলনে ব্যবহৃত সূক্ষ্ম যন্ত্রাদি, থারমোমিটার, নানাবিধ মিটার, কাঁচ, প্লাস্টিক, ফাউনটেন পেন, ব্যাটারি, নাট-বল্টু, হারিকেন লাল্টার্ণ প্রেসার কুকার, বঙ ও বার্ণিশ, ইলেকট্রিক কেবল, রেলের মালগাড়ী, সালফিউরিক এ্যাসিড, কষ্টিক সোডা, নানা রকম জীবনরক্ষাকারী ঔষধ, রবার, টায়ার ইত্যাদি। এ সবের শিল্পের মধ্যে কিছু শিল্প সরকারী মহলে ও কিছু শিল্প বেসরকারী মহলে স্থাপিত হয়েছে। যে মহলেই স্থাপিত হয়ে থাকুক না কেন, এই শিল্প বিস্তার ভারতের অর্থনীতি ও সমাজের ওপর এক প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছে। শিল্পের প্রসার যে অনেক রকম পণ্যের আমদানী, সংরক্ষণ করেছে মাত্র তা নয়, বহু লোকের কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা করেছে। শুধু তাই নয়। বহু পণ্য রপ্তানী করে, এখন আমরা বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি।

শিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশে কয়লা ও বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়ে গিয়েছে। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ১,৮১৫,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হত। ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৪৬৫৩,০০০ কিলোওয়াট, ১৯৭০-৭১ খ্রীষ্টাব্দে ১৪,৭০৯,০০০ কিলোওয়াট ও ১৯৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৯,৯০০,০০০ কিলোওয়াট। এর ফলে মাথাপিছু বিদ্যুতের ব্যবহার ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ কিলোওয়াট—ঘন্টা থেকে বেড়ে ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে ৩৮ কিলোওয়াট—ঘন্টা ১৯৭০-৭১ খ্রীষ্টাব্দে ৯০ কিলোওয়াট—ঘন্টা ও ১৯৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ৮৮ কিলোওয়াট—ঘন্টায় দাঁড়ায়। গ্রামাঞ্চলেও বৈদ্যুতিকরণ করা হয়েছে। কৃষির সেচের জন্য ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে যা বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহৃত হত, এখন তার দ্বিগুণ ব্যবহৃত হচ্ছে।

কৃষি ও শিল্প উৎপাদন ও আনুসঙ্গিক ব্যবস্থা-বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতি ফলে আমাদের জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয়ও বেড়েছে। যথা—(কোটি টাকায় ও ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দের স্থিতিমান মূল্যমানের ভিত্তিতে)

বৎসর	জাতীয় আয়	মাথাপিছু আয়
১৯৬০-৬১	১৩,২৬০	৩০৫-৬
১৯৬৫-৬৬	১৫,০৮২	৩১১-০
১৯৭০-৭১	১৯,০৯৬	৩৫৩-০
১৯৭৫-৭৬	২১,৯৫২	৩৩৫-৯
১৯৭৭-৭৮	২৩,৪০০	৩৭৫-০

শুধু কৃষি ও শিল্পই যে বাড়তির পথে এগিয়ে গিয়েছে, তা নয়: রাস্তাঘাট, যোগাযোগ, জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষারও অনেক প্রসার ঘটেছে। পাঁচ দিয়ে আবৃত রাস্তা ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ছিল ২৫৭,০০০ কিলোমিটার। ওটা বেড়ে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে দাঁড়িয়েছিল ২৬৩,০০০ কিলোমিটারে ও ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ৫১৩,০০০ কিলোমিটারে। পাঁচ-দ্বারা অনাবৃত রাস্তা ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ছিল ১৪৩,০০০ কিলোমিটার, ওটা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে দাঁড়িয়েছিল ২৬২,০০০ কিলোমিটার ও ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ৭৪৮,০০০ কিলোমিটারে। পোস্ট অফিসের সংখ্যা ১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রামাঞ্চলে ছিল ৩০,৪০০ ও শহরাঞ্চলে ৫,০০০। ওটা বেড়ে ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে দাঁড়িয়েছিল ৬১,৫০০০ ও ৭,০০০ এবং ১৯৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে ১০৬,৪০০ ও ১২,৪০০। টেলিগ্রাফ অফিসের সংখ্যা ১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দে ছিল ৬,২০০, ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে ১১,২০০ ও ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ছিল ২২৫০০ টেলিফোনের সংখ্যা ১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দে ছিল ১৬৮,০০০ ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে ৪৬৩,০০০ ও ১৯৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ১,৯১৮,০০০। আগে দেশে টেলিভিসন বলে কিছু ছিল না। কিন্তু ১৯৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ৪৫৫,৮০০ টেলিভিসন সেটের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল।

বিখ্যাত গীতিকার ও সুরকার—শ্রীবিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়-এর (সঙ্গীত বিশারদ, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, অধ্যাপক প্রাক্তন তবলাবাদক ও অ্যামেচার অভিনেতা) স্বরচিত কথা ও সুরসম্বলিত আগমনী গান। প্রয়োজন হইলে যোগাযোগ করুন। সময় সকাল ৯-৩০ মিঃ হইতে ১১-৩০ মিঃ বৈকাল ৫-৩০ মিঃ হইতে ৬-৩০ মিঃ শ্রীশ্রী সিনেমার কাছে—মিনতি স্টোর্স। ২৯৮, গোপাললাল ঠাকুর রোড, কলিঃ-৭০০০৩৬

সরগম
নতুন সংযোজন
খেয়াল—অজয় চক্রবর্তী
Hony.)
রবীন্দ্রসঙ্গীত—পূরবী মুখোপাধ্যায়
খেয়াল : নাসিম আমেদ খাঁ। ব্যাগস্ত্রবী সঙ্গীত : রামকুমার চট্টো। সীমা দাস। নজরুল, রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্র-গীতি : বিমল মুখো। রবীন্দ্রসঙ্গীত : সুশীল চট্টো। কমলা বসু। চিত্রপ্রিয় মুখো। আধুনিক : অশোক তরু। সেতার : প্রখ্যাত বেতারশিল্পী। গীটার : অভিজিৎ নাগ। অঞ্জলি দে। প্রণব বন্দ্যো। তবলা : দীপক সেনগুপ্ত। বালক নন্দী। নৃত্য : মনিশঙ্কর। মুকুন্দ চক্রবর্তী। অংকন : শুভাপ্রসন্ন।
।। ছাসিখুসির আসর ।।
নাচ গান অংকন, পড়াশোনা আড়াই থেকে ছ বছরের শিশুদের জন্য সপ্তাহে দুই দিন ক্লাস।
৭, কৈলাস বসু স্ট্রীট। কলি-৬
প্রত্যহ বিকাল ৫-৮টা
রবিবার সকাল ৯—১২টা
ফোন : ৩৬-১৩৬৫

যাঁরা চায়ের সমঝদার তাঁদের চাই

লিপটন গ্রীন লেবেল ঃ
অনুপম এর সুবাস, কারণ—
এর সবটাই দার্জিলিঙ্ চা।

দার্জিলিঙের ঢালু পাহাড়ের গায়ে গাঢ় সবুজ গালিচের মত বিছানো রয়েছে কয়েকটি চা বাগান। দুনিয়ার কোথাও তাদের জুড়ি নেই। চায়ে অপূর্ব সুবাস ফুটিয়ে তুলতে হবে ঠিক যেমনটি জল, আলো আর হাওয়া দরকার, একমাত্র দার্জিলিঙের কুয়েলি ঘেরা পাহাড়েই তা মেলে। তাই দার্জিলিঙের চা সারা দুনিয়ায় অদ্বিতীয়। লিপটনের গ্রীন লেবেল আপনি তা পাচ্ছেন। যাঁরা চায়ের সমঝদার, এক চুমুকেই যাঁরা ধরতে পারেন, তাঁদের কাছে এই চা সেরা দার্জিলিঙ্ চা। যে অপূর্ব সুবাস অন্য আর কোন চায়ে নেই, তাই পাবেন লিপটন গ্রীন লেবেলে।

লিপটন গ্রীন লেবেল চা—অতুলনীয় মাদ্ সুবাস

শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ২৬টা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, তা বেড়ে ১৯৬৯-৭০ খ্রীষ্টাব্দে দাঁড়িয়েছিল ৭৯টা। ডাক্তারী পড়াশোনা করবার জন্য ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে ছিল ৪৫টা কলেজ, ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে ৬০টা ও ১৯৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ১০৫টা। ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী কলেজ ১৯৬০-৬১তে ১০২টা, ১৯৭৫-৭৬তে ১৪২টা। ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা কলেজ ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে ছিল ১৯৫টা, ১৯৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ২১৯টা। প্রাইমারী স্কুলসমূহে ১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল এক কোটি ৯১ লক্ষ পাঁচ হাজার। ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিন কোটি ৫০ লক্ষ ও ১৯৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ছয় কোটি ৪৭ লক্ষ। মিডল স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দে ৩১ লক্ষ ২০ হাজার। ৬০-৬১তে ছিল ৬৭ লক্ষ ও ১৯৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এক কোটি ৫৯ লক্ষ। সেকেণ্ডারী স্কুলসমূহের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দে ১২ লক্ষ ২০ হাজার। ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে ৩০ লক্ষ ও ১৯৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ৮৮ লক্ষ। কলেজের ছাত্র সংখ্যা ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে ছিল সাত লক্ষ, ১৯৬৮-৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ লক্ষ ও ১৯৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ৩১ লক্ষ।

জনস্বাস্থ্যের দিক দিয়ে ১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দের পর কি ঘটেছে তা নীচের তালিকা থেকে বুঝতে পারা যাবে—

	১৯৫০-৫১ সংখ্যা	১৯৬৯-৭০ সংখ্যা	১৯৭৪-৭৫ সংখ্যা
হাসপাতাল	৯,২০০	১৫,৮০০	*
হাসপাতালের বেড	১১৫,০০০	২৬১,০০০	২৮৪,০০০
পাশকরা ডাক্তার	৫৬,০০০	১২০,০০০	১৭৬,০০০
পাশকরা নার্স	১৫,০০০	৬৩,০০০	১২০,০০০
পরিবার উন্নয়ন কেন্দ্র	১২,১০০	৩৫,৫০০	*

* পাওয়া যায়নি।

চিকিৎসার এই সব সুবিধা হওয়ার ফলে মৃত্যুহার ক্রমশ কমে গিয়েছে—

বৎসর	জন্মহার শতকরা	মৃত্যুহার শতকরা
১৯৫১-৬১	৪-১৫	২-২৮
১৯৬১-৭১	৪-১১	১-৮৯
১৯৭১-৭৬	৩-৫৬	১-৫২

ওপরে দেওয়া তথ্য ও পরিসংখ্যান-সমূহ থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যাবে যে দেশ খুব দ্রুতই বাড়তির পথে চলেছে। গত তিরিশ বছরে দেশের কিছুই হয়নি, এটা একটা নির্লজ্জ মিথ্যা কথা। আমরা অনেক টাকা খরচ করেছি, এবং অনেক কিছুই করতে পেরেছি। তবে আজকের প্রত্যেকটার মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে এক নগ্ন দরিদ্রতা। এটার কারণ কি, সে সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

প্রথম কারণ হচ্ছে জন-বিস্ফোরণ। এর জন্য দেশের জনগণই দায়ী। আমি আমার 'চ্যালেঞ্জ অভ্ সুরবাল পভার্টি' (১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত) নামক বইয়ে দেখিয়েছি যে এ সম্বন্ধে আমি ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে সরকারকে সতর্ক করে দেওয়া সত্ত্বেও প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার রচয়িতারা সেদিকে মনোযোগ দেননি। তাঁরা এই দুই পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন জনসংখ্যার ১-২ শতাংশ বৃদ্ধি হারের ভিত্তিতে। কিন্তু ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ পেল যে জনসংখ্যার প্রকৃত বৃদ্ধিহার হচ্ছে দুই শতাংশের অধিক। এর ফলে খাদ্যশস্য, ডালকলাই ইত্যাদির মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও মাথাপিছু প্রাপ্তি-যোগের পরিমাণ বিশেষ বাড়েনি। বরং ডাল-কলাইয়ের ক্ষেত্রে পরিমাণ কমেই গিয়েছে। এটা নীচের তালিকা থেকে বুঝতে পারা যাবে।

বৎসর	খাদ্যশস্য (দিনপিছু মাথাপিছু গ্রাম)	ডালকলাই
১৯৫১	৩৬০	৭০
১৯৬১	৪০৩	৬৯
১৯৬৬	৩৬০	৪৮
১৯৭৩	৩৮২	৪১
১৯৭৫	৩৭০	৪০

মানুষের শরীরকে সুস্থ রাখবার জন্য যে পরিমাণ ক্যালরী (কমপক্ষে দিনে ২৫০০ ক্যালরীর প্রয়োজন হয়) ও প্রোটিনের প্রয়োজন হয়, তার তুলনায় এটা যে খুব কম, তা বলা বাহুল্য মাত্র। সুতরাং প্রাচুর্যের মধ্যে আমরা দৈন্য নিয়ে বেঁচে আছি। খাদ্যের খাদ্যের ওপর নির্ভর করে শরীরের পুষ্টি এবং শরীরের পুষ্টির ওপর নির্ভর করে কর্মদক্ষতা। সেদিক্ থেকে বিচার করলে, আজ জাতির কর্মদক্ষতা কমে গিয়েছে।

এদিকে শিল্পের উৎপাদন বাড়লেও শিল্পজাত নিত্য ব্যবহৃত অনেক ভোগ্যপণ্য আমরা আমাদের প্রয়োজন মত তৈরী করার প্রতি যথাযথভাবে মনোযোগ দিই নি। তার ফলে বর্তমানে মাথাপিছু কাপড়ের প্রাপ্তি-যোগ হচ্ছে বৎসরে মাত্র ১৩-৮ মিটার। এটা স্বাধীনতা পূর্ব যুগে আমরা যা পেতাম, তার চেয়ে বেশী কিছু নয়।

বস্তুতঃ ভোগ্যপণ্য প্রাপ্তিযোগের ওপরই জীবন যাত্রার মান নির্ভর করে। সেদিক থেকে অন্যান্য দেশের তুলনায় আমরা যে কত পিছিয়ে আছি, তা নীচের তালিকা থেকে বুঝতে পারা যাবে।

(প্রতিদিনের ব্যবহার গ্রামে প্রদর্শিত)

দেশ				
ভারত	৩৮৪	৪৯	১১৬	১৯৯০
অস্ট্রেলিয়া	২১৬	১৪১	৬৪৬	৫১৬০
ব্রেজিল	২৭২	১২৬	১৯৫	২৮২০
কানাডা	১৮০	১৩৬	৬১৯	৩২০০
পঃ জার্মানী	১৮৯	১৫৫	৫৬৭	৩১৮০
যুক্তরাজ্য	২০০	১৩৬	৫১২	৩১৭০
যুক্তরাষ্ট্র	১৭৬	১৪০	৬৮১	৩৩০০
রাশিয়া	৪২৮	১০৬	৪৭৬	৩১৮০

ফোটা পদ্মের গভীরে

অতীন্ বন্দ্যোপাধ্যায় ।। ১৪·০০

কামনার সুখ দুঃখ

২য় মুদ্রণ ।। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ।। ১০·০০

গোয়েন্দা কর্ণেল

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ।। ৬·০০

চুপি চুপি আঁধারে	।।	কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়	৭·০০
অপরিচিতা রূপসী	।।	চিরঞ্জীব সেন	৪·৫০
রামায়ণী প্রেমকথা	।।	সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ	৬·৫০
সীমান্তবর্গ	।।	প্রলয় সেন	১২·০০
সুয়েজ পেরিয়ে	।।	সুজাতা	১০·০০
অবৈধ পাপ এবং প্রমীলা সংবাদ	।।	বীরু চট্টোপাধ্যায়	৪·৫০
নতুন ভুবন	।।	শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়	৫·০০

রূপকথা দেশে দেশে	।।	বড় সাহেবের কাঁঠাল খাওয়া	
বীরু চট্টোপাধ্যায়	৫·০০	নারায়ণ চক্রবর্তী	৫·০০
বকম বকম	।।	ড্রাগনের মুখোশ	
অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৪·০০	দেবব্রত মল্লিক	৩·০০

প্রফুল্ল গ্রন্থাগার ঃ ৫।১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

এগুলো সবই গড় সংখ্যাঙ্ক। কিন্তু অন্য দেশের গড়ের সঙ্গে আমাদের দেশের গড়ের আকাশ-পাতাল তফাৎ। তার কারণ, আমাদের দেশে নীচের তলার লোকের সঙ্গে ওপর তলার লোকের যে বিরাট ব্যবধান আমরা দু'দিক থেকে বিচার করতে পারি—গ্রামের দিক থেকে ও শহরের দিক থেকে। গ্রামে যে ব্যবধান আছে, তা জমির মালিকানা স্বত্ব থেকেই বুঝতে পারা যাবে। গ্রামে জমির মালিকানা স্বত্বের স্বরূপটা নীচের তালিকাদৃষ্টে প্রতীয়মান হবে—

মালিকানার পরিমান	মোট মালিকের শতাংশ	মোট জমির শতাংশ
এক একরের নীচে	৫০-৬	৯-০
এক একর থেকে পাঁচ একর	৩৮-০	৪৭-৪
পাঁচ ও তদূর্ধ্ব একর	১১-০	৫৩-৪

এ তালিকা থেকে বুঝতে পারা যাবে যে জমির মোট মালিক সংখ্যার ১১-০ শতাংশ মালিক ৫৩-০ শতাংশ জমির মালিকানা স্বত্ব ভোগ করে, আর ৫০-৬ শতাংশ মালিকরা মাত্র ৯-০ শতাংশ জমির মালিকানা স্বত্ব ভোগ করে। নীচের তলার সঙ্গে ওপর তলার যে বিরাট ব্যবধান আছে, তা এই সংখ্যাঙ্ক থেকে বুঝতে পারা যাবে।

চাষের উন্নতির জন্য গত তিরিশ বছরে চাষীর কাছে অনেক রকম কারিগরী উৎকর্ষতা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সে উৎকর্ষতা ব্যবহার করবার মত সঙ্গতি মাত্র ওই ১১-০ শতাংশ চাষীরই আছে। আর ৫০-৬ শতাংশ চাষীর কোন সঙ্গতিই নেই তা উপভোগ করবার। এছাড়া, আছে ভূমিহীন চাষী। তাদের সংখ্যা হচ্ছে গ্রামের জনসংখ্যার ১৬ শতাংশ।

গ্রাম বৈদ্যুতিকরণ করা হয়েছে বটে, কিন্তু তার সুফল মাত্র ১১-০ শতাংশ চাষীরাই পাচ্ছে। তার কারণ যে সব গ্রাম

বৈদ্যুতিকরণ হয়েছে, সেগুলো মাত্র সেই সকল গ্রাম যেগুলো গ্রিড লাইনের পাশে অবস্থিত। তাছাড়া, বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে হলে, ব্যবহারকারীকে নিজ বাসে গ্রিড লাইন থেকে লাইন তৈরী করে নিতে ভূমিতে বা বাসস্থানে নিয়ে যেতে হয়। সে সঙ্গতি মাত্র ওই ১১-০ শতাংশ চাষীরই আছে। বাকী চাষীরা যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই আছে।

এবার আমাদের শহরের দিকে তাকানো যাক। ভারতে শহরসমূহে বাস করে ২০ কোটি ৯১ লক্ষ লোক। শহরের ওপর তলার লোক, আর নীচের তলার লোক, এটা নির্ধারণের জন্য আমরা যদি ওপর তলার লোক হিসাবে মাত্র তাদের ধরি যারা আয়কর দেয় (তার মানে যাদের বাৎসরিক আয় আট হাজার টাকার ওপর) তাহলে আমরা দেখতে পাব যে মাত্র ২৩ লক্ষ ৬৭ হাজার লোক আয়কর দেয়। মোট শহরবাসীর অনুপাতে এরা হচ্ছে মাত্র ২-১৬ শতাংশ। এ থেকেই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে শহরে ৯৭-৮৪ শতাংশ লোক হচ্ছে নীচের তলার লোক, তার মানে যাদের বার্ষিক আয় হচ্ছে আট হাজার টাকার কম। তবে একটা তথ্য এ থেকে প্রকাশ পাচ্ছে, সেটা হচ্ছে এই যে শহরের তুলনায় গ্রামেই হচ্ছে ধনীর সংখ্যা বেশী।

গত তিরিশ বছর ধরে এই বিরাট ধন-বৈষম্য দূর করবার জন্য আমরা অনেক প্রয়াস করেছি, কিন্তু ধনবৈষম্য তো দূর হয় নি, বরং বেড়েই গিয়েছে।

সব শেষে আমি দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্বন্ধে একটা কথা বলব। শিক্ষা বিস্তার সত্ত্বেও দেশের মধ্যে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে গিয়েছে। এটা নীচের তালিকা থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যাবে—

বৎসর	মোট জনসংখ্যা (কোটি)	নিরক্ষরতার হার শতকরা	নিরক্ষরের মোট সংখ্যা (কোটি)
১৯৫১	৩৬১	৮৩-৪	৩০০
১৯৬১	৪৩৯	৭৬-০	৩৩৪
১৯৭১	৫৫৭	৭৮-৭	৩৮৭

শতকরা হারের দিক দিয়ে বিচার করলে মনে হবে নিরক্ষরতার হার ক্রমশ কমে যাচ্ছে। কিন্তু যেহেতু জনসংখ্যা বাড়ছে সেই হেতু মোট নিরক্ষরের সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে।

বস্তুতঃ গত তিরিশ বছরে আমরা বাস্তবের পথে অনেক দূর এগিয়ে গেছি বটে কিন্তু তার সুফল অনেকটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে জনবিস্ফোরণ ও ধনবৈষম্য বৃদ্ধির দরুন।

আমাদের প্রকাশিত চিরায়ত কাব্য, উপন্যাস, গল্প, ভ্রমণ কাহিনী ও প্রবন্ধ-সংকলন

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের :
সমগ্র কবিতা ২০৲ ॥ উত্তরায়ণ ৬৲
শেষ স্বাক্ষর ৪৲
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের
সমগ্র কবিতা ৬৲ ॥
বনফুলের :
ত্রিনয়ন ৮৲ ॥ পঞ্চাৎপট ১৮
বুদ্ধদেব বসুর :
বাসর ঘর ৬৲ ॥ লাল মেঘ ৬৲
কালা হাওয়া ১২৲
জগদীশ গুপ্তের :
লঘু-গুরু ও অসাধু সিদ্ধার্থ ৬৲
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের :
পদসঞ্চার ১০৲ ॥ ঘূর্ণি ৪৲
নরেন্দ্রনাথ মিত্রের :
উদ্যোগ পর্ব ১৫৲ ॥ চেনামহল ১২৲
দ্বীপপুঞ্জ ৮৲ ॥ অনাগত ৬৲
বিমল মিত্রের :
চাঁদের দাম এক পয়সা ১০৲
প্রতিভা বসুর :
জন্মান্তর ১০৲
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের :
জনপদবধূ ৮৲ ॥ কর্ণাটরাগ ৮৲
নগরনন্দিনীর রূপকথা ৮৲
নিরঞ্জন চক্রবর্তীর :
কাঠগোলাপের গন্ধ ৬৲
শেষ বসন্ত ৮৲
প্রতিবিম্বের স্বাদ ৮৲
আজ কাল পরশু ৬৲
সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের :
আবছা আলোর জাল ৭৲
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের :
পিপাসা ৫৲
বিকাশ বিশ্বাসের :
উদিত ভানুর দেশ জাপান ১৫৲
ডঃ সরোজমোহন মিত্রের :
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য ১৮৲ ॥ মার্কসীয় দৃষ্টিতে শরৎ সাহিত্য ১২৲
সুকান্তের জীবন ও কাব্য ১০৲
হিমালয়ের পথে প্রান্তে ৮৲
রবীন্দ্র পরিষদ পাটনার :
রবীন্দ্র সমীক্ষণ ১০৲

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
১২এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা—৭৩

ভবতোষ দত্ত

আর্থিক উন্নতি তিন দশকের খতিয়ান

একত্রিশ বছর আগে দেশ যখন স্বাধীন হোল, তখন আমরা মনে প্রাণে আশা করেছিলাম যে এখন থেকে রাজনৈতিক অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক অধিকারও আমাদের হাতে আসছে এবং তার ফলে আর্থিক পরিকল্পনার সাহায্যে আমাদের ব্যাপক দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব হবে। পরিকল্পিত উন্নয়ন সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা ১৯৪৭-এর আগে থেকেই চলছিল। ১৯৩৪-এ প্রখ্যাত ইঞ্জিনিয়র বিশ্বেশ্বরাইয়া ভারতের আর্থিক পরিকল্পনা নিয়ে প্রথম বই লেখেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে জাতীয় কংগ্রেস জবাহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে একটি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করেন। যুদ্ধ যখন চলছিল তখন বোম্বাই-বাসী কয়েকজন শিল্পপতি একটি পনেরো বছরের পরিকল্পনা রচনা করেন। অন্যদিকে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের গোষ্ঠি একটি সমাজতান্ত্রিক 'জনগণের পরিকল্পনা' প্রকাশ করেন। অর্থনীতি বিদদের মধ্যেও অনেকে পরিকল্পিত আর্থিক উন্নয়নের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করেন। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অধিকার যখন সম্পূর্ণ ভাবে আমাদের হাত -এল, তখন আমরা পরিকল্পনার নীতি গ্রহণ করতে প্রস্তুত।

১৯৪৭-এর আগে যে সব আলোচনা হয়েছিল তাতে দেশ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে এ সম্ভাবনা কারো মনে আসে নি। আমরা স্বাধীনতা পেলাম এমন ভাবে যাতে পাটের কল রইল ভারতে আর পাট-চাষের অঞ্চল গেল পাকিস্তানে, কাপড়ের কল থাকল ভারতে আর তুলার উৎপাদনের অনেকটাই গেল পাকিস্তানের ভাগে। যে নদীর জল থেকে সেচ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি, সেই জলের উৎস চলে গেল অন্য দেশে। পূর্বাঞ্চলে বঙ্গদেশ খণ্ডিত হোল, আর আসাম ও অন্যান্য উত্তর পূর্ব অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র পথ রইল হিমালয়ের পাদ দেশে একটি সঙ্কীর্ণ ভূ-খণ্ডের ভিতর দিয়ে। স্থাপিত ভারতের স্থাপিত অর্থনীতির উপরে নূতন চাপ পড়ল অগণিত শরণার্থীর আগমনে।

পাঁচ-সালা পরিকল্পনা

এর মধ্যেই নূতন করে পরিকল্পনার রীতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে চিন্তা চলতে থাকে এবং ১৯৫১-৫২ সালে ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সুরু করা হয়। তার পর থেকে পাঁচ বছর পর পর নূতন স্তর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৯৫৫-৫৬-তে আসে দ্বিতীয় পঞ্চ-বর্ষ পরিকল্পনা, ১৯৬১-৬২-তে তৃতীয় পরিকল্পনা। পঞ্চাশের দশকে অনেক সমস্যা ছিল, কিন্তু তার চেয়ে অনেক কঠিন সমস্যা এল ষাটের দশকে। ১৯৬২তে চীনা আক্রমণের প্রতিরোধে সরকারি ব্যয় বাড়ল এবং আর্থিক উন্নতির জন্য সংস্থান কমাতে হোল। তার পরে ১৯৬৫তে পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষে যে আর্থিক বিপর্যয় দেখা দিল তার ফলে পাঁচ-সালা পরিকল্পনার রীতি সাময়িক-ভাবে পরিত্যক্ত হোল—তার বদলে এল পর পর তিন বছর এক একটি বার্ষিক পরিকল্পনা। ১৯৬৬-৬৭ থেকে ১৯৬৮-৬৯ পর্যন্ত এই তিন বছরকে অনেকে পরিকল্পনার 'অবকাশ-কাল' বলে বর্ণনা করেছেন। ১৯৬৯-৭০-এ আবার দেশ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে ফিরে গেল এবং চতুর্থ পরিকল্পনা রচিত হোল। ১৯৭৪-৭৫-এ তৈরি হোল পঞ্চম পরিকল্পনা।

এই পঞ্চম পরিকল্পনার শেষ হবার কথা ছিল বর্তমান বছরে, অর্থাৎ ১৯৭৮-৭৯তে। কিন্তু গত বছর নূতন সরকার ঘোষণা করলেন যে এখন থেকে আর আগের মত পাঁচ বছরের পরিকল্পনা করা হবে না—তার বদলে আসবে 'প্রবাহমান পরিকল্পনা'। পঞ্চম পরিকল্পনাটিকে তার চতুর্থ বছরের শেষে থামিয়ে দিয়ে, বর্তমান বছর থেকেই প্রবহমান পরিকল্পনা তৈরি করা হবে। এই পরিকল্পনা ও পাঁচ বছরের জন্যই তৈরি হবে, কিন্তু পাঁচ বছর পর পর নয়। প্রথম তৈরি হবে ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৩ পর্যন্ত একটি পরিকল্পনা; তার পরে আগামী বছর গোড়ার দিকের এক বছর বাদ দিয়ে এবং শেষের দিকে এক বছর যোগ দিয়ে ১৯৭৯-৮৪র জন্য পরিকল্পনা তৈরি হবে। তার পরের বছরে হবে ১৯৮০-৮৫ নিয়ে পরিকল্পনা এবং এভাবেই চলতে থাকবে। অর্থাৎ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বলে কিছু থাকবে না। পরিকল্পনা কমিশন যে ধারণা উপস্থাপিত করেছেন তাতে 'ষষ্ঠ' কথাটি ব্যবহার করা হয় নি—নাম দেওয়া হয়েছে 'ধারাবাহিক পরিকল্পনা ১৯৭৮-৮৩'।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি

১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৭৭-৭৮ পর্যন্ত ২৭ বছর ধরে যে পরিকল্পিত উন্নয়নের পন্থা আমাদের দেশে নেওয়া হয়েছে তার হিসাব-নিকাশ করলে দেখা যাবে অনেকদিকে আমরা বহুদূর অগ্রসর হয়েছি এবং আবার অন্য অনেকদিকে আমরা যে শুধু লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি নি তাই নয়, খানিকটা পশ্চাদ-গতিও হয়েছে—বিশেষত, যদি মোট উন্নতির দিকে নজর না দিয়ে মাথাপিছু উন্নতি কতটা হয়েছে সেদিকে তাকাই। অবশ্য, মাথাপিছু আয় যদি আশানুরূপ বেড়ে না থাকে কিংবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভোগ্যদ্রব্যের মাথাপিছু সরবরাহ কমে গিয়ে থাকে, তার জন্য জনসংখ্যার বিরাট বৃদ্ধি অনেকাংশে দায়ী। ১৯৫১তে ভারতের জনসংখ্যা ছিল ৩৬-১০ কোটি; ১৯৭১-এ সংখ্যাটা গিয়ে দাঁড়ায় ৫৪ ৮০ কোটিতে, অর্থাৎ কুড়ি বছরে দেড়গুণেরও বেশি। এ থেকে বার্ষিক বৃদ্ধির হার পাই শতকরা ২-২। ১৯৬১ থেকে ১৯৭১ বৃদ্ধির হার ছিল বছরে শতকরা প্রায় ২-২৩; এই হার যদি আর না বেড়ে থেকে তাহলে ১৯৭৭-এ জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৬৫ কোটি। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্যের চাহিদা বেড়েছে, স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদির প্রয়োজন বেড়েছে এবং উন্নয়নের হার আশানুরূপ না হওয়াতে বেকারের এবং অর্ধ বেকারের সংখ্যা বেড়েছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যে অনেকটা বাড়তে পারে সেটা আগে থেকেই বোঝা উচিত ছিল। যেটুকু আর্থিক উন্নতি হবে তার ফলে মৃত্যুর হার (বিশেষ করে শিশু-মৃত্যুর হার- কমবে এটা প্রায় নিশ্চিত। অন্যদিকে জন্ম-হার কমাতে অনেক সময় লাগে—জীবনযাত্রার মান, শিক্ষার বিস্তার ইত্যাদিতে প্রভূত উন্নতি না হলে জন্মের হার কমে না। বরং মা হবার বয়সের মেয়েদের মধ্যে মৃত্যুহার কমে গেলে তার ফলে নূতন-শিশুর জন্মের হার একটু বাড়তেও পারে। বছরে অন্তত শতকরা দুই হারে জনসংখ্যা বাড়বে প্রথম থেকেই এটা ধরে নিয়ে যদি পরিকল্পনা তৈরি হোত এবং প্রয়োগের

সুতীবস্ত্র, পানীয় জল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পল্লী-শিল্প ইত্যাদির উপরে প্রয়োজনীয় জোর পড়ত, তাহলে আমাদের হয়তো এতটা সমালোচনার দিকে যেতে হোত না।

কী হয়েছে

সাতাশ বছরের পরিকল্পিত উন্নয়নের চেষ্টার পরে আজ যখন প্রাপ্তি এবং অপ্রাপ্তির খতিয়ান করতে যাই তখন অবশ্য অপ্রাপ্তিগুলির দিকেই নজর পড়ে বেশি। সেগুলিকে একটু বিশদভাবে আলোচনা করবার আগে মনে রাখা ভাল যে মোট উৎপাদনের দিক থেকে আমাদের আর্থিক ব্যবস্থাতে অনেকখানি উন্নতি হয়েছে। আমাদের দেশের ইতিহাস আমরা যতটা জানি, তাতে এর আগে কোনো আড়াই দশক জুড়ে নানাদিকে উৎপাদনের বৃদ্ধি এতটা হয়েছে বলে জানা নেই। খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১৯৫০-৫১তে ছিল মাত্র ৫-৮৫ কোটি টন, ১৯৭৭-৭৮-এ এটা প্রায় ১২-৫ কোটি টন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। কলের তৈরি কাপড় তৈরি হয়েছিল ১৯৫০-৫১তে ৩৪০ কোটি মিটার আর ১৯৭৬-এ ৭৯৫ কোটি মিটার। সিমেন্টের উৎপাদন ছিল ১৯৫০-৫১তে ২৭ লক্ষ টন আর ১৯৭৬-এ ১৪৭ লক্ষ টন। সাতাশ বছরে চিনির উৎপাদন বেড়েছে ১১ লক্ষ টন থেকে ৪০ লক্ষ টন। যে বিদ্যুতের কথা আমরা এখন বিবৃত, তার বেলাতেও উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১৯৫০-এ ২৩ লক্ষ কিলো-ওয়াট আর ১৯৭৬-৭৭-এ ২৩৭ লক্ষ কিলো-ওয়াট। বিদ্যুতের কার্যকর উৎপাদন এই সাতাশ বছরে ৬৫৮ কোটি ইউনিট (কিলো-ওয়াট-ঘন্টা) থেকে ৮১১৯ কোটিতে গেছে। প্রতি কিলো-ওয়াট উৎপাদন-ক্ষমতা থেকে বছরে ৫০০০ ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা উচিত। এদিক থেকে দেখতে গেলে ১৯৭৬-৭৭-এ ১২,০০০ কোটি ইউনিট বিদ্যুৎ আমাদের পাওয়া উচিত ছিল কিন্তু পেয়েছি তার ৭৫ শতাংশ এবং কোনো কোনো রাজ্যে, যেমন পশ্চিমবঙ্গে, তার পরিমাণও অনেক কম।

এই সাতাশ বছরে দেশের মোট উৎপাদন বেড়েছে বছরে শতকরা ৬-১ ভাগ হারে, কৃষি উৎপাদনের বৃদ্ধির হার শতকরা ২-৮। মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধি হয়েছে বছরে গড়পড়তা ৩-৫ ভাগ। শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা বেড়েছে বছরে শতকরা ২-৫ হিসাবে। যদি শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সমাজকল্যাণমূলক কাজের দিকে তাকাই, তাহলে দেখি যে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৯৫০-৫১তে ৯-৫ লক্ষ এবং ১৯৭৫-৭৬-এ প্রায় ৩৫ লক্ষ; ছয় থেকে এগারো বছরের বয়সের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১৯৫০-৫১-এ ১ কোটি লক্ষ এবং ১৯৭৫-৭৬-এ ৬৪৭ লক্ষ। ৬ বছরের মোট শিশুদের সংখ্যার কত জন স্কুলে পড়তো ১৯৫০-৫১তে; এই অনুপাত ১৯৭৫-৭৬-এ হয়েছিল শতকরা ৮৪। মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে আরম্ভ করে বিশ্ববিদ্যালয়, টেকনিক্যাল কলেজ ইত্যাদি সর্বস্তরেই বৃদ্ধির পরিমাণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে অনেক বেশি। একথা খাটে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, হাসপাতাল ইত্যাদির ক্ষেত্রেও। বিশেষ করে উল্লেখ করা উচিত রাস্তাঘাট ও মোটর চালিত পরিবহনের উন্নতি; কিন্তু এটা সহজেই চোখে পড়ে যে স্বাধীনতার পরে প্রায় ত্রিশ বছরে নূতন রেলপথ নির্মিত হয়েছে মাত্র ৬,৬০০ কিলোমিটার।

দেশের পরিকল্পিত উন্নতির জন্য কত টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে তার একটা যোগফল দেওয়া কঠিন, কারণ মূল্যস্তরের পরিবর্তন হয়েছে নানাদিকে। মোটা পরিষ্কার ভাষা বলা যায় সেটা হোল যে পরিকল্পনার প্রথমদিকে আমাদের অর্থনীতিতে মোট বিনিয়োগ ছিল জাতীয় আয়ের শতকরা দশ ভাগের নীচে, এখন সেটা পনেরো-ষোল শতাংশেরও উপরে চলে এসেছে। প্রথম পরিকল্পনাতে পাঁচ বছরে সরকারি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ ধরা হয়েছিল ২০৬৯ কোটি টাকা। পঞ্চম পরিকল্পনায় এই পরিমাণ হয় ৩৭,৫০০ কোটি টাকা এবং ১৯৭৮-৮৩র খসড়াতে পাঁচ বছরের সরকারি বিনিয়োগ ধরা হয়েছে ৬৯,৩৮০ কোটি টাকা। এই সব সংখ্যাকে একই মূল্যমানে হিসাব না করলে তুলনার কোনো অর্থ হয় না এবং সেটা প্রায় অসম্ভব। তাই জাতীয় আয়ের কতটা অংশ বিনিয়োগে দেওয়া হচ্ছে সেটা দেখাই যুক্তিসংগত। সেদিক থেকে দেখা যায় যে সরকারি এবং বেসরকারি দুই ক্ষেত্রেই বিনিয়োগের তুলনামূলক উন্নতি হয়েছে।

আর কী হয়নি

এই অনস্বীকার্য উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন ওঠে যে তাহলে আমাদের সমস্যা এখনো এত কঠিন কেন, দারিদ্র্যের ভার এখনো লাঘব করা সম্ভব হোল না কেন? আগেই বলেছি যে মোট উৎপাদন যে সব ক্ষেত্রে অনেকটা বেড়েছে সে সব ক্ষেত্রেও মাথাপিছু উৎপাদন বা সরবরাহ প্রায় একই রকম আছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কমেও গিয়েছে। মোট জাতীয় আয়ের দিকে তাকালে দেখি যে বৃদ্ধির হার বছরে শতকরা মাত্র ৩-৫ এবং এর সঙ্গে শতকরা ২-২ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে মাথাপিছু আয় বেড়েছে বছরে শতকরা মাত্র ১-৩ হারে। কয়েকবার এরকম হয়েছে যে বৎসরান্তে মাথাপিছু আয় কমে গিয়েছে। মোট সংখ্যাগুলি ছেড়ে দিয়ে যদি কয়েকটি প্রধান জিনিসের দিকে তাকাই তাহলে দেখি যে খাদ্যশস্যের মাথাপিছু সরবরাহ ১৯৫৬তে ছিল দৈনিক ৪৩১ গ্রাম আর ১৯৭৭-এ ৪৩৯ গ্রাম। মাঝে মাঝে অবশ্য কোনো কোনো বছরে এরচেয়ে বেশি হয়েছে, কিন্তু কখনোই ৪৮০ গ্রামের বেশি হয় নি। সুতীবস্ত্রের বেলাতে দেখি যে ১৯৫৫-৫৬তে মাথাপিছু সরবরাহ ছিল ১৪-৪ মিটার আর ১৯৭৬-৭৭-এ মাত্র ১১-৪ মিটার।

অসাম্য বৃদ্ধি

যেখানে গড়পড়তা সরবরাহ বেড়েছে (যেমন চিনি, ভোজ্য তেল বা চা) সেখানেও যারা সত্যিকারের গরীব তাদের কাছে জিনিসগুলি পৌঁছেছে কিনা সন্দেহ। জাতীয় আয় বা দ্রব্য বিশেষের মাথাপিছু হিসাবে যে খবরটা ধরা পড়ে না সেটা হোল আয়ের এবং ভোগের বণ্টন কতটা বদলা বদলাচ্ছে—অসাম্য কমছে, না বাড়ছে। আয়-বণ্টন বিষয়ে আমাদের ভাল পরিসংখ্যান নেই, কিন্তু যে কয়েকটি গবেষণা হয়েছে তাতে মনে হয় যে অসাম্য কমে নি এবং সম্ভবত বেড়েছে। ১৯৬৪তে প্রকাশিত মহলানবিশ কমিটির রিপোর্টে অনুমান করা হয়েছিল যে আর্থিক অসাম্য গ্রামাঞ্চলে কিছুটা কমেছে এবং সহরাঞ্চলে বেড়েছে। ১৯৭১-এ অধ্যাপক দান্ডেকার ও নীলকণ্ঠ রথ কয়েকটি অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিসের

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা সম্পাদক রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

ষোড়শ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যার সূচী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিদ্যাসাগর), হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় (রবীন্দ্রনাথের নটরাজ পরিকল্পনা), ভরতমুনি (নাট্যশাস্ত্র), হরপ্রসাদ মিত্র (সাহিত্য-বীক্ষার রবীন্দ্র-রীতি) অজিতকুমার ঘোষ (নাটক লেখার মূলসূত্র), ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য (শিশুসাহিত্যে দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার), বারিদবরণ ঘোষ (রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় সঙ্গীত

ব্যবহারকে ভিত্তি করে দেখান যে ষাটের দশকে আমাদের জনসংখ্যার শতকরা চল্লিশ-জন দারিদ্র্য-সীমার নীচে ছিল। পরিকল্পনা কমিশন বর্তমানে বলছেন যে আজকাল সম্ভবত শতকরা পঞ্চাশজনই দারিদ্র্য-সীমার নীচে। সহর এবং গ্রামে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং কৃষিতে ভূমিহীন শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি থেকেও। প্রমাণ হয় যে পরি-কল্পনার সুফল যেটুকু সামগ্রিকভাবে হয়েছে সেটাকে সর্বব্যাপী করে তোলা যায় নি।

উৎপাদন ও বণ্টন

এ জিনিসটাকে উৎপাদনের দিক থেকেও দেখা যায়। অবশ্য-প্রয়োজনীয় অনেক জিনিসের উৎপাদন (খাদ্যশস্য ও বস্ত্র যার মধ্যে প্রধান) গত সাতাশ বছরে যা বেড়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি গুণে বেড়েছে ধনীজন-ব্যবহৃত নানারকমের জিনিসের উৎপাদন—মোটর গাড়ি, রেফ্রিজারেটর, টেলিভিশন রেডিয়ো থেকে আরম্ভ করে নাইলন-টেরিলীন, উচ্চ-মূল্যের অঙ্গ-রাগ, বোতলবন্দী ঠাণ্ডা পানীয়। এগুলির বেলায় অনেক ক্ষেত্রে সরকারি লাইসেন্সে যতটা উৎপাদনের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, বেআইনীভাবে তার চেয়ে বেশি উৎপাদন করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে বেকার হয়ে পড়বে এই ভয়ে সরকার শেষ পর্যন্ত উৎপাদনের এই বে-আইনী সম্প্রসারণকে আইনানুগ স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছেন। সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে গৃহনির্মাণের ক্ষেত্রে বিশ্বাস-বহুল বাসভবনের ব্যাপকবৃদ্ধি, অথচ সহরের গরীব লোক বা গ্রামের লোকের আবাসনের ব্যবস্থা আনুপাতিক-ভাবে খুবই কম। যে দেশে লোকের দিনে তিন টাকা খরচ করবার ক্ষমতা নেই, সে দেশে দিনে তিনশ' টাকার পঞ্চ-তারকা হোটেলের সংখ্যা বাড়ছে। বলা হচ্ছে বিদেশী ভ্রমণকারীদের জন্য এসব দরকার, কিন্তু হিসাব নিলে দেখা যাবে যে ভারতীয় ধনী সম্প্রদায়ই এরকম হোটেলের সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক। অসাম্যের পরি-সংখ্যান সংগ্রহ করা নিশ্চয়ই উচিত, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অসাম্য সাক্ষাৎভাবে দৃষ্টি-গোচর হয়ে উঠেছে।

আর্থিক উন্নতির দুটি প্রধান দিক প্রয়োজনীয় জিনিসের উৎপাদন বৃদ্ধি ও তার সুষ্ঠু বণ্টন। এর মধ্যে প্রথমদিকে আমাদের অগ্রগতি আশানুরূপ হয় নি এবং দ্বিতীয় দিকে কোনো উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টাই হয় নি। আয়কর এবং সম্পকরের মাধ্যমে অসাম্য যেটুকু কমানো যায় তাও প্রতিহত হয়েছে নানারকমের চাপে। উঁচু আয়ের উপরে করের হার কয়েক বছর আগে অনেকটা কমানো হয়েছে। প্রয়োজনীয় জিনিসের সমানভাবে বণ্টনের জন্য প্রয়োজন দেশব্যাপী সরকারি বণ্টন ব্যবস্থা—যাতে অন্ততঃ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি—চাল, গম, কেরোসিন, মোটা কাপড় ইত্যাদি—সবাই সমানভাবে পেতে পারে। কিন্তু সরকারি বণ্টন ব্যবস্থা সহরাঞ্চলেই কার্যকর হয়েছে। গ্রামে যে নামমাত্র রেশন ব্যবস্থা আছে তাতে কারো প্রয়োজন মেটে না। উদাহরণ স্বরূপ দেখানো যায় যে কলকাতা-দুর্গাপুর-আসানসোল অঞ্চলের প্রায় ৯৩ লক্ষ লোকের জন্য রেশনে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য দেওয়া হয়, পশ্চিম বাংলার বাকি প্রায় চার কোটি লোককে সবশুদ্ধ তার চেয়ে বেশি দেওয়া হয় না। সরকারি বিক্রয়কেন্দ্র থেকে পাওয়া সস্তা দামের চিনি অপেক্ষাকৃত ধনীরাই ভোগ করেন। করদাতাদের টাকায় প্রচুর ভরতুকি দিয়ে যে দুধ বিক্রি করা হয় তাও বেশির ভাগ কেনেন অপেক্ষাকৃত ধনী ক্রেতারা।

আঞ্চলিক অসাম্য

ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত অসাম্য ছাড়াও আছে আঞ্চলিক অসাম্য। প্রথমদিকে অনেক অসুবিধা এবং সমস্যা ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় থেকে এক অঞ্চল এবং অন্য অঞ্চল বা এক রাজ্য ও অন্য রাজ্যের মধ্যে আর্থিক ব্যবধান দূর করার প্রচেষ্টা বিশেষভাবে করা উচিত ছিল। ১৯৭৫-৭৬-এ মাথাপিছু আয় সারা ভারতে ছিল ১০০০৫ টাকা। পঞ্জাব, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, হিমাচল প্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ—মাত্র এই ছয়টি রাজ্যে মাথাপিছু আয় সর্বভারতীয় গড়ের চেয়ে বেশি ছিল। সর্বোচ্চ গড়পড়তা আয় ছিল পঞ্জাবে (১৫৮০ টাকা) এবং সর্ব-নিম্ন আয় ছিল ওড়িশায় (৭৮৫ টাকা)—অর্থাৎ নানাদিকে উন্নতি প্রকল্প গ্রহণ করা সত্ত্বেও ভারতের এক অঞ্চলে মাথাপিছু আয় অন্য আর একটি অঞ্চলের দ্বিগুণ ছিল। এ তুলনার মধ্যে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে নেওয়া হয় নি, কারণ তাদের অনেকগুলিতে মাথাপিছু আয় অনেক বেশি—যেমন দিল্লীতে ২১৩০ টাকা বা গোয়া-দামন-দিউতে ১৬৮৯ টাকা। আমাদের সাতাশ বছরের পরিকল্পনা ব্যক্তিগত, শ্রেণীগত বা অঞ্চলগত কোনো অসাম্যই কমাতে পারে নি। বেকারের সংখ্যাও বেড়েই চলেছে—যারা বেকার তাদের আয় শূন্য এবং তারা সম্পূর্ণভাবে পরাশ্রিত।

অসাফল্যের কারণ

এই অসাফল্যের মূল কারণ গ্রামাঞ্চলের বিরাট জনসংখ্যার জন্য উপযুক্ত উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয় সৃষ্টির চেষ্টার অবহেলা। এর ফলে এখন শিল্পের ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে পড়েছে, কারণ আমাদের মত এত বড় দেশে কেবলমাত্র ধনী সম্প্রদায়ের চাহিদার উপর নির্ভর করে বড় শিল্পের প্রসার সম্ভব নয় তার জন্য চাই গণ-চাহিদা। এই চাহিদা আসতে পারে যদি গ্রামবাসীদের কর্মসংস্থান হয় এবং তাদের হাতে ক্রয়ক্ষমতা আসে। দেশের লোকের জন্য যথেষ্ট কাপড় নেই অথচ গুদামে অ-বিক্রীত কাপড় পড়ে আছে, এই অসম্ভব অবস্থা তখনই সম্ভব হয় দরিদ্রজনগণের ক্রয়ক্ষমতা দিয়ে [illegible] নাও সম্ভব হয় না। গ্রামোন্নয়ন সম্বন্ধে প্রত্যেক পরিকল্পনাতে অনেক বড় বড় কথা বলা হয়েছে, কিন্তু সত্যিকারের কাজ হয় নি। কৃষির উন্নতির জন্য অবশ্য বিপুল বিনিয়োগ করা হয়েছে—সেচ ব্যবস্থার

॥ সান্যাল প্রকাশনের নূতন বই ॥

নৈহাটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিষয়ে সুবৃহৎ সংকলন

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মারকগ্রন্থ

হরপ্রসাদের অনন্যসাধারণ মনীষা ও সৃজনপ্রতিভার সামগ্রিক পরিচয় প্রতি-ফলিত হয়েছে ৫০০ পৃষ্ঠার সংকলনের অন্তর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে লেখা দেশ-বিদেশের মনীষী বিশ্বজনের লেখা ৮০ খানি চিঠি এবং ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ অন্যান্য লেখকদের ২৫টি রচনায়। আর আছে হরপ্রসাদের পূর্ণাঙ্গ জীবনপঞ্জী, কুলজি এবং রচনাপঞ্জী।

'স্মৃতিকথা'য় ও 'মূল্যায়নে' হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পর্কে লিখেছেন : রবীন্দ্র-নাথ, মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুশীলকুমার দে, রাধাগোবিন্দ বসাক, রমেশচন্দ্র মজুমদার, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, দীনেশচন্দ্র সরকার, গোপাল হালদার, ভবতোষ দত্ত, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে ॥

সীমিত সংখ্যক কপি ছাপা হয়েছে। মূল্য ৩০ টাকা

বিক্রয়কেন্দ্র : জয়দুর্গা লাইব্রেরী ৮এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

উন্নতিতে বা সার-উৎপাদনে কিন্তু এই বিনিয়োগের সুবিধা বড় চাষীরাই পেয়েছে। ছোট ক্ষেতের চাষীর এই সুবিধা তো পায়-ই নি, বরং অনেক ক্ষেত্রে তার বাধ্য হয়ে নিজের জমি বড় চাষীকে ইজারা দিয়ে নিজে কৃষি-শ্রমিকে পরিণত হয়েছে।

সমস্ত গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতের প্রসার হলে ছোট শিল্প সেখানে গড়ে উঠতে পারত। পল্লী-বিদ্যুতায়ন প্রকল্প কোনো কোনো রাজ্যে—যেমন পাঞ্জাবে—সফল হয়েছে অন্য অনেক রাজ্যের চেয়ে বেশি। আগেই বলেছি যে বর্তমানে আমাদের দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যে স্থাপিত উৎপাদন-শক্তি আছে, তার শতকরা ৭৫-এর বেশি কাজে লাগানো হয় না। কোনো কোনো রাজ্যে—যেমন পশ্চিমবঙ্গে—তার চেয়েও কম। বিদ্যুৎ বিভ্রাটে ছোট শিল্প থেকে বড় শিল্প সবই ব্যাহত হচ্ছে। ট্যাক্স-মকুব, কম সুদে টাকা ধার ইত্যাদি নানারকম সুবিধা দিয়ে শিল্পের প্রসারের সব রকম প্রচেষ্টা বিফল হয়ে যাচ্ছে, নিয়মিতভাবে প্রয়োজনীয় পরিমাণে বিদ্যুতের সরবরাহ করতে না পারাতে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে এই ঘাটতি আমাদের গত দশ-পনেরো বছরের পরিকল্পনার একটা বড় অসাফল্য। যদি ঠিকমত পরিকল্পনা তৈরি হোত এবং তার রূপায়ণের সার্থক চেষ্টা হোত তাহলে বর্তমান অবস্থাটাকখনোই আসত না। অনেকবার দেখা গিয়েছে যে পরিকল্পনা-ব্যয়ের সাশ্রয়ের জন্য বিদ্যুৎ-প্রকল্পগুলি সর্বাগ্রে বাদ দেওয়া হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বিদ্যুতের ভবিষ্যৎ প্রয়োজন সম্বন্ধে যে হিসাব করেছেন, অর্থ দপ্তর তা বাতিল করে দিয়েছেন। রক্ষণা-বেক্ষণে অবহেলা বা শ্রমিক-অসন্তোষ বা ঐ রকম অনেক কারণে বিদ্যুতের অভাব বেড়েছে, কিন্তু মূল পরিকল্পনার গলদ অস্বীকার করবার উপায় নেই।

বিদ্যুতের বেলাতে যা হয়েছে, আমাদের সামগ্রিক পরিকল্পনাতেও অনেকাংশে তাই হয়েছে। ইঞ্জিনীয়র, বৈজ্ঞানিক বা অর্থনীতিবিদ যে পরিকল্পনাকে গ্রহণীয় বলে দেখিয়েছেন এবং সেটা রূপায়ণের জন্য আর্থিক সামর্থ্যও বিচার করেছেন। প্রশাসনিক অবহেলা এবং অকর্মণ্যতার ফলে তার গতিপথে বাধা পড়েছে। বস্তুত, ইংরেজ শাসনকর্তারা উনিশ শতকে সাম্রাজ্য শাসনের জন্য যে প্রশাসন রীতি তৈরি করেছিলেন এবং যার মূলে ছিল অধস্তন ভারতীয় কর্মচারীদের উপরে অবিশ্বাস, সেই রীতিই আমরা স্বাধীন ভারতে এবং আর্থিক যোজনায় অব্যাহত রেখেছি। একটা ছোটখাট প্রকল্প অনুমোদিত হতে দু'বছর লেগে যায়, কাজ আরম্ভ করবার পর যদি কোনো পরিবর্তন প্রয়োজন হয় তাহলে ফাইল আবার ভারী হয়ে ওঠে। বরাদ্দ টাকা বছরের শেষে খরচ না হলে আবার নূতন করে অনুমোদন নিতে হবে এই ভয়ে মার্চ মাসে তাড়াহুড়ো করে অপব্যয় করাটা স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে। এর উপরে আছে প্রত্যেক প্রশাসনিক বিভাগের চেষ্টা কী করে নিজেদের সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখা যায়। অথচ, অনেক প্রকল্পই বিভিন্ন বিভাগের সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব নয়—যেমন একটা সেচ প্রকল্পের জন্য দরকার হবে কৃষি ও সেচ বিভাগের যৌথ প্রচেষ্টা, যে দপ্তরগুলি থেকে সিমেন্ট বা লোহা বিলি হয় তাদের সহযোগ, করলা, বিদ্যুৎ, পরিবহন

রাজশেখর বসুর সমগ্র রচনাবলীর সুলভে গ্রাহক করা হইতেছে

পরশুরাম গ্রন্থাবলী

(তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ) সম্পূর্ণ মূল্য : ৭৫.০০

আপনার জন্য গ্রাহক মূল্য

৫০.০০

॥ এতে আছে ॥

প্রথম খণ্ড : গড্ডলিকা, গল্পকল্প, ধুস্তুরী-মায়া, জামাইষষ্ঠী, লঘুগুরু, কবিতা। **দ্বিতীয় খণ্ড :** কজ্জলী, আনন্দীবাঈ, চমৎকুমারী, চলচ্চিন্তা, রবীন্দ্রকাব্য বিচার, কবিতা। **তৃতীয় খণ্ড :** হনুমানের স্বপ্ন, নীলতারা, কৃষ্ণকলি, বিচিন্তা, কবিতা।

রাজশেখর গ্রন্থাবলী

(তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ) সম্পূর্ণ মূল্য : ৭৫.০০

আপনার জন্য গ্রাহক মূল্য

৫০.০০

॥ এতে আছে ॥

প্রথম খণ্ড : কুটিরশিল্প, ভারতের খনিজ, কালিদাসের মেঘদূত, শ্রীমদ্ভাগবত গীতা, হিতোপদেশের গল্প। **দ্বিতীয় খণ্ড :** বাল্মীকি রামায়ণ, **তৃতীয় খণ্ড :** কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাসকৃত মহাভারত।

॥ নিয়মাবলী ॥

দুটি গ্রন্থাবলীরই পৃথকভাবে প্রথমে ২০.০০ টাকা দিয়া নাম তালিকাভুক্ত করিতে হইবে। বাকী ৩০.০০ টাকা দু'বারে ১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড লইবার সময় পৃথকভাবেই ১৫.০০ টাকা করিয়া দিতে হইবে। তৃতীয় খণ্ড লইবার সময় কোনও টাকা লাগিবে না। যাঁহারা ডাকে বই লইবেন তাঁহারা প্রথম ২০.০০ টাকার পরিবর্তে ২৩.০০ টাকা এবং অনুরূপভাবে বাকী ১৫.০০ টাকা করিয়া দু'বার পাঠাইবার সময় ডাকমাশুল বাবদ আরও ৩.০০ অর্থাৎ ১৮.০০ টাকা করিয়া পৃথকভাবে পাঠাইবেন।

॥ মুদ্রণ সংখ্যা খুবই সীমিত ॥ দুটি গ্রন্থাবলীরই ১ম খণ্ড নভেম্বরে পাওয়া যাইবে ॥

এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ ॥ ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০৭৩, ফোন : ৩৪-১৭৮২

ইত্যাদি সব বিভাগের সক্রিয় সমর্থন। মাসের পর মাস ফাইল ঘুরতে থাকে এবং প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের জন্য নূতন করে 'কাগজী' প্রশাসনের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। একটা স্বাধীন দেশে দ্রুত আর্থিক উন্নতি আনতে হলে প্রশাসনের যে শিক্ষা ও মনোভাব প্রয়োজন সেটা তৈরি করবার কোনো চেষ্টাই করা হয় নি।

প্রশাসনিক দুর্বলতা

গত পাঁচটি পরিকল্পনাতে অনেক অসম্পূর্ণতা ছিল—যেমন পল্লী উন্নয়নে অবহেলা—এবং অনেক অসঙ্গতি ছিল—যেমন শিল্প-প্রসার ও বিদ্যুতের চাহিদার মধ্যে সংহতি না রাখা। কিন্তু পর পর পরিকল্পনাগুলিতে যে সব প্রকল্পের ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেগুলি যথাসময়ে এবং পরিপূর্ণভাবে রূপ দিতে পারলে আমাদের জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি বছরে শতকরা সাড়ে তিনের চেয়ে অনেক বেশি হতে পারত। অবশ্য চীনা আক্রমণ, পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষ বা খনিজ তেলের দাম বৃদ্ধিতে বিঘ্ন ঘটেছে, কিন্তু প্রশাসনিক বাধার ফলে যে সব প্রকল্প সময়মতো ও পুরোপুরি রূপায়িত হতে পারে নি তার সংখ্যা অজস্র।

এই প্রশাসনিক দুর্বলতারই একটা স্পষ্ট প্রকাশ মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্য বৃদ্ধিতে। দরিদ্র দেশে দ্রুত আর্থিক উন্নতি আনতে গেলে নানাদিকে চাহিদার বৃদ্ধি হয় এবং সরবরাহ যদি সেই অনুপাতে না বাড়ে তাহলে কিছুটা মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অল্প পরিমাণে মূল্যবৃদ্ধি—যেমন বছরে শতকরা তিন বা চার—সহজেই মেনে নেওয়া যায় এবং এটাও বলা যায় যে ধীরে ধীরে মূল্যস্তর বাড়লে বেসরকারি উৎপাদনে কিছুটা উৎসাহও আসতে পারে। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধির হার যদি বছরে শতকরা পনেরো, কুড়ি বা এমন কি ত্রিশ পর্যন্ত হয় (যেমন হয়েছিল ১৯৭৩-৭৪এ) তাহলে সব হিসাব অর্থহীন হয়ে পড়ে, উৎপাদন ব্যাহত হয়, আয় বণ্টনে অসাম্য বাড়ে, দরিদ্রের উপরে বোঝা বাড়ে। সরকার ইচ্ছা করলেই মুদ্রাস্ফীতি রোধ করতে পারেন একথা ঠিক নয়, কিন্তু কর-ব্যবস্থা ব্যাঙ্কের ঋণদান নীতি, সরকারি ব্যয়ের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি দিয়ে মূল্যবৃদ্ধির প্রকোপ কমাতে পারেন অনেকটা।

১৯৭১ থেকে ১৯৭৪ যে মূল্যবৃদ্ধি হয়েছিল [illegible] তিন বছরে মোট প্রায় ৭৪ শতাংশ) তা মানো অসম্ভব ছিল না। পরে দেখা [illegible] যে ১৯৭৪ সালে সুদের হার বাড়িয়ে এবং কর-নীতির পরিবর্তন করে মূল্যস্তরকে নামানো যায়। 'জরুরি অবস্থার' ফলে দাম কমেছিল, এ ধারণা ভুল—কারণ দাম কমতে আরম্ভ হয়েছিল জুন ১৯৭৫-এর অনেক আগে এবং জরুরি অবস্থার শেষদিকে দাম আবার বাড়তে আরম্ভ করে। সর্বোপরি এটা মনে রাখা দরকার যে পরিকল্পনা অনুসারে প্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্যের (বিশেষ করে খাদ্যশস্যের) উৎপাদন যদি যথেষ্ট বাড়ে, তাহলে চাহিদা বৃদ্ধি সত্ত্বেও বেশি রকমের মূল্যবৃদ্ধি হবে না। আমরা দেখেছি যে ভাল খাদ্যশস্য উৎপাদন হলে সব দামই কমে যায়, আর উৎপাদন ভাল না হলে মূল্যস্তরের উপরে চাপ পড়ে। আমাদের আর্থিক পরিকল্পনার অসাফল্যের একটা বড় দিক হোল যে সেচ, সার তৈরি, পরিবহন ইত্যাদিতে বহু সহস্র কোটি টাকা নিয়োগের পরেও আমাদের কৃষি উৎপাদন এখনো সময়মত বৃষ্টিপাতের মুখাপেক্ষী।

উন্নততর পরিকল্পনা

কেউ কেউ একথা বলে থাকেন যে সরকারি খাতে সাতাশ বছরে সত্তর-আশি হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের পরে জাতীয় আয়ের উন্নতির হার বছরে মাত্র সাড়ে তিন শতাংশ হলে, পরিকল্পনার প্রত্যক্ষ ফল অতি সামান্য। তাঁরা বলেন যে যদি কোনো পরিকল্পনা গৃহীত না হোত, তাহলেও সহজ ঐতিহাসিক কারণে জাতীয় আয় বছরে দুই শতাংশ করে বাড়তে পারত। অর্থাৎ পরিকল্পনার প্রত্যক্ষ ফল হোল জাতীয় আয়ের বৃদ্ধিটাকে মাত্র দেড় শতাংশ বাড়ানো। এ-যুক্তিটা পুরোপুরি ঠিক নয়। কোনো পরিকল্পনা না নিলে জাতীয় উৎপাদন কতটা বাড়ত সেটা জোর করে কেউ বলতে পারে না। তা ছাড়া উৎপাদন কোন্ কোন্ জিনিসের হোত তাও ঠিক বলা যায় না। খাদ্য ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের উৎপাদন পরিকল্পনাকালে বেশি বাড়ে নি, অন্যদিকে বিলাসদ্রব্যের উৎপাদন বেড়েছে কিন্তু পরিকল্পনার নীতি না নিলে যা হয়েছে তাও বোধহয় হোত না। ধনীজনের চাহিদা মেটাতেই সব মূলধন ও শ্রমশক্তি ব্যয়িত হয়ে যেত।

পরিকল্পনার অসাফল্যের দিকটাতে জোর দেওয়ার প্রয়োজন হলেও এটা অনস্বীকার্য

রয়েল বীণাপাণি

স্বাধীনতার পুণ্য প্রভাতে পঙ্গু সমাজের ঘৃণ্য রক্তাক্ত দলিল

নীলোৎপল দের—

লালহুন্ডি

নির্দেশনা/সুর : নীলোৎপল দে। নৃত্য : অনুশীলা

পান্না সম্রাট বসুজেন দে'র শাশ্বত পৌরাণিক অশ্রুঝরা পালা

লীলানিমাই

নির্দেশনা : বিজন মুখার্জী ॥ সুর : প্রশান্ত ভট্টাচার্য

শ্রেঃ- বিজন মুখার্জী, ছবি রায়, গোরাশশী, অনুশীলা, গোপী দে, রীণা চ্যাটার্জী, অনিল রায় বুলারাণি, কুমার নিরঞ্জন, কুমারী কৃষ্ণা, সঞ্জীব কুমার, সবিতা, শ্যামকুমার, নীলিমা, রথীন; নিখিল, প্রণয়কুমার, কার্তিক, লাবণ্য, গৌতমকুমার এবং নট ও নাট্যকার নীলোৎপল দে ও বেতার, চিত্র, মঞ্চের বাসন্তী চ্যাটার্জী!

জেঃ ম্যাঃ দিলীপ দাশগুপ্ত ॥ ম্যানেঃ ঝন্টু দাস

সর্বাধিনায়ক : কানাই ভট্টাচার্য ফোন : ৫৫-৭৫৫২

প্রতিটি গ্রন্থাগারে রাখারও পড়বার মত বই

সন্তোষকুমার ঘোষের ভূমিকা সম্বলিত প্রবীর ঘোষ সম্পাদিত—

বিশ শতকের নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প

১ম—২০-০০ ও ২য়—২০-০০

সংকলনটি সম্পর্কে বিশিষ্ট কয়েকজন সাহিত্যিকের মতামত—

"ছোট গল্পের ধারাকে জানতে হলে শুধু সাধারণ পাঠক নয়, গবেষকদের পক্ষেও সংকলনটি অপরিহার্য"—মনোজ বসু।

'পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক ও নানা রসের নানা স্বাদের গল্প সংকলনটি অনবদ্য।'

—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

"পাঠান্তে ধন্যবাদ দিন উদ্যোগী প্রবীর ঘোষকে—যিনি অনেক বছর, অনেক দশককে সার্থক মিলিয়েছেন'—সন্তোষকুমার ঘোষ।

"বিশ শতকের নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প সম্পাদক ও প্রকাশকের পক্ষে নিঃসন্দেহে মহৎ কাজ হিসেবে বিবেচিত হবে"—সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ।

প্রথম অধ্যায়ে লিখেছেন :—মনোজ বসু, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সতীনাথ ভাদুড়ী, প্রবোধ সান্যাল, মানিক বন্দ্যোঃ, বুদ্ধদেব বসু, সুবোধ ঘোষ, আশাপূর্ণা দেবী, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল মিত্র, কমল মজুমদার, নরেন্দ্র মিত্র, অমিয়ভূষণ মজুমদার, নারায়ণ গঙ্গোঃ, আশুতোষ মুখোঃ, সন্তোষকুমার ঘোষ, ননী ভৌমিক, বিমল কর, সমরেশ বসু, রমাপদ চৌধুরী, বুদ্ধদেব, মহাশ্বেতা দেবী, অসীম রায় ও অরুণ বাগচী। দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখেছেন—প্রবোধবন্ধু অধিকারী, বরেন গঙ্গোঃ, মুস্তাফা সিরাজ, কবিতা সিংহ, মতি নন্দী, শ্যামল গঙ্গোঃ, সন্দীপন চট্টোঃ, অতীন বন্দ্যোঃ, প্রফুল্ল রায়, সুনীল গঙ্গোঃ, শীর্ষেন্দু মুখোঃ, দেবেশ রায়, বুদ্ধদেব গুহ, সঞ্জীব চট্টোঃ, দিব্যেন্দু পালিত, রমানাথ রায়, সমীর রক্ষিত, শেখর বসু, বলরাম বসাক, সুব্রত সেনগুপ্ত, শৈবাল মিত্র, প্রবীর ঘোষ, শচীন দাস, রাধানাথ মন্ডল ও অমর মিত্র।

আপনাদের সকলের চিরপরিচিত **সুধাংশু পাত্রের** এক বিস্ময়কর আবিষ্কার—

আবিষ্কারের কাহিনী ৭-০০

এই গ্রন্থে পাবেন ৪৪ জন আবিষ্কারকের বিস্ময়কর ৪৪ রকমের আবিষ্কার কাহিনী, কি করে টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বিদ্যুৎ, চলচ্চিত্র, সার্জারী, ঘড়ি, জল, গাড়ি, উড়োজাহাজ প্রভৃতির আবিষ্কারককে জানতে হলে পড়ুন ও ছোটদের এই বই পড়ান।

আকাশবাণী খ্যাত **বেলা দে'র**

গৃহিণীর অভিধান ২৫-০০

একমাসে ২য় সংস্করণ নিঃশেষিত। পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত ৩য় সংস্করণ। ২য় সংস্করণে যা ছিল ৩য় সংস্করণে আরো ২০০ পৃষ্ঠা সংযুক্ত হল। ৬০০ পৃষ্ঠার বিশাল অভিধান ৪০ টাকার স্থলে প্লাস্টিক জ্যাকেট সহ মাত্র ২৫ টাকায় পাবেন।

এই সংস্করণে পাবেন—আমাদের শিক্ষা, সংসার পরিচালনা, ঘর ও ফুল সাজানো, বাগান, বস্ত্রধৌতি, ডাইং ক্লিনিং, মা ও শিশু, শিশু পরিচর্যা, নার্সিং, নানান ধরনের সেলাই, বোনা ও প্যাটার্ন, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য, রূপ চর্চা ও প্রসাধন, যাবতীয় রান্না, চাইনিজ, ফ্রেঞ্চ, ইংলিশ, ইতালী, পার্শি, বর্মি, জার্মান-ডাচ, বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, উত্তর ভারত, যুক্তপ্রদেশ, গুজরাট, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের রান্না ও জল খাবার, ৫০ রকমের মিষ্টান্ন ও নোনতা, জ্যাম জেলী, কাসুন্দী, আচার, বিস্কুট, সাবান, দেশলাই, মোমবাতি, কালি, সেন্ট, স্নো, পাউডার, আলতা, সিন্দুর, তেল, ধূপকাঠি প্রভৃতি তৈয়ারীর প্রণালী, টুকিটাকি ও ঘর-গৃহস্থালীর বিভিন্ন বিষয় জানতে ও শিখতে হলে প্রিয়জনদের পড়ান ও পড়ুন।

বাংলা ভাষাতে এই প্রথম! অনুবাদ সাহিত্যে বিস্ফোরণ। রহস্য জগতের চার-জন বিতর্কিত ঔপন্যাসিকের চারিটি ভিন্ন স্বাদের কাহিনীর অনবদ্য সংকলন—

নিশীথ তৃষা ১১-০০

এতে আছে—০০৭ সিক্রেট এজেন্ট জেমস বন্ডের দুরন্ত গতির স্পাই উপন্যাস জেমস হেডলী চেজের নিষাদ রোমাঞ্চের শ্বাসরুদ্ধ কাহিনী, নিক কার্টারের কামনা-শিহরিত থ্রীলার এবং অ্যালিস্টেয়ার ম্যাকলিনের অ্যাকশন-প্যাকড নভেলেট। সব বয়েসের সব রুচির পাঠক-পাঠিকাদের কাছে এই সংকলন অন্তরঙ্গ হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

পাত্র'জ পাবলিকেশন

২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ ফোন : ৩৫-৬০৬২

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়-এর—

মহানন্দা ১২-৫০

সুনন্দর জার্নাল

১ম ও ৩য় প্রতিটি ৯,

চিরঞ্জীব সেন-এর—

আসামী ফেরার ৭,

আশাপূর্ণা দেবী'র—

সোনার কৌটো ৮,

ডঃ আশা দেবী'র—

ছায়া ফেলা সন্ধ্যা ৫,

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ-এর—

বহুবর্ণ ৭,

নীহাররঞ্জন গুপ্ত-এর—

মাধবী ভিলা ৬,

অন্তরাগ ৬,

নিক কার্টার-এর—

বাঘিনীর চোখে ঘুম নেই ৮,

সাগর সহেলীর ফাঁস ১০,

স্যার হল কেইন-এর

ইটারন্যাল সিটি

১ম ও ২য় প্রতিটি ১৫,

পাল 'এস, বাক-এর—

লেটার ফ্রম পিকিং ১০,

রেনবো ১২,

রবার্ট ম্যাককান-এর—

স্ক্যান্ডাল সি-আই-এ ১০,

অ্যালিস্টেয়ার ম্যাকলিন-এর—

দি ওয়ে টু ডাস্টি ডেথ ১২,

ব্রেক হার্ট পাস ১২,

স্বাধীনতার পুন্যলগ্নে শুভেচ্ছা জানাই

— আমাদের ৮৫'র পালা —

হারু রায় রচিত পৌরাণিক পালা

কৃষ্ণশিশুপাল

নির্দেশনা—মহেন্দ্র গুপ্ত সুরকার— রাজেন সরকার

ন দে রচিত ঐতিহাসিক নাটক

সম্রাট-জাহাঙ্গীর

নির্দেশনা— সুজিত পাঠক সুরকার— অমিয় ভট্টাচার্য

কানাই নাথ রচিত সামাজিক পালা

কার পাপে?

সুরকার— তরুণ মুখোপাধ্যায়

শেষ—ন-টে-না-য়-ক

সুজিত পাঠক

ঠাকুরদাস মিত্র, ভক্ত মল্লিক

মায়া পাল ও শর্মিষ্ঠা দাস

গুরুদাস মিত্র, কৃষ্ণকুমার, দিব্যেন্দু মুখার্জী ও সীমা ঘোষ, কার্তিক অধিকারী, সজল ব্যানার্জী, শিশির চ্যাটার্জী, দুর্গাদাস ব্যানার্জী, ডঃ দীপক-কুমার, শংকর ভট্টাচার্য, বাসুদেব, কুমারজ্যোতি, মল্লিকা চ্যাটার্জী, লতা অধিকারী।

আবহসঙ্গীত পরিচালনা— খোকা মল্লিক

ম্যানেজার—অনিলবরণ সরকার ও ক্ষেত্রমোহন পাত্র

জেনারেল ম্যানেজার : অভয় সাহা

পারফরমেন্স

সিনেমিহল

৩৯২ডি, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬

কার্য যে ব্যাপকতর এবং গভীরতর পরি-কল্পনার পথেই আমাদের চলতে হবে। সম্প্রতি সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও উদ্যোগের বিরুদ্ধে যে একটা মত উঁচু মহলে গড়ে উঠেছে সেটা কার্যকর হলে দরিদ্র জনগণের দুঃখদুর্দশার আরো অবনতি হবে। অসম্পূর্ণ এবং অ-সফল পরিকল্পনার প্রতিকার আসবে পরিকল্পনার পরিহারে নয়, সেটা আসবে পরিকল্পনার সংগঠন ও রূপায়ণকে আরো সুষ্ঠু, দক্ষ এবং সৎ করা থেকে। গত সাতাশ বছরের কৃতিত্বের দিকটা অবহেলা করবার মত অসুবিধা, কোথায় পুনরুপ-রূপায়ণের পদ্ধতি সংস্কার করা প্রয়োজন, এসবই আগের চেয়ে অনেক ভাল জানি। দশ বছর আগেও আমাদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে যতটুকু তথ্য পাওয়া যেত এখন তার চেয়ে অনেক বেশি পাওয়া যায়। আমাদের বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনীয়ররা এখন যে উঁচুস্তরের জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেছেন তাতে পৃথিবীর সর্বত্র তাঁদের সমাদর করে ডেকে নেওয়া হয়। আমাদের অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান বিশেষজ্ঞরা আমাদের মূল সমস্যাগুলির গভীর ও তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনা করে অনেক ভ্রান্তি নিরসন করেছেন এবং অনেক নূতন দিগন্ত দেখিয়েছেন।

গত পাঁচটি পরিকল্পনার উন্নতির যে ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে সেটা আশানুরূপ না হয়ে থাকলেও, সেটাকে অস্বীকার করা অসঙ্গত: এই ভিত্তি থেকে আরও কম নূতনতর পরিকল্পনা নেবার পথ এখন প্রশস্ত। আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা যে আমরা অনেক শিখেছি—সেই শিক্ষাকে এখন কাজে লাগানো প্রয়োজন। কী করতে হবে এবং কোন পথে গেলে কিছু হবে না। দুই-ই আমাদের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার অঙ্গ। প্রশাসনিক রীতির পরিবর্তন সম্বন্ধেও অনেক আলোচনা হয়েছে—একবার সাহসের সঙ্গে এই পরিবর্তন আনতে পারলে পরি-কল্পনার রূপায়ণ অনেক সহজ হবে এবং প্রশাসনিক পরিবর্তনে দেশের বৈজ্ঞানিক, যন্ত্রশিল্পী প্রমুখ বিশেষজ্ঞদেরও কাজে লাগানো যাবে। জাতীয় আয় যেখানে সহজেই শতকরা সাড়ে চার, পাঁচ বা তারো বেশি হারে বাড়ানো যেতে পারে, সেখানে আমাদের বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনীয়রদের রিক্ত হাত নিয়ে চলে যেতে হয় এর চেয়ে দুঃখের কথা আর কিছু হতে পারে না। আর্থিক উন্নতির বড় সমস্যাটা অর্থের নয়—আমাদের যা সংস্থান আছে (আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়, সঞ্চিত বিদেশী মুদ্রা ও সম্ভাব্য বিদেশী

...ায়) তাতেই আমরা অনেকদূর অগ্রসর ...পারি। শ্রমশক্তির আমাদের অভাব নেই এবং দক্ষ শ্রমিকের সংখ্যাও বহুগুণে বেড়েছে। কৃষি ও পল্লীশিল্পের উন্নতির ...রাট ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে। প্রশাসনিক উন্নতি ...লে রক্ষণ ব্যবস্থারও উন্নতি করা ...নিক তেলের সমস্যা এখন আর তেমন ...রুতর নয়। বিদ্যুৎ ঘাটতি অনেকটা ...র্মানে উৎপাদন ক্ষমতার পরিপূর্ণ ...ব্যবহার করেই মেটানো যায়, আর নূতন ...উৎপাদন ক্ষমতা তৈরি করার পরিকল্পনা ...তন-চার বছরের মধ্যেই সফল করা যায়।

ভারতীয় অর্থনীতিতে যে দুটি ...জিনিসের অভাব সব চেয়ে বেশি ছিল—...দ্যশস্য ও বিদেশী মুদ্রা—সে জিনিস-...লির উৎপাদন ও পরিমাণ এখন খুবই ...আশাপ্রদ। এই অবস্থায় যদি আমরা আমাদের ...তুন পরিকল্পনা সফল না করতে পারি, ...হলে তার মার্জনা নেই। এর জন্য সর্বাগ্রে ...য়োজন একটি দৃঢ় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ...আর্থিক উন্নতির পথে কোনো প্রশাসনিক ...রাজনৈতিক বাধা কে কার্যকর হতে দেওয়া ...হবে না। আর্থিক পরিকল্পনার সাফল্যের ...সঙ্গে সময়েই থাকে অনতিক্রমনীয় ...শর্ত বিচার ও সিদ্ধান্ত। এক বার ...একদিকে দৃঢ়ভাবে পদক্ষেপ করা হলে ...আমাদের পরিকল্পনা যথাযথ ভাবে সফল ...হবার কোনো কারণ নেই।

১৯৭৮-৮৩'র পরিকল্পনা

১৯৭৮ থেকে ১৯৮৩ র জন্য প্রবহমান ...পরিকল্পনার প্রথম পঞ্চবার্ষিক কিস্তির যে ...খসড়া প্রকাশিত হয়েছে তাতে এ সবই ...রয়েছে। এই নূতন খসড়াতে ন্যূনতম প্রয়ো-...জনের তালিকা সংশোধন করে প্রাথমিক ...শিক্ষা স্বাস্থ্য কেন্দ্র, গ্রামাঞ্চলে রাস্তা ...ঘাট এবং পানীয় জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ...ব্যবস্থার, বাসগৃহের জন্য জমির ব্যবস্থা ...প্রভৃতির জন্য আগামী পাঁচ বছরে অনেকটা ...অগ্রসর হবার ব্যবস্থা হয়েছে। কৃষি, জল-...সেচ, রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ...বিনিয়োগ বাড়ানো হয়েছে এবং এর মধ্যে ...অনেকটাই পল্লী অঞ্চলের উন্নতিতে ব্যয়িত ...হবে। সরকারি ক্ষেত্রে মোট বিনিয়োগ পঞ্চম ...পরিকল্পনার তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হবে। ...কিন্তু এটা সবচেয়ে বড় কথা নয়। কারণ ...অতীতেও অনেকবার এই খাতে বিনিয়োগ ...বাড়ানো হয়েছে। এবারে সব চেয়ে উল্লেখ ...যোগ্য প্রস্তাব হোল যে মোট বিনিয়োগ ...৩,৩৮০ কোটি টাকার মধ্যে ২৯,৯২৫ কোটি ...টাকা, অর্থাৎ শতকরা ৪৩-১ ভাগ পল্লী অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য ব্যয়িত হবে। আগের পরিকল্পনাতে এই অনুপাত ছিল ৩৭-৫।

পরিকল্পনার কমিশন প্রশাসনিক পদ্ধতি, প্রকল্প রূপায়নের কার্যবিধি এবং এর মূল্যায়নের ব্যবস্থার উন্নতির উপরে জোর দিয়েছেন। পরিকল্পনা সফল করতে হলে মূল প্রয়োজন কী হবে সে সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তাতে আশান্বিত হবার কারণ হয়েছে। কমিশন বলেছেন যে সাফল্যের জন্য প্রয়োজন প্রথমত পরিকল্পনার রূপ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জাতীয় মতৈক্য দ্বিতীয়ত, প্রয়োজনীয় সঞ্চয় ও সম্বন্ধ সংগ্রহে সরকারের স্থির প্রতিজ্ঞ প্রচেষ্টা, এবং চতুর্থত পরিকল্পনা সম্বন্ধে জনগণের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চার। এর জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন হোল সমস্ত আবশ্যকীয় ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত রাজনৈতিক দৃঢ়তা। নূতন পরিকল্পনা কমিশন যে আশা প্রকাশ করেছেন, এর আগেও অনেকে অনেকবার তার উপরে জোর দিয়েছেন। এবারে দেশের লোক আশা করবে যে সরকারি দীর্ঘসূত্রতা, বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং এসবের সঙ্গে অমার্জনীয় আত্মতুষ্টির ভাবের ফলে সম্ভাব্য উন্নতি ব্যাহত হবে না।

বিশ্বাস হারিয়েছেন?

যে কোন সমস্যার সমাধান ও সঠিক প্রশ্নোত্তরের জন্য ভারতবিখ্যাত তান্ত্রিক পাগলাবাবা (বারাণসী)। ৪৫-সি, দুর্গাপুর লেন, চেতলা কলি-২৭। ৮টা—১২টা, ৪টা—৯টা ফোন—৪৫-৫৯২২

ফুড-এর চেয়েও ভাল
দুধেভরা সয়াবীন

পল্থনগরের সয়াবীনে শতকরা ৪২ ভাগ অর্থাৎ খাঁটি দুধের চেয়ে দশগুণেরও বেশী প্রোটিন আছে। এ জিনিস বাজারে আর কোথাও নেই। ডায়েবিটিস রোগীদের একান্ত নির্ভর-যোগ্য পথ্য। খেলোয়াড় ও ব্যায়ামবিদদের একমাত্র শক্তি-বর্ধক খাদ্য। শিশু, বৃদ্ধ, সুস্থ ও রোগী সকলের পক্ষেই পরম উপকারী, অতি সহজে দুধ, দই, ছানা, সন্দেশ, রসগোল্লা ইত্যাদি মিষ্টান্ন ও চপ, ফ্রাই, ঘুগনী প্রভৃতি মুখরোচক খাবার করা যায়। প্রস্তুত-প্রণালীসহ ৫০০ গ্রাম প্যাকেটে পাবেন। পল্থনগরের এক কেজি সয়াবীনে ছয় কেজি খাঁটি দুধ হয়। যে কোন ফুড-এর তুলনায় এখনো খুবই সস্তায় দেওয়া হচ্ছে। সম্ভ্রান্ত ডাক্তারখানা, স্টেশনারী, মুদিখানা এবং খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীদের স্টকিস্ট করা হচ্ছে। ৫০ পয়সার ডাকটিকিট পাঠালে স্টকিস্ট হবার নিয়মাবলী ও সয়াবীনের খাদ্য প্রস্তুত-প্রণালী বিনামূল্যে পাঠান হয়।

ডিসট্রিবিউটরস— (সারা পশ্চিমবাংলা)

পশুপতিদাস এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ

— কৃষি বিভাগ —

৩৭এ, ৪৩/২, এস, এন, ব্যানার্জি রোড, কলিঃ ৭০০০১৪

টেলিফোন: ২৪-৪৩৮৯, ৮২ - টেলিগ্রাম: ব্রাইসাকিংস

শ্রীমানিক্য
ভারতের ভাগ্য

১৪ আগস্ট ৩১ বছর পূর্ণ হবে স্বাধীন ভারতের। গত একত্রিশ বছর আমাদের স্বাধীন ভারতের নাগরিকদের উপর দিয়ে যেমন ঝড়-ঝঞ্ঝা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, আর্থিক দৈন্যতা, রাজনীতি দলের উত্থান-পতন, যুদ্ধ, ক্লেশ, দুর্ঘটনা, ক্ষয়-হানি ইত্যাদি গিয়েছে, তেমন স্বনির্ভরতায়, দেশগঠনে বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক প্রতিযোগিতার মধ্যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে, স্বাতন্ত্রে, সাম্য-শান্তির বাণী নিয়ে বিশ্বের দরবারে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে নিয়েছে। জ্যোতিষশাস্ত্র মতে মকর রাশির অন্তর্ভুক্ত ভারতবর্ষ। মকর রাশি—শনির ক্ষেত্র। দুঃখ-দুর্দশায় সহিষ্ণু, পরিশ্রমী, ক্লেশকারক, ত্যাগী, মহাযোগী, শনি-রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, ভিনদেশীদের দাসত্বের থেকে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট (ইং) যেই লগ্নে আমাদের স্বাধীনতা লাভ হলো, তারও রাজযোগকারক, গৃহ শনিগৃহ, সেই শুভ লগ্নটিতে রাশি ছিল কর্কট পুষ্যা নক্ষত্রে অর্থাৎ শনির নক্ষত্র এবং শনির মহাদশায় আমাদের স্বাধীনতা লাভ। তাই, শনির চরিত্রানুসারে আমরা কখন এই কন্টার্জিত স্বাধীনতার মর্মরস আনন্দের সাথে আস্বাদন করেছি—আবার কখনও তিক্ত-ভাব সাথে অবজ্ঞা, অপব্যবহার করেছি।

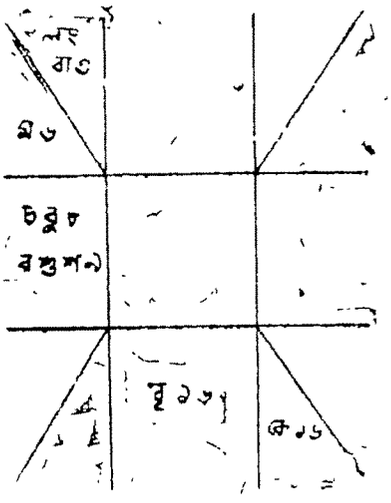

বস্তুবাদ, ধ্বংস, যুদ্ধ, রক্তের কারক মঙ্গলের সাথে অথবা উগ্র যোদ্ধা ধ্বংসাত্মক বিপর্যয়ের কারক রাহু যখনই এনেছে অস্থিরতা, তখনই শনি কঠোর, দুঃখ-দৈন্যতার মধ্য দিয়েও ত্যাগ, সাধনার দ্বারা এনেছে আশ্বাস, দিয়েছে প্রেরণা, রেখেছে গঠনের পথে সজীব। অতএব আমাদের দেশের পক্ষে শুভ-অশুভের জন্য এই মহাগ্রহ শনির প্রভাব, শনির ক্রিয়াকলাপ, শনির প্রতিপত্তি, শনির গতি-প্রকৃতি বহুলাংশে নির্ভরশীল, তাই শনির প্রতি-ক্রিয়া, সংযোগের প্রেক্ষা ইত্যাদির উপর দৃষ্টি রেখেই আমাদের দেশের জ্যোতিষীরা বেশির ভাগ ইঙ্গিত দিয়ে থাকেন। ত্রিশ বছর অন্তর শনির কর্কটে আগমন-নির্গমন অনুধাবন করলেই আমরা বুঝতে পারি যে, শনি আমাদের ভাগ্যের পক্ষে কতটা কারক গ্রহ। ১৯৪৭ সালে কর্কটে শনির অবস্থান কালেই দেশ স্বাধীনতা পেল অর্থাৎ শাসনতন্ত্রের এক ঐতিহাসিক পরিবর্তন ঘটাল। আবার ত্রিশ বছর পর ঐ শনি যখন মেষাদি বারটি রাশি পরিক্রমা করে কর্কটে এলো, আর এক ঐতিহাসিক পরিবর্তন ঘটালো ১৯৭৭ সালে। ত্রিশ বছর আগেও যেমন কর্কটস্থ শনি শাসন-ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটিয়ে সিংহ রাশিতে প্রবেশ করেও শোক-সন্তাপ, বাস্তুহারা-দের বিরাট দায়িত্বের বোঝা, কাশ্মীর নিয়ে বিভ্রাট ইত্যাদি ঝামেলাগুলিতে ভরপুর করে তুলেছিল, এবারও সিংহে প্রবেশ ক শনি অন্ধ্রের প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দুর্ঘট রাজনৈতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া খাদ্যশস্যে ঊর্ধ্ব মূল্যের চাপে দেশবাসীকে জর্জরি করে তুলেছে। কাজেই আমার মনে হয় শনির গতি-প্রকৃতির উপরই আমা দেশের শুভ-অশুভ বহুলাংশে নি নির্ভরশীল। অবশ্য অন্যান্য গ্রহদে কার্যকারিতা আছে। তবে সকলের ম শনির প্রাধান্যতাই বেশি।

বত্রিশ বছরে পদার্পণ করতে চলে আমাদের দেশ। শনি এখন সিংহ রাশি —থাকবে ১৯৭৯ সালের অক্টো পর্যন্ত। বর্তমানে শনি আছে কেত নক্ষত্রে, তারপর যাবে শুক্রে নক্ষত্রে ১৯৬৯ সালে শনি যখন ভারতের লগ্নে শুক্রের নক্ষত্র পেয়েছিল, তখনও আমা

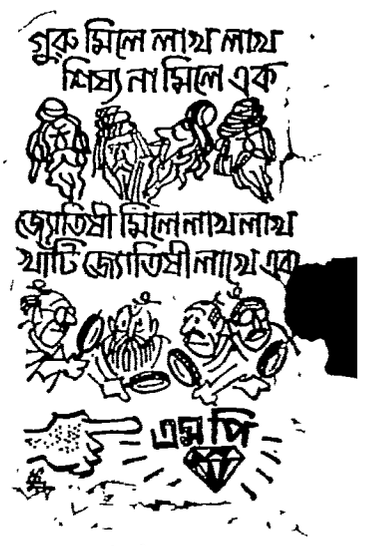

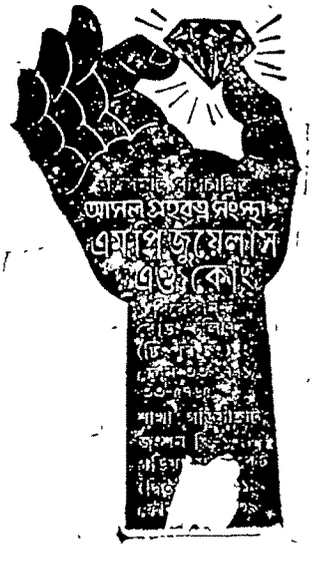

দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা চরমভাবে দেখা দিয়েছিল। দেখা দিয়েছিল নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতপার্থক্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় পরিবর্তন ইত্যাদি। ৯ সেপ্টেম্বর শনি শুক্রের নক্ষত্রে প্রবেশ করবে। আর ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শনি থাকছে কেতুর নক্ষত্রে। এই উভয় নক্ষত্রে শনির প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া আমরা পূর্বে আরও পেয়েছি। শনি যখনই কেতু এবং শুক্রের নক্ষত্র পেয়েছে, তখনই রাজনীতি ক্ষেত্রে এমন খেলা খেলেছে যাতে শাসকদলকে কেমন একটা ঝগড়া-কোন্দলে ফেলে ভাঙনের মুখে নিয়ে গেছে অথবা দল থেকে কয়েকজন নেতার বিদায়কে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে। শনিকে তার ত্যাগ, ধর্ম, সাধন-কর্ম থেকে বিচ্যুত করে ধ্বংস অশান্তির পথে নিতে রাহুর প্রভাবও কিছু কম-নয়। তাই এও দেখা গেছে, শনি যখন গোচরে রাহুর সাথে সম্পর্ক করেছে, তখনও আমাদের ভারতের অবস্থা মোটেই সুবিধার যায়নি। যুদ্ধাত্মক, ধ্বংস, শোকের কারক হয়েছে এই শনি-রাহুর সম্পর্ক। রাহু বর্তমানে কন্যা রাশিতে আছে। বছরের শেষ ২৮ ডিসেম্বর রাহু কন্যা থেকে সিংহ রাশিতে প্রবেশ করবে এবং সেখানে শনির সাথে সহাবস্থান করবে আগামী বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। শনি তারপর সিংহ রাশি থেকে যাবে কন্যাতে কিন্তু ৬ মাসের মধ্যে শনি বক্রী হয়ে আবার ফিরে আসবে সিংহ রাশিতে, থাকবে প্রায় ৩।৪ মাস এই সময়টার মধ্যে ভারতের রাজনীতিতে বহু পরিবর্তন, বহু উত্থান-পতন, কেন্দ্রে মন্ত্রিসভার রদবদল, হানাহানি, দুর্ঘটনা, কোন মুসলিম নেতাসহ কয়েকজন নেতার প্রাণহানির সম্ভাবনা ইত্যাদি অশুভ ইঙ্গিতগুলি দেখা যায়। এই সময়ের মধ্যে কয়েকজন নেতার রাজনীতি থেকে বিদায় দেশের কয়েকস্থানে অগ্নিতে ক্ষতি এবং সেনাদলের প্রয়োজনীয়তারও আভাস রয়েছে। উপরোক্ত অশুভ ফলগুলির মধ্যে বৃহস্পতির শুভ প্রভাব আমাদের বহুলাংশে রক্ষা-কবচ। স্বাধীনতা লাভের সময় ছিল কর্কট রাশি। কর্কট রাশি থেকে ভাগ্যপতি বৃহস্পতি এই আগস্ট মাস থেকেই কর্কটে অর্থাৎ আমাদের স্বাধীন ভারতের রাশিতে তুঙ্গ হয়ে এক বছর থাকবে। যতই বিশৃংখলা অথবা অস্থিরতা দেখা দিক, বৃহস্পতি তারই মধ্যে নিজের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে নতুন এবং স্থিরতার সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তুলবে। বৃহস্পতি আমাদের রক্ষা কবচের মত হয়ে থাকবে।

শনির দশাতে ভারতের স্বাধীনতা লাভ। শনির মহাদশায় বুধের অন্তর্দশাতে ব্রিটিশের হাত থেকে শাসন-ক্ষমতার হস্তান্তর হয়েছিল। এখন আবার বুধের মহাদশায় শনির অন্তর্দশা চলছে—চলবে '৮০ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। যদিও শনি এবং বুধ পরস্পর মিত্র, বসেও আছেন একই ঘরে এবং পরস্পর পরস্পরের নক্ষত্রকে বিনিময় করে। জ্যোতিষশাস্ত্রে এই যোগকে উত্তম যোগ বলে কিন্তু কেমন যেন শনি-বুধের এই পরিবর্তন যোগের দশা-অন্তর্দশাতে আমরা একটা 'পরিবর্তন' পেয়ে এসেছি।

দেশের বিচারকালে দেশ-কর্ণধার এবং শাসকদলের বিচারও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। দেশ-কর্ণধার প্রধানমন্ত্রীর সিংহ রাশি। প্রধানমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ করেন সিংহ লগ্নে। অতএব, ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমাদের ভারতের বুধ-শনির দশা লক্ষ্যণীয়। শাসকদল এই সময়ের মধ্যে বহু প্রকার অশান্তির চাপে জর্জরিত হতে হবে। কালোবাজারী, বাজেট ঘাটতি, বিদেশী বাণিজ্যে ঘাটতি, পার্লামেন্টে বিরোধী পক্ষের প্রতাপ এবং দেশে স্বার্থান্বেষীদের প্রতিক্রিয়া কোন মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে বিবাদ, নেতার মৃত্যু, প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্য ইত্যাদি।

উপসংহারে বলি, জ্যোতিষশাস্ত্র নির্ভুল না হলেও নির্দেশক, ইঙ্গিতবাহক।

শ্রীমাশিক

নিয়মিত **"রাজ জ্যোতিষী"** পড়ুন

পশ্চিম বাংলায় পুলিশি প্রশাসনের রদবদল
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভায় পরিবর্তন (এপ্রিল ১৯৭৮)

১৯৭৭ সনে মন্ত্রিসভার আমূল পরিবর্তন, ভারতের অভ্যন্তরে রাষ্ট্রপতি শাসন, উত্তরবঙ্গে ভূমিকম্প (জানুয়ারী '৭৭), প্রধানমন্ত্রীর সংশয় (মার্চ '৭৭)। ইন্দিরা গান্ধী.... কেউ তাঁকে সরিয়ে দিতে সমর্থ হবে না (মামলার সময়, জানুয়ারী '৭৬) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরের প্রাণহানি (জানুয়ারী ৭৫), প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই, হঠাৎ মহাকালের ডাকে সাড়া দেওয়াও অসম্ভব কিছু নয়, কর্মযোগী এই প্রধানমন্ত্রী হয়তো বা মহাকালের ডাককে কিছুকাল আটকিয়ে রাখলেও রাখতে পারেন (এপ্রিল '৭৭)। এই সকল বিস্ময়কর ভবিষ্যৎবাণী করে আন্তর্জাতিক জ্যোতিষী ও বিচারক

রাজ জ্যোতিষী মাসিক পত্রিকা সম্পাদক

শ্রী বীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী ফোন : ৫৪-১৩১৩

জ্যোতিষ মহাসম্মেলন, যোগাযোগ করুন।

দেখা করার সময় : ১২টা থেকে ২টা ও ৬টা থেকে ৯টা, শনিবার ১২টা থেকে ৫টা। বৃহস্পতিবার ও রবিবার বন্ধ।

জ্যোতিষী বার্ত্তালয়

এস্ট্রোলজিক্যাল ও এস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি।
১।২এ নিলাম্বর মুখার্জী স্ট্রীট, কলি-৭০০০০৪

বিমলানন্দ শাসমল

ভারত কি করে ভাগ হলো

ভারত কেন ভাগ হোলো এই প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আমাদের চলে যেতে হবে সুদূর অতীতে—কয়েক হাজার বছরের পুরানো ভারতে। আমাদের চলে যেতে হবে সেইদিনের ইতিহাসে যেদিন এই ভারতের মাটি লাল হয়ে উঠেছিল আর্যের হাতে নিপীড়িত অনার্যের রক্তে। বহুদিন আগে ১৩৬৭ সালের মাঘ মাসের 'প্রবাসী'তে আমি লিখেছিলাম যে, ইহুদি, মোঙ্গল বা ককেসীয় জাতি বলে যেমন মনুষ্য সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠির উল্লেখ আছে সেই রকম আর্যজাতি বলে কোনো বিশেষ জাতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানব ইতিহাসে কোনো উল্লেখ নেই। পৃথিবীর কোন্ অঞ্চল এদের আদিম বাসস্থান, সেই কারণে সে সম্বন্ধেও কোনো ইতিহাস নেই।

বলা হয়ে থাকে, ভারতের প্রথম সভ্যতা আর্যরাই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর্যরা ভারতকে সুসভ্য করবার জন্য কোথা থেকে ভারতে এলেন সে-সম্বন্ধে অনেক জল্পনা-কল্পনা আছে বটে কিন্তু ভারতে আসবার আগে তাঁদের জন্মস্থানকে তাঁরা কতখানি সুসভ্য করতে পেরেছিলেন সে-সম্বন্ধেও ইতিহাসে কোনো ইঙ্গিত নেই। 'আর্য' কথাটি নাকি এসেছে পারস্য দেশের 'আরিয়স' বাক্যটি থেকে। কিন্তু পারস্যের ভাষায় 'আরিয়স' মানে অভিজাত—ওটা কোনো জাতিজ্ঞাপক বাক্যই নয়।

হিটলারও জার্মানদের এই আর্য-বংশ-সম্ভূত বলে জাহির করতেন। জার্মানদের আর্যত্বের পবিত্রতা রক্ষা করবার জন্য তিনি

লক্ষ লক্ষ ইহুদি নর-নারী ও শিশুর প্রতি করেছিলেন তা কেবল হাজার হাজার বছর আগে আর্যরা অনার্যদের প্রতি যা করেছিলেন তার সঙ্গে তুলনা করা চলে। কিন্তু যেমন জার্মানীর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন হিটলারের আর্য-বংশ বহির্ভূত তেমনি ভারতে অনার্যরা প্রাক-আর্য যুগ থেকেই সভ্যজাতি হিসেবে বাস করছিলেন। এই প্রাক-আর্য সভ্যতার আবর্ষণেই আর্যরা ভারতে প্রবেশ করেছিলেন অন্য দেশ থেকে। যেমন মুসলমানরা পরে অন্য দেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন তেমনি আর্যরাও এদেশে বহিরাগত।

স্বামী বিবেকানন্দ অবশ্য বলেছেন, আর্যরা ভারতেরই লোক—'সমস্ত ভারতই আর্যময়'। কিন্তু অনার্যদের প্রতি আক্রমণের কথা এবং তাদের প্রতি আর্যদের আচরণ —যা বেদে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে সে সম্বন্ধে তিনি কোথাও কিছু বলেননি। তাঁর মতে আর্যদের আদিম বাসভূমি ছিল আফগানিস্তান এবং সে সময়ে আফগানিস্তান ভারতেরই অংশ ছিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আর্যরা সভ্যতা বিস্তার করেছিল বলে বলা হয়, কিন্তু আফগানিস্তানে আর্য সভ্যতার আদিম রূপটি কি ছিল বিবেকানন্দ তা বলেন নি।

বলা হয়ে থাকে, আর্য-হিন্দুরা চিরদিন শান্তিপ্রিয় এবং আবহমানকাল ধরে তাঁরাই পৃথিবীতে শান্তির বাণী বহন করে এনেছেন। কিন্তু এদেশে আর্যদের জীবন-প্রভাত শুরু হয়েছিল নিরীহ শান্তিপ্রিয় অনার্য অর্থাৎ দাস বা দস্যুজাতির রক্ত-সিঞ্চনে। বেদে আর্যদের হাতে এই নিরপরাধ দাস ও দস্যুজাতির হত্যালীলার চিত্রটি সুপরিস্ফুট হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে ধর্মশাস্ত্রগুলির মধ্যে মুসলমানদের কোরান

: 'আল্লায় অবিশ্বাসীদের ধ্বংস
' কিন্তু হিন্দুদের বেদ বলেছে
দস্যুজাতিকে অর্থাৎ অনার্যকে 'হত্যা
ম।' বেদের বহুমন্ত্রে দাস ও দস্যু-
হত্যা করবার শক্তি ও সুযোগ
কথা হয়েছে দেবতার কাছে।
ঋগ্বেদে।
দে আরও একটা ত্রিনিস প্রকাশ

হয়েছে। আর্যদের একটিমাত্র অস্ত্র ছিল আগুন দিয়ে পোড়ানোর ক্ষমতা। ওদিকে দাস ও দস্যুজাতির ছিল অলংকারাদি, বাসগৃহ এমন কি নগর স্থাপত্য। রামায়ণে রামের সৈন্য দিয়ে সেতু তৈরি করে রামের লংকাযাত্রার পথ করে দেবার যে-কাহিনী আছে তা সম্পূর্ণ অলীক নাও হতে পারে। বানররা হলো অনার্য জাতির প্রতীক এবং অনার্যরাই তখন সমুদ্র পারাপারের সেতু তৈরি করবার ক্ষমতা রাখতেন। মহাভারতের ময়দানব জতুগৃহ তৈরি করেছিলেন। তিনিও দাস বা দস্যুজাতি-সম্ভূত ছিলেন। অনার্যদের মধ্যে যাঁরা আর্য প্রভুত্ব স্বীকার করে নিতেন তাঁরাই ছিলেন দাস—যাঁরা করতেন না তাঁরা দস্যু। বহির্গত আর্যরা দাস ও দস্যুজাতির এই যে হত্যাযজ্ঞ শুরু করেছিলেন বহু সহস্র বছর আগে এতেই ভারতীয় সমাজজীবনে বিভেদের বীজ প্রথম থেকেই আরোপিত হয়ে রইল।

যে সকল দাস ও দস্যুকে আর্যরা ধ্বংস করতে পারলেন না অথচ যারা আর্য প্রভুত্ব স্বীকারও করলো না তাদের রেখে দেওয়া হলো সমাজের অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য করে। তাদের মারা হলো না, শুধু কেড়ে নেওয়া হলো তাদের মনুষ্যত্বের মর্যাদাটুকু। এইভাবে কায়িক পরিশ্রমের দিয়ে যাঁরা সমগ্র সমাজ-জীবনকে বাঁচিয়ে রাখতো—চাষী, তাঁতী, কুমোর, কামার, সাঁকরা গয়লা, ধোপা, নাপিত এমন কি পথপতি ও শিল্পী-দেরও আর্য-ভাবতে অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য করে দেওয়া হলো। সেইজন্য স্বাভাবিক কারণেই ভারতীয় সমাজ-জীবনের প্রথম প্রভাত থেকেই এক বিরাট জনসমষ্টি দেশের ও সমাজের প্রতি বিমুখ হয়ে অন্তরে অন্তরে শত্রু হয়ে রইল। 'মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছে যারে'—সেই বিরাট জনসমষ্টি, দেশ ও সমাজকে কি করে ভালবাসতে পারতো এই প্রশ্নটা আমি সবার সামনে রাখছি। সমাজ-সৌধের অঙ্গন থেকে এই বিরাট জনসমষ্টিকে যেন বলপ্রয়োগে বহিষ্কৃত করা হলো ভারতীয় সভ্যতার প্রথম যুগ থেকেই। আর্য-হিন্দুদের মূল মন্ত্রই ছিল সামাজিক বিভাজন।

এই সঙ্গে আর্য-হিন্দুরা একটি অপূর্ব বস্তুর সৃষ্টি করলেন যুগ-জগতের ইতিহাসে যার তুলনা নেই। তাঁরা সৃষ্টি করলেন, কর্মবাদ। অর্থাৎ বর্তমান জীবনে যারা মানুষের অধিকারের মর্যাদা হারিয়ে দুঃখ-লাঞ্ছনার বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে সেটা তাদের পূর্বজন্মের পাপের ফল এবং বর্তমান জীবনে যদি তারা পুণ্যকর্ম অর্থাৎ নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রাহ্মণ বা অন্যান্য উচ্চবর্ণের পরিসেবা করে, যেতে পারে তাহলে পরজন্মে তারাও আবার উচ্চবর্ণে জন্মলাভ করে মনুষ্যত্বের পূর্ণ মর্যাদা লাভ করবে। এটাই ঈশ্বরের অমোঘ বিধান।

এই ধর্মভিত্তিক সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে অচিরে বিদ্রোহ করলেন বিশ্বের প্রথম বিপ্লবী নায়ক, বুদ্ধ। তিনি বেদকে অস্বীকার করলেন এবং জনগণকে বেদের অনুশাসন অনুসরণ করতে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন, মানুষের জীবনে ঈশ্বরের কোনোই প্রয়োজন নেই, নিজের সদবুদ্ধিই মানুষকে পৌঁছে দেবে সত্যের সিংহদ্বারে, সমাজের প্রতিটি বিধি-নিয়ম যুক্তির দ্বারা বিচার করে নিয়ে পালন করতে হবে এবং এমন কি তাঁর নিজের কথাগুলিও, বুদ্ধ বলেছেন বলে নয়, পরন্তু যুক্তির কষ্টি-পাথরে পরখ করে নেওয়া দরকার।

আর্যদের ভারতে অনুপ্রবেশের পর অনার্য বা পাক-আর্য সভ্যতার একটি বিরাট অবদান নষ্ট হয়ে যেতে বসলো। আর্যরা ছিলেন আক্রমণকারী, তাঁরা এদেশে প্রেম ও

মৈত্রীর ধ্বজা ওড়াবার জন্য আসেননি। মৈত্রী ও প্রেমের বা মনুষ্যজীবনের মহত্তর আদর্শগুলির পীঠস্থান এদেশে রচনা করেছিলেন প্রাক-আর্য ভারতীয়রা। দেশের চেয়ে জগৎ বড়—জাতির চেয়ে মানুষের মঙ্গল বড়, এটাই ছিল প্রাক-আর্য ভারতের মমবাণী। প্রশ্ন উঠতে পারে, এই তথ্যটি আমি কোথা থেকে পেলাম? উত্তরে বলবো, নৃশংস আক্রমণে অনার্যদের হত্যালীলার মধ্য দিয়ে আর্যরা প্রেম ও মৈত্রীর বাণীকে চিরতরে ভস্ম করে দিয়েছিলেন এবং প্রেম ও মৈত্রী যদি আর্যদের জীবন-দর্শন হয়ে থাকতো তাহলে দাস ও দস্যুজাতির প্রতি তাঁরা এত নৃশংস হলেন কেন। কেনই-বা দেশের বিরাট জনসমষ্টিকে মনুষ্যত্বের মর্যাদা থেকে বিচ্যুত করে পশুতুল্য জীবন-যাপনের ধর্মীয় অনুশাসনের প্রচলন করলেন? স্বয়ং বিবেকানন্দ বলেছেন: 'এমন শাস্ত্রও আছে যাহাতে এইরূপ কঠোর বাক্য বলা হইয়াছে যে, যদি শূদ্র বেদ শ্রবণ করে তাহার কর্ণে তপ্ত সীসা ঢালিয়া দিতে হইবে, যদি তাহার বেদ কিছুমাত্র স্মরণ থাকে তবে তাহাকে কাটিয়া ফেলিতে হইবে। যদি সে ব্রাহ্মণকে 'ওহে ব্রাহ্মণ' বলিয়া সম্বোধন করে তবে তাহার জিহ্বাচ্ছেদ করিতে হইবে। ইহা প্রাচীন আসুরিক বর্বরতা...এই প্রাচীনগণের কিতক সময়ে সময়ে আসুরিক-প্রকৃতি লোকের অভ্যুদয় হইয়াছিল।' (ভাবতে বিবেকানন্দ, ৩২৯ পৃঃ)

যাঁরা বিশ্বমৈত্রীর বন্ধনে সমগ্র বিশ্বকে সম্মিলিত করবার ব্রত নিয়েছিলেন বলে বলা হয় সেই আর্যরা এই ভারতভূমিতে ন্যূনতম অধিকার অস্বীকার করে এদেশে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের মধ্যে দণ্ডবিধি প্রয়োগের পৃথক মাপকাঠির ব্যবস্থা করেছিলেন। নারী ধর্ষণ করলে ব্রাহ্মণের শাস্তি ছিল সিঙ্গিং অর্থদণ্ড এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাও নয় কিন্তু শূদ্রের বেলায় শাস্তি নির্বাসন এবং সকল সম্পত্তির অধিকার লোপ। ব্রাহ্মণ নারী ধর্ষণ করলে ১০০০ মুদ্রা দণ্ড দিতে হতো ব্রাহ্মণকে, কিন্তু শূদ্র রমনী ধর্ষণ করলে ব্রাহ্মণের দণ্ড ছিল ৫০০ মুদ্রা। অর্থাৎ শূদ্র রমনীর সতীত্বের দাম ছিল ব্রাহ্মণ রমনীর ঠিক অর্ধেক। কোনো অপরাধেই এমন-কি নরহত্যার অপরাধেও ব্রাহ্মণকে কোনো দৈহিক শাস্তি দেবার আইন ছিল না। (ক্রাইম এন্ড পানিশমেন্ট ইন এনসায়েন্ট ইন্ডিয়া, ভ ব পি দাশগুপ্ত দেখুন)

ন্যায়বিচারের স্বাভাবিক গতিকে সম্পূর্ণ কুক্ষিগত করার প্রচেষ্টা দিয়ে এদেশে যারা শুরু করেছিলেন তাঁরা কি করে বিশ্বমৈত্রীর আদর্শকে সফল করতে পারতেন আমি বুঝিনা। যাঁরা নিরীহ-নিরপরাধ অনার্যদের রক্ত-সিঞ্চনে দেশের মাটি লাল করেছিলেন তাঁরা কি করে প্রেম ও মৈত্রীর পূজারী হতে পারেন এটা আমার বুদ্ধির অগম্য। শ্রেণী নিম্নের ভাইকে ন্যায়বিচারের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিলেন তাঁরা কি করে বিশ্বভ্রাতৃত্ব সফল করে তুলতেন আমার জানা নেই।

দেশের মাটি-যে স্বর্গের চেয়েও গরিয়সী এই সংকীর্ণ আদর্শও আর্যরাই এদেশে প্রথম প্রচার করলেন। এটা সত্যকার ভারতের আদর্শ নয়। এই কথা ভেবেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন "আমার স্থির বিশ্বাস আমার দেশবাসী সত্যকার ভারতকে ফিরে পাবে যদি তারা সেই শিক্ষার বিরুদ্ধে লড়তে পারে, যা শেখায় যে, বিশ্বমানবতার আদর্শের চেয়েও দেশ বড়ো" (ইংরেজির অনুবাদ—ন্যাশন্যালিজম— ১০৬ পৃঃ)

প্রাক-আর্য ভারতের সবচেয়ে বড় অবদান এইটাই যে, দেশকে দেশ বলে নয় পরন্তু বিশ্ব জগতের একটি অংশ হিসাবে দেখতে হবে। আলবার্ট সোয়াইৎসেয়ারের বা অলবার্ট আইনস্টাইনের "ওয়ান-ওয়ার্ল্ডের স্বপ্ন প্রাক-আর্য ভারতীয়রা দেখেছিলেন হাজার হাজার বছর আগে। কিন্তু "ওয়ান-ওয়ার্ল্ডের স্বপ্ন সফল করতে গেলে দেশের গন্ডীটি তুলে দিতে হয় এবং বিশ্বজগতের মধ্যে সেই গন্ডীকে ছড়িয়ে দিতে হয়। দেশকে ধ্বংস না করে কি করে সেটা সম্ভব অরই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিল প্রাক আর্য ভারত। সেই কারণে ইতিহসের প্রথম দিন থেকেই ভারতবর্ষ হয়ে উঠেছিল বিশ্বময়। বিশ্বের সকল জাতির মানুষ এসে মিলতে পারতো ভারতে এবং বিশ্ব সমাজের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ গড়ে উঠতে লাগলো এই দেশের মাটিতে। সমগ্র বিশ্বকে একত্র করে নেবার এই-যে পরম প্রয়াস এই জন্যই ভারতের আদিম অধিবাসী অনুপ্রবেশকারী আর্যদের প্রতিহত না করে তাঁদের আত্মীয় হিসাবেই বরণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যেদিন ভারতীয়রের এই বিশ্বজনসমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নটিকে আর্যরাই প্রথম নিষ্ঠুর আঘাতে ভেঙে দিলেন। বিদেশ যাত্রা করলে-যে হিন্দুকে সমাজচ্যুত করা হোতো সেটা বিদেশকে ঘৃণা করবার এই আর্য-মনোবৃত্তির অনুসরণেই। আর্য মনোবৃত্তির বিচারে অপর সকলেই ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ শুধু আর্যরাই মহান এবং গরিয়ান।

বুদ্ধ এই অ-ভারতীয় আদর্শের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করলেন। ভারতের ইতিহাসে এই বুদ্ধই আজ পর্যন্ত একমাত্র ব্যক্তি যিনি ভারতের মর্মবাণীটি উপলব্ধি করে তার প্রসারের জন্য জীবনপাত করে ছিলেন। বুদ্ধ প্রথমে সামাজিক শোষণের শৃঙ্খল জাল থেকে মুক্ত করলেন দেশের শ্রমিক-কর্মী সাধারণ মানুষকে। তারপর তিনি তাঁর মহৎজীবনের মঙ্গলস্পর্শ দিয়ে খুলে দিলেন ভারতের সঙ্গে সমগ্র বিশ্বের মহামিলনের তোরণ দ্বার। যেখানে মানুষ মুক্ত সেখানেই সে পরে সৃষ্টির মহান ব্রত সফল করত। তাই বৌদ্ধযুগে ভারতের মুক্ত সমাজের মানুষ দিকে দিকে শুরু করলো জয়যাত্রা। সংস্কৃতিতে, শিল্প-সাহিত্যে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, চরিত্রের মহনীয়তায় বৌদ্ধযুগের ভারত ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে এক আদর্শ দেশ।

কিন্তু আর্য-আদর্শে অনুপ্রাণিত ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম চুপ করে বসে থাকেনি। বেদের প্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম গোপনে ও প্রকাশ্যে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছিল অবিরাম। তারই ফলে ধীরে ধীরে বুদ্ধের প্রবর্তিত মহা-ধর্ম বিকৃত হয়ে উঠলো। বিবেকানন্দ সুবর্ণ বলেছেন যে, বৌদ্ধ ধর্মের শেষ পরিনতি খুব বীভৎস হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং তার ফলে সমগ্র ভারতবর্ষের চরম অধঃপতন ঘটলো। তার উত্তরে বলা যায় যে, ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে একটি মীমাংসার অসারের জন্য বুদ্ধের পরবর্তী ধর্মনেতারা এই ধর্মের বহু আচারকে বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করে নিয়েছিলেন এবং ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের পটভূমিকায় প্রচলিত বহু কিম্বা-কলাপ বৌদ্ধ ধর্মের অঙ্গীভূত হয়ে গেল যা বৌদ্ধ ধর্মের প্রকৃত রূপটিকে অবশেষে ম্লান ও বিকৃত করে দিলো।

স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক যে-কারণেই হোক বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ক্রমে অসার সঙ্গে সঙ্গে এদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থানের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে আবার ফিরে এলো বেদের প্রাধান্য, ফিরে এলো জাতিভেদের যূপকাষ্ঠে ন্যায়বিচারের মৃত্যুদণ্ড ফিরে এলো ধর্মভিত্তিক সামাজিক শোষণের নগ্ন প্রকাশ।

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠায় সামাজিক নির্যাতনের এই নগ্ন পুনঃ প্রকাশে ভারতের দরিদ্র সাধারণ, শ্রমিক-কর্মী নিষ্পেষিত হতে আরম্ভ করলো তারা ধীরে ধীরে আবার দেশের ও সমাজের প্রতি বিমুখ হয়ে উঠলো। মহামতি বুদ্ধের মহামন্ত্র ভারতের আপামর সাধারণকে যে মিলনসূত্রে গ্রথিত করে রেখেছিল সেটি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে একাকার হয়ে গেল এবং বিভেদের বন্যার বারিরাশি ভারতীয় সমাজকে বিভিন্ন পথ দিয়ে প্রবলভাবে প্লাবিত করে তুললো।

বৌদ্ধধর্মকেই ভারতের অবনতির মূল কারণ বলে বারবার উল্লেখ করলেও বিবেকানন্দ স্বীকার করেছেন, 'ক্ষমতা যখন হস্তান্তরিত হয় তখন উহা আসুরিকতার ভাব ধারণ করে....অতএব এই শত শত শতাব্দী-সঞ্চিত শিক্ষা ও সংস্কার—ব্রাহ্মণ এতদিন যাহার রক্ষক-স্বরূপ— তাহা সর্বসাধারণকে দিতে হইবে আর তাঁহারা সর্বসাধারণকে উহা এতদিন দেন নাই। এই কারণেই মুসলমান আক্রমণ সম্ভব হইয়াছিল। তাঁহারা (ব্রাহ্মণেরা) গোড়া হইতেই সর্বসাধারণের নিকট এই ভাণ্ডার উন্মুক্ত করেন নাই, এই কারণেই সহস্র বর্ষ ধরিয়া যে হেয় ইচ্ছ করিয়াছে সেই ভারতে আসিয়া আমাদিগকে পদদলিত করিয়াছে। ইহাতেই আমাদের এইরূপ অবনতি ঘটিয়াছে। (ভাবতে বিবেকানন্দ—৩৩৩ পৃঃ)

বৌদ্ধধর্মের প্রবলতা ও তার ধর্মের পুনরভ্যুত্থানে ভারতীয় সমাজে যে শোচনীয় অবস্থা দাঁড়ালো বিবেকা

নন্দই তাঁর সুস্পষ্ট চিত্র এঁকে গিয়েছেন : 'মুসলমান কয়জন সিপাহী আনিয়াছিল? কয়জন আছে? ছটাকার জন্য পিতা ভ্রাতার গলা কাটিতে পারে এমন লক্ষ লক্ষ লোক ভারত ছাড়া আর কোথায় পাওয়া যায়? সাতশ বছর মুসলমান রাজত্বে ছ কোটি মুসলমান, এক শ বছর ক্রীশ্চান রাজত্বে কুড়ি লক্ষ ক্রীশ্চান—কেন এমন হয়? —ওরিজিন্যালিটি একেবারে দেশকে কেন ত্যাগ করিয়াছে?' (২৪।৪।৯৭—পত্রাবলী ২য় ভাগ, ১৯৩-৪ পৃঃ)

।। ২ ।।

ব্রাহ্মণ্যধর্মের যুগে দরিদ্র অস্পৃশ্য শূদ্র শ্রমিকের জীবন বিভীষিকাময় হয়ে উঠলো। ধর্মীয় অনুশাসনের কঠিন নিগড় দিয়ে তাদের জীবনকে এমনভাবে বেঁধে দেওয়া হলো যে, এই জীবন্ত নরক থেকে মুক্তি পাবার কোনো উপায়ই তাদের রইল না। বৌদ্ধদের উপরেও হিন্দু নৃপতিরা কম অত্যাচার করতেন না। বুদ্ধের পূজা বা গুণগান করলে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হোতো। এমন-কি শিল্পী ও কুশলীদের জীবনও বিষময় করে তোলা হলো। বুদ্ধের পূজা করলে যে প্রাণদণ্ড বা নির্বাসন দেওয়া হোতো তার উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য হৃদয়স্পর্শী কবিতা শ্রীমতীর কথা নিশ্চয়ই কেউ ভুলতে পারবেন না।

কিন্তু এইভাবে বুদ্ধভক্তেরা ও দরিদ্র শূদ্র শ্রমিক অস্পৃশ্যেরা ধীরে ধীরে দেশ ও সমাজজীবন থেকে নিশ্চিতভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। দেশময় এই সামাজিক বিচ্ছিন্নতার সংবাদ সেই প্রাচীন যুগেও বিশেষ চাপা থাকে নি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই সংবাদের সূত্র ধরেই ভারতে মুসলমান আক্রমণ শুরু হয়। যখন মহম্মদ-বিন-কাসিম প্রথম সিন্ধু আক্রমণ করেন, এ বিষয়ে ইতিহাসে উল্লেখ আছে—যে সিন্ধু দেশের কিছু অধিবাসী তখন মহম্মদ-বিন-কাসিমকে পরোক্ষে সাহায্য করেছিলেন। এইজন্যই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন : 'এমন-কি, মুসলমান অধিকারেও এই এক-চেটিয়া অধিকাররাহিত্যরূপ মহা সুফল ফলিয়াছে। আর মুসলমান রাজত্ব—যে প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ মন্দ ছিল তাহাও নহে—জগতের কোনো জিনিসই সম্পূর্ণ মন্দ নহে, কোনো জিনিসই সম্পূর্ণ ভাল নহে। মুসলমানের ভারতাধিকার দরিদ্র পদদলিতদের উদ্ধারের কারণ হইয়াছিল। এইজন্যই আমাদের এক পঞ্চমাংশ ভারতবাসী মুসলমান হইয়া গিয়াছিল। কেবল তরবারির বলে ইহা সাধিত হয় নাই। কেবল তরবারি ও বন্দুকের বলে ইহা সাধিত হইয়াছিল, একথা মনে করা নিতান্ত পাগলামি মাত্র।' (ভারতে বিবেকানন্দ, ৩৬৭-২৮ পৃঃ)

রবীন্দ্রনাথও প্রায় এক জিনিসই লিখেছেন : 'ভারতবর্ষে সাধারণ মানুষের কোনো স্বাভাবিক জন্মস্বত্ব নেই। আমরা যখন পাশ্চাত্য জাতীয়তার কথা বলি তখন আমরা ভুলে যাই যে, সেখানকার লোকেদের মধ্যে একজনের প্রতি অন্যের একটি প্রকাশ্য ঘৃণাভাব নেই যা আমাদের বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে আছে। সমগ্র পৃথিবীতে এমন দৃষ্টান্ত কোথাও আছে কি যেখানে মানুষে মানুষে রক্তের মিলন সংঘটিত হতে দেওয়া হয় না অথচ সেখানে বল-প্রয়োগ বা অর্থকরী উদ্দেশ্য ছাড়া তারা পরস্পরের জন্য স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছে? (ইংরেজির অনুবাদ, 'নাশনালিজম—১২৪ পৃঃ)

অতএব, মুসলমান আক্রমণের সময় থেকেই দেশের দরিদ্র পদদলিতেরা মুসলমানদের স্বাগত জানিয়েছিল এবং কয়েকশ' বছরের মুসলমান রাজত্বে দেশের কয়েক

কোটি নিপীড়িত অস্পৃশ্য-শূদ্রের দল স্বেচ্ছায় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করলেন। মুসলমান আক্রমণের সময়ে স্বাভাবিক ভাবেই কিছু অত্যাচারিত হয়েছিল কিন্তু হিন্দু সমাজের অত্যাচারিত শূদ্র অস্পৃশ্যদের কাছে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ একটা জীবন্ত নরক থেকে মুক্তির পথ হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিল।

১০০১ সালে গজনীর মামুদ ভারত আক্রমণ করে মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করলেন। কয়েকশত বছরের মুসলমান রাজত্বে কয়েক কোটি শূদ্র-অস্পৃশ্য মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করলেন বটে কিন্তু সাধারণভাবে মুসলমানদের সংগে হিন্দুদের, অর্থাৎ উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সামাজিক মিলন কখনও সম্পূর্ণ হতে পারেনি। তার প্রধান কারণ, অন্য ধর্ম ও সমাজস্থ ব্যক্তিকে আপন সমাজের সংগে আত্মস্থ করে নেবার যে-স্বাভাবিক ক্ষমতা সেটা ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থানে ভারতবর্ষ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় কারণ, কোরাণের নির্দেশ : 'অবিশ্বাসীকে ধ্বংস কর।' (১০৫ অনুচ্ছেদ)

এই সামাজিক বিরোধসত্ত্বেও মুসলমান রাজত্বের বহুক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজপতিরা মুসলমান দরবারে মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেছিলেন এবং এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুসলমান নবাব-বংশের সংগে বৈবাহিক সম্বন্ধও স্থাপন করেছিলেন।

হিন্দু মুসলমানদের মূল পার্থক্যটি এখানে বলে রাখা দরকার। হিন্দুদের অর্থাৎ উপনিষদের ধর্মের মত এত বড় উদার ধর্ম পৃথিবীতে বিরল। কারণ উপনিষদে বহু অনার্যের অবদান আছে এবং প্রাক-আর্য প্রভাবে উপনিষদ বহুলাংশে প্রভাবিত। ওদিকে মুসলমান অর্থাৎ ইসলামদের ধর্মের মত এত বড় অনুদার ধর্মও পৃথিবীতে বিরল। কিন্তু, হিন্দু-সমাজের মত অনুদার সমাজ ও মুসলমান সমাজের মত উদার সমাজ পৃথিবীতে নেই। উপনিষদের ধর্মের উদার ইঙ্গিত ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের পুনরভ্যুত্থানের সংগেই এদেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায় আর মুসলমান ধর্মের অনুদারতা মূলতঃ বিধর্মীদের প্রতিই প্রযুক্ত হোতো এবং সমাজের অন্তর্ভুক্তদের জন্য যে-উদারতার পটভূমিকা তৈরি করে দিলো তার তুলনা নেই। হিন্দু ও মুসলমানদের মূল বিরোধ ধর্ম নিয়ে নয় পরন্তু এটা গোঁড়া হিন্দু-সমাজের সংগে বিধর্মীর প্রতি অসহিষ্ণু মুসলমান সমাজের দ্বন্দ্ব। হিন্দু সমাজের অর্থাৎ হিন্দু উচ্চ-বর্ণের চরম সংকীর্ণতা এবং বিধর্মীর প্রতি মুসলমানদের অনীহা কয়েকশত বছরের মুসলমান রাজত্বে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোনো প্রকৃত মিলন সংঘটিত হতে দেয়নি।

বৌদ্ধযুগে যেমন ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনরভ্যুত্থানের সুযোগের অপেক্ষায় বসেছিল, তেমনি মুসলমান যুগেও মারাঠারা এবং রাজপুতেরা মুসলমান প্রভুত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন এবং সাধারণভাবে হিন্দুরা মুসলমান প্রভুত্বের অবসানের সুযোগ আসার অপেক্ষায় ছিলেন। সেই সুযোগ এনে দিল ইংরেজ বণিক, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী।

ইস্ট - ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে ব্যবসা করতেই এসেছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে তারা দেশের শাসনভার নিজেদের হাতে তুলে নিল। এতে হিন্দুদের ও বিশেষতঃ বাঙালী হিন্দুদের উৎসাহ, প্ররোচনা এবং সক্রিয় সাহায্য ছিল সবচেয়ে বেশি। যে মুসলমান প্রভুত্ব হিন্দুরা নিজেদের আয়াসে ধ্বংস করতে পারতেন না, ইংরেজের সাহায্যে এবং বুদ্ধিতে তাঁরা সেই উদ্দেশ্যে সফল হলেন। ধীরে ধীরে মুসলমান প্রভুত্ব লোপ পেল। ইংরেজ হয়ে উঠলো দেশের প্রভু। ১৭৫৭ সালের পলাশি যুদ্ধে মারাঠা নায়ক বাঙালী ব্যক্তিরাও নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ইংরেজকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবেন বলে ক্লাইভকে চিঠি লিখেছিলেন। (কর্নেল মেলসন লেখা 'লর্ড ক্লাইভ' দ্রষ্টব্য)

হিন্দুরা বিশেষ করে বাঙালী হিন্দুরা ইংরেজের প্রভুত্বকে শুধু স্বাগত জানালেন তাই নয়, ইংরেজি শিক্ষা, তাদের সংস্কৃতি তাদের জীবন-দর্শনকে সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করবার জন্য তাঁরা উঠে পড়ে লাগলেন। ওদিকে ইংরেজরা তাদের রাজত্ব কেড়ে নিয়েছে তাই শত্রুর শিক্ষা-সংস্কৃতি-সভ্যতার প্রতি মুসলমান বিমুখ হয়ে রইলেন। বেশিদিন গেলো না—ইংরেজ-বিরোধিতার নেতৃত্ব নিলেন মুসলমানদের ওয়াহাবী সম্প্রদায়। ওয়াহাবীরা মুসলমান রাজত্ব ফিরিয়ে আনবার জন্য দেশে প্রচণ্ড সংগ্রাম শুরু করলেন সশস্ত্র সংগ্রামের ডাক দিয়ে। কিন্তু যেহেতু তাঁরা মুসলমান রাজত্ব ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছেন সেই হেতু সাধারণভাবে হিন্দুদের কাছে তাঁরা গ্রহণীয় হলেন না। গোঁড়া ধর্মান্ধ বলে ওয়াহাবীদের কাছ থেকে দূরে সরে রইলেন হিন্দুরা। ইংরেজ রাজত্বের আগে ভারতে মুসলমানদের রাজত্বই ছিল, কাজেই মুসলমান রাজত্ব ফিরিয়ে আনার জন্য যদি ওয়াহাবীরা সংগ্রাম শুরু করে থাকেন তাকে ইসলামের পুনরভ্যুত্থানের চেষ্টা বলা ঠিক নয়। কিন্তু হিন্দুরা তাই মনে করলেন এবং ওয়াহাবীদের স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে দূরে সরে থাকলেন। ওয়াহাবীরা যদিও ইসলামের পুনরভ্যুত্থানের জন্য সংগ্রাম করে থাকেন এটা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, তাঁরা ইসলামের নামে ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও প্রবল সংগ্রাম শুরু করেছিলেন।

বাংলার ওয়াহাবীদের নেতা ছিলেন মহম্মদ শরীয়তুল্লা। রংপুর, মালদহ ফরিদপুর, ২৪ পরগণা, মেদিনীপুরে ওয়াহাবীরা ইংরেজদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। ওয়াহাবীদের দমন করবার জন্য ইংরেজরা সৈন্যদল নিয়োগ করেছিলেন এবং কারাগারে এঁদের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচার করা হত। ওয়াহাবী বিদ্রোহীদের বন্দী রাখবার জন্যই আন্দামানে সেলুলার জেল তৈরি করা হয়েছিল। জনৈক হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ নরম্যান আবদুল্লার সহকর্মী আমানুল্লার হাতে কোর্ট ওঠবার সিঁড়িতে ছুরিকাঘাতে নিহত হন। তখনও হাইকোর্ট ভবন তৈরি হয়নি বলে কলকাতার হাইকোর্ট বসতো টাউন হলে।

হিন্দুরা এটা স্বীকার করতে চান না। কিন্তু বাংলার ও পাটনার ওয়াহাবীরাই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের দিশারী ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহেও এঁদের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল এবং যে-যে স্থানে সিপাহী বিদ্রোহ ফলপ্রসূ হয়েছিল তা অনেকটা এই ওয়াহাবীদের প্রচেষ্টার ও সংগঠনে। ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করে যত ওয়াহাবী প্রাণ দিয়েছেন বা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন যে কোন পরাধীন জাতির পক্ষেই তা গৌরবের বিষয়। কিন্তু ভারতের ইতিহাস এদের সেভাবে স্বীকৃতি দেয়নি। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই যে হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ-বিচার এতেই প্রমাণ করে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে হিন্দু ও মুসলমান প্রথম থেকেই দুই ভিন্ন দৃষ্টি-কোণ দিয়ে দেখতেন।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহে প্রথম নেতৃত্ব এসেছিল মুসলমান সিপাহী দের নিকট থেকে, পরে সেটা হিন্দু সিপাহী দলে ছড়িয়ে পড়েছিল বলে যদি একে আমরা হিন্দু মুসলমানের মিলিত সংগ্রাম মনে করি সেটাও ঠিক নয়। কারণ হিন্দু ও মুসলমান অভিজাতদের মধ্যে শ্রেণির জন্যই বিদ্রোহের বিরুদ্ধে ইংরেজকে সমর্থন ও সাহায্য করেছিলেন। ওদিকে হিন্দু সেনাদল ও হিন্দু সাধারণের ইংরেজের বিরুদ্ধে একটি প্রধান অভিযোগ দিয়ে ইস্তাহার ছাপা হয়েছিল—'ইংরেজদের চোখে অভিজাত ব্যক্তিরা ও ছোটজাতের লোকেরা এক সমান, নিম্নশ্রেণীর লোকেদের সামনে তারা উচ্চ শ্রেণীর লোকেদের অপমান করে, এমনকি অস্পৃশ্য চামারদের অভিযোগে তারা ভদ্রলোক, নবাব ও রাজাদের গ্রেপ্তার করে কিংবা দরবারে তলব করে অপমান করে। (ইংরেজির অনুবাদ—এ হিস্টরী অফ দি ইণ্ডিয়ান রিভোল্ট—কর্নেল ডড, ৪২৭-৪২৮ পৃঃ)

ইংরেজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য ঘোচলো বই কমলো না। তার তিনটি কারণের প্রথমটি হোল, হিন্দু বিশেষ করে বাঙালী হিন্দু

ইংরেজি ভাষার সাহিত্য, দর্শনে পারদর্শিতা লাভ করে ইংরেজি সভ্যতা ও জীবন-দর্শনকে শ্রেয় হিসাবে গ্রহণ করলেন কিন্তু মুসলমান বিধর্মী শত্রুর ভাষা, সাহিত্য দর্শনকে পরিত্যাগ করলেন ও মাদ্রাসা-গুলিতে ইংরেজি শিক্ষা নিষিদ্ধ করে নির্দেশ জারি করলেন। দ্বিতীয়টি হোল, ১৮৩৪ সালে ভারতের ইংরেজ শাসকরা সরকারী স্তরে আদালতে এতদিনের প্রচলিত ফারসী ভাষা তুলে দিয়ে ইংরেজির প্রচলন করলেন এবং তাতে বহু মুসলমানের জীবিকা নির্বাহের পথ চিরদিনের মত রুদ্ধ হোল কিন্তু ইংরাজিনবিশ হিন্দুদের বরাত খুলে গেল। তৃতীয়টি হচ্ছে, ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিশ কৃত পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ইং-রেজের প্রিয়পাত্র হিন্দুরাই বেশিরভাগ জমি-দারির মালিক হয়ে বসলেন এবং মুসল-মানের বেশিরভাগ—বিশেষতঃ পূর্ব ভারতে - কৃষী ও প্রজা হয়ে জমিদারের অত্যাচারের বোঝা বইতে বাধ্য হলেন। ১৮৭৫ সালে স্যার সৈয়দ আহমেদ এই অবস্থাটার দূরী-করণের জন্য আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন বটে কিন্তু সেটা বেশিরভাগই সীমাবদ্ধ থাকলো উত্তর ভারতের মুসল-মানদের মধ্যে। পূর্ব ভারতের মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের সামাজিক ও শিক্ষাগত ফাঁক বেড়েই চললো। এইরূপ একটা নেতৃত্বহীন নিরাশার অবস্থা মুসলমানদের বৃহত্তর সাধারণের প্রতি ধীরে ধীরে নিরুৎসাহ উষ্ণ করে তুলতে লাগলো।

১৮৯৯ সালে ভারতের বড়লাট হয়ে লর্ড কর্জন ভারতীয় সমাজের এই বিস্ফোরণোন্মুখ অবস্থাটির কথা সম্যক-রূপে উপলব্ধি করে তার প্রতিবিধানের চেষ্টা করলেন। ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে হিন্দুরা যেভাবে সামাজিক অগ্র-গতির পথে এগিয়ে চলেছিলেন ইংরেজি শিক্ষার বিরোধিতা করার জন্য মুসলমান ঠিক সেইভাবে পিছিয়ে পড়ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমানের শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত এই বিরাট পার্থক্যটি যতদূর সম্ভব দূর না করতে পারলে এদের মধ্যে প্রতিনিয়ত সংঘর্ষ অনিবার্য ছিল এবং সেটাই ভারত-বর্ষের জন্য একটি সুষ্ঠু ও সম্মিলিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিশেষ করে পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই ঘটনার তীব্রতা অনুভূত হয়েছিল সব-চেয়ে বেশি। লর্ড কার্জন সেটা বুঝতে পেরে বাংলা প্রদেশকে দুটি ভাগে ভাগ করবার ব্যবস্থা করলেন। তখন বাংলা বিহার উড়িষ্যা একটি প্রদেশ ছিল। তিনি পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব বাংলা ও আসামের অংশ বিশেষ নিয়ে দুটি প্রদেশ সৃষ্টি করলেন যে এইভাবে মুসলমানপ্রধান পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানদের শিল্প সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্র তৈরি করে দিলেন। লর্ড কার্জনের এই বিধান তাঁর পক্ষে এমন কি ইংরেজ শাসন ব্যবস্থার পক্ষে কাল হয়ে উঠলো। সকলেই স্বীকার করেন যে, লর্ড কার্জন ভারতের যোগ্যতম বড়লাটদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। আমাদের দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নতি সাধনের জন্য তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা আমাদের পক্ষে আশীর্বাদ ছাড়া আর কিছু ছিল না। কিন্তু, বঙ্গ-ভঙ্গ প্রস্তাব সারা দেশের হিন্দু সমাজকে আলোড়িত করে তুললো। এই আন্দোলন বাংলা থেকে শুরু হয়ে ক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল।

।। ৩ ।।

১৯০৫ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন এবং বাংলা এবং ভারতের সমগ্র হিন্দু সমাজকে আলোড়িত করে তুললো। এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা ও ভারতের রাজনৈতিক প্রাঙ্গণে তিনটি সুস্পষ্ট কর্মবিধি রূপায়িত হোলো যার ফলাফল হোলো সুদূরপ্রসারী। এই আন্দোলনেই প্রথম বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের প্রস্তাব ঘোষণা করা হোলো। দ্বিতীয়তঃ এই আন্দোলনেই সাধারণভাবে প্রথম সন্ত্রাসবাদ ও ইংরেজ রাজকর্মচারী হত্যাকে দেশপ্রেমের গৌরবময় বহিঃপ্রকাশ বলে মেনে নেওয়া হোলো এবং যারা দেশী-বিদেশী রাজকর্মচারী হত্যা করতে পারলেন বা এমন কি ভুলক্রমে রাজকর্মচারী ভেবে নিরীহ ইংরেজ ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলাকে হত্যা করতে পারলেন তাঁদের দেশের ও সমাজের নমস্য ও প্রণম্য বলে স্বীকৃতি দেওয়া হোলো। সন্ত্রাসবাদ শুধু রাজকর্ম-চারী হত্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলো না, সন্ত্রাসের সাহায্যে নিজের বা মুষ্টিমেয়ের মত অপরের বা সাধারণের ওপর চাপিয়ে দেওয়াটা রাজনৈতিক প্রগতির গৌরব অর্জন করলো। তৃতীয়তঃ, এই সন্ত্রাসবাদ বা বিপ্লববাদ আটকে থাকলো শুধু হিন্দু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে—না পারলো টেনে আনতে সাধারণ জনসমাজকে না পারলো মুসলমান সমাজকে।

এই তৃতীয় কর্মবিধিটি কার্যকরী হোলো খুব সূক্ষ্মভাবে যার ফলাফল ভারতের পক্ষে গভীর অমঙ্গলজনক হয়ে উঠলো, যদিও হিন্দু শিক্ষিতেরা এটা এখনও স্বীকার করতে রাজি নন। এই বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ছিল সন্দেহাতীতভাবে মুসলমান-বিরোধী এবং গভীরভাবে মুসলমান স্বার্থের পরিপন্থী। এই আন্দোলনের ত্যাগীদের যে-সকল সন্ত্রাসবাদী বা বিপ্লববাদী নেতা কর্মক্ষেত্রে প্রকাশিত হলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন গভীরভাবে মুসলমান-বিরোধী। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর 'ইণ্ডিয়া উইনস ফ্রিডম' বইতে লিখেছেন : 'বিপ্লববাদীরা যে-শ্রেণী থেকেই আসুন না কেন, প্রত্যেকেই ছিলেন মুসলমান-বিরোধী।' (ইংরেজির অনুবাদ—৫ পৃঃ)

বিদেশী দ্রব্য বয়কট ও বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যারা নেতৃত্বের প্রথম সারিতে দাঁড়ালেন যেমন, তিলক, অরবিন্দ, বিপিন পাল—এঁরা এমন একটা রাজনৈতিক আদর্শের প্রচার আরম্ভ করলেন যাতে মুসলমানের স্থান পাওয়া অসম্ভব ছিল। এঁরা প্রত্যেকেই রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তর দিয়ে হিন্দু ধর্ম-দর্শনের মহিমা প্রচার করতে শুরু করে দিলেন।

তিলক 'আর্কটিক হোম ইন দি বেদাস' বইটিতে আগেই লিখেছিলেন যে, আর্য হিন্দুরা দেবলোক থেকে এসে প্রথম মর্ত নামেন উত্তর মেরুতে, তারপর ইয়োরোপের মধ্য দিয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েন পৃথিবীকে একটি সুসভ্য ও সংস্কৃতিবান রূপে তৈরি করবার জন্য এবং তাঁরাই স্বর্গ থেকে মর্তে আসবার সময়ে চতুর্বেদ স্বর্গ থেকে বহন করে আনেন। শিবাজি উৎসব ও গণপতি উৎসবের মধ্য দিয়ে তিনি নিশ্চিতভাবে হিন্দুধর্মের আদর্শকে রাজ-নৈতিক ক্ষেত্রে রূপায়িত করেছিলেন এবং এই-ভাবে সমগ্র মুসলমান সমাজের রাজনৈতিক অস্তিত্বকে অস্বীকার করে বসেন।

অরবিন্দ লিখেছিলেন : 'সর্বসাধারণকে আহ্বান করে নিয়ে আসা, ভবিষ্যতের গৌরবকে অতীতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা, ভারতীয় রাজনীতিকে ভাবতের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা দিয়ে সঞ্জীবিত করা—ভাবতের বিরাট ও সুতীব্র রাজনৈতিক অগ্রগতির জন্য এইগুলিই হচ্ছে অপরিহার্য প্রস্তুতি। (স্পিচেস এণ্ড রাইটিংস অফ বিপিন তিলক—এ্যাপ্রিসিয়েসন বাই অরবিন্দ ঘোষ—ইংরেজির অনুবাদ—৮-৭ পৃঃ)

অরবিন্দ অবশ্য একথাও লিখেছিলেন : পৃথিবীর মনুষ্য জাতিগুলির মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষের জন্যেই ছিল এক সমুজ্জ্বল দৈব-নির্দেশ যা সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যতের পক্ষেই ছিল অনিবার্য। সমগ্র বিশ্বের ভবিষ্যতের ধর্মবিশ্বাস ভারতবর্ষকেই জন্মদান করতে হবে। যে চিরন্তন ধর্মবিশ্বাস মানুষের সকল ধর্মবিশ্বাসকে এক সূত্রে গেঁথে সমগ্র মানবজাতিকে একক জীবনে পরিণত করবে। (ইংরেজির অনুবাদ)

অরবিন্দের মধ্যে এই-যে দেশপ্রেমের ধর্মীয় উদ্দীপনা এবং ভারতীয় রাজনীতিকে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক প্রেরণা দিয়ে সঞ্জীবিত করবার যে-প্রচেষ্টা তা সন্দেহাতীতভাবে হিন্দু ধর্মদর্শনকে ভাবতের রাজনীতিতে চাপিয়ে দেবার প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এই ধরনের রাজনীতি মুসলমানদের মধ্যে সন্দেহের প্রশ্ন জাগিয়ে তুললো এবং রাজনীতিতে এই ধরনের সাম্প্রদায়িকতার আমদানি তাদের সচকিত করে তুললো।

বিপিনচন্দ্র পাল এটা আরও পরিষ্কারভাবে বললেন। তিনি লিখলেন : আমাদের মধ্যে জাতীয় চেতনার ও আশা-আকাংখার নব জাগরণ প্রাচীনকালে শাক্ত ধর্মের আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল এবং দুর্গা, কালি, জগদ্ধাত্রী, ভবানী এবং প্রাচীন হিন্দু শক্তি-উপাসকের কল্পিত মূর্তি ও অবয়বগুলি এক নূতন রূপে দেখা দিল। এই সকল প্রাচীন ও সনাতন দেব-দেবীগণ—যাঁরা আধুনিক মানুষের মনের উপর সকল রকম প্রভাব হারিয়ে ফেলেছিলেন—তাঁরা দেশবাসীর চিন্তায় ও ভাবনায় এক নূতন ঐতিহাসিক ও জাতীয়তাবোধক ব্যাখ্যা নিয়ে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হলেন। দেশের লক্ষ লক্ষ লোক আজ দেশকে দুর্গা, কালি, জগদ্ধাত্রী বলে পূজা করছেন। এইগুলি আর শুধু পৌরাণিক অলীক সৃষ্টিমাত্র নয় বা কাল্পনিক জীবমাত্র নয়—এমন কি রাজনৈতিক আদর্শের চিত্রও নয়; এঁরা সেই মাতৃরূপের বিভিন্ন বিকাশ। ভাবতের আত্মাই হচ্ছেন এই মাতৃদেবী।.... এই মাতৃদেবীর আরাধনা আমাদের সাধারণ আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি। আমাদের সমাজের যৌথ জীবন ও কর্মপ্রণালীর এটাই হচ্ছে অধ্যাত্মকরণ ও চেতনাকরণ। আমাদের সমাজ মানসের এবং জাতীয় অন্বয়বের এইটাই চরমতম বিকাশ। আমাদের মনুষ্যত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের সঙ্গে ইহা অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। (সোল অফ ইণ্ডিয়া—ইংরেজির অনুবাদ—১৫৫-৯৬১ পৃঃ)

মুসলমানরা যখন রাজনীতিতে ইনসাল্লা' ঢোকালেন তখন আমরা খুব চেঁচিয়েছিলাম কিন্তু আমরা ভুলে গিয়েছিলাম যে, আমাদের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র দেবী দুর্গাকে দেশজননীর বাহ্যিক রূপ বলে প্রচার করে গেছেন এবং অরবিন্দ, তিলক, বিপিন পাল প্রভৃতি সকল নেতাই বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শের পূজারী ছিলেন।

অরবিন্দ ও অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা যে হিন্দু, সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের উদ্গাতা ছিলেন তারই সমর্থনে সাহিত্যিক গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী লিখেছেন : 'আমরা দেখিয়াছি দেখিতেছি অরবিন্দ এই বঙ্কিমপ্রদর্শিত জাতীয়তাকেই সজ্ঞানে ১৮৯৪ খ্রীঃ হইতেই অনুসরণ করিতেছেন। ব্রাহ্ম সমাজের অথবা মুসলমানের তিনি ধার ধারেন না। তিনি এক পায়ে দাঁড়াইয়া বগলা মন্ত্র জপ ও বগলা মূর্তি পূজা শেষ করিয়া আসিয়াছেন। অরবিন্দ। গুপ্ত সমিতিতে মা-কালীও আছেন এবং শ্রী গীতাও আছেন। এতে মুসলমান ভ্রাতাগণ যদি বলেন যে,—'এ ব্যবস্থায় দেশ উদ্ধারের জন্য তুমরা যাই-ই বা কী করিয়া আর থাকি-ই বা কোন মুখে ? আমাদের ত একটা পৃথক ধর্ম ও তার অনুশাসন আছে'—এ কথার জবাব ত চরমপন্থীদের ও গুপ্ত সমিতির দেওয়াই কর্তব্য।

'চরমপন্থী রাজনীতি ও বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি উভয়ই হিন্দু জাতীয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই দুই সম্প্রদায়ই ধর্ম-নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ প্রচার করেন নাই। রাজনীতি ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মের সাম্প্রদায়িক মতবাদ ও অনুষ্ঠানকে ইঁহারা যেন প্রাণপণে টানিয়া আনিয়াছেন। ভাবিয়াছিলেন যে, ইহার স্বাভাবিই তাড়াতাড়ি জয় উদ্ধার হইয়া যাইবে। আমার বলিবার কথা ১৯০৬ খ্রীঃ অব্দে অরবিন্দ গুপ্ত অথবা প্রকাশ্য এই দুই প্রকার রাজনীতিতে প্রবেশ করিবার মুখেই কংগ্রেসী জাতীয়তাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রবেশ করিয়াছেন। হিন্দুয়ানী ও হিন্দু সাধনাবর্জিত কংগ্রেসী বস্তুতন্ত্রহীন জাতীয়তা অরবিন্দ রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশমুখেই বর্জন করিয়াছেন। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাই অরবিন্দের জাতীয়তা, কংগ্রেসী জাতীয়তা তাঁহার জাতীয়তা নহে বরং জাতীয়তার বিপরীত বস্তু।' (শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলার স্বদেশী যুগ—৪৫২-৫৩ পৃঃ)

বঙ্কিম-অরবিন্দ-বিপিন পাল এবং তাঁদের উত্তরসূরী বিপ্লববাদীরা বাংলার এবং তিলক এবং তাঁর উত্তরসূরীরা মহারাষ্ট্র ও উত্তর ভারতে যে জাতীয়তার জন্মদান করলেন তা ছিল নিছক হিন্দু সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ। মুসলমানগণ স্বভাবতই এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি থেকে ১৯০৫ সাল থেকে শুধু বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন তা নয়—তাঁদের মধ্যেও ধর্মীয় বিষে বিষাক্ত রাজনীতির উন্মেষ হোলো।

এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বহুবার তাঁর মত পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করে গেছেন। ১৯২২-এ তিনি লিখেছেন : 'আমাদের দেশে যখন স্বদেশী আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল তখন আমি তার মধ্যে ছিলাম। মুসলমানরা তখন তাতে যোগ দেননি, বিরুদ্ধে ছিল। জননায়কেরা কেউ কেউ ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন,—ওদের একেবারে অস্বীকার করা যাক। জানি, ওরা যোগ দেয়নি। কিন্তু কেন দেয়নি ? তখন বাংলা হিন্দুদের মধ্যে এত প্রবল যোগ হয়েছিল যে সে আশ্চর্য। কিন্তু এতো বড়ো আগুন শুধু হিন্দু সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ রইল, মুসলমান সমাজকে স্পর্শ করল না। সেদিনও আমাদের শিক্ষা হয়নি। পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদের ডোবাটাকে আমরা সমাজের দোহাই দিয়ে গভীর করে রেখেছি।

'আমি যখন আমার জমিদারি সেরেস্তায় প্রথম প্রবেশ করলেম তখন একদিন দেখি, আমার নায়েব তাঁর বৈঠকখানার এক আরগায় জাজিম খানিকটা তুলে রেখে দিয়েছেন। যখন জিজ্ঞেস করলেম : 'এ কেন' তখন জবাব পেলেম, যে-সব সম্ভ্রান্ত মুসলমান প্রজা বৈঠকখানায় প্রবেশের অধিকার পায় তাদের জন্য ঐ ব্যবস্থা। এক তক্তপোষে বসাতেও হবে অথচ বুঝিয়ে দিতে হবে আমরা পৃথক। এ প্রথা তো অনেকদিন ধরে চলে এসেছে; অনেকদিন মুসলমান এ মেনে এসেছে, হিন্দুও মেনে এসেছে। জাজিম-তোলা আসনে মুসলমান বসেছে, জাজিম-পাতা আসনে অন্যে বসেছে। অবশেষে ওদের মেজে একেবারে তুলেছি :

হাওড়ায় সর্বাধুনিক বস্ত্র বিপণী
বেনারসী ০ জোড় ০ তাঁত ০ সিল্ক ০ মিলবস্ত্র ০ সার্টিং
সুটিং ০ ছিট কাপড় ও তৈরী পোষাক
শ্রীরাম টেক্সটাইল এম্পোরিয়াম
২৭।২, জি টি রোড (সাউথ) হাওড়া

'আমরা ভাই, তোমাকেও আমার সঙ্গে ক্ষতি স্বীকার করতে হবে, কারাবাস ও মৃত্যুর পথে চলতে হবে।' তখন হঠাৎ দেখি অপর-পক্ষ লাল টকটকে নতুন ফেজ মাথায় দিয়ে বলে, আমরা পৃথক। আমরা বিস্মিত হয়ে বলি রাষ্ট্র ব্যাপারে পরস্পর পাশে এসে দাঁড়াবার বাধাটা কোথায়? বাধা ঐ জ্ঞানিম-ভোলা আসনের মস্ত ফাঁকটার মধ্যে। ওটা ছোটো নয়। ওখানে অকূল অতল কল্পনানি। বক্তৃতামঞ্চের উইর দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ডাক দিলেই পার হওয়া যায় না।' (রবীন্দ্র রচনাবলী, ২৪শ খণ্ড, ৩৩-৩৪ পৃঃ)

বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে দেশের হিন্দু নেতারা যে অন্ধ রাজনীতির অনুসরণ করেছিলেন তার নিন্দা করে ডঃ আম্বেদকর লিখেছেন : 'বাঙালি হিন্দুদের বাংলা-বিভাগের বিরোধিতা করার প্রধান কারণ ছিল পূর্ববঙ্গে বাঙালি মুসলমানেরা যাতে যোগ্য স্থান না পেতে পারে সেই আকাঙ্ক্ষার দরুন। বাঙালি হিন্দুরা স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি যে, বাংলা বিভাগের বিরোধিতা ক'রে এবং সেই সঙ্গে স্বরাজলাভের দাবি করে তাঁরা একদিন মুসলমানদের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বঙ্গের শাসক করে তুলবেন।' (পাকিস্তান অর পার্টিশন অফ ইন্ডিয়া—ইংরেজির অনুবাদ, ১১০ পৃঃ)

১৯০৫-এর বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন শুধু বাংলায় নয় সারা ভারতবর্ষে সৃষ্টি করলো দুটি জাতীয়তাবাদ— একটি হিন্দু, অপরটি মুসলমান। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯০৬ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হোলো নিখিল ভারত মুসলিম লীগ।

১৯০৬ সালের সুরাট কংগ্রেসে যখন তিলক, অরবিন্দ প্রভৃতি চরমপন্থী নেতারা নরমপন্থীদের অপসারিত করে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটিকে দখল করলেন তখন স্বভাবতই এঁদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি কংগ্রেসকেও প্রভাবিত করলো। ১৯০৬ সালেই কংগ্রেস সাধারণভাবে হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়ালো এবং তারই প্রতি-যোগী হিসাবে দাঁড়ালো নব প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগ।

॥ ৪ ॥

চরমপন্থী বা অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের প্রচারণায় শুধু যদি হিন্দু দেব-দেবীকে 'দেশ-জননীর মূর্ত প্রকাশ বলে উল্লেখ থাকতো তাহ'লে মুসলমানেরা অতটা ভয় পেতেন না। কিন্তু চরমপন্থীরা দেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে আরও একটি নতুন জিনিসের অনুপ্রবেশ ঘটালেন। সেটা হচ্ছে ফ্যাসিস্ত মনোবৃত্তি। তাঁদের 'কর্মধারার অঙ্গ হিসাবে শুধু সরকারী কর্মচারী হত্যা করাই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। বল-প্রয়োগে বা ভয় দেখিয়ে দেশের লোককে তাঁদের নিজেদের মতের অনুবর্তী করাও তাঁদের কর্মসূচীর একটা প্রধান অঙ্গ হ'য়ে দাঁড়ালো। অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের কর্ম-প্রণালী সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যে কঠোর সমালোচনা করেছিলেন সেটা মনে রাখা দরকার। তিনি লিখেছিলেন : 'দেশের যে সকল লোক গুপ্ত পন্থাকেই রাষ্ট্রহিত সাধনের একমাত্র পন্থা বলিয়া স্থির করিয়াছে তাহাদিগকে গালি দিয়াও কোনো ফল হইবে না এবং তাহাদের ধর্মোপদেশ দিতে গেলেও তাহারা হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। আমরা যে যুগে বর্তমান এ যুগে ধর্ম যখন রাষ্ট্রীয় স্বার্থের নিকট প্রকাশ্য-ভাবে কুণ্ঠিত তখন এরূপ ধর্মভ্রংশতার যে দুঃখ তাহা সমস্ত মানুষকেই নানা আকারে বহন করিতেই হইবে, রাজা ও প্রজা, প্রবল ও দুর্বল, ধনী শ্রমী কেহ তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না।....

'অধৈর্য বা অজ্ঞানবশত স্বাভাবিক পন্থাতে অবিশ্বাস করিয়া অসামান্য কিছু একটাকে ঘটাইয়া তুলিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিলে মানুষের ধর্মবুদ্ধি নষ্ট হয়, তখন সকল উপকরণকেই উপকরণ, সকল উপায়কেই উপায় বলিয়া মনে হয়। তখন ছোটো ছোটো বালকদিগকেও এই উন্মত্ত ইচ্ছার নিকট নির্মমভাবে বলি দিতে মনে কোনো দ্বিধা উপস্থিত হয় না। আমরা মহাভারতের সোমক রাজার ন্যায় অসামান্য উপায়ে সিদ্ধিলাভের প্রলোভনে আমাদের অতি সুকুমার ছোটো ছেলেটিকেই যজ্ঞের অগ্নিতে সমর্পণ করিয়া বসিয়াছি.....।

দুঃখ সহ্য করা তত কঠিন নহে, কিন্তু দুর্মতিকে সম্বরণ করা অত্যন্ত দুরূহ। অন্যায়কে অত্যাচারকে একবার যদি কর্মসাধনের সহায় বলিয়া গণ্য করি তবে অন্তঃকরণের বিকৃতি হইতে রক্ষা করিবার সমস্ত স্বাভাবিক শক্তি চলিয়া যায়, ন্যায় ধর্মের ধ্রুব কেন্দ্রকে একবার ছাড়িলেই বুদ্ধির নষ্টতা ঘটে, কর্মের স্থিরতা থাকে না, তখন বিশ্বব্যাপী ধর্ম ব্যবস্থার সঙ্গে আবার আমাদের ভ্রষ্ট জীবনের সামঞ্জস্য ঘটাইবার জন্য প্রচণ্ড সংঘাত অনিবার্য হইয়া উঠে।

'সেই প্রক্রিয়া কিছুদিন হইতে আমা-দের দেশে চলিতেছে একথা নম্রহৃদয়ে দুঃখের সহিত আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। এই আলোচনা আমাদের পক্ষে একান্ত অপ্রিয় তাই বলিয়া নীরবে ইহাকে গোপন করিয়া অথবা অত্যুক্তি দ্বারা ইহাকে ঢাকা দিয়া অনিষ্টকে সাংঘাতিক হইয়া উঠিতে দেওয়া আমাদের কাহারও পক্ষে কর্তব্য নহে। আমরা সাধ্যমত বিলাতি পণ্য-দ্রব্য ব্যবহার না করিয়া দেশীয় শিল্পের রক্ষা ও উন্নতি সাধনে প্রাণপণে চেষ্টা করিব। ইহার বিরুদ্ধে আমি কিছু বলিব এমন আশঙ্কা করিবেন না।.....

'তথাপি দেশে বিদেশী পণ্যের পরি-বর্তে স্বদেশী পণ্য প্রচার যত বড় কর্মই হউক, লেশমাত্র অন্যায়ের দ্বারা তাহার সমর্থন করিতে হইবে একথা আমি কোনো-মতেই স্বীকার করিতে পারি না।... কিন্তু হায়, মনে নাকি ভয় আছে যে, মুহূর্তের মধ্যে ম্যাঞ্চেস্টারের কল যদি বন্ধ করিয়া দিতে না পারি তবে দীর্ঘকাল ধরিয়া এই দুঃসাধ্য উদ্দেশ্য অটল নিষ্ঠার সহিত বহন করিবার শক্তি আমাদের নাই, সেই-জন্য এবং কোনোমতে হাতে হাতে পার্টি-শনের প্রতিশোধ লইবার তাড়নায়, আমরা পথ-বিপথ বিচার করিতেই চাই নাই। এই-রূপে চারিদিক হইতে সামরিক তাগিদের বধিরকর কলকলায় বিভ্রান্ত হইয়া নিজের প্রতি বিশ্বাসহীন দুর্বলতায় স্বভাবকে অশ্রদ্ধা করিয়া শুভবুদ্ধিকে অমান্য করিয়া অতি সত্বর লাভ চুকাইয়া লইতে চায় এবং এবং পরে অতি দীর্ঘকাল ধরিয়া ক্ষতির নিকাশ করিতে থাকে, মঙ্গল পীড়িত করিয়া মঙ্গল পাইব, স্বাধীনতার মূলে আঘাত করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিব, ইহা কখনো হইতেই পারে না একথা মনে আনিতেও তাহার ইচ্ছা হয় না।

'আমরা অনেকে সম্পূর্ণ জানি না এবং অনেকে স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক যে, বয়কট ব্যাপারটা অনেক স্থানে দেশের লোকের প্রতি দেশের লোকের অত্যাচারের দ্বারা সাধিত হইয়াছে। আমি যেটাকে ভালো বুঝি, দৃষ্টান্ত ও উপদেশের দ্বারা অন্য সকলকে তাহা বুঝাইবার বিলম্ব যদি না সহে, পরের ন্যায্য অধিকারে বলপূর্বক হস্তক্ষেপ করাকে অন্যায় মনে করিবার অভ্যাস যদি দেশ হইতে চলিয়া যাইতে থাকে তবে অসংযমকে কোনো সীমার মধ্যে আর ঠেকাইয়া রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। কর্তব্যের নামে যখন অকর্তব্য প্রবল হয় তখন দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশ অপ্রকৃতিস্থ হইয়া উঠে। সেই জন্যই স্বাধীনতা লাভের দোহাই দিয়া আমরা যথার্থ স্বাধীনতা, ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছি, দেশের মতের অনৈক্য ও ইচ্ছার বিরোধকে দণ্ড উদ্যোলন করিয়া বলপূর্বক একাকার করিয়া দিতে হইবে এইরূপ

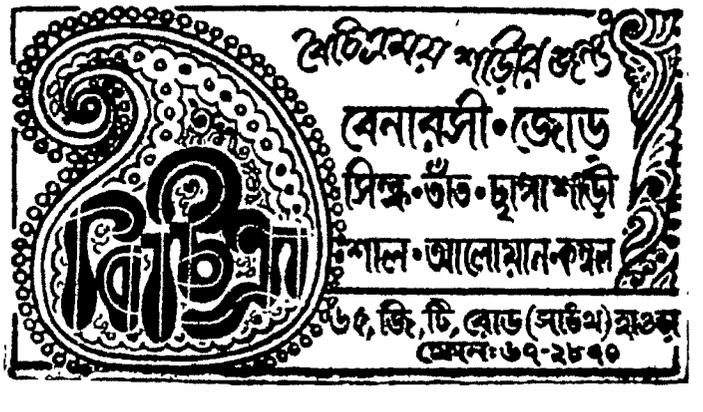

দুর্মতির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। আমি যাহা কবিব সকলকেই তাহা কবিতেই হইবে, আমি যাহা বলিব সকলকেই তাহা বলিতেই হইবে, এইরূপ বলপ্রয়োগে দেশের সমস্ত মত ইচ্ছা ও আচরণ বৈচিত্র্যের অপঘাত মৃত্যুর দ্বারা পশুত্ব লাভকেই আমরা জাতীয় ঐক্য বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়াছি। মতান্তরকে আমরা সমাজে পীড়ন করিতেছি, কাগজে অতি কুৎসিতভাবে গালি দিতেছে, এমন কি শারীরিক আঘাতের দ্বারাও বিরুদ্ধ মতকে শাসন করিব বলিয়া ভয় দেখাইতেছি। আপনারা নিশ্চয় জানেন এবং আমিও তদ্যোধিক নিশ্চয়তররূপে জানি। এরূপ বেনামি শাসনপত্র সম্প্রতি বিশেষে আমাদের দেশের অনেক লোকই পাইয়া থকেন এবং দেশের প্রধান ব্যক্তিরাও অপমান হইতে রক্ষা পাইতেছেন না। জগতে অনেক মহাপুরুষ বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে মত প্রচারের জন্য নিজের প্রাণও বিসর্জন করিয়াছেন, আমরাও মত প্রচার করিতে চাই, কিন্তু আর সকলের দৃষ্টান্ত পরিহার করিয়া একমাত্র কালাপাহাড়কেই গুরু বরণ করিয়াছি।' ('পথ ও পাথেয়'—বাঙ্গা ও প্রজা, পুস্তক হইতে)

অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের এই ফাসিসন্ত মনোবৃত্তি মুসলমানদের মনে সন্দেহ ও ভীতির সঞ্চার করেছিল সেই ১৯০৫ সাল থেকেই এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান স্রোত থেকে তাঁরা প্রায় সেই সময় থেকেই সরে দাঁড়িয়েছিলেন। চরমপন্থী বা বিপ্লববাদীরাও সাধারণভাবে মুসলমানদের বাদ দিয়েই স্বাধীনতা আন্দোলন চালাতে মনস্থ করেছিলেন। ১৯০৫ সাল থেকেই চরমপন্থী বা সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরাই কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সেই হেতু হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একটি রাজনৈতিক পার্থক্য পাকা হয়ে দাঁড়ালো।

এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে গান্ধীজী দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। সঙ্গে সঙ্গেই এই পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তনের ফলাফল সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। চরমপন্থীরা ভেবেছিলেন, মুসলমান না এলেও ক্ষতি নেই, তাঁরাই একা স্বাধীনতা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। কিন্তু গান্ধীজী দেখলেন মুসলমানদের সমর্থন না পেলে ভারতের স্বরাজ আন্দোলন সম্পূর্ণ সফল হতে পারবে না। কি করে স্বরাজ আন্দোলনকে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত আন্দোলনে রূপান্তরিত করা যায় তিনি তার পথ খুঁজে বার করবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

সুযোগও তিনি একটা পেয়ে গেলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিজয়ী মিত্রপক্ষের নেতা হিসাবে ইংরেজরা তুরস্ককে দুই ভাগে ভাগ করে দেবার প্রস্তাব করেন এবং বিশ্ব মুসলমান সমাজের ধর্মগুরু তুরস্কসম্রাট খলিফাকে ক্ষমতাচ্যুত করার সিদ্ধান্ত নেন। ভারতের মুসলমান সমাজ মনে করলেন ইংরেজরা অন্যায়ভাবে তাদের ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছেন। মুসলমানদের তরফ থেকে খিলাফৎ কমিটি ঠিক করলেন বড়লাটের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের দাবিগুলি তার কাছে উপস্থাপিত করবেন,—দাবি না মানলে সারা ভারতবর্ষে আন্দোলন করা হবে।

১৯২০-র ১লা আগষ্ট খিলাফৎ কমিটির অসহযোগ আন্দোলন সুরু হবার কথা ছিল। গান্ধীজী এই খিলাফৎ আন্দোলনের নেতৃত্ব করতে রাজি হয়ে যান। কিন্তু খিলাফৎ আন্দোলনের উদ্যোক্তারা মৌলানা মহম্মদ আলি ও মৌলানা শৌকত আলির নেতৃত্বে ইংরেজের বিরুদ্ধে অসহযোগের প্রস্তাব আগেই গ্রহণ করেছিলেন। এমন কি তাঁরা প্রকাশ্য সভায় প্রস্তাব পাশ করে মুসলমান জনসাধারণকে ভারতস্থ ইংরেজ সেনাদল থেকে পদত্যাগ করে ভারতীয় জনগণের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করে স্বধর্ম রক্ষার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। এটা ছিল প্রকাশ্য রাজদ্রোহ। আলি ভ্রাতৃদ্বয় এর আগেই রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়ে অন্তরীণ জীবন যাপন করে এসেছিলেন।

গান্ধীজীর উদ্দেশ্য ছিল খিলাফৎ আন্দোলনে যোগ দিয়ে তাঁর বৃহত্তর অসহযোগ আন্দোলনে মুসলমানদের সহযোগিতা লাভ করা। কিন্তু হিন্দু সাধারণ এবং বেশির ভাগ নেতৃস্থানীয় হিন্দু খিলাফৎ আন্দোলনে যোগ দিতে মোটেই আগ্রহী ছিলেন না এবং এর সংস্পর্শ থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। মডার্ন রিভিউ-এর সম্পাদক বিখ্যাত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এ বিষয়ে যেন একটু ব্যঙ্গ করেই লিখেছিলেন : মৌলানা মহম্মদ আলি ও মহাত্মা গান্ধী—এই দুজনের বক্তৃতা খুটিয়ে পড়লে এটা বুঝতে কষ্ট হয় না যে তাদের একজনের পক্ষে সুদূর তুরস্কের খিলাফতের সুব্যবস্থার কথাই প্রধান বিবেচ্য কিন্তু অন্য জনের পক্ষে ভারতের স্বরাজলাভই প্রধান লক্ষ্য।' (ইংরেজির অনুবাদ)

গান্ধীজী কিন্তু এর খুব হাস্যকর একটি জবাব দিয়েছিলেন; 'আমি দাবি করছি যে আমাদের উভয়ের পক্ষেই খিলাফতই প্রধান বিবেচ্য, মৌলানা মহম্মদ আলির পক্ষে কারণ যে এইটাই তাঁর ধর্ম, আর আমার পক্ষে কারণ যে, খিলাফতের জন্যে সংগ্রাম করতে পারলে আমি যা আমার ধর্ম অর্থাৎ গরুর মুসলমান ছুরিকাঘাত থেকে বাঁচাতে পারবো।' (ইংরেজির অনুবাদ— ২০।১০।১৯২০ ইয়ং ইণ্ডিয়া)

কিন্তু গান্ধীজীর এই অভিলাষ সফল হতে পারেনি। তিনি মৌলানা মহম্মদ আলিকে সঙ্গে নিয়ে খিলাফৎ আন্দোলনের সমর্থনে সারা ভারতময় প্রচার করে বেড়িয়েছিলেন তবুও হিন্দু জনসাধারণকে এই আন্দোলনে আকৃষ্ট করতে পারেন নি। আবার আরও একটা ব্যাপারে এই সময়ে হিন্দু ও মুসলমান নেতাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য দেখা গিয়েছিল। কংগ্রেসের নেতারা প্রায় একবাক্যে বললেন, ডোমিনিয়ন স্টেটাস পূর্ণ স্বাধীনতার চেয়ে ভালো কিন্তু খিলাফৎ এর মুসলমান নেতারা বললেন, পূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদের লক্ষ্য।

গান্ধীজী, চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহরু সকলেই একবাক্যে ঘোষণা করেছিলেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশীদার হয়ে স্বাধীনতা লাভ বা ডোমিনিয়ন স্টেটাস পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শের চেয়ে মহত্তর। ১৯২৪-এ বেলগাঁও কংগ্রেস সভাপতির অভিভাষণে গান্ধীজী বলেছিলেন : 'আমার মত ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যদি তাদের কথা মত কাজ করেন এবং সততার সঙ্গে আমাদের তাঁদের সমান হতে সাহায্য করেন তাহলে ব্রিটিশ সংস্রব সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন না করাই হবে আরও বিবাট জয়।' (ইংরেজির অনুবাদ)

১৯২৫-এ ফরিদপুর বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতি হিসাবে চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন : 'আমার মনে হয় পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য কমনওয়েলথের ভিতর থেকে স্বাধীনতা লাভের জন্য ভারতের প্রচেষ্টা চালানো উচিত যাতে সে বিশ্ব মানব সমাজের সেবা করতে পারে। (ইংরেজি থেকে-

১৯২৮-এ কলকাতা কংগ্রেসে মতিলাল বলেছিলেন : 'আমার কাছে এইটাই মূল্যবান যে ডোমিনিয়ন স্টেটাসে এমন অনেকটা স্বাধীনতা লাভ করা যায় যা পূর্ণ স্বাধীনতার কাছাকাছি এবং সব দিক দিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার চেয়ে বেশি গ্রহণীয়।
(ইংরেজি থেকে)

এমন কি স্বয়ং সুভাষচন্দ্র বসু যিনি ১৯২৮-এর কলকাতা কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণ করবার জন্য দাবি জানিয়েছিলেন তিনিও আগে মতিলাল নেহরু কমিটির সদস্য হিসাবে ডোমিনিয়ন স্টেটাসই ভারতের লক্ষ্য বলে সেই কমিটির রিপোর্টে নিঃশর্ত সই দিয়েছিলেন।

ওদিকে ১৯২১-এর সর্বভারতীয় খিলাফৎ সম্মেলনে আজাদ শোভানি প্রস্তাব করেছিলেন যে, পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতের লক্ষ্য এবং সে প্রস্তাব পরে পাশও হয়।

১৯২৮-এর সর্বভারতীয় খিলাফৎ সম্মেলনে মৌলানা মহম্মদ আলি বলেছিলেন : 'সর্বদলীয় সম্মেলনে আমি গেছিলাম যে ভারতের চাই পূর্ণ স্বাধীনতা এবং তাতে কোনো সাম্প্রদায়িকতা ছিল না তবুও আমাকে পদে পদে হয়রাণ করা হয়েছিল। এবং বারে বারে আমাকে বক্তৃতা বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। মতিলাল নেহরুর রিপোর্টের উপনির্বাচনিকায় দাসত্বের বন্ধনকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে এবং মতিলাল নেহরুর প্রস্তাবটি ছিল সবচেয়ে জঘন্য। সর্বদলীয় সম্মেলনের সভাপতি ডাঃ আনসারি পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর হাতের একটি পুতুল মাত্র ছিলেন। আর ওই মিঃ জে এম সেনগুপ্তও সেই পোষাকই পরেছেন। এই সেদিন তাঁরা প্রস্তাব পাশ করেছিলেন যে যদি সম্ভব হয় ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে যুক্ত থেকেই স্বরাজ লাভ করতে হবে। কিন্তু প্রয়োজন হলে তার বাইরে গিয়েও স্বরাজ লাভ দাবি করতে হবে। এতদিনে বলার সময় এসেছে যে, আমাদের স্বরাজ হবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আওতার বাইরে,

তবুও মতিলাল নেহরু বলছেন ডোমিনিয়ন স্টেটাসই স্বাধীনতা.... আমি ঘোষণা করছি যে ভারতীয় মুসলমানদের লক্ষ্য হচ্ছে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা।' (ইণ্ডিয়ান এ্যানুয়াল রেজিস্টার ১৯২৮ ভলিযুম ২ ইংরেজির অনুবাদ)।

।।৫।।

আরও একটি ব্যাপারে খিলাফৎ আন্দোলনের নেতাদের সংগে কংগ্রেস নেতাদের বিশেষ করে গান্ধীজীর গভীর পার্থক্য ছিল। গান্ধীজী বারে বারে বলেছেন ও লিখেছেন যে গ্রাম-স্বরাজই কংগ্রেসের প্রধান লক্ষ্য এবং দেশের দরিদ্রতম ব্যক্তির স্বরাজ না হলে সে স্বরাজের কোনো মূল্য নেই। কিন্তু তাঁর কথায় ও কাজে অনেক সময়ে মিল থাকতো না।

তাঁর দ্বারা পরিচালিত স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশের কৃষক গ্রামবাসী ও খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের যোগ দেওয়ার কোনো অবকাশ তিনি রাখেন নি এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেবার জন্য তাদের আহ্বানও জানান নি। ১৯২১ এর অসহযোগ আন্দোলনে গান্ধীজী ত্রি-বর্জন নীতি ঘোষণা করেছিলেন অর্থাৎ আইন-সভা, আদালত ও সরকারী স্কুল-কলেজ বর্জন করতে হবে। ১৯২১-এ ভারতে শিক্ষিতের হার কতটা ছিল বিবেচনা করুন এবং স্পষ্টতঃ গান্ধীজী তাঁর দ্বারা প্রচারিত অসহযোগ আন্দোলন এই অল্প শতাংশ শিক্ষিতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। কৃষক, গ্রামবাসী ও খেটে-খাওয়া মানুষ আইন সভা, আদালত ও স্কুল-কলেজের সংগে কোনো সম্পর্ক রাখতো না। কাজেই তাঁদের পক্ষে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার কোনো অবকাশই গান্ধীজী রাখেননি। গান্ধীজী বোধহয় ইন্দ্রজালে বিশ্বাস করতেন তাই তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে ১৯২১-এর ৩১শে ডিসেম্বরই স্বরাজ লাভ হবে এবং ওদিকে স্বরাজ আন্দোলনে ডাক দিয়েছিলেন দেশের তিন শতাংশ শিক্ষিত ও অর্থবান সম্প্রদায়কে।

বাংলার বীরেন্দ্রনাথ শাসমল গান্ধীজীর আন্দোলনের এই অসংগতিটুকু প্রথমেই ধরতে পারেন এবং সেইজন্য ভারতবর্ষে তিনিই সর্বপ্রথম কৃষক গ্রামবাসীর গণ-আন্দোলনের হিসাবে মেদিনীপুরে ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ করেন ও গ্রামবাসীদের চৌকিদারি ট্যাক্স দিতে নিষেধ করেন। তাঁর অপূর্ব সংগঠন শক্তির মাঝখানে তখনকার সরকার অবশেষে সমগ্র মেদিনীপুর থেকে ২২৭টি ইউনিয়ন বোর্ড তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা বেশির ভাগ ছিলেন জমিদার তাঁরা এই আন্দোলনের বিরুদ্ধতা করেছিলেন কারণ গ্রামবাসী ও কৃষকদল সংগঠিত হচ্ছে দেখে তাঁরা ভয় পেয়ে যান। জওহরলাল নেহরু, তাঁর আত্মজীবনীতে স্বীকার করেছেন যে পাছে জমিদারেরা চটে যায় সেই ভয়ে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনে গ্রামবাসীদের কর বন্ধের প্রকল্প কার্যকরী হতে দেন নি। কংগ্রেসের জমিদারদের সহযোগী নেতারা তাই বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে কংগ্রেসের নেতৃত্ব থেকে যাহিষ্কার করেন এবং এতবড় গণ-আন্দোলনের কথা কোনো ঐতিহাসিক তাঁর বইতে উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি। কেরা বা চম্পারণ সত্যাগ্রহ নিছক স্থানীয় অভিযোগের প্রশ্নে চালানো হয়েছিল- অসহযোগ আন্দোলনের সংগে এদের যুক্ত করা চলেনা।

গান্ধীজী ও কংগ্রেস যে একেবারের নিচের তলার লোকদের মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলন টেনে নিয়ে যেতে পারেন নি এটাই গান্ধীজীর ও কংগ্রেস নেতৃত্বের চরম ব্যর্থতা। আজ পর্যন্ত আমাদের সকল আন্দোলন তাই শুধু শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যেই আটকে থেকে গেছে। এমন কি ৩০-এর লবণ সত্যাগ্রহেও গ্রামবাসীর চেয়ে শহরের শিক্ষিত লোকই বেশি কারাবরণ করেছিলেন।

খিলাফৎ আন্দোলনের মুসলমান নেতারা যতদূর সম্ভব এই অসংগতি দূর করবার চেষ্টা করেছিলেন। আগেই বলেছি, ১৯২১-এর ১০ই জুলাই সর্বভারতীয় খিলাফৎ সম্মেলন ঘোষণা করেছিলেন যে, ভারতীয় আর্মিতে যে সব মুসলমান সৈন্য আছেন তাঁদের পক্ষে ভারতীয় আর্মিতে থাকা বা যোগ দেওয়া ইসলাম-ধর্ম বিরোধী। (ইণ্ডিয়ান এ্যানুয়াল রেজিস্টার ১৯২১, ইংরেজির অনুবাদ ভলিযুম ২, ১৭৩ পৃঃ)। ১৯২১-এ মৌলানা মহম্মদ আলি সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন প্রস্তাবে বলেছিলেন:" মহাত্মা গান্ধী ও যারা তাঁর ধর্মমতে বিশ্বাস করেন তাঁরা গভর্ণমেণ্টের সংগে সংগ্রামকে শান্তিপূর্ণ পথে চালাতে চান কিন্তু মুসলমান ধর্ম বলে যে অন্যায়কে যদি হিংসার সাহায্য ব্যতিরেকে নির্মূল করা না যায় তাহলে হিংসা দিয়েই তাকে নির্মূল করা উচিত। যদি শান্তিপূর্ণ পথ কার্যকরী না হয় তাহলে প্রয়োজন হলে হিংসার ব্যবহার করতে হবে।" (ইণ্ডিয়ান এ্যানুয়াল রেজিস্টার ১৯২১ ভলিযুম ২, ২৩১ পৃঃ—ইংরেজির অনুবাদ)।

খিলাফৎ আন্দোলনের নেতারা তাঁদের আন্দোলনকে সর্ব শ্রেণীতে ছড়িয়ে দিয়ে খুব ব্যাপক করে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন যেটা কংগ্রেস নেতারা পারেন নি বা চাননি।

এইজন্যই গান্ধী-যুগে ভারতে অনেক বড় নেতা জন্মেছিলেন বটে কিন্তু ভালো কর্মী সৃষ্ট হয় নি। যে শ্রেণীর লোক নেতা হতে চায় গান্ধীজী তাঁর সকল আন্দোলনে সেই শ্রেণীর উপরই বেশি

বাংলা ভাষায় কয়েকটি অসাধারণ
জীবনকাহিনী-আত্মচরিত-স্মৃতিচারণ

শ্রীদিলীপকুমার রায়
যুগঋষি অরবিন্দ ১০৲ তীর্থঙ্কর ১৮৲
সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর যাত্রী ১৮৲
মীর মশার্‌রফ হোসেন
আমার জীবনী ২০৲
ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার
জীবনের স্মৃতিদীপে ১৬৲
অধ্যক্ষ জনার্দন চক্রবর্তী স্মৃতিভারে ৫৲
[জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত]
জেনারেল বুকস্, এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ৭

নির্ভর করতেন এবং কর্মী তৈরি হয় যে-শ্রেণী থেকে সেই নিচের তলার লোকদের স্বরাজ আন্দোলনে যোগ দেবার বেশী অবকাশ থাকতো না। ৩০-এর লবণ সত্যাগ্রহে গান্ধীজী অনেকটা এই ভুল শোধরাবার চেষ্টা করেছিলেন বটে কিন্তু এই সংগ্রামেও ভদ্রলোক শ্রেণীই বেশি সংখ্যায় যোগ দিয়েছিলেন এবং কৃষক-গ্রামবাসীর সংখ্যা তুলনায় অনেক কম ছিল।

এই কারণেই গান্ধীজীকে আরও একটি জিনিস মেনে নিতে বাধ্য হতে হয়েছিল যা তাঁর জীবন দর্শনের সম্পূর্ণ বিরোধী। অসহযোগ আন্দোলনে নেতার সংখ্যা বেড়ে গেল বটে কিন্তু কর্মী বলতে প্রায় কেউই রইলেন না। কারণ, কর্মী তৈরির কোনো প্রশ্নই গান্ধীজী নেন নি। কিন্তু কর্মী না হলে কোনো সংগঠন চালানো যায় না। বাংলায় চিত্তরঞ্জন দাশ এই অভাবটি দূর করবার জন্যে স্বদেশী যুগের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের ডেকে এনে কংগ্রেসের ভার তুলে দিলেন তাঁদের হাতে। মেদিনীপুরে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী আন্দোলনে কৃষক গ্রামবাসীদের এক বিরাট কর্মী সংগঠন তৈরি করেছিলেন যে সংগঠনের বনিয়াদ শক্ত থাকার দরুণ মেদিনীপুরে স্বাধীনতা সংগ্রাম বারে বারে অপূর্ব সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। কিন্তু পাছে তিনি সারা বাংলায় নিচের তলার মানুষকে অর্থাৎ কৃষক-গ্রামবাসী খেটে-খাওয়া মানুষকে সংগঠিত করে তোলেন সেই ভয়ে চিত্তরঞ্জন তাঁকে সরিয়ে দিয়ে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের হাতেই কংগ্রেসের পূর্ণ পরিচালন ভার তুলে দিলেন। নিচের তলার কর্মীর অভাব শুধু বাংলায় নয় সারা ভারতেই ছিল। এই ভাবে শুধু বাংলায় নয় উত্তর ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই কংগ্রেসের পরিচালন ভার ধীরে ধীরে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের হাতে চলে গেল। কিন্তু এঁরা সকলেই প্রধানতঃ ছিলেন মুসলমান বিরোধী এবং স্বভাবতই অন্তরে অন্তরে অহিংসা মন্ত্রে বিশ্বাস করতেন না।

গান্ধীজী শীঘ্রই এর প্রমাণ পেলেন ১৯২৪ সালে আহমেদাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে। এই অধিবেশনে গোপীনাথ সাহা কর্তৃক কলকাতায় এক নিরপরাধ ইংরেজকে হত্যা করার নিন্দা প্রস্তাব উত্থাপন করলেন স্বয়ং গান্ধীজী। চিত্তরঞ্জন এই প্রস্তাবের সংশোধনী আনলেন যাতে বলা হোলো যে হত্যাকান্ড নিন্দনীয় হলেও গোপীনাথ সাহা দেশপ্রেমের প্রেরণাতেই ইংরেজ হত্যা করেছিলেন। চতুর আইনবিদ চিত্তরঞ্জন ঘুরিয়ে বলতে চাইলেন যে হত্যাকান্ড খারাপ হতে পারে কিন্তু দেশপ্রেমের প্রেরণায় হত্যাকান্ড চলতে পারে। গান্ধীজী ৭৮ ভোট পেলেন, চিত্তরঞ্জন পেলেন ৭০। নিখিল ভারত কংগ্রেসের ১৪৮ জন সদস্যের প্রায় অর্ধেক বার দিলেন যে, দেশপ্রেমের প্রেরণায় হত্যাকান্ড চলতে পারে। অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা তখন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটির প্রায় অর্ধেক কব্জা করে নিয়েছেন। কিন্তু তাঁরাই কর্মী স্থানীয় ছিলেন এবং অন্যান্যরা ছিলেন নেতা। কাজেই কংগ্রেসের ওপর তাঁদের প্রভাব কত গভীর হয়ে উঠেছিলো সেটা বুঝতে কষ্ট হওয়া উচিত নয়। ১৯২৯ সালের লাহোর কংগ্রেসেও এই রকমটি ঘটেছিলো। সেখানে গান্ধীজী বড়লাট লর্ড আরউইনের উপর বোমা আক্রমণের নিন্দা করে প্রস্তাব আনলেন। নিখিল ভারত কংগ্রেসের ১১৭ জন সদস্য নিন্দাপ্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলেন, ৬৯ জন বিপক্ষে। ৬৯ জন কংগ্রেস সদস্য পরোক্ষে বড়লাটের প্রতি বোমা আক্রমণকে সমর্থন জানালেন।

এই যে কংগ্রেসের কর্মী দলে বেশির ভাগ সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের প্রায় একচ্ছত্র প্রাধান্য হয়ে গেল গান্ধীজী এর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারলেন না। কারণ, প্রধানতঃ কর্মী তৈরী করবার কোনো প্রকল্পই তাঁর কখনও ছিল না এবং দ্বিতীয়তঃ সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে সংগ্রামের প্রধান সেনাপতি হিসাবে সে পথে যেতে তিনি সাহস করেন নি। এই কারণেই ওয়েভেল বারবার তাঁর দিনপঞ্জীতে লিখেছেন যে গান্ধীজী অন্তরে অন্তরে হিংসাকে সমর্থন করতেন শুধু মুখে অহিংসার কথা বলতেন। গান্ধীজী সম্বন্ধে ওয়েভেলের এই কঠোর মন্তব্য সমর্থনীয় নয়। কিন্তু গান্ধীজী কংগ্রেসে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের প্রাধান্য লঘু করবার জন্য কোনো চেষ্টা কখনও করেন নি।

কংগ্রেসের বহু প্রথম সারির নেতা জেলে যেতেন এবং লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিতেন কিন্তু দেশের খুব সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ একদম ছিল না। কারণ বেশির ভাগ নেতাই শহরের চৌহদ্দির মধ্যে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন, গ্রামাঞ্চলে একদম যেতেনই না। গেলেও যতদূর মোটর গাড়ি যায় তার বেশি যেতেন না। এমন কি চিত্তরঞ্জন বা সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বেরও দৌড় ছিল ততদূর পর্যন্ত যতদূর মোটর গাড়ি যায়। অতদূর এই সব নেতাদের নেতৃত্ব বজায় রাখবার জন্য সবসময়েই সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী কর্মীদের উপর নির্ভর করতে হোতো। এবং তাঁরা কোনো কারণেই বিপ্লববাদী কর্মীদের চটাতে সাহস করতেন না। আবার গান্ধীজীকেও এই সব নেতাদের উপর সর্বাংশে নির্ভর করতে হোতো কাজেই তিনিও বিপ্লববাদীদের চটাতে চাইতেন না। আমি দেখিয়েছি মৌলানা আজাদ তাঁর বইতে লিখেছেন: সকল শ্রেণীর বেঙ্গলিউশনারিরা মুসলমান বিরোধী ছিলেন। ১৯২৬-এ এক চিঠিতে মতিলাল নেহরু জওহরলালকে লিখেছিলেন: "দুর্ভাগ্যবশতঃ, বাঙালি রেভলিউশনারিরা চরমভাবে সাম্প্রদায়িক। (এ বাঞ্চ অফ ওল্ড লেটার্স দেখুন)।

তাহলে, ১৯২১ সালেও অর্থাৎ গান্ধী যুগেও একটি সুসংগঠিত মুসলমান বিরোধী কর্মী দল কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যার অর্ধেক স্থান দখল করে বসলেন এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে তাঁদের গুরুত্ব হয়ে উঠল সংখ্যানুপাতে ঢের বেশি কারণ নেতাদের তাঁদের উপরই নির্ভর করতে হত। শুধু অসহযোগ আন্দোলন বা খিলাফৎ আন্দোলনের কথা হলে হয়ত ব্যাপারটা বেশি দূর গড়াত না কারণ গান্ধীজী অচিরেই অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন এবং হিন্দুদের সক্রিয় সাহায্য ব্যতিরেকে খিলাফৎ আন্দোলনের প্রভাবও বেশি বাড়তে পারে নি। কিন্তু ১৯২৩ সালের আর একটি ঘটনায় ফল আরও একটু গড়িয়ে গেল।

চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহরু ১৯২৩ সালে গঠন করলেন নিখিল ভারত স্বরাজ্য দল এবং ঘোষণা করলেন যে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম যেমন বাইরে চলছে তেমনি আইনসভাগুলির ভিতরেও সেই সংগ্রাম চালাতে হবে। গয়া কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন: "আমাদের মধ্যে অনেকে মনে করেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেই দেশের সাধারণ মানুষের স্বরাজ অর্জন করতে হবে। আমি বিশ্বাস করি না যে, কোন বিশেষ শ্রেণীর আন্দোলনকে স্বরাজ সংগ্রামে কখনও পরিণত করার সম্ভাবনা আছে। আজ যদি বিলাতের পার্লামেন্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে দেশে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের প্রবর্তন করেন, আমার পক্ষ থেকে আমি তার প্রতিবাদ করব কারণ তাতে নিশ্চিতভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হবার পথ খুলে দেবে। আমি বিশ্বাস করি না যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণী সেই করায়ত্ত ক্ষমতা হাতছাড়া করবে। বর্তমানে দেশের শাসক সাদা চামড়ার আমলাতন্ত্রকে সরিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভারতীয় আমলাতন্ত্রকে বসালে ভারতের তাতে কি লাভ হতে পারে?" (ইংরেজির অনুবাদ)।

নিখিল ভারত স্বরাজ্য দলের রাজনীতি কিন্তু চিত্তরঞ্জন জমিদারী শ্রেণী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে নিয়েই শুরু করলেন। মুসলমান সম্প্রদায় স্বভাবতই এতে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন। তাঁরা দেখলেন যে, যদিও চিত্তরঞ্জন আইনসভার ভিতর থেকে স্বরাজ্য-সংগ্রাম চালানোর কথা বললেন তবুও স্বরাজ্য দলেরই একটা বড় অংশ—বিশেষ করে বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন। এইভাবে অবশেষে হিন্দু মধ্যবিত্তের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা চলে যেতে পারে বলে মুসলমান মধ্যবিত্ত নীতিমত শঙ্কিত হয়ে উঠলেন. বাংলায় মুসলমানেরা সাধারণভাবে স্বরাজ্য দলের বিরুদ্ধে গেলেন। চিত্তরঞ্জনের মত বিরাট নেতার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও স্বরাজ্য দলের

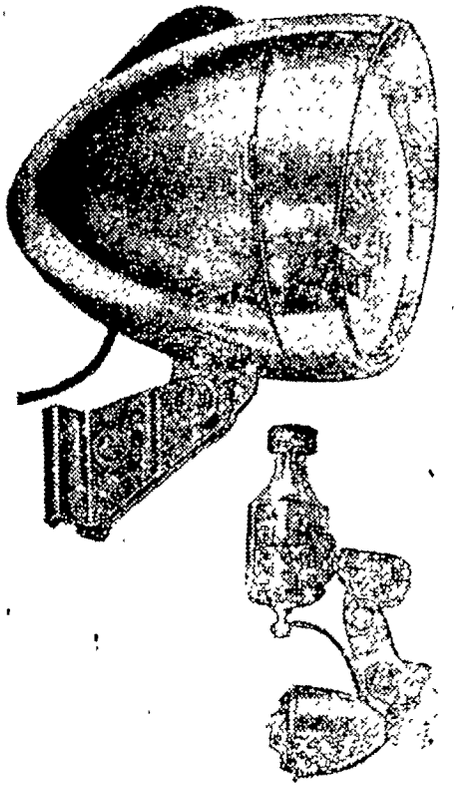

টি আই মিলার ডায়নামো

- ১২ ভোল্ট ও ৬ ভোল্টের— পছন্দ তো আপনার।
- যেকোনো মেঘলা আবছা আবহাওয়াতেও... সোজা তীব্র আলোর রেখা।
- আপন শক্তিতেই আলো জ্বলে— কোনো ব্যাটারী সেলের দরকার নেই— তার মানেই আর কোন খরচ নেই।
- ছিমছাম সুন্দর গড়ন, সম্পূর্ণ ক্রোম করা, আর চুরি হবার সম্ভাবনাও নেই।

আজই মিলার ডায়নামো কিনুন। এটি হল সব আবহাওয়াতেই আলো জ্বালানোর ল্যাম্প, যা' আপনার জীবনভোর কাজে আসবে।

মিলার—অন্ধকার পথে আলোর রশ্মি

MILLER

টি আই মিলার লিমিটেড মাদ্রাজ ৬০০ ০৫৩ (টিউব ইনভেস্টমেন্টস্ অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের একটি পরিপূরক সংস্থা)

মনোনয়নে তিনি মাত্র একটি মুসলমান প্রার্থীকে নির্বাচনে জেতাতে পেরেছিলেন। স্বরাজ্য দলের অন্যান্য মুসলমান প্রার্থী শোচনীয়ভাবে হেরে যান। গান্ধীজীর মত চিত্তরঞ্জনও অচিরেই বুঝতে পারলেন, বেমন বাইরে তেমনি আইনসভার ভিতরেও মুসলমানদের সাহায্য না পেলে তাঁর সংগ্রাম সফল হতে পারবে না।

এর জন্য মূলত দায়ী ছিল কংগ্রেসের হিন্দু নেতাদের বিশেষ করে বাঙ্গালী হিন্দুদের সংকীর্ণ নির্বুদ্ধিতা। লর্ড কার্জনের বঙ্গ বিভাগ মেনে নিলে পূর্ব বাংলা মুসলমান প্রধান হয়ে থাকত বটে কিন্তু পশ্চিম বাংলায় হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা বরাবর রাখা যেত। বাংলাকে এক করে রাখবার একটা উন্মাদ ও অন্ধ তাগিদে হিন্দু নেতারা সমগ্র বাংলায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা কায়েম হতে সাহায্য করেছিলেন। ১৯০৫ সালে যে বাঙ্গালী হিন্দু কার্জনের সেটল্ড ফ্যাকটকে আনসেটল করবার জন্য বুকের রক্ত দিয়েছিলেন ১৯৪৭ সালে তাঁরাই বাংলা বিভাগের দাবি তুলে বাংলা ভাগ করিয়েছিলেন।

এক সময় আইনসভাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান প্রতিনিধিদের সাহায্য না পেলে কোন প্রগতিমূলক কাজ করাই সম্ভব হচ্ছিল না। চিত্তরঞ্জন এটা বুঝতে পেরে মুসলমানদের সন্তুষ্ট করে তাঁদের সাহায্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার আশায় ১৯২৩ সালে সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মিলনীতে তাঁর বিখ্যাত হিন্দু-মুসলিম চুক্তি সম্পাদন করলেন। একে বেঙ্গল প্যাকটও বলা হয়ে থাকে।

এই চুক্তির ফলে আইনসভাগুলিতে মুসলমানদের গরিষ্ঠতার অনুপাতে সদস্য সংখ্যা নির্ধারণের ব্যবস্থা করা হোল এবং এই ব্যাপারে কংগ্রেসও খিলাফৎ কমিটির মধ্যে পূর্ব সম্পাদিত সর্বভারতীয় হিন্দু-মুসলিম চুক্তির শর্তগুলি অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হল। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ছিল চাকুরীর সংখ্যানুপাতিক বিন্যাস। সরকারী চাকুরীতে মুসলমানদের ৫৫ শতাংশ ও হিন্দু ও অন্যান্যের ৪৫ শতাংশের ব্যবস্থা হয়েছিল। ধর্মীয় সহনীতার ক্ষেত্রে এই চুক্তি কয়েকটি সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিল। তার মধ্যে প্রধান ছিল : (১) মসজিদের সামনে বাজনা বাজিয়ে শোভাযাত্রা করা চলবে না, (২) মুসলমানদের ধর্মীয় অনুশাসনের জন্য গোহত্যা চলে তাতে বাধা দেওয়া চলবে না কিন্তু হিন্দুদের মনে আঘাত লাগে এমনভাবে গোহত্যা করা চলবে না।

এই চুক্তির ফলে মুসলমানদের একটা বড় অংশ খুশি হলেন এবং হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির একটা আবহাওয়া সৃষ্টি হল। কিন্তু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এবং জমিদার শ্রেণীর হিন্দুরা এই চুক্তির বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। সবচেয়ে বেশি ক্ষুব্ধ হলেন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দল। যাঁদের হাতে চিত্তরঞ্জন কংগ্রেসের পরিচালনার ভার অর্পণ করে নিশ্চিত হয়েছিলেন। এমন কি গান্ধীবাদী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পর্যন্ত প্রকাশ্য বক্তৃতায় বলেছিলেন : মুসলমানদের নিকট আত্মসমর্পণ করে করে আমরা তাদের একটার পর একটা দাবি বাড়িয়ে তুলতেই সাহায্য করছি। (১৯২৭-এর ২৫শে এপ্রিল—দি বেঙ্গলী দেখুন)।

চিত্তরঞ্জনের হিন্দু-মুসলমান চুক্তি সম্বন্ধে আবুল কালাম আজাদ ইণ্ডিয়া উইনস ফ্রিডম বইতে লিখেছেন : এই সাহসিক ঘোষণা বঙ্গীয় কংগ্রেসের ভিত্তি পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলেছিল। বহু কংগ্রেস নেতা তুমুলভাবে এর বিরোধিতা করলেন এবং মিঃ দাশের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করে দিলেন। তাঁকে সুবিধাবাদের এবং মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের জন্য অভিযুক্ত করা হল। কিন্তু তিনি অটল পাহাড়ের মত খাড়া হয়ে রইলেন। এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে, তিনি দেহত্যাগ করবার পর তাঁর কিছু সংখ্যক শিষ্য তাঁর আদর্শকে খর্ব করে দিলেন এবং তাঁর এই ঘোষণাটিকে বাতিল করে দেওয়া হল। ফলে এই হল যে, বাংলার মুসলমানেরা কংগ্রেস থেকে সরে দাঁড়াল এবং দেশ বিভাগের প্রথম বীজ বপন করা হল। (ইংরেজি অনুবাদ—২১ পৃঃ)।

হিন্দু-মুসলমান চুক্তি ছাড়াও ১৯২৫-এর ২রা মে ফরিদপুর বঙ্গীয় সম্মিলনীর সভাপতি হিসাবে তিনি যে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার প্রস্তাব করেছিলেন এবং ডোমিনিয়ন স্টেটাসকে পূর্ণ স্বাধীনতার চেয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য বলে ঘোষণা করেছিলেন তাতে তিনি বহু নবীন কংগ্রেসীর ও বিশেষভাবে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের কাছে খুব অপ্রিয় হয়ে পড়েন। ফরিদপুরেই সম্মেলন মণ্ডপে কংগ্রেস কর্মীদের কাছে দুর্ব্যবহার লাভ করে তিনি মণ্ডপ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। সন্ধ্যাবেলায় তাঁর জ্বর হয়। তিনি অসুস্থই ছিলেন—তা বেড়ে যায়। তাঁর এই অসুখ আর সারে নি। ১৬ই জুন দার্জিলিংয়ে তিনি দেহত্যাগ করেন।

তাঁর মৃত্যুর পর বাংলার বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতারা ও সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা চিত্তরঞ্জনের হিন্দু-মুসলমান প্যাক্ট বাতিল করার জন্য উঠে-পড়ে লেগে গেলেন।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ভার সন্ত্রাসবাদীদের হাতেই ছিল এবং তাঁদের দাবিতে গান্ধীজী যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে চিত্তরঞ্জনের জায়গায় বাংলার নেতা করে দিলেন। বহু কংগ্রেস সদস্যের অমত সত্ত্বেও শুধু সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের দাবি মেটাবার জন্য গান্ধীজী যে যতীন্দ্রমোহনকে বাংলার নেতা করেছিলেন তার উল্লেখ করে স্বরাজ্য দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ডঃ মুকুন্দলাল জয়াকর (পরে বিলাতের প্রিভিকাউন্সিলে জজ নিযুক্ত হয়েছিলেন) ১৯২৫ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর লালা লাজপৎ রায়কে এক চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন : বাংলা থেকে খবরে জানিয়েছেন অন্যায় হস্তক্ষেপের দ্বারা গান্ধীজী যে সেনগুপ্তকে বাংলার নেতা করে দিলেন তাতে পার্টি শিগগির ভেঙে যাবে। (মাই লাইফ স্টোরি দ্বিতীয় ভাগ—৬৩০ পৃঃ)।

চিত্তরঞ্জনের সক্রিয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব মাত্র পাঁচ বছরের ছিল। প্রথম জীবনে তিনি সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দল অনুশীলন সমিতির সহকারী সভাপতি ছিলেন। ১৯২০তে তিনি গান্ধীজীর অসহযোগ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। ২১শের নাগপুর কংগ্রেসে তিনি অসহযোগ আন্দোলনকে স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু ১৯২৩-এ নিখিল ভারত স্বরাজ্য দল প্রতিষ্ঠা করে আইনসভায় প্রবেশ করে আন্দোলন চালাবার পরিকল্পনা নিলেন। আইনসভায় প্রবেশ করে তাঁর স্বরাজ্য দল বাংলায় ও অন্যান্য প্রদেশে কয়েকবার মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছিলেন এবং কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ কয়েকবার বাজেট প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছিল। রাজনীতির চমক এই সব ব্যাপারে ছিল বটে কিন্তু আসলে এ সবের কোন সার্থকতা ছিল না। কারণ মন্ত্রিসভা প্রত্যাখ্যাত হলে গভর্ণর মন্ত্রীদের শাসিত বিষয়গুলি আইন অনুসারে নিজের হাতে নিয়ে নিতেন এবং তখন তার উপরে আর ব্যবস্থাপক সভার কোন কর্তৃত্ব থাকত না। কেন্দ্রেও বাজেট প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলে বড়লাট সার্টিফিকেট দিয়ে বাজেট পাশ করিয়ে নিতেন। এই ধরনের রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে চিত্তরঞ্জন ১৯২৫-এর ২রা মে ফরিদপুরে প্রাদেশিক সম্মিলনীতে প্রস্তাব করেছিলেন যে, সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দিলেও মন্ত্রীমণ্ডলীকে সকল বিষয় শাসন করবার স্বাধীন অধিকার দিলে তিনি ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছেন।

চিত্তরঞ্জনের এই আপাত-বিরোধী রাজনৈতিক মতামতের ঘূর্ণিবর্তের ভিতর বাংলার ও ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতির পথে চিত্তরঞ্জনের একমাত্র উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল হিন্দু-মুসলিম চুক্তি বা বেঙ্গল অ্যাক্ট। ১৯২২-এ গয়া কংগ্রেসেই প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রকৃত মিলন সাধনের উদ্দেশ্যে উভয় সম্প্রদায়ের নেতারা একটি প্যাক্ট বা চুক্তি করে হিন্দু ও মুসলমানের পারস্পরিক স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবেন। এই প্রস্তাবের তাগিদেই চিত্তরঞ্জন ১৯২৩-এ সিরাজগঞ্জে বেঙ্গল প্যাক্ট পাশ করিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর দেহত্যাগের পর তাঁর প্রিয় শিষ্যেরা বিশেষ করে তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা চিত্তরঞ্জনের বেঙ্গল প্যাক্ট ধ্বংস করবার জন্য উঠে-পড়ে লেগে গেলেন। তাঁদের যুক্তি ছিল, প্যাক্ট কার্যকরী করবার প্রধান শর্ত ছিল মুসলমানেরা স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিলে তবেই প্যাক্ট চালু হবে, যেহেতু মুসলমানের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে না অতএব প্যাক্ট বাতিল হয়ে গেছে।

১৯২৭-এর ২৩শে ডিসেম্বর জিন্না এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন : মুসলমানরা আর কংগ্রেসকে বিশ্বাস করে না কারণ গয়া

কংগ্রেসে হিন্দু-মুসলমানের একটি সর্ব-ভারতীয় চুক্তি স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিয়েও কংগ্রেস তা পালন করে নি। (অমৃতবাজার পত্রিকা ২৫।১২।২৭—ইংরেজি অনুবাদ)।

গয়া কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন চিত্তরঞ্জন। গয়ায় নিজের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনের জন্যই তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অপেক্ষা না রেখে বাংলায় হিন্দু-মুসলিম চুক্তি সম্পাদন করে সারা দেশে এক নবযুগ সূচনার প্রয়াস করেছিলেন।

যে-লোকটি চিত্তরঞ্জনের হিন্দু-মুসলিম প্যাক্টকে সফল করবার জন্য লড়াই করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন সেই বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের দাবিতে চিত্তরঞ্জন কংগ্রেসের সকল দায়িত্বশীল পদ থেকে আগেই সরিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাঁদেরই দাবিতে ১৯২৬ সালে উত্তর মেদিনীপুর কেন্দ্র গভর্নমেন্টের মনোনীত মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের সরকারী চেয়ারম্যান অর্ধ-শিক্ষিত ধনী জমিদার দেবেন্দ্রলাল খাঁকে কংগ্রেসের মনোনয়ন দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয়েছিল যাতে তিনি আইনসভায়ও ঢুকতে না পারেন। এই নির্বাচনের সময়ে বিপ্লববাদী নেতা উপেন ব্যানার্জি প্রকাশ্য সভায় মিথ্যা অভিযোগ করেছিলেন যে, বীরেন্দ্রনাথ শাসমলই সুভাষচন্দ্র বসুকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন। মেদিনীপুরের কংগ্রেস নেতা উকিল উপেন মাইতি ও ডাক্তার শচীন সরকারী ছাপানো ইস্তাহারে ঘৃণ্য অভিযোগ করেছিলেন : 'যে-সকল মুসলমান হিন্দু রমণীর সতীত্ব নষ্ট করেছে ও হিন্দু মন্দির ধ্বংস বা অপবিত্র করেছে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল নিজের বাড়িতে তাদের আশ্রয় দেন এবং তিনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন।'

চিত্তরঞ্জন প্রবর্তিত হিন্দু-মুসলিম চুক্তি নিয়ে বাংলার কংগ্রেসী রাজনৈতিক মহল ১৯২৬-এর গোড়া থেকেই ছিল অতীব উষ্ণ। কংগ্রেসের পরিচালন ভার সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের হাতে তাঁরা একবাক্যে চান চিত্তরঞ্জনের হিন্দু-মুসলমান চুক্তি যথাশীঘ্র বাতিল করে দেওয়া হোক। এই পরিপ্রেক্ষিতে কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনী বসলো ২২এ মে। সভাপতি বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ছিলেন হিন্দু-মুসলিম চুক্তির প্রধান শক্তি-স্তম্ভ। সভার উত্তপ্ত আবহাওয়া দেখে ঠিক হলো যে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রস্তাব আনবেন : 'চুক্তির প্রশ্নটি বিবেচনা এখন স্থগিত রাখা হোক।' সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা এর বিরোধিতা করলেন, তাঁরা চান চুক্তির প্রশ্নটি তুলে তখনই ওটি বাতিল করা হোক। উভয় পক্ষে সমান সমান ভোট হলো—সভাপতি বীরেন্দ্রনাথ কাস্টিং ভোট দিয়ে প্রস্তাবটি পাশ করিয়ে দিলেন। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা এইভাবে বিফল হয়ে তাঁর উপর সাংঘাতিক

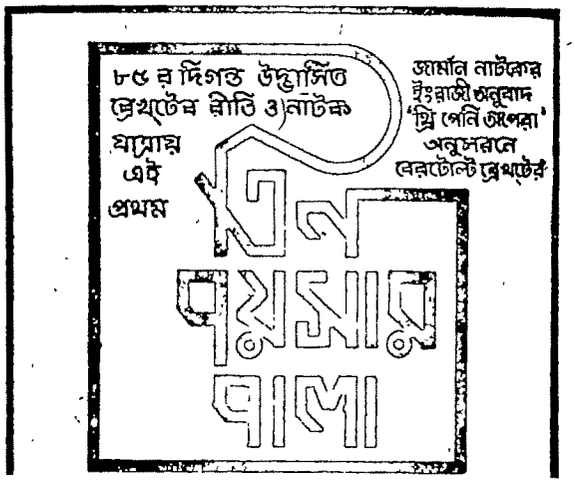

বাংলা রূপান্তর, গীত রচনা, সুর ও নির্দেশনা

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

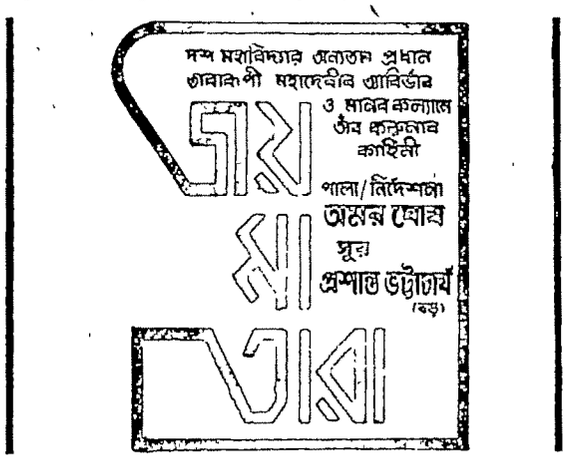

শ্রেষ্ঠাংশে :

লোলিতা চ্যাটার্জী

পাহাড়ী ভট্টাচার্য

— তৎসহ —

জ্যোৎস্না বিশ্বাস · গোপাল হালদার · শিবানী মুখার্জি · দেবব্রত দে বিশ্বাস · এবং ছবি চ্যাটার্জী ও শংকর পাল

পরিবেশনায়—

কলিকাতা যাত্রা সমাজ

১১৭/১, রবীন্দ্র সরণী, কলি:-৬, ফোন-৫৫-৬৭৪৪

হন্টলেন। সভাপতি তাঁর ভাষণে এক জায়গায় বলেছিলেন, যাঁরা ভায়োলেন্সে বিশ্বাস করেন তাঁদের কংগ্রেস কার্যনির্বাহক সমিতি থেকে সরে দাঁড়ানো উচিত, কারণ কংগ্রেসের আদর্শ অহিংসা।' এই মন্তব্যের জন্য সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা বীরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব আনলেন। নিন্দা প্রস্তাব পাশ হতে সভাপতি পদত্যাগ করে কৃষ্ণনগর ছেড়ে চলে গেলেন। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও অন্যান্য নেতারাও কৃষ্ণনগর ত্যাগ করলেন। তখন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা একজন সামান্য দলকর্মী ব্যারিস্টার যোগেশ চৌধুরীকে (ক্যালকাটা ইউকলি নোটসের প্রতিষ্ঠাতা) সভাপতি করে সম্মেলন বসালেন এবং চিত্ত-রঞ্জন প্রবর্তিত হিন্দু-মুসলিম চুক্তি বাতিল করে দিলেন। (পরে যোগেশ চৌধুরীর এই সম্মেলন কংগ্রেসী সম্মেলন বলে বঙ্গীয় কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি ঘোষণা করেছিল, কারণ দেখা গেছিল যোগেশ চৌধুরী ডেলিগেটও ছিলেন না। অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যও ছিলেন না। সে সময়ে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা সভায় সভায় এই ধরনের বহু বাইরের লোক নিয়ে যেতেন দরকার হলে যাঁদের কাজে লাগাতেন।)

কৃষ্ণনগর প্রাদেশিক সম্মেলন সম্বন্ধে কমিউনিস্ট নেতা ও প্রাচীন বিপ্লবী নায়ক মুজফ্ফর আহমেদ লিখেছেন : 'কংগ্রেস কর্মীসংঘ দ্বারা সাম্প্রদায়িকতার কম ইন্ধন জোগানো হচ্ছিল না। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা এই সংঘ গড়েছিলেন। এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তাঁরা সি আর দাশের হিন্দু-মুসলিম প্যাক্টকে বাতিল করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন যা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের প্রচারেরই সহায়ক হয়েছিল। কংগ্রেসের ভিতরে গঠিত স্বরাজ পার্টি চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে তিন বছরের আগে সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক সম্মেলনে হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট বিষয়ে একটি প্রস্তাব পাশ করেছিল। এই প্রস্তাবে মুসলমানদের একটি বড় সংখ্যা খুশী হয়েছিলেন। প্যাক্টে মুসলমানদের বেশি চাকরী পাওয়া ও আরও কি কি অধিকার পাওয়ার কথা ছিল। এই জিনিসটা হিন্দুদের খুব বেশির ভাগ লোক গ্রহণ করতে পারেন নি। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা 'কংগ্রেস কর্মী সংঘ' নাম দিয়ে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। প্যাক্টের বিরুদ্ধে তাঁরা যে প্রচার করেছিলেন সেটা যেন সাম্প্রদায়িক রূপ নিয়েছিল সে কথা আগে বলেছি। কৃষ্ণনগর সম্মেলনে প্যাক্ট নাকচ করবার জন্য বিশেষ উদ্যোগে গ্রহণ করেছিলেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজি দৈনিক 'ফরওয়ার্ডের' এ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর ছিলেন বলে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের অভিভাষণের কপি আগেই পেয়েছিলেন। কাজেই তিনি কলকাতা হতে তৈয়ার হয়েই এসেছিলেন যে, সম্ভব হলে কৃষ্ণনগরের সম্মেলন ভেঙে দেবেন।' সি আর দাশের হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট নাকচ করে দেওয়ার জন্য তিনিও তাঁর বন্ধুরা বদ্ধপরিকর ছিলেনই তার উপরে বীরেন শাসমল তাঁর অভিভাষণে লিখে বসলেন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য।' (কাজী নজরুল ইসলাম—স্মৃতি-কথা, ৩৫৯-৩৬৪ পৃঃ)

১৯২৬-এর ১লা জুন এক ইস্তাহারে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ঘোষণা করেছিলেন : 'কৃষ্ণনগরের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে বেশ কিছু সংখ্যক কংগ্রেস কর্মী যাঁরা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্যও বটে, তাঁরা হিন্দু-মুসলমান চুক্তিটি এবং কাউন্সিল প্রবেশ সম্বন্ধে কংগ্রেসের কার্যক্রম যাতে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয় তার জন্য সক্রিয় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কংগ্রেসের প্রতি এটি একটি জঘন্যতম আনুগত্যহীনতা।'

কিন্তু সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের ভয়ে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ১৯২৬-এর শেষের দিকে বঙ্গীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদ গ্রহণকরতে অস্বীকার করলেন। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে কংগ্রেসের নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দিতে চিত্তরঞ্জনকে বাধ্য করেছিলেন ১৯২২ সাল থেকে। ১৯২৪-এ তিনি যখন মাসিক পাঁচশো টাকা মাসোহারায় কলকাতা কর্পোরেশনের চিফ একজিকিউটিভ অফিসারের পদের জন্য প্রার্থী হয়েছিলেন তখন সন্ত্রাসবাদীদের তরফ থেকে সুভাষচন্দ্রকে দাঁড় করিয়ে মাসিক দেড় হাজার টাকা বেতনে তাঁকে নিযুক্ত করা হয়। ১৯২৬-এর সাধারণ নির্বাচনে তিনি যাতে আইন-সভায় ঢুকতে না পারেন তখন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের দাবিতে মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের সরকার মনোনীত চেয়ারম্যান দেবেন্দ্রলাল খাঁকে দাঁড় করিয়ে কংগ্রেস নেতারা বীরেন্দ্রনাথকে আইন-সভায় প্রবেশ করতে দিলেন না। কিন্তু বাংলার সাধারণ দরিদ্র সংগ্রামী কর্মীরা তাঁদের আপনজন বীরেন্দ্রনাথকে ভোলেন নি। তাঁরা এইবার তাঁকে ডেকে এনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদকের ভার দিলেন। তাঁর চেষ্টায় অধ্যাপক নিতেন্দ্রলাল ব্যানার্জি প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন।

বীরেন্দ্রনাথ শাসমল প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক নিযুক্ত হবার পর অমৃতবাজার পত্রিকা ২৩।১২।২৬-এর সম্পাদকীয়তে লিখেছিল : 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক হিসাবে মিঃ বি এন শাসমলের নির্বাচন নিয়ে আমরা লিখে-ছিলাম : যদি মিঃ শাসমল কর্মীদের মধ্যে 'অতীতকে ভুলে যাবার এবং ক্ষমার ভাব' ফিরিয়ে আনতে পেরে থাকেন এবং কংগ্রেসের কর্মক্ষেত্রের বিস্তৃতির দায়িত্ব নিয়ে থাকেন তাহলে তাঁর সেক্রেটারী নির্বাচন খারাপ হয়নি।' আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছি যে কাজও সেইটাই হয়েছে। কংগ্রেস কর্মীদের, খাঁটি কথায়, কর্মী সংঘের সঙ্গে মিঃ শাসমলের একটি মীমাংসা হয়ে গেছে।

'এই মীমাংসার প্রথম ধাপ হিসাবে কর্মীসংঘের কর্মীরা ও নেতা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে চারটি শূন্য সভ্য-পদের মধ্যে তিনটি পূরণ করেছেন। এটা মনে রাখতে হবে কিছুদিন আগেও শাসমলপন্থী ও কিরণশংকরপন্থীদের যৌথসাক্ষরে কর্মী-সংঘের নেতা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে নির্বাচিত হতে বিফল হল। মিঃ শাসমলের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক হিসাবে নির্বাচন সম্ভব হয়েছে কর্মীসংঘ ও শাসমলপন্থীদের পুনর্মিলনের ফলে। গোষ্ঠীগুলি এখন নবরূপে রূপায়িত হয়েছে; কর্মীসংঘ এবং শাসমলপন্থী বনাম 'কিরণশংকরপন্থী' বা 'বিগফাইভের' সমর্থন লাভ করেছেন।' ('বিগফাইভ' বলতে—বিধান রায়, শরৎ বসু, তুলসী গোস্বামী, নলিনী সরকার ও নির্মল চন্দ্রকে বোঝাতে—লেখক।) মিঃ সেনগুপ্ত এই গোষ্ঠী ও প্রতিগোষ্ঠী গঠনের বাইরে রয়েছেন।' তিনি ঘটনার প্রতি লক্ষ্য রাখছেন।

'মিঃ সেনগুপ্তের মনোভাবের জন্য সকল গোষ্ঠী প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিত্ব তাঁর উপরেই আর একবার অর্পণ করতে উদ্বুদ্ধ হতে পারে। তিনি এতে ইচ্ছুক ও নন বা অনিচ্ছুকও নন। কিন্তু শাসমল-পন্থীরা এবং কর্মীরা অনিশ্চিতের হাতে কোনো কিছুই ফেলে রাখতে চান না।' আমরা শুনেছি তাঁদের শলা-পরামর্শে একটি মোটামুটি ঐকমত সৃষ্টি হয়েছে যে কর্মী-সংঘের নেতা মিঃ অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি না হয় মিঃ শাসমল সভাপতি হবেন। মিঃ শাসমল যদি সভাপতির গদিতে উন্নীত হন তাহলে মিঃ চ্যাটার্জি সম্পাদক হবেন।

'বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত হবার জন্য আবাস না দাঁড়িয়ে মিঃ শাসমল উপযুক্তই কাজ করেছেন। মেদিনীপুর কেন্দ্রের তমলুক বিভাগ থেকে ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত শাসমলপন্থী মিঃ মহেন্দ্র-নাথ মাইতি তাঁর সভ্যপদ ত্যাগ করবার প্রস্তাব করেছিলেন যাতে মিঃ শাসমল সেই জায়গায় আসতে পারেন, কিন্তু তিনি সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি। আমাদের দেশের যোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে বেশির ভাগ দেশের ব্যাপক কর্মপ্রচেষ্টা পরিচালনার পরিবর্তে কাউন্সিলে নির্বাচিত হওয়া অধি-কতর বাঞ্ছিত মনে করেছেন। কর্মী হিসাবে মিঃ শাসমলের অভিজ্ঞতা অনন্য। কর্মকর্তা হিসাবে তাঁর নেতৃত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কাউন্সিলের মাধ্যমে যতটা সম্ভব তার চেয়েও অধিকতর কার্যকরীভাবে যদি দেশকে বিদেশী আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সংগঠিত করবার জন্য নিজেদের শক্তি নিয়োগ করে তাহলে মিঃ শাসমল

দেশের জন্মিতীয় মঙ্গলের কাজটি করবেন। আমরা শুনেছি তিনি কলকাতায় তাঁর সভাপতির অভিভাষণে যে দুর্ভাগ্যজনক মন্তব্যগুলি করেছিলেন তার জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করে ভ্রম সংশোধন করেছেন। প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে তিনি যে আস্থা অর্জন করেছেন তাঁকে এখন তার যথার্থ প্রমাণ করতে হবে। যে-সকল গোষ্ঠী তাঁর সঙ্গে যুক্ত শুধু তাদের সাহচর্য দিয়ে তিনি এটা পারবেন না; তার জন্য তাঁর সকল শক্তি দেশের সেবায় উৎসর্গ করতে হবে।' (ইংরেজির অনুবাদ)

বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের সাহায্য নিয়ে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদল নিজেদের কর্মী ও নেতাকে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচিত করিয়ে নিলেন—যাতে আগে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছিলেন। তারপরেই তাঁরা নতুন মূর্তি ধরলেন। তাঁরা এক বিশেষ সভার নোটিশ দিলেন যাতে কিরণশংকর রায় প্রস্তাব করলেন : 'মিঃ বি এন শাসমল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কাজ করছেন এবং তাকে সম্পাদক নির্যুক্ত করা হয়েছে বলে সমস্ত কার্যনির্বাহক সমিতির বিরুদ্ধে আমরা অনাস্থা জানাচ্ছি।'

এই নিয়ে যে লড়াই হোলো তাতে, বাংলার মুসলমান সমাজের প্রায় সমস্ত নেতা ও কর্মী এসে দাঁড়ালেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের পিছনে। ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুজফ্‌ফর আহমেদও সেদিন বীরেন্দ্রনাথের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। একদিকে দেশসেবার কারণে নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত বীরেন্দ্রনাথ, কংগ্রেসের দরিদ্র নিষ্ঠাবান কর্মীদল ও একজন বাদে সকল মুসলমান কংগ্রেস নেতা ও কর্মী—অন্যদিকে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বিধান রায়, শরৎ বসু, নলিনী সরকার, কিরণশংকর রায়, তুলসী গোস্বামী, নির্মল চন্দ্র, সুরেশ মজুমদার, অতুল গুপ্ত ও বাংলার সকল হিন্দু সন্ত্রাসবাদী নেতা ও কর্মী। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ শাসমল হেরেছিলেন মাত্র চার ভোটে।

এই ভোটাভুটির পর ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৭-এর স্টেটসম্যান সম্পাদকীয়তে লিখেছিল : 'বাংলার রাজনৈতিক চক্রটি আর এক পাক ঘুরে গেলো এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যনির্বাহক সমিতি মোটামুটি সুচারুভাবে গঠিত হয়ে গেল। একটি অনাস্থাব্যঞ্জক ভোটের ফলে সভাপতি মিঃ ব্যানার্জি ও মিঃ বি এন শাসমল পদত্যাগ করেছেন এবং 'বিগফাইভ' ব্যতীত আবার ক্ষমতায় আসীন হয়েছে। তাঁর কুফলসহ বহুলাংশে মূল্যবান কাজ বেশির ভাগই মিঃ শাসমল গঠনমূলক ব্যবস্থা করেছিলেন কিন্তু তা করেও সব রক্ষা করা যায় নি। এটা পরিষ্কার যে তাঁর দলটি থেকে যাচ্ছে এবং আবার লড়াই সুরু করতে পারে কারণ তাঁর দল মাত্র চারজনের সংখ্যালঘু। কিন্তু আরও সংঘর্ষ এই ধারণাকেই ঘনীভূত করবে যে রাজনীতি ক্ষেত্রে কংগ্রেস বাংলায় কোনো প্রকৃত প্রভাব হারিয়ে ফেলেছে।' (ইংরেজির অনুবাদ)

১৩ই ফেব্রুয়ারী দি বেঙ্গলী প্রধান সম্পাদকীয়তে লিখল : 'বিগ ফাইভ' অথবা আমাদের বোধহয় বলা উচিত 'বিগ থ্রী' কারণ গত শুক্রবার গোষ্ঠী-প্রাধান্যের বেদী-মূলে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও মিঃ নলিনী-রঞ্জন সরকারকে বলি দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল—আবার কুক্ষিগত করতে সক্ষম হয়েছে সেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে অর্থাৎ কমিটির সংগঠন কার্যক্রম এবং মর্যাদা বলতে এখনও যেটুকু অবশিষ্ট আছে। গত কয়েকদিন যাবত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্যদের দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে জোগাড় ক'রে আনা হয়েছিল এবং বহু প্রকারের চাপসৃষ্টি ক'রে এবং বহু ধরণের প্রলোভনের মাধ্যমে মাত্র চার ভোটের ক্ষীণ সংখ্যাধিক্য অর্জন করা হয়েছিল যার দ্বারা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির বর্তমান কার্যনির্বাহক সমিতি ও কর্মকর্তাদের উপর একটি অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করা হয়।....

ব্যক্তিগত আক্রোশ চরিতার্থ করবার এই ষড়যন্ত্রের চেয়েও বেশি আশ্চর্যজনক হচ্ছে যে অনাস্থা প্রস্তাবটি পাশ করা হয়েছে একটি ব্যাপকতাত্ত্ব ভিত্তিতে, প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি বা কর্মকর্তারা যার জন্য দায়ী এমন কোনো বিশেষ কাজের জন্য নয়। মাত্র ক'মাস আগে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সকল সদস্যের দ্বারা নতুন কার্যনির্বাহক সমিতি নির্বাচিত হয়েছিল। এটা ধ'রে নিতে হবে যে কার্যনির্বাহক সমিতিতে যাঁরা নির্বাচিত হয়েছিলেন তখন তাঁরা সমগ্র কমিটির পূর্ণতম আস্থার পাত্র ছিলেন। যদিও সেই কার্যনির্বাহক সমিতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবটি গত শুক্রবারের সভায় পাশ হয়েছে তবুও এমনকোনো সাক্ষ্য দিয়ে প্রমাণ করা হয়নি কি ক'রে সেই গভীর আস্থার হানি ঘটলো। জনসাধারণ যতদূর জানে তাতে যা ঘটেছে তা হোলো এই যে মিসেস সি আর দাশ এবং মিঃ অনিলবরণ রায় (যাঁরা যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন) যে কর্মকর্তার পদ তাঁদের দেওয়া হয়েছিল তা গ্রহণ করতে তাঁরা অস্বীকার করেন। এটা অবশ্য শুধু যে আশা করাই

হয়েছিল তা নয় বরং ঘটবে বলেই ধরে নেওয়া হয়েছিল। কারণ, আমরা তখন যেমন বলেছিলাম এই দুটি তড়ি-ঘড়ি নির্বাচনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কর্মকর্তা নির্বাচনের ক্ষমতাটি প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ কমিটির হাত থেকে কার্যনির্বাহক সমিতির হাতে হস্তান্তরিত করা। প্রদেশ

পড়ার মতো ও রাখার মতো বই

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

১৯২০—১৯২৯

তৃতীয় মুদ্রণ ১৫-০০/২০-০০

নির্বাচিত রচনা সংকলন

মুজফ্‌ফর আহমদের প্রথম প্রকাশিত লেখা সহ বিভিন্ন সময়ে লেখা প্রবন্ধ ও রচনার নির্বাচিত সংকলন। ১২-০০/১৫-০০

হরেকৃষ্ণ কোঙার

প্রবন্ধ সংকলন

নির্বাচিত প্রবন্ধ ও ভাষণের সংকলন। ১১-০০/১৫-০০

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তরকালের গল্পসংগ্রহ

লেখকের জীবনের শেষের দিকে ৫৮টি নির্বাচিত ছোট গল্পের সংকলন। ২৫-০০

গণেশ ঘোষ

মুক্তিতীর্থ আন্দামান

আন্দামানের পরিচিতি ও রাজবন্দীদের উপর নিষ্ঠুর নির্যাতন সেই সঙ্গে যেসব সংগ্রাম রাজবন্দীরা করেছিলেন তার বিবরণ উপস্থিত করেছেন লেখক। ১০-০০

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ

১২, বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা—৭০০০৭৩

শাখা : ১৭২ লেনিন সরণি কলকাতা ৭০০০১৩

নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর—৭১৩২১৩

কংগ্রেসের মধ্যে একটি আসন ভাঙন রোধ করবার জন্যই এই চাতুরীর পন্থা গ্রহণ করা হয়েছিল বটে, কিন্তু যাঁরা এটির পরিকল্পনা করে কাজে লাগিয়েছিলেন তাঁরা অচিরেই দেখলেন যে তাঁরা আসল বস্তুটিকেই গণনায় ধরেন নি, কার্যনির্বাহক সমিতি প্রাপ্তিটি গ্রহণ করলো কিন্তু অন্যের দ্বারা পরিচালিত হতে বা অন্যের হুকুম তামিল করতে অস্বীকার করলো। অভিজাত শ্রেণীর সহত্নে লালিত পরিকল্পনাটি খানচাল করে দিয়ে কার্যনির্বাহক সমিতি অধ্যাপক জে এল ব্যানার্জির মত একজন বহিরাগতকে সভাপতি এবং মিঃ বি এন শাসমলের মত একজন নিতান্ত সাধারণ শ্রেণীর লোককে সম্পাদক নিযুক্ত করতে অগ্রসর হোলো।

যে বিরাট ভোটাধিক্যে মিঃ শাসমল 'বিগ ফাইভের' মনোনীত প্রার্থী মিঃ কিরণ-শংকর রায়কে পরাজিত করেছিলেন তাতে 'বিগ ফাইভের' চোখ ধাঁধিয়ে দিল। অভিজাত স্পর্শকাতরতা ও একচেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে এই প্রকাশ্য সিদ্ধান্তের কারণে মিঃ শাসমল এবং তাঁর সঙ্গে খানিকটা অধ্যাপক জে এল ব্যানার্জি 'বিগ ফাইভের' প্রতিদ্বন্দ্বী জাকোশের পাল হয়ে দাঁড়ালেন। এই দুজনের অপবিত্র হাত থেকে প্রদেশ কংগ্রেসকে রক্ষা করবার জন্য মিঃ নির্মলচন্দ্র চন্দ্র ও মিঃ তুলসীচরণ গোস্বামী দিল্লীতে তাঁদের জরুরী কাজ ফেলে রেখে কলকাতায় ছুটে এলেন। মিঃ শরৎচন্দ্র বসু এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় দ্রুতগামী দূত এবং প্রাণ-সংকটের ত্রাণবার্তা পাঠিয়ে দিলেন যাতে তলবী সভায় সদস্যদের আমদানি করে অনাস্থা প্রস্তাবটি পাশ করা যায়। তার ফলে এখনকার মত দেশপ্রেমের খেলাটি মরবে, যদিও অল্পের জন্য, রক্ষা লাভ করেছে।

স্বরাজী নেতাদের কার্যকলাপ তাঁদের অতীত কীর্তি-ধারা এবং কোনো পদ্ধতিই অতীত গর্হিত নয়' তাঁদের ঘোষিত এই নীতির সঙ্গে সঙ্গতিসূচক। কিন্তু প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির আর একটি সদস্য গোষ্ঠীর কার্যকলাপ আরও ঢের বেশি লজ্জাজনক হয়েছিল। এই গোষ্ঠীটি দাবি করেছিলেন যে তাঁরা প্রকৃত কর্ম এবং যোগ্য ব্যক্তির সমর্থক। মিঃ শাসমল যদি তাঁর কৃতকর্মের অভিভাষণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন তাহলে এঁরা তাঁকেই সমর্থন করবেন এমন প্রতিশ্রুতি দিয়ে এঁরা যে রকম নির্লজ্জ-ভাবে নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলেন তাতে এঁরা নির্ভেজাল সুবিধাবাদী এবং সুযোগ-সন্ধানী হিসাবে চিহ্নিত হয়ে রইলেন (এঁরাই সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দল—লেখক)। এটা এখন পরিষ্কার যে এঁদের সমস্ত বৃহৎ বুলি সত্ত্বেও এঁরা অভিজাত শ্রেণীর বিরক্তির পাত্র হবার সাহস রাখেন না এবং আদর্শ ও ফলাফলের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে 'বিগ ফাইভ' যে সিদ্ধান্তই নিন না কেন এঁরা শেষ-মেশ সেটাই সমর্থন করবে জানা। এঁরা অনিয়েছিলেন যে মিঃ শাসমলের বিরুদ্ধে এঁদের একটি আপত্তির কারণটি যখন এঁদের দাবি অনুসারে দূরীভূত করা হোলো তখনও এঁরা মিঃ শাসমলের বিরুদ্ধেই ভোট দিলেন যার পরিষ্কার কারণটি হচ্ছে যে এঁরা শুধু গ্রামোফোন মাত্র ছিলেন যার কাছ হচ্ছে মনিবের কণ্ঠস্বরটি রেকর্ড করে বাজানো। এঁরাও এইভাবে দেশপ্রেমের খেলাতে জয়ী হয়ে গেলেন।

আমাদের রাজনৈতিক মতামত অধ্যাপক ব্যানার্জি বা মিঃ শাসমলের মতামতের সঙ্গে মেলে না এবং সেই কারণে ব্যক্তিগত ঈর্ষা। যে ঘৃণ্য মনোবৃত্তি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে তার দুঃশ্লন কর্মকর্তাকে প্রত্যাহ্বান করতে উদ্বুদ্ধ করেছে তার নিন্দা করতে আমরা অন্য সকলের চেয়েও স্বাধীন, বিশেষত যখন এই দুজনের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনা হয় নি বা প্রমাণিত হয় নি এবং এঁরা বললেন তাঁরাই যাঁরা বিনা বিচারে বন্দী রাখার প্রতিবাদ করেন এবং পরে সম্ভবজনক মুহূর্তে নিজেদের দেশ প্রেমের খেলাটি জাহির করেন।' (ইংরেজির অনুবাদ)

রবীন্দ্রনাথ শাসমলের সঙ্গে সন্ত্রাস-বাদী বিপ্লবীদেরও 'বিগ ফাইভের' অর্থাৎ বিধান রায়, শরৎ বসু, তুলসী গোস্বামী নলিনী সরকার এবং নির্মলচন্দ্র সেনগুপ্ত এদের সঙ্গে যুক্তও হন নি। বিরোধের প্রধান কারণটি স্টেটসম্যান পত্রিকা সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করেছিল ২৭ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী। স্টেটসম্যান লিখেছিল : 'কলকাতা কর্পোরেশনের আসন নির্বাচন কলকাতার স্বরাজী সদস্যদের মধ্যে একটি ভাঙনের সৃষ্টি করেছে যার ফলে দুটো প্রতিদ্বন্দ্বী ইলেকশন বোর্ড স্থাপিত হয়েছে এবং এটাই সম্ভবপর যে কংগ্রেসের ছাপ নিয়ে দুই প্রস্থ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী দাঁড় করানো হবে।

এটা সবলেই জানেন যে কিছুদিন যাবৎ তিনটি পৃথক গোষ্ঠী : 'বিগ ফাইভ', কাউন্সিল (প্রাক্তন বাজবন্দীদের নিয়ে গঠিত) এবং মিঃ বি এন শাসমলের দল এরা বৃহত্তম দল হিসাবে পরিগণিত) বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কব্জায় করবার জন্য চেষ্টা করছে যাতে কর্পো-রেশনের নির্বাচন পরিচালনার কর্তৃত্বটি অর্জন করা যায়। স্মরণ থাকতে পারে কিভাবে বিগ ফাইভের' দল কর্মীদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মিঃ শাসমল ও তাঁর দলকে ক্ষমতাচ্যুত করার উদ্দেশ্যে মিঃ সঙ্গে কংগ্রেস কমিটিতে একটি অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

একথা সত্য যে সম্প্রতি কমিটির এক সভায় মিঃ শাসমলের বিরোধী পক্ষ বিশেষ সামান্য ভোটাধিক্যে কার্যনির্বাহক সমিতির উপর অনাস্থা প্রকাশ করে প্রস্তাব পাশ করেছিল। কিন্তু অচিরেই নানা অসঙ্গতি দেখা দিল। সভার যে কোনো কার্যবিবরণ পাঠানো এবং যদিও সভাপতি মিঃ জে এল ব্যানার্জি ও সম্পাদক মি. বি এন শাসমল পদত্যাগ করেছিলেন কিন্তু তাঁদের বিরোধী পক্ষের লোকেরাই পদত্যাগ করতে অনিচ্ছুক হলেন। ইতিমধ্যে নতুন কার্যনির্বাহক সমিতির নির্বাচন সাপেক্ষে সভাপতি কর্পোরেশন নির্বাচন পরিচালনার ইচ্ছার কথা ঘোষণা করলেন। কিন্তু এতে 'বিগ ফাইভের' অনুমোদন পাওয়া গেল না এবং তাঁরা দিল্লীতে অবস্থিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ওয়ার্কিং কমিটির হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করলেন।

'দিল্লীর সঙ্গে টেলিফোনে কথাবার্তার পর ওয়ার্কিং কমিটি ঘোষণা করলো যে কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচন পরিচালনা করবে কলকাতার বিভিন্ন জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলির সভাপতি ও সম্পাদক নিয়ে গঠিত একটি সংগঠন। সেই অনুসারে মিঃ জে এম সেনগুপ্তকে সভাপতি ও [illegible] 'কর্মী' মিঃ সুরেশচন্দ্র দাশকে [illegible] করে একটি সংগঠন গঠিত হোলো। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যনির্বাহক সমিতির কর্মকর্তারা এটাকে কর্পোরেশন নির্বাচন পরিচালনায় তাদের ক্ষমতা দখল হিসাবে গণ্য করলেন এবং বিভিন্ন প্রস্তাব পাশ করে স্থানীয় ব্যাপারে ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক হস্তক্ষেপের অধিকারকে চ্যালেঞ্জ করলেন এবং ঘোষণা করলেন যে তাঁরা কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচন অভিযান চালিয়ে যাবেন।' (ইংরেজির অনুবাদ)

সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী ও তাঁদের সহযোগী নেতাদের অনুরোধে ১৭ই ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি এক জরুরী অধিবেশনে ঘোষণা করেছিল যে, কলকাতা কর্পোরেশনের আসন্ন নির্বাচন পরিচালনা করবে একটি ইলেকশন বোর্ড যেটি গঠিত হবে কলকাতার বিভিন্ন জেলা কংগ্রেস কমিটির ও সম্পাদকদের নিয়ে এবং এঁরা অন্যান্য সদস্য কো-অপ্ট করবে। ওয়ার্কিং কমিটির এই জরুরী অধিবেশনে মাত্র পাঁচজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন : মতিলাল নেহরু, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, সরোজিনী নাইডু, এ রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার ও টি প্রকাশম। গান্ধীজী যে সময়ে দিল্লীতেই ছিলেন, তাঁকে এই জরুরী সভায় ডাকা হয়নি। আর একজন সদস্য মৌলানা মহম্মদ আলিও দিল্লীতে ছিলেন কিন্তু সভার নোটিশ তাঁর কাছে পাঠানো হয় সভা শেষ হয়ে যাবার পর।

স্টেটসম্যান যেমন লিখেছিল এই নতুন ইলেকশন বোর্ডের সম্পাদক হলেন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস কর্মী সংঘের সম্পাদক শ্রীসুরেশচন্দ্র দাশ। এই কর্পোরেশন নির্বাচনে বাঁকে নাথ শাসমলের প্রতি সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে যে ব্যবহার করা হয়েছিল ১৯২৭-এর ৮ই মার্চ স্টেটসম্যানে তার একটা বিবরণ দেওয়া হয়েছিল এই রকম : [illegible] পরিপ্রেক্ষিতে ইস্টক [illegible] গতকাল সন্ধ্যায় মির্জাপুর পার্কে একটি

নির্বাচনী সভা আচমকিতে বন্ধ করে দিতে হয়। সভার সভাপতি ছিলেন মিঃ জে এন ব্যানার্জি এবং সভাটি ডেকেছিলেন মিঃ শাসমল এবং তাঁর দলের লোকেরা কর্পোরেশন নির্বাচনে তাঁদের মনোনীত প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারের জন্য এবং মিঃ জে এম সেনগুপ্ত এবং তাঁর সমর্থকদল ওই একই জায়গায় এর আগে একটি সভা করে যে সকল প্রচারণা করে গিয়েছিলেন স্পষ্টত তারই জবাব দেওয়ার জন্য। এই কারণে উভয়পক্ষের সমর্থকরা বিরাট সংখ্যায় যোগ দিয়েছিল। মিঃ শাসমল যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন প্রতিদ্বন্দ্বী ইলেকশন বোর্ডের নেতৃস্থানীয় সদস্য ডাঃ জে এম দাশগুপ্ত তাঁর কয়েকটি মন্তব্যের বিরুদ্ধে আপত্তি জানালে উভয়ের মধ্যে বাদানুবাদ সুরু হয়। তৎক্ষণাৎ চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা ও হট্টগোল আরম্ভ হয়ে যায় এবং মিঃ শাসমলকে লক্ষ্য করে কিছু পাথর ছোঁড়া, যদিও তাঁর আঘাত লাগেনি। তখন সভাপতি সভা বন্ধ করে দেন।' (ইংরেজির অনুবাদ)

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বিরুদ্ধতা ও সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদলের গুণ্ডামি সত্ত্বেও যতীন্দ্রমোহন শাসমলের মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে ২১ জন কর্পোরেশনে নির্বাচিত হয়েছিলেন—সন্ত্রাসবাদী ও 'বিগফাইভের' প্রার্থী নির্বাচিত প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৩২। কর্পোরেশনের এই নির্বাচনের পরেই সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের নেতা অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জির 'বেঙ্গল বেল্টিং কোং'-কে ও অন্য সন্ত্রাসবাদী নেতা সুরেশচন্দ্র দাশের ফার্ণিচার কোং-কে কর্পোরেশনের বড় কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়েছিল। আরেকজন নেতা উপেন ব্যানার্জির কর্পোরেশনে চাকরি দেওয়া হয়।

দিল্লীস্থিত কংগ্রেসের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ শুধু কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনের জন্য ইলেকশন বোর্ডটিকে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের হাতে তুলে দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার কৌশলে এমন ব্যবস্থা করলেন যাতে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদল ও তাঁদের সহযোগী নেতারা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কলকাতার অফিস বাড়িটি গায়ের জোরে দখল করে নিতে পারেন।

২২শে ফেব্রুয়ারী শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার যতীন্দ্রনাথ শাসমলকে তার করলেন : 'সম্ভবহলে শনিবার (২৬শে ফেব্রুয়ারী) আমার সঙ্গে দিল্লীতে দেখা করে মীমাংসার ব্যবস্থা করুন।' ওদিকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক হিসাবে নতুন কর্মকর্তা নির্বাচনের জন্য তিনি ২রা মার্চ বঙ্গীয় প্রাদেশিক সাধারণ সভা ডেকেছিলেন। যতক্ষণ নতুন কর্মকর্তা নির্বাচন না হচ্ছে ততক্ষণ তিনিই সম্পাদক থাকবেন বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। ২৬শে ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের সঙ্গে দেখা করে ২রা মার্চ কলকাতায় ফিরে এসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনে যোগদান করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না বলে তিনি ২রা মার্চের সভা স্থগিত থাকলো বলে ঘোষণা করে চতুর্দিকে চিঠি ও তারবার্তা প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু দিল্লী যাবার মুখে তিনি শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের কাছ থেকে আবার তার পেলেন যে ২রা মার্চের সভাটি স্থগিত রাখা চলবে না। কিন্তু তখন ২৭শে ফেব্রুয়ারী হয়ে গেছে এবং পুনরায় তারযোগে জানালেও শ্যামাঞ্চলের বহু কংগ্রেস সদস্য ২রা মার্চের সভাটি স্থগিত থাকছে না এ সংবাদ ঠিক সময়ে না পেয়ে ২রা মার্চের সভায় যোগদান করতে পারবেন না এই কারণে তিনি ২রা মার্চের সভা স্থগিতের ঘোষণাটি তিনি আর প্রত্যাহার করলেন না।

তখন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা ঘোষণা করলেন যে বঙ্গীয় কংগ্রেসের সম্পাদক বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ২রা মার্চ যে সাধারণ সভা ডেকেছিলেন সেই সভা স্থগিত রাখবার তাঁর কোনো অধিকার নেই। এবং তাঁরা ঘোষণা করলেন যে তারাই সেই সভা পরিচালনা করবেন এবং সেই উদ্দেশ্যে পরবর্তে সদলবলে বউবাজারে কংগ্রেসের অফিস বাড়িটি দখল করবার অভিযানে চললেন। গায়ের জোরে কংগ্রেস অফিস দখল করতে ব্যর্থ হয়ে তাঁরা সকলেই বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের উপর আরও প্রচণ্ডভাবে চটলেন।

এই প্রসঙ্গে ৩রা মার্চ স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদকীয়তে যা লেখা হয়েছিল তার বাংলা অনুবাদ এই : '(স্বরাজ এবং লাঠি)—যে সংকীর্ণ এবং উদ্ধত গোষ্ঠীতন্ত্র তাঁর কর্তৃত্ব চাপিয়ে দিতে চাইছে . . র উপর .....।' আমাদের পাঠকদের দশজনের মধ্যে ন'জনকে যদি এই পংক্তিটি পূরণ করতে বলা হয় এবং প্রথমে যদি তাদের বলে দেওয়া হয় যে পংক্তিটি এমন একটি লেখনে বিরাজ করছে যার লেখক হচ্ছেন একজন ভারতীয় রাজনীতিক তাহলে তাঁরা নিশ্চয়ই ধরে নেবেন যে কোনো না কোনো প্রকারের ব্রিটিশ শাসনকেই এতে লক্ষ্য করা হয়েছে। কিন্তু তাঁরা ভুল করবে। যে প্রতিষ্ঠানটির উপরে ওই 'সংকীর্ণ ও অপ্রাজ্ঞ গোষ্ঠীতন্ত্র' নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে সেটি হচ্ছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং ওই পংক্তিটির লেখক হচ্ছেন তিনি যিনি বর্তমানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হয়ে আছেন। এই কথাটি জানতে পেরে বুদ্ধিমান পাঠক সম্ভবত মনে করবেন যে কারো সঙ্গে অপর কারো সম্পর্কটা তিক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তাতে তিনি ঠিকই করবেন। আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে 'সংকীর্ণ ও প্রাজ্ঞ গোষ্ঠীতন্ত্র' যাঁদের সম্বন্ধে বলা হচ্ছে তাঁর আর কেউ নন স্বয়ং মেসার্স জে এম সেনগুপ্ত, তুলসী গোস্বামী, বিধানচন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্র বসু এবং কিরণশঙ্কর রায় যাঁরা তাঁদের কোনো কোনো বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি পরিচালনায় এবং কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন তত্ত্বাব-

নাটক - নাটক - নাটক

বিজয় তেণ্ডুলকরের

চোপ্ আদালত চলছে

মারাঠি নাটকের বঙ্গানুবাদ

শম্ভু মিত্রের

ঘূর্ণি

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

দুই রাত্রি

বড়ো পিসিমা	(কৌতুক)	বাদল সরকার
কাঞ্চনরঙ্গ	ঐ	শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র
হারানো চিঠি	ঐ	অমিতা রাব
আজকের নাটক	ঐ	সুশীল মুখোপাধ্যায়
গল্প বলুন	ঐ	ঐ
তথাস্তু	ঐ	ঐ
অমিতাক্ষর		ঐ
তোমার হলো সুরু		ঐ
বাঁধ		ঐ
অংশীদার		গঙ্গাপদ বসু
অন্ধকারের বৃত্ত		ঐ
মেঘে ঢাকা তারা		শক্তিপদ রাজগুরু

গ্রন্থপীঠ ২০৯বি, বিধান সরণি, কলিকাতা ৬।

ধানের ভাব থেকে মিঃ জে এল ব্যানার্জি মিঃ বি এন শাসমল ও অন্যান্যদের অপসারিত করবার উদ্দেশ্যে। কিছুদিন আগেও মিঃ জে এম সেনগুপ্ত ছিলেন বাংলার ডি-মুকুটধারী অধিপতি, আজ তিনি একটি সংকীর্ণ ও উদ্ধত গোষ্ঠীতন্ত্রের পরিচালক যাকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য নিতান্ত সামান্য লোকেরও অভাব আছে।

চক্রটি আজ পুরোমাত্রায় ঘুরে গেছে। মিঃ ব্যানার্জিকে আমরা একটি মাত্র উপদেশই দিতে পারি। তিনি তাঁর বিশেষণগুলি ব্যবহার করতে যেন একটু কৃপণতা করেন। যদি তিনি সবগুলি বিশেষণই মিঃ সেনগুপ্তের উপরেই ধর্ষণ করেন তাহলে তিনি যখন এমন কোনো, তাঁর মত প্রকৃত, নিন্দাযোগ্য ব্যক্তির সম্মুখীন হবেন, যেমন যদি কোনো দাঙ্গাকারী গুলির আঘাতে আহত হয় তাহলে তিনি বিশেষণের অভাবে দিশেহারা হবেন। সেনাধ্যক্ষের পক্ষে কোনো তুচ্ছ সংঘর্ষে সকল সমরাস্ত্র নিঃশেষ করার মত চরম ভ্রান্তি আর কিছু নেই।

'পাঠকরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে আভ্যন্তরীণ সম্পর্কের অবস্থা সঙ্গিন। অবস্থা এমন পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে প্রকাশ্যে লাঠি ঘোরানো হয়েছে এবং সদস্যরা নিজেদের আসন হারাবার ভয় ছাড়াও মাথা ফাটার ভয়ও করেছেন। এক সাম্প্রতিক সভায় মিঃ ব্যানার্জি, মিঃ শাসমল ও অন্যান্য সদস্যদের পদত্যাগ করতে আহ্বান জানানো হয়েছিল। যে লেখন থেকে আমরা উপরের উদ্ধৃতিটি দিয়েছি তাতে মিঃ ব্যানার্জি জানিয়েছেন যে তিনি প্রকৃতপক্ষে পদত্যাগ করেছেন কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির অনুগামী হওয়ার দরুন ততক্ষণ তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচিত না হচ্ছে ততক্ষণ তিনি তাঁর পদে থেকে যেতে বাধ্য এবং সেই উদ্দেশ্যে এখনও কোনো সভা হয়নি। গতকালের অধিবেশে একটি সভা ডাকা হয়েছিল। কিন্তু যে ভদ্রলোক এই বিবাদে একটি শান্তি স্থাপকের কাজ করতে বাগ্র সেই মিঃ আয়েঙ্গারের সঙ্গে দিল্লীতে একটি সম্মেলনের কতিপয় বৃথা চেষ্টার পর সেই সভা স্থগিত রাখা হয়। কিন্তু সভা স্থগিতের নোটিশ যখন দেওয়া হোলো তখন মিঃ সেনগুপ্ত এবং তাঁর বন্ধুরা সেটিকে নস্যাৎ করে দিলেন এই বলে যে সেটি সম্পাদকের ক্ষমতার বাইরে এবং নিজেরাই সভা আহ্বান করলেন যাতে এক প্রস্থ নতুন কর্মকর্তা নির্বাচন করা যায়। তাঁরা ইতিমধ্যেই নিজেরা কর্মকর্তার পদে এবং ক্ষমতায় আসীন হয়ে আছেন বলে ধরে নিলেন। পুরাতন কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক বাধাদানের কথা তাঁরা গণ্য করলেন না। গতের পর্যায়ের ঘটনা সম্পর্কে আমাদের বিভিন্ন প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করতে হবে; কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে শাসমল কমিটির অফিসে এবং অফিস বাড়ির প্রধান ফটকে তালা লাগিয়ে দিয়ে কিছু হতভাগ্য ব্যক্তিকে বন্দী করে দিয়েছিলেন। তারপরে কি হোলো তার বিবরণ জানতে হলে আমাদের মিঃ সেনগুপ্তের সই করা প্রতিবেদনের সাহায্য নিতে হবে : সন্ধ্যাবেলায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কোনো সদস্য যাঁরা উপরতলায় গিয়েছিলেন নিচের গেট বন্ধ করে দিয়ে তাঁদের আটকিয়ে দেওয়া হয় এবং কিছু লাঠিধারী ব্যক্তি (যারা লাঠি ঘোরাচ্ছিল) তাঁদের নিষ্ক্রমণে বাধা দেয়। সারাদিন ধরে চাতালটি শিখ এবং ভিন্ন প্রদেশীয় দারোয়ানদের দ্বারা পূর্ণ হয়েছিল। এই মুহূর্তে (রাত আটটা) ওই ভদ্রলোকদের আটক করে রাখা হয়েছে এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অন্যান্য সভ্যদের ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। গেটের ঠিক পিছনেই মিঃ বসন্তকুমার মজুমদারকে দেখা গেছে।'

সমস্ত ছোটোখাটো ঘটনার বিবরণ দেওয়ার বা উভয় গোষ্ঠী পরস্পরের বিরুদ্ধে পদ্ধতি সম্বন্ধীয় কূটতর্কের যে অবতারণা করেছেন সে নিয়ে আলোচনার জন্য যথেষ্ট জায়গা আমাদের নেই। তবে সর্বপ্রধান ঘটনা হচ্ছে এই যে মিঃ ব্যানার্জি ও তাঁর বন্ধুদের দখলেই অফিস বাড়িটি রয়েছে যেটিকে তাঁরা একটি প্রতিরক্ষা ব্যূহের মধ্যে এবং অন্য গোষ্ঠীর সভ্যদের যাই ঠিক করা হোক না কেন সেই অনুসারে তাঁরা অফিস বাড়ি থেকে দখলচ্যুত হতে বাধ্য নন কারণ অপর গোষ্ঠীর দ্বারা সভা আইনসঙ্গতভাবে ডাকা হয়নি এবং সেই হেতু, ওঁদের মতে, সেটা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাই নয়। যে সকল ঘটনা ঘটছে তাতে আমরা সকলেই দেখতে পাচ্ছি যে বাংলায় স্বরাজ দল এক প্রচণ্ড ভাঙনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে মিঃ সি আর দাশ একটি শক্তিশালী সংগঠন রেখে গিয়েছিলেন বটে কিন্তু, বাইরের পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে, এমন-কি মিঃ দাশের জীবিত কালেই ওই সংগঠনের ভিতরে ধ্বংসের বীজ নিহিত হয়েছিল। তাঁর ফরিদপুর সম্মিলনীর ভাষণটি চিহ্নিত অনুগামীদের এক বিরাট অংশের কাছেই স্বাগত ছিল না। জীবিত মিঃ দাশ স্বরাজ-দলকে এক সঙ্গে গুপ্ত করে রাখতে পেরেছিলেন মৃত্যুর সময়ে তিনি দলের পরিচালনভার এমন সব লোকের হাতে দিয়ে গেছেন যাঁদের মধ্যে তাঁর মত ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি ছিল না, ছিল না জনসাধারণের কল্পনার উপর তাঁর মত প্রভাব এবং ছিল না সকল বিষয় পরিচালনায় তাঁর দক্ষতার সামান্যতম অংশ। এর ফলাফল অবশ্যম্ভাবী ছিল। এবং সেই অনুসারে যে-সকল বিরোধ বেধে উঠেছে তাতে এমন কোনো নেতার উদ্ভব হয়নি। যিনি ঝড়কে সংযত করতে পারেন বা ঝঞ্ঝাঘাতের সম্মুখে নত না হয়ে থাকতে পারেন। বাংলায় স্বরাজ প্রাক-মুহূর্তের দিনগুলি নোংরা এবং কদর্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। পদাধিকারের এই প্রতিযোগিতায় সিনিই জয়লাভ করুন স্বরাজের নামটা হয়তো বেঁচে থাকবে কিন্তু এর কণ্ঠস্বরটি হবে এক গোষ্ঠীচক্রের মধ্যে আর এক গোষ্ঠীচক্রের এবং এর প্রকাশ্য আকারটি হবে এক বিরাট দৈত্যের পরিত্যক্ত পরিধানের বিশীর্ণ রূপের মত।'

কংগ্রেস অফিস গায়ের জোরে দখল করতে না পেরে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দল ও তাঁদের সহযোগী নেতারা নির্মলচন্দ্রের বাড়িতে সভা করে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন করলেন। সভাপতি হলেন অখিল দত্ত ও সম্পাদক ডাঃ জে এম দাশগুপ্ত। ওদিকে ১৮ই মার্চ সাবেক বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সাধারণ সভায় বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের কার্যনির্বাহক সমিতি আবার সর্বসম্মতক্রমে পুনর্নির্বাচিত হোলো।

দুটো কমিটিই থেকে গেল এবং মীমাংসার কোনো সম্ভাবনা না দেখে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কাছে এই নির্বাচন সম্বন্ধীয় বিরোধের মীমাংসা প্রার্থনা করলেন এই বলে যে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বলে দিক দুটি কমিটির মধ্যে কোনটি বৈধ। যদি তাঁর কমিটিকে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি অবৈধ বলে ঘোষণা করেন তাহলে তাঁর কমিটি ভেঙে দেবার প্রতিশ্রুতি রইল। তাঁর তরফ থেকে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব করবার ভার দিলেন তিনি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের প্রস্তাবক্রমে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি সমস্ত বিরোধটি মীমাংসার জন্য একটি আরবিট্রেশন বোর্ড গঠন করে দিল। ই আরবিট্রেশন বোর্ডে বীরেন্দ্রনাথের তরফে থাকলেন তাঁর পুরাতন বন্ধু মৌলানা মহম্মদ আক্রাম খাঁ এবং সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদল ও তাঁদের সহযোগী নেতাদের তরফে থাকলেন নির্মলচন্দ্র চন্দ্র ও অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ। বীরেন্দ্রনাথের দাবি ছিল একটি মাত্র—নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ঠিক করে দিক বাংলার দুটি কংগ্রেস কার্যনির্বাহক সমিতির মধ্যে কোনটি বৈধ যে কমিটি অবৈধ, বলে ঘোষিত হবে সেই কমিটির বিলুপ্তি সাধন।

কিন্তু আরবিট্রেশন বোর্ড সেই দিকেই গেলো না। বোর্ড বললো, দুটো কমিটিই বাতিল করে দেওয়া হবে এবং তার বদলে তাঁরা সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়ে যে সভ্য তালিকা তৈরী করেছেন সেই তালিকার সভ্যরাই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নতুন কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য নির্বাচিত হবেন। আরবিট্রেশন বোর্ড যে এইভাবে কাজ করবে এর জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নিকট প্রার্থনা জানানো হয় নি। মূল প্রশ্ন যেটি তাঁদের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল সেটি হচ্ছে ঘোষণা করতে হবে কোন্ কমিটি বৈধ। কিন্তু পরবর্তী দেশের রাজনৈতিক মঙ্গলের জন্য বীরেন্দ্রনাথ শাসমল আরবিট্রেশন বোর্ডের প্রস্তাব মেনে নিয়ে তাঁর কমিটিকে বিলোপ করে দিলেন এই আশায় যে আরবিট্রেশন বোর্ডের প্রস্তাব মেনে নিয়ে তাঁদের প্রস্তাবিত সভ্য তালিকা সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দল ও তাঁদের সহযোগী নেতারাও গ্রহণ

করবেন এবং সকলে যুক্তভাবে কংগ্রেস কমিটিতে কাজ করবেন। ঠিক হয়েছিল ২৭ সালের ২৬শে জুন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সভায় আরবিট্রেশন বোর্ডের প্রস্তাবিত সভ্য তালিকা একটি শীলকরা খামে পেশ করা হবে এবং সেই তালিকা অনুযায়ী সভ্যরা কার্যনির্বাহক সমিতিতে নির্বাচিত হবেন। এই সভায় ভোটাভুটির কোনো প্রশ্ন থাকার কথা ছিল না কারণ বীরেন্দ্রনাথের কমিটি আরবিট্রেশন বোর্ডের সভ্য তালিকা গ্রহণ করে নিয়েছিলেন এবং সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দল ও তাঁদের সহযোগী নেতারা তালিকাটি গ্রহণ করলে কাজটি সর্বসম্মতিক্রমে সমাধা করা যেত। এই কারণে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ও তাঁর বহু সহকর্মী ২৬শে জুনের সভায় অনুপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সেই সুযোগে সন্ত্রাসবাদী দল ও তাঁদের সহযোগী নেতারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালেন এবং তাঁরা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির দ্বারা নিযুক্ত আরবিট্রেশন বোর্ডের প্রস্তাবিত সভ্য তালিকা প্রত্যাখ্যান করলেন এবং নিজেদের ইচ্ছামত বঙ্গীয় কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন করলেন যা থেকে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ও তাঁর সকল সহকর্মীকে সমূলে বিদায় দেওয়া হোলো। এই আরবিট্রেশন বোর্ড নিয়োগ করেছিল নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ও তার ওয়ার্কিং কমিটি। কাজেই আরবিট্রেশন বোর্ডের প্রস্তাব অমান্য করে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দল ও তাঁদের সহযোগী নেতারা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকেই অমান্য করলেন। কিন্তু নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এই বিধি-বহির্ভূত কাজের বিরুদ্ধে কিছু বলতে চাইলেন না।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক নিযুক্ত আরবিট্রেশন বোর্ড সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হোলো কিন্তু নিখিল ভারত কংগ্রেসের কর্তারা নীরবে তাতে সম্মতি জানালেন দেখে স্টেটসম্যান পত্রিকা ১৮ই জুন একটি স্মরণীয় প্রধান সম্পাদকীয় লিখেছিল তার বাংলা অনুবাদ তুলে দিলাম : '(স্ববাজের অপসরণ) বহু দেশে একটা গল্প চালু আছে কেমন করে এক শেয়াল দুটি বিবদমান জন্তুর মধ্যে সালিশীর কাজ করেছিল এবং সালিশীর রায় অবশেষে যখন বেরোল তখন বিবাদের বস্তুটি কেমনভাবে শেয়ালের দখলেই থেকে গেল এবং বিবাদের কোনো বস্তু আর না থাকায় কেমনভাবে দুই বিবাদী বিবাদের সঙ্গে বিদায় নিল। বাংলার দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী কমিটির মধ্যে বিবাদ মীমাংসার জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক নিযুক্ত আর-বিট্রেশন বোর্ডের মনে সেই ধরনের একটা স্মৃতি নিশ্চয় প্রভাবিত ছিল। তাঁরা বিবাদের কোনো মীমাংসা করতে পারেন নি, কিন্তু কার্যকরীভাবে তাঁরা দুটি কমিটির মীমাংসা করে দিয়েছেন।' আমাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে উভয় একজিকিউটিভ কাউন্সিল আর বিদ্যমান থাকবে না

ক্লাসিক বইয়ের সংগ্রহ ।। শাশ্বত উপহার

বাংলা সাহিত্যের কিংবদন্তী পুরুষ
নাট্য সাহিত্যেও যাঁর দান অসামান্য

তারাশঙ্কর
নাট্য-সমগ্র

সম্পাদনা : ডঃ অজিতকুমার ঘোষ

দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রতি খণ্ডের সাধারণ মূল্য পঁচিশ টাকা।
গ্রাহকদের জন্য প্রতি খণ্ড ষোল টাকা।
ছ'টাকা দিয়ে গ্রাহক হওয়া যায়। অথবা এককালীন তিরিশ টাকা অগ্রিম দিলেও বিশেষ সুবিধা হিসাবে সমগ্রটি পাবেন।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের মূল্য রত্ন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং আরো অনেকেই এই গ্রন্থ থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন।

আচার্য ক্ষেমেন্দ্র রচিত

বোধিসত্ত্বাবদান
কল্পলতা

অনুবাদ : রায় শরৎচন্দ্র দাশ বাহাদুর
সম্পাদনা : ডঃ বিষ্ণু বসু

দুই খণ্ডে প্রকাশ্য। সাধারণ মূল্য চল্লিশ টাকা। গ্রাহকদের জন্য তিরিশ টাকা। দশ টাকা দিয়ে গ্রাহক হওয়া যায়।

আমাদের আরও বিচিত্র বইয়ের শোভন সংগ্রহ

নাটক •
গোর্কির 'মা'-নাট্যরূপ—৫.০০
জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়
ত্রিশূল—৫.০০
ধনঞ্জয় বৈরাগী
পকেটে চোরের জল—৫.০০
শচীন ভট্টাচার্য
চাক ভাঙা মধু [৩য় সং]—৫.০০
মনোজ মিত্র
অজগর—৫.৫০
মনোজ মিত্রের একাঙ্ক—৮.৫০
সমর মুখোপাধ্যায়
রাজা-বদল—৪.০০
জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়
গরমিল—৪.০০
অজিতকুমার দে
রঙ বদলায়—৪.০০
জ্যোৎস্নাময় বসু

উপন্যাস •
যখন বৃষ্টি—জ্যোৎস্নাময় বসু—৮.০০
সিকিদিবি— ঐ
স্বপ্ন নিয়ে—শান্তিপদ রাজগুরু—৫.০০
সুজনে কুজনে—৫.০০
প্রশান্ত চৌধুরী—
মধুবেণ—কুমারেশ ঘোষ—৩.০০
সোহাগ বাতি—সতী সেন—৪.৫০
রহস্যের নায়িকা—কৌশিক রায়—৩.০০
কার্শিয়াঙে খুন—ডাঃ বাসুদেব—৩.০০
সিন্ধু-সারস—পিনাকীরঞ্জন গুহ—৭.০০
স্মৃতি তুমি বেদনা—৫.০০
সুশীলকুমার ভট্টাচার্য
অন্যান্য •
রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ প্রসঙ্গে—৮.০০
সুরদাস
তন্ত্র পরিচয়—সত্যবান—৮.৫০
গল্প •
সমকালের গল্প—৬.০০
জ্যোৎস্নাময় বসু ও
কিরণচন্দ্র মৈত্র

নাটকের অভিজ্ঞ পত্রিকা ও সকলের জন্য ভালো পত্রিকা

নাট্য সংস্থাগুলির [illegible] নতুন সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে

নাট্য-লিপিকা

পূর্ণাঙ্গ নাটক, একাঙ্ক, নাট্য-আলোচনা, নাটকের বিভিন্ন খবর, সাক্ষাৎকার, সারা বাংলার নাট্য-সংস্থার বিবরণ এবং আরো অনেক জানা-অজানা সংবাদ নিয়ে প্রকাশিত হয়।

বিপুল আয়োজনে পূজা সংখ্যা ছাপা হচ্ছে।
বার্ষিক গ্রাহক-চাঁদা দশ টাকা। সডাক তেরো টাকা।

লিপিকা। ৩০/১এ, কলেজ রো, [illegible]

এবং উভয় দলের পদাধিকারীরা এই মুহূর্ত থেকে কার্য পরিচালনা হতে বিরত থাকবেন।' কিন্তু দুটি কমিটিকে এবং দুই প্রস্থ পদাধিকারীকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে অপসারিত করেও সন্তুষ্ট না হয়ে কে রাজা হবে আরবিট্রেটরেরা তাই ঠিক করবার কাজে নিজেদের নিয়োগ করলেন। একটি নতুন একজিকিউটিভ কাউন্সিল নির্বাচিত করবার জন্য কোনো সভা ও'রা ডাকবেনই না পরন্তু জবরদস্তি করে নয় শুধু পথপ্রদর্শক হিসাবে সভাব সভাপতির হাতে তাঁরা একটি শীলকরা খাম দেবেন যাতে সেই সভ্যদের নাম থাকবে যাঁরা, ও'দের মতে, নতুন একজিকিউটিভ কাউন্সিল গঠন করবেন। মনে হয়, এই ভদ্রলোকেরা বেন বিশ্বাস করেন ইংরেজি ভাষায় 'আরবিট্রেটর' এবং 'ডিরেক্টর' দুটি সমার্থক বাক্য। কিন্তু সত্য কথা বলতে এই দুটি বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন।

মিঃ শাসমল যখন আরবিট্রেটরদের সামনে সাক্ষী দিতে উপস্থিত হন নি ও জানিয়েছেন যে বিবাদের ক্ষেত্র থেকে সরে দাঁড়ালেন এবং ব্যারিস্টারি প্র্যাকটিসে ফিরে গেলেন তখন এটাই সম্ভব যে বঙ্গীয় কংগ্রেসের 'বিগ ফাইভ' কর্তৃক ক্ষমতা দখলের পথ খুলে গেল এবং সে ক্ষেত্রে শীলকরা খামের সভ্য তালিকার মূল্য খুবই সামান্য। আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারি যে বাস্তব ক্ষেত্রে যাদের হাতে ক্ষমতা থাকবে তারাই নিজেদের একজিকিউটিভ তৈরি করবে আরবিট্রেটরেরা যাঁদের নামই সুপারিশ করে থাকুন না কেন। যখন নেতাদের মধ্যে বর্তমান বিবাদটি সম্পূর্ণরূপে অবাস্তব নয় এই অর্থে যে কংগ্রেসের কর্মী স্তরের কোনো বিবাদ এতে প্রতিফলিত হয় নি তখন এইটাই আশা করতে হবে যে শুধুমাত্র একটি গোষ্ঠীর বিজয় আরও ভাঙনের সৃষ্টি করবে। এই ঘটনার একটা খুবই প্রকৃত তাৎপর্য আছে যে বঙ্গীয় কংগ্রেসকে একটি ধীরগতি শক্তিক্ষয়ী মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবার ব্যর্থ প্রচেষ্টার আরবিট্রেটরদের প্রতিবেদন মিঃ দাসের দাশের মৃত্যুবার্ষিকীর দিনেই প্রকাশ করা হোলো। যেদিনের উপর তিনি আধিপত্য করতেন এবং তাঁর উত্তরাধিকারীদের হাতে যা তিনি রেখে গিয়েছিলেন তার সঙ্গে বর্তমান বিবদমান গোষ্ঠীগুলি যে দলের প্রতিনিধিত্ব করছে তার পার্থক্য সর্বাপেক্ষা নিরাসক্ত পর্যবেক্ষককেও বিস্মিত করতে ব্যর্থ হবে না। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে কোনো ব্যক্তির মহত্ত্বের মাপকাঠি হচ্ছে এই যে তিনি এমন কিছু রেখে গেছেন যা তাঁর মৃত্যুর পরেও অক্ষত থাকবে এবং মিঃ দাসের বেলায়, গত বৃহস্পতিবার তাঁর স্মৃতির প্রতি যে-সকল শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে আমরা যদি তার যথার্থ বিচার করতে চাই তাহলে তাঁর শেষ জীবনের রাজনৈতিক কার্যাবলীর অন্তরে পর্যবলোকন করতে আমরা বাধ্য। তাঁর অনুগামীরা যাঁরা কংগ্রেসকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন তাঁদের এই নামে চিহ্নিত করা ঠিক হবে কিনা জানি না, এটা নিশ্চয়ই দেখেছেন যে তিনি যা নির্মাণ করেছিলেন তার পাথরগুলি যেন একটির উপর কোনো আরেকটি কিছুতেই না থাকে। কোনো বাজার অশ্ব বাহিনী, কোনো বাজার সৈন্যবাহিনী, সকল আরবিট্রেশন কমিটিগুলি এই ভেঙে-পড়া বস্তুটিকে আবার দাঁড় করিয়ে দিতে পারবে না।

'আমাদের এই অভিমতে আমরা সমর্থন পাচ্ছি এমন একটি সূত্র থেকে যার সঙ্গে সাধারণত আমাদের মতের কোনো সহানুভূতি থাকে না। ইয়ং ইন্ডিয়াতে দেখা যাচ্ছে মহাত্মা গান্ধী লিখেছেন যে যতক্ষণ হিন্দু ও মুসলমানেরা নিজেদের মধ্যে শান্তি রক্ষার জন্য গভর্ণমেন্টের মুখের দিকে চেয়ে থাকবে ততক্ষণ স্বরাজের আশা করা অসম্ভব। মিঃ গান্ধী প্রচন্ডভাবে সৎ এই জন্যে যে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সকল বিবাদ শয়তান গভর্নমেন্টের দ্বারা উস্কানো হয়েছে নিম্ন স্তরের রাজনীতিকদের মধ্যে চালু এই প্রচার বাক্যটিতে তিনি সমর্থন দেন না। তিনি সকল বস্তুকে বাস্তব দৃষ্টিতে দেখেন এবং স্বীকার করেন যে বিবদমান দাবিদাবদের উপর তথাকথিত নেতাদের কোনো কর্তৃত্ব নেই এবং বলেন : 'এটা আমাদের চিরন্তন লজ্জা যে যুদ্ধবিদের সময়ে গভর্ণমেন্টকেই শান্তি রক্ষার ভার নিতে হয়েছে।' মিঃ গান্ধী মনে করেন যে দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায় লড়াই করতে করতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বে তখনই আমরা সম্ভিত ফিরে পাব।' কিন্তু সেই পথে স্বরাজের প্রারম্ভকেই চিরদিনের জন্য অজানা দেশে অপসারণ করে দেওয়া হবে। এটা মনে করার কারণ নেই যে, বাংলার কংগ্রেস দলের বর্তমান বিবাদ কোনো সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে প্রসূত। প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দু গোষ্ঠীগুলির ব্যক্তিগত উচ্চাশাজনিত পারস্পরিক শত্রুতা থেকেই তা উদ্ভূত। এই সত্যটি যদি হৃদয়ঙ্গম করা যায় তাহলে স্বরাজের স্বপ্ন আরও এক ধাপ পিছিয়ে গেল কারণ, হিন্দু নেতাদের প্রথমে নিজেদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করতে হবে তার পরে তাঁরা মুসলমানদের সঙ্গে যুক্ত হবার স্তরে যেতে পারবেন। যতক্ষণ সেই সংযুক্তি করণটি না হচ্ছে ততক্ষণ, যেমন মিঃ গান্ধী বলেছেন : 'স্বরাজ চাওয়া অসম্ভব।' এবং স্বরাজ পাওয়া ত আরও অসম্ভব। মিঃ গান্ধী দুঃখ করেছেন যে : 'এমন কোনো নেতারা আমাদের নেই যাঁদের আমরা আরবিট্রেটর হিসাবে নিয়োগ করতে পারি।' বাংলার আরবিট্রেশনের যে ফলাফল দেখা গেল তাতে একথা বলা যাবে না যে তাঁর এই ক্ষোভের কোনো সার্থকতা আছে।'

দিল্লীতে কংগ্রেসের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দল ও তাঁদের সহযোগী নেতাদের অর্থাৎ 'বিগ ফাইভকে' আগাগোড়া সমর্থন করতেন সে সম্বন্ধে স্টেটসম্যান পত্রিকার রাজনৈতিক ভাষ্যকার ২রা মার্চ লিখেছিলেন : 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ঝগড়া এক কলঙ্কময় রূপ পরিগ্রহণ করছে। সর্বশ্রী ব্যানার্জি ও শাসমল তাঁদের অধিকৃত পদগুলি পরিত্যাগ করার কোনো লক্ষণই দেখাচ্ছেন না এবং 'বিগ ফাইভ' তথাকথিত 'কর্মীদের' সঙ্গে মিলিত হয়ে ততক্ষণ বিশ্রাম নেবেন না যতক্ষণ না ও'দের বিতাড়িত করতে পারছেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির হস্তক্ষেপ ব্যাপারটিকে আরও জটিলতর করে তুলেছে। বর্তমানে যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে গোষ্ঠীগুলির মধ্যে কেউ যদি হাইকোর্টের শরণাপন্ন হয় তাহলে আমরা আশ্চর্য হব না।

'স্থানীয় সংবাদপত্রে কংগ্রেস সভাপতির যে সব চিঠিপত্র এবং টেলিগ্রাম বেরিয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না যে মিঃ শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার (কংগ্রেস সভাপতি) বাংলার সমস্যাটি সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি এবং সেই কারণে স্থাণুবৎ হয়ে গেছেন। এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই যে তাঁর সাধটা হচ্ছে 'বিগ ফাইভের' হাতে কর্তৃত্ব তুলে দেওয়া কিন্তু খানিকটা যুক্তি প্রদর্শনপূর্বক কোন্ কার্যকরী পন্থায় সেটা করা যায় তিনি সেটা আজও খুঁজে বার করতে পারেন নি। মিঃ শাসমলের দিল্লী গিয়ে নিখিল ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যাপারটার মীমাংসা করবার কথা ছিল কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁর সুযোগ্য সহকর্মী মিঃ বসন্তকুমার মজুমদার নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির বিরুদ্ধে একটি অনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাবের নোটিশ দিয়েছেন।' (ইংরেজির অনুবাদ)

স্টেটসম্যানের রাজনৈতিক ভাষ্যকারের মতে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিবাস আয়াঙ্গারের ইচ্ছা ছিল 'বিগ ফাইভের' হাতে বাংলার কংগ্রেসের কর্তৃত্ব তুলে দেওয়া। কিন্তু মনে রাখতে হবে তখন কংগ্রেসের সর্বময় কর্তা ছিলেন স্বয়ং গান্ধীজী এবং তাঁর ডেপুটি ছিলেন মতিলাল নেহরু। কাজেই শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এই দুজন বড় কর্তার সম্মতি না নিয়ে যে 'বিগ ফাইভকে' সমর্থন করতে চেয়েছিলেন এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। ওদিকে 'বিগ ফাইভের' বেশির ভাগ নেতাই তখন কংগ্রেসী রাজনীতিতে নবাগত ছিলেন। বিধান রায় ত ১৯২৬-এর শেষের দিকে কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন এবং শরৎ বসুর কংগ্রেসী অভিজ্ঞতাও ছিল খুব অল্প দিনের। কংগ্রেসের সাংগঠনিক কর্মী হিসাবে অন্য তিনজনের অভিজ্ঞতা একেবারেই ছিল না। কিন্তু 'বিগ ফাইভের' সকল নেতার এবং এমন কি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নেতৃত্বও নির্ভর করতো সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের উপর। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের দাবিতেই গান্ধীজী যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে বাংলার চিত্তরঞ্জনের উত্তরাধিকারী হিসাবে নির্বাচিত করে যান। ১৯২৬-এর জুন মাসে এক প্রকাশ্য বিবৃতিতে একদিকে 'বিগ ফাইভের' নেতারা অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের নেতারা একথা ঘোষণা করেছিলেন। কাজেই

পাঁচ দশকের পাঁচালী

১৯২৯–১৯৭৮

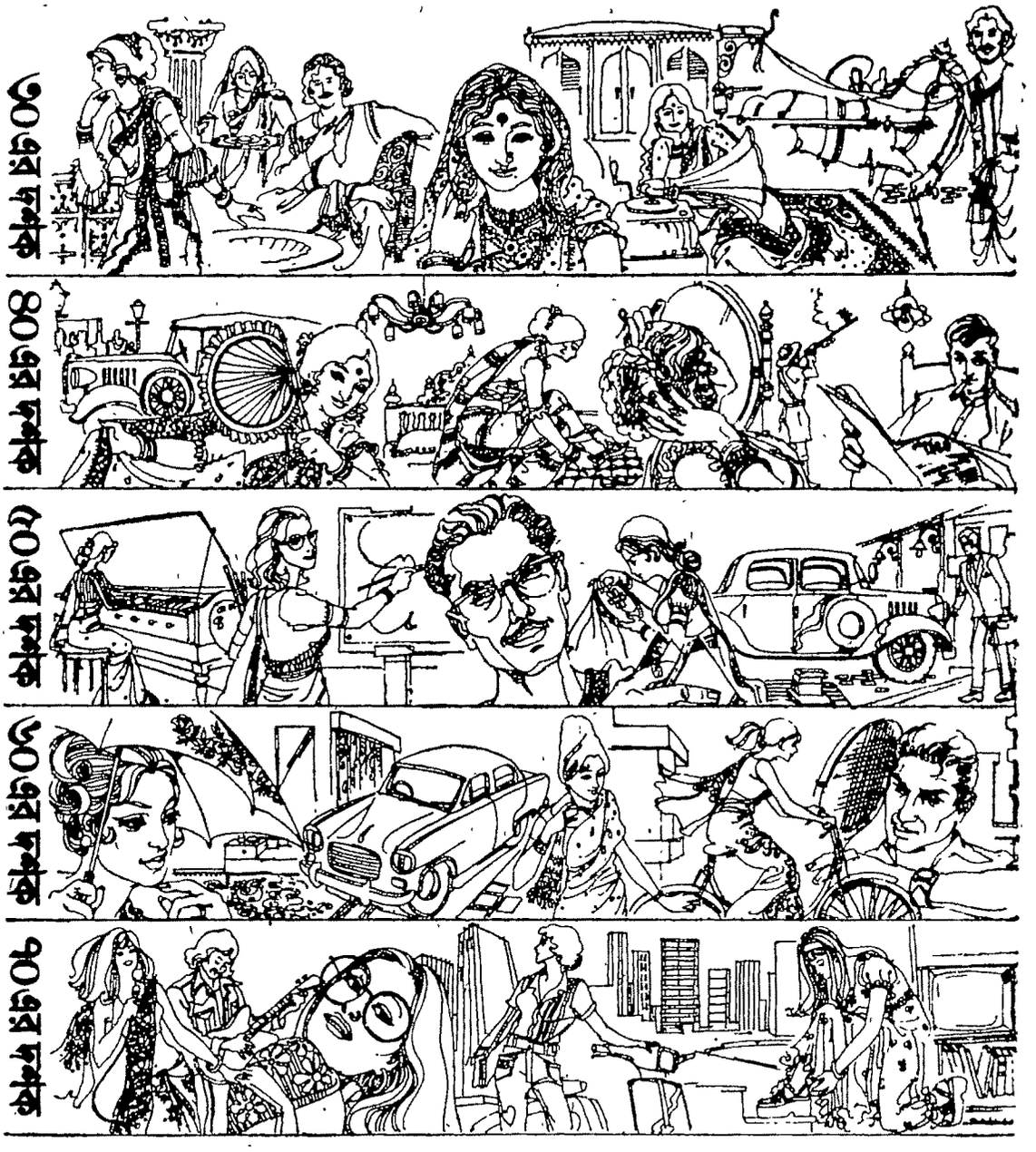

GD 50 YEARS

ফেলে আসা পাঁচটি যুগ। ধীর পর্দানশীন জীবন বদলে গেছে আজকের বহির্মুখী আধুনিকতায়। বদলায়নি শুধু কিছু জিনিষ—যেমন বোরোলীন এবং আমাদের অন্যান্য ঔষধাদির সমাদর। আমাদের প্রতি আপনাদের এই আস্থা আগামী দিনেও অক্ষুণ্ণ থাক—সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে এই কামনা করি।

বোরোলীন প্রস্তুতকারক জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস্
সেবা পরিচর্যায় পাঁচ দশকের সঙ্গী

GD 978

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY

কংগ্রেসের ঊর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষ, অর্থাৎ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ও মতিলাল নেহরু যাঁদের সঙ্গে স্বয়ং গান্ধীজীও নিশ্চয়ই ছিলেন, যখন 'বিগ-ফাইভের' হাতে বাংলায় কংগ্রেসের কর্তৃত্ব তুলে দেবেন ঠিক করলেন তখন তাঁরা প্রকারান্তরে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের হাতেই কর্তৃত্ব তুলে দিতে চাইলেন।

সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা নরহত্যা করে বা অন্যান্য হিংসামূলক পন্থায় ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলেন এবং তাঁরা যে পন্থাকে তাঁরা ভালো মনে করেছেন সেই পন্থায় ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করার অধিকার তাঁদের নিশ্চয়ই ছিল। ১৯২৬-এর ফেব্রুয়ারী মাসে এক চিঠিতে মতিলাল নেহরু জওহরলালকে লিখেছিলেন : 'বাংলার বেঙ্গলিউ-শনারীরা, দুর্ভাগ্যবশতঃ, গভীরভাবে সাম্প্রদায়িক-মনোভাবাপন্ন।' মৌলানা আজাদ 'ইণ্ডিয়া উইন্‌স্ ফ্রিডম' বইতে লিখেছেন : 'সকল শ্রেণীর রেভোলিউশনারীরা মুসলমান-বিরোধী ছিলেন।' সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা যে মুসলমান-বিরোধী ছিলেন সেটা তাঁরা প্রকাশ্যেই স্বীকার করতেন। এবং তাঁদের এই মুসলমান-বিরোধিতার জন্যও তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না কারণ তাঁদের মতে ভারতের পক্ষে যে পন্থা মঙ্গলজনক ছিল তাঁরা সবল বিশ্বাসে সেই পন্থারই অনুসরণ করেছেন। কিন্তু কংগ্রেসের উচ্চতম নেতারা এবং এঁদের মধ্যে স্বয়ং গান্ধিজীও .. ছিলেন— যাঁরা অহর্নিশ অহিংসার বুলি আওড়িয়ে দেশময় একটা প্রচারের কেড়াজাল তৈরি করেছিলেন এবং যাঁরা ঘন ঘন মুসলমান প্রেমের কথা জাহির করে মুসলমান সমাজের সমর্থন দাবি করতেন তাঁরা যে গোপনে চক্রান্ত করে হিংসাপন্থী ও মুসলমান-বিরোধী সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের হাতে বাংলার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব তুলে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন এর মধ্যে কোনো ভণ্ডামি ছিল কিনা সে বিচারের ভার আমি ছেড়ে দিলাম ভবিষ্যত ইতিহাসের হাতে।

১৯২৬-এর সাধারণ নির্বাচনে যখন নাড়াজোলের জমিদার দেবেন্দ্রলাল খাঁকে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের বিরুদ্ধে কংগ্রেস মনোনয়ন দিয়ে দাঁড় করানো হোলো তখনও সেটা প্রধানত সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের দাবিতেই করা হয়েছিল। নাড়াজোলের এই দেবেন্দ্রলাল খাঁ ১৯২৫-এর ২৪শে জানুয়ারী বড়লাট লর্ড লিটনকে অভ্যর্থনা জানাতে অস্বীকার করেন এই কারণে যে লর্ড লিটন সুভাষ-চন্দ্র প্রমুখ বাংলার বহু তরুণ কর্মীকে বিনা বিচারে বন্দী করে রেখেছিলেন। কিন্তু এই দেবেন্দ্রলাল খাঁ লর্ড লিটনকে তাঁর মেদিনীপুরের 'গোপ প্রাসাদে' নিমন্ত্রণ করে বিরাট ভোজসভায় আপ্যায়িত করেছিলেন। ১৯২৬-এর জুন মাসে বীরেন্দ্রনাথ মেদিনী-পুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান পুন-নির্বাচিত হলে বাংলা সরকার (সম্ভবত লিটনের প্রতি অপমানের প্রতিশোধ হিসাবে) তাঁর নির্বাচন নাকচ করে দেন এবং দেবেন্দ্র-লাল খাঁকে জেলা বোর্ডের সরকারী চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন। দেশের ও মাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতক এই দেবেন্দ্রলাল খাঁকে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা দাঁড় করালেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের বিরুদ্ধে এবং যে সুভাষচন্দ্রের মুক্তির বিরোধিতা করে দেবেন্দ্রলাল খাঁ সরকার পক্ষে ভোট দিয়ে-ছিলেন তাঁরই পূজনীয় জ্যেষ্ঠা শরৎচন্দ্র বসু দেবেন খাঁর প্রধান মুরুব্বি হয়ে দাঁড়ালেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আগে থেকে এই মনোনয়ন বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকেই দিয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের দাবিতে সেই মনোনয়ন বদল করে যখন দেবেন্দ্রলাল খাঁকে দেওয়া হোলো তখন অনুরুদ্ধ হয়েও মতিলাল নেহরু এর বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করেন।

এই প্রসঙ্গে ১৯২৬-এর ১১ই নভেম্বর অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদকীয়তে লিখে-ছিল : 'নির্বাচন নিকটবর্তী হচ্ছে এবং আগামী দু' সপ্তাহের মধ্যে নামের শেষে তিনটি আদ্যাক্ষর ব্যবহারের অধিকার লাভের অসুখকর রেষারেষির ইতি হবে। কিন্তু বাংলার বেতাজ বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মধ্যে কংগ্রেসের মনোনয়ন বিলি করা হয়েছে সে প্রসঙ্গ। বিনা মন্তব্যে এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। সাধারণ বুদ্ধির কাছে এটি নিছক বিস্ময়কর। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কংগ্রেসের পরিজ্ঞাত শত্রুকে গ্রহণ করা হয়েছে এবং শুধুমাত্র কোনো কর্তার পছন্দসই নয় সেই অপরাধে কাউকে কাউকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। আরেক জায়গায় যে ব্যক্তি সরকারের দমনমূলক নীতিগুলি সমর্থন করেছিলেন তাঁকে মনোনীত করা হয়েছে এবং যিনি কখনও তা করেন নি এবং সর্বক্ষণ জনসাধারণের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য কাজ করে এসেছেন তাঁর সঙ্গে শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করা হচ্ছে। সকল গুহ্যেতেই দেবতাদের কার্যকলাপ রীতিমত রহস্যাবৃত।'

এমনকি বীরেন্দ্রনাথ শাসমল বঙ্গীয় কংগ্রেসের মনোনয়ন চাইলেও তাঁকে তা দেওয়া হয়নি। এ সম্বন্ধে ৬।১১।১৯২৬-এর অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদকীয়তে লিখেছিল : 'নাড়াজোলের কুমারের যে ঘোষণায় বলা হয়েছে যে তিনি মিঃ শাসমলের পক্ষে নিজের প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নেবেন যদি মিঃ শাসমল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির মনোনয়ন প্রার্থনা করেন, তার জন্য বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়েছি, বাংলার কংগ্রেস কর্তাদের মধ্যে একটি আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। মিঃ শাসমল এই সকল ব্যক্তিদের কাছে জনপ্রিয় নন এবং এঁদের মধ্যে কেউ কেউ প্রকৃতপক্ষে তাঁকে ভয়ই করেন এই কারণে যে তিনি এঁদের প্রভাব খর্ব করে দেবেন। সেই জন্য এঁরা কেউ চান না তিনি নির্বাচন প্রার্থী হিসাবে কংগ্রেসের সমর্থন লাভ করুন। কিন্তু এখন কি করা যায়? নাড়াজোলের কুমার ক্ষণিকের উত্তেজনায় প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলেছেন যে মিঃ শাসমল যদি চক্রের ভেতর ফিরে আসতে রাজি হন তাহলে তিনি প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নেবেন। মিঃ শাসমল সময়ের নষ্ট না করে শর্তটি গ্রহণ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এখন প্রশ্নটি হচ্ছে কি করে কুমারের মুখটি রক্ষা করা যায় ও সেই সঙ্গে মিঃ শাসমলের প্রত্যাবর্তনের আসন্ন বিপর্যয়টি কি করে এড়ানো যায়?

'এই সমস্যাটির সমাধান খুঁজে বের করবার জন্য কংগ্রেসের 'থিংকাইড' গত বৃহস্পতিবার দুপুরে হতে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন। আমরা জানতে পেরেছি, একটি সমাধানও তাঁদের সম্মুখে উপস্থাপিত হয়েছে। মিঃ শাসমলকে বলা হবে যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে তাঁর আবেদনপত্র মঞ্জুর করা হবে না যতক্ষণ তিনি মেদিনীপুরের অন্যান্য কেন্দ্র থেকে তাঁর অন্যান্য প্রার্থীদের প্রত্যাহার করে না নেন যারফলে জায়গায় কংগ্রেস-প্রার্থীদের

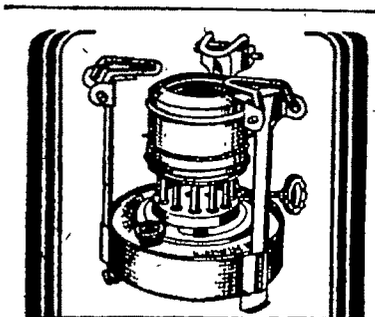
নির্ঝঞ্ঝাটে রান্না সারতে
লাইটেক্স
নীল শিখার কেরোসিন কুকার
১) সেটেড ফাটবার কোনো সম্ভাবনা নেই।
২) তৈয়ারীর গুণাগুণ সম্বন্ধে গ্যারান্টি দেওয়া হয়।
৩) প্রতিটি অংশই আলাদা পাওয়া যায়।
পরিবেশকঃ
ভেনাস এজেন্সীজ
৬, আমড়াতলা স্ট্রীট • (দ্বিতলে)
কলিকাতা-৭০০০০৯ • ফোনঃ৩৪-৬৫৭৩

যথেষ্ট বেগ দিচ্ছে। তিনি যদি এই প্রস্তাবে রাজি হন তাহলে তাঁকে গ্রহণ করে সমর্থন জানানো হবে। কিন্তু কর্তারা সুবিধাজনক-ভাবে আশা করছেন যে এই প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করবেন না।'

কংগ্রেস যে দেশের ও জাতির প্রতি একজন বিশ্বাসঘাতককে সমর্থন করবে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল তার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করেছিলেন। ধনী জমিদারের বহু অবৈধ পন্থার কারণে এবং দু বছরের ক্রমাগত অসহযোগের কারণে তিনি তখন নিঃস্ব ও সর্বশান্ত হওয়ায় ও ধনী জমিদারের সীমাহীন ধন-বিতরণের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারায় তিনি নির্বাচনে হেরে যান। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে ভবিষ্যতে ইতিহাস এটা কংগ্রেসের আদর্শচ্যুতির দৃষ্টান্ত হিসাবেই দেখবে এবং প্রকৃত কংগ্রেসের পরাজয় হিসাবেই গ্রহণ করবে এবং তিনি যে কংগ্রেসের এই আদর্শচ্যুতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, সেটাকে তাঁর নৈতিক জয় হিসাবে গণ্য করবে।

কৃষ্ণনগরের প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ নিয়ে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদীরা অনেক বিষোদ্গার করেছিলেন এবং এখনও করবেন। কিন্তু তাঁর অভিভাষণে তিনি যা বলেছিলেন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা সেই আদর্শের কথাই গোপনে বলাবলি করতেন যদিও প্রকাশ্যে বলতে সাহস করতেন না। অভিভাষণের ভাষা ছিল: 'নন-ভায়োলেন্ট নন-কোঅপারেশনের দ্বারা ইউনিয়ন অটোনমি, ডিস্ট্রিক্ট অটোনমি প্রভিন-সিয়াল অটোনমি এমন কি হয়ত ডোমি-নিয়ন স্টেটাস বা ইকুয়্যাল পার্টনারশিপ উইদিন দি বৃটিশ এম্পায়ার লাভ হতে পারে কিন্তু বাংলা তথা ভারতের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ইহার দ্বারা কিছুতেই অর্জন করা যাইবে না।....বাংলা তথা ভারতের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা টেরোরিজম বা এনার্কিস্ট কনস্পিরেসির দ্বারা কস্মিনকালেও অর্জিত হইবার সম্ভাবনা নাই। সিভিল ডিসওবিডিয়েন্সের লক্ষ্য প্রচলিত শাসন প্রণালীকে সংশোধন করা তাহার অমূল উচ্ছেদ সাধন করা নহে। সুতরাং বাংলা তথা ভারতের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইলে সিভিল ডিসওবিডিয়েন্সের দ্বারাও তাহা অর্জিত হইবে না। বাংলা তথা ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করিবার একটিমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা রহিয়াছে এবং তাহাকে লোকে চলতি ভাষায় রেভোলিউশন বা বিপ্লব বলে।.... আমি বিশ্বাস করি যে, আমার পবাধীন জন্মভূমিকে স্বাধীন করিবার আমার যদি ডিভাইন রাইট থাকে তবে রেভোলিউশনের সাহায্যে তাহা কার্যে পরিণত করিবারও আমার ডিভাইন রাইট রহিয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, রেভোলিউশন বা বিপ্লব হিংসামূলক কেননা ইহাতে রক্তপাত হয়, মানুষে মানুষে মারামারি কাটাকাটি হয়। বাংলার রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতিরূপে আমি আজ সবিনয়ে তাহার প্রতিবাদ

স্বাধীনতার পুণ্যলগ্নে সবাইকে জানাই আমন্ত্রণ।

নিউ গণেশ অপেরা

৩১১, রবীন্দ্র সরণী-কলিকাতা-৬

প্রতিষ্ঠাতা—গোষ্ঠবিহারী ঘোষ স্বত্বাধিকারিণী—গৌরীবালা ঘোষ
সর্বাধিনায়ক—সুকুমার ঘোষ, সুনীল ঘোষ
৮৫'র দুইখানি ভিন্নধর্মী বলিষ্ঠ নাটক
অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত বাস্তবধর্মী

সুর—তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় গীতিকার—উজ্জ্বল বিশ্বাস
হারু রায় রচিত বর্তমান সমাজ দর্পণ

সুর—মনোরঞ্জন পাল
কাহিনী, সম্পাদনা, নির্দেশনা ও শ্রেষ্ঠাংশে

মহানায়ক

ত-প-ন-কু-মা-র

সঙ্গে আছেন—সাধন দাশগুপ্ত, মুকুন্দ মণ্ডল, রঞ্জলাল কর, মাতৃপ্রসাদ ব্যানার্জি, রতন পণ্ডিত, সঞ্জীব ভট্টাচার্য, মহাদেব মায়েক, তপন সরকার, শংকর ঘোষ, সুভাষ ভট্টাচার্য, সুবল দাস, রতন বোস, সুকুমার কুণ্ডু, সুধাংশু মণ্ডল।

ও নাট্যকার হারু রায়

(নারী চরিত্রে)—নবাগতা নায়িকা গীতাঞ্জলি ব্যানার্জি
ও ছবি কর, অঞ্জলি ভট্টাচার্য ও লতিকা পাল।
নৃত্যে—শিবশংকর, মুক্তিপদ সাউ, দীপালি ঘোষাল ও ধীরা পাল
যন্ত্রীসংঘ—পাঁচুগোপাল হালদার, গুরুপ্রসাদ খাঁড়া, গোপাল দাস, সাধন খাঁড়া, গৌরীশংকর করণ, গৌরচন্দ্র ধাড়া, মোহন মণ্ডল ও ভবেন দাস।
(প্রধান কর্মসচিব)—প্রকাশচন্দ্র ঘোষ আলো—শ্রীসুকুমার
(ম্যানেজার)—মণীন্দ্র গোস্বামী (সহঃ ম্যানেজার)—শংকর ঘোষ
(অফিস ইনচার্জ)—অশোক মুখার্জি

পরিচালক— রাজেন মণ্ডল ৫৫-১২৯৫

কোলিঃ তত্ত্বাবধায়ক—অনিল ভাণ্ডারী, ফোন : রাণীগঞ্জ ২৬২৩

করিতেছি। রক্তপাত হইলেই যে তাহা হিংসাপ্রসূত ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে না। রক্তপাত মাত্রই হিংসামূলক নহে। তারপর মানুষে মানুষে মারামারি কাটাকাটি হইলেই যে তাহা হিংসাপ্রসূত তাহাই বা কেমন করিয়া বলি?

কোন পাষণ্ড যদি পথিপার্শ্বে কোন দুর্বল অবলাকে একলা পাইয়া তাহার উপর অত্যাচারের চেষ্টা করে এবং আমি যদি বিনা মারামারি ও কাটাকাটিতে তাহাকে সে কার্য হইতে নিবৃত্ত করিতে না পারি তবে আমার সেই মারামারি ও কাটাকাটিকে কেহ কি হিংসামূলক বলিবেন? হিংসার এইরূপ কদর্যে জগতের সৎ প্রবৃত্তিসমূহের যাবতীয় উৎস অচিরে শুষ্ক ও নীরস হইয়া যাইবে। ভিতরের উদ্দেশ্যকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া আমরা যদি কেবল বাহ্যিক কিয়াকলাপের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহা হইলে পদে পদে আমরা ভ্রমে নিপতিত হইব। আমি একথা শতবার স্বীকার করি যে, হিংসা ভারতের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। কিন্তু সে কারণে রেভোলিউশন বা বিপ্লব হিংসামূলক কে বলিবে? কিম্বা তাহা ভারতের আদর্শবিরুদ্ধ হইবে কেন? রেভোলিউশনের জন্য এ দেশকে প্রস্তুত করিতে হইলে আমাদের যে-নৈতিক, মানসিক ও দৈহিক শক্তির আবশ্যক হইবে তদ্দ্বারা আমরা রেভোলিউশনের পরের সমস্ত সমস্যা সমাধান করিতে পারিব। অন্য সমস্ত পন্থাকে যে-পরিমাণে ধ্বংসমূলক বলা যায় এই পন্থাকে তুলনায় তদপেক্ষা অনেক অর্ধেক পরিমাণে গঠনমূলক বলিয়া স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য। কারণ শর্ট-কাটে পৃথিবীর কোন দেশে রেভোলিউশন কখনও জয়যুক্ত হয় নাই এখানেও বিনা গঠনমূলক কার্যে তাহা হইবে না।

পরবর্তী জীবনে ব্যারিস্টার হিসাবে বীরেন্দ্রনাথ বিনা পারিশ্রমিকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার তিন প্রধান আসামী অনন্ত সিং, লোকনাথ বল ও গণেশ ঘোষকে সমর্থন করে তাঁদের ফাঁসির থেকে বাঁচিয়েছিলেন। এ ছাড়া স্টেটসম্যান-সম্পাদক গুলী-মারা, পেডি হত্যা, বাঘ হত্যা, আরামবাগ রাজনৈতিক ডাকাতি প্রভৃতি মামলায় তিনি বিনা পারিশ্রমিকে আসামীদের সমর্থন করেছিলেন।

সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা যে-আদর্শের প্রচারক বলে দাবি করতেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমল কৃষ্ণনগর অভিভাষণে সেই কথাই বলেছিলেন। কিন্তু সন্ত্রাসবাদের অন্য কর্মপন্থার সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন: কয়েকগত চুরি, ডাকাতি ও নরহত্যার কাজ নৈতিক অবনতির পথ খুলে দেয়। উন্মুক্ত বিপ্লবের পথে যে বীরত্বের প্রকাশ দেখা যায় এই ধরনের গুপ্ত পথের কার্যবীতিতে বারংবার যাঁরা লিপ্ত থাকেন তাঁরা অবশেষে সমাজ-নিরোধীর চরিত্র গ্রহণ করেন। সন্ত্রাসবাদীরা তাঁর এই মন্তব্যে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং ক্ষমা প্রার্থনার দাবি জানান। সরোজিনী নাইডুর বিশেষ অনুরোধে বীরেন্দ্রনাথ সভাপতির অভিভাষণ থেকে তাঁর এই মন্তব্যগুলি বাদ দিয়ে দেন এবং সেই কারণে পংক্তি-গুলি পাঠে বিরত থাকেন।

সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা এতে সন্তুষ্ট হলেন না। তাঁদের দাবি ছিল বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এই সকল মন্তব্য প্রত্যাহারই করবেন না তার জন্য তাঁকে ক্ষমাও চাইতে হবে। আমরা এর আগে দেখেছি অমৃত-বাজার পত্রিকা ও বেঙ্গলী লিখেছিল: যদি কৃষ্ণনগরের মন্তব্যগুলি তিনি প্রত্যাহার করে নেন এবং তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন তাহলে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা তাঁকে বঙ্গীয় কংগ্রেসের সম্পাদকের পদে নির্বাচন সমর্থন করবেন। বীরেন্দ্রনাথ সন্ত্রাস-বাদীদের সন্তুষ্ট করবার জন্য লিখিতভাবে তাঁর কৃষ্ণনগরের সকল মন্তব্য প্রত্যাহার করে নেন এবং তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। জাতীয় ঐক্য স্থাপনের আকাংখায় তিনি নিজের ব্যক্তিগত মর্যাদাকে বলি দিতেও দ্বিধা করেন নি। কিন্তু তবুও সন্ত্রাসবাদীরা তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন এবং তাঁকে সমর্থন করবার প্রতি-শ্রুতি দিয়েও কংগ্রেসের সাধারণ সভায় তাঁর বিরুদ্ধে এবং জমিদার ও অভিজাত শ্রেণীর প্রতিনিধি বিগ ফাইভের সঙ্গে ভোট দিলেন।

এ সবের আসল কারণটি কি এবং তার সঙ্গে ভারত-বিভাগের সম্পর্ক কি সেইটাই এবার বলব। বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির ২৬শে জুন (১৯২৭)-এর সভায় সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দল ও তাঁদের সহ-যোগী নেতারা যখন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নিযুক্ত আরবিট্রেশন বোর্ডের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করলেন এবং নিজেদের ইচ্ছামত কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন করে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ও তাঁর সহকর্মীদের সমূলে বিতাড়িত করলেন তখন দি বেঙ্গলী লিখেছিল: বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ঝগড়া মিটে গেল। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি যেভাবে ঝগড়া মেটাতে চেয়েছিলেন সেভাবে হল না বটে তবুও একটি প্রকাশ্য কেলেংকারির ইতি হল। মিঃ বি এন শাসমল এবং তাঁর সহকর্মীদের বঙ্গীয় কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে। এবং যে সকল কর্মকর্তা কিছু দিন আগে মিঃ [redacted] চন্দ্রের বাড়ির পর্দা মিটিংয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁরাই পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। বঙ্গীয় কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির ই নবরূপায়ণের দুটি প্রত্যক্ষ ফল আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—শাসমল-পন্থীরা কংগ্রেসের কার্যক্রম থেকে দূরে সরে দাঁড়াবেন এবং যে-সামান্য কয়েকজন মুসলমান কংগ্রেসের সঙ্গে এখনও জড়িত আছেন তাঁরা এবার কংগ্রেস ছেড়ে চলে যাবেন। মিঃ আক্রম খাঁ যে কারণে কংগ্রেস ছেড়ে দেবেন বলে বলেছেন তার সমর্থন না করলেও ঘটনা হিসাবে এটা থেকে যাবে যে, বঙ্গীয় কংগ্রেসের বর্তমান কার্যনির্বাহক সমিতি বাংলার মুসলমানদের কাছে টেনে আনার পরিবর্তে দূরে সরিয়ে দেবে অনেক বেশি।' (২৮।৬।২৭—ইংরেজীর অনুবাদ)।

স্টেটসম্যান লিখেছিল: যেমনটি [redacted] করা গিয়েছিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক ও সাধারণ কমিটির নির্বাচনে বিগ ফাইভের দল নিজেদের ইচ্ছামত চালনা করেছে এবং নিজেদের বাছাই করা লোক দিয়ে উচ্চপদগুলি পূরণ করতে পেরেছে। প্রসঙ্গত, আরবিট্রেটরেরা যে-কমিটি নিয়োগের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তার প্রতি এঁরা কোন মর্যাদাই দেন নি। আর-বিট্রেটরেরা যে সভ্যতালিকা পেশ করেছিলেন সেটি শাসমলপন্থীদের দ্বারা সমর্থিত হয়েছিল কিন্তু ভোটগ্রহণের সময়ে এই তালিকা পরাজিত হয়। তবুও যেন মনে হয় আরবিট্রেটরা তাঁদের উদ্দেশ্যে সফল হয়েছেন। তাঁরা পুরনো কমিটি দুটিকে বাতিল করে দিয়েছেন। এঁদের প্রয়োজনীয়তা সেইখানেই শেষ হয়েছিল কারণ কংগ্রেসের বৃহত্তর দলটি যখন দেখতে পেল যে তারা নিজেদের লোককেই নির্বাচিত করতে সক্ষম তখন এঁদের নিকট থেকে কোন উপদেশ গ্রহণ করতে তারা [redacted] ইচ্ছুক ছিল না। কংগ্রেসের দিক [redacted] দুর্ভাগ্য হচ্ছে এইটাই যে, যে পদ্ধতি নির্বাচনগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছে তাতে এ কর্মী-দলে একটি ব্যাপকতর এবং গভীরতর ভাঙন এবং এর সমর্থক দল থেকে মুসলমানদের কার্যকরী অপসরণ সুনিশ্চিত হল (২৮।৬।২৭—ইংরেজির অনুবাদ)

মুসলমান সমাজের বিশিষ্ট মুখপত্র দি মুসলমান লিখেছিল: বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি পুনর্গঠিত হয়েছে এবং বাংলায় কংগ্রেসের দ্বন্দ্বমুখর অবস্থার ইতি হয়েছে। কোন আপস

ফটোগ্রাফী এবং স্ক্রীনপ্রিন্টিং

আপনার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য ঐ দুটি বিষয়ের কারিগরী বিদ্যা আয়ত্ত করুন। আমাদের এই কোর্স উন্নত ধরণের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার সাহায্যে স্বল্প বিনিয়োগে বেশী লাভ করার পথে আপনাকে পরিচালিত করবে। অতি অল্প খরচে হিন্দী, ইংরাজী অথবা তামিল ভাষায় করেসপণ্ডেন্স কোর্সে শিক্ষালাভ করতে পারেন। প্রসপেক্টাসের জন্য লিখুন:

Kalaimathi Nilayam (AM) Nanjaithalaiyur-639204 Tamil Nadu

মীমাংসা সম্ভব হয় নি এবং -আরবিট্রেশন ও তার আনুসঙ্গিকের মোট ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, একটি চিন্তাধারার কর্মীরা সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত হয়েছেন এবং সেই চিন্তাধারার কর্মীরা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটির সম্পূর্ণ দখল পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে মুসলমান-বিরোধী ও জাতীয়তাবাদ-বিরোধীদের প্রাধান্য রয়েছে।

খবর বেরিয়েছে যে মৌলানা মহম্মদ আকরম খাঁ, যিনি এই রবিবার কার্য-নির্বাহক সমিতিতে নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি পদত্যাগ করেছেন এই কারণে যে কার্য-নির্বাহক সমিতিতে হিন্দু মহাসভাপন্থীদের প্রাধান্য বেশি। এটা লক্ষ্য করে প্রচুর আনন্দ হচ্ছে যে, তিনি অবশেষে এতদিন পরে উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, বাংলার কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে এর কার্য-নির্বাহক সমিতিতে কোন সত্যকার জাতীয়তাবাদীর স্থান নেই। (২৮।৬।২৭—ইংরেজির অনুবাদ)

সেই স্বদেশী যুগ থেকেই মুসলমানরা স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে দূরে সরে ছিল কারণ, তিলক, অরবিন্দ, বিপিন পাল স্বদেশী আন্দোলনকে উজ্জীবিত করবার জন্য হিন্দু ধর্মদর্শনের বহু আদর্শকে এর মধ্যে উপ্ত করেছিলেন। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন নিঃসন্দেহে মুসলমান-বিরোধী ছিল এবং সেই কারণে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বার বার লিখে গেছেন যে, মুসলমানরা এই আন্দোলনে যোগ দেয় নি বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতারা হিন্দু-মুসলমানের বাহ্যিক মিলনটাই বড় করে দেখেছিলেন কিন্তু বঙ্গ বিভাগ হলে পূর্ব বাংলায় মুসলমানরা যে আত্মবিকাশ ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার একটা প্রশস্ত সুযোগ পেত সে প্রশ্নটি তাঁরা বিচার করলেন না। সন্ত্রাস-বাদী বিপ্লবীরা তখন থেকেই তাঁদের মুসলমান-বিরোধী চরিত্র পোষণ করে এসেছেন।

১৯২১-এ যখন কংগ্রেসের গান্ধী-যুগ শুরু হল এবং গান্ধীজী স্বরাজ আন্দোলন শুরু করলেন তখন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা এর মধ্যে মিশে গেলেন এবং চিত্তরঞ্জনের সহায়তায় বাংলায় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটি দখল করে বসলেন। ফল এই হয়েছিল যে, মুসলমানরা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গেলেন। ১৯২৭-এর এপ্রিলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর মাত্র অধিবেশনে সভাপতি উত্তরবঙ্গের জননায়ক যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী সভাপতির অভিভাষণে বলে-ছিলেন : অতীব দুঃখের সঙ্গে আমাকে আজ উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, দেশবাসীর গত চল্লিশ বছরের ঐকান্তিক সাধনায় যে জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল মুসলমানরা তার সম্মিলিতভাবে তা ত্যাগ করে চলে গেছেন। জনসাধারণের বিভিন্ন গোষ্ঠী স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে যদি লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য পৃথক পৃথক পন্থা গ্রহণ করে তাহলে আমাদের অভিযোগ করবার কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু যদি মুসলমানরা শুধু মুসলমানদের স্বাধীনতার জন্যই ভাবিত হন এবং যদি হিন্দুরাও সেইভাবে এক হিন্দু স্বরাজের জন্য প্রচেষ্টা চালান তাহলে এই পারস্পরিক সন্দেহ দূরীকরণের জন্য অভিযান চালাবার জরুরী প্রয়োজনীয়তা আছে। মুসলমানরা সদলবলে কংগ্রেস পরিত্যাগ করে চলে যাওয়ায় কংগ্রেস মনোনয়নে মাত্র একজন মুসলমান বেঙ্গল কাউন্সিলে নির্বাচিত হতে পেরেছিলেন। শুধু কংগ্রেসপ্রার্থী ছিলেন বলেই বহু খ্যাতনামা মুসলমান প্রার্থী সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলেন। (১৭।৪।২৭ বেঙ্গলীতে ইংরেজি রিপোর্টের অনুবাদ)

এই নিরতিশয় বিপজ্জনক অবস্থার দূরীকরণের জন্য এবং বাংলায় এক সত্যকার গণতান্ত্রিক স্বরাজ প্রতিষ্ঠার কল্পনা নিয়ে চিত্তরঞ্জন ১৯২৩ সালে হিন্দু-মুসলিম চুক্তি বা বেঙ্গল প্যাক্ট সম্পাদনা করে-ছিলেন। হিন্দু-মুসলিম চুক্তির সমর্থনে চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন : যাঁরা এই হিন্দু-মুসলিম চুক্তির বিরোধিতা করছেন তাঁরা বিদেশী সরকারের চর হয়ে কাজ করছেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দল ভারতের জাতীয় ইতিহাসে চিত্তরঞ্জনের এই বৃহত্তম অবদানটিকে ধ্বংস করবার জন্য উঠে-পড়ে লাগলেন এবং তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন চিত্তরঞ্জনের প্রিয় পঞ্চ শিষ্য—বিগ ফাইভ : বিধান রায়, শরৎ বসু, তুলসী গোস্বামী, নির্মল চন্দ্র ও নলিনী সরকার। কৃষ্ণনগর বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে

বিভাগীয় মন্ত্রী কর্তৃক প্রশংসিত

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩

(নির্বাচন নিয়মাবলীর মূল অংশসহ)—ডঃ অসিতকুমার বসু ১০.০০

অক্লান্তা অপরূপা (রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত)—নারায়ণ সান্যাল ১৬.০০

বঙ্কিম অভিধান—ডঃ অশোক কুণ্ডু ১ম খণ্ড ২০.০০

ঐ ঐ ২য় খণ্ড ১৫.০০

শিশু-সাহিত্য সংগ্রহ— ঐ (১ম) ২০.০০

শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি—ডঃ দেবরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ১২.০০

কাব্যমঞ্জুষা (সটীক ও পূর্ণাঙ্গ)—মোহিতলাল মজুমদার ২৫.০০

রবীন্দ্র সাহিত্যের নবরাগ —সুখময় মুখোপাধ্যায় ১৫.০০

ময়মনসিংহ গীতিকা (সটীক ও পূর্ণাঙ্গ) — ঐ ২৫.০০

লোকসাহিত্যে ঈশপ —ডঃ সুধীর করণ ৮.০০

বঙ্গের রত্নমালা —কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ১০.০০

সংস্কৃতির ধর্ম —দক্ষিণারঞ্জন বসু ১০.০০

রবীন্দ্রনাথ (কবি ও দার্শনিক) —ডঃ মনোরঞ্জন জানা ২৫.০০

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস (সাহিত্য ও সমাজ) — ঐ ২০.০০

বিদ্যাপতি সমীক্ষা —ডঃ নিরঞ্জন চক্রবর্তী ১০.০০

শ্রীরূপ ও পদাবলী সাহিত্য —ডঃ শুকদেব সিংহ ২০.০০

বঙ্গীয় কুলশাস্ত্র —ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ১০.০০

চৈতন্যোত্তর প্রথম চারিটি সহজিয়া পুঁথি— পরিতোষ দাস ১০.০০

পাগল হরনাথ —ডঃ কার্তিকচন্দ্র রায় ১৬.০০

রাজা রামমোহন —ঋষি দাশ ১২.০০

সাগরবেদে (সাগরবাসীদের কথা)—বিশ্ববন্ধু সান্যাল ৬.০০

সমষ্টি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ —গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী ১০.০০

সচিত্র যোগব্যায়াম ও খালিহাতে ব্যায়াম— সবিতা মল্লিক ১২.৫০

মানবসমাজ (রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন)—সুবোধ চৌধুরী অনূদিত ১২.০০

আমি, আপনি, কলকাতা—শিবপ্রসাদ সমাদ্দার (যন্ত্রস্থ) ২৫.০০

বিঃ দ্রঃ :—এক চতুর্থাংশ অগ্রিম ছাড়া ভি পি-তে বই পাঠান হয় না।
অন্ততঃ পনর টাকা পুস্তকের পূর্ণ মূল্য অগ্রিম পাঠালে আমরা ডাক ব্যয় বহন করি, এবং রেজিঃ ডাকে বই পাঠাই।

ভারতী বুক ষ্টল

প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা

৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

ফোন নং—৩৪-৫১৭৮ : পোস্ট বক্স নং —১০৮৩১

সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা সম্মিলিতভাবে সেই চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সম্মেলন হঠাৎ ভেঙে যাওয়ায় তাঁরা সেটা সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে পারলেন না। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ১৩ই জুন ১৯২৬-এর সাধারণ সভায় শরৎচন্দ্র বসু প্রস্তাব করলেন: 'হিন্দু-মুসলিম চুক্তি আজ আর দেশবাসীর বিবেচ্য বিষয় নয়। (অর্থাৎ প্রকারান্তরে বলতে চাইলেন যে চুক্তিটি বাতিল হয়ে গেছে) কিন্তু তিনি সফল হলেন না।

সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা ও তাঁদের সহযোগী নেতারা অচিরেই বুঝতে পারলেন যে বাংলার হিন্দু-মুসলিম চুক্তির প্রধান শক্তিস্তম্ভ হয়েছেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এবং দেখতে পেলেন বাংলার প্রায় সমগ্র মুসলমান সমাজ তাঁর পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। সেই জন্য সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা ও তাঁদের সহযোগী নেতারা ঠিক করলেন যে বীরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক জীবনটি চিরদিনের জন্য ধ্বংস করে দিতে হবে যাতে তিনি আর কোনোদিন মুসলমানের হয়ে ওকালতি করতে না পারেন।

এই সত্যটি গোপন থাকলো না, প্রায় সারা ভারতেই ছড়িয়ে পড়লো।

সুদূর লাহোরের সিভিল এণ্ড মিলিটারি গেজেট লিখল: 'কংগ্রেসের প্রাদেশিক কমিটিগুলির পক্ষে আভ্যন্তরীণ কলহে বিদীর্ণ হওয়া একটা স্বাভাবিক

কোম্পানীর শেয়ারে আপনি কি কিছু টাকা খাটাচ্ছেন ?

তাহলে আপনি কর মুক্ত লাভাংশপুরো পেতে পারেন

আপনি যদি কোনও "কোম্পানী" না হন এবং ডিভিডেণ্ট সমেত আপনার মোট আয় আয়করের ন্যূনতম সীমার কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে (অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষ, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার, ফার্ম সমিতি, সংস্থা ও "আর্টিফিশিয়াল, জুরিডিক্যাল" ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যে সীমা বর্তমানে দশ হাজার টাকা), তাহলে কোম্পানীর ঘোষিত লভ্যাংশের অংশ আপনি করমুক্ত হিসাবে পাবেন।

কেমন করে ?

আপনার আয়করের আধিকারিকের কাছে ১৪নং ফর্মে এই আবেদন জানান যে, যে কোম্পানীতে আপনার শেয়ার আছে সেই কোম্পানীকে কর না কেটে আপনার লাভ্যাংশ আপনাকে দিতে বলা হক।

অথবা

কোনও কোম্পানী থেকে প্রাপ্য লাভ্যাংশ যদি আড়াইশ টাকার কম হয় তাহলে অনুরূপ প্রত্যেকটি কোম্পানীকে, ১৪-বি ফর্ম ভরে, আর দু কপি পাঠান।

এই সুবিধার সুযোগ নিন এবং আয়কর আধিকারিকের কাছ থেকে পাওনা ফেরৎ চাওয়ার ঝঞ্ঝাট এড়ান।

ডিরেকটোরেট অফ ইন্সপেকশান
(রিসার্চ স্ট্যাটিসটিকস অ্যাণ্ড পাবলিকেশান্স)
ইনকাম্‌ট্যাক্স ডিপার্টমেণ্ট
নতুন দিল্লী-১১০০০১

ডিএভিপি ৭৮।১৫৮

ব্যবস্থায় দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। গত বছর পাঞ্জাব কমিটিতে এই ধরণের একটা সংঘাত বেধেছিল এবং বঙ্গীয় কমিটি এখন তার চেয়েও সঙ্গীন অবস্থায় পড়েছে। পরস্পর বিরোধী গোষ্ঠীগুলি হয় কমিটির অফিস বাড়ি গায়ের জোরে দখল করার কাজে বা অপর পক্ষকে তালা বন্ধ করে বাইরে আটকে দেবার কাজে বেশি সময় ব্যয় করে বলে দেখা যাচ্ছে। বিরোধের সমস্ত সূত্র অনুসরণ করা কঠিন এই জন্য যে দুই গোষ্ঠী সংবাদপত্রে পরস্পর বিরোধী বিবৃতি প্রচার করেছেন। কিন্তু একটি বিষয় পরিষ্কার যে, বাংলায় স্বরাজী দলের প্রধান ব্যক্তিরা যে কোনো উপায়ে মিঃ বি এন শাসমলকে বিতাড়িত করতে বদ্ধপরিকর। গত কয়েক মাস ধরেই বিবাদটা চলছিল এবং তার ফলে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিতে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দফতরও দুই প্রতিদ্বন্দ্বী কার্যনির্বাহক সমিতির সৃষ্টি হয়েছিল। মিঃ শাসমলের অমার্জনীয় অপরাধ হচ্ছে এবং তাঁর সমাজচ্যুতির প্রধান কারণটি হচ্ছে গত প্রাদেশিক সম্মিলনীতে তাঁর সভাপতির অভিভাষণ নিয়ে চরমপন্থী মতবাদের সমালোচনা করবার দুঃসাহস তিনি দেখিয়েছিলেন। একথা সত্য যে তিনি পরে সেই আপত্তিজনক পংক্তিগুলি প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন এবং মোটামুটি নির্দোষ আভরণে ভূষিত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু এই দুঃখ প্রকাশ স্পষ্টতঃ তাঁর অপরাধ মোচনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না এবং তাঁর ও তাঁর সমর্থকদের বিরুদ্ধে আক্রোশ অর্থবর্দ্ধক উদ্যমের সঙ্গে পোষণ করা হচ্ছে।' (স্টেটসম্যান ; ৮ মার্চ ১৯২৭ থেকে উদ্ধৃত— ইংরেজির অনুবাদ)

বোম্বাইয়ের ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল হেরাল্ড লিখলেন : 'কংগ্রেসের ভবিষ্যত কোন পথে যাবে সে সম্বন্ধে বঙ্গদেশ শীঘ্রই সমগ্র দেশকে এক সুনিশ্চিত নেতৃত্বদানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। কিছুদিন থেকে এটা ক্রমাগত পরিস্ফুট হয়েছে যে নেতৃত্বদান বিষয়ে কংগ্রেস দুর্বল। কংগ্রেসের বর্তমান কার্যনির্বাহক সমিতি নির্দ্দেশের স্বৈরাচারমূলক নীতি এবং দুষ্টবুদ্ধিপ্রসূত কারচুপির দ্বারা সাধারণ কর্মী দলের সমর্থন হারিয়েছে এবং তাদের আস্থা থেকে বিচ্যুত হয়েছে। কিন্তু এসব কথার বিশেষ কোনো মূল্য নেই। এমনকি বহুদিন আগে মিঃ সি আর দাশের সময়তেই বাংলায় যুব সমাজের মধ্যে একটা গুমরিত অসন্তোষ ছিল। শুধুমাত্র মিঃ দাশের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বই তাদের লম্ফমান উচ্চাশাকে দাবিয়ে রাখতে এবং তাদের অসন্তোষকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে বাধা দিতে সক্ষম হয়েছিল। মিঃ সেনগুপ্ত মিঃ দাশের উত্তরাধিকারীর সুকঠিন চাপ্তর পালনে যথোচিত প্রচেষ্টা করছেন এবং তিনি যে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতিত্ব চতুরতার সংগে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তাতেই বোঝা যায় যে, তিনি আসন্ন ঝড়ের কথা জানতেন। মিঃ শাসমল ছিলেন একটি সমস্যা বিশেষ, একদিন তাঁকে সাহায্যকারী মনে হোতো পরের দিন মনে হোতো বাধা স্বরূপ। সাধারণ ধারণাটি হচ্ছে এই যে, কর্মীদের ভাবধারার সংগে এক মত না হয়ে এবং তাদের দুঃখ বিপত্তির সম্যক মূল্য না দিয়ে কার্যনির্বাহক সমিতি কর্মীদের সমস্ত ত্যাগ স্বীকারকে শুধুমাত্র নিজেদের কাজে লাগিয়েছে।' (স্টেটসম্যান ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯২৭ থেকে উদ্ধৃত ইংরেজির অনুবাদ)

১৯২৭-এর ২৩ জানুয়ারীর এক সমীক্ষায় স্টেটসম্যান পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা লিখেছিলেন যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সদস্যদের মধ্যে এবং কার্যনির্বাহক সমিতিতেও ভূতপূর্ব রাজবন্দী অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সংখ্যা এত নগণ্য ছিল যে দলগতভাবে তাঁদের একার পক্ষে কোনো কার্যক্রম সফল করার সম্ভাবনা ছিল না। কাজেই তাঁরা যোগ দিলেন 'বিগ ফাইভের' দলের সঙ্গে যাতে বাংলায় কংগ্রেস কর্মীদের একক বৃহত্তম ও সুসংগঠিত দল অর্থাৎ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের দলটিকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত করা যায়।

নিখিল ভারত কংগ্রেসের নেতারা বিশেষ করে মতিলাল নেহরু ও শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সাহায্যপুষ্ট 'বিগ ফাইভের' দলকেই পেছন থেকে কলকাঠি নেড়ে সমর্থন করতে লাগলেন। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের কেন্দ্রীয় সংস্থা কংগ্রেস কর্মী সংঘ প্রস্তাব নিয়েছিল যে ১৯২৬-এর সাধারণ নির্বাচনে যে সকল প্রার্থী চিত্তরঞ্জনের হিন্দু-মুস্লিম চুক্তিতে সমর্থন করবেন কর্মী সংঘ নির্বাচনে তাদের বিরুদ্ধে লড়বেন। তাঁদের দাবিতে যখন মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের সরকারী চেয়ারম্যান ও লর্ড লিটনের বিভিন্ন দমনমূলক নীতির প্রকাশ্য সমর্থনকারী দেবেন্দ্রলাল খাঁকে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হোলো তখন মতিলাল নেহরুও এই জমিদারের পক্ষে চলে গেলেন।

১৯২৭-এ কর্পোরেশন নির্বাচনের মুখে কংগ্রেসের সম্পাদক হিসাবে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল যখন নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের কথা ঘোষণা করলেন তৎক্ষণাৎ দিল্লীতে মতিলাল নেহরুর পরামর্শ জরুরী ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ডেকে অগণতান্ত্রিকভাবে এক নতুন ইলেকশন বোর্ড গঠন করে দেওয়া হোলো যার সম্পাদক হলেন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের কর্মী সংঘের সম্পাদক সুরেশচন্দ্র দাশ। ১৯২৬-এর জুলাই মাসে বগুড়ায় এক প্রকাশ্য জনসভায় সরোজিনী নাইডু বলেছিলেন : 'কংগ্রেস কর্মী সংঘের সভ্যদের মধ্যে শতকরা পঞ্চাশজন পুলিশের গুপ্তচর।' তিনিও মতিলালের সংগে মিলে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সাহায্যে এগিয়ে এলেন।'

২৭-এর জুন মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিরও ওয়ার্কিং কমিটির দ্যার্থহীন নিষ্ক্রিয় অসহযোগ বোর্ড ভেঙ্গে বঙ্গীয় কংগ্রেসের স্বরূপ মীমাংসার নির্দেশ দিলেন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দলও তাঁদের সহযোগী

নেতারা তা মানলেন না এবং না মেনে নিখিল ভারত কংগ্রেসের বিরুদ্ধেই গেলেন। সেই বিধিবহির্ভূত কাজের দায়ভাই তাঁরা বঙ্গীয় কংগ্রেসের একক বৃহত্তম দলটিকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কারের ব্যবস্থা করলেন। নিখিল ভারত কংগ্রেসের নেতারা—মতিলাল নেহরু, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এমন কি গান্ধীজীও নীরবতার মাধ্যমে এতে তাঁদের সম্মতি জানালেন।

একটি অত্যন্ত সংখ্যালঘুদলকে অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দলটিকে অগণতান্ত্রিক উপায়ে বাংলায় কংগ্রেসের সর্বময় কর্তা করে দিলেন দিল্লীতে কংগ্রেসের উর্ধতন কর্তৃপক্ষ। কারণ তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে বাংলার সমগ্র মুসলমান সমাজ যেমন বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের পেছনে দাঁড়িয়েছে তেমন প্রায় সমস্ত শিক্ষিত হিন্দু সমাজ দাঁড়িয়েছে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের পিছনে এবং তার কারণটি হচ্ছে যে তাঁরা চিত্তরঞ্জনের হিন্দু- মুসলিম চুক্তির বিরোধী ছিলেন।

এ সম্বন্ধে অমৃতবাজার পত্রিকা পরিষ্কার করেই লিখেছিল: 'ভারতের প্রত্যেকটি লোক জানে এই চুক্তির দ্বারা যত বিরাট ক্ষতিসাধন করা হয়েছে, মুসলমানেরা আগে কখনও অসহযোগের সামনে বাজনা বাজালে আপত্তি করতো না। এই চুক্তিতেই এই প্রশ্ন প্রথম তোলা হোলো এবং একে গুরুত্ব দেওয়া হোলো। হিন্দু সমাজের একটি প্রভাবশালী অংশ তাঁদের এই অধিকার দিতে প্রস্তুত হওয়ায় তারা তৎক্ষণাৎ এটিকে তাদের একান্ত অধিকার হিসাবে গ্রহণ করেছে। ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে প্রতিনিধিত্ব ও সরকারী চাকরীতে নিয়োগের প্রশ্নেও একই ব্যাপার। কিন্তু এর দ্বারা দেশে মুসলিম রাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। এই চুক্তির সাহায্যে কয়েকটি মুসলমান ভোট অবশ্য যোগাড় করা হয়েছিল এবং ডায়ার্কিকে কার্যকর করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে কি স্বরাজ আমাদের এতটুকু নিকটতর হয়েছে?' (৫।১১।২৬ ইংরেজির অনুবাদ) বাংলার প্রায় সমস্ত হিন্দু সংবাদপত্র দাবি তুলেছিলেন যে চুক্তিটিকে বাতিল করা হোক।

হিন্দু-মুসলিম চুক্তির একটি প্রধান শর্ত ছিল ব্যবস্থাপক সভায় সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ও সরকারী চাকরীতে সংখ্যানুপাতিক হারে নিয়োগ অর্থাৎ শতকরা ৫৫ ভাগ—এইটাই বাংলার শিক্ষিত হিন্দু সমাজকে চঞ্চল করে তুলেছিল সবচেয়ে বেশি। 'মোচলমানে' সব চাকরী নিয়ে নেবে দেশে মোচলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত এই আতঙ্কে শিক্ষিত হিন্দু সমাজ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। শিক্ষিত হিন্দু সমাজের এই ভয়টি আপনোদনের জন্য লড়াইতে নামলেন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদল। দিল্লীতে কংগ্রেসের উর্ধতন কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে মতিলাল নেহরু এঁদের আশীর্বাদ জানালেন।

আমাকে নিশ্চয়ই বলা হবে শিক্ষিত হিন্দু সমাজের স্বার্থ উপেক্ষা করে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল যে মুসলমান সমাজকে সমর্থন করে তাদের সামাজিক দাবি ক্রমাগত বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন এতে তিনি দেশের অমঙ্গলই করেছেন। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ শাসমল কপটতা বা ভণ্ডামি জানতেন না। কংগ্রেসের বহু বিঘোষিত মূলনীতি ছিল হিন্দু মুসলমান ঐক্য এবং বাংলায় সংখ্যাগুরু মুসলমানদের গণতান্ত্রিক অধিকারে তাদের সরকারী চাকরী এবং কাউন্সিলে প্রতিনিধিত্বের যতটুকু ন্যায্য দাবি ছিল সেটুকু মেনে নিতে আদর্শগত দিক থেকে আমরা বাধ্য ছিলাম। ইংরেজরা যখন এদেশ অধিকার করে তখন হিন্দুরা ইংরেজি শিক্ষায় পারদর্শিতা লাভ করে সভ্যজীবনের পথে অনেক দূর এগিয়ে যান কিন্তু মুসলমানেরা ইংরেজি শিক্ষায় বিরোধিতা করে অনেক পিছনে পড়ে থাকে। উভয়ের মধ্যে সামাজিক মিলনের প্রধান বাধাটি ছিল এইখানে। কাজেই তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে পুষ্ট না করতে পারলে বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের মিলনের পথ চিরদিনের জন্য দুর্ভাগ্যময়। তাদের সেই গণতান্ত্রিক অধিকারকে পুষ্ট করবার প্রধান পথ ছিল কাউন্সিলে তাদের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারী চাকরীতে তাদের নিয়োগ সংখ্যানুপাতিক ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করে দেওয়া। কংগ্রেসের বিঘোষিত নীতি ও তাই ছিল। কিন্তু নিষ্পাদিত নীতি হবে এক আর কাজের বেলা হবে অন্য কথা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের এই কপটতা বীরেন্দ্রনাথ কোনোদিন সহ্য করতে পারেননি। অবশ্য যাঁর জীবন দিয়ে তাঁকে এর মাশুল দিতে হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তাঁর স্মৃতি শোকপ্রকাশ তাঁকে জাতীয় নেতার সম্মান দিয়েছিল এবং তখনকার কংগ্রেস সভাপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেছিলেন: 'তিনি বেঁচে থাকলে কংগ্রেসের শক্তি স্তম্ভ হতেন।' কিন্তু তাঁর জীবিতকালে চক্রান্ত করে কংগ্রেস তাঁর রাজনৈতিক জীবনটি ধ্বংস করে দিয়েছিল। অবশ্য বাংলার কোনো কংগ্রেস নেতা তাঁর জন্য এক লাইন শোক প্রকাশ করেননি এবং কেউ তাঁর শবযাত্রায় যোগ দেননি।

এখানে আর একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করা দরকার। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের আর একটি প্রচণ্ড মিথ্যা অভিযোগ ছিল যে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে শত্রুতা করেছিলেন। কর্মী সংঘের নেতা ও সুভাষচন্দ্রের এক সময়ের দক্ষিণ হস্ত উপেন ব্যানার্জি ১৯২৬-এ মেদিনীপুরের নির্বাচনে প্রকাশ্যে মিথ্যা অভিযোগ করেছিলেন যে বীরেন্দ্রনাথই সুভাষচন্দ্রকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। কংগ্রেস কর্মী সংঘের ছাপানো ইস্তাহারেও এই ধরণের ইঙ্গিত ছিল। এই ইস্তাহারটি সুধাকর্ষ বাগচীর লেখা 'দেশবন্ধু স্মৃতি' বইতে পাওয়া যাবে। কিন্তু সত্য কথা হচ্ছে ১১ ফেব্রুয়ারী ১৯২৭-এর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সভায় যখন তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের আলোচনা হচ্ছিল তখন তিনি প্রকাশ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে সুভাষচন্দ্র বন্দীজীবন থেকে মুক্তি পেলেই তিনি সুভাষচন্দ্রের হাতে কংগ্রেসের ভার তুলে দিয়ে সরে দাঁড়াবেন। ২৬ জুনের কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সভাতেও তাঁর বিশিষ্ট সহকর্মী নরেশচন্দ্র সেন তাঁর পক্ষ থেকে প্রস্তাব করেছিলেন যে সুভাষচন্দ্রকেই প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক করা হোক কারণ তখন তিনি বন্দীজীবন থেকে মুক্তি পেয়েছেন। কিরণশংকর রায় এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে প্রস্তাবটি নাকচ করে দেন এই অজুহাতে যে সুভাষচন্দ্র তখন আর কংগ্রেসের সদস্য নন।

কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা ১৯১৩ সালের ২০ অক্টোবর বীরেন্দ্রনাথ স্বয়ং প্রস্তাব করেছিলেন নির্বাসিত জননায়ক প্রাণস্বরূপ চন্দ্র বসুকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত করা হোক। বঙ্গীয় কংগ্রেসের কোন্দল মেটাবার জন্য ১৯৩৭-এ যখন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি মাধব শ্রীহরি আনেকে সালিশিকার বা আরবিট্রেটর নিযুক্ত করে বাংলায় পাঠাল তখন শ্রীযুক্ত আনে বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনের জন্য একটি কমিটি তৈরি করে দেন এবং তাতে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল কংগ্রেস ছেড়ে চলে যাওয়া সত্ত্বেও শ্রীআনে তাঁকে সেই কমিটির সভ্য করে-ছিলেন। সেই কমিটির সভায় বীরেন্দ্রনাথই ঐ প্রস্তাবটি করেছিলেন। তখন অবশ্য সুভাষচন্দ্রের পুরাতন সহকর্মী এবং সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের পুরাতন মুরুব্বি ডাঃ বিধান রায় নিজেই সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়ে দাঁড়ান এবং তিনি সুভাষচন্দ্রকে পরাজিত করে বঙ্গীয়

কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। বিধান রায় পেয়েছিলেন ১১৭, ভোট ও সুভাষচন্দ্র ৮৬ ভোট। নির্বাসিত সুভাষচন্দ্রের প্রতি সামান্য সৌজন্যবোধটুকুও বিধান রায় সেদিন বিসর্জন দিয়েছিলেন।

বীরেন্দ্রনাথ যে বঙ্গীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদে সুভাষচন্দ্রের নাম প্রস্তাব করেছিলেন তার একটা গূঢ় কারণ ছিল। সুভাষচন্দ্রের মহত্ত্ব গুণটি ছিল যে তিনি কপটতা জানতেন না। ১৯৩৪-এই বীরেন্দ্রনাথ গান্ধীজীকে বলেছিলেন: 'আপনি দু নৌকায় পা দিয়ে চলেন সেই কারণে আজ থেকে বিশ বছরের মধ্যে এদেশ থেকে গান্ধীবাদ লুপ্ত হয়ে যাবে। এবং তার জন্য আপনি নিজেই দায়ী?

কিন্তু সুভাষচন্দ্র কখনও দুনৌকায় পা দিয়ে চলেননি। ১৯২৪-এর এপ্রিল মাসে কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ এক্জিকিউটিভ অফিসার নিযুক্ত হওয়ার পরই তাঁর প্রথম বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন: ইয়োরোপের বর্তমান ফ্যাসিজম ভারতের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে তাঁর প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র ডাঃ শিশিরকুমার বসু লিখেছেন: 'সুভাষচন্দ্র দেশ গঠনের প্রয়োজনে রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বের আদর্শকে সমর্থন করতেন।.. তিনি বলেছিলেন ইংলন্ডের রাজকীয় গণতন্ত্র কখনোরেই গ্রহণযোগ্য নয়। মিলিটারী বা মিলিটারীর সাহায্য অনুশাসনের স্বৈরাচারীতার কথাও তিনি বলেছিলেন।' (দক্ষিণীবার্তা, নেতাজী জয়ন্তী সংকলন ১৯৭৬, ৯৩ পৃঃ) এই কারণেই ১৯৩৭-৩৮এ নাৎসী জার্মানী যখন ইহুদি নিধন যজ্ঞে লক্ষ লক্ষ নিরীহ ইহুদিকে হত্যা করতে শুরু করে তখনও সুভাষচন্দ্র নাৎসী জার্মাণীর নিন্দা করতে রাজী হননি। সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের গভীর পার্থক্য ছিল।

তবু তিনি বুঝেছিলেন গান্ধীবাদী নেতাদের গভীর কপটতার জন্য এদেশে গান্ধীবাদ জন্মাবার আগেই মরে গেছে। নিজের জীবনের সর্বস্ব বিসর্জন দিয়েও তিনি গান্ধীবাদী নেতাদের কপটতা থেকে মুক্ত করতে পারেননি। সেই কারণে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিয়ে রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বের আদর্শকে সফল করে তুললে সেটা কপটতার চেয়ে ভাল হবে তিনি মনে করতেন।

বীরেন্দ্রনাথকে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের নির্বাহক সমিতি থেকে সরিয়ে দিয়ে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা বোধহয় ভেবেছিলেন যে দেশে এবার বিপ্লববাদের প্রসার হবে এবং সেই বিপ্লববাদের প্রথম পদক্ষেপ ছিল পল্লী বাংলার শ্রেষ্ঠ কর্মী বীরেন্দ্রনাথকে কংগ্রেস থেকে সরিয়ে দেওয়া। দ্বিতীয় পদক্ষেপ ছিল তিনি যে কৃষক গ্রামবাসীদের নিয়ে বিরাট কর্মী সংগঠন সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন তার পথ রুদ্ধ করে দেওয়া, তৃতীয় পদক্ষেপ ছিল যে হিন্দু-মুসলিম চুক্তির সমর্থনে তিনি কঠিন সংগ্রাম করেছিলেন সেটিকে বরবাদ করা। এই তিনটি

বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি পরীক্ষা

অবশ্যই একটা লাভ করুন পুরস্কার

প্রবেশমূল্য নেই আপনি অবশ্যই একটি পুরস্কার জিতুন

প্রায় এক হাজার পুরস্কার দেওয়া হবে

উদাহরণ

মোট ৩০

৭	১২	১১
১৪	১০	৬
৯	৮	১৩

	১৪	
	১২	
	১০	

(১) রাজদূত মোটর সাইকেল নতুন মডেল বা টেলিভিশন। দ্বিতীয় পুরস্কার (২) ওয়ার্ল্ড সাউন্ড মার্শাল ট্রানজিস্টার গ্যারান্টেড হাই মিডিয়াম ওয়েভ দাম ২৬০ টাকা। তৃতীয় পুরস্কার (৩) সর্বভারতীয় হেভি ডিউটি ট্রানজিস্টার দাম ১৮৫ টাকা। পুরস্কারগুলি অর্ধেক দামে দেওয়া হবে। উদ্যোক্তাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ করুন যার যোগফল হবে ৩৬.... খাড়াভাবে, সমান ভাবে, কোণাকুণি ভাবে যোগের সময় কোন সংখ্যা দুবার ব্যবহার করা যাবে না।

পুরস্কৃত ব্যক্তি পোস্টেজ, প্যাকিং ও লাইসেন্স ফি বাবদ ব্যয় বহন করবেন।

খেলার তারিখ ৩০ আগষ্ট, ১৯৭৮

আপনার প্রবেশপত্র পাঠাবার ঠিকানা—

জুলি এন্টারপ্রাইসেস্ ৭১৩/২, শ্যাম স্ট্রীট গান্ধীনগর দিল্লী-১১০০৩১

হিন্দী বা ইংরেজি নিজের ঠিকানা লেখা খামসহ প্রবেশপত্র পাঠান।

Jully Enterprises
713/2 Shyam Street
Gandhi Nagar
DELHI-110031

পথেই সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা সফল হলেন বটে; কিন্তু তখন ভারতের ভাগ্যবিধাতা যোধহয় অলক্ষ্যে একটু হাসলেন। যেদিন রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে বাংলায় কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হোলো সেই-দিনই তাঁর বন্ধু ও সহকর্মী মৌলানা মহম্মদ আকরাম খাঁ কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করলেন। এই আকরাম খাঁ পরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি হয়েছিলেন এবং 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকার মাধ্যমে পাকিস্তানের পক্ষে কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে দেশবিভাগকে সফল করে তোলেন।

হিন্দু-মুসলমানের মিলন প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের অবদান কতখানি ছিল সেকথা স্বয়ং গান্ধীজী স্মরণ করেছিলেন ১৯৪৭ সালের ১ আগস্ট সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠানে তাঁর প্রার্থনা সভায়। তখন সারা ভারত হিন্দু মুসলমানের হানাহানিতে উন্মত্ত। আমি তখন সোদপুরে গান্ধী শিবিরের কর্মী।

১ আগস্ট অতি প্রত্যূষে মধ্য কলকাতার একটি দাঙ্গা পীড়িত অঞ্চলে আমার গাড়িতে গুলি করা হয়। ১৪টি গুলি আমার গাড়ি ছাঁদা করে দিয়েছিল এবং আমার ধুতির ভেতর দিয়েও গুলি চলে যায়, কিন্তু গায়ে লাগেনি। সোদপুরে পৌঁছতেই খবর পেয়ে গান্ধীজী আমায় ডেকে পাঠান ও বলেন: 'সত্যি সত্যি গায়ে কোনো গুলি লেগেছে কিনা ভালো করে দেখো।' বিকেলে তাঁর দৈনন্দিন ভ্রমণের সময়ে হঠাৎ গিয়ে আমার গুলি বিধ্বস্ত গাড়িটি দেখে আসেন। তারপর তাঁর প্রার্থনা সভায় এই ঘটনার উল্লেখ করে বলেন: 'রবীন্দ্রনাথ শাসমল এক বহুত বাহাদুর আদমি থা। সে যদি আজ বেঁচে থাকতো তাহলে নিজের প্রাণ দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের এই উন্মত্ত হানাহানি রোধ করবার চেষ্টা করতো।

শিক্ষিত বাঙালীরা রবীন্দ্রনাথ শাসমল সম্বন্ধে চিরদিন অত্যন্ত ঈর্ষাকাতর। তাই গান্ধীজীর বাঙালী সেক্রেটারী অধ্যাপক নির্মল বসু গান্ধীজীর বক্তৃতার রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত অংশটুকু সংবাদপত্রে ছাপতে দেননি, কেটে দিয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী যে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ঐ কথা বলেছিলেন তার সাক্ষীদের মধ্যে এখনও আছেন পুলিনবিহারী 'কাকাবাবু' শিক্ষিতাশচন্দ্র দাশগুপ্ত, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বনার্জির দৌহিত্রী শ্রীমতী সাধনা বনার্জি ও কানু গান্ধীর পত্নী শ্রীমতী আভা গান্ধী। শ্রীমতী আভা, গান্ধীজীর পাশে বসে তাঁর সমস্ত বক্তৃতাটি স্বকর্ণে শুনেছিলেন এবং সভাশেষে গান্ধীজীকে তাঁর ঘরে পৌঁছে দিয়েই সেই ভিড়ের মধ্যে আমাকে খুঁজে বার করে গান্ধীজীর বক্তৃতার কথা আমাকে জানিয়ে-ছিলেন। তিনি না জানালে গান্ধীজীর ঐ বক্তৃতার কথা আমি জানতেই পারতাম না। বাঙালীর মেয়ে হয়েও শ্রীমতী আভা গান্ধী আমার প্রতি যে উদারতা দেখিয়েছিলেন তার জন্য তাঁর নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি ১৯৪৫-এর নভেম্বরে গান্ধীজী যখন মেদিনীপুর সফরে যান তখনও কাঁথির বক্তৃতায় তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছিলেন। অধ্যাপক নির্মল বসু সেটাও কাগজে ছাপতে দেননি। অমৃতবাজার পত্রিকার কালিপদ বিশ্বাস নিজ দায়িত্বে সেটা অমৃতবাজারে ছাপিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ শাসমল মুসলমান সমাজের প্রিয় ছিলেন শুধু এই অপরাধে তাঁকে বাঙালী কংগ্রেস নেতাদের হাতে যে লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করতে হয়েছিল তা লক্ষ্য করে বাংলা ও ভারতের মুসলমান সমাজ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। ১৯২১-এ গৌহাটি কংগ্রেসের বিষয় নির্বাচনী সভার একটি ঘটনায় ব্যাপারটি বোঝা যাবে। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের বক্তৃতার সময়ে রবীন্দ্রনাথ শাসমল একটি আইনগত প্রশ্ন তুলে আপত্তি জানিয়েছিলেন। তাতে যতীন্দ্রমোহন রাগত স্বরে বলে ওঠেন, 'সভা এখন আমার দখলে আছে। মিঃ শাসমলের এইভাবে আমাকে বাধাদানের কোনোই অধিকার নেই।' অমনি প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা মহম্মদ আলি বলে ওঠেন: 'মিঃ সেনগুপ্ত মগজ না খাটিয়েই গলাই ফাটালেন। (মিঃ সেনগুপ্ত একসারসাজইউ মোর লাউড দ্যান বেইনস্)'

সেনগুপ্ত সাহেব তখন বললেন 'আপনার এই উক্তি প্রত্যাহার করা উচিত, আমি তার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিনি।' মহম্মদ আলি বললেন, 'আপনি মিঃ শাসমলকে এই কথা বলে দুঃখ প্রকাশ করুন।' (দি বেঙ্গলী, ২৭-১২-২৬, ইংরেজির অনুবাদ)

এখানে আমার বলা কর্তব্য যে রবীন্দ্র-নাথ শাসমলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের প্রধান উস্কানিদাতা ছিলেন ডাঃ বিধান রায়। রবীন্দ্রনাথ বাংলায় কংগ্রেস নেতৃত্ব থেকে বহিষ্কৃত হবার পর এই বুচকী বিধান রায় সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের উস্কানি দিয়ে ১৯২৯ সালের নভেম্বর মাসে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকেও বঙ্গীয় কংগ্রেস কার্যনির্বাহক সমিতি থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন এবং এই লোকটির কুট চক্রান্তে ১৯৩১ সালের কলকাতা কর্পোরেশন কাউন্সিলের নির্বাচনে যতীন্দ্রমোহন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির মনোনয়ন লাভে বঞ্চিত হন এবং তাঁকে সরকারী কংগ্রেস-প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াতে হয়েছিল। ১৯২৮এ কলকাতা কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক হিসাবে বিধান রায় বহু টাকার হিসাব দেননি এবং সমিতির সভাপতি যতীন্দ্রমোহন হিসাব চাইলে বিধান রায় তাঁর প্রতি অপমানজনক ব্যবহার করে-ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে ১৯২৮-এর কলকাতা কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির দুই সভ্য গান্ধীবাদী নেতা ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও ভূতনাথ মুখার্জি সংবাদপত্রে যে ইংরেজি বিবৃতি দিয়েছিলেন তার বাংলা অনুবাদ এখানে তুলে দিলাম: 'অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যবৃন্দের প্রতি: গত ৯ই ডিসেম্বর ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে গত কলকাতা কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির একটি সভা হয়েছিল। সাধারণ সম্পাদক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সভা কর্তৃক অনুমোদনের জন্য একটি হিসাবের বিবরণী পেশ করেন। হিসাবের ছাপানো প্রতিলিপি উপস্থিত সভ্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল, পরে তা সংবাদপত্রে ছাপানোও হয়েছে। যদিও ডাঃ রায় সেদিন হিসাবের বিবরণীটি সভায় পাশ করিয়ে নিতে চেয়েছিলেন, তবুও একজিকিউটিভ কমিটির কাছে এটা ফেরত পাঠানো হয় এই নির্দেশ দিয়ে যে, এসেট্‌স্ এবং লায়েবিলিটির একটি শিডিউল তৈরি করে দেওয়া হোক।

'অভ্যর্থনা সমিতির পরবর্তী সভাটি আজ (২৭ই ডিসেম্বর ১৯২৯) অনুষ্ঠিত হবে ওই হিসাবের বিবরণী বিবেচনা করবার জন্য। সম্পাদক (ডাঃ রায়) যে হিসাবের বিবরণ পেশ করেছেন তাতে বহু ত্রুটি দেখা গেছে, যেগুলো আমরা সবলের সামনে তুলে ধরতে চাই। এ সম্বন্ধে আপনাদের সতর্কতার এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন আছে। কোনো এসেট্ দেখানো হয়নি: বহু

ফলিত জ্যোতিষ — শ্রীহরিহর মজুমদার ২০.০০
বাংলাভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিকথা — ডঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু ১২.০০
রূপনারানের কূলে (দ্বিতীয় খণ্ড) — গোপাল হালদার ২২.০০
আধুনিক দর্শন পরিচয় — ডঃ ধীরেন দাস
এছাড়া মুক্তধারা-র (বাংলাদেশ) প্রধান পরিবেশক
সুখিসদন ৯ এ্যান্টনী বাগান লেন, কলিকাতা-৯

দ্রব্য বিনা অনুমতিতে এবং বিনা নোটিশে বিক্রী করা হয়েছে।

'একোমোডেশন কমিটির হিসাবে আমরা ব্যয়ের ভাগে দেখছি যে ৫০০০ টাকায় ক্যাম্প খাট কেনা হয়েছিল। আমরা খোঁজ নিয়ে দেখেছি এই খাটগুলি মাত্র ২০০০ টাকায় বিক্রী করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই ২০০০ টাকা একোমোডেশন কমিটির হিসাবে ক্রেডিট করা হয়নি। প্যাণ্ডেল কমিটির হিসাবে আমরা দেখছি ৬০০০ টাকার চেয়েও বেশি মূল্যের খদ্দর কেনা হয়েছিল। সম্পাদক বলেছেন এই খদ্দর সব বিক্রী করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু হিসাবে কোথাও সেই খদ্দর বিক্রীর টাকা জমা দেখানো হয়নি।

'কিচেন কমিটির হিসাবে আমরা দেখছি ৫০০০ টাকার খাদ্যদ্রব্য কেনা হয়েছিল। কিন্তু মাত্র ১২৫০ টাকা আদায় দেখানো হয়েছে। ডেলিগেটকার্ড না দেখালে ডেলিগেটদের খাদ্য পরিবেশন করা হোতো না এবং প্রত্যেকের খাদ্যমূল্য দশ আনা হিসাবে আদায় করা হোতো। মনে হচ্ছে এই হিসাব তৈরি করতে কোনো ত্রুটি রয়ে গেছে এবং আমাদের মনে হয় এই হিসাবটি গভীরভাবে খুঁটিয়ে দেখা দরকার।

'ভলানটিয়ার কমিটির হিসাবে ২৮৪৩ টাঃ ১১ আঃ ৬ পঃ দিয়ে একটি মোটরগাড়ি কেনা হয়েছিল। গাড়িটি ছিল একটি শেভ্রলে, ৪-সিলিণ্ডার গাড়ি যার তখনকার কলকাতা ডেলিভারি রাস্তায় চলার উপযুক্ত দাম ছিল ২৪৭৫ টাকা।

'আমরা দেখতে পাচ্ছি কেবল নেতাদের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের খরচ ধরা হয়েছে ৭৬৮০ টাকা যার মধ্যে আছে ইম্পিরিয়াল রেস্টোরেন্টের বিল বাবত ৫৮৮০ টাকা। অভ্যর্থনা সমিতি কতজন নেতাকে কতদিন ধরে খাইয়েছিল? কংগ্রেসের মাত্র কয়েকদিনের অধিবেশনের জন্য নেতাদের খাওয়াবার কারণে যে এই বিরাট পরিমাণ টাকা খরচ করা হয়েছিল এতে আমরা নিছক স্তম্ভিত হয়েছি। ওই সামান্য কয়েকদিনের জন্য নেতাদের আসবাবপত্র খাতে ৪০০০ টাকা খরচ করা হয়েছে এবং ১০৯৫ টাকা নেতাদের বাসস্থান মেরামতের জন্য খরচ করা হয়েছে।

'উপরে লিখিত ঘটনাগুলি এটাও পরিষ্কার করে দিচ্ছে যে হিসাবের বিবরণী পাশ করবার আগে এ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খোঁজ নেওয়া দরকার।'

(দি বেঙ্গলী ১৮-২-২৯)

১৯৩০ সালে বেঙ্গল পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হয়ে বিচারের জন্য বেঙ্গল যাবার প্রাক্‌কালে বাঙালী জাতির উদ্দেশ্যে এক [illegible] বেঙ্গল [illegible]

মোহন সেনগুপ্ত বলেছিলেন : 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বর্তমান কার্যনির্বাহক সমিতিকে আপনারা এখনই বাতিল করে দিন এবং তার বদলে এমন সভ্যদের নিয়ে নতুন সমিতি গঠন করুন যাঁরা মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব স্বীকার করবেন। এক চিরন্তন কলঙ্কের মধ্যে বাংলার সুনামকে আপনারা ডুবিয়ে দেবেন না।' (দি বেঙ্গলী, ১৬-৩-৩০—ইংরেজির অনুবাদ)

১৯২৭-এর ২৪শে মার্চ বাংলার উদারনৈতিক দলের নেতা স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে বক্তৃতায় দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন : 'আজ যদি মিঃ বি এন শাসমল এই সভায় থাকতেন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই জনস্বাস্থ্যের মঙ্গলের জন্য তাঁর সহযোগিতা থেকে আমাদের বঞ্চিত করতেন না। আমি পদাধিকার নির্বিশেষে সকল জাতীয়তাবাদী নেতার ও নেতৃত্বাভিলাষীদের কাছে বিশেষ করে ডাঃ বি সি রায়ের কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে তাঁরা যেন নিজেদের ব্যক্তিগত বিবাদ মিটিয়ে ফেলে এই (জনস্বাস্থ্যের) ব্যাপারে সম্মিলিত প্রচেষ্টা আরম্ভ করেন।

'ডাঃ রায়—আমি মন্ত্রীপদপ্রার্থীদের একজন নই।'

'স্যার প্রভাস—আমি তা বলিনি। আমি বলেছিলাম তিনি নেতৃত্বপদের প্রার্থী।'

'ডাঃ রায়—আমি তা নই।'

'স্যার প্রভাস—তিনি 'বিগ ফাইভের' একজন এবং আমি ডাঃ রায়ের কাছে বিশেষভাবে আবেদন জানাবো যে তিনি নেতৃত্বলাভের প্রচেষ্টায় কম মনোযোগ দিয়ে যে-বিষয়ে তিনি সত্যভাবে অবহিত সে বিষয়ে বেশি মনোযোগ দিন। ...ডাঃ বি সি রায়ের মত যাঁরা বিশ্বাসঘাতকতা করে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিকে রাজনীতি থেকে তাড়িয়েছেন তাঁদের নাম লোকে গৌরবের সঙ্গে স্মরণ করবে না।

'সভাব এই দিকের সভ্য হিসাবে আমরা চাই সকলের নিকট হতে মিলিত কর্মবিধি এবং তা চাই স্বরাজদলের নেতাদের নিকট থেকে এবং যাঁরা নেতৃত্বপদলাভের জন্য কোন্দল করছেন তাঁদের নিকট থেকে। 'বিগ ফাইভের' আর একজন হচ্ছেন মিঃ শরৎ সি, বোস। (একজন : তিনি ত' আপনার ভাগিদার।) তিনিও নেতৃত্বপদলাভের একজন দাবিদার এবং স্বরাজ্য দলের উপর তাঁর বেশ কিছু প্রভাব আছে। আমি আশা করবো, শুধুমাত্র দলের মধ্যে নিজের প্রাধান্য কায়েম করবার জন্যই তিনি তাঁর [illegible]

০ নতুন নাটক ০

সাজানো বাগান
মনোজ মিত্র
সামাজিক পূর্ণাঙ্গ। দুটি নারী। ৫-৫০

গোলাপে রক্ত
জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়
সামাজিক পূর্ণাঙ্গ। দুটি নারী। ৫-৫০

মধুরেণ
গৌতম রায়
হাসির পূর্ণাঙ্গ। দুটি নারী। ৫-৫০

পাহাড়ী বিছে
মনোজ মিত্র
জমাট পূর্ণাঙ্গ। দুটি নারী। ৫-৫০

গোরুর গাড়ির হেডলাইট
সরোজ রায়
হাস্যমুখর পূর্ণাঙ্গ। একটি নারী। ৫-৫০

চিচিং ফাঁক
রাধারমণ ঘোষ
স্যাটায়ার পূর্ণাঙ্গ। দুটি নারী। ৫-৫০

ব্যভিচার
সমর মুখার্জি
জমজমাট পূর্ণাঙ্গ। পাঁচটি নারী। ৬-০০

নোপাসারান বাস্তিল ভাঙ্গছে পাতা নড়ার শব্দে
তিনটি পূর্বপ্রকাশিত একাঙ্ক একত্রে। ৬-০০

পদ্মপাতায় জল
গৌতম রায়
সামাজিক পূর্ণাঙ্গ। একটি নারী। ৫-০০

সঞ্জীব সেনের
নাট্যতত্ত্ব ও প্রয়োগ স্তানিস্‌লাভস্কি ও ব্রেশ্‌ট
একটি গ্রন্থে বিশ্বের দুই মহান্ নাট্য তাত্ত্বিক ও প্রযোগকর্তার শিল্পকর্ম ১০৲
প্রকাশ নন্দীর
নাটক অভিনয়
মঞ্চাভিনয়ের জন্য একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। প্রচুর ছবি। সহজ ভাষা। ১৫-০০

পরিবেশক : নব গ্রন্থ কুটির
৫৪।৫এ, কলেজ স্ট্রীট, কোলকাতা—৭৩

কালীঘাটের কড়চা

মন্দির আর পট নিয়ে কালীঘাট।

পৌরাণিক প্রবাদ, সতীর ডান পায়ের চারটি আঙুল বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন হয়ে এখানে বিক্ষিপ্ত হয়। কালীঘাট তাই মহাপীঠ। মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে এই পীঠস্থানের উল্লেখ আছে।

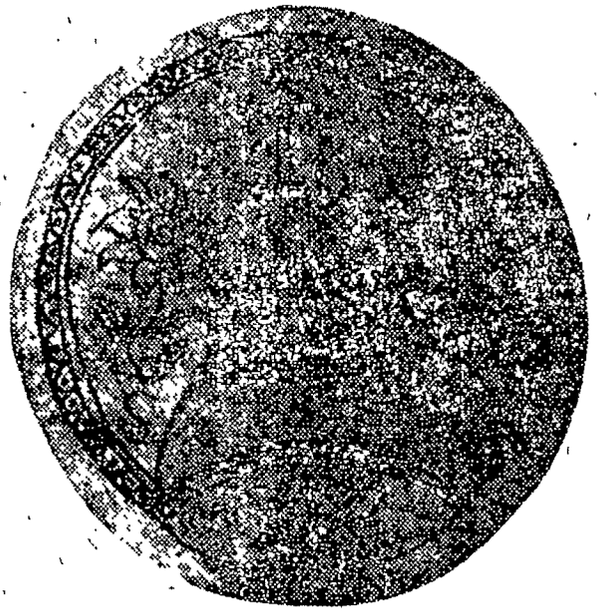

কলহোতা আদিগঙ্গার তীরে কালীর আদিমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায়। বর্তমান মন্দিরটি স্থাপন করেন বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরী বংশের সন্তোষ রায়।

একদা প্রায় জঙ্গলা, বলীদের নরবলিতে সন্ত্রস্ত কালীঘাটে আজ নিত্য মহোৎসব, নিত্য ভীড়। বাংলার লোককলায় কালীঘাটের পট ও পটুয়া আজও সম্মানিত।

কালীঘাটের নামানুসারে কলকাতার নামকরণের কিংবদন্তি বহু বিতর্কিত। কিন্তু কালীঘাটকে কেন্দ্র করেই যে দক্ষিণ কলকাতায় জনপদ বেড়ে উঠেছে তা তর্কাতীত।

সেদিনের সেই দ্বিধাগ্রস্ত ও আতঙ্কিত পথচলা আর নেই। দক্ষিণ কলকাতা আজ জনাকীর্ণ, কণ্ঠশ্বাস। ভীড় ও যানবাহনের চাপে এই সহর আজ বিপর্যস্ত।

এই বিপর্যয়ের হাত থেকে প্রাণবান ও ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ কলকাতাকে রক্ষা করার জন্যেই ভূগর্ভ রেল-এর পরিকল্পনা। দমদমে ভূগর্ভ রেল-এর কাজ শেষ। বেলগাছিয়া থেকে শ্যামবাজার-এর কাজ এগিয়ে চলেছে। আর এসপ্লানেড থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত পথ তো আজ দিনরাত্র কর্মমুখর।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও অধিবাসীদের কথা মনে রেখেই আমরা দক্ষিণ কলকাতার চলাচল ব্যবস্থা যথাসম্ভব চালু রাখার চেষ্টা করছি।

সহৃদয় সহরবাসী [illegible]স সহযোগিতায় আমরা নিশ্চিত। তাঁদের কষ্টস্বীকারের সহিষ্ণুতায় আমরা বিশ্বাসী।

Modern

কলকাতার নতুন মানচিত্র রচনায় ভূগর্ভ রেল

মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়ে)

করবেন না।' (বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের ইংরেজি বিবরণী থেকে অনূদিত)

এই প্রসঙ্গে বিধান রায়ের আর একটি কীর্তির কথা এখানে উল্লেখ না করলে আমার কর্তব্যহানি হবে। ১৯৩২-এ কলকাতার মেয়র থাকাকালীন তিনি ইংরেজ পুলিশ কমিশনারের হুকুমে ভারতের জাতীয় পতাকা কলকাতা করপোরেশন ভবন থেকে টেনে নামিয়েছিলেন। সেই সময়কার এই কলংকময় ঘটনা নিয়ে জওহরলাল নেহরু তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন : 'এই সময়ের মধ্যে একদিন খুব ব্যথা অনুভব করেছিলাম। বেটি হচ্ছে বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি এবং বিশেষ করে যেখানে কংগ্রেস সদস্যদের সংখ্যাধিক্য আছে বলে বলা হয় সেই কলকাতা করপোরেশন কর্তৃক আমাদের জাতীয় পতাকা টেনে নামানো। গভর্নমেন্ট এবং পুলিশের চাপে পতাকা টেনে নামানো হয়েছিল এবং তাদের আদেশ অমান্য করলে কঠিন শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছিল। এই পতাকা আমাদের বহু প্রিয় আদর্শের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং এর ছায়াতলে দাঁড়িয়ে আমরা বহুবার শপথ নিয়েছি যে আমরা পতাকার মর্যাদা রক্ষা করবো। নিজের হাতে বা অপরের হাত দিয়ে সেই পতাকা টেনে নামিয়ে দেওয়াতে শুধুমাত্র সেই শপথ ভঙ্গই হয়নি—এতে যেন একটি ধর্মদ্রোহ হয়েছিল। এতে হয়েছিল অন্তরাত্মার নতিস্বীকার, আত্মার সত্তাকেই এতে অস্বীকার করা হয়েছিল এবং অধিক ক্ষমতাশালী পশুশক্তির চাপে মিথ্যাকেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। যাঁরা এইভাবে নতিস্বীকার করেছিলেন তাঁরা জাতির মনোবলের ও জাতীয় মর্যাদার হানি ঘটিয়েছিলেন।' (অটোবায়োগ্রাফি, পৃঃ ৩৩৩-৮, ইংরেজির অনুবাদ)

বিধান রায় জওহরলালের পারিবারিক বন্ধু ছিলেন তাই তিনি এই নিন্দা ঘোষণার মধ্যে বিধান রায়ের নামটি করেন নি। কিন্তু জাতীয় পতাকার এই অপমান সহ্য করতে না পেরে নেলি সেনগুপ্তা গর্জে উঠেছিলেন : 'গত ১৪ মাসে ডাঃ বি সি রায়ের কার্যকলাপ কখনও কংগ্রেসের উপযুক্ত হয়নি। কলকাতার তথাকথিত 'কংগ্রেসী' মেয়র হিসাবে প্রত্যেক সম্ভবময় মুহূর্তে তিনি কংগ্রেসকে অস্বীকার করেছেন। তিনি শুধু কংগ্রেসেরই অপমান করেননি, যে করপোরেশনের তিনি নেতা বলে প্রচার করেন তাকেও তিনি ডুবিয়ে দিয়েছেন। করপোরেশন ভবনে জাতীয় পতাকার উত্তোলন সম্পর্কে মেয়র ও চিফ একজিকিউটিভ অফিসারকে সতর্ক করে দিয়ে গভর্নমেন্টের চিঠি পড়ে এই মেয়রের জন্য লজ্জায় জনক আত্মসমর্পণ এই ব্যাপারটিকে পরিষ্কার করে দেবে। ডাঃ বি সি রায়কে ওজন করে দেখা হয়েছিল এবং তাতে তিনি ওজনে কম পড়ে গেছেন। .... কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসী মেয়রের নিকট নেতৃত্ব আশা করে —পলায়ন আশা করে না। সেনাধ্যক্ষের পলায়নের সঙ্গে তাঁর পলায়নের পর সেনাদলের দুর্বলতার তুলনা করা চলে না।' কংগ্রেসী মেয়র হিসাবে ডাঃ বি সি রায়ের সকলের আগে কর্তব্য ছিল করপোরেশনের মর্যাদা রক্ষা করা। কংগ্রেসী মেয়র হিসাবে তাঁর কর্তব্য ছিল করপোরেশনের পাশে এসে দাঁড়ানো। কংগ্রেসী মেয়র হিসাবে তাঁর কাজটি, যার দিকে সমস্ত ভারত চেয়ে থাকে, সেই কলকাতা করপোরেশনের শুধু নয়, পরন্তু ভারতের সকল স্বয়ং-শাসিত প্রতিষ্ঠানের আত্মমর্যাদার হানি ঘটালো।' (এডভান্স মার্চ ২৫ ও ২৮, ১৯৩১, ইংরেজির অনুবাদ)

।।প্রথম পর্ব সমাপ্ত।।

সুবর্ণ সুযোগ!

কোন প্রবেশ মূল্য নাই

১০০০০, টাকা এবং অন্যান্য আকর্ষণীয় পুরস্কার

প্রথম পুরস্কার নগদ ১০০০, টাকা

দ্বিতীয় পুরস্কার:
অলওয়ার্ল্ড ট্রানসিস্টার

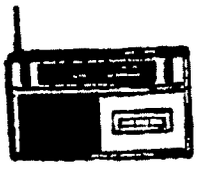

তৃতীয় পুরস্কার:
১৪৫, টাকা দামের আমেরিকান জর্জেট শাড়ী

শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন:

* ভারতের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন....(নন্দ, শাস্ত্রী)
* ভারতের সর্ববৃহৎ স্টীল প্রজেক্ট কোনটি..... (বোকারো, ভিলাই)
* জনতা দলে সর্ববৃহৎ বিখ্যাত এবং জনপ্রিয় নেতা কে..... (শেখর, নারায়ণ)
* ভারতের সর্ববৃহৎ কাগজ তৈয়ারীর কারখানা কোনটি ..... (টিটাগড়, বল্লারপুর)
* ভারতের প্রধান শিল্পপতি কে ..... (টাটা, বিরলা)

হিন্দী অথবা ইংরাজীতে নিজের নাম-ঠিকানা লেখা খামে ১৫ দিনের ভেতর লিখুন।

নিয়মাবলী : সমস্ত পুরস্কারগুলি অর্থমূল্যে দেওয়া হবে। এই বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য আমাদের সদস্যদের প্রগতি। উদ্যোক্তাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ও বাধ্যতামূলক। আইনঘটিত ব্যাপার দিল্লী হাইকোর্টের এক্তিয়ারাধীন। পুরস্কার বিজয়ীদের ডাক-খরচা, প্যাকিং ও লাইসেন্স ফি ইত্যাদি বহন করতে হবে।

এই ঠিকানায় প্রবেশপত্র পাঠান : **JYOTI EXPORTS**
Gandhi Nagar, Delhi-110031

অমিতাভ চৌধুরী

নির্বাসিতা তুমি

বাড়ি কই ?
সিলেট।
আফ্‌নার?
সিলেট।

ব্যাস, আর বলতে হবে না, বামুন-কায়েত হোক, আর হিন্দু-মুসলমান হোক, একজন আর একজনকে ধরবে জড়িয়ে, চোখেমুখে ফুটে উঠবে দিগ্বিজয়ী হাসি। হাজার হোক, দ্যাশের ভাই শুকুর মামুদ। ডিসটিংকট ইজ থিকাব দ্যান দি কানটিন্ট।

অনেকে বলেন, বদিরা প্যাবোকিয়েল, বারেন্দ্রবাও তাই। কিন্তু আমরা সিলেটীরা দশ কাঠি বাড়া। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর সিলেটী আবদুস সামাদ যখন মুজিব মন্ত্রি-সভায় বিদেশমন্ত্রী হলেন, তাঁর মন্ত্রণালয়ের নাম কুলোকেরা দিয়েছিল মিনিস্ট্রি অভ সিলেট অ্যাফেয়ার্স।

আমরা বলি, দেশ তো দুনিয়ায় দুটো—বিলেত আর সিলেত। আমরা অক্‌সোনিয়ান বা শান্তিনিকেতনী যাই হই না কেন, আমাদের জিবে সিলেটী টান হাতুড়িবা ঘা মারলেও যায় না। একালের লণ্ডন বা সেকালের নবদ্বীপ—যেখানেই থাকি না কেন, আমরা এককাট্টা হয়ে থাকি। চৈতন্য মহা-প্রভু সিলেটের ছেলে। সিলেটী উচ্চারণ নিয়ে তিনি ঠাট্টা করলে খেপে উঠতেন তাঁর অন্য সিলেটী বন্ধুরা। তাঁরা বলতেন, 'খুব তো বলছ ভায়া, কিন্তু তুমি কোথাকার ছেলে হে?' অদ্বৈতাচার্য, মুরারি গুপ্ত, বাসু ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, চন্দ্রশেখর আচার্য, রঘুনাথ শিরোমণি—বাপা বাছা সিলেটীদের আড্ডা তখন ছিল নবদ্বীপে শান্তি-পুরে।

আর লন্ডন শহর তো এখন সিলেটীদের কলোনি। তাঁদের সংখ্যা সেখানে লাখ ছাড়িয়েছে। হোটেল রেসতোরাঁ তো এক-চেটিয়া। সৈয়দ মুজতবা আলির 'জলে ডাঙায়' যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন, কীভাবে এঁরা মেমসাহেব বিয়ে করে রেসতোরাঁয় খাটায় এবং নিজে যথাসম্ভব কম ইংরেজি শিখে বউদের সিলেটী উপভাষা শেখায়। তাই ওঁরা যখন খদ্দের দেখে হেঁসেলে হাঁক পাড়ে—'ও ডুরা, এক কটরা সালন দে' (ও ডোবা, এক বাটি ঝোল দে), তখন ডেভনশায়ার বা লিমিং-টনের বিড়ালাক্ষি সব কথা বুঝতে পারে। শুধু তাই নয়, এই একরা-খালাসি হোটেল-ওয়ালারাই বছরে নব্বই কোটি টাকার স্টার্লিং মুলুককে ভেজে এবং সেই কারণেই সিলেটের বহু গ্রামে আছে গিল্ডহলের ব্যাংক, গাঁয়ের

...ট ট্র্যাভেলার্স চেক দিয়ে মাগুর মাছ ...মরুমড়ো কেনা যায় এবং সিলেট শহরে ...মসে কম পঞ্চাশটা ট্র্যাভেল এজেন্সি।

সিলেটী মুসলমানরা যেমন কোন কিছু না হলে দু'পয়সা কামাতে লন্ডন বার্মিংহাম লিভারপুল পাড়ি দেয়, তেমনি দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে সিলেটী হিন্দুরা প্রায় সব চাকরি-বাকরির বন্দোবস্ত করেছিল আসামের। শিলং আসামের রাজধানী স্থানীয় অধিবাসী বাঙালী, কিন্তু বেয়ারা থেকে বড়বাবু থেকে সেক্রেটারি—বেশির ভাগ ছিল সিলেটীদের দখলে। সাতচল্লিশ সালের পর অবস্থা পালটালেও শিলং এখনও মূলত সিলেটী-দের শহর।

এই সিলেটীদের গর্ব অনেক ব্যাপারে। এই জেলায় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি দারুণ, শিক্ষার হার সবচেয়ে বেশি, মেয়েরা প্রগতিতে এগিয়ে, দারিদ্র্য তুলনায় কম এবং কোন প্রকার প্রতিযোগিতায় তারা পিছপা নয়। কেউ কেউ বলেন, সিলেটীরা ধূর্ত। যেমন বিদ্যাসাগর মশাই। সিলেটীরা তাতে হো-হো করে হাসে, বলে শ্রীহট্টে নাস্তিত মধ্যম, বুদ্ধিমানদের ধূর্ত বলার বেওয়াজ অনেক দিনের। আবার বিদ্যাসাগরের পালটা ইতিহাসবিদ মুহম্মদ হাবিবুর রহমান তবে সিলেটীরা পালটা জবাব দেয়, সিলেটীরা হেট সে নয়, গান্ধীজী একবার বলেছিলেন, রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী সিলেট থেকে বেশি কিছু হবেন। সেই জন্যই মিশনে সিলেটী সন্ন্যাসীরা সংখ্যায় ভারী। তিনি যেমন রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনেও গোড়া থেকেই সিলেটী ছাত্রদের ছড়াছড়ি।

সিলেটীদের অন্য গর্ব জেলার বিপ্লবে যে বাঙালী অন্যতম নেতা ছিলেন তাঁর বাড়ি তাদের জেলায়, সিলেটের প্রথম বৃটিশ প্রেসিডেন্ট ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের ভাতুষ্পুত্র, হিন্দুস্থানের রমাকান্ত রায়, দেওয়ান হাসন রাজা, বাসবিহারী বসুর প্রধান সহচর বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ দত্ত, পণ্ডিত, রমাকান্ত নিয়োগী স্বামী বিপিন দাস, বিপিন পাল পণ্ডিতরাজ বিদ্যা-বিনোদ, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, সাহিত্যসেবক চন্দ্র, ঐ সুরেন দত্ত, সংবাদ ভাস্করের সম্পাদক দেবেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য রামনাথ বিশ্বাস, বিশ্বভারতী বাবা, সন্তদাস বাবাজী, বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রথম শিক্ষক শিবধন বিদ্যার্ণব—সবাই সিলেটের সন্তান। তার চেয়েও বড় গর্ব, জেলার মধ্যে একমাত্র সিলেটকে নিয়েই কবিতা লিখেছেন রবীন্দ্র-নাথ। সিলেটীদের একটি দুঃখের জায়গা স্মরণ করে তিনি লিখেছেন, মমতাবিহীন লোকালয়েতে, বাঙালির নাড়ীসমান হোতে, দূরবাসিতা তুমি, সুন্দরী শ্রীভূমি—।

সিলেটের অন্য নাম [illegible] যাদের নাম [illegible] রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় [illegible] [illegible] [illegible]

সিলেটী—কী হিন্দু কী মুসলমান—মনে-প্রাণে চাইত তার জেলা আবার বাংলার সঙ্গে যুক্ত হোক। বহু আবেদন-নিবেদনেও যখন তা সম্ভব হল না, সিলেটীরা হল একজোট—অন্যরা যাকে বলেন 'প্যারোকিয়েল।' সিলেটীরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হল, অকে জবী হতেই হবে। তাই ছুটল নানা দিকে, সাহস এবং শিক্ষাকে 'করল প্রধান অস্ত্র।' বাংলার সঙ্গে প্রশাসনিক দিক থেকে যুক্ত হতে না পারার অভিমান তাকে দিল নতুন শক্তি।

অবশ্যি সিলেটীদের আলাদা একটা অস্তিত্ব ঘোষণার প্রবণতা অনেক দিনের। বাংলার বহু জেলার চেয়ে প্রাচীন অঞ্চল সিলেট। হিউয়েন সাংয়ের বিবরণে তার নাম আছে, আছে আরো প্রাচীন যোগিনীতন্ত্রে। কামরূপ-রাজ ভাস্করবর্মা এবং সংলম্প ত্রিপুরা রাজের আহ্বানে বহু উত্তরপ্রদেশী ও মৈথিল ব্রাহ্মণ আসেন সিলেটে। সেই পঞ্চম ষষ্ঠ দশক থেকে। মিথিলা থেকে পূর্ণিয়া জলপাইগুড়ি কোচবিহার ময়মনসিং হয়ে তাঁরা নেমে আসেন সিলেটে। তাই রাঢ়ী নয়, সিলেটে বৈদিক ব্রাহ্মণদের বড় দাপট। তাঁদের জন্যই সিলেটী উপভাষায় হিন্দী, বিশেষ করে উত্তর বিহারের হিন্দীর প্রভাব আজও এত বেশি। উত্তরপ্রদেশের 'এটা' জেলার অনুসরণে সিলেটের একটি পরগণার নাম পর্যন্ত হয় ইটা। চৈতন্য মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্রও বৈদিক ব্রাহ্মণ এবং সম্ভবত তাদের আদি নিবাস মিথিলা। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার বেশির ভাগ সিলেটী কিয়াকর্মে রঘুনন্দন নয়, বাচস্পতি মিশ্রকে মানেন এবং দুর্গাপূজার বিধানও বিদ্যাপতি রচিত দুর্গাভক্তি তরঙ্গিনী অনুসারে। সিলেটী মুসলমানরা বাংলা বই পড়ল সিলেটী নাগরী হরফে।

একদিকে যেমন দুর্দান্ত পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের প্রভাব, অন্যদিকে তেমনি খানদানী মুসলমানের ছড়াছড়ি সিলেটে। তার কারণ শেখ শাহজলাল। শাহজলালকে সালাম জানান সিলেটের হিন্দু-মুসলমান সবাই। ইয়েমেন-এর অধিবাসী এই দরবেশ চতুর্দশ শতাব্দীতে তিনশ' ষাটজন আউলিয়াকে নিয়ে হিন্দুস্থানের দিকে পাড়ি দেন। তাঁর দীক্ষাগুরু বলেন, ইয়েমেনের শাহজলালের সাধনস্থলের মাটির বর্ণ গন্ধ ও স্বাদ যেখানে মিলবে, সেখানেই যেন তিনি নতুন আস্তানা করেন। মাটির বাটি হাতে নিয়ে জনপদের পর জনপদ পাড়ি দিয়ে সবাই আসেন দিল্লিতে। সেখানে তখন বাদশাহ মুনাখা মহম্মদ তুঘলক। আর আছেন নিজামুদ্দিন আউলিয়া। প্রীতির নিদর্শন হিসাবে নিজামুদ্দিন একজোড়া কাজলা রঙের কবুতর উপহার দেন শাহজলালকে। সেই কবুতর আর ইয়েমেনের মাটি নিয়ে দরবেশদের দল এগোন পূব থেকে পূবে; কিন্তু হাতের মাটির সঙ্গে কোথাও মিল হয় না।

এলাহাবাদের কাছে সিলেট ফেরৎ সিকান্দার গাজীর সঙ্গে দেখা। তিনি সিলেটের রাজা গৌড়গোবিন্দের কাছে পরাজিত হয়ে দিল্লি ফিরছেন সৈন্যসমেত। শাহজলাল তাঁকে বলেন, আবার চল আমার সঙ্গে। হাঁটতে হাঁটতে দু-দলই পৌঁছলেন সিলেট শহরের কাছে। দৈবশক্তিসম্পন্ন দরবেশের জোরে গৌড়গোবিন্দ পরাজিত হয়ে বনে পালান। শাহজলাল সসৈন্য ঢোকেন শহরে এবং কী আশ্চর্য, সেখানকার মাটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন ইয়েমেনের মাটির স্বাদ বর্ণ গন্ধ হুবহু এক। তিনি স্থির করেন, এখানেই তাঁর নতুন আস্তানা করবেন। সঙ্গী তিনশ' ষাট আউলিয়াকে নিয়ে তাই করলেনও। সেই জন্যে মুসলমান সমাজে সিলেটের আর এক নাম 'তিনশ ষাট আউলিয়ার মুলুক।'

শাহজলাল আছেন জেনে আরব মুলুক থেকে আরও বহু গুণীজ্ঞানী সিলেটে চলে আসেন। বিশেষ করে সৈয়দ বংশীয় অনেকে। সেই কারণে খানদানী মুসলমানের সংখ্যা সিলেটে এত বেশি। শাহজলাল দেহরক্ষা করেন সিলেট শহরেই। তাঁর দরগা বিরাট তীর্থস্থান। হিন্দুরাও চেরাগ মানত করেন। এমন কি শাহজলালকে শিবের সঙ্গে মিলিয়ে বহু গানও বাঁধা হয়েছে। আমাদের ছোটবেলায় প্রধান দ্রষ্টব্য ছিল এই দরগা। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে যখন বহুদিন বাদে ঢাকা থেকে সিলেট যাই, শহরে ঢুকেই শাহজলালের দরগায় আমি প্রণাম জানাতে গিয়েছিলাম।

এই শাহজলাল সিলেট হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির প্রতীক। নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দেওয়া জোড়া কবুতর বংশবৃদ্ধি করে লাখে লাখে ওড়ে আকাশে। এদের বলে জালালী কবুতর। পাষয়ার মাংস আমাদের অঞ্চলে প্রিয় খাদ্য। কিন্তু জালালী কবুতর হিন্দুরাও খান না। আমরা ছোটবেলায় দোহাই পাড়তাম শাহজলালের নাম নিয়ে।

শাহজলালের পরবর্তীকালে সিলেটের ছেলে চৈতন্যদেবের প্রভাবও পড়ে সর্ব সাধারণের মধ্যে। যদিও তন্ত্রসাধনার ক্ষেত্র হিসাবে সিলেটের খ্যাতি এবং দেবীর গুহ্যবাপীঠ

মুক্তমঞ্চ ১১৩, রবীন্দ্র সরণী, কলিঃ-৬
৪৬-৯৭৩৪; ৫৫-৫৮৩১

ভগবান তুমি যুগে যুগে বহু লীলা দেখাইছ, এইবার শুধু একটা বিমান পাশ করিয়া দেও- ভারতবর্ষের পুরুষ মেলে পুরুষই বিয়া করতে পারে। তেইলে এই

শ্রীলোক বউ-এর হাত থিকা রক্ষা পাওয়া যায় আর পরিবার পরিকল্পনাও সার্থক হয়।

ইন্ডিয়েশা দেক
জয় মা বলী বোর্ড
সঙ্গে আছে শরৎচন্দ্রের
বৈকুণ্ঠের উইল
একদম ঠিক নতুন
বলাৎকারে জীবন্ত মানুষ
নবনাট্যরূপঃ শিলাদিত্য রায়
সুরঃ নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিচালনায়: তনুব্রত্যোপাধ্যায়

15-ই আগষ্ট

দিনটি পরম আনন্দের ঃ মহান মূল্যবোধ ও আদর্শের জন্য জীবন উৎসর্গ করার শপথ নেবার দিনও বটে।

এই দিন আমরা পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি—

—মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ঐতিহাসিক সংগ্রাম।

—লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর আত্মত্যাগ ও কষ্ট ভোগের কাহিনী।

—লব্ধ স্বাধীনতার বুনিয়াদ দৃঢ় করা এবং দেশের সংহতি সাধনের প্রয়াস ও অর্থনৈতিক বিকাশের ভিত্তি রচনা।

আজ আমরা শপথ নিচ্ছি—

—দেশ থেকে বেকারি, রোগ ও নিরক্ষরতা নির্মূল করব।

—দেশের 5 লক্ষ 76 হাজার গ্রামের মানুষের ন্যূনতম চাহিদা—পানীয় জল, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সড়ক—মেটাব।

—সমাজের দুর্বল শ্রেণীকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে নিয়ে যাব। আমাদের সমান অংশীদার হবে তারা।

স্বাধীনতার 31তম বার্ষিকীতে আসুন আমরা
শপথ নি, গান্ধীজীর স্বপ্নের ভারত আমরা গড়ব;
প্রতিটি অশ্রু-বিন্দু মুছে দেবার চেষ্টা করব।

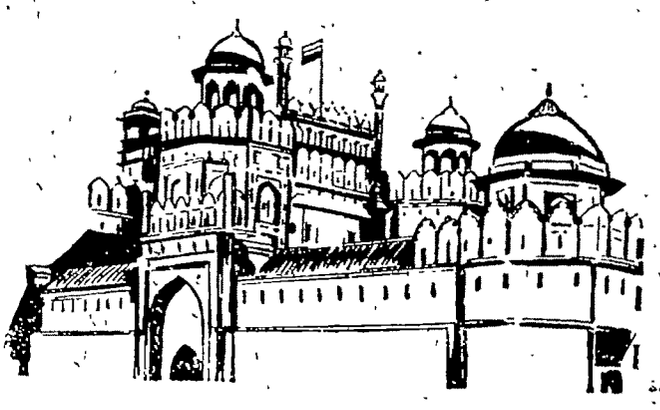

DAVP 78/200

সিলেটেই, তবু বৈষ্ণব প্রভাবও ব্যাপক। তারই জের টেনে সিলেটের লোকসঙ্গীত এত মনোরম, এত সুরময়। ধামাইল বৌনাচ ইত্যাদিতে লোকনৃত্যের ধারা একমাত্র সিলেটেই আজও প্রবহমান। পূর্ববঙ্গের লোকগীতি বলতে যা বুঝি, তার অধিকাংশই সিলেট ময়মনসিং আর কুমিল্লা জেলার। হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতি মিশে গেছে লোক-সাহিত্য ও সঙ্গীতের বন্ধনে।

সেই বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল সাতচল্লিশ সালে। সিলেটীরা বরাবর চেয়ে এসেছে বাংলার সঙ্গে তাদের জেলা সিলেট এবং সিলেটের সহোদর কাছাড় যুক্ত হোক, কিন্তু ভারত অপারেশনের সময় এমন কাটাছেঁড়া হল যে, সিলেটের বড় টুকরো ভারা বাংলার সঙ্গে জোড়া লেগে সর্বনাশ ঘটিয়ে দিল।

এই সর্বনাশের জন্যে দায়ী দেশের নেতারা। ১৯৪৬ সালে ক্যাবিনেট মিশন যখন ভারত ভাগাভাগি পাকা করল এবং বড়লাট মাউন্টব্যাটেন হিন্দুস্থান পাকিস্তান থিয়োরি চাপাতে চাইলেন কংগ্রেসী নেতাদের ঘাড়ে, নেহরু-প্যাটেলরা তিনবার ঢোঁক গিলে তাতে রাজি হয়ে গেলেন। সে এক ধুন্ধুমার ব্যাপার। একালের ছেলেরা সেদিনের সেই হর্ষ-বিষাদের যুগল চেহারা কল্পনা করতে পারবেন না। স্বাধীন হচ্ছি, কিন্তু লাখ লাখ স্বদেশবাসীকে বিসর্জন দিয়ে। কী করুণ অবস্থা।

বলছিলাম সিলেটের কথা। মুসলিম লীগের সাবা দেশ ভাগের দাবির পালটা কংগ্রেসী নেতারা দাবি করলেন পাঞ্জাব ও বাংলাকে ভাগ করতে হবে। যে-জেলায় মুসলমান বেশি, যাবে পাকিস্তানে, আর যে-জেলায় হিন্দু বেশি থাকবে ভারতে। অনেক দর-কষাকষি আর কাঠখড় পোড়ানোর পর ভাঙা-ভাঙি হলও শেষমেষ। সিলেট আসামে। গোটা আসামের ভাবতেই থাকার কথা। হঠাৎ দাবি উঠল, সিলেটকেও পাকিস্তানে যেতে হবে। তার জন্যে নেওয়া হবে গণভোট। এমনই কপাল, মুসলিম লীগের এই দাবি নাকচ করার দিকে কেউ এগিয়ে এলেন না। যেন লুটের মাল ভাগাভাগি চলছে, যে যা পারে গুছিয়ে নিচ্ছে।

দিল্লির কংগ্রেসী নেতারা তো গণভোটের প্রস্তাব মানলেনই, তলে তলে সিলেটকে খারিজ করার ষড়যন্ত্র আঁটলেন আসামের কংগ্রেসী বরদলই মন্ত্রিসভা। লন্ডনে হাউস অভ পার্লামেন্টে এটলি যখন সিলেটে গণভোটের বিল এনে তাড়িঘড়ি পাশ করিয়ে নিচ্ছেন, তার আগে থেকেই আসামের কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর সহকর্মীরা এমন সব ব্যবস্থা গোপনে নিতে লাগলেন যে, গণভোট গ্রহণের আগেই টের পাওয়া গিয়েছিল সিলেট পাকিস্তান হয়ে যাচ্ছে। অসমীয়া নেতারা বহুদিনের ঝাল মেটাতে ভাবলেন সিলেট পাকিস্তানে গেলে আপদ বিদায়। সিলেটী বাঙালীরা চলে গেলেই প্রশাসনে শুরু হবে অসমীয়াদের একাধিপত্য। কেন্দ্রের কংগ্রেসী নেতারা তো বড় বড় ব্যাপার নিয়ে মেতে রইলেনই, আসামের কংগ্রেসী নেতারাও টুঁ শব্দটি করলেন না মুসলিম লীগের প্রবোচনায় ব্রিটিশ সরকারের প্রস্তাবে।' আরো দুঃখ আসামের সিলেটী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বসন্তকুমার দাস পর্যন্ত গা করলেন না।'

১৯৪৭ সালের জুন মাসে গণভোট হল। মনে আছে সেদিনের উত্তেজনা। সিলেটীরা যে-যেখানে আছেন, ছুটে যাচ্ছেন নিজের গ্রামে ভোট দিতে। আসছেন নেতারা পক্ষে বিপক্ষে প্রচার চালাতে। ভোট কিনতে টাকাও ঢালা হচ্ছে অঢেল। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জেলা সিলেটে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ভোটাভুটির ব্যবস্থা হল। কিন্তু বহু জাতীয়তাবাদী মুসলমান ভাবতে থাকার জন্যে ভোট দিতে চলেছেন টের পেয়ে একটা আজব কানুন বেঁধে দেওয়া হল যে, সিলেটে যে কয়েক লাখ হিন্দু চা-শ্রমিক আছেন, তাঁরা গণভোটে যোগ দিতে পারবেন না। এবা ভোট দিতে পারলে সিলেট হয়ত পাকিস্তান হত না। তার উপর বাইরে থেকে এত টাকা সাধারণ গ্রাম্য মুসলমানদের দেওয়া হতে লাগল যে, টাকার লোভে অনেকেই ভোট দিলেন পাকিস্তানের বাক্সে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শেষ মুহূর্তে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন অন্যায় রুখতে, কিন্তু তিনিও পারলেন না। ১৯৪৭ সালে আগস্ট মাসে দেশ স্বাধীন হবার ঠিক আগে জুনের শেষাশেষি ঘোষণা করা হল, গণভোটে স্থির হয়েছে সিলেট পাকিস্তানে যাবে। ভোটের ফলাফল? ব্যবধান অতি সামান্যই—মাত্র কয়েক হাজারের।

সিলেটের মহকুমা পাঁচটি—হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, সদর, মৌলবিবাজার ও করিমগঞ্জ। চারটি পাকিস্তানে ঠেলে দিয়ে করিমগঞ্জ মহকুমা জুড়ে দেওয়া হল কাছাড়ের সঙ্গে। মৌলবিবাজারের বাবটি হিন্দু-প্রধান থানা সংলগ্ন ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করার প্রতিশ্রুতি ফাইলবন্দী হয়ে লন্ডন চলে গেল এবং আকরণে অযৌক্তিকভাবে সিলেটকে ঠেলে দেওয়া হল পূর্ব পাকিস্তানে।

এমন অবিমৃষ্যকারী সিদ্ধান্ত ইতিহাসে কম হয়েছে। যদি সিলেট ভারতে থাকত, তাহলে অসমীয়া নেতাদেরও সিলেটী প্রভুত্বের জন্যে ভাবতে হত না। সিলেটকে না হয় তাঁরা হঠিয়েছেন, সিলেটীরা তো ছড়িয়ে গেছে সারা আসামে। তাছাড়া সিলেট কাছাড় ও ত্রিপুরা মিলে প্রায় এক কোটি লোকের বসভাষী একটি শক্তিশালী রাজ্য হতে পারত। আর ময়মনসিং কুমিল্লা নোয়াখালি চট্টগ্রামের উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে কারণ্যে আশ্রয়মানে যেতে হত না। এ জেলা মিলে নতুন রাজ্যেই লাখ লাখ উদ্বাস্তুকে ঠাঁই দিতে পারত।

কিন্তু সে আর আপশোস করে লাভ নেই। যা হবার তা হবেই। রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করে হয়ে বলা যায়, মমতাবিহীন কালস্রোতেই সিলেটকে আবার নির্বাসিতা হতে হয়েছে। কিন্তু দিল্লির নেতারা সামান্য মমতা দেখালে এই দুর্দশাটা হত না।

তবে সিলেটীরা তাতে হতোদ্যম নয়। এই দুর্ঘটনা বিশ্বময় দিয়েছে তাকে ছড়িয়ে। সিলেটীরা আরো হাজারে হাজারে ছুটেছে কলকাতা দিল্লি কুয়াশেৎ লন্ডন লিভারপুল ক্যালিফর্নিয়ায়, রাজস্থানের গ্রামে, মধ্যপ্রদেশের শহর থেকে সে দাঁড়াচ্ছে বিধানসভা লোকসভা নির্বাচনে। দাঁড়াচ্ছে আসাম ত্রিপুরা মেঘালয় পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে। শিলং গৌহাটি আগরতলা কলকাতা দিল্লি ঢাকা ইসলামাবাদ খুঁজলে দেখবেন আইনসভা বা মন্ত্রিসভায় একজন না একজন সিলেটী আছেই এবং সব সিলেটীর সেই এক বা—ডিসটিংকট ইন থিংকার দ্যান দি কানটিন্যু। আমাদের ভয় কোথায়?

Institute of Railway Services

announces one-year correspondence course for preparing candidates for

RAILWAY SERVICE EXAMINATION

for the following posts

Post	Qualification	Age	Pay
Clerk	Matric/Equiv	18-25	260-400
Asst. Station Master	Matric/Equiv.	18-25	330-560
Ticket Collector	Matric/Equiv.	18-25	260-400
Trainee Guard	Matric/Equiv.	18-25	290-480
Signaller	Matric/Equiv	18-25	260-430
Typist	H S with 40 w p.m	18-28	260-400
Stenographer	Matric with 80/40 w.p m	18-30	330-560
Telephone Operator	Matric/Equiv	18-25	260-400

Standard/78

The upper age limit is relaxable by 5 years for SC/ST. Next session commences from Sept., 1978. For prospectus and admission form send a self-addressed 40 paise stamped envelope (12x24 cm) to the Programme Director.

INSTITUTE OF RAILWAY SERVICES,
10, Old Post Office Street, Calcutta-700 001.

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

খুলনা-যশোর ইতিহাস-ভূগোলের খেলা

১৯৪০।৪১ সনেই প্রথম দেখি—পাকিস্তানের দাবিতে পতাকা হাতে মিছিল। আমাদের সহপাঠীরা আলাদা লাইন দিয়ে স্কুলে ঢুকছেন কাঁধে ওই পতাকা। ও লাইনে সেদিন সব মুসলমান সহপাঠী যোগ দেয়নি। কারণ নাজিমের বাবা কংগ্রেস করতেন। হায়দার আলির কাকা দুই পুরুষে তখন নামী মোক্তার। এমন কি সবুর খানও ওই শ্লোগানে সেদিন গলা মেলান নি। আমি খুলনা-যশোরের কথা বলছি। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৭-এর খুলনা-যশোর। যেমন দেখেছি।

অমন যে সবুর খান—সে-ও সেদিন পাকিস্তান চায়নি। কারণ বাণী মন্দিরে তাকে হিন্দু বন্ধুদের সঙ্গে আলমগীর নামাতে হচ্ছে। কিম্বা শিরাজদৌল্লা। ওদিকে লেডিজ পার্কের উল্টোদিকে ফুটবল ক্লাবের ফুল টিম তারই অ্যাকাউন্টে ওমলেট খাচ্ছে। হাফব্যাক বলাই। গোলকিপার সফিকুল।

স্কুলে অবশ্য শুকরবার নামাজের জন্যে দেড় ঘণ্টার টিফিন। তবু দুর্গাপ্রতিমার ভাসানের বাজনায় কারও বিঘ্ন ঘটতে দেখিনি। দুধ দিচ্ছে খোকাশেদ, পাঁঠা কাটছে কালীপদ, জাল বুনছে নিবারণ, মাছ ধরছে খালেক—এসব নিয়ে পরে যে লিখতে হবে সেদিন তা ভাবিনি। দেশ ভাগের কথা সেদিন কারও মুখে শুনিনি।

মফঃস্বল শহরে সে-সময়ে প্রত্যেক পাড়ায় কয়েকজন থাকতেন—যারা অবিবাহিত—খদ্দর পরেন—কিছুকাল অন্তর জেলে যান—আবার ফিরে আসেন। গলায় তাদের জীবন মরণ নয়তো ডাক্তারের গান। এদেরই দেখলাম—১৯৪২-এ থানা, কোর্ট, কাছারি, ট্রেজারিতে মিছিল করে যেতে।

সে মিছিলে সেদিন কোন সবুর বা কোন ফিরদৌসকে দেখিনি। তখন কারণ বুঝিনি। বুঝতে পেরেছি—অনেক পরে।

মৃত্যুর আগের বছর আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র হিন্দুমহাসভার উদ্যোগে গান্ধী পার্কে বিরাট সভায় বক্তৃতা করলেন। পার্কের গায়ের দেওয়ালে গৈরিক পোশাকে লাঠি হাতে ভলান্টিয়ার। ততদিনে নায়ারে কাফির কথা দুটি শুনতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি আমরা।

এক সহপাঠীর বাবা ছিল আই ডি। তিনি বেলা দেড়টা অব্দি গম্ভীর মুখে সারা শহর সাইকেল করতেন। একদম চিন্তান্বিত মুখে। আরেকজন বিখ্যাত ইনফরমারকে সাইকেলে প্যাডেল করতে দেখতাম। তার নাম—কাকা মিঞা। কিন্তু ওরা তো বৃটিশের প্রতিনিধি।

বঙ্কিমচন্দ্রের ওপর গবেষণা গ্রন্থ লিখেছিলেন নাজিমের বাবা। নাজিম এখন বাংলাদেশের সিনেমার গান লেখে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার।

তখন শহরে উকিল, মোক্তার, ডাক্তার—সবাই প্রায় হিন্দু। এম এল এ গোবিন্দ ব্যানার্জির লনে গোলাপের কেয়ারি। বাবা, কাকা, জ্যাঠারা পাকিস্তান কথাটাকে সিরিয়াসলি নেন নি, বলে ঠাট্টা-তামাসা করতেন। আমরা

ভূগোল পরীক্ষায় অখণ্ড ভারতের ম্যাপ আঁকছি।

হঠাৎ ছাত্র লীগের নেতা হয়ে গেল ফিরদৌসদা। আলাদা বাংলা পাঠ্য পুস্তকে মুসলমানের জায়গায় ছাপা হতে লাগল—মুছলমান। দৈনিক আজাদের বিক্রীবাটা বেড়ে গেল। মুসলমান বাড়িতে আলাদা মাসিক পত্রিকা—সওগাত—ডাকে আসতে লাগল। লালকেল্লার বিচারের পর নেতাজীর ঢেউ যেমন উঠেছিল—তা টিমিয়ে পড়ল। এখনকার এম পি চিত্ত বসুর নেতৃত্বে নেতাজীর নামে প্যারেডের পাঠ উঠে গেল ক্রমে ক্রমে। তার বদলে গ্রাম থেকে—নদীর ওপার থেকে শুক্কুরবার শুক্কুরার মুসলমানদের আগমন—বড় মিছিল—আর শ্লোগানের জোর বেড়ে গেল।

এখন বুঝি — পাকিস্তান দাবির পালটা কোন ইমাজিনেটিভ ইনস্পিরেসন সেদিনকার কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী হিন্দু-মুসলমানের মনে সঞ্চারিত করতে পারে নি। না রাজনীতিতে। না সংস্কৃতিতে। খুলনা-যশোরের ভাগ্য অথর্ব কল্পনাশূন্য জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসী নেতারা অবহেলায়, অজ্ঞতায় নষ্ট করেছেন। তারা জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের কোন অলটারনেটিভ দিতে পারেন নি। পরিণামে —উগ্র পাকিস্তানবাদীদের কোলে গিয়ে তারা পড়েছেন। আর হিন্দুরা নিরুপায় হয়ে ডিফেক্ট করেছেন। যাঁদের পরবর্তী স্ল্যাংকেদ ডেফিনিশন—রিফিউজি।

জীবন তো বয়ে গেল—আর বা কদিন। —এই ভাবনায় ভাবিত ক্ষমতার হাতছানিতে লোভী বৃদ্ধ নেতারা খুলনা যশোরের কথা ভুলে থাকতে চেয়েছিলেন। আর গরিষ্ঠতা হারাবার ভয়ে এখনকার পশ্চিমবঙ্গের কিছু জেলাওয়ারী নেতা খুলনা-যশোরকে অনিশ্চিতের গহ্বরে ঠেলে ফেলে দিতেই ব্যস্ত ছিলেন। এটাই হল সত্য। স্বাধীনতার তিরিশ বছর পরে একথাই আমার মনে হচ্ছে।

ওই সময়েই আমরা বাজারে অনেক রকমের ম্যাপ বিকি হতে দেখি। বেল-স্টেশনের বাইরে। কোর্টের মাঠে। বটতলায়। সবুজ রঙে রাঙানো অনেক জেলাই তখন প্রস্তাবিত পাকিস্তানের ভেতরে। হিন্দু মহাসভা উগ্র কথাবার্তা বলছিল বটে। কিন্তু তাদের বিশেষ খদ্দের ছিল না।

স্বাধীনতার আগের বছর কলকাতায় ডাইরেকট অ্যাকশনের দিন আমরা খুলনায় স্কুল ইন্সপেকটর একরামুদ্দিন আহমেদের বাড়িতে বসে। একরামুদ্দিন আহমেদ ছিলেন নিম্নবিত্ত সংস্কৃতিবান বাঙালী মুসলমান পরিবারের কর্তা। তার ছেলে ফিরদৌসদা ছিলেন ছাত্র লীগের সম্পাদক। তার বাড়িতে বসে আমরা নিরুপদ্রবে পাকিস্তানের অসারত্ব নিয়ে কথা বলেছি। তখনো জানি না—ঠিক এক বছরের মাথায় পাকিস্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে যাবে। ঠিক এই সময়েই ইন্ডিয়ার বদলে একটা কথা চালু হোল—হিন্দুস্থান। বাঙালী হিন্দুরা কোনদিন হিন্দুস্থান বলতেন না। বলতেন ইন্ডিয়া—কিংবা ভারত। অথবা ভারতবর্ষ। হিন্দুস্থান কথাটা বিহারের দিককার।

১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট আমাদের বাড়ির ছাদে উঠলো ইন্ডিয়ার জাতীয় পতাকা ফিরদৌসদার বোন ফতিমা কোন পতাকা তুললো না ওদের ছাদে। ডেকে বললো, ও পতাকা তুলিসনে খোকন। নামায়ে নিতি হবে কদিন পরে।

আমরা বিশ্বাস করলাম না।

১৬ আগস্টও আমাদের ছাদে জাতীয় পতাকা।

১৭ আগস্ট বিকেলের ট্রেনে কলকাতার ইংরিজি কাগজ এল। তাতে বড় বড় করে লেখা—খুলনা ও যশোর পাকিস্তানে পড়েছে। মুর্শিদাবাদকে রাখতেই নাকি এই ব্যবস্থা।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা ফিরদৌসদাদের ছাদে পাকিস্তানের পতাকা উঠলো। আমরা আমাদের পতাকা নামিয়ে নিলাম।

তখন কাস্ট হিন্দুরা ভালো বেঙ্গলী

যে নাটক শুরুতেই করছে বাজীমাৎ—
যে ঝড়ের দাপটে কাঁপছে মহানগরী কলকাতা—

কেলম বাউন মঞ্চে (৩৫-৪১৩৫)

শিয়ালদা স্টেশনের উত্তরে মির্জাপুর স্ট্রীটের বিপরীতে কাইজার স্ট্রীটে
নিউ ইলোরা আর্টস্ নিবেদিত, এস্, পি, দাঁ প্রযোজিত

কালবৈশাখী

পরিচালনা— **শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়**

নাটক—বীরু মুখোপাধ্যায় | আলো—তাপস সেন | মঞ্চে—সুরেশ দত্ত
সঙ্গীত—অজয় দাস | শব্দ—হিমাদ্রী ভট্টাচার্য | ধ্বনি—আলেয়া
ব্যবস্থাপনায়—অনুপ গুপ্ত

শ্রেষ্ঠাংশে— বসন্ত চৌধুরী, নিলীমা দাস, চিন্ময় রায়, কল্পনা মুখার্জী, মুকুল ঘোষ, মাঃ পার্থ, গৌর চ্যাটার্জী, অমল, প্রণব এবং শমিতা বিশ্বাস ও শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

প্রতি বৃহস্পতিবার ও শনিবার সন্ধ্যা ৬।।টায়; রবিবার ও ছুটির দিন ৩টা ও ৬।।টায়।

প্রতি বুধবার রাত ৯-৩০ মিঃএ বিবিধ ভারতী শুনুন

করেও চাকরি পেতো না। বাবা কিছুকাল বাউতলায় হক সাহেবের স্টেনো-টাইপিস্ট ছিলেন। হকসাহেবের হস্তক্ষেপে আমার মেজোভাই চাকরি পেয়েছিলেন। ১৭ আগস্ট-এর রাতে লাল কেরোসিনের আলোয় গুরু-গম্ভীর স্বরে বাবা-মাকে বললেন, ব্যাপারটা বুঝতে একবার হকসাহেবের কাছে যাব্যো।

তা আর যেতে হয়নি।

কদিন বাদে পাঠান সোলজার এসে আমাদের বাড়ির নারায়ণ পুজোর বাসনপত্র বারান্দায় বের করে দেয়। বালুচিস্তানের হোমগার্ড আমাদের স্কুলের হেডস্যার হয়ে এলো। তাঁর থাকবার জন্যে আমাদের বাড়ি রিকুইজিশন হোলো। হিন্দু হেডস্যার অপশন দিয়ে সিউড়ি চলে গেলেন। নতুন হেডস্যারের পায়ে মোজাহীন বুট। বিকেল বেলা তিনি বাজার থেকে এক হাতে জোড়া য়োবগ ঝুলিয়ে ফিরে আসেন। খাঁটি মুসলমান হওয়ার জন্যে একদিন আমাদের ক্লাশের সবেদুল আর আসফাকুলকে উপদেশ দিলেন। ওরা তো হেসেই অস্থির।

তারপর একদিন বেনাপোল দিয়ে আমরা হিন্দুস্থান নামে একটা দেশে চলে এলাম। মায়ের হাতে ছিল খালি হরলিকসের শিশিতে ঢেঁড়শের বিচি। নতুন দেশের মাটিতে এসে পুঁতবেন। তখন শুনেছিলাম—খুলনা-যশোরে নাকি ৫১ পারসেন্ট হিন্দু। ৪৯ পারসেন্ট মুসলমান। কিন্তু এই অংকের মানুষ তো আমরা ছিলাম না। আমরা ছিলাম ৫১+৪৯ =১০০ পারসেন্ট ইণ্ডিয়ান বা বাঙালী।

এই নতুন দেশেও আমরা আছি—তা তিরিশ বছর হয়ে গেল। এখন ঠাট্টা হিসেবে শুনতে হয়—ওপারে নাকি সবারই আম-বাগান, দিঘি, চকমিলানো বাড়ি ছিল!

ভাবি—ভাগ্যিস—টাকি, আরামবাগ, তমলুক, বেলতলা হিন্দুস্থান বোড পাকিস্তান হয়নি! ভাগ্যিস খুলনা-যশোহর হিন্দুস্থান হয়নি! হলে ডাক্তারবাবু, উকিলবাবু, পেটিঅফিসারবাবুদের আমরা কী বলে ঠাট্টা করতাম।

প্রায় পঁচিশ বছরের ব্যবধানে ১৯৭১-এর ডিসেম্বরে খুলনা গিয়েছিলাম। শ্রীশ-নগরের নাম আকবরাবাদ। আকবর মিঞার ইঁটখোলা ছিল রাণাঘাটে। তিনি এক্সচেঞ্জ করে শ্রীশবাবুদের জায়গা জমি পেয়ে যান। সেখানেই তাঁর নামে নগর পত্তন।

পঁচিশ বছর বাদে ঠিক উল্টো। মুসলমান উকিল, ডাক্তার, মোক্তারদের বাড়ি সাবা শহরে। সবুরখান পলাতক। মুসলমান অধ্যাপক, মুসলমান প্রশাসক, মুসলমান প্রকাশক। বুঝলাম, পঁচিশ বছরের পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় কন্ট্রিবিউশন—মুসলমান মিডিলক্লাশ সৃষ্টি। অথচ এই সৃষ্টারা ছিলেন আসলে—এককালের বংগেসে পাত্তা না-পাওয়া বি-টিম—জন্মসূত্রে মুসলমান—নিবাস উত্তর ভারত, গুজরাট।

একাত্তরের ডিসেম্বরে দুজন হিন্দুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। একজন মোজাহীন; পায়ে সু পরেছেন। ধুতী লুঙ্গি করে পরা; গালে লম্বা দাড়ি। অন্যজন অবস্থাপন্ন আওয়ামী রাজনীতিকের ডানহাত এবং বে-নামায় সাবানের এজেন্সি করেন। এই দুজনই লেফ্‌ট-ওভার হিন্দুর তলানী। রূপসার তীরে হিন্দুদের শ্মশানের কোন দাহ হয় না। শ্মশানের কাছেই শিপইয়ার্ড। তার পাশেই সবুর খাঁরের জবরদখল জায়গার নাম—লবণচোরা। নামের সঙ্গে ব্যাপারটার যেন কোথায় যোগ আছে।

ব্যাডক্লিফ ইংরেজ। নেহরু-প্যাটেলের কাছে খুলনা যশোহর কিছুই না। আমাদের কাছে অনেককিছু। সাগরদাড়ি, রাড়ুলি-কাঠপাড়া, ষাট গম্বুজ—সবই জীবনের সঙ্গে জড়িত।

কারণ, আমি তো ৫১+৪৯=১০০ ভাগ ভারতীয়দের একজন। আমাদের ওপর বিনা অপরাধে ৫১ বা ৪৯-এর হিসেব চাপিয়ে দেওয়া হোল কেন? মানুষের জীবন। ইতি-হাস, ভাগ্য কেমন অনায়াসে সেদিন এলে-বেলেভাবে কয়েকজনের সিদ্ধান্তের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। জওহরকোট গার্মে ক্যালেন্ডারের নেহরু ছিলেন আমাদের মায়েদের হিরো। সেই হিরো যে অবলীলায়

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত —(যোগীন্দ্র নাথ বসু প্রণীত ও সুধময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত) ২৫-০০

শিশু-সাহিত্য সংগ্রহ (১ম)—ডঃ অশোক কুণ্ডু ২০-০০

ওভারহেড লাইন নির্দেশিকা —সান্যাল ও সান্যাল ১৫-০০

জলসরবরাহ প্রযুক্তি-বিদ্যা —নীহারকান্তি সামন্ত ১০-৮০

শুচি প্রযুক্তি-বিদ্যা— ঐ ১০-০০

বাস্তু বিজ্ঞান (Building Construction) —নারায়ণ সান্যাল ২০-০০

A HANDBOOK OF ESTIMATING Naryan Sanyal 15.00

INSTALLATION PRACTICE OF POWER CABLES IN INDIA — Sanyal 12.50

CONSTRUCTION PRACTICE OF OVERHEAD LINE IN INDIA — Sanyal & Sanyal 15.00

ANTHROPOLOGY AND SOME INDIAN PROBLEMS Nirmal Kumar Bose 36.00

THE LODHAS OF WEST BENGAL Dr. P. K. Bhowmick **60.00**

AGRARIAN WEST BENGAL THREE FIELD STUDIES Ranjit Kumar Gupta **30.00**

ASTROLOGY FOR THE MILLIONS Shakuntala Devi **8.00**

UNDER THE SHADOW OF THE CROSS — N. N. Sahay 120.00

মৃত্তিকা-বিজ্ঞান —যতীন্দ্রনাথ মজুমদার ২০-০০

প্রাথমিক উদ্যান বিদ্যা —বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ ১০-০০

ব্যবহারিক কৃষি বিজ্ঞান — ঐ ১০-০০

শাক-সব্জি চাষের কথা — ঐ ৭-০০

ফুলের বাগান — ঐ ১২-০০

বিঃ দ্রঃ—অগ্রিম ছাড়া ভি পি-তে বই পাঠান হয় না। অনধিক পনর টাকা মূল্যের পুস্তকের জন্য মূল্য অগ্রিম পাঠাইলে আমরা ডাকব্যয় বহন করি।

অশোক পুস্তকালয়

প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা

৬৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯

যাত্রী জগতের অনন্য জুটী

সহ-শিল্পিবৃন্দ

তাপসকুমার,

সুখরঞ্জন সরকার

বন্দনা দেবী

ইন্দিরা দে

ও শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রেমতোষ চক্রবর্তী

কৃষ্ণা চক্রবর্তী

যে নাম সংকীর্তনে বারবার মুখরিত হয়ে উঠেছে গ্রামবাংলার প্রতিটি আসর,

সেই ভক্তিরসপাথার উজ্জ্বলতম অধ্যায়ের নিঃসন্দেহে সার্থকতম প্রযোজনা—

মহাত্মা শিশির কুমার বিরচিত

অমিয়নিমাই চরিত

সংকলন নরেশ চক্রবর্তী

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের চমক জাগানো বর্ণাঢ্য পালা

বিষের ধোঁয়া

পালা/নির্দেশনা জ্ঞানেশ মুখার্জী

সুর/আবহ পঞ্চানন মিত্র

নৃত্য পরিকল্পনায় কেনেথ কুমার

গীতিকার উজ্জ্বল বিশ্বাস

স্বত্বাধিকারী/শ্রীবীরেন নট্ট পরিচালক অনিল রায় জেঃ ম্যানেজার/ধীরেন

কর্মসচিব/তারক দাস ব্যবস্থাপনা/রণজিত ভট্টাচার্য্য ম্যানেজার/অসিত মুখোপাধ্যায়

শ্রীনাথ নট্ট কোম্পানী

৩০৯, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬

ফোন ঃ ৫৫-৮৮৭৮

কী সব কাণ্ড করে বসে থাকলেন—আজকে তা ভাবলে গা শিউরে ওঠে।

পাকিস্তান হবার পর করাচি ইয়েল্ড ঐতিহাসিক ডেকে এনে বই লিখিয়েছে—ফাইভ থাউজান্ড ইয়ার্স অব পাকিস্তান। অথচ জিনিসটা তো আমাদের ক্লাশ থ্রি-র সময়কার। সেই বইয়ের পাতার অনায়াসে মহেঞ্জোদাড়ো, হরাপ্পা, আলেকজান্ডারকে নিয়ে নেওয়া হয়েছে। ইতিহাস ইতিহাস খেলাটা বেশ জমেছে!

অশোক, কণিষ্ক, আকবরও তো ইতিহাস ভূগোল নিয়ে দিব্যি করেকশো বছর খেলাধুলো করেছেন। নিজের নিজের শিলালিপি, স্ট্যাচু, মিনার, মসজিদ অনেক কিছু করেও তাঁরা ইতিহাস নামক আসল নদীর গতি পালটাতে পারেননি। তেমনিভাবে ভাবতে বসে মনে হয়—কয়েক হাজার বছরের ভারতের ইতিহাস ভূগোলের পাশে এই স্বাধীনতা, এই দেশ-বিভাগ, এই সীমান্ত পিলার কতই তুচ্ছ—কতই নগণ্য। জাতীয় পতাকা, কোর্ট-কাছারি, মুদ্রা, রাষ্ট্রধর্ম—আমরা ইতিপূর্বে পছন্দ হয়নি বলে কি পালটাইনি?

রূপসানদীর খেয়াঘাটে ৭১-এর ডিসেম্বরে খুলনা রেডিওর অ্যানাউনসারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সন্ধেবেলা। তিনি বলেছিলেন, আমার বাবা ট্রানজিস্টরে কলকাতা শোনেন আর রিপন কলেজের কথা ভাবেন।

আমি বলেছিলাম—কলেজটার নাম পালটে গেছে।

আমার বাবা ওখানে ফোর্থ ইয়ার অব্দি পড়েছেন।

জেলা স্কুলের হেডস্যার জানতে চেয়েছিলেন, ওয়াছেল মোল্লার গরম সুটের কাপড়ের গন্ধ কত করে?

আমি তখন চোখে দেখতে পাচ্ছিলাম—ইতিহাসের শুকনো বালিতে কণিষ্ক সম্রাটদের কুম্ভলকদফিসের কবন্ধ বাতিল স্ট্যাচুটি পড়ে আছে। কিসের সীমান্ত! কিসের ইতিহাস! কিসের ভূগোল!

আদি জেলা যশোরকে কেটেই খুলনার জন্ম। খুলনায় থাকতে বঙ্কিম সীতারাম লিখেছিলেন। সাতক্ষীরার ওল্ড ট্রেনে চড়ে চার ঘন্টার ভেতর কলকাতার বৈঠকখানা বাজারে চলে আসতো। খুলনার উল্লাসিনীতে চ্যাপলিনের গোল্ডরাশ দেখতে কলকাতা লা কলেজের ছেলেরা চার ঘন্টার মাথায় ট্রেনে এসে হাজির হোত।

এইতো সেদিনের কথা।

এইভাবে ইতিহাস ভূগোল পাল্টাতে আছে! আমার মেয়ে পশ্চিমবঙ্গের ম্যাপ আঁকতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছে। ও আঁকা যায় নাকি। কত কি নেই ম্যাপে।

আসলে আমরা কেউ ৪৯ নই। ৫১-৬ নই। আমরাই ১০০।

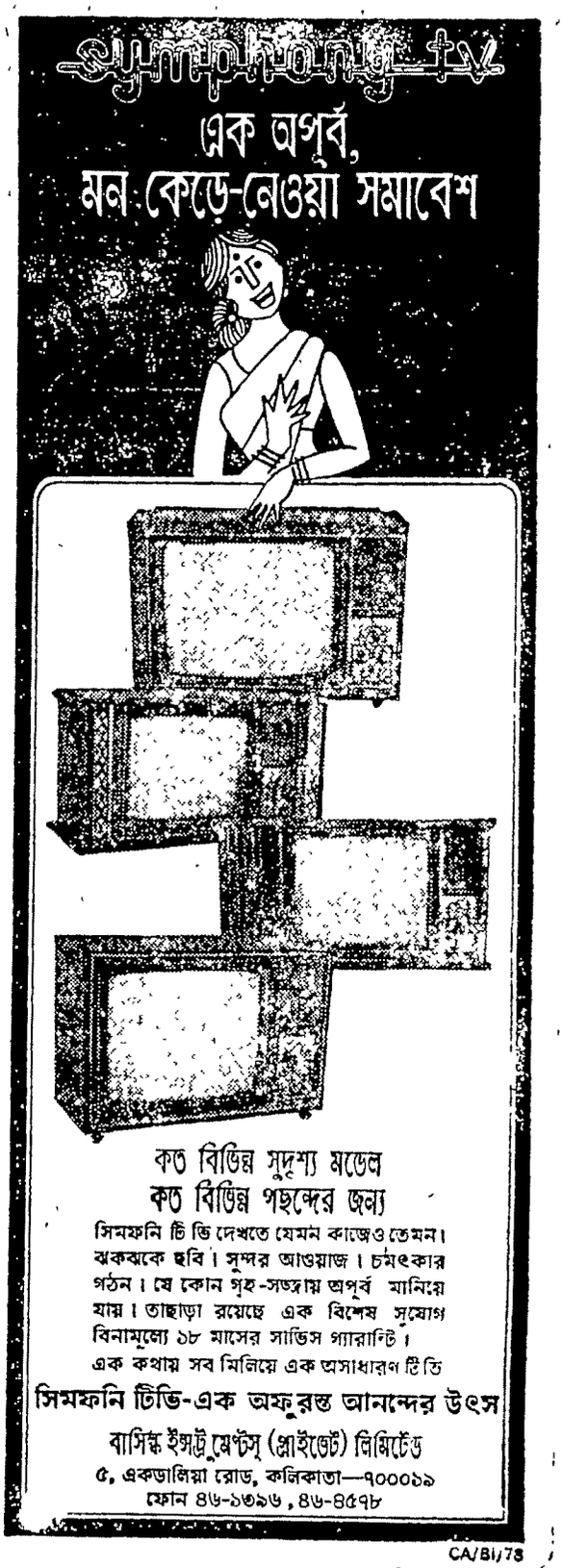

CA/BI/78

কমল চৌধুরী

দেশ বিভাগ ঃ চব্বিশ পরগণা ও নদীয়ার রূপান্তর

পঁয়ত্রিশ বিঘে জমির মালিক ঈশ্বর মারা গেল চটের বিছানায়। কাঠের ওপর ন্যাকড়া জড়ান বালিশ। দাহ করার পয়সা ছিল না, শোক করার লোক ছিল না। নদীর জলে বিসর্জন হল ঈশ্বরের। অবশেষে তাই মেনকা সতী আর ময়না বাজারের মেয়েছেলে হয়ে গেল।

এমন কি ঘটবার কথা ছিল? মানুষের ভাবনা, স্বপ্নে আর বাস্তবে বড়ই অমিল। মানুষ মানুষকেই বিশ্বাস করে। মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ। কিন্তু মানুষই মানুষকে শোষণ করে। জবাই করে।

এক রাতের অন্ধকারে ওদের গোলপাতার ছাওয়া ঘরে আগুন লাগল। ঈশ্বর বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে রাত কাটাল রাস্তায়। গাছতলায়। সকালে পেল বাপের দেওয়া ঘর-বাড়ির পোড়া ছাই। যে ভিটেয় লক্ষ্মী-পুজো হত, নতুন ফসল উঠলে পিঠে পুলির আয়োজন হত। তাকে পিছনে ফেলে অন্ধকারের পথে এগিয়ে চলল ঈশ্বর। দু' মাস কাটাল বসিরহাট স্টেশনে। ছেলে দুটো খিদেয় কাঁদে। মেয়ে দুটো বড়। বোঝে, তাই কিছু বলে না। মেনকার গলা শোনা যায় না। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে ঈশ্বরকে দেখে। ঈশ্বর পাগল হয়ে ফেরে। বাবুদের মোট বয়। জেলেদের মাছ টেনে তোলে। খেয়ে, না খেয়ে দিন কাটে। বিছানাপত্তর, বাসন-কোসন কিছুই নেই। পঁয়ত্রিশ বিঘে জমির মালিকের বিছানা এখন ছেঁড়া চট। পুরোন ছেঁড়া কাপড়ের দু' চারটে কাঁথা। দুটো মাটির হাঁড়ি। চারটে মাটির থালা। দুটো টিনের কৌটো।

সেখান থেকে এল শিয়ালদহ। মেয়ে সতী আর ময়নার তখন বাড়তি বয়স। বউ মেনকার শরীরে তখনও ভাওন ধরে নি। তিন-চার রাত ওরা ঘুমোতে পারল না। শহরের ছিঁচকে শয়তান আর পুলিশের দাপটে পালাতে হল ওদের।

এল বারাসাত। তারপর হাসনাবাদ। বসিরহাটে ছেঁড়া চটে শুয়ে মরল ঈশ্বর। মেনকা কাঁদল না। কাঁদবার মত মনের জোর ছিল না। মেয়ে দুটোকে সামলাতেই সে ব্যস্ত। চারদিকে ছোকরাদের ঘুর ঘুর। কি করে! এর মধ্যে আবার এই লোকটা চলে গেল।

ছেলে দুটো কাজ করতে গিয়ে চুরি শিখল। মেনকা কাঁদল না। বাসন মাজে। কাপড় কাচে। ছেঁড়া কাপড়ে তালি মেরে মেরে আর চলে না। ছেলে দুটো পালাল। মাসের পর মাস গেল। ওরা আর ফিরল না।

আবার এল বারাসাত। লাইনের ধারে ছাপড়ায় থাকে। মেনকাকে তখন সবাই ডাকে সতীর মা। এই সতীকে একজন নামাল গলের ব্যবসায়। সতী হাসনাবাদ থেকে চাল আনে। নিয়ে যায় শিয়ালদায়। বোজ যায় আসে। একদিন ফিরল না। এক-দুই তিন দিন কাটল। ফিরল সতী। চোখ বসে গেছে। মুখে দাগ। চুল উস্কো-খুস্কো। মা বুঝল, মেয়ে শিকার হয়েছে। বাঁচাল হাসপাতালের দিদিমণি।

সতী আর ময়নাকে নিয়ে মেনকা গেল মালতীপুর। লাইনের ধারে থাকে। বাসন মেজে, কয়লা কুড়িয়ে, চুরি করে পেট চালায়। দিনের পর দিন না খেয়ে কাটে। তবু বেঁচে থাকে।

একজন সতীকে কাজ জুটিয়ে দেয় বারাসাতে। বাসন মাজা কাপড় কাচা ঝিয়ের কাজ। তারপর ময়না আসে। আসে মেনকা। তিনজন ভোরের ট্রেনে এসে নামে বারাসাতে। অষ্টার বাড়িতে কাজ করে ওরা। চা আর রুটি খেয়ে কাটে সারাদিন। বিকেলে কাজ সেরে যায় শরীর বেচতে। ইদানিং চাহিদা বেড়েছে। আরও অনেক মেয়ে বউ আসছে। দল বড় হচ্ছে। গ্রামে অভাব বাড়ছে, শহরতলীতে ওরা এসে জমা হচ্ছে। বড়-বাজারের ধারে, কোর্টের আশপাশে, অন্ধকার নামলেই অন্য শিকারীরা তৎপর হয়ে ওঠে। কেবল বাজারের লোক নয়, আজকাল বেশ ভদ্রঘরের ছেলেরাও আসছে।

মেনকা সতী ময়না নষ্টা পঁয়ত্রিশের ট্রেনে ফিরে যায় মালতীপুর তখন সেখানে রাত অনেক।

সকাল হয়। দিন বাড়ে। বোদ, ঝড়, বৃষ্টি, শীত। ঋতুর পর ঋতু আসে। জ্যোৎস্না ভরে যায়। নামে অমাবস্যা। মানুষের মন বদলায়। দিন বদলায়। এক সতী, এক ময়না অনেক হয়ে যায়। সংখ্যায় গোনা যায় না। ওরা আসে শরীরের ক্ষুধা মেটাতে নয়। পেটের জ্বালায় ইজ্জত বিক্রি করে। লজ্জা ধুয়ে ধুয়ে যায়।

ওদের কাছে ছেলের দাম নেই। ছেলেরা চোর হয়ে যায়। মেয়েরা পয়সা আনে। মাকে দেখে। মা দেখে মেয়েকে।

লাইন লাইন মালতীপুর বাঙলার হাজার বসতি জুড়ে। মেনকা সতী ময়নার দল এগিয়ে চলেছে সার সার। সামনে অন্ধকার পিছনে অন্ধকার।

অন্ধকার অনেক গভীর। তিন ইঁটের উনুনে সার সার হাঁড়ি চাপে। চারদিকে কাঁচা কাঠের কটু গন্ধ।

মার সঙ্গে নামে দুই মেয়ে। কোন দিন হাঁড়ি চাপায় কোনদিন না। স্কুলে গিয়ে নামে শরীর ধুয়ে কাপড় বদলায়। মাকে জড়িয়ে শুয়ে পড়ে সতী ময়না। মেনকা মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখে ঈশ্বরকে। যে ঈশ্বর একদা ছিল মাটির মানুষ। যার ছিল যৌবন। ছিল স্বপ্ন। বাঙালীর এই যৌবন, এই স্বপ্নের সমাধি রচনা করল স্বাধীনতা। দুর্ভেদ্য অন্ধকারের প্রাচীর নেমে এল জীবনে।

১৯৪৭ খ্রীঃ। গণভোট নেওয়া হল না। একটি জাতি একটি দেশ হল দু টুকরো। বাঙালীর আর একবার মৃত্যু হল। বাস্তু-

নৈতিক মীমাংসা হল একটা পাঁচিল তুলে দিয়ে। বাড়ির উঠোন, ফুলের বাগান, পিতৃপুরুষের ভিটে, গ্রাম, গঞ্জ, হাট, নদী-নালার ওপর দিয়ে সীমানা টেনে দেওয়া হল। বলা হল, তোমরা হিন্দু। তোমরা মুসলমান। সীমানার দু' ধারে তোমাদের বাস। এক জায়গার পাশাপাশি তোমরা বাস করতে পাবে না। তোমাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি জীবন সম্পূর্ণ আলাদা, এই পাঁচিলের দু' ধারে তোমাদের বাস। বাঙলার প্রধান ফসলী এলাকা চলে গেল পাকিস্থানে। গঙ্গার পূব পাড়ের সামান্য অংশ পড়ল পশ্চিম বাঙলায়। দেশের উত্তরাংশের সঙ্গে দক্ষিণের যোগ হল ছিন্ন। কলকাতার সঙ্গে উত্তরের সব নদী পথগুলো চলে গেল পূর্ব পাকিস্থানে। মাছের ভেড়িও ওপারে। চট-কলের কাঁচা মাল বন্ধ হয়ে গেল। সব থেকে বড় কথা বাঙলাভাষীদের গরিষ্ঠ অংশই পড়ে গেল পাকিস্থানে। যার ফলে বই বাজার, ছায়াছবির বাজার গেল নষ্ট হয়ে।

পূর্ব বাঙলার লক্ষ লক্ষ হিন্দুর জীবনে নেমে এল অতল অন্ধকার। মাতৃ-ভূমির মায়া কাটিয়ে, চোখের জল ফেলে প্রাণ বাঁচাতে ছুটল মানুষ। রাজনৈতিক নেতারা হল সাম্প্রদায়িক. উত্তেজনা। জীবাংসার বলি হল হাজারে হাজারে। নারী শিশু বৃদ্ধ কেউ কারো দিকে ফিরে তাকায় না। বাঙালী ভাগ হয়ে গেল। দীর্ঘ ঢেকাল্লের একটি অধ্যায় সমাপ্ত হল।

সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিম বাঙলার ভূখণ্ডে ঢুকল ওরা চোরের মত। ছিন্নমূল নিঃস্ব মানুষ পিতৃপুরুষের বাস্তুভিটার মায়া কাটিয়ে ছুটে ছিল এপার বাঙলায়। সব হারানোর বোবা যন্ত্রণা, পৈশাচিক নির্যাতনের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা আর সামনে ছিল অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। যে মাটি ছিল মায়ের মত, যার ফসলে ওদের জন্মগত অধিকার, সেখানে ওরা পরবাসী। ঝোপে-ঝাড়ে বিলে, অনাবাদী ভূখণ্ডে গড়ে উঠল নতুন বসতি। যে সব জমি আগাছা ভরা, পরিত্যক্ত, যেখানে কোনদিন ভুল করেও যায় নি মানুষ, বর্ষা ডেকে আনে প্রাণঘাতী বন্যা, সেখানে ধীরে ধীরে গড়ে উঠল বসতি। সরকারী অনুদানের ছিটে-ফোঁটা করুণা জুটল কপালে। কিন্তু বেঁচে থাকতে, মাটির ওপর শক্ত দু' পায়ে দাঁড়াতে তার ভূমিকা ছিল নগণ্য। যারা এল দান হাতে, ভাগ্য, ফিরল তাদেরই। মানুষকে মানুষ কিভাবে বঞ্চিত করে, না খাইয়ে হাত-পা বেঁধে ঠান্ডা মাথায় খুন করে, তার ইতিহাস বক্তাক্ত না হলেও মর্মান্তিক। একটি জাতিকে নিষ্ঠুরভাবে মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র যে কত নিখুঁতভাবে অনুসরণ করা হয়েছিল তার প্রমাণ সেদিনের অন্ধকারময় ইতিহাস। বাঙালীকে সেদিন ছিঁড়ে খেয়েছে বাঙালী-অবাঙালী। তাদের পরিণত করা হল একটি জড়পিন্ডে। অক্ষম, অপদার্থ, অলস এক জেনারেশন। যাদের কোন ভূমিকা নেই। বেঁচে থাকার কোন দায়িত্ব নেই। মানুষের যাবতীয় সদ্‌গুণকে পিষে মারা হল। ওদের পরিচয় হল উদ্বাস্তু।

অথচ ওদের, নতুনভাবে জীবন গড়ে তোলবার রঙীন স্বপ্ন ছিল। দুঃসহ যন্ত্রণার মবিসা। সামনে বসতিহীন জঙ্গলময় অফুরন্ত অনাবাদী জমি। জবর দখল করে গড়ে উঠতে লাগল বসতি কলোনি। স্কুল, পাঠশালা, কলেজ, লাইব্রেরী, ক্লাব, খেলার মাঠ। রাস্তা তৈরি করল। সরকার তখন বোথাস। জনবিরল ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ল মানুষ। ঐসব জমির মালিক, স্থানীয় মানুষের সঙ্গে শুরু হল সংঘাত। সাংস্কৃতিক বৈপরীত্য ব্যবধানের মানুষদের সঙ্গে এপারের বাঙালীকে মুখোমুখি দাঁড় করাল। নিঃসম্বল ও কপর্দকহীন হলেও, তারা উদ্যমহীন ও শ্রমবিমুখ ছিল না। তারা কেবল মাথা গোঁজবার ঠাঁই চায় নি— চেয়েছিল জীবন; চেয়েছিল জীবিকা, শিক্ষা—মানুষের মত বাঁচবার অধিকার। কিন্তু কী পেল ?

ওরা এল। সেদিন দুই বাংলার মাটি, রক্ত হাওয়ায় রাজনীতির বিষ হয়ে বিষাক্ত হাওয়া ছড়িয়েছিল, সীমানার দু' পারে আবদ্ধ জীবন নিয়ে যে খেলা শুরু হয়েছিল, আজও তা শেষ হয় নি।

স্বপ্নের ছবি সামনে রেখে দেশ স্বাধীন হল। বাঙলা আর পাঞ্জাব হল দুটি টুকরো। ১৯৪৭ সালের ১৬ জুলাই গান্ধীজী প্রার্থনা সভায় ভাষণে বলেছিলেন : '....কল্পিতভাবে বা বাস্তবে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে যে সব হিন্দু পাকিস্তানে তাদের নিজ গৃহে থাকতে পারবে না, তাদের একটা সমস্যা আছে। তাদের কাজকর্ম বা গতিবিধিতে যদি বাধা সৃষ্টি করা হয়, বা তাদের নিজেদের প্রদেশে যদি তাদের সঙ্গে বিদেশীর মত আচরণ করা হয়, তাহলে তারা সেখানে থাকতে পারবে না। সে ক্ষেত্রে ভারতীয় ইউনিয়ন সম্পর্কিত প্রদেশের নিশ্চিত কর্তব্য এমন উদ্বাস্তুদের দু' হাত খুলে গ্রহণ করা এবং সকল প্রকার যুক্তিসঙ্গত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া। তাদের অনুভব করাতে হবে যে তারা অপরিচিত দেশে আসে নি।'

আবার জওহরলাল নেহরু তাঁর ভাষণে বললেন : 'পূর্ববঙ্গে যারা বিপন্ন হবে, তাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য হবে তাদের নিজেদের দেশেই তাদের রক্ষার ব্যবস্থা করা, আর যদি অন্য উপায় না থাকে এবং বিশেষ অবস্থায় প্রয়োজনে হয়ে পড়ে আমাদের নিজেদের দেশেই তাদের আশ্রয় দেওয়া, পূর্ব পাকিস্তানে যারা সংখ্যালঘু তারা নিশ্চিত আমাদের দায়, এই অর্থে যে তারা যেন নিরাপদে থাকতে পারে, আর তা যদি না সম্ভব হয় তাদের নিরাপদ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।'

কিন্তু এই ঘোষণার সঙ্গে পরবর্তী-কালের সরকারী সিদ্ধান্তে কোন সাদৃশ্য ছিল না। স্বাধীনতা ঘোষণার পরেই পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দেয়। তখন পাকিস্তান সরকার ও ভারত সরকার মানুষ ও সম্পত্তি বিনিময় করলেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত রূপায়িত হল না।

১৯৪৭ খ্রীঃ, ১৫ অগাস্ট জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন : 'রাজনৈতিক সীমান্ত সৃষ্টির ফলে আমাদের যে সব ভ্রাতা ও ভগ্নীর সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটেছে এবং যাঁরা বর্তমানে এই নবলব্ধ স্বাধীনতার অংশীদার হতে পারছেন না তাঁদের কথা আমরা চিন্তা করছি। তাঁরা আমাদেরই আপনজন এবং যা কিছু ঘটুক না কেন, তাঁরা আমাদের আপনজন থাকবেন এবং আমরা তাঁদের সুখ দুঃখের সমভাগী থাকব।'

তিনি ১৯৫০ খ্রীঃ ২৩ ফেব্রুয়ারি বললেন : 'পাকিস্তানে কোন শোচনীয়

সুতী, পশম, সিল্ক, টেরিন
কাচার লিকুইড ডিটারজেন্ট
Glitter
কনজিউমার প্রোডাক্টস
২৮এ, এস এন দাস লেন, কলি—৫০
পরিবেশক :
পাপু এন্টারপ্রাইজ
৪৭।৩৭, আর কে ঘোষ রোড, কলি-৫০

"ফটো বিউটি"
ভালো ছবি তুলতে
ফটো বিউটিতে আসুন
হাওড়ার একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
৪৩; নেতাজী সুভাষ রোড; হাওড়া। ফোন : গৃহ ৬৭-২২১৬
অফিস : ৬৭-৪৫২৬

ব্যাপার ঘটলে সেটা আমাদের দেশবাসীদেরও বিশেষভাবে প্রভাবিত করে এবং তার জন্যই সে সব ঘটনার প্রতি আমরা উদাসীন থাকতে পারি না। পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অভিপ্রায় আমাদের নেই। কিন্তু পাকিস্তানের বহু নরনারীকে অবর্ণনীয় দুঃখ ও নির্যাতন ভোগ করতে দেখেও আমরা উদ্বেগ বা সমবেদনা বোধ করব না, এমন কথা বলা সম্পূর্ণ নিরর্থক।'

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কী দেখা গেল? বুদ্ধিহীন, নীতিহীন সরকারী ব্যবস্থা, যা নির্মমভাবে স্বার্থপুষ্ট স্বেচ্ছাচার মাত্র।

১৯৫৭ খ্রীঃ ১৩ নভেম্বর জওহরলাল নেহরু লোকসভায় ভাষণে বললেন : 'পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে যে প্রতিশ্রুতি ও দায়িত্ব গ্রহণের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল সেটা অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আমরা বহন করতে পারব না। পূর্ব পাকিস্তানে যে লক্ষ লক্ষ সংখ্যালঘু রয়েছেন তাঁদের ক্ষেত্রে এই প্রতিশ্রুতি কার্যকর হবে না।... ভারত সরকার কিংবা কোন সর্বভারতীয় নেতা কোন সময় এমন কোন প্রতিশ্রুতি দেন নি যে, পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের দায়িত্ব আমরা অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ পর্যন্ত বহন করব। এটা অসম্ভব ব্যাপার।'

প্রধানমন্ত্রীর জবাবী ভাষণে বিমলচন্দ্র ঘোষ সেদিন বলেছিলেন : 'প্রধানমন্ত্রীর এই কথায় আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হলাম যে, পাকিস্তান থেকে ভবিষ্যতে যাঁরা উদ্বাস্তু হয়ে আসবেন তাঁদের সম্পর্কে কোন আশ্বাস দেওয়া হয় নি। আমি প্রধানমন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, দেশ বিভাগের সময় দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দ বলেছিলেন যে, পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের অছিরূপে আমরা নিজেদের গণ্য করব। যদি তাঁরা নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অবস্থাগতিকে বাধ্য হয়ে দেশত্যাগ করে চলে আসতে চায় তাহলে তাদের দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করব। আজ স্বাধীনতা লাভের পর আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করছি। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, উদ্বাস্তুদের আগমনে বাধা দেওয়া হবে না, কিন্তু তাদের সাহায্যও দেওয়া হবে না। প্রধানমন্ত্রী কি চান যে, তারা ভিখারীর মত এসে রাস্তায় মারা যাক?'

প্রকাশ্যে না বললেও, সম্ভবত তাঁরা চেয়েছিলেন একটা ভিখারী জেনারেশন সৃষ্টি করতে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বাঙালী যাতে আর কোনদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে —তার সবরকম পাকাপাকি ব্যবস্থাই করা হয়েছিল। এর জন্য কলকাঠি নাড়বার দায়িত্ব ছিল সে সময়কার পুনর্বাসন মন্ত্রী মেহের-চাঁদ খান্নার ওপর। তিনি নিজে ছিলেন একজন পশ্চিম পাকিস্থানী উদ্বাস্তু। পূর্ব বাঙলার উদ্বাস্তু আগমন বন্ধের জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। ১৯৫৭ খ্রীঃ ৩০ অক্টোবর দার্জিলিং শহরে পুনর্বাসন মন্ত্রিদের সম্মেলনে সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ডিসেম্বরে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় তখনকার উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন বললেন, ইতিমধ্যে যাঁরা এসে পড়েছেন, তাঁদের পুনর্বাসনের জন্য নতুন শরণার্থী আসা বন্ধ করা দরকার। তখন কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব ছিল ৩৫ হাজার কৃষিজীবী শরণার্থীর পুনর্বাসন। খান্নাজীর প্রয়াস এগিয়ে চলল। ১৯৬০ সালে পশ্চিম বাঙলার সমস্ত উদ্বাস্তু ক্যাম্প তুলে দিয়ে এক বছরের মধ্যে পুনর্বাসন বিভাগ বন্ধের ব্যবস্থা করলেন।

পশ্চিম বাঙলার তখনকার কংগ্রেস নেতারা খান্নাজীর এই ব্যবস্থা বদলাতে পারেন নি। তখন দন্ডকারণ্যে পাঠান হয় মাত্র তিন হাজার পরিবারকে। আর পশ্চিম বাঙলায় থেকে যায় বার লক্ষ শরণার্থী। অবশ্য ১৯৫৮ খ্রীঃ এপ্রিল থেকে শরণার্থীদের জন্য মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা চালু হলেও, তার পরের চার বছরে পূর্ব বাঙলা থেকে এসে হাজির

প্রকাশিত হ'ল প্রকাশিত হ'ল

বিপ্লবী নিকেতনের উদ্যোগে শৈলেশ দে সম্পাদিত বিপ্লবী সংকলন গ্রন্থ

অগ্নিযুগ ২৫-০০

১৯০৮ থেকে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ (অরবিন্দ থেকে নেতাজী) পর্যন্ত মৃত্যু-ভয়হীন বিপ্লবীদের অবিশ্বাস্য কাহিনী তাঁদের নিজেদের লেখনী থেকেই জানুন।

শৈলেশ দের স্বাধীনতা বিপ্লবের ভুলে যাওয়া কাহিনী

ইতিহাস মনে রাখেনি ১০.

শপথ নিলাম (২য় সং) ৬. প্রজাপতি মন ১০.

দক্ষিণারঞ্জন বসুর

আত্মচরিতে সমাজচিত্র ১২.

গ্রন্থ সিরিজের ভারত খন্ড (প্রথম পর্ব)

আবদুল জব্বারের নতুন সাড়া জাগানো উপন্যাস

অলৌকিক প্রেমকথা ২০.

রাতপাখির ডাক ১২.

নটরাজনের বৃন্দাবনলীলার চিরনূতন কাহিনী

প্রেম অভিসারে ১২.

প্রমিলা মহল ১০.

ছোটদের অভিনব গ্রন্থ সিরিজ

বীরু চট্টোপাধ্যায়ের লোমহর্ষক কাহিনী

অরণ্যের শয়তান ৫.

অমরনাথ রায়ের সেরা গল্প সংকলন

বিশ্বের সেরা গল্প ৪.

রাশিয়ার ভালো ভালো গল্প ৫.

আকস্মিক আবিষ্কারের গল্প ৩.

বীরবলের সরস গল্প ৩.

মনীষীদের ছেলেবেলা ৫.

বর্ধমান সরকারের আবিষ্কার কাহিনী

ভৌগোলিক আবিষ্কারের কাহিনী ৪.

এ সি সরকারের ম্যাজিক শেখানোর গল্প

গল্পে ভরা যাদুর মায়া ৫.

অশোক সী-এর রূপকথার গল্প

ধবলপুরীর রাজকন্যা ৫.

রমেশ মজুমদারের মজার গল্প

ফুলপরীর দেশে ৫.

পরিচয় গুপ্তের হাসির গল্প

পাতালে লম্বুদা ৩.

মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুপ্তের

সমাচার দর্পণ ৫.

পূর্ণ প্রকাশন

৮এ; টেমার লেন, কলিঃ-৯, ৩৪-৯৫৯২

হয় ৫৫ হাজার শরণার্থী। তারা কিন্তু কোন সরকারী সাহায্য পেলেন না। মানবিক সমস্যাকে হত্যা করার সুচতুর চক্রান্ত প্রতিটি পর্যায়েই সফল হয়ে যাচ্ছিল।

সরকারী ডোলে পেট চালান দায়। শরণার্থীরা তখন যেভাবেই হোক, বেঁচে থাকার তাগিদে নেমে পড়েছে। কেউ রিকশা টানছে, মোট বইছে কেউ কেউ। সুতরাং কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন বিভাগ স্কিমিনিং-এর ব্যবস্থা করলেন। এইসব শরণার্থী ক্যাম্পবাসী ৫১ হাজার মানুষকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। অথচ ১৯৫৮ খ্রীঃ ৪ জুলাই কলকাতায় কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিম বাঙলা সরকারের মধ্যে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ঃ (১) পশ্চিম বাঙলার বিভিন্ন ক্যাম্পে যে ৪৫ হাজার উদ্বাস্তু আছে তার দশ হাজারকে পুনর্বাসন দেওয়া হবে পশ্চিম বাঙলায় বাকি ৩৫ হাজারকে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম বাঙলার বাইরে পুনর্বাসন দেবেন। (২) ক্যাম্পবাসী শরণার্থীদের দু মাসের মধ্যে একবার প্রস্তাব গ্রহণ করতে হবে, প্রস্তাব গৃহীত না হলে দু মাস পরে ছয় মাসের ডোলের সমান টাকা দিয়ে তাদের বের করে দেওয়া হবে ক্যাম্প থেকে। ১৯৫৯ খ্রীঃ ডিসেম্বরে ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় সরকার যে পশ্চিম বাঙলার ক্যাম্প খালি করে দণ্ডকারণ্যে যাও। এইসব ক্যাম্প তুলে দেওয়া হবে ১৯৬১ খ্রীঃ৩১ মার্চ।

অবশ্য পশ্চিম বাঙলা বিধানসভার এর বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল সর্বসম্মতিক্রমে ১৯৬০ খ্রীঃ ১ এপ্রিল। কিন্তু খান্নাজী অনেক চতুর। পুনর্বাসন দপ্তরটি গুটিয়ে ফেলার প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায়। পশ্চিম বাঙলা সরকারের ওপর এসে পড়ল ১২ লক্ষ শরণার্থীর দায়িত্ব। দপ্তর তুলে দেওয়া হল। তখনও পূর্ব পাকিস্থানে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ৯২ লক্ষ। ১৯৬৪ সালের বীভৎস দাঙ্গার পর তাদের অনেকেই এপারে ছুটে আসতে থাকে। বাঙলা দেশে মুক্তিযুদ্ধ বহুমানের অভ্যুত্থানের সময়ও যে ব্যাপক শরণার্থীর আগমন ঘটেছিল তার দায়ও বহন করতে হয়েছিল পশ্চিম বাংলা সরকারকে।

ক্রাউন
টেলিভিসান !!
A/C, D/C or Solid State
স্পষ্ট ছবি
আর মিষ্টি আওয়াজ
"ক্রাউনটিভি"
তাই "টিভি-সরতাজ" !
এছাড়া আমাদের রয়েছে সুকলার রেডিও, রেকর্ড প্লেয়ার, বেতার ট্রানজিস্টার রেডিও, টেপ্ রেকর্ডার, স্টিরিওগ্রাম ইত্যাদি ইত্যাদি।
মেরামতের সুবন্দোবস্ত তো আছেই।
রেডিও এণ্ড ফটো স্টোরস্
৬৫নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিঃ—১৩
ফোন : ২৬-৮৫৫৩

প্রাথমিক অবস্থায়
অর্শের
জ্বালা-যন্ত্রণা
থেকে
আরাম পেতে
বিশ্বস্ত
হ্যাডেনসা
মলম
ব্যবহার করুন-
অস্ত্রোপচার না
করলেও চলে !
3651 BEN

।। ২ ।।

ঝাঁকে ঝাঁকে ওরা আসছিল। মানুষের পর মানুষ। পায়ে হেঁটে সীমান্ত পেরিয়ে বনগাঁ বা বানপুর পেরিয়ে আসত। সেত্রাতের পর সেত্রাত। অবিশ্রাম। বৃদ্ধ, অথর্ব, নারী, শিশু। একান্ত গৃহপালিত প্রাণী কারও কারও সঙ্গে। বিছানা, মাদুর, কিছু আসনকোসন। ন্যাকড়ায় বাঁধা পোটলা। মুণ্ডি চিঁড়ে। চোখেমুখে আতঙ্ক।

দীর্ঘ পথ পেরিয়ে নদীনালা ছাড়িয়ে আসতে পথের ধারে ঢলে পড়ছে অনেকে। সীমান্তে ওদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে বড়ার স্লিপ।

সেদিনের শিয়ালদহ ভাবতে পারেন। সেই নারকে থেকে বাঙালীকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেনি কেউ। জন্ম মৃত্যু এক শয্যায়। ইঁটের উনুন। চারদিকে কাঁচা কাঠের পোড়া গন্ধ। মলমূত্র ছড়ান। কাঁথায় শুয়ে মরছে কোলের শিশু অথবা বৃদ্ধ। জন্ম নিচ্ছে ভবিষ্যতের নাগরিকত্বহীন ভারতবাসী। দান খয়রাতে চলত। সরকারী ডোল আসত। মাঝে মাঝে লরিতে তুলে নিয়ে যাওয়া হত বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে। স্রোত বহুর ধরে ১৯৫৬ খ্রীঃ পর্যন্ত শিয়ালদহ স্টেশন ও তার আশপাশে ছড়িয়ে ছিল প্রায় পাঁচশত শরণার্থী পরিবার। পরে এদের একদলকে নিয়ে যাওয়া হয় টালিগঞ্জের ইন্দুলোক স্টুডিওতে। আর এক দলকে নেওয়া হয় কাশীপুরে এক চটকলে।

পশ্চিম বাঙলা সরকারের মধ্যে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ঃ (১) পশ্চিম বাঙলার বিভিন্ন ক্যাম্পে যে ৪৫ হাজার উদ্বাস্তু আছে তার দশ হাজারকে পুনর্বাসন দেওয়া হবে পশ্চিম বাঙলায় বাকি ৩৫ হাজারকে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম বাঙলার বাইরে পুনর্বাসন দেবেন। (২) ক্যাম্পবাসী শরণার্থীদের দু মাসের মধ্যে একবার প্রস্তাব গ্রহণ করতে হবে, প্রস্তাব গৃহীত না হলে দু মাস পরে ছয় মাসের ডোলের সমান টাকা দিয়ে তাদের বের করে দেওয়া হবে ক্যাম্প থেকে। ১৯৫৯ খ্রীঃ ডিসেম্বরে ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় সরকার যে পশ্চিম বাঙলার ক্যাম্প খালি করে দণ্ডকারণ্যে যাও। এইসব ক্যাম্প তুলে দেওয়া হবে ১৯৬১ খ্রীঃ৩১ মার্চ।

অবশ্য পশ্চিম বাঙলা বিধানসভার এর বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল সর্বসম্মতিক্রমে ১৯৬০ খ্রীঃ ১ এপ্রিল। কিন্তু খান্নাজী অনেক চতুর। পুনর্বাসন দপ্তরটি গুটিয়ে ফেলার প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায়। পশ্চিম বাঙলা সরকারের ওপর এসে পড়ল ১২ লক্ষ শরণার্থীর দায়িত্ব। দপ্তর তুলে দেওয়া হল। তখনও পূর্ব পাকিস্থানে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ৯২ লক্ষ। ১৯৬৪ সালের বীভৎস দাঙ্গার পর তাদের অনেকেই এপারে ছুটে আসতে থাকে। বাঙলা দেশে মুক্তিযুদ্ধ বহুমানের অভ্যুত্থানের সময়ও যে ব্যাপক শরণার্থীর আগমন ঘটেছিল তার দায়ও বহন করতে হয়েছিল পশ্চিম বাংলা সরকারকে।

২৪ পরগণার পূর্ব দিকে গড়ে উঠল বিভিন্ন আশ্রয় শিবির। বসিরহাটের চন্ডীপুর, বনগাঁর বাগদা ও ট্যাংরা গ্রামে তিন হাজার মানুষের থাকবার ব্যবস্থা হল। মুলী বাঁশের বেড়ায় মাটির প্রলেপ আর ওপরে টিনের চাল। বানিয়াটের বৃপ্রশ্রী পল্লীতে স্থান পেল পাঁচ হাজার মানুষ। কুপার্স ক্যাম্পে জায়গা হয়েছিল ৪০ হাজারের। এখন থেকে পাঠান হত উড়িষ্যা ও বিহারে। মুদ্ধের সময় ধর্মতলিখায় তৈরি হয়েছিল ১০টি নিসেন হাট। আরও কিছু ব্যারাকের মত ঘর তৈরি করে স্থান দেওয়া হয়েছিল তিন হাজার শরণার্থীকে। আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যা পৌঁছায় সত্তর হাজারে। খুলনা থেকে বসিরহাট সীমান্তে ইটিন্ডাঘাটে ইছামতী নদী পেরিয়ে এপারে এসে ঢুকে পড়ে অনেকে। ইটিন্ডাঘাটে খোলা হয় আশ্রয় শিবির। কৃষ্ণনগরের উত্তরে জলঙ্গী নদী পেরিয়ে ছিল যুদ্ধকালীন বিমানঘাঁটি। তার রানওয়ে আর ব্যারাকে খোলা হল আশ্রয় শিবির। এখানে আশ্রয় পেল ষাট হাজার শরণার্থী। ত্রিপুরা আর উড়িষ্যায় ২৫,০০০, বিহারে ৫০,০০০ শরণার্থী পাঠাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। আর এক লক্ষ উদ্বাস্তু থাকবে পশ্চিম বাঙলায়।

প্রয়োজনের অনুপাতে আয়োজন ছিল সংকীর্ণ। সাহায্যদ্রব্য পরিমাণে কম। খাবার ত্রিপল, নলকূপ আসে হয়ত পাঁচ হাজার লোকের জন্য। কিন্তু সেখানে শরণার্থীর সংখ্যা হয়ত দশ হাজার। সাহায্যকারীদের সংখ্যা কম। এই অবস্থা চলছিল গোটা ২৪ পরগণা আর নদীয়া জুড়ে। সীমান্তের অন্যান্য জায়গার হালও একইরকম। মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ি, মালদা, পশ্চিম দিনাজপুর কোচবিহার, শিলিগুড়ির সেসব দিনের স্মৃতি আজও মুছে যায়নি মানুষের মন থেকে।

স্থানীয় মানুষদের সাহায্য-সহানুভূতি ভোলবার নয়। কথায় আছে, বাঙালী বাঙালীকে দেখে না। প্রশ্ন, সেদিন দেখেছিল কারা? অন্য রাজ্যের মানুষ সেদিন বাঙলার দিকে মুখ ফিরে তাকায় নি। বাঙলার পথে পথে সেদিন ছিন্নমূলের মর্মন্তুদ প্রতিচ্ছবি। দেশের আকাশে বাতাসে মানুষের দীর্ঘশ্বাস। সাহায্য চাই না, সহানুভূতি চাই না, মানুষের অধিকার চাই। সেই দুর্দিনে লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর জন্য পশ্চিম বাঙলার মানুষেরই হৃদয় কেঁদেছিল। যারা দিল্লীর মসনদে ছিলেন, বাঙালীকে নিয়ে চিন্তার অবসর তাদের ছিল কম। পশ্চিম বাঙলার সমস্যাকে কখনও তারা গভীরভাবে মেনে নেয়নি। পশ্চিম বাঙলার কংগ্রেস নেতারাও কেন্দ্রের ওপর এ ব্যাপারে যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করেন নি।

সীমান্ত এলাকার ট্রানজিট ক্যাম্পগুলো গড়ে উঠেছিল সাময়িক প্রয়োজনে। কথা ছিল সেখান থেকে শরণার্থীদের পাঠান হবে পুনর্বাসন কেন্দ্রে। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল ঐ ট্রানজিট ক্যাম্পগুলোই হয়ে গেল

পার্মানেন্ট হোম। স্থায়ীভাবে পুনর্বাসনের কোন পরিকল্পনাই ছিল না।

লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হল বছর বছর। অস্থায়ী মানুষদের জন্য গড়ল স্থায়ী তোল। কুষক, দোকানদার, শিক্ষক, শিল্পী—বৃত্তি অনুসারে কাজের সুযোগ না পেয়ে ধীরে ধীরে পরিণত হল ভিক্ষুকে। বছর বছর ধরে মানুষ মরেছে। রোগে ভুগে যত না মরেছে, তার থেকে বেশি না খেয়ে। এপার বাঙলার অর্থনীতি, সমাজ জীবন ভেঙে পড়েছে: দিনে দিনে ভিখারী হয়েছে বাঙালী। আর কেন্দ্রীয় সরকার অপপ্রচার চালিয়ে বাঙালী শরণার্থীদের দোষারোপ করেছে। একই পরিস্থিতির দুরকম সমাধান কেন সেদিন তারা করেছিলেন? পাঞ্জাব ও বাঙলা দুটোকেই ভাগ করা হল। অথচ, পাঞ্জাব সমস্যার সমাধানে কেন্দ্রীয় সরকার কালক্ষেপ করলেন না। কিন্তু বাঙলার সমস্যাকে অনন্তকালের জন্য উপহার দিলেন পশ্চিম বাঙলাকে। এক ভাষাভাষী এক জনপদকে দ্বিখণ্ডিত করা হল। বহুতর বাঙলাভাষী-দের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের মানুষ করে দেওয়া হল, তা নাহলে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া যেত না।

দেশবিভাগের পরই ছিন্নমূল মানুষের প্রবল প্রবাহ ভারতীয় অর্থনীতিতে আঘাত সৃষ্টি করে। এর জন্য কোন প্রস্তুতি ছিল না। জনগণই শক্তির উৎস। কিন্তু সেই উৎস যখন বিপর্যস্ত হয়ে অন্য রাষ্ট্রের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে, তখন সেই রাষ্ট্রের অর্থনীতি ভেঙে পড়তে বাধ্য। তাছাড়া দেশ-বিভাগের আগে অধিকাংশ রাজ্যেই জনসংখ্যা ও প্রাথমিকার সংস্থানের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব ছিল। এই অবস্থায় শরণার্থীদের আগমন। প্রথম দিকে বিভিন্ন রাজ্যে উদ্বাস্তুর সংখ্যা ছিল :

পাঞ্জাব	৩২,৩১,৯৮১
পশ্চিমবাংলা	২৩,৯৯,০৭১
উত্তরপ্রদেশ	৪,৮০,২৭০
বোম্বাইপ্রদেশ	৩,৩৮,০৯৬
আসাম	২,৭৪,৪৫৫
মধ্যপ্রদেশ	১,১২,৭৭১
বিহার	৭৭,৫৫২
উড়িষ্যা	২০,০৩৯
হিমাচল	৮,৯২৯

বোঝা যাচ্ছে পাঞ্জাবে শরণার্থীদের সংখ্যা ছিল বেশি। কিন্তু চাপ ছিল পশ্চিম বাংলায় বেশি। পাঞ্জাবের অনুপাতে পশ্চিম বাংলা আয়তনে ছোট। পাঞ্জাবে লোকবিনিময় হয়েছিল। পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে আগত শরণার্থীদের থেকে পূর্বপাঞ্জাব ত্যাগকারী-দের সংখ্যা ছিল বেশি। আর পশ্চিম বাংলা থেকে চলে যাওয়া মুসলমানদের থেকে পূর্ব বাংলা ত্যাগকারী হিন্দুদের সংখ্যা ছিল কয়েক গুণ বেশি। ফলে পশ্চিম বাংলায় স্বাভাবিকভাবে যে জনসংখ্যা পঞ্চাশ বছরে বাড়ত, তা বেড়ে গেল পাঁচ বছরে।

শরণার্থীরা পশ্চিম বাঙলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লেও, সব জেলায় সমান বসতি হল না। কোথাও জনবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ মাইলে হাজার ছাড়িয়ে গেল। আবার কোথাও একশর নীচে থেকে গেল। গড়পড়তা প্রতি বর্গ-মাইলে ৬৮। তখন পশ্চিম বাংলার প্রতি বারজনে একজন শরণার্থী। শরণার্থী-দের আকর্ষণ করেনি মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, কোচবিহার। মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুরে চাষের জমি পেয়েছিল শরণার্থীরা। ২৪ পরগণা, নদীয়া, বর্ধমান, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, হুগলিতে বিরাট সংখ্যক শরণার্থী আশ্রয় পেল। নদীয়ায় দেশভাগের আগে লোক সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছিল, এখন তা বেড়ে গেল। ভূপ্রকৃতি জলবায়ু আর ভূমি-ব্যবস্থার সাদৃশ্যই নদীয়া আর ২৪ পরগণায় পূর্ববাংলার মানুষদের মনপ্রাণ টেনেছিল।

পাঞ্জাবের সাম্প্রদায়িক সমস্যা মিটেছিল সহজেই। পূর্ব পাঞ্জাবের মুসলমান যায় পশ্চিম পাঞ্জাবে আর পশ্চিম পাকিস্তানের হিন্দু আর শিখরা আশ্রয় পেয়েছিল পূর্ব পাঞ্জাবে। নিগৃহীত সংখ্যালঘুরা স্থায়ী বস-বাসের সুযোগ পেয়েছিল। পরিত্যক্ত জমি, ঘরবাড়িতে নবাগতদের সহজেই স্থান সংকু-লান ঘটে। স্থানীয় ব্যক্তিদের ওপর কোন রকম চাপই পড়েনি। পশ্চিম পাকিস্তানের ২৪ লক্ষ উদ্বাস্তু ১৯৫০ খ্রীঃ মধ্যে বসতি পায় পূর্ব পাঞ্জাবে।

১৯৪৯ খ্রীঃ মধ্যে পূর্ব বাংলার ৭০ হাজার মানুষ বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরে স্থান পেয়েছিল। ১৯৫১ খ্রীঃ বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরে ছিল ৭১,৮০১ জন উদ্বাস্তু। ১৯৫৭ খ্রীঃ মধ্যে এপারে আসে ১,২৭,০০০ মানুষ। ৩৬,০০০ জন মানুষ ছিল আশ্রয় শিবিরে কিন্তু ১৯৫০ খ্রীঃ থেকে আগত পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুদের অবিরাম প্রবাহ ও উদ্ভূত সমস্যা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের চরম ঔদাসীন্য ডেকে আনে সংকট। যদিও কিছু কিছু নবাগত পরিবার মুসলমানদের পরি-ত্যক্ত ঘরবাড়ি ও জমিতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। অনেকে আত্মীয় পরিজনের গল-গ্রহ হয়ে ওঠে। সামর্থ্যসম্পন্ন ও শিক্ষিত বাক্তিরা শহরে আশ্রয় নেয়। এ কারণে আশ্রয় শিবিরগুলির সংকট কিছুটা কম ছিল। ১৯৫৪ খ্রীঃ মধ্যে পূর্ব বাংলার ২৮,৬২,৬০১ জন উদ্বাস্তু আসে পশ্চিম বাংলায়। এদের মধ্যে ৫,৫৭,৫৯৪ জনের স্থান হয়েছিল আশ্রয়শিবিরে আর আশ্রয়শিবির থেকে ৪,০৮,৫৫০ জনকে পাঠান হয় পুন-র্বাসন কেন্দ্রে। ৫৪ সালের পর থেকেও পায়ে হেঁটে, ট্রেনে মানুষের আসার বিরাম ঘটেনি। ১৯৫৫ খ্রীঃ দৈনিক গড়ে ১০০ পশ্চিম জলপ্রপ্ত শিবিরে আসতে থাকে। আশ্রয়শিবিরে মাসিক ভর্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫০০০ জনের। ১৯৬৫ খ্রীঃ পাকিস্তানে ব্যাপক দাঙ্গায় বহু ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু পরিবার এপারে এসে পড়ে অসহায় অবস্থায়। এবার তাদের পাঠান হতে থাকে মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যা সীমান্তের দণ্ড-কারণ্যে। প্রথমে যে ১০০০০ পরিবারকে এখানে পাঠান হয়েছিল তাদের অনেকেই ফিরে আসে পশ্চিম বাংলায়। এভাবে বিরাট জনশক্তির অপব্যয় তুলনাহীন। বিরাট পরিমাণ অর্থ ব্যয় অর্থনীতিকে শক্তও করেনি। সরকার দায় সেরেছে মাত্র শিবিরে শিবিরে মানুষ পাঠিয়ে মানবিক কর্তব্য সম্পন্ন হয়নি। মানুষ হিসাবে তাদের বেঁচে থাকার অধিকারকে বারবার অস্বীকার করা হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের মত পূর্ব বাংলার ছিন্নমূল মানুষদেরও যে পুনর্বাসনের দরকার কেন্দ্রীয় সরকার সে ব্যাপারে গুরুত্ব দেননি। যে বিপুল সংখ্যক মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে পূর্ব বাংলা থেকে এসেছিল, তাদের বেশির ভাগই নিজেদের বাসস্থান ও অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করেছিল নিজেরাই। শরণার্থীরা যেখানে গেছে, সেখান-কার মাটির মর্যাদা দিয়েছে। চাষ করেছে, ফসল ফলিয়েছে, নদীতে মাছ ধরেছে। স্কুল

হাওড়া
ফ্রেণ্ডস্ সোসাইটী
বেনারসী·সিল্ক·তাঁত
মিলবস্ত্র·পোষাক
৫৪৫, জি, টি, রোড (সাউথ) হাওড়া
ফোন: ৬৭-৪৪৪৭

হোমিওপ্যাথি জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী যুগোপযোগী পুস্তক,
ডাঃ প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত **অব্যর্থ ঔষধ ৫·০০**
(১১শ সংস্করণ)

আর একটি নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইল— **আমাশয় ২·৫০**
অন্যান্য পুস্তক—ভারতীয় ঔষধের ভৈষজ্য বিবরণ—৭·০০। অম্ল পিত্তীয় রোগ—(২য় সং) ২·০০। দন্তরোগ চিকিৎসা—(২য় সং) ১·৫০। ধাত্রী বিদ্যা—(২য় সং) ৮·০০। জন্ম নিয়ন্ত্রণ—(২য় সং) ২·৫০। কবিরাজী থ্রম্বোসিস—১·৩০। পকেট রেপার্টরি (২য় সং) ৫·০০।
প্রাপ্তিস্থান—এম ভট্টাচার্য এণ্ড কোং, ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিঃ—১, **হ্যানিম্যান পাবলিশিং**, ১৬৬, বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিঃ—১২, **হাওড়া হ্যানিম্যান হল**, ১০।১, জি টি রোড, হাওড়া ময়দান, হাওড়া ১।

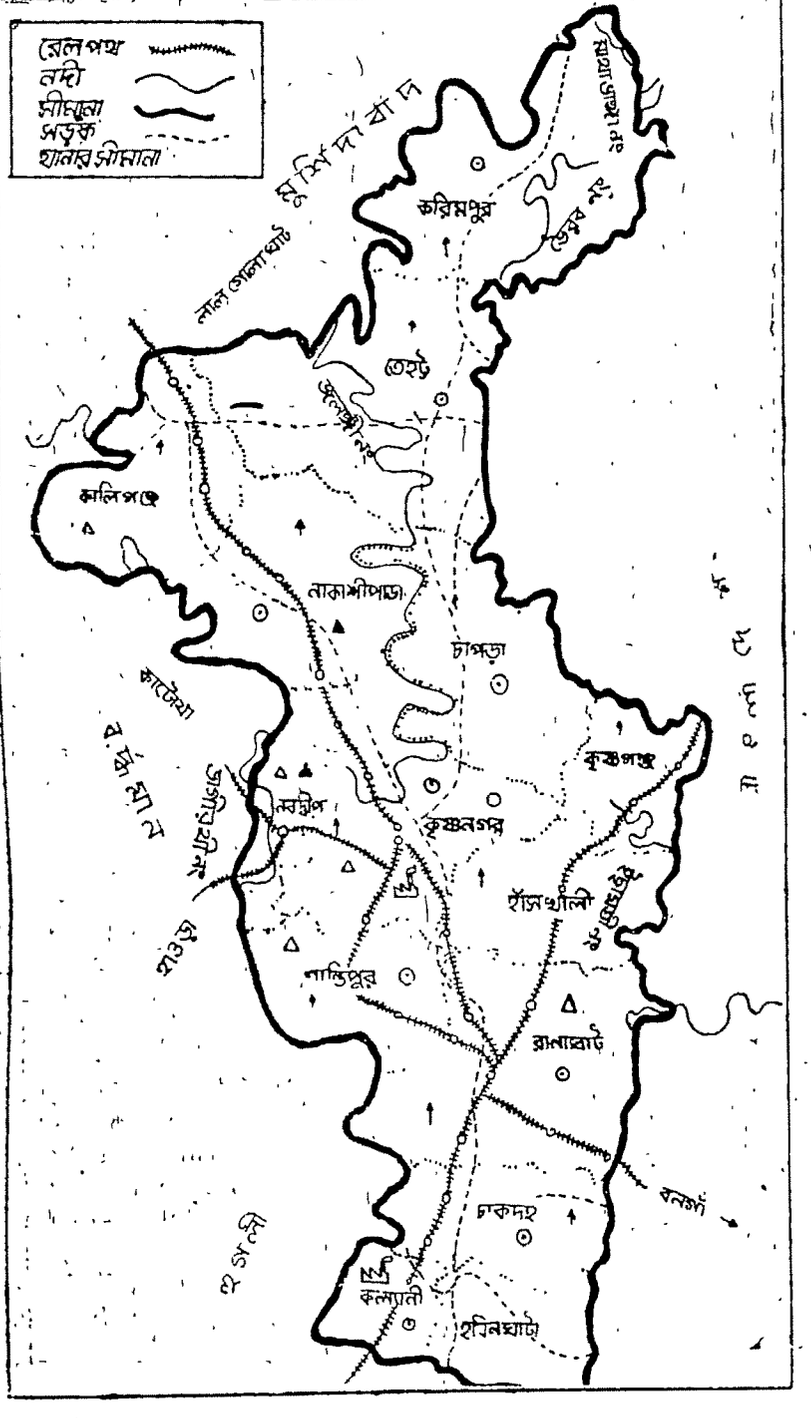

কলেজে করেছে। নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি পূর্ব বাংলার মানুষদের ওপর বিশ্বাসঘাতকতাই করেছিল। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত ৪৭-৪০ লক্ষ উদ্বাস্তু পাঞ্জাব-হরিয়ানা, দিল্লী উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র, কেরালা, তামিলনাড়ু, মহীশূর, অন্ধ্র, বোম্বাই, গুজরাট, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশে মুসলমানদের পরিত্যক্ত বাড়িতে অথবা ভারত সরকারের গড়ে দেওয়া দোকান ও আবাসনে। আবার ফেলে আসা অস্থাবর সম্পত্তি স্থানান্তর, বিনিময় বা ভারত সরকার ক্ষতিপূরণ হিসাবে অনেক কিছু দিয়েছেন। আর পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুরা স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি সবই ফেলে এসেছিল।

পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুরা ক্ষতিপূরণ, জমিজমা, তৈরি-করা বাড়িঘর পেয়েছেন। এছাড়া সরকারী ব্যয় হয়েছে ২০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ঋণের অংশ সামান্যই। ক্ষতিপূরণ পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুরা পাননি। তাদের জন্য ব্যয় করা ৩০৩ কোটি টাকার বেশির ভাগই ঋণ। এই সরকারী হিসাবেও যথেষ্ট কারচুপি রয়েছে। অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের জন্য খরচ করা টাকা কম করে দেখান হয়েছে।

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত মোট উদ্বাস্তু সংখ্যা ৪৭-৪০ লক্ষ। পূর্ব বাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তু সংখ্যা (১৯৭০ খ্রীঃ পর্যন্ত) ৫২-১৪ লক্ষ। এরা হলেন রেজিস্ট্রিভুক্ত উদ্বাস্তু। তাছাড়াও কয়েক লক্ষ উদ্বাস্তু আছেন।

দেশবিভাগ পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের ভাগ্যে সুদিন ডেকে আনে। ওরা যেখানেই গেছেন, সেখানেই পেয়েছেন জীবন আর জীবিকা। পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুদের জীবনে জোটে ধিক্কার। আন্দামানে কৃষিজীবী যত পুনর্বাসন হয়েছে, তার থেকেও বেশি গেছে মধ্যবিত্ত মানুষ। অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যার সীমান্ত জুড়ে ৮০ হাজার বর্গমাইল এলাকা জুড়ে দণ্ডকারণ্যে প্রথমে ৩৫,০০০ পরিবার পুনর্বাসনের কথা ছিল। পরে নামিয়ে আনা হয় ১২,০০০, পরে আরো কমিয়ে করা হয় ৭,০০০ পরিবার। দণ্ডকারণ্য ডেভলপমেন্ট অথরিটি জন্ম থেকেই কর্তৃত্বের লড়াই নিয়ে বিব্রত। সরকারী নীতির উদ্দেশ্যহীনতায় প্রকল্পটি ব্যর্থ হয়ে গেছে। পূর্ব বাংলার শরণার্থীদের গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে গিয়ে রাস্তা তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। চাষের জমির প্রতিশ্রুতি একটি মিথ্যাচারের নিদর্শন। দণ্ডকারণ্যের জন্য কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রকল্প আজও রচিত হয়নি। অথচ, কেবল দিল্লি গেলেই দেখতে পাবেন পশ্চিমের উদ্বাস্তুরা কিভাবে নিরাপদ জীবন পেয়েছে। তারা যেখানেই গেছে সরকারী সহযোগিতায় তারা বাসস্থান পেয়েছে। অথচ বাঙালী উদ্বাস্তুদের জন্য অন্যান্য রাজ্যের দরজা বন্ধ ছিল। আর পশ্চিম বাংলায় শিল্পোন্নয়ন ঘটানো হয়নি। অন্য রাজ্যের শিল্পোন্নয়নে কাঁচামাল সরবরাহকারী রাজ্যে

পরিণত করা হয়েছে পশ্চিম বাংলাকে। ফলে এই রাজ্যের শরণার্থীদের জন্য শিল্পবাণিজ্যের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের পথও ছিল বন্ধ।

পশ্চিম পাকিস্তানের শরণার্থীদের দেওয়া হয়েছিল সাহায্য আর পূর্ববাংলার মানুষদের দেওয়া হয়েছিল ঋণ। আর এই ঋণ দেওয়ার ব্যাপারটাও ছিল বেশ জটিল। ধরুন আপনি কিনবেন একটা মাছ ধরার জাল, অথবা সেলাই কল, অথবা গরু বা এমন কোন জিনিস যা হবে আপনার জীবিকার অবলম্বন। এর জন্য সরকার আপনাকে ঋণ দিল চারটি পর্যায়ে। প্রথম-বারের পর দ্বিতীয়বার ছ মাস কি এক বছর বাদে। ততদিনে আপনার ঋণ পাওয়া টাকা শেষ। এভাবে শরণার্থীদের ঋণ দেওয়ার নামে আরও অসহায় করে দেওয়া হয়েছে।

সরকার মুখাপেক্ষী না থেকেই তত-দিনে শরণার্থীরা বসতি গড়ে তুলছে। পূর্ব বাংলার পৌণ্ড্রক্ষেত্রীয়, ব্রাহ্মণ, রাজ-বংশী, তাঁতি, রুইদাস, কামার, কুমোর, নাপিত, নমঃশূদ্র গোয়ালা, শাঁখারী, কাহার, হাড়ি, গন্ধবণিক সকল সম্প্রদায়ের মানুষ এল। এপার বাংলার সমাজব্যবস্থা ও জনজীবনের সঙ্গে মিশে যেতে সময় লেগে-ছিল। কিছু অসদ্ভাব ও অপ্রেমের ঘটনার মধ্য দিয়ে দুই বাংলার মানুষের মানসিক বিভেদ দূর হয়ে গেল ধীরে ধীরে।

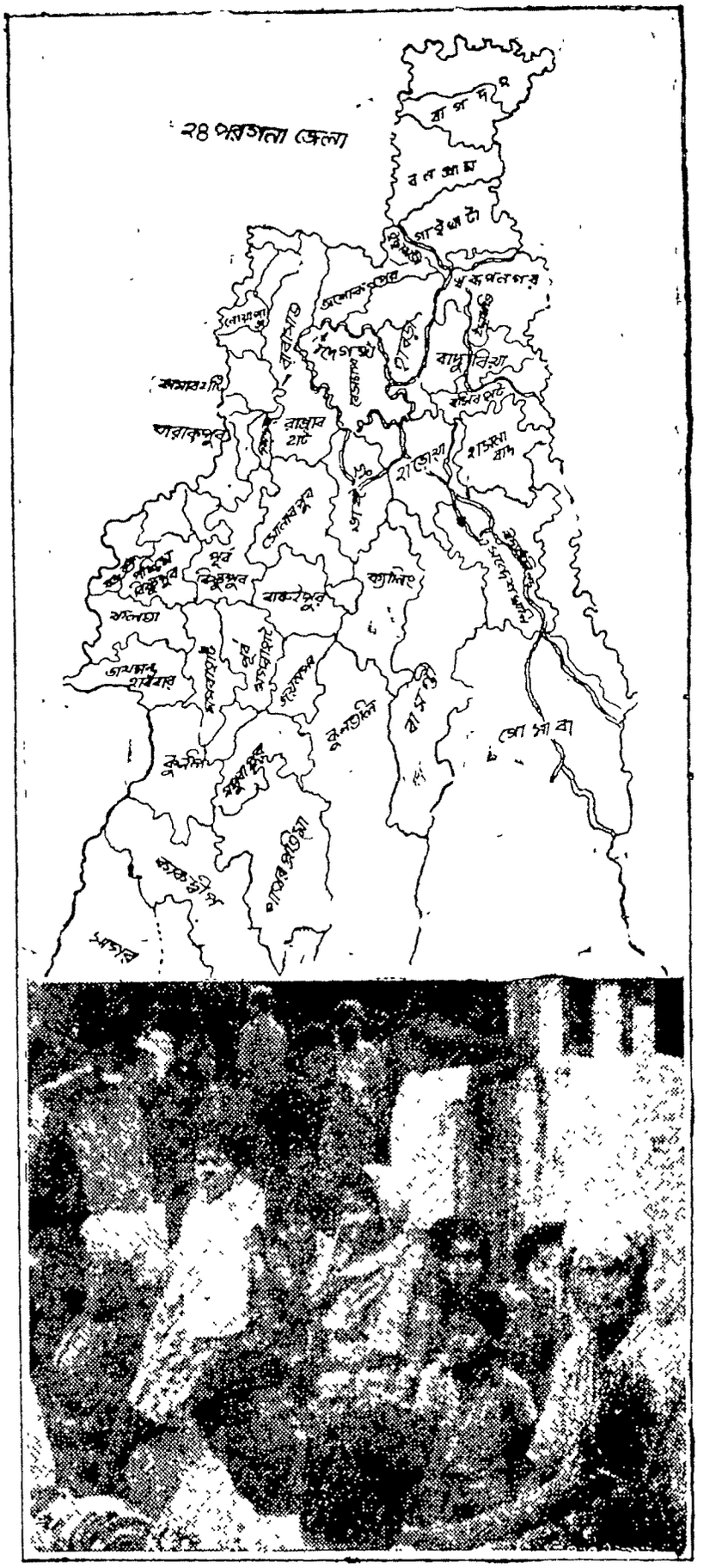

শরণার্থী আগমন

বছর	সংখ্যা
১৯৪৬	৪৪,৬২৪
১৯৪৭	৩,৭৭,৮৯১
১৯৪৮	৪,১১,০১৮
১৯৪৯	২,৭৫,৫৯২
১৯৫০	৯,২৫,১৮৫
১৯৫১	
১৯৫২	৪,৭৭,১৮৩
১৯৫৩	৬০,৬৫৭
১৯৫৪	১,০৫,৮৫০
১৯৫৫	২,১১,৫৭০
১৯৫৬	২,৪৬,৮৪০
১৯৫৭	৯,১০৩
১৯৫৮	৪,২৮৫
১৯৫৯	৫,৫৩৯
১৯৬০	৮,৬২৯
১৯৬১	১০,০৯৫
১৯৬২	১২,৮০৪
১৯৬৩	১৪,৬০১
১৯৬৪	৬,৬৭,১২৫
১৯৬৫	১,৫৯,৯৮১
১৯৬৬	৪,২১৪
১৯৬৭	৬,৮৯৫
১৯৬৮	৬,৫৮৯
১৯৬৯	১১,০৬৮
১৯৭০	(১৫,৭,৭০ পর্যন্ত) ১,৪০,০০০
	৪২,০৩,৩৭৮

পশ্চিম বাঙলায় প্রতি জেলায় উদ্বাস্তুর সংখ্যা

জেলা ও মহকুমা	উদ্বাস্তু মোট	উদ্বাস্তু পুরুষ	উদ্বাস্তু নারী	মোট জনসংখ্যার অনুপাতে উদ্বাস্তুর হার (শতাংশ)
পশ্চিম বাঙলা	২০৯৯,০৭১	১১,১৮,৪৭৫	৯,৮০,৫৯৬	+ ৮.৫
বর্ধমান	৯৬,১০৫	৫১,১৩২	৪৪,৯৭৩	+ ৪.৪
বীরভূম	১১,৭৮৩	৬,২০৫	৫,৫৭৮	+ ১.১
বাঁকুড়া	৯,২৯৪	৪,৮১৭	৪,৪৭৭	+ ০.৭
মেদিনীপুর	৩৩,৫৭৯	১৭,৪৭৭	১৬,১০২	+ ১.০
হুগলি	৫১,১৫৩	২৬,৮৪৪	২৪,৩০৯	+ ৩.৩
হাওড়া	৬১,০৯৬	৩২,৯৮৪	২৮,১১২	+ ৩.৮
২৪ পরগণা	৫,২৭,২৬২	২,৮৪,৮৯৭	২,৪২,৩৬৫	+১১.৪
কলকাতা	৪,৩৩,২২৮	২,৩৪,২৪২	১,৯৮,৯৮৬	+১৭ ০
নদীয়া	৪,২৬,৯০৭	২,১৯,৩৬৩	২,০৭,৫৪৪	+৩৭ ৩
মুর্শিদাবাদ	৫৮,৭২৯	৩১,১৬৮	২৭,৫৬১	+ ৩.৪
মালদহ	৬০,১৯৮	৩০,৯১৮	২৯,২৮০	+ ৬ ৪
পশ্চিম দিনাজপুর	১,১৫,৫১০	৬১,১৯৭	৫৪,৩১৩	+১৬.০
জলপাইগুড়ি	৯৮,৫৭২	৫৪,১১৯	৪৪,৪৫৩	+১০.৮
দার্জিলিং	১৫,৭৩৮	৮,৯৩১	৬,৮০৭	+ ৩.৫
কোচবিহার	৯৯,৯১৭	৫৪,১৮১	৪৫,৭৩৬	+১৪.৯

বিভিন্ন রাজ্য	শরণার্থী নয়	শরণার্থী	অ-শরণার্থীর অনুপাতে শরণার্থীর হার (শতাংশে)
রাজস্থান		২,৭৪,৪৫৫	০ ১৩
আসাম	৮৭,৬৯.২৫২	১,১২,৭৭১	০.৫৩
মধ্যপ্রদেশ	২.১১,৩৪,৭৬২	২০,০৩৯	০.১৪
উড়িষ্যা	১,৪৬,২৫,৯০৭	৭,১১৩	০.০৮
মহীশূর	৯০,৬৭,৭৭৯	৩,৩৮,০১৬	০.৯৫
বোম্বাই	৩,৫৬,১৮ ০৫৪	৩২,৩১,৯৮১	৩৪.৩৫
পাঞ্জাব	৯৪,০৯,২২৪	৮,৯২৯	০.০২
মাদ্রাজ	৫.৭০,০৭,০৭৩	৪,৮০,২৭০	০ ৭৭
উত্তর প্রদেশ	৬,২৭.৩৫.৪৭২	৭৭,৫৫২	০ ১৯
বিহার	৪,০১৪৮,৩৯৫	২০,৯৯,০৭১	৯.২৭
পশ্চিম বাঙলা	২,২৭,১১,২৩৭	৩০৭	০ ০০৩
ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন	৯২,৮০,১১৮		

পশ্চিম বাংলায় শরণার্থী সব বছরে সমানভাবে আসেনি। ১৯৪৮, ১৯৫০, ১৯৫১, ১৯৬৪ খ্রীঃ এসেছিল সব থেকে বেশি পরিমাণে। সরকারী তথ্য থেকে জানা গেছে পশ্চিম বাংলার বাইরে ৪,৫৩ লক্ষ শরণার্থীকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। পশ্চিম বাংলার বসতি পেয়েছে ২২-৮ লক্ষ। ২৪-৬৫ লক্ষ মানুষ এখনও পুনর্বাসনের অপেক্ষায়।

পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুদের চাপ পশ্চিমবাংলা ও ত্রিপুরার ওপর বেশী। তাছাড়া উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, আসাম, বিহার ও উত্তর প্রদেশে গেছে বাঙালী উদ্বাস্তু। এ বাবদ ঐ সব রাজ্যকে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার জমি-জায়গা ও অন্যান্য সম্পত্তির জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়নি। যা দেওয়া হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে। পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের জন্য কেন্দ্রীয় কেন্দ্রীয় তহবিল ছিল পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে তা ছিল না। ফলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলি কোন ক্ষতিপূরণ পায়নি। যার জন্য বাঙালী উদ্বাস্তু ঐ সব রাজ্যের সরকার ও স্থানীয় মানুষদের সহানুভূতি পায়নি কখনও। পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৪৭ থেকে ১৯৭৮-এর মার্চ পর্যন্ত খরচ করেছেন ৪৭৬ কোটি টাকা। দণ্ডকারণ্য সহ। আর পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের জন্য খরচ দেখান হয়েছে ২১০ কোটি টাকা। কিন্তু এদের জন্য ক্ষতিপূরণ তহবিলের ব্যয়ের উল্লেখ কখনও করা হয়নি। সুতরাং হিসাবটি প্রতারণামূলক। পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের জন্য বিনামূল্যে জমি, নতুন বাড়ি, মুসলমান দেশত্যাগীদের জমি বাড়ি ও শিল্প সংগঠন প্রভৃতির মূল্য বাবদ মোট খরচের পরিমাণ আনুমানিক ৪৮৭০ কোটি টাকার মত। সবসময়ই এই হিসাবকে গোপন করে যাওয়া হয়। আর কেন্দ্রীয় সরকারের এই বৈষম্যনীতি প্রথম থেকেই। কোন প্রতিকার নেই। শক্তিশালী কেন্দ্র প্রতিবাদের পরোয়া করে না।

যে একশ কোটি টাকা উদ্বাস্তুদের নামে ভিন্ন স্বার্থে খরচ হয়েছে, তা পশ্চিম বাংলার মধ্যে খরচ করে দণ্ডকে পাঠান ২,২৫,০০০ হাজার উদ্বাস্তুর একটা ব্যবস্থা করা যেত। যেসব রাজ্যের ভূখণ্ডে দণ্ডকারণ্য সেখানকার লোকের ওপর মানুষই তো পশ্চিম বাংলায় আসছে বছর বছর। তাদের উপার্জনের পথ বাংলার মানুষ বন্ধ করেনি। কিন্তু বাঙালীর জীবনকে বন্ধ্যা করার দায়িত্ব কার?

পশ্চিমবাঙলার বর্তমান জনসংখ্যা ভারতের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮২ ভাগ। প্রতি বর্গমাইলে ১০২১ জন অথবা প্রতি বর্গ কিঃ মিঃ-এ ৫৯৭ জন বাস করে। সমগ্র ভারতের লোকবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিঃ মিঃ-এ ১৮২ জন। ভারতের একমাত্র কেরলেই লোকসংখ্যা পশ্চিমবাঙলার মতই ঘনবসতিপূর্ণ। এদিক থেকে পশ্চিমবাঙলার স্থান দ্বিতীয়। জনসংখ্যার ভিত্তিতে ভারতের দ্বিতীয় রাজ্য হলেও, ভারতের মোট আয়তনের মধ্যে পশ্চিমবাঙলার ভাগে জমির পরিমাণ শতকরা ২.৭ ভাগ।

রাজ্যের লোকবসতি সর্বত্র সমান নয়, দক্ষিণাংশেই লোকবসতি বেশী। হুগলি নদীর উভয় পাড়ে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি ও ২৪ পরগণার বিশেষ কয়েকটি এলাকায় লোকবসতি ঘন হওয়ার কারণ কল-কারখানা। এখানে লোকবসতির ঘনত্ব প্রতি কিঃ মিঃ-এ ৫০০ থেকে ১০০০-এর ওপর। কলকাতার লোকবসতি প্রতি বর্গ কিঃ মিঃ-এ ত্রিশ হাজারের বেশী। কোথাও চল্লিশ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। কলকাতার পর সব থেকে ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা হল রাণীগঞ্জ, আসানসোল ও দুর্গাপুর। নদীয়া জেলায় প্রতি বর্গ কিঃ মিঃ-এ চারশ, মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রতি বর্গ কিঃ মিঃ-এ চারশ পঞ্চাশ, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় প্রতি বর্গ কিঃ মিঃ-এ দুশ পঞ্চাশ এবং মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, কোচবিহার ও পুরুলিয়া জেলায় লোকবসতির ঘনত্ব ৩০০ থেকে ৫৫০।

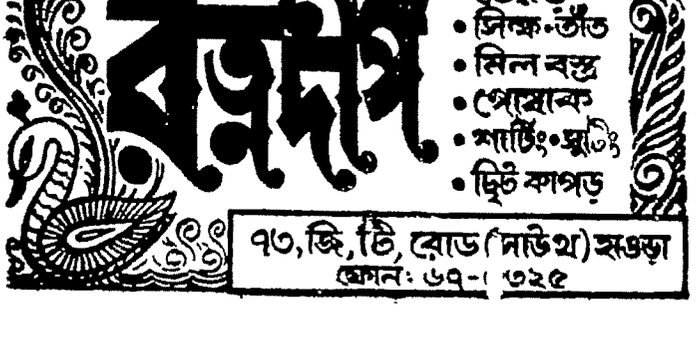

পশ্চিমবাঙলায় গ্রাম : ৩৮,৪৬৫
শহর : ২২৩

বাকিটি শহরের লোকসংখ্যা এক লক্ষের ওপর।

দেওয়ানী বাঙলায় প্রতি বর্গমাইলে দুশ তিনজন লোকের বাস ছিল। আর লোকসংখ্যা ছিল প্রায় তিন কোটি। কোল-ব্রুকের বিবরণে জানা যায়, সব থেকে সমৃদ্ধ অঞ্চল ছিল বর্ধমান, ২৪ পরগণা ও নদীয়া। এবং পশ্চাদপদ এলাকা ছিল কোচ-বিহার, ত্রিপুরা, রামগড় ও সিলেট। ১৮০৮ খৃঃ ডঃ বুকানন হ্যামিলটন সংগৃহীত তথ্যে এবং কোলব্রুকের বিবরণে জানা যায় যে কোন জায়গায় জনবসতি ছিল বেশ ঘন, কোথাও কম।

ভারতে প্রথম জনগণনা হয় ১৮৮২ খৃঃ। অর্থাৎ উনিশ শতকের বেশীর ভাগ অধ্যায়ের জনসংখ্যা নিরূপণ সম্ভব নয়। তবে ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন থেকে বোঝা যায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি ছিল ঊর্ধ্বমুখী। চির-স্থায়ী বন্দোবস্ত হয় ১৭৯৩ খৃঃ, ১৮৫৯ খৃঃ রেন্ট অ্যাক্ট, ১৮৬৫ খৃঃ রেন্ট কেস এবং বংগীয় প্রজাস্বত্ব আইন চালু হয় ১৮৮৫ খৃঃ। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে (১৭৭০ খৃঃ) বাঙলার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ মারা পড়ে। ১৮২৫-৩৫ খৃঃ মধ্যে সেই হ্রাসপ্রাপ্ত লোকসংখ্যা বেড়ে গিয়ে জনসমুদ্র ঊর্ধ্বমুখীন অগ্রসর হতে থাকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি স্থির ছিল না। কখনও বেড়েছে, কখনও কমেছে। অবশ্য ১৯২০ খৃঃ থেকে জনসংখ্যা হ্রাস না পেয়ে ক্রমশ বাড়তেই থাকে। অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, যাতায়াতের সুবিধা, কৃষিপণ্যের প্রসারিত বাজার ও অর্থোপার্জনের সুযোগ বৃদ্ধি জনসমষ্টি বৃদ্ধির পক্ষে হয়েছে অনুকূল। তাছাড়া এই সময়ে বহির্বাগতের সংখ্যাও বাড়ছিল। ১৯৪৬ খৃঃ থেকে ১৯৫৫ খৃঃ মধ্যে জনসংখ্যা চরম বৃদ্ধির কাল।

বিশ শতকের প্রথমে পশ্চিমবাঙলার লোকসংখ্যা ছিল ১৬,৯৪০,০৮৮ জন। এখন ৪,৪৪,৪০,০৯৫। অর্থাৎ প্রায় তিনগুণ বেড়েছে। ১৯৫১-৬১ খৃঃ মধ্যে লোক-বৃদ্ধির হার ছিল গড়ে প্রতি বছরে শতকরা ৩.২৮। বিভিন্ন জেলাগুলির মধ্যে কোচ-বিহারের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সব থেকে বেশী। তারপরই নদীয়া ও জলপাইগুড়ি। চব্বিশ পরগণা, বর্ধমান, হুগলি জেলার লক্ষ্যণীয় জনবৃদ্ধি ঘটেছে।

জেলাগুলির মধ্যে আয়তনে বৃহৎ ২৪ পরগণা। লোকবসতির দিক থেকেও সংখ্যাগরিষ্ঠ। কেবল পশ্চিমবাঙলায় নয়। ভারতের মধ্যেও। ২৪ পরগণার প্রায় সম-আয়তনের জেলা মেদিনীপুর। অথচ ২৪-পরগণার লোকসংখ্যা প্রায় বাষট্টি লক্ষ একাশি হাজার, আয়তন ৫২৮৫ বর্গমাইল। মেদিনীপুরের লোকসংখ্যা তেতাল্লিশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার, আয়তন ৫২৫৮ বর্গ-মাইল। সব থেকে কমসংখ্যক লোকের বাস দার্জিলিং জেলায়, ছয় লক্ষ পঁচিশ হাজার, আয়তন ১১৬০ বর্গমাইল। আয়তনের দিক থেকে সব থেকে ছোট জেলা কলকাতা, ৪০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা একত্রিশ লক্ষ। আর হাওড়া জেলার আয়তন ৫৭৫ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা কুড়ি লক্ষ আটত্রিশ হাজার।

বিগত ষাট বছরে কলকাতার জনসংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশী বেড়েছে। ১৯৫১-৬১ খৃঃ মধ্যে এই বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৮.৪৮। এই সময়ে পুরুলিয়া জেলায় জন-সংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১৬.৩৩।

পশ্চিমবাঙলায় এই ব্যাপক জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ অধিক সংখ্যায় বহির্বাগতের আগমন। এই বৃদ্ধির বৃহৎ একটি প্রবাহ গেছে চা-বাগান ও শিল্পাঞ্চলের দিকে। যাদের বেশির ভাগই হল অবাঙালী। নদীয়া ও ২৪ পরগণা জেলার জনসংখ্যা বেড়েছে পূর্ববাঙলার শরণার্থীদের আগমনে।

এখন পশ্চিমবাঙলার বৃহৎ জনপদগুলি ক্রমশ শহরে পরিণত হচ্ছে। বর্তমান শতকের প্রথমে এই রাজ্যে শহরের সংখ্যা ছিল ৭৮; স্বাধীনতার পরবর্তী মুহূর্তে ছিল ১২০; ১৯৬১ খৃঃ হল ১৮৪। অর্থাৎ দশ বছরের মধ্যে ৬৪টি নতুন শহরের জন্ম। ১৯৭০ খৃঃ সেন্সাস অনুসারে পশ্চিমবাঙ-লায় নগর ও শহরের সংখ্যা ২২৩।

শিল্প বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন শহরের আবির্ভাব ঘটছে। শিক্ষা, অর্থ ও উন্নততর জীবনের জন্য মানুষ হয়ে উঠছে শহরমুখী। হুগলি নদীর দুপাশে আছে প্রায় ৮০টি শহর। কিন্তু গত চার দশকে শহরবাসীর সংখ্যা বাড়ছে খুব ধীরে ধীরে। পরিসংখ্যান হল :

(জনসংখ্যার শতাংশ হিসাবে)

	১৯৩১	১৯৪১	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭১
গ্রামবাসী	৮৫	৮০	৭৬	৭৬	৭৫
শহরবাসী	১৫	২০	২৪	২৪	২৫

অনেকদিন ধরে একটা কথা শোনা যাচ্ছে পশ্চিম বাঙলার অর্থনীতির বিকাশ এখন শেষ পর্যায়ে (স্যাচুরেশন পয়েন্ট)। কিন্তু কত আবাদযোগ্য পতিত জমি,

গ্রাহক হোন! গ্রাহক হোন! গ্রাহক হোন!

৩৬ টাকার বই গ্রাহক মূল্য মাত্র ২৫ টাকা

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন

তন্ত্রকন্যা

দুই খণ্ডে সমাপ্য। প্রথম খণ্ড মহালয়ার দিন প্রকাশিত হবেই। গ্রাহক হবার শেষ তারিখ ১৫ই সেপ্টেম্বর। প্রতি খণ্ড ১৮·০০। দুই খণ্ডের গ্রাহক মূল্য মাত্র ২৫·০০। ১০·০০ দিয়ে গ্রাহক হোন।

বেদ, বেদান্ত, পুরান, তন্ত্র, আত্মরহস্য ও সামাজিক উপন্যাসের এক আশ্চর্য সমন্বয়। লেখক জিতেন্দ্রমোহন ভৌমিক সুদীর্ঘকাল তন্ত্রসাধনার সঙ্গে যুক্ত। তন্ত্রের গূঢ় তত্ত্বগুলি সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধ্য করে তুলেছেন চমকপ্রদ এক সুখপাঠ্য কাহিনীর মাধ্যমে। তন্ত্র ও আত্মরহস্য বিষয়ক এতাদৃশ উপন্যাস এর আগে প্রকাশিত হয়নি। আজই গ্রাহক হোন।

মণিঅর্ডার; ব্যাঙ্কড্রাফ্ট ও গ্রাহক হবার ঠিকানা—

দেবকণ্ঠ পাবলিশার্স

(শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর কাছে)
১০৯, বিধান সরণি, কলিকাতা-৪

সিএফ এডিভিটিজ।ভিপি।৭৮

অনাবাদী ও জলে ডোবা জমি আছে কি, নতুন শিল্প গড়ে উঠতে পারে—সরকারীভাবে তার ব্যাপক পর্যালোচনা হয়নি। পশ্চিম বাঙলার জনশক্তিকে ব্যাপক উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা হয়নি। রাজনৈতিক দাবা খেলা হয়েছে মাত্র।

১৯৫০-৫১ খৃঃ পশ্চিম বাঙলায় অনাবাদী জমি ছিল ১৮ লক্ষ ২১ হাজার একর (ওয়েস্ট বেঙ্গল টু-ডে, পৃ ৫০)। এর পরও আরও পরিসংখ্যান তৈরি হয়েছে। রিপোর্ট তৈরি হয়েছে। উত্তরে পশ্চিম দিনাজপুর থেকে দক্ষিণে ২৪ পরগণা পর্যন্ত যে বহু ছোটবড় জলাভূমি রয়েছে সেগুলি থেকে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করলে কয়েক হাজার একর আবাদযোগ্য জমি পাওয়া যাবে।

৫৬ সালে সে সময়কার বাঙলা সরকার গঠিত শিল্প তদন্ত কমিটির সুপারিশগুলি পরবর্তীকালে কার্যকর করা হয়নি।

৫৫-৫৬ সালের বাজেট বক্তৃতায় ডঃ বিধানচন্দ্র রায় বলেছিলেন, শিল্পের দ্রুত প্রসার না হলে পশ্চিম বাঙলার অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হবে না।

আসানসোল অঞ্চলের বিরাট সম্পদকে আজও সার্থকভাবে ব্যবহার করা হয়নি।

।।৩।।

পলিমাটিতে তৈরি সমভূমি শস্যসমৃদ্ধ অঞ্চল ২৪ পরগণা। উত্তরের ভূভাগ উঁচু হলেও, দক্ষিণাংশ ক্রমশ নীচু হয়ে গেছে। দক্ষিণে সুন্দরবন জলা অঞ্চল। ভাঙাগড়া চলেছে অবিশ্রাম। জেলাটির দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে হুগলি নদী। উত্তরে নদীয়া জেলা এবং পূর্বদিকে বাঙলাদেশের খুলনা জেলা। বিদ্যাধরী, ইছামতী, মাতলা, পিয়ালী ছাড়াও আছে কত নদনদী। এক সময় বলা হত ভাঁটির দেশ। কারণ, নদীর ভাঁটা প্রবাহিত হয় দক্ষিণ দিকে। হিন্দু-বৌদ্ধযুগে নাম ছিল সমতট। সমতট ছিল প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্ভুক্ত। মুসলমান আমলে সাতগাঁ সরকারের অধীন। ১৭৫৭ খৃঃ ২০ ডিসেম্বর মিরজাফর কোম্পানিকে ২৪ পরগণা জেলা উপহার দেন। তখন জেলার আয়তন ছিল ৮৮২ বর্গমাইল। বর্তমান আয়তন ৫,৬৩৯·৯ বর্গমাইল। সে সময় ২৪ পরগণার অন্তর্ভুক্ত ছিল : আকবরপুর, আমীরপুর, আজিমাবাদ, কালিয়া, বারিদহাটি, বসনধেলর, কলকতা, দক্ষিণ সাগর, হাতিয়াগড়, ইখতিয়ারপুর, খোড়িজুড়ি, খাসপুর, মেদিনীমল্ল, মাগুরা, মানপুর, মমদা, মুনরাগাছা, পৈখান, পাচকুলি, সাতাল, শাহনগর, শাহপুর ও উত্তর পরগণা—এই চব্বিশটি পরগণা নিয়ে গড়ে উঠেছিল কোম্পানির কলকাতা জমিদারী। সুন্দরবন ছিল কোম্পানির শাসনের বাইরে। বনগাঁ ছিল যশোহর জেলায়। ক্লাইভ ১৭৫৯ খৃঃ ব্যক্তিগত জায়গীর পান ২৪ পরগণা জেলা। কিন্তু ১৭৭৪ খৃঃ ক্লাইভের মৃত্যুর পর চব্বিশ পরগণা আবার কোম্পানির অধিকারভুক্ত হয়। শাসন কাজের সুবিধার জন্য ১৮৩৪ খৃঃ ২৪ পরগণা জেলাকে দুটি ভাগ করা হয়—আলিপুর ও বারাসাত। পরে আবার দুটি জেলা এক হয়ে যায়। বারবার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে জেলাটি বর্তমান রূপ পেয়েছে। ১৯৪৭ খৃঃ ১৫ আগস্ট দেশ স্বাধীন হয়। যশোহর জেলার বনগাঁ মহকুমা চলে আসে ২৪ পরগণা জেলার মধ্যে। অবশ্য অনেক আগে ১৭৯৩ খৃঃ ২৪ পরগণা ও কলকাতার জন্য স্বতন্ত্র বিচার ব্যবস্থা চালু হওয়ায়, কলকাতা স্বতন্ত্র জেলায় পরিণত হয়। বর্তমানে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য ২৪ পরগণা উত্তর ও দক্ষিণ অংশে বিভক্ত। উত্তর ২৪ পরগণার মধ্যে পড়ে ব্যারাকপুর, বারাসাত, বসিরহাট ও বনগাঁ এই চারটি মহকুমা। দক্ষিণ ২৪ পরগণায় দুটি মহকুমা —আলিপুর ও ডায়মন্ডহারবার। দক্ষিণাংশে পড়েছে সুন্দরবনের বেশির ভাগ। বজবজ থেকে বজবজ পর্যন্ত ২৭ পরগণার বিস্তৃত শিল্পাঞ্চল। দক্ষিণে সাগর দ্বীপে ছিল সাংখ্যদর্শন প্রণেতা কপিলমুনির আশ্রম।

আলিপুর, বসিরহাট, বারাসাত, বনগাঁ, ব্যারাকপুর ও ডায়মন্ডহারবার এই ছয়টি মহকুমা, ৪৯টি থানা এবং ৪১১৩টি মৌজা নিয়ে গঠিত এই জেলা। জেলার আয়তন প্রায় ১৩,১২ বর্গ-কিলোমিটার। পশ্চিম বাঙলার মোট জনসংখ্যার সর্বাধিক অর্থাৎ ১৯·৩১ শতাংশ বাস করে চব্বিশ পরগণায়। পশ্চিম বাঙলার ১৫-৬৯ শতাংশ ভূভাগ ২৪ পরগণার অন্তর্গত।

২৪ পরগণা জেলার মোট জনসংখ্যা ৮৫৮১৭৪৩ (১৯৭১ খৃঃ সেন্সাস)। পুরুষ ৪৫৬৫৭৭৭ এবং স্ত্রীলোক ৪০১৫৯৬৬। মোট জনসংখ্যার ৩৪-১৮ শতাংশ অর্থাৎ ২৯৩২৯৩৮ জন শহরাঞ্চলে বাস করে। প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে জনবসতি ৬২৩।

২৪ পরগণায় যে নদীগুলি আমডাঙা, স্বরূপনগর এবং বারাসাত-বসিরহাট অঞ্চলের জল নিঃসারণের কাজ করত সেগুলি শুকিয়ে আসছে। সুটি নদীর দীন চেহারা। পদ্মা ও যমুনার অবনতি ঘটেছে। এক সময় নদীর দুকূলের দূরত্ব ছিল বিরাট। এখন নদীর রেখা মাঝ বরাবর। ত্রিবেণীর কাছ থেকে বেরিয়ে যমুনা নদীরা ও যশোরের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে এসে স্বরূপনগরের কাছে মিশেছে ইছামতীতে। পদ্মার বিভিন্ন স্থানে নদীগর্ভ ভরাট হয়ে গেছে। এই দক্ষিণ-বাহিনী নদী দেগঙ্গার কাছে একটি বাঁক সৃষ্টি করে উত্তর পথে এগিয়ে স্বরূপ-নগরের চাবঘাটার কাছে যমুনায় পড়েছে। নদী মরে যাচ্ছে। কৃষিকাজের অবস্থা শোচনীয়। কৃষি জমির উৎপাদন শক্তি কমে গেছে। ইছামতীর উত্তরে গোবরা, দক্ষিণে বসিরহাট। নদীর আশপাশে আছে অনেক মরা গাঙ। পশ্চিমে বাদিধি, মধ্যে নালো আর পূর্বে কলসী বিলে সারা বছর জমে থাকে গভীর জল। মাছ ধরার প্রধান কেন্দ্র। আরও দক্ষিণ বিদ্যাধরী এক সময় বড় নদী ছিল। এখন অবস্থা শোচনীয়। তবুও ভাঙড় ও বাজারহাট অঞ্চলে অবস্থা স্বাভাবিক আছে কিছুটা। ইছামতী, বসিরহাট ও হাসনাবাদের পলিমেশান দো-আঁশলা মাটি চাষের উপযোগী। আমন, আউশ ও পাটচাষ হলেও আমনেরই প্রাধান্য। বারাসাত-বসিরহাট অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের বার্ষিক পরিমাণ ৫৯ থেকে ৬৪ ইঞ্চির মধ্যে। শতকরা ৬০ জন কৃষিজীবী।

ব্যাপকভাবে শরণার্থীরা আসা শুরু হবার পর ১৯৫০ খৃঃ। অত্যাচারের বিভীষিকা নিয়ে আসছে তারা। ডঃ রায় নির্দেশ দিলেন পুনর্বাসনের। জেলাশাসকরা তৎপর হলেন। ডঃ রায় ছিলেন অন্য ধাতের মানুষ। সেকালী নিয়মকানুনের থেকে মানুষের সুখ-সুবিধাকেই বড় মনে করতেন। আর

সেভাবেই সরকারী কর্মীদের কাজের নির্দেশ পাঠাতেন। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্বাস্তু নীতিতে ওঁর ভরসা ছিল কম। তাঁর মৃত্যুর পর পূর্ব বাঙলার শরণার্থীদের পুনর্বাসনের কোন বলিষ্ঠ পদক্ষেপই নেওয়া হয়নি। যা তিনি করে গিয়েছিলেন, তা আর বাড়েনি। বরং ধ্বংসের পথ প্রশস্ত হয়েছে।

সাজিরহাট থেকে সোদপুর রোড বা মিলিটারী রোড হয়ে যশোর রোড। ১৯৫০ খৃঃ পর্যন্ত চারপাশ ছিল জঙ্গলময়। সমৃদ্ধি ছিল না, মানুষ বাসের পরিবেশের অভাব। মাঝে মাঝে দু-একটি ঘর। তাদের কাছে দিনের বেলাটাই জীবন। রাতের অন্ধকারে কোন মানুষের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া ছিল কঠিন। নির্জন। নিস্তব্ধ। দিনের বেলায় ঘুরে বেড়াত শুয়োর, শেয়াল। বাদু থেকে কলকাতায় আপিস যাত্রী যেত দুচারজন। মধ্যমগ্রাম স্টেশনে এসে ট্রেন ধরত তারা। গোয়ালারা দুধ নিয়ে যেত শিয়ালদহ বাজারে।

ডঃ রায় তখন বেঁচে। বসিরহাট বনগাঁ হয়ে অজস্র মানুষ আসছে। মধ্যমগ্রামের বিস্তৃত বসতিহীন এলাকায় শরণার্থীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হল। বদলে গেল পরিবেশ। জঙ্গল বিদায় নেওয়া শুরু করল। শুয়োর শিয়াল পালাল। শীতের রাতে মাঝে মাঝে শিয়ালের ডাক শোনা যেত বছর কয়েক আগেও। জঙ্গল কেটে গড়ে উঠল নতুন নতুন ঘর। নতুন বসতি। চারদিকে অভূতপূর্ব কর্মব্যস্ততা। ভরে উঠল মানুষে। বসুনগর, বীরেনপল্লী, বঙ্কিমপল্লী, বিধানপল্লী, দেবদাসপল্লী, সুভাষপল্লী, বিজয়নগর, দেবীগড়, চণ্ডীগড়, রবীন্দ্রপল্লী, শ্রীপুর, শ্রীনগর আরও অনেক নামে পরিচিত হল জনপদ। উদয়রাজপুর আর সাজিরহাট ছিল আগে থেকেই।

চল্লিশ বছর আগে চলত গরুরগাড়ি, ডুলি, পাল্কি। মাঝে মধ্যে দেখা যেত ঘোড়ার গাড়ি। তখন সোদপুর রোডের ধারে এত দোকান ছিল না। খাবারের দোকান, স্টেশনারি দোকান, জুতো, কাপড়, রেডিও, ঘড়ি, বই, কাপড় ছাপান, ফার্নিচার, কম্বল, চশমা, কত কি। সবই পাওয়া যায় এখন। কুড়ে ঘর চোখে পড়ে কম। এখন ভরে গেছে পাকা বাড়িতে। ইলেকট্রিক এসেছে। আবার, শ্রীকৃষ্ণ দুটো সিনেমা হল। এম বি বি এস ও হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের ছড়াছড়ি। পলিক্লিনিক আছে। একসরে ক্লিনিক হয়েছে। প্রসূতি সেবাসদন ও শিশুসেবা কেন্দ্র, দাতব্য চিকিৎসালয়, প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র আছে। বাঙালীর প্রিয় কালীবাড়ীও পাবেন মধ্যমগ্রামে। শিব-মন্দির, শীতলা-খোলা, শনিঠাকুরের খোলা, নাবায়ণঘর, অন্নপূর্ণা মন্দির, হয়েছে দেশ বিভাগের পর। বিধানপল্লীতে আছে একটি পুরোন মসজিদ। স্টেশনের কাছেই বাজারটি জনসংখ্যা অনুপাতে একেবারে ছোট।

এক সময় এখানে ছিল দু'একটা পাঠশালা। আর চৌমাথার পাশের ময়দানে ছিল ২৪ পরগণা জেলা বোর্ডের অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। দোহারিয়াড়ে ছিল টোল। শোনা যায় মিশনারিরাও নাকি প্রাথমিক স্কুল খুলেছিল। একশ বছর কেন, ষাট বছর আগে উঁচু ক্লাসে পড়তে যেতে হত বারাসাত।

কিন্তু জনপদে গড়ে উঠল অনেক প্রাথমিক স্কুল। মধ্যমগ্রাম হাইস্কুল স্টেশনের পাশেই। প্রথমে তালগাছের খুঁটি আর গোল পাতার ছাউনি দিয়ে তৈরি হয়েছিল স্কুলবাড়ি। ঘর ছিল দুখানা। ছাত্র বাড়তে থাকে। আস্তে আস্তে সবে গেল গোলপাতার ছাউনি। মুলিবাঁশের বেড়া। এখন বিঘাট বাড়িতে স্কুল বসে। সুবৃহৎ গ্রন্থাগার। ল্যাবরেটরি। খেলার মাঠ। শিক্ষক ও কর্মীদের বেতন মাসে দশ হাজার টাকার ওপর।

মধ্যমগ্রামের প্রায় সবকটা পল্লীতে গড়ে উঠেছে একাধিক স্কুল। তাছাড়া আছে মেয়েদের হাতের কাজ শেখার দুটি শিক্ষা-কেন্দ্র।

নোয়াই খালের ওপারে মধ্যমগ্রাম। এপারে নববারাকপুর। একেবারে আধুনিক জনপদ। নববারাকপুরের ইতিহাস স্বাধীনতা পরবর্তীকালের। এই বসতির কোন অতীত নেই, আছে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। যে বর্তমানের সূচনা করে গেছেন হরিপদ বিশ্বাস।

হরিপদ বিশ্বাসের বাড়ি ছিল খুলনায়। বারাকপুরে। বারাকপুর ইউনিয়নের কামার-বাড়ি গ্রামের চারশত ঘর বাস্তুহারা নমঃশূদ্র অধিবাসী নিয়ে চলে আসেন এপারে। স্থাপিত হল সমবায়পল্লী নববারাকপুর। দেশ ছেড়ে আসার সময় সঙ্গে নিয়ে আসেন বারাকপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহাকালিকা। প্রতিষ্ঠা করলেন দেবীমূর্তি।

নববারাকপুর তখন অনাবাদী এলাকা। জলা-জঙ্গল। বাঁশবনে ভর্তি। চোরডাকাতের আস্তানা। একদিকে বেঙ্গলাইন চলে গেছে বনগাঁয়। ওপারে যশোর রোড। অতি নীচু-ভূমি। বর্ষায় জল জমে। সব উপেক্ষা করে ১৯৫০ খৃঃ গড়ে উঠতে থাকে নববারাকপুর

বিনয় ঘোষের

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি ১ম খণ্ড ৪০৲ ২য় খণ্ড ৪০৲

বাংলার বিদ্বৎসমাজ পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সং ১৫৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের — চাণক্য সেনের নতুন উপন্যাস

বলাকারমন ১০৲ **পত্র, পিতাকে** ১৮৲

Prof. S. N. Basu's

Standard Problems on Accountancy	12.00
Solutions to Standard Problems on Accountancy	25.00
Incometax Simplified (Latest Ed.)	20.00
Standard Problems on Advanced Accountancy with Solution	8.50
Model Problems on Advanced Accountancy (for B.Com. pass course)	10.00

অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ সেনের

হিসাব পরীক্ষা শাস্ত্র (Auditing Revised Ed.) ১৬৲

অবনীন্দ্র রচনাবলী ১ম ২০৲, ২য় ২২.৫০, ৩য় ২৮৲, ৪র্থ ছাপা হচ্ছে

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের — লাভাসস্থ-র

পুতুলনাচের ইতিকথা উত্তরাধিকার

দাম : ১২.৫০ — দাম : ১২.০০

প্রকাশ ভবন : ॥ ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩ ॥

উপনগরী—নবব্যারাকপুর কো-অপারেটিভ কলোনি সোসাইটি। পরে নাম হয় নব-ব্যারাকপুর সমবায় হোমস লিঃ। আয়তন ৪ বর্গমাইল। ৫০ হাজার লোকের বাস এখন। ৩৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। ছেলেমেয়েদের ৯টি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়। তিনটি কলেজ। হাসপাতাল, মাতৃসদন ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্র। দুটি পৌর বাজার। ব্যাংক। সমবায় সমিতি। রেল স্টেশন। প্রায় ৩০টি ক্লাব। পাঠাগার। সিনেমা হল। সব মিলিয়ে নববারাকপুর এক আধুনিক বসতি। উপনিবেশের আকর্ষণ বাড়ছিল। সেই সঙ্গে জনসংখ্যা। বনগাঁ লাইনে সব থেকে দ্রুত উন্নত অঞ্চল।

বনগাঁ বা বসিরহাট থেকে কলকাতা আসতে পড়ে বারাসাত। বারাসাত থেকে কলকাতা, ব্যারাকপুর, কৃষ্ণনগর, বসিরহাট, যশোর যাওয়ার পথ আছে। বর্তমানে বারাসাত জনসংখ্যায় একটি বৃহৎ শহর। হাসপাতাল, কোর্ট, কাছারি, অফিস, ব্যাংক, যানবহন চলাচলে সদাব্যস্ত। দেশ বিভাগের পর থেকে জনসংখ্যা বাড়ছে দ্রুত।

বারাসাত থেকে বসিরহাট যাওয়ার সরু রেলপথ চালু হয় ১৯০৫ খৃঃ জানুয়ারি মাসে। টাকি ও হাসনাবাদ পর্যন্ত এই রেলপথ বিস্তৃত হয় ১৯০৯ খৃঃ। লেভেল ক্রসিং-এর জায়গায় ১৯০৫ খৃঃ হৃদয়পুর স্টেশন তৈরি হয়েছিল। একটি চালাঘরে ছিল স্টেশন। পাকা স্টেশন ঘর তৈরি হয় ১৯১৩ খৃঃ। ততদিনে রেলপথের লীজ ফুরিয়ে গেলে বেঙ্গল সেন্ট্রাল রেলওয়ে কোম্পানির নতুন মালিক হল ইস্টার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে। ১৯২৪ খৃঃ শ্যাম-বাজার থেকে বসিরহাট বাস সার্ভিস চালু হয়। কৃষ্ণনগর রোড ও যশোহর রোডের সংযোগস্থলে দুলীপুকুরের ধারে ডাক-বাংলো নির্মিত হয় বহিরাগতদের সুবিধার জন্য। মোগল আমলে এখানে ছিল সরাই-খানা। বারাসতের মাঝখানে যে পোস্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস ছিল ১৯১৭ খৃঃ সেটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় স্টেশনের কাছে কাছারির ধারে নতুন পোস্ট অফিস স্থাপিত হয়। বর্তমান পোস্ট অফিসটি বারাসাত বাজারের কাছে। ১৮৬৯ খৃঃ মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত হলেও, জেলা সদরের সুনাম শেষ হয়ে যায় ১৮৬১ খৃঃ। কোম্পানি আমলের প্রথম থেকেই বারাসাতের আত্মপ্রকাশ। উত্তরাংশের হেস্টিংস ভিলা এখন এসডিও বাঙলো। এক সময় ঘোড়দৌড়ের মাঠ ছিল। তখন কলকাতায় ঘোড়দৌড়ের মাঠ ছিল না। কোম্পানির বহু কর্মচারীর বাগানবাড়ি, বহু নীলকুঠি সেনা শিক্ষাকেন্দ্র, আরও অনেক কিছু নিয়ে বারাসাত ছিল জমজমাট।

সরকারি স্কুল আর কলেজে আশ-পাশের গ্রামের মানুষরা আসত লেখাপড়া শিখতে। সব মিলিয়ে হাজার লোকের বাস। এখন বারাসাত কেবল মানুষের মহল্লা। নপাড়া, পাইওনিয়ার, সরোজিনীপল্লী, সুভাষপল্লী, গড় কলোনি, শরৎপল্লী, বঙ্কিমপল্লী, রাজারামমোহনপল্লী, সুকান্ত-পল্লী, প্রশান্তপল্লী (কৃষ্ণনগরের ১৫০ ঘর এসেছে), নরেন্দ্রপল্লী, বিবেকানন্দ পেলস, আশুতোষপল্লী, শকুন্তলনগর, চড়কডাঙা অশ্বিনীপল্লী, বরিশাল কলোনি চড়কডাঙা (হাটখোলা), নতুনপুকুর, সতীন সেন পল্লী, শিবানন্দপল্লী—আরও আছে। অশ্বিনীপল্লীতে ঢাকা ও বরিশালের লোক বেশি। শকুন্তলনগর গড়ে উঠেছে বরিশালের মানুষ নিয়ে। ঢাকা, বরিশাল ও ফরিদপুরের মানুষের সমাবেশে সুকান্তপল্লী। চৌধুরী-পাড়া ও দক্ষিণপাড়ার অনেক পুরোন বাড়ি চোখে পড়ে। বেশ কয়েক পুরুষের বাস এখানে। পাড়ায় পাড়ায় ক্লাব স্কুল। বিরাট হাসপাতাল। থানা। জেলখানা আছে একটা। এককালে ছিল এক সহেবের বাগান বাড়ি। যে বিরাট জনসংখ্যা বেড়েছে, সে অনুপাতে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা হয়নি। কলেজ একটি। বছর কয়েক আগে একটি ইভনিং কলেজ খোলা হয়েছে। তিনটে সিনেমা হল আছে। আরও দুটো হচ্ছে।

বারাসাতের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল টিপিকাল ধরনের। শরণার্থীরা আসবার আগে সামান্য জনপ্রাণী নিয়ে এই মফঃস্বল শহরটি ছিল শান্ত নিরীহ সবল। শরণার্থীরা বার বার এসেছে। বারাসতের ওপর দিয়েই ছিল যাতায়াত। স্বার্থান্বেষী মানুষদের ভিড় বাড়ল। হঠাৎ পয়সা কামিয়ে জমিবাড়ি করে অনেকেই সমাজ-শিরোমণি হয়ে উঠল। এই শহরটিতে যেমন আছে প্রচুর বিত্তশালী মানুষ তেমনি গরীবের অভাব নেই। একটি ভাল পাবলিক লাইব্রেরী নেই, খেলার মাঠ নেই। থিয়েটার হল নেই। বেশ কিছুকাল যাবৎ ধর্মীয় প্রচেষ্টা প্রকট হয়ে উঠছে। দেশ বিভাগের আগে কোন সার্বজনীন পুজো হত না। এখন তার সংখ্যা চারশর ওপর। নানা ধরনের সমাজদ্রোহীদের একটা বড় ঘাঁটি বারাসত।

বসিরহাট উত্তর চব্বিশ পরগণার বিশিষ্ট মহকুমা শহর। এখানে বড় বড় রাস্তা, হোটেল, হাসপাতাল, দোকান-পাট বড় বড় বাড়ি, অফিস আদালত, পিকনিক স্পট, সবই আছে। স্কুল, কলেজ আছে। বাস, টেম্পো বিকসা—যাতায়াতের সুবিধা অনেক। দেশ ভাগের সঙ্গে সঙ্গে বসিরহাটের ওপর শরণার্থীদের প্রচন্ড চাপ পড়ে। কৃষি-নির্ভর সমগ্র থানায় পূর্ব বাঙলার কৃষক ও জেলে বসতি গড়ে তোলায় অর্থনৈতিক পরিবর্তন এসেছে। ধানকুড়িয়া, নিহালপুর বাকড়া, কপালপুর, শ্রীনগর, গোবিন্দপুর, ধোকড়া, নিক্সা, শিবহাটি, গাছা, পানিতর, ইটিন্ডা—এসব গ্রামে পূর্ব বাঙলার মানুষ বেশি। কলকাতা থেকে দূরত্ব মাত্র চল্লিশ মাইল। ট্রেনে বসিরহাট হয়ে হাসনাবাদ যাওয়া যায়। নৌকায় বা লঞ্চে বসিরহাট হয়ে ঢোকা যায় সুন্দরবনে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতুলনীয়। ইছামতী গেছে এই মহকুমার মধ্য দিয়ে। প্রবাদ, এই পথে বাণিজ্যে যেতেন চাঁদ সদাগর।

বসিরহাট গড়ে উঠেছে অনেক আগে। সেই পাঠান, মোগল আমল থেকে লোক-বসতির শুরু। এখন এই মহকুমা সুন্দরবন থেকে বারাসত মহকুমা পর্যন্ত বিস্তৃত। সীমান্তে বাংলাদেশ।

কৃষি প্রধান এলাকা। কুটির শিল্পের ব্যাপকতা ঘটেছে। কৃষক, কুমোর, কামার, তাঁতির বসতি। ধান, পাট খেজুর, গুড় তালগুড়, মধু, আখের গুড়, ডাল, তুলা, মাছ, নানা রকম তরিতরকারি থেকে তাঁতের

ইন্দুভূষণ মণ্ডল-এর প্রকাশনায়

একালের স্বপ্ন

২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা-শ্রাবণ. লিখেছেন :—বাজীরাও সেন, ব্র.না.ম, ঊর্ধ্বরুধারী, গোপালহরি বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়দেব মনি, অসীমা মাইতি, শিবকালী চট্টো-পাধ্যায়, সমীরণ রুদ্র, শোভন শেঠ, সুখলাল, রবীন্দ্রকুমার সাহা, হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে।

শারদীয়ার জন্য সত্বর লেখা পাঠান।

সম্পাদক - বীরেন হালদার
ইন্দা, খড়গপুর, জেলা মেদিনীপুর।

বঙ্গশ্রী
হাওড়া
৪১/১, জি, টি, রোড, হাওড়া
• বেনারসী
• জোড় • সিল্ক
• তাঁত • মিল
• গোষাক
• সাটিং • সুটিং
ও ছিট কাপড়

কাপড়, গামছা, খেলনা, পুতুল, কাঠ, মহুয়া বাঘের চামড়া পাওয়া যায় সব জায়গায়। এ-সব রপ্তানি হচ্ছে কলকাতায়। শাহী মসজিদ, তারা ক্ষ্যাপার আশ্রম, কালীবাড়ি; শোনপুকুর কুঠির মাঠ, নেওয়াদীঘি, সংগ্রামপুরের কালীবাড়ি, চন্দ্রকেতুগড়, তারাগুনিয়ার বারুনির মেলা, রোশান বিবির থান, শিব মন্দির, বিবেকানন্দ শিষ্য স্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্দির, হাড়োয়ার বীর গোরাচাঁদের সমাধি, বসিরহাটের অতীতকে স্মরণ করিয়ে দেয়। পুঁড়া সাঁড়াপুল গ্রামে নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। বর্ধিষ্ণু গ্রাম চাপঘাটে পীর ঠাকুর সাহেবের দরগাহ আছে। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন মহারাজ প্রতাপাদিত্য। হাড়োয়ার পূর্ব বাঙলার উদ্বাস্তুদের একটা উপনিবেশ গড়ে উঠেছে। পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে শরণার্থী বসতি হয়েছে যথেষ্ট।

।।৪।।

চারদিকে গাছপালা। ঝোপজঙ্গল। কয়েক ঘর গোয়ালার বাস। জনমানুষের চলাফেরা কম। শন বন। শিয়ালের আনাগোনা দিনে-রাতে। ম্যালেরিয়ার কাঁথা জড়ান গ্রামের গায়ে। দিনের বেলায় ট্রেনের ইঞ্জিনের হুসহুস শব্দ মিলিয়ে যেতেই, গ্রামের পথে দেখা যায় দু'-চারজন মানুষ। কাঁধে বাঁক। দুধের ভ্রাম নিয়ে যাচ্ছে কলকাতা। অথবা ফিরছে। যশোর রোডের ওপর প্রচণ্ড গতিতে ছুটে যাচ্ছে আসছে গোনাগুনতি বাস। স্কুল পাঠশালা নেই। কিছু ধনী গোয়ালা আর মুসলমান ধনীর বাস।

এল স্বাধীনতা। ওপার বাংলার মানুষের ঢল নামল। সীমান্ত পেরিয়ে এপার বাংলায় ছুটে এল। সঙ্গে মুমূর্ষু সংসার। এখানে মাটির গন্ধ এক। জলের স্বাদ এক। একই পাখি ডাকে। ফুল ফোটা ঝরা গাছগুলো চিরপরিচিত। জন্মের পরিচয়।

তখন ছিল মাছের সের চার আনা। চার আনা মণ টমেটো। ক্ষেত থেকে যেগুন তুলে নিয়ে গেলে লড়াই বাধত না। মূল্য খেত না কেউ। ১১ টাঃ মণ দুধ। ওপারের মানুষ এলে টান পড়ল খাবারে, জমিতে। স্থানীয় মানুষরা ঠাট্টা করে বলত 'কী শালা বাঙাল জাত এসেছে যে কচুর মুই শুধ খেয়ে নিচ্ছে।'

সেই বিরলপ্রাণ জমিতে জন্ম নিয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগণার সমৃদ্ধ ব্যবসা কেন্দ্র হাবড়া। হাবড়া থেকে ৮২ নম্বর বাস মঙ্গলন্দপুর-মগরা হয়ে চলে যাচ্ছে বসিরহাট। ১১ নম্বর বাস যাচ্ছে বাগাঘাট। বদর হয়ে বেড়াচাঁপা পর্যন্ত গেছে একটা রাস্তা। হাবড়া হাট বসে শুক্রবার আর মঙ্গলবার। গ্রাম থেকে আসা শরণার্থীরা আশ্রয় নিয়েছিল হাবড়ায়। কাছের গ্রাম বাইগাছিতে। কলকাতা থেকে ২৭ মাইল দূরে হাবড়ায় একটা সৈন্যনিবাস গড়ে উঠেছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে। দীর্ঘ রানওয়ে তৈরি হয়েছিল বিমানবাহিনীর জন্যে। যোগাযোগের ভাল রাস্তা ছিল। পাঁচ বর্গমাইল এলাকা মুড়ে। যশোর রোডের ধারে। কলকাতার সঙ্গে রেল ও সড়ক পথে যোগাযোগ ছিল আগে থেকেই।

হাবড়ার উদ্বাস্তু পুনর্বাসন পরিকল্পনার ছিল একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। আশ্রমশিবিরে আগে থেকেই যারা এসেছিল তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করাই ছিল জরুরী। গ্রামবাসী ও শহরবাসী দু' ধরনেরই মানুষ ছিল এদের মধ্যে। সে কারণে সরকার উপনিবেশকে দুটি ভাগ করেন। একটি হবে উপনগরী এবং অপরটি গড়ে উঠবে গ্রাম্য পরিবেশে। উপনগরীর নাম হল অশোকনগর। আর গ্রাম্য উপনিবেশের নাম কল্যাণগড়।

নিউ আলিপুরে সেনাবাহিনীর পরিত্যক্ত ব্যারাকে যে সব উদ্বাস্তু আশ্রয় নিয়েছিল তাদের নিয়ে যাওয়া হয় কল্যাণগড়। প্রত্যেকের জন্য জমি বরাদ্দ-হয়। আগত মানুষ অল্প সময়ে ঘর তুলে, গাছ লাগিয়ে গ্রামগার চেহারা দেয় বদলে।

হাবড়ার কয়েক মাইল উত্তরে যশোর রোডের পশ্চিমে নয়তাবা গ্রাম। চারদিকে পড়ে ছিল অনাবাদী জমি। সেই জমির মাটিতে বালির ভাগ বেশি। চাষের অনুপযোগী। উদ্বাস্তুরা এসে উঠল এখানে। তারা কৃষিজীবী। তাদের ভাল লাগল। জায়গাটা। কিন্তু পছন্দ হল না। জীবিকার সন্ধান কোথায়? একদিন সরে গেল তারা। এল নতুন দল। তাদের অনেকেই ছিলেন ওপার বাঙলার গোয়ালা। তাদের একজন ভক্ত ঘোষ। পঞ্চাশ সালে এসেছিলেন। আসবার সময় একটি গরু ছিল সঙ্গে। এখন ষাটটি গরু। মানুষজন। পাকা বাড়ি। টালির ঘর অনেক। শ্যামাপ্রসাদ বিদ্যায়তন নামে একটি স্কুলও হয়েছে।

হাবড়ার পথে-ঘাটে-আধুনিক জীবনের ছোঁয়া। স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরী, সিনেমা হল, ক্লাবের ছড়াছড়ি। হাবড়া থানায় পড়া ৮টি কলেজ। ৩২টির মত হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল। সাহাপাড়ায় তৈরি হচ্ছে বেডিমেড জামা-কাপড়। দক্ষিণ হাবড়ার অধিকাংশ ব্যবসায়ী। চাকুরিজীবী সংখ্যায় কম। ইতনা কলোনিতে অবস্থাপন্ন মানুষের বাস বেশী। প্রফুল্লনগর কলোনি হলেও পার্চেজড়

সদ্য প্রকাশিত কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য বই

রমেশ মজুমদার-এর বিপ্লবী বই

সূর্য্যসেন ও সশস্ত্র বিপ্লব

সূর্য সেনের স্বাধীনতা আন্দোলনের তথ্যবহুল কাহিনী এবং সেই সঙ্গে স্বাভাবিক কারণে এসে গেছে তাঁর সহকর্মীদের বিরাট অবদানের কথা। এই গ্রন্থের প্রতিটি পাতা রোমহর্ষক কাহিনীসমৃদ্ধ, যা তখনকার দিনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল এবং আজও পাঠকচিত্ত আলোড়িত করে।

দাম : আট টাকা

রমেন দাস-এর বহু প্রতিক্ষিত

নজরুলের প্রেম

বিদ্রোহী কবির জীবনেও ফুটেছিল ভালবাসার অনেক ফুল। রোমাঞ্চকর সেই কাহিনী নজরুলের প্রেম।

দাম : আট টাকা

রমেন দাস-এর কিশোর উপন্যাস

জয়সূর্য্য

ভারত সীমান্তে নেতাজীর নেতৃত্বে রামসেনাদের মরণপণ যুদ্ধের পটভূমিকায় সাড়া জাগানো উপন্যাস।

দাম : চার টাকা

জ্যোতি প্রকাশন • ২এ নবীন কুণ্ডু লেন • কলিকাতা—৯

স্পষ্ট বলুন ঃ আজ্ঞে না, ধন্যবাদ

আপনার সংরক্ষিত টিকিটের দাম ফেরৎ দেবার জন্য রিজার্ভেশন অফিসে গেলে অনেকেই হয়তো আপনার টিকিটটি কিনে নেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করবেন।

কিন্তু না, ওঁদের কাউকেই বিক্রী করবেন না। সোজা কাউণ্টারে ফেরৎ দিন।

কারণ, হয়ত এঁদের মধ্যে দু-একজন যাত্রী থাকবেন কিন্তু বেশির ভাগ লোকেরই উদ্দেশ্য আপনার টিকিটটি কিনে অন্য কোন নিরীহ যাত্রীর কাছে বেশী দামে বিক্রী করা।

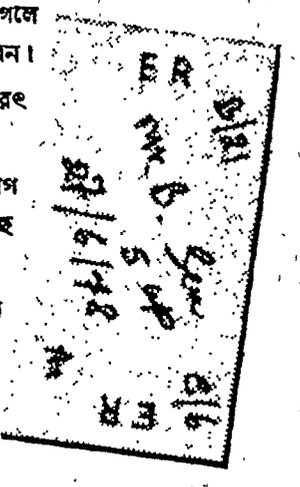

অন্যের নামে রিজার্ভ করা টিকিট নিয়ে ভ্রমণ করা অপরাধ এবং এর জন্য শাস্তি নগদ জরিমানা ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত অথবা তিন মাসের জেল অথবা দুইই হতে পারে। তাছাড়া এই ধরনের জরিমানা সমেত রেলের ভাড়া দিতে হবে বা তাঁকে গাড়ী থেকে নামিয়েই দেওয়া হবে।

আপনি নিশ্চয়ই চান না কোন নিরীহ যাত্রী এইসব শাস্তি ভোগ করেন কিংবা আপনি নিজে এ জাতীয় অপরাধে জড়িয়ে পড়েন।

সুতরাং জোর গলায় বলুন, আজ্ঞে না, ধন্যবাদ।

পূর্ব রেলওয়ে

medium

ল্যান্ড। অবস্থাপন্ন মানুষের বাস। এখানে আছে হাইস্কুল, গার্লস স্কুল, প্রাইমারি আর নার্সারি। নগরবধূর অধিকাংশ মানুষ কুন্ডু। একটা হাই আর একটা প্রাইমারি স্কুল আছে। পুরোন ভাঙা বাড়ি, বিরাট দীঘি স্থানটি যে অর্বাচীন নয়, তারই প্রমাণ। হিজলপুকুরে খুলনা-যশোরের লোক বেশি। আশুতোষ কলোনিতে আছে প্রায় তিনশ পরিবার। অধিকাংশ ব্যবসায়ী। দুটো প্রাইমারি স্কুল আছে। হাটখোলার গ্রাম সেবা সংঘ গার্লস স্কুল আর লাইব্রেরী করেছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী শচীন করগুপ্ত। কিন্ডার গার্ডেন আর নার্সারী স্কুল আছে। জয়বধূরা, ডহরবধূরা, কামারধূরা, আর শ্রীনগর তো গড়ে উঠেছে ওপার বাঙলার মানুষ নিয়ে।

স্টেশনের কাছেই হাবড়া হাইস্কুলের বিরাট বাড়ি। টিনের চালা দেওয়া ছোট সেই বাড়িটাকে আজ আর খুঁজে পাওয়া কঠিন। পাশেই গার্লস স্কুল। হাবড়া হাইস্কুল প্রতিষ্ঠায় ডালমিয়াদের দান উল্লেখযোগ্য। গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন তরুণকান্তি ঘোষ। শ্রীচৈতন্য কলেজও তাঁর সৃষ্টি।

অশোকনগর বিরাট এলাকা। সব থেকে অবহেলিত। সুন্দর সুদৃশ্য রাস্তা অযত্নে অবহেলায় ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। দুটি মাধ্যমিক ও দুটি গার্লস স্কুল আছে। ১৪নটি গ্রামের প্রতিটিতেই আছে একটি স্কুল।

হাবড়া স্টেশন থেকে বাসে যেতে হয় বাণীপুর। এখানে আছে আটটি নানা ধরনের শিক্ষাকেন্দ্র। বেসিক ট্রেনিং কলেজ, জুনিয়ার বেসিক ট্রেনিং কলেজ, জনতা কলেজ, স্টেট ইনস্টিটিউট, ফিজিক্যাল কলেজ, পি টি এবং পি আই বি টি কলেজ, এক্সপেরিমেন্টাল নার্সারী স্কুল আর অর্ফান স্কুল। জনতা কলেজে সমাজবিদ্যার তিন মাসের সংক্ষিপ্ত শিক্ষা কোর্স চালু আছে। বাণীপুর সেন্ট্রাল লাইব্রেরী ব্যবহার করতে পারেন স্টেট ইনস্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্ররা। আগে রড মেলা হত। এখন বন্ধ হয়ে গেছে।

পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির তুলনায় হাবড়ার ইতিহাস যে একেবারে অনুল্লেখ্য নয়, তার প্রমাণ রয়েছে পুরাকীর্তির নিদর্শনের মধ্যে। হাবড়া শব্দের উদ্ভব হাওড় থেকে। হাওড় অর্থাৎ বিল বা জলা জায়গা। এক সময় যে বেগবতী নদী প্রবাহিত ছিল, এগুলি তারই নিদর্শন। নদী সরে গেছে, কিন্তু তার গভীর অংশ থেকে গেছে বিলের আকারে। প্রাচীনকালে হাবড়া, গোবরডাঙা এ-সব অঞ্চল ছিল সাগরের বাজুর অংশ। সেকালে প্রধান নদী ছিল যমুনা। এখন এখানে যমুনা কোথায়? গোবরডাঙার মধ্য দিয়ে ছিল চালুন্দিয়া নদী। এখন তার চিহ্ন রয়েছে জলাভূমিতে। যমুনার একটি শাখা পদ্মা প্রবাহিত হত হাবড়ার তিন দিক দিয়ে। এই পদ্মার তীরে ছিল চন্দ্রকেতুগড়। পদ্মাকে হাবড়ার মধ্যে পাওয়া যাবে বিলের মধ্যে। আরও

বাংলা সাহিত্যে প্রথম

শেকস্‌পীয়ার
৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ। মূল্য ১২০ টাকা গ্রাহকমূল্য ৭৫ টাকা।

মপাসাঁ
৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ। মূল্য ৮০ টাকা। গ্রাহকমূল্য ৬০ টাকা।

অসকার ওয়াইল্ড
২ খণ্ডে সম্পূর্ণ। মূল্য ৪০ টাকা। গ্রাহকমূল্য ৩০ টাকা।

হোমার
ইলিয়াড ও ওডিসি। এক খণ্ডে সম্পূর্ণ। মূল্য ২০ টাকা। গ্রাহকমূল্য ১৫ টাকা।

দান্তে
ডিভাইন কমেডি। এক খণ্ডে সম্পূর্ণ। মূল্য ২০ টাকা। গ্রাহকমূল্য ১৫ টাকা।

গ্রীক নাটক সংকলন
১২টি নির্বাচিত নাটক।
মূল্য ২০ টাকা। গ্রাহকমূল্য ১৫ টাকা

দেশবন্ধু রচনাসমগ্র
এক খণ্ডে সম্পূর্ণ বাংলা ও ইংরেজী সকল রচনা। মূল্য ৩০ টাকা। গ্রাহক-মূল্য ২২ টাকা।

জরাসন্ধ-এর ট্রিলজি উপন্যাস

স্বপ্ন সত্য বাস্তব ১২৲
৬০০ পৃষ্ঠার বৃহৎ গ্রন্থ।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৪টি উপন্যাস নিয়ে

মন মাটি মানুষ ১২৲
৬০০ পৃষ্ঠার বৃহৎ গ্রন্থ।

অবধূত-এর ট্রিলজি উপন্যাস

সুখ শান্তি ভালবাসা ১০৲
৬০০ পৃষ্ঠার বৃহৎ গ্রন্থ।

অবধূত-এর উপন্যাস

ভোরের গোধূলি ১৬৲
মায়ামাধুরী ১৫৲
বিশ্বাসের বিষ ১০৲
আমার চোখে দেখা ১০৲
একটি মেয়ের আত্মকাহিনী ৮৲
অনাহুত আহুতি ৬৲

উত্তমপুরুষ-এর উপন্যাস

জীবনের খেলাঘর ১০৲

বেদুইন

মাও সে-তুং একটি নাম ১২৲
ওরা নকশালপন্থী কেন? ১০৲
মাও সে-তুং-এর চিন্তাধারা ৫৲

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

কালরাত্রি ১০৲ **অভিনেত্রী** ৬৲

নীহাররঞ্জন গুপ্ত-র উপন্যাস

সূর্যমহল ৮৲ **নিশিবধূ** ৮৲

কৌটিল্য গুপ্ত-র উপন্যাস

স্নোফকস্‌ ক্যাবারে ১০৲
ব্যুরোক্র্যাসী ১০৲
পাথরের শিহরণ ১০৲
প্যাশান ১২৲
ফুল ও স্ফুলিঙ্গ ৭৲
চৌরঙ্গী কনট সার্কাস ৬৲

অমরেন্দ্র ঘোষ

অগ্নিযুগের নায়ক ৬৲
যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর ৫৲

সুনীল চক্রবর্তী কনিষ্ক

আমি মন্ত্রী হব ১০৲

কনিষ্ক

জঙ্গল জ্বলছে ৮৲

মায়া বসুর উপন্যাস

দূরবগাহিনী ৫৲

শৈলেশ দে

ফাঁসি মঞ্চ থেকে ৬৲

ভূপেন্দ্র সেন-এর রাজনৈতিক গ্রন্থ

মার্কসবাদ বনাম সুবিধাবাদ ১২৲

অজাতশত্রু

কামনার রঙ ৮৲

নামী লেখকদের সংকলন

অন্তরঙ্গ শরৎচন্দ্র ৬৲

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

সবার প্রিয় সুভাষ ১৫৲
কাল মার্কস ১০৲
নকশালবাড়ি ১০৲
মুক্তির ফৌজ ১০৲
রক্তের মূল্যে মুক্তি ৮৲

গী দ্য মপাসাঁ লেখর সেনগুপ্ত

সুন্দর তুমি প্রিয়তম ১২৲
রেজি দ্যবে ৫৲
নির্যাতিত নিগ্রো ৪৲

অশোক মুখোপাধ্যায়

ফ্যাসিবাদ দেশে দেশে ৬৲

প্রবোধ সরকার-এর উপন্যাস

রূপ-পসারিণী ১৫৲ **বারবধূ** ১০৲
সমাজ বিরোধী ৭৲
আমি কামালপাশা ৬৲

তুলি-কলম ফোন : ০৪-৮১৮০
১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

কয়েকটি নদী ছিল। বর্তমানে হাবড়ায় জলাব দুই বিঘা জলা জমি আছে। হাবড়ায় রেলপথ তৈরি হয়েছিল ১৮৮২ খ্রীঃ। যশোব রোড তৈবি করেছিলেন যশোবের কালী-প্রসাদ পোদ্দার। পরবর্তীকালে আরও অনেক রাস্তা তৈবি হয়েছে।

হাবড়ার কয়েকটি স্থানের মাটি খুঁড়ে প্রস্তর মূর্তি, মাটিব মূর্তি, মাটির পাত্র, দেবদেবীব মূর্তি, পাথবের গণেশ, কালো-পাথরের গণেশ, মাটিব ঘট, শঙ্খ প্রভৃতি পাওয়া গেছে। কামারধুবা গ্রামের শিব-বাড়িতে কোন মন্দির নেই। জায়গাটা বেশ উঁচু। দেশ বিভাগের আগে ছিল মুসলমান প্রধান এলাকা। অনেকের ধাবণা এটা কোন বৌদ্ধ বিহার। সাড়ে তিন ফুট উঁচু কষ্টি পাথরেব বিষ্ণু মূর্তি পাওয়া গেছে মানিক-তলায় একটি পুরোন পুকুর সংস্কারের সময়। মূর্তির দুপাশে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কীর্তিমুখ, উড়ন্ত গন্ধর্ব প্রভৃতি আছে। তাছাড়া এখানে পাওয়া গেছে লক্ষ্মী মূর্তি, পোড়ামাটিব মুখ প্রভৃতি। এইসব প্রত্ন-তাত্ত্বিক নিদর্শনকে অনেকেই সেন আমলেব মনে করেন। আরও গ্রামে পাওয়া গেছে চার-পাঁচটি রৌপ্য মুদ্রা ও পাথরের একটি মূর্তি। কোম্পানি আমলে হাবড়ার ছিল নীলকুঠি। তার ধ্বংসাবশেষ রয়েছে।

ইচ্ছামতীর তীরে বনগাঁ ছিল এক সময় বাণিজ্য কেন্দ্র এবং যশোহব জেলাব মহকুমা। তাবও আগে ছিল নদীয়া জেলার সঙ্গে যুক্ত। কয়েকটি নদী প্রবাহিত ছিল এক সময়। কিছু শুকিয়ে গেছে। মযনা, নাওডাঙা, বেতন, কোদলা, হাঁকর নদী এখনও প্রবাহিত। ইছামতী নদী এক সময় ছিল বেশ চওড়া। কুমীরেব উৎপাত ছিল প্রচন্ড। ১৯২৬ খ্রীঃ পর্যন্ত এই নদী থেকে মুক্তা পাওয়া গেছে। ইছামতী দুটি শব্দেব মালা। ইচ্ছা মানে গলদা চিংড়ি, আব মতী হল মুক্তা। ঝিনুক থেকে পাওয়া যেত মুক্তা। ঝিনুক থেকে চুন তৈরি হত। বনগাঁ এক সময় চুনেব বড় ব্যবসা কেন্দ্র ছিল। চুন ও মতির বড় ব্যবসা কেন্দ্র ছিল মতিগঞ্জে। গুপ্তযুগেও বড় বড় জাহাজ এসে ভিড়ত। মতিগঞ্জেব সে জৌলুস আব নেই। মতিগঞ্জের অপর তীরে বিল-বেতের জঙ্গলে ছিল বাঘ আর সাপ। এখন নেই সেসব। গড়ে উঠেছে জনবসতি। কেউটিপাড়া, মডিঘাটা, গাঁড়াপোতা, গোবরাপুর, গোপালনগব, ভান্ডাবকোলা, বল্লভপুর, কলমপুর গ্রামগুলিতে কেবল মানুষেব বসতি। এক সময় ছিল জনবিবল। গাইঘাটা থানাব কয়া, গদাধরপুর, ঠাকুরনগর, শশাডাঙাব, জলেশ্বর, ইচ্ছাপুরেও এক সময় ছিল অল্প মানুষের বাস।

১৮০০ খ্রীঃ একটি নীলকুঠি স্থাপিত হয়েছিল ঝিকরগাছা ঘাটে। কুঠিয়াল মেকেঞ্জি প্রতিষ্ঠিত হাট মেকেঞ্জিগঞ্জের হাট নামে পরিচিত হয়। ঝিকরগাছার কিছুদূরে বৈষ্ণবতীর্থ বোধখানা গ্রামে কানাই ঠাকুরের শ্রীপাট। প্রাণবল্লভজীউর মন্দির ও বিগ্রহ আছে। প্রতি বছর পঞ্চম দোলে সমাবোহের সঙ্গে মেলা বসে।

মহলন্দপুর স্টেশনটিতে এক সময় এমন কি লোক নামত! কয়েক ঘব ধনী মুসলমান চাষী পরিবাবই ছিল এখানকার বাসিন্দা। ট্রেন থেকে নেমে আর্টলিয়া, আটঘরা, আঁধার-মানিক, তাবাগুনিয়া, পিয়াড়া, আটরিয়া গ্রামে গেলে দেখা যাবে কি বিপুল সংখ্যক পূর্ব বাংলার মানুষ এখানে আশ্রয় পেয়েছে। স্বরূপ-নগর থানার কপিলেশ্বরপুর, ঘোলা, বার-ঘরিয়া, গলদহা, ছোট বাকড়া, কৈজুড়ী, চাবঘাটের অবস্থাও একই রকম।

যমুনা নদীর পশ্চিম তীবে গোবব-ডাঙা মিউনিসিপ্যালিটিব অন্তর্গত গোবর-ডাঙা-গাইঘাটা পাকা রাস্তার ধারে গৈপুর গ্রামে ওলাবিবির একটা বহু পুরোন দরগাহ আছে। এখানে বেশ কয়েকঘর শবণার্থী বসতি করেছে। গোবরডাঙা ও চাঁদপাড়া স্টেশনের মাঝে ঠাকুরনগব উপ-নিবেশ। বিভাগ পরবর্তী বাংলায় সম্পূর্ণ নতুন জনপদ। উপনিবেশের মধ্য দিয়ে গেছে যশোব রোড। প্রতি বছর ফাল্গুন মাসের মধুকৃষ্ণা-ত্রয়োদশী তিনি থেকে তিনদিন ধরে হরিঠাকুরের আবির্ভাব উৎসব হয়ে থাকে। ঠাকুরনগর স্টেশন হয়েছে অনেক পরে। শিমুলপুর, চিকনপাড়া, বরা, কিশ্চানপাড়া গীর্জা বসতি—এসব নাম আগে কখনও শোনা যায়নি। মানুষজন তো দূরের কথা।

উত্তর ২৪ পরগণাব শিল্পাঞ্চলে দেশ-বিভাগের আগে বাঙালী জনবসতি ছিল যথেষ্ট। কিন্তু কলকারখানায় বাঙালী কর্মীব সংখ্যা ছিল কম। শবণার্থীরা এপার বাংলায় যখন ব্যাপকভাবে আস্য শুরু করল, তখন জীবিকার সন্ধানে তাবা ঘুরছিল এসব এলাকায়। ব্যারাকপুর, খড়দহ, টিটাগড, নৈহাটি, কাঁচবাপাড়া, হালিশহর, পানিহাটি, ভাটপাড়া, সোদপুর, আগড়পাড়া—এসব এলাকায় গড়ে উঠল অনেক নতুন বসতি।

।।৫।।

নদীয়া বলতে বোঝাত বাংলাব এক বৃহৎ অঞ্চল। বিভিন্ন সময়ে এই জেলাব কিছু কিছু অংশ ২৪ পরগণা, হুগলি,

ডঃ দীপক দে'র

বঙ্কিমমূল্যায়ন ১০-০০

(পি এইচ ডি থিসিস)

সাম্যবাদ (উপন্যাস) ৫·০০

(১৯৬৭ থেকে বিপ্লব, ৭৭ অবধি শাসন)

মাষ্টারমশায় ৫·৫০

(শিক্ষক জীবন নিয়ে উপন্যাস)

অবাঞ্ছিত (উপন্যাস) ৪·০০

(পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের আগমন)

কলকাতা দেখেছি ৪·০০

উদারপন্থী (উপন্যাস) ৫·০০

প্রেমিক প্রেমিকাদের বৈঠকে ৪·

দে বুক স্টোর, ১৩ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট

বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ—

বলেন্দ্র রচনাবলী

ভূমিকা : ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী, সম্পাদনা : সদানন্দ ভট্টাচার্য ও দিলীপ চক্রবর্তী

১ম খণ্ড প্রকাশিত হল ২০·

বলেন্দ্রনাথ শুধুমাত্র ববীন্দ্রনাথ ঠাকুবের ভ্রাতুষ্পুত্রই নন, তিনি বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যেব একজন শ্রেষ্ঠ লেখক, এবং ববীন্দ্রনাথের সম প্রতিভা সম্পন্ন গদ্যকার। তাঁব সমগ্র রচনা এবং ববীন্দ্র-বলেন্দ্র পত্রাবলী ২ খণ্ডে প্রকাশিত হবে। দ্বিতীয় খণ্ড আগামী সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত হবে। এখন ও ১০· দিয়ে গ্রাহক হওয়া যাবে। গ্রাহকগণ ২ খণ্ড ৩২· পাবেন।

আমাদের আবেকখানি উল্লেখযোগ্য বই

রুশ বিপ্লবের ইতিহাস

ইন্দুভূষণ দাস, ৫·

বাশিযাব প্রাচীন আমল থেকে নভেম্বর বিপ্লব পর্যন্ত ঘটনাবলীব তথ্যপূর্ণ ইতিহাস। বাংলায় এবকম বই আব নেই।

জে; এন; চক্রবর্তী এ্যান্ড সন্স ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলি-৭৩

যশোহর ও মুর্শিদাবাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ১৭৯৩ খৃঃ যশোহরের সঙ্গে যোগ করা হয় বসিরহাট ও পার্শ্ববর্তী কিছু এলাকা এবং ২৪ পরগণার সঙ্গে আনারপুর মৌজা। ১৭৯৫ খৃঃ হুগলি ও বর্ধমানের সঙ্গে যুক্ত হয় নদীয়া জেলার কয়েকটি অংশ। ১৭৯৬ খৃঃ ১৯ জানুয়ারি নদীয়ার কিছু অংশ আবার মুর্শিদাবাদের আয়তন বাড়ায়। নদীয়ার কয়েকটি পরগণা নিয়ে বারাসাত জেলা গঠিত হয় ১৮৩৪ খৃঃ। ১৮৮২ খৃঃ বনগ্রাম মহকুমাকে যুক্ত করা হয় যশোহরের সঙ্গে এবং ১৮৮৮ খৃঃ ১ এপ্রিল অগ্রদ্বীপ যুক্ত হয় বর্ধমানের সঙ্গে। ১৯৪৭ খৃঃ পর্যন্ত নদীয়া জেলার এই রকম আয়তনই বজায় ছিল। কিন্তু র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ অনুসারে পরবর্তী সময়ে কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুরের বৃহৎ অংশ নদীয়া থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়।

নদীয়া জেলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ছুঁয়ে মুর্শিদাবাদ জেলা, বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলা উত্তর-পূর্বে, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে ২৪ পরগণা জেলা। ১৯৭১ খৃঃ সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী জেলার আয়তন ১৫১৪-৯ বর্গমাইল (৩৯২৬ বর্গ কিঃ মিঃ)। ভাগীরথী, জলঙ্গী ও মাথাভাঙা নদীয়া জেলার তিনটি প্রধান নদী। অবশ্য ভাগীরথীই অন্যতম। অছাড়া আছে চূর্ণী, ইছামতী নদ। কয়েকটি হ্রদ ও খাল-বিল আছে এই জেলায়।

১৯০১ খৃঃ থেকে ১৯৭১ খৃঃ পর্যন্ত নদীয়া জেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার :

বৎসর	মোট জনসংখ্যা
১৯০১	৭,৭৩,২০২
১৯১১	৭,৭৫,৯৮৬
১৯২১	৭,১১,৭০৬
১৯৩১	৭,২১,৯০৭
১৯৪১	৮,৪০,৩০৩
১৯৫১	১১,৪৪,৯২৪
১৯৬১	১৭,১৩,৩২৪
১৯৭১	২২,২৯,০২২

পূর্ব বাংলার শরণার্থীদের আগমনের ফলেই নদীয়ায় ব্যাপক জনবৃদ্ধি ঘটেছে। সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৭৭.০৩ হিন্দু, ২২.৩৬ মুসলমান, .০৫১ খৃস্টান। শিখ, বৌদ্ধ ও ইহুদি বাস করে বেশ কিছু সংখ্যক। পুরুষ ১১,৪৩,৩৬৭ এবং নারী ১০,৮৫,৬৫৫। মোট সাক্ষর সংখ্যা ৩৩.০৫ শতাংশ; পুরুষ ৪২.৮৪ শতাংশ, নারী ২২.০৮ শতাংশ।

নদীয়ায় ২২ লক্ষ ৩০ হাজার অধিবাসীর ১০,১১,৭৬০ জন উদ্বাস্তু। নদীয়া জেলার যে অংশ পূর্ব বাংলায় পড়ে, তারা এপারের নদীয়াতেই বসতি স্থাপন করেছে।

দেশ-বিভাগের সময় নদীয়া জেলার আয়তন অর্ধেক কমে গেলেও, শরণার্থীদের আগমন এই জেলায় ঘটে সবথেকে বেশি। রাণাঘাট কুপার্স ক্যাম্প ও ধুবুলিয়া ক্যাম্পে আশ্রয় পায় বিপুল সংখ্যক মানুষ। সরকার উদ্বাস্তুদের জন্য কল্যাণীর কাছে গয়েশপুর, কাঁটাগঞ্জ, গোকুলপুর, বীরনগরের কাছে তাহেরপুর এবং চাকদহের কাছে ঘোষবাগ মহল্লা ও হাসিমপুরে জমি দখল করে। ফুলিয়ায় উপনগরী গড়ে ওঠে ১৯৫০ খৃঃ কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায়। এখানে ক্ষুদ্রশিল্প কেন্দ্র ছাড়াও আছে কৃষি ও কারিগরী শিল্প প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। রাস্তা, বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। কৃষিজীবী উদ্বাস্তুরা করিমপুর, তেহট্ট, চাপড়া, কৃষ্ণগঞ্জ ও হাঁসখালি থানা এলাকায় আশ্রয় নেয়। মধ্যবিত্ত উদ্বাস্তুরা কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, চাকদহ, দেবগ্রাম, নাকাশীপাড়া থানায় বিশেষভাবে বসতি গড়ে তুলতে থাকে। এরা রেল রেললাইনের আশপাশেই প্রধানত আশ্রয় নেয়। পূর্ব বাংলার তাঁতীদের বৃহৎ অংশ নবদ্বীপ, রাণাঘাট ও শান্তিপুরের চারপাশে ছড়িয়ে যায়। তাহেরপুর, ঘোষবাগ ও গয়েশপুর কলোনির তাঁত কারখানা স্থাপন করে জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা হয়। সরকার এই জেলার উদ্বাস্তুদের জন্য ১৩,৪৬,৭১,৪৪৫ টাকা খরচ করলেও, বেশিরভাগ উদ্বাস্তুর এখনও অর্থনৈতিক পুনর্বাসন ঘটেনি। কোন কলোনিতেই পরিকল্পিত শিল্পোদ্যোগ নেই। অসংখ্য কারিগরি ও সাধারণ শিক্ষিত বেকার। পুনর্বাসন না পাওয়া উদ্বাস্তুরা এখনও এইসব শিবিরে জীবন কাটাচ্ছে ধুবুলিয়া আশ্রয় কেন্দ্র, চামতা মহিলা আশ্রয় কেন্দ্র, কুপার্স ক্যাম্প আশ্রয় কেন্দ্র, রূপশ্রী পল্লী মহিলা আশ্রয় কেন্দ্র এবং রূপশ্রী পল্লী আশ্রয় কেন্দ্র এবং চাঁদমারী আশ্রয় কেন্দ্র।

৮৫'তে বিরাট প্রযোজনা

ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের

ঐতিহাসিক পালা

এনের অমর কাহিনী

জনপ্রিয় সুপারহিট পালা

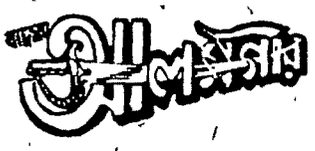

অশ্রুসজল সামাজিক পালা

ব্রজেন্দ্র কুমার দে'র চিরনতন ক্লাসিক

সোনাই দীঘি

শ্রেষ্ঠাংশে ও ভাবনা কাজীর ভূমিকায় .. ..

নটসূর্য দিলীপ চট্টোপাধ্যায়

প্রযোজক— —যোগেশ মুখোপাধ্যায়

পরিবেশনায়— সগর্বকণ্ঠে উচ্চারিত একটি নাম

ফোন—৫৪-২১৯৫

রঙমহলে বাদশা আলমগীরের নিয়মিত শো দেখুন

নদীয়া জেলায় মোট ৪৭টি উদ্বাস্তু উপনিবেশ আছে। এর মধ্যে ১৮টি সদর মহকুমায়। ২৬টি রাণাঘাট মহকুমায়। ১৯৭১ খৃঃ বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের ১২ লক্ষ এই জেলায় বিভিন্ন শিবিরে আশ্রয় নেয়।

নদীয়া জেলায় মোট ৪৭টি উদ্বাস্তু উপনিবেশ আছে। এর মধ্যে ১৮টি সদর মহকুমায়। ২৬টি রাণাঘাট মহকুমায়। ১৯৭১খৃঃ বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের ১২ লক্ষ এই জেলায় বিভিন্ন শিবিরে আশ্রয় নেয়।

বিরাট সংখ্যক শরণার্থী নদীয়া জেলার কৃষি ব্যবস্থা পরিবর্তন আনে। জমিতে ফসলি ভাগ বেশি। জল জমে কম। আমন থেকে আউসের চাষ হত বেশি। এখন ধান ছাড়াও পাট, গম, সরষে, ছোলা, আখ, ডাল, নানারকম তরকারির চাষ হচ্ছে। কাঁকিমপুর, নাকাশীপাড়া, কালীগঞ্জ, ভীমপুর, মগুলা, চাকদহ-হরিণঘাটায় ব্যাপকভাবে পাট চাষ হচ্ছে। সমগ্র জেলায় আছে ১২১টি হাট ও বাজার। এর মধ্যে ১৭টি পাইকারি বাজার। সমগ্র জেলা জুড়ে রেলপথ আর বাসা চলাচল করে। ১৬টি হাসপাতাল, ৫৪টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়, আটটি কলেজ, চারটি শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয়, বিয়াল্লিশটি ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ, প্রায় দু'হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাতশত উচ্চ বিদ্যালয় ছাড়াও আরও কয়েকশ বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাকেন্দ্র আছে। সব কটি বড় বড় জনপদে ব্যাঙ্কের শাখা খোলা হয়েছে। দেশ বিভাগের আগে নদীয়া জেলা ছিল মূলত কৃষিভিত্তিক। তাঁতশিল্প, মৃৎশিল্প ও কাঁসাপিতলের বাসন ছিল নদীয়ার ঐতিহ্য পূর্ব বাঙলার শরণার্থীদের চাপে জেলার কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি শিল্পাভিত্তিক হয়ে ওঠে। এরমধ্যে বেসরকারী অল্প উদ্যোগই ছিল সম্বল। আধুনিক ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকেন্দ্র হিসাবে রাণাঘাট ও কল্যাণির ভূমিকা আজ অগ্রগণ্য। তাঁতশিল্প শান্তিপুর ওনবদ্বীপে, মৃৎশিল্প কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণিতে, কাঁসাপিতল শিল্প নবদ্বীপ ও ধর্মদায় ছড়িয়ে আছে। কাঁলিগঞ্জের শোলার টুপি, নবদ্বীপ, মাটিয়ারি ও ধর্মদায় প্রায় ১৫০টি পরিবার কাঁসাপিতল শিল্পের ওপর নির্ভরশীল। কল্যাণিপুরের কাছে ১৫০টি পরিবার শাঁখা শিল্পে নিযুক্ত। মদের কারখানা, লোহার রড তৈরির কারখানা, জুতো, সাইকেলের যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানা হয়েছে কল্যাণিতে। কৃষ্ণনগরে চা বাগানের যন্ত্র ও সাজসরঞ্জাম তৈরি হচ্ছে। নবদ্বীপে ঘড়ি তৈরি হচ্ছে। শক্তিনগর গোয়ি তৈরিতে খ্যাতি লাভ করেছে। দেশ বিভাগের পর ফুলিয়ার উন্নতিই সব থেকে বিস্ময়কর। তাঁত শিল্পের জন্য বিখ্যাত হয়েছে। অধিকাংশই পূর্ব বাঙলার মানুষ নিয়ে গড়ে ওঠা উপনিবেশ। ফুলিয়া শান্তিপুর শহর থেকে ৪ মাইল, রাণাঘাট থেকে ৯ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে। ফুলিয়া স্টেশনের আগে নাম ছিল বৈঁচি। ফুলিয়া কলি কুন্ডিবাসের জন্মস্থান স্টেশন থেকে দুরত্ব ও মাইল। উপনগরী ফুলিয়ার আধ মাইল দূর দিয়ে গেছে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক।

যাবাসত থেকে বাসে চলে আসুন নগর ঈশ্বড়া গ্রাম। হাবড়া থেকেও যেতে পারেন। যমুনা নদীর ধারে। এটি ছিল মুসলমান প্রধান অঞ্চল। দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় জাতীয় পতাকা উত্তোলন নিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল প্রচণ্ড বিক্ষোভ। সে সময়েও চাল আনা সের রসগোল্লা পাওয়া যেত। ছিল জলময়। পূর্ব বাঙলার মানুষ এল। দুপার বাঙলার ভাষায় দারুন প্রভেদ। দলে মারপিটও হয়ে ছিল। অবশেষে শান্ত হল। লোকসতি গড়ে উঠল। অনুর্বর অনাবাদী জমিতে ফসল ফলল। এখন পুরোপুরি ব্যবসা কেন্দ্র। অধিকাংশ পূর্ব বাঙলার মানুষ। কুমিল্লার লোকই বেশি। প্রায় পনের হাজার মানুষ ছড়িয়ে আছে আট দশটা গ্রামে।

৫০০ রজনী অতিক্রান্ত! আলোড়ন সৃষ্টিকারী নাটক

অভিযান

তপন থিয়েটারে

ফোন ঃ ৪২৫৪৭১

নাটক ও পরিচালনা। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

অভিনয়ে ঃ বিকাশ রায়। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রদীপ। ইরা। সান্ত্বনা। গিরীন। রবীন। মিহির। সুনীল। নিখিল। অরুণ। শংকর। উৎপলেন্দু। শৈলেন। অলোকা। মধু। গণেশ। দীপঙ্কর। স্বপন। তিমির। তপন। শান্তি। ধ্রুব। কেষ্টা। স্মরদেব। অপূর্ব। বিশ্বনাথ। রবীন (ছোঃ) গোবিন্দ। বিকাশ (ছোঃ)। নিখিল (ছোঃ)। মায়া। কাজল। শিবানী। রমা। পাপিয়া। মিঠু এবং রত্না ঘোষাল ও তরুণকুমার

আলো - বিমল বোস ● সহকারী - রবীন। স্বপন। তারক। জগন্নাথ। মনু ● মেক-আপ - সরোজ মুন্সী ● কেশ - দিওয়ার হোসেন

সাজসজ্জা - শ্যামল। গৌর। মীরা ● মঞ্চ সহকারী - মাণিক। অজিত। রথীন্দ্র। সুধীর ● স্থিরচিত্র - শীতল দাস

বেতার প্রচার - মিডিং সাউণ্ড ● প্রচার - বিদ্যুৎ চক্রবর্তী

প্রতি বৃহঃ ও শনিবার ৬।।টায় ও রবি ছুটির দিন ৩টা ও ৬।।টায়

হাবড়া থেকে নগর উখড়া যেতে পড়ে কামারথুরা, বনবনিয়া, কাজলা, ঘড়তলা, ঝিকড়া, হাঁপানিয়া। হাঁপানিয়া মুসলমান প্রধান। ঝিকড়া থেকে হাঁপানিয়া যাওয়ার পথে দুধারে কুমড়োর খেত, আখ। খেতের মধ্যে কাঠের পোস্টে ইলেকট্রিসিটি। একটা বিরাট খেত জুড়ে চলেছে ট্রাকটর।

ওখানকার এক চাষীর সঙ্গে আলাপ হল। বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ। মুসলমান। বললেন, ইলেকট্রিক বলুন, জাতীয় সড়ক বলুন আর ট্রাকটরই বলুন—পূর্ব বাঙলার মানুষজন না এলে আমরা পেতাম না। আমার বাপ-ঠাকুর্দা শ্যালো জানত না। এসব তো হালের ব্যাপার।

নগর উখড়া হাট। টিনের চালার নীচে কামারশালা। দুপুরের প্রচণ্ড রোদে হাতুড়ি পেটানোর শব্দ আসছিল। গোটা কয়েক বাড়ি। দুটো মিষ্টির দোকান। দুটো গানের স্কুল। একটা বড় স্টেশনারি দোকান। ইউ বি আই-এর বিরাট বিল্ডিং মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। পরিবেশের সঙ্গে যা সম্পূর্ণ বেমানান। খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশনের অফিস। বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সাহায্য কেন্দ্রের সাব-অফিস। নদীয়া কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ। কো-এডুকেশন স্কুল একটা। একটা গার্লস স্কুল। কলেজ স্কুল। একটা আধাপোস্ট অফিস হয়েছে। মানিঅর্ডারে টাকা এলে সঠিক লোকের হাতে পৌঁছায় না যথাসময়ে। এ অভিযোগ শুনেছি। পিওন চিঠি দেয় না। কোন নেই এতবড় ব্যবসা কেন্দ্রে।

শান্তিপুরের মত অদূর ভবিষ্যতে নগর উখড়াতে ঘরে ঘরে বসবে তাঁত। যদি আবার এইসব শরণার্থীর জীবনে বিপর্যয় নেমে না আসে।

গ্রাম উত্তর দিয়ে প্রবাহিত যমুনা আজ তোয়হীন—মরাখাল। যমুনার বেগ যখন ছিল তখন গড়ে উঠেছিল ছোটখাট ব্যবসা কেন্দ্র। অধিকাংশ সওদা ছিল কৃষিপণ্য। তারপর এক সময় জঙ্গলময় বসতিহীন অঞ্চলে পরিণত হয়। কিন্তু পূর্ব বাঙলার অধিবাসীদের আগমনের পর গড়ে ওঠে নতুন বসতি। গ্রামটির অধিকাংশ অধিবাসী হিন্দু। গ্রামের মাঝ-খানে ওলাইচণ্ডী দেবীর মন্দির। বছরে চারবার মেলা বসে। মন্দির প্রতিষ্ঠা করে-ছিলেন জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কাষ্ঠ-নির্মিত মদনমোহন বিগ্রহ গ্রামের অন্যতম আকর্ষণ। শান বাঁধান একটি ছোট বেদী শীতলাতলা নামে পরিচিত। ষষ্ঠীতলায় সন্তান কামনায় মায়েরা পূজা দেয়। এটি পঞ্চাননতলা নামেও পরিচিত। শিবের অপর নাম পঞ্চানন। গ্রামটি এক সময় ছিল জঙ্গলময়। হিংস্র জন্তু জানোয়ারে ভরা।

জয় মা

যৌবনের অগ্নিদূত

মোহনমেরা

নিবেদিত ৮৫'র পালা উপহার

আনন্দময়ের ভক্তিমূলক পৌরাণিক

আদ্যাশক্তি মহামায়া

সুর ঃ ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও পঞ্চানন মিত্র

গীত রচনা ঃ সুনীলবরণ ও শান্তি দে

সত্যপ্রকাশ দত্তের দুঃসাহসিক পালারূপ

বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী

সুর ঃ রঘুনাথ দাস

সেই সংগে '৮৪র সুপারহিট পৌরাণিক পালা

কালকেতু ফুল্লরা

নির্দেশনা ও অভিনয়ে পুরাণে পারদর্শী

মোহন চ্যাটার্জী

ও

মিতা চ্যাটার্জী

ফিঃ ম্যানেজার ।। সুনীল দত্ত - সহঃ প্রজাপতি পাত্র তত্ত্বাবধায়ক ।। সুধীর অধিকারী, কোষাধ্যক্ষ ।। খগেন চক্রবর্তী, কার্যাধ্যক্ষ ।। হরিপ্রসাদ সিং, অঃ তত্ত্বাবজায়ক প্রভঞ্জন চক্রবর্তী, স্মারক ঃ অসিত মাঝি; জেঃ ম্যানেজার ঃ শঙ্কর কোলে।

৩০৯, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা - ৬ ।। ৫৫-৫৪১৩

তাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য শুরু হয় মনবিবি পূজা। পূজাস্থানটি বনবিবিতলা নামে পরিচিত। মনসাতলায় দশহরা ও শ্রাবণ মাসে মনসা পূজা হয়। নগর উখড়া বাজারে একটি কালীমন্দির স্থাপিত হয়েছে। শোনা যায় অতীতে মন্দির তৈরি করেছিলেন জনৈক জমিদার। তার চিহ্ন নেই। এই কালীমন্দিরের পাশে গাছতলায় আছে কামাখ্যা দেবীর পোড়ামাটির মূর্তি। মূর্তিটি চণ্ডী ও দুর্গার অনুরূপ।

অনেক সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়ে কল্যাণী উপনিবেশের পত্তন হয়েছিল। জাজান বাড়ি, পথঘাট, বাজার, হাসপাতাল, স্কুল কলেজ, অফিস-সব মিলিয়েই জনবসতি গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু নতুন জনপদও নির্ভরশীল কলকাতার ওপর। সমস্যা অনন্ত। পাঁচশত শয্যাবিশিষ্ট জওহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল হাসপাতাল এবং ই এস আই এর একটি একশত পঁচিশ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল আছে। মহাত্মা গান্ধীর নামেও একটি হাসপাতাল হয়েছে। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। কল্যাণী স্টেশনটির আগে নাম ছিল চাঁদমারী। উলাবেড় নগর, জনপদে স্নানাঘাট, তেহট্ট-এসব পুরোন জনপদে দেশ বিভাগের আগে এমন কিছু মানুষের বাস ছিল না। এখন প্রতিটি জায়গার অগুন্তি জনপদ, অসংখ্য গ্রাম। হাটবাজার। স্কুল কলেজ। নগণ্য গ্রাম ছিল ধুবুলিয়া। দেশ ভাগের পর শরণার্থীদের জন্য যে আশ্রয় শিবির গড়ে ওঠে, তাকে কেন্দ্র করেই আজকের সুবৃহৎ জনপদ। বেথুয়াডহরী ব্যবসাকেন্দ্র। বড় বাজার আছে। আধুনিক জীবনের পক্ষে দরকারী সব জিনিসই আছে। সরকারী ইক্ষু গবেষণা কেন্দ্র চালু হয়েছে। বেথুয়াডহরী স্টেশনের পশ্চিমে নাকাশীপাড়া গ্রাম। গ্রামের পাশ দিয়ে গেছে একটি খাল।

হরিণঘাটায় আছে পশ্চিম বাঙলা সরকারের পশুপালন কেন্দ্র ও ডেয়রী ফার্ম। তাছাড়া আছে কলকাতার খাটাল উচ্ছেদ করে গোমহিষ রাখবার ও গোয়ালাদের দুগ্ধ উপনিবেশ। পশুপালন কেন্দ্রে নানা বিষয়ে গবেষণা হয় এবং এখানে দশ হাজারের বেশি গরু আছে। এখান থেকে কলকাতা ও নদীয়ার বিভিন্ন স্থানে প্রতিদিন এক লক্ষ কুড়ি হাজার লিটার দুধ সরবরাহ করা হয়।

অনাথ বা নাবালিকাদের আশ্রয়স্থল ও হাতের কাজ শেখবার জন্য শিল্পপতি কর্ণেল ডি এন ভট্টাচার্য এখানে ভাগীরথী শিল্পাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন সিমুরালিতে। এখানে একটি বিটি কলেজ আছে।

শিমুরালির সেই মেয়েটিকে ভোলা কঠিন। বিধবা মা, আর চারটি ভাইবোনকে বাঁচাতে ও রোজই চাকরিতে আসে কলকাতায়, বহুদূর লোক। ও জানে কিসের বিনিময়ে বেঁচে আছে সংসার। সরকারী ঋণে টিনের শেড দেওয়া চাটাই-এর ঘর বানিয়েছিলেন বাবা। দারিদ্র্য জ্বালায় ট্রেনের নীচে বিসর্জন দিলেন নিজেকে। জয়শ্রী সংসারের হাল ধরল।

।।৬।।

ব্যারাকপুর রোড। নীলগঞ্জের কলোনি থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছিলাম। প্রচণ্ড রোদের তাপ। দূর থেকে আসছিলেন এক বৃদ্ধ। মাথায় অগুন্তি তালিমারা ছাতা। একটি শীর্ণ গরুর গলায় দড়ি বেঁধে নিয়ে আসছিলেন। পরণে গামছা। গায়ে ছেঁড়া ফতুয়া। সিলেটের কোন এক স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। দুই ছেলে আর স্ত্রী নিয়ে আসেন এপারে। চাকরি জুটলো না। তবু সর্বস্ব দিয়ে ছেলেদুটোকে বড় করলেন। ওরা চাকরি নিয়ে চলে গেল। ঘরে ফিরল না। বৃদ্ধা অন্ধ। বৃদ্ধ অন্ধপ্রায়। যতক্ষণ কথা বলছিলেন, কেবল পূর্ব বাঙলার স্মৃতি। ছেলেদের কথা নয়। বাসনা মরার আগে একবার চোখের দেখা হল না জন্মভিটের। বললেন, অনেক আশা নিয়ে এসেছিলেন, আমিও কংগ্রেসের ভলেনটিয়ারি করেছি। জল ঘেটেছি। কি পেলাম?

অথচ, কী না ছিল ওপার বাঙলায়! অভিশাপ। একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র। তাই পরিমাণ। ওর স্মৃতিতে ভাসছিল—

পূর্ব বাঙলায় ছিল নারকেল, সুপুরি, তাল, খেজুর, আম কাঁঠাল গাছ ঘেরা গ্রাম। বড় বড় অশ্বত্থ-তেঁতুল গাছের ঠাণ্ডা ছায়া। পুকুর ডোবা নদীনালায় ভরা। খেতে ফসল। পুকুর ভরা মাছ। বর্ষায় ভেসে যায় নদীনালা। ঘরবাড়ি। পথঘাট।

দুকূল ছাপিয়ে জল। জল। আর জল। পথঘাট আর জনপদ ভেসে চলেছে। যেন এক সমুদ্রে সমুদ্র দেখিনি। তখন ছেলেমানুষ। মনে হত সমুদ্র একরকমের। এই সমুদ্রের ওপর জেলে ডিঙি দেখে মনে হত নোয়া চলেছে। পৃথিবী ভেসে যাবে!

ভোর রাতে জেলে ডিঙি থেকে ভেসে আসত ভাটিয়ালী। মাঠ গ্রাম ছাড়িয়ে ভেসে যেতো সেই সুর। অসীমে হারিয়ে যেত। ঘুম জড়ান চোখে মনে হত পৃথিবীটা কত সুন্দর! কত সুন্দর সে সব দিন।

বাণভট্টের

কাদম্বরী

গ্রন্থের প্রকাশক কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত

স্মরণীয় দু'খানি গ্রন্থ :

কাদম্বরী সহ গ্রন্থগুলির অনুবাদ করেছেন

প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

মহাকবি দণ্ডী-র

দশকুমার চরিত

মগধরাজ-পুত্র ও তার নয়টি বাল্য-সহচরের মৃগয়াকালীন সংঘটিত বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার রুদ্ধশ্বাস কাহিনী—'দশকুমার চরিত'। [দাম ১৬·০০]

বাণভট্টের

হর্ষচরিত

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পুরুষ সম্রাট শ্রীহর্ষের জীবন-চর্যার অন্তরঙ্গ আলেখ্য—'হর্ষচরিত'। [দাম ২২·০০]

কাদম্বরী

"....এ যেন স্বর্গের মন্দাকিনীকে বাংলার মাটিতে ভাগীরথী-ধারার মতো নামিয়ে আনা, বাংলা সাহিত্যে এ একটি স্থায়ী কীর্তি রচনা করা হলো।" —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[দাম ১২·০০]

শ্রী

১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট : কলকাতা ৭০০ ০৭৩

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে হোটেল, পুরী ও রাঁচী

সেবা ও বৈশিষ্ট্যের ঐতিহ্যমণ্ডিত

এই জুটির জন্য আমরা গর্বিত

পুরীতে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে হোটেল

আরাম ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সুস্বাদু খাদ্য এবং ব্যক্তিগত সেবার মাধ্যমে আপনাকে আহ্বান জানায়। চিত্তাকর্ষক সমুদ্র সৈকত, জগন্নাথ দেবের মন্দির, কোনারকে সূর্য মন্দির এবং মন্দির নগরী ভুবনেশ্বরের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করুন।

অনুসন্ধান ঃ ম্যানেজার, দঃ পূঃ রেলওয়ে হোটেল, পুরী; ফোনঃ পুরী ৬৩।

রাঁচীতে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে হোটেল

তৃপ্তিদায়ক খাদ্য ও উৎকৃষ্ট সেবার সাহায্যে ছুটি উপভোগের যাবতীয় স্বাচ্ছন্দ্য সহ আপনার প্রতীক্ষারত। ছোটনাগপুর পাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং আঁকাবাঁকা ক্ষুদ্র জলপ্রপাত আপনাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখবে।

অনুসন্ধানঃ ম্যানেজার, দঃ পূঃ রেলওয়ে হোটেল, রাঁচী। ফোনঃ রাঁচী ২১৯৪৫।

IPB/SER/1-75B

সভা-সমিতি, আলোচনা চক্র প্রভৃতি আয়োজনের আদর্শ পরিবেশ ও বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে

সর্বদা সেবারত
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

কলিকাতায় অনুসন্ধান :
'ডেপুটি সি, সি, এস' (ক্যাটারিং)
ফোন : ২৩-২৯৩৬

স্বাধীনতায় শুভেচ্ছা জানাই!

যাত্রাজগতের গুরু

নট সম্রাট

স্বপনকুমার

১৩৮৫তে স্থায়ীভাবে
যোগদান করলেন
সঙ্গে এলেন:—
নাট্যাধিরাজ

স্বপ্নাকুমারী

এ বছরের বালষ্ঠ প্রযোজনা:

কথাশিল্পী
তারাশঙ্করের

চাঁপা ডাঙার বউ

পালারূপ—সত্যপ্রকাশ দত্ত
ও

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের

জীবনমৃত্যু

পালারূপ—সমর মুখার্জী

পরিবেশনায়:—
ভারতীর আশীর্বাদপুষ্ট

ভারতী অপেরা

১১৩, রবীন্দ্র সরণী· কলিকাতা-৬
ফোন:—৫৫-২৩৫৯

জীবন। ফলফুল, নীল আকাশ। কখনও আঁধার কবে আসে। ভেসে জলার পাখির অবাধ কূজন। নিভৃত বনচ্ছায়ায় বনকলমী ফুলের ঝোপ, গাছের মাথায় উঠে গেছে মাকাললতা, নাটা কাঁটার হলুদ রঙের ফুলের থোকা নীল আকাশের অনন্ত মুক্তির বুক চিরে লতাপাতার কটুতিক্ত গন্ধ।

আকাশের ইন্দ্রনীল রং, শিমুলে গাছ, কাশবন, আউশ ধানের খেত। নদী জলে অদ্ভুত নীলরঙের প্রতিচ্ছায়া—দূর বিস্তৃত দিগন্তের কত পার্থিব গান। ধানের ক্ষেত, মৌবীর খেত। কী সুগন্ধ! মিষ্টি আলোয় রূপের ঝর্ণায় মন মাতান সুবাস জড়িয়ে আছে আজন্ম।

আদিগন্ত বিস্তৃত আকাশ অসীম নীলের প্রতিচ্ছবিতে সার সার গ্রাম, গাছপালা, উড়ন্ত পাখি—মোহন প্রকৃতি। কোথাও আমগাছ বেয়ে উঠেছে কুচলতা, বাঁশগাছ বেয়ে নেমেছে বনগোয়ালে লতা সাঁইবাবলার ডাল থেকে উড়ে য পানকৌড়ি, ডালে ডালে বনের পাখি দুর্গা টুনটুনি ডাকছে, কুল্লো ডাকছে। গাছের মগডালে, নটকান ফুলের ছাতিমবনে গাও শালিখ, কুকোপাখির দোয়েলের ডাক।

বনঘাঁইয়ের সুগন্ধে সুর, গোধূলির রাঙা আলো বনে, মাঠে চ জলে। টুকটুকে মাকাল ফল ঝুলে সেখানে নিশ্চিন্তে বসে আছে লেজঝোল হলদে পাখি। নলখাগড়ার শ্যামল সবুজ ঝোপ, ছোষাবালতা, বন্যবুড়ো গাছের সাবি, জলের পাড়ে জলজ ঘাসের ঝোপ-সবুজ, সবুজ, অনন্ত সবুজ-সবুজের সৌন্দর্য। নদীর দুপাশে ঘন সবুজ উলুবন, কুমড়োর ক্ষেত, উচ্ছে পটলের ক্ষেত, প্রাচীন অশ্বত্থ গাছের ছায়া, যাড়াগাছ, জিউলিগাছ, আম গাছ, জাওয়া বাঁশের ঝাড় নানান বন্য ফুলের মিলিত অপূর্ব সুবাস—পাখির ডাক। প্রাচীন বট অশ্বত্থগাছের ফাঁক দিয়ে ভেসে উঠছে ময়ূরকণ্ঠী রঙের নীল আকাশ। কখনও দূরে সাদা বুকে নীল ছাপ মারা মেঘ।

বনঘেরা বাড়ির উঠোনে নামছে ঘন-ছায়াবিকেল। চারদিকে পাখির কিচ্‌কিচ্‌ ডাক। নিঃশব্দ, মিষ্টি শান্ত বিকেল। হলদে পাখি উড়ে এসে বসে গাছের ডালে। কৃষ্ণচতুর্থীর ভাঙাচাঁদ উঠেছে। সাঁইবাবলা গাছের ফাঁকে ফাঁকে জোনাকি পোকার মিষ্টি আলো। অপূর্ব। জ্বলন্ত নিভন্ত আলোকপুঞ্জ। পাড়াগাঁয়ের অখ্যাত কোনে কোনে মহান রূপদৃষ্টি। বাইরে জ্যোৎস্না। বৌ-কথা-কও ডাকছে। বাঁশবনে রাতজাগা পাখির আওয়াজ ঠক্‌ ঠক্‌। গভীর রাত পিছনে ফেলে জগডুমুর গাছ থেকে থেকে ওঠে লক্ষ্মীপেঁচা। কালমেঘের জঙ্গল বিঁঝি পোকার ডাক। দূরের শ্যামবাগান থেকে গভীর রাতে ভেসে আসছে হুতুম পেঁচার ডাক।

বাঙলার শরৎ মধুর-সুন্দর। কাশফুল, শিউলিফুল ফোটে। গন্ধে গন্ধে স্পর্শের রমণীয় বন্যা নামে। উজ্জ্বল রোদে আর নীল আকাশ মিলে অপূর্ব। ঐ নীল আকাশে অনন্ত মুক্তি। পুকুর ভরে ওঠে কচুরিপানায়, নলখাগড়ায় কলমীলতায়। তালগাছে বাবুই পাখির বাসা। নদীর ধারে বনকোপ, সাঁইবাবলার গাছ। নদীয় রূপ নারীর সৌন্দর্যকেও হারমানায়। থেকে থেকে ঘুঘু ডাকে। ফাঁকা মাঠে গরুর পিঠে রাখাল। দূর থেকে ভেসে আসে বাউল গান। আলপথ বেয়ে বাজরা মাথায় চলেছে চাষী। দূরের পথে গরুর গাড়ির ক্যাচ ক্যাচ শব্দ। সে জীবন ছিল না স্বপ্নের, ছিল বাস্তবে।

এই জীবনকে পিছনে ফেলে ছিন্নমূল মানুষেরা এসে হাজির হল। পছন্দ অপছন্দের সময় তখন ছিল না। কোনরকম মাথা গোঁজার ঠাঁই দরকার। নতুন বসতি বা উপনিবেশ গড়ে উঠল। কোন পরিকল্পনা ছিল না। অনাবাদী জমির সঙ্গে সঙ্গে কৃষি জমিতেও ঘরবাড়ি উঠল। কিন্তু বড় বড় রাস্তা তৈরি হল না। জমি কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু। বেশির ভাগ জায়গায় জল জমে বর্ষায়। কোন কোন জায়গায় প্রায় প্রতি বছরই নৌকা সবাতে হয়। ময়লা জল বেরোবার পথ নেই। ঐ জল জমে, পচে, গন্ধ বেরোয়। দিনের পর দিন পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠছে। ডাক্তারের অভাব। হাসপাতাল নেই। বড় অসুখের চিকিৎসায় এখনও ছুটতে হয় কলকাতায়। অসহনীয় বেকারত্ব এইসব উপনিবেশের বেকার যুবকদের বেপরোয়া করে তুলছে। নীতি বা আদর্শ হারিয়ে গেছে অনেককাল। কেবল খাদ্যের অপুষ্টি নয়, মানসিক অপুষ্টি একটি জাতিকে কিভাবে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, তারই প্রতিচ্ছবি গোটা বাঙলা জুড়ে।

কিছু কলোনি দেখেছি, যেগুলিকে বলা যায় শহরতলীর বস্তী। ওপরে টালির শেড। চাটাই-এর দেওয়াল। মেঝে কাঁচা বা পাকা। ট্রানজিস্টরে চটুল হিন্দী গান। মাঝে মাঝে বসে কীর্তনের আসর। প্রতিবেশীরা মেলে। আবার ব্যাপক গণআন্দোলনে অংশ নিতে এগিয়ে আসে এরাই।

নদীমাতৃক বাঙলার চরিত্র গেছে বদলে। শুকিয়ে যাচ্ছে নদনদী শহর বদলাচ্ছে। একদিনের সমৃদ্ধ জনপদ ক্ষয়ের পথে। অন্য চেহারার শহর, অন্য জায়গায় গড়ে উঠছে। অন্য প্রেরণায় প্রয়োজনে ওইসব শহরের আত্মপ্রকাশ। যেখানে পূর্ব বাঙলার মানুষ গেছে, সেখানেই তারা কেবল সোনার ফসল ফলাবার চেষ্টা করেনি, মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার সমস্ত উপকরণকে টেনে এনেছে। এপার বাঙলার জোক উৎসব, পূজাপার্বণ, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র মিশে হয়েছে একাকার। নদীয়া ও ২৪ পরগণার কোথাও কোথাও পূর্ব বাঙলার শরণার্থীদের অস্পৃশ্য হিসাবে দেখা হত প্রথমদিকে। পরে এদের আন্তরিক মিলন ঘটে গেছে। বৈবাহিক সম্বন্ধও ঘটেছে। শহরতলীর কলোনি থেকে নিত্যদিন হাজারে হাজারে মানুষ আসছে শহর কলকাতায়। জীবনের সন্ধানে। চাকরি চাই। কেউ পাচ্ছে। কেউ না। পিতৃপুরুষের উপজীবিকা বিসর্জন দিয়ে যা সামনে পাচ্ছে তাকেই আকড়ে ধরছে। যেভাবেই হোক বাঁচতে হবে। সৎপথে না হলেও অসৎ পথে পা বাড়াবার ভয় নেই। সন্ধ্যার শিয়ালদহ স্টেশনে নদীয়া আর ২৪ পরগণার বিভিন্ন কলোনি থেকে মেয়েরা আসে। নারীত্বের বিনিময়ে উপার্জন করে কয়েকটি মুখের অন্ন। গাড়ি ভর্তি চাল নিয়ে শহরে ঢুকছে এরাই। এই পেশায় মেয়ে পুরুষ নাবালক সকলেই জড়িত। ক্রমশঃ সংখ্যায় এরা বাড়ছে।

স্বাধীনতা বাঙালীর কাছে এক প্রহসন। রক্তের বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীনতা কি দিয়েছে আমাদের? আত্মত্যাগের এমন মর্মান্তিক পরিণতি ইতিহাসে অতুলনীয়। ঘরে বাইরে অবিশ্রাম বঞ্চনার প্রহেলিকায় বিভ্রান্ত জীবন। জনসংখ্যার চাপে উঠছে নাভিশ্বাস। জতুগৃহের চারদিকে আগুনের শিখা। বন্ধ্যাজীবনের সামনে পিছনে, অতল স্পর্শী অন্ধকার। জীবন

রূপে - লেখায় - ছবিতে - ফিচারে অতুলনীয়

সাহিত্য - সিনেমা - যাত্রা এবং সংস্কৃতির বহুল প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর একমাত্র মাসিক পত্রিকা

তুলি

তরুণ লেখক/লেখিকাদের বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়। আপনি পড়ুন অপরকে পড়ান, তরুণ সাহিত্যিক **বাদল ঘোষ রায়ের** ধারাবাহিক উপন্যাস "শ্লোগানের থেকে প্রেম শুরু"।

বিঃ দ্রঃ ॥ **আমাদের পত্রিকায় মহিলা সাংবাদিক অবশ্যক ॥**

প্রধান সম্পাদকের সংগে যে কোন রবিবার সকাল ৭টা হইতে ৯টার মধ্যে দেখা করতে পারেন।

যোগাযোগের একমাত্র ঠিকানা :—
তপনকুমার দে / প্রধান সম্পাদক "তুলি" ॥ ৭৩জি আলিপুর রোড, কলিকাতা-২৭
চেতলা ॥ দুর্গাপুর বাজারের সংলগ্ন।

॥ আগামী বিজ্ঞাপনে নজর রাখুন ॥

১৫০ টাকার বই
মাত্র ৭৫ টাকায়

মাও রচনাবলী ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৩০.০০ টাকা

॥ মাত্র 800 গ্রাহক করা হবে ॥

যাঁরা এককালীন ৭৫.০০ (পঁচাত্তর) টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হবেন, কেবল তাঁরাই ১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ) টাকার বই মাত্র ৭৫.০০ (পঁচাত্তর) টাকায় পাবেন। টাকা জমা দেওয়ার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে 800 জন পর্যন্ত গ্রাহক করা হবে। শারদোৎসবের আগেই সমগ্র রচনাবলী সরবরাহ করা হবে!

* ডাকযোগে বই সংগ্রহকারীদের ক্ষেত্রে ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

নবজাতক প্রকাশন, এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-৭

নেই—জীবিকা কোথায়! হৃদ্‌পিণ্ডের নরম মাটির দেওয়াল ভেঙে গেছে। মাটির বুক চিরে উঠছে যন্ত্রণার হাহাকার ধ্বনি।

এক শ্মশানভূমির বুকে দাঁড়িয়ে বর্তমান বাঙলা। কি দুঃসহ জীবন। কি মর্মান্তিক পরিহাস। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে হাজার হাজার যুবকের আত্মদানের কি কুৎসিৎ ফলশ্রুতি!

সোনার বাঙলায় সোনা নেই, যক্ষ্মা মঠ, অবরুদ্ধ জীবন। ইংরেজ যখন এসেছিল, সপ্তদশ শতাব্দীতে তখন অনন্ত ঐশ্বর্য। ইংরেজ যখন গেল, তখন কলকাতা সম্পদশালী। আর এখন কলকাতা মিছিল নগরী, বেকার-দালাল আর ভবঘুরেদের শহর। বাঙলার অনন্ত দুর্দশা। একদা যে দেশ গোটা ভারতকে ঐশ্বর্য দিয়েছে, এখন সে হল ঘাটতি অঞ্চল। স্নিগ্ধ প্রকৃতির বুকে অনাহার আর অপুষ্টিক্লান্ত মানুষ। বিত্ত নেই—জীবন নেই—আছে অসীম অবহেলা আর অপবাদ। ভারত জুড়ে বাঙালী বিদ্বেষ। ভারতের স্বর্ণখনি বাঙলা, আজ সব থেকে পশ্চাদপদ ভূখণ্ড। অসংখ্য বেকার, কলকারখানার অভাব, শিক্ষায় চরম নৈরাজ্য। চারদিকে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। নৈতিক অবক্ষয়ের জন্য সুপরিকল্পিতভাবে অপসংস্কৃতির বিকাশে মদত দেওয়া হয়েছে। বাঙলার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত রক্তে শূন্যতার ভয়াবহ শবযাত্রা। এক জগদ্দল পাথর চাপা দিয়ে হত্যার ষড়যন্ত্র চলেছে। তাকে সবাবে কে! অর্থনৈতিক বিপর্যয়, সামাজিক অবক্ষয় রাজনৈতিক অশান্তি—বাঙালীকে করে ফেলেছে মেরুদণ্ডহীন। অনন্ত শূন্যতায় জীবন গড়ে ওঠে না। শ্মশানের বুকে জীবন খুঁজে ফেরা বৃথা। স্থবির বৃদ্ধের কাছে নতুন জীবনের মন্ত্র মেলে না। চারদিকে ঘুরঘুটি অন্ধকার। পেটে জ্বলছে আগুন। কঙ্কালসার বাঙালী অবোধ শিশুর মত অসহায়। যন্ত্রণার অন্ধকার থেকে উঠছে আর্তবানি। পিঁপড়ের সারির মত মিছিল চলেছে অনাহারক্লিষ্ট মানুষের। প্রস্তুতিও বন্ধ্যা। সমস্ত বিচ্ছেদ ও বেদনার উপান্তে বন্ধুত্বের পাশে দাঁড়িয়ে অলৌকিক প্রতিশ্রুতিতে ভোলবার দিন আর নেই। কেননা,

সোনার কাঠি হারিয়ে গেছে
খুঁজে কোথায় পাব?
বাঙলা জুড়ে ঘুমের নেশা,
ঘুমেই মরে যাব?

ঘুম ভাঙিয়ে কি হবে ছাই
স্বপন দেখি জেগে
দিন আমাদের চলেই যাবে
পরের দোরে মেগে।

যে সোনার মাটিতে নামত জ্যোৎস্না, যে প্রকৃতির বুকে ছিল পাখির গান, যে মাটির ফসলের গন্ধে আমাদের জন্ম-জীবন, তাকে আমরা ফিরে পেতে চাই। হে মাটি, ফিরিয়ে দাও জীবন, হে আকাশ ফিরিয়ে দাও জীবন।

একটা জাতির ঐতিহ্য ও ঐক্যকে বিশ্বাসঘাতকরা সেদিন নিঃসংকোচে খণ্ডবিখণ্ডিত করেছিল। মমতা আত্মীয়তার মাধুর্য বঞ্চিত হয়ে বাঙালীকে সেদিন মেনে নিতে হয়েছিল বর্তমানকে।

মহম্মদ আলি জিন্নার খণ্ডিত প্রদেশ-গুলি থেকে লোক বিনিময়ের প্রস্তাবকে সেদিন কিন্তু ভারতীয় নেতারা মেনে নেননি। অথচ পাঞ্জাবে আলিখিতভাবে লোক বিনিময় ঘটে গেল, যা হল না পূর্ব পাকিস্থানে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় য়ুরোপে ব্যাপক লোক বিনিময়ের সুফল পাওয়া গিয়েছিল। প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ জার্মান উদ্বাস্তু মাত্র পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে পশ্চিম জার্মানীতে সুষ্ঠু পুনর্বাসন পেয়েছিল। ইজরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হল। দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে থাকা ইহুদিদের নিজস্ব বাসভূমি গড়ে উঠল। অথচ পূর্ব পাকিস্তানে লোক বিনিময় হল না। অত্যাচার ও বিতাড়নের এক নতুন অধ্যায় শুরু হল বাঙালীর জীবনে। দেশভাগের জন্য যারা দায়ী, যারা প্রতিশ্রুতির পুরোবৃদ্ধি করেছিলেন, তারা অনেকেই নেই। উত্তরসূরীরা আছেন। লাঞ্ছিত মানবতার যে করুণ ইতিহাসের আজ মুখোমুখি আমরা দাঁড়িয়ে, সেখানে যে ভয়াল অন্ধকারের ভ্রূকুটি—তার মোকাবিলা করবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। কারণ বাঙালী ভাগ হয়েছে বাঙালীর জন্যে নয়, সমগ্র ভারতের স্বাধীনতার বিনিময়ে। কেন্দ্রীয় সরকারের ভাব এমন যে তারা দয়া করে, বাঙালীর পুনর্বাসন দিচ্ছেন। এটা কোন অনুকম্পা বা অনুগ্রহের ব্যাপার নয়। তারা নৈতিক দায়িত্ব অবহেলা করেছেন। আর সেই অবহেলা, ঘৃণা আর বঞ্চনায় পুঞ্জিভূত ক্রোধ যদি দাবানল হয়ে ওঠে পূর্ব ভারতে, তবে তা প্রতিরোধের ক্ষমতা নেই ভারত সরকারের। দণ্ডকারণ্যে বাঙালীর দণ্ডদান না করে, মানবতা ও সহানুভূতি-শীল বিবেকের দ্বারা পরিচালিত না হলে, মেহেরচাঁদ খান্নার সেই, ট্রাডিশন আরও দীর্ঘকাল চলবে। ঘার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে একদিন গোটা ভারতকেই।

স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা

নরহরি কবিরাজ ২৫.০০

স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন স্রোতধারা—কৃষক বিদ্রোহ, সেনা বিদ্রোহ, কংগ্রেস আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন সম্মিলিত হয়ে যে মহাসমুদ্র সৃষ্টি করেছিল—মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ঐ আন্দোলনের তত্ত্বগত তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ—এই বইটিতে পাওয়া যাবে।

মানুষের গল্প

সুশীল জানা ও সৌরী ঘটক সম্পাদিত ১৫.০০

বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, দেশবিভাগে বাংলাদেশে ভাগ্যবিবর্তনের মধ্যে এই দেশের সংগ্রামী সাহিত্যিকদের হাতে যে ফসল ফলেছে তারই একটি দুর্লভ সংকলন।

ভারত রুশকথাঃ বাঙালীর রুশচর্চা

কেশব চক্রবর্তী ২০.০০

ভারত ও রাশিয়া দুই বিশাল প্রাচীন দেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক যে পলাশীর যুদ্ধের সময় থেকেই গড়ে উঠেছে তারই ইতিহাস। "বাঙালী চিত্তের রুশ রাজপ্রীতি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রুশ-বঙ্গদেশহিতৈষীদের প্রতি সহানুভূতিতে রূপান্তরিত হয়েছিল, বইটি পড়লে মনে হয়, ভারত-রুশ মৈত্রীর উজ্জ্বল অধ্যায়-উনবিংশ শতাব্দী"।

মনীষা গ্রন্থালয়

৪/৩বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

শাখা: মেদিনীপুর - খড়্গপুর - শিলিগুড়ি - মালদহ - দুর্গাপুর
বালুরঘাট - ইসলামপুর - বোলপুর

তরুণ অপেরার

পরিবেশনায়

বিশ্ব শ্রমিক শ্রেণীর
অগ্নি পরীক্ষিত নেতা,
সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক
সমাজের মহান স্থপতি
জে, ভি, স্তালিনের
জন্মশতবর্ষ স্মরণে
আমাদের ৮৫-র অর্ঘ্য

রচনা : মধু গোস্বামী

স্তালিন ও লেনিন/শান্তিগোপাল

সুর/পরিচালনায়

শম্ভু রাগ রচিত **লেনিন**

শম্ভু রাগ রচিত **ক্লীতদাস**

আমাদের নতুন হেড অফিসে যোগাযোগ করুন/১১/১ শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫

শম্ভু রাগ রচিত **কার্ল মার্ক্স**

মধু গোস্বামী রচিত **লালপাই মিউটিনি**

অমর ঘোষ রচিত **আমি সুভাষ**

হারু রায় বিশ্বজিৎ পুরকায়স্থ রচিত **বিদ্রোহী সন্ন্যাসী**

শম্ভু রাগ রচিত **রক্তাক্ত তেলেঙ্গানা**

নির্মলকুমার দাস

কি চেয়েছিলাম কি পেয়েছি

চায়ের আসরে বিপ্লবীরা

ক্ষিতীশ সরকার

সুধীন্দ্রনাথ ধর

চৌকিতে হাঁটু মুড়ে বসে ক্ষিতিশ সরকার স্থির চোখে তাকিয়েছিলেন সামনের দেওয়ালে টাঙ্গানো মানচিত্রটির দিকে। গায়ে তাঁর ছেঁড়া গেঞ্জি। চোখে-মুখে যন্ত্রণা। উনি নিজের পয়সা দিয়ে কিনে এনে মানচিত্রটি নিজের মুখোমুখি দেওয়ালে এমনভাবে টাঙিয়েছেন, যাতে সারাক্ষণ চৌকিতে শুয়ে বসে এবং রাত্রে ঘুম জড়ানো চোখের পাতা এক করার ঠিক আগের মুহূর্ত পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে দেখা যায় এবং প্রত্যুষে চোখ মেলে প্রথমেই যেন ঐ মানচিত্রটি চোখে পড়ে। আকাঙ্ক্ষা হটতে হটতে এখন এইখানে এসে ঠেকেছে। মাথার পিছনে দরোজার মতো বড় বড় জানালা। সেখান দিয়ে ছুটে আসা হু হু বাতাসের দাপটে মাঝে মাঝে যখন মানচিত্রটি থাই থাই শব্দ করে উড়ে যেতে চায়, তখন চোখের সামনে এই মানচিত্র টাঙ্গিয়ে রেখে প্রাণভরে দেখার অধিকারটুকুও কেড়ে নেওয়া হবে,—হয়ত ভয়ানক এই ভয়ে বুক তার কেঁপে ওঠে। মানচিত্রটি বিদেশ অর্থাৎ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এর। এক সময় যা ছিল স্বদেশ। যখন স্বদেশ ছিল, তখন ছিল ইংরেজ। ছিল পরাধীনতা।

স্বদেশের পরাধীনতার গ্লানি এবং অসহ্য এক অপমানবোধ ক্ষিতীশবাবু সেই সময়ে মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। এবং ইংরেজ তাড়িয়ে পরাধীন দেশে স্বাধীনতা আনার এক সুতীব্র বাসনায় ব্যাগ্র হয়ে উঠে সকল কিছু সমর্পণ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া আশা-আকাঙ্ক্ষা অন্তর্হিত হয়ে গিয়ে তার সামনে দেশ ও দশের জন্য এক মহৎ এবং বৃহৎ চাওয়া মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। তার নাম: স্বাধীনতা।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'স্বাধীনতা চাওয়ার আগ্রহ ঠিক কোন সময় থেকে আপনার ভিতরে ক্রিয়া করতে শুরু করেছিল, মনে পড়ে?'

সম্বিত ফিরে পেয়ে মানচিত্র থেকে চোখ সরিয়ে আমার দিকে তাকালেন। সলজ্জ হাসিতে মুখ ভরিয়ে আমার হাত ধরে অপরাধী গলায় বললেন, 'মনেই ছিল না আপনি বসে আছেন। কি জিজ্ঞাসা করলেন।'

প্রশ্নটি আবার করতেই উনি অপেক্ষাকৃত জোর গলায় বললেন—'মনে থাকবে না কেন। তখন আমার বয়েস ধরেন এই ছয় কি সাত। দেশের বাড়ীতে,—আমার দেশ কোথায় ছিল জানেন?

আমি মাথা নাড়লাম। 'জানি না।

উনি চৌকি থেকে নেমে এসে আমায় ধরে টেনে নিয়ে এলেন দেওয়ালে টাঙ্গানো মানচিত্রটির সামনে। তারপর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বললেন,—'ময়মনসিং। এই ময়মনসিং জেলা দেখছেন, এরই—এই যে নেত্রকোণা,—এইখানে আমার জন্ম ১৯০০ কি ১৯০১ সালে। সঠিক মনে নাই। এই ছিল আমার দেশ, বুঝলেন। এখন আর নাই।

ধীর পায়ে আবার চৌকিতে এসে বসলেন। আমি বারংবার অনুরোধ করলাম শুয়ে পড়ার জন্য। কারণ উনি গভীর অসুস্থ। কথা বলতে খুব একটা দম পান না। নানান অসুখে জর্জরিত। তা সত্ত্বেও শুয়ে না পড়ে উনি বসে থাকলেন। বললেন, 'সারাদিন তো শুয়েই কাটে। আপনি এলেন, একটু বসেই কথা বলি।

—হ্যাঁ, আমার যখন ছয় কি সাত বছর বয়েস, তখন দেশের বাড়ীতে একটা টুর্নামেন্ট হয়েছিল। সেই টুর্নামেন্টে লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, এছাড়া আরো অনেক শারীরিক কসরতও দেখানো হয়েছিল। ঐ লাঠিখেলা, ছোরাখেলা দেখে ঐ বয়েসেই আমার ভীষণ একটা ইম্প্রেশন হয়। তখন, মানে খেলা দেখার সময় ও তারপরে আমার কেবলি মনে হতে থাকে, আমারা তো যুদ্ধ করতে পারি। শুধু তাই নয়, যুদ্ধ করে ইংরেজ তাড়িয়ে দেশে স্বাধীনতাও আনতে পারি। কি ভাবে যুদ্ধ করবো। ইংরেজ তাড়িয়ে কিভাবে স্বাধীনতা আনবো, এইসব ভাবনার উন্মেষ তখন থেকেই ঘটে। ঐ টুর্নামেন্টটি অর্গানাইজ করেছিলেন যোগেন্দ্র চক্রবর্তী। উনি অনুশীলন দলের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। সিলেট জেলার মৌলভীবাজার মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেটকে বোমা মেরে হত্যা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ বোমা তাঁর হাতেই বাস্ট করে। তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। সিলেট জানেন তো কোথায়,—ঐ যে যেখেন সিলেট, ঐ যে মৌলভীবাজার—'

—আশ্চর্য হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করি, —'এতদূর থেকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন?'

—অস্পষ্ট দেখি। তবে না দেখলেও আমি সব দেখতে পাই। সবই তো দেখা। মুখস্থ। ভুলবো কি করে?'

—'তারপর—'

—'হ্যাঁ, যুদ্ধ করে আমরাও স্বাধীনতা আনতে পারি। এই ভাবনাটা আমার মাথায় ঢোকে। এইভাবে কয়েকটা বছর কেটে যাওয়ার পর আমি অনুশীলন দলে যোগ দিই। প্রথম প্রথম কি করতো জানেন,—পরীক্ষা করার জন্য আমাদের এটা ওটা কাজ দিত। যেমন একটা সাদা কাগজ কি একটা মাটির ডেলা দিয়ে বলতো কাউকে দিয়ে আসতে। আবার মাঝে মাঝে মাঝরাতের অন্ধকারে একা একা শ্মশানে যেতে বলতো। ভয় কাটাবার জন্য। আর কাজ ছিল সেবা। সেই সময়ে খুব কলেরা হতো। দলের যারা কলেরায় আক্রান্ত হতো, কি কোনো এ্যাকশনে অস্ত্রের আঘাতে আহত হতো, তাদের সেবা করতাম। পরের দিকে দলে আমার ভূমিকা ছিল ইন্সট্রাকটরের। কোনো দিন কোনো এ্যাকশনে যাইনি। একবার শুধু ময়মনসিং-এর মহীলদেও-এ এক ডাকাতিতে আমার কাজ কি ছিল জানেন,—টেলিগ্রাফের তারকাটা। সেটা ১৯১৫ কি ১৯১৬ হবে।'

একটানা বলে থামলেন। তার কিছুক্ষণ পর টুকরো টুকরো ভাবে বললেন বেঙ্গুন বসবাসের কথা। সেখানকার বন্দরে ঐতিহাসিক স্ট্রাইকের কথা এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা,—যে দাঙ্গায় বার্মিজরা বাঙ্গালীদের কচুকাটা করেছিল।

১৯৩০-এ ক্ষিতিশবাবুর নামে ওয়ারেন্ট বের হয়। উনি তখন পলাতক। ওঁর বিপ্লবী জীবনে একটা বড় অভিজ্ঞতা। অনেক সরকারী কর্মচারী ওঁকে নানান ভাবে সাহায্য করেছিল। এমনকি চিটাগাং ডিভিশন কমিশনারের পি-এ পর্যন্ত।

ঐ ১৯৩০-এ কিশোরগঞ্জে কেষ্ট রায়ের বাড়ী অসংখ্য কৃষক গিয়ে আক্রমণ করে। সমস্ত দলিল, কাগজপত্র ছিঁড়ে ফেলে ধন-সম্পত্তি লুঠ করে। তখন বিপ্লবীদের একটা সেকশন মনে প্রাণে বিশ্বাস করলো,—যে একটা কি দশটা ইংরেজ মেরে দেশে স্বাধীনতা আসবে না। এটা কৃষকের দেশ। যদি সমস্ত কৃষক সংঘবদ্ধ হয়, তাহলে শক্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং সেই শক্তিতেই আসবে স্বাধীনতা। এই ভাবনা এবং বিশ্বাস নিয়ে ঐ সেকশনে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করে। ঐ সেকশনে ক্ষিতিশবাবুও ছিলেন। উনিও যোগ দেন কমিউনিস্ট পার্টিতে। এর পরেই উনি মণি সিং-এর সঙ্গে সুসংগ জমিদারের বিরুদ্ধে হাজং কৃষকদের সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন।

এ সকল কিছুই স্বাধীনতা চেয়েছিলেন বলে।

বললাম—'দেশ তো স্বাধীন হয়েছে—'

উনি যুগপৎ ব্যথিত এবং বিদ্রূপের স্বরে বললেন—'স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু এই স্বাধীনতা তো আমরা চাইনি। দেশের মানুষও চায়নি। এটা দেশের মানুষের স্বাধীনতা নয়। কয়েকজন নেতার স্বাধীনতা।'

এর ঠিক পরক্ষণেই ঝপ করে আলো নিভে গেল। লোডশেডিং। এবং ক্ষিতিশবাবু সঙ্গে সঙ্গে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। চৌকি থেকে নেমে এলেন নিচে।

—এই দ্যাখেন, আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলতে সব ভুলে গেছি। হেরিক্যান-এ তেল ভরিনি। কোথায় বোতল, কোথায় কি, এই অন্ধকারে আমি এখন—'

ওঁকে শান্ত করার চেষ্টা করে বললাম, 'আপনি স্থির হয়ে বসুন। আমি বোতল খুঁজে তেল ভরছি। ব্যস্ত হবেন না।

উনি শুনলেন না। হাতড়ে হাতড়ে আমার সামনেই অন্ধকারে হারিয়ে গেলেন। মানুষটি অবিবাহিত। এবং যথেষ্ট শিক্ষিত। নিজের অসংখ্য মূল্যবান বই কুদঘাটের অনুশীলন পাঠাগারে দিয়ে দিয়েছেন। কিছু দিন আগে মাথায় গণ্ডগোল দেখা দিয়েছিল। সেই সময়ে হঠাৎ একদিন কিছু না বলে এখান থেকে উধাও হয়ে যান। এবং জনশ্রুতি—ডায়মণ্ডহারবারের ওদিকে জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু জনসমক্ষে সেটা সম্ভব হয় নি। শরীরিক তো নয়ই, মানসিক দিক দিয়েও ওঁকে আমার সম্পূর্ণ সুস্থ বলে মনে হয়নি।

শব্দ করে দেশলাই জ্বলে উঠতেই ঘরের এককোণে তাঁকে আমি আবিষ্কার করলাম। হেরিক্যানের ফিতে ধরিয়ে কাঁচ তুলে দিলেন। অতি সাবধানে কম্পিত হাতে বোতল থেকে তেল ভরলেন। তারপর হেরিক্যানটি একটি ছোট টেবিলে রেখে চৌকিতে উঠে বসলেন। এবং বিড়বিড় করে কিসব বলতে লাগলেন। আমি বিদায় চেয়ে উঠে দাঁড়ালাম। হেরিক্যানের নিষ্প্রভ আলোয় স্পষ্ট করে মানচিত্রটি চোখে পড়ছে না। ক্ষিতিশবাবু যদিও তাঁর দুর্বল দৃষ্টিশক্তিতে কয়েক হাত দূর থেকে লালচে আবছা আলোয় দেওয়ালে টাঙানো এই মানচিত্রটি দেখতে সক্ষম হচ্ছেন না, তবু আমার স্থির বিশ্বাস, তিনি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন : কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা, ময়মনসিং,—তাঁর জন্মভূমি। তাঁর পূর্ববাংলা। ঘর থেকে বেরিয়ে লম্বা টানা বারান্দায় এলাম। তারপর সিঁড়ি বেয়ে নিচে। রাস্তা থেকে দেখলাম, বিরাট এই চারতলা বাড়ীটি নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ডুবে আছে।

কলকাতা থেকে বেশী দূরে নয়। দক্ষিণে মাত্র ২৩ কিলোমিটারের পথ কালিকাপুর। অবশ্য চম্পাহাটী দিয়ে গেলে দূরত্ব এক কিলোমিটার বেশী। তবে রেল কোম্পানীর ভাড়া একই : ০-৮০ পয়সা। ০-৮০ পয়সা দিয়ে শিয়ালদহ সাউথ সেকশন থেকে কালিকাপুর কি চম্পাহাটীর একটি টিকিট কেটে ক্যানিং লোকালে উঠলে মাত্র আধ ঘন্টার চেয়ে কয়েক মিনিট বেশীর পথ। তারপর রিকসা। বলতে হবে, চারতলা বাড়ী। ভাড়া নেবে ০-৬০ পয়সা। অবশ্য প্রখর রৌদ্রের সময় বেলা বারোটার পর দাবি করবে ১ টাকা। তবে ০-৭৫ কিংবা ০-৮০-তেই প্যাডেল মেরে ঐ বিরাট চারতলা বাড়ীটির একেবারে সামনে পৌঁছে দেবে।

বাগানপুকুর নিয়ে ৬ বিঘা জায়গার ওপর এই বিশাল প্যালেসিয়ান বিল্ডিংটি একদা নির্মাণ করেছিলেন প্রখ্যাত অভিনেতা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাকা যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পুত্র পুলিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে সরকার বাড়ীটি কিনে নেন ৬০-এর দশকে শেষ ভাগে মূক বধিরদের একটি স্কুল করার জন্য ২ লাখ ৩০ হাজার টাকায়। তারপর মেরামত খরচ হিসেবে যায় ৮০ হাজার এবং উঁচু পাঁচিল দিতে যায় ১৪ হাজার টাকা।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই বাড়ীটি মূক-বধিরদের স্কুল হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি।

রিকসা থেকেই লোহার গেট-এর মাথার ওপর চোখে পড়বে একটি সাইনবোর্ড। তাতে লেখা : হোম ফর ওল্ড এ্যাণ্ড ইনফার্ম। পলিটিক্যাল সাফারার্স।

১৯৬৮ সালের ২রা অকটোবর পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ধর্মবীর এই হোম উদ্বোধন করেন। যুক্তফ্রন্ট সরকারেরই উদ্বোধন করার কথা ছিল কিন্তু রাজনৈতিক অচলাবস্থার জন্য রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন বলবৎ হওয়ায় সেটা সম্ভব হয়নি। যাইহোক পরাধীন ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আনার সংকল্পে তাঁরা জীবনের মূল্যবান যৌবনের দিনগুলি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। বার্ধক্যে তাঁদেরই কাউকে কাউকে এখানে স্থান দেওয়া হলো, থাকা এবং খাওয়ার দায়ভার বহন করবেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

খাতা-কলমে এই হোমে বর্তমানে আছেন ২৪ জন স্বাধীনতা সংগ্রামী। অসুস্থতার জন্য ৬ জন এখন বিভিন্ন হাসপাতালে। অর্থাৎ হোমে উপস্থিত আছেন ১৮ জন। কিন্তু কয়েকদিন ধরে যাতায়াত এবং সন্ধান করে আমি ১৬ জনের বেশী দেখতে পাইনি। যেমন দোতলার দুটো ঘরে ৪ জন ৪ জন করে ৮ জন; তিনতলায় দুটো ঘরের একটিতে ৩ জন অপরটিতে ৪ জন এবং চারতলায় ১ জন।

এই ১৬ জনের মধ্যে আবার শ্রেণী বিভাগ আছে। ১৫ জন কেন্দ্রীয় সরকারের ২০০ টাকা পেনসন পান। তার মধ্যেও ৩ জনকে ঐ ২০০ টাকা থেকে, থাকা-খাওয়া বাবদ ১০০ টাকা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সারেন্ডার করতে হয়।

১৯৭২-এ যখন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ২০০ টাকা করে পেনসান দেবার ব্যবস্থা হলো তখন এই হোমে আশ্রিত বিপ্লবীদের কাছে নোটিশ গেল : তোমরা তো এখন ২০০ টাকা করে পেনসন পাচ্ছো। সুতরাং এখন এই হোম ছেড়ে চলে যাও।

নয়তো থাকা-খাওয়া বাবদ ঐ ২০০ টাকা থেকে ১০০ টাকা সারেন্ডার করো।

সকলেই বজ্রাহত হলেন। ২০০ টাকা নিয়ে বাইরে গিয়ে কি করবেন। তাছাড়া ঐ ২০০ টাকা তো কেন্দ্রীয় সরকার ফ্যামিলি পেনশন হিসেবে দিচ্ছেন। তা থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১০০ টাকা নেবেনই বা কেন? এতদিন তো থাকা-খাওয়ার জন্য কোনো টাকা নেননি। এঁরা গররাজী হলেন। এবং এঁদের ক্ষেত্রে জল আর বেশী দূর গড়ায়নি। তার পরবর্তীকালে পেনশনভুক্ত যাঁরাই এসেছেন, তাঁদের কাছ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১০০ টাকা করে নিয়ে নিয়েছেন এবং ভবিষ্যতে এই হোমে যাঁরা আসবেন তাঁদের কাছ থেকেও নিয়ে নেওয়া হবে। অন্যথায় স্থান পাবেন না।

যাই হোক ১৬ জনের মধ্যে ১৫ জন পেনশন পান। তার থেকে তিনজনকে ১০০ টাকা সারেন্ডার করতে হয়। বাকি ১ জন কোনো রকম পেনশন পান না। এঁর নাম সুবেন সরকার। এই হোমে আছেন দু আড়াই বছর। জন্ম ১৯০০ সালে ১ মার্চ।

—কি চেয়েছিলেন কি পেয়েছেন—প্রশ্ন করতেই বললেন—চেয়েছিলাম একটা বড় কিছু। স্বাধীনতা। এখন সবকিছু হারিয়ে এখানে থাকতে পেরেছি।

হাত দিয়ে ক্ষিতিশবাবুকে দেখিয়ে বললেন, চোখের সামনেই মানুষটা মরতে বসেছে। আমারও সেই অবস্থা। মাঝে মাঝে ভিতরে বড় লাগে। এই বয়সে রোজগারের একটা পথ পেলে এই হোম ছেড়ে চলে যাবো।

ইনি যেহেতু পেনশন পান না সেই হেতু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে সাদা মাসের হাত খরচ বাবদ পান ১০ টাকা অর্থাৎ দৈনিক ৩৪ পয়সাও নয়। যদি তিনি কোনো কারণে হোমে অনুপস্থিত থাকেন তবে দিন গুণে হিসেব করে পয়সা কেটে নেওয়া হয়। নিয়মটি অপমানকর বলে সুবেনবাবু ঐ ১০ টাকা প্রত্যাখ্যান করেছেন। সাবা মাসের জামা-কাপড়ের জন্য পান ৬ টাকা, মেডিক্যাল ৪ টাকা, গায়ে মাখা সাবান মাসে্পিস ১টা দাড়ি কামাবার জন্য ২টি অশোক ব্লেড, কাপড় কাচা সাবানের জন্য ১-২০ পয়সা মাথায় মাখা তেল ৫০ কি ১০০ গ্রাম, সেটা সঠিক জানেন না।

এই হোমে থাকা ৭ জন মানুষ আছেন। ননপোলিটিক্যাল। ওদের ডিপার্টমেন্ট হলো: মিডিল ক্লাস এডুকেটেড পিপল হোম। আনডার দ্য ডাইরেকটোরেট অফ সোসাল ওয়েল ফেয়ার, ওয়েস্ট বেঙ্গল।

মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামে ওদের হোম ছিল। সেটা বন্ধ করে দিয়ে এখানে আনা হয়েছে। এদের খুচরো জন্য বরাদ্দ ৪৫ টাকা।

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সকলেরই এক প্রশ্ন—অন্যায় তো এদের থাকা যেতে পারে এখানে কেন?

অনেক প্রাক্তন বিপ্লবী বাইরে অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে দিন যাপন করছেন। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই মৃত্যুপথযাত্রী। এখানে আসার সুযোগ পাচ্ছেন না। কারণ এ্যাকোমডেশনের অভাব।

একতলা এবং চারতলা একটা ব্লকে নন-পোলিটিক্যালদের রাখা হয়েছে। অন্য কোথাও ওদের ব্যবস্থা করে যতজন সম্ভব প্রাক্তন বিপ্লবীদের এখানে আনা হোক—অন্যথায় যদি পোলিটিক্যাল এবং নন-পোলিটিক্যালদের একই সঙ্গে একই বাড়িতে রাখা হয় তাহলে গেট থেকে হোম ফর ওল্ড এন্ড ইনফার্ম পোলিটিক্যাল সাফারার্স লেখা সাইন বোর্ডটি তুলে নেওয়া হোক—সকলের এই এক দাবি।

রিকসা থেকে নেমে লোহার গেট ঠেলে ভিতরে ঢুকলেই বাঁ হাতে পড়বে সাবেকী ধামধলা একটি বাড়ি। ইট চুন, বালি অহরহই খসে পড়ছে। দেয়াল থেকে রসগ্রহণ করে ক্রমশঃই সাম্রাজ্য বিস্তার করে চলেছে গাছগাছড়ার ঝোপ। বাড়িটি অব্যবহৃত এবং প্রথম দর্শনেই বোঝা যায় উপেক্ষিত। অথচ মেরামত করলে বেশ কয়েকটি বড় বড় ঘর অতি অনায়াসেই পাওয়া যেতে পারে। ডানদিকে অফিস। অফিসের পাশ দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে একে একে দোতলায়, তিনতলায় চারতলায়।

অফিস কর্মচারির সংখ্যা সব মিলিয়ে ২৪।

—অর্ফিসয়াল ট্রিটমেন্ট ইজ্জানর্ট এ্যাট অল গুড।

বিছানায় শুয়ে কথাটি আমাকে বলেছিলেন সুবোধ বল। সম্প্রতি ঢাকা জেল থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত মকশাল নেতা সুব্রত বল-এর পিতা ইনি। জন্ম ১৯০৮। জন্মস্থান ময়মনসিং।

ভারাক্রান্ত গলায় তিনি বললেন—অফিস কর্মচারিদের কথা বলায় অকোনোষ আচার ব্যবহারে একটা চরম অবজ্ঞা ফুটে থাকে। ওদের চোখে মুখে হাবেভাবে এটাই প্রকাশ পায়, মানে ওরা ভাবে ওই সব বুড়োরা দেশের জন্যে কোনোদিন কিছু করেছিল কিনা কে জানে। এখন সরকারের ঘাড় ভেঙ্গে খাচ্ছে। পাশেই খালি গায়ে একটি ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল। ছেলেটির বয়স আন্দাজ ১৭ কি ১৮। ওকে দেখিয়ে সুবোধবাবু বললেন—মাত্র কয়েকদিন আগেও ও আমাদের একজনকে কি বলেছে জানেন?

ছেলেটির দিকে একঝলক তাকিয়ে আমি সুবোধবাবুর চোখে কৌতূহলী চোখ রাখলাম।

—বলেছে আপনাদের আর কি সরকারী পয়সায় বুড়ো বয়সে বসে ফোকোটিয়া খাচ্ছেন। বেশ মজায় আছেন। বলে বড় যন্ত্রণায় একটু ঠোঁট ছড়িয়ে হেসে উনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

শুনে আমি অবাক এবং স্তব্ধ। কয়েক মুহূর্ত পর ঐ ছেলেটিকে, যার নাম তুলসী, জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি বলেছ?'

ও হাসল।

'—তুমি এদের চেন?'

ও ঘাড় নাড়ল। চেনে না।

আমি বললাম, 'এরা কারা, কেনই বা এখানে এসে আছেন, এই বড় বাড়িটি হাসপাতাল কিনা, এই সব জানতে ইচ্ছেও হয় না?'

'—না বাবু। আমার দু বেলা খাবার দেওয়ার কথা, দিয়ে চলে যাই। ব্যাস।'

সুবোধবাবু বললেন, 'ওকে দোষ দিয়ে লাভ কি। অফিসই ওকে বলেনি। সরকারী কৃপায় আমরা এখানে আছি। ওরাও সরকারী কর্মচারী। তাই ওরাও আমাদের কৃপার চোখে দেখে। যে আদর্শের জন্যে এই হোমটি তৈরি করা হয়েছিল, এঁরা সেটা মেইনটেইন করে না। আসলে এই হোমের প্রথম সুপারিন্টেন্ডেন্ট বীরেন ভট্টাচার্য চলে যাওয়ার পর থেকেই অবস্থা ডিটোরিয়েট করতে শুরু করে। বীরেনবাবুও পোলিটিক্যাল সাফারার ছিলেন।'

বীরেনবাবু চলে যাওয়ার পর আসেন বিরেন্দ্রলাল চৌধুরী। প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা করে জেনেছি, বিরেনবাবু অত্যন্ত অভদ্র ব্যবহার করতেন, তিনি যে সুপারিনটেন্ডেন্ট, এটা সকলকে দাপটের সঙ্গে বোঝাবার চেষ্টা করতেন এবং তিনি মনেপ্রাণে চাইতেন, এই হোম উঠে যাক।

সুবোধবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো প্রতিক্রিয়া হয়?'

'—হয়ে লাভ কি। '৭৭-এর ডিসেম্বরে আমি এবং এই হোমের একজন গিয়েছিলাম রাইটার্স বিল্ডিং-এ। সোসাল ওয়েলফেয়ার মন্ত্রী নিরুপমা চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা করে, এখানকার চরম অব্যবস্থার কথা খুলে বলেছিলাম। সব শুনে তিনি ভিজিট করবেন কথা দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, কোথা থেকে কিভাবে এখানে আসবেন, সেই পথনির্দেশও নিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তিনি আসেননি।' বলে সুবোধ বাবু থামলেন। ১৯২১ সালে যখন ইনি ক্লাস সেভেন-এইটের ছাত্র, তখন গান্ধীজীর আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কিছুদিন পর চলে যান সশস্ত্র বিপ্লবের দিকে। যোগদান করেন অনুশীলন দলে। এই সবের মূলে একটা চাওয়াই কিয়াশীল ছিল: শ্রেণী শোষণমুক্ত ভারতের স্বাধীনতা। পাওয়ার মধ্যে পেলেন, দেশ ভাগের যন্ত্রণা। এই প্রসঙ্গে তিনি একসময় উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'কিসের জন্যে আমরা স্বাধীনতা চেয়েছিলাম, বাড়ীঘর ছাড়ার জন্যে? যে স্বাধীনতা মানুষকে তার ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে, সেটা আবার কি ধরনের স্বাধীনতা? স্বাধীনতা তো আর একটা আ্যাবস্ট্রাকট কিছু নয়। দেশছাড়া হয়েছি, ঘরছাড়া হয়েছি, আমার পায়ের নিচে মাটি নেই। '৭৫-এ একবার গিয়েছিলাম। আমার জন্মভূমিতে। কিচ্ছু নেই। মরুভূমি। বেগার, বেগার, আই এ্যাম নাথিং বাট এ

বেশার। আমাদের মানসিক কাঠামো এর ফলে বদলে গেছে। মারডাইল টেন্ডেন্সিস হয়। ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা বৃদ্ধি পায়। মানসিক ভারসাম্য অনেকেই হারিয়ে ফেলে।'

মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার যথার্থ সত্যতা আমি দোতলা থেকে তিন-তলায় গিয়ে ঠিক পরক্ষণেই উপলব্ধি করেছিলাম। একজন লম্বা চেহারার মানুষ চেয়ার পেতে টানা বারান্দায় বসেছিলেন। তাঁর কাছে গিয়ে আমার আসার উদ্দেশ্য জানাতেই তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে, চোখমুখ বিকৃত করে বললেন, —কি চেয়েছিলাম, কি পেয়েছি, তা দিয়ে আপনার কি মশাই?'

বললাম।

উনি বললেন, 'আপনি লিখবেন? আমি বলবো, আর তাই শুনে, আপনি লিখবেন, — কি এডুকেশন আপনার? টাকা ক্যালান দেবি। কি চেয়েছিলাম আর কি পেয়েছি—হুঁ। যান যান আমার কাছে এসে লাভ নেই। আমি কিছু বলবো না।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার দেশ ছিল কোথায়?'

বক্রচক্ষু ভ্রূমধ্য লক্ষিত করে উনি বললেন: 'ফেনীনামে।' তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, কি চেয়েছিলাম— আর কি পেয়েছি— এবং একসময় অকস্মাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, বুঝলেন, যাহা চাই তাহা ভুল বলে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না—প্রথমে ধীরে ধীরে আবৃত্তির সুরে একবার এবং তারপর অতি দ্রুত একই কথা বারবার বলতে বলতে তিনি টানা বারান্দা দিয়ে সোজা সিঁড়ির দিকে চলে গেলেন।

ওঁর নাম সুবোধ গুপ্ত। বাড়ী, কুমিল্লা, বরদাখাতে জেলে গিরীন সেনের সঙ্গে দীর্ঘ দিন জেল খেটেছেন।

চোখের আড়ালে চলে যাবার পর আমি সুধীন্দ্রনাথ রায়ের ঘরে ঢুকি।

এই হোমের ১৬ জনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়স্ক এই সুধীন্দ্রনাথ রায়। শরীর এখনো শক্ত। নিয়মিত প্রত্যেক দিন এখনো দুবেলা ব্যায়াম করেন। জন্ম তারিখ জিজ্ঞাসা করতেই বললেন, —১৮৯৫ সালের ২০শে অক্টোবর বুধবার। বাংলা ১৩০২ সন, ৪ঠা কার্তিক।

গ্রামের নাম মালুচি, সাব ডিভিসন, জাফিকগঞ্জ, ঢাকা।

বেঙ্গল পার্টিশনের ব্যাপারে কার্জনের আমলে বরিশালে যে বিরাট গোলমাল হয়, সেই গোলমালের সময় বজেন্দ্র গাঙ্গুলি ১৯০৫ সালে ময়মনসিং থেকে বরিশালে গিয়েছিলেন। সেখানে পুলিশের লাঠির আঘাতে তাঁর মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যায়। ময়মনসিং-এ ফিরে আসার পর, তাঁকে নিয়ে সুধীনবাবুদের বাড়ীর বিরাট উঠানে এক পাবলিক মিটিং হয়। সেই আবহাওয়া থেকেই সুধীনবাবুর ভিতরে স্বাদেশিকতার জন্ম। এছাড়া হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী মাঝে মাঝেই ওঁদের বাড়ীতে আসতেন। ময়মনসিং-এ যুগান্তর দলের নেতৃস্থানীয় পদে ছিলেন তিনি। সুধীনবাবুর পিতার সঙ্গে তাঁর নিচু স্বরে উত্তেজিত স্বদেশ বিষয়ক আলোচনা সুধীনবাবুকে প্রবল নাড়া দিত।

এক সময় বেঙ্গল পার্টিশনের ব্যাপারে মহারাজা সূর্যকান্তকে অতিথি হয়ে কার্জন ময়মনসিং-এ এলেন। কিন্তু এই ব্যাপারে সূর্যকান্ত মত দিলেন না। মহারাজা সূর্যকান্ত হলেন, বাংলার বর্তমান এ্যাডভোকেট জেনারেল দেবাংশু আচার্যের পিতামহ।

ময়মনসিংএ কার্জনের পদার্পণ নিয়ে সেই সময়ে একটা বড় আন্দোলন হয়। পথ দিয়ে যখন কার্জন সাহেব মহারাজার বাড়ীর দিকে যাচ্ছিলেন, পথের দুধারে অগণিত আবালবৃদ্ধবণিতা হাতে বড় বড় পোস্টার নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল : দ্য ক্যাট অফ দ্য বেঙ্গলী, ডিভাইড আস্ নট।

—কি রকম লেখা ছিল জানেন— বলে সুধীনবাবু আঙুল দিয়ে শূন্যে একটা অর্ধবৃত্ত এঁকে বললেন, —দ্য ক্যাট অফ দ্য বেঙ্গলী ছিল এই রকম। তারপর নিচে সরল রেখার মতো লেখা ছিল, ডিভাইড আস নট। সাদা কাগজে লাল কালিতে ছাপা। আমাদের কাজ ছিল, ঐ ছাপা কাগজগুলো আঠা দিয়ে পিচবোর্ডে সাঁটা। তখন থেকেই হাতে খড়ি। আর বিলিতি কাপড় চোপড় বর্জন করার জন্য সেই সময়ে আমরা গান গেয়ে বেড়াতাম। সেই গান এখনো মনে আছে। মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই/দীন দরিদ্রিনী মা-র যে দেওদর তার বেশী আর সাধ নাই। এর কিছুদিন পরে যুগান্তর দলে যোগ দিই। ময়মনসিং-এ। পরে দল আমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেয়।

জিজ্ঞাসা করলাম, —কলকাতায় তখন নেতৃস্থানীয় পদে কে কে ছিলেন?

—নরেন্দ্র ঘোষ চৌধুরী। ওঁর বাড়ী ছিল নোয়াখালি। এছাড়া ছিলেন: জ্ঞানরঞ্জন গুপ্ত জ্যোতি মজুমদার। পরে জন্মেন। আর ছিলেন যতীন সেন। তিনি অবশ্য আসাম থাকতেন। পুলিসকমিশনার হেমেন্দ্র ছিলেন দীর্ঘদিন। ঐখানেই মারা যান। যাই হোক কলকাতায় এসে বীরেনের পথম আকাশি কবি কর্পোরেশন সাঁটাই এবং এখন যার নাম সুরেন ব্যানার্জি রোড। এক কামরা-লারি শপে। মালিকের নাম হোসেন মহিলাদের ছিল। আমি ওদের বন্ধুকরী ব্যবসাটাই বন্ধ ছিল। হাতুড়মলা পাঞ্জাবীদের চেপে আমরা গিয়েছিলাম ডাকাতি করতে। তখন আমাদের ডাকাতির জন্যে হরদয়াল সিং নামে এক পাঞ্জাবী ট্যাকসি সাপ্লাই করত।

—আপনারা কে কে ছিলেন?

—আমি, মনোরঞ্জন, বিধু বাবু, নিতেন সেন, আর রামচন্দ্র ঘোষ ওরফে ভীমা গয়লা ওরফে হ্যামার।

অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম : —হ্যামার কেন?

—সিন্ধুকে খোলার জন্যে চাবি পাওয়া না গেলে, ওর কাজ ছিল হ্যামার মেরে সিন্ধুক ভেঙে ফেলা। সেই থেকেই আমরা ওকে হ্যামার বলে ডাকতাম। যাই হোক মিনিট চারপাঁচেকের মধ্যে আমরা আমাদের কাজ সেরে ফেলেছিলাম। হাইকোর্টের উকিল গোবিন্দ রায়ের বাড়ীতে ঐ সব গয়না রাখা হয়েছিল। পরে গলিয়ে সোনার বাট করে বিক্রি করা হয়। সেই সময়ে রাস্তার মোড়ে মোড়ে লেভেল ক্রসিং-এর গেটের মতো বড়বড় গেট করে দিয়েছিল। যাতে ডাকাতির খবর পেয়েই গেট নামিয়ে গাড়ি আটকানো যায়।

উনি থামতেই আমি জিজ্ঞাসা করলাম: —আপনি একজন আই বি পুলিশ ইন্সপেকটরকে মার্ডার করেছিলেন।

তার নাম কি?

সুধীনবাবু হেসে বললেন,—মধুসূদন ভট্টাচার্য। ১৯১৬-র নানুয়ারীর ঘটনা আমার বয়স তখন ২১। এখনো সব মনে আছে।

অনুরোধ করলাম,—ঘটনাটা বলুন।

বিছানায় শুয়ে উনি ধীরে ধীরে বললেন,—নরেন্দ্র ঘোষ চৌধুরী একদিন আদালতে বললো, সর্দি হয়েছে, মধু চাই! ওর বিরুদ্ধে তখন অনেকগুলো কেস ছিল। আর বেশীর ভাগ কেস-এর সাথে ঐ মধুসূদন জড়িত ছিল। তখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, ওকে মার্ডার করতে হবে। একদিন দেবেন চৌধুরী, এই হোমে ছিল কিছুদিন আগে মারা গেছে, আমাকে জানাল যে, ভারটা আমার ওপরই পড়েছে। আমি মধুসূদনকে চিনতাম না। বিধু রায় চিনত। সুতরাং ওকে সঙ্গে নিতে হলো। ও পড়ত বিপন কলেজে। ওদের হস্টেলে মধুসূদন মাঝে-মাঝেই গিয়ে অত্যাচার করতো। একদিন বিধুকে সঙ্গে নিয়ে বেরোলাম। যে যে রাস্তায় মধুসূদনকে পাওয়া যেতে পারে, গেলাম। কিন্তু পাওয়া গেল না। দ্বিতীয় দিন পাওয়া গেল কলেজ স্ট্রীট আর হ্যারিসন রোডের জংশন থেকে উত্তরে কয়েক পা হাঁটলেই ডানদিকে একটা গলি পড়ে। যেটা ঘুরে এসে আবার হ্যারিসন রোডেই পড়েছে। ঐ গলিরই একটা সেলুনারি লেকান কমলা এজেন্সী না কমলা স্টোর্স, যেন তার নাম, মধুসূদন কিছু কেনাকাটা করছিল। বিধু ইশারায় আমাকে দেখিয়ে ছিল—ঐ মধুসূদন ভট্টাচার্য। কেনাকাটা সেরে দোকান থেকে বেরিয়ে সে দক্ষিণে হাঁটতে শুরু করল।

আমরা পার্থক্য রেখে ফলো করতে লাগলাম। ওদিকে দেবেন চৌধুরী সাইকেল নিয়ে আপ-ডাউন করছে। দেখা হতেই বললাম, পাওয়া গেছে, শুনে দেবেন বললো, তাহলে তার দেরী কেন, নিয়ে নাও। আমি বললাম, এখানে এত ভীড়। সুবিধে হবে না। সুবিধে মতো পেলেই নিয়ে নেব। দেবেন চলে গেল। আমরা ফলো করতে করতে মেডিকেল কলেজের সামনে এসে গেলাম। এখন সেখানে হরলালকার দোকান, বিরাট বিরাট বাড়ী, তখন সেখানে ছিল খোলার ঘর, পুরোনো বইয়ের দোকান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় আমরা তখন যেন ওর পথ আটকে। হঠাৎ যেন দেখা হয়ে গেলে, এমনভাবে

আলাপ জুড়ে দেয়। ও তাই করলো। আর আমি তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে পিস্তল বের করে টিগার টিপলাম। জার্মান মেড মশার পিস্তল। অটোমেটিক। টেন চেম্বার। রডা কোম্পানি এর এজেন্ট ছিল। আমি এই মশার পিস্তল খুব পছন্দ করতাম। যাই হোক সঙ্গে সঙ্গে মধুসূদন পড়ে যেতেই আমি রাস্তা পার হয়ে এপারে এসে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে কাছ থেকে আর একটা গুলী করলাম। যাতে না কোনো রকম ডাইং ডিক্লারেশন দিতে যেতে পারে। তাছাড়া একেবারে কাছেই মেডিকেল কলেজ। দ্বিতীয় গুলী করার পর আমি আর বিধু প্রতাপ চ্যাটার্জি লেনএ ঢুকে পড়ি। এদিকে একটা পশ্চিমা লোক পিছন থেকে ভাগতা হ্যাব ভাগতা হ্যায় বলে চেঁচাচ্ছে। বিধুকে একটা ফ্ল্যাংক ফায়ার করতে বললাম। ওর কাছে ৪৫০ বোরের রিভলভার ছিল। কিন্তু ও জানাল, ওর রিভলভারের চেম্বার পড়ে গেছে। তখন আমিই একটা ফ্ল্যাংক ফায়ার করলাম। কয়েক পা এগিয়ে দেখি ওটা ব্লাইণ্ড লেন। বাঁ দিকে একটা উঁচু পাঁচিল ঘেরা জায়গা। সেখানে ঢুকে পড়লাম। দেখি একটা লোক খড় কাটছে। তার সামনে অনেকগুলো টিন সাজানো। ঐ টিনের ওপর উঠে পাঁচিল টপকে একটা স্ফুয়ার ডিচ-এ পড়লাম। সেখান থেকে আরপুলি লেন, চুনাপুকুর লেন হয়ে আমহার্স্ট স্ট্রীটের ডাফরিন হসপিটালের একেবারে সামনে। কেউ আর তখন ফলো করছে না। যোবাজার স্ট্রীট ধরে শিয়ালদার দিকে কিছুক্ষণ হাঁটার পর বিধুকে ওর হস্টেলে পাঠিয়ে দিলাম। আর আমি উই-লিয়মস লেন-এর মোড়ে বঙ্গবাসী কলেজের হস্টেলে আমার ভাগনের কাছে পিস্তল, কার্টিজ আর গায়ের চাদর রেখে বেরিয়ে এসে আবার ঐ স্পটে গেলাম। দেখি এনকোয়ারি হচ্ছে। দেবেনের সাথে আমার মির্জাপুর পার্কে, এখন যার নাম শ্রদ্ধানন্দ পার্ক,— দেখা করার কথা ছিল। দেখা করতেই দেবেন বললো, 'লোম্যান এসেছে এন-কোয়ারিতে, তাকেও নিয়ে যাও না কেন।' আমি জানালাম, অস্ত্র রেখে এসেছি। তবু চেষ্টা করে একবার দেখার জন্যে ভাগনের হস্টেলে গেলাম। কিন্তু তখন তার পক্ষে অস্ত্র বের করে দেওয়া চরম অসুবিধে ছিল। সেইদিনই ঘণ্টাদুয়েক পরে খবর পেলাম, বিধুকে অ্যারেস্ট করেছে। তখন একটা ঘটনা ঘটলেই, সন্দেহজনক যত লোক আছে সবাইকে এ্যারেস্ট করা হতো। দু'-তিনদিন পর বিধুকে স্টেটমেণ্ট নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়।'

সুধীনবাবু থামলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'সাম্প্রতিককালে মেডিকেল কলেজের কাছে গেছেন?'

—'হ্যাঁ, মাসকয়েক আগে। একটা হার্ণিয়া বেল্ট কেনার জন্যে।

—'ঐ ঘটনার কথা মনে পড়েছিল।'

—'হ্যাঁ মনে পড়বে না আবার। একটুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম সেখানে, আর

৮৫র সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ!

শৈলেশগুহনিয়োগী

রচিত-পরিচালিত

নাচ-গান ভরা ঐতিহাসিক নাটক

অমরপ্রেম

সুর • রঘুনাথ দাস • গীতিকার - সমরেন্দ্র ঘোষ

•

অমূল্যচন্দ্র ঘটক রচিত

ভক্তিমূলক নাটক

নীলাচলে মহাপ্রভু

নির্দেশনা - বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র • সুর - দুর্গা সেন

রূপায়ণে

নবকুমার

বিজলী দে

বঙ্কিম সাউ • শান্তি ভট্টাচার্য্য

গণেশ সরকার • প্রভাত বসু

বিশ্বনাথ বিশ্বাস • সুব্রত বসু

অনুপম ঘোষ • রথীন দাসগুপ্ত

অশোক ভট্টাচার্য্য • শক্তি অধিকারী

সমর গাঙ্গুলী • অশোক উত্তম

তপন চক্রবর্তী • কার্তিক দাস

কাজল দাস • রাখী হালদার

রিঙ্কা সরকার • সুপর্ণা ঘোষ

যন্ত্রীসংঘ

বরুণ দাস • কৃষ্ণপদ • সুভাষ পাল • ধনঞ্জয় পাল

অনিল দত্ত • অশোক চট্টোপাধ্যায় • বটকৃষ্ণ পাইন

নীলমণি বর কালিপদ মণ্ডল

ও

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন

তারসানাই বাদক সন্তুর বাদক

চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় রথীন সরকার

দল-ম্যানেজার অফিস-ইন চার্জ

মিলন মুখার্জি • বিকাশ মিত্র বিনোদ সাহু

সর্বাধিনায়ক পরিচালক

সুভাষ মিত্র কমল কৃষ্ণ খাঁ

পরিবেশনা

চন্দ্রলেখা অপেরা

৩৭৩ • রবীন্দ্র সরণী • কলিকাতা ৫ • ফোন • ৫৪ ৩৬৩৩

ভেবেছিলাম, এইখানেই সেই ঘটনাটা ঘটেছিল আজ থেকে ৬৩ বছর আগে। দেখতে দেখতে কত বছর কেটে গেল। তবু যেন মনে হয়,—এই তো সেদিন। টাইম এণ্ড টাইড। ফর নো ম্যান বাইড।'

—'আপনি ধরা পড়েননি?'

—'পড়েছিলাম। তবে আমার নিজের কোনো কেস-এ না। ঐ বছরই মার্চ মাসে কুমিল্লা থেকে কলকাতার যুগান্তর দলের কাছে অস্ত্রও লোক চেয়ে পাঠায় একটা ডাকাতি লীড করার জন্যে। দেবেন চৌধুরী ও আমি রওনা হই। পথে হ্যারিসন রোড ও আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়ে দেবেন ধরা পড়ে। এই ঘটনার দু-তিনদিন পরে দুটি মশার পিস্তল ও শ'দুয়েক কার্টিজ নিয়ে আমি একাই শিয়ালদা থেকে রাতের ট্রেনে কুমিল্লা চলে গেলাম। ওখানে মহেশ-প্রাঙ্গনে উঠি। এই মহেশ-প্রাঙ্গন হচ্ছে কলকাতার মহেশ ভট্টাচার্য, বিখ্যাত ঔষধ বিক্রেতা, তাঁর বাড়ি। ইস্কুলের হেড-মাস্টার মনমোহন চক্রবর্তি তখন বোধহয় সেখানকার ইনচার্জ ছিলেন। তাঁর সাথে দেখা করি। কুমিল্লা টাউন থেকে মাইল পাঁচিশেক দূরে এক বড়লোকের বাড়িতে ডাকাতি করতে হবে। আমি ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে ময়নামতী পাহাড়ের ভিতর দিয়ে বরকামতা গ্রামে যাই। ওখান থেকে লোক নিয়ে, তারপর দিন পায়ে হেঁটে ঐ বড়লোকের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হই। যাওয়ার সময় দু'জন ছেলের ওপর ভার দিয়ে গিয়েছিলাম, সন্ধ্যা অন্ধকার হলেই, ওরা যেন টেলিগ্রাফের তার কেটে দেয়। কিন্তু তার কাটার সময় ওরা ধরা পড়ে। ওদের মধ্যে একজন, অবনীর তিন বছর জেল হয়। ডাকাতি করে ফেরার পথে রাস্তায় দেখি মোটরের হেডলাইট। উঁচু রাস্তা। দু'পাশে চষা জমি। আমরা রাস্তা থেকে নেমে নিচে গা-ঢাকা দিলাম। তারপর মাঠ দিয়ে কুমিল্লার দিকে হাঁটতে লাগলাম। কুমিল্লা শ্মশানঘাটে আমাদের মিলিত হবার কথা ছিল। সেখানে গিয়ে যখন উঠি, তখন রাত প্রায় শেষ। সকালে আমাদের জড়িয়ে ধরে বললো—'আপনারা ফিরেছেন, আপনারা ফিরেছেন'—শহরে তখন খুব গণ্ডগোল। অনবরত ব্যাংক ফায়ার হচ্ছে। ময়নামতী পাহাড়ের পথে আর্মড পুলিশ গার্ড।

অমর দাস নামে একজন কর্মীর বাড়িতে ১ মাস থাকার পর একদিন রাতের ট্রেনে ময়মনসিং-এ হেমেন্দ্রকিশোরের বাড়ি যাই। সেখান থেকে ময়মনসিং টাউনে আমাদের বাড়িতে এলাম। পুলিশ তখন পিছনে লেগেছে। কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ একদিন আলুচি গ্রামের বাড়িতে চলে গেলাম। পুজোর সময় বাড়ির সকলে ওখানে যেত। ছুটি শেষ হতে, সকলে চলে আসার ঠিক পরের দিন শেষ রাতে পুলিশ সারা গ্রাম ঘেরাও করে ফেলল। পদ্মার ধারে আমাদের বাড়ি। জল তখনো নামেনি। পালাবার কোনো পথ ছিল না। ধরা পড়লাম। ঐ বছরেরই অক্টোবরে। চার্জ ছিল পাবিল ডাকাতি। অথচ আমি ঐ ডাকাতিতে ছিলাম না। ছিল আমার ভাই, বিনয়েন্দ্রনাথ রায়। যাই হোক, আমাকে প্রথমে ঢাকায়, তারপর দিন ময়মনসিং-এ পাঠিয়ে দিল এবং কোর্টে হাজির করার ১০ মিনিটের মধ্যেই ডিস-চার্জ করলো। কোর্ট থেকে যেই আমি বাইরে পা দিয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ আবার এ্যারেস্ট করে বললো—'আই এ্যারেস্ট য়ু আনডার সেকশন ১২এ ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট।'

ফটো এবং স্টেটমেণ্ট নিয়ে আমাকে ময়মনসিং জেলে পাঠিয়ে দিল। ওখান থেকে কলকাতায় ইলিসিয়াস রো-তে, বর্তমান যার নাম লর্ড সিনহা রোড। তারপর নিউ সেণ্ট্রাল জেল। তবে মাঝে মাঝেই আমাকে জেল থেকে ইলিসিয়াস রো-তে নিয়ে আসত।

একদিন আই বি পুলিশ কমিশনার টেগার্ট আমাকে জিজ্ঞেস করলো—'আর য়ু এ স্পোর্টস্‌ম্যান?'

আমি বললাম—'ইয়েস, আই অ্যাম এ স্পোর্টস্‌ম্যান।'

—'ডু য়ু প্লে ফুটবল?'

—'না।'

—'অলরাইট, কাম অন। লেট মি প্লে ফুটবল উইথ য়ু—' বলে সে উঠে দাঁড়ালো। আমি বুঝলাম বুটের লাথি মারবে। সঙ্গে সঙ্গে বললাম—'ডোন্ট টাচ মি। ইট উইল গো হার্ড, ইফ য়ু টাচ মি।'

শুনে সে বসে পড়ল।

একদিন ব্যাটারি চার্জ করলো। জ্ঞান ফিরে পেতেই দেখি পাশে এক বাঙালি আই বি ইন্সপেক্টর। বললো—'সুধীনবাবু, আপনার খাবার দেওয়া হয়েছে, খেয়ে নিন।' প্রসঙ্গে আমাকে সে বলত, 'সুধীনবাবু, আপনাকে রেগুলেশন ৩ অফ ১৮১৮ এ্যাক্টে এ্যারেস্ট করেছে। সারাজীবন আটক রাখবে। কি দরকার মশাই আপনার। যা জানেন বলে দিন। ওরা আপনাকে বিলেত পাঠাবে। বড় চাকরি দেবে—'

ঐ অ্যাক্টে নেপোলিয়ানকে আটক করা হয়েছিল। যাই হোক আমি খুব হাসতাম। কারণ আমাকে যে এ্যাক্টে এ্যারেস্ট করেছে, তাতে এক মাসের বেশি রাখতে পারে না। ওখান থেকে আমাকে পাঠাল চিটাগাং ডিস্ট্রিক্ট্-এর কুতুব-দিয়া আইল্যাণ্ডে। বার্মা সীমান্তের কাছে। ওখানকার চাষীরা বার্মায় ধান কাটতে যেত। ঐ আইল্যাণ্ডে এক দারোগা আমাকে খুব ভালোবাসত। আমার্কে বলে দিয়েছিল যে, যারা ওখানে আটক আছে, তাদের মধ্যে দু'জন ইনফরমার। আমি যেন ওদের কাছ থেকে তফাতে থাকি। আসবার সময় সাহাজঘাটে ঐ দারোগা আমাকে খেজুর-রসের পায়েস খাইয়েছিল। ওখান থেকে আবার কলকাতা প্রেসিডেন্সী জেল তারপর হাজারিবাগ মোদিলীয়ার সেণ্ট্রাল জেল। তারপর কিছুতেই ঝড় নিতে না পেরে ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর না অক্টোবরে ছেড়ে দিল। জেল থেকে বেরোবার পর হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমাদের নেমন্তন্ন করলেন। বললেন, 'আপনারা দেশের জন্যে কাজ করছেন। মহাত্মা গান্ধীও করছেন। তবে ওঁকে ইংরেজ যতটা না ভয় পায়। আপনাদের ভয় পায় তার চেয়ে অনেক বেশী।' ভালো বলতে পারতেন না। যাইহোক আমার মতে গান্ধীর নন-ভায়োলেন্স হচ্ছে এক্সট্রিম ভায়োলেন্স।'

সুধীনবাবু থামতে আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—'এই সব কেন করেছিলেন?'

বাইরে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভারী গলায় সুধীনবাবু বললেন,—'স্বাধীনতা চেয়েছিলাম, চেয়েছিলাম ইংরেজ আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাক—'

—'ইংরেজ তো গেছে স্বাধীনতা-ও এসেছে—'

সুধীনবাবু এবার একটু উত্তেজিত গলায় বললেন, —'কিন্তু জন্মভূমিকে হারিয়ে এই যে স্বাধীনতা,— এই স্বাধীনতা আমি চাই নি। মনে পড়ে '৪৭-এর ১৫ আগস্টের কথা। চারদিকে বাজি ফাটছে। হৈ-হল্লা। মানুষের কী আনন্দ। সবাই সবাইকে আলিঙ্গন করছে। তখন যুগান্তর দলের সতীশ ঘোষের সাথে আমার দেখা। তাকে বলেছিলাম, 'সতীশ, এই স্বাধীনতা, আমাদের স্বাধীনতা নাবে।' আপনিই বলেন, আমার দেশ তো পূর্ব-বাংলা, অথচ সেটাই এখন বিদেশ। বাংলা-দেশ যখন স্বাধীন হয়, অনেকে আমার কাছে চাঁদা চেয়েছিল, দিইনি। দিতাম, যদি আমি আবার ঐ দেশকে আমার দেশ, আমার পূর্ববাংলা বলতে পারতাম। কি পেলাম জানতে এসেছেন। কিছুই না, শুধু মনস্তাপ ছাড়া।'

সুধীনবাবু অবিবাহিত। জিজ্ঞাসা করে জেনেছি, কোনো সময়ে কোনো মহিলার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতাও হয়নি। তাঁর আপন কথায়—'এই দিক দিয়ে আমি বেঁচে গেছি। কারণ, সন্তান জন্ম দেওয়া এখন একটা পাপের ব্যাপার। দুঃখ ছাড়া তো ওরা কিছুই পাবে না।'

বর্তমান কালের রাজনীতি সম্পর্কে বললেন—'সব দলের সব নেতারা কেবল পকেট ভরছে। দেশের জন্যে ভাবছে কে। তবে একটা বিপ্লব হবে। তার পরিণাম কি, সেটা বলা মুস্কিল।'

—'নকশাল আন্দোলন সম্পর্কে আপনার কি অভিমত?'

—'ওদের নীতিটা ঠিক আমি ধরতে পারিনি। নিরীহ কনস্টেবল মেরে বিপ্লবের পথে কতটা অগ্রসর হওয়া যায়, আমি মানি না।'

—'জীবনের প্রথমে স্বাধীনতা চেয়েছিলেন, এখন কি চান?'

—'মৃত্যু।' বলেই তিনি বিছানায় উঠে বসলেন। বললেন—'এই দ্যাখেন কথায় কথায় দৈ পাততে ভুলে গেছি।'

বাবাজীবন দৈ পেতে ঘরে এসে বললেন, —'রোজ দৈটা খাই। আমি তো ভাত খাই না। ভাতের বদলে আমাকে ১০টা রুটি দেয়। ৮টা খাই। ২টো রেখে দিই। ১টা পাখিদের দিয়ে আর ১টা রেখে দিই। রাত্তিরে দেয় ৭টা। ৮ হলো। ৬টা খাই আর ২টো সকালের জন্যে রেখে দিই। ভীষণ ক্ষিদে পায় তো সকালে।'

শুধু সুধীনবাবুরই না প্রত্যেকেরই পায়। কিন্তু কোনো উপায় নেই। সকালে যা দেওয়া হয়, তাতে ক্ষিদে মেটে না। ১ কাপ চা আর ১টা থিন এরারুট বিস্কুটে ক্ষিদে মেটে?

সুবোধ বল বলেছিলেন,—'পরাধীন আমলের জেলখানার তৃতীয় ডিভিশনের চেয়েও খারাপ অবস্থা। সেই সময়ে সকালে তবু চিঁড়ে-গুড়টা দিত।'

দুপুরে ২০০ গ্রাম চালের ভাত, পাতলা একটা ডাল, বাচ্চা পোনার একটা টুকরো আর তরকারি একটা। আমি যখন গিয়েছিলাম, তখন পঞ্চায়েত ইলেকশনের জন্য দু-একজন মন্ত্রী গ্রামে গিয়েছিলেন। অকস্মাৎ ভিজিট করতে পারেন, এই আশংকায় একদিন ২ টুকরো মাংস এবং একদিন আধখানা ডিম, প্রায় ৮।৯ বছর পর দিয়েছিল, যাতে প্রমাণিত হয় এঁরা মাছ-মাংস-ডিম রেগুলার পেয়ে যাচ্ছেন। বিকালে ১ কাপ চা আর ১টি থিন এরারুট বিস্কুট।

রাত্রে ১০০ গ্রাম চালের ভাত। আগে ৫০ গ্রাম ছিল। যাঁরা ভাত খান না, তাঁদের জন্য ৭টি কাগজের মতো পাতলা রুটি। ডাল, তরকারি আর ১০০ গ্রাম দুধ। এই দুধ প্রসঙ্গে সুবোধ বল : ৬০ ভাগ জল, ৪০ ভাগ দুধ। সারা মাসের আহারের জন্য বরাদ্দ ৭০ টাকা। আগে কয়লা, ঘুঁটে, তেল এর বাইরে ছিল। এখন সব ঐ ৭০ টাকার মধ্যে। অনেকে বাইরে থেকে মাছ, ফল, দুধ কিনে খান। কেউ কেউ দুধ দিয়ে ছানা তৈরি করান। তিনতলা থেকে আমি দোতলায় নামছি, দেখি রাঁধুনি সদ্য দুধ কেটে তৈরি করা ছানা নিয়ে ওপরে উঠছে। সঙ্গে ১৭।১৮ বছর বয়সী একটি ছেলে। আমার সামনেই সিঁড়িতে সে নির্দ্বিধায় খপ্ করে এক-মুঠো ছানা তুলে মুখে পুরে দিল। তারপর আঙুল চাটতে চাটতে চলে গেল।

ছানা কমে যাওয়ার কারণ হয়ত, দুধ পড়ে গিয়েছিল গোছের হবে।

এই হোমে ভীষণ চুরি হয়। ভাঁড়ার থেকে চাল, লাইব্রেরী থেকে বই অহরহই চুরি যায়। হোমের সম্পত্তি হিসেবে সাইকেল, ইলেকট্রিক পাম্প, বিপ্লবীদের সম্পত্তি হিসেবে টাকা, ঘড়ি—তীর্থরঞ্জন চক্রবর্তীর ফিলিপস্ রেডিও একবার চুরি হয়ে গেল। কারা করে?

এইসব অব্যবস্থা, বিশৃংখলা সুপারিন্টেন্ডেন্ট স্বিজেন চৌধুরীর আমল থেকেই মাথাচাড়া দেয় এবং বৃদ্ধি পায়। তিনি নিজে বাগানের ফলমূল, ফলিডল ফেলে পুকুরের মাছ নিয়ে যেতেন। এখন এই পুকুরে কড়ে আঙুলের সাইজের তেলাপিয়ার বাচ্চা কিলবিল করে সাঁতার

বিচিত্র বিদ্যা গ্রন্থমালা

জিজ্ঞাসা-র নতুন প্রয়াস : স্বল্পমূল্যের নিবন্ধ সাহিত্য

'জিজ্ঞাসা' প্রকাশন প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য, মানবিকী বিদ্যামূলক বাংলার বিষয়ের উপর বিশিষ্ট লেখকদের রচনা পাঠকসমাজের কাছে সুলভে পৌঁছে দেওয়া। এই উদ্দেশ্যে 'জিজ্ঞাসা' বিচিত্র বিদ্যা গ্রন্থমালা প্রকাশে ব্রতী হয়েছে। গ্রাহক-সদস্য ভিত্তিতেও এই গ্রন্থমালা বিপণনের ব্যবস্থা আছে।

গ্রাহক-সদস্য হওয়ার নিয়মাবলী

* যে কোন ব্যক্তি 'বিচিত্র বিদ্যা গ্রন্থমালা' সংগ্রহের জন্য এককালীন দশ টাকা দিয়ে গ্রাহক-সদস্য হতে পারেন, উক্ত অর্থ প্রত্যর্পণযোগ্য নয়।
* গ্রাহক-সদস্যগণ 'গ্রন্থমালা'র অন্তর্ভুক্ত যে কোন বই কিনতে পারেন, সব বই কেনা আবশ্যিক নয়।
* সদস্যগণ গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত বাংলা এবং অনুরূপ গ্রন্থমালায় প্রকাশিত ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের উপর ২৫% কমিশন পাবেন।
* একমাত্র এই গ্রন্থমালার সদস্যগণ 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থের উপর ১৫% কমিশন পাবেন।
* গ্রন্থমালার সদস্যগণকে বই কেনার সময় সদস্যপত্র দেখিয়ে বই কিনতে হবে।
* বিশেষ উপহার : কোন গ্রাহক-সদস্য বছরে একশো টাকার বেশী বই কিনলে 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশিত এক বা একাধিক বই উপহারস্বরূপ পাবেন।
* ডাকযোগে বই পেতে হলে ডাকমাশুল গ্রাহক-সদস্যগণকে বহন করতে হবে।
* সদস্যপত্র পুনঃসংগ্রহের কালে এক টাকা দিয়ে নূতন পত্র নিতে হবে।

সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস :
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৪.০০

ঈশ্বর-সন্ধানে :
প্রবাসজীবন চৌধুরী ৩.৫০

বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় :
অতুল সুর ৩.৫০

রামকথার প্রাক্-ইতিহাস :
সুকুমার সেন ৪.০০

অর্থনীতির পথে :
ভবতোষ দত্ত ৫.০০

বিজ্ঞান দর্শন ও ধর্ম :
প্রিয়দারঞ্জন রায় ৬.০০

কলিকাতায় বিদ্যাসাগর :
রাধারমণ মিত্র ৪.০০

ভারতে মূলধনের বাজার :
অতুল সুর ৪.৫০

স্বর্গলোক ও দেবসভ্যতা :
রাজেশ্বর মিত্র ৫.০০

বাংলা মুদ্রণের দুশো বছর :
অতুল সুর ৪.০০

॥ প্রকাশের অপেক্ষায় ॥

ভারতে ইতিহাস রচনার প্রণালী : যমেশচন্দ্র মজুমদার ও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

উপসর্গের অর্থবিচার : স্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্যাকরণের ইতিহাস : বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

ভারতীয় দর্শন : হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

শব্দের জগৎ : পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য

জিজ্ঞাসা : প্রকাশন বিভাগ ॥ ১এ কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

কাটে। সরকারী পয়সায় নয়, পার্ট-টাইম ডাক্তার দুর্গাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের পয়সায় ছেড়েছেন। চাষ করলে ভালো মাছ পাওয়া যেতে পারে। পুকুরের দুই পাড়ে দুটি চমৎকার সানবাঁধানো ঘাট। অপরিষ্কৃত। কারো বসার সাধ্য নেই। অনেকটা ফলগাছ নিয়ে বিলাট বাগানের অবস্থাও তাই। অযত্ন এবং অতি-অবহেলায় সর্বত্রই বনঝোপ। আগাছা। ঘাসের উচ্চতা এক-এক জায়গায় প্রায় আধ হাত। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে জন্মানো জঞ্জাল। আম, পেয়ারা বাতাবিলেবু, কলা আরো নানান ফলের গাছ আছে। অবশ্যই অযত্নে। গেইন ফুল পারপাসে এই বাগান পুকুরকে কাজে লাগানো তো যেতে পারেই। উপরন্তু ঘাস ছেঁটে, কয়েকটি ফুলের গাছ লাগিয়ে যদি বসার জায়গা করে দেওয়া যায়, তাহলে বিকাল কি জ্যোৎস্নায় ভেসে যাওয়া নক্ষত্র-খচিত আকাশের নিচে সন্ধ্যারাত্রিতে, চৌকির একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পেয়ে এই মানুষগুলি এসে একটু বসতে পারেন। হয়ত একটু শান্তিও পেতে পারেন।

তীর্থবাবু বললেন,—'আমি এই ঘরে স্বিজেনবাবুরে কইছিলাম, আপনে ওডা চালকুমড়া চুরি করেন নাই?'

—'চুরি!' স্বিজেনবাবু অবাক হবার ভান করেছিলেন।

—'অখন আপনে দি কন চুরি না, স্বইচ্ছায় না বলিয়া নিয়া গেছি, হেইডা আলাদা কথা—'

বাগানের ফলমূল, পুকুরের মাছ,—এঁদেরই পাওয়ার কথা। সেক্রেটারি জে কে যাই তাই বলেছিলেন। কিন্তু স্বিজেনবাবু কর্ণ পাতলা করে বলেছিলেন,—'রিটিন কিছু আছে? রায়সাহেব আপনাদের খুশী করার জন্যে বলেছেন।'

সরকারী সম্পত্তি যেহেতু, সেইহেতু সব কিছু আলিপুর টেজারিকে জমা দেওয়ার নাম করে তিনি নিয়ে যেতেন। এইসব জানালেন, তীর্থরঞ্জন চক্রবর্তী। জন্ম ১৯০০ সালের ৫ই আগস্ট। ১৯১২ সালে অনুশীলন দলে যোগ দেন। এমন এক স্বাধীন ভারতবর্ষ চেয়েছিলেন, যে ভারতবর্ষে কোনো শোষণ থাকবে না, থাকবে না কোনো শ্রেণী-বিভাগ। পান নি।

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে কিছু চান কিনা প্রশ্ন করায় জানালেন অনুশীলন এবং যুগান্তর দলের সৃষ্টির ইতিহাসকে বিকৃত করা হচ্ছে। তাঁর একমাত্র চাওয়া,—এটা যেন না হয়। অনুশীলন সৃষ্টির মূলে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে সরলা দেবীর নাম পাওয়া যায় না। অথচ এই সরলা দেবীই অনুশীলনের ছেলেদের পিস্তল চালনা শিখিয়েছিলেন।

তীর্থবাবুর কাছ থেকে উঠে যাই তিনতলায়, যে ঘরে সুবোধ গুপ্ত থাকেন। সুবোধবাবু ছাড়াও এই ঘরে থাকেন যতীশ মুন্সী এবং শৈলেশ বিশ্বাস, গান্ধীবাদী।

যতীশবাবুর চৌকির পাশের দেওয়াল কেটে তৈরী করা ওপরের তাকে দুটি আশ্চর্য মডেল। এঁদের বর্তমান জীবনের প্রতিচ্ছবি। তৈরী করেছেন শৈলেশবাবু। তাকটি দু'ভাগে ভাগ করা। বাঁদিকে ছোট ছোট টেবিল-চেয়ার খাট। খাটের ওপর বসে আছে দুই দাড়িওলা বৃদ্ধ। মাথায় টোকা মাবলে যে পুতুলের ঘাড় নড়ে, সেই পুতুল। এই মডেলটির নিচে কাগজে লেখা : বার্ধক্যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী।

ডানদিকে দু-তিনটি প্লাস্টিকের পুতুল। টেবিল, চেয়ার, রেডিও, টেলিফোন। নিচে কাগজে লেখা : যমালয়ের শাখা দপ্তর।

শৈলেশবাবু বললেন, 'আমরা অপেক্ষা করে বসে আছি। যমরাজও টেলিফোন নিয়ে বসে আছে। টেলিফোনে খোঁজখবর নিয়ে লোক পাঠালেই চলে যাবো।'

এঁদের এবং একে একে বাকি সবাইকে নানান প্রশ্ন করলাম। একই উত্তর : স্বাধীনতা চেয়েছিলাম। পেয়েছি দেশ ভাগের যন্ত্রণা। স্বদেশকে বিদেশ বানিয়ে এই যে স্বাধীনতা, এটা আমরা চাইনি।

সকলেই পেয়েছেন আঘাত। পেয়েছেন দেশ ভাগের তীব্র যন্ত্রণা। এবং পাচ্ছেন আরো তিনটি জিনিস—অনাদর, অবহেলা এবং অসম্মান।

তবে জীবনের মূল্যবান সময় ঢেলে দিয়েছেন বলে, কারো মনে কোনো অনুশোচনা নেই।

এক-এক দিন দুপুরে কি রাত্রে খাবার মুখে তোলার সময় এক একজন, হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া দিনগুলির কথা মনে পড়ে যাওয়ায় অনামনস্ক হয়ে যান। মনের ভিতরে প্রশ্ন জাগে,—শেষ জীবনে এইটুকু পাওয়ার জন্যেই কি প্রথম জীবনে অমন দুর্দান্তভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম?

ছবি তোলার জন্য শেষ দিন গিয়ে দেখি ক্ষিতিশবাবু গুরুতর অসুস্থ। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। উঠে বসার শক্তি নেই। আশ্চর্যের বিষয় চিকিৎসার তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই। একজন নার্স আছেন। অনেকের মতে ইনি নার্সিং-এর কিছু জানেন না।

কোনো কম্পাউন্ডার নেই। ফার্স্ট এড-এর কোনো রকম ব্যবস্থা নেই। একজন পার্ট টাইম ডাক্তার আছেন। তাঁর মাসিক বেতন ১০০ টাকা। প্রত্যেক দিন ঘুরে যান। বাড়াবাড়ি দেখলে প্রেসক্রিপশন করে দেন। বিপ্লবীদের নিজের পয়সায় ওষুধ কিনতে হয়। তবে অবস্থা যদি সংকটজনক হয়, বিছানায় শুয়ে মৃত্যুবরণ করা ছাড়া কোনো গতি নেই। কারণ এত বড় বাড়ী, কোনো টেলিফোন নেই। একটু গাড়ীও নেই। গেল শীতে মধ্যরাত্রে বিছানায় চরম অসুস্থতার মধ্যে রঞ্জন দে মারা যান। দীর্ঘদিন শুশ্রূষারী ছিলেন। মারা যাওয়ার পরের দিন সকালে বিছানায় মৃত বলে আবিষ্কৃত হন। অনুশীলন দলে ছিলেন। বাড়ী ছিল ঢাকা।

দোতলায় ছবি তোলার পর তিনতলায় গিয়ে দেখি বারান্দায় চেয়ার পেতে সুবোধ গুপ্ত বসে আছেন।

আমি হেসে বললাম, 'আপনাদের ছবি তুলতে এসেছি।'

উনি আমার কথাটাই বিকৃত করে বললেন, 'আপনাদের ছবি তুলতে এসেছি। বাস্কেল কোথাকার।'

আহত হয়ে আমি বললাম,—'আপনি গালাগাল দিচ্ছেন কেন। আমি তো আপনার সাথে খারাপ ব্যবহার করিনি।'

উনি ক্রোধ গলায় বললেন, 'কি পেয়েছেন মশাই বোজ বোজ এখানে। ইয়ার্কি? কি চেয়েছিলাম, কি পেয়েছি জেনে আপনার কি লাভ? গেট আউট ইউ সোয়াইন, স্কাউন্ড্রেল—'

—আপনি যদি ছবি তুলতে না দেন তুলবো না, সুধীনবাবুর ঘরে যাবো। দয়া করে গালাগাল দেবেন না।'

—'বেরিয়ে যান এখান থেকে।'

মর্মাহত হয়ে আমি ওঁর সামনে থেকে সরে গিয়ে সুধীনবাবুর ঘরের দিকে পা বাড়াতেই উনি ঝটিতি চেয়ার ছেড়ে উঠে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার কলম, খাতা কেড়ে নিয়ে মেঝেতে আছাড় মারলেন, তারপর লাথি মারার জন্য সজোরে পা তুললেন। আমি স'রে গেলাম। তারপর আবার রাগের মাথে আমার ওপর পড়ে —'বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা শুয়োরের বাচ্চা এখান থেকে—বলতে বলতে ঠেলতে লাগলেন।

নির্বিবাদে আঘাত সহ্য করা ছাড়া কোনো পথ নেই। কারণ তিনি সম্ভবের কাছাকাছি এক বৃদ্ধ।

ইতিমধ্যে তাঁর উত্তেজিত বিকট চিৎকারে ফোটোগ্রাফার দিলীপ ঘোষ ওপরে উঠে, আমাকে মুক্ত করতে এসে ঐ অবস্থা দেখে সন্তাপ নিয়েছিলেন।

অফিস থেকেও কয়েকজন কর্মচারী এবং অন্যান্য ঘর থেকে বিপ্লবীগণ ছুটে এসেছেন। সুবোধবাবু আমাকে ছেড়ে ভীষণ ক্রোধে ফেটে পড়ে ঘরে চলে গেলেন।

এই ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে অন্যান্য সবাই জানালেন, সুবোধবাবুর মাথায় গণ্ডগোল আছে। ইতিপূর্বে তিনি এই এলাকার দু-একজন যুবক কর্তৃক প্রচণ্ড প্রহৃত হয়েছিলেন। সুতরাং যে কোনো সময়েই ওঁর নিজের অথবা অন্যের জীবন বিপন্ন হতে পারে। কোনো মানসিক হাসপাতালে এঁকে স্থানান্তরিত করাই একান্ত প্রয়োজন। কারণ ইনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন এবং হারাবার কারণ : যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই। যাহা পাই তাহা চাই না।

এখন যারা স্বাধীন

এখন যারা স্বাধীন ভারতের মাটিতে হেসে খেলে বড় হচ্ছে তারা কদাচিৎ উপলব্ধি করে যে এই স্বাধীনতা কত রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে। কারই বা গরজ ইতিহাসের পাতা উল্টে 'পুরানো সেই দিনের কথা' জানার, তেনে শ্রদ্ধাবনত হওয়ার। অথচ বোমার বিস্ফোরণ, গুলির আওয়াজ আর বারুদের গন্ধে ভরা সেই দিনগুলিই তো ভারতবাসীর সবচেয়ে গর্বের ধন। সেই মুখগুলি—যাদের ভাঁজে ভাঁজে ছিল সংকল্পের দৃঢ়তা, ছিল দেশপ্রেমের আদর্শে আত্মবিসর্জনের আকুতি—তাদের নিয়েই তো সাজিয়ে তুলতে হবে আমাদের অ্যালবাম।

কিন্তু প্রায় সব মুখই তো ঝরে গেছে। প্রায় সব মুখই তো এখন কেবল ছবি, 'শুধু পটে লিখা'।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, প্রতাপচন্দ্র গুহরায় এখনো জীবিত—তিনি যার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে অতীত কথা বলে ওঠে। জন্মেছিলেন ফরিদপুরে আজ থেকে প্রায় ৯১ বছর আগে। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকলে মানুষ হয়ে ওঠে মানুষেরই কাছে করুণার পাত্র। কিন্তু প্রতাপচন্দ্র গুহরায়কে দেখে, তাঁর সঙ্গে কথা বলে আমার মনে হল বয়স তাঁর দেহকে অধিকার করলেও মনের তেজ ও বুদ্ধির দীপ্তিকে ম্লান করে কার সাধ্য! গড়িয়া থেকে 'প্রতাপগড়ের দূরত্ব বেশী নয়।

বললেন, 'রাজনগরে ছিল রাজবল্লভের বাসস্থান। আমাদের পাড়া, নাম নগর বোয়ালিয়া, ছিল ঐ রাজনগরের অন্তর্গত। এতে সেই সময় কেউ কেউ মনে মনে গর্ব অনুভব করে থাকলে তাদের দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু আমার জন্মের মাত্র ছয় মাস পরেই ভয়ঙ্করী পদ্মা কোন্ সর্বনাশা ক্ষুধার তাগিদে এতবড় হাঁ করে গিলে ফেললো গোটা রাজনগরটাকে আজো তার হদিশ পাইনি।'

শিহরিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—'সেই থেকেই কি পদ্মার ঐ অংশের নাম কীর্তিনাশা?'

মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে বললেন, 'কিন্তু তোমার কি মনে হয় পদ্মা ঠিক রাজনগরকেই গ্রাস করতে চেয়েছিল নাকি তার লক্ষ্য ছিল অন্য কেউ?'

যা ইঙ্গিত করলেন তাতে গায়ে কাঁটা দিল। তবু হেসে বললাম, 'কি করে ভেঙ্গে গড়তে হয় ঐ শিশুবয়সেই আপনাকে সেই শিক্ষাটুকু দিয়ে যাওয়ার জন্যই বোধহয় পদ্মা ঐ কাণ্ডটা ঘটিয়ে থাকবে।'

সন্তুষ্ট হয়ে চেয়ে রইলেন আমার দিকে।

হেসে বললেন, 'অতটুকু শিশু আবার কি শিখবে? তবে ভেঙ্গে গড়ার শিক্ষা আমি কোন্ মানুষের কাছে পেয়েছি জানো? তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। অমন দূরদর্শী নেতা দুটি হয় না বললেই চলে।'

বললাম, 'কিন্তু দেশবন্ধুর সান্নিধ্যলাভের অনেক আগেই তো পুলিশের লাঠি নিজের পিঠে নিয়ে আপনার চোখ খুলে গিয়েছিল। তাই না কি?'

সমর্থন জানিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, পুলিশের লাঠির আঘাতে সেদিন গুরুতরভাবে আহত না হলে সহনশীলতার শিক্ষা পেতাম কোথায়? ঘটনাটা শুনবে? আমার তো তখন মাত্র কুড়ি বছর বয়স। বরিশালে প্রতিবাদ সম্মেলন ডাকা হল।

প্রতাপ গুহরায়

লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। ফরিদপুরের নেতা অশ্বিকা মজুমদারের নির্দেশে মাদারিপুর থেকে গোটা পঞ্চাশ স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করে আমি বরিশালের দিকে রওনা দিলাম। মাদারিপুর থেকে বরিশাল ৩৬ মাইল পথ। তিনদিনে পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতে তেমন কোন বেগ যে পাইনি তার জন্য সহৃদয় গ্রামবাসীদের বেশী করে কৃতজ্ঞতা জানাতে হয়। তারা মুক্তহাতে মুক্তমনে সহযোগিতা করেছে বলেই পথ ক্লেশ আমাদের তেমনভাবে স্পর্শই করতে পারে নি।'

মুগ্ধ হয়ে শুনতে শুনতে মনে চলে যাচ্ছিল অনেক পিছনে সেই ১৯০৬ সালের শ্বেতাঙ্গশাসিত ভারতে। বরিশালে ১৪৪ ধারা অমান্য করার অপরাধে সুরেন্দ্রনাথ, দেবেন পাল, অশ্বিনীকুমার দত্ত, অশ্বিকা মজুমদার, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রমুখ বিশিষ্ট নেতাদের কৌশলে বন্দী করলেন বেম্‌ফিল্ড ফুলার—পূর্ববঙ্গের তৎকালীন অধস্তন রাজ্যপাল। ফলে ছড়িয়ে পড়লো বিক্ষোভ।

'পুলিশের বেপরোয়া লাঠিচালনার সামনে সেদিন প্রায় কেউই নিজেদের শরীর অক্ষত রাখতে পারে নি। চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতার কথা মনে পড়ে। উনি মাথায় আঘাত পেয়ে পুকুরের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। আমি নিজেও যখন আঘাতে আঘাতে জর্জরিত মনে হয়েছিল এই আমার স্বাধীনতা সংগ্রামে দীক্ষা হয়ে গেল।'

কলকাতায় এসে প্রতাপচন্দ্র চিকিৎসাসংক্রান্ত বইটইয়ের পাতা উল্টেছিলেন কিছুদিন। তারপর ১৯০৭ সালে মুরারীপুকুর সংলগ্ন উদ্যানে বারীন বসুর বিপ্লবী সংঘ গঠিত হলে যখন দেখা গেল সদস্যদের তালিকায় প্রতাপচন্দ্র গুহরায়ের নামটি জ্বলজ্বল করছে তখন কেউই বিস্মিত হন নি।

প্রতাপচন্দ্র বললেন, 'যতীনদার নির্দেশেই বিডন রোডে আমরা একটি স্বদেশী বিপণী খুলে লোকদেখানো ব্যবসা শুরু করি। আসল উদ্দেশ্য যে ভিন্ন তা তো বুঝতেই পারছো। যুগান্তরের প্রকাশ্য প্রচার সরকার নিষিদ্ধ করে দিয়েছে বলেই তো আর হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না। যুগান্তর চালাতেন যিনি সেই অরবিন্দের মত বোমাতত্ত্ব আমাদের কারো ছিল না জানি। কিন্তু অরবিন্দ যতদিন জেলে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকবেন ততদিন কি কাজ কিছুই এগোবে না? তাই আমাদের এই কূটকৌশল। আমরা গোপনে ইস্তাহার ছাপিয়ে বিলি করি যাতে কাজ না থেমে থাকে।'

শুনতে শুনতে মনের মধ্যে রোমাঞ্চ ও উত্তেজনা খেলা করে যাচ্ছে।

সবর ভারী করে বলি, 'তবু পুলিশের চোখে আপনারা চিরকাল ধুলো দিতে পারেন নি।'

মহাত্মার সঙ্গে কাজ করার স্মৃতি রোমন্থন করে প্রতাপচন্দ্রের মুখচোখ গর্বে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে।

সেই গর্বের রেশ তাঁর কণ্ঠস্বরেও —'এরপর স্বরাজ পার্টি আন্দোলন, তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ কাঁথি আইন অমান্য আন্দোলন, ইউনিয়ন বোর্ড আইন অমান্য আন্দোলন—কোন ক্ষেত্রে না আমি আমার কর্মশক্তি ও কর্তব্যনিষ্ঠার দাগ রেখে এসেছি?'

এটা কি প্রশ্ন না চ্যালেঞ্জ?

কৃতি প্রতিভা : কিছু কথাবার্তা

তিন কবি

দশকের বিচারে যাঁরা ষাট দশকের, এমন তিন কবির কাছে আলাদা আলাদা ভাবে গিয়েছিলাম, প্রশ্নগুলো ছিল কমন, একটা করে বিশেষ প্রশ্ন ছিল। কিছু ব্যক্তিগত প্রশ্ন রেখেছিলাম, আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে এর সাথে কবিতার সম্পর্ক কোথায়। অথচ এটা বলা-বাহুল্য যে, কবির সামগ্রিক চিন্তাভাবনা, রুচি-প্রকৃতি জীবনযাপন ইত্যাদি থেকেই উঠে আসে তাঁর কবিতা।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়, রত্নেশ্বর হাজরা, কালীকৃষ্ণ গুহ যদিও স্বাধীনতা-কালে প্রায় কিশোর তবু আমার প্রথম প্রশ্ন ছিল **"স্বাধীনতা" শব্দটার সঙ্গে আপনার পরিচয় কতদিনের ? প্রথম পরিচয়ের স্মৃতি বলুন।'**

পবিত্র মুখোপাধ্যায় (১৯৪০), একটি কলেজে বাঙলা পড়ান, ২১ বছর ধরে 'কবি-পত্র' সম্পাদনা করছেন, শ্রেষ্ঠ কবিতা বাদ দিলে সাতটা কবিতার বই বেরিয়েছে ওঁর, তাছাড়া নিজের দশকের কবিদের সংকলন সম্পাদনাও করেছেন। পবিত্র-র যা বয়স, তা থেকে বেশী বয়সী মনে হয়। মাঝারি হাইট সকালে বেড়াতে বেরোন। পবিত্র বললেন বুঝেছিলাম। ছেলেবেলায় সতীন সেনকে একবার দেখেছিলাম। কংগ্রেসের নেতা বলতে সতীন সেনকেই বুঝতাম। আমাদের মফস্বল শহরে কোনো রক্তপাত হয়নি। শুনলাম পাকিস্থান হয়েছে। চাঁদ-তারার সবুজ পতাকা ঘাড়ে নিয়ে ঘুরেছিলাম। সুতরাং স্বাধীনতার অর্থ তখন বুঝতে পারিনি। তবে ইংরেজরা চলে গেছে এটা বুঝতে শুরু করলাম।

রত্নেশ্বর হাজরা (১৯৩৭), মহাকরণে মেন বুকে বসেন, প্রকাশিত কবিতার বই সাতটি, অন্ত্য সংহার এবং গীত-গোবিন্দ-র অনুবাদ-বইও বেরিয়েছে, কোনো নিয়মিত আড্ডা-স্থলে যান না, মাঝারি উচ্চতার রত্নেশ্বর সংসার-প্রিয়।

রত্নেশ্বর বললেন, স্বাধীনতা যে দিন হল অর্থাৎ ১৯৪৭-র ১৫ আগস্ট তার কিছু আগে গ্রামেগঞ্জে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে—আমি তখন খুব ছোট, নিচু ক্লাসে পড়ি, স্মৃতি সেই অর্থে কিছু নেই। পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যন্ত একটা গ্রামে বাস করতাম। না, আমাদের মুসলীম প্রধান গ্রামে কোনো চাঁদ-তারা পতাকা দেখিনি।

কালীকৃষ্ণ গুহ (১৯৪৪), পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিসে আছেন, দুটি কবিতার বই এ যাবৎ বেরিয়েছে, লম্বা এবং রোগা, কথা শুনলে মনে হতে পারে কালীকৃষ্ণ আগে বাক্যগঠন করেন, পরে বলেন।

কালীকৃষ্ণ বললেন, আমার দাদু বাঁশের ডগায় একটা চাঁদ-তারাঁর পতাকা টাঙিয়ে দিয়েছিলেন, বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করায় দাদু 'স্বাধীনতার' কথা বলেছিলেন। স্বাধীনতা কি—ঠিক বুঝতাম না। কেন স্বাধীন, কিসে স্বাধীন, এসব স্বাধীনতার অর্থ বুঝতে পারিনি। বোঝানো হয়নি।

> 'জেনে গেছি বলে কোনো দুঃখ নেই
> দুঃখরোগ ক্রমে সেরে গেছে'
> পবিত্র মুখোপাধ্যায়

আমার পরের প্রশ্ন ছিল, **'মাইকেল রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দ পরাধীন দেশের কবি। আপনাদের সাথে ওঁদের পার্থক্য কোথায় ?'**

পরাধীন দেশের কবিদের সামনে একটা লক্ষ্য থাকে, পবিত্র বললেন, লক্ষ্য দেশ স্বাধীন করা। স্বাধীনতা সম্বন্ধে একটা খুব সুন্দর সুখ স্বপ্ন ছড়িয়ে থাকে। মানুষের সংগে মিলে মিশে মুক্তিযুদ্ধের কথা ভাবে। স্বাধীন দেশের কবির কাছে স্বপ্নের থেকে বাস্তব বড়। স্বাধীনতা না থাকার জন্য জ্বালা যন্ত্রণা ক্ষোভ আর স্বাধীনতা পাওয়ার স্বপ্ন মাইকেল রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে খুব স্বাভাবিকভাবেই থেকে যায়। আমরা যারা স্বাধীনতার পরে লিখতে এসেছি তাদের কাছে দেশের অর্থনীতি, গঠনমূলক নানান দিক এবং বেশী মানুষের সুখ স্বচ্ছলতার প্রশ্ন বড়। তা না দেখলে হতাশা আসে।

রত্নেশ্বর বললেন, মধুসূদনের সময় পরাধীনতার ব্যাপার সম্ভবত ততটা বোঝা যায়নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সময় সেটা যথেষ্টই ছিল আর জীবনানন্দের মধ্যে পরাধীনতা থেকে মুক্ত হওয়ার যে চিন্তা বা প্রচেষ্টা সেটা আমার মনে হয় খুব স্পষ্ট বা ডাইরেক্ট নয়। আর যারা স্বাধীনতার পরে লিখতে শুরু করেছি তাদের মধ্যে কিন্তু ওই পরাধীনতা থেকে মুক্ত হবার যে চেষ্টা বা প্রচেষ্টা তার কোনো প্রয়োজনই ছিল না।

কালীকৃষ্ণ বললেন, মনে হয় কোনো পার্থক্য নেই। আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছিল শুধুমাত্র এই কারণেই আমাদের কবিতা লেখার পক্ষে কী বিপক্ষে কোনো সুবিধে বা অসুবিধে আছে বা নেই এ রকম মনে হয়নি কিছু। এখন পরাধীন আছি এটা কল্পনা করতে পারি না। পরাধীন থাকলে স্বাধীনতার আন্দোলন আমাদের কবিতাকে প্রভাবিত করতে পারতো।

> 'এই শর্তে রাজি আছি :
> রক্তপাত ঘটে গেলে
> জল দিয়ে ধোয়ানো হবে না'
> রত্নেশ্বর হাজরা

পরের প্রশ্ন : **আপনি 'কবিতা লেখাকে' রাঁধুনির কাজ বলে ভাবেন কি ? আপনি কি ভাবে কবিতা লেখেন ? কখন লেখেন ?**

রত্নেশ্বর বললেন, না। কারণ হচ্ছে কবিতা লেখাটা কোনো গতানুগতিকতা নয়। কবিতার জন্য যে চিন্তা ভাবনা-স্টিরিও টাইপ নয়। রাঁধুনিকে একদিন কাজ না করলে চলে না। রাঁধুনির কাজটাও নির্দিষ্ট সময়ের যা একজন কবির নয়।

হঠাৎ কোনো একটা শব্দ থেকে বা কোনো একটা অনুষঙ্গ থেকে একটা পংক্তি বা একটা ভাবনার শুরু হয়। সেটা ক্রমশ বাড়তে থাকে। এই বৃদ্ধি কখনো হয়ত একদিনে ঘটে, কখনো বা কয়েক মাস লেগে যায়। ফলে যে পংক্তিটা আজকে শুরু হল, সে পংক্তির সমস্ত কবিতাটি যখন শেষ হয় তখন দেখা যায় যে, একদিন বা দুদিন অতিক্রান্ত, আবার কখনো দেখি দুমাস পার হয়ে গেছে। কোনো কবিতা দু-তিন লাইন হয়ে থেমে থাকে—ইতিমধ্যে অন্য কবিতাও লেখা হয়। দু একটা বড় কবিতা লিখতে আড়াই মাস তিন মাসও চলে গেছে।

নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই। সময় পেলে যে কোনো সময় লিখতে বসতে পারি। তবে খুব ভোর বেলায় বা দুপুরে লিখতে ভালো লাগে।

পবিত্র বললেন, কবিতা লেখা এক ধরণের রাঁধুনির কাজ তো বটেই। ভালো রান্না হলে তারিফ করে, খারাপ হলে বসে দুর-ছাই। কিন্তু ঘামে জলে নেয়ে রান্না ঘরে বসে রাঁধুনিকে কি কষ্টটা পেতে হয়, সেকথা কেউ মনে রাখে না। অবশ্য শুধু-মাত্র কবির ক্ষেত্রেই এ প্রশ্ন করা চলে,

কালীকৃষ্ণ গুহ

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

রত্নেশ্বর হাজরা

জোগানদারের ক্ষেত্রে নয়। অনেক কবিতা-লেখক মূলত জোগানদার।

কবিতা লেখার কোনো নিয়ম আমার ক্ষেত্রে খাটে না। তবে ইনস্পায়ার্ড মোমেন্ট না এলে আমি ঘোরাঘুরি করি, আড্ডা মারি, ঘুমোই, বই পড়ি। হঠাৎ ঘুমোতে ঘুমোতে কিংবা পথ চলতে চলতে এক একটা পংক্তি ঝলসে ওঠে। পকেটে নোটবই থাকে, পংক্তিটা টুকে নিই। তারপর যে কোনো সময় বেছে নিয়ে লিখতে বসি। আবার দীর্ঘ কবিতার বেলায় মাসের পর মাসও এক নাগাড়ে লেখা চলে।

কালীকৃষ্ণ বললেন, বাঁধুনির কাজ, ঠিক এরকম অ্যানালিজ তো কখনো ভাবিনি। তবে এ রকমও ভাবা যেতে পারে। কেননা কবিতা লেখার কাজটা গোপনে অভিজ্ঞতা স্মৃতি কল্পনা মিশিয়ে করতে হয়।

কাগজ কলম জড়ো করে লিখি। তখন কোনো প্রভোকেটিভ-একসপেরিয়েন্স কোনো বোধের বা সংকটের মতো দেখা দেয়, তখন।

সাধারণত রাত্রে। কেননা রাত্রি ছাড়া কোনো সময়ে একা একা বসা যায় না।

'আমার দু চোখে অন্ধতা নেমে আসবে;
আমি টের পাই
কে আমাকে কবিতা লিখতে শিখিয়েছিল?
কালীকৃষ্ণ গুহ

প্রিয় পশু। পাখি। ঋতু। ফুল ফল জানতে চেয়েছিলাম তিন কবির কাছে।

কালীকৃষ্ণ-র প্রিয় পশু বাঘ। বাঘের সৌন্দর্য ছাড়াও ছেলেকে প্রায়ই বাঘের গল্প শোনাতে হয়।

যদিও রত্নেশ্বরের বাড়িতে পোষা কুকুর নেই তবু রত্নেশ্বরের প্রিয় পশু কুকুর।

পবিত্র-র মায়ের স্মৃতি জড়িয়ে আছে বেড়ালের সাথে। তাই পবিত্র-র প্রিয় বেড়াল।

যে কোনো ছোট পাখিই রত্নেশ্বরের ভালো লাগে।

প্রিয়র ফাঁকা মতের মধ্যে নিস্তব্ধতাকে ভেঙে দেয় যে কাঠটোকরা তাকে বেছে নিয়েছেন প্রিয় পাখি হিসেবে।

কাক কালীকৃষ্ণ-র শুধু প্রিয় নয়, অপ্রিয়ও। কাকের পাশাপাশি ওর একটা বসবাসও আছে।

পবিত্র-র প্রিয় ঋতু বর্ষা। কালী কৃষ্ণ সব ঋতুর স্বরকেই ব্যবহার করতে চান। রত্নেশ্বরের মনে হয় শীতকালে চতুর্দিকটা কেমন সংহত হয়ে আসে, তাই ওর প্রিয় ঋতু শীত।

কালীকৃষ্ণ-র তেমন কোনো প্রিয় ফুল নেই। রত্নেশ্বরের প্রায় সব রকমের ফুলই ভালো লাগে। পবিত্র-র প্রিয় বকুল।

রত্নেশ্বর আম কলা এই সব ফল ভালো বাসেন। পবিত্র ছোটবেলায় আম কুড়োতে যেতেন, সেই স্মৃতি থেকে উনি পছন্দ করেন আম। কালীকৃষ্ণ-র ফলাতো খাওয়াই হয় না প্রায়, তবে শীতে মিষ্টি কমলালেবু উনি খান।

ইকুলিশ! আগুন চুরি ক'রে আনো
পোড়াবো পৈতৃক ঘরবাড়ি
বংশ-তালিকার কিংবা হিসাবের
নথিপত্র পোড়াবো আগুনে'
পবিত্র মুখোপাধ্যায়

তিন কবি কখনো পোলো কিংবা লন টেনিস খেলা দেখেছেন কিনা জানতে চাইলাম।

রত্নেশ্বর দেশপ্রিয় পার্কের পাশে লন টেনিস দেখেছেন। নিয়ম-কানুন জানেন না। কালীকৃষ্ণ-ও পারফেক্ট নিয়ম জানেন না। তবে খেলা দেখেছেন। দুজনের কেউই পোলো দেখেননি। পবিত্র পোলো খেলা দেখেছেন, তবে গ্যালারিতে নয়, ৩১নং ট্রামে বসে যেতে যেতে যতটা দেখা সম্ভব। ওর বক্তব্য এসবের মানে কী?

'বিদ্রোহী ছিলাম না বলেই অনুগত
হতে পারিনি প্রবলতম প্রতিপক্ষ
পেলাম না একজনও যার কাছে দাঁড়িয়ে
বলতে পারি এই নাও আমার আনুগত্য।'
রত্নেশ্বর হাজরা

রবিশংকর না বিলায়েৎ—প্রশ্নটা এরকমই করেছিলাম।

পবিত্র এত বিচার করে দেখেননি। তবে দুজনের বাজনা-ই উনি শুনতে সমান আগ্রহী।

কালীকৃষ্ণ-র কাছে বিলায়েতের বাজনা যদিও প্রীতিসঞ্চার করে তবু রবিশংকরের বাজনা ওর মহৎ মনে হয়।।

বিলায়েতের থেকে রবিশংকরের বাজনা শোনার বেশী সুযোগ পেয়েছেন রত্নেশ্বর সে কারণে রবিশংকরের প্রতি ঝোঁক বেশী রত্নেশ্বরের।

'কবিতা লিখে কিছুই হয়নি আমাদের'
এই কথা ব'লে তুমি
কুঁজো হ'য়ে হেঁটে যেতে লাগলে
'কবিতা লিখে কিছুই হয়নি আমাদের'
এই কথা ব'লে আমি
পাশাপাশি কুঁজো হ'য়ে হেঁটে
যেতে লাগলুম।
বাইরে তখন চৈত্রমাস সূচিত হচ্ছে—
অন্য কোনো ভাষা নেই—
স্মৃতিহীনতার মতো চৈত্রমাস।
কালীকৃষ্ণ গুহ

কবিতাকে স্মরণযোগ্য করে তোলা ছাড়া ছন্দের আর কোনো নিজস্ব দায়িত্ব আছে কি? প্রশ্ন করেছিলাম।

রত্নেশ্বর বললেন, কবিতায় ছন্দ থাকলে পরে একজন সাধারণ পাঠকের কাছেও প্রথম পাঠেই আগ্রহ জাগাতে পারে। দ্বিতীয়ত ছন্দ কবিতার অন্যান্য দুর্বলতাকে কিছুটা আড়াল করতে সমর্থ। ছন্দ বলতে বাঙলা ভাষায় প্রচলিত ছন্দ-গুলোকেই ধরে নিচ্ছি। তবে ছন্দই যদি কবিতার মুখ্য ভূমিকা অবলম্বন করে তাহলে কবিতা মার খেতে পারে। ছন্দ কবিতার একটা অঙ্গ, কিন্তু সব নয়।

পবিত্র বললেন, এলোমেলো কথাকে ছন্দ শৃঙ্খলা দেয় এবং পরিমিতি এনে দেয়। এ দুটোই কবিতার পক্ষে জরুরী।

কালীকৃষ্ণ বললেন, ছন্দ বলতে সাধারণত লোকে যা বোঝে আমার তার

সংগে কোনো সম্পর্ক নেই। এবং সেই ছন্দ কবিতার ক্ষতি করতে পারে বলে মনে হয়। তবে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লিখলে মাত্রাতুকভাবে পদ্যের আবেগহীনতা যদি কেউ বজায় রাখতে পারেন তাতে আপত্তি নেই।

পরের প্রশ্ন চিত্রকল্প বিষয়ক

পবিত্র জানালেন, উনি সর্বত্র চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন। তবে ওঁর বিশ্বাস অতিরিক্ত চিত্রকল্প ব্যবহার কবিতার দুর্বলতা। চিত্রকল্প একটা অলংকার আরো ভিন্ন অলংকার কবিতায় লাগে।

কালীকৃষ্ণ বললেন, চিত্রকল্প ব্যবহার করি। তবে তার জন্য কোনো রকম যত্ন বা আগ্রহ বোধ করি না। চিত্রকল্প কবিতাকে সমৃদ্ধ করে বলেও আমি মনে করি না। চিত্রকল্প জিনিষটা কি আমি ঠিক বুঝি না। তবে তা যদি দেখা কোনো ছবি হয় তাতো কবিতায় নিজের থেকে আসেই।

রত্নেশ্বর বললেন, আপনি বলতে পারেন আমার কবিতায় চিত্রকল্প বেশী থাকে। আমি কবিতাটিকে পাঠের সংগে সংগে দৃষ্টি গ্রাহ্য করতে চেষ্টা করি। তবে চিত্রকল্পই প্রধান নয়। আমি মনে করি ছন্দের মতোই চিত্রকল্পের বাহুল্য ঘটলেও সে কবিতা দুর্বল কবিতা।

'কবিই জানেন তাঁরে পিছে ফেলে একা
ও নির্জন হতে একা ও নির্জন
আত্মায় জাগ্রত রেখে ত্রিকালবিম্বিত
স্বচ্ছ বোধ
তিনি চলেছেন পথে উদাস ঝাঁটিতে
গোঁজা পাখির পালক
চোখে শব্দভেদী তীর চলেছেন তিনি
কপালে প্রোজ্জ্বলে সূর্য উদ্ভাসিত
আত্মপর যাহার প্রভাব
প্রথম মানব তিনি পদচিহ্ন মুছে মুছে
চলেছেন একা
অথচ সমস্ত বিশ্ব তাঁরই চোখ থেকে
আপন চুরি করে আনে।'

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

আপনার 'প্রিয় গ্রন্থ' কোনটি?

কালীকৃষ্ণ বললেন, অন্তত একশ'টা আছে। একটা নাম বলা সম্ভব হবে না।

পবিত্র বললেন, অনেক প্রিয় গ্রন্থ আছে। তবে সবচেয়ে প্রিয় মহাভারত। প্রায় নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতো অনিবার্য কিংবা একসিজেনও বলতে পারেন মহাভারতকে।

রত্নেশ্বরেরও প্রিয় গ্রন্থ মহাভারত। কারণ মহাভারতের মধ্যে—অতীত, গল্পের মতো রোমাঞ্চকর অনেক জিনিষ, আবার প্রবন্ধের মতো গভীরতা বা চিন্তার বিষয় আছে, আছে কবিতা এবং কল্পনা। একই গ্রন্থের মধ্যে এত বিরাটত্ব আর কোথাও পাই না।—রত্নেশ্বর বললেন।

কি খেতে ভালোবাসেন, প্রশ্ন করলে—

পবিত্র জানালেন, মাছ ওর সবচেয়ে প্রিয়। আর মিষ্টি।

রত্নেশ্বর ভাত বা অন্য কিছুর সংগে ফল, সংগে দুধ অথবা টক দই খেতে ভালোবাসেন।

কালীকৃষ্ণ-র ভালো লাগে গরমকালে আম-ডাল।

আপনার পেশা আপনাকে সুখী করতে পারে কি?

উত্তরে পবিত্র জীবনানন্দের পংক্তি উদ্ধৃত করলেন, পৃথিবীতে নেই কোনো বিশুদ্ধ চাকরী।

আমার পেশা নিয়ে আমি অন্তত অসুখী নই—রত্নেশ্বরের জবাব।

কালীকৃষ্ণ বললেন, পেশা আমাকে সুখী করতে পারে না। তবে কোনো পেশা না থাকলে ভালো হত এরকম আমি মনে করি না। প্রত্যেকেরই জীবিকার জন্য শ্রম-দান করা উচিৎ। আমিও প্রশ্নহীনভাবে করি।

কলকাতা কি আপনার প্রিয় ভূমি? কেন?

পারিবারিক কারণে, কলকাতাই কালীকৃষ্ণ-র স্বদেশ।

কলকাতা ছেড়ে অন্য কোথায় আছেন, একথা পবিত্র ভাবতেও পারেন না।

কলকাতাতে অনেক সুবিধা আছে সেই কারণে রত্নেশ্বরের কলকাতাকে ভালো লাগে। তবে কলকাতার কাছাকাছি একটু দূরে থাকতেই ওর আগ্রহ বেশী।

পিতৃত্বলাভের আগে পুরুষেরা অন্তত
একবার হিংসুটতম হয়ে ওঠে
আত্মজের রক্তে হাত ধোয়
পিতৃত্বলাভের আগে পুরুষেরা নিজের
ছায়ায় বসে কাঁদে
রত্নেশ্বর হাজরা

পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় অসংখ্য দেশীয় পুরাকল্পের অনুষঙ্গ উঠে আসে। ওকে প্রশ্ন করলাম—**পুরাকল্প বা মিথ-কে ব্যবহারের মধ্যে নিজস্ব সৃষ্টির কতটা সুখ পাওয়া যায়? কি ভাবে? আপনার কর্ণ বা অভিমন্যু, ব্যাসদেবের কর্ণ-অভিমন্যু থেকে ভিন্ন কোথায়?**

পবিত্র বললেন, মিথ্-এর মধ্যে অনেক তাৎপর্য থাকে যা কখনো পুরোনো হয় না। প্রত্যেক দেশের কবি শিল্পী তার মূল চরিত্রটিকে নতুন অর্থে ভরিয়ে দেন। একটা সার্বজনীন জরুরী তাৎপর্য এভাবে উঠে আসে। কর্ণ এবং অভিমন্যু আজকেরই মানুষ, যেমন ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়।

রত্নেশ্বর হাজরার কবিতায় বিভিন্ন দুর্লভ প্রাকৃতিক সম্পদ বার বার ঘুরে ফিরে আসে। ওকে প্রশ্ন করলাম—**দুর্লভ প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি আপনার আকর্ষণ কেন?**

রত্নেশ্বর বললেন, আমি ব্যক্তিগত-ভাবে যে জিনিষগুলো খুব সহজ লোভ্য নয়, যার হয়ত অস্তিত্ব নেই কিন্তু কল্পনায় যাকে অস্তিত্বময় কোরে তোলা যায়—তার জন্য একটা দুর্লভ আকর্ষণ অনুভব করি। হয়ত তাই বিষুব-রেখা বা কর্কটক্রান্তি নামক কল্পিত রেখাকেও আমি অস্তিত্বময় বলে মনে করি।

কালীকৃষ্ণ গুহ অনুভূতিতে টুকরো টুকরো বা ছোট ছোট কবিতায় কবিতায় ধরে রাখতে চান। ওঁকে প্রশ্ন করলাম **দীর্ঘ কবিতা লেখেন না কেন?**

কালীকৃষ্ণ বললেন, দীর্ঘ কবিতা লিখতে পারলে নিশ্চয়ই একটা বড় কাজ করা যায়। দীর্ঘ কবিতা লেখা আমার পক্ষে বোধহয় কখনোই সম্ভব হবে না।

'একটি মাত্র কবিতার দিকে চলে যায়
আমার প্রতিটি অন্ধকার পাণ্ডুলিপি
নারীর মুখ যায়; তার অনিশ্চিতভাবে
মেলে দেওয়া চুল এবং নিঃসঙ্গতা যায়—
প্রতিটি অন্ধকার পাণ্ডুলিপির ভিতর
থেকে একটি মাত্র কবিতার দিকে চলে যায়
হেমন্তের বিষাদ; শীতরাত্রির মূঢ় কাক;
এপিটাফ;
কালীকৃষ্ণ গুহ

উচ্চফলনশীল ধান, পাট, গম, আলু শাকসব্জির ও
চায়ের অধিক ফলনের জন্য
"মুসৌরী ফস্"
ভারত সরকারের তৈয়ারী
ফস্ফেট সার
অম্লজমির জন্য I.C.A.R. অনুমোদিত
ডিস্ট্রিবিউটারস : বি, সি, পাল এণ্ড কোং
১৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১, ফোন : ২২-৭৮৮৭

তিন শিল্পী

ষাট-এর দশকের মধ্যভাগ থেকে ভারতবর্ষের চারুকলা চর্চাক্ষেত্রে একটা পালা বদলের হাওয়া লেগেছে। তার মানে অবশ্য এই নয় যে আগেকার চিন্তা-ভাবনা-কর্ম-পদ্ধতির জের একেবারেই চলছে না বা তার কোনই জোর নেই। বক্তব্যের অর্থ শুধু এই যে, ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে যেসব চিত্রকর ও ছাপের ছবি নির্মাতারা নিরন্তর সৃষ্টিচিন্তন শিল্পচর্চার মধ্য দিয়ে তাঁদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতা-ধ্যান-ধারণার সুসংহত রূপটিকে নিরন্তর তুলে ধরার চেষ্টা করছেন এবং তা সার্থকভাবে করে তাঁদের স্বকীয়তাকে প্রতিষ্ঠা করছেন—তাঁরা কেউই তাঁদের পূর্বসূরীদের মতন আগে পূর্ব-নির্ধারিত কোন শিল্পশৈলী বা শিল্পভাষার সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হয়ে, তারপরে সেইভাষা বা শৈলীর স্বীকরণে সৃজনকর্ম সাধন করতে বসেননি। এটা আর একটু বিশদভাবে বলা দরকার।

আধুনিক যুগের জন্মকাল (চারুকলা ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে আধুনিক যুগের সূত্রপাত অবনীন্দ্রনাথ থেকে। তাঁর আগে রাজস্থান ও পাঞ্জাব-হিমালয়ের বিভিন্ন ছোট ছোট কেন্দ্রগুলে মধ্যযুগের রকরকা শেষ হয়েছে। নানা সূত্রে লৌকিক রীতিতে অবসাদ এসেছে। আর কলকাতা-মাদ্রাজ-বোম্বাইয়ে নতুন মধ্যবিত্ত শহুরেশিক্ষিতরা ইউরোপীয় শিক্ষা-প্রাপ্ত শিল্পীরা যান্ত্রিকভাবে পাশ্চাত্য পদ্ধতি-প্রকরণ প্রয়োগ ও অনুসন্ধানকরণে ব্যস্ত-সমস্ত হয়েছেন। অবনীন্দ্রনাথই প্রথম ভারতীয় ব্যক্তি-শিল্পী যিনি কোন গোষ্ঠি-ঐতিহ্য চালিত হয়ে শিল্পচর্চা করেননি। তাঁর কাছে শিল্পভাষার প্রশ্নটা নৈর্ব্যক্তিক ছিল না; তিনি নিজের ভাবোদ্দীপন চালিত হয়ে ধ্যান-ধারণার শিল্পরূপ দিতে চেয়েছিলেন। তিনি যদি কোন পূর্বনির্দিষ্ট শিল্প-ঐতিহ্যের স্বীকৃতি হয়েও থাকেন, তা হয়েছেন স্বপ্রবণতাচালিত হয়ে) থেকেই ভারতীয় চিত্রিতকলা দুই বিপরীতমুখী প্রবণতার টানাপোড়েনে অবিরত বিপর্যস্ত হয়েছে কখন তার ভারতীয় পরিচয় অক্ষুণ্ণ নামাবলীর মতন ধারণ করবে বলে সে কোন-না-কোন প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় ভারতীয় শিল্পশৈলীর স্বীকৃত হয়েছে, কখনওবা যেন আধুনিক পাশ্চাত্যশৈলীর পোশাক পরে আধুনিক বা আন্তর্জাতিক হবার চেষ্টা করেছে। দু ক্ষেত্রেই শিল্পীরা তাঁদের সমসাময়িক ভারতীয় জীবনের অভিজ্ঞতা ও ধ্যান-ধারণার রূপায়ণে অল্পাধিক পরিমাণে ব্যর্থ হয়েছেন। কতটা স্বীকরণ করা হয়ে থাকে না কেন পূর্বনির্ধারিত শৈলী তার সমস্ত অনুষঙ্গ নিয়ে উপস্থিত হয়ে শিল্পীর পারিপার্শ্বগত ধ্যান-ধারণার বিশিষ্ট রূপটিকে ফুটতে দেয়নি। আধুনিক ভারতীয় চারু-কলার প্রথম ষাট বছরে তার যে-ব্যতিক্রম

শিল্পী কাঞ্চন দাসগুপ্ত

দেখা যায়নি তা নয়। ব্যতিক্রম অবনীন্দ্রনাথের চন্দ্রমল্লিকা ও আরব্য-রজনী চিত্রমালা, ব্যতিক্রম গগনেন্দ্রনাথের আর্ট বেঙ্গল-এর ছবি, নন্দলালের ১৯০৫ থেকে ১৯৫০-এর মধ্যপর্ব এঁরা নিসর্গচিত্র, অমৃতা শেরগীলের শেষ পর্বের ছবি, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় পারিবারিক বেড আর মলখুলে ফিদা হুসেনের শিল্প-কর্ম। এঁদের সৃজনকর্ম সাধারণ কারণ এঁরা প্রাথমিকভাবে কোন শিল্পভাষা বা শৈলীর প্রতি অনুরাগ থেকে শিল্পকর্মে প্রবৃত্ত হননি, অভিজ্ঞতা-ধ্যান-ধারণার দৃশ্যরূপ দেবার তাগিদে প্রাপ্ত শিল্পভাষাকে শরণাপন্ন হয়েছিলেন। তাঁদের অভিজ্ঞতা-ধ্যান-ধারণা-ভাবোদ্দীপনের শিল্পরূপ দেবার জন্য তাঁদের পূর্বস্থিত শিল্পশৈলী বা রীতির স্বীকরণের হেলায় মাততে হয়েছে। এঁদের ব্যতিক্রম অধিকাংশ শিল্পীই প্রাপ্ত শিল্পশৈলী, শিল্পভাষা, রীতি-নীতি, পদ্ধতি-প্রকরণের ইস্প্রেশনিস্টিক ভাইব্রেশনের আর শিল্পশৈলীর প্রয়োজনমতো অভিজ্ঞতা-ধ্যান-ধারণা বানানোর খেলায় কালাতিপাত করেছেন।

মধ্য-ষাটের পর থেকে যেসব চিত্রকর, ভাস্কর, ছাপের ছবি নির্মাতারা পাদপ্রদীপের আলোয় এসেছেন তাঁদের শৈল্পিক-ভাবোদর্শনের উৎস-জগৎ-জীবন-পারিপার্শ্বের সঙ্গে তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্কজনিত অভিজ্ঞতা এবং সেই অভিজ্ঞতা-প্রসূত ধ্যান-ধারণা। তাঁরা সেই অভিজ্ঞতা-ধ্যান-ধারণার রূপ দেবার জন্য পূর্বস্থিত ভাষা-শৈলী-রীতি-পদ্ধতি-প্রকরণের স্বীকৃত হন, কিন্তু এর কোনটিই তাঁদের প্রাথমিক প্রেরণা হয় না। তাঁরা কোন পূর্বনির্দিষ্ট শিল্পশৈলী বা শৈলীর বিশেষ মালমশলা [illegible] নির্বিশেষে সেসব পুরোনো শৈলী-রীতি-পদ্ধতি-প্রকরণের [illegible] প্রবৃত্ত হন যে সকলের মধ্যে [illegible] তাঁদের অভিজ্ঞতা-ধ্যান-ধারণার শিল্পরূপ সন্ধান-সাধনা দেখতে পান। প্রাথমিক [illegible] ও সূত্র বদলের ফলে ষাট দশকে [illegible] থেকে ভারতে আলোচনায় [illegible] চরিত্রই বদলে গেছে। যাঁরা এই [illegible] হোতা তাঁদের মধ্যে পরোক্ষে [illegible] জন শিল্পী থাকলেও [illegible] পরিচিতা থেকে পরোক্ষে [illegible] বিষয় এঁদের সবেও যাবা [illegible] ও সম্ভাবনা নিয়ে [illegible] চিন্তা-ভাবনা [illegible] দর্শনের শিল্পরূপের [illegible] হচ্ছেন, তাঁদের [illegible] প্রতিটি। তাঁরা [illegible] মনে শিল্পীরা [illegible] সম্ভব শৈলী ও [illegible] প্রেরণা [illegible] পরিবর্ধন, [illegible] শিল্পের [illegible] মান এও নয় যে, দক্ষ হাতে [illegible] করে [illegible] শিল্পী [illegible] [illegible] তবে [illegible] না। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] বোধ হয় [illegible] [illegible] ভাবছেন [illegible]

মুষ্টিমেয় কিছু তরুণ চিত্রকর, ভাস্কর ও ছাপের ছবি নির্মাতা অন্যানুসৃত সহজ উপায় অবলম্বন না করে জগৎ-জীবন সম্পর্কে তাঁদের নিজ নিজ বোধ-অভিজ্ঞতা-ধ্যান-ধারণাকে অবলম্বন করে সৃজনকর্মে লিপ্ত আছেন। কলকাতায় এমনই যে-কজন তরুণ চিত্রকরের সন্ধান মেলে তাঁদের মধ্যে কাঞ্চন দাশগুপ্ত, অশোক ভৌমিক ও তিলক মণ্ডল সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিপূর্ণ, সবচেয়ে সম্ভাবনাময়।

কাঞ্চন দাশগুপ্ত

আলোচ্য তিনজনের মধ্যে কাঞ্চন বয়োজ্যেষ্ঠ। তিনি দেশবিভাগোত্তর ভারতের সমবয়সী। জন্ম বারাণসীতে। শিক্ষা-দীক্ষা কলকাতায়। ১৯৭০-এ গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট এণ্ড ক্র্যাফট্স থেকে স্নাতক হয়ে বেরিয়ে একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থায় চাকরি নেন। সেখানেই আছেন। থিয়েটার সম্পর্কে ওঁর আগ্রহটা কেবল দর্শক হিসাবেই নয়। পুতুল নাচের প্রমোদের দিকটা বজায় রেখেও কিভাবে তাকে আধুনিক জীবনের অভিজ্ঞতা-ধ্যান-ধারণা প্রকাশের মাধ্যমে পরিণত করা যায়, পুতুল-নাচকে বক্তব্য-প্রেরণের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মাধ্যম হিসাবে কিভাবে ব্যবহার করা যায়, পুতুল-নাচের বিভিন্ন পরম্পরার ঐতিহ্যকে কি করে একই উপস্থাপনায় ব্যবহার করা যায়, নতুন উদ্ভাবিত রীতি-কৌশলগুলির সঙ্গে পুরানো পদ্ধতি-প্রকরণের জোড়-বন্ধ কি করে করা সাধ; পুতুল-নাচকে কি করে বহুমাধ্যম উপস্থাপনার অন্যতম হিসাবে ব্যবহার করা যায়—এসব নিয়ে কাঞ্চন তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে বহুদিন ধরে নানান রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যস্ত আছে।

প্রত্যেক শিল্পীরই কর্মজীবনের প্রারম্ভে একটা পর্যায় থাকে যখন 'কি করে শিল্প-বস্তু নির্মাণ করা উচিত', 'কেমনভাবে শিল্পবস্তু নির্মাণ করা বিধেয়' এবংবিধ ভাবনাই তাঁকে সবচেয়ে বেশী ভাবিত করে। ততক্ষণ পর্যন্ত না এ ধরনের ভাবনা, 'কেন শিল্পবস্তু নির্মাণ করব' আর 'কি নিয়ে শিল্প হবে' এই দুই প্রশ্নের অনুগ ভাবনা হয়ে দাঁড়ায় ততক্ষণ শিল্পে নিজস্বতা প্রকাশ পায় না। শিল্পকর্ম পূর্বানুসৃতিতেই আবদ্ধ থাকে। শিল্পকর্মের সে-পর্যায়ে শিল্পবস্তু নির্মাণের দক্ষতাই শিল্পীর কৃতিত্ব বিচারের একমাত্র মান হিসাবে দেখা দেয়। কাঞ্চনের শিল্পীজীবনের প্রারম্ভেও এমন একটা পর্যায় স্বাভাবিকভাবেই ছিল। কিন্তু এরকম প্রারম্ভিক পর্যায়ে যখন অনেক ভবিষ্যৎশিল্পী প্রাপ্ত শৈলীর পরিমার্জন-পরিবর্ধন-সংযোজন-সংশোধন করে শিল্প-বস্তু নির্মাণ করেন প্রাপ্ত শৈলীর জনপ্রিয়তা, সম্মান, আলংকারিতা ইত্যাদির মোহে যতটা স্বকীয় ধ্যান-ধারণা প্রকাশের সহায়ক হিসাবে ঠিক ততটা নয়, তখন কাঞ্চন তাঁর প্রভাব-চয়ন করেছেন তাঁর আবেগ-অনুভূতি-অভিজ্ঞতা-ধ্যান-ধারণার প্রয়োজনের তাগিদে। কাঞ্চনের শিল্পকর্মের সে-প্রাথমিক পর্যায়ে যখন অন্যের উপস্থিতি সম্পূর্ণ অস্বীকৃত নয়, তখনও কিন্তু এটা বোঝা যেত যে তিনি আত্মপ্রকাশের প্রয়োজনেই অন্যের দ্বারস্থ। কাঞ্চনকে তাঁর স্বকীয় বাচনভঙ্গির জন্য বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি।

কাঞ্চন যে-ধরনের ছবি দিয়ে তাঁর নিজস্বতা সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা করলেন, সেগুলো সবই ছোট মাপের মিশ্র মাধ্যমে আঁকা। তেলরং দিয়ে জমি তৈরি করে, তার উপরে স্বচ্ছ কাগজ আঠা দিয়ে সেঁটে, জলরংয়ের কাজ করতেন। সেই কাগজের উপর প্রথম কাজের পর পরতে পরতে নানাভাবে কাটা বা ছেঁড়া স্বচ্ছ কাগজ জুড়তেন এবং প্রতি-স্তরে জলরং দিয়ে কিছু কিছু কাজ করতেন। স্বচ্ছ কাগজের স্তরের বা ভাঁজের নীচ থেকে রং, রেখা, আকার সম্বলিত রূপবন্ধ ও রূপকল্প অর্ধস্ফুট বা অর্ধউদ্ভাসিত হয়ে উঠতো, কি উঠতো না। কাগজের ভাঁজ ও কাটার দাগ ছবির জমির উপরে বুনটের নকশা তৈরী করত। এখনও কাঞ্চন মাঝে-মধ্যে এই মাধ্যমে কাজ করেন।

কাঞ্চনের এইসব মিশ্র মাধ্যমে আঁকা ছবিগুলিকে তাদের আপাতদৃষ্ট এবং আঙ্গিক বিষয়ের দিক থেকে দু ভাগে ভাগ করা যায়। এবং এ-দুটি ভাগ কাঞ্চনের শিল্প-কর্মের দুটি পর্যায়ের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর প্রথম দিকের ছবির বহিরঙ্গ বিষয় অধিকাংশ সময়ই হয় মধ্য দূরত্ব থেকে দেখা সম্পূর্ণাঙ্গ একলা মানুষ, না-হয় নিকট থেকে দেখা অসম্পূর্ণাঙ্গ মানুষ বা একক মানুষের অংশ। কখনও মানুষটির সঙ্গে একটি একক পশু কি পাখী আছে। কখনও বা তা নেই। কখনও মানুষটি সম্মুখচারী এবং স্থাণু। কখনও পার্শ্বচারী সক্রিয়তার ভঙ্গিতে হয়েও স্থাণু। অধিকাংশ সময়েই দেখা যায় কাঞ্চনের এই ধরনের ছবিতে ছবির চরিত্র-গুলির কোন পরিবেশ নেই; মানুষজনদের কোন সামাজিক বা শ্রেণীচরিত্র নেই। ছবিতে নেই কোন প্রাকৃতিক বা সামাজিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠাকারী রূপবন্ধনের সমাহার, নেই কোন প্রেক্ষাপট। ছবির মানুষরা যেন পরিবেশহীন, পরিচয়হীন এক একটি নিরবলম্ব একক মানুষ। এই সব বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতন একক মানুষরা যখন একটি একক পশু বা পাখীর সম্মুখীন হয় তখন সম্পর্কের সমস্যা নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়। অনুরাগ, বিরাগ, আকর্ষণ, বিকর্ষণ, ঘৃণা, ভালবাসা কোন আবেগেই এই একক মানুষরা মথিত হয় না, কারণ এ-সবই

শিল্পী অশোক ভৌমিক

পারস্পরিক সম্পর্কজনিত আবেগ। সম্পর্ক-হীন এসব মানুষদের কাছে সম্পর্ক ব্যাপার-টাই সমস্যামূলক। কিন্তু, কাঞ্চন কি সত্যি সত্যিই এ ধরনের একজিস্ট্যানসিয়ালিস্ট? না এই ভারতবর্ষের একজন মধ্যবিত্ত বাঙালীর পক্ষে এমন একজিস্ট্যানসিয়ালিস্ট হওয়া সম্ভব?

একই মাধ্যমে কাঞ্চন অনেক ধরনের ছবি এঁকেছেন, যে সব ছবির কেন্দ্রবিন্দুতে সেই একক মানুষ থাকলেও, তার একটা পরিবেশ আছে, আছে প্রেক্ষাপট আর সেই পরিবেশে আছে তার সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু কিছু বস্তুর রূপবন্ধ। এ-সব ছবিতেও অবশ্য ছবির মানুষগুলোর দেশ-কাল সমাজ-শ্রেণীগত পরিচয় সরাসরি সে-সব মানুষের রূপবন্ধ থেকে পাওয়া যায় না। তবু পরি-বেশস্থিত বস্তুসম্ভারের রূপবন্ধ থেকে মানুষদের সমাজ-শ্রেণীগত পরিচয় খানিকটা পাওয়া যায়। কিন্তু সেটা ছবির অভিজ্ঞতার দিক থেকে জরুরী নয়। এখানে একটু বিশদভাবে বলা দরকার কাঞ্চন তাঁর ছবির নায়কদের জন্য কি ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি করেন। অধিকাংশ সময়েই কাঞ্চনের ছবির এই একক চরিত্রদের দেখতে পাওয়া যায় অত্যন্ত সস্তাদরের সাদামাটা বিরল আসবাব-বিশিষ্ট তিন-দেওয়ালে আবদ্ধ আলো-বাতাসহীন রুদ্ধ সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠে। যে-ধরনের ঘরে কলকাতার শহরের বাণি-জ্যিক সংস্থায় চাকুরিরত অবিবাহিত বা একাকী কেরানীরা একা থাকে। যে-ঘরে সারাজীবন থাকার পরেও ঘরটা আপনার মনে হয় না, বাসা বা বাড়ি হয় না। এ-সব আপনার আসবাবপত্র বহুদিন ব্যবহার করার পরেও কখন আরামপ্রদ মনে হয় না। এ-ঘরে মৃত্যু হলেও কেউ খোঁজ নিতে আসে না; ঘরের আসবাবপত্র আর ছাদ থেকে ঝোলা বাতিই সেই মৃত্যুর সাক্ষী হয়ে থাকে। এ-ঘরে সব মৃত্যুই তিল তিল করে আত্মহত্যার সামিল।

কাঞ্চন সাধারণতঃ হয় ফ্লোর লেভেল এংগেল অফ ভিসান বা মেঝের কাছাকাছি দৃষ্টিতল থেকে, না-হয় সিলিং লেভেল এংগেল অফ ভিসান বা দেয়ালের উপরি-ভাগের দৃষ্টিতল থেকে ঘরটাকে দেখেন। ফলে, মেঝে আর ছাদ ছবির ভূমি-সমান্ত-রাল ফ্রেমের সঙ্গে সমান্তরাল না দেখিয়ে, দেখায় ডায়াগোনাল বা হেলানো। যদি কোন বস্তুকে স্বাভাবিক দৃষ্টিতল থেকে আঁকা হয়, মনে হবে সে বস্তু যেন নীচের ঢাল, ভূমি বেয়ে হুড়মুড় করে পড়ে যাবে। কাঞ্চনের ছবির চরিত্রদের শুধু নয়, যে-সব বস্তুর সঙ্গেই তাদের সম্পর্ক, সেই সব সম্পর্কের পায়ের নীচে যে শক্ত-মাটি নেই —সে ব্যাপারটা বিশুদ্ধ নান্দনিক উপায়ে বোঝানোর জন্যই কাঞ্চন দৃষ্টি-তল আর প্রেক্ষাপট নিয়ে এ-খেলাটা খেলেন। কিন্তু কাঞ্চনের পরিবেশহীন মানুষদের মতন পরিবেশ সহ নায়কদের সমস্যাও সামাজিক পরিবেশহীন মানুষের অস্তিত্বের সমস্যা; যে সমস্যার প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে

শিল্পী তিলক মন্ডল

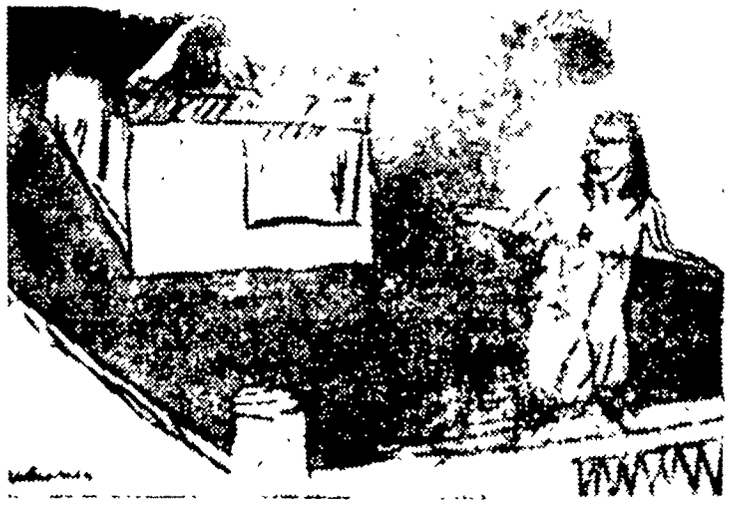

ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বন্দ্বের চেয়ে মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব বড়।

এক সময় মনে হত কাঞ্চন আধুনিক পাশ্চাত্য ফ্যাসান অনুগামী একজিস্ট্যান-সিয়ালিস্ট। কিন্তু, তিনি বোধ হয় তা নন। কাঞ্চনের এ ধরনের ছবির নায়করা কেউই প্রায় রক্ত-মাংসের মানুষ নয়। ঈষৎ অস্বচ্ছ টিস্যু পেপারের নীচে জলরঙে আঁকা এই সব মানুষদের কোন শারীরিক ওজন নেই, ঘনত্বও কম। এরা পুতুলের মতন। কাগজের মন্ডের বা কাপড়ের তৈরী পুতুল-নাচের পুতুলের শরীরের উপর যে-রকম ভাঁজের খাঁজ-খোঁচ দেখা যায় এদের শরীরের উপরেও সে-রকম ভাঁজ টাজ খাঁজ-খোঁচ দেখা যায় (কাটাছেঁড়া টিস্যু পেপার সাঁটার ফলে এরকমটা হয়)। এদের মুখমন্ডলে আবেগের কোন অভি ব্যক্তি দেখা যায় না কোন একজিস্ট্যান সিয়ালিস্ট কারণে নয়, কারণ এরা সব পুতুলনাচের পুতুল। কাঞ্চনের এ ধরনের ছবির বিন্যাস এবং বিশেষ করে ছবিতে ফিগার-এর উপস্থাপনা অনিবার্যভাবে বক্স্ স্টেজ মঞ্চাভিনয়ের কথা মনে পড়ায়। ফিগার সাধারণতঃ সম্মুখপটে বা মধ্যপটে মধ্যক্ষেত্রে উপস্থাপিত হয়; উপরে আর দু-ধারে আনেকটা ফাঁকা জায়গা থাকে। ফিগার সবচেয়ে বেশী আলোকে ভাসিত হয় এবং এক একটি অংশে রোমাল লাইটে এক একটি রূপবন্ধ দেখা যায়। সামনে বসা দর্শকের কথা মনে রেখে এ পরিকল্পনা বিন্যস্ত হয়। স্টেজের তিন দিকে দেয়াল কল্পনা করা হয়। বক্স স্টেজের ফ্রেমের কথা মাথায় কাঞ্চন কখন কখন ছবির ফ্রেমের মধ্যে একটি চতুষ্কোনী ফ্রেমও তৈরী করে নেন। তাহলে, ছবিতে উপস্থাপিত পাত্র পাত্রী ছবিতে বর্ণিত ঘটনা সবই পুতুল নাচের মতন, মঞ্চাভিনয়ের মতন—এ কথাই কি কাঞ্চন বলতে চান? অথচ কাঞ্চনের ছবির পাত্র-পাত্রী পুতুলের মতন হলেও ঠিক পুতুল নয়, মঞ্চটাও ঠিক মঞ্চ নয়। এ-যেন পুতুলের মতন মানুষ মঞ্চের মতন সংসার।

শহুরে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী মানুষই যে কাঞ্চনের বিদ্রূপ ও করুণা, ঘৃণা ও সহানুভূতির পাত্র, তার নিজেকে নিয়ে অভিনয়ই যে কাঞ্চনের ছবির মোদ্দা বিষয় তা ভালোভাবে বোঝা যায় তাঁর ১৯৭৬-৭৭-এ আঁকা তেলরঙের ছবি থেকে। এ-ছবির নায়কেরা সব সার্কাসের ক্লাউন। তারা সার্কাসের তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে শহরের পথে-ঘাটে পার্কে বসবাস ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের সব দর্শকরা ফেটে ফেটে থাকে, কিন্তু দলে থেকেও প্রত্যেকে একা, কারো সঙ্গে কারো আবেগের সম্পর্ক নেই। তারা সবাই সিঁড়ি বেয়ে উঠতে ভালবাসে। বাড়ির ছাদে টেলিভিশনের এন্টেনা লাগাতে চায়। গাড়ির উপরে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে হাওয়াকে দেখতে চায় যে তেলাপোকার মতন গাড়ি তাদের আছে। অবশ্য নিজে ছবি কাঞ্চন এর আগেও এঁকেছেন। সার্কাসের ক্লাউন এ-যুগের মানুষদের কাছেই খুবই প্রিয় মোটিফ। চার্লি চ্যাপলিন, পাবলো পিকাসো, জর্জ রুয়ো সবাই ফুর্তির বিভিন্ন রূপটিকে দেখবেন ক্লাউন যাদের আনন্দের জন্য ক্লাউন সেজে তাদের মধ্যে। দেখেছেন এদের গভীর দুঃখক্ষয়ী যন্ত্রণা কি করে আনন্দ যোগায়। কাঞ্চনের ক্লাউন এদের সবটির থেকে আলাদা। কাঞ্চনের ক্লাউন আমাদের সম্বন্ধে সহানুভূতি দাবী করে না, কারণ কাঞ্চনের ক্লাউনরা যুগের ক্লাউন এরা পুতুল-নাচের পুতুল। বোধহয় এই পুতুল বলেই ক্লাউন কোন প্রদর্শন করে—তা মানুষই হোক বা নৈর্ব্যক্তিক কিছুই হোক —দল থেকে সরে এসে একা একা নাচায়। তাঁর একক নাচের টানা টানা নাচে। তার যে অন্য অর্থ আছে, প্রমাণ হেঁয়ালি নাচে, ভাঁড়ামি করে সে-সবের তার সাধারণতঃ সাচ্চেন নয়। অথচ ছবিতেই পার্শ্বপুরুষরা, যাদের ছবি তাঁর একাকার বসে অথবা যাদের মাঝে বসে তারা সবাই মানুষ ছিলেন এই উভয় পক্ষ সে-সব মানুষের ছবি উঠে গেছে, অবশ্য হয়েছে [illegible]। মূর্তিতে কাঁচের মূর্তি [illegible]। ক্লাউন পাত্রটি [illegible] মানুষ হয়ে [illegible]

১৯৭৫, ৭৬, ৭৭ সালে [illegible]

রঙের ছবিতেই দেখা গিয়েছিল কাঞ্চন মোটরগাড়ি, টি-ভি এনটেনা ইত্যাদিকে এ্যাসপিরেশন-সিম্বল বা আকাঙ্ক্ষা-প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করছেন। রাস্তার দিক-নির্দেশক চিহ্নগুলিকে নৈর্ব্যক্তিক আদেশ-প্রতীক হিসাবে ব্যবহারও করেছেন ঐ পর্বে। সাম্প্রতিক ছবিতে তাঁকে সাধারণ আসবাবপত্রকে প্রতীকে পরিণত করতে দেখা যাচ্ছে। এ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এর গত বাৎসরিক প্রদর্শনীতে কাঞ্চনের একটি ছবি ছিল। ছবিটি দুটি ভাগে বিভক্ত। বাঁ-দিকে একটি অতিরিক্ত আলোকোদ্ভাসিত তিন দেয়ালে আবদ্ধ ঘরে একটি সাধারণ কাঠের হাতলওয়ালা চেয়ার দেখা যাচ্ছে আর ডান দিকে তেমনই একটি তিন-দেয়ালে আবদ্ধ অন্ধকার প্রকোষ্ঠে একটি সাধারণ কাঠের হাতলওয়ালা চেয়ার দেখা যাচ্ছে। দুটি ঘরই অস্বাভাবিকভাবে শূন্য। চেয়ার দুটিও শূন্য। চেয়ার দুটি যে রঙে আঁকা তাদের পরিবেশও সেই রঙেরই বর্ণান্তরে বা সম্পূরক কোন নিকট বর্ণে আঁকা। তার চেয়েও যা লক্ষ্যণীয় তা হল, চেয়ার দুটি কোন ছায়া ফেলে না; চেয়ার দুটির শরীরে আলোছায়া খেলে না। ফলে চেয়ার দুটি ঘনত্ব আর ওজন হারিয়ে ভৌতিক বা অলীক চেয়ারে পরিণত হয়। অলীক চেয়ার ভৌতিক উপবেশনকারীর জন্য জন-শূন্য ঘরে বিরাজ করে। এ-সেই চেয়ার যাকে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী পেতে চায়। অন্ধকারে যেমন আলোতেও তেমনই এ-চেয়ার অলীক, ভৌতিক।

কাঞ্চনের ছবির সাংকেতিকতা অধিকাংশ সময়েই যত্ত বক্তব্যভারাক্রান্ত ও বুদ্ধি-নির্ভর ঠিক ততটা দৃষ্টিবোধগম্য নয়। অথচ ছবিতে সেটা হওয়া একান্ত দরকার। দ্বিতীয়তঃ, কাঞ্চনের ছবির বক্তব্য অনেক সময় এ্যামবিগুইটির (ambiguity) উপর নির্ভরশীল, যেমন মানুষটি রক্তমাংসের মানুষ না পুতুল-নাচের পুতুল, ক্যাউনটি মানুষ না পুতুল ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ এই এ্যামবিগুইটি দৃশ্যতঃ যতটা প্রতিষ্ঠা পাওয়া দরকার ততটা প্রতিষ্ঠা পায় না, মনে হয় তাঁর নিজের এ-সম্বন্ধে কনফিউশন আছে।

অশোক ভৌমিক

অশোক ভৌমিকের জন্ম ১৯৫৩ সালের দেশবিভাগোত্তর পশ্চিম বাংলায়। ১৯৭৫-এ কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ থেকে শিক্ষা সমাপন করে এমন একটা সাধারণ চাকরির চেষ্টায় ঘোরাফেরা করছেন, যে চাকরি করে তিনি খাওয়া-পরার সংস্থান করতে পার-বেন, ছবি আঁকার সরঞ্জাম কিনতে পারবেন এবং ছবি আঁকার সময় পাবেন। এদেশে যখন শুধু ছবি এঁকে, তা বিক্রী করে, বিক্রয়লব্ধ অর্থে কায়ক্লেশে বেঁচে থাকার কথা মাঝে স্বপ্নেও ভাবা যায় না, তখন শিল্পীর পক্ষে এমন চাকরি দরকার যে চাকরি করে ছবি আঁকা বা মূর্তি গড়ার কাজে দেবার মতন যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়।

ছাত্রাবস্থায় আর্ট কলেজের প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত ছবির কথা বলছি না, ছাত্রত্ব ঘোচার পরে অশোক যে ধরনের ছবি নিয়ে জনসমক্ষে প্রথম আত্মপ্রকাশ করলেন তার মধ্যে শিক্ষানবীশসুলভ কোন অপরিণত-মনস্কতা ছিল না। সেসব ছবিতে কোন গুরুমুখী প্রবণতা ছিল না। তার কাজের নিশ্চিত আত্মপ্রত্যয় থেকে মনে হয়েছিল এই তরুণশিল্পী একটি নিজস্ব বক্তব্য নিয়েই শিল্পক্ষেত্রে এসেছেন। অশোকের সেসব ছবিতে ছিল বাদামী আর কালোর প্রাবল্য। বাদামী আর কালো রঙের নানান টোনে ছবি আঁকতেন। সেসব ছবিতে কোন প্রেক্ষিত এবং প্রেক্ষাপট থাকত না। ছবির জমি হত ফ্ল্যাট। কিন্তু ঐ ফ্ল্যাট দ্বিমাত্রিক চিত্রক্ষেত্রে যে আক্ষরিকমাত্রিক রূপ-বন্ধ চিত্রিত হত তা কিন্তু ফ্ল্যাট দ্বিমাত্রিক হত না। কালো বা বাদামী রঙের বর্ণপুঞ্জের এবং বর্ণান্তরের দ্বারা সেসব রূপবন্ধের শরীর নির্মিত হবার দরুণ রূপবন্ধকে ঘনশরীর বিশিষ্ট বলে মনে হত। তাদের ওজন থাকত। সাধারণত একটি ছবিতে অধিকাংশ চিত্রক্ষেত্র জুড়ে এমনই ঘনশরীর বিশিষ্ট রূপবন্ধ বিরাজ করত। রূপবন্ধগুলি রঙের পুঞ্জের এবং বর্ণান্তরের সাহায্যেই নির্মিত হত, কোন সীমাসংজ্ঞা নির্ধারক রেখা তাদের আকার নির্ধারণ করত না, কোন কন্টারলাইন তার ঘনত্ব জ্ঞাপন করত না। অশোকের এ পর্বের ছবির রূপবন্ধ কোন জাগতিক বস্তুর প্রতিনিধিত্ব করত না। অথচ, রূপবন্ধ কোনক্রমেই বিমূর্ত বা এ্যাবস্ট্রাক্ট নয়। আকৃতি ও প্রকৃতির দিক থেকে এই সব রূপবন্ধ জীবধর্মী। তারা নির্দিষ্ট কোন প্রাণী বা জীবের প্রতিনিধিত্ব না করলেও জীবনসম্পন্ন বা প্রাণসম্পন্ন কোন এবং সবকিছুরই প্রতিনিধিত্ব করে। অর্থাৎ তারা জৈবধর্মের বা মূল প্রাণবস্তুর প্রতীক। কখনও তারা পরিবেশহীন, প্রেক্ষা-পটহীন চিত্রক্ষেত্রের উপর নিরবলম্ব হয়ে অবস্থান করে। কখনও বা একই রকম চিত্র-ক্ষেত্রে ত্রিশংকুর মতন ঝুলে থাকে। কখন আবার অশোক ঐ ফ্ল্যাট চিত্রক্ষেত্রকে একটি আনুভূমিক রেখা টেনে বা দুটি আনু-ভূমিক রঙের ক্ষেত্র দিয়ে দুটি চিত্রতলে পরিণত করতেন, তখন ফ্ল্যাট চিত্রক্ষেত্র ত্রিমাত্রিকতা লাভ করত এবং রূপবন্ধ একটি প্রেক্ষিত পেত। অশোক তাঁর চিত্রস্থ রূপকল্পের চারপাশে বর্ণান্তরের এমন একটা মণ্ডল তৈরি করতেন যেটাকে রূপকল্পের মধ্যস্থ পুঞ্জেরই সম্প্রসারণ বলে মনে হত। মনে হত রূপ-কল্পের আকারের বহির্বিভাগীয় ক্ষেত্র যেন রূপকল্পেরই সম্প্রসারিত অংশ কি না। এক দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকালে মনে হত ঐ জৈবিক রূপকল্প যেন প্রতিটি নিঃশ্বাস গ্রহণের সঙ্গে স্ফীত হয় অনেকখানি শূন্য-ক্ষেত্রকে ভরে তুলছে আর প্রতিটি প্রশ্বাস ত্যাগের সঙ্গে নিজের মধ্যে সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ত্যাগের ঐই মৌল জৈবিক পরিব্যাপ্ত অনুভব দৃষ্টিগ্রাহ্য হবার সঙ্গে জৈবিক রূপকল্প অতিরিক্ত অর্থে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতো। অসীম অন্ধকার ব্যাপ্তমণ্ডলে জীবের জীবনধারণ মানে যে একটা বৃহৎ নিঃসঙ্গ সংগ্রাম তাই বোধহয় সংকেতে ইঙ্গিতে প্রতীক অনুভবাসিদ্ধ করতে চাইতেন সে সময়ের অশোক। আর সেটা বোধহয় ছিল নিঃসঙ্গ মানুষের জীবনধারণ সংগ্রামেরই এ্যালেগোরি।

দু-তিন বছরে অশোকের ছবি বদলেছে, অশোক বদলিয়েছেন। কিন্তু এ পরিবর্তনটা মৌলিক নয়। পরিবর্তনটা ক্রমিক, পূর্বানুসরণ সম্পর্কিত। যেমনটা হওয়া স্বাভাবিক। এখন অশোকের প্রতিটি ছবির একটি নৈসর্গিক পরিবেশ থাকে, সেটি অবশ্য কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিবেশ নয়। অধিকাংশ সময়েই দৃশ্যটা একটা বিরল প্রান্তরের। স্বাভাবিক দৃষ্টিতলের চেয়ে একটু নীচু থেকে দৃশ্যটা দেখা হয়, ফলে প্রান্তরেখা থাকে ছবির মধ্যভাগে বা তারও উপরে, সম্মুখ ও মধ্য-পটে সমতলভূমি প্রাধান্য পায়। তারপরে থাকে মেঘহীন মহাশূন্য। ভূমি কখনও উপলপূর্ণ, প্রস্তরময়, কখনও বা উষর সমতল। এই সমতলভূমি অনিয়মিতভাবে অসংখ্য অন্ধকার গহ্বরপূর্ণ। এই কালো অন্ধকার গহ্বরগুলি যে অশোকের ছবিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, সেটা তাদের উপস্থাপনা থেকে বোঝা যায়। এই গহ্বরগুলি ছবির সমগ্রটার মতন দ্বিমাত্রিক প্রেক্ষিতের নিয়মানুসারে অঙ্কিত না হয়ে দ্বিমাত্রিক চিত্রক্ষেত্রে ফ্ল্যাট রঙের পুঞ্জ হিসাবে উপস্থাপিত হয়। অর্থাৎ ভিন্ন ধরনের উপস্থাপনার গুরুত্ব এদের উপর আরোপিত হয়। এহেন পরিবেশে মধ্যদূরত্ব থেকে দর্শক কিছু জীবকে বিচরণ করতে দেখে। এসব জীবের অধিকাংশই বিবরবাসী বা কোটরবাসী। এদের মধ্যে সাপ, কেঁচো, কেন্নো, টিকটিকি গিরগিটি, গোসাপের মতন মাটির নীচে বাস করা সরীসৃপ জাতীয় জীব যেমন আছে, তেমনই আছে গাছের কোটরে বাস করা গরবে পোকা, ঘুনপোকা, সুয়ো-পোকা ইত্যাদি, ব্যাঙও আছে। এদেরকে আমরা সাধারণত একক ভাবে দেখি। যুথবদ্ধ-ভাবে যেসব জীবকে দেখি, যেমন পিপড়ে, মৌমাছি, পাখী—তারা লক্ষ্যণীয়ভাবে অশোকের ছবিতে অনুপস্থিত। আর আছে টিকটিকি, গিরগিটি, বা সাপের মতন দেখতে মানুষ। বাঘও দেখা গেছে এক আধবার। এদের বিশেষত্ব হল এদের মেটামরফিক রূপ। কেঁচো, কেন্নো, সাপ, টিকটিকি, গিরগিটি, সুঁয়ো পোকা, গরবে পোকা, ঘুনপোকা, ব্যাঙ, মানুষ ঠিক কেঁচো, কেন্নো সাপ, টিকটিকি, গিরগিটি, সুঁয়োপোকা, গরবে-পোকা, ঘুনপোকা, ব্যাঙ বা মানুষের মতন দেখতে নয়। এক জীব আরেক জীবের মতন দেখতে। অশোকের কোন একটি ছবিতে সাধারণ এক জাতের দুটি জীব দেখা যায় না। অর্থাৎ প্রত্যেক জীবই ছবিতে নিঃসঙ্গ। যদি কোন ছবিতে একাধিক একই জাতের জীব দেখা যায়, তাহলে দেখা যায় তারা যেন পরস্পরের প্রতি সন্দিগ্ধ-চিত্ত, পরস্পরের গোপন উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান, প্রত্যেকেই সন্ত্রস্ত ও সজাগ।

ছবিতে উপস্থিত শুধু একই জাতের দুটি নিঃসঙ্গ জীবের মধ্যে এ ধরনের পারস্পরিক সম্পর্ক দেখা যায় যে তা নয়, ছবিতে যখনই দুটি বা ততোধিক জীবকে একসঙ্গে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়, তখনই দেখা যায় সে তারা প্রত্যেকেই আত্মরক্ষার্থে সন্ত্রস্ত—আক্রমণোদ্যত বা পলায়নোদ্যত। এমন কি যখন একটি ছবিতে একেবারে একা নিঃসঙ্গ একটি জীবকে দেখা যায় তখনও মনে হয় যেন জীবটি যেন অনাত্মীয় নৈসর্গিক পরিবেশে, অগোচর কোণ থেকে অকস্মাৎ অজানা আততায়ীর আক্রমণের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত, পাবলে যেন সে এক্ষুনি তার বিবরের বা কোটরের নিশ্চিত অন্ধকারের আশ্রয়ে ফিরে যাবে। অশোকের ছবির জীবদের শরীরের সবচেয়ে অভিব্যক্তিপূর্ণ অংশ তাদের চোখ। অথচ অশোকের তুলে আছে মাত্র দু ধরনের চোখ। এক ধরনের চোখ যাকে ইংরিজিতে বলে গগল আই—বিস্ময় বিস্ফারিত বা আতঙ্কগ্রস্থ নির্নিমেষ চোখ, অবয়বের তুলনায় প্রকাণ্ড বড়।—আর আছে অন্ধকার গহ্বরের মতন খোলা অন্ধ চোখ। এ-চোখ যেন ভিতর দিকে দেখে। এ সেই চোখ যে চোখ অন্ধকারে দেখে। এ চোখের অধিকারী জ্ঞানী, আর তাই সন্ত্রস্ত নয়। মৃত্যুকে সে অনিবার্য জ্ঞানে বলে আক্রমণ পলায়ন সবই তার কাছে অর্থহীন। খণ্ডের ক্ষেত্রে অশোকের ছবিতে যে সবজ্ঞ আর কালের প্রাধান্য দেখা যায় তার সঙ্গে সরাসরি যোগ মাটির আর অন্ধকারের।

অশোকের ছবির নৈসর্গিক পটভূমিতে যে আনুভূমিক সমান্তরালতার প্রাধান্য ছিল সম্প্রতি তা বিপর্যস্ত। সেই আনুভূমিক সমান্তরালতা ছিন্ন করে কিছু আলম্বিত বস্তুকে দেখতে পাচ্ছি। মনুষ্য নির্মিত বস্তু যা এতাবৎকাল পর্যন্ত অশোকের ছবিতে অনুপস্থিত ছিল, তাও কিছু কিছু দেখতে পাচ্ছি তাঁর ইদানিংকার ছবিতে (যেমন কিছু ঘরবাড়ির অংশ। কিন্তু অশোকের শিল্পকর্মে এদের ভূমিকা এখনও স্পষ্ট নয়।

অশোকের ছবি বক্তব্যধর্মী। সে বক্তব্য রূপকাবে উপস্থিত করেন। রূপসৃষ্টির প্রধান উপায় হিসাবে তিনি তাঁর রূপকল্প-গুলিকে ব্যবহার করেন। ওঁর রূপকল্প মেটাফরিক্যাল। রূপবন্ধ বা রূপকল্পই যখন তাঁর ছবির অন্যতম মূল অবলম্বন তখন প্রধান রূপকল্প গঠনবিধি সম্পর্কে তাঁর [illegible] থেকে যতটা অবধান আশা করা উচিত এখন পর্যন্ত ঠিক ততটা পাওয়া যায় না। যেমন মনুষ্য মূর্তি রূপায়ণ সম্পর্কে এখনও তিনি একটি একনিষ্ঠ ধারণাও উপনীত হননি। অবশ্য একথাও স্বীকার্য যে তাঁর ছবি থেকে বোঝা যায় তিনি এ বিষয়ে সচেতন এবং সচেষ্ট। স্থিতীয়ত রূপবন্ধ বা মোটিফকে রূপকল্প বা ইমেজে পরিণত করতে হলে তাকে সমগ্র ছবির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে স্বেডাবে ট্রান্সফর্ম করতে হয় তাতে বিশ্বাসযোগ্যতা একটা ভূমিকা গ্রহণ করে। অনেক সময়ে ট্রান্সফরমেশনের কালে বিশ্বাসযোগ্যতার সর্ত অশোক পালন করেন না। অশোকের ছবির প্রেক্ষিত ত্রিমাত্রিক। কিন্তু সেই ছবিতে যখন তিনি ত্রিমাত্রিক উপর গর্ত আঁকেন তখন তা দেখায় দ্বিমাত্রিক চিত্রক্ষেত্রে ফ্ল্যাট বর্তুলের গোলচে আকার পদ্মের মতন। তাতে ইমেজ ব্যাহত হয়। এটা তিনি করেন নৈবয়াক্তিক ক্ল্যাসিক্যাল কম্পোজিশনের সূত্র মেনে ব্যালেনসড ডিজাইন করার জন্য। এটাই অশোকের প্রধান দুর্বলতা। একটি ছবিকে দ্বিমাত্রিক চিত্র-ক্ষেত্রে সন্নিবিষ্ট বর্ণপুঞ্জের, বর্ণমূল্যের, রেখার, আকারের সমাহারের ব্যালেনসড ডিজাইন হতে হবে এবং সে ভারসাম্যের জন্য সিমেট্রিক্যালিটির বা সামানুপাতের তত্ত্বকে অগ্রাধিকার দিতে হবে—এবংবিধ ক্ল্যাসিক্যাল ধারণাটি বোধহয় একদা আর্ট স্কুলের ভাল ছাত্র অশোকের ভাবনায় গেঁড়ে বসে আছে। অশোকের ছবির বক্তব্য এবং অভিব্যক্তির পক্ষে এ ধারণা ক্ষতিকর।

তিলক মণ্ডল

তিলক স্বাধীন ভারতের সমবয়স্ক। কলকাতার সরকারী চারু ও কারু কলা মহাবিদ্যালয় থেকে শিক্ষা সমাপন করেছেন ভারতীয় রাষ্ট্রের জীবনে প্রবর্তী অবস্থার শাসন নিগড় কায়েম হবার বছরে।

অশোকের মতন তিলকও জনসমক্ষে প্রথম আবির্ভাবেই সম্প্রতিভ স্বকীয়তার সাক্ষ্য রেখেছিলেন। কোন ধার করা বৈভব দিয়ে দৈনা ঢাকার চেষ্টা করে দ্বিধাজড় পদ-ক্ষেপে তিনি আত্মপ্রকাশ করেননি। তাঁর সেদিনের দুর্দম পদক্ষেপে হয়তো সুশীল চারুশীলতা ছিল না, ছিল আবেগের প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি।

রঙ তিলকের তূণের ব্রহ্মাস্ত্র। কিন্তু তিলকের রঙ প্রাতিস্বিক নয়। অর্থাৎ জাগতিক বস্তুর স্বাভাবিক রঙ তিলককে তাঁর বর্ণচয়নে, বর্ণবিতরণে বা বর্ণলেপনে প্রভাবিত করে না। একসূত্র বা এক উৎস থেকে আসা আলোর উপরে তার বর্ণের উষ্ণলতা-অনুষ্ণলতা, স্বচ্ছতা-অনচ্ছতা নির্ভরশীল নয়। বর্ণ ও বর্ণান্তর (টোন) অর্থাৎ বর্ণের উপর আলো-ছায়ার প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে তিনি জাগতিক-বস্তুর প্রতি-নিধিমূলক রূপবন্ধের ঘনত্ব এবং ওজনকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করেন না। তবু, তিলকের ছবির শরীর গঠনে বর্ণচয়ন, বর্ণবিতরণ এবং বর্ণ-লেপন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায় তিলকের ছবিতে রঙ কি ভূমিকা পালন করে এবং কিভাবে? এ প্রশ্নটা নিয়ে একটু ভাবা যাক।

ছাত্রত্ব ঘোচার পরে তিলক প্রথমে যে-ধরনের ছবি এঁকেছিলেন এবং যে-ধরনের ছবি নিয়ে জনসমক্ষে উপস্থিত হয়েছিলেন আপাতঃদৃষ্টিতে তার বিষয় ছিল প্রশস্ত কক্ষের নিভৃতে স্ত্রী-পুরুষের নাটক। নাটকের পত্র-পাত্রীর মাথায় প্রায়শই এক ধরনের শিরোভূষণ দেখা যেত, যেটাকে কখনও মুকুট কখনবা ক্লাউনের মাথার টুপি বলে মনে হত। শিরোভূষণের সাহায্যে পাত্র-পাত্রীর পরিচয় সম্পর্কে তিলক একধরনের এ্যামবিগুইটি তৈরী করতেন। আপন কক্ষের নিভৃতে সব স্বাধিকার প্রমত্ত নরনারীই নিজেদের রাজা-রানী বলে কল্পনা করতে ভালবাসেন। এ-ভাবনা বোধহয় সব পরাজিত

২০%থেকে৫০%পর্যন্ত ডিসকাউন্ট
নতুন মালে
নীরা স্টোর্স থেকে কোন জিনিষ কিনলে অতিরিক্ত ২% বোনাস ডিসকাউন্ট পাবেন, কাটিং সাথে আনলে আগস্ট পর্যন্ত
পুরুষদের—কারবনাইজড শার্ট (২ মিটার পিস) ৩৪ টাঃ, টেরিকটন শার্ট (২ মিটার পিস) টাঃ; ২১ ও ২৯। বিনি টেরিকট প্যান্ট পিস টাঃ ৩২-৭০, কটন ফুল প্যান্ট পিস টাঃ ১০-৫০, কটন শার্ট পিস ১৬ টাঃ, টেরিকটন শার্ট ১৫-৯০, টেরিকটন ফুল প্যান্ট টাঃ ২৫ ও ৩৫, কটন ফুল প্যান্ট টাঃ ১০-৫০, কটন শার্ট টাঃ ১০-৯০, ২ মিটার ৮০×২০ টেরিকটন শার্ট পিস ২৭ টাঃ। নাইলন গেঞ্জি ৩৩ টাঃ। মহিলাদের—উলি শাড়ি ৪৪ টাঃ, পিওর সিল্ক ৭৫ টাঃ, কাশ্মিরী সিল্ক ৩৫ টাঃ, পিওর গাজী টাঃ ৮৫-২৫, অবগেঞ্জা ৩১ টাঃ, তাঁত শাড়ি টাঃ ১৪-৫০, মিলের ছাপা শাড়ি টাঃ ১৮-৭৫, বুমিয়া ভয়েল ৩৫ টাঃ। বালকদের—টেরিকটন প্যান্ট ৮-৫০, টেরিকটন শার্ট ১২-৫০ টাকা। এবং ২০% ছাড়ে প্লাস্টিক, নাইলন, বেনকোট ও ছাতা, এছাড়া ৬৪% ছাড়ে ডাকব্যাক বেনকোট। পুরুষদের চামড়া হ্যান্ডেলের ছাতা—টাঃ ১৫-৭৫, পুরুষ ও মহিলাদের ফোল্ডিং ছাতা (ইমপোর্টেড ফ্রেম)—টাঃ ৩৩ ও ৩৭ এবং ৩০% ছাড়ে পাবেন শীতকালীন সোয়েটার, শাল, পুরুষ ও মহিলাদের কোট এবং কম্বল ইত্যাদি। প্রতিটি নিটও তদুর্ধ্বে।
নীরা নীরা স্টোর্স
১এ, চৌরঙ্গি রোড, কলি-১৩ ১৮৪, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলি-১৩।
প্রতি শনিবার ও রবিবার খোলা রাত ৮-৩০ মিঃ পর্যন্ত

মানুষেরই গোপন বিলাস। এই বিলাসী-ভাবনা যেমন হাস্যকর তেমনই ট্র্যাজিক। এই ভাবনা যদি প্রকাশ পায় তবে শুধু অন্যের কাছে নয়, নিজের কাছেও নিজেকে ক্লাউন বলে মনে হবে। এমন কোন ইঙ্গিতই বোধহয় ক্লাউন-রাজা ক্লাউন-রানীর রূপকল্পে দৃশ্যায়িত করতে চেয়েছিলেন তিলক। কিন্তু এঁদের নিভৃত নাটকের চরিত্রটি কি, এঁদের পারস্পরিক সম্পর্কই বা কি? এঁরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করে, চুম্বন করে। কিন্তু সে আলিঙ্গনে যেন নেই প্রেম, প্রীতি, স্নেহের স্পর্শ। চুম্বনে নেই আবেগ কমিউনিকেট করার আকুতি। আলিঙ্গন, চুম্বন সবই যেন নারী-পুরুষের জৈব-তাড়নাকে শরীর থেকে নিষ্ক্রান্ত করার উপায় মাত্র। আলিঙ্গন বা চুম্বনের পার্টনার প্রক্রিয়ার সহায়ক মাত্র। তার প্রতি স্নেহ, প্রেম, প্রীতির অনুভূতি সম্ভব নয়। বরঞ্চ অবাঞ্ছিত সহায়ক হিসাবে সে-ঘৃণার পাত্র বা পাত্রী। তিলকের আলিঙ্গনাবদ্ধ পাত্র-পাত্রীকে দেখে মনে হয় তারা যেন মরণাশ্লিষ্ট বদ্ধ। চুম্বনরত রাজা-রানীকে মনে হয় তারা যেন পরস্পরের প্রতি আক্রমণোদ্যত।

পরাজিত নায়কের রাজা সাজার বা নায়িকার রানী হবার ভাঁড়ামো এবং বিলাসী প্রচেষ্টার ট্র্যাজিক অভিব্যক্তি, জৈব-তাড়না চালিত পুরুষ-নারীর তাড়না-, নিষ্ক্রান্ত হবার মর্মান্তিক প্রচেষ্টার অভিব্যক্তি, প্রেম-প্রীতি-স্নেহহীন পারস্পরিক নির্ভরতার ঘৃণ্য আকর্ষণের অভিব্যক্তি আত্ম-বিনাশী হিংসার অভিব্যক্তি ইত্যাদি প্রকাশের উপায় তিলকের চারটি। এক রূপবন্ধের বিশেষ করে যিগার্বের অতিচারী অবয়বিক ভঙ্গি। দুই, বর্ণপ্রয়োগ পদ্ধতি। তিন, বর্ণ-চয়ন এবং চার, বর্ণবিতরণ ও বর্ণবিন্যাস। চিত্রে উপস্থাপিত পাত্র পাত্রীর দেহ-ভঙ্গির মাধ্যমে আবেগ-অনুভূতিকে দৃশ্যায়িত করার জন্য আবয়বিক ভঙ্গিকে অতিরিক্তভাবে দেখান তিলক। শুধু তাই নয়, আবেগ-প্রকাশক দেহাংশের ভঙ্গিমাকে গুরুত্ব দিয়ে, দেহের অন্যান্য অংশকে নিষ্প্রভ করে দেখাবার বহুব্যবহৃত একসপ্রেশনিস্ট রীতিকে তিলক স্বচ্ছন্দে আত্মস্থ করেছেন। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ঘরের আসবাবপত্রের এমন কি দেয়ালেরও ভঙ্গিমা আছে, যেন তারা সজীব বস্তু। এও একসপ্রেশনিস্ট উত্তরাধিকার। কিন্তু রূপবন্ধের আবয়বিক ভঙ্গিমার চেয়েও যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল বর্ণ প্রয়োগ পদ্ধতি। তিলক আ লা-প্রিমা প্রথায় রঙ লাগান। কোন বর্ণচ্ছায়া (শেডিং) এবং বর্ণস্তর (টোনাল গ্রেডিং) করেন না। হাতের যে-ধরনের চালনা দিয়ে যে-ভাবে রঙ লাগান তাতে বর্ণপুঞ্জের শরীরে হস্ত-চালন ক্রিয়া দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। বর্ণপুঞ্জের আবয়বিক ভঙ্গিতে শিল্পীর সৃজনশীল ভঙ্গি শরীর পায়। সব উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়া-কর্মের পিছনে যেহেতু নির্দিষ্ট আবেগ-অনুভূতি কাজ করে, সেহেতু উদ্দেশ্যমূলক বর্ণ-লেপনের পিছনে যে-মানসিকতা কাজ করে, বর্ণ-লেপন পদ্ধতির মধ্যে তা ধরা পড়ে। অবশ্য বর্ণ-লেপন যদি সংস্কারিত না-হয়। তিলক এ-পর্বে মোটা থেকে সরু হয়ে আসা স্থূল টানে বর্ণলেপন করতেন। টানগুলি সাধারণত আভূমিক (হরাইজন্টাল) এবং তির্যক (ডায়াগোনাল) হত। টানগুলি পর-স্পরের সমান্তরাল হত এবং ক্যানভাসের বাইরে বেরিয়ে যাবার প্রবণতা থাকত। অর্থাৎ তিলকের বর্ণলেপন পদ্ধতি দুঃসাহসী আত্মপ্রত্যয়ী এ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় মানসিকতার ইঙ্গিত দিত। এদিকের আলোচনা থাক। তিলকের ছবির রূপবন্ধ পুঞ্জ সর্বস্ব। অর্থাৎ রূপবন্ধের কোন বেশামাত্র নেই। এবং আলো-ছায়া সেসব রূপবন্ধের অবয়বকে রূপ দেয় না। রূপবন্ধের আকার আয়তন বিশদ সবই শরীর পায় বর্ণপুঞ্জ লেপন ভঙ্গি মারফৎ। অর্থাৎ বর্ণ-পুঞ্জের ভঙ্গি রূপবন্ধের আবয়বিক ভঙ্গিকে দৃশ্যায়িত করে। তাহলে রূপবন্ধ যে অভি-ব্যক্তি প্রকাশ করে তা বর্ণপুঞ্জের ভঙ্গির উপর নির্ভরশীল, মানতে হয়। তিলক এ-পর্বে সাধারণতঃ নানা প্রকার উজ্জ্বল লালের আর বেগুনীর প্রাধান্যধর্মী কয়েকটি শেড দিয়ে ছবির পশ্চাদপদ তৈরী করতেন। দৃষ্টিকেন্দ্র বা ফোকাল পয়েন্টে তৈরী করা নাটকের মূল কেন্দ্রে অল্প জায়গা জুড়ে একটি অত্যন্ত সজীব বর্ণপুঞ্জ তৈরী করতেন উজ্জ্বল হলুদ অথবা শীতল নীলকে অন্তর্হেলে করে নিয়ে তার ফলে প্রাধান্যকারী শান্ত বিজন করে উজ্জ্বল উদ্দাম নাটকের অভিনয় ঘটত তিলকের ছবিতে। সমগ্র ব্যাপারটাই কেমন হাস্যকর করুণ আর অবাস্তব।

তিলক তাঁর সাম্প্রতিক ছবিতে সেই রাতের বন্ধঘর থেকে দিনের আলোয় বেরিয়ে এসেছেন। অবশ্য আলো বা অন্ধকার কোনটাই তাঁর ছবিতে আলো বা অন্ধকার হিসাবে আসে না। রঙের এবং শেডের উষ্ণ-শীতল উজ্জ্বল-আধার অনুভব মূল্য থেকে আসে। রঙের পারস্পরিক অবস্থান থেকে আসে। চিত্রক্ষেত্রে রঙের বিতরণ-পদ্ধতি থেকে আসে। ছবির পশ্চাদপটের অধিকাংশ স্থান জুড়ে থাকা রঙ হিসাবে এখন তিনি সাদা, অফ-হোয়াইট, উজ্জ্বল হলুদ ইত্যাদি অনেক বেশী ব্যবহার করেন। ছবিতে এখন অনেক বেশী চরিত্রের সমাহার দেখা যায়, পশু-পাখীও দেখা যায়। গাছ-পালা, বাড়ি-ঘর-দোর অনেক বেশী। এখন-কার ছবিরও দৃষ্টি-কেন্দ্র বা ফোকাল পয়েন্টে একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। সেটা মুরগীর লড়াইও হতে পারে, আহত পাগলা ঘোড়ার ভয়-চকিত বিভ্রান্ত দৌড় বা থমকে দাঁড়ানোও হতে পারে, আবার পাগল মানুষের কীর্তি-কলাপও হতে পারে। বেশীর ভাগ সময়েই ছবির দৃষ্টি-কেন্দ্রের এই মূল নাটকটি অভিনীত হয় একটি আবদ্ধ ক্ষেত্রে বা অঙ্গনে। প্রতিটি ক্ষেত্রে নাটকের মূল চরিত্রটি বা চরিত্র দুটি আহত, বিড়ম্বিত, ভীত, চকিত জীবের। এই সব চরিত্ররা তাদের বিড়ম্বনার অবসানের জন্য হঠাৎ মরীয়া হয়ে এমন একটা হিংসাত্মক আক্রমণাত্মক কর্মে রত হয় যা হয় আত্ম-বিনাশী, না হয় অধিকতর বিড়ম্বনাময়, আর তা না হলে হয় হাস্যকর। তিলক তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উপায়ে বর্ণপুঞ্জ শরীরের ভঙ্গি দিয়ে ঘটনা এবং ঘটনা-সম্পৃক্ত আবেগকে দৃশ্যমান করেন। এখন তাঁর বর্ণপ্রয়োগ পদ্ধতি একটু বদলেছে। আহত, বিড়ম্বিত, ভীত, চকিত পাত্র-পাত্রীর আত্মবিনাশী কর্মের অভিব্যক্তির ইঙ্গিত দৃশ্যায়িত করার জন্য চক্রাকারে তুলি চালনা করে দৃষ্টি-কেন্দ্রের নাট্যমঞ্চে রঙ লাগান। বর্ণপুঞ্জকে দেখার কেন্দ্রচক্র বিচ্ছুরণের মতন কেন্দ্রীয় নাট্যমঞ্চের বাইরে তিনি একদল লোককে দর্শকের মতন ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিন্যস্ত করেন। এই লোকেদের চোখে-মুখে, আবয়বিক ভঙ্গিতে হয় নির্বোধ কৌতূহল না হয় অশ্লীল বিভৎস ফূর্তির অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়। অচেতন, সহানুভূতিহীন দল-বদ্ধ মানুষ যে আত্মসচেতন ভিন্নমনস্ক ব্যক্তিমানুষের প্রতি কিরকম অশ্লীল এবং নিষ্ঠুর হতে পারে এবং সে-নিষ্ঠুরতার ফলে ভিন্নমনস্ক ব্যক্তিমানুষ কিরকম আত্ম-বিনাশী হয়ে উঠতে পারে—তার দলিল তিলকের সাম্প্রতিক ছবি। আত্মবিনাশী নিঃসঙ্গ জীব আর নির্মম যূথবদ্ধ জীবের বাইরেও তিলকের ছবিতে মাঝে মাঝে এক ধরনের শান্ত নিষ্ক্রিয় নিঃসঙ্গ মানুষদের দেখা যায়। তারা সর্বদর্শী জ্ঞানী মানুষ—যারা মরা এবং মরার প্রক্রিয়াকে অমোঘ জেনে বিষাদ-মগ্ন।

তিলকের বর্ণপ্রয়োগ পদ্ধতিতে বৈচিত্র্য বড় কম। মাঝে মাঝে মনোটোনাস বলে মনে হয়। বর্ণচয়নে দেশীয় আবহাওয়া, জলবায়ু, নিসর্গ-প্রকৃতি, বস্তুসম্ভারের রঙের প্রভাব বড় কম। তুলনায় বিদেশী ছবির, বিশেষ করে জর্মন একসপ্রেসনিস্টদের এবং ফরাসী ফোভিস্টদের ছবির, বর্ণচয়নের প্রভাব বেশী। তিলকের বড় দুর্বল জায়গা চিত্রক্ষেত্রের শূন্যক্ষেত্র নিয়ে। ওঁর ছবির শূন্যক্ষেত্র ছবির অন্যান্য অংশের তুলনায় নির্জীব। চিত্রস্থিত রূপবন্ধশূন্যক্ষেত্র ব্যবহার সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট ধারণা যতক্ষণ না ছবিতে প্রতিষ্ঠা পায় ছবি ততদিন অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

কাঞ্চন আর অশোকের ছবি এলেগোরিকাল। ওঁরা দুজনেই ভেবেচিন্তে এক একটা ন্যারেটিভ তৈরী করেন যে নেরেটিভের অভিঘাত তুলনীয় কোন জাগতিক ঘটনা বা অবস্থার সারাৎসারের মতন। এঁদের তৈরী এলেগোরি আসলে আমাদের জাগতিক ঘটনা বা অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করে। তিলকও এ্যালেগোরি তৈরীর জন্য ন্যারেটিভ তৈরী করেন, কিন্তু এ্যালেগোরি বা ন্যারেশান কোনটিই তাঁর মূল লক্ষ্য নয়। তুলনীয় জাগতিক ঘটনা বা অবস্থার ইঙ্গিত দেওয়াও তার উদ্দেশ্য নয়। ঐ ঘটনা বা অবস্থা যে আবেগ সৃষ্টি করে—দৃশ্যত সে আবেগ সঞ্চার করাই তিলকের সৃজনকর্মের লক্ষ্য। এঁরা তিনজনেই ভবিষ্যতে কি কাজ করেন তা সাগ্রহে লক্ষ্যণীয়।

বিজনকুমার ঘোষ

একুশ বছর বয়সে গল্প লেখা শুরু করেছেন বিজনকুমার ঘোষ। তারপর বিরাম-হীন ভাবে লিখে চলেছেন একটানা। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কখনও তাঁকে অর্থাৎ তাঁর গল্প নিয়ে হৈ-চৈ হয় নি। অবশ্য এ নিয়ে তাঁর কোন আক্ষেপও নেই। উদ্যমেও পড়ে না কখনও টান। তিনি লিখছেন এবং লিখে যাবেন। তাঁর নিজের কথায়, 'গল্প লেখাটা আমার কাছে কচ্ছপের কামড়ের মতো। পৃথিবীর একটি লোক-ও যদি আমার লেখা না পড়ে, তবু আমি লিখে যাবো।'

চাকরি করেন কাগজের অফিসে। নাইট সিফটে কাজ করে সকালে সবে বাড়ি ফিরেছেন, সেই সময় আমি হাজির। খাটের ওপর বাবু হয়ে বসেছিলেন। দেখে আমার খুশী যে ভালো লাগল। বাঙালী বাবু হয়ে এসেছে,—এ আর আজকাল বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না।

চল্লিশের ওপারের এই মানুষটি স্ত্রীর কাছে স্বামী, সন্তানের কাছে পিতা, সংসারের কাছে আদর্শ সংসারী। কিন্তু তাঁর সংসারের বাইরে যে বিরাট সংসার আছে,—সেখানে তিনি গল্পকার।

জানতে চেয়েছিলাম, কেন তিনি গল্প লেখেন।

উত্তরে বলেছিলেন, 'না লিখে থাকতে পারি না। এই জন্যেই লিখি। কেন পারি না, সেটা বলি। দেখুন প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে আমার বয়স বেড়ে চলেছে। ট্রামে-বাসে গিয়ে অফিস-কাছারিতে যেতে যেতে, কিংবা হাট-বাজারে, পথে ঘাটে আমি নানান কিছু দেখি। সব কিছুই হয়ত দেখা হয় না। যাই হোক, এইসব দেখার মধ্যে থেকে হঠাৎ হঠাৎ কোনো বিশেষ ঘটনা কি কোনো দৃশ্য আমার ভিতরে গেঁথে যায়। একটা প্রতিক্রিয়া হয়। এবং লক্ষ্য করে দেখেছি, এর থেকেই একটা ভাবনার ভ্রূণ হয়। সঙ্গে সঙ্গে, কি দু-এক বছর পর ঐ ভাবনাটি প্রকাশের পথ খোঁজে। যতক্ষণ না আমি ওগুলো প্রকাশ করছি। ততক্ষণ মুক্তি পাই না। এবং এই প্রকাশের মাধ্যমটি গল্প। এটা কিছুটা পারি। না লিখলে মানসিক স্বাস্থ্য খারাপ হয়।'

'—তাহলে মানসিক স্বাস্থ্য ঠিকঠাক রাখার জন্যেই লেখেন।'

'—নিশ্চয়ই।'

আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, যে বুদ্ধি দিয়ে আপনি গাড়ি-ঘোড়ার ভেতর দিয়ে রাস্তা পার হন, গল্প লেখার কি সেই বুদ্ধি প্রয়োগ করেন ?'

'হ্যাঁ।'

পরের প্রশ্ন করতে যাবো,—কিন্তু বিজনবাবু থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ বললাম বটে, তবে একটু ব্যাখ্যা করি। আপনার প্রশ্নটা একটু অদ্ভুত। যাই হোক, রাস্তা পার হওয়ার সময় আমি ট্রাম-বাস, লোকজন ইত্যাদির প্রতি নজর রাখি। কার-ও সঙ্গে কোন রকম সংঘর্ষ না ঘটিয়ে রাস্তা পার হতে যে বুদ্ধি, যে বিবেচনা শক্তির প্রয়োজন হয়, গল্প লিখতে তাই লাগে। এবং তার চেয়ে বেশী কিছুও লাগে।'

'—যেমন ?'

'গল্পের মধ্যেও তো আমি একটা উত্তরণ চাই। ভীড়াক্রান্ত রাস্তা পার হয়ে ওপারে পৌঁছনোর বুদ্ধির চেয়ে, গল্প লিখে পাঠকের কাছে পৌঁছতে যেটুকু বুদ্ধি বেশী লাগে, তা হল, প্রথমটি বাস্তবগত ব্যাপার এবং দ্বিতীয়টি শিল্পগত। কিন্তু কোনোক্রমেই বাস্তবকে বাদ দিয়ে নয়। তবে মোটামুটি কাঠামোটা এক।'

'আচ্ছা, গল্পকার হিসেবে আপনার চোখে ছোট গল্পের ভবিষ্যৎ কি ?'

আমার এই প্রশ্নে উত্তরে বিজনবাবু বললেন, 'দেখুন মানুষ গল্প শুনতে চায়। গল্প পড়তে চায়। তার কারণ গল্পের ভিতর দিয়ে সে নিজেকে দেখতে পায়। সুতরাং যতদিন মানুষ থাকবে, ততদিন ছোটগল্পের ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই আছে। এতে আর কোনো ভুল নেই।'

'—কিন্তু প্রকাশকদের রিপোর্ট তো গল্পের বই বিক্রী হয় না—'

'ব্যবসায়িক দিকটা হচ্ছে সামগ্রিক ব্যাপার।' বিজনবাবু বললেন, 'কিন্তু একথা তো ঠিক যে মানুষ গল্প চায়। চাইবেনই। গল্প থেকে মানুষের মুক্তি নেই। হয়ত লেখার বিষয় বদলাবে, ফর্ম বদলাবে—কিন্তু গল্প থাকবেই।'

'আপনি কি লিখতে চান ?'

'আমার কথা লিখতে চাই।'

'—অর্থাৎ ?'

'অর্থাৎ আমার অভিজ্ঞতার কথা। যা লিখতে গিয়ে অনিবার্য ভাবে আমার চার-পাশের মানুষের কথা চলে আসে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কতটা পেরেছেন ?'

স্পষ্ট গলায় বিজনবাবু উত্তর দিলেন —'সত্যি কথা বলতে কি কিছুই পারি না।'

'লিখছেন কিন্তু অনেক দিন,—না পারার কারণ কিছু ভেবেছেন ?'

ছোট্ট করে ঘাড় নেড়ে বিজনবাবু জানালেন, ভেবেছেন। সুযোগের অভাবটা তো আছেই। তবে উনি নিজের অক্ষমতার দিকটাই বড় করে দেখেন।'

এর পরের প্রশ্নে জানতে চেয়েছিলাম পরবর্তী কার গল্প ওঁর ভালো লাগে। উনি, অভ্র রায়, প্রলয় সেন, প্রভাত চৌধুরী এবং শৈবাল মিত্রর নাম উল্লেখ করলেন।

'আচ্ছা, প্রেম এবং প্রতিবাদ, গল্পের ক্ষেত্রে কোনটিকে আপনি বেশী প্রাধান্য দেন ?'

বিজনবাবু বললেন, 'আমার গল্পে প্রেম আছে। তবে তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে। লক্ষ্য করে দেখেছি, প্রেমটা এখন আর তেমন মুখ্য হয়ে উঠছে না। উঠছে তো না-ই। বরং পিছিয়ে পড়ছে। প্রতিবাদ আসছে। তবে কোন বিশেষ রূপে না এসে, আসছে বিভিন্ন প্রকারে। কিন্তু কখনোই সোচ্চারে নয়। বরং বলতে পারি, কিছুটা বা মরুবে। প্রতি-বাদ আসছেই। তুলনায় প্রেম অনেক, অ-নে-ক কম।'

'—কেন ?'

'হয়ত এ সময় প্রেমের সময় নয়।' বিজনবাবু বললেন, 'লিখতে গেলেই মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের নানান সমস্যা, তাদের ক্ষোভ, জ্বালা, হতাশা, ব্যর্থতা, গ্লানি ইত্যাদি এসে জায়গা জুড়ে বসে আমাকে প্রতি-বাদী করে তোলে। এবং সংগত কারণে গল্পের ক্ষেত্রে প্রতিবাদ-ই প্রাধান্য পায় বেশী।'

'আচ্ছা, যেসব সমস্যাকীর্ণ মানুষের জন্য আপনি প্রতিবাদী হয়ে উঠছেন, গল্প লিখে কি আপনি তাদের কাছে পৌঁছতে পারবেন ?'

'—জানি না পারবো কিনা। তবে চেষ্টা তো করে যেতে হবে।'

'গল্পকার হিসেবে শুধু গল্পের কথাই ভাবেন, না পাঠকের ভাবনা মাথায় থাকে ?' আমার শেষ প্রশ্নের উত্তরে বিজনবাবু বল-লেন, 'না, আমি আমার গল্পের কথাই ভাবি। কেউ নিল কি না নিল, সেদিকে বিন্দুমাত্র নজর থাকে না। পাঠকের কোনটা ভালো লাগবে না লাগবে, এই ভাবনায় আমি কখনোই ভাবিত হই না। তবে পাঠকের ভাবনা অর্থাৎ মানুষ সংক্রান্ত একটা ভাবনা তো থাকেই। কারণ মানুষ এবং মানুষের ভাবনা থেকেই তো আমার ভাবনার জন্ম। তার থেকেই শিল্পরূপ। আমার লেখা।'

শৈবাল মিত্র

'আমি যা সত্য বলে বিশ্বাস করি, সাহসে ভর করে সেই কথাই বলি। লিখি। 'পোস্টমর্টেম' লিখেছিলাম নিছক চমক দেওয়ার জন্য নয়।' ওটা আমার বিশ্বাস। আমি

বিশ্বাস করি, আমাদের পূর্বপুরুষদের সঠিক মূল্যায়ণ হয়নি। আমার এই বিশ্বাসের বিপক্ষে কেউ যদি দশটা বই দেখায়, পক্ষে আমি পঞ্চাশটা বই দেখাতে পারি।'

একটানা বলে শৈবাল মিত্র থামলেন।

বাংলার অধ্যাপক অসুস্থতাবশতঃ কলেজ যান নি। তাই জানান না দিয়ে গিয়েও পাওয়া গিয়েছিল। একসময় রাজনীতি করতেন। লিখতেনও। তারপর বেশ কয়েক বছর কলম স্তব্ধ রাখার পর গত দু বছর ধরে ধারাবাহিক ভাবে লিখছেন।

কারণ, এখন সময় পাচ্ছি।

আমার প্রথম প্রশ্নে জানতে চেয়েছিলাম তিনি কেন গল্প লেখেন।

'গল্প লিখি কেন—'

'—হ্যাঁ—'

'কেন লিখি তা নিয়ে কখনো ভাবিনি জানেন। সবাই যেমন একটা গতানুগতিক উত্তর দেয়, না লিখে থাকতে পারি না, তেমন উত্তর অবশ্য একটা দেওয়া যায়। আসলে ব্যাপারটা তা নয়। আমি হাট-বাজার করি, কলেজে যাই, সংসার করি, ইত্যাদি সবকিছু করার পর লক্ষ্য করে দেখেছি, বেশ কিছু সময় এবং প্রাণশক্তি আমার উদ্বৃত্ত থেকে যায়; যা অনেকের থাকে না। সেটা খরচ না করে উপায় নেই। তাই লিখি। অর্থাৎ লেখার ক্ষেত্রে সেটা খরচ করি।'

'উদ্বৃত্ত সময় এবং প্রাণশক্তি খরচের জন্য গল্প কেন, অন্য কিছুও তো করতে পারতেন।'

'—পারতাম। কিন্তু আমি যে অন্য কিছু পারি না। এটাই পারি।'

'আচ্ছা, যে বুদ্ধি দিয়ে আপনি গাড়ী ঘোড়ার ভেতর দিয়ে রাস্তা পার হন, গল্প লেখায় কি সেই বুদ্ধি প্রয়োগ করেন?'

'—তার চেয়েও বেশী বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হয়।' শৈবালবাবু প্রশ্নটি শোনা মাত্রই বললেন, 'রাস্তাঘাটে গাড়ী ঘোড়া, মানুষের যে ভীড়, যে জটিলতা, তার চেয়েও অনেক, অনেক বেশী জটিল অবস্থা থাকে গল্পের ক্ষেত্রে। অনেক বড় ধরনের ট্র্যাফিক জ্যাম সেখানে। অনবরত অনেক বড় বড় দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়, এর কোন শেষ নেই। রাস্তা পেরোলেই, তখন আর রাস্তার ভাবনা থাকে না। কিন্তু একটি গল্পের শেষেই অন্য ভাবনা থোকা থেকে এসে জুড়ে বসে, সুতরাং সারাক্ষণ বুদ্ধি খাটাতে হয়। সেই বুদ্ধি অনেক বেশী ধারালো। তীক্ষ্ণ।'

আমার পরবর্তী প্রশ্ন ছিল ছোটগল্পের ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত।

শৈবালবাবু বললেন, ছেলেবেলা থেকে ভবিষ্যৎ অন্ধকার শুনে শুনে 'ভবিষ্যৎ' কথাটি শুনলেই সবকিছু অন্ধকার বলে মনে হয়। আপনার মনে হয় না?'

আমি হাসলাম।

'—ব্যাপারটা নিয়ে আমি তেমন ভাবি নি। বোধ হয় কেউ ভাবেন না। কারণ বর্তমান নিয়েই আমরা বেশী ভাবি। এবং প্রয়োজন মতো অতীতকে টেনে আনি। অথচ ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবি না। যদিও ওটারই প্রয়োজন বেশী। আসলে আমরা মায়াবাদী লোক।'

'—তবু।'

'দেখুন, ছোটগল্প পড়বেন কারা, মানুষ তো। সেই মানুষের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এবং উজ্জ্বল মানুষের শিল্প নিশ্চয়ই উজ্জ্বল হবে। সেটা 'ছোটগল্প' হল কি না হল, তাতে কিছু যায় আসে না। এক সময় 'এপিক' ছিল এখন 'উপন্যাস' অনেক বেশী লোককে কাছে টানছে। ভবিষ্যতে তেমন—'

'—আমি বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে আপনার ধারণা জানতে চাইছি।'

'সর্বভারতীয় বিচারে ছোটগল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এবং এর শতকরা ৯০ ভাগ কৃতিত্ব হিন্দী লেখকদের। কি অসাধারণ গল্প লেখা হচ্ছে। কি তার পটভূমি। ভারতবর্ষের রুরাল লাইফটাকে ওদের গল্পে পাওয়া যাচ্ছে। অথচ বাংলায়?—শাস্ত্রবিরোধী গল্প। হ্যাঁ মশাই, শাস্ত্রই জানলাম না, বিরোধিতা করবো কি করে। আসলে কি জানেন, অক্ষমতার একটা তাত্ত্বিক চেহারা দিতে হবে তো। ছোট কাগজে যাঁরা শাস্ত্রের বিরোধিতা করছেন, বড় কাগজে তারাই আবার শাস্ত্রকে মানছেন। সব দু হাতে লড়ে যাচ্ছে। বাংলায় লেখা হচ্ছে শহরকেন্দ্রিক, বানানো গল্প। যার মধ্যে সব বানানো দুঃখ থাকে। বর্তমানের বিচারে আমাদের ছোটগল্পের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কথার মাঝখানে শৈবালবাবুর ছ'-সাত বছর বয়সী মেয়ে এসে জানতে চাইল, আমি আকাশবাণীর লোক কিনা। এবং আশাহত হল। মেয়েটি শিশুমহল-এ গান গাইতে চায়।

'আপনি কি লিখতে চান?'

মেয়ের দিক থেকে চোখ সরিয়ে শৈবালবাবু বললেন, 'অনেক বড় কিছু লিখতে চাই। যে লেখা কেউ লেখেনি। যে লেখার কথা কেউ ভাবেনি। আমার সেইসব লেখায় কোন রকম 'আপোষ' এবং 'সমর্পণ' থাকবে না। আমি বিশ্বাস করি আপোষ এবং সমর্পণ না করাই লেখার মূল ভিত্তি।'

'—কতটা পেরেছেন?'

'—কিছুই পারিনি। কোন লেখাই এখনো লেখা হয়নি। আসলে এসব হাত পাকানোর লেখা। পাকা হাতের লেখা নয়।'

'পরবর্তী কার গল্প ভালো লাগে?'

'—অমর, শচীন, সিদ্ধার্থ, অবশ্য—এদের। আর হ্যাঁ—শঙ্কর বসু।'

'প্রেম এবং প্রতিবাদ কোনটিকে তাঁর বেশী প্রাধান্য দেন, জানতে চাওয়ায় শৈবালবাবু জানালেন, প্রেম এবং প্রতিবাদ একই টাকার এ-পিঠ ও-পিঠ। যে প্রতিবাদ করতে পারে না, সে প্রেম করতেও পারে না।'

'—কিন্তু লক্ষ্য করে দেখেছি—' শৈবালবাবু বললেন, '—বেশীর ভাগ সাহিত্য দোষি দু ভাগে ভাগ করা। তথাকথিত বামপন্থী পত্রিকাগুলো দেখুন, শুধুই প্রতিবাদ। নায়কেরা প্রেম করতে জানে না। আবার অন্যদিকে শুধুই প্রেম—প্রতিবাদহীন। কিন্তু এ দুটো তো মেলানো দরকার। দুটো নিয়েই তো জীবন।

আপনি রামায়ণ মহাভারত দেখুন, ইলিয়াড দেখুন—সর্বত্র প্রেম প্রতিবাদ পাশাপাশি।'

'আচ্ছা, গল্পকার হিসাবে গল্পের কথাই ভাবেন, না পাঠকের ভাবনাও মাথায় থাকে?'

'—নিশ্চয়ই পাঠকের ভাবনা মাথায় থাকে। কারণ কি লিখছি, কেন লিখছি, কাদের জন্য লিখছি,—সবটাই জুড়ে তো পাঠক থাকে। নিশ্চয়ই তাদের ভাবনা ভাবি। কিন্তু তাদের জন্য কিছু লিখিনি। পারি নি।'

শুনে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এটা তো গেল একদিক। ব্যবসায়িক দিকটা, যদি ধরি—'

শৈবালবাবু বললেন, 'সাহিত্য নিয়ে ব্যবসা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আজকাল অনেকেই করছেন। আমি তাদের দলে না থেকেও হয়ে যাচ্ছি।'

'—কি ভাবে—'

'দেখুন শতকরা ৭৩ জন বাঙ্গালী পড়তে পারেন না। বাকি ৩০ জনের মধ্যে বই পড়েন ১০ জন। আমার লেখা তো তাদের কাছেই যাচ্ছে। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে। কারণ তারাই পাঠক। বাকি ঐ অশিক্ষিত ৭০ জন আধুনিক কারও, এমনকি রবীন্দ্রনাথের নামও জানেন না। কিন্তু রামায়ণ মহাভারত জানেন। কিনে পড়েন নি। আমি ঐ ৭০ জনের কাছে পৌঁছতে চাই।'

'একটা প্রশ্ন, ঐ ৭০ জন সমস্যায় একেবারে জর্জরিত,—লেখার তাগিদে না লিখে, উদ্বৃত্ত সময় এবং প্রাণশক্তি খরচের তাগিদে লিখে কি আপনি ওদের কাছে পৌঁছাতে পারবেন?'

শৈবালবাবু দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, 'নিশ্চয়ই পারবো। ওদের সমস্যা মানুষের বেঁচে থাকার সমস্যা। কেন পারবো না? পারবোই। আমি তো মানুষের বেঁচে থাকার কথাই বলতে চাই।'

অমর মিত্র

ত্রিবিংশ পেরিয়ে অমরের পা এখন সাতাশের ঘরে। অমর মিত্র কলকাতার ছেলে। নকরি সূত্রে থাকেন গোপীবল্লভপুরে, প্রত্যেক শনিবার এসে, রবিবার থেকে, সোম বার সোজা অফিসে চলে যান। কলকাতার ছেলে হয়েও কলকাতার জন্য মন কেমন করে না। নেই কলকাতায় ফেরার তেমন এক তীব্র বাসনা। কারণ জানতে চাওয়ায় অমর জানালেন, তিনি এখন সুদূরে গ্রামাঞ্চলেই ঘুরে বেড়াতে চান। একটি বিশেষ ঘটনার জন্য গোপীবল্লভপুর নামটি এখন সর্ব

জনবিদিত কিন্তু এমন অনেক গ্রাম আছে। গ্রামের মানুষ আছে। যা দেখলে কোনো-ক্রমেই বিশ্বাস হবে না, আমরা বিংশ-শতাব্দী প্রায় মেরে এনেছি। অমর সেইসব গ্রাম, গ্রামের মানুষ তাদের সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে লিখতে চান। ওঁর কয়েকটি গল্প ওরা এসেছে।

এক রোববার সকালে ওঁর বাড়ীতে ওকে প্রশ্ন করলাম, 'গল্প লেখেন কেন?' টেবিলের উপর 'সংক্রান্তি' নামক একটি ত্রৈমাসিক। সংযুক্ত সম্পাদকমণ্ডলীতে অমর আছেন। এতক্ষণ পত্রিকাটির উপর চোখ আটকে ছিল। আমার প্রশ্ন শুনে একটু ভেবে, চোখ তুলে বললেন 'অন্য কোনো মাধ্যমে স্বাচ্ছন্দ্য আসে না। গল্পে আসে। আমি যা বলতে চাই সেটা দেখেছি গল্পে দিয়ে উত্তরণ পারি। তাই গল্প লিখি।'

'এখানে একটা প্রশ্ন আছে—' আমি বললাম '—ধরুন পরবর্তীকালে আপনি এমন একটা মাধ্যম পেলেন, যেখানে আরও অনেক বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন, অনেক ভালোভাবে নিজের কথা বলতে পারছেন, তাহলে কি গল্প লেখা ছেড়ে দেবেন?'

অমর বললেন 'অন্য কোনো মাধ্যম পেলে নিশ্চয়ই যাবো। কারণ যেকোনো শিল্পমাধ্যম তার ক্ষেত্রে সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যমটি বেছে নেবেন। তবে গল্প, লেখা ছাড়বো না। গল্পের সঙ্গে একটা ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেছে। আর তাছাড়া, আমার ব্যক্তিগত ধারণা। গল্প উপন্যাসে নিজেকে সেভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, অন্য কোনো মাধ্যমে তাটা পাওয়া যায় না।'

পরের প্রশ্ন, 'আপনি কি সেই বুদ্ধিদীপ্ত গল্প লেখায় প্রয়োগ করেন, যে বুদ্ধিতে ভবিষ্যন্তে রাস্তা পাবেন।

'মোটামুটি একই বুদ্ধি প্রয়োগ করি।'

অমর হাতের পাতা নেড়ে ব্যাখ্যা করলেন, 'যেমন ধরুন আমি এসপ্ল্যানেডের রাস্তা পার হচ্ছি। প্রচুর গাড়ীঘোড়া আগো-পাছোভাবে ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে। মানুষজন গাড়ীঘোড়ার ফাঁক ফোকর দিয়ে দৌড়িয়ে রাস্তা পার হচ্ছে কারণ লাল আলো হঠাৎ সবুজ হয়ে যাওয়ার একটা চরম উৎকণ্ঠা থাকে। এই অবস্থায় রাস্তা পার হতে গেলে, আমার সমস্ত চেতনাই নষ্ট করবে। গল্পের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা তাই, সমস্ত চেতনা কেন্দ্রীভূত থাকে গল্পের দিকে। রাস্তা পার হওয়ার মতোই, একটা ত্রাস থাকে। যতক্ষণ না ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে ততক্ষণ কাঁটাছেড়া যন্ত্রণা—'

—'রাস্তা পার হওয়াটা কিন্তু আত্মরক্ষার ব্যাপার।'

'এটাও ঠিক। ঠিকমতো ধরতে পারলে তবেই লেখক নিজের কাছ থেকে নিজেকে রক্ষণ করতে পারেন।'

'ছোট গল্পের ভবিষ্যৎ কি? আপনার চোখে?'

অমর জানালেন, ছোট গল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, অনেকে অবশ্য বলেন ছোটগল্পের ভবিষ্যৎ তেমন নয়। কারণ উৎকৃষ্ট গল্প লেখা হচ্ছে না। অমর একথা অবিশ্বাস করেন। গল্প লেখা হচ্ছে। এবং ভালোই লেখা হচ্ছে। তার উদাহরণ বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিন। মাঝে মাঝে বড় পত্রিকাতেও ভালো গল্প পাওয়া যায়।

পরের প্রশ্ন করলাম, 'আপনি কি লিখতে চান?'

'আমার সংকটের কথা লিখতে চাই।'

—লেখক হিসেবে আপনার কাজ কি শুধু নিজের 'সংকট' নিয়ে নাড়াচাড়া করা?

'না। আমার সংকট অর্থে, যে মানুষের মধ্যে আমি বেঁচে আছি। তাদের সংকটের কথা। ব্যাপারটা এইভাবে হচ্ছে,—আমি দু চোখ দিয়ে নানান সংকট দেখছি, এবং দেখতে দেখতে এক সময় সমস্ত সংকট নিজের মতো করে নিজের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি। তখন সব কিছু আমার হয়ে যাচ্ছে। আমি লিখি। এই লেখার মধ্যে আমি লোকগাথা মাইথলজি-ক্যাল কনসেপ্টগুলো ভেঙে ঢুকিয়ে দিই। এইভাবে লিখতে ভালো লাগে।'

'কেন?'

—'কারণ তো এই সমস্ত কন-সেপ্টগুলো আমাদের ভিতরে গেঁথে আছে। সেগুলো আচমকা ভেঙে দিলে। পাঠক-কে সহজে পেনিট্রেট করা যায়।'

'কতটা পেরেছেন?'

'সমস্ত বিচারটাই পাঠকের। আমি অবিরাম চেষ্টা করে চলেছি।' ৭২-এ লেখা শুরু করেছিলাম। '৭৪ থেকে আমার ভিতরে একটা পরিবর্তন আসে। তখন মেলার দিকে যব' গল্পটা লিখি। কলকাতার বাইরে গিয়ে দেখলাম, অন্য একটা জীবন। তখন থেকে আমার গল্পের বিষয়, পটভূমি বদলে যেতে থাকে। লিখতে লিখতে মুক্তসীমানাও কিছুটা এসেছে। একটা কথা বলতে পারি, কিছুটা নিশ্চয়ই এগিয়েছি।'

সমসাময়িকদের মধ্যে কার গল্প ভালো লাগে, জানতে চাইলাম।

অমর জানালেন, শচীন, সিদ্ধার্থ, নবারুণ।

'আচ্ছা গল্পের ক্ষেত্রে, প্রেম এবং পরি-বারের মধ্যে আপনি কাকে বেশী প্রাধান্য দিয়ে থাকেন?'

দুই ভুরুর সংযোগস্থল আঙুল দিয়ে চেপে চোখ বন্ধ করে অমর বললেন, 'প্রেমের গল্প একটা লিখেছিলাম। এখন আর সেদিকে বিশেষ করে ওদিকে যাই না। তবে পরিবারের ক্ষেত্রে, হাত তুলে সোচ্চার প্রতি-বাদ জানানো। ওতে আমি নেই। বিশ্বাস করিনা। ধরুণ রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কি সামাজিক —যে কোনো বিষয়ে মানুষের একটি ধারনা আছে। সে সেটাকে নির্ভুল বলেই জানে। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি ওটা ঠিক নয়। গল্প লিখে আমি তার ধারণাকে অস্বীকার করলাম। এটাও তো এক ধরণের প্রতিবাদ। এবং এইসব প্রতি-বাদের মধ্যে যদি প্রেম ঢুকে পড়ে, পড়ুক। আলাদা করে নয়।'

'গল্পকে মাধ্যম করে আপনি কি আজকের সমস্যাকীর্ণ মানুষের কাছে পৌঁছতে পারবেন?'

অমর জোর দিয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই পারবো। এই বিশ্বাস আমার আছে। না থাকলে লিখতাম না। লেখা যাবও না।'

আমার শেষ প্রশ্ন, 'পাঠকের হিসেবে পাঠকের ভাবনা ভাবেন? নাকি শুধু গল্পের কথাই—'

'না, পাঠকের মুখ চেয়ে আমি লিখি না। যদিও প্রচুর লেখা হয় এবং হচ্ছে। কিন্তু কালক্রমে ওগুলো ডাস্টবিনে যাবে। তবে যদি পাঠকের ভাবনা অর্থে, পাঠকের সংকটের কথা বলেন, —নিশ্চয়ই ভাবি, সেই ভাবনাটা অন্য ধরণের। পাঠক বুঝতে পারছে না, একটু সরল করে দিই।—এই ভাবনা নয়। বুঝতে পারা না পারার দায়িত্ব আমার নয়। তবে শুধু 'ফর্ম' চর্চা-ও করি না। ওতে কোনো কাজ হয় না। ফর্ম দেওয়া ছাড়া।'

অমল আচার্য

রেল ইয়ার্ডের পাশ দিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে এক সময় অমল আচার্য মৃদু হেসে বললেন, 'জানেন, রেল স্টেশন আর শ্মশানে গেলে দেখেছি আমি কেমন দার্শনিক হয়ে যাই। আমার অনেক গল্পের রেল স্টেশন আর শ্মশান এসেছে।'

শুনে বললাম, 'আমি কিন্তু আপনার সাক্ষাৎকারটি এই কথা দিয়েই শুরু করব। অর্থাৎ শেষ থেকে শুরু।'

অমলবাবু হাসলেন।

একটু আগেই ওর বাড়ীতে ওর একটা সাক্ষাৎকার নিয়েছি। যেটার শেষে বড় রাস্তা পর্যন্ত উনি সঙ্গ দিচ্ছেন। তার পর আলাদা।

একটি হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক অমলবাবু। 'এই শতক' নামে পত্রিকা প্রকাশ করছেন ৬২ থেকে ৬৭, এই পাঁচ বছর। তার পরের পাঁচটি বছর একেবারে ফাঁকা। লেখার সঙ্গে যোগ

ছিল না। নিজের কথায়, 'ঐ পাঁচ বছর আমি লেখার দিক থেকে হারিয়েছি।'

৭২-এ আবার শুরু। 'বর্ণবিবর্ণ' নামে একটি গল্পের বই বেরিয়েছে। আর একটি বই সেদিন বেরোল, ডুমুরের দিব্য-বাস।'

প্রথমেই জানতে চেয়েছিলাম, গল্প লেখেন কেন?

প্রশ্ন শুনেই বিব্রত হয়ে পড়লেন। গল্প লিখে এমন জায়গায় যান নি, যেখান থেকে সাক্ষাৎকার দেওয়া যায়। — এই প্রসঙ্গটি তুললেন।

—তবু—

অমলবাবু বললেন, আপনার প্রশ্নটি সাংঘাতিক এবং বহু জিজ্ঞাসিত। কেন লিখি, এ নিয়ে কোন দিন ভাবি নি। আসলে ঐতিহ্যকে মেনে নিয়ে, আমি আমার সময়, আমার দেশ, আমার মানুষ,—এ'দের সঙ্গে মিশে থেকে ভাবষ্যতের জন্যে বেঁচে থাকতে চাই। বেঁচে থাকতে থাকতে সংসারে যা দেখি, সেগুলো আমার ভিতরে ঢুকে ভাবনায়, অনুভূতিতে রূপান্তরিত হয়ে প্রকাশ হতে চায়। এই প্রকাশের মাধ্যমটাই গল্প। যখন যিল কবি তখন লিখি। জোর করে নয়।

—মাধ্যমটি গল্প কেন?, কবিতাও তো হতে পারত।

হয় নি। তার কারণ কবিতার ক্ষেত্রে অনেক শাসন আছে। গল্পের ক্ষেত্রে ততটা নেই। আমি নিয়ম-কানুন, শাসন, তেমন মানতে পারি না। আর কবিতা পড়তে ভালবাসি। আর একটা কথা, গল্পের ক্ষেত্রে যে কোন জায়গায় পৌঁছেছি তা নয়। চেষ্টা করছি।

আমার পরের প্রশ্ন, যে বুদ্ধিতে আপনি গাড়ি-ঘোড়ার ভেতর দিয়ে রাস্তা পার হন, গল্প লেখায় কি সেই বুদ্ধি প্রয়োগ করেন?

সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে, চোখ বন্ধ করে খানিক ভেবে অমলবাবু বললেন, না। সেই বুদ্ধিতে গল্প লিখি না। গাড়ী-ঘোড়ার ভেতর দিয়ে, যে বুদ্ধিতে রাস্তা পার হই,—তার মধ্যে আত্মরক্ষার তাগিদ থাকে। কিন্তু গল্প লেখার ক্ষেত্রে সেই রকম বুদ্ধির দরকার হয় না। গল্প লেখার ক্ষেত্রে যে বুদ্ধির দরকার, সেটা হল আত্ম-প্রকাশের বুদ্ধি। আত্মপ্রতিষ্ঠার বুদ্ধি। দুটো বুদ্ধি এবং তাদের কাজ মূলত ভিন্ন।

ছোট গল্পের ভবিষ্যৎ কি,—জানতে চাইলাম।

অমলবাবু মুহূর্তকাল না ভেবে জোরের সঙ্গে বললেন, আমি বিশ্বাস করি, ছোট গল্পের ভবিষ্যৎ ভীষণ রকমের উজ্জ্বল। এবং আপনি দেখে নেবেন, এমন একটা সময় আসবে, যখন ছোট গল্প বাংলা সাহিত্যকে শাসন করবে।

—সে রকম কোন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছেন?

নিশ্চয়ই। গত এক দশক জুড়ে দেখুন ছোট গল্প নিয়ে কত পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে। উপন্যাস বা কবিতায় কিন্তু হচ্ছে না। এর কারণ আর কিছুই না, ছোট গল্পের ওপর প্রত্যেকেরই একটা তীক্ষ্ণ নজর আছে। আর এই নজরের পিছনে আছে প্রত্যাশা। এবং জোর দিয়ে বলা যায় এই প্রত্যাশা সফল হবেই। উপন্যাসের ক্ষেত্রে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেউ অতিক্রম করতে পারেন নি। কিন্তু ছোট গল্পের বেলায় কিন্তু বিষয়টি ভাববার। এবার পুজোয় দেখুন, একটা উপন্যাসও দাগ কাটে না। অথচ ছোট গল্প?—একা মহাশ্বেতা দেবীই একশো।

আপনি কি লিখতে চান?

আমি মানুষকে শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি এবং মানুষের প্রতি আমার অসীম সহানুভূতি— অমলবাবু বললেন,—আমি মানুষের কথা লিখতে চাই, যে মানুষ তার দেশ, কাল এবং সমাজের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন-ভাবে যুক্ত, তার কথা লিখে যেতে চাই। শুধু মাত্র মানুষের মনস্তাত্ত্বিক দিক নিয়ে গভীর আলোচনা, বা তার শুধু অন্ধকার দিকটাও আমি দেখাতে চাই না। ভাল-মন্দে মিশে থাকা নিটোল মানুষের কথা লিখতে চাই।

কতটা পেরেছেন।

কিছুই পারি নি। তবে তো শুরু।

—তবু—

অমলবাবু বললেন, পারা না পারার বিচারক পাঠক। আমি শুধু আমার লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছি।

পরবর্তী কার গল্প ভাল লাগে জানতে চাওয়ায় অমলবাবু খানিক ইতস্তত করে বললেন, দেখুন আমি গল্প লিখে সেই জায়গায় পৌঁছুই নি, যেখান থেকে পরবর্তীদের সঠিকভাবে চিনে নেওয়া যায়। বুঝে নেওয়া যায়।

—তবু—

সিদ্ধার্থ, অনর মিত্র,—এদের লেখা আমার ভাল লাগে। আমার স্থির বিশ্বাস ছোট গল্পের ক্ষেত্রে এরা নিজেদের জায়গা করে নেবে।

প্রেম এবং প্রতিবাদ,—গল্পের ক্ষেত্রে আপনি কোনটিকে বেশী প্রাধান্য দেন?

দুটোকেই— অমলবাবু বললেন,—আমি দুটো নিয়েই বেঁচে আছি। দুটো নিয়েই লিখতে চাই। (ঠিক এই সময় শ্রীমতী আচার্য চা নিয়ে এলেন। অমলবাবু রসিকতা করে বললেন, আমার স্ত্রী। মদের প্রথম পেগের দিন সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দেয়। বাকি পেগের দিন রাশন ফেলে শব্দ করে। প্রেম এবং প্রতিবাদের এই অপূর্ব সহাবস্থানকে বাদ দিয়ে লিখব কি করে? তিনজনেই হাসলাম।)

আচ্ছা — পরের প্রশ্ন করলাম,— গল্পকে মাধ্যম করে আপনি কি সমস্যা-কীর্ণ মানুষের কাছে পৌঁছতে পারবেন?

নিশ্চয়ই, পারব। গল্পকে মাধ্যম করেই তো পৌঁছতে হয়। আপনি যীশুকে দেখুন, — প্যারাবল-এর আশ্রয় তিনি নিয়েছেন। ঈশপ দেখুন, জাতকের গল্প দেখুন,—এমন কি আমাদের রামকৃষ্ণকে দেখুন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে গল্পই তো একমাত্র শক্তিশালী মাধ্যম।

আমার শেষ প্রশ্ন গল্পকার হিসেবে শুধু গল্পের কথাই ভাবেন, না পাঠকের ভাবনাও মাথায় থাকে?

নিঃসন্দেহে পাঠকের ভাবনা মাথায় থাকে। তার কারণ, আমার গল্প তো শুধু আমারই গল্প নয়। গল্পের মাধ্যমে আমি আমার অনুভূতিকে পাঠকের অনুভূতি করে তুলতে চাই। আমার অনুভূতির স্তরে পাঠককে তুলে আনতে চাই। আমি যেতে চাই না। যদি আমার ভাবনা, তাদের ভাবনা করে তুলতে না পারি, তার দায়, দোষ এবং অক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে আমার। স্বাভাবিক-ভাবেই পাঠকের ভাবনা অর্থাৎ মানুষের ভাবনা এসে যায়। তবে তাদের মনোরঞ্জনের ভাবনা আমি ভাবি না। ওটা আর কিছু হোক,—সাহিত্য হয় না।

সিদ্ধার্থ রায়

সে প্রাণিপার্শ্বকে জীবন কাটাতে হয়, তার সঙ্গে একটা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার টানাপোড়েন চলতেই থাকে। মানুষ হিসেবে তাকে প্রকাশ করবার, প্রতিক্রিয়াকে মূর্ত করে সমাজসচেতনতার পূর্ণ উপলব্ধির জন্যই এক-এক শিল্পী এক-এক মাধ্যম বেছে নেন। কেউ গল্প, কেউ স্থাপত্য, কেউ চলচ্চিত্র। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে বলা যায়, পাঠকের মানসে প্রবেশ করে তার সঙ্গে সাযুজ্য স্থাপনে কথাসাহিত্য আকৃষ্ট করে—শৈশবে এই আবহাওয়াতেই বড় হয়েছি। তাই গল্প লিখি। গল্প লেখার কারণ প্রসঙ্গে উপরোক্ত কথাগুলি বলছিলেন সিদ্ধার্থ। সিদ্ধার্থ রায়। পড়াশুনা করেছেন শান্তিনিকেতনে। রামকিংকরকে জানেন গভীরভাবে। গল্পকার হিসেবে ২৮ বছর বয়সী এই তরুণ যুবক অনিয়মিত পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করে, গত পাঁচ-ছ বছর ধরে নিয়মিত লিখছেন। ওর নিজের ভাষায়,—লেখা চেষ্টা করছি।

আমাদের কথা হচ্ছিল ইকনমিক

টাইমসের (এখানে সিদ্ধার্থ চাকরি করেন।) উল্টো দিকের এক রেস্তরাঁয়। মাঘের আকাশে অসময়ের মেঘ। এই মেঘলা আকাশের নিচে সেদিন মহদানে পাঞ্জাব বনাম কেরলের খেলা হচ্ছিল। এবং সেই খেলায় প্রতিমুহূর্তে কি ঘটতে চলেছে, সেই খবর জানার জন্যে অসংখ্য আগ্রহী এবং কৌতূহলী মানুষ উদগ্রীব হয়ে ভিড় করে দাঁড়িয়ে কান পেতেছিল রেস্তোরাঁর ছোট্ট ট্রানজিস্টারে। মাঝে-মধ্যেই তাঁদের উত্তেজনা আমাদের বেশ ভাল রকমের বাধার সৃষ্টি করছিল।

আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে সিদ্ধার্থ বললেন, গাড়ী-ঘোড়ার ভেতর দিয়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় যে বুদ্ধি প্রয়োগ করি, তার চাইতে অনেক বেশী বুদ্ধি এবং সচেতনতা প্রয়োগ করতে হয়। লেখকের সামনে প্রধান সমস্যা নির্বাচনের। বাস্তবতার এক ধরণকে নির্বাচন করে, তাকে বাস্তবের চেনা মাপ থেকে আরও বড় করে, অতিরঞ্জিত করে, নির্দিষ্ট ভাষার কাঠামোয় প্রকাশ করা। একটি শব্দেরও হেলাফেলা প্রয়োগ নয়, একটি বাক্যেরও অসচেতন গঠন নয়, একটি উপমারও অসংলগ্নতা নয়—এই প্রাথমিক কথা মনে রেখে গল্পের ভ্রূণকে পরিণত করা নির্দিষ্ট গড়নে। এই পদ্ধতি নিশ্চিতই সচেতন। দৈনন্দিন ব্যবহারের চাইতে অনেক বেশী সচেতনতা দাবী করে।

একটু ভেবে সিদ্ধার্থ বললেন, 'আমাদের সমসময়ের বাস্তবতার ধরন জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন, সামাজিক জীবনের জীবনের অনিবার্যতা, এই দুই কারণের অবারিত উন্মুখ মানসিকতা মানব সম্পর্কের ভেতর ছায়া ফেলেছে। আমাদের ক্ষমতা ও উপলব্ধির মাঝখানে নেমে আসছে সেই ছায়া।' একটু থেমে সিদ্ধার্থ বললেন, 'আমাদের দেশের আশি ভাগ লোকের পেটে ক্ষিদে। বিশ মিলিয়ন যুবক বেকার। একজন সচেতন মানুষ এই পারিপার্শ্বকে উদ্বুদ্ধ হবেনই আত্মপ্রকাশে।

আত্মপরিচয়ের অভাব, সত্তাহীনতার এই বোধ নিশ্চিতই ভবিষ্যতে মহৎ গল্পের প্রেরণা দেবে। লেখা হবে না, —এমন কখনোই মনে হয় না।'

'আপনি কি লিখতে চান?' প্রশ্ন করলাম।

'—সামাজিক মানুষের সম্পর্ক, তার জীবনধারণ, মানুষের ক্ষমতা ও চলতি অবস্থায় সেই ক্ষমতার কতখানি প্রকাশ ক্ষমতার অপমৃত্যু আর সম্পর্ক এই জীবনযাপনে বাঁচার তাগিদ,—এছাড়া আমার লেখার আর কোনো উপজীব্য নেই।'

'—কতটা পেরেছেন?'

সিদ্ধার্থ হেসে জবাব দিলেন, 'পারা না পারার নির্ধারক তো মহাকাল।' এর পরের প্রশ্নে আমি জানতে চেয়েছিলাম সমসাময়িকদের মধ্যে কার গল্প ভালো লাগে।

উত্তরে সিদ্ধার্থ বললেন, 'বিশ্বনাথ বসুর লেখা সব চাইতে ভালো লাগে। 'পরিচয়' 'কালান্তর' এবং অমৃত পত্রিকায় তাঁর অসামান্য কয়েকটি গল্প প্রকাশিত হয়েছে।' ('অসামান্য)' কথাটির ওপর সিদ্ধার্থ বেশ জোর দিয়েছিলেন। এবং বলেছিলেন শব্দটি যেন থাকে। কাটা না হয়।)

'—আর?'

'অন্য সবারই লেখা পড়ি। ভালো লাগা লাগানো এভাবে বলা ঠিক না।—শ্রদ্ধা নিয়ে তাঁদের লেখার জগৎ বোঝবার চেষ্টা করি।'

'আচ্ছা, প্রেম এবং প্রতিবাদ, গল্পের ক্ষেত্রে কোন্‌টিকে আপনি বেশি প্রাধান্য দেন?'

এই প্রশ্নের উত্তরে সিদ্ধার্থ : প্রেম বা প্রতিবাদ এভাবে তো কোনো বিশেষ কথা মাথায় রেখে গল্প লেখা যায় না। আমি মানব সম্পর্কের বিভিন্ন কোণ খুলে দিতে চাই। তাতে প্রেম ও প্রতিবাদ মিশেই থাকে।—সবচাইতে প্রধান, তার পরিণতি উদ্ঘাটন করা।

গল্প লেখার সময়, গল্পের ভাবনার পাশাপাশি পাঠকের ভাবনা স্থান পায় কিনা, এই প্রসঙ্গে সিদ্ধার্থ বললেন, 'লেখার সময় ভাবনাকে শিল্পীত করে তোলাটাই মুখ্য থাকে। ভাবনার সংলগ্ন সবকিছু আমার মাধ্যমে প্রকাশ করা। পাঠককে তো লেখার জগৎ মগ্ন করবে, নতুন বোধ দেবে। যদি তা না দেয়, তাহলে লেখা হয়নি বুঝতে হবে।' একটু হেসে বললেন, 'একটা কথা আমার মতো চুনোপুঁটিদের মনে রাখতেই হয়—'

'—কি কথা—'

'বড় লেখা কেউ ছাপে না।'

এ নিয়ে ওর সঙ্গে কিছু কথা হল। এই প্রসঙ্গে ওর এক তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা জানতে পারলাম। একটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকা ওর কাছে একবার একটি লেখা চেয়েছিল। অতি যত্নের সঙ্গে রামকিংকরকে নিয়ে একটা লেখা দিলেন। কিন্তু দু-বছর অতিক্রান্ত হবার পরও প্রকাশিত হয়নি। অবশেষে একদিন দুপুরে পত্রিকা অফিসে লেখাটি ফেরৎ চাইতে গেলেন। রামকিংকরকে নিয়ে ঐ লেখাটি দু-বছর ধরে অবহেলায় আলমারির নিচে ধুলোবালির মধ্যে পড়েছিল। পরে 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই-রকমই আর একবার গল্প-সংখ্যার জন্য একটি গল্প নিয়ে ঐ পত্রিকা ফেলে রেখেছিল। পরে গল্পটি 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। '—এগুলো দুঃখজনক ঘটনা নয়? আমি তো যেচে লেখা দিইনি।' সিদ্ধার্থ বললেন।

আমি আমার শেষ প্রশ্ন করলাম 'আচ্ছা, গল্পকে মাধ্যম করে আপনি কি সমস্যাকীর্ণ মানুষের কাছে পৌঁছতে পারবেন?'

একটুক্ষণ ভেবে সিদ্ধার্থ উত্তর দিলেন, 'আমার গল্প যাঁরা পড়েন, এতো তাঁদেরই হাতে। চেতনায় প্রবেশ করবার ব্যাপারে তো কোনো জোর খাটে না।'

'—তবু?'

'এ-সম্ভাবনা বুঝতেই অনেক সময় লাগে।'

নীতিশ মুখোপাধ্যায়

যামিনী রায় ছবি আঁকতেন। ছবি করতেন না। এবং কবি-ছবি দেখতেনও না। উনি বলতেন, '—ওসব ভূতের মতো ছায়া-ছায়া চলাফেরা দেখে না ভরে মন, না ভরে চোখ।'

কিন্তু তরুণ চিত্র-পরিচালক নীতিশ মুখোপাধ্যায়, যিনি সৎ ছবি করার স্বপ্ন দেখেন এবং করেন, তিনি ছবি আঁকেনও। এবং ছবি এঁকে যে পয়সা পান, সেই পয়সা অকৃপণ হাতে ব্যয় করেন ছবি করাতে।

ছবি আঁকেন, কিন্তু ছবি করেন কেন শুনতে চেয়েছিলাম।

উত্তরে নীতিশবাবু বলেছিলেন, 'যখন আঁকি, তখনও একরকমের ছবি করি। কিন্তু সে-ছবি হয় ব্যক্তিগত। কখনো একার। কখনো বা কিছুজনের। কিন্তু সকলের জন্যে কখনোই নয়। তাই একটা সময় ক্যানভাস বড় করার সাধ হল। বলতে পারেন নিজেকে বহু করার আকাংক্ষা। বিচিত্র সুখ, বিচিত্র জায়গা, বিচিত্র ঘটনা,—সব মিলে জীবন্ত চলচ্চিত্রের ক্যানভাস। ফোটোগ্রাফিক, মিউজিক, অভিনয়, লেখা, পরিচালনা—শিল্পের প্রায় প্রত্যেক স্তরের এমন সমাবেশ আর কোন্ মিডিয়ামে আছে? তাই ছবি করছি। এ-ও তো আর একরকমের ছবি আঁকা।'

'যে বুদ্ধি দিয়ে গাড়িঘোড়ার ভেতর দিয়ে আপনি রাস্তা পার হন; ছবি করায় কি সেই বুদ্ধি প্রয়োগ করেন?'

'—গাড়িঘোড়ার ভেতর দিয়ে রাস্তা পার হওয়া,—সে তো চারধার ভালো করে দেখে তবে ফুটপাথ থেকে রাস্তায় পা রাখা। অর্থাৎ চলচেরা হিসেব। ছবি

করাতেও হিসেব একটা থাকে নিশ্চয়ই। সে-হিসেব হল, একটা বাস্তবনিষ্ঠ শিল্প-সম্মত রুচিশীল ছবি করার। ব্যবসাদারদের কাছে এ-হিসেবটা একেবারেই জোলো। অর্থহীন। ওঁদের হিসেবটা অন্য। যেমন, ছবিতে ঠিক সময়ে নায়ক-নায়িকার ভাব, তারপর গান, ঠিক সময়ে নায়িকার দুঃখ, তারপর গান, ঠিক সময়ে নায়িকাকে ভিলেনের তুলে নিয়ে যাওয়া এবং নায়কের আবির্ভাব এবং মারপিঠ, সবশেষে নায়ক-নায়িকার মিলন এবং গান। এ-হিসেবের রগড় বাংলা ছবিকে ইদানীং রগড়ের পর্যায়ে এনে দিয়েছে, এটা সুলক্ষণ মনে মনে করি। এ-হিসেব আমার ছবিতে প্রয়োগ করি না। এখনো সে-মন আসেনি। তাই ছবি করছি 'নয়নশ্যামা', শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্প। আর করছি 'রবিবার'—রবীন্দ্রনাথের গল্প।' ব্যবসাদারদের কাছে যাঁদের বক্স শূন্য।'

এই প্রসঙ্গে জানা গেল, 'নয়নশ্যামা' শেষ হয়ে যাওয়ার পরের ঘটনা।' ডিস্ট্রিবিউটর পাওয়া যাচ্ছে না। একজন ডিস্ট্রিবিউটর ছবি দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেন, 'আপনার ছবি দারুন। এ ক্লাশ—।'

নীতিশবাবু আমাকে বললেন, 'এরকম শুনলে কার না আশা জাগে বলুন। এরপর ভদ্রলোক কি বললেন শুনবেন—'

'—কি?'

'আপনার ছবি এ-ক্লাশ। কিন্তু না। এ-ক্লাশ ছবি চলে না।'

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

'আচ্ছা স্বাধীনতার পর বেশ কয়েকজন চলচ্চিত্রকারের আবির্ভাব হওয়া সত্ত্বেও বাংলা ছবির মান ক্রমশঃ কেন নেমে যাচ্ছে?'

'—নেমে যাচ্ছে তার কারণ, মুষ্টিমেয় কয়েকজনের প্রভাব সামান্য। এবং এঁদের ছবির সংখ্যা ১০০টার মধ্যে ১টা কি ২টো। অন্যদিকে ব্যবসাদারেরা তাঁদের ফরমুলার ছকে বাঁধা ছবি করছেন অশিক্ষার পুরো সুযোগ নিয়ে। আর স্বাভাবিক কারণেই ছবির মান নেমে যাচ্ছে।'

রবিবারের সকাল। আমাদের প্রশ্নোত্তরের মাঝে একে একে অনেকেই এসে গেছেন। কেউ অভিনয় করেন। কেউ ক্যামেরা দিয়ে সেই অভিনয় ধরে রাখেন সেলুলয়েডের ফিতেয়।

আমি আমার পরের প্রশ্ন করলাম, 'বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ কি?'

উত্তরে নীতিশবাবু বললেন, 'এক সময়ে অমানুষ-এর জয়জয়াকার দেখে মনে হয়েছিল, এই তাহলে বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ। কিন্তু ইদানীং বড় বড় বাজেটের বড় বড় স্টার সমেত কমার্শিয়াল মাল-মশলায় তৈরি ছবিগুলো সব পরপর সুপার ফ্লপ করে রেকর্ড তৈরি করেছে। এইসব ছবিই বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এটা সুলক্ষণ। লোকে এগুলো আর দেখতে চাইছে না,—এটা জীবনের লক্ষণ। এবার হয়ত শুষ্ক মরুর মধ্যে মৃত্যুর পর সবুজ-সজীব পাতার লক্ষণ দেখা দিতে পারে।'

সাহিত্য নির্ভর না হয়ে চলচ্চিত্র একটা আলাদা শিল্প হয়ে উঠতে পারে কিনা, জিজ্ঞাসা করায় উনি বললেন, 'চলচ্চিত্র চিত্র-প্রধান। দৃশ্যের পর দৃশ্যের সংযোজনে ছবি চলচ্ছবি হয়ে ওঠে। এই দৃশ্যগুলো গড়ে ওঠে একটা বক্তব্যের ভিত্তিতে। তাই সাহিত্যের প্রয়োজন। সাহিত্য-নির্ভর নয়,—সাহিত্য চলচ্চিত্রের আশ্রয়। সাহিত্যকে আশ্রয় করে চলচ্চিত্র নিজের ভঙ্গীতে শিল্প হয়ে ওঠে।'

'আচ্ছা, যে-কোনো ধরনের সেন্সরশিপ সম্পর্কে আপনার কি মতামত'

'—শিল্পীর স্বাধীনতা অবশ্যই কাম্য। তবে স্বাধীনতা মানে যথেচ্ছাচার নয়। সৃষ্টি যেখানে বাস্তবনিষ্ঠ, বক্তব্য যেখানে অপরিহার্য, তা যতো কদর্য হোক না কেন, সৃষ্টার স্বাধীনতা সেখানে চাই-ই। অবশ্য যদি তা ডেস্ট্রাকটিভ না হয়ে কনস্ট্রাকটিভ কিছুর আভাষ দেয়।'

'ভালো ছবির দর্শক এখনো নিশ্চিতভাবে তৈরি হল না, এজন্যে দায়ি কে?

'—দায়ি সেইসব পরিচালক, প্রযোজক, পরিবেশক, যাঁরা ব্যবসার নামে শতকরা ৮৫ জন মানুষের অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে বাংলা ছবিতে যথেচ্ছাচারের ফরমুলা তৈরি করে যাচ্ছেন। অশিক্ষিত মানুষগুলোকে আরও অন্ধকারে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। এর ব্যতিক্রম যদি কিছু ঘটে, তবে তার জায়গা হয় একেবারে অন্য কোথাও —অর্থাৎ অস্পৃশ্যদের মাঝখানে।'

চুম্বন ব্যবহারের অনুমতি পাওয়ায় ওঁর কি মতামত জানতে চাওয়ায় বললেন, 'দেখুন, আমাদের দেশে ধর্মের নামে সতীদাহ প্রথা ছিল। সেটা গেছে। স্বাধীনতার এত বছর পর পর্যন্ত আমরা জীবহত্যা হবে, এই ভেবে ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এ ভয় পেতাম। এই ভয়টাও গেছে। বাধ্য হয়ে। চলচ্চিত্রে চুম্বনের প্রয়োগটাও সেইরকম। জাতির বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হবে, এ নিয়ে যাঁরা চেঁচাচ্ছেন, একটা সময় আসবে তখন এঁরা বুঝতে পারবেন, প্রয়োজনে এর প্রয়োগ অন্যায় কিছু নয়। এটাও তো জীবনের একটা অপরিহার্য অঙ্গ।'

'—কিন্তু একটা কথা তো নিশ্চিত হয়ে বলা যায়, যে প্রয়োজনের চেয়ে অপ্রয়োজনেই বেশি প্রয়োগ হবে।'

'হবে। কিন্তু লোকে এটা বেশিদিন সহ্য করবে না।'

'ফিল্মের এন্টারটেনমেন্ট ভ্যালুকে কত দূর পর্যন্ত আপনি মেনে নেবেন'—এই প্রশ্নের উত্তরে নীতিশবাবু জানালেন, 'এন্টারটেনমেন্ট দু-রকমের। একজন আনন্দ পায় স্থূল তাৎক্ষণিকতায়। আর একজন এই তাৎক্ষণিকতার ওপরে কোনো কিছুতে। অর্থাৎ সে ভাবছে, কি পেলাম। সৃষ্টা এখানে বেশি কিছু দিতে পারলো কিনা। এক্ষেত্রে দায়িত্ব দুজনেরই। কেউ কেউ একেই বলতেন, একজন জীনিয়াস। আর একজন টেস্ট। এই দুটির সংমিশ্রণে যে হার্মোনি তৈরি হল, সেই এন্টারটেনমেন্ট আমার ছবির এন্টারটেনমেন্ট।'

'সরকারের কাছে, ছবি করার জন্যে আপনি কি কোনোরকম আর্থিক সাহায্যের আশা করেন?'

আমার শেষ প্রশ্নের উত্তরে নীতিশবাবু বললেন, 'সাহায্য—। রবীন্দ্রনাথের রবিবার ছবির জন্যে রাষ্ট্রপতি শাসনে দেড় লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়েছিল। বর্তমান সরকারের কাছে দেখা করে, চিঠি দিয়ে কোনো কিছু এখনো সঠিকভাবে জানতে পারিনি। তবে শুনেছি, ওঁরা প্রগতিধর্মী সাতটি ছবিকে আর্থিক সাহায্য দিচ্ছেন। তার মধ্যে রবিবার নেই। হয়তো রবীন্দ্রনাথ ওঁদের মতে প্রগতিধর্মী নন। তাই রবিবার-এর ভাগ্যে সাহায্য জুটলো না।'

বিপ্লব রায়চৌধুরী

চতুর্দিকে সর্বক্ষণ বন্যার থাকা প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে বিপ্লব রায়চৌধুরী নামে এক তরুণ চলচ্চিত্রকার সৎ এবং সুস্থ চিন্তাধারার ছবি করার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার দুর্দান্ত প্রয়াসে দাঁতে দাঁত চেপে কঠিন সংগ্রাম করে চলেছেন।

ডকুমেন্টারি করেছেন অনেক। তার মধ্যে একটি ছবি ৭০-এ ন্যাশনাল এ্যাওয়ার্ড পায়। প্রথম ফীচার ছবি বর্ণবিবর্ণ।

'ছবি করছেন কেন?'—ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরির এডিটিং রুমে তাঁর সঙ্গে দেখা করে প্রশ্ন করেছিলাম।

উত্তরে বিপ্লববাবু বলেছিলেন, ছবি করেছি, কেউ ছবি আঁকছে কবিতা লিখছেন—এইরকম যে যাই করুক না কেন, এই করার পিছনে প্রথমে কাজ করে ভালো লাগা, তারপর ভালোবাসা, স্বপ্ন তাগিদ এবং উচ্চাকাংক্ষা। 'ভালো লাগা দিয়ে শুরু হয়েছিল। তারপর এক সময় ঐসবগুলো একত্র হয়ে আমাকে ছবি করার দিকে ঠেলে দিয়েছে।'

'যে বুদ্ধি দিয়ে আপনি গাড়িঘোড়ার ভেতর দিয়ে রাস্তা পার হন,—ছবি করায় কি সেই বুদ্ধি প্রয়োগ করেন?'

প্রশ্নটি শুনে বিপ্লববাবু একটু হেসে বললেন, 'দেখুন চলচ্চিত্র একটা ভাষা। যতক্ষণ না ভাষাটা আয়ত্তে আসছে, ততক্ষণ একটা অস্বস্তি থেকেই যায়। তাই সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তে এনে এই অস্বস্তিটা কাটাতে হয় বুদ্ধির প্রয়োগে। তবে রাস্তা পার হবার বুদ্ধিটাও প্রয়োগ করি।'

'—কি রকম?'

'রাস্তা পার হতে গেলে তাড়াহুড়ো করে ছুটে-যাওয়া মানুষ, সবুজ আলোর জন্যে গর্জনকারী অসংখ্য যানবাহন ইত্যাদি-গুলো বাধার সৃষ্টি করে। এই বাধা কাটাতে হয়। আমরা যারা নতুন ছবি করছি, তাঁদের সামনেও এই ধরনের অসংখ্য বাধা আসে। সেগুলোর সম্মুখীন হতে হয়। হিসেবে ভুল হলে এগোনো যায় না। কিংবা মাঝরাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়তে হয়।—তবে একটা কথা, রাস্তা পার হবার একটা 'তাড়া' থাকে। ছবি করার ক্ষেত্রে সেটা 'তাগিদ' হয়ে দাঁড়ায়।'

স্বাধীনতার পর বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান চলচ্চিত্রকারের আবির্ভাব হওয়া সত্ত্বেও, বাংলা ছবির মান ক্রমশঃ নেমে যাচ্ছে কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে বিপ্লববাবু বললেন, 'অনভিজ্ঞ চলচ্চিত্র-কারদের ভিড় একটা কারণ। আর একটা কারণ হল বড়রা।'

—'কি রকম?'

'স্বাধীনতার পর যাঁরা এসেছেন, যেমন সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন ইত্যাদি, এঁদের আমরা অর্থাৎ নতুনরা শ্রদ্ধা করি। এঁরাই আমাদের গর্ব। আমাদের প্রেরণা। একটা কথা ওঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা সম্পূর্ণ অটুট রেখে গভীর দুঃখের সঙ্গে বলছি, দেখুন, আমরা অনেক কিছু করার ভাবনাটা ভাবতে পারি, কিন্তু এই ভাবনাটা ঠিক কি বেঠিক, সেটা কি করে বুঝবো, যদি না বড়রা বুঝিয়ে দেন?'

'—এক্ষেত্রে একটা সময়ের প্রশ্ন থাকে—'

'হ্যাঁ থাকে। থাকে নিশ্চয়ই। কিন্তু একজনকেও তার ভুল ধরিয়ে দেওয়ার সময় থাকে না। এটা কিন্তু আমি মানবো না। বর্ণবিবর্ণ আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেক বড় পরিচালককে দেখতে অনুরোধ করে-ছিলাম। শুধু মাত্র কোথায় কি ভুল আছে, তা জানার জন্যে। কেউ দেখেননি। একটা প্রশ্নের জবাব দিন তো। যাঁদের অনেক স্বপ্ন আছে, সম্ভাবনা আছে, তাঁদের সঠিক পথে চালনা করা কি বড়দের কর্তব্য নয়? ওঁরা ভালো ছবি করছেন ঠিক, কিন্তু সংখ্যায় শতকরা ১ কে ২। পাশাপাশি প্রত্যেকদিন অগুণতি অখাদ্য ছবির জন্ম হচ্ছে। এতে মান তো নামবেই। একটা কথা স্পষ্টভাবে বলি। ওঁরা ভালো ছবি নির্মাণ করছেন। কিন্তু নির্মাণে সাহায্য করছেন না।'

বিপ্লববাবু উত্তরে বললেন, 'এটা একটা ভ্যাকুয়াম পীরিয়ড। না ভালো এক্সপেরিমেণ্টাল ছবি হচ্ছে, না ভালো কমার্শিয়াল ছবি। ভবিষ্যৎ কি সেটা গবেষকরা গবেষণা করবেন।'

'—তবু আপনার কি মনে হয়?'

'আমার ক্ষেত্রে যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। তবে যে কথাটা একটু আগে বললাম, দায়িত্বটা যদি বড়রা নেন। তাহলে ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই ভালো।' একটু থেমে বিপ্লববাবু বললেন, 'দেখুন একটা সময় আসবে যখন ওঁরা কেউ থাকবেন না। তাই এখন যদি কাউকে ওঁরা তৈরী করে দিয়ে না যান, তাহলে ধারাবাহিকতা থাকবে কি করে? পঁচিশ কি বিশ বছর আবার আমা-দের অপেক্ষা করতে হবে, একটি নতুন প্রতিভার আবির্ভাব দেখার জন্যে। ইদানিং বড় বড় পরিচালকদের সব বিপ্লবী ছবি দেখছি। বাংলা ছবিকে বাঁচাবার জন্যে কেন তাঁরা বিপ্লব করছেন না?'

আমার পরের প্রশ্ন, 'যে কোনো ধরনের সেন্সরশীপ সম্পর্কে আপনার কি মতামত?'

'সেন্সরশীপ থাকা উচিত। কারণ যা ইচ্ছে তাই করার অধিকার কারও নেই। আবার নগ্ন দৃশ্য থাকলেই তা কাটতে হবে। এমন যেন না হয়। যা কিছুরই প্রয়োগ করা হোক না কেন। সেটা যেন শিল্প সম্মত হয়। এবং সেন্সর যেন সেটা বোঝে।'

সাহিত্য নির্ভর না হয়ে চলচ্চিত্র একটা আলাদা শিল্প হয়ে উঠতে পারে কিনা, এই প্রসঙ্গে বিপ্লববাবু জানালেন, নিশ্চয়ই পারে।

প্রশ্ন করেছিলাম, 'আপনি করছেন না কেন?'

একটু হেসে উত্তর দিলেন, 'দেখুন আমরা বাধা ধরা ফরমুলার বাইরে ছবি করলেই বাধার সম্মুখীন হই। তার ওপর যদি ছবিতে গল্প না থাকে। তাহলে অবস্থাটা কি হবে বুঝতেই পারছেন। তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি। চলচ্চিত্র যেমন সাহিত্যের ওপর নির্ভর করে নির্মান করা হচ্ছে। তেমন চলচ্চিত্রর ওপর নির্ভর করেও অনেক বড় বড় সাহিত্য রচনা করা যেতে পারে। আপনি চ্যাপলিনের অসংখ্য 'শর্ট' 'ফিল্মগুলো দেখুন—।'

'আচ্ছা ভালো ছবির দর্শক এখনো নিশ্চিত ভাবে তৈরি হল না। এর জন্য দায়ী কে?'

'সমঝদারের একটা অভাব তো আছে। কিন্তু দায়ী ফিল্ম মেকার, যাঁরা পয়সার জন্যে দর্শকদের অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছেন।'

বর্তমান সরকার ছবিতে চুম্বন ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। এ সম্পর্কে ওঁর কি মতামত জানতে চাইলাম।

বললেন, 'আমরা বিদেশী ছবিতে তো চুম্বন অহরহ দেখছি। তাহলে দেশীয় ছবিতে দেখতে বাধা কোথায়। আর যাই-চেটিয়া নয়। প্রয়োজনে এর ব্যবহার অবশ্যই দরকার।'

'কিন্তু এর অপব্যবহার তো হবে—'

'হবে। বিদেশেও হচ্ছে। এদিকটা নজর দিতেই হবে।'

'ফিল্মের এণ্টারটেনমেণ্ট ভ্যালুকে কতদূর পর্যন্ত আপনি মেনে নেবেন?'—এই প্রশ্নের উত্তরে বিপ্লববাবু বললেন, 'এখনো অধিকাংশ বাঙালী ছবিকে বলে বই এবং হিন্দুস্থানীরা বলে খেল্। সুতরাং এদের ভাবনা ভাবতে হয় বৈকি। ওদের ভাবনা মাথায় রেখে তার ভিতর দিয়ে নিজের ভাবনা পৌঁছে দিতে হয়। কি কন্টকর পরিস্থিতিতে কাজ করতে হয় একবার ভাবুন।'

আমার শেষ প্রশ্ন, 'ছবি করার জন্যে আপনি আর্থিক দিক দিয়ে সরকারের কাছে কোনোরকম আর্থিক সাহায্যের আশা করেন?'

'না। কোনোরকম আশা করছি না। কারণ করতে পারছি না। চারপাশের এই-সব দেখেশুনে আমার একটি শিক্ষা হয়েছে এবং এই শিক্ষা আমাকে একটি স্থির বিশ্বাসে উপনীত করেছে। সেটা হলো, ভবিষ্যতে যদি বড় পরিচালক হই, নিশ্চয়ই সাহায্য পাবো। কারণ, সাহায্য-টাহায্য-গুলো বড়দের কাছেই তো যায়।'

অঞ্জন দাস

সৎ ছবি করার এক অদম্য আকাংক্ষায় অঞ্জন দাস, নতুন পাওয়া মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ-এর লোভনীয় চাকরির দেড় বছরের মাথায় ছেড়ে দিয়ে প্রচণ্ড সাহস এবং উদ্যম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন ইণ্ডাস্ট্রিতে। প্রতিশ্রুতিবান নবীন এই চলচ্চিত্রকারের বয়স ২৭ এবং ছবি করতে এসেছেন ৭৫-এ। প্রথম ছবি 'সৈনিক'। ছবিটি ৭৫-এ বার্লিনে মার্কেট সেকশনে দেখানো হয়েছে। এবং এক-মাত্র বাংলা ছবি হিসেবে প্রদর্শিত হয়েছে

স্থিত ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসবে। ওয়েস্ট জার্মানির মানহাইম, তেহেরান এবং ইতালির বার্গামোতে ভারত সরকারের 'অফিসিয়্যাল এনট্রি' নিয়ে 'সৈনিক' প্রতিযোগিতায় স্থান পেয়েছিল।'—কিন্তু কি ঘটলো জানেন—' যুগপৎ ক্ষোভ এবং বিস্ময়ে হয়ে অঞ্জন বললেন, 'কি এক অজ্ঞাত কারণে প্রথম দু জায়গায় প্রতিযোগিতার পরে ছবির প্রিন্ট গিয়ে পৌঁছলো। আর তেহেরান থেকে বার্গামোর পথে প্রিন্টটি হারিয়েই গেলো।—আশ্চর্য!'

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'দিবি তো চাকরি নিয়েছিলেন। ছবি করতে এলেন কেন?'

উত্তর দিয়েছিলেন, 'মানুষ তো নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। নিজের জীবন দর্শন সম্পর্কে কিছু বলতে চায়। এই চাওয়াটা যখন দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে, তখন সে একটা মাধ্যম খোঁজে। আমি মাধ্যম হিসেবে ছবি করাকে বেছে নিয়েছি। কারণ আমার মনে হয়, নিজেকে প্রকাশ করার এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম।'

'—আচ্ছা যে বুদ্ধি দিয়ে গাড়ি-ঘোড়ার ভেতর দিয়ে আপনি রাস্তা পার হন, —ছবি করার কি সেই বুদ্ধি প্রয়োগ করেন?'

প্রশ্নটি শুনে অঞ্জন কিছুটা সময় চেয়ে ভাবতে লাগলেন। ওঁর ঠিক মাথার ওপর, দেওয়ালে ওঁর একটি ছবি। ক্যামেরার পিছন থেকে নির্দেশ দিচ্ছেন।

আমার বাঁ পাশে একটি টেবিল।' ফাইলপত্র ছড়ানো। মাত্র ন' দিনে শেষ করা ওঁর দ্বিতীয় ছবি 'ঝড়'এর একটি রীল।। ছবিটি শেষ করতে শেষ পর্যন্ত ওকে নিজের কোটপ্যান্ট শাল ইত্যাদি বন্ধক দিতে হয়েছে। 'ঝড়' বার্গামোতে আমন্ত্রিত।

—'না।' অঞ্জন ভেবে বললেন, 'রাস্তা চলতে গেলে নিজেকে বাঁচানোর বুদ্ধি কাজ করে। কিন্তু ছবি করার সময়, নিজের সৃষ্টি নিয়ে এমন ইনভলভড্ হয়ে পড়ি, তখন বাঁচানোর বুদ্ধি কাজ করে না। এবং বাঁচানোর কথা খেয়ালও থাকে না।

বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে অঞ্জন জানালেন, ওর মতে বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ অন্ধকার। যাঁরা নিয়মিত ছবি করছেন এবং ব্যবসা করছেন, তাঁরা ফর্ম এবং কন্টেন্ট-এর দিক থেকে অনেক অনেক পিছিয়ে আছেন। আর নতুন, যাঁরা অনেক স্বপ্ন নিয়ে ছবি করতে আসছেন, তাদের সামনে এত সমস্যা, যে তাঁদের বাধ্য হয়ে অন্য পথ দেখতে হচ্ছে। সুতরাং কে এনে দেবে সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ?'

আমার পরের প্রশ্ন, 'স্বাধীনতার পর বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান চলচ্চিত্রকারের আবির্ভাব হওয়া সত্ত্বেও, বাংলা ছবির মান ক্রমশঃ নেমে যাচ্ছে কেন?'

—কজন প্রতিভাবান কাজ পেয়েছেন? যাঁরা পেয়েছিলেন, পরের দিকে তাঁরা পুরোপুরি প্রযোজকদের হাতে চলে গেছেন। আর এই সময় থেকেই হিন্দী ছবির জোয়ার আসে। হিন্দী প্লামারের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কঠিন ব্যাপার। আর একটা কথা, এখানে কেউ যদি কোনো রকম টাকা যোগাড় করতে পারেন, সেই পরিচালক হয়ে যান। না হলে 'রজনী' ছবিতে টিভি-র এ্যান্টেনা দেখা যায়!'

'—এ্যাঁ!'

'তাহলে আর বলছি কি।'

পরের প্রশ্নে আমি সেন্সরশীপ সম্পর্কে ওঁর মতামত জানতে চেয়েছিলাম।

অঞ্জন বললেন, 'দেখুন আমাদের দেশে যাঁরা ছবি করেন, তাঁদের বেশীর ভাগই অশিক্ষিত। পাবলিসিটিটা তাদের কাছে খুব বেশী। কিন্তু 'পাবলিসিটি' ছবি করার অধিকার তো তাদের নেই। এইদিক থেকে সেন্সরশীপ থাকা উচিত।'

'—যদি রাজনৈতিক দিকটা ধরি—'

'সুস্থ রাজনৈতিক ছবি যদি হয়, আপত্তির কোনো কারণ নেই। কিন্তু সেন্সর থাকা উচিত। তারা দেখবে ছবি যেন কমিউন্যাল দিকটায় আঘাত না করে।'

'আচ্ছা অপনার কি মনে হয়, সাহিত্য নির্ভর না হয়ে চলচ্চিত্র একটা আলাদা শিল্প হয়ে উঠতে পারে?'

'—নিশ্চয়ই পারে। বিদেশে যদি পারে, এদেশে অসম্ভব কেন? সাহিত্য নির্ভর না হয়ে চলচ্চিত্র একটা আলাদা শিল্প হয়ে ওঠাই তো উচিত।'

'ভালো ছবির দর্শক এখনো নিশ্চিতভাবে তৈরী হয়নি। এর জন্যে দায়ী কে?'

অঞ্জন উত্তরে বললেন, 'দেখুন ভারতবর্ষের মানুষের একটি বিরাট অংশ অশিক্ষিত। এটা একটা ফ্যাক্টর। কিন্তু এই পরিস্থিতির জন্যে সিংহ ভাগ দায়ী আমাদের আগের পরিচালকেরা। সস্তা সেন্টিমেন্ট দিয়ে পয়সা লুটেছেন দর্শক তৈরী করার কথা একটুও ভাবেন নি। সুতরাং আজ ভালো ছবি পড়লে সঙ্গে সঙ্গে মার খায়। তাদের উচিত এবং দায়িত্ব কি ছিল না সিঁড়ি ভেঙ্গে ভেঙ্গে দর্শককে ওপরে নিয়ে যাওয়া।'

সম্প্রতি চলচ্চিত্রে চুম্বনের ব্যবহারের অনুমতি পাওয়া গেছে,—এই প্রসঙ্গে ওঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম।

অঞ্জন জানালেন, এটাকে ওঁর তেমন একটা সাহসী কাজ বলে মনে হয়নি। তাই তেমন করে ভাবেন নি। নিজের কাজ প্রসঙ্গে বললেন, 'ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে চুম্বন রাখবো। যদি অতীতে প্রয়োজন বোধ করতাম, নিশ্চয়ই রাখতাম। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, কোনো ধরাবাঁধা নিয়মের মধ্যে শিল্প সৃষ্টি হয় না।'

'ছবির এন্টারটেইনমেন্ট ভ্যালুকে কত দূর পর্যন্ত আপনি মেনে নেবেন?'

'—নাচ গান হৈ-হুল্লোড়ের দিকটা যদি ধরেন, একদম মানবো না। কিন্তু যদি বলেন অন্য দিকটার কথা, মেনে নেবো। যেমন বার্গম্যানের ছবি দেখে আমার প্রচণ্ড স্যাটিসফ্যাকশন হয়। এটাই আমার কাছে এন্টারটেইনমেন্ট। রাশিয়ানরা যুদ্ধের ছবি ভালোবাসে। এটাই ওদের কাছে এন্টারটেইনমেন্ট। আসল কথা নিজের পার্সোনিফিকেশন হলেই সেখানে এন্টারটেইন্ড হওয়া যায়।'

আমার শেষ প্রশ্ন, 'ছবি করার জন্যে আর্থিক দিক থেকে, সরকারের কাছে কোনো রকম সাহায্যের আশা আপনি করেন কি?'

অঞ্জন ক্ষুব্ধ গলায় বললেন, 'বাঙালীর চিরকালের স্বভাব তেলামাথায় তেল দেওয়া, —সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। কাগজে দেখলাম সরকার সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, উৎপল দত্ত,—এঁদের ছবি করার জন্যে অর্থ দিচ্ছেন। এরপরেও কি আশা করা যায়? অথচ যেসব নতুন ছেলেরা সুস্থ চিন্তাধারার ছবি করছেন, করার স্বপ্ন দেখছেন, সরকারের তাদের সাহায্য করা উচিত নয়,—কর্তব্য। কিন্তু লক্ষণটা তো সেদিকে দেখছি না।

যাই হোক, ডকুমেন্ট্যারি করার জন্যে এক বছর ধরে বাইটাসে ঘোরাঘুরি করছি। আগের সরকার পাত্তাই দেয়নি। বর্তমান সরকার আসাতে প্যানেলে নাম উঠেছে, —ডাক আসে নি। সুতরাং আশার মুখে ছাই। ডাক এলে আনন্দিত হব। না এলে দুঃখিত হব না।'

শিব ঠাকুর

আসামের নবীন এবং ক্ষমতাবান চলচ্চিত্রকার শিব ঠাকুর জানালেন, আসামে চলচ্চিত্র নিয়ে দিবারাত্রি পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে। যদিও সেখানে কোনো শিল্প ল্যাবরেটরী নেই। নেই ভালো স্টুডিও। যন্ত্রপাতির ভীষণ অভাব। একটিমাত্র ক্যামেরা আছে। সরকারী কাজে সারাক্ষণ ব্যবহৃত হওয়ায়, পাওয়া কষ্টকর। এইসব কারণে তাঁদের সর্বাংশে বম্বে এবং কলকাতার ওপর নির্ভর করতে হয়। আরও জানালেন, পরিবেশক বলে আসামে কেউ নেই। ছবি দেখানো হয় সোজাসুজি প্রদর্শকের সঙ্গে কথা বলে।

শুনে বললাম, 'বেঁচে গেছেন। আমাদের এখানে তিন-চার মাসে ছবি শেষ করে এক একটি তাজা ছেলে পরিবেশক খুঁজে বেড়ান তিন-চার বছর ধরে। তবুও পান না। জীবনী শক্তির বেশীর ভাগটাই তাঁদের পরিবেশকের দর্শন পেতে চলে যায়।'

হাসলেন।

ওঁর সঙ্গে কথা হচ্ছিল কবি গৌতম-প্রসাদ বড়ুয়ার নিউ আলিপুরের বাড়িতে। ছবির কাজে কলকাতায় এসেছিলেন। ডিব্রুগড় ইউনিভার্সিটির অধীনে একটি কলেজের রয়টানির হেড অফ দা ডিপার্টমেন্ট। বাংলা বলেন পরিষ্কার। মাঝের সঙ্গে দেখা ছিলেন অভিনেতা এবং পরিচালক হিসেবে। এবং আন্তঃ রাজ্য প্রতিবেশিতায় পুরস্কার

ছেন একাধিক। বিদেশী কোনো ছবি
যন নি। কারণ বিদেশী ছবি আসামে
দেখানো হয় না। দেখেছেন সত্যজিতের পথের
পাঁচালী, অভিযান, মহানগর, অপরাজিত
ঋত্বিকের মুক্তি তর্কো ও গল্পো,
মৃণাল সেনের মৃগয়া। কো-অপারেটিভ
বেসিসে করেছেন প্রথম ছবি, 'ফাগুনি।'
ভূপেন হাজারিকার ভাই সদ্য পরলোকগত
জয়ন্ত হাজারিকার ওপর একটি ডকুমেন্টারি
করেছেন। সরকারকে বিক্রয় করবেন না।
গুনি'র সঙ্গে দেখাবেন।

প্রশ্ন করলাম 'ছবি করছেন কেন?'

উত্তরে বললেন, 'প্রকৃতি এবং মানুষের
। আমি গ্রামাঞ্চলের মানুষ। ছোটবেলা
কে আমি গ্রামেই বড় হয়েছি। গ্রামের
কৃতি, অর্থাৎ আসামের গ্রামের প্রকৃতির
ত রূপ সেটা আমার দেখা। এবং তার
প্রতি আমার এক দুর্নিবার টান রয়েছে।
আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, আমাদের এই
প্রকৃতিকে তেমনভাবে ছবিতে স্থান দেওয়া
হয়নি। ছবি করার আমার মূল কারণ, আমি
আসামের গ্রামের প্রকৃতিকে, কালারকে
সবসমক্ষে তুলে ধরতে চাই। মানুষের
সুখ-দুঃখ, ব্যথাবেদনা, কিভাবে মানুষ
বেঁচে আছে আমাদের এই বর্তমান সমাজ-
ব্যবস্থায়, সেই কথা বলতে চাই। এক কথায়,
তি এবং মানুষের কথা বলতে চাই।'

—অন্যান্য মাধ্যমেও তো বলতে
পারতেন। যেমন গল্প-উপন্যাস—'

—'পারতাম। কিন্তু বলাটা খুব একটা
জোরদার হতো না, কারণ সর্বক্ষেত্রে দক্ষতার
এক প্রাথমিক এবং বড় প্রশ্ন থেকে যায়।
যার তাছাড়া, এই মাধ্যমটি সবচেয়ে
ক্তিশালী। এক সঙ্গে অনেক মানুষকে
য়া যায়। তার সবচেয়ে বড় কারণ, এই
ন অডিও-ভিস্যুয়াল দিকটি।'

'ফাগুনি' করার আগে ছবির সঙ্গে
ত ছিলেন ?'

'—ছিলাম। 'মমতা' নামে একটি
বিতে প্রধান সহকারী হিসেবে কাজ
করেছি। ছবিটি '৭৩-এ সার্টিফিকেট অফ
মেরিট পায়।'

আমার পরের প্রশ্ন, 'যে বুদ্ধি দিয়ে
আপনি গার্ডীধেড়ার ভেতর দিয়ে রাস্তা পার
ছবি করায় কি সেই বুদ্ধি প্রয়োগ
করেন ?'

উত্তরে বললেন, 'তার চেয়েও বেশি
কিছু প্রয়োগ করতে হয়। কারণ আমি
কিছু সৃষ্টি করতে চলেছি।'

সমীয়া ছবির ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে প্রশ্ন
করতে শিবঠাকুর বললেন, 'আমরা উন্নয়নের
ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছি। দিনরাত
ভেবে চলেছি কি থেকে কি করা যায়।'

থামতেই প্রশ্ন করলাম : 'মানুষ তো
সংকটে পড়লেই ভুলে যেতে চায়। আপনারা
কি—'

—বলতে পারেন কিছুটা তাই।
বেশির ভাগ মানুষ এখনো সস্তা সেন্টিমেন্ট
সর্বস্ব ছবি দেখছেন ফলে বেশির ভাগ
ফিল্মমেকার ঐ ধরনের ছবি করে চলেছেন।
হিন্দী ছবিও সর্বগ্রাসী হয়ে এগিয়ে
আসছে। একটু থেমে বললেন, '—ঐ ধরনের
ছবি করলে পয়সা পাবো ঠিকই,কিন্তু শুধু
পয়সা রোজগারের জন্যে তো ছবি করতে
আসিনি। তাই যদি হতো, তাহলে এই
অনিশ্চয়তার মধ্যে না এসে লোহার ব্যবসা
ট্যাবসা ফেঁদে বসতাম।'

কি ধরনের গল্প নির্বাচন করায়
আপনি আগ্রহী ?' শুনেই বললেন, 'যে
গল্প মানুষ এবং সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।
যে গল্পে কিছু বলার আছে, আছে নিম্ন-
বিত্ত এবং খেটে-খাওয়া মানুষের দুঃখ এবং
সংগ্রামের কথা।'

'পরবর্তী ছবির জন্য গল্প নির্বাচন
করেছেন ?'

'—হ্যাঁ। বসন্ত দাসের 'রংশন,'
স্টেশনের ভিখিরিদের ওপর।'

'আপনি কি মনে করেন, সাহিত্য নির্ভর
না হয়ে চলচ্চিত্র একটি আলাদা শিল্প হয়ে
উঠতে পারে ?'

'দেখুন চলচ্চিত্র একটি যৌথ শিল্প।
এখানে সাহিত্য আছে। সঙ্গীত আছে।
নাটক আছে,—সেগুলি আলাদা আলাদা-
ভাবে এক একটি শিল্প। এবং এসব কিছুর
সংমিশ্রণে চলচ্চিত্র একটি ভিন্ন ধরনের
শিল্প। আপনি বলতে চাইছেন। সাহিত্য
ছবিতে গল্প না থাকার কথা। তাইতো?'

'—হ্যাঁ—'

'—দেখুন পারা না পারার আগে
আমাদের গল্পের কথা ভাবতেই হয়। একটু
অন্য ধরনের ছবি করলেই দর্শক পাওয়া
মুস্কিল হয়ে পড়ে, তার ওপর যদি গল্প না
থাকে—। আমি বলতে চাইছি, ছবিতে গল্প
থাকাটা আবশ্যক। আমাদের এই দেশে
অন্তত। গল্পের মাধ্যমেই সবকিছু বলতে
হবে।'

এরপরের প্রশ্নে আমি জানতে চাইলাম
ছবির এন্টারটেইনমেন্ট ভ্যালুকে উনি কত
দূর পর্যন্ত মেনে নেবেন।

উত্তরে জানালেন, প্রয়োজনে যতটুকু
আসবে, ততটুকুই। দর্শক আকর্ষণ করার
জন্যে জোর করে কিছু প্রয়োগ করার
পক্ষপাতী উনি নন। কারণ তাতে আর
যাইহোক, শিল্প হবে না।

যেকোনো ধরনের সেন্সরশীপ থাকা না
থাকার প্রসঙ্গে বললেন, 'সেন্সর থাকা উচিত
নয়।' কোনোরকম গণ্ডীর মধ্যে শিল্পসৃষ্টি
হয় না।'

'—তাহলে ব্যবসাদারেরা যে এর
সুযোগ নেবেন।'

'হ্যাঁ। কিন্তু সেটা একটা নির্দিষ্ট
[illegible] প্রশ্নই [illegible]
বর্জন করবেন। কারণ বিষয়টি একঘেয়েমীর
পর্যায়ে চলে যাবে।'

'আচ্ছা ভারত সরকার সম্প্রতি
চলচ্চিত্র চুম্বনের অনুমতি দিয়েছেন,
এসম্পর্কে আপনার কি অভিমত ?'

শিবঠাকুর বললেন, 'প্রয়োজনে থাকলে
ক্ষতি নেই—'

'কিন্তু সুযোগসন্ধানীরা তো এর
অপব্যবহার করতে পারে—'

'একটা সীমা পর্যন্ত। কারণ দর্শক
তাদের দৌরাত্ম্য তো চিরকাল সহ্য করবেন
না। অপ্রয়োজনে হলে কিছুদিন দেখার পর,
বাতিল করে দেবেন।'

আমার শেষ প্রশ্ন, 'আসাম সরকারের
কাছ থেকে আপনারা কিরকম সাহায্য
পান ?'

'—সরকার আমাদের সাহায্য করেন।
অ্যামিউসমেন্ট ট্যাক্স পুরোটা ফেরৎ দেন।
সাবসিডি দেন। হল মালিককে সাইন করে
নির্দেশ দিয়েছেন, বছরে কম করে ৮৪টি
প্রদর্শনীতে অসমীয়া ছবি দেখাতেই হবে।'

থামতেই আমি বললাম, 'আপনারা
ভাগ্যবান।'

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন : প্রভাত
চৌধুরী, প্রণবরঞ্জন রায়, নির্মল-
কুমার দাশ

Essence of Pandit Nehru only in one Book.

JAWAHARLAL NEHRU & HIS ECONOMIC POLICY

Dr. Mrigen Bose Ph.D (U.S.A.)
Postage Free
Send Rs. 15 M.O. or V.P. Rs. 16.

Comments :

Prof. Bose's Volume sketches Nehru in clear and unambiguous lines
"Amrita Bazar Patrika"

Dr. Mrigen Bose has written a bold book
"Indian Express"

Dr. Bose Explaines why Nehru failed
"Business Standard"

The author has done well
"The Hindu"

Dr. Mrigen Bose gives a critical review of Nehru's Economic Policy
"The Economic Times"

Mrs. Anita Bose,
159, Dum Dum Park Calcutta-55.
Book Sellers — Decent Terms

C.F.ADVTG/AB/78

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ মকবুল ফিদা হুসেন

আত্মপ্রতিকৃতি

১৯৭১ সালে সাও পাওলো (ব্রাজিল) দ্বি-বাৎসরিক আন্তর্জাতিক চারুকলা প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ একটা অভিনব পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। বিভিন্ন দেশের জাতীয় চারুকলা আকাদেমি কর্তৃক পাঠানো শিল্প সম্ভারের প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শনীর সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষ নিজেদের তরফ থেকে প্রতিবার দুজন প্রখ্যাত শিল্পীকে তাঁদেরই নির্বাচিত কিছু শিল্প সম্ভারের প্রদর্শনী করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁদের সম্মান জানাবেন এবং সেই সঙ্গে প্রদর্শনীর সম্মান বৃদ্ধি করার চেষ্টা করবেন। এই পরিকল্পনা গ্রহণ করার পর প্রথম প্রদর্শনীতে (১৯৭১) তাঁরা যে দুজন শিল্পীকে আমন্ত্রণ জানালেন তাঁদের একজন হলেন জীবৎকালে রূপকথায় পরিণত শিল্পী পাবলো পিকাসো এবং অপরজন বিশ্বশিল্পের মানচিত্রে অবহেলিত ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জীবিত চিত্রকার মকবুল ফিদা হুসেন। সেই বছরই নিউইয়র্কের শিল্প সম্পর্কিত গ্রন্থের সুখ্যাত প্রকাশক আব্রামস্ হুসেনের জীবন এবং শিল্প-কর্মের উপর একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করলেন। হঠাৎ ১৯৭১-এ এসেই হুসেনের কপালে এ সম্মান জোটেনি।

মকবুল ফিদা হুসেনের জন্ম ১৯১৫ সালে মহারাষ্ট্রের পান্ধারপুর শহরে, এক সুলেমানি বোহরা পরিবারে। বাপ ছিলেন কাপড় কলের হিসাব পরীক্ষক কেরানী। মামাবাড়ীতে ছেলেবেলা কাটিয়েছেন হুসেন। সেখান থেকে বরোদায় গিয়ে মাদ্রাসায় পড়েছেন, মাদ্রাসায় পড়া শেষ করে ইন্দোরে গেছেন, বাবার তদানীন্তন চাকরী স্থলে। ইন্দোরের আর্ট স্কুলের নৈশ বিভাগে দু বছর পার্ট টাইম ছাত্র হিসাবে কাটিয়েছেন। ১৭ বছর বয়সে ইন্দোরে অনুষ্ঠিত কোন একটি প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করে একটি সোনার মেডেলও পেয়েছিলেন। ১৯৩৭ সালে হঠাৎ পরিবারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্কচ্ছেদ করে বম্বেতে চলে যান। বম্বে গিয়ে সিনেমার হোর্ডিং পেনটিং-এর একটি কোম্পানীতে কাজ নিয়ে জীবনধারণ করতে শুরু করেন। ১৯৪০ সালে সে-কাজ ছেড়ে দিয়ে আসবাব নির্মাতার একটি কোম্পানীতে চাকরী নিয়ে শিশুদের জন্য তৈরী আসবাবে রং করার আর ছবি আঁকার কাজ নেন। তাঁর ছবি আঁকায় কিন্তু কখনও ছেদ পড়েনি। ১৯৪২-৭৩-এ যখন বম্বেতে ইংরাজ এবং মার্কিন সামরিক বাহিনীর লোকদের প্রচুর সমাগম, তখন মাঝে-মধ্যে সৈনাবাহিনীর তরুণ শিক্ষিত অফিসারদের কাছে কিছু কিছু ছবি বিক্রীও করেছেন। কিন্তু সমকর শিল্প-জগতের তখনকার প্রধান পৃষ্ঠপোষক সেলিসিয়ার, বাট্লি ফল লাইটনে ও লাংহামার এবং সদ্য খ্যাতিমান তরুণ-শিল্পী ফ্রান্সিস নিউটনি সুজা আর কাউকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন কখনই যখন ১৯৫৭ সালে বম্বে আর্ট সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত বার্ষিক প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেলেন। সুজার আমন্ত্রণে হুসেন সদ্যপ্রতিষ্ঠিত প্রগ্রেসিভ আর্টিস্টস গ্রুপে যোগ দেন। ১৯৪৮ সালে হুসেন চাকরী ছেড়ে ছবি আঁকাকেই প্রধান পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। ১৯৫০ সালে হুসেন বোম্বাইতে তাঁর ছবির প্রথম একক প্রদর্শনী করেন। তখন তাঁর বয়স ৩৫ বছর। ১৯৫৫ সালে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত ললিত কলা আকাদেমি কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে চারুকলায় জাতীয় পুরস্কার পান। ঐ বছরই তিনি প্রথমবার ভেনিসের দ্বি-বাৎসরিক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫৯ সালে টোকিও দ্বি-বাৎসরিক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে একটি পুরস্কার লাভ করেন।

হুসেনসাহেব কাব্য-পাঠের প্রথম প্রেরণা লাভ করেন শৈশবে বরোদায় মাদ্রাসায় পড়বার সময়ে তাঁর এক গুরুর কাছ থেকে। এই চাচা উর্দুতে শায়র লিখতেন। তাঁর অনুপ্রেরণায় হুসেনও উর্দু ভাষায় কবিতা রচনাতে হাত পাকান। কাব্যপ্রীতি তাঁকে কখনও ত্যাগ করেনি। এখনও উর্দুতে শায়র এবং ইংরিজিতে পদ্য লিখে থাকেন। তবে অন্য যে শিল্প-মাধ্যমে হুসেন সক্রিয়ভাবে আকৃষ্ট তা ফিল্ম। তাঁর প্রথম ফিল্ম থ্রু দি আইস অফ এ পেন্টার ১৯৬৭ সালের বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল-এ ছোট দৈর্ঘ্যের শ্রেষ্ঠ ফিল্ম বলে বিবেচিত হয় এবং গোল্ডেন বেয়ার পুরস্কার লাভ করে।

১৯৫৮-তে ভারত সরকার হুসেনকে পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত করেন এবং ১৯৭৩-এ পদ্মবিভূষণ হন। এমার্জেন্সি সমর্থনের দায়ে শিল্পী ও সরকারের মহলে হুসেন আজ একা। অবশ্য হুসেন বরাবরই একা। প্রোগ্রেসিভ পেন্টারস গ্রুপের ইনটেলেকচ্যুয়াল শিল্পীদের মধ্যে সাদামাটা হুসেন ছিলেন নিঃসঙ্গ। আবার বাইরের চেহারার এই মানুষটি কিন্তু শিল্পী সাধারণ মানুষদের সঙ্গে খুব সহজে বিচরণ করতে পারেন, খুব সহজে তাদের সঙ্গে একাত্মতা হতে পারেন। কয়েক বছর আগে হায়দরাবাদ শহরের কাছে দশহরার দিন একটি রামলীলা অনুষ্ঠানে হুসেনের রামায়ণ সিরিজের বেশ কয়েকটি ছবি অনুষ্ঠানের প্রেক্ষাপট হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গত নভেম্বরে অযোধ্যা-উপদেশের সমাদরাপকলবর্তী অংশের উপর দিয়ে মাত্র সাত বছর যাবার মাসখানেকের মধ্যে দুজন মৃত ভারতীয় শিল্পী সেখানে গিয়েছিলেন একজন হায়দরাবাদের তরুণ শিল্পী লক্ষ্মা গৌড়, অপরজন প্রবীণ শিল্পী মকবুল ফিদা হুসেন। গণতন্ত্রপ্রেমী বা জনপ্রিয় হোন গণশিল্পী সেখানে যান নি; লক্ষ্মা এবং হুসেন দুজনেই তাঁদের অধ্যাত্ম-অন্তর্ভুক্তিভিত্তিক ছবির বিনিময়ে নগদ অর্থ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের ত্রাণ কাজে দান করেছেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

দাম তিন টাকা। অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২৫ নয়সা

এপার বাংলা ওপার বাংলার বিশিষ্ট শিল্পী
সমন্বয়ে — যাত্রায় আলোড়ন আনবে —

পৌরাণিক পালা

কমলে কামিনী

রচনা • রবীন ব্যানার্জি • সুর • দুর্গা সেন
চণ্ডীপাঠ • বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

সামাজিক পালা

ব্যথার পাঁচালী

রচনা • বিশ্বজিৎ ধুরকায়স্থ • সুর • তরুণ মুখোপাধ্যায়

সঞ্জীবন দাসের

তটিনীর বিচার

সুর • প্রশান্ত ভট্টাচার্য্য (বড়)

নাট্য নির্দেশনা ও প্রধান চরিত্রে
পশুপতি ঘোষ

চরিত্র সৃষ্টি
অমর ব্যানার্জি • গৌর অধিকারী • নান্টু গাঙ্গুলী
চণ্ডী ব্যানার্জি • অনিল রায় • অমূল্য বোস • নবকুমার
পঞ্চু সেন (ছোট) • ফকিরচাঁদ (গানে) • রবি গুপ্ত
মন্টু দাস • মুকুল মিত্র • অরুণকুমার • দক্ষিণা • সুদর্শনা
সীমা • মালবিকা • রাজ্যলক্ষ্মী
তপতী রায় • মিতালী মণ্ডল • ভারতী সাহা
নৃত্যে • অঞ্জনা চ্যাটার্জি • হেনা চ্যাটার্জি
ছবি • ললিতা সিনহা • গৌরী • পিয়ালী ও বলাই মাষ্টার
এবং
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর পর ৩ বৎসর সঙ্গীতে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার সম্মানিত
কিতীশ রায়

পরিচালক • **গোপেন দেব**
ম্যানেজার • নারায়ণ নন্দী • মুক্তি শঙ্কর
অফিস-ইন-চার্জ — দেবু গাঙ্গুলী
ব্যবস্থাপনা — গৌর অধিকারী
কার্য্যাধ্যক্ষ • অজিত কোলে • উত্তমকুমার
সর্বাধিনায়ক • পশুপতি ঘোষ

পরিবেশনা
লোকনাথ অপেরা

প্রোঃ • লোকনাথ সাউ
৩১১ রবীন্দ্র সরণী • কলিকাতা-৬ • ফোন-৩৫ ১২৯৩

Regd. No. WB/NC-13
Gram : AMRITA Calcutta-3

বিশুদ্ধ 'কুকমী' গুঁড়া মশলার ক্রেতারা

সাবধান!

'কুকমী' গুঁড়া মশলার জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে কলকাতার কয়েকটি গুঁড়া মশলা কোম্পানী তাদের নিজস্ব নিকৃষ্টমানের ব্রাণ্ডের সংগে জনপ্রিয় কুকমীর নাম জুড়ে হুবহু কুকমী (Cookme) নামের স্টাইল নকল করে আসল কুকমী গুঁড়া মশলা বলে বাজারে চালাবার চেষ্টা করছে।

কেনার সময় দেখে নেবেন— 'কুকমী'র প্যাকেটে কেবলমাত্র 'কুকমী' (Cookme) ছাপই আছে,— অন্য কোন ব্রাণ্ডের নাম যুক্ত নেই।

প্রস্তুতকারক :

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ

২৩৫ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা ৭০০০৭০ ● ফোন : ৩৩০৯৯৫, ৩২৬৬৩২

পোস্ট বক্স নং : বড়বাজার ৬৮৮৫ ● ফ্যাক্টরী : কাশীপুর

iaa 590

CENTRAL LIBRARY

নতুন

এইচ এম ভি'র দুটি মজবুত সেট

বিস্ময়কর এদের গড়ন আরও বিস্ময়কর এদের সুলভ দাম!

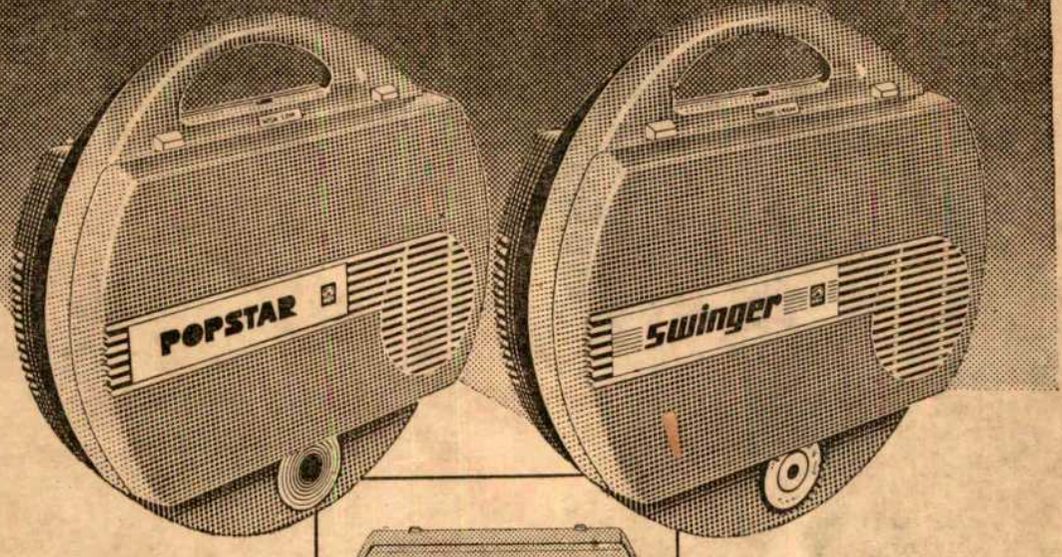

GC 9608

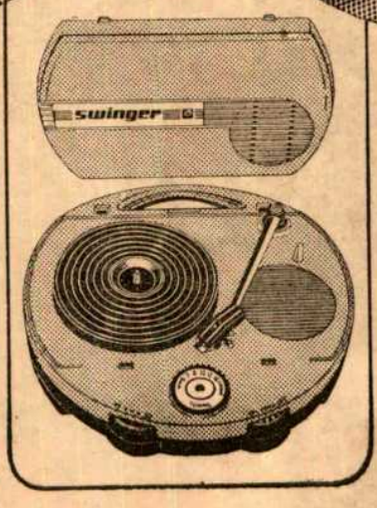

পপস্টার

ট্রানসমেইন্‌স
রেকর্ড প্লেয়ার

ছিমছাম-মজবুত-সুদৃশ্য। বিভিন্ন মনোরম রঙে পাওয়া যায়। এর গড়ন আপনাকে মুগ্ধ করবে।

পপস্টার রেকর্ড প্লেয়ার। দু'রকম স্পীডে এবং ব্যাটারিতে ও এসি মেইন্‌সে চলে। হঠাৎ বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে বা বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলেও পপস্টার কিন্তু থামবে না—স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেইন্‌স থেকে ব্যাটারিতে চলতে শুরু করবে। হাতে নিয়ে ঘোরাফেরা করতে কোনো অসুবিধে নেই—তাই যেখানে খুশী নিয়ে বাজাতে পারেন। তবে এই সেটটির আসল উৎকর্ষ লুকিয়ে আছে এর নিখুঁত আওয়াজে আর নির্ঝঞ্ঝাট কাজে। অপূর্ব, তাই না!

সুইঙ্গার

ট্রান্সমেইন্‌স
রেডিওগ্রাম

সুইঙ্গার আরও এক ধাপ এগিয়ে আছে—কারণ সুইঙ্গারের সঙ্গে আছে একটি মিডিয়াম ওয়েভ রেডিও!

এই সুন্দর রেডিওগ্রামটি আপনার গানবাজনা শোনার আনন্দ আরো বাড়িয়ে দেয়। স্থানীয় রেডিও স্টেশনের প্রিয় অনুষ্ঠানগুলি এবং আপনার পছন্দের রেকর্ডের নিখুঁত, ডরাট আওয়াজে আপনার মন ভরিয়ে তুলবে। নজরকাড়া নানান রঙে পাবেন সুইঙ্গার—চলে ব্যাটারিতে ও এসি মেইন্‌সে। চালিয়ে দেখুন।

HMV

আপনার কাছাকাছি এইচ এম ভি ডীলারের দোকানে আসুন।

হিজ মাস্টার্স ভয়েস
উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি

একটি আকর্ষণীয় উপহারের বাক্সে পাবেন। সব উপলক্ষে সেরা উপহার।

নটরাজন-এর চাঞ্চল্যকর রচনা

লালবাজার ২০.

থানার মাটি নোনা ১৬.

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সার্থক উপন্যাস

শেষ বিচার ১৮.

স্বাতী ও দীপু ১২.

শ্রীকৃষ্ণের যৌবনলীলা এবং দ্বারকা ও বেট-দ্বারকার কৃষ্ণলীলা-স্থল পরিক্রমা অবলম্বনে বাংলা সাহিত্যের প্রথম ভ্রমণ কাহিনী

শঙ্কু মহারাজ-এর

মন-দ্বারকায় ১২.

শ্রীকৃষ্ণের শৈশব ও কৈশোর লীলা এবং বিশ্বের প্রাচীনতম পদ-যাত্রা ব্রজ-পরিক্রমার ওপরে রচিত বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তম ভ্রমণকাহিনী, এই লেখকের

মধু-বৃন্দাবনে

তিন শ' পৃষ্ঠার তিনটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ পর্বে সমাপ্ত। প্রতিটি পর্ব আলোকচিত্র, মানচিত্র, পথপঞ্জী ও বিষয়সূচীসমৃদ্ধ। মূল্য প্রতি পর্ব বারো টাকা।

এই লেখকের

চতুরঙ্গীর অঙ্গনে ১৫.

শৈলেশ দে'র অবিস্মরণীয় সৃষ্টি

গান্ধীজী ও নেতাজী ২০.

ব্রজমাধব ভট্টাচার্যের সাম্প্রতিকতম উপন্যাস

ত্রিভুবনের বাইরে ১৮.

শান্তিপদ রাজগুরুর উপন্যাস

অনুসন্ধান ১৫.

কাশীকান্ত মৈত্রের

গণতন্ত্র মুখোশ ও মুখশ্রী ২৫

নারায়ণ সান্যালের

বিহঙ্গ বাসনা ১০

গজমুক্তা ১০.

সুবোধ ঘোষের

গল্প মনিঘর ১৪

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

আকাশে আয়না ১০

একাল চিরকাল ১০.

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের

গোমুখীর পথ ১৬.

কুশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

থৈ থৈ হাহাকার ১৮.

অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সুবর্নশিরি ২০.

নিখিলচন্দ্র সরকারের

সজনে নির্জনে ১২

দুঃখেসুখেবাঁচা ১০.

কলহনের

খবরে প্রকাশ ১০.

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের

প্রেম ঘৃণা দাহ ৮.

শ্রীহংস-এর

লাস্ট ওয়ার্ড ৬.

গাইনিক ওয়ার্ড ৮.

রবীন্দ্র লাইব্রেরী

১৫।২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০০৭৩

ফোন : ৩৪-৮৩৫৬

সম্পূর্ণ ক্যাটলগের প্রয়োজন হলে লিখুন।

অমৃত

সুখের স্মৃতি দুঃখের স্মৃতি

রাণী চন্দ

গুরুশিষ্য ছবিতে যুগল বন্দী। অবনীন্দ্রনাথ আর রাণী চন্দ। দু'জনে মিলে এক সঙ্গে এঁকেছিলেন শান্তিনিকেতনের অনেকগুলো রঙিন ছবি। সেই ছবি আঁকার অসাধারণ কাহিনী এই প্রথম লিখলেন অসামান্যা লেখিকা রাণী চন্দ। এই ধরণের পূজো সংখ্যায় তাঁর লেখাও এই প্রথম।

রবিঠাকুরের পাগলা ফাইল

অমিতাভ চৌধুরী

বন্ধ উন্মাদ, পাগল ও ছিট গ্রস্তদের রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠি। কেউ চাইছে পেঁপের বিচি, কেউ চাইছে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার সোজা রাস্তা, কেউ পাঠাচ্ছে সোনালী চুলের গোছা। শত শত চিঠি। রবীন্দ্রনাথ কী করেছেন সেই চিঠির তাড়া নিয়ে?

এবার পূজোয় সব চেয়ে বড় আকর্ষণ শান্তিনিকেতনের যাদুঘর থেকে অমৃতের জন্য বিশেষভাবে আনা অমিতাভ চৌধুরীর এই সুদীর্ঘ সচিত্র রচনা।

লেখক যখন প্রেমিক

যখন ডায়রির পাতায় এক একটি শব্দ মানে স্মৃতির শুকনো বকুল। একজন বিশিষ্ট বাঙালী লেখক মধ্য বয়সে নিতান্ত সামান্যা বালিকার প্রেমে পড়েছিলেন। লেখকের নামটি পরে প্রকাশ্য। অন্যতম শারদীয়া চমক।

উল্লম্বনারী

ভবেশ সান্যাল

আসামের ছেলে ভবেশ সান্যাল চৌরঙ্গীর আর্ট স্কুলে ছবি আঁকতে এসে মডেলের খোঁজে ছুটলেন নিষিদ্ধ পল্লীতে। তখন ছবির জগতে রয়েছেন অবন ঠাকুর, বামিনী রায়। গল্পকে হার মানান ভাষায়, সেই সব মানুষ ও সময়ের কথা।

নরবলি এখনও আছে

অবিশ্বাস্য হলেও বিশ্বাস করতে হবে। ওড়িশার গাঁয়ে ঘুরে নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন সংকর্ষণ রায়—চরি অব ইতিহাসে নিপুণ ধারাবিবরণী।

শিশির ও বিশ্বনাথ

মধুসূদন মজুমদার

প্রখ্যাত নট শিশির ভাদুড়ীর ভাই বিশ্বনাথ ভাদুড়ীও কম যেতেন না। তাই নিয়ে শিশিরবাবুর মধ্যে একটু ঈর্ষাও ছিল সম্ভবত। দুই ভাদুড়ীর ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ ফুটেছে এই লেখাটিতে।

উপন্যাস লিখছেন

আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, শচীন দাস।

বড় গল্প লিখছেন

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, লীলা মজুমদার, নবনীতা দেব সেন এবং শৈবাল মিত্র।

গল্প লিখছেন

মনোজ বসু, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, পরিতোষ সেন, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ, অমর মিত্র ও আরও অনেকে।

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের প্রবন্ধ
সুমথনাথ ঘোষের 'সাহিত্যিক আড্ডা'

কবিতা লিখছেন

অরুণ মিত্র, মনীন্দ্র রায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, কৃষ্ণ ধর, আলোক সরকার, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, সুনীল নন্দী এবং আরও অনেকে।

শ্রীদুর্গা ও শ্রীগৌরাঙ্গের রঙিন অফসেট ছবি

আপনার কপির জন্য হকার বা এজেন্টকে এখুনি বলে রাখুন অথবা লিখুন সার্কুলেশন ম্যানেজার; অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কলি-৩।

সেপ্টেম্বরেই বেরোবে

দাম ঃ দশ টাকা। রেজিষ্ট্রি ডাকে অতিরিক্ত দু টাকা পঁচিশ পয়সা

১৮ বর্ষ
১৬ সংখ্যা
১৫ ভাদ্র, ১৩৮৫
1 September, 1978

সম্পাদকীয় ৩
সাহিত্য ইত্যাদি ঃ মনীন্দ্র রায়
সমালোচনা ৫
প্রচুর ও দুর্লভ ৭
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
ভাগ্য গণনা ৯ শ্রীমানিক্য
রাজধানীর ইনসাইড স্টোরি ১০
পর্যবেক্ষক
বাজনীতি কলকাতা স্টাইল ১১
বেদব্যাস বৈদ্য

প্রচ্ছদকাহিনী ১২

ফিল্মমেকার বুদ্ধদেব
নির্মলকুমার দাস
প্রচ্ছদের রঙীন ছবি
প্রফুল্ল মিত্র

কবিতা ১৬ নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়
শংকর দে, বাসুদেব দেব,
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শক্তিপদ ব্রহ্মচারী
হাওয়াগাড়ি (উপন্যাস) ১৭
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
ভারত কী করে ভাগ হল ২২
বিমলানন্দ শাসমল
কোনদিন জংগলে ২৭
পিনাকী চট্টোপাধ্যায়
তরণীপাহাড়ে বসন্ত (উপন্যাস) ৩০
নীরোদ মিত্র
চিত্তবিনোদনে অতুলপ্রসাদ ৩৬
সোমেন্দ্রনাথ গুপ্ত
সোনার হরিণ নেই (উপন্যাস) ৪০
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
আতরের খালি শিশি (গল্প) ৪৭
গৌরীশংকর ভট্টাচার্য
সমাধান (গল্প) ৫২
বিশ্বনাথ ঘোষ চৌধুরী
খেলা ৫৫
সাবাস পাড়ুকোন ৫৬
লিংকম্যান
ভিন্ন আর নেই ৫৭
শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়
বোম্বাই বিচিত্রা ৫৮
চিত্রধ্বনি ৬১

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ কাহিনী
জগদীশ গুপ্তের প্রত্যাবর্তন
গল্প লিখছেন
প্রফুল্লকুমার সিংহ

মৎস্য সমাচার

কলকাতার বাজারে মাছের সরবরাহ এখন ভয়াবহ রকম কম হয়ে দাঁড়িয়েছে। দাম প্রায় সব মাছেরই আকাশছোঁয়া। খবরে প্রকাশ, একদিন নাকি কই মাছের দাম ৪০ টাকা কেজিও হয়েছিল। তাছাড়া কাটা পোনা ও ইলিশ ২২ টাকা, এ তো রোজকার ঘটনা। এমনকি চিরঅবহেলিত তেলাপিয়াও ৮ টাকা দামে বিকি হচ্ছে। এবং জোগান না থাকায় অনেক ব্যবসায়ী দোকানও বন্ধ করে দিচ্ছেন।

মাছের এই ঘাটতি বা আধা-দুর্ভিক্ষের কারণ কী, সে বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। হাওড়ার মৎস্য ব্যবসায়ীদের সংগঠন থেকে তাঁদের মুখপাত্র যা জানিয়েছেন, তাতে মনে হয় জোগান কমে যাবার কারণ ত্রিবিধ। (১) এখন ডিম ছাড়ার সময় বলে মাছ মারা বারণ; (২) বারাসত বসিরহাট অঞ্চলের ভেড়ি লুট; (৩) পূর্বতন সরকার ভেড়িগুলোকে জাতীয়করণের যে প্রস্তাব তুলেছিলেন তার ফলে ভেড়ি মালিকদের ভীতি। তাছাড়া, বেশি দাম দেয় বলে বেশ কিছু মাছ উত্তরবঙ্গ ও আসামে চলে যায়, এও নাকি অন্যতম কারণ।

অন্যদিকে সরকারী মুখপাত্রের বক্তব্য হল, মাঝে মাঝে জোর-জবরদস্তি করে দলবদ্ধভাবে ভেড়ি লুটের ঘটনা ঘটছে বটে, কিন্তু সে মাছ তো বাজারেই আসছে। তাঁর বক্তব্য থেকে প্রধান কারণ মনে হয় দুটি। (১) বাজারে মাছের দাম যত চড়া তা বহুলভাবে ফাঁপিয়ে তোলা। যে দামে পাইকাররা মাছ সংগ্রহ করেন তার ওপর মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীরা বেশ বড় রকম লাভ উশুল করে তবে তা খুচরো বাজারে ছাড়েন। সেটাই মূল্য বৃদ্ধির একটা বড় কারণ। (২) সমবায় ভিত্তিতে মৎস্য চাষের যে ব্যবস্থা আগে করা হয়েছিল তার ব্যর্থতা। নদীয়া জেলায় এ-রকম ৮০টি কো-অপারেটিভ সংস্থাকে চারা মাছ সরবরাহ করেছিলেন সরকার, তাঁরা কেউই এ পর্যন্ত মাছের জোগান দেন নি। তাঁরা জানাচ্ছেন, কো-অপারেটিভের পুকুরগুলোর পাড় ভেসে যাওয়ায় মাছগুলো সব নাকি পালিয়ে গেছে। যুক্তিটা অভিনব বটে। কিন্তু এ বিষয়ে প্রকৃত পরিস্থিতি এতটাই খারাপ কিনা, তা জানার জন্যে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে অজ্ঞাত রয়ে গেল।

অবশ্য সরকারী সূত্র থেকে কয়েকটি আশার খবরও যে না শোনা গেছে তা নয়।

গুজরাট সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে সেখান থেকে মাছ আমদানীর জন্যে। তা সফল হলে সরবরাহের পরিমাণ কিছুটা অন্তত বাড়বে। চার মাস বসে থাকার পর চারখানি সরকারী ট্রলার সমুদ্রের মাছ ধরে তোলার জন্যে বেরিয়ে পড়ছে অচিরেই সে মাছ বাজারে এলে দাম কিছুটা কমবে। তাছাড়া মাছের ভেড়িগুলোকে সরকারী আওতায় আনা যায় কিনা সে বিষয়েও বিবেচনা করা হচ্ছে।

আপাতত অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য উপায় দেখা যাচ্ছে না।

সাহিত্য ইত্যাদি...

সাহিত্য ও পুরনো বই

কলেজ স্ট্রীটের পুরনো বইয়ের দোকানগুলো বড় আশ্চর্য জায়গা। হঠাৎ হঠাৎ অভাবিত সব পণ্ডিত ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। তাঁরা সকলেই যে খুব বিখ্যাত মানুষ তা নয়। কিন্তু কলেজ আর লাইব্রেরির ঘরের মধ্যেই তাঁদের স্বাভাবিক গতিবিধি তাঁদের পক্ষে এই সব দোকান আর ফুটপাতের পশরা আউট এবং রাউন্ডসই হবার কথা।

কিন্তু না, এ ধারণা ঠিক নয়। সেটা বুঝতে পেরেছিলাম, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের এক উক্তিতে।

এম সি সরকার অ্যান্ড সন্সের সান্ধ্য বৈঠকে সেকালের জনৈক ঊর্ধ্বতন সাহিত্যিক মলাটহীন একখানা বই দেখিয়ে বললেন, মাত্র চার আনায় পেয়েছেন। হাতে নিয়ে দেখলাম, পাঁচকড়ি দের 'নীল বসনা সুন্দরী'। বললাম, এ বই এখনো পাওয়া যায়?

খোঁজ রাখলে পাওয়া যায় বইকি। নজর রাখতে হয়। পূর্বোক্ত সাহিত্যিক মন্তব্য করলেন।

আমি বললাম, শক্ত ব্যাপার। একটি মাত্র বইয়ের জন্যে অতোগুলো দোকান আর ফুটপাত চষে বেড়ানো।

তখনি শুনতে পেলাম সেই আশ্চর্য খবর।

কেদারবাবু তাঁর স্বাভাবিক গলায় তীর্যক দৃষ্টি ফেলে বললেন, দরকার থাকলে তা তো খুঁজতেই হয়। বলেন বাড়ুজ্যে খুঁজতেন, অনেক রকম দুষ্প্রাপ্য বই তিনি পেয়েছেন ওখানে। শুনেছি হরিনাথ দেকেও দেখা যেত পুরনো বইয়ের দোকানে।

তারপর থেকে আমিও অনেক নামী অনামী সাহিত্যিককে আবিষ্কার করেছি ওখানে। অধ্যাপক বন্ধুদের কাউকে কাউকে তো প্রায়ই দেখতে পাই।

বাস্তবিক পুরনো বই এক আশ্চর্য জিনিস। বছরের পর বছর চেষ্টা করেও আপনার নিজস্ব প্রয়োজনের যে বিশেষ বইটি আপনি কোথাও খুঁজে পাচ্ছিলেন না, হঠাৎ হয়তো তার সাক্ষাৎ পেলেন লেভিঙের পাশে থাকা করা স্টলে। এখানেই আমি পেয়েছিলাম আরিস্টটলের 'পোয়েটিক্স' বইটি। এবং সুশীল গুপ্ত কোম্পানীর 'ভাত' মার্কা বইয়ের সিরিজে ভলটেয়ার-এর 'ক্যান্ডিড'। (তখন আমরা ইংরেজি উচ্চারণে এইরকমই বলতাম। এখন ফরাসীবিদ কবি অবশ্য মিত্রের অনুবাদ প্রকাশিত হবার পর অবশ্যই বলতে হবে কাঁদিদ।) এবং এই সব ইংরেজী বই-ই শুধু নয়, বাংলা বইও পেয়েছি। তার প্রায়গুলো যে খুব সারগর্ভ তাও নয়। যেমন বহু বছর আগে হঠাৎ একটা স্টলে পেয়েছিলাম 'মানদার আত্মকথা' যা সেকালে প্রকাশ্যে দেখা যেত না।

এ প্রসঙ্গে আরো দুটো মজার ঘটনা মনে পড়ল। বইগুলো কেমন বিচিত্র গতিতে চলাফেরা করে তার হদিস পাওয়া যাবে হয়তো।

কবি বিষ্ণু দে যখন কলকাতার এক বেসরকারি কলেজের শিক্ষক ছিলেন সেই-কালে তাঁর এক সহকর্মী বন্ধু তাঁর কাছ থেকে একখানা বই নেন। এবং মাসের পর মাস ধরে সে বই আর ফেরৎ দেবার নাম করেন না। বইটি দরকারি, অনেক চেষ্টাচরিত্র করে বিলেত থেকে আনানো। ফেরৎ না পেয়ে বিষ্ণুবাবু উদ্বেগ বোধ করতে থাকেন। শেষে নিজেই গিয়ে হাজির হন বন্ধুর বাড়িতে।

বিষ্ণুবাবুকে দেখে অনেক শোকগোল করে তাঁকে বসিয়ে কুশল সংবাদ বিনিময়ের পর তাঁর উদ্দেশ্য জানতে পেরে বন্ধুবর যেন আকাশ থেকে পড়লেন, বলেন কি, সে বই তো গত সপ্তাহেই আপনাকে দিয়ে এলাম।

বিষ্ণুবাবু অবাক। সবিনয়ে জানালেন, গত সপ্তাহে তো তিনি বিষ্ণুবাবুর বাড়ি যাননি।

উনি বললেন তাহলে তার আগের সপ্তাহে হবে। আচ্ছা নিজেই দেখে যান। একটু আসুন তো। —বলে বিষ্ণুবাবুকে নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে একটা আলমারির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, ঐ দেখুন, মাঝের তাকের বাঁদিক থেকে ফোর্থ বইয়ের পাশে একটা ফাঁক। ওখানেই ছিল বইখানা। আপনাকে যদি নাই দেব তো জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেল কী করে?

অকাট্য যুক্তি, তাই না! কিন্তু কী করে ফাঁকা হয়ে গেল তা আমি বুঝতে পেরেছি বেশ কয়েক বছর পর। যখন তাঁর শোবার ঘরে গিয়েছিলাম একদিন তাঁর কাছ থেকে একটি লেখা আনতে। ঘরে শয্যাশায়ী ছিলেন তিনি। আমি গেছি শুনে লেখাটির বিষয়ে কয়েকটি ফোটোগ্রাফ দেখিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবার জন্যে সামনে ডাকেছিলেন তিনি। তখনি, তাঁর কথা-গুলো শুনতে শুনতে দেয়ালের পাশে রাখা কেস-এ অন্য কয়েকটা বইয়ের সঙ্গে সগৌরবে বিরাজ করতে দেখি নিরুদ্দিষ্ট বইখানাকে।

কিন্তু এ খবর বিষ্ণুবাবুকে আর জানাতে পারিনি তখন।

দ্বিতীয় কাহিনীটি আরো ইন্টারেস্টিং। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় মানে আমাদের পবিত্রদা ছিলেন অজাতশত্রু মানুষ। কেবল তাই নয় সাহিত্যিকদের তিনি প্রায় দিয়ে ভালোবাসতেন, এবং অযাচিতভাবেই তাঁদের উপকার করে ফিরতেন এ ব্যাপারে কাজি নজরুল ইসলাম থেকে শুরু করে তরুণতম লেখক পর্যন্ত, কাউকেই তিনি বাদ দিতেন না। ফলে সকলেরই তিনি হয়ে উঠতেন ঘরের মানুষ। অচিন্ত্যকুমার সেন-গুপ্ত তাঁর 'কল্লোল যুগে' ঠিকই বলেছেন, পবিত্র সকলের হাঁড়ির খবর নিয়ে হাঁড়ির ওপর সদা হয়ে বসত।

এ হেন সর্বজনপ্রীতিধন্য মানুষকে সকলেই যে নিজেদের নতুন বই উপহার দেবেন তাতে আর আশ্চর্য কী। কিন্তু এই উপহার দেওয়া বই নিয়েই একবার এক মজার ব্যাপার ঘটেছিল।

নজরুল পবিত্রদাকে তাঁর সদ্য প্রকাশিত বই 'অগ্নিবীণা'র এক কপি উপহার দিয়ে-ছিলেন পবিত্রদার জন্মদিনে। সে বই কিছু-কালের মধ্যেই ফুটপাতে চলে আসে। সেখান থেকে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সে বই কিনে নিয়ে উপহার দেন নজরুলের জন্মদিনে। নজরুল কিন্তু হ্যাঁ, না কিছুই বলেন না। তারপর পবিত্রদার পরবর্তী জন্মদিনে সেই বই-ই উপহার দেন আবার পবিত্রদাকে।

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

বই সম্বন্ধে সব থেকে বড় কথা, এজগতে নতুনের চেয়ে পুরনোর কদর বেশি। এবং পুরনো বইয়ের বেশি কদর বাড়ে যদি সে বই কোনো বিখ্যাত মানুষের সংগ্রহ থেকে আসে, তাঁর অভিনিবেশের চিহ্ন বহন করে।

ধরুন, শেকসপীয়রের কোনো বই যদি সেকালের স্বনামধন্য অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের সংগ্রহ থেকে হাতসাফাই করে কেউ ফুটপাতে এনে বিক্রি করে এবং সে বই কোনো উপযুক্ত ব্যক্তি কিনে নিয়ে তার মার্জিনে প্রফুল্লচন্দ্রের মন্তব্য দেখতে পান, তার যা আনন্দ তা কি টাকায় মাপা যাবে?

আমিও একবার এইরকমভাবে পেয়ে-ছিলাম অধ্যক্ষ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের মার্জিন নোট সহ ইংরেজি আধুনিক কবিতার একখানা সংকলন (যা এককালে এম-এর পাঠ্য ছিল।) বহুদিন বইটি সযত্নে রেখেছিলাম। তারপর একদিন দেখি, নেই।

কী জানি আবার হয়তো ফুটপাতেই ফিরে গেছে।

পুনশ্চ : গত সপ্তাহের লেখায় প্রথম প্যারাগ্রাফে ওপর থেকে ৮ম লাইনে 'নাথুলা'র পর হবে 'গিরিবর্ত্ম'। ৪র্থ প্যারাগ্রাফের ৭ম লাইনে 'কিন্তুস' বদলে হবে 'দ্বিতল'। ম,

—মতীন্দ্র রায়

স্বর্ণকুমারী-জ্যোতির্ময়ী-গিরিবালা

এককালের জনপ্রিয় লেখক আরেককালে জনস্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যান। সাহিত্যের ইতিহাসে এরকম ঘটনা বিরল নয়। কাল নিষ্ঠুর, মানুষের রুচি পরিবর্তনশীল। অনেক লেখকই তাঁদের শিল্পখ্যাতির সম্পূর্ণ অবসান দেখে গেছেন তাঁদের জীবনে। প্রাচীন সাহিত্যের বহু লেখকই আজ মুষ্টিমেয় পাঠকের পরিচিত—তাঁদের নাম ও খ্যাতির বিপুল বিস্তার সত্ত্বেও তাঁদের রচনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় নিতান্তই সীমাবদ্ধ। বাংলা সাহিত্যেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে যাঁরা জনপ্রিয়তার তুঙ্গচূড়ায় আসীন ছিলেন তাঁরা অনেকেই বিস্মৃত কিংবা বিস্মৃতপ্রায়। সাহিত্যের ইতিহাসে আলোচিত ও কীর্তিত হওয়া সত্ত্বেও আজকের পাঠক তাঁদের রচনাকে সঙ্গে গ্রহণ করেননি। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা নবীনচন্দ্র সেন যাঁরা একদিন বাঙালী পাঠককে মুগ্ধ করেছিলেন তাঁদের রচনা পরিকল্পনার বিরাটত্বে, আবেগের প্রচণ্ডতায় এবং রচনাশক্তির উচ্ছ্বাসে, আজ তাঁদের সঙ্গে সাধারণ রসিক-সমাজের আজ কোন যোগ নেই। কোথায় হারিয়ে গেলেন তাঁরা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ যত্ন ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের গ্রন্থাবলী ছেপেছেন। বিদগ্ধ লেখকেরা তাঁদের সাহিত্য-কৃতির নিপুণ বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে তাঁদের গ্রন্থ পাঠ্য-তালিকায় যুক্ত করেছেন। কিন্তু হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র পাঠকসমাজে আর প্রতিষ্ঠা পেলেন না। যাঁরা ইতিহাসের ধারা বিশ্লেষণ করার জন্য কিংবা বাংলা কাব্যের পালা-বদলের ইতিহাস বোঝার জন্য তাঁদের রচনা পড়েন কিংবা পড়তে বাধ্য হন তাঁরাও তাঁদের রচনায় কোন জীবন্ত, প্রাণোচ্ছল কবিকে আবিষ্কার করতে পারেননি। ইতিহাসের যে মুহূর্তে তাঁরা ছিলেন সজীব ও মুখর, উদ্দীপ্ত এবং প্রেরণার উৎস সে মুহূর্তে-গুলিকে আর একবার পুনর্জীবিত করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে কালের সঙ্গে তাঁদের কালের সংঘাতের মধ্য দিয়ে তাঁদের কাব্যগ্রন্থগুলি নতুন কোন তাৎপর্যের আলোয় আর জ্বলে ওঠেনি। তাঁরা সাহিত্যের নিভে-যাওয়া নক্ষত্র, তাঁদের স্মৃতি হয়ত কোন কোন পাঠককে ক্ষণিক ব্যাকুল করে তোলে কিন্তু তাঁদের জীবন্ত উপস্থিতি আর অনুভব করা যায় না। শুধু কি হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র? ঊনবিংশ শতাব্দীর এমনকি বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেও যাঁরা লিখেছেন, প্রশংসা পেয়েছেন, খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁদের সঙ্গেই বা আজকের পাঠকের যোগ কতটা আন্তরিক। বিহারীলালকে সাধারণ পাঠকরা কতটা চেনেন, কতটা চেনেন দেবেন্দ্রনাথ সেনকে বা অক্ষয়কুমার বড়ালকে। এমনকি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, যাঁর গ্রন্থাবলী বাংলার অবলীলায় পাওয়া যায়, তিনিও কতটা বেঁচে আছেন। তাঁর খ্যাতি বহুশ্রুত। পাঠক মাত্রেই তাঁর নামের সঙ্গে পরিচিত, পাঠ্যপুস্তকের কল্যাণে শিক্ষিত বাঙালীমাত্র কোন না কোন সময়ে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁর রচনার স্বাদ গ্রহণ করেছেন, তবু মাইকেল বাঙালী পাঠক সমাজের মনে কোন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত নক্ষত্র, তাঁর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না, কিন্তু তাঁর সঙ্গে তাঁর রস উপভোগের কোন সম্পর্ক নেই। হতে পারে বেদনাদায়ক, কিন্তু সত্য।

শ্রীমতী বাণী রায় স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনাবলীর ভূমিকায় প্রশ্ন তুলেছেন স্বর্ণকুমারীর গ্রন্থাবলী পাওয়া দুষ্কর কেন? কেন বহু লেখিকার—অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, মানকুমারী দেবী, কামিনী রায়, শৈলবালা ঘোষজায়া প্রিয়ম্বদা দেবী, সীতাদেবী—রচনাবলী সংরক্ষণের কোন চেষ্টা নেই? এঁরা অনেকেই একদা জনপ্রিয় লেখিকা ছিলেন। পাঠকসমাজ একদা এঁদের রচনায় আনন্দ পেয়েছেন, তৃপ্তি বোধ করেছেন। কিন্তু আজ এঁরা পাঠকসমাজের কাছে প্রায় অপরিচিত। এর কারণ অবশ্যই এই নয় যে এঁরা মহিলা লেখক। বহু পুরুষ লেখকও বিস্মৃতির অতলে চলে গেছেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর সমসাময়িক এবং পরিচালনাধীন বহুমুখী লেখক নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের কথা ধরা যাক। উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ সবই লিখেছেন বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে দুখণ্ড রচনাবলীও প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলা ছোটগল্পের আদিপর্বে তিনি অনেক-গুলি উৎকৃষ্ট গল্প লিখেছেন, যেমন লিখেছেন স্বর্ণকুমারী দেবী, তাঁর উপন্যাসের মধ্যেও ছিল অনেক ইঙ্গিত যা পরবর্তীকালে পরিণতি পেয়েছিল। তিনি কোথায় হারিয়ে গেলেন। ঊনিশশ চল্লিশ সালে তিনি যখন মারা যান তখন বেদনার সঙ্গে অনুভব করে গেছেন যে তিনি তাঁর লেখার চেয়ে দীর্ঘ-জীবন পেয়েছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কথা ধরা যাক। বাল্মীকির জয় বা বেনের মেয়ের লেখক আজ কতটা পরিচিত। পণ্ডিত হর-প্রসাদের খ্যাতি পণ্ডিতমহলে সীমাবদ্ধ, কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাসের জোয়ারে গত শতকের দশকের বাংলাসাহিত্য যখন প্লাবিত হয়েছিল তখনও বেনের মেয়ের কথা আমাদের মনে পড়েনি। এই সেদিন যে জলধর সেন নামে একজন লেখক ছিলেন, উপন্যাস, ছোট-গল্প ভ্রমণকাহিনী লিখেছিলেন অসংখ্য—এবং একদা জনচিত্ত জয়ও করেছিলেন, তিনিই বা গেলেন কোথায়? কোথায় হারিয়ে গেলেন রবীন মাস্টার খ্যাত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত? কমলা ও জীবনায়নের মণীন্দ্রলাল বসু?

পাঠকের রুচিকে ধিক্কার দিয়ে লাভ নেই। সাহিত্যের ইতিহাসে এরকম ঘটনা বারবার ঘটেছে। আর লেখকের খ্যাতির অবসানের জন্য শুধু পাঠকের উপেক্ষাকে

দাবী করা ভুল হবে। লেখকের নিজের একটি সীমাবদ্ধতাও তার বড় কারণ। পলাশীর যুদ্ধের রক্তলোলিত শুদ্ধপ্রবাহ একদিন দেশকে মাতিয়েছিল, কিন্তু বিংশ-শতাব্দীতে পৌঁছনোর আগেই তা ক্ষীণ হয়ে গেল। আজ লক্ষ্য। একজন লেখক এককালের বড় লেখক, এককালের ভালো লেখক। কিন্তু তিনি দীর্ঘজীবী নাও হতে পারেন। তিনি যদি আজকালে স্মরণযোগ্য না হন তার জন্য ক্ষোভ থাকবে কেন? শতবর্ষ পরে কজন কবির কবিতার পাঠক থাকে? কজন লেখক শতবর্ষ পরেও তাদের রচনার উত্তরাধিকার সঞ্চারিত করে দিতে পারেন নতুনকালের পাঠক-পাঠিকার হৃদয়ে? কাল নির্মম সন্দেহ নেই, পাঠকের রুচি নিত্য নূতনের অনুসন্ধানী তাতেও সন্দেহ নেই আর সেই সঙ্গে মেনে নিতে হবে লেখকের শক্তির সীমাবদ্ধতা।

আর যদি স্বর্ণকুমারী, কিংবা প্রিয়-ম্বদাদেবী, অনুরূপা দেবী বা গিরিবালা দেবীর রচনার সঙ্গে আমাদের অপরিচয় ঘটে থাকে তা আমাদের রুচির বিকার বা সংকীর্ণতা একথা মানব না। ঐ লেখিকারা একদিনের পাঠকের মনে আসন পাতা দিতে সমর্থ হন একথাও স্বীকার করে নিতে হবে। এবং এ স্বীকার করার মধ্যে ঐ লেখিকাদের প্রতি কোন অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায় না। একটি নির্মম ঐতিহাসিক সত্যকে মেনে নেওয়া হয়।

কিন্তু আর একটা স্থূল সত্য। একজন লেখক হয়ত আজকের মানুষের কাছে অচল বিবেচিত নন। কিন্তু তার অর্থ নয় যে তিনি চিরকালের মত লুপ্ত হয়ে গেলেন। ইতিহাসের কোন পরিপ্রেক্ষিতে আবার তিনি সজীব হয়ে উঠতে পারেন। সাহিত্যের ইতিহাস এবং মানুষের চিন্তার ইতিহাসে একাধিকবার দেখা গেছে পুরনো যুগের কোন লেখকের। আবার হঠাৎ নতুন করে আবিষ্কৃত হয়েছেন যে লেখককে সবাই ভুলে গিয়েছিল আবার তাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। কার নতুন মূল্য কবে আমরা নির্ণীত হবে বলা সহজ নয়। আর এজন্যই শিক্ষিত পাঠকের এবং সমালোচকের দায়িত্ব। তাঁরা যখনই প্রাচীন এবং অর্বাচীন সাহিত্যের বিচার করবেন আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে তার সোপস্পর্শটি খুঁজবেন। মূল্যবিচারের পালা অনিঃশেষ।

সেইজন্য বিশেষ প্রয়োজন লেখককে বারবার পাঠকসমাজের সামনে তুলে ধরা। তাঁর রচনার সংরক্ষণ তাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীমতী বাণী রায় সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজ পালন করেছেন। বাংলাসাহিত্যের বহু কবি, ঔপন্যাসিক প্রাবন্ধিক পাঠকের কাছে যে ধরনের তার একটা কারণ বোধহয় তাঁদের অস্তিত্বই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের বিবর্ণ পাতায় বন্দী। তাঁরা যদি সহজে লভ্য হতেন, যদি তাঁদের রচনা সংস্কৃত পদ্ধতিলোচনের মত দুরূহ কাজ না হত, তাহলে তাঁরা সর্বসাধারণের পরিচিত হতেন এমন দাবী করি না। কিন্তু অন্তত সাহিত্য সমালোচক এবং দায়িত্বশীল সচেতন পাঠক সমাজ তাঁদের নতুন মূল্য বিচারে অগ্রসর হতে পারতেন। সমালোচক ও দুষ্প্রাপ্যগ্রন্থের সংগ্রহকারীর ভূমিকা স্বতন্ত্র।

শ্রীমতী বাণী রায় তিনজন যশস্বিনী লেখিকার—স্বর্ণকুমারী দেবী, গিরিবালা দেবী এবং জ্যোতির্ময়ী দেবী—রচনার তিনটি সংকলন প্রস্তুত করে আমাদের সকলের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। এই তিনটি রচনাবলীই অবশ্য লেখিকাত্রয়ীর রচনা সম্পূর্ণ সংকলন নয়। সম্পাদিকা রচনার নির্বাচন করেছেন। এই নির্বাচন অবশ্য সকলের মনঃপূত হবে মনে করি না। স্বর্ণকুমারীর কোন সংকলনে দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করি যে স্বর্ণকুমারীর ছোটগল্প একটিও গৃহীত হয়নি। স্বর্ণকুমারী 'নবকাহিনী' নামে একটি গল্পসংকলন প্রকাশ করেছিলেন আঠারশ বিরানব্বইতে—এই গল্পগুলির বেশ কয়েকটি লেখা হয়েছিল আরো অনেক আগে। অর্থাৎ বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার আগেই স্বর্ণকুমারী ছোটগল্প নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেছিলেন। বাংলা ছোটগল্পের প্রথম পর্বের ইতিহাসে তিনি তাই বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারীর ছোটগল্পের সংরক্ষণে বিশেষ উৎসাহ দেখাননি। উপন্যাসের মধ্যে 'বিদ্রোহ' এবং 'কাহাকে' সংগৃহীত হয়েছে। স্বর্ণকুমারী প্রায় বারোটি উপন্যাস লিখেছেন; কাজেই তার মধ্যে থেকে সম্পাদিকা নিজের বিবেচনা এবং রুচিমাত্রা দুটি উপন্যাস বেছে নিয়েছেন। 'দীপনির্বাণ' উপন্যাসটি গৃহীত হলে সংকলনটির মূল্য বাড়ত মনে করি। নানা কারণের মধ্যে একটি কারণ হল এইটি স্বর্ণকুমারীর প্রথম উপন্যাস এবং ভারতীয় লেখিকাদের মধ্যে স্বর্ণকুমারীই প্রথম উপন্যাস রচয়িত্রী। সেদিক থেকে গ্রন্থটির ভূমিকা ঐতিহাসিক।

গিরিবালা দেবী জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনাবলীতে শ্রীমতী বাণী রায় সম্পাদিত, লেখিকাদ্বয়ের জীবনী ও সাহিত্যকৃতি লিখেছেন যথাক্রমে একটর সুধা ভাদুড়ী এবং শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী সিংহ। অনুমান করি সম্পাদিকা এই দুটি গ্রন্থেও রচনা নির্বাচনে লাঘিত্ব নিয়েছেন, যদিও নির্বাচনের কোন লক্ষণ তিনি নির্দেশ করেন নি। এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে 'নয়বাড়ী' নামক উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড। প্রথম খণ্ডের চুম্বক দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বলা হয়নি কেন দ্বিতীয় খণ্ড গ্রহণ করা হল। অনুমান করি সম্পাদিকার বিবেচনায় দ্বিতীয় খণ্ডটিই উৎকৃষ্টতর এবং সম্ভবত স্বয়ংসম্পূর্ণ উপন্যাস। একটর সুধা ভাদুড়ী গিরিবালা দেবীর জীবন ও সাহিত্যকৃতি রচনা করেছেন। দুর্ভাগ্যবশত তিনি জীবনী রচনা রচনা করতে বসেও তারিখ সাল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। গিরিবালার জন্ম উনিশ শতকের শেষ দশকে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'পদ্মহীনা' প্রকাশিত হয় সচিত্র শিশির পত্রিকায়। তাঁর নানা উপন্যাস ও ছোটগল্প গ্রন্থের নামও উল্লেখিত হয়েছে কিন্তু কোথায় তারিখ সাল নেই। অথচ সাধারণ পাঠকের বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসের চতুর্থ খণ্ড থেকে জানতে পারি গিরিবালার জন্ম ১৮৯১ খৃস্টাব্দ, তাঁর প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে ১৯২৫এ, তাঁর একমাত্র ছোটগল্প সংগ্রহ তুষারচ্ছন্ন প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২২-এ। জীবনী রচনার জন্য ডঃ ভাদুড়ী সামান্য পরিশ্রম করেননি। আরো ক্ষোভ হয় এই জন্য যে গিরিবালা দেবীর কন্যা বাণী রায়ই এই গ্রন্থের সম্পাদিকা অথচ তাঁর জননীর গ্রন্থাদির তারিখ সাল এই গ্রন্থেই অনুল্লেখিত। নয়বাড়ী ও কবরী মল্লিকা উপন্যাস দুটি এই গ্রন্থে সংকলিত, কিন্তু গিরিবালা আরো অনেক উপন্যাস লিখেছেন। ডঃ ভাদুড়ী তাঁর সাহিত্যকৃতি আলোচনায় সেইসব উপন্যাসের সামান্যতম আলোচনাও করেননি। এখানে যে গল্পগুলি সংকলিত হয়েছে সেগুলি কি তাঁর 'তুষারচ্ছন্ন' থেকে গৃহীত, না, অন্যান্য উৎস থেকে গৃহীত তাও লেখাও বলা হয়নি। অর্থাৎ যাঁরা গিরিবালা দেবীর রচনার আলোচনা ঐতিহাসিক দিক থেকে করতে চান তাঁরা এই গ্রন্থ ব্যবহার করতে গিয়ে ক্ষুব্ধ হবেন।

স্বর্ণকুমারীর জীবনী ও সাহিত্যকৃতি সম্বন্ধে লিখেছেন সম্পাদিকা শ্রীমতী বাণী রায়। স্বর্ণকুমারীর জীবনী সম্বন্ধে আমরা অনেকটাই নির্ভর করি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যসাধকচরিতমালার ওপর। সম্প্রতি স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যকৃতি সম্বন্ধে ডঃ পশুপতি শাসমল দীর্ঘ রচনা করেছেন। বাংলা ছোটগল্পের ঐতিহাসিকেরাও তাঁকে সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করেছেন। ডঃ রামদুলাল বসু তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দ' নামক তথ্যপূর্ণ গ্রন্থে স্বর্ণকুমারীর উপন্যাসের আলোচনা করেছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনা সুপরিচিত। স্বর্ণকুমারী বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব এবং সাহিত্যে ঐতিহাসিকেরা তাঁকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত বলে মনে হয় না। শ্রীমতী বাণী রায় অবশ্য মনে করেন যে রবীন্দ্রনাথের খ্যাতির অন্তরালে 'এই অসাধারণ লেখিকা এখনো সম্পূর্ণ আবৃত হয়ে আছেন। তাঁর যা প্রাপ্য তিনি তা পাননি। কেন অদ্যাপি আমার কাছে কারণ অজ্ঞাত।'

কারণ অবশ্যই পুরোপুরি 'অজ্ঞাত' নয়। সম্পাদিকা নিজেই বলেছেন রবীন্দ্রনাথের খ্যাতির অন্তরালে স্বর্ণকুমারী আবৃত। সম্পাদিকা মনে করেন 'সাহিত্যসৃষ্টির উৎকর্ষে শুধু নয় সাহিত্যসৃষ্টির বৈচিত্র্যে তিনি অদ্যাপি অতুলনীয়া।' সেই জন্যই তাঁর ক্ষোভ যে স্বর্ণকুমারীর প্রতি সুবিচার হয়নি।

বাংলাদেশের সুধীসমাজ স্বর্ণকুমারীর প্রতিভাকে স্বীকার করেছেন। তাঁদের দিক থেকে স্বর্ণকুমারীর প্রতি কোন অবিচার হয়েছে মনে করি না। সাধারণ পাঠকের স্মৃতিতে স্বর্ণকুমারী দীর্ঘজীবী নন। বহু লেখকই পাঠকের স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেছেন। অতএব বিশেষভাবে স্বর্ণকুমারীর প্রতি সুবিচার হয়নি এই মন্তব্য মেনে নেওয়া কঠিন।

স্বর্ণকুমারীর রচনায় বৈচিত্র্য আছে। তাঁর মন কল্পনা প্রবণ, তাঁর রুচি পরিশীলিত ও অভিজাত। তাঁর ভাষা নিপুণ

এবং মধুর। তা সত্ত্বেও তিনি যে আজও পাঠকের মন আকর্ষণ করেন না তার পেছনে অনেক কারণ আছে। তাঁর প্রথম উপন্যাস দীপনির্বাণ যখন বেরিয়েছে তখন বঙ্কিম প্রতিভার দীপ্তিতে বাংলাসাহিত্য ঝলমল করছে। যে বছর সীতারাম প্রকাশিত হয়, সে বছরই বেরিয়েছে স্বর্ণকুমারীর চতুর্থ উপন্যাস হুগলীর ইমামবাড়ী। ঔপন্যাসিক হিসেবে স্বর্ণকুমারীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে বঙ্কিমের সঙ্গে এবং পরে তাঁরই পাশাপাশি লিখেছেন রমেশচন্দ্র দত্ত আর স্বর্ণকুমারীর শেষ উপন্যাস যখন বেরিয়েছে (মিলন বাহ্নি ১৯২৫) তখন বাংলা উপন্যাসে শরৎচন্দ্র তাঁর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। বঙ্কিম, রমেশচন্দ্র, শরৎচন্দ্র—এবং রবীন্দ্রনাথ এই চারজন প্রধান লেখকের দীপ্তিতে স্বর্ণকুমারী ম্লান হয়ে গেছেন। এটাই ঐতিহাসিক ঘটনা। অবিচারের প্রশ্ন তাই অবান্তর। একই ঘটনা ঘটেছে গিরিবালা দেবীর ক্ষেত্রে। তিনি উপন্যাস রচনা করেছেন শরৎচন্দ্র যখন বাংলা উপন্যাসের প্রধান নায়ক। তারপর এক এক করে শক্তিশালী ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্পকারদের আবির্ভাব ঘটেছে। গিরিবালা দেবী তাঁদের অতিক্রম করে বা তাঁদের থেকে স্বতন্ত্রভাবে এমন একটি জগৎ তৈরি করে নিতে পারেন নি, যা পাঠককে জীবনের একটি গভীর ও বিস্তারিত ক্ষেত্রের সন্ধান দিতে পারে। একথা বললে তাঁর শক্তির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয় না। তাঁর রচনায় একটা আন্তরিকতা আছে। অভিজ্ঞতার সততা আছে। কিন্তু তিনি তাঁর সমকালীন অন্যান্য লেখকদের থেকে কোন একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন নি। তাই তাঁর রচনার কোন কোন মুহূর্তের স্মরণীয়তা সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর স্থান নীচের সারিতে।

জ্যোতির্ময়ী দেবী, এই তিনজন লেখিকার মধ্যে কনিষ্ঠা। তাঁর রচনাও পাঠকের সমাদর পেয়েছে যদিও বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর স্থানও সংকীর্ণ। তাঁর কৃতিত্ব ছোটগল্প রচনায়, অন্তত উপন্যাসের চেয়ে ছোটগল্পেই তিনি সুপরিচিত। সম্পাদিকা তাঁর তিনটি উপন্যাস এবং কুড়িটি গল্প সংকলিত করেছেন এই রচনাবলীতে। ভূমিকায় শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী সিংহ লিখেছেন, "জ্যোতির্ময়ী দেবীর লেখা প্রায় শতাধিক গল্পের মধ্যে, রাজস্থানের রাজঅন্তঃপুরকে কেন্দ্র করে যে যে গল্পগুলি রচিত হয়েছে—বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা মেলা ভার।" ঠিকই, জ্যোতির্ময়ী দেবীর এই সব গল্পে বাঙালী পাঠক এক নতুন জগতের স্বাদ পেয়েছিল। সুমেরু রায়, শেঠানীজী বা খুশ্‌নজরজী গল্পের আবহাওয়া, তার চরিত্র, তাদের আচার আচরণ সমস্ত কিছুর মধ্যে আছে অপরিচিত জগতের রূপ গন্ধ ও স্পর্শ। তিনজন লেখিকারই প্রকৃতি তিন ধরণের—স্বর্ণকুমারীর লেখায় আভিজাত্য, ভাষার লাবণ্য, গিরিবালার রচনায় সবোয়া ছন্দ আর পরিচিত জগতের ছিমছাম ছবি, আর জ্যোতির্ময়ীর রচনায় অপরিচিত জীবনের টুকরো টুকরো ঘটনা এবং তথ্য-সুখীনতার চেয়ে কল্পনা নির্ভরতা।

আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত এই তিন কৃতী মহিলা সাহিত্যিকের রচনাবলী আশা করি বাঙালী পাঠক-সমাজকে আনন্দ দেবে এবং এই তিন লেখিকার নির্বাচিত রচনার মধ্য থেকে তাঁরা বাঙ্গালীর জীবন ও সাহিত্য থেকে কতখানি বিচ্ছিন্ন এক পরিবেশের মাধুর্য ও উত্তাপ উপভোগ করবেন। আর এই রচনাবলী আমাদের নতুন করে উদ্বুদ্ধ করবে এই সাহিত্যিকাদের রচনার মূল্য নির্ধারণে।

শিশিরকুমার দাশ

স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনাবলী : গিরিবালা দেবীর রচনাবলী। জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনাবলী। তিনটি গ্রন্থেরই সম্পাদিকা শ্রীমতী বাণী রায়। রামায়ণী প্রকাশ ভবন। কলকাতা-৯। প্রত্যেকটির মূল্য আঠার টাকা।

প্রচুর ও দুর্লভ

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বিবাহ ব্যাপারটা হাতফের হতে-হতে এখন প্রায় ষোলআনা ছেলেমেয়ের, অর্থাৎ পাত্র-পাত্রীর হাতে ফলে যেতে বসেছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এটা সম্পূর্ণ বাপ-মায়ের অবর্তমানে অন্য গার্জেনের হাতে ছিল। এখন যে একেবারে নেই এমন বলা যায় না, তবে তাঁরা দ্রুত দ্বিতীয় স্তরে নেমে আসছেন, কতকটা, যে নাইয়ের 'পেশ' ধরে থাকে তার মতো।

এখানে একটা কথা লিখে রাখা দরকার। যা বলা হোল তা প্রধানত বিবাহের বয়স আর সময় নিয়ে। অন্যান্য বিষয়, যেমন দেনা-পাওনা ইত্যাদি, এখনও মোটামুটি বাবা-মা, বা অপর গার্জেনদের হাতে আছে। ছেলেরা আজকাল যে এ-সব বিষয়ে বাড়া-বাড়ি একেবারে পছন্দ করে না এটা তাদের সভা-সমিতির রিপোর্ট থেকে আমরা স্পষ্ট জানতে পারি; তবে, একটা শুভলক্ষণ, এতে বাপ-মা-গার্জেনদের অবাধ্যও হতে দেখা যায় না। মেয়েদেরও নয়; তাপাও তো আজকাল বয়স-শিক্ষা সব দিক দিয়ে উপযুক্ত হয়ে থাকে, পাত্রের নাক-চোখ-কান শিক্ষা নিয়ে বিচার করে এমন মেয়েরও কথা শোনা যায়, কিন্তু পণ-সোনা-নমস্কারির বাহুল্য দেখে যেকে বসেছে এমন সংবাদ কদাচিৎই পাওয়া যায়। সব যে তার সঙ্গে ওদিকেই যাচ্ছে, এটুকু বুদ্ধি ঘটে থেকেই যায়।

একটু অবান্তর হয়ে পড়ছে। আসলে, আমি বলতে চাইছিলাম আমাদের দক্ষিণ-পাড়ার সোনামণির বিবাহের কথা। পাত্র আমাদের পাড়ার ভুবন দত্তের পঞ্চম পুত্র নবকুমার। এক বৎসর পূর্বে স্কুল থেকে বেরিয়ে কলেজে ঢুকেছে। একেবারে কচি নিশ্চয়।

তাহলে আর একটু আগের থেকে বলতে হয়। আমি আধুনিক কথা প্রাক্-আধুনিক কালের কথা বলেছি। তারও আগে, আমাদের কৈশব-যৌবনারম্ভে [illegible], বিবাহ অনেক ক্ষেত্রেই নির্ভর করত বৃদ্ধাদের কথার ওপর—ঠাকুমা, দিদিমা, পিসিমা, মাসিমাদের সেকালের বড় বড় পরিবার, সব জিনিস খাঁটি, তাঁরা টিকে থাকতেন অনেকদিন, সব পরিবারেই দু'এক জন বদ্যে পাওয়া যেতই। শেষের দিকে নাৎজামাই-নাৎবৌয়ের মুখদেখা, অন্যথায় কাশী ধাম—এই নিয়ে জিদ ধরে বসতেন, বিবাহ হয়ে যেত। একটি ষোল-সতেরো বছরের কচি জামাই, একটি তার সঙ্গে মানিয়ে কচিবৌ নয়, দশ, এগারো।

আজকাল এ-ধারাটা একরকম উঠেই গেছে। প্রথমত, ভেজাল খেয়ে খেয়ে বুড়ির দল আর এত এগুতো পাচ্ছেন না। তাছাড়া চারিদিকের হাওয়ায় বিবাহ জিনিসটাই কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তাও তো কেউ বলতে পারছে না।

তবু, অবস্থা আর পরিবেশ অনুকূল হলে ছিটকে-ছাটকে এক আধটা হয়েও যাচ্ছে এখনও। অবশ্য একটু মফঃস্বলের দিকে।

ভুবন দত্তের পরিবারটি বড়। নিজেদের ক্ষেত-খামার, পুকুর-বাগান, গাইগোরু, মফঃস্বলই, তবে রেলাশহরের গা ঘেঁষে—শিক্ষা থেকে নিয়ে আধুনিকতার সব উপচারই রয়েছে বাড়িতে।

তার মাঝখানটিতে রয়েছেন একেবারে সে যুগের প্রতিভূ বিন্ধ্যবাসিনী; ভুবন দত্তের মা। বয়স আশী অতিক্রম করে একাশী যাচ্ছে। কিছুদিন আগে আশী পূর্তির উৎসব গেল।

বিন্ধ্যবাসিনী দক্ষিণ পাড়ায় যাঁদের সঙ্গিনী প্রসন্নময়ীর বাড়ি গিয়েছিলেন। প্রসন্নময়ী বেঁচে নেই। তবে বাড়িটির ওপর মায়াটা রয়েছে, বড়ছেলে কলকাতায় একটা বড় ফার্মের ম্যানেজার; সে এলে তার মোটর করে ঘুরে আসেন বিন্ধ্যবাসিনী।

নূতন শীতের দুপুর পেরিয়ে গেছে। মাদুরে একটা বালিশ মাথায় দিয়ে ছাতে শুয়ে অঞ্জন, বাড়ির গিন্নি হেমনলিনী মেয়ে, বৌ নিয়ে গল্প করছেন, সোনামণি উঠে এল। বছর এগার বয়স, শ্যামবর্ণ, চোখ দুটি ভাসা-ভাসা।

বিন্ধ্যবাসিনী প্রশ্ন করলেন—'ইটি ?'

'আপনার নাতনী' হেমনলিনী বললেন। 'কৈ আগে দেখিনি তো। দেখেছি ?' —আজকাল ভুল হয় খুব বেশি এই রকম। হেমনলিনী বললেন—'দেখেছেন বইকি মা। তবে কম। ওপরে যখন আসেন, প্রায় সকলেই একবার

তো। আজ শনিবার, সকাল সাকাল ছুটি হয়েছে।'

'পড়ছে।'

'হ্যাঁ, নাইনথ্ ক্লাসে। এদিকে সেলাই, গান...'

'ওসব বুঝি না। পাকা চুল তুলতে পারে?'

'খুব মিষ্টি-হাত। বাপের তো টাক পড়িবে দিলে। বসে যা না কে সোনা।'

'এই পড়ে এল। ক্লান্ত হয়ে....হা

'তা হোক। সেবা করবার এমন সুবিধে রোজ পাচ্ছে যেন।'

সোনামণি মাথার কাছে বসে গেল। গল্প চলল আবার।

'সত্যি বড় মিষ্টি হাত রে।'

শাশুড়ি, বৌ আর বড় মেয়েতে একটু চোখো-চোখি চলছিল, বেড়ে গেল। হেমনলিনী এক সময় বলেই ফেললেন মুখটা একটু নীচু করে—'নিসে নিননা কাকিমা।'

'বড্ড কাঁচাটি সে। আর আমাদের কথা কি চলবে?...অবিশ্যি আমি ওদের বাড়ি যখন আসি এর চেয়ে ছোটটিই....'

—একটি ছোট্ট নিঃশ্বাস পড়ল।

'আপনার কথা কাটবে। সাদ্যি আছে কার।...জানি না তো। নিন কাকিমা—এটি বিদায় হলেই একটু ঝাড়া হাত-পা হই।'

সোনামণির হাত আলগা হয়ে গেছে। নিতান্ত ছেলেমানুষ, গা ঝেড়ে উঠে পড়তে পারছে না।

গল্প-স্বল্প আবার আগেকার খাতে নেমে এল।

ওঠবার সময় বিন্ধ্যবাসিনী বললেন—'অনেকক্ষণ সেবা খেলাম, দেখিয়ে মুখখানা, আজকাল তেমন দেখতেও তো পাইনা।'

চিবুকে হাত দিয়ে চুমো খেলেন একটা।

সেইদিনই নয়। দু'দিন পরে কথাটা তুললেন একটু ঘুরিয়ে। ছেলেরা বলল—'বেশ তো মা, পছন্দ হয়েছে, নেবে। তবে নিতান্ত কচি—অন্তত আর গোটা কতক বছর....'

'তবে তাই করিস বাবা। আমাকে তাহলে কাশী পাঠিয়ে দে। বিশ্বনাথ পায়ে না ঠাঁই দেন, এসে দেখে যাব নাতবৌয়ের মুখ।'

ঠিক হয়ে গেল বিবাহের কথা।

বেশ ঘটা করেই হোল বিবাহটা। ছওয়ার কথাই, গ্রামের সবচেয়ে কীর্তিমান পরিবার, তার ওপর মায়ের শেষ ইচ্ছা, ভুবন দত্ত কথানা পাড়া নিয়ে সমস্ত গ্রামটাই টেনে নিলেন উৎসবের মাঝে। কবেকার ছেড়ে-আসা, প্রায়-ভুলে-যাওয়া একটা প্রথা আধুনিকতার সঙ্গে মিশে গিয়ে একটা যেন নূতন সুরই উঠল অনুষ্ঠানটিতে। সতেরো বছরের বর, এগারো বছরের কনে সমস্ত গ্রামটা যেন বিয়ের পুতুল খেলায় মেতে উঠল। বিয়ে থেকে নিয়ে বৌভাত—আরও দু'একটা দিন এদিকে-ওদিকে একটা উৎসবের উল্লাসে হাওয়াটা বোঝাই হয়ে রইল।

এর মধ্যে একটি মুখ বিষণ্ণ, প্রায় মৌন; যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সেই সোনামণির। উৎসব বাড়ির হৈ-চৈ, চঞ্চলতা, কনে-বৌ হয়ে এসেছে, কোণ খুঁজে বেড়াচ্ছে। প্রথমটা নজরে পড়েনি অতটা কারুর, তারপর আস্তে আস্তে পড়ল, এ-কান ও-কান হতে, হতে কৌতূহলও বাড়ল। হেতুটাও বের করতে দেরি হোল না, নেপথ্য আলোচনায় এসে-এসে পড়তে লাগল সেটা—হ্যাঁরে, বিয়ের কি বোঝে ও? যতই দাও-থোও, বাড়ি থেকে মনটা কি টেনে নেওয়া যায় এত শীগ্গির?.... একালের মেয়ে নয়তো গা, সব ঝেড়ে-ঝুড়ে ফেলে হসতে হাসতে বিয়ের, কাজেই লেগে গেল; পানসাজা, গোছানো-সাজানো—এও তো দেখছি.

এক-আধটা কাপটা এদিকেও এসে পড়ে বর্ষীয়সীদের মুখে।

ভোলবার চেষ্টাও থাকে। হাঁরে সোনা, অমন মুখভার করে বয়েছিস কেন? মন কেমন করছে? আ এই তো বাড়ি, ডাকলে সাড়া পাওয়া যায় না ওঠ, লক্ষ্মীটি। একটু ঘুরে ফিরে দেখে-শুনে বেড়া দিকিন। তোর জন্যেই তো এত কাণ্ড, বাজনা-বাদ্যি, ভোজ, তামাশা, আর তুই-ই কিনা..'

মেয়েদের ডেকে নেন, ননদ-জা, নানা সম্বন্ধের ভরা বাড়িতে—কেউ সাজ-গোজ নিয়ে, কেউ আনাজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত।

নিজের নিয়ে ব্যস্ত, যা দিকিন সোনাকে একটু ভালো করে সাজিয়ে-গুজিয়ে, মুরিয়ে, দেখিয়ে শুনিয়ে আন দিকিন.

সাজাবার আর জামতা খালি নেই গায়ে; একজন ননদের ঠোঁটে বিদ্রূপ জেগে ওঠে—

'এতদিন দাদা-দাদা করে এল, তার সঙ্গে বিয়ে.. চল, ডেকে ঠাকুমার হাতে সোপর্দ করে দিই.'

নিয়ে যায়। খানিকটা ঘোরাঘুরি করে খাটে একটু গা এলিয়ে পড়ে আছেন বিন্ধ্য বাসিনী, একজন দাসী পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

'নাও। ভূতের কান্না বোঝার বোঝে। কোন মতেই তোমার নাতবৌয়ের মন পাওয়া যাচ্ছে না...'

'নাঃ, তোদের মতন ঢুকেই মাৎ করবে বশুরবাড়ি।....'

পাশ ফিরে বুকে টেনে নেন—

'কি হয়েছে রে সোনা? কেমন সাজিয়ে-গুজিয়ে দিয়েছে—শাড়ি, গয়না সব পছন্দ হয়েছে তো?....ওমা, দ্যাখো ভুল! আমার হারটা এখনও পরানো হয়নি। কখন পড়াবে? বড়বৌমাকে ডেকে দে শীগ্গির..'

নিজের জড়োয়া সাতনরী হার, ছোট নাতির বৌয়ের জন্যে বাঁধা।

বড়বৌ এসে বের করে দিতে, উঠে নিজের হাতে পরিয়ে দিলেন। হীরে-মুক্তোয় সমস্ত ঘরটা যেন নতুন করে ঝলমল করে উঠল।

'দেখ দিকিন কত সুন্দর।'

ফুটল মুখে হাসি।

মাঝে মাঝে উঠছে ফুটে কিন্তু টেঁকছে না। মলিন হতে হতে মিলিয়ে যাচ্ছে কেমন একটা মৌন বিষণ্ণতার মধ্যে।

কাছে পিঠের সবার মনেই লাগে একটু করে..এ বিষণ্ণতার ছোঁয়াচ।

প্রশ্ন লেগে থাকে—কিছু বলছেও না তো গা। তাহলে বোঝা যায়....

তারপর বললে এক সময়। কাকে সব কথা যে বলা যায় প্রথম স্পর্শেই যে সে-অনুভূতিটুকু কি করে আসে।

ফুলশয্যার পালঙে আসলে শুয়ে গল্পসল্প করে অন্যমনস্ক করবার চেষ্টা করছিল সেজো জা, নবকুমার আসবে একটু মিষ্টি হেসে, একটা মিষ্টি মন্তব্য করে বেরিয়ে গেল।

ওর মনটাও ব্যথিত শুনছে, কিন্তু প্রতিকার তো করতে পারছে না।

জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে ছিল সোনামণি, মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে, মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করল—'কী হয়েছে সোনা? ... আমাকেও বলবে না?....আরও কিছু চাই? কোনও নতুন গয়না আরও? .. কত ভালবাসেন সবাই তোমায়। কত দিয়েছিল—কত করেছেন।.... আমাকেই নিশ্চয় পছন্দ হয়নি?....'

এত আদর, এত পাওয়ার মধ্যে একটি যে নিরুপায় বঞ্চনা কচি বুকটিকে ব্যথাতুর করে রেখেছে তার সমস্ত চিন্তা আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তার কথা বলতে বলতে স্বামীর উরুতে মুখ চেপে ফুলে ফুলে কেঁদে উঠল সোনামণি—

'পরীর জানা হয়েছে.. বাড়িতে.... ঘাটের নীচে,...'

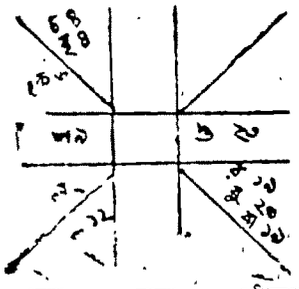

লগ্নে গোচরে শনির অবস্থান

এবার আমরা পশ্চিমবাংলার মহামান্য হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রীশংকরপ্রসাদ মিত্র মহাশয়ের রাশিচক্র নিয়ে আলোচনা করতে চেষ্টা করব।

সিংহ লগ্ন, বৃষ রাশি, রোহিণী নক্ষত্র। জন্মকালীন চন্দ্রের মহাদশা ভোগ্য ছিল দুই বৎসর পাঁচ মাস।

জাতকের রাশিচক্রে বৈশিষ্ট্য—(১) চন্দ্র তুঙ্গী, (২) চন্দ্র, বৃহস্পতি যোগে জীবযোগ, (৩) ভাগ্যদর্শী ভাগ্যপতি মঙ্গল—লগ্নপতি রবিতে দৃষ্টি করছে।

আমরা যদি রাশিচক্রের ভাগ্য স্থানকেই পর্যবেক্ষণ করি তবে সহজেই উপলব্ধি করতে পারবো যে এই রাশিচক্রে ভাগ্যস্থানই একমাত্র বিচার্যের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে। এবং কর্ম যাই করুন না কেন, ভাগ্য যদি সহায় হয়—এই প্রবাদ বাক্যটির সাফল্য এই রাশিচক্রে জাজ্বল্যমান। আমরা এই রাশিচক্রের ভাগ্যস্থানকে তিন দিক থেকে বিচার করতে পারি। যেমন লগ্নস্থান থেকে, চন্দ্রস্থান থেকে আর রবিস্থান থেকে। লগ্নের থেকে ভাগ্যস্থানের অধিপতি মঙ্গল গ্রহ ভাগ্য স্থানকে অষ্টম দৃষ্টিতে পূর্ণদর্শন করছে। এবং ভাগ্যপতি শুধু ভাগ্যকে নয়, লগ্নপতিকেও দর্শন করাতে রাশিচক্র বলবান। ভাগ্যপতি মঙ্গলগ্রহ বৃহস্পতি কর্তৃক দৃষ্টি প্রাপ্ত হয়ে নিজেও বলবান।

আবার ভুলে চন্দ্রস্থান থেকে বিচার করলে দেখতে পাই চন্দ্র থেকে ভাগ্যপতি শনি, কর্কট রাশিতে বসে ভাগ্যস্থানকে পূর্ণ দৃষ্টি করছে এবং স্বয়ং চন্দ্রলগ্নের অধিপতি শুক্র গিয়ে ভাগ্যস্থানে বসে আছে।

বুধ এবং রাহুকে নিয়ে রবিগ্রহ যেখানে বসে আছে যদি সেখান থেকে বিচার করি, তবে দেখতে পাচ্ছি রবি থেকে ভাগ্যস্থানের অধিপতি স্বয়ং রবি। মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হয়ে বসে আছে বুধকে সঙ্গে নিয়ে। অর্থাৎ যেভাবেই বিচার করি না কেন, জাতকের ভাগ্যস্থান অত্যন্ত বলবান। তার সঙ্গে লগ্নের থেকে কর্মস্থানে চন্দ্র-বৃহস্পতির জীবযোগ যেন রাশিচক্রে সোনায় সোহাগা। ২ কর্মস্থানের অধিপতি শুক্র কর্মস্থান থেকে ভাগ্যস্থানে বসে ভাগ্যকে উৎসাহিত করেছে। কর্ম এবং ভাগ্যের যোগ বলাবলে জাতক কর্মে শীর্ষস্থানের অধিকারী।

জাতক ধর্মেশ কর্তৃক পঞ্চম স্থানস্থ লগ্নেশকে দৃষ্টি করার ফলে ধর্মীয় এবং অধ্যাত্ম চর্চাতেও ব্যুৎপত্তি লাভ করেছেন। জাতকের বর্তমানে শনির মহাদশা চলছে। এই শনি জাতকের পক্ষে যেমন শুভ ফলদাতা তেমন কিছুটা অশুভত্বও আছে। কারণ শনি বক্রী এবং লগ্নের ব্যয়স্থ। ফলে শুভ সংযোগে শনি শুভ ফলদাতা। অশুভযোগে অশুভ ফলদাতা। তাই ইতিপূর্বে জাতক শনির সঙ্গে রাহুর দশা ভোগ করাতে কিছুটা অশুভ ফল দিয়েছে হয়তো। যেমন ন্যাসা প্রাপ্তিতে বিঘ্ন, মানসিক অশান্তি, ব্যয় ইত্যাদি। কিন্তু বর্তমানে শনির সঙ্গে বৃহস্পতির দশা জাতকের পক্ষে বিশেষ শুভ ফলদাতা। বিশেষ করে ৫ই আগস্ট গোচরে বৃহস্পতি কর্কটে তুঙ্গে হয়ে জন্মকালীন শনির সঙ্গে সহাবস্থানে জাতকের পদোন্নতি ক্ষমতাবৃদ্ধির কারক হয়েছে। শনির দশায় বৃহস্পতির অন্তর্দশা '৮০ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলবে এবং ঐ সময় পর্যন্ত জাতক উত্তরোত্তর শুভ ফল পাবেন। রাজনৈতিক বিচার বিভাগেই আরও উন্নতি রাজপাল রাষ্ট্রদূত ইত্যাদি। কিন্তু লক্ষ্য করবার মত দশা এবং গোচরে বৃহস্পতি যতই শুভদাতা হোক—লগ্নে গোচরে শনির অবস্থান জাতককে কোন প্রাপ্তিতে অনিচ্ছা প্রকাশ দ্বারা ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের কারকও বটে।

যাক এবার সম্ভাব্য ব্যক্তিগত রাশিফল বলছি। সপ্তাহটি ইংরেজি ১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার থেকে আরম্ভ।

ব্যক্তিগত রাশিফল

মেষ : সংসারের ছোটখাটো ঘটনাগুলি মনের ওপর চাপ রাখতে পারে। ভবিষ্যতের কোন পরিকল্পনা তৈরি হতে পারে। রাজনীতিতে প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। শনি রবি অশুভ। বুধ বৃহস্পতিবার শুভ।

বৃষ : যদিও কর্মস্থানে আপনি আগের চাইতে বহুলাংশে শুভ ফল পাবেন, কিন্তু গৃহ-বাড়ীর অশান্তি কাজকর্মের ক্ষতি করতে পারে। মঙ্গলবার মনে নৈরাশ থাকবে বৃহঃ শুভ।

মিথুন : কর্মস্থানে প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকবে। কোন সন্তানের ব্যাপারে সুখবর পাবেন। বয়স্কদের স্বাস্থ্য খারাপ করতে পারে। বুধ, বৃহস্পতিবার অশুভ।

কর্কট : আর্থিক ব্যাপারে আগের চাইতে বহুলাংশে শুভ ফল পাবেন। যান-বাহন সুখ পাবেন। দাঁতের রোগে কষ্ট পেতে পারেন। সোম থেকে বুধবার লক্ষ্যণীয়।

সিংহ : যেমন সামাজিক ব্যাপারে তেমন কাজে-কর্মে উৎসাহ পাবেন। আর্থিক ব্যাপারেও চিন্তা অনেকটা কমে যাবে। শনি, রবিবার কোন সংবাদে উৎসাহিত হতে পারেন।

কন্যা : অহেতুক অপরের ঝামেলায় জড়িয়ে কর্মস্থানে নিজের ক্ষতির সম্ভাবনা। জমানো অর্থে হাত পড়তে পারে। কিছু ঋণও অসম্ভব নয়। মঙ্গল, বুধবার শুভ।

তুলা : কিছু স্বজন আপনার নিন্দা করতে পারে। কোথাও ভ্রমণসূচীতে বাধা-বিঘ্ন আসতে পারে। কিন্তু সপ্তাহের মাঝামাঝি আয়ের সূত্র পাবেন। বৃহস্পতিবার লক্ষ্য রাখুন।

বৃশ্চিক : সরকারী চাকুরেদের বিশেষ করে প্রশাসনিকদের কর্মস্থানে মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। দূরে কোন আত্মীয়জনের অসুস্থতার সংবাদ মনকে বিচলিত করতে পারে। বৃহস্পতিবার ছাড়া সপ্তাহটি মন্দ নয়।

ধনু : পুরনো কোন সূত্র ধরে আয় বৃদ্ধি পাবে। কোন ব্যাপারে অর্থলগ্নী হতে পারে। বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে সময়টা অনুকূল। শনি, রবি কোন কারণে মনে চাপ থাকবে। মঙ্গল থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত লক্ষ্যণীয়।

মকর : আর্থিক ব্যাপারে কিছুটা উন্নতি হলেও কারণে-অকারণে সপ্তাহটা আপনাকে কেমন একটা নৈরাশ্য হতাশার চিন্তায় ফেলতে চেষ্টা করতে পারে। চাকুরেদের কর্মস্থানে শুভ ইঙ্গিত থাকবে। মঙ্গল বৃহস্পতি অশুভ।

কুম্ভ : আর্থিক ক্ষেত্রে সুখের হবে। কর্মব্যস্ততাও থাকবে। কিন্তু বিরোধী ভাবাপন্ন ব্যক্তি থেকে, এমন কোন সংবাদ বিচলিত করতে পারে। বুধ বৃহস্পতিবার শুভ।

মীন : ঘরোয়া কোন ব্যাপারে চিন্তা হতে পারে। কোন সন্তানের জন্যে উৎকণ্ঠা হবে। আয় থাকলেও ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। ফলে মনের উপর চাপ থাকবে।

শ্রীমাণিক

আগামী সংখ্যায়

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

হরিজন

পাঁচসালা যোজনা বুঝি না। দুটো ছাগল কেনবার পয়সা দিন আমাকে। একটা ছাগলের দুধ খাওয়াবো পক্ষাঘাতগ্রস্ত স্বামীকে। অন্য ছাগলটির দুধ বিক্রি করে পয়সা আনব ঘরে। উত্তরপ্রদেশের এক গ্রামের হরিজন মহিলার এমন সহজ-সরল উক্তির সার্বিক তাৎপর্য নয়াদিল্লির বিশেষজ্ঞ ও পরিকল্পকরা এখনও উপলব্ধি করেননি। করলে যোজনা ভবনের কাজকর্মের ধারা বদলে যেতো। সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীর বাস্তব পরিবর্তন ঘটত।'

ত্রিশ বছর ধরে কংগ্রেস সরকার যেভাবে হরিজন সমস্যা নিয়ে গড়িমসি করেছেন, ঠিক তেমনি চালে কেন্দ্রে এবং বিভিন্ন রাজ্যে জনতা সরকারও অনেক পরিকল্পনা নিয়ে কেবল নাড়াচাড়া করছেন। দলিত মানুষের ওপর গ্রামাঞ্চলে যে অত্যাচার চলছে তার নিন্দাতে এঁরাও সোচ্চার। কিন্তু সরেজমিনে বিশেষ কোন কাজ হচ্ছে না। ভূমিহীনদের উদ্বৃত্ত জমি বন্টনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও কাজ বিশেষ এগোয়নি এপর্যন্ত। এমনকি জরুরী অবস্থার সময়েও না। পরিসংখ্যানগতভাবে এর একটা প্রমাণ এই যে যোজনা কমিশনের হিসাব মত দেশে উদ্বৃত্ত জমির পরিমাণ দুই কোটি একর হলেও ভূমিহীন হরিজন ও অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এপর্যন্ত বিলি হয়েছে মাত্র পনেরো লাখ একর জমি। দেশে ভূমিহীন ক্ষেত-মজুরের সংখ্যা হল প্রায় সাত কোটি আশী লক্ষ।'

হরিজনদের অধিকার সম্বন্ধে আইন আছে। নতুন নতুন আরও অনেক আইন হয়তো ভবিষ্যতে হবে। কিন্তু নয়াদিল্লির চকমেলানো মনোরম সংসদ ভবনের সিদ্ধান্তগুলি বাস্তব রূপায়ণের জন্য যে পথ ধরে গ্রাম-ভারতে পৌঁছয় সেই পথেই নাকি যত গণ্ডগোল। আইনকানুনের পরোয়া করে না কেউ। জমি যার জোর তার। যার যত জমি তার জোর তত বেশী। তেতাল্লিশ কোটি লোক যে গ্রাম ভারতে বসবাস করে সেখানে এই জোর-জবরদস্তিভাবে খাটে। হরিজনদের সুযোগসুবিধা দেবার সাংবিধানিক সিদ্ধান্তকে এপর্যন্ত নানাভাবে বাধা দিয়ে আসছে জমির মালিকরা যাদের কাছে এই মালিকানার অর্থ অর্থনৈতিক ক্ষমতা এবং সেইসঙ্গে রাজনৈতিক প্রভাব।

অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং সামাজিক অবিচারের হাত থেকে হরিজনদের কীভাবে রক্ষা করা যায় তাই নিয়ে জনতা সরকার গভীরভাবে চিন্তায় পড়েছে। পথ হাতড়াচ্ছেন তাঁরা। উপায় খুঁজছেন। খোদ রাজধানীর সন্নিকটে কানহাওয়ালা গ্রামে হরিজনদের সঙ্গে জাঠদের লড়াইয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা অবাক হয়েছেন। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ,

রাজধানীর ইনসাইড স্টোরি

তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্রের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে চমকে উঠছেন কেন্দ্রীয় সরকার।

কংগ্রেস আমলে গ্রামাঞ্চলে অবস্থাবানদের সংঘবদ্ধ বাধা ঠেলে যে মন্থরগতিতে হরিজনদের মধ্যে কাজ হচ্ছিল এই জনতা সরকারের ক্ষেত্রেও সেসব কাজের কোন উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হয়নি। কাজ সেই ঢিমেতালে থাপছাড়াভাবে কোন কোন অঞ্চলে হচ্ছে। কংগ্রেস ও জনতা সরকারের কাজকর্মের স্টাইল এবং সমস্যা মোকাবিলার রীতি-পদ্ধতি একই রকমের।

কেন্দ্রে এবং বিভিন্ন রাজ্যে জনতা সরকার ক্ষমতায় আসবার পর হরিজন সমস্যা হঠাৎ এমন বিস্ফোরণের আকার নিচ্ছে কেন? এই প্রশ্নের জবাবে উচ্চপদস্থ একজন তপশিলী সরকারী কর্মচারী এই লেখককে বলেন : কারণ খানিকটা 'সাইকোলজিকাল'। হরিজন এবং অ-হরিজন—দুই তরফেরই দুই ধরনের মানসিকতার ফলে স্থানে স্থানে অত্যাচার ও সংঘর্ষের কথা শোনা যাচ্ছে। সাবেকি চাহিদা অর্থাৎ কাঁড়ে ঘরটা মেরামতের জন্য কিছু পয়সা বা কিছু ঋণ বিত্তবান অ-হরিজন সম্প্রদায় মঞ্জুর করে। তবে আইনত অধিকার থেকে হরিজনদের বঞ্চিত করার ব্যাপারে কিন্তু তাঁরা বেশীর ভাগ সময় এককাঠ্ঠা।'

জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসবার পর বিশেষতঃ উত্তর ভারতের গ্রামাঞ্চলে হরিজনদের মধ্যে একটা অস্বস্তি দেখা দেয়। এই দলের দুই অন্যতম শরিক ভারতীয় লোকদল এবং জনসংঘ হরিজনদের আস্থা লাভ করতে পারেনি। গ্রামাঞ্চলে জমিজমা নিয়ে যারা গুছিয়ে বসেছে তারা এই দুই গোষ্ঠীর সমর্থক বলে নিজেদের পরিচয় দিচ্ছে। আর নির্দিধায় ভূমিহীন হরিজনদের মধ্যে যে কজন সাইকেল কিনেছিল তাও কেড়ে নিচ্ছে। এইসব ঘটনার নিন্দা নয়াদিল্লিতে বসে করা হলেও এইসব অন্যায় তাড়াতাড়ি বন্ধ করার এবং হরিজনদের আস্থালাভের জন্য জনতা পার্টি সরেজমিনে বিশেষ কাজ করেনি। এছাড়া জনতা পার্টির চেহারাটা এমনি এলোমেলো যে কোন সিদ্ধান্ত যে সব শরিক মানতে বাধ্য নন, সেটাও হরিজনদের মধ্যে স্পষ্ট এখন। সুতরাং গ্রামাঞ্চলে একপক্ষ যেমন মনে করছে যে যা খুশী তাই করা যায়, অন্যপক্ষ তেমনি ভাবছে সরেজমিনে এখনি রুখে না দাঁড়ালে সমূহ বিপদ। এর ফলে নতুন করে টেনশন' দানা বাঁধছে। সংঘর্ষ হচ্ছে। এইসব

পর্যবেক্ষক

সংঘর্ষকে জগজীবন রাম তপশিলীদের 'মুক্তি যুদ্ধ' বলে ব্যাখ্যা করছেন।

জগজীবনবাবু তপশিলীদের আন্দোলনের সমর্থক ও তাদের দুর্দশায় দুঃখিত হলেও তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব এদের ওপর আর তেমন নেই। স্বাতন্ত্র্যের সালের সংসদীয় নির্বাচনের সময় সি-এফ-ডি দল তৈরির পর থেকে দ্রুত হারে তাঁর প্রভাব ও প্রতিপত্তি কমতে শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে কোন রাজনৈতিক দলের কিংবা ব্যক্তিগতভাবে কোন নেতার উল্লেখযোগ্য প্রভাব নেই তপশিলীদের ওপর। এদিক থেকে দেশের নয় কোটি তপশিলী এবং তার মধ্যে প্রায় চার কোটি তপশিলী সতর লক্ষ ভূমিহীন ক্ষেত-মজুরের কোন নেতা নেই। নেতৃত্বহীন ক্রমবর্ধমান তপশিলীদের মধ্যে শিক্ষিত ব্যক্তিরা ক্রোধে ফেটে পড়ছেন। দলিত প্যানথার নামে পরিচিত এঁদের কয়েকজনের সঙ্গে রাজধানীতে আলাপ করে এইটুকুই বোঝা গেল যে ওঁদের মতে হরিজনদের অর্থনৈতিক সমস্যার মূল কারণ নাকি অ-হরিজন লোকজনের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। সুতরাং অ-হরিজনদের সাহায্যে এবং নেতৃত্বে হরিজন সমস্যার সমাধান হবে না। তা যদি হত তাহলে একত্রিশ বছর ধরে এই অন্যায় চলত না। দলিত প্যানথারদের মতে গ্রামাঞ্চলে হরিজন কৃষক ও ক্ষেত-মজুরদের 'পপারাইজেশন' দ্রুত হারে বাড়ছে। 'গ্রাম ভারত জ্বলছে' একজন এই মন্তব্য করে বিশ্ব ব্যাংকের গ্রামীণ সমস্যা সম্বন্ধে এক মর্মন্তুদ কাহিনী তুলে ধরলেন। হরিজন ক্ষেত-মজুররা সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পাঁচ টাকা দৈনিক মজুরীও পায় না। আর দেনার দায়ে তারা নিজেদের অস্তিত্ব পর্যন্ত খোয়াতে বসেছে।

তপশিলীদের হরিজন আখ্যা দিয়েছিলেন গান্ধীজী। এই নাম সম্বন্ধে ঘোর আপত্তি উঠেছে তপশিলীদের মধ্যে। ওঁদের মতে এই শব্দের মধ্যে নাকি এক ধরনের অনুকম্পা মেশানো আছে। শিক্ষিত তপশিলীরা এটা পছন্দ করছেন না। আমরা গান্ধীবাদী নই। নই কমুনিস্ট বা সোসালিস্ট। আমরা সামাজিক অবিচারের প্রতিবাদ করব এবং অধিকার দাবী করব। শিক্ষিত তপশিলীরা নতুন এক প্রস্তাব নিয়েও চিন্তা করছেন। এঁরা নাকি শীঘ্রই পৃথক ইলেকটোরেটের দাবী তুলবেন। এঁদের উদ্দেশ্য হল অ-হরিজন রাজনীতি থেকে সব দিক থেকে পৃথকভাবে হরিজন বা তপশিলী রাজনীতিকে গড়ে তোলা। দেশের জটিল রাজনৈতিক ধারাবরণে এঁদের এই নতুন ভাবমূর্তি নিঃসন্দেহে নতুন এক জোরালো উপসর্গ।

শতবাবুর ডিনার টেবিলে

রাজ্যের দুই কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠী অনেকদিন ধরে নিজেদের ভেতরকার রাজনৈতিক ব্যবধান কমিয়ে আনতে সচেষ্ট। বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণের পর থেকে তাদের তৎপরতা আরও বেড়েছে। হিসাব কষে তারা দেখেছেন, দুই কংগ্রেস এবং জনতা দল একজোট হয়ে লড়লেও শতকরা ৪৫ ভাগের বেশী ভোট তাদের ভাগ্যে জুটত না। সি পি আই (এম) দলের দ্রুত প্রসার এবং প্রতিপত্তি কিভাবে কোন পথে খর্ব করা যায়, দুই কংগ্রেসের এবং জনতা দলের চিন্তাশীল মহল তাই নিয়ে খুব চিন্তিত। তারা মনে করেন, রাজ্যের জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলির জোটবদ্ধ হওয়া একান্তভাবে প্রয়োজন।

রাজ্য জনতা দলের প্রবীণ নেতা প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সঙ্গে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লকান্তি অর্থাৎ শত ঘোষের সম্পর্ক সম্প্রতি আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে। প্রফুল্লবাবু রাজ্যে দুই কংগ্রেসের সহযোগিতায় জাতীয়তাবাদী দলগুলিকে নিয়ে এক যৌথ আন্দোলন করার পক্ষপাতী। কিন্তু ইন্দিরার ঘনিষ্ঠ এবং বিশ্বস্ত সহচর প্রণব মুখোপাধ্যায় প্রফুল্লবাবুর ঐ উদ্যমকে কতখানি সমর্থন করবেন, তা যাচিয়ে দেখার জন্য প্রফুল্লচন্দ্র সেন বিশেষ উদগ্রীব ছিলেন। শতবাবু প্রফুল্লবাবুর মনোভাব বুঝতে পেরে তাঁর বাসভবনে এক নৈশ ভোজের আয়োজন করেন। তাতে তিনি নির্দিষ্ট চার তরুণ নেতাকে আমন্ত্রণ জানান। দিনক্ষণ জানিয়ে শতবাবু বলেন, অনেকদিন প্রাণ খুলে কথা হয়নি। দেখা-শুনাও নেই বহুদিন। অমুক দিন ডিনার টেবিলে বসে অনেক কথা বলা যাবে।

শতবাবু তাঁর ডিনার টেবিলে আমন্ত্রণ জানান, শ্রীমতী ইন্দিরার কাছের মানুষ প্রণব মুখোপাধ্যায়, প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী, প্রদীপ ভট্টাচার্য ও পংকজ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। প্রণববাবু বাদে বাকি তিনজন মোটামুটিভাবে চরমপন্থী। এক টেবিলে খেতে বসে তাঁদের মধ্যে অনেক কথা হয়। হিসেবী মানুষ শতবাবু ভাবীদের কাছে তাঁর মনোবাসনা প্রকাশ করে বলেন, আমরা সব কংগ্রেসী। পশ্চিম বাংলার সঙ্গে ভারতের রাজনীতির তফাৎ অনেকখানি। আমরা ইন্দিরাজী চরনজী বুঝি না। আমরা বুঝি আমাদের রাজ্যের স্বার্থ। রাজ্যের কী হাল হয়েছে!

রাজনীতি কলকাতা স্টাইল

প্রণবভাই, আমরা কি এক হয়ে আবার কাজ করতে পারি না?

শতবাবু মধুর ভাষী। প্রিয়-পংকজ-প্রদীপরা তাঁর কথায় নীতিগতভাবে শতবাবুকে তিন যুব নেতাই সমর্থন জানান। প্রণববাবু বলেন, হ্যাঁ শতবাবু, আপনার সঙ্গে আমিও নীতিগতভাবে একমত। সি পি আই (এম)কে প্রতিহত করতে আপনারা ইন্দিরা কংগ্রেসে আসুন। আসুক অন্য সব জাতীয়তাবাদী নেতা এবং কর্মীরা। প্রয়োজনে রাজ্য কমিটির ব্যাপক পুনর্গঠন করাও অসম্ভব হবে না। শ্রীমতী গান্ধী এখন আর তেমন কোন সর্তের বেড়াজাল তুলবেন না বলেই আমার মনে হয়।

তিন যুব নেতা অবশ্য প্রণববাবুর প্রস্তাবে সায় দিলেন না। বললেন, দুই কংগ্রেস সি পি আই (এম) তথা বামফ্রন্টকে কতখানি যুঝতে পারবেন তাতে সন্দেহ আছে। গান্ধীবাদী প্রফুল্লচন্দ্র সেন জনতা দলের বিরাট এক অংশকে সি পি আই (এম) বিরোধী করতে পেরেছেন। তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা না পেলে এ রাজ্যে বামফ্রন্টকে প্রতিহত করা অসম্ভব: কথায় কথায় নৈশ ভোজ শেষ হয়। রাতিও গভীর। দুই কংগ্রেসের নেতারা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, শতদা—সি পি আই (এম)কে রুখতে আমরা নীতিগতভাবে সকলে একমত। এনিয়ে আবার একটা বিস্তৃত এবং খোলা-খুলি আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

চার নেতাকে নিয়ে এ পর্যন্ত শতবাবু আর কোনও ডিনার পার্টি অথবা নৈশভোজ

বেদব্যাস বৈদ্য

করেছেন বলে জানা যায়নি। তবে ইতিমধ্যে এই রাজ্যের জাতীয়তাবাদী শক্তিকে সংঘবদ্ধ করার একটা গোপন অথচ সক্রিয় আন্দোলন গড়ে উঠছে। অতি সম্প্রতি কলকাতা পৌরসভার কর্মী ইউনিয়ন নিয়ে জনতা নেতা প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সঙ্গে চরন-কংগ্রেসের প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী এবং ইন্দিরা কংগ্রেসের সুব্রত মুখার্জির মধ্যে গোপন পরামর্শ-বৈঠক হয়েছে। তাঁদের নেতৃত্বে কোনও দলীয় ইউনিয়ন না করে পৌরসভার কর্মীদের জন্য জাতীয়তাবাদী কর্মী সমন্বয় সমিতি গড়ার কাজ শেষ হয়েছে। শত ঘোষের ডিনার টেবিলের জাতীয়তাবাদী দলগুলির জোটবদ্ধ হওয়ার প্রস্তাবের সঙ্গে পৌরসভার সদ্য গড়া সমন্বয় সমিতির চরিত্রগত ও নীতি-গত মিল সহজেই ধরা পড়ে। ইন্দিরা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক এবং প্রণববাবুর দের সহযোগী সুব্রত মুখার্জি পৌর-রাজনীতির আসরে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, রাজনৈতিক ঐক্য বা মিলনে আগাম শর্ত বা কন্ডিশন থাকে। অথচ সমঝোতার কোনরকম শর্তের অবকাশ নেই। ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন গড়তে জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলির মধ্যে সমঝোতাই এখন প্রথম এবং প্রধান প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, সুব্রতবাবুর সঙ্গে প্রণববাবুর বক্তব্যে নীতিগত ফারাক অনেকখানি। শত-বাবুর ডিনার টেবিলে প্রিয়-পংকজ-প্রদীপরা যে বক্তব্য রেখেছিলেন, সুব্রতবাবুর মতেও সেই এক সুর ধ্বনিত। অর্থাৎ শর্তসাপেক্ষ ঐক্য বা মিলন নয়—ইস্যুভিত্তিক সমঝোতা। এবং তার সূচনা দেখা দিয়েছে পৌরসভার কর্মী সমন্বয় সমিতির মধ্য দিয়ে।

বলা বাহুল্য, এ রাজ্যে সি পি আই(এম) তথা বামফ্রন্ট বিরোধী আন্দোলন গড়ার মুখে দুই কংগ্রেস, জনতা এবং জাতীয়তা-বাদী শক্তিগুলি নতুন জোট গড়ার দাবীতে ক্রমেই সোচ্চার হচ্ছে। শতবাবুর ডিনার টেবিলের গোপন অভিপ্রায় এবং প্রফুল্ল সেনের সঙ্গে প্রিয়-সুব্রতর বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য এক এবং অভিন্ন। ইতিমধ্যে শত-বাবুর দিল্লি সফর রাজনৈতিক মহলের কৌতূহল বাড়িয়েছে। রাজধানীর জনত নেতাদের সঙ্গে গোপন মোলাকাত এবং রাজ ইন্দিরা কংগ্রেসের বক্তব্য-সুব্রতদের সঙ্গে তাঁর মাখামাখি ঐক্য-প্রয়াসীদের বেশ হতাশ করেছে। ঐক্য নয় সমঝোতা, শর্তসাপেক্ষ মিলন নয়—ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন—এই শতবাবুর ডিনার টেবিলের আলোচনার হল-শ্রুতি রাজ্য রাজনীতির ঘোলাটে জলকে ক্রমেই স্পষ্ট করে দিচ্ছে।

ফিল্ম মেকার বুদ্ধদেব

নির্মলকুমার দাস

বুদ্ধদেবের জীবিত মাতা সংকল্প

'এটি সেলুলয়েডে হওয়া দরকার, দরকার এ ধরনের আরও ছবি হওয়ার। এগুলি দেখে দর্শকবৃন্দ আপাততঃ স্বাদ বদলাক। তাঁরা প্রস্তুত হোন পরবর্তী বিস্ফোরক সময়ের জন্য। রাত্রিবেলা ভীষণ ঘুমে যে সব পরিচালকদের মুখ থেকে নির্গত লালায় বালিস ভিজে যায়, আজ সেই সব বাবিতর হাত থেকে গোটা ব্যাপারটা আমাদেরই হাতে তুলে দিন। উপহার এই অনুরোধ।'

ফিল্ম ফেডারেশনের 'ফিল্ম' নামের জার্ণালে ১৩৭৪-এর শরৎকালীন সংখ্যায় প্রকাশিত 'সময়ের কাছে' চিত্রনাট্যটির ভূমিকায় উপরোক্ত কথাগুলি বলেছিলেন বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত। তিনি ফেডারেশন আয়োজিত এক প্রতিযোগিতার বিজ্ঞাপন কাগজে দেখে, নিজেরই গল্প অবলম্বনে 'সময়ের কাছে' চিত্রনাট্য লিখে পাঠান এবং প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং তিনি সম্পতি নির্মাণ করেছেন তাঁর প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি,—'দূরত্ব'—যেখানে পাওয়া যাবে এই সময় এবং তার সংকটকে, কারণ বুদ্ধদেব এই সময়ের চলচ্চিত্রকার।

চলচ্চিত্র নামক এই ক্ষমতাশালী এবং গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যমটিকে নিজের বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার পূর্বে বুদ্ধদেবকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে—বস্তুত প্রস্তুতি পর্ব হিসেবে গিয়েছে ঐ দিনগুলি—মূলত থিয়োরিটিক্যাল এবং প্র্যাকটিক্যাল এই উভয় দিকেই যথেষ্ট জ্ঞান অর্জনের জন্য। তারপর তিনি লিখলেন তাঁর প্রথম চিত্রনাট্য—'সময়ের কাছে' এবং চলচ্চিত্রকার হিসেবে উপস্থিত হতে চাইলেন মানুষ এবং যন্ত্র নিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে—তার আগে নয়।

সেলুলয়েডের ফিতেয় ভরে জীবনের প্রথম চিত্রনাট্যটি অসংখ্য মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার এক দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা বোধ করেছিলেন সেই সময়ে যখন তিনি ইউনিভার্সিটির ছাত্র।

চলচ্চিত্র নির্মাণ কার্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার মূল জ্ঞান এবং সুস্পষ্ট ধারণা তিনি অর্জন করেছেন। শিল্পসৃষ্টির পূর্বে যে কল্পনা শক্তির একান্ত প্রয়োজন, তাও তাঁর রয়েছে। কিন্তু টাকা—? শিল্পের ক্ষেত্রে যতগুলি মাধ্যম আছে, চলচ্চিত্র সর্বাপেক্ষা ব্যয়সাপেক্ষ।

বুদ্ধদেব তখন ছাত্র। সোর্স অফ ইনকাম=শূন্য। অথচ কল্পনাকে বাস্তবায়িত করার এক অদম্য আকাঙ্ক্ষা তাকে টেনে নিয়ে চলেছে ক্রমশ সামনের দিকে। অনেক ঘোরাঘুরির পর অবশেষে বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে টাকা ধার করে, ৮০ টাকায় ৮ ঘন্টা এই হিসেবে ক্যামেরা ভাড়া করে নেমে পড়লেন। তখন এই রেট ছিল। এখন ৮ ঘন্টার জন্য গুণে দিতে হয় ১৫০ টাকা মাত্র! দু-তিন দিন শুটিং করার পর টাকা ফুরিয়ে যেতেই অর্থসংকট দেখা দিল। বহু চেষ্টা করেছেন অর্থসংগ্রহের। পারেন নি। অসমাপ্ত অবস্থায় 'সময়ের কাছে' বাধ্য হয়ে শেষ করতে হল।

দু-তিন দিনে তোলা কয়েকটি দৃশ্যের সেই সেলুলয়েডের রীল এখনও আছে। মাঝে মাঝে দেখেন। জীবনের প্রথম ছবিটি করার যে আনন্দ ছিল, ছিল উত্তেজনা,—তার বদলে সমস্ত হৃদয় জুড়ে জায়গা নিল কষ্ট।

ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে তিনি তাঁর এক শুভানুধ্যায়ীর আগ্রহে আর একটি শর্ট ফিল্ম তুললেন। কন্টিনেন্ট অফ লাভ।

আর্থিক দিক থেকে লাভবান হওয়া দূরে থাক, চরম ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। কিন্তু ছবিটি করে পেয়েছেন পরিচিতি। যোগ দিয়েছেন ফিল্ম সংক্রান্ত বিভিন্ন আলোচনাচক্রে। নতুন স্বাদ। নতুন অভিজ্ঞতা, উদ্দীপনা, আনন্দ।

এর পর থেকেই বুদ্ধদেব অনিয়মিতভাবে তথ্যচিত্র, সংবাদচিত্র তুলে যেতে থাকেন, এবং কিছু দিনের মধ্যে বর্ধমানের একটি কলেজে অধ্যাপনার চাকরী নিয়ে চলে যান। কিছু দিনের মধ্যেই দম যেন বন্ধ হয়ে এল। একঘেয়ে চাকরী জীবন ছবি করার ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে লাগল। এক সময় দুটি ছবি নির্মাণের জন্য দীর্ঘ ছ মাস সময়ের প্রয়োজন দেখা দিল। কিন্তু ছুটি মঞ্জুর হল না। বুদ্ধদেব তৎক্ষণাৎ চাকরী ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় চলে এলেন। তুললেন একটি সরকারী তথ্যচিত্র। এবং দ্বিতীয় তথ্যচিত্র 'ক্ষীরোদ নট'—১৯৭৪-এর শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্র হিসেবে পুরস্কৃত হয়। যখন বুদ্ধদেব এই ছবিটি করেন ক্ষীরোদ নটের বয়স তখন ১০৪ বছর। ক্যামেরা নিয়ে তাঁর কাছে যেতেই তিনি ঘরের বিভিন্ন স্থান থেকে একে একে বের করে নিয়ে এলেন ধুতি, চাদর মোড়েল ইত্যাদি। সামনে রেখে ধরে স্মৃতি রোমন্থন করে তিনি বললেন, কবে কোন সাজা-মজাবাজা তাঁর বাজনায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে এই সব পুরস্কার দিয়েছেন।

ঢোলের বাজনা তখন আর কেউ ডাকে না। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমাদের সংস্কৃতিচর্চা পথ ঘুরে চলে গেছে এমন এক জায়গায়, যেখানে ঢোলের স্থান নেই, নেই ঢুলীর কদর। এই চরম সত্য ঢুলীর ছেলেরও চোখ এড়ায় না। তাই সে আজ কয়েক ক্লাশ পড়েই চলে যায় কল-কারখানায়। ঢোলের ওপর নির্ভর করার দিন চলে গেছে যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে। ডাক আসে না, কোনদিন আসবে না আর, একথা জেনেও ঢোলের বাজা সরকারী সাহায্যের ওপর নির্ভর করে নির্জনে প্রতিদিন তৈরী করে গেছেন সব নতুন নতুন বোল। সৃষ্টির কাজ তাঁর থেমে থাকে নি। ছবিটি করতে গিয়ে বুদ্ধদেবের এ-এক অতিমাত্রায় অভিজ্ঞতা। ছবি দুটি শেষ করার পর বুদ্ধদেব আবার আর্থিক নিরাপত্তার অভাব বোধ করলেন। এবং সিটি কলেজে নিলেন অধ্যাপনার

চাকরী। অর্থের জন্য পড়াতে লাগলেন অর্থনীতি। কিছুদিন পর আবার ছাড়লেন।

এর পর থেকে একের-পর-এক নির্মাণ করে যেতে লাগলেন বিভিন্ন তথ্যচিত্র, সংবাদচিত্র, বিজ্ঞাপনচিত্র এবং এই সব কাজের ফাঁকে ফাঁকেই বড় ছবি করার একটি ভাবনা, আগ্রহ তাঁকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়ে যাচ্ছিল। কারণ তথ্যচিত্রে, তথ্যের প্রাধান্যই বেশী। সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের দেশে যারা তথ্যচিত্রের ভার দেন, বিষয়বস্তুও তাঁরাই নির্বাচন করে দেন। হল্যাণ্ডের জোরিস ইভেনস তথ্যচিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে যে স্বাধীনতা পেয়ে থাকেন, আমাদের দেশে তা ভাবনার অতীত।

আর তাছাড়া চলচ্চিত্র নিয়ে যখন থেকে বুদ্ধদেবের ভাবনা-চিন্তার শুরু, তখন থেকেই কম খরচে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি নির্মাণের আশা এবং আগ্রহ একই সঙ্গে পাশাপাশি বাড়তে থাকে। আরও একটা প্রধান দিক, প্যারালাল সিনেমার স্বপ্ন।

যে প্যারালাল সিনেমার স্বপ্ন নিয়ে পঞ্চাশের দশকে ফ্রান্সে, তৎকালীন সিনেমার ভয়াবহ এক কঠিন শূন্যতা লক্ষ্য করে এগিয়ে এসেছিলেন ফ্রাঁসোয়া, গদার প্রমুখ,—সেই প্যারালাল সিনেমার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার এক দুর্দান্ত আকাংক্ষা, জেদ।

গল্প খুঁজতে লাগলেন বুদ্ধদেব। কি গল্প করবেন এই এক প্রাথমিক এবং প্রধান সমস্যা। আন্তোনিওনি একবার বলেছিলেন : দি ফিউচার প্রগেস্স অফ ফিল্ম মাস্ট বি ডোমিনিটেড বাই নিউ ফর্মাব।

সর্বক্ষেত্রেই কি কথাটি প্রযোজ্য?

আমাদের ইণ্ডাস্ট্রিতে প্রায় প্রতি দিনই এক-একজন করে নতুন চলচ্চিত্রকারের জন্ম হচ্ছে। বর্তমানে বাজারে যে কটি বাংলা ছবি দেখান হচ্ছে, তার মধ্যে অনেকগুলিই নতুনদের হাতে তৈরী। আন্তোনিওনির কথাটা কি তাদের ক্ষেত্রেও খাটে?

উত্তরে স্পষ্টভাবে বলা যায় না। কারণ তাদের ছবি দেখলে কোনক্রমেই এ বিশ্বাস দৃঢ় হয় না, যে তাঁরা ছবি করার স্বপ্ন নিয়ে ছবি করতে এসেছেন। তাঁদের মূল মন্ত্র টাকা করার জন্য ছবি করা। সেই কারণে এই সব নবাগতদের ছবি তৈরী হয়, অবাস্তব, নড়বড়ে গল্পের কাঠামোর ভিত্তিতে। সেখানে থাকে কাঁচা সেন্টিমেন্ট। অহেতুক গান। ধর্মীয় কাহিনীর ছড়াছড়ি। অথচ একই সময়ে, বের্তোলুচি, পন্টিকার্ভো, দমিয়ানি, ফ্রান্সেসকো প্রভৃতি শক্তিমান তরুণ পরিচালকেরা কাজ করে যাচ্ছেন।

বিদেশ থেকে চোখ ঘুরিয়ে যদি তাকাই ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে, সেখানেও দেখব, অংকুর, দস্তক টোটোচিত্তিসেভেন ডাউন, সারা আকাশ, আষাঢ় কা একদিন, গরম হাওয়া প্রভৃতি নির্মাণ করা হয়ে গেছে।

অথচ এই বাংলায়?—আজ থেকে ১৫।২০ বছর আগে ছবিতে যে গল্প ছিল, যে সেন্টিমেন্ট ছিল, ঠিক সেই সেই বস্তু অবিকল ধরে রাখতে আমাদের অসংখ্য নবাগতরা কী ভীষণ সচেষ্ট। অন্যথায় ট্র্যাডিশন যায় যায়। ধপাধপ ছবি ফ্লপ হচ্ছে, অথচ কাজ চলেছে বিরামহীন। সাধু। সাধু।

এই রকম সংকটাবস্থায় বুদ্ধদেব ছবি করতে এসেছেন।

এসেছিলেন বারীন সাহা নামে এক ভদ্রলোক। 'তের নদীর পারে' নামক একটি অবিস্মরণীয় ছবিও নির্মাণ করেছিলেন। ক্যামেরা দিয়ে নিয়েছিলেন এমন কতকগুলি শট, যা মূল্যবান সম্পদ হয়ে রইল ভবিষ্যতের দিনগুলির জন্য। বারীনবাবুকে ইণ্ডাস্ট্রি ছবি করতে দেয় নি। দর্শকও নেয় নি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিটা কার?

পি জি হসপিটালের উডবার্ণ ওয়ার্ডে ঋত্বিক ঘটককে প্রশ্ন করেছিলাম

ঋত্বিক বলেছিলেন, 'দর্শকের।'

'কিভাবে?'

'একটা ভাল ছবি যেহেতু দর্শন দেখলেন না, সঙ্গে সঙ্গে হারালেন আরও দশটা ছবি। যাতে পদার্থ থাকত। বাজেনের 'পালংক' মার খেলে, এর পর বাজেন ছবি করার জন্যে ভাববে দশবার। এবং যে সমস্ত ছেলেরা ভাল ছবি করবে বলে ভেবেছিল, তারাও একশোবার ভাববে। সুতরাং ক্ষতিটা তো হচ্ছে দর্শকের।'

ঋত্বিক তাঁর প্রতিভার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটাতে পারেননি, পারিনি পাবেননি, পারবেন না বাজেন। চোখের সামনে এইসব নজির। অথচ বুদ্ধদেব ক্ষণিকের জন্যও বিচলিত নন, এবং তাঁর উদ্যমেও ভাটা পড়ে নি। গল্প খোঁজার জন্য অবিরাম গল্প পড়তে লাগলেন। এমন এক গল্প নির্বাচন করতে হবে, যে গল্পে থাকবে একটি স্পষ্ট বক্তব্য। চিত্ররূপ দেওয়ার জন্য খুব বেশী অর্থের প্রয়োজন হবে না। সর্বোপরি চরিত্র থাকবে কম।

গল্প খুঁজতে বেশ সময় গেল। অথচ আমাদের ধমনীতে অজস্র আখ্যান-উপাখ্যান আছে। যার ভিত্তিতে ছবি করলে, মা-লক্ষ্মীর আগমনে ঘর আলো করার ব্যাপারটি ৯০ ভাগ পাকা করে ফেলা যায়। সাম্প্রতিককালে এই রকম কাণ্ডকটি কাণ্ড আমরা ঘটতে দেখেছি। বুদ্ধদেব সেদিকে যান নি, অবশেষে অনেক খোঁজা-খুঁজির পর পাওয়া গেল একটি গল্প। পাওয়া গেল বলা হয়ত সঠিক বলা হবে না। আসলে বহু দিন আগে পড়া একটি গল্পের কথা হঠাৎ বুদ্ধদেবের মনে পড়ে গেল। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ছ-সাত পৃষ্ঠার একটি গল্প। নাম,—'দ্রবত্ব।'

গল্পটি আবার পড়া হল। তারপর বার-বার।

'দ্রবত্ব' গল্পের নায়ক মন্দার। তরুণ অধ্যাপক। সে প্রায়ই একটি স্বপ্ন দেখে। দুঃস্বপ্ন। অঞ্জলি সদ্য মাতৃত্বের একটি বাচ্চা কোলে নিয়ে একটি ভিড় বাস থেকে তার নির্দিষ্ট জায়গায় নামতে চেষ্টা করছে। পারছে না কিছুতেই। বাসের ভিড় সন্তানের কান্না ছটফটানি অঞ্জলিকে এক ভীষণ খারাপ অবস্থার মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

অঞ্জলিকে বিয়ে করার পর মন্দার জানতে পারে, অঞ্জলি অন্তঃসত্ত্বা। এবং মন্দার এই সন্তানের জনক নয়। মন্দারের প্রশ্নের উত্তরে অঞ্জলি জানায়, সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখা এবং তার একটি পবিচয় সংগ্রহের জন্যই সে-এ কাজ করেছে। মন্দার ঘটনাটিকে সহা করতে পারে না। অঞ্জলি চলে যায় তার বাবার কাছে। বিবাহবিচ্ছেদ হয়। কিছু দিনের মধ্যে নন্দিনী নামে এক কলেজ ছাত্রীর সঙ্গে মন্দারের ঘনিষ্ঠতা হয়। মন্দার তাকে বিয়ে করবে বলে মনস্থির করে। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দেয়, বিয়ে করা কি ঠিক হবে?

ঠিক এই সময়েই স্বপ্নটি দেখে মন্দার।

তার ব্যাকুলতা বাড়ে। সে বোঝে, তার পক্ষে নন্দিনীকে বিয়ে করা সম্ভব নয়। একদিন সে গিয়ে উপস্থিত হয় অঞ্জলির কাছে। স্বপ্নের কথা বলে এবং বলে, অঞ্জলি যেন এর পর থেকে সাবধানে বসে ওঠা-নামা করে।

'দূরত্বের' গল্প এখানেই শেষ।

বুদ্ধদেবকে প্রশ্ন করেছিলাম, 'গল্পটি আপনাকে আকৃষ্ট করল কেন?'

'ভীষণ রকম এক মানবিক আবেদন রয়েছে বলে।'

প্রশ্ন উঠতে পারে, যিনি প্যারালাল সিনেমার স্বপ্ন দেখেন, তিনি কেন এমন একটি নিটোল গল্প নির্বাচন করলেন, বিশেষত এটাই যখন তাঁর প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি।

সাময়িক ভুল বোঝাবুঝি দিয়ে শুরু করে, শেষে কান্না এবং গান দিয়ে ছবি সমাপ্ত করার অগুণতি লোক আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে আছেন। বুদ্ধদেব কেন? তাঁরাও গল্পটি করতে পারতেন।

প্রসঙ্গত মনে পড়ে যায় গদারের 'টু অর থ্রি থিংগস, হোয়াট আই নো অ্যাবাউট হার' ছবিটি। সেখানে দেখা যায়, ফ্রান্সে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের হাতে টাকা আসছে। এবং তাদের জীবন-যাত্রার মান অতিদ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। আমরা এক সময় দেখি স্ট্যাটাস অক্ষুণ্ণ রাখতে, কয়েকটি পরিবারের মহিলারা বাড়তি টেলিফোন বিল, ইলেকট্রিক বিল মেটাচ্ছে। নিজেদের দেহ বিক্রয় করে। কিন্তু তারা গণিকা নয়।

বাংলা সাহিত্যে আমরা এমন অসংখ্য গল্প কি পাই নি, যেখানে অসুস্থ স্বামীকে বাঁচাবার জন্য স্ত্রী দেহ ফিরি করে বেড়াচ্ছে? টেলিফোন বিল মেটানোর চেয়ে, অসুস্থ স্বামীর ওষুধ কেনার জন্য দেহ বিক্রয় করা ঢের পুণ্যের। আমাদের বাংলা ছবিতেও এমন ঘটনা এসেছে। কিন্তু গদার আমাদের যেখানে নিয়ে যান তাঁর আশ্চর্য ক্যামেরা ক্ষমতার মাধ্যমে সেখান থেকে আমরা দেখতে পাই ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় মানুষ ক্রমশ কী হয়ে যাচ্ছে। কিভাবে আমেরিকানাইজড হয়ে পড়ছে ফ্রান্স তথা ইউরোপ।

গদারের বিষয় নিয়ে আমাদের এখানে রাম-শ্যাম-যদুও ছবি করতে পারেন। করলে সেটা যে কি বস্তু হবে, তা বুঝবে রসিকজন, যে জান সন্ধান। 'দূরত্বের' বেলায়ও একই কথা বলা চলে।

এই গল্পটিই করা হবে স্থির হবার পর, একটি প্রশ্ন উঠলো—শুধু কি মানবিক আবেদনের ভিত্তিতেই চিত্রনাট্য রচনা, হবে? ব্যক্তি মানুষ তো একই সঙ্গে একলা এবং সমাজবদ্ধ। মন্দার অধ্যাপক। একজন সামাজিক ব্যক্তি। নিশ্চয়ই সমাজ এবং রাজনীতি বহির্ভূত মানুষ নয়। এই সমাজে তার একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা আছে। মূল গল্পে মানবিক তাৎপর্যকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক তাৎপর্য সেখানে সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। কাহিনী বিন্যাসের সময় বুদ্ধদেব এবং গল্পকার অমিয়ভূষণ বসু যিনি এই ছবির শুরু থেকে গভীরভাবে জড়িত, মূল গল্পের মানবিক আবেদনের দিকে নজর রেখে রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতটিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কারণ তত্ত্ব এবং প্রয়োগের দ্বন্দ্ব শুধুমাত্র একটি মানবিক সমস্যা নয়, একই সঙ্গে একটি জরুরী রাজনৈতিক সমস্যাও। অতএব ছবিতে রাজনীতি এলো। আসার আরও একটি কারণ, যাঁরা রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন, তাঁরা গল্প ভেঙে দিয়ে, ঘটনাকে ঘটনা হিসেবে দেখিয়ে, তার একটি রাজনৈতিক তাৎপর্য দিতে চান। দেওয়া আবশ্যক বোধ করেন। কারণ ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় যেকোন শ্রেণীবিভক্ত সমাজে যেকোনো সামাজিক ঘটনাকে রাজনীতিহীন চমকপ্রদ গল্প হিসেবে হাজির করা বুর্জোয়া রাজনীতির কাজ। কাহিনী বিন্যাসের সময় এইভাবে এল রাজনীতি, এল আরও চরিত্র, গল্পটি পেল সম্পূর্ণ একটি নতুন আকার। ছবির সময়কাল হিসেবে বেছে নেওয়া হলো সেই সময়কে, যখন দেশ জুড়ে চলেছে পুলিশ এবং গুণ্ডার সন্ত্রাসের রাজত্ব। বিভিন্ন এলাকা থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে সমস্ত রাজনৈতিক কর্মীদের।

এইরকম রাজনৈতিক কর্মীর আশ্রয়ের কথা একদিন নৃপতি মন্দারকে বলে। নৃপতি মন্দারের বন্ধু। সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। মন্দার আশ্রয় দেয় না।

মন্দার চরিত্রে অভিনয় করেছেন প্রদীপ মুখোপাধ্যায়। এবং নৃপতি চরিত্রে পৃথ্বীশ ভট্টাচার্য নামে এক নতুন অভিনেতা। যিনি ব্যক্তিগত জীবনেও একজন রাজনৈতিক কর্মী। ফলে তিনি অভিনয় করেন না। প্রয়োজনে নিজের নামটুকু কেবল বদলে নেন। মন্দার অধ্যাপক। কিন্তু কি তার বিষয় গল্পে বলা হয়নি। এখানে বলা হতো মন্দার পোলিটিক্যাল সায়েন্স পড়ায়। বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী। ক্লাসে এসেলসের বক্তব্য উদ্ধার করে সে বোঝায়, ব্যক্তি সম্পত্তির বিলোপের সঙ্গে নারীমুক্তির প্রশ্নটি একাত্মভাবে জড়িত। পুরুষ শাসিত সমাজ শাসক শ্রেণীর পুরুষ, নারীকে ব্যক্তি সম্পত্তি হিসেবেই ব্যবহার করে। মন্দারের এই বিশ্বাস প্রয়োগের ক্ষেত্রে এলে আমরা দেখি তার মধ্যবিত্ত সংশয় এবং দুর্বলতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছে তার কথা এবং কাজের মধ্যে একটি ব্যবধান।

অঞ্জলি অন্তঃসত্ত্বা।

কিন্তু কেন এবং কার দ্বারা, সেকথা চিত্রনাট্যে বলা হলো। অমিত তা ব্যক্তি হিসেবে বিশ্বাসহীন, দ্বিধাগ্রস্থী। তার স্বভাব অত্যন্ত লঘু। কিন্তু শয়তান নয়। অমিত অঞ্জলির দাদার বন্ধু। দাদার মৃত্যুর পর সে অঞ্জলিদের পরিবারকে নানাভাবে সাহায্য করেছে। অমিতকে অঞ্জলি অসুস্থ ভাবলেও, সে তার প্রতি করুণা বোধ করে। একটি পূর্ণাঙ্গ দায়িত্বপূর্ণ সম্পর্কে গড়ে তুলে অমিতকে নৈতিক এবং মানসিক দিক থেকে অঞ্জলি কিছুটা স্বচ্ছন্দ রাখতে চায়। বিস্তৃত ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর যখন অঞ্জলি অন্তঃসত্ত্বা হয়, তখন অমিত তার সন্তানের দায়িত্ব অস্বীকার করে। অমিত চরিত্রে অভিনয় করেছেন নিরঞ্জন রায়। তাকে তো আজকাল আর দেখাই যায় না।

যাইহোক, অঞ্জলি অতি সহজেই এই সংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারতো। কিন্তু সে পথে না গিয়ে সে শিশুটিকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইল, কারণ তারও কয়েকটি গভীর মানবিক মূল্যবোধ আছে, যেখান থেকে সুস্থ রাজনৈতিক বিশ্বাসের জন্ম; সেই মূল্যবোধকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে, শিশুটিকে বাঁচিয়ে রাখা ভীষণভাবে প্রয়োজন। অমিতের সঙ্গে সে সম্পর্ক শেষ করে মন্দারের সঙ্গে একদিন রাস্তায় এ্যাপয়েন্টমেন্ট করে। অমিতই মন্দারের সঙ্গে অঞ্জলির আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। মন্দারের আছে গভীর মূল্যবোধ এবং স্বচ্ছ ব্যক্তিত্ব।

নির্দিষ্ট দিনে রাস্তায় দেখা করে অঞ্জলি মন্দারকে জানায়, তার একটি চাকরির প্রয়োজন। কারণ বাড়ি থেকে তার এমন এক জায়গায় বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা চলছে, সেখানে ওর মত নেই। চাকরি ছাড়াও তো বাঁচবার অন্য পথ আছে। মন্দার মুহূর্তে ভীষণ দুর্বল বোধ করে। সে নিজেই অঞ্জলিকে বিয়ে করতে চায়। অঞ্জলি জানায়, মন্দার তো কিছুই জানে না তার বিষয়ে—প্রয়োজন নেই। যতটুকু জেনেছে তাই যথেষ্ট।

সবল সত্য গোপন করে মন্দারকে বিয়ে করার একমাস পর, যখন যথার্থ একটি মানবিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেছে, অঞ্জলি স্বেচ্ছায় স্বীকার করে যে সে অন্তঃসত্ত্বা। মন্দার মেনে নিতে পারে না। সে সমস্যাটিকে প্রবঞ্চনার সমস্যা হিসেবেই দেখে। ফলে অঞ্জলি ফিরে যায় তার বাবার কাছে। বিবাহ বিচ্ছেদ হয়।

অঞ্জলি এবং তার বাবার ভূমিকায় যথাক্রমে মমতা-শংকর এবং বিজন ভট্টাচার্য অভিনয় করেছেন। মমতাশংকর অভিনীত

প্রথম বাংলা ছবি 'দূরত্ব' এবং বিমল ভট্টাচার্য এই ছবিতেই শেষ অভিনয় করে গেছেন। বুদ্ধদেব ভাগ্যবান।

অথচ এই মন্দারই কলেজে এসেলসের উক্তি দিয়ে নারীমুক্তির কথা বলে। নারীকে গাড়ি, বাড়ি, ফ্রিজের মতো ভোগ্যবস্তু নয়। সেকথা বোঝায়। অথচ কার্যক্ষেত্রে তার মধ্যবিত্ত সংস্কার এবং দুর্বলতা, তার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কী ভীষণ ক্রিয়াশীল। রাজনৈতিক এবং সামাজিক কোনোদিক থেকেই সে অঞ্জলির সমস্যাটিকে বোঝার চেষ্টা করে না।

নৃপতি যখন ঐ রাজনৈতিক কর্মীর আশ্রয়ের কথা বলে তখনো দেখেছি। মন্দার বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী। সে বিশ্বাস করে এই দুঃসময়েই কর্মীকে আশ্রয় দেওয়া ভীষণ প্রয়োজন এবং তার কর্তব্য। কিন্তু দেয় না। একটু একটু করে সে রাজনৈতিক বিশ্বাস থেকে সরে যায়। এবং একাকীত্বের শিকার হয়। সে একাকীত্বের শিকার হওয়ার পর থেকে মানুষ তার মৌল সমস্যা থেকে দূরে সরে যেতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত এই ব্যবস্থাকে টিঁকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। সমস্ত কিছুর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সে বেছে নেয় নন্দিনী নামে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের এক চাকুরিজীবী মেয়েকে। নৃপতি ঘটনাটি জানতে পেরে প্রশ্ন তোলে এবং অঞ্জলি সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে বলে।

কিন্তু মন্দারের বদ্ধমূল ধারণা, অঞ্জলি তার সর্বনাশ করেছে। শুধু মন্দারের নয়, প্রচলিত মূল্যবোধে বিশ্বাসী মন্দারের মা-বোনও ঐ একই ধারণার বশবর্তী হয়। একমাত্র ব্যতিক্রম মন্দারের ভাই শৈবাল। একজন রাজনৈতিক ছাত্র-কর্মী। সেই মন্দারের এই ভ্রান্ত মূল্যবোধের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলে। সে বোঝে, বৌদির কোনো স্পষ্ট রাজনৈতিক চেতনা না থাকলেও, বর্তমান সমাজব্যবস্থায় একটি শিশুকে প্রচণ্ড সামাজিক দুর্যোগের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখাই হচ্ছে মূল লড়াইয়ের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। গোপনে সে বৌদির সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। শৈবাল চরিত্রে অভিনয় করেছেন প্রভাস সরকার। মৃণাল সেনের 'পদাতিক' ছবিতে যিনি এক রাজনৈতিক কর্মীর ভূমিকায় রূপদান করেছিলেন। প্রভাস বেকার। অভিনয়কে পেশা হিসেবে নেবার কথা ভাবছেন। কিন্তু আমাদের ইণ্ডাস্ট্রিতে প্রভাসের মতো ছেলেরা কতটুকু জায়গা করে নিতে পারবেন এবং কিভাবে?

না নৃপতি না শৈবাল কারো কথায় কর্ণপাত করে না। বস্তুত ঝুঁকি নিয়ে সে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে রাজী নয়। সকলের কাছ থেকে, এমনকি নিজের কাছ থেকেও পলায়নের সোজা রাস্তা বেছে নিয়ে সে নন্দিনীর দিকে অগ্রসর হয়। নন্দিনীর বাবা মৃত। মা উন্মাদ। ব্যক্তিগত জীবন তার এই কারণে বিপর্যস্ত। সাংসারিক অশান্তির ভয়ে এবং মার প্রতি দায়িত্ব বোধের জন্য নন্দিনী বিয়ের দিকে এগুতে পারে না। কিন্তু প্রচণ্ড রকম ভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। এনেছে মায়ের প্রসঙ্গ। এবং নিজে থেকেই সবকিছু ভেঙে দিতে বাধ্য হয়েছে। একের পর এক ঘটতে থাকে একই ঘটনা। এক সময় মন্দারের সঙ্গে তার আলাপ হয়। পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং ব্যর্থতা, নন্দিনীর চরিত্রে এমন এক লঘু এবং বড় উপাদান তৈরি করে, যাতে একদিন মন্দার প্রচণ্ড পীড়িত হয়। সে পিছিয়ে আসে।

নন্দিনী চরিত্রে রূপদানকারী শিল্পী সিনহা বন্দ্যোপাধ্যায়। গানে পারদর্শিনী। ইস্কুলে অংক করান। এবং নিজে অংক নিয়ে গবেষণা করেন। ভালো ছবিতে অভিনয়ের আশা রাখেন। প্রশ্নটা ওঠে এখানেই। কটা হয় ভালো ছবি?

নন্দিনীর কাছ থেকে পিছিয়ে আসার পর মন্দারের মনে পড়ে যায় নৃপতির প্রশ্ন, বিপ্লবী কর্মীকে আশ্রয়দানের অনুরোধ, নিজের অতীত, রাজনৈতিক বিশ্বাস, তাই শৈবালের ঠাণ্ডা ব্যবহার ইত্যাদি; এবং এইসব একত্র হয়ে তাকে ভীষণ ভাবনার মধ্যে ফেলে দেয়। সে বুঝতে পারে, সে অঞ্জলির প্রতি এক চরম অন্যায় করেছে। বুঝতে পারে, নবজাতকের ভবিষ্যত গড়ে তোলার সঙ্গে মূল সংগ্রামের কোনো বিরোধ নেই।

দীর্ঘ দুবছর পরে মন্দার ফিরে যায় অঞ্জলির কাছে।

—আমরা বুঝতে পারি মন্দার এইবার সেই ফেরারী বিপ্লবী কর্মীকে আশ্রয় দেবে। দেখতে পাই সেই মন্দারকে—সে সারা চিত্রনাট্য জুড়ে চলাফেরা করেছে, অথচ দেখা যায়নি।

গল্প খুঁজে গল্প পাওয়া গেলো। তাকে বিন্যাস করে রচিত হলো চিত্রনাট্য। এইবার চিত্রনাট্যটি সেলুলয়েডে ধরার জন্য চাই টাকা।

তথ্য এবং বিজ্ঞাপন চিত্র করে বুদ্ধদেব যে টাকা জমিয়েছিলেন, তাই নিয়ে নেমে পড়লেন। সঙ্গে এলেন কিছু বন্ধু যাঁরা টাকা দেবেন।

চিত্রগ্রহণের জন্য নিলেন রণজিৎ রায় নামে পুনা ফিল্ম এ্যান্ড টেলিভিসনের এক কৃতী ছাত্রকে। সঙ্গীতের ভার দিলেন খ্যাতনামা আধুনিক উর্দু কবি আরান রশীদকে। শুটিং শুরু করার কিছুদিনের মধ্যেই টাকা ফুরিয়ে গেল। যেসব বন্ধুরা টাকা দেবে বলে ছবির শুরুতে বুদ্ধদেবের সামনে বুক পেতে দাঁড়িয়েছিল — অর্থ সংকটকালে বুদ্ধদেব তাদের পিঠ দেখতে পেলেন। এক সময় শুটিং বন্ধ।

তাহলে কি 'সময়ের কাছের' ঘটনা পুনরায় ঘটতে চলেছে।

দাঁতে দাঁত চেপে কঠিন হলেন বুদ্ধদেব। ছবি তিনি শেষ করবেনই। একটাই উপায়,—ধার। ধারের পর ধার করে চললেন। সরাসরি। কেউ বা ভবিষ্যতে সাহায্য করবেন, এই মৌখিক আশ্বাসের ওপর নির্ভর করে।

ধার করে দিনের পর দিন শুটিং করে যাওয়া হলো। অবশেষে একদিন বুদ্ধদেব শেষ করছেন তাঁর প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি, 'দূরত্ব' শুরু করেছিলেন সাতাত্তরের সেপ্টেম্বরে। শেষ হলো ডিসেম্বরে। সম্পাদনার দায়িত্ব নিলেন মৃন্ময় ভট্টাচার্য। ফিল্ম ইন্সটিটিউটের ছেলে।

বুদ্ধদেব শক্তিমান তরুণ কবি। 'দূরত্ব' ছবি নির্মাণের জন্য যেমন তিনি দিনের পর দিন শট নিয়েছেন, কবিতাও লিখেছেন সময় করে। তিনি মনে করেন, চলচ্চিত্রের মতো একটি শক্তিশালী মাধ্যমের ওপর কবিতার দাপট চাপিয়ে না দিয়েও, কবিতার কিছু মৌলিক সার্চ বজায় রেখে, চলচ্চিত্রের ঋজু কাঠামোর মধ্যে তার বিশ্বাস্য বক্তব্যকে তিনি হাজির করতে পারেন।

বহু কষ্টের মধ্যে শুরু হয়ে শেষ হবার পর 'দূরত্ব'কে যার সম্মুখীন হতে হলো, তার নাম,—ডিস্ট্রিবিউশন।

যাঁরা ফাঁকি না দিয়ে ভালো ছবি নির্মাণ করার চেষ্টা করবেন, করেছেন, তাঁদের এই ডিস্ট্রিবিউশন নিয়ে কি রকম পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয় তার একটা উদাহরণ দিই। এক তরুণ চলচ্চিত্রকার ছবি করার পর এক ডিস্ট্রিবিউটরের দরজায় গেলো, ডিস্ট্রিবিউটর তাঁকে প্রথম প্রশ্ন করেন, 'কটা গান আছে আপনার বইতে?' (ছবিতে নয়) এইরকম প্রশ্নে পরিচালকটি ভড়কে যান।

বলেন, গান তো নেই!'

—গান নেই!

'নেই মানে আছে,—রবীন্দ্রসঙ্গীত।'

ডিস্ট্রিবিউটর মশায় তাচ্ছিল্য করে বলেন, 'দূর মশাই ওসব রবি ঠাকুরের গানে কি বই চলে। আধুনিক গান জোগাড় করে সাত-আটটা। তারপর আপনার বই নেবো।'

বুদ্ধদেব মুষড়ে পড়বেন না। কোনো ডিস্ট্রিবিউটর যদি ছবি না দেন তাহলে কিভাবে ধারদেনা করে ছবি নির্মাণ করা হয়েছে, সেইভাবেই রিলিজ করবেন।

বিভ্রান্ত অর্জুন

নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়

শ্মশান-সহর শুধু জ্যোৎস্নায় হাড় দিয়ে রাষ্ট্রসংঘ গড়ে,
সব যুদ্ধ জন্ম নেয় মানুষের মনে, এ কথা সরল সত্য—
পথ কেন রক্তাক্ত। কেন এত অন্ধকার? কার পাপে, কেন?
সবাই নিরুত্তর, বহুদূরে আকাশের নক্ষত্রেরা হাসে।

মানুষই স্বর্গ গড়ে, বর্ণে ছন্দে এক স্বর্গ, স্বর্গ ভালোবাসা,
মৃত্যুছন্দ বিশ্বময়, সূর্য নিষ্প্রভ হয়ে যায় রক্তের আগুনে
আকাশ স্বপ্নিল নীল, স্বপ্নে কত অনুরাগ, তবুও আগুন জ্বলে
মনে, দেশেদেশান্তরে। রণক্ষেত্রে ভাখো ওই বিভ্রান্ত অর্জুন

একটি কবিতা

শংকর দে

মেয়েটির নাম ছিল বিশ্ব
চানে সে ঢেকে রেখেছিল
ছেঁড়া পাতা, কাজলের শিস
হাতে নিয়ে, বেজে উঠেছিল
ছন্দ-বিম্ব, নূপুরের পায়ে
নয়নে সে একা জেগেছিল
সারারাত, আকাশ-কুসুম।

ডাকবাংলো

বাসুদেব দেব

ডাকবাংলো পড়ে আছে বিস্মৃত স্মৃতির মত
তাকে পুজো করে দুটি ডালিয়ার টব
তারা কেউ নেই আজ লাল টাই হলুদ আঁচল
শুধু চায়ের কাপে সেই দুটি জীবনের স্বাদ
ঘুড়ে বনমালি
খালি পায়ে হেঁটে হেঁটে তদারক করে এইসব

একটি কবিতা

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

গোরুবাড়ির তিনজন রাখাল
একজন গোবর কুড়তে কুড়তে
কেবল হাসে
একজনের গায়ে সিউড়ি থেকে কেনা
ছাপা ফুলের শার্ট
সে খুব কায়দা করে বিড়ি নাড়তে শিখেছে;

একজন রাখাল খুব বুড়ো হয়েছে
এক শতাব্দীর কষ্ট
তার মুখ দেখে মনে পড়ছে।

ব্যাহতস্পর্শ

শক্তিপদ ব্রহ্মচারী

১. কাউকে চিনি না, তবু তোমাদের গলিপথ চিনি
অগস্ত্য-ইচ্ছার নীচে একজন তরল বৈরিণী
ঘর ভাঙে, ফের ঘরে ডাকে
তোমার ফাল্গুনে জন্ম? আমার বৈশাখে
২. চোখের পদবী খোলো, হাতে লাগে খুন
ও দাদা দোহাই দিই, এইবার পর্দাটা টানুন
অনেকক্ষণ বসে আছি, এইবার পাহাড়ে-টাহাড়ে
যেতে হবে
মেয়েমানুষের এক ইতর-উৎসবে
কে কোথায়, বাঙা-বউ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে
৩. আধখানা মরা চাঁদ, কাল রাতে এসে
অন্ধকারে মৃত্যু ভালবেসে
টেনেছিল তাকে,
বালিশে ঘুমের ঘোরে পেয়েছি তোমাকে।।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

হাওয়া গাড়ি

।। তিরিশ ।।

অফিসে ঢুকতে লজ্জা করছিল দিলীপের। অনাথ চক্রবর্তী তার পিঠে হাত দিয়ে ডিপার্টমেন্টে নিয়ে গেল। বসে পড়ো তো নিজের জায়গায়। ঘোরো। ফেরো। এ তোমার নিজের অফিস।

খানিক বাদে নিজের টেবিলে ফোন বেজে উঠতেই দিলীপ তুললো।

ও পাশ থেকে এম ডি বললো, এই ভালো হোল। অনেক আগেই তো এভাবে জয়েন করতে পারতেন।

তা পারতাম।

সই করেছেন?

এখনো করিনি। করব—

করুন। আপনার সার্ভিসের কোন ব্রেক থাকবে না। বকেয়া মাইনে সব পেয়ে যাবেন কাল। বেগুলার কবে চিঠি দিচ্ছেন তো?

নিশ্চয়।

অনেক দিন পরে অফিসের জন্যে মায়া হল দিলীপের। এই অফিস ছেড়ে কি করে দূরে ছিলাম? এদের বিরুদ্ধে আমি হাইকোর্টে গিয়েছিলাম। সেসব শুধু মিথ্যে। বাড়িতে ফোন করল দিলীপ।

আমি জয়েন করলাম রাণী।

স্যার লেদার্লির কোম্পানীতে?

ধ্যাৎ! তা কেন? আমার অফিসেই জয়েন করলাম—

সত্যি?

হ্যাঁ রাণী। এই তো আমার টেবিলে থেকেই ফোন করছি।

সব মিটে গেছে — তাহলে খুব ভাল। আমি বলি কি — তাহলে তুমি ফ্ল্যাটের কিস্তি শোধ করে দাও। একবার গেলে এ রকম ফ্ল্যাট আর পাবে না।

নিশ্চয়। বলে ফোনটা রাখল দিলীপ। এখন তার সামনে অফিসটা দু ভাগে ভাগ করা। এক ভাগ হল—যারা খুব আশা করেছিল—দিলীপ বসুর আর এ-অফিসে ফেরা হচ্ছে না। আরেক দল হল—যারা চায়—দিলীপ বসু ফিরে আসুক। দু দলেরই লোকগুলোর মুখ চেনে দিলীপ।

কলকাতার মার্কেন্টাইল ফার্মগুলোর এক পাল একজিকিউটিভ গত তিন-চার মাস সুখাদ্য হিসেবে একটি জিনিসই চিবিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়েছে। তা হল: দিলীপ বসু আর কোল ইণ্ডিয়ায় ফিরবে কিনা? ফিরতে পারবে কি? এই এক আলোচনা। বার বার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এই এক আলোচনায় তারা চোয়াল ব্যথা করেছে। এক পালের অ্যাটিচিউড—বেশ হয়েছে। খুব বাড় বেড়েছিল দিলীপ। আরেক পাল চাইছিল, হাইকোর্টের অর্ডারে মেসার্স ইণ্ডিয়া কিছুটা নাস্তানাবুদ হোক।

তার জয়েন করার খবরটা যেমন নানান দলের মনের অবস্থা কি হয়, তাই ভাবছিল দিলীপ। ইস! কেন যে বাড়ির জন্য খেলা পরিত্যক্ত। সভাইটা কেমন জমল না।

খোঁজ নিয়ে জানল, খারি আউট অব স্টেশন। ইস্টার্ণ কোল ফিল্ডস-এর কাছে ওয়াগন চাইতে গেছে ধানবাদে। ফিরতে আরও দু দিন।

টেলিফোনে অনন্তকে পেল না, গোবিন্দ পিওন ঘিয়ের অফিসে জয়েন এনগেজড। শেষে স্বাতীকে ফোন করল। ওকে কথা আছে—লম্বা ট্যুরে অফিসের কাজে কলকাতার বাইরে যাচ্ছি। কবে ফিরব জানি না।

ফোন ধরল পুরুষ কণ্ঠ। স্বাতী বাড়ি নেই। এখুনি ফিরবে। আপনার নাম, নম্বর বলুন লিখে রাখছি।

নাম বলতেই ওপাশ থেকে গলা ভেসে এলো। আমি জ্যোতির্ময়। নিশ্চয় নাম শুনেছেন।

একশো বার। এবার গিয়ে জরুরি করে আসব। বলবেন—আমি ট্যুর থেকে ফিরে এসেছি।

তাহলে এবার বউদিকে নিয়ে আমাদের বাড়ি আসুন।

এইবার যাবো।

জানলা দিয়ে কলকাতার বড়বেলার আলো। সেদিকে তাকিয়ে একজনের জন্যে তার অন্যটা হু-হু করে উঠল। সে তার বউ। রাণী। এ ফ্ল্যাস এক্সবারও সে জানতে চায় নি—তোমার কি হবে? চাকরি থাকবে তো? যদি চাকরি যায় তাহলে কি করবে? —সে হল রাণী। যেন দিলীপের অফিসে কিছুই হয় নি—যেমন চাকরি করছিল তেমনই করে যাচ্ছে—এ রকম একটা প্রশ্নহীন অবস্থার ভেতর সে সংসার করে গেছে এ ক'মাস। দুনিয়াসুদ্ধ বাকি লোকের মধ্যে ছিল শুধু ওই সব প্রশ্ন। দিলীপ জবাব দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। কেউ কেউ মামলার খবর জানতে চাইত। জানতে চাইত—কোর্টে কেমন খরচা পড়ছে? দিলীপ যা ইচ্ছে বলে দিত।

অফিসের পর লিফটে ঢুকল। সেই সঙ্গে ঢুকল এসট্যাবলিশমেন্টের বড় কেরানী গৌতম। সে হাসতে হাসতে বলল, শেষ অবধি ক্ষমা চাইলেন?

ক্ষমা? কার কাছে।

নাঃ। আপনার ফাইলটা আমার হাতে এসেছিল। টাইপ হতে গেল—

ক্ষমা তো চাই নি।

আপনাকে ক্ষমা করা হচ্ছে।

যে-জিনিস চাই নি — তা আমাকে কেউ করে কি করে?

অনাথবাবু আপনার চিঠির ওপর সাসপেনসন উইথড্রলের নোট দিয়েছেন।

লিফট থেকে বেরিয়ে রাস্তায়। সেখান থেকে গাড়িতে ওঠার মুখে দিলীপ বলল,

আমরা তো দুঃখ প্রকাশের—লেটার অব রিগ্রেট এক্সচেঞ্জ করে ছিলাম—

কাল-পরশু তো চিঠি পেয়ে যাবেন। সবই জানতে পারবেন।

মনের ভেতরে একটা কেটে যাওয়া নখ আঙুলে চেপে ধরে দিলীপ বাড়ি ফিরল। একটু আগেও পৃথিবীকে যতটা নির্মল আর সুন্দর লাগছিল এখন আর ততটা লাগল না।

রাণী অনেক দিন পরে ফ্রিজ থেকে বড় আঙুর বের করল। বোঝাই যায়—ফোনে খবরটা পাওয়ার পর বাজারে বেরিয়েছিল।

জামা-কাপড় না ছেড়েই দিলীপ খাবার টেবিলে বসে দুটো আঙুর ছিঁড়ে নিল। আগে আঙুর আপেল খেলে আমার নিজেকে বুগী মতে হত।

দিলীপ দেখল, রাণী আজ সন্ধ্যে হবার আগেই চুল বেঁধেছে। গা ধুয়েছে। হাসতে হাসতে বলল, কচি ঠাকুমা কি চিরকালই এত সুন্দর থাকবে।

কেন? তুমি কি চাও—আমার দাঁত পড়ে যাক? চুলে পাক ধরুক?

ও কে চায়। কিন্তু আমার ভয় করে রাণী।

কিসের ভয় বল তো?

আমি তো বুড়ো হয়ে গেছি। বয়স বাড়ছে। অথচ তুমি এখনও রহস্য মাখান। বাইরেটা তোমার যা দেখি—ভেতরে না জানি আরও কতো কি আছে।

আমি তো সারাদিন পায়ের ওপর থাকি। রবির ছেলেটাই আমায় ঘুমোতে দেয় না।

খোকন কোথায়?

কুটু পিসির সঙ্গে বেরিয়েছে—

পালিত বাড়ি যায় নি তো আবার?

কুটু সে পাত্তরই নয়। আমি ভাবছি অন্য কথা—

কি কথা রাণী?

হয়ত বিশ্বনাথের সঙ্গে স্কুটারের পেছনে চড়ে ভাইপোকে নিয়ে বেরিয়েছে কুটু।

তা কবে থাকলে ভাল করে নি কুটু। স্কুটার খুব রিস্কি।

খানিকক্ষণ চুপচাপ। দিলীপের বার বার মনে হচ্ছিল, তাকে ক্ষমা করবার কে অফিস। ক্ষমা তো আমি চাই নি। তাহলে?

মনটা ভেতরে ভেতরে অস্থির। তবু বাইরে শান্ত হয়ে থাকল দিলীপ। শেষে বলল, আগে ফাঁকা বাড়িতে থাকলে মনে হত—তোমায় নিয়ে কিছু করি।

আগে তো পাগল হয়ে যেতে। তখন কুটু হয় নি। রবি ছোট।

এখন অন্য রকম মনে হয় রাণী।

রাণী চুপ করে তাকিয়ে ছিল। বাইরে পৃথিবীর রাস্তায় এই সময় রোজ আলো জ্বলে ওঠে। আজ এ-ঘরে এখনও সুইচ টিপে আলো জ্বালান হয় নি।

এখন তোমার সঙ্গে এমন ফাঁকা বাড়িতে আমার মনে হয় রাণী — আমি আর তুমি দুজনের মত দুজনে একা একা আছি।

কিচ্ছু বুঝতে পারছি না আমি।

কত আনন্দ করে দুজনে শুরু করেছিলাম। জীবনটা তো দুর্গাপুজোর মতই শুরু হয়েছিল। এখন আমরা শুধু অপেক্ষা করে আছি—

বিশ্বাস কর। কিচ্ছু বুঝতে পারছি না আমি। সবগোলমাল হয়ে যাচ্ছে—

আমাদের সামনে কি আর কোন আশা আছে? এই বাড়ি—এই জীবন—রবি—রবির ছেলে— কুটুর বিয়ে—কোনটাই যে আমায় আর টানে না রাণী।

তোমার রিলাক্স করা দরকার। দরকার। ভীষণ টেনশন গেল তো তোমার—

টেনশন নয়। ওর ভেতর তো আমি চিরকালই আছি। গা-সওয়া হয়ে গেছে। আমি ভাবি ফাঁকা বাড়িতে তোমায় একা পেয়েও আমি আর পাগল হই না কেন আগের মত?

বয়স হচ্ছে। আমার শরীর তোমার শেষ কথা তো কখনোই হতে পারে না। তোমার কাজ বাকি অনেক। ওদের সেটেল করে যাওয়া—

আমার বাবাও বোধহয় এভাবে ভাবতেন রাণী। তার বাবাও ভাবতেন।

এভাবেই তো লোকে সংসার করে।

সব বড্ড তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাচ্ছে। তাই না?

ভাবলেই শেষ। না ভাবলেই শেষ নয়। তুমি ভাবাভাবি একটু কমাও তো।

এবার মাল্টিপল ইন্সটলমেন্টে ফ্ল্যাটের দেনাটা শোধ দিতে শুরু করা।

কার জন্যে ফ্ল্যাট করবে।

আমাদের ছেলে-মেয়েদের জন্যে।

কুটু তো বিয়ে করে চলে যাবে।

বিশ্বনাথকে নিয়ে বেড়াতে আসবে তো বিয়ের পর। কোথায় থাকবে?

তুমি অনেক দূরে ভাব।

আমি এ বাড়ির মা। রবির বিয়ে হলে—

রবি আগে ফিরে আসুক তো।

ও কথা বলছ কেন ওগো?

রবির ফেরা তো। সে-এখন অগাধ জলে, রাণী।

তবু কি আমরা আশা করব না?

আশা করা সব সময়েই ভাল রাণী। কিন্তু আমার যেন মনে হয়—রবিই সব তছনচ করে দিল। ভেবেছিলাম—ও পড়াশুনো করে পাশে দাঁড়াবে। সব বাবাই যেমন আশা করে। কুটুর কথা ছিল গান শেখার। ভাল গানের গলা। শিখল কোথায়? তার বদলে বিশ্বনাথের পপ সং ওর পছন্দ হয়ে গেল।

রবি বিয়েটাও করল এমন—

রবির ব্যাপারে তুমি বাবা হিসেবে মন দাও নি। বুকে হাত দিয়ে বল—সেই সময়টা ভৌমিক খাদান—কমিশনই ছিল তোমার ধ্যানজ্ঞান।

রবি তো আমায় দালাল বলেছিল তখন! আমারই স্যান্ডেল পায়ে দিয়ে—

তোমার স্যান্ডেল?

সাবধান হয়ে গেল দিলীপ। কী কথায় কী কথা বেরিয়ে যাচ্ছিল মুখ দিয়ে! দিলীপ হেসে বলল, আমারই স্যান্ডেল পায়ে দিয়ে তখন ঘুরে বেড়াত।

তখন সব বেশ সবল ছিল। এই তো—তিন বছরও হয় নি। দেখতে দেখতে সব কি হয়ে গেল।

এইভাবেই বোধহয় সব হয়ে যায়। বাবা-মা আমাদের ভালবাসতেন। আমাদের জন্যে কোন হিসেবের পরোয়া করেন নি। আমরা কি সেই অনুপাতে বাবা-মাকে অত ভালবেসেছি, রাণী। বাসি নি। তাঁদের আশা, ইচ্ছের কথা চিন্তাও করি নি। তার বদলে ছেলে-মেয়ের জন্যে আমরা মনের, সামর্থের সবখানি দিয়েছি। ওরা আমাদের জন্যে পরোয়াও করে নি।

চল না আমরা কোথাও ঘুরে আসি কিছুদিনের জন্যে। দীঘায় কটেজ নিয়ে থাকতে পারি।

তার চেয়ে রাণী চল—আবার আমরা চিল্কাই যাই।

না। ওখানে আর আমি যাব না।

চিল্কা না যাও—রম্ভাতে যেতে পার। নয়ত সিকোস্ট ধরে যে অজানা জায়গায় যাওয়া যাবে।

ওদিকটায় যাব না।

ভয় নেই রাণী। ওদিকটায় গেলে বাবার সঙ্গে তোমার আর দেখা হবে না। আচ্ছা

মুর্শিদাবাদ কাহিনী—বিভিতিভূষণ রায় ২৫.০০
সাহিত্য : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৪.০০
শয়তান (টলস্টয়)—অনুবাদ—বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১০.০০
ভাঙন নদীর তীরে—ডঃ সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত ৩.০০
প্রকাশ মুক্তধারা-৮ (বাংলাদেশ) প্রধান পরিবেশক
মুখিপত্র ৯ এ্যান্টনী বাগান লেন, কলিকাতা-৯

একটা কথা বল তো রাণী। কোন খুনীকে তোমার কেমন লাগবে?

আমি কোন খুনী দেখি নি জীবনে।

খুনী আমাদেরই মত দেখতে। ধর আমাদের বকতেই তৈরি—

রাণী ছুটে এসে দিলীপকে জাপটে ধরল। তারপর নিজের কান্না সামলাতে না পেরে দিলীপের বুকের ওপর জলে ভারি চোখ দুটো চেপে ধরে ফুঁপিয়ে উঠল। চুপ করো—

দিলীপ আলগোছে রাণীর পিঠে হাত রাখল। ফাঁকা বাড়ি। আজ রাণী অনেক দিন পরে যত্ন করে চুল বেঁধেছে। দিলীপ বুঝল, রাণীর এখন অনেকক্ষণ ধরে ফাঁকা বাড়িতে কাঁদা দরকার। তার নিজেরও একটা চাপা কান্না বুকের ভেতর গুদামজাত করা আছে। সে কান্নাটাকেও অন্তত একবার গুদাম সাবাড় সেলের মত হু-হু করে বের করে দেওয়া দরকার। কিন্তু যে জন্যে এ-বাড়ি উপযুক্ত জায়গা নয়। সংসারে গৃহকর্তার কাঁদতে নেই; অন্তত প্রকাশ্যে। তার এ-কাজের জন্যে চাই আস্ত একটা ফাঁকা মাঠ। নদীর পাড়ে হলে সবচেয়ে ভাল হয়।

রাণীকে সে-অবস্থায় রেখে দিলীপ নিচে নেমে এল। অন্য ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের গাড়িগুলো এখনও বেসমেন্টে ফেরে নি। অস্টিন টুবারটা তার স্টিয়ারিং সুদ্ধ দিলীপকে ডাকল। দিলীপ ফিরেও তাকাল না। আজই অফিস থেকে ফেরার পথে দিলীপ বলেছে, সব মিটে গেল কালুদা।

সব?

সব। শাসপেনসন অর্ডার তুলে নিচ্ছে—

খুব ভাল হল। এবার মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করে দাও। কাজ না করে পুরুষ মানুষ থাকতে পারে নাকি?

দিলীপ বাঁধান গ্রাউণ্ড ফ্লোরের চাতাল পেরিয়ে রাস্তায় নামল। চেতলা বেকারির চিমনির ডগায় ধোঁয়া। সেই বরাবর ফুটপাথে চায়ের দোকান। মাথায় টালি। গায়ে চাঁচারির বেড়া। এক দঙ্গল পুজোয় তৈরি হয়েছিল। আর ওঠে নি। দোকানদারের হাতে বেসের বই। পাশের স্লেটে সাট্টার হিসেব। বাচচু, বাবুলাল, বাকু বসে।

মালবিকা কাটান-ছাটান করে দেবার পর বাচচুর সঙ্গে আর বিশেষ কোন কথা হয় না দিলীপের। বাবুলাল ডাকল। এসো গুরু। বসবে গুরু। আমরা আলুর দম খাব।

দিলীপ বলল, তা খাও। কিন্তু আমার মত বাবার বয়সী লোককে গুরু ডাক কেন? এ্যাঁ?

তুমি আমাদের সঙ্গে মিশে থাক তাই। আজ একটু বাংলা খাওয়াবে?

বাচচুর মুখের দিকে তাকাল দিলীপ। বাবুলালের কথার কোন জবাব না দিয়ে বাচচুকে বলল, বিশ্বনাথ কোথায় রে?

তা আমি জানব কি করে।

কুটুকে নিয়ে বেরিয়েছে—

তোমার মেয়েকে নিয়ে বেরিয়েছে। তুমি বুঝবে।

ঝগড়া করছিস কেন? সঙ্গে খোকনটা রয়েছে। স্কুটারে বাচ্চা নিয়ে চাপা— তাই তো চিন্তা করছি।

বাকু মুখ খুললো। অত চিন্তা কিসের দিলীপদা। মৌজ হয়ে থাকো। সব ভুলে যাবে। আমাকে দেখো তো।

দেখার কিছু ছিল না। দিলীপের অর্ধেক বয়স। সারা দিন কোথায় থাকিস?

গঙ্গার ঘাটে। বড় খাটালের পাশ দিয়ে গেলেই আমায় পাবে।

গঙ্গা মানে আদি গঙ্গা। আলিপুর থেকে কেওড়াতলা। সেখান থেকে গড়িয়া। উজানে বড় গঙ্গার সঙ্গে যোগ। জিরাতপুর পেরিয়ে বড় খাটাল। জেলখানার দেওয়াল। চিড়িয়াখানার দেওয়াল। জায়গাটা ফাঁকা। বড় গাছপালাও আছে। গৃহকর্তা হিসেবে চড়া পর্দায় কেঁদে ওঠার পক্ষে জায়গাটা আদর্শ। কোন সাক্ষী থাকবে না।

ওখানেই ব্রিজের নিচে ডোমেদের শুয়োর চরে। ওদের একটা আড্ডাও আছে ওখানে।

বাচ্চুকে বলল, কি খেলি আজ?

তিন টাকায় বড় এক বোতল চুল্লু।

চুল্লু?

বাবুলাল বলল, ভাল চোলাই।

অন্ধ হয়ে যাবি বাকু।

এখন তো লাল হয়ে আছি।

দিলীপ দেখল, বাকুকে সত্যি লালচে লাগছে। কপাল, ভুরু—সবই টলটলে ঘামের ফোঁটায় ঘেমো চেহারা পেয়েছে। বাঁ হাতের পাতা নেই বাকুর। বোধ বাঁধতে গিয়ে উড়ে গিয়েছিল। ও নাকি এক সময় বালিগঞ্জ গভর্ণমেন্ট স্কুলে পড়ত।

তোর বউ কোথায় রে বাবু?

ওসব কথা রাখো দিলীপদা। বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে আলাদা হয়ে গেছে।

দিলীপ ভাবছিল, বাকুকে সঙ্গে নিয়ে সে কোন মাঠে কাঁদতে যেতে পারে কিনা। কান্নাকাটির জন্য আইডিয়াল সঙ্গী। যদি অবশ্য কাঁদতে রাজি হয়। বুক খালি করে দিয়ে কান্না বের করার সময় এ রকম সঙ্গীই বেস্ট।

বাকু বলছিল, চার টাকায় তোমার নেশা কমপ্লিট।

বাবুলাল সব জানে। তবু বলল, কি রকম?

তিন টাকায় নগদ এক বোতল বড়। আর এক টাকায় মাংস।

এবার দিলীপেরও হাসি এসে গেল। এক ধাক্কা মারল।

হ্যাঁ। চার পিস। ডোমেদের বাড়ি রান্না হয়। সঙ্গে আলু দেয়। তবে মাংসের এক পিঠে লোম থাকে অনেক সময়।

কিসের মাংস?

আহা। বিশ্বাস করছ না কেন? ওরা খুব আদর-যত্ন করে খাওয়ায়। আরও কম দামের মাংস আছে।

তা খেয়ে বাঁচে লোকে?

কেন বাঁচবে না দিলীপদা।

এক টাকায় শুয়োরের মাংস চার পিস।

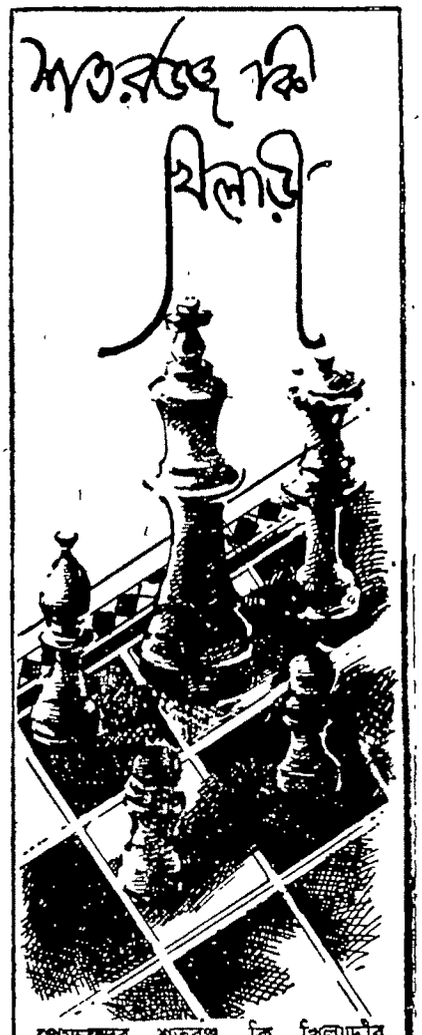

প্রেমচন্দের শতরঞ্জ কি খিলাড়ীর বঙ্গানুবাদ এন বি টি ছাড়া কেউ ছাপছে না। 'ওকা উড়ি কথা'র (মৃণাল সেন পরিচালিত) মূল গল্পের বঙ্গানুবাদও আর কেউ ছাপছে না। সঙ্গে আরও ২০টি গল্প নিয়ে প্রেমচন্দের গল্পগুচ্ছ—অনুবাদ : প্রসূন মিত্র, মূল্য ৮ টাকা

আমাদের অন্যান্য অনূদিত গল্পগুচ্ছ : তেলুগু—১৫·২৫ পয়সা; অমিল—৬ টাকা; উর্দু—১৩ টাকা; হিন্দি—৭ টাকা; মলয়ালম—১০ টাকা।

যেখানে পাবেন :
সেলস এমপোরিয়াম, পাবলিকেশন ডিভিশন, ৮ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, ৭০০০০১; লেখক সমবায় সমিতি, ই-১২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, ৭০০০১২; উষা পাবলিশিং হাউস, ১৩/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট ৭০০০৭৩; সায়েন্টিফিক বুক এজেন্সী, ২২, জানা উডমার্ট স্ট্রীট, ৭০০০০১; স্টুডেন্ট বুক হাউস, ৬৫-এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, ৭০০০০৯; সিনহা বুক এজেন্সী, ৭৯/২ মহাত্মা গান্ধী রোড ৭০০০০৯

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া,
নয়াদিল্লি ১১০০১৬।

সঙ্গে তিন টাকার চুলবু। ওরা আমায় ভীষণ ভালোবাসে। তোমার যদি কাউকে পোড়ানোর দরকার পড়ে—

পোড়াবো কেন ?

ধরো মারা গেলো কেউ। আমি সস্তায় ব্যবস্থা করে দেবো। কোন ঝামেলা হবে না। ওরা যত্ন করে পুড়িয়ে দেবে। সবদিক দেখবে শুনবে।

এখুনি দরকার হচ্ছে না বাকু। আট আনার মাংসটা বিসেব ? সাপের !

এইতো। কিছুই বিশ্বাস হয় না। পাঁঠার মাথার ঘিলু আর আলু একটা মাখা বানায়। ওরা বলে মুড়ি। পয়সা কম থাকলে খাই। দিব্যি লাগে। বিকেলের ঝুরঝুরে বাতাস মাথার রগ টাচ করলে যেন উড়ে যাই।

বেশ আছিস বাকু।

বাকুর নেশাও তখন বেশ। আস্তে বললো, চা খাবে ?

না।

খাওনা এক খুরি। বলে অর্ডার দিলো। তারপর রাস্তার একটা ঘেয়ো কুকুরের জন্যে বিস্কুটেরও অর্ডার দিলো। চুণীকে দুখানা লেড়ো দাও।

নিজের নাম শুনেই কুকুরটা কাছে চলে এলো।

স্লেটে সাটার হিসেব লিখতে লিখতে দোকানদার বললো, চুণীর দরুণ বিস্কুটের দাম তিন টাকা বাকি।

দামের পরোয়া কি। দিয়ে দাও দুখানা লেড়ো। এক সঙ্গে সব মিটিয়ে দেব।

না। পারবো না বাকুবাবু।

একটা অবলা জীব না খেয়ে মরবে ?

ও গু-খেকো কুকুর তো আস্তাকুড় ঘেটে খেয়ে বেড়াচ্ছে—

অ্যাও ! বলে হাতের খাবড়া তুললো বাকু। চুণীর বদনাম সহ্য করবো না। আমি নিজে বাজারের হোটেলে খাই। চুণী আমার সঙ্গে গিয়ে খায়। আস্তাকুড় তো দূরের কথা। ও কারও পাতেরটা খায় না।

বাবুলাল ফোড়ন কাটলো। হোটেলে ওর মিল পড়ে কত করে ?

বাকু খুব সিরিয়াস গলায় বললো, ও তো আর টেবিল চেয়ারে বসে না। বাজারের রাস্তায় বসে খায়। বাসনকোসনের বালাই নেই—

দিয়ে দেখেছো ?

দেখেছি। অসুবিধে হয়। তাই পঁচাত্তর পয়সা পার মিল। আমার ভাগ থেকে কিছুটা ভাত দিই। দুজনের হয়ে যায় কোনমতে।

দিলীপ বললো, জীবনটা বেশ সিম্পল করে ফেলেছো বাকু।

আমার তো কোন অসুবিধে হয় না। বলেই দোকানদারকে আবার একটা হুঙ্কার দিলো। অ্যাও !। বলছি দুখানা লেড়ো দাও। মোট সতেরোই সব কিলিয়ার হয়ে দেব।

তারপর কী খেয়াল হতে বাকু হাসতে হাসতে বললো, লোককে শুনেছি বলতে—জিনিসপত্রের নাকি দাম বেড়ে গেছে। আলু, বেগুন, পটল, মাছ, মাংস, সাবান, চিনি। এমন কি বাড়িভাড়াও। আমি কিন্তু কিছু টের পাইনা।

থাকো কোথায় এখন ?

বাজারে শুই। ফলপট্টিতে। চানু করি ওখানকার কলে। চব্বিশ ঘণ্টা জল।

অসুখ করলে ?

করে না।

যদি করে ?

যদি করে ? তাহলে পাড়ার ডাকতারখানায় যাই। নইলে ভালো এক বোতল খেয়ে শুয়ে থাকি। জ্বর, পেটব্যথা, মাথা ধরা—সব সেরে যায়। পরদিন ঘুম থেকে উঠলে একদম ফ্রেস। ও হ্যাঁ। একবার সবাই মিলে হাসপাতালে ফিট বেড়ে দিয়েছিলো। এত যত্ন আমার সইলো না দিলীপদা। পালিয়ে এলাম—

সন্ধ্যেবেলার চেতলা। বাঙালী পাড়া। মাঝে মাঝে ফুলস্পিডের গাড়ি চলে যাচ্ছে—স্বাধীনতার পরেকার বড়লোক ভবতারিণদের বাড়ি। খাটাল, মাল্টিস্টোরিড বাড়ি, বেকারি, পার্ক—সবই সন্ধ্যের আলোয় এখন অন্যরকম।

দিলীপের কি ইচ্ছে হোল—পরিষ্কার বললো, তুমি কখনো কাঁদোনি বাকু ?

কতো কেঁদেছি আগে দিলীপদা। ইদানীং।

এখন আর কাঁদার সময় পাই না। সময়ই হয় না। ফুরসৎ কোথায় ?

বাবুলাল বললো, অতো ঠিক। ভোরবেলা উঠে বিকাসে চেপে বড় খাটাল। তারপর সেখানে তৈরি হয়ে দুপুর বা বিকেল নাগাদ পাড়ায় ফেরা—তারপর তো আর কিছু মনে থাকে না।

বাকু কোন পাত্তাই দিলো না বাবুলালকে। সে পরিষ্কার বললো, মাঝে মাঝে কাঁদি। তবে স্বপ্নে দিলীপদা। তখন তো কেমন সাবানের ফেনার মত আকাশ বাতাস। কোন সাক্ষী থাকে না। নিজের লোকের সামনে কাঁদি। বেশ লাগে এক-একদিন।

কী জন্যে কাঁদো ? ভয় পেয়ে ?

ভয় এ বান্দা জানে না। কষ্ট হলে কাঁদি। তখন মা আসে স্বপ্নে। আমার ছোট ছেলেটা এক একদিন আসে স্বপ্নে। পয়সা চায়। প্রথম দুবার বলি—যা ভাগ। গোলমাল করিসনে। তবু দাঁড়িয়ে থাকে। যায় না। তখন একটা আধুলি দিই। স্বপ্নের আধুলি তো দিলীপদা, অনেক জিনিস কেনা যায় তা দিয়ে। একদিন আমার জন্যে একটা বড় টয়াইসাইকেল কিনে এনেছিলো। সেটায় চড়ে ওকে নিয়ে বেড়ালাম অনেকক্ষণ। তারপর ও চলে গেলো চুলিতে ঢুকে।

ছোট ছেলে কতবড় তোমার ?

বেঁচে থাকলে এই ছ' বছর হোত।

ও একটু থেমে গিয়ে দিলীপ সরাসরি বাকুর চোখে চোখ রাখলো আমার সঙ্গে একবার কাঁদবে ?

যাঃ ! তুমি ইয়ার্কি করছো দিলীপদা। কোরাসে কখনো কাঁদা যায় নাকি ?

খুব যায়।

তবে এসো। কাঁদি।

এখানে নয় বাকু। আমি গাড়ি বের করছি।

বাবুলাল দিলীপকে বললো, কি হচ্ছে গুরু ? ইয়ার্কি থেকে তুমি ইদানীং বড় সিরিয়াস হয়ে যাও। এত সিরিয়াস হওয়ার কিছু নেই কিন্তু।

সিরিয়াস কে বললো বাবুলাল ? আরও অল্প বয়সে বিয়ে করলে তোর বয়সী ছেলে থাকতো আমার। থাকতো কিরে ! রবি বোধহয় তোর চেয়ে বড়ই হবে। তোর কোন্ ইয়ারে জন্ম ?

ওকথা থাক গুরু। রবিদার কোন খবর পেলে ?

জানি না। সিরিয়াস—হালকার তুই কি বুঝিসরে ?

এটা তুমি কি বলছো গুরু ? যে যার নিজের মত করে বেঁচে সব সময়। সবাই কাঁদতে যাচ্ছো ? তাহলে আমায় সঙ্গে নাও।

বাকু বিজার্ভ সিস্টেম প্যাসেঞ্জারের মত ভাবিককি চালে বলল তুইও কাঁদবি আমাদের সঙ্গে ? তোর তো বউ নেই যে তোকে ত্যাগ করবে ?

শুধু পরিবারের জন্যেই লোকে কাঁদে বুঝি ? গুরু। গাড়ি বের করো। আমি এক ছুটে গাছের জামাটা পালটে আসছি।

দিলীপ বললো, আমরা কিন্তু একটুও ওয়েট করতে পারবো না। গাড়ি বের করবো। স্টার্ট নেবো। আর বেরিয়ে পড়বো।

দু মিনিট দাঁড়াও গুরু।

ফেল্ল গুরু ? মেরে ঠাণ্ডা করে দেবো তোকে। বাপের বয়সী লোককে গুরু ?

দু মিনিট দাঁড়াও দিলীপদা। আমি যাবো আর আসবো।

বেশ যা। তুই এলে তবে গাড়ি বের করবো। কিন্তু ঠিক দু মিনিট।

যাচ্ছি আর আসছি।

চায়ের দোকানদার দিলীপের কানের কাছে মুখ এনে বললো, আজ কি হয়েছে আপনার দিলীপবাবু ? বাকুবাবুকে কাঁদতে বসালে সামলাতে পারবেন ?

সবাই অ্যাডাল্ট। সবারই নিজের কান্না থাকে একটা করে। সেই কান্নাটুকুও কাঁদতে পারবে না ভালো করে ? শুধু ভালো একটা মাঠ বেছে নেওয়া দরকার।

দিলীপ বুঝতে পারছিলো, এর পরিণতি আবার শ্যাংগিরি ধারণ হয়ে যাবে।

(ক্রমশঃ)

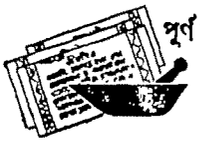

পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভে একমাত্র সহায়ক ৩০০০ বৎসরের পুরাতন প্রকরণ

ডাবরের চ্যবনপ্রাশ চার প্রকারে পরিবারকে স্বাস্থ্যসম্পন্ন রাখে

ভিটামিন 'সী' ভরপুর অম্লমধুর স্বাদে ভরা একটি অকৃত্রিম সংমিশ্রণ

১ দেহস্থ কোষগুলি সতেজ রাখে
ডাবরের চ্যবনপ্রাশ দেহস্থ কোষগুলির ক্ষয়ক্ষতি বেশি হতে দেয় না।

২ দেহে রোগ প্রতিরোধের শক্তি বাড়ায়
ডাবরের চ্যবনপ্রাশ সেবন করলে দেহ আবশ্যীয় রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা লাভ করে। সর্দি-কাশির জন্যও এটি সেবন করার বিধি দেওয়া হয়।

৩ স্ফূর্তি জোগায়
ডাবরের চ্যবনপ্রাশ শিশুদের চাঞ্চল্য আর স্ফূর্তি জোগায়। বার্দ্ধক্যেও মানসিক আর শারীরিক ক্ষমতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

৪ এতে আছে দেহস্থ কলাপুষ্টির গুণ
ডাবরের চ্যবনপ্রাশ দেহকে পূর্ণতঃ গঠন করার শক্তি রাখে।

দৈব প্রকরণ—
কথিত আছে ৩০০০ বছর পূর্বে চ্যবন ঋষিকে নবযৌবন দানের জন্য দেব বৈদ্যগণ এই সংমিশ্রণ তৈরী করেন। পৃথিবীর প্রাচীনতম ঔষধ হইলেও অধুনা ডাবর দ্বারা স্বাস্থ্যপূর্ণ ও আধুনিক উপায়ে স্বয়ংচালিত যন্ত্রে ঐ ঔষধ তৈয়ারী করা হয়।

এক কেজি প্যাকের সঙ্গে বিনামূল্যে একটি চামচ।

একটি আয়ুর্বেদিক স্বাস্থ্য বর্ধক টনিক

ডাবরের চ্যবনপ্রাশ

কেমিস্ট আর ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়।

বিমলানন্দ শাসমল

ভারত কি করে ভাগ হলো

উইনস্টন চার্চিলকে এই চিঠি লেখবার পর কয়েকমাস ব্রিটিশ সরকার কিছুই করলেন না, কিন্তু ওয়েভেল ছাড়লেন না, তিনি বার বার বিলাতে তাগিদ পাঠাতে লাগলেন, যাতে চার্চিল সরকার এ-বিষয়ে সত্বর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অবশেষে ১৯৪৫-এর মার্চে ওয়েভেলকে লণ্ডনে ডেকে পাঠানো হোলো যাতে তিনি চার্চিল ও অন্যান্য মন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সমস্ত ব্যাপারটা তাদের বুঝিয়ে ব্যবস্থা নেওয়াতে পারেন। ওয়েভেলকে লণ্ডনে প্রায় তিনমাস বসে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সদস্যদের ভারতের স্বাধীনতা দানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বুঝিয়ে বললেন। অবশেষে ৩১শে মে রাত সাড়ে দশটার মন্ত্রিসভার বৈঠকে চার্চিল ওয়েভেলের প্রস্তাব মেনে নিলেন যে, ভারতবর্ষকে সন্তুষ্ট করবার জন্য কিছু করা দরকার এবং বড়লাটের মন্ত্রিসভার সম্পূর্ণ ভারতীয়করণের ও মন্ত্রিসভার সাধারণভাবে স্বাধীনভাবে কাজ করবার প্রস্তাবও তিনি মেনে নিলেন এবং এই সকল প্রস্তাব আলোচনার জন্য তিনি ওয়েভেল কর্তৃক কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলনেতাদের এক সম্মেলনের প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। নয়াদিল্লিতে ফিরেই ওয়েভেল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বন্দী সদস্যদের মুক্তির আদেশ দিলেন এবং তাঁর প্রস্তাবমত ২৫শে জুন সিমলায় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও শিখ-নেতাদের নিয়ে এক বৈঠকে বসলেন পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের আগে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও শিখ-নেতারা কিভাবে ভারত সরকার পরিচালনায় সহযোগিতা করতে পারেন।

এই সিমলা সম্মেলন সফল হয়নি, তার কারণ বড়লাটের মন্ত্রিসভায় জিন্না কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলিম লীগ সদস্যদের সমান সংখ্যক আসন দাবি করলেন এবং কংগ্রেস কিছুতেই তাতে রাজি হোলো না। কিন্তু চার্চিলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ওয়েভেল যে তাঁকে ভারত সম্বন্ধে কার্যকরী কিছু প্রগতিমূলক নতুন ব্যবস্থা নিতে প্ররোচিত করেছিলেন, তাতে ওয়েভেলের আন্তরিকতার ও ভারত প্রীতির তুলনা পাওয়া যাবে না।

দুর্ভাগ্যবশত ওয়েভেলের আন্তরিকতার সম্যক স্বীকৃতি আমাদের দেশের ঐতিহাসিকরা দিতে পারেননি। কেউ কেউ বলেন, ওয়েভেলের উচিত ছিল, জিন্নার দাবি অগ্রাহ্য করা। তাহলে জিন্না ও মুসলিম লীগ বড়লাটের মন্ত্রিসভায় আসতো না এবং কংগ্রেস একাই আধিপত্য করতে পারতো। কিন্তু পরের ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, সেটা ঠিক হোতো না, কারণ, ভারতের মুসলমান অধিকাংশই কংগ্রেস-বিরোধী ছিলেন এবং এতে তারা রুষ্ট হতেন। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ শতকরা ৯০টি মুসলমান আসন দখল করেছিল। সবচেয়ে বড় কথা ছিল, চার্চিল তখনও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এবং লীগকে বাদ দিয়ে কংগ্রেসের হাতে বড়লাটের মন্ত্রিসভা তুলে দেওয়া তিনি যথাশক্তি বন্ধ করবার চেষ্টা করতেন।

জুলাই মাসে ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচন শ্রমিক দল বিরাট জয়লাভ করলো এবং চার্চিল মন্ত্রিসভার রাজত্ব শেষ হয়ে গেলো। শ্রমিক মন্ত্রিসভা কার্যভার গ্রহণ করেই ভারত সম্বন্ধে কি করা যেতে পারে, তাই আলোচনার জন্যে ওয়েভেলকে লণ্ডনে ডেকে পাঠালেন। এঁদের সঙ্গে আলোচনা করে নয়াদিল্লি ফিরেই ১৯শে সেপ্টেম্বর ওয়েভেল ঘোষণা করলেন : 'মহামান্য সম্রাটের সরকার ভারতীয় জননেতাদের সঙ্গে একমত হয়ে অবিলম্বে ভারতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অবিলম্বে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইন-সভাগুলিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মহামান্য সম্রাটের সরকারের অভিলাষ যে, যত শীঘ্র সম্ভব একটি সংবিধান-রচনা-পরিষদ গঠন করতে হবে, যারা ঠিক করবে ১৯৪২ সালের ঘোষণা (ক্রিপস্ প্রস্তাব) বা বিকল্পে কোনো পরিবর্তিত বা নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।' (ইংরেজির অনুবাদ)

কিন্তু সদ্য কারামুক্ত কংগ্রেস নেতারা শীঘ্র স্বাধীনতা না পেলে আবার আন্দোলন করবেন বলে ভয় দেখাতে লাগলেন, ওদিকে সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজের কিছু অফিসার ও সৈনিক-দের বিচার নিয়ে দেশে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিল। শান্তভাবে কিছু করবার আর অবকাশ রইল না। ১৯৪৬-এর ৫ই জানুয়ারি ব্রিটেন থেকে এক পার্লামেণ্ট সদস্যের দল ভারতে এলেন ভারতের অবস্থা সরেজমিনে বিচার করতে। কিন্তু তাঁরা বিশেষ কিছু করতে পারলেন না— কয়েকদিনের মধ্যেই ফিরে গেলেন। ফেব্রুয়ারি মাসে ঠিক হোলো, ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার তিনজন মন্ত্রী পেথিক লরেন্স, স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ ও আলেকজাণ্ডার ভারতে এসে নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করবেন কিভাবে ব্রিটেন শাসন-ক্ষমতা ভারতীয়দের হাতে হস্তান্তর করবে।

এখানে বলে রাখা দরকার যে, ওয়েভেলের নিন্দা করা হয়ে থাকে, তিনি জিন্না ও মুসলিম লীগের প্রতি আগোগোড়া পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। কিন্তু এই সময়ে অর্থাৎ ৪৬-এর মার্চে পাঞ্জাবে মুসলিম লীগ ৭৯টি সভ্যপদ লাভ করা সত্ত্বেও এবং সর্ববৃহৎ একক দল হওয়া সত্ত্বেও, ইউনিয়নিস্ট - কংগ্রেস-আকালি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করা হলে তিনি তাতে কোনো বাধা দেননি। পরে দেখা যাবে, এই কারণে পাঞ্জাবে ভয়াবহ দাঙ্গা শুরু হয়ে যায় এবং সেই দাঙ্গার ভয়াবহতা জওহরলাল ও মাউণ্টব্যাটনকে ভারতের বিভাগ-পরিকল্পনা রচনা করতে বাধ্য করে।

আপোষ আলোচনার জন্য ব্রিটিশ সরকারের তিনজন মন্ত্রী ২৩শে মার্চ ভারতে পৌঁছলেন। এঁদের সঙ্গে সকল শ্রেণীর ভারতীয় নেতাদের আলোচনা হোলো। কয়েকবার দিল্লি-সিমলাও হোলো, কিন্তু ফল হোলো না। কংগ্রেস ও লীগ নেতারা কিছুতেই একটি যৌথ প্রস্তাবে সম্মত হতে পারলেন না, যাতে উভয় দলের স্বার্থ ও আদর্শ অক্ষুণ্ণ থাকে।

৪৬-এর ৩রা এপ্রিল নয়াদিল্লিতে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতাকে এক সাক্ষাৎকারে জওহরলাল নেহরু বলেছিলেনন : 'আমাদের মতে, নতুন সংবিধানে হবে ইচ্ছুক প্রদেশগুলি নিয়ে একটি ফেডারেশন, যাতে যতদূর সম্ভব স্বাধীনতা প্রদেশগুলির থাকবে। কার্যত প্রদেশগুলি হবে প্রায়-স্বাধীন (সেমি-ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট)। আর কেন্দ্রের হাতে থাকবে যতদূর অল্প-সংখ্যক বিষয়। এই বিষয়গুলি হচ্ছে : 'বিদেশ বিভাগ, দেশরক্ষা, যোগাযোগ, মুদ্রা ইত্যাদি যাতে প্রত্যেকটি প্রদেশ পাবে নিজেকে বিকশিত করবার পূর্ণ স্বাধীনতা। কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্তভাবেও কতকগুলি বিষয় রাখা যেতে পারে, যেগুলি কোনো প্রদেশ ইচ্ছা করলে গ্রহণ করতে পারে বা না-ও পাবে।... এইভাবে এটাও সম্ভব যে, দেশের দু'-একটি অঞ্চল এখনকার মত স্বাধীনভাবে চলতে পাববে এবং পরে কোনো বিশেষ অঞ্চলের সকল অধিবাসীর গণভোটে বিশেষ বিষয়টি সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে।' (দি স্টেটসম্যান, ৪-৪-৪৬, ইংরেজির অনুবাদ)

মুসলিম লীগের সঙ্গে চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা

আজাদ ৪৬-এর ১২ই মে বড়লাটকে যে-চিঠি দিয়েছিলেন তা এই :

(১) কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি নিম্নলিখিতভাবে হবে :—

(ক) প্রতিনিধিরা প্রত্যেক প্রাদেশিক লেজিসলেটিভ এসেম্বলির দ্বারা 'প্রোপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন'-এ (সিঙ্গল ট্রান্সফারেবল ভোটে) নির্বাচিত হবেন। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যা হবে এসেম্বলির সদস্যদের একপঞ্চমাংশ।

(খ) দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন ব্রিটিশ ভারতের প্রতিনিধিরা যে লোকসংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন, সেই অনুপাতে। কিভাবে এই প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন তা পরে বিবেচনা করা হবে।

(২) কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি ফেডারেল ইউনিয়নের জন্য একটি সংবিধান রচনা করবে। তাতে থাকবে একটি নিখিল ভারত ফেডারেল গভর্নমেন্ট এবং আইনসভা, যার অধীনে থাকবে : বিদেশ বিভাগ, দেশরক্ষা, যোগাযোগ, ফান্ডামেন্টাল রাইটস্, মুদ্রা, শুল্ক এবং পরিকল্পনা এবং থাকবে সেই বিষয়গুলি যেগুলি পরে ভালো করে বিবেচনার পর দেখা যাবে যে, উপরোক্ত বিষয়গুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে লিপ্ত। এই সকল বিষয়গুলি পরিচালনার জন্য যে অর্থ-সম্পতির প্রয়োজন, তা পাবার জন্য আবশ্যকীয় ক্ষমতা ফেডারেল ইউনিয়নের থাকবে এবং স্বকীয় অধিকারে খাজনা আদায়ের অধিকার থাকবে। সংবিধান-ব্যবস্থা ভেঙে পড়লে বা চরম জরুরী অবস্থায় তার প্রতিবিধান করবার ক্ষমতাও ইউনিয়নের থাকা চাই।

(৩) অবশিষ্ট সকল ক্ষমতা প্রদেশগুলির বা অঙ্গগুলির হাতে থাকবে।

(৪) বিভিন্ন প্রদেশ নিয়ে গ্রুপ গঠন করা যেতে পারে এবং এই সকল গ্রুপ ঠিক করতে পারবে কোন্ কোন্ প্রাদেশিক বিষয় যৌথভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

(৫) কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি নিখিল ভারত ফেডারেল ইউনিয়নের সংবিধান আগের ২নং অনুচ্ছেদের মত রচনা করবার পর প্রদেশের প্রতিনিধিরা গ্রুপ গঠন করতে পারবে এবং প্রত্যেক গ্রুপের প্রদেশগুলির সংবিধান রচনা করবার জন্য এবং যদি তারা চায়, তাহলে গ্রুপের জন্যও একটি সংবিধান রচনার জন্য।

(৬) কোনো সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিখিল ভারত ফেডারেল ইউনিয়নের সংবিধানের কোনো নিদান কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিতে পাশ হোলো বলে ধরা হবে না, যতক্ষণ না সেই সম্প্রদায়ের বা সম্প্রদায়গুলির সভ্যরা যাঁরা এসেম্বলিতে উপস্থিত আছেন এবং ভোট দিচ্ছেন, তাঁরা পৃথকভাবে তাকে সমর্থন করছেন এবং এই সকল প্রশ্নে কোনো সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত না সম্ভব হলে তা আরবিট্রেশনে দেওয়া হবে। কোন্‌টি সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ দেখা দিলে স্পীকারকে সে-বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে অথবা যদি সেইমত সবাই ইচ্ছুক হন, তাহলে সিদ্ধান্তের জন্য প্রশ্নটি ফেডারেল কোর্টে পাঠানো হবে।

(৭) সংবিধান রচনার সময়ে কোনো বিষয় নিয়ে বিবাদ উপস্থিত হলে সেই বিশেষ বিষয়টি আরবিট্রেশনে দেওয়া হবে।

(৮) যে-কোনো সময়ে সংবিধান সংশোধনের জন্য ব্যবস্থা থাকা চাই, যদিও তাতে প্রয়োজনমত বাধাবাধি থাকতে পারে। যদি দরকার হয়, এটা পরিষ্কার বলেও দেওয়া যেতে পারে যে, সমগ্র সংবিধানের পুনর্বিবেচনা দশ বছর পরে করা হবে।

(দি স্টেটসম্যান, ১৯শে মে '৪৬, ইংরেজি থেকে)

১২ই মে তাঁর চিঠিতে জিন্নাও মুসলিম লীগের ন্যূনতম দাবিগুলি বড়লাটকে জানিয়ে দিলেন :

১। ছটি মুসলমান-প্রধান প্রদেশ (পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, বেলুচিস্তান, সিন্ধু, বাংলা ও আসাম) একটি গ্রুপে গঠিত হবে এবং অন্যান্য সকল বিষয় এবং বস্তু তারা নিজেরাই শাসন করবে, শুধু বিদেশ বিভাগ, দেশরক্ষা, দেশরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা ছাড়া। এই সকল বিষয় সম্বন্ধে হিন্দু-প্রধান ও মুসলমান-প্রধান প্রদেশগুলির দুটি গ্রুপের সংবিধান রচনা পরিষদ একত্রে বসে শাসন ব্যবস্থা রচনা করতে পারবে।

২। উপরোল্লিখিত ছটি মুসলমান-প্রদেশগুলির জন্য একটি পৃথক সংবিধান রচনা পরিষদ থাকবে। এই সংবিধান রচনা সমস্ত গ্রুপের সংবিধান রচনা করবে এবং কোন্ বিষয়গুলি প্রাদেশিক শাসনাধীন হবে এবং কোন্‌গুলি (পাকিস্তান ফেডারেশন) গ্রুপের কেন্দ্রীয় শাসনাধীন হবে তা ঠিক করে দেবে, কিন্তু প্রদেশগুলির হাতে রেসিডিউয়ারি বা অবশিষ্টাংশ সার্বভৌম শাসনক্ষমতা থাকবে।

৩। সংবিধান রচনা পরিষদে প্রতিনিধি নির্বাচনের পদ্ধতি এমন হওয়া চাই যাতে পাকিস্তান গ্রুপের প্রত্যেক প্রদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা অনুপাতে প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব থাকে।

৪। পাকিস্তান গ্রুপের ফেডারেল সরকারের সংবিধান এবং প্রদেশগুলির সংবিধান, সংবিধান-রচনা পরিষদ কর্তৃক চূড়ান্তভাবে রচনা হয়ে যাবার পর, গ্রুপের যেকোনো প্রদেশের পক্ষে সেই গ্রুপ থেকে নিজেকে বের করে নেবার স্বাধীনতা থাকবে কিন্তু সেই প্রদেশের অধিবাসীদের ব্যাপারে যাওয়া না যাওয়ার ইচ্ছা গণভোট দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে।

৫। দুটি সংবিধান রচনা পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে কেন্দ্রীয় ইউনিয়নের একটি আইনসভা থাকবে বা থাকবে না তা বিবেচনা করবার ব্যবস্থা থাকবে। কেন্দ্রীয় ইউনিয়নের আর্থিক সঙ্গতি যোগান দেবার পদ্ধতি সম্বন্ধেও দুটি সংবিধান রচনা পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে বিবেচনা করবার ব্যবস্থা থাকবে। কেন্দ্রীয় ইউনিয়নের আর্থিক সঙ্গতি কিন্তু কোনো মতেই ট্যাক্স বসিয়ে আদায়ের ব্যবস্থা করা যাবে না।

৬। কেন্দ্রীয় ইউনিয়নের সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এবং যদি আইনসভা গঠিত হয় সেখানেও বিভিন্ন প্রদেশের দ্বারা গঠিত দুটি গ্রুপের সমান প্রতিনিধিত্ব থাকা চাই।

৭। ইউনিয়ন সংবিধানের কোনো গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন দুটি সংবিধান রচনা পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে পাশ হলে বলে গণ্য হবে না যতক্ষণ না হিন্দু-প্রধান গ্রুপের উপস্থিত ও ভোটদানকারী পরিষদ-সদস্যরা এবং মুসলমান-প্রধান গ্রুপের উপস্থিত ও ভোটদানকারী পরিষদ-সদস্যরা এবং মুসলমান-প্রধান গ্রুপের উপস্থিত ও ভোটদানকারী পরিষদ-সদস্যরা পৃথকভাবে সংখ্যাধিক ভোটে তা সমর্থন করেন।

৮। ইউনিয়নের আইনসভা গঠিত, শাসন ব্যবস্থা গঠিত বা শাসকমণ্ডলী গঠিত কোনো বিতর্কমূলক প্রশ্ন তিন-চতুর্থাংশ সভ্যের সংখ্যাধিক্য ছাড়া পাশ করা যাবে না।

৯। গ্রুপ এবং প্রাদেশিক সংবিধানগুলিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যাপারে মৌল অধিকার (ফান্ডামেন্টাল রাইটস্) এবং ধর্ম, সংস্কৃতি ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে রক্ষা কবচ থাকা চাই।

১০। ইউনিয়নের সংবিধানে এমন ব্যবস্থা থাকা চাই যে যেকোনো প্রদেশ তার আইনসভার সংখ্যাধিক্য ভোটে প্রথম দশ বছরের পর সংবিধানের বিধানগুলি পুনর্বিবেচনা করে দেখতে পারবে এবং কোনো প্রদেশের পক্ষে দশ বছর পরে ইউনিয়ন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেবার স্বাধীনতা থাকবে। (ইংরেজির অনুবাদ—দি স্টেটসম্যান ১২শে মে ১৯৪৬)

মুসলিম লীগের এই ন্যূনতম দাবি সম্বন্ধে বিবেচনা করে কংগ্রেস সভাপতি সেইদিনই (১২ই মে) বড়লাটকে জানিয়ে দিলেন :

"কোনো ব্যবস্থাতেই, আসামকে যে গ্রুপে ফেলা হয়েছে সেখানেই তাকে রাখা যাবে না এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, সেই প্রদেশও এই গ্রুপ-গঠন প্রস্তাবের পক্ষে নয়।

"যেহেতু গ্রুপ-গঠনের পূর্বে বিশেষ কোনো প্রদেশের সেই গ্রুপে যোগদানের সম্মতি দেওয়া দরকার সেই কারণে কোনো প্রদেশের পরে গ্রুপ থেকে বেরিয়ে যাবার ব্যবস্থার কোনো প্রয়োজন নেই।

মুসলিম লীগের ন্যূনতম দাবির ৬, ৭ এবং বিশেষ করে ৮নং অনুচ্ছেদের বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রবল আপত্তি জানালো।

আমরা দেখেছি ৩রা এপ্রিল বসটাবের বিশেষ সংবাদদাতার কাছে জওহরলাল ঘোষণা করেছিলেন যে কংগ্রেস ভারতে এমন একটি ফেডারেশন গঠন করতে চায় যেখানে ফেডারেশনের অঙ্গ-প্রদেশগুলি সেমি-ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট থাকবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে যত কম সম্ভব শাসনাধীন বিষয় রাখা হবে। কিন্তু ১২ই মের কংগ্রেস সভাপতির চিঠিতে মৌলানা আজাদ যে কটি বিষয় ভারতীয় ফেডারেল ইউনিয়নের শাসনাধীন রাখতে চাইলেন তাতে অঙ্গ-প্রদেশগুলির স্বাধীনতা প্রচণ্ডভাবে খর্ব করা হোলো। বিশেষ করে সংবিধান প্রয়োগে অচলাবস্থার হলে বা চরম জরুরী অবস্থার উদ্ভব হলে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপের সুযোগ রাখার জন্য দাবি করা হোলো—পরিরক্ষা বিভাগটিও কেন্দ্রের হাতে রাখা হোলো। কংগ্রেস নেতারা মুখে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের কথা বললেন বটে কিন্তু ১২ই মের চিঠিতে প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থা যথেষ্ট পরিমাণে কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল করে রাখা হোলো। কংগ্রেস সভাপতি এটাও পরিষ্কার করে দিলেন যে নিখিল ভারত ফেডারেল ইউনিয়নের সংবিধান রচনা হবার পর তবেই অঙ্গ-প্রদেশগুলির গ্রুপ-গঠনের কথা উঠবে এবং প্রদেশগুলি প্রাদেশিক সংবিধান অথবা গ্রুপ সংবিধান রচনা করতে পারবে। ফেডারেল ইউনিয়নের সংবিধান রচনা হয়ে যাবার পর অঙ্গ-প্রদেশগুলিকে সেই সংবিধানই অনুসরণ করতে বাধ্য থাকতে হোতো এবং তখন প্রাদেশিক বা গ্রুপ সংবিধান রচনা করতে হলে প্রদেশগুলিকে ফেডারেল সংবিধানের প্রভাবমত তাই রচনা করতে হোতো এবং সেদিক দিয়ে দেখলেও প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনকে অনেকটা নেতিবাচক করে মেরে রাখার বিধান চাওয়া হোলো।

কংগ্রেস সভাপতি অবশ্য এটাও বললেন যে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের রীতি অনুযায়ী কোনো প্রদেশকে কোনো গ্রুপে যোগ দিতে বলার আগে তার সম্মতির প্রয়োজন। বিনা সম্মতিতে বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো প্রদেশকে কোনো গ্রুপে যোগদানে বাধ্য করা চলবে না। সেই হেতু, আসামকে বাংলার সঙ্গে গ্রুপ গঠনে বাধ্য করা চলবে না এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ কংগ্রেস শাসন চালু থাকায় সেই প্রদেশও গ্রুপ গঠনের ব্যবস্থায় রাজি হবে না কাজেই তাকেও পাঞ্জাব বা সিন্ধুর সঙ্গে গ্রুপ-গঠনে বাধ্য করা চলবে না। গ্রুপ থেকে বেরিয়ে আসবার যে স্বাধীনতা মুসলিম লীগ প্রদেশগুলিকে দিতে চাইলো কংগ্রেস বললো তার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ পূর্বাহ্নে সম্মতি দেওয়ার জন্যে আর গ্রুপ থেকে বেরিয়ে যাবার প্রয়োজন হবে না।

ভারতের নতুন সংবিধান রচনার ব্যাপারে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের দৃষ্টিভঙ্গীর এই রূপ মৌলিক পার্থক্য থাকায় মন্ত্রী-মিশন শাসনভার হস্তান্তরের পদ্ধতি নিয়ে ১৬ই মে ঘোষণা করলেন তাঁদের নিজেদের প্রস্তাব।

তাঁদের ঘোষণাপত্রের ১৫নং অনুচ্ছেদে মন্ত্রী-মিশন বললেন : আমরা সমাধানের যে রূপটি জানাচ্ছি যার দ্বারা বিভিন্ন দলের মূল দাবিগুলির প্রতি ন্যায় বিচার করা হবে এবং সেই সঙ্গে ভারতের জন্য একটি স্থিতিশীল এবং কার্যকরী সংবিধান গঠন করা সম্ভব হবে।

আমরা সুপারিশ করছি যে সংবিধান নিম্নবর্ণিত ভিত্তিতে গঠিত হবে :—

(১) ব্রিটিশ ভারত এবং রাজন্য ভারত-এর সংযুক্তিতে একটি ভারতীয় ইউনিয়ন গঠিত হবে আর বিদেশ বিভাগ, দেশরক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা শুধু এই কটি বিষয়ের উপর তার কর্তৃত্ব থাকবে এবং এই সকল বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার অর্থ সংকলনের অধিকার থাকবে।

(২) ইউনিয়নের একটি শাসন-পরিষদ (একজিকিউটিভ) থাকবে এবং ব্রিটিশ ভারত ও রাজন্য ভারতের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত একটি আইনসভা থাকবে। কোনো প্রধান সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে আইনসভাকে সিদ্ধান্ত নিতে গেলে দুই প্রধান সম্প্রদায়ের উপস্থিত ও ভোটদানকারী প্রতিনিধিদের সংখ্যাধিক্যের প্রয়োজন হবে এবং সেই সঙ্গে উপস্থিত ও ভোটদানকারী সকল প্রতিনিধির সংখ্যাধিক্যেরও প্রয়োজন হবে।

(৩) ইউনিয়নের বিষয়গুলি ছাড়া এবং অন্যান্য সকল বিষয় এবং সকল অবশিষ্ট ক্ষমতা (রেসিডিউয়ারি পাওয়ারস) প্রদেশগুলির হাতে থাকবে।

(৪) রাজন্য-প্রদেশগুলিও (নেটিভ স্টেটস) ইউনিয়নকে প্রদত্ত ক্ষমতা ও বিষয়গুলি ছাড়া অন্যান্য সকল বিষয় ও সকল ক্ষমতা হাতে রাখবে।

(৫) প্রদেশগুলি ইচ্ছামত শাসন-পরিষদ (একজিকিউটিভ) ও আইনসভা সমেত গ্রুপ গঠন করতে পারবে এবং প্রত্যেক গ্রুপ কোন কোন বিষয় প্রদেশগুলির সঙ্গে যুক্তভাবে গ্রহণ করবে তাও ঠিক করবে।

(৬) ইউনিয়ন ও গ্রুপগুলির সংবিধানে একটি শর্ত থাকবে যে, যে কোনো প্রদেশ তার আইনসভার সংখ্যাধিক্য ভোটে দশ বছর পরে প্রথম গঠিত সংবিধানের শর্তগুলির পুনর্বিবেচনা করতে পারবে এবং তারপরে প্রতি দশ বছর অন্তর এইভাবে পুনর্বিবেচনা করতে পারবে।

(ক) আমরা তাই প্রস্তাব করছি যে প্রত্যেক প্রাদেশিক আইনসভা কর্তৃক নিম্নসংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন—আইনসভার প্রতি অংশ (সাধারণ, মুসলিম বা শিখ) সিঙ্গল ট্রান্সফারেবল ভোটে প্রোপোরশনাল রিপ্রেজেণ্টেশন পদ্ধতিতে প্রতিনিধি নির্বাচন করবে।

প্রতিনিধি সংখ্যা তালিকা

সেকশন 'এ'

প্রদেশ	সাধারণ	মুসলমান	মোট
মাদ্রাজ	৪৫	৪	৪৯
বোম্বাই	১৯	২	২১
যুক্তপ্রদেশ	৪৭	৮	৫৫
বিহার	৩১	৫	৩৬
মধ্যপ্রদেশ	১৬	১	১৭
উড়িষ্যা	৯	০	৯
	১৬৭	২০	১৮৭

সেকশন 'বি'

	সাধারণ	মুসলমান	শিখ	মোট
পাঞ্জাব	৮	১৩	৪	২৮
উত্তরপশ্চিম সীমান্ত	০	০	০	০
সিন্ধু	১	৩	০	৪
	৯	২২	৪	৩৫

সেকশন 'সি'

	সাধারণ	মুসলমান	মোট
বাংলা	২৭	৩৩	৬০
আসাম	৭	৩	১০
	৩৪	৩৬	৭০
ব্রিটিশ ভারতের মোট প্রতিনিধি			২৯২
রাজন্য ভারতের প্রতিনিধি			৯৩
			মোট ৩৮৫

বিশেষ : চিফ কমিশনারের প্রদেশগুলির প্রতিনিধি হিসাবে 'এ' সেকসনের কেন্দ্রীয় লেজিসলেটিভ এসেম্বলিতে দিল্লীর প্রতিনিধি, আজমীর মারওয়াড়ার প্রতিনিধি এবং কুর্গ লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের প্রতিনিধি যুক্ত হবেন। সেকসন 'বি'তে ব্রিটিশ বেলুচিস্তানের প্রতিনিধি যুক্ত হবেন।

(খ) চূড়ান্ত কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলিতে রাজন্য ভারতের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব দিতে হবে কিন্তু তার সংখ্যা ১৩-র বেশি হবে না এবং প্রতিনিধি নির্বাচনের পদ্ধতি আলোচনার পর ঠিক হবে। রাজ্যগুলির প্রতিনিধি হিসাবে প্রথমে একটি আলোচনা কমিটি কাজ করবেন।

(গ) নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নয়াদিল্লিতে মিলিত হবেন।

(ঘ) একটি প্রাথমিক মিটিং-এ সাধারণ কার্যবিধি নির্ধারিত হবে, চেয়ারম্যান এবং আদিবাসী ও বহির্ভূত অঞ্চলগুলি সম্বন্ধে উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হবে। তারপর প্রদেশগুলির প্রতিনিধিরা (ঙ) উপচ্ছেদের তালিকা মত 'এ' 'বি' 'সি' তিনটি সেকশনে বিভক্ত হবেন।

(ঙ) এই সেকশনগুলি প্রত্যেক সেকশনের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশগুলির সংবিধান রচনা করতে আরম্ভ করবে এবং সেই প্রদেশগুলিতে গ্রুপ সংবিধান চালু করা যাবে কিনা তাও ঠিক করবে এবং তা যদি হয়, তাহলে কোন্ কোন্ প্রাদেশিক বিষয় নিয়ে গ্রুপের কর্তৃত্ব থাকবে তাও ঠিক করবে। নিম্নবর্ণিত (ছ) উপচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী কোনো প্রদেশ বিশেষ কোনো গ্রুপ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারবে।

(চ) সেকশনের এবং রাজন্য ভারতের প্রতিনিধিরা ইউনিয়ন সংবিধান রচনার জন্য পুনর্বার মিলিত হবেন।

(ছ) ইউনিয়ন কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলি যদি ১৫নং অনুচ্ছেদের, গ্রুপাবলীর কোনো অদল-বদল করতে চান বা কোনো মৌলিক সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত এবং যদি দুই প্রধান সম্প্রদায়ের একটির প্রতিনিধি দল কর্তৃক অনুরুদ্ধ হন তাহলে নিজের সিদ্ধান্ত

ঘোষণার আগে কেন্দ্রীয়ের কোর্টের পরামর্শ গ্রহণ করবেন।

(ঘ) নতুন সংবিধানের বিধানগুলি চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে কোনো প্রদেশ ইচ্ছা করলে যে গ্রুপে নিজের স্থান হয়েছে সেই গ্রুপ থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। নতুন সংবিধান অনুসারে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত প্রাদেশিক আইনসভা এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।"

কংগ্রেস নেতারা এতদিন বলে আসছিলেন যে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের ভিত্তিতে প্রদেশগুলি হবে সেমি-ইন্ডিপেন্ডেন্ট, কিন্তু ২৪শে মের প্রস্তাবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি প্রথম বললেন : 'কেন্দ্রে শক্তিশালী সরকার দরকার' এবং আরও বললেন যে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের নীতি অনুসারে কোনো প্রদেশকে কোনো গ্রুপে যোগ দিতে বলার আগে তার সম্মতি প্রয়োজন।

মন্ত্রী-কমিশনের এই ঘোষণা বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী মিশনকে একটি চিঠি লিখে জিজ্ঞাসা করলেন ঐ ঘোষণার ১৫নং অনুচ্ছেদ বাদ দিয়ে মন্ত্রী-মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় কিনা এবং তা যদি হয় তাহলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ 'বি' সেকশনে এবং আসাম 'সি' সেকশনে যোগদান থেকে বিরত থাকতে পারবে কি না। গান্ধীজীর চিঠির পাশে ওয়েভেল লিখে ছিলেন : 'এর জবাব হওয়া উচিত একটি নিশ্চিত এবং দৃঢ়সম্মত "না"।"

কংগ্রেস নেতারা এই গ্রুপ গঠনের প্রস্তাবটির প্রবল বিরোধিতা করলেন। তাঁরা বললেন কোনো প্রদেশ কোনো গ্রুপে যোগদান করবে কিনা এ-নিয়ে কোনো জবরদস্তি থাকা উচিত নয়। প্রদেশের প্রতিনিধিরা যদি ইচ্ছে করেন তবেই তাঁরা গ্রুপে যাবেন, না ইচ্ছে করলে যাবেন না। আসাম হিন্দু-প্রধান কিন্তু 'সি' সেকশনে পড়ে মুসলমান-দের সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধীন হয়ে পড়বে এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার অধীন কিন্তু 'বি' সেকশনে পড়ে সেখানে কংগ্রেস কর্তৃত্ব হারাতে পারে। 'সি' সেকশনে (বাংলা, আসাম) মুসলমান প্রতিনিধি সংখ্যা ছিল ৩৬ এবং অ-মুসলমান ছিল ৩৪। ইয়োরোপীয়দের ভোট ছিল না। তবুও আসামের মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বরদলই নেতাদের ধরে বসলেন আসামকে কিছুতেই 'সি' সেকশনে পাঠানো চলবে না এবং গান্ধীজী ও জওহরলাল উভয়েই তাঁকে সমর্থন করলেন। জিন্না বার বার বলতেন, হিন্দু-মুসলমান কখনও একসঙ্গে বাস করতে পারছে না। আসাম মুখ্যমন্ত্রীর দাবি মেনে নিয়ে গান্ধীজী ও জওহরলাল প্রকারান্তরে জিন্নার সেই দাবিই মেনে নিলেন যে হিন্দু-প্রধান আসামকে মুসলমান-প্রধান বাংলার সঙ্গে একসঙ্গে যুক্ত করা চলবে না। অবশ্য কংগ্রেস নেতারা এটাও বললেন যে মন্ত্রি-মিশনের কোথাও লেখা নেই যে, প্রদেশগুলি নির্দিষ্ট গ্রুপে যোগদান করতে বাধ্য থাকবে।

কংগ্রেস নেতারা যখন দাবি করলেন যে ১৬ মের ঘোষণা থেকে প্রদেশগুলির গ্রুপ গঠনের যে ব্যবস্থা আছে প্রদেশগুলি তা মানতে বাধ্য নয় তখন ২৫ মে মন্ত্রী-মিশন ঘোষণা করলেন : 'ঘোষণা পত্রের ১৫নং অনুচ্ছেদের যে ব্যাখ্যা কংগ্রেস দল করেছেন অর্থাৎ প্রদেশগুলি প্রথম সুযোগেই ঠিক করতে পারবেন কোনো প্রদেশকে যে সেকসনে ফেলা হয়েছে সেই সেকসনে থাকবে কি থাকবে না—মিশনের অভিপ্রায়ের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। প্রদেশগুলি কর্তৃক গ্রুপ গঠনের ব্যবস্থার উদ্দেশ্যগুলি ভালোভাবেই সকলে অবগত আছেন এবং এটি আমাদের প্রস্তাবনার একটি মৌলিক অঙ্গ এবং শুধু বিভিন্ন দলের ঐকমত্যের দ্বারাই এর পরিবর্তন সম্ভব হতে পারে।' (ইংরেজির অনুবাদ

কংগ্রেস নেতারা এতেও সন্তুষ্ট হলেন না। তখন বড়লাট লর্ড ওয়েভেল কংগ্রেস সভাপতিকে চিঠি লিখে জানালেন ১৫ জুন : 'মন্ত্রিদল এবং আমি আপনাদের গ্রুপ গঠনের বিরুদ্ধে আপত্তির কথা জানি। আমি অবশ্য জানিয়ে দিতে চাই যে ১৬ মের ঘোষণাপত্র গ্রুপ গঠনকে বাধ্যতামূলক করে দেয়নি। এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার ছেড়ে দেওয়া হয়েছে প্রদেশগুলির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর যাঁরা বিশেষ বিশেষ সেকসনে যুক্তভাবে বসে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।... শুধু এই বিধানটি করা হয়েছে যে 'কিশেষ বিশেষ প্রদেশের প্রতিনিধিরা বিশেষ সেকসনে একসঙ্গে মিলিত হবেন যাতে তাঁরা ঠিক করতে পারেন যে কোনো গ্রুপ গঠন করা হবে কি হবে না। যদি

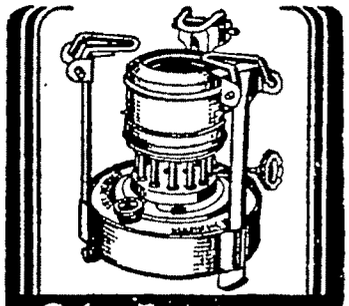
নির্ঝঞ্ঝাটে রান্না সারতে
লাইটেক্স
নীল শিখার কেরোসিন কুকার
১) স্টোভ ফাটবার কোনো সম্ভাবনা নেই।
২) তৈয়ারীর গুণাগুণ সম্বন্ধে গ্যারান্টি দেওয়া হয়।
৩) প্রতিটি অংশই আলাদা পাওয়া যায়।
পরিবেশক:
ভেনাস এজেন্সীজ
৬, আমড়াতলা স্ট্রীট • (দ্বিতলে)
কলিকাতা-৭০০০০১ • ফোন: ৩৪-৬৫৭৩

রচনাবলী গ্রন্থমালা

তারাশংকরের গল্পগুচ্ছ

অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত। তিন খণ্ডে সমগ্র ছোটগল্প। [প্রতি খণ্ড ৪০.০০]

গিরিশ রচনাবলী

পাঁচ খণ্ডে সমগ্র রচনা। ডঃ রথীন রায় ও ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত। কয়েকটি বিশেষ প্রবন্ধ সংযোজিত। [প্রতি খণ্ড ২৫.০০]

মধুসূদন রচনাবলী

এক খণ্ডে ইংরেজিসহ সমগ্র রচনা।
ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত। [২২.৫০]

বঙ্কিম রচনাবলী

যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত। দুই খণ্ডে সমগ্র রচনা :
প্রথম খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস (১৪টি) একত্রে [২০.০০]।
দ্বিতীয় খণ্ডে সমগ্র সাহিত্য-অংশ একত্রে [২২.০০]।

প্রতি রচনাবলীতে জীবনী ও সাহিত্য কীর্তি আলোচিত

সাহিত্য সংসদ

৩২-এ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েও থাকে তখনও কোনো বিশেষ প্রদেশের যদি অভিরুচি হয় তাহলে সে নিজেকে তার গ্রুপ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারবে।' (ইংরেজির অনুবাদ)

এখানেও কংগ্রেসের ব্যাখ্যা হোলো নির্বাচিত প্রতিনিধি মানে যারা বর্তমানে নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু মন্ত্রী মিশন থেকে বলা হোলো নির্বাচিত প্রতিনিধি মানে নতুন সংবিধান অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচনে যাঁরা নির্বাচিত হয়ে আসবেন। মূলত এই একটি ব্যাখ্যার পার্থক্যের জন্যই কংগ্রেস লীগ ঐক্যমত ভেঙ্গে যায় এবং ভারত বিভাগের দরজা খুলে দেওয়া হয়।

ওদিকে ৬ জুন মুসলিম লীগ বিনা শর্তে ১৬ মের মন্ত্রী মিশন প্রস্তাব মেনে নিয়ে একতাবদ্ধ ভারত সংকাবের অধীন থাকবে বলে স্বীকার করে নিয়েছে এবং পাকিস্তানের দাবি ছেড়ে দিয়েছে। এমনকি তাদের ১২ মের চিঠির বহু প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়া সত্ত্বেও তারা নিঃশর্ত সমর্থন জানিয়েছে মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাবকে।

কিন্তু ২৬শে জুন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি প্রস্তাব নিলেন : কংগ্রেস যে স্বাধীনতার লক্ষ নিয়েছিল তাতে একটি ঐক্যবদ্ধ, গণতান্ত্রিক ভারতীয় ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হবে যার কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশের রাষ্ট্রগুলির শ্রদ্ধার পাত্র হবে, যাতে সর্বোচ্চ পরিমাণ প্রাদেশিক স্বাধীনতা থাকবে এবং থাকবে দেশের প্রতিটি পুরুষ এবং স্ত্রীর সমান অধিকার। মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় সরকারের যে সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে এবং প্রদেশগুলি নিয়ে গ্রুপ-গঠনের যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তাতে সমস্ত কাঠামোটিকে একেবারে দুর্বল করে ফেলা হয়েছে এবং তাতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ : আসামের প্রতি অবিচার করা হয়েছে যেমন করা হয়েছে কোনো কোনো সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিশেষ করে শিখদের উপর। কমিটি তাই অগ্রাহ্য করছেন। তাঁরা অবশ্য মনে করেন যে সামগ্রিকভাবে প্রস্তাবটিকে গ্রহণ করলে এমন যথেষ্ট অবকাশ আছে যাতে কেন্দ্রীয় সরকারকে পরিবর্ধিত ও শক্তিমান করা যাবে এবং কোনো প্রদেশের গ্রুপ-গঠন সম্বন্ধে নিজের অভিরুচির অধিকার সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হবে এবং কোনো সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অন্য কোনো প্রকারে ক্ষতিজনক অবস্থায় পড়লে তাদের উদ্ধারে আসতে পারবে। কমিটি কিন্তু সাব্যস্ত করেছে যে কংগ্রেস প্রস্তাবিত কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বিতে যোগদান করবে যাতে একটি স্বাধীন, ঐক্যবদ্ধ ও গণতান্ত্রিক ভারতের সংবিধান রচনা করতে পারা যায়।...

'কমিটি কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিতে কংগ্রেসের যোগদানে রাজি হওয়ায় তাঁদের মতে এটি অত্যাবশ্যক যে একটি প্রতিনিধিমূলক ও দায়িত্বশীল অন্তর্বর্তীকালীন গভর্ণমেন্ট যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হওয়া দরকার। স্বেচ্ছাচারী এবং প্রতিনিধিত্বহীন গভর্ণমেন্ট কেবলমাত্র ক্ষুধার্ত জনগণের দুর্ভোগ বাড়িয়ে তুলবে এবং আরও অশান্তির সৃষ্টি করবে। এতে কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলির কাজের বাধা সৃষ্টি হবে কারণ একে কাজ করতে হবে একটি স্বাধীন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে।' (ইংরেজির অনুবাদ)

কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটির এই প্রস্তাব যখন ৭ই জুলাই বোম্বাই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে পাশ করবার জন্য পেশ করা হোলো তখন জওহরলাল পরিষ্কার করে কংগ্রেসের মনোভাবটি ব্যক্ত করলেন : 'এটা পরিষ্কার যে বিদেশ বিভাগের ভিতর বৈদেশিক বাণিজ্য থাকবে। বৈদেশিক বাণিজ্য, বৈদেশিক অর্থনীতি, বৈদেশিক মুদ্রা এসব বাদ দিয়ে বিদেশ বিভাগের কথা বলাই অবাস্তব। দেশরক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বললে স্বভাবতই দেশ-রক্ষার সঙ্গে যুক্ত সকল বিষয়বস্তু তার সঙ্গে থাকবে। দেশরক্ষার সঙ্গে নিশ্চয়ই বহু সংখ্যক উৎপাদক ব্যবসায় যুক্ত থাকা চাই। বিদেশ বিভাগ বিভাগ, দেশরক্ষা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ছাড়াও ইউনিয়ন সেন্টারের অর্থ-সংকলনের ক্ষমতা থাকবে। এর অর্থ এই হয় যে ইউনিয়ন সেন্টার কতকগুলি রাজস্ব-উৎপাদক বিষয়ের উপর কর্তৃত্ব করবে। আমি ঠিক বলতে পারবো না এই রাজস্ব-উৎপাদক বিষয়গুলি কি কি হবে। এটা অবশ্যম্ভাবী যে কোন্ কোন্ রাজস্ব-উৎপাদক বিষয় কেন্দ্রের হাতে যাবে তা ঠিক করে দিতে হবে। মনে হয় সে-বিষয়গুলির মধ্যে শুল্ক বিভাগ ও শুল্ক-কর পড়বে এবং হয়ত আয়-করও পড়বে।

'মন্ত্রী মিশনের দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্প-মেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমি যতটা দেখতে পাচ্ছি তাতে দীর্ঘমেয়াদী বা স্বল্প-মেয়াদী কোনো পরিকল্পনা গ্রহণেরই প্রশ্ন ওঠে না। প্রশ্নটি শুধু কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিতে আমাদের যাওয়ার মধ্যেই নিবদ্ধ। সেইটুকুই আসল—তার চেয়ে কিছুমাত্র বেশি নয়। আমরা অন্য কোনো বিষয় নিয়ে এতটুকু বাধ্যবাধকতায় নেই. এই মুহূর্তে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি শুধু এই যে আমরা কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিতে যোগদান করবো এবং নিশ্চয়ই সেখানে শুধু সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা দেবার জন্য বরং আমাদের সমস্যাগুলিকে জয় করে কিছু গঠন করবার জন্য।' (ইংরেজির অনুবাদ)

বোম্বাইতে ১০ই জুলাইয়ের এক সাংবাদিক সম্মেলনে জওহরলাল আরও পরিষ্কার করে কংগ্রেসের মনোভাবটি তুলে ধরলেন যে কংগ্রেস ১৬ই মের প্রস্তাবনার কিছুই গ্রহণ করেন নি শুধু এক স্বাধীন কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিতে যেতে রাজি হয়েছেন। তিনি বলেছিলেন, 'এই কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি যদি স্বাধীনভাবে কাজ করতে না পারে তাহলে আমরা এই এসেম্বলি থেকে বেরিয়ে আসবো, দরকার হলে ভেঙে দেবো। আমরা কারণ তাঁবেদারির কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি চাই না আমরা চাই একটি বৈপ্লবিক কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি।

কংগ্রেস নেতারা প্রস্তাব পাশ করলেন বটে যে তাঁরা ১৬ই মের মন্ত্রী-মিশন পরিকল্পনা সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতায় বলতে লাগলেন, কোনো প্রদেশকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে গ্রুপে যোগ দিতে বাধ্য করা চলবে না এবং কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি হবে সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন এবং কার্যত যা খুশি তাই করতে পারবে।

কংগ্রেস নেতাদের এই দ্বি-মুখো নীতিতে জিন্না রুষ্ট হয়ে উঠলেন। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে ২৮শে জুলাই বোম্বাইতে জিন্না বললেন, 'ওরা নির্বোধের মত বলছে যে কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিকে একটি সার্বভৌম প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবে, যে কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিকে তলব করছে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের মনোনীত ভারতের বড়লাট। পণ্ডিত জওহরলালের বাহাদুরি-পূর্ণ এবং ছেলেমানুষী বিবৃতিতেই কি কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিকে সার্বভৌম প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যাবে?.. কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবটি যথেষ্ট মন্দ ছিল কিন্তু পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কংগ্রেস সভাপতির কার্যভার গ্রহণ করেই ১০ই জুলাই বোম্বাইয়ের সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী-মিশনের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা সম্বন্ধে কংগ্রেসের নীতি এবং মনোভাব পরিষ্কার করে দিয়েছেন। সেই সম্মেলনে পণ্ডিত নেহরু বলে দিয়েছেন যে কংগ্রেস কোনো কিছুই মানতে বাধ্য নয় এবং ঘোষণা-পত্রের ১৫ নং অনুচ্ছেদ বা ১৯ নং অনুচ্ছেদ মানতেও তাঁরা বাধ্য নন। ২৩শে জুলাই নয়াদিল্লীর এক জনসভায় পণ্ডিত নেহরু ঘোষণা করেছেন যে কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিকে তাঁরা যদি অধিকতর ক্ষমতা-শালী করতে না পারেন তাহলে তাঁরা কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিকে খতম করে দেবেন।...আমি প্রতিবাদের ভয় না রেখেই বলতে পারি যে তিনটি পক্ষের ভিতর সারা আলোচনার সময়ে একমাত্র মুসলিম লীগই একটি সম্মানজনক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করেছে। আমরা একের পর এক ত্যাগস্বীকার করেছি তার কারণ এই নয় যে আমরা ভয়-বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। আমরা, তা করেছিলাম শুধু একটি শান্তিপূর্ণ ও বন্ধুত্বময় মীমাংসায় পৌঁছবার চরম আকাঙ্ক্ষায় যাতে করে এই উপ-মহাদেশের মুসলমান ছাড়াও অন্যান্য অধিবাসীরা স্বাধীনতা লাভ করতে পারে। কিন্তু কংগ্রেস এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রইল, তার আর কোনো উদ্দেশ নেই আছে শুধু একটি—কি করে মুসলিম লীগকে ডোবানো যায়।' (কংগ্রেসের প্রতি) আপনাদের কি এইটুকু সৌজন্য নেই, এতটুকু সাহস এবং আত্ম-সম্মান-জ্ঞান নেই যাতে আপনারা একথা বলতে পারেন যে আপনারা এই ঘোষণা-পত্রটি মানতে পারেন না কারণ সেটি আপনাদের লক্ষ্য এবং আপনাদের মৌলিক নীতির বিরোধী?' (ইংরেজির অনুবাদ)

(চলবে)

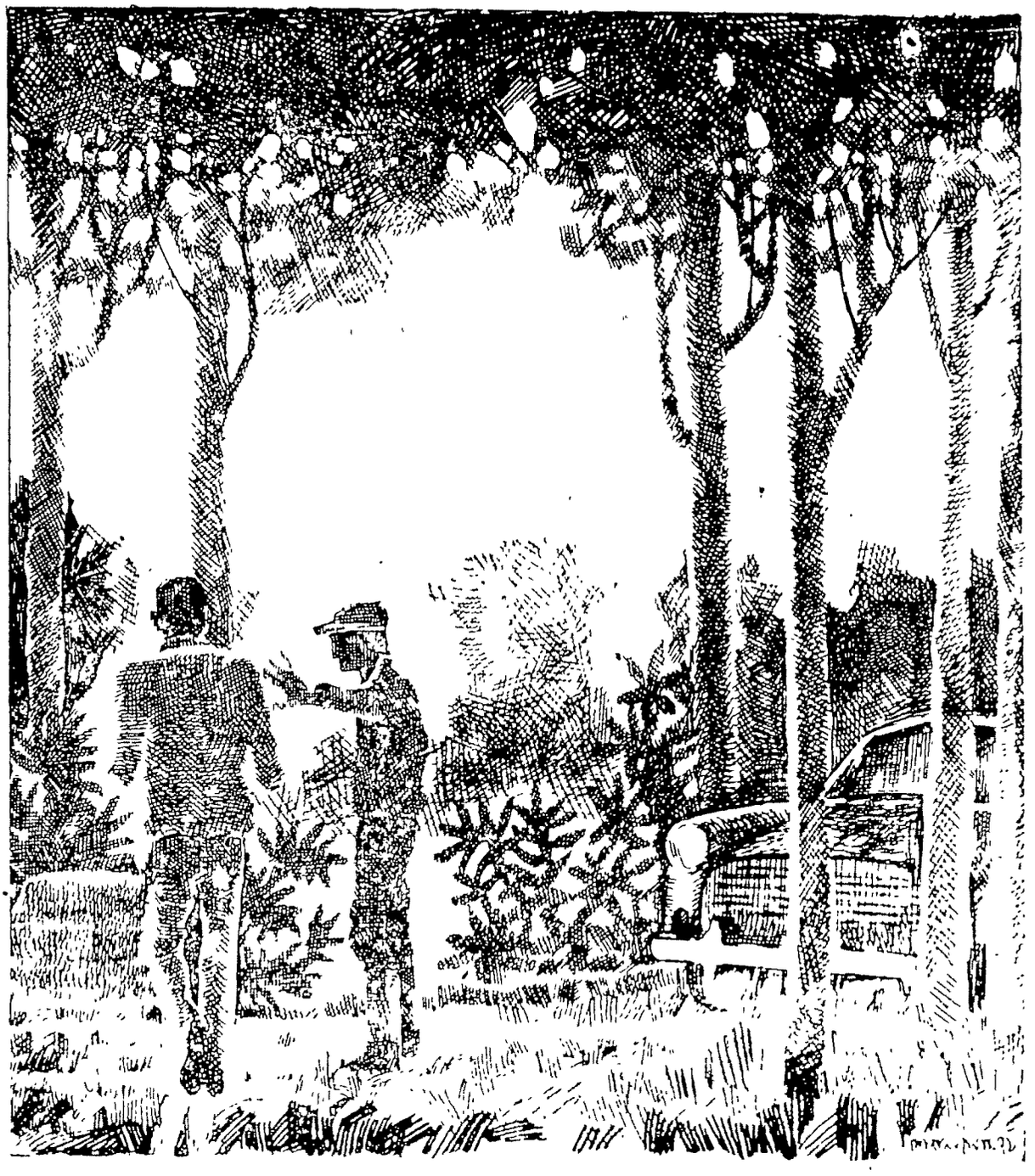

কোন দিন জঙ্গলে

পিনাকী চট্টোপাধ্যায়

।। ১ ।।

ভকিল সাহাব, আই অ্যাম থানডেভ পাবসেনট সিওর, উও ফাদাব খুদ আপনি হাত সে ইয়ে বুঢ়া কাম কিয়া। ব্যস, ডাকিল সাহাব তো চটেমটে লাল। একটার পর একটা প্রশ্ন, সে আর শেষই হয় না। ওদিকে জজ সাহেব ঘন ঘন হাই তুলছেন, ঘা গরম ডালটনগনজে, তাতে ঘুম পাওয়াটা দোষের কিছু না। ঘর ভরতি লোক। অর্ধেক ফরেস্ট ডিপারটমেনটের, বাকি সব গাবভেব। বাইসন খুনের মামলা। আসামী স্বয়ং খ্রীস্ট ভজুৎ ফাদার চাবো। কিসমাসের সময় বেতলা ফরেসটে নিজের হাতে বন্দুক চালিয়ে শিক বাইসনটাকে ফাদার খুন করেছেন।

যীশুর জন্মোৎসবে মহাভোজের উপাচার সংগ্রহে নেমেছিলেন ফাদার। বাদ সেধেছে বেতলা জঙ্গলের দাঁতাল ফরেস্ট অফিসার বিয়াস সিং। সেই বাদ-বিবাদের মামলায় এখন ডালটনগনজ বারির কড়াইয়ে চীনে বাদামের মত ফুটছে।

বেলা শহরের তাবৎ শংকর দাস ব্যানার্জির ফাদারের দিকে। তবুও লাভ হয়নি। আদালতের নাম—ফাদার অপরাধী, তাই ১৯৭২ সালের বন্য প্রাণী আইন অনুসারে তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। কিন্তু চারুচন্দ্র হাল ছাড়ার পাত্রই নয়। হাযার কোরটে আপীল করে ফাদারের হরিণবাড়ি গমন ঠেকিয়ে রেখেছে। সেই গল্পই বিয়াস বলছিল। বেতলার একমাত্র গেছো-ঘরের বারান্দায় বসে তারার আলোয় মহুয়ার গন্ধে মাখামাখি সন্ধ্যার বাতাসে গা জিরোতে জিরোতে সেই গল্প শুনছিলাম। অল্পদিন হল বৈশাখ নেমেছে এই পালামৌর জঙ্গলে। সিমুল, পলাশ, খয়ের গাছগুলো পুড়ে খাক হয়ে গেলেও আশ্চর্যভাবে সবুজ হয়ে আছে শাল, সেগুন, বহেড়া, আমলকী, কুসুম, ধাই, চিরাবিল্ব ও মহুয়ার জঙ্গল। নারকেল তেঁতুল চিরো ও চুরানট গাছের ঠাস বুনোট আয়োজন। মাটি ফেটে ফুটিফাটা। লাল ধুলো পায়ে পায়ে। রাঁচি থেকে একটা গাড়ি নিয়ে আজই দুপুরে একশ চার মাইল গরম বাতাসে সাঁতার কাটতে কাটতে এই জঙ্গলে এসে পৌঁছেছি। এসে শুনি বিয়াস নেই। বিয়াস গেছে ডালটনগনজে, অফিসের মামলা সামলাতে।

রে শোনে, সেই বকে পাগল। এই গরমে পালামৌ জঙ্গলে? সর্বনাশ, দম বন্ধ হয়ে মারা পড়বে যে। কেউ নয়। আর তাছাড়া এখন ওখানে দেখার আছেটা কি? জঙ্গলের জন্তুরাই এ সময় ঘর ছেড়ে বেরোয় না। লু বইছে। বরং যেতে হয় তো দার্জিলিং বা শিমলা ঘুরে এসো। বিহারের জঙ্গলে যাওয়ার মধুমাস অকটোবরের পর। তখন টুরিস্টরাও যায়। তখন বাঘ ভালুকের সঙ্গে ধলকাতার বালক বালিকাদেরও পাবে। যা বলছি শোন, পাগলামি করো না।

উপদেশ শুনে শুনে কান ঝালাপালা হওয়ায় জোগাড়। নিশ্চিন্ত হলাম, তাহলে ভুল ডিসিশন নিইনি। রাত সাড়ে আটটায় হাওড়া থেকে হাতিয়া-রাঁচি এক্সপ্রেস ছাড়ে। সটান গিয়ে উঠে বসলাম ওই ট্রেনে।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙল কনডাকটর গার্ডদের বৈতালিকে—রাঁচি আসছে। আর ধারো মিনিটের মধ্যে ট্রেন পৌঁছে যাবে। আপার বার্থে শুয়ে শুয়ে টের পাচ্ছি, ট্রেনটা হামাগুড়ি দিয়ে গুটি গুটি চড়াই ভাঙছে। ভোর রাতেই মুড়ি জংশন আমরা ছেড়ে এসেছি।

বিয়াস নেই। বেতলা রেঞ্জের ফরেস্ট অফিসও খা খা করছে। পিচ বাঁধানো রাস্তার বাঁ ধারে একতলা খান সাতেক বাড়ি। এই দফতরের ছোট বড় অফিসারদের অফিস কাম কোয়ার্টার। ইষৎ দূরে শ' খানেক ফুট উঁচু টিলার ওপর ডি এফ ও সাহেবের বাড়িটা নীল আকাশের বুকে ছবি হয়ে আছে। ডান হাতে টুরিস্ট কটেজ, টুরিস্ট লজ ও এই টি হাউস। মধ্যবয়সী মহুয়া গাছের গুঁড়িটা কলকাতার টাউন হলের থামের মত ফুট ত্রিশেক ওপরে উঠে চার-দিকে ডালপালায় ছড়িয়ে গিয়েছে। ওই গাঁটের মুখে বাঁশ ও বেত দিয়ে বানানো এই ডবলবেডের গেছো ঘর। সামনে ঘোরানো ঝুল বারান্দা। পাশেই অ্যাটাচড প্রিভি। বেসিনে মুখ ধুয়ে আয়নায় একবার নিজের বোদে পোড়া পুরোনো মুখটা দেখে নিলাম। কপালে, দুই গালের ওপরে, চোখের নীচে কালো কালো ছোপ।।

অনেক খুঁজে পেতে ফরেস্ট রেঞ্জারের অফিসের দাওয়ায় দুটি লোককে পেলাম। হলপাই বংয়ের মোটা কাপড়ের উর্দি গায়ে হাঁপাচ্ছে। আমরা জঙ্গলের ভেতরে খেড় ডাকবাংলো দিন কয়েকের জন্য বুক করতে চাই শুনে ওদেরই একজন খোঁনা গলায় বলল, সিংজী তো নেই। বিয়াস সিং ছাড়া এখানে আর কেউ পারমিশন দিতে পারবে না। ডালটনগনজে ফরেস্ট অফিস থেকে পারমিশন নিয়ে আসতে হবে। খেড় বেতলা থেকে আরো আট কিলোমিটার জঙ্গলের ভেতরে। বেতলা-মহুয়াদাঁড় রাস্তার ধারে। সরকারী অফিসারেরা ছাড়া সাধারণত ওই বাংলোয় কেউ যায় না। বেতলার পর জঙ্গলে টুরিস্টদের ঢোকা নিষিদ্ধ। সঙ্গী বন্ধু নির্মল সাহার মুখেই খেড়ের কথা শুনেছিলাম। গত মার্চে হোলির সময় ওই বাংলোয় কটা দিন কাটিয়েও গিয়েছে। গভীর রাতে চিতল হরিণ এসে বাংলোর হাতায় বহেড়া গাছের ফল খেতে। বাইসন তব দুপুরে গম্ভীর মুখে রাস্তা পেরিয়ে পাশ-বুরাশের জঙ্গলে ছায়া খুঁজে ফেরে। দূরে ছিপছিপে রেল গুমটির অপর পাড়ে খয়ের, কুসুম, শালের জঙ্গলে, নালার ধারে ঘুর ঘুর করে সম্বর, বুনো শুয়োর, ময়ূর আর জঙ্গলের আবর্জনা সংসারী কুকুর। কপাল ভাল হলে বড়া জানোয়ারের সঙ্গেও নাকি দেখা হয়ে যেতে পারে। কখনো-সখনো ভালুকও বেরোয়।

বিয়াস হাতের চার ব্যাটারীর টর্চটা দূরের শাল জঙ্গলের ওপর ফেলল। অসংখ্য হীরের কুচি একসঙ্গে জ্বলজ্বলে। চিতলের পাশ বেঁষেছে গরমিন সন্ধ্যার কচি চুরানট পাতার মুখের স্বাদ বদলাতে। টর্চের আলোয় মুগ্ধ চিতলের চোখ খনির অন্ধকারে যেন মণি। বিয়াস জাতে রাজপুত। প্রায় ছ ফিটের কাছাকাছি। পোড়া তামাটে কুদে-কাটা মুখের ওপর বাঁকা প্রতাপের গোঁফ জোড়ায় এই আটত্রিশ বছরেই বয়সের পা পড়েছে। ঝুলপিতে, মাথা জুড়ি কালো চুলের বাঁশে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে বয়স। প্রচণ্ড স্বাস্থ্য। ঢোলা পা ট্রাউজারের ওপর হাওয়াই শার্টটার লোভাম সব কটা খোলা। মহুয়া গাছের ঘরের বারান্দায় বসে বুক ভরে সিকুত হতে হতে বিয়াস বলল, ভবিল সাহার নাছোড়বান্দা। প্রমাণ হবেনোই যে ফাদার চক্কো নিরপরাধ কিন্তু নির্মল তুমি তো জানো জঙ্গলের জন্তু আমার বলবে। একটা বাইসন তুমি খুন করবে আর আমি তোমায় ছেড়ে দেবো। কর্তব্য নেই।

ফাদার চক্কো দুজন চেরো আদিবাসী খ্রীশ্চানকে নিয়ে বেতলার ভেতর দিয়ে শর্ট-কাটে বারোয়াদি যাচ্ছিলেন। আজ তোমা-দের জঙ্গলের যে প্রান্ত থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে এলাম, তার ঠিক ওপাশেই বারোয়াদি। সপ্তাহে দুদিন হাট বসে। ফাদার যাচ্ছিলেন হাটে। বিকেল বিকেল। নালার ধারে বাই-সনের যুথ চরছিল। একটা বাচ্চা কি করে ছিটকে নালার অপর পাড়ে চলে যায়। ফাদার লোভ সামলাতে পারেন নি। জোব্বার ভেতরে কেরামতী ফাদার একটা বিভলবার ক্যারি করেন। বেমকা সুযোগ পেয়ে একেবারে পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে বাচ্চাটার কপাল ফুটো করে দিলেন।' কাজ তো হাসিল হল, এখন বমাল সামলাবেন কি করে? সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এরপর টুরিস্টদের নিয়ে সদর দফতরের কর্মীরা জিপে চড়ে স্পট লাইট দিয়ে জঙ্গল দেখাতে বেরিয়ে পড়বেন। তাই তিন-জনে তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে একটা খয়ের গাছের নীচে বাইসনটাকে মরা খয়ের পাতা দিয়ে ঢেকে কেটে পড়লেন। পরদিন সকালে এসে বাকি কাজটা হাসিল করবেন এই মতলব।'

বিয়াস নেই শুনে, আবার আমরা গাড়িতে ফিরে এলাম। ড্রাইভার ফলিন্দর প্রসাদ ঝিমোচ্ছিল।' ডালটনগনজ যেতে হবে শুনে যেন একটু চমকে উঠল। সেই সকাল থেকে গাড়ি ছুটছে। বাতাসে বিহারী লু। আবার ছুটতে হবে এই দুপুরে রাঁচি শহরে কাঁকরাঝোরা ট্যাংক রোডের বস্তি থেকে প্রসাদকে তুলে নিয়ে গাড়ি ছাড়া হয়েছে। গাড়ির মালিক আদিত্য হাজরা থাকেন শহরের অন্যপ্রান্তে লালপুরায়। দেশ একদা ছিল পূর্ববঙ্গে। গত বিশ বছর রাঁচিতে। ব্যবসা ট্রান্সপোর্টের। ছোট ভাই বনু সওদাগরী নিয়ে ধানবাদ চলে গিয়েছে। তাই দাদা নিজে আমাদের নিয়ে বেরোলেন ড্রাইভার খুঁজতে। সাত দিনের কড়ারে ভাড়া নিচ্ছি, তাই এক-জন কড়া ড্রাইভার চাই। ধকল যাতে সামলাতে পারে। গাড়ির ব্যাটারীটার আবার মৃগীরোগ। ক্ষণে অক্ষণে ডাউন হয়ে যায়।

চেক-কাটা টেবিলক্লথের প্যানেলের ওপর সুতীর চকরা বকরা হাওয়াই শার্টের নীচে প্রসাদ মেদ মাংসহীন। তোবড়ানো গালে তিন-চার দিনের বাসী কাঁচা-পাকা দাড়ি গড়ের মাঠ হয়ে আছে। পালামৌ জঙ্গলের নিষ্পত্র পলাশ গাছের মত মাথার চাঁদিটা ইষৎ কালচে। আদিত্যবাবু ভাবতেই একটা লুঙ্গি হাতে নিয়ে গরু থেকে বেরিয়ে এসে ড্রাইভিং সিটে বসলা।' মুখে কোন কথা নেই। ঘরে সাতটা মুখ হাঁ করে আছে। বরফ ত্রিশও হতে পারে, ষাটও হতে পারে। এক সময় ডালটন-গনজ থেকে টিটিগড়ে পেপার মিলের জন্য বাঁশ নিয়ে যেত ট্রাকে। ডান চোখটায় পাথর লাগানোর পর ট্রাক চালানো ছেড়ে দিয়ে টুরিস্ট বোঝাই ট্যাকসি চালায়। রাত্রিবেলা ঠাহর করতে না পেরে ট্রাকটা একটা লরি-ভাবতে ভুলে দিয়েছিল। চালটে রাত্রের আর

একটা চোখ জন্মের শোধ জন্মা দিয়ে চার মাস হাসপাতালে পড়ে ছিল। ওর পুরোনো মনিব এক পয়সাও ক্ষতিপূরণ দেয়নি। স্টার্ট দেওয়ার আগে নীচু গলায় শুধু বলল : এ সময় বিহারের সব শহরে অফিস সকালে বসে, বেলা বারোটায় ছুটি হয়ে যায়।

ঘড়িতে দেখলাম দুপুর দুটো। আটাশ মাইল ঠ্যাঙাতে হবে। ছরসা দিল নির্মল, রাস্তা তো একটাই। যদি বিয়াস অফিসে না থাকে তো বেতলায় ফিরবেই। পথেই দেখা হয়ে যাবে।

অক্ষরে অক্ষরে ওর ভবিষ্যদ্বাণী মিলে গেল। ডালটনগনজ শহরে ঢোকার মুখেই দেখি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের উর্দিকি আঁকা একটা জিপ উলটো মুখে তেড়ে আসছে। থামাও প্রসাদ থামাও। গাড়ি ছেড়ে দুজনে পিচ রাস্তায় নেমে এলাম। ততক্ষণে জিপের ভেতর থেকে নেমে এসেছে রাজপুত।

তিনশ বছর আগে আওরঙ্গজেবের আমলে বিয়াসের পূর্বপুরুষ ইজ্জৎ বাঁচাতে রাজস্থানের বেশোয়ারা ছেড়ে চলে এসেছিল বিহারে। সিমেনট শহর জাপলাই ওদের এখন দেশ। ছেষট্টি সালে বি এস সি পাশ করে বন দফতরে ঢুকেছিল, ফরেস্ট রেঞ্জার। তারপর পরীক্ষা, ট্রেনিং আবার পরীক্ষা দিতে দিতে এখন হয়েছে বেতলার ওয়াইলড লাইফ ওয়ারডেন। গিন্নী জানকীকুমারী দুটি মেয়ে আর তিনটি ছেলেকে নিয়ে সত্তর মাইল দূরে জাপলায় থাকেন। ঘরবাড়ি আত্মীয়স্বজন সব ছেড়ে বিয়াস পড়ে থাকে এই জঙ্গলে, বেতলায়। একতলা নীচু বাংলোর ওই কোয়ার্টারে।

খেড়ের ডাকবাংলোর ব্যবস্থা হয়ে গেল। টুরিস্ট লজে মুরগীর ঝোল দিয়ে ভাত। তারপর বন দফতরের জিপে চড়ে বেরোলাম রিজার্ভড ফরেস্টের চেহারা দেখতে। পিচ-বাঁধানো রাস্তা একে-বেঁকে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে দূরে বহুদূরে চলে গিয়েছে। যাতে টুরিস্টদের কোন অসুবিধা না হয়। রাস্তা থেকে দু-ধারে প্রায় পঁচিশ ফুট ফার জঙ্গল সাফ করে দেওয়া হয়েছে। যাতে গাড়ি থেকেই তাদের দেখা যায়। বিয়াসের হাতে স্পট-লাইট। দূরে শাল জঙ্গলের পেছনে বেতলা পাহাড়ের মাথায় সূর্য ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। বাতাসও সবুজ শাল ও সেগুনের গন্ধ মেখে আস্তে আস্তে ভারী হয়ে উঠছে। দলে দলে চিতল, সম্বর, বাইসন জঙ্গল ছেড়ে উঠে আসছে রাস্তার দু-ধারে চুরানট ঘাসের মাঠে। মরা খয়ের গাছের পাতা মাড়াতে মাড়াতে জিপ ছুটছে।

রায়রেঙ্গা অফিসে বসে কাজ করছিলাম। হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এল এক ফরেস্ট গারড। পাহারাদারী সেরে ঘরে ফিরছিল। এমন সময় খয়ের গাছের নীচে হঠাৎ একটা ঢিবি মত দেখে একটু বিস্মিত হল—পাতা দিয়ে ঢাকা। কি ব্যাপার? সকালে তো ওখানে কোন ঢিবি ছিল না। হাতের টাঙ্গিটা ওই ঢিবির মাথায় বুলোতেই মরা পাতাগুলো সরে গিয়ে বেরিয়ে পড়ল মরা বাইসন।

তক্ষুনি জিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে ওই ফরেস্ট গারড আর এই বিভলবার। টেবিলের ওপর ওর খাপ খোলা বিভলবারটা গ্লাস ও জলের মগের পাশে পড়েছিল। বসে বইলাম সারা রাত ওই মৃত বাইসনের পাশে। টরচের আলোয় দেখলাম কপালে গুলির গর্ত। জানতাম যে বা যারা এ কাজ করেছে, তারা ভোর হলেই আসবে পাচার করতে।

তখনো সূর্য ওঠেনি। কুসুম কুসুম আলো জঙ্গলের মাথায় মাথায়। সারা রাত জেগে একটু ঢুলুনি এসেছিল। এমন সময় বাস্তায় মরা পাতার ওপর মচ মচ আওয়াজ শুনে ঢটকা ভেঙে গেল। কারা যেন আসছে? তাড়াতাড়ি ফরেস্ট গারডকে সঙ্গে নিয়ে খয়ের গাছটার পেছনে নালায় নেমে গেলাম। ঘাসের মধ্যে মুখ লুকিয়ে দেখতে পাচ্ছি দুজন চোরা মরদ এদিকে আসছে। খালি গা, কোমরে লেংটি। হাতে ছুরি। সামনে পিছনে তাকাতে তাকাতে। চোখে মুখে ভয়, সন্দেহ। গাগটি মেরে পড়ে রইলাম। ওরা এল। বাইসনটার কাছে এসেই থমকে দাঁড়াল। যেন বুঝতে পারল ওরা যে অবস্থায় রেখে গিয়েছিল, সে অবস্থা আর নেই। মরা পাতার ঢিবি হাঁ হয়ে আছে। দুজনে নিজেদের মধ্যে কি বলল, শুনতে পেলাম না। মনে হল একজন যেন তক্ষুনি পালাতে চাইছে, অন্য জনের তাতে সায় নেই। স্বিতীয় মরদটি ছুরি নিয়ে তক্ষুনি বসে গেল। ঝপাঝপ হাত চালাচ্ছে। প্রথম জন নজর রাখছে। আস্তে উঠে এলাম। হাতে পয়েনট থ্রি নট এইট বিভলবর। আঙুল ট্রিগারে। আমাকে দেখেই যেন ভূত দেখল। যে ব্যাটা ছাল ছাড়াচ্ছিল সে আর ওঠার চেষ্টা করল না, ওই বাইসনের পাশেই শুয়ে পড়ে কান্না জুড়ে দিল। আর নজরদার লাফ দিয়ে রাস্তায় পড়ে লাগাল ছুট। আমিও লাফ দিয়ে রাস্তায় উঠে এসে চাঁচাকার করে বললাম, থাম। যদি না থামিস তো এই বাঘপুতের গুলি তোর পা একেবারে জখম করে দেবে। পাছে মনে করে ফাঁকা বুলি, তাই দু রাউণ্ড ওর মাথার ওপর দিয়ে চালিয়ে দিলাম। তাতেই কাজ হল। ধরা পড়ার পর সব কবুল করল। বলল, বাবো-যাদি হাটের কাছে চারবের জান নিয়ে ফাদার অপেক্ষা করছেন। বলে দিয়েছেন ছাল-ফাল ছাড়িয়ে শুধু মাল নিয়ে যেতে। দুই ব্যাটাকে জিপে তুলে তখনই ছুটে গেলাম বাবো-যাদিতে। গিয়ে দেখি ফাদার চাকো ভ্যানটাকে রাস্তার ওপর রেখে হাতঘড়িতে সময় দেখছেন। হঠাৎ জিপের ভেতর ওই চেরো মরদ দুটোকে দেখেই ফাদারের সন্দেহ হল। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলেন ভ্যানের দিকে। হাটবার। হাটের চালাগুলো রাস্তার দু ধারে। আমিও জিপ থেকে নেমে পেছন পেছন ছুটতে লাগলাম। চালাগুলোর পাশ কাটিয়ে যখন গিয়ে পৌঁছুলাম ততক্ষণে ভ্যানটা স্টার্ট নিয়ে নিয়েছে। ধরতে পারলাম না।

ভকিল সাহাব ছাড়েন না। ভ্রূণের সামনেই চেপে ধরলেন আমাকে : ফরেস্ট রেনজারের পরীক্ষায় বসতে চলে তো আগে ষোল মাইল দৌড়ের পরীক্ষায় পাশ করতে হয়?

বুঝলাম জঙ্গলের আইন ভকিল সাহেব-এর মুখস্থ। বললাম : ট্রেনিং পিরিয়ডে আরো দু দফা ন মাইল দৌড়ের পরীক্ষা দিতে হয়।

—তাহলে ফাদার চাকোকে ধরতে পারলেন না কেন?

—আমি তো পাহাড়ীর ফাস্টেস্ট রানার নই। অলিম্পিকে পাঠালে ফাদার চাকো নিশ্চয় ইনডিয়ার জন্য একটা গোলড মেডেল আনতে পারতেন।

গল্পে গল্পে রাত বেড়ে গিয়েছে। এই রাতে আরো আট কিলোমিটার দূরে আমাদের যেতে হবে। জানি না সে ডাকবাংলো কি রকম? তার চৌকিদার কি ভাবে এত রাতে আমাদের অভ্যর্থনা জানাবে? আদৌ জানাবে তো? অবিশ্যি নির্মলের মুখে শুনে শুনে মনে হয়েছে ওই ডাকবাংলোর ইঁট-গুলোয় রোমাঞ্চ, কড়ি বরগায় রহস্য—জ্যোৎস্না রাতে হরিণ ডাক দিয়ে যায়, রাকা-ঙাড়ার বেগুনী ফুল ফুর ফুরে হাওয়ায় দোলে, খয়েরের গন্ধে মহুয়ার ফুলে বাতাস উন্মত্ত হয়ে ওঠে। বিয়াস হাতের গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বলল, চল একটা ফোরট তোমাদের দেখিয়ে আনি।

(চলবে)

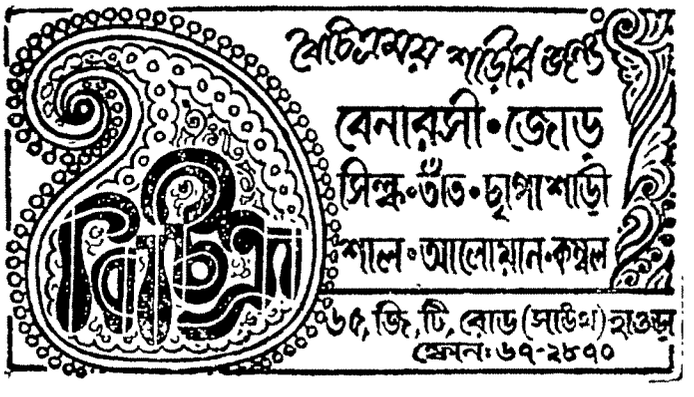

শৈবাল মিত্র

তরণী পাহাড়ে বসন্ত

বসুদের সঙ্গে অনেক আলোচনা আছে। সময় করে একদিন বসতে হবে। লুট ছাড়ানোর কাজটা ফেলে রাখতে নেই, কিশোর জানে।

গরীব কৃষকের সঙ্গে একাত্ম হওয়া খুব কঠিন নয়। কিছু অসুবিধে, কষ্ট আছে। সেগুলো ঝেড়ে ফেলতে হয়। মাটি কামড়ে লেগে থাকাটাই বড় কথা। পুরনো অভ্যেস গুলো খসে যায়। শোষণবঞ্চনা চলাফেরা কথায় জীবনের আদল আসে। গাঁয়ের মানুষ সরল নিরীহ। অনেক ঝড়ঝাপটা গেছে। তাই ওরা সতর্ক। বাইরের লোকের কাছে মুখ খোলে না। সহজে ধরা দেয় না। কিন্তু একবার বিশ্বাস করলে আঁকড়ে ধরে। বিশ্বাস বানাতে সময় লাগে। কিন্তু বানানো যায়। সেই সঙ্গে দরকার রাজনৈতিক বিশ্বাস আর সাধারণ মানুষের মধ্যে কাজ। মাস ওয়ার্ক। এটা পয়লা ধাপ। গরীব মানুষকে শ্রেণী হিসেবে সংগঠিত করাই শক্ত কাজ। শ্রেণী চেতনা সহজে আসে না। জীবন আর অস্তিত্বকে আমূল বদলাতে হয়। পিছিয়ে মানুষ সহজে পারে না। হাজার সংস্কার আর বিশ্বাস তাকে আটকায়। কিন্তু যে পারে সারাজীবন সে টলে না। গরীব মানুষের বিশ্বাস বড়ো মজবুত আর সুন্দর।

হাজার হাজার মানুষ আজ সারা অঞ্চলে ফুঁসছে। কিন্তু ওদের মধ্যে কজন কম্যুনিস্ট কিশোর জানে না। সমসাময়িক সমস্যার জন্যে ওরা জান দেবে। কিন্তু সমস্যার শেকড় খুঁজবে না। এরা গণ-ফৌজের লোক। কিন্তু কম্যুনিস্ট নয়। চারপাশে এতো মানুষ জড়ো হওয়া সত্ত্বেও তাই এলাকার সঙ্গে পার্টির নাড়ীর যোগ নেই। সেইভাবে পার্টিও তৈরী হলো না। গেরিলা স্কোয়াডই এখন পার্টি। তফাতের চেয়ে বন্দুক বড়ো হয়ে উঠছে। হয়তো এর পর একদিন বন্দুক পার্টিকে নির্দেশ দেবে। লড়াই পার্টির হাতের বাইরে চলে যাবে। তখন বন্দুক কর্তা, পার্টি নয়।

তাঁতিপাড়া থেকে গুবুলেগাছি সাড়ে দু-ক্রোশ পথ। মাঝখানে ধু ধু মাঠ, শাল সেগুন পলাশ তেকাঁটার বন। গেরুয়া রঙের শক্ত মাটি। সূর্য মাঝ আকাশে এলে মাটির রঙ বদলায়। লালচে হয়ে ওঠে। ফাঁকা মাঠে গরম ভাপ ওড়ে। হাজার হাজার অবছা সেলোফেন পেপার ডাইনে বাঁয়ে নেচে বেড়ায়। হাওয়ায় কাঁপে। ফাঁকা মাঠের মধ্যে উঁচু বাঁধ। বাঁধে ঘেরা বিলিফের পুকুর। বদামী জল। পুকুরের ধারে একটা সভা বসেছে। তাঁতিপাড়ার ছেলেরা আছে। সঙ্গে জনাচারেক গরীব কৃষক। বাস্তা থেকে ওদের দেখা যায় না।

জলের দিকে নজর রেখে একটা মেয়ে বক দাঁড়িয়ে আছে। নিরীহ, নিরামিষ ভঙ্গী। বাঁধের ওপর কয়েকটা গাঙ শালিক বেকার চেঁচামেচি করছে। কালো রঙ, গলায় শাদা সুতোর মালা। হলুদ ঠোঁট।

রঞ্জন উত্তেজনায় ফুটছে। পাশে পরাসিয়া গ্রাম। ওখানে বনেদী পয়সাওলা মানুষেরা থাকে। এই একটা গাঁয়েই বারোটা বন্দুক আছে। আজ রাতে ওখানে এ্যাকশান হবে। খুঁটিনাটি আলোচনা হচ্ছিল।

দিন সাতেক আগে ওরা একবার চেষ্টা করেছিল। দেড় দুশো মানুষ গাঁয়ে হানা দিয়েছিল। দিনের আলো তখন সবে গেছে। ধোঁয়াটে, পেঁজা অন্ধকার। মানুষজন দেখা যায়। চেনা যায় না। রঞ্জনরা খবরটা আগেই রটিয়েছিল। ভেবেছিল জোতদাররা নিজেরাই ভয়ে সব বন্দুক দিয়ে দেবে। সেটা হলো না। বরং তারা জোট বাঁধলো। উগ্রপন্থীদের মোকাবেলা করবে। পরাশিয়ার কাছেই পুলিশ ক্যাম্প। কিন্তু তারা আসেনি।

একটা দোতলা ছাদে জোতদাররা জড়ো হয়েছিল। হাতে বন্দুক। ভীড়টা দেখেই তারা গুলি চালাতে শুরু করলো। বেপরোয়া গুলির বৃষ্টি।

গুল্লি। গোল্লি। হৈচৈ চীৎকার। অন্ধকারে দৌড় ঝাঁপ লেগে যায়। কে আগে পালাবে।

জোতদার আর প্রতিরোধ বাহিনী এতোটা ভাবেনি। পালাতে দেখে তাদের হিম্মত বাড়ে। পেছনে ধাওয়া করে। জনা-তিনেক আহত হলো। কেউ ধরা পড়েনি, এই রক্ষে। কোনো ফয়দা হলো না।

রঞ্জন বললো—পার্টি লাইন না মানার ফল। গেরিলা কায়দা নিতে হবে। বাবলু ঢুলছিল। গতকাল রাতভোর যাত্রা দেখেছে। যাত্রা দলের পোশাক পরে একটা এ্যাকশান করেছে। তখন মাঝরাত। পালা শেষ। সারা গাঁ ঘুমে নিঝুম। রঞ্জন, বাবলু, শিবেন, পলাশ এবং আরো কয়েকজন তৈরী ছিল।

যাত্রা দলের লোকেরা শুয়েছিল চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায়। মেয়েরা ছিলো ঘরে। ওদের দেখাশোনার ভার ছিলো পলাশের ওপর। পলাশ বুদ্ধিটা দিয়েছিলো। কীচক বধ পালা। নানারকমের জমকালো পোশাক। মুখোস।

বাবলু সাজলো অর্জুন। রঞ্জন কীচক। মুখে গোঁফ, দাড়ি, হাতে তলোয়ার। আসল অভিনেতারা তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। শিবেন আর পলাশ মন্ত্রী সাজলো।

চণ্ডীমণ্ডপের পাশে অন্ধকার বট-তলা। হ্যারিকেনের ফিকে আলোয় ওরা নিজেদের রূপসজ্জার তারিফ করে। কয়েকটা জোনাকি অন্ধকারে বিলি কাটছে গাঁয়ের চেনা কুকুরটা ওদের দেখে ধাঁধায় পড়ে। ল্যাজ নাড়ে। হাওয়া শোঁকে।

ইণ্ডিয়ান টেকস্টাইলের পাকা বাড়ীটা আবছা দেখা যায়। সাদা রঙ। আকাশে এক টুকরো চাঁদ উঠেছে। কোম্পানীর মালিক ত্রিপাঠিজী পালার মাঝখানে উঠে গেছে। ঘি দুধ খাওয়া জাঁদরেল শরীর। টকটকে রঙ। বয়েস বোঝা যায় না। বাতের দারোয়ান শেষ পর্যন্ত আসবে ছিল। এখন নিশ্চয়ই কাঁধে বন্দুক নিয়ে ঢুলছে। ত্রিপাঠীরও একটা দোনলা বাইফেল আছে। এই মওকা। মাল দুটো হাতাতে হবে। পলাশ বলে- চুনকালি মাখার দরকার নেই। যাত্রাওলাদের মাল কাজে লাগাবো।

অন্ধকার মেঠো পথে দলটা এগোয়। বাবলু হাওয়ায় তলোয়ারটা কয়েক পাক ঘুরিয়ে নেয়। হাওয়া কাটার শাঁইশাঁই শব্দ। চাঁদের আলো পালিশ করা টিনের তরোয়ালে চলকে ওঠে।

বাড়ির সামনে একমানুষ খাড়াই পাঁচিল। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ভোলা পাঁচিল টপকে ভেতরে যায়। হুড়কো টানার শব্দ। দরজা খোলে।

সামনে সিমেন্টের রক। ভোজপুরি দারোয়ান কম্বল পেতে ঘুমোচ্ছে। বন্দুকটা শিবেন ছো মেরে তুলে নেয়। হেঁচকা টানে দারোয়ানের ঘুম ভাঙে। বন্দুকটা ওর পান্টের বেল্টে বাঁধা। চোখ খুলতেই ও দেখে মাথার ওপর দুটো ধারালো তলোয়ার। ঝিকে গোঙানি ওর গলায়।

চোপ রও—বাবলু চাপা ধমক দেয়।

দারোয়ানের হাত পা অবশ হয়ে গেছে। ঝলমলে পোশাক পরা অর্জুন, মুখোসধারী কীচককে দেখে ওর ভিমি লেগে যায়।

শিয়ারাম, শিয়ারাম—ও বিড়বিড় করে। শিবেন বন্দুকটা টানাটানি করছে। দারোয়ান ভয়ে প্যান্ট খুলে দেয়। সেই প্যান্টেই ওরা বন্দুকটা জড়িয়ে নেয়। ওর বুকে তলোয়ার ছুঁয়ে বঞ্জন খাড়া থাকে। বাকীরা দোতলায় ওঠে।

ত্রিপাঠীর পাতলা ঘুম ওদের পায়ের শব্দে ভেঙে যায়। মাথার কাছে পাঁচ ব্যাটারির ত্রিপাঠী বোতাম টেপে। বাবলুর মুখে একঝলক তেজী আলো ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওর চোখ ধেঁধে যায়। এগোতে পারে না। শিবেন, পলাশ আর ভেলা ত্রিপাঠীকে ঘিরে ধরে। ত্রিপাঠী দেখে। বোঝার চেষ্টা করে। এরা যাত্রা-মানুষ নয়। এখানে কি করছে। শিবেন দোনলা বন্দুকটা দেওয়াল থেকে নামায়। ভয়াট গলায় পলাশ বলে ওরে দুরাচার রাক্ষস। সবংশে নিধন হবি তুই। যাত্রার ডায়ালগ। ত্রিপাঠীর হাত থেকে টর্চ পড়ে যায়। নিমেষে জমাট অন্ধকার নামে।

কয়েক সেকেণ্ড পরেই বাইরে শুকনো ঘাসপাতায় পায়ের শব্দ ওঠে। পাড়ার কুকুরেরা চেঁচায়।

চটপট যাত্রার পোশাকগুলো ওরা ছেড়ে ফেলে। পলাশ এক দৌড়ে সেগুলো চণ্ডীমণ্ডপে পৌঁছে দেয়। ইণ্ডিয়ান টেক্‌স্‌টাইল কোম্পানীতে তখন অনেক গলার আওয়াজ।

গত রাতের এই জয় ওদের মাতিয়ে দিয়েছে। পার্টির জন্যে একটা সত্যিকার কাজ হলো। ওদের চলাফেরায় এখন আলেকজাণ্ডারের ভঙ্গী। সাতদিন আগে পায়াশিয়ার ভাড়া খেয়েছিল। পালিয়ে এসেছে। সে দুঃখ এখন কম। বরং পালানোর লজ্জা তেতে দগদগ করছে। জ্বালা আর রাগ ফুসছে।

চারপাশে এখন একতরফা জয়ের খবর। গ্রামগুলো লাল হয়ে যাচ্ছে। প্রায় মুক্ত এলাকা। গরীব মানুষের রাজত্ব। জেলার শহরগুলোতেও মধ্যবিত্ত মানুষ, ছাত্র যুবকেরা ফেটে পড়ছে। গাঁয়ের হাওয়া শহর ভাসিয়ে দিচ্ছে। শহরগুলোয় বিস্ফোরণের ঝাঁঝ। সব বাড়ীতেই দু একজন বিপ্লবী আছে। তারা লড়তে চায়। বোলপুর, হেতমপুর, সিউড়ি, রামপুরহাট, নলহাটিতে লড়াইয়ের ডাক এলো। এই জেলা শহরগুলো ঘিরে আছে গ্রাম। গাঁয়ের জোতদার, মহাজন, বাবু-ভাইয়ারা শহরেও মাতব্বর। ডাক্তার, দোকানদার, কেনাবেচার সাত সতেরো ধান্দা। সুদের কারবার তো আছেই।

বদ স্বভাবের ভদ্রলোকদের শায়েস্তা করার জন্যে পার্টি ফরমান দিলো। এই নির্দেশের দুটো উদ্দেশ্য। এক : গাঁয়ের ওপর পুলিশী চাপ কমানো। জেলার অর্ধেক গ্রামে পুলিশ ক্যাম্প বসেছে। পুলিশ টহল দিচ্ছে। রাতে তারা বেরোয় না। দিনের বেলায় দল বেঁধে হামলা করে। পুলিশের শক্ত বেড়া ভাঙা দরকার।

দুই : শহরের গরীব মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। এদের আত্মীয়-স্বজন কম বেশি গ্রামে থাকে। তাই শহরের মেহনতী মানুষের বাড়াই গাঁয়ের গরীবদের চাঙ্গা করবে। তাদের বিচ্ছিন্নতা কাটবে।

কোলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর করুন... দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন

প্রতিবার খাওয়ার পর কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। আপনার দাঁতকে সুরক্ষিত করার জন্যে সারা পৃথিবীতে দাঁতের ডাক্তাররা এই উপদেশই দেন।

দাঁতের ফাঁকে খাবারের টুকরো থেকে গেলে রোগ-জীবাণুর সৃষ্টি হয়। ফলে, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ আসে, পরে দাঁতে যন্ত্রনাদায়ক ক্ষয়রোগ শুরু হয়।

প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। দাঁতকে সাদা ঝকঝকে করে তুলে, নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয় রোধে কোলগেটের অসাধারণ ক্ষমতা বহুবার প্রমাণিত হয়ে গেছে।

জীবাণুমুক্ত নির্মল শ্বাসপ্রশ্বাস ও ঝক্‌ঝকে সাদা দাঁতের জন্যে সারা পৃথিবীতে লোকে সবচাইতে বেশি কেনে কোলগেট টুথপেস্ট।

কোলগেটের নির্ভরযোগ্য করদুনা কিভাবে কাজ করে:

নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয়ের জীবাণু জমার দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের টুকরো থেকে।

কোলগেটের প্রচুর ফেনা দাঁতের ভেতরে গিয়ে অবাঞ্ছিত খাবারের টুকরো ও রোগজীবাণু দুইই দূর করে।

ফলাফল : সাদা ঝকঝকে দাঁত, নিঃশ্বাস দুর্গন্ধের ভয় থাকে না, ক্ষয়রোগ বেশের পরিবেশ।

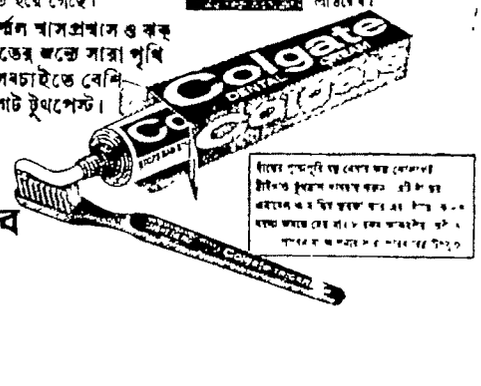

কেবল দাঁতের ডাক্তারই এরচেয়েও ভালোভাবে আপনার দাঁতের পরিচর্যা করতে পারেন

তাছাড়া শহরের তরুণদেরও কাজ চাই। আগামীদিনের গণফৌজের তারা সৈনিক। তারা লড়তে শিখবে।

তাঁতিপাড়া গরম হয়েছিল। নতুন নতুন নির্দেশ পেয়ে তারা ফেটে পড়লো। জবাব দেবার সময় এসেছে। রঞ্জন আজকাল সারাদিন জঙ্গলে থাকে। পুকুরের ঘোলা জল খায়। কিশোরেরও সেই অবস্থা। রাতে বেরোয়। পাড়ায় যায়। কাজ-কর্ম করে। পাড়ায় ওদের শত্রু নেই। সকলে ভালোবাসে। তবুও দু একজনকে সন্দেহ হয়। দিবাকর মালে চৌকিদার। পুলিশের লোক। অনেক আগেই ওর হিসেব চুকে যেতো। শুধু স্বাধীনের কথা ভেবে ওরা চুপচাপ আছে। স্বাধীন ওদের কমরেড। সিউড়িতে পার্টির কাজ করছে। দিবাকর কাজ জানে না। স্বাধীনও জানায় নি। খবরটা শুনলে চৌকিদার কি করবে।

আলোচনা শেষ হয়। জন্য দশেকের এক স্কোয়াড পলাশিয়ায় যাবে। রঞ্জন কম্যান্ডার। ও বলে—এগারোটা বন্দুক আজ চাই। কালকের দুটো সঙ্গে থাকবে তো—বাবলু জানতে চায়।

দরকার নেই—রঞ্জন বলে—আমাদের সাবেকি হাতিয়ারই যথেষ্ট।

পার্টি সেটা চায়।

তাহলে বন্দুক দখলে কি লাভ—বাবলু জিজ্ঞেস করে।

মজুত করতে হবে—রঞ্জন জানায়—গণফৌজ তৈরী হচ্ছে। হাতিয়ার চাই।

নিতাই বাউড়ি বলে—বন্দুকের চেয়ে হেঁসো ভালো। বন্দুক ফেটে গেলে কি হবে। ঘাসের ওপর রাখা হেঁসোটায় ও হাত বুলোয়।

ঝানু বাগদী ঘাড় নাড়ে—কথাটা ঠিক। সাইবেডের সেজোকর্তা বন্দুকে দেগে কুঁদোর ধাক্কা খেয়েছিল। মাটিতে সপাটে পড়ে কোমর ভাঙ্গলো। তারপর থেকে ধনুকের মতো বেঁকে যাচ্ছে।

পলাশ বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে চারপাশে নজর চালায়। সাবধানী চোখ। দুজন মানুষকে ও দেখতে পায়। এদিকেই আসছে। এখনো অনেকটা দূরে। বনকলমীর একটা ঝোঁপের আড়ালে পলাশ উবু হয়ে বসে। পোষাক দেখে ভদ্রলোকের মনে হয়। পশ্চিমমুখো হাঁটছে। সূর্যের ঝলসানো রোদ। ওরা সোজাসুজি তাকাতে পারছে না। ঘাড় গুঁজে পা ফেলছে।

কারা যেন আসছে—পলাশ জানায়।

পুলিশ নাকি—বাবলুর গলা।

কেউ ? —রঞ্জন জানতে চায়।

পলাশ বাঁধ থেকে নামে। দুজন সাদা পোষাকের লোক, ও জানায়। নিতাই আর ঝানু বাঁধে ওঠে। গামছা পরা কালো কালো শরীর। শক্ত টানটান। নিতাই মাথা একটা খুলে করে। ঝানু বাঁধের ধারে এসে জানায়— পলাশিয়ার সুদেব মণ্ডল আর তার বেটা। উ শালা কিষাড়হর বটে।

রঞ্জনের রক্ত চলকে ওঠে। এই লোকটাও সেই সন্ধ্যেতে দুষমনী করেছিল। বন্দুক চালিয়েছিল হাত থেকে। আজ ওকে জবাই করবে।

অদূরে শালবন। রোদে আধশোক্ত পাতা। হাওয়ায় ধুলোর ঘাগরা ওড়ে। ফাঁকা মাঠে কে যেন নেচে বেড়ায়। অনেক দিন-রাত এই জঙ্গলে কাটছে। মাঝে মাঝে রক্তের মধ্যে কি যেন চিড়বিড় করে। এই দেশ পাড়াগাঁ ওর জীবনটা বদলে দিলো। বাবার মুদির দোকান। দাঁড়িপাল্লা হাতে সারাদিন সওদা মাপছে। হিসেব কষছে। ভুল হিসেব। গরীব মানুষ বোঝে না। সেই হিসেবে সাড়া দেয়। নিয়মিত বসে। স্কুল ফাইন্যাল পাশ করার পর বাবা দিন কয়েক ওকে পাশে বসিয়েছিল। পরে বিপদ বুঝে নিজেই সরিয়ে দিয়েছে। ছিধর মালকে বাবা হিসেব বোঝাচ্ছিল একদিন। চার ষোলো হলো গিয়ে চুয়াত্তর। চুয়াত্তর আনা মানে পাঁচ টাকা চার আনা।

রঞ্জন জানে এসব বাবার চালাকি। আরো অনেকেই জানে। আড়ালে বলে ঠগ, জোচ্চোর। ছিধর সরল সাদা মুখে বাবার হিসেব শোনে। ঘাড় নাড়ে। কোনো সন্দেহ বা অবিশ্বাস নেই। রঞ্জন ক্ষেপে গিয়েছিল। ভুলটা ধরিয়ে দিতে বাবা ঘাবড়ায় নি। ছিধরকে দেখিয়ে খুব হেসেছিল। ভাবটা, দেখো কেমন ছেলে বানিয়েছি। হিসেবে চৌকশ। খরচ করে লেখাপড়া শেখাতে হয়।

ছিধর চলে গেলো। পরদিন থেকে বাবা আর রঞ্জনকে দোকানে ঢুকতে দেয়নি। গাঁয়ের এই জীবন তাকে মনমরা করে দেয়। কি অদ্ভুত বেঁচে থাকা। কে কাকে ঠকাতে পারে। ঠকানোর প্রতিযোগিতা চলেছে। এ সম্পর্ক শুধু বড়োলোক গরীবে নয়। সুযোগ পেলে গরীব তার স্বজাতিকে ছাড়ে না। বরং সেই কোঁদলই বেশী।

নিতাই বাউড়ি বলে—উ শালা মহা চশমখোর। বিশ হালের চাষ। নিতাই ওর কাছে এক সময় বাইখলাসিতে জমি দিয়েছিল। এখনো ফেরৎ পায়নি।

একদিন আমাকে কি মারটাই মারলে—ঝানু জানায়—ওর গোয়াল থেকে আমার বহু গোবর নিতো। ঘুঁটে দিতো। তবে জব্দ করেছিনু খুব। একবার ওর গোয়ালে একরাতে চাষ জায়গায় হেগে গোবর ঢেকে দেইছিনু। সকালে ও নিজের হাতে গোবর গুড়ো করে। সেদিন গোবর তুলতে গিয়ে আকচেল গুড়ুম। ধরতে পারে নি। তাহলে আমার ছালচামড়া আলাগ করে দিতো।

মকবুল তাকায় রঞ্জনের দিকে। ঢোলে ঢোলে কথা হয়। বাপ বেটার কথা শোনা যাচ্ছে। ওরা এগিয়ে আসছে। তেকাঁটার ঝোপ থেকে ওরা গতরাতের বন্দুক দুটো বার করে। পলাশ বলে—আমাকে একটা দাও।

দোনলা বন্দুকটা রঞ্জন এগিয়ে দেয় নিতাইয়ের দিকে। নিতাই বলে—তুমু রাখ। এই আমার হেঁসো আছে।

রোদ বাঁচাতে সুদেব মোড়লের মাথায় গামছা। শরীরে ধুতি ফতুয়া। বয়েস বছর ষাট। ছেলের নাম সুবাস। কলেজে পড়েছে। ভালো স্বাস্থ্য। বছর পঁচিশ বয়েস। প্যান্ট, শার্ট পড়েছে। তাঁতিপাড়ার পেছনে ওদের দুটো বড়ো আখের খেত আছে। বোধহয় ছেলে ফিরছে। আখের চাষ নিয়ে ওরা কথা বলছিল।

শিবেনের সঙ্গে ওদের চেনাজানা উশখুশ করছিল শিবেন। রঞ্জন ওর হাতে দোনলাটা ধরিয়ে দেয়।

বাপ বেটা বাঁধের ওপর ওঠে। হঠাৎ কজন মানুষ তাদের ঘিরে ধরে। অনেক দূরে একটা গরু কি রকম গলায় যেন ডেকে ওঠে। শরীর কামড়ানোর ডাক। ফাঁকা মাঠ। কেউ শোনে না।

বাবলু ধাক্কা দিয়ে দুজনকে বাঁধের নীচে যেতে বলে। খাড়াই বাঁধ। নামতে গিয়ে মোটা লোকটা গড়িয়ে পড়ে। কঁকিয়ে ওঠে। সুবল বাবাকে টেনে তোলে। গরুর কাছিতে ওদের হাত পা রঞ্জন শক্ত করে বাঁধে।

এ্যাকশান হোক—পলাশ বলে।

তার আগে বিচার করতে হবে—শিবেন জানায়। আদালতের রায় চাই।

গত হপ্তায় ছাত থেকে গুলি চালিয়েছিল—পলাশ বলে খুন করতে চেয়েছিল আমাদের।

তার চেয়েও অনেক বড়ো অপরাধ এ লোকটা করেছে—বাবলু জানায়—গাঁয়ের গরীব মানুষ তার সাক্ষী। নিতাই আর পানুকে দেখিয়ে বাবলু বলে—এরাও সে কথা বলবে।

নিতাই, পানু চুপ। সুদেব মোড়ল বা তার ছেলের দিকে তাকাচ্ছে না।

পলাশ হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে—মৃত্যুদন্ড হোক। ওরে দুরাচার, মৃত্যু ছাড়া শাস্তি নাহি আর।

পলাশ হঠাৎ খেপে যায়। হাত, পা বাঁধা দুটো মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এলোপাথাড়ি কিল চড় লাথি চালায়। মোড়ল কাৎরায়। ছেলেটা চুপ। রঞ্জন পলাশকে ছাড়ায়। নিতাই আর ঝানুকে বলে—এ দুটোকে কাটি।

নিতাই এগিয়ে আসে। হাতের হেঁসো রোদে জ্বলছে। সুদেব মন্ডল চোখ বুজে আছে। সুমন পলকহীন। আকাশ দেখছে। একঝোড়া তিতির শালবনে ডেকে উঠলো। ভবনী পাহাড়ের দিকে সূর্য হেলেছে। পাহাড়ের মাথা রোদে জ্বলছে। গরম লাল মাটি। ধোঁয়ায় ধোঁয়া বাতাস হাওয়ায় ভাসে। ধুলোর ঝড় বাঁধে ধাক্কা মারে। ধানসুখ বক টুপ করে জলে মাথা ডোবায়। ঠোঁটে রুপোলী মাছ।

নিতাই এগিয়ে যায়। পেছনে ঝানু। হাত পা বাঁধা মানুষ দুটোকে ওরা দেখে।

হেলো শ্যাম্পু—ঠিক আপনার মত চুলের যত্নের জন্যে!

অনেক নরম, রেশমী চিকন চুলের জন্যে হেলো কস্‌মেটিক শ্যাম্পু!

আপনার চুলে আনুন হালফ্যাশানের ঝলমলে রূপ···
হেলো কস্‌মেটিক শ্যাম্পু দিয়ে! এর বিশেষ সুষম ফর্মুলা—
আপনার চুলে ফিরিয়ে আনে সহজাত রেশমী কমনীয়তা!

স্বাভাবিক সুস্থ চুল চান—তো আজই
যত্ন নিতে শুরু করুন হেলো দিয়ে

হেলো এগ্‌ শ্যাম্পু : প্রোটিন সমৃদ্ধ হেলো এগ্‌ শ্যাম্পু দিয়ে আপনার চুলে সঞ্চার করুন প্রাণ আর সৌন্দর্য্য!

হেলো লেমন-ফ্রেশ শ্যাম্পু : তেলা চুলকে করে তোলে সহজাত সৌন্দর্য্য দীপ্ত, ঝকঝকে পরিষ্কার, ঝলমলে উজ্জ্বল।

হেলো কনসেন্‌ট্রেট শ্যাম্পু : রাশি রাশি সমৃদ্ধ ফেনার জন্যে একটুখানিই যথেষ্ট। এতে চুল নরম থাকে, আপনার সম্পূর্ণ আয়ত্বে আসে।

কেবল হেলো শ্যাম্পুগুলিতেই আছে নিখুঁত সুষম ফর্মুলা!

HSR.G.4 BN

বাবলু বলে—কাট, শালাদের কাট। ওরা তুদের সব্বোনাশ করেছে। মা বুনদের ইজ্জত কেড়েছে।

ক্ষমা করিস না—পলাশ উৎসাহ দেয়। ঝানু এগোয়। সুদেবের মাথার কাছে দাঁড়ায়। সুদেব এক পলক তাকায়। চোখ লাল। ফ্যাকাশে মুখ। মাথার টাক ঘামে ভিজে। মুখে বুকে দরদর ঘাম বইছে।

মারিস না, আমাদের মারিস না—ভাঙ্গা গলায় সুদেব কেঁদে ওঠে।

ঝানু থমকে যায়।

নিতাই হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায়। রঞ্জনকে বলে—তুই কাট।

পার্টির মানা আছে—রঞ্জন জানায়—গরীব কৃষক নেতৃত্ব দেবে। এটা তাদের লড়াই। তাদের সঙ্গে আমরা থাকবো।

ঝানু বলে—আমার পেটে পাক মারছে। সকাল থিকে খাওয়া হয় নাই। হাত বে চলে না।

এ্যাকশানের পর চা মুড়ি খাবো—পলাশ জানায়।

বাবলু অধৈর্য। ভেতরে ফুঁসছে। এতোদিনের প্রচার, তবু কাজ হয় নি।

গরীব মানুষের মনে সেই শ্রেণীঘৃণা জাগে নি। নিতাই আর ঝানু তাই খতমে ভয় পাচ্ছে। কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। রঞ্জনও এরকম কিছু ভাবছিলো। গরীব কৃষকদের সঙ্গে তারা মেশে। ক্ষমতা দখলের রাজনীতি বলে। গাঁয়ে গাঁয়ে তাদের যাতায়াত। সকলেই সাড়া দেয়, সায় দেয়। কিন্তু পার্টির কাছাকাছি থেকেও এ দুজন ভরসা পাচ্ছে না। কোথায় আটকাচ্ছে।

কিশোর দা, অজিত দাদের সভাতে ও গেছে। কিশোরদা যে কোনো গাঁয়ে দুটো সভা করলেই একটা গেরিলা স্কোয়াড তৈরী হয়। খতম হয়। ও দেখেছে কিশোরদার সভায় মানুষ কিভাবে জেগে ওঠে। সভা শেষ হওয়ার আগেই গর্জ করার জন্যে তারা লাফিয়ে ওঠে: কিশোরদা আটকায়। আবার আলোচনা করে। লোকগুলো উত্তেজনায় ধাপস্। কিশোরদা কি মন্ত্র জানে! তা না হলে ওর সাদামাঠা কথায় গরীব মানুষগুলো কেন এতো সহজে ফনা ধরে। কিশোর দার কথায়, চোখে সাপুড়ের জাদু আছে।

কিশোরের ভঙ্গীটা অনেক চেষ্টায় রঞ্জন শিখেছে। সভাগুলোতে কাজ হয়েছে।

কিন্তু দরকারে লাগলো না।

পলাশ অনেক বোঝাচ্ছে—শত্রুকে বাঁচিয়ে রাখার মানে মৃত্যু। আজ রাতে ভোজ আছে। একটু বাদেই চা বিস্কুট খাবো।

নিতাই কথা বলছে না। ঝানু একটা জলা ঘাসের ডগা চিবোচ্ছে। রঞ্জন ওদের থামায়। নিতাইয়ের হাতের হেঁসোটা বাবলু টেনে নেয়। আমিই কাটবো—ও চেঁচায়। রঞ্জন বলে না।

শিবেন বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। নজর রাখছে চারপাশে। তাছাড়া সুবলের সামনে থাকতে চায় না। স্কুলে এক সঙ্গে পড়েছে। ওদের বাড়ীতে গেছে। দুধ মুড়ি খেয়েছে। শীতের সময় পাটালি গুড়।

রঞ্জন বলে—ওদের ছেড়ে দাও। এবার বাবলু আটকায়—হতে পারে না। শ্রেণী শত্রুকে ছাড়া বেইমানী। শত্রুকে ছাড়া মানে মৃত্যু। এটা সারেন্ডার।

অরির শেষ না রাখিতে হয়—পলাশ যোগ করে।

শিবেন ওদের বাঁধন খুলে দেয়। সুদেব মোড়ল বেহুঁশ। পুকুরে গামছা ভিজিয়ে ওর মুখে চোখে শিবেন জল ছিটোয়। সুবল পাথরের মতো বসে আছে।

রঞ্জন বোঝায়—এটা সাদের লড়াই, তারা শিবেন এগোলো না। আমরা কাটতে পারি না। আমাদের কাজে গলদ আছে। গরীব মানুষকে আমরা জাগাতে পারি নি। তাদের সঙ্গে থাকতে হবে। একাত্ম না হলে লড়াই এগোয় না।

শিবেন দেখে সুদেব মণ্ডলের শরীর ঝরে পড়ে যাচ্ছে। কথাটা কাউকে বলে না।

দুজন মানুষ ছাড়া পেয়ে হাঁটতে শুরু করে। দূরে।

পারাসিয়া গ্রামের আবছা গাছপালা। সুবলের কাঁধে ভর দিয়ে বোকটা হাঁটছে। বাবলু বিড়বিড় করে, আজ রাতে ফের দেখা হবে।

রঞ্জনের খুব ক্লান্ত লাগছিল। এই-ভাবে চটপট কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক নয়। বিপদ ঘটে। নিতাই বা কানু ঠিক ভয় পায় নি। দুজনেই ভাল কর্মী। তবু খতমে রাজি হল না। আসলে ওরা মানসিকভাবে তৈরী ছিল না। রঞ্জন ওদের দোষ দেয় না। যে কোন কাজের আগেই গরীব মানুষেরা খতিয়ে ভাবে। তাছাড়া ওদের জীবন ধারণ-টাও আলাদা। পশুবৃত্তি, মোষ জীবন। কোন কাজের আগে গোটা গাঁ শলাপরামর্শ করে। এক সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেয়। একা কিছু করার কথা ওরা ভাবে না। গাঁগোষ্ঠীর ওপর একটা সহজাত আনুগত্য আছে। একজন রাজনীতি বুঝে এখানে এগোয় না। গোটা গাঁয়ের মানুষকে বুঝতে সময় দেয়। অপেক্ষা করে। গাঁয়ের যৌথ জীবন যেমন একজনকে চালায় তেমনি একজনের ভাগ্যের সঙ্গে সারা গ্রাম জড়িয়ে পড়ে। গাঁয়ে পুলিশ ঢুকলে পুরো গাঁ ধাক্কা খায়। ঝামেলা পোহায়।

মাথা গরম করে কোন কাজ হয় না, রঞ্জন বলে।

ঠিক বটে—নিতাই বাউড়ি ঘাড় নাড়ে।

এদিকে ঘাস পাতা জন্মায় না। শুকনো খটখটে মাটি। রোদে পুড়ে শক্ত পাথর। দড়ি ছেঁড়া একটা গরু শুকনো পাথর চাটে। ছলছল চোখে আকাশ দেখে। ডাক ছাড়ে—হাম্বা। নাড়ী থেকে উঠে আসা লম্বা ঘন স্বর। রঞ্জন তাকায়। উপোসী গরু পৃথিবীর কাছে জীবনরস চাইছে।

সকলেই কেমন যেন একটু ঝিমিয়ে পড়েছে। আজ রাতে বারটা বন্দুক দখলের অভিযান। আক্রমণের ছকটা নিয়ে ওরা এতক্ষণ আলোচনা করছিল। রক্তের মধ্যে একটা তাপ ছিল। নিতাই আর কানুর ব্যবহারে সেটা কেমন থিতিয়ে গেছে। বাবলু হাই তুলছে। হাঁ মুখের সামনে তুড়ি বাজাচ্ছে। রোদ নিভে আসে। চার পাশে ছায়া জমছে। মাটির ওপর গরম হাওয়ার নাচানাচি নেই। হাল্কা ঠাণ্ডা ভাব। এক ঝাঁক বক মনোরম ভঙ্গীতে গুড়ুল গাছের দিকে উড়ে গেল।

গাঁয়ে গাঁয়ে প্রতিরোধ বাহিনী তৈরী হচ্ছে। কৃষি উন্নয়ন সমিতি এর নেতা। জমিদার মহাজনদের সংগঠন। সঙ্গে আছে পুলিশ, দাগী ডাকাত আর মস্তানরা। বড়লোকদের ছেলেরা মহাফাঁপরে পড়েছে। এতকাল যাত্রা ভর্তা গান পালায় সময় কেটেছে। দরকারে মুনিষ মাহিন্দার বাগাল-দের কাজ দেখেছে। প্রাণ হাতে করে রাত জাগার কথা ভাবে নি। ঠাণ্ডা লাগে। কেমবে মাজায় টনটনে ব্যথা। বুকের মধ্যে একটানা গুড়গুড় শব্দ। দম যেন বেরিয়ে আসে। বড় খারাপ সময়।

প্রতিরোধ বাহিনী নিয়ে আলোচনা চলছিল। পলাশ হাসাহাসি করছিল। ননী-গোপালদের বড় মুস্কিল। গলে যাওয়ার দাখিল। রঞ্জন বলল—আরও অনেক গোলাম জুটেছে। প্রায় সবকটা বামপন্থী দল কমিটিতে ঢুকেছে। বড়লোকদের হয়ে গরীবদের জড়ো করার চেষ্টা করছে।

বাবলু গরম হয়। চেঁচায়—দালাল, বেইমান, ওদের ছাড় নেই। বড়লোকের বাড়ীর কুকুরকে কর্তার আগে মরতে হয়।

থানা পুলিশেও খবর দিচ্ছে—পলাশ বলে। এখানটায় ঘন শাল বন। দু-একটা মহুয়া আছে। অন্ধকার ঘন হয়। নিশুত রাত। চার পাশ ঘুমে ঢুলছে। একটু পরেই অসাড় হয়ে যাবে। আরও কয়েকজন ছায়া-মূর্তি হাজির হয়। রাত প্রায় আটটা। এবার ওরা পারাসিয়ায় ঢুকবে। নিতাই আর কানুর চেহারা বদলে গেছে। নিতাই মাথার বাবরি চুলে একটা ঘুনো লতা ফিতের মত বেঁধে নেয়। আকাশে এক টুকরো চাঁদ। ফিকে জ্যোৎস্নায় শুকনো লাল মাটি ভিজে ভিজে লাগে। ওরা পশ্চিম মুখো হাঁটতে থাকে। নজন মানুষ। কোন শব্দ হয় না। অভিযানের ছকটা রঞ্জন সকলকে বুঝিয়ে দিয়েছে। গাঁয়ের পেছন দিয়ে ঢুকবে ছজন। তিনজন থাকবে সদর রাস্তায়। সদর রাস্তার ওপরে সুধন্য সাহার দোতলা দালান বাড়ী। ছাত আছে। গতবার ওখান থেকেই জোতদারেরা ওদের আটকে-ছিল। আজও তারা ওখানে থাকবে নিশ্চয়। সামনের দলটা দের রাস্তা রাখবে। বাকী

হুজন পেছন থেকে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। বাবলু রাস্তায় আলাদা হয়ে যায়। বাবলু বলে আমরাই ওদের ঢিট করব। আগের লড়াইটায় ওরা হেরেছে। জোতদাররা ছাত থেকে হুংকার দিচ্ছিল, আয় শালারা আয়, সব কটার মাথা উড়িয়ে দেব। শব্দগুলো ও ভোলে নি। মাথাটা গন গন করে। একটা বন্দুক ওর আনার ইচ্ছে ছিল। শেষ পর্যন্ত হল না। পার্টির লাইন নয়।

পেছন দিকে একটা নাবাল জমি। বুনো ঝোপ। পাশে একটা ডোবা। তারপর সরু রাস্তা। ধুলো বোঝাই। ওদের পায়ে পায়ে ধুলো ওড়ে। অন্ধকারে রঞ্জনের নাক মুখে ধুলো ঢোকে।

জোরাল শ্লোগান ওঠে। পার্টির নামে, নেতার নামে ঘন ঘন ধ্বনি। বাবলুরা গাঁয়ে পৌঁচেছে। ওদের গলার শব্দ হঠাৎ কয়েকটা বন্দুকের আওয়াজে ডুবে যায়। গুড়ুম গুড়ুম এলোপাথারি গুলির শব্দ। অন্ধকার, নীরবতা কেঁপে ওঠে। রঞ্জনের সঙ্গে মূল বাহিনী গুঁড়ি দিয়ে এগোয়। গুলির শব্দ থেমেছে। কোথাও কোন সাড়া নেই। রঞ্জন ভাবে, বাবলুরা জানান দিচ্ছে না কেন? কি হল ওদের। গুলি লেগেছে নাকি। ওর বুকের দুটো শব্দ হঠাৎ জড়িয়ে যায়। তখনই দূরে বাবলু হাঁক ছাড়ে—কমরেডস বেড়ি। চার্জ ডিনামাইট। অমাম গাঁ উড়িয়ে দাও।

চার পাশ চুপ। একটা ধারাল উত্তেজনা উত্তেজনা কাঁপছে। জোতদাররা বন্দুক চালাচ্ছে না।

আবার বাবলুর গলা—দাঁড়াও। আর একটু সময় দাও। ফিউজ খুলো না। ওর প্রতিটা কথা পরিষ্কার, জোরাল।

রঞ্জনরা শোনে। এক পা করে এগোয়।

প্রাইমারী স্কুলের ছোট বাড়ী। দেড়-খানা ঘর। বাবলু দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে। পলাশ আর ঝানু পেছনে আছে। শ্লোগান দিলে হদিশ মেলে।

শেষবার বলছি—বাবলুর চড়া গলা। পেছনের স্কোয়াডের কোন সাড়া নেই। বাবলুর মাথায় চিন্তা চক্কর খায়। চিন্তার রেলগাড়ী ঝমঝম ছোটে। এক জায়গায় দাঁড়ান ঠিক হবে না। শত্রুরা ছাত থেকে নেমে ঘিরে ফেলবে। ফিকে জ্যোৎস্না। একটা কুটুরে পেঁচা চেরা গলায় ডেকে উড়ে যায়। গোটা গাঁ ছাই হয়ে যাবে তোমরা বন্দুক ফেলে দাও — অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে—বাবলু বলে। হঠাৎ তার পাশে কে যেন এসে দাঁড়ায়। বাবলু দেখে পলাশ। তার পেছনে ঝানু। ডানদিকে একটা বড় মাঠকোটা। বন্ধ জানলার ফাঁকে এক চিলতে আলো। ঝানু বলে—সুদের মোড়লের ঘর বটে।

ওরা সুদের মোড়লের ঘরের দিকে ছুটে যায়। মাটির উঁচু পাঁচিল। জানলার সামনে দাঁড়িয়ে পলাশ বলে — বন্দুকটা দাও। ভেতরে মেয়েলি গলার কাৎরানি—দিয়ে দাও। দিয়ে দাও।

না—সুদেবের ভরাট গলা। চাপা গলায় কথা কাটাকাটি। ঝানুর কানে বাবলু নীচু গলায় কিছু বলে। দুজনে পাকাচিলের পাশে দাঁড়ায়।

জোতদারদের কথাবার্তার টুকরো শব্দ আসে। ওদের মধ্যেও বিতর্ক। এক দল ছাত থেকে নামতে চাইছে। শত্রুদের ওপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। অপর পক্ষ রাজি নয়। তারা আটকাচ্ছে। বলছে—ফাঁদে পা দিও না। এক মানুষ খাড়াই পাঁচিল টপকে বাবলু আর ঝানু ভেতরে ঢোকে। অন্ধকার উঠোন, নিকোন পরিষ্কার। উঠোন ঘিরে উঁচু মাটির দাওয়া। তারপর ঘর। ঘরের দরজা বন্ধ। ওরা দুজন দরজার সামনে দাঁড়ায়। দুজনে এক সঙ্গে বন্ধ দুটো পাল্লার ওপর সারা শরীর দিয়ে ধাক্কা মারে। দরজা শুধুমাত্র ভেজান ছিল। ওরা বেগ সামলাতে পারে না। বাবলু সপেটা সুদেবের ঘাড়ের ওপর পড়ে। সুদেব বন্দুকে গুলি ভরছিল। আচমকা আঘাতে উল্টে যায়। বন্দুক ছিটকে পড়ে। সুদেবের বৌ কাঁদছে। ছেলের পাত্তা নেই। ঝানুর হাতে ধারাল হেঁসো। ও এগিয়ে আসে। বন্দুক আর গুলিগুলো বাবলু হাতায়। একটা লম্বা ছুরি সুদেবের পেটে ফোটায়। ওর মাথায় কি প্রবল দাপাদাপি। হঠাৎ ওর পায়ের ওপর সুদেব মণ্ডলের বৌ আছড়ে পড়ে—বাবাগো..। গলা বুজে যায়।

বাবলু এক পা পিছিয়ে আসে। সুদেব মণ্ডলের পেটে ছুরির আঁচড় কাটে। সামান্য ঘাবাক-ওভাবে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোয়। দু হাতে রক্ত মাখে। গরম তাজা রক্ত। বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে আসে। দু-চারটে বেমক্কা ফায়ার করে। ধারাল আলো।

চিৎকার করে — আমার দু হাতে সুদেব মোড়লের রক্ত। আমরা দুশাসনের বুক চিরেছি। এবার তোমাদের পালা।

ছাতের ওপর থেকে গোটা পাঁচেক বন্দুক জবাব দেয়—গুড়ুম গুড়ুম। তখনই পেছনের রাস্তায় অন্ধকার ফুঁড়ে একটা মিছিল জেগে ওঠে। মিছিলের সামনে দুজন মেয়ে। তারা চেঁচাচ্ছে — ওগো তোমরা বন্দুক চালিয়ো না গো। আমরা মরে যাব গো। ফাঁকা অন্ধকারে তাদের কান্না ছড়িয়ে পড়ে। ঝানু বলে মান্নালালের বহু আর বিটি। মান্নালাল এ গাঁয়ের মাতব্বর। প্রতিরোধ বাহিনীর নেতা। রঞ্জন প্রথমেই তার মেয়ে বৌকে ধরেছে। বুদ্ধি আছে—বাবলু ভাবে। মিছিলটা আসছে দেখা যায়। মাথার ওপর হ্যারিকেন নিয়ে নরেন বাউরি। মেয়েদের মুখে আলো ফেলছে। ছাতের লোকজন যাতে চিনতে পারে। মেয়ে দুটো আকাশ ফাটিয়ে কাঁদছে—তোমরা বন্দুক দিয়ে দাও।

ছাতের ওপর হঠাৎ কবরের নীরবতা নামে। কোন সাড়াশব্দ নেই। বন্দুক-ওলাদের দেখা যায় না। হঠাৎ ছাত থেকে একটা বন্দুক মাটিতে পড়ে।

বাবলু চেঁচায় — এগারোটা বন্দুক গুনে নেবো। ছাত থেকে হরির লুঠের মত টুপটাপ বন্দুক পড়ে। বাবলুর গলা পেয়ে মিছিলটা হৈ-হৈ করে ওঠে। তারপর শুধু শ্লোগান আর নাচ। আকাশ-বাতাস কাঁপতে থাকে। চার পাশের গাঁয়ের ছেলেছোকরারা ছুটে যায়। গান গায়। ঝানু বলে—আমার একটা আঙুল নেই। হ্যারিকেনের আলোয় রঞ্জন দেখে—ঝানুর বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা আমূল খসে গেছে। বাবলু বোঝে—সুদেবের বাড়ীতে হয়েছে। ঝানু নিজের হেঁসোতেই কোপ খেয়েছে। তখন বুঝতে পারে নি।

অনেক দূরে মাঝিপাড়ায় তখন মাদল বাজছে।

(চলবে)

চিত্ত বিনোদনে অতুলপ্রসাদ

সোরেন্দ্রনাথ গুপ্ত

(দশ)

পারিবারিক জীবনে অতুলপ্রসাদ সুখ পান নি। তাই বোধহয় তাঁর চিত্ত স্নেহ-ভালবাসার কাঙাল ছিল। মানুষের সঙ্গ ও বন্ধুত্ব পেলে তিনি সব থেকে বেশী খুসি হতেন। দুঃসহ বেদনা যেমন তাঁর দাম্পত্যজীবনের চিরসাথী ছিল, সামাজিক জীবন তেমনি তাঁর সাহিত্য-সঙ্গীতের মজলিশের রসে ভরপুর ছিল। মাত্র তেষট্টি বছর বয়সে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ২৬ আগষ্ট তাঁর আকস্মিক মৃত্যু ঘটে। বহুদিন যাবৎ তিনি রক্তচাপ বৃদ্ধি (হাই ব্লাডপ্রেসার) রোগে ভুগেছেন এবং এই রোগেই তাঁর আকস্মিক জীবনান্ত ঘটে। মৃত্যুর বেশ কয়েকবছর আগে থেকে, রক্তের চাপ বেড়ে যাওয়াতে প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর রসিক ও মজলিশি মন কখনও ক্লান্ত হয়ে পড়ে নি। ১৯২১ সালে লেখকের মত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের তাঁর লক্ষ্ণৌর বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করার সময় তাঁর বাড়িতে গানবাজনা ও সাহিত্যের আসর বসাতে তাঁর উৎসাহের শেষ ছিল না। ১৯৩০ সালে তৃতীয় অথবা শেষবারের মত যখন বিলাত গিয়েছিলেন সেখানেও ভারতীয় তথা বাঙালী ছাত্রদের নিয়ে তাদের মজলিশে গানবাজনার ও গল্পগাছার আসরে মেতেছিলেন। ১৯৩২ সালে কলকাতায় আসেন তাঁর প্রায় সমবয়সী জ্যেষ্ঠতুতো দাদা সত্যপ্রসাদ সেন ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর শরীর সে সময়ে খুব ভালো না থাকাতে সবাইকে একদিন সত্য-প্রসাদের মহানির্বাণ রোডের বাড়িতে বিকেল বেলায় ডেকে পাঠালেন। সেদিন সে বাড়িতে আসর জমজমাট। তিনি এত অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনকে এতদিন পর এক সঙ্গে এক স্থানে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে নিজেই নিলেন গান—ওগো সাথী, মম সাথী আমি সেই পথে যাব সাথে—গেয়ে উপস্থিত সবাইকে অপূর্ব আনন্দ দান করেন। ১৯৩৩ সালের মে মাসে অতুলপ্রসাদের এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের আহ্বানে স্বাস্থ্য উদ্ধারের আশায় কিছুদিনের জন্য হিমালয় পাহাড়ের 'কাবসিয়ং' সহরে 'গোলকুঠি' নামক ভবনে এসে বাস করেন। তিনি সেই ছোট্ট সহরে এসেছেন—ঐ খবর স্থানীয় বাঙালী বাসিন্দাদের জানতে বাকি রইলো না। সবাই মিলে এসে তাঁকে ধরলেন গান শোনাতে। অসুস্থ শরীর সত্ত্বেও মজলিশী মানুষ অতুলপ্রসাদের গান শোনাতে রাজী হলেন। একদিন স্থানীয় টাউন হলে এই গানের জলসা বসলো। অতুলপ্রসাদ একাই সেদিন দেড় ঘন্টা ধরে স্বরচিত গান গেয়ে বিপুল সংখ্যক শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। সেবারেই বিশ্ববিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শংকর তাঁর দলবলসহ দার্জিলিং থেকে ফিরছিলেন। তাঁর দলের প্রধান পান্ডা হবেন ঘোষ মশাই অতুলপ্রসাদ কাবসিয়ং-এ আছেন জেনে সদলবলে একদিন গোল-কুঠিতে—এসে উপস্থিত হলেন। যে কবেক তাঁরা সেখানে ছিলেন, পেটভরা খাবার খাইয়ে ও গানে, গল্পে, হাসিতে, বসিকতায় ভরিয়ে দিয়ে তাঁদের সেদিন অতুল-প্রসাদ বিদায় দিলেন। অতুল মাত্র দুমাস আগে অতুলপ্রসাদ ১৯৩৪ সালের মে-জুন মাসে ডাক্তারের পরামর্শে পুরীতে আসেন। সঙ্গে প্রায় ডজনখানেক সঙ্গী ছিলেন—সবাই তাঁরই অতিথি—অসুস্থ অবস্থায় পথশ্রম ও অচেনা জায়গায় থাকার একাকীত্ব ঘোচাবার জন্যই অতুলপ্রসাদের এই প্রয়াস ও ব্যবস্থা শুধু নয়—তাঁর চিত্তবিনোদনী ও মজলিশী মনকে সতেজ, সুস্থ ও প্রফুল্ল রাখার ও আনন্দের খোরাক জোগাবার জন্যও বটে।

(এগারো)

কোনও এক বিশেষ পারিবারিক কারণে অতুলপ্রসাদ ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌর কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে চোদ্দ বছর পর কলকাতায় চলে এসে হাইকোর্টে আইন ব্যবসা করার জন্য নাম লেখান। নতুন করে কলকাতার হাই-কোর্টে আবার তিনি ব্যারিষ্টারী সুরু করেন এবং পার্কস্ট্রিট ও ওয়েলেসলী স্ট্রিটের মোড়ে 'ওয়েলেসলী ম্যানসন'-এ একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে তাঁর বাবুর্চিসহ দুজনের সংসার পেতে বসেন। অতুল-প্রসাদ যে আবার কলকাতায় এসে বাড়ি ভাড়া নিয়ে বসবাস করছেন—এ খবরটা কলকাতা সহরে ছড়াতে বেশী দেরী হল না। কবি সত্যেন দত্ত ছিলেন অতুলপ্রসাদের গানের খুব ভক্ত। তিনি একদা অমল হোমের মারফৎ অতুলপ্রসাদকে নতুন গান রচনা করে পাঠাতে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু 'ছন্দের যাদুকর' কবি সত্যেন দত্তর কাছে অতুলপ্রসাদ সুরবিহীন শুধু কথার মালা গেঁথে পাঠাতে চান নি তখন। এবারে কলকাতায় আসাতে তাঁকে গিয়ে কবি সত্যেন দত্তকে গান শোনাতে হল এবং সত্যেন দত্তর ভবতারণ আড্ডায় আরও সাহিত্যিক গোষ্ঠীর সঙ্গে অতুলপ্রসাদের পরিচয় ও বন্ধুত্ব হোল। তাঁরা সবাই অতুলপ্রসাদের ভক্ত হয়ে পড়লেন। ১৮৯৫ সালে সদ্য ব্যারিষ্টারী পাশ করে দেশে ফিরে আসার পর চল্লিশ বছরের যুবক অতুলপ্রসাদের প্রথম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ লাভ, পরিচয় ও স্নেহপ্রীতির যে বন্ধন গড়ে উঠেছিল 'গ্রামফোনের সভায়' মাধ্যমে, তার ফলে তাঁর মধ্যে একটা রসিক ও মজলিশী চরিত্র পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। এই চরিত্র বৈশিষ্ট্য জন্ম দেয় তাঁর রসিক চিত্তবিনোদনের ক্ষমতা।

১৯০০ সালে অতুলপ্রসাদকে কলকাতার মায়া কাটিয়ে দ্বিতীয়বার বিলেত চলে যেতে হয়। অতুলপ্রসাদের দ্বিতীয়বার বিলাত যাবার পিছনে দুটি কারণ ছিল—(১) কলকাতার হাইকোর্টে তাঁর আইন ব্যবসায় পসার না জমাতে তিনি ঠিক করেন বিলাতেই ব্যারিষ্টারী করে ভাগ্য পরীক্ষা করবেন—যদিও ভাগ্য তাঁকে শেষ পর্যন্ত নিরাশ করেছিল; দ্বিতীয় কারণটি তাঁর বিবাহের স্থান হিসাবে স্কটল্যান্ডকে নির্বাচন। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া হেমকুসুম দেবী ছিলেন তাঁর মাতুল কন্যা অর্থাৎ বড়মামা স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের মেয়ে। পরস্পর তাঁরা একে অন্যের জীবনসঙ্গী হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দেশের ও সমাজের রীতিনীতিতে তার কোনই ব্যবস্থা ছিল না। আত্মীয়স্বজনের ও সামাজিক বন্ধুবান্ধবদের ঘোরতর আপত্তি, অশান্তিকে এড়াবার জন্য এবং দেশের আইন-এর বিরুদ্ধাচরণ করাকে প্রশ্রয় না দিয়ে তাঁরা উভয়েই স্কটল্যান্ডে গিয়ে বিবাহ কার্য সমাধা করেন এবং অতুল-প্রসাদ সস্ত্রীক বিলাতেই সংসার পাতেন। সেখানেই তাঁদের যমজ পুত্র হয়।

যমজ পুত্রের কনিষ্ঠ জন (নিলীপ) সেখানেই ৭ মাস বয়সে মারা গেলে তার সমাধিস্থলে একটি খোদাই করা পাথরের ফলক মৃতের পরিচয় পিতামাতা কর্তৃক লিখিত আছে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রতি বছর ছোট ছেলের মৃত্যুদিনে সমাধিতে ফুল দিয়ে সাজানোর জন্য সমাধিক্ষেত্রের পরিচালকের নামে অতুল-প্রসাদ এক পাউন্ড করে অর্থ পাঠাতেন।

(বারো)

অতুলপ্রসাদ এবার বিলাতেই আইন ব্যবসা শুরু করেন, কিন্তু ছোট পুত্রের মৃত্যু ও ব্যবসায়ে সাফল্য না ঘটায় তিন বছর পর অর্থাৎ আগষ্ট-সেপ্টেম্বর (১৯০২ খৃষ্টাব্দ) মাসে দেশে ফিরে আসেন। কয়েকদিন রংপুরে আইন ব্যবসার চেষ্টা করে অবশেষে লক্ষ্ণৌতে চলে যান ১৯০২ সালের শেষে। কলকাতায় রবীন্দ্র-সান্নিধ্যে আর তাঁর থাকা হোল না। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর বাড়ির আসরের সাহিত্য-সঙ্গীতের মহা-রথীদের সঙ্গসুখলাভ থেকে, বিলাত যাবার এবং সেখান থেকে ফিরে এসে লক্ষ্ণৌ চলে আসার জন্য, তিনি বঞ্চিত হওয়ায় অতুল-প্রসাদের রসগ্রাহী ও মজলিশী মন স্বভাবতই ব্যথা পেল। কিন্তু লক্ষ্ণৌতে এসে তাঁর নিজের রসিক গোষ্ঠী তৈরি করতে বেশী দেরী হল না। তিনি নিজে গান রচনা করে তাতে সুর বসিয়ে এবং নিজের কণ্ঠে গেয়ে লক্ষ্ণৌর বিদগ্ধ মানুষদের আনন্দ দিতেন। যাঁরা তাঁর গান শুনেছেন এবং তাঁর বাড়ির আসরের রসাস্বাদন করেছেন—তাঁরা সবাই অতুলপ্রসাদ সম্মলাভের আশায় তাঁর

ঘন ঘন যাওয়া-আসা সুরু করেন এবং দেখতে দেখতে অতুলপ্রসাদ তাঁদের প্রাণ-প্রিয় মানুষ হিসাবে গণ্য হলেন। এইসব নিমন্ত্রিত বসিকদের দলে ছিলেন স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সুশিক্ষিত স্ব-স্ব বিষয়ের অধ্যাপকবৃন্দ, যেমন সাধনকমল ও রাধা-কমল মুখোপাধ্যায় ভ্রাতৃদ্বয়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত, অরুণপ্রকাশ রায়চৌধুরী প্রমুখ। এঁরা ছাড়াও তাঁর বাড়ির আসরে মাঝে মাঝে যোগ দিতেন সাহানা দেবী, চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত (এঁদের দুজনেরই ডাকনাম ঝুনু) ও সমরেন্দ্র, দিলীপকুমার রায়, অম্বিকা মজুমদার, পাহাড়ী সান্যাল প্রমুখ বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পীরা। এর উপর অতুলপ্রসাদের সাহচর্যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যখন লক্ষ্ণৌতে তাঁর বাড়িতে অতুলপ্রসাদের অতিথি হয়ে আসতেন, তখন তো আসর আরও সরগরম হোত। অতুলপ্রসাদের রুচিমন যে শুধু বাংলা গানেই নিবদ্ধ ছিল তা নয়, তিনি হিন্দুস্থানী ও উর্দু গানের জলসা ও সমঝদারেও পক্ষপাতী ছিলেন। ওই সমাবেশে ও হিন্দি-উর্দু ভাষাভাষীদের সঙ্গে তাঁর প্রাণের যোগাযোগ ঘটাতেন যখন তিনি সমস্ত লক্ষ্ণৌ তথা হিন্দুস্থানের একান্ত প্রাণের ও মনের মানুষ বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

হেলা

ইংরেজি আদবকায়দায় যে পাণ্ডিত্যের ছিল অতুলপ্রসাদের সেদিন সমগ্র ভারতবর্ষের ইংরেজি সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন, তাঁর ব্যবহারিক জীবন শুধু আইন-আদালতের মধ্যেই সীমিত রাখেন নি। তাঁর মধ্যবিত্ত মন সব বাধা-নিষেধ অহংকার অভিমান, পদমর্যাদা ভুলে একদিন মজলিশে বা জলসায় আত্ম-বিস্মরণ হয়েছিল। লোক নিন্দা, সমাজের এমনকি পারিবারিক অশান্তিকেও তুচ্ছ করে তিনি অবাধে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত লক্ষ্ণৌর তৎকালীন প্রখ্যাত গায়ক-গায়িকা বাঈজি বসে গান শুনেছেন, তাঁদের সঙ্গে এবং তাঁদের গাওয়া ঠুংরী, টপ্পা বা খেয়ালী গান থেকে বসাস্বাদন করে তাঁর নিজের রচিত বাংলা গানে সেই সুরগুলি কখনও সংগতভাবে ও কখনও বিকৃতভাবে ব্যবহার করেছেন। এই সব গানের এলাকা নিজের সাময়িক মর্যাদা শুধু বাড়ায় নি, ইতিহাসে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

লক্ষ্ণৌবাসীরা অতুলপ্রসাদকে অত্যন্ত সম্মান করতেন ও সম্মানের চোখে দেখতেন। তাঁর সম্মুখে কোন পর একটা গান শোনাতে পারলে আনন্দ ও গর্বের শেষ ছিল না। এই ধরনের এইসব জলসায় অতুলপ্রসাদের সঙ্গী ছিলেন অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ [illegible] ধূর্জটিবাবু নিজেও সঙ্গীতজ্ঞ বোদ্ধা ও সমঝদার লোক ছিলেন, তিনি [illegible] একদিন বলেছিলেন—[illegible] দিকে হেলে [illegible] নিয়ে এসে বৈঠকখানার

কোলাঘাটে ধূর্জটিপ্রসাদের বাড়ির সামনে

বসতেন আর তারই পাতা থেকে সদ্যরচিত গানের খসড়া নিয়তো। গান শুনতাম তাঁর কণ্ঠে, চলে আসতে ইচ্ছা হোত না, যখন চলে আসতাম তখন মন আমার ভরে থাকতো। তিনি নিজের গান আসরে ভালো গাইতে পারতেন না। সভয় অতি সহজেই নিজের উপর বিশ্বাস হারাতেন। মুখ খুলে খুলে পেতেন না। ছোট আসরেই গলা তাঁর খুলতো। সবচেয়ে ভালো শোনাতো শুনে গুণ্ গুণ্ করে গাইবার সময়। তাঁর মত অমন রসিক লোক দুর্লভ। রসই তাঁকে সহিত করেছিল, রসের মর্যাদা তিনি দিতে জানতেন। পণ্ডিচেরিতে ডিসেম্বর ঠুংরি—গিয়েছি তাঁর সঙ্গে। বৃদ্ধ ওস্তাদ কেঁপে ব্যাডিস্টার সাহেবকে কোথায় বসাবে? সেই ছেঁড়া ভাঙ্গা খাটিয়ার উপর বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান শুনলেন, বেলা বারোটা বেজে গেল, ওস্তাদের ছেলের হাতে দুখানা নোট গুঁজে দিলেন আর ওস্তাদজীকে কিসি রোজ মেরা [illegible] নিমন্ত্রণ নিয়ে। আসতে মন সরে না। একদা লক্ষ্ণৌর রাস্তায় এক পাগলী ঘুরে বেড়াত। সে নাকি অর্থাৎ পুলিশ [illegible] এককালে বিখ্যাত গায়িকা ছিল। একদিন অদ্ভুত তোড়ী তার ভৈরবী গান। [illegible] প্রসাদ খবরটা শুনেই সংবাদদাতাকে [illegible] টাকা দিয়ে বললেন, এখুনি তাকে ধরে নিয়ে এস। সেদিন সে পাগলীকে [illegible] পাওয়া গেল না। টাকা ফেরৎ দেয়া [illegible] অতুলপ্রসাদ বললেন,—ওরা [illegible] থাক, যখন খুঁজে পাবে ধরে [illegible] হেলা হলে এরা সুখবরকে অপমান [illegible] দিয়েছিল, সে ছিল এক বিদেশী [illegible] শিক্ষার্থী। ছোট মুখের ওপর [illegible] এক সভার শেষে গায়ক—[illegible] অতুলপ্রসাদের [illegible]। [illegible] হোসেন জলসার শেষে [illegible] বৈশাখীবাগে [illegible] ভৈরবী বাহারে গান [illegible] সব শুনতে শুনতে [illegible] বেহালার মিষ্টি হাত [illegible] চলে [illegible] চলিত টান [illegible] [illegible]

ওয়াজিদ আলি শার মাধ্যমে। লক্ষ্ণৌর কাছে চিরঋণী—কিন্তু অতুলপ্রসাদকে লক্ষ্ণৌএ প্রবাসী করে লক্ষ্ণৌর যে ঋণ পরিশোধ করেছে বাংলাদেশ। অমন দরদী না হলে কেউ অমন করে দিতে পারে?' —বস্তুতঃ গানের মহল থেকে খবরাখবর ধূর্জটিবাবুই এনে অতুলপ্রসাদকে দিতেন যে আজ অমুক নামকরা এক বাইজীর গান করবেন আর তখনই অতুলপ্রসাদের সুরসিক মজলিশী মন সেই আসরে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠতো। বাইজীরা অতুলপ্রসাদের কাছে আলাদাভাবে 'ইনাম' পেতেন। সেজন্যই যে তাঁরা অতুলপ্রসাদকে গান শোনাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন তা নয়, শ্রোতা যদি সত্যিকারের সমঝদার শ্রোতা হন তার শিল্পীদের গান শোনানোও সার্থক হয় এবং এই কারণেই তাঁরা অতুলপ্রসাদকে গান শোনাতে এত ভালবাসতেন।

শুধু মজলিশী বা মাসফেলি গানই নয়—অর্থাৎ হিন্দি ঠুংরি বা উর্দু গজল নয়, তাঁরা কেউ কেউ অতুলপ্রসাদ রচিত বাংলা টপ্পা, ঠুংরি বা কাজরী জাতীয় গানও গাইতেন। বেনারসের বিখ্যাত বাইজী-গায়িকা সিদ্ধেশ্বরী বাঈ, মোতিবাঈ প্রমুখ অতুলপ্রসাদের রচিত বাংলা গান, বিশেষ করে—'শ্রাবণ ঝুলাতে', 'খাদলবুলুকে বোলে' গানগুলি অনবদ্য কণ্ঠে গাইতেন।

১৯০২ সালের শেষের দিকে ভাগ্য-পরীক্ষার জন্য অতুলপ্রসাদ তাঁর স্ত্রী ও পুত্র দিলীপকুমারকে নিয়ে লক্ষ্ণৌতে সংসার পাতলেন। বলাবাহুল্য কলকাতার 'ধামখেয়ালী সভার' সদস্য-বন্ধুদের বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য থেকে দূরে চলে আসতে তাঁর চিত্তবিনোদনী ও মজলিশী মন খুবই কাতর, তার উপরে আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবহীন এই নতুন সহর লক্ষ্ণৌতে এসে তাঁরা খুবই একাকী লাগছে। তবে এখানে তাঁর ভাগ্যদেবী মুখ তুলে চাওয়াতে আস্তে আস্তে আইন ব্যবসায় পসার জমতে সুরু করে এবং অল্প কয়েক বছরের মধ্যে তিনি একজন বিচক্ষণ আইনবিদ্ বলে স্বীকৃত হন এবং তাঁর প্রচুর অর্থাগম সুরু করে। এ সত্ত্বেও তাঁর গীত রচনা অব্যাহত থাকে। তাঁর গান রচনা ও গানের আসরের মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে লোকের সঙ্গে পরিচয় ও নিজের একটি বন্ধু ও অনুরাগী গোষ্ঠী তৈরি হয়। ১৯২২ সালে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় সুরু হবার পর অতুলপ্রসাদের বাড়ীর সান্ধ্য আসরে নিয়মিত আসতে সুরু করলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালী অধ্যাপক-এর দল। যাঁদের মধ্যে দেখা যেত রাধাকুমুদ ও রাধা-কমল মুখার্জি ভ্রাতৃদ্বয়, নির্মল সিদ্ধান্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখার্জী, অসিত হালদার, ললিত সেন, হিরণ্ময় রায় চৌধুরী, রবীন্দ্র সেন চরণদাস চট্টোপাধ্যায়, অরুণ-প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিকে। এঁদের আবির্ভাবের আগে কৈশোরবাগের বাড়ীতে মাঝে মধ্যে কোনও বিশেষ উপলক্ষে যখন গানের মজলিশ বসতো তখন আসতেন দিব্যেন সান্যাল, নগেন্দ্র বা পাহাড়ী সান্যাল, তবলাবাদক শৈলেন সান্যাল ও বরেন সান্যাল, নির্মল সেন, শম্ভু চৌধুরী, সুরেন সেন, সত্য মুখার্জী, বিজন ব্যানার্জী, নির্মল দে প্রভৃতি। দিব্যেন সান্যাল অতুলপ্রসাদকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তিনি ও তাঁর খুড়তুতো ভাই পাহাড়ী অতুলপ্রসাদের কাছে তখনকার দিনে লক্ষ্ণৌতে যারা অতুলপ্রসাদের কাছে গান শিখেছেন তাদের অন্যতম ছিলেন। দিব্যেন সান্যালকে বিলাত চলে যেতে হয় তাই বেশী দিন তিনি অতুলপ্রসাদের সান্নিধ্য লাভ করতে পারেন নি যদিও 'অতুলসেবাদল' নামে একটি সমাজসেবী সংঘ গঠন করার পিছনে দিব্যেন সান্যালের অনেক অবদান ছিল মিশিগলার জন্য অতুলপ্রসাদ পাহাড়ী সান্যালকে খুব স্নেহ করতেন। মাঝে মাঝে পদস্থ বন্ধুবান্ধব কিংবা আত্মীয়স্বজনেরা অতুলপ্রসাদের বাড়ীতে অতিথি হতেন যেমন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, দিলীপকুমার রায়, তাঁর ছোটমাসী সুবালা আচার্য, পুত্রসহ সুপ্রভা রায় (সত্যজিৎ রায়ের মাতা), বড় ভায়রাভাই কমিশনার বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন, সাহানা দেবী প্রভৃতি—তখন তাঁদের আনন্দদান করার জন্য অতুলপ্রসাদ বাড়ীতে ঘরোয়া গানের বৈঠক বসাতেন। সুপ্রভা রায়, সাহানা দেবী উভয়েই সম্পর্কে অতুলপ্রসাদের ভগিনী হতেন এবং উভয়েই নামকরা গায়িকা ছিলেন। অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্তের পত্নী চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত ও সাহানা দেবী সমবয়সী, আবাল্য বন্ধু, একই ডাকনাম 'ঝুনু' ছিল এবং দু'জনেই স্বয়ং রবীন্দ্র-নাথের কাছে গান শিখে সেযুগে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

সেসব বিশেষ গানের ঘরোয়া আসরে গান গাইতেন দিলীপকুমার, সাহানা দেবী, চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত, স্বয়ং অতুলপ্রসাদ, ভগিনী সুপ্রভা রায় প্রভৃতি। বাসিক-শ্রোতাদের মধ্যে থাকতেন সস্ত্রীক অধ্যাপকবৃন্দ, বীরবল সাহানী, স্থানীয় হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার গিরীশচন্দ্র দাস ও তাঁর কন্যা ব্যারিস্টারদ্বয় সস্ত্রীক হেমন্ত ঘোষ ও সুধীন্দ্র দাস (সম্পর্কে অতুল প্রসাদের মাসতুতো ভাই ও সুপ্রভা রায়ের সহোদর), গিরীন্দ্রনাথ ওয়াদ্দেদার, বসন্ত ঘোষাল, গোপী বাঁড়ুয্যে, অনিল বাঁড়ুয্যে, নলিন হালদার, এবং কখনও কখনও দিলীপকুমারের দুই বন্ধু—অধ্যাপক নিক্সন্ ও অ্যালেকজ্যাণ্ডার—যাঁরা উত্তর-কালে কৃষ্ণভক্ত হয়ে যথাক্রমে 'কৃষ্ণপ্রেম' ও 'আনন্দপ্রিয়' নাম পরিগ্রহণ করেন। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য জ্ঞান চক্রবর্তীর পত্নী মণিকা দেবী কুমারী বয়সেই গাজীপুরের সিদ্ধ সাধু পাওহারী বাবার শিষ্যা হন। তিনি পরে 'যশোদা মা' নামে খ্যাত হন এবং কৃষ্ণপ্রেম (নিক্সন্) ও আনন্দপ্রিয় (অ্যালেকজ্যাণ্ডার) 'যশোদা মা'র শিষ্যাত্ব গ্রহণ করে আলমোরায় একটি সুন্দর আশ্রম তৈরি করেন। শেষ বয়সে যশোদা মা এই আশ্রমের বাসিন্দা হন স্বামীর অনুমতি নিয়ে। এঁরা ছাড়াও আরও যাঁরা ঘরোয়া আসরে উপস্থিত থাকতেন তাঁরা হলেন বিরাজ [illegible] ও সাধন বসু সত্যকুমার মুখার্জী, সুবোধ সেনগুপ্ত, বীরেন রায়, নিরুপমা দেবী (কবি ও গীতিকার), বীণা দত্ত ইন্দিরা রায়। তাছাড়া যখন অতুলপ্রসাদের ভগিনীরা তাঁদের পুত্রকন্যাদের নিয়ে লক্ষ্ণৌতে এসে দাদার বাড়ীতে থাকতেন, তাঁরাও জলসাতে শ্রোতার দলে যোগ দিতেন। অমল হোম কলকাতা বা লাহোর থেকে লক্ষ্ণৌ গেলে জলসাতে তাঁর নিমন্ত্রণ বাঁধাই ছিল। সাহানা দেবী লক্ষ্ণৌতে এলে চিত্রলেখা সিদ্ধান্তের উপস্থিতি অবধারিত ছিল কারণ তাঁরা ছিলেন বাল্যবন্ধু ও গানের জগতে তাঁদের উপস্থিতি সবারই, বিশেষতঃ অতুলপ্রসাদের কাম্য ছিল। অতুলপ্রসাদের মহাপ্রয়াণের পরেও একবার 'কবিগুরুকে লক্ষ্ণৌতে যেতে হয়েছিল, সেবারে তিনি তাঁর স্নেহধন্য চিত্রলেখা সিদ্ধান্তের বাড়ীতে আতিথ্য স্বীকার করেন—এবং সে সময়ে সিদ্ধান্ত দম্পতীর গৃহে গান ও গল্পের জোয়ার বয়েছিল। মজলিশী, চিত্তবিনোদিনী ও বাসকশয্যেষ্ঠ অতুলপ্রসাদ তাঁর বাড়ীর ঘরোয়া জলসাকে শুধু লক্ষ্ণৌতে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। ছুটি-ছাটাতে যখনই কলকাতায় এসেছেন সঙ্গে এনেছেন তাঁর চির আনন্দময় রূপ ও চিত্ত বিনোদিনী চরিত্রকে। ১৯৭২-২৮ সাল পর্যন্ত স্টোর রোডে তাঁর শ্বশুর সার [illegible] গুপ্তের বাড়ীতে যখন গরম বা ইস্টার কিংবা বড়দিনের ছুটিতে এসে দিন কয়েক কাটিয়ে যেতেন তখন আত্মীয়স্বজন, বন্ধু বান্ধব ও শিষ্যাশিষ্যাদের কাছে আগেভাগেই খবর রটে যেতো আর প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় ঘরোয়া আসর বসতো গানের। তিনি নিজে তো গান গাইতেনই তাছাড়া তাঁর আত্মীয়-আত্মীয়াদের মধ্যে যাদের সুধাকণ্ঠ ছিল তাঁরাও গাইতেন। এঁদের মধ্যে থাকতেন ছোটমাসীমা সুবালা আচার্য, ভগিনীদের মধ্যে সাহানা দেবী, প্রতিভা দত্ত, সুপ্রভা রায়, কনক দাস (বিশ্বাস), রেণুকা সেনগুপ্ত (দাশগুপ্ত), ঊষা হালদার, ভ্রাতা ধীরেন গুপ্ত ও অজয় আচার্য প্রমুখ এবং অনাত্মীয় স্নেহধন্য বন্ধুবান্ধব ও শিষ্য শিষ্যাদের মধ্যে তাঁর কাছে গান শিখতে থাকতেন দিলীপ কুমার রায়, বণজিৎ সেন (টুলু), কুমুদ সেন (বদন) বিনয় ঘোষ, হরিপদ রায়, হরিদাস গোস্বামী ও এই প্রবন্ধের লেখকও। পাটনা থেকে ভ্রাতুষ্পুত্র সতী দাস (ঘোষ ও কুমা গুহঠাকুরতার মা) মাঝে মাঝে আসতেন ও গান শিখে যেতেন। এই কল-কাতার আসরে শ্রোতাদের মধ্যে থাকতেন মাসতুতো ভাই শিশির দত্ত (খোকনবাবু) ও বিজন আচার্য, মন্টুদার অর্থাৎ দিলীপকুমার রায়ের এক মাতুল (কে, মজুমদার মশায় ওরফে তরু মামা), ক্যাপ্টেন কুনাল সেন (প্রজ্ঞানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের পৌত্র) এবং আরও অনেক আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবেরা। অতুলপ্রসাদ এইসব আসরে তবলার সঙ্গে গাইতেন না বা শেখাতেনও না।

(চলবে)

গা-ব্যথা করছে? এক গ্লাস জল খান

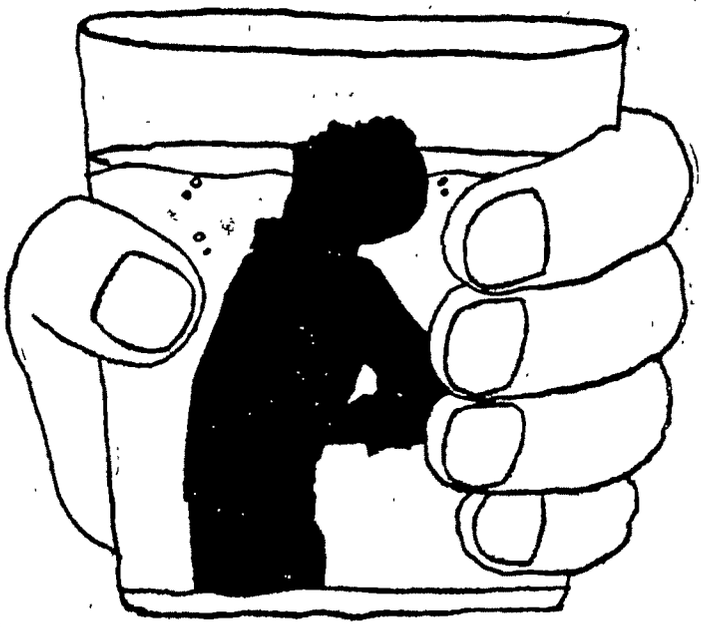

আর কেবল একটি
সারিডন

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সোনার হরিণ নেই

।। তেইশ ।।

সামনে জঙ্গল, তাই বানারজুলির এ-দিকটায় সন্ধ্যে হতে না হতে ঘন অন্ধকার। ফেব্রুয়ারি মাস. ছটা বাজতে না বাজতে সন্ধ্যা। বাইরে পা দিয়ে বাপী তবফদার অন্ধকারের মধ্যে পড়ল, আর শীতের ঝাপটা খেল। কলকাতার তুলনায় এখনো বেশি ঠাণ্ডা এখানে।

পবনে কাল রাতেও শুধু পা-জামা পাঞ্জাবিই ছিল। কিন্তু কাল রাতে এতটা টের পায়নি, অথবা আবুর কড়া মেজাজের মুখে পড়ার ফলে খেয়াল করেনি। বাপীর হাসি পেল হঠাৎ। আরামের শরীরে শীত-গরম কিছুই সয় না। বাপী কি তাহলে আবারের মুখ দেখতে চলল? আসলে দিনের রোদে বেরুনোর সময় গরম জামা সঙ্গে নেবার কথা মনে থাকে না। থাকবে কি করে, মাথার তো আর বিশ্রাম নেই।

জোরে পা চালিয়ে যে শরীর গরম করবে তারও উপায় নেই; অন্ধকারে ঠোক্কর খাবার ভয়। টর্চ আনতেও ভুলেছে। রাতের খাওয়া থেকে টর্চটা বারই করা হয়নি: ব্যাটারি আছে না ফুরিয়েছে তাও জানে না।

বাঁক ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে সোজা মুখের ওপর এক-ঝলক জোরালো আলো। চোখ ধাঁধিয়ে উঠল, অন্যমনস্কতার দরুন চমকেও উঠল একটু। দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু বড় টর্চের ঝাঁঝালো আলো চোখের ওপর থেকে নড়ছে না, কাছ থেকে আরো কাছে এগিয়ে আসছে।

—আঃ! টর্চটা সরাও, চোখ দুটো গেল যে। সামনে একটা হাত আড়াল করে বাপী দেখে নিয়েছে।

আবু দাঁড়িয়ে। তার এক হাতে আর একটা মস্ত টর্চ, অন্য হাতে লাঠি। পরনে খাকী ট্রাউজার, গায়ে পুরো হাতার গলাবন্ধ মোটা গেঞ্জি। বলা সত্ত্বেও মুখের ওপর থেকে টর্চটা সরল না। খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছে। একটু বেশি মাত্রায় গম্ভীর।

—কি মুশকিল! ওর রকম-সকম দেখে বাপী হেসে ফেলল।—শিকারের টর্চ ফেলে আমার চোখ দুটো কানা করে লাভ কি!

আবু টর্চ নামালো। কিন্তু প্রথম কয়েক মুহূর্তে মুখের ভাব ভালো করে দেখা যায়।

সঙ্গ নিয়ে বলল, মেমসায়েব তোমাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দেয়নি তাহলে?

বাপী হাসছে। —তুমি সেই রকম আশা করেছিলে? বার করে দেবার জন্য ডেকেছিলেন?

আবু চুপ একটু। তারপর আবার প্রশ্ন।—আমি পই পই করে তোমাকে সাড়ে তিনটের মধ্যে চলে যেতে বলেছিলাম—সে-জায়গায় তুমি পাঁচটায় গিয়ে হাজির হয়েছিলে?

—দেরিই হয়ে গেল।তোমাকে কে বলল?

কোনো জবাব দেবার মেজাজ নয় এখন আবু বুঝতে পারছে। আবার প্রশ্ন।—আর, তুমি হাতির পিঠে চেপে মেমসায়েবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলে?

বাপী একটু জোরেই হাসল এবার। বলল, দেখে দুজনেরই তাক লেগে গেছল, জঙ্গমনটাকে তো ওই বাঁকের খানিক আগেই নামিয়ে দিয়েছিলাম। বনমায়াকে দেখে তোমাদের বাচ্চা মেমসায়েবের ওর পিঠে চাপার ইচ্ছে একদিন। আমি বললাম, আবুই মুরুব্বি, তাকে বললেই হবে।

আবুর হাতের টর্চ আবারও ওর মুখের ওপর উঠে এসে তারপর নামল। অর্থাৎ ভালো করে আর এক দফা দেখা দরকার হয়েছে। ফোঁস করে একটা বড় নিঃশ্বাস ছাড়ল।—নাঃ, মেমসায়েবকে মা-ই বলে আসি না কেন, তোমার চরিত্তির বোঝা এই মোক্ষার কাজ নয় আর।

বাপী হেসেই জিগ্যেস করল, দেরিতে আসা আর হাতিতে চেপে আসার খবর তোমাকে কে দিলে—রেশমা?

—জানো তো সবই, আর জিগ্যেস করো কেন?

—বাঃ, তোমার রাগের কি হল?

—পাঁচটায় গিয়ে হাজির হলে, মেম-সায়েব কিছু বলল না?

—রাগ করল।

—আর তুমি?

—শুনলাম। দেখলাম। তুমি ওখানে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলে?

—কম করে এক ঘন্টা। আসার সময় মাঝরাস্তায় রেশমার সঙ্গে দেখা। তুমি তার মিনিট দশেক আগে হাতি চেপে মেম-সায়েবের সঙ্গে দেখা করতে গেছ শুনেই আমার মাথা খারাপ হবার দাখিল। কি হল না হল, দয়া করে বলবে এখন?

বাপী তাকে আশ্বস্ত করল, সব ঠিক আছে কিছু ভেবো না।

কি-রকম ঠিক আছে খুঁটিয়ে শুনল। এ ব্যাপারে যেমন ধৈর্য তেমনি মনোযোগ। মেমসায়েবের আচরণ আবুর কাছে অদ্ভুত কিছু নয়। কিন্তু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার মেয়ের ক্রমান্বয় শোনার ফাঁকে ফাঁকে হেসে ছেসে উঠেছে। আর বাপীকে সাবধান করেছে, খবরদার খবরদার! তুমি পছন্দ করলেও মরেছ, মেয়ে পছন্দ করলেও মরেছ!

এত কথার ফাঁকে রেশমার আজ্ঞাবর্তীর

এসে গেছে। বাপী থামতে আবারও দুশ্চিন্তা। —সবই তো ভালো, কিন্তু ওই মানেজার তোমার জন্য সুপারিশ করবে বলে এলে তার কি হবে?

—করবে। ক্লাবে রোজই আসে তো?

—এখানে থাকলে আসে। টর্চের আলোয় আবু হাত-ঘড়ি দেখে নিল। —ভাব জমতে আটটা সাড়ে আটটা এখনো ঢের দেরি। তখন আবার মদের গেলাস নিয়ে জমায় বসে গেলে নড়ানো যাবে না। তখন ডাকা-ডাকি করলে উল্টে বিরক্ত হবে। তার থেকে চলো বাড়িতে যাও না, কাছেই—

কথাটা ভাবার মতো। মদ খেলে মতি-গতি কেমন হয় বাপীর সেটা খুব ভালো জানা নেই। ঘোর-লাগা অবস্থায় রতন বণিককে দেখেছে। কিন্তু লোকটা নির্বিষ ভালো মানুষ, কিন্তু মেজাজী বা প্যাঁচালো মানুষের কথা বলা যায় না। আবুর বাবা কতজনকেই হাড়িয়ে গিলে ছেলের ওপর হম্বি-তম্বি করতে দেখেছে।

—চলো তবে।

ক্লাবের পাশ দিয়ে রাস্তা। এই এলাকায় দু'ঘর একটা কন্ট্রাকটার কোম্পানীর লোক নিয়ে থাকে শুনল। বাপী বলল, কারো সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকলে যদি কারে এসে পড়ে থাকে—দেখেই যাই।

ফটকে এসে আর এক মুশকিল। বাবুবেয়ারা পা দিতেই ব্যস্তসমস্ত ভাটাবাবু এগিয়ে এলো। মাথা চুলকে যে সমস্যার কথা শুনলো শুনেই আবুর মেজাজ খাপ্পা। কোম্পানির এক ছোকরা অফিসারের বন্ধু হঠাৎ সন্তোষ ডুমার্স থেকে এসে গেছে। অফিসার তাদের আপ্যায়ন বাপীর পাশের ঘরে তুলেছে, আর ভাটাবাবুকে অনুরোধ করেছে, গাড়িবার নিয়ে থাকবে ওই কোণের ঘরটা তাদের ছেড়ে দিলে ভালো হয়।

আবু খেঁকিয়ে উঠল, ও-ঘরে কেউ আছে শুনেও ছাড়তে বলে কি করে? আপনি বললেন না?

—বলেছি। মেয়েছেলে নিয়ে থাকা, তাই অনুরোধ করেছেন, রাজি না হলে বলে কওয়া হট করে মেয়েছেলে নিয়ে কেউ হাজির হবে আমিই কি ভেবেছি, সচরাচর তো এ-রকম হয় না।

বাপী বুঝল, তা-বাগানের অফিসারের গেস্ট বলেই ভাটাবাবু একটু বিপাকে পড়েছে। হাজেলেই দরদী আবু আবুকে থামিয়ে বাপী তাকে নিশ্চিন্ত করল।—ঠিক আছে, আমরা এক্ষুনি বেরিয়ে যাচ্ছি, আপনি কাউকে দিয়ে আমার বাক্স আর বিছানা এ-ঘরে এনে দিয়ে তাদের কোণের ঘরেই যেতে বলুন।

ভাটাবাবু কৃতজ্ঞ।

চা-বাগিচা ক্লাবে অনেকে। আবুকে সঙ্গে করে বাপী কোণের ঘর খুলে দিল। ভিতরে ঢুকে টেবিল থেকে কলমটা তুলে নিয়ে এক টুকরো কাগজে গোটা গোটা করে লিখল, বাপী ভরদ্বাজ—ফ্রম মিসেস গায়ত্রী রায়।

আবু জিজ্ঞেস করল, এ-সবের কি হবে?

—আমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব, আগে তুমি গিয়ে এটা চন্দ্রিহার হাতে দেবে, বেরিয়ে আসতেই পাশের ঘরের অতি-থিটির মুখোমুখি। নিজের ঘরে ঢোকার সময় দরজা বন্ধ দেখেছিল, এখন খোলা। দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। অবাঙালী বিহারী-টিহারী হবে। মোটা কালো মুখশ্রী দেখলে দ্বিতীয় বার তাকাতে ইচ্ছে করবে না। ভ্যাবড়েবে চোখে লোকটা ওদের দিকেই চেয়ে আছে। তাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে এসে আবু অস্ফুট কটূক্তি করে উঠল, এই চেহারা নিয়ে বউয়ের সঙ্গে রস করার জন্যে শালার কোণের ঘর চাই!

বাপীও হালকা মন্তব্য করল, বউ নিশ্চয় সুন্দরী, তাই যেটুকু সম্ভব চোখের আড়ালে রাখতে চায়।

রসের ঠাটাস আবুও কম যায় না। সঙ্গে সঙ্গে বলল, মরদের যা ছিটি, তুমি সাব-ধান তাহলে। তোমার সঙ্গে মেয়েছেলের একটু বেশি যোগ দেখছি। একদিকে মেমসাহেব আর তার মেয়ে ঘায়েল, এদিকে ক্লাবে পরি-চয় করে অতিথি আসে না বটে, তুমি এলে আর ওমনি একজন এসে হাজির!

ভাটাবাবুকে চাবি দেবার জন্য বাপী তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল। আবুর ঠাট্টা বুকের কোথাও বেঁধার মতোই। আবুর জানার বাইরেও আরো চার-চারটে মুখ আছে:... গৌরী বউদি, বনকলিন বড়বাবুর মেয়ে উমা, কমলা বণিক...মিষ্টি। মিষ্টি..? হ্যাঁ মিষ্টির সম্পর্কেও আরো কিছু ভাবার আছে, কিন্তু ভাবনাটাকে এ-পর্যন্ত সে জোর করে ঠেলে সরিয়ে রেখেছে।

রাস্তায় নেমে আবু জিজ্ঞাসা করল,

মাড়ির গোলমালের প্রথম লক্ষণ

প্লেক (Plaque)
এক জীবাণুর এক অদৃশ্য পর্দা যা আপনার দাঁত আর মাড়িতে প্রতিদিনই জড়িয়ে থাকে। অবহেলা করলে, প্লেক শক্তপোক্ত পরিবেশ হয়।

টারটার
দাঁতের গোড়ায় জমে, ফলে মাড়ি জ্বালা করে আর ফুলে ওঠে। পরে মাড়ি আর হাড় ভেদ করে দাঁত পড়ে যেতে পারে।

মাড়ি থেকে রক্ত পড়া
ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজা করলে নরম দুর্বল আর ঘোলাটে মাড়ি থেকে রক্ত পড়তে পারে। এতে যারা না দেখেও ওষুধ লাগানো দেখা দিতে পারে।

দাঁতের ডাক্তাররা বলেন:

নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করুন আর মাড়ি মালিশ করুন, তাহলে মাড়ির গোলমাল আর দাঁতের ক্ষয় রোধ করতে পারবেন।

দাঁতের সঠিক যত্নের জন্যে রোজ রাত্রে আর সকালে সঠিকভাবে দাঁত ব্রাশ আর মাড়ি মালিশ করুন ফরহান্স দিয়ে। আর, মাড়ি মালিশ করার সঙ্গে সঙ্গে দাঁত পরিষ্কার করার জন্যে বিশেষভাবে ডিজাইন করা ফরহান্স ডবল-অ্যাকশন টুথব্রাশই ব্যবহার করুন।

মাড়ি খারাপ তো স্বাস্থ্যও খারাপ

ফরহান্স টুথপেস্ট দাঁতের ডাক্তারের তৈরী

180-F-172-B BN

তোমার এখন মতলবখানা কি? ম্যানেজারের হাতে পায়ে ধরবে?

—সেই গোছেরই কিছু করতে হবে। দেখবেই তো।

বাইরে অপেক্ষা করে আবুর মারফৎ চিরকুট পাঠানোর দরকার হল না। এখানের বাইরের ঢাকা বারান্দার বসার জায়গা। গ্লোবালো আলো জ্বলছে। সেখানে মাঝ-বয়সী একজন দাঁড়িয়ে। আবু চেনে তাকে। ম্যানেজার সায়েবের কম্বাইনড হ্যান্ড। অসমীয়া। নাম অর্জুন। বারান্দার পর ভিতরে একটু প্যাসেজের মতো। প্যাসেজের দুদিকে দুটো মুখোমুখি ঘর। বারান্দায় ওঠার পর বাপী লক্ষ্য করল, একটা ঘর থেকে প্যাসেজে সবুজ আলো এসে পড়েছে। বাবা-ন্দায় চড়া আলো, তাই লক্ষ্য না করলে চোখে পড়ে না।

অবুর ইশারায় বাপী নামের স্লিপ লোকটার হাতে দিল। কিন্তু ওটা হাতে নিয়েও তার নড়াচড়ার ইচ্ছে দেখা গেল না।

আবু জিগ্যেস করল, সায়েব নেই বাড়িতে?

—আছেন। পার্টির লোকের সঙ্গে কথা কইছেন। ব্যস্ত আছেন—

এবারে হুকুমের সুরে আবু বলল, এই সায়েব মালকানের কাছ থেকে আসছেন, এটা তাকে দিয়ে এসো।

লোকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেই যেন গেল। মিনিট খানেকের মধ্যেই বণজিৎ চালিহা বেরিয়ে এলো। পরনে চকচকে লুঙ্গি আর হালকা নীল গরম কাপড়ের ফুল হাতার শার্ট। ফর্সা মুখ বেশ লাল। আসা মাত্র বাপীর মনে হল ঘরে বসেই মদ্যপান চল-ছিল। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁ করে গন্ধও নাকে এলো।

বাপীর বিনীত নমস্কারের জবাবে রণজিৎ চালিহা একটু চড়া গলায় জিজ্ঞাসা করল, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট?

বাপী শুকনো গলায় জবাব দিল, মিসেস রাই আপনার সঙ্গে দেখা করতে বল-লেন, তাই অসময়ে..

—আমার সঙ্গে দেখা করতে বললেন? কখন?

—আজই তো মনে হল এইক্ষণ তাঁর ওখানে ছিলাম, সেখান থেকেই আসছি।

ভুরু কুঁচকে চালিহা একবার আবুকে দেখে নিল। তারপর নিজে একটা চেয়ার টেনে বসে বাপীকে বলল, সীট ডাউন—কি ব্যাপার?

হুকুম পেয়েও বাপী বসল না। মুখ দেখে মনে হবে, এমন বেয়াদপীর সাহস আর তার নেই।—বলছি কিন্তু তার আগে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, বাড়ির চিন্তায় কি বলে ফেলেছি না ফেলেছি, ঠিক নেই, আমার অন্যায় হয়েছে—

লোকটার নেশা হয়তো এখনো তেমন জমেনি, বাঁকা চোখে খানিক চেয়ে চেয়ে দেখল তাকে। জিগ্যেস করল, এখন আর বাড়ির চিন্তা নেই?

—আজ্ঞে না, মিসেস রাইকে কথা দিয়ে এসেছি, আপনি যা ঠিক করে দেবেন, তাই হবে।

—আমি?

—হ্যাঁ।

ঠোঁটের ফাঁকে হাসির রেখা স্পষ্ট হল এবার। কলে-পড়া ইঁদুরের মুখ দেখছে যেন।—ওয়েল, আই অ্যাম বিজি উইথ মাই গেস্ট!

একই রকম নিরুচ্ছ্বাস বিনয়ে বাপী বলল, একটা কাজের জন্য মিসেস রাই গত-কাল আর আজ দুদিন আমার ইন্টারভিউ নিলেন, আপনারা আমার জন্য এতটা চিন্তা করবেন ভাবতেই পারিনি। মিসেস রাই আজ জানালেন, তাঁর কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু এ-ব্যাপারে ফাইন্যাল ডিসিশন আপনার, আপনার অ্যাপ্রুভাল ছাড়া তিনি কিছু করেন না।

ঠোঁটের হাসি আরো প্রসারিত এখন। —তিনি এ-কথা তোমাকে বললেন, আর আমার সঙ্গে দেখা করতে বললেন?

এবারে সোজা তুমি। কাল হলে কি কি হত বলা যায় না, আজ বাপী এটুকু অনুগ্রহ হিসেবে গ্রহণ করল যেন।—আজ্ঞে হ্যাঁ।

চালিহা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। —এখন ডিভিডেন্স ইজ ফার্স্ট কনডিশন —এটা এরপর মনে থাকবে তাহলে?

বাপী মাথা নাড়ল। থাকবে।

—অল রাইট, কাল মিসেস রাইয়ের সঙ্গে কথা বলব।

আর আবুর সেলাম বা বাপীর নম-স্কারের জন্য অপেক্ষা না করে ভিতরে ঢুকে গেল। ওরা দুজন বারান্দা থেকে নেমে আবার অন্ধকারে।

আবু বলল, বয়সে যত ছোটই হও, একটা গড় করে ফেলব?

বাপী হাসছে।

—কিন্তু তুমি অত নিশ্চিন্ত ছিলে কি করে? ওই দাপটের লোকের সঙ্গে কাল তুমি যে-রকম ব্যবহার করেছ, মওকা পেয়ে আজ যদি তোমাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করত?

বাপী ধীরে সুস্থে জবাব দিল তা যে করতে পারে না একটু মাথা খাটালে তুমি নিজেও নিশ্চিন্ত থাকতে। চালিহা জানে তোমার মেমসায়েব আমার বাড়ির ভাড়াটে জানে চাকরির ব্যাপারে তার সঙ্গে পরপর দুদিন আমার কথা হল, আর, অত টাকা খরচ করে আমাকে ক্লাব-হাউসে রাখা হয়েছে তাও জানে—এর পরেও সে কি এত বোকা যে তোমারতুমি করে আমাকে একেবারে ছেঁটে দেবে? বরং তোমাদের মেমসায়েব তাকে অত মর্যাদা দিল শুনে কত খুশি দেখলে না?

আবুর হাতের টর্চ বাপীর মুখের ওপর উঠে এলো।

—কি হল?

টর্চ নামিয়ে আবু হালকা গলায় জবাব দিল, আর একবার তোমাকে দেখে নিলাম।

বাপী বলল, কিন্তু চালিহা ভিতরের ঘরে সবুজ আলো জ্বেলে পার্টির সঙ্গে কথা কইছিল, এ আবার কেমন পার্টি?

আবুরও তক্ষুনি টনক নড়ল।—ইস্! জানতে পারলে খুব ভালো হত। ব্যাটা ক্লাবে না গিয়ে বাইরের মানুষকে সন্দেবে ঢুকিয়ে মদ গিলছিল যখন, কোনো শাঁসালো মক্কেলই হবে—কত দিকে যে ফাঁক করব মেমসায়েবকে ঠিক নেই।

অন্ধকারে বাপী মুখ টিপে হাসছে। বসের ইঙ্গিতটা আবু ধরতে পারেনি। লুঙ্গি পরে আর ঘরে সবুজ আলো জ্বেলে যার সঙ্গে মদ খাচ্ছিল সেই মক্কেল কোনো মেয়েমানুষ হতে পারে কিনা সেটাই তার জিজ্ঞাস্য ছিল।

আবুকে ক্লাবের সামনে ছেড়ে দিল। মাঝ রাতে সকালের দিকে বাপীই জঙ্গলে যাবে বলে দিল।

ক্লাবে কে এলো বা ক্লাব থেকে কে বেরুলো তাটাবাবু নিজের জায়গা থেকে বসেই দেখতে পায়। বাপীকে দেখে নিজেই নতুন ঘরের চাবি হাতে দিয়ে গেল। লম্বা বারান্দা ধরে এগোতে গিয়ে কোণের ঘরের দিকে চোখ গেল। খোলা দরজার সামনে আড়াআড়ি দাঁড়িয়ে একজন বেয়ারার সঙ্গে কথা কইছে ডুয়ার্সের অধিষ্ঠাত্রী বউ। মাথার আধখানা দেখা যাচ্ছে। পরনে রং-চঙা সিল্কের শাড়ি, যে-হাতটা দরজার দিকে, সেই হাতে অনেক-গুলো কালো চুড়ি, মাথায় কপাল-ছোঁয়া গোমটা, নাকে একটা ঝকঝকে পাথরের ফুল। বয়েস বেশি নয়, বেশ দীঘাঙ্গী, গায়ের রঙ দস্তুর মতো ফর্সা, দোহারা, চেহারা। মুখের সবটা দেখা না গেলেও বউটি যে বেশ সুশ্রী সন্দেহ নেই।

বাপীর হাসি পেয়ে গেল। আবুকে ঠাট্টা করে বলেছিল বউ নিশ্চয় সুন্দরী, তাই চোখের আড়ালে রাখার জন্য ভদ্রলোকের কোণের ঘর চাই। সেটা মিলল দেখলে আবু খুশি হত।

আজ জুয়ার আসর কেমন বসেছে দেখার জন্য বাপী সামনের বড় হলটায় ঢুকে গেল। গত বারের মতো অতটা জমজমাট নয় এখনো। এক টেবিলে ডুয়ার্সের বাঙ্গালী-কোঙ্কণী অভিধিটিকে দেখে আর একটু এগিয়ে এলো। হাতে মদের গেলাস। একই মদ্যপ বেশ টই-টম্বুর অবস্থা দেখা যায়। পাশের চেয়ারের লোকটি তার এখানকার অভিভাবক বন্ধু হবে।

বউ নিয়ে এসে বেড়াতে এসেছে যা-হোক। বাপী বেরিয়ে এলো। বউটা দরজার সামনে এখন একা দাঁড়িয়ে। এদিকেই চেয়ে আছে। চোখে চোখ পড়তে বাপী মুখ ফিরিয়ে নিল। কোণের ঘরের আলোর রঙটা তার। কিন্তু, কি যে বাধা থাকা সত্ত্বেও বউটা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে সেটা না বুঝিয়েও বাপী অনুভব করল, তার দিকে চেয়েই আছে। দরজার ওপাশে কোণের ঘরে বাপী একটু ঘাড় না ফিরিয়ে পারল না। তার সঙ্গে আবার মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাকে ঘরে ঢুকে পড়তে হল। ওদের বাগানের নাকের ডগার সেই ফুলটার মতোই বউটার

[illegible] বড় চোখ দুটোও যেন চকচক করছিল। আর সেই চাউনি ওর মুখের ওপর আটকে ছিল।

হতে পারে পারিবারিক জীবনে বউটা অসুখী। কিন্তু তা বলে এ কি কাণ্ড! অথচ ওই চাউনিতে অশোভন যে কিছু আছে ঠিক তাও নয়।

ঘণ্টাখানেক বাদে ডিনারের জন্য আবার দরজা খুলে বেরুলো যখন ও-ঘরের দরজা বন্ধ। ডিনার সেরে ফিরল যখন, তখনো। বড় হল-ঘরটা এক চুমকে দেখে নিল। এখন মদ আর জুয়ার আসর জমজমাট। সেই অতিথির মাথা এখন চেয়ারের কাঁধে। আর সোজা রাখতে পারছে না বোধহয়।

এই রাতে আর ভালো ঘুম হল না বাপীর। কাজ এবারে একটা হবে বুঝতে পারছে। গোড়াপত্তন যে-রকম হল, ভালো থাকার মুখ এরপর হয়তো সে-ও দেখবে। গায়ত্রী বাই চালিহাকে বুঝিয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল বিজ্ঞিনেসের জন্য একজনকে ট্রেনিং দিয়ে তৈরি করা হবে। মালিকের মাথায় মতলব যা-ই থাক, মাঝে মাঝে কলকাতায় তাহলে তাকে যেতে হবে। অস্তিত্বের মানচিত্র থেকে ওই একটা জায়গা মুছে ফেলার তাড়না তার।

কিন্তু সত্যি কি তাই? মনের তলায় টুকু লোভের অস্তিত্বও কি আর নেই? কাল বানারজুলিতে পা দিয়ে জঙ্গলের সেই সব স্মৃতি ওকে কি সেই আগের মতোই পাগল করে তোলেনি? দুর্বার আক্রোশে এক মেয়ের ওপর তার দাবীর ঘোষণা তখনো ভিতর থেকে কেউ করেনি? বলতে চায়নি আগের এই সবকিছু যদি সত্যি হয় তাহলে পরে যা ঘটেছে, তাই শেষ নয়? সেই মেয়ের সম্পর্কে যে চিন্তাটা এ পর্যন্ত ঠেলে সরিয়ে রেখেছিল সেটাই যেন এখন এই শেষের প্রতিবাদে আড়ষ্ট তুলছে। ওর ওপর হামলা করার জন্য পাড়ার মস্তান ছেলেকটাকে ধরে আনা হয়েছে দেখে মিস্টির সেই বাগ, তার হাতের কব্জি ধাক্কায় মারমুখো একটা ছেলের দুরে ছিটকে পড়া, আর তারপর সোনালি চশমার মুখের ওপর সেই আগুন ছিটানো। এর পিছনে যদি আর কোনো সত্যের অস্তিত্ব না থাকে এ হয় কি করে? এরকম হতে পারে কি করে?

শেষে হতাশ হয়েই হাল ছেড়েছে বাপী। যন্ত্রণার থেকে কি মুক্তি নেই? এত বের পরেও আশা মরে না কেন?

সকালে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে রাস্তায় নেমে এসেছিল। খানিক ঘোরাঘুরির পর ঘরের টানে ক্লাবে পা দেবার মুখে আবার ই ধাক্কা। কোণের ঘরের জানলায় সেই টা দাঁড়িয়ে। ওর দিকেই অপলক চেয়ে আছে। দিনের আলোয় নাকের সাদা পাথর অত আর চকচক করছে না, কিন্তু চোখে পড়ে।

মুখ ফিরিয়ে বাপী পা চালিয়ে ক্যানটিনের দিকে চলে গেল। আজও অস্বস্তি। বিরক্তিও।

তারপর সকাল প্রায় দশটা পর্যন্ত অর্থাৎ যতক্ষণ বাপী ক্লাবে ছিল, খবরের কাগজ পড়ার ফাঁকে আর ঘর-বার করার ফাঁকে অনেকবার ওই চোখের মুখোমুখি হতে হয়েছে। বাপী ভালো করে তাকাতেও পারেনি, দেখতেও পারেনি। ভালো করে চোখাচোখি হবার আগেই দৃষ্টি ফেরাতে হয়েছে। বউটার ঘরের লোকের সঙ্গেও অনেকবার দেখা হয়েছে। সামনেই বারান্দায় একটা চেয়ার পেতে বসে ছিল। তার ঝিমুনো ভাব এখনো ভালো করে কাটেনি। বউটার আচরণ ভেবেই বিস্ময়ের অন্ত নেই বাপীর। কোনরকম ইঙ্গিত ইশারার ছিটেফোঁটাও নেই, কেবল দেখাটুকুই যেন সব।

এত বেলায় আর জঙ্গলের দিকে এগলো না। ঘুরে ঘুরে চা-বাগান দেখল, দূরে দাঁড়িয়ে মেয়েদের আড়াই-পাতি তোলার কাজ দেখল। তারপর আধ মাইল পথ ভেঙে ঘন-মায়ার সঙ্গে খানিক খেলা করে বেলা বারোটার মধ্যেই ফিরে এলো। রাতে ভালো ঘুম হয়নি, এখন চা-খাওয়া সেরে আগে একটু ঘুমনোর ইচ্ছে।

জানলার কাছে সেই বউটা দাঁড়িয়ে। দূর থেকেই বাপী মুখ ফিরিয়ে নিল। আবার ঘুম সেরে বেলা তিনটে চারটে নাগাদ বেরুনোর সময়েও তাই। ওই জানলার কাছেই দাঁড়িয়ে। বাপীর একবার ইচ্ছে হল সোজা ঘরে তাকায়, আর নিজের দুটো চোখ দিয়েই জিগ্যেস করে, কি ব্যাপার? পারল না। মাথায় ছিট কিনা কে জানে! নইলে বেড়াতে এসেও ওর ভদ্রলোককে কাল বিকেল থেকে এ-পর্যন্ত ক্লাবের বাইরে নিয়ে গেল না কেন?

জঙ্গলে ঢুকলে বাপীর আর সময় কাটাতে অসুবিধে নেই। তবে যেদিকে স্মৃতির টান বেশি, আজ আর সেদিকে পা বাড়ালো না। নতুন গাছপালা আবিষ্কারের জন্য উৎসুক। কিন্তু নতুন কিছুই চোখে পড়ছে না। সবকিছু যেন অন্তরঙ্গ পরিবেশে দোসরের মতো কাছে টানছে তাকে। আবুর সঙ্গে সকালে দেখা হয়নি, কোনো খবর আছে কিনা জানার জন্যেও এ-বেলা যাওয়ার কথা ভেবে রেখেছিল। কিন্তু এই জগতের নিভৃতে ঢুকে পড়ার পর কিছুই আর মনে থাকল না। আগু-পিছু রঙিন প্রজাপতি উড়তে দেখল, গাছের ডালে জোড়ায় জোড়ায় কাঠ-বিড়ালি খেলা করছে দেখল, জোড়ায় জোড়ায় খরগোশের ছোটাছুটি দেখল, ময়ূরীর ছোটাছুটি দেখল, ময়ূরময়ূরী দেখল। বাপীর নিজেরই হঠাৎ মনে হল, ছেলেবেলায় ও বড় নিষ্ঠুর ছিল। কত সময় মরণ-পাখির ছুঁড়ে ওদের এই আনন্দ খতম করে দিয়েছে।

ঘণ্টা দুই ঘোরাঘুরির পর যেখানে এসে দাঁড়াল সে-জায়গাটা চেনা মনে হল, আর অদূরের ওই ডেরাটাও। যদিও মাটির ঘরের এখন আর সেই ভাঙা-দশা নয়, নতুন টালি বসানো হয়েছে, তবু চিনতে ভুল হল না। রেশমার মরদ মাতাল কাঁদনার ডেরা ছিল ওটা। রেশমা কি এখনো এখানেই থাকে?

আবু সঙ্গে নেই, আর এগলো না। ফিরে চলল। গেলে বেশমাই হয়তো বিশ্বাস করবে না ও বেড়াতে বেড়াতে এদিকে চলে এসেছে। কিন্তু পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে পিছনে

ক্যালিক্স® স্যানিটারী ট্যাম্পুন

প্রতিমাসের অস্বস্তিকর পাঁচদিন আপনাকে সহজ ও নিরিবিলি রাখবে।

বৈশিষ্ট্য :
★ অন্তর্বাসের ব্যবহারের উপযোগী করে প্রস্তুত।
★ ব্যবহারের-পদ্ধতি খুবই সহজ, বেল্ট বা পিন লাগে না।
★ অন্তরে থাকাকালীন কোন অস্বস্তিকর অনুভূতি থাকে না।
★ প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কোন স্বাভাবিক কারণে পরিবর্তন অনাবশ্যক।
★ অথচ সাধারণ ন্যাপকিনের মতই কার্যকর।

টিউবে এবং বিনা টিউবে পাওয়া যায়।

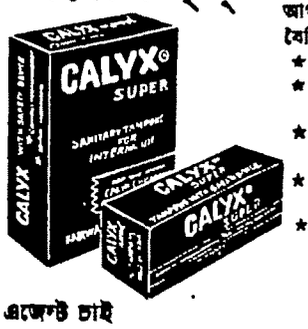

এজেন্ট চাই

ফেয়ারওয়ে ট্রেডিং কোং
৩৯, শীতলাতলা লেন, কলিকাতা-৭০০০১৯
ফোন : ৩৫-৪১৪৫

হাওড়ায় সর্বাধুনিক বস্ত্র বিপণী

বেনারসী ০ জোড় ০ তাঁত ● সিল্ক ০ মিলবস্ত্র ০ সার্টিং

সুটিং ০ ছিট কাপড় ও তৈরী পোষাক

শ্রীরাম টেক্সটাইল এম্পোরিয়াম

২৭।২, জি টি রোড (সাউথ) হাওড়া

কলকণ্ঠে—ও বাপীভাই সামনে অত কি দেখার আছে গো, পিছনে দেখো ?

রেশমা। কিন্তু বেশমার পাশে যে তাকে দেখে বাপী যথার্থ অবাক। উর্মিলা রাই। পরনে শাড়ি। রেশমা অবশ্য কাল বলেছিল মেমদিদি কেবল তার সঙ্গেই গপ্পসপ্প করে, আর কারো সঙ্গে ভালো করে কথাও বলে না। তা বলে দুই সখীর জঙ্গলে বেড়ানোর মতো খাতির ভাবেনি। হাসছিল সেও। অবাবে ঠেসের সুরে বেশমাকেই বলল, যে-ভাবে দেখতে দেখতে যাচ্ছিল, খাঁটি প্রকৃতি বিজ্ঞানীর মতো লাগছিল।

রেশমা জিগেস করল, সে আবার কে ?'

—তুই বুঝবি না। মুখখানা ভাবিক্ষ করে বাপীর দিতে তাকালো। —মায়ের সঙ্গে আজ দেখা হয়েছে ?'

বাপী মাথা নাড়ল, হয়নি।'

—আংকল্ চালিহা সকালে এসেছিল, তুমি কাল রাতে তার সঙ্গে দেখা করেছ বলল, আর মায়ের কাছে তোমার বেশ প্রশংসাই করল।'

এটা খুব অবাক হবার মতো খবর নয়। বিস্ময়ের ধাক্কা এই মেয়ের মুখে সরাসরি তুমি শুনে। কাল বিকেলেও আপনি করে বলেছে, আজ ওর মায়ের মতোই সোজা তুমিতে নেমে এলো।

উর্মিলা আবার বলল, হাঁ করে চেয়ে আছ কি—তুমি সেয়ানা কম ? কি-চ্ছু বুঝতে পারছ না ?'

বাপী সাদা মুখ করে জবাব দিল, সে-জন্য নয়, হঠাৎ অনুগ্রহ দেখে অবাক লাগছিল, কাল পর্যন্ত 'আপনি' ছিলাম, কাজ শুরু হওয়ার আগেই 'তুমি' হয়ে গেলাম।

মেয়ে বলল, আমি আপনি-টাপনির ধার ধারি না, তুমিও তাই বলতে পারো। .. আংকল্কে বশ করলে কি করে, ম্যাজিক-ট্যাজিক জানো ?'

জবাব দেবার আগেই বেশমা আলতো করে ঠেস দিল, পায়ে ধরে কান্নাকাটি করেছে বোধহয়। কি-যে হল বাপীর, হঠাৎ কেন কেন বেশমার মুখখানাই ভালো করে দেখে নেওয়ার ইচ্ছে। সে-চেষ্টার আগেই উর্মিলার ভ্রূকুটি।—এই পাজী মেয়ে, আমি বলি বলে তুইও বলবি, দু'দিন বাদে ওই তোর মুরুব্বি হবে সে-খেয়াল আছে ?

বেশমা চার আঙুল জিভ কাটল তক্ষুনি। —ও বাপীভাই, তুমি এমন করে চেয়ে আছ কেন ? আমার খুব অন্যায় হয়েছে, এই নিজের দুকান মলছি।

সত্যি সত্যি কানে হাত দিল। তারপর হেসে উর্মিলাকেই বলল, আমি কি-রকম পাজী মেয়ে তোমার থেকে বাপীভাই ঢের ভালো জানে মেমদিদি, —রাগ করবে না। তু আমার কি আর পৌঁছে দেওয়ার দরকার আছে—লোক তো পেলে।'

উর্মিলা সঙ্গে সঙ্গে ওকে ছুটি দিয়ে দিল, ঠিক আছে, তোকে আর আসতে হবে না। ঘরে যা, বিকেলে আর সাপ-টাপ ধরতে বেরুবি না বলে দিলাম।

জঙ্গলের পথ ধরলে প্রধান থেকে বাড়ি খুব একটা দূরে নয়। আবার একেবারে কাছেও নয়। বাপীর অস্বস্তি লাগছে। উর্মিলা আগে আগে খানিকটা এগিয়েই ঘুরে দাঁড়াল। —এখনো কি জঙ্গলের শোভা দেখতে দেখতে যাবে নাকি ? পা চালিয়ে চলো, খ্যাঁক-খ্যাঁক করার জন্য মা বাইরে বসেই আছে দেখছ তো—

বাপী যথার্থই ঘাবড়ালো একটু, বলল, আমাকে সঙ্গে দেখলে কি খুশি হবেন....

কথাটা আদৌ তলিয়ে ভাবল না উর্মিলা। জবাব দিল, তুমি নুন্ন থাকলে তো রেশমাই সঙ্গে আসত, অখুশির কি আছে।

অর্থাৎ মেয়ের খাতায়াতে একজনের সঙ্গে থাকা দিয়ে কথা। আসার সময় সঙ্গে কে ছিল সে কথা না তুলে বাপী আলতো করে জিগেস করল, একা চলাফেরা উনি পছন্দ করেন না বুঝি ?

—নাঃ ! এক শব্দের জবাবেই এক অবলা বিবকৃতি। —কোথাও বেরুতে হলে মঙ্গে হয় কোয়েলা, নয় রেশমা, নয় আবু, নয়তো উনি নিজে।

তারপরেই উৎকণ্ঠা একটু। —প্রথম দিন দেখেই তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছে। তুমিই ঠিক মা-কে বলে করেছ—ইউ উইল বি মাই ফ্রেন্ড—উইল ইউ ?

মা বলেই কেন এই ভালো লাগা। বিপন্ন মুখ করে বাপী বলল, সেটা কি আমার দিক থেকে একটু ভয়ের কথা হবে না ?

—ভয়ের কথা হবে কেন ?'

—ইয়ে, আবুর মুখে শুনেছিলাম, আমার আগে চা-বাগানের একজন চৌকস লোককে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছিল... সে বন্ধুতের জন্য এগোতে তার চাকরি গেছে।

উর্মিলা প্রথমে অবাক মুখ করে তাকালো তার দিকে। তারপর মনে পড়ল। —তার তো অন্য রকম মতলব ছিল, আমিই তো মা-কে বলে তাকে তাড়িয়েছি ! সঙ্গে সঙ্গে চোখ পাকালো, তোমার সাহস তো কম নয়, তুমি বুঝি সে-রকম বন্ধুতের কথা ভেবেছ ?

বাপী তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল। —তা না ...সেই একজন কি-রকম বন্ধুতের দিকে এগিয়েছিল আবু সেটা বলেনি।'

উর্মিলা জোরেই হেসে উঠল। তরতাজা হাসি। বলল, আবু একটা ওয়ার্থলেস্, আর তুমি একটা সেয়ানা বোকা—ওয়েট ক্যাট্।

বাপী ক্লাবে ফিরল রাত প্রায় নটায়। মন মেজাজ সত্যি ভালো। গায়ত্রী বাইয়ের ঠোঁটের ফাঁকে আজ একটু হাসিও দেখেছে। দেখামাত্র বলেছে, চালিহা সকালে এসে তোমার জন্য সুপারিশ করে গেছে। তুমি তাকে কি বলেছ, তাও শুনেছি। বাট ডোন্ট্ এভার ট্রাই টু ওয়ার্ক্ দ্যাট স্টাফ অন মি ...বি স্ট্রেইট অ্যান্ড বি অনেস্ট।'

আর মুখ ফুটে বলার দরকার হয়নি, নিজেই চা খাইয়েছে। প্রাণের জমিতে ওর জন্য ঘর তোলার কথাও চালিহার সঙ্গে হয়ে গেছে। সে কনস্ট্রাক্টর লাগানোর ব্যবস্থা করবে। ঘর না ওঠা পর্যন্ত ক্লাবেই থাকা ছাড়া আর উপায় নেই।

সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা আবুর ঘরে এসেছে। সুখবর আবু আগেই জানে। বিকেলে ওর খোঁজে ক্লাবে এসে ফিরে গেছে। এই নতুন মানুষটার সঙ্গে বাপের জড়াজড়ি কাণ্ড দেখে ওর ছেলে দুটো খুশিতে হাততালি দিয়েছে। আবু আবার প্রচুর জলখাবার খাইয়েছে। আর, ঘরের লোকের উদ্দেশ্যে ঠেস দিয়ে বাপীকে শুনিয়েছে, রান্নাবান্নাতে এতদিন একজনই বুদ্ধিমান লোক ছিল, কাল থেকে সেই অহংকার একটু কমেছে।

ক্লাবে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে কোণের ঘরটার দিকে আগে চোখ গেল। এতক্ষণ মনেও ছিল না। ঘর অন্ধকার, দরজা খোলা। দু'দিন থাকার কথা ছিল, আজই চলে গেছে হয়তো। বউটার আচরণ দুর্বোধ্যই থেকে গেল। নিজের দরজা খোলার ফাঁকেও আর একবার ও-ঘরটার দিকে তাকালো। কেউ আছে মনে হল না।

দরজা ভেজিয়ে গায়ের বুক-খোলা সোয়েটার আর পাঞ্জাবি খুলে সটান শয্যায়। ভারী জলযোগের ফলে আধো ঘণ্টা দেড়েকের আগে খাবার তাড়া নেই। ডাক্তারবাবু হয়তো কালই আবার ওকে কোণের ঘরটা দিতে চাইবে। কিন্তু বাপীর আর দরকার নে এ-ই বেশ ভালো। আবার কে কখন পরিবার নিয়ে হাজির হয় ঠিক কি।'

দরজায় টুক-টুক শব্দ। বাপী শুয়েই ঘাড় ফেরালো। ডাক্তারবাবু এই রাতেই ঘর বদলের কথা বলতে এসেছে, নাকি গায়ত্রী রাই আবার কিছু খবর পাঠালো ? রণজিৎ চাহিলা নয় তো....।

তাড়াতাড়ি সাড়া দিল, কাম ইন।

আস্তে আস্তে এক পাট দরজা খুলে যে এলো, তাকে দেখামাত্র প্রচণ্ড বিস্ময়ে বাপী ধড়মড় করে উঠে বসল।

কোণের ঘরের বউটা।

চোখ দুটো চকচক করছে। ঠোঁটে হাসি। নাকের পাথরে সাদা জেল্লা। আরো দু'তিন পা এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল।

বাপীর গলা শুকিয়ে কাঠ। এমন বিমূঢ় সে একটা শব্দও বার করতে পারছে না।

—দু'দিন আমাকে দেখে চিনতেও পারলে না বাপীদা, আমি তো তোমাকে দেখেই চিনেছি !

মাথার খাটো ঘোমটা খসে গেছে। এবারে আর এক প্রস্থ ইলেকট্রিক শক্ খেল যেন বাপী। তারপর স্থান-কাল ভুলে ক করে দেখছে। চেনাজানাই বটে। কি কপালে সবুজ টিপ, নাকে চকচকে পা পাথর, দু'হাতে এক গোছা করে কালো চুড়ি এই বাপী করে কোথায় দেখল ? মেয়েটার ভুল হয়ে থাকলে ওর নাম বলার কি করে—বাপীদা বলবে কি করে।

—থাক, আর চেষ্টা করতে হবে না। আমি তোমাদের ছুইং মাস্টার মশাই ললিত

ভারতে সবচেয়ে বেশী বিক্রীর সাইকেল চেন

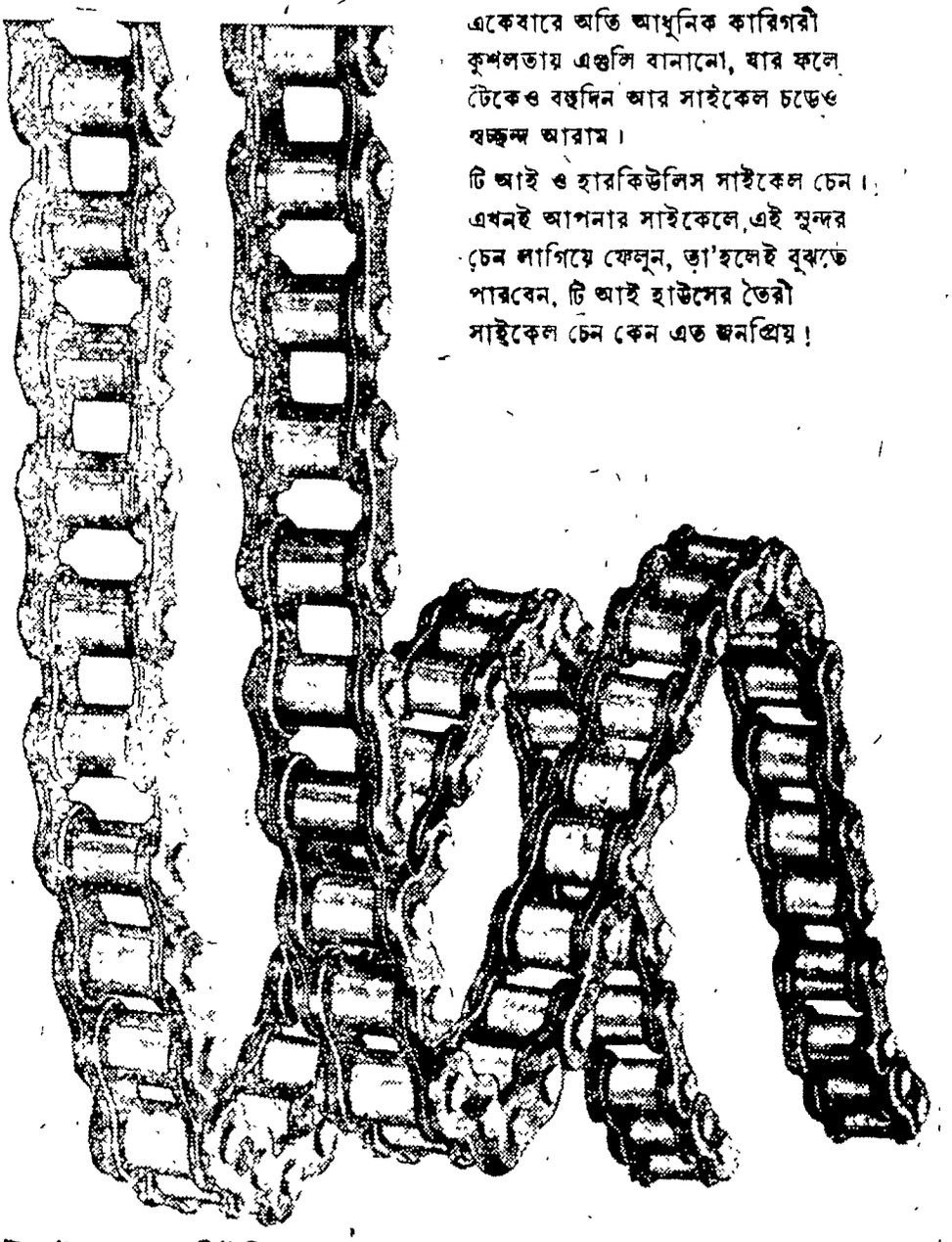

একেবারে অতি আধুনিক কারিগরী কুশলতায় এগুলি বানানো, যার ফলে টেকেও বহুদিন আর সাইকেল চড়েও স্বচ্ছন্দ আরাম।

টি আই ও হারকিউলিস সাইকেল চেন। এখনই আপনার সাইকেলে এই সুন্দর চেন লাগিয়ে ফেলুন, তা'হলেই বুঝতে পারবেন, টি আই হাউসের তৈরী সাইকেল চেন কেন এত জনপ্রিয়!

টি আই অ্যাণ্ড হারকিউলিস

TI & Hercules

টি আই ডাইমণ্ড চেন লিমিটেড, মাদ্রাজ-৬০০ ০৫৩

(টিউব ইনভেস্টমেন্টস্ অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের এক পরিপূরক সংস্থা)

ADS TID 2706 A BEN

ভবের মেয়ে কুমকুম। মনে পড়ছে না, তাকেও ভুলে গেছ ?

মাথায় একটা মুগুরের ঘা খেয়ে আত্মস্থ হল বাপী তরফদার। তার পরেও বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা নেই। নিজের দুটো চোখের ওপর বিশ্বাস খোয়ানোর দাখিল। তেতাল্লিশ সালের গোড়ার দিকে হাড়ের ওপর শুধু সাদা চামড়া মোড়া বছর চৌদ্দর এই মেয়েটাকে প্রথম দেখেছিল। বাপের হাঁকডাকে, কড়াইশুঁটি সেদ্ধ আর চিঁড়ে ভাজা খেতে দিয়েছিল। তার বেশির ভাগ রোগা পটকা দুটো ছেলে আর মাস্টার-মশাইয়ের পেটে গেছল। পরের দেড় বছরের মধ্যে মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে কমই যাওয়া-আসা ছিল, কিন্তু তখনো এই মেয়ে নিজের স্বাস্থ্যের লজ্জায় হোক বা ময়লা ছেঁড়া-খোঁড়া জামা-কাপড়ের লজ্জায় হোক, সামনে আসতই না। ভিতরের ঘরে সেঁধিয়ে থাকত। একদিন মাত্র বাগের মুখে দেখেছিল—যেদিন জিলিপির ঠোঙা আর মুড়ি নিয়ে যেতে ও বলেছিল, মাসের রাক্সস থেকে বাবা দশ টাকা চুরি করে দুর্ভিক্ষের ফান্ডে পাঠিয়েছিল বলে বাড়ির সকলের উপোস চলছে। আর মাস্টারমশাই অ্যারেস্ট হবার দিন মেয়েটা ছেঁড়া আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদছিল। দেখা বলতে সর্বসাকুল্যে তিন-চারদিনের।

পাঁচ-ছ বছরে সেই হাড়-চামড়া মোড়া মেয়ে এই হতে পারে কোনো কল্পনার মধ্যেও আসা সম্ভব নয়। বাপী মাথা নাড়ল বটে, মাস্টার মশাইকে ভোলেনি, কিন্তু এখনো যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না, এ সেই মেয়ে।

কুমকুম বলল, কাল সকালে চলে যাচ্ছি, আজ একবার না এসে পারলাম না।

বাপী দ্রুত নিজের মধ্যে ফিরে আসছে। —কাল থেকে দেখছ, চিনেছ.. এলে না কেন, কবের সঙ্গে আলাপই করিয়ে দিলে না কেন ?

এক জবাবে কুমকুম দুদিক সারল। —আলাপ করানোর মতো মানুষ নয় এখনো এ-ঘরে দেখলে চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে যাবে।

চমকে দরজার দিকে তাকালো বাপী। তারপর তাড়াতাড়ি উঠে এসে দরজার দুপাটই খুলে পর্দাটাও তুলে দিল। কুমকুম হাসল একটু। —তোমার ভয় নেই, আমি দেখে এসেছি, মদ আর জুয়ার নেশায় এখন আর কোনদিকে হুঁশ নেই।

হঠাৎ ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করছে বাপী। কুমকুমের ঠোঁটের হাসি আর চকচকে চোখ কেন যেন খুব স্বাভাবিক লাগছে না।

—বোসো। বসার চেয়ার নিজেই সামনে এগিয়ে দিল। নিজে খাটে বসল। —তোমার বরের নাম কি ?

—বত্রীজমোহন। কুমকুমের মুখে অদ্ভুত হাসি।

—নিজে বিয়ে করেছ ?

—তা ছাড়া আর কি। কবে থেকেই তো নিজের বাঁচার ভাবনা নিজের।

তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলালো বাপী। —মাস্টারমশাইয়ের খবর কি ?

খবর বলা নয়, বাপীর বুকের ভিতরটা দুমড়ে-মুচড়ে দিল কুমকুম। মাস্টার-মশাইয়ের খবর ও জানে না, বা কেউ জানে না।....দীনাজপুরে এসে প্রথম দুআড়াই বছর তারা মামা-মামীর আদর যত্ন পেয়েছিল। মামা মুহুরী কিন্তু জনাকতক পয়সা-অলা মক্কেলের সঙ্গে তার খুব খাতির ছিল। মামার অগোচরে মামী সস্তার বাজারে কুমকুমকে আম-দুধ-ঘি খাইয়ে বেশ তাজা করে তুলেছিল। তারপর বাপের থেকেও বয়সে বড় এক বউমরা খাতিরের মক্কেলের সঙ্গে ওর বিয়ে ঠিক করে ফেলেছিল। এই সময় বাবা এসে যেতে এই বিয়ে নিয়েই মামার সঙ্গে তার কাটাকাটি ঝগড়া। মুখ দেখাদেখি বন্ধ। ওদের এক খোলার ঘরে উঠে যেতে হল, তারপর প্রায় দিনই উপোস। মাস্টারমশাই জঙ্গল থেকে একদিন কি-সব ফল আর লতাপাতা এনে হাজির— সেদ্ধ করে নুন দিয়ে খেতে নাকি চমৎকার। কুমকুম বা তার মা ফিরেও তাকালো না দেখে নিজেই সেদ্ধ করল। তারপর বাবা আর ছোট ভাই তাই খেল। বড় ভাইটাকে মামা আগেই ঢাকায় এক আত্মীয়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। সে বেঁচে গেল। অবশ্য বেঁচে আছে আছে কি নেই কুমকুম জানে না। সেখানকার বড় দাঙ্গার পর থেকে সেই আত্মীয়ের কারো আর খবরই পায়নি। ওই সেদ্ধ বুনো আনাজ খাওয়ার দুঘন্টার মধ্যে বাবা আর ছোট ভাইয়ের সে কি পেট কাচিয়ে বমন, আর অধাকাটা পশুর মতো যন্ত্রণায় ছটফটানি। রাতের মধ্যে ভাইটা মরেই গেল। বাবা শেষ পর্যন্ত সামলে উঠল, আর তারপর থেকে একেবারে পাগলের মতো হয়ে গেল। বেরিয়ে যেত, আর কখনো কখনো দুদিন তিনদিন পরেও ফিরত। শেষে একবার বেরিয়ে আর ফিরলই না। পরের কবছরের মধ্যেও কুমকুম আর তার দেখা পায়নি।

শোনার যন্ত্রণাও কম নয়। বাপীর দম আটকে আসার দাখিল। —আর তোমার মা ?

—বাবা চলে যাবার দুমাসের মধ্যে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। তার আগের রাত পর্যন্তও আমাকে প্রত্যহ অভিসম্পাত করেছে।

মাথাটা ঝিমঝিম করছে বাপীর। আর কিছু জিগেস করতেও ইচ্ছে করছে না। এবারে কুমকুমের চকচকে চোখ উৎসুক একটু। —তুমি বিয়ে করোনি বাপীদা... না ?

—না।

—এখানেই থাকো ?

বিশদ করে বলল না। জবাব দিল, থাকব বলে এসেছি—কলকাতায় ছিলাম।

শুধু চোখ নয়, কুমকুমের মুখও রাগত হঠাৎ। —কলকাতা কেমন জায়গা বাপীদা ?

—আছে একরকম। অস্বস্তি বাড়ছেই বাপীর। বলল, কুমকুম এখন তুমি ঘরে যাও, বত্রীজমোহন ফিরে এলে ...তুমি যা বলছ....

—হ্যাঁ, খুব মুশকিল। কুমকুম তক্ষুনি উঠে দাঁড়াল। ঠোঁটের ফাঁকে তীক্ষ্ণ হাসির ঝলা। —বেইমানী ভাবলে তোমার ঘাড়েও ফেলে চলে যেতে পারে।

চলে গেল। এই রাতে বাপীর আর ডিনার খেতে বেরুনোও হল না।

সকাল। বাপী ইচ্ছে করেই প্রাত-রাশের পর বাইরের বারান্দায় চেয়ারে বসে কাগজ পড়ছিল। খানিক আগে একটা জিপ এসে দাঁড়িয়েছে। জিপে ড্রাইভারের পাশে চা-বাগানের সেই ছোকরা অফিসার— বত্রীজমোহনের বন্ধু।

আগে সুটকেশ হাতে বেয়ারা কোনের ঘর থেকে বেরুলো। পিছনে বিপুলবপু বত্রীজমোহন। তার পিছনে চার আঙুল ঘোমটা টানা কুমকুম। বাপীর দিকে মেয়েটা তাকালোও না একবার। বারান্দা থেকে নেমে গেল।

অফিসার বন্ধুটি মিটিমিটি হাসছে। বত্রীজমোহনও দাঁত বার করে হেসে পিছন ফিরে কুমকুমকে দেখল একবার।

ওদের নিয়ে জিপটা বেরিয়ে গেল।

আর তক্ষুনি চোখের সামনে থেকে একটা ঝাঁপসা পর্দা আচমকা ছিঁড়েখুঁড়ে যেন একাকার হয়ে গেল। কুমকুম আর কতভাবে বোঝবে ও কে ? ও কি বলেছে, কবে থেকেই ওর নিজের ভাবনা নিজের— বলেছে, মা গলায় দড়ি দিয়েছে তার আগে পর্যন্ত অজস্র অভিসম্পাত করেছে—বলেছে, বেইমানী ভাবলে ওই লোক তাকে বাপীর ঘাড়ে ফেলেও চলে যেতে পারে। তার আগে ব্যঙ্গস্বরে জিগেস করেছিল কলকাতা কেমন জায়গা।

এই একজন নয়, পুরুষ প্রকৃতির কোন কাঁচা ভিতের ওপর কুমকুমের মরণ-বাঁচন নির্ভর—সেটা আর কতভাবে ও বলে যাবে ?

বাপী স্তব্ধ। বিবর্ণ।

(চলবে)

আতরের খালি শিশি

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

ভীম পড়ে গেল। এটা মহাভারতের যুগ নয় এমন কি ঘটনাটা যাত্রার দলেও ঘটে নি তাই এ খবরে সংবাদপত্র উচ্চবাক্য করবে সে আশা নাস্তি। ভীম একজন ঘরামি তবে সর্দার ঘরামি অতএব তার এই আকস্মিক পতনে সেথোরা প্রথমে অবাক অবাক হয়েছিল। কিন্তু বিস্ময় বিলাসের সময় হাতে মোটেই ছিল না। কেননা ভূপাতিত ভীম বুকের পাঁজরটা চেপে ধরে খিস্তি করল— শোরের বাচ্চারা হাসতেচে, তোল আমারে আগে, চোট নেগেছে—। উঃ বাবা গো— হেই সুমুন্দির পো—তোল্—ধর্—।

মল্টু, পুলিন, ন্যাদস সবাই ধরাধরি করে একুশ নম্বর বস্তির ঘরে আহত ভীমকে যখন এনে শুইয়ে দিল তখন সে আর এক দফা খিস্তি করে বলল — ওরে অমন করে মড়ার মত রাখিস নে, আমারে বসে দে, ঠেস দে, নালি শুতি পারব নি। বুকে যন্তনা করতেছে। বড্ড ঘা নেগেচে--

এরকম অনর্থ কাণ্ড দেখে নি কখনো সর্দারের বৌ। বস্তুত পঁচিশ বছর আগে ঘরামিকে প্রথম দেখে যখন মজে গিয়েছিল তখন ভীমের পেটানো শরীর আর বাঁদরের মত লাফ দিয়ে দোতলা বস্তির ওপর থেকে হরদম নামতে-উঠতে দেখেই মজেছিল। বলা যায় সৈরভিই পড়েছিল, সে পড়া এর চেয়েও সাংঘাতিক—ভীমের প্রেমে পড়েই একেবারে সাজানো সংসার ভাসিয়ে দিয়ে মরণকে সঙ্গে নিয়ে এই একুশ নম্বরে ঘর বেঁধেছিল বৈভি। তখন গন্তব ছিল সৈরভির, পাঁচ বাড়িতে বাসনমাজা এটা-ওটা করেছে। দুজনের বেজগাছে সুখে-দুঃখে দিব্যি দিন কেটেছে। সৈরভির মরণকে নিয়ে বড় সুখ। মরে-হেজে ষেটের কোলে এক ছেলে, দুই মেয়ে বেঁচে-বর্তে আছে। কিন্তু এত বছরের মধ্যে ভীমের পতন এই প্রথম। সৈরভি বলল — কি করে হল মরতে কোথায় গিইছিলে।

সৈরভির কথা ত নয় পুলিশের জেরা। ভীমের পড়ে যাওয়ার জন্যে যেন সেথোরাই দায়ী। নদীরাম বিবৃতি দিল— কাটামের ওপর টালি সাজাতে সাজাতে সর্দার বিড়ি চাইল। মুই পাশ থে দিচচি, হাত বাড়িয়ে নেচচে। তলা থে ল্যাংড়া বললে, ভীম আমি বাজার থেকে ঘুরি আসছি, তোমাদের কিছু লাগে ত বল— এ্যাই কথা আর শেষ হল নি, কাণ্ড হয়ে গ্যালো। দেখি সর্দার ভুঁয়ে গড়াগড়ি।

সৈরভির কণ্ঠে বিছের কামড়ের বিষ ঝরানো ছটফটানি—তাই বলো, পোড়াকপাল ওই ল্যাংড়া হেবোর বাড়িতে মরতে কাজ নিয়েছিলি ক্যানো। ওই মাতালটার ভিটেতে পা দিলে যে নেশা হয়। নাও এখন বোঝো। মাতাল, ঠগবাজের বাড়িতে কাম করবা খ্যাসারং গোনো এখন। মরণকে নিয়ে সারাডা জীবন জ্বলে মরলাম, ভগমান আমাকে নেয় না কেন?

ভীম যখন ধমক দিল—তুই চুপ করবি কিনা বল। তখন সৈরভি থামল।

মিনিট দশেকের মধ্যে ট্যাকসি এল। ঘরের সামনে ভিড় জমে গেল। পাড়ার ছানাপোনা থেকে শুরু করে বৌ-ঝিরা অনেকেই এল। আর রাস্তার ওপারের কোঠাবাড়ির লোকেরা দূর থেকে খোঁজ-খবর নিল। ভীমকে হাসপাতালে নিয়ে গেল তার বড় মেয়ে আর সেথো ন্যাদস। বস্তির মানুষ হলেও এসব ব্যাপারে ভীমের মেয়েরা খুব একসপার্ট।

তারপর গবেষণা চলল, কেউ বলল হাড় ভেঙেছে, কেউ বা আরও বেশি শংকা প্রকাশ করে বলল, ফুসফুস ফেটে গিয়েছে। এবং কবে কার যেন এই রকম হয়েছিল তাও বলে দিল। আসলে, আঘাতের গুরুত্ব সম্পর্কে যে যত পারল জ্ঞানের পুঁজি উজাড় করে দিয়ে আত্মীয়তার আধিক্য দেখানোর রেষারেষি চলল। আরও কতক্ষণ চলত তার ঠিক কি, হঠাৎ ঢোলের ডুগ-ডুগ এবং সেই সঙ্গে চাঁছা-ছোলা কণ্ঠের অ গ দিদি ব্যাটা না বিটি হয়েছে, প্রশ্নে চাউর হল হিজড়ে এসেছে অতএব—।

ভীমের ঘরটা নানা কারণে গুরুত্ব-পূর্ণ। বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে, তার একটা বাচ্চাও হয়েছে তবু সে এখানেই থাকে, জামাইও থাকে। ছেলে লাভ ম্যারেজ করেছে

সে থাকে তার বন্ধুবান্ধব যাদ যায় না। ছোট মেয়েটার এক সখী চাকরি ছেড়ে দিয়ে আপাতত এখানেই আস্তানা নিয়েছে। এর মধ্যে ভীমের এই কাণ্ড হল। হাসপাতালের আউটডোর থেকেই ক্রেপ ব্যাণ্ডেজ জড়িয়ে ছেড়ে দিল। বেলা তিনটে নাগাদ তাকে নিয়ে মেয়ে ফিরল। বলল—কাল বাদ পরশু যেতে বলেছে, বুকের ফটো তোলাতে হবে।

আমি এসব জানলাম কেন না সে আমার পড়শী। শুধু কি তাই, দরজা খুললেই সামনা-সামনি রাস্তার ওপারে ওদের ঘর। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর খবরটা শুনে অবধি মনটা খারাপ হয়েছিল। এই বয়সে জখম হয়ে একটা খেটে-খাওয়া মানুষ পড়ে থাকবে, ওদের সংসার চলবে কি করে? আমি অবিশ্যি কিছুই করতে পারব না। পারি বা না পারি চোখের সামনে কারুর কষ্ট দেখলে তার জন্যে সহানুভূতিটুকুও থাকবে না এমন নির্বিকার হতে পারি নই। এককালে ওর বৌ থেকে শুরু করে মেয়েরা সবাই এ বাড়িতে কেউ না কেউ কাজ করেছে। সে সব ছেড়ে দিলেও আমার যখন পা ভেঙেছিল তখনকার অসহায় অবস্থাটার কথা স্মৃতিপটে ভেসে ওঠাটাও এই উদ্বেগের পশ্চাতে পরোক্ষভাবে কাজ করে থাকবে। যাই হোক, বেলা সকালে বাজার থেকে বাড়ি ঢোকার আগে ভীমের খোঁজ নেওয়াটা প্রায় নিত্যকর্ম পদ্ধতির মধ্যে পড়ল।

—কেমন আছো?

—আর বাবু, বুকের যন্ত্রণায় সারা রাত বড্ড কষ্ট গেছে।

—ঘুম হয় নি?

—ঘোম কি বাবু, শুতি পারি নে, ঠায় বসে কাটতি হয়।

ঘরের সম্মুখে এক চিলতে জায়গা, নর্দমার ওপর বাঁশ আর তক্তা দিয়ে তৈরি বারান্দাই বলা চলে—সেখানে কাঠের বাকসের ওপর ভীম বসে আছে। শীতের সকালে রোদ পোয়াচ্ছে। আমার গলা পেয়ে সৈরভি গলা পর্যন্ত ঘোমটা টেনে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কোমর বেঁধে যখন অন্যের সঙ্গে ঝগড়া করে তখনকার রণরঙ্গিণী চামুণ্ডা মূর্তি যে এ-ই তা কে বলবে। এত বছর পরেও সেই লজ্জায় অধোবদনা ভাবটা অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে নিখুঁত রয়েছে। কর্তার সামনে দাঁড়িয়ে ফিসফিসিয়ে আফশোস করে—কী যে হবে। ডাক্তারেরা ত ধরতে পারছে না। নিয়ে যাওয়া নিয়ে সাসাই সাব।

—কি বলছে?

—বুকের ফটো তুলে নিয়েছে। চিকিচ্ছে ত শুরু হয় নি। বলেছে ছবি দেখে ঠিক হবে, হাসপাতালেই রোগ দেয় কি না।

—এক্স-রে রিপোর্ট কবে দেবে?

—তিন দিন বাদে। তা তিন দিনের একদিন ত কেটে গেল। সারা রাত উঃ-আঃ করবে। নিজে ঘুমোতে পারবে না। কারুকে ঘুমোতে দেবে না। তার ওপর নাখনটাও খণ্ডর-খণ্ডর কাশতেছে।

চার-পাঁচ মিনিটে দুঃখের পাঁচালীর কয়েক পাতা শুনিয়ে দিল ওরা দুজনে।

বুকের ছবি নিয়ে হাসপাতালে কদিন যাওয়া-আসা চলল। একদিন ছোট ডাকতারেরা বলল ছবি হয়েছে, বড় ডাকতার যখন দেখতে চাইলেন তখন বলল—কাল হবে। এদিকে হাসপাতালে হয়রানির পর্ব আধাপথেই চুকল। ভীম বলল—ওরা দেখিইচি, এট্টা মালিশ দিয়েছে। আর সেঁক দেওয়া হচ্ছে। গরীব মানুষ বাবু, হাসপাতালে ওই যে কম্পাণ্ডার আছে তাদের টাকা খাওয়াতি পাল্লে তবে চিকিচ্ছে হয় নইলে সব অমানুষ, সব কষাই। দেখে-শুনে ও আশা তেগ করে দিইচি। যা হয় ইতিই হবে।

—ব্যথা যন্ত্রণা কেমন আছে?

এট্টু কমেছে মনে হয়, এখন ধরে শুইয়ে দিলি এক পাশে শুতি পারি। তবে বেশিক্ষণ পারি নে। আচ্ছা বাবু?

—কি?

—পাঁজরের হাড় মনে হয় ভাঙে নি, না?

ডাক্তার নই তবু বলি—নাঃ, সে সব কিছু নয়। অত উঁচু থেকে পড়েছ চোট লেগেছে এ তারই ব্যথা। হাড় ভাঙলে জ্বর থাকত, তা ছাড়া যন্ত্রণাই কি কমত নাকি?

—আমারও তাই মনে নিচ্চে।

বিজ্ঞের মত কথাগুলো বলার আর কোনই কারণ নেই। শুধু দুটো মুখের কথায় সান্ত্বনা দিলে যদি মানুষটা স্বস্তি পায় ত পাক না। যদিও জানি যে আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে এক্স-রে করে হাড়ের কোথায় চিড় খেয়েছে কিনা তা জানা যায়। তাছাড়া বুকে আঘাত লাগলে যথাসময়ে চিকিৎসা না করলে তার পরিণাম সাংঘাতিক হতে পারে। এ সবই জানি। কিন্তু সে সব খবর দিয়ে উৎকণ্ঠা বাড়ান ছাড়া এখান উপকারই করা যাবে না। ভীমের ছেলেটাকেও বলে কোন লাভ নেই। সে ধোপদুরস্ত পোশাক পরে ঘুরে বেড়ায়, কি যে কাজ করে তা জানি না আর বাবা জানে তারা সেই সদুপায়ে পয়সা কামায় না। মাঝে মাঝে পুলিশের কব্জায়ও মেয়াদ খেটে আসে। এর মধ্যে একবার আলাদা সংসার পেতেছিল, চালাতে পারে নি। এখন বৌ থাকে তার মায়ের সংসারে আর সে বাপের ঘাড়ে। খরচ কিছু দিয়ে থাকে তবে নিয়মিত নয়। এই যে বাপের এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটল ছেলে কিন্তু একদিনও হাসপাতালে যায় নি।

সান্ত্বনা দিয়ে অবাধ আমার অস্বস্তি দিন দিন বাড়তে থাকে। বলে ত দিলাম, যদি কিছু খারাপ হয়, বাঁকা পথ ধরে ব্যথার জায়গাটা, তাহলে? জানলা দিয়ে মাঝে মাঝে ভীমের সিংহাসনের দিকে নজর দিই, বসে থাকে। গায়ের ফতুয়াটা কাঁধে ফেলা, বুকের ব্যাণ্ডেজটা জড়ানো। লোকটা বসে বসে বিড়ি টানে। কখনো বা বস্তির ছেলে-মেয়েগুলোর সঙ্গে ফাস্টিনষ্টি করে। বাচ্চাদের সঙ্গে তার আজকাল খুব দোস্তী হয়েছে।

ইদানীং দূর থেকেই জিগ্যেস করি—কেমন আছো?

হাসে। দাঁতের মাড়ি বার করা হাসির সঙ্গে অনেক দিন তেল না পড়া খোঁচা-খোঁচা চুলগুলো কেমন একটা অসুস্থতার পরিবেশ রচনা করেছে। তবু শুনি—ভালো।

মাসখানেক হয়ে গেল। ভীমের ভালো থাকার মধ্যে কেমন একটা অবসাদের আমেজ। নাকি এটা আমারই মনের একঘেয়েমী। এত দিন ধরে ওর এইভাবে কাটান আমার ভাল লাগে না। তাই কি?

প্রশ্নটা আর কারুর নয়। নিজের কাছেই নিজের জিজ্ঞাসা। বেশ ভেবে দেখেছি, ওর বয়স, আর্থিক অবস্থা আর পেশা সবগুলোরই সম্পর্ক আছে আমার এই ঝেড়ে ফেলতে না পারা ত্রিশঙ্কু দশার সঙ্গে। লোকটা যদি আর ভাল হয়ে না ওঠে তাহলে কি দশা দাঁড়াবে? সৈরভির আর সে গতর নেই যে একার রোজগারে বসিয়ে খাওয়াবে। মেয়েরা? তারাই বা কদিন টানবে। আশ্চর্য, এসব নিয়ে আমি কেন এত ভাবি। ওদের নিজের ঘরে হাসিঠাট্টায় ত ভাঁটা পড়ে নি। নিজেকে মনে মনে ধমক দিতে গিয়ে হাসিই পেল। এ বাড়ির গিন্নী যখন মুখের ওপর একরাশ উদ্বেগ নিয়ে বলেন—হ্যাঁ গো কি হবে? এ সংসারে ত সমস্যার সংখ্যা কম নয়। কোন্ ছিদ্রটি বোজান একান্ত জরুরী, বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাই। তিনি বলেন—এই আমেরিকার কাছে বাণিজ্যের কাছে আমাদের যে এত দেনা, এ টাকা শোধ করার কি উপায় হবে? যেন কাবুলিওয়ালা দরজার সামনে লাঠি ঠুকছে আর হাঁকাহাঁকি করছে। তাঁর এই অকারণ দুশ্চিন্তাকে ধমকে তাড়ান ছাড়া উপায় কি? এই ভাবুকতা বড় ছোঁয়াছে, এও বোধহয় এক ধরনের ব্যাধি। নিজের যুক্তি দিয়ে পরিষ্কার বুঝে ফেললাম ভীমের ব্যাপারে কোন উদ্বেগের কারণ ঘটে নি, দুনিয়াতে সব ঠিক ঠিক চলছে, খবরের কাগজে ত দৈনিক কত অপঘাত মৃত্যুর কথা আমরা পড়ি। যা পড়ে আঁতকে শিউরে উঠি তা ভুলতে আমাদের কতক্ষণ সময় লাগে। আর এ লোকটার ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক কিছুই ত হয় নি। বরং আস্তে আস্তে আরোগ্যের দিকেই চলেছে। সে ত আমার কাছে সাহায্যও চায় নি। তার ওই নর্দমা-ঢাকা বারান্দায় বাঁশের খাঁটিতে ঝোলান খাঁচার টিয়াপাখিটাও দানাপানি পাচ্ছে—তা দেখেও কি বুঝতে বাকি থাকে ভীমের সংসারে সব ঠিক আছে।

ওদিকে এখন আকাশ ছোঁয়ার গাছটাকে দেখবার জন্যে। সবুজের সঙ্গে সব সম্পর্কই ত ঘুচে গেছে। ওদের বস্তির পিছনের বিরাট রেনট্রীর কাছ, কিছুদূরকে কুপিয়ে জবলানী করে আকাশের সীমানা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তলায় ঘর তুলে মানুষের সুবিধে করা হয়েছে। এমনি

আরও সুবিধের জন্য একে একে কত গাছই গিয়েছে। কুল গাছটা আপনি মরে গেল, মাদার গাছটার কি হল কে জানে। শুধু উড়ুম্বরের কাঁচ পাতাগুলো হাওয়ায় দুলছে। বাজার থেকে ফেরার পথে সেদিন ওই পুরনো গাছগুলোকে স্মৃতি থেকে তুলে এনে দেখছিলাম। হয়ত অন্যমনস্কতায় আরও কিছু দেখা যেত, খোঁচা খোঁচা শাদা দাড়িওয়ালা একটি লোক আমার সামনে পথ আগলে দাঁড়িয়ে ছিল. বিরক্ত হয়ে তাকে পাশ কাটিয়ে যেতে চেষ্টা করি কিন্তু সে প্রশ্ন করল—বাবুর এর মধ্যে বাজার করা হয়ে গেল?

চিনতে পারলাম না, চলতে চলতেই কথার জবাব দিলাম—হ্যাঁ। আজকাল বাজারে দেরি হয় না, যা আগুন দাম!

লোকটা তবু পথ ছাড়ে না দেখে বলতেই হল—আমাকে কিছু বলবে?

—যে আজ্ঞে। এ্যাটা কথা বলতাম।

—কি কথা?

অচেনা মুখ। এ পাড়ায় দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

—আজ্ঞে আপনি যখন বাজার যান তার আগু থে ডোঁরিয়ে রইচি। বাজার গ্যালেন। দ্যাখলাম। ভাবলাম কাজের মানুষ আপনি, বলি খুবেই আসুন।

রীতিমত রহস্যজনক ঠেকছে। এ ধরনের মানুষের আমার সঙ্গে কি দরকার থাকতে পারে? ও, বুঝেছি। হয় বলবে ছেলের চাকরি করে দাও কিম্বা কিছু টাকা-পয়সা! ভেতরে ভেতরে নিজেকে আড়ষ্ট করে ফেলি। এ আপদকে অবিলম্বে সরানো দরকার। গম্ভীর ভাবে বলি—সব বুঝলাম। কিন্তু বাপু তোমায় ত চিনলাম না!

—আজ্ঞে, মোরে চেনবেন না ছোটনোক। কিন্তু মুই আপনারে চিনি, দেবতার পোরা মনিষ্যি।

ভনিতায় ভয় আরও বাড়ে। মতলবটা কি? বলি—ছোটলোক বলতে নেই, পরকেও নয়, নিজেকেও নয়ই। যাক কাজের কথা কিছু থাকে বলো, বাজার নিয়ে গেলে রান্না চুকবে।

জিভ কেটে লোকটা হাত জোড় করল—হেই বাবু অপরাধ নেবেন নি। এই লোকটার কথা বুঝতে না পেরে বলি—ভীমকে চেনো?

আবার জিভ কেটে বলল—তাই কি বলতে পারি? অত আস্পদ্দা হলি পাপে জিভ খসে যাবে। আজ্ঞে যদি গরীবির উবগারটুকু করেন। উত্তর জনি এনেলাম। কিন্তুক ভস্সা হল নি। অপরাধ নেবেন নি। মুই আর যাবো নি।

বলতে বলতে সে কাঁধের ঝুলি থেকে সবুজ একটা ডাটার মত কি যার করল! আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সামনে লাউডগা সাপের মত ডাঁটাটা উঁচু করে ধরল—এরে হাড়জোড়া বলে জানেন বাবু। ধন্বন্তরি ওষুধ। যিখানি হাড় ভেঙেচে সিখানি বেটি লাগালে সে ঝতো বড়ো ভাঙাই হোক জুড়ি যাবে। এমন জুড়া লাগবে যি বেমালুম টাইট ঝাইট।

তার চোখ-মুখের ভাব দেখলে মনে হবে আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের কুদরতে দুনিয়ার সব ভাঙা হাড় জুড়ে ফেলেছে এই মুহূর্তে। অবিশ্যি হাড়জোড়া যে, ক্যাকটাস গন্ধপের গাছরা এবং তার দ্রব্যগুণ ছেলেবেলায় ঠাকুমার কাছে শুনিছি। তাজ্জব লাগছে এই লোকটার কাণ্ড দেখে, এইখানে অন্তত আধ ঘন্টা দাঁড়িয়ে রয়েছে আমার জন্যে, অথচ—! থাক গে—।

হাত বাড়িয়ে বললাম—দাও এ আর এমন বড় কথা কি!

সে কৃতার্থভাবে ডাঁটাটা দিয়ে বলল—বড্ড উবগার হলো। উত্তর পরিবারের ইডা হাতে দেবেন, ক্যান বেটি নাগায়। কথাডা কানে গ্যালো, ভীম বড্ড কাতর হয়ে পড়েচে, তা এই আজ অসি কাল আসি করি করি পড়ে গেনু বাতের ব্যামোতে। কাল থে এট্টু নরম পড়েচে। নড়াচড়া করতি পাল্লি ভীমির অর ভাবনা কত্তি হত নি। তা, হ্যাঁ বাবু সে এখুন ক্যামন আচে?

তাই তো ভীমের সেই বুকের আঘাতটার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। লোকটা নিশ্চয় ভীমের খুব নিকট জন। কিন্তু এত দূর এসে—ও?

আবার বলল—ক্যামুন আচে সে?

—অনেকটা ভালো। কিন্তু তুমি নিজে না গিয়ে—

—সে আপনি বুঝবেন নি বাবু! মানুষির মন না মতি। গেলি হয়ত ভাবে, বিপদে পড়েচি বলি মজা দেখতি এয়েচ? কি দরকার বাবু?

বুঝলাম না তার কথার মর্ম। তার মুখের দিকে চেয়ে সেটুকু বোধহয় গোপন করতে পারি নি। এবার একগাল হেসে সে রহস্যভেদে সহায়তার ভঙ্গীতে প্রশ্ন করে—বাবুর মনে আচে ইখানে এ্যাডডাও কোটা বাড়ি ছেল না! তখন আপনার কী নং আর কী কাটাম ছেল। সেই সময়ে আপনার হাতে ধক্কা খেয়ে পেলিয়েছিলাম। সে ধাক্কা ক্যান এখুনো লেগে আয়চে!

বঙ্গশ্রী
হাওড়া
৪১/১, জি, টি, রোড, হাওড়া
• বেনারসী
• জোড় • সিল্ক
• তাঁত • মিল
• পোষাক
• সাটিং • সুটিং
ও চিট কাপড়

অধ্যাপক শ্যামসুন্দর মাইতি সম্পাদিত

বলেন্দ্র কবিতা সমগ্র

বলেন্দ্রনাথের কৃতিত্বের আর একটি দাবী প্রেমের কবিরূপে। শুধুমাত্র প্রেমকে উপজীব্য করে দুখানা কাব্য রচনার বিরল গৌরব বাংলা সাহিত্যে এক বলেন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারুর নেই।

বর্তমান সংগ্রহে আছে বলে • বলেন্দ্রনাথের সমস্ত কবিতা ও গান • সম্পাদক লিখিত ভূমিকা, বলেন্দ্র-প্রসংগ, বলেন্দ্র-মাহানা-সম্পর্ক • বলেন্দ্রনাথের কবিতা সম্পর্কে বিশিষ্ট সমালোচকগণের অভিমত • বলেন্দ্রনাথের ব্রহ্ম সংগীতগুলির কাঙালীচরণ সেন এবং পংকজ কুমার মল্লিক কৃত স্বরলিপি • বলেন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্র-প্রিয়া সাহানার দুষ্প্রাপ্য —আলোকচিত্র।

উপহারে অনবদ্য • মূল্য দশ টাকা মাত্র

দেবকুক স্টোর : ১৩ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

ভ্রূকুঞ্চকে মনে করতে চেষ্টা করি। মার-ধর করার খ্যাতি কস্মিনকালে ছিল না ত। লোকটা বলে কী? অকস্মাৎ পর্দা সরে গেল। এক সান্ধ্যতে একটা মাতালকে অবিশ্যি আমার বাড়ির সামনে থেকে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়েছিলাম। লোকটা খুব হম্বিতম্বি করছিল। অনেকবার বারণ করেছিলাম, গায়ে হাত করেনি বরং মাত্রা আরও চড়িয়ে দিয়েছিল আস্কালনের। কেন যেন মনে হয়েছিল লোকটা আসলে নেশাগ্রস্ত ছিল না, এটা ছিল উপলক্ষ্য—পিছনে ছিল ঝামেলা পাকানোর মতলব এবং সেটার লক্ষ্য সামনের ওই ঘরামির ঘর। তখন ঘরামিই জানতাম। তার নামটাও জানতাম না।

এই লোকটাকে দেখে কিছুতেই সেই পুরনো মুখখানা পুনরুদ্ধারের কোনো উপায় নেই। ঘাড়ের ধমনিটা হাতবদল করে বলি—উঃ সে কি আজকের কথা! তারপর কতকাল কেটে গিয়েছে! তোমাকে তো পাড়ায় দেখিনি বহুকাল।

সে হাসল—আমরা কি দ্যাখার যুগ্যি মানুষ বাবু! এ্যাক্কাবারে এসি নি তা নয়। এইচি, রাস্তাবিরেতে মুকেক ছাপ্পো, মিছে বলবি নি আপনায়ে। তবে হ্যাঁ, হাজামা টেজ্জৎ সেই শেষ!

কথার কথায় স্মৃতির মাটিটা থেকে কেমন সোঁদাসোঁদা বাস উঠছিল, নইলে হঠাৎ আমার জিজ্ঞেস করব কেন—তুমিই ত জীবন।

খোঁচা-খোঁচা পাকা দাড়িতে হাত বুলিয়ে লোকটা লজ্জা ঢাকতে চেষ্টা করে। এই চেহারায় যেমানান সলজ্জ ভাবটুকু ভারি বিচিত্র লাগে। সে নিজের লম্বা দেহটা কুঁকিয়ে ঝাড় কাৎ করে সায় দিল—আজ্ঞে, নামডাও ঠিক মনে রেখেচেন বাবু! ধন্যি!

এবার একটু জোর দিয়ে বলি— তা এসেই যখন পড়েছ একবার চোখের দেখাটা দেখেই যাও না।

বোধহয় দীর্ঘশ্বাস হজম করল—নাঃ! ম্যাথায় লোকের ত অভাব নি! তার ভরা সোম্সার। নাতি নাতুনির সামনে তো আর লজ্জার ফোঁল ক্যানো!

কথাটা শেষ করেই সে অতর্কিতে আমার পায়ের ধুলো নিল, এখনই আচমকা ব্যাপারটা ঘটল যে বাধা দেবার অবকাশ পেলাম না। আমি কিছু বলবার আগেই সে উল্টো দিকে হন-হন করে চলতে শুরু করেছে দেখলাম।

থাক গে! আমার তাতে কীই বা যায় আসে। টাকাপয়সা চেয়ে সকালে মেজাজ খিঁচড়ে দেয় নি তাতেই আমি খুশি। উপরি হিসেবে কিছু পেয়েছি তাই বা মন্দ কি!

আমি দেখেছি, অপরকে তেল দিতে বারন করলেও। তেল পেতে সবাই অল্পবিস্তর ভালোবাসে। মোটেই ওই আখ্যা দেওয়া চলবে না, তাহলেই গোলমাল।

হাড় জোড়ার ডাঁটিটা ভীমের হাতে দিলাম। সে বসে বসে একটা কুকুরের সঙ্গে বকবক করছিল। আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল—ইডা কী বাবু?

—হাড়জোড়া।

অবাক হয়ে সে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলেন—অ! তা ই কোথা পেলেন? বাবু?

গম্ভীরভাবে জবাব দিলাম—পথের মধ্যে জীবন এটা দিয়ে বলল, তোমার বৌকে দিয়ে বাটিয়ে বুকে লাবাতে হবে, হাড় ভেঙে থাকলে জুড়ে যাবে!

ডাঁটিটার দিকে তাকিয়ে সে স্বাগতভাবে বলে—কি বললেন? কে দিয়েচে? জীবনে! আমার হাড় ভেঙেচে! শোনো কথা। শালা সব গিয়েচে তবু তোর মনে শান্তি নি। ওরে শালা দরদের পীরিত দেখে বাঁচি নে! শালা পীরিত ঝালাবার ফিকিরে ছোঁক ছোঁক করিস এখনো! দুদিন বাদে চিতেয় উঠবি হুঁঃ।

ঘরের ভেতর থেকে আওয়াজ এল—সাতসকালে কার পিণ্ডি দিচ্চ শুনি? কাজ নি কম্ম নি, ওই এক পোষা কুকুর ব্যাতা হয়েচে। বসে বসে কুষ্টি কাটতেচে দ্যাখো।

ভীমও এবার গলা চড়িয়ে যে ভাষায় বৌকে সম্ভাষণ শুরু করল তা কলমের ডগাকে লজ্জা দেয়। পাঠক অনুমান করে নিন সেই সব বিশেষণ, পোশাকী ভাষায় প্রতিবেদন করলে দাঁড়ায়—তোর সোয়ামী জীবনে চত ফরে হাড়জোড়াব নত্তা পেটিয়ে দেছে।

—কই সে ঘাটের মড়া তারে একবার দেখি।

কথার গতি আছে অর্থাৎ বক্তব্য এবার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করছেন। ব্যাপারটা ওদের, কাজেই আমি মন দিয়ে নিজের খাঁচার দিকে এগোই। পিছন ফিরলেও সিরাজির কণ্ঠস্বর কানে যাবে না এমন কালা নই।

—এ্যাই দ্যাখ হাড়জোড়ার নত্তা!

—সে ঘাটের মড়া কই?'

—সি কি এ দিগরে আছে নাকি?

—তা তুমি ডাকলে না ক্যান আমারি।

—সে কি এয়েল নাকি! বাবু রি দে পেটে দেচে।

পাছে কথাগুলো আমার কানে যায় বোধ করি সেই জন্যেই আমার জানলার সামনে হাজির হয়ে সৈরভি চিৎকার করেত থাকে —ও মা আমার কি লজ্জা। শেষমেষ বাবুর হাত দে পাটানো। এতবড় বুকির পাটা, বাবুরে হুকুম। ক্যান আমরা কি খায় না আক্কেষ যে তারে দেখলি গিলি খাবো। ছি-ছি-ছি—বেমাকক্কা বেআক্কেলে মালি এমন পাপ করে। ওই জন্যি সারাটা জেবন নিজিও মলি মল্লো মোদেরও নরকে গল্লি ঘাঁটাতে চায়। হাড়জুড়া না হাড়ভাঙা, ও মল্লি আমার হাড় জুড়োয়।

এবার ভীমের গলাও পাওয়া গেল—এই থাম, পাড়া মাথায় করি কি হবে। ঘরে চ।

—ঘরে? দাঁড়াও মরণ বাবো। তার আগে সে এসে বলুক, মোদের মঙ্গলই যদি চাবি ত এলি নি ক্যানো। একবার ভাবো তো কোন্ তেপান্তর ভেঙে নোকতা এল। তা এইচিস, বেশ কথা, ঘরকে এসে দুদন্ড থির হয়ে বস। নুন ভাত খ্যা ছোটে খেয়ে ঠান্ডা হয়ে তারপর মরগে যা তোর চুলোয়। আপদের যে দিনকুলে কেউ নি! মরুক সে যাক।

ভীম বলল—যে মরবে আপনার দোষে কি করবে তার হবিহর বাসে।

—তাই না তাই।

একটা, কুকুর তার স্বরে চিৎকার করছে, বোধহয় কোলার কাঁধে কোনো 'ব্যাগ পিকার' দেখেচে। আস্তাকুড়গুলো কেন কুকুরদের খাশা তালুক, তাই মরলা সোরো কাগজ কুড়নো লোকগুলোকে দেখলেই ওরা ক্ষেপে ওঠে এবং দলবেঁধে চেঁচাতে চেঁচাতে পেছনে ধাওয়া করে। ঠিক তাই, নাগাড়ে গোটা কয়েক বিরক্ত, রুষ্ট কুকুরের মিলিত চিৎকারে ভীম আর সৈরভির কণ্ঠস্বর তলিয়ে গেল।

নিশ্চিত হন কনট্রাকটর

এবং

সাব-কনট্রাকটরের

প্রাপ্য থেকে

কর কেটে নেওয়া হয়েছে কিনা

আয়কর আইনের চাহিদা

• কেন্দ্রীয় সরকার অথবা কোন রাজ্য সরকার অথবা কোন স্বায়ত্তশাসিতত প্রতিষ্ঠান, কিম্বা আইনানুসারে প্রতিষ্ঠিত কর্পোরেশন, কিম্বা কোন কোম্পানি কিম্বা কোন কো-অপারেটিভ সোসাইটির সঙ্গে চুক্তি অনুসারে রাজ্যের জন্য প্রাপ্য ৫০০০ টাকার বেশি মূল্যের পাওনা থেকে ২% হিসাবে আয়কর কেটে নিতে হবে।

• কোন ব্যক্তিবিশেষ বা হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের সদস্য ছাড়া অন্য যেকোন সাব কনট্রাকটরের ৫০০০ টাকার বেশি সাব-কনট্রাকটের কোন কাজের জন্য পাওনা থেকে ১% হিসাবে আয়কর কেটে নিতে হবে।

• উপরের উল্লেখমতে আয়কর কেটে নিতে হবে, কনট্রাক্টর বা সাব-কনট্রাক্টরের পাওনা আদায় দেওয়ার সময় অথবা নগদে বা চেকে/ড্রাফটে যে-ভাবেই হোক আগে দিতে হবে।

• ওপরের উল্লেখমত কেটে নেওয়া আয়কর, আয়কর আইনানুসারে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নামে সম্পূর্ণ জমা পড়বে।

বিধিবদ্ধ নিয়মকানুন মেনে নিয়ে আয়কর কাটা ও জমা দিতে ব্যর্থ হলে আইনানুগ ফলভোগের সম্ভাবনা

প্রচার করছেন
ডিরেক্টর অফ ইনসপেকশন
(রিসার্চ, স্ট্যাটিসটিকস অ্যান্ড পাবলিকেশন)
ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেণ্ট
নিউ দিল্লী-১১০০০১

ডিএভিপি—৭৮/১

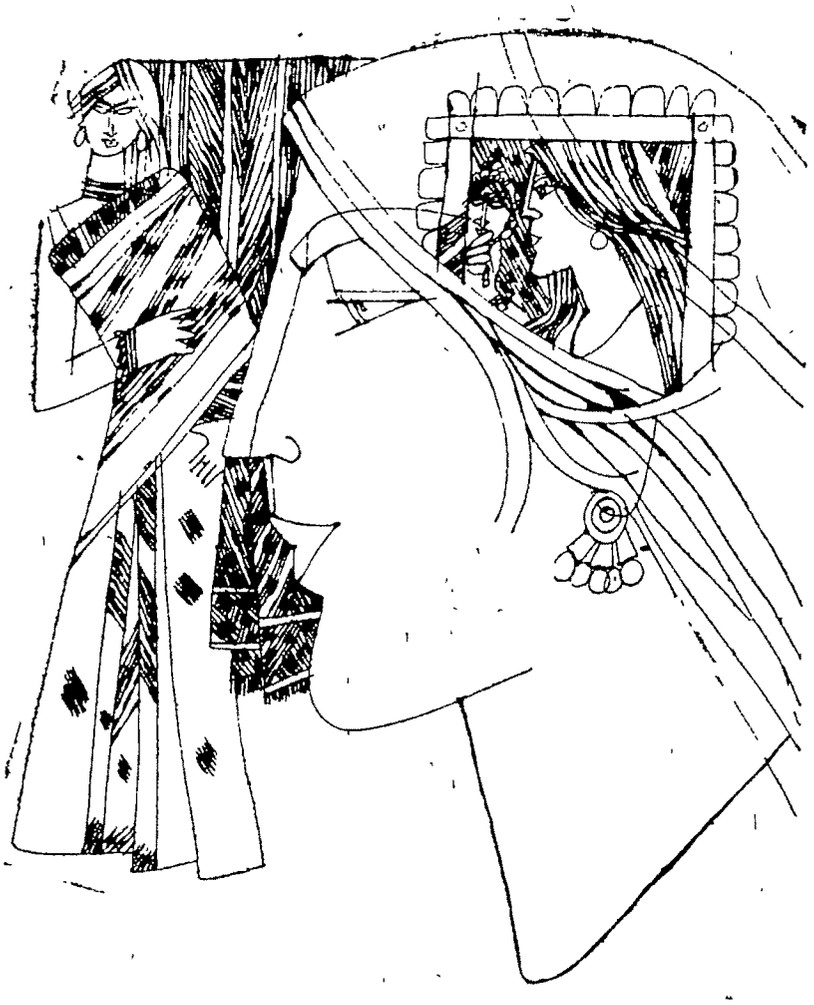

সমাধান

বিশ্বনাথ ঘোষচৌধুরী

শীতের নির্জন অন্ধকার রাত। নিস্তব্ধ বেল স্টেশনকে দূর থেকে মনে হয় কোনো এক প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। লোড শেডিং চলছে। চলছে সকাল থেকে রাত্তির। চাপ চাপ অন্ধকার জমাটবেঁধে আছে। টিমটিম করে একটা বাতি জ্বলছে। কাছে, দূরে একটি লোকও নেই। উত্তরের ঠাণ্ডা হাওয়া দক্ষিণ দিকে মুখ ফিরে বইছে। হাডকাঁপানো ঠাণ্ডা অন্যদিন হকারের ভিড় থাকে। আজ তা নেই। রঘু গুটি গুটি পায়ে প্লাটফরমের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল স্টেশন মাস্টারের ঘরের দিকে। ভীত সন্ত্রস্ত রঘু, মাস্টারের ঘরের দিকে চোখ ফেরাতেই দেখে, বেলের ঘন্টেরাম ব্যাটা একটা টুলের ওপর ব্যায়ের মত উবু হয়ে ঘুমোচ্ছে। ওর ঘুমের কায়দা দেখে বোকা রঘু হেসে ফেলল। পাশেই টিকিট কাউন্টার। একজন যাত্রী ওখানে চুপটি মেরে দাঁড়িয়ে আছে। হৃদয়পুরের আপ অ্যান্ড ডাউন দুদিক লাল। গাড়ির পাত্তা নেই। স্টেশনের সঙ্গেই রেল কোয়ার্টার। আগের মতই আছে। রাত বাড়ছে রঘুর চিন্তাও বাড়ছে।

রঘু ধীর পায়ে এগিয়ে অত্যন্ত বিনীত কণ্ঠে বলল, বাবু শিয়ালদহ থেকে গাড়ি কখন আসবে?

বাবু উত্তর দিল, 'জানিনে।'

রঘু বললো, 'বাবু দেরি আছে?'

বাবুর কাছ থেকে উত্তর এলো—হ্যাঁ।

যাত্রীটি রঘুকে বললো, 'এই প্রচণ্ড শীতে এত রাতে কোথায় যাবে? তোমার কি কিছু নেই? খালি পায়ে ছেঁড়া একটা ধুতি গায়ে জড়িয়ে চলে এসেছো।

রঘু উত্তর দিল, 'বাবুর খবর নিতে এসেছি।' রঘু কথা না বাড়িয়ে প্লাটফরমের সামনের দিকে চলে এল। রঘু ভাবলো যাত্রীটার এত রাতে কোন ধান্দা আছে। নাহলে অন্ধকারে ঐ কাউন্টারের ওখানে এতক্ষণ কেন? ব্যাটা বহুত মতলববাজ। কোন মেয়েছেলের ব্যাপার থাকতে পারে? শালার কথা পর্যন্ত আড়িয়ে যাচ্ছে। খুব গিলেছে আজ। কিছু খবর জন্য এসেছে। স্টেশন তো এখন সেন্টার। ছোড়দাবাবু এসে গেলে ব্যাটাকে বহুত গিড়াতাম।' ইতিমধ্যে দু-চারজন প্লাটফরমে এসে গেছে দেখে সেই লোকটা এক দুই তিন করে হাওয়া।

হৃদয়পুর থেকে মাইল চারেকের পথ কলকাতা বিমানবন্দর। প্রচণ্ড গর্জনে কয়েকটি জেট ছুটলো ল্যান্ড করার জন্য। একটি প্লেন রানওয়ের সঙ্গে এ্যাডজাস্ট করতে না পেরে চিলের মত বাঁদিকে কাত হয়ে প্রচন্ড গতিতে ছুটতে থাকে ওপরের দিকে। যাত্রীরা সকলে ঐ প্লেনটার খেলা দেখে সময় কাটায়। রঘু অতসত বোঝে না সেও ঐ খেলা দেখতে থাকে। একটি শিয়ালদামুখী গাড়ি এল আবার স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেল। যাত্রীরা নেমে বাড়ির পথ ধরলো।

রঘুর মায়ের নির্দেশ, 'অসীমের খবর নাও। কেন এত রাত হয় বুঝি না?' অসীম না-আসা পর্যন্ত চিন্তা দূর হবে না। তাই রঘু এসেছে ছোড়দাদাবাবুর খবর নিতে।

ছোড়দাদাবাবুর খবর নিতে এসে এক ঘন্টার ওপর স্টেশনে। রাত প্রায় দশটা হল। গাড়িও নিখোঁজ। রঘুর ভালো নাম শ্রীরঘু-নাথ রাউত। দেশ কটক জিলা। রঘুর প্রায় এক-পুরুষ কলকাতা বা তার আশেপাশে কেটেছে। রঘুর বাবা খুব ছোটবেলায় রঘুকে অসীমদের বাড়িতে রেখে গেছে। অসীমের বাবা নির্মলবাবুর ওপর অগাধ বিশ্বাস। অসীমের দু-এক বছরের বড় হবে রঘু. অসীমের সঙ্গে থেকে রঘু খুব প্র্যাকটিকাল হয়ে উঠেছে। কলকাতার জল একবার স্পর্শ করলেই 'সাফলা' নিশ্চিত। রঘুর তাই হয়েছে। কিন্তু রঘু বোকার ভান করে থাকে। আজকাল সর্বত্র বাড়ির চাকর বা অফিসের বেয়ারা ওরাই বাবু। রঘুকে দেখে মনে হয় একটা কেউকেটা।' বহুত চালু ছেলে রঘু। সময় পেলে খইনি হাতে নিয়ে ছোড়দাদাবাবুকে দিতে দিতে বেশ 'পলিটিক্যাল জ্ঞান দেয়।

দেখ ছোড়দাদাবাবু ওসব রাজনীতি টাজনীতি করে কোন সমস্যার সমাধান হবে না। আসলে ভগবানকে চেঞ্জ করতে হবে। সেই যে কয়েক হাজার বছর আগে আমাদের উপর যমরাজ হয়ে বসে আছে তার আর কোন পরিবর্তন নেই। ভগবান নিজে গুছিয়ে নিচ্ছে আর চামচাদের কিছু দিচ্ছে না। তোমার কপালে কাঁচকলাও জুটবে না। হঠাৎ অসীমের চোখে চোখ পড়তেই রঘু বুঝলো ছোটবাবু ঘাবড়ে গিয়েছে. কেটে পড়াই ভালো। রঘু হাসতে হাসতে ঘর ছেড়ে চলে গেল। কারণ রঘু অসীমের হাতে একবার হেভী ঝাড় খেয়েছিল। মাসের মাঝিনা রঘু পাড়ার গরীবদের কাছে সুদে খাটাতো। বিষয়টি অসীমের কানে আসে। সেই থেকে ছোটবাবু বেগে গেলে রঘু পালিয়ে যায়।

নিখোঁজ গাড়ি ফিরে এল। দলে দলে যাত্রী নেমে বাড়ির পথ ধরলো।

ছোড়দাদাবাবু ফিরলো না। রঘু বাড়ির পথ ধরলো। বাড়ির কাছে এসে দেখল অনেকের ভীড়।

রঘুর দুশ্চিন্তা তাহলে ছোটবাবুর কি...? দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে দেখল ছোড়দাদাবাবুর মা কাঁদছে। অনেকেই সান্ত্বনা দিচ্ছে। 'দিদি গো তুমি কেঁদো

না।' বলাই ব্যারিস্টার দাঁড় করিয়ে জামিন নেব।' ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বললে ছোট বদমাইসগুলো তো প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুলিশ তাদের পাকড়াও করতে পারে না?'

রঘু বুঝল ছোড়দাদাবাবু পুলিশ হাতাতে। রঘু বিড় বিড় করে বলতে থাকে 'পুলিশে ছুঁলে একশো আট-ঘা। কতবার বলেছি ওসব ছাড়ো। মুখ রঘুর কথা কে শোনে। এখন যাও গুলিশের লালকুঠি দেখে এস। দেখবে কেমন মজার পৃথিবী।' রঘুর চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে বড় ভালবাসত ও ছোড়দাদাবাবুকে।

রঘু পাড়ার নেতাদের চিনত। এক-জনকে বলল ঘটনা। নেতা উত্তর দিলেন, 'বিষয়টি কমিটিতে আলোচনা করে দেখব। এখনি কিছু বলতে পারছি না।'

রঘু বুঝলো সেই নেতাকে, 'বাবু জামিনের ব্যবস্থা হবে না? এতদিন তো আপনাদের কাজ করেছে।'

রঘুর উপর নেতা চটে গেল। রঘুকে বললো, 'তোমার বাবুকে বলো জামিনের ব্যবস্থা করতে। এই কথা বলে একটা নতুন অ্যামবাসাডর গাড়িতে উঠে রঘুর নাকের উপর দিয়ে চলে গেল। রঘু ফ্যাল ফ্যাল করে ঐ দিকে তাকিয়ে বলল, 'ত্যাগ স্বীকার না করলে বড় হওয়া যায় না। নেতা ত্যাগ স্বীকার করে আজ গাড়ি চড়ছেন। কাল হয়তো ছোড়দাদাবাবু চড়বেন। রঘু বাড়ি ফিরে এল।

অসীম বাপ-মায়ের সবেধন নীলমণি। ওর বাবা নির্মল সেন রেলের কেরাণী। মাইনে ও এদিক-ওদিক নিয়ে মাস গেলে শ-সাতেক টাকা পান। বেল ধর্মঘটে যোগ দিয়ে প্রায় মাস তিনেক সাসপেন্ড হয়েছিল। খুব সাধারণ জীবন যাপন। ছেলেটা এম-এ পাশ করলে সংসারের কিছু সুরাহা হতে পারে এই সব ভাবনাগুলো মনে দানা বেঁধে উঠছিল। অন্যদিনের মত সেদিনও রাত করে এলো। ফিরবার সময় পথেই খবর পেয়েছে। অসীমের মা কান্নাতে ভেঙে পড়লো। নির্মল-বাবু ধীর গতিতে ঘরে ঢুকে দেখে রঘু অসীমের ঘরে এটা-ওটা নিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছে। কতকগুলো ছেঁড়া পোস্টার, ভাঙা তুলি, বোতল ভর্তি বালি ভেসে চলেছে। বইপত্র ছড়ানো ছিটানো এধার ওধার হয়ে আছে। মার্কস। লেনিন, গান্ধীজীর ছিওরি মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। নির্মলবাবু ওসব দেখে রঘুকে কিছু না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। এতক্ষণে বাড়িটা ঠান্ডা হয়েছে। কেবল নিনু-কাকিমা বসে ছিল।

নিনু-কাকীমা নির্মলবাবুকে দেখে সামনের দিকে ঘোমটা টেনে দিয়ে বললো, নির্মলদা বউদি সর্বস্ব ত্যাগ করে অসীমকে মানুষ করছে। আজ পর্যন্ত একদিনও অসীমছাড়া হয়নি।'

রাত গভীর হয়েছে। পাড়াটা নিঝুম মেরে রয়েছে। শীত ওদের স্পর্শ করছে না। নিনু-কাকীমা পাই বলে উঠে রঘুকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ফিরল।

অসীম বাড়ি ফেরার পথে দীপার সঙ্গে দেখা করে ঘরে ফিরত। সেদিন দীপা ঝিমলীর কাছে খবর পেয়ে চমকে উঠল। ড্রেসিং টেবিল ছেড়ে উঠে এসে ঝিমলীকে বললো। কি হবে ঝিমলী পিসী' ওদের প্রেমের ঘটনা পাড়ার সকলেই জানত। বছর পাঁচেকের পরিচয় ওদের। সেই ক্লাস নাইন থেকে চলছে। রাতের ঘুম চলে গেল। এ-ঘর ও-ঘর পায়চারী করতে সুরু করলো। কি করবে ভেবে পায় না। শেষপর্যন্ত বিছানাতে একটা বই মুখের উপর রেখে চুপ করে শুয়ে রইলো। ঝিমলী রাতের খাবার টেবিলে সাজিয়ে চলে গেল।

সারাটা রাত বিছানাতে এ-পাশ আর ও-পাশ করেছে। ঘরের জিনিসপত্র সব এলোমেলো। অতীতের স্মৃতিগুলো ওর চোখের সামনে ভেসে বেড়ায়। ভোরের আলো ঘরের ঘুলঘুলি দিয়ে চোরের মত ঢোকে। দীপা বুঝলো রাত ভোর হল। দুটো চড়ুইয়ের কিচির মিচির শব্দে বিরক্ত হয়ে দরজা খুলে সামনের বারান্দায় এসে একটা বেঞ্চির উপর বসে বসে গতকালের ঘটনাটা এ্যাভয়েড করার চেষ্টা করলো, কিন্তু একটা অবরুদ্ধ যন্ত্রণা থেকে থেকে বুকের মধ্যে মোচড় দিতে থাকে। চোখের কোণায় অশ্রুর চিহ্ন। চুলগুলো এলোমেলো হয়ে মুখের অর্ধেক ঢেকে রেখেছে। অতীতের দিনগুলি ওর মনে বার বার আঘাত করতে থাকে। ও কিছুটা আন-ইজি ফিল করে। ভেবেই পায় না কেন এমন হলো।

বাইরেও ভাল লাগছে না।'

দীপা ঘরে এল। ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখে সবকিছু অগোছালো। কলেজের বইপত্র চারিদিকে পড়ে আছে। অন্যদিন ড্রেসিং টেবিলের পর্দা ওঠানো থাকে, সেদিন পর্দা ঝুলছিল। গত রাতে অসীম অসেনি ড্রেসিং আয়নার পর্দাও ওঠেনি। দীপা সাজতে ভীষণ ভালবাসত।

একদিন অসীম জানলায় মৃদুস্বরে ডাকল, 'এই দীপা, কি করছো?'

উত্তর না দিয়ে জানলায় এসে দাঁড়ালো। অসীমের চোখে চোখ রেখে বললো, এ সবই তোমার জন্য।'

অসীম মৃদু হেসে উত্তর দিলো, 'কি জানি মেয়েদের মন বুঝি না।'

দীপা ভো বেগে লাল। লাল মুখখানি নিয়ে ভাগর চোখে অসীমের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো।

অসীম নিজেকে সামলে নিয়ে দীপাকে বললো, বড় শীত, আজ চলি।'

না— আগে বলো আর কতদিন লুকিয়ে থাকবে? অসীমের হাত ধরে রাখে দীপা। নিরুপায় হয়ে অসীম উত্তর দিল যতদিন চাকরি না পাই'। অভিমান করে বলেছিল চাকরি খুঁজবে, না আন্দোলন করবে? তোমার মত ছেলে চাকরি পায় না, এটা হতে পারে না।

অসীমের ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে বারণ করে। এটা কাশিয়া বা চীন নয় যে চাকরী আমাদের ডাকবে? এ একটা অন্য দেশ। এখানে চাকরিকে আমরা ডাকি.... বুঝলে....বুঝলে দীপা।'

অবুঝ দীপা উত্তেজিত হয়ে বললো, 'ওসব জানিনে, ইমিডিয়েট এ্যারেঞ্জমেন্ট করো। না হলে আমার বাবা....।

দীপার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে উত্তর দিল, 'ভীষণ শীত। এখন টা টা। পরে ফাইনাল। যাওয়ার সময় হাতটা টিপে দিয়ে চলে গেল। দীপার শেষ কথাটি অসীম বুঝতে পারলো না। দীপার বাবা সরকারের আন্ডার টেকিং কোম্পানীর বড় অফিসার। অসীমের পাড়ার প্রথম সারির প্রথম বিত্তবান বাড়ি। ভদ্রলোকের দুটিই মেয়ে। দীপা আর বীতা। দীপা বড় মেয়ে। বিয়ের চেষ্টা চলছে। ভাল পাত্র জুটলে সামনের বৈশাখে পার করবেন।

সেদিন শেষ দেখা। দীপার চোখের সামনে ফুটে উঠল প্রথম আলাপের দিনটি। দীপাই প্রথম এগিয়ে এসে পরিচয় করে। স্কুলের যাওয়ার রাস্তায় ডাকলো, 'অসীমদা কোথায় চললে?' উত্তর এলো, কলেজে।' সেই থেকেই চলছে। অনেক কথাই ওর মনে পড়ে।

একদিন ফিল্ম দেখার নাম করে বাড়ি থেকে এসে অসীমের সঙ্গে একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতায় গিয়েছিল। শ্রোতাদের সামনে বসে দীপা ডিবেটের মজা দেখতে থাকল। 'উদ্বাস্তু সমস্যা জাতীয় সমস্যা না স্টেট প্রবলেম।' কঠিন প্রতিযোগিতা। অনেকটা শীল্ডের নক-আউট গেমের মত। প্রতি রাউন্ডে দশ মিনিট সময়। সব ডিবেটকে হারিয়ে ফাইনালে শ্রীমতী তপতী দাস বনাম শ্রীঅসীম সেন। লড়াই সুরু হলো। মাঝে মাঝে প্রচন্ড হাততালি আর হাসির রোলের মধ্যে ওদের বক্তব্য শোনা যায় না। তপতীর বক্তব্য স্পষ্ট, উদ্বাস্তু সমস্যা জাতীয় হলেও রাজ্যগুলিকে সমাধান করার কথা ভাবতে হবে। সীমানা ভাগ হওয়ার পরে যে রাজ্যের অধিবাসী উদ্বাস্তু হয়ে আসছে দায়িত্বটা কি সেই রাজ্য সরকারের নয়? সমস্যা সমাধানের রাজ্যগুলি কেন্দ্রের কাছে আর্থিক সাহায্য চাইতে পারে কিন্তু এক রাজ্যের উদ্বাস্তুর দায়িত্ব অন্য রাজ্য নেবে কেন?

তপতীকে বাধা দিয়ে অসীম সুরু করলো, বন্ধুগণ, আমার বান্ধবী সমস্যাটির গভীরে না গিয়ে ওপরে ওপরে অবাস্তব যুক্তিগুলিকে খাড়া করবার চেষ্টা করছে। আমাদের দেশ এক এবং অখণ্ড আমরা কোন স্টেটের নাগরিক নয়। আমরা একটি গোটা দেশের নাগরিক। ছোট-বড় অনেকগুলি স্টেট নিয়ে গঠিত আমাদের দেশ। কেউ বলা ফেডারেল, আবার কেউ বলেন ইউনিটারি। একটা দেশের সমস্যা সেটা সব সময় ন্যাশনাল প্রবলেম। আমার বান্ধবীর বক্তব্য কনস্ট্রাডিকটরি। সব ব্যাপারটাকে পাল্টিয়ে ফেলেছেন।

তপতী বোধহয় লাফ দিয়ে বললেন, উদ্বাস্তু আমরা বলি কেন? উদ্বাস্তু

কথাটি কি কোন দেশের নাগরিক আখ্যা? তপতী ক্রমশ অসীমের যুক্তির জালে জড়িয়ে যেতে বসেছে। অবচেতন মনে মেনে নিল উদ্বাস্তু সমস্যা জাতীয় সমস্যা।

অসীম আবার বলতে সুরু করলো উদ্বাস্তু কথাটি খারাপ লাগলেও বলতে হচ্ছে। স্বাধীনতার পববর্তীকালে দেশ ভাগ হয় তখন ওরা পূর্ব বাংলার মানুষ, কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে থাকে। যেহেতু সেই দেশে ওরা থাকতে পারলো না বা নাগরিকত্ব ছেড়ে চলে এলো তখন ওদের ডেফিনেশন উদ্বাস্তু হল।

তপতী বাধা দিয়ে বলে, 'ওদের, যাযাবর বলা উচিত। কারণ ওরা নিজেদের ইচ্ছেমত একমুঠো অন্নের জন্য ভিটেবাড়ি ছেড়ে এর দুয়ারে, তার দুয়ারে ঘুরছে। ওদের বক্তের সঙ্গে বাংলাভাষা, বাঙ্গালীর মাটির সম্পর্ক রয়েছে, তাই ওরা অন্য রাজ্যে থাকতে চাইছে না, এমনও তো হতে পারে? আমার বন্ধু কি বলেন।

অসীমের বক্তব্য রাজ্যের হাতে যদি অর্থ না থাকে, জমি না থাকে চাকরি দেবার সুযোগ না থাকে, তবে কি করে এ মাটির সঙ্গে তারা সম্পর্ক রাখবে? আমার মনে হয় তপতী সুকৌশলে প্রতিশ্রুতিযাতিক্রমকে ডেকে আনছেন। আসলে গোটা দেশের প্রশ্ন জাতীয় প্রশ্ন এবং তা রাজ্যের উর্ধ্বে থাকা উচিত। তাই বলে আমি বলতে চাই না, কোন অবস্থায় পচে পচে ওরা মরুক। এটা তো আদিম যুগ নয় যে অতীতে প্রাচ্য দেশগুলি ফড়ের সাহায্যে মানুষ দিনে দিনে-রাতে আঠারো ঘন্টা বেগার খাটাতো। অত্যাচার করতো। এখন সমাজ বদল হয়েছে। প্রায় সব দেশ নতুন সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত; সুতরাং এখন এ-সব ভাবতে চাই না। এসব সমস্যা জাতীয় সমস্যা, সুতরাং জাতীয় স্তরেই আলোচিত হওয়া উচিত। আমার তো তাই মনে হয়। সরকারের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্যাপারটিতে নাক গলাতে চাই না।

জাজ্ ঘোষণা করলেন সমাপ্ত। অসীম ফাইনালে বিজয়ী হিসাবে চিহ্নিত হলেন। দীপার মনে আনন্দের ঝড় বয়ে গেল।

এসব ছোট বড় ঘটনা দীপার মনের কোটরে ভেসে বেড়াতে থাকে।

ঝিমলী পিসী একটু শোনো, মৃদু-স্বরে, ডাকল দীপা।

সব কাজ বুঝিয়ে দিল। অসীমের বাড়ির খবর নিল। ঝিমলী দীপার বাবাকে দাদা বলতো, তাই এই সম্পর্ক। ওদের এই প্রেমের বিষয়টি ঝিমলী জানত। বেলা বাড়তে থাকে। বৌদ্ধ এসে দীপার ঘরের বিছানার উপর পড়েছে। সকালের ব্রেকফাস্ট সেরে নিল। হাত বাড়িয়ে জানলার পর্দা টেনে দিল। এক কথায় স্টাইলিস্ট গার্ল, সবসময় টিপটাপ থাকতে ভালবাসে। দুদিন হল মনমরা হয়ে পড়ে রয়েছে।

ওদিকে নির্মলবাবু নিজের খরচে এক নামজাদা ব্যারিস্টার দাঁড় করালেন কোর্টে। গোটা আবেদন নামঞ্জুর হল। অর্ডার হল জে-সি অর্থাৎ জেল কাস্টোডি।

নির্মলবাবুর চোখে জল। ওর মাকে বাড়ি গিয়ে কি বলবেন।

একটা কথা আছে, আউট অফ সাইট, আউট অফ মাইন্ড। দীপারও তাই মনে হল। ধীরে ধীরে পুরনো স্মৃতি মন থেকে সরে যেতে থাকল। বাবার দেওয়া টোপ খুব সহজে গিললো দীপা। ভালো বর কে না চায়। বেশ জামজমক করে দীপার বিয়ে হয়ে গেল। পাত্র টাটার চাকুরে। ইনজিনিয়ার। আড়াই হাজার টাকা বেতন। দারুন ব্যাপার দীপার কাছে।

বিয়ের পরে ঝিমলী একজন প্রতিবেশীকে বলেছিল 'মেয়েরা ভালো বর পেলে, অর্থ পেলে পুরোনো প্রেম তো দূরঅস্ত বাবা-মাকেও ভুলে যায়।' মেয়ে জাতের যে কত ঢঙ! তিন বছর ধরে অসীমকে নাচিয়ে লম্বজাব মাথা খেয়ে ড্যাং ড্যাং করতে করতে চললো। আবার যাওয়ার সময় আমার হাতে একটা চিঠি দিয়ে বলে গেল অসীম যদি কোনদিন আসে দিও। মরণ আর কি।

প্রায় এগারো মাস পার করে অসীম ঘরে ফিরল। অত সুন্দর স্বাস্থ্য ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। গালভর্তি দাড়িগোঁফ। বড় তামাটে মেরে গেছে। গলার স্বর যেমন ছিল ঠিক তেমনই আছে। হঠাৎ ছাড়া পেয়ে গেল। বিলিজ অর্ডার হাতে নিয়ে ওর মনে পড়ছে মুকীত ওরে মুকীত কোথায় পাবি?'। সাবজেলারের কাছ থেকে আটআনা পয়সা নিয়ে তবে বাড়ি ফিরেছে।

প্রথমেই মাকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'মা ভালো আছো'? মায়ের চোখেমুখে আনন্দের আভাস। কতদিন পরে আবার অসীমকে পেলো। এতদিনে মায়ের বাধ্যক্যের ছাপ ফুটে উঠেছে। ছোট ছোট পায়ে এগিয়ে বাবার কাছে এসে দাঁড়ালো। বাবা বললেন, তোমার স্বাস্থ্য খুব ভেঙেছে দেখছি। অসীম উত্তর দিল 'না তেমন নয়। তবে ওটা তো জেল নয় মানুষ মারা কল। ওখানে যাকে ঢুকিয়ে দেবে সেই শুকিয়ে মরতে বসবে। অনেকটা হিটলারের গ্যাস চেম্বারের মত।

বাবা আর কিছুই বললেন না, বুঝলেন অসীম একইরকম আছে। পরিবর্তন হয়নি। অসীম নিজের ঘরে এসে দেখল রঘু ঘুমোচ্ছে। বিরক্ত না করে বেরিয়ে স্নান খাওয়া সারতে চলে গেল। বেলা গড়িয়ে গড়িয়ে দুটো হয়েছে।

রঘুর ঘুম ভাঙলে শোনে ছোট-দাদাবাবু এসেছে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে রান্না ঘরে এসে দেখে মায়ের কাছে বসে গল্প করছেন। খাওয়া অনেক আগেই শেষ হয়েছে।

রঘু দাদাবাবুর কাছে বসে পড়ল। মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে মুচকে মুচকে হাসতে থাকে। সবই অদৃষ্ট।

অসীম কথা শেষ করে নিজের ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ে। মনে মনে ঠিক করে নিল সন্ধ্যের পর দীপার সঙ্গে দেখা করবে। রঘুকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, 'দীপার খবর কিছু জানিস?, রঘু উত্তর দিল, 'সব শেষ, দাদাবাবু সব শেষ' দীপাদি শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে। কথা শুনে অসীম চমকে উঠল। ওর হৃদয়ের ভিতর একটা অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে। ক্লান্ত অসীম কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে তা জানে না। ওর মনের ভিতরে যে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হলো তা আর কোনদিন ভরাট হবার নয়।

ঘুম ভাঙলো। অসীম চারিদিকে তাকিয়ে দেখে কোথায় কেউ নেই। সূর্য অস্ত গেছে। সন্ধ্যের আলো ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে বুকসেফটার বইগুলোর উপর চোখ পড়লো দরজার উপরে রবীন্দ্রনাথের বাঁধানো ছবিতে আবর্জনার স্তূপ হয়ে রয়েছে। মনে মনে রঘুর উপর রাগ হল। রঘু ঘরটাকে পর্যন্ত দেখিনি। ঘরের আনাচে কানাচে সিগারেটের টুকরো পড়ে রয়েছে। এসব হারামজাদা রঘুর কাজ। ব্যাটা ফাঁকা ঘরে খুব দম দিয়েছে। খুব দ্রুত নিজেকে সামলে দিয়ে ঘর-সাফ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বুক সেফটা গোছাতে এসে 'স্টেট এ্যান্ড রেভুলেশন' বইটা টেনে নিয়ে দুএক পাতা নেড়ে চেড়ে রেখে দেয়।

পূর্ণিমা তিথি। চাঁদের আলোয় ঘর ভরে গেছে। ও মনে মনে বলতে থাকে 'পূর্ণিমার' চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি'। এমন ক্ষণে ঝিমলী এসে অসীমকে দীপার দেওয়া সেই চিঠিটা দিয়ে বিদায় নিল। চিঠিতে লেখা আছে—

প্রিয় অসীম,

ক্ষমা করো। বাবার কাছে হার মেনে বিয়েতে মত দিলাম। তোমার দীর্ঘ অনুপস্থিতি এর একমাত্র কারণ। সাহস হারিয়ে ফেলেছি। তবু তোমার নাম প্রস্তাব করে সমর্থন পায়নি। সম্পূর্ণ নিরুপায় হয়ে অন্যের ভালবাসা গ্রহণ করলাম। তোমার সঙ্গে দেখা হলে আমার চোখের অশ্রু বাধা মানবে না সে জলে তোমাকেই ভাসিয়ে নিয়ে চিরকালের মত বিদায় নেব। সব নিতে [illegible] কিন্তু মনটাকে কেউ নিতে পারে? ভালবাসা নিও।

ইতি তোমার দীপা।

রাত ভোর হল। সারাটা রাত ও যন্ত্রণায় ছটফট করেছে। মনে মনে স্থির করেছে একটি চাকরি যেভাবে হোক জোটাতে হবে। সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ল এমপ্লয়মেন্ট কেন্দ্রে। ওখানে বড় বড় প্লানের কথা লেখা। ওর কাঁধে একটি ঝুলন্ত ব্যাগ। শান্তিনিকেতনের কাজ করা। নানা জিনিষ পত্র ওই ব্যাগের ভিতরে ভর্তি। হাঁটতে সুরু করলো কাউন্সিল হাউস স্ট্রীট ধরে এ-মি বেঙ্গলের সামনে দিয়ে সোজা আকাশবাণী। বাঁদিকে মোড় নিয়ে গড়ের মাঠের দিকে। বড় রাস্তা জ্যাম। বিরাট মিছিল চলেছে ময়দানের দিকে। তুলছে 'শিক্ষা শেষে চাকরি দাও'। মিছি অনেকেই চেনাজানা। কখন যে ওর হাত মিছিলে টেনে নিয়েছে, অসীম পারে নি।

এইভাবেই বোধহয় ও দীপাকে ভু চেষ্টা করলো না কি, কে জানে।

খেলা

কমনওয়েলথ গেমস

কানাডার এডমন্টনে একাদশ কমনওয়েলথ গেমসের চূড়ান্ত পদক তালিকায় প্রথম স্থান পেয়েছে উদ্যোক্তা দেশ কানাডা, দ্বিতীয় স্থান ইংল্যান্ড এবং তৃতীয় স্থান অস্ট্রেলিয়া। ১৯৭৪ সালের আসরে অস্ট্রেলিয়া প্রথম, ইংল্যান্ড দ্বিতীয় এবং কানাডা তৃতীয় স্থান পেয়েছিল। গতবারের ৬ষ্ঠ স্থানাধিকারী ভারত এবারও ৬ষ্ঠ স্থান পেয়েছে। এমনকি ভারতের মোট পদক সংখ্যা গতবারের মত এবারও ১৫।

অ্যাথলেটিকসে ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার দৌড়ে একজনের পক্ষে স্বর্ণ পদক জয় বিরাট কৃতিত্বের পরিচায়ক। গতবার (১৯৭৪ সালে) পুরুষ বিভাগে জ্যামাইকার ডন কুয়ারী এবং মহিলা বিভাগে অস্ট্রেলিয়ার রেলিন বয়েল ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণ পদক জয়ের সূত্রে ডাবল খেতাব জয়ী হয়েছিলেন। এবার কেউ তা পাবেননি। এবারও পুরুষ বিভাগে ডন কুয়ারী ১০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণ পদক জয়ী হন। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য ২০০ মিটার দৌড়ের সেমি-ফাইনালে মাংসপেশীর টানে আক্রান্ত হয়ে গড়াতে উনি শেষ পর্যন্ত ফাইনালে উঠতে পারেননি। মেয়েদের ১০০ মিটার দৌড়ে ইংল্যান্ডের সোনিয়া লানাম্যান গতবারের স্বর্ণ পদক বিজয়িনী অস্ট্রেলিয়ার রেলিন বয়েলকে দ্বিতীয় স্থানে রেখে স্বর্ণ পদক জয় করেন। কিন্তু ২০০ মিটার দৌড়ে রৌপ্য পদক পাওয়াতে তাঁর কপালে ডাবল খেতাব জোটেনি। পুরুষদের ১,৫০০ মিটার দৌড়ে ইংল্যান্ডের ২৫ বছরের স্কুল শিক্ষক ডেভিড মরক্রফ্ট বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টা গতবারের বিজয়ী তানজানিয়ার ফিলবার্ট বেযিকে হারিয়ে স্বর্ণ পদক জয়ী হন এবং রাতারাতি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন। ডেকাথলনে ইংল্যান্ডের ডেভে টমসনের স্বর্ণ পদক জয়ও এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তিনি ডেকাথলনে ৮৪৬৭ পয়েন্ট সংগ্রহ করেন। ডেকাথলনে বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টা আমেরিকার বুশ জেনারের সংগৃহীত পয়েন্ট ৮,৬১৮। পয়েন্টের তালিকায় টমসনের স্থান এখন তৃতীয়। কেনিয়ার হেনরী রোনো খুব সহজেই ৫,০০০ মিটার দৌড় এবং ৩,০০০ মিটার স্টিপল চেজে স্বর্ণ পদক জয়ী হন। কিন্তু এই দুই বিভাগে তাঁর যে বিশ্ব রেকর্ড আছে তা তিনি এই আসরে ভাঙ্গতে পারেননি।

সাঁতারে বিরাট সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে কানাডা। সাঁতারে মাত্র এই চারটি দেশ স্বর্ণ পদক পেয়েছে—কানাডা ১৫, অস্ট্রেলিয়া ১০, ইংল্যান্ড ২ এবং নিউজিল্যান্ড ২। সাঁতারে কানাডার মোট পদক ৩২—স্বর্ণ ১৫, রৌপ্য ৮ এবং ব্রোঞ্জ ১। স্বদেশের মোট ৪৫টা স্বর্ণ পদকের মধ্যে কানাডার সাঁতারুরা ১৫টা স্বর্ণ পদক সংগ্রহ করে দেন। শুধু কি তাই। কানাডার ২০ বছরের সাঁতারু গ্রাহাম স্মিথ ৬টা স্বর্ণ পদক জয়ের সূত্রে কমনওয়েলথ গেমসের সাঁতারের ইতিহাসে একটি আসরে সর্বাধিক স্বর্ণ পদক জয়ের রেকর্ড করেছেন। গ্রাহাম স্মিথ স্বর্ণ পদক পেয়েছেন—১০০ ও ২০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক, ২০০ ও ৪০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলি, ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইল এবং ৪×১০০ মিটার মেডলি রিলেতে। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৬৬ সালের কমনওয়েলথ গেমস আসরে কানাডারই ১৬ বছরের সাঁতারু এলাইন ট্যানার মোট ৭টা পদক (স্বর্ণ ৪ ও রৌপ্য ৩) জয়ের সূত্রে একটি আসরে সর্বাধিক পদক জয়ের যে রেকর্ড গড়েছিলেন তা আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

এবারের কমনওয়েলথ গেমসের আসরে মাত্র একটা বিশ্বরেকর্ড হয়েছে। মেয়েদের ৮০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে অস্ট্রেলিয়ার টেসিস উইকহ্যাম ৮ মিনিট ২৪-৬২ সেকেন্ডে দূরত্ব অতিক্রম করে স্বপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ব-রেকর্ড ভেঙেছিলেন।

সাঁতারের মত কুস্তিতেও কানাডা প্রাধান্য বিস্তার করেছিল—মোট পদক ৯ (স্বর্ণ ৬ ও রৌপ্য ৩)। কুস্তির ১০টি স্বর্ণ পদক এই তিনটি দেশ ভাগাভাগি করে নিয়েছিল—কানাডা ৬, ভারত ৩ এবং অস্ট্রেলিয়া ১।

একাদশ কমনওয়েলথ গেমসে ভারত মোট ১৫টি পদক জয়ী হয়—স্বর্ণ ৫, রৌপ্য ৪ ও ব্রোঞ্জ ৬। ভারতের এই ১৫টি পদকের মধ্যে কুস্তি থেকেই আসে নয়টি পদক—স্বর্ণ ৩, রৌপ্য ৩, ও ব্রোঞ্জ ৩। গতবারের মত এবারও কুস্তিগীররাই ভারতের মুখ রেখেছেন। এগারোজনের ভারতীয় অ্যাথলেটিকস দলটি মাত্র একটি ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। এই ব্রোঞ্জ পদকটি সংগ্রহ করেন সুরেশবাবু লং জাম্পে। ৭-৯৪ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে।

ভারতের পদক জয়ের খতিয়ান

স্বর্ণ ৫ (কুস্তি ৩, ব্যাডমিন্টন ১ ও ভারোত্তোলন ১)

কুস্তিতে স্বর্ণ পদক জয়ী হন লাইট ফ্লাইওয়েটে অশোককুমার, ব্যান্টমওয়েটে সতপ্পীর সিং এবং ওয়েল্টারওয়েটে রাজেন্দর সিং।

ব্যাডমিন্টনে পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনাল যুদ্ধে শীর্ষ বাছাই প্রকাশ পাড়ুকোন ১৫-৯ ও ১৫-৮ পয়েন্টে ইংল্যান্ডে ডেবেক চ্যালেঞ্জারকে পরাজিত করে স্বর্ণ পদক জয়ী হন। ভারোত্তোলনের ফ্লাইওয়েট বিভাগে এগারজন কৃতিগরের ভারতের পক্ষে প্রথম স্বর্ণ পদক জয় করেন। রৌপ্য ৪ (কুস্তি ৩ এবং ভারোত্তোলন ১)।

কুস্তিতে রৌপ্য পদক জয়ী হন ফ্লাইওয়েটে সুদেশকুমার, ফেদারওয়েটে জগমিন্দার সিং এবং ১০০ কেজিতে সতপাল সিং।

ভারোত্তোলনের ৫৬ কেজি বিভাগে জামিল সেলভম রৌপ্য পদক জয়ী হন।

ব্রোঞ্জ ৬ (কুস্তি ৩, ব্যাডমিন্টন ১, লং জাম্প ১, বকসিং ১)

কুস্তিতে ব্রোঞ্জ পদক জয়ী হন লাইটওয়েল্টারে জগদীশকুমার, লাইট হেভীওয়েটে কার্তার সিং এবং হেভীওয়েটে ঈশ্বর সিং।

ব্যাডমিন্টনে মেয়েদের ডাবলসে ব্রোঞ্জ পদক পান আমি ঘিয়া এবং কানওয়াল ঠাকুর সিং।

লং জাম্পে ৭-৯৪ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে ব্রোঞ্জ পদক পান সুরেশবাবু।

বকসিংয়ের লাইট ফ্লাইওয়েটে ব্রোঞ্জ পদক পান বীরেন্দার সিং থাপা।

চূড়ান্ত পদক তালিকা
(প্রথম দশটি দেশ)

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
কানাডা	৪৫	৩১	৩৩
ইংল্যান্ড	২৭	২৮	৩২
অস্ট্রেলিয়া	২৪	৩৩	২৭
কেনিয়া	৭	৬	৫
নিউজিল্যান্ড	৫	৬	৯
ভারত	৫	৪	৬
স্কটল্যান্ড	৩	৬	৫
জামাইকা	২	২	৩
ওয়েলস	২	১	৫
আয়ারল্যান্ড	২	১	২

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

১৯৭৮ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান অপরাজিত অবস্থায় লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। এই নিয়ে তারা ১৬ বার প্রথম বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ান হল এবং অপরাজিত অবস্থায় লীগ বিজয়ী হল ৪ বার। এ বছরের লীগের শেষ খেলায় জর্জ টেলিগ্রাফ দলের সঙ্গে ১—১ গোলে খেলা ড্র করার ফলে সমস্ত খেলায় জিতে লীগ বিজয়ের সাধ তাদের অপূর্ণ থেকেই গেল। জর্জ টেলি-গ্রাফ দলের বিপক্ষে মোহনবাগান তাদের লীগের শেষ খেলায় পূর্ণ শক্তি নিয়ে নামে নি। অধিনায়ক প্রসূন ব্যানার্জি, হাবিব, আকবর এবং গোলরক্ষক শিবাজী ব্যানার্জি এই শেষ খেলায় দলে ছিলেন না। এ বছরের লীগের ২২টা খেলায় মোহনবাগানের জয় ২১ এবং ড্র ১। তারা ৭৯টা গোল দিয়ে মাত্র গোল খেয়েছে। সিঙ্গল লীগের খেলায় এর আগে কোন দল ২২টা খেলায় ৭১ গোল দিতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে মোহনবাগান ২১টা খেলায় ৭৯ গোল দিয়েছে। কারণ কালী-ঘাটের সঙ্গে মোহনবাগানের খেলাই হয়নি।

১৯৭৮ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় বানার্স আপ হয়েছে গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল ৩৯ পয়েন্ট) এবং তৃতীয় স্থান পেয়েছে মহমেডান স্পোর্টিং (৩৬ পয়েন্ট)। লীগ তালিকার বাটা সর্বনিম্ন স্থান পাওয়াতে আগামী বছর তাদের দ্বিতীয় বিভাগে খেলতে হবে।

দর্শক

সাবাস পাড়ুকোন

কমনওয়েলথ গেমস-এ ভারতের প্রকাশ পাড়ুকোন ব্যাডমিন্টনে পুরুষদের সিঙ্গলস-এ সোনা জিতে এনেছেন। আন্তর্জাতিক মানের প্রতিযোগিতাগুলিতে পায় ক্ষেত্রেই ভারতের ফলাফল যখন আমাদের নৈরাশ্যের অন্ধকারে ডুবিয়ে দিচ্ছে, সেই মুহূর্তে প্রকাশের স্বমহিমায় এই প্রকাশিত হওয়ার ঘটনাটি প্রশংসার তো বটেই আমাদের ক্ষেত্রেও অনেকটাই আশাব্যঞ্জক। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে সেমি ফাইনাল খেলায় পাড়ুকোন ইংলন্ডের রে স্টিভেন্সকে ১৫-০ ১৫-৭ পয়েন্টে হারিয়েছিলেন।

ফাইনাল খেলায় প্রকাশ যেন স্বমহিমায় প্রকাশিত হওয়ার সংকল্প নিয়েই খেলতে নেমেছিলেন। ক্রাইস্টচার্চে গতবারের খেলা এই দুবলত ট্যালবটসই প্রকাশকে রুখে দিয়েছিলেন। কোয়ার্টার ফাইনালের বেড ড্রিংকেতে দেননি। প্রকাশকে হার মানতে হয়েছিল। এবারের খেলায় সেই পরাজয়ের স্মৃতি ভার মানসিকতার বিন্দুমাত্র চাপ তৈরি করতে পেরেছিল বলে মনে হয় না। বরং তার অনায়াস আচরণে সেবারের হারের একটা যোগ্য জবাব দেওয়ার সংকল্পই সম্ভবত কাজ করছিল। দুরন্ত সাহস আর দুর্জয় মনোবল মূলধন করে প্রকাশ নেমেছিলেন স্বর্ণ জিতে নেবার প্রতিজ্ঞায়। রীতিমত লড়াকু মেজাজে দাপটে লড়াই করেছেন।

রণক্ষেত্রে স্বমহিমায় প্রকাশিত থেকেছেন সর্বক্ষণ। যোগ্যতার পরিচয় আদায় করে নিয়েছেন ব্যাডমিন্টনের অভিজাতবাদী সম্রাট হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে। আর বলাই বাহুল্য সে সম্মান অর্জন সম্ভব হয়েছে রীতিমত লড়াইয়ের বিনিময়ে। এই সঙ্গে প্রকাশ গতবারের পরাজয়েরও একটা যোগ্য জবাব দিয়ে দিয়েছেন।

মারমুখী খেলা প্রকাশ শুরু থেকেই শুরু করেছিলেন। জয়ের প্রতিজ্ঞায় অটল প্রকাশের সে খেলায় ট্যালবটস রীতিমত বিপর্যস্ত। ০-৫ পয়েন্টে পিছিয়ে পড়ে ট্যালবটস একসময় অবশ্য ৯-৯ পর্যন্ত এসে-ছিলেন। এরপর প্রকাশ তাঁকে সুযোগ দেন নি। প্রথম গেম ১৫-৯য়ে জিতে যান প্রকাশ। ট্যালবটস দ্বিতীয় গেম-এ দাঁতে দাঁত চেপে লড়াইয়ে খানিকটা ফিরে আসার চেষ্টা করেছিলেন। ৪-৩ পয়েন্ট পর্যন্ত এগিয়েও এসেছিলেন। কিন্তু প্রকাশ তখন রণং দেহি মূর্তিতে। তার দাপট আত্মবিশ্বাস ক্রীড়াকুশলতা সব মিলিয়ে ভাব খেলোয়াড়ী ভঙ্গিমা তখন রীতিমত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বক্তৃতের মধ্যে জয়ের দুর্বার আকাঙ্খা অবিরাম ঘোড়া ছোটাচ্ছে। দ্বিতীয় গেম প্রকাশ যেইমাত্র ১৫-৮ পয়েন্টে জিতলেন, সেই মুহূর্তেই তার গলায় দুলল স্বর্ণ-পদক—ভারতের হয়ে কমনওয়েলথ গেমস-এ ব্যাডমিন্টনে প্রকাশই যা প্রথমবার লড়াই করে জিতে আনল। এ পর্যন্ত কমনওয়েলথ-এ ব্যাডমিন্টনে একমাত্র পদক পেয়েছিলেন দীনেশ খান্না। উদ্দিশশো দেবটিতে তিনি ব্রোঞ্জ পদক এনেছিলেন ভারতের হয়ে। আশা করব প্রকাশের এ জয় ভারতের খেলোয়াড়দের মধ্যে বেশ খানিকটা আত্ম-বিশ্বাস ফিরিয়ে আনবে।

শীল্ডে বড় অতিথি 'আরারাত'

এ বছর কলকাতায় আই এফ এ শীল্ডে রাশিয়ার আরারাত দল খেলতে আসছে। এ বছরে শীল্ডের আসরে কলকাতার দর্শকের কাছে এটাই আপাতত সবচেয়ে বড় খবর। ভারতের অন্যান্য শক্তিশালী দলগুলো যেভাবে শীল্ডে খেলতে আসার ব্যাপারে উদাসীনতা দেখিয়ে আসছে গত কয়েক বছর ধরে তাতে শীল্ডের আকর্ষণ যে অনেকখানি কমেছে তা বলা বাহুল্য। কলকাতার দুই বড় দলের লড়াই ছাড়া শীল্ডে তেমন আকর্ষণীয় খেলা কলকাতার দর্শকের ভাগ্যে জোটেই না। অথচ কয়েক বছর আগেও একাধিক জমাটি খেলা হত। এ বছর শীল্ডে অন্তত দর্শকের কাছে আরারাত খানিকটা ভালো খেলা দেখার স্বপ্ন ঝুলিয়ে রাখতে পেরেছে।

আর্মেনিয়া সাধারণতন্ত্রের ইরেভান শহরে 'আরারাত' দলের ঠিকানা। ইউরোপে দলটি পরিচিত 'ইরেভান আরারাত' বলে। ১৯৩৭ থেকে দলটি সোভিয়েত চ্যাম্পিয়ন-শিপে খেলছে। সুপার লীগে ১৯৪৯ থেকে। ১৯৭৩-এ সোভিয়েত কাপ জয় আর জাতীয় লীগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সম্মান বগলদাবা করে গোল্ডেন ডাবল হয়। ১৯৭৬ সালে সোভিয়েট কাপ আর সোভিয়েত চ্যাম্পিয়ন-শিপের রানার্স ছিল আরারাত। পশ্চিম জার্মানীর বেয়ার্স দলে যখন পৃথিবী জোড়া নাম ডাকওয়ালা খেলোয়াড় বেকেন বাউয়ার হার্ড মুলার আরও কেউ কেউ ছিলেন তখনই 'আরারাত' তাদের কাবু করেছিল। গত ফুটবল মরশুমে সোভিয়েট সুপার লীগে আরারাতের জায়গা ছিল দশ নম্বর দল হিসেবে। দল ছিল ষোলটি। এ বছর সুপার লীগে আরারাত খেলছে। খেলা এখনও শেষ হয় নি। দেশের বাইরে ভাল খেলার সুনাম আছে আরারাতের। ইতিপূর্বে ফ্রান্স হাঙ্গেরী, ইরাক, সিরিয়া আর লেবাননে খেলে তার প্রমাণ রেখেছে দলটি। দেশের মাটিতে খেলেছে ভারত, জাপান, পাকিস্তান, পশ্চিম জার্মানী, ব্রাজিল প্রভৃতি দেশের সঙ্গে। আগামী পাঁচ কিংবা ছয় সেপ্টেম্বর আরারাত ইরেভান কলকাতার মাটিতে পা রাখবে। মাঠে নামবে ৮ সেপ্টেম্বর। ঐদিনই তাদের প্রথম খেলা। দলে আসছেন, আবুমিরান, আলেক্সোমান, বাগদাসারান, গিভরকিরান, খাচাতুরিন, সাকিসিয়ান, মেরেপিরান, বনদারেংকো, ফেরোপিয়ান, মেলিকিবাম, জাখারিয়ান, ওথনাসিয়ান, সাকিখান এবং পেত্রোসিয়ান। দলের অধিনায়ক লিংকম্যান আলেক্সোমান এবং গোলরক্ষক আবুমিরান জাতীয় দলে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। দলের বেশির ভাগ খেলোয়াড়ই ছাব্বিশ বছর বয়সী গড়-পড়তা বাইশের কাছাকাছি। আরারাতের প্রথম লড়াইয়ে মুখোমুখি হতে হবে সম্ভবত কলকাতার দুই প্রধানের এক প্রধান—ইস্টবেঙ্গলকে। মোহনবাগান অথবা ইস্টবেঙ্গল কোন্ দল সেমিফাইনালে আরারাতের মুখোমুখি হবে তাই নিয়ে লটারী হয়েছে। অন্যান্য বারের মত ছোট্ট কয়েক নাম-ডাকওয়ালা দলও শীল্ড প্রতি-যোগিতার জৌলুস বাড়াতে আসছে। এদের মধ্যে রয়েছে বাঙ্গালোরের সি আই এল এল আর ডি ই আর পাঞ্জাব পুলিশ। শীল্ডে যোগ দিচ্ছে মোট সাতচল্লিশটি দল।

লিংকম্যান

ভিনু আর নেই

এখনো চোখের সামনে ভাসছে ইডেনে তাঁর লেট্‌কাট করার দৃশ্য। মনে আছে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় 'লেট্ কাট' করতে গিয়েই তিনি চটপট আউট হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরের টেস্ট মাদ্রাজেই তাঁকে আবার দেখা গেল স্বমহিমায়। পঙ্কজ রায়কে সঙ্গে নিয়ে প্রথম উইকেট জুটিতে বিশ্ব রেকর্ড গড়লেন। ১৯৫৬ সালে তাঁদের সেই ৪১৩ রানের বিশ্ব রেকর্ড আজো কেউ ভাঙতে পারেন নি। সেই টেস্টে মানকাদ একাই করেছিলেন ২৩১ রান। আর পঙ্কজ রায় ১৭৩।

আরো একটি বিশ্ব রেকর্ড এখনো ভিনুর নামের পাশে অম্লান হয়ে আছে। বিশ্বের খেলোয়াড়দের মধ্যে টেস্ট ক্রিকেটে তিনিই দ্রুততম 'ডাবল' লাভ করেছিলেন। ১৯৫২ সালে মাত্র ২৩টি টেস্ট খেলেই তিনি করেছিলেন হাজার রান আর দখল করেছিলেন একশর ওপর উইকেট।

ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে তিনিই শুধু ইংলন্ড সফরে গিয়ে এক মরশুমে হাজারের ওপর রান ও একশর ওপর উইকেট লাভ করার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। এ সেই ১৯৪৬ সালের কথা। সেই মরশুমে তিনি করেছিলেন মোট ১১২০ রান আর পেয়েছিলেন ১২৯টি উইকেট।

ভিনু মানকাদ মোট ৯৭টি টেস্টের ১৫২টি ইনিংস খেলে করেছিলেন ২১০৯ রান। এর মধ্যে পাঁচটি ইনিংসে তিনি ছিলেন অপরাজিত। আর ৫২৩৫টি বল করে দখল করেছেন ১৬২টি উইকেট। উইকেট প্রতি যার গড় হিসেব দাঁড়ায় ৩২·৩১ রান।

পরিসংখ্যানের হিসেব দিয়ে ভিনু মানকাদকে চেনা যাবে না। নেভিল কার্ডাস একবার স্কোর বোর্ডকে গাধার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। কারণ স্কোর বোর্ডে শুধু ঐ রানটুকুই লেখা থাকে। কিন্তু সেখান থেকে হাজার চেষ্টা করেও পাওয়া যাবে না সেই রানের পেছনে ব্যাটসম্যানের মন ভোলানো খেলার কথা সে খেলার, সে মারের সৌন্দর্য দর্শকদের মন ভরে গিয়েছিল। যে খেলা দেখার স্মৃতি তাঁরা তাঁদের মনের মণি-কোঠায় সযত্নে রক্ষা করবেন।

তাই পরিসংখ্যানের আবরণ ছিন্ন করে আমরা যদি ভিনুকে বের করে আনি তাহলে দেখতে পাবো এক অনন্যসাধারণ পুরুষকে। যিনি চিরকাল সোজা হাতে ব্যাট করে গেছেন। হার মানেন নি কোনদিন। হার মানতে জানতেন না তিনি। তাই সেবার টুমম্যান যখন লীডস্ টেস্টে আগুন ছোটাচ্ছিলেন, তাঁর সেই দুরন্ত ফাস্ট বোলিংয়ের সামনে অসহায় হয়ে পড়ে ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা পিছু হটছিলেন তখন বুকে দাঁড়িয়েছিলেন ভিনু মানকাদ। ফ্রেডি টুমম্যান জুজুর ভয় থেকে সেদিন রক্ষা করেছিলেন ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের।

তারপর তিনি লর্ডস মাঠে যা খেলা খেললেন তার কাহিনী এখন বইতে বইতে জড়ানো। সেই টেস্টটি মানকাদের টেস্ট নামে পরিচিত। কি করেছিলেন মানকাদ সেই খেলায়? কি করেন নি সেটাই প্রশ্ন। তাঁর হাতের ব্যাট ঘুরেছে বন বন করে। রানের বন্যায় ভেসে গেছে লর্ডস মাঠ। মানকাদ প্রথম ইনিংসে ৭২ আর দ্বিতীয় ইনিংসে করেছিলেন ১৮৪ রান। তারপর তিনি বল হাতে নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা হাত ঘুরিয়েছেন। দু ইনিংস মিলিয়ে বল করেছেন মোট ৯৭ ওভার। খেলার প্রায় পঁচিশ ঘন্টার মধ্যে মানকাদ মাঠে কাটালেন কুড়ি ঘন্টা। এ তো এক অবিস্মরণীয় কাহিনী। তাঁর একার সামর্থ্যে তিনি সেদিন ধরেছিলেন পুরো ভারতীয় দলের হাল। কিন্তু লর্ডস মাঠে সঙ্গী হিসাবে ভিনু মানকাদ কাউকেই পান নি। ক্রিকেটে একার পক্ষে পুরো একটি দলের বিরুদ্ধে লড়া যায় না। তবু তিনি ইংলন্ডকে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। কি ভাবেই না। পিটিয়েছিলেন ইংলন্ডের দুর্ধর্ষ সব ফাস্ট বোলারদের। তিরিশ মিনিটে করলেন আটত্রিশ রান। ষাট মিনিটে সত্তর আর ১৪০ মিনিটে ১৫০ রান। চোখ ঝলসানো ব্যাটিংই বটে। যে টুমম্যানের ভয়ে তখন ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা কাঁপছিলেন সেই টুমম্যানের এক ওভারেই তিনি সতেরো রান করলেন—সেই ওভারে চার চার বার টুমম্যানকে পাঠালেন বাউন্ডারি সীমানার বাইরে।

সেবার তাঁর সেই অসাধারণ খেলাই তাঁকে এনে দিল উইসডেনের স্বীকৃতি। ১৯৪৭ সালে উইসডেন তাঁকে বছরের সেরা পাঁচজন খেলোয়াড়ের একজনের সম্মান দিল। মার এম সি সি তাঁকে দিল আজীবন সদস্যের সম্মান।

স্পিন বোলার হিসেবেই ভিনু মানকাদের পরিচয়, তাঁর মত নিপুণ বোলার বিশ্বে খুব কমই দেখা গেছে। কিন্তু স্পিনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি পেস বলও করতে পারতেন। বল করতে পারতেন দু হাতেই। পেস বল ডান হাতে আর স্পিন বাঁ হাতে। আর ব্যাট করতেন ডান হাতে।

শুধু অল রাউন্ডার হিসেবেই নয় অধিনায়ক হিসেবেও তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় তিনি ভারতের নেতৃত্ব করেছেন।

ভিনু মানকাদের জন্ম ১৯১৭ সালের ১২ এপ্রিল। মাত্র ১৮ বছর বয়সে প্রথম বম্বাই ট্রফিতে খেলতে নামেন 'ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া দলের পক্ষে। ১৯৩৭-৩৮ সালে লর্ড টেনিসনের দল এল ভারত সফরে। সেবারই তিনি প্রথম বে-সরকারী টেস্টে খেলার সুযোগ পেলেন। এবং সেই শুরু। তারপর থেকে তাঁকে বাদ দিয়ে ভারতীয় দল গড়ার কথা কেউ কোন দিন ভাবতেও পারে নি।

বিশ্ব যুদ্ধের পর ১৯৪৬ সালে ভারত গেল ইংলন্ড সফরে। সেবার জুন মাসের ২২ তারিখে ভিনু মানকাদ প্রথম সরকারী টেস্ট ম্যাচ খেলার সুযোগ পেলেন। সেবারই তিনি ইংলন্ডের দর্শকদের মাতিয়ে দিয়ে দেশে ফিরে এলেন। আর জীবনের শেষ টেস্ট খেললেন ১৯৫৯ সালে। দিল্লিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে খেলাই তাঁর জীবনের শেষ টেস্ট খেলা।

এই তেরো বছরের টেস্ট খেলোয়াড় জীবনে ভিনু মানকাদ ইংলন্ডের বিরুদ্ধে ১৯৪৬ সালে তিনটি, ১৯৫১ সালে পাঁচটি ও ১৯৫২ সালে তিনটি টেস্ট; অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৯৪৭ সালে পাঁচটি ও ১৯৫৬ সালে তিনটি, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ১৯৫৪ সালে পাঁচটি, ১৯৫৩ সালে পাঁচটি ও ১৯৫৮ সালে দুটি টেস্ট; পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১৯৫২ সালে চারটি, ও ১৯৫৫ সালে পাঁচটি টেস্ট এবং নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৯৫৫ সালে চারটি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন। এছাড়া খেলেছেন ১৯৩৭-৩৮ সালে লর্ড টেনিসনের দলের বিরুদ্ধে চারটি, ১৯৪৫ সালে অস্ট্রেলিয়ান সার্ভিসেস দলের বিরুদ্ধে দুটি, ১৯৪৯ সালে কমনওয়েলথ দলের বিরুদ্ধে চারটি, ১৯৫০ সালে দ্বিতীয় কমনওয়েলথ দলের বিরুদ্ধে পাঁচটি ও ১৯৬৩ সালে তৃতীয় কমনওয়েলথ দলের বিরুদ্ধে একটি বে-সরকারী টেস্ট ম্যাচ।

ভিনু টেস্ট খেলায় পাঁচটি সেঞ্চুরি করেছেন। সেগুলি হল ১৮৪ ইংলন্ডের বিরুদ্ধে ১৯৫২ সালে লর্ডসের দ্বিতীয় টেস্টে, ১১৬ রান অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৯৪৭ সালে মেলবোর্নে তৃতীয় টেস্টেও ১১১ রান অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে, ১৯৪৭ সালে মেলবোর্নের পঞ্চম টেস্টে, ২৩১ রান নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৯৫৫-৫৬ সালে মাদ্রাজের পঞ্চম টেস্টেও ২২৩ রান নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৯৫৫-৫৬ সালে বোম্বাইয়ের দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে।

গত দু বছর ধরে ভিনু মানকাদ অসুস্থ ছিলেন। দু দুবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তা ছাড়া আরো রোগ ছিল। বিগত কয়েক মাসে তাঁর শরীরটা খুবই ভেঙ্গে পড়েছিল। গত রবিবার ২০ আগস্ট রাত্তিরে হৃদরোগের প্রচন্ড আক্রমণের সঙ্গে শুরু হল মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ। সোমবার সকালে তাঁকে বোম্বাই হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং দুপুর সাড়ে তিনটে নাগাদ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

বোম্বাই সমাচার

গুজবে কান দেবেন না, গুজব রটাবেন না। অতি পরিচিত কটু কথা, কিন্তু কজনা মেনে চলেন? কারণ এক অদৃশ্য অন্ধবিশ্বাসে আমরা রটনাকে ঘটনার রূপ দিয়ে ফিস-ফিসিয়ে একে অপরের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলতে থাকি—যা রটে তার কিছুটা বটে। কিন্তু পাঠক-পাঠিকা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের অগণিত দর্শকদের আজ এমন গুজবের কথা শোনাবো যার পুরোটাই ঘটনা এবং নির্ভরযোগ্য সত্য।

অনেক দিন ধরেই বিভিন্ন সূত্র থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম, ভারতের বর্তমান মুষ্টি-মেয় কয়েকজন সুঅভিনেতাদের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য বিনোদ খান্না চলচ্চিত্র জগৎ থেকে বিদায় নিচ্ছেন। কোনো ক্রমেই বিশ্বাস করতে পারিনি—গুজব বলেই হেসে উড়িয়ে দিয়েছি। কারণ বর্তমানে এক নম্বর জনপ্রিয় অভিনেতার প্রতিযোগিতায় বিনোদের প্রতি-যোগী মাত্র একজন, অমিতাভ বচ্চন। খ্যাতি, যশ ও প্রতিপত্তির সুউচ্চ স্বর্ণশিখরে বসে কেইবা আর স্বেচ্ছায় নির্বাসনদণ্ড চায়। বারবার এ ধরনের গুজবের মুখোমুখি হয়েছি আমরা কখনও শুনেছি রাজেশ, কখনও ধর্মেন্দ্র কখনও হেমা কখনও শর্মিলা-রা পালা করে চলচ্চিত্র জগতের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন কিন্তু বাস্তবে কেউই ক্যামেরার মোহমুক্ত হতে পারেননি। গরম গরম খবরে চায়ের দোকান, কফি-হাউস, ফাটকা-বাজার ব্যস্ত হয়েছে। রংচংয়ের ফিল্মী পত্রিকারা হটকেকের মতো বিকিয়েছে রাস্তা-ঘাটে।

আসলে সম্ভব হয় না—রক্ত-মাংসের মানুষ তো! অর্থ ও যশলাভের প্রচেষ্টায় এ-ও এক ধরনের ফিকির। সেই পড়েননি রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটকের সেই কঠোর বাস্তব ঘোষা সংলাপ—মুকুট-পরা শকুত কিন্তু মুকুট ত্যাগ করা আরও কঠিন। তাই অতি সহজে আমরা এ ধরনের গুজবকে গুজবের আলমারীতেই বন্ধ করে রাখি—বাস্তব দুরবস্থ।

এবারে কিন্তু আর পারছি না গুজবকে গুজব বলে উড়িয়ে দিতে। আচার্য রজনীশের দীক্ষায় দীক্ষিত ও তার একান্ত ভক্তদের অন্যতম বিনোদ বেশ কিছুকাল ধরেই এক-দিকে যেমন অভিনেতারূপে দু-হাতে খ্যাতি কুড়োচ্ছিলেন অন্যদিকে তেমনই কেমন যেন শান্ত সমাহিত ভঙ্গিমায় বাস্তব জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত থেকে দূরে থেকে কিছু যেন খুঁজছিলেন। সর্বদাই গেরুয়া বসন পরিহিত বিনোদ সুযোগ পেলেই চলে যেতেন পুনাতে আচার্য রজনীশের আশ্রমে। এইভাবেই বাস্তব জগতের ইচ্ছে অনিচ্ছের সঙ্গে ঐশ্বরিক মুক্তির দ্বন্দ্ব চলছিলো দীর্ঘদিন। অব-শেষে অভিনেতা বিনোদের পরাজয় ঘটলো।

বিনোদ খান্না বিদায় নিচ্ছেন

গত ২ আগস্ট বোম্বের সেন্সর হোটেলে এক বিরাট সাংবাদিক সম্মেলনে বিনোদ করজোড়ে ঘোষণা করলেন যে তিনি সত্যি সত্যিই চলচ্চিত্র জগৎকে গুডবাই করে চলে যাচ্ছেন সপরিবারে পুনাতে, কারণ জীবনে যা যা পার্থিব বস্তু তিনি চেয়েছেন তার থেকে বেশীই পেয়েছেন—বিনোদ প্রেমী সমস্ত দর্শক, সাংবাদিক, প্রযোজক, পরিচালক ও অসংখ্য টেকনিশিয়ানদের কাছে তাঁর কৃতজ্ঞতার কথা জানিয়ে তিনি এবারে বিদায় চাইছেন—লক্ষ্য তাঁর আত্মিক মুক্তির জগৎ। নতুন যে সমস্ত ছবির জন্যে তিনি সম্প্রতি চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন সেই সমস্ত ছবিতে কাজ করতে না পারার অক্ষমতার কথা ঘোষণাও করেছেন সেদিন, তবে যেসব ছবি ফ্লোরে আছে এবং আংশিক অথবা প্রায় শেষ হতে চলেছে চুক্তি অনুযায়ী সে-সব ছবিতে কাজ করবেন তিনি। নতুন কোন ছবি আর নয়।

এ-খবর যতখানি মামুলী ভাবছেন ততখানি মামুলী কিন্তু নয়। ঝড় নেই জল নেই, শান্ত আবহাওয়া তবুও বাজ পড়লো যেন। অনেক প্রযোজকের মাথায় হাত, যারা বিনোদ খান্নাকে সাইন করে অনেক আগেই পরিবেশকের কাছ থেকে আগাম টাকা নিয়ে নিয়েছেন। তারা কেউ ছুটছেন অমিতাভের কাছে অথবা নিদেন পক্ষে শত্রু, জ্যানী কিংবা ধর্মেন্দ্রর কাছে। দৌড়োদৌড়ি শুরু হয়ে গেছে। আর বিনোদ খান্না সবার উদ্দেশ্যে হাত তুলে বলছেন—বিদায় চলচ্চিত্র।

যদি কোনদিন পুনা অথবা অন্য কোথাও দেখেন গেরুয়া বসন পরিহিত বিনোদ তাঁর স্ত্রী গীতাঞ্জলির পাশাপাশি দুটি সন্তানের হাত ধরে গুনগুনিয়ে ভজন গাইতে গাইতে সাধারণ মানুষের মধ্যদিয়ে হেঁটে চলেছেন তাহলে অবাক হবেন না জানি। তবুও দুঃখ তো হবেই চলচ্চিত্র জগৎ থেকে

রাখী আর বিনোদ

শুধু বিজ্ঞাপনই নয় বিজ্ঞানও বটে

'আয়ুর্বেদোহমৃতানাম'— আয়ুর্বেদ অমৃতের শ্রেষ্ঠ। আয়ুর্বেদিক ঔষধের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতে আয়ুর্বেদীয় ঔষধগুলির চাহিদা দিনে দিনে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। সম্পূর্ণ দেশজ সম্পদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের নির্দেশে এখন যে সমস্ত ঔষধগুলি প্রস্তুত হচ্ছে তা জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধনের ব্রত পালন করে চলেছে। প্রাচীনকাল থেকে বহু মুনি ঋষিরা এবং আয়ুর্বেদাচার্যগণ বহু গবেষণা করে এই সব বনজ, খনিজ প্রাণীজ এবং সাধারণ লতাপাতা থেকে যে সমস্ত ঔষধ আবিষ্কার করে গেছেন সেগুলো এখন আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে পরম সমাদর লাভ করছে। আয়ুর্বেদের প্রামানিক গ্রন্থসমূহ যেমন আয়ুর্বেদ সংগ্রহ, দ্রব্যগুণ নির্ঘন্টম, ভৈষজ্যরত্নাবলী, চরক ও সুশ্রুত সংহিতা প্রভৃতি বহু প্রাচীন পুস্তকে আয়ুর্বেদীয় ঔষধের গুণ-সমূহ উল্লেখ করা আছে। তাঁদের সেই প্রজ্ঞালব্ধ জ্ঞানামৃতের পরম্পরা রক্ষা করে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের সমীকরণে এস, সি, কেমিক্যালস আয়ুর্বেদীয় ঔষধের জগতে যে সাম্প্রতিকতম ঔষধটি সংযোজন করেছেন তার নাম **'লিউকোনেক্স'** ট্যাবলেট। **'লিউকোনেক্স'** ট্যাবলেট লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগের আশু ফলপ্রদ ঔষধ। এই অসুখ মেয়েদের রূপলাবণ্য হরণ করে। অসহ্য যন্ত্রণায় ও কষ্টে মহিলারা ক্রম নৈরাশ্যের অন্ধকারে প্রবিষ্ট হন। স্বাস্থ্যের পক্ষে পরম হানিকর এই লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগটি যখন ক্রমান্বয়ে অধিক পরিমাণে প্রকাশ পায় তখন রোগীর গলাবুক জ্বালা, হাতে পায়ে জ্বালা হয় এবং পরে উহা সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। অম্লবোধ, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, ক্ষুধামান্দ্য, আমাশা, খুঁতখুতে স্বভাব, সন্দিগ্ধচিত্ততা, আত্মবিশ্বাস নষ্ট, আহারে অরুচি, কর্মে অনুৎসাহ, জীবনে হতাশা ও বিতৃষ্ণা, নিদ্রানাশ, নিতান্ত আপনজন স্বামীপুত্রের প্রতি স্নেহ ভালবাসাটুকুও হ্রাস পায় সুতরাং এই লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগকে সম্পূর্ণরূপে নিরাময়ের জন্য এস, সি, কেমিক্যালস নিরলস প্রচেষ্টায় প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্র নির্দেশিত পথে উন্নত পরীক্ষাগারে প্রস্তুত করেছেন **'লিউকোনেক্স'** ট্যাবলেট, তাই রোগ যত পুরানো ও কঠিন হোক না কেন **'লিউকোনেক্স'** ট্যাবলেটই লিউকোরিয়ার (সাদাস্রাবের) বিশ্বাসযোগ্য প্রতিকার, এই ঔষধ সেবনের পরে দেহে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না। দ্রুত আরোগ্যলাভ করতে হলে **'লিউকোনেক্স'** ট্যাবলেট ব্যবহারের সঙ্গে বাহ্যিক চিকিৎসা হিসাবে আক্রান্ত স্থানে **'ফেকটিন'** লোশনটির ব্যবহার অপরিহার্য। সুতরাং আর দেরী না করে আয়ুর্বেদের বিশুদ্ধ ঔষধ **'লিউ-কোনেক্স'** ট্যাবলেট সেবন করুন এবং **'ফেকনিট'** লাগান। লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগে আক্রান্ত রোগীদের বিশেষভাবে জানান যাচ্ছে যে, যাঁরা প্রচণ্ড অম্বল অজীর্ণ বুকজ্বালা প্রভৃতি রোগে ভুগছেন তাঁরা **'এসিনা'** ব্যবহার করুন। লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগের সঙ্গে যাঁরা পুরাতন ও নতুন অমাশয়ে ভুগছে তাঁরা **'এসিবেল'** ব্যবহার করুন। লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগের সঙ্গে যাঁরা কোষ্ঠকাঠিন্য, অরুচি, ক্ষুধামান্দ্য ও লিভার জনিত যে-কোন অসুখে কষ্ট পাচ্ছেন তাঁরা **'এসিনেক্স'** ব্যবহার করুন, লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগের সঙ্গে যাঁরা ব্যথা ও গাঁটের বাতজনিত রোগে ভুগছেন তাঁরা **'আরথিন'** ব্যবহার করুন। লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগের সঙ্গে যাঁরা কৃমিতে ভুগছেন তাঁরা **'ভারনেক্স'** ব্যবহার করুন। লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগের সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত ভদ্রমহিলারা এই সব উপসর্গে ভোগেন তাঁরা **'লিউকোনেক্স'** ট্যাবলেট ব্যবহারকালে ঐ সব উপসর্গের জন্য উল্লিখিত ঔষধগুলো ব্যবহার করলে রোগের আরোগ্য আরও ত্বরান্বিত হবে। আজই আপনার নিকটবর্তী দোকানে খোঁজ করুন অথবা সরাসরি আমাদের কবিরাজমণ্ডলীর সুপরামর্শ গ্রহণ করুন। **এস, সি, কেমিক্যালস,** (আয়ুর্বেদ বিভাগ), ২৭নং শোভাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৫।

Release through Calcutta Filmlet Advertising.

সত্যিকারের একজন ভালো অভিনেতার এই স্বেচ্ছা নির্বাসনে।

ফ্যানের পাগলামি ও একটি মৃত্যু

চলচ্চিত্র জগতের স্বপ্নসুন্দরী হেমা মালিনীর পিতা ও প্রযোজিকা শ্রীমতী জয়া চক্রবর্তীর স্বামী শ্রী ভি আর এস চক্রবর্তী সম্প্রতি (২০ জুলাই) হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তার জুহুস্থিত বাসভবনে পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল পঁয়ষট্টি। উনিশশো তের সালের পাঁচই মে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মাদ্রাসের এই স্বনামধন্য আইনজীবী পরে ভারত সরকারের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন। বিদগ্ধ পণ্ডিত হিসেবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল—দর্শনশাস্ত্রেও তিনি ছিলেন পারদর্শী। জীবিতকালে একাধিক দর্শনের বই লিখেছেন তার মধ্যে দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত দার্শনিক শ্রীরামানুজমকে নিয়ে লেখা 'ফিলজফি অফ রামানুজম' এক উল্লেখযোগ্য দলিল।

সাহিত্য ও শিল্পপ্রেমী পিতাই ছিলেন হেমার জীবনের অনুপ্রেরণার উৎস।

এর আগে দু-দুবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েও তিনি ছিলেন শক্ত সমর্থ অথচ অসময়ে এই অস্বাভাবেক মৃত্যু খুবই দুঃখজনক।

হেমা মালিনীর জনৈক পাকিস্তানী ভক্ত খুরশীদ আহমেদ আলি যখন রাতের অন্ধকারে ছুরি হাতে অবৈধভাবে তাদের বাড়ীতে ঢুকে পড়ে পর্দায় দেখা স্বপ্নসুন্দরীকে সামনা-সামনি দর্শনের আশায়, অঘটন তখনই ঘটে। সিঁড়ি বেয়ে ওপর-নীচ করতে থাকেন শ্রীচক্রবর্তী পুলিশকে টেলিফোন করবার জন্যে এবং পরে হৃদরোগে আক্রান্ত হন।

হেমার সাক্ষাৎ দর্শনের আশায় উক্ত হেমা-ভক্ত বাড়ির ঝি জানকীর ঘরে হঠাৎ ঢুকে পড়ে। জানকী তার ছেলেমেয়ে নিয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। জেগে ওঠতেই সে ভয় না পেয়ে রুখে দাঁড়ায় সেই ভক্তের বিরুদ্ধে। শেষপর্যন্ত ভক্ত কবুল করে যে সে একবার মাত্র হেমা মালিনীকে দেখতে চায়। জানকী তাকে আশ্বাস দিয়ে অন্য ঘরে চলে যায় হেমাকে ডাকতে। সচকিত হেমা তার মা, বাবা ও অন্যান্যেরা জানকীর ঘরে ঢুকে অনেক চেষ্টার পর হাতে-নাতে ধরে ফেলে আলিকে। শ্রীচক্রবর্তী পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ এসে এ্যারেস্ট করে তাকে। পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত শ্রীচক্রবর্তী হঠাৎ হৃদরোগের শিকার হয়ে পড়েন। বোম্বের প্রথিতযশা হৃদরোগ বিশেষজ্ঞদের তৎক্ষণাৎ ডাকা হয়, কিন্তু সমস্ত প্রয়াসই ব্যর্থ হয়। মৃতদেহ শ্মশানঘাটে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে বোম্বে চলচ্চিত্র জগতের সমস্ত নামকরা অভিনেতা, অভিনেত্রী, প্রযোজক, পরিচালক ও কলাকুশলী ছিলেন।

খ্যাতির যে এমন মর্মান্তিক পরিণাম হতে পারে—সত্যিই ভাবা যায় না। উল্লসিত উচ্ছ্বসিত তারকাপ্রেমীরা এবারে একটু সাবধান হোন প্লীজ।

মারামারির সুটিং

নটরাজ স্টুডিওতে এক নম্বর ফ্লোরে ঢুকেই দেখি বিরাট সেট লেগেছে কোলড-স্টোরেজের। চারিদিকের আঁটায় ঝোলানো রয়েছে সারি সারি কাটা ছাগল। একদিকে বেশ কিছু বড়ো বড়ো মাছ, অন্যদিকে আলু, পেঁয়াজ ও অন্যান্য শব্জী সাজানো। একদিকে

শক্তি সামন্তের অনুসন্ধান ছবিতে আমজাদ

নিগেটার মতো কালো চেহারা নিয়ে বসে আছে মার্টিন (শেঠী)। পরিচালক শক্তি সামন্তের নির্দেশে ক্ল্যাপস্টিকের আওয়াজ বাতাসে মিলিয়ে যেতেই গরুপর শেঠী (রূপেশকুমার), জয় (অমিতাভ বচ্চন)-কে ধাক্কা মারতে মারতে কোল্ড স্টোরেজের মধ্যে ঢুকে পড়ে। শুরু হয়ে যায় সংলাপ।

শেঠী : কোথায় আছে সেই সরকারী টেপ আর কোডবুক ?

জয় : আমি জানি না।

শেঠী : (জয়ের জামার কলার চেপে ধরে) বলো কি চাও টেপ, কোডবুক না পঞ্চাশ হাজার ডলার ?

জয় নিরুত্তর থাকে। চীৎকার করে শেঠী মার্টিনকে ডাকে।

চওড়া কাঁধ, বিশাল বপু মার্টিন এগিয়ে আসে মাংস কাটার অস্ত্র হাতে নিয়ে।

শেঠী : যদি এ সোজা কথায় টেপ আর কোডবুক না দেয় তাহলে এর চামড়া তুলে কেটে কেটে টুকরো টুকরো করে ছাগলের মতো ঝুলিয়ে রেখো।

বলেই শেঠী বেরিয়ে যায় দ্রুতগতিতে। মার্টিন এগোতে থাকে কসাইয়ের মতো।

পরিচালক চীৎকার করে ওঠেন কাট ওকে বলে। পরে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে মার্টিন ও জয়ের মারামারি পিকচারাইজ করা হয়।

শেষ পর্যন্ত জয়ের মার সহ্য করতে না পেরে মার্টিন মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দরজা ভেঙে বাইরে বেরিয়ে যায় জয়। বেচারা শেঠী কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে মার্টিনের এই অবস্থা দেখে অবাক হয়ে করিডরের দিকে এগিয়ে যায় কিন্তু ততক্ষণে পাখি খাঁচা ছেড়ে চলে গেছে। নায়কের এই জয়ে পরাজিত ভিলেন ফুঁসতে থাকে উত্তেজনায় ও রাগে।

আর আপনারা ? দর্শকেরা ? —জানি প্রফুল্ল মনে হাততালি দিতে থাকেন।

জেনে নিন ছবির নাম —দি গ্রেট গ্যাম্বলার। প্রযোজক সি ডি কে শাস্ত্রীর প্রযোজনায় ও পরিচালক শক্তি সামন্তের পরিচালনায় এই ছবির বেশীর ভাগ শুটিং হয়েছে ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশে। প্রধান শিল্পী তালিকায় আছেন অমিতাভ, জীনত, নীতু, প্রেম চোপড়া, সুজিতকুমার, উৎপল দত্ত, মদনপুরী, রূপেশকুমার ও হেলেন। ছবির সুরকার আর ডি বর্মন। শীঘ্রই ছবিটি মুক্তি পাবে। প্রযোজক পরিচালক অশোক রায়ের ছবি হীরালাল পান্নালালের শুটিং শেষ হয়ে গেছে। ছবিটি পনেরই সেপ্টেম্বর মুক্তি পাচ্ছে বোম্বে অন্যত্র।

এছবির মুখ্য চরিত্রে আছেন শশী-কাপুর, রণধীর কাপুর জীনত আমন ও নীতু সিং তাছাড়া আছেন আমজাদ খান, প্রেমনাথ ও অজিত।

মোহন কাউলের এই কাহিনীর সংলাপ লিখেছেন এস এম আব্বাস, আলোক-চিত্রশিল্পী কমল বোস। সুর আর ডি বর্মনের।

আর একটি বড়ো বাজেটের ছবি ধরম কাণ্ডর ঘোষণা করেছেন প্রযোজক, পরিচালক সুলতান আহমেদ। একদিকে রাজকুমার, প্রীতেন্দ্র ও রাজেশ খান্না অন্যদিকে ওয়াহিদা রেহমান, রীণা রায় ও সুলক্ষণা পণ্ডিত তাছাড়া অন্যান্য চরিত্রে বিশিষ্ট শিল্পীরা থাকছেন এছবিতে।

ছবির মহরৎ অনুষ্ঠান বাইশে আগষ্ট। এছবির সুরকার নৌশাদ।

জ্যোতিপ্রকাশ রায়

চিত্রধ্বনি

অতিথি বরণ

অতিথি ছবিটি দেখবার আগেই আমি জেনেছিলাম যে ছবিটির গল্প ও চিত্রনাট্য রচনার দায়িত্বে আছেন শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল রায়। এই জানার মধ্যে, বলাই বাহুল্য, কিছুটা স্বস্তি ও কিছুটা খুশী হওয়ার মেজাজ আছে। অন্ততঃ ভাবতে পারা যায় চিত্রনাট্যকার স্বয়ং যখন একজন মান্য গল্পশিল্পী। গল্পটি হাজার ডামাডোলে হারিয়ে যাবে না বরং বেশ জোরের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকবে নিজের পায়ে।

দেখার পরও আমি খুব যে আশাহত তা নয়। অতিথি মহৎ ছবি নয়, ভালো ছবি নয় এমনকি চলচ্চিত্র সমালোচনার চুলচেরা বিচারে হয়ত ছবিও নয় তবু একটি স্বাদু অপরাহ্নের জন্য প্রয়োজনীয় মডারেটলি গুড এনটারটেনমেন্ট। ছবির প্রতিটি চরিত্রের কোথাও একটা মৃত্তিকা ও রক্তের স্পর্শ লেগে গেছে।

নবেন্দু এবং আনন্দ, দুজন যুবক। অর্থনীতির টানাপোড়েনের স্রোতে একদিন জীবনের চোরাগলিতে তাদের বন্ধুত্ব হয়ে যায়। তাঁরা যে জীবনযাপন করে সেখানে বাঁকে বাঁকে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ। এই নবেন্দুর মৃত্যু সংবাদ জানাতেই আনন্দ এসেছিল নবেন্দুদের কলঙ্কিত গৃহতে। সেখানে একজন অসুস্থ পিতা, সংসারের ভারবহনরতা ভাগ্যাহতা বসন্তকুমারী। ছিন্ন বাঁধা আনন্দ কি করে যে এখানে স্নেহ প্রেম মায়ার বাঁধনে জড়িয়ে যায়, মূল খবরটাই তার আর দেওয়ার সময় হয়ে ওঠে না; এ নিয়েই গল্প।

অভিনয়ের দিক থেকে সবচেয়ে ভালো লাগে নবেন্দুর বড় বোনের ভূমিকায় শাবানা আরমিকে। জীবন তাঁকে বেশ কিছুটা লালিত্যহীন করে তুলেছে; তার কথাবার্তায় কিছুটা বেপরোয়া হতাশার ছোঁয়াচ। আর সেইটাই তো স্বাভাবিক। এমনকি আমাদের আরও ভালো লাগে যে প্রেমের মধ্যেও সে, বাজার চলতি প্রেমিকাদের তুলনায়, কুণ্ঠিতা ও সংযমী।

আনন্দের ভূমিকায় শশী কাপুর ম্যানারিজম মুক্ত ও সফল। তাঁর অস্বস্তিটা দর্শকের হৃদয়ে প্রবেশ করে বিনা বাধাতেই।

শ্রীযুক্ত অরবিন্দ সেনের প্রশংসা করব এ কারণে যে ক্যামেরার সাহায্যে একটি গল্প বলার ক্ষমতা তাঁর আছে। কিন্তু ছবিটি আরও সুনির্মিত হতে পারত অন্তত নীচের তিনটি বক্তব্য গুরুত্ব পেলে।

(ক) সব কটি গানই বাদ যাক না। প্রয়োজনহীন গানে দর্শককে ভুলিয়ে রাখা এতই জরুরী?

(খ) শশী কাপুর তার সম্ভাব্য ছোট শ্যালিকার প্রেমে সাহায্য করেছেন, সেটা মানা গেল। কিন্তু নিজের ও শ্যালিকার প্রেমে নাচানাচিটা অর্থহীন।

(গ) উৎপল দত্ত অভিনেতা হিসেবে সর্বজনমান্য কিন্তু প্রচলিত ভিলেন কনসেপ্টের মধ্যে তিনি প্লান হয়ে আছেন।

তবে অতিথি বরণ করাই ভালো। রঙিন নাচগানের মধ্য দিয়ে একটু তো মেঘলা আকাশের স্পর্শ মেলে। তাই বা কম কি?

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

অতিথি ছবিতে শশী কাপুর/উর্মিলা ভাট

ভয়ে বুক কাঁপত

আজকের সেরা অভিনেতা বিনোদ খান্নার দুতিন বছর সময় লেগেছিল ক্যামেরার মুখোমুখি দাঁড়াতে। স্বাভাবিক-ভাবে ওর পক্ষে অভিনয় করা প্রথম দিকে ছিল ভীষণ শক্ত। কেমন আনাড়ি মনে হত। ভয়ে বুক কাঁপত। হাত-পা শক্ত হয়ে যেত। মনে হত সামনে অনেক দর্শক। ওর শুটিং জোনের চারপাশ ঘিরে কেবল মানুষ। এসব ভাবতে গিয়েই নার্ভাস হয়ে পড়তেন। আর এখন।

সুনীল আর বিনোদের সম্পর্ক নিয়ে কিছু গুঞ্জন উঠেছিল। সব নিরসন করে সুনীল বলেছেন: 'আমরা দূরে সরে যাইনি। আমার জন্মদিনে বিনোদ এসেছিল। একই ছবিতে দুজনে কাজ করছি বেশ কয়েকটি। আমার সঙ্গে ছবি করছে শুনেই ও কনট্রাক্টে সই করে। রোল দেখে না। ওর এতখানি বিশ্বাস আমার ওপর।

গ্ল্যামার বাদ দিয়ে

বোম্বে ফিল্মের অভিনেত্রীদের গ্ল্যামার বাদ দিয়েও যে কজন অভিনয় ক্ষমতায় উজ্জ্বল, নূতন তাদের একজন। প্রায় সব

অবিস্মরণীয় নাটকের অসামান্য জনপ্রিয়তা!
৫০০ রজনী অতিক্রান্ত ০ প্রতি বৃহঃ ও শনি—৬॥টায়/রবিবার—৩ ও ৬॥টায়
তরুণ থিয়েটারে
নাটক।পরিচালনা।সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়
রূপায়ণে: বিকাশ, সত্য, প্রদীপ, ইরা, সান্ত্বনা, গিরীশ, রবীন, মিহির, সুনীল, নিখিল, শংকর, অরুণ, দীপংকর, উশীনর, শৈলেন, মধু; গণেশ; স্বপন, অলোক, তিমির এবং রত্না ঘোষাল ও তরুণকুমার

টপ্ নায়কদের বিপরীত অভিনয় করেছেন। এক দিলীপকুমার বাদে। অবশ্য দিলীপ-কুমারকে নিয়ে যে ছবিতে অভিনয় করছিলেন, সেটি শেষ হয় নি। হবেও না। সুজাতার প্রাণস্পর্শী অভিনয়ের জন্য নূতন শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছিলেন। তখন মতিলাল বেঁচে। হামারা বেটিতে ওদের দুজনের অভিনয় ভোলবার নয়। নূতন কিন্তু মতিলালকে ভোলেন নি। মতিলালের সাহায্য ও শিক্ষাকে মনে রেখেই নূতন বলে। নিজের মায়ের থেকেও অভিনয়ে ওঁর শিক্ষাই আমাকে বড় হতে সাহায্য করেছে। এই শিক্ষাই বোধহয় আজও নূতনকে আলাদা করে রেখেছে বোম্বে ফিল্মে।

মেহমুদ বলছেন

পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কমেডি তৈরিতে এখনও আমরা পশ্চিম থেকে পেছিয়ে আছি একশ বছর। বলেছেন মেহমুদ। বাচ্চাদের জন্যে

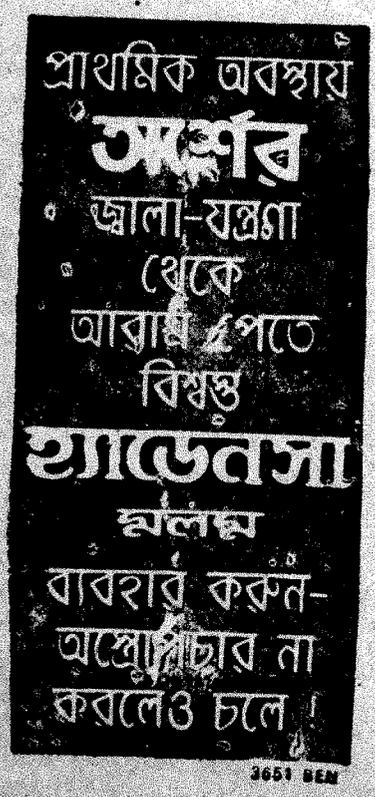

ছবি করেছিলেন ভূত বাঙলা। ছবিটা 'এ' সার্টিফিকেট পেল কেন? এটা একটা রহস্যই বটে। ছবিতে কোন শয়তান নেই, শয়তানীও নেই। মেহমুদ কমেডি ছবির মধ্যে একটি আদর্শ তুলে ধরার চেষ্টা করেন। কুয়ারা বাপ এবং সবসে বড়া রুপয়াতেও আছে একই উদ্দেশ্য। কিন্তু কমেডি দৃশ্যে ঘটেছে লক্ষ্যচ্যুতি। ফলে সেগুলি হয়ে উঠেছে ফ্লপির ব্যাপার।

হিন্দী ছবির, কমেডি এক খেঁয়ের। স্টিরিও টাইপ হয়ে উঠেছে। পরিচালকরা হাসির দৃশ্য সৃষ্টি করে চলেছেন। গ্রচন্ড মাথা খাটাচ্ছেন দর্শকদের হাসাতে। কমেডি শব্দটি আর কমেডিয়ানের ভূমিকা সম্পর্কে তাদের কোন স্পষ্ট ধারণাই নেই।

মুখার্জি পরিবার

বোম্বের ফিল্মে মুখার্জি পরিবারকে নতুন করে জানার চেষ্টা কেউ করবেন কিনা সন্দেহ। সেই কবেকার কথা। শশধর মুখার্জিকে কেইবা জানত। হঠাৎই এসে-ছিলেন বোম্বাই ফিল্মে। বোম্বে টকিজ আর ফিল্মিস্তান স্টুডিওতে পর পর হিট ছবি করে তাক লাগিয়ে ছিলেন সেদিন। তারপর করলেন নিজের ফিল্মালয় স্টুডিও—প্রায় দুই দশক আগে। অনেক ছবি করলেন। কয়েকটি সুপার হিট ছবি। আরও মাঝারি ধরনের ছবি। এই প্রবীণ চিত্র প্রযোজকের পাঁচ ছেলে ছবির জগতে পরিচিত নাম। বাবার নাম রাখতে এবার যেন দল বেঁধে এসে হাজির তাঁরা। বড় ছেলে স্টুডিও দেখাশোনা আর ছবি তৈরি নিয়ে ব্যস্ত। দ্বিতীয় ছেলে জয় অল্প বাজেটের ছবি শেষর মেরা নাম শেষ করেছেন। তার দ্বিতীয় ছবি হোয়ারে যাওয়ার পথে। তৃতীয় ছেলে দেবু শেষ করেছেন সাসপেন্স থ্রিলার হাওয়াইয়ান। পরের ছবি নিয়ে ভাবছেন। চতুর্থ ছেলে শমু মুখার্জির চৈলা বাবু সিলভার জুবিলী পেরিয়েছে। দারুন হিট ছবি। এর পরের ছবি ফিফটি ফিফটি। ছোট ছেলে সুবীরের বড় বাজেটের ছবি বেতসরী আখের কাছে এগিয়ে চলেছে। কাকা সুবোধ মুখার্জি পরিচালক। চৈলা বাবুর সিলভার জুবিলী সাড়ম্বরে বোম্বাই-এ পালন করলেন মুখার্জি পরিবার। এই মুহূর্তে শশধর মুখার্জির গর্ব হওয়া স্বাভাবিক। টিনা মুখিম আর রাজেশকে নিয়ে ফিফটি ফিফটির কাজ শুরু হচ্ছে।

হেমার থেকেও বড়

এন এন শিপ্পির ঘর মুকুতি পেয়েছে। ভাল পয়সাও পাচ্ছে। বিনোদ মেহেরা-রেখা জুটিই ছবিটাকে হিট করেছে। বারখা ভার আর ইমান ধরমের রেখা এই ছবিতে আরও সফল। রেখার সম্পর্কে মোহন সেগল বলছিলেন মেথেটার ক্ষমতা অনেক। ওর দরকার ভাল বোল, ভাল চিত্র-নাট্য, ভাল পরিচালক। মোহন সেগলের আবিষ্কার রেখা। রেখাকে নিয়ে ছবি পরি-চালনা করেছে গুলজার। ওর মতে রেখা কিন্তু হেমা থেকে কোন অংশেই ছোট নয়। সোজা বাঙলায়, হেমার থেকে ওর ক্ষমতা বেশি। 'কথাটা ফেটে পড়েছে আমার মত। কিন্তু গুলজার বলছেন, ঘটনা ঘটনাই। আমরা তাকে মেনেই নেব।' প্রযোজক সিপ্পিরও এই মত।

রতন

স্টুডিও সংবাদ

সত্যিই তাই ঘটছে।

বর-কনে গরদ আর বেনারসীতে সজ্জিত। চড়া মেক আপ ভিজে উঠছে। মনিটরের ফাঁকে সহকারী মেক-আপম্যান এসে বরফের টুকরো বুলিয়ে যাচ্ছেন বর-কনের গালে।

তাতেও ঘাম বাধ মানছে না। পরি-চালক অমল দত্ত মনিটর কমপ্লিট করে ক্যামেরাম্যান কৃষ্ণ চক্রবর্তীর উদ্দেশ্যে বললেন কি দাদা, যাব এবার।'

জবাব এল—'হাঁ, আমি রেডি। এধারের ফুলগুলোকে একটু আলো দিয়ে নি।'

এক গোছা ফুলের ওপর আলো ফেলা হল। রঙিন ছবি — তাই আলোরও বেশী দরকার।

বর-কনে মানে দীপংকর দে আর মিঠু মুখার্জি সংলাপ মুখস্থ করে এসে দাঁড়ালেন সুটিং জোনে।

'সন্ধির ছবির সুটিং এবার আরম্ভ হবে। পরিচালক অমল দত্ত বললেন— 'অল লাইটস।'

কিন্তু আর আলো জ্বলে না। লাইট-ম্যান সুইচ টিপলেন, কিন্তু আলোরা সব নীরব।

অর্থাৎ লোডশেডিং নামক নিয়মিত বায়বীয় ভূতটি এক নম্বর স্টুডিওটির ঘাড়ে ভর করল। ফ্লোরের বাইরে খটখটে রোদ, অমল দত্ত ব্যাজার মুখে বেরিয়ে গেলেন। কৃষ্ণ চক্রবর্তী ক্যামেরা চাপা দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন চুপচাপ।

বর-কনের মুডটি গেল বিগড়ে। দীপংকর দে 'স্যাৎ তেরি' বলে পকেটের বোতাম খুলতে শুরু করলেন। মিঠুর সে উপায় নেই। অমলবাবুর উদ্দেশ্যে বললেন —'অমলদা, মেক-আপ রুমে যাচ্ছি।' চীনা হেয়ার ড্রেসারকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পা বাড়ালেন সেই দিকে।

প্রযোজক বীরেশ চক্রবর্তীকে বললেন —'আর পারা যাচ্ছে না। লোডশেডিং-এর জ্বালায় মশাই স্টুডিও ছাড় হতে হবে।'

এমনিই চলছে স্টুডিও স্টুডিও। আলোর আসা-যাওয়ার কোন স্থিরতা নেই। কদিন আগে উত্তম-সৌমিত্র-সতাজিৎ-ভূপেন হাজারিকার একটি দল এই 'অস্থির' বিদ্যুৎ সরবরাহকে 'সুস্থির' করার আবেদন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কাছে হাজির হয়েছিলেন।

তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সপ্তাহে

তিলোত্তমা ছবিতে সুমিত্রা মুখার্জি/গীতা দে

অন্তত তিন- কি চার দিন যাতে নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকে তার ব্যবস্থা তিনি করবেন।

যতদূর জানা গেছে এখনও সেই ব্যবস্থা চালু হয় নি। তবে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি পেয়ে সবাই-ই এখন নীরব।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা—বাংলা ছবির গুণগত মান যেমন চক্রবৃদ্ধি হারে নিম্নগামী তাতে বিদ্যুৎ সরবরাহের উন্নতি কি কোন কাজে আসবে? স্টুডিও লোড-শেডিংমুক্ত হলে বাংলা ছবি দেখার যোগ্য হবে এমন গারান্টি কি ছবির পরিচালকরা দিতে পারেন? স্টুডিও যেমন লোডশেডিং-মুক্ত হওয়া দরকার তেমনি পরিচালক-দেরও উচিত ভাল ছবি তৈরী করা। নইলে সেই পুরোন কথা—'নাচতে না জানলে'.... কেই টানতে হয়।

শহর থেকে দূরে—ইন্দ্রপুরীতে

শহর থেকে মোটেই দূরে নয়, কাছেই বলা যায়। ইন্দ্রপুরী স্টুডিও আর শহর থেকে কত দূরেই বা, টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর গায়ে-গা-লাগিয়ে দাঁড়ান ইন্দ্র-পুরীতে এখন শহর থেকে দূরে ছবির সেট পড়েছে।

অচানকা কেউ ফ্লোরে ঢুকলে ভাবতে পারেন গাঁয়ের কোন এক বর্ধিষ্ণু বাড়িতে এলাম বুঝি। দোতলার স্ট্রাকচার সমেত ঝুলবারান্দা আর সিঁড়ি লাগিয়ে একবারে নিখুঁত একটি দোতলা মেটে বাড়ির সেট তৈরী করেছেন সুরেশ দত্ত।

সামনে বিরাট উঠোন। রান্নাঘর, নিকোন দাওয়া, অজস্র সাপের মত কিল-বিলে চেহারা নিয়ে দাওয়ায় ছড়ান লাইটের তার। চেয়ারও রয়েছে দু-চারটে।

ফ্লোরে ঢুকেই দেখি পরিচালক তরুণ মজুমদার দোতলায় সিঁড়ির গোড়ায় ক্যামেরা নিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়েছেন। ক্যামেরাম্যান শঙ্কিত ব্যানার্জি পাশে দাঁড়িয়ে। বাড়ির বাইরে থেকে ছুটতে ছুটতে ঢুকলেন সন্ধ্যা রায়। দপদপিয়ে পা ফেলে উঠে গেলেন সিঁড়ি বেয়ে। তরুণ-বাবু ক্যামেরাতে চোখ রেখেই বললেন—'ওকে।'

গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠতে শঙ্কিত ব্যানার্জি একই পজিশনে শুয়ে পড়লেন ক্যামেরা নিয়ে। আর আলোর আডজাস্টমেন্ট শুরু হল।

বাড়ির উঠোনে একটা চেয়ারে বসে তখন ক্লান্তিতে ঢুলে পড়ার উপক্রম করছেন ভানু ব্যানার্জি, বুবু মানে সমিত ভঞ্জ সপারিষদ একটা বড় টুলের ওপর বসে, জমেছে আড্ডা। বিষয় আগের দিনের ইস্ট-বেঙ্গল-মোহনবাগান খেলা। মোহনবাগানের জিত হওয়ায় সমিত কিঞ্চিৎ প্রাণবন্ত।

ইস্টবেঙ্গলের কড়াপাক সাপোর্টার ভানুবাবু নীরবে লক্ষ্য করে যাচ্ছেন বুবুকে। নো কথা। নো কমেন্ট।

অনেকক্ষণ ধরেই বসেছিলেন ভানু-বাবু। তরুণবাবুকে বললেন—একটু বাইরে থেকে আসছি। আর বুবুর দিকে তাকিয়ে বললেন—'হারছি তো কি হইছে! দিন কি শ্যাস হইয়া গ্যাল নিকি! এবং সটান তিনি ফ্লোরের বাইরে।

সমিতের কাছ থেকেই জানা গেল ওর 'স্ট্রাইকার' ছবি এ মাসের (আগস্ট) শেষ সপ্তাহেই কলকাতায় রিলিজ করছে। মতি নন্দীর লেখা গল্প। বিষয় এই ফুটবল খেলা। মোহনবাগান লীগ পাওয়ায় সমিত যেন আশার আলো দেখতে পেল। 'স্ট্রাইকার' ছবির সাফল্য সম্পর্কে এই মুহূর্তে কোন মতামত দেয় নি সে, কিন্তু ফুটবল পাগল কলকাতার দর্শকের কাছে 'স্ট্রাইকার' হবে অবশ্য দর্শনীয়। সমিত নিজে মোহনবাগানের ব্লাইন্ড ফ্যান হলেও খেলার ব্যাপারে খেলোয়াড়ি মনোভাব তাঁর আছে। সুতরাং ছবির সাকসেস বা ফেইলিওরকে সে সমানভাবে নিতে পারে।

যাই হোক, আলো রেডি করে ভানু-বাবুকে ডাকলেন তরুণবাবু। সুটিং শুরু করবেন।

অমনি ঝপ্ করে গেল আলো নিভে। 'সন্ধি' ছবির ফ্লোরের মত আধো-আলো-অন্ধকার নামল ফ্লোরে। চোখটা সামলে নিতে একটু সময় লাগল। সুটিং প্যাক আপ ডিক্লেয়ার করে তরুণবাবু বেরিয়ে এলেন। এবং ফ্লোরের বাইরে এসে মনে হল সত্যিই এখন আমরা 'শহর থেকে অনেক অ-নেক- দূরে।'

নির্মল ধর

নবনালন্দার উৎসবে

সম্প্রতি রবীন্দ্রসদনে নবনালন্দা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে তিন দিন-ব্যাপী উৎসব শুরু হয়েছিল দুটি একক আসরের অনুষ্ঠান দিয়ে। বর্ষার আকাশ থেকে অশান্ত বর্ষণ সেদিন আপনিই ঝরে চলেছিল। কিন্তু পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের শ্রোতা-দের অন্তরে বর্ষার ঢল নামলো তাঁদেরই গান দিয়ে 'রবীন্দ্রসংগীতে বাংলা পরিপূর্ণ বর্ষা'। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুচিত্রা মিত্র মঞ্চ গ্রহণের আগে তাঁদের সম্পর্কে একথা বললেন সংস্থার অধ্যক্ষা ভারতী মিত্র।

দুই অসামান্যা যেন কোন দুর্লভ প্রেরণার আলোতেই আমাদের তৃষিত হৃদয়ে উন্মুক্ত করে দিলেন সুরের সেই মায়ালোক যার মধ্যে ছিল ঘন মেঘের পুঞ্জীভূত বিষাদ, বিদ্যুতের চকিত ইশারা, উতল ধারার অশান্ত গুঞ্জন, আর সব মিলিয়ে এক মধুর আত্মবিহ্বলতা।

প্রথম শিল্পী কণিকা যখন ধরলেন তাঁর প্রথম গান 'কোথা যে উধাও' মনে হল একাকীত্বের নির্বাসন থেকে যেন বন্দিনী চিত্তের বেদনা যেন ছড়িয়ে পড়ল দিকে-দিগন্তে। মেঘের পরে মেঘ জমে উঠলে আঁধারে যিনি প্রতীক্ষা করে থাকেন আর যাঁর প্রতীক্ষা করা হয় সে বুঝি সেই নীরবতাই সুরে যে নীরবতা পরমকে স্পর্শ করল 'সখি আঁধারে একলা ঘরের বেদনায়, সজল পবনের মীড়ছলা সূক্ষ্ম অন্তরস্পর্শী তানে কিংবা 'নীলাঞ্জন ছায়ার মায়ায় যেখানে বীণা নীরব, বাণী নীরব, নীরব রবিশশী। রাত্রি অন্ধকার, আকাশ, হৃদয় সপ্তলোক সবই যেন নীরবতায় স্তব্ধ। আর স্তব্ধ রহ রহ সাথে? এ যেন একান্তভাবে কণিকারই গান যে গানে বলকে ওঠে আমাদের হৃদয়ের

নবনালন্দার অনুষ্ঠানে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়/সুচিত্রা মিত্র

সেই গম্ভীর, গোপন অবশ রাত্রি, যে গানের সূক্ষ্মতম শ্রুতির ধ্বনিতরঙ্গে আমরা শুনতে পাই বিষাদের কি যাদু, দুঃখের কি আশ্চর্য শিহরণ। এই অনুভবের তীরে নিজের মুখোমুখি হলেই কি শুনতে পাওয়া যায় না; আরেকটা পাখার ঝাপটা? কণিকার গান শুনলে মনে পড়ে যায় বুদ্ধদেবের 'অনুভব' রবীন্দ্রনাথের গান অপেক্ষার কাব্য। কোনো এক পরম মিলনের জন্য চির প্রতীক্ষায় ফেলে দেবার প্রেরণা।

অনুভবের এই বৃত্ত সম্পূর্ণ হল যখন সুচিত্রা ধরলেন 'আবার এসেছে আষাঢ়' কিংবা 'এক দিন আমার আঘাত' অনেক কথা বলেছিলেম' 'নীল নবঘনে' কিংবা উতল ধারা বাদল ঝরে প্রভৃতি গান যে গানে প্রকাশ পেয়েছিল সেই 'আবার'-এর অনুভূতি। মেম জন্ম থেকে শুরু করে বারিধারা অবধি বাইরের অভিজ্ঞতাপুঞ্জকে একেবারে ঠেলে ফেলে নয়, তাকে অন্তরঙ্গ করে ধরে রেখেই তিনি যেন খুঁজছিলেন বর্ষার নির্যাস, জানছিলেন সত্তাপরিচয়। ঐ দিন শোনা গেল দুটি প্রায় অশ্রুত গান 'কাঁপিছে দেহলতা থরথর ও মেঘের কোলে কোলে শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল শিল্পী যেন অলৌকিক সুর-সম্পদে স্পষ্ট করে তুলছিলেন গাঢ় অনুভবের রেখাগুলি। ঐ 'কৃষ্ণকলি' তাঁরই কণ্ঠে শুনেছি ত কতবারই। কিন্তু গতবার শুনি কোন যাদুমন্ত্রে যেন বেরিয়ে আসে নতুন কোন ডাইমেনশনের ক্ষুরধার দীপ্তি। বাড়ের রাতে আভিজাত্য শিল্পী যখন প্রবল কণ্ঠকে হঠাৎ নামিয়ে শেষ চরণে চুপি চুপি কথা বলার মত গাইলেন 'গভীর কোন অন্ধকারে হতেছ তুমি পার' হৃদয়টা কৃতজ্ঞ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

দ্বিতীয় দিনে বনানী ঘোষের একক আসরে 'তোমায় চেয়ে আছি বসে', 'তুমি ছেড়েছিলে বলে যা হারিয়ে যায়' প্রাণবন্ত আবেগে ভরপুর।

তাসের দেশ নৃত্যনাট্যে চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় বনানী ঘোষের গান ছাড়াও উপরি পাওনার মত অনেক আশ্বাস পাওয়া গেল টেক্‌কানটির ভূমিকায় দীপান্বিতা গুপ্তর গানে। আর নাচ, গান অভিনয় সবকিছু মিলিয়েই ভাস্বতী মিত্র সত্যিই এক ভাস্বতী তারকা।

শেষ দিনের মেঘনাদ বধকাব্য নৃত্যনাট্য শুধু নব নালন্দার গত দশ বছরের অনুষ্ঠানগুলির মুকুটমণিই নয়, ইদানীংকালের এক উজ্জ্বল মাইলস্টোন। আর এই বিস্ময়কর সাফল্যের প্রধান স্তম্ভত্রয়—কমলেশ মৈত্র, অনাদিপ্রসাদ ও ভারতী মিত্র যথাক্রমে আবহসংগীত নৃত্যরচনা ও নৃত্যনাট্যরূপ নির্দেশনায় ছিলেন। মহাকাব্যের বিশালতার পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে আছে অতগুলি চরিত্র, তাদের ঔদার্য বীর্যে, মহত্ত্ব, হিংস্রতা এবং ক্ষুদ্রতা সবকিছু নিয়েই। কিন্তু কাঠিন্যের মধ্যে কোমলতার বানডাকা অশ্রুজলে দুলে ওঠে মানবিক আবেদনও। মেঘনাদের ধীরোদারও চরিত্রে নরেশকুমার ও প্রমীলার ক্ষাত্রতেজভরা রমণী দীপ্তিতে সুমিত্রা মিত্রর নৃত্যাভিনয় অভিনয়ের গণ্ডী অতিক্রম করেছিল।

নেপথ্য সংলাপে কাজী সব্যসাচী, দেবরাজ রায়, সুচিত্রা মিত্র, কল্যাণ রায়, আর্য মিত্র, কাজল গুপ্তর কণ্ঠে সকল চরিত্রের নৃত্যাভিনয়ের সঙ্গে মিলে যেন মহাকাব্যের সুরকেই উত্তাল করে তুলেছিল। আর নিয়তির মত পরিণাম ঘোষণার পর্যায়ে সম্মিলিত কণ্ঠের আবৃত্তি নাটকের ক্লাইমেকসকে ঘনীভূত করেছে। এই অভিনব কল্পনার কৃতিত্ব অবশ্যই ভারতী মিত্রর।

আলোক সম্পাত, মঞ্চসজ্জা ও রূপসজ্জায় সুশীল দাশ, শচিব্রত দেব ও ননী দাশগুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য।

সন্ধ্যা সেন

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পাইকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা ৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

মূল্য ৭৫ পয়সা। ত্রিপুরার অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

মহাত্মা
শিশিরকুমার ঘোষ

প্রণীত

কয়েকটি অমূল্য লোক-চরিত
ও কাব্য-গাঁথা

এই অপূর্ব রচনাগুলি পাঠক-পাঠিকাদের
দেবে অমৃত পানের আনন্দ। তৃষিত শোকসন্তপ্ত
হৃদয়ে আনবে পরম শান্তি।

শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত ১ম—৬ষ্ঠ খণ্ড ২৬·০০

শ্রীনরোত্তম চরিত ৩·৫০ পঃ

শ্রীকালাচাঁদ গীতা ৩·০০

Lord Gouranga (Eng. Vol. 1) ৩·০০

গ্রন্থগুলি জনপ্রিয় হলেও এর মূল্য বৃদ্ধি করা হয়নি।
অবিলম্বে সংগ্রহ করুন।

প্রাপ্তিস্থান ঃ
পত্রিকা হাউস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৭০০০০৩।

দে বুক স্টোর্স, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ও
নাথ ব্রাদার্স, ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট; কলিকাতা।

Gram : AMRITA Calcutta-700003 AMRITA Friday 1st September, 1978 Phone 55-5231 (14 lines)

বিশুদ্ধ 'কুক্‌মী' গুঁড়া মশলার ক্রেতারা

সাবধান!

'কুক্‌মী' গুঁড়া মশলার জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে কলকাতার কয়েকটি গুঁড়া মশলা কোম্পানী তাদের নিজস্ব নিকৃষ্টমানের ব্রাণ্ডের সংগে জনপ্রিয় কুক্‌মীর নাম জুড়ে হুবহু কুক্‌মী (Cookme) নামের স্টাইল নকল করে আসল কুক্‌মী গুঁড়া মশলা বলে বাজারে চালাবার চেষ্টা করছে।

কেনার সময় দেখে নেবেন— 'কুক্‌মী'র প্যাকেটে কেবলমাত্র 'কুক্‌মী (Cookme) ছাপই আছে,— অন্য কোন ব্রাণ্ডের নাম যুক্ত নেই।

প্রস্তুতকারক :

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ

২৩৫ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা ৭০০০৭০ ● ফোন : ৩৩০৯৯৫, ৩২৬৬৩২

পোস্ট বক্স নং : বড়বাজার ৬৮৮৫ ● ফ্যাক্টরী : কাশীপুর

iaa 590

9 SEP 1978

CENTRAL LIBRARY CALCUTTA

জগদীশ গুপ্তের প্রত্যাবর্তন

৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪
দাম ৭৫ পয়সা

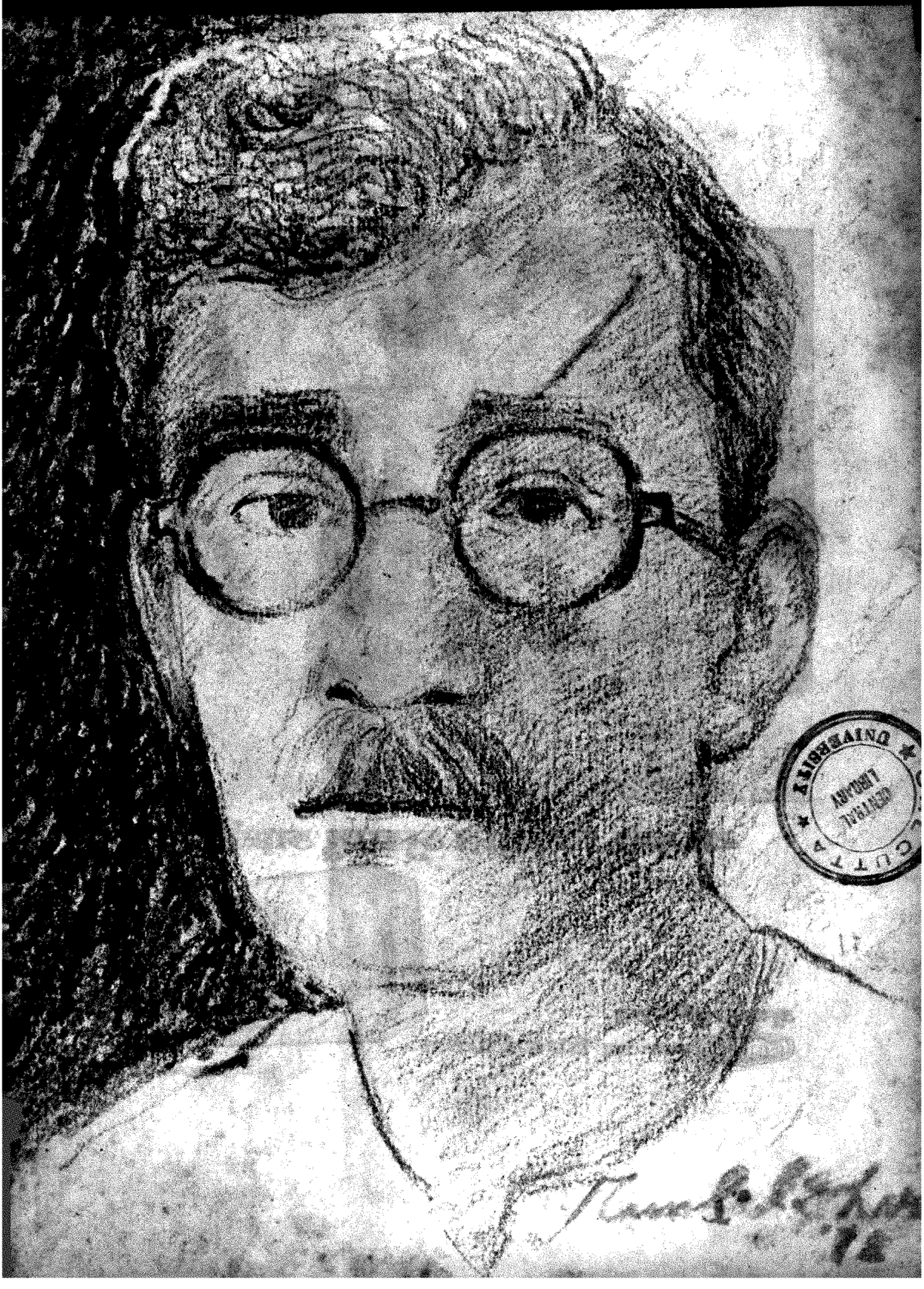

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

ব্রিটানিয়া
দুধ বিস্কুট

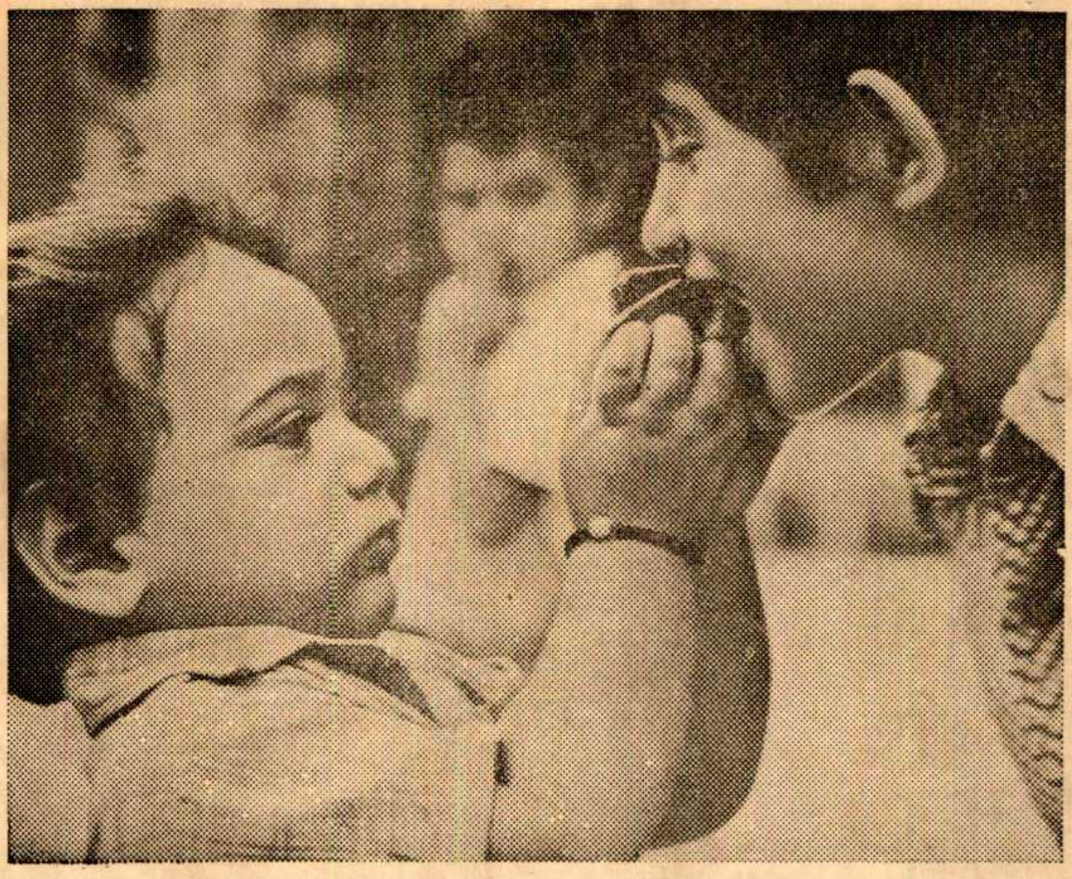

বাড়ন্ত বাচ্চার সুস্বাদু সাথী!

সুস্বাদু, পুষ্টিকর
ব্রিটানিয়া গ্ল্যাক্সো মিল্ক বিকিস

লিনটাস-BBC.GLXMB.2-203 BG

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৮৫তম জন্মদিনে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ

পথের পাঁচালী ১২৲ পথের পাঁচালী (পে·ব্যা) ৭৲ আদর্শ হিন্দু হোটেল (উঃ) ১১ দেবযান ১৫ অথৈজল ৯৲ আরণ্যক ১৫ আরণ্যক (পে·ব্যা) ৭৲ ইছামতী ১৮৲ ইছামতী (পে ব্যা) ৯৲ দৃষ্টি প্রদীপ ১২৲ অনুবর্তন ১২৲ অপরাজিত ১৫৲ মেঘমল্লার ৭৲ কুশল পাহাড়ী ৫৲ নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব ৪৲ আদর্শ হিন্দু হোটেল (নাঃ) ২-৫০ গল্প সমগ্র ৪০৲ অশনি সংকেত ১০৲ অরণ্য মর্মর ৭·৫০ হীরা মাণিক জ্বলে ৫৲।

*

বিভূতি রচনাবলী

নবম খণ্ড

৩য় মুদ্রণ বেরিয়েছে

কুড়ি টাকা

বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে ঃ-

তৃতীয় খণ্ড	২৬৲
চতুর্থ খণ্ড	২৬৲
পঞ্চম খণ্ড	২৬৲
সপ্তম খণ্ড	২৫৲
অষ্টম খণ্ড	২৫৲
নবম খণ্ড	২০৲
দশম খণ্ড	২৫৲

১ম, ২য়, ৬ষ্ঠ, ১১শ, ১২শ—যন্ত্রস্থ

বিভূতি রচনাবলী সুলভ সংস্করণ

চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে

গ্রাহকরা অবিলম্বে তাঁদের খণ্ড সংগ্রহ করুন!

পেপার-ব্যাক ক্লাসিক্স্ সিরিজ-এ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

'রাণু' পর্যায়ের বিখ্যাত চারখানি গ্রন্থ একত্রে একখণ্ডে পেপার-ব্যাক সংস্করণ-এ প্রকাশিত হল।

রাণু

মূল্য—সাড়ে পনেরো টাকা

ক্লাসটিক ল্যামিনেটিং করা সুদৃশ্য প্রচ্ছদ।

॥ স্থায়ী গ্রাহকরা সংগ্রহ করুন ॥

—শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে—

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের নবতম উপন্যাস

দিনান্তে নিশান্তে ১২৲

*

—সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস—

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের

বিভ্রান্ত ৮৲

বিমল মিত্রের

জন গণ মন ১৬৲

প্রমথনাথ বিশীর

পনেরোই আগস্ট ২৫৲

*

—নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হলো—

জরাসন্ধের

কারান্তরালের অজেয় আলেখ্য

লৌহকপাট— অখণ্ড—৩৫৲

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ,

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩ ৩২৪৩৯১

৮৬।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি ৯/৩৬৩৪৯২

পাত্রপাত্রী না চাকুরী ?
জামিজমা না মোটর লরি ?
ব্যক্তিগত বা ব্যবসা বাণিজ্য ?

রক্তব্য যে কোনও বিষয়েই
হোক না কেন
যুগান্তর এ
শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন ছাপালে
অনেক বেশি উত্তর পাবেন
কম সময়ে আর সবচেয়ে কম খরচে

কারণ অনেকগুলো ঃ

* যুগান্তরের জনপ্রিয়তার দ্রুত উর্ধগতি। গত ৯'মাসে দৈনিক প্রচার বেড়েছে ৮০০০০ এরও বেশি। তাছাড়া প্রতি রবিবারের কাটতি এখন ৩,১০,০০০ এরও ওপর।
* পাঠক সংখ্যাও দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। লোকে অন্যের হাত থেকে টেনে নিয়ে যুগান্তর পড়ে থাকেন। আপনার বক্তব্য এই অগণিত পাঠক পাঠিকাদের নজর এড়াবে না।
* প্রতিটি শ্রেণীর বিজ্ঞাপন সুন্দরভাবে সাজানো হয়, ভিড়ে হারিয়ে যায় না।

যুগান্তর
শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের সুযোগ নিন
এস্টাব্লিশ্ট রেট পাবেনই

অমৃত

১৮ বর্ষ
১৭ সংখ্যা
২২ ভাদ্র, ১৩৮৫
8 September, 1978

সম্পাদকীয় ৩
সাহিত্য ইত্যাদি ৪ মনীন্দ্র রায়
বেবতীভূষণের কার্টুন ৬
রাজনীতি কলকাতা স্টাইল ৭
ভাগ্যগণনা ৮ শ্রীমাণিকা
স্ট্যাটাস সিম্বল ৯
সমীর চট্টোপাধ্যায়
কবিতা ১১ অমিত চৌধুরী,
দিলীপ দাশগুপ্ত, সমবেন্দ্র দাশ,
জ্যোতির্ময় দে বিশ্বাস।
সমালোচনা ১২

প্রচ্ছদকাহিনী ১৪
জগদীশ গুপ্তর প্রত্যাবর্তন
অমল মুখোপাধ্যায়
প্রচ্ছদশিল্পী রামলাল ধর

ভারত কী করে ভাগ হল ২১
বিমলানন্দ শাসমল
হাওয়া গাড়ি (উপন্যাস) ২৬
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
চিত্তবিনোদনে অতুলপ্রসাদ ৩১
সোমেন্দ্রনাথ গুপ্ত
কোন দিন মঙ্গলে ৩৪
পিনাকী চট্টোপাধ্যায়
তরণী পাহাড়ে বসন্ত (উপন্যাস) ৩৮
শৈবাল মিত্র
নতুন ঠাকুরদার ঝুলি চাই ৪৩
মলয় বসু
সোনার হরিণ নেই (উপন্যাস) ৪৫
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
ঘোড়া (গল্প) ৫০
প্রফুল্লকুমার সিংহ
খেলা ৫৬ দর্শক, লিংকম্যান
শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়
চিত্রধ্বনি ৫৯

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ কাহিনী
১২০ টাকায় বেঁচে আছি
লিখেছেন দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
গল্প লিখেছেন
শওকত ওসমান

কোণারক মন্দির

কিছুকাল আগে কোণারক মন্দিরের গা থেকে একটি দেড় টন ওজনের পাথর খসে পড়ার খবর পাওয়া গিয়েছিল। পাথরটিতে একটি মূর্তি উৎকীর্ণ রয়েছে, যা সৌভাগ্যক্রমে রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু পঁয়তাল্লিশ ফিট উঁচু থেকে স্থানচ্যুত হওয়ার ফলে পাথরটি হয়ে গেছে দ্বিখণ্ডিত।

কোণারক মন্দিরের তত্ত্বাবধান এবং সংরক্ষণের কাজ ১৯৩৯ সাল থেকে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তাঁরা অবিশ্যি আশ্বাস দিয়েছেন, স্টেইনলেস ইস্পাত এবং বিশেষ ধরনের রাসায়নিক বস্তু দিয়ে জুড়ে পাথরটিকে আবার যথাস্থানে বসিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু তা যথোচিত সতর্কতার সঙ্গে করা হবে কিনা সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত বোধ করা কঠিন! কেননা, খবর যা পাওয়া গেছে তাতে শোনা যায়, ভূপতিত পাথরটিতে ফাটল ধরেছিল অনেক আগেই। এবং রক্ষণাবেক্ষণের ব্যক্তিরাও প্রতিদিনই উপস্থিত ছিলেন মন্দিরে। তাঁরা যদি নিজেদের দায়িত্বের বিষয়ে সচেতন থাকতেন, এমন ঘটনা অনেক আগেই আটকানো যেত।

যাই হোক, দেরিতে হলেও পুরাতাত্ত্বিক সার্ভের অধ্যক্ষ কোণারক মন্দিরের সংরক্ষণ বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্যে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি তৈরি করেছেন। তাঁরা ভবিষ্যতের জন্যে কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তার জন্যে অপেক্ষা করা যেতে পারে

কোণারক মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাজা নরসিংহ দেব, প্রায় সাড়ে সাতশো বছর আগে—তের শতকের প্রথম দিকে। বর্তমানে যে মন্দির কোণারক মন্দির বলে পরিচিত, তা আসলে মূল মন্দিরের জগমোহন। এর উচ্চতা মাত্র ১২৫ ফিট। মূল মন্দির ছিল ২২০ ফিট। বহুকাল আগেই সেটি ভেঙে পড়েছে এবং (যা অন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছে) তার ভগ্নস্তূপ থেকে তাকে নতুন করে আর গড়ে তোলাও সম্ভব হয়নি। কিন্তু যা আছে, তারও শিল্পমূল্য যথেষ্ট। মন্দিরের স্থাপত্যশৈলী এবং তার ভাব-ব্যঞ্জনা সারা পৃথিবীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। মূর্তিগুলোর সুকুমার দেহভঙ্গির মাধুর্য প্রায় গীতিকবিতার মতো অনুপম। তাছাড়া সূর্যমন্দির হিসাবে স্থাপিত এই মন্দিরকে সূর্যের রথ বলে কল্পনা করে এর নিচের দিকে বারো জোড়া চাকা (প্রতিটি চাকা একটি করে পক্ষ), সপ্তাহের সাতদিনের প্রতীকে সাতটি ধাবমান অশ্ব, এবং প্রতি চাকার মধ্যে আটটি প্রহরের কল্পনায় আটটি অর (স্পোক)—এককথায় অতুলনীয় পরিকল্পনা বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না।

প্রতিদিন দেশী-বিদেশী মিলিয়ে দর্শনার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় দু' হাজার। বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহের উৎস হিসাবেও কোণারক মন্দিরের মূল্য কম নয়। কাজেই আর্থিক ও শৈল্পিক দু'দিক থেকেই মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ জাতীয় গুরুত্ব দাবি করতে পারে

সাহিত্য ইত্যাদি...

সাহিত্যের কলকাতা

কলকাতা খুব একটা পুরনো শহর নয়। তার তুলনায় লন্ডন বা প্যারিস অনেক বেশী প্রাচীন। রোম গ্রীসের কথা না হয় নাই তুললাম। কলকাতার চেয়ে মুর্শিদাবাদ বা ঢাকাও অনেক বেশি পুরনো। দিল্লী ততোধিক প্রবীণ। আর বারাণসী, সে তো গৌতম বুদ্ধের সময়েও বর্ধিষ্ণু নগর ছিল।

তবু, প্রাচীনত্বের বিচারে নেহাতই সেদিনকার ব্যাপার যে-শহর, তার বিষয়েই মনে হচ্ছে কৌতূহল আমাদের কিঞ্চিৎ বেশি।

কেন? এক কথায় জবাব দেওয়া শক্ত।

হয়তো এমন হতে পারে যে, কলকাতার গোড়াপত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই গোটা দেশটির আধুনিক ইতিহাসের গোত্রান্তর ঘটেছিল সে একটা বড় কারণ। আধুনিক ব্যবসা, আধুনিক জমিদারী, আধুনিক শিক্ষা—সব কিছুরই পায়োনিয়ার হল কলকাতা। কলকাতাতেই শুরু হয়েছে নব্য চিন্তা, নব্য রুচি আর জীবনযাত্রার নতুন স্টাইল। কিন্তু গোটা ব্যাপারটিই যেহেতু ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক এবং সারা দেশের মধ্যে তার কোনো আশ্রয় ছিল না, সেজন্যে নতুনত্ব (যাকে আমরা আদর করে বলি রেনেশাঁস) বড়ই দ্রুত চালে পার হতে লাগল তার বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের স্তর। এবং ক্রমেই এক সর্বব্যাপী অবক্ষয়ে তার নাভিশ্বাস উঠতে লাগল।

পাঠক, আমার এই জ্ঞানগর্ভতায় বিরক্ত হবেন না। আমি পন্ডিত নই, বিশেষজ্ঞ তো নইই। নিতান্তই আমি এক-জন সাধারণ বাঙালি, নানা কার্যকারণের ফলে বছর পঁয়তাল্লিশ ধরে কলকাতার অধিবাসী। ডেকাডেন্সের ক্রমপর্যায়টি স্পষ্ট চোখের ওপর ঘটতে দেখছি। সেইটুকুই আমার মূলধন।

রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি শান্তি-নিকেতনে এবং কলকাতায়, মাত্রই দুবার। প্রথমবার আমরা কয়েকজন কবিযশপ্রার্থী মিলে শান্তিনিকেতনে যাই। কবির সঙ্গে দেখাও হয়, কিন্তু কথা হয় না। কথার ব্যাপারটা উনিই চালিয়ে যান। এবং মামুলি শুভেচ্ছাসূচক কথা ছাড়া গভীরতর কিছু নয়। দ্বিতীয়বার মহাজাতি সদনের প্রতিষ্ঠার দিন।

সে যাক, আসল কথায় আসি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের শেষ দু-সাত বছর আমাদের চোখের সামনেই লিখ-ছিলেন। কলকাতাকে ঘটনাস্থল করে তাঁর কিছু কিছু লেখা তখনো বেরিয়েছে বটে, কিন্তু কলকাতার নিজস্ব জীবন নিয়ে গল্প-উপন্যাস লেখার চেষ্টা করেননি কখনো। তাঁর নিজের জীবনের কথা বলতে গিয়ে 'ছেলেবেলা' বইটিতে জোড়াসাঁকোর ঐ বাড়ির বিষয়ে কিছু কথা অনিবার্য-ভাবেই তাঁকে বলতে হয়েছে। তাতে পুরনো দিনের হালচালের খবরও পাওয়া যায় বটে। কিন্তু সেটা ছিল আনুষঙ্গিক ব্যাপার, মূল প্রসঙ্গ নয়।

কলকাতার জন্ম (এবং মৃত্যু) হলেও, রবীন্দ্রনাথের আসল আগ্রহ ছিল গ্রামের দিকে। গ্রামীন জীবনের হাজার রকম সমস্যা, কৃষি এবং ঋণ থেকে শুরু করে শিক্ষা এবং সমবায় পর্যন্ত কতোদিকেই তার কতোরকমের পরামর্শ। গ্রামীন জীবন তিনি ভালোভাবেই বুঝতেন। আর বুঝতেন বলেই লিখতে পেরেছিলেন 'গল্পগুচ্ছে'র ঐ অবিস্মরণীয় গল্প-গুলো। আর কবিতা, না সে ফর্দ দিয়ে আর কথা বাড়াব না।

শরৎচন্দ্রকেও দেখেছি, রাসবিহারী এভিনিউয়ের এক দোকানে, কী যেন কিনছিলেন। তাঁকে দেখার জন্যে আরো দু-চারজন সঙ্গী ছিলেন আমার, তাঁদেরই একজন বললেন, কাছাকাছি থাকেন উনি। ভালো করে দেখতে না দেখতেই কাজ সেরে গাড়িতে গিয়ে বসলেন, এবং চোখের আড়ালে চলে গেলেন।

শরৎচন্দ্রও মূলত ছিলেন গ্রাম-জীবনের লেখক। যদিও তাঁর প্রধান দুটি উপন্যাসের ঘটনাস্থল এবং চরিত্রপাত্রেরা মোটামুটি ছিল কলকাতার মানুষ। আমি 'গৃহদাহ' আর 'চরিত্রহীনে'র কথা বলছি। কিন্তু সেখানেও তাঁকে ঘটনাবিন্যাসের জন্যে কলকাতার বাইরে যেতে হয়েছে। বুঝতে পারা গেছে, কলকাতায় তিনি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন না। গ্রামজীবনের হাজার ত্রুটি তাঁকে পীড়িত করে তুললেও সেখানেই তিনি খুঁজে ফেরেন শুশ্রূষা। এমনকি তার নিরাময়ের ওষুধও বাতলে দেন তিনিই। যেমন 'পল্লীসমাজ'।

অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি, মোটা-মুটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে (রবীন্দ্র-নাথ অবিশ্যি মারা গেছেন ৪১-এ) আমাদের সাহিত্যের প্রধান দুজন লেখক তাঁদের সাহিত্যিক কাজের সমাপ্তি টেনে-ছেন। কিন্তু কলকাতায় বাস করলেও 'কলকাতাইয়া' বিষয়ের উপজীব্য করেন নি। ব্যতিক্রম বোধহয় শুধু রবীন্দ্র-নাথের 'শেষের কবিতা' এবং শেষ পর্যায়ের গল্প তিনটি। কিন্তু এগুলো ঠিক ধর্তব্যের মধ্যে আসে কিনা জানি না। এবং শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্তে'র মধ্যে কলকাতার ডেলিপ্যাসেঞ্জার করণিকদের বিষয়ে যেটুকু লেখা স্থান পেয়েছে, তা নিতান্তই একটু করুণ রস সৃষ্টির জন্যে, বইটির মূল বক্তব্য নয়।

কলকাতাকে নিয়ে, অর্থাৎ কলকাতার নিজস্ব জীবন নিয়ে সত্যিকারের নাগরিক রচনা শুরু করেন বোধকরি প্রেমেন্দ্র মিত্র। তাঁর লেখাতেই প্রথম ধরা পড়ে বিশাল একটি 'কলোনিয়াল' শহরের নাগরিক বৈশিষ্ট্য। তারই রচনায় প্রথম দেখা দেয় সেইসব 'আর্বান' মানুষ, জীবন যাদের মাটির সঙ্গে যোগ হারিয়েছে, যারা ছোটো গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ, যারা হাজারবকম কমপ্লেক্স-এর শিকার—যাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, এমনকি দুঃখ-যন্ত্রণাও যেন ছোট্ট সীমার মধ্যে বাঁধা।

এবং এই পটভূমিতেই এসে হাজির হন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। নাগরিকতা যে মানুষকে কেমন করে বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, যৌন আসক্তির হাড়িকাঠে কেমন করে দ্বিখন্ডিত হচ্ছে স্নেহ-প্রেম-বাৎসল্যের সমস্তরকম সুকুমারবৃত্তি, 'সরীসৃপ' এবং অন্যান্য গল্পের বইয়ে তার অজস্র পরিচয় মিলবে। আর, হৃদয়-বৃত্তির অত্যন্ত নিষ্কাশনের ফলে মস্তিষ্ক-ময় মানুষ কেমন করে শেষপর্যন্ত স্থান পায় গিয়ে পাগলামীর পাশাপাশি, তার বিস্ময়কর আলেখ্য আঁকা রয়েছে 'চতুষ্কোণ' উপন্যাসটিতে।

কলকাতার কথা পরবর্তী কালেও আরো কারো উপন্যাসে স্থান পেয়েছে বই কি। তারাশঙ্করের 'মন্বন্তর' উপন্যাসে উত্তর কলকাতার ক্ষয়িষ্ণু ধনী পরিবারের ছবি আছে, আছে দুর্ভিক্ষের সময়কার কলকাতার পথবাসী মানুষজনের কথা। কলকাতার পড়ন্ত পরিবারের ছবি বিমল মিত্রেরও বিষয়বস্তু হয়েছিল 'সাহেব বিবি গোলামে'। নিম্নবিত্ত গলিবাসী মানুষের কথা রয়েছে সন্তোষকুমার ঘোষের 'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাসে। কল-কাতার তথাকথিত নব্য আরিস্টোক্র্যাট জীবনের অন্তঃশীল পাপপ্রবাহের নাটক দেখা গেছে শঙ্করের 'চৌরঙ্গী' উপন্যাসে। সমরেশ বসুর 'বিবর' এবং বিশেষ করে 'পাতকে' শোনা গেছে কলকাতার বিকৃত জীবনের বিষে জর্জরিত হিংসু মানবাত্মার প্রতিঘাতী চিৎকার।

সংক্ষেপে, কলকাতা আমাদের গদ্য-সাহিত্যে কম দেয়নি। বলার দরকার নেই ওপরের দ্রুত বর্ণনায় অনেক লেখকের নাম জায়গা কম বলেই বাদ গেছে। যেমন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, মতি নন্দী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, এবং আরো অনেকে।

কিন্তু ইদানীং কেমন যেন সন্দেহ জাগছে, বাংলা সাহিত্যে কলকাতা আর নতুন কিছু দিতে পারবে কিনা। কেননা, হালের দুচারজন লেখক যেরকম কলকাতার জীবন নিয়ে লিখতে গিয়ে ফ্যান্টাসী বা কাব্য করার দিকে ঝোঁক দেখাচ্ছেন তাতে আশংকা হচ্ছে কলকাতার বাস্তব জীবন ইতিমধ্যেই বোধকরি নিষ্ফলা হয়ে উঠেছে। এবং কলকাতাকে নিয়ে ঘটনা ফাঁদতে গেলেই প্রেমেন্দ্র-মানিক-বিমল-শংকর-সমরেশের ফাঁদে ঘুরপাক খেতে হচ্ছে। অথচ সাহিত্যের কলকাতা ভবানীচরণের 'কলিকাতা কমলালয়' থেকে মাত্রই কিছু-বেশি একশ' বছর মাত্র পার হয়েছে।

অমলেন্দু রায়

শারদীয়া অমৃত

সেপ্টেম্বরেই বেরোবে

শ্রীদুর্গা ও শ্রীগৌরাঙ্গের
রঙিন অফসেট ছবি

সুখের স্মৃতি দুঃখের স্মৃতি

রাণী চন্দ

গুরুশিষ্য ছবিতে বন্ধুর-বন্দনা। অবনীন্দ্রনাথ আর রাণী চন্দ। দু'জনে মিলে এক সঙ্গে এঁকেছিলেন শান্তিনিকেতনের অনেকগুলো রঙিন ছবি। সেই ছবি আঁকার অসাধারণ কাহিনী এই প্রথম, লিখলেন অসামান্যা লেখিকা রাণী চন্দ। এই ধরণের পুজো সংখ্যায় তাঁর লেখাও এই প্রথম।

রবিঠাকুরের পাগলা ফাইল

অমিতাভ চৌধুরী

বদ্ধ উন্মাদ, পাগল ও ছিট গ্রস্তদের রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠি। কেউ চাইছে গেণ্ডেরিয়া বিচি, কেউ চাইছে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার সোজা রাস্তা, কেউ পাঠাচ্ছে সোনালী চুলের গোছা। শত শত চিঠি। রবীন্দ্রনাথ কী করেছেন সেই চিঠির তাড়া নিয়ে?

এবার পুজোয় সব চেয়ে বড় আকর্ষণ শান্তিনিকেতনের যাদুঘর থেকে অমৃতের জন্য বিশেষভাবে আনা অমিতাভ চৌধুরীর এই সুদীর্ঘ সচিত্র রচনা।

লেখক যখন প্রেমিক

রূপন তার রিব পাতায় এক একটি শব্দ মানে স্মৃতির শুকনো বকুল। একজন বিশিষ্ট বাঙালী লেখক মধ্য বয়সে নিতান্ত সামান্যা বালিকার প্রেমে পড়েছিলেন। লেখকের নামটি পরে পঞ্চাশ। অন্যতম শারদীয়া চমক।

উপন্যাস

আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, শচীন দাস।

বড় গল্প

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, লীলা মজুমদার, নবনীতা দেব সেন শৈবাল মিত্র

গল্প

মনোজ বসু, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, পরিতোষ সেন, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ অমর মিত্র ও আরও অনেকে।

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের প্রবন্ধ
সুমথনাথ ঘোষের 'সাহিত্যিক আড্ডা'

কবিতা

অরুণ মিত্র, মনীন্দ্র রায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, কৃষ্ণ ধর, আলোক সরকার, প্রণবেন্দ্র দাশগুপ্ত, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, সুনীল নন্দ এবং আরও অনেকে।

উল্লম্বনারী

ভবেশ সান্যাল

প্রাসাদের ছেলে ভবেশ সান্যাল চৌরঙ্গীর আর্ট স্কুলে ছবি আঁকতে এসে রঙ্গলোকের খোঁজে ছুটলেন নিষিদ্ধ পল্লীতে। তখন ছবির জগতে রয়েছেন অবন ঠাকুর আর যামিনী রায়। গল্পকে হার মানান ভাষায়, সেই সব মানুষ ও সময়ের কথা।

নরবলি এখনও আছে

অবিশ্বাস্য হলেও বিশ্বাস করতে হবে। ও ওড়িশার গাঁয়ে ঘুরে নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন সংকর্ষণ রায়—ছবি সহ ইতিহাস নির্ভর ধারাবিবরণী।

শিশির ও বিশ্বনাথ

মধুসূদন মজুমদার

প্রখ্যাত দুই শিশির ভাদুড়ীর ভাই বিশ্বনাথ ভাদুড়ীও কম ছোটেন না। তাই নিয়ে শিশিরবাবুর মধ্যে একটু ঈর্ষাও ছিল সম্ভবত। দুই ভাদুড়ীর ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ ফুটেছে এই লেখাটিতে।

দাম : দশ টাকা। রেজিস্ট্রি ডাকে দু টাকা পঁচিশ পয়সা অতিরিক্ত

সার্কুলেশন
ম্যানেজার, অমৃত পাবলিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড কলি-৩।

অমৃত

অবরোধ!
পাল্টা প্রস্তাব

রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেস দ্বিধা বিভক্ত

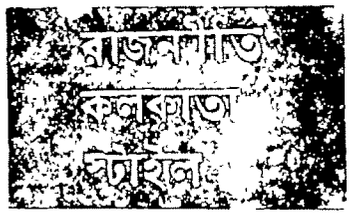

বেদব্যাস বৈদ্য

বামফ্রন্ট তথা সি পি আই (এম) বিরোধী আন্দোলন নিয়ে রাজ্য ইন্দিরা-কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত। একপক্ষ মনে করেন, সি পি আই (এম) তথা বামফ্রন্ট সরকার-বিরোধী ব্যাপক আন্দোলন অনতি-বিলম্বে গড়ে তোলা প্রয়োজন। সি পি আই (এম) দলকে আর বেশী বাড়তে দেওয়া যায় না। আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটেছে। জনজীবনে নিরাপত্তা নেই। আর কিছুদিন ক্ষমতায় থাকলে সম্পূর্ণ প্রশাসন যন্ত্র ওরা কব্জা করে ফেলবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

অপর অংশ অবশ্য এই মতবাদে বিশ্বাসী নন। তাদের মতে সর্বভারতীয় রাজনীতি বা প্রশাসনে রাজ্যের সি পি আই (এম) দল বা বামফ্রন্ট সরকার সমুদ্রের শিশিরবিন্দু মাত্র। ইন্দিরা কংগ্রেসের প্রথম এবং প্রধান শত্রু কেন্দ্রের জনতারাজ। তাই সি পি আই (এম)-এর বিরুদ্ধে অযথা শক্তিক্ষয় করে নিজেদের দুর্বল না করে জনতা দলের বিরুদ্ধে বৃহত্তম সংগ্রামের প্রস্তুতি নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। সি পি আই (এম)-এর নেতৃত্বে গঠিত বামফ্রন্ট সরকার জনতা দলের অপ-সৃষ্টি মাত্র। এবং কেন্দ্রে জনতারাজের যতদিন অস্তিত্ব, ততদিনই তার আয়ু।

বলাবাহুল্য, ইন্দিরা কংগ্রেসের যে অংশ পরোক্ষভাবে মতবাদে বিশ্বাসী তাদের সঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্র সেনের দৃষ্টি-ভঙ্গীর বিস্ময়কর মিল রয়েছে। তাদের এই চিন্তাধারার মিলের অন্যতম কারণ, যতটা না রাজনৈতিক, তার চেয়েও অনেক বেশী অন্ধ কমিউনিস্ট বিদ্বেষ। এই দলে বরকত সাহেবের সঙ্গে আছেন সরকত-সোমেন, গোবিন্দ-আনন্দসহ ছোটবড় অনেক নেতা এবং অজস্র কর্মী। তাঁরা এই মুহূর্তে রাজ্য-জুড়ে সি পি আই (এম) বিরোধী ব্যাপক গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে অতি-মাত্রায় আগ্রহী শুধুমাত্র প্রফুল্ল সেনের নেতৃত্বই নয়, প্রয়োজনে তাঁরা বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী দল এবং নেতা এবং প্রদেশ-লক্ষ্মীদের সঙ্গে সমঝোতা করতেও পিছপা নন। তাই ইতিমধ্যে প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সঙ্গে ইন্দিরা কংগ্রেসের একাংশ গোপনে যোগসূত্র স্থাপন করে চলেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রফুল্লচন্দ্র সেনের নেতৃত্বাধীন প্রস্তাবিত বামফ্রন্ট বিরোধী আন্দোলন কতখানি সফল হবে তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। কারণ, এই প্রশ্নে ইতিমধ্যে রাজ্য কংগ্রেসের উপরতলায় রীতিমত মতান্তর সৃষ্টি হয়েছে।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর একান্ত ঘনিষ্ঠ এবং বিশ্বস্ত সহযোগীদের অন্যতম প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণবকুমার মুখো-পাধ্যায় একজন সর্বভারতীয় নেতা। যদিও তিনি রাজ্য কমিটির পদস্থ কোনও পদে আসীন নন, এবং বর্তমানে নয়াদিল্লীর তালকোটোরা রোডের বাসিন্দা, তবুও রাজ্য কংগ্রেসের রাজনীতিতে তাঁর প্রভাব অপরিসীম। নেপথ্য নায়ক প্রণবকুমারের পরামর্শ এবং মতামত তাঁদের কাছে অপরিহার্য। কেননা, প্রণবের মতামত অগ্রাহ্য করে শ্রীমতী গান্ধী যে রাজ্য নেতাদের কোনও সুপ্ত বাসনা পূরণ করবেন না—একথা সকলেরই জানা। দেবী-সিদ্ধার্থের মত অনেক নেতা সুদিনের সফল ভোগ করে শ্রীমতী গান্ধীকে দুর্দিনে যখন নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করেন, সেই চরম বিপর্যয়ের সময়েও প্রণব ছিল তাঁর ছায়াসঙ্গী। সুতরাং রাজ্য কমিটির রেউ না হয়েও প্রণব অনেক কিছু। রাজ্য নেতারাও এবিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল।

রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেসের সভাপতি বরকত সাহেব এবং তাঁর সমর্থকরা প্রফুল্লচন্দ্র সেনের বামফ্রন্ট, তথা সি পি আই (এম) বিরোধী আন্দোলনের সামিল হতে আগ্রহী হলেও শেষপর্যন্ত তাঁদের পক্ষে প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে কতটা এগোন সম্ভব, সেবিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। প্রণববাবু এবং তাঁর অনু-গামীরা সস্তা রাজনীতিতে আর বিশ্বাসী নন। তাঁরা দলকে সর্বভারতীয় রাজ-নীতির পরিপ্রেক্ষিতে চালাতে চান। রাজ্যের সি পি আই (এম) তথা বামফ্রন্ট সর-কারকে তাঁরা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সমুদ্রের শিশিরবিন্দু বলে মনে করেন। প্রণব-বাবুর ভাষায়, এরাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার জনতা রাজেরই অপসৃষ্টি। সুতরাং কেন্দ্রের জনতা সরকারকে ক্ষমতচ্যুত না করে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার অর্থ মশা মারতে কামান দাগানো ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রফুল্লচন্দ্র সেন এবং তাঁর প্রস্তা-বিত আন্দোলন সম্পর্কে প্রণববাবুর দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেসের উগ্র গোষ্ঠীর মৌল পার্থক্য বর্তমান।

প্রফুল্লবাবুর প্রতি নিষ্ঠা এবং সম্মান দেখালেও, প্রণববাবু মনে করেন, ১৯৬৭ সালের অজয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ১৯৭৭-এর প্রফুল্লচন্দ্র সেনের রাজনীতিগত এবং দৃশ্যগত তেমন কোন ফারাক নেই। দশ বছর আগে কংগ্রেস ছেড়ে ব্যক্তিগত ক্ষোভ, অভিমান আর বিদ্বেষ নিয়ে অজয়-বাবু প্রথম যুক্তফ্রন্টের জন্ম দিয়েছিলেন। এবং দু বছরের মধ্যেই সি পি আই (এম) নেতা ও কর্মীদের সম্বন্ধে তাঁর মোহমুক্তি ঘটেছিল। দশ বছর পর প্রফুল্লচন্দ্র সেনও তেমনি কংগ্রেস ছেড়ে ব্যক্তিগত অভিমান আর আক্রোশবশে এ রাজ্যে সি পি আই (এম) তথা বামফ্রন্ট সরকারের সৃষ্টি করেছেন। তথাকথিত গণতান্ত্রিক অধিকারের নামে প্রফুল্লবাবু যদি প্রমোদ-জ্যোতি চক্রকে এ রাজ্যে নতুন করে পুন-র্বাসন না দিতেন, তবে আর পশ্চিম বাংলার এই হাল হত না।

প্রণববাবুর মতে, অজয়-প্রফুল্ল দুই জাতীয়তাবাদী নেতা ব্যক্তিগত জীবনে থুব সরল-সহজ। কিন্তু দুজনেই বড্ড বেশী সেন্টিমেন্টাল। ভাবাবেগ নিয়ে সাহিত্যসৃষ্টি চলে, রাজনীতি চলে না। এছাড়াও প্রণববাবু মনে করেন, প্রফুল্ল-বাবু মূলতঃ জনতা দলের পৃষ্ঠপোষক। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তিনি সি পি আই (এম) বিরোধী আন্দোলন করতে চাইলেও জনতা দল ও কেন্দ্রীয় সরকার বাম-ফ্রন্টের আশ্রয়দাতা। প্রফুল্লবাবুর সত্যাগ্রহ ক্ষোভ, অভিমান, আন্দোলন সবই তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাঁর পেছনে সুসংহত কোন দল নেই। তাই প্রফুল্লবাবুর সি পি আই (এম) বিরোধী প্রস্তাবিত আন্দো-লন জনতা-সি পি আই (এম) দলের মধ্যে-কার কৃত্রিম লড়াই ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রফুল্লবাবুর এমন কোন শক্তি নেই, যার দ্বারা তিনি কেন্দ্রীয় সরকার বা জনতা দলকে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে প্রভা-বিত করতে পারেন। অথচ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী চান, কেন্দ্রের জনতা রাজকে উৎখাত করতে। ইন্দিরা কংগ্রেসের প্রথম এবং প্রধান আক্রমণের লক্ষ্য জনতা দল ও সরকার। তাই সর্বশক্তি নিয়ে সুসংহত আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতিতে বিশ্বাসী রাজ্যের বামফ্রন্ট অথবা সি পি আই (এম) বিরোধী আন্দোলন করে এই মুহূর্তে শক্তি খর্ব করতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী অথবা প্রণববাবুরা মোটেই আগ্রহী নয়। বরং বামফ্রন্টের শরিকদলগুলির সহায়তায় কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক কোনও আন্দোলন সম্ভব কিনা, সেই কৌশল রচনাতেই তাঁরা বেশী আগ্রহী।

মঙ্গলগ্রহের কর্মপতি মঙ্গল

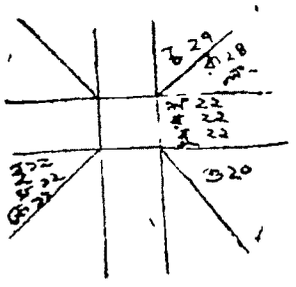

প্রাচীন ঋষিদের দেওয়া নিশ্চিন্ত গণনা-নীতিতে এক সপ্তর্ষী, কালী-গণপতি নিয়ন্ত্রণপতি ও শনি-রাহুকে বাদ দিয়ে ছয়টি গ্রহের সমন্বয়ে সপ্তর্ষী মণ্ডলের কথা বলেছেন। এরই সঙ্গে সপ্তর্ষীদের সম্পর্ক পাঠকদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখন সপ্তর্ষী মণ্ডলের সাতটি গ্রহের কর্মক্ষমতার উপর সমধর্মী গ্রহ কি ভাবে কর্মনিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নির্ভরশীল করে তোলে সেই তত্ত্বের মধ্যে বিস্তারে ঢুকে পড়ার আগে কর্মনিয়ন্ত্রণ চিন্তাই এর যায় না—বিশেষ করে শহরবাসীর। গ্রামে গঞ্জে বিদ্যুৎ এবং তথাকথিত। তাহলে বিদ্যুতে সমস্ত জীবনযন্ত্রকে চালিত করে দিতে সক্ষম সংবাদপত্রে গ্রামবা পড়তেই পারি, তাতে কখনও আশ্চর্য হলে, কখনও বা হতাশায় ভেঙ্গে পড়ি। তাই যে গ্রহই এ এস ইন্টারফেসের ওপর এমন কোন গ্রহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়, যাঁর সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে নাগরিকের ভয়স—সে কি ব্যক্তিগত আই এ এস এফিসার বা সংসদ সদস্যের সঙ্গে কিংবা ভাবনা তাকে ধরছি।

মুনি ঋষি, উদ্ভিদ ভাস্কর্যদর্শনের কোন লেখনে জাতক মনোযোগ সহকারে। বিশ্লেষণটিকে জ্যোতিষী দৃষ্টিতে দেখা গেলে পঞ্চমেই হোগে শনি—সিংহ রাশিকে বলিষ্ঠ গ্রহে বসিয়ে লক্ষ্যে বৃহস্পতি এবং মঙ্গল সহযোগিতা। সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয় জাতক রাশিচক্রে কর্ম স্থানপতির গৃহে ভাগ্যপতি রাশির সঙ্গে চন্দ্রের নক্ষত্রে বসে এবং লগ্নের সপ্তমাধিপতি আরও লক্ষ্য করার মত, কর্ম স্থানের সঙ্গে যোগকারক গ্রহ শনি একাদশে বিদ্যে নক্ষত্রে বলেন গ্রহ রাশিচক্রে স্থানের কারণে ফলপ্রদ নয়। সেই নিয়মে বিচার মঙ্গল দ্বিতীয়স্থানে থাকায় ১৯৩৫ সালে ৫০ ডিগ্রিতে কুম্ভ রাশির ২৫ ডিগ্রি ৪৯ মিনিট ক্রান্তি এই এ এস প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়েছে। হয়েই না নানা রকম বিরোধিতার কারণে পক্ষে বিপক্ষের গড়ে ওঠা। দশায় নবমেশ সপ্তমস্থানে শনির ভুক্তি কর্মক্ষেত্রে ভাগ্যোন্নতি এনে দেবার কথা। তাই হয়েছিল। তবে গোচরে শনি দ্বিতীয় স্থানে এসে কিছু বৃহস্পতি দ্বিতীয় কিছু বক্রগতি, বিদ্যে বসে বসে বস

ভ্রমণ এড়িয়ে চলা উচিত। শুক্র, শনিবার অশুভ।

কর্কট : যদিও মাথায় এক গাদা চিন্তা থাকবে। কিন্তু প্রয়োজনবোধে অর্থ সংগ্রহ হয়ে যাবে। ভ্রাতৃস্থানীয় কারোর সঙ্গে মনোমালিন্যের যোগ দেখা যায়। সোম থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত শুভ।

সিংহ : আর্থিক ক্ষেত্রে কিছুটা হাঁটা পড়তে পারে। অহেতুক ব্যয় মনের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে। চক্ষুরোগের সময়টা অনেকটা অনুকূল। সোম, মঙ্গলবার অশুভ।

কন্যা : যে কাজই করুন না কেন আত্ম-বিশ্বাস রাখুন। শুভ ফল পাবেন হঠাৎ ক্রোধ ক্ষতির কারণ হতে পারে। শনি, রবিবার শুভ। বুধ, বৃহস্পতিবার অশুভ।

তুলা : সাংসারিক ব্যাপারে কোন কারণে হাঁটা দেবা দিলেও ব্যবসাপত্রের দিক থেকে সপ্তাহটা উল্লেখযোগ্য। সোম মঙ্গল কোন আশা পূর্ণ হতে পারে।

বৃশ্চিক : কর্মে সফল হবেন। কিন্তু অধস্তন কর্মচারীরা কোন কারণে মনে চাপ সৃষ্টি করতে পারে। কোন ব্যবসায় হঠাৎ লাভ হতে পারে। শনি রবি শুভ। মঙ্গলবার অশুভ।

ধনু : আইনগত ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। ভ্রাতৃ-স্থানীয় কারোর ব্যবহার অসন্তুষ্টি আনতে পারে। কিন্তু ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আনন্দ পাবেন। সোম মঙ্গলবার শুভ।

মকর : আর্থিক কারণে চিন্তা হতে পারে কর্মক্ষেত্রে ও ন্যায্য প্রাপ্তিতে বাধা দেখা যায়। বিবাদ দেখা যায় সহ-কর্মীদের সাথে। এই সময় সেখকদের পক্ষে সুযোগ আসবে। বুধ বৃহস্পতিবার লক্ষ্যণীয়।

কুম্ভ : আর্থিক ক্ষেত্রে হেরফের দেখা দেবে। প্রতিযোগিতামূলক কাজে সফলতা পাবেন। বহু দিনের কোন প্রত্যাশা সফল হতে পারে। সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত শুভ।

মীন : ব্যয়ের চাপ থাকবে। বিবাদ দেখা যায়। কর্মস্থানে উর্ধ্বতনের সান্নিধ্য পাবেন। হঠাৎ কোন ব্যক্তির প্রেসার লেভেল নেগে যেতে পারে। শনি, রবিবার অশুভ।

শ্রীগণিকা

প্রশান্ত শূর
আগামী সংখ্যায়

স্ট্যাটাস সিম্বল

সমীর চট্টোপাধ্যায়

শংকরবাবুর কথাই ধরা যাক। তিনি কখনো বিদেশে যাননি, বাল্যকাল তাঁর কাটেনি কোনো অভিজাত শহরে। গ্রামের পাবলিক স্কুলে পড়াশুনা করেছেন। স্কুলে ছুটির পর পকেট ভর্তি মুড়ি নিয়ে খেলতে গেছেন মাঠে। খেলাধুলোর পর গঙ্গায় সাঁতার কেটে ভিজে জামা-কাপড়ে বাড়ি ফিরেছেন। সন্ধ্যে হতে না হতেই চোখ জুড়ে নেমে আসতো ঘুম। কোথায় আবর, কোথায় সুমের বৃত্ত, আর কোথায়-বা ফর্মুলার ফাঁস—সব একাকার হয়ে যেত। বাড়িতে ছিল পিতামহের কড়া শাসন, যৌথ-পরিবারের হিটলার। পিতামহের বকুনি শুরু হলে পিতামহী এসে দাঁড়াতেন সবুজ গ্যালাবীর একনিষ্ঠ সাপোর্টার হয়ে। এক আকাশ-ভরা নক্ষত্র মাথার উপরে, আদুলে গায়ে ঠাম্মা বসে, হাতে হাতপাখা, হাত-পাখার ডাঁটি দিয়ে মাঝে মাঝে পিঠের চামচি মারছেন—গল্প শোনাতেন একের পর এক। গল্প শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়তেন আর স্বপ্নের দেশে তখন শুধু বজ্রপুত্র কোটালপুত্র, ব্যাঙমা-ব্যাঙমি আর নির্জন রাজপ্রাসাদে বন্দী ঘুমন্ত রাজকন্যা। অথচ শংকরবাবু ম্যাট্রিকে রেজাল্ট করলেন দারুণ। ভালো ছেলে হিসেবে সুনাম ছিল চিরকাল, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত তা তিনি বজায় রেখেছেন। চিত্রাচরিত পড়াশুনার সঙ্গে শংকরবাবুর শখ ছিল সাহিত্য পড়ায়, গান শোনায়। সেই ছোটবেলা থেকেই। পড়েছেনও বিস্তর। তাঁর রিডিং-রুম দেখলে কিছুটা অনুমান করা যায়। আজ শংকরবাবু জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কোথায় যেন এতটা বয়সে, যখন কৃত্রিম প্রোটিন এসে গেছে শরীরে, একটা খটকা লেগে গেছে। ঠিক ঠিক মেলাতে পারছেন না সব কিছু। শুধুমাত্র স্ত্রীর অসন্তুষ্টির অনুরোধে ছেলে মেয়েকে পড়াতে হচ্ছে ইংরাজী স্কুলে। বাঙালি ছাতার মতো হঠাৎ গজিয়ে ওঠা এইসব স্কুল আজ শহরের প্রায় সর্বত্র। স্ট্যাটাস-সিম্বল হিসেবে এ-সকলের স্কুলে ছেলে মেয়েদের আজকাল নাকি পড়াতেই হয়। এসব স্কুলে পড়লে ছাত্র-ছাত্রীরা খুব ডিসিপ্লিনড্ হয়। কী ধরণের ডিসিপ্লিন বানাতে পারেন না শংকরবাবু। তাঁর মনে পড়ে পিরিয়ডের ফাঁকে ফাঁকে হেডমাস্টারমশাই বেত দিতে বেরুতেন সারা স্কুল ভয় সমস্ত এলাকা চেহারা নিত হয়ে ডিসিপ্লিন মানে যদি শোকের পরিপাটী বা কিছু শৃঙ্খলতা, তাহলে শংকরবাবুর ধারণা ডিসিপ্লিনড্ সমস্ত দেশটা চেহারা হবে যেন সদ্য হাতে পোষা পাখিদের মতো। এক স্ট্যাটাস পাবলিক পাঠশালায় ছেলেকে ভর্তি করে, এবং স্কুলে নাকি ভালো ইংরেজি শেখানো হয়। এখন শংকরবাবুর চিন্তা বাংলা মাধ্যমে পাবলিক স্কুলে কম্পিটিশন-ভাষা বা সাহিত্যের সমঝদার হবার মতো কোনো আকর্ষণ হয় নি।

পূজোয় অভিনয়ের জন্য কয়েকটি সুনির্বাচিত নাটক

বিজয় তেন্ডুলকারের
চোর আদালত চলছে
মারাঠি নাটকের বঙ্গানুবাদ ৫·০০

বড়ো পিসিমা	(কৌতুক)	বাদল সরকার ৪·০০
হারানো চিঠি	ঐ	অমিতা রায় ৩·০০
আজকের নাটক	ঐ	সুশীল মুখোপাধ্যায় ৩·০০
গল্প বলুন	ঐ	ঐ ৩·৫০
তথাস্তু	ঐ	ঐ ৪·৫০
অমিতাক্ষর		ঐ ৩·৫০
তোমার হলো শুরু		ঐ ৩·৫০
বাঁধ		ঐ ৩·০০
কাঞ্চনরঙ্গ		শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র ৩·০০
অংশীদার		গঙ্গাপদ বসু ৪·০০
অন্ধকারের বৃত্ত		ঐ ৩·৫০
মেঘে ঢাকা তারা		শক্তিপদ রাজগুরু ৫·০০

শম্ভু মিত্রের
ঘূর্ণি ৩·০০
নীহাররঞ্জন গুপ্তের
দুই রাত্রি ৩·০০

গ্রন্থপাঠ, ২০৯বি, বিধান সরণি, কলিকাতা ৬।

বয়সে ঠাকুমার ঝুলি, ডোম্বল সর্দার, উপেন্দ্রকিশোর, অবনীন্দ্রনাথ বা সুকুমার রায় প্রিয় হওয়া উচিত, সে-বয়সে ছেলে-মেয়েদের মিলস্ এন্ড বুনস্ সিরিজ বা ব্লিন্ড্ ব্লাইটন পড়তে দেখলে অস্বস্তিবোধ করেন। ফলতই তিনি সেদিন ক্ষুব্ধ হলেন। —'ফিশ' বানান লিখতে না পারার জন্য বাঁতিমতো বকুনি খাচ্ছিল ছেলে। স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেই ফেললেন—'মৎস্য' বানানটা শেখা ওর কাছে জন্মসূত্রে জরুরী বেশি। ওকে কি সেটা শিখিয়েছেন? শংকরবাবু অবাক হন যখন দেখেন, টুইকিল টুইকিল-এর মতো ছড়াও মুখস্ত বলতে পারে যারা, তাদের কখনো পড়ানো হয় না যোগীন্দ্রনাথ সরকার। কোনো 'প্রাদেশিকতা বা গোঁড়ামি নয় আসলে শংকরবাবুর ভয় হয়, এমনিভাবেই হয়তো একদিন এমন এক জেনারেশন আসবে যারা ভুলে যাবে যা-কিছু আমাদের অতীত ঐতিহ্য, আমাদের সম্পদ। তারা না-হবে কাক, না-হবে ময়ূর, ময়ূরপুচ্ছ দাঁড়-কাকের ঘৃণ্য অপবাদ নিয়ে বেঁচে থাকবে।

শংকরবাবু আরো অবাক হন। তরুণদের সঙ্গে মিশতে উনি ভালোবাসেন। মাঝে মাঝে কফি-হাউসে যান। শংকরবাবু সেই ধরণের বিরল মানুষ, যিনি বয়েস অতিক্রম করে মিশতে পারেন। ফলে টেবিল-ঘিরে আড্ডা জমে ওঠে বেশ। এদের মধ্যে অনেকেই সাহিত্য-কবিয়ে। কেউ কেউ লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক। এরা প্রায় সময়ই বিভিন্ন বিদেশী কবি-লেখকের নাম করে। তাঁদের লেখার ভূয়সী প্রশংসায় আলোচনায় মেতে ওঠে। শংকরবাবু এদের আলোচনায় যোগ দেন। উত্তেজিত হন। ভাবেন, তাহলে তিনি কি পিছিয়ে পড়ছেন? গোপনে গোপনে পড়ে ফেলেন যা পড়া হয়নি তখনো। অথচ আশ্চর্য! বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে শংকরবাবু দেখেন, প্রায় সবাই যাঁদের নাম প্রায়শই শ্রদ্ধা-সহকারে উল্লেখ করে সব আলোচনায় মেতে ওঠে, তাঁদের লেখা পড়েনি। শুধু বাঁশি শুনেই এতো লাফালাফি। আসলে এটাও হয়তো একটা ফ্যাশন, যেমন আই-বেলা প্লাকিং বা প্ল্যাটফর্ম সু। নাটকের আলোচনা করতে গিয়ে যারা কথায় কথায় বেকেট, লোরকা বা জেনের নাম বা কবিতার আলোচনায় মায়াকভস্কি, কর্কতো বা নেরুদা উল্লেখ করে, তারা না পড়েছে ছাত্রের মতো গভীর অধ্যায়সায়ে এঁদের লেখা, না পড়েছে মাইকেল, দীনবন্ধু, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দ। জীবনানন্দ নিয়ে সম্প্রতি একটু বেশি আলোচনা হয়,—কেজি টপিক, কিন্তু তা প্রায়শই এতো প্রশংসাব্যঞ্জক যে, শংকরবাবুর সন্দেহ হয়, সত্যি সত্যি জীবনানন্দও পঠিত কিনা। তরুণদের মুখে লঞ্জেসের মতো কাফকা-ক্যামু-সার্ত্রর নাম ঘোরে ফেরে। হাসি পায় শংকরবাবুর। এলিয়েনেশন বা নির্দেশদর্শন তো ভাবতীয় দর্শনেরই উপহার। যা-ছিলো মূলতই আইডিয়ালিস্টিক তা ওঁদের লেখায় অনেক বেশি মাটি-রস-ঘামে ভেজা। স্বাভাবিক। কিন্তু এলিয়েনেশনের যে চেহারা ওঁদের লেখায় যা চূড়ান্ত ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের বিষবিক্রিয়া, তা আমাদের দেশে বিরল। অথচ অবিকল ইউরোপের ধার করা সেই বিচ্ছিন্নতা নিয়ে আমাদের দেশে যখন কেউ কেউ লিখে থাকেন, তখন শংকরবাবুর মনে হয় প্রতিক্রিয়াশীল কাজকম্মো বোধহয় একেই বলে। তাঁর দৃঢ় ধারণা, যারা প্রত্যক্ষভাবে লেখালিখির সাথে যুক্ত, তারাই যদি এভাবেই হারিয়ে ফেলে দেশের নিজস্ব সাহিত্য, মাটি-মানুষের সম্পর্ক, তাহলে যা মূলত সমাজের দর্পণ তাতে মুখ ভেসে উঠবে অন্য। ভরাডুবি তখনই।

শংকরবাবুর এক বন্ধু আছেন। ফরাসী ভাষার অধ্যাপক তিনি। দু-দুবার ফ্রান্সে গেছেন। শংকরবাবু কোনদিন ফ্রেঞ্চ শেখার প্রেরণা অনুভব করেন নি। ফ্রান্সে যাননি বলে দুঃখও নেই। অথচ ফরাসী-সাহিত্য পড়েছেন। প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবোধও আছে। সুতি-সম্প্রতি ওদেশের সাহিত্যে কি ঘটছে তা তিনি স্পষ্টতঃ জানেন না। অধ্যাপক বন্ধুটি সর্বদা ফরাসী দেশ এবং সাহিত্যের কথা বলেন। বলেন, ওদেশে যা হয়েছে এবং হচ্ছে, তার তুলনা নাকি অন্য দেশে মেলা ভার। একদিন আর না-পেরে শংকরবাবু বলেই ফেললেন, ভাই, মানলুম সব। কিন্তু আমাদের দেশে কি কিছুই হয় নি? ফরাসী বিপ্লবের কথা কিংবা প্যারী কম্যুনের কথা এমনভাবে বলো যেন তুমি নিজেই সেখানে উপস্থিত ছিলে সেসময়, কিন্তু ভাই, আমাদের দেশেও তো চোঁয়াড় বিদ্রোহ বা তেলেঙ্গানা নিদেনপক্ষে হয়েছে। মুখ ফসকে কি একথাও বেরোতে নেই? ফরাসী সাহিত্য নিশ্চয়ই পড়বে, কিন্তু তা বলে ভুলে করেও কি চতুরঙ্গ, গণদেবতা, পুতুল-নাচের ইতিকথা বা আরণ্যক পড়তে নেই? যাদের নাম আবিরাম করো, এঁরা কি তাঁদের চেয়ে খুবই নিকৃষ্ট? আর এখন যাঁরা লিখছেন এদেশে, কবিতা কি উপন্যাস, তাঁরা কি বুদ্ধিজীবীর মতো এক লাইনও লেখেন নি?' শংকরবাবু ভাবেন, যাদের সারাটা জীবন কেটে যায় মাতৃভাষা শিখতে, এবং আমরা যারা দুর্ভাগা, ঔপনিবেশিক সূত্রে পেয়েছি আর একটা ভাষা এবং তা শিখতে হয় গলদঘর্ম হয়ে, তাদের পক্ষে আবার ভাষা শেখা নিতান্ত বিলাসিতা-বা বোঝার উপর শাকের আঁটি ছোড়া আর কি? তবু ভাষা শেখা মোটেই আপত্তিকর নয়। কিন্তু তা বলে কে মাথার দিব্যি দিয়েছে যে, গুণা করতে হবে নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য, দেশজ ঐতিহ্য বা সংস্কৃতিকে? উপেক্ষা করতে হবে তাঁদের যাঁরা এই অপরিস্কৃত ভাষাকে উন্নত করার জন্য কিছু শ্রম বা মেধা ব্যয় করছেন?

শংকরবাবু প্রায়ই ভাবেন—দু-বাংলা মিলিয়ে যে আয়তন বা জনসংখ্যা তা ইউ-রোপে যে কোন দেশের চেয়ে বেশী। এই পৃথিবীতে বাংলাভাষী লোকের সংখ্যা আই-রিশ বা ফরাসী বা ইতালী বা স্পেনিশভাষীর চেয়ে অনেক বেশি। অন্য কোনো ভাষার সাহিত্যও এসে অল্পসময়ে এই উন্নত-অবস্থায় পৌঁছতে পারে নি। সবে তো গোলেমেলে দেড়শ বছর। তিনি যেন স্পষ্টতঃ দেখতে পান—পৃথিবীর প্রায় সব দেশে কিছু-না-কিছু মানুষ বাংলাভাষা শিখছে, সাহিত্য পড়ছে। বাংলা-সাহিত্যের একটি এপ্রিসিয়েটিভ মোহার সারা পৃথিবী জুড়ে। আমাদের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সম্বন্ধে উৎসাহও প্রবল। চার-পাঁচ বছর অন্তর এক-একজন কবি বা লেখক নোবেল পুরস্কার পাচ্ছেন। যে-সব বাধ এখনো বর্তমান, তা উঠে গেছে তখন। তিনি এসব ভাবেন। তিনি আশাবাদী। যদিও যখন সব কিছুরই খারাপ দশা, তখন সব কিছুকে ভালো বলার এবং ভালো ভাবার বাতিক হলো আশাবাদ, তবুও তিনি.....।

কারণ, তিনিও তো অনেকটা কমনম্যান সুনন্দের মতো কমনম্যান শংকর সান্যাল॥

প্যাস্টোরাল (১)

অমিত চৌধুরী

যে কোনো কথার মধ্যে হেসে ওঠা তোমার স্বভাব।
তবুও তোমাকে আমি কতটুকু চিনি ?
তুমি কী সকালে উঠে গান গাও
খুব ধীর ব্যস্ত হও কাজে ?
মর্নিং স্কুল থেকে ফিরে এসে খুব তড়াতাড়ি
স্নান,হারা সেরে নাও
দুপুর কী ভাবে কাটে ? একা একা
টিউটোরিয়াল ছুটি—এখন বিকেলে
কোথাও বেড়াতে যাওয়া যায়—যাবে নাকি ?
কাছাকাছি--দূরে নব শখের বাজারে।
কিনে আনব শৌখিন জিনিস, টুকিটাকি
শীতের টম্যাটো খুব ভিটামিন
—সবুজ পালং
রুম্পার হাতের চুড়ি—বাঁকুড়ার টেরাকোটা ঘোড়া
এইসব।
শখের বাজার খুব দূরে নয়, বাড়ীর কাছেই
কিছুক্ষণ ঘুরে আসা যায়
যাবে নাকি ?

প্রশ্ন

দিলীপ দাশগুপ্ত

তুমি কি ভালবাসার উপযুক্ত মানুষ।
তুমি কি একাগ্রতা রেখেছ কোনো প্রিয় মুখের জন্য।
টেলিগ্রাফের তারে বোবা কান্নার প্রতিশব্দ।
ঝাপসা হয়ে যাওয়া বাস্তব চলন্ত গাড়ী।
বৃষ্টিতে নেভে ও জ্বলে বহুদূরের জলছবি।

এখানে ভাসছে রাত্রিদিন উদাস মুখ, ক্লান্ত শরীর, দীপ্ত চোখ।

বাংলা ইটের ঘুম

সমরেন্দ্র দাস

দূরে উপত্যকা—ঐ সবুজ জলাশয় ঝালরের মত পড়ে ছিল একা
তার চাষ কোনে সিংহমুখ জেগেছিল কোনো একদিন
আজ আবার মানুষের নিজস্ব প্রয়োজনে এলো, গাঁইতি ও কোদাল
তারপর পুরোনো সিন্দুকের মত গন্ধ উঠে এলো, এলো ভগ্নাবশেষ

সবুজ জলাশয়, তার ভিতরে তেড়ছা ভঙ্গিতে শুয়েছিল জলটুঙ্গী
বাংলা ইটে ঘুম ভেঙে গেল, কেন ঐ সাবলের চাড়
কেন স্বপ্ন,কেন ঘুম ছিঁড়ে বাজালে শাদা অর্গান সুর
আলপিনের মাথায় উঠে এলো জোনাকিমালা, অস্থির অস্থির

সিংহের চোখে লুকিয়ে থাকে জলবিন্দু পুরোনো দিনের ভেজা গান
সবুজ জলাশয় ঘিরে ঝালরের, শিল্পের ধর্ম হল ভ্রষ্ট আজ
জলছবির মত উঠে এলো শাদা হাড়ে নিষ্পাপ কণ্ঠহার—চুড়ি
তারপর পুরোনো সিন্দুক ভাঙা, তারপর সকলে নীরব।

কর্মধারাবাহিক

জ্যোতির্ময় দে বিশ্বাস

নিজের কফিনের শেষ পেরেক
ভালো হতো—
আমি নিজেই যদি ঠুকে নিতে পারতাম।
কিন্তু তা কখনো হয় না।
আমাকে নির্ভর করতে হয়
অন্য কিছু মানুষের উপর।
তারা হাঁটু ভেঙে নিঃশব্দে বলবে :
বাবা, আমরা তোমার বাকি কাজ করছি।
(বলবে তো ? তারা বাকি কাজ করবে তো ?)
এইরকম সন্দিহান হওয়া স্বাভাবিক।
কারণ,
আমি আমার বাবার কবরে মাটি দেবার সময়
বড় অন্যমনস্ক ছিলাম এবং সেদিন
আমার নিজস্ব মুখ উজ্জ্বল ছিল না।

সমালোচনা

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফসল

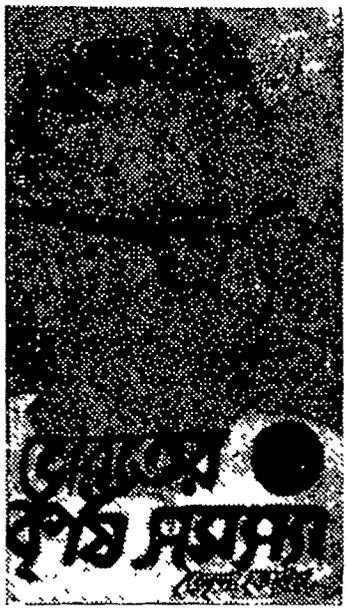

ভারতের কৃষি-সমস্যার প্রধানত দুটি দিক—একটি এর টেকনিক্যাল দিক অর্থাৎ বীজ, সার, সেচ, লাঙ্গল ইত্যাদি সম্পর্কিত, অন্যটি এর মানবিক দিক যেখানে ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক ও অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভারতের চাষী অনেক ক্ষেত্রেই একটি বঞ্চিত, অপমানিত এবং শোষিত সত্তা। এই দ্বিতীয় দিক থেকে দেখতে গেলে ভারতের কৃষি-সমস্যার সঙ্গে ভারতের ভূমি-সংস্কার সমস্যার একটি অঙ্গাঙ্গী যোগ রয়েছে। ভূমি-সংস্কারের উপর আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা এর তাত্ত্বিক কচকচির উপরই বেশি নজর প্রত্যক্ষ করি এবং চেঙ্গিস থেকে আরম্ভ করে বর্ধন, শ্রীনিবাসন এবং আরো অনেক রথীমহারথীদের আলোচনায় আমরা বর্গাদার ও ভূমিহীন কৃষকদের সম্পর্কে আলোকপ্রাপ্ত হই। ভূমি-সংস্কার বিষয়ে বাংলাভাষায় রচিত গ্রন্থে তো নয়ই, ইংরেজি ভাষায় লেখা কোন গ্রন্থেও আমরা সচরাচর প্রমাণ পাই না যে, লেখক ভূমি-সংস্কারের বাস্তব সমস্যাটিকে নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় সিঞ্চিত করে পরিবেশন করেছেন। হরেকৃষ্ণ কোঙারের 'ভারতের কৃষি সমস্যা' গ্রন্থটি এর এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।

ভারতের কৃষি-সমস্যা বা ভূমি-সংস্কার সমস্যার সঙ্গে হরেকৃষ্ণ কোঙারের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কত নিবিড়, সে-সম্বন্ধে বিশদ করে বলার প্রয়োজন নেই। এ-বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে তিনি যে-সমস্ত বক্তৃতা দিয়েছেন এবং প্রবন্ধ রচনা করেছেন, তা এতদিন বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বা রিপোর্টে প্রকাশিত অবস্থায় ছিল। হরেকৃষ্ণ কোঙার মেমোরিয়াল অ্যাগরেরিয়ান রিসার্চ সেন্টারের তরফ থেকে শ্রীগৌর সাহা এগুলিকে সংকলন করে সম্প্রতি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন। যে পঁয়ত্রিশটি বক্তৃতা-প্রবন্ধ এই সংকলনে স্থান পেয়েছে, তার মধ্যে ভারতবর্ষের ভূমি-সমস্যা, বর্গাদারদের অধিকার রক্ষা, ভূমি-সংস্কার আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, জোতদার-বর্গাদার সম্পর্ক, কৃষক-আন্দোলনের বর্তমান স্তর, শোষণের বিরুদ্ধে গণজাগরণ, আটক জমির সদ্ব্যবহার, বর্গাদারদের উচ্ছেদ বন্ধ, জোতদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করবার পদ্ধতি, গ্রামের গরীবদের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি, কৃষি-সংকটে কৃষকসভার কাজ, সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব, ভূমি-সংস্কার রূপায়ণ, জঙ্গী কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে হরেকৃষ্ণ কোঙারের অত্যন্ত জোরালো বক্তব্য স্থান পেয়েছে। বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে আন্তরিক অথচ দৃঢ় এমন একটা আত্মবিশ্বাসের আলোকচ্ছটা আছে যে, বক্তব্যটি সম্পূর্ণ আলোচিত হয়ে চোখের সামনে যেন স্পষ্টভাবে অনাবৃত হয়ে ভেসে ওঠে। তাঁর রাজনৈতিক বক্তৃতাগুলির মধ্যেও যে যুক্তি পরিস্ফুট হয়েছে, তা অর্থনীতির অনেক পণ্ডিতদেরও অনুধাবনযোগ্য। হরেকৃষ্ণ কোঙারের অনেক লেখায় ঝাঁজ যথেষ্ট আছে, এবং যে পরিপ্রেক্ষিতে লেখা তাতে তা আশা করা যায়, কিন্তু তাঁর বক্তব্যে কোথাও যুক্তিহীনতা নেই। পশ্চিমবঙ্গ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় ভূমি-সংস্কার মন্ত্রী হয়ে (এবং তারও অনেক আগে থেকে) তিনি ভূমি-সংস্কারের নামে যে কপটতা ও ভ্রষ্টাচার লক্ষ্য করেছিলেন, সে-কথা তিনি তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে অনাবৃত করেছেন। তাঁর বক্তব্যের অনুসরণ করে তাঁর জীবদ্দশায় এবং পরবর্তী সময়েও ভূমি-সংস্কার বিষয়ক আইনে পশ্চিমবাংলায় বেশ কয়েকটি সংশোধন করা হয়েছে। ভূমি-সংস্কার সম্বন্ধে তাঁর মূল বক্তব্যটি—অর্থাৎ কিছুটা জঙ্গী কৃষক-সংগঠন না থাকলে ভারতবর্ষের মতো ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশে প্রকৃত ভূমি-সংস্কার সম্ভব নয়—সাম্প্রতিককালে পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন প্রতিবেদনও সমর্থিত হয়েছে। ভূমি-সংস্কার বিষয়ে ভবিষ্যতে কোন্ কোন্ দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন সে-সম্বন্ধেও হরেকৃষ্ণ কোঙার তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে কোথাও কল্পনাবিলাসের স্থান নেই—সব সমস্যা নিজের চোখে দেখে এবং হৃদয় দিয়ে অনুভব করেই তিনি ভারতের কৃষি-সমস্যা তথা ভূমি-সংস্কারের উপর তাঁর বক্তৃতা-প্রবন্ধগুলি রচনা করেছেন।

বক্তৃতা/প্রবন্ধগুলি সংকলন - গ্রন্থে কালানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে, যার ফলে বিভিন্ন বিষয়ের উপর হরেকৃষ্ণ কোঙারের বক্তব্যগুলি বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে। আমাদের মনে হয়, কৃষি-সমস্যা ও ভূমি-সংস্কার সম্বন্ধে, বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার পরিপ্রেক্ষিতে—যাঁরা জানতে আগ্রহী, তাঁরা এই গ্রন্থটি থেকে অনেক উজ্জ্বল চিন্তার খোরাক পাবেন। গ্রন্থটির ছাপা ও বাঁধাই উচ্চমানের।

ডঃ তুষারকান্তি ঘোষ

ভারতের কৃষি সমস্যা : হরেকৃষ্ণ কোঙার। ন্যাশনাল বুক এজেন্সী (প্রাঃ) লিমিটেড। প্রথম প্রকাশ মার্চ, ১৯৭৮। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২৫। মূল্য পনের টাকা।

নিভৃত ব্যক্তিজীবনের ছবি

আমাদের দেশের ইংরেজী-জানা পণ্ডিতদের সম্পর্কে একটা অভিযোগ আছে যে, তাঁরা ক্যাশরুম বক্তৃতায় যত শক্তি ব্যয় করেছেন, স্বল্পশিক্ষিত দেশবাসীকে মাতৃভাষার ইংরেজী সাহিত্য ও সংস্কৃতির খবর জানাতে তার শতাংশের একাংশও নজর দেননি। তাতে তাঁদের গৌরব কতটা বেড়েছে জানি না—মাতৃভাষা অবশ্যই অনেক দিক থেকে বঞ্চিত ও দরিদ্র রয়ে গেছে।

সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্তকে ধন্যবাদ তিনি মাতৃভাষার প্রতি তাঁর দায়িত্বকে অনেকদিন আগেই স্বীকার করেছেন, মহাকবি সেক্সপীয়রের জীবনী রচনা করে। 'আঙন নদীর তীরে' সেক্সপীয়রের জীবনী-গ্রন্থ বটে কিন্তু প্রামাণ্য জীবনচরিত নয়। অর্থাৎ সাল-তারিখ হিসাবনিকাশ মেলানো জীবনী-গ্রন্থ নয়। জীবনসুধায় আকণ্ঠ তৃষ্ণার্ত এক মহাকবির জীবনের গোপন এবং দুর্গম অসংখ্য ছবির সমাহার—আঙন নদীর তীরে।

এলিজাবেথীয় যুগে যে উইলিয়ম সেক্সপীয়রের উদ্ভব ও বিকাশ, স্বভাবতই তাঁর জীবনের দুটো দিক থাকা সম্ভব। একটি তাঁর নিশ্চান্ত ব্যক্তিগত জীবন। অন্যটি সমাজ রাষ্ট্র ও রাজপ্রসাদপ্রভাবিত জীবন-নাট্য। আঙন নদীর তীরের লেখক মূলতঃ জোর দিয়েছেন সেক্সপীয়রের নিভৃত ব্যক্তিজীবনের ওপর—যার সঙ্গে অলক্ষ্যে তাঁর সমগ্র নাটক ও কাব্যের যোগ একেবারেই দুর্লক্ষ্য নয়।

সমাজ রাষ্ট্র অর্থনীতি ও রাজপ্রসাদ প্রভাবিত সেক্সপীয়রের জীবনের একটি অনন্য একাডেমিক ইন্টারেস্ট আছে। কিন্তু স্ট্র্যাটফোর্ড আঙনের গাছপালা, নির্জন পথঘাট ঘনকুয়াশা বসন্তের সবুজ সমা-

রোহের মধ্যে যে উদাসী কিশোরটি তিলে তিলে নিজের মত করে বড় হয়ে উঠছিলো, তার কাহিনী অনেক বেশি হৃদয়গ্রাহী, অনেক বেশি রসঘন এবং দেশকালাতীত পাঠকের হৃদয় অধিকারক্ষম।

সেক্সপীয়র সর্বকালের পৃথিবীর এক বিস্ময়কর প্রতিভা—যেন এক নিপুণ বংশী-বাদক রাখাল ছেলে। স্ট্র্যাটফোর্ড পল্লী ছেড়ে একদিন লন্ডনে এসে উপস্থিত হল। পাথেয়হীন সহায়হীন সম্বলহীন। থিয়েটারের মালিকের দয়ায় সহিসের পদে নিযুক্ত হল। সেখান থেকে উন্নতি হয়ে নাটকের প্রম্টার। তারপর অভিনেতা। তারপর হঠাৎ একদিন থিয়েটারের মালিক দেখলেন, সেক্সপীয়র—স্ট্র্যাটফোর্ড অন আভনের সেই গ্রাম্য ছেলেটি একটি নাটক লিখে ফেলেছে। টাইটাস এনড্রনিকাস। তারপরই লাভস্ লেবার লস্ট। সেক্স-পীয়রের নাটক দেখার জন্য মিঃ ফিলিপ হ্যানসনের থিয়েটারে হাজার হাজার দর্শক ভেঙে পড়লো।

সেই দিন থেকে সেক্সপীয়রের জয়-যাত্রা শুরু হয়েছিল। মান-সম্মান যশ প্রতিপত্তি ও অর্থের তুঙ্গে উঠে স্ট্র্যাট-ফোর্ড আভনের সেই রাখাল ছেলেটির সব মোহ ঘুচে গেল। যখন লন্ডনে ছিল, কি এক মোহে একবারও সে স্ট্র্যাটফোর্ডের দিকে ফিরে তাকায়নি। সে-মূল্য তাকে দিতে হয়েছে। প্রণাধিক পুত্র হ্যামলেটকে সে হারিয়েছে। বাবা মারা গেছেন অনেক-দিন। মা-ও মারা গেছে কিছুদিন হল। মার স্নিগ্ধ শান্ত মুখখানি কবির মনে পড়ে। কবি স্ট্র্যাটফোর্ডে ফিরে এলেন। লন্ডনকে মোহিত করে, জয় করে, ফিরে এলেন কবি। কন্যা সুসান ও জুডিথ তাঁর হৃদয় ভরে দিল। শুধু তেমন করে যোগ হল না স্ত্রী এ্যানের সঙ্গে। যে দাম্পত্য-সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হয়ে গেছে, আর কি তাকে জোড়া দেওয়া যায়?

সেক্সপীয়রের সাহিত্য ও জীবনে সবচাইতে ট্র্যাজিক চরিত্র সম্ভবত তাঁর স্ত্রী এ্যান হ্যাথওয়ে। সাহিত্যের বিচারে যদি না-ও হয়, জীবনের বিচারে অবশ্যই সত্য। এই হতভাগিনী মহিলা যত দীর্ঘদিনব্যাপী পাণ্ডুর ও বিবর্ণ জীবনযাপন করেছেন সেক্সপীয়রের সঙ্গে সম্পর্কিত আর কোন চরিত্র সম্ভবত এতটা কষ্টভোগ করেনি।

এই অংশটি সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন। সেক্স-পীয়রের দিন ফুরিয়ে আসছে। ভাব হয়েছে। শরীর অবশ। দুর্বল হয়ে পড়েছেন ভীষণভাবে। নিজেই বুঝতে পেরেছেন বিদায় নেওয়ার সময় হয়ে এসেছে। একজন উকিল ডাকতে বললেন তাঁকে। উইল করে যাবেন। উৎকণ্ঠা দেখে এ্যান বুঝতে পারলো, সময় আর নেই। আমাদের গ্রন্থের লেখক আশ্চর্য মুন্সি-য়ানায় বর্ণনা করেছেন—'এ্যান স্বামীর অসুখে একদিনও কাঁদেনি। হয়তো কেঁদেছে উইলের আড়ালে। উইল তা জানতে পারেনি। আজ এ্যান আর নিজেকে সামলাতে পারল না। উইল স্ত্রী-কে প্রবোধ দেয় : কান্নার কি আছে? আজ আমি যাচ্ছি, কাল তুমি যাবে। আমাদের সোনার হ্যামনেট তো আমাদের ছেড়ে আগেই চলে গেছে। যদি পরলোক বলে কিছু থাকে, তাহলে আমরা সবাই এক জায়গায় মিলিত হব। এখানে যে অপূর্ণতা রইল, সেখানে হয়তো তা থাকবে না।' বড় হতে গিয়ে সেক্সপীয়র যে মূল্য দিয়েছেন, তার হাহাকার যেন এই অংশে বালুকাতটে সমুদ্র-ঊর্মির মত আছড়ে পড়েছে।

লেখক অবশ্য নিজেই স্বীকার করেছেন, আন্দ্রে মারোয়ার 'এরিয়েল' গ্রন্থের ছাঁদে এই গ্রন্থের পরিকল্পনা করেছেন। তাছাড়া সিডনী লী থেকে আরম্ভ করে কোমেন্স ডেইনের মত বিখ্যাত জীবনীকারদের বই থেকে এবং আরো অনেক বিচ্ছিন্ন রচনার সাহায্য নিয়েছেন।

পূর্বেই বলেছি শ্রীসেনগুপ্ত বইটিকে মামুলী জীবনী করতে চাননি। জীবন মন্থনজাত যে সুখ-দুঃখ বিরহ-বেদনা সেক্সপীয়রের জীবনের সার্থকতা ও ব্যর্থতা—'আভন নদীর তীরে' ছোট বই-খানাতে তা সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। লেখকের হাতে সুন্দর ভাষা আছে, হৃদয়ে উত্তাপ আছে—দুইয়ে মিলে একটি সার্থক সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

অমল মুখোপাধ্যায়

আভন নদীর তীরে : সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত। পুথিপত্র। ৯, এণ্টনিবাগান লেন, কলকাতা-৯। দাম তিন টাকা।

ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী পত্রিকা

একটি 'ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী মাসিক পত্রিকা'র পক্ষে আঠারো বছর কাটিয়ে উনিশে পদার্পণ করা নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তবে 'পার্থসারথি' কেন যে দীর্ঘ-জীবন লাভ করেছে, তা উনিশ বর্ষের প্রথম সংখ্যাটির পাতা ওল্টালেই বোঝা যাবে। এই সংখ্যায় শ্রীঅরবিন্দের সাধনা নিয়ে আলোচনা করেছেন ডঃ সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। শব্দযোগ প্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানন্দ সরস্বতী এবং যোগবাণী সম্পর্কে পরমহংস যোগানন্দের আলোচনা দুটিও সুলিখিত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যে ধারাবাহিক অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে, তার অনুবাদক ও টীকাকারের নাম দেওয়া হয়নি, তবে তিনি যে যত্নসহকারেই এই দুরূহ কাজ করছেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

পার্থসারথি : সম্পাদক প্রীতিকুমার ঘোষ। ৫এ, অক্রুর বোস লেন, কলকাতা-৪। ৫০ পয়সা।

মহানন্দ রচিত

অমরনাথ কেদার বদ্রী

শুদ্ধ চিত্র সম্বলিত ভ্রমণ কাহিনী

• দাম দশ টাকা •

প্রাপ্তিস্থান :

১১৪কিউ, ডাঃ সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জী রোড কলিকাতা-১০

দে বুক ষ্টোর্স : ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

চিরঞ্জীব প্রকাশনী : ৪২, বেনিয়াটোলা লেন, কলি-৯

সমতট : ৩৬

সূচী ॥ কবিতা : দিব্যেন্দু পালিত মঞ্জুভাষ মিত্র, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়, জয় গোস্বামী সজল বন্দ্যোপাধ্যায়। **গল্প :** দীপংকর লাহিড়ী, নির্মলেন্দু রক্ষিত, তুষার ভট্টাচার্য। **প্রবন্ধ :** ব্যবস্থাপকদের ধ্যান-ধারণা—একটি সমীক্ষা/ শীতাংশু কুমার চক্রবর্তী ১৮৫৭ সাল—নতুন আলোয়/সুপ্রভা চৌধুরী বাঙালি মুসলমান-সমাজ / শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অলক্ষ্মী ও বাঙলার দেবীভাবনা / চিত্রা দেব পশ্চিমবঙ্গে তামার সম্ভাবনা/সংকর্ষণ রায় শিল্প—সেকাল ও সমকাল/অহিভূষণ মালিক আর্থিক অসাম্য প্রসঙ্গে অমর্ত্য সেন/ ধীরেশ ভট্টাচার্য বিজ্ঞান-ক্লাব প্রসঙ্গে/ দীপক দা নতুন রেকর্ড/অর্চনা সরকার। **আলোচনা :** কল্যাণ দাশগুপ্ত চিত্ত সিংহ উমানাথ ভট্টাচার্য কুন্তলা দত্ত অমিয় দাশ শান্তিদেব ঘোষ কিরণ-শশী দে চাঁদা (ভারতে) : ১/২/৩ বছর / আজীবন (পত্রিকা) / আজীবন (সংস্থা) ১২/২৩/৩২ /১০০/২০০। **অফিস :**- ৫।১বি, দেশপ্রিয় পার্ক ইস্ট, কলিকাতা-২৯ ফোন : ৪২-৫৫৯০

বঙ্গশ্রী
হাওড়া
৪১/১, জি, টি, রোড, হাওড়া

• বেনারসী
• জোড়·সিল্ক
• তাঁত·মিল
• পোষাক
• সাড়ি·সুটিং
ও ছিট কাপড়

জগদীশ গুপ্তের প্রত্যাবর্তন

অমল মুখোপাধ্যায়

দুঃখ হয় এমন একজন শক্তিমান লেখক জীবিতকালে কোনই স্বীকৃতি পেলেন না। কেন যে পেলেন না, তাও এক রহস্যের দ্বারা আবৃত। অথচ সমসাময়িক লেখক ও সমালোচকবর্গ তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কে যেমন উচ্ছ্বসিত ভাষা প্রয়োগ করেছেন এমন খুব কম ক্ষেত্রে ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ, যিনি লেখক হিসেবে জগদীশচন্দ্রকে ভেতর থেকে গ্রহণ করতে পারেননি, তিনিও স্বীকার করতে ভুল করেননি, 'লেখবার ক্ষমতা তার আছে একথা পূর্বেই জানা ছিল। এবারেও তার পরিচয় পেয়েছি।'

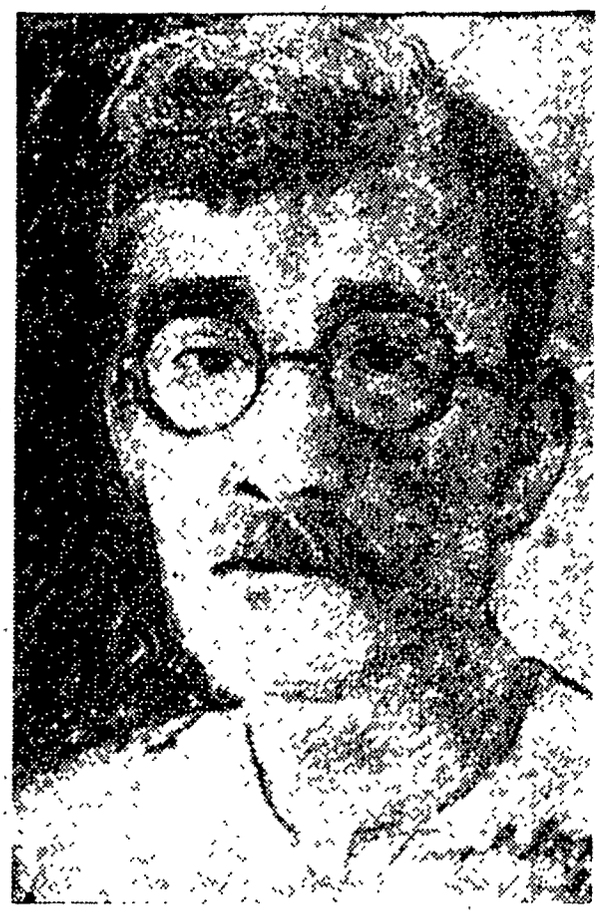

সৎ পাঠক ও সাহিত্যিকদের অনেকেরই ধারণা আছে, সাহিত্যের প্রাঙ্গণ মানে সরস্বতীর কমল বন। নোংরামী, মালিন্য আর যেখানেই থাকুক, সাহিত্যের বৃত্তাঙ্গনে তার ছায়াও পড়ে না। কিন্তু জীবনের জটিলতা সম্পর্কে সজ্ঞান পাঠক জানেন, কোনো কিছুই একটা দেশের রাজনীতি সমাজনীতি ও অর্থনীতির ঊর্ধ্বে নয়। যে নীতিতে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি ও জীবননীতি নিয়ন্ত্রিত, সাহিত্য সাধনাও সেই নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে বাধ্য। ব্যতিক্রম, কাক মধ্যে কখন যখন, লাঞ্ছিত হতে বাধ্য। ব্যবসার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি একটা ভাল পণ্যকে চেপে দিতে পারলে কত বাজে মাল বাজারে কত সহজে ও অনায়াসে চলে যায়। সাহিত্য ব্যবসায়ও ঐ নিয়ম ব্যবহৃত না-হওয়ার কোনো কারণ দেখিনা। পক্ষতপক্ষে সাহিত্যের লিবিসপ্রুডেন্স এবই নাম কনসর্পিবেসি অব সাবালেন্স।

বাংলা সাহিত্যের একটা গরিষ্ঠ সংখ্যক পাঠক সম্ভবত জানেন না যে বর্তমান শতাব্দীর ত্রিশের দশকে এক আশ্চর্য শক্তিমান লেখকের আবির্ভাব ঘটেছিল, যিনি 'কালি কলম' কল্লোল, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, ভারতী, বঙ্গবাণী ইত্যাদি পত্রিকার গল্পের জন্য দীর্ঘকাল ধরে অনলসভাবে পরিশ্রম করেও একটি গল্প সংকলন বার করবার প্রকাশক পাননি। শুধু তাই নয়, গুণমুগ্ধ বন্ধুর দান গ্রহণ করে বোলপুর থেকে 'বিনোদিনী' নামে যে গল্প সংকলনটি প্রকাশ করেও ছিলেন, তার ৩০।৩৫টি বই উপহারের খাতে বিতরিত হয়েছিল, বাকি হাজার খানেক বই প্যাকিং বাক্সের ভেতরেই পোকায় খেয়েছিল। সম্ভবত ৬০।৭০ কপি বিক্রি হয়েছিল কি হয়নি।

বাংলা সাহিত্যে এইরকম ঘটনা, নিশ্চয়ই, এই প্রথম নয় এবং এটাই শেষ নয়। যেটি এই প্রথম এবং এই শেষ, সেটি হল বাংলা সাহিত্যে এমন দুর্দশাগ্রস্ত গ্রন্থ ও তার লেখকের ক্ষমতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ থেকে মোহিতলাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত লেখক ও সমালোচকগণ একবাক্যে কুণ্ঠাহীন প্রশংসা রেখে গিয়েছেন।

স্বভাবতই জানতে ইচ্ছা করে, কি সেই প্রশংসা, যার পরেও বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে জগদীশ প্রায় সম্পূর্ণ অপরিচিতই থেকে গেলেন? রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লেখককে লিখেছেন, 'ছোটগল্পের বিশেষ রূপ ও রস তোমার লেখায় পরিস্ফুট দেখিয়া সুখী হইলাম।' মনে রাখতে হবে, ছোটগল্প সাহিত্যের শাস্ত্রকার রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন তিনি জগদীশ গুপ্তের গল্পে একটি বিশেষ রূপ ও রস দেখেছেন তখন জানতে হবে রবীন্দ্রনাথের গল্প থেকে তা কোনো একটি জায়গায় নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ ও নিমন্ত্রিত না হলে এমন বাড়াই করা শব্দ কখনোই ব্যবহার করতেন না। কবিশেখর কালিদাস রায় 'বিনোদিনীর গল্পগুলি

সম্পর্কে বলেছেন, 'রূপে রসে অদ্বিতীয়।' এখানেও শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। কবি সমালোচক মোহিতলাল বলেছেন, 'গল্প সাহিত্যে বিনোদিনীর স্থান বহু উর্ধ্বে।' কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক অতি সুন্দর', ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত বলেছেন, 'এমনটি আর নাই।'

এটা অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়, এমন একটি গল্প-গ্রন্থ দিয়ে যিনি সাহিত্যিক জীবন শুরু করেছিলেন, বাংলাদেশের পত্রপত্রিকা, প্রকাশক, সম্পাদক, সাহিত্যানুরাগী পাঠক এবং সম্বর্ধনা-দান ও মানপত্র পাঠের সোল এজেন্টরা, পঞ্চাশ বছরের মধ্যে একটু সময় করে উঠতে পারেননি, এই অসামান্য শক্তি ও প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি জানাবার। চাকরি বাংবার দায়ে গবেষক ও সমালোচকগণ এদিক ওদিক কিছু লিখেছেন বটে কিন্তু একটি জাতীয় অন্যায় শোধ একদিনের জন্যও তাঁদের তাড়িত করেনি। কবলে তার ফল আমরা জানতে পারতাম।

অজ্ঞাত কুলশীলের পরিচয়

জগদীশ গুপ্ত সাহিত্যের প্রাঙ্গণে আত্মপ্রকাশ করেন প্রৌঢ় বয়সে। ১৯২৭ সালে ৪১ বছর বয়সে বিনোদিনী নামের গল্প-সংকলন নিয়ে তিনি বাংলা-সাহিত্যে আবির্ভূত হন। নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া শহরে ১৮৮৬ খৃস্টাব্দে জগদীশ গুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কৈলাশচন্দ্র গুপ্ত কার্যোপলক্ষে এই শহরেই বাস করতেন। পুত্রের প্রাথমিক শিক্ষাও এখানেই হয়েছিল।

বিনোদিনী প্রকাশের পূর্বে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর নানা রচনা প্রকাশিত হয়। তবে কবিতা লিখতে শুরু করেন খুব অল্প বয়স থেকেই। একমাত্র কাব্যগ্রন্থ অক্ষয়া তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। কবিতাগুলিতে নারীদেহের সৌন্দর্য ও সম্ভোগের বাসনা ব্যাকুলতা অকপট ভাষায় মর্মরিত হয়ে উঠেছে। বয়স তখন পনের কি ষোল। হঠাৎই ব্যাপারটা গুরুজনদের নজরে আসে। তাঁরা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। কবিতা লেখা আর সাহিত্য-সাধনা সে তো আত্মহত্যারই সমার্থক। সাবধান হলেন গুরুজনেরা। যশিদপুর জেলার খোদমেহেরচাসী গ্রামের সম্ভ্রান্ত বিশ্ব পরিবারের সংস্রবশীল বাসস্থান থেকে ছোকরাটিকে চালান করে দেওয়া হল কলকাতায়, ৪৬।৩ লাবিসন বোডের মেস বাড়িতে। ভর্তি করে দেওয়া হল সিটি কলিজিয়েট স্কুলে। সেটা ১৯০৯। ১৯০৫-এ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে ভর্তি হলেন সিটি কলেজে। এই সময়ে পিতা কৈলাসচন্দ্র ও মাতা হেমাঙ্গিনীর পারিবারিক অবস্থা ক্রমে আসে। জগদীশচন্দ্রকে পড়াশুনায় ইস্তফা দিয়ে চাকরীতে ঢুকতে হল বন্ধন আমলের মধ্যে।

কাজ করতে করলেন সিউড়ির জজ আদালতে। সেখান থেকে সম্বলপুর। সম্বলপুর থেকে ফটক সার্কিট কোর্ট, পাটনা কোর্ট হয়ে আবার সেই বীরভূম—বোলপুরের চৌকি আদালত। ত্রিশ বছরের চাকরী জীবনে দুঃসহ অভাব অনটনের মধ্যে তাঁর একমাত্র তৃপ্তি ছিল সাহিত্য সাধনায়—যে সাধনা দেয়নি তাঁকে কিছুই অথচ নিয়েছে তাঁর সবটুকুই। এমন কোন সাহিত্য পত্রিকা সেদিন ছিল না, যার পাতাকে তিনি গৌরবান্বিত করেননি। কালি-কলম, কল্লোল, প্রবাসী, ভারতী, বঙ্গবাণী। অথচ শিল্প ও সহৃদয় ব্যবহার পেয়েছেন খুব কম ক্ষেত্রেই। আর্থিক অনটন প্রসঙ্গে একটি পত্রিকার নাম করে মুরলীধর বসুকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন '.....সঙ্গে যাগাড় করিয়াছি। ভাত-কাপড়ের কথা নাই, লাথি ঝাঁটার গোঁসাই। একটা পয়সা কেউ দেবে না, অথচ খাল দেবার বেলা সবাই আছেন।'

তাই শেষ জীবনে দেখি, তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী হাসু গুপ্তা (১০ বছর বয়সে পরম আদরের মত কোচে আছেন) নিজের নিজস্ব পিতৃদত্ত অলঙ্কার বিক্রি করে যাদবপুরের কাছে রামগড় কলোনীতে যে কুঁড়েঘর বানিয়েছিলেন তাতেই মহাতৃপ্তির সঙ্গে শেষ জীবন কাটিয়ে গিয়েছেন। শেষ জীবনে দুটি স্বীকৃতি তিনি পেয়েছিলেন। একটি ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত সরকারের ১৫০ টাকার বৃত্তি। আর পেয়েছিলেন এক সম্বর্ধনা। দিয়েছিলেন রামগড় কলোনীর প্রগতি সংঘের সভ্যরা। সে সম্বর্ধনা যাঁরা আয়োজন করেছিলেন তাঁরা বাংলা সাহিত্যের পাঠকবর্গের চিরনমস্য হয়ে থাকবেন অন্তত একটি কারণে যে জগদীশ গুপ্তের প্রতিভার পরিচয় জানে, এমন একটি সম্পাদক, সমালোচক বা লেখক সেই সম্বর্ধনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। থাকলে, ৬৮ বছরের অশক্ত দুর্বল ও দৃষ্টিশক্তিহীন বন্ধকে জীবন সায়াহ্নে মাত্র বত্রিশ—তাঁর প্রতিভার উপযোগী সম্মান-বাক্য নিশ্চয় ব্যবহৃত হোত। যা ব্যবহৃত হয়েছে তার মধ্যে সাধুতা থাকতে পারে সরলতা থাকতে পারে কিন্তু তা কোনক্রমেই দুর্বাসাশিল্পী জগদীশ গুপ্তের উপযুক্ত নয়।

দুর্বাসা শিল্পীর জীবন দৃষ্টি

দুর্বাসা শিল্পীর জীবন দৃষ্টি

রামগড় কলোনীতে জগদীশ গুপ্তের সম্বর্ধনায় যে বিবরণ পাওয়া গেছে তাতে আছে, 'বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাহিত্য-রসিকগণ জগদীশবাবুর রসাল রচনার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।' আর এক জায়গায় পাচ্ছি, 'এতদুপলক্ষে বিভিন্ন বক্তা জগদীশ-বাবুর জীবনী সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে সাহিত্যের প্রভাব যে কত শক্তিশালী তাহা বর্ণনা করেন।' লেখা অনুমান ও কল্পনার সাহায্যে কাছাকাছি পৌঁছানো যায়, আমি হলফ করে বলতে পারি, আটষট্টি বছরের এই বৃদ্ধ রসিকশেখর সভার বক্তাদের মত বলে, তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মজীবন পরমাত্মীয় স্বজনের আধা উপলব্ধ-সত্যকে অবিনশ্বর সত্য বলে অনন্তকে ফুরাতে পারেননি। তিনি জীবনকে দেখেছিলেন নিরাসক্তিগ্রহীত এক নিরপক্ষপাতিত্বের পরিহাসরূপে। আর কোথাও একটু দয়া মায়া নেই। একটি অন্ধ বিচারহীন বিবেচনাবহির্ভূত শক্তির অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে আছে। তার খেয়াল-খুশীর পরিমাপের শক্তিকে মানুষের নাই। সে উদাসীন এবং নির্মমতা। বিনোদিনীর একটি গল্পে এই সত্য তিনি ভয়াবহ দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্পটি এইরকম। শিবপ্রিয় তার স্ত্রী মা ও তিনটি ছাত্রীর গরু নিয়ে পল্লীগ্রামে সুখেই ছিল। একজন সাধু এসে তাকে লোভ দেখাল সোনা তৈরী করবার বিদ্যা শিখিয়ে দেবে। সরলচিত্ত শিবপ্রিয় সংসার ছেড়ে সাধুর সঙ্গে চলে গেল। ছ' মাস অমানুষিক পরিশ্রমে সাধুর সেবা করলো। তারপর একদিন সাধু তাকে ফেলে পালালো। যাবার সময় শিবপ্রিয়র অসময়ের সম্বল লুকানো দশটাকাও নিয়ে গেল। উপবাস ক্লান্তিনায় ক্লান্ত শিবপ্রিয় যখন ঘরে ফিরলো শুনলো, তার সুন্দরী স্ত্রী লোকের অপবাদ সইতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে। শিবপ্রিয় পাগল হয়ে গেল।

এই জগতের যে নিয়ন্তা সে মানুষের সুখ দেখতে পারে না। নানাভাবে মানুষকে বঞ্চনা দিয়েই তার আনন্দ। মানুষের মধ্যেকার প্রবৃত্তিগুলিও যেন সেই শক্তির হেলাখেলার অনুকূলে নিষ্ঠুর। এই সম্পর্কিত জগদীশবাবুর পরম নির্মমতায় তার সমগ্র সাহিত্যসাধনার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। সেই অলক্ষ্য উদাসীন শক্তিকে তিনি সত্যটা নির্মম বলে কল্পনা করেছেন ঠিক ততটা নির্লিপ্ত ও নিরপেক্ষতা দিয়েই তিনি সাহিত্যে এই সত্যটিকে প্রকাশ করে তুলেছেন।

তাঁর সমগ্র গল্পগুলি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কোন সমালোচক বলেছেন 'নারীর পবিত্রতা অসহ্য করিয়াছিল,' জগদীশবাবু অবশ্যই একটিও সুখের সংসার বর্ণনা করেননি। তা তিনি করেননি না। হরমোহিনীর কলঙ্কাহতী সোনাটির সরলতার জন্য মায়া বেশীই মনে হয়। ছেলেদের মাসিক আয় কয় হাজারের উপরে সেদিকে যাঁ ছেলেরা সকলেই মা বলতে অজ্ঞান। মায়ের আদেশ একটিও লংঘিত হয় না।

এই ত' ভবা সুখ। হরমোহিনী অসুখে পড়িয়াছিলেন, বাঁচিবেন এই আশাই ছিল না, অতিকষ্টে রক্ষা পাইয়াছেন, অত্র তিনি অন্নপথ করিবেন। ছটি ছেলের ছয় ছক ছত্রিশটি ছেলেমেয়ে লইয়া গাঙ্গুলীর প্রকাণ্ড সংসার—সবার উপর মা। সেই মা পথ্য করিতেছেন, সবাই আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। বালিশে ঠেশ দিয়া সকলের মুখের দিকে একবার চাহিয়া তৃপ্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া হরমোহিনী চক্ষু মুদিত করিলেন। পথ্যের বাটি মুখে ধরা হইল, মা নীরব। প্রসাধন মায়ের নাভী টিপিয়া বলিয়া উঠিল 'মা ত' নাই।' পরক্ষণে মা মা আইঢ়ানে আর আর্তনাদে গৃহ পূর্ণ হইয়া উঠিল। ইহাই 'ভবা সুখের' আপাতিক ব্যাখ্যা।'

এই প্রকাশ এতই অনিবার্য, এতই হৃদয়বিধ্বংসকর ও মমতা-রহিত যে সমগ্র বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয় কোন কথা-সাহিত্যিক নেই যে এই অত্যাশ্চর্য ক্ষমতায় জগদীশচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারেন। কল্লোল যুগে বাংলা সাহিত্যে যে রিয়ালিজমের আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তার উৎস যতটা না বাস্তব জীবনমুখীতায় তার চেয়ে অনেক বেশী রবীন্দ্রবিরোধিতায়। প্রকৃতপক্ষে এই সময়ে রবীন্দ্র বিরোধিতা প্রায় একটা ফ্যাসান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই প্রমাণিত হয়ে গেছে যে বাংলাদেশের রবীন্দ্র-বিরোধী লেখকগোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথের বৈদান্তিক স্বপ্ন-কল্পনার জগৎ থেকেই আহরণ করে নিজেদের বাঁচিয়ে রেখে-ছিলেন। একমাত্র ব্যতিক্রম এই জগদীশচন্দ্র গুপ্তর। চিন্তায়, জীবনাচরণে এবং জীবনদৃষ্টির সংলগ্নতায় তিনি রবীন্দ্রনাথ থেকে আজীবন পৃথক; এবং পূর্বাপর বাহিত প্রতিভা।

এমন একটি প্রতিভা সম্বর্ধনাসভায়, কিছু সৎ ও সবল লোক, তাঁর সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা করতে গিয়ে যদি জাতিগঠনে সাহিত্যের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করে থাকেন তাহলে অবশ্যই অনুমান করতে পারি, নিয়তি শেষ ছোবলটি জগদীশচন্দ্রের দেহেই উগরে দিয়ে গেছে। সেদিন মঞ্চে বসে যে প্রতিক্রিয়াই তাঁর হোক না কেন, মুখে হাসির রেখাটি হারিয়ে যায়নি এবং তিনি কৃতজ্ঞ অন্তঃকরণে সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।' এখানেই জগদীশ গুপ্ত গেট। বিশ্বাস ও কর্মে অভিন্ন মানুষ। প্রিয় বন্ধু নন্দগোপাল সেনগুপ্তকে একবার কবিতায় চিঠি লিখেছিলেন। 'দুঃখে কষ্ট এ-জীবনে চিরস্থায়ী নয়, আজ হক কাল হক হবে তার ক্ষয়। তবু সেই ভাগ্যবান, যার যথাকালে, দুঃখ অন্তে সুখোদয় সম্ভবে কপালে। আমি নয় সেই দলে তাতে নাই ক্ষতি, অশ্রুর কমলে পূজি দুঃখ-সরস্বতী।'

দুঃখ সরস্বতীর সাধনা

প্রকৃতই জগদীশ গুপ্ত সারাজীবন অশ্রুর কমলে দুঃখ-সরস্বতীর পূজা করে গিয়েছেন। ছিলেন দূর মফস্বলে। অধিকাংশ সময়ই একা একা। তাঁর লেখক আত্মাকে সস দেবার মত মানুষ তিনি পাননি। একমাত্র কালিকলমের সম্পাদক মুরলীধর বসুর সঙ্গে পত্র মারফৎ তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। কালে-ভদ্রে কলকাতায় এলে দেখা হোত। কলকাতার বড় বড় সম্পাদকদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না। তদ্বির তদারকের লাইনটাতে উনি একদম বিশ্বাস করতেন না। তাকে লেখা পাঠিয়েছেন। মাস তিনেকের মধ্যে ফেরত তাকে অমনোনয়নের চিঠি পেয়েছেন কখনো। কখনো পাণ্ডু-লিপি ফেরত পাননি বা হারিয়ে গেছে। কাউকে সেজন্য দোষারোপ করেন নি। আবার গল্পের কপি করেছেন, গল্প সংশোধন করেছেন। অন্যের সংশোধনী প্রস্তাব যুক্তিসহ মনে করলে, পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। আবার তাকে সেই লেখা পাঠিয়েছেন।

অভাব অনটনের কারণে ঋণগ্রস্ত ছিলেন। সম্পাদকদের কাছে নগদ্য প্রাপ্যের জন্য চিঠি প্রাঠিয়েছেন খুব কম। ক্ষেত্রেই সফল পেয়েছেন। একটি চিঠিতে দক্ষিণা প্রসঙ্গ তুলে উঁচানে; বুড়ো আঙুলের ছবি এঁকে দিয়েছেন। আর একটি চিঠিতে মুরলীবাবুকে লিখেছেন, 'দুটি গল্প ইতিপূর্বে বসুমতীতে ছাপা হইয়াছে; তাহারই বিনিময়ে বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে। এবার বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতে বলিয়া নগদে টাকা চাহিয়াছি।' আর একটি চিঠিতে লিখছেন, 'দক্ষিণা কেহ দিবে বলিয়া মনে হয় না।' কাছারীর কাজটা জগদীশচন্দ্রের কাছে ছিল বন্ধন মাত্র। আনন্দ তো ছিলই না, এমন কি গল্প লিখবার একটু সময় পর্যন্ত পেতেন না। একটি চিঠিতে লিখেছেন, '৭টা হইতে ১০টা ও ১১টা হইতে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত অফিস। তারপর বন্ধুদের জোর করিয়া হাকিমদের গল্প শোনানো। তারপর হোটেলে খাওয়ার গর্ভযন্ত্রণা। যে ঘণ্টাগুলি লাভারীতে কাটাই, সবগুলি কাজের এবং উৎকণ্ঠার।' একদিকে, 'কোর্টের কাজে বেগার দিতে হয় যথেষ্ট। নূতন লোক পাইয়া ঠকাইতেছে। ভয়ে ভয়ে না বলিতেও পারি না।' অন্যদিকে 'নিরুপায় পক্ষে যে উপজীবিকার' উপর নির্ভর করেছিলেন তার সম্পর্কে পরম হতাশায় বলেছেন, 'গল্প অন্ন দেয় নাই দিবে, এই আশাও দেয় নাই।'

গল্পের প্রশংসা শুনে খুশী হয়েছেন ('লোকের মুখে আমার লেখার প্রশংসা শুনিয়া আপনার বিদেশ ভ্রমণের আনন্দ বাড়িতেছে শুনিয়া যথার্থ তৃপ্ত হইয়াছি। আনন্দ দেওয়া ও পাওয়া ছাড়া লেখার আর কোন সার্থকতার আমি প্রত্যাশা করি না)। আবার নিন্দা বা অপ্রশংসায় এতটুকু কাতর হননি ('তৃষিত আত্মা' গল্পটি, আপনাদের পছন্দ হয় নাই জানিয়া আমি দুঃখিত হই নাই')। অর্থাৎ নিজের রচনা সম্পর্কে তাঁর এমন একটি কনভিকশান ছিল যে তিনি সুখে ছিলেন বিগতস্পৃহ এবং দুঃখে নিরুদ্বিগ্নমনা। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাই তিনি হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করতে পারেননি। কারণ তিনি মনে করেছেন সমালোচনার সর্বজনবিদিত এথিকস্ রবীন্দ্রনাথ মেনে চলেননি। 'শিল্প ছেড়ে তিনি ব্যক্তি-শিল্পীকে আক্রমণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের আক্রমণ ও জগদীশচন্দ্রের প্রতি আক্রমণ

একথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের শেষ পর্ব পর্যন্ত দেশের তরুণ লেখক সম্প্রদায়কে যে ভালবাসা ও প্রীতির সহযোগিতা দিয়ে গিয়েছেন, তার তুলনা নাই। কালি-কলম, কল্লোল পরিচয়-এর প্রায় প্রত্যেকটি তরুণ লেখক তাঁর কাছ থেকে প্রশংসা লাভ করেছেন। দুএকজনকে যেটুকু যা নিন্দা করেছেন তা সুরুচি সম্মত কৃতি ও শালীনতার মোড়কে জড়ানো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ জগদীশচন্দ্রের সমালোচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কেমন যেন একটি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে দু-এক জায়গায় অরবীন্দ্রোচিত আক্রমণ করে-ফেলেছেন।

জগদীশচন্দ্রের 'লঘুগুরু' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৩৩৮ সালে। প্রকাশ করেন নাথ ব্রাদার্স। প্রকাশিত হবার পর লেখক নিজেই রবীন্দ্রনাথকে একখণ্ড বই পাঠিয়ে দেন। সম্ভবত সঙ্গে বিভিউ করবার অনুরোধও একটা ছিল। কিন্তু নিতান্তই এটা আমার অনুমান। অতি অল্পকালের মধ্যেই ১৩৩৮ সনের 'পরিচয়' কার্তিক সংখ্যায় উপন্যাসটির রবীন্দ্রনাথকৃত একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এত তৎপরতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কল্লোল, কালি-কলম গোষ্ঠীর কোন তরুণ লেখক সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। জগদীশচন্দ্রের একটি উপন্যাস সম্পর্কে তাহলে এই তৎপরতা কেন? প্রতিবেশী তরুণ লেখকের প্রতি ভালবাসা? তরুণ ও শক্তিমান লেখককে স্বীকৃতি দানের প্রেরণা? ঔপন্যাসিকের অনুরোধ রক্ষা? অনুমানের উপর ভিত্তি করে এর উত্তর দেওয়া শক্ত। তবে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাটি ধীরে এবং যত্নের সঙ্গে পড়লেই বোঝা যায় উপরিউক্ত কোনো একটিও উদ্দেশ্য

নয়, এক অন্যতর মনোভাব থেকে তীক্ষ্ণ সমালোচনাটি তিনি করেছিলেন।

সমালোচনার শুরুতেই রবীন্দ্রনাথের মত স্থিতধী মানুষের ধৈর্যহীনতা (যাকে ইংরেজিতে বলে ইরিটেশন) এমনভাবে আর কোন সমালোচনাতে প্রকাশিত হতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তিনি সমালোচনা শুরুই করেছেন, এইভাবে—'যে বই পড়ার জবাবদিহি আছে, সে-বই পড়তে সহজে রাজি হইনে।' আমার বয়সে কর্তব্যের চেয়ে অবকাশের মূল্য অনেক বেশী।' বিশেষত যে কর্তব্য আমার অবশ্য দায়িত্বের বাইরে।'

রবীন্দ্রনাথ এই সমালোচনা যখন লেখেন তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স সত্তরের উপরে। এই বয়সে বিশ্বভারতী নিয়ে তাঁর চিন্তা ও নানা কর্মের ভার ও আপন স্বাস্থ্যের নানান জটিলতা তাঁর পক্ষে খুবই ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছিল সন্দেহ নেই। বিশ্রাম সত্যি করার প্রয়োজন ছিল এবং তিনি তা যথেষ্ট পরিমাণে পাননি, এও সত্য। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে একখানা প্রশংসাপত্র পাবার স্বাভাবিক বাসনা সেদিন রবীন্দ্র-বিরোধী শিবিরেও যেমন দেখা দিয়েছিল আবার প্রশংসাপত্র দেবার সহজ ঐতিহ্যটিও তিনিই সৃষ্টি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মত একজন সাহিত্যগুরুর কাছে একখানা বই পাঠিয়ে মতামত চাওয়ার মত ক্ষমার্হ বিষয় আর কিছুই হতে পারে না। বিশ্রাম ও সময়ের অভাবে রবীন্দ্রনাথ যা তাঁর 'অবশ্য কর্তব্য নয়' তেমন একটি উপন্যাস পাঠ ও তার সমালোচনা লিখনে অবহেলা করলে কারুরই কিছু বলার থাকতো না। কিন্তু 'লঘুগুরু' উপন্যাস সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি 'পরিচয়ের' পাতায় যে আক্রমণাত্মক মনোভাব দেখিয়েছেন, তা তাঁর নিজের রচিত সমালোচনাতত্ত্বের (সাহিত্য, সাহিত্যের পথে) নিরিখে সুখকর দলিল নয়।

রবীন্দ্রনাথের মূল আলোচনাটি আরম্ভ হয়েছে এইভাবে—'লঘুগুরুর গল্প সম্বন্ধে যদি জবরদস্তি করতেই হয়, তাহলে গোড়াতেই আমাকে কবুল করতে হবে যে, এই উপন্যাসে যে লোকযাত্রার বর্ণনা আছে আমি একেবারেই তার কিছু জানিনে। সেটা যদি আমারই ত্রুটি হয়, তবু আমি নাচার। বলে রাখছি, এ-দেশে ভোকালয়ের যে চৌহদ্দির মধ্যে কাটালুম এই উপন্যাসে অবলম্বিত সমাজ তার পক্ষে সাত-সমুদ্দুর পারের বিদেশ বললেই হয়। দূর থেকেও আমার চোখে পড়ে না। লেখক নিজেও হয়তো বা অনতিপরিচিতের সন্ধানে রাস্তা ছেড়ে কাঁটাবন পেরিয়ে ও-জায়গায় উঁকি মেরে এসেছেন।'

এত কাঁচা সমালোচনা রবীন্দ্রনাথ আর কখনো করেছেন বলে জানা নেই। যে কোন সাধারণ সমালোচক জানেন, সাহিত্যের সত্য আর জীবনের সত্য এক নয়। সাহিত্যে বিশ্বাসযোগ্যতাই সাহিত্য বিচারের সব চাইতে বড় মানদণ্ড। কেউ পতিতালয় দেখেছে কি দেখেনি, সেই বিশেষ অবস্থানের সঙ্গে লেখকের বর্ণনা মিলেছে কি মেলেনি, সেটা বড় কথা নয়—বড় কথা হল, লেখকের বর্ণনায় পাঠকের মনে তা রূপ পরিগ্রহ করেছে কি করেনি।

এই সমালোচনা জগদীশ গুপ্তকে শুধু আহতই করেনি, অনেক পরিমাণে উত্তাপসৃষ্টও করেছিল। সাহিত্য সাধনায় জগদীশ-বাবু রবীন্দ্র-বিরোধী গোষ্ঠীভুক্ত হলেও তিনি রবীন্দ্রনাথের [illegible] সমালোচক যেমন ছিলেন না, রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়ে তেমনি [illegible]ও ছিলেন না। ফলতঃ রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচনার [illegible] প্রতিবিধান প্রয়াস করেছেন তাঁর 'উদয়লেখা' গল্পসংকলনের [illegible] তিনি লিখেছেন, 'আমার 'লঘুগুরু' বইখানি সম্বন্ধে [illegible] বিভিন্ন প্রকাশ যে রায় দিয়াছেন, তাহার [illegible] বলিয়া [illegible]—কারণ তাহাতে ঘোষক [illegible] বিচারের কারণ, বিচার্য বিষয় ছাড়িয়া তাহা বিপথগামী হইয়াছে, অর্থাৎ আসামীকে ত্যাগ করিয়া তাহা ফরিয়াদীর নির্দোষ চলকরে আক্রমণ করিয়াছে! কিন্তু আপনি নাই।'

শেষ বাক্যটিতে একটি অসহায়তার সুর শোনা গেলেও, প্রতি-আক্রমণে তিনিও যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছেন। মুখবন্ধের শেষ অংশে লিখেছেন, 'পুস্তকের (পরিচয়ের সমালোচনা) কোন অংশের চেহারাটাতে তার অঙ্গদ্ব হলের কারণ নিঃসন্দিগ্ধ পুস্তক [illegible] মত দেখাইতেছে না—ইহাতেই আমার আপত্তি।'

রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশ গুপ্তের মধ্যে বিরোধের কোনো ভূমি থাকা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ এতই বড় আর জগদীশচন্দ্র এতই অনালোচিত যে দুই সমকালীন লেখকের মধ্যে বিরোধের যে স্বাভাবিক ভূমি থাকা সম্ভব, তা এই ক্ষেত্রে থাকার [illegible] ওঠে না।' প্রশ্ন ওঠে, তাহলে এই বিরোধের উৎস কোথায়? এই বিরোধের উৎস দুজনের দৃষ্টিভঙ্গির অমিল পার্থক্যে। একজন রোমান্টিক, অন্যজন নির্মোহ জীবনবাদী। একজন অন্তর্মুখী, [illegible] বিহারী, চিরসৌন্দর্যলোকমগ্ন, অন্যজন নিষ্ঠুর ও কঠিন বাস্তবকর্মী। একজন সকল সুখদুঃখের মধ্যে অনন্ত মঙ্গলময়ের হস্ত প্রসারিত দেখেন, অন্যজন দেখেন বাস্তব জীবনের অন্ধকার কোণে ঘাঁড়িয়ে

জগদীশ গুপ্ত ফিরে এসেছেন। তাঁর পাঠকের সংখ্যা ক্রমে বাড়ছে। তাঁর প্রতি বিবাট অবিচার নিয়ে গুঞ্জন-ধ্বনিও শোনা যাচ্ছে। পুনর্বিচারের দাবীও উঠেছে অনেক জায়গায়। বিচারকরা অনেকেই নড়ে-চড়ে বসেছেন। পুনর্বিচারে বাংলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করা, সম্ভবত, এই গৃহহীন সম্বলহীন সন্তানহীন সর্ববন্ধনমুক্ত সন্ন্যাসীশিল্পীর পক্ষে অসম্ভব হবে না।

আছে এক অন্ধকার নিয়তি। অর্থাৎ বিশ্বসেব জগতে দুইজন একেবারে বিপরীত কোটির লেখক। রবীন্দ্রনাথ, এমন কি, নাটকেও সাবজেকটিভ আর জগদীশচন্দ্র উপন্যাসেও নাট্যকারের মত অবজেক্টিভ। জগদীশচন্দ্রের এই বাস্তবিকতা তথা ফিয়োজিগ্রম-নিষ্ঠুর কোথাও কোথাও ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ কখনোই এ জিনিসটাকে সহ্য করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর জগদীশ গুপ্ত দীর্ঘকাল যে সাহিত্য লিখেছেনও নিতান্ত কম নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত রবীন্দ্রনাথ দেখে যেতে পারেননি, বিশ্বাস ও জীবনদৃষ্টিগত কনসিসটেন্সি জগদীশ গুপ্ত রবীন্দ্রপরবর্তী বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও অদ্বিতীয়। বাংলা সাহিত্যে অনেকের ক্ষেত্রেই রিয়েলিজম ও নেচারে-লিজম-এর সাধনা ছিল একটা ভঙ্গি মাত্র, কিন্তু জগদীশচন্দ্রের ক্ষেত্রে এটা ছিল আদর্শ ও বিশ্বাসজাত।

থিওরী এণ্ড প্রাকটিস

জগদীশচন্দ্রের গোটা সাহিত্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। তবু আমাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে কিছু কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলাম।

জগদীশ গুপ্তের প্রথম গল্প 'পেয়ারা চোর'-এর মধ্যেই তাঁর লিখন ক্ষমতার সমস্ত গুণ ধরা পড়েছে। জীবনের প্রতি তীব্র ও বিদগ্ধ কৌতুক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে কৌতুক সৃষ্টির অসাধারণ [illegible] মিলে গল্পটিকে একটি নিটোল রসাশ্রিত গল্পে পরিণত করেছে।

স্ত্রীর গঞ্জনায় জীবন সম্পর্কে উচ্চাশাহীন যুবক (লেখকের জবানীতে লেখা) কলকাতায় এসেছে কর্মের সন্ধানে। সেই কলকাতায় যেটা কিনা যথার্থভাবে কাজের জায়গা। পকেটমারের ব্যবসা থেকে নোট জাল পর্যন্ত এবং মোসাহেবী বা বাজার সরকারী থেকে লাট-দপ্তরের চাকরী পর্যন্ত—অসৎ ও সৎ কাজের কেন্দ্র ঐ স্থানটি।'

বন্ধু ননীর অনুরোধে ননীর কলকাতার বাড়িতেই উঠেছিলেন। বেশ কিছু দিন আতিথেয়তা ভোগ করে, লেখক বন্ধুকে প্রতি মাসে কিছু খরচ দিতে চাইলেন। বন্ধু অনিচ্ছায় নিতে রাজি হলেন। মাত্র বারো টাকা। কৃতজ্ঞতা নয়, প্রীতির বাহুল্য বোধ নয়, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ নয়—উপকৃত ব্যক্তিটি ভাবলেন, কলকাতায় আহার ও বাসস্থান মাত্র বারো টাকায়। বড় জিতেছি। স্ত্রীকে সোল্লাসে চিঠি পাঠালেন, যাত্রা শুভক্ষণেই হইয়াছে।'

আরম্ভ হল বন্ধুর আদর। 'ননী ও তার স্ত্রীর আদর নাকে-মুখে ঢুকে আমার দম বন্ধ করে দিতে লাগলো।' কিন্তু প্রত্যেক ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক ও অনিবার্য, তা বুঝতে লেখকের বেশী বিলম্ব হোল না। আতিথেয়তার যে চূড়ান্ত বাড়াবাড়ি ননী ও তার স্ত্রী দেখিয়েছিল, সেখান থেকে অবলীলায় অতিথিকে অভদ্রতা ও ইতরতার নরককুণ্ডে ফেলে দিল। পেটপুরে খাওয়ার মত ভাত দেওয়া বন্ধ হল। চা এল না। গিয়ে খেতে হল। তাও ঠাণ্ডা। কয়েকদিন পর চায়ের কাপ নিজে ধুয়ে রাখতে হল। বিছনা পাততে হল নিজেকে। ঘর ঝাঁট দিতে হল। এবং শীতের রাতে সাঁ্যাৎসেঁতে ঘরে বসে যে ঠাণ্ডা ভাত খেতে আঙুলের ডগা অবশ হয়ে আসে—তেমন ভাতই খেতে হল। স্ত্রীকে চিঠিতে লিখলেন, 'আমি সংসারের উপযুক্ত হয়ে উঠছি।'

ক্রমে অবস্থা খারাপ হল। লেখক যখন শীতের রাতে ঠাণ্ডা ভাত খেতেন তখন ননীর স্ত্রীর পাশেই উপবিষ্ট ননীর পাতের ওপর ধূমায়মান ফুলকো লুচি কাঠিতে বিঁধে এনে ছেড়ে ছেড়ে দিত।' ননীর পাতে যখন নিয়মিত রুইমাছের পেটি, ইলিশ মাছের পেটি ও মাছের মাথা পড়তো, তখন লেখক ঠাণ্ডা ভাতে পোনা-মাছের লেজা পেয়েও তৃপ্ত ছিলেন। স্ত্রীকে চিঠিতে লিখলেন তাঁর ভুঁড়ি হয়েছে।'

গল্প এখানে মোড় নিয়েছে এবং অনুমানের অতীত এক কৌতুকময়তার মধ্য দিয়ে গল্প শেষ হয়েছে। ননীর নিয়মিত গরম লুচি ও মাছের মাথার কালিয়া ভক্ষণ, লেখকের মনে একটি দুষ্ট-বুদ্ধির জন্ম দিয়েছে। তিনি নিজ খরচায় একটি বিজ্ঞাপন ছাপালেন এবং একটি লোককে দিয়ে সেটা ছাতুবাবুর বাজারের সামনে বিলি করালেন। বাজার শেষ করে ফেরার পথে ননীর হাতে সে বিজ্ঞাপন পড়লো। রুইমাছের বড় মাথাটা সেদিন আর ননীর খাওয়া হোল না। পড়ল গিয়ে লেখকের পাতে।

আহারান্তে হুকো টানতে টানতে ননী বন্ধুকে তার সার্টের পকেট থেকে একখানা ছাপা কাগজ বের করে আনতে বললো। লেখক জানলেন, ছাপা কাগজটি একটি বিজ্ঞাপন। গড়শ্যাম স্বাস্থ্যোন্নতি সমিতির পক্ষে ডঃ টি পি গাঙ্গুলী এম-এস-সি, এম-ডি কর্তৃক প্রকাশিত। বিজ্ঞাপনটির বক্তব্য হল—'খাদ্যের মধ্যে মৎস্য অশেষ অনিষ্টের আকর। সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ত্রিনিস মৎস্যের মাথা। প্রসিদ্ধ জার্মান ডাক্তার ডন কনটেনবর্গ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মৎস্যের মাথার প্রতি বর্গইঞ্চিতে প্রায় ৮০ হাজার জীবাণু বাস করে। মৎস্যের মাথার ঘি খাইলে দৃষ্টিশক্তি সবল হয় এই প্রাচীন সিদ্ধান্ত ডঃ কনটেনবর্গ উল্টাইয়া দিয়াছেন।' তিনি বলেন ঐ পদার্থে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়, স্নায়বিক দৌর্বল্য বৃদ্ধি পায় এবং পাকস্থলীতে এক প্রকার ...' ইত্যাদি

বিজ্ঞাপনটি সমাপ্ত হলে লেখক বললেন, যাহে কথা। ননী বলল, জার্মানরা বাজে কথা বলে না। লেখক অনেক দিন ননীর গৃহ ত্যাগ করেছেন। চিঠিতে জেনেছেন, ননী ইহ জীবনের মত মাছের মাথা ত্যাগ করিয়াছে।'

প্রথম গল্পেই, জীবনকে একটু তির্যক দৃষ্টিতে দেখা এবং সামাজিক সম্পর্কগুলির অসারতা এবং ব্যক্তিচরিত্রের অন্তঃসার-শূন্যতা দেখাবার প্রবণতা ও আশ্চর্য শক্তি ধরা পড়ে। এই দৃষ্টিই ক্রমে দুর্বাসা দৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে যেখানে জীবন সম্পর্কে কোনো মোহকে তিনি তিলমাত্র স্থান দেননি। তার কাছে ক্ষমা নেই। স্ত্রী, বন্ধু, বন্ধুর স্ত্রীর এমনকি নিজেকেও তিনি ক্ষমা করতে পারেননি। যার বাড়িতে একদিন আশ্রয় পেয়েছিলেন, তার ব্যবহার অসহ্য হয়ে উঠলে—তিনি দুঃখ পাননি, কোনো বেদনাবোধ তাঁকে উত্যক্ত করেনি—অতি সূক্ষ্মভাবে গায়ের জ্বালা মিটিয়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছেন। এখানেই জগদীশ গুপ্ত প্রতিযোগীহীন শিল্পী। জগদীশচন্দ্রের পরিণত শক্তির সৃষ্টি 'পলায়নপরী' ষষ্ঠী'। এই গল্পে দুর্দান্ত ও ধনী সদুখাঁ যেভাবে পরস্ত্রীকে নিজের ঘরে এনে আটকবন্দী করেছে, তা শয়তান ধনীর শক্তির কাছে নিরীহ গরীব-দুর্বলের অসহায়তার একটি চূড়ান্ত ছবি আঁকা হয়েছে। গোটা বাংলা সাহিত্যে শ্রেণী সংগ্রামের পটভূমিকায় এই গল্পের পাশে দাঁড়াবার মত একটিও গল্প নেই।

স্নানের ঘাটে, নৌকায় ভ্রমণরত সুদখাঁ, জসিমের রূপবতী স্ত্রীকে দেখে দেখেই তার হিংসা প্রবৃত্তি জেগে ওঠে। এই ধনী, লোকচরিত্রসদৃশ লোকটি নিপুণ ছলনার আশ্রয় নেয়। আত্মীয়তার ভান করে মিথ্যা উৎসবের অজুহাতে জসিম ও তার পরিবারকে পাল্কি-বেহারা পাঠিয়ে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। অনিবার্য কারণে উৎসবে বাধা পড়েছে জানিয়ে দুএকদিন থেকে স্ত্রীপুত্রদের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। দাদার বাড়িতে বোন আরো কয়েকটা দিন থেকে যাবে, এই অজুহাতে জসিমের সুন্দরী স্ত্রীকে অন্তঃপুরে রেখে দেয়। বাড়ি ফিরে জসিমের মনে খটকা লাগে। সে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার জন্য পরদিন সদুখাঁর বাড়ি যায়। সদুখাঁর সামনে দাঁড়িয়ে জসিম বলিল, 'আমার স্ত্রী—। সদুখাঁ। উত্তর করল পালিয়েছে বুঝি?'

শুনে জসিম থই পায় না। ভয়ে ভয়ে বলল, 'আপনি তাকে নিয়ে এসেছেন—'

সদু যেন আচমকা বাঘ ডাকিয়া উঠিল,—জেল্লাব—

সদু জসিমের দিকে আঙুল তুলিয়া বলিল,—এই বেটা পাগল। বলছে আমি ওর বৌকে নিয়ে এসেছি। বাঁদীর বাচ্চার কান দুটো কেটে রেখে নদীর পারে করে দিয়ে আয়।' জসিম সদুখাঁর পায়ে পড়ে ক্ষমা চায়। পরাক্রান্তরে স্ত্রীর উপর অধিকার প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করে রক্ষা পায়।

অসহায় জসিম সরল বছরের ব্যর্থ-অর্জন নমশূদ্রদের কাছে আছাড় খেয়ে পড়লো। আর এক শক্তিমানের কাছে বিচারের জন্য। প্রথমটায় অর্জুন রাজি হয়নি। জসিমের কাকুতি-মিনতি শুনে জসিমকে সঙ্গে করে সদুখাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেল।

বাঘের সঙ্গে বাঘের দেখা হল। দুই পক্ষের তর্জন-গর্জন শেষে সদু ভাত তুলে গালি দিল। বলল 'তোদের আক্কেল হয় নাতো খেলে: অনেক দিন বুঝি তা মাথায় পড়ে না?'

অর্জুনের ভাইপো যুধিষ্ঠির পিতৃব্যকে টেনে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল। যেতে যেতে চেঁচিয়ে বলল, এ মামলা মিটবে লাঠির ঘায়ে। সদুও চেঁচিয়ে উত্তর দিল, আচ্ছা।

নমশূদ্র পাড়ার নীচেকার গোচারণের ভূমিতে লড়াইয়ের জায়গা ঠিক হল। দিনও ধার্য হল। যুধিষ্ঠিরের দলে পঁচিশজন।

[illegible]ই অর্জুনের সাগরেদ। সদুখাঁর দলে দুশোজন। অর্জুন আলো [illegible]লোক পেত। কিন্তু এই অভিজ্ঞ লাঠিয়াল সদুর দুশো জনের বিরুদ্ধে পাঁচিশজনই যথেষ্ট মনে করলো। কাসিমরা তিন ভাই। তাদের লাঠি ধরতে দেওয়া হল না। তারাই এ লড়াইয়ের দর্শক। সদুর দুশো লোক এসে জড় হল। অর্জুন তার দলের বাইশজনকে ধীরে এগিয়ে যেতে বলে, ঘরে ফিরে এল। মাটিতে বসে মিনিট কয়েক মা মা বলে ডাকতে লাগলো। যখন উঠে দাঁড়ালো, পুরো চেহারা পাল্টে গেছে। যেন শিবের সংহারমূর্তি। তারপর দলবল নিয়ে প্রমত্ত ঝড়ের বেগে প্রতিপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। সদুর দল সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হল।

গল্প এখানেই শেষ নয়। শেষটা আরো অনেক ভয়াবহ। সেই ভয়াবহ সত্য প্রকাশে জগদীশচন্দ্রের কলমে মাত্র এগারোটি শব্দের দুটি বাক্য দরকার হয়েছে।

'কাসিম তার বৌকে ফিরিয়া পায় নাই। বৌ নিজেই আসিতে চায় নাই।'

উনিশ দিনের আদিম সত্য আজো সভ্যতার কোলে কোষে প্রবাহিত। তার এমন উদ্ঘাটন বাংলা সাহিত্যে পূর্বাপরহিত।

সমসাময়িক সমালোচকের মূল্যায়ন

কল্লোল যুগের সুবিখ্যাত লেখক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর স্মৃতিগ্রন্থে লিখেছেন, 'জগদীশ গুপ্ত সাহিত্যকে ভালবেসেছেন প্রাণ দিয়ে। প্রাণ দিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন।... আধুনিক সাহিত্যের নদীতে তিনি একটা বড় রকমের বেগ।' তখনকার আর একজন বিখ্যাত সম্পাদক পরিমল গোস্বামী তাঁর স্মৃতিগ্রন্থে স্বীকার করেছেন 'এমন একটি মানুষ সাহিত্যক্ষেত্রে বিরল বলেই মনে হয়েছে।' ১৩৩৬ সনের বিচিত্রা পত্রিকার ভাদ্র সংখ্যায় অধ্যাপক অনিলবরণ রায়ের আধুনিক সাহিত্য বিষয়ে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে জগদীশচন্দ্রের সামগ্রিক সাহিত্যশৈলী একটি উচ্চাঙ্গের আলোচনা আছে। সেখানে তিনি বলেছেন, 'আমাদের দেশে সম্প্রতি একটি প্রতিভার আবির্ভাব হইয়াছে, সেটি একেবারে মৌলিক। শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার ছোটগল্পে যে ধারা প্রবর্তিত করিয়াছেন, কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য, কি প্রাচীন কি আধুনিক কোথাও তাহার তুলনা নাই বলিলেই চলে।'

কবি সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার তাঁর সাহিত্য বিতান গ্রন্থের অন্তর্গত 'বর্তমান বাংলা সাহিত্য' প্রবন্ধে আরো স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, কল্পনা বা মনোগত বাগবিবাগ এবং ন্যায় অন্যায় প্রভৃতি সংস্কার মুক্ত হইয়া জীবনকে অকুণ্ঠচিত্তে দেখিবার যে ভঙ্গি অথচ তাহাতেই এক প্রকার রসাস্বাদের যে প্রবৃত্তি তাহাই সাহিত্যে 'পিশাচিজম্'। ...এইরূপ বৈশিষ্ট্য দাবী করিতে পারেন শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র গুপ্ত। আর এক যায়গায় বলেছেন, 'সভ্য ও শিক্ষিত মানুষের সুস্থবুদ্ধি যে সকল ঘটনাকে কল্পনারও বিরোধী বলিয়া মনে করে, জগদীশচন্দ্র তেমন ঘটনাকেও তাঁহার গল্পে— শুধু সম্ভাব্যতা নয়—এমন বাস্তবতায় মণ্ডিত করিয়াছেন যে, তাহাকে যাহারা বিয়ারি বলে, সেই ভাব আমাদের অভিভূত করে। মনে হয় আমরা এমন একটি বস্তুর সম্মুখীন হইয়াছি যাহা মানুষের বুদ্ধি বা জাগ্রত চৈতন্যের অগোচর।'

ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ ভূদেব চৌধুরী, অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত এবং আরো অনেক প্রবীণ ও নবীন সমালোচক জগদীশচন্দ্র গুপ্তের জীবনদৃষ্টির মৌলিকতা ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ক্ষমতাকে অকপট স্বীকৃতি দিয়েছেন।

নির্বাসনের কারণ সন্ধানে

এখন প্রশ্ন হল, আলোচিত মৌলিকতা অসাধারণ সৃষ্টিপক শক্তি ও ক্ষমতার পরিচয় থাকা সত্ত্বেও জগদীশচন্দ্র ও তাঁর সাহিত্য বিস্মৃত ও নির্বাসিত হয়েছিল কেন? বলা বাহুল্য এই আলোচনা একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বিষয়। এ ক্ষেত্রে আমি সংক্ষেপে কারণগুলি স্পর্শ করবার চেষ্টা করবো।

(১) পূর্বেই আলোচনা করেছি, সাহিত্যে সুনাম অনেক পরিমাণে পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের ভূমিকার মত। পাঠকের চোখের সামনে সে নাম যদি ক্রমাগত প্রতিফলিত না-হয়, তাহলে পাঠক তাকে ভুলে যাবে। আউট অব সাইট আউট অব মাইণ্ড। অথচ অচিন্ত্যকুমারের ভাষায় জগদীশচন্দ্র ছিলেন অন্তরালের সাহিত্যিক। নিজস্ব পরিচিত বৃত্তের বাইরে তাঁর গতিবিধি ছিল সঙ্কুচিত। 'কল্লোল' পত্রিকার তিনি এক বিশিষ্ট লেখক হয়েও, কল্লোলের সুবিখ্যাত আড্ডায় তিনি ছিলেন অনুপস্থিত। ফলতঃ সহযোগী লেখকদের প্রীতির প্রচার, বন্ধুতের বিজ্ঞাপন, অক্ষম ও প্রতিযোগীর গালাগাল, ইত্যাদি বিজ্ঞাপনের সহায়ক কিছুই তিনি পাননি।

(২) তেজের দ্বারা প্রকাশক সম্মোহনের বিদ্যাও তাঁর করায়ত্ত ছিল না। নিজের মতামত সম্পর্কে তিনি এতই দৃঢ় ছিলেন যে নিজের গল্প ও প্রবন্ধের রচনা সম্পর্কে সম্পাদকদের সঙ্গে প্রায়ই মতানৈক্য ঘটেছে। শরৎচন্দ্রের শেষের পরিচয়' সমালোচনায়, শরৎচন্দ্রের রমরমার কালে তিনি গড্ডলিকা সমালোচনায় না গিয়ে

যে দেশে দৈনিক পত্রপত্রিকার অফিসে মাত্র ব্যবচ্ছেদ পর্ব মনীষী তৈরী হয়, সে দেশে জগদীশ গুপ্ত নামক একজন যথার্থ শক্তিমান লেখকের চিরনির্বাসনে থাকা বোধ ও বুদ্ধির অগম্য কোন ব্যাপার নয়। কিন্তু দিন বদলায়। শাসনে অন্যলোক আসে। নির্বাসনের দণ্ডকাল শেষ হয়।

যে নির্মোহ মানসিকতা ও অভিনব বিশ্লেষণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন— তা সংসারের দৃষ্টান্তে হলেও, জগদীশচন্দ্রকে কিছু পরিমাণে জনপ্রিয়তার প্রতিকূল স্রোতে পড়তে হয়েছে। জগদীশচন্দ্রের এই রাগী ও আপোষহীন মনোভাব তাঁর জীবন দৃষ্টি সম্পর্কে। রচনাবলীতে উদ্ধৃত মুকুন্দের বসুকে লিখিত চিঠিতে এর অনেক দৃষ্টান্ত আছে। যাজেই প্রকাশের ক্ষেত্রে, অর্থানুকূল্যের ব্যাপারে, সমকালীন অন্যান্য লেখকদের তুলনায় জগদীশবাবু পত্রপত্রিকা ও তার সম্পাদকের পৃষ্ঠপোষকতা বা আনুকূল্য সামান্যই পেয়েছেন।

(৩) দারিদ্র্যের কারণে তিনি তাঁর সমস্ত বইয়ের স্বত্ব বিক্রি করে দিতে একদা বাধ্যবাধকর হয়েছিলেন। সম্পাদক বন্ধুকে চিঠিতে লিখেছিলেন 'সমুদয়ের স্বত্ব ত্যাগ করিয়া যদি বরদা এজেন্সীকে দিতে চাই তবে শিশিরবাবু লইতে রাজি আছেন কিনা শুনিয়া আমাকে কালই লিখিবেন। কত টাকা দিতে পারে জানাইবেন। বাই ইনস্টলমেন্ট আমি লইতে রাজি আছি। আমার আশা খুব লিমিটেড।' কিন্তু হায়। জগদীশচন্দ্রের বই নামমাত্র মূল্যে কেনার প্রকাশকও সেদিন ছিল না। এই সব কারণে এবং পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতার দৃষ্টান্তে জগদীশচন্দ্রের মধ্যে আত্মগোপন ও আত্মপীড়নের প্রবণতা দেখা যায়। লেখার জন্য উপযুক্ত দক্ষিণা পান নি। এইগুলি তাঁকে আহত করেছে বেদনার্ত করেছে কিন্তু সম্পাদকের দপ্তর পর্যন্ত ধাওয়া করতে উদ্বুদ্ধ করেনি।

ফলে, যথেষ্ট উৎসাহের অভাবেও তিনি নির্বাসনকে ধীরে ধীরে মেনে নিয়েছিলেন।

(৪) জগদীশচন্দ্র গুপ্ত এমন এক ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, যার ভেতরের রস ও যথেষ্ট আনন্দের উপাদান খুঁজে পাওয়া পাঠকের প্রস্তুতি নিরপেক্ষ ভাবে সম্ভব নয়। অর্থাৎ অনুশীলন ও চর্চার মধ্য দিয়ে একমাত্র প্রস্তুত পাঠকই জগদীশ গুপ্তকে আবিষ্কার করতে পারবেন। বাঙালী পাঠকের আদর্শ ভোজ্য সুপরিচিত ভাবপ্রবণতা, আবেগমুখরতা, উচ্ছ্বাস, অতিকথন ও রসের বহিঃসার্বী ব্যবহার জগদীশ গুপ্তে একেবারেই নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্সের জগতে ভূমিষ্ঠ হয়ে, রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক স্বপ্ন কল্পনার সুবিশাল বেলাভূমিতে আলস্যে বিচরণ করে, শরৎচন্দ্রের আবেগ, উচ্ছ্বাস ও মিষ্টি ভাবাপ্লুতার জগতে পরিপোষিত হয়ে, বাঙালী পাঠক জগদীশচন্দ্রের নির্লিপ্ত, নিষ্ঠুর আবেগবর্জিত রচনায় প্রবল ধাক্কা খেয়েছেন। সামলে উঠে, শোন দৃষ্টিতে পরীক্ষা করে নিতে নিতে পঞ্চাশটা বছর পার হয়ে গেল।

সাহিত্য সম্ভবত এমনি হয়। অন্তত সংসাহিত্যে অনেক সময়ই হয়েছে, সে দৃষ্টান্ত বিশ্বসাহিত্যে অনেক আছে। ভবভূতি বলেছেন, আমি অনন্তকাল অপেক্ষা করতে রাজি আছি, তবু অরসিককে যেন আমার রস নিবেদন করতে না হয়। যথার্থ মূল্যায়ণের জন্য সেক্সপীয়রকেও তিনশো বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে

জগদীশ গুপ্ত এমন এক শক্তির অধিকারী শিল্পী, যাঁর নাম, তারাশংকর মাণিক ও বিভূতিভূষণের নামের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে তো বটেই, সম্ভবত সকলের আগে উচ্চারিত হবার যোগ্য, বলতে এবেবারেই অত্যুক্তি করা হবে না।

অসতর্ক পাঠকের পক্ষে জগদীশচন্দ্রকে ভুল বোঝার অবকাশ আছে তাঁর উপন্যাসের ক্ষেত্রে। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের হাতে উপন্যাসের যে সার্থকতা আমরা দেখেছি, বিষয়ে জগদীশচন্দ্রের উপন্যাসগুলি তার চেয়ে অনেক পৃথক। জীবনের 'হরাইজ্যানটাল' বিস্তার নয় 'ভার্টিক্যাল ডেপথ্'এর অন্বেষণই জগদীশচন্দ্রের উপন্যাসের ধ্রুব লক্ষ্য। তাঁর অসাধু সিদ্ধার্থ, গতিহারা জাহ্নবী, লঘুগুরু, দুলালের দোলা, তাতল সৈকতে, নিদিত্ত কুম্ভকর্ণ সকল উপন্যাসেই সেই একই প্রয়াস।

জগদীশ গুপ্ত রচনাবলীর প্রকাশক গ্রন্থালয়ের আনন্দরূপ চক্রবর্তী, সম্পাদক নিরঞ্জন চক্রবর্তী ও সহযোগী সম্পাদক শুভেন্দুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অশেষ ধন্যবাদ। জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী প্রকাশ করে একটি নির্বাসিত লেখকের স্বস্থানে ফেরার যে আয়োজন তাঁরা করেছেন সেই জন্য বাংলা সাহিত্যের বিপুল সংখ্যক সৎপাঠক, স্থিতধী সমালোচক ছাত্র ও শিক্ষকের সশ্রদ্ধ ধন্য তাঁরা পাবেন তাতে সংশয় নেই।

জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী। ১ম খণ্ড। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা-৭৩। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৫৫। দাম, পঁচিশ টাকা।

সংযত ও নিরপেক্ষ থাকা বাঞ্ছনীয়

গত ৩০শে জুন অমৃতে প্রফুল্লচন্দ্র মহলানবীশের কবিগুরু আয়োজিত সেকালের গানের আসর' প্রবন্ধে এই বলাইদাস শীল আমার সব গান নষ্ট করেছে' রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি লেখক বচনায় এমনভাবে পরিবেশন করেছেন যে এখনকার দিনের পাঠকরা পড়ে হয়তো গায়ক বলাইদাস শীল প্রথম শ্রেণীর শিল্পী ছিলেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করবেন।

বলাইদাস শীলের দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের রেকর্ড আজো শুনলে অবাক লাগে। বিস্ময় জাগে তাঁর স্বাভাবিক গলাকে প্রয়োজনে বিকৃত করার ক্ষমতা লক্ষ্য করে, বিস্ময় জাগে তাঁর সুর ছেড়ে গানকে সহসা বেসুরে পরিবেশন করার দক্ষতায়। সেকালের যে দু একজনের গান আজো নিখুঁত করলে চমক সৃষ্টি করবে—বলাইদাস শীল তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তখন দ্বিজেন্দ্রলালের গাওয়া রেকর্ডের অপর পিঠে বলাইদাসের গান প্রকাশিত হয়েছে।

রেকর্ডে হাসির গানের প্রথম সার্থক শিল্পী বলাইদাস শীলের গাওয়া দ্বিজেন্দ্র গীতি 'কুড়োবুড়ি দক্ষযজ্ঞে' 'আমরা পাঁচটা এয়ার', 'একেই বলে প্রেম' 'স্বচ্ছিকা সে ঘোষেদের', 'পান বাঁশিতে সদা প্রাণান্ত', 'তোমরই মিশছে সই', 'দেখা হতে পরতাম' প্রভৃতি গান কিংবা তৎকালীন প্রচলিত হাসির গান 'বাড়িছে তেনা-তেনা তেন-তেনাক-নাকুড়', 'বিহারে বেঘোরে চড়িনু একা' প্রভৃতি রেকর্ড সেকালে জনপ্রিয়তার শীর্ষে আরোহণ করেছিল। সে সময়ে দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের রেকর্ড অন্য সব সঙ্গীতকে কোণঠাসা করে দিয়েছিল তার জন্য বলাইদাস শীলের অবদান অনস্বীকার্য।

তখনকার দিনে যাঁরা রেকর্ডে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেছেন যেমন হরেন্দ্রনাথ দত্ত, জিতেন্দ্রনাথ দাস, নিতেন্দ্রনাথ দত্ত কে মল্লিক, দ্বিজেন্দ্রবাগচী প্রভৃতি সব শিল্পীরাই সুরে, তালে এমন কি কথায় সব দিক দিয়েই রবীন্দ্র সঙ্গীতের ওপর স্টীম-রোলারই চালিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ যদি বিশেষ কারণে কথা প্রসঙ্গে কারো নামে তাঁর সঙ্গীত পরিবেশনায় অসন্তোষ প্রকাশ করে থাকেন (যা কখাই স্বাভাবিক) তবে তা লিখে এইভাবে চিহ্নিত করলে শিল্পীর প্রতি অমর্যাদা প্রকাশ করা হয়। যদি এ বিষয়ে লেখার প্রয়োজন হত তবে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তা লিখে প্রকাশ করতেন। কথা প্রসঙ্গে কিছু বলা আর লিখে কিছু প্রচার করায় অনেক পার্থক্য।

তাই এই প্রবন্ধ থেকে রবীন্দ্রনাথেরই উক্তি তুলে ধরতে ইচ্ছে করছে—প্লোকেত বাসাসড়্। এই প্রবন্ধ পড়ে লেখককে কি কোথাও কোথাও বাষাসড় মনে হয় নি। যেমন সাহানা দেবী নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের অন্যতমা হলেও তাঁর গাওয়া 'আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে' এ রেকর্ডটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের জগতে আলোড়ন আনে, একথা কি একটু বেশি বাড়িয়ে বলা নয়। সে রেকর্ড এখন শুনলে কি খুব আকর্ষণীয় লাগে। অথচ এ রেকর্ডের কিছুদিন পরে কৃষ্ণচন্দ্র দের গাওয়া 'আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে, আজো শুনলে মুগ্ধ হতে হয়—সত্যিই মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

এ-সব ক্ষেত্রে প্রবন্ধকারদের সংযত এবং নিরপেক্ষ থাকাই বাঞ্ছনীয়।

শৈলশেখর মিত্র
কলকাতা-৭০০০০৩

আংশিক সত্যি হতে পারে

সুমন্ত সেনের 'ঘুষ খাবারই' পড়ে (অমৃত ২৮।৭।৭৮) মনে হল এই দিন ৫।৬ আগে স্বর্গতকে পড়েছিলে সংচিতে থানায় এফ আই আর করাতে গেলেও ঘুষ ছাড়া হয় না। আর রেলের টিকেট বা রিসার্ভেশান, সে তো বোধহয় আর এখন যে আইনী বলেই লেখকের মনে হয় না, গা-সওয়া হয়ে গেছে। —তবে কিনা কোনো অধ্যাপকের পৈতৃক সম্পত্তি বা টুইশনি ইত্যাদির অইনসম্মত রোজগারও থাকতে পারে। তাই অধ্যাপকদের সম্বন্ধে হয়তো কেউ হয়তো দশের টাকায় বাড়ি গাড়ি করতে পারেন শ্রীসেন যেমন লিখেছেন। তবে তার মানে এই নয় যে কোনো অধ্যাপকের বাড়ি গাড়ি থাকলেই তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখতে হবে। তেমনি ছেলেমেয়েদের কটা বা নীল চোখ' এর কারণ শ্রীসেন যা দেখিয়েছেন, তা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সত্যি হতে পারে কিন্তু কটা বা নীল চোখ দেখলেই কোনো মহিলা সম্বন্ধে কলাটা নিশ্চয়ই ঠিক হবে না। কটা বা নীল চোখের একমাত্র কারণ নিশ্চয়ই শ্রীসেন যা লিখেছেন তা নয়। —নমস্কারান্তে

শ্রীলা সেন
শিলং-৩।

বিমলানন্দ শাসমল

ভারত কি করে ভাগ হলো

২৯শে জুলাই-এর বক্তৃতায় জিন্না বললেন, সমগ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে সফল করবার জন্য মুসলিম লীগ পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব কংগ্রেসের পায়ে জল দিয়েছিল। কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তি নিশ্চয়ই এত আপত্তি করবেন না যদি আমি বলি যে যাতে রক্তপাত ও গৃহযুদ্ধের পটভূমিকা তৈরি না হয় আমরা সেই ইচ্ছার পরিচালিত হয়েছিলাম। প্রধান অপর পক্ষের সঙ্গে একটি শান্তিপূর্ণ মীমাংসার আসার আকাংখায় আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তিনটি বিষয় ছেড়ে দিয়েছিলাম, এবং একটি সীমাবদ্ধ পাকিস্তান স্বীকার করে নিয়েছিলাম। আমরা স্বার্থহীন ভাবে কংগ্রেসের হাতে সেই ত্যাগ স্বীকার করেছিলাম.... আমাদের একটি খুব তিক্ত শিক্ষা হয়ে গেল . আজ পর্যন্ত এইটা তিক্ততম। আর মীমাংসার স্থান রইলো না। এবার আমরা এগিয়ে যাবো।' ফিরদৌসির কবিতা উদ্ধৃত করে জিন্না বললেন আপনারা যদি শান্তি চান আমরা যুদ্ধ চাইবোনা—কিন্তু আপনারা যদি যুদ্ধ চান আমরা বিনা দ্বিধায় তার গ্রহণ করবো।' (ইংরেজির অনুবাদ)

২৯শে জুলাইয়ের বক্তৃতায় জিন্না একটি সাংঘাতিক অভিযোগ করলেন।' তিনি বললেন 'মন্ত্রী মিশনের স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের সঙ্গে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের একটি গোপন চুক্তি হয়েছে যে ১৬মের ঘোষণা পত্রের শর্তগুলি কংগ্রেস না মানলে কংগ্রেস যদি শুধু এইটুকু বলে" আমরা ১৬ই মের ঘোষণা পত্র গ্রহণ করেছি তাহলে ব্রিটিশ সরকার কনস্টিটিউয়েন্ট ডাকবার জন্য বড়লাটকে নির্দেশ দেবেন এবং অন্তবর্তী সরকার কংগ্রেসকে' ঘোষণা দিতে তাহলে জানাবেন। লর্ড ওয়েভেল তাঁর দিন-পঞ্জী 'ওয়েভেল দি ভাইসরয়েস জার্নালে মোটামুটি এই অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করেছেন। (বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে চুক্তির প্রয়োজনীয়তা ছিল এই কারণে যে তিনি প্রথম থেকেই ১৬ই মে-র ঘোষণা-পত্র প্রত্যাখ্যানের দাবি জানিয়েছিলেন।)

১লা আগষ্ট জিন্না আবার বললেন তিনটি বিষয় অর্থাৎ বিদেশ বিভাগ, দেশরক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ছেড়ে দিয়ে কেবলমাত্র একটি ক্ষুদ্র সংস্করণের পাকিস্তান মেনে নিয়ে আমরা চরম ত্যাগস্বীকার করেছিলাম কারণ ও করতে বসবাসকারী প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মঙ্গলের কথা ভেবে আমরা প্রভাবিত হয়েছিলাম এবং ভেবেছিলাম এই ভাবে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে আমরা বিদেশীর দাসত্ব থেকে মুক্ত হবো এবং স্বাধীনভাবে করবো।' (ইংরেজির অনুবাদ)

কংগ্রেসের প্রস্তাবে বলা হলো যে তাঁর ১৬ই মের ঘোষণা পত্র গ্রহণ করেছেন কিন্তু কংগ্রেস নেতারা বল্লেন তারা কিছুই গ্রহণ করেন নি শুধু কনস্টিটিউটের এসেম্বলিতে যাবেন এবং সার্বভৌম কনস্টিটিউটের এসেম্বি যাইচ্ছা তাই করতে পারবে—এই দেখে ২৯শে জুলাই মুসলিম লীগ কাউন্সিল তাদের ৬ই জুনের প্রস্তাবে ঘোষিত মন্ত্রী-মিশন পরিকল্পনার অনুমোদন প্রত্যাহার করে নিলেন এবং ঠিক করলেন পাকিস্তান আদায়ের জন্য এবার "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" আরম্ভ করতে হবে। জিন্না বল্লেন "এতদিন আমরা নিয়মতান্ত্রিক পথে চলে এসেছি, এইবার আমরা নিয়মতান্ত্রিক পথকে 'গুড বাই" জানিয়ে দিলাম।' একথা অবশ্য ঠিক, ১৬ইমে-র ঘোষণা-পত্র মেনে নেবার সময়ে ৬ই জুনের প্রস্তাবে মুসলিম লীগ বলেছিলেন এখনও, তাঁদের লক্ষ্য রইল একটি সম্পূর্ণ সার্বভৌম পাকিস্তান "এবং তাঁরা "পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই অন্যান্য দলের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত লক্ষ্যটি আশু লক্ষ্য হবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না কারণ ১৬ই মে-র ঘোষণায় সে সম্বন্ধে কোনো ব্যবস্থা নেবার অবকাশ ছিল না। কিন্তু একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে তখনকার মত মুসলিম লীগ একটি অবিভক্ত ভারতেই থাকতে রাজি ছিলো এবং ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে, দেশরক্ষা, বিদেশ বিভাগ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার শাসনভার ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছিল।

মুসলিম লীগের "প্রত্যক্ষ সংগ্রামের "পরিকল্পনা দেশে অভূতপূর্ব হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার রূপ নিলো। ১৬ই আগস্ট কলকাতার দাঙ্গায় উভয় সম্প্রদায়ের কয়েক হাজার লোক নিহত হলেন এবং অনেক বেশী সংখ্যক নিরস্ত্রায় ঃ অন্যান্য প্রকারে উৎপীড়িত হলেন।

ওয়েভেল কয়েকদিনের মধ্যেই কলকাতা দেখতে এলেন এবং সেখানে সব দেখে ও লোকের সঙ্গে কথা বলে তিনি শংকিত হয়ে উঠলেন এই সব যে এবার সারা ভারতময় এই ধরনের সাম্প্রদায়িক ছড়িয়ে পড়লে তাকে রোধ করা অসম্ভব হয়ে উঠবে। কলকাতাতেই মুসলিম লীগ নেতা ও গিন্নার বিশ্বস্ত অনুগামী খাজা নজিমুদ্দিন ওয়েভেলের সঙ্গে দেখা করে বললেন যে, যদি মিশন প্রস্তাব অনুযায়ী গ্রুপ-গঠনের নিদান কার্যকরী করা হয় তাহলে লীগের লীগের পক্ষে মিশন প্রস্তাব অনুযায়ী কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিতে যোগ দেওয়া সম্ভব হবে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াল রূপ প্রত্যক্ষ করে এবং লীগের পক্ষে মিশন-প্রস্তাবের পুনঃ সমর্থন লাভের সম্ভাবনা আছে বুঝতে পেরে নয়াদিল্লী পৌঁছেই ২৭শে আগষ্ট ওয়েভেল গান্ধীজী ঃ জওহরলালকে ডেকে পাঠিয়ে কাতরভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে লীগের সঙ্গে গ্রুপ-গঠনের প্রশ্নে বোঝাপড়া সম্ভব না হলে সারা ভারতবর্ষে রক্তবন্যা বইবে এবং কেউ তা রোধ করতে পারবে না।

কংগ্রেসের এবং বিশেষ করে গান্ধীজীর তখনও ধারণা ছিল এবং তিনি বারবার এই কথাই লিখছিলেন যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্বই নেই—যেটুকু দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে তা ব্রিটিশ রাজনীতির খেলা এবং তৃতীয় পক্ষে অর্থাৎ ব্রিটিশ শক্তি একবার ভারত পরিত্যাগ করলেই হিন্দু-মুসলমানের সকল দ্বন্দ্বই নিমেষে অন্তর্ধান করবে। ১৯৪৬-এর ২৭শে জানুয়ারি স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সকে লেখা এক চিঠিতে জওহরলাল জানিয়েছিলেন যে ব্রিটিশ সরকার যদি ঘোষণা করেন যে, তাঁরা কোনোমতেই পাকিস্তানের দাবিকে আমল দেবেন না তাহলে লীগের আন্দোলন একেবারেই থেমে যাবে কারণ মুসলিম লীগের নেতৃত্ব কোনো প্রকারের প্রকাশ্য আন্দোলন করবার বা কোনো প্রকার প্রকৃত সংকট সৃষ্টি করবার একেবারেই অনুপযুক্ত, তারা শুধুমাত্র দু-একটা শহরে সাময়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করতে পারে। গান্ধীজীর ও জওহরলালের এই ধারণা যে কত ভ্রান্ত ওয়েভেল তা তাঁদের বারবার বোঝাবার চেষ্টা করেও পারলেন না। ওয়েভেল বারবার গ্রুপ-গঠনের প্রস্তাবটি মেনে নেবার জন্য অনুরোধ করায় গান্ধীজী ও জওহরলালের কাছে যেন প্রতিজ্ঞা হোলো যে ওয়েভেল মুসলিম লীগের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করছেন এবং এমন কি তিনিই হয়তো মুসলিম লীগকে গ্রুপ-গঠনের দাবিতে অটল থাকতে উস্কানি দিচ্ছেন।

এই সাক্ষাৎকারে ওয়েভেল বলেছিলেন যে, আইনবিদের ব্যাখ্যা দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে না; বাস্তবকে

মেনে নিতে হবে এবং সেটা হচ্ছে এই যে, কংগ্রেস ও লীগের একটি সুস্থ মীমাংসা না হলে ভারতে রক্তবন্যা বইবে। ওয়েভেলের দিন-পঞ্জী। 'ওয়েভেল : দি ভাইসরয়েজ জার্নাল'-এর সম্পাদক পেন্ডেরেল মুন লিখেছেন, ওয়েভেল বহুবার বলেছিলেন যে তাঁর কথা শুনে গান্ধীজী নাকি সজোরে টেবিল চাপড়ে বলেছিলেন : 'ভারতের যদি রক্তস্নানের প্রয়োজন থাকে তাহলে তাই হবে।' (ইফ ইণ্ডিয়া নিডস্ এ ব্লাড বাথ্ দেন শী শ্যাল হ্যাভ ইট।)

এই সাক্ষাৎকার থেকে ফিরে এসেই পরের দিন গান্ধীজী ওয়েভেলকে একটি চিঠি দেন, সেটিকে তাঁর চরমপত্র বলেও মনে করা যেতে পারে।

প্রিয় বন্ধু, ২৮।৮।৪৬

আমি বন্ধু হিসাবে এবং গভীর চিন্তার পর এই চিঠি লিখছি।

গতকাল সন্ধ্যায় আপনি বারবার উল্লেখ করেছিলেন যে আপনি 'একজন সাধারণ মানুষ এবং সৈনিক' এবং আইনের ব্যাপার আপনি কিছু জানেন না। আমরা সকলেই সাধারণ মানুষ যদিও আমরা সকলেই সৈনিক নই এবং যদিও আমাদের কেউ কেউ আইন জানেন। আমি ধরে নিচ্ছি যে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন কোনো পন্থা খুঁজে বার করা যাতে কলকাতার ভয়াবহ ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি না ঘটে। আমাদের সম্মুখে প্রশ্ন হচ্ছে কোন পথে তা সবচেয়ে ভালোভাবে করা যাবে।

'গতকাল সন্ধ্যায় আপনার ভাষা ছিল ভীতিপ্রদর্শক। রাজার প্রতিনিধি হিসাবে আপনি শুধু সৈনিক হয়েই থাকতে পারেন না এবং আইনকে অগ্রাহ্যও করতে পারেন না। সেই আইন যা আপনারই নিজের তৈরি। আপনি ভয় দেখালেন যে পণ্ডিত নেহরু ও আমার সামনে আপনি যে মীমাংসা সূত্রটি উপস্থাপিত করলেন কংগ্রেস সেটি গ্রহণ না করলে আপনি কনস্টিটুয়েন্ট এসেম্বলি ডাকবেন না। ব্যাপার যদি সত্যিই তাই হয় তাহলে আপনি ১২ই আগস্ট যে ঘোষণাটি করেছিলেন সেটি আপনার করা উচিত হয়নি। (এই ঘোষণায় ওয়েভেল কংগ্রেসকে তাঁর শাসন-পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণ করবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন লেখক।) কিন্তু ঘোষণাটি যখন করা হয়ে গেছে তখন সেটিকে আপনি প্রত্যাহার করুন এবং আপনার পূর্ণ বিশ্বাসভাজন অন্য একটি মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করুন। অন্তর্ভবতীকালীন শান্তি : শৃঙ্খলার জন্য যদি ব্রিটিশ অস্ত্র এখনও রক্ষা করা হয় তাহলে আপনার অন্তর্বর্তী সরকার একটি প্রহসনে পরিণত হবে। ব্রিটিশ অস্ত্রের সাহায্য নিয়ে ভারতের বিবাদমান পক্ষগুলির উপর নিজের অভিমত চাপিয়ে দেওয়া কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব হবে না। সম্প্রতি বাংলায় যে পাশবিক প্রদর্শনী দেখা গেছে তার জন্য এটা আশা করা উচিত নয় যে কংগ্রেস নিজেকে অবনমিত করে সেই পথ গ্রহণ করবে যাকে সে ভ্রান্ত বলে বিবেচনা করে। এই ধরনের আত্মসমর্পণ ঐ বীভৎসতার উৎসাহবর্ধক হবে এবং তার পুনরাবৃত্তি ঘটাবে। উভয়পক্ষের প্রতিশোধ-মূলক মনোবৃত্তি আরও গভীর হয়ে সেই সুযোগের জন্য অপেক্ষা করবে যখন সে অধিকতর ভয়াল ও লজ্জাকর রূপে নিজেকে প্রকাশ করতে পারবে। শক্তিশালী এবং শস্ত্র-গর্বিত বিদেশী শক্তির ভারতে কায়েমী অবস্থানই এর প্রধান কারণ।

'আমি একথা হিন্দু হিসাবে বলছি না বা মুসলমান হিসাবেও বলছি না। আমি শুধুমাত্র একজন ভারতীয় হিসাবে এই চিঠি লিখছি। আমি যতদূর জানি, কংগ্রেস আপনি অথবা অন্য কোনো ইংরেজের চেয়ে হিন্দু মানসিকতা এবং মুসলমান মানসিকতা উভয়কেই ভালো জানার দাবি রাখেন। সেই হেতু আপনি যদি কংগ্রেস গভর্নমেন্টকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে না পারেন তাহলে আপনার সিদ্ধান্ত পুনর্বিচার করে দেখা উচিত, যেমনভাবে আমি ইঙ্গিত করলাম।

দয়া করে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার কাছে আমার সমস্ত চিঠিটাই পাঠিয়ে দেবেন।' (ইংরেজির অনুবাদ)

গান্ধীজী ও ওয়েভেলের প্রথম সাক্ষাৎকার থেকেই একজন অপরকে সুনজরে দেখতে পারেন নি। ৪৫-এর ১৫ই ডিসেম্বর দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারে ওয়েভেল যখন বললেন যে স্বাধীনতা লাভের জন্য হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একটা ঐক্য মতের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি তখন গান্ধীজী বললেন যে তিনি একটি মীমাংসার জন্য, বরাবর চেষ্টা করেছেন কিন্তু ব্রিটিশের 'ডিভাইড এন্ড রুল' নীতির দরুন সফল হতে পারেন নি। জবাবে ওয়েভেল বলেছিলেন : 'দিস ইজ ননসেন্স। আমরা দুই সম্প্রদায়ের মিলনের জন্য যথা শক্তি চেষ্টা করেছি, কিন্তু ১৯৩৭-৩৯-এ কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীর নানান কাজে সাম্প্রদায়িক মনোভাব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মুসলমানরা ভাবতে আরম্ভ করেছে যে কংগ্রেসের কাছে তারা সুবিচার পাবে না এবং সেই জন্যই মুসলিম লীগের অভ্যুত্থান এবং পাকিস্তানের দাবির জোরদার হয়েছে।' যখন ওয়েভেল বললেন যে স্বাধীনতা লাভের পর ভারতকে দেশরক্ষা ও বাণিজ্যিক উন্নতির জন্য ব্রিটেনের সহযোগিতা কামনা করতে হবে তখন গান্ধীজী বললেন, ভারত তার বাণিজ্যিক উন্নতি নিজের পথেই করবে এবং দেশরক্ষার জন্য সে অহিংসার আত্মিক শক্তি প্রয়োগ করবে—সেই শক্তি একদিন সারা পৃথিবী জয় করবে এবং বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে। জবাবে ওয়েভেল বলেছিলেন : 'আপনার জীবদ্দশায় বা আমার জীবদ্দশায় এই সাধু উদ্দেশ্য সফল হয়েছে বলে দেখতে পাওয়া যাবে না।'

এই প্রসঙ্গে গান্ধী ও কংগ্রেস নেতৃত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। গান্ধীজী নিঃসন্দেহে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধানতম সেনাপতি ছিলেন এবং তাঁরই পরিচালনায় দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম আগাগোড়া এগিয়ে চলেছে। তবুও কতগুলো কথা বলে রাখা প্রয়োজন।

এ ছাড়াও, বলে রাখি, আমি গান্ধীজীর স্নেহের যোগ্য ছিলাম না, কিন্তু তবুও উনি আমার বাল্যকাল থেকেই আমাকে সবিশেষ স্নেহ করতেন। ১৯৩৫-এর জানুয়ারিতে যখন তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করতে যাই, তখন আমার ন' বছর পূর্ণ হয় নি। কিন্তু সেই বালক অবস্থায় আমার সেদিন আমার করণীয় সম্বন্ধে গান্ধীজী যা বলেছিলেন আমি আজও তা ভুলিনি। ১৯৪৪-এ বন্দী জীবন থেকে মুক্তি পাবার পর তাঁর অনশন-ভগ্ন শরীরে নানা জরুরী কাজ থাকা সত্ত্বেও আমার এক ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমাকে উপদেশ দিয়ে ১৬-১০-৪৪ তারিখে স্বহস্তে চিঠি লিখেছিলেন : 'প্রিয় বিমলানন্দ আমি তোমার বাবাকে ভালো করে চিনতাম। আমার মনে হয় তোমার উচিত পরীক্ষায় পাশ করা এবং তোমার মাকে দেওয়া অঙ্গীকার পূর্ণ করা। ব্রহ্মচর্যের চিন্তা করবার যথেষ্ট সময় পাবে। অনেক যুবক তাদের পবিত্র সংকল্প পূর্ণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। কেউ তোমাকে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করাতে পারে না।' তোমার আন্তরিক : ম, ক, গান্ধী।'

আসল ইংরেজি চিঠির প্রতিলিপি এই সঙ্গে দেওয়া হোলো।

আরও দু-একবার তাঁর কাছে কোনো অনুরোধ করলে তিনি আমার অনুরোধ রক্ষার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নি।

কিন্তু আমাকে সত্য প্রকাশ করতে হবে এবং সত্যের মাহাত্ম্য গান্ধীর চেয়ে বা পৃথিবীর মহত্তম মানুষের চেয়েও বড়।

গান্ধী-যুগ কংগ্রেসে একটা বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। গান্ধী-যুগের আগে নেতারা আন্দোলন ইত্যাদি করতেন বটে, কিন্তু দেশের শাসন-ভার ইংরেজের হাত থেকে আমরা নিজেদের হাতে নিয়ে নেব এই কথাটি অত পরিষ্কার করে কেউ বলতেন না। ১৯২৪-এর ৬ই নভেম্বর গান্ধীজী যখন চিত্তরঞ্জন দাস ও মতিলাল নেহরুর সঙ্গে চুক্তি করলেন এবং কাউন্সিল-প্রবেশ সমর্থন করলেন তখন কংগ্রেসের লোকেদের নিকট উদ্দেশ্যটা আরও পরিষ্কার হয়ে গেল যে স্বরাজ মানে ইংরেজের নিকট হতে ক্ষমতা-দখল। স্বাধীনতা আন্দোলন মানে হোলো ক্ষমতা-দখলের আন্দোলন। স্বভাবতই রাজনীতিকদের মনে ধারণা জন্মে গেলো যে অদূর বা দূর ভবিষ্যতে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানই ক্ষমতার আসনে বসবে। এবং কাউন্সিল-এসেম্বলি ইত্যাদিতে কংগ্রেসের লোকেরাই বেশির ভাগ আসন দখল করবে। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান যাদের মনোনয়ন দেবে তারাই এই সকল আসন দখল করতে পারবে। অতএব যেন-তেন প্রকারেণ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে

ক্ষমতা দখল করে বাখার একটা অন্ধ প্রতি-যোগিতা প্রথম থেকেই আরম্ভ হয়ে যায় এবং যেমন বহু রাজনীতিক কর্মী তেমনি বহু রাজনীতিক নেতাও এই ক্ষমতা-দখলের আবর্তে জড়িয়ে পড়েন।

গায়ের জোরে কংগ্রেস অফিস দখলের প্রথাটি বাংলায় চিত্তরঞ্জনের আমল থেকেই আরম্ভ হয়। ১৯২৪-এর ৫ই নভেম্বরের গান্ধী-দাশ-নেহরু চুক্তির প্রতিবাদে বেঙ্গল নন-কো-অপারেশন লীগের নেতা শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ স্বর্গত মাখনলাল সেন ও শীক্ষিতীশ-চন্দ্র দাশগুপ্ত প্রকাশ্য লিখিত বিবৃতিতে এই গায়ের জোরে কংগ্রেস অফিস দখলের প্রতি দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে-ছিলেন। (১৯২৪—১৭ই ও ২০শে নভে-ম্বরের দি বেঙ্গলী দেখুন) ১৯২৪-এর জুলাই মাসে বিলাতের হাউস অফ লর্ডসে ভারত-সচিব শ্রমিক দলের লর্ড অলিভিয়ার অভিযোগ করেছিলেন যে চিত্তরঞ্জন দাশ কাউন্সিলের ভোটে জিতবার জন্যে কাউ-ন্সিলের অনেক সদস্যকে ভয় দেখিয়ে ভোট আদায় করতেন অথবা টাকা দিয়ে কারু কারু ভোট কিনতেন। সে অভিযোগ মিথ্যা ছিল না।

ব্যারিস্টার যোগেশ চৌধুরী ১৯২৫-এর ২৩শে এপ্রিল দি বেঙ্গলীতে বিবৃতি দিয়ে বলেছিলেন : 'চিত্তরঞ্জন দাশ ও তাঁর পার্শ্বচরেরা যে দুর্নীতির মন্দির প্রতিষ্ঠা করে গেলেন তাতে স্বরাজ সংগ্রামের গতি ব্যাহত হবে।'

সারা ভারতের বাৎসরিক কংগ্রেসে যে ডেলিগেট পাঠানো হোতো তাতে অধি-কাংশ ক্ষেত্রেই ভোটের জালিয়াতি করা হোতো। আমি অমৃত পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে আগে দেখিয়েছি (৫ই আগস্ট ১৯৭৭) ১৯২৮-এর কলকাতা কংগ্রেসে গান্ধীজী বলেছিলেন : এই কংগ্রেসে ডেলিগেট নির্বাচন পদ্ধতিটি সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েছিল। ডেলিগেটরা সকলেই ছিলেন স্ব-নির্বাচিত। এক টাকার ডেলিগেট টিকিট পনেরো টাকায় বিক্রি করা হয়েছিল।'

১৯৩৯, ২৮শে জানুয়ারীর 'হরিজনে' গান্ধীজী লিখছেন : 'কংগ্রেস সভাদের মধ্যে দুর্নীতির অভিযোগ সামলাতেই আমার এবং আমার সহকর্মীদের বেশির ভাগ সময় চলে যায়। বোম্বাইয়ের একজন কংগ্রেস সভ্যের নিকট থেকে এই ধরনের সাম্প্রতিক চিঠি পেয়েছি আছে : গত রবিবার বোম্বাইতে ত্রিপুরী কংগ্রেসের ডেলিগেট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোলো। সকাল আটটায় ভোট আরম্ভ হবার কথা ছিল। আমি কংগ্রেস হাউসে পৌঁছালাম সকাল প্রায় ৮-৪৫-এ কিন্তু সন্তস্ত হয়ে গেলাম এই দেখে যে মাত্র ৪৫ মিনিটের মধ্যে আমার হয়ে গেল ভোট দেওয়া হয়ে গেছে। অসংখ্য অন্যও অনেক সভ্যের একই অভিজ্ঞতা হয়ে-ছিল। আমি এর উৎসটি খুঁজে বার করবার চেষ্টা করতে লাগলাম, এবং যেমন আশাই

Sevagram
16-10-44

Dear Bernard Shaw,

I knew your father well. I think you did redeem your promise to my mother & pass your exam. But to-day Sharija has ample time for reflection. Many young men have failed in their aims & resolves. No one can compel you to act against your will

Yours sincerely

লেখককে গান্ধীজীর চিঠি

করেছিলাম) দুষ্কৃতকারীকে খুঁজে বার করতে পারি নি, কিন্তু আমি জানতে পারলাম যে ভোট আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে এই ভোট জালিয়াতির ব্যাপারটি সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত হয়েছিল এবং ব্যাপক হারে প্রযুক্ত হয়েছিল। স্বভাবতই যাঁরা আধ ঘন্টা পরে এসেছিলেন তাঁরা সবলেই হতাশ হয়ে যান এই দেখে যে তাঁদের প্রত্যেকের হয়ে জাল, ভোট দেওয়া হয়ে গেছে।'

'এই লেখকের চিঠিটি উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র বোম্বাইতে কংগ্রেস নির্বাচন , জাল ভোটের ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা নয়। চিঠিটি একটি সংকেত মাত্র। ভোটে জালিয়াতি ছাড়াও কংগ্রেস সভ্য তালিকায় আগাগোড়া কারচুপি হয় সভ্যে মিথ্যা নাম বহু থাকে।' (ইংরেজির অনুবাদ)

এই সময়ে বোম্বাই কংগ্রেসের এক-ছত্র নায়ক ছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। এবং ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষ-চন্দ্রের সঙ্গে তাঁর একটা বোঝাপড়ার প্রয়োজন ছিল। ওদিকে ১৯২৮-এ কলকাতা কংগ্রেসের ডেলিগেট নির্বাচনে যখন কার-চুপি হয়েছিল বলে স্বয়ং গান্ধীজী প্রকাশ্যে অভিযোগ করেছিলেন তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন সুভাষ-চন্দ্র বসু।

১৯৩৯-এর ৭ই ফেব্রুয়ারীর 'হরিজনে' গান্ধীজী আবার লিখলেন : 'হরিজনে আমার বিভিন্ন লেখা প্রমাণ করেছে যে কংগ্রেস দ্রুত একটি দুর্নীতিপূর্ণ সংগঠনে পরিণত হচ্ছে এই অর্থে যে এর সভ্য তালিকায় অত্যন্ত বেশি সংখ্যক ভুয়া সদস্যের নাম থাকে।' (ইংরেজির অনুবাদ)

কংগ্রেসে গান্ধী-যুগ সুরু হবার পর সাধারণের দানের টাকা নিয়ে কি রকম ছিনিমিনি খেলা হোতো সে নিয়ে গান্ধীজী প্রবর্তিত তিলক স্বরাজ ফান্ড সম্বন্ধে 'দি বেঙ্গলী' লিখেছিল : 'ইয়ং ইন্ডিয়ার' বর্তমান সংখ্যায় তিলক স্বরাজ ফান্ডের পরিচালনা সম্পর্কে মিঃ গান্ধীর মন্তব্য আমাদের এই ধারণায় প্রলোচিত করেছেন যে 'হিমালয় সদৃশ ভ্রান্তির' গান্ধী বিলুপ্ত হয়েছেন এবং তার বদলে স্থান নিয়েছেন এক উৎসাহব্যঞ্জক ভ্রান্তিহীনতার গান্ধী। 'তিলক স্বরাজ ফান্ডের' কাহিনী কে না জানে? বাস্তবায় আসলে পাঁচ ছ' লক্ষ টাকা তোলা হয়েছিল যদিও ঘোষণা করা হয়েছিল যে পঁচিশ লক্ষ টাকা তোলা হয়েছে। এই বিপুল অংকের নগদ টাকা কিভাবে যে উবে গেল সেইটাই একটি রহস্য। ১৯২১-এ আসাম বেঙ্গল রেল ধর্মঘটের খরচের জন্য ফান্ড থেকে প্রথম বড় অংকের টাকা খরচ করা হয়েছিল। যে সব টাকা আদায় দেওয়া হয়েছিল সেগুলি হিসাবের তালিকায় মোট অংকে দেখানো হয়েছিল খরচের খুচরো হিসাব তাতে ছিল না। বাংলার জনসাধারণের দানের এই টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলার ফলে অচিরেই ফান্ড নিঃশেষ হয়ে যায় এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে অবশ্য দেয় কোটা দেওয়া যায় নি। অন্যান্য প্রদেশগুলির কৃপা ভাজনে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় অংশ গ্রহণের অধিকার হতে বঞ্চিত হওয়া থেকে বাঁচিয়েছিল। ঘটনাবলীর এই নিতান্ত আপত্তিজনক অবস্থার জন্য মিঃ গান্ধী যদি দুঃখিত না হন তাহলে আমাদের বলে নিতে হবে যে পুরাতন গান্ধী ভ্রান্তি স্বীকার ভীত এক মর্যাদাবন্ধ আমলায় পরিণত হয়েছেন।' (২৭।২।২৭—ইংরেজির অনুবাদ)

এ সম্বন্ধে ৪।১।২৭ তারিখে স্টেটস-ম্যান লিখেছিল : 'কেশরী' পত্রিকায় জনৈক লেখক তিলক স্বরাজ ফান্ডের প্রথম তিন বছরের হিসাব নিয়ে আলোচনা করেছেন। তার থেকে দেখা যাবে যে, ১৯২৩-এর শেষ পর্যন্ত বিশেষ কার্যক্রমের ফান্ডের (স্পেসিফিক পারপাসেস্ ফান্ড) পরিমাণ ছিল ৫৩,৮৮,৫৮৩ টাকা, কিন্তু অডিটর মন্তব্য করেছেন যে বিশেষ বিশেষ কার্য-ক্রমের আর্থিক অবস্থা এবং অগ্রগতি সম্বন্ধে কোনো সংবাদ তাঁর পক্ষে সর্বশেষ রিপোর্টে দেওয়া যায় নি। এছাড়া ১৯২৩ পর্যন্ত জেনারেল ফান্ডে ৭১ লক্ষ টাকা আদায় হয়েছিল। সেই মোট অংক থেকে ১৯½ লক্ষ টাকা জাতীয় শিক্ষার জন্য বরাদ্দ হয়েছিল, ১১ লক্ষ টাকা জাতীয় কর্মীদের 'এডভান্স হিসাবে' দেওয়া হয়েছিল, তিন লক্ষ টাকা 'পারিশ্রমিক' হিসাবে খরচ হয়ে-ছিল এবং ২৬ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল খাদ্যের জন্য। শেষের এই বিষয়টির সম্বন্ধে অডিটর মন্তব্য করেছেন যে, বিভিন্ন স্থানীয় খাদি বোর্ডকে আগাম দেওয়া টাকার একটা বিরাট অংশ 'প্রদর্শিত সম্পত্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় নি।' (টাস্ট নট্ রিপ্রেজেন্টেড বাই এভেলেবল এসেটস)। ১৯২১-এ ঘোষণা করা হয়েছিল যে বাংলা ফান্ডে তিরিশ লক্ষ টাকা তুলে দিয়েছে কিন্তু পুনর্বিবেচনায় তিরিশ লক্ষ লক্ষ কমে গিয়ে তিন লক্ষে দাঁড়িয়েছিল।' (ইংরেজির অনুবাদ)

ওদিকে ২৪।২।২৭-এর 'ইয়ং ইন্ডিয়াতে' গান্ধীজী লিখেছিলেন : 'তিলক স্বরাজ ফান্ডের পরিচালনায় এমন কোনো আর্থিক ক্ষতি হয় নি যা খুব সতর্ক ব্যবসায়ীর পক্ষে যা হয় তার চেয়ে বেশি। সামান্য যা ক্ষতি হয়েছে তা অবহেলাপ্রসূত নয় বরং খুব সতর্ক পর্যালোচনা ও হিসাব-পরীক্ষা সত্ত্বেও তা হয়েছে। আমি এমন কোনো প্রতিষ্ঠানের কথা জানি না যাতে কোনো অসাধু প্রতিনিধি নেই। কংগ্রেসও এই ব্যাপারে ব্যতিক্রম নয়। এই ফান্ড সুরু করেছিলাম বলে আমার বিন্দুমাত্র অনু-শোচনা নেই এবং এর ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধেও আমার বিবেক সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার। ফান্ড একটি বিরাট জাতীয় ভিভিটাকে পূর্ণ করেছে। যে বিরাট সংগঠন অকস্মাৎ সৃষ্টি হয়েছিল তা হতে পারতো না যদি এই বিরাট জাতীয় ক্ষোভ সৃষ্টি না হোতো যে কোষে ধনী-নির্ধন উভয়েই প্রচুর অনুদান দিয়েছিল।' (ইংরেজির অনুবাদ)

অসহযোগের যুগ থেকেই কংগ্রেসে দুর্নীতির যে দুষ্ট ক্ষত দেখা দিয়েছিল তার বিরুদ্ধে সতর্ক হতে নেতাদের ডাক দিয়েছিলেন, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। সেই সূত্রে গান্ধীজী, মতিলাল নেহরু এবং চিত্তরঞ্জনের সঙ্গেও তাঁর বিরোধ হয়। তিনি বলেছিলেন, এই সব দুর্নীতির বন্ধ-পথ এখন থেকে বন্ধ না করলে কালে এর বিপুল বন্যা দেশকে ভাসিয়ে দেবে এবং তখন একে রোধ করবার কোনো উপায় থাকবে না। চিত্তরঞ্জন তাঁকে বলেছিলেন : 'শুধু সাধু লোক নিয়ে রাজনীতি করা যায় না—দুষ্ট লোকেরও প্রয়োজন থাকে।' জবাবে বীরেন্দ্র-নাথ বলেছিলেন : 'আপনি নীলকণ্ঠ—এই বিষ কণ্ঠে ধারণ করবার ক্ষমতা রাখেন। কিন্তু আপনার অবর্তমানে সারা দেশ এই বিষে জর্জরিত হবে তখন কিছু করবার উপায় থাকবে না।' (এর কোনো ছাপানো প্রমাণ নেই—কিন্তু আমি নিজে বীরেন্দ্র-নাথের নিজের হাতের লেখায় এর উল্লেখ দেখেছি।)

কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন বলেও বীরেন্দ্রনাথ শাসমল সকল সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীর কাছে ও সাধারণভাবে বাঙালীর কাছে বিরাগ ভাজন হয়ে পড়েন। কিন্তু সারা ভারতের নেতা ও কর্মীরা সেই জন্যই তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। সরোজিনী নাইডু তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলিতে বলেছিলেন : 'দেশপ্রাণ শাসমলের ঋজু ও অকুতোভয় অন্তঃকরণ অসত্যের সঙ্গে আপোষ করতে ঘৃণা করতো। তিনি কলুষ স্পর্শহীন হয়ে চিরদিন দাঁড়িয়েছিলেন সেই আদর্শটির জন্য যা তিনি ভালবাসতেন ও অনুসরণ করতেন—ভারতবাসীর স্বাধীনতা।' তাঁর মৃত্যুর পর লন্ডন থেকে ইন্ডিয়া লীগের নেতা ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্য লেনার্ড ম্যাটার তাঁর শোক-বার্তায় বলেছিলেন : 'মিঃ শাসমলের চরিত্রের সত্যতা দিতার জন্য সরকারী কর্মচারী ও পুলিশ অফিসাররাও তাঁকে শ্রদ্ধা করতো।' অসত্যের সঙ্গে কখনও আপোস করেন নি বলেই বীরেন্দ্র-নাথ বলেছিলেন : 'আমি যে শিব জীবন কাহারও নিকট নত করি নাই, মরণের পরেও তাহা যেন অবনত না করা হয়। আমাকে যেন ঊর্ধ্বশিরে দাহ করা হয়।'

কিন্তু দুঃখের বিষয়, গান্ধীজী 'হরিজনে' দু'-এক কলম লেখা ছাড়া কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি শোধন করবার কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা করতে পারেন নি। সেই কারণে কংগ্রেসের এই আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দিনের পর বেড়েই গেছে। এমন কি নিজের প্রিয়পাত্র ক্ষমতার আসনে বসাবার জন্য গান্ধী দুর্নীতি এবং অসত্যের সঙ্গে আপোস করতেও পশ্চাৎপদ হলেন না। ১৯৩৮-এ কলকাতা করপোরেশনের মেয়র নির্বাচন ব্যাপারে তিনি এই ধরনের দুর্বলতা দেখিয়ে-

ছিলেন। করপোরেশনের কংগ্রেস দলের সংখ্যাধিক সদস্য ফজলুল হককে মেয়র করতে চাইলেন—সংখ্যালঘু সদস্যরা সরকার মনোনীত সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে চাইলেন নলিনী সরকারকে। কংগ্রেসী কাউন্সিলরা সরকার মনোনীত কাউন্সিলরদের সঙ্গে যোগ দিলে সেটা কংগ্রেসের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছু ছিল না। সংখ্যাধিক কাউন্সিলরদের নেতা হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রনাথ শাসমল গান্ধীজীকে আহ্বান করলেন তিনি যেন কলকাতা করপোরেশনের কিছু সংখ্যক কংগ্রেসী কাউন্সিলরদের কংগ্রেসের প্রতি এই বিশ্বাসঘাতকতার নিন্দা করেন। কিন্তু নলিনী সরকার গান্ধীজীর প্রিয়পাত্র। টাকার ক্ষমতা অসীম—নলিনী সরকার বাংলার গভর্নর স্যার জন এণ্ডারসনের প্রিয়পাত্র আবার স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীরও প্রিয়পাত্র। রবীন্দ্রনাথ সেদিন তারযোগে গান্ধীজীকে জানিয়েছিলেন : 'গান্ধী-আদর্শে বিশ্বাসীরা আপনার নিকট চাটুকারিতা বা নালিশ করবে না। ভগবানের দোহাই, গোপন ধ্বাধ্বনির ঊর্ধ্বে উঠুন। কংগ্রেসীরা যদি অকংগ্রেসীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যায় বা কংগ্রেসীরা কংগ্রেসের হিন্দু-মুসলমান মিলনের আদর্শে পদাঘাত করে তাহলে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করা নেতার কর্তব্য। অস্বীকৃতি বা উদাসীনতার অর্থ হবে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া। বাংলা হয়ত কখনও ক্ষমা করবে না।' রবীন্দ্রনাথের অনুরোধের জবাবে গান্ধীজী জানিয়েছিলেন : 'অপর দল (অর্থাৎ নলিনীবাবুর দল-লেখক) অনুরোধ না করলে আমি হস্তক্ষেপ করতে সাহস করি না।' (ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট—৩০।৬।৩৪, ইংরেজির অনুবাদ)

কিন্তু ব্যাপারটি এতখানি ক্ষোভের হল যে স্বয়ং জওহরলাল নেহরু '৩৬-এর আগস্ট তারিখে একটি চিঠি লিখলেন গান্ধীজীকে। তিনি লিখেছিলেন : 'এই সেই নলিনী সরকার, আমরা যখন জেলে ছিলাম, তখন যিনি ভারত সরকারের হোম মেম্বার ও অন্যান্য পদস্থ কর্মচারীকে নিমন্ত্রণ করে পরিচর্যা করতেন। বাংলার কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটি নলিনী সরকারের সামাজিক উন্নতির সোপান হিসাবে কাজ করছে। শুধু একা বাংলায় নয় সর্বত্রই এই ধরনের লোকের হাতেই কংগ্রেসের কর্তৃত্ব চলে গেছে। কংগ্রেস অতি দ্রুত কলকাতা করপোরেশনের মত একটি লজ্জাকর রঙ্গমঞ্চের পরিবর্ধিত সংস্করণে পরিণত হচ্ছে।

যাঁরা নানা ঝঞ্ঝা-আবর্তের মধ্যেও জাতীয় পতাকা তুলে ধরে রেখেছিলেন তাঁদের অনেককেই আজ কংগ্রেসের মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। যাঁরা নিজের হাতে জাতীয় পতাকা টেনে নামিয়েছিলেন তাঁরাই এখন কংগ্রেস মন্দিরের প্রধান পুরোহিত। কংগ্রেসের আদর্শবাদ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এর উপর থেকে নিচ পর্যন্ত শুধু দলবাজি।' (দ্য বাঞ্চ অফ ওল্ড লেটার্স' থেকে ইংরেজির অনুবাদ)

কেউ কেউ বলেন জওহরলালের এই চিঠি পাবার পরই গান্ধীজী কংগ্রেসের সদস্যপদ ত্যাগ করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন —গান্ধীজী নিজে অবশ্য তা অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু এই চিঠি যে ১৯৩৪-এর অক্টোবরে গান্ধীজীকে কংগ্রেসের সদস্যপদ-ত্যাগে অনেকটা প্রভাবিত করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। কংগ্রেস ছেড়ে দিলে গান্ধীজী কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দুর্নীতির সঙ্গে মোকাবিলার দায়িত্ব থেকে রেহাই পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু সেইসব দুর্নীতির প্রতিবিধান আর করা যায় নি।

(চলবে)

দাঁতের ডাক্তাররা বলেন :

নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করুন
আর মাড়ি মালিশ করুন,
তাহলে মাড়ির গোলমাল আর দাঁতের
ক্ষয় রোধ করতে পারবেন।

যাঁরা ফরহ্যান্স ব্যবহার করেন, স্বেচ্ছায় জানাচ্ছেন

"... আমার দাঁতে কোনো গোলযোগ নেই..."
"... ফরহ্যান্স টুথপেষ্ট ব্যবহার করতে শুরু করে অবধি আমার দাঁতে কোনো গোলযোগ বা দাঁতের ক্ষয় হয়নি...
আপনাদের ফরহ্যান্স টুথপেষ্ট আর ফরহ্যান্স ডবল-অ্যাকশন টুথব্রাশের জন্যে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো..."
(স্বাঃ) পি. রাজেশ কামাথ, আন্ধেরী, বম্বে

(এগুলির এবং এই ধরণের আরো চিঠির ফোটোস্ট্যাট কপি কেন্দ্রিয় সরকারের প্রধান কোন অফিসে দেখতে পাবেন।)

উজ্জ্বল করলা রঙের প্যাকে

Forhan's
FOR THE GUMS
BRUSH YOUR TEETH WITH IT

"প্রায় দশ বছর আগে আমার মাড়িতে গোলযোগ ছিল..."
"প্রায় দশ বছর আগে আমার মাড়িতে গোলযোগ ছিল, আর তখনই আমি টুথপেষ্ট বদলে ফরহ্যান্স ব্যবহার করতে শুরু করি...এখন আমি মজবুত আর সুস্থ দাঁতের এক গর্বিত অধিকারী।
এই অপূর্ব কোয়ালিটির টুথপেষ্ট তৈরীর জন্যে আপনাদের অভিনন্দন জানাই।"
(স্বাঃ) বি. এস. জয়ন্তী, মৌলালী, হায়দ্রাবাদ

দাঁতের সঠিক যত্নের জন্যে রোজ রাত্রে আর সকালে সঠিকভাবে দাঁত ব্রাশ আর মাড়ি মালিশ করুন ফরহ্যান্স দিয়ে।
আর, মাড়ি মালিশ করার সঙ্গে সঙ্গে দাঁত পরিষ্কার করার জন্যে বিশেষভাবে ডিজাইন করা ফরহ্যান্স ডবল-অ্যাকশন টুথব্রাশই ব্যবহার করুন।

মাড়ি খারাপ তো স্বাস্থ্যও খারাপ

বিনামূল্যে! "দাঁত আর মাড়ির যত্ন" সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ বুকলেট। অনুগ্রহ করে ২০ পয়সার ডাকটিকিট সমেত এই ঠিকানায় লিখুন :
ফরহ্যান্স ডেন্টাল এডভাইসারী ব্যুরো,
পোষ্ট ব্যাগ নং ১১৪৬৩, ডিপো: নং T 129-179
বম্বে ৪০০ ০২০।
যে ভাষায় চান জানাবেন

ফরহ্যান্স দাঁতের ডাক্তারের তৈরী টুথপেষ্ট

FFDF-162 BEN

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

হাওয়া গাড়ি

।। একত্রিশ ।।

কালু ঘোষ দু'বার বললো, 'অত জোরে গাড়ি চালিও না। দিলীপ শুনেও শুনলো না। জিরাতপুল পেরোতে না পেরোতেই বাবুলাল বললো, ব্রেক কষো দিলীপদা। আমার ভীষণ পাইখানা পেয়েছে।

দিলীপ ঝাঁকুনী দিয়ে গাড়ি থামালো। সঙ্গে সঙ্গে বাকু আর বাবুলাল নেমে পড়লো।

তুই কোথায় যাচ্ছিস বাকু?

আমারও পেয়েছে। তুমিও নাবো। গাড়িটা এই দেওয়ালের গায়ে রাখো। এখানে কেউ হাত দেবে না।

কোথায় যাবো?

এসো না। ওই তো বড় খাটাল।

দিলীপ বেঁকে দাঁড়ালো। ওসব নোংরা জায়গায় আমি যাবো না। আর এই অন্ধকারে—

বাবুলাল ততক্ষণে আদিগঙ্গা পেরিয়ে চিড়িয়াখানার দেওয়াল ধরে শুকনো পাঁক-মাটির ওপর দিয়ে হাঁটছিলো। সেখান থেকেই চেঁচিয়ে বললো, চলে এসো দিলীপদা। গঙ্গার হাওয়া খেতে খেতে অনেক জমে যাবে। সামনেই নিওন আলো পাবে।

তোর না পাইখানা পেয়েছিলো একটু আগে?

ওকথা না বললে তুমি গাড়ি থামাতে! চলে এসো।

জায়গাটা একদম পৃথিবীর বাইরে। আদিগঙ্গার গায়ে ভাঙা অ্যাসবেসটসের ঝুড়পাড়ি। দেওয়াল বলতে বাতিল টি চেস্টের কাঠ। ছাদ্যা দেবার জন্যে ডালপালা ছড়ানো একটা গাছও আছে। আর আছে পোর্ট কমিশনারের একটা শেড। একদম আদি-গঙ্গার গায়ে। সেখানে বোধহয় এক সময় নৌকো ভিড়তো। তাই একটা ভাঙা ঘাট। হেঁটে গিয়ে জোয়ারের জলে ডুবে ছিলো। সেদিক থেকেই একপাল শুয়োর উঠে এলো। জিরাতপুলের গায়ে লটকানো সিগারেটের বিজ্ঞাপন—নিওন আলোয় সবুজ হচ্ছিলো। লাল হচ্ছিলো।

এই তোদের বড় খাটাল?
চলে এসো।

আবেকটু এগিয়ে দিলীপ অবাক হয়ে গেলো। কলকাতা শহরের বুকে চুব চুব মাতাল হবার জন্য অনুপান সমেত এমন এক্স-ক্লুসিভ জয়েন্ট বোধহয় আর নেই। জনা তিরিশেক নানা বয়সের লোক শুয়ে বসে গড়াগড়ি। খাচ্ছিল। তাদের পাশেই আদিগঙ্গা থেকে কেটে আনা নালায় গোটা দশ ব্যাবো মোষ পাঁক মাটিতে মাখামাখি। সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ না করেই যে-যার মত ছোটো বড় বোতল নিয়ে বসেছে। মেটে সানকির মত বড় প্লেটে ধোঁয়া ওড়া সেই বিখ্যাত চাব পিসের ঝোল। এক বুড়ো ঝুপড়ি থেকে সেই মাংস বয়ে বয়ে আনছে। আর এক বাচ্চা ছেলে ঘরের ভেতর থেকেই ছোটো বড় বোতলগুলো নিয়ে আসছিলো।

বাকুকে দেখে সবাই হাত তুলে সুস্বাগতম জানালো। আলো ঝলছে বিজ্ঞাপনটার আলো। আধগাটা একবার একদম লাল হয়ে যাচ্ছে। আবার সবুজ হয়ে যাচ্ছে। হাত তুলে আনন্দ জানানোর লোকগুলো বিজ্ঞাপনের লাল সবুজ আলোয় একবার সাধু একবার পাপীর চেহারা পাচ্ছিলো। তার ভেতরেই বাকু নুয়ে পড়ে সেভাবে দিলীপকে খাতির জানালো—তাতে দিলীপ পকেট থেকে টাকা বের করে দিতে বাধ্য হোল।

জিরাতপুলের মাথায় নিওনের বিজ্ঞাপনটা এখানে ঘন ঘন অমাবস্যা পূর্ণিমা করে দিচ্ছিলো। তাঙা অ্যাসবেসটসের টুকরো দিয়ে বানানো ছাদ—দেওয়াল বলতে টি চেস্টের কুড়িয়ে আনা পচা কাঠ। সেই ঝুপরির ভেতর থেকে কানহার মা বসো একজন বেরিয়ে এলো। বেরিয়ে এসেই এই বিরাট গড়াগড়িকে একদম তুচ্ছ করে চেঁচাতে লাগলো। ও কানহা। কানহারে—

তারপর যা বললো, তার অর্থ—ভইসাগুলোকে তোল। ওদের যে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় সর্দি বসে যাবে বুকে। শুয়োর-গুলোকে এবারে খেয়াড়ে ভরে দে। তারপর বাবুদের তাড়া—

তিন চুমুকে দিলীপের কান, গলা গরম হয়ে উঠেছিলো। সেই সঙ্গে কচ কচ করে তিন টুকরো শুয়োর চিবোলো। মশলা ঝোলের ভেতর মেশেনি। মুখে বাটা হলুদ আটকে যাচ্ছিলো। হঠাৎ মোষ আর শুয়োরগুলো কানহার হাতের ছাড়ির বাড়ি খেয়ে দৌড়োদৌড়ি লাগালো। গড়াগড়ি যাওয়া মানুষগুলো এদিক ওদিক ছুটকে গেল। কেউ কি আদিগঙ্গায় জোয়ারে পড়ে গেল?

জায়গাটা পৃথিবীর বাইরে। অথচ কলকাতার ভেতরে। বাবুলাল বাকুকে হেঁচড়ে টেনে এনে গাড়িতে তুললো। সিটে শুয়ে পড়ে বাকু বললো, তুমি না কাঁদবে বলেছিলে দিলীপদা—

দিলীপের হাতে পড়ে তখন অস্টিন ট্যুরার আবার টলে টলে ছুটছিলো।

কালু ঘোষ বললো, তুমি তো সবাইকে মারবে দিলীপ। এভাবে গাড়ি চালায় কেউ?

দিলীপ সেকথায় কান না দিয়ে বাবুলালকে বললো, এইতো বেশ ভালো কায়গা—

হ্যাঁ। এখানকার আকাশটা ভালো।

গাড়ি থামিয়ে যেখানটায় দিলীপ নামতে গেল—তার পাশেই নতুন হাওড়া

বিল্ডিংয়ের খাম্বা খাম্বা খুঁটি। ঢালাই সিমেন্টের একটা জমাট স্রোত আকাশের ভেতর অনেকটা উঠে ফুরিয়ে গেছে আচমকা। ওরা তিনজন হাসতে হাসতে সেই ঢালাই করা ঢেউটা বেয়ে আকাশে উঠতে লাগলো।

বাবুলাল বললো, খুব পরিষ্কার জায়গা দিলীপদা।

বাকু ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে উঠছিলো। সেও বললো, বাতাস এখানে খুব পাতলা।

দিলীপ বললো, আয় আমরা কাঁদি।

আকাশে আর খানিক এগিয়েই সে-ঢেউ হঠাৎ ঘ্যাচ করে শেষ হয়ে গেছে। উল্টোদিকে প্রিন্সেপ ঘাটের ছাদ। তাতে একটা অশথ চারা দুলছিলো। ঘাটের ওপারেই গঙ্গায় নানারকম আলোর ফুটকি। একখানা জাহাজ।

দিলীপ কাঁদতে গিয়ে দেখলো, সে কোনো একটা ব্যাপারেরও ভেতরে যেতে পারছে না। তবু গলা চিরে চেঁচিয়ে উঠলো। উল্টোদিকের গাছের অন্ধকারে কয়েকটা কাক বা পাখি ডানা ঝাপটে জায়গা পাল্টালো। দিলীপ দেখলো, সে কোন কারণেই কাঁদতে পারছে না। রবির জন্যে নয়। স্বাতীর জন্যে নয়। ভৌমিক খাদানের জন্যে নয়। রানীর জন্যেও নয়। কোনো ব্যাপারেই তার কান্না আসছে না।

বাকু কিন্তু ঢালাই ঢেউটার ওপর শুয়ে পড়ে দিব্যি কেঁদে যাচ্ছিলো। গুন গুন করে। ঘোর অনিয়মের জন্যে পেটের বা বুকের মাঝায় কান্না কি না তা বোঝা গেল না। দিব্যি চোখ খুলে কাঁদছিলো। আকাশের দিকে মুখ করে। কাছাকাছি সব মিলিটারি কোয়ার্টার।

বাবুলালকে ঝাপটে ধরলেন দিলীপ। তুই তো হাসছিস ?

ছেড়ে দাও গুরু।

মারবো এক চড়। গুরু কি রে ? কালার নাম করে আমার পয়সায় এক পাঁট গিলালি। এখন কাঁদছিস না কেন ? এই কি কথা ছিলো ?

তুমিও তো কাঁদছো না গুরু।

এইতো এখুনি কাঁদলাম।

ওকে কান্না বলে না। তুমি ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছিলে—

দিলীপের পার্সোনালিটির বেলুনটায় এইমাত্র আলপিন ফুটিয়ে দিয়েছে বাবুলাল। দিলীপ হাঁটু মুড়ে বাবুলালের পাশে শুয়ে পড়লো। জায়গাটায় পরিষ্কার বাতাস। বাকু খুব সুন্দর কাঁদছিলো।

বাবুলাল বললো, তুমি তো সত্যিকার কান্না কাঁদোনি গুরু। সত্যিকারের কান্নায় মুখ ফুলে যায়। নেশা হয়ে যায়। তখন কাঁদতে ভীষণ ভালো লাগে। থামতেই ইচ্ছে করে না।

দিলীপের মাথা দিয়ে একটা শিস উঠছিলো। চোখের উল্টোদিকে একদম আকাশ। বাকু যেভাবে কাঁদছে—তাতে নিশ্চয় এখন ওর ছোট ছেলেটা দেখা করতে এসেছে।

এমন সময় কালু ঘোষ পড়িমড়ি করে দিলীপের কানের কাছে চলে এলো। এবারে ওঠো তোমরা। সেই লোকটা আবার এসেছে। কখোন যে পিছু নিয়েছে—বুঝতেও পারিনি। সঙ্গে আরেকটা লোক এনেছে দিলীপ। ষণ্ডামত।

আসতে দাও কালুদা—

এ-কথাটা বাবুলালের কানে গেল। কার সঙ্গে কথা বলছো গুরু ?

কারও সঙ্গে না। দুটো লোক এখুনি আমাদের তাড়া করবে দেখিস।

এখানে আবার লোক কোথায় ? একটু সরো তো। তোমরা পাশে শোবো একটু।

অনেক তো শোবার জায়গা আছে। সরে শোও না।

বাবুলাল কিন্তু শোবার চান্স পেলো না। সেই বিরাট ঢালাই করা ঢেউয়ের শুরুতে দুটো ভারি ছায়া ভেসে উঠলো।

দিলীপের কানের কাছে কালু ঘোষের গলা। এখন শুয়ে থেকো না দিলীপ। উঠে পড়ো। নষ্ট করার মত সময় নেই হাতে।

জ্বালালে। বলো উঠে দাঁড়ালো দিলীপ। বাবুলাল কতক্ষণে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কে গুরু ?

দ্যাখ্ না কে ? বলে দিলীপ বাকুকে একটু লাথি কষালো। একদম পাছায়। উঠে বোস্। আর কাঁদতে হবে না।

দুটো ভারি ছায়া কাছাকাছি এসে একদম হো হো করে হেসে উঠলো। বিলকুল বেহোস।

এ হাসিতে তড়াক করে উঠে বসলো বাকু। কে তোমরা ?

হামারা কাগজ কাঁহা ?

দিলীপ বললো, কিসের কাগজ ?

চুপ বেওকুফ। বলে বিরাট এক ধমক দিলো লম্বা লোকটা। বড়ভা হোকে লড়কপনা কর রহা হ্যায় ? সরম নেহি আতা ?

বাবুলাল কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে দুজনের ভেতর দিয়ে দৌড়তে গেল। দরবারীলালের পাশেই ছিলো শুগো। সে একটা পা বাড়িয়ে দিলো। যাতে বাবুলাল ল্যাং খেয়ে শক্ত সিমেন্টের পাটাতনে গিয়ে পড়ে।

কিন্তু বাবুলাল পড়লো না। সে লাফ দিয়ে টপকে গেল। দরবারী পড়ে গেল-শুগোর সেই পায়ের ঝটকায়। এই ফাঁকে দু পাশের সরু ফাঁক দিয়ে তর তর করে ছুটে নেমে এলো দিলীপ আর বাকু। একদম ঢালু রেলিং ধরে। স্পীডের মাথায় ছুটতে ছুটতে ঘাসে এসে পড়লো। সেখানটা মোলায়েম বলে কিছুই গায়ে লাগলো না ওদের।

তখন দুই ভারি ছায়া ওদের পিছ নিয়েছে। নিচে নেমে গাড়িতে বসতেই দেখলো, একটা আম্বাসাডর চুপ করে অন্ধকারে দাঁড়ানো। কালু ঘোষ সেটা দেখতে পেলো। অনেকক্ষণ ফলো করছে আমাদের।

তারপর একটু গলা তুলে দিলীপকে বললো, যে করে হোক খিদিরপুর ব্রিজ পার হও। ওখানটায় বেশ ভিড় আছে। লোকজন থাকে দিলীপ।

দিলীপ অ্যাকসেলারেটরে একটা চাপ দিলো। খিদিরপুর ব্রিজ পেরোবার সময় মনে হোল একটা আম্বাসাডর ট্রাফিক আইল্যান্ডে এসে জোরে ব্রেক কষলো। ভাগ্যিস লাল আলো পাবার আগেই পেরিয়ে এসেছি।

রাত ন'টা সাড়ে ন'টা হবে। চেতলা বেকারির চিমনি বরাবর চায়ের দোকানটায় এখন শুধু চুনী বসে। বাকু বাজারের গেটে নেমে গেল। বাবুলাল নামলো তার বাড়ির সামনে। যাবার সময় বললো, লোক দুটোকে চেনো তুমি ?

জীবনেও দেখিনি।

কী সব বললো তোমায়। বুড়ো হয়ে বাচ্চাদের সঙ্গে মিশছো বললো।

ওই হিন্দীর ওই মানে নাকি ? আমি তো কিছুই বুঝিনি। লোক দুটো কেন যে ফলো করছে—কিছুই বুঝতে পারছি না।

ওদের কিসের কাগজপত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে—

অজানা লোকের কাগজপত্তর দিয়ে আমি কি করবো বল তো ?

বেসমেন্টে গাড়ি রাখার সময় কালু ঘোষ বললো, বাচ্চু—বিশ্বনাথ এবার কারও কাগজপত্র নিয়ে আসেনি তো ?

ওরা কাগজ দিয়ে কি করবে ?

হয়তো তুমি কিছুই জানো না দিলীপ।

হতে পারে। কিন্তু একজন গান গায়। অন্যজন বাজায়। ওরা অপরের কাগজ কোন্ কাজে লাগাবে ?

কালু ঘোষ চুপ করে গেল।

দিলীপ নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে দেখলো, লিভিং রুমের মেঝেতে সতরঞ্চি পেতে রীতিমত গানের আসর বসে গেছে। এক অজানা ভদ্রলোক হারমোনিয়ামের সামনে মুখ হয়ে বসেছে। তার পেছনে তার ঠাকুমা। আর পিসি।

দিলীপকে দেখে রানী আঁচলটা টেনে বসলো। চোখের ইসারায় বসতে বললো দিলীপকে। দিলীপ শব্দ না করে খাবার টেবিলের লাগোয়া চেয়ারে গিয়ে বসলো।

যখন মজুমদারের পুরনো গান। গান শেষ হতে ভদ্রলোক চোখ খুললো। গায়ে গলা বন্ধ পাঞ্জাবি। বুক পকেটে ছোট কালো ডায়েরি। এই যে। আপনি এসে গেছেন। চিনতে পারছেন ?

দিলীপের মাথায় তখনো দুই ভারি

ছায়া দৌড়োদৌড়ি করছিলো। সে ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে তাকালো।

সেই যে অলিম্পিয়ায় আমায় কার্ড দিয়ে নেমন্তন্ন করেছিলেন ঘুরে যাবার জন্যে—

ওহো। আপনি। তাই বলো চেনা লাগে কেন?

এই তিনবারের বার এসে দেখা হোল আপনার সঙ্গে।

দিলীপ কুটুর দিকে তাকিয়ে বললো, এই ভদ্রলোক তোমার বাবা হতে পারতেন মা—।

রানী উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ভ্রুকুঁচকে বললো, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বদ রসিকতা করছো কেন?

প্রবোধও এমন করে তাকালো—তার চোখে ভয় এসে দেখা দিলো।

দিলীপ হেসে বললো, কথাটা মিথ্যে নয় রানী। কি বলেন প্রবোধবাবু।

প্রবোধ থতম খেয়ে বললো, বিষের ব্যাপারে কতজনের সঙ্গেই তো কথা হয়। পর্টে একজনের সঙ্গেই।

অত সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছেন কেন? আপনি আমার গিন্নির পূর্বপরিচিত। তাই একটু রসিকতাও করবো না। আপনাদের রেল লাইন তো উঠে গেছে—

হ্যাঁ। চাকরিটা এখনো যায়নি। বসিয়ে বসিয়ে মাইনে দিচ্ছে। তবে আর বেশিদিন হয়তো দেবে না।

কেন?

ব্রডগেজ লাইন বসবে শুনেছিলাম। তা তো আর বসার লক্ষণ দেখছি না। এরপর কি আর বসিয়ে মাইনে দেবে?

আপনাদের শিয়াখালা লাইনের গোড়াতেই শনি লেগেছিলো। শুনেছিলাম—কেউ টিকিট কাটতো না। আর প্রাইভেট বাসের সঙ্গে প্রচন্ড কম্পিটিশন চলতো।

সে জন্যেই তো লাইন তুলে দিলো। আছেন কোথায়?

চন্ডীতলায়। রেল কোয়ার্টারে। কারেন্ট কেটে দিয়েছে। পাশের এক দোকান ঘরের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে লাইন এনেছি টেম্পোরারি।

ঘরভাড়া লাগে?

কে নেবে? কোম্পানীই তো উঠে গেছে।

লাইট বেলওয়ে চালু রাখা খুব কঠিন।

কে বলেছে দিলীপবাবু! এখনো তো বাঁকড়া দামোদর লাইন চালু আছে।

কথা থামাতে হোল দিলীপদেব। রানী এসে বললো, আমি ভাবছি কুটুকে ওঁর কাছে গান শেখাবো। হপ্তায় দুদিন।

অতদূর থেকে আসতে পারবেন?

খুব পারবো। রানীর মেয়েকে শেখাবো না?

হ্যাঁ। রানীকেও তো নিজের হাতে দেড়শো দুশো গান শিখিয়েছিলেন।

ওর গলাটা খুব ভালো ছিলো। শিখিয়েছিলামও খুব মন দিয়ে।

আজকাল আর গায় না কিন্তু।

রানী লজ্জায় মাথা নামালো। বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না? তুমি ভেতরে গিয়ে বোসো।

প্রবোধ বললো, ভেতরে যাবেন কেন? বেশ তো কথা বলছেন। বসুন না এখানে।

আমি এখন ঠাকুমা। আমি কি গান গাইবো বলুন তো?

প্রবোধ গুরু শিষ্যার সম্পর্কের টান ধরে বললো, গান সব বয়সেই গাওয়া যায়। এই যে গিরিজা দেবী, কেশরীবাঈ—এঁরা কেউ কচি খুকী নন্। আসল কথা গানের পরিবেশ থাকলে যেকোন বয়সেই গাওয়া যায়।

সেরকম পরিবেশ আমি করতে চেয়েছিলাম প্রবোধবাবু—

রানী দিলীপকে থামালো। আমাকে একটু কথা বলতে দাও। আমার চেয়েও কুটুর এখন গান শেখা অনেক জরুরী।

ও কি শিখবে রানী। ও তো বিশ্বনাথের পপসং-ই ভালোবাসে বেশি।

কুটু ঝাঁঝিয়ে উঠলো। বাজে কথা বলবে না বাবা। বিশ্বনাথও রাগপ্রধান—ভজন বেশি ভালোবাসে। কিন্তু ও গান গেয়ে তো এখুনি পয়সা পাবে না। পয়সা না পেলে ওর বাবার সংসার চলবে কিসে? ভজন গেয়ে তো আর চালাতে পারবে না।

তুই একটু শেখ না এসব গান।

রানী বললো, বেশ তো—আমি বসে দিচ্ছি। প্রবোধ—আপনি বুধ আর শুক্রবার আসতে পারবেন? বিকেলের দিকে। ও ভোরে উঠে রোজ রেওয়াজ করবে—

দিলীপের কানে বাকি কথাগুলো আর গেল না। সে এক অনিশ্চিত ভয়ের রুগী হয়ে ভেতরে ভেতরে কাঁপছিলো। কিংবা—না কাঁপলেও—কোথায় যেন বিপদের আগামী ছায়া দেখতে পাচ্ছিলো। যেমন: স্কাথেকে দু'টো লোক আজ ফলো করতে এলো? অফিসই বা তাকে কেন হঠাৎ ক্ষমা করতে পারে?

পরদিন বেলা এগারোটায় অফিস কিন্তু দিলীপকে ক্ষমা করলো। টাইপ করা চিঠি দিয়ে। বেশ ধমক দিয়ে তাকে চিঠিতে বলা হোল—এবার যে অন্যায় করেছো—সেজন্যে তোমায় ক্ষমা করা হোল। কারণ, অনাথ চক্কোত্তি তোমার বিগেট্ট লেটারের ওপর তোমার ক্ষমা করার জন্যে সুপারিশ করেছেন। তোমার বিরুদ্ধে সব অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেওয়া হোল।

অনেক আগেই তার সকালবেলার ভেতরে কালচে ছায়া পড়ে ছিলো। দিলীপ চিঠিখানা হাতে পেয়ে পরিষ্কার যা বুঝলো—তার মানে একটাই—আমাকে কথার মার-প্যাঁচে ঠকানো হয়েছে। আমি কখনোই ক্ষমা চাইনি।

সে দেখতে পাচ্ছিলো সাধন চক্কোত্তি কেমন টেনস্ অবস্থায় অ্যাডেন্টিনের ফাঁকা টেবিলে বসে ছিলো। মাথাটা কাছে টেনে কপালে চুমু দিলো। নিজের দুঃখ প্রকাশের চিঠিখানা চেয়ে নিয়ে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলছে অনাথ চক্কোত্তি। দিলীপের চোখ জলে ভরে গেছে। অনাথের দেওয়া কাগজে খস খস করে কি লিখে দিলো। একটু আগে মণিবাবুর মসাবিদা করা ইংরিজিতে টাইপ করা দুঃখ প্রকাশের চিঠিখানা অনাথদা দুমড়ে টেবিলের নিচে ফেলে দিয়েছে। চলো তুমি এখুনি জয়েন করবে অফিসে।

এখনো তো আমি কোন চিঠি পাইনি অনাথদা—

কোন চিঠি লাগবে না।

সব রেগুলারাইজড্ হবে তো?

সব হবে।

দিলীপ চিঠিখানা পেপারওয়েট দিয়ে চাপা দিলো। আমি যদি সেদিন জয়েন না করতাম—তাহলেও এ-চিঠি ইগনোর করা যেতো। বলা যেতো—আমার পার্সোনাল চিঠির উপর অনাথ চক্কোত্তি নোট দিতে পারে না। সে-নোটের ওপর অফিসের আমাকে ক্ষমা করার কোন অধিকারই নেই।

ভেবেচিন্তেই অনাথ চক্কোত্তি সেদিন আমায় অফিসে জয়েন করিয়েছে। সই করতে বলেছে।

সই না থাকলে আমি হাইকোর্টের শো-কজ রিভাইভ্ করাতে পারতাম।

একেই ভালো বাংলায় বলে শঠতা। খারাপ বাংলায়—ষড়যন্ত্র।

যার কাছে আমি ক্ষমা চাইনি—সেই কোল ইন্ডিয়া আমায় ক্ষমা করে কোন্ সাহসে?

দিলীপের মাথার ভেতর গতরাতের সেই একজোড়া ভারি ছায়া সিমেন্টের ঢালাই ঢেউ বেয়ে এসে নামলো। তাদের কোনদিন দ্যাখেনি সে এর আগে।

চিঠিখানা হাতে মুভে নিয়ে এম ডি-র ঘরে গেল। কি খবর? মুখখানা হাসি হাসি এম ডি-র। অনেকদিন পরে অফিস কেমন লাগছে?

এ-চিঠিখানা দেখেছেন?

আমারই সই করা।

আবার একখানা ভুল চিঠি দিলেন আমায়?

কেন? তারিখ তো ঠিক আছে। সাসপেনসন অর্ডার তুলে নেওয়া হয়েছে।

সেসব ঠিক আছে। কিন্তু আমায় ক্ষমা করলেন কেন?

কি করবো?

আমি তো ক্ষমা চাইনি। আপনি বলেছিলেন—আমাদের দুজনের ভেতর অ্যামিকেবলি মিটিয়ে নিলেই হবে। এসব তো কথা ছিলো না।

এটা তো একটা অফিস।

আমিও তো তাই জানতাম। সেজন্যেই

শো-কজ করেছিলাম। কোর্ট যা বলতো তাই হোত। এভাবে আমায় ঠকালেন কেন?

সামনেই আপনার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। আপনি শীগগিরি এরিয়া ম্যানেজার হচ্ছেন আমাদের—

আমায় ঠকালেন কেন এভাবে?

অনাথবাবু ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিলেন। আপনাকে খুব ভালোবাসেন উনি।

সেকথা আমিও শুনে আসছি কিছুকাল। কিন্তু এভাবে কথায় খেলাপ করলেন? আমি একদম ভাবতে পারিনি। অফিস আমাকে ক্ষমা করবে কে? বলতে বলতে দিলীপ এবার কেঁদে ফেললো। যে কান্নাটা কাল ঢালাই ফ্লোরে দাঁড়িয়ে সে চেষ্টা করেও কাঁদতে পারেনি। তখন গলার দড়ের আওয়াজ আসছিলো।

এম ডি কোনদিন কোন বয়স্ক লোককে এভাবে কাঁদতে কাঁদতে দেখেনি। সে চমকে দাঁড়ালো। ঘরে ভিজিটরদের জন্যে গদি লাগানো কুশন। নিজে টেবিলের বাইরে এসে দিলীপের পিঠে হাত রাখলো।

কি হোল দিলীপবাবু? শরীর টরীর খারাপ নেই তো?

দিলীপ কান্না চাপতে পারছিলো না। এখানে তার কাঁদাও উচিত নয়। কিন্তু চোখ যত পারে জল দিচ্ছিলো। দিলীপের মনের ভেতরকার বাবণের তোয়াক্কা না করেই। এভাবে আমায় অপমান করার কি দরকার ছিলো? আমি তো জয়েন করতে চাইনি। আই ওয়ান্টেড এ লিগাল ব্যাটেল।

কথা জড়িয়ে যাচ্ছিলো দিলীপের।

মিস্টার চক্রবর্তী কিন্তু আপনাকে ভীষণ ভালোবাসেন।

একদম বাজে কথা। ভালোবাসলে কেউ কি প্ল্যান করে একাজ করে বলুন? তার যে গলায় হাড় ফুটেছিলো। আমি যে তাকে ওপেন কোর্টে টেনে তুলতাম। আমি জানতাম—অফিসের একতরফা ডোমেসটিক ইনকোয়ারির কোন দাম নেই—দ্যাট ওয়াজ এ ফার্স!

দিলীপ একদমে আর কথা বলতে পারলো না।

এম ডি তাকে ধরে কুশনে বসালো। এছাড়া আমাদেরও তো অন্য কোন রাস্তা ছিলো না মিস্টার বোস। হোয়াট কুড উই ডু? কুড উই সেনসর এ সিনিয়র পার্সোনেল লাইক অনাথ?

তাই বলে আমায় অপমান করবেন?

আপনিও তো ওঁকে সাফিসিয়েন্টলি হিউমিলিয়েট করেছিলেন। অনাথ চক্কোত্তি তো কম শাস্তি পায়নি।

উনিই তো আগে অ্যাসল্ট করেছেন আমায়। আগে গালাগালি করেছেন

আপনাকে কিন্তু খুব ভালোবাসেন।

তাই বুঝি! দিলীপ চোখ মুছে বেরিয়ে এলো।

এম ডি দরজা খুলে দাঁড়িয়ে ছিলো। দিলীপ বললো, আমি আপনাদের অফিসে থাকবো না।

অনাথ চক্কোত্তিকে তার ঘরে পেলো না দিলীপ। পি বি এক্সে এ ফোন করে জানলো—অফিস লাইব্রেরির ঘরে বসে আছেন।

দিলীপ সেখানে গেল। তাকে দেখে বললো, চিঠি পেয়েছো?

হ্যাঁ। এই তো।

দেখি—বলে চিঠিখানা হাতে নিলো অনাথ চক্কোত্তি। সব ঠিকই তো আছে। সাসপেনসন অর্ডার পুরোপুরি তুলে নেওয়া হয়েছে। বকেয়া মাইনে সব একসঙ্গে পেয়ে যাবে।

দিলীপ চিঠিখানা হাতে নিয়ে বললো—এসব কি লেখা রয়েছে?

কোনটা?

এই যে—আমাকে ক্ষমা করা হয়েছে—আপনার সুপারিশের ওপর।

হ্যাঁ। তাই তো করা হবে। অফিস ডিসিপ্লিন বলে একটা কথা আছে তো।

সেরকম তো কথা ছিলো না। আপনার দুঃখ প্রকাশের চিঠির তো কোন উল্লেখই নেই এ-চিঠিতে? আমি তো কারও কাছে ক্ষমা চাইনি। রিগ্রেট লেটার তো আপনার কথার আমরা একসচেঞ্জ করলাম। আমি তো কোন রিগ্রেট জানাতে যাইনি। আমি হাইকোর্ট করেছি। ডোমেসটিক এনকোয়ারি তো একতরফা কাণ্ড! কমপ্লিট ফার্স!

মুখ গম্ভীর করে অনাথ চক্কোত্তি বললো, তুমি দেখছি সাফিসিয়েন্টলি রিপেনট্যান্ট নও।

আমি আবার জয়েন করেছি বলেই তো এ-টোনে কথা বলতে পারছেন!

দিলীপ আর দাঁড়ালো না। সে ফিরে আসবার সময় বুঝলো অনাথ চক্কোত্তি তার পিঠের দিকে তাকিয়ে আছে। সে নিজের টেবিলে বসলো। এ-টেবিলটার সঙ্গে সম্পর্ক চোদ্দ বছরের। কিংবা কিছু বেশি। আমি আর অনাথ চক্কোত্তি—এ কমাস ধরে সম্মান সম্মান খেলছিলাম। বুদ্ধি দিবে। উকিল দিবে। ভালোবাসার ভান দিয়ে অনাথ জিতে গেলো শেষে। এই জেতাই ওর কাল হবে।

এখন যেন তার মনে হচ্ছে—রবি কি তারই মত আর কোন পথ না পেয়ে লেভেল-ক্রসিংয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো শেষে? এরকম অবস্থায় শেষ অব্দি কোন পথ থাকে না আমাদের জন্যে। সাধন গুপ্ত তো পুরোপুরি পর্দার আড়ালে। অনাথ চক্কোত্তি আশ্রয় নিলো অফিস ডিসিপ্লিন নামে মহেন্দ্র দত্তের সবচেয়ে বড় ছাতাটার ছায়ায়! আমিই শুধু অপমানের রোদ্দুরে—ইনসিকিউরিটির ঢেউয়ের ওপর বসে আছি।

দিলীপ ডাইরেক্ট লাইনে স্যার লেজলির অফিস চাইলো। মেমের জেনারেল রাশ লাঞ্চে বেরিয়ে গেছে।

দিলীপ হাঁটতে হাঁটতে ঋষির ঘরে গেলো। ঋষি ইদানীং বিডিং গ্লাস ইউজ করছে। কাঁচের ওপিঠ থেকে শান্ত চোখে তাকালো। মুখে সেই মিষ্টি হাসিটা। কি খবর? সব মিটে গেছে তো?

দিলীপ বললো, না, মেটেনি ঋষি। আমার কোন পথই সহজ হয় না জীবনে।

কেন? একথা বলছিস কেন?

চিঠিখানা মেলে ধরলো দিলীপ।

হাতে নিয়ে পড়ে দেখে চোখ তুললো ঋষি। ঠিকই তো আছে।

সব ঠিক আছে?

হ্যাঁ। সবই তো উইথড্র করেছে।

দিলীপের গলার ভেতর নিজের মুখের থু থু আপনা-আপনি গদের আঠা হয়ে গেল। দে—

দিলীপ কিছু না বলে চিঠিখানা হাতে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। কালু ঘোষকে বললো, কালুদা তুমি চালিয়ে নিয়ে রেসমেন্টে তুলে রাখো গাড়িটা। আমি হেঁটে ফিরবো।

পাগল নাকি! দিনের বেলা এখন। রাস্তায় লোকজন। ড্রাইভার ছাড়াই গাড়ি চলতে দেখলে—অন্য সব গাড়ির ড্রাইভার অ্যাকসিডেন্ট করে বসবে। ট্রাফিক পুলিশ এ দৃশ্য দেখলে দড়াম করে অজ্ঞান হয়ে পড়বে। তখন?

তখন আর কি? তুমি আমায় ছাড়ো তো কালুদা। আমি একটু একা থাকতে চাই।

এ-গাড়ি নিয়ে আমি এখন বেরোলে রাস্তা সুদ্ধ লোক তাকিয়ে থাকবে। খবরের কাগজের রিপোর্টার ছুটে আসবে। আর এই দুপুরবেলায় তুমিই বা কোথায় হেঁটে হেঁটে যাবে?

তবে চলো—বলে নাগে নাগে গিয়ে স্টিয়ারিংয়ে বসলো দিলীপ।

একটু পরে কলকাতার রাস্তায় তখন এরকম কথাবার্তা চলছিলো।

জানো কালুদা। যেদিন সাসপেন্ড হয়েছিলাম—তার চেয়েও আজ আমার বেশি খারাপ লাগছে।

কেন? আবার সাসপেন্ড হয়েছো নাকি? কাকে আবার কি করলে?

কাউকে কিছু করিনি।

তাহলে?

আজ আমায় ক্ষমা করা হোল।

ওঃ! সাসপেনসন তুলে নিয়েছে। ভালোই তো।

তা নিয়েছে। কিন্তু ক্ষমা করে। যে-ক্ষমা আদৌ আমি কোল ইণ্ডিয়ার কাছে চাইনি।

ওটা হোল গিয়ে দিলীপ—অফিস প্রসিজিওর।

ধ্যুৎ! আবার সেই অটোমোবিল ইণ্ডিয়ার কচকচি-জুড়ে দিলে দেখছি—

বাঃ আমি একটা বিরাট অফিস চালাতাম। আমি ছাড়া এসব কথা কে বলবে!

তাও তো সত্যি। আচ্ছা কালুদা—আবার যদি তুমি রক্তে মাংসে পাকাপাকি ফুটে উঠতে পারতে তাহলে কি অটোমোবিল ইণ্ডিয়ায় গিয়ে এম ডি হয়ে বসতে?

নিশ্চয়। এইট অ্যান্ড হাফ পারসেন্ট ডিভিডেন্ট দিতাম শেয়ার হোল্ডারদের।

(চলবে)

আপনার পরিবারের সকলের জন্যে এখন পাবেন সর্ব্বাধুনিক শ্যাম্পু- যা সবকটি গুনে সমৃদ্ধ, অথচ কমদামী-

নতুন পামলিভ ফ্যামিলি শ্যাম্পু

আজকের শ্যাম্পু হবে গুণে সমৃদ্ধ-এবং ঘনঃ যেমন নতুন পামলিভ ফ্যামিলি শ্যাম্পু। যা খুব বেশী ঘন বা খুব বেশী পাতলা নয়। জল যাই হোক, নরম বা খর—প্রচুর ফেনা হয় এই শ্যাম্পুতে।

প্রত্যেকের চুলের যত্নের জন্যেঃ নতুন পামলিভ ফ্যামিলি শ্যাম্পু আপনার পরিবারের সবার জন্যে বিশেষভাবে তৈরি। বাচ্চাদের নরম চুলের জন্যেও উপযুক্ত। আপনার চুলকে শুধু পরিষ্কার করা নয়—নরমও ঝকঝকে করে তোলে। কিন্তু রুক্ষভাব এনে দেয় না। বাড়ীর কর্তার জন্যেও ঠিক মনের মতো।

দামে কতো কমঃ নতুন পামলিভ ফ্যামিলি শ্যাম্পু আপনার সারা পরিবারকে যোগ্যভাবে সবকটি গুণে সমৃদ্ধ ভালো শ্যাম্পুর বিলাস—অথচ এই ধরণের যে কোন শ্যাম্পুর চেয়ে এর দাম অনেক কম।

পামলিভ ফ্যামিলি শ্যাম্পু—আপনার পরিবারের জন্যে সবকটি গুণে সমৃদ্ধ একটি ভালো শ্যাম্পু।

PFS.2 BN

চিত্তবিনোদনে অতুলপ্রসাদ

সোমেন্দ্রনাথ গুপ্ত

দিলীপকুমার গানের সঙ্গে তবলার ব্যবহার পছন্দ করতেন এবং তিনি অতুলপ্রসাদের কাছ থেকে গান শিখেও নিজের ঢংএ তান ও মীড় দিয়ে যে সুরমূর্ছনার সৃষ্টি করতেন তা' শুনে অতুলপ্রসাদ শুদ্ধ সব শ্রোতাই খুব উপভোগ করতেন। রবীন্দ্রনাথের গানের সুর ও ঢং-এর মধ্যে যেমন পাহাড়াদারী—অতুলপ্রসাদের গানে তা' একেবারেই ছিল না। তিনি শিক্ষার্থী ও গায়কদের কিছুটা স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। আমরা শিক্ষার্থীরা যদি তাঁর কাছে শেখা গানটির মোটামুটি সুরটা বজায় রেখে ভাবটা আরও ফোটাবার জন্য কোথাও যদি একটু মিষ্টি খোঁচ বা কোথাও একটি ছোট্ট মীড় বা তান্ দিয়ে কিম্বা সুরের সঙ্গতি রেখে একটু কোমল পর্দা ছুঁয়ে গাইতাম ও তাঁকে শোনাতাম—তিনি উজ্জিবে উঠতেন উচ্ছ্বসিত হয়ে। বলতেন—বাঃ বাঃ, এটা খুব ভাল করেছ, এটা রেখে দাও। আমরাও তাঁর সম্মতি নিয়ে সে ভাবেই গানটা গাইবার অভ্যেস করতাম। তাঁর নিজের গলা শাদামাঠা ধরনের হলেও খুব ডরাট বা গুরু-গম্ভীর আওয়াজে বাঁধা ছিল। সর্বোপরি তাঁর উচ্চারণ ছিল স্পষ্ট ও গানের ভঙ্গী ছিল অসাধারণ ভাবব্যঞ্জক। তিনি একটু থেমে থেমে ধাক্কা দিয়ে, কোথাও একটু খোঁচ লাগিয়ে গাইতেন—যা' শুনতে সকলেরই অনবদ্য লাগতো। আজ রেকর্ডে, রেডিওতে ও ফিল্মে যে সব তথাকথিত নাম-করা গায়ক-গায়িকাদের কণ্ঠে তাঁর রচিত গান শুনি—আমাদের অনেকেরই মন ভরে না—এটাই দুঃখের বিষয়। দিলীপকুমার বাহের মারফৎ এক সুকণ্ঠ গায়কের সঙ্গে অতুলপ্রসাদের পরিচয় হয় ও তিনি অতুলপ্রসাদের কাছে কয়েকটি গান শেখেন। কিন্তু দেখা গেল এইসব গান তিনি অন্যত্র গাইছেন ও শিক্ষা দিচ্ছেন তাঁর মোর করে হস্ত করা দিলীপ বাহের 'দৈলিপী' ঢং-এ। একদিন তিনি এই গায়কের কণ্ঠে তাঁরই শেখানো গান শুনে একেবারে স্তম্ভিত। মুখে যদিও কিছু বললেন না তাঁকে—পত্রে খেদ প্রকাশ করে একদা বলেছেন—'ইস্, আমার গানগুলির কী অবস্থা করেছে—আমার গান-গুলি সব নষ্ট করছে সে এভাবে গেয়ে।' তাঁর বক্তব্য ছিল দিলীপ (রায়)কে নকল করে গাইলে 'ক্যারিকেচার'-এর সামিল হয়—তার 'ট্যালেন্ট' থাকতে পারে—তা', বলে সে দিলীপও নয় এবং দিলীপের 'জিনিয়াস'ও তার মধ্যে নেই। এই গায়কটি যদিও উত্তর-কালে গানের জগতে এবং রেকর্ডের মাধ্যমে খুব নাম করেছিলেন।

(পনেরো)

১৯০০ সালে বাধ্য হয়ে স্কটল্যাণ্ডে গিয়ে অতুলপ্রসাদকে বিবাহ করতে হয় সুখে ও শান্তিতে দাম্পত্য জীবন যাপনের আশা নিয়ে। বিধাতাপুরুষ তখন বোধহয় অলক্ষ্যে হেসেছিলেন। কারণ তাঁদের বিবাহিত জীবন সুখের তো হয়ই নি উপরন্তু একদিন ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়—হয়তো বিধাতারই অভিশাপে। বড়মামা সার কে, জি, গুপ্তের কন্যা ছিলেন তাঁর স্ত্রী হেমকুসুম দেবী। ব্রিটিশ সম্রাটের প্রতিভূ ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত কন্যা হেমকুসুমকে উপযুক্ত ইংরাজি শিক্ষায়, আদব কায়দায় যথারীতি শিক্ষিত করে-ছিলেন। তিনি যেমন জল ইংরাজি বলতে ও লিখতে পারতেন তেমনি বেহালা ও পিয়ানো বাজাতে এবং চিত্রাঙ্কনে সুদক্ষ ছিলেন। সামাজিক ব্যবহারে তিনি যেমন আদব কায়দা দুরস্ত তেমনি মানুষের সঙ্গে সদ্ভাবের সঙ্গে মিশতে পারতেন। কিন্তু তাঁর স্বভাবে অস্বাভাবিক রাগ, ক্রোধ, ঈর্ষা ও সন্দেহ ইত্যাদি দোষগুলি তাঁর অন্যান্য সকল গুণকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। তিনি যেমন অতুলপ্রসাদের জনপ্রিয়তা ও বাইরে-দের বাড়ী গিয়ে গানবাজনা শোনা অপছন্দ করতেন তেমনি অতুলপ্রসাদের মাতৃদেবী ও ভগিনীদের উপস্থিতি সহ্য করতে পারতেন না। এইসব কারণে স্বামীর সঙ্গে কলহ, বিবাদ, অশান্তি লেগেই থাকতো। এই পরিস্থিতি থেকে কিছুদিনের জন্য অব্যাহতি পাবার জন্য, ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌর কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়ে একটি পাচক সম্বল করে তিনি কলকাতায় এসে সংসার পাতেন এবং কবি সত্যেন দত্ত ও নতুন পরিচিত সাহিত্যিক বন্ধুবান্ধব নিয়ে এবং কলকাতার হাইকোর্টে আইন ব্যবসা করে নতুন জীবন শুরু করেন। তিনি কলকাতায় একা স্থায়ী-ভাবে বাস করছেন—এ খবরটা কলকাতার বিদগ্ধ রসিক মহলে ছড়িয়ে পড়তে দেরি হোল না। কলকাতায় তখন আরেকটি নতুন সংস্থা জমজমাট। 'ননসেন্স ক্লাব' নামটি ননসেন্স বাইমস-এর প্রবর্তক ও খ্যাতনামা সাহিত্যিক সুকুমার রায় (সত্যজিৎ রায়ের পিতৃদেব ও অতুলপ্রসাদের মাসতুতো ভগিনীপতি বদলে 'মাণ্ডে ক্লাব' রাখলেন কারণ অধিবেশনগুলি সোমবারেই অনুষ্ঠিত হোত বলে। ক্লাবের অধিবেশন শেষ হোত মিঠাই মণ্ডা সহযোগে—তাই পিছনে অনেকে এই সংস্থাটিকে 'মণ্ডা ক্লাব'ও বলতো। 'মাণ্ডে ক্লাব' গঠনে সুকুমার রায়কে সহযোগিতা দিয়েছিলেন তাঁর ছোট দুই ভাই—সুবিনয় ও সুনির্মল রায়—তা ছাড়া আরও যাঁরা ক্লাবের পাণ্ডা ছিলেন, তাঁরা হলেন সুকুমারের এক মামা প্রভাত গাঙ্গুলী (জংলীবাবু), পিসতুতো ভাই হিতেনবাবু (বিখ্যাত কুন্তলীন কেশ তৈলের উদ্ভাবক এইচ, বসুর পুত্র), সম্পর্কে এক কাকা অমল হোম এবং অতুলপ্রসাদের মাসতুতো ভাই ও মামাতো ভাইরা যথাক্রমে শিশির দত্ত (খোদনবাবু) ও হিমাংশু এবং ধীরেন গুপ্ত (বড়কু ও ছোটকু বাবু) প্রমুখেরা। এঁরা ছাড়া আরও ছিলেন অতুলপ্রসাদের, মাসতুতো ভগিনীপতি ডাক্তার শিবজ্ঞেন মৈত্র (বেঙ্গল সোশ্যাল সার্ভিস লীগের প্রতিষ্ঠাতা), ডক্টর সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর কালিদাস নাগ, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, অধ্যক্ষ সতীশ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশ ও কবি জীবনময় রায় প্রভৃতিরা। এঁরা সবাই মিলে কলকাতায় 'মাণ্ডে ক্লাব' নামে একটি সংস্থার প্রতিষ্ঠা ও সাহিত্য, সঙ্গীত ও সাংস্কৃতির বিভিন্ন আসর পরিচালনা করেন ক্লাবের মাসিক অধিবেশনের মাধ্যমে। সঙ্গীত-সাহিত্য আসরে হাস্যরসও পরিবেশন করতেন সুকুমার রায়। 'মাণ্ডে ক্লাবে'

কার্শিয়ংয়ে উদয়শঙ্কর নৃত্য শেষে

একদিন অমল হোম এসে অতুলপ্রসাদকে ধরে নিয়ে এলেন। শিশির দত্ত ওরফে খোদনবাবু ছিলেন এই ক্লাবের একজন বিশিষ্ট সভ্য ও সম্পাদক এবং সম্পর্কে অতুলপ্রসাদের মাসতুতো ভাই। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর 'ভাইদা'কে (অতুলপ্রসাদকে তাঁর ভাইবোনেরা এই নামেই ডাকতেন) ক্লাবের সভ্য করে নিলেন। হাসি, গানে, রসিকতায় সবাইকে মাতিয়ে অতুলপ্রসাদ সকল সভায় খুবই প্রিয় হয়ে পড়লেন। অতুলপ্রসাদ 'মানডে ক্লাবে' যোগ দেবার পর মাসিক বৈঠকগুলি প্রায় তাঁরই ফ্ল্যাটে বসতো কারণ সাহিত্য ও সঙ্গীতচর্চার পর ভক্ষণ হস্তের ব্যাপারটি এমন বিরাট আকার ধারণ করতো যে অন্যত্র আসর বসানো প্রায় দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়। অতুলপ্রসাদের বাড়ীতে আসর ডাকার আগে 'মানডে ক্লাবের' বৈঠক বসেছে ডাক্তার দ্বিজেন মৈত্রর গঙ্গাধারের মেয়ো হাসপাতালের কোয়ার্টার্সের ছাদে, সুনীতি চাটুজ্যের সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাড়ীতে, সুকুমার রায়ের গড়পার রোডের বাড়ীতে এবং অমল হোমের পিতৃদেব গগন হোমের সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়ীর বৈঠকখানায় ও আলিপুর চিড়িয়াখানার তদানীন্তন অধিকর্তা বিজয় বসুর (ডক্টর কালিদাস নাগের মামা ও ইলা পালচৌধুরীর পিতৃদেব) বাড়ীতে। চিড়িয়াখানার বিজয় বসুর বাড়ীতে মানডে ক্লাবের এক আসরে অস্কার ওয়াইল্ড লেখা 'ম্যান্ অ্যান্ড হিজ ওয়ার্ক' নামক প্রবন্ধটি পাঠ করলেন অমল হোম। অতুলপ্রসাদ খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলেন এবং পরে জানালেন আগামী বৈঠকে তিনি অস্কার ওয়াইল্ড ট্র্যাজেডি বন্ডওয়ার্ড সকলকে শোনাবেন। লন্ডনের ওল্ড বেইলির আদালতে অস্কার ওয়াইল্ডের যখন বিচার হয় তখন অতুলপ্রসাদ ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ—দুজনেই বিলাতে আইনের ছাত্র। তাঁরা দুজনেই এই বিচার দেখতে ও শুনতে সেদিন ওল্ড বেইলির কোর্টে উপস্থিত ছিলেন। সার এডওয়ার্ড কার্সনের জেরার জবাবে সেদিন অস্কার ওয়াইল্ডের মুখে যে কথার তুবড়ি ছুটেছিল—সে গল্প তিনি পরের বৈঠকে সকলকে শুনিয়ে সবার চিত্তবিনোদন করেন। অন্য এক বৈঠকে অতুলপ্রসাদ এডমন্ড নির্বাচিত কয়েকটি কবিতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করে শোনান। 'মানডে ক্লাবের' সভ্যরা নানা মনোজ্ঞ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। যেমনে এতগুলি সাহিত্যিক, কবি, গায়ক, শিল্পী ও বিদগ্ধ রসিকদের সমাবেশ, সেখানে শুধু কৌতুক ও ভোজ-ধ্বনির মধ্যেই বৈঠক শেষ হোত না। অনেকবার অতুলপ্রসাদ ক্লাবের বৈঠকে রেস্টিস্টনের লেখা 'ওয়ারশিপ-অফ দি ওয়ার্লড' প্রবন্ধটি পাঠ করে শোনান। আরেকবার মানডে ক্লাব থেকে এক স্টিমার পার্টির আয়োজন করা হয়। এই জল-বিহার অনুষ্ঠানে প্রধান আকর্ষণ ছিল স্বয়ং অতুলপ্রসাদের উপস্থিতি ও তাঁর কণ্ঠে রচিত গানের অমল স্টিমার ছাড়বে কলকাতা থেকে সকালে আর থামবে

পাহাড়ী সান্যাল

গিয়ে বিকেলে কোলাঘাট। সেখানে রাত্রি যাপনেরও ব্যবস্থা হয়েছে কোলাঘাটের সরকারী সেচ বিভাগের ডাকবাংলোয় এবং পরের দিন কলকাতায় ফেরা। সপরিবারে কেউ আবার একা অথবা সবান্ধবে বেশীর ভাগ সদস্যই এই জল-বিহার, উপভোগ করার জন্য এগিয়ে এলেন। সকাল থেকে বিকেলে কোলাঘাট পৌঁছানো পর্যন্ত—এক লুচি মাংস খাবার অল্প সময়টুকু বাদ দিয়ে বাকী সব সময়টা গানের বৈঠকের মধ্য দিয়ে মহানন্দে সকলে কাটালেন। বিকেলে কোলাঘাট পৌঁছে সবাই সেচ-বিভাগের বাংলোতে এলেন রাত কাটাবার জন্য। এই বাংলোটি, মেদিনীপুরের খাল এসে যেখানে রূপনারায়ণ নদীতে পড়েছে, তার কাছেই ছিল। সে রাতটা ছিল ফুটফুটে জোৎস্নায় ভরা। রূপনারায়ণ নদীর থেকে সদ্য ধরা ইলিশ মাছের ঝোল

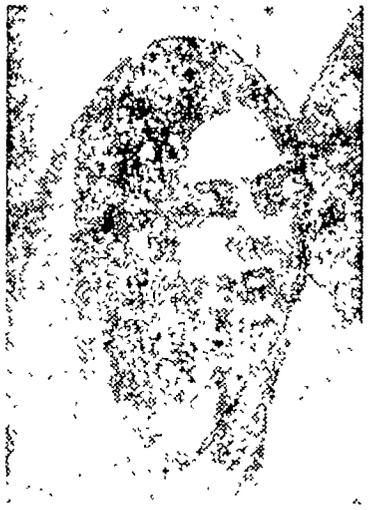

বেণুকা দাশগুপ্ত

আর ভাত খেয়ে বাংলো থেকে আবার সবাই জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলো ছড়ানো খাল জলে নৌবিহারে বেড়াতে যাওয়া হো আবার গান শুরু হোল। কয়েকটি রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইলে সদস্যদের মধ্যে গায়ক-গায়িকারা। পরে অতুলপ্রসাদ তাঁর গম্ভীর দরাজ গলায় ভাবের রস ঢেলে দিয়ে কয়েকটি স্বরচিত গান—যার মধ্যে 'কি আর চাহিব বলো', 'জানি জানি তোমারে গো রঙ্গরাণী' ও 'বধূয়া নিদ্ নাকি আঁখি পাতে' অন্যতম। শেষোক্ত গানটি রচনার প্রসঙ্গে তিনি সেদিন বলেছিলেন—'একটি মোকদ্দমার ব্যাপারে একবার মফঃস্বলে যেতে হয়েছিল। রাত্রিবাসের জন্য এক ডাকবাংলাতে আশ্রয় নেওয়া হোল। রাতে ডিনার খাবার পর ডাকবাংলোর বারান্দাতে একটা আরামকেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম নেবার তোড়জোড় চলছে। বাইরে টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টি হচ্ছে। চোখে ঘুম আসছে না। ব্যাং আর ঝিঁঝি পোকার ঐকতান শুনছি। মনটা হঠাৎ উদাস হয়ে গেল। হঠাৎ মাথায় গান এসে গেল আর তখনি এই গানটি লিখলাম।' আরও কয়েকটা তাঁর স্বরচিত গান রচনার ইতিহাস তিনি সেদিন সবাইকে শুনিয়েছিলেন। কোর্টে তখন টিফিনের বিরাম, চতুর্দিকে উকীল, মক্কেল, আরদালী, পুলিশ, পেয়াদা, সাক্ষীরা ঘোরাফেরা করছে। নিজের চেম্বারে এসে কোর্টের বার লাইব্রেরিতে বসেছি এমন সময় হঠাৎ গান মনে এলো। লিখলাম তৎক্ষণাৎ—'ওগো আমার নবীন শাখী ছিলে তুমি কোন বিমানে।' আরেকবার লক্ষ্ণৌর বাড়ীতে। কোর্টে যাবার বেলা হয়েছে। বাথরুমে স্নান করছেন। হুড়হুড় করে ঘটিভরা জল গায়ে মাথায় ঢালছেন বারবার। এমন সময় 'জল কহে চল্ মোর সাথে চল্' গানটি তৈরি হয়ে গেল। সেদিনকার সেই কোলাঘাট স্টিমারে বেড়ানো নানা গল্পে, গানে ভরিয়ে দিয়ে অ প্রসাদ বেড়ানোর আনন্দ শতগুণে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। মানডে ক্লাব অতুলপ্রসাদকে নিয়ে বেশ জমে উঠেছিল। আর এই জমে ওঠার পেছনে ছিল তাঁর রসিক ও মজলিশী মনের বসবিতরণের ও রসিক চিত্ত-বিনোদনের অফুরন্ত প্রয়াস। হঠাৎ একদিন লক্ষ্ণৌ ফিরে যাবার জন্য তিনি পরোয়ানা পেলেন তাঁর দুই পুরানো বন্ধু লক্ষ্ণৌর পণ্ডিত গোকরনাথ মিশ্র ও মীর্জা সামিয়ুল্লা বেগের কাছ থেকে। তাঁদের দুজনের মিলিত ডাকে ও তাগিদে একদিন অতুলপ্রসাদকে কোলকাতার পাট গুটিয়ে লক্ষ্ণৌর দিকে পা বাড়াতে হোল। তাঁর কোলকাতা ত্যাগ উপলক্ষে মানডে ক্লাবের সদস্যরা ১৯১৫ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে এক বিদায় সম্বর্ধনা জানান। এর কদিন পরেই ট্রেনে উঠে অতুলপ্রসাদ লক্ষ্ণৌর পথে পাড়ি জমান।

(ষোলো)

আমরা বন্ধুসন্তানরা অতুলপ্রসাদের কাছ থেকে শুধুই পেয়েছি—অথচ দিই নি

কিছুই। কিন্তু প্রবাসী এই মহান বঙ্গ-সন্তানের জন্য উত্তরপ্রদেশ তথা লক্ষ্ণৌ-বাসীরা শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সঙ্গে তাঁর স্মৃতিরক্ষার ব্যাপারে কোনও কার্পণ্য করে নি। তাঁর জীবিতাবস্থায় তাঁর লক্ষ্ণৌর বাড়ী 'হেমন্ত নিবাসের' সামনের রাস্তা-টিকে 'এ, পি, সেন রোড বা সরণী' নামে নামাঙ্কিত করে ও মিউনিসিপ্যাল পার্কে তাঁর আবক্ষ মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে উত্তরপ্রদেশবাসী তাদের অতুলপ্রসাদের প্রতি শুধু অন্তরের শ্রদ্ধাই প্রদর্শন করে নি উপরন্তু কবির প্রতি তাদের ঋণও কিছু পরিমাণে শোধ করেছে। আমরা 'এপার ও ওপার'এর বাঙালীরা কি করেছি? অতুল-প্রসাদকে নতুন করে চেনার ও জানার যে প্রচেষ্টা কলকাতাবাসী ক'জন তাঁর জন্মশত বার্ষিকী উৎসবের মাধ্যমে করেছিল ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে—তা স্তিমিত হয়ে গেছে। তাই বোধহয় এখনও প্রতি বছর কলকাতা তথা পশ্চিমবাংলার বাঙালীদের 'বিশে অক্টোবর' তারিখটি মনে করিয়ে দিতে হয়। আমরা স্বাধীন হয়েছি তিরিশ বছর আগে, কিন্তু তাঁর লক্ষ্ণৌর বসতবাড়ী 'হেমন্ত নিবাস'-কে সরকারীভাবে অধিগ্রহণ করে 'অতুলপ্রসাদ স্মৃতি মন্দির' করার কোনও পরিকল্পনা বা প্রচেষ্টা হয় নি। কলকাতার সঙ্গে যাঁর এতদিনের ও এতবার যাওয়া-আসার যোগ ছিল—সেই কলকাতাতে তাঁর নামে কোনও রাস্তা বা পার্কের নাম হয় নি, হয়নি তাঁর কোনও মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা কলকাতা মহানগরীর বুকে—যদিও আমরা কোল-কাতাকে বঙ্গ সংস্কৃতির পীঠস্থান বলে গর্ব ও উল্লাস করি। স্বাধীন ভারতের যাঁরা পরিচালক—সেই দিল্লীর মসনদে অধিষ্ঠিত মহাশক্তিমান ও বিচক্ষণ পুরুষদের কল্পনাতে দুর্ভাগ্যবশত আজও উদয় হয় নি যে অতুলপ্রসাদের চিত্রসম্বলিত একটি ভারতীয় ডাকটিকিটের প্রবর্তন করা আশু কর্তব্য—যেটি গত তিরিশ বছরের মধ্যে পালিত হয় নি। ওপার বাংলার ঢাকা শহরের শত শত যুবক বাংলা ভাষার মর্যাদা রাখতে গিয়ে একদিন যে প্রতিপক্ষের বন্দুকের গুলীতে আত্মদান করে 'শহীদ' হয়েছেন—তাঁদের উত্তর-সূরীরা কি জানেন যে, যে বাংলাদেশের মাটিতে অর্থাৎ ঢাকা শহরে অতুলপ্রসাদ একদা বঙ্গসন্তানরূপে আবির্ভূত হয়ে-ছিলেন, ও বাংলাদেশেরই জল হাওয়া তাঁকে শৈশব থেকে কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনের দরজায় পৌঁছে দিয়েছিল একদা এবং যে মানুষটি তাঁর মাতৃভাষা বাংলার গুণগান করে রচনা করে গেয়েছিলেন —'মোদের গরব মোদের আশা, আ'মরি বাংলাভাষা' এবং যাঁর প্রচেষ্টায় ও অর্থে একদা তাঁর পিতৃপুরুষের আদি নিবাস ফরিদপুর জেলার 'মগর' গ্রামের ছেলেদের শিক্ষার উন্নতিকল্পে 'গুরুরাম বিদ্যালয়' স্থাপিত হয়েছিল এবং সম্ভবত আজও বাংলাদেশের প্রতি তাঁর গভীর টানের নিদর্শনরূপে সাক্ষ্য বহন করছে—ওপার বাংলার বঙ্গসন্তানদেরও এসবের জন্য অতুলপ্রসাদকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা কর্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলাদেশের কোনও বেতার কেন্দ্র থেকে সেখানকার শিল্পীদের কণ্ঠে 'আ'মরি বাংলা ভাষা' গানটি শোনা যায় না—শোনা যায় না [illegible] অতুলপ্রসাদের জীবন ও [illegible] বৈশিষ্ট্যর উপরে রচিত [illegible] সম্বন্ধে। কবিগুরু রবীন্দ্র [illegible] রচিত গীতসম্পদ আজ দেশ ও কালের ঊর্ধ্বে—এপার ও ওপার বাংলায় সমধিক বন্দিত। সেই রবীন্দ্রনাথ, যিনি অতুলপ্রসাদের মহাপ্রয়াণের সংবাদ পেয়ে বলেছিলেন—'আমি অতুলপ্রসাদের মৃত্যু স্বীকার করি না। এক সুরলোক হইতে তিনি আরেক সুরলোকে গেলেন। এই মর্তলোকে তিনি আপন সাধনায় যে সঙ্গীতময় সুরলোক রচনা করিয়াছিলেন, সমস্ত জীবনের বেদনা ভরা সাধনার অবসানে ভগবানের করুণায় পূর্ণ সেই প্রেমময় সুরলোকে তিনি আজ প্রয়াণ করিলেন। এই সুরলোক তাঁহাকে অমৃতময় শান্তি প্রদান করিবেন।' গুরুদেব রবীন্দ্র-নাথের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র ও বিশ্বস্ত বন্ধু হিসাবে যিনি তাঁর পার্থিব জীবনে চিহ্নিত হয়েছিলেন—সেই গীতিকবি অতুলপ্রসাদের প্রতি তাঁর প্রিয় এপার ও ওপার বাংলার জনসাধারণের যে কর্তব্য ও দায়িত্ব রয়ে গেছে—সে সম্বন্ধে আজ আবার নতুন করে ভাবনার সময় এসেছে

ডাকটিকিটের নকশা প্রতিযোগিতা

নতুন দিল্লীর ডাক ও তার দপ্তরের ডাকটিকিট সংগ্রহ শাখা একটি ডাকটিকিটে ব্যবহার করার জন্য '১৯৭৭-এ ভারতে গণতন্ত্র পুনঃস্থাপন' সম্পর্কে মৌলিক রঙীন চিত্রের নমুনা পাঠাবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

চিত্র বা নক্‌শার আয়তন ২০ সেঃ মীঃ × ১৫ সেঃ মীঃ হওয়া চাই। তাতে চিত্রকরের পুরো নাম ঠিকানা থাকা দরকার।

যাঁরা নক্‌শা নির্বাচক কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত হবে তিনি দেড় হাজার টাকা পুরস্কারস্বরূপ পাবেন।

প্রয়োজন হলে নির্বাচিত নক্‌শায় রদবদল করে নেওয়া হতে পারে। নির্বাচিত নক্‌শার ওপর ডাক ও তার বিভাগের সর্বৈব অধিকার সংরক্ষিত থাকবে।

সব নমুনা নীচের ঠিকানায় ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৮এর মধ্যে পৌঁছান চাই।

দি ডিরেকটার
ফিলোটিনি ব্রাঞ্চ অফ
দি পি অ্যান্ড টি ডিরেকটোরেট,
ডাক তার ভবন,
পার্লামেণ্ট স্ট্রীট,
নিউ দিল্লি-১১০০০১

ডিএভিপি ৭৮।২৫০

পিনাকী চট্টোপাধ্যায়

কোনদিন জঙ্গলে

।। ২ ।।

অন্ধকারেও টের পাচ্ছি গাড়ি কখনো এঁকেবেঁকে ওপরে উঠছে, কখনো নামছে নীচে। দু'ধারে গার্ড অব অনার দিচ্ছে ঝুপসি গাছের সারি। এই রাতে তারার আলোয় অরণ্য কেমন ছায়া-ছায়া। চাপা একটা আলোর আভা আকাশে। বোধহয় খানিক বাদেই চাঁদ উঠবে। প্রাক্তন ট্রাক ড্রাইভার প্রসাদ অতীতে বহুদিন বহুবার এই পথ দিয়েই কাগজ-কলের খালি বাঁশ গাড়িবোঝাই করে নিয়ে গিয়েছে। রাস্তা মুখস্থ। একটা তো পাথরের, অন্যটা ঘুমোচ্ছে কিনা কে জানে, পেছন থেকে প্রসাদের মুখ-চোখ দেখতে পাচ্ছি না। এখন রাত এগারোটা। ভীষণ। টায়ার্ড লাগছে। আজ রাতে আর দুর্গ দেখতে গেলাম না। কাল দেখব বলে বিয়াসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসেছি। কিন্তু কালও সন্ধ্যার আগে বিয়াসের সময় হবে না। ডালটনগঞ্জে যাবে। ভাই সই। স্পট লাইট আর টর্চের আলো তো আছে। আর যদি সাঝ-সকালেই কাল চাঁদ ওঠে, তাহলে তো কোন কথাই নেই।

চুপচাপ পাশে বসে খুব মনোযোগ দিয়ে নির্মল এতক্ষণ টর্চটা পরীক্ষা করছিল। কখনো জ্বালাচ্ছে। এবার মুখ খুলল : ধর যদি গিয়ে দেখি আর কেউ অপেক্ষায় বুক করে বসে আছে।

—কেন তুই বুকিং-এর আগে চার্ট দেখে নিসনি?

—নিয়েছি বলেই তো বললাম। বিহার গভর্নমেন্টের একজন অফিসার ফ্যামিলি নিয়ে উঠেছেন। আজ রাত আটটায় ওদের চলে যাওয়ার কথা। আমাদের বুকিং রাত আটটার পর।

ক্যান্সিত-ফ্যান্সিত সব উবে গেল। সোজা উঠে বসে জিজ্ঞাসা করলাম, যদি রাত হয়ে গিয়েছে বলে ভদ্রলোক ঘর না ছাড়েন, তাহলে?

পরম নিশ্চিন্তে সিটের পেছনে মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে বলল, তাহলে রাতটা এই গাড়িতেই কাটাতে হবে। অন্ধকারে কেউ কারো মুখ পড়তে পারছি না। পাশাপাশি ছায়ামূর্তির মত বসে। নির্মলের ব্যায়াম-পুষ্ট ছ' ফুট বাই সাড়ে তিন ফুট দেহটা পেছনের লম্বা আসনের আধখানার বেশি দখল করে আছে। আর মুখখানার ওপর একরাশ কুন্তল চুল ঝুলছে। পরনে ওর নিজস্ব ডিজাইনের নীল জিনের সাফারি স্যুট। সামনের সিটে প্রসাদের বাঁদিকে আমাদের সর্বস্ব দুটি কিট্ ব্যাগে গচ্ছিত। পাজামা, তোয়ালে, টুথপেস্ট ও ব্রাশ আর বাড়তি একজোড়া জামাকাপড় ছাড়াও শরীর ও অন্তরের কথা ভেবে আসার সময় নির্মল দু' ডজন মেক্সাফবম, দু ডজন ডাইরিন ও এক ডজন কোডোপাইরিন নিয়ে এসেছে। আপাতত ওষুধগুলো একটা কাগজের বাক্সে বন্দী অবস্থায় ওর কিট্ ব্যাগের কোণে পড়ে রয়েছে। বেড়াতে বেরিয়ে কোনরকম রিস্ক নেওয়া নির্মলের পছন্দ নয়। গাড়িটা রাস্তা ছেড়ে বাঁদিকে টার্ন নিয়ে শ'খানেক গজ হামাগুড়ি দিয়ে আস্তে একটা গেটের সামনে এসে থামল। দুদিকে তারকাঁটার বেড়া। প্রসাদ ক্রমাগত হর্ন বাজাচ্ছে।

মিনিট দুই কেটে গেল। গেট আর কেউ খোলে না। শেষ পর্যন্ত নির্মল নেমে গেল। তালা-ফালার কোন ব্যাপার নেই, সেফ্রেফ ভেজানো ছিল। কাঠের গেটটা হাট করে খুলে দিল। কিন্তু ততক্ষণে বাবোটা যা বাজার বেজে গিয়েছে। গাড়ি আর স্টার্ট নেয় না। ব্যাটারী ডাউন। প্রসাদ হ্যাণ্ডেল মারতেই ব্যাটারীর মৃগীরোগ সেরে গেল। ধোঁয়া ও গর্জন ছাড়তে ছাড়তে অ্যাম-বাসাডারটা শুঁকতে শুঁকতে এগুতে লাগল। চোখ অনেকটা সয়ে এসেছে। বাঁদিকে একতলা বাংলো বাড়ি। দেওয়াল সাদা। ডানদিকে ছোট ছোট খানকয়েক এককামরা। মাঝখানে বিরাট চত্বর। একটা গাড়ি এই চত্বরের মাঝখানে ঘুমুচ্ছে। প্রসাদ ওই গাড়িটার পাশে নিয়ে আমাদের গাড়িটা দাঁড় করাল।

ভোঁ-ভাঁ—কেউ নেই। অভ্যর্থনা তো দূরের কথা, বেমক্কা কোথা থেকে গোটা-দুই দিশী কুকুর চীৎকারে আকাশ ফাটাতে শুরু করল। ডাকবাংলোর বারান্দার ওধারে ঘরটার একটা মাটমেটে আলো। ভেতরে ঢুকে দেখি একটা ডাইনিং টেবিলের ওপর একটা হ্যারিকেন, টেবিলের চারধারে কয়েকটা ভীত মুখ। অধিকাংশই কিশোরী ও মহিলা, শুধু একজনের ঠোঁটের ওপর পুরুষ্টু আশ্বস্তোষী গোঁফ। নির্মল ওই স্যার আশুতোষকেই জিজ্ঞাসা করল : চৌকিদার রামদাস কোথায় বলতে পারেন?

কেউ কোন জবাব দেয় না। যেম দুটো ভূত সামনে দাঁড়িয়ে। বারকয়েক একই প্রশ্ন রিপিট করার পর স্যার আশুতোষ তোতলাতে তোতলাতে অনেক কষ্টে বললেন লাস্ট বামদাসকে দেখা গিয়েছিল সন্ধ্যাবেলা। ডাকবাংলোর রেজিস্টার-খাতাটা নিয়ে এসেছিল সেই কবাতে। তা রাত হয়ে যাওয়ার জন্য ওরা আজ যাওয়া পোস্টপণ্ড করে দিয়েছেন। সেই যে রামদাস উধাও হয়েছে আর পাত্তা নেই। রাতের ডিনার পর্যন্ত জোটেনি।

সঙ্গে সঙ্গে কেসটা টেক-আপ করল নির্মল। বলল, চ, খুঁজে দেখি।

বেশি খুঁজতে হল না, ডাকবাংলোর পেছনে মহুয়া গাছের নীচেই খুঁজে পাওয়া গেল। হাফ প্যাণ্ট, সাদা হাফ-হাতা গেঞ্জি, পাশে একটা খালি বোতল—সাড়ে চার ফুট রামদাস সর্বাঙ্গ অন্ধকারে ডুবিয়ে নাক-ডেকিয়ে ঘুমুচ্ছে। টর্চের আলো

চেখে পড়তেই লাপা-পোঁছা মুখের ওপর বাঁ চোখটা ঈষৎ কুঁচকে উঠল। আধখোলা এক চোখে আগন্তুকদের সাইজ আঁচ করছে রামদাস নির্মল একটা দশ টাকার নোট দিয়ে টর্চের মুখটা ঢেকে দিল। আধা অন্ধকারেও দেখতে পাচ্ছি চৌকিদারের বাঁ চোখটা পুরোপুরি খুলল। তারপর ডান চোখ। সবশেষে পুরু ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি।

বুকিং স্লিপ দেখল কি দেখল না, সগর্জন ঘোষণা উচ্চারিত হল—ঘর দিতেই হবে। রাত আটটায় ওদের বুকিং শেষ হয়ে গিয়েছে। আইনত একটা ঘর এখন আমাদেরই প্রাপ্য।

পাটনাই অফিসারকে ধমকে ধামকে ডাইনিং হলের বাঁ ধারের ঘরটায় সপরিবার পুরে দিয়ে তবে ছাড়ল রামদাস। ডান হাতি ঘরটা পেলাম আমরা। অর্ধঘণ্টার মধ্যে ডিনার এসে গেল—গরম মুরগীর মাংস আর হাতেগড়া রুটি। কি করে সম্ভব হল? নির্মল খাটো গলায় বলল : স্যার আশুতোষ যেটা অর্ডার দিয়েছিলেন সন্ধ্যেবেলা, সেটাই এখন আমাদের সার্ভ করল। তিনদিন ধরে ব্রেক ফাস্ট, লাঞ্চ, টি, ডিনার, স্নানের জল, গাড়ি ধোয়া পাগলা করে করে রামদাস যে পরিমাণ বখশিশ আশা করেছিল, তার সিকির সিকিও ঠেকান নি স্যার আশুতোষ। তাই সন্ধ্যাবেলা নিট একটা পাঁইট মহুয়া টেনে ফ্যাট হয়ে পড়েছিল। ওদিকে সেয়ানা—তুমি যতবড়ই অফিসার হও না কেন আদিবাসী কর্মচারীর গয়ে হাত দিলেই পাহাড়ে দাবানল লেগে যাবে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে ডবল খাটের একটায় টান টান হয়ে পড়তেই দেখি মুখ-সুদ্ধির মত দুটো ডাইনিং বডি গায়ে ফেলে নির্মল ডাইনিং হলের দিকে পা বাড়াল। হাতে টর্চ। শরীর আর মানছে না, চোখ বন্ধ হয়ে আসছে।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। বাইরে গাড়ির আওয়াজ। স্টার্ট নিচ্ছে। নির্মল ঘরে নেই। পাগলা কি এই রাতেই গাড়ি নিয়ে বেরোচ্ছে? তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে নামলাম। ডাইনিং হল ফাঁকা। হ্যারিকেনটা নিভু নিভু। ওপাশের ঘরের দরজা বন্ধ। বারান্দায় গিয়ে দেখি নির্মল কাকে যেন হাত নাড়ছে, আর বলছে, ফির মিলেঙ্গে। আর ডাকবাংলোর চত্বরে আমাদের গাড়ির পাশেই দ্বিতীয় গাড়িটা হেড লাইট জেলে গর গর করছে। স্টিয়ারিংয়ে স্যার আশুতোষ। রীতিমত গম্ভীর মুখ। গাড়িটা চলে গেল।

—কে হল রে? এত রাতে ওরা চলে গেল?

—না গিয়ে কী উপায় বল। তিনটে জান্ত ভূতের গপ্পোর পর এই ডাকবাংলো তো মূর্তিমান বিভীষিকা। তাছাড়া ওরা যে ঘরটায় ছিল এই সেদিন হোলির সময় কড়িকাঠে ধুতি খুলিয়ে আত্মহত্যা ডিটেলস্ বর্ণনা শোনার পর স্যার আশুতোষের স্ত্রী কন্যারা স্ট্রেইট জেহাদ ঘোষণা করল, এক মিনিটও নয়। চল এবার ওই ঘরটাও আমরা দখল করি।

আম, মহুয়া, বহেড়া গাছ দিয়ে ঘেরা এই ডাকবাংলো। ছোট একটা টিলার ওপর। উঁচু ভিতের গায়ে সাঁটা সাদা মার্বেল পাথরের ওপর কালো অক্ষরে খোদাই করা— সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০২৫ ফুট উঁচুতে এই বাংলো। বারান্দার সিঁড়ির দু ধারে দুটি ফুলন্ত নয়নতারা গাছ। খানিক দূরে ডানকাঁটার বেড়ার ওধারে একটা টেলার ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। ভ্যানের পেছনে একতলা টালি ছাওয়া একটা কোঠাবাড়ি। ভোরবেলা রামদাস চা দিতে এসে তথ্যটা দিয়ে গিয়েছে। গরম চায়ে চুমুক দিতেই ঘুম কেটে গেল। বিছানায় পড়ে থাকতে আর ইচ্ছে করছে না। বারান্দায় পায়চারী করতে করতে চারপাশ দেখছিলাম। পিচ বাঁধানো রাস্তাটা দূরে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে যেতে যেতে নেমে গিয়েছে। টিলার নীচেই খয়ের জঙ্গলের ভেতর একটা ইঁদারার সামনে সাতসকালেই কলসীর লাইন পড়ে গিয়েছে। চেরো, ওঁরাও রমণীরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে। ডাক বাংলোর দক্ষিণে তারকাটার বেড়ার ধার ঘেঁষে শুরু হয়ে গিয়েছে চেরো গ্রাম। রামদাস দ্বিতীয় কাপ চা ঢালছে। নির্মল এখনো ওঠে নি। জিজ্ঞাসা করলাম, চৌকিদার ওই টেলার ভ্যান আর কোঠাটা কার?

রামদাসের জবাব রীতিমত বিস্ময়কর। ভ্যানগাড়ি ও কোঠাবাড়ির মালিক কলকাতার এক মেম সাহেব। নাম তার অ্যান রাইট। শ্রীমতী রাইটকে আমি চিনি। ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ডের সদস্য, বন্যপ্রাণী প্রেমিক। রামদাসের জবানীতে—কলকাতা থেকে মেমসাহেব দলে দলে বিদেশী টুরিস্ট নিয়ে আসেন এই জঙ্গলে শের, ভালু দেখাতে। মাথা পিছু পাঁচ হাজার টাকা। অতিথিদের সাময়িক বাসস্থান ওই কোটা। ভ্যানগাড়িটা বধ। কখনো বেতলায় কখনো মধ্যপ্রদেশের কানহায় নিয়ে যান বিদেশীদের। চলাও ঘাবরার।

এই কানাবাবের কথাই গত রাতে বলছিল বিমল। ৯৩৬ বর্গ কিলোমিটার জোড়া এই বিশালত্ব ফরেস্ট রাজই আরো চল্লিশটি। বাইসন ৫০০, সম্বর ৫০০, চিতল, হরিণ ১১,০০০, বুনো শুয়োর ১৬,০০০, চিতাবাঘ ২০০, বুনো হাতি ৩৮, নীলগাই ৭৫, জংলী কুকুর ১০০, নেকড়ে ৫০, কুকিং তিমার ২০০, ভালুক ১০০ আর অগণিত ময়াল। গাছে মাটিতে গাছায় সর্বত্র ময়াল। তার এই অসামান্য বনসম্পদ দেখতে প্রতি বছরই হাজার হাজার টুরিস্ট আসে এই জঙ্গলে। গত বছর টুরিস্ট এসেছিল প্রায় বিশ হাজার। ফিরার মেনসন করে গেছে চামার বিমল বলল, এর মধ্যে পনেরো হাজারই কলকাতার বাঙালী। তোমাদের দুর্বিনয়ে সুখ ও পয়সা দুই পাওয়া যায়।

—কি রকম?

—একটা হিসাব দিলেই ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এই বিশাল জঙ্গলটা ফরেস্ট [illegible] ভাগ করা—চেতলা, ছিপাদোহর, পাল্লা ও বারেবাঁড়। এই বেতলা রেঞ্জেরই [illegible] খরচ সেখানে এক লাখ সত্তর হাজার টাকা সেখানে টুরিস্ট খাতে আয় আড়াই লাখ টাকা। আর এই যে ডেরো-মাথে বসে আছো এটা বানাতে খরচ পড়েছে সাতে সতের হাজার টাকা। এক বছরেই উসুল সাড়ে ছ হাজার টাকা। আর এই আয়ের ত্রিশী থেকে পঁচাশী ভাগ তো [illegible]

[illegible] বয়েছে অত বড় সুন্দরবন। টাইগার প্রোজেক্ট সারা দেশে আর কোন টাইগার প্রোজেক্টে এত বাঘ নেই যত আছে সুন্দরবনে, তবে দুশটি। আছে বারো রকম হরিণ, হুতোম চিতল হরিণ। অসংখ্য কুমির আর শুশুক ডলফিন। লক্ষ লক্ষ পাখী। এত অজস্র মধু ও মৌমাছি। সর্বোপরি দিগন্ত ছড়ানো নদী, মাঝে মাঝে [illegible] বর্জন, ধুধুল চরাঞ্চল। সবই [illegible] আর সব জঙ্গলে [illegible] চড়ে মোষ সম্ভব, [illegible] করে, বে-আইনি ভাবে [illegible] টাকে তুলে পালনো [illegible]—একেবারে [illegible] সুন্দরবনে [illegible] নৌকো ছাড়া ঢোকাই যায় [illegible] ধরনে সরকার বাহাদুর। [illegible] লোকালয়ে মাত্র পাঁচশো [illegible] মধু, কাঠ বা হরিণমাংসের [illegible] আড়াই লাখ টাকার লঙ্গর [illegible] মৌলিক লাভি হয়ে না। [illegible] খামতি ও সাহায্য ছাড়া [illegible] সাধ্য নেই যে সুন্দরবনের [illegible] গত পাঁচ বছরে ওই জঙ্গলের [illegible] পায় ত্রিশ লাখ টাকা [illegible] দিয়েছে দিনির। পাঁচ [illegible] ফরেস্ট [illegible] পড়ে [illegible] বিভিন্ন [illegible] ওইসব [illegible] বসে [illegible] [illegible] [illegible]

ছিপাদহ রেল গুমটির দিকে।' খেড় থেকে প্রায় পাঁচ মাইল। সঙ্গে সঙ্গী খেড়ের দুই ফরেস্ট গার্ড তুলসী মাহাতো আর ভগবান রাম। জলপাই রংয়ের ফুলপ্যান্টের ওপর একই রংয়ের শার্ট পরেছে রাম। মাহাতো হাফপ্যান্টের ওপর চড়িয়েছে একটা হাফ শার্ট, হাতে টাঙ্গি। বিকেলের মুখেই এসে পড়লাম রেল গুমটিতে। বেললাইন ধরে হাঁটছি। দু ধারে ঘন জঙ্গল। লাইনের ধারে ধারে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে অর্ধদগ্ধ শাল ও সেগুন। ইনজিনের জ্বলন্ত কয়লার কারবারি। দুরন্ত গরমে শুকনো আগাছার জঙ্গলে ছিটকে পড়ে যে আগুন জ্বালায় তারই পরশমণির ছোঁয়ায় প্রাণ হারায় প্রাণবন্ত সবল সব বৃক্ষ। ওই অরণ্য-শ্মশানের পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে চলেছি। খানিক বাদেই আমাদের সঙ্গে হাঁটতে শুরু করল শুকনো বালির খাদ। বর্ষায় ওই খাদই হয়ে ওঠে কোশিয়াড়া নদী। মাইলখানেক হাঁটার পর সামনে পড়ল একটি বেল-ডাঙ্গা। এই সাঁকোর মুখে কোশিয়াড়ার বালির খাদে এসে মিশেছে জাওনা নদীর মরা খাত। পশ্চিমের পাহাড় থেকে আসছে। দুই নদী আষাঢ় মাসে এক হয়ে লক্ষ লক্ষ কিউসেক জল বয়ে নিয়ে যায় কোয়েলে। বর্ষার কোয়েল ততটাই সাংঘাতিক, গ্রীষ্মে ততটা নরম ও শান্ত। সাঁকো পার হয়ে আমরা মেটো পথ ধরে বাঁ ধারের জঙ্গলে ঢুকলাম। বন দফতর এদিকে আর একটা বেতলা গড়ে তোলার কাজে হাত দিয়েছেন। দু'ধারে শুধু কুসুম গাছ। সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে টকটকে লাল ফুল। কুসুমের জঙ্গল পেরোতেই জমি গড়িয়ে নেমে গিয়েছে ঢালুতে। ঢালুর এক পাশে টিলা। টিলার পাথুরে গা ফাটিয়ে গজিয়ে উঠেছে আমলা, ধাউ, চিলবিল আর মহুয়া গাছ। টিলাটাকে বেড় দিয়ে বয়ে চলেছে একটা সরু নালা। অল্প অল্প জল থানা দিয়ে পড়ে রয়েছে। নালার ধারেই কাঠের ওয়াচ টাওয়ার। বিশ ফুট উঁচু। ঘোরানো কাঠের সিঁড়ি। রাম আর মাহাতো আগে আগে, পেছনে আমরা। বুনো ঘাস আর নরম ধাউয়ের গন্ধ বাতাসে। আমাদের দুই গাইড কথা বলতে নিষেধ করে দিয়েছে—নির্জনতায় অভ্যস্ত জীবজন্তুর কানের পর্দা নাকি ভীষণ স্পর্শকাতর। কিন্তু নির্মল আর থাকতে পারল না—একটা ভোঁতকা গন্ধ পাচ্ছিস?

ফিস ফিস করে বললাম—পাচ্ছি। কিসের বল তো? জবাবটা এল গাইড দুজনের মুখ থেকে। ওয়াচ টাওয়ারের সিঁড়ির মুখে ওরা দাঁড়িয়ে। সিঁড়ির নীচে কি যেন একটা জিনিস দেখছে। কাছে এগিয়ে গেলাম। একটা বুনো শুয়োর মরে পড়ে রয়েছে। কম করেও দেড় মণ। পাগুলো টান টান। চোখ গলে গিয়েছে। মুখটা ঈষৎ ফাঁক। কোথাও কোন আঘাতের চিহ্ন নেই। কে মারল এই জন্তুটাকে?

উত্তর পেলাম রাত আটটায়। এর মধ্যে দুই গার্ড রাম আর মাহাতো জঙ্গলের আদি-বাসীদের ডেকে, টাঙ্গি দিয়ে শালগুঁটি কেটে, বন্যজন্তুটার পা গামছা দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে ফিরে এসেছে ডাক বাংলোয়। রাম দাসের একচালার পাশের একটা বন্ধ মাটির ঘরে সব দেহটা শুইয়ে দিয়ে ছুটে গিয়েছে বেতলায়। খবর পেয়ে টাইগার প্রজেক্টের ডিরেকটর ব্রে পি সিং চলে এলেন। এক দিন বিকেলে উনি এসেছিলেন চেতলার ইনস্পেকশনে। সঙ্গে একজন ভেটারনারি ডাকতার। দুই বিশেষজ্ঞ ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন।' রাম একটা হ্যারিকেন উঁচিয়ে ধরল। মাহাতো একটা বাঁশ দিয়ে মৃতদেহটা উল্টে পাল্টে দেখাতে লাগলো। মিনিট দশেক। দেখেশুনে বিশেষজ্ঞরা রায় দিলেন বেচারার মৃত্যুর কারণ হোঁটখাটো কোন হাত বোমা। টাইগার প্রজেক্টের বিস্তীর্ণ জঙ্গলের ভেতরে ভেতরে গোটা পঁয়ত্রিশ গ্রাম আছে। হাজার ষোল বাসিন্দা। বাবো আনাই ওঁরাও, চেরো ও কিষাণ আদিবাসী। ক্ষেতের ফসল বাঁচানোর জন্য অনেক সময় আদিবাসী গ্রামবাসীরা মাঠের ভেতর হাতে বানানো বিস্ফোরক ছড়িয়ে রাখে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে বুনো আলু। লোভী শুকরশাবকটি না বুঝে গিলে ফেলে আর ওগরাতে পারে নি। মুখেই বারুদ ঠুসেছে। ওই অবস্থায় পাগলের মত ছুটতে ছুটতে জঙ্গলে ঢুকেছে।' ভেবেছে নালার জলে মুখটা ঘষতে পারলে জ্বালাযন্ত্রণা ঘুচবে। প্রায় পৌঁছেও গিয়েছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারে নি। নালা থেকে হাত দশেক দূরে ওয়াচ টাওয়ারের সিঁড়ির তলায় মুখ থুবড়ে পড়েছে। কর্তারা নির্দেশ দিয়ে চলে গেলেন।

ওই রাতেই রাম দাস গিয়ে পাশের গ্রাম থেকে চামার ডেকে নিয়ে এল। হ্যারিকেনের আলোয় দেখছি এক জোড়া ক্ষিপ্র হাত মৃতদেহের গা থেকে মুঠো মুঠো লোম ছিঁড়ে নিচ্ছে। আধ ঘন্টার মধ্যে ঘন কৃষ্ণবর্ণ দেহটা কেমন ন্যাড়া হয়ে গেল। তারপর একটানে গলা থেকে পেট ও তলপেট চিরে দিতেই ডাকবাংলোর মাঠটা ভ্যাপসা বোঁটকা গন্ধে পাগল করে দিয়ে নাড়িভুঁড়ি কলজে টলজে সব বেরিয়ে পড়ল। সব সাফ করে ভেতরে সের দশেক চুন ভরে দিল। তারপর অন্ধকারে দুই বন-সিপাহী রাম আর মাহাতো, চৌকিদার রাম দাস ও চামারের কাঁধের খাটিয়ায় ঝুলতে ঝুলতে পাকাপাকিভাবে বনের বাসিন্দা চলে গেল স্থায়ী আস্তানায়—বেরো গ্রামের প্রান্তে ওর জন্য তিন ফুট বাই দু ফুট মাটি খোঁড়া হয়েছে। আর কখনো কোন ক্ষেতে মুখ দিতে যাবে না।

মন খারাপ লাগছিল। বেরোতে ইচ্ছে করছিল না। নির্মল বলল, চ বেতলা ঘুরে আসি। বিয়াস অপেক্ষা করে থাকবে। বললাম, তুই যা, আমি একটু গড়িয়ে নি। কিন্তু রামদাস আর সে সুযোগ দিল না। দু বোতল মহুয়া টেবিলে রেখে বলল, চট করে মেরে দিন স্যার, সবরা দিন যা ধকল গেছে আপনাদের।

ফলিন্দর প্রসাদের মুখে টবচ ফেলে নির্মল বলল, খাঁটি মহুয়ার প্রভাব দেখ। খড়ের মাঠে বোঝাই তোবড়ানো গাল দুটো বেশ ফুলে উঠেছে। কপালে ঘাম। রাতে গাড়ি চালাতে কোন অসুবিধা হবে কি না—এই প্রশ্নের জবাবে প্রসাদ সাবা শরীর ঝাঁকিয়ে বলল, কিসের অসুবিধে। বরং রাত্তিরবেলা কম লরি চলে রাস্তায়, এখনই তো চালিয়ে সুখ।

বেতলায় ঢোকার মুখেই সাস্তা বন্ধ করে চেকনাকা। দু ধারে দুটো শালখুঁটির হাড়িকাঠ। তার ওপর লম্বালম্বি আর একটা শাল খুঁটি শোয়ানো। দিনে রাতে জঙ্গলে গাড়ি চলাচল বেসটিক্রট করার জন্য। চেকনাকার চৌকিদারের খাতায় গাড়ির নম্বর, টাইম, ডেসটিনেশন ও সই দেওয়ার পর বন্ধ সুবার খুলবে। আমাদের গাড়িতে খোদ বনকর্তা বিয়াস সিং। দরজা খুলে গেল। মূল রাস্তা ছেড়ে বাঁ ধারের পাহাড়ী পথ ধরে গাড়ি সতর্ক হয়ে এগোতে লাগল। টাল হাবালেই অনিবার্য পতন। আর পতন মানেই বিশ পঁচিশ ফুট নীচের খাদে পাকা ভুমি শয্যা। স্পট লাইট ফেলে বিয়াস জঙ্গল দেখাচ্ছে।' দু ধারে বন দফতরের হাতে পোঁতা দশ বিশ বছরের শাল জঙ্গল। গাছের মাথা থেকে মাথায় আলো ঘুরছে। দু-একটা নাম-না-জানা পাখি হঠাৎ আলোর ঝলকানি সহ্য করতে না পেরে বাসা ছেড়ে আকাশে ঝাঁপ দিল। সদ্য গজানো শাল পাতার গন্ধে বেশ একটা আমেজ। ঝটকা মেরে গাড়িটা থমকে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে গাছের মাথা ছেড়ে বিয়াসের স্পট নেমে এল মাটিতে। গাড়ির হেড লাইট আর স্পটের আলোয় দেখলাম পাইথন কুঁকড়ে কুঁকড়ে আড়াআড়ি রাস্তাটি পেরোচ্ছে। বড় বড় খয়েরী-সাদা চাকা চাকা দাগ। অন্তত দশ ফুট লম্বা। আমাদের গাড়ি থেকে তিন চার হাত দূরে। আমরা নিঃশব্দে বসে রইলাম। পাহাড়ী পথের ওপর ছোট ছোট পাথর, অল্প অল্প ঘাস। রাস্তাটা এবড়ো খেবড়ো। সাপটার মাথার দিকটা এক এক টনে খানিক এগোচ্ছে, পর মুহূর্তে দেহটা গুটিয়ে আসছে। বিশমিনিট লেগে গেল ওই সরু রাস্তাটা পার হতে। আস্তে আস্তে বাঁ ধারের শাল জঙ্গলে দেহটা অদৃশ্য হয়ে গেল। কানে এল বিয়াস বলছে—আমরা এসে গেছি।' ওই যে অন্ধকারে পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে আছে ওইটাই দুর্গ। চেরো রাজা মেদিনী রায়ের কেল্লা। লাস্ট সেঞ্চুরির গোড়ার দিকে বৃটিশদের সঙ্গে লড়তে গিয়ে রাজা সর্বস্বান্ত হয়ে যান। বৃটিশরা কামান দেগে দুর্গের ঘরবাড়ি মানুষজন সব উড়িয়ে দেয়। পারে নি শুধু ওই সদর দরজাটা গুড়াতে। সলিড পাথরের।' চওড়ায় চার হাত। শুনেছি এই দুর্গের পরিধি ছিল প্রায় দুই কিলো-মিটার। এখন এই দরজাটা ছাড়া আর কিছু নেই। ভেতরে ঘন জঙ্গল। ওই জঙ্গলে সব

প্রস্তুই আছে। বাঘও মাঝে মাঝে আসে। সবচেয়ে বেশি আছে ময়াল। নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়ায়। চল ওই দরজার মুখ পর্যন্ত ঘুরে আসি।

স্পটটা নিতে হলে ব্যাটারীটাও সঙ্গে নিতে হব। তা ওই বিশ কিলো মোট বইবে কে। তাই নির্মলের টবচটা নিয়ে আমরা নামলাম। রাস্তা এখানে শেষ। সামনে বড় বড় পাথরের চাঁই, ধাপে ধাপে ওপরে উঠে গিয়েছে। এগুলো পাথর নাকি পুরোনো কোন সিঁড়ির ভগ্নাবশেষ। ফাটলে ফাটলে হাঁটু সমান উঁচু লম্বা ঘাস। পাশে আমার স্যানড়েল। ঘাসের ডগায় পা লাগতেই গা শির শির করে উঠছে। এখনো চোখে ভাসছে ওই ময়ালের দেহটা। পাথরে পা রেখে রেখে টাল সামলাতে সামলাতে প্রায় বিশ ফুট উঁচুতে উঠে এলাম। সামনে বিশাল ফটক। সর্বাঙ্গ পাথরে মোড়া। দিল্লির রেড ফোরটের সদর দরজার আদল আসে। নির্মল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলো ফেলছে। আদিবাসী বলেই কি অসভ্য হয়? তাহলে সেই অসভ্যরা কেমন অসভ্য ছিল যে দু-তিনশ বছর আগে এই জঙ্গলে সত্তর আশী ফুট উঁচু পাথরের দরজা বানায়। এই বিশাল বিশাল পাথরের চাঁই কোন্ পাহাড় থেকে কি ভাবে টেনে এনেছিল এই জঙ্গলে? কোন সিমেন্ট দিয়ে জোড় মিলিয়েছিল, যা আজো অটুট? কামানের গোলাতেও কারু হয় নি। জামবাটি সাইজের বড় বড় গর্ত ওই ফটকের দেওয়ালে। একেবারে মাথায় দু'ধারে দুটি টোপর পরা ঘর—নহবৎখানা? না পাহারাদারদের পাহারদারীর অন্তানা? দেয়ালের খাঁজে খাঁজে চিত্র-বিচিত্র আঁকা। কারা এই পাথরের গায়ে ছবি কেটেছিল? কোন্ অস্ত্র দিয়ে? সেই শিল্পীরাই বা কারা? তবে কি অত্যন্ত উন্নত একদল মানুষের নেতা ছিলেন মেদিনী রায় ও তাঁর পূর্ব পুরুষরা। যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে পরাজিত প্রতিপক্ষকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে ব্রিটিশটা এদের অসভ্য আদিবাসী বলে গাল দিয়েছে? আর সেটাই আমরা মেনে নিয়েছি? আর সেই সর্বস্বান্ত গৌরবকে আত্মজনের ঘৃণার হা থেকে বাঁচাতেই কি পালামৌ পাহাড় থেকে অরণ্য নেমে এসেছে এই ভগ্নাবশেষে? কে জানে সেই অবলুপ্ত গৌরবেরই উত্তরসূরী এখন কেউ ডাকবাংলোয় চৌকিদারী করছে কি না? রাতে যখন বাংলোয় ফিরে এলাম দেখি রাম দাস বারান্দায় দাঁড়িয়ে। হাফপ্যান্ট গেঞ্জিতে ঢাকা ওই খর্বকায় মানুষটাকে দেখে বিশ্বাসই হতে চায় না যে এরই কোন পূর্ব পুরুষের নাম ছিল মেদিনী রায়।

(চলবে)

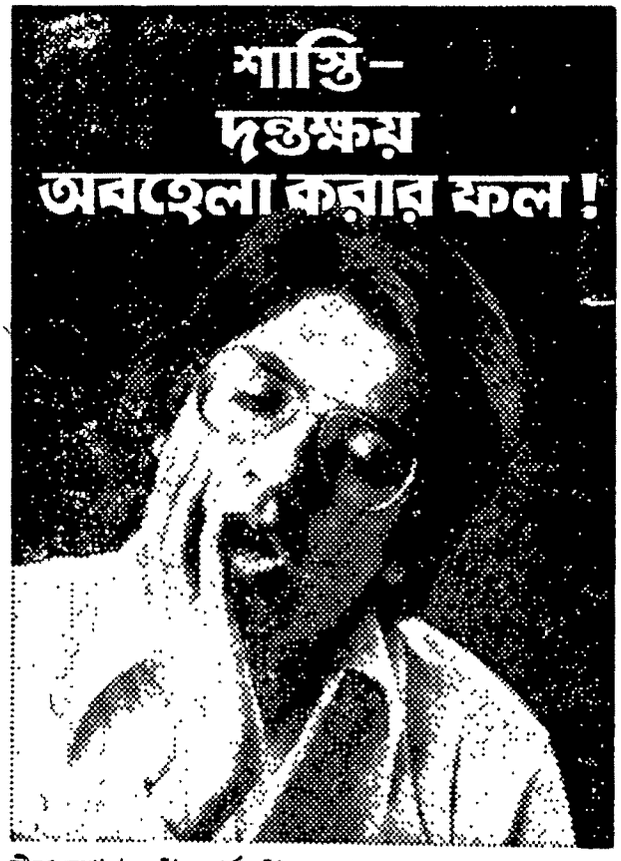

ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক দাঁতে গর্ত! দাঁতের রোগ! এর হাত থেকে বাঁচতে হলে আপনার দাঁতকে দন্তক্ষয়ের কবল থেকে বাঁচান। বিনাকা ফ্লোরাইড* ব্যবহার ক'রে দাঁত পরিষ্কার আর সুরক্ষিত রাখুন।

পৃথিবীময় পরীক্ষা ক'রে দেখা গিয়েছে যে, টুথপেস্টে ফ্লোরাইডই হল একমাত্র উপাদান যা দাঁতের এনামেলের সঙ্গে ঠিক ঠিক মিশে দাঁত মজবুত বানায় আর ক্ষয় হতে দেয় না। বিনাকা ফ্লোরাইডের দীর্ঘস্থায়ী গুণ দন্তক্ষয়ের জীবাণু জন্মাতে দেয় না আর দাঁতে যন্ত্রণাদায়ক গর্ত হতে দেয় না।

* এতে আছে সবচেয়ে কার্যকর ফ্লোরাইড কম্পাউণ্ড সোডিয়াম-মোনোফ্লোরোফস্‌ফেট।

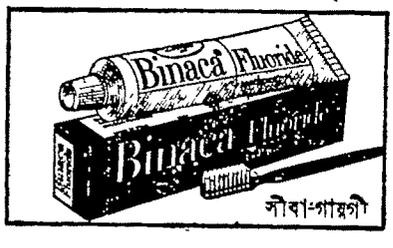

সীবা-গায়গী

বেশী মজবুত দাঁতের জন্যে, দন্তক্ষয় বন্ধ করার জন্যে—

বিনাকা ফ্লোরাইড

ভারতের সর্বপ্রথম ও সর্বোত্তম ফ্লোরাইড টুথপেস্ট।

U-BF 8/7 ben

শৈবাল মিত্র

তরণী পাহাড়ে বসন্ত

যেটুকু আশা টিমটিম করছিল, এক ফুঁয়ে সেটাও নিভে গেলো। ডাক্তারবাবু খবরটা দিলো—স্বাধীন জেলে। খবরটা বাবলু দিয়েছে। দিবাকরের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। এ কি করে সম্ভব? তার ছেলে জেলে! স্বাধীনও তাহলে রঞ্জনদের দলে ভিড়েছে। কথাটা সে বিশ্বাস করতে পারে না। আন্দাজ পায়নি কোনোদিন। যদিও ছেলেকে সে খুব কম বোঝে। কেমন যেন দূরের আবছা মানুষ মনে হয়। কলেজে পড়ে, শহরে থাকে, চালচলন আলাদা। কম কথা বলে। দিবাকরের কথাও একনিমেষে ফুরিয়ে যায়। নিজের মধ্যে কথা হাতড়ায়। যৎসই কিছুই মনে আসে না। দু' বছর এইভাবে চলছে। তবু স্বাধীন যে এইসব করবে, দিবাকর ভাবেনি। দু' চোখের সামনে অন্ধকার নাচে। পৃথিবী ঘুরে যায়।

ঝাপসা মাথায় মাঠ, জঙ্গল ভেসে ও ছুটতে থাকে। থানায় যাবে। বড়োবাবুর পায়ের সামনে ও লুটিয়ে পড়ে। মুখে গোঙানো—বাবু, বাঁচান। আমার বেটা জেলে।

বড়োবাবু প্রথমে বুঝতে পারে না। দিবাকরকে তোলে। দিবাকর হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে—বাবু, আমার সাতটা নাই, পাঁচটা নাই, ঐ একটাই, কোনোরকম ছাড়িন এনে দেন বাবু। আমি জানি—বাবু, স্বাধীন এসব কাজ করতে পারে না। তাকে মিছিমিছি ধরেছে বাবু। অনেক কথা তার গলায় দলা পাকায়। বলতে পারে না। গোঙাতে থাকে।

বড়োবাবু পা-টা সরিয়ে নিয়ে টেনে-টেনে বলে—এ তো বড়ো সাংঘাতিক কেসরে দিবাকর। বলে না, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। আর পুলিশ ছুঁলে চুয়ান্ন। আচ্ছা আমি সিউড়ি যাবো। দেখবো, কিছু করা যায় কিনা।

দিবাকরের কানে সব কথা ঢোকে না। ও একভাবে বকে যায়—স্বাধীন এসব কাজ করতে পারে না বাবু।

বড়োবাবু ওর কথায় আমল দেয় না। বলে—তুইও আজকাল তেলা সিকির মতো অচল হয়ে গেছিস। রঞ্জনের খবর বল। শুধু রঞ্জন নয়, পটল, শিবেন, ভোলা, পলাশ, নিতাই, পানু, ছিধর, কানু—সবাই যে তোদের গাঁয়ের। সকলকে তুই চিনিস। ও ব্যাটারা খুব ডেঞ্জারাস হয়ে উঠেছে রে। এক রাতেই দু' ডজন বন্দুক ছিনতাই করেছে। আর চাকরি রাখা যাবে না। মোতি কোথায়?

দিবাকর কথা খুঁজে পায় না। সে ভাবে, স্বাধীন কি কোনোদিন জেল থেকে ফিরবে? এ-খবর সে যমুনাকে কেমন করে বলবে।

কি রে, চুপ করে আছিস কেন—বড়োবাবু খেঁচায়—বেটার কাছে তুইও গুরুমন্তর নিয়েছিস নাকি?

দিবাকর আর শুনতে পারে না। কেঁদে ফেলে। কাঁদতে কাঁদতেই ঘরে ফেরে।

যমুনা আজকাল দিনরাত কাঁদে। গাল-মন্দ দেয়। বাপের পাপে ছেলে জেলে পচছে। অমন সোনার টুকরো ছেলে কারো ক্ষেতি করেনি। সে কষ্ট পাবে কেন? ভগবান তো কানা নয়। দিবাকরই দায়ী। লোকটা তার স্বামী না, শত্তুর। লোকের সব্বোনাশ করলে নিজের সব্বোনাশ হয়। দিনরাত দিবাকর কথা শোনে। একটা ভীষন কষ্ট বুকে পাক খায়। কার সব্বোনাশ করলো, ভাবতে চায়। মনে পড়ে না। মুখ গুঁজে খেঁচানি শোনে। সে-ও কাঁদে। তবে আড়ালে, যাতে কেউ না দেখে।

চারদিকে ধরপাকড় চলছে। প্রায় রোজ পুলিশভ্যান আসছে। সঙ্গে সি আর পি, সাদা পোশাকের তাগড়াই চেহারার লোক। ওরা এসেছে কলকাতা থেকে। কলকাতার উগ্রপন্থীদের ঠেঙানোর অভিজ্ঞতা আছে ওদের। মেরে পাট করে দিয়েছে। ঘরে ঘরে হানা দিচ্ছে। দিবাকরকে ঘর চেনাতে হয়। কোমরের বেল্টটা রোজ আলগা হয়ে যাচ্ছে। নেমে যায়। দু'হাতে টেনে তুলে ঠিক জায়গায় রাখার চেষ্টা করে। দুটো নতুন ফুটো করেছে। কষে বাঁধে। মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গায় চুপচাপ বসে থাকতে ইচ্ছে করে। সেখানে কেউ নেই। বৌ নয়, মাধু নয়। চোরা পায়ে মাতি আসে না। যমুনার কান্না, পুলিশের হুইশিল, সি আর পি-র বুটের শব্দ সেখানে পৌঁছোয় না। কিন্তু সেটা হয় না। দিনরাত পুলিশের সঙ্গে সমান কদমে ছুটে চলে। সে না থাকলে মাঠঘাটের হদিশ বাতলাবে কে!

স্বাধীনকে দেখতে ইচ্ছে হয়। যমুনাও যেতে চায়। হয়ে ওঠে না। মুখ ফুটে কথাটা বড়োবাবুকে বলতে পারে না। হয়তো সন্দেহ করবে। থানাতে গেলেই ইচ্ছেটা বুকের মধ্যে হাঁকপাক করে। বলি বলি করেও হয় না। মাঝে মাঝে লুকিয়ে ডাক্তারবাবুর ঘরে যায়। জগাই তিলির দাওয়ায় বসে তাদের সঙ্গে সেও কাঁদে। তারপর এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে জামার হাতায় চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে আসে। কিছুটা আরাম পায়। চোখের জলে বুকের খাতে মলম বোলায়। শিবেনের মা ও তার লুকোনো কান্নার ভাগীদার। দুঃখকষ্টের মধ্যে দিয়ে গাঁয়ের লোকের সঙ্গে সম্পর্ক আবার ঘন হয়। মনে হয়, এরাই অসময়ের বন্ধু। অনেকদিনের নাড়ীর যোগ। এই গাঁ, মাটি, এখানকার মানুষ, গাছপালা—সবকিছু যেন নতুন করে তাকে জড়িয়ে ধরছে। এরাই তার আপনজন। এরাই ঠিক। সে যা করে এসেছে সব ভুল। তার সমস্ত চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারণা পোকায় কাটা, ফোঁপড়া। শরীরে লাগানো খাঁকি পোশাকটা তাকে বুঝতে দেয়নি এসব। তার চোখের আড়ালে একটা বিরাট ফাটল জেগেছে। মাটি খসার শব্দ সে খেয়াল করেনি। বেহুঁশ মাতালের মতো শুধু ছুটেছে। সাপখোপে ভরা একটা মান্ধাতা আমলের বাড়ি পাহারা দিয়ে জীবনটা চলে গেল। আর দেরে না। মোতি, রঞ্জন, বাবলুরা যদি সবকিছু ভেস্তে দেয় তো দিক। তার কিছু হয়ে আসে না। মোতি

যদি মাধুকে নিয়ে যেতে চায়, সে আটকাবে না। থানার সঙ্গে, বড়োবাবুর সঙ্গে সম্পর্কের এখানেই শেষ।

অনেকদিন পর নিজেকে তার বড়ো হালকা লাগে। আসলে পরাশিয়ার ঘটনাটা তাকে ভীষণ নাড়া দিয়েছে। দিবাকর জানতো, ওরা হানা দেবে। শিবেন বলেছিল। কেন বলেছিল, দিবাকর জানে না। কিন্তু খবরটা সে কাউকে জানায়নি। বুকের ভেতরটা ফিকা হয়ে গেছে। সারাদিন ঘরবার করেছে। রাতে হৈ-চৈ, গুলির শব্দ যখন কানে এলো, তখন দাওয়ায় দাঁড়িয়ে ঠকঠক কেঁপেছে। হে ভগবান, আমায় বাঁচাও। আমি কি করবো, কোথায় যাবো? অন্ধকার আকাশে ঝাঁক ঝাঁক তারা। শুকনা পক্ষের চাঁদ। কোনো জবাব পায়নি। এখন তার পারাশিয়ায় যাওয়া উচিত। কিন্তু একদৌড়ে থানায় পৌঁছোনো দরকার। কোনোটাই করেনি। মাথার মধ্যে তখন ছেলের চিন্তা। স্বাধীন ছেলে। বড়োবাবুর সঙ্গে দেখা করে সবে ফিরেছে। খবরটা বৌকে দেয়নি। তার ঘরেও আগুন লেগেছে। অনেক জল দরকার। সে এখন কোথায় যাবে?

থানায় গেলে বড়োবাবুর সেই এক কথা—রঞ্জনকে ধরিয়ে দে। যেন রঞ্জন ধরা পড়লে স্বাধীন ছাড়া পাবে। রঞ্জনের জন্যে স্বাধীন জেল খাটছে। বড়োবাবুর ভাবভঙ্গীতে তাই মনে হয়। কিন্তু রঞ্জনের খবর সে কেমন করে জানবে। তার ডেরা, যাতায়াতের রাস্তা কি সে দিবাকরকে বলে গেছে। এই মাঠ, বনজঙ্গলের যে-কোনো জায়গা থেকে সে মাটি ফুঁড়ে উঠতে পারে। মাঝে মাঝে তার মনে হয়, শিবেন ছেলেটা নরম। গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে অনেক কথা জানা যায়। কিন্তু কেমন যেন কষ্ট হয়। জিজ্ঞেস করতে গলায় বাধে। তাছাড়া এখন আর একটা রঞ্জন নেই। অগুনতি রঞ্জন। তাঁতিপাড়া, দলুই, কাউড়ি, মালপাড়ায় ঘরে ঘরে রঞ্জনরা ছড়িয়ে পড়ছে। দিবাকর হাওয়া দেখে সব বোঝে। জল অনেকদূরে গড়িয়েছে।

জগাই তিলি বা শিবেনের মা তাকে বিশ্বাস করে। বসতে বলে। সুখ-দুঃখের কথায় একসঙ্গে চোখ মোছে। কিন্তু অন্ধকার নামলে যখন চারপাশ ঝাপসা হয়ে যায়, গাঁয়ের তাজা ছেলেগুলো চুপিসারে কুলিতে ঘোরে, তাকে দেখে কিছু লুকোতে চায়, তখন সে বুঝতে পারে, এরাও সব রঞ্জন। ডজন ডজন রঞ্জনকে সে চোখে দেখে। অথচ বড়োবাবু শুধু একটা রঞ্জনের জন্যে তাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে।

হঠাৎ যদি কোনোদিন সে রঞ্জনকে হাতের মুঠোয় পায়, কি করবে? থানায় ছুটবে, খবর দেবে বড়োবাবুকে। দিবাকরের মাথায় এই প্রশ্নটা হুল ফোটায়। রঞ্জনকে ধরলে স্বাধীন ফিরবে। বড়োবাবু আভাস দিয়েছে। স্বাধীনের ফেরা দরকার। ওর বুকটা লাফাতে থাকে। ভেতর থেকে আরেক দিবাকর বলে—তোমার শান্তি, তোমার সুখ, সুখের ঘর, ছেলে না ফিরলে ভেসে যাবে।

সংসারে অভাব ঢুকেছে। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই অভাব দেখছে। তার হাঁ রোজ বাড়ছে। জমিদার-বাড়ির সিংদরজা যেন ক্রমশ খুলে যায়। হাতি, ঘোড়া, লোকলস্কর তলিয়ে যাচ্ছে ভেতরে। সেই সঙ্গে তার ঘরের ঘটিবাটি, কাঁসার থালা যা দু'একখানা ছিলো, সব গেছে। খালি হাতে আজকাল কেউ ধার দেয় না।

মহাজনেরা হঠাৎ সকলে গোঁসাই হয়েছে। বলে—কস্মিনকালে আমরা ও ব্যবসা করিনি। এমনকি ওই পশুপতি কুণ্ডু পর্যন্ত বন্ধকী সাইকেলটা মিনিমাগনা ফিরিয়ে দিলো। পাওনা চল্লিশ টাকার কথা তুললো না। বললো—টাকা হলে ফেরৎ দিস। সুদ লাগবে না। দিবাকর চমকেছিল। তবে সে ঠকাবে না। সুদে-আসলে পশুপতির কর্জ শুধবে। ঋণ শোধ না হওয়া অব্দি সাইকেল ছোঁবে না। পশুপতি বুঝুক যে দিবাকর লোক খারাপ নয়। মওকা বুঝে চোট দেয় না। অভাবের সময় হাত পেতেছে। ধার শোধের দায়িত্বও তার। কেমন করে সংসার চলছে তাও সে জানে না। বাইরে খাটতেও যায় না আজকাল। কেউ ডাকে না তাকে। একা একা ঘুরে বেড়ায়। বেতাল, বেসামাল। দু'বেলা দু'মুঠো খায়। কোথা থেকে আসে, সে জানে না। যমুনা আর বাধু জানে।

পার্টি, গণফৌজ, বিপ্লবী কমিটি, এই তিনটে শব্দ দিনরাত থানায় বিজবিজ করে। পার্টি গড়ার কাজে কিশোর বেশি জোর দিতে চায়। তখনই ঝামেলা বাধে। পার্টি তৈরির পদ্ধতি নিয়ে তর্ক শুরু হয়। কম্যুনিস্ট কে? কম্যুনিস্টের সংজ্ঞা কি?

বরুণ বলে—শ্রেণী-শত্রুর রক্তে হাত না ভেজালে কেউ কম্যুনিস্ট হয় না। খতমের লড়াই, বন্দুক দখলের লড়াই চালাতে হবে। এ্যাকশানের মধ্যে দিয়েই পার্টি তৈরি হবে। ঘটনা ঘটাও, বন্দুক ওঠাও।

কিন্তু পার্টি না থাকলে এ্যাকশান হবে কি করে—কিশোর যুক্তি দেয়।

সিধ নদীর পাশে শালের বন। কিছু আগে সন্ধ্যে হয়েছে। ঠাণ্ডা হাওয়া। বর্ষার নদীতে স্রোতের শব্দ। হাওয়ায় ভিজে পাতার গন্ধ। এই জঙ্গল একটানা রাজপুর-হাট ছুঁয়ে দুমকায় মিশেছে।

বেশ বড়ো আকারের সভা। জেলার প্রায় সব থানার প্রতিনিধি আছে। চনমনে উত্তেজনা। সুরেনদা এসেছে। সুরেনদা বিজিওনাল কমিটির একজন দায়িত্বশীল নেতা। পার্টির সাফল্যের হিসেব দিলো।

সবচেয়ে বড়ো কাজ, পুলিশের ইন্টেলিজেন্স আমরা ভেঙ্গে দিয়েছি। তারা

আমাদের কোনো হদিশ পাচ্ছে না। যেটুকু পাচ্ছে ভুল, ভুয়ো। খামোকা হয়রানি হচ্ছে ওদের। ফিজিক্যাল ইনটেলিজেন্স চালু করেছে। ধড়পাকড়, মারধোর করে জেরা চালাচ্ছে। লাভ হচ্ছে না, বরং ওদের শত্রু বাড়ছে। কলকাতা থেকে এক-জন জাঁদরেল গোয়েন্দা অফিসার এসেছে। এখন তার বুদ্ধিতেই ওরা এগোবে। পুলিশকে একতরফা ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কলকাতায় সর্বদলীয় সম্মেলন এই ক্ষমতা মঞ্জুর করেছে। তবে কয়েকটা ব্যাপারে সাবধান হতে হবে। পার্টির নামে ডাকাতি হচ্ছে। এটা বন্ধ করা দরকার। প্রয়োজন হলে আমাদের গোপন ইস্তাহার ছড়াতে হবে! শহরেও দমদাম এ্যাকশান আমরা বন্ধ করতে চাই। পার্টির মধ্যে পুলিশ লোক ঢোকাতে চাইছে।

সুরেনদা এক লহমা থামে। আবছা অন্ধকারে মানুষদের মুখ দেখা যায় না। একটা হিম হাওয়া ঘুরে বেড়ায়। জানহাতে বনকেপাসির ঝোপ। ঝাঁক ঝাঁক ফুল ফুটেছে। জবাফুলের মতো ঘন লাল রঙ। মিষ্টি গন্ধে বাতাস ভারি।

সুরেনদার শরীরে দারুণ জ্বর। মুখে কপালে হারপিস হয়েছে। চাকা চাকা লালচে ফোস্কা। মাথাজোড়া টাক। সেখানেও দু-একটা হারপিসের ক্ষত। কথা বলার সময়েও সুরেনদা একনাগাড়ে টাক খুঁটছে। মাঝে মাঝে কথা হারিয়ে যাচ্ছে। বছর পঞ্চাশ বয়েস। দেখে মনে হয় জরা-জীর্ণ বৃদ্ধ। এই জেলাতে অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। গলার স্বর নীচু মোলায়েম। এক নজরেই বোঝা যায় যুক্তি-তর্কের মানুষ। বোধহয় সে-কারণেই দুটো দাদা কম্যুনিস্ট পার্টিতে জায়গা হয়নি।

পকেট থেকে কি একটা ট্যাবলেট বার করে বুদ্ধদেব সুরেনদাকে দিলো। সেটা খাওয়ার জন্যে বরুণ মাঝি এক গ্লাস হাঁড়িয়া ঢালে। সুরেনদা ছোঁয় না। শুকনো মুখে ওষুধটা গিলে নেয়। বুদ্ধ-দেব বিশ্বভারতীর ছাত্র। বোলপুরের ছাত্র-নেতা। সুরেনদার সঙ্গে এসেছে।

বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বিহারের সঙ্গে আমাদের জেলার বর্ডার সিল করে দেওয়া হয়েছে। খবরটা জেনে রাখা ভালো। সুরেনদা আবার শুরু করে। গলায় কষ্ট, ক্লান্তির ছাপ। আমাদের প্রায় চারশো কর্মী ধরা পড়েছে। মারা গেছে এগারো-জন। সরকার প্রতিরোধ হিসেবে বন্দুক চালাবার ঢালাও হুকুম দিয়েছে। সিউড়িতে প্রফুল্ল সেন তাঁর লোকজনদের নিয়ে শান্তি শিবির খুলেছেন। ক্ষেতমজুরদের তিনি বোঝাচ্ছেন, জোতদাররা মজুরীর হার এক টাকা থেকে বাড়িয়ে দেড় টাকা করেছে। সেই সঙ্গে একটা খোরাকি পাল্লা সপরা মুড়ি। জোতদার, ক্ষেতমজুর ভাই-ভাই।

মিনিমাম ওয়েজেস করলেও মানে না—বুদ্ধদেব ফুট কাটে।

কার হয়ে উনি কথা বলছেন—বরুণ মাঝি জিজ্ঞেস করে। জোতদারের হয়ে—সুরেনদা বলে—ফসল কাটার সময় এগিয়ে আসছে। বড়োলোকরা বেশির ভাগ ভয়ে গ্রামছাড়া। অথচ মাঠভর্তি ধান। নোলা ছলছল করছে। প্রফুল্ল সেনকে শিখণ্ডি রেখে ওরা গাঁয়ে ঢুকতে চায়।

সেটি হতে দিবো না বটে—রবি হাঁসদা ফুঁসে ওঠে—হুল শুরু হয়ে গেইচে। সব ফসল আমাদের।

সাংগঠনিক আলোচনা শুরু হয়। মাথার মধ্যে দিনরাত ঘুরপাক-খাওয়া চিন্তা গুলো কিশোর ব্যাখ্যা করে। পার্টি, গণ-ফৌজ, বিপ্লবী কমিটি। পার্টি গড়তে হবে। সে অর্থে এখনো পার্টি তৈরি হয়নি। শৃংখলা, কেন্দ্রিকতার অভাব। বড়ো বেশি ঢিলেঢালা, স্বতঃস্ফূর্ত চেহারা। এভাবে চলতে পারে না। কিশোর থামে। অন্ধকারে সিধ নদীর ছলছল শব্দ। পেছনে অরুবছা তরণী পাহাড়। জঙ্গলের মুখে লোকালয়। টোরা গ্রাম। এই ভর-সন্ধেতেও অন্ধকার। কথাবার্তার ফিকে শব্দ, কুকুরের ডাক শোনা যায়। শাল-পাতার ধোঁয়ায় বীর সিং ভিলা ফলের গরম তেল আনে। নদীর পাড়ে বসে এতোক্ষণ ও সুরেনদার জন্যে তেল গরম করছিল। ভীলার তেল, ঘা, দরদে বড়ো আরাম দেয়।

বরুণ বলছিলো—পার্টি আছে। গণ-ফৌজ গড়তে হবে। গণফৌজ ছাড়া জন-গণের কিছুই নেই। গণফৌজের ভ্রূণ গেরিলা স্কোয়াড। খতম অভিযানের মধ্যে দিয়েই গেরিলা স্কোয়াড তৈরি হবে। এখন মূল কাজ খতমের লড়াইকে তীব্র করা। জমি, ফসলের ওপর অধিকার রাখতে গেলেও খতমের লাইন আঁকড়ে থাকতে হবে।

বরুণের বক্তৃতা সভা মাৎ করে। ওর প্রস্তাবে জমি আর ফসলের গন্ধ মাখানো।

গেরিলা স্কোয়াডই জোতদার, মহা-জনকে গাঁ-ছাড়া করতে পারে। গাঁয়ের গরীব মানুষেরা সেটা জানে। পার্টির ভূমিকা তাদের বোঝানো হয়নি। শুধু গেরিলা অ্যাকশানের তাপ দেওয়া হয়েছে। হাতেনাতে ফলও কিছু মিলেছে। প্রত্যেকটা এ্যাকশানের পর উৎসব লাগে। মেলা বসে যায়। গরীব মানুষ নিজস্ব ক্ষমতার স্বাদ পায়। কিশোর বোঝে, তার যুক্তি ধোপে টিকবে না।

বরুণকে সমর্থন করে বাবলু বক্তৃতা করলো। মায়াশোল, ইলামবাজারের কম-রেডরা বরুণ আর কিশোরের বক্তব্য মিলিয়ে অদ্ভুত জগাখিচুড়ি পাকালো। তাদের বক্তৃতা কেউ বুঝলো না। বুদ্ধ-দেব সমর্থন করলো কিশোরকে। বজ্রদা হঠাৎ চটে গিয়ে সুরেনদাকে এবহাত নিলো। কিছু কিছু গেরিলা এ্যাকশানের নামে পুরোনো লাইন চলছে। দু-চার হাজার মানুষের ভিড় জমিয়ে গেরিলা স্কোয়াডের দায়িত্ব ও ধার মেরে দেওয়া হচ্ছে। এটা ঠিক নয়। সংশোধনবাদী ধারণা থেকেই এগুলো হচ্ছে। এর মধ্যে বাহাদুরি নেওয়ার চেষ্টাও আছে। যেমন সিউড়ির বনশল্কা গ্রামে গত হপ্তায় দু হাজার লোক অ্যাকশান করেছে। অ্যাক-শানের পর গানবাজনা, সভা, ভূরিভোজ হয়। এই ধরনের ঘটনা পার্টির গেরিলা যুদ্ধের নীতি-বিরোধী। বজ্রদা এক পলক সুরেনদাকে দেখে।

বনশল্কা গ্রাম এবং এই চৌহদ্দির নেতা সুরেনদা। গত পঁচিশ বছর সুরেনদা ওখানকার কৃষকদের সুখ-দুঃখে জড়িয়ে আছে। বজ্রদার ধারালো আক্রমণে সুরেনদা সাড়া করে না। বোধহয় জ্বরে, জ্বালায় খুবই কাহিল। বজ্রদার সব কথা ওর কানে যাচ্ছে না। আধবুড়ো লোকটাকে অন্ধকারে কেমন ভাঙাচোরা ছায়ার মতো দেখায়। মোতি নীচু গলায় জিজ্ঞেস করে—শরীরটা কি খুব খারাপ লাগছে? সুরেনদা তাকায়। অন্ধকারে চোখের মণি-দুটো কেমন ঘোলাটে লাগে। মোতির হাঁটুর ওপর একটা হাত রেখে সুরেনদা হাসে। সুরেনদার হাতের চেটোয় তপ্ত চাটুর ভাত।

রাত বাড়ে। অন্ধকার ঘন হয়। আলোচনা থামে না। অজস্র জটিলতা, জিজ্ঞাসা। লড়াই যতো বাড়ছে, ছড়াচ্ছে, ততো নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এসব সমস্যা আন্দাজের বাইরে। আগে ভাবা যায় না।

তার ওপর গাঁয়ে অভাব বাড়ছে। ঘরে ঘরে চালের হাহাকার। জোতদাররা গাঁ ছাড়ার পর চাষীদের মুনিষ-মাহিন্দরের কাজ পর্যন্ত নেই। বাগাল নেওয়া বন্ধ। ফলে প্রত্যেকটা অ্যাকশানের পর বাড়ো-লোকদের বাড়িতে লুঠতরাজ করার জন্যে গরীব মানুষগুলো ছটফট করে। দু বিশ ধান, সামান্য নুন, একটা পুরোনো ধুতি-শাড়ির জন্যে ঠান্ডা লড়াই চলে। জোতদার, মহাজনরা কম চালু নয়। গাঁ-ঘর ছাড়ার আগে ধান-চাল হাওয়া করে দিয়েছে। অধিকাংশ বাড়িতে এক বিশ ধান-চাল মেলে না। ভাতের মার বড়ো মোক্ষম, এটা ওরা জানে।

বজ্রদা বক্তৃতা চালিয়ে যাচ্ছে। অনেকে দখল-করা বন্দুক নিয়ে কেন্দ্রীয় ফৌজ গড়ার কথা ভাবছে। এটাও ভুল, পার্টি-বিরোধী। এখন শুধু গেরিলা আক্র-মণের ঢেউ উঠবে। নতুন মানুষ তৈরি হবে। তাদের নিয়ে হবে গণফৌজ। কিছু আগেই সুরেনদা বন্দুক ব্যবহারের কথা বলেছে। সুরেনদার বিরুদ্ধেই বজ্রদার কটাক্ষ।

কিন্তু এতো বন্দুক করবো কি রাখবো কোথায়—মোতি প্রশ্ন করে।

আপাতত লুকোনো থাকবে—বজ্রদা জানায়—তালগাছের মাথায়, পুকুরে, মাটির তলায়।

ঘাঁশিতে দশাই সিরিং-এর সুর বাজাচ্ছিল মগন টুডু। মগন সবে কুড়ি পেরিয়েছে। অন্য পাঁচজন সাঁওতালের সঙ্গে ওর চেহারার খুব একটা ফারাক নেই। তবে ওর নাকি চোখে কাজ করার বুদ্ধি আছে। বছর বারো বয়েস থেকে [illegible] টোরা থেকে

ভারত ও জার্মানী
সহযোগিতার একটি আদর্শ

ভারত ও ফেডারেল প্রজাতন্ত্রী জার্মানীর কূটনৈতিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে গত ২৫ বছরে একটি উচ্চ শিল্পোন্নত দেশ এবং তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশের মধ্যে সহযোগিতার একটি আদর্শ চরিত্র গড়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান এই বিশেষ সম্পর্কটিকে পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

১। বাণিজ্য	১৯৬১ ডিএম/মিলিয়ন	১৯৭৭ ডিএম/মিলিয়ন
জার্মানীতে ভারতীয় রপ্তানী	২২২.৯	৭৮৬.৩৩
ভারতে জার্মানী থেকে আমদানী	৭৮০.০	১১৪০ ৭৪

ভারত-জার্মান বাণিজ্যিক ঘাটতির পরিমাণ ভারতের অনুকূলে প্রায় অর্ধেক হয়ে এসেছে।

২। বিকাশমূলক সহযোগিতা	১৯৭২/৭৩ ডিএম/মিলিয়ন	১৯৭৭/৭৮ ডিএম/মিলিয়ন
দ্বিপাক্ষিক সরকারী আর্থিক সহায়তা (আন্তর্জাতিক বিকাশ সংস্থার শর্তে প্রদত্তঃ ৫০ বছরে পরিশোধযোগ্য, ১০ বছরের ছাড়সহ ০.৭৫ টাকা সুদে)	২৮০	৩৬০
বহুপাক্ষিক সহযোগিতা		২৭৩.৫ (সাকুল্যে ১৯৭৬ পর্যন্ত)
বেসরকারী লগ্নী		১৭৮.৫ (সাকুল্যে ১৯৭৬ পর্যন্ত)

৩। সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষা সম্পর্কী বিনিময়

ভারতে অবস্থিত ৩টি মাক্স মুলার ভবন ভারত ও জার্মানীর মধ্যে গভীরতর সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার কাজে সক্রিয় থেকে ২০ বছর পূর্ণ করেছে। প্রযুক্তিবিদ্যা এবং উচ্চতর শিক্ষার জন্য জার্মান শিক্ষা বিনিময় পরিসেবা বৃত্তি প্রদান করেছে। জ্ঞানের বিনিময়, গবেষণা প্রকল্পগুলির সংগে সহযোগিতা এবং মাদ্রাজস্থিত ইণ্ডিয়ান ইনস্টিট্যুট অফ টেকনোলজি-কে প্রদত্ত সরাসরি সহযোগিতা এত উল্লেখযোগ্য হয় যে, আই আই টি, মাদ্রাজ, জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রী গেনশার-কে 'ডক্টর'-এর সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত করে।

দি ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানী
এক নির্ভরযোগ্য সহযোগী

ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানীর কনসুলেট জেনারেলের তথ্য ও সংবাদ বিভাগ
৯, হেস্টিংস পার্ক রোড, কলিকাতা-২৭ কর্তৃক প্রচারিত।

বিলকান্দি যাওয়া-আসা দশ মাইল। আরো কিছুকাল স্কুলে পড়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু হয়নি। ঘরে অভাব। বাড়ির কাজ, চাষের কাজ মার খায়। স্কুলের বই-খাতা আজও মগন যত্নে তুলে রেখেছে। ধুলো ঝাড়ে, হাত বুলোয়। সময় থাকলে শালবনের আড়ালে বই খুলে বসে। গান, বাজনা, যাত্রা ঝুমুরের ও খুব ভক্ত। কোথাও আসর বসার খবর থাকলেই মগন বাড়ি ছেড়ে হাওয়া। ওর খুব শখ যাত্রাদলে বাঁশি বাজাবে। অজিতের সঙ্গে এতোক্ষণ এসব কথাই হচ্ছিলো। তু হাল ধর, একটো আলকাপের দল বানাই—মগন বলে—তু শিখাবি বটে।

অজিত সায় দেয়—ঠিক আছে। আমরাই পালা লিখবো। গাঁয়ে গাঁয়ে দেখাবো।

অন্ধকারে সিধ নদীর ঘোলাটে জল রঙ বদলায়। নদীর এই দিকে জঙ্গল পাতলা। টোংরার মানুষজন এখানে চান করে, জল নেয়। পায়ে পায়ে তৈরি রাস্তা। একটা মস্তো কালো পাথরের চাঁই নদীর জলে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। ওটাই ঘাট। চারপাশে বনকলমী, ভ্যারেণ্ডার ঝোপ। কয়েকটা বেঁটে তেঁতুলগাছ আর কেসাব ঝাড়। একটা ঝোপের আড়ালে ওরা পাশাপাশি বসেছিলো। এখান থেকে নদীর ওপর পরিষ্কার দেখা যায়। ওপারের মেটে রাস্তা, দু-একটা গরুর গাড়ি, তীরে লাগানো একটা নৌকো অজিতের চোখে পড়ে। গাঁয়ে ঢোকার এই একটাই সদর রাস্তা। রামপুর-হাট দিয়েও ঢোকা যায়। কিন্তু কোনো পথ নেই, গভীর জঙ্গল।

কড়া, সতর্ক নজরে অজিত পাহারা দেয়। লড়ায়ের এলাকায় কমরেডরা এসেছে। জরুরি সভা বসেছে। তার ঘাড়ে ঘাঁটি আগলানোর দায়িত্ব। গাঁয়ের লোকেরাও সভার খবর জানে। তারাও সজাগ আছে। দীনু মাণ্ডি গেছে গাঁ থেকে একটু গরম জল আনতে। চা হবে। রঞ্জন চা এনেছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক হলো দীনু গেছে। এখনো পাত্তা নেই। অজিত ভাবে, হয়তো হাঁড়িয়ার আসরে জমে গেছে।

আকাশে দু-একটা তারা জাগে। পেছনের শালবনে একটা পিঅই পাখি শেষ-বারের মতো শিস্ বাজায়। মগন বলে—পেড় আসবে বটে।

ঠিক তখনই ঘাসপাতা ঢাকা জমিতে চুপ চুপ পায়ের শব্দ ওঠে। অজিত ঘুরে হাসে। ভিনগাঁয়ের একটা মেয়ে বাড়ি ফিরছে। হাতে ছোটো পুঁটলি। ফ্যাকাশে আলোয় তার শরীরটা আবছা দেখা যায়। বয়েস কম। তেজী শবডাঁটার মতো ছিপ-ছিপে শরীর। মগন বাঁশিতে ভোর। সে দেখে না। মেয়েটা মগনের দিকে তাকিয়ে হাসে। অজিতকে খেয়ালই করে না। এবার মগন তাকে দেখতে পায়। বাঁশি হাতে লাফিয়ে ওঠে। ঘুঙরি তু কুথা গেঁইচিলি—জিজ্ঞেস করে।

নানার ঘরকে গেঁইচিনু—ঘুঙরি বলে—তিন রোজ থাকনু। এখন ফিরতে লাগচি।

ঘুঙরি কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ওদের চোখের ভাষায় বিদ্যুৎ নাচে। অজিত ঘুঙরির নাম শুনেছে। কখনো দেখেছে কিনা খেয়াল নেই।

মেয়েটা খুব চটপটে, সাবলীল। বোঝা গেলো অজিতকে চেনে। ওদের পাশেই বসে পড়লো। ডানদিকে খানিকটা নাবাল জমি। তারপর উঁচু ডাঙা। মকাই-এর ক্ষেত ক্ষেতের প্রান্তে তিনহাত উঁচু ঢোকা। মাথায় খড়ের ছাউনি। ভেতরে রাত-পাহারার মানুষ থাকে। হামা দিয়ে ঢুকতে বেরোতে হয়। ঘুঙরি আর মগন কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে বসেছে। নীচু গলায় কথা বলছে, হাসছে। ঘরে ফেরার কথা মনে নেই। আজ হয়তো ফিরবেও না। সিধ নদীর ওপারে অন্ধকার ডানা বাঁধে। নদীর জল, পারের ঘাটি, রাস্তা, গাছপালা এখন একাকার। কিছুই দেখা যায় না। কয়েকটা জোনাকি আকাশ থেকে নেমে আসে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় তিহেবাহার গন্ধ। বড়ো ঝাঁঝালো সুবাস। কোথায় ফুটেছে কে জানে। আশ-পাশে তিহেবাহার কোনো ঝোপ চোখে পড়েনি। একহাত লম্বা ফুল। আনারস গাছের চেহারা। চোখে লাগে। হয়তো অনেক দূরে জঙ্গলে ফুটেছে। তিহেবাহার গন্ধ এক মাইল দূরেও ছুটে যায়।

মগন নীচু গলায় অজিতের কানে কি যেন বলে। অজিত তাকায়। মগনের মুখে লজ্জা, আকুতি। ও একটু ছুটি চায়। ঘুঙরিকে নিয়ে ঘণ্টাখানেক ঢোকায় শোবে। অজিত প্রথমটা বেগে যায়। কিন্তু ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তেই রাগ গলে জল। কোনো অপরাধবোধ বা গ্লানি নেই। সবল নিরীহ দুটো শিশু যেন খেলার ছুটি চাইছে। অজিত জানে, আর কেউ থাকলে মগন মুখ খুলতে সাহস পেতো না। কিছু সময় ছটফট করে চুপ-চাপ কেটে পড়তো। অজিতের সঙ্গে আলাদা সম্পর্ক। গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের কাছে সেও মাঝির সন্তান, সাতপুরুষের মাঝি।

অজিত বলে—যা। চটপট ফিরবি।

ওরা দুজনে হাত-ধরাধরি করে উঠে যায়। অন্ধকার মেঠো পথে দুজন যুবক-যুবতী নাচের তালে হাঁটছে। মগনের পিঠে রাইফেল, হাতে বাঁশি। ঘুঙরীর খোপায় গাঢ় লাল মেরগ-ঝুঁটি ফুল। ওরা দুজন হামা দিয়ে ঢোকায় ঢোকে।

হাওয়ায় শালের পাতা নড়ে। নদীর জলে কুলকুল স্রোত। জলে, পাতায় সাংকেতিক কথাবার্তার ধ্বনি।

কে তুই ?

আমি কানু, এ আমার দেশ।

কে তুই ?

আমি সিদু, এ আমার দেশ।

গুলিভরা রাইফেলটা তুলে অজিত ঝোপের বাইরে আসে। একটা বিরাট তেঁতুলগাছের আড়ালে বসে। চারপাশে তখন ঘন অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। তবু জঙ্গলে ঢোকার এই মুখ আগলাতে হবে। মিটিং শেষ হতে হয়তো রাত কাবার হবে। আগেও শেষ হতে পারে। মাঝখানে একবার খাওয়া-দাওয়া। খুদ ব্যাঙের ছাতার খিচুরি। সঙ্গে মেটে আলু পোড়া। কিস্তা আর ভাদু গিয়েছিলো বুনো ইঁদুর খুঁজতে। পেয়েছে কিনা অজিত জানে না।

আজকের সভা খুব জরুরী। আপাততঃ এটাই হয়তো শেষ সভা। অবস্থা ঘোরালো হচ্ছে। এতোজন মিলে এভাবে আর বসা যাবে না। যোগাযোগ করাও মুস্কিল। বিশাল এলাকা জুড়ে কাজ। গাড়ী ঘোড়া নেই। ধু-ধু ফাঁকা মাঠের মধ্যে পাঁচ দশ মাইল অন্তত একটা গরম। বর্ষার সময়ে দুর্গম। তার উপর পুলিশ মিলিটারি, প্রতিরোধ বাহিনী জোট বাঁধছে। একটা ভয়ানক লড়াই শুরু হতে চলেছে। সকালের দিকে সুরেনদার মুখে অজিত অনেক খবর পেয়েছে। কিছু একটা ভুল হচ্ছে, খুব সূক্ষ্ম অথচ মারাত্মক গলদ। ধরা যাচ্ছে না। অজিত তার ভাবনাটা সুরেনদাকে বলেছিলো।

সুরেনদা সায় দিয়েছিলো—ভুলটা কি জানি না। আমাদের গোটা কর্ম-কাণ্ড এবং নেতৃত্বকে চীনের পার্টি সঠিক বলেছে। তাদের কথা না মেনে উপায় কি। সুরেন-দাকে অসহায় দেখায়। আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের মতামত উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

অজিতের ঘুম পাচ্ছিলো। কাল রাতে খুব চাপ পড়েছে। এক রাতে বিশ মাইল রাস্তা যাতায়াত করেছে। আমেদপুর থানায় অ্যাকশান ছিলো। তার আগে তাঁতিপাড়ায় সভা, শোভাযাত্রা, মোলসে বাজনগর, সিউড়ি টাউন কমিটি উদ্যোগ নিয়েছিলো। বকেশ্বরে একটা ছোটো-খাটো মেলা ছিলো। অনেক লোক সমাগম। কেউ বুঝতে পারে নি। সন্ধ্যের পর প্রায় হাজার, দেড় হাজার মানুষ, ব্যান্ড বিউগল, হ্যাজাক, মাওয়ের পোর্টেট নিয়ে লাইনে দাঁড়ালো। খাকি কুর্তা পরা ছেলেদের কাঁধে রাইফেল, লাঠি, ট্যাগিং, বল্লম। একদম মিলিটারি কায়দায় গণসংগীত গেয়ে মিছিল ঢুকলো তাঁতিপাড়ায়। তখন চার পাশ অন্ধকার মধুবাক্ষীর জলে ছলাৎ ছল শব্দ। আকাশে ঘন মেঘ।

(চলবে)

COME TO US FOR
Carol
STEREOS
GANGA ELECTRONICS
198, Chandney Market, Cal-72
Phones: 24-6510/0428

নতুন ঠাকুরদাদার ঝুলি চাই

মলয় বসু

বাংলা রূপকথার ইতিহাসে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় নাম। যে বাঙালী কোনো রূপকথার বই পড়েছেন তাঁর দক্ষিণারঞ্জনের 'ঠাকুরমার ঝুলি' বা ঠাকুরদাদার ঝুলি' বই দুইখানিই পড়বার কথা। অনেক শিক্ষিত বাঙালীর কাছে রূপকথার গল্প ও দক্ষিণারঞ্জন প্রায় সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ বাংলা সাহিত্যে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ছাড়াও আরো বহুলেখক লোকমুখে ছড়িয়ে থাকা রূপকথাকে সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করেছেন। আজকের বহু শিক্ষিত বাঙালী সেই সমস্ত লেখকদের বই পড়া দূরে থাক তাঁদের নামও বিস্মৃত হতে বসেছেন। বাংলা সাহিত্যে রূপকথা-শাখার প্রতি অবহেলা যখন এই শাখাটিকে দ্রুত অবলুপ্তির পথে ঠেলে দিচ্ছে, তখনও দেখছি, দক্ষিণারঞ্জনের গ্রন্থদুইটি কেবল কোনো রকমে বেঁচে আছে।

আসলে, লোকমুখে প্রচলিত রূপকথার গল্পগুলিকে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করার কাজটি অত্যন্ত কঠিন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধারণা ছিল যে, রূপকথার আশ্চর্য পেলব গল্পগুলিকে পুরুষেরা নয়, একমাত্র গল্প-কুশলা শিক্ষিত মেয়েরাই লিপিবদ্ধ করতে পারে। তিনি একজন মহিলাকে দিয়ে সে চেষ্টা করে ব্যর্থ মনোরথ হয়েছিলেন (দ্রষ্টব্য: ভূমিকা—ঠাকুরমার ঝুলি)। গল্পকুশল একজন শিক্ষিতা বাঙালী নারী যা পারেন নি, সে কাজ একজন বাঙালী পুরুষ পারবেন—একথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ভাবতে পারেননি। তাই যেদিন দক্ষিণারঞ্জনের 'ঠাকুরমার ঝুলি' বইখানি রবীন্দ্রনাথের হাতে এসে পড়েছিল, সেদিন তিনি সেই বই খুলতে ভয় পেয়েছিলেন। তিনি জানতেন 'এখনকার কেতাবী ভাষায় রূপকথার সুরটি বজায় রাখা বড় শক্ত'। রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছিলেন 'আমি হইলে এ কাজে সাহসই করিতাম না।' (দ্রষ্টব্য—ভূমিকা : ঠাকুরমার ঝুলি)

এই দুঃসাহসিক কাজে দক্ষিণারঞ্জন অবহেলায় করেছিলেন দেখে রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণারঞ্জনকে ধন্য ধন্য করেছিলেন। দক্ষিণারঞ্জনের এই কৃতিত্বের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছিলেন যে 'তিনি (দক্ষিণারঞ্জন) ঠাকুরমার মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে তুলিয়া ধরিয়াছেন তবু তাহার পাতাগুলি প্রায় তেমনি সবুজ, তেমনি তাজাই রহিয়াছে। রূপকথার সেই বিশেষ রীতি, তাহার সেই প্রাচীন সরলতাটুকু তিনি যে এতটা দূর রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার সূক্ষ্ম রসবোধ ও স্বাভাবিক কলানৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।' (দ্রষ্টব্য : ভূমিকা—ঠাকুরমার ঝুলি)

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে। তার দ্বিতীয় রূপকথা-সংগ্রহ গ্রন্থ 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'ও প্রকাশিত হয় ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে। দুটি গ্রন্থের প্রকাশকালের ব্যবধান ঠিক এক বছরের।

আমরা জানি, দক্ষিণারঞ্জন 'ঠাকুরমার ঝুলি'র পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পড়তে দিয়েছিলেন তাঁর মতামত জানবার জন্য। এবং ঐ পাণ্ডুলিপি-পাঠের প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল তাও আমরা অবগত আছি। এ ব্যাপারে একটি জিনিষ আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার আছে। দক্ষিণারঞ্জন তাঁর দুটি গ্রন্থের রূপকথাগুলিকে সংগ্রহ করেছিলেন পূর্ববাংলার মৈমনসিংহ জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। অথচ তিনি গ্রন্থ দুইটির গল্পগুলিকে পুরোপুরি আঞ্চলিক ভাষায় (যেমন শুনেছি তেমনিভাবে) পুঁথিবদ্ধ করেননি। সম্ভবতঃ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরামর্শেই তিনি একটি সর্বজনগ্রাহ্য ভাষায় গল্পগুলিকে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। দক্ষিণারঞ্জন তাঁর গ্রন্থ দুইটির ভাষাকে মূলত দক্ষিণ বাংলার লোকভাষার ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এবং সেই ভাষাতে তিনি মৈমনসিংহ অঞ্চলে ব্যবহৃত শব্দ, প্রত্যয়, ক্রিয়াপদ ও বাক্‌রীতির ব্যাপক ব্যবহার করেছিলেন। ফলে তাঁর গ্রন্থের ভাষা একটি সর্বজনীনতা লাভ করেছিল। ফলে, সেই ভাষা উভয় বঙ্গের লোকের কাছেই বোধগম্য হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সংগ্রহ-গ্রন্থ দুইটির ব্যাপক প্রচার যাতে সম্ভব হয় সেইজন্যই, সম্ভবত, দক্ষিণারঞ্জনকে ভাষা-সংস্কারের পরামর্শ দিয়েছিলেন।

অথচ আশ্চর্য! রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অমূল্য ভূমিকা-সম্বলিত 'ঠাকুরমার ঝুলি' প্রকাশিত হবার ঠিক এক বছর পরে যখন দক্ষিণারঞ্জনের 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' প্রকাশিত হল, তখন দেখা গেল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে দক্ষিণারঞ্জন সেই গ্রন্থে, মৈমনসিংহের আঞ্চলিত ভাষাতেই গল্পগুলিকে লিপিবদ্ধ করে প্রকাশ করেছেন। অবশ্য এই প্রতিরোধ দক্ষিণারঞ্জন দীর্ঘদিন জিইয়ে রাখতে পারেননি। চাপে পড়ে 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'র ২য় সংস্করণেই তিনি ভাষার আমূল সংস্কার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরবর্তী সমস্ত সংস্করণে এই ভাষাই চলে এসেছে।

আমাদের দুর্ভাগ্য, একটি গ্রন্থের ভাষা-তাত্ত্বিক মর্যাদা ও গৌরব-রক্ষার লড়াই-এর ইতিহাস এতোদিন বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে গিয়েছিল। বর্তমান প্রবন্ধের লেখক যখন বাংলা রূপকথার উপর গবেষণা করছিলেন তখন একটি সামান্য সূত্র তাকে এই রহস্য উদ্ঘাটনে সাহায্য করেছিল। এই প্রবন্ধে সেই সমস্ত বিস্মৃত তথ্য ও তত্ত্বকেই উপস্থাপিত করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

দক্ষিণারঞ্জনের 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' যে আঞ্চলিক ভাষাতে মুদ্রিত হয়েছিল একথা কজন বাঙালী জানতেন? আমি যখন বাংলাদেশের বড় বড় পণ্ডিতদের কাছে এ প্রশ্ন করেছিলাম তখন তাঁরা বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। অনেকে আমার এ তথ্যের সূত্রকেও 'বাজে কথা' বলে অগ্রাহ্য করতে চেয়েছিলেন। সূত্রটি পেয়েছিলাম পণ্ডিত প্রবর দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থ থেকে। তিনি বলেছিলেন, "ঠাকুরদাদার ঝুলি"র যখন প্রথম সংস্করণ বাহির হইয়াছিল, তখন সমালোচক মহলে রব উঠিয়াছিল যে 'ভাষা দুর্বোধ্য, এ সকল প্রাদেশিক বাক্যাবলীর অর্থ কে করিবে?" বাঙালী সমালোচকদের এই প্রবল বিরোধীতার সম্মুখে দক্ষিণারঞ্জনের প্রতিরোধ নিশ্চয়ই চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশের একজন নিষ্ঠাবান্ সাহিত্যসেবক, দক্ষিণারঞ্জনের পরাভবকে দুর্ভাগ্যজনক বলে গণ্য করেছিলেন। তিনি দীনেশচন্দ্র সেন। তিনি 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'র প্রথম সংস্করণের ভাষা সংস্কারের জন্য দক্ষিণারঞ্জনকে ভৎসনা করেছিলেন। দীনেশচন্দ্র লিখেছিলেন, ঠাকুরদাদার ঝুলি'র "বাক্যাবলী শুধু প্রাদেশিক নহে, সুপ্রাচীনও বটে। ঠাকুরদাদার ঝুলির প্রথম সংস্করণ পাঠ করিতে যাইয়া পাঠককে বন্ধুর ভাষা-পথের পদে পদে উছট্ খাইয়া হাঁটিতে হইবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, সমালোচকগণের তাড়া খাইয়া দক্ষিণাবাবু পরবর্তী সংস্করণগুলিতে ঠাকুরদাদার ঝুলির ভাষা কতকটা সহজ করিয়াছেন। তাহাতে জিনিষের আদত মূল্য কতকটা কমিয়া গিয়াছে, যদিচ, গল্পভুক্ সামান্য শিক্ষিত পাঠকবর্গের পক্ষে অনেকটা সুবিধা হইয়াছে।"

এই সূত্রটুকু হস্তগত হলেও বিপদ দেখা দিল অন্যত্র। ঠাকুরদাদার ঝুলির প্রথম সংস্করণ পাবার সম্ভাবনা বাংলাদেশে প্রায় নেই। বহু অন্বেষণে, একটি অত্যন্ত জীর্ণ, প্রথম সংস্করণের "কপি" আমার হস্তগত হয়েছিল। সে প্রায় কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের মতো রোমাঞ্চ জাগান প্রাপ্তি। সেই গ্রন্থপাঠের পর বোঝা গেল দীনেশচন্দ্র সেনের খেদোক্তি কত যথার্থ। জনপ্রিয়তার যূপকাষ্ঠে কতবড় সম্পদ পরিত্যক্ত হয়েছে। দীনেশচন্দ্র 'মৈমনসিংহ গীতিকাতে' একটি রূপকথা ও বহু পালাগান লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি কিন্তু গল্পভুক্ পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য ঐ সমস্ত গল্প ও গানের একটি বর্ণও পরিবর্তন করেননি: তাতেই কি 'মৈমনসিংহ গীতিকা' জনপ্রিয়তা হারিয়েছে? না, বাঙালী পাঠক তার রস উপলব্ধি করতে পারেনি? বসন্তরঞ্জন রায় যখন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'এর পুঁথি আবিষ্কার করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে ছাপিয়ে প্রকাশ করেছিলেন তখন ঐ গ্রন্থের ভাষা পরিবর্তনের কথা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। আর বাংলা সাহিত্যের উৎসাহী পাঠক-বর্গের কে না জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থের ভাষা কিভাবে চর্যাপদ ও কৃত্তিবাসের ভাষার মধ্যে ঐতিহাসিক সেতুবন্ধন করেছিল?

এবার আমরা দক্ষিণারঞ্জন মিত্রের ঠাকুরদাদার ঝুলির প্রথম সংস্করণের ভাষার শক্তি ও সৌন্দর্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

প্রথমে, ঠাকুরদাদার ঝুলি'র প্রথম ও দ্বাদশ সংস্করণ থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া যাক।—

গল্পের নাম—মধুমালা।

'মধুমালা' গল্পে আছে, বার বছর পূর্ণ হবার আগে রাজপুত্র মদনকুমার পাতালপুর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য জেদ ধরলে, রাজার কাছে সে খবর গেল। রাজা সে সংবাদে উদ্বিগ্ন হলেন। রাজার উদ্বেগ প্রকাশিত হয়েছে।

১ম সংস্করণেঃ—"শয্যা শুঙ্‌শুঙ্‌ সিংহাসন কাটা, মুখের জল উণ, বাতাস চান্ দুন্।"

দ্বাদশ সংস্করণেঃ—"রাজার মন চন্‌ চন্‌ করিয়া উঠিল, মুখ তালু শুকাইয়া গেল।"

গল্পে আছে, মদনকুমার মৃগয়ায় যাবে। শুনে রাজা-রাণী অস্থির। রাজা বারবার উজীর পুত্রকে অনুরোধ করছেন

প্রথম সংস্করণেঃ—"দিন খাওয়াবে দিন নাওয়াবে, বায় বাতাস দেখলে ঠাঁয় থামাবে; যদি শোন মেঘের গর্জন, তবে জানিবে বিজন।"

দ্বাদশ সংস্করণেঃ—"উজীর পুত্র বাস্‌, আমার মদনমনিকে চোকে চোকে রাখিও-সাঁঝের ডঙ্কা যেন রাজদুয়ারে আসিয়া বাজে।"

অপর গল্পের নাম 'পুষ্পমালা'।

রাজার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের আশঙ্কায় বিচলিত, কোটালের মনোভাব

প্রথম সংস্করণেঃ—"কাজকর্ম করে কোটালের দিনরাত উকুধুকু জাগে, 'হা। রাজার রাজা মহারাজ, তারি কথা 'অনয়' হইল। আজের না, কালের না, ছেলে যখন মায়ের উদরে, মেয়ে যখন মায়ের উদরে, তখনকার সত্য। আজ এখনও বিয়ে আসে তখনও বিয়ে আসে, কনে না জানি টুক্‌ করিয়া রাজার কন্যার বিয়ে হইয়া যায়। রাজার চার চাকলা চৌষট্টি বাঁধ সোনার রাজত্ব; সত্য যদি ভাঙ্গে, তবে কি ভর সইবে?'—হাঁটন পথে চোখ নাই, 'দেখন চোখে দৃষ্টি নাই', ঘরে আসিতে কোটালের মাথায় ঘরের চৌকাটখাম ঠক্‌ করিয়া ঠেকিয়া গেল।"

দ্বাদশ সংস্করণেঃ—"নিত্য কোটালের মনে জাগে—যখন ছেলেমেয়ে হয় নাই, তখনকার সত্য! —আজ, কবে যেন রাজকন্যার বিবাহ হইয়া যায়! —রাজার সোনার রাজত্ব; সত্য যদি ভাঙ্গে, তবে কি ভর সইবে?'—পথে দৃষ্টি নাই, ঘরে আসিতে ঠক্‌ করিয়া চৌকাঠ মাথায় ঠেকিয়া গেল।"

প্রথম সংস্করণেঃ—"রাজকন্যা শেষ পালঙ্ক মাথার বেনী উল্টাইয়া, পাল্টাইয়া, মাটিতে আসিয়া শুইলেন। নাঃ—মাটি বড় শক্ত, মাটি বড় তপ্ত! পিছন দুয়ার খুলিয়া রাজকন্যা উদল মাথা, উদল গা, জলের তলে দু'খান পা, সরোবরের ঘাটে গিয়া বসিলেন।"

দ্বাদশ সংস্করণেঃ—"রাজকন্যা শেষ পালঙ্ক উল্টাইয়া মাটিতে আসিয়া শুইলেন। নাঃ।—মাটি বড় শক্ত, মাটি বড় তপ্ত! সকল অলঙ্কার ফেলিয়া দিয়া, পিছন দুয়ার খুলিয়া রাজকন্যা সরোবরের ঘাটে গিয়া জলের তলে পা রাখিয়া বসিলেন।"

প্রথম সংস্করণেঃ—রাজপুত্র চন্দন "আপন পাগড়ী ছিঁড়িয়া জ্বাল দিলেন, চালে ডালে খিচুড়ী দিলেন; —অফটা ডাল কংকব চাল, সাব্‌ সাব্‌ খিচুড়ী নামা জিব্‌ পোড়া তালু পোড়া—নাকে মু গুঞ্জিষা, দুইজনে, কিসের কিসের শোয়া,—পক্ষীরাজে চড়িয়া চাবুকে পরীর—সোওয়ার।"

দ্বাদশ সংস্করণেঃ—"তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া চন্দন পাগড়ী ছিঁড়িয়া জ্বাল দিলেন, চালে ডালে খিচুড়ী উঠাইয়া রাখিয়া,—দুইজনে পক্ষীরাজে চাবুক দিলেন।"

গল্পের নাম শঙ্খমালা।

প্রথম সংস্করণেঃ—"কপাট না, ভাঙ্গা—শক্তির কপাল না, ভাঙ্গা! 'ইতল বেতল চেতল চিতল'—যা চাই, না, তাই। —কেশ ঢলে শক্তির বেশ ঢলে, দিন প্রভাতে শক্তির ঘরে মোমের বাতি জ্বলে!"

দ্বাদশ সংস্করণেঃ—"কবাট ভাঙ্গা তো নয়, শক্তির কপাল ভাঙ্গা। যা চায় কুঁজী, তাহাই মিলিল!! উঁকি দিয়া দেখে শক্তির 'কেশ ঢলে বেশ ঢলে, কেন প্রভাতে শক্তির ঘরে মোমের বাতি

যে কোনো রসজ্ঞ পাঠক, এই সমস্ত উদ্ধৃতি থেকে নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারবেন, যে প্রথম সংস্করণের ভাষার শক্তি ও সৌন্দর্যের সঙ্গে পরবর্তী সংস্করণগুলির ভাষার তুলনা চলতে পারে না। উল্লিখিত উদাহরণগুলি থেকে একথা স্পষ্টই প্রতিভাত হয় যে 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'র প্রথম সংস্করণের ভাষা শুধু প্রাদেশিকই নয়, সুপ্রাচীনও বটে। দক্ষিণারঞ্জন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বাংলা-দেশের একটি বিশেষ অঞ্চলের সুপ্রাচীন ভাষাকে অবিকৃত রেখে গল্পগুলিকে লিপি-বদ্ধ করেছিলেন। শুঙ্‌ শুঙ্‌, ঊন, চান, দুন, বাঁষ, সার্‌ সার্‌ প্রভৃতি সুপ্রাচীন শব্দাবলী' চার চাকলা চৌষট্টি বাঁধ, দেখন চোখে দৃষ্টি নাই, কোটর চোখে তারার ফুল, অন্ধ চোখ পানের বাটা, ইতল বেতল চেতল চিতল প্রভৃতি প্রাচীন ইডিয়ম ও 'মন চন্‌চন্‌ করিয়া উঠিল,' 'বাষে বাতাস দেখলে ঠাঁয় থামাবে,' 'কিসের থাকা, কিসের শোয়া' প্রভৃতি বিশিষ্ট বাক্‌রীতির সংযোজনে দক্ষিণারঞ্জনের 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'র ১ম সংস্করণটি বিশেষ ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিক মর্যাদা দাবী করতে পারে।

প্রথম সংস্করণ পাঠ করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে, রূপকথা কথনের যে সুললিত ভঙ্গিটি, প্রথম সংস্করণের গল্পগুলিকে সুরের দোলায় দুলিয়ে দিয়েছে, পরবর্তী সংস্করণগুলিতে সেই ভঙ্গি ও সুর বহুলাংশেই ব্যাহত হয়েছে। পরবর্তী সংস্করণে গল্পগুলি যেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে।

দক্ষিণারঞ্জনের 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'র প্রথম সংস্করণের পুনঃপ্রকাশ ও প্রচারই একমাত্র ঐ সংস্করণটিকে বিস্মৃতির গর্ভ থেকে তুলে যথার্থ মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এবং এ কাজ সম্পন্ন করা অসাধ্য কিছু নয়।

দুঃসাধ্য রোগ

একজিমা, সোরাইসিস্‌, দূষিত ক্ষত, রক্তদোষ, বাতরক্ত, ফুলা, শ্বেত-কুষ্ঠসহ আরও অনেক কঠিন চর্মরোগ হইতে স্থায়ী মুক্তিলাভের জন্য ৮৪ বৎসরের চিকিৎসাকেন্দ্রে চিকিৎসিত হউন।

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া-১, ফোন: ৬৭-২৩৫৯; শাখা: ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড (হ্যারিসন রোড), কলিকাতা-৯

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সোনার হরিণ নেই

।। চব্বিশ ।।

আবু রববানী আর দুলারি ধরেই নিয়েছে গায়ত্রী বাইয়ের এত বড় ব্যবসার কর্তৃত্ব এখন আস্তে আস্তে বাপী ভায়ের হাতে চলে যাবে। বাতাবাতি কিছু হবে না। চালিহাকে কোন রকম সন্দেহ করার সুযোগ মেমসায়েব দেবে না। তাছাড়া ব্যবদিবের কারকর্মের হদিস পেতেও বাপী-ভাইয়ের কম সময় লাগবে না। চোখ কান খোলা রেখে সব দেখে শুনে বুঝে নিতে হবে। তারপর বাপীভাইয়ের ওপর মেম-সায়েবের বিশ্বাস পাকাপোক্ত হয়ে উঠলে তখন আস্তে আস্তে মেয়েছেলের বুদ্ধির খেল দেখা যাবে। তাই গোড়া থেকে খুব সাবধান বাপীভাই, খুব সাবধান।

একই সঙ্গে ওদের আনন্দ উৎসাহ আবার উৎকণ্ঠা দেখে বাপী তবফদারের হাসি পায়। সেই সঙ্গে অস্বস্তিও একটু। মেমসায়েবের মনে কি আছে সেটা বাপীর বোকামির জন্যেই এরা টের পেয়ে গেছে। প্রথম সন্ধ্যায় গায়ত্রী বাইয়ের সঙ্গে এই বোঝাপড়ার ঝকাঝকিটা আবুর চোখের ওপর দিয়ে ঘটে না গেলে ওরা এতটা হয়তো বুঝত না। কোন্ ভবিষ্যতের দিকে চোখ রেখে মহিলা নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত লোক খুঁজছে আর কেন ছ' মাসের জন্য ওকে ট্যায়েল দেবার আগ্রহ—বাপী সেটা তার খুশির ওপর বলেই দিয়েছিল। আবু রববানী সন্ত্রাসে মেমসায়েবের প্রতিক্রিয়া দেখেছে আর বিমূঢ় বিস্ময়ে তার ফলাফলও দেখেছে। তার পরে মেমসায়েবের সঙ্গে বাপীর প্রতিটি সাক্ষাতের বৃত্তান্তও খুঁটিয়ে জেনে নিয়েছে। তাই ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ছবিটা ওর স্পষ্ট আঁচ না করতে পারার কথা নয়। আর আবু সব জানে বলেই দুলারি সব জানে।

এখন ওরাই তাকে উপদেশ দিচ্ছে, সাবধান করছে। এর পিছনে আন্তরিকতা-টুকুই সব, জানে। অস্বস্তির কারণ আলাদা। পর পর দু'-তিন দিন এ-রকম শোনার পর বাপী সেদিন বলল, তোমাদের মেমসায়েবের মতলব কি সেটা আমি গোড়া থেকেই জানি, কিন্তু তা নিয়ে তোমরা এ-রকম খোলাখুলি আলোচনায় বসলে শুরুতেই সব ভেস্তে যাবে—

দুলারি আর আবু দুজনেই অবাক। —এখানে তো ঘরে বসে নিজেদের মধ্যে কথা কইছি, কে জানছে?

—এ-সব কথা ঘরের দেয়ালের জানা বা শোনাটাও ভালো নয়। খুব হাল্কা-ভাবেই জিগেস করল, মেমসায়েবের মতলব আর কে বুঝেছে—রেশমা?

আবু জবাব দিল, রেশমার সঙ্গে তো ক'দিনের মধ্যে দেখাই হয় নি—এক ওর মেমদিদি যদি বলে থাকে, খুব জলঘসে ওকে . . .

একটু ভেবে বাপী বলল, সে রেশমাকে এ-সব কিছু বলবে মনে হয় না, তার মা-ই তাকে বারণ করবে। যা-ই হোক, তোমাদের কাছ থেকে কিছু না শোনাই ভালো।

সঙ্গে সঙ্গে আবুর মুখ বিবস একটু।—রেশমাকে তুমি অবিশ্বাস করো বাপী ভাই। তুমি জানো না, ওই চালিহার ওপর আমাদের থেকে ওর ঢের বেশি রাগ, ইচ্ছে করে ওর ওপর সব থেকে বেশি অবিচার করছে। সুযোগ পেলে রেশমা কোনদিন সাপের মতোই ওকে ছুবলে দেবে—

যত সেয়ানা হোক, আবু যে ওর তুলনায় সাদা মনের মানুষ বাপী জানে। যে সংশয়ের ছায়াটা মনের তলায় উঁকিঝুঁকি দিয়ে যায় সেটা ওকে বলা যাবে না; বিবর্তি চেপে জবাব দিল বিশ্বাস অবিশ্বাসের কোনো কথা হচ্ছে না—তুমি যা বললে সেটা সত্যি হলেও মেমসায়েবের মতলব ওর না জানা ভালো—ওই রাগের মাথাতেই বেফাঁস কিছু করে বসতে পারে বা বলে ফেলতে পারে।

দুলারির গম্ভীর চাউনিটা মুখের ওপর আটকেছিল। বাপীর কেমন মনে হল, শুধু শুনছে না, একই সঙ্গে ভেতর দেখে নেবার চেষ্টা। চোখোচোখি হতে ও অন্য দিকে ফিরল। দাবড়ানির সুরে বলল, বাপীভাইয়ের ছটাক বুদ্ধিও ধরো না সেই জ্ঞান তোমার আছে? যা বলছে মন দিয়ে শুনে রাখো, আখেরে সকলেরই তাতে ভালো ছাড়া মন্দ হবে না—বুদ্ধির ঢেঁকি।

এই ধমকের মধ্যে আবুকে নিরস্ত করার কোনো ইশারা ছিল কিনা বাপী ঠিক ধরতে পারে নি। বিমূঢ় মুখে আবু তার বিবিকে দেখেছে একটু, তারপর মোলায়েম গলায় প্রসঙ্গ বাতিল করেছে। —ঠিক আছে, ঠিক আছে, একেবারে মাটি চাপা দিলাম।

কিন্তু আবু চাপা দিলেও সে-মাটি একটু অনাদরে খুঁড়ে দিয়ে গেল গায়ত্রী বাইয়ের মেয়ে উর্মিলা বাই। বন্ধুত্ব হবার ফলে বাপী ওকে ডলি নামে ডাকবে কি উর্মিলা, তাই নিয়েও ভেবেছিল। ডলি মিষ্টি নাম, কাজের নাম। সতর্কতার অজুহাতে সেই কারণেই ডলি বাতিল। এমন কি মনে

মনে বন্ধুত্বও বাতিল। নিজেকে অবিশ্বাস, গায়ত্রী বাইকে আরো বেশি।

বানাবস্তুলির চা-বাগান এলাকায় গায়ত্রী বাইয়ের ব্যবসার আপিসও একটা আছে। ছোট বড় তিন ঘরের আপিস। বড় সাজানো গোছানো ঘরটা চিফ একসিকিউটিভ চালিহার। এখানে থাকলে সকালের দিকে এক দেড় ঘন্টা সে এই ঘরে এসে বসে। অন্য সময় শুধু পার্টির সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকলে তাকে ও-ঘরে দেখা যায়। এই আপিসে সাড়ে নটা পাঁচটা নিয়মিত হাজিরা বরাদ্দ শুধু অ্যাকাউনটেন্ট আর টাইপিস্টের। একজন বেয়ারাও কর্ত্রী অর্থাৎ গায়ত্রী বাইয়ের এই আপিসে কখনো পদার্পণ করেছে শোনে নি। কারণ, আসল আপিস বাপীর দু ঘরের বাড়িতে যে নতুন ঘর উঠেছে, সেটা। আর সামনের ওই বারান্দাটা। দরকারি ফাইলপত্রের বেশির ভাগ ওই ঘরে। সেখানে ছোট একটা টাইপ রাইটারও দেখেছে বাপী। ওটা মালিকের নিজস্ব। তেমন জরুরি চিঠিপত্র টাইপ করার দরকার হলে গায়ত্রী বাই নিজেই করে নেয়, টাইপিস্টের আশায় বসে থাকে না। প্রয়োজনীয় দুটো একটা নৈমিত্তিক লেনদেন বা হিসেবের ফাইল সাইকেলের ক্যারিয়ারে চাপিয়ে অ্যাকাউনটেন্টকে প্রায় রোজই একবার করে চুপুরের দিকে মালিকের আপিস ঘরে হাজিরা দিতে হয়।

এ দু সপ্তাহের মধ্যে বাড়ির আপিস ঘরে বাপীর একদিনও ডাক পড়ে নি। পড়বে জানে কিন্তু সেটা কেন ভবিষ্যতে, মহিলার মুখ দেখে আঁচ করা শক্ত। এখন পর্যন্ত কাজের কোন রকম হদিসও তার কাছ থেকে মেলে নি। শুধু বলে রেখেছে, ফাঁক পেলে মাঝে মাঝে এসো। কিন্তু কোন্ সময়টা মহিলার কাছে ঠিক ফাঁক বলে গণ্য হতে পারে, বাপী এখন পর্যন্ত ঠাওর করে উঠতে পারে নি। বণজিৎ চালিহা এখানে থাকলে সন্ধ্যায় ওই বাংলোর বারান্দায় তার সঙ্গে ব্যবসায়িক কথাবার্তার বা গল্প করার সময়। সেই অন্তরঙ্গ পরিবেশে এসে হাজির হবার ফলে মহিলার সাদাটে ভুরুতে বিরক্তির ভাঁজ দেখেছে। বরাদ্দায় ওঠেও অবকাশ না দিয়ে বলেছে, দরকার নেই—

অর্থাৎ, যেতে পারো। দুদিন বাদে এক সকালের দিকে আপিস সঙ্গে সঙ্গে কম্পিত উত্তেজিত দেখেছে মহিলা। গলার স্বর শুনেছে।—চান খাওয়া সেরে এসেছ?

বাপী অপ্রস্তুত। —না।

—এখন নটা বাজে, মিস্টার চালিহা দশটার আপিসে হাজির থাকেন, তিনি দেরির কৈফিয়ৎ চাইলে আমি সদয় থাকব ভেবো না।

বাপীর পরপাঠ প্রস্থান। মেমসাহেবের সামনে ওই কথা শুনে অপমানিত বোধ করার কথা। কিন্তু বাপীর ধারণা খুব স্পষ্ট বলেই গায়ে মাখে নি। আরো অপ্রস্তুত পরের রবিবারের ছুটির দিনে বেলা দশটা সাড়ে দশটা নাগাত এসে। ছুটির দিন, সকাল থেকে আবুর সঙ্গে আড্ডা দিয়ে তারপর দুজনে গল্প করতে করতে চলে এসেছিল। সেদিন অন্তত কোনো বিরূপ আপ্যায়ন আশা করে নি।

কিন্তু ওদের দেখামাত্র মহিলার ভুরুকুটি। পাশে মেয়ে বসে। মালিকের মুখের দিকে চেয়েই আবু ঘাবড়েছে একটু। আর বাপী ভেবেছিল, মেয়ের কোনো কারণেই মহিলার মেজাজ ভালো নয়। আবুর বিনীত আদাবের জবাবে মুখের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করল একটু। তারপর জিগেস করল, কিছু বলবে?

এ-রকম অভ্যর্থনার জন্য আবুও প্রস্তুত ছিল না। জবাবদিহির সুরে সে বলল, দোস্ত্ আসছে দেখে সেও সালকানকে শুধু সেলাম জানাতেই এসেছে আর কোনো কারণে নয়।

মেমসাহেবের মেজাজ এখন পর্যন্ত বাপীর থেকে ঢের ভালো বোঝে আবু। বলল, চন্দ্রার নতুন চাবা বেড়টা খাসা হয়েছে মেমসাহেব, পালেন তো একবার দেখে আসবেন। আচ্ছা, আমি চলি—আদাব।

আবু চলে যেতে গায়ত্রী বাইয়ের অপ্রসন্ন দু চোখ বাপীর মুখের ওপর।—তোমার কি?

—এমনি যদি কিছু বলেন।

—যদি কিছু বলি শোনার জন্যে সঙ্গে লোক নিয়ে আসতে হবে—এ বাড়ির রাস্তা তুমি চেনো না?

দোষের হদিস বাপী পেয়েছে, কিন্তু এ কথার আর জবাব কি দেবে। গায়ত্রী বাই আবার বলেছে, এখানে কাজ করতে হলে দোস্তি ভুলতে হবে।

নিরীহ মুখে বাপী জিগেস করেছে, বাজার বাইরেও?

—কাজের বাইরে তোমার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক আছে আমার?

বাপী বিনয়-বিনম্র। মাথা নেড়েছে, নেই।

—এখন আমি তোমাকে কিছুই বলব না। যা বলব মিস্টার চালিহা বলবেন। তোমার কিছু জিজ্ঞাসা থাকলে তাঁকেই জিগেস করবে।

বাপী এরপর অনায়াসে ফিরে প্রশ্ন করতে পারত, ফাঁক পেলে তাকে মাঝে মাঝে আসতে বলা হয়েছিল কেন। জিগেস করল না। আনুষ্ঠানিকভাবে কাজে জয়েন করার পর থেকেই মহিলার এমনি রুক্ষ মেজাজ দেখছে। আবুর ভাষা অনুযায়ী, এক চালিহা ছাড়া আর সব কর্মচারীর সঙ্গে এই মালিকের আচরণ ঠাকরোনের। বাপীর ধারণা অন্য রকম। ওকে নেবার উদ্দেশ্যটা বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল বলেই শুরুতে লাগামের মুখে রাখছে। দরকার বুঝলেই ছুটি চালাতে পারে বুঝিয়ে দিচ্ছে। আর একই সঙ্গে চালিহার মর্জির ওপর ছেড়ে দিয়ে যোগ্যতা যাচাইয়ের মহড়াও নিচ্ছে বোধহয়। কদিন আগের সম্পূর্ণ অজানা অচেনা একটা লোককে শুধু মুখের কিছু কথা শুনে এক্কটু বেশি প্রশ্রয়ই দিয়ে ফেলা হয়েছে ভাবাও বিচিত্র নয়।

অতএব বাপী বুদ্ধিমানের মতোই নরম মুখে বাংলো থেকে নেমে এসেছে। পরের এই এক সপ্তাহের মধ্যে আর ও-মুখো হয় নি। গায়ত্রী বাইও তার অস্তিত্ব ভুলেছে যেন। একবারও ডাকে নি। এই কারণেই বাপীর আরো বদ্ধ ধারণা, সে তার লক্ষ্যের মধ্যেই আছে, আর তার প্রতিদিনের খুঁটিনাটি হিসেবও মহিলা রাখে। হিসেব কে দেয় বাপী সঠিক না জানলেও আঁচ করতে পারে। বণজিৎ চালিহা খুব সম্ভব। তাই যদি হয় তো এটা মহিলার যে সূক্ষ্ম সপাটু চাল একটা, বাপী অস্বীকার করবে না।

টাইপিস্টকে তার ঘর ছেড়ে মেশিনপত্র নিয়ে অ্যাকাউনটেন্টের ঘরে চলে যেতে হয়েছে। তার ছোট ঘরখানা বাপীকে মেটামুটি সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। বণজিৎ চালিহার তুলনায় সে-সজ্জা কিছুই নয়। তবু মতো ওর ঘরের দরজায় নামের ফলকও কিছু বসানো হয় নি। কি পোস্ট বা কি চাকরি ওর, সে-সম্পর্কে এক কর্ত্রী ছাড়া আর কারোই হয়তো ধারণা নেই। পশ্চিম বাংলার জন্য কাজকর্ম শেখানো হবে শুনেছিল কিন্তু কাজে লাগার পর আর কিছু কানে আসে নি।

সকাল দশটার পাঁচ দশ মিনিট আগেই হাজিরা দেয়। অ্যাকাউনটেন্ট আর টাইপিস্ট এসে সাড়ে নটায়। চালিহা এলে বাপী ব্যবসার কর্তব্য বোধে সামনে এসে দাঁড়ায়। তার ফর্সা মুখের মিটিমিটি হাসির অর্থও খুব অস্পষ্ট নয়। গায়ত্রী বাই তাদেরও নিশ্চয় ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছে সে-ই আসল মুরুব্বি ওর।

বণজিৎ চালিহা আগে তাকে ফর্মের ফাইল পড়তে হুকুম করছে। কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে, ফাইল পড়লে মোটা মুটি ধারণা হবে। আর বলেছে, জঙ্গলটা ভালো করে স্টাডি করো, জঙ্গল থেকেই আমাদের যা-কিছু। জঙ্গলের প্রসঙ্গে সাপ ধরা আর কেনা-বেচার ব্যাপারটা আরো ভালোভাবে অর্গানাইজ করা দরকার, সে-কথাও বলেছে।

উড়ো খই গোবিন্দের পায়ে। ওকে নিয়ে চালিহার হাজারও অনেকটা সেই রকমই। সকালে সামনে এসে দাঁড়ালে মুচকি হেসে জিগেস করে, ফাইল দেখছ?

বাপী সবিনয়ে মাথা নাড়লে বলে, বেশ। তারপরেই নিজের কাজে ব্যস্তভাব।

দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষের দিনে আপিসে ঢুকতেই অ্যাকাউনটেন্ট বলল, আপনার সাইকেলটা একবার দেখে নিন—

ঈষৎ অবাক চোখে ঘরের দেয়ালের গায়ে বাপী একটা ঝকঝকে নতুন সাইকেল

ঠেস দেওয়া দেখল, দামী ভালো সাইকেল। অ্যাকাউনটেন্ট জানালো মালিকের হুকুমে এটা তার জন্য কেনা হয়েছে। এগিয়ে এসে বাপী ওটা নাড়াচাড়া করে দেখল একটু। অ্যাকাউনটেন্টকে বলল ঠিক আছে। সে তার টেবিলে গিয়ে বসল পরেও বাপী ওটার দিকে চেয়ে নিশ্চল দাঁড়িয়ে। পুরনো স্মৃতি ব্যথার মতো ভেতর থেকে ঠেলে উঠছে। নতুন নয়, একটা পুরনো সাইকেলের স্বপ্ন দেখেছে কত দিন। সাইকেল-সাইকেল করে পিসীকে জ্বালাতন করে মেরেছে আ গরিব বাপের সাধ্যাসাধ্য থেকেছে। মিষ্টিরা আসার পর সাইকেলের দাবি আরো বেড়েছিল। ও সাইকেল চেপে পিছনো কারিগরের মিষ্টি আনবে।

চালিহা আসতে সচকিত। অ্যাকাউনটেন্ট আর টাইপিস্ট শশব্যস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। এই মাঝারি ঘরের ভিতর দিয়েই তার ঘরে ঢোকার পথ। বাপীও। একটা নতুন সাইকেলের সামনে ওকে দেখে সেও দাঁড়িয়ে গেল। জিগেস করল, ওটা কার ?

অ্যাকাউনটেন্ট জানালো, মিস্টার ওবরয়দারের জন্য কেনা হয়েছে।

কার নির্দেশে কেনা হয়েছে সেটা বুঝে নিতে চালিহার এক মুহূর্ত সময় লাগল না। সপ্রতিভ তৎপরতায় মাথা নাড়ল। —ও, হ্যাঁ। যেন জানাই ছিল সাইকেল একটা কেনা হবে। মুখোমুখি সরে বাপীকে বলল, ঘরে বসা কাজ নয় আমাদের ফিল্ড ওয়ার্কের জন্য তৈরি হও।

নিজের ঘরে ঢুকে গেল। আর তার মিনিটখানেকের মধ্যেই নিজে তৎপরতা দেখালো। তার সই করে একটা টাইপ করা চিঠি এলো বাপীর টেবিলে। কারো নামে চিঠি নয়। ব্যবসায়ের প্রতিনিধি হিসেবে বাপী ওবরয়দারের নামে পরিচয়পত্র। এটা পাঠিয়ে বণজিৎ চালিহা যেন একপ্রস্থ হাসিকতা করল ওর সঙ্গে। অর্থাৎ, সাইকেল পেয়েছ, পকেটমানিও দিলাম, এবারে চরে খাও দেখি কেমন মুরোদ। ওর ভালো নামটাও জানে না, বাপী ওবরয়দারের নামেই পরিচয়পত্র।

বণজিৎ চালিহা এক-পাও এগিয়ে সহায্য করবে এ-রকম প্রত্যাশা বাপীর কোনো সময় ছিল না। কর্তব্যও নেই নিশ্চয়। কিন্তু তার যাচাইয়ের রীতি বিচিত্র। ওপরঅলার মতো চালিহাকে সামনে রেখে পাশে পাশে ঠোকরকর খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে, কাজকর্ম সম্পর্কেও কোনো আদেশ বা নির্দেশ নেই, কিন্তু সাইকেল দেবার পিছনে কিছু ইঙ্গিত আছে। সেই ইঙ্গিত বণজিৎ চালিহাও বুঝেছে। তাই সাত তাড়াতাড়ি পরিচয়-পত্র পাঠিয়ে দায়িত্ব সেরেছে। এখন বাপী শূন্য খোলে কি হাল ছাড়ে দু-তিনদিন কাছেই যেন সেই পরীক্ষা।

পাশের নিচু মাটি চাই বাপীর। এখানে যা ফাইল আছে সব ওল্ট খুঁটিয়ে পড়া আছে। এবারে নিম্নস্থ ফাইলে মাইল দশেকের একটা গন্ডী টেনে নিয়ে কাজ শুরুর ছক ঠিক করে নিল। এই এলাকার মাল বানাবজুলির গোডাউন থেকে চালান হয়। ভুটানের এলাকা পর্যন্ত ধরলে আরো দুটো গোডাউন আছে। এখানকারটাই বড়। এখন থেকে উত্তর বাংলা আর তার বাইরেও অনেক জায়গায় মাল চালান যাচ্ছে। কিন্তু বড়ন সাইকেল, দূরের দিকে পাকিয়ে লাভ নেই। যুচরো মালের কারবার নেই যখন, এই দশ মাইল পরিধির পুঁটিনাটি খদ্দেরদেরই তার লক্ষ্য। তাদের নাম-ধাম যার কাছে কে কত মাল আর কত রকমের মাল নিয়ে থাকে তার একটা খসড়া করে নিল। যারা আগে মাল নিত, কিন্তু এখন নিচ্ছে না বা কম নিচ্ছে—তাদেরও এই নিম্নস্থ ফাইলে এলো।

সাপ চলাচলের ব্যবসা যেখানে ব্যাপারে জোর দিয়েছিল বণজিৎ চালিহা। এই ফাইল কটাও খুটিয়ে দেখে নিল বাপী। কোথা যোগান দিচ্ছে, কোথা কিনছে, আর কত চাহিদা। চাহিদা বলতে গেলে আরো ঢের বেশি। এদিকেও নজর দেওয়া ঠিকই দরকার। এ-ব্যাপারে আবুর সঙ্গেই পরামর্শ করতে হবে। আবু বাড়িয়ে বলে নি, এখনো যে পর্যায়ের সাপ যে দামে বেনা হচ্ছে আর যে দরে বিক্রি করা হচ্ছে তার মধ্যে অনেক ফারাক। অর্থাৎ লাভ অনেক।

মদ বিক্রি আর নেশার গাছ-গাছড়া ফলমূল বিক্রি থেকেও বছরে এতোর টাকা লাভ হয় বাপী শুনেছিল। কিন্তু এ-সবের কোনো ফাইলের চিহ্ন নেই এই দপ্তরে। এ-সব সুড়ঙ্গ পথের কারবার, থাকবে না জানা কথাই। এই কারবারে মালিকের একমাত্র দেসব সম্ভবত বণজিৎ চালিহা। আর ঘরবাড়ীও কিছু ভাগ পায় কিনা সঠিক জানে না এখন পর্যন্ত।

সেদিন শনিবার। টাইপিস্ট আর অ্যাকাউনটেন্ট দুটোর পরে চলে গেছে। চালিহা আপিসেই আসে নি। বেয়ারাটা এই আপিসেই থাকে বলে সে আছে। আর নিজের গরজে বাপী আছে।

বেলা পাঁচটা নাগাত হাত ঘড়ি দেখতে দেখতে যে ঘরে ঢুকল তাকে এখানে দেখে বাপীর অবাক হবারই কথা। ঊর্মিলা বাই। পরনে হালকা সবুজ শাড়ি গায়ে সবুজ ব্লাউস। কপালে সবুজ টিপ। সুন্দরই লাগছে। কিন্তু বাপীর চোখ সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করছে না। এখানে আসার হেতু বুঝতে চেষ্টা করছে।

ঊর্মিলা এগিয়ে এসে টেবিলে ছড়ানো ফাইল কটা দেখল। তারপর বাপীর দিকে তাকালো। গম্ভীর। বলল, বাপী ইজ এ গুড বয়, শনিবারে বিকেল পাঁচটার পরেও কাজ করছে। মা জানলে খুশি হবে।

বাপী জিগেস করল, কি ব্যাপার ?

—ব্যাপার কিছু না। বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। বেয়ারাটা রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল। সে বলল তুমি এখনো অফিসে আছ। তাই ইনস্পেকশনে এলাম। আমিও কলেজে কলমে ব্যবসার পার্টনার একজন জানো তো ?

—জানা না ঘুমন্ত ?

—তার মানে ?

—সিলপিং পার্টনার কিনা জিগ্যেস করছিলাম।

—এখন পর্যন্ত সিলপিং। মা জাগাতে চেষ্টা করছে।

বাপী বলল, তাহলে দরজা বন্ধ করে বস হোক।

টেবিলের কোণে মাটিতে এক পা রেখে আধাআধি বসল ঊর্মিলা। বসার ওই ভঙ্গিতে চিন্তাটা বরদাস্ত করা উচিত নয় বাপীর। বলল, চেয়ারগুলো কি দোষ করল ?

—কেন তোমার অসুবিধে হচ্ছে

—হচ্ছে।

—কি অসুবিধে ?

—দেখতে ভালো লাগছে, এই অসুবিধে

সটান উঠে দাঁড়াল বাপী। ঘরে কোনো মেয়েরা চোখ পাকালে, প্রথম। তারপর হেসে ফেলে একটা চেয়ার টেনেই বসল বটে এ-রকম অসুবিধে হতে দিতে আদৌ রাজি নয়।

বাপী জিগেস করল, একলা, বেড়াতে বেরিয়েছ ?

সঙ্গে সঙ্গে জবাব। —কেন আমি কচি মেয়ে না বাঘ-ভালুকে খাবে ?

—তুমিই সেদিন বলেছিলে, ছ, একলা বেরুতে দেন না, সঙ্গে বেই একজন থাকেই।

মনে পড়ল। তার পরেও বিরক্তি চাপা থাকল না। —আজও ড্রাইভার আছে, সঙ্গের গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছি, মাকে আমি পষ্ট করে দিয়েছি, বর্ষণ আমলাতে চেষ্টা করলে আমার বাড়ি ছেড়ে পালাব।

বাপীর মুখে নিরীহ বিস্ময়। —আবার বলতে ?

ঊর্মিলা থমকালো একপ্রস্থ। তারপর হেসেই জবাব দিল, একলা বাস করে শিল্পসৃষ্টি পালিয়ে গিয়ে এক বন্ধুর বাড়িতে দুদিন ছিলাম। তার পরেই এ-প্রসঙ্গের ওপর যবনিকা। —কত কি-রকম বুঝছ ?

—চেষ্টা করছি।

—আকলের কাছ থেকে ক্ষমতা-টমতা কিছু আদায় করতে পেরেছ ?

—এখন পর্যন্ত মিচ্ছি, না।

—সে কি! কাল সন্ধেই তো আংকেল মাকে বলছিল, তোমাকে একেবারে ফ্রি-হ্যান্ড দিয়ে দিয়েছে।

এটা কত নম্বরি চাল বাপী বুঝে উঠতে পারল না। সদা সতর্ক করে বলল, ফাইল পড়তে বলেছেন আর কিছু স্টাডি করতে বলেছেন আর ওই পরশু ফার্মের মিটিংয়ে হিসেবে একটা আকোয়েন্টেন দিয়েছেন। তোমার মা না চাইলে ক্ষমতা পাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না—

বাধা দিয়ে ঊর্মিলা বলে উঠল, কিছুই বলতে না বা কিছুই করতে না, চুপচাপ বসে তোমায় মুক্তোদানা দেখতে বলা।

একটু থেমে আবার বলল, তবে তুমি যখন আমার ফ্রেন্ড, তোমাকে চুপি চুপি বলে রাখতে পারি... তোমার ওপর মায়ের অনেক আশা—

বাপীর নির্বাক মুখ। চুপচাপ চেয়ে আছে—

—সব জেনে বুঝেও হাঁ করে চেয়ে থেকে বোকা সাজছ কেন? হাসল। —সত্যি-কারের বন্ধু হলে আমিও তোমাকে কিছু কিছু সাহায্য করতে পারি।

মায়ের আশা আর নির্ভরতা আছে বলেই মেয়েও বন্ধুত্ব পাতিয়ে ওকে হাত করতে চায় এটুকু স্পষ্ট। সাহায্যের কথায় বাপী ঔৎসুক্য দেখালো। —কি রকম?

—মা তো চায়ই আমি একটু-আধটু কাজকর্ম দেখি। দেখব। কিন্তু আসলে আমার দ্বারা এ-সব কিচ্ছু হবে না। আংকেল তো মাসের মধ্যে সতের দিন টুরে ছোটায়—আজও চার দিনের টুরে বেরুলো। সে না থাকলে এখানকার কাজে কি অসুবিধে হয়, আর কত রকমের গলদ দেখা দেয় সেটা বুঝতে তোমার আর কত সময় লাগবে? তুমি আমাকে বলবে, আর আমি তোমার এক্তার প্রশংসা করে মা-কে বলব। দারিদ্র তখন তোমার হাতে সেধে আসবে দেখে নিও।

ওই মায়ের মেয়ের বুদ্ধি সেই কে বলবে।

হাসি মুখেই ঊর্মিলা আবার বলল, আমার প্রশংসার অনেক দাম আছে বুঝলে ফ্রেন্ড, এক রেশমা ছাড়া মা আমার মুখে আর কারো প্রশংসা শোনে নি কখনো—

—রেশমার অত ভাগ্য ফেম?

—ও সত্যিকারের ভালো মেয়ে বলে। ভালো কথা, ওর মজুরিটা তুমি চটপট বাড়িয়ে দাও দেখি—

—কিসের মজুরি?

—সাপ ধরার। প্রাণের মায়া ছেড়ে জঙ্গলে সাপ ধরে বেড়ায়, অথচ পাওনার বেলায় ওর ওপর অনেকদিন ধরে অবিচার হচ্ছে শুনেছি।

—আমি মজুরি বাড়িয়ে দেব?

—নিশ্চয় দেবে, যার যা পাওনা তাকে তা দেবে না কেন?

—রেশমার ওপর অবিচারের কথা তোমার মা-কে বলো না কেন?

—বলতে বাকি রেখেছি! মায়ের মতো রেশমাও দু চক্ষে মদ খাওয়া দেখতে পারে না বলে মা ওকে পছন্দও করে, বিশ্বাসও করে—আমি বলতে ওকে বুপোর গয়নাও গড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু দেনা-পাওনার ব্যাপারে কখনো আংকেলের কাছে মুখ খুলবে না।

—আংকেলকে বলো না কেন?

—হুঁঃ! বলা হয়েছে—তার কি মতলব কে জানে।

বাপী ভাবল একটু। বলল, সকলকে ছেড়ে প্রথমেই একটা মেয়ের জন্য আমার মাথা ব্যথা দেখলে তোমার মা কি ভাববেন?

ভ্রূকুটিটা মেনে নিয়েও ঊর্মিলা হেসে উঠল। —ভাববে তুমি মজে গেছ। অরুকণে, আংকেলকে আমার কথা বলেই না হয় ওর মজুরিটা বাড়াতে চেষ্টা করো—অবিচার হচ্ছে বলে গত বছর থেকে মেয়েটা রাগে ফুঁসছে।

—ঠিক আছে। এবারে আলতো করে বাপী জিগেস করল, তোমার সত্যিকারের বন্ধু হতে হলে আমাকে কি করতে হবে সেটা বললে না তো?

জবাবে ভ্রূকুটি। সেই সঙ্গে ঠোঁটে হাসি। —ধরে বাঁদর নাচ নাচাতে চাইলেও সেটা বরদাস্ত করতে হবে।

সাপ চালানের আর চাহিদার হিসেব শুনে আবু রব্বানী কিডি দাঁতে চেপে এমনভাবে তাকালো যার অর্থ, বাপীর বুদ্ধির দৌড় দেখে সে অবাকই হয়েছে। বলল, যত সাপ ধরা হয় আর চালান যায় তার সব হিসেব খাতায় ওঠে তুমি ভাবো নাকি! এর মধ্যে কালো ব্যাপার কিছু নেই?

বাপী এ-দিকটা ভাবে নি বটে। তবু চাহিদার ব্যাপারটা আবু অস্বীকার করল না। সাপ ধরার পার্টি আরো গোছালোভাবে বড় করা যায় এও ঠিক। কিন্তু লাভের কড়ি আরো কিছু না খসালে তা হবে কেন? লাভের খবর এখন আর কে না রাখে? এ-ব্যবসায় তো মালিকদের শুধু মুনাফা লোটা ছাড়া আর কোনো কষ্ট করতে হয় না, তাহলে লাভের ন্যায্য ভাগ ওদের দেবে না কেন? আর এ-কাজে মেহনত বাড়ালে আবুরই বা বাড়তি লাভটা কি? মাস গেলে দুলারির নামে দিচ্ছে তো মাত্র পঞ্চাশটি টাকা।

আরো কিছু অসুবিধের কথাও শুনল। বাপী। গরীব বেদে বেদনীরা সাপ ধরলেই নগদ টাকা আশা করে। সেই ব্যবস্থাও করা দরকার। ম্যানেজার কত সময় থাকে না, তখন এক পাওনা পেতে ওদের কতদিন ঘুরতে হয়। অবশ্য টাকা অনেক সময় মালকিন আগাম দেন, কিন্তু ম্যানেজারের সই না হলে হিসেব মেটে না। আবার অনেক সময় মেমসায়েবও পাহাড়ের বাংলোয় বা এ-ধার ও-ধার চলে যান। এই লোকগুলো তখন বিরক্ত হয়ে আবুকেই পাঁচ কথা শোনায়। বড় দল যে করবে, সম্বৎসরে কটা টাকা ওরা পায়—বছরের মধ্যে শীতের পাঁচ মাস মনসা মায়ের সন্তান সন্ততিরা তো গর্তেই সেঁধিয়ে থাকে, আর বর্ষার ওঁরা বাড়েন বটে কিন্তু ধরা পড়ে কম। সময়ে ভালো বসদ না পেলে দল বেঁধে ওরা জ্ঞানের ধকল পোহাতে আসবে কেন?

বাপী কথা দিল, মালিকের সঙ্গে আলোচনা করে যতটা সম্ভব সুব্যবস্থা করবে। কিন্তু ওর মুখ চেয়েও এ বছর সাপের চালান বাড়ানোর কথা আবুকে ভাবতে হবে। তারপর জিগেস করল, রেশমার মজুরি নিয়ে অবিচার হচ্ছে শুনলাম, সেটা কি ব্যাপার?

আবুর একটা চোখ ছোট মানেই রসের খোরাক পেয়েছে।—অবিচারের কথা কে বলল?

—ঊর্মিলা রাই।

আবু হেসে মাথা নাড়ল।—অবিচার হচ্ছে আর সেটা হচ্ছে ওই মাদেরোসার বদজাতির জন্য।

কি বদজাতি তাও শুনল। সাপ ধরতে সাধারণত দুজন করে লোক লাগে। বেদেদের সঙ্গে অনেকসময় বেদেনীরাও থাকে, কিন্তু মজুরির হিসেব হয় পুরুষের নামে। রেশমার বেলায় হিসেব হয় ওরই নামে। সঙ্গীকে রেশমা ছ'আনা বখরা দেয় আর ও-ই মুরুব্বি। আর চালিহার বিবেচনায় সব জায়গাতেই পুরুষের তুলনায় মেয়ের মজুরি কম। রেশমার ভাগ কম কেন হবে, চালানের সময় কি সাপের গায়ে লেখা থাকে এটা মেয়েছেলে ধরেছে! এদিকে গুনগুলে রেশমাই সব থেকে বেশি যোগান দেয়। ও সাপের গর্ত চেনে, শীতের সময়ও শুধু ও-ই খুঁজে পেতে মাস গেলে দু-পাঁচটা সাপ ধরে আনে।

—তাহলে ওর ওপর এই জুলুম কেন?

আবুর এক চোখ ছোট আবার। —একটু বাড়তি তোয়াজ তোষামোদের আশায়। এবার বুঝেছ?

হাসতে গিয়েও আবুর মনে পড়ল কি। গলা খাটো করে বলল, সেদিন তুমি চলে যেতে দুলারি আমাকে বকাঝকা করছিল। সে-ও বলছিল, তোমাকে নেবার ব্যাপারে মেমসায়েবের মতলব রেশমারও না জানাই ভালো।....মেয়েটাকে দুলারিই সব থেকে বেশি ভালবাসে, কিন্তু ওর মেজাজ-মর্জির ওপর বিশ্বাস নেই। তোমার ওপর কখনো রেগে গিয়ে ওই শালার ম্যানেজারকে তোষা-মোদ করার জন্য যদি কিছু লাগিয়ে দেয় তাহলে চিত্তির। আবু বড় করে তাকালো বাপীর দিকে, এই জন্যেই তুমি রেশমাকেও জানাতে বারণ করেছিলে, তাই না?

বাপী অস্বীকার করতে পারেনি। কিন্তু দুলারি যে এত চতুর ধারণা ছিল না।

রবিবারের এই দুপুরেই রেশমার সাপ ধরা দেখেছে বাপী। ভয়ডর ওর নিজেরও কম, কিন্তু বেপরোয়া আর তার সঙ্গীর দুঃসাহস দেখে বার বার গায়ে কাঁটা দিয়েছে। হাতের মুঠোয় জীবন নিয়েই ওরা বেরোয় বটে।

শুনল এই মৌসুমে এর মধ্যে আর একদিন মাত্র বেরিয়েছিল ওরা। কিন্তু তখনো শীতের আমেজ ছিল বলে একটাও মেলেনি। আজ এই দ্বিতীয়বার দল বেরুলো। আবুর মুখে খবরটা শুনে বাপী সকালেই রেশমার ঘরে এসে হাজির হয়েছিল। খুশি.

মুখে বেশমা টিপ্পনী কেটেছিল ভয় পেয়ে আবার কেলেঙ্কারি কাণ্ড বাঁধাবে না তো?

কেলেঙ্কারী শব্দটা খট্ করে কানে লাগল বাপীর। সেটা বুঝেই রেশমা আবার বলল, ওই হারমা'র আগে যাকে কাজ শেখাতে গেছলাম প্রথম দিন একটা কেউটে ফনা তুলে ফোঁস করে উঠতেই ভয়ে আমাকে একেবারে জাপটে সাপটে ধরেছিল।

দুচোখ জোর করেই অন্যদিকে ফিরিয়েছে বাপী। একথার পর মেয়েটা যেন আরো বেশি চোখ টানছিল। সাপ ধরতে বেবুনোর পোশাক বলতে পরণে একটা আঁট জাঙিয়া আর গায়ে তেমনি আঁট গেঞ্জির মতো জামা একটা। পায়ে ফিতে বাঁধা জুতো। ব্যস। মেয়েটার এই যৌবন শাসনে রাখা ওই বেশের সাধ্যের বাইরে।

বেশমার এই সঙ্গীর নাম হারমা। এদিকেরই আদিবাসী। সমবয়সীই হবে দুজনে। স্বাস্থ্য ভালো, হাবাগোবা মুখ। কিন্তু চাউনিটা সন্দিগ্ধ। প্রথম দেখেই বাপীর মনে হয়েছে বেশমার কাছে বাবু-মানুষ আসাটা পছন্দ নয়। জঙ্গলের পথ ভাঙার ফাঁকে হেতুও বুঝেছে। ভক্ত মুগ্ধ হলে যা হয়, তাই। মুখে কথা নেই, কিন্তু চোখ দুটো নারী-অঙ্গ ছেড়ে নড়ে না। শিকারের সময়েও কি এই মুগ্ধ ভক্ত ওর দিকেই চেয়ে থাকে নাকি। তাহলে তো ছোবল খেয়েই মরার কথা।

সাপ ধরার সরঞ্জামও সাদাসিধে। হাতে এক ইঞ্চি মোটা আর দু হাত লম্বা একটা করে লাঠি। লাঠির এক মাথায় কম্বলের টুকরোর মতো ছোট জাল আটকানো। আর বিপাকের হাতিয়ার হিসেবে কোমরে ছোরা গোঁজা। হারমার বগলে সরু আর গোল বেতের ঝুড়ি একটা, তার মধ্যে ছোট ছোট কতগুলো দড়ির ফাঁস লাগানো থলে।

প্রথমেই আনায়াসে বড়সড় একটা নির্বিষ সাপ ধরে থলেতে পুরল ওরা। নির্বিষ সাপে পয়সা অনেক কম, কিন্তু বউনি ছাড়তে নেই। বেশমা ছুটে গিয়ে লাঠির মাথায় আটকানো কম্বলের জাল মাথায় ফেলতেই হারমা শক্ত দুহাতে ওটার গলার কাছটা চেপে ধরে ঝুড়িতে ঢুকিয়ে দিল। তারপর থেকেই গায়ে কাঁটা বাপীর। একটা সাদা-কালো শাখামৃগের পিছনে তাড়া করেছে ওরা। এরও ফনা নেই, কিন্তু অতি-বিষাক্ত। এবারে লাঠির জালের দিকটা ওদের হাতে। তবতর করে একটা গাছের দিকে এগোতে যাচ্ছিল, তার আগেই রেশমা লেজের ওপর লাঠির ছোট ঘা বসালো একটা। সাপটা ওর দিকে তেড়ে আসতেই পিছন থেকে হারমা তেমনি লেজে ঘা মারল। এই চলল মিনিট কতক। রেশমাকে তাড়া করে তো হারমা লেজে ঘা মারে আর হারমাকে তাড়া করে তো রেশমা। বিষাক্ত সাপের বেলায় দেখা গেল শেষ কাজ রেশমার। ফাঁক বুঝেই খপ করে এক হাতে গলার কাছটা চেপে ধরে মাটি থেকে তুলে ফেলল, আর গায়ে জড়ানোর আগেই অন্য হাতের মুঠো আর আঙুল সাঁড়াশির মতো খানিকটা নিচের দিকে চেপে ধরেছে। আর চোখের পলকে হারমার লাঠির জালের দিকটা শাখামৃগের মুখের ওপর। বিষদাঁত ওই কম্বলের জালে আটকে গেল। তারপর কাঁপি থেকে থলে বার করে জাল সরিয়ে ওটার মুখে ধরলেই হল—তখন লেজ ওপরে মুখ নিচে। থলেতে না ঢুকে যাবে কোথায়?

এই দেখেই ঘাম ছুটেছিল বাপীর। তারপর দেড় ঘন্টার মধ্যে পঁচিশ মিনিটের ফারাকে দু দুটো গোখরো ধরা দেখে শরীরের রক্ত জল। প্রথমটা কম করে ছ ফুট লম্বা হবে, পরেরটাও পাঁচ ফুটের কম নয়। আর তেমনি চকচকে বসানো বীভৎস ফণা। ধরার কায়দা একই, তবে ফণা আছে বলে আরো হুঁশিয়ার ওরা। ছোবল দেবার জন্য একজনের দিকে ফণা তুললেই অন্যজন লেজে বাড়ি দেয়। সেদিকে তাড়াতাড়ি করে ফণা তুললেই অন্যজন তাই করে। ..... বেশমার বুকের পাটা সম্পর্কে বাপী বলেছিল, বিষাক্ত সাপগুলোর খপাখপ টুঁটি টিপে ধরা দেখলে তোমার তাক লেগে যাবে। একটুও বাড়িয়ে বলেনি। দেখেই বাপীর কালঘাম ছুটেছে। টুঁটি যখন চেপে ধরে তখন রক্তবর্ণ মুখ বেশমার, আর চোখদুটোও তখন যেন সাপের মতোই ভয়াবহ। এক হাতে এই সাপ মুঠোয় ধরে রাখা যায় না, একটু বাদেই দুহাত লাগাতে হয়। ততক্ষণে সাপের তলার দিকটা হারমার এক হাতের মুঠোয়। মুখে জাল লাগিয়েই অন্য হাতে ঝাঁপি থেকে থলে বার করবে।

বেশমা হাঁপাচ্ছে আর বুকটা ফুলে ফুলে উঠছে। আবার হাসছেও। মুখ এখনো লাল। কাজ সারা হতেই ভক্ত হারমার মুগ্ধ দু চোখ আবার ওর দিকে তন্ময়।

বাপীর দিকে চেয়ে রেশমা বলল, বোসো, ওটার জোড়টাও এক্ষুনি এ-দিকে এলো বলে। সম্ভব হলে বাপী রেশমাকে টেনে নিয়ে চলে যেত। বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হল না, মিনিট পঁচিশের মধ্যে কোথা থেকে বেরিয়ে সাপটা সোজা তেড়ে এলো। কি ঘটেছে আঁচ করতে পেরেই হয়তো এই হিংস্র আক্রোশ। এটাকেও থলেতে পোরার পরে এই দিনের মতো ক্ষান্ত হল রেশমা।

খুশিতে আটখানা।—তুমি আমার খুব পয়মন্ত লোক দেখি যে বাপী-ভাই, দু ঘন্টার মধ্যে তিন-তিনটে জাত সাপ ধরে ফেললাম। তোমার পায়ে একটা শঙ্খচূড় পেলে হত—একটাতেই ডবল টাকা।

বেশমার হুকুমে ঝুড়ি মাথায় হারমা আগে আগে চলেছে—আর সাহেবকে দেখিয়ে ওটা সাপ-ঘরে রেখে আসবে।

বাপী বলল, ভালো টাকা রোজগার হল আজ তাহলে?

—হলই তো। সঙ্গে সঙ্গে চোখে মুখে রাগের ঝলক।—অন্য লোকে ধরলে আরো বেশি টাকা পেত, আমি বলে ওই ম্যানেজারের বখরাতির জন্য কম পাই। ওই তিনটে বিষাক্ত সাপের জন্য অন্য অন্য লোকে কম করে তিন-পাঁচে পনের টাকা পাবে।

—আর তুমি?

—আমাকে দেবে বারো টাকা। এর থেকে হারমাকে ছ' আনা ভাগ দিলে আমার কি এমন থাকে!

অর্থাৎ একটা সাপের জন্য চার টাকা। ওর ভাগে থাকে আড়াই টাকা। বুকের তলায় মোচড় পড়ছে বাপীর। মাত্র আড়াইটে টাকার জন্য এক-একবার হাতের মুঠোয় প্রাণ।

রেশমা আবারও ঝাঁঝালো গলা—ওই ম্যানেজারকে বলে আমার পাওনাটা এবারে তুমি ঠিক করে দাও না, অন্যের থেকে আমি কম পাব কেন?

—আমি বললে বেশি দেবে?

—হাড় পাজি ওটা, এমনি বললে দেবে না, একটু তোষামোদ করে বলতে হবে।

বাপী জবাব দিল, আমার দ্বারা ওটাই তো হয় না।

—হয় না মানে, নিজের জন্যে তো বেশ তোষামোদ করতে পারো!

কি মনে পড়তে বাপীর স্নায়ুগুলো সজাগ হয়ে উঠল হঠাৎ। ভালো করে মুখ-খানা দেখে নিতে ইচ্ছে করল। কিন্তু খানিক আগের ভয়াল উত্তেজনা কমে আসার পর এই মেয়ের পাশাপাশি চলাটাই অস্বস্তি-কর। হারমা হয়তো রাগ বা অভিমান করেই অনেকটা এগিয়ে গেছে।

সাদা মুখেই বাপী জিগ্যেস করল, তুমি পারো না তাকে তোষামোদ করতে?

—আমি? আমি ওর ঘরে কেউটে বা গোখরো ছেড়ে দিয়ে আসতে পারি।

—সেই রাতে তাই তাড়তে গেছলে?

এক ঝটকায় সামনে এসে মুখোমুখি দাঁড়াল রেশমা।—কোন্ রাতে?

—পনের ষোল দিন আগে যে রাতে আবুকে সঙ্গে করে আমি নিজের জন্য তোষা-মোদ করতে গেছলাম?

কয়েক মুহূর্তের জন্য হতচকিত মুখ। তারপরেই দু চোখ ঝলসে উঠল।—তোমাকে কে বলল?

—কেউ না। আমার ধারণা তুমি তখন ম্যানেজারের ভিতরের ঘরে ছিলে। বাপী হাসছে অল্প অল্প।—অত চোখ লাল কোরো না, সরো।

ছিটকে সরে গিয়ে রেশমা দ্রুত হেঁটে চলল। একটু বাদেই গাছ-গাছড়ার আড়ালে

বাপী সেখানেই আরো খানিক দাঁড়িয়ে। হঠাৎ মাস্টার মশাই ললিত হুডের মেয়ে কুমকুমের মুখখানা মনে পড়ল। পেটের দায়ের সেই মুখের সঙ্গে রেশমার এই মুখের অনেক তফাৎ।

রেশমা বাববর্ণিনী নয়। রেশমা ফণিনী। (চলবে)

ঘোড়া

প্রফুল্লকুমার সিংহ

চেতনার আকাশটা একটু একটু ফিকে হয়ে আসছে। ভয়ে বিস্ময়ে ঘোরলাগা চোখের পাতা মেলবারও সাহস নেই তখন। আস্তে আস্তে হাতটা তুলে মাথায় রাখল। সেখানে এক রকমের চিনচিনে বেদনা। হাতে চ্যাটচেটে কিছু লাগল। কাঁচা রক্ত। তখনো ঝনের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। আরো ভয় পেয়ে গেল ও। হাঁটু দুটো ভাঁজ করে কুঁকড়ে বসবার চেষ্টা করল। অনেক চেষ্টার পর একটু একটু করে চোখ খুলল। চারিদিকে নিরেট অন্ধকার। নিজের শরীরটাও দেখা যায় না। চলাফেরা অসম্ভব। সঙ্গে একটা ডিব্‌বী বাতি ছিল সেটা যে কোথায় ছিটকে পড়েছে তাও জানে না। আকাশ-পাতাল তোলপাড় করা বিপুল শব্দপুঞ্জ কানের পাতায় এখনো ঝম্‌ঝম্‌ করছে। আর সেই ভয়ংকর বায়ুপ্রবাহ। যার ঝটকায় সে যে কোথায় ছিটকে পড়েছে জানে না। জানে না আর অতিপ্রিয় ঘোড়া জেমি এখন কোথায়।

পুঞ্জীভূত ভয়, বিস্ময়, অন্ধকারে সে প্রাণপণে চিৎকার করল—জেমি!

সেটা ঘোড়ার যুগ। যুদ্ধ করতে ঘোড়া। বিয়ের বরযাত্রী যেতেও ঘোড়া, মল তুলতেও ঘোড়া, খাদের হলেও টানতেও ঘোড়া। জেমি তেমনি একটি ঘোড়া যে খাদে টবগাড়ী টানত। যেন ডিপের খোল নম্বর গোলাই থেকে পূর্বে বাইশ নম্বর ডিপ পর্যন্ত দেড় হাজার ফুট লম্বা ট্রাম লাইন। কাঠের ফ্রেম আর লোহার পাতি দিয়ে তৈরি টবগাড়ী-গুলো সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। প্রতি। ক্ষেপে আটটি করে খোঝাই টবগাড়ী যুতে দেওয়া হত জেমির কাঁধে। জেমি চলত। পিছনে বসার টান পড়ে টবগাড়ীও চলত। ইরফান আলি তার সহিস। এখন হঠাৎ হাওয়ার ঝটকায় ছিটকে পড়েছে কয়লার কাঁথিতে। মাথায় চোট লেগেছে। রক্তপাত হচ্ছে এবং সর্বাঙ্গে এক প্রকার ভয় গুর-গুর করছে। বুকের ভিতর ধুক্‌ ধুক্‌ করে ডিজেল ইঞ্জিন চলছে এবং তার চেতনা দ্রুত স্পন্দমান হৃৎপিণ্ডের তালে তালে আছাড়-পিছাড় খাচ্ছে।

ইরফান আলি আবার চিৎকার করে উঠল—জেমি!

বহু দূর থেকে এক জান্তব কণ্ঠস্বর ভেসে এল। ইরফান তা কান পেতে শুনল এবং চিৎকার করল—জেমি!

আবার সেই কণ্ঠস্বর। অস্পষ্ট হেষা-ধ্বনি। ইরফান তা চিনতে পেরে টবগুলি উৎসাহে চিৎকার করল। জবাব এল একটু পরেই। এরপর এক জন্তু ও এক মানুষ পরস্পরকে ডাকাডাকি করে হাতে পেয়ে হাঁটতে লাগল। তাদের কণ্ঠস্বর বন্ধ সুড়ঙ্গ পথে গম্‌ গম্‌ করছিল। দিক নির্ণয়ে যথেষ্ট বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছিল। তবু অন্ধকারের ভয়াবহ ভীতি বুকে নিয়ে শুধুমাত্র শব্দ সম্বল করে ওরা অনেক কষ্টে পরস্পরের

নিকটে এল। এবার ওরা পরস্পরের শরীরের গন্ধ পাচ্ছে। শব্দে গন্ধে ব্যাকুল জন্তু ও মানুষ যখন মিলিত হল তখন উভয়ের মধ্যে এক আশ্চর্য আবেগের প্লাবন উথাল-পাথাল করে উঠল।

জেমির মুখটা ধরে স্বর্ণাধারার মত কাঁদতে কাঁদতে ইরফান বলল—জেমি! আমাদের কি হল রে? এ কোথায় এলাম রে? চারিদিকে শুধু অন্ধকার। নীরব, নিস্তব্ধ। কোথাও একটা লোক চলাচল নেই। একটা বাতির ছটা নেই। একি ভীষণ ব্যাপার রে।

জন্তুটি ঘনঘন মাথা নাড়ল। মুখের লালায় ওর মুখ ভাসিয়ে দিল এবং অস্পষ্ট দুর্বোধ্য ভাষায় অনেক কিছু বলল। এসব কথা, অভিব্যক্তি সব বোঝে ইরফান। ওদের অন্তরের সম্পর্ক বড় নিবিড়। কত কি কারণেই এর কথা মনে করলেই ইরফানের স্মৃতির পাতাগুলো ফরফর করে উড়তে থাকে। ছেলে এবং স্ত্রীকে মনে পড়ে। প্রথম প্রণয়ের কথা মনে পড়ে। ঘোড়ার পিঠে চড়ে অভিসারে যাওয়ার কথা মনে পড়ে। সে যে ওদের মিথুন পর্বেরও সাথী। ভালবাসার কি পরিমাপ আছে?

সেই জেমি এবং ইরফান জীবনের এক অন্ধকার মুহূর্তে যাদের মধ্যে ব্যাকুলভাবে পরস্পরের সঙ্গে গলাগলি করে পড়ে আছে। জন্তু ও মানবের চোখ বেয়ে অবিরল ধারায় জল পড়ে কালো কয়লার আস্তরণ ভিজে যাচ্ছে।

আর তখন ফুলটাঁড় কলিয়াবীর আকাশে পাতালে মাটিতে বাতাসে শুধু হাহাকার। সেই যে এক লেলিহান আগুনের ফুলকি বা চানকমুখে নীল আলোর রোশনাই নিয়ে ঝলসে উঠেছিল, আকাশে ছড়িয়ে দিয়েছিল কালো। কালো ধোঁয়ার পুঞ্জ এবং বিরাট শব্দে পৃথিবী বিদীর্ণ হয়েছিল তার ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া যাদের ভিতরে কাটা-ছেঁড়া পোড়া ঝামা মৃতদেহ এবং উপরে ভয়ে ভাবনায় উদ্বেগে হাজার হাজার নরনারীর বুকফাটা আর্তনাদ। পথে ঘাটে, কথায়-বার্তায়, আহারে নিদ্রায়, নিঃশ্বাসে ও প্রশ্বাসে শুধু একটাই রব—ফুলটাঁড়ে বিস্ফোরণ। যাদের ভিতর গ্যাস, আগুন। মানুষজন পুড়ে ঝামা। বাঁচার আশা কারো নেই।

কতক্ষণ এভাবে পড়েছিল কে জানে। হঠাৎ কানে এল মানুষের পথ চলার শব্দ। কথা বলার শব্দ। আরো পরে এক ফালি ক্ষীণ আলো।

ইরফান চিৎকার করে উঠলো—কে আছো?

ওদিক থেকে সাড়া মিলল—তুমি কে?

—আমি ইরফান আলি। জেমির সহিস।

—তোমরা কে কে আছো? বেঁচে আছো তো?

—আমি আর জেমি। দুজনেই বেঁচে আছি।

——তোমার কাছে বাতি আছে?

—না।

—ওখানেই থাকো আমরা যাচ্ছি।

এগিয়ে এলো চারজন মানুষ। সিধু দাস—খাদের সরদার। অন্য তিনজন কাঠমিস্ত্রীর দল। রাজু মিশ্র—মিস্ত্রী রামধনি ও বুলাকিরাম—কুলি। সিধুবাবুর হাতে একটি তিনসেল টর্চ। বাদবাকী সবাই আঁধারের মুসাফির। তবে রাজু মিশ্রর হাতে একটি বাগুলী এবং রামধনির হাতে একটি শাবল আছে। হাতের যন্ত্র।

সিধুবাবু বললেন—যাক্ তবু যে তুই বেঁচে আছিস এই যথেষ্ট। আমরা বিপদে পড়ে গেছি রে। হাওয়ার ঝটকায় কে যে কোথায় ছিটকে পড়ল কে জানে। বাতিটাতিও সব নির্ভে গেছে। এখন দুনিয়া অন্ধকার। পথটাবও হদিশ বের করতে পারছি না। মাথা গোলমাল হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে খাদে কোথাও বিস্ফোরণ হয়ে গেছে। ওঃ কি ভয়ংকর! ভাবতেও গা শিউরে উঠছে।

ইরফান কান পেতে শুনছিল। কাতর-ভাবে বলল—তাহলে উপায়?

—চল উপরে উঠি। এই একটি মোটে বাতি জ্বাললেই ক্ষয়। কী করে যে যাব সেই ভাবনা। পূর্ব পশ্চিম দিকও ঠিক হচ্ছে না।

রাজু মিশ্র বলল—পথ না পেলে যাবে কী করে?

—যেতে হবে। এখানে এই মৃত্যুর গহ্বরে পড়ে থাকার তো কোন যুক্তি নেই। চলতে চলতে পথের খোঁজ করতে হবে। তবে একটা কথা বলি ক্রমাগত উপরের দিকেই উঠবে নীচে নামবে না। তবেই কোন এক সময়ে আমরা মাটির কাছাকাছি পৌঁছাব। হয়ত পেয়ে যাব কোন পুরনো চানক অথবা সিঁড়ি খাদ। আমরা মরব নারে। আমাদের উপরে যে অনেকগুলি পৃথ্যি নির্ভর করে আছে। ঈশ্বর তা জানেন।

ক্লান্ত বিষণ্ণ কণ্ঠে কথা বলতে বলতে গলাটা বুজে এল। সিধুবাবুর মনে হল তার স্ত্রী পুত্র কন্যারা অঝোরে কাঁদছে। তাদের বুকভাঙা কান্নায় শুকনো মাটি ভিজে যাচ্ছে। তাদের আর্ত বিলাপ শুনে পথের পথিক চোখ মুছছে। ওঃ। ভগবান!

বিস্ফোরণের প্রচন্ড তরঙ্গ চানকমুখে বেরিয়ে যাবার পথে যারা ছিল তারা তো তৎক্ষণাৎ উড়ে গেছে। কিন্তু যারা ছিল বহুদূরে অর্থাৎ এই সিধুবাবুদের মত তারা স্রেফ বাতাসের ঝটকায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। কেউ বা তিন চারশ ফুট পর্যন্ত গড়িয়ে পড়েছিল। চোটখাট সবারই লেগেছে। কারো চোখে মুখে, কারো হাতে পায়ে মাথায়। এখন জ্ঞান ফিরেছে তবে দিশেহারা। পথ ভুলে কোথায় যে চলছে জানে না।

আঁধার ঘরে ঘুম ভেঙে পরিচিত দুয়ারটি হাতড়ে হাতড়ে খুঁজতে গিয়েও কারো না পায়ে খাট, টেবিল, দেওয়াল বা জিনিসপত্রের ঠোকাঠুকি লাগে না? আর এতো খাদ। এখানে নকিছুই সহজ সরল নয়। সব কিছুই প্রকৃতির ব্যতিক্রম। এমন কি বাতাসটিও আসছে কৃত্রিম উপায়ে। এখানে যা কিছু অকৃত্রিম তা নিকষ কালো কয়লা এবং পাথর। চলতে গেলেই হোঁচট খেতে হয় কাঠ, খুঁটো, কগ, দেওয়াল, পাথর ইত্যাদির সঙ্গে। সিধুবাবুর হাতে একটি মাত্র টর্চের কভু কখনো ফিনকি দেওয়া আলোতে দেখে নিচ্ছে সামনেটা তারপর হামাগুড়ি দিয়ে চলছে। কল্ কল্ করে গা দিয়ে ঘাম ঝরছে। ক্রমশঃ ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ছে। তবু চলা চাই। পথের শেষে জীবনধারণের একান্ত অবলম্বন আলো, বাতাস এবং খাদ্য। সেখানে যে পৌঁছতেই হবে।

সবারই শেষে ইরফান। সে একহাতে ধরে আছে জেমির গলা। বুক দিয়ে শাঁ শাঁ করে বাতাস বইছে এবং হাতে পায়ে খিল ধরে আসছে। জেমি অবলা প্রাণী। তার প্রাণ বইছে ফোস ফোসে কান্নার মত। নির্বোধ জানোয়ার নির্বিচারে বুদ্ধিমান মানুষকে অনুসরণ করছে।

হঠাৎ মানুষের গলা।

সিধুবাবু সাড়া দিলেন—কে রে তুই?

—আমি। দীনু বাউরী। পাথরকাটা।

—আর কেউ আছে নাকি?

—একজন আছে। আঁধারে চিনতে পারছি না। বোধহয় মরে গেছে।

—আসছি। দাঁড়া। আমি যাচ্ছি।

তারপর সঙ্গীদের বললেন—তোরা সব এইখানে থাক। আমি আর রাজু দেখে আসি। নাকি বল।

রামধনি আর বুলাকিরাম বসে হাঁফাতে লাগল। ইরফানও হাঁফাচ্ছে। ঘোড়াটির গায়ে হাত বুলিয়ে বলল—তোর খিদে লেগেছে রে?

জেমি গলাটা লম্বা করে শ্বাস নিল। তারপর পা মুড়ে বসে পড়ল।

রামধনি বলল—বড্ড পিয়াস লেগেছে ইরফান ভাই।

বুলাকি বলল—মনে হচ্ছে বুক ফেটে যাবে।

ইরফান বলল—আচ্ছা, আমরা বাঁচব তো?

বুলাকি বলল—শ্রীরাম চন্দ্রজীর কৃপা হলে বাঁচব।

রামধনি বলল—না। আর বসে থাকতে পারছি না। একটু শুই। বড় ঘুম পাচ্ছে।

লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। কয়লার মিহি গুঁড়ো ওর পিঠের উপর লম্বা কাটা দাগটার উপর চেপে বসল। বকৃত মুখে কয়লা গুঁড়ো লেগে চিন চিন করে উঠল। তখন আবার হাত দিয়ে মুছতে গিয়ে আরেক যন্ত্রণা।

ওর দেখাদেখি ইরফান ও বুলাকি রামও শুয়ে পড়ল। ঘাম ঝরা গায়ে কয়লার

মিহি গুঁড়ো একটা কালো আবরণ পরিয়ে দিল। ক্লান্ত অবসন্ন চোখ দুটি বুজে স্ব-স্ব গৃহকোণে জাতক জায়া ও জননীর কথা ভেবে ব্যাকুল হয়ে পড়ল। স্ব-স্ব ইষ্টদেবকে স্মরণ করে প্রার্থনা জানাল—ঠাকুর এই ঘোর বিপদ থেকে উদ্ধার কর।

সিধুবাবু ফিরে এলেন। তার সঙ্গে দীনু পাথরবাটা এবং রাজুর কাঁধে মিতন মাঝির সংজ্ঞাহীন দেহ।

মিতনকে লম্বা করে শুইয়ে দিয়ে গামছা দিয়ে শরীরের ঘাম মুছে নিয়ে ওর চোখ মুখ মুছিয়ে দিতে দিতে সিধুবাবু বললেন—একটু জল হলে ভাল হত। ঘামের জল আর কতটুকু। ওতে কি জ্ঞান হয়। ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে রে।

রাজু মিঞা গামছা ঘুরিয়ে ওর মুখে একটু একটু করে বাতাস করতে লাগল। ইরফান জেমির কষ বেয়ে পড়া ফেনাটুকু হাত দিয়ে চেঁছে নিয়ে মিতনের চোখে মুখে দিল।

হঠাৎ রাজু মিঞা একটা কাণ্ড করে বসল। মিতনের মুখে প্রস্রাব মাখিয়ে দিল। ওর হাঁ করা মুখ দিয়ে অনেকখানি প্রস্রাব পেট পর্যন্ত পৌঁছে গেল। মুখটা জলে ভেসে গিয়েছিল সেজন্য গামছা দিয়ে মুছিয়ে দিল এবং গামছা ঘুরিয়ে জোরে জোরে বাতাস করতে লাগল।

অন্য সময়ে যা হত ভীষণ অশ্লীল এবং অপমানকর তা এখন এতগুলি মানুষের কাছে এতটুকু বিসদৃশ ঠেকল না। এবং আশ্চর্য, শরীরের দূষিত আবর্জনার মত ঐটুকু জল একটা মানুষের চেতনার আকাশে রং ধরিয়ে দিল। সে একটু একটু করে জেগে উঠল। সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে প্রস্রাবের কটুগন্ধে নাক সিঁটকাল কিন্তু অন্য কেউ তাকে এব্যাপারে কিছু বলল না।

সিধুবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—এখন কেমন লাগছে রে মিতন?

—ভাল লাগছে বাবু। ওঃ পরানটাই উড়ে গেইছিল হে।

—হুঁ। আপাতত ফেরৎ এল তবে কতক্ষণ খাঁচায় থাকবে কে জানে।

রামধনির পেটটা কল কল করে ডাকছিল। সে বলল—বাবা, ক্ষিদা তিষ্টাতেই মরতে হবে নাকি।

—সে বললে কি হয় রে রামধনি। আমাদিকে চলতেই হবে যতক্ষণ না আলো বাতাস পাই। চল উঠি। মিতন চলতে পারবি?

—না। বুকটা বেদনায় ফেটে যাচ্ছে।

ইরফান বলল—তুই জেমির পিঠে বোস।

—হুঁ হুঁ। এই কথাটি মনে পড়ে নাই হে।

মিতনকে জেমির পিঠে চড়িয়ে ওরা আবার হামাগুড়ি দিয়ে চলতে শুরু করল। বড় কষ্টদায়ক, বড় ক্লান্তিকর সেই যাত্রা। অব্যবহৃত সুড়ঙ্গ পথ। কোথাও পাথর পড়ে তাই হয়ে আছে, কোথাও কাঠ খুঁটো হড়কে গেছে। কোথাও বা আস্ত ছাদ ধসে গেছে। হামাগুড়ি দিয়ে চলার পথে ঠোক্কর খেতে খেতে ওরা এগুচ্ছে। বাতাস ভীষণ জলবী। একটুকু স্রোত নেই। মাঝে মাঝে মাকড়শার জাল। চোখের পাতায় সেঁটে গিয়ে বিপত্তি বাড়াচ্ছে। উঁচু নীচু ভাঙা পাথর কখনো বা মধ্যে চলতে গিয়ে কারো বা পা হড়কে যাচ্ছে। তৃষ্ণায় কাতর অবসন্ন মানুষগুলির বুক চলছে হাপরের মত। বাঁচবার কোন আশা তখন তাদের অবশিষ্ট নেই।

সিধুবাবু বললেন—সবাই একটু জিরিয়ে নাও। তারপর এই লেভেল রাস্তা ধরেই আমরা চলব। দেখছো তো এই বরাবর একটা পুরনো লাইন ছিল। আশাকরি পথটা ভাল হবে এবং চলতে চলতে আমরা যেন ডিপে পেঁছে যাব। তখন রাস্তা পাব।

রাজু বলল—ততক্ষণ বাঁচব তো?

—হুঁ হুঁ। নিশ্চয় বাঁচব।

—কি খেয়ে বাঁচব। তেষ্টায় তো বুক ফেটে গেল।

—কেন প্রস্রাব খাও। তিষ্টা মিটাও।

বুলাকি বলল—ছিঃ। তাই কি হয় নাকি!

রাজু বলল—হয় হয়। আরে জীবনটা বাঁচলে তো লজ্জা ঘেন্না।

—তাও তো বটে।

প্রস্তাবে সায় দেওয়া সবারই পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু জীবনের বড় দায়ও নেই। সবাই এলিয়ে পড়েছে। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে। এখন দু ফোঁটা জল। সে ড্রেনের জলই হোক বা প্রস্রাবই হোক তাতে কি যায় আসে।

রামধনি প্রথম শুরু করল। হাত পেতে নিজের প্রস্রাব নিয়ে নিজেরই মুখে দিল। এক বিরাটকায় ঘেন্নার পাহাড় সমেত তা গিলেও ফেলল। নোনতা আস্বাদন এবং কটুগন্ধে বুক ঠেলে বমি আসার উপক্রম হল তবু কিন্তু একরকমের স্বস্তি। অতঃপর সবাই সেই পথের সামিল হল। এবং এখন লজ্জা, ঘৃণা পাকস্থলীর প্রজ্বলিত বহ্নিকুণ্ডে আহুতি দিয়েছিল।

দীর্ঘক্ষণ যাবৎ অসাড় হয়ে পড়ে রইল। বুকের হাপরটার গতিবেগ ক্রমশঃ কমে এল। এখন বুক চিরে শাঁ শাঁ শব্দের ক্ষীণ শ্বাস প্রশ্বাস জীবনের অস্তিত্বকে জাগিয়ে রেখেছে মাত্র। কথা বলারও সাধ্য নেই। চুপচাপ চোখ বুজে পড়ে আছে। মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছে। শরীরের গিঁট গুলিতে খিল ধরে গেছে। হাত নাড়তে কষ্ট, পা নাড়তে কষ্ট, শ্বাস নিতেও কষ্ট।

ইরফান জেমির গলাটা ধরে শুয়েছিল। জেমি চারখানা পা লম্বা করে ছড়িয়ে দিয়ে মাথাটা এলিয়ে একপাশে কাৎ হয়ে পড়েছিল। এক নজরে দেখলে মড়া বলেই ধারণা হবে বোধহয়। ইরফানের এবং জেমির শ্বাস-প্রশ্বাস একই তালে বইছিল। বুকজোড়া জ্বালা জ্বলকে জ্বলকে উঠছিল। সারা অস্তিত্ব নড়ছে। চোখের সামনে মতিন বিবির নিরেট মুখখানা ভাসছে। আহা বেচারীর কত সাধের ঘরকন্না। কেন এলি হতভাগী সহিসের বাচ্চা সহিসের ঘরকন্না করতে? বাঁড় হবার জন্যে?

দুটি শিশু। এখনো দুধ দাঁত খসে পড়েনি। তারা হাসে, তারা কাঁদে, তারা খেলা করে। তাদের নিরেট বোকা জননী বিপুল স্নেহে লালন করে। তাদের সহিস বাপ অভিভূত হয়। এক অকৃত্রিম আকর্ষণ বোধ করে ঐ নারী ও শিশুদের প্রতি। যেখানেই থাকুক সে ছুটে যায় ঘরের কোণে।

এখন সেই দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ছোট বড় কত মুহূর্তের স্মৃতি ঝিকঝিক শব্দ তুলে চোখের পাতার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। কত চেষ্টা করছে অন্ততঃ একটাকেও যদি ধরতে পারে। কিন্তু ওরা যে অধরা। ওরা তো ধরা দেবার জন্য আসে না। আসে প্রাণের স্পন্দনে গতি সঞ্চার করতে।

হঠাৎ তার কান দুটো খরগোশের মত খাড়া হয়ে গেল। ওদিকে ফিসফিস করে কথা হচ্ছে রাজু মিঞার সঙ্গে সিধুবাবুর। রাজু মিঞার লোকটা বড় হিংসুটে, বড় বেপরোয়া। না পারে এমন কাজ নেই। এখন তেমনি একটি কাজের ফিরিস্তি দিচ্ছে সিধু-বাবুকে।

সিধুবাবু বললেন—নাবে রাজু। আদা অবলা জীবন। আমাদেরও যা গতি হবে ওরও তাই হবে।

ফিসফিসানির মধ্যেও গর্জে উঠল রাজু—তাই বলে হাতের কাছে থাকতে এত-গুলো মানুষ উপোষ দিয়ে মরব নাকি।

দীনু বলল—না যাবু অমত করো না। ই-ছাড়া পথ নাই।

বুলাকি বলল—মিস্তি ঠিকই বলছে।

শুনতে শুনতে বুকের স্পন্দন থেমে যাবার উপক্রম। ওরা কি বলতে চাইছে? ওরা কি জেমিকে—না না। সেকথা সে ভাবতে পারে না। হে আল্লা মেহেরবান এমন দাগা দিও না।

অনেকক্ষণ নীরব। রাজু বলল—ইরফান।

—উঃ।

—শোন।

—বল।

—দেখতেই তো পাচ্ছিস। সবাই তো মরতে বসেছি। এ সময় কিছু খাবার পেলে হয়ত বেঁচে যাব। তাই বলছি জেমিকে আমাদের হাতে দে।

আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল—না। না।

গলা দিয়ে চিঁচিঁ করে শব্দ উঠে মিলিয়ে গেল। ঠাণ্ডা গলায় রাজু বলল—অবুঝ হস্ নে ইরফান। মনে কর আমরা যদি কিছু খাবার পাই তবে তো আবার চলতে পারব। আবার পথের খোঁজ নিতে পারব। তখন হয়ত একটা পথ পেয়েও যেতে

রি।] আবার আমরা আলোর জগতে পৌঁছে তে পারি।]

রীম্রু ঘন নিল।] কুলোকি বলল—মাদের জানানা বাল-বাচ্চা আছে। তাদের খেতে দেবে? কে পালপোষ করবে? ত আমরা মরে গেলে জানানা বালবাচ্চা খ মেগে বেড়াবে নাকি বহু বেটি কসবি ন যাবে-তা কি করে জানবি বল।] কাজেই মাদিকে বাঁচতেই হবে।

দীনু বলল—এই ঘোড়ার রক্ত মাংস য়ে নতুনভাবে লড়াই করার তাগদ তো ব।

ইরফান কাতরভাবে বলল—আমি বেঁচে কতে জেমির মৃত্যু দেখতে পারবো না। র চেয়ে আমাকে কেটে খা।] আমারো তো রীরে রক্ত মাংস আছে। ঘোড়ার সঙ্গে নুষের বেশী তফাৎ হবে না।

যুলাকি বলল—ওসব বাজে কথা লস না ইরফান।]

রাজু বলল—বুঝলি অন্ধকারের একটা জা আছে। তুই এখান থেকে ঘর পর্যন্ত খতে পাবি। দ্যাখ তো—কি দেখছিস? তার ছেলেগুলো কেঁদে কেঁদে নেতিয়ে ড়েছে। তোর বৌয়ের চোখ দিয়ে আর জল বছে না। রক্ত ঝরছে। সে রাস্তার ধারে াঁড়িয়ে আছে। খিদেতে পেট কলকল রছে।] তাজা শরীরটা শুকিয়ে গেছে।

—হাঁ সে কি বুঝছি না।

—অথবা এমন তো হতে পারে।] সে তার পথ চেয়ে বসে থাকতে পারছে না।' তার খিদে-তিষ্টে কামনা বাসনা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তখন কেউ এসে তার সামনে টাকার তাড়া নাচাচ্ছে। সে যেমনি এক হাত দিয়ে টাকার তোড়াটা নিতে যাচ্ছে অমনি সেই লোকটার আরেকটা হাত তার লঙ্গোর আবরণ টেনে খুলে দিচ্ছে। সে টাকা দিচ্ছে বিনিময়ে তোর বৌয়ের মাংস-রক্ত চেটে চেটে খাচ্ছে।'

—না। তা হতে পারে না।] সে আমি সহ্য করতে পারব না।'

—তবেই ভেবে দ্যাখ ঘোড়ার মাংস তোর বৌয়ের মাংসের চেয়ে বেশী দামী নয়।

সিধুবাবু বললেন—অবুঝ হস নে ইরফান। এছাড়া পথ নেই।

—বুঝি তো সব। কিন্তু মন যে মানে না।'

—মনকে তো মানাতে হবে রে ভাই।

আবার নিস্তব্ধতা।' বুকচেরা করেকটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়া কারো মুখে কথা নেই। ইরফানের চোখের পাতায় মতিন বিবির মুখ। সে কাতর ভাবে তার দিকে তাকিয়ে। যেন বলছে বলো কি খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখব তোমার ছিলেদিকে? আমার কি আছে? এই শরীর। এ তো তোমার জন্যই।

দীনু হামাগুড়ি দিয়ে ওর কাছে পৌঁছাল। সে আলতোভাবে ঘোড়ার গায়ে

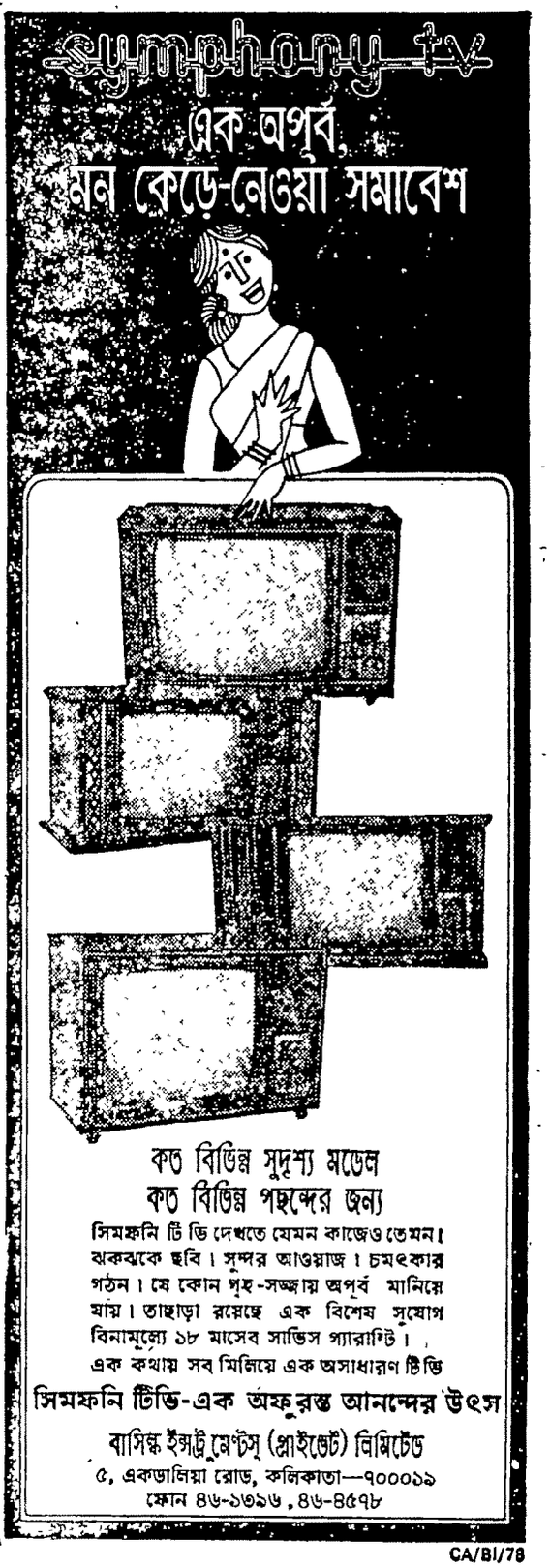

CA/BI/78

হাত বুলাতে লাগল। একটুপর রাজু। তারপর বুলাকি।

ইরফান বলল—তোরা কি বলছিস কি?

—বাজী হ ভাই।

—না।

—না কেন? তোর জিদের জন্য আমরা মরব বলতে চাস?

—আমাকেই মেরে ফেল তবে।

রাজু বলল—কথা শুনবি না।

—না।

—শালা মানুষের চেয়ে ঘোড়ার জানের দাম বেশী হল তোর কাছে?

—সে যা বুঝিস।

—তাহলে জুলুমেই মরতে হবে।

ফুঁসে উঠল ইরফান—কই মারতো দেখি।

হঠাৎ দীনু এক ঝাপটায় ওকে ঠেলে ফেলে দিল। বুলাকি চেপে বসল ইরফানের বুকে। ওর শুকনো পাঁজরগুলো তখন মড়মড় করছে। তবু প্রাণপণে ছাড়াবার চেষ্টা। অশক্ত, দুর্বল, অবসন্ন মানুষের মধ্যে ধস্তাধস্তি চলছে। এলোমেলো ভাবে হাত-পা চালাচ্ছে। ইরফান চেষ্টা করছে ঘোড়াটার কাছে পৌঁছাতে। একবার চিৎকার করে উঠল —জেমি তুই পালিয়ে যা।

কিন্তু রাজু মিঞার হাতের বাশুলী ঘাঁচ ঘাঁচ করে কেটে দিয়ে যাচ্ছে জেমির মাথায় গলায়। জেমি তড়াক করে একবার উঠবার চেষ্টা করেই আবার মুখ থুবড়ে পড়ল। ওর গলার রক্তবাহী শিরা এবং পাদনালী কেটে দুফাঁক হয়ে গেছে। ভলকে ভলকে রক্ত বেরুচ্ছে। সিধুবাবুর টর্চটা সেইখানেই নিবদ্ধ। হিংস্র হত্যাকাণ্ডের পর হিংস্র জন্তুর মত সেই রক্ত মুখ দিয়ে চুষে নিচ্ছে রাজু মিঞা, তারপর সিধুবাবু তারপর বুলাকিরাম। তারপর একে একে সবাই।

ইরফান একদিকে কাৎ হয়ে পড়ে আছে। উঠবার শক্তিও নেই প্রয়োজনও নেই। দীনু এক আঁজলা রক্ত এনে ওর মুখের কাছে ধরল—নে খা।

ইরফানের ভাঙ্গা বুক দিয়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। বলল—না।

—তোকে খেতেই হবে। আর না করে কি করবি? সব তো শেষ!

—না।

—ঘরে তোর জানানা বাল-বাচ্চা আছে তাদের দিব্যি রইল। খেতেই হবে।

রামধনি পিছন দিক থেকে ওকে ধরে ফেলল এবং সবাই মিলে জোর করে জেমির রক্ত ওকে খাওয়াল।

এরপর বাশুলী দিয়ে কাটাকাটি। জন্তুর রক্ত খেয়ে সুরারই শরীরে একটু জোর এসেছে। তারা ভাগাভাগি করে কাঁচা মাংস খাচ্ছে। সে এক প্রাগৈতিহাসিক যুগের কাণ্ড কারখানা। কাঁচা মাংস দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে খেতে কারো বাধছে না। কারো ঘেন্না হল না। অসীম দুঃখ ও বেদনায় অন্তরটা পুড়ে যাচ্ছে তবু পাকস্থলীর কি প্রচন্ড দাহ যে সবাইকে ঠেকা দিয়ে, সব অনুভূতিকে জখম করে দিয়ে নিজের ইন্ধন অবলীলায় গ্রহণ করে নিল।

আর তো বসে থাকা চলে না। কেউ গামছায়, কেউ পরনের কাপড় খুলে কাঁচা মাংসের টুকরোগুলো বেঁধে নিল। এতবড় ঘোড়ার হাড়গোড়গুলিই পড়ে রইল। চেঁছে নিল তার চর্বি মাংস ইত্যাদি। এখন প্রায় সবাই নগ্ন এবং রক্তাক্ত। হিংস্র জন্তুর মত তাদের মুখে কাঁচা রক্ত মাংস। কেউ বা তখনো চিবুচ্ছে। অশক্ত চোয়াল ধরে গেছে। তবুও। অন্ধকার পরম যত্নে এই ভয়ংকর দৃশ্যকে কালো পরদায় ঢেকে দিয়েছে। না হলে তখন যদি ওরা স্ব স্ব প্রতিকৃতি দেখতে পেত তবে হয়ত ঘৃণা ও বিবমিষায় মরে যেত। অথবা কিছুই হত না। কারণ তাদের যাবতীয় মানবিক বোধ সাংঘাতিকভাবে জখম হয়ে গেছে।

ইরফান উদ্ভ্রান্ত। টলে টলে পড়ে যাচ্ছে। বিড় বিড় করে বকছে। সঙ্গী, সাথী নারী শিশু ঈশ্বর সকলকে অভিশাপ দিচ্ছে। মাঝে মাঝে বিকট চিৎকার করে উঠছে—হায়। হায়। জেমি।

সিধুবাবু ওর কাঁধে হাত দিয়ে বলেলেন—কাঁদিস নে ইরফান। যদি বাঁচি তবে সারা জীবন ধরে মনে করব তোর জেমিই আমাদের জীবনদাতা। আর যদি মরি তবে তো সব ফুরিয়েই গেল। ও না হয় দু দণ্ড আগে গেল এর বেশী তো কিছু নয়। চল।

এবার চলার পালা। ওরা চলছে। ভয় ভাবনাকে অতিক্রম করে ওরা এখন চলার মধ্যেই উদ্বুদ্ধ। সেই হামাগুড়ি দিয়ে যাওয়া। টর্চের ব্যাটারীও প্রায় শেষ। খুব ক্ষীণ একটি হলুদ আলোর বৃত্তের মধ্যে ছায়ার আঁধার। সিধুবাবুই সবার আগে। চলতে চলতে এক জায়গায় এসে ঠেক খেয়ে দাঁড়াল। এটি একটি বন্ধ সুড়ঙ্গ। এরপর আর সুড়ঙ্গ নেই।

খোঁজাখুঁজি করে চড়াই ভেঙ্গে উপরে উঠবার একটা সুড়ঙ্গ পেল ওরা। উঠতে শুরু করল। ততক্ষণে পেটের ভিতর একরকমের তীব্র বেদনার সঞ্চার হচ্ছে। ঘোড়ার মাংসে পচন ধরেছে। প্রথমে মৃদু অম্ল গন্ধ তারপর তার বুক ঠেলে বমি আসার মত এক প্রকার যন্ত্রণা। ওরা একটু একটু করে উঠছে। পচা মাংস খাচ্ছে এবং মাংসের দুর্গন্ধেই পাগল হচ্ছে।

সিধুবাবু বললেন—ওঃ কি বিকট দুর্গন্ধ রে। ফেলে দে।

ইরফান পাগলের মত চিৎকার করে উঠল—জেমি।

রাজু মিঞা ওর হাত ধরে বলল—না ইরফান। পাগলামি করিস না। তোর জীবনে জেমির চেয়েও প্রিয়জন আছে। তাদের কথা ভেবে দ্যাখ। তাদের মুখ মনে করে দ্যাখ ওরা কেমন ব্যাকুল ভাবে তোর পথের দিকে তাকিয়ে আছে বুঝে দ্যাখ।

কিন্তু ইরফানের পাগলামি থামল না ও সেখানেই বসে পড়ল। মাথা ঠুকতে ঠুকতে বলল—যেখানে জেমি সেখানেই আমি।

এই পাগলাকে নিয়ে তো বড় জ্বালা। এখানে আর থাকাও যায় না। পচা মাংসের বিশ্রী দুর্গন্ধ সুড়ঙ্গকে ভাগাড় বানিয়ে দিয়েছে। এখন বাঁচতে হলে আগে এই দুর্গন্ধের হাত থেকে রেহাই পেতে হবে।

অতঃপর ওরা যুক্তি করে ইরফানকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবার জন্য হিড়-হিড় করে টানতে লাগল। একেই শরীরে ক্ষমতা নেই তারপর নেই কোন আলো। চড়াই ভেঙে ওঠাই দুষ্কর তারপরে একটি মানুষের বোঝা। ওদের কাছে কাজটা বড় কষ্টকর। কিন্তু তবু ওকে ফেলে দিয়ে যাবার কথা কেউ ভাবল না। বরং যত কষ্টই হোক টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল।

একমাত্র সিধুবাবুর পরনে একটা হাফ-প্যান্ট বাদবাকি সকলেই চারহাতী কাপড় পরে এসেছিল। পচা মাংসের সঙ্গে সেগুলিকেও বিসর্জন দিয়ে এখন ওরা নগ্ন। কালো কমলার সঙ্গে সামিল হয়ে গেছে।

আবার যেই ক্ষুধা তৃষ্ণার যন্ত্রণা। ক্লান্তি ও অবসাদের পাহাড় ভেঙে পড়ছে মাথায়। হাত-পা আর এক ইঞ্চিও চলছে না। বুকের ভাপর হস্ হস্ করছে।

ওরা থামল। কেউ কেউ শুয়ে প[illegible] সিধু বললেন—ওঃ আর যে পারি না। এবার মনে হচ্ছে মরে যাব। সব আশা শেষ হয়ে গেল।

ইরফান বলল—এতক্ষণ পর এই কথাটি বলবার জন্য তুমি আমাদিকে এইভাবে কষ্ট দিলে বাবু। বাঁচবো না যদি তবে এত পথ চলা কেন আর জেমিকেই বা খতম করা কেন?

—আঃ চুপ কর ইরফান।

—না। চুপ করব না। যদি না বাঁচি তবে আগে বাবুকে খতম করব তবে মরব।

—আঃ কবিস কি?

রাজু ও বুলাকি ওকে ধরে ফেলল।

মিতন মাঝি বলল—আমার মিথানের বোঙা (ভূত) লেগেছে। আমি না গেলে কে বোঙা ছাড়াবেক। তুরা বসে থাক আমি দেখে আসি।

—এ আবার আরেক পাগল।

কথাটা বলে সিধুবাবু লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ চুপচাপ। পেটের ক্ষিদে

তখন মাথার চাবিয়ে গেছে। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। এখন আর প্রস্রাবও বেরুচ্ছে না। একে একে সব শেষ।

হঠাৎ সিধুবাবুর কান দুটি খাড়া হয়ে গেল। ফিস্ ফিস্ করে বললেন—কি একটা শব্দ হচ্ছে না?

মিতন মাঝি একদিকে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকেই বলল—হ্যাঁ। এইদিকে একটা শব্দ শুনছে।

—হে ভগবান। সবাই হাতজোড় করল। মনে মনে ঈশ্বরের কাছে ভেঙে পড়ল। প্রাণপণ প্রচেষ্টায় শব্দ অনুসরণ করে চলতে লাগল। কিন্তু আর কোন সাড়া শব্দ নেই। তবু ওরা এগুচ্ছে। অনেকদূর এগিয়ে গেছে। এক জায়গা থেমে সিধুবাবু বললেন—নিজের বুকেই ইঞ্জিন চলছে তো বাইরের শব্দ কি পাব। বোস তোরা। বুকের শব্দ আসুক।

অনেকক্ষণ যাবৎ শুয়ে আছে ওরা। ঘড় ঘড় শব্দের একটানা প্রতিধ্বনির মত একটা শব্দ ভেসে এল। সিধুবাবুর চোখ দুটো সেই মুহূর্তেই জ্বলে উঠল। বুকের রক্ত ছলকে উঠল। বললেন—হে ভগবান। এই বার সত্যি হব। ওরে রাজু এ যে লরি স্টার্ট দেবার চলার শব্দ রে।

রাজু বলল—হ্যাঁ। তাই মনে হচ্ছে।

—চল চল। আর বসে কাজ নেই।

—চলতে পারব তবে তো চলব।

—না না। চলতেই হবে।

সিধুবাবুর বুকে ঘোড়ার বল। উনি চলছেন। পিছনে মুমূর্ষু মানুষের সারি। এক অসহ্য প্রেরণায় তারা চলছে। তাদের বুকে ডিজেল ইঞ্জিন। সবারই মুখে রক্তোচ্ছ্বাস। জীবন ওদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ওরা সব ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। শব্দটা ক্রমশঃ নিকটে আসছে।

কিন্তু হায়। সামনের পথ বন্ধ। কেউ পথে ইঁটের দেওয়াল। একেবারে নিশ্চিদ্র। এতটুকু আলো বাতাসও প্রবেশ করছে না। থমকে দাঁড়াল। আশাভঙ্গের অসহ্য বেদনায় কালো কালো মুখগুলো থেঁৎলে গেল। বুকের হাপরটা এবার বুঝি ছেঁদা হয়ে যাবে। আবার সেই ঘড় ঘড় শব্দটা। দেওয়ালের ওপাশে জীবনের স্পন্দন। আর ওরা একটা দেওয়ালের ব্যবধানে মৃত্যুর পদধ্বনি শুনছে।

সিধুবাবু বললেন—চালাও, গাঁধনী ভাঙো।

—বাপরে। এ যে অসম্ভব কথা। চলবার শক্তি নেই গাঁধনী ভাঙব কি দিয়ে? না এ পারা যাবে না।

—পারতেই হবে। দেওয়ালের ওপাশে ডাক দেবে আর আমরা তা শুনতে পেতে চুপচাপ মরে পড়ে থাকব? তা হয় না। মরতে হলে ভাঙা গাঁধনীতেই মাথা দিয়ে মরব।

রাজু মিশ্র শাবল তুলে নিল। অনেকবার আঘাত দিয়ে একটা ইঁট আলগা করে

বলল—বাপ্পাঃ কি শক্ত। চুনবালির গাঁধনী জমাট হয়ে গেছে। ওর হাত থেকে শাবল নিয়ে একে একে সবাই দেওয়াল ভাঙার কাজে লেগে গেল। হাত পায়ে বল নেই। শরীর অশক্ত। শুধুমাত্র মনের জোরে, জীবনরক্ষার অসহ্য তাগিদে ওরা কাজ করে যাচ্ছে। এবং এইভাবে সাতটি মুমূর্ষু মানুষের অসাধারণ প্রচেষ্টায় ইঁটের দেওয়ালে একটুখানি ফাঁক দেখা দিল। ঝির ঝিরে বাতাস বয়ে এল সেই ফাঁক দিয়ে। ওরা হাঁ করে শ্বাস নিল। দোমড়ানো কোঁচকানো হৃৎপিণ্ড খাতাসের স্রোতে একটু একটু করে ফুলতে শুরু হল। তখন ওদের কালো মুখে কি বিপুল অস্থিরতা। শরীরের রক্তস্রোতে ঝম্ ঝম্ করে দামামা বাজছে যেন।

এখন ওদের সমস্ত শক্তি সংহত হয়েছে শাবলের ডগায়। একজনের হাত অবশ হয়ে গেলে অন্যজন শাবল তুলে নিচ্ছে। এইভাবে একটু একটু করে একটি মানুষ পার হবার মত ফাঁক হতেই সেই পথে ঠেলে ঠুলে সিধুবাবুকে পার করতে শুরু করল। ওর মুখটা যখন দেওয়ালের ওপাশে তখন একজন মানুষ দেখতে পেলেন। তার হাতে ডিবরী বাতি। হলুদ আলোর বৃত্তে জীবন।

সিধুবাবু ডাক দিলেন—কে আছো, বাঁচাও।

তত্ক্ষণে কণ্ঠস্বরে দারুণ পরিবর্তন হয়ে গেছে। কেমন একটা খোনা খোনা স্বর মাত্র। ওরা মনে করছে আমরা কথা বলছি, কিন্তু বস্তুত সে-কথা বোঝার জো নেই। নেহাৎ যারা ওর মধ্যেই নিবিষ্ট তারাই বুঝতে পারে।

ডিবরী বাতিওলা লোকটি ভয় পেয়ে চিৎকার করতে করতে পালিয়ে গেল। কারণ ওদের ধারণায়—দেওয়ালের ওপাশে ভয়ংকর সব মারণ গ্যাস ও মৃত্যু ওঁৎ পেতে বসে আছে। শত শত মানুষের অশরীরি আত্মা ভূত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখানে মড়া ও প্রেতাত্মার ভিড়। এই যে এখন সে একটি কণ্ঠস্বর শুনল এ কখনো মানুষের হতে পারে না। নিশ্চয় কোন ভূত বা প্রেতাত্মা।

কিন্তু সে ছুটে গিয়ে খবর দিল সর্দী সাথী এবং সরদারকে। তারা সব দল বেঁধে ভূত দেখতে এসে সাতটি জীবন্ত মানুষ দেখে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল।

নগ্ন, কঙ্কালসার, ক্ষতবিক্ষত, রক্তে মাংসে কয়লার গুঁড়োতে আবৃত মানুষগুলোর শরীরে বিশ্রী দুর্গন্ধ। চোখগুলো কোটরে ঢুকে গেছে। দাঁত ও চোয়াল ভয়ংকরভাবে বেরিয়ে পড়েছে। বেবাক উদোম শরীরে চামড়ার ছাউনী দেওয়া হাড়গুলো গোনা যাচ্ছে এবং হাঁ করে শ্বাস টানার সময় পাঁজরগুলো নড়ছে। চাল খেয়ে পড়ে যাচ্ছে।

সিধুবাবু বললেন—আমরা মানুষ। ফুলটাঁড় কোলিয়ারীর লেবার। আমাদিকে বাঁচাও।

ওদের সরদার তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললেন—কি আশ্চর্য! তোমরা বেঁচে আছো? ঐ খাদে যে বিস্ফোরণ হয়েছে। কত মানুষ যে মরেছে তার হিসেব নেই। আজ কুড়িদিন ধরে শুধু মড়া উঠানো হচ্ছে। একটাও বেঁচে নেই। আর তোমরা আজ কুড়িদিন বেঁচে আছো! হে ভগবান।

সিধুবাবু বললেন—এটা কোন খাদ? ফুলটাঁড় তো?

—না। ফুলটাঁড় নয়। নিশিবাঁধ কলিয়ারী। আমরা ফুলটাঁডের এলাকা বরাবর ইঁটের দেওয়াল দিয়ে বন্ধ করে রেখেছি কারণ আমাদের ধারণা ছিল ওদিকটাই শুধু ভয়ংকর গ্যাস আর মৃত্যু। তার মধ্যে থেকে তোমরা বেঁচে এসেছো এরচেয়ে আশ্চর্যের কি আছে। হে ঈশ্বর তোমার কি আশীর্বাদ। ওরে তোরা দাঁড়িয়ে কেন? যা যা উপরে সাহেবের দিকে খবর দে। স্ট্রেচার নিয়ে আয়। জল, ফল, কাপড় বাতি সব নিয়ে আয়। মৃত্যুঞ্জয়ী মানুষকে আমরা মাথায় করে নিয়ে যাব রে।

ওর কথা শুনতে শুনতে সিধুবাবু, রাজু মিশ্র, রামধনি, বুলাকি রামের বুক ভাসিয়ে হু হু করে কান্না নেমে এল। কুড়িদিন পর তাদের বুক ঠেলে মানুষী কান্নার প্লাবন বইতে শুরু হল।

ইরফান আলি বুক ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল—জেমি! তোকে কোথায় রেখে এলাম রে। আল্লা মেহেরবান। ওর জানটা নিয়ে আমাদিকে মৃত্যুর সীমানা পার করে দিলে। তোমাকে আমি কি বলব?

ঈশ্বরের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে ওরা সবাই এগিয়ে পড়েছে। যুগান্তরের ঘুম নেমে এসেছে চোখে। কুড়িদিন কারো ঘুম নেই।

সুতী, পশম, সিল্ক, টেরিন
কাচার লিকুইড ডিটারজেন্ট
Glitter
কনজিউমার প্রোডাক্টস
২৮এ, এস এন দাস লেন, কলি—৫০
পরিবেশক :
পাপু এন্টারপ্রাইজ
৪৭।৩৭, আর কে ঘোষ রোড, কলি-৫০

খেলা

মানকাদের আর এক দিক

মানকাদ তাঁর খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নামেন। ১৯৪৬ সালের ২২শে জুন, ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ঐতিহাসিক লর্ডস মাঠে। তাঁর খেলোয়াড় জীবনের শেষ টেস্ট খেলা ১৯৫৯ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী, দিল্লীতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে। মানকাদ ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, নিউজিল্যাণ্ড এবং পাকিস্তান—এই পাঁচটি দেশের বিপক্ষে মোট ৪৪ টেস্ট ম্যাচ খেলেন। ক্রিকেট সফরে গিয়েছিলেন ইংল্যাণ্ডে দু'বার এবং একবার করে অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এবং পাকিস্তানে। টেস্ট খেলায় ভারতের পক্ষে অধিনায়কত্ব করেছিলেন ৬ বার—পাকিস্তানের বিপক্ষে ১৯৫৪-৫৫ সালের পাঁচটি টেস্টে এবং ১৯৫৮-৫৯ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে চতুর্থ টেস্টে। তাঁর নেতৃত্বে পাকিস্তানের বিপক্ষে ভারত ১৯৫৪-৫৫ সালের পাঁচটা টেস্ট খেলাই ড্র করে। কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ১৯৫৮-৫৯ সালের চতুর্থ টেস্ট খেলায় ভারত ২৮৫ রানে হেরে যায়।

টেস্ট ক্রিকেটে মানকাদের ব্যাটিং পরিসংখ্যান : খেলা ৪৪, ইনিংস ৭২, নট-আউট ৫ বার, মোট রান ২১০৯, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২৩১ (বিপক্ষে নিউজিল্যাণ্ড, মাদ্রাজ, ১৯৫৫-৫৬), গড় ৩১-৪৭, সেঞ্চুরী ৫ (এর মধ্যে ডাবল সেঞ্চুরী ২), অর্ধ সেঞ্চুরী ৬ এবং ক্যাচ ৩৩। টেস্টের বোলিং পরিসংখ্যান : খেলা ৪৪ বল ১৪৬৮৬ মেডেন ৭৭৭, ৫২৩৫ রানে ১৬২ উইকেট, গড় ৩২-৩১, এক ইনিংসে ৫ উইকেট ৮ বার এবং একটি খেলায় ১০ উইকেট ২ বার। উইকেটের জুটিতে শতাধিক রান করেছেন ৮ বার। টেস্টের এক ইনিংসে তাঁর ডাবল সেঞ্চুরী ২ বার—১৯৫৫-৫৬ সালে নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে বোম্বাইয়ের ২য় টেস্টে ২২৩ রান এবং মাদ্রাজের ৫ম টেস্টে ২৩১ রান।

আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত টেস্টের এই দুটি বিশ্ব রেকর্ড আজও অক্ষুণ্ণ আছে— সব থেকে কম টেস্ট ম্যাচ খেলে ব্যক্তিগত ১০০০ রান ও ১০০ উইকেট সংগ্রহ এবং প্রথম উইকেটের জুটিতে সর্বাধিক রান সংগ্রহ।

মানকাদ ১৯টি টেস্ট খেলে তাঁর ১০০০ রান এবং ২৩টি টেস্ট খেলে তাঁর ১০০ উইকেট পূর্ণ করেছিলেন। আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে তিনিই সব থেকে কম টেস্ট ম্যাচ খেলে (২৩টি) 'ডাবল' অর্থাৎ ১০০০ রান এবং ১০০ উইকেট পূর্ণ করার যে বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন তা আজও কেউ স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারেন নি। মানকাদ তাঁর ৩৯তম টেস্ট খেলার মাধ্যমে তাঁর ২০০০ রান পূর্ণ করেন। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ২০০০ রান ও ১০০ উইকেট পাওয়ার ক্ষুদ্র তালিকায় মানকাদ তাঁর পাকাপোক্ত স্থান করে নেন। মানকাদ ছাড়া অপর কোন ভারতীয় খেলোয়াড় টেস্ট খেলার 'ডাবল' খেতাব অর্থাৎ ১০০০ রান এবং ১০০ উইকেট সংগ্রহের গৌরব লাভ করতে পারেন নি।

নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৫৫-৫৬ সালের ৫ম টেস্টে (মাদ্রাজে) তিনি পঙ্কজ রায়ের সহযোগিতায় ১ম উইকেটের জুটিতে যে ৪১৩ রান সংগ্রহ করেছিলেন তা প্রথম উইকেটের জুটির বিশ্ব রেকর্ড হিসাবে আজও অক্ষুণ্ণ আছে। টেস্টে তিনি ১নং থেকে ১১নং—খেলার সকল পজিশনেই খেলেছেন। এ এক দুর্লভ নজির।

ভারতের বিপক্ষে ১৯৫২ সালের লর্ডস মাঠের দ্বিতীয় টেস্টে ইংল্যাণ্ড ৮ উইকেটে জিতলেও, মানকাদের অসাধারণ ক্রীড়াচাতুর্য-গুণে এই খেলাটি 'মানকাদের খেলা' নামে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছে। মানকাদ ১ম ইনিংসে ৭২ রান এবং ২য় ইনিংসে ১৮৪ রান করেন। তাছাড়া ইংল্যাণ্ডের ১ম ইনিংসে ১৯৬ রানে ৫টা উইকেট পান। খেলার চতুর্থ দিনে তিনি পূর্বদিনের অপরাজিত ৮৪ রান নিয়ে খেলতে নেমে লাঞ্চের সময় ১৭৯ রান করে অপরাজিত ছিলেন। ফলে তিনি মাত্র ৫ রানের জন্যে লাঞ্চের পূর্বে এক শত রান করার দুর্লভ গৌরব থেকে বঞ্চিত হন। মানকাদকে এই খেলায় কি কঠোর পরিশ্রমই না করতে হয়েছিল। ভারতের ১ম ইনিংসে ৭২ রান করে ইংল্যাণ্ডের ১ম ইনিংসে ৭৩ ওভার বল করেন এবং ভারতের ২য় ইনিংসে ব্যক্তিগত ১৮৪ রান করার পর ইংল্যাণ্ডের ২য় ইনিংসে ২৪ ওভার বল করেন। লর্ডস মাঠে মানকাদের এই অসামান্য ক্রীড়া-শৈলীতে মুগ্ধ হয়ে এম সি সি-র সদস্যবৃন্দ মানকাদকে অভ্যর্থনা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে দু' বার আসন ছেড়ে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন। লর্ডস মাঠের ইতিহাসে এর নজির বিরল।

মানকাদের ১৯৪৬ সালের ইংল্যাণ্ড সফর তাঁর ব্যক্তিগত ক্রীড়া-চাতুর্যে গৌরবে আজও সমুজ্জ্বল আছে। তিনি এই ১৯৪৬ সালের ইংল্যাণ্ড সফরে ১,১২০ রান এবং ১২৯ উইকেট সংগ্রহ করে ব্যাটিং ও বোলিংয়ে অসামান্য সাফল্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডের একটি মরশুমের সফরে অপর কোন ভারতীয় খেলোয়াড় এই ভাবে ১০০০ রান ও ১০০ উইকেট সংগ্রহ করতে সক্ষম হননি। এখানে উল্লেখ্য, ইংল্যাণ্ডের মাঠে একটি সফরের খেলায় কোন বিদেশী খেলোয়াড়ের পক্ষে ক্রিকেটের এই 'ডাবল' খেতাব লাভ (১০০০ রান এবং ১০০ উইকেট) খুবই দুর্লভ সম্মান। মানকাদের আগে মাত্র একজন বিদেশী ক্রিকেট খেলোয়াড় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিশ্ব খ্যাত লিলিবাী কন্স্টানটাইন (পরবর্তী কালে স্যার উপাধিপ্রাপ্ত) ১৯২৮ সালের ইংল্যাণ্ড সফরে এই 'ডাবল' খেতাব জয় করেছিলেন। মানকাদের ১৯৪৬ সালের ইংল্যাণ্ড সফরের বিরাট সাফল্যের স্বীকৃতি হিসাবে ১৯৪৭ সালের প্রখ্যাত 'উইসডেন' ক্রিকেট বর্ষপঞ্জিকায় 'বছরের সেরা পাঁচজন খেলোয়াড়' তালিকায় তাঁকে স্থান দেওয়া হয়েছিল।

ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৫১-৫২ সালের শেষ মাদ্রাজ টেস্টে ভারতের ঐতিহাসিক এক ইনিংস ও ৮ রানের [illegible] লাভের মূলে ছিল মানকাদের অসাধারণ বোলিং সাফল্য (১০৮ রানে ১২ উইকেট)। ভারতের এই জয় ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে প্রথম জয় এবং এই দুই দেশের টেস্ট খেলায় ইনিংস জয়ের প্রথম নজির।

ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৫১-৫২ সালের টেস্ট সিরিজ ১-১ খেলায় অমীমাংসিত থাকে (ড্র ৩)। এই সিরিজে মানকাদ ২২৩ রান (গড় ৩১.৮৫) এবং ৩৪ উইকেট (গড় ১৬.৭১) সংগ্রহ করেছিলেন। আজ পর্যন্ত কোন ভারতীয় খেলোয়াড় একটি টেস্ট সিরিজের খেলায় মানকাদের এই 'অল-রাউণ্ড' রেকর্ড স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারেন নি।

মানকাদ তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে (১৯৪৬-৫৯) মোট ৪৪ টি টেস্ট ম্যাচ খেলার সূত্রে স্বদেশের পক্ষে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ভারতের বি[illegible] দলের পক্ষেও যে-সব টেস্ট রেকর্ড [illegible] ছিলেন তার কয়েকটি দীর্ঘ বছর প[illegible] যেমন ভেঙেছে, তেমনি অনেকগুলি রেকর্ড আজও অম্লান আছে।

মানকাদ ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৫১-৫২ সালের টেস্ট সিরিজে ৫৭১ রানে ৩৪ টি উইকেট পাওয়ার সূত্রে একটি টেস্ট সিরিজে সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার যে রেকর্ড করেন, ভারতের বিপক্ষে টেস্ট খেলে বিদেশের কোন খেলোয়াড় তা আজও স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারেন নি। নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৫৫-৫৬ সালের টেস্ট সিরিজে সুভাষ গুপ্তের ৬৬৯ রানে ৩৪ টি উইকেট পাওয়ার সুবাদে মানকাদের রেকর্ড স্পর্শ করেন। আর দীর্ঘ বছর পর ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৭২-৭৩ সালের টেস্ট সিরিজে বি এস চন্দ্রশেখর ৩৮ উইকেট পাওয়ার সূত্রে মানকাদ এবং গুপ্তের পূর্ব প্রতিষ্ঠিত রেকর্ড (এ সিরিজের ৩৪ উইকেট) ভেঙে দেন।

ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে টেস্ট খেলায়, মানকাদের এই তিনটি ভারতীয় টেস্ট রেকর্ড আজও অম্লান আছে : (১) এক

ইনিংসে সর্বাধিক উইকেট ৮টি (মাদ্রাজ, ১৯৫১-৫২), (২) একটি খেলায় সর্বাধিক উইকেট ১২টি (মাদ্রাজ, ১৯৫১-৫২) এবং (৩) ইংলন্ডের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান ১৮৪ (লর্ডস, ১৯৫২)।

[illegible] পাকিস্তানের টেস্ট খেলোয়াড়দের প্রতিষ্ঠিত এই তিনটি রেকর্ড উভয় পক্ষে রেকর্ড হিসাবে [illegible] (১) [illegible] সর্বাধিক উইকেট ৮টি (দিল্লি, ১৯৫৯-৬০), (২) একটি খেলায় সর্বাধিক উইকেট [illegible] (১৯৫২ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে [illegible] দানে [illegible]

(১১১ রানে ১৩ উইকেট) ভারত শেষ পর্যন্ত এক ইনিংস ও ৭০ রানে জিতেছিল।

ভারতীয় টেস্ট খেলোয়াড়দের মধ্যে মানকাদই টেস্টে ১০০ উইকেট সংগ্রহের [illegible] লাভ করেন। এপর্যন্ত ৬ জন ভারতীয় খেলোয়াড় টেস্টে ১০০ উইকেট পূর্ণ করেছেন। মানকাদ তাঁর ৫৭টি টেস্ট খেলায় মোট ১৬২ উইকেট [illegible] সূত্রে টেস্টে সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার যে ভারতীয় রেকর্ড স্থাপিত হয়েছিল, তা দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণ ছিল। পঙ্কজ রায় ১৯৭৬ সালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে কলকাতার ১৯ টেস্টে মানকাদের পূর্ব প্রতিষ্ঠিত রেকর্ড (১৬২ উইকেট) ভেঙে দেন। মানকাদ সেখানে ৪৪টি টেস্টে ১৬২ উইকেট পেয়ে ভারতীয় রেকর্ড গড়েছিলেন, প্রসন্ন সেখানে ৩৬টি টেস্টে ১৬৩ উইকেট পেয়ে মানকাদের রেকর্ড ভাঙেন।

মানকাদ দীর্ঘ ১৩ মরশুম ইংলিশ লীগ ক্রিকেট খেলার সঙ্গে [illegible] খেলোয়াড় হিসাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি খেলার পথে পাঁচটি চুক্তির খেলায় অংশ নিয়ে এবং সি এ বি-কে কেন্দ্র হিসাবে আমাদের খুবই আপনজন হয়ে পড়েছিলেন। [illegible] [illegible] [illegible] খেলা সম্ভ করে চিরশান্তিধামে ফিরে গেলেন। এ যেন ঠিক ক্রিকেট খেলারই মতই—খেলা শেষ করে প্যাভিলিয়নে ফিরে যাওয়া।

দর্শক

ক্রিকেটের দলবদল

[illegible] ফুটবলের মাঠে যেমন [illegible] ক্রিকেটে তেমন নয়। তবুও [illegible] ক্রিকেটে [illegible] [illegible] [illegible] ফুটবলের [illegible] [illegible] [illegible]

ফিল্ড মার্শালের ফরমান

ভারতের খেলাধুলোর জগতের কর্তারা এতদিন দিব্যি বহাল তবিয়তে রাজত্ব করছিলেন। নিজেদের খেয়াল খুশীমত দল গড়া, দলের সঙ্গে বিদেশে বেড়াতে যাওয়া আরো কতো কি যে তাঁরা করতেন তা বলে শেষ করা যাবে না। কেউ কেউ তো আবার টাকা-কড়ির ব্যাপারেও দুর্নাম কিনেছিলেন।

ফুটবল, ক্রিকেট, হকি থেকে আরম্ভ করে সব খেলাধুলোরই নিয়ামক সংস্থার হাল ধরে যাঁরা আছেন—তাঁদের মুখগুলি সুপরিচিত। আমাদের গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচন হয়। সরকার বদলায়। কিন্তু খেলাধুলোর রাজত্ব যাঁরা চালাচ্ছেন তাঁরা বছরের পর বছর বছর বছর তবিয়তে গদি আঁকড়ে বসে থাকেন। সরে যাবার নামটি পর্যন্ত করেন না। নির্বাচন অবশ্য প্রতিটি নিয়ামক সংস্থাতেই হয়। কিন্তু তার ভোট তো তাঁদের পকেটে। তাঁদের অঙ্গুলী হেলনের ওপরেই তো নির্ভর করছে কোন বাক্সে ভোট পড়বে না পড়বে।

সুতরাং তাঁদের আর সরাবে কে? সে ক্ষমতাই বা কে ধরেন? সরকারী গাইড লাইন একটা ছিল বটে। কিন্তু তাকে কে পরোয়া করে? কারণ মন্ত্রীর জোর ওঁদের নেহাত কম নয়। সেই জোরেই তাঁরা গাইড লাইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এসেছেন। পেছনে মামা থাকলে সরকারী নির্দেশ যে না মানলেও চলে বেদবাক্যের মত এতদিন পর্যন্ত তাঁরা তা প্রতি পদে পদে মেনে চলেছেন। এবং ফুটবল, ক্রিকেট, হকি ইত্যাদি বিভাগে দিব্যি সুখের সংসার পেতে বসেছিলেন।

কিন্তু এবার বুঝি সব যায়। তাঁদের সেই সুখের সংসার টলমল করছে।

বাঘা মিলিটারি অফিসার—ফিল্ড মার্শাল ম্যানেকশ ক্রীড়া পরিষদের সভাপতি হয়ে বসে সব ভন্ডুল করে দিতে বসেছেন। নিত্য দিনই তিনি ফরমান ছাড়ছেন আর তার ভয়ে বুক ফেঁপে উঠছে দুঁদে সব ক্রীড়া কর্মকর্তাদের। ভাবছেন, এবার বুঝি সব গেল, সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে পালাতে হবে।

সর্বভারতীয় ক্রীড়া পরিষদের সভাপতি হয়ে ম্যানেকশ বলেছিলেন—সব নিয়ামক সংস্থাই যদি নিয়মকানুন মানতে পারে, সরকারী গাইড লাইন অনুযায়ী কাজ করতে পারে তাহলে ক্রিকেটই বা তা পারবে না কেন?

তারপর আবার একদিন বললেন, দল গড়ায় স্বজন পোষণ চলবে না। কমনওয়েলথ ক্রীড়ায় যোগদানকারী ভারতীয় দলের প্রতিনিধিদের যেভাবে মনোনয়ন করা হয়েছিল—ভবিষ্যতে আর যেন সেইভাবে না হয়।

হকির প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেছেন, কর্মকর্তাদের ঝগড়া আর খেয়োখেয়ির জন্যেই ভারতীয় হকি এইভাবে বছরের পর বছর পিছিয়ে পড়ছে। এইজন্যে খেলোয়াড়দের দোষ দেওয়া যায় না। যতো দোষ ঐ গোলমাল পাকাতে ওস্তাদ কর্মকর্তাদের।

কিন্তু এসব চলবে না। দেশকে খেলাধুলোয় এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে সৎ, পরিশ্রমী এবং দূরদর্শী কর্মকর্তা চাই।

সর্বভারতীয় ক্রীড়া পরিষদের সভাপতি ম্যানেকশ'র এইসব বিবৃতি ভস্মে ঘি ফেলার মত। কিন্তু দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতে চেয়েও তা পারছেন না কেউ। কারণ তাঁরা এখন স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন যে ফিল্ড মার্শাল সাহেব অতি কড়া লোক। তিনি যা বলছেন তাই করিয়ে ছাড়বেন।

তার নীট ফল হল আন্তর্জাতিক খেলাধুলোর আসর থেকে ভারতের ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়া। যে হকিতে ভারত একদিন ছিল বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন; হকি বলতে ভারতকেই বোঝাত—সেই হকিতেই ভারতের স্থান আজ অতিরিক্তের দলে। পাকিস্তানে যে ছদ্দলের হকি প্রতিযোগিতা হল সেখানে ভারতকে আমন্ত্রণ জানান হয়েছে হয়েছে অতিরিক্ত অর্থাৎ স্ট্যান্ড বাই দল হিসেবে। এ যে আমাদের কাছে কত বড় লজ্জা তা প্রতিটি ভারতবাসীই জানেন।

কিন্তু যাঁদের জানার, যাঁদের বোঝার দরকার সবচেয়ে আগে—তাঁরা কিন্তু দিব্যি চোখটি বুজে আছেন। জেনেও না জানার, দেখেও না দেখার ভান করছেন।

ম্যানেকশ তাই সরাসরি ওঁদেরই আক্রমণ করেছেন। বলেছেন, হকিতে ভারতের আজকের এই হালের জন্যে দায়ী কর্মকর্তারাই। তাঁদের খেয়োখেয়ি, তাঁদের দলাদলি, তাঁদের ঝগড়ার জন্যেই খেলোয়াড়রা ঠিকমত খেলতে পারেন নি। তাছাড়া দলও ঠিকভাবে গড়া হয় নি।

ফিল্ড মার্শাল ম্যানেকশ তাই ফরমান জারী করেছেন যে দল গড়ার ব্যাপারে স্বজন পোষণ নীতি বরদাস্ত করা হবে না।

কিন্তু এই নির্দেশ কতোটা মেনে চলা হবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ মুখে বলা এক আর কাজে করা আর এক: দীর্ঘদিন ধরে যা চলে আসছে তাকে রাতারাতি বদলে দেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়।

এবারই তো কমনওয়েলথ ক্রীড়ার আগে কেন্দ্রীয় জনতা সরকার ঘোষণা করেছিলেন যে বেশী কর্মকর্তা এডমনটনে পাঠানো হবে না। প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে প্রতিযোগীরাই যাবেন, কর্মকর্তারা ওঁদের সঙ্গে গিয়ে ভিড় বাড়াবার কি দরকার। যাঁদের না গেলে নয়—তাঁরাই শুধু যাবেন।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যাঁদের খুঁটির তেমন জোর নেই বাদ পড়লেন শুধু তাঁরাই। অন্যরা দিব্যি ঢ্যাং ঢ্যাং করে কানাডায় বেড়াতে গেলেন। এবং তার জন্যে দলের যাত্রার দু-একদিন আগে পর্যন্ত চলল টালবাহানা।

এডমনটনের কমনওয়েলথ ক্রীড়ায় ক্রীড়া চিকিৎসক হিসেবে যাওয়ার জন্যে মনোনীত হয়েছিলেন কলকাতার ডাঃ অলোক ঘোষ। অন্য কয়েকজনের সঙ্গে তাঁকে বলা হল যে নিজের খরচে তাঁদের যেতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের যাওয়া আসার ভাড়া দিতে পারবেন না। ডাঃ ঘোষ আগেভাগেই জানিয়ে দিলেন সে নিজের খরচে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

অন্যরা কিন্তু মুখটি বুজে রইলেন। তারপর চলল তদ্বির-তদারক এবং শেষ পর্যন্ত দেখা গেল তাঁরা ব্যাপারটা ম্যানেজ করে নিয়েছেন এবং সরকারী খরচেই এডমনটন ঘুরে এলেন। মধ্যে থেকে বাদ পড়ে গেলেন ডাঃ ঘোষ। বাঙালী হওয়াই কি? অথচ যে বিভাগ থেকে ভারতীয় দলের যাত্রা এবং অনুদান মঞ্জুর হল সেই দপ্তরের পূর্ণমন্ত্রী হচ্ছেন একজন বাঙালী।

বিষয়টা অবশ্য অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু কমনওয়েলথ ক্রীড়ার ব্যাপারেই দেখা গেছে যে যা বলা হয় সব সময় তা মানা হয় না। তাই ফিল্ড মার্শালের ফরমানে কতটা কাজ হবে কে জানে। তবে একথা ভুললে চ না যে প্রস্তাবটা সাধু এবং এসেছে জবরদস্ত ফৌজি কর্তার কাছ থেকে। যিনি হুকুম দিতে জানেন, তেমনি জানেন তা তামিল করিয়ে নিতে।

ম্যানেকশ বলেছেন যে খেলাধুলোর ক্ষেত্রে ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে তিনি চেষ্টা করবেন। এবং সেই চেষ্টা যাতে ফলপ্রসূ হয় তার দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখবেন। তিনি যদি তা পারেন তাহলে ভারতের কোটি কোটি মানুষের সমর্থন তিনি পাবেনই। কারণ ভারতের ক্রীড়া উৎসাহী জনগণ অনেকদিন ধরেই চাইছিলেন এমন একজন মানুষকে যিনি শক্ত হাতে হাল ধরতে পারবেন ভারতের খেলাধুলো জগতের। সুতরাং স্বার্থসর্বস্ব ক্রীড়া কর্মকর্তাদের বুক তো আজ কাঁপবেই। তবে একথাও সে তাঁরাও চট করে সব কিছু ছেড়ে দেবেন না। টিঁকে থাকার লড়াই তাঁরা চালাবেনই। দেখা শেষ পর্যন্ত কি হয়—কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

বোম্বাই সমাচার

একটা হিট চাই

হ্যাঁ শুধুমাত্র একটা হিট। ব্যাস্ কেল্লা ফতে। জানতে চান কারা কারা হিট চান? কে আর লিখি—কেউই বাদ যান না। প্রযোজক, পরিবেশক অভিনেতা অভিনেত্রী থেকে শুরু করে স্পট বয় পর্যন্ত সবাই ছুটছেন ঐ হিট (না ওর বাংলা সাংবিধানিক কান শব্দ বহুল পরিমাণে প্রচারিত নয়) বস্তুটির পেছনে।

আসুন সংক্ষেপে সবার কথাই বলে ফেলি। প্রযোজক ভাবছেন ছবি হিট হলে অনেক অনেক পয়সা পাবো, পরিচালক ভাবছেন ছবি ভালো চললে সুনাম সুখ্যাতি বাড়বে আরও বেশী ছবি পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়া যাবে। বেশী ছবি মানে বেশী পয়সা। পরিবেশকেরও সেই একই কথা, ওভার ফ্লো'র চিন্তা। অভিনেতা অভিনেত্রী ছবি হিট হলে সবার চোখের মণি হয়ে যান। রাতারাতি লাইন পড়ে যায় প্রযোজকদের। লাখের অংককে তখন লাখ ঠেলে বাড়াতে থাকে। সুপার স্টার, ডিমু গার্ল, সেকস বোম্ব ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত হয়ে তারা শিফ্টের হিসেব কষতে থাকেন মনে মনে। সিনেমা হল মালিক অর্থাৎ প্রদর্শকেরা তাদের সিনেমা হলে প্রচার বাড়াতে থাকেন, সঙ্গে সঙ্গে হাউস ফুল ক্যাপাসিটি বেটের অংক উর্ধ্বগামী হয়। সরকারী তহবিলও ফুলে ফেঁপে ওঠে। সাধারণ স্টাফ যেমন অ্যাসিসটান্টরা কিংবা মেকাপম্যান অথবা ডেসম্যানেরা এমন কি স্পট বয়েরা প্রযোজকের কাছে আর্জি পাঠান একটা হিটের আবেদন পত্রসহ। একটা জুবিলী মানে কম পক্ষে এক মাসের বোনাস পাকা। চাতকের মতো সবাই তাই বেছে বেছে ঐ হিট ছবিটির পেছনে ছুটছেন লক্ষ্যে, অলক্ষ্যে। চেষ্টার তাই ত্রুটি নেই—গল্পের চরিত্র দেখে কেউই শিল্পী খোঁজেন না। জনপ্রিয় তারকাদের জনপ্রীতির ওপর পুরোপুরি ভরসা রেখে তবে চরিত্র লেখা হয়। বোম্বের জনপ্রিয় গল্প লেখকদের স্ক্রীপ্ট দেখবার সুযোগ হলেই আপনাদের কাছে ব্যাপারটা আরও বেশী স্পষ্ট হত। সেখানে নায়ক-নায়িকাদের নামেই চরিত্র চিত্রণ হয় অন্ততঃ প্রাথমিক পর্যায়ে তো বটেই।

কারণে অকারণে মারপিট, ক্যাবারে, সেকস ছাড়াও মালটি স্টার কাস্টের সমাবেশ ইত্যাদি মিলিয়ে অসহনীয় পরিস্থিতি তবুও হিটের তাগিদে এসব কিছুর আমদানী বাড়ছে তো বাড়ছেই।

সবি। মিউজিক ডিরেকটারদের কথা তো বলাই হয়নি। তাঁরা তো আদা জল খেয়ে সাধারণ দর্শকদের গাধা বানানোর জন্যে বিদেশী সুর লহরী চুরি করছেন এমন কি পুরোনো দেশী সুরও একটু অদল বদল করে বেমালুম আনকোরা নতুন বলে চালাচ্ছেন।

কিছুই বলার নেই। সবাই এখানে 'হিট'-এর দাস। ফিল্মী দুনিয়ায় হিট-ই ধর্ম কর্ম ও আরাধ্য।

সেই সংস্কৃত শ্লোকটিকে একটু লিখলে কি দাঁড়ায় দেখুন—

হিট ধর্ম, হিট কর্ম, হিট হী পরমন্তপ
হিটেরি প্রতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে
সর্ব ফিল্ম ওয়ালা।

ভালো ছবির ভালো হাওয়া—

দুলহন ওহী যো পিয়া মন ভায়ে, পতি পত্নী আউর ও, দামাদ, আপনাপন এবং এখন ম্যায় তুলসী তেরে আঙ্গন কী র অসাধারণ সফলতা চলচ্চিত্র শিল্পের চলমান গতানুগতিকতাকে ভেঙে চুরে তছনছ করে দিয়েছে। সুস্থতার পালে হাওয়া লেগেছে। নিঃসন্দেহে শিল্প প্রেমিকদের কাছে এ খবর সুখবর।

আর একবার চলচ্চিত্র প্রযোজকদের টনক নড়লো। যে ছবি সুন্দর, সুস্থ, সাবলীল ছবি মারপিট, সেকস ও অন্যান্য বাহ্যিক অলংকার ছাড়াই হিট হতে পারে।

"দুলহন ওহী যো পিয়া মন ভায়ে" শুধুমাত্র এ বছরের সেরা হিন্দী ছবিই নয়। বাম্বেশ্বরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বোম্বের অন্যতম ব্যস্ত নায়িকা হিসেবে। নায়িকা হিসাবে প্রথম ছবি। সুপার হিট ছবি। নবাগতা ব্যস্ত হলেন প্রথম ছবির সাফল্যের পরই। পরিচালক লেখ ট্যান্ডন যদিও নতুন নন তবুও এ ছবির আগে কমার্শিয়াল বাজারে তিনি ছিলেন পুরোপুরি ব্যর্থ। এখন তিনি বেশ কিছু ছবি পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছেন।

বি আর চোপরা সুদীর্ঘকাল ধরে বেশ কিছু শক্তিশালী ভাবাবেগের ছবি উপহার দিয়েছেন ভারতীয় দর্শকদের।

"পতী পত্নী আউর ও" ছিলো তার প্রথম কমেডী ছবি করার প্রয়াস এক কথায় এক নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হয়েছিলেন। সঞ্জীব কুমারও ছিলেন ব্যতিক্রম, ভারতীয় নায়কের চিরাচরিত ইমেজ থেকে

তপনকুমার দে পরিকল্পিত এবং সম্পাদিত
দীর্ঘ ১২ বছরের ঐতিহ্যবাহী/বহু প্রশংসিত সাহিত্য/সিনেমা/যাত্রা/ সংস্কৃতির প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা

"তুলি"

* নতুন লেখক/লেখিকার সুযোগ সর্বপ্রথমে।
* বাৎসরিক গ্রাহকের চাঁদা ১৮৲। নমুনা সংখ্যা পাঠানো হয় না।
* গ্রাহকদের মধ্যে লেখার সুযোগ বেশী দেওয়া হয়।
* গ্রাহকদের একসংগে ১২ কপি পত্রিকা বেজিস্টিসুযোগে পাঠানো হয়।
* এজেন্ট এবং হকাররা যোগাযোগ করতে পারেন।
* সমস্তরকম টাকা পয়সা লেনদেন প্রধান সম্পাদকের নামে অথবা রেণুকা দেব নামে করিতে হইবে। যোগাযোগ করুন॥

রেণুকা দে/কোঃঅফ তুলি পত্রিকা/
৭৩জি আলিপুর কোর্ড/কলিকাতা/২৭।

মহিলা সাংবাদিক আবশ্যক :—ন্যূনতম যোগ্যতা, গ্রাজুয়েট এবং সুন্দরী। বাংলার উপর দখল থাকা বিশেষ প্রয়োজন। ফটো পাঠান। অথবা প্রধান সম্পাদকের সংগে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন। যে কোন দিন সকাল ৭টা হইতে ৯টার মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায়।

আগামী বিজ্ঞাপনে নজর রাখতে ভুলবেন না কিন্তু..... .....

অবিস্মরণীয় নাটকের অসামান্য জনপ্রিয়তা !
৬০০ রজনীর দ্বারপ্রান্তে ০ প্রতি বৃহঃ ও শনি—৬॥টায়/রবিবার—৩ ও ৬॥টায়

তপন থিয়েটার

নাটক।পরিচালনা।সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রেঃ ঃ বিকাশ, সত্য, প্রদীপ, ইরা, সান্তনা, গিরীশ, রবীন, মিহির, সুনীল, নিখিল, শংকর, অরুণ, দীপংকর, ঊশীনর, শৈলেন, মধু; গণেশ; স্বপন, অলোক, তিমির এবং রত্না ঘোষাল ও তরুণকুমার

বোম্বাইয়ের একটি পার্টিতে রাজেশ খান্না, শর্মিলা সামন্ত, উত্তমকুমার

অনেক দূরে সরে গিয়ে তিনি এক খল-প্রেমিকের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। এই চরিত্রে সঞ্জীবের অনবদ্য অভিনয় তাঁকে আরও বেশী জনপ্রিয় করে তুলেছে। তাঁর স্ত্রীর মনোমতো না হলেও দর্শকেরা অবশ্যই চরিত্রটিকে বেশী ভালোবেসে প্রশংসা দিতে দ্বিধা বোধ করেননি। বাঁধাধরা গণ্ডীর মধ্যেও সঞ্জীবের অভিনয় ক্ষমতার স্ফুরণ হয়েছে।

এই ছবির সাফল্য প্রমাণ করেছে যে ভালো চিত্রনাট্য ও ভালো পরিচালক হলে সে একাই একশো। মালটি স্টারকাস্টের বিরুদ্ধে এ এক বলিষ্ঠ জেহাদ।

'পতি, পত্নী আউর ও'র সাফল্য আশা করি অনেক প্রযোজককে সস্তায় ভালো ছবি করার প্রেরণা যোগাবে।

'দামাদ' আর এক সফল হাসারসের ছবি। বাসু চ্যাটার্জির 'ছোটী সে বাত'এর সমগোত্রী প্রচেষ্টা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। এ ছবির সফল পরিচালক নবাগত ব্রজত রক্ষিত।

"দুলহন ওহী যো পিয়া মন ভায়ে" জন্ম দিলো এক নবাগতা প্রশ্নাতিমধুর নায়িকা রাজেশ্বরীকে এবং ফণ্টুস ডিরেক-টারের ইমেজ মুছে প্রতিষ্ঠিত করলো সফল হিট ডিরেক্টর লেখ ট্যান্ডনকে এবং "পতি পত্নী আউর ও" প্রমাণ করলো যে শক্তি-শালী ভাবাবেগের ছবির পরিচালক ইচ্ছে করলে পরিচ্ছন্ন হাসির ছবি করতে পারেন এবং সে ছবিতে সঞ্জীবকুমারের প্রয়োজন হয় না একাধিক সহনায়ক, ভীড় এড়িয়ে তিনি একাই গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পারেন।

"দামাদ" (বাংলা ছবি মৌচাকের হিন্দী চিত্র রূপ) জন্ম দেয় এক নোতুন তরুণ পরিচালকের, যে ওমপ্রকাশের 'আপনা ধন' প্রমাণ করে যে ইমোশনাল ছবি সহজেই জুবিলী ছুঁয়ে যায় তথাকথিত ফাইট ও অ্যাকশন ছাড়াই।

আর এখন রাজ খোসলার 'মাই তুলসী তেরে আঙ্গন কী'র সাফল্য আর এক-বার প্রমাণ করলো যে ভালোগল্পই ছবি হিটের মূল মন্ত্র, সঙ্গে ভালো বিচারক ও সঠিক প্রচেষ্টা হলে তো সোনায় সোহাগা। সেখানে নোতুন কিংবা পরোনে অর্থবা বিকল্পীর যোগ্য কিংবা অযোগ্য শব্দগুলো অর্থহীন হয়ে যায়। এই ছবিতে আশা পারেখ ও নূতনের অভিনয় অসাধারণভাবে প্রাণবন্ত, বিশেষ করে আশা পারেখের অভিনয়ের কথা তো সবার মুখে মুখে।

দর্শকেরা তো ভুলতেই বসেছিলেন রাজ খোসলার 'চিরাগ' অথবা 'দো বদন' অথবা শক্তি সামন্তের 'ছুটি পতঙ্গে'র আশা পারেখকে।

আশ্চর্য হবো না যদি নূতন এবং আশা পারেখ আবার ব্যস্ত হয়ে পড়েন, খুশী হবো সুঅভিনেতা রাজেশ খান্নার সম্মান-জনক প্রত্যাবর্তনে। পরিচ্ছন্ন ভালো ছবির জন্যে অনেকেই আবার নোতুন করে ভাবতে শুরু করেছেন। এদেশে যে ভালো ছবি চলে তার একসারি প্রমাণ তা হাতে-হাতে। সুস্থ ছবির পালে হাওয়া লেগেছে —এবারে তরণী আপনা থেকেই চলবে, জোর করে দাঁড় বেঁধে লক্ষ্যে টেনে নিয়ে যাওয়ার দিন সম্ভবতঃ শেষ হয়ে আসছে।

তাকুং ছবিতে পরভীন বাবি

ক্লান্ত ওমর শরীফ

ইজিপশিয়ান চলচ্চিত্র অভিনেতা ও শরীফ বলেছেন যে সিনেমা জগতে থেকে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

সিসিলির এক লাকশান যেখানে তি অ্যামেরিকান পরিচালক রিচার্ড ফ্লেশারের ছবি 'অশান্তি' ছবির শুটিং করছিলে সেখানে তিনি সাংবাদিকদের কাছে বলেন নিজের জীবনের জন্যে আরও বেশী সম বরাদ্দ করবার সময় এসে গেছে।

খুব সম্ভবতঃ তিনি আর এক বছ চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে যুক্ত থাকবে তারপর অন্ততঃ তিন বছরের অবস ফাটাতে চান। তাঁর নিজের কথায়— 'চলচ্চিত্র জগৎ আর আমাকে সাড়া জাগা না। জীবন রুটিন মাফিক কাজই নয় শুধু জীবন অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। আমি আরও বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন কাটা চাই বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন ও শুভা কাঙ্খীদের নিয়ে।

টুকরো গল্প

একদিন শাবানা আজমী তার গাড়ি এমন এক জায়গায় পার্ক করলেন যে সেখ পুলিশের অনুমতি ছিলো না। দুই ঘ পরে শাবানা ফিরে এসে দূর থেকে দেখ পান কি তার গাড়ির সামনের সীটে এক পুলিশ কনস্টেবল বসে আছে সম্ভব গাড়ি শুদ্ধ তাকে থানায় নিয়ে যাবার জন্যে চট করে শাবানার মাথায় এক বুদ্ধি খে গেল। ট্যাক্সি করে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফি শাবানা ফোন করলেন পুলিশ স্টেশনে বলে যে তার গাড়ি চুরি হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ পরে গাড়ি এসে দরজার সামনে হাজির। সেই একই কনস্ট গাড়ি থেকে নেমে এসে শাবানাকে বোঝ থাকে কি এই গাড়িটা খুঁজে বের করতে ত ক্ষত পরিশ্রম হয়েছে।

শচীন আর সারিকা একবার কোথ বেড়াতে যাচ্ছিল। আলাপ আলোচনা ক বাড়ী চলতে চলতে হঠাৎ সারিকা কাশা শুরু করেন। শচীন সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্রভ বিস্তার করবার জন্যে সারিকাকে বললেন চলো সারিকে (রাধিকে!) তোমার গল জন্যে কিছু নিয়ে নিই। সারিকা তৎক্ষণ রাজী হয়ে একটা জুয়েলারীর দোক দেখিয়ে বললো চলো একটা হীরের নেকলে কিনে দেবে। সারিকার কাশিও বন্ধ হ গেল। শচীন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সাতে সতে ভাবতে ভাবতে জুয়েলারীর দোকানের দিকে পা বাড়ালো।

জ্যোতিপ্রকাশ রায়

চিত্রধ্বনি

ফন্দিবাজ সমীরবাবু

ভারতীয় চলচ্চিত্রে পরিচালক শ্রীসমীর গাঙ্গুলীর প্রধান অবদান মৌসুমীর গজদন্ত। দুম্ করে বলা হয়ে গেল কিন্তু আমি ঠিক তা চাইনি। আমি, মানে, নানামহল থেকেই এ সম্পর্কে প্রশংসা শুনেছিলাম। এবার সুযোগ পেয়ে সুন্দরী নায়িকার সুন্দরতর দন্তসজ্জা দু' চোখ ভরে লক্ষ্য করলাম। আমার মনে হয় না ইতিপূর্বে অন্য কোন পরিচালক মৌসুমীর রূপের খাস রহস্য এমন ফাঁতেতের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন।

ফন্দেবাজ ছবির পরিচালকের দ্বিতীয় অবদান চিত্রনাট্য ও কাহিনী বিন্যাসে। এ-বিষয়ে তিনি অবশ্য পথিকৃৎ নন কিন্তু এ-রকম একটি অটোমেটিক চিত্রনাট্য আমি খুব কম দেখেছি। ইন্টেলেকচুয়ালরা কি সব ক্লাস লুক গোদার ইত্যাদি কঠিন কঠিন ফরাসী নাম বলেন, ফন্দেবাজ দেখবার পর আমার মনে হচ্ছে তারা দুধের বাচ্চা। আমরা তো কোন ছার, সমরবাবুও জানতেন না গল্প কি ভাবে শেষ হবে। ভাগ্যিস, ফিল্মের র' স্টকের একটা হিসেব ছিল, তাই বাঁচোয়া।

আমাদের অনেকের ধারণা যে প্রেমের সঙ্গে পয়সার একটা অপ্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে। কিন্তু গাঙ্গুলীমশাই জানাচ্ছেন—না, মোটেই তা নয়। পানওয়ালার সঙ্গেও নবাবনন্দিনীর ভালোবাসা হতে পারে, তবে একটু ফন্দীবাজ হতে হবে। ধর্মেন্দ্র এখানে অবশ্য পানওয়ালা নন তবে লন্ড্রীওয়ালার বন্ধু এবং মোটামুটিভাবে ছেঁড়া কাথায় শুয়েই সিনেমার নায়ক হওয়ার স্বপ্ন দেখেন। তো এ হেন ধর্মেন্দ্র বিনা গাড়ী থেকে সামান্য কাদা ছেটানোর অপরাধে মৌসুমীর অমন সুন্দর মুখে পাল্টা কাদা লেপে দিতে

ফন্দিবাজ ছবিতে ধর্মেন্দ্র/মৌসুমী

পারেন, তিনি যে সময় ও সুযোগ পেলে প্রত্যুপকার না হোক অন্ততঃ জালিয়াতী করবেন, এতে আর অবাক হওয়ার কি আছে।

এই ভাবে দুষ্টু ছেলে ধর্মেন্দ্র ও মিষ্টি মেয়ে মৌসুমীর প্রেম হল। আর ধর্মেন্দ্র একদিন হৃদয়তাপে গলে গিয়ে প্রেমিকার সামনে অপরাধ জানিয়ে বসলেন। মায়া ভাবছেন—মেয়েরা আরশোলা দেখলে ভয় পায়, জালিয়াত শুনলে তো ভিরমি খাবে—তারা বালক। মায়ের জাত তো ঃ মৌসুমী, সুতরাং, এক নিমেষেই ক্ষমা করলেন গাফিলতি। বিয়ের পরে মৌসুমীকে বাসন মাজতে হল আর বোয়ের বকা খেয়ে নবকুমার গুলাম ধর্মেন্দ্র গাল ফুলিয়ে এলেন বকসিং রিংয়ে।

এরপরে আরও অনেক কিছুই ঘটল। কিন্তু কি যে ঘটল, পাঠক আমায় মাপ করবেন, ধর্মেন্দ্রর লীলাখেলা সামান্য বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা যায়? আমি শুধু বলব প্রেম চোপরা, জিৎ প্রমুখ খারাপ খারাপ লোকজন এরপরই মাঠে নামবেন।

আর দেরি না করে ছবিটা দেখে আসুন। বিলম্বে বিন্দুর বক্ষস্ফীতি, প্রেম চোপড়াক সন্তরণ, রাহুল দেবের সঙ্গীত, ধর্মেন্দ্রর অশ্বচালনা, মৌসুমীর আর্তনাদ না দেখতে পেলে হতাশ হবেন।

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

ছোট ফিল্ম মেকার ছোট নয়

ছোটরা নাকি চিরদিনই বড়র দাবী দাবিয়ে চলে। কথাটা সাংসারিক জীবনে খাঁটি হলেও এই বিবাট ব্যবহারিক পৃথিবীতে বড়রাই চিরদিন ছোটদের দাবীয়ে রেখেছে। ক্ষমতায় কিন্তু ছোটরা অসীম, বড়দের চাইতে তেজী কম নয়।

বড়দের দাবিয়ে রাখাটাকে আর বেশীদিন বরদাস্ত করতে পারছিলেন না স্থানীয় ছোট ছবির বড় বড় মেকাররা। গত সপ্তাহে একদিন তাই সবাই মিলে আলোচনায় বসেছিলেন নিজেদের নিয়ে। নিজেদের সমস্যা নিয়েই আলোচনা করছেন। বিতর্ক ও জুড়েছেন অনেক সময়, অন্তিমে সিদ্ধান্ত হয়েছে একজোট হয়ে না দাঁড়াতে পারলে ভাঙ্গা কোমরটাকে সহজে সোজা করা যবে না।

সারাদিন ধরে যে আলোচনা চলেছিল তা ছিল একান্তভাবে সদস্যদের জন্য এবং বন্ধ দেয়ালের মধ্যে। বিকেল বেলা গেটে ইস্টার্ন হোটেলের একটি ঘরে সংস্থার সভাপতি শান্তি চৌধুরী সেই আলোচনাচক্র প্রসঙ্গে উপস্থিত সাংবাদিকদের জানালেন সরকারী নিষ্ক্রিয়তা ও আর্থিক অনিশ্চয়তা ছাড়া ছোট ছবি-করিয়েরা আজ যে প্রধান সমস্যাটির সম্মুখীন তা হল প্রেক্ষাগৃহে ছোট ছবি দেখানোয় হল-মালিকদের নির্লজ্জ ফাঁকিবাজি। আইনমাফিক পতি প্রদর্শনীর ফুড়ি মিনিট ডকুমেন্টারি ও শর্ট ফিল্ম দেখানোর জন্য নির্ধারিত। বেশীর ভাগ প্রেক্ষাগৃহ আজকাল বিজ্ঞাপনের ছবি দেখিয়েই ঐ সময়টুকু নষ্ট করছেন, কারণ তাতে হলের খরচ বাড়ে। যদিও বা কোনো হল দয়াপরবশ হয়ে ডকুমেন্টারি ছবিটি দেখান অনেক সময়ই ছবির দৈর্ঘ্য হপ্-স্টেপ-জাম্প দেয় এবং বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত হঠাৎ শেষ হয়ে যায়। এই অবস্থায় অবসান দাবী করা হয়েছে সবার আগে।

সরকারী আর্থিক সহায়তার কথা উল্লেখ করে ফিল্ম ডিভিশনের মুখ্য সংযোজক মুশির আমেদ বললেন পূর্বাঞ্চলের জন্য পৃথক 'সেল' তৈরীর প্রস্তাব রয়েছে। তিনি একথাও বললেন যে যদিচ পূর্বাঞ্চলের ছাব্বিশজন ফিল্মমেকার ফিল্ম ডিভিশনের তালিকাভুক্ত, কিন্তু বছরে এই অঞ্চল থেকে ছ-সাতটির বেশী ছবি ফিল্ম ডিভিশন পায় না। সংখ্যাটি নাকি খুবই হতাশাব্যঞ্জক।

ঠিক তার আগে ভূপেন হাজারিকা বলেছিলেন পূর্বাঞ্চলের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি চিরদিনই বিমাতাসুলভ। অবশ্য পাহাড়ে ঘেরা এই সব অঞ্চলে অসংখ্য উপজাতিদের নিয়ে গবেষণামূলক ছবি করার প্রচুর সুযোগ রয়েছে। এ ব্যাপারে ফিল্ম ডিভিশনের অগ্রণী ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন। পূর্বাঞ্চলের সীমানার শুধু পাটনায়, শেষ নয়—এটা যেন কেন্দ্রীয় সরকার মনে রাখেন।

সারা দিনের আলোচনায় সরকারীপক্ষের হয়ে আরও উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও বেতার দপ্তরের (ফিল্ম) সহকারী সচিব এস কে শর্মা, রাজ্য সরকারের সচিব ডঃ এন সেনগুপ্ত এবং ইউকো ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি জে এন পাঠক। শ্রীপাঠক একটি সুসংবাদ দিয়েছেন। সুসংবাদটি হল ফিল্মের জন্য ঋণের সুদ ১৬ থেকে সাড়ে ১২তে কমান হচ্ছে।

চেক ছবির সুদিন নেই

ফ্যান্টাসীধর্মী ছবি করিয়ে হিসাবে কারেন কাচমনার নাম চেক চিত্রজগতে প্রথমের সারিতে। তাঁর 'স্টিল মাবমেড' কিন্তু বিষয়ের (কাহিনী ঃ হান্স্ অ্যান্ডারসন) বৈচিত্র্যে যেমন বুদ্ধির গোড়ায় আঘাত দিতে পারেনি, তেমনি প্রকরণগত বৈচিত্র্যে অর্থাৎ স্টাইলিস্ট স্যালিও ছবিটি চোখকে তৃপ্তি দেয়নি। একমাত্র ব্যতিক্রম রং, নরম নীলাভ রং পর্দাজুড়ে হাল্কা খুশীর ফোয়ারা ছড়িয়েছে।

ডাকলাভ ভোরলিসেক এর নাম এই প্রথম শোনালেন সিনে সেন্ট্রাল, যারা ছিলেন এই উৎসবের অন্যতম উদ্যোক্তা। প্রথম ছবি দিয়ে তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলেন না। দুর্ভাগ্য আমাদেরও, রাজনৈতিক পর্দা বদলের পর দীপ্তির ছুরি হাতে কাউকে দেখা গেল না চেক ছবির জগতে।

সমাজবাদী আদর্শের ভ্রমগান নিশ্চয়ই

প্রচার করবে ছবি, কিন্তু সেই প্রচারের চেহারায় শৈল্পিক পোশাক থাকবে না কেন আরবহীন, মৌলুষ হীন শ্লোগো লাগবে কেন সৃষ্টিগুলো। পানসে গল্প আর আরও পানসে চিত্রনাট্যে এই উৎসবের ছবিগুলো তাই চেক ছবির একদা সুদিনকে মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল বার বার।

স্মৃতিকে আরও বেদনার্ত করে দিল জোসেফ মাখের 'দি প্যাকেট অফ লাভ'। ছবিটিতে বিখ্যাত চিত্রকর জোসেফ মানের জীবন - বেদনা - আর্তি - আকাঙ্খা অসাফল্য - প্রেম - চিন্তিত করেছেন পরিচালক শিল্প-স্নেহে। মানের যন্ত্রণাকে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন, নাহলে অমন টগবগে রাগী ছবি তৈরি সম্ভব হতো না। সারা ছবিতে ক্লোজ-আপ ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র একটি বার। তাও একবারে শেষ দৃশ্যে। দৃপ্ত, ব্যঞ্জোচিত ভঙ্গিতে মান যেন তাকিয়ে আছেন দর্শকের দিকে, বলতে চাইছেন 'আমি ছিলাম, আমি আছি, আমি থাকব। আমি শাশ্বত।'

ঐ একটি ক্লোজ-আপই যেন ছবিটির 'কী পয়েন্ট'। জোসেফ মাখ বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে মানকে হাজির করেছেন পর্দায়।

উৎসবের অপর ছবি অলডিচ লিপস্কির 'মারসেক পাস সি এ পেন' একটি পরিচ্ছন্ন কমেডি। উঁচু জাতের কমেডি নয়, খুবই সাধারণ মানের। বয়স্ক বাবার লেখাপড়া শেখাকে কেন্দ্র করে তরুণ ছেলের সঙ্গে তাঁর মজার মজার কিছু ঘটনা সরলীকৃত অবস্থায় রঙিন করে পর্দায় দেখানো হয়েছে। সান্ধ্য-মজলিশ মনোরঞ্জনের পক্ষে ছবিটি অগ্রাহ্য করার নয়, কিন্তু রাতের ঘুম কেড়ে নেবার যোগ্যতা তার নেই।

কারই বা ছিল।

আজকের চেক ছবির সত্যিই সেই সুদিন আর নেই। কোথায় গেল 'ডেথ ইজ কলড অ্যাঙ্গেলচেন'-এর সেই বলিষ্ঠ ভঙ্গি। কিংবা 'ডেথ কামস ইন রেইন' এর বুক ছেঁদা করে দেওয়া ঝড়। 'নেল ফর দি বেয়ার ফুটেড'ই বা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কই। এখন বুঝি 'সাইলেন্ট ব্যাবিকেড্ড' এর পালা চলছে।

নির্মল ধর

ছবির খবর

'পম্পার শুভ মহরৎ

প্রদীপ ভট্টাচার্য পরিচালিত শ্রে বি এন্টারপ্রাইজ নিবেদিত 'পম্পা' ছবির শুভ মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে টেকনিশিয়ান স্টুডিওর স্কোরিং রুমে সঙ্গীত গ্রহণের মাধ্যমে। নির্মল চক্রবর্তীর সুরে ঐদিন দুটি গান গাইলেন হৈমন্তী শুক্লা ও তরুণ ব্যানার্জি। জগদীশ ভট্টাচার্যের কাহিনী থেকে এছবির চিত্রনাট্য পরিচালক নিজেই তৈরি করেছেন। ভূমিকালিপিতে আছেন, অনিল চ্যাটার্জি, মাধবী চক্রবর্তী জলী ব্যানার্জি, রবি ঘোষ ও মৃণাল মুখার্জি।

মহঃ আব্দুল সামাদ কাজী প্রযোজিত 'পম্পার বাকীবাহিক চিত্রগ্রহণের কাজ আগামী মাস থেকেই শুরু হচ্ছে। চিত্রগ্রহণ করবেন পিন্টু দাশগুপ্ত।

বাতাসী

তারা মা চিত্রমন্দির নিবেদিত 'আগন্তুক' পরিচালিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সুরতহাল রিপোর্ট' অবলম্বনে 'বাতাসী' ছবির সম্পূর্ণ অন্তঃদৃশ্যগ্রহণের কাজ সম্প্রতি শেষ হয়েছে টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে। উমা দত্ত প্রযোজিত এছবির বহির্দৃশ্যগ্রহণের কাজ এ মাসের মাঝামাঝি থেকে শুরু হবে বীরভূমের বিভিন্ন স্থানে। চিত্রগ্রহণ করছেন শংকর ব্যানার্জি। অভিনয় করছেন নিরঞ্জন রায় কালি ব্যানার্জি, রবি ঘোষ, জ্ঞানেশ মুখার্জি, সঙ্গীতা ব্যানার্জি, চিন্ময় রায়, অমর দত্ত ও নামভূমিকায় নবাগতা উর্মিলা দত্ত। এছবির নটি গানে সুর দিচ্ছেন আটজন সুরকার। এঁদের মধ্যে আছেন কালীপদ সেন, বাজেন সরকার, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, প্রবীর মজুমদার, হিমাংশু বিশ্বাস, অজয় দাশ, দিলীপ রায় ও সবিতা-ব্রত দত্ত।

উপলব্ধি

তপন সাহা পরিচালিত 'উপলব্ধি' ছবির পাঁচদিনব্যাপী ইনডোর সুটিং-এর কাজ সম্প্রতি হয়ে গেল টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে। এছবির অর্ধেকেরও বেশী অংশের সুটিং ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। রূপ তারা ইউনাইটেড ফিল্মস নিবেদিত এছবির শিল্পীরা হলেন মহুয়া রায়-চৌধুরী মৃণাল মুখার্জি সন্ধ্যারাণী, সুব্রতা চ্যাটার্জি, চিন্ময় রায়, বিপ্লব চ্যাটার্জি, শমিত ভঞ্জ ও মিঠুন চক্রবর্তী। চিত্রগ্রহণ গণেশ বোস। সুর অমল চ্যাটার্জি।

যাত্রা সংবাদ

নিউ প্রভাস জপেরা

'বাদশা বেগম' ও 'অশান্ত পৃথিবী' দুটি পালা এবার আসরস্থ করবেন। দলের রিহার্সাল প্রায় শেষ, উদ্বোধনের দিন গুনছে। এ দলে চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসছেন—সমীর লাহিড়ী, শ্যাম সুন্দর, দেবকুমার, তপন-কুমার, প্রশান্তকুমার, গীতিকা মিত্র, শেলী পাল। দল মালিক দীনবন্ধু বাবুর আশা দুটি পালাই সাফল্য লাভ করবে।

যাত্রালোক

বিশ্ববরেণ্য সত্যজিৎ রায়ের কথা ও সুর এবং উপেন্দ্রবাবুর কাহিনী নিয়ে যাত্রায় আসছে, "গুপি গাইন বাঘা বাইন", মহড়া শেষ হবার মুখে। দলের আর একটি বলিষ্ঠ প্রয়াস "ভগবানের মৃত্যু" প্রযোজক তিনকড়িবাবু শিল্পি সমাবেশ করছেন এ ভাবে—মনোরঞ্জন চক্রবর্তী, সুবিমল আদক, রাজা ভট্টাচার্য, বিমলেন্দু ভট্টাচার্য, বালকুমার, মহুয়া ব্যানার্জি, রীতা সেন, লীলা চক্রবর্তী।

হাওড়ার সুপ্রসিদ্ধ বস্ত্র প্রতিষ্ঠান!
সুতী · ফ্যান্সী · ছাপা শাড়ী · বিভিন্ন প্রকার বস্ত্রের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
শ্রী বিহারিজী শাড়ী ষ্টোর্স
৫৩১, জি. টি. রোড, হাওড়া · মল্লিক ফটক (কাছারীর পাশে)

উৎসবে · উপহারে · নিত্য প্রয়োজনে
বেনারসী · সিল্ক · তাঁত · মিল · ফ্যান্সী শাড়ী
সুটিং · শার্টিং ও পোষাক
শ্রীরাম টেক্সটাইল এম্পোরিয়াম
২৭/২, জি. টি. রোড (সাউথ) হাওড়া-১

শুধু বিজ্ঞাপনই নয় বিজ্ঞানও বটে

'আয়ুর্বেদোহমৃতানাম'— আয়ুর্বেদ অমৃতের শ্রেষ্ঠ। আয়ুর্বেদিক ঔষধের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতে আয়ুর্বেদীয় ঔষধগুলির চাহিদা দিনে দিনে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। সম্পূর্ণ দেশজ সম্পদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের নির্দেশে এখন যে সমস্ত ঔষধগুলি প্রস্তুত হচ্ছে তা জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধনের ব্রত পালন করে চলেছে। প্রাচীনকাল থেকে বহু মুনি ঋষিরা এবং আয়ুর্বেদাচার্যগণ বহু গবেষণা করে এই সব বনজ, খনিজ প্রাণীজ এবং সাধারণ লতাপাতা থেকে যে সমস্ত ঔষধ আবিষ্কার করে গেছেন সেগুলো এখন আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে পরম সমাদর লাভ করছে। আয়ুর্বেদের প্রামানিক গ্রন্থসমূহ যেমন আয়ুর্বেদ সংগ্রহ, দ্রব্যগুণ নির্ঘন্টম, ভৈষজ্যরত্নাবলী, চরক ও সুশ্রুত সংহিতা প্রভৃতি বহু প্রাচীন পুস্তকে আয়ুর্বেদীয় ঔষধের গুণ সমূহ উল্লেখ করা আছে। তাঁদের সেই প্রজ্ঞালব্ধ জ্ঞানামৃতের পরম্পরা রক্ষা করে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের সমীকরণে এস, সি, কেমিক্যালস আয়ুর্বেদীয় ঔষধের জগতে যে সাম্প্রতিকতম ঔষধটি সংযোজন করেছেন তার নাম **'লিউকোনেক্স'** ট্যাবলেট। **'লিউকোনেক্স'** ট্যাবলেট লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগের আশু ফলপ্রদ ঔষধ। এই অসুখ মেয়েদের রূপলাবণ্য হরণ করে। অসহ্য যন্ত্রণায় ও কষ্টে মহিলারা ক্রম নৈরাশ্যের অন্ধকারে প্রবিষ্ট হন। স্বাস্থ্যের পক্ষে পরম হানিকর এই লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগটি যখন ক্রমান্বয়ে অধিক পরিমাণে প্রকাশ পায় তখন রোগীর গলাবুক জ্বালা, হাতে পায়ে জ্বলা হয় এবং পরে উহা সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। অম্লবোধ, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, ক্ষুধামান্দ্য, আমাশা, খুঁতখুতে স্বভাব, সন্ধিগর্ধাচিত্ততা, আত্মবিশ্বাস নষ্ট, আহারে অরুচি, কর্মে অনুৎসাহ, জীবনে হতাশা ও বিতৃষ্ণা, নিদ্রানাশ, নিতান্ত আপনজন স্বামীপুত্রের প্রতি স্নেহ ভালবাসাটুকুও হ্রাস পায় সুতরাং এই লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগকে সম্পূর্ণরূপে নিরাময়ের জন্য এস, সি, কেমিক্যালস নিরলস প্রচেষ্টায় প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্র নির্দেশিত পথে উন্নত পরীক্ষাগারে প্রস্তুত করেছেন **'লিউকোনেক্স'** ট্যাবলেট, তাই রোগ যত পুরানো ও কঠিন হোক না কেন **'লিউকোনেক্স'** ট্যাবলেটই লিউকোরিয়ার (সাদাস্রাবের) বিশ্বাসযোগ্য প্রতিকার, এই ঔষধ সেবনের পরে দেহে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না। দ্রুত আরোগ্যলাভ করতে হলে **'লিউকোনেক্স'** ট্যাবলেট ব্যবহারের সঙ্গে বাহ্যিক চিকিৎসা হিসাবে আক্রান্ত স্থানে **'ফেকটিন'** লোশনটির ব্যবহার অপরিহার্য। সুতরাং আর দেরী না করে আয়ুর্বেদের বিশুদ্ধ ঔষধ **'লিউ-কোনেক্স'** ট্যাবলেট সেবন করুন এবং **'ফেকটিন'** লাগান। লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগে আক্রান্ত রোগীদের বিশেষভাবে জানান যাচ্ছে যে, যাঁরা প্রচণ্ড অম্বল অজীর্ণ বুকজ্বালা প্রভৃতি রোগে ভুগছেন তাঁরা **'এসিনা'** ব্যবহার করুন। লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগের সঙ্গে যাঁরা পুরাতন ও নতুন আমাশয়ে ভুগছে তাঁরা **'এসিবেল'** ব্যবহার করুন। লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগের সঙ্গে যাঁরা কোষ্ঠকাঠিন্য, অরুচি, ক্ষুধামান্দ্য ও লিভার জনিত যে-কোন অসুখে কষ্ট পাচ্ছেন তাঁরা **'এসিনেক্স'** ব্যবহার করুন, লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগের সঙ্গে যাঁরা ব্যথা ও গাঁটের বাতজনিত রোগে ভুগছেন তাঁরা **'আরথিন'** ব্যবহার করুন। লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগের সঙ্গে যাঁরা কৃমিতে ভুগছেন তাঁরা **'ভারনেক্স'** ব্যবহার করুন। লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগের সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত ভদ্রমহিলারা এই সব উপসর্গে ভোগেন তাঁরা **'লিউকোনেক্স'** ট্যাবলেট ব্যবহারকালে ঐ সব উপসর্গের জন্য উল্লিখিত ঔষধগুলো ব্যবহার করলে রোগের আরোগ্য আরও ত্বরান্বিত হবে। আজই আপনার নিকটবর্তী দোকানে খোঁজ করুন অথবা সরাসরি আমাদের কবিরাজমণ্ডলীর সুপরামর্শ গ্রহণ করুন। **এস, সি, কেমিক্যালস,** (আয়ুর্বেদ বিভাগ), ২৭ন, শোভাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৫।

Release through Calcutta Filmlet Advertising.

আয়করের ফাঁদে

বোম্বাই চিত্রতারকাদের নিয়ে আবার ফ্যাসাদ। প্রতিবছরই এ নিয়ে ঝঞ্ঝাট বাড়ছে বই কমছে না। ২-৬৫ কোটি টাকার ওপর পাওনা হয়েছে আয়কর। প্রায় ১-৬৩ কোটি টাকা আয়কর দেওয়া হয় নি সরকারকে। এদের মধ্যে আছেন শর্মিলা ঠাকুর, রাজকাপুর সঞ্জয় খান, রাজেশ খান্না বণধীর কাপুর, নূতন, জয়া ভাদুড়ী সুলক্ষণা পণ্ডিত এবং আরও অনেকে।

তাজ্জব!

শুটিং থেকে হঠাৎ রেখার মনে হল ওর শহরে ফেরা দরকার। একঘেয়ে কাজ ভালও লাগছিল না। পরিচালককে ম্যানেজ করে ও কেটে পড়ল। রাস্তায় ওর পাশেই, দেখা হল প্রযোজকের সঙ্গে। তার গাড়িও শহরমুখী। গাড়িটা দাঁড় করাল রেখা। প্রযোজককে নিজের গাড়ি ছেড়ে তার গাড়িতে উঠতে বলল রেখা। ভদ্রলোক খুশি। নায়িকার সঙ্গী হওয়া যাবে কিছুক্ষণ। কিন্তু খানিক গিয়েই একটা বণ দেখিয়ে প্রযোজককে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে রেখা চলে গেল। ভদ্রলোকের গাড়ি চলে গেছে আগেই। রেখার গাড়ি ততক্ষণে চোখের বাইরে। তাজ্জব ব্যাপার।

সুরকার হাসপাতালে

সুরকার অপ্পন ছুরির ঘায়ে কাহিল। যার অঞ্চলে ওকে কার ছুরি মারে। তার ফলেই ওকে নানাবতী হাসপাতালে যেতে হয়েছে। ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করছেন। লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল, কল্যাণজী আনন্দজী, শশী-কাপুর আরো অনেকেই অপ্পনজীকে দেখতে গিয়েছিলেন।

রেখাকে ভয় পাই

এন এন সিপ্পির ঘরের সাফল্যের মূলে রেখা। অথচ এই রেখার সম্পর্কে ওর মার কোন আশাই ছিল না। রেখার বোন বাধা দেখতে অনেক সুন্দরী, লেখাপড়া শিখেছিল। মার ধারণা একদিন ও হবে বড় অভিনেত্রী। কিন্তু প্রযোজক পরিচালক এস এম আব্বাসের ছেলে ইসমাইলকে বিয়ে করে বাধা এখন সংসারী। মার রেখাই শেষ পর্যন্ত উল্টে দিল ওর মার স্বপ্নকে।

রেখার সঙ্গে অভিনয় করতে ভয় পায় শচীন। ওর কাছে রেখা ভাল অভিনেত্রী। কিন্তু ওর সঙ্গে অভিনয়? আমি যখন ছোট ছিলাম ও আমাকে খোঁচা দিয়ে বলত, তুমি যখন নায়ক হবে, তখন আমার সঙ্গে অভিনয় করবে?' অবশ্য আমিও বলতাম, হ্যাঁ তুমি হবে আমার নায়িকা। এখন একথা স্টুপিডের মত মনে হয়।

উজ্জ্বল আশবাণী

ফিল্ম টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের ছাত্র আশবানী কমেডিয়ান হিসেবে বোম্বে ছবিতে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। ৫০টির ওপর ছবি করেছেন এর মধ্যে।

হৃষিকেশ মুখার্জির গুড্ডাড আর অভিমানই ওকে চিত্র জগতে পরিচিত করেছে সব থেকে বেশি। তারপর থেকে ওর চলার পথ অনেক স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক। দর্শকপ্রিয় হয়ে উঠতে কোন বাধাই আসেনি। শকুন্তি সামন্তর বালিকা বধূ ও মোহনকুমারের আপ্ বেটি এই প্রতিভাবান কমেডিয়ানকে নিয়ে এসেছে প্রথম সারির অভিনেতাদের মধ্যে। বহু সরকারী ও বেসরকারি পুরস্কার পেয়েছেন আশবানী। বিচিত্ররূপী চরিত্র রূপায়িত করছেন। চরণকা বাজার মস্তান সর্দার, বুলেটবাজে কলেজ ছাত্র, ছৈলা বাবুতে সি আই ডি অফিসার, সাহেব বাহাদুরে গ্রাম্য মানুষ, চাঁদনী-সোনায় পকেটমার, খুনপাশিনায় এক সৎ কৃষক, কালাবাজে ক্লাউন—এসব অভিনয় করতে গিয়ে আশবানী তার জীবনের উজ্জ্বল সম্ভিক্ষণে চাক্ষিয়ে। গুজরাটি ছবি যুগল যদি মা বাপে একটি প্রধান চরিত্রে আছে। আশবানী। ওর নিখুঁত কথায় ইয়াকুব আর মতিলাল—এই দুজন স্বাভাবিক ও বাস্তব করেছেন চিত্র অভিনয়কে। ওর তো অনেক অভিনয় করেছেন। কিন্তু কখনই একঘেঁয়ে হয়ে পড়েন নি। ইয়াকুবই আমাকে অনুপ্রাণিত করে, ওঁর অভিনয় অত্যন্ত বাস্তব।

পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লাখ

এক সে বধ কর এক ছবির চূড়ান্ত মুহূর্তের দৃশ্য গ্রহণে একটি হাতির দরকার পড়েছিল। অভিনয়ে জন্য ভাড়া করে আনা হল। পাঁচ দিনে হাতিটি আয়করে ৫০,০০০ টাকা। চরণ দাস ছবির দৃশ্য গ্রহণে ৫০টি কুকুরের দরকার পড়ে। কারণ একটি কুকুরের জন্মদিনের দৃশ্য। তিন দিন ধরে শুটিং চলে। খরচ হয়েছিল এক লাখ টাকা।

টিপিকাল

উগদাবাবু, ছবি করেন প্রযোজক এস এইচ মুন্সিস। মানুষটি মাবাত্মক সাধাসিধে। ওর অফিসটা একেবারে সেকেলে। দেওয়াল ভাঙাচোরা পুরোন গন্ধ ছড়ান চারদিকে। কোন মান্ধাতার আমল থেকে সম্ভবত চেয়ার টেবিলগুলো আনা হয়েছে। মুন্সিজীর চোরটা ওর ওজন সহ্য করতে পারবে কিনা সেটাই সন্দেহ। ময়লা ধুতি আর কোর্তা পরে অফিস আসেন প্রত্যেক দিন। উগদাবাবুর প্রথম দিনের শুটিং শেষে মুন্সিজী নায়ক ধর্মেন্দ্রর বাড়িতে টাকা পাঠান। মাত্র এক হাজার টাকা রেখে বাকিটা ধর্মেন্দ্র ফেরৎ পাঠান মুন্সিজীর নতুন কাপড়-জামা ও জুতো কিনতে। মুন্সিজী রাজি না হওয়ায় ধর্মেন্দ্র নিজে লোক পাঠিয়ে জামা কাপড় কিনে আনালেন। মুন্সিজীকে জোর করলেন নতুন পোশাক পরতে। এবার আর ধর্মেন্দ্রকে অসম্মান করলেন না। কিন্তু ধর্মেন্দ্রকে অবাক করে মুন্সিজী পরদিন অফিসে এলেন তার নিত্যদিনের নোংরা জামাকাপড়ে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা ৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

ⓟ ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

মূল্য ৭৫ পয়সা। ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

মহাত্মা
শিশিরকুমার ঘোষ

প্রণীত

কয়েকটি অমূল্য লোক-চরিত ও কাব্য-গাঁথা

এই অপূর্ব রচনাগুলি পাঠক-পাঠিকাদের
দেবে অমৃত পানের আনন্দ। তৃষিত শোকসন্তপ্ত
হৃদয়ে আনবে পরম শান্তি!

শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত ১ম—৬ষ্ঠ খণ্ড ২৬·০০

শ্রীনরোত্তম চরিত ৩·৫০ পঃ

শ্রীকালাচাঁদ গীতা ৩·০০

Lord Gouranga (Eng. Vol. 1) ৩·০০

গ্রন্থগুলি জনপ্রিয় হলেও এর মূল্য বৃদ্ধি করা হয়নি।
অবিলম্বে সংগ্রহ করুন।

প্রাপ্তিস্থান:
পত্রিকা হাউস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৭০০০০৩।

দে বুক ষ্টোর্স, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ও
নাথ ব্রাদার্স, ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট; কলিকাতা।

Regd. No. WB/NC-13
Gram : AMRITA Calcutta-700003
AMRITA
Phone 55-5231 (14 lines)

বিশুদ্ধ 'কুকমী' গুঁড়া মশলার ক্রেতারা

সাবধান!

'কুকমী' গুঁড়া মশলার জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে কলকাতার কয়েকটি গুঁড়া মশলা কোম্পানী তাদের নিজস্ব নিকৃষ্টমানের ব্রাণ্ডের সংগে জনপ্রিয় কুকমীর নাম জুড়ে হুবহু কুকমী (Cookme) নামের স্টাইল নকল করে আসল কুকমী গুঁড়া মশলা বলে বাজারে চালাবার চেষ্টা করছে।

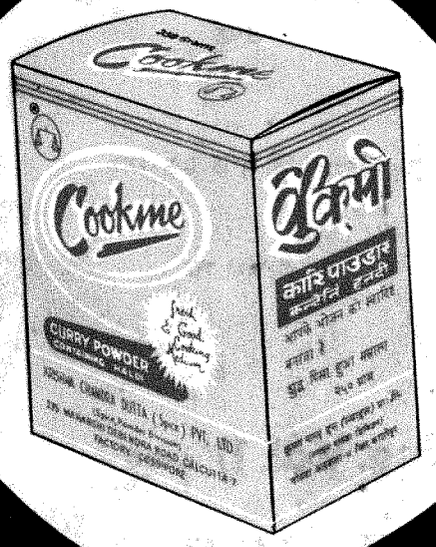

কেনার সময় দেখে নেবেন— 'কুকমী'র প্যাকেটে কেবলমাত্র কুকমী (Cookme) ছাপই আছে,— অন্য কোন ব্রাণ্ডের নাম যুক্ত নেই।

CENTRAL LIBRARY CALCUTTA

প্রস্তুতকারক :

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ

২৩৫ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা ৭০০০৭০ ● ফোন : ৩৩০৯৯৫, ৩২৬৬৩২
পোস্ট বক্স নং : বড়বাজার ৬৮৮৫ ● ফ্যাক্টরী : কাশীপুর

iaa 590

ফটো-অফসেট : এস, কে, প্রোসেস এণ্ড কোং প্রাঃ

১২০ টাকায় বেঁচে আছি

অমৃত
সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি
১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮
দাম ৭৫ পয়সা

মাসে মাসে আয়!

আই ও বি-র বিশেষ দীর্ঘস্থায়ী জমা প্রকল্পে লগ্নী করুন

আই ও বি-র বিশেষ দীর্ঘস্থায়ী জমা প্রকল্প হল তাঁদের জন্যে আদর্শ, যাঁদের থোক টাকা আছে আর নিয়মিত মাসিক আয়ের প্রয়োজন! বোনাস, নগদ উপহার, পূর্ণকালপ্রাপ্ত জীবনবীমা, অবসর গ্রহণের সময়ে পাওয়া টাকা বা আকস্মিক লাভের টাকা লগ্নী করার এটি চমৎকার উপায়!

প্রতিমাসে আপনার ডিপজিট থেকে কত আয় হবে তা নীচের চার্টে দেখানো হল:

ডিপজিটের অঙ্ক	মাসিক আয়		
	12-36 মাসে	39-60 মাসে	63 এবং তারও বেশী মাসে
টা. 5,000/-	24.88	31.06	37.22
টা. 10,000/-	49.75	62.11	74.44
টা. 1,00,000/-	497.51	621.11	744.40

আই. ও. বি-.তে আসুন! আপনার জন্যে আমরা চমৎকার পরিকল্পনা করে রেখেছি।

ইণ্ডিয়ান ওভারসীজ ব্যাঙ্ক

আপনার প্রগতির পথে সত্যিকার সাথী

IOB 41A-R-Ben

নটরাজন-এর নবতম উপন্যাস

লালবাজার ২০.

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সার্থক উপন্যাস

শেষ বিচার ১৮.

শক্তিপদ রাজগুরুর উপন্যাস

অনুসন্ধান ১৫.

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস

নীলাঙ্গুরীয় ১২.

কাশীকান্ত মৈত্রের

গণতন্ত্র মুখোশ ও মুখশ্রী ২৫.

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ভ্রমণ কাহিনী

গোমুখীর পথ ১৬.

অমলেন্দু ঘোষের

বিপ্লব ও বিপ্লবী ৮.

নারায়ণ সান্যালের উপন্যাস

গজমুক্তা ১০.

কল্‌হনের উপন্যাস

খবরে প্রকাশ ১০.

শঙ্কু মহারাজ-এর

চতুরঙ্গীর অঙ্গনে [দ্বিতীয় মুদ্রণ] ১৫.

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের উপন্যাস

একাল চিরকাল ১০.

নিগূঢ়ানন্দের উপন্যাস

হৃদয়ে নায়িক ৮.

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাস

প্রেম ঘৃণা দাহ ৮.

সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

অলোকলতা ৮.

ব্রজমাধব ভট্টাচার্যের

ত্রিভুবনের বাইরে ১৮.

চরের মিথুন ১৫.

স্বর্ণভ্রমর ১৪.

শৈলেশ দের

গান্ধীজী ও নেতাজী ২০.

রবীন্দ্র লাইব্রেরী

১৫।২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭৩

ফোন : ৩৪-৮৩৫৬

শারদীয় অমৃত

সেপ্টেম্বরেই বেরোবে

শ্রীদুর্গা ও শ্রীগৌরাঙ্গের
রঙিন অফসেট ছবি

সুখের স্মৃতি দুঃখের স্মৃতি

রাণী চন্দ

গুরুশিক্ষা ছবিতে যুগল-বন্দী। অবনীন্দ্রনাথ আর রাণী চন্দ। দু'জনে মিলে এক সঙ্গে এঁকেছিলেন শান্তিনিকেতনের অনেকগুলো রঙিন ছবি। সেই ছবি আঁকার অসাধারণ কাহিনী এই প্রথম, লিখলেন অসাধারণ লেখিকা রাণী চন্দ। এই ধরণের পুজো সংখ্যায় তাঁর লেখাও এই প্রথম।

রবিঠাকুরের পাগলা ফাইল

অমিতাভ চৌধুরী

বদ্ধ উন্মাদ, পাগল ও ছিট গ্রস্তদের রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠি। কেউ চাইছে পেঁপের বিচি, কেউ চাইছে বোবেল, প্রাইজ পাওয়ার সোল্লা গ্যারান্টা, কেউ পাঠাচ্ছে সোন্নালী চুলের গোছা। শত শত চিঠি। রবীন্দ্রনাথ কী করেছেন সেই চিঠির তাড়া নিয়ে?

এবার পুজোয় সব চেয়ে বড় আকর্ষণ শান্তিনিকেতনের মানুষ থেকে অমৃতের জন্য বিশেষভাবে আনা অমিতাভ চৌধুরীর এই সুদীর্ঘ সচিত্র রচনা।

লেখক যখন প্রেমিক

যখন ডায়রির পাতায় এক একটি শব্দ মানে স্মৃতির শুকনো বকুল। একজন বিশিষ্ট বাঙালী লেখক মধ্য বয়সে নিতান্ত সামান্য বালিকার প্রেমে পড়েছিলেন। লেখকের নামটি পরে পাবেন। অন্যতম শারদীয়া চমক।

উপন্যাস

আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, শচীন দাস।

বড় গল্প

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, লীলা মজুমদার, নবনীতা দেব সেন শৈবাল মিত্র

গল্প

মনোজ বসু, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, পরিতোষ সেন, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ অমর মিত্র ও আরও অনেকে।

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের প্রবন্ধ
সুমথনাথ ঘোষের 'সাহিত্যিক আড্ডা'

কবিতা

অরুণ মিত্র, মনীন্দ্র রায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, কৃষ্ণ ধর, আলোক সরকার, প্রণবেন্দ্র দাশগুপ্ত, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, সুনীল নন্দী এবং আরও অনেকে।

উল্লম্বনারী

ভবেশ সান্যাল

গ্রামসেবক ছেলে, ভবেশ সান্যাল চৌরঙ্গীর আর্ট স্কুলে ছবি আঁকতে এসে বড়লোকের খপ্পরে ছটফটিয়ে পড়লেন। তখন ছবির জগতে রয়েছেন অবন ঠাকুর, যামিনী রায়। গল্পকে হার মানান ভাষায়, সেই সব মানুষ ও সময়ের কথা।

নরবলি এখনও আছে

অবিশ্বাস্য হলেও বিশ্বাস করতে হবে। ওড়িশার গাঁয়ে ঘুরে নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন সংকর্ষণ রায়—ছবি সহ ইতিহাস নিষ্পন্ন ধারাবিবরণী।

শিশির ও বিশ্বনাথ

মধুসূদন মজুমদার

প্রখ্যাত নট শিশির ভাদুড়ীর ভাই বিশ্বনাথ ভাদুড়ীও কম যেতেন না। তাই নিয়ে শিশিরবাবুর মধ্যে একটু ঈর্ষাও ছিল সম্ভবত। দুই ভাদুড়ীর ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ ফুটেছে এই রেখাচিত্রে।

দাম : দশ টাকা। রেজিস্ট্রি ডাকে
দু টাকা পঁচিশ পয়সা অতিরিক্ত

সার্কুলেশন
ম্যানেজার; অমৃত পাবলিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড কলি-৩।

অমৃত

অমৃত
১৮ বর্ষ
১৮ সংখ্যা
২৯ ভাদ্র ১৩৮৫

15 September, 1978

সম্পাদকীয় ৩

সাহিত্য ইত্যাদি ৪ মণীন্দ্র রায়

আমি কেমন আছি? ৫ দীপঙ্কর চক্রবর্তী

ভাগ্য গণনা ৬ শ্রীমাণিকা

প্রদর্শনী ৭ পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

রাজনীতি কলকাতা স্টাইল ৮
বেদব্যাস বৈদ্য

রাজধানীর ইনসাইড স্টোরি ১০
পর্যবেক্ষক

সমালোচনা ১১

প্রচ্ছদ কাহিনী ১৪

১২০ টাকায় বেঁচে আছি
দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ এঁকেছেন শৈবাল ঘোষ

পঞ্চশর (গল্প) ১৯
শওকত ওসমান

তরণী পাহাড়ে বসন্ত (উপন্যাস) ২৩
শৈবাল মিত্র

কোন দিন জঙ্গলে ২৭
পিনাকী চট্টোপাধ্যায়

আমাদের পিতারা ৩২
তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতা ৩৪ শান্ত রায়, মতি মুখোপাধ্যায়, সলিল চক্রবর্তী, জয়ন্ত চক্রবর্তী

সোনার হরিণ নেই (উপন্যাস) ৩৫
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

ভারত কী করে ভাগ হল ৪১
বিমলানন্দ শাসমল

হাওয়া গাড়ি (উপন্যাস) ৪৬
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

খেলা ৫২ দর্শক, লিঙ্কম্যান, শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতবরণ মিত্র

বোম্বাই বিচিত্রা ৫৭
জ্যোতিপ্রকাশ রায়

চিত্রধ্বনি ৬০

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ কাহিনী
৫০ নট আউট
লিখেছেন অন্নদা মজুমদার
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
বলেন্দ্রকুমার দাশগুপ্তর প্রবন্ধ
সুনীল জানার গল্প

বন্যার পর বন্যা

বাঁকুড়া, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলার ওপরে বিধ্বংসী বন্যার করাল ছায়া নেমে এসেছে। আজ ৪।৯ তারিখ পর্যন্ত যা জানা গেছে তাতে দশ লক্ষ মানুষ বিপন্ন; কম করে দেড় হাজার মানুষ নিখোঁজ; মৃতের সংখ্যাও একশ'র কম নয়। এ সংখ্যা আরো বেশি দাঁড়াবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। কেননা, গত রবিবার পর্যন্তও মেদিনীপুর ও ঘাটাল অঞ্চলে সেনাবাহিনীর বোট ত্রাণসামগ্রী নিয়ে সংযোগ স্থাপন করতে পারে নি।

অবিশ্যি বিমানবাহিনীর সাহায্যে হেলিকপ্টার থেকে প্যাকেট করা খাদ্য ও ত্রাণদ্রব্য পাঠানো শুরু হয়েছে। দুর্গত ব্যক্তিদের যাতে নিরাপদ জায়গায় আনা যায় সেজন্যে নৌকা সংগ্রহেরও চেষ্টা চলেছে। রাজ্য সরকার এই আকস্মিক বন্যার প্রবল দুর্বিপাকে নিরাশ্রয় মানুষের পাশে সর্বশক্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য থেকেও জানা গেছে রাজ্য সরকার তাঁদের দায়িত্বের বিষয়ে খুবই সচেতন রয়েছেন। আশা করা যায়, কেন্দ্রীয় সরকারও ত্রাণসামগ্রী ও অর্থ জোগান দিয়ে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করবেন।

বন্যা এখন সারা উত্তর ভারতেরই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যমুনা নদীর আকস্মিক জলস্ফীতির ফলে হরিয়ানা উত্তরপ্রদেশ ও দিল্লি অঞ্চলে অজস্র গ্রাম প্লাবিত হয়েছে, গৃহহারা হয়েছে হাজার হাজার মানুষ। তাছাড়া আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গেও তো কদিন আগেই পদ্মার জলস্ফীতির ফলে মালদহ এবং মুর্শিদাবাদের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। সে বিপদ থেকে মুক্ত হতে না হতেই দেখা দিল নিম্ন বঙ্গের বন্যা কতোদিনে তার ক্ষয়ক্ষতি পুরো হিসেব পাওয়া যাবে তাও এখন স্পষ্ট নয়। প্রাথমিক সংবাদেই বিপদের পরিমাণ যতো বেশি বলে জানা গেছে তাতে শুধু সরকারি ত্রাণব্যবস্থার ওপর নির্ভর না করে সমস্ত মতের মানুষেরই এগিয়ে আসা দরকার বন্যার্তদের সাহায্যের জন্যে।

পশ্চিমবঙ্গে দামোদর, শিলাবতী ও কংসাবতী নদীই নিম্নবঙ্গের এই সাম্প্রতিক বন্যার কারণ। ডি ভি সির পাঞ্চেৎ থেকে অতি দ্রুত এক লক্ষ কিউসেক জল ছেড়ে বাঁধগুলোকে বিপদমুক্ত করা হয়েছিল। কংসাবতীর বাঁধও বিপদের মুখে। হয়তো আরো বেশি জল ছাড়ার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে, আর তাতে মেদিনীপুরের দুর্গতির মাত্রা আরো বেড়ে যাবার আশঙ্কা। মাইথন বাঁধ থেকেও সোয়া লক্ষ কিউসেক জল ছাড়া হবে বলে জানা গেল। তাছাড়া দ্বারকেশ্বর নদীর বাঁধ ভেঙে যে আরামবাগ অঞ্চলে কী ভয়াবহ দুর্গতি ঘটিয়েছে, সে খবর আগেই পাওয়া গেছে। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ সেটা সুস্পষ্ট। ত্রাণের কাজ সুষ্ঠুভাবে করাই এখন প্রাথমিক কর্তব্য। কিন্তু বন্যারোধের জন্যে স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে তোলাও খুবই জরুরী হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্য নিয়ে অবিলম্বেই সেদিকে কাজ শুরু করা দরকার।

সাহিত্য ইত্যাদি...

কলকাতার সাহিত্য

সাহিত্যের কলকাতা হল শহরটির প্রাণের কথা। আর কলকাতার সাহিত্য তার বাইরের প্রসঙ্গ।

কিন্তু শহরটি যেহেতু জ্যান্ত, এখনও জ্যান্ত, তা যতো অরাজনৈতিকভাবেই হোক, তার বাইরের হালচাল জানলে অন্তত্বের খবরও পাওয়া যায় খানিকটা।

সেজন্যেই আমরা পুরনো কলকাতার খবর জানতে এত বেশি আগ্রহী। বাপ-ঠাকুর্দার পরিচয় জানলে একটা মানুষকে যেমন ভালো করে বুঝতে পারি, এও অনেকটা সেইরকম আর কি।

আগেকার আমলে হরিহর শেঠের বই ছিল। প্রাথমিক কাজ এবং ভালো কাজই বলতে হবে। তবে পুরনো কলকাতার পুরো চেহারা তাতে উঠে আসেনি। অন্তত যাঁদের নাহলে নতুন কলকাতার ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্পসংস্কৃতির গোড়াপত্তনই ঘটত না, তাঁদের কথা সবিস্তারে বলা হয়নি।

সেকাজে পেয়েছি বিনয় ঘোষের কাছে। কলকাতার বনেদী পরিবার এবং বাবু সমাজের উৎপত্তি, তাঁদের জীবনযাত্রার ধরন-ধারণ, সাংস্কৃতিক দেউলেপনা, উচ্ছৃঙ্খলতা এসব আমরা ভালো করে প্রথম জানলাম বিনয়বাবুর বইগুলোতে। সেইসঙ্গে নতুন ধরনের শিক্ষাদীক্ষা, ইয়ং বেঙ্গল, বিদ্যাসাগর এনিয়েও অনেক কিছু অনুসন্ধান করেছেন তিনি।

অবিশ্যি প্রাচীনেরা এসব বিষয়ে কিছু কিছু উপাদান যে রেখে যাননি তা নয়। যেমন রাজনারায়ণ বসু, চন্দ্রনাথ বসু এবং বিশেষ করে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ি ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' বইটিতে। আর 'আলালের ঘরের দুলাল' থেকে শুরু করে সেকালের উপন্যাস নাটকেও কলকাতার খবর কম নেই। হুতোম তো তাঁর নকসায় পুরোপুরি একটা আলবামই রেখে গেছেন পুরনো কলকাতার জীবনযাত্রার।

তাছাড়া রয়েছে খবরের কাগজে। 'হিকির গেজেটি' থেকে 'সংবাদ প্রভাকর', 'হিন্দু পেট্রিয়ট', অমৃতবাজার পত্রিকা, বেঙ্গলহরকরা এবং আরো নানা কাগজে অজস্র উপাদান ছড়ানো রয়েছে। ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংবাদপত্রে সেকালের কথায় পরিচয় পাওয়া যাবে তার। বিনয় ঘোষ তাঁর 'সাময়িক পত্রে সমাজচিত্র' সম্পাদনা করে একটি যোগ্য কাজ করেছেন। ভবিষ্যতে যাঁরা গবেষণা করবেন তাঁদের অশেষ দরকারে লাগবে এইসব বই।

ইদানীং নতুন লেখকরাও উৎসাহী হয়েছেন এদিকে।

পুরনো শহরের বিভিন্ন অঞ্চল এবং ঘটনাস্থলের পশ্চাদপট এঁকেছেন শ্রীপান্থ। একই কাজ করেছেন পুর্ণেন্দু পত্রী, অনতি-প্রাচীন কলকাতার স্থানমাহাত্ম্য নিয়ে। এছাড়া আরো কেউ কেউ মনোযোগ দিয়েছেন এদিকে। তাঁদের পুরো তালিকা হাজির করা সম্ভব হল না। হয়তো তার প্রয়োজনও নেই। আর যাই হোক, ক্যাটালগ তৈরি করা উদ্দেশ্য নয়।

আকর্ষণীয়ই বলতে হবে, পুরনো কলকাতার এইসব গল্পসল্প। সত্যি ঘটনাও যে কতো মনোরম লাগতে পারে, কলকাতার স্থানচরিত্র হাতে নিলে স্পষ্ট বোঝা যায় সেটা।

ফ্যান্সী লেন নামক জায়গায় শোভিন মজাদার ঘটনা ঘটত না কোনোদিন। ঐ গলিতে ফাঁসি দেওয়া হত। ইংরেজিতে লেখা 'ফাঁসি' শব্দটিই বাঙালির উচ্চারণে হয়েছে ফ্যান্সী। কিন্তু পার্ক স্ট্রীটে সত্যিই ছিল পার্ক। হরিণও ছিল সেখানে। একেবারে সেই পার্ক স্ট্রীট এলাকা থেকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল পর্যন্ত। আর ঐ মেমোরিয়ালের জায়গাটিতেই পরে তৈরি হয়েছিল সেকালের জেলখানা। তাই জেলে যাওয়াকে সেকালে বলত 'হরিণবাড়ি যাওয়া'। এখনকার লোকের কাছে তার কোনো মানে নেই। কিন্তু বলে দিলে খুবই মজাদার লাগার কথা।

এরকম আরো কতো কী।

যেমন ধরুন সিঁথির কাছাকাছি একটা জায়গাকে লোকে বলে চিড়িয়ার মোড়। চিড়িয়া মানে তো পাখি, কোথায় তার পাত্তা!

কিন্তু আগে ছিল। সত্যি সত্যি একটা চিড়িয়াখানা ছিল ঐখানে। আর তাতে পাখির সঙ্গে অন্য জন্তুও ছিল।

আবার বি-বা-দী বাগ এলাকাতেও কম বিস্ময় ছড়ানো নেই। এখনকার জি পি ও-র জায়গায় ছিল প্রথম যুগের কেল্লা। সিরাজউদ্দৌলা যখন ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসেন, আসল লড়াই হয়েছিল এখনকার বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট এলাকাতে। কাঁচা বো-তে ছিল সরু একটা খাল, অর্থাৎ কাঁচা, তা দিয়ে উত্তরের লবণ হ্রদ থেকে জল যেত গঙ্গায়। পরে সে কাঁচা বুজিয়ে ফেলা হয়, কিন্তু তার ইতিহাস রয়ে গেছে রাস্তাটির নামে। পাশেই রয়েছে মলঙ্গা লেন, সেখানে বাস করত মালঙ্গীরা। তারা লবণ হ্রদের নোনা জলের কাঁচা থেকে জল নিয়ে নুন তৈরি করত। চৌরঙ্গীর নামের পেছনে রয়েছে ঐ নামেরই এক সাধুর স্মৃতি। ধর্মতলায় সম্ভবত ছিল ধর্মঠাকুরের 'থান'। কিন্তু বউবাজার? সে জায়গাটিতে কি অনেকগুলো বাজার ছিল (এখনও আছে) বলেই বহু-বাজার? নাকি সত্যি সত্যি বৌবাজার! ওরই কাছাকাছি তো বাইজিরাও থাকত। তা থেকে যদি বাইবাজার, এবং তারই রূপান্তরে হয় থাকে বউবাজার, তারই বা সদুত্তর কী?

এছাড়া মনে করুন কলকাতার গলি-গুলো। তারও ইতিহাস কম উৎসাহজনক নয়। কিছুকাল আগে বাধারমণ মিত্র এ বিষয়ে একটি বই বার করেছেন। তাঁর আরো কিছু কিছু লেখা এদিকে-ওদিকেও বেরিয়েছে। কলকাতার বিষয়ে এমন নির্ভরযোগ্য এবং ওয়াকিবহাল মানুষ আর কেউ এখন আছেন বলে আমার জানা নেই। যেমন তিনি তথ্যনিষ্ঠ, তেমনি সোর্স মোটিবিয়ে বিষয়ে সবেরমিনে পরীক্ষা করে দেখার উৎসাহী।

কলকাতাকে নিয়ে প্রসঙ্গভিত্তিক কাজও কম হচ্ছে না। যেমন বঙ্গমঞ্চের ইতিহাস, ছাপাখানা ও বটতলার কথা, ইস্কুল কলেজের গোড়াপত্তনের কথা, খবরের কাগজের ইতিহাস, রাজনৈতিক আন্দোলন, ধর্ম আন্দোলন, সমাজ সংস্কার, কতো কী নিয়েই লেখা হচ্ছে এখন। তারপর পুরনো আমলের যানবাহন, পুলিশ আর আইন আদালত, জেলখানা, এগুলোও কম উৎসাহী করছে না। তরুণ গবেষক কমল চৌধুরী, অনতিতরুণ নিখিল সরকার, ইন্দু মিত্র, নারায়ণ দত্ত, আরো কতো মানুষকে উপাদান জুগিয়ে চলেছে কলকাতা।

কলকাতার সাহিত্য এখন প্রায় মহাভারতের আকার নিতে চলেছে। আঠারো পর্ব শেষ হতে এখনো অনেক দেরি।

অরুণেন্দু রায়

আমি কেমন আছি ?

দীপঙ্কর চক্রবর্তী

প্রথম চাকুরীতে ঢুকে আমার যে সমস্যাটা হয়েছিলো তা একেবারেই স্বাভাবিক, সুস্থ মনের লক্ষণ নয়। আমার মনে হয়েছিলো, এ চাকরিটা আমার নয়। আমার মনে হয়েছিলো যেন আমি এমন কোনো অলৌকিক রাজ্যে এসে পড়েছি যেখানে ঢোকার আমার কখনো কোনো অধিকার ছিল না। এখানে কেমন করে লোকে কথা বলে, কেমন করে হাঁটে চলে, কেমনভাবে দাঁড়ায়—এর কোনোটাই তো আমি চিনি না। আমার এখনো শার্টের বোতাম খুলে যায়, বাথরুম ফেরৎ প্যান্টের জিপ্ খোলা থাকে। জুতো পরে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে পা টনটন করে, ঠিক করে চুল আঁচড়াতে জানি না। আমার মত বেয়াদপ এখানে কী করে জায়গা পেলো। ওই তো ভাস্কর কি সুন্দর কেরানী বা টাইপিস্টদের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেলে অন্যদিকে কায়দা করে মুখটা সরিয়ে নেয়, একদমও অভদ্র লাগে না ওকে, মনে হয় এই-মাত্র যেন কোনো সাংঘাতিক দরকারী কথা মনে হোতে এতটা অন্যমনস্ক হয়ে গেছে ও! প্যান্টের পকেট থেকে অভিজিৎ প্রত্যেক দিন ঝক্‌ঝকে শাদা রুমাল বার করে। টাই আলগা করে রিল্যাক্সড হয়। চোখে চোখ রেখে কথা বলতে বলতে চায়ের কাপে চিনি মেশায়, এক ফোঁটা চা-ও সসারে (আমি যাকে ডিশ বলতাম) পড়ে যায় না। অথচ ভাস্কর বা অভিজিৎ—এরা কেউই খুব একটা বেশি পড়াশোনা করেনি। সমারসেট মম, আর মোপাসাঁর 'নেকলেস' বাদ দিলে ওদের 'বিদেশী সাহিত্যের ভাঁড়ার আগলাচ্ছেন' আগাথা ক্রিস্টি, পেরি মেসন আর হেডলি চেজ। তবু ওদের আমার নিজের থেকে অনেক বেশি চালাক মনে হয়। ভাস্কর, অভিজিৎ—এরা দুজনেই প্রবাসী বাঙালী। জন্মালে ওদের বাবা, মা, আত্মীয়-স্বজন। কলকাতায় ওরা যায়নি, যেতে ইচ্ছেও নেই। কলকাতা ওদের কাছে একদম ভদ্রলোকের জায়গা নয়। পশ্চিমবঙ্গ ওদের চোখে মানহাটানের সামিল। সেখানকার লোকেরা বোমা দিয়ে ভাত খায়, সবার বাড়িতে পাইপ-গান থাকে। ওরা রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প-সংগ্রহ পড়েছে—ইংরিজীতে। শরৎচন্দ্রের পরে নাকি বাংলাদেশে আর কোনো লেখক জন্মায়নি (লেখকেরা যে লেখক হয়েই জন্মায় কী করে সে রহস্য আমার আজো বোঝা হয়নি)। চণ্ডীগড়ের মতো প্ল্যান্ড সিটি দেখার পর কলকাতা দেখতে ওদের ঘেন্না

এরই নাম ন্যাশানালিজম

হয়। দেখালো বটে বাবা পাঞ্জাব—এরই নাম তো ন্যাশানালিজম! আমি একটু ঢোক গিলে কিন্তু কিন্তু করে একদিন বলে ফেলে-ছিলাম যে চণ্ডীগড়ের মডেল তো লো করবুসিয়েরের করা। উনি তো পাঞ্জাবের লোক ছিলেন না। অভিজিৎ, ভাস্কর আমাকে প্রায় মারতে আসে সেকথা শুনে। ডিজাইন যারই হোক, করাতো এদেশের লোকেরই হাতে। তবে! আর গ্রীন রেভোলিউশন, সেটাই কী কর্বুসিয়েরের ডিজাইন মাফিক। পশ্চিমবঙ্গের ছেলেদের নাকি জানা উচিত যে কৃষি বিপ্লবের হাঁক-ডাক করার আগে অ্যাগ্রিকালচার নিয়ে পড়াশোনা করা দরকারি। আবে দূর, ভালো করে একটা রাস্তা বানাতে জানে না যারা তারা আবার বিপ্লব করবে! জন্মদাতা বাবা-মাকে, নিজের পরিবারের লোককে যারা ভালোবাসতে পারে না, তারা নাকি জনগণকে ভালোবাসবে! উঁচু থেকে কায়োকে টেনে নামিয়ে নীচু না করে, যাতে নীচু থেকে সবাইকে উঁচু করা যায় সে চেষ্টাই আমাদের দরকার। ওরা এসব বুঝিয়ে-ছিল আমাকে। ওদের মতে মানুষে মানুষে তফাৎ থাকতে নাকি বাধ্য। 'তুই কি মনে করিস, চীনে মাও-সে তুং যে চেয়ারটাতে বসেন, যে কোনো সাধারণ লোকেরও সেখানে বসার অধিকার আছে?'—অভিজিৎ একদিন আমায় এরকম প্রশ্ন করেছিল। আমি আর কোনোদিনও ওদের সঙ্গে এসব বিষয়ে কথা বলিনি এবপর। আসলে আমার উচিত ছিল না হঠাৎ দুম করে এরকম একটা চাকরিতে ঢুকে পড়ার। অবশ্য চাকরিটা না করেও কোনো উপায় ছিল না। কুড়ি বছর ডিঙ্গিয়ে, বি-এস-সি পাশ করে বসে আছি। পোস্ট-গ্রাজুয়েটে নাম লেখাইনি। যে চাকরিটা পেলাম তার নাম জুনিয়ার একসিকিউটিভ। যে চাকরিকে আমি আজীবন ঘেন্না করে এসেছি। অথচ অনেক মাইনে, বাংলা উপ-ন্যাসের নায়করা যেমন পায়। আমি বেঁটে খাটো, রোগা পাতলা মানুষ, টাই পরে, প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে কথা বলতে পারবো কোনোদিন, এরকম স্বপ্নেও কখনো ভাবিনি। পকেটে ওয়ালেট, তাতে দশটাকা, পাঁচটাকা, সিগারেটের প্যাকেট, লাইটার, সানগ্লাস, এসব মিলিয়ে মিশিয়ে আমি তো রীতিমতো একটা সুখী শুয়োরের বাচ্চা হয়ে যেতে চলেছি। হেডলি চেজের বইগুলো এবারে কিনে ফেললেই হয়। স্ত্রীলোটা আর কয়েকটা দিন এদেশে থাকলে আমি ওকে বিয়ে করে ফেলতে পারতাম পর্যন্ত। তারপর হানি-মুনে দার্জিলিং যেতাম। স্ত্রীলাকে বিলিতি বক্সিয়া কিনে দিতাম। দামী বক্সিয়ের কনট্রাসেপটিভ কিনতাম। বক্সিন ব্রাজিয়া কিনতাম। এতো ভালোভাবে প্রতিবাদে বেঁচে থাকা যায় অথচ তবু লোকে কেন যে এতো রাগারাগি করে! আমার সব ধারণা গুলিয়ে যেতে লাগলো।

চাকরিটা হয়েছিল বোম্বেতে। আমি, ভাস্কর, অভিজিৎ আর তপনদা একটা বাড়ি ভাড়া করে একসঙ্গে থাকতাম। ভাস্কর, অভি-জিৎ সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফিরে রিপোর্ট লিখতে লিখতে হুইস্কি খেতো। কোত্থেকে কম দামে সাতার মাঝে মাঝে স্কচ নিয়ে আসতো। মাঝে মাঝে গোয়া থেকে 'ফেনি'। কাজু-বাদামের বড্ডাণ্ড। হুইস্কির থেকেও কড়া আর দিশী। অভিজিৎ উদাস হয়ে মাঝে মাঝে বেসুরো গলায় গান ধরতো 'আলো' আমার আলো ওগো, আলো ভুবন ভরা', ভাস্কর 'হোয়ে হোয়ে' বলে ভুল তালে (অনেকটা 'সারারারা রারারারা হোলি হ্যায়'-এর মতো) হাততালি দিতো। তপনদা আন্ডারওয়ার কাচতে কাচতে বাথরুম থেকে 'আমার জন্যে একটু মাল রাখিস' বলে নাকী গলায় খোকামি করতো। আর মাঝে মাঝে রাত্রিবেলায় ঘুম থেকে উঠে বাথরুম চলে গিয়ে অনেকক্ষণ পরে ফিরে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘুমিয়ে পড়তো আবার। চারজন আলাদা আলাদা বিছানায় শুতাম। মশারী গোঁজার অভ্যেস আমার একেবারে ছিল না। অনেক রাত অবধি জেগে জেগে বই পড়তাম। আলো নেভাতে ভুল হয়ে যেতো প্রায়ই। মাঝরাতে একদিন যথারীতি ঘুম থেকে উঠে বাথরুম যাবার পথে হঠাৎ আমার বিছানার কাছে এসে বসে পড়লো তপনদা। স্নেহের সঙ্গে আমার মশারী গুঁজে দিল। আলো নিবিয়ে দিলো। তারপর মশারীর মধ্যে ঢুকে পড়ে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে নরম গলায় জিজ্ঞেস করেছিল 'তুই এতো রোগা কেন রে?' আমার পাজামার উপর হাত রেখে তপনদা বললো ওর নাকি বড্ড মন কেমন করছে ছেলে-বউয়ের জন্য।

তপনদা কোম্পানিতে কেরানী হয়ে ঢুকেছিল, তারপর ঘেঁষটে ঘেঁষটে অফিসার। প্রায় আমাদের সমান মাইনে পেতো। দুটি পুত্রসন্তান সমেত নিজের বউটিকে হাওড়ার পৈতৃক বাড়িতে রেখে আসতে হয় তপনদাকে। 'বাবার দেখাশুনো করার জন্যে',—তপনদা যা বলতেন। যাহোক, তপনদার তো তখন বড্ড মন কেমন করে উঠল বৌদির জন্য, কিন্তু আমার পাজামার দড়িতে তার হাত চলে আসে কেন? আমি ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠেছিলাম মেয়েদের মতো।

সমকামীতার জন্য তপনদার চাকরিটা শেষ অবধি গেল। আমি বাঁচাতে পারিনি।

দশমে শক্তিশালী চন্দ্র

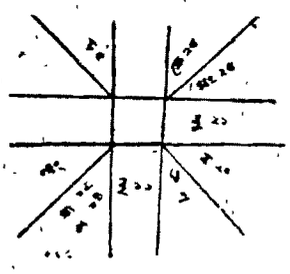

জটিল জ্যোতিষ শাস্ত্র। আমাদের দেশে এই জ্যোতিষ শাস্ত্রে যে কত প্রকার বিচার পদ্ধতি আছে, তা অল্প কথায় অথবা দুই-একটা রাশিচক্র বিচারের মাধ্যমে বোঝান শক্ত। তবে মোটামুটি সরলভাবে যেসব বিচার হয়—আমরা তারই কয়েকটা উদাহরণ পাঠকের সামনে তুলে ধরেছি। রাশিচক্র বিচার কালে গ্রহের অবস্থান, বলাবল, নক্ষত্র এবং যোগাদির দিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদের জ্যোতিষীরা প্রাথমিক বিচার করে থাকেন, তারপর দশা-অন্তর্দশা। আমরা এতদিন এক-একটি পদ্ধতি কেন্দ্র করে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রাশিচক্র নিয়ে আলোচনা করেছি। এবং প্রায় প্রত্যেক রাশিচক্রেই আমরা লক্ষ্য করেছি—যে নক্ষত্রের গুরুত্ব অনেকখানি, অর্থাৎ কোন গ্রহ, যদি স্বীয় নক্ষত্রে অবস্থান করে অথবা যোগকারক গ্রহে নক্ষত্রে অবস্থান করে তবে সে গ্রহ তুলনাধিক ফল প্রদান করে।

আলোচ্য রাশিচক্রটিতেও আমরা সে প্রমাণ স্পষ্ট দেখতে পাই। আর দেখতে পাই লগ্ন থেকে দশমস্থ বলবান চন্দ্রের ফলাফল। রাশিচক্রটি আমাদের মিউনিসিপ্যাল মিনিস্টার শ্রীপ্রশান্তকুমার শূর মহাশয়ের। সিংহ লগ্ন, বৃষ রাশি। লগ্ন এবং রাশি উভয়েই উনত্রিশ ডিগ্রি অতিক্রম করেছে আমরা আগেও বলেছি কর্কট এবং সিংহ-রাশির পক্ষে মঙ্গলগ্রহ হলো রাজযোগকারক গ্রহ। এখানেও রাজযোগকারক গ্রহ মঙ্গল লগ্নকে এবং মঙ্গলেরই নক্ষত্রাশ্রিত শনিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখছে। আর দেখছে চন্দ্রকে—সেও মঙ্গলের নক্ষত্রে অবস্থিত। অর্থাৎ রাজযোগকারক কিম্বা রাজযোগের ফলদাতা মঙ্গলের অবস্থানটি নিখুঁত এবং সুন্দরভাবে রাশিচক্রটিকে আগলে ধরে রেখেছে। আর রাশিচক্রটিকে তুলে ধরেছে মান, যশ-খ্যাতির অধিপতি বৃহস্পতি—তুলা রাশিতে নিজের নক্ষত্রে বসে। বৃহস্পতি শুধু যে নিজের আছে তা নয়, সে যোগকারক গ্রহ মঙ্গলকেও নিজের নক্ষত্রে এবং নিজের দৃষ্টিতে রেখেছে। আর লগ্নপতি রবিকে এনে রেখেছে নিজের গৃহে ধনুরাশিতে। যদিও বৃহস্পতি এই রাশিচক্রের পক্ষে একেবারে নির্ভেজাল শুভ ফলদাতা নয় তথাপি সে নিজে নিজের নক্ষত্রে থেকে এবং অন্যান্য গ্রহকে নিজের নক্ষত্রে

এবং নিজের গৃহে রেখে রাশিচক্রকে বহুলাংশে বলবান করেছে।

বৃহস্পতি জন্মকালীন অবস্থাতে যেমন জাতকের শুভ ফল প্রাপ্তিতে সাহায্য করেছে। তেমন গোচরেও যখনই বৃহস্পতি সুযোগ পেয়েছে তখনই জাতককে শুভ ফল দিয়েছে। জাতককে আমরা দেশ সেবক হিসেবে প্রথম দেখতে পাই কাউন্সিলার হিসেবে ১৯৫৪ সালে—তখন বৃহস্পতি জাতকের রাশিতে অবস্থান করে জাতককে শুভ ফল দিয়েছে। ঘুরতে ঘুরতে বৃহস্পতি যখন ১৯৬৯ সালে কন্যারাশিতে এসে সে সময়ের দশাপতি শনির সঙ্গে (যেই শনি মঙ্গলের নক্ষত্রে অবস্থিত) মিলিত হয়ে মঙ্গলের নক্ষত্র পেয়েছে, জাতককে দিয়েছে রাজযোগ ফল। জাতক তখন কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হলেন। মেষের হিসেবে আমরা জাতককে পরপর দুই বছর দেখতে পেলাম কারণ তখন অন্যান্য শুভ যোগের সঙ্গে ছিল অন্তর্দশা কর্মপতি শুক্রের দান। এইভাবে কখনও রাজযোগ ফলদাতা মঙ্গল, কখনও বৃহস্পতি আবার কখনও কর্মেশ শুক্র জাতককে এগিয়ে এনে ১৯৭৭ সালে করলো সেই মিউনিসিপ্যালের মন্ত্রী। আমরা ওঁর রাজনীতি, কর্মনীতি ঐ মিউনিসিপ্যালের মধ্যেই প্রথম থেকে দেখে আসছি। আমার মনে হয় তার প্রধান কারণ শক্তিশালী চন্দ্রের অবস্থান। কারণ জ্যোতিষশাস্ত্রে দশমে শক্তিশালী চন্দ্রের অবস্থানে এই রকমই ইঙ্গিত দিয়ে গেছে যে দশমে বলবান চন্দ্র পৌর বিভাগের নেতৃত্ব দেওয়ার কারক হয়।

বর্তমানে জাতকের শনির মহাদশায় বৃহস্পতির অন্তর্দশা চলছে—চলবে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত। এই দশা অন্তর্দশায় জাতকের উত্তরোত্তর শুভ ফলই পাওয়া উচিত। কারণ দশাপতি এখন লগ্নেই আছে। তাছাড়া দশাপতি শনির এবং অন্তর্দশাপতির পরিচয় আগেই দিয়েছি। কিন্তু জাতকের লগ্ন থেকে দ্বিতীয় স্থানে যেখানে জন্মকালীন রাহু এবং শনি বসে আছেন সেখানে আগামী বছর শেষভাগে রবির নক্ষত্রে শনির অবস্থান স্বাস্থ্যের পক্ষে কতটা শুভকর হবে তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকছে। বিশেষ করে গলা অথবা কণ্ঠদেশে কোন রোগের প্রাদুর্ভাব অসম্ভব নয়। তবে জাতক তখন বৃহস্পতির গোচর আনুকূল্য পাবেন যেমন এখন পাচ্ছেন। এই বছর ১৮ নভেম্বর সিংহ রাশিতে রাহুর সংক্রমণ ও জাতকের স্বাস্থ্যের পক্ষে এবং কোন ব্যাপারে কর্মস্থানে প্রতিকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু বৃহস্পতি যেমন অন্তর্দশায় সহায়ক থাকছে, তেমন গোচরেও কম সহায়ক নয়।

ব্যক্তিগত রাশিফল

এবার সম্ভাব্য ব্যক্তিগত রাশিফল বলছি। এখন গ্রহের অবস্থানে আর কালসর্প যোগ নেই। শনিবার মধ্যরাতে রবি-গ্রহ সিংহ রাশি থেকে কন্যা রাশিতে গিয়ে রাহুর সঙ্গে মিলিত হবে আর তখন চন্দ্রও কুম্ভরাশি থেকে যাবে মীন রাশিতে কেতুর সঙ্গে মিলন কালে শনিবার রাত দশটা পঞ্চাশ মিনিট সতের সেকেণ্ড গতে চন্দ্রগ্রহণ আরম্ভ।

মেষঃ- কল-কারখানায় যুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে সময়টা অনুকূল। কিন্তু আর্থিক ব্যাপারে দুশ্চিন্তা থাকতে পারে। কিছু ঋণ ও অসম্ভব নয় সোমবার কোন ব্যাপারে মনে চাপ পড়তে পারে।

বৃষঃ- কর্মস্থানে কারোর বিরোধিতা উদ্বেগের কারণ হবে, কোন ভাইয়ের জন্যও চিন্তা হতে পারে। অথচ নিজ গুণে সম্মান পাবেন বুধবার কারোর সঙ্গে বাদ বিসম্বাদে না যাওয়াই ভাল হবে।

মিথুনঃ- পারিবারিক আগের কোন ঝামেলা মিটে যেতে পারে। যার ফলে শান্তি আসবে। দূরে কোথাও যাওয়ার চিন্তা হতে পারে। সোম থেকে বুধবারের মধ্যে কোন আশা বাস্তবে রূপ নিতে পারে।

কর্কটঃ যে কাজই করুন না কোন অধস্তনদের ব্যবহার মনের উপর চাপ সৃষ্টি করবে। কোন না কোন সূত্রে অর্থ এসে যাবে হাতে। বিলাস ব্যসন বৃদ্ধি পাবে। রবি, সোম অশুভ।

সিংহঃ- অত্যন্ত ব্যয়ের চাপে জর্জরিত সিংহ এবার কিছুটা শ্বাস ছাড়তে সুযোগ পাবে। কিন্তু ঘরে ঘনিষ্ঠ কারোর স্বাস্থ্য চিন্তায় ফেলতে

পারে। শুক্র, শনিবার ছাড়া বাকি দিনগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ না রাখাই ভাল।

- একটু ক্লান্ত হলেও কন্যা এখন নিজের কাজ গুছিয়ে নিতে পারবে। যদিও চাকুরেদের কর্মস্থানে অশান্তির ইঙ্গিত আছে। শুক্র থেকে রবিবার কারোর সঙ্গে সাক্ষাৎ ভবিষ্যতে উপকার দিতে পারে।

তুলা: ব্যবসাতে সপ্তাহের প্রথমেই কোন ঘটনা মনের উৎসাহ বাড়াবে। আয় বৃদ্ধির পক্ষে ও সময়টা এখন অনুকূল। কিন্তু আত্মসম্মান সম্বন্ধে সচেতন থাকুন, শনিবার অশুভ।

বৃশ্চিক:- স্বাস্থ্য কিছুটা উৎপাত করতে পারে। কোন নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে বিবাদ ও দেখা যায়। ফলে মনে অশান্তি থাকবে। ভ্রমণসূচী এড়িয়ে চলুন। আর্থিক ব্যাপারে চিন্তা থাকবেনা। মঙ্গলবার থেকে সপ্তাহটি ভাল।

ধনু:- আইন সংক্রান্ত ব্যাপার মনের উপর চাপ দিতে পারে। কোন ভাইয়ের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হওয়া অসম্ভব নয়। চাকুরেদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। তবু মঙ্গলবার, বুধবার অশুভ।

মকর:- ব্যবসাতে চিন্তা থাকবে। অর্থেও টান পড়তে পারে। কিন্তু গুণের মর্যাদা পাবেন। প্রশাসকদের কর্মস্থানে শুভ ইঙ্গিত থাকবে। শনি থেকে সোমবার শুভ।

কুম্ভ: যদিও চিন্তাগ্রস্থ কুম্ভ চিন্তা এখন প্রগতির দিকে এগিয়ে যাবে। কাউকে ঠকাতে গিয়ে নিজে ঠকতে পারেন। ঘরের যে কোন ব্যাপার এড়িয়ে চলুন। মঙ্গল, বুধবার শুভ।

মীন:- ব্যবসাতে দু পয়সা আসবে। সরকারী চাকুরেদের ও মর্যাদা বাড়বে। কিন্তু কোন সন্তানের জন্য চিন্তা হতে পারে। হঠাৎ ক্রোধ ও ক্ষতির কারণ হতে পারে। সপ্তাহটি মন্দ নয়।

শ্রীমাণিক্য

আগামী সংখ্যায়

আশাপূর্ণা দেবী

প্রদর্শনী

ধীরাজ চৌধুরীর ছবি

ধীরাজ চৌধুরী, যাঁর ড্রইং ও ছবিগুলির একক প্রদর্শনী লণ্ডনে আর্টস ৩৮ গ্যালারিতে দেখানো হচ্ছে, এমন একজন প্রতিভাবান মানুষ যিনি উপেক্ষিত বা অবজ্ঞাত হতে পারেন না। বেঁচে থাকার হতাশা অসুখী দিকের প্রতিফলন ছড়িয়ে ছিলো গ্যালারির ছোটো দেয়ালে ঠাসাঠাসি করে রাখা আলেখ্য আর ড্রইংগুলোয়। মনে হচ্ছে, ট্র্যাজেডি, ধীরাজ চৌধুরীর বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ—যার দৃশ্যরূপের উপাদানকে তিনি কলমকালিতে নিয়ে আসেন। তাঁর কৃতা শিল্প, বিষয় মানবতা, বক্তব্য-সত্য। যে নির্মম সত্য আমাদের বেঁচে থাকাকে অসহায় আর কুপাকার করে তোলে, তাকে নান্দনিক দীপ্তির সঙ্গে একটি কুটাভাগের সাহায্যে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেছেন তিনি। এজন্যে ভাবতে তাঁর ছবি চিহ্নিত।

ধীরাজ চৌধুরীর ছবিগুলি পরিষ্কার জানিয়ে দেয় যে সমস্ত শিল্পই কোনো পূর্বশর্ত অনুযায়ী রম্য নয়। অনেক ড্রইং এই যে চেহারাগুলো রয়েছে—তাদের চেহারা ফ্রাঙ্কেনস্টাইনদেখা, মাথাগুলো খুব বড়ো, হাত-পা বিচিত্র, ভঙ্গী কুৎসিত—যা চোখে দেখার পক্ষে স্বাভাবিক অর্থে খুব সুস্তির নয়। এমন কি যে মুখগুলি সর্বাঙ্গীন আবেগ প্রকাশ করছে তাদের চেনা-আদল এলেও, তাদের দেখে সাধারণ অর্থে খুশি হওয়া যাবে না। যখন প্রকৃতিকে ছবিতে পাখি প্রাণী বা গাছের আকার নিয়ে আসা হয়েছে, তখনো তাদের দৃশ্যমানবতার পরে সমান প্রাণশূন্যতা রাখা হয়েছে।

সৌভাগ্যত সবটাই যন্ত্রণা ও ব্যর্থতার ফেরোজ নিয়ে তৈরি হয়নি। নর্সটি আলেখ্য রচিত হয়েছে পুঙ্খানুপুঙ্খ রাত, নবম ব্রুশস্ট্রোকে যা একটি সিনথ বিপরীত অভিজ্ঞতা এই নর্সটি ছবির মূল কথা প্রাণোচ্ছলতা; রঙের বিচ্ছুরণ লম্বা জায়গা নিয়ে ল্যান্ডস্কেপকে ফুটিয়ে তুলেছে যে কটি মানুষ উপস্থিত আছে—তারা বিভঙ্গ অবয়বরেখা। যথেষ্ট কল্পনা ও মৌলিকতা আছে এইসব ছবিতে। মরীচিকার মতো দূরবর্তী দ্যুতিময়তা থাকার জন্যে, ক্যানভাসের ফাঁকা অংশে এই বর্ণালেখ্য একটি মাত্রারচনা করে উঠতে পেরেছে। কোনো ছবিরই নাম না থাকার জন্যে, মূল চিন্তার সঙ্গে অল্প যোগাযোগ হচ্ছে দর্শকদের।

লণ্ডনে ধীরাজ চৌধুরীর এটি তৃতীয় প্রদর্শনী। তিনি জেনেভা, সানফ্রান্সিসকো ও ডাবলিন হয়ে এসেছেন। শিল্পী বাংলাদেশের। স্বভাবিকভাবেই দেশের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রদর্শনী করেছেন।

ক্যাটলগ থেকে জানতে পারা গেলো, ভারতের অনেক শিল্পসমালোচকের ধারণা, ধীরাজ চৌধুরীর শিল্পকর্ম অনুল্লেখিত নয়। তাঁরা বলছেন, শিক্ষক ও শিল্পী—দুই হিসেবেরই ধীরাজ চৌধুরী এমন একজন প্রতিশ্রুতিবান যিনি নিজের একটি ব্যক্তিগত শৈলীনির্মাণে মগ্ন।

যাহোক, সমালোচক অথবা সমালোচক নয়—যে কোনো শিল্প-প্রদর্শনীতেই একজনের কাছে সেটা বড়ো প্রশ্ন তা হলো সাধারণ মানুষেরা গ্যালারিতে কমবেশি সময় নিয়ে আসছেন কিনা, সত্যিই শিল্পের ব্যঞ্জনাটি অনুভব করতে চাইছেন কিনা; এটাও একটা প্রশ্ন যে প্রথম দেখায় ছবি ভালো লাগার গুরুত্ব আছে কি নেই। আলেখ্যগুলির দিকে আমি একবারের বেশি নজর করেছি। ড্রইংগুলি আমাকে উৎসাহী করেনি।

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

রাজনীতি কলকাতা স্টাইল

বেদব্যাস বৈদ্য

অ'াতাত— ভায়া খুশবন্ত

কলকাতার একটি বৃহৎ সংবাদপত্র গোষ্ঠী হাওয়া বুঝে আবার দিল্লি ধাওয়া করেছেন। দিল্লি মানে ১২নং ওয়েলিংডন ক্রিসেন্ট। সেখানে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বাসভবনে। শ্রীমতী গান্ধী ওঁদের চেনেন। ওঁদের চরিত্র সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল। এ খবর তাঁরাও জানেন। মনে চাপা আশংকা আর আতংক তাদের কম নেই। কিন্তু দিল্লির হাওয়া বদলের মধ্যে ওঁরা রাজনীতির পালা বদলের সবুজ সংকেত দেখতে পেয়েছেন। তাই শ্রীমতী গান্ধীর সংগ্রামের সাথী, আর নীতিতে বিশ্বাসী হতে তাঁরা এক নতুন কৌশল ধরেছেন। তাঁদের এই নীরব আবেদন পৌঁছে দিতে তাঁরা সঞ্জয়ের মামাশ্বশুর সাংবাদিক খুশবন্ত সিংয়ের সাহায্যপ্রার্থী।

খুশবন্ত সিং শ্রীমতী গান্ধীর অত্যন্ত কাছের মানুষ। ইন্দিরার সমর্থন করে খুশবন্তকে জীবনে কম খেসারত দিতে হয় নি। এক বিখ্যাত সর্বভারতীয় ইংরাজি সাপ্তাহিকের তিনি সম্পাদক ছিলেন। খুশবন্ত সিং ব্যক্তিত্বর কলম নিয়ে নিঃশংকভাবে সুদিনের মত দুর্দিনেও ইন্দিরাকে সমর্থন করেছেন। অবশেষে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইয়ের খ্যাতিমান পুত্র কান্তি দেশাইয়ের স্নজনীয় খুশবন্তকে চাকরীটি খোয়াতে হয় ফলে অভিযোগ। এর ফলে খুশবন্তের প্রতি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মমত্ববোধ এবং স্নানুভূতি যে আরও বেড়েছে, সে খবরটুকু ওঁদের অজানা নেই। তাই সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা খুশবন্তকে খুশী করতে উঠে-পড়ে লেগেছেন। তাদের বিশ্বাস, খুশবন্তকে খুশী করতে পারলে অন্তর ভাগ্নী-জামাই সঞ্জয় গান্ধী খুশী হবেন। এবং এভাবে শ্রীমান সঞ্জয়ের মন গলাতে পারলে সেই পথ ধরে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পর্যন্ত পৌঁছান অসম্ভব হবে না।

বেকার খুশবন্তের একটা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিয়ে ইতিমধ্যে দিল্লিতে ছুটির হয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য : "মোরারজী দেশাই-চক্র আপনার সাংবাদিক জীবন বরবাদ করেছে। আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানের দরজা আপনার মত মহান সাংবাদিকের জন্য খুলে রেখেছি। অর্থ অথবা অন্য কোন রকম সুযোগ-সুবিধারই অভাব হবে না। আমরা আপনার সাংবাদিকতার মহান ব্রতে আবার দেখতে চাই।

ওঁদের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে আরেকটি ইংরাজি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা হয়েছে। ওঁদেরই একখানি ইংরাজি সাপ্তাহিকের বর্তমান সম্পাদককে প্রস্তাবিত পাক্ষিকের দায়িত্ব দিয়ে তাঁর পদে খুশবন্ত সিংকে বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য, যুগপৎ ইন্দিরা গান্ধীকে খুশী করা এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইয়ের উপর চাপ সৃষ্টি করা।

হঠাৎ এই মোরারজী বিরোধিতার কারণের পেছনে অবশ্য একটি গোপন কাহিনী আছে। ইন্দিরা গান্ধীর জরুরী অবস্থার সময় কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো ঐ পত্রিকা গোষ্ঠীর সর্বত্র তল্লাস করে বেআইনী কাগজপত্র পেয়ে একটি মামলা দায়ের করে। ওঁরা নানাভাবে তদ্বির ও চাপ সৃষ্টি করেও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইকে দিয়ে তা প্রত্যাহার করাতে পারেন নি। মোরারজী দেশাই সুস্পষ্টভাবে তদ্বিরকারীদের বলেছেন, জরুরী অবস্থার দোহাই দিয়ে অন্যায় অথবা বেআইনী কোনও কাজের নায়করা রেহাই পাবে না। আইন তার নিজের পথ ধরেই চলবে। মোরারজী দেশাইয়ের এই স্পষ্টার মনোভাব এবং ওঁদের ব্যর্থতা ওঁদের আপাতত মোরারজী বিরোধী করে তুলেছে।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর রাজনৈতিক পতনের মুখে ওঁরা দেশবাসীর মনোভাব বুঝতে পারেন। রাতারাতি ইন্দিরা-বিরোধী হাওয়ায় পাল তুলে সস্তা নাম্বা লুটতে যাঁরা একের পর এক তথাকথিত সংবাদ সাহিত্য সৃষ্টিতে মদত দেন। দেখতে দেখতে সত্য-মিথ্যায় ঠাসা মনগড়া বিকৃত সব তথ্যে রোমাঞ্চকর কিছু কেচ্ছা তৈরী করে শ্রীমতী ইন্দিরা ও তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে প্রচার-অভিযানে নামেন। নিরপেক্ষ এবং নির্ভীক সংবাদিকতার আদর্শ বিসর্জন দিয়ে এক হাতে কাঁচা পয়সা এবং অন্য

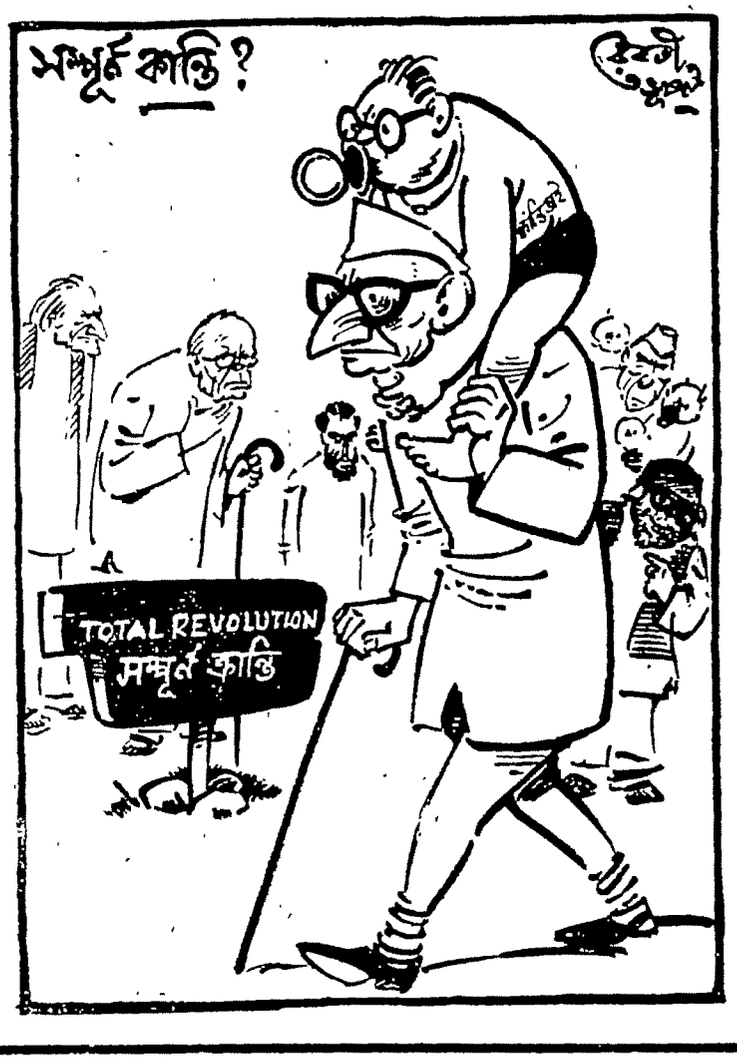

...ত সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনে মেতে ওঠেন।

মাত্র কদিন আগেও কলকাতার শিশির মঞ্চে জার্নালিস্ট ক্লাবের এক অনুষ্ঠানে ঐ পত্রিকা গোষ্ঠীর কর্ণধার আদর্শের কথা জাহির করে বলেছেন : সাংবাদিকদের নিষ্ঠাবান ও সাহসী হওয়া প্রয়োজন। জরুরী অবস্থার বিরোধিতা আমরা মাথা নত করি নি—এমন কি ইন্দিরা গান্ধীর কাছেও। বিশিষ্ট সাংবাদিক কুলদীপ নায়ারের মত আমাদের দুজন সাংবাদিককেও কম লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয় নি। কিন্তু তাতে আমরা ভয় পাই নি।

সম্পাদক মশাই হয়ত জরুরী অবস্থার সময় তাঁরই পত্রিকায় প্রকাশিত একটি ঘোষণার কথা বেমালুম ভুলে গেছেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন : যে দুজন সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাঁর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাদের আর কোন সম্পর্ক নেই। ঐ দুই সাংবাদিকের বক্তব্য এবং কার্যকর্মের জন্য তিনি বা তাঁর প্রতিষ্ঠান দায়ী নন ইত্যাদি।

প্রসঙ্গত আরও একটি ছোট্ট কাহিনী এখানে তুলে ধরা প্রয়োজন। ঘটনার স্থান খোদ লন্ডন। জরুরী অবস্থা চলাকালীন সময়ে লন্ডনে কমনওয়েলথ প্রেস ইউনিয়নে ভাষণ প্রসঙ্গে ওই কর্ণধার মশাই বিদেশী-দের কাছে বলেছিলেন : জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দেশকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। এ ধরনের বক্তব্য নিয়ে ঐ সময় তাঁর পক্ষ থেকে বিদেশে একটি প্রচার পুস্তিকাও প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ স্বদেশে ইন্দিরা-বিরোধী হাওয়ায় একদিকে যখন তাঁরা দেশবাসীকে একাদশীর চাঁদ দেখিয়েছেন এবং ইন্দিরা অ্যান্ড কোম্পানীর কেচ্ছা ছড়িয়ে অর্থ লুটেছেন। বিদেশে বসে প্রায় একই সঙ্গে ইন্দিরা ও তাঁর জরুরী অবস্থার প্রশস্তি গিয়ে করেছেন। নিষ্ঠাবান আর সাহসী সাংবাদিক না হলে কি আর এ ধরনের যৌথ-অভিযান সম্ভব।

ইন্দিরা গান্ধীর রাজনৈতিক পতনের পর সারা দেশে ইন্দিরা-বিরোধী যে হাওয়া বইছিল, জনতা দল ও কেন্দ্রীয় সরকারের বহু ক্ষেত্রে ব্যর্থতার ফলে গত দেড় বছরে ভারতের রাজনীতিতে আবার পরিবর্তনের সুর উঠেছে। পালা বদলের পালাকাররা এই হাওয়া বদলের সুরে বিভোর, চিন্তিত এবং শংকিতও। তাঁদের ধারণা, জনতা দল ও কেন্দ্রীয় সরকারের চরম বিপর্যয়ে ইন্দিরা হাওয়াকে আবার প্রবল করবে। তার ধাক্কায় হয়ত আগামী বছরের গোড়ায় আরেক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হবে। গান্ধী সাম্প্রতিক দিল্লি রাজনীতির নেপথ্যের খবর রাখেন, তাঁরাও প্রশ্ন এ ব্যাপারে অভিন্ন মত পোষণ করেন।

তাই আর দেরী নয়। এই মওকায় খুশবন্ত সিংকে খুশী করে সন্তুষ্ট গান্ধীর মন গলাতে তাঁরা উঠে-পড়ে লেগেছেন। তাঁদের আপাতঃ লক্ষ্য খুশবন্ত সিং হলেও, মূল লক্ষ্য শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। ওঁদের প্রস্তাবে খুশবন্ত সিং খুশী সন্দেহ নেই। এই প্রস্তাব গ্রহণ করা-না-করা নিয়ে দিল্লিতে ও ওঁদের নিত্য গোপন দৌত্য চলছে। খুশবন্ত সিং হয়ত এ বিষয়ে ইন্দিরা সম্প্রদায়ের পরামর্শ চাইবেন। কারণ, ফলু সাংবাদিক খুশবন্ত ওঁদের সাংবাদিকতা, রাজনীতি এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ-ভাবে সচেতন।

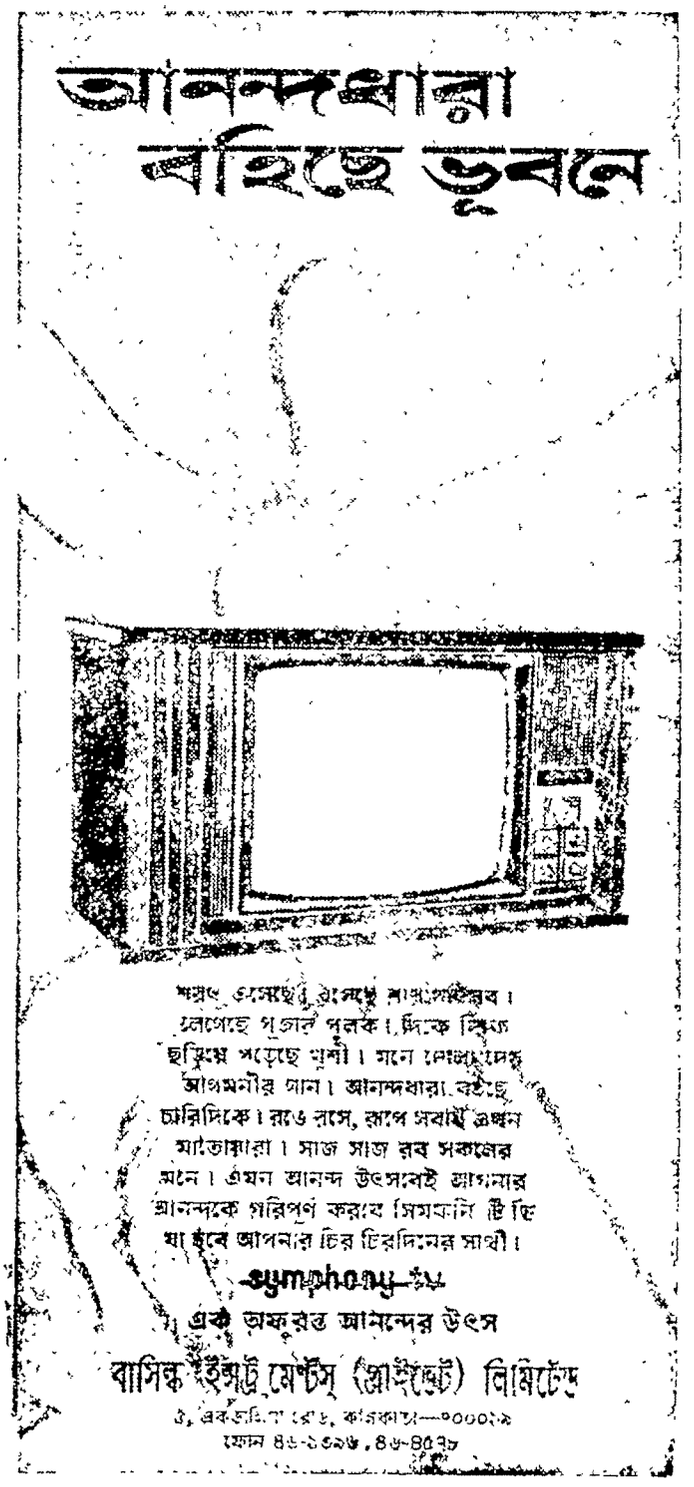

জনতা নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত

গেল গেল রব উঠেছিল। কিন্তু জনতা পার্টি ভেঙে চৌচির হল না। প্রধানমন্ত্রীর গদি টলল না। মোরারজী দেশাই যেখানে ছিলেন সেখানেই রইলেন। তবু প্রশ্ন থেকে যায় : তারপর? ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডলীতে একাধিক নতুন মুখের উদয় হলেও অভিনব কিছু ঘটবার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না। এই অভিনবত্বের অভাবই কেন্দ্রীয় সরকারকে ক্রমশ প্রেডেসিসটেন্স করে তুলছে।

সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের যতটা ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার আছে তার কণামাত্রও কাজে লাগাতে অবর্ণনীয় সংকোচ এবং ইতস্তত বোধের জালে জড়িয়ে পড়ছেন প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সহকর্মীরা। বাক্তি স্বাধীনতা এবং মতামত প্রকাশের ও সমালোচনা করবার যে রকম সুযোগ-সুবিধা পুরো মাত্রায় বজায় রেখেও সংবেদনশীল কাজকর্মের জন্য প্রশাসনিক জোরের বিশেষ প্রয়োজন হয়। জোরের সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিলেই গণতন্ত্রের শ্বাসরোধ হয় না। গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থায় এই জোরকে কোথাও অস্বীকার করা হয় নি কখনও। কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা কেউ এই জোরটুকুও খাটাতে চাইছেন না। সরকারী সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে দেশে কোন রকম কনটোভার্সি হোক এটাও তাঁরা চান না। এসব এড়াতে পারলে যেন তাঁরা বাঁচেন। বিভিন্ন শরিক দলের প্রতিনিধি হিসাবে যাঁরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডলীতে আছেন তাঁদের সকলেরই এই একই ধরনের অনীহা। পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ এবং অটুট এই সাদৃশ্য। যেখানে ন্যায্যত সামান্যতম ক্ষমতা প্রয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয় সেখান থেকে অবিলম্বে এঁরা মুখ ফিরিয়ে নিতে চান। দৃশ্যত ক্ষমতা প্রয়োগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা নারাজ। এগিয়ে আসতে তাঁদের সংকোচবোধ। এর ফলে নেপথ্যে কাজ করবার ইচ্ছাটাই প্রবল হয়ে উঠছে তাঁদের মধ্যে। কংগ্রেস আমলের জরুরী অবস্থার তুলনায় তাঁদের বর্তমান জামানা যে ভিন্ন সেটা এইভাবে পরোক্ষে প্রমাণ করতে ব্যস্ত জনতা পার্টি। সুযোগ পেলেই নেতারা এখনও বলেন : আমরা বাক্তি স্বাধীনতা ফিরিয়ে এনেছি। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছি। এসব কথা কেউ অস্বীকার করে না। তবে কেবল এই কৃতিত্বের ধাক্কায় দেশ চলে না।

রাজধানীর ইনসাইড স্টোরি

গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে সিদ্ধান্তের বাস্তব রূপায়ণের জন্য জোর খাটাবার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার এবং জনতা পার্টির নেতাদের যে মানসিকতা তার মূলে রয়েছে তাঁদের 'অ্যান্টি ইমারজেন্সি ফিলিং।' জরুরী অবস্থা সম্বন্ধে সকলের বিরাগ ও তিক্ততা সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলার নেই। তবে জোর মানেই জরুরী অবস্থা, এমন একটা ভাবনা পাশ্চে পেলে মুস্কিল অনেক। দেশের স্বাভাবিক খোলামেলা আবহাওয়ায় কাজ ঠিকমত করবার জন্য প্রশাসনিক জোর এবং সেই-কাজে ঠিকমত না চলে জরুরীদিহির মধ্যে গণতন্ত্র-বিরোধী মনোভাব প্রকাশ পায় না। বরঞ্চ গণতন্ত্রের বুনিয়াদ পাকা করবার জন্য শক্ত হাতে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার দরকার। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা ন্যায্য জোর খাটালেই জরুরী অবস্থার মন্ত্রীদের মত হয়ে উঠবেন না। খোলামেলা আবহাওয়ায় এমন হওয়া সম্ভবও নয়। সম্ভব নয় বলেই তো সংবাদপত্রের এবং জনসাধারণের যতায়াত প্রকাশের মৌলিক স্বাধীনতার ওপর সর্বাগ্রে কোপ পড়ে যে কোন দেশের জরুরী অবস্থায়। জরুরী অবস্থা সম্বন্ধে অবসেশন বা বিশেষ মানসিক আচ্ছন্নতার কবল থেকে মুক্তি না পেলে দীর্ঘসূত্রতা এবং মন্থরতার পাঁক ক্রমশ জমা হবে নেতাদের চার পাশে। গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা মানে আলোমেলো অগোছাল ভারমূর্তি যে নয় সেটা প্রমাণ করাই জনতা পার্টির বড় দায়িত্ব। আর এই দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করতে পারলেই অতীতের জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে গড়ে উঠবে স্থায়ী ও মজবুত প্রাচীর।

জনতা পার্টির লোকজনদের কথাবার্তা ও কাজকর্মের মধ্যে আবার 'অ্যান্টি হিরো' ভাবটাও লক্ষ্য করবার মত। যৌথ নেতৃত্বের চিন্তা-ভাবনা এবং সেই উদ্দেশ্যে খাড়া করা কাঠামোর মধ্যেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশিষ্ট নেতৃত্বের প্রয়োজন থাকে বৈকি। সব ব্যাপারে একই ব্যক্তির কথা শুনতে সবাই আর পত্র-পত্রিকায় এবং পোস্টারে

পর্যবেক্ষক

একই মুখ জনসাধারণের চোখের সামনে অহরহ ভাসছে এমন পরিস্থিতির পাল্টা ভাবমূর্তি হিসাবে নেতাদের লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যাবার আপ্রাণ প্রচেষ্টাও বিপরীতমুখী এক তীব্র প্রতিক্রিয়া। অন্য দিক থেকে এটাও আবার এক ধরনের বাড়াবাড়ির সামিল। জনতা পার্টির নেতারা এ পর্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করেন নি। নানা স্থানে ছোট-বড় জনসভা মারফৎ জনসাধারণের সঙ্গে নিজেদের পরিচিত করেন নি। নতুন যোগাযোগ স্থাপন করেন নি। নিজেদের চিন্তা-ভাবনা এবং কর্মপরিকল্পনার কোন ছবি তাঁরা তুলে ধরেন নি। এই ধরনের রাজনৈতিক বনবাসের ফলে সাতাত্তর সালে সংসদীয় নির্বাচনের সময় ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা রাখেন বলে বেশ কয়েকজনকে দেখে মনে হলেও তাঁরা ইতিমধ্যেই হারিয়ে গিয়েছেন। মন্ত্রীরাও কোন রকম রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেবার ধারে-কাছে যান না। নতুন নতুন চিন্তা-ভাবনা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরে তাদের সক্রিয় করবার প্রচেষ্টা অতিসন্তর্পণে পরিত্যাগ করা হয়েছে। নেতৃত্বের কাছে সব দেশের লোকই কিছু আশা করে। আমাদের দেশে আবার এই আশার পরিমাণটা খুব বেশী। সেক্ষেত্রে পরোপরি 'এ্যান্টি হিরো' সুলভ ভারমূর্তি জনসাধারণকে হতাশ করে। জনসাধারণ আস্থা হারায়। এইভাবে অলক্ষ্যে এবং অজান্তে নেতৃত্বের কাঠামো ক্রমশ নড়বড়ে হয়ে ওঠে। নেতৃত্বের নড়বড়ে কাঠামো বিপজ্জনক সব দিক থেকে। আমাদের দেশ এমন বিপদের পরিণাম সাংঘাতিক। এখানে সিভিক কোড় বলে এখনও কিছু তৈরি হয় নি। কোন দল ও মতের লোকজন ক্ষমতায় বসল তার ওপর নির্ভর করে না কোটিকোটি মানুষের আচার-ব্যবহার। তারা সাধারণত চলে আপন তালে। উচিত-অনুচিত কিংবা ন্যায়-অন্যায়ের ব্যাখ্যা কোন সর্বজনগ্রাহ্য ফরমুলার মধ্যে পড়ে না। নেতৃত্ব মারফৎ প্রশাসনিক জোরটা এক্ষেত্রে তাই বিশেষ প্রয়োজন। এখানে নেতৃত্ব দিতে থতমত খেলে চলে না। এটা এমন এক দায়িত্ব যেটা পালন না করতে পারলে জনসাধারণের শ্রদ্ধা হারাতে হয়। এই বাঞ্ছনীয় নেতৃত্বের মাধ্যমে ভবিষ্যতে জনতা পার্টি গ্রামে-গঞ্জে জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগও স্থাপন করতে পারে। কিন্তু নিজেদের নিয়ে জনতা পার্টির নেতারা ও মন্ত্রীরা এতই ব্যস্ত যে, তাঁরা ভুলতে বসেছেন কেন তাঁরা ক্ষমতায় এসেছেন।

সমালোচনা

মূল সুর সোস্যাল স্যাটায়ার

মনোজ মিত্রের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় তাঁর নাটকে। কোনো একটি সৌখিন নাট্য-সংস্থা অভিনয় করেছিল তাঁর দুটি একাঙ্ক —'মৃতার চোখে জল' এবং 'টাপুর টুপুর'। অভিনয়ে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল, মনে আছে,—না ছিল যথেষ্ট মঞ্চ-জ্ঞান বা দলগত নৈপুণ্য। কিন্তু দুটি নাটকের উচ্চাবিত্ত সংলাপ এমন আকৃষ্ট করেছিল যে, নাট্য-কারের নাম জেনে নিতে ভুল করিনি। এরও বহুদিন বাদে থিয়েটার ওয়ার্কশপ করলেন 'চাক ভাঙা মধু'। নাট্যকারের নাম আমার প্রথম চমক-লাগানো নাম, আর তত-দিনে ওয়ার্কশপ তো বাংলা থিয়েটারে প্রথম সাবির। 'চাক ভাঙা মধু' দেখার অভিজ্ঞতা এক বিশাল ভূমিকম্প বা বিধ্বংসী অগ্ন্যুৎ-পাতের মতো ছিল। আজও তা মনে করতে পারি। একজন কবি সারাজীবন যেমন অপেক্ষা করেন কয়েকটি অমোঘ কবিতা রচনা করার জন্য, একজন ঔপন্যাসিক বা বা চিত্রকর অন্তত উপন্যাস বা ছবির জন্য এবং তা যদি কখনো ঘটে, কখন ঘটে গেল এ সম্বন্ধে কোনো প্রতীতি তাঁর জানা থাকে না, 'চাক ভাঙা মধু' সেরকমই এক নাট্য-কারের অজানিত অভাবিত অমোঘ রচনা। অন্ততঃ আমার তাই মনে হয়। এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, গত দশ বছরে বাঙলা সাহিত্যে যে-কটি উল্লেখনীয় নাটক রচনা হয়েছে, 'চাক ভাঙা....' তাদের অন্যতম। এরই মধ্যে আর কয়েকটি নাটক দেখেছি। শুনলাম 'সুন্দরম' বা মনোজবাবু এবং তাঁর সহযোগী বন্ধুরা একদা যৌবনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই নাট্যসংস্থার পুনর্নবীকরণ হয়েছে এবং প্রায়-নিয়মিত অভিনয় করছে 'পরবাস'। মনোজ মিত্রেরই নাটক। আরও আকর্ষণীয় এবং রীতিমতো হানা হয়ে টিকিট সংগ্রহ করেছি যখন শুনলাম নাটকের প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন মনোজ মিত্র স্বয়ং। 'পরবাস' দেখা আমার আর-এক অভিজ্ঞতা। নাটকের বুনোট কাহিনী, সরস সংলাপ অন্তর্লীন বিষাদ এবং সর্বোপরি মনোজ মিত্রের অসাধারণ অভিনয় আমাকে উদ্বুদ্ধ করে। যখন প্রায় সমস্ত নাটকার বাঙলা ভাষায় নাটক লেখার সময় অযথা বিদেশী নাট্যরূপের অনুসঙ্গ টেনে আনেন এবং দর্শকের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে থাকা পরাজয়, ব্যর্থতা, দংশন বা ছোট ছোট সুখ-আনন্দের অনুভূতি অপাঙ্‌ক্তেয় করে নিদেন কোলাজ ফর্মে গায়ের জোরে লাফ সুরু হোলেন, তখন পরবাস' আমার কাছে অন্য স্বাদ নিয়ে এসেছিল। মনে আছে, কোনো একটি পত্রিকায় 'পরবাস'-এর বিজ্ঞাপন করতে গিয়েও এসব কথা বলেছিলাম। অদম্য আগ্রহ ছিল মুখোমুখি পরিচিত হবার। যিনি নাটকে রসিকতার বান ডেকে গোপনে তাতে বিষাদের সে'কোবিষ মিশিয়ে দিতে

মনোজ মিত্র

পারেন, তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়া রীতিমতো সৌভাগ্যের। তাই একদিন ...।

ফর্সা, মাঝারি গড়ন, একটু ভারী চেহারা—প্রায় মাঝবয়সী, চোখে পুরু ফ্রেমের চশমা—মনোজ মিত্রের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে পরিচয় হল ওঁর বাড়িতে। পেশায় দর্শনের অধ্যাপক। এক লহমায় মেক-আপ-বিহীন মনোজবাবুকে দেখলে কে বলবে, এই আপাত-সংযত মানুষটি নাটক-রচনায় বা অভিনয়ে এতো রসিকতা করতে পারেন, দর্শকের পর দর্শক সাজিয়ে মানুষকে শেষে বিষাদের কোন্ অন্ধকূপে ছুঁড়ে ফেলতে পারেন। কিন্তু এসবই যেন আরোপিত ভাজার পোষাক। গেরিলা যুদ্ধ-পদ্ধতি। শুনো নারকোলটি যেমন। আলাপ ক্রমশঃ গাঢ় হতে হতে যখন প্রত্যেকেই সপ্রতিভ, যখন কোন অজান্তে খুলে যায় পাথরের দরজা। হৃদ্যতা, বন্ধুত্ব এবং রসিকতার বান ডাকে তখন।

স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্র ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় নাটক চাপলো মাথায়। জুটেও গেলো কিছু অভিনয়-পাগল বন্ধু-বান্ধব। 'সুন্দরম' জন্ম নিলো। 'গন্ধর্ব' প্রতিষ্ঠান প্রায় সমসাময়িক। অধ্যক্ষ ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়। নাটকার এবং অভিনেতা নাট্য বিশারদ। প্রেরণা পেতে বিলম্ব হলো না পড়াশুনার সঙ্গে পাল্লাদিয়ে চললো নাটক চর্চা। সেসময় স্কটিশের বাড়ো সুসময়। আজকের বাঙলা নাট্যজগতের অনেক রথী মহারথীরাই তখন ঐ কলেজের ছাত্র। কিন্তু ছাত্রাবস্থার পর বেশিদিন 'সুন্দরম'-এ সক্রিয় থাকতে পারলেন না মনোজবাবু। জীবিকার কারণে থাকতে হলো কলকাতার বাইরে। অভিনয় করার সুযোগ আর পাইলো না। কিন্তু নাটক লেখা আদৌ ছাড়েন পড়েনি কখনো। নাটক লিখতেন, অভিনয় হতো

সুন্দরমে অন্যান্য গ্রুপে, বেতারের সুন্দরম-এর দায়িত্ব তখন পার্থপ্রতিম চৌধুরীর হাতে। অবশেষে কলকাতায় এলেন মনোজ মিত্র। চলচ্চিত্রের দার-দায়িত্ব বাড়লো, ফলত পার্থপ্রতিমের হাত থেকে দায়িত্বভার তুলে নিলেন তিনি। মন দিলেন রচনা, পরিচালনায় অভিনয়ে। এবং এই তিন বিভাগেই তিনি যে কী মুন্সিয়ানার পরিচয় দিতে পারেন, 'সুন্দরম'-এর প্রযোজনা তার সাক্ষ্য। যেমন 'সাজানো বাগান'। যাঁরা বলেন, বাঙলা সাহিত্যে নাটক রচনা হয় না, যদি কিছু হয়ও তো তা টেকনিক-সর্বস্ব, সাহিত্যের গুণ নেই বললেই চলে, তাঁদের দয়া করে 'সাজানো বাগান' দেখা উচিত। রূপকের অন্তরালে শ্রেণী-চরিত্রের বিশ্লেষণ, সরস সতেজ সংলাপ, কী অভাবনীয় লিরিক-ধর্মে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নাটক হতে পারে, তা দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। 'চাক ভাঙা মধু' এবং 'পরবাস'-এর পর এই আর একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক মনোজবাবুর যা শুধুমাত্র সাহিত্যের স্বার্থে ঘরে বসে একাকী পাঠ করেও অন্তত স্বাদগ্রহণ করা যায়। আর মনোজ মিত্রের অভিনয়! অভিনয়ের ব্যাপারে এহেন সাবলীল একক-দোরুস্কা আমি এর আগে আর মাত্র কয়েকবারই দেখেছি। 'অবাদিপাউস', 'দশচক্র', 'রক্তকরবী' বা 'পুতুল খেলায় শম্ভু মিত্র, 'ভোডো শালিখের ঘাড় রো' বা 'টিনের তলোয়ার'-এ উৎপল দত্ত, 'কালোছায়া'-এ শেখর চট্টোপাধ্যায়, 'অঙ্গার'-এ রবি ঘোষ, 'ব্যারিকেড'-এ সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, 'চাক ভাঙা মধু'-তে বিভাস চক্রবর্তী, 'জগন্নাথ'-এ অরুণ মুখোপাধ্যায়ের পর স্মৃতির ক্যানভাসে আরেকটি সংযোজন 'সাজানো বাগানে' বাঙ্গ কাপালির ভূমিকায় মনোজ মিত্রের অভিনয়। একজন নাট্যকার যখন দক্ষ পরিচালক হন এবং সঙ্গে সঙ্গে হন কুশলী অভিনেতা, তখনি সোনায় সোহাগা। বিদেশে এহেন দক্ষতার খুব একটা কম নয়। আমাদের দেশে খুবই বিরল। মনোজ মিত্র বিরলদের অন্যতম। মঞ্চ-সম্পর্কে জ্ঞান তাঁরই নিরন্তর এবং প্রত্যক্ষ যিনি অভিনেতা এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীর মানসিক শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য বা অস্বাচ্ছন্দ্য তাঁরই নখদর্পণে তিনি পরিচালক। সমস্ত এই দুই বাক্তি এক হবে গিয়ে যদি লেখেন নাটক এবং তাঁর যদি থাকে নাটকের রূপ-বিকাশের জ্ঞান এবং কলাকৌশল করিব করিতে, তাহলে তিনি আলোচিত নাট্যকার হতে বাধ্য। তিনিই নাট্যকার যিনি মানবহৃদয় জ্ঞানেন এবং হৃদয়কে দিয়ে কথা কওয়াতে পারেন। দর্শককে সচেতন করে তার, অথচ নাটকের রসাস্বাদে দিয়ে অবাস্তব কৃত্রিম কেরামতি চলবে না। নিজের ভাষা নাটকারকে নিজে নিতে হবে, বিশুদ্ধভাবে কথা বলা চাই এবং বলাবলি সুসমঞ্জস বাক্য চাই কারণ মিলের আতিশয্য ভাষাকে ক্ষুণ্ণ করতে দেওয়া যায় না। নাট্যকারকে হতে হবে উদার এবং সব সময়ই স্বাভা-

বিক, নতুনতর থাকবে কিন্তু তা উদ্ভট হলেই বিপদ। ফলতই ক'াদিদের এক রুচিবান সমালোচক যথার্থ বলেন—
—'এই নিয়মগুলি যে অগ্রাহ্য করে সে হয়তো একটা বা দুটো এমন নাটক লিখতে পারে যা নাটমঞ্চে করতালি পাবে, কিন্তু সে কখনো ভালো লেখক বলে স্বীকৃত হবে না। ভালো বিয়োগান্ত নাটক খুবই কমই আছে। কতক আছে যেগুলি হলো ভালো ভাষায় ও ভালো মিলে কথোপকথনের আকারে পল্লীগাথা, কতক আছে যেগুলি হলো রাজনৈতিক বিতর্ক যা শুনলে ঘুম পায় অথবা বাকাবাগীশ যা শুনলে মেজাজ বিগড়ে যায়. আর বাকিগুলি হলো বর্বর রচনা-ভঙ্গিতে লেখা।

এদেশে নাটক লিখে পয়সা নেই। লেগে গেলে, হয়তো কিছু যশ জোটে। তবু দেখেছি, আমাদের দর্শকেরা নাটক এবং তার অভিনয় বা সেট কিংবা আলোর চমক নিয়ে এতো মশগুল যে সত্যি সত্যি নাট্যকার সম্পর্কে কোনো শিরঃপীড়া নেই। হলফ করে বলতে পারি, গত কয়েক বছরের সবচেয়ে হিট্-নাটক যা বাঙলা দেশের প্রায় সবাই দেখেছেন, সেই 'মারীচ সংবাদে'-এর নাট্যকার কে, তা শতকরা পঁচাত্তরজন বলতে পারবেন না। এদেশে এই ঐতিহ্য আজও গড়ে ওঠে নি। কিন্তু এইই কি একমাত্র কারণ? না। প্রকাশনার সমস্যাও আছে। এদেশে আজও সবচেয়ে কম খরচে কবিতার বই প্রকাশ করা যায়। প্রায় সব কবিই নিজস্ব সংগৃহীত অর্থ বা বন্ধুবান্ধবের অর্থ-সাহায্যে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। এবং তার ছাপা বা গেট-আপ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন থাকেন। এছাড়া পরিচিত কবিদের কবিতার বই তো বিভিন্ন প্রকাশক এখন নিয়মিত প্রকাশ করে থাকেন যথেষ্ট যত্ন নিয়ে। এর একটা বাজারও এখন তৈরী হয়েছে। উপন্যাসের কথা অহেতুক এই আলোচনায় এরিনাতে আনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু বেচারা নাটক? ক'জন প্রকাশক আছেন এদেশে যাঁরা নিয়মিত নাটক প্রকাশ করে থাকেন- তিন কিংবা চার। এবং কয়েকটি প্রকাশনা বাদ দিলে প্রায় সব নাটকই ছাপা হয় কুৎসিত কাগজে, অসংখ্য মুদ্রণ প্রমাদ রুচিহীন প্রচ্ছদ। পেপারব্যাক ছাড়া শক্ত বাইণ্ডিং-এর কোনো নাটকের বই দেখেছি বিনা আদৌ, মনে পড়ে না। সৌখিন নাট্যসংস্থা ছাড়া নাটকের বই বিক্রীও হয় না। অথচ সাহিত্যগুণ সমন্বিত বেশ কিছু নাটকের বই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে এবং হয়ে থাকে। এরপরও প্রকাশকদের চিবাচর্বিত ঠকানো তো আছেই। কিন্তু তবুও পৃথিবীর প্রায় সব দেশে সর্বকালে নাটক লেখা হয়েছে, প্রকাশ হয়েছে, অভিনীত হয়েছে। এবং প্রায় সব দেশে তাঁরাই মহান নাট্যকার বলে প্রমাণিত হয়েছেন, যাঁরা কবিতা রচনায়ও নিজেদের প্রতিভা প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রায় সব বড়ো নাট্যকারই বড়ো কবি। যেমন, শেকসপীয়ার, বেনশট, লোরকা, ব্রেখ্ট। যেমন আমাদের দেশে দুই

স্বীকৃত এবং চূড়ান্ত অর্থে নাটকের জগতের আধুনিক এবং অভিনব—মাইকেল এবং রবীন্দ্রনাথ। অথচ তারপরে কোনো কবিই আর মৌলিক নাট্যরচনায় অগ্রসর হলেন না। এদেশে। একমাত্র ব্যতিক্রম, বুদ্ধদেব বসু। তাও কাব্যনাটক। পাঠের অভাবনীয় গুণ থাকা সত্ত্বেও তা প্রকৃত অর্থে মঞ্চবিমুখ। অথচ নাটকের চূড়ান্ত সফল পরিণতি মঞ্চ-উপস্থাপনায়। পরবর্তী সময়ে একমাত্র উল্লেখনীয় মোহিত চট্টোপাধ্যায়। 'গোলাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' কবির পরবর্তী সময়ে আলোচিত নাট্যকার রাজ-বসন্ত বাতপাখি, চন্দ্রালোকে আপনকাণ্ডে। আসলে নাটকের টেকনিক্যাল দিক এখন এতো জটিল এবং উন্নত যে, মঞ্চ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ ধারণা না থাকলে আর কারুর পক্ষেই একাধারে সাহিত্য-রসাশ্রিত এবং মঞ্চ সফল নাটক লেখা সম্ভব নয়।

এ হেন ডামাডোল, কঠিন কালেন্টের মধ্যেও নাটক প্রকাশিত হচ্ছে। যেমন মনোজ মিত্রের সদ্য প্রকাশিত একাঙ্ক নাট্যসংকলন। ছটি নাটক আছে এতে। প্রকাশক লিপিকা। দাম আট টাকা পঞ্চাশ পয়সা। মনোজ মিত্রের মতে সবারই যা দীর্ঘ যেমন আছে, তেমনি আছে কর্ণাল জলের ছন্দ, সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হয়ে যা মুক্তোর মতো শোভা পায়। একাঙ্ক নাটক সেরকমই তাঁর কাছে। তাই এই সংকলন। মৃত্যুর চোখে জল, কালবিহঙ্গ, টাপুর টুপুর, পাখি, চোখে আঙুল দাদা, আমি মদন বলছি—এই ছটি নাটকের সংকলন। এই প্রত্যেকটি নাটক এক বা একাধিকবার অভিনীত হয়েছে মঞ্চে অথবা বেতারে। কবে, কোথায় কারা প্রথম প্রথম অভিনয় করেন তার বিবরণও এতে আছে। প্রথম চারটি নাটক যদি দাঁড়িয়ে থাকে মানুষের সহজাত অন্তর্লীন বিষাদ-বেদনাকে উপজীব্য করে, তাহলে শেষ দুটি নাটক অনেক বেশি খোলামেলা, অনেক বেশি আক্রমণাত্মক। ছটি নাটকেরই মূল সুর সোশাল স্যাটায়ার। আসলে চেখভীয় রীতির নাট্যকার মনোজ মিত্র। কোনো লেবেল মারার জন্য নয়, বলছি মনোজ-বাবুর নাট্যকর্মের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই। আপাত শ্লেষের মাঝে কখন চালিয়ে দেন তীক্ষ্ণ ছুরি, বোঝার আগেই রক্তক্ষরণের শুরু। হ্যাঁ, আসলে মজা নয়, শ্লেষ, সমালোচনার গূঢ় মুখ ভারিক্কি নয়, বিদ্রূপ। ফলতই মৃত্যুর চোখে জলের রুদ্ধ আমাদের করুণা কেড়ে নেয়, টাপুর টুপুর-এর দুই গ্রাম্য দম্পতি আরবান মেকি কাঠামোয় সরল অথচ দৃপ্ত রুব্যাল প্রতিবাদ, পাখি নাটকের দম্পতির অপমানে ভেসে পড়ার মুহূর্তে মনে হয়—এ অপমান তো চোখের সামনে দেখেছি অনেক, নীরবে সয়েছি অগোচরে। চোখে আঙুল দাদা শুদ্ধের প্রমথনাথ বিশীর একটা ছোট নকশা অবলম্বনে লেখা। বেতারে প্রচারকালীন প্রভূত সাড়া জাগিয়েছিল। দাদা এক অকর্মণ্য আঁতেল, মৃত্যুর পর যমরাজের সামনে উপস্থিত, নিজের তৈরী বোবট শিশুর হাতে পর্যুদস্ত। যারা কথা বলে বেশি, সমালোচনায় পঞ্চমুখ অথচ কাজের বেলায় অন্তর্বস্তুর তাদের প্রতি বড়া চাবুক এই নাটকটি। নাটকে আর এক 'সমারুঢ়া'। আমি মদন বলছি'র মদন এক হাবাগোবা রুব্যাল ক্যারেকটার, শহরে এসেছে যা তার স্বপ্নের শহর কলকেতা—বাবুদের বাড়ির চাকর হবে বলে। মদন যেন একটা পিন-হোল, যাতে চোখ রেখে নাট্যকার অবলীলায় দেখিয়ে দেন তাঁদের যাঁরা সমাজে মান্যগণ্য। কেউ ফিলমের নায়িকা, কেউ বুদ্ধিজীবী, কেউ দুষখোর চাকুরে, কেউবা পোলিটিক্যাল লীডার। এ রাউন্ড দ্য ক্যালকটা। নাট্যকার যে লেখার গুণে কতো বড়ো সোশাল ডিসেকটর হতে পারেন, আমি মদন বলছি তার প্রমাণ। তবে ব্যক্তিগতভাবে, 'আমার কাছে ফর্ম, কনটেন্ট সব মিলিয়ে ভাল লাগে 'মৃত্যুর চোখে জল'। যা বিশাল নয় অথচ আকর্ষণীয়, যা গম্ভীর নয় অথচ করুণ, যা শুধুই মৃত্যু নয় অথচ মৃত্যুর চেয়েও মহান—জীবন যার নাম এবং শুধু বেঁচে থাকতেই যা অসীম লুব্ধতা—মৃত্যুর চোখে জলের রুদ্ধ তার প্রতিনিধি। কানে বাজে সেই অমোঘ পংক্তি—'হে প্রগাঢ় পিতামহী.... আমিও তোমার মতো বুড়ো হবো।.....' আমরা দুজনে মিলে শুনা করে চলে যাবো জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার।'

বাংলা ভাষায় এখন যাঁরা নাকি লিখছেন, যাঁদের নাম সগর্বে উচ্চারিত, তাঁদের মধ্যে মনোজ মিত্র অধুনা সর্বাধিক আলোচিত। তিনি সেই বিরল ক্ষমতাবান-দের অন্যতম-যিনি নাকি লেখেন, পরিচালনা করেন অভিনয় করেন। কে তাঁকে রুখবে? পেরিক্লা আগ্রাসনের মতো তিনি দখল করছেন আমাদের মস্তিষ্ক, একের পর এক ঘাঁটি তাঁর হস্তগত হচ্ছে।

সমীর চট্টোপাধ্যায়

মনোজ মিত্রের একাঙ্ক। লিপিকা। ৩০।১এ, কলেজ রো। দাম ৮-৫০।

একজন খাঁটি মানুষের কথা

....মূল্য দিলে অনেক দুর্লভ বস্তুও মেলে, কিন্তু রাজভাণ্ডার উজাড় করে দিলেও মেলে না শুধু একটি ষোল আনা খাঁটি মানুষ। সেই খাঁটি একটি মানুষ এই কিছুকাল আগেও আমাদের মধ্যে ছিলেন। তিনি ছিলেন আমাদের সবার একান্ত অন্তরঙ্গ, একান্ত আপনজন। প্রাসাদ থেকে পর্ণকুটির—সর্বত্র ছিল তাঁর অগাধ বিচরণ। তাঁর সময়ে বাংলাদেশে এমন কোন স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন না যিনি শুধু আর ভালবাসার বাঁধনে তাঁর সঙ্গে না বাঁধা পড়েছিলেন। —এমনি এক হাস্যকৌতুকের রাজা, আশ্চর্য রস-রসিক, নির্ভীক, নির্লোভ মানবদরদী শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের জীবন কথা নিয়েই নির্মলরঞ্জন মিত্রর এই গ্রন্থ 'সেরা মানুষ দাদাঠাকুর।'

জন্ম, বৈশাখ ১৩—১২৮৮ সাল। অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী, আজীবন নগ্ন পায়ে হেঁটে হেঁটে ভবানীপুর, বালীগঞ্জ বা হাওড়া ঘুরে আসতেন দিনের পর দিন। কদাচিৎ কখনো ট্রামে চড়তেন—তাও সেকেণ্ড ক্লাসে। বলতেন—ট্রামে চড়বো কি, সবসময়েই দেখি ট্রামে ঝুলেন আর বাস একই সঙ্গে চলছে।' এমনি অসাধারণ রসজ্ঞান, প্রচণ্ড কবিত্বশক্তি, কোমল প্রাণ আর স্নিগ্ধ উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের ছোঁয়াচ সকলকেই প্রায় মুগ্ধ করতেন। কিন্তু অন্যায় আর অসাম্যের কাছে মাথা নোয়াননি তিনি। প্রয়োজনে কঠোর হয়ে উঠতেন।

পরনে ফর্সা ধুতি, গায়ে চাদর, কাঁধে গামছা আর বগলে ছাতা—এই ছিল দাদাঠাকুরের চিরপরিচিত ড্রেস। ছাতাটি ছাড়া তাঁকে ভাবাও যেত না। ওটা দেখিয়ে তিনি বলতেন—'রোদে ছায়া, জলে ঘর—যে না বয় সে বর্বর।'

প্রথম জীবনেই তাঁর সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বিদূষক'-এর মাধ্যমেই তিনি বিদগ্ধ সমাজ ও সর্বস্তরের মানুষের কাছে খুব আপন হয়ে উঠেছিলেন। ১৩২৯ সালে তিনি প্রথম 'বিদূষক' প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত রচনাই তাঁর নিজের। নিজে লিখে, নিজে কম্পোজ করে হাত মেসিনে ছাপিয়ে তিনি কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় বিক্রী করে বেড়াতেন। বিদূষকেরও আগে ১৩২১-এ দাদাঠাকুর 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। প্রধানত নীলামের ইস্তাহার ও কিছু স্থানীয় সংবাদ নিয়েই এই পত্রিকার প্রকাশ। সত্যবাক তেজস্বী পুরুষ দাদাঠাকুর ছিলেন দীন-দুঃখী, নিরপরাধ আর অসহায় মানুষের পরম বন্ধু। স্বভাব কবিত্ব ছিল তাঁর কণ্ঠভূষা। পকে একসময় বোতল-এর ছবি যুক্ত মসাটে লাগিয়ে এমনি সব কবিতাগুলো একসঙ্গে প্রকাশ করেছিলেন। নামও দিয়েছিলেন—'দাদাঠাকুরের বোতল পুরান।'

দাদাঠাকুর

বহু বিচিত্র ঘটনাসমৃদ্ধ জীবনের নানান বিষয় নিয়েই একসময় শুরু করেছিলেন আত্মজীবনী। কিন্তু নানান ঝামেলায় সেটা বন্ধ হয়ে যায়।

সেই অর্ধ সমাপ্ত জীবনকথার অন্যান্য রচনাদির মূল্যবান অংশ ছাড়াও দাদাঠাকুরের জীবনের অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিবরণ নিয়েই 'সেরা মানুষ দাদাঠাকুর' এক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত মিত্র এই গ্রন্থ রচনায় যথেষ্ট পরিশ্রমী হয়েছেন। একদিকে গল্পচ্ছলে তিনি দাদাঠাকুরের জীবনের অনেক বিভিন্ন অভিজ্ঞতাকে যেভাবে তুলে ধরেছেন অন্যদিকে তেমনি তাঁর জীবনের এমন এমন তথ্য পরিবেশন করেছেন যা ইতিপূর্বে অন্য কোথাও দেখা যায়নি। এছাড়া আছে অনেক হাসির গান ও কবিতা—যা দাদাঠাকুরের রসরসিক ও কবিমনেরই প্রতিচ্ছবি। আসলে শ্রীযুক্ত মিত্র অনেকদিন কাল তাঁর জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। তাই তার পক্ষে এই গ্রন্থের রচনা সম্ভব। সুন্দর উপযুক্ত বাঁধাই ও মুদ্রণে গ্রন্থটি যে কোন পাঠকের কাছেই এক অসামান্য সম্পদ। গ্রন্থটি সংগ্রহে রাখা উচিত।

শচীন দাস

সেরা মানুষ দাদাঠাকুর।। নির্মলরঞ্জন মিত্র।। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী।। ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩। মূল্য ঃ বারো টাকা।

বাংলায় নাটক লেখা হয় কম। অভিনয় হয় বেশি। সুতরাং নতুন নাটক হাতে এলেই আশান্বিত হওয়ার কথা। 'অসামাজিক' নাটক অভিনয় উপযোগী এবং পড়তেও ভালো লাগে। শোষক ও শোষিতের শ্রেণীসংগ্রাম নিয়ে কাহিনী। নাট্যকার ইংরেজি শব্দ অতিরিক্ত ব্যবহার করেছেন।

অসামাজিক—ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। গল্প নিকেতন। ১৮।এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা। দাম পাঁচ টাকা।

কলেজ পাঠ্য পুস্তক

দর্শন (Philosophy)

অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত প্রণীত
ভারতীয় দর্শন—(১ম) ৯ম সং ১২-০০
ভারতীয় দর্শন—(২য়) ৩য় সং ৭-০০
ভারতীয় দর্শন—৩য় খণ্ড (বেদ ও উপনিষদ) ৭-০০
পাশ্চাত্ত্য দর্শন—১১শ সংস্করণ ১২-০০
নীতিবিজ্ঞান—১০ম সংস্করণ ১২-০০
সমাজদর্শন—১০ম সংস্করণ ১২-০০
মনোবিদ্যা—৮ম সংস্করণ ২২-০০
পাশ্চাত্ত্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—(আধুনিক যুগ) ৩য় সংস্করণ ১২-০০
পাশ্চাত্ত্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—কাণ্ট ১৬-০০
ধর্মদর্শন (Phi. of Religion) ২২-০০
সমাজ মনোবিজ্ঞান—২য় সংস্করণ ১০-০০
অধিবিদ্যার কয়েকটি সমস্যা—(For B.U) ৩য় সংস্করণ ৬-০০

শিক্ষা (Education)

অধ্যাপক সেনগুপ্ত ও রায় প্রণীত
শিক্ষাতত্ত্ব—৩য় সংস্করণ ১৪-০০
ভারতের শিক্ষা সমস্যা—(পরিমার্জিত) ৪র্থ সংস্করণ ১৬-০০
শিক্ষা মনোবিজ্ঞান—৪র্থ সংস্করণ ২২-০০

বাংলা সাহিত্য

ডঃ সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত প্রণীত
পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সমালোচনার ধারা—দ্বিতীয় সংস্করণ ১০-০০

ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী প্রণীত
কুলীন কুলসর্বস্ব— ১০-০০

শিক্ষক-শিক্ষণ (B. Ed and Basic)

অধ্যাপক গৌরদাস হালদার প্রণীত
শিক্ষণ প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ—(পরিবর্তিত) ২য় সংস্করণ ১৬-০০
শিক্ষণ প্রসঙ্গে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান ১৪-০০
শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষার ইতিহাস—১৬-০০
ভারতের শিক্ষা সমস্যা—(প্রাচীন ও মধ্যযুগ) ৪-০০
অধ্যাপক সেনগুপ্ত, রায় ও ঘোষ প্রণীত
শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান—৩য় সংস্করণ ২৫-০০
শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষাতত্ত্ব— ১৬-০০

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য

অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত প্রণীত
Higher Secondary Philosophy (English edition)
উচ্চ-মাধ্যমিক দর্শন (সংশোধিত ও পরিবর্তিত)—৪র্থ সংস্করণ ১৫-০০
অধ্যাপক সেনগুপ্ত ও গীতা সেন প্রণীত
উচ্চ মাধ্যমিক মনোবিজ্ঞান— ২২-০০
অধ্যাপক সেনগুপ্ত ঘোষ ও হালদার প্রণীত
উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা— ২২-০০
অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় ও সেনগুপ্ত প্রণীত
উচ্চ মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা— ১৮-০০

BP
ব্যানার্জী পাবলিশার্স
৫/১এ কলেজ রো, পিন-৭০০০০৯
: ৮৪৬২ ৩৪-৭২৩৪

১২০ টাকায় বেঁচে আছি

দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

আসুন এখানে, আমার কাছে। শেয়ালদা স্টেশন থেকে মাত্র মিনিট পাঁচেকের দূরত্বে আমি থাকি। শ্যামবাজার থেকে বাসে লাগে দশ মিনিট। হেঁটে আধ ঘন্টা। কলেজ স্ট্রীট থেকে আসতে সোজা ইউনিভার্সিটির পাশ থেকে, গোলদিঘীর গা বেয়ে বেলোনো সূর্য সেন স্ট্রীট ধরে আসুন; বড় জোর পনেরো মিনিট। কাইজার স্ট্রীট দিয়েও আসতে পারেন। কিন্তু সে বড় কঠিন রাস্তা। এঁকে বেঁকে প্রেসিডেন্সি ইনস্টিটিউটকে পাশে রেখে, কাইজার স্ট্রীট গলি থেকে অলি কোন্ গলি দিয়ে কোথায় গেছে, আমি ঠিক জানি না। সব অলিগলির নামও নেই।

একদিন দুপুরে এসে বেড়িয়ে যান। আগে থেকে জানালে আমি বাড়িতে থাকি। বাড়ি বলতে অবশ্য আমার কিছু নেই, একে আস্তানা বলা যেতে পারে।

বস্তুত, আমি বাড়িতে থাকি না অন্ধকার মেসে থাকি। আপনি সেই অন্ধকার বিবরে আমারই মতো আরো এগারো জন মানুষ— যাঁরা নিজেরাই অনেকে এক-একটি অন্ধকার গলিঘুপচির মতো।

সরষের দানার মতো কলকাতার চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে মানুষ। এদের সকলের বসবাসস্থান কোথায়? অনেকেরই অবস্থা সুধাংশু-মাথুর বাসাহীন সেই শুক পাখির মতো। বিশেষ করে তাঁদের আশ্রয় কোথায়, জীবিকার সন্ধানে যাঁরা সুদূর দূরান্ত অতিক্রম করে কলকাতায় এসেছেন? কলকাতার নিজস্ব বাড়িতে বসবাসকারী কোটিজনের তুলনায়, বোধহয় কলকাতার বাইরে থেকে আসা মানুষের সংখ্যা বেশি। নগরীর স্ফীত কোলাহলের বাইরের এই জনসাধারণ পরিসংখ্যান, আজো ভালো করে নেওয়া হয়নি, সম্ভবত।

মেসের যে জগৎ, তার সঙ্গে গৃহস্থবাড়ির জগতের প্রায় কোনো মিল নেই। মেসের জগতের সঙ্গে তুলনা চলতে পারে স্টেশনের ওয়েটিং রুমের। জেলখানার ভেতরে খোলা কম্পাউন্ডটুকু—যার মধ্যে কয়েদিদের সকাল বিকেলের ভ্রমণপর্ব চোখে মেসের জগতের সঙ্গে তারও একটি দূরবর্তী সাযুজ্য আছে।

বসবাস গৃহের আছে আলাদা সকাল, আলাদা বিকেল ও সন্ধ্যা। কলকাতার অধিকাংশ মেসগৃহের ভেতর সকাল বিকাল ও সন্ধ্যার আলাদা অস্তিত্ব নেই। সব মুছে গিয়ে মেসে প্রধান দুটি সময়। সকাল থেকে বিকেল অব্দি এক ধরনের আবছা বর্ষার ভোরের মতো দিন। তারপরেই ঝপ্ করে রাত্রি, প্রধান রাত্রির মধ্যে মেসের সব বাড়ি ঘর আস্তে আস্তে ডুবে যেতে থাকে।

প্রত্যহ ঠিক বেলা থেকে বাড়ি অব্দি বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে। ভোরের দিকে ঘুম থেকে উঠে একে একে মেসবাসীরা তাঁদের ঘরের বাতিগুলি নিবিয়ে দেন। শুরু হয় মেসের দিন। সকালের দিকে বৈদ্যুতিক বাতিগুলি কিছুটা অনুজ্জ্বল নিষ্প্রভ দেখায়। যতো বেলা বাড়ে, বাইরে যখন ধীরে ধীরে গোধূলি শুরু হয়, গোধূলি গড়াতে থাকে সন্ধ্যার দিকে মেসবাড়ির জীর্ণ ছাদগুলির তল থেকে ভাদ বেয়ে ঝুলে থাকা বৈদ্যুতিক ডুমগুলি ততো ধীরে ধীরে নিষ্প্রভা কাটিয়ে উঠে উজ্জ্বল হতে শুরু হয়। অর্থাৎ সন্ধ্যে একশো ওয়াটের যে বৈদ্যুতিক বাতি ষাট ওয়াটের আলো দিচ্ছিল সেই বাতিগুলি ধীরে ধীরে তীব্র হয়ে একশ ওয়াট ঠিক একশ ওয়াটের মতোই হয়ে ওঠে। মেসবাড়ির স্বস্তিকর সময় এটাই।

কলকাতার মেসগুলি সাধারণত অত্যন্ত পুরাতন বাড়িগুলিতে অবস্থিত। নতুন নতুন বাড়ি ও ঝকমকে পাড়া মেসের পক্ষে মানানসই নয়। কলকাতার দক্ষিণাঞ্চলের তুলনায় হয়তো তাই মধ্য ও উত্তরে মেসের সংখ্যা বেশি। এখন আর কোনো নতুন বাড়ির মালিক তাঁর গৃহটিকে মেস হিসেবে ব্যবহৃত হতে দিতে চান না। তাই প্রাচীনতম ও রক্ষণশীল অর্থে মেস দেখতে হলে আসতে হবে মধ্য ও উত্তর কলকাতায়। অন্ধকার গলিপথ, আবছা আলোয় ম্লান বাড়িগুলিতে মেসের চেহারা ভালো ফুটে ওঠে। প্রাচীন কলকাতার আরো বহু জরাজীর্ণতার সঙ্গে জড়িয়ে আজও টিমটিম করছে মেসবাড়িগুলি।

নতুন মেস আর বিশেষ জন্মাচ্ছে না। পুরোনো যেগুলি এখনো টিকে আছে, তাদেরও আর সেই যৌবনকালীন দিন নেই। মেসে যাঁরা বাস করেন, তাঁরাও মানুষ হিসেবে কোথাও যেন একটু আলাদা; একটু মনোযোগ দিলেই মেসে বসবাসকারী মানুষদের চিনতে দেরী হয় না। এঁরা কলকাতায় থাকেন, অথচ কলকাতাবাসী নন। এঁরা প্রকৃত অর্থে পরবাসী। একদিন এইসব মানুষের শিকড় ছিল গ্রামে আজ সেই শিকড়ও ছিন্ন। নতুন শিকড় এরা গজাতে পারলেন না উচ্চশ্বাস ও উজ্জ্বলতাময় কলকাতায়। তাই এঁরা নির্বাসিতের মতো একা, অসংখ্যজন। কি দুঃখী এইসব মানুষ। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই থেকে ছিঁড়ে যেন এরা কলকাতার বিশেষ কয়েকটি বাড়িতে উড়ছে।

এমন কি যে যে পাড়ায় মেসগুলি থাকে, সেই সব পাড়ার ভেতরে এগুলো যেন এক-একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। কলকাতার ভাড়াটে লোকের সংখ্যা অগণ্য, তবু নতুন ভাড়াটে পাড়ায় এলে, কিছুদিন পর পাড়া তাকে নিজের লোক বলে মেনে নেয়। কিন্তু একই পাড়ায় অবস্থিত মেসের বাসিন্দারা কখনো পাড়ার লোক হয়ে ওঠেন না। একটা দূরত্ব রয়েই যায় পাড়া থেকে। পাড়ার শুধু নানা-বয়সী ছেলেমেয়েদের বিরাট কৌতূকের উৎস হচ্ছে মেস। মেসের ভেতরে এক ফালি উঠোন থাকলে, সেই উঠোনের ওপর প্রত্যেকেরই একটা অধিকারবোধ আছে, নেই শুধু সেই মেসের বাসিন্দাদের।

ঐ উঠোনটুকু ফুটবল ক্রিকেট খেলার গ্রাউন্ড। বিকেলে বাচ্চা থেকে পাড়ার প্রায়-যুবতী কিশোরীটির চু-কিৎ-কিৎ খেলার জায়গা। সন্ধেবেলা মোমবাতি জ্বালিয়ে পাড়ার অনাত্মীয়দের তাস

খেলার আসর। রাত্রে ভাত খেয়ে পাড়ার যুবকদের ভ্রমণতৃষ্ণা মেটানোর মাঠ সেই ছোটটু উঠোন। কদাচিৎ কদাচিৎ প্রেম করার স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হয় এই চারদিকে দেয়াল-তোলা ছোটটু উঠোনটুকু। পাড়ার যুবকদের প্রেমিকাকে চিঠি আদান-প্রদানের স্বয়ংক্রিয় পোস্টবক্সও এটি। মধ্যরাত্রে এই উঠোন আবার পাড়ার ভিখারী ও নিরন্ন মানুষের শোবার ঘর। পাড়ার স্নেহপ্রাপ্ত নিষ্কর্মা চালকটির মূল্যবান বস্তু সংরক্ষণের স্থান হিসেবেও অনেক সময় মেসকে ব্যবহার করা হয়।

পাড়ার লোকদের সঙ্গে মেসবাসীর সম্পর্ক মধুর নয়, তিক্তও নয়, বিষাদ নয়, উদাসীনতাবও নয়। মেসবাসীদের সঙ্গে সম্পর্কই নেই পাড়ার মাটির, জলের, আবহাওয়ার, মানুষের। মেসের পাশের বাড়ির মহা-ধুমধাম বিবাহ উৎসবে, পাড়ার সকলেই নিমন্ত্রিত, মেসবাসীদের নিমন্ত্রণ নেই সেখানে। হৈ-চৈ করে পাড়ার লোকেরা যখন বিবাহ-বাড়িকে সরগরম করে তুলছেন, তখন পাশেই চির-অন্ধকারময় স্তব্ধতার ডুবে আসে মেস। তার জীবনধারায় সেই এক ছন্দ। ঠাকুরের নাম ধরে ডাকাডাকি। খাবার হয়েছে কিনা চৌকির ওপর থেকে জিজ্ঞাসারত মেসবাবু। সন্ত্রাস্ত মেসের তরুণ মেদিনীপুরের চাকরটির জলের বালতি হাতে বাথরুমের দিকে চলে যাবার পদশব্দ। বাথরুম সংযোগকারী রাস্তায় মেসবাবুর খড়মের আওয়াজ। কোনো স্থান চলছে তাদের আড্ডা। দুর্গতিনজন মেসবাবু আর তাদের অফিস-কলিগ বন্ধুদের টুয়েন্টি নাইন; রামির খেলার ডাক দেওয়ার শব্দ। সংক্ষেপে এই হচ্ছে মেসের সন্ধেবেলা। মেসের রাইসন পাড়ার চেহারা এক-একদিন বদলে যায়। সামান্য কোনো উপলক্ষে মাইক আসে। চলে ফিল্মী গান, কখনো বাংলা কখনো হিন্দী। আবার রবিঠাকুরের গানও বাজে কখনও কখনও, কখনো বা পাওয়া যায়ও। কিন্তু মেসের একটি সন্ধেবেলা, ঠিক আগের বা পরের সন্ধেবেলার মতোই পরিবর্তনহীন।

পরস্পর বন্ধুর নানা সাংবৎসরিক পুজোর আগে অবশ্য হঠাৎ পাড়ার ছেলেরা মেসগুলি সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে পড়েন। হাতে চাঁদার বিল দলে দলে ছেলেছোকরা সকাল সন্ধে দুবেলা মেসে হানা দিতে থাকেন। চাঁদা তহবিলে তাঁদের ইচ্ছে মাফিক একটি অঙ্ক বসিয়ে মেস ম্যানেজারের সামনে ফেলে দিয়ে তাঁদের নানা দরকারী কাজে চলে যান। শুধু যাবার আগে ম্যানেজারকে ঈষৎ শাসানির ভঙ্গীতে অনুরোধ করে যান চাঁদাটি যতো দ্রুত সম্ভব পুজো কমিটির হাতে পৌঁছে দিতে।

মেসবাসীরা সাধারণত হন ভারী শান্তিপ্রিয় জীব। দুটি নিষ্কর্মা করুণ চোখ ও একটি মাত্র আত্মা সম্বল করে চাঁদা পার্টির ছোটপাট সামলানো তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। অধিকাংশ চাঁদা পার্টি তাঁদের সাথলোন মুখ দেখতে পান। চাঁদা আদায়-পর্ব ও পুজো শেষ হয়ে গেলে এইসব পাড়ার সন্তানদল অবশ্য আর মেসের চ্যাটার্জিবাবু, কি রামবাবু কি চৌধুরীকে আর চিনতে পারেন না। চ্যাটার্জি চৌধুরী, রামবাবুর মুখেও দেখা দেবে ধীরে ধীরে সেই উদাসীনতা, যা কোনো মেসবাসীর মুখেই দেখা দিতে পারে।

কলকাতার মেসবাসীরা অধিকাংশই মফঃস্বলের লোক। মেসে বসবাসের ঘটনা থেকে বোঝা যায়, হয় এঁরা মামলার মামলুন অথবা দেশের বাড়িতে বৃহৎ পরিবারের চাপে এঁদের শিরদাঁড়া চিরস্থায়ী নমনীয়তা অর্জন করেছে। এঁদের মেসে না থেকে উপায় নেই। কলকাতার মামলার ধরনের মেসগুলিতে ৬০।৭০ সালেও মোটামুটি ৭০।৮০ টাকা হলে চলে যেত। অন্তত দুবেলার প্রধান দুটি অন্নের অভাব ঘটতো না। ইতিমধ্যে গত সাত বছরে টাকার অঙ্ক গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১২০ টাকা থেকে ১৪০ টাকার মধ্যে। তবু, আজ সর্বদিন পাতে মাছ নেই। আগেও পাতের ক্ষুদ্রতম খণ্ডটি ছিল মাছের। এখন মৎস-খণ্ডটি আরো ক্ষুদ্রকায়, অনুবীক্ষণে দর্শনোপযোগী। একদিকে হু হু করে বাড়ছে বাজারদর, অন্যদিকে-হু হু করে নামছে মুদ্রামূল্য। মধ্যবর্তী জাঁতাকলে ছটফট করছে মানুষ। মেসে বসবাস করলে বাজারদর সম্পর্কে ধারণা আরো স্পষ্ট হতে পারে। মেসে যে লোকটি বসবাস করছেন, তাঁর বেশ কিছু সাধারণ সাংসারিক দক্ষতা থেকে মুক্তি আছে। নেই হঠাৎ মাসের শেষে স্কুলের শরীর খারাপ ছেলেমেয়ের পরীক্ষার ফি, ইত্যাদি। তবু তাতেও খরচের পরিমাণ উত্তরোত্তর বাড়তেই দেখতে হয়।

'মেস'—এই ব্যবস্থা প্রায় গরীবের আবিষ্কার বলে, এখানে আজও খরচ অপেক্ষাকৃত কম। এখনো ১২০ টাকায় থাকা খাওয়ার কথা ভাবতেই মজাক লাগে। হোস্টেল, বোর্ডিং ও বোর্ডারের মধ্যে একটি তৃতীয় শ্রেণীর অস্তিত্ব আছে। সেই শ্রেণী মালিক শ্রেণী। হোস্টেল বোর্ডিং থেকেই মালিক শ্রেণী জীবিকা নির্বাহ করেন বলে, এনাদের এই ব্যবস্থা থেকে একটি লভ্যাংশ তুলে নিতে হয়। স্বভাবতই এতে খরচের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু, প্রায় সব মেস-গুলিরই পরিচালন ব্যবস্থা থাকে নিজেদের হাতে। সেখানে লাভের প্রশ্ন নেই। এক-একজন মেসবাসী এক-এক মাসে ম্যানেজার নিযুক্ত হন। তিনি বিনা-পারিশ্রমিকে গোটা মেসটি সেই মাসের জন্যে চালনা করে থাকেন। সুতরাং আরো এখানে খরচ একটি নির্দিষ্ট জায়গায় সীমাবদ্ধ। কলকাতার হোটেল জাতীয় ব্যবস্থাপনাগুলির কথা অবশ্য ভাবতেও গায়ে কাঁটা দেয়। যে কোনো মাঝারিগোছের হোটেলে থাকতে ১৪০ থেকে ২০০ টাকার মতো খরচ। অথচ সেখানে অব্যবস্থার কোনো শেষ নেই। মেসে দৈনন্দিন আহার সারলে মোটা-মুটি বছর ৪৫ সুস্থ থাকা যায়। হোটেলে নিত্য আহারি লোকেরা অবশ্য তত দীর্ঘ দিন মোটেও বাঁচার আশা করেন না। এই ব্যাপক সমস্যাকীর্ণ কলকাতায় এই ভাবেই হোটেল, বোর্ডিংগুলি আড়ালে আড়ালে চমৎকার জনহিতকর কাজ করে চলেছে। তবু লোকেরা কেন যে হোটেল বোর্ডিং-এর নিন্দে করে। সাধারণ লোকে ভারী অকৃতজ্ঞ। শুনেছি কিছু, কিছু হোটেল মালিকের মস্তান পোষা থাকে। খাবার বা থাকবার অসুবিধে বিষয়ে বোর্ডারেরা কথা তুললেই, এই মস্তান-

দলের আবির্ভাব ঘটে হোটেলে। এবং গোলমালকে বোর্ডারদের চিনি, কি হবিনিক্স, কিংবা বরাদ্দ দুধ বিনা অনুমতিতে খেয়ে তাঁরা মুখ মুছে চলে যান। ফলত ঐ হঠাৎ ন্যায়বাদী হয়ে ওঠা বোর্ডারটির অন্যায়ের প্রতি সহনশীল একটি সকরুণ দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে।

এভাবেই মেসে বসবাসকারী মানুষের মনে একটি অজ্ঞাত ভয়ের ভাব এমনি সৃষ্টি হয়ে আছে। এই চরিত্রিক ভয় ধীরে স্থায়ী অবচেতনে পরিণত হয় কলকাতার মতো আগাপাশতলাহীন আধা-মফস্বলী শহরের চাপে। যে কোনো প্রধান ভসমোপলিটান টাউনের চেহারার সঙ্গে কোথায় ও পেছে থাকা একটি চিত্রাবয়বের মিল আছে। অন্যান্যদের মানুষই শিক্ষায় হিসেবে বর্ণাঢ্য; মেসবাসীদের অধিকাংশ মানুষের মন ভিজে ভিজে ভোরের চষা মাঠের মতো এবং এর সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ উদ্বেগ নিয়ে এঁরা কলকাতার ভিতে হাজির হন। অনেকদিন কলকাতা বসবাস অভিজ্ঞতাও এই মানসিক ধাঁচটি তাঁদের পাল্টাতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে এঁরা কলকাতার মানসিকতা গ্রহণ করতেই চান না সহজে। দূরের বাসস্তায় একটি স্টেলা হচ্ছে দেখলেই এঁদের বুক কাঁপে। যে কোনো মুহূর্তে সেখান থেকে বোমা ও সোভার বোতল ছুটে আসতে পারে এই ভয়ে এরা দূরে দিয়ে পাশ কাটিয়ে এঁরা মেসে ফেরেন। কলকাতার ঘুঘু লোকদের মতো গোলমালের ভাগবাটোয়ারা নিয়ে উঁচু-রাজনীতি মকসো চেষ্টা করেন না। সংবাদপত্রের মাধ্যমেই এঁরা প্রধানত কলকাতায় বসেই কলকাতাকে জানেন।

মেসে বসবাসকারীর তাই ধীরেস্থস্থে শৃঙ্খলাপরায়ণ। এঁরা সঠিক দশটার অফিসে পৌঁছোনোর জন্যে বেরিয়ে পড়েন। বাসের চড়ন্দারা তো আছে। আর অফিস শেষ হলে যতদূর সম্ভব সন্তর্পণে সন্ধে-সন্ধে মেসে ফিরে আসেন। অধিকাংশ মেসবাসীদের হয় অফিস নয় মেসে পাওয়া যায়। অফিস ছুটি হলেই কোনোক্রমে একটি ট্রাম ধরে নিদেন মেসপাড়ায় একবার ভেসে উঠতে পারলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। কেননা সমস্ত কলকাতার মধ্যে এই অঞ্চলটুকুই তাঁর ভালো চেনা। একবার নিদেন গর্তে সেঁধিয়ে পড়তে পারলে সারাদিন ভোরের আগে আর সহজে তাঁরা বাস্তায় পা দিচ্ছেন না। এইভাবেই বাড়ি। বাড়ি প্রভাত হলে অফিস যাওয়ার জন্যে ঘুনরায় তোড়জোড়। অর্থাৎ মানুষ নামক প্রচণ্ড স-ভাবনাময় বেশ কতকগুলি জীবন এইভাবে রূপান্তরিত হয়ে যায় মেসিনে। এঁদের মধ্যে কেউ কি ছিলেন কবি, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে কি অন্য কিছুতে সম্ভাবনাময় ব্যক্তিত্ব? আজ আর জানার উপায় নেই। বহু স্তর পলিমাটির নীচে প্রোথিত হয়ে গেছে এঁদের আত্মা—যা উদ্ধারের কোন সম্ভাবনা নেই। এঁরা নিজেরাও আজ নিজেদের খোঁজতে চান না। চিড়িয়া হাওয়া কিংবা মাঘ নিশীথের বেরিবেরির স্বপ্নও এখানে পৌঁছয় না। তাছাড়া নিজের হৃদয় খুঁড়ে বেদনা বোঝাতে কজনই বা ভালবাসেন?

হোস্টেল বা বোর্ডিং-এ যাঁরা থেকেছেন, তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন, বোর্ডিং হোস্টেলে এক ধরনের স্থবির যৌবনের স্মার্টনেস আছে, মেসের জীবনে ঠিক সেটি নেই। তার হোস্টেলগুলির চেহারা তো অনেকটা ব্রিমন্যাস্টিক আখড়ার মতো। পি ডব্লিউ হোস্টেল-গুলিতে কাপড়ে গেঞ্জি ও পায়ের পাতা পর্যন্ত ঝুলন্ত ভদ্রলোকদের অলস মন্থর চলাফেরা দেখলে মনে হয়, আসলে এঁরা এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন; রবিবার মাংসমজ্জার ডাক পেলেই অফিসের চেয়ার টেবিলে পড়বেন। আপাতত তাঁদের কোনো কাজ নেই বলে মনে হলেও আছেন। পড়াশোনা এইসব বাড়ির ব্যালকনিগুলি বহির্দেশ-সংলগ্ন মতো কিছুটা তফাতে দিয়েছেন। তবু সব জায়গাতেই কিছু ব্যতিক্রম থাকে। যেমন এখানে টেবিলে আজ কোনো পড়াশুনোর চিহ্ন মনে হয় ভাঁজ পড়া পত্রিকা, দর্শনের সংখ্যা আর খুলে নিজের সংবাদপাঠ। টেবিলের থেকে মেসের বাকি বুকে তাঁর নাম তুলে রাখা হয়, যিনি রাত বিরেতে ফেরেন দল দল বন্ধু বান্ধব নিয়ে আড্ডা দিয়ে থাকেন। কখনো বা দু চার দিন মেস থেকে উধাও হয়ে যান বিনা কারণে।

যাই হোক একজন মেসবাসী প্রথমত বিচ্ছিন্ন তাঁর গ্রাম থেকে উপশহর থেকে; তারপর কে শহর তাঁর অন্য কোনোকিছুর সঙ্গে তো নাড়ির যোগ নেই। এবং নিজেও নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন। পরিবারের মধ্যে জীবন কাটালে পরে যে সাংসারিক এ্যাডজাস্টমেন্ট একজন মানুষের মেরুদণ্ডকে আরো সবলভাবে গড়ে তোলে। সে প্রক্রিয়াটি জীবনের প্রায় সবাংশটি কাটিয়ে দিলেন পরিবার থেকে দূরে, পরিবারেও তাঁর স্থান নানে হয়ে যায়। ছেলেমেয়ের বড় হয়ে ওঠা কি স্ত্রীর মান অভিমান কোনো কিছু সম্পর্কেই তাঁর প্রত্যক্ষ ধারণা হয় না। এই সামগ্রিক বিচ্ছিন্নতা যে কি ভয়াবহ, তা ঐসব মেসবাসী অফিস থেকে গৃহকোণের পথ বাড়িতে ফিরে গিয়ে টের পান।

মেসবাসীর জীবনে কাঁড়েমির সুযোগ প্রচুর। দুবেলা খাপিসের পর তাঁর আর কিছু না করলেও চলে। এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেতেও অনেক মেসবাবুর প্রচুর আপত্তি। শুয়ে শুয়ে চৌকিতে পা নাচানো আর মেসের চাকরের উদ্দেশ্যে হুকুম দিয়ে কাজ তামিল করিয়ে নিতে পারলেই যথেষ্ট। বাংলায় একটা প্রচলিত প্রবাদ আছে : 'কাজের মধ্যে দুই, খাই আর শুই।' কোন মহাপুরুষ এটি কবে করেছিলেন জানা যায় না, তিনি কি কলকাতার মেসবাবুদের দেখেছিলেন? চৌকিতে আধশোয়া থেকেই জগৎ মুখে মাখা যায়। বড় বড় হাতি ঘোড়া মেরে গড়গড় করে গাড়িয়ে দেওয়া চলতে পারে, কে আর দেখছে? মেসের আলোচনায় বিষয়ের স্থান নেই? রাজনীতি, সমাজনীতি, অফিস পলিটিক্স থেকে শুরু করে মুখরোচক পরচর্চা সব কিছুই এখানে অনায়াসে চলে। এইভাবে মেসজীবনের ঘটনা চলতে থাকে তর্কাতর্কির মধ্যে বসে। বালিশের থেকে মাথা তুলে পড়লেই তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে খেয়ে নাক ডাকতে থাকে। ঘুমের ব্যাপারে এক-একজন মেসবাসী এক-একটি বিশ্ববেকর্ডের অধিকারী।

পরিবারের মধ্যে থাকলে এসব গুড়ে বালি পড়া স্বাভাবিক। যাঁরা অবিবাহিত তাঁদের ভয়ঙ্কর দুটি ভাড়নসত্ত্ব আছে—বাবা আর মা। বিবাহিতদের অবস্থা আরোই বাহিল : স্ত্রী আছেন। তিনি পান থেকে চুণ খসলেই নটরাজ-নৃত্য করেন। ভয়ংকরী স্ত্রীর মুখোমুখি দাঁড়াবার ক্ষমতা বেশির ভাগ পুরুষ মানুষের নেই।

মেসের চাকর হচ্ছে চির-শোষিত সম্প্রদায়। বিগত কয়েক বছরে কলকাতার সব কিছুর মূল্য বেড়েছে। বাড়েনি শুধু মেসের ঠাকুর চাকরের মাইনে। বাড়েনি কি অবশ্য সে না-বাড়ার মতোই। ওদেরও নাকি ঠাকুর চাকরদেরও ইউনিয়ন ইউনিয়ন হচ্ছে। ভালো কথা। তবে বেশির ভাগ মেসে এই বিপ্লবের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ এসে পৌঁছোয়নি। সপ্তাহে এক দিনও ঠাকুর চাকরের ছুটি নেই। এদের মাসের সব মাস। এবং মাস ফুরোয় বছরে

বোববারের আড্ডা

গলায়। ইউনিয়ন টিউনিয়ন হলে সাধারণ মেসের ঠাকুর চাকরের ভাগ্য নতুন করে উদিত হবে, এমন মনে করার কোনোই কারণ নেই। চাকরিতে তাদের এমনিই কোনো নিশ্চয়তা নেই। মাইনের অঙ্কও নানা জায়গায় নানারকম। আর মাইনে বাড়াবার তেমন ক্ষমতাও নেই মেসবাবুদের। ইউনিয়নের উদ্ভব ঘটলে মেসগুলির দেউটি একে একে নিভে যাবে। আর তখন কোথায় যাবেন হতভাগ্য মেসবাবুরা, আর কোথায় বা যাবে তাঁদের রন্ধনবন্ধু?

মেসের বাবু থেকে শুরু করে সবার অবস্থাই খানিকটা মেসের আবশোলাগুলোর মত। যতোটুকু ফাঁক যতোদিন আছে, তাতেই মাথা গুঁজে কায়ক্লেশে কোনো রকমে দিন গুজরান করা। কিন্তু যেদিন চুনকাম করা হবে মেসের ঘরগুলিতে, সেদিন কোথায় যাবে বেচারী আরশোলাকুল? ফলে মেসের ব্যাপারে সংস্কারসাধন করা আর একে বিনাশ করা একই বস্তু। যেমন একটি বিষফোঁড়া অপারেশন করতে গিয়ে, সমগ্র পাটি কেটে ফেলার কোনো অর্থ নেই, তেমনি মেসের যা কিছু যেমন ভাবে আছে, রেখে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ, অন্যরকম করতে যাওয়াটাই অর্থহীন। তবু এক আধদিন ছুটি কি কিছুটা মাইনে বৃদ্ধি করা যদি সম্ভব হয়, করে দেখার অসুবিধে কি? একথা ঠিক মেসের ঠাকুর-দের অনন্ত সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে এই সমস্ত চেষ্টাই একটি বুলডোজারের বিরুদ্ধে একটি পিঁপড়ের বিরুদ্ধবাদী চাঁড়া তোলার মতোন।

কলকাতার অধিকাংশ মেসের ঠাকুর ও চাকর সরবরাহ করে থাকে মেদিনীপুর-উড়িষ্যা সীমান্ত। এঁদের অনেকের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সব কিছুই আছে। এরা প্রায় অশিক্ষিত ও অজ্ঞ, ভগবৎ-বিশ্বাসী ও মস্তিষ্কহীন।

ঠাকুর চাকরদের মধ্যে শতকরা ৮০ জনই অত্যন্ত সুন্দর ও নিরীহ প্রকৃতির। বাকী ২০ ভাগের প্রকৃতি একটু চড়া; চড়া হওয়ার যথেষ্ট ব্যাকরণসম্মত কারণ আছে। যে ৮০ জন বরং নিরীহ প্রকৃতির তারাই বিস্ময়ের কারণ। মেসের অধিকাংশ বাবু এদের সম্পর্কে দারুণ উদাসীন: শীতের সময় কাঁপতে কাঁপতে এরা ঘর-বার করছে এই দৃশ্য কলকাতার যে কোনো মেসের পরিচিত একটি ছবি। পায়ের তলায় আঙুলের ফাঁকে চিরকালীন হাজা। মেসের সর্বাপেক্ষা খারাপ স্যাঁতসেঁতে ঘরটিই রান্নাঘর। সেই ঘর এদের কর্মস্থান, আহার ও বসবাসের জায়গা। এদের প্রায় সকলেই ঠাণ্ডা-জনিত বুক ব্যথা ও বাত রোগের শিকার। রোগকে এরা ততো সম্মানিত বস্তু মনে করে না। সুতরাং কোন রোগের চিকিৎসারই খুব বেশি প্রয়োজন আছে বলে এদের মনে হয় না। এরকম মনে না-করার সুবিধে হয়েছে এই যে এদের একটি প্রয়োজন অন্তত কমেছে। কলিকাতার হাসপাতালের অউটডোর আছে—খুব প্রয়োজনে এক আধবার সেখানে যাওয়া যেতে পারে।

পৃথিবীতে আর ডোডো পাখি নেই, আশ্চর্য সব পুরাতন সভ্যতার নগরী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অদৃশ্য, মেসের ঠাকুর-চাকর সম্প্রদায় কিন্তু আজো আছে। এর কারণ সম্ভবত প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারা: তিমি মাছ এক সময় ডাঙায় ছিল বলে শোনা যায়। শুধুমাত্র আত্মরক্ষার তাগিদে তাকে যেন নিতে হয়েছে জলে বসবাস করবে। মেসের ঠাকুর-চাকরেরা অবশ্য দরকার অভাবকে মেনে নিয়েছে। এভাবে আরো কতদিন এরা থাকবে, জানা যায় না। কিন্তু ফাঁস ক্রমশ ছোটো হচ্ছে, গলায় চেপে বসছে। শরীরে যথেষ্ট তাগদ যাদের নেই, যারা বয়স্ক হয়েছে তারা মাঝে মাঝে এক প্রবল জ্বরের তাড়সে শয্যা গ্রহণ করে। তখন ঐ ভিজে, বান্নাঘরের মেঝেয় তাদের শয্যা পাতা হয়। বোগশয্যা বলতে ছেঁড়া-খোঁড়া এক বাস দুর্গন্ধময় কাঁথাকানির স্তূপ। বাবুদের খাওয়া-দাওয়ার মাঝখানে দেয়াল ঘেঁষে পড়ে থাকে ও কুঁকিয়ে চলে। এবং এক সময় আবার উঠে দাঁড়ায়। হাতা, খুন্তি, হাঁড়ি ও ডেকচিদের জগতে আবার ফিরে যায়। এদের রোগ জ্বালায় কারো সেবা শুশ্রূষা পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ঠাকুর জ্বরে পড়লে, চাকর তাকে সকলের খাওয়া-দাওয়ার শেষে কখনো একটু-আধটু বার্লি গরম করে দেয়। এইভাবেই চাকর জ্বরে পড়লে ঠাকুরই একমাত্র সহায়ক।

কিন্তু বাবুদের অসুখ বিসুখে এঁদের শুশ্রূষা করার কোন অন্ত নেই। তখন মেসে সাধারণ ডিউটির পরও অসুস্থ বাবুটিকে শুশ্রূষা করা আরো একটি কাজ হয়ে দাঁড়ায়। অফিসে সবাই চলে গেলে, যখন একা শূন্য ঘরে অসুস্থ বাবুটি নানারকম যন্ত্রণার শব্দ তুলে বিছানায় আছাড়ি-পিছাড়ি খায়, তখন এদের হাত মাতৃমমতায় কি স্ত্রীর অনুরাগে সেই অসুস্থ বাবুটির মাথা ধুইয়ে দেয়। ওষুধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করে। এই বাবুটিই পরে যে আবার তার সঙ্গে মানবোচিত ব্যবহার করবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

ঠাকুর চাকরদের মমতার ছোঁয়া শুধু বাবুদের ঘিরেই নেই, রন্ধনশিল্পের অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রগুলিও ঘিরে আছে। বান্নাঘরের মেঝেয় পড়ে থাকা বাটি কোনো বাবু অসাবধানে ডিঙিয়ে গেলে যথেষ্ট চটে ওঠে। এদের ধারণা ঐ ভাবে অসম্মানিত বাটিতে মানুষের হাত পা কাটার সম্ভাবনা প্রবল। এ ব্যাপারে এদের যুক্তি খানিকটা আবছা ধর্মঘেঁষা। যদিও প্রকৃতপক্ষে এর আরো নানা কারণ থাকতে পারে। আবার উনুনের ওপর পা তুলে শীতকালে গা হাত পা সেঁকা এরা বস্তুত অপছন্দ করে। কেননা, আগুন নাকি সাক্ষাৎ দেবতা। এই সমস্ত থেকে মনে হয় রন্ধনকে এরা অজ্ঞাতসারে হলেও একটা শিল্প বলেই মনে করে থাকে। কোনো লেখক যদি তাঁর কলমকে, শিল্পী যদি তুলিকে সম্মানিত না করেন তাহলে যেমন অস্বাভাবিক মনে হয়, এঁরা রন্ধনশিল্পের অঙ্গগুলির প্রতি অসম্মান করলে তেমনি অস্বাভাবিক হোতো।

মাঝারি গোছের একটা মেসের ঠাকুরের মাইনে বড় জোর ৫০।৭০ টাকা। চাকরের ৩৫।৪০ টাকা। থাকা খাওয়ার খরচা নেই। এতো সামান্য টাকায় দেশের পরিবার প্রতিপালন যে কিভাবে সম্ভব, তা এরাই জানে। বস্তুত সম্ভব নয়। অথচ এদের সন্তান-স্নেহ কি স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা যে কোনো বড় কমার্সার্নের কোন হোমরা-চোমরার থেকে কম হওয়ার কথা নয়। কেননা এদেরও রক্তের রং লাল ও হৃদপিণ্ড একইরকম শব্দময়। সুতরাং মাসের শেষ দিন মেসের বাঁধাধরা গ্র্যান্ড ফিস্টের বারে এবং কুম্ভনগরের সদ্গোপবিয়ারা কি কে সি দাসের মিষ্টিতে কামড় দিতে গিয়ে, দেশের বাড়িতে টিউটিউতে রুগ্ন ছেলেটির কথা ভেবে মিষ্টির স্বাদ গ্রহণ করতে ভুলে যায়। এদের এই মনস্তাপ ও গোপন কান্নার রহস্য অবিবাহিত শহুরে বিলাসী মানুষের পক্ষে একেবারে বোঝা সম্ভব নয়।

মেসে কত রকমারি চরিত্রের মানুষের ভিড়। একটা ছোটো মিনি পৃথিবীর মতো। কেউ যোগাসনে মত্ত নিজের চৌকিতে। কেউ ঈশ্বরের আরাধনায় ব্যস্ত। কারো শখ ইনিয়ে বিনিয়ে কবিতা

লেখাব। কারো দিনরাত কাপড় কাচাব ও মুখে সাবান ঘষার ঝামেলা। সকলেরই ঝক্কি ক্ষুদ্র দুটি মানুষকে পোষাতে হয়। তাদের মেজাজও নানারকম। সকাল থেকে যে ব্যস্ততাব শুরু বেলা দেড়টাব আগে তাব শেষ নেই। বাবুরা অফিসে চলে গেলে তখন খাঁ খাঁ করা নির্জন মেসে শিহিল সময় নেমে আসে। ঠাকুব-চাকরদেব বেক-ফাস্টের অবসর ঘটে। বাইরে থেকে সন্তর্পণ পদক্ষেপে আসে তাদের সুচারজন দেশের লোক কি বন্ধুবান্ধব। তাদেব সঙ্গে গল্প করতে করতেই উনুনে বসিয়ে রাখা রাত্রিবেলাব ডালে তারা কাঠি ঘুরিয়ে দেয়, ও বেলাব তরকারি কুটে রাখে। কিংবা ঢাল থেকে কাঁকর বাছে। গম ফুলোয় ঝেড়ে নেয়। নিভে আসা উনুনেব ছাই ঝাড়ে। ন্যাতাজল সহযোগে উনুনের পাড় পরিষ্কার করে রাখে। সপ্তাহ-খানেক পরপর বান্নাঘরের মেঝেটিকেও সোডা ও জল ধৌত করতে হয়। এই করতে করতে বেলা বাড়ে। এবং মেসের স্বল্পতম জলে সংক্ষিপ্ততম স্নানপর্বটুকু সেরে কাঁকর মিশ্রিত তলানি পড়া ফুরফুরে ভাত খেতে বসে। এরপর রান্নাঘরের মেঝেতে ভাতঘুমটুকু সেরে নেয়। ঘুমে বলা তিনটে হয়। ঠং-ঠং শব্দে পাশের গলিতে আসে কাঁসার বাসন বিক্রেতা। কলতলায় এঁটো কাঁটার মধ্যে কাকের ডানা ঝাপটানির শব্দ শুনে ঘুম ভাঙে। কাক তাড়াতে উঠে দেখে ছুর ছুর করে কলে এসেছে—বৈকালিক জল। আবার কাজের শুরু।

কলকাতার আশপাশ থেকে অর্থাৎ ৭০।৮০ মাইলের মধ্যে যাঁদের বাড়ি, সেইসব বাবুরা প্রতি শনিবার অফিস করার পর আর মেসে ফেরেন না। অফিসার কি অফিস সুপারিনটেন্ডেন্টকে ভুলুং-ভালুং দিয়ে তাঁরা শনিবার দুর্গা দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়েন সকাল সকাল। কোনো লোকাল ট্রেনে শেয়ালদা হাওড়া থেকে, কপিটা, শ্যাকটা, শাকালীন লাল গুন্ডার টমাটো কিনে থলি ভর্তি করেন। বাড়িতে অপেক্ষাতুর প্রোষিতভর্তৃকার জন্য কেউ কেনেন, স্নো পাউডার, কিংবা বউয়ের মনপছন্দ কোনো বস্তু। লুকিয়ে ব্যাগ-গহ্বরে তাও নিয়ে যান। যৌথ-পরিবারে বসবাসকারীকে স্ত্রীর উপ-হারের ব্যাপারে খুবই সতর্ক হতে হয়।

আর যেসব মেসবাসীরা কলকাতা থেকে ১৫০।২০০ কিমি দূরে থাকেন, তাঁদের বাড়ি যাওয়া সহজে ঘটে না। কোনো বড় ছুটির অপেক্ষা করতে করতে তাঁদের বিষণ্ণ ছোটো ছুটিগুলি কাটে। তবু শনিবারের মেসের চেহারা অনেকটা শুকিয়ে আসা নদীর স্রোতের মতো। ঠাকুর-চাকরদের মনেও শনিবার থেকে রবিবার রাত্রি পর্যন্ত কেমন একটু ছুটি ছুটি ভাব। অল্প যে কজন শনিবার মেসে থাকেন, তাঁরাও সহজে নির্জন মেসে কিরতে চান না। আশপাশের হলে যেসব ফিলিম চলছে, তারই একটায় অনায়াসে ঢুকে পড়ে ঘণ্টা-পাঁচেক মহা আনন্দে কাটিয়ে রাত্রি হলে ফেরেন তাঁর নিজস্ব বন্দীশালায়। মেসের এক্টেবে ছোটো ঘরে।

শৈশব থেকে যৌবন, যৌবন থেকে ধার্ধক্যের দিকে যেতে যেতে যেমন কলকাতা বহুবার তাকে পেরেকে ছিন্ন করেছে, তেমনি আনন্দিত করেছে অনেকানেকবার। হঠাৎ এক একদিন যে বেঁচে থাকার প্রতি তাঁর অনাস্থা কেটে গিয়ে গভীর শান্তির রেখা এসে লেখা দিত, সেগুলি তো কম আনন্দের ছিল না। ইতিমধ্যে তাঁর পুত্র হাঁটি-হাঁটি পা পা করতে করতে তাঁর অজান্তেই কবে যেন লেখাপড়া শেষ করে চাকুরিতে প্রবেশ করেছে। ছেলের এই চাকুরি প্রাপ্তির সংবাদ একদিন মেসের অন্ধকার ডাকবাক্স হাতড়ে পেয়েছিলেন। এবার তাঁকে কলকাতা ছেড়ে যেতে হবে। এবার তাঁর অবসর। অর্থাৎ যে বিরাট মেসিনের একটি সামান্য বল্টু তিনি ছিলেন, ঐ মেসিনে লেগে থাকার যোগ্যতাও তাঁর আর নেই। এই প্রথম একটি প্রচণ্ড শূন্যতার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি ভাবছেন তাঁর বাকী করুণ রঙিন পথটুকুর কথা—যা কেবলই সবলবেধায় মৃত্যুর দিকে গেছে। প্রকৃতপক্ষে জীবনের নানান খুচরো স্বাদ তাঁর স্পর্শেন্দ্রিয় সাধ্যমত গ্রহণ করেছে—একমাত্র তাঁর অজানা মৃত্যু। ঠিক ততোটা অচেনাও যেন নয়—কেননা এই সময় ঐ মানুষ শেষ দীপশিখার মতো কল্পনার আগুনে জ্বলে উঠে নিজের জন্যে একটা মৃত্যুর দেশকে দেখে নিতেও পারছেন। এরকম দিন ফুরোনো কোনো ব্যাকুল-সাঁঝে তাঁর মনে হয় ঘরের ভেতর যে ড্যাম্পের দুর্গন্ধ একদা তাঁর মনে হয়েছিল অত্যন্ত ঘৃণ্য, এখন আর তাকে ততো খারাপ লাগছে না তো। পাড়ার যে উঠতি মস্তানটিকে তিনি বরাবরই ভয়ের চোখে দেখেছেন, তাকেও সহসা বেশ মানুষ মানুষ মনে হয়। ঘরের ছাদ থেকে ম্যাডমেড়ে অদ্যিকালের ফ্যানের মুণ্ডুতে যে নকশা, তার দিকে তাকিয়ে তিনি মুগ্ধ হয়ে যান। কেন আরো মন দিয়ে তিনি নিজের চারিপাশকে দেখেন নি ভেবে, নিজেকে ক্রমাগত ভিরস্কার করতে থাকেন। মেসের চারপাশের পারিবারিক ও পাড়ার চলমান জীবনকে তাঁর মনে হয় উপন্যাসের সুন্দর ঘটনার মত। এ-বাড়িতে দুঃখ ও বাড়িতে আনন্দ। মেসের বাঁ-পাশেই বিবাহবাড়ি ডাইনে শ্রাদ্ধগৃহ, সবই তাঁর মনে হয় এক চমৎকার মিশ্র শিল্পের মত। এই কাঁথাশিল্পের মধ্যে তিনি ছিলেন একটি ক্ষীণ ফুল। কেউ তাঁকে কোনো দিন বলেনি তো তাঁরও জীবন ছিল মূল্যবান। এতদিন পর মনে হয় একটি রত্ন পাথর কিভাবে যেন এতদিন ধুলোর অন্ধকারে ঢাকা পড়ে ছিল। আজ একটু ফুঁ দিতেই স্পষ্ট হয়ে উঠল তার ঔজ্জ্বল্য। কেন এতদিন তিনি এব সমতাসেবা করেননি ভেবে তাঁর চোখের কোণে ফুটে ওঠে এক বিন্দু অশ্রু। পরক্ষণেই শোক থেকে নিজেকে তিনি মুক্ত করে নিতে পারেন। তিনি বুঝতে পারেন, জীবন এভাবেই কাউকে তিরস্কৃত কাউকে পুরস্কৃত করতে করতে পল্লবিত হয়। সব মানুষের সমগ্র জীবন-ব্যাপী এই যে শিল্প এখানে কলঙ্কের স্থান নেই। আজও বেঁচে থাকাকে কেন তিনি তাহলে বলবেন না নদীর উজ্জ্বল সাদা বালির খাড়িয়া

শওকত ওসমান

'মূর্খের মত অন্ধকারে ঝাঁপ দিতে আমি অক্ষম। মৃত্যুর পর আর কোন যন্ত্রণা নেই, যদি কেউ ভজিয়ে দিতে পারত, তাহলে আমি আত্মহত্যা করে এখনই সব জ্বালা জুড়িয়ে ফেলতাম, জুড়িয়ে ফেলতাম।'

বাষ্পাস্তর অর্তস্তর—ভৈরবের নিকট-গতী মেঘনার উপকূলে, জগন্নাথ ঘাট-নির্মিত ধমুনার তীরে, কি পদ্মা-তিস্তার গ্রাম-জবীপ শিকলের মৃদু-মলয় ঝংকারে যা যেখানেই যাও,' শ্যামসবুজ ছায়া ইস্তামতীর নড়ুতিব আত্মীয়তা-লগন হাজার হাজার মাইল—সমলয়ে এগোতে থাকবে দিকচক্র-বালের খোঁট-অভিমুখী, যেন অশ্রুপীড়িত কোন স্নেহার্দ্র উমেদার. বাধ গোটা. অগ্রই গাত্র হয়ে গেছে. বাহু প্রসারিত থাক বা নেই থাক। বেইমান, বিশ্বাসঘাতক বাতাসের অংশ হসেবে নিঃশ্বাস গ্রহণে ঘোর ঘেন্না থাকলেও নিসর্গ-শোভার জুলুমের নিকট আত্মসমর্পণই তখন খোলা পথ প্রত্যেকের জন্যে। স্বর জমাট হয়ে থাকে হলকুম বা কণ্ঠনালীর পথবাহী আবো অভ্যন্তরে। আটপৌরে কথায় বুক, পাজর ইত্যাদি নিদর্শন-গত নাম এত দেওয়া যেতে পারে যদিও কিছুই সেখানে চিহ্ন রাখে না। বরং যায়-বাবীয় ধারায় নির্তোড ভেসে বেড়ার বসন্তদেব যাক্ষর বা দীর্ঘশ্বাসের নোটীশ টানিয়ে দিতে।

'আমার পক্ষে সব নিষেধ, বাক্য নিষেধ, স্পর্শ নিষেধ, দৃশ্য নিষেধ—প্রিয়াপ্রিতি যাদের বাস। আমি পরাতন কোন দেউড়ির থাম, যেহেতু আমার দুহিতা ধর্ষিতা, যে চোখ তোলে না সংক্ষিপ্ত প্রয়োজনে সারা দিনেও, আর একবার যদি মুখ খোলে. তার চোখের জল আমি দেখার সুযোগ পাইনে, আমারও চোখ অজানিত জলেই ঝাপসা হয়ে থাকবে দরুন. কোন বার্ধক্যজনিত টানে নয়। নিরপরাধকে ক্ষমা করার সুযোগ আসে, এমনও ঘটনা ঘটে, তাই জামাই ভ-কে ক্ষমা করেছিল বৈকি। সে—।'

'ক্ষমা যেখানে করুণার উপর ঝুলে থাকে সেখানে বক্ষিতা বা পরিচারিকা বাস করতে সক্ষম, কোন স্ত্রী নয়—অধিকার-সচেতনতার মধ্যে যার আকাঙ্ক্ষার হরিণ চরণভূমি খুজে বেড়ায়।' সংকুচিত ব্যক্তিত্বের প্রসারও বটে নিজস্ব ধারার অন্তর্গহনে প্রবেশের পর। সদর-দরজা রুদ্ধ

করা হয় যদিও নিরাপত্তার প্রতি নির্বেদ, অথচ কৃপণের মত সম্পদ-দর্শনের আশাটুকু থাকে—যেখানে পুনরাবৃত্তিই সংখ্যা-বৃদ্ধি-জাত আনন্দের উৎস। এমন স্থলে ঘুমোনো চলে, স্বপ্নের আওতায় অস্তিত্ব-বিসর্জিত পদচারণায়, গতির কোন হদিস না রেখে, দিকের অবয়ব দু'হাতে মুছে ফেলে আর এক ধরনের হোচট খাওয়ার তাড়না। অথচ কোথাও আমার কোন চিহ্ন থাকত না। শেষে বিপত্নীক পিতার আশ্রয়ে ফিরে এসেছিলাম একদিন, কোন একদিন, পাঁজির মাহাত্ম্য দেখার প্রয়োজন ছিল না নিজেকে অভিপ্রেত মঙ্গললোকে প্রতিষ্ঠাকল্পে। ধাঁচা এক ধরনের গতানুগতিকতার চাকা রূপে গড়িয়ে চলল, সন্তর্পিত নিস্তব্ধতার উঠানে বন্দী। বুক ভরে রইল দুর্দম্য ভাবে যদিচ টাল-সামলানোর দায় যথারীতি বর্তমান। মুখ-থুবড়োনো আকাশকে দু'হাতে ঠেলে সরানোর প্রচেষ্টা স্বাভাবিকতার একটা হিল্লে হতে পারত, কিন্তু সামনে তেমন কোন কিছুর ইঙ্গিত থাকে নি। ধূসর রং ক্রমশঃ ধূসরতার বিস্তারে নিরেট যেন সকল কোমলতা-খসা পাহাড়, আশপাশে থাদের বহর। কল্পনা-শক্তির অধিকারী, যান্ত্রিকতার মধ্যেও প্রাণ-সঞ্চারব্রতী মানুষের নিকট দিন-রাত্রি মাস বর্ষ শুধু ঋতু পরিবর্তনের স্মারক হয়ে থাকে না। নিষ্ক্রিয়তা তদস্থলে এক ধরনের অনুঘটক প্রাণ-বহ্নির অথবা ভবিষ্যৎ কালের —যার আবছা ছবি চোখের উপর যাদুদণ্ড ছুঁইয়ে অস্তিত্বের গোড়ায় রস যোগায়।

অসহায় জরাক্রান্ত পিতার সান্নিধ্য তাই শুধু শুশ্রূষা সেবার বাহানা ছিল না আমার নিকট, যদিচ তিনি কৃতজ্ঞতার বোঝা বুক-উজাড়ের পন্থায় এগিয়ে আসতেন মমতার স্বর-রূপে, মৃদু কণ্ঠ, কম্পিত হাত আমার হাতে তুলে দিতে। আমি আরো পাথর হয়ে যেতাম অপমান-জর্জর আঘাতে। আমার কণ্ঠ স্তব্ধতার হিমাদ্রি, সব জমাট যাতাস গুমরিয়ে ওদিকে আটকে দিত। অথচ দম ফেলার এমন অবকাশ ও সুযোগ কে কবে অবহেলায় ঠেলেছে? বিষবৎ পুরুষ-সান্নিধ্য আত্মীয়তার তোয়াক্কা মানত না, রাখত না কোন শিষ্টাচরের বেড়ি, যদিও ইচ্ছা সর্বে-সর্বা হওয়ার জন্যে নিঃশ্বাস নিতে সর্বপ্রকার কৌশলের বিকল্প একের পর এক গ্রহণ বা ত্যাগ করত—দুই-ই যেখানে সমান। শুধু মানুষে মানুষে ব্যবধান মাপ-গত নয়, পর্যায়-গত এমন অন্ধিসন্ধিক বাহার যে স্বয়ং সৃষ্টার পক্ষে হিসেবও অতি অসাধ্য। দিবস-রজনীর নাটাই ইন্টারভ্যাল ছিল যখন পিঠা-পিঠি মাত্র বয়সে এক বছরের তফাৎ ছোট ভাই রাজা আপন ব্রত—অবকাশে এখানে ছিটকে পড়ত। হ্যাঁ, তা-ই। কারণ সে যেন ভিন্ন আকাশের নক্ষত্র। মানবজীবনের সঙ্গে আকৈশোর বোঝাপড়া-কারী। মুক্তিযোদ্ধা ছিল বিলোনিয়া এলাকায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে—যার দহন-জ্বের আমার অবশেষ শুধু পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে ক্ষান্ত নয়, অনেক ঝলসানি রেখে গেছে এই টাটকা গতয়ে, পিতার বিপরীত মেরুকেন্দ্রে। রাজা রাজা-ই— দুঃখের মোকাবিলায় খাড়া শিরদাঁড়া, স্মিতহাস নয়ন এবং অধর টানটান—হিংস্রাজের কর্দম-কূপে পতিত কোন গোয়ান-চকে কাঁধ দিয়ে মোতায়েন।'

'এ-ই— বোন খাঁদী, (তোর ডাক-নামটা এদেশের মেয়েদেরই যোগ্য) তুই অমন চুপচাপ থাকিস কেন? এই জন্যে আমাকে কসম খেতে হবে—আর বাড়ী আসব না, তুই যদি একটু সহজ না হতে পারিস। স্মৃতিগৃহ জতুগৃহ। দরজা থাকে না। সবাই তা জানে বলেই ত মানুষ গবাক্ষ তৈরি করে এবং সেই পথে নিষ্ক্রান্ত গাছপালা পশু-পক্ষী প্রকৃতির লীলা-সহচর সেজে সব তাগদ-সঞ্চয়ের পর আবার আত্মকেন্দ্রে ফিরে আসে। সেখানে প্রত্যাবর্তন অবধারিত, নিয়তিও নিয়মবন্দী। বর্ষাকালে কচু-ক্ষেত-পথে, উপায় নেই, যেতে হয়েছিল বলে কবে গায়ে কেঁচো উঠেছিল এবং কবে তা ঝটকায় ফেলে দেওয়া এবং বুটের দলায় খতম। অথচ তোর মাতম (বিলাপ) খতম হল না। তিন বছর কেটে গেছে। তিন শ' বছর এক লহমায় কেটে যায় যদি মনের পর্দাগুলো তুমি ঠিকঠিক আবার বাজাতে জানো আঙুলের ছোঁয়ায়, রক্ত এবং বাইরের শব্দের মেল-বন্ধনে। শিক্ষিত লোক? ছিঃ, শিক্ষিত লোক তোর অফিসার স্বামী। আমি জানি তা নয়। না। লেফাফা-দুরস্ত, ঠাকুর-প্রতিমার ভেতর খড়-বিচালি। বাংলাদেশের রূপে যারা মজেনি, তারাই যে কোন রকমের ঘাতক-আততায়ী। ঠুনকো সংস্কার তাদের উপর ওইভাবে চেপে বসে। আসলে লোকটা নরাকার। বেশ করেছিস। ভেতরে ভেতরে আমরণ দোজখ জেলে বাইরে মুখোস যথা-যথ-বক্ষী দেঁতো হাসির প্রাণান্ত মহড়া অন্ততঃ তোকে আর দিতে হবে না কারো নিকট। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ফেলের অধম হয়, এ-ই তার এক আদর্শ নমুনা হয়ে থাকত তুই যদি তেমন গৃহবধূতের গর্তে আবার ঢুকে যেতিস। মরুভূমির মধ্যে একগাদা উটের মধ্যে বাস করতে হত, মানুষ মিলত না। কিন্তু তোর খোয়ার চেহারা দেখার জন্যে, স্তব্ধতার সঙ্গে মোলাকাতের জন্যে আমি বাড়ী আসি নি আমার কাজ ফেলে। প্রতিমা হতে যাসনি কোন দিন। পুতো পার, কিন্তু নিজে প্রাণহীন অনড়তার শিকার। আমি কথা রেখেছিলাম..।'

'বৃন্দেরা চেয়ে থাকে দিগন্তের পানে সূর্যের সঙ্গে নিজেও অস্তমিত হওয়ার প্রেরণায়, বাসনায়—এই ঝুট কথা আবহমান কাল থেকে চালু আছে। ঝুট, ঝুট কথার ব্যাপকতা শুধু স্থানে ঘেরা পড়ে থাকে; যারা বলে, তাদের বাক্যি জিহ্বা-নিঃসরিত নয়। দিগন্ত ছুতো মাত্র। অস্তিত্বের সকল ঠেস্ মাটির উপর, মাটির উপর যা খাড়া তার উপর। অর্থাৎ নিজের গণ্ডীবদ্ধ আশপাশ জানান দিতে থাকে : আমি তোমার কন্যা, আমি তোমার পুত্র—আমার দিকে না তাকালেও তুমি তাকিয়ে আছো যদি চোখ বন্ধও থাকে। ওপারের সম্বল এপারের সম্বলের বনিয়াদে প্রতিষ্ঠা পায়।' কিন্তু নসীবের মোচড় আমার দুই সন্তানকে দুই দিক ছিনিয়ে নিয়ে গেল। মেয়ে গেল পর-গৃহে রেওয়াজ-অনুযায়ী সমাজের মুখ-রক্ষায়। পুত্র গেল একই গন্তব্যে ভিন্ন সড়কে—সমাজব্রতী, সর্বপ্রকার কদাকার মুখে সৌন্দর্যের অনুলেপন মারফৎ জেল্লার ভাব যার মত আর্টে অনেকের। কিন্তু অনেক ত একের জন্যে প্রতীক্ষা করে। সেই ডাক সবাই শুনতে পায় না। আমার রাজা ছেলের বেলা থেকে তার কর্ণপটে একটি সুরই গ্রহণ করেছিল, যা হয়ত সকল ঐকতানের জনক। আমি একা, বিগত-দার বলে নয়, একাকীত্ব আমার অস্থি মজ্জায় ঋতু-পরিবর্তনের ইশারা-আচড় দিতে নির্বিকার। নিঃস্বতার চৌহদ্দি যখন প্রতিদিন বিস্তারমান যুক্তের সঙ্গ পায়, সব আবেগের এক-একটা বিন্দু অস্থিরতার প্রবাহেই গা সঁপে দেয় এবং আর কিছু করার থাকে না, অমোঘকে নিষ্প্রাণ চেতনার ছকে ফেলে দেওয়া ব্যতীত।'

'রাজা বেশী দিন লাগেনি তার বাকি রক্ষা করেছিল। পাকিস্থানী বাহিনীর একটা পুরো প্ল্যাটুন উড়িয়ে দেয়, পেছনের জীপের চারজন অফিসার সহ কুপোকাৎ। সহোদরের পক্ষে ভগ্নীর বেইজ্জতির বদলা—প্রতিশোধ—গ্রহণ অস্বাভাবিক কিছু নয়। তা আমি জানি এবং যখন জেনেছিলাম, স্বতস্ফূর্ত আনন্দ দৌড়ে আসার কথা। কিন্তু আমি শুধু কানে শুনেছিলাম। পুলিশ হৃত-সম্পত্তি উদ্ধার করলে, মালিক তখনও ফেরৎ পায় নি। নিজেই সবিস্তারে বাজকীয় স্বাধীনতায় রাজা আমার কাছে বলেছিল, নৈশ-অভিযানে কটা গ্রেনেড একটা মেশিন গান আর পাঁচখানা রাইফেল নিয়ে অসম্ভবের সম্মুখীন তারা শেষে পানা বনের কী আশ্চর্য সৌজন্য পায় কয়েকটি গাছপালার আড়ালে—ফ্যোরিবিসন বোমার আলোয় যা দুশ্মনদের চোখ খুলে দিতে সক্ষম হয়নি। বিস্মৃতির ঘা যখন আর্ক খোচায় দগ্‌দগে হয়ে ওঠে, তার সুড়ুৎ-শোষের রসনায় বহুৎ স্বাদ ঢালে যেন শুকিয়ে যাওয়ার দাগ আর কোন দিন মিটে না যায়। প্রতিধ্বনি কী শুধু বায়ুস্তরের ব্যাপার?

না, মৃত্যুর অপর নাম কাল, আর কাল মরে না, পরিস্থিতির মধ্যে তার গতায়াত সর্বক্ষণ।'

'ইয়ে খুবসুরৎ বাঙ্গালী আওরত.. আবে দেখো.. দেখো... লেকিন হাম পহ্‌লে ...পহ্‌লে উস্‌কা বাদ জিস্‌কা মরজী চাহে.. খুদা কা কসম বিসমিল্লা হামারা..দেখো ভাই, আভি ইসকো তোমরা ভাবী বানা দেও হুঁ..... আভি।'

'প্রাবাদিক প্রেতের অট্টহাস নয়। প্রেতের কান্নাও মাঝে মাঝে ঘটনার বুকই হয়ে দাঁড়ায়, যখন সহোদর ভগিনীর বে-ইজ্জতির অবসান-কল্পে মরীয়া অসম্ভবের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে সকল বিবরণ-সহ।

'সিপাইটা কোন ইউনিটে ছিল, কোন সময়, কতজন ইত্যাদি ফিরিস্তিযোগে ইব্রাবতী থেকে ইচ্ছামতীর তীর পর্যন্ত

প্রেতার্তনাদ শোনো। আমার মত তোমাদের কান না থাকলেও অবগতির অসুবিধা ঘটবে না।'

'লেকিন ও বাঙ্গালী আওরত মরা নেহি কি'উ? জ্যায়সা লড়া মশোর কা গাঁও মে ওয়ে কিষাণ-আওরত।'

'এলোকেশী বিবসনা নৃমুণ্ডমালিনী-ভর কৃষক-বধূ হাতে ধারাল দা সূর্যস্নাত —বজ্রশফায়ারের চোটে ঝলসানো কবন্ধ এবং ঝাঁকরা। এমন উবুর প্রতি কারো কোন লোভ থাকার কথা না। অতীত-চকিত ছবি প্রেতাত্মার মুক্তির দোসর, অট্টরোদনের সহায়ক।'

'ও বাংগালী আওরত মরা নেহি কি'উ? তব হাম ত গুনাগার নেহি হোতা। কি'উ নেহি মরা? কি'উ নেহি মরা? আখোব হাম মর গয়া, গুনা কা সাজা মিলা....।'

'প্রৌঢ়তন্ত্র-পার বৃদ্ধজনও জেলের মত মাল গুটিয়ে নিতে তীর-পানে টানে। কিন্তু সে নিজেই তখন মাছ বনে যায়, তখন তাকে কেউ ফুঁফে নেয় এবং পরবর্তী সমাপ্তি অঙ্কই তার সার্থকতা। শুধু নিজেকে কারো হাতে সমর্পণের নেশাই প্রান্তবাসীর চরম কাম্য হয়ে দাঁড়ায় যদিও মানুষ মৎস্য নয়। যন্ত্রির সাহায্য নয়, অন্য স্নেহার্ত হাতের চেটোয় বন্দী হতে পারলেই প্রবীণ নিঃশ্বাস সহজ হয়—গ্রহীতা সাহায্য করুক বা নাই করুক। মা, তুমি আমার

নিয়মিত কিছু কিছু জমিয়ে যান— দেখবেন, আপনার যত সাধের জিনিস একদিন আপনার হাতের মুঠোয় এসে গেছে।

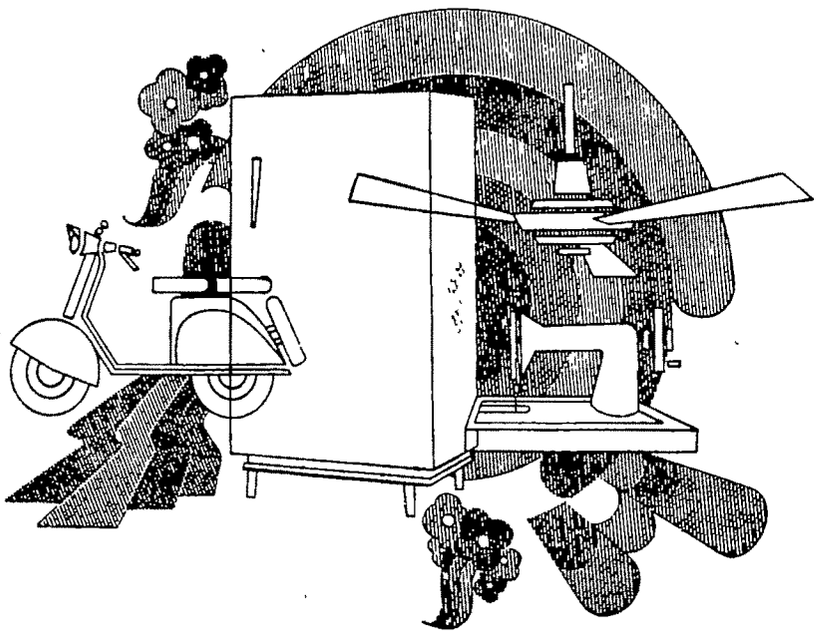

হ্যাঁ, এই আলাদীনের কাজই করে এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের রেকারিং ডিপোজিট স্কীম

সঞ্চয়ের এই পরিকল্পনাটির সবচেয়ে বড়ো সুবিধে হচ্ছে, মাসে মাসে কতো জমাবেন সেটা আপনার পছন্দমতো আপনিই ঠিক ক'রে নিতে পারেন। কমসে-কম ১০ টাকা থেকে সর্বাধিক ১,০০০ টাকা অবধি, আর তা-ও ১ বছর থেকে ১০ বছরের মেয়াদে—যা আপনার খুশি।

এতে সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে সহজেই একটা আয়ও দাঁড়িয়ে যায়। ফলে, মেয়াদ শেষ হলে মোট যা পাবেন তা আপনার জমা টাকা থেকে ৫০ শতাংশ বেশী তো হবেই....তার চেয়েও বেশী হতে পারে। এমনি করেই তখন ইচ্ছেমতো কেনাকাটার সুযোগ আসে, বহুকালের সাধ ও স্বপ্ন সফল হয়।

বিস্তারিত জানতে হলে আপনার কাছাকাছি এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের শাখায় আসুন।

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক

আপনার নিজস্ব ব্যাঙ্ক

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

D AB 3 BEN

কাছে আছো এবং বেঁচে আছো এই পরম নসীব। এমন নসীব সবার হয় না, যখন আর-আর জনে যে যার কর্তব্যে সড়কে সশব্যস্ত। রাজা ব্যাটা ছেলে, হয়ত আজকের দিনে ঘর তার পক্ষে মানায় না, চতুর্দিকে ঘর-ভাঙ্গা কম্পন যেহেতু বইছে ক্ষণনও প্রকৃতির প্রকোপে কখন বা মানুষের। দেহ আমাদের কাল, বাধা। জাঁইয়ে জাঁইয়ে ঠেলে বের করে দেবে মাটির উপর থেকে অভ্যন্তরে—মাটির সামিল। এবং অতঃপরের হদিস জ্ঞানী, মূর্খ সকলের নিকট সমান। গিরিখাদের কিনারায় বসে সূর্যাস্ত দেখার বাতিক কারো কারো থাকে। আমার তা হওয়ার কথা ছিল না। কালের ফেরেবে যেখানে এসে পৌঁছলাম সেই স্টেশনে কোন গাড়ী দাঁড়ায় না। ধোঁয়াধুলো, ঘটোৎকচ-শব্দ শুধু উপরি পাওনা হয়ে দাঁড়ায়। তুমি কাছে না থাকলে দুর্ভাব কাঁধে মুখ থুবড়ে পড়তাম এবং ঘষটে ঘষটে ইহকালের হাওলাৎ শেষ করতে হত কড়ায় গণ্ডায়। তোমার বাঁচার সঙ্গে এক খোঁট, আমার বাঁচা জড়িত। তা আমার চেয়ে অধিকতর তুমি নিজেও জানো। আমি তোমার মুখ দেখে টের পাই, চোখের দৃষ্টি যতই কমজোর হয়ে আসুক।'

'কালের অপর নাম সর্বনাশ। সর্বনাশের মৃত্যু হয় না, কালেরও না।'

'দায়িত্ব থাকে প্রত্যেক স্বামীর। ওয়াকিবহাল আমি তা পালনে কখনও কসুর করিনি। অথচ ভেতরের ফাঁক হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও আর ভরাট করতে পারলাম না বিধায় স্বাভাবিক হয়ে গেলাম যেন ভন্ডামির কোন অপবাদ আমাকে কোনদিক থেকে ছোঁকে না ধরে—এমনকি নিজের বন্ধুরও খোঁটামুক্ত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কতজন প্রাণ দিয়েছে ইজ্জত খোয়ানোর আতঙ্কে শিহরিত, এতটুকু দেরি করেনি নারীপ্রাণের মায়া কান্নায় কোন রকমে বাঁচতে। হাজার হাজার অবলা বলৎকৃত কি মৃত অথবা পাশবিক জুলুম অন্তে বেয়োনেটের খোঁচায় শেষ করার অপেক্ষায়—এমন যে কোন বিকল্প বাঁদীর ক্ষেত্রে ঘটতে পারত। মৃত্যু সেখানে কতো সম্মানজনক এবং সমস্যা নিবসনের বন্ধু, এখন পরিষ্কার বুঝতে কোন কষ্ট হয় না। বেঁচে গেল, বেঁচে রইল—তা হল কাল আমার নিজের, গোটা পরিবারের এবং সংশ্লিষ্ট বহুজনের, যাদের মুখ পশ্চাতে উন্মুক্ত। স্পষ্ট কোনদিন বলিনি, বলার সংকল্প গুরীবার ভেতর দপাদপির ছিল বৈকি, মরতে ত তখনই পারতে, এত যন্ত্রণাভার বইতে-সইতে হত না পৃথিবীকে, যদিচ তা সর্বংসহা।'

বাঁদি কোন এই দেশে কাজের কোন অভাব হয় না, বেকারের সংখ্যা চচ্চড় যতই বাড়ুক কাজ তোমার আমার সকলের আছে। এমন কী বেকারেরও কাজ আছে যেখানে বেহাই পাওয়ার কাজ এবং এমন ক্ষেত্রে এক দম নিষ্ক্রিয় অবসর-ভোগ নিতান্ত অন্যায়। বাপজানকে দেখার কোন লোক নেই, অর্থাৎ তোর মত দেখতে পারে এমন কেউ নেই। তাই কিছু বলিনি। নচেৎ আমি তোকে সঙ্গে করে নিয়ে চলে যেতাম। তখন কাজের চোটে তোর দম-রাখার ক্ষমতা কত বাড়ে তার পরিচয় দিস্। সে-চেষ্টা বৃথা যাবে না, নিজের কাছেই জবাব পাবি। হয়ত কারো তারিফের তোয়াক্কাই থাকবে না তোর।

'এবং রাজা চলে যাওয়ার ক'দিন পর হঠাৎ আমার স্বামী এসেছিল, প্রথমে পিতৃদেবের নিকট দরখাস্ত ও আর্জি সহ : ভুলচুকের একটা খেসারৎ হওয়া বাঞ্ছনীয় তিন বছর চলে গেলেও। উভয় পক্ষে পাল্লা সমান। অতএব পাল্টা অভিযোগ বা ধর্তব্যের কিছু থাকে না। সেই রাত্রে বিছানায় আমি আবার সেই বিদেশী আততায়ী, সৈনিকের সাক্ষাৎ পেলাম, পস্তাতে লাগলাম। পিতৃঋণ শোধের নানা উপায় থাকতে পারে সংসারে। কিন্তু ওই নতি-স্বীকার আর না। আমি ভুল করেছি। বাজার কোপন প্রতিধ্বনি লোকটা সম্পর্কে বার বার ব্যঙ্গ হেনে গেল : কাঁহা দার্জিলিং, কাঁহা ডাল্টবীন। ও লোকটা অফিসার, মানুষ? ?'

'লেকিন..লেকিন..ও বাংগালী আওরত মরা নেহি কিঁউ? হাম তো গুনাগার নেহি হোতা। গুনা সে বাঁচ যাতা। বহুত এ্যায়সা হুয়া। ছুনে কা আগে দুনিয়া-সে সাফ। কিঁউকে বন্দুক চালানে পড়তা। ও বাংগালী আওরত মরা নেহি কিঁউ? ?'

'মফস্বল শহর লড়য়ের প্রথম চোটের পর নীরব, প্রায় শান্ত। অথচ এমন উৎপাত শুরু হবে কোনদিন ভাবিনি। পিতার মাথার টুপি এবং চিবুক ভর্তি দাড়ির ঝোপে নিরাপত্তার ভরসা পেয়েছিলাম এবং তিনি ভরসায় থাকলেও বলতেন, 'জামায়ের এসময় তোকে এসে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল, আমরা কী আগল দেওয়ার আর তাগদ আছে ...আল্লা মালেক,' কোন চিন্তা নেই।' আকস্মিক হামলা, দরজায় বুটের লাথি, পিতার অসহায়তা, বাড়ির পেছনের উঠানে চিৎ-শয়ান আমি তখনও সংজ্ঞাহীন নই। যেহেতু টুকরো-টুকরো বোধ শক্তি বকতের চলাচলে লিখে যাচ্ছিল কোন দুরাগত সঙ্গীত-আর্তনাদ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কোন বৈদিক-মন্ত্র—সকল সমাপ্তির মুখে তা যেন মৃতজনের আত্মার শিবায় শিবায় পৌঁছায়। কিন্তু কোথায়, কোথায় মানুষের আত্মা? ? ?'

আমার জন্মলগ্নে বক্তাক্ত অঙ্গ জননীকে দেখিনি, তখন চোখ দৃষ্টির অর্থ বোঝে না। আজ আমার দেখার সুযোগ হল, দুর্ভাগ্য হল—নিজেরই অস্তুর, জননীর বেশে আমার দগ্ধিতা উঠানে ধুলোর উপর। আসমানের নীচে আল্লা ছিল না। ছিল অট্টালিকার আল্লাহো আকবর ধ্বনি বিদ্রোহীদের কণ্ঠে—অসহায়তার মর্দন-ভাণ্ডবে যাদের চরণ আকাশের মুখে ফুৎকার ছোঁড়ে অথবা লাথি মারে—নিজেদের মুখ বিকৃতির প্রতীক জানিয়ে। মরে যাইনি, মূর্ছা যাইনি, ভেঙ্গে পড়িনি। যেহেতু কর্তব্য দায়িত্ব নড়বড়ে শরীরেও অশেষ তাগদ গুঁজে দিয়েছিল আপন জননী তথা সন্তানকে পুনর্বার কোলে তুলে নিতে—একদা শৈশবের ঋণ পরিশোধ অথবা যুগ-সঞ্চিত ইমানের প্রতি শেষ কুর-কুটিল তপ্ত দৃষ্টিযোগে সব পুড়িয়ে ছাই করে ফেলার প্রচেষ্টায়। মড়া মানবতার প্রতি চোখ ফেলতে হয়েছিল, সকল পচা মড়ার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় পথচারী যেমন তা দ্রুত দেখে নেয় নাসারন্ধ্র রুমালে ঢেকে, দুর্দম্য কৌতূহলের বশবর্তী।'

'একটি নারীপ্রাণ সঞ্জীবন বাঁচার অধ্যবসায়ে, হে চিকিৎসক, আপনার এত মেহনৎ-ক্ষয় প্রয়োজন ছিল না। কী প্রয়োজন, জন্মের খেসারৎ শেষ পর্যন্ত যদি ভালো সান্ত্বিয়ে এগিয়ে দিতে হয় শুশ্রূষার জিহ্বাগ্রে, সকল অসম্মানের যূপকাষ্ঠে, জগঝম্প আশ্বিনের জমায়েৎ কুত্তা-দঙ্গলে—যখন তাদেরই এক সঙ্গীর বর্তিবন্ধ দেখে নিজেদের পালার প্রতীক্ষায় লেলিহান অঙ্গ। সৃষ্টা মার্কা বাস্টেড এমনই ঘটে।

'বেঁচে গেলাম মৃত্যুর মোক্ষবিলাস, সর্বস্ব-খোয়ার প্রাত্যাহিকতার মুখোমুখি আশ্চর্য আর এক অধ্যায়—যার মধ্যে অক্ষরের মিছিল থাকত অর্থহীনতার গতি-মুখ আঁকড়ে।'

'আজও স্বীকার করছি স্বামীরূপে দায়িত্ব ছিল। মন্ত্রপূত বন্ধনের জোর অথবা জোর। তার বেশী কেউ যদি আদায়-অভিলাষী হয়, আমি প্রদানে অক্ষম। সেখানে মনের সম্মতিই আখেরী বাস। পরিস্থিতি অনুযায়ী বলা যায়, মৃত্যু কোন সমাধান দিল না, মৃত্যুর বহর যখন ছাউনী পেতেছিল সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে।'

কালের আওড় যেন নদীর আওড়। সেখানে জলধারার চলৎ-শক্তি অব্যাহত থাকে। শুধু দিক পরিবর্তন হয়। সুরে অদল-বদল ঘটে। কখনও গর্জন, কখনও গুঞ্জন। বাংগালী আওরত মরা নেহি কিঁউ? হাম গুনাগার নেহি হোতা। প্রেতায়িত দিগন্ত, প্রেতায়িত প্রান্তর—সকল গাছপালা, জনপদের অন্ধিসন্ধি। অট্টকান্নায় ভেজা নয় শুধু, চিৎকার মাদুর মেলে যায় এবং অন্যদিকে চামড়ার মত আকাশ স্বয়ং গুটিয়ে আসে। বেঁচে থাকো, বেঁচে থাকো, মা। মরা নেহি কিঁউ? এর চেয়ে মৃত্যু ভালো। হ্যাঁ, মৃত্যু উত্তম হেন ক্ষেত্রে। মৃত্যুর অপর নাম কাল। অথচ কালের মৃত্যু হয় না। তুই বাঁচবি বৈকি, বোন। তোর বিহিংসিত আত্মা আগুনে পুড়ে পুড়ে হাঁতিয়ার তৈরি হবে। তুই বাঁচবি না তো কে বাঁচবে? কালের অপর নাম সর্বনাশ। সর্বনাশের কাল ঘটে না। বাঁচবি বৈকি তুই। হাম গুনাগার নেহি হোতা। মুখের মত অন্ধকারে আমি ঝাঁপ দিতে অক্ষম। মৃত্যুর পর আর কোন যন্ত্রণা নেই, যদি কেউ আমাকে ভাঙিয়ে দিতে পারত, তাহলে আমি আত্মহত্যা করে এখনই সব জ্বালা জুড়িয়ে ফেলতাম, জুড়িয়ে ফেলতাম।

শৈবাল মিত্র

তরণী পাহাড়ে বসন্ত

তাঁতিপাড়ার ঘরে ঘরে খুশীর হুল্লোড়। শাঁখ বাজছিলো, অনেকের বাড়ীতে। গণযৌজ শব্দটা মুখে মুখে ঘুরছিলো। টাউন কমিটির অনেকে অখুশী। তারা আসেনি। তাদের মত প্রকাশ্য কাজে পার্টির বিপদ বাড়বে। তবু সিদ্ধান্তটা বাতিল হয়নি। গোপনে প্রচার চলেছে। গরীব মানুষেরা আগেভাগেই জানতো।

চণ্ডীমণ্ডপের মাঠে তখন দাউ-দাউ আগুন জ্বলছে। স্কুলমাস্টার ফটিক মণ্ডলের বাড়ি থেকে বোর্ডের পরীক্ষার খাতা তুলে এনেছে কয়েকজন। খাতার বাণ্ডিলে বহ্যুৎসব। পুরোনো, বস্তাপচা শিক্ষা নিপাত যাক। ঘন ঘন শ্লোগানে গমগম করছে চারপাশ। পুলিশ, মিলিটারি, মৌকিদার—কারো পাত্তা নেই। বাবলু চটেছিলো মোতির ওপর। এ-ঘরের মূলে আছে মোতি। খোলামেলা কাজ করার লাইন দিচ্ছে ও। বাবলু ভাবে পার্টি ভাববে। তবু এই উৎসবকে ও এড়াতে পারে না। চণ্ডীমণ্ডপের উঁচু বেদিতে দাঁড়িয়ে রঞ্জন বক্তৃতা দেয়। পার্টি, গণফৌজ আর যুক্তফ্রন্ট—এই তিনটে হলো বিপ্লবের মূল হাতিয়ার। বক্তৃতার পর গান, হলো আবৃত্তি। ভিড় বাড়ে। খুশিতে উপচে পড়ে। ছেলেমেয়ে, যুবতী, বৌ সকলেই হঠাৎ কি এক মন্ত্রে জেগে উঠছে। সকলের চোখে-মুখে সতেজ স্বাধীন ভঙ্গী। দুনিয়াটাকে যেন নতুন চোখে দেখছে। ভয়, জড়তার চিহ্ন নেই। অজিত বুঝতে পারে, একটা মুক্তাঞ্চল গড়ে উঠছে।

তাঁতিপাড়ায় এখন এমনিতেই একটা খুশীর হাওয়া বইছে। পুরোনো কিছু অবিদাওয়ার সুরাহা হয়েছে।

তিনশো মিটার পাকানির বান্ডিল ষাট পয়সার বদলে বেড়ে এখন এক টাকা। মজুরীও কিলোপ্রতি পাঁচ টাকা বেড়েছে। তসর সংগ্রহের পাঁচটা প্রতিষ্ঠান মূল দাবিটাও মেনে নিয়েছে। এতোদিন এক মহাজন গুটিতে তাঁতিরা বারোশো গ্রাম সুতো দিচ্ছিলো। মহাজনেরা হঠাৎ একদিন একতরফাভাবে চোদ্দোশো গ্রাম চেয়ে বসলো। তাঁতিরা প্রতিবাদ করেছে। কিন্তু কাজ হয়নি। মহাজনেরা হুমকি দিয়েছে গুটি দেওয়া বন্ধ করে দেবে। পেটে হাত। তাঁতিরা চোদ্দশো গ্রামেই রাজি হয়েছে।

তারপর কয়েক বছর ধরে অনেক অনুনয়, তদ্বির চললো। মালিকেরা টলেনি। দুশো গ্রাম বাড়তি তসর দিতে তাঁতিদের মাথার ঘাম পায়ে পড়েছে। শরীর ভেঙে গেছে। আজ হাওয়ায় বারুদ আর রক্তের গন্ধ পেয়ে মহাজনেরা আগবাড়িয়ে তাঁতিদের সঙ্গে ফয়সালা করেছে। কাগজে-কলমে পাকা চুক্তি। তাঁতিদের দাবি মেনে নেওয়া হলো। বুড়ো সুধীর কুণ্ডু চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে এসব কথাই বলছিলো। আনন্দে আবেগে বুড়োর দু চোখ, মুখ জলে ভেসে যায়। সব কথা বোঝা যায় না। হ্যাজাকের আলোয় ভাঙা মুখের ভাঁজে ভাঁজে জলের রেখা আটকে থাকে।

তুমরা আমাদের কি উপকার যে করেছো, ভগবান জানেন—বুড়ো তাঁতি বলে যায়—তুমরা আমাদের সোনার টুকরো ছেলে। ভগবান তোদের সহায় হবেন। চোখের জলে বুড়োর কথা জড়িয়ে যায়। বনকলমীর আড়ালে ঘন অন্ধকার। দিবাকর দাঁড়িয়েছিলো। এই দৃশ্যে হঠাৎ তার বড়ো কান্না পায়।

নরহরি মাল নীচু গলায় অজিতকে ডাকে—এখন আমাদের যেতে হবেক। অজিত ভিড়ের বাইরে আসে। ঝানু নিতাই, বাবলু, রঞ্জন, শিবেন একে একে হাজির হয়। ওদের সকলের হাতেই অস্ত্র। বন্দুক, টাঙ্গি, ভোজালি। নরহরির দূর-সম্পর্কের এক সম্বন্ধী আমেদপুর থানার কনস্টেবল। নাম মাধব। জাতে মাল। কিছুদিন আগে সে পার্টিতে এসেছে। পার্টির এক স্কোয়াড তার রাইফেল কেড়ে নিয়েছিলো। তাকে বন্দীও করেছিলো। কিন্তু গায়ে হাত দেয়নি। ভালো ব্যবহার করেছে। অনেক কথা বুঝিয়েছে। তুমি আমাদের শত্রু নও, ঘরের লোক, বন্ধু। জঙ্গলের মধ্যে পাশাপাশি বসে ওরা খেয়েছে। মাধব প্রথমটা ভড়কে গিয়েছিলো। তারপর মুখ খুললো। আমার ভগ্নীপতিও আপনাদের পার্টির লোক, কমোরেট। —

নাম কি—অজিত জিজ্ঞেস করেছিলো।

নরহরি মাল।

সেই থেকে যোগাযোগ। মাধব এখন পার্টির খুব দরকারী লোক। অনেক দামী খবর পাঠায়। পুলিশের মধ্যে পার্টির কাজ বাড়ে। আজ রাতে আমেদপুর থানার মাল-খানা লুঠ করার ছক পাশ হয়েছে। কলকাতা থেকে কোন এক ভি আই পি সিউড়ি আসবে। তাকে সেলাম জানাতে হবে। আমেদপুর থানা ওই রাতে প্রায় খালি থাকবে। বাঁশফুলিতে মাধবের গাঁয়ে বসেই কথা পাকা হয়েছে। নরহরি থানার গলি-ঘুঁজি চেনে। আগেভাগে সব দেখে এসেছে। আজকের অ্যাকশানের সেই কম্যাণ্ডার। থানায় ঢুকে প্রথম কাজ হলো মাধব সমেত সকলকে পিছমোড়া করে বাঁধা। এ-বুদ্ধিটা মাধবই দিয়েছে। যাবার আগে বারকয়েক মনে করিয়েছে—আমাকে বাঁধতে ভুলবেন না যেন।

অন্ধকার আল বেয়ে সাতজনের স্কোয়াড এগিয়ে যায়। জলে-কাদায় পিছল পথ। আকাশে মেঘ, বিদ্যুতের ঝাপট। যে-কোনো সময়ে বৃষ্টি নামবে। জলাজমির পর পাথুরে ডাঙ্গা মাঠ। সারা বছর ফাঁকা, হা-হা চেহারা। বনকুল, বেঁটে খেজুরের গাছ অন্ধকারে ঘাপটি মেরে আছে। শিবেন নীচু গলায় কি যেন বলছিলো অজিতকে। সবটা অজিত শুনতে পায় না। কেন্দুয়ার মেন ক্যানেলের কাছে কার যেন ডেডবডি পাওয়া গেছে। কে পার্টির খুব কাছের লোক। কাগজে কে যেন ছদ্মনামে চিঠি লিখেছে। তার লেখা পড়ে মনে হয় পার্টির অনেক খবর জানে।

সে কে? সিউড়িতে পাঁচজনকে পুড়িয়ে মারার ঘটনাটা ঠিক নয়। কে সি পন্থের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় পার্টি বসছে কেন? বাবলু আর পানু অনেকটা এগিয়ে গেছে। ওদের পায়ের শব্দও শোনা যায় না।

ঠিক রাত দুটোয় ওরা সাতজন থানার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। গাঁয়ের সাধারণ থানা। পুলিশ চৌকি বলাই ভালো। গড় ঘুমে চারপাশ অচেতন। ডিউটি সিপাই চেয়ারে বসে ঘুমোচ্ছে। গভীর ঘুমে মুখ হাঁ হয়ে আছে। ইজেকটিক নেই। টিম-টিমে হ্যারিকেনের আলো। শিখা কাঁপছে। তেলের অন্তিম দশা। রাত পাহারার কোমরে চেন বাঁধা রাইফেল তার দু পায়ের মাঝখানে ঠেস দিয়ে রাইফেলও ঘুমোচ্ছে। পাঁচজন ভিতরে ঢোকে। দুজন অন্ধকারে গা ঢেকে দাঁড়ায়।

প্রথম ডিউটি সিপাই-এর ঘুম ভাঙে। বুকের ওপর অন্য একটা বন্দুকের নল। হাড়ের পাশে টাঙ্গি। ব্যাপারটা বুঝতে ওর অসুবিধে হয় না। চেন খুলে নিজের রাইফেলটা সে চুপচাপ মানুর হাতে তুলে দেয়। পাঁচ মিনিটের মধ্যে এ্যাকশান শেষ। কোনো হল্লা হয় না। একফোঁটা রক্ত পর্যন্ত পড়ে না। গুমোট মেঘলা আকাশে হঠাৎ মাতাল হাওয়ার সোয়াত বয়। ঝিরঝির বৃষ্টি নামে।

হ্যারিকেনের মৃদুমন্দ আলোয় হাত পা বাঁধা সিপাইরা কয়েকটা ছায়াশরীরকে দেখতে পায়। ওরা ভয়ে কাঠ। আওয়াজ করে না। মাধব ঘুমের জ্ঞান করে পড়ে ছিলো। তার দুটো হাত নরহরি বাঁধলো। আসার সময় গালে একটা জোর থাপ্পড় কষিয়ে বললেন—শালা। অজিতের মুখে আবছা হাসি খেলে যায়।

রাত কতো হলো অজিত বুঝতে পারে না। চোখের পাতা ঘুমে ভারী। মগনের পাত্তা নেই। অন্ধকার পাহাড় সমতল, নদী জঙ্গল একাকার। টোংরা গাঁ ঘুমে অসাড়। অজিত ভাবে, এবার থাকার আনা উচিত। সেই দুপুরে মিটিং শুরু হয়েছে। মুড়ি জল ছাড়া সারাদিন কিছু জোটেনি। দীনু আর মগন গাঁ থেকে খাবার আনবে। দীনুও বেপাত্তা। অজিতের অস্বস্তি হয়। পার্টির লাইন নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। এতো এ্যাকশান, বন্দুক দখলের পরেও সত্যিকারের গণফৌজ তৈরী হয়নি। এ্যাকশানের পর কর্মীরা বেকার। হাতে নেই কর্মসূচীর অভাব। গাঁয়ের আর্থিক ভিত্তিকে বদলানোর জন্যে কিছুই করা হচ্ছে না। ওরাই এর কৃষক আন্দোলনের রিপোর্টে দশটা কাজের উল্লেখ আছে। সেগুলো ধরেও এগোনো যায়। তাও হচ্ছে না ওদের এই রিপোর্টটাও যেন ধামাচাপা পড়ে গেছে। এ্যাকশানের প্রচার এবং কর্মসূচী ছাড়া কিছুই নেই। এ্যাকশান এখন জলভাত। শরীর কৃষকদের সম্ভাব ঠিক থাকে আলোচনা চললেই এ্যাকশনের হাঁক ওঠে। আলোচনার একটা মেড ইজিও ওরা তৈরী করেছে। প্রথমে গরীব মানুষ তাদের দুঃখ, অসহায়তার কথা বলে। একজনা করেক ঘন্টা তারা বলে যায়। কখনো কাঁদে কখনো রাগে ফেটে পড়ে, অক্ষমতায় হাত কামড়ায়। সংগঠক চুপচাপ শুনে যায়। একসময় কৃষকদের কথা ফুরোয়। ওরা কিম মেরে বসে থাকে। তখন সংগঠক প্রশ্ন ছোঁড়ে—আমরা তিনো ক্ষেত খেনা নিয়া—আপনার কতো জমি আছে? আমরা ওরারে তিনো হব—আপনার ঘরে কজন লোক? সানাম বছর বিয়া যম কুলাওয়েলা সে বাৎ—সারা বছর তাদের খাবার কুলোয়?

তিন অ চাদোঁবিরা যম লাগি বাহার বে কাম করুর—কমাসের খাবারের জন্যে বাইরে খাটতে হয়?

এইভাবে প্রশ্নোত্তর চলে। কেন খেতে পান না? এতো মেহনতের পরেও ঘরে উপোস কেন? টুকটাক প্রশ্নে তুষের আগুনে ফুঁ পড়ে। মানুষগুলোর বুকে ধিকিধিক তাপ ছড়ায়। তারপর একসময় পোক্ত জমায়েত দপ করে জ্বলে ওঠে। ইতিহাস, অতীত তাদের বকতে ঘাই দেয়। এই মহল্লা জুড়ে একদিন সিদু, কানু, চাঁদ ভৈরব সভাই করেছে; ঠাকুর্দারা আজো সে কাহিনী বলে। তারাও শুনেছে বাপ ঠাকুর্দার মুখে। সেই সব মানুষের শরীরে অনেক দগদগে ক্ষত অপমৃত্যু জেগে ছিলো। বাঁশঢুলি, বৃন্দাবনীতে সিদু কানুর টাঙ্গি, শালের ডাল মাদল, বাঁশি দেখে আজও ওদের বুক উথলে ওঠে।

কৃষ্ণপক্ষের রাত। পরিষ্কার আকাশ। ঝাঁক ঝাঁক তারা। তিন প্রহর রাতে চাঁদ উঠবে। টোংরায় হঠাৎ অনেক কুকুর ডাকছে। আবছা গুঞ্জন। অজিতের চটকা ভেঙ্গে যায়। ও খাড়া হয়ে বসে। দুচোখে টর্চ লাইট জ্বেলে ও নদীর দিকে তাকায়। অন্ধকারে দুটো নৌকোর ফিকে চেহারা। ও দুটো কখন এলো, অজিত ভেবে পায় না। অজিত বোঝে পালে বাঘ পড়েছে। অন্ধকারে একটা মাদল সাংকেতিক শব্দে বেজে ওঠে। শুকনো ঘাস পাতায় দ্রুত পায়ের শব্দ। অজিত দেখে, মগন এসে দাঁড়িয়েছে। পেছনে ঘুংরি। এলো চুল। গাছ কোমর বাঁধা শাড়ী। বাহু মূল থেকে দুটো কালো হাত কোমর ছাড়িয়েছে। মগনের হাতে বন্দুক ও বলে তু খাড়া থাক কমেরেট, আজ পুলিশের গুষ্টির পিণ্ডি করবো। ঝড়ের বেগে ও গাঁয়ের দিকে ছুটে যায়। ঘুংরি পিছু ছাড়ে না।

হঠাৎ অন্ধকারে একটা জোরালো সার্চ লাইট জেগে ওঠে। গাঁকরাক আলো। সেই আলোর মধ্যে মগন আর ঘুংরিকে স্পষ্ট দেখা যায়। ওরা ছুটছে হাওয়ায় ঘুংরির এলোচুল ওড়ে। যেন সাক্ষাৎ রক্ষেকালীর মূর্তি। আলোর ফিতে যেন গুটিয়ে নিচ্ছে দুজন মানুষকে। ঘুংরির হাতে মগনের বাঁশি। বন্দুকের শব্দ। মগন দেখেছে। তারপর একঝাঁক ফায়ারিং। মগন মুখ থুবড়ে পড়লো। ঘুংরিকে দেখা গেলো না। আলোটা তখন নিভেছে। চারপাশ নিকষ অন্ধকার। অনেক গলার শব্দ। পাড়ার কুকুরদের আকাশ ফাটানো হাঁকডাক। অজিতের দুচোখ ধেঁধে যায়। ও রাইফেল কাঁধে তেঁতুল গাছের আড়ালে ওৎ পেতে থাকে। মাথায় ঘুরপাক চিন্তা। মিটিংয়ে এখন কি হচ্ছে? ওরা নিশ্চয়ই শব্দ শুনেছে। এতোক্ষণে জঙ্গলে ঢোকার কথা। মাইল তিন-চার উজিয়ে যেতে পারলেই নাগালের বাইরে চলে যাবে। জুতোপরা অনেক পায়ের শব্দ ক্রমশঃ এগিয়ে আসে। অজিত পেছোয়। আবার সেই দাঁত্য আলো জ্বলে ওঠে। ঘন গাছপালার দেওয়ালে আটকে যায়। লাফালাফি করে।

সভাব জায়গা ফাঁকা। বিশ-পঁচিশজন লোক গভীর জঙ্গলে উবে গেছে। গোটা বনস্থলী নিঃস্তব্ধ। অন্ধকার। ঘন পাতার ছাউনি। আকাশ দেখা যায় না। পায়ের নীচে ভিজে মাটি, শুকনো পাড়া। হাঁটতে সেঁতে ভাব। কিছুটা দূরে পায়ের শব্দ। গাছপাতায় সরসর ঘসটানির আওয়াজ। অজিত দমবন্ধ করে একটু এগোয়। দু-তিনজন কাকে যেন কাঁদে তুলে এগোচ্ছে। কিশোরকে চেনা যায়। অজিত ডাকে। তিনজন দাঁড়ায়। কানু নিতাই আর কিশোরের কাঁধে সুরেনদা। অজিত ঘাবড়ে যায়। কি হলো জিজ্ঞেস করে।

কি জানি কিশোরের গলা গমগম করে বোধহয় স্টোক। হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলেন। নিকষ অন্ধকারে কারো মুখ দেখা যায় না। কিশোরকে সরিয়ে অজিত কাঁধ লাগায়। সুরেনদা ছোটোখাটো রোগা মানুষ। ভার নেই। তিনজনে চটপট এগোয়। অজিত দেখে সামনে মোতি আর বুদ্ধদেব। জঙ্গলের মধ্যে একটা চোরা রাস্তা আছে। বৃন্দাবনী হয়ে সে রাস্তা তরাণী পাহাড় ছুঁয়েছে। সে পথ বুধুর মাঝি চেনে। বুধুর আগে পথ দেখায়। আজ রাতেই সুরেনদাকে ডাক্তার দেখানো দরকার।

পৃথিবীতে এরকম খারাপ রাত খুব বেশী আসে না। অজিতের মনে হয় একটা অক্ত ফাঁসে ওরা আটকে গেছে। কিশোর কথা বলে না। আকাশে এক ফালি চাঁদ ওঠে। অজিত দেখে, কিশোরের মুখের কোনো দুঃখ উদ্বেগের ছাপ নেই। চোখা নাক, ধারালো চোখ শীর্ণ মানুষটার সাধু-জনোচিত ভঙ্গী। চোখ খুলে মেয়েলি কামনীয়তা। সব মিলে এত অদ্ভুত টান সত্যিকারের পুরুষের চেহারা একটু নারীভঙ্গ থাকা ভালো। বৃন্দাবনী পৌঁছোতে অন্ধকার পাতলা হয়ে যায়। আকাশে লালচে ভাব। সিধ নদীর ধারে ওরা সুরেনদাকে রাখে। সুরেনদার দেহে প্রাণ নেই। ঘন্টাখানেক আগেই মারা গেছে।

মগন টুডুর শরীর সতেরোটা বুলেটে ঝাঁঝরা। দুদিন পরে ওর লাস পুলিশই পুড়িয়ে দিলো। বেহুঁশ ঘুংরিকে পাওয়া গেল জঙ্গলের ধারে। শরীরে শাড়ী নেই। নকতমাথা উরু জাঙ। দুদিন পরে জ্ঞান এলো। ঘুংরির দৃষ্টি দেখে অজিতের

শরীর সিরসির করে। এলোকেশী এই মেয়েকে সেদিন রাতে মগনের পিছু পিছু ছুটতে দেখছে। অজিত নিজের মনেই বিড়-বিড় করে রক্ষেকালী জাগো।

ডি পি ওর বড়ো ঘড়ির নীচে শিবানী দাঁড়িয়েছিল। টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছে। ঝড় এসেছে। আকাশে রুদ্ধশ্বাস মেঘ। রেবার পৌঁছোতে মিনিট দশেক দেরী হলো।

শিবানী বললো—আমি ভেবলুম তুই আসবি না।

রেবা হাসলো। বা ভীড, ট্রামে-বাসে ওঠা যায় না। খুব দেরী হয়েছে—ও জানতে চায়।

এমন কিছু নয়—শিবানী বলে।

গুঁড়ো বৃষ্টির মধ্যে ওরা নামে। রেবা আগেই একটু ভিজেছিল। শিবানীর চুলে, কপালে বৃষ্টি দানা জমে।

রিজার্ভ ব্যাংক পেরিয়ে বাঁদিকের সরু গলি। কিছু এগিয়ে ডানদিকের বাড়ির চারতলায় সার এন্টারপ্রাইজের অফিস। বাঁদিকে ছোটো ছিমছাম চায়ের দোকান।

একটু পরিচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া উচিত—শিবানী বলে।

রেবা নিজের দিকে তাকায়। সকাল থেকে ঘুরছে। শরীরের ওপর রোদ জল গেছে। দু হাতে ধুলোর সর। আলুথালু চেহারা। মাথায় চুল অগোছালো। এতো চুল সামলানো মুস্কিল। প্রায়ই মনে হয় অর্ধেকটা উড়িয়ে দেবে। বুকের ওপর খোলা চুল ছড়িয়ে কাঁচ হাতে দু-একবার বসেছে। পাড়ে নি। কেমন মায়া হয়।

নিমকি বিস্কুট আর দু কাপ চা নিয়ে ওরা একটা কোবিনে বসে। শিবানী পর্দা টেনে দেয়। রেবা কাপড়ের কুঁচি সাজায়। চুলে চিরুনী চালায়। রুমালে মুখ মোছে। শিবানী নিজের বটুয়া থেকে একটা ছোটো আয়না পাউডারের কৌটো পাফ দেয়। রেবা মুখে ঘসে।

চাকরিটা আমার হওয়ার কথা—শিবানী বলে—কিন্তু আমি টাইপ জানি না। ফসকে গেল।

আয়নায় রেবা নেজেকে দেখে। স্নো পাউডার ও মাখে না। কিন্তু মাখলে খারাপ দেখায় না।

আমার একটু তাড়া আছে শিবানী জানায় তোকে আলাপ করিয়ে দিয়ে আমি চলে যাবো।

রেবা আয়নাটা ওকে ফিরিয়ে দেয়। একটু থাক না—রেবা বলে—কতোক্ষণ আর লাগবে।

শিবানী দাম মেটায়। লিফট বন্ধ। সিঁড়ি ভেঙে ওরা চারতলায় ওঠে। অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে সিঁড়ি। পুরোনো আমলের বাড়ি। সিঁড়িতে ভারী ভ্যাপসা বাতাস। কাঁচ লাগানো কাঠের দরজায় লেখা—সার এন্টারপ্রাইজ।

শিবানী দরজায় চাপ দেয়। হ্যান্ডেল বল লাগানো দরজা খুলে যায়। ওরা ভেতরে ঢোকে। মাঝারি ঘর। দুটো চেয়ার, দুটো টেবিল। একটার ওপরে টাইপ রাইটার। ঘর ফাঁকা। কেউ নেই। ভেতরে আর একটা ঘর। দরজা ঠেলে একজন ছোকরা বেরিয়ে আসে। অফিসের পিওন।

মিঃ রায় আছেন—শিবানী জিজ্ঞেস করে।

পিওনটা চোখ টিপে তার পেছনের বন্ধ দরজাটা দেখায়।

সাহেবের খাস কামরা শিবানী বলে। শিবানী দরজা ঠোকা দেয়। ভেতর থেকে ভারী ডাকে—কাম ইন। দুজন দরজা ঠেলে ঘরে ঢোকে।

শিবানীর পেছনে রেবা। চমৎকার সাজানো অফিস ঘর। গডরেজের টেবিল চেয়ার। বন্ধ কাঁচের জানলায় দামী পর্দা। ঠান্ডা মেসিনের ঝিঁঝি শব্দ। জানলার পাশে চামড়া মোড়া ডিভান। দু টুকরো ফোমের তাকিয়া। বেঁটে কালো এবং মোটা একটা লোক টেলিফোনে কথা বলছে। লোকটার হাতে সাদা রং-এর বিসিভার। বড়ো অদ্ভুত দেখায়।

মিঃ রায়—শিবানী নীচু গলায় বলে। রায় একপলক ওদের দেখে। ইসারায় বসতে বলে। তারপর ফোনে কথা বলে যায়।

ওরা বসে না। দাঁড়িয়ে থাকে। আধ-ভেজা কাপড়। রেবার হঠাৎ কেমন শীত শীত করে।

হ্যালো। কি বললে? নুন নয়। পটাশের চালান। টেস্ট করেছো। হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো। আর কেউ জানে? দত্তবাবু সেটা? কেউ নয়।

রায়ের গলা কাঁপছে। শকত মুঠোয় ফোনটা গুঁড়িয়ে যাওয়ার অবস্থা। ইয়ার বকসটা কানে সেঁটে গেছে। রায় হঠাৎ ফিসফিস করে—টপ সিক্রেট। মুখে কুলুপ এঁটে দাও।

আড চোখে ওদের দিকে তাকায়। পরে কথা হবে বিসিভার রেখে দেয়। ঘরের মধ্যে হঠাৎ থমথমে নীরবতা। শিবানী বলে—আমার বন্ধু রেবা। এর কথা বলেছিলুম। টাইপ জানে। রায় বলে—তোমরা বসো। ও একটা সিগারেট ধরায়। চা খাবে—জিজ্ঞেস করে। না না—শিবানী বলে এই খেয়েছি। আমাকে একটু যেতে হবে। তাড়া আছে।

বাংলা সাহিত্যকে জেরালো মেজাজ দিয়ে টগবগিয়ে ছোটবার জন্য

মাসিক সাহিত্য-র

২য় সংখ্যা বেরোচ্ছে আগামী অক্টোবরে। জবাবী খামে খুব উন্নতমানের ছোট গল্প, রম্যরচনা, প্রবন্ধ (৬৫ লাইন) ও কবিতা পাঠান।

সম্পাদক : সমরনাথ চট্টোপাধ্যায়
১৭, কার্তিকচন্দ্র নিয়োগী লেন, কলি-৩৫

সংসদ
বাঙালী চরিতাভিধান
[প্রায় সাড়ে-তিন হাজার জীবনী সম্বলিত আকরগ্রন্থ]
প্রধান সম্পাদক : ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত।
সম্পাদক : শ্রীঅঞ্জলি বসু।
ঐতিহাসিক কাল থেকে ফেব্রুয়ারি '৭৬ পর্যন্ত প্রয়াত বাঙালী জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁরা উল্লেখ্য ভূমিকা রেখেছেন, তাঁদের তথ্যসমৃদ্ধ জীবন-চরিত। লাইনো হরফে ময়লাপিথো কাগজে সুমুদ্রিত। [৪০·০০]
আচার্য সুনীতিকুমার বলেছেন :
...প্রকাশিত চরিতাভিধানের মত একখানি পুস্তকের বিশেষ অভাব বাঙালী পাঠক সমাজে অনুভূত হইয়া আসিয়াছে।...এই চরিতাভিধানখানি 'সাহিত্য সংসদের মর্যাদা' পূর্ণভাবে রক্ষা করিবে।
আনন্দবাজার পত্রিকা বলেন :
...এই মুহূর্তে হাতের কাছে সাড়ে-তিন হাজার বাঙালীর জীবনী এমন সাজানো গোছানো আকারে পাব কোথায়?...সংহত, নিত্য-ব্যবহার্য, সুমুদ্রিত শোভন গ্রন্থ এটি।
যুগান্তর বলেন :
...বাঙালী চরিতাভিধানের মত একখানি বিশেষ গ্রন্থ প্রকাশের আলোয় উপস্থিত করার জন্য প্রকাশক, প্রধান সম্পাদক এবং সম্পাদককে ধন্যবাদ।
সাহিত্য সংসদ ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলিকাতা ৭০০ ০০৯

রায় একলহমা কি ভাবে। বলে; ওর স্পীডটা একটু দেখা দরকার।

ও থাকবে—শিবানী জানায়। তারপর উঠে দাঁড়ায়। রেবা একটু ঘাবড়ে যায়।

শিবানী আন্দাজ করে। বলে, কাল দেখা হবে।

রায় নিজের চেয়ারে বসে। কতো স্পীড জিগ্যেস করবে। রেবা জবাব দেয়।

লোকটা একটুকরো টাইপ করা কাগজে এগিয়ে দেয়। বলে—ওঘরে যাও। এটা কপি করো। বাইরে মেঘ। আবছা অন্ধকার। অফিস কাছারির ছুটি হয়েছে। লোকজনের টুকরো কথা। গাড়ীর ফিকে শব্দ। বেয়ারা ঘরের আলো জ্বালে। রেবার কেমন অস্বস্তি হয়। শিবানী থাকলে পারতো। এই বাড়ির কয়েকটা অফিসে ও টেলিফোন আগলায়। সেই সূত্রেই রায়ের সঙ্গে পরিচয়। লোকটার নানারকম ব্যবসা। সিনেমা হল আছে। ঢালাইয়ের কারখানার মালিক। কেনাবেচার কাজ করে। বাগরী মার্কেটেও একটা অফিস আছে। এ বাড়ীতে আরো একটা দপ্তর খুলছে। শিবানীই বলেছে এসব খবর।

খুব সাবধানে ও টাইপ করে। প্রায় বছর ছয়েক আগে শিখেছে। তখন চল্লিশ স্পীড ছিল। এখন তার অর্ধেকও নেই। চর্চা না থাকলে এই হয়। মাঝখানে একটা ভুলও হয়ে গেল। মাথার মধ্যে নানা চিন্তা ঘাই দেয়। পাখা খায়। রাস্তায় এখন কোনো শব্দ নেই। জোরে বৃষ্টি নামলো। রাজ পড়ার কুড় কুড় শব্দ। বেয়ারাটাও কোথায় কেন চলে গেছে। শরীরের ভেতরে শীতটা লঘু পায়ে ঘুরে বেড়ায়। হঠাৎ কাঁধের ওপর গরম নিঃশ্বাস পড়ে। ও চমকে ওঠে। ঘাড় ফেরায়। রায় ওর কাঁধের ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। ওর ভেতরটা ঠকঠক করে কেঁপে ওঠে।

কদ্দূর হলো—রায় সহজ গলায় জিজ্ঞেস করে।

শরীরের মধ্যে থরথর কাঁপুনি। রেবা কি যেন বলে। সে নিজেই বুঝতে পারে না। রোলার থেকে কাগজ নামায়।

ভেতরে এসো— রায় ডাকে। রেবা দাঁড়ায়। কণ্ঠনালী শুকনো কাঠ। জ্বালার অনুভূতি।

স্টীমারের ধারালো বাঁশি বাজে। ছাওয়ায় কেমন এক অচেনা গন্ধ। রেবা বোঝে, সে ভয় পেয়েছে। বারের পেছনে ও ভেতরের ঘরে ঢোকে। দাঁড়িয়ে থাকে। রায় ডিভানে বসে। হাতে টাইপকরা কাগজ। চোখ বোলায়। দাঁড়িয়ে কেন, বসো—রায় বলে। রেবা চেয়ারে বসে।

মোটামুটি ঠিক আছে। তবে স্পীড কম। রায় তাকায়। কালো মোটা ঠোঁট। সামান্য হাসে।

বাইরে বৃষ্টির শব্দ। কাঁচের ওপর জলের নকসা। হাজার রকম আঁকিবুকি।

বাড়ী ফিরবে কি করে—রায় জিজ্ঞেস করে।

রেবা উঠে দাঁড়ায়। বলে—চলে যাবো।

তাড়া আছে—রায় জিজ্ঞেস করে।

রেবা সহজ হওয়ার চেষ্টা করে। থুতু গিলে কণ্ঠনালীটা ভেজাতে চায়। ফাঁকা মুখে জিভটা চটচট করে।

বলে—হ্যাঁ বাড়ী ফিরতে হবে। অনেক সকালে বেরিয়েছি।

একটু বসো। বৃষ্টিটা ধরুক।

রায় দেওয়াল আলমারির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। কি যেন ভাবে। তারপর সোডা ওর চোখের সামনে এগিয়ে আসে। বলে—আমার সঙ্গে একটু সময় কাটাও না।

রেবা চেয়ার থেকে ছিটকে ওঠে—কি বলছেন আপনি?

রায় হাসে—এটা হুকুম নয়। অনুরোধ।

রেবা কথা খুঁজে পায় না। ওর বুকের মধ্যে একটা কান্না ঠেলে ওঠে। বন্ধ দরজা। ফাঁকা বাড়ী। লোকটা ইচ্ছে করলে ওকে আটকে রাখতে পারে। তার শরীর ও ডিঙে তছনছ করে দিলেও কেউ বলার নেই। ওর অনেক টাকা আছে। যোগাযোগ প্রভাব আছে। তাকে দেখার কেউ নেই। কাকে বলবে সে? বাড়ীতে মা শুয়ছে। বোকা ভাই। অপোগণ্ড কয়েকটা বোন। অনেক টাকা দরকার। ঠান্ডা মেসিনের একটানা শিরশির শব্দ হচ্ছে। রাতের বেলায় তাদের ঘরেও এ শব্দ হয়। উইপোকা পুরনো পাঁজি খায়।

ভয় নেই—রায় বলে—আমি জোর করছি না। আসলে একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে।

রেবা তাকায়। লোকটার গলায় কোনো উত্তেজনা বা ভান নেই।

শিবানীর সঙ্গে কতোদিন আলাপ—রায় জিজ্ঞেস করে।

বছরখানেক—রেবা জবাব দেয়।

রায় কি যেন ভাবে। মুখে আলগা হাসি। বলে—ও আমার কাছ থেকে কাল পঞ্চাশ টাকা নিয়েছে।

রেবা বুঝতে পারে না। রায় টেবিলে আঙুল নাচায়। রেবাকে দেখে।

মাঝে মাঝে শিবানী ওর দু একজন বান্ধবীকে নিয়ে আসে—রায় বলে তারা আমাকে সঙ্গ দেয়। তাদের টাকার দরকার। আমি টাকা দিই। কিন্তু কোনো জোর নয়। দুতরফের মতামতেই কাজটা হয়। বিজনেস। ভদ্রলোকের চুক্তি। একজনকে আজ আনার কথা। রায় চুপ করে। রাস্তায় কে যেন জোরে বেক চাপে। চাকা ঘসটানির শব্দ। একজন টাইপিস্টের কথাও বলেছিলুম ওকে। মনে ছিলো না—রায় কৈফিয়ৎ দেয়—দুটো মিটিং গেছে।

রাস্তায় বোধহয় জল জমলো—রায় কথার মোড় ঘোরায়। জানলার বন্ধ কাঁচ নাক রেখে রাস্তা দেখার চেষ্টা করে। রেবা নিজেকে সামলায়। বুকের গুড়গুড় শব্দটা কমেছে। লোকটাকে খুব খারাপ লাগে না।

এখনও রায় দূরত্ব রেখে হাঁটছে। খোলামেলা কথা। ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

খুব ফ্যাসফ্যাসে—জানলায় পিঠ দিয়ে বলে—নিজেকে লুকিয়ে রাখা নেই মাঝে মাঝে খুব একা লাগে। তখন একজন মেয়ের সঙ্গ ভালো লাগে। একসঙ্গে বসি। একটু ড্রিঙ্ক করি। কিছু খাই। আড্ডা হয়। কলকাতায় মেয়ের অভাব নেই। পয়সা দিলেই পাওয়া যায়। টাকা দিয়ে সব কিনি। তবে একটু ভদ্র ছিমছাম মেয়ে না হলে কথা বলে আরাম নেই।

রেবা শোনে আর অবাক হয়। লোকটার কোনো পাপবোধ নেই। আজকালকার মেয়েরা অনেক স্মার্ট, চালু—রায় যোগ করে—এটাকে প্রায় চাকরী ভাবে। রাস্তায় নেমেই অফিসের কথা ভুলে যায়। শুধু টাকাটার কথা মনে রাখে। আফটার অল নিজের উপায় করা টাকা। অফিসে মাসকাবারি মাইনের সঙ্গে এর তফাৎ কোথায়? টাকার আলাদা গন্ধ বা রঙ নেই। দুটোর জন্যেই গতর বেচতে হয়। বুদ্ধি লাগে। টাকা ইজ টাকা। গতর প্লাস বুদ্ধি ইকোয়াল টু টাকা। অফিসে বসে টাকা কামানো আর আমার ঘরে বসে টাকা কামানো একই কথা। বরং এখানে দক্ষিণা অনেক বেশী। ইন্দ্রজিত ফিজিত বাজে কথা। মানুষকে বাঁচতে হবে। ভিক্ষে করার চেয়ে এটা অনেক ভালো। রায় সিগারেট ধরায়। ধোঁয়ার রিঙ ছাড়ে। আলোর চারপাশে একডজন কালো বৃত্ত পাক খায়।

অনেক কথা বললুম—রায় বলে—আর নয়। এবার তুমি বলো।

কোথায় বাড়ী? কে আছে?

রেবার চিন্তা চেতনা হঠাৎ ঝাঁকুনি খেয়ে সজাগ হয়েছে। ও দুচার কথায় বাড়ীর খবর দেয়।

আমি বুঝেছি—রায় ঘাড় নাড়ে—তুমি লড়ুয়ে মেয়ে। লড়ে যাও।

রায় ব্যাগ খোলে। পাঁচটা দশ টাকার নোট এগিয়ে দেয়। রেবা পাথরের মতো বসে থাকে। হাত ওঠায় না।

নাও—রায় বলে—ধার দিলুম। সময়মতো ফেরৎ দিও। ওর হাতে টাকাটা রায় গুঁজে দেয়। রেবার বুকের মধ্যে আবার সেই যন্ত্রণাটা মোচড় দেয়।

দরকার হলে এসো—রায় বলে—শিবানীর সঙ্গে মিশো না।

রেবা উঠে দাঁড়ায়। কি এক ঘোরের মধ্যে রাস্তায় নামে। তখনও টিপটিপ বৃষ্টি। একটা কালো এ্যাম্বাসাডার ওর শাড়ী ভিজিয়ে চলে যায়। ব্যাগের মধ্যে টাকাটা রাখতে গিয়ে মাঝের প্রেসক্রিপসানটা ওর চোখে পড়ে। রেবা বিড়বিড় করে—কিশোর—তুমি কোথায়?

খালাসিটোলা থেকে বেরিয়ে দুজন মাতাল ময়দানের দিকে হাঁটছিলো। ভিজে রাস্তা। এখানে ওখানে জমা জল। ঠান্ডা হাওয়া ছুটছিল। রাস্তায় ভিড় নেই। কল মাতাল মানুষ বৃষ্টিকে ডরায়।

প্রথম মাতাল বাতাস শোঁকে। চারপাশে দেখে বন্ধুকে বলে—দারুণ লাগছে মাইরি। ভিজে কলকাতা। দেখলে আমার ছালছাড়ানো চামড়াশাসের কথা মনে পড়ে।

(চলবে)

পিনাকী চট্টোপাধ্যায়

কোনদিন জঙ্গলে

আজ দু দিন হল নেতারহাটের টুরিসট লজে এসে চুপ চাপ বসে আছি। ভোর না হতেই স্টিলের গোল চেয়ারখানা টেনে নিয়ে গিয়ে লজের সামনে শান বাঁধানো কাস্তে মাবকা বেদীব ওপব ফিট কবে বসে থাকি। বেদী ঘিরে রেলিং। চাব ধাবে হলুদ কানাইল ফুল ফুটে আছে। এক কোণে অযত্নে বর্ধিত একটা রক্ত-কববী। মৌমাছিব মৌতাতে বিলাযেতের মিষ্টি হাতের আলাপ ভোরের ধূসর আকাশটাকে জমিয়ে বাখে। বহু দূরে, বহু নীচে পাথরে, বালিতে শুয়ে আছে কোয়েল। পাহাড়ী নদী এ সময় বড় নিস্তব্ধ —শুকনো, রুক্ষ, উদাস উদাস। অপর পাড়ে থাকে থাকে পাহাড় উঠে গিয়েছে আকাশেব গায়ে। সারাদিন ধবে বাতাস ওই পাহাড়গুলোকে ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কাব কবে—ভোব বাতে আকাশ ধুলোয় মাখা-মাখি। চাঁদ মাথাব ওপব ফ্যাকাশে। একটু বাদেই চাদরে ধুয়ে মুছে সাফ করে আকাশেব কোথাও কোন প্রান্তে সাঁরবে রেখে রোদ্দুব ওঠে। একেবারে আবীরে মাখামাখি। চোখ জুড়িয়ে যায়। এই সময় স্থানীয় টুরিস্ট ইনফবমেশন অফিসাব বোস সাহেব ফুলের সাজি নিযে আসেন লজের হাতায় গজিয়ে ওঠা গোলাপ, জবা, তুলসে। পবনে ডোবাকাটা ঘুমেব পোশাক। লজের পেছনে উঁচু জমিতে ওর কোয়ার্টার। বিহার সরকারের অফিসার। পাহাড়, জঙ্গল, পুবোনো স্মৃতি চিহ্ন ঘুরে ঘুরে দেখতে ভালবাসেন। ভাল ল াগলে ফোটো তোলেন। ওবই তোলা ফোটোয় এই দোতল লজের একতলাব লম্বা বারান্দাটা সাজানো। দোতলাটা তৈবি হয়ে পড়ে আছে—এখনো টুরিসটদেব জন্য খোলা যায় নি।

বোস সাহেবই বলছিলেন, বছবে গড়ে হাজার দশেক টুরিস্ট আসে নেতাব-হাটে।

—এত কম কেন? নেতারহাট তো শুনি বিহাবের দারজিলিং।

—আসবে যে প্রচার কোথায়? নেহাত বাঙালীরা আসে তাই এখানকার লোক দুটো পযসার মুখ দেখে।

—টুরিস্টদেব কত পারসেন্ট বাঙালী?

—তা ধবুন সেভেনটি ফাইভ পার-সেন্ট।

—কেন রাঁচী, পাটনা থেকে আসে না?

—আসে। তাদেবও একটা বড় অংশ বাঙালী।

এলে পব উঠবে কোথায়? থাকাব মধ্যে সবকাবী বাড়ি বলতে তো এই একটা টুবিস্ট লজ। বড় জোব চল্লিশ জনেব থাকাব জায়গা আছে। আব আছে একটি ফরেসট ডাক বাংলো। বড় পোশাকী, সাহেবি কেতাব। সারা বছবই বড় বড় অফিসারদেব জন্য বুক করা। আর থাকার মধ্যে দু একটা বেসরকারী আবাস নিবাস। দুম করে এলে জায়গা জোটানো যে বীতি-মত মুসকিল তা দু দিনেই মালুম হয়েছে।

বোস সাহেব বললেন, তাকে যারা আগে ভাগে চিঠি লেখেন, উনি তাদেব পত্রপাঠ জানিয়ে দেন কদিনের জন্য কখানা রুম পাওয়া যাবে। খালি থাকলে একদিনেব ঘর ভাড়া অ্যাডভান্স পাঠাতে লিখে দেন।

লজেব রাঁধুনী চা দিয়ে গেল। নির্মল এখনো বিছানা ছাড়ে নি। বেলাবেলি ওঠে। প্রসাদ গাড়িব ভেতবে বসে চা খাচ্ছে। সাত সকালে উঠে গাড়িটা ধোয়াপাখলা কবেছে। গাড়িটাই ওব ঘর-বাড়ি। হাজাব বলেও ওকে শোয়াতে পাবিনি। ঘরে কিছুতেই শোবে না। পাছে গাড়িব কল-কব্জা খোয়া যায়। খোলা আকাশেব নীচে এই লজের উঠোনে ওই মুর্গী-গাড়িটার দবজাব একটা পাল্লা খুলে দিয়ে পেছনেব সিটে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকে। কি ভাবে যে এতে ঘুম হয় বুঝি না।

গরম চায়ে আস্তে, জোবে চুমুক পড়ছে। টের পাচ্ছি আমাব পেছনেই সূর্যোদয়ের ভিড। পবশু দুপুবে যখন এসেছিলাম, তখন গোটা লজটাই প্রায় ফাঁকা। সন্ধ্যাব পব আমাদেরই পাশের ঘরটা ভবতি হয়ে গেল। স্বামী, স্ত্রী ও বছব তেরো চোদ্দব একটি ছেলে। স্ত্রীর তুলনায স্বামী ঈষৎ বেঁটে। শিবনাথ শাস্ত্রীব মত একগাল দাড়ি। চোখে চশমা। মুখটা গম্ভীব। বছব সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ হবে। পাযে জঙ্গল বুট। ট্রাউজাবসের ওপব হাওয়াই শার্ট। ছেলেটিকে হিন্দিতে মনে হল কি যেন বললেন। বোধহয় রাঁচিব অবাঙালী পারবার। লজেব ম্যানেজার ওদের ঘর দেখিয়ে দিলেন।

দু দিন ধবে দেখছি। নেতাবহাটের টুরিস্ট লজের ম্যানেজাব জামা-কাপড় বিশেষ একটা পছন্দ করেন না। সকাল হোক সন্ধ্যে হোক, দুধের শিশু হোক আর বুপসী যুবতী টুরিস্টই হোক ব্যবহারের কোন তাবতম্য নেই। সবলের সামনে হয় একটি তোযালে বা বড জোর একটি আনডারওয়্যাব পবে ঘুরে বেড়ান। মাঝে মধ্যে শখ হলে ওর ওপরই একটা স্যানডো গেনজি। পাযতাল্লিশ বাই পাঁয়তাল্লিশ বাই পঁয়তাল্লিশ সাইজের আয়তক্ষেত্র বপুটা ধীরে সুস্থে নড়ে চড়ে। হাক ডাকে লজের স্টাফের কি হয় জানি না, টুরিস্ট-দের পিলে চমকে যাওয়ার যোগাড। এক-ছত্র সম্যাটের মত চাল-চলন। টুরিস্টরা এসে করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, সম্রাট নিজের ঘরে বসে বিবিধ ভাবন্তী শোনেন। ওই সব মুহূর্তে কারো সাহস নেই যে ডিসটাবব করবে।

অবাঙালী ভদ্রমহিলা বাচ্চাটিকে সঙ্গে নিয়ে আমার ঠিক পেছনেই এসে বসেছেন। একহারা দীঘল। শ্যামলার ওপর

টুলটুলে মুখখানা। শুনতে পেলাম পরিষ্কার বাংলায় ছেলেকে বলছেন—যাও, বাপীকে গিয়ে বলো সূর্যোদয়ের সময় হয়ে গিয়েছে। ভদ্রলোক বোধহয় এখনো শুয়েই আছেন। ছেলেটি লাফ দিয়ে চলে গেল বাপকে খবরটা দিতে। হাত ঘড়িতে দেখি সোয়া পাঁচটা। কাল পৌনে ছটায় সূর্য উঠেছিল। বললাম, এখনো আধ ঘন্টা বাকি।

তখনই দেখলাম যাকে অবাঙালী বলে ভুল করেছিলাম সেই মহিলার পাশেই বসে আর একটি মেয়ে। কচি কলাপাতা রংয়ের ব্যাঙ্গালোরি সিল্কের শাড়িটা সুগৌর তনু-দেহটি ঘিরে রয়েছে। তুলি দিয়ে আঁকা ভুরুর নীচে পাইন পল্লবের মত নাক ভোরের বাতাসে তির তির করে কাঁপছে। হাসিটি মিষ্টি—মাড়ি দেখা যায় না, ঝকঝকে দাঁতের সারি দুধে ধোওয়া। ছোট একটা কালো তিল ঠিক ঠোঁটের ওপরেই। শাড়ির মতই হালকা, পলকা, ছিমছাম। পেছনে এই সূর্য-না-ওঠা ভোরেই ফুলপ্যান্ট, শার্ট, কোমরে বেল্ট, পায়ে বুট, যুবকটি বোমবাই মিলের স্যুটিং-এর মডেল হয়ে দাঁড়িয়ে—নির্ঘাৎ সদ্য বিবাহিত। নতুন বিয়ের ছাপ সবকটার মত ছেলেমেয়েদের মুখে চোখে লেগে থাকে। সুগন্ধ কাছে এলেই পাওয়া যায়।

—কাল এলেন?

ব্যাঙ্গালোরি শাড়ি লজ্জায় যেন গুটিয়ে গেল। বোধহয় অপর মহিলার সঙ্গে কোন অন্তরঙ্গ কথা হচ্ছিল। আমার প্রশ্নটা বেমক্কা ঝড়ের মত সব এলো-মেলো করে দিল। বোমবাই মডেল হেসে জবাব দিল—হ্যাঁ, কাল একটু বেশী রাতে এসেছি।

—কোন ঘরে উঠেছেন?

আঙুল দিয়ে আমাদের ওপাশের ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, ওইটায়।

—আছেন কদিন এখন?

—না কালই চলে যাবো।

—সে কি, এতদূরে এসে মাত্র দুটি দিন?

—কি করব বলুন, ফ্যাকটরি এর বেশী ছুটি দেবে না।

—কোন ফ্যাকটরিতে আছেন?

—রাঁচির হেভি ইনজিনিয়ারিং।

—ও আপনারা তাহলে লোক্যাল।

মডেলের বয়স বেশী নয়। বড় জোর সাতাশ-আঠাশ। এরই মধ্যে কোমরে ও গলায় চর্বির থাক জমেছে। বলল, আমার বাড়ি কলকাতায় যাদবপুরে। মাসে দু মাসে একবার করে যাই। তবে আমার স্ত্রী কৃষ্ণা এখানকারই মেয়ে। গৌরতনু কৃষ্ণার বড় বড় চোখ দুটি নেতারহাটের বড় ঘাঘরির মত গভীর। পাইন বনের ছায়া চোখের পাতায়।

দুটি আদিবাসী কিশোর শুকনো পাইন ফল বিক্রি করতে এসেছে এই ভোরে। ঝন-বাদাড় ঘুরে কুড়িয়ে এনেছে। কৃষ্ণা দেখলাম দুটি ফল কিনল কুড়ি পয়সা দিয়ে। পয়সা দিতে দিতে বলল, কাল রাতে তো আপনারা কিছুই খেলেন না। ঝরঝরে পরিষ্কার সুরেলা গলা। স্বচ্ছন্দ। আমি খেয়াল না করলেও ওরা ঠিকই খেয়াল করেছে। কাল দুপুরে গিয়েছিলাম বাজাডোবায়। সাডনি ফলসে চান করতে। নেতারহাট থেকে প্রায় বিশ মাইল। ফিরতে রাত হয়ে গেল। ফেরার পথে আদিবাসী গাঁয়ের হাটে গাড়ি থামিয়ে দু বন্ধু কেনাবেচা দেখছিলাম। মুরগি, গরু, ছাগল থেকে শুরু করে চাল, ডাল, তেল, নুন, মশলাপাতি, আলুর বীজ সব বিক্রি হচ্ছে। একটা বুড়ো, আমগাছের নীচে গোল হয়ে বসে কয়েকজন দেহাতী শাল পাতার ডোঙার করে মহুয়া খাচ্ছিল। সুন্দর পানীয়। নির্মল, প্রসাদ ও আমি কাঠি গুঁজে বানানো ডোঙা। কচি পাতার ওই পত্র-পাত্রে খাঁটি মহুয়া এক অসম্ভব সুন্দর পানীয়। নির্মল, প্রসাদ ও আমি তিনজনেই ভিড়ে গেলাম ওই দলে। সঙ্গে ভাজা ছোলার চাট। ওরা সবাই খ্রীশ্চান। ওঁরাও গ্রামে সাহেববাবারা স্কুল করেছে, হাসপাতাল করেছে, উপাসনার জন্য চারচও বানিয়ে দিয়েছে। যীশুবাবার নামে উৎসর্গ করে সরু খোলার মত কাঠের লম্বা কৌটো থেকে ঢালছে আর খাচ্ছে। কতগুলি কৌটো যে খালি হয়ে গেল, শেষে আর গোনাগুনির স্টেজে ছিলাম না। অন্ধকারে গাছের চার ধারে একে একে কুপী জ্বলে উঠল, বহু উঁচুতে, আকাশের গায়েও অসংখ্য কুপীর আলো। আকাশ ও মাটির ওই দুই সার আলোর সেতাতে ভাসতে ভাসতে শরীরটা অসম্ভব হালকা মনে হল। বললাম, প্রসাদ তুমি গাড়ি নিয়ে পেছনে পেছনে এসো, আমরা এখন ছুটব।

—কুড়ি মাইল ছুটে এসেছেন? কৃষ্ণা ও অপর মহিলা দুজনেই যেন অবাক বিস্ময়ে শিউরে উঠলেন। আর ওদের প্রশ্ন শুনেই আমরাও খেয়াল হল, তাই তো কাল কতক্ষণ ছুটেছি, কতটা ছুটেছি তাতো মনে নেই। গোটা পথটাই কি ছুটে এসেছি? অসম্ভব। তাহলে তো ম্যারাথন রেসে নামার যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেছি।

—তা কম করেও মাইল চারেক তো হবে। নির্মল উঠে এসেছে। পাজামার ওপর একটা লাল কম্বল জড়িয়েছে গায়ে। হাতে চায়ের কাপ। সিনেমার হিরোর মত লম্বা ঢেউ খেলানো এক গুচ্ছ চুল ওর চওড়া কপালে নেমে এসেছে। ঘুম ভাঙা ভারী গলার স্বর। অম্লান হাসি মুখে। দুই মহিলাই একটু নড়ে চড়ে বসলেন। কাল রাতে খার কী, এত মহুয়া খেয়েছি যে আর অন্য কিছু খাওয়ার মত অবস্থাই ছিল না। তাও তো দৌড়ে হালকা খানিকটা হয়েছিলাম বলে লজে ফিরে মনে হল কিছু একটা খেলে ভালো হোত।

—তাই বুঝি ডাইনিং হলে এসে-ছিলেন? শ্যামলা হলেও মহিলার চোখ দুটি বড় বড় ভাসা ভাসা। যেন কথা বলে। অপরিচিতা বা সদ্য পরিচিতার চোখে চোখ বেশিক্ষণ রাখা ঠিক নয়। অসভ্যতা, নাকি হ্যাংলামি। আসলে এসব ভাবনা নিজেরই। অথচ তাকিয়ে থাকতে ভালো লাগে। যাকে দেখছি তার কি এই ধরনের অ্যাপ্রিসিয়েশন ভালো লাগে না? হয়তো লাগে, হয়তো লাগে না। ভদ্রমহিলা চোখ জোড়া নামিয়ে ছিলেন। ছেলে বাবার হাত ধরে টানতে টানতে এসে দাঁড়াল মায়ের পেছনে। এত ঝকঝকে তরুণী চোখ যার তার ছেলে নাইন বা টেনে পড়ে ভাবতেও মন কেমন বিবর্ণ হয়ে যায়। মুখ ফিরিয়ে স্বামীকে বললেন : তুমি মিস করলে।

ভদ্রলোকের গলার স্বর ওর গালের দাঁড়ির মতই নিবিড়। বললেন, বাথরুমে এক ফোঁটা জল নেই। কাল রাতে সেই যে লোডশেডিং শুরু হয়েছে, এখনো আলো আসে নি। আরো বোধহয় কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, ওর গলা ডুবিয়ে দিয়ে রেডিও বেজে উঠল : কভি কভি মেরা দিল মে। ম্যানেজারটা অসহ্য। এই ভোরে, পাহাড় যখন কচি রোদ্দুরে চান করছে তখন ট্রান-জিসটর চালিয়ে দিল। ওর ধারণা টুরিস্টরা বোধহয় এসব খুব পছন্দ করে। তাই খুব চড়া করে বাজাচ্ছে। বলেও লাভ হবে না। নিজে না বুঝলে, কেউ কি বলে বোঝাতে পারে।

শিবনাথ শাস্ত্রীরা আজই সকালে ফিরে যাচ্ছেন। আটটা নাগাদ নেতারহাট বাস স্ট্যান্ড থেকে বাস ছাড়বে। রাঁচির। ছিয়ানব্বই মাইল। পৌঁছোতে পৌঁছোতে বিকেল গড়িয়ে যাবে। রাত নটায় কলকাতার ট্রেন। ওদের এখুনি ঘর ছাড়তে হবে। একটা বিরাট বাস বোঝাই করে দুর্গাপুর থেকে কয়েক ডজন টুরিস্ট এসে এই মাত্র নেমেছেন। ম্যানেজারের সঙ্গে তাদের হাই লেভেল মিটিং চলছে। ম্যানেজারের বক্তব্য খুব কিন্তু, এত লোকের জায়গা কোথায়? দুর্গাপুরীরাও ছাড়বেন না—তারা চিঠি দিয়েই এসেছেন। চিঠি লেখাটাকে ম্যানেজার অস্বীকার করছেন না, কিন্তু তাঁর প্রশ্ন : পাল্টা চিঠি না পেয়ে কেন হুট করে চলে এলেন?

তর্ক-বিতর্ক বেশ জমে উঠেছে। নেতারহাটের এই টুরিস্ট লজ এতক্ষণে সত্যি সত্যি একটা হাট হয়ে উঠেছে। আর টেঁকা যাচ্ছে না। কৃষ্ণা আর ওর স্বামী অশোক হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে গেল। বড় ঘাঘরি, ছোট ঘাঘরি ওদের এখনো দেখা হয় নি। দেখা হয় নি লেবটাও।

প্রসাদ গাড়িটাকে নিয়ে ব্যস্ত। তেল-টেল সবই আছে। যত গন্ডগোল ওই ব্যাটাবাঁটাকে নিয়ে। অথচ অবাক কান্ড গত সাত দিন ওই ব্যাটাবাঁটাই গাড়িটাকে চালিয়ে নিয়ে এসেছে। চালানো মানে চাট্টিখানি কথা নয়। পিচ বাঁধানো রাস্তা তো দূরের কথা, রাস্তাই যেখানে নেই, শুধু পাথুরে মাটি, পাথর আর নুড়ি, শুকনো সব বালির খাত, মরা নদীর সোঁতা সব কিছুর ওপর দিয়েই ঠিক ঠিক চলেছে। অবিশ্যি এর মূলে নির্মল।

মেদিনী রায়ের ফোরট দেখার পর দিন দুপুরে ঠিক করলাম যাব সোজা মহুয়াদাঁড়। পালামৌ জঙ্গলের দক্ষিণ-

পর্যায়ে প্রান্ত। বিহার যেখানে ভোজালির মত মধ্যপ্রদেশে ঢুকে পড়েছে সেই টিপটা। এগারোটা নাগাদ প্রসাদ গম্ভীর মুখে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ঘরে এল। টেবিলের ওপর সাজানো বিসকুটের প্যাকেট, সরষের তেলের বোতল, ওষুধের প্যাকেট, চাল, ডাল ও ডিমের তিনটে আলাদা থলি। সব আসার সময় 'ডালটনগনজ থেকে কিনে আনা। বসে বসে লিখছিলাম। নির্মল একটা অ্যাডভেঞ্চার স্টোরি পড়ছিল। পেপিরাস। টেবিল থেকে সরষের তেলের বোতলটা খুলে ডান হাতের তালুতে খানিকটা ঢেলে নিল। মাথায় বুলোতে বুলোতে প্রসাদ বেরিয়ে যাচ্ছিল।

—আমরা ঠিক একটায় বেরোব প্রসাদ। বই থেকে চোখ না তুলে বলল নির্মল।

টাকে তেল ডলতে ডলতে নির্বিকার মুখে প্রসাদ বলল, আজ হবে না।

—কি'উ? বইটা বিছানায় রেখে ধড়[illegible]বে উঠে বসল নির্মল। আমার কলমটাও গেল থেমে।

—ব্যাটারী ডাউন।

—তোমাকে যে বললাম সকালে গাড়িটা ধাব করে মাইলখানেক রেসিং করিয়ে আনো।

—কি করে করব? গাড়ি যে স্টার্টই নিল না।

—হ্যানডেল মারলে না কেন?

—মেরেছি, তাতেও হল না।

—রামদাস আর ফরেস্ট গার্ডদের দিয়ে খানিকটা ঠেলে নিলেই তো স্টার্ট নিত।

—ওরা যদি ঠেলতে রাজি না হত?

এতক্ষণ কথাবার্তা হিন্দিতেই চলছিল। নির্মল এবার বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। স্বগতোক্তির মত বলল, দাঁড়াও তোমাকে দেখাচ্ছি। তুমি যেমন বুনো ওল, আমিও তেমনি বাঘা তেঁতুল। প্রসাদ এখনি ব্যাটা খুলে নিয়ে সোজা বেতলা চলে যা। ওখান থেকে লরি বা ট্রাক পাবে। তাতে চেপে চলে যাও বাঁচি। সারিয়ে কাল দুপুরে ফিরবে। আর হালদারবাবুকে বলবে এই দুদিন গাড়ি চলেনি, ঠায় বসেছিল—এক পয়সাও ভাড়া দেবো না।

বাইরে চড়চড়ে রোদ। গাছপালা পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। এক গ্লাস জল খেতে না খেতেই আর এক গ্লাস খেতে ইচ্ছে করছে। ঘাম হয় না, অথচ গায়ে রোদ পড়লে চামড়া ফামড়া সব পুড়ে যায়। অভ্যস্ত আদিবাসীরাও এ সময় বেরোয় না। সে যার মাটির ঘরে পড়ে আছে। বন্য জন্তুরাও সকাল সকাল জলভরা নালা বা ছায়া। ছায়া জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। এই দুপুরে আধমণী এই ব্যাটারিটা ঘাড়ে নিয়ে আট কিলোমিটার হেঁটে বেতলা যাওয়া, তারপর কোন শাল-খুঁটি বা বাঁশের ট্রাকে হাতে-পায়ে ধরে রোদে ভাজা ভাজা হয়ে শেষে রাঁচি পৌঁছলেও আর ফিরতে পারে কিনা সন্দেহ। যে ছবিটা আমি নিজে দেখতে পাচ্ছি, অভিজ্ঞ ড্রাইভার প্রসাদের কাছে নিশ্চয় তা জলের মত ক্লিয়ার। মুখের নির্বিকার ভাবটা মুহূর্তে কেটে গিয়ে কপালে গালে ব্রেশ কয়েকটা ভাঁজ ফুটে উঠল প্রসাদের। গলার স্বরও বদলে গেল: আমি স্নান সেরেই গাড়িটা নিয়ে পড়ছি। ঠিক একটার আগেই যে করে হোক বেডি করে ফেলব।

নির্মলের মুখ চোখ এখন নির্বিকার। গলাটা মোটা করে বলল: দেখা যায় গা।

পনেরো মিনিটের ভেতরেই বাইরে মরা গাড়িটার জ্যান্ত হওয়ার হাঁক-ডাক শুরু হয়ে গেল। রামদাসের ছেলে আর একটা গুন্ডা কিশোর গাড়িটা ঠেলছে। রামদাস বলে ওর ওই একটিই ছেলে। গুন্ডাটা অনাথ, তাই দয়া-পরবশ হয়ে ঠাঁই দিয়েছে। নির্মলের ধারনা অবশ্য ঈষৎ ভিন্ন।

কাঁটায় কাঁটায় একটায় আমরা বেরোলাম। ফিরতে রাত হবে। যেতে আসতে প্রায় দেড়শ কিলোমিটার। রামদাসকে ডিনার রেডি রাখতে বলে দিলাম। ড্রাইভারের সামনের আয়নায় চোখ পড়তেই দেখি প্রসাদের জ্যান্ত চোখটা পাথরের মত আমাদের দিকে তাকিয়ে। চোখাচোখি হতেই বাঁ চোখটা সরিয়ে নিল। প্রসাদের কাছে ব্যাকসিটের মানুষ দুটো সম্ভবত আর সাদামাটা টুরিস্ট নয়—সেরফ খুনে। উদ্ভট চরিত্র। রাতে রাতে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। দুপুরে বোদ যত চড়ে তত এদের গোবার নেশা বাড়ে। খাওয়া-দাওয়ার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। রাতের অভুক্ত ডিনার দিয়ে সকালে ব্রেকফাসট সারে। সারাদিন কাটে তাজা টাটকা বৃক্ষ-রসে।

রাস্তাটা এখানে একটা নালার ওপর দিয়ে ছুটছে। লোকাল নাম বানারী নালা। সিমেন্ট বাঁধানো কজওয়ের দুধারে মরা খাত জুড়ে বড় বড় দানার হলুদ বালি। বালির ওপর ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র মরা শুকনো পাতা। খানিকটা এগোতেই রাস্তাটা দু-ভাগ হয়ে গেল। ডান দিকের লাল মেঠো পথ চলে গিয়েছে ছিপাদহ হাটের দিকে। রামদাস এই হাট থেকেই মুরগী কিনে নিয়ে যায়। চাল, ডাল ফুরিয়ে গেলে এই হাটই একমাত্র ভরসা। মেঠোপথ ডান হাতে রেখে পিচ বাঁধানো রাস্তা ধরে গাড়ি এগোচ্ছে। দুধারে বিশ-পঁচিশ ফুট উঁচু শিশু শাল সবুজ পাতায় মসৃণ। সামনেই ছিপাদহ রেল গুমটি। দুবার কষে হর্ন দিতেই গুমটিঘর থেকে বেরিয়ে এসে গুমটিম্যান দরজা দুটো খুলে দিল।

আদিবাসীরা দারুণ ক্ষুধে। পাহাড়ে উপত্যকায় এত গাছ, এত কাঠ, সরকারী কানুনের ঠেলায় এক টুকরোও পাওয়ার জো নেই। এই গরমে কাঠে কাঠে ঠোকাঠুকি লেগে বা রেলের ইনজিনের পোড়া কয়লার আগুনে বনে দাবানল জ্বলে ওঠে নিত্যি। লাখ লাখ টাকার জঙ্গল পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তাতে সরকারের কোন আপত্তি নেই, যত আপত্তি গরীব গুর্বোরা যদি ভাত ফুটোনোর জন্য বা রামদানার আটা দিয়ে রুটি পাকানোর জন্য কয়েক টুকরো কাঠ কুড়িয়ে নেয়। তাহলেই থানা পুলিশ, মারধর, জেল। গাঁয়ের পালামৌ জঙ্গলের মতই আদিবাসীরা খেপে অস্থির হয়ে আছে। আর তাতে ইন্ধন জোগাচ্ছে পলিটিশিয়ানরা। সেই গল্পই শুনলাম বিয়াস সিংয়ের মুখে।

ঘরদোর ছেড়ে ছুড়ে একলা মানুষটা পড়ে থাকে এই জঙ্গলে। রাত-বিরেত নেই, অরণ্যজন্তুর তত্ত্ব-তালাশ নিয়ে ফেরে খালি হাতে। ভ্রূক্ষেপও নেই। করেও না। কিন্তু মানুষ-জন্তুর মুখোমুখি হলেই অস্বস্তি বোধ করে। সারা রাত জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে সকালবেলা কোয়ারটারে ফিরে দেখে বাড়ির সামনে শ' পাঁচেক আদিবাসীর এক উত্তেজিত ভিড়। হ্যানড মাইক মুখে ঠেকিয়ে ভিড়টাকে ক্রমাগত উত্তেজিত করে চলেছেন এক প্রাকতন এম-এল-এ। একদা এই জঙ্গলের মানুষের ভোটে নির্বাচিত হয়ে পাটনায় গিয়েছিলেন। পাঁচ বছর তার টিকিও কেউ দেখেনি। এবার হেরে গিয়ে আবার ফিরে এসেছেন। এসেই ঘোঁট পাকাচ্ছেন। প্রাকতন এম-এল-একে ঘিরে তার নিজস্ব চামচার দল। পাকানো গোঁফ, লম্বা জুলপি, বাবরী চুল, পরণে দামী ফিনফিনে ধুতির ওপর সাদা টেরিকট-এর পানজাবি। বক্তৃতার গলায় গনগনে আগুন —ভাইয়ো, এই জঙ্গল কার? এই মাটি কার? সব তোমাদের। অথচ তোমাদের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে বদমাইস সরকার। গুন্ডির তুষ্টি করি এই সরকারের। আর এই সরকারের পাজির পা ঝাড়া যে সব অফিসার তোমাদের জঙ্গলে ঢুকতে দেয় না তাদেরও গুন্ডির তুষ্টি করি। তোমরা যদি চাও তো তোমাদের এই জন্মভূমিতে এক টুকরো জমি পাবে না, একটা ঘর তুলতে পারবে না, অথচ জঙ্গলের অফিসার দেখ কেমন সুন্দর এই মন্দির গড়ে তুলেছে। এই মন্দিরের জমি কার? এ জমি তোমাদের।

ও হরি, অ্যাটাকটা সে ঘুরে বিয়াসের ওপর ডিরেকট এসে পড়ছে। কোয়ারটারের সামনে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ছোট একটা ফুলের বাগান শিল্পের হাতে গড়ে তুলেছে। ওই বাগানে ভেতরেই কুললক্ষ্মী নওলাক্ষার মন্দির বানিয়েছে বিয়াস। ব্যাটাচ্ছেলের টারগেট তাহলে ওই মন্দির। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। জ্বালাময়ী ভাষণ। তোমাদের যারা বাঁচকুটো সংগ্রহ করতে দেয় না, জঙ্গলে ঢুকতে দেয় না, তারা তোমাদের শত্রু। সব আদিবাসীর শত্রু। তোমাদের দেওতার কোন মন্দির নেই অথচ এই বিধর্মী নিজের দেওতার মন্দির বানিয়েছে তোমাদের জমিতে। তোড়ো ইরে মন্দির, তোড়ো।

জনতাও টগবগ করে ফুটছে। যে কোন মুহূর্তে কাঁটাতারের বেড়া ছিঁড়েফুড়ে ভেতরে ঢুকে সব লন্ডভন্ড করে দিতে পারে। ফরেস্ট গার্ডরা যে যার বন্দুক হাতে তুলে নিয়েছে। শেষে না একটা কেলেংকারী হয়। যে করেই হোক ঠেকাতে হবে।

সোজা ভিড় ঠেলে বক্তার সামনে এগিয়ে গিয়ে সবিনয়ে অনুরোধ করল বিয়াস: আমার সামান্য একটু বক্তব্য আছে। যদি মাইকটা একবার দেন।

চমচারা সঙ্গে সে বিয়াসকে ঘিরে ধরে গলা কাটিয়ে চীৎকার করতে লাগল—ক্রান্তি

নেহি। আদিবাসীদের দুঃখমোচন এই সরকারী অফিসারের কোন কথা কেউ শুনবে না।

চালাকাঠা পরিষ্কার। একতরফা লোক খেপিয়ে গণ্ডগোল পাকানোই উদ্দেশ্য। হাত মাইকের প্রয়োজন নেই। শ' পাঁচেক লোককে অ্যাড্রেস করার মত গলার জোর আছে। লরিতার ওপর বন দফতরের জিপটা দাঁড়িয়ে। ছুটে গিয়ে জিপের বনেটের ওপর উঠে বিরাস করজোড়ে জনতাকে সম্বোধন করে বলল, আপনারা আমাকে চেনেন। ছেষট্টি সাল থেকে এই জঙ্গলে পড়ে আছি। আমার বৌ-বাচ্চা কেউ এখানে থাকে না। আমি একাই থাকি। প্রথম যখন এখানে এসেছিলাম তখন মনে আছে এই জঙ্গলে সবাই কাঠ কাটতে পারত। বলুন পারত কি না?

জনতা নীরবে শুনছে। হ্যাঁ বা না কিছু বলল না। তাড়াতাড়ি মনে মনে অঙ্ক কষে নিল বিরাস। জবাব আসুক ছাই নাই আসুক, থামলে চলবে না। বলে যেতে হবে।

তারপর বাহাত্তর সালে সরকার নতুন কানুন করল। জঙ্গলের কাঠ কাটলে জেল হবে। আমি সরকারের নোকর। সরকার যা করতে বলবে, তাই করতে বাধ্য। কিন্তু আমি জানতে চাই, যে বা যারা আজ আপনাদের জন্য চোখের জল ফেলছে, তারা কেন ওই কানুন বানানোর সময় বাঁধা দিল না। আপনারা জানেন, কানুন বানায় এম-এল-এরা। মাননীয় বক্তা যিনি এতক্ষণ বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তাঁরাই এই কানুন বানিয়েছেন। গত পাঁচ বছরে ওই কানুনের জন্য আপনাদের হাত-পা বাঁধা ছিল। এখন ভোট হবে গিয়ে বলছেন, কানুন তোড়ো। এ কি ধরনের কথাবার্তা, আপনারাই বলুন।

জনতা যেন ইষৎ চঞ্চল। প্রাক্তন এম-এল-এ ও তার সঙ্গীরাও। প্রাক্তন এম-এল-এ মাইকটা মুখে নিয়ে কি যেন বলতে গেলেন, তার আগেই চঞ্চল জনতা গর্জন করে উঠল: ওকে বলতে দাও।

এতক্ষণে যেন পায়ের তলার মাটি ফিরে পেল বিরাস। উত্তেজনায় দরদর করে ঘাম-ছিল। পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ, ঘাড়, গলা ভাল করে মুছল। তারপর আরো একধাপ চড়িয়ে দিল গলা: আইন করেছিস, বেশ করেছিস, আমরা সরকারী কর্মচারী হুকুমের দাস, সব মেনে চলতে বাধ্য। কিন্তু যাদের ভোটে জিতে পাটনায় গেলি, গত পাঁচ বছরে তাদের জন্য কি করেছিস? একবারও এসে খবর নিয়েছিস যে এরা কেমন আছে? খেতে পায় কিনা? চাষের জমি আছে কিনা? মাথার ওপর একটা চালা আছে কিনা? উনুন জ্বালানোর মত কাঠ-কুটোর সংস্থান আছে কিনা? কানুন তো সরকার করেছে। কিন্তু আজ যারা উসকানি দিচ্ছে তাদের পার্টি তো বিরাট পার্টি, দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্টি। টাকা-কড়ির তো কোন অভাব নেই। কানুন করে যাদের ভাতে মারলি তাদের জন্য পার্টি ফান্ড থেকে দুটো পয়সা দান খয়রাত করতে কে বারণ করেছিল? জবাব দাও।

ভিড়টা রীতিমত ক্ষুব্ধ। মুখে মুখে স্লোগানের মত গর্জন উঠল: জবাব দাও। আড় চোখে তাকিয়ে দেখে বিরাস, চামচারা ব্যাটারী সমেত হ্যান্ড মাইকটা গুটিয়ে নিয়ে গাড়িতে তুলেছে। নেতা অসহায়, মুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামছেন। জনতা স্লোগান দিচ্ছে: জবাব দাও।

আবার সেই ধবল বিরাস: ভাইয়ো, আপনারা জানেন আমি গরীব সরকারী অফিসার। মাসে গেলে সাতশ টাকা মাইনে পাই। বাড়িতে পঠাই পাঁচশ টাকা। ঘরে স্ত্রী ও পাঁচটি বাচ্চা। নিজের জন্য বাকি দুশ টাকা। যদি চান, আপনারা সে দুশ টাকাও নিয়ে নিতে পারেন। আমার তো বদখেয়াল নেই। পাটনায় গিয়ে পড়েও থাকি না। বা নিজের কোন গাড়িও নেই। এই জিপটা সরকারের। সরকারী কাজ ছাড়া চড়িও না। যদি দয়া করে দোবেলা দুটো করে রুটি আর একটু ডাল দেন তাতেই চলে যাবে।

চামচারা সব গাড়িতে। অসহায় নেতা ফাঁক খুঁজছেন, কি করে এই ভিড়ের পাশ কাটিয়ে গাড়িতে উঠবেন, সম্ভবত তার সুযোগ পাচ্ছেন না। আউর এক ধাক্কা, তাহলেই চিত্তির হয়ে পড়বে। ভাইয়ো আপনারা জানেন নওরাক্ষা বড় জাগ্রত দেবী। শ্রাবণ মাসে দেবীর পুজো হয়। তার পর আপনারা মন্দির বানান, তুলে দিন কিছু বলব না। কিন্তু পুজোর আগেই, এই বৈশাখে যদি কেউ দেবীর মন্দিরে হাত দেয় তাহলে দেবী তাকে ভস্ম করে দেবে। সেই জন্য কি নেতা নিজের হাতে মন্দির না ভেঙে আপনাদের দিয়ে ভাঙাতে চাইছেন? যাতে যদি দোষ হয় তাহলে আপনাদেরই হবে—নেতার দোষ হবে না।

আর বক্তৃতার দরকার নেই। নেতার কাছা ধরে ঝুলছে কয়েকজন। বিদ্যুৎগতিতে কোমরের গিঁট খুলে ফেলে দিয়ে হরিণের মত তিন লাফে ভিড়ের ওপর দিয়ে প্রায় ভাসতে ভাসতে নেতা উড়ে গিয়ে ঢুকে পড়লেন গাড়িতে। গাড়ি আগে থেকেই স্টার্ট দিয়েছিল। জনতার হাতে হাতে ধুতির টুকরো, পানজাবির পকেট, আনডারওয়্যারের ফিতে। মোটর বেসের লাস্ট ল্যাপের স্পিডে নেতার প্রাইভেট কারটা ছুটছে। পেছনে হঠাৎ বর্ষার জলে ফুলে ফেঁপে ওঠা পাহাড়ী নদীর মত আদিবাসী জনতা। সে কি গর্জন, সে কি প্রচণ্ড ক্রোধ!

এই মাত্র আমাদের গাড়ি গাবু নদীর ওপর সেতুটা পার হয়ে এল। পাহাড়ী নদীর পক্ষে বেশ চওড়া। শুধু বালি আর পাথরে বোঝাই। জল নেই এক ফোঁটাও। সামনে ডান দিকে বন-দফতরের ডাক-বাংলো। ডাক-বাংলোর পরই রাস্তার দুধারে বাজার বসেছে। আজ হাটবার। ওঁরাও, সেরো মেয়েরা বিরাট বিরাট ভারী ঝুড়ি মাথায় নিয়ে ছুটছে। ভিড়ের ভেতর দিয়ে প্রসাদো হাতের খেলায় গাড়িটা ব্যাক্সুয়ালি ছুটে চলল।

সামনেই একটা পাহাড় এই পিচ রাস্তার ওপর আড়ভাবে নত হয়ে আছে। আমরা এই মাথায় চড়ে বসলাম। বোধহয় আড়াই হাজার ফুট ওপরে এখন। দুধারে বাঁশের ঝাড়। কচি বাঁশ। বিশেষ লম্বা চওড়া নয়। ছোটখাট সাইজের। সার দিয়ে রাস্তায় লরি দাঁড়ানো। আদিবাসী পুরুষ ও রমণী বাঁশ কাটছে। কলকাতার কাগজ কলে চালান যাবে।

ঘুরতে ঘুরতে গাড়ি নামছে। অসংখ্য ছোটখাটো নালা দু পাশের পাহাড় থেকে নেমে এসেছে। জল নেই। শকৃত পাথরের গায়ে গত বর্ষার দাগ ধূসর হয়ে আছে। নালার ধারে যেখানে এখনো একটু জল আছে সেখানে চিবো ঘাসের মসৃণ কার্পেট বিছানো। বোদের ঝাঁঝ একটু মরেছে। তিনটে প্রায় বাজে। মারোমার এই মাত্র পার হয়ে এলাম। অর্থাৎ অর্ধেক পথ কাবার।

বারেষাড় হয়ে যখন মহুয়াদাড়ে পৌঁছুলাম তখন সূর্য বিহারের [redacted] পাহাড়সারির মায়া ছাড়িয়ে মধ্যপ্রদেশের অরণ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। খেড় এখন [redacted] কিলোমিটার দূরে। একটা বিরাট টেবল-ল্যানড এই মহুয়াদাড়। চারধারে দূরে দূরে পাহাড়। বোদে পোড়া মাটি ধুলো ধুলো। একপাল ন্যাংটো আদিবাসী ছেলেমেয়ে আমাদের গাড়িটা ঘিরে দাঁড়িয়ে। রাস্তার ধারে কয়েকটা ভাজাভুজির দোকান। শালপাতার ঠোঙা দোকানগুলোর মুখে স্তূপীকৃত হয়ে আছে। প্রসাদ গাড়ির জল লাগবে বলে বোতল নিয়ে গম্ভীর মুখে চলে গেল একটা গলির ভেতরে। একটা বাস দাঁড়িয়ে আছে। ঘন ঘন হর্ন বাজছে। বোধহয় ছাড়ার সময় হয়ে এল। গাড়ির কপালে হিন্দিতে বড় বড় হরফে লেখা ডালটনগনজ। এরপর আর বাস নেই। আমরা দু ঠোঙা ভুজিয়া কিনে গালে ফেলতে লাগলাম।

দূরে ধুলো উড়িয়ে একটা ভ্যান [redacted] আসছে। মোটামুটি চোখের রেনজে আসতে ভ্যানের গায়ের লেখা পড়ে বুঝলাম স্থানীয় চারচের গাড়ি। ভেতরে ড্রাইভারের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে এক মহিলা স্টিয়ারিং ধরে আছে। লায়নার। গাড়ি চালানো শিখছে। পরনে গেরুয়া রঙের সিলকের শাড়ি। মাথায় গেরুয়া ক্যাপ, অনেকটা নার্সের টুপির মত। আমাদের গাড়িটা রাস্তার আধখানা জুড়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে ভ্যানটা থেমে গেল। আস্তে আস্তে পাশ কাটাচ্ছে। মহিলার গাত্রচর্ম উজ্জ্বল শ্যাম, চোখে মুখে যথেষ্ট চটক। কিন্তু বাজারের লোকজনের সামনেও বিকার-হীন মুখে ড্রাইভারের প্রায় কোলে বসে গাড়ি চালাচ্ছেন। মুখে চোখে ডোনট কেয়ার ভাব। ড্রাইভারের বাঁ হাতটা ভদ্রমহিলার কোমরে। আদিবাসীদের উন্নত করার ব্রত নিয়ে এই জঙ্গলে জায়গায় এসে দেশজ শহুরে আদব-কায়দাগুলো শাড়ির আঁচলের মতই গা থেকে খসে গিয়েছে। পীনোন্নত পয়োধরা। হাটুরে মানুষজন ফ্যাল ফ্যাল করে দেখছে। সম্ভবত অসভ্যদের যারা সভ্য করতে আসে তারা অসভ্যদের চাউনী-টাউনীগুলোকে

পেরোয়া করে না। একগাদা ধুলো নাকে মুখে ছড়িয়ে দিয়ে ভ্যানটা চলে গেল।

ফিরতি পথে বারেষাঁড়ে এসে প্রসাদ বলল, সাবধান সার, হাতি। কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে দুজনে নড়ে-চড়ে উঠলাম। এখানে দুধারে জঙ্গল ঢালু হয়ে নীচে নেমে গিয়েছে। বিলবিল, আসান, ধাউগাছের সার। ওই গাছগুলোর পরেই বাঁশের ঝাড়। বিশাল বিশাল পোড়া বাদামী কোট গায়ে দিয়ে সন্ধ্যার মুখে কচি বাঁশ দিয়ে ডিনার সারছেন তাঁরা—মা, বাবা ও তিনটি বাচ্চা। গাড়ির আওয়াজে বাবামশাই মুখটা ঘুরিয়ে সোজা আমাদের দিকে তাকালেন। বেশি নয়, পঁচিশ, ত্রিশ ফুট দূরে। ওরা যে বেশিক্ষণ আসেননি, তার প্রমাণ রাস্তার দুধারেই। বড় বড় ধাউ আর আসান গাছ গুঁড়ি ভেঙ্গে উলটে আছে। কাছ থেকে দেখলে জানবে—দুজনেই নেমে পড়লাম রাস্তায়। প্রসাদ বিড় বিড় করছে। ওর হতে একটা বোতল। গাড়ির ভেতরে ক্লমাট মিষ্টি গন্ধ। গাড়ির ও ড্রাইভার দুজনেরই পানীয় মহুয়াদাঁড় থেকে প্রসাদ জোগাড় করে এনেছে।

আস্তে মাদী হাতিটাও ঘুরল। বাচ্চা তিনটে লেপটে রয়েছে মার কোলের কাছে। সামনের একটা ঝাঁড়ের বাঁশ মটকে পড়ল। তারপর আরো কয়েকটা মদ্দাটার চোখের চাউনী অনেকটা বাংলা স্কুলের ইংরিজির মাসটারের মত। শুঁড় নয় তো ডাসটার। এখুনি ছাত্রদের আঙুলের গাঁটে গাঁটে করবে। দূরত্ব আস্তে আস্তে কমে আসছে। আর বড় জোর বিশ ফুট। প্রসাদ হঠাৎ চীৎকার করে উঠল : হাম গাড়ি ছোড় দেগা।

কথায় কথায় যে ব্যাটারী ডাউন হয়ে যায়, প্রাণের ভয়ে তাও এখন চাঙ্গা। হ্যানডেল লাগল না। কোন ধাক্কা না। চাবি ঘোরাতেই গর্জন করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চোখে সামনে একটা বাঁশ ঝাড় ছত্রাখান হয়ে পড়ল। শুধু কানে এল নির্মলের আর্তনাদ : বান, পিনাকী বান। বাদামী কোট ছুটে আসছে।

টেনে দরজাটা বন্ধ করে ওঠার আগেই দেখি গাড়ি সেকেনড, থারড শেষ করে লাসট গিয়ারে পৌঁছে গেছে। জানালায় মুখ রেখে দেখতে পাচ্ছি বারেষাঁড় রেনজটা বিলবিল, আসান, ধাউয়ের বেড়া ভেঙ্গে দলমল করে ছুটে আসছে। আপনা আপনি চোখ বন্ধ হয়ে গেল।

কৃষ্ণা আর অশোক দুপুর বেলা ফিরে এল লজে। প্রায় চার হাজার ফুট উঁচু নেতারহাট। না, ঠান্ডা, না গরম, চমৎকার বাতাস। রোদের ঝাঁঝ নেই। তবু অনেকটা পথ ঘুরে আসায় কৃষ্ণার ফরসা মুখখানা টকটক করছে। আমাদের মালপত্র গাড়িতে ওঠানো সারা। হাতে গড়া রুটি, মুরগীর মাংস ও পেঁয়াজ দিয়ে এইমাত্র লানচ সেরে উঠেছি। প্রসাদ গাড়ির তেল, জল ইত্যাদি ঠিক ঠাক আছে কি না চেকআপ করে নিচ্ছে। নির্মল গেছে ম্যানেজারের ঘরে বিল মেটাতে। বারান্দায় পা রেখে কৃষ্ণা যে চমকে উঠল : আপনারা কি চলে যাচ্ছেন?

বললাম—হ্যাঁ। তবে যাওয়ার পথে একবার খেড় ডাক বাংলোটা ঘুরে যাব।

: কেন নেতারহাট ভালো লাগছে না?

: লাগছে। তবে বেশী দিন এক জায়গায় থাকলে পা দুটো কেমন অচল অচল লাগে। থিতু হতে মন চায় না।

যেন আপন মনেই বলল কৃষ্ণা, দিদিরাও আজ সকালে চলে গেলেন। ভাবলাম আপনারা থাকবেন। তা আপনরাও চলে যাচ্ছেন।

অশোক প্রসঙ্গটা ঘোরানোর জন্য বলল, কৃষ্ণার গান আপনারা শুনলেন না। ও দারুণ রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়।

: তাই নাকি। বেশ তো। চলুন আমাদের ঘরে। এখনো বওনা হতে আধঘন্টা বাকি। খালি গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত তো মধু।

লজ্জায় কৃষ্ণার লাল মুখটায় যেন একরাশ আবীর মাখিয়ে দিল। নির্মল বিল মিটিয়ে ফিরে আসছে। পেছনে ম্যানেজার তার বিখ্যাত নিজস্ব ইউনিফরমে।

—কি রে দাঁড়িয়ে কেন চল। আর দেরি করলে খেড় পৌঁছোতে রাত হয়ে যাবে।

—একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত—

—এই দুপুরে রবীন্দ্রসঙ্গীত। নির্মল একেবারে মত্ত হাতীর মত শুঁড় পাকিয়ে উঠল। আমার কথা শেষ হওয়ার আগে এমনভাবে মুখ বেঁকিয়ে উঠল যে, আর কিছু বলা চলে না। মেয়েটির মুখের দিকে আর তাকানো যাচ্ছে না। অশোকও বিব্রত। কিন্তু নির্মলের কোন বাখঢাক নেই—চ, চ, দুপুরবেলা গান ফান আর শুনতে হবে না।

হঠাৎ যেন ওর খেয়াল হল, এত হড়বড় করে বলাটা বোধহয় ঠিক হয় নি। তাড়াতাড়ি নিজেকে অ্যামেন্ড করে নিল—কে গাইবে?

: কৃষ্ণা দারুণ গান গায়।

জিভ টিভ কেটে কৃষ্ণার সামনে হাতজোড় করে বলল : মাপ করবেন, আমি ঠিক বুঝতে পারি নি। না, না, গান না শুনে কিছুতেই যাচ্ছি না। চলুন, চলুন আমাদের ঘরে চলুন।

হৈ হৈ করে এক মুহূর্তে জমে ওঠা গুমোট তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে ওদের নিয়ে নির্মল ঘরে ঢুকল। মাঝে মাঝে এমন এক একটা ওল নামায় নির্মল যে, পরে সামাল দিতে ওরই ঘাম ছুটে যায়। তবু যা হোক ম্যানেজ তো করেছে।

সেদিন খেড়ে পৌঁছোতে অনেক রাত হয়ে গেল। আধখানা বাটির মত একটা চাঁদ তখন পালামৌ রেনজের মাথায়। বাতাস ভারী। ঠান্ডা। বোধহয় দূরে কোথাও দু এক পশলা হয়ে গিয়েছে। আসতে আসতে চোখে পড়ল পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। কৃষ্ণার গলায় আগুনের পরশমণি এখনো সমস্ত প্রাণ ছুঁয়ে আছে। স্নিগ্ধ পরিচ্ছন্ন উচ্চারণ। বেদানার দানার মত প্রতিটি শব্দ আলাদা আলাদা ভাসা যায়। অথচ পরস্পরকে ছুঁয়ে থাকে। গান থামিয়ে দুম করে জিজ্ঞাসা করল—আপনারা কি এভাবেই দুজনে ঘুরে বেড়ান।

: তার মানে? প্রশ্নটা ঠিক ধরতে পারি নি বলেই ব্যাখ্যা চাইলাম।

একটু যেন অপ্রস্তুত বোধ করছে। বলতে গিয়েও আটকে যাচ্ছে—মানে শুধু আপনারা আপনারাই ঘোরেন। আর কেউ কখনো সঙ্গে থাকে না?

অর্থাৎ বিবাহিত কি না? আমরা নির্ভেজাল দুটি এডে গরু, না, গলায় ঘন্টা বাঁধা হয়ে গিয়েছে? এই প্রশ্নটাই করতে গিয়ে মেয়েটা ঘেমে নেয়ে উঠছে। একসঙ্গে দুজনেই প্রাণ খুলে হেসে উঠলাম। নির্মল জবাবটা দিল—কবিতা টবিতা আমার খাদ্য নয়, তবু একটা লাইন মনে আছে, পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য নহিলে খরচ বাড়ে।

আর যদি কখনো বাঁচি আসি তাহলে নিশ্চয় যেন ওদের বাড়িতে উঠি। কৃষ্ণা, অশোক দুজনেই বার বার অনুরোধ করেছে। গাড়ি ছাড়ছে। অশোক বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে। কৃষ্ণার মুখটি গাড়ির জানালায়। পাইনের ছায়া ওর দুই চোখ জুড়ে : আসবেন তো?

বললাম : আসব, নিশ্চয় আসব।

গাড়িটা আস্তে আস্তে পাহাড়ী পথ ধরে ওপরে উঠছে। দুধারে পাইন ও দেবদারুর সারি। ছায়া ছায়া পথ। দূরে লেকের জলে এক টুকরো মেঘ আটকে আছে। প্রসাদের মুড আজ ফাইন। বোধহয় একটা বোতল সকালেই খালি করে দিয়েছে। কিছু আর ভাল লাগছে না। বিষণ্ণতা যেন পেয়ে বসেছে। হয় না কখনো কখনো, বন্ধুর বিষন্নতাও বুকের ভেতর ছবি আঁকে।

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের পিতরা

পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব কিভাবে এবং কতোদিন আগে হয়েছিলো, তা নিয়ে আজও গবেষণার শেষ নেই। বাস্তবিকই নিজেদের অতীত ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে খুব অদ্ভুত লাগে। আমরা চাঁদে পৌঁছে গিয়েছি, কিন্তু নিজেদের ইতিহাস এখনও সঠিক জানি না। গত শতাব্দীতে ডারউইন চেষ্টা করেছিলেন, সবটা পারেন নি। তাঁর বর্ণিত ধারাবাহিকতার মাঝে মধ্যে কিছু ফাঁকফোকর ছিলো, স্বীয় জীবদ্দশায় ডারউইন তা ভরাট করার সুযোগ পান নি। এখন আবার নতুন নতুন নানা আবিষ্কার আমাদের অহরহ চমকে দিচ্ছে। এই তো কিছুদিন আগে পূর্ব আফ্রিকার দুটি ঘটনা নৃতাত্ত্বিকদের রীতিমতো হকচকিয়ে দিয়েছে। প্রথমটি হলো কেনিয়ার পাওয়া একটি মাথার খুলি ও কিছু হাড়, কার্বন ডেটিং প্রক্রিয়ার যার বয়েস টের পাওয়া যাচ্ছে প্রায় ছাব্বিশ লক্ষ বছর। ভাবি অবাক কান্ড বটে, কারণ বর্তমান ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী আদি মানুষ 'হোমো ইয়েকটাস'-এর আবির্ভাব ঘটে মাত্র দশ লক্ষ বছর আগে। অথচ কেনিয়ার পাওয়া এই খুলিটি মানুষের এবং তা এর দ্বিগুণ পুরোনো। আরো আশ্চর্যের কথা যে, ছাব্বিশ লক্ষ বছর আগের এই খুলির গঠন দেখে মনে হয় হোমো ইরেকটাসের চেয়ে (যারা মাত্র দশ লক্ষ বছরের নাবালক) এরা অনেক উন্নত মস্তিষ্কের অধিকারী ছিলো। কে এই রহস্যের উত্তর খুঁজে এনে দেবে?

আর একটি আবিষ্কার ঘটেছে মোয়াজিল্যান্ড ও নাটালের মধ্যে সীমা-রেখা বরাবর। এক গুহার ভেতর মেঝে খুঁড়ে মনুষ্য বসতির চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। পোড়া কাঠের টুকরো, ভুক্ত আহার্যের অবশিষ্টাংশ, শিকার করে আনা পশুর অস্থি, কিছু মানুষের হাড় এবং একটি আস্ত শিশুর কঙ্কাল ইত্যাদি। প্রাপ্ত দ্রব্যাদি পরীক্ষা করে নৃতাত্ত্বিকেরা বলছেন যে এরা শুধু যে আধুনিক ছিলো তাই নয়—এরা আমাদেরই গোত্রের প্রাণী, অর্থাৎ খাঁটি হোমো স্যাপিয়েন্স। অস্থির গঠনে কোনো পার্থক্য নেই। অথচ (এবং এটি খুব বিরাট 'অথচ') সে সময়টা হলো হিসেব মতো নিয়ানডার্থাল মানুষের যুগ—কারণ কার্বন ডেটিংয়ের দ্বারা ওই কঙ্কালের বয়েস দেখা যাচ্ছে প্রায় সত্তর হাজার বছর। সত্তর হাজার বছর আগে হোমো স্যাপিয়েন্স-এর আগমনই ঘটে নি পৃথিবীতে, তারা (অর্থাৎ বর্তমান মানুষ) বসবাসও আবিষ্কার হয় মাত্র পঁয়ত্রিশ হাজার বছর আগে। শুধু তাই নয়—এই মানুষেরা হাতিয়ার তৈরিতেও বেশ দক্ষ ছিলো। গুহার মাটি খুঁড়ে অনেক এমন পাথর ও হাড়ের হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছে যা আজও সম্পূর্ণ ব্যবহারযোগ্য। এরা গুনতেও জানতো এমন প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে, কোনো কিছু গুনতে হলে এরা হাড়ের টুকরোর ওপর খোদাই করে তার হিসেব রাখতো। এদের বোধহয় কোনো নির্দিষ্ট ধর্মও ছিলো, কারণ সাধারণতঃ ধর্মই পরলোক বিশ্বাস এনে দেয়। এরা মৃত্যুর পরবর্তী অস্তিত্বে বিশ্বাস করতো। পুনরুত্থান ঘটবে এই আশায় অত্যন্ত যত্নে শিশুটিকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল—আশে-পাশে ছিলো নানা নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য—যাতে নতুন জীবনে জেগে উঠে বালকটি তার প্রয়োজনীয় সব কিছুই পেয়ে যায়। অবশ্যই এদের একটা বেশ উন্নত রকমের ভাষাও ছিলো—কারণ অমরত্ব জাতীয় বিমূর্ত চিন্তাকে হাত-পা নাড়া বা পশু-সুলভ গর্জন দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। সত্তর হাজার বছর আগে বুদ্ধিমান প্রাণী, যারা অবিকল মানুষের মতো দেখতে, যারা মৃতকে পুনর্জীবিত হবে এই আশায় সমাধিস্থ করতো, যাদের ভাষা ছিলো, হাতিয়ার ছিলো—এরা কারা? এই ধাঁধার উত্তর পাওয়ার জন্য শেষ অবধি আমাদের কি দানিকেন সাহেবের কাছে ছুটতে হবে?

নিয়ানডার্থাল মানুষেরা কৃষ্টিহীন অসভ্যের জাত ছিল—একথা মনে করা একেবারে ভুল। বরং তারা একটা বিষয়ে আদি হোমো স্যাপিয়েন্স্দেরও ছাড়িয়ে গিয়েছে। খুলে বলি।

নিয়ানডার্থালরাও মৃতদের কবর দিতো ইরাকের শানিদার গুহায় এরকম কয়েকটি কবর পাওয়া গিয়েছে। অবশ্য এটাই বড় কথা নয়, মজা রয়েছে অন্য জায়গায়। সমাধির থেকে কিছু মাটির নমুনা অনু-বীক্ষণের নিচে পরীক্ষা করতে গিয়ে চমকে উঠলেন শ্রীমতী আরলেৎ লেরয়া-গুরহান একি দেখছেন তিনি! মৃতের মাথার কাছ থেকে পাওয়া মাটিতে মিশে আছে লক্ষ লক্ষ ফুলের রেণু। ফুলের পাপড়ির গুঁড়োও রয়েছে সেই সঙ্গে। কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়েই এত ফুলের রেণু মাটির দশ হাত নিচে চলে যেতে পারে না।

নিয়ানডার্থালরা আজ থেকে ষাট হাজার বছর আগেও মৃতদেহ ফুল দিয়ে সাজিয়ে দিতো।

ভাবা যায় একথা! মৃতকে ফুল দিয়ে সম্মান জানানো তো রীতিমতো আধুনিক প্রথা—বিদগ্ধ মনের পরিচয়। ষাট হাজার বছর আগে তুষার যুগের শীতল, নির্জন পাহাড় চূড়ার একজন লোমশ নিয়ানডার্থাল মানুষ তার সদ্য মৃত প্রিয়জনের শেষ শয্যা সাজিয়ে দেবার জন্য ফুল খুঁজছে, অর ম্লান মাঝে মাঝে হাতের উলটো পিঠ দিয়ে চোখ মুছে নিচ্ছে—এই ছবিটি কল্পনা করতে চেষ্টা করুন তো। গায়ে কাঁটা দেবে বিস্ময়ে।

পঁয়ত্রিশ হাজার বছর আগে নিয়ান-ডার্থালরা পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যায়, সে জায়গা দখল করে হোমো স্যাপিয়েন্স্। নতুন দলের ভাষা ছিলো আরো উন্নত, তারা দৈনন্দিন ঘটনার রোজনামচা রাখতে জানতো—ফলে যুগ থেকে যুগে চিন্তা-ধারাকে চালনা করা সম্ভব হয়েছিলো তাদের পক্ষে। চান্দ্র-মাসের সাত জড়িত এক প্রাচীন হাড়ের ওপর আঁকা পঞ্জিকাও

পাওয়া গিয়েছে তাদের। বন্যা, ঝড় ইত্যাদি নানা প্রাকৃতিক ঘটনার ছবি খোদাই করা আছে তার ওপরে। বছরের কোন ঋতুতে কি রকম আবহাওয়া আশা করা যায় তারই স্মারক আর কি। প্রখ্যাত নৃতাত্ত্বিক শ্রীমতী জাকেত্তা হক্স্ মনে করেন এইসব বিশেষ জ্ঞানের হাতিয়ারের জোরেই হোমো স্যাপিয়েন্সরা জিতে গিয়েছিলো।

শিল্প ও সৌন্দর্যের বোধ মানুষের খুব পুরনো বোধ। পৃথিবীর বহু জায়গায় নিজেদের আবাস যে গুহার, তার দেওয়ালে নানা রঙের ছবি এঁকে গিয়েছে গুহাবাসী মানুষ। কোনো কোনো ছবি আজও টিকে আছে। এ-সব প্রাগৈতিহাসিক গুহা চিত্র অবশ্য শুধুমাত্র সৌন্দর্যবোধের তাড়নায় আঁকা হয়নি, তবু সে সব ছবিতে রঙের সুচিন্তিত ব্যবহার, বলিষ্ঠ রেখা এবং দৃশ্য পরিকল্পনা ইত্যাদি অবাক করে দেয়।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এক গ্রীষ্মের বিকেলে স্পেনের সান্তিলানাদেল-মার প্রদেশে মার্সেলিনো সাওতুওলা নামে এক-জন সখের প্রত্নতাত্ত্বিক আলতামিরা গুহার ভেতরে একা খনন কার্য চালাচ্ছিলেন। গুহাটি ছোট ছোট অনেক কামরায় ভাগ করা। তাঁর ন' বছর বয়েসের মেয়ে মেরী খেলতে খেলতে পাশের একটা কক্ষে চলে গিয়েছে, সেটা মার্সেলিনো খেয়াল করেন নি। হঠাৎ সেখান থেকে মেরীর উত্তেজিত গলার চিৎকার—টোরোস, টোরোস। বাবা, শিগ্‌গির এসো—কতো ষাঁড়।

মার্সেলিনো দৌড়ে গেলেন। গুহাভ্যন্তরের আধো আলো আধো অন্ধকারে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে মেরী কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর দেওয়ালে লাল, কালো, বাদামী, হলুদ ইত্যাদি রঙে আঁকা অন্ততঃ ১৭।১৮টি—না, ষাঁড়ের নয়, বাইসনের ছবি। বাচ্চা মেয়ে ষাঁড় বলে ভুল করেছে। গুহার আরো ভেতরে এগিয়ে গেলেন মার্সেলিনো। হ্যাঁ, যা ভেবেছিলেন তাই। শুধু বাইসন নয়—বন্যবরাহ, ঘোড়া, হরিণ এবং নেকড়ে বাঘের অজস্র ছবি রয়েছে ভেতরে। একটা লোমশ ম্যামথের ছবিও রয়েছে।

এইভাবেই বিখ্যাত আলতামিরা গুহা আবিষ্কৃত হয়। এবং এর সঙ্গে সঙ্গেই খুলে যায় মানবসভ্যতার অন্ধকার প্রাক্-ইতিহাসের দরজা।

মার্সেলিনো দেখেশুনে ঠিক করলেন এসব ছবির কোনোটিরই বয়েস দশহাজার বছরের কম নয়—বরং বেশী। সবচেয়ে আধুনিক যেটি, সেটিও কমপক্ষে চোদ্দহাজার বছরের আগে আঁকা। তখন পুরনো প্রস্তর-যুগ শেষ হ'য়ে আসছে, শেষ তুষারযুগের হিমবাহ গলতে শুরু করেছে একটু একটু করে। বয়েস নির্ণয় করা মার্সেলিনোর পক্ষে তেমন অসুবিধা হয়ে দাঁড়ায়নি। কারণ গুহায় এমন সব প্রাণীর ছবি রয়েছে, যারা পুরনো প্রস্তর যুগের শেষাশেষি পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

১৮৮০ সালে লিসবনের এক সভায় মার্সেলিনো তাঁর আবিষ্কারের কথা প্রথম ঘোষণা করেন এবং ওইসব গুহাচিত্রের কিছু হাতে আঁকা নকল উপস্থিত পণ্ডিতদের দেখান। কিন্তু হায়! কেউ বিশ্বসই করলো না তাঁর কথা, ছবিগুলিকে জুয়াচুরি বলে উড়িয়ে দিলো। নিশ্চয় লোকটা চুপিচুপি গিয়ে গুহার গায়ে ছবি এঁকে রেখে এসে এখন ফাঁকতালে নাম করবার চেষ্টা করছে। পনেরো হাজার বছর আগে মানুষ রঙিন ছবি আঁকতে শিখেছে—তাও এতো সুন্দর! হাঃ, পাগল নাকি!

মার্সেলিনোকে জীবন কিছুই দেয়নি। জোচ্চোর, ঠক, প্রতারক—ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত হয়ে সকলের চোখের আড়ালে প্রাগৈতিহাসিক শিল্পের প্রথম আবিষ্কারকের মৃত্যু হয়। এবং তার ক বছর পর থেকেই সমস্ত পৃথিবী জুড়ে একে একে আবিষ্কার হতে থাকে নতুন গুহা, যাতে ঠিক আলতামিরার মতো ছবি আঁকা রয়েছে। এমন কি আলতামিরার মাটি খুঁড়ে আরো বড়ো হাড়ের ওপর আঁকা বাইসন ইত্যাদির ছবি বের করলেন, যা ওপরের ছাদে আঁকা ছবির সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। সমস্ত জগৎ জুড়ে এই নিয়ে সাড়া পড়ে গেলো। কিন্তু অহো ভাগ্যম্ মার্সেলিনো সাওতুওলা তখন কোথায়? এ কথা কে বলবে, তাঁর মতবাদ শেষপর্যন্ত গৃহীত হয়েছে দেখে নিজের অবহেলিত করবের নিচে মার্সেলিনো গভীর তৃপ্তিতে পাশ ফিরে শুয়েছিলেন কিনা।

সত্তর বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর বৈজ্ঞানিকেরা এসব গুহাচিত্রের ব্যাপারে কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর বের করতে পেরেছেন সবচেয়ে পুরনো গুহাচিত্রটির বয়েস তিরিশ হাজার বছর। আর সবচেয়ে আধুনিকটি দশহাজার বছর আগে আঁকা। প্রথম যুগের ছবিতে ডিটেলের কাজ তত স্পষ্ট ছিলো না আঙ্কিত পশুদের শারীর-সংস্থানও যথাযথ নয়। যত দিন গড়িয়েছে, শিল্পরীতিও তত উন্নত হয়েছে, রঙের ব্যবহার হয়েছে সুচিন্তিত। ছোটো ছোটো ডিটেলের দিকে নজর পড়েছে শিল্পীর। এক এক জায়গায় এরা প্রায় পিকাসোর কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। যেমন একটি হরিণের মুখ প্রোফাইলে আঁকা, কিন্তু শিঙদুটো আঁকা ফ্রন্ট্ ভিউতে। কান-দুটো মুখের যেখানে-সেখানে জুড়ে দেওয়া। তবু পাকা হাতের গুণে এটিকে হিজিবিজিবিজ্ঞের ছবি বলে মনে করবার কারণ নেই।

প্রাগৈতিহাসিক গুহামানবেরা এত কষ্ট করে এইসব ছবি কেন এঁকেছিলো—এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই মনে আসে। না, নিজের শিল্পের বোধকে তৃপ্ত করার জন্যই শুধু এ-সব ছবি আঁকা হয় নি। তখনকার মানুষের আরো নিদারুণ সব সমস্যা ছিলো, আর্ট নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো সময় তার আদৌ ছিল কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। আধুনিক পুরাবিদেরা বলেন—গুহাবাসী মানুষ এই ছবিগুলিকে sympathetic magic হিসেবে ব্যবহার করতো। খাদ্য সংগ্রহ করা সে যুগের একটি প্রধান সমস্যা। দল বেঁধে শিকার করতে বেরুনোর আগে গুহামানবেরা এ-রকম একটি ছবি এঁকে বেরুতো—যাতে দেখা যেতো একটি বিরাট হরিণ তীরবিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছে, বা একটি বাইসন বল্লমের খোঁচায় আহত হয়েছে—এই ধরনের কিছু। যে পশু শিকার করা হবে, তার ওপরে এইভাবে তুকতাকের জাদু বিস্তার করা সম্ভব, এই আশায় আঁকা হতো ছবি। অর্থাৎ একটি হরিণ তীর লেগে মারা গিয়েছে, এই ছবি এঁকে রেখে সেদিন একটি হরিণ শিকার করা যাবে।

সাধারণতঃ এই ছবিগুলি গুহার অনেক ভেতরে অন্ধকার কোনো জায়গায় আঁকা হতো। কেন এভাবে ছবি লুকিয়ে রাখতো গুহামানবেরা? বোধহয় অন্য গোষ্ঠীর কেউ দেখতে পেলে ম্যাজিক নষ্ট হয়ে যাবে এই ভয়ে। কিম্বা অন্য কারণও হয়ে যাবে এই ভয়ে। কিম্বা অন্য কারণও থাকার পরে আর সঠিক উত্তর দেওয়া বোধহয় সম্ভব নয়। নিজের গোপন কথা নিজের বুকে চেপে রেখে আদিমানব পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে—সে আজ বহুদিন হোলো।

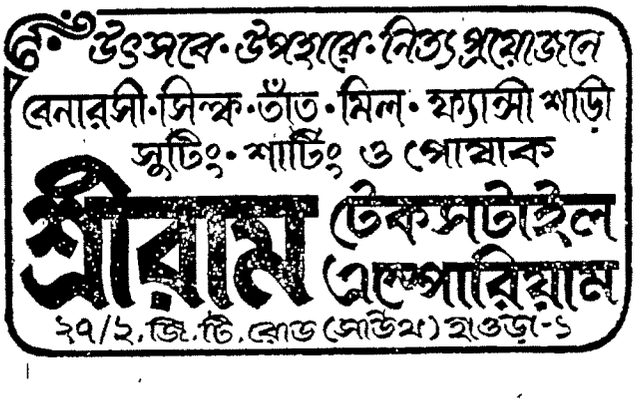

অনুভবে স্থির

শান্ত রায়

অন্ধকারকে সবচেয়ে কাছে পাওয়া যায়
আকাশের নিচে,
নক্ষত্রের বিচ্ছুরণে আকাশ ও অন্ধকার প্রকৃত সুন্দর
হয়ে ওঠে....
এইসব ভাবতে ভাবতে, পায়ের আঙুল থেকে
মাথা অব্দি ডুবে যায় ঘুমে,
তুমি পাশে শুয়ে আছো—বুকের সান্নিধ্যে সুখ,
হাতে হাত, অনুভবে স্থির।

অরণ্যে বৃক্ষের শাখা অপর বৃক্ষের বাহু ছুঁয়ে
বেঁচে থাকে সারারাত
নক্ষত্রের বিচ্ছুরণে আকাশ ও অন্ধকার প্রকৃত সুন্দর
হয়ে ওঠে....
যেন আমি যন্ত্র ক্লান্ত, পরিশ্রমে হয়ে যাই ঘুমে; তুমি
আমপল্লবের মতো সম্পূর্ণতা আনো।

জলের ভিতরে

মতি মুখোপাধ্যায়

জলের তো হাত নেই, হাতছানি তার
গোপনে গোপনে তবু ডাকে
কাকে, ঠিক জানা নেই, উপরিতলের
মসৃণতা সব ঢেকে রাখে।

জলের তো দাঁত নেই, তবু হাঙরের
নীরব অস্ত্রে কাটে কারো যৌবন
নাকি সর্বক্ষণ, কবেকার মাহাজন্তুবির
রক্তের কোঁটা যেন প্রবাল নাড়ির
ভিতর ঝরে টুপাটাপ, ... বৃষ্টি যেমন।

জলের ভিতরে ওরা কারা; সে, আমি
নাকি আমাদেরই
অসুখী আত্মারা ?

পড়ে আছে, থাকে

সলিল চক্রবর্তী

এখন নিশ্চিন্ত সব ঘুমের ভিতরে, ঘুমে, শুধু
তালদীঘি ফুটে আছে মাঠে, কথা বলে কারো সাথে।
ঘর সাথে। পড়ে আছে এলোমেলো দুধেল শবরী।

বিদ্যুৎ বেসেছে ভালো, একাকী সে আছে পড়ে, আছে,
থাকার মতোন নয়, অথচ যে আছে, পড়ে আছে,
কাদায়, বৃষ্টিতে জলে। ভালোবাসা এইভাবে ছিঁড়ে
খুঁড়ে তাকে, কষ্ট দেয়, মারে, দুঃখে হাততালি দেয়—
তবুও সে ভেসে যায়, থাকে পড়ে থাকে।

দেবতার বংশধর

জয়ন্ত চক্রবর্তী

চন্দন, তোরই জন্যে আমার দুঃখ
তোর অমল মুখে বুলি শুনি : নিলামবালা ছ আনা।
এটা কি তোর নিজেরও মূল্যমান ?
তিনতলা থেকে ইন্দ্রশিশু হাত দেখিয়ে বলে,
'আমো নিলামবালা, আমি বেলুন নেব।'
ইন্দ্রশিশু বেলুন কিনে সোজা চলে যায়
ইস্কুলের গাড়ির ভিতর।

চন্দন তোর মায়ের বুকেও ছিল ওমন একটি
ঝকঝকে ইস্কুলের গাড়ি—তিনতলা ইস্কুলের বাড়ি।
তোর রুগ্ন বাপের বুকে, স্কুলবসার ঘণ্টা
আর তোর বুকে, মায়ের খিদের মুখ, বাপের খিদের মুখ।

চন্দন, এখন তোর ইন্দ্রশিশুর মতো বাল্য বয়স,
কে বানালো তোকে ফিরিওয়ালা ?
চন্দন, তোর ছ' আনার মলে ভদ্রলোকেরা টুসকি মেরে
ফেলে দেয় সিগারেটের ছাই
তোর নিলামগাড়িটা কোন্ রাজ্যে যায় চলে ? আবার আসে...

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সোনার হরিণ নেই

[পঁচিশ]

দু তিনখানা চেয়ার পড়ে সামনে সে-রকম চিলতে বারান্দা। মাঝারি সাইজের শোবার ঘর একটা। তার পিছনে পার্টিশন করা দুটো ছোট খুপরি। কিচেন আর বাথ। যেমন কথা হয়েছিল গায়ত্রী বাই তার কিছু বেশিই করে দিয়েছে। নিজের বাংলো থেকে জলের পাইপ আর ইলেকট্রিকের লাইন টেনে দিয়েছে। কাঠের কাজ সব, নগদ টাকা ফেললে এটুকু কনস্ট্রাকশনের জন্য কন্ট্রাক্টারের কত আর সময় লাগতে পারে। বাঙ্গালী মহিলার তাড়ায় দেড় মাসের মধ্যে সব কাজ শেষ। মাঝে মেহেদির পার্টিশন বসানোও। একদিকের বারান্দা বা ঘর থেকে অন্যদিকের বাংলো শুধু দেখা যায়। মানুষ দেখা যায় না।

কর্তার নির্দেশে এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে বাপী তরফদার চা-বাগানের ক্লার্ক ছেড়ে এই বাসস্থানে উঠে এলো। মহিলাকে এই দু মাস ডাক্তারবাবুর চড়া বিল মেটাতে হয়েছে। এ-সময়টা বাপীকে পঞ্চাশ টাকা করে পকেট-খরচ দেওয়া হয়েছে। দুবেলার চা জলখাবার পর্যন্ত ব্যবসার অ্যাকাউন্টে গেছে যখন বাপীর পাঁচ টাকারও দরকার হয়নি। অ্যাকাউনটেন্ট পঞ্চাশ টাকা হাতে তুলে দিতে কর্তার নির্দেশ বুঝে সে-ও নিয়ে নিয়েছে।

এর মধ্যে আর মাত্র দুদিন বাপী তরফদার এখানে এসে কর্তার সঙ্গে দেখা করেছিল। অ্যাকাউনটেন্ট প্রায় রোজই আসে। প্রথমবার তার মারফৎ বাপী খবর পাঠিয়েছিল, দেখা করা দরকার। গায়ত্রী বাই সেই বিকেলেই তাকে যেতে বলেছে। আর বারান্দায় ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁঝালো গলায় বলেছে, খবর পাঠানোর মানে কি দরকার পড়লে নিজে চলে আসতে পারো না?

বাপী তক্ষুনি রাগের হেতু, অ্যাকাউন্ট - অ্যাকাউনটেন্ট আর টাইপিস্ট দুজনেই বর্ণজিৎ চালিহার বশংবদ। জানান দিয়ে দেখা করতে আসাটা গোপন না-ও থাকতে পারে। কিন্তু কাজে নামার পর সেই কদিনে বাপীর মনের জোর আর বিশ্বাস কিছু বেড়েছে। ঠান্ডা মুখেই জবাব দিয়েছিল, দরকার পড়লে চলে আসার ব্যাপারে সে-নিজে একটু অসুবিধের সৃষ্টি করেছেন। কখন এলে অখুশি হবেন মা বা ভাড়িয়ে দেবেন মা আমায় পরিষ্কার বোঝা মুশকিল।

মুখের ওপর কথা কখনো করার মেয়েজ নয় মহিলার। কিন্তু সেই কথাগুলো চাউনির সরাসরি কেন যেন অকৃত্রিম মনে হয়নি বাপীর। গায়ত্রী বলেছে, দুপুরে তো বেরুই সাইকেল নিয়ে বেরুচ্ছ?

চোখের দেখা না হলেও খবর রাখে বোঝা গেছে। মাথা নাড়তে আবার বলেছে, দুপুরের দিকে আমি ফ্রি থাকি, দরকার পড়লে তখন এসো।

বাপীর হাতে তার সেই নিজস্ব ফাইল আর সঙ্গে মাঝারি সাইজের একটা ডায়রি। দশ মাইল জুড়ে প্রত্যহ ঘোরাঘুরির ফলে ফাইল আরো পুষ্ট হয়েছে। ডায়েরিতে প্রতি দিনের কাজের হিসেব। কোন তারিখে কোথায় কোন্ পার্টির সঙ্গে দেখা করেছে, তাদের কি অসুবিধে বা কি অভিযোগ ইত্যাদি।

বাপী ফাইল খুলতেই মহিলা চেয়ার ছেড়ে উঠে ভিতরের ঘরে গেছে। একটু বাদে খাপসুদ্ধ পড়ার চশমাটা নিয়ে এসেছে। সেই ফাঁকে বাপী দেখেছে পাশের জমিতে তার ঘর উঠছে। আর এদিকে তিন-তিনটে মালি মেহেদির পার্টিশন বসানোর জন্য মাটি খুঁড়ছে। কিন্তু মহিলা এ-সম্বন্ধে সেদিন একটি কথাও তোলেনি। ফলে বাপীও নিরাসক্ত।

শৌখিন সোনার ফ্রেমের চশমা এঁটে ফাইলটা আদ্যোপান্ত পড়ল। ডায়রিটাও। মুখ দেখে খুশি অখুশি কিছু বোঝা গেল না। কিন্তু বাপী জানতো অখুশি হবার কোনো কারণ নেই। অঙ্কের মাথা বরাবর সাফ। ছকে বেঁধে কাজে নেমেছে। তিন সপ্তাহ আগের আর তিন সপ্তাহ পরের লেন দেনের গার্ট পাশাপাশি রেখেছে। কি কারণে কজন ছোটখাটো পাইকিরি খদ্দের তাদের কাছ থেকে মাল নেওয়া বন্ধ করেছিল, আর কি শর্তে আবার তারা হাত মেলাতে রাজি—ফাইলে তাও লেখা আছে।

ফাইল দেখা আর ডায়রি পড়া শেষ করে মহিলা চশমাটা আবার খাপে পুরে শোনার জন্য প্রস্তুত।—বলো।

বাপী জানিয়েছিল কাছাকাছির এইসব ছোট পাইকিরি খদ্দেরদের বেলায় আসল গলদ সময়ে মাল পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে। মাসে একবার ঝাঁকা মাল দিয়ে বা গোরুর গাড়ীতে করে তাদের কাছে মাল যায়। নয়তো লরি যখন দূরে দূরে বড় চালান নিয়ে যায় তখন পথে পড়ে বলে তারা কিছু কিছু পায়। সে-ও কচিৎ কখনো। এখন থেকে পনের দিনে একদিন সে যদি মাল নিয়ে যাবে আসতে পারে তাহলে এই সার্ভিসের ব্যবসাই যে আরো দু আনা বাড়বে সম্ভব সেই হিসেব ওই ফাইলেই আছে।

গায়ত্রী বাই জিগেস করেছিল, মিস্টার চালিহাকে বলেছ?

—বলেছি। তাঁর মাথে এত ছোট কাজে নজর দেওয়া সম্ভব নয়, আর জ্ঞান আপনার হেপাজতে।

একটু চুপ করে থেকে জিগেস করেছে, কয়েকজনের নাম ঠিকানা দিয়েছিলে তুমি যে-সব খদ্দের ছিটকে গেছে সেই মাল তারা কোথা থেকে কিনছে?

এই প্রশ্নটার জন্যই ভিতরে ভিতরে

উৎসুক ছিল বাপী। নির্লিপ্ত মুখে জবাব দিয়েছে, খদ্দেরদের চাহিদা জেনে গুদাম থেকে ছালায় মাল বোঝাই করে সাইকেলের ব্যাবিয়ারে চাপিয়ে নিজেই পৌঁছে দিয়েছি। বিকি বাড়বে বোঝার পরে আপনাকে ভ্যানের কথা বলতে এসেছি।

...গায়ত্রী বাইয়ের চোখে পলকের বিস্ময় দেখেছিল বাপী। এটুকুই কাম্য ছিল। বি-এস সি পাশ ভদ্রলোকের ছেলে এই মেহনতের কাজও করতে পারে ভাবেনি।

—ভ্যান পাবে। কবে চাই?

—কাল একবার পেলে ভালো হয়, চৌদ্দদিনের মাথায় আর একবার নেব।

—ঠিক আছে।

এই ঠিক আছের অর্থ সে বিদায় হতে পারে ভাব দুদিন বাদে উর্মিলা বিকেল সাড়ে পাঁচটার পর আবার আপিসে হাজির। আগের দিনের পর সতের দিন বাদে এই দেখা এই দিনেও অ্যাকাউন্টেন্ট আর টাইপিস্টের থাকার মেয়াদ পার করে দিয়ে এসেছে। আগের দিন বেলা এগারোটা থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ভ্যানে মাল চালানের ধকল গেছে পনেরদিন ছুটির পর নিরিবিলিতে নিজের ফাইলে লেনদেনের হিসেব লিখে রাখছিল।

উর্মিলার পরনে প্রথম বিকেলে-দেখা সেই রঙিন ঘাগরা, গায়ে লম্বা সাদা ব্লাউজ। মা-ই পরুক মেয়েটাকে ঝকঝকে দেখায়। কিন্তু সেইদিন মুখখানা বিরস। টেবিলের সামনে এসেই বলে উঠেছিল, মা-কে খাওয়ান করে বেশ খুশি মেজাজে আছ—কেমন?

বাপী ভিতরে উৎসুক, বাইরে অবাক। —কি করেছি? বোসো—

—ভদ্রলোকের ছেলে সাইকেলে মাল বয়েছ কাজ দেখিয়ে মন কেড়েছ। অসহিষ্ণু হাতে চেয়ার টেনে বসল।—প্রশংসা শুনে তোমার সম্পর্কে কড়া কিছু বলতে ইচ্ছে করছিল, বলার মতো চট করে কিছু পেলাম না।

বাপী হেসে ফেলেছিল।—আমার ভাগ্য। কিন্তু তোমার রাগের কারণ কি?

—তোমার সঙ্গে আমার ফ্রেন্ডশিপ হবে না—সাফ কথা। আর, আমি পিছনে লাগলে তোমার খুব সুবিধে হবে না তাও জেনে রেখে দিও।

—কি মুশকিল, দোষটা কি করলাম?

—দোষ কি তুমি জানো না? রেশমাকে কি বলেছ?

যত রাগই দেখাক, বাপীর মনে হয়েছিল ওর মায়ের খুশির খবর দিয়ে তাকেও একটু খুশি করার তাগিদ আছে। জবাব দিয়েছে, কেন কি বলেছি তা বোধহয় জানো না....

—তাও জানি। ওটা পাজির পা-ঝাড়া, তোমাকে আগে তোষামোদের খোঁচা দিয়েছিল নিজেই স্বীকার করেছে। তা বলে তুমি ও-রকম করে বলবে? আংকলের কাছে অনেকরকম কাজে গিয়ে থাকতে পারে—

—তা পারে, তবে ভদ্রলোক তখন ড্রিংক করছিলেন, তাঁর ভেতরের ঘরে সবুজ আলো জ্বলছিল, রেশমা সেখানে ছিল।

—তোমাকে আর ব্যাখ্যা করে বলতে হবে না, মুখ লাল উর্মিলার, আমি সব জানি—আমার কোনো কাজেই যদি ও গিয়ে থাকে আর আংকল যদি শয়তানি করে ওকে ভিতরে ডেকে পাঠায়—ও কি করবে?

বাপীর মজাই লাগছিল। কিন্তু গম্ভীর।—রেশমাকে পাজি বললে, আংকলকে শয়তান বললে আর আমাকে তো কতবার সেয়ানা বলেছ—তোমার চোখে ভালো কে?

—কেউ না! মোট কথা তুমি যা ভেবেছ সব বাজে। খবরদার, মায়ের কাছে এ-সম্বন্ধে একটি কথাও নয়।..রেশমার সাপ ধরা তো নিজের চোখেই দেখেছ, ওই মজুরিতে পোষায় না অন্যের থেকে ওকে কম দেবার কোনো মানে হয়?

—কোনো মজুরিতেই পোষায় না আর কম দেবারও মানে হয় না। আমার হাত থাকলে তোমাদের এ-ব্যবসা আমি বন্ধ করে দিতাম।.. তোমার নাম করে রেশমার মজুরি বাড়ানোর কথাও চালিহা সাহেবকে বলেছিলাম—

—তারপর? এবারে উৎসুক।

—উনি ঠাট্টা করে ফিরে জিগেস করেছিলেন আমার কোনো ইন্টারেস্ট আছে কিনা। আমি বলেছি নেই।

—হাড়ে হাড়ে শয়তানি। ফিক করে হেসেও ফেলেছিল।—একেবারে নেই বলে দিলে কেন রেশমা খারাপ কি—এবারে চলে যাবার আগে পর্যন্ত দেখেছি তোমাকে ও খুব পছন্দ করত।

ভেতর-বার এক-রকম নয় বাপীর। ভেতরে আঁচড় পড়েছে। নিজেকে চোখ রাঙিয়েছে। এই মেয়ে এমন প্রগলভ হতে পারে অবশ্য ভাবেনি। ফাইলটা সামনে টেনে নিয়ে গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করেছে, রেশমার সম্পর্কে তোমার এত আগ্রহ কেন?

জবাব দিতে গিয়ে থমকেছিল একটু। তারপর বলেছে, বাঃ, ওই তো একমাত্র সঙ্গী আমার এখন। তারপরেই কাঁধ দেখিয়েছে,—দেখো, ফ্রেন্ড বলে আমার ওপর মাতব্বরি করতে এসো না—আমার আগ্রহে তাতে তোমার কি?

কিন্তু আর না বসে চটপট চলেও গেছে।

পনের দিন আগে গায়ত্রী বাইয়ের সঙ্গে দ্বিতীয় দফা সাক্ষাৎ বাপীর। নির্দেশমতো দুপুরেই এসেছিল। সঙ্গে সেই ফাইল আর তাগিদ। সেদিনও লক্ষ্য করেছে পাশের জমিতে তার ঘরের তিন ভাগ কাজ সারা।

গায়ত্রী বাই তখন আর এখানকার আপিসঘরে। সেখানেই ডাক পড়েছে। দুবার ভ্যান পাওয়ার ফলে বিক্রির তুলনামূলক চার্ট দাখিল করেছে বাপী। খদ্দেরের লিস্ট-এ তিনটি নতুন নামও দেখাতে পেরেছে।

ফাইল আর ডায়রির পাতায় চোখ বুলিয়ে গায়ত্রী বাই সে-দুটো আবার তার দিকে ঠেলে দিতে বাপী একটা প্রশ্ন করেছিল আর একটা প্রস্তাব দিয়েছিল। প্রশ্নটা শুনে কর্ত্রীর সতর্ক চাউনিও লক্ষ্য করেছিল।

এরই মধ্যে মোটামুটি দুজন বড় পাইকারি খদ্দের কিছু জিনিস চেয়েছে যা এখানকার গো-ডাউনে নেই বাপী জানে। কিন্তু তারা সেটা মানতে রাজি নয়, তাই বাপীর প্রশ্ন, এখানকার গোডাউনে যে-সব মাল আছে তাছাড়াও মালিকের হেপাজতে আর কোনো জিনিস আছে কিনা।

শুনেই যেন বাঁকা চৈতেছে।—কি জিনিস চেয়েছে তারা?

—শুখাসিন্ধি, আফিম আর মিঠা জহর।

গায়ত্রী বাইয়ের গোল দু চোখ তার মুখের ওপর নড়েচড়ে স্থির আবার।—এসব আমাদের কাছে থাকতে পারে তাদের ধারণা হল কেন?

—ধারণা নয়, তারা আগেই জানে। তাদের দাবী আগে পেয়েছে এখন কেন পাবে না।

গায়ত্রী বাইয়ের চাউনিতে বিস্ময়ের ছোঁয়া—কত আগে পেয়েছে?

বাপী নির্লিপ্ত গম্ভীর। —কারো নামে কিছু বলতে আমার রুচিতে বাধে, ওদের বক্তব্য শুনলে আপনার নালিশের মতো লাগবে।

ধৈর্য কম মহিলার, কড়া গলায় তাগিদ দিয়েছেন, আমি শুনতেই চাই।

—তাঁদের অভিযোগ, ওসব জিনিস মিস্টার চালিহা আগে সেধে দিয়ে এসেছেন, আপনি তার জন্য তারা ভালো দামও দিয়েছে। কিন্তু চালিহা সাহেব এখন এত বড় হয়ে গেছেন তাঁর আর পাত্তাই নেই, ফলে তারা জিনিসও পাচ্ছে না।

মহিলার ঠাণ্ডা মুখভাবে রকমফের ছিল না খুব। তবু বাপীর ধারণা খবরটা তার কাছে নতুন—আর সেই সব মাল বিক্রির ভালো দামও তার হিসেবে আসেনি।

একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, এ ব্যাপারে আমি পরে তোমার সঙ্গে কথা বলব। মিস্টার চালিহাকে কিছু বলেছ?

—না।

—বলার দরকার নেই।

এরপর সাপ চালানের ব্যবসা সংকোচের প্রস্তাব দিয়েছিল বাপী। আবু রববানী আর দুলাভাই সঙ্গে পরামর্শ করে মোটামুটি একটা প্ল্যান ছকেই এনেছিল: সাপ ধরার দল পুষ্ট করে তুলতে হলে, অর্থাৎ প্রতি বছর যারা নিয়মিত এই কাজে আসবে এমন একটা দলকে কমে বড় করে তুলতে হলে তাদের মজুরি বাড়াতে হবে, পাওনা-গণ্ডাও নগদ মিটিয়ে দিতে হবে। চালান যদি চাহিদা অনুযায়ী শতকরা পঁচিশ ভাগও বাড়ানো যায় তাহলেও বাড়তি খরচ পুষিয়ে লাভ বেশি থাকে। তাছাড়া খরচের প্রশ্ন তুলে দালালদের সঙ্গেও দামের নতুন ফয়সলার চেষ্টা করা যেতে পারে। যেরকম চাহিদা চাপ দিলে

দামের দাম না বাড়িয়ে উপায় নেই।

এই প্ল্যানও খুঁটিয়ে দেখে গায়ত্রী যাই খুব যে খুশি, তা নয়। সাপ পিছু আট আনা এক টাকা বা শঙ্খচূড় অথবা অতিকায় ময়াল পাইথন হলে দশ পনের টাকা বেশি মজুরির প্রস্তাব। এছাড়া দল-গড়া আর পাকা তদারকির জন্য দুলারির নামে আবুর মাইনে পঞ্চাশের জায়গায় একশ টাকা, আর তার সহকারী হিসেবে কাজ করার জন্য আরো পঞ্চাশ টাকা দিয়ে একজন লোক রাখা, বাড়তি সাপ রাখার সুব্যবস্থা করার জন্য দুলারির ঘর ভাড়া কুড়ি টাকা থেকে তিরিশ টাকায় তোলা—এসব তার তেমন ভালো লাগার কথা নয়। কিন্তু প্ল্যান অনুযায়ী কাজ হলে বাড়তি খরচ পুষিয়েও যে লাভের অংক বাড়ে, সেই হিসেব তার চোখের সামনেই। তাছাড়া এর ফলে পাহাড়ের বাংলোয় বিষ বার করার পরিমাণও বাড়বেই। তাতেও মোটা লাভ।

মুখে এতটুকু খুশি বা আশার অভিব্যক্তি নেই। উল্টে মন্তব্য করেছিলেন, তুমি তো দেখি দানছত্র খুলে বসতে চাও।

বাপী জবাব দিয়েছে, আমি আপাতত যা চেয়েছি সেটা মিনিমাম।

সঙ্গে সঙ্গে কড়া চাউনি মহিলার।—তার মানে এটুকু না হলে তুমি একাজে হাত দেবে না?

পুড়ে যাওয়া ক্ষতের চিকিৎসা
অন্য রকম ক্ষত থেকে আলাদা।

পুড়ে যাওয়া ক্ষতের জ্বালা-যন্ত্রণা অন্য ধরনের ক্ষত থেকে একেবারে আলাদা—জ্বলুনী—বেদনা—ফোস্কা পড়া প্রভৃতি। এই পুড়ে যাওয়া ক্ষতের জন্য আপনার এমন অ্যান্টিসেপ্টিক চাই যা সব রকম জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে চট্‌পট্ আরাম এনে দেয়। আর তা এমনই অ্যান্টিসেপ্টিক যা আপনাদের সবারই সুপরিচিত—তা'হল বার্নল। চট্‌পট্ ঠাণ্ডা আরাম এনে দিতে বার্নল অদ্বিতীয়। বার্নল অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীমেতে এর সবকটি গুণই রয়েছে যা পুড়ে যাওয়া ক্ষত জলদি উপশম করে। সবসময়ে ঘরেতে বার্নল মজুত রাখুন, এটি পুড়ে যাওয়া ক্ষত উপশমের আসল চিকিৎসা।

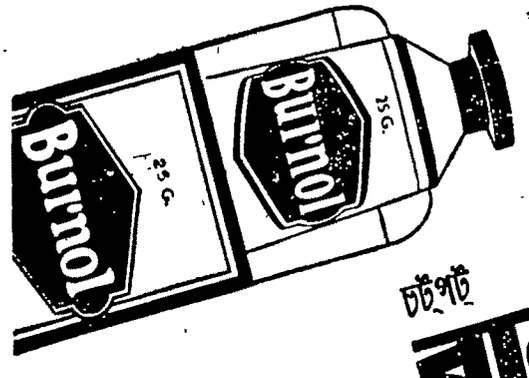

চট্‌পট্
বার্নল লাগান
পুড়ে যাওয়া ক্ষত উপশমের
আসল চিকিৎসা

Boots

—না। আমার অসুবিধে হবে। হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়ে কি ভয়ংকর সাহসে বুক বেঁধে ওরা এই কাজ করে, একদিন জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে সেটা আমি নিজের চোখে দেখেছি। ভালো লাভ সত্ত্বেও এটুকুও ওদের দিতে না পারলে আমার বিবেকে বাধবে।

নিজে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে ওদের কাজ দেখার কথা শুনে মহিলার চোখে বিস্ময়ের ছোঁয়া, কি অবেগের কথা শুনে বাপী ঠাওর করতে পারেনি। এ প্রসঙ্গও গায়ত্রী বাই সেখানেই শেষ করেছিল। প্ল্যানের খসড়া নিজের কাছে রেখে দিয়ে বলেছিল, ভেবে দেখি। তাছাড়া মিস্টার চালিহার সঙ্গেও পরামর্শ করে দেখতে হবে।

কিন্তু মেজাজের কিছু পরিবর্তন দেখাই গেছে। জিগেস করেছিল, চা খাবে?

বাপী মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

তারপরেও অনেকটা নির্লিপ্ত মুখেই গায়ত্রী বাই বলেছে তোমার ঘর তো প্রায় শেষ. দেখেছ ?

মনে মনে এটুকুতে অনুগ্রহ ধরে নিয়েছিল বাপী। কারণও আঁচ করতে পেরেছিল। অখুশি নয় বোঝা গেছে। বাপী মাথা নেড়েছে। দেখেনি।

—ইচ্ছে করলে দেখে যেতে পারো।

—দেখবই তো. তাড়া কি। থ্যাংস—

পনের দিন বাদে এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহের এই রবিবার সকালে চা-বাগানের ক্লাব ঘর ছেড়ে নতুন বাসায় চলে আসার হুকুম হয়েছে।

বাপী এসেছে।

ভাবছিল কিছু। নিজের ঘর হল বটে, এখন তড়িঘড়ি অনেক কিছুর ব্যবস্থা করতে হবে। অফিসের মধ্যেই একটা খাট কেনা দরকার। বিছানাপত্রর যা অবস্থা সেগুলো ব্যবহার করতে নিজেরই এখন অরুচি। শৌখিন কর্ত্রীটি বা তার মেয়ে দেখলে নাক সিঁটকাবে। সে সবও নতুন করতে হবে। বারান্দায় পাতার মতো গোটা তিনেক চেয়ার আর একটা ছোট টেবিল অন্তত চাই। যতটা সম্ভব ছিমছামভাবেই থাকতে হবে। পাশাপাশি ঘর তোলার কথা বলেছিল যখন, এই বিড়ম্বনার কথা ভাবেনি। এছাড়া বাসনকোসনের সরঞ্জাম চাই, চায়ের ব্যবস্থা চাই। টুকিটাকি আরো অনেক কিছু চাই। অনেক দিনের অভ্যাসের দরুন বাপীর যেন হালছাড়া মনের অবস্থা।

—নিজের ঘর দেখে যে মুখ একেবারে, কোনোদিকে আর হুঁস নেই দেখছি।

উর্মিলা। বাপী এদিক ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল। নিশ্চয় পার্টিপে এসেছে, নইলে পায়ে স্যানডালের চপ্পল হলেও কাঠের মেঝেতে টের পাবার কথা।

ঘুরে দাঁড়াতে উর্মিলা বলল, মা তাড়া দিল বটে কিন্তু নিজে ঘর ছেড়ে বেরুনোর জন্য ব্যস্ত নয় একটুও। খেদের সুরে বলল, ইউ আর ভেরি লাকি। মা বাড়ি হলে আমি তোমাকে তার সঙ্গে ওবাড়ি থাকতে পাঠিয়ে আমি এটা দখল করতাম।

বাপী বলল, চলো তাহলে, তাকে সেই প্রস্তাব দিয়ে দেখা যাক।

উর্মিলা প্রথমে চোখ পাকালো। তারপর হঠাৎই খিলখিল করে হেসে উঠল। হাসি আর থামতেই চায় না।

—কি হল ?

হাসি থামার পরেও লাল মুখ। বলল, যে হাকে তুমি মায়ের মন কাড়ছ, তার বয়েস আরো বছর বারো কম হলে বা তোমার বেশি হলে ঠিক একটা লটফট কাণ্ড হয়ে যেত।

বাপীও হেসেই ফেলল। মেয়েটার মুখে কিছুই আটকায় না দেখছে।

মেহেদি পার্টিশনের মাঝখানে যাতায়াতের গেট-টেট কিছু বাধা হয়নি। আসা-যাওয়ার প্রয়োজনে সামনে দিয়েই ঘুরে আসা ঘুরে যাওয়া।

গায়ত্রী বাই বারান্দার চেয়ারে বসে চোখে সোনালি চশমা এঁটে কাগজ পড়ছে। ওরা দুজন উঠে আসতে কাগজ সরালো, চশমা খুলে খাপে ঢোকালো। এখনো গম্ভীরই বটে, তবে অপ্রসন্ন নয়। গলার স্বরও মোলায়েম।—পছন্দ হয়েছে?

বাপী জবাব দিল, এত ভালো আশা করিনি।

—বোসো। এত ভালো এমনি হয়নি, অনেক খরচ পড়েছে। সব হিসেব তুমি পাবে। আর—

বাপীর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েও মায়ের পাশের চেয়ার টেনে বসতে যাচ্ছিল। দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, তাহলে আমি সরে পড়ি—

—বোস। এখুনেই ব্রেকফাস্ট দিতে বলেছি। তাছাড়া এই হিসেবের মধ্যে তোর থাকা দরকার। আর কতদিন আমি একলা সব দিক দেখব ?

মেয়ে হালছাড়া মুখেই বসল। কিন্তু তারপর জবাবখানা যা দিল বসিয়ে শোনার মতোই। বলল, জবাব একলাই দেখতে হবে, আমাকে তো বিয়ে দিয়ে চটপট শ্বশুর-বাড়ি পাঠানোর মতলবে আছ।

বাইরে বোঝা না গেলেও মহিলার মেজাজ এই সকালে প্রসন্নই বলতে হবে। বাপীর সামনে এই উক্তির দরুন একটুও রাগ করল না। মেয়ের উদ্দেশ্যে হালকা সুরেই জবাব দিল, সে চিন্তা তোকে করতে হবে না, বিয়ে যে করবে তাকেই এসে শ্বশুরবাড়িতে থাকতে হবে।

মেয়ে ওমনি ফোঁস করে উঠল, আই [illegible]—প্লাই পারসন মাস্ট বি এ ভেড়া-মার্কা সামবডি।

বাপীই যেন আপাতত বুঝদার লোক। তার দিকে চেয়ে গায়ত্রী বাই বলল, সি ইজ ইনকরিজিবল।

মেয়েও তক্ষুনি বাপীর দিকে ফিরে চোখ পাকালো। —এ ব্যাপারে মায়ের কথায় সায় দিলে ফ্রেন্ডশিপ ঘুচিয়ে দেব মনে রেখো।

কোয়েলা মস্ত একটা ট্রে এনে টেবিলে রাখল। খোসাসুদ্ধ তিনটে বড় কলা, দুটো ডিশে দুটো করে এগ পোচ, এক থাক টোস্ট, বাটির মাখনে বাটার নাইফ গোঁজা। দুটো জেলি আর জ্যামের শিশি। একটা বড় কাঁচের বাটিতে কর্ণফ্লেকস, পাশে মিল্ক-পট আর সুগার-পট।

ট্রে থেকে কর্ণফ্লেকস বাটিটা তুলে কোয়েলা কর্ত্রীর সামনে [illegible]। বিধবা নেপালিনীদের ডিম বা আ[illegible] কিনা বাপী জানে না। একটা কলা ডিমে কোয়েলা ছুরি দিয়ে চাক চাক কেটে কর্ণফ্লেকস-এর ওপর ছড়িয়ে দি, তারপর দুধ আর চিনির পট বাটির সামনে রেখে চলে গেল।

উর্মিলা তক্ষুণে উঠে দাঁড়িয়ে ওদের দুজনের টোস্টে মাখন মাখাচ্ছে। গায়ত্রী বাই কর্ণফ্লেকস-এর বাটিতে পটের দুধটা ঢেলে নিয়ে দু চামচ চিনি ছড়িয়ে দিয়ে ওদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

আর ঠিক তক্ষুনি বাপীর জিভ এমনি সুড়সুড় করে উঠল যে সংবরণ করাই গেল না। কারো দিকে না চেয়ে খুব সাদামাটা সুরে বলল, ব্রেকফাস্টের ব্যাপার দেখেই মনে হচ্ছে শ্বশুরবাড়িতে যে আসবে সে নিজেই আর নড়তে চাইবে না।

গায়ত্রী বাইয়ের ঠোঁটের ফাঁকে এবার চুলের মতো একটু হাসির রেখা। শোনার পর মেয়ের দিকে চোখ। কিন্তু টোস্টের ওপর উর্মিলার বাটার নাইফ থেমে গেছে। চকিতে একবার ঘাড় ফিরিয়ে ভিতরের দরজার দিকটা দেখে নিল। তারপর ঝকঝকে দু চোখ বাপীর মুখের ওপর। —ওই কোয়েলাকে তোমার পছন্দ হয় ?

বাপীর নিরীহ আক্রান্ত মূর্তি। গায়ত্রী বাই বলে উঠল ইউ ডার্টি—

কিন্তু মায়ের অনুশাসনে মেয়ে ভ্রূক্ষেপও করল না। ঝাপটা মেরে বলে গেল, কোয়েলার জন্য মা বর খুঁজছে, পেলে সেও এই বাড়িতেই থেকে যাবে আর ভালো ভালো খেতে পাবে—চাও তো লাগিয়ে দিতে পারি।

বলতে বলতে নিজেই হেসে ফেলে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল। নির্বিকার গায়ত্রী বাইকেও এবার হাসতেই দেখল বাপী। তারপর পলকা ধমক, দিনকে দিন ছেলেমানুষি বাড়ছে তোর ডলি।

খেতে খেতে আবার কাজের কথা, অর্থাৎ সেই হিসেবের কথা। আর এসব কথার সময় স্বভাবতই মহিলা বেশ

গম্ভীর। —এবাড়ি আর তোমার ওই কল তোলার জন্য মোট যা খরচ হয়েছে তার সব হিসেব রেডি করে অ্যাকাউন্টেন্ট তোমাকে কপি দেবে। খরচ অনেক হলেও বাড়ি ভাড়ার একশ টাকা থেকে মাসে পঞ্চাশ টাকা করেই কাটা হবে, পঞ্চাশ টাকা হাতে পাবে—ও কে?

এ উদারতার কারণ বুঝতেও বাপীর এক মুহূর্ত সময় লাগল না। দখলের দাবী যত দীর্ঘ মিয়াদী হয় ততো তার সুবিধে। বাপী ভালো মুখ করে জবাব দিল পুরো একশ টাকাই কাটতে পারেন।

—না, পঞ্চাশ টাকাই কাটব—মাইনে তো আপাতত বেশি পাচ্ছ না। ক্লাবে থাকার খরচ চালাতে হত বলে এতদিন পঞ্চাশ টাকা করে পকেট খরচ পেয়েছ, সেটা বড় জোর এখন দশ টাকা হবে। এর সঙ্গে বাড়ি ভাড়া থেকে কিছু না পেলে তোমার চলবে কি করে।

আগে দশ টাকা মাইনে শুনলে আনন্দে ভেতরে হয়তো কিছু সাড়া জাগত। কলকাতার লোয়ার ডিভিশন চাকরির মাইনে ছিল সর্বসাকুল্যে আটাত্তর টাকা। কিন্তু এখন কিছুই যেন খুব অপ্রত্যাশিত নয়। বাপী জানেই, এও সবে শুরু। শেষ নয়।

চুপচাপ খাওয়া শেষ করে মহিলা বাটিটা পাশে সরিয়ে রাখল। অল্প একটু জল খেল। ভাবছে কিছু। —খাট বেডিং টেবিল চেয়ার সবই তো কিনতে হবে তোমাকে?

টোস্ট আর পোচে বাপীর মুখ আটকানো। মাথা নাড়ল। হবে।

—আগাম কত টাকার দরকার?

মুখের পদার্থ জঠরস্থ করে জবাব দিল, কিছু লাগবে না, মোটামুটি গুছিয়ে নেবার মতো কিছু টাকা হাতে আছে।

এ পাশ থেকে উর্মিলা ফস করে বলে বসল, আহা মায়ের কান জুড়িয়ে গেল!

মহিলা একলহমা চোখেই ধমকালো মেয়েকে। বাইরের লোকের সামনে এরকম বলাটা যে বাড়াবাড়ি তাই বুঝিয়ে দিল। কিন্তু মেয়ের ভ্রূক্ষেপ নেই, অন্যদিকে চেয়ে ঠোঁট চিবুচ্ছে। ফাঁক পেলেই মেয়ে যে তার মাকে ঠেস দিতে ছাড়ে না এ বাপী আগেও লক্ষ করেছে।

গায়ত্রী বাই জিজ্ঞাসা করল, এখানে তোমার খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্থা হবে?

পরিবর্তন ভালোই দেখছে বাপী। কদিন আগেও মহিলা ঝাঁঝিয়ে বলেছিল, ক্লাবের বাইরে তোমার সঙ্গে আর কি সম্পর্ক আছে আমার?

জবাব দেবার আগে চায়ের স্টেট হাতে রঙ্গমঞ্চে আবার কোয়েলা। সেটা টেবিলে রেখে আগের টেস্টে ডিশটিশ সব তুলে নিয়ে গেল। বাপীর দিকে চেয়ে উর্মিলা অস্ফুট শব্দ করে হেসে উঠল। অর্থাৎ আবারও মনে করিয়ে দিল, ভালো খাওয়া-দাওয়া ব্যবস্থা সহজেই হতে পারে।

মেয়ের প্রগলভতায় মহিলা এবারে যথার্থ বিরক্ত। তার দিক থেকে বাপীর দিকে চোখ ফেরালো।

টেবিল থেকে খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে বাপী বলল, কিছু ভাববেন না, আমি ব্যবস্থা করে নেব।

কাগজের দিকে তাকালে এখনো কলকাতার খবরই আগে চোখ টানে। মাঝের এক জায়গায় একটা হেডিংয়ের ওপর দৃষ্টি আটকে গেল। কলকাতায় প্লেগ। সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে একটা অদ্ভুত অস্বস্তি। গায়ত্রী বাই কি বলছে, তার মেয়ে কি করছে কিছুই আর খেয়াল নেই বাপীর। খবরটুকু পড়ে ফেলল। মধ্য কলকাতার কোনো এলাকা থেকে এ পর্যন্ত এগারোজন লোকের প্লেগ রোগাক্রান্ত সন্দেহে হাসপাতালে সরানো হয়েছে। তার মধ্যে তিনজন মারা গেছে। কলকাতা করপোরেশন তাই ওই এলাকাকে প্লেগ এরিয়া বলে ঘোষণা করেছে।

যুদ্ধের সময় বা কলকাতায় বোমা পড়ার সময় ওখানকার যে কোনো খবরের ফাঁক দিয়ে দুনিয়ার সকলকে ছেড়ে একটি মেয়েই তার চোখের সামনে এগিয়ে আসত। আজও তাই। প্লেগ কি, প্লেগ কেমন বাপীর কোনো ধারণা নেই। শুধু জানে মারাত্মক কিছু, একটা শহরকে শহর উজাড় হয়ে যাবার মতোই কিছু। তবু যে মেয়ের বাড়ি মধ্য কলকাতার ধারে কাছেও নয়, দক্ষিণের এক রাস্তার সাতাশি নম্বর বাড়ির সেই মেয়েকেই যেন বিপন্ন দেখার অনুভূতি একটা। এ চিন্তা নিছকই পাগলামি জানে। তবু বুকের তলায় কাঁপুনি কিছুক্ষণের—কোনো অঘটনের মধ্য দিয়ে ওপরওলার হাত কি সব কিছু হঠাৎ মুছে দিয়ে যাবে? তার পর আর কিছু না—কিচ্ছু না?

আত্মস্থ হল। শুধু গায়ত্রী বাই নয়, তার মেয়েও ঈষৎ বিস্ময়ে ওর দিকে চেয়ে আছে। এই মিনিট কতক তারা কি দেখেছে কি লক্ষ করেছে, জানে না।

গায়ত্রী বাই জিজ্ঞেস করল, কাগজে অত মন দিয়ে কি দেখছিলে আর তারপর কি ভাবছিলে?

মুখে কিছু না বলে আঙুল দিয়ে কাগজের প্লেগের খবরটা দেখালো। গায়ত্রী বাই আরো অবাক। —কলকাতায় তোমার কে আছে?

বাপী চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল।—কেউ না। অনেক কাজ আছে, সেরে ফেলিগে।

কাজ কত আর কাজ। কাজের মধ্যে মুখ গুঁজে থাকলে মুক্তি, কাজে ডুবে থাকলে স্বস্তি। উর্মিলা যখন তখন এসে ঘরে ঢুকে পড়ে। কখনো হাসে কখনো রাগ করে, কখনো বা অকারণ ঠেস ঠিসারার বিদ্ধ করতে চায়। বাপী তখন তন্ন তন্ন করে নিজের ভেতর দেখে তখন। কোনো পাতালে প্রবৃত্তির সেই পশু আজও লুকিয়ে আছেই। লোভের সন্ধান পেলে এখনো ওটা থাবা চাটবে। সেই থাবা বাপীর দুমড়ে মুচড়ে ভেঙ্গে দেওয়ার আক্রোশ। উর্মিলার ওই সহজ নিঃসঙ্কোচ যাতায়াত ভালো লাগে বলেই বাপী সেটা চায় না।

....বেশমা রাগ ভুলেছে। দেখা হলে মুচকি হাসে। দেখা হলে খুশি হয়ে এগিয়ে আসতে পারে। কথা বলতে পারে। সাপ চালানের ব্যাপারে বাপীর নতুন বন্দোবস্তের প্ল্যান ওদের মেহসাসের সবটাই মেনে নিয়েছে। এই ব্যবসায় সেই এখন মরুবির ওদের। পুরুষদের সঙ্গে ওর মরুবি সমান হয়েছে। আবুর হিসেব মতো কাগজে সই করে দিলেই একদিনের মধ্যে অ্যাকাউন্টেন্টের কাছ থেকে নগদ টাকা মেলে। অবশ্য চালান যে হারে বাড়ছে, অ্যাসাউন্টেন্টের হিসেবে খাতায় তার সবটা উঠছে না। এ ব্যাপারে করীম নির্দেশ অনুযায়ী কাজ। এ নিয়ে মাথা না ঘামালেও বাপীর নিজস্ব একটা পাকা হিসেব আছে। বেশমার রাগ ভোলার আর খুশি থাকার আরো কারণ আছে। তদারকি আর বল বাড়ানোর কাজে আবু ধরবানীর সহকারিণী হিসেবে মাসে বাবদ পঞ্চাশ টাকা সেই পাচ্ছে। আবু ওকেই বাড়াই করছে। তার দলালির সামনেই এক চোখ ছোট করে রসিকতা করেছে, মেমসাবকে অফিসিয়ালি পেয়ে কাজে উৎসাহ আমার চার গুণ বেড়ে গেছে—বুঝলে বাপীভাই।

জবাবে হেসে হেসে বেশমা দলালিকে আশ্বাস দিয়েছে, তুমি ভেবো না জবরী, আমার সাপের টাঁপি চেপে ধরা আবু সাহেব স্বচক্ষে দেখেছে। তারপর বাপীকেই নিবেদন করেছে, আমাদের এতবড় মুরুব্বিকে এখনো বাপীভাই বলতে হবে না। সাহেব টাহেব বলতে হবে?

বাপী জবাব দিয়েছে, আগে যা বলতে তাই বলবে।

...এই মেয়েরও চটক আছে। চোখের আলোয় আগুন আছে। ছেলে দুলে চলে যখন সেই যৌবন ঢেউয়ের আমন্ত্রণ আছে। নিজের অগোচরে হঠাৎ-হঠাৎ ভালো লাগে বলেই বেশদাকেও কাছে ঘেঁষতে দিতে চায় না।

আজ রবখানী আর দুলারির খুশির সংলাপ বলতে গেলে বোজই ওকে আশা করে। একে ভালবাসে, তার বাপীর জন্যেই দুশমনাবই আয় বেড়েছে। এছাড়া জঙ্গলের আশা জায়গার মালকনের দরকারি চারা বেড কবা বা দরকারি গাছ-গাছড়া চাষের বাবদ ন্যায্য পারিশ্রমিক যে পাবে—সে সম্বন্ধেও নিশ্চিন্ত। ফলে দুদিন দেখা না পেলে আবু মুখ ভাব করে। আর দুলারি যখন লোককে দাবড়ানি দেবার ছলে ওকেও কথা শোনায়। —বাপীভাই এখন কত বড় মানুষ আর কত কাজের মানুষ—তোমার সঙ্গে রোজ এসে আড্ডা দেবার অত সময় কোথায়!

কিন্তু ওদের এই সুখের সংসার দেখেও ভালো লাগে আর ভিতরে ভিতরে কিছু প্রত্যাশা উঁকিঝুঁকি দেয় বলেই বাপী এদেরও এড়াতে চায়। কোনো ভালো লাগার সঙ্গে তার কিছুমাত্র আপোস নেই।

তাই কাজে ডুবে যাওয়া, কাজে ভেসে যাওয়া, আর কাজের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া। ফলে খুশি যার সব থেকে বেশি হবার কথা সে তো খুশি বটেই। গায়ত্রী রাই। তার গাম্ভীর্য অটুট এখনো। কিন্তু আচরণ বদলেছে। স্টোভে নিজে রান্না করে খায় বাপী। খাওয়ার ফিরিস্তিও মেয়ের কাছেই শুনেছে। বাপীর সামনেই সেদিন বলছিল, ভাতের সঙ্গে প্রায় সমস্ত রকমের আনাজ সেদ্ধ আর ভেল আর নুন আর কাঁচা লঙ্কা—তোমার কাজের ছেলে খানা খেয়ে কাজে ডুবে আছে!

গায়ত্রী রাইকে অই শুনে ভাবতে দেখেছে। শেষে প্রস্তাব দিয়েছে, মাসে যা হয় ধরে দিও—তোমার দু'বেলার খাবারটা এখান থেকেই যাবে না হয়।

হেসে উঠে ঊর্মিলা বলেছিল, কোয়েলার সম্পর্কে এখনো ভেবে দেখো ফ্রেন্ড—মাসে আর তাহলে কিছু ধরে দিতেও হবে না।

একলা পেলে আর আগের চরিত্রগত মেজাজে থাকলে বাপী জবাব দিতে ছাড়ত না। রসিকতা করে বলে বসত, কোয়েলার বদলে তার মনিবের মেয়ের সম্পর্কে ভাবতে রাজি আছি। ওই জবাব মাথায় এসেছিল বলেই বাপী নিজের ওপর অসহিষ্ণু। এক কথায় মহিলার প্রস্তাব নাকচ করেছে। বলেছে, আপনি আমাকে কাজে এগিয়ে যেতে দিন শুধু, আর কিছু দেখার দরকার নেই।

তা সত্ত্বেও প্রতি রবিবার বা অন্য ছুটির দিনের সকালে ওই বাংলো থেকে সকালের চায়ের আসরে তার ডাক পড়বেই। দু'দিন তিনদিন পরে পরে কোয়েলা রান্না-করা মাছ মাংসও দিয়ে যাবে। বাপী প্রথম দিনেই বলেছিল, আর এ-রকম কষ্ট করার দরকার নেই—আমার এই খেতেই ভালো লাগে। তা সত্ত্বেও কোয়েলা এটা-ওটা নিয়ে আসে মানেই কর্ত্রীর নির্দেশ অমান্য করতে পারে না।

গায়ত্রী রাই তার হিসেব মতোই ধীরে সুস্থে কাজে এগিয়ে দিচ্ছে তাকে। মাসে দুদিন করে ভান ছেড়ে দেওয়ার ফলে স্থানীয় এলাকার গন্ডী আরো বড় হয়েছে। আর, মোটামুটি বড় এবং বিশ্বস্ত পাইকারি খদ্দেররা গোপনে যা চায়, তাও তার মারফৎই পাচ্ছে। কর্ত্রীর নির্দেশে কোয়েলা মাপা শঙ্খা সিন্ধি, আফিম, মিঠা জহর ইত্যাদি ঘর থেকেই বার করে দেয়। এ-সব কোথা থেকে আসে, বা কে কখন চালান দেয় বাপী এখনো সে খোঁজ রাখে না। এ-সব বিক্রীর হিসেব যে অ্যাকাউনটেন্টের খাতায় উঠবে না, অও বলে দিতে হয়নি। এই টাকা গায়ত্রী রাইয়ের হাতেই তুলে দেয়।

তিন মাসের মাথায় গায়ত্রী রাই নিজেই ওকে সঙ্গে করে উত্তর বাংলার নানা জায়গার বড় বড় পার্টির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। বলেছে, আমাদের রিজিয়-ন্যাল ম্যানেজার। এবার থেকে যোগাযোগ আর সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা তার মারফৎ হবে।

কোন্ রিজিয়নের ম্যানেজার তা নিয়ে বাপী নিজেও মাথা ঘামায়নি। কাজের পরিধি ঢের বেশি বাড়ল, আরো বেশি কাজে ডোবার সুযোগ মিলল, তার এটুকুই লাভ। এই দায়িত্ব পাওয়ার ফলে চিফ একসিকিউটিভ রণজিৎ চালিহাকে সন্দিগ্ধ দেখবে বা অসন্তুষ্ট দেখবে, ভেবেছিল। কিন্তু আদৌ তা না। ওই লোকের সঙ্গে মহিলার হৃদ্যতা আগের থেকে বেশি ছাড়া কম নয়। হয়তো তাকে জানিয়েই সব কিছু করা হচ্ছে।

পরে উত্তর বাংলার দুজন বেশ বড় খদ্দরের আচরণে বাপী ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধ। আবার একটু অবাকও। বার দুই যোগাযোগের পরে আভাসে ইঙ্গিতে কিছু ব্যক্তিগত লাভের টোপ ফেলতে চেয়েছে ওই দুজন। মাল সাপ্লাইয়ের ব্যাপারে কেউ টের পাবে না এমন সামান্য কিছু কারসাজির পথে চললে বাপী তরফদারের নিজের পকেটে অনায়াসে বেশ বাড়তি টাকা আসতে পারে আর তাদেরও কিছু লাভ হয়, তোয়াজের ছলে সেই আভাস, সেই ইঙ্গিত।

বাপী বিরক্ত হয়ে সেই পথ নাকচ করতে তারা আরো অমায়িক। তক্ষুনি সৎ মানুষের সঙ্গে তাদের সদ্ভাবেই কাজ করার প্রতিশ্রুতি। মিস্টার তরফদার যেন কাউকে কিছু না বলেন বা নিজে কিছু মনে না করেন। বাপীর অবাকও লেগেছে কারণ, দীর্ঘকাল ধরে যে মহিলার সঙ্গে ব্যবসায়ে যুক্ত, তাদেরও এ-রকম মতি হয় কি করে। গায়ত্রী রাই সঙ্গে করে যখন নিয়ে এসেছিল, বাপী নিজের চোখেই এদের যত্ন-আত্তি দেখেছে, তোয়াজ তোষামোদ দেখেছে, সম্ভ্রমের সঙ্গে কথা কইতে দেখেছে। যত ভেবেছে এদের এই ব্যাপরটা কেমন হেঁয়ালির মতো লেগেছে।.....রণজিৎ চালিহার সঙ্গে কি এই গোছের ব্যবস্থা কিছু ছিল? নইলে মাত্র দুবার যোগাযোগের পরেই এরা এমন কথা বলে কি করে?.... কিন্তু চালিহা অনেক দিনের লোক। বাপী ক'দিনের? ভালো করে জানা চেনা বোঝার আগেই এত বেপরোয়া!

কি ভেবে গায়ত্রী রাইকে সত্যি কিছু বলেনি বাপী। রণজিৎ চালিহাকে বলার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু শিলিগুড়ি আর মালদহের এই দুই পাইকারি রইস খদ্দেরের টোপ ফেলার চেষ্টাটা মনে গেঁথেই থাকল বাপীর।

(চলবে)

পূজায় শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ!

গল্প সম্ভার **শতবর্ষের লেখকার গল্প** ৯.০০

শুনু ঘোষালের রহস্য উপন্যাস

মোগল হারেমে শেষ রাত্রি ৫.০০

মালতী সন্ধ্যা ৩.৫০

ছোটদের টডের রাজস্থান কাহিনী

গল্প সংকলন ৩.০০

প্রমীলা প্রকাশনী

C/o. নিউ বাণীশ্রী, ৯।৪ টেমার লেন, কলিকাতা - ৭০০০০৯

বিমলানন্দ শাসমল

ভারত কি করে ভাগ হলো

জিন্নার প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগ যে দুর্নীতিহীন ছিল বা মুসলিম লীগে গুন্ডা ছিল না, এমন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু জিন্না বুঝেছিলেন কংগ্রেসী গুন্ডামির কাছে মুসলিম লীগের গুন্ডামি বিফল হবে।

গান্ধীজীকে বুদ্ধ এবং যিশুখৃষ্টের সঙ্গে তুলনা করা হয় বটে, কিন্তু তিনি ছিলেন একজন নির্ভেজাল রাজনীতিক। সত্যাগ্রহ রাজনীতিকের যা প্রধান উদ্দেশ্য থাকে অর্থাৎ ক্ষমতা দখল, তিনি কখনই তার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন নি। কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতির ব্যাপারেও তিনি কার্যকরী কিছু করবার চেষ্টা করেননি এই কারণে যে তিনি জানতেন এ নিয়ে বেশি চাপাচাপি করলে কংগ্রেস ভেঙে যাবে এবং রাজনৈতিক দাবা-দাওয়ার জন্য তাঁর তৈরি যন্ত্রটি তিনি আর ব্যবহার করতে পারবেন না।

আশু স্বাধীনতা লাভ করবার পর ভারতের শাসন ক্ষমতা তাঁর প্রিয়পাত্রদের হাতেই ন্যস্ত হোক গান্ধীজী এইটাকে পরিষ্কার করে নিতে চাইলেন এবং তার প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ালো মুসলিম লীগ। কংগ্রেস ও লীগের প্রধান দ্বন্দ্বটি লাগলো এই-খানেই। হিন্দুরা চাইলেন প্রধান ক্ষমতা যেন তাঁদের হাতে থাকে মুসলমান তাই ভেবে শঙ্কিত হলেন। কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলির নির্বাচনে ৭৯টি মুসলমান আসনের মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছিলেন মাত্র ৩টি, কাজেই মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করবার দাবি কংগ্রেসের পক্ষে অচল হয়ে গেল। মুসলমানরা চাইলেন ভারতের যেখানে যেখানে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে যেন তাঁদের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকে। জিন্না দেখলেন মুসলমান-প্রধান প্রদেশগুলিকে নিয়ে গ্রুপ গঠন করা হলে এবং মাত্র তিনটি বিষয়ে ও আনুষঙ্গিক আর্থিক ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব থাকলে তাঁর ভয়ের কোনো কারণ নেই। কিন্তু গান্ধীজী ও জওহরলাল তাঁর সেই আশায় বাদ সাধলেন। তাঁরা গ্রুপ-গঠনের ভিত্তিই অস্বীকার করলেন এবং বললেন যে কোনো প্রদেশকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো গ্রুপে যোগ দিতে বাধ্য করা চলবে না। কংগ্রেসের যুক্তি হোলো হিন্দুপ্রধান গ্রুপে মুসলমান সংখ্যালঘু হয়ে থাকলে কোনো ক্ষতি নেই কিন্তু মুসলমান-প্রধান গ্রুপে হিন্দু বা শিখ যেন কিছুতেই সংখ্যালঘু হয়ে না থাকে।

এই সময়ে কেন্দ্রে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পালা এসে গেলো। তার বিস্তৃত ইতিহাস এখানে লেখার স্থানাভাব। প্রথমে কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকারে যেতে রাজি হয়নি। কিন্তু জিন্না ৬ই জুন মন্ত্রী-মিশন প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন বলে আশা করেছিলেন যে মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তী সরকারে যাবে—কংগ্রেস যাবে না। কংগ্রেস নেতারা পরে মত পরিবর্তন করে ২রা সেপ্টেম্বর অন্তর্বর্তী সরকারে গেলেন। মুসলিম লীগ ২৯শে জুলাই মন্ত্রী-মিশন প্রস্তাবের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিলো বটে কিন্তু ২৬শে অক্টোবর অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিলো। মুসলিম লীগের লিয়াকৎ আলি খাঁ অর্থ-মন্ত্রী হয়ে বড় ব্যবসায়ীদের আয়ের উপর শতকরা ৩৭½ ভাগ বিজনেস প্রফিটস্ ট্যাক্স বসালেন। বিরলা ও অন্যান্য বড় ব্যবসায়ীর অনুরোধে জওহরলাল লিয়াকৎকে বললেন ট্যাক্সের হারটা কমাতে। লিয়াকৎ রাজি হলেন না। তখন জওহরলাল ঐ ওয়েভেলকে বললেন লিয়াকৎকে বলে ট্যাক্সের হার কমিয়ে দিন। এইভাবে অন্তর্বর্তী সরকারেও কংগ্রেস এবং লীগের দ্বন্দ্ব গভীর হয়ে উঠলো। জওহরলাল অভিযোগ করলেন লীগ অন্তর্বর্তী সরকারের 'কিংস পার্টি' বা বিলাতের রাজার পক্ষ হয়ে কাজ করছে। জিন্না তার জবাবে বললেন যে ওয়েভেলের শাসন-পরিষদে সভ্যপদ গ্রহণ করবার আগে জওহরলাল নিজেই প্রথমে বিলাতের রাজার কাছে আনুগত্যের শপথ নিয়েছেন।

ওদিকে ১৬ই আগস্ট কলকাতার দাঙ্গার পর প্রায় সমগ্র ভারতেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হয়ে গেলো। কলকাতার প্রভাব পড়লো নোয়াখালিতে—নোয়াখালির প্রভাব বিহারে। এই সাম্প্রদায়িক আগুনের লেলিহান শিখা কিছুতেই দমন করা যাচ্ছে না দেখে একটি সুষ্ঠু মীমাংসার জন্য ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বিটিশ সরকার, জওহরলাল নেহরু, বলদেব সিং, লিয়াকৎ আলি খাঁ, জিন্না ও ওয়েভেলকে আলোচনার জন্য লন্ডনে ডেকে পাঠালেন। সেখানে আলোচনায় কংগ্রেস ও লীগনেতাদের মধ্যে কোনো মীমাংসা সম্ভব হোলো না। কিন্তু ৬ই ডিসেম্বর বিটিশ সরকার ঘোষণা করলেন যে গ্রুপে যোগদান সম্বন্ধে মন্ত্রী-মিশন প্রস্তাবের যে ব্যাখ্যা মুসলিম লীগ করেছে সেইটাই সঠিক ব্যাখ্যা অর্থাৎ প্রদেশগুলি প্রথম অবস্থায় গ্রুপে যোগদান করতে বাধ্য থাকবে কিন্তু নতুন সংবিধান অনুসারে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হবার পর কোনো বিশেষ প্রদেশ কোনো গ্রুপ থেকে নিজ এসেম্বলির সংখ্যাধিক্য ভোটে সিদ্ধান্ত নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে। বিটিশ সরকার অবশ্য আশা করলেন যে এই ব্যাপারে ফেডারেল কোর্টের অভিমতও গ্রহণ করা যেতে পারে। কংগ্রেস ফেডারেল কোর্টে যেতে রাজি হোলো কিন্তু বললো যে বিটিশ সরকার মন্ত্রী-মিশন প্রস্তাবের যে-ব্যাখ্যা করেছে সেই ব্যাখ্যা করে মূল প্রস্তাব থেকে অনেকখানি সরে দাঁড়ানো হয়েছে।

এই অবস্থায় কংগ্রেস ও লীগের মিলন আকাশকুসুম হয়ে রইলো এবং ভারতের স্বাধীনতার প্রকৃত রূপটি অসীমাংসিত অবস্থায় ঝুলতে লাগলো। কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিতে লীগ কিছুতেই যেতে রাজি হোলো না। জিন্না বারবার বললেন যে কংগ্রেস মন্ত্রী-মিশন প্রস্তাবের মূল ভিত্তিই স্বীকার করেনি এবং একথাও বলেছে যে কন-স্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি ইচ্ছা করলে সকল প্রস্তাবের রদবদল করতে পারে—এবং মিশন প্রস্তাবও বাতিল করে দিতে পারে, অতএব লীগের পক্ষে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা বা কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিতে যোগদানের কোনো প্রশ্ন ওঠে না। জিন্না বললেন, মীমাংসার সবচেয়ে উত্তম পথ হচ্ছে ভারতকে হিন্দুস্থান এবং পাকিস্থান দুটি স্বাধীন গভর্নমেন্ট ভাগ করে দেওয়া।

লন্ডন থেকে ফেরবার সময়ে জিন্না একটি সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করে-ছিলেন যে, কংগ্রেস যদি নিঃশর্তভাবে ১৬ই মে-র ঘোষণাপত্র গ্রহণ করে তাহলেই তিনি লীগ কাউন্সিল ডেকে কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিতে লীগের যোগদানের কথা বিবেচনা করতে বলবেন, নচেৎ নয়।

এই সময়ে গান্ধীজী নোয়াখালিকে পদযাত্রা করে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির চেষ্টা করছিলেন। বিটিশ সরকারের ৬ই ডিসেম্বরের ঘোষণার পর তিনি ঘোষণা করলেন, যাতে কংগ্রেসের সঙ্গে লীগের মিলনের সম্ভাবনা প্রায় তিরোহিত হয়ে গেল। ৬ই ডিসেম্বরের ঘোষণায় বিটিশ সরকার বলেছিলেন যে গ্রুপ-গঠন সম্বন্ধে মুসলিম লীগের ব্যাখ্যাই ঠিক অর্থাৎ নতুন সং-বিধানের আওতায় প্রথম সাধারণ নির্বাচনের আগে ঘোষণা-পত্র অনুসারে প্রত্যেক প্রদেশের নির্বাচিত গ্রুপে বসতেই হবে, ইচ্ছা করলে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর কোনো প্রদেশ কোনো গ্রুপ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারে। এই ব্যাখ্যায় আসামকে বাংলার সঙ্গে এক গ্রুপে যোগদান করতে বাধ্য হতে হোতো।

আসামের কয়েকজন কংগ্রেস নেতা

আসাম মুখ্যমন্ত্রীর তরফে গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার নির্দেশ প্রার্থনা করলেন। গান্ধীজী আসামের নেতাদের পরিষ্কার বললেন: 'আপনারা কিছুতেই বাংলার সঙ্গে এক সেকশনে যোগ দেবেন না। বাংলা আসামের ওপর কর্তৃত্ব করবে এটা অসহনীয়। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কি নির্দেশ দেবেন জানি না যদি কোনো কিছু না বলেন তাহলে আপনাদের উচিত হবে কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি বয়কট করা। জোর করে আপনাদের কিছুতেই সেকশনে বসতে বাধ্য করা চলবে না। শিখদেরও তাই করা উচিত। আসাম এইভাবে সারা ভারতকে পথ দেখাবে।

'মুসলিম লীগ কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি বয়কট করে উচিত কাজই করেছে। মুসলিম লীগই ঠিক পথে চলেছে। আপনাদেরও ওই পথে যেতে হবে। কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি থেকে আপনারা বেরিয়ে আসুন। দরকার হলে আপনাদের কংগ্রেসের বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে হবে।'

আসামের নেতারা বললেন: 'আপনার আশীর্বাদ নিয়ে আমরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁড়াবো।'

গান্ধীজী বললেন: 'ভগবানের আশীর্বাদ নেবেন।' (ইংরেজির অনুবাদ—দি স্টেটসম্যান—২১-১২-৪৬)

ওয়েভেল যখন দেখলেন যে কংগ্রেস মন্ত্রী-মিশন ঘোষণার একরকম ব্যাখ্যা করেছে কিন্তু লীগ করেছে অন্যরকম ব্যাখ্যা এবং দুই দলের ব্যাখ্যার পার্থক্য এত বেশি যে কংগ্রেস লীগের মিতালির সম্ভাবনা প্রায় অসম্ভব তখনই তিনি একটি পরিকল্পনা করে ফেলেছিলেন যে ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৮ সালের ৩১শে মার্চের মধ্যেই ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে কিন্তু সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে মীমাংসা না হওয়ায় শুধু কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশগুলিকে আগে স্বাধীন করে দেওয়া হবে এবং মুসলমান-প্রধান প্রদেশগুলিতে এখনকার মত ব্রিটিশ শাসনই চলবে, পরে সুযোগমত এদের স্বাধীন করবার ব্যবস্থা হবে। ওয়েভেলের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে এইভাবে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ও ভ্রাতৃঘাতী রক্তপাত এড়ানো সম্ভব হবে। ওয়েভেল মুসলিম লীগের দাবিগুলিকে জোরদার করতে সাহায্য করেছিলেন একথা সত্য হলেও তিনি আগাগোড়া প্রাণপণ শক্তিতে ভারত-বিভাগের বিরোধিতা করে গেছেন। ৪৬-এর ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভারতীয় নেতাদের সম্মেলনের সময়ে শেষ বিকল্প হিসাবে যখন 'ভারত-বিভাগের কথা ওঠে তখনও ওয়েভেল প্রচন্ড-ভাবে এর বিরোধিতা করেছিলেন। ওয়েভেলের 'ব্রেকডাউন প্ল্যান' কিছু ভারতীয় নেতার কাছে এবং সম্ভবত ব্রিটিশ সরকারের কাছেও ওয়েভেলকে যেন ভারতের স্বাধীনতার বিরোধী বলে প্রতিভাত করলো। কিন্তু ১৯৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ সরকার যে ঘোষণা করলেন সেটা অনেকটা ওয়েভেলের 'ব্রেকডাউন প্ল্যানের অনুরূপ। এই ঘোষণায় বলা হয়েছিল যে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে যদি কোনো মীমাংসা একেবারেই সম্ভব না হয় তাহলে ১৯৪৮ সালের জুন মাসে ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ভারত ছেড়ে চলে যাবে।

ব্রিটিশ সরকারের ৬ই ডিসেম্বরের ঘোষণা সম্বন্ধে ৬ই জানুয়ারি (১৯৪৭) দিল্লী অধিবেশনে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি প্রস্তাব নিলেন: 'এ-আই সি-সির দৃঢ় অভিমত হচ্ছে যে, স্বাধীন ও সার্বভৌম ভারতের সংবিধান যতটা সম্ভব ভারতবাসীদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে রচিত হওয়া উচিত। বাইরের কোনো শক্তির দ্বারা এতে কোনো হস্তক্ষেপ থাকা উচিত নয় এবং এক প্রদেশের দ্বারা অন্য প্রদেশের বা প্রদেশের অংশ বিশেষের উপর কোনো বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা থাকা উচিত নয়। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার ৪৬-এর ১৬ই মে-র ঘোষণাতে আসাম, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবের শিখদের জন্য যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি করা হয়েছে বলে এ-আই-সি-সি হৃদয়ঙ্গম করেছে, সম্প্রতি ৪৬—৬ই ডিসেম্বরের ব্যাখ্যায় এটি আরও বেশি করে করা হয়েছে।....এ-আই-সি-সি সরকারের ৪৬ এর ৬ই ডিসেম্বরের ঘোষণা মেনে নিচ্ছে বটে কিন্তু এই ব্যাপারে কোনো প্রদেশের উপর কোনো বাধ্যবাধকতা থাকতে পারবে না এবং পাঞ্জাবে শিখদের অধিকার কোনো প্রকারে খর্ব করা চলবে না। যদি বাধ্যতামূলক কিছু করাবার চেষ্টা করা হয় তাহলে স্বীয় অধিবাসীদের ইচ্ছাকে কার্যকরী করে তোলবার জন্য যে-কোনো কর্মপন্থা গ্রহণ করবার অধিকার কোনো প্রদেশের অংশবিশেষের রইল।'

(ইংরেজির অনুবাদ)

এর জবাবে ৩১শে জানুয়ারি মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি প্রস্তাব নিলেন যে, কোনো প্রদেশকে বা প্রদেশের অংশ বিশেষকে (এটি একটি নতুন শর্ত) গ্রুপ-গঠনের ব্যবস্থাকে বানচাল করে দেবার স্বাধীনতা দেওয়ায় কংগ্রেসের দ্বারা মন্ত্রী-মিশনের ১৬ই মে, ৪৬-এর ঘোষণা পত্র এবং ৬ই ডিসেম্বর, ৪৬-এর ব্যাখ্যা কোনোটাই সত্যভাবে গৃহীত হয়নি এবং সেই হেতু অবস্থার কোনো পরিবর্তন না হওয়ায় লীগ কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিতে যোগ দেবে না এবং পাকিস্তানের দাবিতে অটল থাকবে। তাঁরা চাইলেন, 'কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি ভেঙে দেওয়া হোক ও ভারত-বিভাগের ব্যবস্থা করা হোক।—কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি সেকসনগুলির ক্ষমতা কেড়ে নিচ্ছে বলেও অভিযোগ করা হোলো।

ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে ভারতে ফিরেই জিন্না সারা ভারতের মুসলমানদের ডাক দিলেন: পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বস্ব দান করতে হবে। তাঁর ডাকে পাঞ্জাবের মুসলিম লীগ পাঞ্জাবে একটি 'প্যারালেল গভর্ণমেন্ট' গঠন করবেন বলে ঘোষণা করলেন। তাঁরা একটি 'জাতীয় ভাণ্ডার' স্থাপন করলেন যাতে প্রত্যেক মুসলমান ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠান লাভের টাকায় তিন পাই, কর্মচারীরা বছরে এক-দিনের মাইনে এবং সেনা বিভাগ ও সরকারী-কর্মচারীরাও বছরে একদিনের মাইনে দান করবেন বলে নির্দেশ দেওয়া হোলো। এই 'প্যারালেল গভর্ণমেন্ট' পাঞ্জাবের মুসলমান প্রধান অঞ্চলগুলিতে ট্যাক্স ও খাজনা ধার্য করবেন বলেও ঠিক করলেন।

৪৭-এর ২৪শে জানুয়ারি পাঞ্জাব গভর্ণমেন্ট পাঞ্জাব মুসলিম লীগের ৭ জন খ্যাতনামা নেতা—মিয়াঁ ইফতিকারুদ্দিন, ফিরোজ খাঁ নুন, সৌকৎ হায়াৎ খাঁ, মামদোতের নবাব, বেগম শানওয়াজ এবং আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করলেন এবং পাঞ্জাবের মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডকে বে-আইনী সংগঠন বলে ঘোষণা করলেন। ওদিকে ৮ই জানুয়ারি আসাম মুসলিম লীগ আসাম গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করবেন বলে ঘোষণা করলেন।

পাঞ্জাবে মুসলিম লীগের এই 'প্যারালেল গভর্ণমেন্ট' নিয়ে প্রচন্ড দাঙ্গা সুরু হয়ে গেল। একদিকে মুসলমান অন্যদিকে হিন্দু ও শিখ। এই দাঙ্গা ক্রমশ সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও ছড়িয়ে পড়লো। ওয়েভেল গান্ধীজীকে যে রক্ত-বন্যার ভয় দেখিয়েছিলেন সেই রক্তবন্যা বুঝি সত্যি সত্যিই এসে গেল।

১৯৪৭-এর ২০শে ফেব্রুয়ারির ঘোষণায় ব্রিটিশ সরকার আরও একটি কাজ করলেন যার ফলে এই রক্তবন্যার গতি সম্ভবত বেড়ে গেল। এই ঘোষণায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এক মাসের নোটিশে ওয়েভেলকে বড়লাটের পদ থেকে বরখাস্ত করলেন এবং তাঁর জায়গায় নিয়োগ করলেন লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেনকে।

এর বহু আগে থেকেই কংগ্রেস নেতারা বিলাতের শ্রমিক সরকারের কাছে দরবার করছিলেন যে, ওয়েভেলকে অপসারণ না করলে কংগ্রেস-লীগে কোনোদিন মিলন সম্ভবপর হবে না। বিলাতের শ্রমিক সরকারের কাছে কংগ্রেস নেতাদের বক্তব্য ছিল যে ওয়েভেল কংগ্রেসের শত্রু, এবং অন্তরে অন্তরে ভারতের স্বাধীনতার বিরোধী।

এ ব্যাপারে ওয়েভেলের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছিল তখন যখন তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারির অফিস থেকে বিলাতে সরকারের বড় কর্তাদের নিকট লেখা তাঁর গোপন চিঠিপত্র সেই অফিসের একজন ভারতীয় স্টেনোগ্রাফার অন্তবর্তী সরকারের কংগ্রেসী মন্ত্রীদের কাছে পাচার করে দেয়। যে বিশেষ চিঠিটি নিয়ে কংগ্রেস নেতারা ও ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার প্রধান সদস্যরা ওয়েভেলের উপর বিরূপ হয়ে ওঠেন আমার মনে হয় সেটা ১৯৪৬ এর ৮ই জুলাই রাজা রুস্ট জর্জকে

লেখা ওয়েভেলের গোপন চিঠি। এই চিঠিতে তিনি গান্ধীজী সম্বন্ধে লিখেছিলেন :

'গান্ধী তাঁর স্বভাবতই নিজের পথে চলেছিলেন, তাঁর প্রভাব এখনও যথেষ্ট আছে তাঁর চিন্তাধারা এবং কর্মপদ্ধতি চিরদিনের মতই অনন্যসাধারণ; তিনি এমন ধরনের বক্তব্য রাখেন যার ভাষা এমন শূন্যগর্ভ অথচ এমন অর্থবোধক থাকে যা পরে তাঁর প্রয়োজনমত যে ভাবে ব্যবহার করলে তাঁর সুবিধা হয় সেইভাবে ব্যবহার করা যেতে পারবে। কিন্তু যতটা দ্বি-মুখো তিনি হউন না কেন একটি লক্ষ্যে তিনি একনিষ্ঠ যা থেকে গত চল্লিশ বছরে তিনি মোটেই বিচ্যুত হননি—সেটি হচ্ছে ভারত থেকে ঘৃণ্য ব্রিটিস প্রভাবের আপনোদন। এই ধূর্ত (শ্রুড) অনিষ্টকামী (ম্যালভোলেন্ট) বৃদ্ধ রাজনীতিক সম্বন্ধে কনফারেন্স (সিমলা) হবার আগে থেকেই আমার গভীর অবিশ্বাস ছিল, এখন তা আরও অনেক বেশি গভীর হয়েছে। মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাবগুলি প্রথম থেকেই তাঁকে অবিশ্বাস করতে শুরু করেন—আমার মনে হয় শেষে সকলেই তাঁকে অবিশ্বাস করতেন। প্রসঙ্গত, তাঁকে প্রথম যখন দেখি তার চেয়ে এখন তিনি অনেক বেশি শক্ত ও ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী।'

(ইংরেজীর অনুবাদ)

আর একটি চিঠিতে ওয়েভেল লিখেছিলেন : 'গান্ধী হচ্ছেন ৭০% ঝানু রাজনীতিক, ১৫% ভণ্ড, ১৫% সাধু'। এই চিঠিটিও হয়ত জওহরলাল বা বল্লভভাই এর হাতে পড়তে পারে।

ওয়েভেলের দিন-পঞ্জীতে ২৭ শে মার্চ (১৯৪৭) তিনি পরিষ্কার লিখেছেন যে তাঁর লেখা কোনো কোনো গোপন চিঠির প্রতিলিপি জওহরলাল বিলেতে নিয়ে গিয়ে স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্‌কে দেখিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে ওয়েভেল অন্তরে অন্তরে কংগ্রেসের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন এবং তাঁকে যে বড়লাটের পদ থেকে অপসারিত করা হয় এতে জওহরলালের হাত ছিল। (ওয়েভেল- দি ভাইসরয়েজ জার্নাল, ৪৩৩ পৃঃ) ওয়েভেলের এই বইটির সম্পাদক পেন্ডেরেল মুন অবশ্য স্বীকার করেন নি যে তাঁর গোপন চিঠি পাচার হবার সঙ্গে ওয়েভেলের অপসারণের কোন যোগ ছিল। কিন্তু ওয়েভেল নিজে অন্য কথা লিখে গেছেন।

ওয়েভেলের অপসারণ করা শুধু নয়, মাউন্টব্যাটেনকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছিল জওহরলালেরই অনুরোধে। মাউন্টব্যাটেন ভারতের বড়লাট নিযুক্ত হওয়ায় মুসলিম লীগপন্থী কোনো কোনো সংবাদপত্রে উল্লেখ করা হয়েছিল যে জওহরলালের স্বার্থে মনোনীত হয়ে মাউন্টব্যাটেন ভারতের বড়লাট হতে পেরেছেন। ১৯৪৭ এর ২১শে ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে জওহরলাল এ অভিযোগ অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, ওয়েভেলের ঐকান্তিকতা সম্বন্ধে তাঁর কখনও কোনো সন্দেহ ছিল না এবং মাউন্টব্যাটেনকে তিনি প্রীবৃন্দে

দুটি কাঁটার মাঝে একটি গোলাপ ফুল

দু'বার দেখেছেন—একবার সিঙ্গাপুরে ও পরে একবার দিল্লিতে। এই বিবৃতিতে জওহরলাল নিঃসন্দেহে সত্যকে গোপন করেছিলেন। কারণ, 'ফ্রিডম এট মিডনাইট' বইয়ের লেখকদ্বয় প্রকাশ করেছেন যে ১৯৭৩-এর ফেব্রুয়ারী মাসে কৃষ্ণমেনন তাঁদের একজনের কাছে স্বীকার করেছিলেন যে তিনি বিলাতে শ্রমিক মন্ত্রিসভার সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সকে বুঝিয়েছিলেন যে ওয়েভেল ভারতের বড়লাট হয়ে থাকলে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার কোনো সমাধান হবে না এবং তাঁর বদলে কাকে ভারতের বড়লাট করা যায় এই প্রশ্নের উত্তরে কৃষ্ণ মেনন জানিয়েছিলেন যে জওহরলাল মাউন্টব্যাটেনকে পছন্দ করেন। কৃষ্ণ মেনন স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস-এর কাছে যাবার আগে জওহরলালের সঙ্গে দেখা করে তাঁর সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলে নিয়েছিলেন। কিন্তু পাছে মুসলিম লীগ জানতে পারে সেইজন্য সমস্ত ব্যাপারটা খুব কঠিনভাবে গোপন রাখা হয়েছিল। (ফ্রিডম এট মিডনাইট—৮ পৃঃ) জওহরলালের জন্যই যে মাউন্টব্যাটেন বড়লাট হতে পেরেছিলেন এ কথা ফ্রিডম এট মিডনাইটের লেখকদ্বয় বইয়ের অন্যান্য জায়গায়ও বলেছেন। (৮৭ পৃঃ দেখুন।)

৪৬-এর ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে লন্ডনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার কয়েক দিন পরে জিন্না মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন উইনস্টন চার্চিল, এস্টলি ইডেন ও রিচার্ড কটলারকে। তাঁদের নিকট থেকেই হয়ত জিন্না খবর পেয়ে থাকতে পারেন যে, ওয়েভেলকে অপসারণ করা হবে এবং নেহরুর মনোনীত মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের বড়লাট করা হবে। ঠিক এই সময়েই প্রধানমন্ত্রী এটলি মাউন্টব্যাটেনকে ডেকে পাঠিয়ে তিনি বড়লাটের পদ গ্রহণ করতে পারবেন কি না তা জেনে নেন।

জওহরলাল প্রতিবাদ করলেও জিন্নার বুঝতে বাকি ছিল না যে, তাঁরই মনোনীত হয়ে মাউন্টব্যাটেন বড়লাট হচ্ছেন। ওয়েভেল যে নিরপেক্ষতা রক্ষা করে চলেছিলেন মাউন্টব্যাটেন আর সেই নিরপেক্ষতা রক্ষা করবেন না, তিনি জওহরলালের লোক, জওহরলালের কথায় চলবেন সেটা জিন্না এবার পরিষ্কার বুঝতে পারলেন। ওয়েভেল উভয় পক্ষের প্রতি যতটা সুবিচার করা সম্ভব তারই ওকালতি করেছিলেন এবং সেই হেতু মুসলিম লীগ তাঁর অনেক নিন্দা করলেও তাঁকে গভীরভাবে বিশ্বাস করতো। কিন্তু জিন্নার চোখে মাউন্টব্যাটেন ভারতের ভাগ্যাকাশে শনির মত উদয় হলেন।

মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারে মাউন্টব্যাটেন দম্পতির সঙ্গে ফটো তোলবার জন্য জিন্নাকে দুজনের মাঝখানে দাঁড়াতে বলায় জিন্না একটু ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন : 'দুটি কাঁটার মাঝে একটি গোলাপ ফুল।' কিন্তু কথাটি সম্পূর্ণ ব্যঙ্গ ছিল না। জিন্না মাউন্টব্যাটেন দম্পতিকে ভারতের মঙ্গলের পথে কাঁটাই মনে করতেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে চ—ল করে যে ওয়েভেলকে বড়লাটের পদ থেকে সরানো হোলো এবং জওহরলালের পছন্দমত মাউন্টব্যাটেনকে বড়লাটের পদে নিয়োগ করতে ব্রিটেনের শ্রমিক মন্ত্রিসভা বাধ্য হলেন এতেই মনে হয়, জিন্না মনস্থির করে ফেললেন যে, আর মীমাংসার কথা নয়—যদি প্রয়োজন হয় গৃহ-যুদ্ধ করেও দেশ-বিভাগ করতে হবে।

ওয়েভেল তাঁর দিন-পঞ্জীর ২৭শে মার্চ, ১৯৪৭-এর লিপিতে পরিষ্কার লিখেছেন যে, তাঁর বরখাস্তে এবং মাউন্টব্যাটেনের নিয়োগে নেহরুর হাত ছিল। কাজেই এ খবরটি তখন গোপন ছিল না এবং জিন্নাও খবরটি আগেই পেয়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকার যে জওহরলালের কথায় ওয়েভেলের মত বড়লাটকে বদল করলেন এতে জিন্না মনে করলেন যে, ব্রিটিশ সরকারের কাছে তাঁর পক্ষে হয়ত সুবিচার পাওয়া যাবে না।

সেইজন্য তিনি লন্ডনেই উইন্সটন চার্চিল প্রভৃতির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন এবং পাকিস্তানের দাবি আদায় করবার উদ্দেশ্যে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ করবার জন্য মনস্থির করে ফেললেন।

একথা মনে রাখতে হবে মন্ত্রী-মিশন প্রস্তাব সম্বন্ধে কংগ্রেস নেতাদের আপাত-বিরোধী নীতি সাধারণভাবে মুসলমানদের মধ্যে মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বাড়িয়ে তুলেছিল। কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলির নির্বাচনে ৭৯টি মুসলমান আসনের মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছিল মাত্র ৩টি এবং জওহরলালের যুক্তপ্রদেশ (বর্তমান উত্তর-প্রদেশ) কংগ্রেস প্রার্থী তিন জায়গায় দাঁড়িয়ে তিন জায়গাতেই হেরে যান। অন্য জায়গায় দাঁড়িয়ে হেরে যেতে পারেন সেই ভয়ে আবুল কালাম আজাদকেও দাঁড়াতে হয়েছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে।

বিভিন্ন প্রদেশে এতদিনের কংগ্রেসী ও মুসলিম লীগ বিরোধী মুসলমান নেতারা একে একে মুসলিম লীগে যোগ দিতে লাগলেন। পাঞ্জাবের পুরাতন কংগ্রেস নেতা পাঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ও এক সময়ের কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মিয়াঁ ইফতিকারউদ্দিন মুসলিম লীগে যোগ দিলেন। বাংলায়ও কৃষক-প্রজা দলের নেতা এক সময়ে প্রবল মুসলিম লীগ বিরোধী ফজলুল হক ও তাঁর সহকর্মী সামসুদ্দিন আমেদ অন্যান্য বহু সহকর্মীসহ লীগে যোগ দিলেন। চিত্তরঞ্জনের সময়েই যিনি মুসলমান কংগ্রেসীদের মধ্যে প্রথম সারিতে গণ্য হতেন এবং যাঁকে স্বয়ং সুভাষ-চন্দ্র একবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত করেছিলেন সেই আসরাফউদ্দিন আমেদ চৌধুরীও এই সময়ে লীগে চলে গেলেন। মতিলাল নেহরুর এক সময়ের বিশ্বস্ত সহকর্মী চৌধুরী খালিকুজ্জমানও লীগের দরজায় চুকলেন।

এমন-কি ভারত গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী হয়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সফর করবার সময়ে স্বয়ং জওহরলালকে বহু-দিনের পুরানো এই কংগ্রেসী ঘাঁটিতে বিক্ষুব্ধ মুসলমান জনতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাঁকে লক্ষ্য করে যে সব ইঁট-পাথর ছোঁড়া হয়েছিল তাতে তাঁর গাড়ির কাঁচ ভেঙে যায় এবং নিজেও তিনি সামান্য আঘাত পেয়েছিলেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ও পাঞ্জাবে মুসলিম লীগ সমর্থকদের এই সব গুণ্ডামির সম্বন্ধে ওয়েভেলের কাছে জওহরলাল যখন অভিযোগ করেন তখন ওয়েভেলের একান্ত সচিব পরে পাঞ্জাবের গভর্ণর স্যার ইভান জেনকিন্স বলেছিলেন : 'কংগ্রেস ১৯২১ সাল থেকেই এই সব করেছে এখন মুসলিম লীগও ওই পথ ধরেছে।'

এই পরিপ্রেক্ষিতে মনে রাখা দরকার যে প্রথম থেকে জিন্নার দাবি ছিল ভারত-বিভাগ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা। আমি প্রবন্ধের প্রথম দিকে দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতার প্রতি অবিশ্বাস এবং হিন্দু নেতাদের ভ্রান্ত নীতি অনুসরণের ফলে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রায় প্রথম থেকেই মুসলমান সমাজ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেনি। জিন্না এটাকে পরে দ্বি-জাতিতত্ত্ব বলে প্রচার করেছিলেন এবং দ্বি-জাতি তত্ত্ব সত্য কি কি মিথ্যা সেই আলোচনায় না গিয়েও এ কথা স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই যে জাতীয়তা-বাদের প্রশ্নে হিন্দু ও মুসলমানের দৃষ্টি-ভঙ্গীর মধ্যে অনেক পার্থক্য এসে গিয়েছিল। জিন্না তাই আগাগোড়াই বলতেন, এই দুই পৃথক দৃষ্টিভঙ্গীর মিতালি হওয়া সম্ভব নয় এবং সেইজন্য হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের মঙ্গলসাধনের একটি উপায় হচ্ছে ভারতকে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানে ভাগ করে দেওয়া—এ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।

আমরা অনেকেই বলি যে হিন্দু মুসলমানের এই অনৈক্যটি প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টি করেছিল সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ রাজনীতিকেরা যাতে ভারতে ইংরেজ শাসন নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে পারে এবং এও বলি যে, ভারতকে চিরদিনের জন্য দুর্বল করে রাখবার জন্য তারাই ভারতকে ভাগ করে দিয়ে গেছে। এর জবাবে মানতেই হবে যে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের রাজ প্রতিনিধি ওয়েভেল ভারতকে স্বাধীন করে দেবার মুখে প্রাণপণ চেষ্টা করলেন যাতে ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক ঐক্যটি ক্ষুণ্ণ না হয়। ওয়েভেল অবশ্য মাটি ইংরেজের মতই কাজ করেছিলেন। প্রায় দেড়শ' বছরের ইংরেজ শাসনে ভারতকে শোষণ করা হয়েছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু ইংরেজ ভারতের একটি প্রধান মঙ্গল করতে পেরেছিল বহুধা বিভক্ত ভারতীয় সমাজে একটি মোটামুটি সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐক্যের বন্ধন এনে দিতে পেরেছিল। ওয়েভেলের একমাত্র চিন্তা ছিল ভারত থেকে ইংরেজ শাসন নিরাপদের জন্য বিদায় নেবার সময়ে ভারতের প্রতি ইংরেজের এই সর্বশ্রেষ্ঠ অবদানটি যেন ধ্বংস না হয়ে যায়। ওয়েভেলের এই আন্তরিকতার মূল্য হয়ত আমরা দিতে চাইব না। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর আন্ত-রিকতা যে ছিল একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

ওয়েভেলের বিশেষ চাপাচাপিতেই ভারতবর্ষ বিভাগ না করে কিভাবে মুসল-মানের স্বাতন্ত্র্যও রক্ষা করা যায়, তারই পথ দেখিয়েছিল ৪৬-এর ১৬ই মে-র ঘোষণাপত্র। বলা যেতে পারে, ওটা কোনো মিলনের পথই ছিল না—ওতে মিলনের সূত্র কিছুই ছিল না। হয়ত তাই। যাঁরা এই মতের সমর্থক তাঁদের তাহলে বলা উচিত ছিল যে এই মিলনের সূত্রটি মিথ্যা এবং দাবি করা উচিত ছিল যে জিন্নার আবদার অগ্রাহ্য করে কংগ্রেসের হাতেই শাসন-ব্যবস্থা তুলে দিয়ে ইংরেজ ভারত ছেড়ে চলে যাক আর না-হয় জিন্নার দাবি মেনে নিয়ে ভারতকে পরিষ্কার দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রে ভাগ করে দেওয়া হোক।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সেই মতই ছিল। ১৯৪৬-এর ৬ই জুলাই বোম্বাইতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে প্যাটেল বলেছিলেন : 'মন্ত্রী-মিশনের ১৬ই মে-র ঘোষণাপত্রে মিঃ জিন্না দেখেছেন পাকি-স্তানের বীজ নিহিত আছে আর আমরা দেখছি ঐক্যবদ্ধ ভারতের।' এ-বিষয়ে সমাজ-তন্ত্রীদের নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের সঙ্গে ধনিকশ্রেণীর বন্ধু বল্লভভাই প্যাটেলের আশ্চর্য মিল ছিল। শ্রীজয়প্রকাশ বলেছিলেন, 'মুসলিম লীগের নেতার সঙ্গে আলোচনা করে কোনোদিন সত্যকার স্বাধীনতা পাওয়া যাবে না। এই কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি ইংরেজেরই সৃষ্টি—এর দ্বারা আমরা কোনো দিন সত্যকার স্বাধীনতায় পৌঁছতে পারবো না। মন্ত্রী-মিশনের এই ঘোষণাপত্র এখনই প্রত্যাখ্যান করে আবার বিপ্লবের ডাক দিতে হবে এবং বিপ্লবের পথেই ইংরেজকে ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য করতে হবে। মুসলিম লীগের সঙ্গে আপোস করে আমরা সে পথে যেতে পারবো না।' প্রতিবাদস্বরূপ পরে শ্রীনারায়ণ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য-পদ ত্যাগ করেছিলেন।

শ্রীনারায়ণ যেমন বিপ্লবের কথা বলে-ছিলেন তেমনি বল্লভভাইও মুসলিম লীগকে লক্ষ্য করে পরে বলেছিলেন : 'তরবারি দ্বারাই তরবারিকে আটকানো হবে।' (অবশ্য জিন্না এর জবাবে বলেছিলেন : 'সর্দার প্যাটেলের তরবারিটি কোথায়? কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী এবং ষড়লাটের শাসন-পরিষদের কংগ্রেসী সদস্যরা ব্রিটিশ বেয়নেটের দ্বারা সুরক্ষিত না হলে নিজেদের কাজ চালাতে পারতেন না।')

বল্লভভাই প্যাটেল বা জয়প্রকাশ নারা-য়ণের পথ হয়ত খুব জটিলতার সৃষ্টি করতে পারতো, কিন্তু এতে কোনো লুকোচুরি ছিল না। পথটি ছিল দিনের আলোর মত পরিষ্কার। কিন্তু মুস্কিল হল গান্ধীজী ও জওহরলালকে নিয়ে। এঁরা জিন্নার সঙ্গে আপোস করতে চাইলেন অথচ জিন্না যা চাইতো তা পুরোপুরি দিতেও এঁদের প্রবল আপত্তি। গান্ধীজী বললেন যে তিনি ১৬ই মে-র ঘোষণাপত্র মেনে নিয়েছেন, কিন্তু আসামকে বললেন যে সে যেন কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্ব-লিতে যোগ না দেয়। জওহরলাল ত' ওয়েভেলকে সরিয়ে নিজের মনোনীত লোকটিকে বড়লাটের পদে বসালেন। উপা-য়ান্তর না দেখে জিন্না গৃহযুদ্ধের পথই বেছে নিলেন।

৪৬-এর ৭ই এপ্রিল এক বিবৃতিতে জিন্না কংগ্রেস নেতাদের এ বিষয়ে আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'মুসলিম ভারতের পক্ষে একটি ঐক্যবদ্ধ ভারতের ধারণা একেবারে অসম্ভব। যদি মুসলমানদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো সিদ্ধান্ত তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে মুসলিম ভারত সকল উপায়ে এবং সকল শক্তি দিয়ে তার প্রতিরোধ করবে। যদি দুর্ভাগ্যবশত রক্তপাতের ভয় দেখিয়ে ইংরেজদের কিছু করতে বাধ্য করা হয়, যদিও তা ধাপ্পাবাজিই হবে, বাস্তব সত্যের চেয়ে

—তাহলে এবারে মুসলিম ভারত আর নিষ্ক্রিয় বা নিরপেক্ষ হয়ে থাকবে না। তারা তাদের যা করণীয় তাই করবে—সকল বিপদ-এর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। পণ্ডিত নেহরু মস্ত ভুল করছেন। তিনি বলেছেন, হাঙ্গামা হতে পারে কিন্তু তা মোটেই খুব বেশি হবে না। তিনি এখনও 'আনন্দ-ভবনের' আবহাওয়ায় বাস করছেন।' (ইংরেজির অনুবাদ—দি স্টেটসম্যান ৮-৪-৪৬)

পাঞ্জাব গভর্নমেন্ট ইতিমধ্যে পাবলিক সেফটি অর্ডিন্যান্স জারি করে সভা-শোভাযাত্রা বেআইনী বলে ঘোষণা করেছিলেন। জিন্না তাঁর সতর্কবাণীতে বললেন : পাঞ্জাব গভর্নমেন্টের পক্ষে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে এই আর একটি উন্মাদের মত এবং শত্রুতা-মূলক আচরণের ফল সারা মুসলমান ভারতের পক্ষে সাংঘাতিক হবে এবং আমি বড়লাটের নিকট আবেদন জানাচ্ছি, তিনি যেন অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করে অবস্থাকে রক্ষা করেন, তা না হলে সমস্ত ব্যাপারটার পরিণতি খুব গুরুতর হতে পারে এবং তার জন্য দায়ী থাকবেন বড়লাট এবং ব্রিটিশ সরকার।' সম্ভবত ওয়েভেলের হস্তক্ষেপে পাঞ্জাব গভর্নমেন্ট কারাবরুদ্ধ লীগ নেতাদের ছেড়ে দিলেন এবং মুসলিম লীগ ন্যাশন্যাল গার্ড-এর (ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের) উপর হতে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেন বটে কিন্তু পাবলিক সেফটি অর্ডিন্যান্স জারি রইল এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সভা-শোভাযাত্রা পরিচালনা করে মুসলিম লীগ আইন অমান্য সুরু করলেন।

ফেব্রুয়ারির প্রথমে জওহরলাল দাবি তুললেন যে যেহেতু কংগ্রেস ১৬ই মের প্রস্তাব গ্রহণ করেছে এবং লীগ গ্রহণ করেনি অতএব ওয়েভেলের শাসন পরিষদ থেকে মুসলিম সদস্যদের পদত্যাগ করতে বলা উচিত। এই নিয়ে জওহরলাল বিলাতে ব্রিটিশ সরকারকেও চিঠি দিলেন। ১ই ফেব্রুয়ারি ওয়েভেল বিলাতে ভারত-সচিবকে চিঠি দিয়ে জানালেন যে এখনও আর একবার চেষ্টা করে দেখা দরকার লীগকে কনস্টি-টিউয়েন্ট এসেম্বলিতে আনা যায় কিনা। ১১ই ফেব্রুয়ারি তিনি একটি খসড়া ঘোষণা তৈরি করে বিলাতে পাঠালেন এবং বলে দিলেন যে ব্রিটিশ সরকার যদি এই ঘোষণাটি করেন তাহলে লীগ হয়ত এখনও কনস্টিটিচয়েন্ট এসেম্বলিতে যোগ দিতে পারে।' কিন্তু ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা ওয়েভেলের অনুরোধমত কোনো ঘোষণা করতে অস্বীকার করলেন।

১৩ই ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জানিয়ে দিলেন, ওয়েভেলকে এক মাসের নোটিশে বরখাস্ত করা হোলো এবং তাঁর জায়গায় লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে বড়লাট নিযুক্ত করা হোলো। বরখাস্তের নোটিশ পেয়েও ১৭ই ফেব্রুয়ারি ওয়েভেল ব্রিটিশ সরকারকে অনুরোধ করলেন লীগকে কনস্টি-টিউয়েন্ট এসেম্বলিতে আনবার একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা উচিত। ব্রিটিশ সরকার তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারি বল্লভভাই প্যাটেল সর্বপ্রথম ওয়েভেলকে জানিয়ে দিলেন যে মুসলিম লীগ যদি নাছোড়বান্দা হয়, তাহলে পশ্চিম পাঞ্জাব সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (যদি বাজি হয়) ও পূর্ব বাংলা নিয়ে তারা পাকি-স্তান গঠন করতে পারে। ২০শে ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ সরকার ওয়েভেলের 'ব্রেকডাউন প্ল্যানের' অনুরূপ ঘোষণাটি করলেন যাতে বলা হোলো 'কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি যদি সর্বসম্মত সর্বভারতীয় সরকার গঠন করতে অক্ষম হয়, তাহলে ব্রিটিশ সরকার বর্তমান প্রাদেশিক সরকারগুলির হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ভালো ও যুক্তিসম্মত বলে মনে করবেন।'

মার্চের প্রথম দিন থেকেই পাঞ্জাবের অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে লাগলো। মুসলিম লীগ আইন অমান্য আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল এবং তাদের আন্দোলনে বিব্রত হয়ে ও অন্যান্য জটিলতার জন্য মুসলিম ইউনিয়নিস্ট প্রধানমন্ত্রী মালিক খিজর হায়াৎ খান তিওয়ানার মন্ত্রিসভা ৩রা মার্চ পদত্যাগ করলো। মুসলিম লীগ সর-কার গঠনের দাবি জানালো, কিন্তু ব্যর্থ হোলো—পাঞ্জাবে গভর্নরের শাসন চালু করতে হোলো। কিন্তু পাঞ্জাবে মুসলিম লীগ গভর্নমেন্ট গঠন করে ফেলতে পারে এই আশংকায় হিন্দু ও শিখরা প্রতিবাদ জানা-লেন এবং সেই প্রতিবাদ অচিরেই লাহোর, অমৃতসহর, রাওয়ালপিন্ডি ও অন্যান্য অনেক শহরে প্রবল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রূপান্তরিত হোলো যা পরে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়লো এবং সহস্র সহস্র লোক এর রক্তাক্ত স্পর্শে সিঞ্চিত হলেন। এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ধীরে ধীরে ক্রমশ সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ভারতে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। বল্লভভাই প্যাটেল ওয়েভেলকে অনুরোধ করলেন পাঞ্জাবে মিলিটারি শাসন চালু করা হোক। কিন্তু ভারতকে স্বাধীনতাদানের মুখে ওয়েভেল পাঞ্জাবে মিলিটারি বসাতে রাজি হলেন না।

২২শে মার্চ মাউন্টব্যাটেন তাঁর ইয়র্ক এম ভর্বলিউ ১০২ এরোপ্লেনে চড়ে যখন ভারতের ভাগ্যাকাশে শনির মত উদয় হলেন তখন সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ভারত একটি বারুদখানা হয়ে আগুনের হুঙ্কার সামনে বসে আছে।

মাউন্টব্যাটেন পৌঁছবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বড়লাটের একান্ত সচিব লর্ড এরেল (ইনি ওয়েভেলের সময় থেকেই ছিলেন) তাঁকে জানিয়ে দিলেন, ভারতবর্ষ সিভিল ওয়ারের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। তাঁর চিফ অফ স্টাফ লর্ড ইসমে খবর দিলেন : 'ভারতবর্ষ মাঝ-সমুদ্রে একটি আগুন-লাগা জাহাজ যার নিচের খোলে ঠাসা রয়েছে বারুদ।' পাঞ্জাবের গভর্নর স্যার বার্ট্রান্ড ফ্ল্যানসি খবর পাঠালেন : 'সমগ্র প্রদেশে সিভিল ওয়ারের হাওয়া বইছে।'

মাউন্টব্যাটেনের ভারতে পা দেবার এক সপ্তাহের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কুলকাতায় হত হলেন ৯৯ জন, বোম্বাইতে ৭১। তিনি ভারতবর্ষের পুলিশের বড়কর্তাদের ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : 'আপনারা শান্তি শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে পারবেন?' তাঁরা একবাক্যে বললেন 'আমরা পারবো না।' তখন ভারতের প্রধান সেনাধ্যক্ষ স্যার রুড অচিন-লেককে মাউন্টব্যাটেন একই প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেন : পারবেন না। তাঁর নিজের গভর্নমেন্ট কংগ্রেস সদস্যদের সঙ্গে লীগ সদস্যদের বৈরিতা এতদূর বেড়ে গেছে যে নিজেদের মধ্যে কথা বলা পর্যন্ত বন্ধ। ১৯৪৭-এর ২রা এপ্রিল মাউন্টব্যাটেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে জানালেন যে, ভারতের ভবিষ্যত সম্বন্ধে একটি সম্মিলিত সিদ্ধান্ত লাভের কোনো আশা তিনি পাচ্ছেন না এবং তিনি যদি খুব তাড়াতাড়ি কাজ শেষ না করতে পারেন তাহলে তাঁকে সারা দেশে সিভিল ওয়ারের সূত্রপাত অবলোকন করতে হবে।

মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই গান্ধীজী ও জওহরলাল তাঁর সঙ্গে স্নেহের বন্ধনে বাঁধা হয়ে গেলেন। কিন্তু জিন্না ধরতে পেরেছিলেন যে মাউন্টব্যাটেন নেহরুর লোক, আগাগোড়া তিনি মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে ঘৃণাসূচক ব্যবহার করলেন। মাউন্টব্যাটেনের ব্যক্তিগত প্রশ্নগুলি একটার পর একটা শুধু 'হ্যাঁ' 'না' বলে এড়িয়ে গেলেন। বড়-লাট-প্রাসাদে এক প্রকাশ্য ভোজসভায় জিন্না সকলের সামনে মাউন্টব্যাটেনকে তাচ্ছিল্য করতে দ্বিধা করেননি।

জিন্নার ব্যবহারে মাউন্টব্যাটেনকে বলতে বাধ্য হতে হোলো : 'ভারতে আমার কাজ যে কতখানি অসম্ভব হবে, একথা মহম্মদ আলি জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাতের আগে আমি বুঝতে পারিনি।' (ইংরেজির অনুবাদ—ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট)। মাউন্টব্যাটেন ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে জিন্নাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে ভারত-বিভাগ করলে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি হবে। তিনি জানতেন না জিন্না স্থির করে রেখেছেন মাউন্টব্যাটেনের কোনো কথাই শুনবেন না। তাই হোলো। মাউন্টব্যাটেন চরমভাবে ব্যর্থ হলেন। শুধু একটি বিষয়ে জিন্না মাউন্টব্যাটেনকে সমর্থন করলেন : খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে—ভারত বিভাগের অপারেশনটি খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে, তা না হলে ভারত ধ্বংস হয়ে যাবে। জিন্নাকে দেখে মাউন্টব্যাটেনকে বলতে হোলো : 'আমি কখনও বিশ্বাসই করতাম না যে একজন বুদ্ধিমান, উচ্চ শিক্ষিত, বিলাতের আইন-বিদ্যালয়ের কেউ জিন্নার মত মনের দরজা এমনভাবে বন্ধ করে বসে থাকতে পারে। এমন নয় যে তিনি যুক্তিটা ধরতে পারেন না, কিন্তু তার পরেই পাল্লাটি বন্ধ হয়ে যায়। সমস্ত জিনিসটাতেই তিনি একটি অপশক্তি হয়ে বসে আছেন। অন্য সকলকেই বুঝিয়ে রাজি করানো যায়, কিন্তু জিন্নাকে যায় না। যতদিন বেঁচে থাকতে থাকতে কিছুই করা সম্ভব হবে না।' (ইংরেজির অনুবাদ—ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট)।

(ক্রমশ)

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

হাওয়া গাড়ি

।।বত্রিশ।।

কলকাতা থেকে খাটাল একদম তুলে দেওয়া হবে। কাগজে কাগজে ছবি। মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি। দুগ্ধ উৎপাদন সমিতির প্রেস কনফারেন্স। সরকারী পরিকল্পনা নিয়ে ফলাও খবর। হরিণঘাটার কাছে গো-উপনিবেশ গড়ে তোলা হচ্ছে। সেখানে গরু আদর্শ পরিবেশে বাস করতে পারবে। শহরও গোবরের হাত থেকে—চোনার হাত থেকে উদ্ধার পাবে।

তবে এখানে গরু রাখলে মালিকদের একটা ভাড়া দিতে হবে। আর দুধ বেচতে হবে রাজ্য সরকারকে। যদি পছন্দ না হয়—তাহলে সরকারের হাতে গরু জমা দিয়ে এককালীন ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে গোকুল দত্ত পরিষ্কার ঝকঝকে গোয়ালের ভেতর দিয়ে হাঁটছিলো। দু ধারে গরুদের লেজ। তিনটি শংকর গাই গাভিন। শুরু করেছিলাম—একটা দেশী গাই নিয়ে। আজ এরাই আমার প্রতিষ্ঠা। এদের হরিণঘাটায় পাঠিয়ে আমি থাকবো কি করে। মানুষের জন্যে গরু। গরুর জন্যে মানুষ।

গোকুল দত্ত গুনগুন করে গাইতে লাগলেন। বোধ হয় বিবিধ ভারতীতে শোনা একটা গানের কলি।

আমার কানের পাশা
হারিয়ে গেলো
ঐ ঘোলা জলে—এ—এ—

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গাইছিলো আর ভাবছিলো, ঘোলা জল মানে কি এখানে ফেলে-আসা বছরগুলো? কানের পাশা মনে কি—সুখের ঘটনাগুলো? শিক্ষিত লোকজন তো এভাবেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গান লেখে। সহজ করে বলে না।

একটা হলস্টিন গাই চোখ তুলে তাকালো গোকুলের দিকে। ধাকে ধলে দশাসই-তাই এই গাইটি। গোড়ায় এসে এ-বেলা ও বেলা করে দিনে ছাব্বিশ কিলো দুধ দিচ্ছিলো।

গোকুল বললো, কি? দেশের কথা মনে পড়ছে মা?

হলস্টিনটির বয়স আট। সে বললো, আম্বা—আঁ—আঁ—

গোকুল বললো, তা তো পড়বেই। আর ছটা বছর আমার দুধ দাও। তারপর তোমায় পেনশন দেবো।

হলস্টিন বললো, পুরনো কথা মনে পড়ছে সব। সবুজ বারসিম লতার ঢাকা প্রান্তর। দূরে আলপসের চূড়ো। বাতাসে ঘুরছে উইন্ডমিলের ডানা—

সবুর করো মা। আবার তুমি ইউরোপে জন্মাবে। চাইকি সামনেরবার পাহাড়ের গায়ে বুনো লতা হয়ে বেয়ে উঠবে। আমরা ইন্ডিয়ান তো। আমরা ওইভাবে ভাবি। দ্যাখো না কত বয়স হয়ে গেল আমার। দোবারা সংসার করলাম। আমার ইলিগাল সন প্রিন্স এখন পুরোদস্তুর ইয়ংম্যান। লখনউতে ছড়ি ঘোরাচ্ছে।

বাবা আপনার ফোন। আবার গাই-গুলোর সঙ্গে কথা বলছেন?

হেঁটে গিয়ে রিসিভার ধরলো। হ্যালো। কে? অনন্ত—বল—

রিসিভার নামিয়ে রেখে গোকুল তার বড় ছেলের দিকে তাকালো। এবার তোমার বিয়ে দেওয়া দরকার।

আপনি একা একা ওদের সঙ্গে কথা বলেন কেন?

সে কৈফিয়ৎ তোমায় দেবো না।

জানি বাবা। আপনি ধরেই নিয়েছেন—এবার ওদের হরিণঘাটায় বিদেয় দিতে হবে। সেখানে ঘুরে এসেছি আমি। চমৎকার ব্যবস্থা। গাইগুলো ঘুরে ফিরে বেড়াতে পারবে। হরিণঘাটায় রাখলে আপনি গিয়ে দেখে আসতে পারবেন মাঝে মাঝে। আর বলেন তো পৈলানের দিকে জায়গা কিনে ওদের ওখানে নিয়ে রাখি।

হয় ওরা এখানে থাকবে। নয়তো ধর্মপেনশেশন নিয়ে ওদের হরিণঘাটায় দিয়ে আসবো। দেবার পর কোনো দিন আর ওমুখো হবো না। কিন্তু তার আগে দেখছি—তোমার বে দেওয়া দরকার—

বে করবো কি বাবা। আমি তো এখনো নিজে একটা পয়সা আয় করিনি। এখানে আপনার হাতে ধরা হয়ে আছি।

এই ঘি, দুধ, ছানা, গাই, ব্যবসা—সবই তো তোমার।

এসবই আপনার বানানো বাবা।

তোমার পছন্দ মত কিছু বানাও বাবা। না ইচ্ছে তোমার। মনে রাখবে আমি সব সময় তোমার পেছনে আছি। তুমি আমার প্রথম সন্তান।

ওসব কথা রাখুন। যদি মনে করেন—গাইগুলো ছাড়া আপনি থাকতে পারবেন না—তাহলে এখুনি আমাদের পৈলানে জায়গা নেওয়া দরকার—

তার আগে তোমার বউ আনা দরকার। বেশ ভালো দাড়ি উঠেছে দেখছি। কাটোনি কেন? যদি রাখবে ভেবে থাকো—তবে চাপদাড়িই রাখা ভালো।

আমার গাল এখনো ভরাট হয়নি।

বেশ তো! রাখোনা দাড়ি। কিন্তু বউ এলে কেটে ফেলতে হবে।

সে তখন দেখা যাবে বাবা।

আমি একটু বেরোচ্ছি। চিলিং প্ল্যান্টের চাবি তো তোমার কাছে। একটু লক্ষ্য রেখো—ভোল্টেজ চেঞ্জের দরুণ কম্প্রেসর যেন লাল না হয়ে যায়—

আপনি আবার খাওয়া-দাওয়া করতে বেরোচ্ছেন। বুকে ব্যথা হবে কিন্তু ঘুমের ভেতর।

গোকুল দাঁড়িয়ে পড়লো। হাসিমুখে বড়ছেলের দিকে তাকিয়ে বললো, গাড়িটা বের করতে বলো। তারপর বললো, ব্যথা হলেই বা। আমি আছো কি করতে?

খানিক পরে গোকুল এসে অর্ডিনান্স ক্লাবের সামনে গাড়ি রাখলো। গাড়িগুলো দেখে বুঝতে পারলো, অনন্ত, মীরা, ঋষি এসে গেছে। আরও কেউ কেউ থাকতে পারে।

আত্মজীবনী ॥ পঙ্কজকুমার মল্লিক

রবীন্দ্রসঙ্গীত যখন রবিবাবুর গান ছিল, সেই সময় থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত বাঙালীর সংস্কৃতি, সঙ্গীত, চলচ্চিত্র, বেতার ও রুচি পরিবর্তনের ধারাবাহিক স্মৃতিচিত্র। এবারের পুজো সাহিত্যের সেরা আকর্ষণ। সঙ্গে বহু দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র।

রবীন্দ্রনাথের অসুখবিসুখ ॥ অমিতাভ চৌধুরী

বিধান রায় বললেন, অপারেশান করতেই হবে। স্যার নীলরতন বললেন; কিছুতেই না। দুই বাঘা ডাক্তারের লড়াই যাঁকে নিয়ে,—সেই রবীন্দ্রনাথের অটুট স্বাস্থ্য কীভাবে হরণ করলেন, তারই কাহিনী। বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র সদন থেকে উদ্ধার করে আনা বহু অপ্রকাশিত তথ্য ও চিত্রসহ এবার পুজোয় অভিনব উপহার।

বছরের সেরা পাঁচটি উপন্যাস ॥ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়,

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, নিমাই ভট্টাচার্য ও অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

শারদীয় যুগান্তর ১৩৮৫

পূর্বাভাষ ॥ অন্নদাশঙ্কর রায়

বিভাগপূর্বকালের পূর্ববাংলাকে নিয়ে লেখা চাঞ্চল্যকর রচনা।

এ ছাড়া কয়েকটি বিশেষ রচনা

মন-পাঠাগার ॥ লীলা মজুমদার
উমা হৈমবতীর কলুজি ॥ সুকুমার সেন
সমকালীন কয়েকজন চিত্রশিল্পী ॥ সন্দীপ সরকার
বাঙলা ছবিতে শরৎচন্দ্র ॥ আশিসতরু মুখোপাধ্যায়
ছায়াচিত্রের ছায়া দেবী ॥ মধুসূদন মজুমদার

বড় গল্প ও ভ্রমণকাহিনী

আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, বরেন গঙ্গোপাধ্যায় ও তারাপদ রায়।

ছোটগল্প ও রহস্য কাহিনী

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ, সুধাংশু ঘোষ, সমীর রক্ষিত, প্রলয় সেন, সুব্রত সেনগুপ্ত; শৈবাল মিত্র, শচীন দাশ, গৌতম রায়, কণা বসু মিশ্র; অমর মিত্র; অমল আচার্য প্রমুখ।

বিশিষ্ট কবিদের সুনির্বাচিত কবিতাগুচ্ছ ॥ সেরা শিল্পীদের আঁকা স্কেচ

দাম : দশ টাকা। রেজিস্টি ডাকে অতিরিক্ত দু টাকা পঁচিশ পয়সা

আপনার কপির জন্য হকারকে বলে রাখুন, কিংবা সরাসরি যোগাযোগ করুন :
সার্কুলেশন ম্যানেজার, যুগান্তর লিমিটেড; কলকাতা-৩ ফোন : ৫৫-৫২৩১

এইসব সময় গোকুলের মনে হয় একটু নরম হুইস্কি আর সোডা সম্ভবত কোন ফলের রস। কেননা, পেটে পড়লে বুকটা ঠাণ্ডা হয়—দূরের ছড়িয়ে পড়া আলোয় বিয়েবাড়ির সানাইয়ের গুঁড়ো মিশে যায়।

গোকুলকে দেখে প্রথম হাত তুললো মীরা। এদিকে এসো গোকুলদা।

কতক্ষণ তোমরা এসেছো ?

অনেকক্ষণ—বলে মীরা বুঝলো, ঘাসের ওপর বেতের চেয়ার থেকে অন্তত দুজন পুরুষ তার পরিষ্কার গলা বা গুরীবার দিকে তাকিয়ে আছে। আজ চুল বেঁধেছে অনেকক্ষণ ধরে। চার আগে সে আসন করে। সযের তেল মেখে। কিছুতেই ভুড়ি হতে দেবে না। এ পৃথিবীতে একটু চেষ্টা করলেই হাজার বছর সুন্দরী থাকা যায়।

গোকুলের ঠিক উল্টো দিকে ঋষি বসেছিলো। তারও প্রিয় ফলের রসের নাম সোডা মিশ্রিত হুইস্কি। তিনটে শরীরে ধাবার পর ইদানীং সে বুঝতে পারে বুকের রিবকেসে দু-একটা খিলান, পিলার সামান্য ডেবে গেছে। নয়তো—তার আর কিছুই পাল্টায় নি। গোকুলকে দেখে বললো, আজ আপনার জন্যে আদা-লেবু এতক্ষণ টেবিলে ছিলো গোকুলদা—

গোকুল জানে—এটা ভালোবাসার কথা। তার মনের ভেতর তখনো—আমার স্নানের পাশা হারিয়ে গেল—ওই ঘোলা জলে—গানটা তিরতির করে কাঁপছিলো। কোথায় একটা হারানো সুখস্মৃতি ধুলোবালি মাখা অবস্থায় অনাদরে পড়ে আছে। তা, শুধু গোকুলের দেখার অপেক্ষা। চোখে পড়লেই কুড়িয়ে নেবে।

লেবুর রসে ভেজানো আদার কুঁচি গোকুল দত্তর প্রিয় স্যালাড। যেখানেই বসুক সে—কদিনের ভেতর বেয়ারারা জেনে যায়। গোকুল সোজাসুজি তাকালো। ঋষি হুইস্কির ভেতর দিয়ে পৃথিবীর নিজের বুকের রস শুষে নিয়ে মাথায় রাখছিলো। চোখের নিচে জমা করছিলো। তাই ওর মুখে এখন চোখ নামে দুটি স্থির স্ফটিক।

গোকুল দত্ত বললো, অনেককাল দেখা নেই দিলীপের—

অনন্ত বললো, সব মিটে গেছে ভালোয় ভালোয়।

সত্যি ? কী আনন্দ পেলাম। ওর কথা ভেবে আমার মনে সুখ ছিলো না একদম।

অনন্ত বলতে গেল, দ্যাখো গোকুলদা। তুমি এত তাড়াতাড়ি—আমার মন—মুখ—এসব কথা বলো কি করে ? এসব কথার মানে জানো ?

এ আর এমন কি কঠিন কথা অনন্ত। আমি আমার গাইগুলোর মনের কথা অব্দি জানি। কোন্‌টার কাল রাতে ঘুম হয়নি—কোনটা আগামী পূর্ণিমায় ছিটে আসবে—সব আমি বুঝতে পারি। আর নিজের কথা—বন্ধুদের কথা বুঝবো না ?

কি জানি বাবা। তুমি যে অ্যাতো সেনসিটিভ মেশিন—তা তো জানতুম না।

তুমি কোন্ খবর রাখো ঋষি ?

কিসের গোকুলদা ?

দিলীপের ?

দেখা হচ্ছে না। তবে জরুরি করেছে। বলেই ঋষি ক্লাব লনের আবছা আলোছায়ায় তাকিয়ে বললো, অনেক দিন বাঁচবে। ওই তো দিলীপ। আয়। এখান আয়—

আজ দিলীপের পায়ে পাম্পসু। গায়ে ঢোলা হাতার পাঞ্জাবি। পরণে কোঁচা ঝোলানো ধুতি। কতক্ষণ এসেছিস সবাই ?

আধ ঘন্টাও হয়নি। তোর কথাই হচ্ছিলো দিলীপ। আজ অফিসে যাসনি ?

খাওয়া হয়নি। এবারে তোর রোজ যাবো।

অনন্ত বললো, দিলীপদা—সব মিটে গিয়ে কেমন সুন্দর হয়ে গেল।

খুব সুন্দর অনন্ত। তোর খবর কি মীরা।

খুব ভালো। অনেকদিন পরে আবার আপনাকে আমরা পাবো এখন।

আমি চিরকালই তোমাদের।

ঋষি বা অনন্ত—দুজনই দিলীপের ধাত চেনে। দুজনেই একসঙ্গে সিধে হয়ে বসে গ্লাসে সিপ্ করলো। কারও মুখে কোন কথা নেই।

গোকুল দত্ত বললো, তাহলে দিলীপ তুই এবারে ভৌমিক খাদানের দিকটা দ্যাখ—

দেখলেই হয়। এর বেশি আর বলতে পারলো না দিলীপ।

ঋষি বললো, হ্যাঁ। তুই আবার সব দ্যাখ—

অনন্ত বললো, আবার আনন্দ হোক—। তারপর বললো, তুমি কি খাবে দিলীপদা ?

তোমরা যা খাচ্ছো।

দিলীপের জন্যেও সেই ফলের রস এলো। আলাদা করে তাদের নাম সোডা আর হুইস্কি। দিলীপ খুব তাড়াতাড়ি বার-তিনেক এই জিনিস দিয়ে গলা ভেজালো। তারপর পনেরো মিনিটের ভেতর সে বুঝলো, তার গলা দিয়ে নোনতা ঢেকুর উঠে এসে বুকের ভেতরের কিছু সত্যি কথাকে ঠেলা দিচ্ছে।

ঋষি বুঝলো, ডায়লগ চালানো দরকার। নয়তো আলোছায়ার ভেতর লন কমেই মিলিয়ে যাচ্ছিলো। অফিস আবার নতুন লাগছে নিশ্চয়—

দিলীপ নিজে এখন একটি সম্পর্কহীন আচমকা কথা বলে ফেললো। জানিস ঋষি, কোল ইণ্ডিয়া আমায় ক্ষমা করেছে।

গোকুল দত্ত বললো, তা তো করবেই। অফিস হলেই এই নিয়ম দিলীপ।

যে-ক্ষমা আমি চাইনি—তার জন্যেও ক্ষমা করে দেবে ?

হ্যাঁ দেবে।

তুমি চুপ করতো গোকুলদা। যা জানো না—বোঝো না—তা নিয়ে কথা বলো কেন ?

অনন্ত বললো, বেশতো সবাই ছিলাম। অন্য কথা বল না দিলীপদা।

আমার মনে অন্য কোন কথা আসছে না অনন্ত।

ঋষি এতক্ষণ চুপ করে ছিলো। সে এ-কদিনে এরকম একটা কথাই শুনেছে অফিসে। আর একথা নাকি দিলীপের মুখেই শোনা গেছে। অফিসে তাই তার কানে এসেছে। এখন খোদ দিলীপের মুখ থেকে শুনে তা কনফার্ম হোল। সে বললো, পুরনো কথা তুলে কি লাভ দিলীপ। আবার ফিরে শুরু করা যায় না ? ভেবে দ্যাখ না—

সব সময় কি শুরু করা যায় ঋষি ? আমার অনেক কিছু বলার ছিলো। কিন্তু বলবো না। তোর হয়তো পুরনো কাসুন্দি মনে হবে।

গোকুল দত্ত বললো, বল না।

সব জায়গায় সব সময় সব কথা বলা যায় না গোকুলদা।

অনন্ত বললো, তোমরা দুজন ঘুরে এসো না—

ঋষি অস্থির গলায় বললো, ভাঙা কিসের ? সব সময় তো দেখাই হচ্ছে আমাদের।

এবার গোকুল দত্তই বললো, যাও না ঋষি। তোমরা ঘুরে এসো।

আইডিয়াটা মন্দ নয়। বলে ঋষি উঠে দাঁড়ালো। গাড়ি এনেছিস দিলীপ ?

কেন ? ক্লাবের বাইরে যাবি ? চল তাহলে—

ক্লাব কম্পাউণ্ডের বাইরে এসে অস্টিন টুরারের সামনে ঋষি থমকে দাঁড়ালো। নিজেই চালাস ?

হ্যাঁ। এটাতেই হাত সেট হয়ে গেল। শুনেছি জলের মত চলে। অনাথদা বলছিল।

গাড়ি চলতে শুরু করলে দিলীপ অনিচ্ছুক গলায় বললো, আর কি বলেছে অনাথদা ?

বিশেষ কিছু, না। তুই জরুরি করলি। ভালোয় ভালোয় সব মিটে গেল।

হেস্টিংস দিয়ে মোহন হাউসের সামনে গাড়িটা ছুটছিলো। দিলীপ বেঁকে বসলো। ভালোয় ভালোয় তো মেটেনি ঋষি। তোর চেয়ে একথা বেশি কে জানে ?

আমি তো তখন কলকাতায় ছিলাম না। আমি জানবো কি করে ?

ফিরে এসে শুনিসনি ?

সবাই যা শুনেছে—আমিও তো তাই শুনেছি। আর তুই তো নিজেই কোম্পানীর চিঠিখানা দেখালি।

যের গাড়ি চালাতে চালাতে দিলীপ সামনের দিকে তাকিয়ে বললো, তোর কিছু মনে হয়নি ?

মনে হবার কি আছে ? ব্যাপারটা তো তোর দিলীপ।

তোর কিছু নয় ?

নিশ্চয় আমার। তবে শুধু সেইটুকুই আমার—যেখানে আমি চাইছিলাম—অনাথদা আর তোর ভেতরকার ব্যাড ব্লাড মুছে যায়। আবার আমরা সবাই অফিসের মত হয়ে যাই।

কিন্তু আমি একথা ভুলি কি করে ঋষি ?

কোন্ কথা?

সাধন গুপ্ত কি এম ডি-র সঙ্গে এক-দিন একটা কথায় গলা মেলায়নি ?

কি কথা দিলীপ ?

আমার বলতে খুবই লজ্জা করছে। কিন্তু না বলেও উপায় নেই। সেদিন নাকি আলোচনার বিষয় ছিলো—কি করে দিলীপ বসুর পাখা দুটো ছেঁটে দেওয়া যায়। আমি নাকি পাণ্ডবেশ্বর এবিষয়ে ভীষণ সরসর করে উড়ছিলাম।

সে তো তুই জানিস দিলীপ। কোল ইণ্ডিয়া বদি ভৌমিক খাদানের কাছে মাথেটিংয়ে ব্যথা পায় এক জায়গায়—সে তো কোল ইণ্ডিয়ার ভ্যানিটিতে লাগবেই।

সে জন্যে সাধন গুপ্ত কি ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে হাত মেলাবে ?

মিলিয়েছেন বলে আমি বিশ্বাস করি না। মিলিয়ে থাকলে অন্যায় করেছেন। তবে তুই একটা কথা বলতে পারিস। তুই কেন অনাথদার গায়ে হাত দিলি ?

কেন ? কলকাতা সুদ্ধ সবাই বলছে—তোর উন্নতিতে ক্ষেপে গিয়ে আমি ওনার গায়ে হাত দিয়েছি।

তাই কিন্তু বলছে সত্যি। আমার মনে হয় তুই প্যারানইয়াক।

কথাটার মানে কি ঋষি ?

ঋষি কোন জবাব দিলো না।

দিলীপ গাড়ি চালাচ্ছিলো। সেই সময়ে বিড়বিড় করে বললো, যারা আমার ডানা কেটে দেওয়ার ফন্দি আঁটে তাদের আমি কি করে ক্ষমা করি। আমি ঠিক একদিন তাদের ধরবো। আমার মত করে ধরবো।

দিলীপ। আমি তোর মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার ভালো লাগতো—যদি তুই এই মানসিক অবস্থা থেকে মুক্ত হতিস। কারও ওপর রাগ—প্রতিশোধ—বিদ্বেষ নিয়ে অন্যের চেয়ে নিজের মনেরই বেশি ক্ষতি হয়। এঅবস্থা থেকে তুই বেরিয়ে এলে আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হতাম।

তোর কাউকে ধিক্কার দেবার নেই ?

কেউ আমার ধিক্কার খাওয়ার জন্যে বসে নেই। আর আমিই বা ধিক্কার দেওয়ার কে ?

কেন ! কাগজে দেখিসনি ! আগে পশ্চাদ্‌ বোমা ফাটালেই কিছু বাঙ্গালী ধিক্কার জানিয়ে পেপারে স্টেটমেন্ট দিতো।

ওঃ ! সেই বুদ্ধিজীবীর কথা বলছিস দিলীপ ? হো হো করে হেসে উঠলো ঋষি। ওরকম একটা বুদ্ধিজীবী আমাদের পাড়াতেও আছে। উর্মিলা লণ্ডন্ত্রীতে এত বাকি পড়েছে লোকটার।

ঠিক এই টোনে তুই কোল ইণ্ডিয়ার এম ডি সম্পর্কে কথা বলতে পারিস ? সাধন গুপ্ত সম্পর্কে ? পারবি না। তোর ধিক্কার গলার ভেতর পাথর হয়ে যাবে।

আমাকে কি কোনোভাবে ছোট প্রমাণ করতে চাস ?

তোমার ক্যাটাগরিক্যাল সঙ্গে তুই কোনো ভাবেই জড়িত নয়। কিন্তু আবার জড়িতও বলা যায়।

তোর ক্যাটাগরিক্যাল তো তোর ডেকে আনা। অনেক কিছুই তো জীবনে এড়িয়ে চলা যায়। ইগনোর করা যায়।

সব সময় কি ইগনোর করা যায় ঋষি ? না, করা উচিত ? আমার কথা যদি বলিস—আমি বলবো—ইগনোর করলে আমি ভেতরের যন্ত্রণায় মরে যাবো। সব জিনিস তো চুপ করে থাকা যায় না। আমি দেখতে পাচ্ছি—কে গা বাঁচিয়ে চলছে—কে নগদ বিদায়ে খুশি। আমি একটা টেবিলে কোল ইণ্ডিয়ায় একইভাবে স্তব্ধ হয়ে আছি। কোন পরিবর্তন নেই। আমি তো একটা জিনিস গড়ে তুলতে ভালোবাসি। না গড়ে তুলতে পারলে আমার দম আটকে আসে। আমি নিঃশ্বাস ফেলতে পারি না। সেই যে কত আনন্দ করে আমরা সবাই টেনে করে একদিন শীতের সন্ধেবেলা পাণ্ডবেশ্বরে গিয়ে হাজির হলাম। আমি। তুই। অনন্ত। মীরা। গোকুলদা। অমাথ চক্কোত্তি। সাধন গুপ্ত—। এইতো সেদিনের কথা। জীবন কী ভাবে পালটায় ঋষি। কত তাড়াতাড়ি পালটায়। আশ্চর্য।

এসব কথা বলতে তুই আমায় ডেকেছিস ?

কোন কথা বলার জন্যেই ডাকিনি তোকে। এমনি খানিকক্ষণ তোর সঙ্গে থাকবো বলে ঋষি। এটা কি খুব বেশি দাবি ?

আমার আজকাল মনান্তর—মতান্তর—যাই বলিস—মন খারাপ করে দেওয়া ব্যাপারগুলো একদম ভালো লাগে না। আমার নার্ভে চাপ পড়ে। কদিনের জীবন বল তো ? কদিনের জন্যে এই মাতামাতি। আমার তো আজকাল ক্লান্ত লাগে দিলীপ।

আমি আর ও-বাড়িতে কাজ করবো না ঋষি।

এই পাগল ! কোথায় যাবি ? আমরা কতকাল বল তো একসঙ্গে আছি।

আর বোধহয় একসঙ্গে থাকবো না। থাকার কোন যুক্তি নেই ঋষি।

তুই যা ভালো বুঝিস।

আমার একটা জিনিস আজকাল খুব জানতে ইচ্ছে করে ঋষি। এই যে আমি তোর প্রোজেক্টার আড্ডায় নেই। থাকিই না। তা তো বেশ কিছুদিন হোল। এ ব্যাপারটা কেমন লাগে তোর ?

কেটে যায়। জীবন যেমন কেটে যায়। প্রোজেক্টার জীবন তো রুটিন মাত্র। তার ভেতর অফিস আছে। কাজ আছে। রাত আটটার পর কাজনায় মিলে কিছু কথাবার্তা—খানিকটা হুইস্কি। তুই আর আসিস না কেন ? চলে আসবি।

দিলীপ বললো, সে তার কোশ্চেনের জবাব পায়নি। এবার দু রকমের হতে পারে। এক : তুই নেই বলে কোনো অসুবিধে তো হচ্ছে না। দুই : তুই নেই বলে—তুই আসিসনে বলে তোর অ্যাবসেন্স ভয়ংকর ফিল করি।

আরও একটা জবাব ঋষি দিতে পারতো। সেটা অনেকটা একরকম : কে এলো—কে গেল—তা দেখার ইচ্ছে হয় না আমার। আমি বেশ আড্ডায় টেবিলে কিছু তোর পেলেই খুশি। তাদের মুখ দেখার দরকার নেই আমার। তারা এ বি সি ডি যে কেউ হতে পারে। আমার কোন অ্যাটাচমেন্ট নেই। কারও দিকে আমার বিশেষ কোন আকর্ষণ নেই। আমি দিলীপ তোর মত আঁকড়ে ধরে কষ্ট পাবার পার্টি নই।

দিলীপ নিজের মনে মনে ভাবলো, সত্যিই কি ঋষি এরকম ? না, না। কখনো নয়। ঋষি কত সুন্দর হেসে বলতো—তুই একটা মিরাকেল দিলীপ। তুই একটা উই-আর্ড। তুই না হলে এ খাদান—এই সাবসেস মাইনসয়ের টাকা আমরা কোনো জায়গা থেকেই জোগাড় করতে পারতুম না।

কালু ঘোষ বললো, একটু ইন্টারফেয়ার করছি। তুমি কিন্তু এখন ডকে বওয়ার খোলা বিজের মুখে।

দিলীপ বললো, সে তোমায় ভাবতে হবে না কালুদা।

ঋষি চমকে তাকালো, কার সঙ্গে কথা বলছিস দিলীপ ?

কালুদার সঙ্গে—

কালুদা ? সে-কে ?

আছে ভাই ! আছে ! জীবন তো শুধু রুটিন নয়। কি বলো কালুদা !

কালু ঘোষ বললো, কি করছো দিলীপ ? এভাবে আমায় মুখ খুলতে বাধ্য করো না। আমার ভীষণ কষ্ট। আমি আছি—একথাটা যদি কেউ চ্যালেঞ্জ করে—তাকে আমি ছেড়ে কথা বলবো না। সে যে-ই হোক। যত কষ্টই হোক—আমি কিন্তু এই চলন্ত গাড়িতেই ফুটে উঠবো। তখন তোমার প্রাণের বন্ধু ঋষিবাবুর কি দশা হয় দেখো।

কি আর হবে। একটু ঘাবড়ে যাবে।

কার সঙ্গে এত রসিয়ে রসিয়ে কথা বলছিস দিলীপ ?

দিলীপ বুঝলো, ঋষির চোখে এখন যে সন্দেহের ছায়া পড়েছে—তা শুধু পাগল দেখলেই লোকের চোখে ভেসে ওঠে।

আমাদের গাড়িতে আরেকজন আছেন—

ঋষি পেছনে তাকিয়ে বললো, কোথায় ! তুই তো ভুল বকছিস দিলীপ। থামা। গাড়িটা থামা। আমি নেমে যাবো দিলীপ।

পেছন থেকে কালু ঘোষ বললো, কি হচ্ছে দিলীপ ? শুধু শুধু বন্ধুকে ঘাবড়ে দিয়ে কি লাভ তোমার ? সামনে খোলা ব্রিজ। এখুনি বোধ হয় ব্রিজ উঠে যাবে—জাহাজ পাস হবে—

ঘাবড়াচ্ছো কেন কালুদা। এই দ্যাখো—বলতে বলতে অস্টিন টুলোর অ্যাক্সেলারেটরে চাপ খেয়ে গাড়ি ঘন ঘন করে কেঁপে উঠেই ছুটলো। পেছনের চাকা দুটো ব্রিজের আধখানা পেরোতেই ব্রিজটা মাঝখান থেকে দুভাগ হয়ে আস্তে আস্তে ওপরে উঠতে লাগলো।

ঋষি চেঁচিয়ে উঠলো। কি করছিস কি ? আরেকটু হলে—

কোন চিন্তা নেই। এই দ্যাখ, আমি কেমন এপারের রাস্তায় চলে এসেছি—

এমন অন্ধকারে কেউ অত স্পীডে গাড়ি চালায় ?

কোন ভয় নেই ঋষি। আমি একটা অঙ্ক কষেই স্পিড বাড়িয়েছিলাম। নইলে তো ব্রিজের পেছনের টুকরোয় পড়ে থাকলে গাড়িটাই উল্টে যেতো। এখানে থেমে দিলীপ বললো, কি কালুদা? তাই না?

কালু ঘোষ বললো, কি হোল তোমার দিলীপ আজ? হুইস্কি তো বেশি খাওনি।

দিলীপ বললো, আজ যে খাওয়ার সময় ঋষি সঙ্গে ছিলো কালুদা—

ঋষির মুখ দেখে কালু ঘোষ এখন কোন কথা বললো না। তার কথা ঋষি শুনতে পাচ্ছে না। পাচ্ছে দিলীপ। স্বভাবে দিলীপ যা বলছে—সেটুকু শুধু শুনে ঋষির তো অসংলগ্ন লাগবেই। কোন দিন তো দিলীপ এরকম করে না। আজ অপেক্ষাকৃত কতটুকুই বা খেয়েছে! তাতেই অমন হাই?

কাকে সেই থেকে কালুদা কালুদা করছিস? গাড়িতে তো আমরা দুজন।

না ঋষি। গাড়িতে আমরা, এখন তিন-জন।

গাড়িটা ব্রিজ পেরিয়ে—একটা ভাঙা হাজারের ভেতর দিয়ে লোক বাঁচিয়ে, রিকসা বাঁচিয়ে, ষাঁড় বাঁচিয়ে বেশ স্পিডেই ছুটে-ছিলো। অবশ্যটা অনেকটা এরকম—এই গুঁতো লাগে লাগে। এটুকুর জন্যে কাটিয়ে বাঁকিয়ে নিতে পারে দিলীপ। নইলে বিষম কাণ্ড হয়ে যায়—

এ-অবস্থায় ঋষি কোন তর্কে গেল না। সে শুধু বললো, জাহাজ পাস হয়ে ব্রিজ জুড়তে এখনো তো অন্তত দু ঘন্টা।

না না। আজকাল অতক্ষণ ব্রিজ বন্ধ থাকে না।

তুই জানলি কি করে দিলীপ? তোর আবার এদিকে কিসের কাজ?

ওঃ! তা জানিস নে বুঝি। সেই যে আমায় ক্ষমা করলো অফিস—তা দেড় দু-মাস তো হতে চললো। তারপর থেকেই তো আমি আর কালুদা—কলকাতা আবিষ্কারে বেরিয়ে পড়ি রোজ।

তোর গাড়িটার নাম কালুদা?

তা বলতে পারিস ঋষি। আসলে আমার আগে কালুদা ছিলো সেকেণ্ড ওনার। আমি এখন থার্ড।

দুই ওনার একসঙ্গে গাড়ি চড়াচ্ছিস!

তা বলতে পারিস।

অফিসে যাসনে কেন?

গিয়ে কি হবে! ওটাকে আর আমার অফিস মনে হয় না।

তুই চিরকালই এতটা ইনভলভড কেন দিলীপ? একথাটা বলার সময় ঋষির এক-বারও মনে হোল না—একটু আগে সে নিজে এই দিলীপকেই বন্ধ পাগল ভেবেছিলো। অবিশ্যি সে সন্দেহ তার এখনো পুরোপুরি কাটেনি।

এক-একজন মানুষ এক-এক রকমের হয়। মেলাতে গিয়েই যত গোলমাল ঋষি।

গাড়ি এখন আগের চেয়ে অনেক আস্তে যাচ্ছিলো। রাস্তার দুধারে গার্ডেনি বিচের সেই বিখ্যাত দর্জিপাড়া। দূরে বড় কোন গোডাউনের উঁচু মাথায় ট্যুইন একটা আলো জ্বলছিলো। সেখানে গিয়ে গাড়িটা দাঁড় করালো দিলীপ। সন্ধ্যাবাতের মিষ্টি হাওয়া এসে তার রক্তে লাগছিল। তোর খুব অসু-বিধে হোল ঋষি? টবদম আড্ডা থেকে তোকে তুলে এনেছি। ওরা হয়তো বসে থাকবে—

থাকলে থাকবে। তুইও তো যাবি।

যাবো। তোকে নামিয়ে দিয়ে চলে যাবো। দেরি হবে গেল?

নাঃ! খুব আর দেরি কোথায়। তুই বসবি না ভেতরে গিয়ে?

না ঋষি।

এই তো দিলীপ। তুমি হিউমার হারিয়ে ফেলছো। হিউমার ছাড়া মানুষ বড় ডাল হয়ে যায়।

আমি জানি ঋষি—কখনো তুই উপদেশ দিস।

কখোন?

যখন তুই আমাকে তুমি বলে কথা বলিস! আয় ঋষি—আজ তোকে আমি এ-গাড়ির সেকেণ্ড ওনারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো। ব্যাপারটার নিশ্চয় হিউমার আছে।

মারাত্মক হিউমার দিলীপ। যাকে চোখে দেখতে পাচ্ছিনে—অথচ একই গাড়িতে আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ ট্র্যাভেল করছেন—তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবো এখুনি—এর চেয়ে বড় হিউমার আর কি হতে পারে! হিউমার নেভার ডাল ফর এ মোমেন্ট!

এই যে একটু আগে বললি—এইতো দিলীপ। তুমি হিউমার হারিয়ে ফেলছো।

এখুনি উইথড্র করলাম কথাটা। কিন্তু সেকেণ্ড ওনার মশায় কোথায়?

সামনেই বড় গোডাউনের করোগেটেড টিনের ঢেউ তোলা দেওয়াল। তার সামনে ট্যুইন সেই আলোর মধ্যে একটা ছায়া এসে পড়েছে অস্টিন টুয়ারের গায়ে। কাকে পিঠে লোক বলতে একদম কেউ নেই। এর পরেই বোধ হয় ইলেকট্রিক আলো, শহর, লোক-আলয়ের শেষ। কেননা দুটো গুদামের ফাঁক দিয়ে একটা কড়াই কালো আকাশ লাফিয়ে পড়েছে।

দিলীপ ফাঁকা গাড়িটার দিকে তাকিয়ে বললো, নেমে এসো কালুদা। আমার পুরনো বন্ধু ঋষি।

কালু ঘোষ বললো, কেন গোলমাল পাকাচ্ছো ভাই?

কোন গোলমাল হবে না। কোল ইণ্ডিয়ায় আমার পুরনো বন্ধু। আমাদের অনেক দিন হোল একসঙ্গেই ওঠাবসা। তোমার পুরো নাম শুনলে চিনতে পারবে নিশ্চয়।

এখন আমি ফুটে উঠতে পারবো না দিলীপ।

কেন? জায়গাটা তো খারাপ নয়। লোকজন নেই। তোমায় দেখতে ভিড় হবার কোন ভয় নেই এখানে।

ঋষি বুঝলো, নিশিপাওয়া কোন লোক এভাবেই একতরফা কথা বলে যায়। যেন কারও কথার জবাবে কথা বলছে। অথচ শুধু একদিকের কথাই শোনা যাচ্ছে। ঋষি মনে মনে বললো, টেমপোরারি ইনস্যানিটি। কিন্তু মুখে চুপ করে থাকলো।

কালু ঘোষ বললো, কেন ওরকম করছো দিলীপ। পাগলের মত এতক্ষণ গাড়ি চালিয়েছো। তোমার তো লাইসেন্সও নেই। যদি এ্যাকসিডেণ্ট হোত!

হলে হোত। মাপিগয়ে। তুমি কি ফুটে উঠবে?

না।

কেন কালুদা?

আমার খুব কষ্ট হয় দিলীপ। প্রচণ্ড ইচ্ছেশক্তি একত্র করতে হয়। ইচ্ছের কুলোয় না আমার। এই বয়সে কি অতটা ইচ্ছে থাকে।

কেন! ক্যালকাটা ক্লাবে তো দিব্যি ফুটে উঠেছিলে।

ভয়ংকর কষ্ট পেয়েছিলাম।

এবার ঋষি লক্ষ্য করলো, একজন ক্লান্ত শ্রান্ত দিলীপ হেড়োগলায় চেঁচাচ্ছে। ফুটে ওঠো কালুদা। তোমার লজ্জা কিসের? ফুটে ওঠো। তুমি একজন সেকেণ্ড ওনার। ফুটে ওঠো কালুদা—

ঋষি ফাঁকা গাড়িতে কাউকে দেখতে পেলো না। সে আস্তে গিয়ে দিলীপের পিঠে হাত রাখলো। তারপর কাঁধে। নে! চল এবারে। ওরা ওয়েট করছে—

আরেকটু দেখি। কালুদা। এই শেষ-বার বলছি ফুটে ওঠো। ওঠো।

ঋষি এগিয়ে এসে দিলীপের হাত ধরলো। সে হাতে স্টার্টার। ওকি হচ্ছে দিলীপ। স্টিয়ারিংটা ভাঙবি নাকি। ফিরতে হবে না এতটা পথ?

একথায় মাথা ঝুলে পড়া দিলীপ গিয়ে স্টিয়ারিংয়ে বসলো। এবার গাড়ি চলছিলো আস্তে আস্তে। দিলীপের সেই তাড়া নেই এবারের ড্রাইভিংয়ে। ঋষি দুবার কথা বলেও কোন সাড়া না পেয়ে বললো—কিরে ঘুমো-চ্ছিস নাকি?

নাঃ!

তোর কালুদা লোকটা কিন্তু বেশ ভালো। ওখানে ওই অন্ধকার গোডাউনের সামনে ফুটে উঠলে কিন্তু আমি ঠিক অজ্ঞান হয়ে যেতাম।

দিলীপ জানে—ঋষি খুব ঘন ঘন ঠাট্টা করছে। তাই সে একবার কোন জবাব দিলো না।

(চলবে)

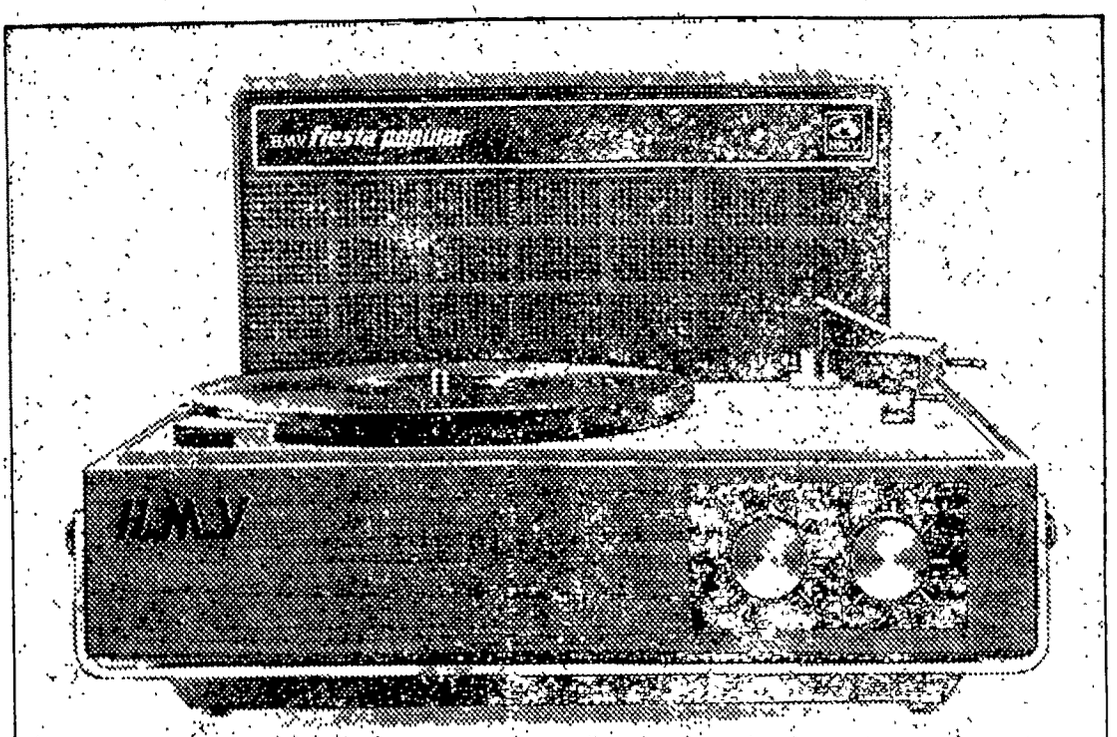

ভারতের সবচেয়ে বেশী বিক্রীত রেকর্ড প্লেয়ার এইচ এম ভি ফিয়েস্টা পপুলার

ফিয়েস্টা পপুলার বাজারে চালুকরার সময়ে আমাদের আশা ছিল যে এতে আমরা অনেক বেশি শ্রোতাদের কাছে সংগীতের আনন্দধারা পৌঁছে দিতে পারবো।

এইজন্যে আমরা ফিয়েস্টা পপুলারে সেই সব বৈশিষ্ট্যের সংযোজন করেছিলাম যা সংগীত প্রেমিক মাত্রেই একটি দ্বিমুখাম এবং মজবুত সেটে আশা করেন। তার প্রথম প্রমাণ হলো এর সুলভ দাম, এসি অথবা ব্যাটারী মডেল উভয়েরই। শুধু এই নয়, এতে আছে শক্তিশালী ও বিস্তৃত ফ্রিকোয়েন্সি রেইনজ-এর অ্যামপ্লিফায়ার এবং চাকনায় লাগানো চমৎকার মানানসই স্পীকার যেটিকে আপনি যেখানে খুশি রেখে গান-বাজনা শুনতে পারেন। ধ্বনির গভীরতা ইচ্ছেমত ভারী অথবা হালকা করার জন্য আছে একটি টোন-কন্ট্রোল। আর আছে সব রকম রেকর্ড বাজাবার জন্য ৩-স্পীডের টার্নটেবল।

এসবের উদ্দেশ্য একটি—যাতে ফিয়েস্টা পপুলারের মাধ্যমে অনেক বেশি লোক গান-বাজনা শোনার আনন্দ পান।

আনন্দের বিষয় এই যে আমাদের প্রত্যাশাকে ছাপিয়ে অনেক আগেই ফিয়েস্টা পপুলার ভারতের সবচেয়ে বেশি বিক্রীত রেকর্ড প্লেয়ারে পরিণত হয়েছে।

আজ সারা ভারতে ২,৫০,০০০ ফিয়েস্টা পরিবার আছেন। আপনি নিশ্চিত জানবেন—ঠিক এই মুহূর্তে কোথাও না কোথাও এইচ এম ভি ফিয়েস্টা নিশ্চয়ই বাজছে।

সর্বাধিক অনুমোদিত খুচরো দাম ৪৫৫ টাকা উৎপাদন শুল্ক সমেত স্থানীয় কর আলাদা

আপনি কি রেডিও অথবা অ্যামপ্লিফায়ারের মাধ্যমে বাজানো যায় এমন একটি রেকর্ড প্লেয়ার খুঁজছেন? তাহলে আপনি অবশ্যই কিনুন এইচ এম ভি ক্যালিপ্সো পপুলার আপনার আরেকটি 'পপুলার' সঙ্গী।

GC 9845

হিজ মাস্টার্স ভয়েস
উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি

খেলা

বিশ্ব সন্তরণ প্রতিযোগিতা

পশ্চিম বার্লিনে সদ্য সমাপ্ত ১৯৭৮ সালের তৃতীয় বিশ্ব সন্তরণ প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পদক জয়ের তালিকায় আমেরিকা প্রথম স্থান, রাশিয়া দ্বিতীয় স্থান এবং পশ্চিম জার্মানী তৃতীয় স্থান লাভ করেছে। সাঁতারের মোট ২৯টা স্বর্ণ পদকের মধ্যে আমেরিকা একাই পেয়েছে ২০টা স্বর্ণপদক—পুরুষ বিভাগে ১১ এবং মহিলা বিভাগে ৯। তাছাড়া বিশ্ব রেকর্ড ভাঙ্গা-গড়ার লড়াইয়ে আমেরিকার সাঁতারুরা গৌরবের সিংহভাগ পেয়েছেন। তাছাড়া পাঁচ বছর পর আমেরিকার মেয়েরা আন্তর্জাতিক সাঁতারে পূর্ব জার্মানীর পাঁচ বছরের প্রাধান্য চুরমার করে পুনরায় স্বদেশের শ্রেষ্ঠতর প্রতিষ্ঠা করলেন। এবারের আসরে মেয়েদের বিভাগে পূর্ব জার্মানীর শোচনীয় ব্যর্থতায় বিশ্ব-শুদ্ধ লোকের চোখ কপালে উঠে গেছে। এবার পূর্ব জার্মানীর কপালে জুটেছে মাত্র একটা স্বর্ণ পদক। মেয়েদের ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল সাঁতারে পূর্ব জার্মানীর বারবারা ক্রাউস স্বর্ণপদক জয়ের সূত্রে কোন রকমে স্বদেশের মুখ রেখেছেন। অথচ গত পাঁচ বছরে পূর্ব জার্মানীর মেয়েরা আন্তর্জাতিক সাঁতারের আসরে স্বর্ণপদক জয় এবং বিশ্ব রেকর্ড ভাঙার সংবাদে কি তোলপাড়ই না করে-ছিলেন। গত পাঁচ বছরে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব সন্তরণ প্রতিযোগিতা এবং ১৯৭৬ সালের অলিম্পিক সাঁতারে পূর্ব জার্মানী মেয়েদের বিভাগে শীর্ষ স্থান লাভ করেছিল। ১৯৭২ সালের অলিম্পিক সাঁতারে পূর্ব জার্মানী মেয়েদের বিভাগে পেয়েছিল মাত্র ৫টি পদক (রৌপ্য ৪ এবং ব্রোঞ্জ ১)। তাদের কপালে ১৯৭২ সালের অলিম্পিক সাঁতারের একটা স্বর্ণ পদকও জুটেনি। আর ১৯৭৬ সালের অলিম্পিক আসরে মেয়েদের সাঁতারের মোট ৩৯টা পদকের মধ্যে পূর্ব জার্মানী একাই পেয়েছিল ১৮টা পদক। মোট ১৩টা স্বর্ণপদকের মধ্যে পূর্ব জার্মানীর ভাগে ছিল ১১টা স্বর্ণপদক। এবং একটা করে স্বর্ণপদক পেয়েছিল আমেরিকা এবং রাশিয়া। আর ১৯৭৮ সালের বিশ্ব সন্তরণ প্রতি-যোগিতার আসরে মহিলা বিভাগে আমে-রিকা সেখানে ৯টা স্বর্ণপদক সেখানে পূর্ব জার্মানীর ভাগে মাত্র একটা স্বর্ণ-পদক। এক বছরের ব্যবধানে কি উত্থান-পতন!

১৯৭৮ সালের তৃতীয় বিশ্ব সন্তরণ প্রতিযোগিতার আসরে বিরাট ব্যক্তিগত

ভিন রাজ্যের 'তারা'রা কলকাতায়

ভিনরাজ্যের ফুটবল মাঠের তারকারা ইদানিং কলকাতামুখো পাড়ি জমাচ্ছেন। একজন তো ইতিমধ্যেই কলকাতায় খেলেছেন কয়েকটি খেলায়। কলকাতায় না খেললে ফুটবলের আসল চেহারাটাই নজরে এলো না, ফুটবলের আসল স্বাদটাই জিভে ঠেকল না—এমন কথা অনেক সেরা ভারতীয় খেলোয়াড় বিভিন্ন সময়েই বলেছেন। কলকাতা মাঠে সেইসব ভিনরাজ্যের দিকপাল খেলোয়াড় তাঁদের যৌবনের উত্তপ্ত দিনগুলি গৌরবের সঙ্গেই কাটিয়ে গেছেন। দলকে ভালোবেসেছেন—ভালোবেসেছেন ফুটবল পাগল কল-কাতাকে—গড়ের মাঠের ঘাস-মাটিকে, কেউ কেউ তো কলকাতাতেই ঘর সংসার পাতিয়ে কাটিয়ে দিয়েছেন বাকি জীবনটা।

গত কয়েক বছরে কলকাতা মাঠে ভিনরাজ্যের খেলোয়াড় আমদানি তেমন হয়নি। মাঝে মধ্যে এক আধজন যে আসেননি এমন নয়, ভারতীয় ফুটবলে মিজোরামের একমাত্র প্রতিনিধি ক্রাওলা মিজোই তো খেলেছেন চলতি বছরে মহমেডান স্পোর্টিংয়ে, তবে দল বেঁধে আসেন নি।

এ বছর কলকাতা ভিনরাজ্যের অতিথিদের নিয়ে মশগুল। গড়ের মাঠের আনাচে কানাচে চাপা উত্তেজনা—কার তাঁবুতে কে ভিড়ছে? কার বাজার দর কত? ক' তারার হোটেলে কাকে এনে তোলা হয়েছে? কোন্ দলের খেলায় কবে কোন্ ভিনরাজ্যের ফুটবল তারকাকে দর্শকের আসনে বসে খেলা দেখতে দেখা গেছে? মোটকথা আগামী ফুটবল মরশুমে বড় দলগুলিতে যে বেশ কয়েকজন অন্য রাজ্যের নামী ফুটবলার আসছেন তা কলকাতা দর্শক মোটামুটি জেনে গেছে।

চলতি মরশুমেই অবিশ্যি মুহাম্মেডানের নামডাকওয়ালা স্ট্রাইকার সাব্বির আলির কলকাতায় খেলার কথা ছিল। সেই মতই সাব্বির গত বছরের ৩০ সেপ্টেম্বরে ইস্ট-বেঙ্গলে খেলার আবেদন জানিয়ে ছিলেন পশ্চিম ভারত ফুটবল সংস্থার কাছে। তার আগেই ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে অন্যান্য কথাবার্তা পাকাপাকি করে ফেলেছিলেন। পশ্চিম ভারত ফুটবল সংস্থার সম্পাদক সাব্বিরের আবেদনে সাড়া দিলেন না। সামান্য একটা খত দিলে যে সাব্বির কল-কাতা মাঠে চলতি মরশুমের পুরোটাই লাল-হলুদ জামা পরতে পারতেন, তাঁকে আটকা পড়তে হল ছাড়পত্রের নাছোড় প্যাঁচকলে। সম্পাদক অবিশ্যি কেন খত

হরজিন্দার সিং

দিলেন না তা একটা নোট অফ ইনটারো-গেশন হয়ে ঝুলেছিল আমাদের সামনে। সাব্বির সম্পাদকের সিগনেচারের অনুগ্রহ ছাড়াই ছাড়পত্রের দরখাস্ত সোজা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ভারতীয় ফুটবল সংস্থার ঠিকানায়। দুর্ভাগ্য সাব্বিরের, সে দর-খাস্ত ঠিক ঠিকানায় পৌঁছতে কিছু বিলম্ব ঘটেছিল—তাইতেই এগারো মাসের ধাক্কা।

আবেদনের ফলাফল নিয়ে পাক্কা এগারোটি মাস সাব্বির কাটিয়ে ছিলেন টিটমেন্ডাস মেন্টাল টেনশনের মধ্যে। গ্রীন সিগন্যাল মিলবে কি মিলবে না, এই ঝুলে থাকা সিদ্ধান্তের দিকে চেয়ে কত আর প্রতীক্ষার দিন গোনা যায়? তো সাব্বির কলকাতায় খেলার বাসনা এক-দম সাফ সাফাই করে দেননি। সাংবাদিক-দের পরিষ্কার জানিয়েছিলেন—কলকাতায় খেলতামই। চলতি মরশুমে পারমিশন না পেলে কামিং সিজন-এ মশাল হাতে নিতাম—নো বিটার্স অর্নি—বোম্বাই ফিরতাম না কোনমতেই। কলকাতা সাব্বিরকে বহুত পেয়ার দেখিয়েছে মাঠে নামতে না নামতেই। এতো সহজে ভুলতে পারবে না সাব্বির। সেই সিদ্ধান্ত মগজে রেখেই সাব্বির অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন ইস্টবেঙ্গল দলের সঙ্গে। আর শেষ-মেস এগারো মাসের টাগ-অফ-ওয়ার শেষে সাব্বির কলকাতায় খেলার গ্রীন সিগন্যাল পেয়েছিলেন তা তো পাঠকের জানা। লীগের যে কটা খেলায় ইস্ট-বেঙ্গলের হয়ে মাঠে নামার সুযোগ পেয়েছেন সাব্বির তাতে যে দারুণ খেলা দেখিয়েছেন এমন নয়, তবে শীল্ডে সাব্বির স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবেন এমন প্রত্যাশা রয়েছে কলকাতা দর্শকদের।

পাঞ্জাবের লীডার্স ক্লাবের ডাক-সাইটে খেলোয়াড় হরজিন্দার সিং আগামী

সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে আমেরিকার ১৫ বছরের স্কুলছাত্রী টেরিস কলকিন্স। পাঁচটি স্বর্ণ পদক জয় (ব্যক্তিগত ৪ ও রিলে ১) এবং চারটি বিশ্ব রেকর্ড করার সূত্রে কুমারী কলকিন্স ১৯৭৮ সালের তৃতীয় বিশ্ব সন্তরণ প্রতিযোগিতার আসরে 'সুপারস্টার' আখ্যা লাভ করে।

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা

তামিলনাড়ুর মাদুরাই শহরে আয়োজিত ৪২তম জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স ২—১ ও ১—০ গোলে রেল দলকে হারিয়ে রঙ্গস্বামী কাপ জয়ী হয়েছে। উল্লেখ্য, গত বছর এই দুই দল যুগ্মভাবে চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল। জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স দলের প্রথম যোগদান ১৯৭৬ সালে। প্রথম যোগদানের বছরে তারা সেমি ফাইনালে উঠে এই রেল দলেরই কাছে হেরেছিল।

১৯৭৮ সালের প্রতিযোগিতার যোগদানকারী ২৭টি দল চারটি গ্রুপে ভাগ হয়ে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলেছিল এবং এই লীগের শেষ খেলার প্রতি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ দলই শেষ পর্যন্ত কোয়ার্টার প্রাথমিক লীগের যোগ্যতা লাভ করেছিল। প্রাথমিক লীগের খেলায় যথাক্রমে চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ হয়েছিল—'এ' গ্রুপে কর্ণাটক (১১ পয়েন্ট) ও রেল দল (১০ পয়েন্ট), 'বি' গ্রুপে বোম্বাই (৭ পয়েন্ট) ও সার্ভিসেস (৫ পয়েন্ট), 'সি' গ্রুপে ভূপাল (১৩ পয়েন্ট) ও দিল্লী (১২ পয়েন্ট) এবং 'ডি' গ্রুপে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স (১২ পয়েন্ট) ও তামিলনাড়ু (১০ পয়েন্ট)। লীগের সব খেলায় জিতেছিল একমাত্র 'ডি' গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স—৬টা খেলায় ১২ পয়েন্ট। তারা ৬টা খেলায় ৩১টা গোল দিয়ে মাত্র দুটো গোল খেয়েছিল। লীগের খেলায় অপরাজিত ছিল : এ গ্রুপে কর্ণাটক, বি গ্রুপে বোম্বাই, সি গ্রুপে ভূপাল এবং ডি গ্রুপে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স।

কোয়ার্টার ফাইনাল

ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স ৩ : দিল্লী ১
তামিলনাড়ু ২ : ভূপাল ০
রেল ৫ : বোম্বাই ৩
সার্ভিসেস ৩ : কর্ণাটক ১
* প্রথম দিনের নির্ধারিত সময়ের খেলা ১—১ গোলে ড্র। টাইব্রেকার পদ্ধতিতে ৬—৬ গোলে ড্র। দ্বিতীয় দিনে টাইব্রেকার পদ্ধতিতে রেল ৫—৩ গোলে জয়ী।

সেমি ফাইনাল

রেল দল ২, ৩ : সার্ভিসেস ১, ১
ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স ১, ১ :
তামিলনাড়ু ০, ২

যরশুমে কলকাতা মাঠে নামছেন লাল-হলুদ জার্সি পরে ইস্টবেঙ্গলের মশাল হাতে নিয়ে। আন্তঃরাজ্য ছাড়পত্র এবং আনুষঙ্গিক সই-সাবুদ পাকাপাকি করতে হরজিন্দার গত ২৩ আগস্ট থেকেই কলকাতায়। কলকাতার গড়ের মাঠে খেলার স্বপ্ন হরজিন্দারের অনেক দিনের। ফুটবলের এই তীর্থক্ষেত্রে কলকাতায় না খেললে খেলোয়াড়ী জীবনটাই পূর্ণ হয় না, এমনি ধারণাটা বোধহয় এই পঞ্জাব নন্দনের। আসলে কলকাতা ফুটবলের নেশায় শুধু মাতাল হতেই জানে না আর সকলকেও মাতাল করে দেয়। সেই মাদকতার টান খেলোয়াড়রাও বড় কম উপভোগ করেন না। আর কলকাতার দর্শক, —সে বড় সমঝদার দর্শক। যেখানে-সেখানে কেরামতির জায়গায় জায়গায় তাঁরা সমঝদারের সমঝদারি জানিয়ে যান। তাই কলকাতা আর কলকাতার ফুটবল পাগল দর্শককে যে 'সালাম' জানাতেই হয়। ভারতীয় ফুটবলে পাঞ্জাব-এর কামাল করা নাম লয়ালপুরের জার্নাল সিং ধীলন আজও যখন কলকাতায় আসেন, মুখর হয়ে ওঠেন তাঁর কলকাতার খেলোয়াড় জীবনের স্মৃতি চারণায়। মোহনবাগান তাঁর ঘুরে না গিয়ে পারেন না, এককালে এশিয়ার সেরা স্টপার জার্নেল সিং। কলকাতা তাঁর কাছে যৌবনের উপবন।

হরজিন্দার অবিশ্যি কলকাতায় আসতেন গত ছিয়াত্তরেই। যোগদান করতেন মোহনবাগানে। সেই ইচ্ছা জানিয়ে ছাড়পত্রের আবেদনও করেছিলেন—সে আবেদন মঞ্জুর হয়নি। এ-বছর আর কোনমতেই ঠেকাতে পারেনি ছাড়পত্রের প্যাঁচকল। আটকাতে পারেনি আঠারোশো টাকার জোরালো টোপও। হরজিন্দারকে দুরন্ত টানে টেনে এনেছে কলকাতা। ফুটবলের শহর কলকাতা। এবার জাতীয় ফুটবলের আসরে খেলতে এসে কলকাতার মহিমায় আরও মুগ্ধ হয়েছেন। ফুটবলের সমঝদারিতে বিস্মিত হয়েছেন হরজিন্দার। পাঞ্জাব থেকে কলকাতায় আসছেন স্টপার গুরুদেব সিং এবং মনজিৎ সিং। তাঁদেরও বাসনা ইস্টবেঙ্গল দলে খেলার।

কেরালার অন্তত ছয়েক নামডাকওয়ালা খেলোয়াড় এবার কলকাতায় খেলার ইচ্ছে জানিয়েছেন। এর মধ্যে ব্রেভিথার পায়াস খেলবেন মোহনবাগানে। নাজীব, প্রেমনাথ ফিলিপ, দীনকর মহমেডানে। পাউলস ও জেকব খেলতে চাইছেন ইস্টবেঙ্গলে। জেকবের ইস্টবেঙ্গলে খেলা নিয়ে খানিকটা অনিশ্চয়তা দেখা গেছে। হয়তো তাঁর কলকাতায় খেলার আবেদন নামঞ্জুরও হতে পারে। কলকাতায় খেলতে আসছেন তামিলনাড়ুর ডেভিড উইলিয়াম আর কর্ণাটকের দেবরাজ এবং গ্যাথিউ।

ভিনরাজ্যের খেলোয়াড়দের কলকাতায় আসা নিয়ে অনেকে স্থানীয় খেলোয়াড়দের সুযোগ সীমিত হওয়ার আশংকা করছেন। অনেকে বলছেন ঘরের খেলোয়াড়দের তুলনায় এদের দক্ষিণা বেশি দেওয়া হচ্ছে—হয়তো সত্যি ভুল এসব।

সাঁথিয়ন অর্জুন

বাঙালী সেন্টিমেন্টের দিকে তাকিয়ে কথাটা অভিমানের সুরে নিশ্চয়ই বলা যেতে পারে। ঘরের খেলোয়াড়দের বেলায় টাকাকড়িতে হাতটান আর বাইরের খেলোয়াড়দের বেলা মোটা দক্ষিণা—এই বিমাতৃসুলভ আচরণ নিশ্চয়ই অভিযোগের। তাই বলে বাইরের খেলোয়াড়রা কলকাতায় খেলবেন না, এমন ধারণা করলে ভুল হবে। কেননা অতীতে কলকাতায় তো ভিনদেশী খেলোয়াড় এসেছেন দলে দলেই। কলকাতার মাঠ আলো করে খেলে গেছেন বছর বছর। তাঁদের পাশাপাশি বাঙালী খেলোয়াড়রাও তো উজ্জ্বল ছিলেন। ভিনরাজ্যের খেলোয়াড়রা তো তাঁদের পথ আগলে দাঁড়াননি। যোগ্যতায় তাঁরা তো সামনের সারি দখল করেই ছিলেন।

মোদ্দা কথা ফুটবলের তীর্থক্ষেত্র কলকাতায় আজ এই বাইরের খেলোয়াড়দের আসা নিয়ে যেন কোন সংকীর্ণতার প্রাদেশিক ঝড় না ওঠে। কলকাতার ফুটবল তীর্থে জাতিধর্ম নির্বিশেষে খেলোয়াড়দের যে মিলন এবং সম্প্রীতি গড়ে উঠেছে এতদিন, তার ধারাটি যেন কোন মতেই ক্ষুণ্ণ না হয়। আজও ধনরাজ, বলরাম, মেওয়ালাল কিংবা সত্তার যখন তাঁদের সময়ের স্মৃতিচারণা করেন গড়ের মাঠে দাঁড়িয়ে, তখন তাঁদের চোখের সামনে বিশ্বই আলোয় উঠে আসে যেসব মুখগুলি তাতে কোন প্রাদেশিকতার ছবি থাকে না, সবাইকে স্মৃতিতে ভাসে মান্না। বলরামের স্মৃতিতে ভাসে চুনী কিংবা পি, কে। বহু বছর পর কলকাতায় খেলে যাওয়া কোন প্রবাসী খেলোয়াড় এসে গড়ের মাঠের দিকে চেয়ে তাঁর সময়ের ছবি আঁকলে যে জলছবি ফোটে তাতে সবাই গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়াবে। প্রাদেশিকতার কোন প্রাচীর নেই।

লিংকম্যান

দ্রষ্টব্য : ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স বনাম তামিলনাড়ুর তৃতীয় দফার সেমি-ফাইনাল খেলাটি গোলশূন্য অবস্থায় ড্র যায়। ফলে তামিলনাড়ুকে প্রথম দফায় ১—০ গোলে হারানোর সুবাদে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স ফাইনালে উঠেছিল।

বাংলার খেলা

প্রাথমিক লীগের 'ডি' গ্রুপে বাংলা খেলেছিল। এই গ্রুপ থেকে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স (১২ পয়েন্ট) এবং তামিলনাড়ু (১০ পয়েন্ট) যথাক্রমে চ্যাম্পিয়ান এবং রাণার্স-আপ হওয়ার সূত্রে কোয়ার্টারের ফাইনালে উঠেছিল। লীগ তালিকায় বাংলা পেয়েছিল তৃতীয় স্থান (খেলা ৬, জয় ৩, ড্র ১, হার ২, গোল পক্ষে ৮ ও বিপক্ষে ৭ এবং পয়েন্ট ৭)। বাংলা ২—০ গোলে উড়িষ্যা, ১—০ গোলে অন্ধ্র এবং ১—০ গোলে মহারাষ্ট্রের বিপক্ষে জিতেছিল, হেরেছিল ১—২ গোলে তামিলনাড়ু এবং ২-৪ গোলে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের কাছে। খেলা ড্র করেছিল ১—১ গোলে মণিপুরের সঙ্গে।

এখানে উল্লেখ্য, জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় বাংলা এ পর্যন্ত পাঁচবার ফাইনালে খেলে জিতেছে তিনবার—১৯৩৬ সালে মাদ্রাজের, ১৯৩৮ সালে ভূপাল এবং ১৯৫২ সালে পাঞ্জাবের বিপক্ষে। ফাইনালে হেরেছে ১৯৩২ ও ১৯৪৯ সালে পাঞ্জাবের কাছে।

জাতীয় জুনিয়র হকি প্রতিযোগিতা

১৯৭৮ সালের জাতীয় জুনিয়ার হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে গত বছরের রাণার্স-আপ সম্মিলীত বিশ্ববিদ্যালয় দল ১—০ গোলে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সকে পরাজিত করে সুদৃশ্য বোম্বাই কাপ জয়ী হয়। গত বছরের চ্যাম্পিয়ান কর্ণাটক প্রাথমিক লীগের খেলায় চ্যাম্পিয়ান অথবা রাণার্স-আপ না হওয়ার ফলে মূল প্রতিযোগিতায় উঠতে পারে নি। বাংলার ভাগ্যেও তাই ঘটেছিল। বাংলা 'বি' গ্রুপে তৃতীয় স্থান পেয়েছিল (৪টে খেলায় জয় ২ ও হার ২)।

কোয়ার্টার ফাইনাল

সম্মিলীত বিশ্ববিদ্যালয় ২ : ভূপাল ১
তামিলনাড়ু ১ : সার্ভিসেস ০
ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স ২ : বোম্বাই ১
দিল্লী ২ : উত্তর প্রদেশ ১

সেমিফাইনাল

সম্মিলীত বিশ্ববিদ্যালয় ৫ : তামিলনাড়ু ৩
ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স ২ : দিল্লী ০

সেপ্টেম্বর ১০ তারিখে শ্রীনগরে ৩৫তম জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর বসছে। লীগ এবং নক-আউট প্রথায় খেলা হবে। প্রতিযোগিতার যোগদানকারী ২৬টি দল ৮টি গ্রুপে ভাগ হয়ে প্রাথমিক লীগ পর্যায়ের খেলায় অংশ নেবে। প্রাথমিক লীগের প্রতি গ্রুপের একমাত্র লীগ চ্যাম্পিয়ান দলই পরবর্তী কোয়ার্টার ফাইনাল লীগে খেলবার যোগ্যতা লাভ করবে। কোয়ার্টার ফাইনাল লীগ খেলা হবে এই দুটি গ্রুপে—এ গ্রুপ এবং 'বি' গ্রুপ। এ গ্রুপে খেলবে প্রাথমিক লীগের ১ নং, ৩ নং, ৫ নং এবং ৭ নং গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান। অপরদিকে বি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান এবং এ গ্রুপের রাণার্স-আপ। সেমি-ফাইনাল খেলা হবে দুই পর্বে।

গত বছরের সন্তোষ ট্রফি বিজয়ী বাংলার খেলা পড়েছে প্রাথমিক লীগের ৮ নং গ্রুপে। এখানে উল্লেখ্য, বাংলা এ পর্যন্ত জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় ফাইনালে ২৬ বার খেলে ১৭বার সন্তোষ ট্রফি জয়ী হয়েছে। জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার গত ৩৪ বছরের ইতিহাসে সর্বাধিকবার ফাইনালে খেলা (মোট ২৬ বার), সর্বাধিকবার সন্তোষ ট্রফি জয় (মোট ১৭ বার) এবং উপর্যুপরি সর্বাধিকবার ট্রফি জয় (চারবার)—এই তিনটি উল্লেখযোগ্য রেকর্ড বাংলাই করেছে।

দর্শক

আট মাস ধরে ক্রিকেট খেলব

পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা অনেক। এর মধ্যে খেলাধুলোও আছে। সবচেয়ে মাথাব্যথা বোধহয় এ রাজ্যের ক্রিকেটকে নিয়ে। অর্থাৎ ক্রিকেটের মানকে নিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু, যিনি আমাদের ক্রীড়ামন্ত্রীও, রাজ্য ক্রিকেটকে ইতিমধ্যে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। গত তিন-চার মাসে এই খেলার কাজে প্রায় এক কোটি সরকারী টাকা খরচ হয়েছে। গ্যালারী তৈরি ও মেরামত, ইনডোর পীচ এসবের জন্য। ইডেন উদ্যানের তদারকী করছেন রাজ্য বনদপ্তর। যখনই প্রয়োজন হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী নিজে সি এ বি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা এবং মাঠ পরিদর্শন করেছেন। ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষ, ময়দানের দখল যাদের হাতে, তাঁদের সঙ্গেও তিনি কথা বলেছেন। সম্প্রতি ইডেনের ক্লাব হাউসে আয়োজিত সি এ বি-র পুরস্কার বিতরণী সভায় আবার তিনিই বলেছেন আমি ক্রিকেট জানি না। আমরা জানি তিনি কারুর থেকে কম ক্রিকেটপ্রেমী নন। ক্লাব হাউসে সেদিন জ্যোতিবাবুকে দর্শকদের ব্যাপারেই যেন বেশী চিন্তিত মনে হয়েছে। কথাবার্তায় তিনি সেইরকম ভাবই প্রকাশ করেছেন। 'বাইরের লোকেরা তো আমাদের দর্শকদের এতকাল প্রশংসাই করে এসেছেন। কিন্তু এটা কি? বড় খেলা মানে মাঠে কলকাত্তার যাবতীয় পুলিশ মোতায়েন? দল হারলে ময়দান জুড়ে সবকিছুর তছনছ? আবার জিতলেও বাসের ভাড়া দোবো না?' মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু অনুরোধও রেখেছেন। 'মাঠের এই ছেলেরা আমার আপনারই বাড়ির ছেলে। ওদের মধ্যে খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব আমাদেরই।' আর ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা বিষয়ে বলেছেন—এই খেলা ফুটবলের মতই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

দেখা যাচ্ছে ক্রিকেটের ব্যাপারে রাজ্য সরকার যথেষ্ট আগ্রহী। এবার দেখা যাক রাজ্য ক্রিকেট এখন কোথায় দাঁড়িয়ে। গত মরশুমে আমরা চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ। বর্ণজি, দেওধর বা দলীপ ট্রফী—এসব আমাদের নাগালের বাইরে। যদিও স্কুল-কলেজ লেভেলে আমরা চ্যাম্পিয়ন। ব্যাস! ওই পর্যন্তই। তারপর আমরা হেরে যাচ্ছি। হারিয়ে যাচ্ছি। আমাদের খেলার মান এখন সর্বভারতীয় মানের থেকে অনেক নীচে নেমে এসেছে। শিক্ষার মান খারাপ হলে আমরা শিক্ষাব্যবস্থাকে দায়ী করি। খেলাধুলোও শিক্ষার অঙ্গ। সেইমত রাজ্য ক্রিকেটের অবনতির জন্য সি এ বি-কে দায়ী করে সম্পাদক বিশ্বনাথ দত্তর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। সি এ বি-র নতুন কার্যকরী সমিতির কাজকর্ম জানবার জন্যও বটে। বিশ্বনাথবাবু দপ্তরে নতুন। সবে তিন-চার মাস হল দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি এক সময় ঘোষণা করেছিলেন— যেভাবেই হোক আমরা আট মাস ধরে ক্রিকেট খেলব। প্রথমে ওই প্রসঙ্গই তুললাম। তিনি বললেন—এতকাল আমরা তিন মাসের ক্রিকেট খেলে এসেছি। কিন্তু এটা পারফেকশনের যুগ। যত বেশী খেলব তত উন্নতি। তাই আরো বেশী সময় ধরে খেলতেই হবে। সমস্যা হল বর্ষা। এবং মাঠ।

বললাম—দু-একটা দল অবশ্য চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য পাঁচ মাস পর্যন্ত খেলে থাকে। কিন্তু সকলকেই ছ' মাস খেলতে হবে। বছরের বাকী সময় চলবে প্র্যাকটিস।

বললেন—যাতে সারা বছর প্র্যাকটিস চলতে পারে তার জন্য আমরা ময়দানে কিছু পীচের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছি। মুখ্যমন্ত্রীও আমাদের সঙ্গে কিছু জায়গা পরিদর্শন করেছেন। এবার মাঠের কথায় আসি। এখানে দুটো প্রধান খেলা। ফুটবল এবং ক্রিকেট। মাঠগুলোকে আমরা দু ভাগে ভাগ করার চেষ্টা করছি। কোনো কোনো মাঠে খেলা হবে শুধু ক্রিকেট। অন্যগুলোতে শুধু ফুটবল। এছাড়া আরো কিছু ব্যবস্থার করাও চিন্তা করছি। যাতে একই মাঠকে সারা বছরের জন্য সমানভাবে ভাগ করা যায়। তবে আমাদের

সঙ্গে তো আর বম্বের তুলনা চলে না। ওখানে নব্বুইটা মাঠে নিয়মিত খেলা হয়। একই মাঠে আবার দুটো করে খেলাও মাঝে মাঝে হয়ে থাকে। ছুটির দিনে বম্বেতে অন্তত দু'হাজার লাক কিক্রেট নিয়ে ব্যাস্ত থাকে।

আপনারা তো সবরকম সরকারী সাহায্য পাচ্ছেন। আপনাদেরও নিশ্চয় কিছু প্রগতি-মূলক কর্মসূচী আছে। সেগুলো সম্বন্ধে কিছু বলুন।

আগে থেকে কিছু বলতে চাই না। আচ্ছা দু-একটা বলছি। জেলার খেলো-য়াড়দের জন্য অল্প দামে খেলার জিনিসপত্রের ব্যবস্থা। তাদের মধ্যে খেলার উৎসাহ বাড়িয়ে তোলা। কলকাতার দলগুলোর জন্য সস্তায় লাঞ্চ প্যাকেট সরবরাহ। অতীত দিনের এবং দুঃস্থ খেলোয়াড়দের জন্য বেনিফিট ম্যাচ। এই রকম আরো আছে।

এবছর কোন নতুন ট্রফির প্রচলন করছেন কি? প্রথম ডিভিশন লীগের কিছু দল কমিয়ে ষোলো সতেরোয় আনার বিষয়ে একবার আপনারা ভেবেছিলেন। সেইমত কিছু হবে কি?

এখনই আমরা কোনো নতুন ট্রফির কথা ভাবছি না। দল বদলের পরে দল কমানোও সম্ভব নয়।

এক সময় পৃথিবীর সেরা মাঠগুলোর তালিকায় ইডেনের নাম ছিল। আবার একে সেরা করে তোলা যায় না?

নিশ্চয়ই যায়। আমরা চেষ্টা করছি। রাজ্য বনদপ্তরও কাজ করছেন। টেস্ট খেলার আগেই পরিবর্তন দেখতে পাবেন। নতুন গ্যালারী হবে। নতুন প্রেস বক্স হবে। ইলেকট্রনিক স্কোর বোর্ড বসবে।

এখানে ফুটবলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কিক্রেটও পেশাদারী পর্যায়ে চলে আসছে। কে আপনি কি চোখে দেখেন?

দু-একটা বড় ক্লাব বাদে বাকিদের আর্থিক অবস্থা এমন নয় যে এই ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে চালু হতে পারে। তবে পেশা-দারী পর্যায়ে খেলা চালাতে গেলে ক্লাব-গুলোর সাহায্যে শিল্পপতি বা ব্যবসায়ী দলকে এগিয়ে আসতে হবে।

এইবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা করি। কিক্রেটের মানোন্নয়নের জন্য দরকার উন্নত কোচিং। আপনাদের কোচিং স্কীম-গুলো কি কি?

কলকাতা এবং জেলায় আমরা কোচিংকে তিন ভাগে ভাগ করব। বয়সের ভিত্তিতেই এই ভাগ হবে। বারো থেকে পনেরো, ষোলো থেকে আঠারো এবং উনিশ থেকে বাইশ। জেলায় জেলার টেনিং সেন্টার খোলা হবে। কলকাতাতেও হবে আট জায়গায়। জেলা-গুলোতে প্রবীণ কিক্রেটারদের কোচ করতে আহ্বান করা হবে। কোচদের জন্যও কোচিং-এর ব্যবস্থা থাকবে। জিমন্যাসিয়াম এবং মেডিক্যাল ইউনিট বসানো হবে।

শিবনাথ দত্ত এবং আমার প্রশ্নোত্তরের আসর এইখানেই শেষ হয়েছিল। বিদায় নেবার আগে আমি তাঁর কাছে কিছু সাজেশন রেখে এসেছিলাম। যেগুলো তিনি সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন। সেগুলি হল :

(১) ইডেনের টেস্ট খেলাগুলোকে ফিল্মে ধরে রাখা এবং পরে তা কোচিং সেন্টারগুলোতে দেখানো। এই ব্যবস্থা আগে থেকে চালু থাকলে সোবার্সের সেঞ্চুরী, কানহাইয়ের ৩০৩, ডেকস্টারের ৬২, সিম্প-সনের ৬২, হার্ভের ৭৬, উইকস ওরেল কাউড্রের ইনিংস-এর মত আরো কত ক্লাসিক খেলা আমরা আমাদের ছাত্রদের দেখাতে পার-তাম। হল, গিলক্রিস্ট, লিন্ডওয়াল, ডেভিড-সন, রামাধীন, ভ্যালেন্টাইন, গিবস, বেনো, লক প্রমুখের ডেলিভারীও ধরা থাকত। এই-সঙ্গে আমাদের খেলোয়াড়রা ত থাকতই।

(২) কোচিং সেন্টারগুলোতে কোচদের সঙ্গে ডিমনস্ট্রেটর নিয়োগ। বয়স্ক কোচ অনেক সময় যা বলেন বা দেখাতে চান তা দেখাতে পারেন না। বিশেষ করে ফাস্ট বোলিং এবং ফিল্ডিং-এর ক্ষেত্রে। ডিমন-স্ট্রেটর অবশ্যই ভাল খেলোয়াড় হবেন।

(৩) আমাদের পংকজ রায় একজন আদর্শ কপিবুক কিক্রেটার। তাঁর স্টাম্প এবং সবকমের মারকে ফিল্মিং করে ভাল ডিমনস্ট্রেশনের কাজ চলতে পারে। এইরকম আরো কিছু ব্যবস্থা করে তা ছাত্রদের দেখানো। ওদেশের স্যার জ্যাক হবসের স্টাম্পকে এখনও সকলে স্মরণ করেন।

(৪) আই এফ এ শীল্ডের মতো সি এ বি নক আউটের কিছু খেলাও জেলায় জেলায় অনুষ্ঠিত করা।

(৫) নিয়মিত সেমিনার করা। বিশেষত কোচিং-এর জন্য।

(৬) ফুটবলের মত কিক্রেটেও এক ধরনের নোংরা খেলা কলকাতার লীগে চালু হচ্ছে। তা হল টেন্ট-এর খেলা। অর্থাৎ পয়েন্ট ছাড়াছাড়ি। যেভাবেই হোক খেলা-গুলোকে টেন্ট থেকে মাঠে নাবাতে হবে।

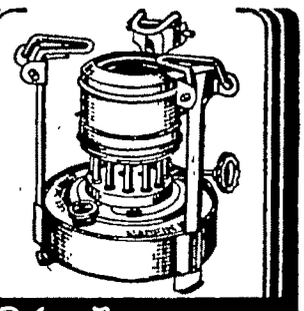

নির্ঝঞ্ঝাটে রান্না সারতে

লাইটেক্স

নীল শিখার কেরোসিন কুকার

১) স্টোভ ফাটবার কোনো সম্ভাবনা নেই।
২) তৈয়ারীর গুণাগুণ সম্মর্কে গ্যারান্টি দেওয়া হয়।
৩) প্রতিটি অংশই আলাদা পাওয়া যায়।

পরিবেশক:
ভেনাস এজেন্সীজ
৬, আমড়াতলা স্ট্রীট • (দ্বিতলে)
কলিকাতা-৭০০০০১ • ফোন:৩৪-৬৫৭৩

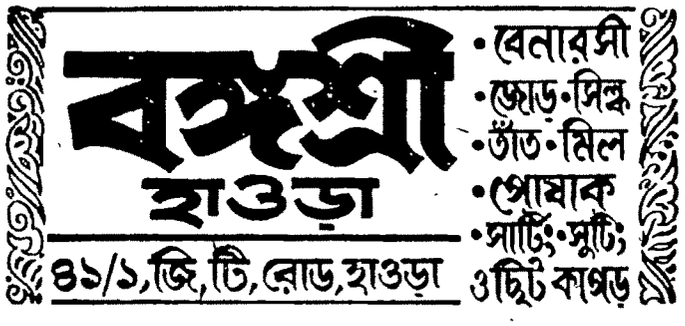

ক্যালিক্স® স্যানিটারী ট্যাম্পুন

প্রতিমাসের অস্বস্তিকর পাঁচদিন আপনাকে সহজ ও নিবিঘ্ন রাখবে।

বৈশিষ্ট্য :
★ অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের উপযোগী করে প্রস্তুত।
★ ব্যবহারের-পদ্ধতি খুবই সহজ, বেল্ট বা পিন লাগে না।
★ অভ্যন্তরে থাকাকালীন কোন অস্বস্তিকর অনুভূতি থাকে না।
★ প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কোন স্বাভাবিক কারণে পরিবর্তন অনাবশ্যক।
★ অথচ সাধারণ ন্যাপকিনের মতই কার্যকর। টিউবে এবং বিনা টিউবে পাওয়া যায়।

এজেন্ট চাই

ফেয়ারওয়ে ট্রেডিং কোং
৩৯, শীতলাতলা লেন, কলিকাতা-৭০০০১৯
ফোন : ৩৫-৪১৪৫

গেঁয়ো যোগীর ভিখ মেলে না

কথায় বলে 'গেঁয়ো যোগীর ভিখ মেলে না।'

সত্যি যে মেলে না তার প্রমাণ আমরা হাড়ে হাড়ে টের পেলাম কলকাতার ফুটবলকে কেন্দ্র করে। এখন কলকাতা ময়দানের যা হাল তাতে গেঁয়ো যোগী অর্থাৎ স্থানীয় খেলোয়াড়রা আর বিশেষ পাত্তা পাবেন কিংবা পাচ্ছেন বলে মনে হয় না। অবশ্য মুষ্টিমেয় কয়েকজনের কথা আলাদা। তাঁদের পা তো সোনা দিয়ে বাঁধানো।

সোনা দিয়ে পা বাঁধানো ছিল আগে অনেকেরই। কিন্তু সেই সোনায় যেই খাদ মিশল কিংবা সোনা ক্ষয়ে যেতে শুরু করল অমনি তাঁদের ছুঁড়ে ফেলে দিতে পিছু-পা হন না ময়দানের বড় ক্লাবগুলোর হর্তা-কর্তা-বিধাতারা। অবশ্য অভিনেতাদের গোঁফ'র মত খেলোয়াড়দের খেলার ওপরই যে সব কিছু নির্ভর করে সে কথা বলাই-বাহুল্য। কিন্তু যোগ্যতার স্বীকৃতি কজন পান সেইটাই প্রশ্ন।

যোগ্যতার প্রশ্ন যখন উঠলোই তখন একটু খোলাখুলি ভাবেই না হয় কথাটা বলি। সম্প্রতি পঞ্জাবের দেশের এক তা-বড় খেলোয়াড় কলকাতায় এসেছিলেন। বেশ কয়েক দিন তিনি ছিলেন এই শহরে। ইস্ট-বেঙ্গল ক্লাবের অনুকূলে সই করলেন আন্তঃ-রাজ্য ছাড়পত্র। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের খেলো-য়াড়দের সঙ্গে কদিন সকালে অনুশীলনও করলেন। প্রথমে তাঁকে রাখা হয়েছিল গ্রেট-ইস্টার্ণ হোটেলে। পরে আনা হল আরো দামী পাঁচ তারার হোটেল ওবেরয় গ্রান্ডে। অর্থাৎ এঁদের পেছনে ক্লাবের মত টাকা খরচ করতে পিছু পা নন ক্লাবের কর্তারা।

হোটেলে রাখা, বিমানে আসা যাওয়া ছাড়াও এঁদের পেছনে হাজার হাজার টাকা খরচ করবেন ক্লাব। সত্যি কথা বলতে কি এই রকম একজন খেলোয়াড়কে রাখা হাতী পোষারই নামান্তর। এখন আমাদের প্রশ্ন— এত খরচ করার মত খেলোয়াড় সত্যিই কি তাঁরা? নাকি তাঁদের মত কৃতী খেলোয়াড় এই পোড়া বাংলায় নেই?

স্বীকার করছি পাঞ্জাবের হরজিন্দর সিং দারুণ খেলেন। তাঁর বলের কন্ট্রোল অসাধারণ। পায়ের কাজেরও তুলনা হয় না। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের এবারের অধিনায়ক সুরজিত সেনগুপ্ত কি তাঁর সময়ে হর-জিন্দারের চেয়ে কোন অংশে কম ছিলেন? আজ সুরজিতের বয়স বাড়ছে। খেলে খেলে পোড় খেয়েছেন। তাঁর উন্নতি বয়সের খেলার সেই ধার এখন পড়তির দিকে। তবু এখনো সুরজিত যা খেলেন তা কোন দিক দিয়েই হরজিন্দরের চেয়ে কম নয়। যাঁদের মনে এতটুকুও সন্দেহ জাগবে তাঁরা একবার গতবারের ফুটবলের ফাইনাল বাংলা-পাঞ্জাবের খেলার কথা মনে করে দেখুন।

তবু এই সুরজিতকে তাঁর মর্যাদা আদায়ের জন্যে, পাওনা আদায়ের জন্যে কম মেহনত করতে হয়নি। এবছর সুরজিত ক্লাব থেকে যা পেয়েছেন তা তাঁকে লড়ে আদায় করতে হয়েছে।

কিন্তু কেন? সুরজিত স্থানীয় খেলোয়াড় বলেই কি? তাই আমরা দেখি বরদিয়ান হাবিব ও অনভিজ্ঞ জাকবর যে টাকা পান এখানকার অনেক কৃতী খেলোয়াড়ও তার ধারে কাছে পৌঁছুতে পারেন না। বহির-বঙ্গের খেলোয়াড়দের দিকে আমাদের ফুটবল কর্তাদের এই অহেতুক শৌক নতুন কিছু নয়। চিরকালই আমরা এই বৈষম্য দেখে আসছি। ঘরের ছেলে পাত্তা পায় না, কিন্তু বাইরের খেলোয়াড়দের এনে আমরা নাচানাচি করি। অথচ যোগ্যতার দিক দিয়ে যদি ঠিক ঠিক বিচার করা যায় তাহলে দেখা যাবে আমাদের ঘরের ছেলেরা কোন দিক দিয়েই কম যান না। হরজিন্দার, নাজির, গুরুদেব, জাকর কিংবা পাপ্পাসের মত খেলোয়াড় কল-কাতায় গাদাগাদা আছেন—একথা বলছি না। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও জোর দিয়েই বলব যে এঁদের সমগোত্রীয় খেলোয়াড় কলকাতায় বেশ কয়েকজনই আছেন। কিন্তু তাঁদের নিয়ে কি আমরা ঠিক ততটা নাচানাচি করি? নাকি তাঁরা তাঁদের প্রত্যাশিত প্রতিষ্ঠা বা স্বীকৃতি পান?

এবার বাইরের খেলোয়াড়দের নিয়ে একটু বেশীই বাড়াবাড়ি হচ্ছে। কেরল আর পাঞ্জাব মেটিয়ে খেলোয়াড়রা আসছেন। আসছেন কর্ণাটক থেকে। তামিলনাড়ু থেকে। অর্থাৎ উনআশি সালটি স্থানীয় খেলোয়াড়-দের পক্ষে বড়ই দুর্বছর। তাঁদের অবস্থা হবে গেঁয়ো যোগীর মত। ভিখ আর মিলবে না।

কলকাতা ময়দানের তিন প্রধানের একটি ক্লাবের কোচ তো ইতিমধ্যেই সাংঘাতিক এক কথা বলে বসে আছেন। তিনি এ বছরের দু-তিনজন খেলোয়াড়ের নাম করে বলেছেন ওঁদের ছাড়া এবার কাউকে আসছে বছর দর-কার নেই। তিনি তাঁর মতমত খেলোয়াড় নিজের ঝোলা থেকে আনবেন?

এবং তা যে কথার কথা নয়—তার প্রমাণ আমরা ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছি। কেরলের বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়কে তিনি কলকাতায় এনে নিজের দলের পক্ষে সই করিয়েছেন আন্তঃরাজ্য ছাড়পত্রে। এবং আরো আনবেন বলে হুমকি দিয়েছেন। এই হুমকি অবশ্যই স্থানীয় খেলোয়াড়দের জন্যে। বাও তোমরা মানে মানে কেটে পড়। এতদিন মোটা টাকা নিয়ে বড় দলে খেলেছ এবার ছোট দলে গিয়ে নাম লেখাও।

ছোট দলে নাম লেখাতে হবে কারণ অন্য বড় দুটি ক্লাবের একটিতে তো বহিরা-গত খেলোয়াড়ের ছড়াছড়ি। অন্যটি আটাত্তর সালের পুরো দলটাই ধরে রাখতে চাইছেন। সেই সঙ্গে এ-ক্লাব ও-ক্লাবের দু-একজন আর বাইরের এক আধজনকে দলে আনতে পারলেই তাঁরা খুশী হবেন।

ফলে কলকাতার খেলোয়াড়দের অবস্থা আজ বড়ই করুণ। ফুটবল খেলোয়াড়দের দল বদলের সময় এতদিন যাঁদের কেন্দ্র করে আই এফ এ অফিসের সামনে ভিড় জমত, যাঁদের কেন্দ্র করে বাজারে গুজবের ছড়াছড়ি টামে, বাসে, পার্কে মসদানে কিংবা রেস্ট-রেস্টে আলোচনার অন্ত থাকত না— সেইসব নামীদের অনেকেই শুকনো মুখে চুপি চুপি এসে সই করে যাবেন। তাঁদের বাজার দর, তাঁদের মর্যাদা অনেকটাই টিলে করে দিচ্ছেন ঐ হরজিন্দার, গুরুদেব, নাজির জেকব প্রভৃতি খেলোয়াড়রা।

অথচ খেলোয়াড় হিসেবে এঁদের চেয়ে ওঁরা কোন দিক দিয়েই কম যান না। কিন্তু তাঁদের গায়ে যে বহিরঙ্গে ছাপটি মারা নেই। থাকলে ওঁদেরও গ্র্যান্ড হোটেলে থাকার অধিকার অবশ্য পাওয়া যেত। এ বড় দুঃখের কথা, বড়ই পরিতাপের বিষয়। বাঙালী খেলোয়াড়রা নিজভূমে পরবাসে যাচ্ছেন।

বাংলার হকি দলে যেমন বাঙালী খেলোয়াড় খুঁজে পাওয়া যায় না, তেমনি হয়তো বছর দু-একের মধ্যেই ফুটবলের দলেরও হাল হবে। আঙুলে গুনতে হবে তাঁদের।

অথচ আজো ভারতে ফুটবল বলতে যেমন বাংলাকেই বোঝায়, তেমনি কৃতী ও সফল খেলোয়াড়ের কথা উঠলে সকলেই সবার আগে বাংলার ও বাঙালী খেলোয়াড়-দের কথাই বলেন।

আমরা আশা করব যে আমাদের এই সুনাম বজায় থাকবে। সুরজিত প্রমাণ করে-ছেন যে তিনি হরজিন্দারের চেয়ে কোন দিক দিয়ে কম নন। প্রদীপ, সুব্রত, চিন্ময়রা দেখিয়ে দেবেন যে গুরুদেব সিংয়ের মত তাঁরাও লড়তে জানেন। গৌতম-প্রসূন প্রমাণ করবেন যে তাঁরাই ভারতের সেরা মিডফিল্ডার দুটি। নাজির কিংবা জেভিয়ার পায়াসের সামনে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেবার মত খেলোয়াড় কলকাতা ময়দানে আছেন—এই সত্য যদি তাঁরা প্রমাণ করতে পারেন তাহলেই হয়তো কর্মকর্তাদের এই কৌকটা কাটবে। তা না হলে ওরা টাকার হাতছানিতে সব কিছু ভুলে পরের ছেলেকে ভুলে পরের ছেলেকে আপন করে কোলে টেনে নেবার জন্যে হাত বাড়িয়েই বসে থাকবেন। এবং তা হবে বাঙালী খেলো-য়াড়দের ওপর, বাংলা দেশের ফুটবল খেলার ওপর চরম অবিচার। প্রতিকারহীন অবিচারই বটে।

সেই পুরোন কথাটাই আর একবার বলি —কলকাতার বড় দলগুলোর কর্মকর্তাদের নজর এবার এমন এক দিকে চালিত হয়েছে, যখন গেঁয়ো যোগীদের ভিক্ষে মেলার সম্ভা-বনা সত্যিই কম। অন্তত আপাতত তো বটেই..।

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

বোম্বাই সমাচার

উদ্দেশ্যহীন যৌবনের ডাকে

গতকাল ভোরে বাসু চলে গেল কলকাতায়। কলকাতা থেকে ফিরে যাবে নিজের গ্রাম নদীয়া জেলার আশাননগরে সেখান থেকে বেকারত্বের যন্ত্রণা ও অবক্ষয়ের হতাশা ডিঙিয়ে শেষ সম্বল চাকুরীর কাছ থেকে পাওয়া ওয়েস্ট এণ্ড ওয়াচ হাতঘড়িটা একশো টাকায় বেঁচে দেওয়া থেকে রানিং টিকিট কেটে চলে এসেছিল ওর স্বপ্নে দেখা অপরূপ রূপে রূপবতী, গ্ল্যামার নগরী বোম্বেতে।

এসেছিল আমার কাছে, ওর শৈশবের পরিচিত বন্ধুর কাছে। এক বুক আশা নিয়ে একটা কিছু হিল্লে হবেই এই ভেবে। ওর সঠিক কোনো লক্ষ্য ছিল না। একটা ছোটোখাটো রোল অথবা ফিল্ম লাইনের যে কোনো একটা কাজের দাবী নিয়েই এসেছিলো। খুঁজে পেতে আমার ভবসায় বুক বেঁধে পৌঁছেছিলো আমার কাছে, কিন্তু অবাক হল আমাকে কারও বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হিসেবে থাকতে দেখে। যদিও আমি অবাক হইনি, কারণ শুধু বাসুই আমার কাছে প্রথম নয়, অনেককেই একের পর এক উদ্দেশ্যহীন হয়ে বোম্বেতে আসতে দেখেছি। দু একজন ছিটকে আমার কাছেও এসেছে। সীমিত ক্ষমতায় যতটুকু সাহায্য করার করেছি, বেশীর ভাগকেই টিকিট কেটে ফেরৎ পাঠাতে হয়েছে। এবার আমি নই বোম্বের স্থায়ী বহু বাসিন্দাই এ অভিজ্ঞতা সোজ কুড়োচ্ছেন। বাসুদেব মোদককেও টিকিট কেটে ট্রেনে তুলে দিলাম। চলে গেলেও, হয়তো ও অনেককেই বোঝাবে, অন্তত বোম্বের ফিল্ম লাইন সম্বন্ধে কিছু সুস্থ ধারণা ওকে দিয়ে দিয়েছি।

পাঁচ-ছয়দিন ওকে নিয়ে স্টুডিও পাড়ায় ঘুরিয়েছি—অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছে যাদের, তাদের এ যাবৎকাল সিনেমার পর্দায় দেখে মনের যাবতীয় অলংকারে সাজিয়ে রেখেছিল। প্রথম প্রথম বোমাঞ্চিত হয়েছে বৈকি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কষ্টও পেয়েছে ওর থেকে সুদর্শন হিন্দীভাষীদের (যাদের মধ্যে অনেকেই পুণা ইনস্টিটিউট থেকে) পায়ের জুতো ঘষে ঘষে চটি করে যাওয়া দেখে যাবা আশায় আশায় অনেক বছর কাটিয়ে দিল বোম্বেতে, যোগ্যতার মানদণ্ডেও যাদের অনেক আগেই উত্তরে যাবার কথা। ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয় এই প্রবাদ বাক্যের নেগেটিভ অংশটুকু আমি ওকে দেখিয়ে দিয়ে তবেই টিকিট কেটে ফেরত পাঠিয়েছি।

দিনের পর দিন দেখেছি স্টুডিও পাড়ায় দরোয়ানদের ধাক্কা খেতে অগুন্তি যুবক-যুবতীদের, যাদের মধ্যে অনেকেই বাঙালী। দুঃখ পেয়েছি কিন্তু এটুকুই, করার কিইবা থাকতে পারে।

দীর্ঘদিন বোম্বেতে আছি। এই ধরনের টুকরো টুকরো ঘটনা সাজিয়ে একটা মর্মস্পর্শী উপন্যাস লেখা যায়। মনে পড়ে উনিশশো চুয়াত্তর সালের একটা ঘটনা। ভায়মণ্ডহারবার থেকে রুমা মাইতি নামে একটা কৈশোর উত্তীর্ণা যুবতী হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় ফেল করে বাবা, মা আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে অপমানিত হবার ভয়ে হাতের আংটি ও কানের দুল বেঁচে হাওড়া স্টেশন থেকে বোম্বের টিকিট কেটে চড়ে বসেছিল ট্রেনে এই ভেবে যে বোম্বেতে গেলে নায়িকা না হলেও সহ-নায়িকা হয়ে যাবেই সে একটু চেষ্টা চরিত্তির করলে। দেখতে তো সে খারাপ নয়, পাড়ার অনেক ছেলেই [illegible] দেখে ফিল্মের হিরোদের মতো [illegible] শিষ দেয়। ফিল্ম লাইনে কিছু না হলেও একটা চাকরি সে নিশ্চয়ই পাবে। ভুলে গেল ক্ষণিকের মানসিক অস্থিরতায় যে সে হায়ার সেকেণ্ডারী ফেল এবং তার কোনো অতিরিক্ত যোগ্যতার সার্টিফিকেট নেই।

ট্রেনে বসে বসে স্বপ্নে বিভোর রুমা ভুলে গেল সবকিছু, এমন কি নিজেকেও। হঠাৎ নাগপুরের পর কিছু লোক ওর পেছনে লাগলো। দু-একজন ইশারায় কাছে ডাকলো। নানারকমের মুখরোচক মন্তব্য (যেমন কি জিনস মাইরী, ক্যায়া বাত হ্যায় একেলী হ্যায় ক্যায়া, হেয়ার্ট এ নাইস গার্ল ইত্যাদি জাতীয়) ছুড়ে মারতে লাগলো।

স্বপ্ন ভাঙলো ওর, যখন ভয়ে জড়ো-

অনুসন্ধান ছবিতে অমিতাভ বাবী

সড়ো হয়ে জবুথুবু বসে আছে এককোণে তখন আমারই এক বন্ধু সুকান্ত মালাকার (এয়ার ইণ্ডিয়ার চাকরি পেয়ে প্রথম বোম্বে আসছিলো) এগিয়ে যেনে ওর সঙ্গে যেচে আলাপ করলো এবং সমস্ত ঘটনা জানতে পেরে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে এই আশ্বাস দিয়ে আমার কাছে নিয়ে হাজির হোলো। প্রথমে অবাক হলেও পরে সব ঘটনা শুনে বন্ধুর সৎসাহসের তারিফ করে, মেয়েটিকে না জানিয়ে সোজা পুলিশ স্টেশানে যেয়ে সবকিছু খোলা-খুলি বললাম। কারণ অন্য কোনো রাস্তা খোলা ছিলো না।

পুলিশ ওকে স্থানীয় রেসকিউ হোমে পাঠিয়ে দিয়ে যোগাযোগ করলো ওর বাড়ির সঙ্গে ভাষা লালবাজার। আমরাও ওর বাড়ির ঠিকানায় টেলিগ্রাম করলাম।

ওর দাদা যিনি ফ্লাইং ব্যাবেজের একজন সিনিয়র ইঞ্জিনীয়ার তড়িঘড়ি করে এসে পড়লেন বোম্বেতে। পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে বোনকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। অসংখ্য ধন্যবাদ পেলাম। সঙ্গে করে সবাই মিলে বোম্বাই ঘুরলাম। রুমার দৌলতে দাদাও বোম্বে ঘোরা হল এই উপরি পাওনাটুকু নিয়ে দাদা ফিরে গেলেন বোনকে সঙ্গে করে।

পরে রুমা দীর্ঘদিন আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে। চিঠিপত্রে। সেদিন সুকান্ত নিজের থেকে এগিয়ে না গেলে ওর ভাগ্যে কি হতো কে জানে, হয়তো কোথাও অলিখিতভাবে বিক্রী হয়ে যেত।

অভিযুক্ত সত্যম

দিল্লির একটি হোটেলে সম্প্রতি সত্যম শিবম সুন্দরম ছবিতে নগ্নতা ও অশ্লীল সামাজিক অপরাধপ্রবণ দৃশ্যে অভিনয়ের জন্যে জীনত আমান এবং শীতলের বি রুদ্ধে একটা মামলা রুজু হয়েছে।

দিল্লির অ্যাডভোকেট শ্রীনরেশচন্দ্র দত্ত সঙ্গে সঙ্গে প্রযোজক রাজকাপুর, পরিবেশক শশী কাপুর এবং আলোকচিত্রশিল্পী বাবু কর্মকারের বিরুদ্ধে পৃথক পৃথক মামলা করেছেন এবং পরে বিশাল হলের মালিক প্রাণলেশ্বর বাওয়ের বিরুদ্ধেও নালিশ মামলা করেছেন।

অপরাধ, নগ্নতা ও অশ্লীলতা প্রদর্শন।

রুমার সম্প্রতি বিয়েও হয়ে গেল। শুধু হাসার সেকেণ্ডারী নয় ও পরে বি. এ পাশ করেছে। ও নিশ্চয়ই সুখী হবে।

আরও অনেক ঘটনা বাস্তবে লেখার ইচ্ছে রইলো।

আমার এ লেখার উদ্দেশ্য কিন্তু কাউকে উচ্চ প্রেক্ষণা থেকে নিরুৎসাহিত করা নয়।

উদ্দেশ্যহীন ঘরছাড়া পরিণতি অসম্পূর্ণই থেকে যায়। অনেকেই ছোট থেকে বড়ো হয়েছে এই চলচ্চিত্র জগতে ঠিকই কিন্তু বড়ো থেকে ছোটো হয়ে যাওয়া এমনকি একেবারে নিঃশেষ হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার সংখ্যা অজস্রগুণ বেশি। স্বপ্নের অনন্ত আকাশ বাস্তব ছোঁয় না সবসময় একথা ভুলবেন না প্লীজ।

আবপার ছবিতে শশী কাপুর, বেবী বিন্দু ও অন্যান্য শিল্পী

ছবির খবর

মোহন স্টুডিওতে প্রকাশ মেহরা প্রডাকশনের পরের ছবি 'লাওয়ারিশ' এর মহরৎ অনুষ্ঠান হল নায়ক অমিতাভ বচ্চনকে ক্যামেরার সামনে রেখে। মন্দিরের সেট লাগেছিলো। অতিথি প্রযোজক মোহন মোহন সেহগল ক্ল্যাপস্টিক দিলেন এবং ক্যামেরার সুইচ অন করলেন প্রকাশ পিকচার্সের গোপাল দাস। মহরৎ এর পর একটানা তিন দিনের স্যুটিং হল। স্যুটিং-এ অংশ নিয়েছিলেন অমিতাভ, পরভীন বাবি এবং মধু মালিনী। অন্যান্য চরিত্রে আছেন আমজাদ খান, ডাকতার শ্রীরাম লাগু, বণজিৎ এবং আর পি শেঠী, তাছাড়া রাখী একটি বিশিষ্ট চরিত্রে রূপদান করবেন।

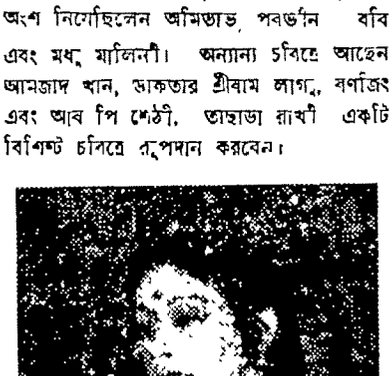

কাচ্চে হীরে ছবিতে অরুণা ইরানী

দীনদয়াল শর্মার গল্প ও চিত্রনাট্য নিয়ে এ ছবির পরিচালক ও প্রযোজক প্রকাশ মেহরা সুরকার হিসেবে কল্যাণজী আনন্দজীকে চুক্তিবদ্ধ করেছেন। এ ছবির আলোকচিত্রশিল্পী ও শিল্প নির্দেশক যথাক্রমে এন সত্যেন এবং মনহর।

পরিচালক বিজয় কাপুর একটানা ৫০ দিনের স্যুটিং শেষ করলেন মোহন স্টুডিও এবং কে আসিফ স্টুডিওতে। বাঙ্গালী পিকচার্স-এর ব্যানারে নির্মীয়মান এই ছবির নাম "বাধা আউর সীতা"। ছবির কাজ প্রায় সমাপ্তির মুখে। রবীন্দ্র জৈন লিখিত ও সুরারোপিত চারটে গান—এরই শিকচারাইজেশন হয়ে গেছে। ছবির প্রায় সব অভিনেতা অভিনেত্রীই এই শেষ পর্যায়ের স্যুটিংএ অংশ নিয়েছিলেন।

অভিনেতা অভিনেত্রীর তালিকায় আছেন বীতা ভাদুড়ী, আভা ধুলিয়া, অরুণ গোভিল, মদন পুরী এগদীপ, পিন্টু কাপুর, রূপেশ কুমার, তরলা মেহতা, রীতু-কমল এবং উর্মিলা ভাট। তারাচাঁদ বর জাতিয়া প্রযোজিত এ ছবির সংলাপ লিখেছেন মদন যোশী। দীনেশ বিলমোরিয়া এ ছবির শব্দযন্ত্রী এবং সুকতার আহমেদ ছবির সম্পাদক।

শাম্মী কপুর ও দারা সিং কে এবারে দুই ভাইয়ের চরিত্রে দেখতে পাবেন যখী টাণ্ডন পরিচালিত ও মোহন কোটিয়া প্রযোজিত শহরী বাবু ছবিতে। আর কে স্টুডিওতে সম্প্রতি একটানা সাতদিনের স্যুটিং-এ অংশ গ্রহণ করেছিলেন দুজনে।

ঋষি কাপুর ও মৌসুমী চ্যাটার্জি এ ছবির রোমান্টিক জুটি। অন্যান্য মুখ্য-চরিত্রে আছেন অরুণা ইরানী, ফরিদা জালাল, নিরুপা রায় সত্যেন কাপুর জীবন এবং রবীন্দ্র কাপুর।

জ্যোতিপ্রকাশ রায়

শুধু বিজ্ঞাপনই নয় বিজ্ঞানও বটে

'আয়ুর্বেদোহমৃতানাম'— আয়ুর্বেদ অমৃতের শ্রেষ্ঠ। আয়ুর্বেদিক ঔষধের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতে আয়ুর্বেদীয় ঔষধগুলির চাহিদা দিনে দিনে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। সম্পূর্ণ দেশজ সম্পদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের নির্দেশে এখন যে সমস্ত ঔষধগুলি প্রস্তুত হচ্ছে তা জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধনের ব্রত পালন করে চলেছে। প্রাচীনকাল থেকে বহু মুনি ঋষির এবং আয়ুর্বেদাচার্যগণ বহু গবেষণা করে এই সব বনজ, খনিজ প্রাণীজ এবং সাধারণ লতাপাতা থেকে যে সমস্ত ঔষধ আবিষ্কার করে গেছেন সেগুলো এখন আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে পরম সমাদর লাভ করছে। আয়ুর্বেদের প্রামাণিক গ্রন্থসমূহ যেমন আয়ুর্বেদ সংগ্রহ, দ্রব্যগুণ নির্ঘন্টম, ভৈষজ্যরত্নাবলী, চরক ও সুশ্রুত সংহিতা প্রভৃতি বহু প্রাচীন পুস্তকে আয়ুর্বেদীয় ঔষধের গুণ সমূহ উল্লেখ করা আছে। তাঁদের সেই প্রজ্ঞালব্ধ জ্ঞানামৃতের পরম্পরা রক্ষা করে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের সমীকরণে এস, সি, কেমিক্যালস আয়ুর্বেদীয় ঔষধের জগতে যে সাম্প্রতিকতম ঔষধটি সংযোজন করেছেন তার নাম **'লিউকোনেক্স'** ট্যাবলেট। **'লিউকোনেক্স'** ট্যাবলেট লিউকোরিয় (সাদাস্রাব) রোগের আশু ফলপ্রদ ঔষধ। এই অসুখ মেয়েদের রূপলাবণ্য হরণ করে। অসহ্য যন্ত্রণায় ও কষ্টে মহিলারা ক্রম নৈরাশ্যের অন্ধকারে প্রবিষ্ট হন। স্বাস্থ্যের পক্ষে পরম হানিকর এই লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগটি যখন ক্রমান্বয়ে অধিক পরিমাণে প্রকাশ পায় তখন রোগীর গলাবুক জ্বালা, হাতে পায়ে জ্বালা হয় এবং পরে উহা সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। অম্লবোধ, কোষ্ঠ কাঠিন্য, ক্ষুধামান্দ্য, আমাশা, খুঁতখুতে স্বভাব, সন্ধিগধচিত্ততা, আত্মবিশ্বাস নষ্ট, আহারে অরুচি, কর্মে অনুৎসাহ, জীবনে হতাশা ও বিতৃষ্ণা, নিদ্রানাশ, নিতান্ত আপনজন স্বামীপুত্রের প্রতি স্নেহ ভালবাসাটুকুও হ্রাস পায়। সুতরাং এই লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগকে সম্পূর্ণরূপে নিরাময়ের জন্য এস, সি, কেমিক্যালস নিরলস প্রচেষ্টায় প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্র নির্দেশিত পথে উন্নত পরীক্ষাগারে প্রস্তুত করেছেন **'লিউকোনেক্স'** ট্যাবলেট, তাই রোগ যত পুরানো ও কঠিন হোক না কেন **'লিউকোনেক্স'** ট্যাবলেটই লিউকোরিয়ার (সাদাস্রাবের) বিশ্বাসযোগ্য প্রতিকার, এই ঔষধ সেবনের পরে দেহে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না। দ্রুত আরোগ্যলাভ করতে হলে **'লিউকোনেক্স'** ট্যাবলেট ব্যবহারের সঙ্গে বাহ্যিক চিকিৎসা হিসাবে আক্রান্ত স্থানে **'ফেকটিন'** লোশনটির ব্যবহার অপরিহার্য। সুতরাং আর দেরী না করে আয়ুর্বেদের বিশুদ্ধ ঔষধ **'লিউ-কোনেক্স'** ট্যাবলেট সেবন করুন এবং **'ফেকনিট'** লাগান। লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগে আক্রান্ত রোগীদের বিশেষভাবে জানান যাচ্ছে যে, যাঁরা প্রচণ্ড অম্বল অজীর্ণ বুকজ্বালা প্রভৃতি রোগে ভুগছেন তাঁরা **'এসিনা'** ব্যবহার করুন। লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগের সঙ্গে যাঁরা পুরাতন ও নতুন আমাশয়ে ভুগছে তাঁরা **'এসিবেল'** ব্যবহার করুন। লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগের সঙ্গে যাঁরা কোষ্ঠকাঠিন্য, অরুচি, ক্ষুধামান্দ্য ও লিভার জনিত যে-কোন অসুখে কষ্ট পাচ্ছেন তাঁরা **'এসিনেক্স'** ব্যবহার করুন, লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগের সঙ্গে যাঁরা ব্যথা ও গাঁটের বাতজনিত রোগে ভুগছেন তাঁরা **'আরথিন'** ব্যবহার করুন। লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগের সঙ্গে যাঁরা কৃমিতে ভুগছেন তাঁরা **'ভারনেক্স'** ব্যবহার করুন। লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগের সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত ভদ্রমহিলারা এই সব উপসর্গে ভোগেন তাঁরা **'লিউকোনেক্স'** ট্যাবলেট ব্যবহারকালে ঐ সব উপসর্গের জন্য উল্লিখিত ঔষধগুলো ব্যবহার করলে রোগের আরোগ্য আরও ত্বরান্বিত হবে। আজই আপনার নিকটবর্তী দোকানে খোঁজ করুন অথবা সরাসরি আমাদের কবিরাজমণ্ডলীর সুপরামর্শ গ্রহণ করুন। **এস, সি, কেমিক্যালস,** (আয়ুর্বেদ বিভাগ), ২৭নং শোভাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০৫।

Release through Calcutt a Filmlet Advertising.

চিত্রধ্বনি

সমীরবাবুর দু'নম্বরী

গত সপ্তাহে আমরা সমীরবাবুর ফন্দী ফিকির সম্বন্ধে সামান্য জেনেছি। অনজানে মে' এই ভদ্রলোকেরই দু নম্বরী গদা নিক্ষেপ।

কাহিনীর বিস্তার একটি সার্কাস দলকে ঘিরে। এমনিতেই ফুল ফুটফুটে চাঁদ উঠলে ঋষি কাপুরের মত খোকনসোনারা ক্ষদমতলায় যায়, তার ওপর এখানে তো হাতি ঘোড়া নাচানাচি করছে। আমরা, অতএব আনন্দে মুহ্যমান। এই আমাদের দোষ, আমরা শুধু সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের খবর রাখি। সমস্ত ঘটনার অন্তরালে কিন্তু অদৃশ্য হনুমানের ভূমিকায় বিরাজ করছেন সমীরবাবু। অনজানে মের লংকাকান্ড মূলভ সমীরবাবুর প্রতিভার আগুন থেকেই। এর পরেও পাছে লোকে পরিচালক সম্বন্ধে কিছু বলে, সেই লোকলজ্জায় তিনি ভিলেনকে দিয়ে ঈদিপাস কমপ্লেকসের কথা আউড়িয়েছেন। নাঃ, আমরা কেউ আর কিছু সন্দেহ করছি না। সমীরবাবু নিশ্চয়ই স্কুলের পরীক্ষা পাশ করেছেন ও ইংরিজি পড়তে পারেন।

নায়ক শ্রীঋষি কাপুর শ্রীকৃষ্ণের এগার নম্বর অবতার। ইনি কখনোও মাকে চোখের জলে কখনোও প্রেমিকাকে নাকের জলে ভাসিয়ে লীলাখেলা দেখিয়েছেন। দশজনের তান্ডবে ভগবান পর্যন্ত ভূত হয়ে যায়, তো ঋষিবাবু সে দুর্ঘটনায় স্মৃতিভ্রষ্ট হবেন এতে আর আশ্চর্য কি? তবে যেহেতু আধুনিক যুগ ও ঘটনাস্থল বৃন্দাবন নয় বম্বে সুতরাং নায়ক ননীর বদলে হীরে চুরি করেছেন। আর প্রভুভক্তির কসরৎ দেখাতে মাঠের গরুর বদলে আসতে হয়েছে সার্কাসের হাতিকে।

নায়িকা শ্রীমতী নীতু সিং লিঙ্গদোষে স্ত্রীলোক। ফলে তাঁকে যুগপৎ মায়ামাখি পটীয়সী ও বিরহিণীর ভূমিকায় নামতে হয়েছে। আহারে বেচারি। লোকে প্রেমিকের জন্য কষ্ট করে, নীতুকে শাশুড়ির জন্যেও ঝুলতে (দড়িতে) হয়েছে।

যে ভিলেন ফরেড পড়ে তার সম্পর্কে আমার কিছু না মন্তব্য করাই শ্রেয়।

কল্যাণজী আনন্দজীর সুরে একটি গান জনপ্রিয় হবে। ছবির ভেতরে দুটি দুর্ঘটনা ঘটিয়েছেন পরিচালক। তৃতীয় দুর্ঘটনা ছবিটি। এবার কিন্তু তাঁর শিকার ঋষি কাপুর নন আমরা।

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

সিংহদুয়ার ছবিতে সুমিত্রা, রাজকুমার ও শিপ্রা বসু

সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু

ফুটবল আমাদের জাতীয় খেলা। আমাদের জীবনের অঙ্গ। একবারও বলে 'লাথি মারেন নি এমন বাঙালী কেই বা আছেন। চুনী - পিকে - বলরামের নাম শোনেন নি এমন লোকই বা কজন। আসলে এই খেলা আমাদের জীবনের সঙ্গে মিশে গেছে। অথচ আমাদের ছবিতে এর জগৎ পুরোপুরি উপেক্ষিত। হিন্দী বা অন্যান্য আঞ্চলিক ছবির নির্মাতারাও এ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান না। তবে ওদের ত আর মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল নেই। আমাদের আছে। তাই যখন মতি নন্দীর 'স্ট্রাইকার' ছবি হয়ে বেরিয়েছে, তখন আর প্রেস শোর জন্য অপেক্ষা করতে পারি নি। বিলিজের দিনেই হলে দৌড়েছি।

ছবি হিসেবে স্ট্রাইকার কতটা গ্রহণীয় সেটা পরের কথা। আগে এমন একটা ছবির প্রচেষ্টার জন্য নির্মাতাদের ধন্যবাদ জানাই। কিছু কিছু বাংলা ছবিতে ফুটবলের ব্যাপার যদিও আছে—যেমন : ওরা থাকে ওধারে, ধন্যি মেয়ে, মোহনবাগানের মেয়ে ইত্যাদি—তবে সেগুলো মাঠের বাইরের ছবি। ভেতরের নয়। সেগুলোতে ফুটবলারদের স্বপ্ন-সাধনা - আশা - আনন্দ - বেদনা - হতাশার জীবনকে তুলে ধরার চেষ্টা হয়নি। স্ট্রাইকার-এ হয়েছে। আমাদের সমাজে নায়ক প্রসূন ছাড়াও নিমাই, আনোয়ার, রমা, হর্ষদা বা ডাকুদার মত চরিত্রও থে বয়েছে, দর্শকরা এই প্রথম জানতে পারবেন।

উঠতি খেলোয়াড় প্রসূনের বাবা অনিল ভট্টাচার্য একসময় নামকরা ফুটবলার ছিলেন। কোন এক ফাইনাল খেলায় চোট পেয়ে গোল করার সহজ সুযোগটি নষ্ট করার জন্য তাঁর ক্লাব যুগের যাত্রী হেরে যায়। সমর্থকরা তাঁকে ঘুষ খাবার মিথ্যে অভিযোগে অভিযুক্ত করে। যে অপমান তিনি সারা জীবন বয়ে বেড়ান। অনেক বাধা বিপত্তির পর প্রসূনও একদিন সেই যুগের যাত্রী'র নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় হয়ে ওঠে। শীল্ড ফাইন্যাল খেলায় কিভাবে নিজের দলকে জিতিয়ে সে তার বাবার লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নেয়, ছবিতে তাই দেখানো হয়েছে।

এবার ছবির দোষগুণ সম্পর্কে কিছু বলা যাক। স্ট্রাইকার প্রসূন হয়েছেন সুমিত্র ভঞ্জ। অভিনয় ভাল হলেও চরিত্রটিতে তাকে মানায় নি। অর্থাৎ সতেরো-আঠারো বছরের উঠতি খেলোয়াড় বলে কখনই মনে হয়নি। সুমিত্রর চেহারাও খেলোয়াড়সুলভ নয়। খেলার দৃশ্যগুলোতে যা আরও ধরা পড়েছে। যেখানে ক্যামেরাও তাকে সাহায্য করেনি। ওই দৃশ্যগুলোতে তাঁর পেটের কাছেই যেন বেশী করে ফোকাস করা হয়েছে। আরতিকেও চরিত্রের তুলনায় বয়স্কা মনে হয়েছে। কে ফ্র্যাশব্যাকের অনিল চট্টোপাধ্যায়। এঁরা সকলেই ভাল অভিনয় করেছেন। লেগেছে সন্তু মুখোপাধ্যায়, রমেন রায় চৌধুরী, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, রুমা গুহ-ঠাকুরতা এবং বিশেষ করে চিন্ময় রায়কে। চিন্ময়ের রমা চরিত্রটি অভিমাত্রায় বাস্তব। কালোকে তোলা ছবি। ডিসাপোয়েন্ট দিকটা ভালই হয়েছে। তবে ছবির আসল গলদ চিত্রনাট্যে এবং সম্পাদনায়। ডিটেলের কাজে কিছু কিছু ফাঁক থেকে গেছে। প্রথম স্বপ্ন দৃশ্য তেমন এফেক্ট আনতে পারে নি। খেলাধুলোর নোংরা রাজনীতিও একটু বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। ছবিতে গতির প্রয়োজন ছিল। যা এসেছে একেবারে শেষে। যখন প্রখ্যাত ভাষ্যকার অজয় বসু মাইক ধরেছেন।

সিংহদুয়ার

সুখেন দাসের সিংহদুয়ার কখনও দুই-পুরুষ, কখনও স্বয়ংসিদ্ধা, আবার কখনও প্রতিশ্রুতি ধরনের। মনে হবে ওইরকম কিছু গল্প থেকে শুধু মেলোড্রামার অংশগুলোকে যেন ছেঁকে নেওয়া হয়েছে। আর সব মিলে যা দাঁড়িয়েছে, সে যে কী ভীষণ

তা না দখলে বোঝানো শক্ত। সুখেনবাবু এই মেলোড্রামাকেই মূলধন করেছেন। সেই-সঙ্গে রয়েছে সস্তা সেন্টিমেন্টের ঢালাও কারবার। বড় ভাইয়ের আত্মত্যাগ ও ভালো-বাসা, ছোট ভাইয়ের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি, গরীব স্বামীদের সঙ্গে ধনী বেশ্যাদের পথে বসানো, অত্যাচারী জমিদার তথা শ্বশুরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম—এমনই যত মামুলী ঘটনা নিয়ে 'সিংহদুয়ার'।

চরিত্রগুলোর মধ্যে সরাসরি দুটো ভাগ আছে। ভাল এবং খারাপ। ভাল- লোক প্রায় ভগবান। খারাপেরা শয়তানের চূড়ান্ত। এই নাটকীয়তার ভেতর মাঝামাঝির কোনো স্থান নেই। শিল্পীরাও নাটকঘেঁষা অভিনয় করে গেছেন। জমিদার সেজেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়। চরিত্রটি অস্বাভাবিক, অনিল-বাবু কোনোরকমে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন। ভাল অভিনয় করেছেন শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়। তাঁর অভিনয়ের জোরেই ছবি কিছুটা মাত পেয়েছে। অন্যদের মধ্যে ভাল লেগেছে সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, মেনকা দেবী এবং নবাগত মাস্টার কুমার ও শিপ্রা বসুকে। একটি চরিত্রে সুখের দাস দর্শকের সহানুভূতি আদায় করে নিয়েছেন। অবশ্য সুখের দাসের বড় পরিচয় তিনি এ ছবির পরিচালক। সেইসঙ্গে কাহিনী, চিত্রনাট্য এবং সংলাপও তাঁর লেখা। টাইটেলের তিন জায়গায় তাঁর নাম আছে।

নিয়মমাফিক ছবিতে বেশ কিছু গান আছে। গানগুলো ভালই। গেয়েছেন মান্না দে আরতি মুখোপাধ্যায় এবং নমিতা ব্যানার্জি। টেকনিক্যাল কাজ সম্বন্ধে উল্লেখ করবার মত কিছু নেই। আর ডিটেলের কথা নাই বা তুললাম।

অসিতবরণ মিত্র

কলকাতায় তনুজা - ড্যানি

তনুজা খোলা গলায় স্বীকার করলেন, 'ভালো ছবি ভালো চরিত্র আমি এই টালি-গঞ্জ থেকেই পেয়েছি। দোলনা, তিন ভুবনের পারে বম্বেতে তৈরির কথা তখন ভাবতে পারেনি কেউ।'

'লালকুঠি' ছবির প্লাটিনাম জয়ন্তী উপলক্ষে কলকাতায় এসেছিলেন তনুজা, তিনি একা নন, সঙ্গে ছিলেন ড্যানিও। প্রযোজক আশিষ রায় চিত্রনাট্যকার মহিন্দর বাত্রা ও আরও কয়েকজন কলাকুশলীকে বম্বে থেকে হাজির করেছিলেন।

পার্ক হোটেলের ব্যাংকোয়েট ঘরে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে লালকুঠি ট্রফি দেওয়া হল ছবির কলাকুশলী-শিল্পীদের। প্রযো-জক আশিষ রায় বি এফ জে এর লাইব্রেরি ফান্ডে পাঁচ হাজার টাকা দিলেন সংস্থার সভাপতি এন কে জিল হাতে

তনুজা এবং ড্যানি দুজনেই জানিয়েছেন বাংলা ছবিতে কাজ করার তাঁরা আগ্রহী। আশিষ রায়ের পরের ছবি 'কালা পাহাড়ে' কাজও শুরু করেছেন ড্যানি। তনুজা চাইছেন এই কলকাতায় কাজ করতে। বম্বের ফিল্ম যা ফিল্মিক হাওয়ার সঙ্গে তিনি অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন না, পারেন না বলেই এই টালিগঞ্জের দিকে তাঁর চোখ।

এই অনাড়ম্বর সন্ধ্যায় যে দুজনের অনুপস্থিতি চোখকে পীড়া দিয়েছে তাঁরা হলেন ছবির পরিচালক প্রভাত কনক মুখার্জি ও প্রবীণতম শিল্পী রণজিৎ মল্লিক।

আসামের একজন

বয়স চারের কোঠার প্রথম দিকে, পেটা চেহারা, চোখে তেমন কোন আলাদা দৃষ্টিও নেই, একবারে নির্ভেজাল মধ্যবিত্ত মানুষ অতুল বরদলৈ।

বকসি মিনিয়েচারের অন্ধকারে দু ঘন্টা 'কল্লোলিত' হবার পর বাইরে বেরিয়ে পরি-চয় হল [illegible]

কল্লোলে লালচিত যুবক

স্কুল শিক্ষক। অসমিয়া 'কল্লোল'-এর পরিচালক তিনি। কি দুর্ধর্ষ আর আন্তরিক অতুলবাবু! ছবিটিকে তিনি জমাট বাবুদের গোলার চেহারা দিয়েছেন। অসমিয়া ছবির সঙ্গে 'কল্লোল', 'নিশান্ত'-এর চেহারা নিতে পারে। দুটি ছবির তুলনা করার উদ্দেশ্য নয়, ছবি দুটির অন্তর্নিহিত বক্তব্য একই ধারার অনুসারী বলেই এই মন্তব্য।

জমিদারের শোষণে নিপীড়িত একদল গরীব জেলের অভ্যুত্থানের গল্প ঠিক নয়, সজাগ হবার কাহিনী এই 'কল্লোল'। বাংলা ছবিতে ভালো গল্পের অভাবের অভিযোগ তোলেন এখানকার পরিচালকরা, অথচ পাশের বাড়ি আসামে কেমন নিটোল গল্পকে ভাষা-পত্র করে সমাজের সমস্যা নিয়ে কি নির্মম-সুন্দর ছবি হচ্ছে! চোখ খুলে দেখলে অনেক কিছু শেখার আছে।

ছবিটি নিশ্চুত সংবাদসুন্দর—একথা বলা যাবে না, বরং নাটকীয়তার আকর্ষণে পরিচালক কিঞ্চিৎ পথও হারিয়েছেন, কিন্তু তাঁর আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, এবং সমাজের সমস্যার প্রতি শিল্পীর দায়িত্ব নিয়ে দৃষ্টি-ক্ষেপ—এগুলোকে তো অস্বীকার করা যাবে না। আর্থিক দৈন্যতার ছাপ রয়েছে ছবির সর্বত্র, তবুও নায়কের সর্বগ্রাসী হাসরাটি খাবতে যাওয়ার দৃশ্যে শব্দ ও গানের ব্যবহার, (সঙ্গীত : বুলু বড়ুয়া) হাঙ্গরের নৌকা টেনে নিয়ে যাওয়া, শেষ দৃশ্যে জেলেদের মাঝে

ক্রাউন
টেলিভিসান !!
A/C, D/C or Solid State
স্পষ্ট ছবি
আর মিষ্টি আওয়াজ
"ক্রাউনটিভি"
তাই "টিভি-সরতাজ" !
এছাড়া আমাদের রয়েছে রুফআর বেডিও, বেকর্ড প্লেয়ার, রেকর্ড ট্রানজিস্টার রেডিও, টেপ্ রেকর্ডার, স্টিরিওগ্রাম ইত্যাদি ইত্যাদি।
মেরামতের সুবন্দোবস্ত তো আছেই।
রেডিও এণ্ড ফটো স্টোরস্
৬৫নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিঃ—১৩
ফোনঃ ২৬-৮৫৫৩

হাওড়ার সুপ্রসিদ্ধ বস্ত্র প্রতিষ্ঠান!
সুতী · ফ্যান্সী · ছাপা শাড়ী · বিভিন্ন প্রকার বস্ত্রের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
শ্রী বিহারিজী
শাড়ী ষ্টোর্স
৫৩১, জি, টি, রোড, হাওড়া · মল্লিক ফটক (কাঠগোলার পাশে)

জমিদারের ঘোড়া ছুটিয়ে আসা এবং সবুজের প্রেক্ষিতে অত্যাচারের শট্—এগুলো তো মনে গেঁথেই যায়। এবং এই সকল দৃশ্যগুলিই প্রমাণ করে অতুল বরদলৈ আসামের ঐতিহ্য প্রতিভা।

শিক্ষকতার পাশাপাশি এমনি সমাজ-সচেতন শিল্প রচনা হোক না। এখানকার পেশাদারীরা এখনও 'আবেগে-উচ্ছ্বাসে-উৎকণ্ঠায় স্পন্দিত ছবি তৈরি করে চলেছেন। পাশের বাড়ি থেকে না হয় কিছু শিক্ষা হবে। 'পথের পাঁচালী'র কথা তো সবাই ভুলেই গেছে।

নির্মল ধর

চাঁদ বণিকের পালা

সম্প্রতি এক সন্ধ্যায় আকাদমি মঞ্চে শম্ভু মিত্র 'চাঁদ বণিকের পালা' থেকে পাঠ করে শোনালেন। অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেছিলেন শ্রীমতী বীতা দত্ত ও শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষ স্টুডেন্টস হেলথ হোমের সাহায্যার্থে। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ তাঁদের এই একান্ত মানবিক ও সৎসংকল্পকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছিল।

আমরা অনেকেই, যাদের বয়েস পঁয়তিরিশের কম, শ্রীমিত্রর সুরকবয়েসের বিখ্যাত আবৃত্তি 'মধুবংশীর গলি' শুনিনি সামনাসামনি। এই পরিণত বয়েসে চার ঘণ্টারও কিছু বেশী সময় ধরে তাঁর অননুকরণীয় কণ্ঠে একটি বিশাল নাটক প্রায় অভ্রান্ত পাঠ করে তিনি আমাদের সেই ক্ষোভ মিটিয়ে দিয়েছেন। আর সে-তো শুধুমাত্র পাঠ নয়। একই সঙ্গে তিনি চাঁদ, বেহুলা, লখীন্দর, সনকা, নেড়া, আচার্য, বেণীনন্দন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মাপের চরিত্রে যেন অভিনয় করে যাচ্ছিলেন। 'যেন' বললাম শুধু এই জন্যে যে তিনি কায়িক অভিনয়টি শুধু করেননি. না হলে শুধুমাত্র কণ্ঠেই তিনি প্রায় একটি পূর্ণাঙ্গ অভিনয়ের অভিজ্ঞতা উপস্থিত করেছিলেন। মাঝে মাঝে বলে যাচ্ছিলেন দৃশ্যসজ্জা, মঞ্চের খুঁটিনাটি, আলোর পরিকল্পনা, যাতে পুরো ব্যাপারটা আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়। গানের অংশগুলোকে ছন্দে ফেলে কবিতার মতো, কখনো সুর টেনে পাঁচালীর মতো করে শোনাচ্ছিলেন। সবদিক দিয়েই তিনি আমাদের একটি পুরো অভিনয়ের স্বাদ এনে দেন।

এই নাটক, চাঁদ সওদাগরের অগ্নিশুদ্ধ পরীক্ষকারের প্রেক্ষাপটে শুরু হয়ে বিভিন্ন যন্ত্রণা, ক্লেদ ও ব্যর্থতার উপলব্ধির ভিতর দিয়ে শেষপর্বে এক করুণ নিয়তিবাদে এসে ভর রাখে। 'মানুষের উপায় কি বল' এই দীর্ঘশ্বাসময় হাহাকার প্রায় শেষপর্ব জুড়ে ধারবার বেজে ওঠে। আর নিয়তির যখন আর কিছুই ছিনিয়ে নেওয়ার থাকে না চাঁদের কাছ থেকে, যখন পার্থিব, অপার্থিব সমস্ত দিক দিয়েই সে নিঃস্ব, তখন সেন সমুদ্রের তলদেশের তলস্তর উদ্ভিদের স্মৃতিচিহ্নসহ উঠে আসে তাঁর নিমজ্জিত যাত্রাসঙ্গীরা, অন্তহীন ধ্বংসের আহ্বান ফেটে পড়ে অসংখ্য কণ্ঠে। সাফল্য নয়, ব্যর্থতা নয়, 'তবু চাঁদ পাড়ি দিয়াছিলো'—এই পাড়ি দেওয়াটাই সবচেয়ে অসহায় সত্য হয়ে ওঠে।

আমি নাটকটির বচনা বিষয়ে কোন আলোচনা করছি না, তার পরিসর অন্য। আমি শুধু যে কেন্দ্রগত বিষয়টির কথা বললাম, তার কারণ সেদিনের পাঠে একক কণ্ঠেই, মঞ্চ ও আলোর মায়া বাদ দিয়ে, পোশাক ও সঙ্গীতের আশ্রয় না নিয়ে, শ্রীমিত্র এই অনুভব সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন সমবেত শ্রোতাদের মধ্যে, এটা বোঝাতো শ্রোতারা তখন কেবল দর্শক না হওয়ার ক্ষোভে ভুগেছি। কারণ আগাগোড়া মঞ্চনির্ভর এই নাটকটির পূর্ণ মঞ্চরূপ শ্রীমিত্রর নির্দেশনায় দেখবার সাধ আমাদের অনেক দিনের। সেই মঞ্চ-আট বছর আগে থেকে বিভিন্ন পর্বে পর্বে এই নাটক প্রকাশিত হচ্ছিল বহুরূপী পত্রিকায়। জানি না, আমাদের প্রতীক্ষা আরও কত দীর্ঘ হবে।

নৃত্যরসে চিত্ত মগ্ন

রবীন্দ্রনাট্য রচনার শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিখ্যাত 'গীতবিতান' সংস্থা গত ১৬ জুলাই থেকে ২২ জুলাই রবীন্দ্র সদন মঞ্চে সপ্তাহব্যাপী যে 'রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা'র আয়োজন করেছিলেন তার শেষ-সন্ধ্যায় ছিল এই নৃত্যনাট্যের উপস্থাপনা। প্রথমে 'নবনালন্দার 'নটীর পূজা' এবং পরে 'সুরঙ্গমা'র 'চিত্রাঙ্গদা'। নটীর পূজা যদিও ঠিক নৃত্যনাট্য নয়, তবু এর শেষ দৃশ্যে রাজনটী শ্রীমতীর যে চরম নৃত্য তার মধ্যেই উপ্ত ছিল পরবর্তী নৃত্যনাট্যের বীজ। সেই হিসেবেই সেদিন এর শেষ দৃশ্যটি কেবল দেখানো হয়েছিল। কিন্তু নাটকের পরিণতির পেছনে ধীরে ধীরে হয়ে ওঠার যে প্রস্তুতি থাকে, অন্যান্য দৃশ্য বাদ দিয়ে কেবল শেষ দৃশ্যের অভিনয়ে স্বাভাবিক কারণেই তা অনুপস্থিত ছিলো। ফলে একটি খণ্ড দৃশ্য, আরও সঠিক করে বলতে গেলে শ্রীমতীর একটি বিচ্ছিন্ন নাচ, কোন নাট্যরসে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। তাছাড়া শ্রীমতীর ভূমিকায় ভাস্বতী মিত্র বা বত্সরাজের চরিত্রে দেবযানী মল্লিক মোটেই স্বচ্ছন্দ ছিলেন না। নির্দেশিকা ভারতী মিত্রকেও আরও মনোযোগের প্রয়োজন ছিল দৃশ্য পরিকল্পনায়, যার অভাবে নাচের মধ্যে শ্রীমতীর পোশাক খুলে ফেলার অংশটি একেবারে অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। তবে প্রতিহারিণীদের মধ্যে প্রথম সারিতে দর্শকদের দিকে মুখ করে মঞ্চে ডানদিকে যিনি দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর আয়ত-চোখের ভাবব্যঞ্জনা সম্পূর্ণ দৃশ্যটিকে কিছুটা সাহায্য করেছিল। আর নেপথ্যে শ্রীমতীর গানে প্রণতি লাহিড়ীও অনবদ্য ছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে চিত্রাঙ্গদাই নৃত্যনাট্য হিসেবে প্রথম। এই সন্ধ্যায় শান্তিদেব ঘোষের শৈলজারঞ্জন মজুমদারের পরিচালনাধীনে সুরঙ্গমা শিল্পীরা চেষ্টা করেছিলেন গুরুদেবের তৎকালীন নিজস্ব পরিবেশন-পরিকল্পনার রূপাভাস দিতে। চিত্রাঙ্গদায় ঘটনার ধারা স্তিমিত। মূলত রাজেন্দ্রনন্দিনীর 'সে নহি সে নহি' বক্তব্যটিকেই চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের বিভিন্ন অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং মদনের নাটকীয় ভূমিকার মাঝখান দিয়ে ফুটিয়ে তোলার কাজ এই নৃত্যনাট্যে। বর্তমান অনুষ্ঠান-রচনীতে সেই কাজ অনেকটাই সফল হয়েছিল। অর্জুনের ভূমিকায় শিবশংকরণের পৌরুষদৃপ্ত ও অভিব্যক্তিসমৃদ্ধ নাচ ছিল তার সবচেয়ে বড় সম্বল। অর্জুনের চরিত্রের যে কটি স্তর এ নাটকে উপস্থিত তা তাঁর নাচে অনায়াস কুশলতায় সত্য হয়ে উঠেছিল। শ্রীমতী পূর্ণিমা ঘোষ যদিও অনেক গুরুভার এখন তবুও নাচে অপরূপ স্বচ্ছন্দ। নতুন রূপপ্রাপ্তা চিত্রাঙ্গদার নাচে শর্মিষ্ঠা দাশগুপ্তও ছিলেন পরম কমনীয়। 'কেটেছে একেলা বিরহের বেলা' গানের সঙ্গে তাঁর এবং শিবশংকরণের নাচ অনবদ্য। মদনের নাচে কিন্তু নন্দা বত্সরাজকে আড়ষ্ট লেগেছে এঁদের তুলনায়। অবশ্য সখীদের মধ্যে সুমিতা বসুমিত্র, মঞ্জুরা মুখোপাধ্যায়, মণিষা গুপ্ত প্রভৃতি সুন্দর নেচেছিলেন।

সব মিলিয়ে চিত্রাঙ্গদার নৃত্যাংশ সুন্দর ছিল সে রাতে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম পশ্চাৎপটে কণ্ঠসঙ্গীত বা আবৃত্তি সাবাক্ষণই ছিল শিথিল এবং শ্লথগতি। এমনকি 'ঝড় নেমে আয়' বা 'অশান্তি আজ হানলো' অংশে নাচ যেখানে নাটকের গতিকে পূর্ণমাত্রায় ধরতে চাইছে সেখানেও গানের এই মৃদু ও ধীর ভাব রসপুষ্টির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংলাপ যেখানে নাটকের ফাঁক পূরণ করার জন্য রাখা সেখানে অপটু আবৃত্তি পীড়াই দিয়েছে বেশী। এই ত্রুটিগুলো যদি সেরে নেওয়া যেত, তবে চিত্রাঙ্গদা, যার আবেদন বর্তমান সমাজে-পরিবেশে অনেক কমে এসেছে, তাও আরো মনোগ্রাহী হয়ে উঠতে পারতো।

সুরজিৎ ঘোষ

যাত্রার খবর

আদ্যাশক্তি মহামায়া

সুদর্শন শিল্পী ও প্রযোজক মোহন চ্যাটার্জি, 'আদ্যাশক্তি মহামায়ার' উদ্বোধন করেছেন বঙ্গমহলে। পৌরাণিক পালায় মোহন চ্যাটার্জি ভক্তের ভক্তি আদায় করে নিতে পারেন বলে সর্বজনস্বীকৃত। এই ভক্তিমূলক পালা উপস্থাপনাও তার ব্যতিক্রম নয়। পালা দেখে দর্শকরা নিরাশ হবেন না—কখনও ভক্তের চোখে আসবে জল, কখনও ভগবানের লীলাদর্শনে দর্শকরা হবেন অভিভূত। সুর দিয়েছেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। মোহনবাবুর পার্শ্বচরিত্রে বিশিষ্ট ভূমিকায় থাকবেন মিতা চ্যাটার্জি।

প্রমাণ হবে আসরে

বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নয়, আসরে প্রমাণ করবো কে শ্রেষ্ঠ—বললেন যাত্রা জগতের বলিষ্ঠ শিল্পী স্বপনকুমার। এরার ভাগ্যতী অপেরায় যোগদান করে উপস্থাপনা করতে চলেছেন—কথাশিল্পী তারাশঙ্করের 'চাপাডাঙ্গার বৌ' ও বাংলা চলচ্চিত্রের হিট ছবি 'জীবন মৃত্যু'। দুটি ভিন্ন স্বাদের পালা।

যে প্রেম অমর

চিৎপুরের প্রতিষ্ঠিত দল চন্দ্রলোক অপেরা। এ দল গত বছর উপহার দিয়েছিল নগরবধূ। আর ঐ পালা চন্দ্রলোকের মতোই প্রতিভাত হয়েছিল যাত্রামোদীদের কাছে। শৈলেশ গুহ নিয়োগীর ঐ পালাকে স্মরণ রেখেই দল এবার আসরস্থ করতে চলেছেন তাঁর 'অমর প্রেম'। পালার উদ্বোধন হয়ে গেছে। এ ছাড়াও অমূল্য ঘটকের 'নীলাচলে মহাপ্রভু' পালাটিও এ দল আসরস্থ করবেন। এই সাড়া জাগানো ভক্তিমূলক পালায় সুর দিয়েছেন দুর্গা সেন, নির্দেশনায় আছেন স্বনামধন্য বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। অভিনয়ে আছেন, সুদর্শন ও প্রখ্যাত নট নবকুমার। বিশিষ্ট ভূমিকায়—বঙ্কিম সাউ, শান্তি ভট্টাচার্য, শিউলী মুখার্জি।

শংকর গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রাবণের গগনের গায়

গত ১২ আগস্ট কলকাতায় শিশির মঞ্চে 'ভানুতীর্থের বার্ষিক অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান এবং কবিতা শ্রোতের আসর হয়ে গেল।

রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা কেন্দ্র হিসেবে ভানুতীর্থের একটি বিশিষ্ট মর্যাদা আছে। তাদের প্রতিটি অনুষ্ঠানেই থাকে যথেষ্ট রুচিবোধ এবং আন্তরিক নিষ্ঠা। সম্প্রতি 'শ্রাবণের গগনের গায়' শীর্ষক অনুষ্ঠানেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

সম্মেলক কণ্ঠে শ্রাবণের গগনের গায় গানটি দিয়েই অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। অংশ গ্রহণ করেন ভানুতীর্থের ছাত্রছাত্রীরা। এঁদের গলায় এদিন একাধিক সমবেত কণ্ঠের গান শোনা যায়। বলা বাহুল্য সবগুলিই রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান। সম্মেলক কণ্ঠের প্রায় প্রতিটি গানেই যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে গেয়েছেন শিল্পীরা। বিশেষ করে শেষ গানটির রেশ হল ছেড়ে আসার পরও অনেকক্ষণ ছিল। গানটি ছিল খোলও বিমিক ঝিমিক রবিষন।

অনুষ্ঠানে সংস্থার শিল্পীদের মধ্যে একক কণ্ঠে যাঁরা গেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সুব্রত সেনগুপ্ত দীপ্তি বিশ্বাসের গান খুবই ভালো লেগেছে। দীপ্তি বিশ্বাসের কণ্ঠে 'অশ্রুভরা বেদনা' একটি সজল-করুণ পরিমণ্ডল রচনা করেছিল। সুব্রত সেনগুপ্ত বসে নবীন। গলাটি ভালো আডল্ট ভাবটি কাটিয়ে উঠলে ভবিষ্যতে ভালো গাইবেন।

অতিথি শিল্পীদের মধ্যে অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ ভালই গেয়েছেন। অবশ্য 'আমার প্রিয়ার ছায়ার চেয়ে শ্রাবণ মেঘের আধেক দুয়োর' গানটি বেশি আবিষ্ট করেছিল আমাকে। অতিথি শিল্পীদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল গেয়েছেন এদিন পূরবী মুখোপাধ্যায়। 'ঝড়ে যায় উড়ে যায়' এবং 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে' গান দুটি অসাধারণ উপস্থাপনা হয়ে উঠেছিল। তিনি গানের মর্ম ছুঁয়ে ছিলেন। তাঁর গান ছুঁয়েছিল আমাদের মর্ম। আর শ্রাবণের পূর্ণিমাতে গানটিও ভালো গেয়েছেন পূর্বা দাস। কণ্ঠ দিয়েছেন গৌতম মিত্র। 'আমার যে দিন ভেসে গেছে' গানটি গাইতে তিনি যেমন কষ্ট পেয়েছেন আমরা শুনেও অনুরূপ কষ্টই পেয়েছি। এমন কষ্টকর উপস্থাপনার উৎস কোথায় বোঝা গেল না। গীতি আলেখ্য প্রযোজনা করেছিলেন অরবিন্দ বিশ্বাস। নিজেও তিনি দুটি গান গেয়েছেন। বেশ কিছুদিন ধরেই তাঁর গলা সুস্থ নয়। তা সত্ত্বেও এদিন 'এমন দিনে তারে বলা যায়' এবং 'এস গো জেবলে দিয়ে যাও' গান দুটি তাঁর আন্তরিকতা এবং অনুভবের স্পর্শে উজ্জ্বল। আমার অবশ্য দ্বিতীয় গানটিই বেশি ভাল লেগেছে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি প্রযোজনার জন্যও ধন্যবাদ জানাতে হয় অরবিন্দবাবুকে।

বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ষামঙ্গল ও ভারতনাট্যম্

শ্রীশিক্ষায়তন হলে বর্ষামঙ্গল ও ভরত নাট্যম শাস্ত্রীয় নৃত্যের আয়োজন করেছিলেন রবীন্দ্রগবেষণা সংস্থা। এদিন ছিল সুবর্ণজয়ন্তীর উনবিংশতিতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশ।

অনুষ্ঠানের প্রথমার্ধে বর্ষামঙ্গল। নৃত্য সহযোগে রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠান। সুবর্ণজয়ন্তীর শিক্ষার্থী মেয়েরা নাচে যোগ দেয়। নেপথ্যকণ্ঠে ছিলেন শিক্ষক-ছাত্রী উভয়েই। সুন্দর উপস্থাপনা। দর্শকরা শুরু থেকেই মন্ত্রমুগ্ধ। বর্ষামঙ্গলে মোট আটটি বড় ও ছটি ছোট মেয়ে নেচেছে। দু একজনের চেহারা ঈষৎ বেমানান। তা নাহলে টিমওয়ার্ক মোটামুটি ভালই। নৃত্য নির্দেশনায় ছিলেন বটু পাল। অনিমা চট্টোপাধ্যায়ের গাওয়া 'মেঘের পরে বাদল অমেছে' অপূর্ব। 'পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে' গানটির সঙ্গে ছোটদের বাউল নাচ মনে দাগ কাটে। সঙ্গীত পরিচালনা নিখিল বসুর। সঙ্গতে ছিলেন দেবীদাস ভট্টাচার্য।

দ্বিতীয়ার্ধে শ্রীমতী বিজয়া রায়ের ভরতনাট্যম শাস্ত্রীয় নৃত্য এদিনকার অনুষ্ঠানের অন্যতম মুখ্য অনুষ্ঠান। নৃত্য পরিচালনা করেন ই জ্ঞানপ্রকাশম।

বিজয়া মোট এক ঘণ্টা নেচেছেন। মাঝে মাঝে সামান্য ত্রুটি। তবে ভরতনাট্যম অনুষ্ঠানে গুরুত্বের অংশটি দুর্বল। তাই বিজয়ার অক্লান্ত পরিশ্রম সত্ত্বেও শেষার্ধের অনুষ্ঠান দর্শকরা সবাই তেমনভাবে নিতে পারেননি। উৎবেজির সঙ্গে বাংলায় কমপেয়ারিং বাঞ্ছার প্রয়োজনীয়তা কর্তৃপক্ষ কেন অনুভব করলেন না সঠিক বোঝা গেল না।

প্রিয়দর্শী

COME TO US FOR
Carol
STEREOS
GANGA ELECTRONICS
185, Chandney Market, Cal-72
Phones : 24-6510/0428

দক্ষিণ শহরতলীর অভিজাত সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্র।
কণ্ঠ - যন্ত্র - নৃত্য
সর্বশ্রী চিন্ময় লাহিড়ী, অখিলবন্ধু ঘোষ, সবীর খাঁ, ডলি চ্যাটার্জী এবং রবীন্দ্র সঙ্গীতের সকল বিভাগ অমল নাগ, হেনা সেন ও কানুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত।
মেট্রোপলিটন কলেজ
২৪১।১, ডায়মণ্ডহারবার রোড, বেহালা, কলিকাতা—৩৪। ফোন : ৪৫-০১৩৯

IDEAL ADVIG

অবিস্মরণীয় নাটকের অসামান্য জনপ্রিয়তা !
৬০০ রজনীর দ্বারপ্রান্তে ০ প্রতি বৃহঃ ও শনি—৬।।টায়/রবিবার—৩ ও ৬।।টায়
তপতী থিয়েটারে
নাটক।পরিচালনা।সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রেঃ : বিকাশ, সত্য, প্রদীপ, ইরা, সান্ত্বনা, গিরীশ, রবীন, মিহির, সুনীল, নিখিল, শংকর, অরুণ, দীপংকর, ঊশীনর, শৈলেন, মধু; গণেশ; স্বপন, অলোক, তিমির এবং
রত্না ঘোষাল ও তরুণকুমার

CALCUTTA LIBRARY

হেমা এখন রাজিয়া

রাজিয়া সুলতানার স্যুটিং চলছে ফিল্মস্তান স্টুডিওয়। রাজিয়ার মতি-মহল সেট তৈরি করতে লেগেছে চার লক্ষ টাকার ঝুটো মুক্তো। ওর নিজস্ব এই ছোট্ট ঘর তৈরিতে সময় লেগেছে তিন মাস। মোট খরচ ১৪ লক্ষ টাকা। আর্টডিরেক্টর কুলকার্নি সেটটি তৈরি করতে অসাধারণ পরিশ্রম করেছেন। রাজিয়ার চরিত্রে হেমা। আর হেমাকে কেন নিলেন কমল আমরোহি? বলেছেন, 'হেমা বড় অভিনেত্রী বলেই নামভূমিকায় ওকে নেই নি। এর কারণ রাজিয়ার চরিত্রের সঙ্গে ওর দরুণ মিল। ওর শরীরের গড়ন, চলাফেরা, মুখভঙ্গি এমনকি সাহস মিলে যায় রাজিয়ার সঙ্গে।'

*

ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে ব্ল্যাক মানির ছড়াছড়ি। হিসেব কেউ করেন না। করাও অসম্ভব। আর এর বেশির ভাগই একশ টাকার নোট। প্রতি তিনখানায় একখানি জাল নোট।

৩০ বছর আগে পরে

সে তো অনেকদিন আগের কথা। প্রায় ত্রিশ বছর হল। রাজ কাপুর ছবি করেছিলেন আগ। ক্যামেরাম্যান রাজ আনন্দ। পরে ইনি লেখেন আন আর সঙ্গম। আর কে ফিল্মের ছবি। রাজ আনন্দের তখন সুন্দর যৌবন। সুপুরুষ। ভালবাসলেন নার্গিস, কামিনী কৌশল আর নিম্মি সুলতানা। দুর্ভাগ্য রাজ আনন্দের। একটি দুর্ঘটনায় ওর মুখ পুড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত নার্গিস ওর নির্মল ভালবাসাকে মেনে নেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই রাজ কাপুরের নতুন ছবি সত্যম শিবম সুন্দরম। এখানে নায়িকার মুখ পুড়ে গেছে। সম্ভবত রাজসাহেব এখন নিজেকে নিয়েও ছবি করার কথা ভাবছেন।

ঘটনা অনেক দিনের। রাজসাহেবের সঙ্গে তখন টপ। নার্গিসের সঙ্গে একটা ব্যাপার স্যাপার নিয়ে বাজার চলতি গুঞ্জন। যেমন চলেছিল দেব আর সুরাইয়াকে নিয়ে। সুরাইয়ার সঙ্গে রাজ ছবি করছেন শুনতেন। আর নার্গিসকে নিয়ে যে কানাঘুষো কী বাত। একসঙ্গে পর পর কয়েকটি ছবি তৈরির পর, মুখ কাপড়ের রোজগার হল, তাইতো, এটা কি সহ্য করা যায়। সোজা গিয়ে হাজির দেবসাহেবের কাছে, 'দেব, তোমার সঙ্গে নার্গিসের কি ব্যাপার?' দেব ঠান্ডা মাথায় রাজকে বলল : 'তুমি ছাড়া, কিছুই না। তোমার নিজের ওপর আর মেয়েটির ওপর কি কোন আস্থা নেই।' ধাক্কা নিরুত্তর।

এটা নিয়েও একটা ভাল ছবি হতে পারে কিন্তু।

সুনীল দত্ত

সুনীল দত্তের এবারের নতুন ছবি ডাকু জওয়ান, রামকমল, জনি দুশমন আর মকবালা। অভিনেতা পরিচালক সুনীলের জুড়ি মেলা ভার। এখন ওর বাজারও বেশ গরম। নিজের সম্পর্কে বলেছেন সুনীল :

ভি শান্তারাম একদিন বললেন, ছবি করার সময়, ব্যবসার দিকটা ভাববে, আর দর্শকের কথা মনে রাখবে। তখন আমি যুবক মানুষ। একটা তেজি ভাবও ছিল। মতে মিল হল না। এত বছরের অভিজ্ঞতার পর বুঝতে পারছি,

ওঁর উপদেশই ঠিক। সম্পূর্ণ সত্যি। এখন ছবি করতে খরচ ৭০।৮০ লাখ টাকার মতো। এত টাকা ঢেলে ছবি করা একজনের পক্ষে খুবই শক্ত। ১০।১৫ লাখ টাকায় ছবি করার দিন শেষ। আমি এখন দর্শক আর ব্যবসার কথাই ভাবি। আর আমি তো একজন সফল কমার্শিয়াল আর্টিস্ট। দর্শকও চায় আমার নিজস্ব ধরনেরই স্ফূর্তি। কমার্শিয়াল ছবির দর্শক যেভাবে আমাকে দেখে, তারা ঠিক সেইভাবেই আর্ট ফিল্মেও দেখতে সুনীল দত্তকে। যেমন শ্যাম বেনেগাল যদি একটা পুরো কমার্শিয়াল ছবি করেন, তাহলেও দর্শক তার কাছে চাইবে আর্ট ফিল্ম। কিন্তু-কাল অভিনয়ের পর হঠাৎ আমার মনে হল, যেসব চরিত্রে আমি অভিনয় করছি, সেসব চরিত্র বাজে। মেহবুব খানই আমাকে সচেতন করেন। তখন আমি ওঁর মাদার ইন্ডিয়ায় অভিনয় করছি। পরিচালনার অনেক শিক্ষাই তার কাছ থেকে পেয়েছি। সুজাতা, মাদার ইন্ডিয়া, মুঝে, জিনে দো, ইয়ে রাস্তা হ্যায় পিয়ার কা, গুমরাহ, পড়ে শন, বশমা অউর সোহেবা—এসব ছবিতে অভিনয় করে সত্যিই আমি খুশি।'

*

সাংবাদিক, প্রযোজক এবং পরি-চালক খাজা আহম্মদ আব্বাস পুনর্জন্ম লাভ করেছেন। চার বছর পরে তিনি চোখ ফিরে পেয়েছেন। চোখের বাদুকর অধ্যাপক সভরতোশ্লভ ফিয়োদরভের হাতে ঘটেছে এই অবিশ্মরণীয় ঘটনা। অধ্যাপক কয়েক বছর আগে এসেছিলেন ভারতে। তখনই আব্বাস সাহেব তাঁকে আনান। ফিয়োদরভ ওকে মস্কো যেতে বলেন। এবং বলেন, চোখ ঠিক হবেই। হলও তাই। এখন আব্বাস সাহেব অধ্যাপক ফিয়োদরভকে নিয়ে বই লেখায় ব্যস্ত।

ঘোড়ার দাম ছ' লাখ

সৌদি আরব থেকে সাতটি নিরেট সাদা ঘোড়া আনছেন প্রযোজক সুভাষ দেশাই। তাঁর নতুন ছবির জন্য কেনা এই ঘোড়াগুলির দাম পড়বে ছয় লাখ টাকার ওপর। ঘোড়াগুলো রক্ষণা-বেক্ষণের মাসিক খরচ পড়বে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা। এরা দু বছর ধরে ব্যস্ত থাকবে স্যুটিংএ।

*

শিবাজী পার্কের কাছে শ্যুটিং চলছিল। ছবির নাম তিন বন্ধু। সাদা কুর্তা পরা গায়ে শাল। অন্ধ উত্তম-কুমার টেলিফোন তুলে উত্তর দিচ্ছেন দুই বন্ধুর, তাঁরা হলেন আমজাদ খান আর ভরত কাপুর। প্রবোধ যোশীর মঞ্চসফল গুজরাটী নাটকের চিত্ররূপে এই তিন বন্ধুর একজন অন্ধ, একজন কালা এবং একজন বোবা। অন্ধের ভূমিকায় উত্তম, বোবার চরিত্রে আমজাদ আর কালা ভরত কাপুর। আমজাদের চরিত্রটি কমেডি। তিনজন ঘটনা বিপর্যয়ে ছাড়াছাড়ি হয়ে পড়ে। বহু পথ ঘুরে আবার মেলে একসঙ্গে।

রতন

অন্নদা প্রকাশনী প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পাঁচকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও ৬ তংকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

মূল্য ৭৫ পয়সা। ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যান্য অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

লাক্মে

ল্যাভেণ্ডার ট্যাল্ক

একেবারে আসল ফরাসী ল্যাভেণ্ডারের মত এর মন-মাতানো সুরভি আপনাকে সারাক্ষণ আবেশে বিভোর করে রাখবে—যে সুরভির রেশ কখনো ফুরোয় না।

লাক্মে—
সৌন্দর্য সাধনায় যাঁরা সবার সেরা

লাক্মে

লাক্মে

ভ্যানিশিং ক্রীম

কত কোমল…
কত স্বাভাবিক—মেক-আপের মূল বুনিয়াদের এক আদর্শ উপাদান। লাক্মে ভ্যানিশিং ক্রীম।

লাক্মে—
ত্বকের পরিচর্যায় যাঁরা সবার সেরা

লাক্মে

deCunha/L-VC/LT/3 h Ben.

Regd. No. WB/RC-13
Gram : AMRITA Calcutta-700003
AMRITA
Friday 15th September, 1978
Phone 55-5231 (14 lines)

বিশুদ্ধ 'কুক্‌মী' গুঁড়া মশলার ক্রেতারা

সাবধান!

'কুক্‌মী' গুঁড়া মশলার জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে কলকাতার কয়েকটি গুঁড়া মশলা কোম্পানী তাদের নিজস্ব নিকৃষ্টমানের ব্রাণ্ডের সংগে জনপ্রিয় কুক্‌মীর নাম জুড়ে হুবহু কুক্‌মী (Cookme) নামের স্টাইল নকল করে আসল কুক্‌মী গুঁড়া মশলা বলে বাজারে চালাবার চেষ্টা করছে।

কেনার সময় দেখে নেবেন— 'কুক্‌মী' প্যাকেটে কেবল মাত্র কুক্‌মী (Cookme) ছাপই আছে,— অন্য কোন ব্রাণ্ডের নাম যুক্ত নেই।

প্রস্তুতকারক :
কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
২৩৫ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা ৭০০০৭০ ● ফোন : ৩৩০৯৯৫, ৩২৬৬৩২
পোস্ট বক্স নং : বড়বাজার ৬৮৮৫ ● ফ্যাক্টরী : কাশীপুর

14 SEP 1978

মুদ্রণ-প্রকাশে : এন. পে. প্রোসেস এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

৫০ নট আউট

অমৃত

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮
দাম ৭৫ পয়সা

৫০ বছর

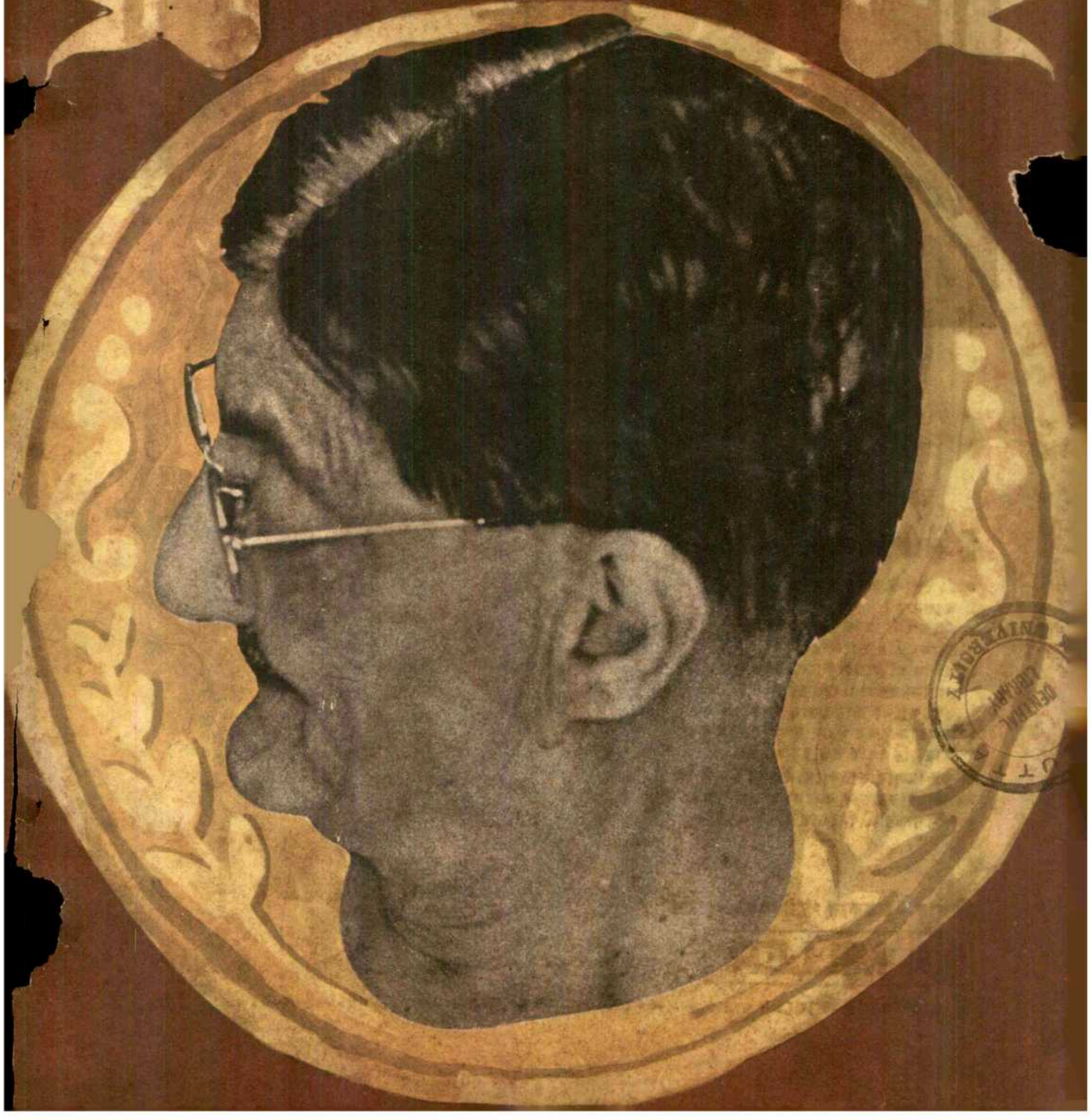

আপনার সাইকেলে লাগান-যা'হল সবার সেরা

টি আই মিলার ডায়নামো

- ১২ ভোল্ট ও ৬ ভোল্টের— পছন্দ তো আপনার।
- যেকোনো মেঘলা আবছা আবহাওয়াতেও... সোজা তীব্র আলোর রেখা।
- আপন শক্তিতেই আলো জ্বলে— কোনো ব্যাটারী সেলের দরকার নেই— তার মানেই আর কোন খরচ নেই।
- ছিমছাম সুন্দর গড়ন, সম্পূর্ণ ক্রোম করা, আর চুরি হবার সম্ভাবনাও নেই।

আজই মিলার ডায়নামো কিনুন। এটি হল সব আবহাওয়াতেই আলো জ্বালানোর ল্যাম্প, যা' আপনার জীবনভোর কাজে আসবে।

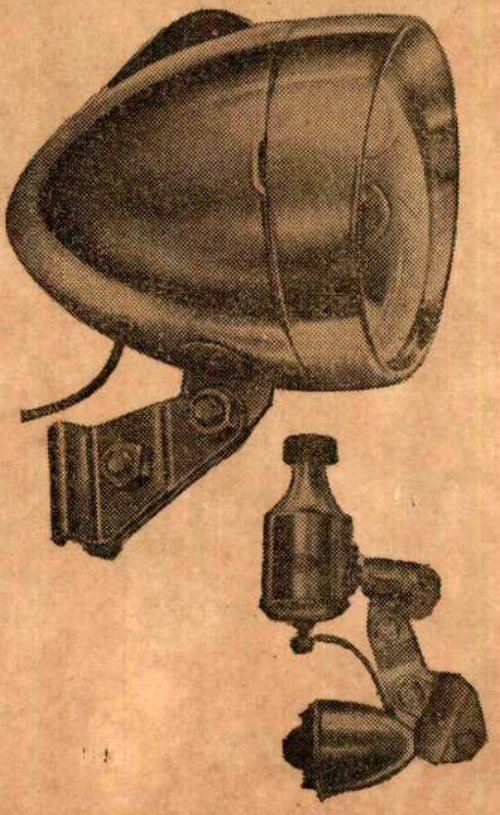

FDS TIM 2703 BEN

মিলার—অন্ধকার পথে আলোর রশ্মী

MILLER

টি আই মিলার লিমিটেড মাদ্রাজ ৬০০ ০৫৩ (টিউব ইনভেস্টমেন্টস্ অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের একটি পরিপূরক সংস্থা)

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৮৫তম জন্মদিনে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ

পথের পাঁচালী ১২, পথের পাঁচালী (পে-ব্যা) ৭, আদর্শ হিন্দু হোটেল (উঃ) ১১, দেবযান ১৫ অথৈজল ৯, আরণ্যক ১৫, আরণ্যক (পে-ব্যা) ৭, ইছামতী ১৮, ইছামতী (পে-ব্যা) ৯, দৃষ্টি প্রদীপ ১২, অনুবর্তন ১২, অপরাজিত ১৫, মেঘমল্লার ৭, কুশল পাহাড়ী ৫, নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব ৪, আদর্শ হিন্দু হোটেল (নাঃ) ২-৫০ গল্প সমগ্র ৪০, অশনি সংকেত ১০, অরণ্য মর্মর ৭·৫০ হীরা মাণিক জ্বলে ৫, আরো একটি ২, শ্রেষ্ঠ গল্প ১২।

*

বিভূতি রচনাবলী

নবম খণ্ড

৩য় মুদ্রণ বেরিয়েছে

—কুড়ি টাকা—

বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে :-

তৃতীয় খণ্ড	২৬,
চতুর্থ খণ্ড	২৬,
পঞ্চম খণ্ড	২৬,
সপ্তম খণ্ড	২৫,
অষ্টম খণ্ড	২৫,
নবম খণ্ড	২০,
দশম খণ্ড	২৫,

১ম, ২য়, ৬ষ্ঠ, ১১শ, ১২শ—অপ্রকাশ্য

বিভূতি রচনাবলী

সুলভ সংস্করণ

চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে

গ্রাহকরা অবিলম্বে তাঁদের খণ্ড সংগ্রহ করুন।

পেপার-ব্যাক ক্লাসিক্স সিরিজ-এ

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

'রাণু' পর্যায়ের বিখ্যাত চারখানি গ্রন্থ একত্রে একখণ্ডে পেপার-ব্যাক সংস্করণ-এ প্রকাশিত হল।

রাণু

মূল্য—সাড়ে বারো টাকা

প্লাস্টিক লামিনেটিং কভার সুদৃশ্য প্রচ্ছদ।

॥ স্থায়ী গ্রাহকরা সংগ্রহ করুন ॥

—শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে—

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের নবতম উপন্যাস

দিনান্তে নিশান্তে ১২,

*

—সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস—

শৈলজ মুখোপাধ্যায় লিখিত — বিমল মিত্রের

বিভ্রান্ত ৮, **জন গণ মন ১৬,**

প্রমথনাথ বিশীর

পনেরোই আগস্ট ২৫,

*

—নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হলো—

জরাসন্ধের

কারাস্তরালের অনেক আলেখ্য

লৌহকপাট— অখণ্ড—৩৫,

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩/৩৪৮৭৯১
৮৬।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯/৩৪৩৪১২

আত্মজীবনী ॥ পঙ্কজকুমার মল্লিক

রবীন্দ্রসঙ্গীত যখন রবিবাবুর গান ছিল, সেই সময় থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত বাঙালীর সংস্কৃতি, সঙ্গীত, চলচ্চিত্র, বেতার ও রুচি পরিবর্তনের ধারাবাহিক স্মৃতিচিত্র। এবারের পুজো সাহিত্যের সেরা আকর্ষণ। সঙ্গে বহু দুষ্প্রাপ্য আলেখ্যচিত্র।

রবীন্দ্রনাথের অসুখবিসুখ ॥ অমিতাভ চৌধুরী

বিধান রায় বললেন, অপারেশান করতেই হবে। স্যার নীলরতন বললেন; কিছুতেই না। দুই মাথা ডাক্তারের লড়াই থাকে নিয়ে,—সেই রবীন্দ্রনাথের অটুট স্বাস্থ্য রক্তাপহারক কীভাবে হরণ করলেন, তারই কাহিনী। বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র সদন থেকে উদ্ধার করে আনা বহু অপ্রকাশিত তথ্য ও চিত্রসহ এবার পুজোর অভিনব উপহার।

বছরের সেরা পাঁচটি উপন্যাস ॥ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, নিমাই ভট্টাচার্য ও অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

শারদীয় যুগান্তর ১৩৮৫

পূর্বাভাষ ॥ অন্নদাশঙ্কর রায়

বিভাগপূর্বকালের পূর্ববাংলাকে নিয়ে লেখা চাঞ্চল্যকর রচনা।

এ ছাড়া কয়েকটি বিশেষ রচনা

মন-পাঠাগার ॥ লীলা মজুমদার
উমা হৈমবতীর কুলুজি ॥ সুকুমার সেন
সমকালীন কয়েকজন চিত্রশিল্পী ॥ সন্দীপ সরকার
বাঙলা ছবিতে শরৎচন্দ্র ॥ আশিসতরু মুখোপাধ্যায়
ছায়াচিত্রের ছায়া দেবী ॥ মধুসূদন মজুমদার

বড় গল্প ও ভ্রমণকাহিনী

আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, বরেন গঙ্গোপাধ্যায় ও তারাপদ রায়।

ছোটগল্প ও রহস্য কাহিনী

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ, সুধাংশু ঘোষ, সমীর রক্ষিত, প্রলয় সেন, সুব্রত সেনগুপ্ত; শৈবাল মিত্র, শচীন দাশ, গৌতম রায়, কণা বসু মিশ্র; অমর মিত্র; অমল আচার্য প্রমুখ।

বিশিষ্ট কবিদের সুনির্বাচিত কবিতাগুচ্ছ ॥ সেরা শিল্পীদের আঁকা স্কেচ

দাম ঃ দশ টাকা। রেজিস্টি ডাকে অতিরিক্ত দু টাকা পঁচিশ পয়সা

আপনার কপির জন্য হকারকে বলে রাখুন, কিংবা সরাসরি যোগাযোগ করুন ঃ
সার্কুলেশন ম্যানেজার, যুগান্তর লিমিটেড; কলকাতা-৩ ফোন ঃ ৫৫-৫২৩১

অমৃত
১৮ বর্ষ
১৯ সংখ্যা
৫ আশ্বিন, ১৩৮৫
22 September 1978

সম্পাদকীয় ৩
সাহিত্য ইত্যাদি ৪ মণীন্দ্র রায়
রাজনীতি কলকাতা স্টাইল ৬
বেদব্যাস বৈদ্য
জালবাড়িতে টেনশন ৮
শ্যাম মল্লিক
রাজধানীর ইনসাইড স্টোরি ৯
পর্যবেক্ষক
ভাগ্যগণনা ১০ শ্রীমাণিক্য
কবিতা ১১ গৌরাঙ্গ ভৌমিক
সিদ্ধার্থ বসু,
শ্রীকুমার চক্রবর্তী
নিরঞ্জন ঘোষ
প্রচ্ছদ কাহিনী ১২
৫০ নট আউট
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
অন্নদাচরণ মজুমদার
প্রচ্ছদশিল্পী শৈবাল ঘোষ
নিষিদ্ধ ফল (গল্প) ১৭
সুনীল জানা
কোনদিন জঙ্গলে ২২
পিনাকী চট্টোপাধ্যায়
ভারত কী করে ভাগ হল ২৮
বিমলানন্দ শাসমল
চিঠিপত্র ৩৫
তরণী পাহাড়ে বসন্ত (উপন্যাস) ৩৮
শৈবাল মিত্র
সোনার হরিণ নেই (উপন্যাস) ৪৩
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
আমাদের প্রভু বীক্ষণ দাও ৪৭
রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত
শোলার টোপর (গল্প) ৪৯
বনচিকা মুখোপাধ্যায়
খেলা ৫২ শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়,
লিশকম্যান, দর্শক
চিত্রধ্বনি ৫৬

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ কাহিনী
বাজশেখর
লিখেছেন গৌরীশংকর ভট্টাচার্য
প্লাবন ৭৮
লিখেছেন রমেন দাস, অমর মিত্র
প্রদীপ আচার্যের গল্প

এনকেফেলাইটিস ও তার প্রতিকার

কয়েক মাস হল পশ্চিমবঙ্গে এক নতুন ধরনের অসুখ দেখা দিয়েছে, তার নাম এনকেফেলাইটিস। অসুখটি প্রাণঘাতী, মৃত্যুর হার খুবই বেশি—তিনজন আক্রান্ত রোগীর মধ্যে দুজনেরই প্রাণ হারাবার সম্ভাবনা। তাছাড়া এখন পর্যন্ত এই ব্যাধির কোন চিকিৎসার উপায় আবিষ্কৃত হয় নি, এটাও খুবই অশান্তিজনক। অসুখটি এ বছর প্রবল আকারে দেখা দিলেও বছর পাঁচেক আগেও একবার বাঁকুড়া অঞ্চলে এর প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। এবং মাস দুয়েকের মধ্যে প্রাণও হারিয়েছিল ২৫০ জন। তারপর হঠাৎ এক সময় থেমে যেতে থাকে অসুখের প্রকোপ।

এ বছর এনকেফেলাইটিস প্রথম দেখা দেয় বর্ধমানে। সেখানে মে থেকে জুলাই মাসের মধ্যে ২০০ জন প্রাণ হারায় ঐ অসুখে। তারপর এ রোগ ছড়াতে শুরু করে বাঁকুড়াতে। এবং এক মাসের মধ্যেই সে জেলাতে ১২৫ জন মৃত্যুকবলিত হয়। কিছু কিছু মৃত্যুর খবর সে সময় বীরভূম জেলা থেকেও পাওয়া গেছে। ইতিমধ্যে বাঁকুড়া থেকে অসুখটি ছড়িয়ে পড়েছে পুরুলিয়া জেলাতে।

কলকাতা থেকে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা গিয়ে আক্রান্ত অঞ্চল পরিদর্শন করে এসেছেন। রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের বাড়ি থেকে গৃহপালিত প্রাণীদের রক্ত নিয়ে এসেও পরীক্ষা করে দেখেছেন। এনকেফেলাইটিস সম্বন্ধে তাঁদের অভিমতের কথা পরবর্তী সময়ে রেডিও এবং খবরের কাগজের মারফৎ প্রচার করাও হয়েছে।

এনকেফেলাইটিস অসুখের বাহক হল বিশেষ এক জাতের মশা। রোগাক্রান্ত পশু বা পাখিকে কামড়ানোর পর এই জাতীয় কোন মশা কউকে যদি কমড়ায় তবে তার এনকেফেলাইটিস হবার আশংকা থাকে। গৃহপালিত পশু-পাখির মধ্যে শুয়োর গরু ছাগল হাঁস ইত্যাদিই প্রথমে আক্রান্ত হয় এবং তাদের সূত্র থেকেই অসুখটির সংক্রমণ ঘটে মানবদেহে। কিন্তু কোন গ্রামে একটি এনকেফেলাইটিস রোগী থাকা মানেই এ নয় যে সে গ্রামের সকলেই রোগাক্রান্ত হবে। এমন কি একই বাড়িতে বাস করেও সকলে সংক্রমিত হয় না। কেননা তার জন্যে দরকার বিশেষ এক জাতের মশার মাধ্যম—যে মশা রোগাক্রান্ত কোন পশু-পাখি বা মানুষকে কামড়ে রোগ বীজাণু বহন করে নিজের শরীরে এবং নতুন কাউকে দংশন করামাত্র তার শরীরে সংক্রমণ ঘটায়।

কাজেই অসুখটি থেকে আত্মরক্ষার প্রধান উপায় হল মশারী ব্যবহার করা। এবং দ্বিতীয়ত, মশারী সংগ্রহ সম্ভব না হলে গরু শুয়োর হাঁস ইত্যাদির সঙ্গে এক ছাউনির নিচে রাত্রি যাপন না করা। কিন্তু সেটাও যদি সম্ভব না হয়, তবে নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে গিয়ে এনকেফেলাইটিসের টিকা নেওয়া উচিত। এবং সরকারের উচিত এই টিকার বীজ প্রয়োজন মত সংগ্রহ করে আক্রান্ত অঞ্চলে পাঠান।

সাহিত্য ইত্যাদি...

টলস্টয়—দেড়শ বছরের জন্মদিনে

টলস্টয় বেঁচে থাকলে এখন তাঁর বয়স হতো ১৫০ বছর। সেজন্যে সারা পৃথিবীতেই তাঁর দেড়শতম জন্মবার্ষিকী পালিত হচ্ছে। আমাদের এই কলকাতা শহরেও একাধিক কমিটি স্থাপিত হয়েছে সে উপলক্ষে। কেউ কেউ ইতিমধ্যে মিটিংও করেছেন। প্রথমটি হয়েছে এ মাসের ৯ তারিখে। কেননা সেটাই তাঁর জন্মদিন। ১৮২৮ সালের ৯ সেপ্টেম্বর মস্কোর কাছে তুলা শহর থেকে খানিকটা দূরে ইয়াসনাইয়া পলিয়ানায় জন্মেছিলেন তিনি। তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ রচনা প্রকাশিত হয়েছে কাগজে। তাঁর জীবনপঞ্জি, যাকে বলে বায়ো-ডেটা, সে-সবও পাওয়া গেছে কোনো কোনো লেখায়। এবং আমাদের অর্থাৎ ভারতীয়দের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে তাঁর আসল গুরুত্ব কী এবং কেন, সে-সবও আলোচিত হয়েছে কখনো কখনো। কাজেই সেদিক দিয়ে নতুন কিছু শোনবার নেই আমার।

তবু, দেড়শ বছরের শতবার্ষিকী বলেই জানা কথাও নতুন করে একটু বলে নেওয়া দরকার।

ইয়াসনাইয়া পলিয়ানাতে টলস্টয়দের পারিবারিক জমিদারী ছিল। জার-এর আমলের সেইসব দিনে রাজা জমিদাররা জীবন কাটাতেন আমিরী চালে। কাউন্ট লিও টলস্টয়ও ছিলেন তাঁদেরই একজন। তাছাড়া অল্প বয়সে তিনি মা-বাবাকে হারান, মানুষ হন এক আত্মীয়ার কাছে। এবং একটু বড় হয়ে ১৮৪১ সালে যখন তিনি কাজান বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে যান তখনও ছিলেন মূলত অভিভাবকহীন। স্বেচ্ছাচারিতা সেসব দিনে এমনিতেই ছিল বড়-লোকের ভূষণ, টলস্টয়ের আরাম জোগে পারিবারিক বাধাও ছিল না। ফলে অতি সহজেই তিনি হয়ে পড়লেন অমিতাচারী। তখন তিনি এসব বিলাসব্যসনের জন্যে কোন-রকম বিবেকদংশনও বোধ করেননি।

যদি এইভাবেই চলত, তাহলেও টলস্টয় বড় লেখক হতে পারতেন। কেননা পৃথিবীতে বহু লেখক আছেন যাঁরা সাহিত্যের দিক দিয়ে মহৎ কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে বড় নন। টলস্টয় তাঁদের দলে পড়েন না। তিনি লেখক হিসেবেও বড়, মানুষ হিসেবেও মহৎ। আর মহত্বের বীজ অংকুরিত হয়েছিল কাজানের দিনগুলোতেই।

বছর দশেক স্বেচ্ছাচারিতার জীবন কাটাবার পর ১৮৫১ সাল নাগাদ তাঁর মনে হল, অত্যন্ত বাজেভাবে সময় নষ্ট করছেন তিনি। নিজের কৃতকর্মের জন্যে লজ্জাবোধ করলেন। এমন কি পর যখন দেশের অতি হতভাগ্য কৃষকদের জীবনকে ভালো করে জানলেন তখন নিজের সম্বন্ধে এমন ধিক্কারোক্তিও করলেন, আমি অপরাধী, কাজানের জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে সব-কিছু ছেড়েছুড়ে তিনি চলে যান ককেশাস অঞ্চলে। সেখানে তাঁর এক দাদা ছিলেন সেনাবাহিনীতে, তাঁর কাছে গিয়ে ওঠেন। পরে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময়ে তিনিও যোগ দেন সেনাবাহিনীতে। এবং যুদ্ধের অভিজ্ঞতাও পেয়ে যান তিনি। সেবাস্তোপল রক্ষার যুদ্ধের সেসব অভিজ্ঞতার কথা নিয়ে গল্পও লিখেছেন পরে।

ইতিমধ্যেই কিন্তু তিনি লেখক হিসেবে খ্যাতি পেয়ে গেছেন। তাঁর কাজান-কেন্দ্রিক দিনগুলো নিয়ে এবং তারও আগের কথা দিয়ে তিনখানা আত্মজীবনী-মূলক বই লিখেছিলেন, তা খুবই প্রশংসা পেয়েছিল সেকালের বড় বড় লেখকদের কাছে। এই লেখার মধ্যেই টলস্টয়ের নিজস্ব জীবনদৃষ্টির স্ফুরণ ঘটে। দেখা দেয় আত্মিক সংকট ও সংঘাত এবং তাই থেকে নৈতিক উত্তরণের বিষয়ে প্রয়োজনের উপলব্ধি—যা টলস্টয়ের প্রায় সব লেখাতেই কোন-না-কোনভাবে দেখা দিয়েছে। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগ দেবার পর পর তিনি হত্যা ধ্বংস এবং মানব জীবনের অপূরণীয় অপচয়ের বিরুদ্ধে—

অনিবার্য কারণে বর্তমান সংখ্যায় শ্রীশ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'হাওয়া গাড়ি' ছাপা হল না। আগামী সংখ্যা থেকে নিয়মিত বেরোবে।

যুদ্ধের বিরুদ্ধে কলম ধরলেন। অথচ নিজের দেশকে রক্ষার জন্যে যুদ্ধেও যোগ দিয়েছিলেন তিনি। তিনি যেন বলতে চাইলেন, যুদ্ধ যদি কেউ চাপিয়ে দেয়, প্রতিরোধ করতে হবে, কিন্তু যুদ্ধ যাতে না হয় তার জন্যেও সজাগ থাকতে হবে।

পরে তিনি সেনা বাহিনী ছেড়ে ইওরোপ ভ্রমণে বেরোন ৫৭ সালে। সেখানে গিয়ে ধনী-গরিবের জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে আশমান-জমিন ফারাক দেখে আরও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং নিজের জমিদারীতে ফিরে হাতে-নাতে কাজ শুরু করেন।

তখনকার সেই জার-এর আমলে রুশ দেশে চাষীরা ছিল আসলে ভূমিদাস। জমিতে তাদের কোন অধিকার ছিল না, সত্যিকারের কোন স্বাধীনতাও ছিল না তাদের। ক্রীতদাস বললেই হয়। টলস্টয় প্রথমেই তাঁর জমিদারীর চাষীদের সব রকম বন্ধন থেকে মুক্তি দিলেন এবং সমস্ত জমিকে তাদের মধ্যে ভাগ করে বিলিয়ে দিলেন। তারপর তাদের সত্যিকারের মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে খুললেন ইশকুল এবং নিজেই শুরু করলেন শিক্ষকতা। কিন্তু নির্দোষ এই সংস্কারের কাজও জার খুব সুনজরে দেখলেন না। পুলিশ এসে তাঁর বাড়ি খানা তল্লাসী করে ইশকুলের দরজাব তারা বুঝিয়ে দিয়ে গেল।

কিন্তু টলস্টয়কে তাতেও বাধা দেওয়া গেল না। কৃষকের সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। এবং সমাজ পরিবর্তন যে অনিবার্য লেখার ভেতর দিয়ে প্রচার করতে লাগলেন সেটা। তখন তাঁর সামনে প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল, পরিবর্তনটা কোন পথে করা হবে? বিপ্লব না সংস্কার? সংস্কারের পথই বেছে নিলেন টলস্টয়। সাধারণ কৃষকের জীবনের সঙ্গে তিনি আরও ঘনিষ্ঠ-ভাবে যুক্ত হয়ে পড়লেন। তিনি বুঝতে পারলেন, যারা পরিশ্রম করে আর জমি চষে ফসল ফলায় তারাই সব কিছু সম্পদের স্রষ্টা। তারা ভাগ্যহীন কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত জীবনের পবিত্রতা ও নৈতিক মান অনেক উঁচু। তারাই আসলে ইতিহাস তৈরি করে। এই দিকটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলছেন তিনি তাঁর মহাকাব্যিক উপন্যাস ওয়ার এণ্ড পীসে। সেই সঙ্গে জোগের দিকটিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ঐ উপন্যাসে।

অসহযোগ ও নৈতিক আদর্শের কথা প্রচার করতে লাগলেন টলস্টয়। রেজারেক-শান উপন্যাসের ভেতর দিয়ে জার-এর আমলের অভিজাত মানুষদের সমাজ জীবন আর তার ধ্যান-ধারণার দেউলেপনা দেখিয়ে আত্মিক প্রায়শ্চিত্ত ও কবুলের কথা প্রচার করলেন, এইভাবে জীবনের পর্বে পর্বে মানবসমাজের মূল সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে ক্রমে ক্রমে তিনি হয়ে উঠলেন গোটা উনিশ শতকের পৃথিবীর বিবেকের মত।

অনেকেরই হয়ত এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে মহাত্মা গান্ধীর কথাও। কেননা দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকার সময় গান্ধীজী অসহযোগ ও নৈতিক উন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে টলস্টয়ের সঙ্গে চিঠির মারফৎ যোগাযোগ করছেন। এবং ঐ মহামানবকে তিনি শ্রদ্ধাও জানিয়ে গেছেন সে জন্যে।

সাহিত্যিক টলস্টয় বাংলা সাহিত্যে কোন দিকে কী পরিমাণ প্রভাব রেখে গেছেন, তার পুরো মূল্যায়ন এখনও কেউ করেছেন কিনা জানি না। বারান্তরে সে বিষয়ে কিছু খোঁজ-খবর নেবার চেষ্টা করব।

অরুণেন্দ্র রায়

শারদীয়া অমৃত

সেপ্টেম্বরেই বেরোবে

শ্রীদুর্গা ও শ্রীগৌরাঙ্গের
রঙিন অফসেট ছবি

সুখের স্মৃতি দুঃখের স্মৃতি

রাণী চন্দ

গগনেন্দ্রনাথ ছবিতে বাঙালি-বন্দী। অবনীন্দ্রনাথ আর রাণী চন্দ। দুজনে মিলে এক সঙ্গে এঁকেছিলেন শান্তিনিকেতনের অনেকগুলো রঙিন ছবি। সেই ছবি আঁকার অসাধারণ কাহিনী এই প্রথম লিখলেন অসামান্য লেখিকা রাণী চন্দ। এই ধরণের পুজো সংখ্যায় তাঁর লেখাও এই প্রথম।

রবিঠাকুরের পাগলা ফাইল

অমিতাভ চৌধুরী

বদ্ধ উন্মাদ, পাগল ও ছিট গ্রস্তদের রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠি। কেউ চাইছে পেপেরর বিচি, কেউ চাইছে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার সোজা রাস্তা, কেউ পাঠাচ্ছে সোনালী চুলের গোছা। শত শত চিঠি। রবীন্দ্রনাথ কী করেছেন সেই চিঠির তাড়া নিয়ে?

এবার পুজোয় সব চেয়ে বড় আকর্ষণ শান্তিনিকেতনের বাদুড় থেকে অমৃতের জন্য বিশেষভাবে আনা অমিতাভ চৌধুরীর এই সুদীর্ঘ সচিত্র রচনা।

লেখক যখন প্রেমিক

এখন তার বির পাতায় এক একটি শব্দ মানে স্মৃতির লুকনো ধরুল। একজন বিশিষ্ট বাঙালী লেখক মধ্য বয়সে নিতান্ত সামান্য বালিকার প্রেমে পড়েছিলেন। লেখকের নামটি পরে পকাশ্য। অনাতম শারদীয়া চমক।

উল্লম্বনারী

ভবেশ সান্যাল

আসামের ছেলে ভবেশ সান্যাল চৌরঙ্গীর আর্ট স্কুলে ছবি আঁকতে এসে মডেলের খোঁজে ঢুকলেন নিষিদ্ধ পল্লীতে। এখন ছবির জগতে রয়েছেন অবন ঠাকুর জামিনী রায়। গল্পকে হার মানান ভাষায়, সেই সব মানুষ ও সময়ের কথা।

নরবলি এখনও আছে

অবিশ্বাস্য হলেও বিশ্বাস করতে হবে। ওড়িশার গাঁয়ে ঘুরে নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন সংকর্ষণ রায়—ছবি সহ ইতিহাসের নিখুঁত ধারাবিবরণী।

শিশির ও বিশ্বনাথ

মধুসূদন মজুমদার

প্রখ্যাত নট শিশির ভাদুড়ীর ভাই বিশ্বনাথ ভাদুড়ীও কম যেতেন না। তাই নিয়ে শিশিরবাবুর মনে একটু ঈর্ষাও ছিল সন্তর্পণে। দুই ভাদুড়ীর ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ ফুটেছে এই রোমাঞ্চিত।

উপন্যাস

আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, শচীন দাস।

বড় গল্প

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, লীলা মজুমদার, নবনীতা দেব সেন শৈবাল মিত্র

গল্প

মনোজ বসু, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, পরিতোষ সেন, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ অমর মিত্র ও আরও অনেকে।

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের প্রবন্ধ
সুমথনাথ ঘোষের 'সাহিত্যিক আড্ডা'

কবিতা

অরুণ মিত্র, মনীন্দ্র রায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, কৃষ্ণ ধর, আলোক সরকার, প্রণবেন্দ দাশগুপ্ত, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, সুনীল নন্দ এবং আরও অনেকে।

দাম : দশ টাকা। রেজিস্ট্রি ডাকে দু টাকা পঁচিশ পয়সা অতিরিক্ত

সার্কুলেশন
ম্যানেজার; অমৃত পাবলিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড কলি-৩।

অমৃত

মার্কসবাদীরাও স্যালুট চান

রাজনীতি কলকাতা স্টাইল

বেদব্যাস বৈদ্য

সি, পি, আই (এম) দলের সম্পাদক শ্রীপ্রমোদ দাসগুপ্ত বলেছেন, তাঁর দলের সদস্য সংখ্যা দারুণভাবে বেড়েছে। তাঁর মতে, ছাত্র-যুব, শ্রমিক-কর্মচারী, ভূমিহীন কৃষক-মধ্যবিত্ত সকল স্তরেই এই ধারা অব্যাহত। সম্পাদক হিসাবে এই সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিতে তাঁর খুশী হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। এর দ্বারা তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা এবং দল পরিচালনার যোগ্যতাই প্রমাণিত হয়। নতুন সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দলের প্রবীণ এবং প্রাচীন কর্মী এবং নেতাদের মনোভাবটা যাচাই করা দরকার। আগে থেকেই দলের মধ্যে একটা বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী দলীয় নেতৃত্বের কঠোর সমালোচক ছিলেন। সি, পি, আই (এম) দল ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সেইসব নেতা ও কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ আরও অনেকগুণ বেড়ে গিয়েছে। বিশেষ করে চব্বিশ পরগণা, হুগলী, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মালদহের দ্বিতীয় সারির নেতা পর্যায়ে দলীয় কোন্দল অত্যন্ত তীব্র। বিগত সাধারণ নির্বাচনের সময় রাজ্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধে একটা অংশের চাপা ক্ষোভ থাকলেও, ব্যাপকভাবে তা প্রকাশ পায়নি। বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কর্মী এবং নেতা তখন দলীয় সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন মাত্র। কিন্তু প্রায় দেড় বছরের মাথায়, অর্থাৎ সি, পি, আই (এম) দল রাজ্যের শাসন ক্ষমতা হাতে পাওয়ার পর, নিষ্ঠাবান কর্মী এবং জেলা পর্যায়ের নেতাদের মধ্যে যুগপৎ হতাশা ও ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। তবে কংগ্রেসীদের সঙ্গে মার্কসবাদীদের মূলগত পার্থক্যটা এক্ষেত্রেও বর্তমান। ক্ষুব্ধ কর্মী এবং নেতারা দল এবং নেতৃত্বের কঠোর সমালোচক হলেও কংগ্রেসীদের মত তারা তা প্রতিপক্ষের হাতিয়ার করে তুলতে সাহায্য করেন না। এবং পত্রপত্রিকায় বিবৃতির পর বিবৃতি দিয়ে আত্মপ্রচারেও মেতে ওঠেন না। বরং নেতৃত্বের ভ্রান্ত নীতি বা নেতৃত্বের মোহ সম্পর্কে সহকর্মী-দের মধ্যে বিরূপ মনোভাব তৈরি করতে নিজেরা সক্রিয় হন। ফলে তার প্রভাব দলকে দারুণ দুর্বল করে দেয়।

সি পি আই (এম) রাজ্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধে জেলা পর্যায়ের নেতা এবং কর্মী-দের একাংশের ক্ষোভ নানাবিধ। এক পক্ষের সমালোচনা সাময়িক। নরম এই সমালোচক গোষ্ঠীর সংখ্যা সম্প্রতি খুবই বেড়েছে। অপরাংশের বিরোধিতা সুদূরপ্রসারী। চরমপন্থী এই গোষ্ঠী বহুদিন ধরেই রাজ্য নেতৃত্বের সমালোচক। বরং দল ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এদের বিরোধিতা এবং সমালোচনার মাত্রা তীব্রতর হয়েছে।

সি, পি, আই (এম) দলের নরমপন্থী সমালোচক সদস্যরা মনে করছেন, দলীয় নেতারা সুদীর্ঘকাল বিভিন্ন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেসব শিক্ষা দিয়েছেন, এখন তাঁরা তা ভুলে গেছেন। কংগ্রেসী আমলে আমলা এবং পুলিশের বিরুদ্ধে বিশ্বস্ত কর্মীরূপে তাদের ব্যবহার করা হয়। মন্ত্রিত্বের আসনে বসে নেতারা এখন সেই আমলা-পুলিশের উপর নির্ভরশীল। এ ব্যাপারে কংগ্রেসীদের সঙ্গে তাদের মৌল পার্থক্য নেই। মার্কসবাদী মন্ত্রীরা পুলিশের স্যালুট না পেলে যে অখুশী হন এটা তাঁরাও লক্ষ্য করে চলেছেন। এছাড়া দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের সমর্থনে গত দুই দশক পাড়ায় পাড়ায় তাঁরা আন্দোলন করেছেন। দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের নির্বাসন থেকে ফিরিয়ে এনে পশ্চিমবাংলায় পুনর্বাসন দেওয়ার দাবীতে তাঁরা এতকাল মুখর হয়েছেন। কিন্তু হাতে ক্ষমতা পেয়ে নেতৃবৃন্দ সেই প্রতিশ্রুতি ভুলে এখন নতুন সুর তুলেছেন। এছাড়া দেড় বছর ক্ষমতা হাতে পেয়েও এ পর্যন্ত সরকার বড়বাজার অথবা কালোবাজারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন নি। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম যেমন ঊর্ধ্বমুখী, তেমনি পুলিশ এবং প্রশাসনের দুর্নীতিও অব্যাহত। এধরনের বাস্তব সব তিক্ত অভিজ্ঞতা নিষ্ঠাবান কর্মীদের অত্যন্ত ভাবিয়ে তুলেছে। প্রতিদিন এখন তাদের বহু প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাই পাড়ায় পাড়ায় এই ধরনের কর্মীরা বসে

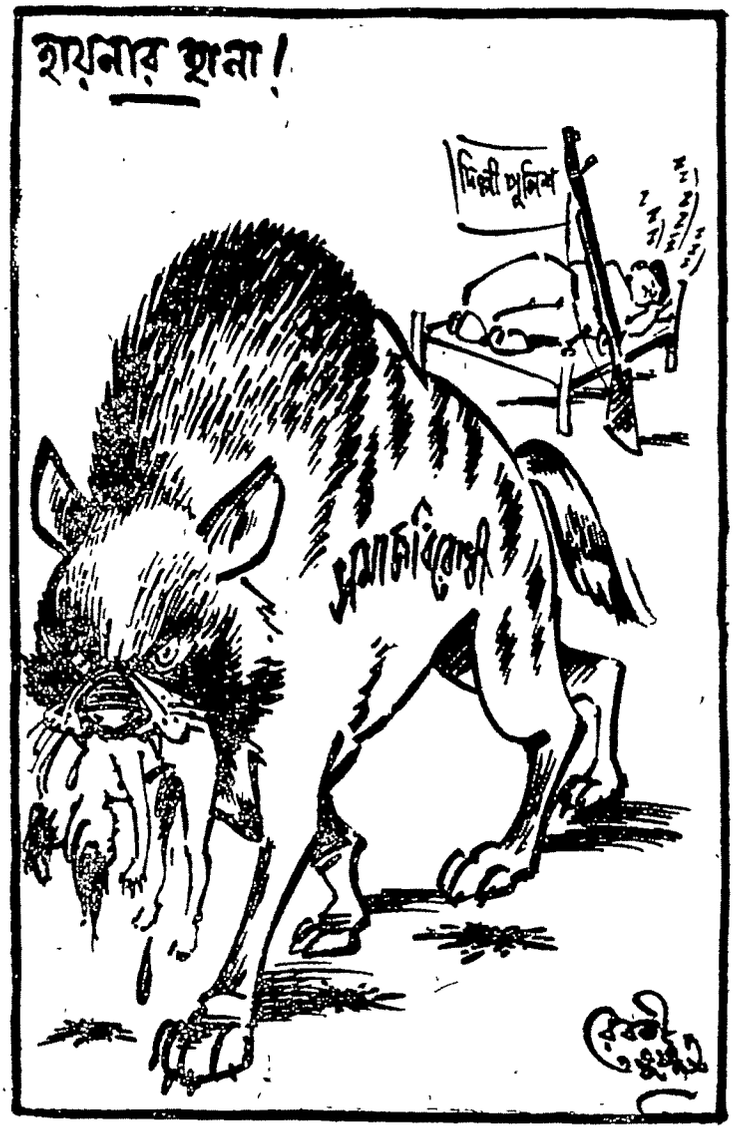

পড়ছেন। দিনে দিনে তাদের মধ্যে নেমে আসছে নিদারুণ হতাশা। দলের প্রতি একটা মোহ অথবা আকর্ষণ থাকলেও কোন উৎসাহ বা উদ্দীপনা নিয়ে এখন আর তারা এগিয়ে আসছেন না।

সি, পি, আই (এম) দলের ক্ষুব্ধ এবং চরমপন্থীরা অবশ্য সাধারণ কর্মীদের এই হতাশার সুযোগ পুরো মাত্রায় নিচ্ছেন। তাঁরা অভিযোগ তুলেছেন, সি, পি, আই (এম) নেতারা গণতন্ত্র জলাঞ্জলি দিয়ে ব্যক্তি-নির্ভর রাজনীতিতে মেতেছেন। মার্কসবাদের মূল কথা ভুলে সংসদীয় গণতন্ত্রের নামে আত্মতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত। সংসদীয় গণতন্ত্রের ছত্র-ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে নেতৃত্বে দুর্নীতি সৃষ্টি করছেন। এদের মতে, দলীয় নেতারা এখন ক্ষমতার লিপ্সায় চরম শোধনবাদের পথ ধরেছেন। উদাহরণস্বরূপ তাঁদের একজন বলেন, বাশিয়া অথবা সি, পি, আই পর্যন্ত চীনকে যে ভাষায় আক্রমণ করতে দ্বিধাবোধ করেছে, সি, পি, আই (এম) নেতৃত্ব তার চেয়ে অনেক বেশী কঠোর এবং কঠিন ভাষায় ও বিশেষণে চীন সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করছেন। ক্রমে মার্কসবাদের লাইন থেকে তাঁরা সরে আসছেন। এবং আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা অর্থাৎ কর্তাভজার রাজনীতির নতুন লাইন সৃষ্টি করছেন। ব্যক্তিনির্ভরতার রাজনীতি আমদানির উদ্দেশ্য মার্কসবাদের নাম করে একটি চক্রের হাতে দল ও সরকারের ক্ষমতা ধরে রাখা। সি, পি, আই (এম) দলের ক্ষুব্ধ এবং চরমপন্থী এই অংশ অবশ্য ইতিমধ্যে তাঁদের প্রচার অভিযানে নেমেছেন। জেলায় জেলায় তাঁরা কর্মী এবং নেতাদের নিয়ে গোপন সভাও শুরু করেছেন। রাজ্য নেতারা যে এ খবর রাখেন না, তা নয়। বহু ক্ষেত্রে তাদেরও এধরনের বহু অভিযোগ ও প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। রাজ্য নেতৃত্বের বক্তব্য অবশ্য একটাই : সংসদীয় গণতন্ত্রের ছত্রছায়ার থেকেই মূল উদ্দেশ্য কায়েম করতে হবে। এটা একটা সাময়িক কৌশল মাত্র। বিক্ষুব্ধ এই নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে রাজ্য নেতৃত্ব কঠোর। তাঁরা মনে করেন : গণ-তান্ত্রিক পদ্ধতিতেই তাঁরা নেতৃত্বাধীন। কমরেড লেনিনের বাণী উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁরা বলেন, দলের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সকলের মতামত যাচাই করো। তখন সমালোচনার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কিন্তু একবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে তা বিরোধীদেরও মেনে চলতে হবে। রাজ্য নেতৃত্বের মতে বিক্ষুব্ধরা লেনিনের মূল বক্তব্যই অমান্য করছেন। তাঁরা হঠকারি।

সি, পি, আই (এম) দলের রাজ্য নেতৃত্ব মুখে যাই বলুন না কেন, ঘরে তাঁদের, এখন সুখ নেই। ক্ষমতাসীন হওয়ার পর জোয়ারের জলের মত সমর্থক এবং সদস্য সংখ্যা বাড়ছে ঠিকই। ১৯৬৭ এবং ১৯৬৯ সালের দুই যুক্তফ্রন্টের আমলেও এমনি সমর্থনের ঢেউ উঠেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে সেই বিপুল সমর্থক-বাহিনীর অধিকাংশ কংগ্রেস অথবা নকশাল আন্দোলনের সঙ্গী হয়। তাই সদস্য-সমর্থক বাড়ার সঙ্গে দলের শক্তি বৃদ্ধির কোন যোগ আছে বলে মনে হয় না। বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ এবং সংগঠক প্রমোদবাবুরও তা অজানা নয়। সুতরাং এই মুহূর্তে দলের সমর্থক-সদস্য বৃদ্ধির ঘোষণা একটা রাজনৈতিক কৌশল মাত্র।

ডিসেম্বরের শেষাশেষি হাওড়ার সাঙ্কিয়ায় পার্টি প্লেনাম বসবে। সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং দলের সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে সেখানে আলোচনা হবে। আসন্ন প্লেনামে রাজ্য নেতৃত্বকে যে দারুণ ঝড়ের মুখোমুখি হতে হবে, তা তাঁরাও জানেন। ইতিমধ্যে ক্ষুব্ধ চরমপন্থী নেতা এবং কর্মীরা বসেপড়া ও হতাশ কর্মীদের সুসংগঠিত করতে সক্রিয়। সমাজতান্ত্রিক দেশের নেতাদের চরিত্র ও আদর্শ তুলে ধরে রাজ্য নেতৃত্বের ব্যক্তি-তন্ত্র ও ব্যর্থতার প্রমাণে জেলা পর্যায়ে তাঁরা উঠেপড়ে লেগেছেন। বিরোধী দলের চক্রান্ত নয়, ক্ষুব্ধ দলীয় নেতা ও কর্মীদের মোকাবিলার কৌশল রচনায় রাজ্য নেতৃত্ব এখন ব্যস্ত। রাজ্য কমিটি সেপ্টেম্বরের গোড়ায় সাতাশজন বিশিষ্ট সদস্যকে দল থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ক্ষুব্ধ গোষ্ঠীকে জব্দ করার জন্য আরও সদস্য বিতাড়ন অসম্ভব নয়। তার কোপে কিছু বিধানসভা সদস্যও পড়তে পারেন।

রাজ্য নেতৃত্বের এখন মূল ভাবনা, পার্টি প্লেনামের আগে র‍্যাডিকেল ক্যাডারদের ক্ষোভ ও হতাশা কিভাবে দূর করা যায়, এবং দায়িত্বজ্ঞান সরকার ও দায়িত্বহীন পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে কোন পথে সরকার ও দলের মার্কসবাদী ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখা যায়।

সুতী, পশম, সিল্ক, টেরিন কাচার লিকুইড ডিটারজেন্ট

Glitter

কনজিউমার প্রোডাক্টস

২৮এ, এস এল দাস লেন, কলি—৫০

পরিবেশক :

পাপু এন্টারপ্রাইজ

৪৭।৩৭, আর কে ঘোষ রোড, কলি-৫০

শ্রীমন্ত অসমর যুগচিন্তা-য়

কবিতা/গল্প/প্রবন্ধ/সংবাদ পাঠান এবং আসাম ও তার প্রতিবেশী রাজ্যগুলির বাঙালী কবিদের একমাত্র মিলন ক্ষেত্র

স্বরের আড়ালে শ্রুতি-তে

(সম্পা : কুমার অজিত দত্ত) আজই কবিতা ও কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠান। সভ্য হোন।

১২১।বি, বি বি সি কলোনী, গৌহাটি—১২

নতুন প্রকাশিত হলো

প্রবীণ নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্তের

উইংস-এর আড়ালে

সুদীর্ঘ ৩১ বছর অবিচ্ছিন্নভাবে রঙ্গালয়ের সঙ্গে যুক্ত থেকে যেসব শিল্পী-দের সঙ্গে তিনি কাজ করেছেন, যাঁদের কথা তিনি শুনেছেন, তাঁদের জীবনের আনন্দ-বেদনার টুকরো কাহিনীগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন, বলা যেতে পারে, সাহিত্য ক্ষেত্রে এ এক নতুন সংযোজন। ।৯।৫ ।৯৪

প্রবোধকুমার সান্যালের (উপন্যাস)।

কন্যা রূপম (পেপার ব্যাক)—চার টাকা

শম্ভু মিত্রের (নাটক)

চাঁদবণিকের পালা —আট টাকা

পুনঃ প্রকাশিত হলো

উৎপল দত্তের (শেকসপীয়ার সম্বন্ধে আলোচনা)

শেক্সপীয়রের সমাজচেতনা—পঁচিশ টাকা

কানন দেবীর (আত্মজীবনী)

সবারে আমি নমি —বারো টাকা

এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—৭৩, ফোন : ৩৪-১৭৮২

লালবাড়িতে টেনশন

শ্যাম মল্লিক

বি, বা, দি বাগের মস্ত ঐ লাল বাড়িটায় কিছুদিন হল একটা 'টেনসন' শুরু হয়েছে। প্রকাশ্যে কেউ কিছু না বললেও চোখ চাওয়া-চাওয়ি হচ্ছে। কেউ কেউ কানও ভাঙাচ্ছে। সি পি এম বিরোধী খবর-টবর কাগজে বেরোলে অন্য শরিকের মুখে চাপা হাসিও দেখা যায়। 'টেনসনটা' শুরু হয়েছে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে বাস্তুহারা-এর ব্যাপার নিয়ে। কয়েকটা জেলায় শরিক দলের 'ব্যাঙ্ক এণ্ড ফাইলের' মধ্যে সেই ভাই ভাই সম্পর্কটা আর নেই। দলের পক্ষপাত বিস্তারের উদ্যোগকে কেন্দ্র করে মালদহ মুর্শিদাবাদ এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও হুগলীতে নিজেদের মধ্যে ছোটখাট কয়েকটা সংঘর্ষও ঘটে গেছে। গোসবাসহ সুন্দরবনের কয়েকটা অঞ্চলে সি. পি এম একটা 'আগ্রাসী' নীতি গ্রহণ করেছে বলে' আর, এস, পির অভিযোগ।

কোন কোন জেলার কয়েকটা পকেটে ফরোয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে সি. পি. এম-এর মন কষাকষি বেশ সুস্পষ্ট। এসব নিয়ে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া বিবাদি বাগের ঐ লাল বাড়িটায় দেখা দিয়েছে।

এ বাড়ির 'টেনসনটা' অবশ্য মাঠে ময়দানের মত নয়। এখানে প্রত্যেক দলেরই একটা 'ইনটেলিজেন্স' আছে। সবাই অপরের খবরাখবর নোট করছেন। সংবাদপত্রেও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত খবর ছাপানোর চেষ্টা চলছে। এই তো সেদিনের কথা। দুই শরিকের মধ্যে একটা জমিকে কেন্দ্র করে ছোটখাট একটা সংঘর্ষ বাধে তারপরই মহাকরণে দু'দলের দুই মন্ত্রীর তৎপরতা। পুলিশের এক বড় কর্তাকে ঘরে ডেকে এনগেজড্ ব্যক্তি গ্রেপ্তারিয়ে আলাদাভাবে দুজনে বললেন মশাই আমার পার্টির ক্যাডারদের একটু দেখবেন। অফিসারটি অবশ্য দুই মন্ত্রীকেই বললেন, হ্যাঁ স্যার দেখবো। এই অবস্থায় 'ডি ফ্যাক্টো' করতে করতে অফিসারদের মধ্যেও একটা 'টেনসন ডেভেলাপ' করছে।

একজন ইনজিনিয়ারকে বদলির ব্যাপারে অন্য দলের এক মন্ত্রীর সরাসরি হস্তক্ষেপের অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও গেছে। মুখ্যমন্ত্রীর তাৎক্ষণিক তৎপরতার জন্য চলা অবশ্য বেশিদূর গড়ায়নি। 'টেনসন' শুরু হয়েছে আরো অনেক কারণে। যেমন বসুমতী নিয়ে। বুদ্ধদেব বসুমতী ছিল বুদ্ধদেব শিল্প দপ্তরের হাতে। সেটা আনা হল তথ্য দপ্তরের আওতায়। অনেক কাঠ খড় পোড়াবার পর এ ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত হল। কেউ কেউ বলেন, শিল্পমন্ত্রী কানাই ভট্টাচার্য মহাশয়ের এ ব্যাপারে একটা চাপা ক্ষোভ আছে। এক সময় কথা উঠেছিল বসুমতীকে তথ্য দপ্তরের অধীনে আনার ব্যাপারে বামফ্রন্টের সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে, কানাইবাবু সম্মতি দিচ্ছিলেন না। আর একটা সিদ্ধান্তের ঝুলে আছে। সেটা হল গেস্ট ইনসাইট হোটেলকে রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের অধীনে আনা। এটাও কানাইবাবুর হাতে ছিল। এখনও ফাইল চালাচালি চলছে।

পরিবহণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শিবেন চৌধুরীর বিরুদ্ধে কয়েকটা অভিযোগ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এ প্রসঙ্গ মন্ত্রিসভার বৈঠকে তোলার একটা চেষ্টা হয়েছিল। শেষমেষ তা আর হয়নি। পঞ্চায়েতের ক্ষমতা ও নতুন আইনকানুন রচনার ব্যাপারে একটা কমিটি হয়েছে। কমিটি গঠনের আগে পর্যন্ত পঞ্চায়েত মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুই জানতেন না। প্রকাশ্যে কিছু না বললেও পার্টির বৈঠকে দেবব্রতবাবু নাকি এ ব্যাপারে কিছু অভিযোগ তুলেছেন।

এইতো সেদিনের ঘটনা। মহাকরণের করিডরে কিছুদিন ধরে কয়েকজন টাউট ঘুরে বেড়াচ্ছিল। একজন পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। কৃষিমন্ত্রী কমল গুহের ঘরে বসে তিনি ফলাও কারবার চালিয়েছেন। বাসের চেসিস, চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রয়োজনে ঋণ পাইয়ে দেবার নাম করে তিনি টু পাইস কামিয়েছেনও। এই ঘটনা সংবাদপত্রে বেরোবার আগে তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে কমলবাবুর কথা হয়। বুদ্ধদেববাবু কমলবাবুকে বলেছিলেন, রিপোর্টারদের কাছে এখন কিছু বলবেন না। এ খবর কাগজে বেরোলে টাউটরা এবং যেসব সরকারী কর্মচারী এসব ব্যাপারে জড়িত তারা এলার্ট হয়ে যাবে। কিন্তু কমলবাবু কোন এক সংবাদপত্র খবরটা ছাপিয়ে দিলে বুদ্ধদেববাবু একটু ক্ষুব্ধ হন।

মহাকরণে রামবাবু অর্থাৎ রাম চ্যাটার্জিকে নিয়েও একটা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। কয়েকজন ঘাঘা ঘাঘা মন্ত্রীকে বলতে শুনেছি—রামবাবুই উদ্বাস্তুদের উস্কানী দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে এনেছেন। দণ্ডকারণ্য গিয়ে রামবাবু উদ্বাস্তুদের সামনে কি বক্তৃতা করেছিলেন ডি, ডি, এর কাছ থেকে তার টেপ আনা হয় মহাকরণে। হুগলী রামবাবুর জেলা। সেখানে সি. পি. এম-এর সঙ্গে তাঁর বনিবনা হচ্ছে না। এ নিয়েও মাঝে মধ্যে মহাকরণে কথা-বার্তা উঠছে। রামবাবুর কাজকর্ম অনেক মন্ত্রী নাকি ক্ষুব্ধ। অফিসারদের তিনি 'স্যার' বলেন এটাও অনেক মন্ত্রী পছন্দ করছেন না।

পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীকে নিয়েও অনেকের ক্ষোভ। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, সরকারের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তিনি কোন একটা সংবাদপত্রের কাছে ফাঁস করে দিচ্ছেন

সবচেয়ে বড় কথা সবার মাথার ওপর যিনি আছেন ওই মহাকরণে তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতার জন্য অনেক ছোটখাট ব্যাপার মিটমাট হয়েছে। নিজের দলের একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে একটা খবর বের হবার পর সাংবাদিকরা মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আমি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছি। কয়েকদিন বাদে তিনি নিজেই সাংবাদিকদের জানান, খবরটা আংশিক সত্য। তিনি বলেন, মন্ত্রীর গাড়িতে মন্ত্রী-পত্নী যাতে অফিস না যান তা বলে দিয়েছি।

অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্রের বিরুদ্ধে একটা চাপা গুঞ্জন শোনা যায়। সে অভিযোগ 'পক্ষপাতিত্বের।' সি, পি, এম ছাড়া অন্য দলের অধীনে যে সব দপ্তর আছে অনেক ক্ষেত্রে অনেক দপ্তরের অর্থ বরাদ্দ ঠিকমত পাশ হয় না। ফাইলও ঠিকমত 'মুভ' করে না। ছোট ছোট শরিক দল ভাবতে শুরু করেছেন, বড় দল হয়ে সি, পি, এম তাদেরকে অবহেলা করছেন।

ক্যাবিনেটে যাবার মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয় অথচ অবিলম্বে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার এজন্য একটা ক্যাবিনেট কমিটি বা সাবকমিটি ক্যাবিনেটে তৈরি হয়েছিল। এই 'ক্যাবিনেটে' সব দলের মন্ত্রীই আছেন। গত তিন মাসে ঐ ক্যাবিনেটের বৈঠক হয়েছে মাত্র একবার। আরো কারো বক্তব্য, বৈঠক ডাকা হচ্ছে না। আবার আর এক দিকের বক্তব্য বৈঠক ডাকলে মন্ত্রীরা ঠিকমত আসেন না।

আপাতত চার শরিকের সরকার। এসব ছোটখাট 'টেনসন' তো থাকবেই। মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব কয়েকদিন আগে হাসপাতাল থেকে ফিরছেন। কয়েকজন সাংবাদিককে তিনি হাসপাতাল চত্বরে প্রেজেন্ট করেছেন।

জনতা পার্টি না জনতা কংগ্রেস ?

জনতা পার্টি কি ধীরে ধীরে কংগ্রেসী আদল নিতে চলেছে? হিন্দিভাষী একজন সংসদ সদস্য এই প্রশ্নের যে জবাব দিয়েছেন তার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় এইরকম: জনতা পার্টিকে জনতা কংগ্রেস বললেই ভালো শোনায়। এখনি এমন উক্তিতে নানা মহলে রা-রা রব ওঠার সম্ভাবনা থাকলেও জনতা পার্টির নেতাদের হাবভাব এবং কথাবার্তা প্রাক্-নির্বাচনী অবস্থার কংগ্রেস জমানার কথাই বারবার স্মরণ করায়। কংগ্রেসকে নির্বাচনে হারিয়ে দিলেও গদিতে বসলেও, কংগ্রেসী 'পলিটিক্যাল কালচার' থেকে মুক্তি পাওয়া যে খুব দুষ্কর ব্যাপার, তার ভূরিভূরি প্রমাণ দিচ্ছেন জনতা পার্টির কর্ণধারেরা। এই কালচার একাধারে ব্যাপক এবং সংক্রামক। তবে, জনতা পার্টির নেতাদের সঙ্গে কংগ্রেস নেতাদের দৃশ্যতঃ একটিমাত্র ব্যতিক্রম আছে। সেটা হল কংগ্রেস নেতারা দলের মেকেতে ফরাশ পেতে এবং তাকিয়ায় পিঠ দিয়ে কিংবা হাত রেখে দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একদা আলোচনায় মশগুল হয়ে উঠতেন। জনতা পার্টির নেতারা এমন ব্যবস্থার পক্ষপাতী নন। ওঁরা শীতলাপ মিরজিত বিরাট কক্ষে ঘোড়ার নালের আকারের জম্বা-সরু টেবিলের সামনে এবং চেয়ারে বসে আলাপ আলোচনায় মেতে ওঠেন। অতীতে কংগ্রেস দলের হালফিল অবস্থায় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের সঙ্গে বর্তমান জনতা পার্টির জাতীয় কার্যনির্বাহক সমিতির সমাবেশের মধ্যে এই বৈষম্যটা এখনও চোখে পড়ে।

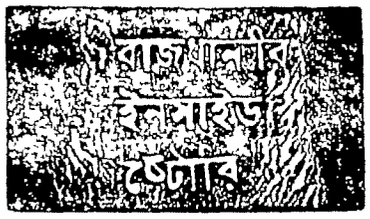

জনমনে, জনতার লোকদল কিংবা সোস্যালিস্ট - জনতা পার্টির এই তিন গোষ্ঠীর অনেকের মধ্যেই অল্প-বিস্তর কংগ্রেসী ভাবধারা ইদানীং লক্ষ্য করা যায়। ক্ষমতায় আসবার প্রথম পর্যায়ের উত্তেজনা এবং প্রথম প্রথম বহু গালভরা কথার তোড় কমে যাবার পর চালচালন, সমস্যায় মোকাবিলা করার নীতি-পদ্ধতি এবং সার্বক্ষণিক চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে কংগ্রেস স্টাইলকেই এঁরাও অবশেষে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছেন। সুতরাং কংগ্রেস ক্ষমতায় না থাকলেও কংগ্রেসী মানসিকতা কেবল যে রয়েই গেছে তাই নয়, সযত্নে লালিত হচ্ছে আপাতদৃষ্টিতে এই কংগ্রেস-বিরোধী জনতা সরকারে।

সম্প্রতি জনতা পার্টির সাংগঠনিক রূপরেখা কী হবে সে বিষয়ে নানা প্রস্তাব ও খসড়া নিয়ে তর্ক-বিতর্কে জাতীয় কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যরা যাবার বিনা সংকোচে কংগ্রেস দলের সংগঠন সংক্রান্ত নিজেদের সমর্থনসূচক উল্লেখ করেছেন। জনতা পার্টিতে বিভিন্ন শরিকদের মধ্যে সংগঠন কংগ্রেস, সি এফ ডি এবং বিদেশাগত কংগ্রেসের লোকজনদের মুখে অহরহ কংগ্রেস সংগঠন 'পারফরমেন্স' খুবই স্বাভাবিক। স্বাভাবিক কেননা মুখে যে যাই বলুন না কেন এই তিন শরিকের পক্ষে কংগ্রেসকে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। ভোলবার চেষ্টা করলে নিজেদের অতীত রাজনৈতিক জীবনকেও ভুলতে হয়। কংগ্রেস দলের মধ্যে থেকে বড় হওয়া এইসব পঞ্চান্ন বাষট্-সত্তর-আশী বছরের লোকজনদের পক্ষে সংস্থা হিসাবে কংগ্রেসের প্রতি গভীর ও আন্তরিক সমবেদনা এবং সহানুভূতি হয়ে যায়। মোরারজী দেশাই, জগজীবন রাম, চন্দ্রশেখর মোহন ধারিয়াদের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের প্রতি মোহ এবং কংগ্রেস নামের একটা জাদু থাকবেই। আর তা আছেও। এর ফলে জনতা পার্টিকে সম্পূর্ণ নতুন আদলে গড়ে তোলবার জন্য নতুন ধরনের কোন প্রচেষ্টা বা পরিকল্পনা দেখা যাচ্ছে না।

কংগ্রেসী কালচারের প্রভাব এতই প্রবল যে জনতা পার্টির মধ্যে এবং বাইরে ঠিক কংগ্রেসী স্টাইলে একটা সমঝোতার ভাবমূর্তি তুলে ধরতে সর্বদা সকলে ব্যস্ত। এই কংগ্রেসী স্টাইলের লক্ষণীয় দিক ছিল এই যে সমস্ত বকমের কন্টা ভিকশন ধামাচাপা দিয়ে সকলকে নিয়ে মিলেমিশে থাকা। এই মিলেমিশে থাকবার মানসিকতা কংগ্রেসের ভরাডুবাকে কবোষ্ণতা বিস্তৃত। আর সেই ভাষার তলায় রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তার জন্য আশ্রয় নিতে হবেক চিন্তাভাবনার লোকজন। সমালোচকরা দল ছাড়াতে চাইলে এবং তার ফলে দলের রাজনৈতিক ক্ষতির কোন সম্ভাবনা না থাকলেও না—হেও না' গোছের অনুরোধ-উপরোধের সুরটা সর্বদা চড়া গলায় বেঁধে রাখতেন কংগ্রেসের নেতারা। এককথায় নেতৃত্বের এইরকম ভাবমূর্তিকে একটি বিশেষ টাইপ হিসাবে ব্যাখ্যা করা চলে। অপরদিকে কংগ্রেসের মধ্যে তথাকথিত বিদ্রোহীরা খানিকটা লম্ফ-ঝম্পের পর ঝিমিয়ে পড়তেন। তাঁরা ঝিমিয়ে পড়তেন দুটি কারণে। প্রথমতঃ কংগ্রেস কালচারের টানে এবং দ্বিতীয়তঃ দল ভেঙে কোথাও যাবার তেমন মনোমত জায়গা ছিল না বলে। বিকল্প স্থানাভাবই ছিল একসময়ে বড় রাজনৈতিক সমস্যা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য সবকিছু উপেক্ষা করে তবু ছোট ছোট গোষ্ঠী হয়ে যাঁরা কংগ্রেস ছেড়েছিলেন এককালে তাঁদের মধ্যে অনেকেই আজও কংগ্রেস কালচার থেকে মুক্তি হতে পারেন নি। এককথায় যাকে বলে কংগ্রেস ছাড়া কোন জায়গা নেই। দেশের সেবা করতে গেলে কংগ্রেসে থাকতে হবে। নাম করতে গেলে কংগ্রেসে থাকতে হবে। নেতা হতে হলে কংগ্রেসে থাকতে হবে।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে চায় না আজকের জনতা পার্টি। মোরারজী দেশাই থেকে শুরু করে বর্তমান নেতাদের একটা বড় অংশের বক্তব্য হল সংস্থা হিসাবে কংগ্রেস খারাপ নয়। কয়েকজন মিলে কংগ্রেসের মহান ঐতিহ্যকে বিকৃত করেছে। সুতরাং কয়েকজনের ভুল-ত্রুটির জন্য কংগ্রেসকে দোষারোপ করা যায় না। এইরকম চিন্তাভাবনা থেকে জন্ম নিচ্ছে আর এক নতুন কল্পনা। আর সেটা হল জনতা পার্টিকে বিরাট মহীরুহের আকার দেবার কল্পনা। এরফলে নানা মতের লোকজন আসবে তার নিশ্চিত রাজনৈতিক ছাপার তলায়। এককালে কংগ্রেস কেমন ছিল সেইভাবে জনতা পার্টিকে গড়া যাতে বিকল্প রাজনৈতিক আস্তানার সুযোগ-সুবিধা তেমন না থাকে। এই পথেই সবরকম প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে।

জনতা পার্টির তলাকে বিভিন্ন শরিকদের প্রাথমিক সদস্যত্বগ্রহণের পূর্বে সমীক্ষা থেকে দেখা যায় বহু জায়গায় কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যরাই দলে ভীড় করছে। উত্তর ভারতের গ্রামাঞ্চলে সরসরি রাজনীতি ব্যাপারে লোক দেওয়া হয়েছে বিশেষ বিশেষ পেশা এবং সামাজিক পদমর্যাদার লোকজনদের ওপর। জনতা পার্টির সদস্য হয়েছেন ডাক্তার-কবিরাজ, স্কুল মাস্টার, ডাক্তারের কম্পাউন্ডার, মোড়ল গোছের। গ্রাম ভারতে একদা এঁরাই ছিলেন কংগ্রেসের বিশ্বস্ত খুঁটি। কংগ্রেস অনুসৃত পদ্ধতি, সাংগঠনিক কাঠামো এবং যোগাযোগ রক্ষার মেসিনারি করার দিকে এইভাবে জনতা পার্টির ঝোঁকটা প্রবল হয়ে উঠছে। রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে এই ঝোঁকের সাময়িক তাৎপর্য যাই থাকুক না কেন কংগ্রেসী ঢং-এ দেশ চালানো এবং পার্টি গড়া যায় কিনা সেইটাই প্রশ্ন। চালানো সম্ভব হলে কংগ্রেসের প্রভাব ও ক্ষমতা ক্রমশঃ কমত না। বিশ বছর আগে কংগ্রেসে একটা জায়গায় এসে থেমে পড়েছিল। তার নতুন কিছু দেবার ছিল না। সেই কংগ্রেসী স্টাইল আর অভ্যাস নিয়ে জনতা পার্টি কোথায় দাঁড়াবে?

যোগ্য রাশিচক্রের অধিকারিনী

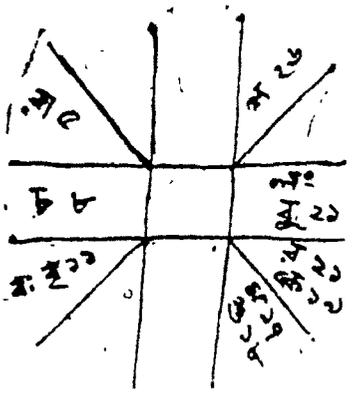

জাতিকা কর্কট রাশি, পুষ্যা নক্ষত্র, মকর লগ্ন। রাশিচক্রটির বৈশিষ্ট্য হলো ভাগ্যপতি বুধগ্রহ লগ্নে অবস্থিত হয়ে সপ্তমস্থানস্থ চন্দ্র—যিনি মনন শক্তির কারক তাকে পূর্ণ দৃষ্টিতে অবলোকন করায় জাতিকার বোধন এবং মনন শক্তির সমন্বয় ঘটিয়েছে। আর এই বোধন এবং মনন শক্তির বিকাশ ঘটে সেই স্থান থেকে সেই পঞ্চম গৃহের পতি শুক্রগ্রহ পঞ্চম স্থানকে পূর্ণ দৃষ্টি করায় জাতিকার লেখা হয়েছে এতো জীবন্ত এবং হৃদয়গ্রাহী। জ্যোতিষশাস্ত্রে কথিত আছে কোন গ্রহ যদি স্বীয় নক্ষত্রে অবস্থান করে, তবে সে তার ফল স্বরূপ শুভ ফল দান করে। এই রাশিচক্রে আমরা তার কয়েকটি নিদর্শন দেখতে পাই। যেমন, লগ্নপতি শনি মীন রাশিতে স্বীয় নক্ষত্রে অবস্থিত। স্বীয় নক্ষত্রে অবস্থিত হয়েছে রবিগ্রহ ধনু রাশিতে সঙ্গে কেতু গ্রহকে নিয়ে সেই কেতুও স্বীয় অবস্থান করছে। স্বীয় নক্ষত্রের গ্রহগণ জাতিকাকে দশা ফল দানকালে যথেষ্ট শুভ ফল দিয়েছে। আবার জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহের শুভদৃষ্টি সম্বন্ধেও যা কথিত আছে তাও এই রাশিচক্রে বিদ্যমান। কথিত আছে :— শুভস্থানের অধিপতি যদি শুভস্থানকে দৃষ্টি করে তবে শুভফলের বৃদ্ধি ঘটায়। আমরা রাশিচক্রে দৃষ্টি রাখলে দেখতে পাচ্ছি জাতিকার লগ্নপতি শনিগ্রহ মীন-রাশিতে বসে যেমন স্নেহদৃষ্টিতে মান, যশের ঘর পঞ্চম স্থানকে দেখছে, তেমন ভাগ্যস্থানেও পূর্ণ দৃষ্টি করে ভাগ্য এবং যশ-খ্যাতির বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। আবার ঐ মান, যশ-খ্যাতির অধিপতি শুক্রগ্রহ এবং সুখেশের অধিপতি মঙ্গলগ্রহ একত্রে একাদশে বসে পঞ্চম স্থানকে দৃষ্টি করায় জাতিকাকে যথার্থই যশ-খ্যাতির সিংহাসনে তুলে ধরতে সাহায্য করেছে।

জাতিকার রাশিচক্রে আরও কয়েকটি শুভ যোগ বিদ্যমান যেমন দুঃস্থান অধিপতি দুঃস্থানে বসে আছে, বসে আছে রাহু দুঃস্থানে তুঙ্গ হয়ে। অতএব, যোগ্য রাশিচক্রের অধিকারিণী আশাপূর্ণা দেবী যোগ্য পুরস্কার পেয়েছেন।

জাতিকা তাঁর লগ্নপতি শনিগ্রহের মহাদশার শেষকালে অর্থাৎ প্রায় ষোল বৎসর বয়সে বিবাহিতা হন। যোগকারক গ্রহ শুক্রের মহাদশা আরম্ভ হতেই প্রথম ছোটগল্প লিখে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। ঐ শুক্রের মহাদশাতেই বৃহস্পতির সহায়তায় জাতিকার অবিস্মরণীয় উপন্যাস অগ্নিপরীক্ষা প্রকাশিত হয়, সেই অগ্নিপরীক্ষা চলচ্চিত্রেও আলোড়ন সৃষ্টি করে। রবির মহাদশার শেষকালে মহাবলীন্দ্র পুরস্কার এবং সুখেশ মঙ্গল গ্রহের মহাদশায় ১৯৭৭-এর ডিসেম্বর মাসে পেলেন জ্ঞানপীঠ পুরস্কার। সাহিত্য জগতের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

জাতিকার জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছে মঙ্গলের দশাতে বৃহস্পতির অন্তর্দশায়। বর্তমানে চলছে মঙ্গলের দশাতে শনির অন্তর্দশা, আরম্ভ হয়েছে '৭৮ সালের জানুয়ারী মাসের ১৯ তারিখ থেকে, চলবে '৭৯ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। এই এক বৎসর এক মাস জাতিকার পক্ষে ততটা শুভ ফল দাতা নয়। গত মার্চ মাসে তাঁর পতি-বিয়োগ ঘটে। লগ্নপতি শনির অন্তর্দশা হেতু প্রায়ই স্বাস্থ্য উৎপাত করতে পারে। আগামী নভেম্বরের মাঝামাঝি গোচরে বাহ্যর সিংহরাশিতে সঞ্চার স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ ভাবে উদ্বেগের ইঙ্গিত বহন করে। কিন্তু '৭৯ সালের ফেব্রুয়ারীর পর জাতিকা গোচরে তুঙ্গ বৃহস্পতির আনুকূল্যে এবং মঙ্গল, বুধের দশাতে শুভফল প্রাপ্ত হবেন।

ব্যক্তিগত রাশিফল

এবার সম্ভাব্য ব্যক্তিগত রাশিফল বলছি। সপ্তাহটি ইংরাজী ২২শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার থেকে আরম্ভ। গ্রহকুলের মধ্যে বৃহস্পতি কর্কটে, শনি এবং বুধ সিংহরাশিতে রবিবার বুধ সিংহ থেকে কন্যারাশিতে চলে যাবে যেখানে আছে রবি এবং রাহু। তুলায় আছে শুক্র এবং মঙ্গল আর মীনে আছে কেতু। চন্দ্র বৃষ রাশি থেকে শনিবার বওনা করে বৃহস্পতিবার গিয়ে সিংহ রাশিতে পৌঁছুবে।

মেষ : ছুটির দিনেই এমন কিছু প্রাপ্তি অথবা সংবাদ পাবেন যাতে আনন্দ বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে প্রভাবশালী ব্যক্তির শত্রুতা উদ্বেগ কারক। আত্ম-সম্মান বজায় রেখে চলুন। রবি থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত শুভ।

বৃষ : কর্মক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ অশান্তি দেখা দিতে পারে। অশান্তি ঘরেও হবে। কোন বন্ধুর সাথে ভুল বোঝাবুঝি অসম্ভব নয়। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে নিজ গুণের প্রশংসাও পাবেন। বুধ, বৃহঃ শুভ।

মিথুন : আর্থিক চাপ থাকবে। কাউকে বেফাঁস কথা বলা থেকে বিরত থাকুন। কর্মস্থানে দায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে। সোম, মঙ্গলবার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে।

কর্কট : আর্থিক চাপ থাকলেও চরম মুহূর্তে ভ্রাতৃস্থানীয় কারোর সহায়তা লক্ষ্যণীয়, কোন নিকট বন্ধু দ্বারা ভাগ্যোন্নতি হতে পারে। বুধ, বৃহঃ শুভ।

সিংহ : বিভিন্ন কারণে ঝঞ্ঝাট থাকবে। অংশীদারের সঙ্গে কোন ঝামেলা মিটে যেতে পারে। বৃহস্পতিবার ছাড়া সপ্তাহটি মন্দ নয়।

কন্যা : যদিও ব্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে সপ্তাহটি সুখের হয়ে উঠতে পারে। নিকট আত্মীয়ের দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। শুক্র, শনি ছাড়া সপ্তাহটি ভাল।

তুলা : কোন মহৎ কাজে ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। সাংসারিক ব্যাপারে অশান্তি দেখা যায়। সোম, মঙ্গল অশুভ।

বৃশ্চিক : আর্থিক ব্যাপারে অনেকটা সুরাহা হবে। ব্যবসাতে পসার বৃদ্ধি পাবে। চাকুরেদের পক্ষে সময়টা অনুকূলে নয়। বৃহঃ অশুভ।

ধনু : কাজেকর্মে অনেকটা শান্তি পাবেন। সোম, মঙ্গলবার বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে।

মকর : দূরের কোন প্রতীক্ষিত যোগাযোগ উৎসাহ বৃদ্ধি করাবে। কিন্তু কর্মস্থানে কারোর বিরোধিতা মনের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। রবিবার থেকে বৃহঃবার পর্যন্ত লক্ষ্যণীয়

কুম্ভ : ব্যবসা অথবা স্বাধীন প্রফেশনে অনুকূল। শনি, রবিবার অশান্তির সৃষ্টি হতে পারে।

মীন : সন্তান স্থানীয় কারোর জন্য চিন্তা হতে পারে ব্যবসা, অথবা কাজের পসার বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু বুধবার কোন বিতর্কে না যাওয়াই উচিত।

শ্রীমাণিক্য

আগামী সংখ্যায় ভাদ্রে

"সাংবাদিকতাই জীবনের লক্ষ্য—বলেছিলেন ১৯৩৮ সালের বেতার ভাষণে।

৫০ নট আউট

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

বাবা সিপাহী বিদ্রোহের সাক্ষী। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে ইংরেজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রিপোর্ট পাঠাতেন কাগজে। তাঁরই ছেলে কাগজে লিখলেন—রাজপুরুষের সঙ্গে বিচারপতির মাথা-মাখি ভাল নয়। ছেলেকে জেলে যেতে হল। আগেই স্যার তেজ-বাহাদুর সপরু বলেছিলেন, তুষার—এ লেখা কিন্তু তোমায় ভোগাবে।

১৮৫৮ আর ১৯৩৫—বাঙালীর ইতিহাসের দুটি শতাব্দীর দুটি সময়-ফলক। এই দুই ঘটনার দুই প্রান্তে দুজন নির্ভীক সম্পাদক। কাগজের নাম অমৃতবাজার পত্রিকা। বাবা শিশিরকুমার ঘোষ উনিশ শতকের শেষ দিককার প্রায় অর্ধেক জুড়ে যে-ধারার অন্যতম প্রধান প্রবাহ—আজ বিশ শতকেরও বারো আনা পার হয়ে এসে শতাব্দীর শেষ সিকিতেও তুষারকান্তির হাতে সে-তরঙ্গ অপ্রতিরোধ্য।

ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য।

আমাদের দেশে এমন ইতিহাসজয়ী ঘটনার আর কোন উদাহরণ নেই। অন্য দেশেও আছে কিনা জানি না। বঙ্কিমচন্দ্রের সময়কার শিশিরকুমার শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ফিল্ড রিপোর্টার হিসাবে সাংবাদিকের গাইড লাইন তৈরি করলেন। যতটা দৃঢ়ভাবে একজন সম্পাদকের শাসকের সঙ্গে মাথামাথি এড়িয়ে চলা

উচিত তার নজির সৃষ্টি করলেন তিনি। সম্পাদক কেমন হওয়া উচিত নীল চাষীরা তাঁর কাজে তা জানলো।

অনাড়ম্বর, নির্ভীক, কৃশকায় এই বাঙালী গৃহকর্তার বাড়িতে রাজা-মহারাজারা আসতেন। আসতেন সাধারণ মানুষ। ওঁদের বাড়িতে রবিবার মাংস হত। মাথাপিছু চার টুকরো। কথা বলতে বলতে তাঁর ছেলে তুষারকান্তি অনেক কথাই মনে আনবার চেষ্টা করছিলেন। অল্প বয়সে পিতৃহীন। বালক বয়সে দেখেছেন—গোখলে, তিলক—বাবা-কাকাদের সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। আসছেন গান্ধীজী। জওহরলাল।

সাধারণের প্রতিনিধি হওয়া কঠিন জিনিস। বাংলার নব-জাগরণের দিনে অনেকেই ইংরেজ শাসনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। অরাজকতা এসেছিলো—দিল্লি দুর্বল হয়ে পড়ায়। তারপর ইংরেজ এসে ডাকঘর, রেললাইন, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল দিল। এই সময়ে বাঙালীর মনীষা ইংরেজের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নানা খাতে সমৃদ্ধ হয়েছে। শিল্প, শিক্ষা, ব্যবসা, প্রশাসনে বহু বাঙালী কৃতী হয়েছেন।

কিন্তু এই পরিবার বেছে নিয়েছিলো কঠিন পথ। গণতান্ত্রিক চিন্তার অন্যতম ভিত্ সংবাদপত্রের পত্তন ও তাকে প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর ঘোষ ভাইয়েদের প্রধান অবদান। ওঁরা ব্যবসায়ে যাননি। কেননা, সংবাদপত্র তখনও না-ব্যবসা—না-শিল্প—বরং বলা যায় একটি কঠিন পরীক্ষা। এই সময় থেকেই শিশির-কুমার-মতিলাল-হেমন্তকুমার এই ব্রত নিয়ে এগোতে গিয়ে কণ্টকের পথ না মাড়িয়ে বরং ঔদ্ধত্যের কাঁটার মুকুট স্বেচ্ছায় মাথায় পরেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময় থেকে আজ এই ১৯৭৪এ একশো চল্লিশ বছর জুড়ে শিশিরকুমারের প্রবাহ তুষারকান্তিতে সমান ধারায় বয়ে চলেছে। এই ব্যাপ্ত প্রবাহকে এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে বলা কঠিন। তুষারকান্তি ঘোষ অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক হয়েছেন পঞ্চাশ বছর। সম্পাদক হওয়ার আগেও তিনি জন্ম থেকেই এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। অমৃতবাজার পত্রিকা গত শতাব্দী থেকেই বাঙালীর জীবনে ইতিহাস। পত্রিকা বলতে ভারতের বাইরেও গত শতাব্দী থেকেই কাগজটিকে বোঝায়। একবার 'ইংলিশম্যান' কাগজ সখেদ ঈর্ষা বলেছিল, সরকার কেন এই 'নেটিভ' পত্রিকাকে এত গুরুত্ব দেন। চুরুট করে পুড়িয়ে ফেললেই পারেন। কিন্তু গুরুত্ব যে কী অপরিসীম একটি ঘটনাতেই বলা যাবে—ভূপালের নবাব ইংরেজ রেসিডেন্টের অত্যাচারে কাহিল হয়ে ছদ্মবেশে শিশিরকুমারের সঙ্গে দেখা করে বলেছিলেন—আপনি যদি একটু লেখেন তাহলেই অবস্থা পাল্টায়।

শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ, শ্রীমতী বিভারাণী ঘোষ, তাঁদের প্রপৌত্রীকে কোলে নিয়ে।

সকল কাজের প্রতিই আন্তরিক ভালবাসা থাকা, গুরুত্ব প্রদান করা যে একান্ত প্রয়োজনীয় এই শিক্ষা পেয়েছিলাম, যে শিক্ষা কাজকে এগিয়ে দেয় এবং মানুষ হিসেবে করে পরিণত। অহরহই এই ধরনের ঘটনা ঘটতো, যা দেখে আমরা অনুপ্রাণিত হতাম। নিজের কাজ মনে করে সকল কাজ যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে করতাম। আমাদের মধ্যে এই আন্তরিকতা থাকার আর একটি বড় কারণ হল, তুষারবাবু সকল কর্মীদের নিজের বাড়ীর মানুষ বলেই মনে করতেন। প্রভু-ভৃত্যের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এই মহৎ গুণটি আমি তুষারবাবুর দাদা নীহার-বাবু, গোপালবাবু, মৃণালবাবু, পীযূষবাবু প্রত্যেকের মধ্যেই দেখেছি। এই মধুর সম্পর্কটি থাকার ফলে আমরা নিজে থেকেই অনেক কাজ করেছি। যেমন, সালটা আমার মনে নেই, লবণ সত্যাগ্রহের পরে একদিন রবিবার দেখে আমি ও আমাদের নিউজ এডিটার রবীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মশায় সিনেমা দেখতে যাই। ছবি চলতে চলতে হঠাৎ বন্ধ হয়ে পর্দায় একটি লেখা ফুটে উঠলো : মহাত্মা গান্ধী রিলিজড। সিনেমা হল মহাত্মা গান্ধীর জয়ধ্বনিতে ভরে উঠলো। তখনই আমরা ফিরে এসে গোপালবাবুকে বললাম, টেলিগ্রাম বের করতে হবে। উনি রাজী হলেন। পরদিন সকালে আমাদের পত্রিকা মারফৎ মহাত্মা গান্ধীর মুক্তির সংবাদ প্রচারিত হল। অন্য কোনো পত্রিকা টেলিগ্রাম বের করেনি। তখনকার দিনে রবিবার অফিস বন্ধ থাকতো ফলে সোমবার কাগজ প্রকাশিত হত না।

এইরকম অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ খবর আমরাই প্রথম প্রকাশ করি। এই মুহূর্তে আর একটি মনে পড়ছে। তখন সুটেনে অষ্টম এডওয়ার্ডের সিংহাসন ত্যাগ নিয়ে জোর গুঞ্জন চলছে। একদিন রাত্রি দুটোয় পর আমাদের লন্ডনের সংবাদদাতা মিঃ কাবাডির টেলিগ্রাম এলো। অষ্টম এডওয়ার্ড সিংহাসন ত্যাগ করেছেন। নাইট এডিটার ছিলেন দুর্গেশ নিয়োগী মশায়। তিনি এডিট করার পর হেডিং করে রিপোর্ট প্রেসে দিলেন এবং ঠিক তার পরেই খবর এল, সিংহাসন ত্যাগের খবর ছাপা চলবে না। কপি ফেরৎ দিতে হবে। নিরুপায় দুর্গেশবাবু সেই রাত্রে তুষারবাবুকে খবর দিলেন। কাজের জন্য তাঁকে সব সময়েই পাওয়া যেত। শুনে তিনি বললেন, 'তার' যখন পেয়েছি এই খবর ছাপতেই হবে। ইতিমধ্যে পিওন কপি ফেরৎ নেওয়ার জন্য হাজির। কপি তাকে দেওয়া হল ঠিকই। কিন্তু পরদিন সকালে আমাদের কাগজে প্রকাশিত হল অষ্টম এডওয়ার্ডের ঐ সিংহাসন ত্যাগের খবর।'

তখন ১৯৩০ সাল। সত্যাগ্রহ চলছে। অন্যদিকে বিপ্লবীরাও বিরামহীনভাবে তাঁদের কাজ করে চলেছেন। সংবাদপত্র চালানো সেই সময়ে খুবই দুষ্কর ছিল। একটু বেচাল হলেই বিদেশী শাসকের কোপ নেমে আসতো। অথচ সকল সংবাদ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই সংবাদপত্রের কাজ। এই বিষয়ে তুষারবাবু যথেষ্ট সাহসের

পরিচয় দিয়েছিলেন। দক্ষিণেশ্বর ষড়যন্ত্র মামলার প্রথমদিকে দক্ষিণেশ্বরে যে ধরপাকড় হয়, তার রিপোর্ট এনে রিপোর্টার জানিয়ে গেল যে, পুলিশ অফিসাররা এই রিপোর্ট ছাপতে নিষেধ করেছেন। দোর্দণ্ড প্রতাপ-শালী স্যার চার্লস টেগার্টের এই হুকুম। সংকট দেখা দিল। এতবড় একটা খবর, কাগজে না দেওয়াও প্রকৃতপক্ষে অন্যায়। তুষারবাবু তখন বুদ্ধি করে প্রেস অফিসার ব্যারেট সাহেবকে ফোন করলেন। ব্যারেট সাহেব জানালেন, সার্চ হয়েছে ধরপাকড় হয়েছে, এ খবর ছাপা যেতে পারে।

ছাপা হল। পরদিন সকালেই টেগার্ট সাহেবের চক্ষুস্থির। ফোনে তুষারবাবুকে ডেকে পাঠালেন। তুষারবাবু গিয়ে জানালেন, প্রেস অফিসারকে জিজ্ঞাসা করে এবং তাঁর অনুমতি নিয়েই ওটা ছাপা হয়েছে।

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মৃত্যুর পর আমার জেলের এক বন্ধু, প্রভাস-চন্দ্র দে এসে দেশপ্রিয় সম্বন্ধে একটি কবিতা দিয়ে ছাপতে বললেন। কবিতাটি দেশপ্রিয়র মৃত্যু নিয়ে ইংরেজ কবি টেনিসনের 'ইন-মেমোরিয়াম' কবিতার অনুসরণে লেখা। একটা লাইন তাতে ছিল 'হোয়েন ডার্কনেস ট্রাম্পেট শিল্ড।' কবিতাটি ছাপা হতেই টেগার্ট সাহেব ফোনে তুষারবাবুকে ডেকে পাঠালেন। তুষারবাবু গেলেন এবং ফিরে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কবিতাটি কে প্রেসে দিয়েছে।

আমি আমার দোষ বুঝতে পেরেছি এবং মাথা নিচু করে জানালাম, আমিই ও কাজ করেছি। তিনি কিছু না বলে চলে গেলেন।

আমি আমার কর্মজীবনে একটা বিষয় লক্ষ্য করেছি, তা হল আমাদের সমস্ত কাজের, দোষের ফল, ক্ষেত্রবিশেষে তা যত কঠিনই হোক না কেন, ভোগ করতেন নিজেন। বাইরের কোনো উত্তাপই আমাদের স্পর্শ করত না। সবকিছু তাঁর ওপর দিয়েই যেত। এবং তার জন্য কোনোরকম দোষারোপ তিনি আমাদের করতেন না। সবকিছু তিনিই মাথা পেতে নিতেন। কিরূপ, তা এই ঘটনায় উল্লেখে বোঝা যাবে।

মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট বার্জসাহেবকে হত্যার অপরাধে প্রদোষ ভট্টাচার্জির ফাঁসির হুকুম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই বিষয়কে কেন্দ্র করে পত্রিকায় এক তীব্র সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় এবং প্রকাশিত ঐ সম্পাদকীয়কে কেন্দ্র করে আদালত অবমাননার দায় এসে পড়ে তুষারবাবুর ওপর। বিচার চলাকালীন রিপোর্টে আমার করা কয়েকটি হেডিংও ঐ অবমাননার মধ্যে এসে পড়ে এবং এর জন্য বোধহয় কিছু জরিমানাও দিতে হয়েছিল। কিন্তু আদালত অবমাননার মামলাটির নিষ্পত্তি সহজে হয়নি। কাগজে প্রকাশিত ঐ লেখায় বলা হয়েছিল, যদি বড় বড় সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে হাইকোর্টের জজদের ঘনিষ্ঠ মেলামেশা থাকে, তাহলে স্বাধীনভাবে মামলার রায় দেওয়ার ক্ষমতা জজদের থাকবে না। যদিও কখনো কোনো জজ ন্যায়সঙ্গতভাবে কাউকে শাস্তি দেন, তবু সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে তার 'দহরম মহরম'কে কেন্দ্র করে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামীর মনে একটি সন্দেহ দেখা দিতে পারে, ন্যায়বিচার থেকে সে বুঝি বঞ্চিত হল।

'বাই দ্য ওয়ে' প্যারাতে এইসব লেখা হয়েছিল এবং লিখেছিলেন একজন ব্যারিস্টার। যে সহযোগী সম্পাদক এটা প্রুফে দিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন হাইকোর্টের

উঠিল। কেসটি সারা দেশে একটি চাঞ্চল্য এনে দিয়েছিল। স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু তুষারবাবুর পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। এক-জন বাঙ্গালী জজ, মন্মথ মুখোপাধ্যায় বলেন, তুষারবাবু নির্দোষী। কিন্তু চীফ জাস্টিস স্যার হ্যারল্ড ডার্বিসায়ার সমেত অন্যান্য জজেরা তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে ক্ষমা চাইতে বলেন। কিন্তু তুষারবাবু ক্ষমা চাননি। তার কারণ, অসংযত ভাষায় লেখা হলেও, যা বলা হয়েছে তা ন্যায়সঙ্গত—এই ছিল তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস। বিচারে তাঁর শাস্তি হল, তিনমাস জেল। আর একজনকেও এক-মাসের জন্য কারাবাস ভোগ করতে হয়। সম্পর্কে তিনি তুষারবাবুর মামা—নাম, ভড়িৎকান্তি বিশ্বাস। তিনি ছিলেন প্রিন্টার এবং তুষারবাবুর মত তিনিও ঐ রচনার বিষয়ে কিছু জানতেন না। উপরন্তু কোনো রচনার পরিবর্তন করার বিন্দুমাত্র ক্ষমতাও তাঁর ছিল না। হাইকোর্টের রায় বেরোবার পর তিনি ভীষণভাবে মুষড়ে পড়েছিলেন। ঘটনার কারণটা ছিল সম্পূর্ণ আত্মদা এবং চমকপ্রদ। ভড়িৎবাবু আফিং বিনা চলতে পারতেন না। অথচ পুরো একটি মাস। যাই-হোক, জেলে যাতে আফিং পাওয়া যায়, তার ব্যবস্থা সেদিন তুষারবাবু করেছিলেন। টেবিলে টেবিলে গিয়ে তিনি যে বৈঠকী গল্প জমাতেন, তার মধ্যে এই আফিং বিষয়টি লুকোনো হয়েছিল পরে। বৈঠকী গল্পে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। তাঁর সঙ্গে যাঁদের সামান্য-তম পরিচয়ও আছে, তাঁরাও জানেন কী অসাধারণ রসবোধ তাঁর, কী অসাধারণ কৌতুকপ্রিয় তিনি। প্রতিটি কথা ও বাচনভঙ্গী হাস্যরসে একেবারে আদ্যরসে টইটুম্বুর। এবং তার বেশীর ভাগটাই নিজেকে নিয়ে। একটি সভায় ভাষণ পড়তে পড়তে হঠাৎ উনি থেমে গেলেন। বললেন, মুস্কিল কি জানেন, এই সব ভাষণ-টাষণ আমি কখনোই লিখি না। সে-বিদ্যাও আমার নেই। অন্যে লিখেছেন, আমি পড়ি। তো তাঁরা মাঝে মাঝে এমন এক-একটা খটমট শব্দ বসিয়ে আমাকে বিপদে ফেলে দেন, এই যেমন দেখুন অবি-মৃষ্যকারিতা না কি যেন একটা লিখেছে, যার সঠিক উচ্চারণ করা আমার অসাধ্য। সারা সভা তুমুল হাসিতে ফেটে পড়ল।

আসলে সবটাই অভিনয়। কৌতুক। এবং অসাধারণ এই গুণটি থাকার ফলে এই বয়সেও তিনি বিধ্বস্ত নন, বিমর্ষ নন। ৫০ বছর আগে যেমন দেখেছিলাম, আজও ঠিক তেমনই আছেন। কথায়-বার্তায়, আহারে-বিহারে, পোশাকে-আশাকে—ঠিক তেমনই। একজন খাঁটি বাঙ্গালী। যা একালে দুর্লভ। পরস্পর মুখ দেখলেই তো এখন সব সাহেব হয়ে যায়। এই লেখা লিখতে গিয়ে বারবারই মনে হচ্ছে এইতো সেদিন তুষারবাবু সম্পাদক হলেন, কিন্তু দেখতে দেখতে ৫০ বছর পূর্ণ হয়ে গেল। দীর্ঘ এই ৫০ বছরের পথ মোটেই সুগম ছিল না। অসংখ্যবার তাঁকে নানান ঝড়-ঝাপটার মধ্যে পড়তে হয়েছে। কিন্তু তাঁর অসাধারণ ধৈর্যশীলতা ও বুদ্ধিমত্তায় সেগুলি পত্রিকার কোনো ক্ষতিসাধন করতে পারেনি। বিদেশী শাসকের পোষ্য এদেশের কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ আমাদের পত্রিকাকে সব সময়েই দাবিয়ে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করতো। তারকেশ্বর সত্যাগ্রহের সময় থেকেই এই ঘটনার সূত্র যখন সম্পাদক ছিলেন গোপালবাবু।

তুষারবাবুর আমলে দু-দুবার এই ধরনের জন্য চেষ্টা করা হয়েছিল। তার মধ্যে স্বিতীয়বারে নেতৃত্ব হয়েছিল কংগ্রেসের সাহায্যে এই আক্রমণটা, যতদূর মনে পড়ে, যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশের পর করা হয়েছিল। প্রায় বছর দুই আগে এক ইংরাজকে তুষার-বাবু বিপ্লবী রাজবন্দীদের মুক্তি প্রসঙ্গে তাঁর নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেছিলেন যে, তরুণ বিপ্লবী বন্দীদের এখনই মুক্তি দেওয়া সরকারের উচিত। যাঁরা অনেকদিন ধরে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত তাঁদের বিষয়ে পরে বিবেচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। এই কথা তিনি সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে বলেননি। বলেছিলেন ইংরেজ বণিক সম্প্রদায়ের একজনকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ-যোগ্য বন্দীমুক্তি প্রসঙ্গে মহাত্মাজীও ঠিক এই মতামত জানিয়ে ছিলেন বড়লাট বাহা-দুরকে।

একথা সকলেই জানতেন তুষারবাবুর ঐ মতামত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। পত্রিকা চিরকালই সকল রাজবন্দীদের মুক্তির দাবী জানিয়ে এসেছে। কিন্তু যাঁদের লক্ষ্য পত্রিকাকে হীন প্রতিপন্ন করা, তাঁরা কোনো যুক্তিই মানতে চান না—যদিও এঁদের সঙ্গে জনসাধারণের কোনো যোগ ছিল না। পত্রিকাকে বয়কট করার জন্য তাঁরা ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট হলে একটি সভা ডাকলেন। সেই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন শ্রীশরৎচন্দ্র বসু মহাশয়। আর কোনো নামকরা কংগ্রেস নেতা ছিলেন বলে মনে পড়ছে না। আর হ্যাঁ, হলের অধিকাংশই ছিল ভাড়াটে গুণ্ডা।

শরৎবাবু বক্তৃতা দিলেন। কিন্তু কি সি চ্যাটার্জি পত্রিকা সম্বন্ধে কিছু বলতে উঠলেই গুণ্ডারা হৈ-হট্টগোল করে সভা পণ্ড করার চেষ্টা করলো। কিছুই বলতে পারলেন না তিনি। তাই দেখে তুষারবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র প্রফুল্লকান্তি সভাপতির মত নিয়ে কিছু বলার জন্য এগিয়ে যেতেই গুণ্ডারা তাঁকে শারীরিকভাবে আঘাত করতে থাকে এবং তাই দেখে আমি কালবিলম্ব না করে এগিয়ে যাই ও ওদের হাতে নিগৃহীত হই। ছুটে গিয়ে শরৎবাবুকে বলেছিলাম, ছেলেটিকে ওরা মারলো, আপনি রক্ষা করার চেষ্টা করলেন না কেন? শুনে তিনি অসহায়ভাবে একবার আমার দিকে আর একবার ওদের দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করলেন। যাইহোক, সভা পণ্ড হয়ে গেল। স্বার্থান্বেষীদের উদ্দেশ্য সফল হল না।

পত্রিকা যেমন চলছিল, তেমনই চলতে লাগল। কখনোই কোনো দিক দিয়ে থেমে থাকেনি। বস্তুত তুষারবাবু তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় থামতে দেননি। কিন্তু একটি জিনিসকে তিনি জানি না কোন্ দৈববলে থামিয়ে রেখেছেন—সেটি হল তাঁর বয়স। এখনো অনেক কিছু করার ক্ষমতা রাখেন তিনি।

১৯২৮ সালে সম্পাদক হিসেবে যে কর্ম-প্রবাহের সূত্র, ১৯৭৮-এ তার বয়স ৫০। দীর্ঘপথ, কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস, তুষারবাবু সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমা করবেনই।

নিষিদ্ধ ফল

সুনীল জানা

এখন আমাকে হিসেবটা একবার আগা-গোড়া মিলিয়ে দেখতে হবে। ওরা আর কেউ হয়তো এটা করতে চাইবে না। কিংবা সাহস পাবে না। বরং ভয় পাবে। আমিও ভয় পাচ্ছি। কাল থেকে আমি একটা আশ্চর্য আশংকা নিয়ে অপেক্ষা করে আছি। এবং সেই থেকে শুধু প্রস্তুত হচ্ছি মনে মনে। কাল যখন শিয়ালদা স্টেশনের ঘড়িতে দ্বিতীয়বার সাতটা বাজতে দেখি, আমার মনে হয়েছিল আমি ওদের কাউকে চিনি না। স্টেশনের বাইরে ডিসেম্বরের সন্ধেটা কুয়াশায় ভারি হয়ে উঠেছিল নিচুতেই। তবু ওদের চোখে-মুখে অন্য কিছুর ভারি ছায়া পড়েছিল। সকাল সাতটার তুলনায় যা একেবারে বিপরীত। মনে হয়েছিল, কয়েক ঘণ্টার এই দিনটা শেষকালে সবাইকে ঠকিয়েছে। তখন বেশি কিছু ভাবতে ভালো লাগে নি। ভেতরে ভেতরে খুব অস্বস্তি বোধ করছিলাম। আসলে আমার ভয় করছিল। তাই ওদের কাছ থেকে সরে আসতে চেয়েছিলাম তখন। একলা হতে চেয়েছিলাম।

ওরাও আর দেরি করেনি। একলা হবার দরকার বুঝি ওদেরই বেশি ছিল। দলটা ভেঙে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাওয়ার আগে ওরা বারবার আমাকে বলেছিল, ছবিগুলো পরের দিন আনিস কিন্তু। খুব আসবে হইলো।

আমাকে ওরা সাক্ষী মেনেছে। আমাকে এবং আমার ক্যামেরাটাকে। কাল ওরা কৃপণের মত লোভী হয়ে উঠেছিল। কালকের দিন-টাকে ওরা আলাদা রকম গড়তে চেয়েছিল। কেউই তার কোন অংশটুকু হারাতে চায়নি। বারো ঘন্টা সময়ের বিচিত্র টুকরোগুলোকে কাঙালের মত খুঁটে খুঁটে সকালে ভাণ্ডার ভরতে চেয়েছে। নিজেদের স্মৃতিকে ওরা হয়তো সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেনি। প্রত্যক্ষ স্থায়ী দলিল হাতে হাতে পাবার আগ্রহে আমার ক্যামেরাকে ওরা বেশি নির্ভরযোগ্য মনে করেছে। আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। ক্ষণে ক্ষণে ওদের ইচ্ছা পালন করে গেছি। এই তো ছবিগুলো তৈরি আমার হাতে। আজ রোববার। সোমবার ইউনিভার্সিটির করিডোরে বা ক্লাসরুমে ওদের হাতে ওগুলো পৌঁছে করে দেব। কিন্তু, আমি ভয় পাচ্ছি, ওরা বোধহয় খুশি হবে না। ওরা ভীষণ ভুল করেছিল। এমনটা হবে ওরা ভাবতো না। কেউ ভাবতেই পারেনি। এখনো হয়তো ভাবছে না। কিন্তু ছবিগুলো হাতে পেয়ে ওরা যদি একবার সবটা ভাবতে চায়, ছবির টুকরোগুলো জুড়ে জুড়ে যদি পুরো দিনটার একটা সম্পূর্ণ ছবি গড়তে যায় অসতর্কভাবে, আমি জানি না তখন ওরা কি করবে। আমি কিন্তু নিখুঁত ছবি তুলেছি, স্পষ্ট যথার্থ ছবি। এই একদিনের এলবামটা

ক্যামেরা নিয়ে অনেক কসরৎ করে গেছি। ওরা অবশ্য নজরই দেয়নি। তখনগানের পালা চলছিল। একে একে সবাই গাইছিল। আশ্চর্য কেউ যেন খারাপ গাইছে না। আমি শুধু শুনছিলাম। শুনতে শুনতে কখন যে ওদের এই দ্বিতীয় ছবিটা নিয়েছি, কেউ টের পায়নি।

পরের ছবিটা তোলা হয়েছে একেবারে নির্দিষ্ট স্টেশনে নেমে। সেই উচ্ছল মুখের ভিড়, সেই বোহিসেবী উচ্ছ্বাস। উচ্ছ্বাসটা এখন আরো বেড়েছে। মাথার ওপরে বড় বড় অক্ষরে স্টেশনর নামটার স্পষ্ট ঘোষণা সকালের মিষ্টি রোদে তখন চারদিকে ভরে গেছে, চারপাশের সবকিছু উজ্জ্বল করে তুলেছে, এদের আনন্দ এদের বন্ধুত্বের এই বিচিত্র স্বাক্ষরের খসড়াটাকেও জীবন্ত করেছে।

এবং এরপরই চমৎকার একটা ল্যাণ্ডস্কেপের মতো সুন্দর সেই বাড়ির ছবিটা। ইতিমধ্যে সবাই স্টেশন ছাড়িয়ে নির্জন গ্রাম্য-পথটাকে চমকে দিয়ে খানিক হেঁটে এসেছে। পথ সামান্যই। দুধারে অজস্র গাছপালা পশুপাখি বিল পুকুর আর আলোছায়া। মাঝে মাঝে ছোটখাটো ঘরবাড়ি। কখনো কখনো পথচলতি দুএকজন লোক। এবং বাকিটা নির্জনতা। হাতে হাতে জিনিসপত্র নিয়ে হৈ-চৈ করে সেই নির্জনতা ভাঙতে ভাঙতে সবাই এগিয়েছে। তারপর ঠিক সামনেই বাংলোটা। একেবারে রাস্তার গায়ে। আনন্দে সবাই অমনি গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠেছে।

আমাদের তোলা ছবিটার মতোই বাংলোটা, অবিকল আর একটা ছবি। পরিচ্ছন্ন সাজানো সুন্দর। চারপাশ ঘিরে বিরাট আয়তনের মাঝখানে বাংলোটা খুব ছোট না হলেও কেমন একটুকরো মনে হয় যেন। বাংলোটাকে কেন্দ্র করে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে আছে অজস্র গাছগাছালি বাগান দিঘি এবং স্বপ্নের মত সবুজ ঘাস ঢাকা বেশ খানিকটা খোলামেলা মাঠ। তারই একপাশে আবার অনেকগুলো গাছে ছাওয়া একটা বাঁধানো গোল বেদি। অনেক অনেক আয়োজন। এমনটা হবে ভাবা যায়নি। অথচ এমনটা ছাড়া অন্যকিছু সেই মুহূর্তে ভাবা যাচ্ছিল না। চারপাশে একবার মাত্র চোখ বুলিয়ে নিয়ে সবাই একনিশ্বাসে দৌড়ে চলে গেছে বেদিটার কাছে। চারপাশ থেকে তার উপর লাফিয়ে উঠে পড়েছে। ছবিটা নেওয়া পর্যন্ত কেউ অপেক্ষা করতে পারেনি।

ছিপছিপে শ্যামলী খুশিতে এরকম ফেটে পড়ে প্রস্তাব করেছে এই মাঠটায় সবাই বাজি রেখে দেড়ড়বো কিন্তু।

অরুণের ইচ্ছে, অনেকদিন পরে এই দিঘিটায় প্রাণভরে সাঁতার কাটা যাবে।

আশিসের বক্তব্য, গাছে চড়ার অভ্যেসটা এই বেলা করে নিতে হবে।

চৈতালির গলায় গান, অনেকগুলিয়ে উঠেছে, কোথাও আমার হারিয়ে যেতে নেই মানা—

সুনির্মল অমনি টিপ্পনি কেটেছে, দেখো যেন আবার গরু খোঁজা খুঁজতে না হয়।

সকলে সরে হাসতে হাসতে সঞ্জয় এবার প্রস্তাব দিয়েছে, আজকের ব্রেকফাস্ট এখানেই সারবো আমরা। কি আছে বার করো সব ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে।

বাছা বাছা ভুল কোনকিছু এরা এনেছিল কিনা, তখন ভাবিনি। দেখেছি সেসব ঝোলাঝুলি ঝেড়ে বেরিয়েছে অনেক খাবার-দাবার—রুটি মাখন সন্দেশ বিস্কুট কলা, এমনকি তেলেভাজা পর্যন্ত। সান্তনা তাই চোখ বড় বড় করে প্রায় কপিয়ে উঠেছে, ওমা —এ আবার কি? তেলেভাজা আনলো কে আবার

ইন্দ্রনীল বলেছে, কেন আপত্তি কোথায় আজ যখন ক্লাসের গণ্ডি ছেড়েছি, তখন কোন নিষেধই মানবো না। খাবারেও না। এই নিষিদ্ধ খাবারও খাবো সবাই।

এ সেই নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার মতো

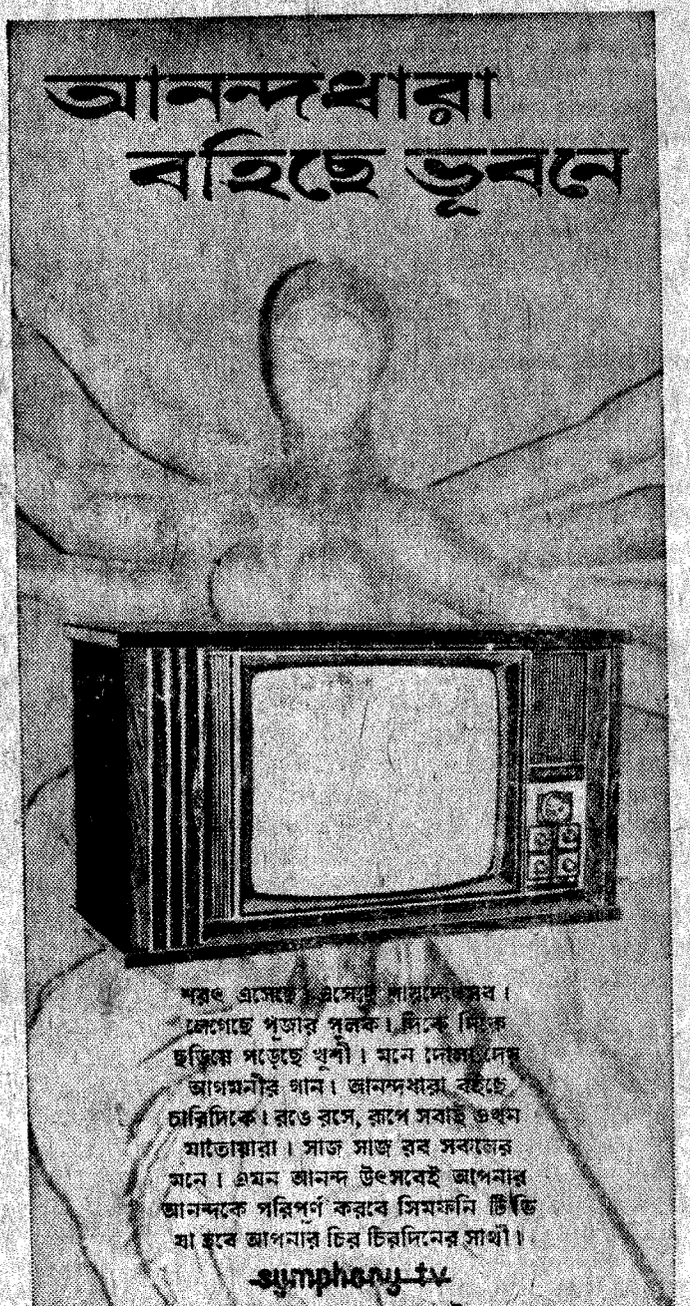

পিনাকী চট্টোপাধ্যায়

কোনদিন জঙ্গলে

॥ ৪ ॥

মাঝে দুটো দিন বাদ দিয়ে আবার আমাদের ফিরে পেয়ে থেড় ডাকবাংলোটা হৈ-হৈ করে উঠল। শহরে রাত দশটায় কোন রাতই না, কিন্তু পালামৌর এই জঙ্গলে, সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে যেখানে বারো ঘন্টার টানা লোড শেডিংয়ের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, সেখানে সন্ধ্যা হলেই আঁধার ঘনায়। ওরা জানত আজ আমরা ফিরব। আরো জানত পাগলা দুটো সময় কান্য। রাতফাত কেয়ার করে না। উঠল বাই তো জঙ্গলমে যাই। তাই সবাই জেগে বসেছিল। সেই কালো অপুষ্ট গুঙ্গা ছেলেটা ছুটে এসে গেট খুলে দিল। পেছনে পেছনে ছুটে এসেছে চৌকিদার রামদাসের ছেলে। রামদাস তার সেই আদি অকৃত্রিম হাফ প্যান্ট গেঞ্জির উর্দিতে সেজে ডাকবাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে। সিপাহী রাম আজ একটা রঙিন লুঙ্গির ওপর গেঞ্জি চড়িয়েছে। গলার স্বর ঈষৎ জড়ানো। বোধ-হয় আমাদের জন্য অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে বোতলটাক গলায় ঢেলে টাইট হয়ে রয়েছে। এই সময় বাংলোর পুবের বারান্দার কোণে জাকাবাণ্ডা গাছটার ডালে একটা পাখী ডেকে উঠল। চাঁদ প্রায় মাথার ওপর। বাতাস সামান্য শীতল।

হাট থেকে দুটো মুরগী আগেই কিনে রেখেছিল রামদাস। দাম বলল পঁচিশ টাকা। দামটা আদায় করে চলে গেল ডিনার বানাতে। কিন্তু আগাম টাকা ও পেল কোথায়? সে প্রশ্ন করে কোন লাভ নেই। এই জঙ্গলের পি সি সরকার চৌকিদার রামদাস পারে না এমন কোন কাজ নেই। যা চাও তাই পাবে। তবে দক্ষিণা ঠিকঠাক বুঝিয়ে দেওয়া চাই।

প্রসাদ আমাদের সুটকেশ দুটো ঘরে তুলে দিল। সিপাহী রাম তিনটে বেতের চেয়ার আর একটা ছোট টেবিল ঘর থেকে পুবের বারান্দায় নিয়ে সাজাল। গুঙ্গা ছেলেটা এসে চুপচাপ বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে দাঁতে নখ খুটছিল। এক ধমকে তাকে বিদেয় করে ছাড়ল সিপাহী রাম।

—দেখতে পাচ্ছিস সাবরা টায়ারড, এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ভাগ।

তুলসী মাহাতোও বনের সিপাহী। তবে নেহাতই দেহাতী। এই পার্থক্যটা রাম সুযোগ পেলেই দু-চারটা ইংরাজির ফোড়ন দিয়ে বুঝিয়ে ছাড়ে। ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করল: একদম খাঁটি জিনিস। আনব স্যার?

দশ টাকায় পাঁচ বোতল মহুয়া। প্রসাদ তার ভাগেরটা আগে ভাগেই চেখে নিয়ে গেল। খবরটা রাম দিল। ঠাণ্ডা বাতাসে খোলা বারান্দায় চাঁদের আলোয় বসে ভাজা মুরগী দিয়ে মহুয়া। সিপাহী রামের গলাটা কেমন ভেজা ভেজা, উদাস উদাস। জানেন স্যার, গত রাতে এক জোড়া সম্বর এসেছিল। দু পহরে ঘুম ভেঙে গেল। পিসাব করতে বাইরে বেরিয়ে দেখি এই বহেড়া গাছের নীচে কারা যেন খুটুর খুটুর করছে। ভাবলাম কিনা কি। সনদ হোল। এগিয়ে দেখি এক জোড়া। ওরা তো বহেড়া খেতে দারুণ ভালবাসে।

—কি মনে হয়, আজো আসবে? নির্মল টেবিলের ওপর পা দুটো তুলে দিয়ে হাফশোয়া অবস্থায় জানতে চাইল।

—মনে তো হয় আসবে।

—আর কোন জন্তু জানোয়ার এদিক সেদিকে বেরোচ্ছে?

—বেরোচ্ছে স্যার। কাল দুপুরে বানারী নালার সাইডে ডিউটি দিচ্ছিলাম। দেখলাম বাইসনের ঝুন্দ চরছে। ঝুন্দে কচিকাচা মাদী মরদ মিলিয়ে প্রায় বিশ-বাইশটা। আর কি সাইজ। কি জেল্লা! চোখ জুড়িয়ে যায় সাব। এ আপনার বেতলার টুরিস্ট-পোষা বাইসন নয়, একজন জঙ্গলের খাঁটি আসলি চীজ।

—কাল দেখাতে পারবে?

—থাকলে স্যার নিশ্চয় পারব।

—যদি পার বকশিশ পাবে।

বকশিশের কথায় যেন রামের চোখ জোড়া চকচক করে উঠল। এক ঢোকে একটা গ্লাস সাফ করে দিয়ে বলল: একটা রিকোয়েস্ট করব স্যার?

—বল।

—এখানে আপনারাও জমি নিন না। অ্যান মেমসায়েবের মত একটা কুঠী বানিয়ে নিন। কলকাতা থেকে টুরিস্ট নিয়ে আসুন। মোটা টাকা কামাবেন। আমাদেরও দু-চার পয়সা আমদানী হবে।

নেশাটা বেশ জমেছে বোঝা যাচ্ছে: নির্মলও সিপাহী রামের প্রস্তাবে বেশ আগ্রহী। বলল, যদি এই ডাকবাংলোর আশপাশে জমি দিতে পারো তো একবার চেষ্টা করে দেখি।

: হা, হা কেন পারব না। রাস্তার উল্টো পিঠেই আমার নিজের তিন বিঘা আছে। আপনারা যদি লেন তো এক বিঘা জঙ্গের দরে ছেড়ে দেবো।

—কত পড়বে?

—হাজার টাকা চাইলে এখুনি পাই, তবে আপনাদের জন্য আটশোয় বিঘা দেবো।

ব্যাপারটা সিরিয়স হয়ে উঠছে দেখে বাধা দিলাম: টাকা না হয় জোগাড় হবে কিন্তু আদিবাসীদের জমি তো বাইরের কেউ কিনতে পারে না রাম। গভমেন্ট অ্যালাউ করবে না।

—সে সব হামার রেসপনসিবিলিটি। আমি হাওলাত নিচ্ছি, জমি বন্ধক রেখে। কোন শালা কানুন দেখাবে।

বুঝলাম সিপাহী রাম বামেলায় আছে। নিশ্চয় টাকা-কড়ির টানাটানি চলছে। নইলে এত অল্প পরিচয়ে প্রয়োজনের প্রসঙ্গ টেনে আনবে কেন। হয়তো অনেকগুলো বাচ্চা-

নিরালোক আলো ছড়াচ্ছে। দূরে শাল, পিয়াশাল, পলাশের মাঠটা তেমনিই পড়ে রয়েছে। তবে আওয়াজটা এলো কোথা থেকে ?

—এ বাবু।

এই মুহূর্তে যদি কেউ রিভলবার উঁচিয়ে বলত হ্যাণ্ডস আপ, তাহলেও বোধহয় এতটা অবাক হতাম না। এই গভীর রাতে এই নির্জন ডাকবাংলোর বারান্দায় মেয়েলোকের গলা ? মুখ ঘুরিয়ে দেখি আমার আর নির্মলের চেয়ারের পেছনে দুটি আদিবাসী মেয়ে দাঁড়িয়ে। নির্মলেরও ঘুম ভেঙে গেছে। উঠে বসতে বসতে জিজ্ঞাসা করল : কি রে, আমিন বেটা এসেছে ?

—একটা না দুটো।

—সে কি রে ! কোথায় ?

—তোর পেছনে।

দু দিক থেকে দুটো মেয়ে ততক্ষণে আমাদের চেয়ারের কাছে সেঁটে এসেছে। অসন্তোষ রোগা, পোড়া কয়লার মত বিবর্ণ, পরণের শাড়ি শত ছিন্ন। আমাদের ভয় পালানোর জন্য দাঁত বার করে হাসছে। হাসলেও কুণ্ঠিত বোঝা যায়। আমরা কিভাবে নেব, তা যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। আমরা গভীর বিস্মিত। তাই বোধহয় ওদের হাসিও মুছে গেল। অসহায়ের মত যেন বুঝে উঠতে পারছে না এই বাবু দুটো কি করবে। কি করতে চায় ?

রামদাস বিয়েল চৌকিদার। শুধু ডাকবাংলোর নয়। আশপাশের গাঁয়েরও। নইলে এত রাতে। নিশ্চয় ওর ধারণা হয়েছে আমিন শব্দটা আমরা কোড হিসাবে ব্যবহার করেছি। এক এক বাবুর এক এক রকম রীতি-ব্যবহার। কেউ খোলাখুলি কাজ করতে ভালোবাসে, কেউ আড়ালে আবডালে। ঢাকাঢুকি দিয়ে। সকলেরই হার্টের প্যালোপিটেশন, নাড়ির গতি রামদাসের মুখস্থ। জঙ্গলে ঘুরে জন্তু দেখে বেড়াচ্ছো না, জানি না তোমরা বাবুরা কেন জঙ্গলে আসো ?

কবুল করতে কোন লজ্জা নেই—ঘুরতে ঘুরতে হাঁপিয়ে উঠছিলাম। মাঝে মাঝে ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল না। দুটো বজ্জাতছেলে সারাক্ষণ মুখোমুখি—বোটানিস্ট বা মুণ্ডলজিস্ট হলেও না হয় কথা ছিল। কেন এসেছি জঙ্গলে ? কলকাতাই বা কেন ছেড়ে এলাম ? চারদিকে কামানো, না কামানো দাড়িওয়ালা মুখ, বাঁধাধরা বিবাহিত সেকস—এক অসহ্য ব্যাপার। একটি মেয়ে সটান আমার কোলের ওপর বসে পড়ল, পিঠটা হেলিয়ে দিল আমার বুকে। হিন্দীতে ফিস ফিস করে বলল—ঘরে চ বাবু।

আর একটি মেয়ে নির্মলের বুকের ওপর আধশোয়া অবস্থায় গড়িয়ে পড়ল।

জানতে চাইলাম, তোদের খবর দিল কে ?

—কেন চৌকিদার।

—তোরা কি নিজেরা আসিস ?

—চৌকিদার বললে। আসি, বাবুরা চাইলে আসি।

—কত পাস ?

—পাঁচ টাকা।

—কি করবি টাকা দিয়ে ?

—কাল ছিপাদহ হাটে যাব। চাল, ডাল কিনব, কাঁচের চুড়ি, আয়না আর চিরুনি কিনব। কপালে টিপ পরব। সাজব।

—মরদ নেই তোর ?

—আছে।

—তবে যে ছেড়ে দিলো এই রাতে ?

—কি করবে। একটা টাকা কামানোর মুরদ নেই। একটা সিনেমা দেখার না।

—সিনেমা দেখেছিস কখনো ?

—হুঁ। ডাল্টনগঞ্জে। কি দারুণ দেখতে।

—দেখালে দেখতে যাবি ?

—নিয়ে চল বাবু। তুদের তো গাড়ি আছে। যাবি আর আসবি। কাল সারাদিন তুদের সঙ্গে থাকব। এক পয়সাও দিতে হবে না।

—কেন পয়সা নিবি না কেন ?

—তাই তো নিয়ম। জঙ্গলের ট্রাক-ওয়ালারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলে তুলে লেয়। ডাল্টাগঞ্জে সিনেমা দেখায়, হুটেলে পেট ভরে খাওয়ায়। পরদিন আবার ফেলং দিয়ে যায়। এত খরচ-খরচার পর কি আর কিছু চাওয়া যায়।

নির্মল আর ওই মেয়েটি কথা বলতে বলতে বহেড়া গাছটার নীচে গিয়ে দাঁড়াল। ছায়া ছায়া অন্ধকারে ঠিক যেন এক জোড়া সম্বর ঘুরে বেড়াচ্ছে। মচ মচ করে শুকনো পাতা গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। বাতাস হালকা ভাবে ঘোরাঘুরি করছে। হঠাৎ মনে হল আরো যেন কেউ আমাদের দেখছে। পেছনে চোখ ফেরাতেই গুসার চোখে চোখ পড়ল। বারান্দার ওই কোনাটায় চাঁদের আলো পৌঁছায়নি। অন্ধকারে এক জোড়া সাদা চোখ আমাদের দেখছে। বসন্তসন্ধিক্ষণের কৌতূহলী ওই দৃষ্টির সামনে নিজেকে ভীষণ ছোট মনে হল। আমার কোলে বসা মেয়েটি কথা বলতে বলতে ঘুমে ঝিমোচ্ছে। আমার ডান হাতটা টেনে নিয়ে ওর বুকের ওপর বসিয়ে দিয়েছে। সামনের ওই মাটাটার মতই পেলব। বয়সে যুবতী হলেও, যৌবন এসেও আসেনি এই দেহে। ছোট দুটি কলি আম শাড়ির পর্দায় ঢাকা। কলকাতায় চৈত মাসে যে কাঁচা আম দিয়ে বাড়িতে টক্কের ডাল রান্না করা হয়। ওকে হাত ধরে উঠিয়ে ভিসে দাঁড়িয়ে পড়লাম। পকেট থেকে মানিব্যাগটা বার করে দশটা টাকা দিয়ে বললাম, কাল ডাল্টাগঞ্জে গিয়ে সিনেমা দেখিস, এখন যা।

যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। হাতের মুঠোয় টাকাটা। বড় বড় চোখে শুধু অবিশ্বাস। নাকে একটা দস্তার নথ। আরো ঠেলে এল কাছে—ঘরে চ বাবু।

—ঘরে যাব। কিন্তু তুই আগে বাড়ি যা।

—ক্যানে ?

—আমার দরকার নেই।

—পুলিস কি বাবু ?

—হাঁ রে। যা বলছি তাই কর।

—তবে তুর টাকা আমি নিব না।

—সে তোর যা খুশী তাই কর।

অন্ধকারেও ওর চোখের সাদা কাঁপছে। নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে। পুরু ঠোঁট জোড়া কি যেন বলতে চাইছে। হাসি, টাসি সব মুছে গিয়েছে। নেতারহাটের আর একটা মুখ আমার ভেতরে বার বার জেগে উঠছে। সব ছবিই কি বুকে আঁকা থাকে ? শরীরের নীচে চামড়ার নীচে যেখানে একটা যন্ত্র সারাদিন চব্বিশ ঘণ্টা ধুকপুক করে সেইখানে ? মুখটা কেমন বিস্বাদ লাগছে। বেশি রাতে খেয়ে হজম হয়নি। ঢেঁকুর উঠছে। ঘড়িটা টক টক। মোটটা দলা পাকিয়ে আমার গায়ের ওপর ছুঁড়ে মেরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল মেয়েটি। এত অপমান যেন এর আগে কেউ কখনো করেনি। কাজ না করে পয়সা ? ছিঃ ছিঃ। পারলে যেন থুতু দেয় আমার গায়ে। টাকাটা হাওয়ায় ধাক্কা খেয়ে বারান্দা দিয়ে গড়িয়ে ছুটে অন্ধকারে গেল মিলিয়ে। মেয়েটি আস্তে আস্তে পায়ে পায়ে বারান্দার সিঁড়ি ভেঙে জাফরাডাঙা গাছের ছায়ার ছায়ায় ওধারে নিঃশব্দে চলে গেল। আমি ঘরের ভেতরে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিলাম।

ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। সূর্য পঁয়তাল্লিশ ডিগরি অ্যাঙ্গেলে আকাশে, রামদাস চা দিয়ে গেল। ন্যাপাপো'ছা মুখ। যেন কিছুই হয়নি। কাল রাত যেন অন্য যে কোন রাতের মতই ঘটনা বিহীন। এই জঙ্গলে আবার ঘটনা কোথায়। নির্মল নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। রামদাস জানতে চাইল দুপুরে কী খাব ?

বললাম—ভাত আর আণ্ডাকারী।

আজ দুপুরে আর বেরোলাম না। খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘরে বসে দুজনেই দুটো বই পড়ছি। সিপাহী রাম একবার এসেছিল। বলে গেছে বাইসনের ঝুণ্ডেরা কল্লাসে ঘাচ্ছে। দেখা পেলেই খবর দেবে। পাঁচটা টাকা আগাম বকশিশ নিয়ে গেছে। ওর চাই টাকা, তুলসী মাহাতোর চাই টাকা। জমির ব্যাপার নিয়ে নির্মলকে কয়েকটা জরুরী কথাও জানিয়ে গেছে। আজ আর জমি নিয়ে নির্মলের বিশেষ উৎসাহ নেই। মন দিয়ে প্যাপিলন পড়ছে। প্রসাদ সকাল থেকে একবারও দেখা দেয়নি। গত কয়েকদিনের যা ধকল গেছে। তবু গোড়ার সেই রাগ রাগ ভাবটা ওর আর নেই। এখন ওর চাউনী অন্যরকম সরল। বোধহয় নিরুপায় হয়েই এদের মেনে নিয়েছে। তাছাড়া [illegible] বকশিশ নিশ্চয় পাবে—এ আশাও [illegible]। আর তো মোটে একটা দিন। কাল সকালেই আবার বাঁচির পথে। কাল রাত নটায় কলকাতার ট্রেনে।

মাঝে তিনটে নাগাদ ঘুমটা ভেঙে গেল

ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে মাউন্টব্যাটেন

করে আপনি ভারত বিভাগ রোধ করুন। জবাবে গান্ধীজী বললেন : কংগ্রেস যদি পাগলের মত কাজ করে থাকে তার অর্থ এই নয় যে আমাকে মরতে হবে। দুদিন পরে প্রার্থনা সভায় তিনি বললেন : আমি যখন দেশ-বিভাগে বাধা দিতে চেয়েছিলাম তখন দেশের লোক দেশ বিভাগ চাইত না সেইজন্য আমিও দেশ বিভাগের বিরোধী ছিলাম। এখন দেশের লোকই দেশ বিভাগ চাইছে আমার বাধা দেওয়া উচিত হবে না।

শুধু আর একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করে রাখবো।

১৯৪৭ এর ২০শে জুন বেঙ্গল লেজিস-লেটিভ এসেম্বলির অধিবেশন বসলো সদস্যদের মতামত জানবার জন্য যে তাঁরা ভবতীয় কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিতে যোগ দেবেন না নতুন ও পৃথক কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিতে যোগ দেবেন। এসেম্বলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সদস্যেরা এক যোগে ভোট দিলেন, তাঁরা ভারতীয় কনস্টিটিউ-য়েন্ট এসেম্বলিতে যোগ দিবেন না, নতুন ও পৃথক কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিতে যোগ দেবেন। এই নতুন ও পৃথক কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিই হোলো পাকিস্তান কনস্টিটিউ-য়েন্ট এসেম্বলি। বাংলার মুসলমান এসে-ম্বলি সদস্যের সেদিন স্বেচ্ছায় অন্যের বিনা প্ররোচনায় নিজেদের স্বাধীন চিন্তায় পাকি-স্তানে যোগ দিয়েছিলেন। কাজেই ১৯৭১ সালে আমরা যখন বললাম যে পাকিস্তান জবরদস্তি করে পূর্ব বাংলা দখল করে বসে আছে তখন আমরা সর্বতোভাবে অসত্য কথা বলেছিলাম। সারা ভারতের বড় বড় নেতাদের অনুসরণে কলকাতা হাইকোর্টের বড় বড় অনেক জজ ব্যারিস্টার মিটিং করে এই [illegible] পূর্ব বাংলার যোগ দিয়ে পাকিস্তানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে নিজেদের ভাগ্য রচনা করেছিলেন। তারপর হঠাৎ একদিন সকালে উঠে আমরা স্বাধীন বলা মাত্র পাকিস্তান যদি সেটা স্বীকার করতে রাজি না হয় তাহলে আইনের দিক থেকে পাকিস্তান অন্যায় কিছু করে নি। আমাদের দেশে আমরাও কাশ্মীর ও মিজো-নাগাদের ক্ষেত্রে সেই রকম ব্যবহারই করেছিলাম। তবে পূর্ব বাংলার মুসলমানরা পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চেয়ে ছিলেন এবং তারজন্য লড়াই করতে চেয়ে ছিলেন। এটাকে ওয়ার অফ সিসেশন নিশ্চয় বলা চলে কিন্তু স্বাধীনতার যুদ্ধ যাকে সাধারণত বলা হয় বাংলাদেশের যুদ্ধকে তাই বলা ঠিক নয়।

এই সম্বন্ধে আরও একটি কথা বলা দরকার। বাংলাদেশকে স্বাধীন করে দেবার জন্য আমরা ভারতীয়রা কৃতিত্বের দাবি করি এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে সেইজন্য এই সময়ে এশিয়ার মুক্তির সূর্য বলেও অভিহিত করা হোতো। কিন্তু বিনীতভাবে বলতে চাই যে লোকটির জন্য বাংলাদেশ স্বাধীন হতে পারলো—তাঁর নাম মহম্মদ আলি জিন্না। ১৯৪৭ সালের ২০শে জুন পূর্ব বাংলার মুসলমানরা জিন্নার আহ্বানে অগ্রাহ্য করে যদি পাকিস্তানে যোগ না দিতেন এবং ভারতে যোগ দিতেন এবং তারপর দশ-বিশ বছর বাদে যে-কারণে পাকিস্তান হতে বিচ্ছিন্ন হতে চাইলেন অর্থাৎ ভাষা পার্থক্যের জন্য ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতালাভ করতে চাইতেন তাহলে শেখ মুজিবুর রহমানকে আমরা বাঙালিরা কি ফুলের মালা দিয়ে পূজা করতাম না রাস্তায় কুকুরের মত গুলি করে মারার দাবি জানাতাম? প্রায় একই কারণে শেখ হয়েছিল নিশ্চয়ই সেকথা কেউ ভোলেন নি। পাকিস্তানে স্বেচ্ছায় যোগ দিয়ে তারপর পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হবার দাবি জানালে পাকিস্তান পূর্ব বাংলায় যে অত্যাচার করেছিল আমাদের ভারতবর্ষে স্বেচ্ছায় যোগ দিয়ে তারপর ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হবার দাবি জানালে ভারতবর্ষ পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানের চেয়ে বেশি না হোক কম অত্যাচার করতো না। মিজো-নাগাদের উপর আমরা যে অত্যাচার করে-ছিলাম পৃথিবীর লোক কোনোদিন সে সংবাদ জানতে পারবে না। এবং ভারতের মত শক্তিশালী দেশের সংগে লড়াই করবার জন্য ক্ষুদ্র পাকিস্তান বা পৃথিবীর কোনো দেশের কার্যকরী সাহায্য পূর্ব বাংলার লোকেরা পেতেন না। ভাগ্যবশত পূর্ব বাংলা পাকি-স্তানে যোগ দিয়েছিলো তাই খুব সহজেই স্বাধীন হতে পারলো—না হলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দূর অস্ত হয়ে থাকতো। সেই-জন্যই বললাম, পূর্ব বাংলার মুসলমানরা মহম্মদ আলি জিন্নার ডাকে সাড়া দিয়ে পাকিস্তানে যোগ দিয়েছিল বলেই সহজে স্বাধীন হোলো। ১৯৪০ এ লাহোরের পাকিস্তান প্রস্তাবে জিন্না একাধিক মুসল-মান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নই দেখেছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে জিন্নার স্বপ্নই সফল হোলো।

আর একটি প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে আমার মনে থেকে গেছে তার কোনো সদুত্তর আমি পাই নি। একথা সবাই জানেন, ভারতীয় সৈন্য পূর্ব বাংলায় যেতে না পারলে পূর্ব বাংলা স্বাধীন হতে পারে না। গোপনে যে-ধরণের সাহায্য দেওয়া হচ্ছিল তাতে একটা দেশকে স্বাধীন করা যায় না। পূর্ব বাংলা থেকে লক্ষ লক্ষ আশ্রয় প্রার্থী ভারতে এসে

স্থগিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কিছু করা উচিত এই দাবি নিয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পৃথিবীর বড় বড় রাষ্ট্রনেতাদের সংগে সাক্ষাৎ করে তাঁদের কার্যকরী কিছু করতে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু ব্যর্থ হলেন। পৃথিবীর কোনো দেশই এ ব্যাপারে ভারতকে কিছু অর্থ ভিক্ষা দেওয়া ছাড়া আর কিছু করতে রাজি হোলো না। সহা হোক মিথ্যা হোক—একথাও তখন অনেকে বলতেন যে এই লক্ষ লক্ষ আশ্রয় প্রার্থীর ভারতে আগমনও একটি ষড়যন্ত্রের ফল। এই পাকিস্তানীদের (আশ্রয় প্রার্থীরা তখনও পাকিস্তানী) ভারতে আগমনের দরুণ ভারত এদের বসবাসের জন্য পাকিস্তান থেকে জমি দাবি করে লড়াই সুরু করতে পারতো। এবং শেষকালে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে হয়তো সেই পথই নিতে হোতো যদিও তাতে বিশ্বে ভারতের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া খুব তীব্র হোতো। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীকে রক্ষা করলেন একজন পাকিস্তানী ভদ্রলোক।

তাঁর নাম জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁ—পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। তিনি ১৯৭১-এর ৩রা ডিসেম্বর ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিলেন। বাংলাদেশ যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল অরোরা ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অফ ইন্ডিয়া-তে লিখেছিলেন যে এই সুযোগটি যেন ভগবৎ প্রেরিত এবং বাংলাদেশ যুদ্ধে যোগদানের পূর্বে তিনি ইয়াহিয়া খাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর নামে একটি টোস্ট পান করেছিলেন। ইয়াহিয়া খাঁ যদি ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করতো তাহলে ইন্দিরা গান্ধী বিশ্ব জনমতে সুযোগই পেতেন না। ফলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতে পারতো না। এবং ইয়াহিয়া খাঁ এইভাবে কয়েক বছর চুপ করে বসে থেকে সারা পূর্ব বাংলাকে শ্মশান করে দিতে পারতো। লক্ষ লক্ষ পাকিস্তানী আশ্রয় প্রার্থী নিয়ে ভারতের অর্থনীতির উপরও অচিরেই গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দিত। ৩রা ডিসেম্বর ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ইয়াহিয়া খাঁ ইন্দিরা গান্ধীকে পূর্ব বাংলায় সৈন্য পাঠাবার সুযোগ করে দিলো কেন? ইয়াহিয়া খাঁ কি ইন্দিরা গান্ধীর কাছ থেকে মোটা টাকা ঘুষ পেয়েছিল? অথবা যে সব লোকের উপদেশ মেনে ইয়াহিয়া খাঁ চলতো তাদের মধ্যে কেউ কি ইন্দিরা গান্ধীর চর ছিল?

৩রা জুনের ঘোষণার পরের দিন মাউন্ট ব্যাটেন একটি সাংবাদিক সম্মেলন ডাকলেন। একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন: 'আপনার গতকালের বেতার বক্তৃতায় আপনি বলেছিলেন যে দুটি ভাগ-করা প্রদেশের সীমারেখা সম্ভবত নিশ্চয়ই বর্তমানে যেভাবে আপাতত টানা হয়েছে, সেভাবে হবে না। কেন?'

মাউন্ট ব্যাটেন জবাব দিলেন: কারণটি খুবই সরল এবং সেটি এই যে পাঞ্জাবের গুরদাসপুর জেলার লোক সংখ্যার হিসাবে শতকরা ৫০-৪ ভাগ মুসলমান এবং ৪৯-৬ ভাগ অ-মুসলমান। তবুও আপনি দেখবেন যে বাউণ্ডারি কমিশন এই জেলাটির সমগ্র অঞ্চলকে মুসলমান-প্রধান বিভাগে ফেলবেন না। সেই রকম বাংলার একটি জেলাতেও অবস্থাটি ঠিক উল্টো। সেখানে খুব সামান্য ভগ্নাংশ অ-মুসলমানের সংখ্যাধিক্য আছে। আমি নিশ্চয়ই আশ্চর্য হবো যদি দেখি যে বাউণ্ডারি কমিশন ওই জেলাটিকে সমগ্রভাবে অ-মুসলমান বিভাগে ঠেলে দিয়েছে। আমরা জেলাগুলি সম্বন্ধে শুধু একটি উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছি এবং সেটা হচ্ছে সবচেয়ে সরল উপায় যার দ্বারা প্রত্যেকটির আইন-সভার সদস্য সংখ্যা কি করে বাড়ানো যায়। আমি চাই না যে ওই সব জেলার অধিবাসীরা একেবারে চূড়ান্তভাবে ধরে নিক যে তাদের সম্প্রদায় সেখানে সংখ্যাধিক্য নয় সেই অঞ্চলেই তাদের ঠেলে দেওয়া হবে। এই সাংবাদিক সম্মেলনে মাউন্ট ব্যাটেন বাংলার যে জেলা সম্বন্ধে উল্লেখ করেছিলেন কিন্তু নাম করেন নি, মনে হয়, সেটি যশোহর জেলা।

৪৭-এর ৪ঠা জুলাই মাউন্ট ব্যাটেন বাংলা ও পাঞ্জাবের বাউণ্ডারি কমিশন নিযুক্ত করার কথা ঘোষণা করলেন। পাঞ্জাব কমিশনে রইলেন লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি মহম্মদ মুনির। বিচারপতি দিন মহম্মদ, বিচারপতি মেহেরচাঁদ মহাজন ও বিচারপতি তেজা সিং। চেয়ারম্যান বিলাতের প্রিংস কাউন্সিল স্যর সিরিল র‍্যাডক্লিফ বাংলার কমিশনে রইলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিজনকুমার মুখার্জি বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস, বিচারপতি আবু সালে মহম্মদ আকরাম, বিচারপতি সৈয়দ আবদুল রহমান। চেয়ারম্যান ওই সিরিল র‍্যাডক্লিফ।

ঠিক হোলো কমিশনের দৈনন্দিন অধিবেশনে চেয়ারম্যান র‍্যাডক্লিফ একদিনও যোগদান করবেন না। বাংলায় কমিশনের দৈনন্দিন অধিবেশনে র‍্যাডক্লিফ কখনই যোগ দেন নি। আরও ঠিক হোলো দুটি কমিশনের বিচারপতিরা যদি একমত হয়ে রায় দেন তাহলে র‍্যাডক্লিফ তাতে মোটেই হস্তক্ষেপ করবেন না বা কিছুমাত্র বদলাবার চেষ্টা করবেন না। কমিশনের সদস্যরা যদি একমত না হন তাহলেই চেয়ারম্যান নিজের মতামত বড়লাটকে জানাবেন এবং তখন তাঁর সিদ্ধান্ত মত রায় দেওয়া হবে। আরও ঠিক হোলো প্রায় এক মাসের ভিতর অর্থাৎ ১৬ই আগস্টের মধ্যে দুটি কমিশন তাঁদের রায় পেশ করবেন। র‍্যাডক্লিফ প্রতিশ্রুতি মত ১১ই আগস্টের ভেতরেই দুটি কমিশনের রায় বড়লাটের নিকট পেশ করেছিলেন। কিন্তু মাউন্ট ব্যাটেন শীল-মোহর করা খাম দুটি খুললেন না। তিনি ঠিক করেছিলেন ১৫ই আগস্ট ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজটা সমাধা হয়ে গেলে তারপর কমিশন দুটির রায় প্রকাশ করবেন। সেইমত ১৬ই আগস্ট বাংলা ও পাঞ্জাবের বাউণ্ডারি কমিশনের রায় দুটি প্রকাশ করা হয়েছিল।

১৪ই জুলাই থেকে কলকাতার বেলভেডিয়ারে—এখন যেখানে ন্যাশনাল লাইব্রেরী বাংলার বাউণ্ডারি কমিশনের দৈনন্দিন অধিবেশন বসেছিল। কংগ্রেসের পক্ষে ছিলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত হিন্দু মহাসভার পক্ষে নির্মলচন্দ্র চ্যাটার্জি, মুসলিম লীগের পক্ষে হামিদুল হক চৌধুরী ও মহম্মদ ওয়াসিম। আরও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেও অন্যান্য আইনবিদ ছিলেন।

মুসলিম লীগ তাঁদের লিখিত দাবিতে কলকাতাকে পূর্ব বাংলার অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলেন কারণ,

(১) কলকাতা বন্দরের অধিকাংশ লস্কর মুসলমান;

(২) পূর্ব বাংলার পাট সবটাই কলকাতা বন্দর দিয়ে রপ্তানি করা হয়, অতএব কলকাতা বন্দর পূর্ব বাংলা না পেলে বন্দরও ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং পূর্ব বাংলার পাটও রপ্তানি হতে পারবেনা।

(৩) কলকাতার উন্নতিতে পূর্ব বাংলার অবদান বেশি।

মুসলিম লীগ চাইলেন কলকাতা থেকে তালতলা, বেলেঘাটা, ভাঙড়, বারাসাত, বসিরহাট দিয়ে সীমারেখা টেনে দুটি প্রদেশকে ভাগ করে দেওয়া হোক।

পার্বত্য চট্টগ্রামের পক্ষ থেকে বলা হোলো তাদের মুসলমান প্রধান প্রদেশে ফেলা ঠিক হবে না কারণ ত্রিপুরা ও আসামের সঙ্গে তাঁদের যোগসূত্র গভীরতর। নোয়াখালির চারটি থানার পক্ষ থেকে দাবি জানানো হোলো যে তাঁদের যেন পশ্চিম বাংলার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়। কলকাতা-পেড়াদা-গোয়ালন্দ রেলপথটিকে পশ্চিম বাংলা কর্তৃত্বাধীনে রাখা হোচে এমন দাবিও করা হোলো।

কংগ্রেস চাইলেন দিনাজপুর, রংপুর এবং চারটি থানা বাদে মালদহ জেলা পশ্চিম বাংলার অন্তর্ভুক্ত হোক। পশ্চিম বাংলার জন্য কংগ্রেস চাইলেন ৩০,০০০ স্কোয়ার মাইল এবং পূর্ব বাংলাকে দিতে বললেন ৩১,০০০ স্কোয়ার মাইল। কিন্তু তাঁরা পশ্চিম বাংলার লোকসংখ্যা ধরলেন ২৮,০০০,০০০ দুকোটি আশি লক্ষ এবং পূর্ব বাংলার লোকসংখ্যা ধরলেন ৩২,০০০,০০০ তিন কোটি বিশ লক্ষ।

বাংলার ব্যাপারে দেখা গেল কমিশনের সদস্যদের মধ্যে বাউণ্ডারির সীমারেখা নিয়ে গভীর মতানৈক্য রয়েছে। আগের ব্যবস্থা মত তাঁরা চেয়ারম্যান সিরিল র‍্যাডক্লিফকে অনুরোধ করলেন তিনি নিজের বিবেচনামত রায় দিন এবং সেইটাই কমিশনের রায় হবে। র‍্যাডক্লিফ তখন সমস্ত ব্যাপারটা বিবেচনা করে কমিশনের রায় দিলেন এবং মাউন্ট ব্যাটেন তাই গ্রহণ করলেন।

বাংলা সম্বন্ধে র‍্যাডক্লিফ তাঁর রায়ে বললেন যে ৭টি প্রধান প্রশ্নের উপর বাউণ্ডারির লাইন টানার কাজ প্রধানভাবে নির্ভর করছে।

(১) কলকাতা কাকে দেওয়া হবে অথবা

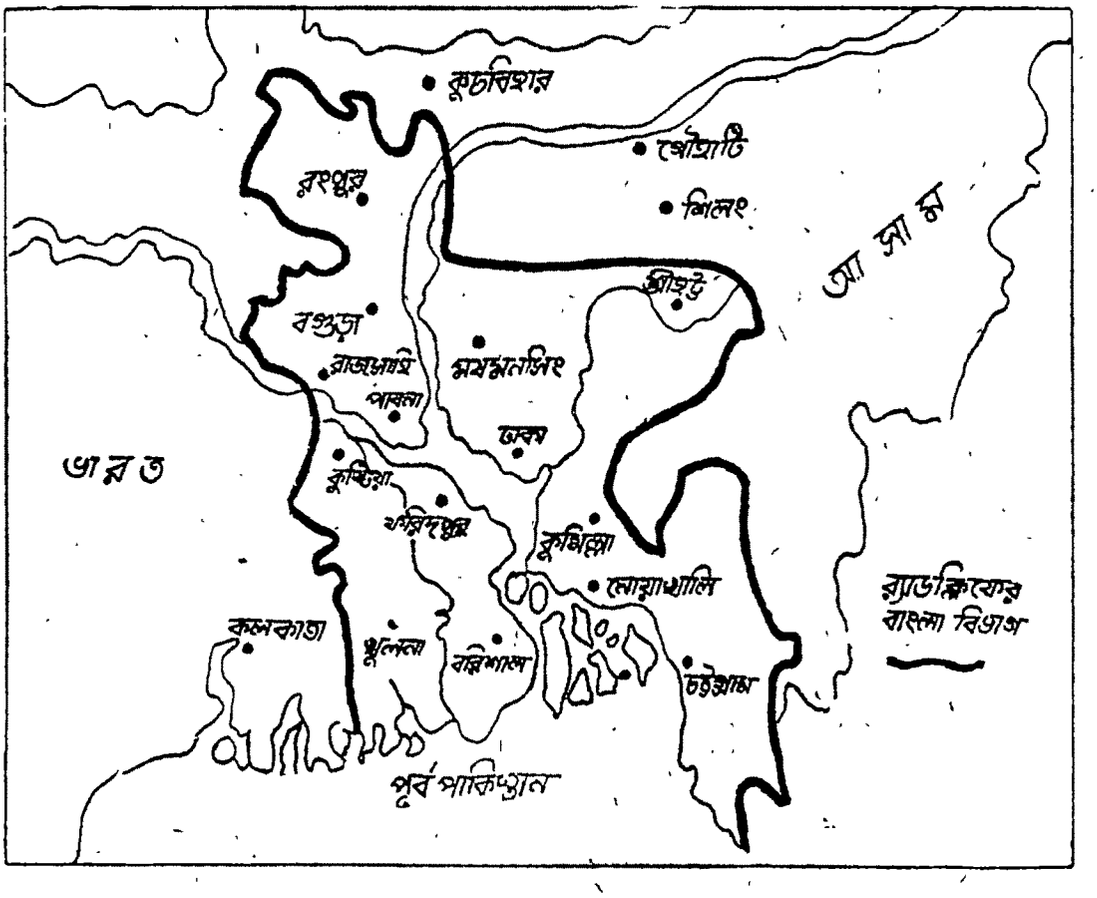

কলকাতাকে দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে;

(২) কলকাতা যদি যেকোনো একটি রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণভাবে দেওয়া হয় তাহলে নদীয়ার নদীপথ অথবা কুলটি নদীবাহিত অঞ্চলটি কার হাতে দেওয়া হবে যেহেতু বাঁচতে হলে এদের উপরেই কলকাতাকে নির্ভর করতে হবে।

(৩) বাউন্ডারি কমিশনের কার্যপদ্ধতির বিধিগুলিকে কি অমান্য করা হবে যদি গঙ্গা-পদ্মা-মধুমতী নদীপথটির আকর্ষণে যশোর ও নদীয়া জেলায় মুসলমান সংখ্যাধিক্যের দাবিকে অগ্রাহ্য করা হয়;

(৪) খুলনাকে কি একটি রাষ্ট্রে দেওয়া যায় এবং যশোহরকে অপর রাষ্ট্রে;

(৫) মালদহ ও দিনাজপুর জেলা দুটিতে হিন্দু সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও কি এ পূর্ব বাংলায় দেওয়া ঠিক হবে;

(৬) ২-৪২ শতাংশ মুসলমান নিয়ে লিং এবং ২৩৮ শতাংশ মুসলমান নিয়ে দার্জিলিং পাইগুড়ি কারা পাবে যদিও দুটি জেলার অব্যবহিত অঞ্চলগুলিতে অ-মুসলমান সংখ্যাধিক্য নেই;

(৭) পার্বত্য চট্টগ্রাম কাকে দেওয়া হবে যেখানে মুসলমান মাত্র ৩ শতাংশ, কিন্তু চট্টগ্রাম জেলার শাসন ব্যবস্থা থেকে একে বিচ্ছিন্ন করা শক্ত।

বাউন্ডারি কমিশনে কোনো বিশেষ অঞ্চলে এক সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্যই একমাত্র বিবেচনার বিষয় ছিল না। কোনো জেলাতে বা মহকুমায় এক সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য থাকলেও অব্যবহিত অঞ্চলটিতে কোন সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য সেটাও যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছিল। জেলা বা মহকুমায় সামান্য সংখ্যাধিক্য আছে কিন্তু অব্যবহিত অঞ্চলে অন্য সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য থাকায় অনেক জায়গায় অব্যবহিত অঞ্চলের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সঙ্গে মূল অঞ্চলকে যুক্ত করা হয়েছিল।

র‍্যাডক্লিফের রায়ে পশ্চিম বাংলা পেল পুরো কলকাতা শহর এবং সম্পূর্ণ বর্ধমান ডিভিসন।

পূর্ব বাংলা পেল রাজসাহী ডিভিসনের রংপুর, বগুড়া, রাজসাহি এবং পাবনা জেলা এবং প্রেসিডেন্সি ডিভিসনের খুলনা জেলা। পেলো সম্পূর্ণ চট্টগ্রাম ডিভিসন ও ঢাকা ডিভিসন।

নদীয়া জেলার খোকসা, কুমারখালি, কুষ্টিয়া, মীরপুর, আলমডাঙা, ভেড়ামারা, গণগণি, দামুরহুদা, চুয়াডাঙা, জীবননগর, মেহেরপুর এবং মাথাভাঙা নদীর পূর্বে দৌলতপুরের অংশটুকু; বনগাঁ এবং গাইঘাটা বাদে সম্পূর্ণ যশোর জেলা পেল পূর্ব বাংলা। নদীয়ার বাকি অংশ ও বনগাঁ এবং গাইঘাটা পেল পশ্চিম বাংলা।

দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট, ইটাহার, বংশীহারী, কুশমুণ্ডি, তপন গঙ্গারামপুর, কুমারগঞ্জ, হেমতাবাদ, এবং প্রধান উত্তর-দক্ষিণ রেলওয়ে লাইনের পশ্চিমে বালুঘাটের অংশটুকু পেল পশ্চিম বাংলা দিনাজপুরের বাকি সমস্তটাই পেল পূর্ব বাংলা।

জলপাইগুড়ি জেলার তেঁতুলিয়া, বোচাগড়, বোদা, দেবিগঞ্জ, পাটগ্রাম এবং কুচবিহারের দক্ষিণে ঢুকে-থাকা অঞ্চলগুলি পেল পূর্ব বাংলা। জলপাইগুড়ির বাকিটা গেল পশ্চিম বাংলা।

দার্জিলিং পুরোটাই পেল পশ্চিম বাংলা।

মালদহ জেলার গোমস্থাপুর, নাচোল, নবাবগঞ্জ, শিবগঞ্জ এবং ভোলাহাট পেলো পূর্ব বাংলা। মালদহের বাকিটা পেলো পশ্চিম বাংলা।

আমাদের বেলায় প্রথম প্রশ্ন উঠেছিল কোন কোন অঞ্চল নিয়ে বাউন্ডারি কমিশন কাজ করবে। কমিশনের কোনো কোনো সদস্য বলেছিলেন শ্রীহট্ট ছাড়াও আসামের অন্যান্য মুসলমান প্রধান অঞ্চলগুলিকেও কমিশনের এখতিয়ারে ঢোকানো চাই। র‍্যাডক্লিফ কিন্তু শুধু শ্রীহট্ট ছাড়া অন্য কোনো জেলা সম্বন্ধে বিবেচনা করতে রাজি হলেন না।

পাথরকান্দি, রাতাবাড়ি, করিমগঞ্জ এবং বদরপুর থানাগুলি ছাড়া শ্রীহট্ট জেলার সবটাই পেল পূর্ব বাংলা।

পাঞ্জাব কমিশনের রায়ে পশ্চিম পাঞ্জাব পেলো সম্পূর্ণ মুলতান ডিভিসন ও রাওয়ালপিণ্ডি ডিভিসন এবং লাহোর ডিভিসনের গুজরানওয়ালা, শেখুপুরা এবং শিয়ালকোট জেলাগুলি।

পূর্ব পাঞ্জাব পেলো সম্পূর্ণ জলন্ধর ডিভিসন এবং আম্বালা ডিভিসন এবং লাহোর ডিভিসনের অমৃতসর জেলা। লাহোর ডিভিসনের গুরদাসপুর ও লাহোর জেলা দুটি পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হোলো। রাবি নদীর পশ্চিমে গুরদাসপুরের শকর-গড় তহশিল পশ্চিম পাঞ্জাব পেল এবং পাঠানকোট গুরদাসপুর ও বাগলা তহশিলগুলি—যেগুলো রাবি নদীর পূর্বে অবস্থিত—পেল পূর্ব পাঞ্জাব। লাহোর জেলার সম্পূর্ণ চুনিয়ান এবং লাহোর তহশিল পেলো পশ্চিম পাঞ্জাব।

কসুর তহশিল পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবের ভেতর ভাগ করে দেওয়া হোলো। বিভাগ-রেখা পড়লো আপার বারি দোয়াব ক্যানেল যে-বিন্দুতে তহশিলে ঢুকেছে তার পশ্চিমের গ্রামগুলির সীমারেখা ধরে ফেরোজপুর রেল স্টেশনের পশ্চিমের শেষ বিন্দু পর্যন্ত তারপর পূর্বে বেঁকে শতদ্রু নদীর মুখে মাস্তেকে গ্রাম পর্যন্ত।

প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁর লেখা আত্ম-জীবনী 'ফ্রেন্ডস্ নট মাস্টারস' প্রকাশিত হবার পর বইটি আমার সম্পাদিত ইংরেজি সাপ্তাহিক 'লা ডেবিতে' সমালোচনার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন পাকিস্তানের তৎকালীন কলিকাতাস্থ ডেপুটি হাই-কমিশনার আমার বন্ধু স্বর্গত হোসেন ইমাম। সেই সমালোচনার খানিকটা এই প্রবন্ধে তুলে দিলাম বাংলায় অনুবাদ করে।

প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ সম্পূর্ণ অভ্রান্ত নন যেখানে তিনি লিখেছেন যে মুসলমানরা তাঁদের সমস্ত দিয়ে এক স্বতন্ত্র বাসভূমির জন্য আগাগোড়া লড়াই করেছিলেন যার ফলশ্রুতি হোলো পাকিস্তান। সত্য কথা এই যে, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মুসলমান নেতৃস্থানীয়রা, যাঁদের মধ্যে জিন্না ছিলেন প্রধান, একটি স্বাধীন ভারতীয় গভর্নমেন্টের জন্য দাবি করেছিলেন যাতে হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সমান এবং সম্মানজনক শরিক হয়ে বাস করতে পারবে। কায়দে আজম জিন্না এক সময়ে প্রখর জাতীয়তাবাদী ছিলেন ও কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। সরোজিনী নাইডু তাঁর সম্বন্ধে বলতেন: হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের দূত।

মুসলমান রাজনৈতিক মানসিকতা উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের কাছে বড় আঘাত পেলো ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনে। ১৯০৫ সালের বঙ্গ বিভাগ শিক্ষা, ব্যবসা ও শাসন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মুসলমানদের একটি আত্মবিকাশের ভূমি তৈরি করে দিতে চেয়েছিল। মুসলমানের সেই আত্মবিকাশের পথ রুদ্ধ করে দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের একটি তথাকথিত অবিচ্ছেদ্য বন্ধনের নামে উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদ এত বাধা দিলো। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহে হিন্দু ও মুসলমান সৈন্যরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল এবং মুসলমানরা আবার দিল্লীর সিংহাসনে এসে বসতে পারবে এই নিয়ে হিন্দুদের কোনো উদ্বেগ ছিল না। কিন্তু ১৯০৫ সালে মুসলমানরা প্রথম উপলব্ধি করতে পারলেন যে সম্প্রদায় হিসাবে তাঁদের উন্নতির পথে হিন্দু আতিথেয়তাবাদ একটি প্রধান বাধা স্বরূপ হবে।

তবুও তখন তাঁরা তাঁদের জন্য একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন বাসভূমির জন্য দাবি তোলেন নি। এমনকি ভারত থেকে ব্রিটিশ শক্তি বিদায় নেবার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কায়দে আজম জিন্না ও মুসলিম লীগ ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন ভারতের কল্পনাকে ফলবতী করবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। যাতে ভবিষ্যতে মুসলমান সম্প্রদায় ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার পেয়েছিলেন সেই ১৯৪৬-এর ১৬ই মে তারিখের ব্রিটিশ মন্ত্রী মিশন প্রস্তাব নিঃশর্তভাবে গ্রহণ করে জিন্না এবং মুসলিম লীগ ভারত বিভাগকে একটি ভবিষ্যতের সম্ভাবনা মাত্র হিসাবে রেখে-ছিলেন, অবশ্যম্ভাবী বলে নয়। জওহরলাল নেহরুর একগুঁয়েমির জন্য এই মন্ত্রী-মিশন প্রস্তাব কার্যকরী করা যায় নি এবং তারপরে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সুরু হয়ে যায় যার জন্য হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই সমানভাবে দায়ী ছিলেন। যদি এই মন্ত্রী-মিশন প্রস্তাব কংগ্রেস নেতারা আন্তরিকভাবে মেনে নিতেন তাহলে জিন্না এবং মুসলিম লীগ হয়ত ভারত থেকে মোটেই বিচ্ছিন্ন হতে চাইতেন না। এবং দেশবিভাগের পরেও দেশরক্ষা, যোগাযোগ ইত্যাদি নিয়ে উভয় দেশের মধ্যে কার্যকরী চুক্তি করা সম্ভব হোতো। .....

সর্বপ্রথম মুসলিম লীগ একটি নামে-মাত্র রাজনৈতিক দল ছিল। ১৯০৫-এর ভারত শাসন আইনে বাংলার কৃষক-প্রজাদল যেসিব ভাগ মুসলিম নির্বাচন কেন্দ্রগুলিতে মুসলিম লীগকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। এই কৃষক-প্রজা দলের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে একজন হিন্দু ছিলেন। বাংলা এসেম্বলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে কৃষক-প্রজা দলের নেতা ফজলুল হক কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন গভর্নমেন্টের প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের ঊর্ধ্বতন মহল অনুমতি দিতে অস্বীকার করলেন। তখন হতাশা-ক্লিষ্ট ফজলুল হক মুসলিম লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন করতে বাধ্য হলেন এবং কংগ্রেস নেতাদের এক-গুঁয়েমির জন্য বাংলায় মতপ্রায় মুসলিম লীগ পুনর্জীবন লাভ করলো।

এই কারণে, একথা বলা ভুল যে ভারতের মুসলমানরা তাদের স্বতন্ত্র স্বাধীন বাসভূমির জন্য আগাগোড়া লড়াই করে এসেছে। সত্য কথা এই যে, উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদ মুসলমানদের বুঝিয়ে দিয়ে-ছিল যে সেই উগ্র জাতীয়তাবাদে তাদের কোনো স্থান নেই এবং তখন প্রতিনিধিস্থানীয় কংগ্রেস নেতারা তাঁদের এড়িয়ে যেতে লাগ-লেন তখন তাঁরা নিজেদের জন্য এক উগ্র মুসলিম জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির পথ গ্রহণ করলেন। তথাপি, বহু দায়িত্বশীল মুসলমান নেতা এবং স্বয়ং কায়দে আজম জিন্না শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একটি ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন ভারতের ব্যবস্থা চালানো যায় কিনা তা যাচাই করতে রাজি ছিলেন যদি তাঁরা হিন্দু এবং কংগ্রেস নেতাদের নিকট থেকে সন্তোষজনক উৎসাহ পেতেন। ১২ই জুলাই ১৯৪২-এর হরিজনে লেখা গান্ধীজীর একটি প্রবন্ধের উত্তরে কায়দে-আজম জিন্না বলেছিলেন: 'মুসলিম ভারতের কাছে পাকিস্তান একটি অপরিহার্যের বস্তু। কিন্তু আপনারা একটি সম্মানজনক মীমাংসার জন্য আন্তরিকতা ও সরলতা প্রদর্শন করুন।' কায়দে আজম জিন্নার কাছে পাকিস্তানই শেষ কথা ছিল না। সুযোগ পেলে তিনি সম্মানজনক মীমাংসায় আসতে রাজি ছিলেন। কিন্তু হিন্দু নেতাদের একগুঁয়েমি এবং বাস্তব সম্বন্ধে কংগ্রেস নেতাদের এক বিকৃত দৃষ্টি-ভঙ্গী জিন্না এবং মুসলিম লীগ নেতাদের এক নিরুপায় অবস্থার দিকে ঠেলে দেয় এবং যখন তাঁরা দেখলেন হিন্দু এবং কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে কোনো মীমাংসা সম্ভবপর নয় তখনই তাঁরা দেশ-বিভাগই একমাত্র সমাধান বলে মনে করলেন। মুসলমানরা প্রথম থেকে স্বতন্ত্র স্বাধীন বাসভূমি কখনই চাননি। হিন্দু নেতাদের অন্ধতা এবং কংগ্রেস নেতারা স্বার্থপরতার বশে প্রতিনিধিস্থানীয় মুসল-মান নেতাদের সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতা ভাগা-ভাগি করে নিতে অস্বীকার করায় মুসলমানরা বাধ্য হয়ে স্বতন্ত্র স্বাধীন বাসভূমির দাবি জানাতে বাধ্য হয়েছিলেন।

আয়ুব খাঁর বইয়ের প্রত্যেকটি পাতা এই সমালোচক খুঁজে দেখেছে পূর্ব পাকি-স্তানে (পূর্বতন) সংখ্যালঘু হিন্দুদের জন্য তাঁর কি বলবার আছে। ভারতের মুসলমান-দের একটা বড় অংশ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন এই জন্যে যে কংগ্রেস সংখ্যালঘুদের সমস্যা সরাসরি অস্বীকার করতেন। এই সমালোচক দেখতে পাচ্ছে যে প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ ভারতীয় কংগ্রেসের নেতাদের সেই বিজ্ঞতাহীন নীতিই অনুসরণ করেছেন। পাকিস্তান সৃষ্টির সময়ে কায়দে আজম জিন্না বলেছিলেন যে পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের প্রতি সংখ্যাগুরুদের সমান মর্যাদার সঙ্গে ব্যবহার করা হবে। এটা মনে রাখতে হবে যে প্রথম পাকিস্তানী মন্ত্রিসভায় জিন্না দুজন হিন্দুকে ক্যাবিনেট মর্যাদার মন্ত্রী নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর লোকা-ন্তরের পরও পাকিস্তানের অন্যান্য নেতারা সময়ে সময়ে ঘোষণা করতেন যে সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের 'জিম্মি' স্বরূপ। কারও কারও মতে এটা খুব মর্যাদাসূচক ছিল না বটে, তবু ওতে একটা সহানুভূতির প্রকাশ ছিল। হুসেন শহীদ সুরাবর্দি এক সময়ে পাকিস্তানে মিশ্র নির্বাচন পদ্ধতি (জয়েন্ট ইলেকটরেট) প্রবর্তনের প্রস্তাব করেছিলেন: তিনি যে সময়ে এই মনোভাব ব্যক্ত করে-

ছিলেন : যদি পাকিস্তানের হিন্দু যুবকদের তাদের নিজ দেশে উপযুক্ত সুযোগের অবকাশ না দেওয়া হয়, তাহলে তারা সেই সুযোগের জন্য ভারতের দিকে তাকিয়ে থাকবে।' কিন্তু আয়ুব খাঁর বইতে এই সমালোচক পাকিস্তানে অ-মুসলমান যুবকদের সমস্যা সম্বন্ধে কোথাও কোনো উল্লেখ দেখেনি। পাকিস্তানে কি আর কোনো অ-মুসলমান যুবক অবশিষ্ট নেই?

এই প্রসঙ্গে একটা মৌলিক প্রশ্ন এসে পড়ে এবং এই সমালোচক ধন্যবাদ জানাচ্ছে যে তাকে এইভাবে সেই প্রশ্ন আলোচনার সুযোগ দেওয়া হোলো না। একমাত্র মহামতি বুদ্ধের ধর্ম ছাড়া অন্যান্য সকল ধর্মই অবিশ্বাসীর প্রতি সমান অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেছে। খৃস্টানধর্ম, হিন্দুধর্ম ও ইসলাম এ-বিষয়ে এক। বাইবেলে ইহুদিদের প্রতি নির্যাতনের নির্দেশ ছিল এবং বেদে নির্দেশ আছে যে দাস ও দস্যু জাতিকে (যে-সকল অনার্য আর্যধর্ম ও সমাজদর্শন মেনে নেয়নি) নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে এবং কোরাণেও অবিশ্বাসীদের ধ্বংস করবার কথা বলা আছে। কিন্তু সেদিনের এখন পরিবর্তন হয়েছে। বাইবেল থেকে ইহুদিদের নির্যাতনের নির্দেশ অপসারিত হয়েছে। যদিও বেদের বিধি হিন্দুরা পরিবর্তন করতে পারেননি, তথাপি অস্পৃশ্যতা এখন অপরাধ বলে ঘোষিত হয়েছে। এই সমালোচক আশা করেছিল যে একজন আয়ুব খাঁ অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে কোরাণের অসঙ্গত নিদানের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াবেন। যদিও ইসলাম একটি প্রচারকামী ধর্ম, এই সমালোচক এ-বিষয়ে নিশ্চিত যে পবিত্র পয়গম্বরের এ ইচ্ছা কখনই ছিল না যে ইসলামে অবিশ্বাসীদের ধ্বংস করে ফেলতে হবে। প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ তাঁর বইতে উলেমা পির এবং ফকিরদের বিরুদ্ধে অনেক কিছু লিখেছেন, কিন্তু তাঁর বোঝা ছিল এই সব উলেমা, পির এবং ফাকরের দল অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণুতার সকল সুযোগ গ্রহণ করবে যদি না এই নিদানটি বাতিল করা হয়। অন্য ধর্মের প্রতি ঘৃণার পথ দিয়ে কোনো মহান ধর্ম বিকশিত হতে পারে না। প্রেসিডেন্ট যদি বলতে চান যে অবিশ্বাসীদের ধ্বংস করবার কথা কোরাণে কোথাও লেখা নেই তাহলে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে (প্রাক্তন) নব্বই লক্ষ সংখ্যালঘু অ-মুসলমান সম্বন্ধে একেবারে নীরব রইলেন কেন?'

সত্য বলতে কি, কায়দে আজম জিন্নার নেতৃত্বে ভারতের মুসলমানরা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করেছিলেন সেটা শুধু মুসলমানদের জন্য [illegible] যেখান থেকে তাঁরা তাঁদের ধর্মপ্রচারের সুযোগ পেতে পারেন। এই সমালোচক এ বিষয়ে নিশ্চিত যে জিন্না সকল ধর্মের সকল মানুষের সমান অধিকারের জন্য লড়াই করেছিলেন এবং তাঁর বিদ্রোহ ছিল সেই হিন্দু-সমাজদর্শনের বিরুদ্ধে যা মানুষকে উচ্চ ও নিম্নবর্ণের বিভাগে বিভক্ত করে দেয় এবং যা উচ্চবর্ণের মানুষের জীবনকে লক্ষ লক্ষ নিম্নবর্ণের মানুষের শ্রমের শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত করে রাখে। এই বিষয়ে জিন্নাকে একজন বিপ্লবনেতা হিসাবে বিবেচনা করা দরকার। শুধুমাত্র মুসলমান সমাজের নেতা বলে নয়। জিন্না বলেছিলেন : 'এটা বোঝা খুব কষ্টকর আমাদের হিন্দু-বন্ধুরা হিন্দুধর্ম ও ইসলামের প্রকৃত রূপটি হৃদয়ঙ্গম করতে বিফল হন কেন? ধর্ম ব্যাপারটির প্রকৃত অর্থে এ দুটি পৃথক ধর্মমত মোটেই নয়— বরং সত্যদৃষ্টিতে দুটি পৃথক এবং ভিন্ন সমাজব্যবস্থা। এটা একটি নিছক স্বপ্নমাত্র যে হিন্দু ও মুসলমান কখনও একটি মিলিত জাতীয়তার সৃষ্টি করতে পারবে।' (৬।৪।৪০-এর হরিজন মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক উদ্ধৃত)

হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে মুসলিম জাতীয়তাবাদের ধ্বজা তুলে ধরবার জন্য শুধু নয়, পরন্তু সাম্যের বাণীকে সফল করবার জন্যই জিন্না আমৃত্যু লড়াই করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন অ-মুসলমান মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন, তাঁর একমাত্র সন্তান কন্যাটিও একজন অ-মুসলমানকে বিবাহ করেছেন।

প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁর লেখায় এই সাম্যের বাণীটি কোথায়? হিন্দুরা যদি মুসলমানকে পাবিয়া করে থাকে তাহলে তার অর্থ কি এই যে মুসলমানদেরও হিন্দুকে পারিয়া করতে হবে? এইভাবে কি তিনি তাঁর কথা মত 'ইসলামের যেসব বাধাসূচক এবং শত্রুতামূলক প্রভাব তার প্রকৃত চরিত্রটিকে বিকৃত করেছে' তাদের হাত থেকে ইসলামকে রক্ষা করবেন?

প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ মুসলিম আশ্রয়-প্রার্থীদের ভারত ছেড়ে পাকিস্তানে গমন সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখেছেন এবং নিঃসন্দেহে তাদের দুঃখ এবং দুর্দশা খুব বিষাদময়। কিন্তু যেসব লক্ষ লক্ষ হিন্দু আশ্রয় প্রার্থী পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে চলে এসেছিল তাদের সম্বন্ধে একটি কথাও লেখেন নি। যদি সামাজিক অবিচারের ফলে মুসলিম আশ্রয়প্রার্থীরা ভারত ছেড়ে গিয়ে থাকে তাহলে হিন্দু আশ্রয়প্রার্থীরাও একই কারণে পাকিস্তান ছেড়ে এসেছে। আয়ুব খাঁর নিজের লেখাতেই দেখা যাচ্ছে যে ধর্মের পার্থক্য ঈশ্বরের সামনে মানুষে মানুষে সাম্য প্রতিষ্ঠার বাধা স্বরূপ হবে। কিন্তু এটা একজন উলেমার মনোবৃত্তি হতে পারে কিন্তু একটি নবীন রাষ্ট্রের আধুনিক কোনো প্রগতিশীল নেতার এই মনোবৃত্তি রাখা চলে না।'

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে বহু হিন্দুও কংগ্রেস নেতা পাকিস্তান সৃষ্টির ব্যাপারটি মনে মনে মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু সেই কারণে কি পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র সংখ্যাক্ষুদ্র হিন্দু সম্প্রদায়কে সন্দেহের চোখে দেখতে হবে? আনুগত্যের প্রশ্ন হয়ত তোলা হতে পারে। যদি পাকিস্তানের নব্বই লক্ষ হিন্দু সংখ্যালঘুকে সন্দেহের চোখে দেখা হয়, তাহলে ভারতের ষাট লক্ষ মুসলমান সংখ্যালঘুকেও সন্দেহের চোখে দেখা হতে পারে। কিন্তু এইভাবে আমরা কোনো সমাধানে পৌঁছতে পারবো না।

এই প্রশ্নগুলি দেশবিভাগের সময়েই ভাবা উচিত ছিল এবং এর প্রতিবিধানের পথ

ঠিক করে রাখা উচিত ছিল। পাকিস্তানের সংস্থারা যদি সত্যিই বিশ্বাস করতেন যে হিন্দু ও মুসলমান কিছুতেই এক দেশের অধিবাসী হয়ে একসঙ্গে বসবাস করতে পারবে না, তাহলে স্পষ্টত তাদের উচিত ছিল লোক বিনিময়ের ব্যবস্থা করা যাতে পাকিস্তান একটি নিছক মুসলমান রাজ্য এবং ভারত একটি নিছক হিন্দুরাজ্যে পরিগণিত হতে পারতো। যাই হোক, সে সময়ে কেউই উভয় দেশের সংখ্যালঘুদের দুর্দশার কথা ভাবেননি, কিম্বা এ সম্বন্ধে একটা কার্যকরী সমাধান বের করবার চেষ্টা করেননি। দেশ-বিভাগের সময়ে পাকিস্তানের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে, সংখ্যালঘুরা পাকিস্তানের সম-মর্যাদার সম্মানজনক অধিবাসী হিসাবে গণ্য হবে এবং তাঁদের ভয়ের কোনো কারণ থাকবে না। কংগ্রেস নেতারা অবশ্য, তাঁদের একটি তথাকথিত সম্মিলিত জাতীয়তাবাদের প্রতি আনুগত্যের জন্য সমস্ত ব্যাপারটির এই সবচেয়ে মূল্যবান প্রশ্নটিই তুলতে চাননি। এবং এখন, নিশ্চয়ই, এই প্রশ্ন তোলার পক্ষে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশেই সংখ্যালঘুদের থাকতেই হবে এবং তাদের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সমান মর্যাদা ও অধিকারও পাওয়া চাই। কিন্তু প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ তাঁর দেশের সংখ্যালঘুদের কি প্রশ্নটি নীরবতা দিয়ে এড়িয়ে গেছেন যদিও তিনি বার বার উল্লেখ করেছেন ভারতের মুসলমান সংখ্যালঘুদের সম্বন্ধে। কায়দে আজম জিন্না দুজন হিন্দু ক্যাবিনেট মন্ত্রী নিযুক্ত করেছিলেন এবং তিনি বার বার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে সংখ্যালঘুদের সম্পূর্ণ সমান দৃষ্টি দিয়ে দেখা হবে। এতে সন্দেহ নেই যে মার্শাল আয়ুব খাঁ এ ব্যাপারে কায়দে আজম জিন্নার মহান সামাজিক আদর্শ থেকে অনেকখানি দূরে সরে গেছেন।

এই সমালোচক বুঝতে পারেনি আয়ুব খাঁ বার বার কেন শুধু এইটুকু বোঝাবার প্রয়াস করেছেন যে পাকিস্তান একটি মুসলমান রাষ্ট্র মাত্র। মুসলমান রাষ্ট্রগুলি সম্বন্ধে তিনি বলেছেন : '. এটি একটি বাস্তব ঘটনা যে কম্যুনিস্ট জগত, ক্রীশ্চান জগত এবং হিন্দু ভারত এদের মুসলিম রাষ্ট্র বলেই মনে করে' (১৮৩ পৃঃ)। কিন্তু আয়ুব খাঁও কি সেইটাই চাননি : ইসলামীয় ধর্মদর্শনের উপর অত্যধিক নির্ভরতা এবং অন্য ধর্মের লোকেদের কোনো সুবিধাদানের বিষয়ে চরম উপেক্ষা এইসব দেশগুলিকে প্রচণ্ডভাবে মুসলিম জাতীয় করে তুলেছে এবং তার জন্য এইসব দেশের নেতারাই মুখ্যত দায়ী। ইসলামীয় জীবন দর্শনই পথপ্রদর্শক হতে পারে কিন্তু অন্যান্য সমাজব্যবস্থার বিশেষ গুণগুলি অধিগ্রহণ করতে দোষ কি থাকতে পারে? আয়ুব খাঁ নিজেই বলেছেন : 'অন্যান্য বিষয়ের চেয়েও বিজ্ঞান ও যুক্তির শক্তি এবং ধর্মীয় গোঁড়ামি ও পুনরুত্থানবাদের শক্তির যে এক দুর্লংঘ্য পার্থক্যই জাতির ঐক্যবদ্ধতার বিরুদ্ধে কাজ করেছে সবচেয়ে বেশি' (১৯৫ পৃঃ)। কিন্তু সব সময়ে ইসলামীয় ধর্মদর্শনের উপর বেশি জোর দিলে ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং পুনরভ্যুত্থানবাদই বেশি শক্তি পাবে—বিজ্ঞান কিম্বা যুক্তি পাবে না। ২৫২ পৃষ্ঠায় পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট তাঁর ইস্তাহারে বলেছেন : 'আমি মুসলিম জাতীয়তাবাদ প্রসারের দায়িত্ব নিচ্ছি যাতে পাকিস্তান পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম দেশগুলির সঙ্গে সহযোগিতার এক মহান ক্ষেত্র হিসাবে কাজ করতে পারে।' এই সমালোচকের সন্দেহ নেই যে প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ খুব উদার মতের লোক কিন্তু তাঁর অবর্তমানে তাঁর এই ইস্তাহার যে পাকিস্তানবাসী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচারের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হবে না, তার নিশ্চয়তা কোথায়? হিটলারের 'ক্রীশ্চান' জাতীয়তাবাদের ফলশ্রুতির কথা পৃথিবী কি কোনোদিন ভুলতে পারবে? পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট নিজেই বলেছেন যে মুসলমানদের মধ্যে তিয়াত্তরটি সম্প্রদায় আছে এবং সেইটাই একদিন বিপদের উৎস হয়ে উঠতে পারে।

১৯৬ পৃঃ-য় তিনি লিখেছেন : 'ইসলামকে যেসকল বাধাসূচক ও বিজাতীয় প্রভাব তার প্রকৃত চরিত্রকে বিকৃত করেছে যতক্ষণ না ইসলামকে সেগুলি থেকে মুক্ত করা হচ্ছে ততক্ষণ মুসলমান সমাজের পক্ষে কোন অগ্রগতি অসম্ভব। এবং ১৯০৯-এর ১২ই এপ্রিলের নোটে তিনি বলেছেন : ঈশ্বরের সামনে সকল মানুষ সমান। অতএব, বর্ণ, জাতি এবং দেশের সকল পার্থক্যের মধ্যেও মানুষের মৌলিক একত্বকে স্বীকার করতেই হবে' (১৯৭ পৃঃ)। এই লাইনটির মধ্যে 'ধর্ম' কথাটিও দেখবার জন্যে বৃথা চেষ্টাই সমালোচক করেছে। তার অর্থ এই যে ধর্মের পার্থক্য থাকলে মানুষের মৌলিক একত্বকে স্বীকার করা চলবে না। তাহলে দাঁড়াচ্ছে যে মুসলমানরা অ-মুসলমানদের সম্বন্ধে ঈশ্বরের সামনে সকলে এক বলে মানতে রাজি নন। এই বিষয়ে প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁর পথপ্রদর্শক তাঁর পবিত্র পয়গম্বর নন, বরং সেই আর্য ও ব্রাহ্মণ যারা শত-শতাব্দী ধরে নিজেদের সমাজের এক বিরাট অংশকে হীনতার কালিমায় লিপ্ত করেছিল এই জন্য যে দুর্ভাগ্যবশত সেই বংশে তাদের জন্ম হয়েছিল যারা উচ্চবর্ণের লোকদের সেবা করতে বাধ্য।

ইংরেজরা যখন তাদের শিক্ষার আলোক নিয়ে এদেশে এসেছিলেন তখন মুসলমানরা তাকে পরিহার করেছিলেন। কিন্তু হিন্দুরা ইংরেজি শিক্ষাকে স্বাগত জানালেন। জাতীয়তাবাদের প্রথম বীজ ভারতে রোপিত হয়েছিল ইংরেজের স্বারা ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে এবং হিন্দুরা প্রথমে এই শিক্ষা পেয়েছিলেন বলে তাঁরাই জাতীয়তাবাদের প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন। কিন্তু বহুজাতিক ও বহুবর্ণভিত্তিক ভারতবর্ষে ভূমিভিত্তিক জাতীয়তাবাদ এক ভাঙ্গুর স্বপ্নের মতই ছিল। কাজেই শিক্ষিত হিন্দুরা হিন্দু ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক আদর্শকেই ধরলেন তাঁদের জাতীয়তাবাদের ভিত্তিভূমি হিসাবে। কিন্তু জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ধর্মের সংমিশ্রণ সব সময়েই বিপজ্জনক। জার্মানিতে একটি বিপর্যয় ঘটে গেছে এর ফলে এবং ভারতের বেলাতেও সেইটাই হয়েছে। এই সমালোচক প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁকে এইটুকু অনুরোধ করছে, মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলির সামাজিক অবস্থার সঙ্গে পশ্চিমের যে দেশগুলি জাতীয়তাবাদ ও ধর্মের সম্বন্ধকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে তাদের অবস্থা তুলনা করে দেখুন।

কিন্তু ভারতে এর নিষ্ক্রিয়করণ এত গভীর হয়েছিল যে গান্ধী ও নেহরুর মত শ্রেষ্ঠ নেতারাও মধ্যযুগীয় মানসিকতার এই অন্ধকারের শক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তার মোট ফল এই দাঁড়িয়েছিল যে দুটি হিন্দু ও মুসলিম জাতীয়তাবাদ পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে রুখে দাঁড়ালো এবং প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ বলেছেন, একবার কাশ্মীর সমস্যাটির সন্তোষজনক সমাধান হয়ে গেলেই এই দুটি জাতীয়তাবাদ 'ভাই-ভাই' হয়ে যাবে। এই সমালোচকের এবিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। জাতীয়তাবাদ বিষ কিন্তু ধর্মমূলক জাতীয়তাবাদ দ্বিগুণ বিষ। এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে, শিক্ষিত হিন্দুরা যদি হিন্দুধর্মে অনুপ্রাণিত জাতীয়তাবাদ প্রচার না করতেন মুসলমানরা ইসলামে অনুপ্রাণিত জাতীয়তাবাদ প্রচার করতে উৎসাহ পেতেন না।

অতীতে হিন্দু ও কংগ্রেস নেতারা অনেক ভুল করেছেন। কিন্তু পাকিস্তানি প্রেসিডেন্টের আদর্শ যদি এই হয় যে ব্রাহ্মণ্যবাদের মূলমন্ত্র হচ্ছে বিশ্বজোড়া ঘৃণা। সাম্যের আদর্শের যিনি উপাসক, ইসলামের আদর্শের যিনি উপাসক তিনি কেন ঘৃণার আদর্শকে উপাসনা করবেন? ইসলাম ঘৃণার উপাসনা করে না—ইসলাম মানুষে মানুষে শত্রুতার বাণী প্রচার করে না। যদি হিন্দুধর্ম এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম ভুল করে থাকে তারা তার ফল ভোগ করবে। কিন্তু ভারতের এবং পাকিস্তানের ভাবীকালের মানুষদের স্বাধীনভাবে এবং নিষ্ফলুষ হয়ে ফুটতে দিতে হবে সমগ্র মনুষ্যজাতির কুসুমটির মত—হিন্দু, মুসলমান, কিশ্চান বা ইহুদি হিসাবে নয়।

(শেষ)

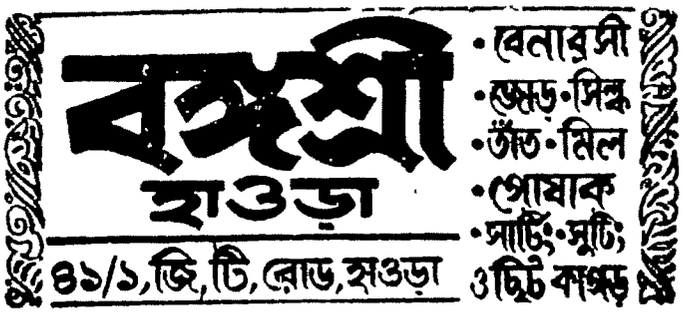

চিঠিপত্র

জাল তথ্যে জয়পুর

আমরা বাঙ্গালীরা ইতিহাসবিস্মৃত জাতি হিসাবে একদা অতীতে দুর্নাম অর্জন করিয়াছিলাম—সম্প্রতি দেখিলাম ইতিহাসকে অপহরণ ও বিকৃত করিয়া উপস্থাপনে তো আমাদের দক্ষতা কম নহে। ঘটনাটি হইল কলিকাতার একটি উল্লেখযোগ্য সাপ্তাহিক পত্রিকায় ৮ এপ্রিল ১৯৭৮ জনৈক বঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জয়পুরের জন্মদিনে' নিবন্ধটি পাঠ করিয়া।

আমাদের হাতের কাছে বোম্বাই-এর তাজমহল হোটেল গোষ্ঠীর পরিচালনায় ইংরাজী ত্রৈমাসিক 'তাজ ম্যাগাজিন' (খণ্ড ঃ৬ সংখ্যা ঃ ৩ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৭৭) এবং ইয়ুথ টাইমস (নভেম্বর ২৫—ডিসেম্বর ৮, ১৯৭৭) পত্রিকাটি দুটি আছে। এই দুইটি পত্রিকার চারিটি প্রধান প্রবন্ধের (যথা 'জয়-পুরস জুয়েলারী' লেখিকা শ্রীমতী শ্যামলী দাস; 'এন্ড সো ওয়াজ জয়পুর বর্ন' লেখক ডঃ অশোককুমার দাস এবং অন্য দুটি যথা-ক্রমে যদুবেন্দ্র সহায় এবং মুলকরাজ আনন্দ লিখিত) ব্যাপক তথ্য, ভাব, ভাষা ও বাক্য গঠন রীতি প্রভৃতি শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নিজ প্রবন্ধে কোন রকম কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়াই উল্লেখ করিয়া দিয়াছেন যেটিকে পক্ষান্তরে আত্মসাৎ বলিলে ভুল বলা হইবে না।

কিন্তু বিশেষ পরিতাপের বিষয় যে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত প্রবন্ধগুলি তেমন মনযোগ সহকারে পাঠ করেন নাই এবং জয়-পুরের পথেঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইবার সময় চোখ কান খুলিয়া রাখেন না। ফলে ঐ প্রবন্ধ-গুলি হইতে লিখিত তথ্য উল্লেখ করিতেও অজস্র ভুল করিয়াছেন এবং যেখানেই ঐ ইংরাজী নিবন্ধগুলির চিন্তা-ভাবনার বাহিরে নিজস্ব মতামত জাহির করিবার চেষ্টা করিয়া-ছেন তাহা প্রাদেশিকতার সংকীর্ণতায় অথবা অসংলগ্নতা দোষে দুষ্ট দেখা গিয়াছে।

আমরা শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বীকার-বিহীন অপহরণ কর্মের প্রতিবাদে জয়পুরের অনেকেই ঐ সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদকের কাছে প্রতিবাদপত্র পাঠাইয়াছিলাম কিন্তু স্বধর্মের ব্যক্তিকে সমর্থনের অপচেষ্টায় সম্পাদক অগণিত পত্রের মধ্যে একটি মাত্র প্রতিবাদপত্র কিছুটা কাটিয়া-ছাঁটিয়া নরম করিয়া প্রকাশিত করিলেন যাহাতে প্রবন্ধ লেখকের পক্ষে আত্মপক্ষ সমর্থন কিছুটা সহজ হয়। অবশ্য প্রকাশিত ঐ একটি প্রতি-বাদই যে কোন লেখকের লজ্জিত হইবার যথেষ্ট কারণ থাকিলেও উক্ত প্রবন্ধের লেখক হাতে-নাতে ধরা পড়িয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি অমার্জিত ভাষায় একেবারে খোলাখুলি পত্রলেখককে আক্রমণ করিয়া নিজের অরবাং ঢাকিতে কেমন হাস্যকর ও অশোভন আচরণ করিলেন তাহার কিছুটা বিস্তৃত আলোচনা করা সাহিত্যের ধর্ম রক্ষার খাতিরে প্রয়োজন।

এ প্রসঙ্গে আরো বলা প্রয়োজন যে শ্রীহেমকান্ত রায় শ্রীমতী রুচি নিয়োগী, সোনালী রায়, মঞ্জুলা দাশ, অসিত দাস এবং বর্তমান লেখকের প্রতিবাদপত্রসহ অন্য আরো বহুজনের প্রতিবাদপত্রগুলি ঐ সাপ্তাহিকের সম্পাদক মহাশয় প্রকাশিত করেন নাই করণ সেগুলির উত্তর দেওয়া সম্ভবত লেখকের পক্ষে সহজ ছিল না। সম্পাদকের এই পক্ষপাতপূর্ণ আচরণের প্রতিবাদে জয়পুর বেঙ্গলী লিটারারী এসো-সিয়েশনের সদস্যরা সংশ্লিষ্ট সাপ্তাহিকের কর্তৃপক্ষের কাছে একটি জানবার্তা প্রেরণ করেন। সেটির বক্তব্য ছিল :

> কিন্তু এই জরুরী তারবার্তার কোনো জবাব অদ্যাবধি আসে নাই অথবা ঐ সাপ্তা-হিকে একমাত্র ডঃ অশোককুমার দাসের পত্র ব্যতীত অন্য কোন প্রতিবাদপত্র প্রকাশিতও হয় নাই। সংঘের মুখপাত্র হিসাবে বর্তমান লেখক সুদূর জয়পুর হইতে কলিকাতার উক্ত পত্রিকার সম্পাদকের সহিত এ প্রসঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করিতে গিয়া ছিলেন। কিন্তু সম্পাদক মহাশয় পত্রিকার স্থানাভাবের স্থূল অজুহাতে তাহাকে নিরস্ত করেন।

বঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবন্ধটির নামকরণ করিয়াছিলেন—জয়পুরের জন্ম দিনে কিন্তু তিনি ঐদিনের (১৮ নভেম্বর, ১৯৭৭) নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শহরের অনুপম আলোক-সজ্জা, মধ্যরাত্রি-ব্যাপী আতসবাজী প্রজ্বলন মহারাজাদের ব্যবহৃত যানবাহনের ও পোষাক আসাকের বর্ণময় শোভাযাত্রা, প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইয়ের সর্বধর্ম সমন্বয়ের আহ্বানে ভাষণ ও জয় সিং-এর মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান এবং গোবিন্দজীর মন্দিরের বিশেষ যজ্ঞানুষ্ঠান সম্বন্ধে কিছুই লিখিলেন না। জন্মদিনের কোন কথাই তো পাঠকরা জানিতে পারিলেন না—অথচ এইদিনের এই

ছবিটি আর যাই হোক ভগ্নস্বাস্থ্য প্রমাণ করে না—এবং দীর্ঘ বিদ্যার কথাটি প্রমাণ করে তিনি বাজার মন্ত্রীপদে উন্নীত হয়েছিলেন—হাতেনাতে ঋণ শোধ নয়।

বিশাল কর্মকান্ড ভারত সমেত সারা বিশ্বে দূরদর্শন মারফৎ প্রচারিত হইয়াছিল। পরিবর্তে তিনি শোনাইলেন শহরের ফেনায়িত ও স্বকপোল কল্পিত ইতিহাস। এই বিকৃত শহর পরিচিতি শোনাইবার জন্য তো তিনি ঐ সময়ে আসেন নাই—তিনি আসিয়াছিলেন একটি ঐতিহাসিক শহরের ২৫০তম জন্ম দিবস পূর্তির দিনের কিছু কথা আর শহরটির পাসঙ্গিক কিছু ইতিহাস লিখিতে। অর্থাৎ প্রকাশিত লেখাটির না রহিল কোন তাৎপর্য না রহিল নামকরণের স্বার্থকতা।

প্রবন্ধটিতে তথ্যগত ভুলের এবং সামঞ্জস্যহীন মতামত প্রকাশের মধ্যে একই অধিক যে এই রচনার [illegible]

আমরা সেই অসংখ্য ত্রুটি ও লেখকের অমার্জিত কটূক্তির কয়েকটির মাত্র এইখানে আলোচনা করিতেছি।

এক।। রঞ্জনবাবু লিখিয়াছেন—'গোলাপী জয়পুর শহরের বাজার এলাকায় এমন একটি আকস্মিক বাড়ীও দুর্লভ যার গায়ের রং চন্দন, সবুজ কিংবা লোহিত। সমস্ত শহরটি এক ব্যাপক সংক্রমক গোলাপীর দ্বারা আক্রান্ত এবং প্রায় পোপ-এর কবিতার ধরণে এ-সব বাড়ির আঙ্গিক, বিন্যাস ছন্দ একেবারে এক। আমাদের চোখ ও মনের পক্ষে নিঃসন্দেহে পীড়াদায়ক এই বৈচিত্র্যহীন সমীকরণ।' এই প্রস্তাবোক্তিটি অর্থহীন এই কারণে যে, তিনি সুদূর কলিকাতা হইতে যে শহরটির ২৫০তম জন্মজয়ন্তী উৎসবের সংবাদ পরিবেশনের দায়িত্ব লইয়া আসিয়াছিলেন সেটি তাহার জন্মলগ্ন হইতেই ভ্রমণবিলাসিকদের কাছে পরিচিত গোলাপী শহর বা পিংক সিটি হিসাবে এবং রঙের 'বৈচিত্র্যহীন সমীকরণই' শহরটিকে বিশ্বের কাছে দুর্লভ ও বিশেষভাবে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে। জয়পুরের বিভিন্ন গৃহের রঙ যদি লেখকের খুশিমত হলুদ সবুজ নীল লাল বেগুনী কিংবা কালো হইত তাহা হইলে বিশ্বের অগণিত শহরের সহিত জং সিং-এর মানসকন্যাতুল্য এই শহরের কোনো প্রভেদ থাকিত না এবং সেক্ষেত্রে তেমন একটি বর্ণসংকর শহরের জন্ম-জয়ন্তী উৎসবে যোগদানের জন্য সারা বিশ্বে এমন ব্যাপক উৎসাহের প্রকাশ দেখা যাইত না।

গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় বিদগ্ধ এক নৃপতি ও প্রাচীন ভারতীয় বাস্তুশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এক স্থপতির দীর্ঘ পরিশ্রম ও সাধনায় যে শহরটির জন্ম হইয়াছিল আধুনিক নগর পরিকল্পনার ইতিহাসেও তাহা অভূতপূর্ব। শহরের রাস্তা, বাজার, বাড়ি মন্দির প্রভৃতি প্রতিটি স্তরেই যাঁরা মানসবার বাস্তুশাস্ত্রের নির্দেশ মানিয়াছিলেন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন তাঁরা যে রং ব্যবহারের ব্যাপারে অবিবেচনার কাজ করিবেন ইহা ভাবাই যায় না। জয় সিং এবং বিদ্যাধর শহরের রঙের মূল সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার পূর্বে সাদা, বাসন্তী, গেরুয়া ইত্যাদি কয়েকটি রঙ ব্যবহার করিবার পর গোলাপী রঙটি নির্বাচন করিয়াছিলেন মঙ্গল ও শুভদায়িনী হিসাবে। পরবর্তী সমস্ত রাজারাই রঙের এই সমীকরণের সামাত্য বজায় রাখিবার ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন এবং ১৭২৭ হইতে ১৯৪৯ পর্যন্ত অর্থাৎ ভারত ভুক্তির আগে জয়পুর রাজাদের আমলে গৃহস্বামীদের নিয়মিত রাজকর্মচারীদের তত্ত্বাবধানে গৃহে গোলাপী চুণকাম করা আবশ্যক ছিল। পরে সরকারী আমলে সে বাধ্যবাধকতা না থাকায় অনেকেই নিজেদের খেয়ালখুশিমত নানা রঙে বাড়ীগুলি রাঙিয়ে তুলিতেছিলেন। সেই কিম্ভূতকিমাকার বর্ণের কোলাহলে জয় উৎসবের কথা স্মরণে রাখিয়া বিগত তিন বছর বহু পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে পুরানো জয়পুরের অতীত গোলাপী রূপটি আবার ফিরাইয়া দিয়া সরকারী বিভাগ উক্ত লেখক ব্যতীত সকলেরই সাধুবাদ পাইয়াছিলেন।

জয়পুরের অনবদ্য কারুকার্যময় এবং চিত্রঘটিত বাড়িগুলিকে বৈসাদৃশ্যহীন বুঝাইতে গিয়ে কবি পোপের কবিতার প্রতি যে বক্রোক্তি লেখক করিলেন তাহাতে সন্দেহ জাগে লেখক কবির নামটি কোন সূত্রে অবগত হইলেও কবির রচনার সহিত বিশেষ পরিচিত নহেন।

দুই।। জয়পুরের দোকানগুলির নামপট্ট লিখন পদ্ধতি প্রসঙ্গে রঞ্জনবাবু লিখিয়াছেন—'তবে এইসব সাইনবোর্ড এবং আকাশলগ্ন বিজ্ঞাপনে অক্ষরের গঠন ও বিন্যাস প্রভেদহীনভাবে সাদামাঠা। মনে হয় না যে আধুনিক বিজ্ঞাপনরীতির একটি রূপণ স্রোতও রাজস্থানী ব্যাপারী মহলের আটপৌরে সাবেকীয়ানার কোনো দুর্বল ছিদ্র ঢুকতে পেরেছে।' আসলে লেখক জয়পুর শহরের চরিত্রটিই অনুধাবন করিতে পারেন নাই, অন্য শহরের সহিত তুলনা করিতে যাইয়া সব গুলাইয়া ফেলিয়াছেন। সাইনবোর্ডের এই প্রভেদহীন সাদামাঠা ভাবটি আইন করিয়া কঠোর হস্তে প্রযুক্ত করিতে হইয়াছিল। সবকারী আমলে বাড়ির রঙেতে যে সময়ে ঐ অবাঞ্ছকতা দেখা দিয়াছিল সে সময়ে দোকানপাটের সাইনবোর্ডের আকার আয়তন ও সাজসজ্জায় ক্যালিগ্রাফী ও টাইপোগ্রাফির আতন্ত্রীয়তা এমন অমার্জিতভাবে সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছিল যে, যে উদ্দেশ্যে নূতন করিয়া গোলাপী রঙের কথা চিন্তা করা হয় সেই একই কারণে অর্থাৎ জয় সিং-এর কালের চিত্রটিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্যেই আইনের সাহায্যে সাইনবোর্ডে নাম লেখার ব্যাপারে সাহায্যতা আনিতে হয়। তাহা না হইলে রাজস্থানী ব্যাপারী মহল যে আটপৌরে নয় এবং তারা যে প্রচণ্ডভাবে প্রগতিবাদী বা এন্টারপ্রাইজিং তার নমুনা কলিকাতা এবং ভারতের বাণিজ্যিক মানচিত্রটি দেখিলেই উপলব্ধি করিতে অসুবিধা হয় না।

তিন।। জয়পুরের বাজার ও জনপথ প্রসঙ্গে রঞ্জনবাবু পরস্পরবিরোধী উক্তি করিয়াছেন। একবার লিখিলেন—'এবং সমস্ত জয়পুর শহরটিকে একটি ক্রমবর্ধমান বাজার বললেও অত্যুক্তি হবে না। প্রতিটি জনপথের সঙ্গে সেখানে প্রায় আবশ্যকভাবে সংলগ্ন একটি করে বাজার।' আবার অন্যত্র বললেন, 'শহরের কেন্দ্রে রয়েছে বিখ্যাত বাজারগুলি এবং বাণিজ্য মহল। প্রতিটি জনপথ সব জটিল ঘূর্ণনের শেষে একত্র হয়েছে এখানে। সমস্ত শহরটি মোট নটি ধাপে এই কেন্দ্রবিন্দু থেকে বিস্তৃত হয়ে আছে।' জয়পুরের সমস্ত রাজপথ জনপথ এমনকি সংকীর্ণতম গলিপথ পর্যন্ত সোজা সরল এবং সমান্তরালভাবে শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঋজুভাবে বিস্তৃত। একটি পথ অন্য পথের সহিত সহজলভ্য এই শহরের নক্সা দেখিলেই যে কোন অর্বাচীন দর্শকের পক্ষেও বুঝিয়া লওয়া সম্ভব যে পথের কোথাও ঘূর্ণনের অবকাশ নাই—জটিলতা তো অলীক স্বপ্নবিলাস।

আর রাজপথের নামের সঙ্গে 'বাজার' শব্দটির উল্লেখ থাকিলেই যে সেটিকে 'গড়িয়াহাট মার্কেট' হইতে হইবেই এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই—ঐ অঞ্চলগুলিতে পদার্পণ করিলেই বুঝিতে পারা যায় জহুরি বাজার, চাঁদপোল বাজার, কিষণপোল বাজার, সিরে ডেউরি বাজার, মোতি কাটলা বাজার, রামগঞ্জ বাজার প্রভৃতি শুধুমাত্র মার্কেট বোঝায় না, এলাকাও বোঝায়। বিদ্যাধর শহরের যে নক্সা করিয়াছিলেন তাতে রাজপথের দুই নকসা সারি সারি সমমাপের ১৬২টি দোকান ও তাহার পিছনে বাসগৃহ মন্দির বিদ্যালয় এবং হস্তশিল্প ও কারুশিল্পের কারখানার ব্যবস্থা রাখিয়াছিলেন। অন্য শহর হইতে জয়পুর শহরের বৈশিষ্ট্য হইল তাহাই। সমান মাপের রাজপথ, সরল ও সমান্তরাল, সমান উচ্চতা ও আকারের দোকানপাট, সমানাকৃতির সিংহদ্বার প্রভৃতি। রঞ্জনবাবুর উক্তি হইতে আমাদের মনে দুইটি চিন্তার উদয় হয়—লেখক জয়পুরের রাস্তায় আদৌ পদার্পণ না করিয়া সরকারী গাইড বইয়ের পাতায় রাস্তার নামের সহিত বাজার শব্দটি যুক্ত দেখিয়া সমগ্র জয়পুরকে বাজার ভাবিয়া বসিয়াছেন এবং বাজার যখন অতএব তাহা নিঃসন্দেহে কলুটোলা বা বৈঠকখানার বাজারের মতই জটিল ও ঘূর্ণনময় পথের সমষ্টি।

চার।। রঞ্জনবাবুর পরবর্তী ভ্রান্ত মন্তব্যটি জয়পুরের স্থপতিবিদ্ এবং আশ্চর্য প্রতিভাশালী পুরুষ শ্রীবিদ্যাধর চক্রবর্তী সম্পর্কে। ইতিহাসের কোন সম্পর্ক না রাখিয়াই তিনি লিখিলেন—'তিনি এই বিশাল কর্মযজ্ঞের সূচনায় এক তিরিশ বছরের বাঙালী ছোকরা এবং সুপরিণত অন্তিমে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স্ক এক কীর্তিমান, ভগ্নস্বাস্থ্য বাঙালী প্রৌঢ় যাঁর কপালে একাধিকবার জুটেছে সরকারী খেতাব, যাঁকে পুরস্কৃত করেছেন স্বয়ং মহারাজা জয় সিং। কিন্তু এ যেন তাঁর সব অবিচল নিষ্ঠা, অমোঘ পরিকল্পনা আর অকল্পনীয় সাফল্যে হাতে হাতে পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দেওয়া যাতে ভবিষ্যতের কাছে কোন প্রত্যাশা না থাকে যেন জয়পুরের ইতিহাস কোনকালে এই বাঙালী রাজকর্মচারীর প্রতি ঋণবোধে না বিব্রত হয়ে পড়ে।' একজন সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত ব্যক্তিকে, যাঁর বয়স ত্রিশ বছর তাঁকে 'ছোকরা' সম্বোধন করিয়া উল্লেখ অশালীন ও অভদ্র মনোভাবের পরিচায়ক বলিয়াই আমাদের মনে হইয়াছে। তাহা ছাড়া তিরিশ বছরের 'ছোকরা' বিদ্যাধর পঁয়তাল্লিশে হঠাৎ ভগ্নস্বাস্থ্য প্রৌঢ় হইয়া গেলেন কেন তাহা বুঝিতে পারা গেল না;

সেকালের এই 'বাঙালী রাজ-কর্মচারীর' প্রতি মহারাজ জয় সিং এবং তাঁর পরবর্তী নৃপতিরা ঋণ স্বীকারে কোন কার্পণ্য করেন নাই বা কুণ্ঠিতও যে ছিলেন না তার চিরস্থায়ী প্রমাণ রহিয়াছে। বিদ্যাধর জয় সিং-এর নিকট প্রথম শিরোপা (সম্মানিত উপাধি) পাইয়াছিলেন ১৭২৬ খৃঃ জয়গড় দুর্গ নির্মাণের জন্য। ১৭২৯ খৃঃ তিনি 'দেশ দেওয়ান' পদে (রাজস্ব মন্ত্রী) উন্নীত হইয়াছিলেন জয়পুর নগর পরিকল্পনার সুচারু রূপায়ণের জন্য। ১৭৩৪ খৃঃ শিরোপা পাইয়াছিলেন সাতমহলা চন্দ্রমহল প্রাসাদ নির্মাণের জন্য। ১৭৩৫ সালে পুনরায় জয় সিং-এর কাছে পুরস্কৃত হন দর্ভবতী নদীর গতি পরিবর্তন করাইয়া তাহাকে জয়পুর শহরের [illegible] দিয়া প্রবাহিত করানোর জন্য। ১৭৪৩ [illegible] জয় সিং-এর মৃত্যুর পর ঈশ্বরী সিং [illegible] হইবার পরও বিদ্যাধর রাজস্ব মন্ত্রীর পদে বহাল ছিলেন এবং শিরোপায় ভূষিত হয়েছেন পর্যায়ক্রমে ১৭৪৪ খৃঃ, ১৭৪৬ খৃঃ এবং ১৭৪৮ খৃঃ। ঈশ্বরী সিং, ১৭৫০ সালে মারা যাইবার পর রাজগদীতে বসিয়াছিলেন তাঁর সহোদর মাধো সিং—কিন্তু বিদ্যাধর নূতন শিরোপাসহ তাঁর রাজত্ব-কালেও রাজস্ব মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত থাকিয়াছেন। ১৭৫১ সালে ৫৪ বছর বয়সে [illegible]ধরের মৃত্যুর পর কৃতজ্ঞ রাজা তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র মুরলীধর চক্রবর্তীকে রাজস্ব মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন। বিদ্যাধরের অন্য দুই পুত্র গঙ্গাধর এবং গদাধর সরকারী খাজাঞ্চী হইতে যথাক্রমে এক হাজার ও পাঁচশো টাকা পাইয়াছেন আজীবন। মুরলীধরের ছেলে লক্ষ্মীধর (বিদ্যাধরের নাতি) বার্ষিক আটশো টাকা দক্ষিণা পাইতেন। মহারাজা মাধো সিং কোন এক [illegible]য় বিশেষ খুশি হইয়া 'হীরারাজ' নামে [illegible]ট পুরুষ হস্তী উপঢৌকন দিয়াছিলেন। [illegible]জস্থান বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃত 'ডঃ [illegible]সীমকুমার বসুর গবেষণা পত্র দ্রষ্টব্য]

আর জয়পুর তার শ্রষ্টার ঋণ স্বীকার করিয়া চলিতেছে আজও বিদ্যাধর কি রাস্তা (রাজপ্রাসাদের প্রধান তোরণদ্বার ত্রিপোলিয়ার কাছে বর্তমান জয়পুরের একটি উল্লেখযোগ্য রাজপথ) এবং জয় সিং-এর অন্যতম রাণী শিশোদিয়ার বিখ্যাত প্রাসাদের কাছে বিদ্যাধর-কা-বাগ নামে একটি সুরম্য উদ্যান বুকে নিয়ে। রঞ্জনবাবু তাঁর সাংবাদিক দায়িত্ববটি সামান্যতম [illegible]ভাব সঙ্গে পালন করিলে জানিতে পারিতেন যে 'শুধুমাত্র সরকারী শ্বেতাবই' নয় শিল্পী বিদ্যাধরকে আজও সকলে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া থাকে—তাই জয়পুরের জন্মদিনের (১৮ নভেম্বর ১৯৭৭) পরের দিনটি অর্থাৎ ১৯ নভেম্বর ১৯৭৭ 'বিদ্যাধর দিবস' হিসাবে চিহ্নিত ছিল।

বিদ্যাধরের এই ব্যক্তিগত সম্মান এবং পারিবারিক সম্বর্ধনা এবং জয়পুরের তথা বিশ্ববাসীর এই শ্রদ্ধাকে লেখকের ভাষায় নগদ বিদায়ের পর্যায়ে ফেলা যায় না। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য বালক বিদ্যাধরের বুদ্ধি ও প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া মহারাজা জয় সিং নিজ ব্যয়ে তাঁর শিক্ষার ভার লইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বাস্তু বিদ্যা, তর্কশাস্ত্র প্রভৃতি অধ্যয়নের জন্য তৎকালীন অধ্যয়নের শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান বারাণসীতে পাঠাইয়াছিলেন রাজকীয় রক্ষণাবেক্ষণে। অতএব দেখা যায় এই 'বাঙালী রাজ-কর্মচারীর প্রতিভার বিকাশে মহারাজা জয় সিং-এর অবদান কোন অংশে কম নয়। রঞ্জনবাবু এইসব সত্যকে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া কি করিয়া যে ঐ 'ঋণবোধে বিব্রত না হয়ে পড়ে' ইত্যাদি মন্তব্য করিলেন তাহা বুঝিলাম না।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার নানাস্থানে তাঁর অন্ধ প্রাদেশিকতাবোধ বড়ই উলঙ্গভাবে প্রকাশ পাইয়াছে—অথচ 'জয়পুরের জন্ম-দিনের ঘটনা লিখিতে যাহার কোনই প্রয়োজন ছিল না। 'ভগ্নস্বাস্থ্য' প্রসঙ্গটি লেখার মধ্যেও সস্তা 'বাঙালী সেন্টিমেন্ট' জাগ্রত করা ছাড়া অন্য কোন কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। (মাফ করিবেন এই পংক্তিটি লিখিতে পারার জন্য আমি রঞ্জনবাবুর কাছেই ঋণ স্বীকার করিতে চাই—ঐ প্রবন্ধের অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন —'তবু এই উৎসব প্রাঙ্গণে দুটি বাঙালী গুণের একান্ত অভাব—একটি বাঙালী-বিধুরতা, অন্যটি বাঙালী সৌজন্য।' বিধুরতা ও সৌজন্যতাবোধের 'বাঙালী' বিশ্লেষণের সাথে এর আগে আমাদের পরিচিত হইবার সুযোগ হয় নাই—সেই সুবাদেই 'বাঙালী সেন্টিমেন্ট' হইবে কিনা ভাবিতেছিলাম।)

বিদ্যাধর সওয়াই জয়সিং-এর অন্যতম পরিষদ কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্যের আপন ভাগনা, কোন 'সম্ভবত' দূর সম্পর্কীয় জ্ঞাতি নন। কৃষ্ণরাম সওয়া 'খ্যাতিমান স্থপতি' ছিলেন ইহা রঞ্জনবাবুর নিজস্ব আবিষ্কার। ১৭২৭ সালে ১৮ নভেম্বর পুরোহিতের ভিত্তি-পূজনের মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে 'প্রথম পাথরটি সযত্নে শুইয়ে দিলেন মহারাজা সওয়াই জয়সিং' ব্যাপারটিও রঞ্জনবাবুর উর্বর কল্পনার ফলশ্রুতি। কারণ তখনকার দিনে ও-ধরনের 'বর্তমান রাজনৈতিক' বেওয়াজ ছিল না।

জয়পুরের জন্মদিনের কথা লিখিতে গিয়া রঞ্জনবাবু আমাদের অনেক অবাস্তব ইতিহাস মায় হিপি-হিপিনীদের প্রেম ও অন্তর্বাস' পরিধানের অবাস্তব ও গর্হিত প্রসঙ্গও উত্থাপন করিলেন, কিন্তু যে বিষয়-গুলি না লিখিলে জয়পুরের কাহিনী অসম্পূর্ণ থাকে তাহা লিখিলেন না। যেমন তিনি বিদ্যাধর পরিকল্পিত সাতমহলা চন্দ্র-মহল প্রাসাদে অধুনা রাজপরিবারের ব্যবহৃত বিষয়বস্তুর যে সংগ্রহশালা বা যাদুঘর রহিয়াছে, যেটি বর্তমানে ভারতবর্ষের বিশিষ্ট যাদুঘরগুলির মধ্যে অন্যতম তার সম্পর্কে কিছু বলিবেন না। বলিবেন না শ্রীগোবিন্দজী ও যশোরেশ্বরীর মন্দির (বাংলার বারো ভুঁইয়া প্রতাপাদিত্যের ইষ্টদেবী) শিশোদিয়া প্রাসাদ বিদ্যাধরের উদ্যান, মোতি ডুংরি দুর্গ (কিছুকাল আগে আয় বিভাগের তল্লাশির ফলে জয়পুরের 'সোনার কেল্লা' নামে সংবাদ-পত্রে উল্লেখিত হইয়াছিল), এ্যালবার্ট হল সংগ্রহশালা, গেটোর এবং গলতা অথবা জলমহল সম্পর্কেও কিছু। আকবর সেনাপতি জয়পুররাজ মান-সিং-এর বিখ্যাত অম্বর দুর্গ ও প্রাসাদ সম্পর্কে লিখিবার ব্যাপারে এক মধ্য-বয়স্কা বাঙালী মহিলার দ্রুতগতি পর্বতারোহন ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না এবং তিনি নিজে দমছুট হইয়া কোনমতে প্রাসাদের চত্বরে উঠিয়ে যে একটি মাত্র দ্রষ্টব্য দেখিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং যেটিকে লিখিলেন 'পুতুল বাড়ীর মত জলমহল' সেটি আসলে একটি কারুকার্যময় উদ্যান যার নাম মোহন বাগ'। জলমহল প্রাসাদ অম্বর প্যালেস হইতে প্রায় মাইল খানেক দূরে পথে আসিতে পারে। অম্বর প্রাসাদটির শিল্প-সৌন্দর্য এবং পাহাড়ের চূড়ায় তাহার বিস্ময়ের ব্যাপ্তি ও বিস্তার প্রভৃতি লইয়া অনেক কিছুই লেখা চলিত, কিন্তু রঞ্জনবাবু সে চেষ্টা করিলেন না।

বিশ্ববিখ্যাত 'যন্তর মন্তর' (অবজার-ভেটরি) প্রসঙ্গে বলিতে গিয়া তিনি এককথায় সেটিকে আজকের ইলেকট্রনিক যুগে অচল ঘোষণা করিয়া ইরুম টাইমসে (নভেম্বর ২৫ —ডিসেম্বর ৮ ১৯৭৭) প্রকাশিত মূলকরাজ আনন্দের লেখাটি হইতে অনুবাদ করিয়া জয়সিং-এর মনীষা ও চপল প্রেমের এক অলীক কাহিনী শোনাইলেন, তার কোন ঐতিহাসিক সমর্থন নাই। কিন্তু ২৫০ বছর পূর্বে নির্মিত এই যন্তর মন্তর-এর ১৮।১৯টি বিভিন্ন বিশাল 'যন্ত্রের' মাধ্যমে এই ইলেকট্রনিক ঘড়ির যুগেও সৌরমণ্ডলের সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র ও রাশিচক্রের অবস্থান এবং গতিপথের নির্ভুল গণনা ও গবেষণা করা সম্ভব তাহাদের কথাও কিছুই বলিলেন না।

প্রবন্ধে প্রকাশিত নামগোত্রহীন ছবি-গুলি অত্যন্ত নিকৃষ্ট পর্যায়ের এবং অধি-কাংশই জয়পুরকে প্রতিনিধিত্ব করে না যা তার জন্মদিনের প্রাসঙ্গিক নহে—তাছাড়া পুষ্করতীর্থের ছবি কি করিয়া রচনায় স্থান পাইল বুঝিলাম না। পুষ্কর জয়পুর হইতে আশী মাইল দূরে আজমীরের নিকটে এক তীর্থ শহর।

জয়পুরের 'ব্লু পটারী' শিল্পের প্রচলক হিসেবে রঞ্জনবাবু জয়সিং-এর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এই ব্যাপারে ঘড়ি-মাফিক যে কাহিনীটি তিনি তাঁর ম্যাগাজিনে যদু-বেন্দ্র সহায়ের প্রবন্ধ থেকে বিনা স্বীকৃতিতে হুবহু শব্দ প্রতিশব্দ অনুবাদ করিয়া দিয়া-ছেন সেটি একটু আত্মস্থ হইয়া পাঠ করিলে জানিতে পারিতেন—ঘটনার নায়ক জয়সিং-নয়, তাঁর রাজত্বের প্রায় নব্বই বছর পরের সপ্তম উত্তরসূরী সওয়াই রাজা দ্বিতীয় রাম সিং। এই ভুলটি পরে স্বীকার করিবার সময় রঞ্জনবাবু 'নীরস তথ্য' বলিয়া নস্যাৎ করিবারও চেষ্টা করিলেন।

[illegible]

শৈবাল মিত্র

তরণী পাহাড়ে বসন্ত

দ্বিতীয়জন সাড়া দেয় না। বাস্তায় বেরিয়ে হঠাৎ তার জোর বাথরুম চেপেছে। সে জায়গা খুঁজছে। ওরা এখন ময়দানে যাবে। ভিজে ঘাসের ওপর আন্ডারওয়ার পরে ফ্রি স্টাইল কুস্তি লড়বে। ঘুমোবে কিছু-সময়। জল, কাদা, রোদ ওদের গায়ে লাগে না। এরা দুজন কবিতা লেখে। অশাস্ত্রীয় কবিতা। একজনের নাম সৌরভ। অন্যজন খগেন।

সৌরভের খ্যাতি কম। চাকরি নেই। ডিমের ব্যবসা করে। খগেন মোটামুটি ঝাঁকিয়ে বসেছে। নামী কাগজে কাজ করে। তাবাই পাম্প করে ওকে ফুলিয়েছে। মাল খেলে ওর বিবেক চাড়া দেয়। তখন ও কাঁদে। অনেক কথা বলে। বাস্তাব ওপরেই খগেন জল ছড়ায়। সৌরভ বিবক্ত হয়। গোটা শহরটাকে শালা ইউরিনাল বানিয়ে দিল। ওর মনে দুঃখ আছে। খগেন ওকে টেক্কা দিলো। অথচ খগেনের চেয়ে ওর লেখা অনেক ভালো। ওর কবিতা খুঁড়লে ঝর্ণার জল লাফিয়ে উঠবে। অনেকেই বলেছেন একথা। অথচ খগেন আজ বড় কবি। খগেন পুরনো বন্ধু। সুখ দুঃখে বহুকাল জড়িয়ে গেছে। তবু হিংসে হয়। তার ওপর খগেন নামে কবি। ভাবা যায় না। এ নিয়ে আগে হাসাহাসি হতো। খগেনও হাসতো। আজকাল কেউ হাসে না। খগেন কবি হওয়ার পর কেউ আর হাসতে সাহস পায় না। ধর্মতলা স্ট্রীট ধরে ওরা চৌরঙ্গীতে আসে। দুজনেই চুপচাপ।

সৌরভ কবিতার কথা ভাবে। তার নিজের কবিতা। খগেনের কবিতা। রবীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে-র কবিতা। খগেন পাবলো। আমি পাবলুম না। কেন এমন হয়। পাশাপাশি দুটো দোকান। একই জিনিস বেচে। একই গুড উইল। তবু একটা ফুলে ফেঁপে ওঠে। আর একটা ডুবে যায়। খগেনকে কাগজওলারা ঘেরে নিলো। খগেন কবি। সে হাজার ধর্ণা দিয়ে পাত্তা পেলো না।

উল্টো ফুটে অন্ধকার, ভিড়। একটা পুলিশভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। খগেন ওর হাত ধরে রাস্তা পেরোয়। মাঝে মাঝে খগেনকে চলন্ত গাড়ির সামনে ধাক্কা দিতে ইচ্ছে করে। বেশ জোরালো ইচ্ছে। ও নিজেকে সামলায়। ভাবে, হিংসে করা ঠিক নয়। খগেন বন্ধু। নিজের চেষ্টায় তিতেছে। খারাপ কি। নিজেকে প্রমান দেয়া। মানুষ হিসেবে খারাপ হলে ভালো লেখক হওয়া যায় না। নিজেকে শোধরাও। মহৎ হওয়ার চেষ্টা করো।

মানুষগুলো ওর মনে কোনো দাগ কাটে না। ভালো মানুষ লেখক ও একটাও দেখেনি। অনেক লেখকের সঙ্গে ওর পরিচয়। বেশীরভাগ ভণ্ড, ধান্দাবাজ, খারাপ লোক। এরা কি করে লেখক হয়। সৌরভের সব কিছু যেমন যেন গুলিয়ে যায়। এরা দালাল বা ফোড়ে হতে পারে। কেরানী বা মোসাহেব হলেও মানিয়ে যায়। কিন্তু লেখক হয় কি করে। যতো আখডাই মাল। সবকটা বান্দর। কোথাও পাত্তা না পেয়ে লাইনে নেমেছে। লেখালেখির লাইন। সবকটা ছুঁচো। ফুলে ফেঁপে শুয়োর হতে চায়। কালো ভ্যানের মধ্যে দুটো মেয়ে চেরা গলায় চেঁচাচ্ছে।

গাড়ীটা ঘিরে ফালতু মানুষের ভিড়। একজন পালোয়ান গোছের লোক একটা মেয়েকে প্রায় চ্যাংদোলা করে নিয়ে এলো। কে যেন বললো —কুকুর ধরছে। পাশে মিনিবাসের লাইন। দুজন মহিলা অবাক চোখে দেখছে।

শালা—খগেন বিড়বিড় করে—খেতে দেওয়ার নাম নেই কিল মারার গোঁসাই। সৌরভ ভাবছিলো একই মেয়েমানুষ। অফিস ফেরৎ মিনিবাসের লাইনে দাঁড়িয়ে একজন সতী গেরস্ত বৌ। আর একজন সাজগোজ করে ল্যাম্পপোস্টের নীচে দু চার টাকার ধান্দা করলে বেশ্যা। নিয়মটা ওর ভালো লাগে না। শরীরের সবগুলো একইরকমের যন্ত্র-পাতি, চেহারাতেও বিশেষ তফাৎ নেই, তবু দুটো আলাদা ক্লাস। এটা ঠিক নয়। খগেন কবি কোনো ব্যাপারে সে কারোর চেয়ে কমতি নয়। অথচ সে কল্কে পেলো না। খগেন কথা বলছিলো—ভিক্ষে যদি অপরাধ হয়। বেশ্যা বৃত্তিও আইনী করা উচিত। মেয়েগুলো কি করবে? এটাও একটা সেফটি এমপ্লয়মেন্ট। না খেয়ে তো মানুষ মরবে না।

মরবে কেন—সৌরভ কথার পিঠে বলে।

সেতো বটেই। সকলের বাঁচার অধিকার আছে। কিন্তু কিভাবে যে বাঁচবে কেউ জানে। এদেশে তন্ত্রফন্ত্র বাজে। গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র স্বৈরতন্ত্র কিছুই কিছু নয়। মানুষ খেতে চায়, পরতে চায় আর বাঁচতে চায়। খগেন একটানা কথা বলে। সাধারণ মানুষের কাছে গণতন্ত্র আর স্বৈরতন্ত্রে কোনো ফারাক নেই। খাদ্য, চাকরী বাদ দিয়ে স্বৈরতন্ত্র বা গণতন্ত্র কোনোটাই চলবে না। আমার মনে হয় মানুষ ফুড প্লাস স্বৈরতন্ত্র মেনে নেবে। কিন্তু গণতন্ত্র মাইনাস ফুড মানবে না। শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না।

ভিজে ঘাসের জল ছিটকে ওদের মুখে লাগে। আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়। খগেন একপলক মনুমেন্টের দিকে তাকিয়ে বলে—এটা বোধহয় একটু একটু করে বেঁকে যাচ্ছে। ভবানীপুর ক্লাবের পেছন দিয়ে ওরা মোহনবাগান মাঠের দিকে এগোয়। লাইন দিয়ে গাড়ী চলেছে। কোনো সাড়শব্দ নেই। জমাট অন্ধকার। আলো জ্বলে নি। এপাশটায় যেন মাঝরাত। ঘন নীরবতা।

মাঠের পেছনদিকে ওরা দাঁড়ায়। বড়ো রাস্তা অনেক দূরে। দু একটা গাড়ীর ছুটন্ত আলো। ওরা পোষাক খোলে। শরীরের শুধু ক্রিয়া। সৌরভের মাথার মধ্যে কি যেন দপদপ করে। আজ ওর তিনটে লেগ-ইন মরশুমী মরেছে। এক হপ্তায় সতেরোটা মরলো। আকাল লেগেছে। ও ফতুর হয়ে যাবে। খগেন উবুতে চাপড় মারে। যোগা, শুকনো শরীরে চটপটি বাজে। আজ ওকে খুন করবো, সৌরভ ভাবে। খগেনের মাড়ে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। খগেনের মনে হয় সৌরভের শরীর আজ বেজায় গরম। সৌরভের ধমনীতে ফুটন্ত রক্তস্রোতের শব্দ ও শুনতে পায়। সৌরভ এক লেঙ্গিতে ওকে মাটিতে ফেলে দেয়। খগেনের মাথাটা ঘুরে

যায়। তবু ও ওঠে। সৌরভকে জাপটে ধরে। দাঁতে দাঁত টিপে দুজনে লড়ছে। একসময় খগেনের ক্লান্ত লাগে। সৌরভ এক ঝটকায় ওকে কাত করে দেয়। তারপর বুকের ওপর চেপে বসে। দুটো শক্ত হাত ওর গলায় সাঁড়াশির চাপ দেয়। দম যেন বেরিয়ে আসছে। বুক ফেটে যায়। মুখে গোঁ গোঁ শব্দ। সৌরভ হঠাৎ দুহাত আলগা করে। ওকে নাড়া দেয়। নাম ধরে ডাকে। খগেন আবছা গলায় বলে—শালা, ভীতু।

সৌরভ বিড়বিড় করে—খুন করা বড়ো শক্ত কাজ। দুজনেই একসময় ঘুমিয়ে পড়ে।

পুণ্যা-গত তিন রাত ঘুমোয় নি। মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করছিল। তিনদিনে সতেরোটা সভা করেছে। দিনরাত সভা। ঘরোয়া বৈঠক। কোনোটাই তিন চার ঘন্টার কমে শেষ হয় না। পার্টির বড়ো দুর্দিন। চারদিকে ভাঙনের শব্দ, সন্দেহ অবিশ্বাস দলাদলি। মিটিং করার জন্যে গিয়ে দুজন কমরেড আর ফেরে নি। সহকর্মীদের হাতে খুন হয়েছে। পুণ্যা পার্টির ওপরতলার নেতা। পুলিশ খুঁজছে। তার মাথার দাম দশ হাজার টাকা। ত্রিশ বছরের রাজনৈতিক জীবনে এতোবড়ো দুর্যোগ আগে আসেনি। পার্টিকে বাঁচাতে হিমসিম খাচ্ছে। পার্টিই জীবন।

আজ এই মধ্যবয়সে বারবার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। স্কুলে কলেজে পড়া পুণ্যাকে স্বপ্নের মধ্যে দেখে। আবছা ঘুমের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া সেই তরুণ হেঁটে যায়। তখন কবিতা লিখতো। গল্প লিখতো। বোমা রোলাঁ ছিল প্রিয় লেখক। জাঁ ক্রিস্তফের মতো একটা জীবন চাই। সেই বিখ্যাত কথাটা দিনরাত মাথায় খোঁচাতো আইন শৃঙ্খলার নামে যখন অন্যায় চলে, তখন আইনশৃঙ্খলা ভাঙা ন্যায়সঙ্গত। আমি থামবো না।

কাঁচা বয়েসের সেই আদর্শবাদ পোড় খেয়ে আজ অনেক শক্ত এবং বাস্তব। তবু কৈশোর যৌবনের দিনগুলো এখনো মায়া ছড়ায়। অনেক কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে। মাঝে মাঝে প্রীতির কথা মনে হয়। সংসার নিয়ে তার অনেক স্বপ্ন ছিল। মেটে নি। অশনির এখন বছর বারো বয়েস। স্কুলে যায়। দেখা করার উপায় নেই। ওর পুরনো সব আন্ডারাই পুলিশ জানে। নতুনগুলোও চিনে যাচ্ছে। এখন ও দিনরাত ছুটছে। এই বয়েসে রক্তের মধ্যে যেন একটা নতুন প্লাবন এসেছে। চারপাশে ঝাঁকে ঝাঁকে তাজা তরুণ ছেলে। কতোজন শহীদ হলো। শরীরে মনে আরো দিনরাত তাপ ছড়ায়।

আরো আগে শুরু করা উচিত ছিলো। দেরী হয়ে গেছে। তবু হতাশ হওয়ার কিছু নেই। শেষপর্যন্ত পথ মিলেছে, এটাই বড়ো কথা। তাছাড়া ইতিহাসের নিজস্ব কিছু নিয়ম আর প্রক্রিয়া আছে। ব্যক্তি সেটাকে ঠেলে সাজায়। কিন্তু সবটাই ব্যক্তির ওপর নির্ভর করে না। সেই দুপুর থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আকাশে এখনো চাপচাপ

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নিষিদ্ধ উপন্যাস

সমবায় প্রকাশনীর বই

সম্পাদনায় : প্রলয় সেন, অর্ধেন্দু চক্রবর্তী ও দেবব্রত মল্লিক।

[আট খণ্ডে সম্পূর্ণ। মোট মূল্য ২৪০ টাকা। গ্রাহক মূল্য ১৭০ টাকা। এককালীন গ্রাহক মূল্য ১৪০ টাকা। ১০ টাকা দিয়ে গ্রাহক হোন। টাকা মনি অর্ডারেও পাঠাতে পারেন]

যুগে যুগে জগদ্বরেন্য উপন্যাসিকদের অমর সৃষ্টি রাজনৈতিক কিংবা অশ্লীলতার দায়ে শাসক শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থরক্ষার জন্য নিষিদ্ধ হয়েছে। অথচ কালের কষ্টিপাথরে এই ধ্রুপদী সৃষ্টিগুলি মানবসভ্যতার অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন। এই সব নিষিদ্ধ উপন্যাসকে বাদ দিয়ে বিশ্বসাহিত্য অসম্পূর্ণ। আমরা এই কালজয়ী উপন্যাসগুলি আট খণ্ডে প্রকাশ করছি। সম্ভাব্য লেখকসূচী : লেডি চ্যাটার্লি লাভার—লরেন্স, মাদাম বোভারি—ফ্লবেয়ার, ট্রপিক অফ ক্যানসার—মিলার, গডস লিটল একার—কল্ড ওয়েল, স্যাংচুয়ারি—ফকনার, একনেকটিকাট, ইয়াং কি ইন কিং আর্থারস কোর্ট—মার্কটোয়েন, দি সন অলসো রাইজেস—হেমিংওয়ে, অয়েল— সিনক্লেয়ার, দি ওয়ার্ল্ড অফ উইলিয়াম ক্লিস ওলড—ওয়েলস, দি জিনিয়াস—ডেইজারস, ডেকামেরন—বোকাচ্চিয়ো, ডক্টর স্টোরিজ—বালজক দি পিকচার অফ ডোরিয়ান গ্রে—অসকার ওয়াইল্ড, ডঃ জিভাগো পাস্তারনাক, নানা—জোলা, অলকোয়ায়েট অন দা ওয়েস্টার্নফ্রন্ট— রেমার্ক, ইয়ামা দি হেলহোল—কুপরিন এবং একটি ভারতীয় উপন্যাস। সঙ্গে থাকছে লেখক পরিচিতি ও নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ।

পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ বিশিষ্ট সাহিত্যিকরা করছেন। প্রতি খণ্ড (আনুমানিক পাঁচশ পাতা) সংগ্রহকালে গ্রাহকদের কুড়ি টাকা দেব। সাইজ ১/৮ ডিমাই। বোর্ড বাঁধাই। প্লাস্টিক জ্যাকেট।

আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য বই :

কিশোর জ্ঞানকোষ

কিশোর কিশোরীদের জীবন গঠনের আধুনিক বেদ।

দু খণ্ডের মূল্য ৫০ টাকা। প্রথম খণ্ড আর কিছু পাওয়া যাচ্ছে। দ্বিতীয় খণ্ড অল্প কয়েকদিনের মধ্যে বেরুবে।

পৃথিবীর পৌরাণিক কাহিনী

মূল্য ২০ টাকা। ২৪টি দেশের দেড়শোর বেশী পুরাণের গল্প বাংলা ভাষায় এই প্রথম।

রূপকথার বিশ্ব

দ্বিতীয় সংস্করন। বত্রিশটি দেশের ৪২টি সুনির্বাচিত সচিত্র গল্প সংকলন। বাংলা ভাষায় এতগুলি দেশের রূপকথার গল্প কোন একটি গ্রন্থে এর আগে পরিবেশিত হয়নি। সঙ্গে আছে প্রতিটি দেশের পরিচয়। মূল্য বারো টাকা।

*গ্রাহকদের হয়ে বুক সেলারসরা যোগাযোগ করতে পারেন।

পরিবেশনায় : মডেল পাবলিশিং হাউস
২এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০৭৩

কালো মেঘ। নিকষ নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। একটা তারা নেই। রাস্তায় জল জমেছে। তারা নেই। রাস্তায় জল জমেছে। গাড়ির চাকায় জল ভাঙার শব্দ। এখনি বেরোতে হবে। আজ রাতে বীরভূম যাওয়ার কথা। ঝড়ের বেগে সবাই এগোচ্ছে ওখানে। ঝড়ম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ওরা। ওটা কোনো রাজনৈতিক কাজ নয়। কম্যুনিস্টের সংস্কৃতি নিয়েও ওদের দ্বিমত। পার্টি খুব শকত হাতে এসবের মোকাবেলা করবে। বিতর্কের দরকার আছে। কিন্তু গোটা যুদ্ধকে এগিয়ে দেবে। মজবুত করবে পার্টি ঐক্য। বিতর্কের ঝড়ে যদি পার্টির ভিত নড়ে যায়, লড়াই কিমিয়ে পড়ে, তবে সে বিতর্কের কি দরকার। পার্টি এর বিরোধিতা করবে।

প্রায় আধ ঘণ্টা হলো গণপতি ট্যাকসি ডাকতে গেছে। এই ঝড় বৃষ্টির সন্ধ্যেতে ট্যাকসি পাওয়া মুসকিল। কোথায় ঘুরছে কে জানে। সুর্যদা অসুস্থ। চলাফেরার ক্ষমতা নেই। বাইরে যাওয়ার আগে একবার দেখা করা দরকার। এই একটা লোক গোটা দেশকে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখিয়েছে। ওকে বাঁচাতে হবে।

সুর্যদার সঙ্গে কথা বলে ও যাবে প্রিয়নাথের বাড়ী। প্রিয়নাথ ওর পুরোনো বন্ধু। একসময়ে পার্টিতে ছিল। তাত্ত্বিক নেতা। এখন বসে গেছে। তবে বন্ধুত্ব কমেনি। ওর ঘরে বসে কাগজের আগামী সংখ্যার সম্পাদকীয়টা লিখবে। সময় কম। এখনই বেরোনো উচিত।

গণপতি বেজার মুখে ফিরে আসে—রাস্তায় একটাও খালি ট্যাকসি নেই। কি হচ্ছে তাই ব্যাপার।

পুন্য একটু মুষড়ে পড়ে। সুর্যদার সঙ্গে আজ আর দেখা হবে না। মাথায় কিছু নতুন কথা আর চিন্তা জেগেছে। সুর্যদাকে বলা দরকার। দু চারদিন পরে হয় তো মনে থাকবে না। আজকাল এটা প্রায়ই হয়। স্মৃতি দুর্বল হচ্ছে। চিন্তা ভাবনাও জট পাকায়। গুছিয়ে ঝটিতে চিন্তা করতে কষ্ট হয়।

যুক্তি তর্ক পর পর আসে না।

সন্ধ্যায় বসে অনেক সময় মেজাজ খারাপ হয়। মাথা তেতে ওঠে। নতুন ছেলেরাও সেইরকম। বুড়োদের নাজেহাল করতে চায়। দু-একটা মহা বিচ্ছু শয়তানও আছে।

প্রায়ই পুন্য ক্ষেপে ওঠে। থাকলে ওকে ডর। প্রশ্ন থাকলেও চেপে যায়। অশোক পুন্য একতরফা কথা বলে। রাজনীতির কথা। ওর ভঙ্গীটা মজার, রসালো। সভা জমে যায়। তবুও, তাজা ছেলেদের চোখের তারায় আলো জ্বলে। একটা পুরোনো আপসা পথ পুন্য দেখতে পায়। কমবয়েসী একটা ছেলে হাঁটছে। পুন্য চিনতে পারে। পাঁচিশ ত্রিশ বছর আগের পুন্য। সেও এখন চলতে বুকের আসে। মাথা আটকে যায়। হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে। গোটা সভাও তখন কাঁদছে।

পুন্যর লজ্জা করে। দুহাতে চোখের জল মোছে। নিজেকে নিয়ে ব্যঙ্গ করে—আমি আগুনখোর বিপ্লবী। আমি কাঁদবো কেন? তবু কান্না পায়। এ হলো মহাপ্রভু চৈতন্যের কৃপা। চোখের জলে দেশটাকে স্যাঁতসেঁতে করে দিয়েছে। কমনিক সর্দি।

ওর কথায় সকলে হাসে। পুন্য ঠিক করে, আর কাঁদবে না। দরকার হলে পায়ে পা লাগিয়ে সভায় ঝগড়া করবে। সভা বারন রাখবে।

রাস্তায় ফিকে আলো। ওরা দুজনে হাজরার দিকে এগোয়। গণপতির পেছনে পুন্য। গণপতির নামেও ওয়ারেন্ট আছে।

কেউ কথা বলে না। রাস্তায় কথা বলা নিষেধ। গায়ে গায়ে হাঁটে না। ওদের কথা মানেই রাজনীতি। চাপা গলায় রাজনীতি আলোচনা হয় না। গলা চড়ে। বিপদ হয়। সময়টা বড়ো খারাপ। সাধারণ মানুষও চুপচাপ। মুখ খোলে না।

কাঠের গুদোমের পাশ দিয়ে সরু গলিতে ওরা ঢোকে। গলিটা অন্ধকার। এইখানেই প্রিয়নাথ থাকে। উঠোনগুলো পুরোনো আমলের ফ্ল্যাটবাড়ী। দোতলায় প্রিয়নাথের ফ্ল্যাট। বছর পাঁচেক আগে স্ত্রী মারা গেছে। সেই থেকে ফ্ল্যাটটা খালি। একমাত্র মেয়ের আগেই বিয়ে হয়েছে। প্রিয়নাথের ঘর ভর্তি বই। লেখাপড়া নিয়ে আছে। বাজারে কয়েকটা চালু বই আছে। ভালো রয়ালটি আসে।

বাড়ীর গেট থেকে গণপতি চলে যায়। অন্ধকারে সিঁড়ি ভেঙ্গে পুন্য দোতলায় ওঠে। বেল টিপতে প্রিয়নাথ দরজা খুলে দেয়। পুন্য ভেতরে ঢোকে।

প্রিয়নাথ কাজের ছেলেটাকে চা করতে যায়। এ বাড়ী পুন্যর চেনা। ও বাথরুমে যায়। হাত মুখে জল দেয়। জামা, প্যান্ট খোলে। ভেতরে লুঙ্গি গেঞ্জি। একটা ইজি চেয়ারে আরাম করে বসে। চোখে পাতা ঘুমে ভারী। মাথায় অগোছালো চিন্তা। সম্পাদকীয়টা ভাবতে হবে। বিষয়টা মাথায় আছে। চেয়ারম্যানের নতুন ঘোষণা—হয় যুদ্ধ বিপ্লব আনবে; নতুবা বিপ্লব। প্রতিহত করবে যুদ্ধ। প্রিয়নাথ জিজ্ঞেস করে—কতোদিন ঘুমোওনি?

পুন্য হাসে। জবাব দেয় না। মধু চা দিয়ে যায়। পুন্য চা খায়। প্রিয়নাথকে বলে—দুটো সাদা কাগজ দাও। কলম হাতে বসলেই একটা লেখা তৈরী হয়ে যায়। মাথার মধ্যে একটা বিরাট লাটাই আছে। সুতো টানলে খুলতেই যাবে। হাজার লক্ষ গজ সুতো। বাইরে থেকে বোঝা যায় না। মাঝে মধ্যে নিজেরই চমক লাগে। এমন আশ্চর্য ধাবালো সুতো মাথায় আছে।

অবাক কাণ্ড। কতো পুরোনো স্মৃতি, অভিজ্ঞতা টানে টানে বেরিয়ে আসে। লম্ভ ভন্ড চিন্তা একটা পরিষ্কার আদল পায়। [illegible] তখন কাজ করে। সেই মানুষটা সব মনে রাখে। তার অসাধারণ মেধা, তীব্র, তীক্ষ্ণ অনুভূতি। সে কিছু ভোলে না। লিখতে বসলেই পুন্যর মনে হয়, পঞ্চাশ বছর বেঁচে আছি। বাঁচার কোনো ভেজাল নেই। জীবনটা ফাঁকিবাজি নয়।

প্রিয়নাথ বই পড়ে। মাঝে মাঝে পুন্যকে দেখে। পুন্যর অনেক কবিতা একদা মুখস্থ ছিল। রোগা, ফ্যাকাসে, চেহারা মানুষটার চোখের চশমা ঝুলে পড়েছে। চিবুকের হাড় উঁচিয়ে আছে। মাথার চুল প্রায় সাদা। বুড়ো হয়ে গেল। অথচ বয়েসে তার চেয়ে পুন্য অন্ততঃ বছর পাঁচেকের ছোটো।

তোমার লুঙ্গি আর গেঞ্জিটা দিচ্ছি যেও—প্রিয়নাথ বলে—কাচিয়ে রাখবো।

পুন্য শুনতে পায় না। কাগজে মুখ গুঁজে ও তখন লিখছে যুদ্ধ আর বিপ্লবের ভেতরকার সম্পর্কের কথা। স্নান হওয়ার পর থেকেই ও যুদ্ধ করছে। অনেক অনেক যুদ্ধ। মাঠে ময়দানে মিছিলে লেখার টেবিলে আড্ডায় অক্লান্ত লড়ছে। অসুখে, রোগশয্যায় এই যুদ্ধের স্বপক্ষে যুক্তি সাজিয়েছে। বহু বছরের জমানো আগুন কলমের ডগায় জ্বলে ওঠে। এই শেষ যুদ্ধ। ফয়সালা চাই।

পাশের মেস বাড়ীতে অনেক গলার শব্দ। ঠাকুর আধখানা পটল ভাজা দিয়ে যাও—একতলায় রান্নাঘর। ঠাকুর বলে মাথা গুনতি মাল। দেওয়া যাবে না। তিনতলার লোকটা বেগে যায়। চেঁচায়—বাপের ইয়ে খাও। ঠাকুর সমান তেজী। বলে—তুমি খাও।

কে যেন বলে—এই শালা চুপ।

পাল্টা ধমক—তুই চুপ।

সন্ধ্যের পর লোকটা জেগে ওঠে বাসিন্দারা কাজ সেরে ফেরে। তাদের কথা ঠাট্টা তামাশা শুনে প্রিয়নাথের সময় কাটে। একা একা বড়ো কষ্ট হয়। এক সময় প্রতিটি দিন কাজে ঠাসা ছিল। দম ফেলবার সময় পেতো না। মেয়ের পরও অনেকদিন এরকম চলেছে। মহামায়ার মুখ ভার। কান্নাকাটি করেছে। বড়ো বুদ্ধিমতী ছিলো। প্রিয়নাথকে তার লাইনে বোঝাতে তোমার লেখার এতো খ্যাতি, তুমি লেখো। মাঠে ময়দানে তোমার কাজ নয়।

প্রিয়নাথ হাসতো। মহামায়া চটতো না। বুঝতে চাইতো প্রিয়নাথকে। সময় সুযোগ মতো কথা পাড়তো—সকলেই মাঠে ময়দানে লড়ে না। কারখানার কাজও আটকে পড়ে থাকা তোমার কাজ নয়। তুমি আলাদা ধাতুর মানুষ। কারখানার ফন্টকে যারা থাকবে তাদের জাগিয়ে রাখতে হবে। তুমি পারবে। তোমার সারাদিন লেখা উচিত। মহামায়া খুব বেশী লেখাপড়া শেখে নি। কিন্তু গুছিয়ে কথা বলতে পারতো; অসাধারণ ভঙ্গী। প্রিয়নাথের যুক্তি ছিল। শুধু ঘরে বসে থাকলে লেখা হয় না। জীবনকে দেখা,

অমৃতাঞ্জন

ব্যথা বেদনা, ঠাণ্ডা লাগা ও মচকানির জন্য একটি বহুমুখী ঘরোয়া দাওয়াই

আপনার ব্যথাস্থানে, ঠাণ্ডা-লাগা ও মচকানো জায়গায় সামান্য পরিমাণ আরামদায়ক অমৃতাঞ্জন লাগিয়ে মালিশ করুন। কয়েক মিনিটের মধ্যে এর দশটি ভেষজের কার্যকারিতা অনুভব করবেন এবং আপনি অনেক আরাম বোধ করবেন।

অমৃতাঞ্জন—জার, শিশি ও ছিমছাম কমদামী টিনের কৌটোয় পাওয়া যায়।

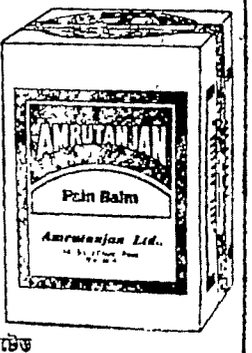

অমৃতাঞ্জন—
৮০ বছরেরও বেশি
সময় ধরে বিশ্বস্ত ঘরোয়া
রোগ প্রতিষেধক

AM 1912

অমৃতাঞ্জন লিমিটেড

জানা চাই। জীবন একটা টগবগে তেজী ঘোড়া। তার পিঠে চাপতে হবে। সে ছুটবে। দেখাকে পিঠ থেকে ঝেড়ে ফেলবে। হাত পা ভাঙবে। ভয় পেলে চলবে না। তার পিঠে আবার চড়তে হবে। এর নাম অভিজ্ঞতা। এটা বাদ দিয়ে লেখা হয় না। কিন্তু ওসব যুক্তি বিশ্বাস গড়ে যায়। মহামায়ার কথাগুলো নতুন করে ভাবায়। মনে গিঁথে থাকে। মহামায়ার যুক্তি-গুলো অনেক জোরালো লাগে। আসলে এসব কথা প্রিয়নাথের নিজের মাথাতেও অনেকবার এসেছে। নিজের রাস্তায় এগোতে হবে আমাকে। বিশেষ করে, জেল খাটার সময়ে এই ভাবনাটা ওকে পেয়ে বসেছিল। একা, নিঃসঙ্গ জীবন। শুধু মিছিল আর সভা করে সময় কাটলো। অথচ অনেক বড়ো কাজ করার আছে। পার্টির জন্যে, দেশের জন্যে অনেক কিছু সে দিতে পারে। সে কাগজ কলমের ব্যবহার জানে। লিখতে পারে। ওটাই তার মাধ্যম। লেখা দিয়ে সে মানুষকে তৈরী করবে।

পুন্যর সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল। পুন্য হেসেছিল—হয় না, বন্ধু হয় না। ওটা পালাবার দর্শন। কেটে পড়ার যুক্তি। পুন্যর কথায় খোঁচা ছিল। প্রিয়নাথ শোনেনি। নিজের রাস্তায় চলেছে। তারপর সত্যি একদিন অনেক দূরে সরে গেছে। বাজারে তখন ওর অনেক বই। গল্প উপন্যাস নয়। দামী ভারী লেখা। তত্ত্ব, দর্শনের প্রবন্ধ। এককালে খুব কাটতি ছিল। এখন কমেছে।

পাশাপাশি পুন্যও লিখেছে। বাজার কাজের মধ্যেও ও থামেনি। ওর লেখার পরিমাণ কম। ওর লেখাও বেশ কয়েক বছর বাজার মাতিয়েছিল। এখন বাসী। চলে না। অনেক বছর হয়ে গেল। এসব স্মৃতি আজ জলের দাগ। আতস কাঁচে দেখতে হয়। প্রিয়নাথ বোঝে, জীবন অন্য জিনিষ। ঘরে বসে বা রাস্তায় নেমে জীবন দেখা যায় না। আরো কিছু ব্যাপার আছে। যে বোঝে সে জিতে যায়। কিছু একটা অভাব আছে, এটা প্রিয়নাথ বুঝেছে। কিন্তু অনেক খুঁজেও অভাবের অর্জনটা ও ধরতে পারেনি। কোন জিনিষটা না থাকলে একজন হেরে যায়? অনেক ভেবেও বহুদিন পায়নি। বোধহয় যে জেতে একমাত্র সে জানে। কিন্তু সে বলতে পারে না। অভাবের জিনিষটার অভাব না থাকলে সে চিনবে কেমন করে।

একটা বিষয়ে পুন্য টেক্কা দিয়েছে। সে আজো লেগে আছে, লড়ছে। থিমোয় নি। তার থাড়াবের চেহারা, কলাকৌশল সম্পর্কে প্রিয়নাথ একমত নয়। খুচরো আলোচনায় সেটা বোঝা গেছে। কিন্তু প্রিয়নাথ মানে এ লোকটা লড়ছে। সত্যিকার লড়াই। এখানে কোন ধান্দাবাজী বা মতলব নেই। ও সময়ের পিঠে চড়েছে। সব সময়েই ও আধুনিক। প্রিয়নাথ নিজে মেসো কাকা, পিশে হয়েছে। কিন্তু ওই লোকটা পুন্যদা রয়ে গেল। সব যুগের ছেলে-মেয়েদের দাদা, আপন লোক। ওর রক্তে বোধহয় কোন অলৌকিক নুন আছে। যা পচে না, পচায় না।

রান্নাঘর থেকে খিচুড়ির গন্ধ আসছে। পুন্য ঢুকেই বলেছে—আজ ভুনি খিচুড়ি হোক। সঙ্গে পাঁপর ভাজা। মধু দোকানে পাঁপর কিনতে গেছে। দশটা নাগাদ সেই ছেলেটা পুন্যকে নিতে আসবে।

টেবিলের দিকে প্রিয়নাথের নজর যায়। লেখা কাগজে মুখ গুঁজে পুন্য ঘুমোচ্ছে। মাথার সামনে খোলা কলম। লোকটা হাজার হাতে লড়ছে।

মেসবাড়িতে খাওয়ার হুল্লোড়। অন্ধকার সিঁড়িতে চাপা পায়ের শব্দ। বোধ-হয় মধু ফিরলেন। দরজার সামনে এসে শব্দটা থেমে যায়। মধু ঢুকছে না কেন—প্রিয়নাথ ভাবে। সিঁড়িতে আবার ফিক শব্দ। প্রিয়নাথ পাত্তা দেয় না। পুন্যর লেখা কাগজগুলো ভাঁজ করে একটা বইয়ের মধ্যে রাখে। কলমটা বন্ধ করে। ও ঘুমোক—প্রিয়নাথ ভাবে। ঘরের দরজা খোলা। সামনে অন্ধকার। ডাইনিং স্পেস। ওপাশে রান্না-ঘর। ফ্ল্যাটের দরজা খুললে খাবার দালান। রান্নাঘরে ফ্যাকাসে আলো। মধু ফেরে নি। প্রিয়নাথ অবাক হয়। ছেলেটার পায়ের শব্দ কানে এলো। ফ্ল্যাটের দরজা ভেজান। প্রিয়-নাথ নিজের চেয়ারে ফিরে আসে। ভেজান দরজা খুলে যায়। প্যান্ট শার্ট পরা একজন জোয়ান লোক ভেতরে ঢোকে। তার পেছনে আর একজন। পর পর অনেকগুলো মানুষ। প্রিয়নাথ অবাক। এরা কে? কোথা থেকে আসছে। আপনি প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়। প্রিয়নাথ ঘাড় নাড়ে।

রুটিন চার্টে বেরিয়েছে—অফিসার জানায়।

জনাদশেক লোক ঘরে ঢুকেছে। পুন্যর ঘুম ভাঙে নি। অফিসার ঘুমন্ত পুন্যকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে—উনি কে?

মামাশ্বশুর, প্রিয়নাথ বলে।

অসুস্থ নাকি?

হুঁ।

কি নাম? অফিসার প্রশ্ন করে।

বনমালি ঘোষাল।

পুন্যর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে এক-জন অফিসার তাকে দেখে।

আর একজন পুন্যর কাঁধে চাপ দেয়।

পুন্য ধড়মড়িয়ে ওঠে। ঘুম মাখান চোখে লোকগুলোকে দেখে। প্রিয়নাথের দিকে তাকায়।

অফিসার বলে, কি হয়েছে আপনার?

কিসসু না—পুন্য জবাব দেয়।

প্রিয়নাথ বললেন, আপনি অসুস্থ। অফিসার হাসে। কি নাম আপনার—প্রশ্ন করে।

মুরারি চক্রবর্তী।

অফিসার হঠাৎ যেন চমকে যায়। সে কি, প্রিয়নাথবাবু বললেন, বনমালি ঘোষাল।

প্রিয়নাথের বুক ধক করে ওঠে। পুন্য বোঝে কেলেংকারি হয়েছে। এক নিমেষে বিপদ পরিষ্কার হয়ে যায়।

প্রিয়নাথ দমে না। গলা নামিয়ে বলে—মাথা খারাপ। বেশ কিছু দিন ভুগছে।

কথাটা পুন্য শুনতে পায়।

অফিসার এক লহমা প্রিয়নাথকে দেখে। তারপর পুন্যর সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

ঘর ভর্তি বই। নানা কাগজপত্র। পাণ্ডুলিপি। সঙ্গীরা নেড়েচেড়ে দেখে।

কোথায় থাকেন—অফিসার পুন্যকে জিজ্ঞেস করে।

উত্তরপাড়া।

মধু ফেরে। হাতে পাঁপরের প্যাকেট। ঘরে এত লোকজন দেখে ঘাবড়ে যায়। রান্নাঘরে ঢোকে।

ছেলেটা কে—অফিসার জানতে চায়।

কাজের লোক—প্রিয়নাথ বলে।

আপনাদের দুজনকে যেতে হবে—অফিসার বলে।

কোথায়?

থানায়।

ওয়ারেন্ট আছে?

দরকার নেই। অফিসারের চোয়াল শক্ত হয়।

প্রিয়নাথ বোঝে, পুন্যকে ওরা [illegible] চিনতে পারে নি। থানায় গেলে বি [illegible] পড়বে। ও শেষ চেষ্টা করে। বলে—আমি যাচ্ছি। অসুস্থ লোকটাকে টানা-হেঁচড়া করবেন না প্লীজ।

দুজন সহকর্মীকে অফিসার ডাকে। ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে। চাপা ফিসফিস কথা। প্রিয়নাথ শুনতে পায় না। আমি কমিশনারকে ফোন করছি—প্রিয়নাথ জানায়।

দরকার নেই—অফিসার এগিয়ে [illegible] আপনাদের একবার যেতেই হবে। মেস বাড়ীতে কে যেন মুখ ধোয়। কাশি, কুলকুচির শব্দ। প্রিয়নাথের বড় অসহায় লাগে। বলে — আমার একটা সামাজিক পরিচয় আছে। পাঁচজন মানুষ আমায় চেনে, সম্মান করে। আপনারা এটা করবেন না।

ওসব বলে লাভ নেই।—অফিসার ঠাণ্ডা চোখে তাকায়—মিথ্যে কথা বলেছেন আপনি। একটা হিমস্রোত প্রিয়নাথের পিঠ বেয়ে নেমে যায়। নিজেকে সামলে বলে—না। মিথ্যে নয়। প্রায় এক বছর জবরদস্ত করেই দুজনকে কালো ভ্যানে তোলা হয়। দুজনে পাশাপাশি বসে। ওদের ঘিরে সাদা পোশাকের কয়েকজন পুলিশ। একটা কালো জিপে চারজন সঙ্গীকে নিয়ে অফিসার উঠল। জিপের পেছনে ভ্যান। ভিজে ফাঁকা রাস্তায় দুটো গাড়ী উত্তর মুখো এগোয়। প্রিয়নাথ চুপ। পুন্যও কোন কথা বলছে না। বলার নেই কিছু।

(চলবে)

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সোনার হরিণ নেই

।। ছাব্বিশ ।।

অনেক সপ্তাহে কখনো পনের দিনে একবার গায়ত্রী বাইকে মেয়ে সহ ভ্যানে করে তিন দিনের জন্য বাইরে যেতে দেখে বাপী। কোথায় চলল বা কদিনের জন্য চলল, কেউ অন্তত কিছু বলে যায় না। পরে মেয়ের মুখে শুনেছে, ভুটানে পাহাড়ের বাংলোয় যায় তারা। বাপীর ধারণা, বনজ নেশার জিনিস বা গোপন জিনিস যা আসে, ওখান থেকেই আসে। বোতলের জিনিস, অর্থাৎ মদ কিভাবে আসে সে-সম্বন্ধে এখনো সুস্পষ্ট কিছু ধারণা নেই। শুখা-সিদ্ধি আফিং গাঁজা কোয়েলার মারফৎ এই বাংলো থেকেই বেরুতে দেখছে বাপী। তাও কাছা-কাছির ছোট চালানের সময়। বড় চালান হয়তো ওই পাহাড়ের বাংলো থেকেই সরাসরি চলে যায়। আর মদের পেটি সরাসরি চালিহার হপাজতে গিয়ে পৌঁছয়। গত ছ'মাসে বাপীর উপর গায়ত্রী বাইয়ের বিশ্বাস আর নির্ভরতা বেড়েছে এটুকু বুঝতে পারে। কিন্তু ওই মাল সম্পর্কে কোনো কথাবার্তা হয় না। ও-দিকটা এখন পর্যন্ত তার এক্তিয়ারের বাইরে। আর রবরানীর মুখে কিছু শোনা আছে। জিগেস করলে হয়তো আরো জানা যেতে পারে, বোঝা যেতে পারে। জিগ্যেস করে না। বাপী নিজের কাজ নিয়ে আছে। আর চুপচাপ দেখেও যাচ্ছে।

উর্মিলা বলে, তার পাহাড়ে যেতে একটুও ভালো লাগে না। মা টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায়।

—কেন, ওটাই তো দেশ তোমাদের।

—কে বলল ? ওটা মায়ের দেশ, আমার বাবা নেপালের মানুষ ছিল।

মায়ের ওপর মেয়ের রাগ কেন এই জবাব থেকেই বোঝা যায়। মায়ের কিছুই মেয়ে ভালো চোখে দেখতে রাজি নয়।

ঘরে আলো জ্বলছে দেখে সেদিনও উর্মিলা এসে হাজির। গোমড়া মুখ। দিনে বাপীর টিকিরও দেখা মেলে না। তাই আড্ডা দেবার মেজাজ হলে আর ঘরে আলো দেখলে রাতেই আসে। ওর মা নাকি গোড়ায় গোড়ায় এটা পছন্দ করত না। কিন্তু মেয়ে তার ভ্রুকুটি বা নিষেধ উপেক্ষা করেই চলে আসত। একদিন বেশি বকাবকি করতে ও নাকি মুখের ওপর বলে দিয়েছে, নিশ্চিন্ত থাকো, তোমার কোনো হাতের মুঠোর ছেলের প্রেমে কস্মিনকালেও আমি পড়ব না—আর ওই ত্যাঁদড় ছেলেও নিজের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে তোমার মুখ ছেড়ে আমার মুখের দিকে কখনো তাকাবে না।

সেই থেকে রাতে এখানে আসা নিয়ে মা আর কিছু বলে না। মেয়েটার আসা-যাওয়া যেমন সহজ, তেমনি অকপট। মনের মতো কথা না হলে ঝগড়াও শুরু হয়ে যায়। তখন যা মুখে আসে তাই বলে বসে। বেশি রেগে গেলে বলে, আমার সঙ্গে লাগতে এসো না, মা-কে তেল দাওগে যাও—সুবিধে হবে।

বাপীর একটুও রাগ হয় না। কিন্তু এই মেয়ে এলে তার মায়ের কারণে হোক বা নিজেকে সংযমে বাঁধার তাড়নায় হোক, বাপী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। একজনের প্রেমে মজে না থাকলে এই মেয়েই হয়তো আবার তাকে কোনো বিপাকের দিকে টেনে নিয়ে যেত। মা-কে জব্দ করার আশ্বাসেও কখন কি মতি হয় ঠিক নেই। মায়ের ওপর মেয়ের এত রাগ এত বিতৃষ্ণা দেখেই বাপীর বিশ্বাস, আবুর অনুমান সত্য। এই মায়ের প্রথম প্রেমের স্রোতে একটুও ভাঁটা পড়েনি।

খাটে আধ-শোয়া হয়ে একটা বই পড়ছিল। রাতে ঘুমের আগে পর্যন্ত এখানে বই সম্বল। পড়ার অভ্যেস আগেও ছিল। ভালো-মন্দ ধর্ম-অধর্ম, হাতের কাছে যা পায়, নির্লিপ্ত মনোযোগে পড়ে ফেলে। চা-বাগান-এর লাইব্রেরি থেকে বই আনে। সময় কাটানোর তাগিদে উর্মিলারও বইয়ের স্টক কম নয়। সে-ও দেয়।

বই বন্ধ করে সোজা হয়ে বসল বাপী। মুখ দেখে বুঝে নিল মেজাজ সুবিধের নয়। রাতে বাইরের বেতের চেয়ার তিনটে ঘরে এনে রাখা হয়। তার একটা খাটের সামনে টেনে নিয়ে উর্মিলা বসল।

—কাল থেকে আমি কাজ শুরু করছি, আমার জন্য তোমাদের ওই আপিসে একটা ঘর ঠিক করবে। কালই চাই।

বাপী চুপচাপ চেয়ে আছে। তাতেই অসহিষ্ণু। —এই সাদা কথাও তোমার বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে ?

—কি কাজ ?

ব্যবসার কাজ—আবার কি কাজ ? এই-ভাবে শুয়ে বসে ঘুমিয়ে দিন কাটবে আমার ?

ফল কি হবে জেনেও খুব মোলায়েম সুরে বাপী বলল, দিন যাতে ভালো কাটে সে-চেষ্টা তোমার মা হয়তো তলায় তলায় করছেন।

গরম তেলে ফোড়ন পড়ল।—তা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে কে বলেছে ? মা ইচ্ছে করলেই আমার নাকে দড়ি পরিয়ে ঘোরাতে পারবে ভেবেছ ? তোমাকে যা বলছি তুমি তা করবে কি না ?

—কি করে করব, আপিসে ঘর তো মাত্র তিনখানা।

উর্মিলার মেজাজ আরো তপ্ত। —আমি কোনো কথা শুনতে চাই না ! তোমার নিজের

ঘর ছেড়ে দিয়ে ওই অ্যাকাউনটেন্টের ঘরে বোসোগে যাও। তুমি কি ভেবেছ আমি তোমার সঙ্গে ইয়ারকি করতে এসেছি?

—তা না, বাপীর নরম মুখ, ইচ্ছে করলে তুমি তো তোমার আংকলের ঘরেই বসতে পারো—তিনি তো সকালে এক-দেড় ঘন্টার বেশি থাকেন না। ওটাই সব থেকে ভালো ঘর—

অপছন্দ হল না। বলল, এখনকার মতো তাই হতে পারে। ঠাণ্ডা একটু। গলার স্বরও অন্যরকম। —একটু আগে মায়ের সঙ্গে আমার এক হাত হয়ে গেল। মা তোমাকে ডেকে পাঠাতে পারে।

বাপী ফাঁপরে পড়ল। —সে কি! তোমাদের হাতাহাতির মধ্যে আমি কে?

—আঃ! শুনেই ভীতুর মতো অত ঘাবড়াচ্ছ কেন? শোনো—মা কাল সকালে দু-তিন দিনের জন্য পাহাড়ে যাচ্ছে, আমি সঙ্গে যেতে রাজি নই—তাই নিয়ে ঝগড়া। আমি মা-কে বলেছি, তোমার সঙ্গে আমার হয়েছে কাল থেকে তোমাদের আপিসে আমি কাজে বসব, তাই আমার যাওয়া হবে না। মা তোমাকে ডেকে জিগেস করলে তুমি বলবে কথা হয়েছে।

দ্বিধাগ্রস্ত মুখে বাপী বলল, দুটো তিনটে দিনের জন্য তুমি যেতে বাজিই বা হচ্ছ না কেন?

সঙ্গে সঙ্গে রাগ। —কেন যাব? কি আছে সেখানে?

—এখানে কি আছে?

—এখানে কি আছে সে কৈফিয়ৎ তোমাকে দিতে হবে?

ঠাণ্ডা মুখে বাপী জবাব দিল, আমাকে না জড়ালে কিছুই দিতে হবে না।

আরো তেতে উঠতে গিয়েও উর্মিলা ঘুরে দরজার দিকে তাকালো। বারান্দায় পায়ের শব্দ। মুখ লাল তক্ষুনি।

ঘরে ঢুকল গায়ত্রী বাই। বাপী এখানে আসার পর এই প্রথম পদার্পণ। ঘরাঘরকার মতোই নির্লিপ্ত-গম্ভীর। একটু কুশনও বাপী শশব্যস্তে উঠে চেয়ার এগিয়ে দিতে যাচ্ছিল। বাধা পড়ল।

—বসতে আসিনি। খরখরে চাউনি। —ডলির সঙ্গে কাজ নিয়ে তোমার কি পাকা কথা হয়েছে শুনলাম?

মেয়ে তক্ষুনি ঝাপটা মেরে উঠল, কথা ও বলেনি, আমি বলেছি!

—আমি ওকে জিগেস করছি।

উর্মিলার গলার ঝাঁঝ আরো বাড়ল। —কেন তুমি মাইনে-করা লোককে আমার সম্পর্কে জিগেস করবে?

মহিলার দু-চোখ মেয়ের মুখের ওপর স্থির একটু। —মাইনে-করা লোককে তুই এ-সময়ে কি বলতে এসেছিস?

—আমি আমার ঘর ঠিক করার কথা বলতে এসেছি।

—সেটা মাইনে-করা লোক ঠিক করবে না আমি ঠিক করব?

মেয়ে গুম। বাপী নির্বাক দ্রষ্টা এবং শ্রোতা। গায়ত্রী বাই তার দিকে তাকালো। —ডলির কাজ শুরু করতে দুটো-তিনটে দিন দেরি হলে খুব ক্ষতি হবে?

উর্মিলার চোখ এড়িয়ে কলের মুখ করে বাপী জবাব দিল, না ক্ষতি আর কি, ঘুরে এসে শুরু করলেই হল।

চেয়ারটা জোরে ঠেলে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল উর্মিলা। তারপর বাপীর মুখের ওপর এক পশলা আগুন ছড়িয়ে দুপ-দাপ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

গায়ত্রী বাই তেমনি গম্ভীর। কিন্তু ঠোঁটের ফাঁকে চুল-চেরা হাসির আঁচড়। বাপীর বিপাকে পড়া মূর্তি দেখে চোখেই যেন আশ্বাস দিয়ে গেল একটু। তারপর সেও ধীরেসুস্থে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

হাতে কাজ না থাকলে এখনো নিজের মনে জঙ্গলেই ঘোরে বাপী। নিজেদের দরকারের গাছ লতা-পাতা চিনতে চেষ্টা করে। ফাঁকা জায়গা দেখলে কোন্ জিনিসের চাষ হতে পারে আবুর সঙ্গে সেই পরামর্শ করার কথা ভাবে। গাছ-গাছড়া লতা-পাতা চেনার, প্রস্তুতির তাগিদে কর্ত্রীকে একটা প্রস্তাব দেবার কথা অনেকদিন ভেবেছে। দিন-কতকের জন্য একবার গায়ত্রী বাইয়ের পাহাড়-এর বাংলোয় গিয়ে থাকার ইচ্ছে। আবুর মুখে শুনেছিল, সেখানে তার স্বর্গত স্বামী বীরেশ্বর রাইয়ের এ-সম্পর্কে অনেক বই-পত্র আছে। সে-সব পড়ার ইচ্ছে। তারপর সেখান থেকে ঝগড়ুকে নিয়ে পাহাড়ী জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে নিজের চোখে সেগুলো দেখা আর চেনার ইচ্ছে। বীরেশ্বর বাই তাই করত শুনেছে।

কিন্তু বলি-বলি করেও এখন পর্যন্ত বলে উঠতে পারেনি। মহিলা কি সন্দেহ করবে ভেবে দ্বিধা। এবারে পাহাড় থেকে ফিরে এলে বলবে ভাবছে। নিজের প্রয়োজনেই বাপীর ওপর বিশ্বাস তাকে রাখতে হবে।

জঙ্গলের এদিক-ওদিকে এক-এক জোড়া বেদে-বেদেনীকে দেখেছে। এক মনে সাপ খুঁজছে তারা। আবার শীত এসে গেল। আর দু-চার দিনের মধ্যে ওদের এ কাজের পাট এ-বছরের মতো শেষ হবে।

আপন মনে বাপী জঙ্গলের নিবিবিলি দিকটা ধরে এগোচ্ছিল। ওই লোকগুলোর কাছে সে এখন মস্ত মানুষ। ওদের বাস্ত করার ইচ্ছে নেই। একটু বাদেই দাঁড়িয়ে পড়তে হল। অদূরের জারুল গাছটার নিচে পাথর-মূর্তি মুখখানা খুব চেনা। রেশমার সাপ ধরার সঙ্গী হাবমা। একলা দাঁড়িয়ে। সামনের দিকে চেয়ে নিবিষ্ট চিত্তে দেখছে কিছু। তার সামনে মাটিতে সাপ ধরার সরঞ্জাম।

বাপী পায়ে পায়ে সেদিকে এগলো। কিন্তু লোকটা এত তন্ময় যে একেবারে কাছে আসার আগে টেরই পেল না।

—কি ব্যাপার, একলা যে?

হকচকিয়ে গিয়ে লোকটা ঘুরে দাঁড়াল। তারপরেই কপালে হাত তুলে সেলাম। রেশমার কাছেই শুনে থাকবে সে তাদের কর্তাব্যক্তি।

বাপী জিগেস করল, রেশমা কোথায়?

মুখে জবাব না দিয়ে আঙুল তুলে সদূরের কটা অর্জুন আর শিশু গাছ দেখিয়ে দিল। অদূরে বলতে তিরিশ, চল্লিশ গজ দূরে। সেদিকে তাকাতে বাপীর দু-চোখ হোঁচট খেল এক-প্রস্থ। দুটো গাছের ফাঁকে সাপ ধরার পোশাকে রেশমাকে আধাআধি দেখা যাচ্ছে। আর স্পষ্ট দেখা গেল ওর সামনে যে দাঁড়িয়ে, তাকে। চকচকে কোট-প্যান্ট শার্ট টাই পরা চব্বিশ পঁচিশ বছরের একটি সুশ্রী ছেলে। বেশমার কথা শুনছে আর হাসিমুখে মাথা নাড়ছে।

—হি রেশমা!

কর্তা মানুষ খোঁজ করল বলে হোক বা ওই নিরিবিলি আলাপে বিঘ্ন ঘটানোর সুযোগ পেয়ে হোক, গমগমে গম্ভীর গলা হাবমা ডেকে বসল। সঙ্গে সঙ্গে গাছের আড়াল ছেড়ে বেশমা এদিকে ঘুরে দাঁড়াল। সঙ্গের চকচকে লোকটিও। বেশমা তাকে বলল কিছু, আর সঙ্গে সঙ্গে হাতের কিছু একটা জিনিস ঝুকের আঁট জামা ফাঁক করে ঢুকিয়ে দিল।

লোকটা বড় বড় পা ফেলে অন্য দিক দিয়ে চলে যাচ্ছে। ঢিমে তালে রেশমা এদিকে আসছে। তার পরনে আগের দিনের মতোই সাপ ধরার পোশাক। যে পোশাকে ওর মতো মেয়ের যৌবন কুলোয় না।

—বাপীভাই কি হুকুম?

—কিছু না। ওকে একলা দেখে তোমার কথা জিগেস করতে ও ডেকেই বসল।

রেশমার চোখে পলকা ভ্রূকুটি। হাবমাকে বলল, সেয়ানা হচ্ছে উঠছিস—আঁ? হাসি চেপে আর গলা খাটো করে বাপীকে বলল, কারো সঙ্গে আমাকে দুদণ্ড কথা কইতে দেখলে ওর জ্বালাপোড়া শুরু হয়।

—ভদ্রলোক কে?

—ওই যার সঙ্গে কথা বলছিলাম?.... কে জানে, গাছের টাকাকড়ি-টাক করে পাবে, জঙ্গলের কোনো কাজ ধরার মতলবে আসে বোধহয়—আমি আবু সাহেবকে দেখিয়ে দিলাম।

যা বলল, বিশ্বাস করার মতো নয়। নিজেই বুঝল হয়তো, চোখে মুখে এক রাশ হাসি উছলে গেল। —ছুতো ধরে ভ সরিয়ে নিয়ে গিয়ে দুটো কথা বলার মতলব—আসলে তো পালল। হাবমার দিকে ফিরে তাড়া দিল, চল্ চল্, আজ আর কি জুটলে হয়—

ওদের ছেড়ে বাপী পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল। মুখে ভাব-বিকার নেই। চোখে হাসির আমেজ। গাছ-গাছড়ার দিকে যার মন নেই। ভাবছে কিছু।

ওরা দুজন আড়াল হতে বাপী ফিরল। এ সময়ে আবু রববানী চন্দ্রার চাবা বেড-এর কাছাকাছি থাকে। জঙ্গলের হাঁটা পথ সেখানে চলে এলো। চাবা বেডের পরিধি দেখে যা দেখে গেছল তার থেকে অনেকটা বেড়েছে। অবসর সময়ে আবুর এখন কাজের উৎসাহ খুব। অন্যদের সঙ্গে নিজেও খুরপি হাতে মাটি নিড়োচ্ছে।

ওকে দেখে হাসি মুখে খুরপি ফেলে হাত ঝাড়তে ঝাড়তে কাছে এলো। —কেমন, খাসা হবে না?

কি-রকম হবে বাপীর খুব ধারণা নেই। তবু সায় দিয়ে মাথা নাড়ল।

আবু খুশি মুখেই বড় নিঃশ্বাস ফেলল

একটা। বলল, সবই হল বাপীভাই, কেবল তোমার সঙ্গে দু-দণ্ড বসে মনের কথা বলার সময় কমে গেল। সমস্ত দিন তোমার কাজ। আর সন্ধ্যের পরেই বই নিয়ে ঘরে সেঁধিয়ে থাকো—

—তুমি গেলেই পারো।'

কথার ফাঁকে ওকে সঙ্গে করে বাপী চাবা বেডের কাছ থেকে খানিকটা সরে এসে দাঁড়িয়েছে।

—সন্ধ্যের পরে তোমার ঘরে? . .যেতে তো ইচ্ছে করেই। কিন্তু তুমি আমাদের মুরুব্বি এখন, নাকের ডগায় তোমার সঙ্গে মাখামাখি করতে দেখলে মেমসায়েবের হয়তো পছন্দ হবে না ।

এ ব্যাপারে আবুর বিবেচনা আছে। জানলে কর্তীটি হয়তো বাপীকেই ঠেস দিয়ে কিছু শোনাবে। কিন্তু এই আবুর জন্যেই রাঁবিনের আর এক বুত্তে পা ফেলা সম্ভব হয়েছে। বাপী সেটা ভুলবে কি করে।

—তা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না, যখন ইচ্ছে হবে চলে যাবে। যাক, ঊর্মিলা সাইয়ের সেই মিরিকের এনজিনিয়ার ছেলেটার নাম যেন কি বলেছিলে—বিজয় মেহেরা?

এই প্রসঙ্গান্তরের জন্য আবু প্রস্তুত ছিল না। প্রথমে অবাক একটু, তারপরে উৎসুক। —হ্যাঁ, কেন?

—দেখতে কেমন বলো দেখি?

আবু বলল।

বাপীর সংশয় খুব আগেও ছিল না। শোনার পর একেবারেই থাকল না।

আবুর দু-চোখ কৌতূহলে টুপটুপু। —কেন, তুমি তাকে দেখেছ নাকি?

—বোধহয়।

—কবে? কোথায়?

—এদিকেই।

এদিকে বলতে কোন্ দিকে, স্পষ্ট বোঝার কথা নয়। বুঝলও না। —সেই মেয়ে তো তার মায়ের সঙ্গে পাহাড়ে গেছল, ফিরেছে নাকি? কার সঙ্গে দেখলে?'

বাপীর এখন জবাব এড়ানোর দায়। বলল, মেয়ের সঙ্গে নয়, আমার দেখে মনে হল। তোমার মেমসায়েব আর মিসি সায়েব আজ সকাল পর্যন্ত ফেরেনি, এখন ফিরে থাকতে পারে। দেখিগে যাই—

ফিরে থাকলেও ওর দেখার কিছু নেই, ছুতো ধরে আবুর কাছ থেকে সরে এলো। অফিস থেকে সাইকেলটা নিয়ে ঘরের দিকেই চলল। বিকেল তখন প্রায় চারটে। কিন্তু এখন আর বাপীর ঘড়ি ধরা আপিস নয়। দুদিন পেরিয়ে আজ তিনদিন। ওই মা-মেয়েকে আজ হয়তো বাংলোয় দেখা যাবে।

মেয়েকে নয়, মা-কে দেখা গেল। কিন্তু সাইকেল না থামিয়ে বাপী সোজা নিজের আঙিনার বাঁশের ফটকে এসে নামল।

দশ মিনিটের মধ্যে মালি এসে মেম-সায়েবের সেলাম জানালো। আরো মিনিট পনের বাদে বাপী হাজির।

মিষ্টি কথা মহিলা চেষ্টা করলেও বলতে পারে কিনা সন্দেহ। বারান্দায় উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে দেখেও সোজা চলে গেলে কেন?

—সাইকেলটা রেখে মুখ-হাত ধুয়ে আসব ভাবছিলাম। খিদে পেয়েছিল, কিছু খেয়েও এলাম।

—বোসো। কি খেলে?

এরকম প্রশ্ন মহিলা আর কি কখনো কোন কর্মচারীকে করেছে! বাপী হাসল, পাঁউরুটি মাখন—চা খেয়ে আসতে গেলে আরো দেরি হবে বলে সাহস পেলাম না।

—যা বলার সোজাসুজি বলবে। দরজার দিকে ঘুরে তাকালো। —কোয়েলা! বিপুলকায়া দোর গোড়ায় দেখা দিতে হুকুম হল, এক পেয়ালা চা।

বাপী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনাদেরও ও-পাট শেষ বুঝি?

মাথা নাড়ল কি নাড়ল না। —এদিকের খবর কিছু আছে?

—সে-রকম কিছু না, ছোটখাট কটা অর্ডার আছে।

তার সাড়া পেয়েই হয়তো ঊর্মিলা বাই একটা চকচকে নতুন বই হাতে পিছনের দরজায় এসে দাঁড়াল। ফর্সা মুখ মেজাজের মেঘে ছাওয়া। বাইরে বসে পড়ার দরকার বোধেই যেন গম্ভীর মুখে বারান্দায় এসে একটা বেতের চেয়ার হাত পাঁচেক দূরে টেনে নিয়ে বসল।'

এই মুখ দেখে বাপী আরো একটু তাতিয়ে দেবার লোভ সামলাতে পারল না। ভালো মুখ করে জিগেস করল, পাহাড়ে বেড়ানো কেমন হল?

ঊর্মিলার হাতের বই কোলে নেমে এলো। আর ভিতরের আঁচ চোখে এসে জমতে লাগল। ঝাঁঝালো গলা। —ইয়ার্কি পেয়েছ?

বাপীর ভেবাচাকা খাওয়া নিরীহ মুখ। তার মায়ের দিকে ফিরল। এমন গরম হাওয়ার কারণ বুঝছে না যেন।

গায়ত্রী বাইয়ের ঠোঁটের ফাঁকে খুব সূক্ষ্ম হাসির রেখা। কোয়েলা এক পেয়ালা চা এনে বাপীর সামনে রেখে গেল।

—শোনো, যে জন্যে ডেকেছিলাম।' গায়ত্রী বাই একটু বেশি গম্ভীর গলায়। —গত জুলাইয়ের মিডল-এ তোমার দেওয়া ছ'মাসের ট্রায়েল পিরিয়ড শেষ হয়ে গেছে?

এটা সেপ্টেম্বরের শেষের দিক। মুখের চা-টুকু তল করে বাপী জবাব দিল, শেষ হয়েছে কিনা আপনার বিবেচনা ...

দুঃসাধ্য রোগ

একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষত, রক্তদোষ, বাতরক্ত, ফুলা, শ্বেত-দাগসহ আরও অনেক কঠিন চর্মরোগ হইতে স্থায়ী মুক্তিলাভের জন্য ৮৪ বৎসরের চিকিৎসাকেন্দ্র চিকিৎসিত হউন।

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া-১, ফোন: ৬৭-২৩৫৯; শাখা: ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড (হ্যারিসন রোড), কলিকাতা-৯

—এঃ! সঙ্গে সঙ্গে ও-পাশ থেকে মেয়ের হেঁস। —বিনয়কুমার একেবারে।

সময় বিশেষে গায়ত্রী বাইও মেয়েকে ধাঁটায় না হয়তো, তার দিকে তাকালোই না। বাপীর মুখের ওপর চোখ রেখে বলল, এ মাস থেকে পাকা খাতায় নাম উঠবে তোমার আর জুলাই থেকে রেট্রোসপেকটিভ এফেক্ট তিনশ টাকা করে পাবে তুমি। মিস্টার চালিহাকে জিগেস করেছিলাম, তিনি তাই সাজেস্ট করেছেন।

এখনো চালিহার দেয়াল মাঝখান থেকে ফাটতে বাকি নয় মহিলা বোঝা গেল। মুখে কিছু বললে তার মেয়ে পাছে আবার ফোড়ন কাটে সেই ভয়ে বাপী চোখের ভাষাতেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল।

গায়ত্রী বাই চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল। —তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আই অলরেডি রেডি করে রেখেছি, দিয়ে দিচ্ছি—

ভিতরে চলে গেল। সেই ফাঁকে বাপী আস্তে আস্তে তার মেয়ের দিকে চোখ ফেরালো। উর্মিলা তার দিকেই চেয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই চাপা ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল, সুখবর পেয়ে মুখখানা যে আরো ওয়েট ব্যাটের মতো হয়ে গেল। এইবেলা ছুটে গিয়ে এক ভাঁড় তেল কিনে ঘরে মজুত রাখো!

মেয়েকে পাহাড়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে মায়ের কথায় সায় দিয়েছিল বলেই এই রাগ। মুখখানা খুব নির্লিপ্ত করে বাপী বলল আমার ঘরে এলে সুখবর আমিও কিছু দিতে পারি।

গম্ভীর, কিন্তু চোখের তারা উৎসুক। বাপীর নির্বিকার মুখ আবার সামনের দিকে। একটা ফাইল হাতে গায়ত্রী বাই ফিরে এসেছে।

চেয়ারে বসলো। ফাইল খুলল। বাপী তার আগেই দেখে নিয়েছে বড় হরফের টাইপে ফাইলের ওপর বাপী তরফদার নামের লেবেল। বাপীর মনে হল, তার পোশাকী নাম বিপুলনারায়ণ তরফদার বুঝি হারিয়েই গেল। চার মাস আগে মহিলার সঙ্গে বাড়ির যে কনট্রাক্ট হয়েছিল তাতেও বাপী তরফদারই ছিল, আর সেও বিনা আপত্তিতে তাই সই করেছিল। বাই অ্যান্ড বাই লেটার হেডে টাইপ-করা আর সই-করা একটা চিঠি তার দিকে বাড়িয়ে দিল। কর্তার অমলে স্বামী-স্ত্রীর নামে ব্যবসা চালু ছিল। এখনো ওই নামই আছে। অর্থাৎ মা আর মেয়ে মালিক। পকেটে রাখার উদ্দেশ্যে বাপী চিঠিটা ভাঁজ করতে যাচ্ছিল। বিবর্তিত সুরে বাধা পড়ল।

—পড়ে নাও!

পড়ল। মুখে যা বলেছিল তাই। তার সঙ্গে আরো কিছু যোগ করা আছে। বিক্রয়-ন্যস্ত ম্যানেজার হিসেবে তাকে বহাল করা হল। কোন্ বিক্রিয়ন এতেও তার উল্লেখ নেই। মাস মাইনে থেকে তিনশ। বাৎসরিক ইনক্রিমেন্টের ব্যাপারে ফার্মের ব্যবসা আর কর্মপটুতা বিবেচনাসাপেক্ষ। বাইরে টুরের প্রয়োজনে যাতায়াত এবং থাকা খাওয়ার খরচ দেওয়া হবে। এক মাসের নোটিশে অথবা এক মাসের ক্ষতি-পূরণে মালিক কর্মচ্যুতি ঘটাতে পারে। কাজে ইস্তফা দেওয়ারও একই শর্ত।

চিঠিতে চারদিন আগের তারিখ। অর্থাৎ পাহাড়ের বাংলোয় যাবার আগেই ব্যবস্থা পাকা করে রেখে গেছল।

—ঠিক আছে?

বাপী মাথা নেড়ে সায় দিল।

ফাইলসুদ্ধু ওই চিঠির কপিটা তার দিকে এগিয়ে দিল। —রিসিভড্ দি ওরিজিন্যাল লিখে সই করে দাও, আজকের তারিখ দিলেই হবে।

পাকা কাজ। পকেট থেকে কলম বার করে বাপী লিখল। সই করল। গায়ত্রী বাই-এর দু-চোখ সেই থেকে তার মুখের ওপর কলম্বাস। সই করা হতে ফাইলটা টেনে নিয়ে বন্ধ করে পাশে সরিয়ে রাখল। তখনো মুখের দিকে চেয়ে নতুন করে কি দেখছে মহিলা বাপী ঠাওর করতে পারল না।

—শীত আসছে, তুমি কি এই পাজামা পাঞ্জাবি পরেই কাটিয়ে দেবে নাকি?

বাপী জবাব দিল, গরম জামা আছে, গরম চাদরও আছে।

—টুইডের ধা কোট?

—ওসব কখনো পরিনি।

—এখন থেকে পরো। বড় বড় পার্টির সঙ্গে দেখা করতে হবে, ড্রিল করতে হবে—টু অ্যাট রিপ্রেজেনটিং এ বিগ ফার্ম। গোড়াতে কিছু অ্যাউটফিট অ্যালাউয়েন্স গ্র্যান্ট করে দিচ্ছি, যা কেনার করে নাও।

এতক্ষণে বাপী অনুভব করল মাথের চালিহা-দেওয়াল কিছুটা সরেছে। দ্বিধা-গ্রস্তমুখে হেসে বলল, এই পোশাকটা বেশ ট্রেডমার্ক হয়ে গেছল ...

অনেক দেখা, তবু এই বেশবাস আর একদফা খুঁটিয়ে দেখে নিল মহিলা। তারপর মন্তব্য করল, ট্রেডমার্ক হয়নি এমন অনেক জায়গায় এরপর তোমাকে যেতে হবে।

—ঠিক আছে। প্রসঙ্গ বাতিল করে মনে যা আছে বলা হোলার এটাই সময়। —আপাতত দিন কতকের জন্য আমি এখান থেকে ডুব দিচ্ছি।

শোনামাত্র মহিলার সাদাটে দুই ভুরু কুঁচকে গেল। অন্য দিকে কথা আর শেষ হয় না দেখে তার মেয়েও হয়তো বিবর্তিত হচ্ছিল। যে মুখ করে বাপী সুখবর দেবার কথা বলেছিল। ওই মেয়ের পাশে বসে পাকা সহজ নয়। ফের দেরার কথা শুনে পড়ার বই ছেড়ে সেও বই নামালো।

পরক্ষণে বাতিল করার মতোই রুক্ষ স্বরে গায়ত্রী বাই জিগেস করল, কোথায়?

—প্রথমে আপনার ভুটান পাহাড়ের বাংলোয়, তারপর পাহাড়ে আর জঙ্গলে।

এই জবাব মা বা মেয়ে কেউ আশা করেনি জানা কথা। মহিলার গোল চোখ তার মুখের ওপর স্থির।

বাপী বলল, আবুর মুখে শুনেছি আপনার পাহাড়ের বাংলোয় মিস্টার রাইয়ের পাহাড় আর জঙ্গলের অনেক দরকারি গাছ-গাছড়া লতাপাতা ফলমূলের ভালো ভালো বই আছে। সেগুলো আগে পড়ে নিতে চাই। তারপর ওইসব গাছ-গাছড়া লতাপাতা বীজ-দানা খুব ভালো চেনে এমন একজন লোক যদি সেখানে পাই, তাহলে নিজের চোখে সব দেখা আর বোঝার অভিজ্ঞতা হয়। যে কাজ আমরা করছি তার গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত একজনের অন্তত সব চেনা অল জানা দরকার। বইপত্র ঘাঁটলে আর নিজে যাচাই-বাছাই করতে পারলে ফিল্ড বাড়ানও সম্ভব। আর, এ অভিজ্ঞতার সব থেকে বেশি দরকার বোধহয় কাজটাকে ভালবাসার জন্যে।

একসঙ্গে এতগুলো কথা বাপী কমই বলেছে। মহিলার অপলক চাউনি। সাদাটে মুখে লালের আভা। এই প্রথম ওই মুখে বুকের তলার কোনো অনুভূতির প্রতিক্রিয়া দেখল বাপী। তার ধারণা, স্বামীর বইপত্র পড়া, দুষ্প্রাপ্য জিনিসের খোঁজে পাহাড়ে জঙ্গলে ঘোরা, সব চেনা-জানা-বোঝার তাগিদে আহার-নিদ্রা ভুলে বন-বাদাড় চষে বেড়ানো, ইত্যাদি স্মৃতির কোনো নিঃশব্দ আলোড়ন চলেছে ভিতরে অনুমান খুব ভুল নয় সেটা একটু বাদেই বোঝা গেল।

গায়ত্রী বাই বলল, বই আছে। সব চেনে জানে এমন লোকও আছে। তুমি কবে যেতে চাও?

—কালও যেতে পারি। এখানকার কাজ মোটামুটি সেরে রেখেছি, তাছাড়া মিস্টার চালিহাও কিছুদিনের মধ্যে টুরে যাচ্ছেন না শুনেছি।

চুপচাপ ভাবল একটু। —কাল হবে না, পরশু সকালে রেডি থেকো।

ওদিক থেকে তার মেয়ে আঁতকে উঠল। আমি এখন আর এক পা-ও এখান থেকে নড়ছি না বলে দিলাম।

ভিতরে কিছুটা নাড়াচাড়া পড়েছে বলেই হয়তো মেয়ের পলকা দিকটা বেশি ঠোকর পড়ছে মহিলার। তার দিকে চেয়ে রুক্ষ-গম্ভীর জবাব দিল, তোকে যেতে হবে না! ওকে রেখে আমি দু ঘন্টার মধ্যে ফিরে আসব।

কথা শেষ। বাপী চলে এলো। অনুমতি পেলে আবুকে সঙ্গে করে পাহাড়ের বাংলোয় যাবে ভেবে রেখেছিল। দিন দুই ওকে সেখানে ধরে রেখে রাগড়ের সঙ্গে ভালবাসা করে নেবে। তার থেকে এ অনেক ভালো হল। কর্তা নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছে।

বাপী এতটা আশা করেনি।

(চলবে)

'আমাদের প্রভু বীক্ষণ দাও'

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

'আমাদের প্রভু বীক্ষণ দাও'—এই প্রার্থনার মর্ম দশ লাইনের কবিতাটি যেদিন প্রথম পড়ি সেদিন তেমন বুঝি নাই। শব্দকয়টি কানেও তেমন বাজিয়া উঠিয়াছিল কিনা মনে নাই। তবে বীক্ষণ শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করিয়াছিলাম। গদ্যে বা পদ্যে এই শব্দটির প্রয়োগ বড় চোখে পড়ে নাই। সুবেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের বেত্রাঘাত বীক্ষণ-শাস্ত্র প্রবন্ধটি পড়িয়া অনুমান করিয়াছিলাম মাত্র যে পদটি একটু বহস্যময়। কিন্তু আজ এই চারটি বাংলা শব্দ যেন এই মহা-পৃথিবীর এক করুণ প্রার্থনার মত শুনাইতেছে। অতীতের বহুদূরের অন্ধকার হইতে যেন এই আকুল প্রার্থনা কোন এক পতাকের আশ্বাসে মানুষ মুহুর্মুহু পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হইতেছে। এই উচ্চারণ যেন এই প্রথম শুনিলাম।

এই বীক্ষণ বা দর্শনা বা প্রজ্ঞার কথা ত কম শুনি নাই। ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কত ঋষি, কত মনীষী মানুষকে ডাকিয়া বলিয়াছেন, জ্ঞানী হও প্রজ্ঞাবান হও সম্বুদ্ধ হও। পাশ্চাত্যেও দেখি জ্ঞানই মানুষের পরুষার্থ। বাধাকৃষ্ণণত বলেন যে যাহা উপনিষদে বুদ্ধি বা বিজ্ঞান তাহাই গ্রেকেটেস নাউস—আর উপ-নিষদের এই বুদ্ধি কিনা যাহা আমাদের এই দেহরথের সারথি।

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেবচ।

এই বুদ্ধিই আবার ওল্ড টেস্টামেণ্ট-এর কোহেলেথ আর নিউ টেস্টামেণ্ট-এর সিপিয়া। এক সেরা প্রার্থনা লর্ড'স প্রেয়ার এ কৃপা ভিক্ষা আছে বুদ্ধি ভিক্ষা নাই। আর আমরাই বা বুদ্ধির জন্য প্রার্থনা করিব কেন? অতীতে সকল বুদ্ধির আধার ছিলেন ব্রাহ্মণ। তাঁহার বিধান ঈশ্বরের বিধান। এরপর ইংরাজ আমলে এক নতুন ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইল। তাঁহারা ইংরাজী শিখিয়া জ্ঞানবান হইলেন। আর তাঁহাদের মাথার উপর ইংরাজ বসিয়াছিল বলিয়া তাঁহারা মাথায় ঈশ্বরকেও ছাড়াইয়া গেলেন। বাঙালীর মাথায় বুদ্ধি পাকা করিতে লাগিল আর পাকে পাকে করিতে করিতে বুদ্ধি যেন উপচাইয়া পড়িতে লাগিল। বুদ্ধিরাত ভাসিতে ভাসিতে আর কে বুদ্ধির জন্য প্রার্থনা করে।

বাঙালী বক্তৃতা শব্দে কাঁপে
ইংলণ্ড জর্মনী।
কাঁপে ফরাস মার্কীন কাঁপে
সমাগরা ধরা।।

তবপ্রও স্বাধীন হইলাম। বুদ্ধি যেন আরও পাঁকপরুর হইতে লাগিল। মনু ছাড়িয়া মিল ধরিয়াছিলাম, এখন মনু ও মিল দুইই ছাড়িয়া মার্কসকে ধরিলাম। সকল বীক্ষণ ও ঐ মার্কসের রচনা নিচয়ের মধ্যে নিবদ্ধ। আবার কোন প্রভুর কাছে বীক্ষণ প্রার্থনা করিব। আমার মাথা আর মার্কসের মাথা এক হইয়া দেখ এক কি ভীষণ প্রমাথান সৃষ্টি হইয়াছে। আমি এক মার্কসীয় বোধিবরুথ দনুমহলে বসিয়া এক সবুদ্ধ হইয়া পৃথিবীর মুকতি বিধান করিতেছি। বীক্ষণের আমার অভাব নাই। আমাদের প্রভু বীক্ষণ দাও কথাটি অর্থ আমি বুঝিনা। আমাদের ছোট দাও কথাটি বুঝি। কিন্তু সে ছোটকোনও প্রভুর কাছে ভিক্ষা করিবনা। সে ছোট ভিক্ষা করিব মনগণের কাছে। তাঁহারা হয়ত মার্কস বোঝে না, কিন্তু মার্কস যাহারা বোঝেন তাঁহাদের বোঝে। আমাদের বীক্ষণ বুঝিবার মত বীক্ষণ তাহাদের মধ্যে আছে বলিয়াই জগৎসংসার চলিতেছে। উষার দুয়ারে আঘাত পড়িতেছে নবপ্রভাত আনীত হইতেছে।

কিন্তু তবু কেন আমাদের প্রভু বীক্ষণ দাও কথাটি এমনভাবে হৃদয় স্পর্শ করিতেছে। কেন মনে হইতেছে এই প্রার্থনা একান্ত অভিনব হইয়াও বড় প্রাচীন। এই প্রার্থনা যে কখন কোন প্রভাতে বা কোন সন্ধ্যায় প্রথম উচ্চারিত হইয়াছে কে বলিবে? এই প্রার্থনার একটু পূর্বেই দেখি 'অনেক রাত অনেক অন্ধকার রাত।' তবু যেন সৃষ্টিকে ঘিরিয়া কুয়াশা বলিয়া বোধ হইতেছেনা। তাহার দেখি যুবকের দল চাহিয়া রহিয়াছে। 'একবার নক্ষত্রের পানে, একবার বেদনার পানে।' নক্ষত্রের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে আবার বেদনার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে এমন যুবকের দল ত দেখিনা। ইহার আরম্ভ কোথা হইতে আসিল? যে নবীনেরা আর সবুজেরা আজ আধুনাদের যা মালিতেছে তাঁহারা ত তাকাইয়াছে গেছে মার্কস-রূপ নক্ষত্রের দিকে, বা প্রতীক্ষার বেদনার দিকে। কিন্তু ঐ নক্ষত্রদর্শী বেদনাদর্শী যুবকের দলই কি শেষ জিজ্ঞাসা করিতেছে —তামসা জননী রাত্রির বুকের তাহাদের চারিদিকে কি স্থির ধর্মনিশ্চিত পিরামিড আর তাহারাই কি দেখিতেছে—গড়িয়া উঠিল মানবের দল সূর্য সাগরতীরে কালো অন্ধকার বহস্যময় ভূলের বুনুনি।

এই ভূলের বুনুনি ছিঁড়িয়া সত্যে পৌঁছাইতে হইলে চাই বীক্ষণ। আমাদের প্রভু বীক্ষণ দাও এই প্রার্থনা, এই কালো আত্মার প্রার্থনা। সেই কালো অন্ধতা এক মিথ্যার ঠাসা বুনুনি। সে এই বুনুনি ছিন্নভিন্ন করিয়া বাহির হইয়া আসিতে চায় কালো শুদ্ধ ধবল হইতে চায়। তাহার তরে একদিন সমুদ্রের কালো আলোড়নে উপনিষদেরও শাদা পাতাগুলি ক্রমে ডুবে যাবে।

কিন্তু এই বীক্ষণ মানুষ কখন প্রার্থনা করে? যখন সে বুঝিতে পারে সে এতদিন ভুল চিন্তা সংকেতের আবর্তে মরু-ভূমিতে দাঁড়াইয়া আছে। দূরে কাছে কেবলি নগর ঘর ভাঙে গ্রামপতনের শব্দ হয়। অথচ মনে হয় এই মাতৃভূমি ঘিরে বিচিত্র বৃক্ষের শব্দে স্নিগ্ধ এক দেশ এ পৃথিবী, এই প্রেম, জ্ঞান, আর হৃদয়ের এই নির্দেশ।' যাহার মধ্যে একই সময়ে এই মরু-ভূমির বোধ আর এই স্নিগ্ধ এক দেশের স্বপ্ন সে বীক্ষণের প্রত্যাশী। যাহারা মাঠে ময়দানে কথা বলে তাহাদের বিষ ঝেড়ে ফেলে দিতে চায় আর তাহারা কোন স্নিগ্ধ দেশ কোন বিশুদ্ধ সমাজের সংবাদ রাখেনা। ঐ দেখ ওইখানে 'বিকেলের সমিতিতে' অগণিত লোক। তবু ওত দেখি 'ঘুঘুর গালে কালি আর চুন।' কত মানুষ কত কথা বলিতেছে—আর কতক্ষণ ধরিয়া বলিতেছে। কতনা সমিতি, কতনা সঙ্ঘ। হুজুগে মানুষ কত দল পাকিয়া কিস্তির বল-সঞ্চারের ব্যবস্থা করিতেছে। এই মাঠে এক পিতামহের মূর্তির পাদদেশে দাঁড়াইয়া একদল বলিতেছে বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। ঐ

অভিনব
নাট্য-পত্রিকা
নাট্য-লিপিকা
শারদীয় সংখ্যা
শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে
এতে লিখেছেন—মন্মথ রায়, বীরেন্দ্র-কৃষ্ণ ভদ্র, ডঃ অজিত ঘোষ, বটুল ঘোষ মনোজ মিত্র, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় সলিল দাশগুপ্ত, রবীন্দ্র ভট্টাচার্য, নবকুমার ঘোষ, দেবকুমার ভট্টাচার্য, দিগিন্দ্র দাশগুপ্ত, তপন ঘোষাল, কিশোরকুমার তথা জ্যোৎস্নাময় বসু এবং আরও অনেকে।
দাম-৮ টাকা
৩০।১এ, কলেজ রো, কলিকাতা—৯

মাঠে আর এক পিতামহের পাদদেশে দাঁড়াইয়া আর একদল কোন এক শুভংকর ভ্যাতোর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বলিতেছে—আমরা বৌদ্ধ নই, আমরা ভিন্ন মতের মতী। আরেকটি মাঠে দেখ আরেক পিতামহের পাদদেশে দাঁড়াইয়া আর এক দল সমস্বরে উপনিষদের মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছে—তমসো মা জ্যোতির্গময়।

কত মানুষ আর কত কথা। বীক্ষণের দিকে বেশী ঝুঁকিলে এত কথা বলা যাইবে না। বেশী দেখিলে, বেশী বুঝিলে, বেশী অনুভব করিলে হয়ত বা হাবা হইয়া যাইবে। যখন দেশের মানুষ তোমার বাণী শুনিবার জন্য উৎকর্ণ তখন তুমি নীরব। বিপ্লব সরব মানুষের কর্ম। যাহারা বধিরতা হইয়া তোমার কথা শুনিতে মাঠে ভিড় করিবে তাহারা নীরব থাকুক। তুমি সরব হও। তুমি কথা বল, আর যদি শব্দের অভাবে সকল কথা মুখে না আসে অঙ্গভঙ্গি করিয়া তোমার বক্তব্য উপস্থিত কর। যদি চিন্তার সূত্র হারাইয়া ফেল, চিৎকার কর। চিন্তা এক বুর্জোয়া বস্তু, বড় মানুষের বিলাস, চিৎকার জনগণের কানের ভিতর দিয়া তাহাদের মরমে পৌঁছায়। চিৎকার ডেমোক্র্যাসির অন্তরের সুর। চিৎকার করিয়া জনগণ মন অধিনায়ক হও। বীক্ষণের জন্য বসিয়া থাকিলে একা পড়িয়া যাইবে। তোমার ভাক কেহ শুনিবে না। তোমার সঙ্গে কেহ কথা বলিবে না। সকলে মুখ ফিরাইয়া থাকিবে। তুমি কোন একটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের নায়ক হইবে, দেশ-নায়ক হইতে পারিবে না। তোমার অনেক লোকসান হইবে। চাহিয়া দেখ তোমার চারি-পাশে আপন গিরেবাজ যাঁহার যাঁহার গাঁট সামলাইতেছেন দেশের জন্য কাঁদিয়া দুইটা পয়সা করিতেছেন। স্বাধীন দেশের মানুষ নির্ভয়ে দেশের জন্য কাঁদিতে পারেন। কারাবাসের ভয় নাই বরং সুন্দর বাসগৃহের আশা আছে। যদি বল দেশের মানুষের জন্য ভাব হয়, দেশবাসীর দুঃখে দুঃখ হয় কিন্তু চোখে জল আসিতে চায় না তাহা হইলে মনে করিও না তুমি, হৃদয়হীন। কাঁটা তালাশের মত আদর্শ চক্ষু লইয়া বুর্জোয়া সেন্টিমেন্টের প্রশ্রয় দেওয়া যায়, দেশের হিতকর্মে মগ্ন হওয়া যায় না। আর সজল নয়নে দেশ-কর্মের জন্য যৎসামান্য পাওনা-গণ্ডা ঠিক ঠিক গুনিয়া লইতে পারিবে না। সিকিটিকে আধুলি দেখিবে, আধুলিটিকে টাকা দেখিবে। তোমার গহন ক্ষতি হইবে। তাই বলি দেশের জন্য কাঁদিও না, হিসাবের গোলমাল হইয়া যাইবে।

বীক্ষণের লেঠার অন্ত নাই। মননশীল মানুষের এক বড় দোষ এই যে সে শীঘ্রে বিশ্বাসী। সে সংযত, সংহত, সদাচারী। এমন মানুষ দেশের কাজে লাগিতে পারে না। ঐ দেখ যাঁহারা দেশের জন্য প্রাণ দিতেছেন, ঠিক প্রাণটি একেবারে না দিলেও দেশের জন্য প্রাণান্ত করিতেছেন, তাঁহাদের জনহিতায় কত অভদ্রভাব আশ্রয় লইতে হইতেছে। মহর্ষি বলিলেন—হে মহামহর্ষি, আপনার পুত্র চাই। মহামহর্ষি বলিলেন, হে মহর্ষি আপনার জামাতা চাই। অমনি উলুবনের যুপসী ডাকিনী বলিয়া উঠিলেন—তোরা সকলে চোর। মননশীল মানুষ এমন চোর চোর খেলিতে পারিবে না। স্বাধীন দেশের সন্ন্যাসী আন্দোলনে যথার্থ সাধু বলিয়া পরিচিত হইতে হইলে তোমাকে চোর চোর খেলিতে হইবে। মনে চোরের বয়স পার হইয়া গেলেও ঐ খেলা তোমাকে খেলিতেই হইবে। বীক্ষণের সঙ্গে এই খেলার অহিনকুল সম্পর্ক।

বীক্ষণের আর এক লেঠা এই যে উহা তোমার আকাংখার পেতায় ছাই ঢালিবে। তোমাকে বড় হইতে দিবে না, সামনের দিকে অগ্রসর হইতে বা ঊর্ধ্বে উড্ডীন হইতে দিবে না। তুমি একেবারে নিস্তেজ নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িবে। যে আগুনের পরশমণির ছোঁয়া পাইয়া তুমি পবিত্র যজ্ঞ-কাষ্ঠের মত জ্বলিতেছে, অন্যকে জ্বালাইতেছ সে আগুন আকাংখার আগুন। অর্জুন এই আকাংখা ত্যাগ করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে কি ধমকটাই দিলেন। সেই ধমক আজ হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের এক শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ন ক্লৈব্যং পার্থ গচ্ছতে। কৃষ্ণ ন বাক্যং সুখানি চ। এমন কথা মুখে আনিও না। শ্রীকৃষ্ণ রাগ করিবেন। আকাংখা তোমার হৃদয়ে যথার্থভাবে উদ্রিক্ত হইলে আবিষ্টটলীয় ক্যাথারসিস প্রক্রিয়ায় উহা নিবারিত হইয়া তোমাকে নিষ্কাম কর্মে নিযুক্ত করিবে। তুমি দলপতি হইবে নবকান্তি হইবে। অর্থাৎ তুমি দেশনায়ক হইয়া যাহা চাও তাহা পাইবে—তোমার কথায় লোক উঠিবে, বসিবে, শুইবে, দাঁড়াইবে। তোমার আমোদ হইবে। এই আমোদই নিষ্কাম অনাসক্ত কর্মযোগীর সচ্চিদানন্দ।

বৃদ্ধ হইয়া মনে করিও না তোমার আকাংখার আর প্রয়োজন নাই। ঐ দেখ পলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে আরেকটি প্রভাতের ইশারায় জীবনের উষ্ণ অনুরাগ তোমাকে যেন ত্যাগ না করে। অতিবৃদ্ধ হইয়াছ বলিয়া তুমি বানপ্রস্থে যাইওনা। বরং এই শহরটিকে একটি নৈমিষারণ্যে ইরিণত কর। দেশের মানুষের কাছাকাছি থাকো। 'নিয়াডডিরোহি দূর যা যাহি।' আত্মপ্রত্যয়ের অগ্নি, 'হে সন্তান প্রথম জ্বলুক তব সবে।'

যদি দেখ কোথাও কয়েকটি স্থির সমীচীন যুবা অনেক চিন্তার সমবায়ে একটি মহৎ দিন গঠন করিতেছে তাহা হইলে দেখিও তাহারা যেন ভারই পাখির মত আকাশে উড্ডীন না হয়। আকাশে উড়িবে বৃহৎ চিল অর্থাৎ তুমি। যুবাকে ডাকিবে তোমার শত্রুপক্ষকে পিটাইবার জন্য। যুবারাও যদি তোমার মত উড়িতে থাকে, তাহা হইলে পিটাইবার জন্য আর লোক পাইবে কোথায়। পিটাইতে বড় বীক্ষণের প্রয়োজন হয় না। ক্ষীণকায়া যদি মননশীল হয় সে লাঠি চালাইতে পারিবে না।

কিন্তু বীক্ষণের কবিকে লইয়া একটু মুস্কিলে পড়িলাম। তিনি এই বস্তুটিকে কিছুতেই ছাড়িবে না। কথা হইল যে তিনি পাইলেন বলিতেছি না। এই বীক্ষণই কি মানুষের মন-বিদ্যুতের মত সুন্দর ভীষণ। এই বীক্ষণই কি দিতে পারে সুচেতনা, এক দুরন্তর স্বপ্ন। শহরের বিপুল মেঘের কিনারে সূর্য উঠিতেছে। নদীর ওপারে সূর্য। 'মহীয়ান কিছু এই শতাব্দীতে আছে—আরো এসে যেতে পারে।' এই সব কি বীক্ষণের কথা? কে দেখিতেছে 'সকল অলাত ইতিহাসের হৃদয় ভস্মিয়া উঠিতেছে বৃহৎ সবিতা।' এই মহৎ বীক্ষণ কাহার? যিনি ভাবেন, হয়তো না অন্ধকারই সৃষ্টির অন্তিমতম কথা।' আবার তিনিই প্রত্যক্ষ করিতেছেন এক 'সুনিবিড় উদ্বোধন—আছে আছে এই বোধির ভিতরে চলেছে নক্ষত্র রাত্রি সিন্ধু, গীতি মানুষের বিবস হৃদয়। জ্বলে অন্তসূর্য, জ্বলে অলখ অরুণোদয় জ্বলে।' এ কোন বহুসাময় বীক্ষণ, এ কোন প্রসন্ন বিস্ময়। সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের সন্ধ্যার মত সন্ধ্যা নামিয়া আসিতেছে তখন অন্তরীক্ষে কে এই অন্ধ পাখী সূর্যের দিকে চাহিয়া প্রার্থনা করিলেন? কেন ঋষি এক অনন্ত অনাগত প্রভাত সূর্যের জয়গান করিলেন।

শোলার টোপর

সুচিরা মুখোপাধ্যায়

—কিরে শুনলাম তুই বিয়ে করছিস ?

—ঠিকই শুনেছিস।

—হঠাৎ মত বদলে গেল !

—গেল। চিরকাল লোকের এক মত থাকবে ভার কী মানে।

—তা বটে। মেয়ে কীরকম রে ?

—ভালই।

—বিয়ের এক বছর পর বলিস।

—কেন ?

—হাল্কা টোপর পরে তো বিয়ে করতে যাচ্ছিস। বছরখানেক পর দেখবি ঐ সোলার টোপরই লোহার হয়ে উঠেছে।

পরমেশের এসব্ড়ো খেবড়ো কথা শুনে সন্দীপ মুখটা ভেঙেচে ওষুধ খাওয়ার মত মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল। ফ্লাইওভারটা

শেষ হতে অবশ্য অসংখ্য শব্দ সোডাকাটার ট্রাম্পার যানবাহনের মত 'জ্যাম' হয়ে আটকে গেছে। সন্দুর বাড়ি ঢুকলেই পরমেশ 'চলি, উইশ ইউ গুডলাক' বলে কাঁধ ঝাঁকিয়ে চলে গেল। সন্দীপ ওর যাওয়ার পথের দিকে একটা ঘুঁসি নিক্ষেপ করল। বিড়বিড় করতে করতে বাস স্টপের দিকে পা বাড়াল। 'মতভেদ সব—আমি বিয়ে করছি সেটা আমার ব্যাপার—তুই কেন নাক গলাস' 'পরমেশটা চিরকালের ফেলুপরদালাল' 'আসলে ওটার হিংসে হচ্ছে।'

'শালা অন্ধ কেয়া' প্রায় ঘাড়ের উপর একটা ট্যাকসি ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্রেক কষেছে। শিখ ড্রাইভার সন্দীপের উদ্দেশে মুখ খিস্তি করে বেরিয়ে গেল। খিস্তি শুনে সেতারে তার ছেঁড়ার মত চড়াং করে উঠল মাথার ভিতর। আর একটা ঘুঁষি মেরে বলল—'শালা'।

তেত্রিশ নম্বর বাস একটা আসছে। স্টপেজ আরও খানিকটা এগিয়ে। সন্দীপ ছুটতে শুরু করল। বাসটার আগে স্টপেজে পৌঁছনো যাবে কী। ঐ বাসটা এগিয়ে এল। সন্দীপ প্রাণপণ ছুটছে। নঃ পারা গেল না। বাসটা টলমল করতে করতে, মুঠো উপছানো মানুষ নিয়ে বেড়িয়ে গেল। মাথাতে যেন একশ ভোমরা ঢুকে পড়েছে। তাদের পাখার ভোঁ ভোঁ আওয়াজ কান মাথা দিয়ে স'া-স'া শব্দে ছুটে যাচ্ছে। ঠিক সামনের ঐ যানবাহনগুলোর মত। বাসের জন্য দাঁড়িয়ে কাজ নেই। অযাচিত সৌজন্যের মত একটা খালি ট্যাকসি ওর নাকের ডগায় এসে পড়ল। হাত তুলে দাঁড় করিয়ে হুড়মুড়িয়ে উঠে বসল। 'শালা পরমেশ বন্ধুর উদ্দেশে গেউড় ছুড়ল সন্দীপ। 'চারটে টাকা খসলে ছুঁচো' 'দেখাব তোমার গামদোবাজি।' চল্লিশ ছুঁই ছুঁই সন্দীপ আঠারো বছরের মস্তান ছোড়ার মত মুখ খারাপ করে বিড়বিড়িয়ে।

—'কা বোলতে হা'া ?' —ট্যাকসি ড্রাইভার ঘাড় ঘুরিয়ে শুধাল।

সন্দীপ অপ্রস্তুত হল। 'কুছ নহী।'

পরমেশটাও বিয়ে করেনি। আরও কজন ছাড়া সব বন্ধু-বান্ধব বিয়ে করে ঘোর সংসারী। কারো তিন-চারটে ছেলেমেয়ে। কারো বা পরিবার পরিকল্পনার আদর্শ অনুসারে এক বাচ্চা বাস। বন্ধুদের বাড়ি কচিৎ যাওয়া হয়। গেলে তাদের মুখে ভাং খাওয়া ঘুরোনো কথারই পুনরাবৃত্তি শুনতে হয়। বেড়ে প্যান্টটা ল্যাগারোছিস তোফা আছিস। খাচ্ছিস। ফর্মিনশ্চি করছিস—মাজা লাগাচ্ছিস' ইত্যাদি ইত্যাদি। পরমেশটা সঙ্গে থাকলে এমন কিছু বলে বসে যে সন্দীপের বিচচ্ছিরি লাগে। পরমেশ তার পরম বন্ধু। কিন্তু ওর ঐ পালিশ ছাড়া কথাবার্তার জন্য সন্দীপের সঙ্গে ওর বচসা হয়। পরমেশের সঙ্গ মাঝে মধ্যেই এড়িয়ে থাকতে চায়। অবশ্য বেশীদিন পরমেশকে ছাড়াও চলে না। ওর মধ্যে কী যেন আছে যা ক'াচপোকার তেলেপোকাকে টানবার মত সবাইকে টানে।

সন্দীপ তো না হয় পরমেশের ছেলে-বেলার বন্ধু। কিন্তু যার সঙ্গেই পরমেশের পরিচয় হয় সেই আর ওর সঙ্গ ত্যাগ করতে পারে না। ওর গুণমুগ্ধ ভক্তে শহরে কম নয়। ভক্তদের মধ্যে অবশ্য মহিলারাই পাল্লায় বেশ একটু ভারি। হাসো লাস্যে ঢলঢলে, বয়চেঙে বাহারে শহরের সেরা মেয়েরা এক ঝাঁক প্রজাপতির মত ঘিরে থাকে ওকে। পরমেশের সব মেয়ের সঙ্গে সমান ব্যবহার। সবার সম্বন্ধে একটা অনামনস্ক আগ্রহ বা উদাসীন মনযোগ। বাইরে থেকে সন্দীপের তাই মনে হয়। পরমেশকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে বলে—'আরে ছোঃ। ওদের ভিতর শাঁস নেই, কেবল আঁশ। এক রকমের দেশী গোলগাল গ্রাম আছে—দেখেছিস তো ? সোনার মত রং। লালের ছোপ দেওয়া টুকটুকে—টুসটুসে। দেখলেই মনে হয় খেয়ে কোন কিন্তু খেলে পস্তাতে হয়। এরাও সেই রকম।'

মেয়েদের সম্বন্ধে এ ধরণের মন্তব্যে সন্দীপের সংস্কারী মনে যা লাগে। বলে—'তবে ওদের নিয়ে অত মাখামাখি করিস কেন?'

—'ঐ তো মজা। ওদের ছাড়াও চলে না বুঝলি? বেশ লাগে তুলতুলে গায়ে গা লাগিয়ে বসতে, টসটসে ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকাতে। আর দৈবাৎ বেছে বেছে দুটি একটির সঙ্গে শুতেও নেহাৎ মন্দ লাগে না। কিন্তু তার বেশী—নৈব নৈব চ। তাহলেই নরক দর্শন।'

সন্দীপের শরীরের মধ্যে কী রকম একটা কিলবিলে শিহরণ হয়।

পরমেশের কথা মাঝে মাঝে কী রকম হেঁয়ালি হয়ে ওঠে। ওর জীবন-দর্শন কী বোঝা দায়। সন্দীপ এতদিন বিয়ে করেনি খানিকটা অর্থনৈতিক কারণে বাকিটা মেয়েদের সম্বন্ধে অহেতুক ভয় মেশানো আশংকার জন্য। সে কোনদিনই মেয়েদের সঙ্গে মিশতে পারে না। অল্প বয়স থেকে মেয়েদের সম্ভ্রম দূরত্ব রেখে চলেছে।

বিয়ে করবার অর্থনৈতিক বাধা যা ছিল তা অনেকদিনই দূর হয়েছে। তবু বিয়ে করেনি এতদিন। তার কারণ বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে একটা অজানা শংকা ওকে বিবাহ থেকে নিরস্ত করেছে। বুড়ো মা অনেকদিন বহু তাগাদা দিয়ে ইদানীং হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। যোগাযোগটা হঠাৎই হয়ে গেল। ওর পিসির সম্পর্কে দেওরঝি বিনীতা। পিসতুতো বোনের বিয়েতে হঠাৎ আলোর ঝলকানি দিয়ে বিনীতা ওর সামনে এসেছিল। ওকে দেখবার পর থেকে সন্দীপ মেয়েদের সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে শুরু করেছে।

একটি তপ্ত যৌবনার সান্নিধ্য পাবার জন্য ওর উনচল্লিশ বছরের অনভিজ্ঞ দেহ-মন ছটপটিয়ে উঠেছিল। বিনীতার সর্বনাশা টান—কেটালের বাণের মত আছড়ে পড়ল। ওর ছাতা-তিলে না-পড়া অনেক দিনের নির্ভেজাল কৌমার্য ঢৌল খেয়ে গেল। নানা রসাল নিষিদ্ধ চিন্তায় মশগুল হয়ে পড়ল। শঙ্কা-ভাবনা তলিয়ে গেল কোথায়! পিসির প্রস্তাবে সামান্য গড়িমসি ভাব দেখিয়ে রাজি হয়ে গিয়েছিল।

বিয়ে ঠিক হবার পর থেকে সন্দীপের পড়ন্ত যৌবন-নিকুঞ্জে পাখী গান গাইতে শুরু করল। আজ পরমেশ রাস্কেলটা তাতে বেসুর লাগিয়ে দিল একটু। 'ওটা একটা হোপলেস' মনে মনে আওড়াতে আওড়াতে বাড়ী ঢুকল সন্দীপ। বাড়ী এখন জমজমাট। বোনরা সব এসে পড়েছে। বিয়ের আর দিন পনেরো। বাড়ীর ভিতর সবসময় একটা মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে আছে। সন্দীপ নিঃশ্বাস ভরে গন্ধটা নিতে চাইল। কিন্তু নাকে আজ কোনো গন্ধ পেল না। কর্পূরের মত হঠাৎ উবে গেল। নাকি ওরই নাক বন্ধ।

—'এই যে দাদা। এ ঘরে এসো। দেখবে।

—'কী দেখব? জামা কাপড় ছাড়ি আগে।

—'আরে এসোই না বাপু।—প্রায় টানতে টানতে বোন সুনী নিয়ে গেল ভেতরে মায়ের ঘরে। ঘরে ঢুকে অপ্রস্তুত। চেনা অচেনা অচেনা এক দঙ্গল মেয়ে। হুমড়ি খেয়ে সবাই কী দেখছে। মিষ্টি গন্ধটা নাকে এসে আবার লাগল। মেয়ের দলের মাঝে এক ঝলক দেখল। নতুন শাড়ী গয়না চোখ ঝলসে দিল। সন্দীপের চোখে আমেজ লাগল।

—'দাদা দেখো। বউয়ের গয়না শাড়ী। পছন্দ কিনা বলো।

সন্দীপের কানের ডগা লাল হল।—'ধ্যেৎ, ও সবের আমি কী বুঝি।'

এক ঝটকায় বেরিয়ে যাচ্ছিল বোন হাত চেপে ধরল। 'অরে দেখোই না। তুমি পছন্দ না করলে তো ফেরৎ দিতে হবে। জোর করে খাটের উপর বসাল। সন্দীপের সামনে ডাঁই করে রাখল নতুন শাড়ী জামা গয়না। এই দেখো বেনারসী। লাল রঙের আজকাল কেউ পরে না। ডীপ পিংক কিনেছি।'—সন্দীপ আধখানা চোখে তাকাল চোখ দুটো ধাঁধিয়ে গেল শাড়ীর জৌলুসে বর্ষার প্রথম বৃষ্টির সোঁদা মাটির গন্ধে ভিতরটা যেমন অজানা পুলকে হুলকে ওঠে তেমনি সন্দীপের হচ্ছে নতুন কাপড়ের গন্ধে।

ঐ গাঢ় গোপালী শাড়ীতে বিনীতাকে কেমন লাগবে? ভাবতেই শরীরের ভিতর দিয়ে একটা কম্পন নামতে লাগল।

—'এই দেখো। এটা সেকলেশ। কেমন?'

সন্দীপ আর তাকাতে পারছে না। অনেক দিন আগে অপূর্ব সৌরভে ভরা ফুলের মস্ত এক উদ্যানে ঘুরছিল সে। বেশীক্ষণ ঘুরতে পারে নি। ও যেন কী রকম বুঁদ হয়ে গিয়েছিল। মাথার ভিতরটা অসুস্থতার লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। এখন সেই রকম অনুভূতি হচ্ছে। শানিত তলোয়ারের মত নেকলেশটা চোখের সামনে ঝলসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বিনীতার আরবী ঘোড়ার মত গরীবার ছবি ফুটে উঠল। সন্দীপের বোন আরও কী সব দেখাতে লাগল। সন্দীপের আর কিছুই চোখে পড়ছে না। ঝকঝকে গয়না, ডগমগে শাড়ী-জামা ওর চোখ কী অন্ধকার করে দিল। খুব বেশী মিষ্টি কম্যাগত খেলে মানুষের জিভের স্বাদ চলে যায়, অতিরিক্ত সঙ্গীত শ্রবণে মানুষ বধির হতে পারে, খুব চড়া রঙ মানুষের চোখ কানা করে দিতে পারে। সন্দীপ কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

নেশাগ্রস্তের মত নিজের ঘরে এল। জামা-কাপড় ছেড়ে স্নান করল। খানিকটা এসেন্স ঢেলে দিল জামাতে। গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করছে। গলায় গান আসতে চায় না। তার জন্য এখন বেশ দুঃখ হচ্ছে। রেকর্ডে শোনা একটা গানই বেসুরে ভাঙা গলায় গেয়ে উঠল—তুমি আমারি আমারি—মম সন্ধ্যা গগন বিহারী—'

'বিনীতা বিনীতা বিনীতা'—নানা ঢঙে নামটা বার বার উচ্চারণ করতে লাগল। বি-নী-তা—আঃ। কী মধুর। ছোটবেলায় 'ক্যাডবেরী' চকলেট অনেকক্ষণ ধরে গালে রেখে কৃপণের মত চুষত আর ভীষণ ভাল লাগত। 'বিনীতা' নামটাই যেন ক্যাডবেরী চকলেট।

কিং কিং কিং.....

শরীর ভরা ভাল লাগা নিয়ে শুয়ে পড়বার আগেই ঘুমপাতন।

—হ্যালো:—

—'সন্দীপ? কি রে ঘুমিয়ে পড়েছিলি নাকি?

—'না' সন্দীপের মুখ লম্বা হল। পরমেশের গলা তার কানে ঠিক ফরাতের আওয়াজের মত লাগল।

—'জেগে জেগে বিনীতার স্বপ্ন দেখছিলি বুঝি?'

চমকে উঠল সন্দীপ। ক্যাডবেরী চকলেটটা হঠাৎ চিরতার মত হয়ে গেল।

—'তোর বউয়ের নাম বিনীতা তো! হ্যাঁরে তুই বিনীতাকে বিয়ে করছিস। তাজ্জব কী বাত। আমি জানতামই না। আরে সন্ধ্যার হঠাৎ বিনীতা—

'শাট্ অপ।' সন্দীপের ভিতর গর্জে উঠল। 'বিনীতা নাম তুই মুখেও আনবি না। উচ্চারণ করবি না।'

COME TO US FOR
Carol
STEREOS
GANGA ELECTRONICS
186, Chandney Market, Cal.-12
Phones: 24-6616/6428

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর সংখ্যায় মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ এর বিজ্ঞাপনে "রানু" পুস্তকটির লেখক হিসেবে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নামের বদলে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামটি ভুলবশত ছাপা হয়।

এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

আপ্পারাও চলে গেলেন

সেদিন মোহনবাগানের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের খেলা। বেলা একটু বাড়তেই জ্যোতিষ গুহ গিয়ে হাজির হলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের খেলোয়াড়দের মেসে। দেখলেন, একটা চাদর মুড়ি দিয়ে আপ্পারাও শুয়ে আছেন। শংকিত গুহমশাই এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করতেই আপ্পারাও বললেন, কুছ নেহি, ঠিক হ্যায়...।

কিন্তু ঠিক যে সেদিন তিনি ছিলেন না তার খবর পাওয়া গেল মেসের ঠাকুরের কাছে। প্রথমে সে কিছু বলবে না। আপ্পাদাদার বারণ। কিন্তু গুহমশায়ের তাড়া খেয়ে সত্যি কথাটা শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল। বলল, ও উঠবে কি। কাল থেকে তো ওর খুব জ্বর। কিন্তু সে কথা বলা বারণ, পাছে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে তাকে মাঠে নামান না হয়।

গুহমশায় গিয়ে কপালে হাত দিতেই চমকে উঠলেন আপ্পারাও। তখনও বেশ জ্বর। কিন্তু জ্যোতিষবাবুর হাত জড়িয়ে ধরলেন আপ্পারাও। বললেন, আমায় বসিয়ে দেবেন না। শুধু জার্সি পরিয়ে মাঠে নামিয়ে দেবেন।

তাঁর সেই আকুতি ঠেলতে পারলেন না গুহমশাই। আপ্পারাওকে খেলালেন। কিন্তু অসুস্থ আপ্পারাও যা খেললেন তার তুলনা হয় না। একমাত্র আপ্পার পক্ষেই বোধহয় তা সম্ভব।

অসুখ ছিল আপ্পারাওয়ের নিত্যদিনের সঙ্গী। দুরারোগ্য হাঁফানী ছিল তাঁর। আর একদিনের কথা। পরের দিন ইস্টবেঙ্গলের বড় খেলা। তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে সব শুয়ে পড়েছেন। হঠাৎ মাঝ রাতে কিসের যেন শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল ধনরাজের। এদিক-ওদিক দেখতেই চোখ গেল জানলার দিকে। জানলার পাশে বসে আপ্পারাও বুকে হাত দিয়ে হাঁপাচ্ছেন। ভীষণ বেড়ে গেছে তাঁর কষ্ট। এক ফোঁটা বাতাসের জন্যে গিয়ে বসেছেন খোলা জানলার ধারে। বড্ড কষ্ট হচ্ছে।

পায় পায় ধনরাজ এগিয়ে গেলেন তাঁর কাছে। কিন্তু যে মানুষ হাজার চেড়েও রা কাটেন না সেই মানুষই সেদিন রাত্রে ধনরাজকে পাশে দেখে দারুণ রেগে গেলেন। বললেন, তুমি কেন উঠে এসেছ? জানা তোমার খেলা। যাও শুতে যাও।

অবাক হয়ে গেলেন ধনরাজ। কিন্তু কিছু বলার সাহস হল না। মন খারাপ করে ফিরে এসে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু পর দিন সকালে জ্যোতিষবাবুর কাছে গিয়ে আর্জি জানালেন। ওকে খেলাবেন না। মারা যাবে শেষ কালে। কাল সারা রাত বসে বসে হাঁপিয়েছে।

জ্যোতিষবাবু বললেন, ওর সঙ্গে তাঁর কথা হয়ে গেছে। ও শুধু জার্সি পরে মাঠে নেমে দাঁড়িয়ে থাকবে। সেদিন ইস্টবেঙ্গলের জার্সি গায় হথারীতি মাঠে নেমেছিলেন আপ্পারাও। তারপর সকলে অবাক হয়ে দেখলেন তাঁর খেলা। সারা রাত হাঁফানীর টানের পর কেউ কি ঐ রকম খেলা খেলতে পারে? অবিশ্বাস্য মনে হয় যেন!

সত্যিই আপ্পারাও এক অবিশ্বাস্য প্রতিভাবান খেলোয়াড় ছিলেন। প্রতিভা না থাকলে কি আর কেউ হাঁফানী নিয়ে অমন খেলা খেলতে পারেন? সারা রাত বসে বসে হাঁফানীতে কষ্ট পেয়েছেন—বুক ফেটে যেতে চেয়েছে এক ফোঁটা হাওয়ার জন্য—তারপর কটা ঘন্টা কাটতে না কাটতেই তিনি মাঠে নেমে দুরন্ত খেলা খেলেছেন। এ বোধহয় একমাত্র আপ্পারাওয়ের পক্ষেই সম্ভব।

বড় দুঃখ আপ্পারাওয়ের খেলা দেখি নি। তিনি যখন অবসর নিয়ে কলকাতা ছেড়ে চলে গেছেন তখনও আমরা গড়ের মাঠে যাবার ছাড়পত্র পাই নি। তাই আমাদের কাছে ভেংকটেশ আপ্পারাও, ধনরাজ, আমেদ ও সালের খেলার কথা গল্প কাহিনীর মত।

দুঃখ হয় এই কথা ভেবে যে, কেন আরও কিছু দিন আগে জন্মাই নি। তাহলে তো ঐ পঞ্চপান্ডবকে দু চোখ ভরে দেখতে পেতাম। অভিজ্ঞ ফুটবল বিশেষজ্ঞ ও সে যুগের খেলোয়াড়দের কাছে শুনেছি যে, অমন সংযত, অমন ভদ্র এবং মার্জিত খেলোয়াড় আর দেখতে পাওয়া যায় না।

আমাদের কথা ছেড়ে দিলাম, স্বয়ং আপ্পারাওয়ের জীবনে একটা মস্ত দুঃখ ছিল। সে বড় কষ্টের স্মৃতি তিনি সারা জীবন বহন করে গেছেন। অত বড় খেলোয়াড় কিন্তু চিরকাল রয়ে গিয়েছিলেন উপেক্ষিতের দলে। ভারতীয় দলে তাঁকে

স্থান দেওয়া হত না। অজুহাত, তাঁর বয়স হয়ে গেছে। বয়স তাঁর হয়েছিল ঠিকই, মাথার চুলে পাক ধরেছিল আগে ভাগেই। কিন্তু নির্বাচকদের কাছে যোগ্যতার মাপ-কাঠি হয়ত খেলা ছিল না, ছিল বয়স। তাই যাঁকে পেলে ভারতীয় দলের শক্তি অনেক বেড়ে যেত, সেই আম্পারাওকে অবহেলায় চিরকাল রাখা হল দূরে। শুনেছি তাঁর জন্যে মনে মনে দুঃখ পেলেও মুখ ফুটে কোনদিন একটি কথাও বলেন নি আম্পারাও।

আম্পারাও কলকাতায় খেলতে এসেছিলেন ১৯৩৭ সালে। কালীঘাটে চারটি মাছর কাটিয়ে ৪১ সালে চলে আসেন ইস্টবেঙ্গলে। সেই যে লাল-হলুদ জার্সি গায় চড়িয়েছিলেন আম্পারাও—আর কোনদিন গা খোলেন নি। ১৯৫১ সাল পর্যন্ত টানা ইস্টবেঙ্গলে খেলে অবসর গ্রহণ করে দেশে ফিরে গেলেন কিংবদন্তীর পণ্ড তারকার দ্বিতীয়তম খেলোয়াড়টি।

আম্পারাও যেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ভাগ্য লক্ষ্মী হয়ে এসেছিলেন। তাঁর আসার পর অর্থাৎ চল্লিশের দশকে সাফল্যের ইতিহাসকে উজ্জ্বল করে তুলেছিল।

১৯৪২ সালে ইস্টবেঙ্গল প্রথম লীগ চ্যাম্পিয়ন হল। তারপর লীগ ও শীল্ড একই বছরে প্রথম পেল, তারপর কলকাতার লীগের সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে ঘরে তুলল কাপ। অর্থাৎ শুধু সাফল্য আর সাফল্য। ১৯৪৬ সালে তিনি ছিলেন ইস্টবেঙ্গলের অধিনায়ক। সেবার তাঁর দল ইস্টবেঙ্গল লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল।

ও কথা থাক। খেলোয়াড় আম্পারাওয়ের কথায় আসি। খেলোয়াড় হিসেবে তিনি ছিলেন মস্ত এবং মহৎ। তিনি নিজে যেমন খেলতেন। ভেলকি দেখাতেন খেলার মাঠে, তেমনি অন্যদের খেলতে সাহায্য করতেন। তাঁর খেলা ছিল বুদ্ধিদীপ্ত। ছিল সৃষ্টি ধর্মিতায় অনন্য। বয়স কোন দিন তাঁর খেলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে নি। বরং বলা যায় তাঁর বয়স যত বেড়েছে। খেলাও খুলেছে ততই। তাঁর খেলোয়াড় জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত কেউ বলতে পারেন নি যে আম্পারাও ফুরিয়ে এসেছেন। তাঁর দিন শেষ হয়ে এল। তাই শেষ বয়সে তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্যেই বোধহয় তাঁকে ভারতীয় দলের প্রতিনিধি হিসেবে কাবুলে পাঠান হয়েছিল। কিন্তু সেই মনোনয়নে খুশী হতে পারে নি আম্পারাওয়ের বঞ্চিত হন। বরং অনেক বেশী আনন্দ পেয়েছিলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সঙ্গে রাশিয়া সফরে যেতে পেরে।

আম্পারাওয়ের মত খেলোয়াড় এ যুগে আর হবে না, আম্পারাওয়ের মত ভদ্র, বিনয়ী ও মহৎ মানুষ এ যুগে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। আম্পারাওয়ের মত দরদী মন এ যুগে হয়তো অচল। তেমনি আদর্শ খেলোয়াড় হিসেবেও আম্পারাওয়ের মত আর কাউকেই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সেই আম্পারাও আমাদের মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন। কলকাতা থেকে বহু দূরে নিজের শহরে কাকিনাড়ায় আটষট্টি বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন এই শতাব্দীর এক মহৎ খেলোয়াড় আম্পারাও। ভেংকটেশের পর বড় আচমকাই আমাদের কাছ থেকে মৃত্যু ছিনিয়ে নিয়ে গেল সেই পণ্ড তারকার দ্বিতীয় এবং উজ্জ্বলতম নক্ষত্রটিকে....।

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

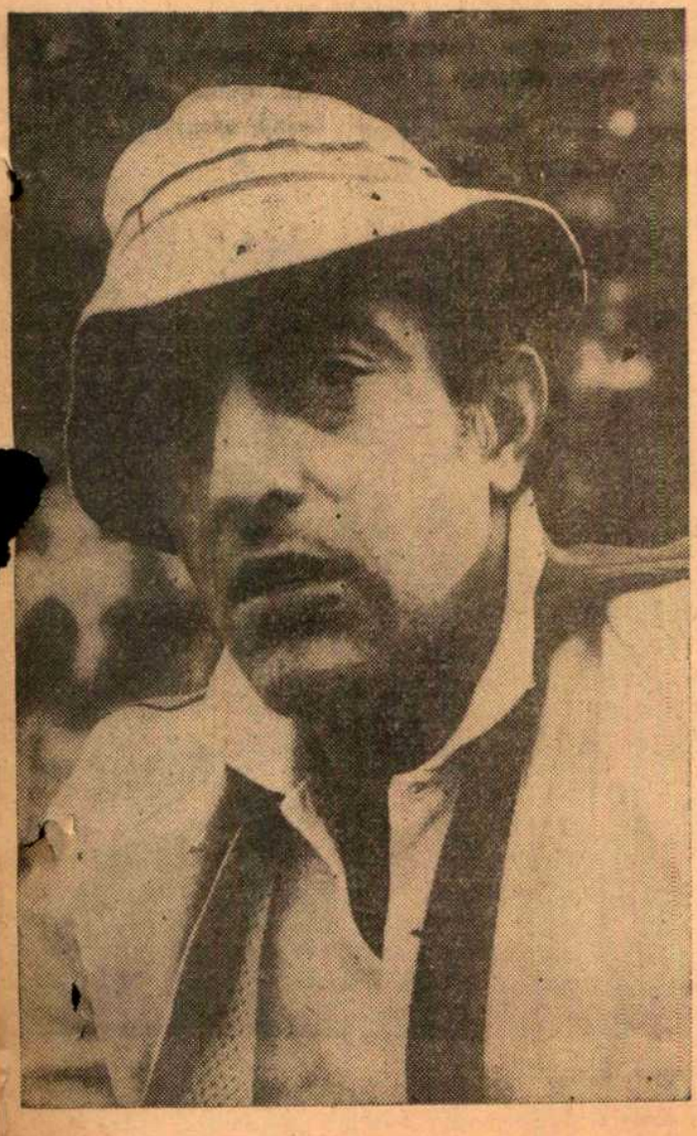

গড়ের মাঠে বাঘ?

মনসুর আলী খান—নবাব অফ পাতৌদি—সংক্ষেপে টাইগার প্যাট আজও ভারতীয় ক্রিকেট রসিকের কাছে একটি বৈদ্যুতিক নাম। সে নামের সুইচে হাত পড়লেই রক্তে তরঙ্গ ছোটে চোখের সামনে জ্বলে ওঠে আলোর রোশনাই। সে আলোতে স্পষ্ট হয় টাইগারের নবাবী মেজাজ। নিজস্ব বিশিষ্ট স্টাইল। জলছবির মত চোখের সামনে লেপ্টে থাকে বাঘা পাতাউদির চোস্ত হাতের মার। ব্যাট অবিরাম চামড়ার গোলা ছুঁড়ছে সীমানার ওপারে। মোদ্দা কথা টাইগার পাতাউদি আজও আমাদের উত্তেজিত করেন। তাঁর নামে আজও আমাদের রক্তে চনমনে ঘোড়া দ্রুতই লাফিয়ে চলে।

এবারও তাই পাতাউদির নামে আমাদের উত্তেজনা তুঙ্গে। তিনি আসছেন। জোর খবর তিনি আসছেন। ক্রিকেটের নবাব বাঘা পাতাউদি এবার কলকাতায় আসছেন। কলকাতায় তিনি অবিশ্যি এর আগেও অনেক বার এসেছেন। এসেছেন খেলতে, খেলা দেখতে। একবার এসেছিলেন বিয়ে-সাদীর কাজ সারতে। আর টাইগারের বিয়ে-সাদী নিয়েও সে ক'দিন কলকাতা কম সরগরম থাকে নি। সংবাদপত্রগুলির কর্মব্যস্ততা কম ছিল না। হাজার হলেও টাইগারের সাদী তো!

তো এবার সেই টাইগারই আবার আসছেন কলকাতায়। আসছেন আর এক ভিন চেহারায়। আসছেন সম্পাদক শিরোপা নিয়ে। খেলার বৃত্তান্ত নিয়ে এক ইংরেজী পত্রিকা বেরোবে পুজোর পর। টাইগার তার সম্পাদক। কালিকলম অবিশ্যি

পাতাউদির নাম-ডাক আগেই ছিল। 'টাইগারস টেল' লিখে নজর কেড়ে ছিলেন সেবার এছাড়া কলকাতার ইংরেজী এবং বাংলা দৈনিকের হয়ে টেস্ট কভারেজও করেছেন। এবার খাতায় কলমে পাকাপাকি বন্দোবস্ত। এবার ব্যাটবলের লড়াকু ব্যাটসম্যান খাতা কলম নিয়ে রাশভারি সম্পাদকের চেয়ারে।

কলকাতার ক্রিকেট পাগল মানুষের উত্তেজনা আরও অন্য কারণে। ময়দানে হুইস্পারিং গড়ের মাঠে নাকি বাঘ নামবে। আসছে ক্রিকেট লীগে কলকাতার কান একটি নামী দলের হয়ে ব্যাট হাতে বাঘা ক্রিকেটার পাতাউদি রোদে পিঠ এলিয়ে পড়ে থাকা গড়ের মাঠে তে-কাঠির সামনে এসে দাঁড়াবেন। হয়তো অতীত আর একবার উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

তবে এটা নিতান্তই বাতাসে বাতাসে —অর্থাৎ কিনা ভাসমান খবর। এখনও পাকাপাকি হয়নি কোন দলের খাতায় নাম লেখাচ্ছেন প্যাট। তবে যেটুকু খবর মিলেছে তাতে জানা গেছে ক্রিকেটে কলকাতার দুটি নামী দলের মধ্যেই লড়াই চলছে বাঘ ধরা নিয়ে; দেখা যাক কোন তাঁবুতে বাঘ-বন্দী হয়!

দু'চোখে আলো ফুটুক

এবারও ভারতীয় নির্বাচক মন্ডলীর দু'চোখে আলো ফুটল না। এক চোখ অনুজ্জ্বলই রয়ে গেল। আর দুর্ভাগ্য সম্বরণের, সেই উজ্জ্বল চোখের আলোটুকু তার ওপর এসে পড়ল না। তিনি রয়ে গেলেন সেই অনুজ্জ্বল অন্ধকারের বৃত্তে। নির্বাচক মন্ডলীর এ উদার দৃষ্টিভঙ্গীর কোন জবাব নেই।

উইকেটের পিছনে ধারালো চোখ আর শকত মুঠি নিয়ে কোমর ভেঙে উবু হয়ে শিকারী মেজাজে যে মানুষটি দাঁড়িয়ে থাকে ক্রিকেটের পরিভাষায় তার নাম উইকেট কীপার। বড়ো দায়িত্বের কাজ পায়ে প্যাড হাতে গ্লাভস আঁটা মানুষটির। বাংলার সম্বরণ—সম্বরণ ব্যানার্জীও সেই কাজ করে থাকেন। এবং সে-কাজে তাঁর দক্ষতা যথেষ্ট। কিন্তু পুরস্কার মিলল কৈ? নির্বাচক মন্ডলীর আলোকিত চোখ তাঁর ওপর পড়ল কৈ? পাকিস্তান সফরকারী ভারতীয় দলের শিক্ষা শিবিরে যোগ দিতে যে পঁচিশজন ডাক পেয়েছেন সম্বরণ তার মধ্যে নেই। ফিরমানি ছাড়া উইকেট কীপার হিসেবে ডাক দেওয়া হয়েছে ভরত রেড্ডি আর বেদরাজকে।

নির্বাচন মন্ডলীর আন্তরিকতা। ভারতের প্রতি একটু বেশি সেটা গত কয়েক বছরে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু নির্বাচক মন্ডলীর স্বপক্ষে সেই আন্তরিকতা দেখানোর যোগ্য সমর্থন কোথায়? কর্ণাটকের পক্ষে খেলার জন্যে তো ভরতের ডাকই পড়েনি। আর অতীতের যে সব দৃষ্টান্তগুলি একজন খেলোয়াড়ের যোগ্যতার প্রশ্নকে উজ্জ্বল করে তোলে সেদিক থেকেও সম্বরণ ভরতের থেকে অনেক এগিয়ে।

১৯৭৩-এ উইকেটকীপার সম্বরণ বাংলা দলের হয়ে প্রথম খেলেন। ১৯৭৫-এ দলীপ ট্রফিতে খেলেন পূর্বাঞ্চলের হয়ে। অবশিষ্ট ভারতীয় দলের হয়ে ইরাণী ট্রফিতেও বোম্বাইয়ের বিপক্ষে খেলেছেন তিনি। টনি গেড্রগের এম সি সি-র বিরুদ্ধে পূর্বাঞ্চলের হয়ে খেলে সম্বরণ রীতিমত রেকর্ড করেছেন। ভারত সফরকারী বিদেশী দলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ইনিংসে সর্বোচ্চ শিকারের নজীর সৃষ্টি করেছেন। ঐ ইনিংসে উইকেটের পিছনে দাঁড়িয়ে তিনজনকে ক্যাচ ধরে ফিরিয়ে দিয়ে আর দুজনের স্টাম্প বেমালুম উড়িয়ে দিয়ে তিনি অনেকেরই নজর টেনেছিলেন। ৭৫-৭৬ সালেও সম্বরণের পারফরমেন্স জোরালো। রণজি ট্রফির পাঁচটি খেলায় তাঁর হাতে ধরা পড়ে অথবা স্টাম্পড হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরেছিলেন চব্বিশজন খেলোয়াড়। এই কৃতিত্বেও সম্বরণ একটি নজীর সৃষ্টি করেছিলেন। সাগর পারের মাঠে গিয়েও কাউন্টি খেলে এসেছেন। খেলেছেন বোস্টন লীচ, কিংজলে ক্রিকেট ক্লাবের হয়ে। সেখানেও উইকেটের পিছনে দাঁড়িয়ে ক্যাচ ধরা এবং স্টাম্প করার কেরামতি দেখিয়ে এসেছেন। তিনবার হ্যাট কালেকমনের সম্মান কুড়িয়েছেন।

বোধ হয় দেশে বিদেশে সম্বরণের উজ্জ্বল ভূমিকাটির কথা মনে রেখেই নির্বাচক মন্ডলী গত বছর মাদ্রাজ টেস্টিং ক্যাম্পে ডাক পাঠিয়েছিলেন তাকে। সেখানে নিজের ক্ষমতা প্রমাণ করে স্থান করে নিয়েছিলেন গাভাসকারের একাদশ [illegible] ভেঙ্কটরাঘবনের একাদশের নির্বাচনী খেলাতেও। সে খেলার কিন্তু এবারে ডাক পাওয়া উইকেটরক্ষক ভরত রেড্ডি ছিলেন না। সে খেলায় সম্বরণ ব্যাটিংয়েও মোটামুটি দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। দুনম্বর উইকেট কীপার হিসাবে কোন দিক দিয়েই ভরত সম্বরণকে হারাতে পারেন নি অথচ দলে ঠাঁই পেয়েছিলেন ভরত। পাকিস্তান সফরে যাওয়া ভারতীয় দলের শিক্ষা শিবিরে আমন্ত্রিত খেলোয়াড়দের মধ্যে এ বারও নাম নেই সম্বরণের অথচ থাকা উচিত ছিল। ফিরমানি ছাড়া এবারে ডাক পেয়েছেন সেই ভরত। আর একজনও ডাক পেয়েছেন উইকেট কীপার হিসাবে— তিনি হলেন পাঞ্জাবের বেদরাজ।

নির্বাচক মন্ডলীর পূর্বাঞ্চলের প্রতি এই বিমাতৃসুলভ আচরণ কবে শেষ হবে মন্ডলীতে পূর্বাঞ্চলের হয়ে সত্যিকারে কিছু বলার মত না হয় কেউই নেই— তা বলে পূর্বাঞ্চল এমন উপেক্ষিত হয়ে থাকবে কতকাল থাকবে?

দিলকুমার

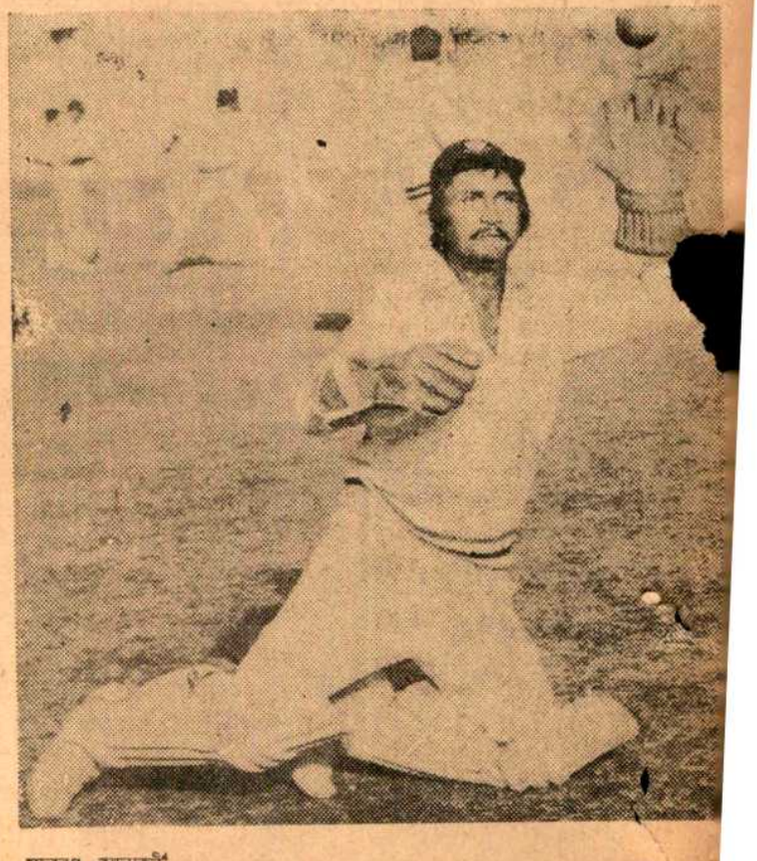

সম্বরণ ব্যানার্জী

বরদলুই ট্রফি

গৌহাটির নেহরু স্টেডিয়ামে ১৯৭৮ সালের বরদলুই ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে কলকাতার ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ৪-২ গোলে ব্যাংককের পোর্ট অথরিটি দলকে হারিয়ে মোট ৪ বার বরদলুই ট্রফি জয়ের গৌরব লাভ করেছে। এই নিয়ে ইস্টবেঙ্গলের ফাইনালে খেলা হল মোট ৫ বার। এখানে উল্লেখ্য, এবারের প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান ক্লাব অংশ গ্রহণ করে নি। তারা গত বছর বরদলুই ট্রফি জয়ের সূত্রে উপর্যুপরি ৪ বার বরদলুই ট্রফি জয়ের রেকর্ড করেছিল। মোহনবাগান ছাড়া আর কোন দল এ পর্যন্ত কি উপর্যপরি ৩ বারও এই ট্রফি জিততে পারে নি।

এ বছরের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল প্রথমার্ধে একটি এবং দ্বিতীয়ার্ধে তিনটি গোল দিয়েছিল। দ্বিতীয়ার্ধের শেষ তিন মিনিটে দিয়েছিল দুটি গোল। ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে মিহির বসু প্রথম ও চতুর্থ গোল এবং সুরজিৎ সেনগুপ্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় গোল করেন। পোর্ট অথরিটি দলের পক্ষে প্রথমার্ধে গোল দেন সম্পরন এবং অন্যটি পান। প্রথমার্ধের খেলার ৮ মিনিটে মিহির বসু মাচমত গোল করেন। পোর্ট দলের সম্পরন খেলার ২৫ মিনিটে গোলটি শোধ করে দেন এবং খেলার ৪০ মিনিটের মাথায় আট্টাপর্ণ দলের দ্বিতীয় গোল দিয়ে দলকে ২-১ গোলে এগিয়ে দেন। বিরতির সময় পোর্ট দল ২-১ গোলে এগিয়েছিল। দ্বিতীয়ার্ধের খেলার ৫ মিনিটে সুরজিৎ গোল দিয়ে খেলার ফলাফল সমান২-২ করেন। এর পর খেলার শেষ মিনিটে পোর্ট দল পেনাল্টি থেকে গোল করতে পারে নি। তাছাড়া তারা গোল করার দুটো সহজ সুযোগও নষ্ট করে। ফলে ইস্টবেঙ্গল দলের তৃতীয় গোল দিলে ইস্টবেঙ্গল ৩-২ গোলে এগিয়ে যায়। খেলা শেষ হবার এক মিনিট আগে মিহির তাঁর ২য় ও দলের ৪র্থ গোলটি করেন। খেলাটি খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয়েছিল।

কোয়ার্টার ফাইনাল লীগের খেলায় চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স আপ হওয়ার সূত্রে সেমিফাইনালে উঠেছিল এ গ্রুপ থেকে ইস্টবেঙ্গল (চ্যাম্পিয়ান) ও ইণ্ডিয়ান টেরিটোরিয়াল ইন্ডাস্ট্রিজ (রানার্স আপ) এবং বি গ্রুপ থেকে পোর্ট অথরিটি (চ্যাম্পিয়ান) ও আসাম পুলিশ (রানার্স আপ)। সেমিফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ১-০ ও ৩-০ গোলে আসাম পুলিশকে এবং পোর্ট অথরিটি ৩ ও ৪-১ গোলে আই টি আই দলকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল। সেমিফাইনালের দ্বিতীয় পর্বের খেলায় ইস্টবেঙ্গলের নবাগত খেলোয়াড় সাবির আলি আসাম পুলিশের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করেছিলেন।

খেলা

পাকিস্তান সফর

বিষেণ সিং বেদীর নেতৃত্বে ভারতীয় ক্রিকেট দল সেপ্টেম্বর মাসের ২৩ তারিখে পাকিস্তান সফরে যাচ্ছে। এটা ভারতীয় ক্রিকেট দলের দ্বিতীয় পাকিস্তান সফর। প্রথম এবং শেষ সফর করেছিল ১৯৫৪-৫৫ সালে। ভারতীয় ক্রিকেট দলের এই ১৯৭৮ সালের পাকিস্তান সফরে আছে ১২টা খেলা—টেস্ট খেলা ৩টে, এক দিন-ব্যাপী আন্তর্জাতিক খেলা ৩টে এবং তিন দিনব্যাপী খেলা ৬টা। ভারতীয় ক্রিকেট দল তাদের সফরের প্রথম ম্যাচ খেলাতে নামবে সেপ্টেম্বর ২৭ তারিখে, পাকিস্তান ব্যাংক একাদশ দলের বিপক্ষে তিন দিনের খেলা। সফরের শেষ খেলা—তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ, আরম্ভ নভেম্বর ২৪ তারিখে করাচীতে।

বেদী

যুদ্ধ এবং রাজনৈতিক তিক্ততার কারণে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের ক্রিকেট খেলা দীর্ঘকাল বন্ধ ছিল। এ পর্যন্ত পাকিস্তান ক্রিকেট দল দুবার ভারত সফর করেছে—১৯৫২-৫৩ ও ১৯৬০-৬১ সালে। আর এর আগে পাকিস্তান সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দল গেছে মাত্র একবার—১৯৫৪-৫৫ সালে। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এই তিন সফরে যে ১৫টা টেস্ট খেলা হয়েছে তার ফলাফল : ভারতের জয় ২, পাকিস্তানের জয় ১ এবং খেলা ড্র ১২। ১৯৫২-৫৩ সালের প্রথম টেস্ট সিরিজের ১ম টেস্টে ভারত এক ইনিংস ও ৭০ রানে, ২য় টেস্টে পাকিস্তান এক ইনিংস ও ৪৩ রানে এবং ৩য় টেস্টে ভারত ১০ উইকেটে জয়ী হয়। ৪র্থ ও ৫ম টেস্ট ড্র যায়। পরবর্তী ১৯৫৪-৫৫ এবং ১৯৬০-৬১ সালের টেস্ট সিরিজের ১০টা খেলাই অমীমাংসিত থাকে।

ভারত বনাম পাকিস্তানের বিগত ১৫টি টেস্ট খেলায় প্রতিষ্ঠিত বিবিধ টেস্ট রেকর্ড নীচে দেওয়া হল :

ভারত পাকিস্তান মোট

বছর	জয়ী	জয়ী	ড্র	খেলা
১৯৫২-৫৩	২	১	২	৫
১৯৫৪-৫৫	০	০	৫	৫
১৯৬০-৬১	০	০	৫	৫
মোট :	২	১	১২	১৫

এক ইনিংসে দলগত সর্বোচ্চ রান

ভারত : ৪৩৯ (৯ উইঃ ডিক্লে.),
মাদ্রাজ, ১৯৬০-৬১

পাকিস্তান : ৪৪৮ (৮ উইঃ ডিক্লে.),
মাদ্রাজ, ১৯৬০-৬১

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রান
(পুরো ইনিংসের খেলায়)

ভারত : ১০৭, লক্ষ্ণৌ, ১৯৫২-৫৩

পাকিস্তান : ১৫০, দিল্লী, ১৯৫২-৫৩

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান

ভারত : ১৭৭* সি এল রোদে,
মাদ্রাজ, ১৯৬০-৬১

পাকিস্তান : ১৬০ হানিফ মহম্মদ,
বোম্বাই, ১৯৬০-৬১

* নট আউট

এক সিরিজে সর্বাধিক মোট রান

ভারত : ৩৯২ (গড় ৬৩.৬৬)
পলি উমরীগড় ১৯৬০-৬১

পাকিস্তান : ৪৬০ (গড় ৫১.১১)
সৈয়দ আমেদ, ১৯৬০-৬১

ভারত : ২৭ (গড় ২০-৫৬) ভি মানকাদ

পাকিস্তান : ২২ (গড় ১৫-৮৬)
খান মহম্মদ ১৯৫৪—৫৫

এক সিরিজে সর্বাধিক মোট উইকেট

ভারত : ৮ (৫২ রানে) ভি মানকাদ,
দিল্লী, ১৯৫২-৫৩

পাকিস্তান : ৭ (৪২ রানে) ফজল মামুদ,
লক্ষ্ণৌ, ১৯৫২-৫৩

সেঞ্চুরী : ভারত ৮ এবং পাকিস্তান ৮

ভারতের ৮টি সেঞ্চুরীর মধ্যে পলি উমরিগড় একাই ৫টি সেঞ্চুরী করেন। অপর দিকে পাকিস্তানের ৮টি সেঞ্চুরীর মধ্যে ২টি করে সেঞ্চুরী করেন হানিফ মহম্মদ এবং সৈয়দ আমেদ।

চিত্রধ্বনি

প্রেমের সুভাষবাদ

চারিদিকে এখন খুব হৈ-হাঙ্গোল, সবাই দুঃখ করছে যে, গান্ধীজীর অহিংসে নীতি আর কেউ মনে রাখেনি। আমার স্থির বিশ্বাস, হিন্দী পরিচালকদের সম্বন্ধে ভগবান ধারণা না থাকার ফলেই এ-জাতীয় প্রচার করা হচ্ছে। এই 'আপনা খুন' ছবির কথাই ধরুন না। শশী কাপুর যে ভালো হয়ে গেল এটা কি শুধু পাঁচ বছর জেলে থাকার জন্য? হতেই পারে না। হেমামালিনী ওরকম আদর করে গালে নাক না ঘসে দিলে শশী জন্মেই এমন লক্ষ্মীসোনা হয়ে ফিরে আসত না। পরিচালক বি সুভাষ আসলে বলতে চেয়েছেন দুনিয়ার কালো লোকদের মন সাদা করে দিতে হলে পুলিস ও মিলার বদলে অনেক দরকারী প্রেম ও হেমামালিনীর ঠোঁট। একে আমরা অবশ্যই প্রেমের সুভাষবাদ বলতে পারি।

আট শিশুকালেই রামের (শশী কাপুর) বাবা মারা যায় এবং সে মাসি থেকে উদ্বাস্তু হয়ে যায়। আমরা ছবিতে তার এই বড় হয়ে যাওয়া রূপটাই দেখেছি। শশী কাপুর একজন বড় নটেয়া। পুলিশ তার ওপর এতই অসন্তুষ্ট যে, সে যখন খপ্ করে হাওয়া থেকে রাখী ধরে, তাতেই পুলিশ ফস্ করে কিওল-মন বার করে ফেলে। অবশ্য নিজে নিজে অবশ্য কেন, ওই একবারই শশীর অপরাধ হয়েছিল: একটি নিরীহ রাখি হত্যা করে-ছিলেন। এছাড়া খুন তো দূরে থাক্, কোন নিরপরাধ লোকের কেশ স্পর্শও তিনি করেননি। এইভাবেই চলছিল।

ইতিমধ্যে জীবন্ত খুন্জ হয়ে আইন হেমামালিনী হতে এলেন। ইনি মেয়ে মেয়ে অভিনয় করেন। বয়স বতনে রতন চেয়ে। শশী কাপুরে হেমামালিনীকে চিনজেন্স যাবা বুদ্ধিমান তি এম পি (প্রাণ), প্রাবিকা প্রধানমন্ত্রীকন্যা, এরকম ভাবা হলে আমাদের দা ক্ষাপত্ত। শশী আপুরে নায়ক কিনা আরও চিন্তাশীল মাথা ঠান্ডা রেখে খারাপ বজ্জ করে ওদেশে ফিরে হয়ে যাওয়ার ঠিক পরে ধরা পড়লেন। হেমামালিনী হিন্দু মারা ক আর হলেন, স্বাধীন অনুগমন করলেন। আর এই দণ্ডাদেশের পরে? বউ কাঁধে শশী কাপুর নিশ্চুত বেরারী-কন্যা অরণ্যের মধ্য দিয়ে ছুটেছেন, যাবা প্রাণ হোলকপ্টার থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, মাটিতে প্রেম, আকাশে আইলা উচ্চ এর কি উত্তেজনা, পায়ের ঘাম মাথায় উঠে যাবার আপনার।

এত উত্তেজনার আমি সুন্দরের সোনিক তুমির দিকে নজর দিতে পারিনি। তবে এই ছবির সংলাপ ধাঁধিয়ে রাখবার মতো। যেমন প্রেমের ভাষালাপ—হয় লাঠা হলো মাল না উপর মাল্লা না নাম লিখা হচ্ছে হয়ে, জেকিন ইস্ মালকে উপর আপনা প্রাণ দিজেগে রাজা?'

হল থেকে বেরোনর সময় জনৈক বিজ্ঞ দর্শক অবশ জানালেন, হেমামালিনীর মত বউ পেলে তিনিও গুন্ডা হতে রাজি আছেন। তবে সেটা কোন কালের কথা নয়। শ্রী বি সুভাষ 'আপনা খুন' করিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, তিনি অহিংসে পন্থায় দর্শক খুন করতে পারদর্শী। —সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়।

হেমা মালিনী। ছবির নাম ভাগবত

স্টুডিও থেকে

সরকারী সাহায্য

ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীর স্বেচ্ছায় দুঃখে একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন করে-ছিলেন বৃহস্পতিবার সিনে টেকনিসিয়ানস্ ওয়ার্কস ইউনিয়ন ও ফেডারেশন অফ ফিল্ম টেকনিসিয়ানস এন্ড ওয়ার্কার্স অফ ইন্ডিয়া। উদ্দেশ্য ছিল ১৯৭৭-৭৮ সালের মধ্যে প্রয়াত দুঃস্থ কলাকুশলীদের পরি-বারকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার এই কাজে প্রথম এগিয়ে এলেন, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আগেই কয়েকজন সাহায্য পেয়েছিল। মোট পঞ্চাশ হাজার টাকা দশজন দুঃস্থ কলা-কুশলীর পরিবারের জন্য পাঁচ হাজার টাকা করে চেক করে দেওয়া হয়েছে এইবার।

অনুষ্ঠান শুরুর কিছু আগে তথাগতীত লোড শেডিং হল স্টুডিও পাড়ার। জেনারেটর সিনেমায় অন্ধকার থিয়েটার আলোকিত করা হল। নিয়ম ভেঙে তথা ও জনসংযোগমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রায় ঠিক সময়েই এলেন।

শুরু হল অনুষ্ঠান। সভাপতির আসনে বসলেন চলচ্চিত্রের অন্যতম প্রবীণ টেকনি-সিয়ান ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওর হরেন পাকড়াশী। বক্তা হিসাবে একে একে মঞ্চে উঠলেন বিভিন্ন বিভাগীয় গিল্ডের কর্ম-কর্তারা। দুঃস্থ কলাকুশলীদের এই সরকারী সাহায্যদানকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রায় সকলেই একবাক্যে বামফ্রন্ট সরকারের মহানুভবী চরিত্রের কথা উল্লেখ করলেন।

সেই সঙ্গে প্রত্যেক বক্তাই বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির দুরবস্থার চিত্রটি তুলে ধরে সরকারী হস্তক্ষেপের আবেদনও জানা লেন।

প্রত্যুত্তরে মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তাঁর দীর্ঘ ভাষণে বলেন, সবচাইতে বড় কথা হল সাধারণের প্রচেষ্টায় শুটিনিক কর্মচারী বলা কুশলীদের অকুণ্ঠ সমর্থন না থাকলে কোন প্রচেষ্টাই কার্যকরী হবে না। সরকার তার আপনাদের সবাই সক্রিয় সমর্থন নিয়ে আমা-দের পাশে এসে দাঁড়ান, পাশাপাশি এসে সূচীকে বাস্তবায়িত করতে এগিয়ে আসুন।

'ইতিমধ্যেই সরকার অনুদানের মাধ্য ভালো ছবি তৈরির প্রচেষ্টাকে মদত দেবে চেষ্টা করছে। খুব শিগগিরই প্রথম দফ

পরিচালক-প্রযোজকদের নাম ঘোষণা করা হবে। শ্রমিক-কর্মচারীদের স্বার্থের লড়াই-এর পাশাপাশি আপনারা ভালো-সৎ-সুস্থ ছবি তৈরির আন্দোলনটাকেও জোরদার করুন। সরকার অনুদান দিলেই ছবির মান বাড়বে না। ছবির কোয়ালিটি বাড়াবেন আপনারা। সুস্থ সংস্কৃতি-চেতনা তৈরিতে শিল্পের দায়িত্বকে অস্বীকার করা যায় না।

এরপর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য নিজের হাতে দুঃস্থ কুশলী পরিবারবর্গের হাতে হাতে পঞ্চাশ হাজার টাকা তুলে দেন। যাঁদের টাকা পেলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন মহেন্দ্র বিশ্বাস, নিমাই রায়, অনাদি বানার্জি, গোরা গুপ্ত, রামপ্রসাদ শর্মা নিতাই জানা, পুলিন চক্রবর্তী, বিজয় দাস, কালীপদ মুখার্জি ও গোবা আঢ্য।

এখন নন্দিনী

সেদিন ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর এক নম্বর ফ্লোরে ঢুকে দেখি, নন্দিনী মালিয়া সুন্দরীর সাজে সেজে বসে আছেন। শট্ সেওয়া হচ্ছে জয় সেনগুপ্তর প্রেফারেন্সে মিঠু আর রবিন মল্লিকের। পিয়ানো বাজিয়ে হেমন্তর গলায় লিপ্ দিচ্ছে জয় সেন-গুপ্ত। প্রেফারেন্স শটটি শেষ হবার সময় নেওয়া হল মিঠু আর রণজিতের কোয়াজ-রি-অ্যাকশনস শট।

নন্দিনীর কাজ বোধহয় সকালেই হয়ে গেছে। তিনি তখন শটের বাইরে চুপচাপ বসে সুটিং দেখছেন। ডাগর-ডাগর চোখে তাকিয়ে মিঠুর অভিনয় দেখেছেন কখনও কখনও বা অজয় বিশ্বাসের সঙ্গে নিজের চরিত্র নিয়ে আলোচনা করছেন। কথায় কথায় গালের ওপর ছোট্ট টোলটি এখনও পড়ে দেখলাম নন্দিনীর। হাসিতে বাঁকা বাঙ্ময়। তাই বলা—নন্দিনী আর স্তব্ধ নেই।

একটা সময় সে নীরব ছিল এটা সত্যি। অনেকেই তখন ধারণা করেছিলেন, নন্দিনী বোধহয় ফিল্ম লাইন ছেড়েই দিয়েছেন। অভিনয় আর করবেন না। সত্যিই তখন নন্দিনী আগ্রহী ছিলেন ছবিতে কাজ করতে।

এখন তিনি ফিরে এসেছেন। বলা যায় সবারই ফিরে এসেছেন। শুধু ভাগ্যচক্র নয়, নন্দিনী কাজ করছেন অর্জুন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে, প্রতিজ্ঞা-র, দুলুদার (অরবিন্দ মুখার্জি) চয়নচন্দনে, গুরু বাগচীর এই ছবিতে তাঁর চরিত্র রোমান্টিক নায়িকার নয়, রীতিমত বলিষ্ঠ চরিত্র।

নন্দিনী আশা করছেন, আরও অফার আসবে। তবে ইতিমধ্যেই তিনি পিক-এণ্ড-চুজ শুরু করেছেন। সব অফার অ্যাকসেপ্ট করছেন না। যখন প্রশ্ন করলাম এইসব ছবিতে কাজ করে আপনি খুশি নন। গালে টোল ফেলে তিনি বললেন—কাজ করে কেউ কোনদিন খুশি হয় বলুন। তপন সিংহ, তরুণ মজুমদারের সঙ্গে কাজ করতে পারলে আরও ভালো লাগত।

আসলে নন্দিনী চাইছেন ভালো চরিত্র, ভালো পরিচালক—দুই-ই।

নন্দিনী মালিয়া

পার্থপ্রতিম

এই প্রশ্নটা আমারও। বহুদিন হল ও'র কোন খবর নেই। টালিগঞ্জের কোন স্টুডিও-তেই এক মাথা চুল, ঘাসের মত দাড়ি আর লাল চোখের ঐ মানুষটিকে দেখতে পাই না। কাউকে জিজ্ঞাসা করলে জবাব পেয়েছি 'ও বেঁচে আছে নাকি?'

সকলেরই এমন নির্লিপ্ত ভাব। কোনো চিন্তা নেই। ব্যস্ত আপনাতেই।

পার্থপ্রতিমের সঙ্গে কয়েক মাস আগে দেখা হয়েছিল ও'র গলফ ক্লাবের বাড়িতে। তিনি তখন বলেছিলেন, 'ছবি করতেই পারছি না, ছবি নিয়ে আর কি বলব!' গলায় ছিল ক্লান্তি। চোখে আগুন।

না হবার কোন কারণ নেই। 'বদবেশ'-এর মত বলিষ্ঠ ছবি করার পর যদি তাঁকে বেকার হতে হয়, তাহলে নৈরাশ্য আসবে না কেন? দু-দুটো ছবি শুরু করেও শেষ করতে পারেন নি! 'কৃষ্ণপক্ষ' এবং 'নাগরিক' ওমনিবাস হবে কিনা তা তিনি নিজেও জানেন না। ছবি দুটির প্রযোজক নাকি সরকারী সাহায্যের জন্য আবেদন করেছিলেন এবং একটি ছবির ঋণ মঞ্জুর হয়েও ছিল।

কিন্তু টাকা এখনও হাতে আসেনি। তাই পার্থপ্রতিম এখন বোধহয় নিরুদ্দেশে। নাটকপাগল তিনি, মুক্তঙ্গনের আশে-পাশে সন্ধেবেলা ছিল তাঁর নিয়মিত আড্ডার জায়গা। এখন সেখানেও দেখা যায় না। 'সুন্দরমের' রিহার্সাল ঘরে গিয়েও তাঁর হদিশ পাইনি।

সরকারী অনুদান পাবার জন্য তিনি আবেদন করেছেন কিনা জানি না, করলেও তিনি অনুদান পাবেন সে গ্যারান্টি নেই। সুতরাং পার্থপ্রতিমের ছবি করা এখন বড়ই বিশ বাঁও জলে।

নির্মাল্য

জ্যাগুন্ হয়ে থাকে

ন্যাডা নাকি প্রতি মাসে নিয়েনপক্ষে পাঁচিশবার বেলতলায় যায়। আমার প্রকৃতি ছিল বাংলার পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের তথাকথিত হাসির নাটকের বেল ইণ্টিপুরে আমার মাথার যে গভীর কোন্সের দীর্ঘস্থায়ী স্থায়ী রেখে গেছে, তাতে আমিহয়ত ন্যাড়ার মতো ঘন ঘন আর বেলতলায় গিয়ে উঠতে পারবো না। আমার নিশ্চিত ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। গত ১২ আগস্ট, শনিবার সন্ধে সাড়ে ছ'টায় আমি রঙমহলে শ্যামল চ্যাটার্জি ও দুর্গাচরণ পাঠক প্রযোজিত 'জ্যাগুন্' নাটকের অভিনয় দেখেছি।

'নাটক' কথাটি এখানে জেনে বুঝে ব্যবহৃত হয়েছে, বলা উচিত। আসলে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-এর একটি অ-কিঞ্চিৎকর গল্পের সূত্রে অলোক মিত্র, কিছু মোটা দাগের ভাঁড়ামি কাহিনীর মধ্যে করে পরপর ছুঁড়ে দিয়েছেন অথচ রবি ঘোষ (পরিচালক) প্রাণান্ত চেষ্টা করে গেছেন সেই বস্তুটিকে একটা নাটক-নাটক চেহারা দিতে। নাটক মানে যে শুধু গল্প বলা নয় (তা সে-গল্প যেমনই হোক না কেন এই ব্যাপারটা শ্রীঘোষের মনে আছে এরকম একটা সন্দেহ

অবিস্মরণীয় নাটকের অসামান্য জনপ্রিয়তা!
৬০০ রজনীর দ্বারপ্রান্তে ০ প্রতি বৃহঃ ও শনি—৬॥টায়/রবিবার—৩ ও ৬॥টায়
তরুণ থিয়েটারে
নাটক।পরিচালনা-সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়
শেঃ বিকাশ, সত্য, প্রদীপ, সান্তনা, গিরীশ, রবীন, মিহির, সুনীল, নিখিল, শংকর, অরুণ, দীপংকর, উশীনর, শৈলেন, মধু, গণেশ, স্বপন, অলোক, তিমির, পাপিয়া, মিঠু এবং রত্না ঘোষাল ও তরুণকুমার

CENTRAL LIBRARY CUTTA

বেশ কয়েকবার হয়েছে—সূচনায় টেলিফোন দৃশ্যে বা প্রশান্ত ঘোষের বাড়িতে রাত্রিবেলা দুই জানালার দৃশ্যে অথবা প্রথম অংকের শেষে বিরতির ঠিক আগে প্রশান্ত-লাবণ্যর মূর্ছা যাওয়ার। কিন্তু বিপুল হ্যাবল্যাবির মধ্যে এইসব টুকরো কাজ কোন স্থায়ী প্রত্যাশা পূরণ করে না।

এই বস্তুটির (নাটক?) সংলাপ অথবা দৃশ্যবিন্যাস নিয়ে কিছু বলা বেশ কষ্টকর কারণ তাদের জরাজীর্ণ গতানুগতিকতার ফলে কেবলমাত্র লক্ষ্য করার কীভাবে সেগুলো বলা বা করা হয়, অর্থাৎ অভিনয়। প্রশান্তর ভূমিকায় রবি ঘোষ, সুলেখা চরিত্রে সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় এবং লাবণ্যর ভূমিকায় অলকা গঙ্গোপাধ্যায় অভ্যস্ত নৈপুণ্যে যে দায়িত্ব পালন করেছেন, বস্তুতপক্ষে এ-জিনিস যে আড়াই ঘণ্টা ধরে সহ্য করা গেছে তা শুধু এঁদের দক্ষ অভিনয়ের জন্য। হরিপদ-র ভূমিকায় সমরেশ ব্যানার্জিও বিশ্বস্ত ও সহজ প্রাণবন্ত অভিনয় করেছেন। কিন্তু আর সবাই? অবনীশ চরিত্রে সন্তু মুখোপাধ্যায় প্রমাণ করেছেন যে, কাজ চালানোর চেয়ে বেশি কিছু তাঁর কাছে প্রত্যাশা করা অনুচিত আর সুবিমলরূপী উজ্জ্বল সেন-গুপ্তর কাছে কাজ চালানোও বাহুল্য। উজ্জ্বলবাবু, বাণী গঙ্গোপাধ্যায় (লতিকা), তপন রায়চৌধুরী (বসন্ত) প্রভৃতিরা যে মঞ্চে দাঁড়িয়েছিলেন, কথা বলেছেন এই কি আমাদের কাছে যথেষ্ট নয়? অবশ্য এর জন্য নাটকের (?) কাহিনী ও সংলাপও দায়ী। যেমন অলোক বাগচী, যিনি বিনয় চরিত্রে রূপদান করে একটি আস্ত গান সুন্দর গেয়েছেন, তাঁকে কেন চলাফেরা এবং সংলাপও দেওয়া হয়েছে? এই গুরু পরিশ্রমে তাঁর পক্ষে চলাফেরা বা সংলাপের প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হবনি। সোমা মুখোপাধ্যায়ের বসুধা দেখে মনে হয়েছে রবি ঘোষ আর কী করবেন, যার ন্যূনতম ক্ষমতা! তবে সবচেয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন মথুরানাথ-বেশী সন্তোষ দত্ত। তিনি মঞ্চে ঢুকলেন প্রতি দৃশ্যে এই কল্পনাতেই আমি হিম হয়ে যাচ্ছিলাম। হাস্যকর (হাসির নয়) নাটকে কান্নার বিলিফ।

এই নাটকে কনিষ্ক সেন আলোর কোন ফায়দা করবার চেষ্টা করেননি, তাঁর নিজের কাজে অর্থাৎ মঞ্চকে শুধুমাত্র আলোকিত রাখা, যাতে আমরা সব দেখতে পাই, নিশ্চয় সঙ্গে করে গেছেন। আবহ শুনে শ্রীবিভূতি-ভূষণ মুখোপাধ্যায়-এর গল্পের 'গোরার বাদ্যি' মনে পড়ে যায়। মঞ্চ, রূপসজ্জা? জানিনা হয়ে থাকে। —সুরঞ্জিৎ ঘোষ।

মঞ্চে মণি বেগম

গত ১৯ আগস্ট নবকল্লোল রিক্রিয়েশন ক্লাব রঙ্গনা মঞ্চে অভিনয় করলেন শ্রীশকতিপদ রাজগুরুর 'মণিবেগম' নাটকটি। [illegible] আসন অলংকৃত করেন

মণিবেগম নাটকে সিদ্ধার্থ বসু, বলাই দাস ও জগন্নাথ চক্রবর্তী

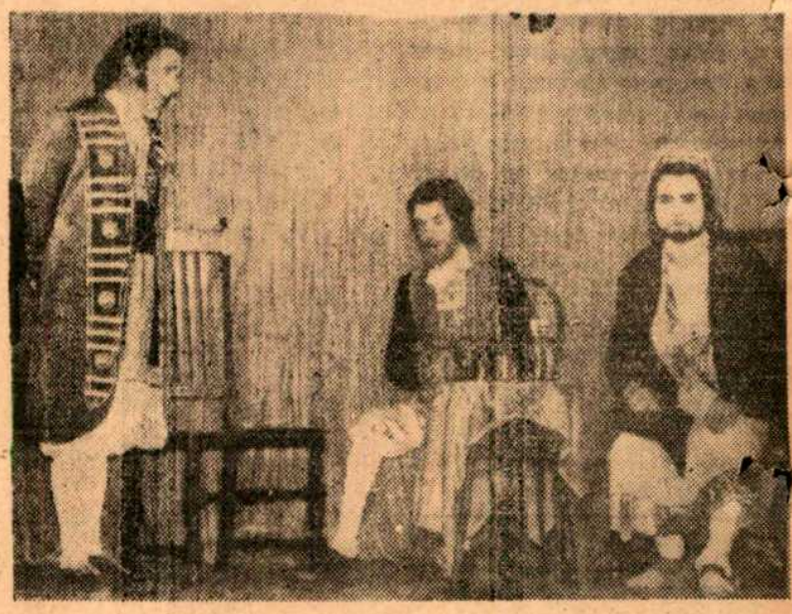

দায়িত্ব নিয়েছিলেন শ্রীনরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী। অংশগ্রহণ করেছিলেন দেবদাস সরকার (মীরজাফর), জগন্নাথ চক্রবর্তী (মীর-কাশিম), নিতাই গোস্বামী (মোহনপ্রসাদ) সিদ্ধার্থ বসু (ওয়াবেন হেস্টিংস) অমূল্য মণ্ডল (বেজা খাঁ), স্বরাজ গিরি (মীরণ) এবং সুব্রত রায়, মদন দাস প্রভৃতি। স্ত্রী চরিত্রে কাজল মুখার্জি (বুবুবাঈ), দীপা হালদার (মণিবেগম) ও চন্দ্রা গাঙ্গুলী (মায়া) অভিনয় করেছিলেন।

ড্রামাটিক গ্রুপের সাথী

ন্যাশানাল ইউথ ড্রামাটিক গ্রুপের প্রথম প্রয়াস 'সাথী' ২৮ জুলাই মঞ্চস্থ হল বিদ্যামন্দিরে।

সাঁওতাল পাড়ায় মাদলের আওয়াজ হঠাৎ থেমে গেল জমিদারী ষোলআনার ছেলেদের বেপরোয়া আওয়াজে। অত্যাচার হার আরও বাড়ল। পুনর্বিবেচনার জন্যে আবেদন মানে স্পর্ধা—ঔদ্ধত্য। শায়েস্তা করার রীতিনীতি সেই একই। রাজাবাবুর কাছে দরবার করতে গেলে তরুন সুদর্শন রাজাবাবু রতন মাঝিকে বশ করল মদ দিয়ে, বাঁধন মাঝিকে দিয়ে সাদা কাগজে টিপছাপ করিয়ে নিল, বাকিদের তাড়িয়ে দিল সেরেফ ঠেঙিয়ে। অবস্থা চরমে ওঠে সুন্দরীকে সাঁওতালপাড়া থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার পরে রতনের নেতৃত্বে সাঁওতালদের আচমকা ফেটে পড়াতে।

গল্পের মধ্যে জোরালো নাটকের বহু সুযোগ ছিল, কিন্তু নাট্যকার-পরিচালক সুভাষ ঘোষ দস্তিদার সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি। নিজের শকতি ও দুর্বলতা—দুটো বিষয়েই তিনি অচেতন। রতনের মতো কাজ-পালানো নেশুড়ের পক্ষে [illegible] পরে নাচে-গানে নাটকের গতি বাহত। শেখর দাস, গদাধর ভট্টাচার্য, ঝুমা বন্দ্যোপাধ্যায় দেবু দত্তরায় মনে রাখার মতো অভিনয় করেছেন। মঞ্চের উপর এক সঙ্গে [illegible] চরিত্রের অভিনয় ভালো ট্রাম-ওয়ার্কের পরিচায়ক আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারে নাটকের বিশ্বাস যোগ্যতা বেড়ে গেছে প্রচুর।

সুরঞ্জিৎ দাশগুপ্ত

মৃত্যু যেখানে মৃত্যু

মিনার্ভা মঞ্চে উদ্বোধন রজনী মঞ্চস্থ হলো 'ভগবানের মৃত্যু'। প্রযোজনা করলেন যাত্রালোক। গান্ধারীর [illegible] নাটকটিকে, নাম পাল্টে ভগবানের [illegible] দেওয়া হয়েছে।

অভিনয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে [illegible] রূপী মনোরঞ্জন চক্রবর্তী। প্রজাদের সর্দারের ভূমিকায়, উচ্চ [illegible] মানুষদের অন্যায় ব্যবহার, [illegible] আর্তনাদ, ক্ষোভ, বিদ্রোহ, [illegible] অভিব্যক্তি বলিষ্ঠ। হলধরএর [illegible] রাজকুমার মানানসই এবং অসীম [illegible] বিশ্বনাথ দত্ত শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় সার্থ

মহুয়া ব্যানার্জি লক্ষণার চরি [illegible] কঠোর কোমলে ভাল অভিনয় করেছে যদুবংশের বধূ হিসেবে মানিয়েছেও সু [illegible] —উপরন্তু বিধ্বস্ত মানসিকতা ফু [illegible] তুলতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। বিমলে ভট্টাচার্যের শান্ত মন্দ নয়। লীনা চক্র [illegible] শূদ্র রমণীর ভূমিকায় অনবদ্য অ [illegible] করেছেন—দুর্ভিক্ষের মর্মান্তিক দৃ [illegible] এই চরিত্রটিকে ঘিরেই যেন স [illegible] গান্ধারীর ভূমিকায় কল্যাণী চক্রবর্তী দাগ কেটেছেন। কৃষ্ণপত্নী জাম্ববতী চরিত্রে রীতা সেন প্রশংসনীয়।

বিভিন্ন ঘটনাকে প্রাণবন্ত উপভোগ্য এবং প্রয়োজন উপলব্ধি [illegible] দেবেন্দ্র নাথ কয়েকটি বি

চরিত্রের অবতারণা করেছেন। এইসব কাল্পনিক চরিত্রে অভিশাপরূপী রাজা ভট্টাচার্য ও কলিরাজের ভূমিকায় শক্তি চ্যাটার্জি যথাযোগ্য।

এ পালার সার্থকতার পিছনে রয়েছে সকলগত অভিনয়নৈপুণ্য। গানগুলির সুর ন্দ-ই। তবে দলের নির্দেশনায় মনোরঞ্জন কবর্তীকে আরও কিছুটা সময় দিতে বে। বিশেষ কিছু দৃশ্যে আলোর কাজ ভাল লাগে।

সামগ্রিকভাবে যাত্রালোকের প্রথম যোজনা ভগবানের মুক্তি সার্থক যোজনা, একথা বলতে বাধা নেই। এই ক্তিমূলক পৌরাণিক পালাটি আবাল-বৃদ্ধবনিতার ভাল লাগবে। সার্থক প্রযো-নায় যাত্রালোকের যাত্রা হলো শুরু, তা ীকার করতেই হয়।

ময় লোকনাট্য

দলের প্রযোজক নীলমণি দে অনেক র্থ ব্যয় করে বিদেশী গল্পের পটভূমিকায় লা করেছেন 'ডাইনী'। পালার উদ্বোধন য়ে গেছে—বিদেশী গল্প হলেও স্বদেশী ত্রার মান নষ্ট হয়নি—বরং যাত্রার নতুন ক উদ্ভাসিত হয়েছে। কয়েকটি বিশেষ শ্যে আলোর কারিগরী দর্শকদের ভাল গবে। এ দলে বিশিষ্ট শিল্পীদের মধ্যে ছেন—শিবদাস মুখার্জি, বর্ণালী নার্জি, অঞ্জনা ব্যানার্জি ও প্রভাত তিম। ২৭ আগস্ট থেকে প্রতি রবিবার জালে স্টার থিয়েটার মঞ্চে নিয়মিত ভিনয় দেখা যাবে। এ দলের ছেঁড়া পাতা লাটির রিহার্সাল দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

নু বন্দ্যোপাধ্যায়

র নাম মুক্ত মঞ্চ। অনুবাবু সেছেন বেশ কিছুদিন। এ কৌতুক তার নামটি এখনও দর্শকদের মধ্যে সর জোয়ার আনে। ও'র যাত্রায় আসার য় থেকেই গ্রামবাংলার মানুষ সমগ্র অনুষ্ঠানটিতে হাসি আনন্দে মন য়েছেন। তার চলচ্চিত্রায়িত হিট্ ছবি লিয়ে জীবন্ত মানুষ'—যাত্রায় অভিনীত প্রশংসা পেয়েছে। এবার উপস্থাপনা বেন হাসির নাটক 'জয় মা কালী ডিং'। সমগ্র পালার মধ্যমণি উনি ন, পাশে থাকবেন তাঁর সহযোগিকা ও য়িকা স্ত্রী নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

র নাম তিন পয়সা

জার্মান নাটকের ইংরাজী অনুবাদ পেনি অপেরা' অনুসরণে বের্টোল টের 'তিন পয়সার পালা' পরিবেশন ছেন কলিকাতা যাত্রা সমাজ। এ দলের পুরুষ সুদর্শন, রুচিবান অভিনেতা ড়ী ভট্টাচার্য। পালার উদ্বোধন হয়ে সাড়ম্বরে। বিভিন্ন মঞ্চে এখনও নীত হয়ে চলেছে। পালার নাম তিন হলেও এ পালা যে যাত্রামোদীদের মূল্যবান সে স্বীকৃতি এ দল আদায়

বনবাসর ছবিতে মহুয়া

প্রখ্যাত অভিনেত্রী লোলিতা চ্যাটার্জি। আসরের অন্তরালে, বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছেন স্বনামধন্য অভিনেতা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে আছেন—জ্যোৎস্না বিশ্বাস, গোপাল হালদার, শিবানী মৈত্র, দেবব্রত দে বিশ্বাস, ছবি চ্যাটার্জি ও শঙ্কর পাল। এ দলের অন্য একটি বলিষ্ঠ প্রযোজনা চলছে—ভক্তিমূলক পালা 'জয় মা তারা'।

লীলাবসান এর চ্যালেঞ্জ

রয়েল বীণাপাণি অপেরা পালা সম্রাট বজেন দের অমর সৃষ্টি লীলাবসান পালাটি এবার আসরস্থ করবেন। দলের

প্রযোজক নারায়ণ ভট্টাচার্য এ পালার বিশেষ কতকগুলি দৃশ্যে চমক সৃষ্টি করবেন বলে জানালেন। কৃষ্ণপুত্র সৌম্যকের দেহ দ্বিখণ্ডিত করার অভিনব কৌশল দর্শকদের আকর্ষণ বাড়াবে সন্দেহ নেই। স্বনামধন্য শিল্পী ও পালার পরিচালক বিজন মুখার্জিকে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় দেখা যাবে। অন্যান্য ভূমিকায় থাকবেন নীলোৎপল দে, ছবি রায়, বাসন্তি চ্যাটার্জি, গোপী দে। লালকুঠি ও গত বছরের সাড়া জাগানো 'বধূ বিনোদিনী' পালা দুটিও অভিনীত হবে।

লোক বাণী

এ্যান্টনী ফিরিঙ্গির রিহার্সাল প্রায় শেষ করে এনেছেন। বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করবেন তপন ভট্টাচার্য্য, বজ গোপাল দে, অনন্যা নাগ, ও স্বপ্না চক্রবর্তী। "কমল মাঝির ঘাট" ও "যমজ ছেলে' পালা দুটিও অভিনীত হবে।' দল পরিচালক গোপাল মুখার্জী।

নিউ রাজধানী যাত্রা ইউনিট

বিশ্বরূপা, রংমহল ও অন্যান্য বিশিষ্ট সব পেশাদার মঞ্চে অভিনয় করে প্রভূত প্রশংসাধন্য, সুদর্শণ সম্ভাবনাপূর্ণ, প্রখ্যাত অভিনেতা সুখেন্দু মুখার্জী যাত্রায় এসেছেন। এ দলের মুখ্য ভূমিকায় এঁকে দেখা যাবে। পালা—"বুলেট ও নৌ বিদ্রোহ" অন্যান্য বিশিষ্ট ভূমিকায় থাকবেন—কুমকুম চৌধুরী ও বিপ্লব মুখার্জী।

লোকনাথ অপেরা

প্রখ্যাত অভিনেতা পশুপতি ঘোষের নাম বাংলার যাত্রা মোদী মানুষের কাছে সুপরিচিত। ওপার বাংলায় জয় যাত্রা সমাপ্ত করে আবার ফিরে এসেছেন এপার বাংলায়। দল করেছেন, হাত দিয়েছেন তিনটি পালায় "কমলে কামিনী", তটিনীর বিচার ও বাথার পাঁচালী" এ ছাড়া তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ পালা "মরেও যারা মরে না" উপহার দেবেন বাংলার সুধীজনকে। বিশিষ্ট শিল্পীদের মধ্যে আছেন—চণ্ডী ব্যানার্জী, ক্ষিতিশ রায়, অমিল রায়, সীমা, মালবিকা, মিতালী ও ভারতী সাহা।

শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়

রূপ রম্য বীণা

উত্তর কলকাতার সাংস্কৃতিক প্রতি-ষ্ঠান রূপরম্য বীণার সম্পাদিকা অধ্যাপিকা সুচন্দ্রা বসুর তত্ত্বাবধানে সম্প্রতি সংস্থার বার্ষিক অধিবেশনের সান্ধ্যবাসরে একক রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন আকাশবাণী ও দূরদর্শনখ্যাত বেহালা শিল্পী সলিল মিত্র নির্বাচিত ১৪টি রবীন্দ্র সঙ্গীতের অন্ত-র্নিহিত ভাবরূপটি গায়কের দরদীকণ্ঠে মূর্ত হয়ে ওঠে। কণ্ঠসঙ্গীতেও এই যন্ত্রশিল্পীর সুচারু কুশলতা উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের প্রশংসা লাভ করে।

ও বরুণ মল্লিকের সহযোগিতা অনুষ্ঠানটিকে উপভোগ্য করে তোলে।

* * *

'বাবা তারকনাথ' ছবির মনপ্রিয় সঙ্গীত পরিচালনার স্বীকৃতিস্বরূপ শ্রীমতী নীতা সেন ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ এশিয়ান কালচারের (লন্ডন) আমন্ত্রণে লন্ডন যান এবং সেখানে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে ২৬ আগস্ট সম্বর্ধিত হন। লন্ডন ছাড়াও শ্রীমতী সেন ইন্দো-কানাডিয়ান কালচারাল সোসাইটি (কানাডা) থেকেও আমন্ত্রিত হয়েছেন। মস্কো ও আমেরিকা হয়ে সেপ্টেম্বরর শেষের দিকে তিনি দেশে ফিরবেন।

সৌরভের সঙ্গীত সন্ধ্যা

বিদেশে দিন দিন ভারতীয় সঙ্গীত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। পঞ্চাশ শতকের মাঝা-মাঝি রবিশংকর ও আলী আকবর প্রথম যখন বিদেশে যান তখন ভারতীয় সংগীতের ঐতিহ্য সম্বন্ধে ইউরোপীয় বা আমেরিকান-দের কোন ধারণা ছিল না। মূলতঃ ওদের প্রচেষ্টায় এবং মেনুইন ও বিটিলসদের পৃষ্ঠপোষকতায় ষাট দশকে ভারতীয় সংগীত বিদেশে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সেই সময়ে অনেকে এটাকে নিছক মাতামাতি বা হুজুগ বলে উড়িয়ে দিলেও, আজ আর তা করতে পারেন না। কারণ সময়ের পরীক্ষায় বোধহয় বিদেশী শ্রোতারা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। শ্রোতারা এখন শুধু ভারতীয় সংগীত অজানা বলেই আকৃষ্ট নয় তারা এখন ভারতীয় সংগীতকে বুঝতে শিখেছে, তাল দিতে শিখেছে ও নিয়মিত শিক্ষা গ্রহণ করছে।

বিদেশ থেকে সদ্যপ্রত্যাগত চারজন শিল্পী জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, ললিতা ঘোষ, কল্যাণী রায় ও শ্যামল বসুর সম্বর্ধনার আয়োজন করে সৌরভ সংস্থা কলামন্দির প্রেক্ষাগৃহে। সম্বর্ধনার আগে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল এবং পরে শিল্পীরা নিজেদের সংগীত পরিবেশন করেন।

সঙ্গীতানুষ্ঠান শুরু হয় ললিতা ঘোষের ভজন দিয়ে। ইনি পর পর চারটি ভজন গান, যার মধ্যে একটি জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠে। ললিতা ঘোষের কণ্ঠ সুরেলা। জ্ঞানবাবু সুরসংযোজনা এই সুরেলা কণ্ঠে মিশে অনুষ্ঠানটিকে আরও মনোগ্রাহী করেছিল। দ্বৈতকণ্ঠের গানটি জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের সহযোগিতায় আরও মধুর হয়েছিল বিভিন্ন সুরের অলংকারে ভূষিত হয়ে।

কল্যাণী রায় পরে বাজান সেতারে রাগ শ্যামকল্যাণ। প্রথমে আউচার ও পরে গৎ মসিদখানি ও রেজাখানি। আউচারের সময় মিড়ের অংশ কম থাকলেও প্রমতী রায়ের সুপরিকল্পিত সঙ্গীতচিন্তা শ্রোতাদের এই অভাব বুঝতে দেয়নি।

সেতারের জোয়ারী খুব খোলা থাকায় দরুণ যে রকম পরিষ্কার তীক্ষ্ণ আওয়াজ বাজনার জৌলুস বাড়াচ্ছিল সে রকম আবার দু-তিন পর্দা মীড় টানলেই রেশ আবছা হয়ে হারিয়ে যাচ্ছিল। গৎ-এর অংশ সুন্দর হয়েছিল এবং তানে ছন্দের বৈচিত্র্য ও পরিচ্ছন্নতা শ্রোতাদের বিশেষভাবে আনন্দ দেয়। কল্যাণী রায়ের সবথেকে বড় গুণ হলো ক্ষমতার বাইরে উনি যান না। যেটুকু বাজান সেটুকু নিখুঁত ও পরিষ্কার। সুরের বিচ্যুতি বা হাত ফসকানো বা বেতালে পড়া ওঁর বাজনায় দেখা যায় না। সেদিনও সেই ধারাটি।

হারমনিয়ামে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ দুটি ছোট ছোট আইটেম পরিবেশন করেন। একটি টপ্পা অঙ্গে ও আর একটি ঠুংরি অঙ্গে। জ্ঞানবাবুর কল্পনাশক্তি ললিতধর্ম বোধ ও হারমনিয়ামের ওপর পূর্ণ দখল শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। খাল-এর সঙ্গে বাজাতে অভ্যস্ত হলেও জ্ঞানবাবুর বাজনায় তন্ত্রকারি অংগ প্রচুর পরিমাণে ছিল। বিশেষ করে শেষের ভৈরবীতে।

শ্যামল বসুর চমৎকার তবলাসঙ্গত যে রকম কল্যাণী রায়ের গৎ-এর সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, সেরকম জ্ঞানবাবুর বাজনাকেও আরও জমাটি করে তোলে।

সৌরভ সংস্থাকে অনুরোধ করব, ভবিষ্যতে আমন্ত্রণপত্রে শুধু রিজার্ভ না লিখে আসলে আমাদের সিটগুলো নাম্বার দিয়ে রিজার্ভ করতে। কারণ গান বাজনা শোনার আগে যদি বসার জায়গা না পাওয়া যায়, অনেক সিট খালি থাকা সত্ত্বেও এবং কো রকমে জায়গা পাওয়ার পরেও যদি বার বা সিট বদল করতে হয় তাহলে গান বাজনা শোনার মেজাজ একদম নষ্ট হয়ে যায়। আমারও সেইদিন তাই হয়েছিল। অবশেষে রিজার্ভ লেখা মেরা জায়গার বাইরে আশ্র গ্রহণ করে শান্তি পেলাম। এই সুযোগ্য সুষ্ঠা স্বর্গীয় অদ্রিজানাথ মুখো[illegible]য়ের সঙ্গে আমার একটা সুন্দর তর্ক-ভালবাসা সম্পর্ক ছিল। উনি জীবিত থাকলে এই বিভ্রাটে পড়তে হত না।

সুব্রত রায় চৌধুরী

মনোজ্ঞ সেতার

সম্প্রতি থিয়েটার রোডে [illegible]লনে এক মাসিক অধিবেশনে সেতার পরিবেশ করলেন সেতারী মণিলাল নাগ। শিল্পী সান্ধ্য অনুষ্ঠান শুরু করলেন রাগ 'ললিত গৌরী' দিয়ে। গৌরী এবং ললিতার মিশ্র এই রাগটিকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছিলে এবং দুই মাধ্যমের মিশ্রণ এত আবেগপ হয়েছিল যে যারা শুনেছিলেন তারাই কে উপলব্ধি করেছিলেন। আজকাল অচর রবীন্দ্রসদন বা কলামন্দিরে এই ধরণ অনুষ্ঠান শোনা যায় না। কারণ দুই ততোধিক শিল্পী থাকলে সময়ের দিক উভয়পক্ষকে চিন্তা করতে হয়। সেদিক থে শিল্পীর স্বাধীনতা অনেক ছিল। আল জোড় ও ঝালার কাজগুলি শুদ্ধ ধাঁচের অনুযায়ী এত সুন্দর হয়েছিল তাতাই উপভোগ্য বা উপলব্ধি ক জিনিস। তিনি তাঁর পিতার শিক্ষাধার বজায় রেখে নিজস্ব এক ঢংয়ে অপূর্ব বাগটিকে ফুটিয়ে তোলেন। গতের এবং আলাপের জোড়ের ঝালার এবং নানান ছন্দের দোলাতে ত কাজের মত সুন্দরভাবে শ্রোতাদে মাতিয়ে তুলেছিলেন। তৈরি বলতে সাধনাই বোঝায় না। বিভিন্ন সরগম পাল্টাগুলিকে সাজিয়ে সাজিয়ে ছন্দ আর সমে ফেলা কখনও বা তবলার সাথসঙ্গত কখনও বা পৃথকভাবে দেওয়া, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার সাজিয়ে তোলাই শিল্পীর প্রধান বৈ একথা তিনি শ্রোতাদের প্রমাণ করে দি শিল্পীকে তবলায় সহযোগিতা করেছি ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁর সুযো সাবীর খাঁ। বয়সে অল্প হলেও কৃতি পরিচয় রেখেছেন। তাঁর ঠেকা, ঠু বোল, সাথসঙ্গত, সবকিছুই যেন পরিম মত ছিল—যেটা সচরাচর আজকাল ত বাদকদের মধ্যে দেখা যায় না। আ তবলাবাদকের কাছে তবলাই যেন প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে—তাঁরা এটা ভুলে যা সঙ্গত করছেন। যাই হোক সাবীর খাঁর যোগিতায় সমগ্র অনুষ্ঠানটি শ্রো কাছে মনোজ্ঞ হয়ে উঠেছিল। শেষ অনুরোধে শিল্পী শেষে রূপকতালে ঠুমরী বাজিয়ে শোনান।

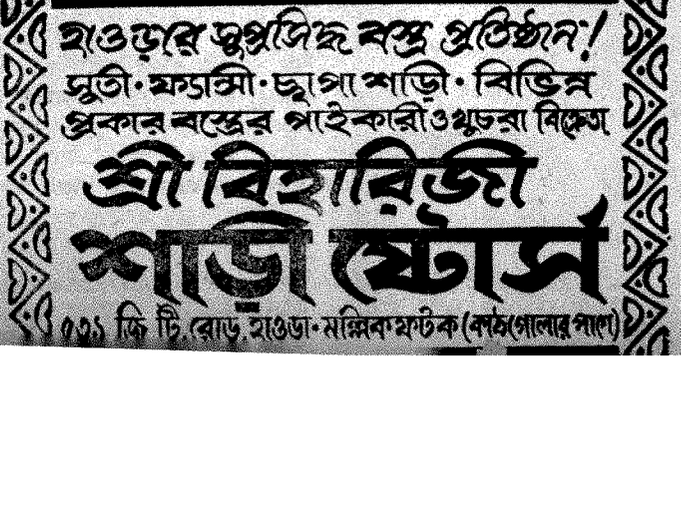

রাজবংশী আর মাহাতোদের গান

নিছক অবসর বিনোদনের জন্য নয়— অবহেলিত সংস্কৃতিকে জনসমক্ষে উপস্থাপিত করার এক মহৎ পরিকল্পনা নিয়ে ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম সম্প্রতি আশুতোষ বার্থ সেন্টিনারি অডিটোরিয়ামে নিবেদন করলেন রাজবংশী ও মাহাতো সম্প্রদায়ের গান।

প্রথমে সুবর্ণরেখা গ্রুপ পরিবেশন করলেন মাহাতোদের গোষ্ঠী সঙ্গীত। রীতি অনুযায়ী আখোড়া বন্দনার পরে মূল অনুষ্ঠান শুরু হয় ময়ূরভঞ্জের শিল্পী ও কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীতের অধ্যাপিকা বীণাপাণি মাহাতোর গান দিয়ে। পরপর সাতটি গান গাইলেন তিনি, তার কোনোটির ভাষা বজ্র, কোনোটির ভাষা ওড়িয়া ইত্যাদি এবং মূলত প্রত্যেকটি গানেই ঝুমুরের উপস্থিতি লক্ষণীয়। শ্রীমতী মাহাতোর কণ্ঠে 'কুঞ্জে আসিবেন হরি/কুঞ্জ সাজাও সহচরী' গানটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পুরুলিয়ার যেসব মাহাতো সম্প্রদায় আসামে চলে গিয়েছেন, তাঁদের গান শোনালেন পশুপতিপ্রসাদ মাহাতো। তাঁর কণ্ঠ তত বলিষ্ঠ নয়, কিন্তু গানের সুরে আছে মাদকতা, শিল্পীর গায়নরীতিও অপূর্ব। তাই অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি শ্রোতার মন জয় করে ফেলেন। 'যখন ফুল ফুটি ছিল/তখন ভ্রমর আইল গেল' এবং অন্যান্য গানগুলির পরিবেশন অতি উত্তম। সুবর্ণরেখা গ্রুপের আর দুজন শিল্পী বীরেন বাদাকর ও রবীন্দ্রনাথ মাহাতো অত্যন্ত দুর্বল।

রাজবংশীদের গান শোনালেন তিস্তা গ্রুপের শিল্পী প্রণব রায়। উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত গায়ক সতোন রায়ের পুত্র। দোতারা সহযোগে মোট চারটি গানের প্রথমটির বিষয় ছিল দোতারা। এবং তারপর বৃষ্টির গান, বিয়ের গান ও অবশেষে দেহতত্ত্ব। মন সুয়া ছাড়িয়া পালালো রে/দারুণ আশা মোর নৈরাশ হৈল।' গানটির যন্ত্রণা, হাহাকার শিল্পীর গায়কীতে স্পষ্ট এবং বলিষ্ঠ ও উদাত্ত কণ্ঠের অধিকারী এই শিল্পীর সম্পূর্ণ একটি একক সঙ্গীতানুষ্ঠানের জন্য এক তীব্র বাসনা

চামেলী মেমসাহেব ছবিতে রাখী

মুহূর্তে জেগে ওঠে। এই ধরনের অনুষ্ঠান আবার শোনানোর জন্য ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ রইল, বিশেষত বেতার মারফৎ যখন এইসব গান শোনার কোনো সম্ভাবনা নেই। কারণ অনুষ্ঠানের পূর্বে এথনোমিউজিকোলজিস্ট শ্রীকালী দাশগুপ্তের একটি ক্ষুদ্র ভাষণে জানা গেল, ভাষা কেউ বুঝবে না বলে বেতার কর্তৃপক্ষ এই গান শোনাতে অক্ষম। কিন্তু সঙ্গীত তো শুনেছি একটি আন্তর্জাতিক ভাষা!

নির্মলকুমার দাস

উপাসনার গান

রামমোহন রায় শুধুমাত্র ভারতীয় সংস্কৃতিতেই নবযুগ আনেননি। ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রথম স্রষ্টাও তিনিই। তারপর থেকে অনেক মনীষীর অবদানে সমৃদ্ধ ব্রহ্মসঙ্গীতের ধারা বাংলা ভক্তিগীতির ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। সম্প্রতি 'ইন্দিরা' গোষ্ঠীর সহযোগিতায় গ্রামোফোন কোম্পানী প্রকাশিত "উপাসনার গান' শীর্ষক এল পি এক মূল্যবান সংগ্রহ। সঙ্গীতমূল্য এবং সাংস্কৃতিক মূল্য উভয় বিচারেই। এ দিকে পনেরখানি প্রাক্‌রবীন্দ্র যুগের ব্রহ্মসংগীত গেয়েছেন জনপ্রিয় শিল্পীরা। শান্তিনিকেতনের সঙ্গীতগুরু ভি ভি ওয়াজলওয়ার এবং ইন্দিরা সঙ্গীতগোষ্ঠী। সঙ্গীত পরিচালনায় আছেন ভাস্কর মিত্র।

সঙ্গীতগুরু সুরু হয়েছে রামমোহন রায়ের গান নিয়ে। সাহানা রাগ ও ধীমার তালের গাম্ভীর্য অক্ষুণ্ন রেখেছেন ইন্দিরা' শিল্পীগোষ্ঠী— 'ভয় করিলে যা'রে' গানে।

ভি ভি ওয়াজেলওয়ারের কণ্ঠে দেশরাগে পরিপূর্ণমানন্দম যেন পূজার মন্ত্র হয়ে উঠেছে।

ঋতু গুহ মিশ্র বিভাস ভিত্তিক 'প্রাণসখা হে' তাঁর পূর্ণ কণ্ঠের স্পর্শে মূর্ত করে তুলেছেন। গানটি পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়ের রচনা।

দেবব্রত বিশ্বাস গেয়েছেন 'অনন্ত অপার তোমায় কে জানে'—তাঁর অনাড়ম্বর ও ভাবগম্ভীর উদাত্ত পরিবেশনা গানটিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছে। গানটির রচয়িতা মনোমোহন চক্রবর্তী।

মিশ্র বিভাসেরই আর এক রূপ পাওয়া গেল কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে আড়খেমটা তালে। কীর্তনের সুর,— নূপুরগুঞ্জিত কণ্ঠ সব মিলিয়ে এ গান যেন আরাধনার সুরে আত্মনিবেদন হয়ে উঠেছে। গানটি হল, 'যদি ডাকার মত পারিতাম ডাকতে।' লেখা হরিনাথ মজুমদারের।

প্রসূন দাসগুপ্ত গেয়েছেন নিমাইচরণ মিত্র রচিত একটি গান 'কেন ভোল, মনে কর তাঁরে।

ত্রৈলোক্য সান্যালের 'হে হরিসুন্দর করুণার সাগর' —নীলিমা সেন গেয়েছেন তাঁর সেই আন্তরিক বিনম্র আবেগে। ঝাঁপতালের লয় তাঁর পরিবেশনায় খুব মানিয়েছে।

তারপরই ইন্দিরা শিল্পীগোষ্ঠির সমবেত কণ্ঠে 'ভজরে ভজ ভব খণ্ডনে'—ভাবপর্যায়কে বাঞ্ছিত পরিণতিতে নিয়ে গেছে। নারায়ণী রাগের মেজাজটিকেও সব এঁরা যথাযোগ্য আলোকপাত করেছেন।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সহজ ভঙ্গিতে গেয়েছেন বলেই এত জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁর কণ্ঠে শুভ আশীর্বাদ দানে প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের লেখা গানটি।

সুপর্ণা চৌধুরী গেয়েছেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গান 'কেন ভোল, ভোল চিরসুহৃদে। মধুর কণ্ঠের আবিষ্টতায়

[illegible] রাগের ছোঁয়া প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে।'

অর্ঘ্য সেনের আবেগ-বিভোর মুক্ত-কণ্ঠে 'অসীম এ পুরে' গানটিতে বেহাগের রেশটি প্রাণে পৌঁছে দেয়।

সুচিত্রা মিত্রর কণ্ঠে 'এ গো দরদি' সবার মনে করিয়ে দিল যে এ ধরনের গানে তিনি সিদ্ধ সাধিকা।

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য সমস্ত পরিকল্পনাকে যেন সার্থক পরিণতিতে পৌঁছে দিয়েছেন। পুরবীর গৈরিক ছটার উদ্ভাসে 'দিবা অবসান হল' সমগোত্রীয় হয়ে উঠেছে তাঁর সেই কালজয়ী 'গয়াগঙ্গা প্রভাসাদি'র সংগে। গানটি অমৃতলাল ভট্টাচার্যের লেখা। শেষ হয়েছে ইন্দিরা শিল্পী গোষ্ঠির 'বিপদ ভয় বারণ' গানটি দিয়ে।

মুসাফির মোছরে আঁখি-জল

গ্রামোফোন কোম্পানীর নজরুল-গীতির রেকর্ডগুচ্ছের প্রথম ও প্রধান আকর্ষণ হল দি জিনিয়াস অফ কাজী নজরুল শীর্ষক একটি এল পি ডিস্ক। এ ডিস্কের বারখানি গান গেয়েছেন অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়, অনুপ ঘোষাল, ফিরোজা বেগম ও মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ফিরোজা বেগমের কণ্ঠের গানগুলি যেন বিস্মৃতপ্রায় একটি যুগের গায়কীর পরিভাস বয়ে আনে। প্রথম যুগে নজরুলের গানের প্রধান মহিলা শিল্পীদ্বয়ের পরিবেশনায় লিরিকের মাধুর্যের চেয়ে মর্দানা ঢং-এর কালোয়াতী স্টাইলটাই বড় হয়ে উঠত। কারণ তাঁদের গাইতে হত অনেকটা বৈঠকী গানের আসরের মর্জি ও মেজাজের দিকে তাকিয়ে। কিন্তু পরের যুগে গানের গতিটা যখন মোড় নিল গভীর অনুভবের দিকে, তখনই শৈল দেবী, সুপ্রভা সরকারদের বিস্তারে এ গানের সূক্ষ্ম দিকটা ক্ষত হয়ে উঠল। কমল দাসগুপ্ত হিজ মাস্টার্স ভয়েসে কবি সুরকারের কর্মক্ষেত্রের অন্তরঙ্গ সহচররূপে থাকতেন তাঁর পাশে পাশে। লক্ষ্য করতেন তাঁর সুরসৃষ্টির মেজাজ যা থেকে নজরুলের গায়কীর একটি বিশিষ্ট শৈলী আপনা থেকেই গড়ে উঠেছিল। কারুণ্য, মধুরতা ও ছন্দ সৌকর্যভরা সেই গায়নশৈলীর রূপটি সারাজীবন ধরে সযত্নে লালন করেছেন কমল দাশগুপ্ত। ফিরোজার সৌভাগ্য হয়েছিল জীবনের শেষ দিনগুলিতে তাঁর কাছ থেকে এ বস্তু আহরণ করবার। [illegible]দনাই ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর গাওয়া গানগুলি মোর আহত পাখীর সম, জানি জানি প্রিয়, মুসাফির, মোছরে আঁখিজল প্রভৃতি গানে। নূতন ধরনের একটি গানও শোনা গেল—হাসিমুখে বাসি ফুল।

প্রায়শঃ এক গায়কী মেলে অঞ্জলি [illegible]ধ্যায়ের গানেও। এঁর নজরুল-গীতির শিক্ষা প্রধানতঃ ইন্দুবালা ও আঙ্গুরবালার কাছে। এর সঙ্গে তাঁর উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের পট-ভূমিকা তো রয়েইছে। তাছাড়া তিনি উত্তর-যুগের শিল্পী। নজরুল-গীতির বিভিন্ন পর্যায়ের গায়নভঙ্গি গ্রহণ করে নিজের আবেগ মিলিয়ে তিনি গড়ে তুলেছেন নিজস্ব এক প্রাণবন্ত প্রকাশশৈলী। —দুটি যুগের ছবি

ভেসে ওঠে তাঁর চারখানি গানে। দক্ষিণ সমীরণ সাথে ও কে নিবি ফুলে আছে অনেকটাই প্রথম অধ্যায়ের প্রভাব। কিন্তু তাঁর শিল্পীসত্তাকে পাওয়া যায় অন্য দুটি গানে : ফুলেরি জলসায় নীরব কেন কবি ও থই থই জলে ডুবে গেছে পথ। প্রথম দুটি গানে তিনি সচেতন গায়িকা। শেষের দুটি গানে আত্মহারা শিল্পী। থই থই-এর লয়ের চলনটি দারুণ।

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের রাগদক্ষতা লয়, সুর সবই ত্রুটিহীন। বাগিচায় বুলবুলি তুই শুনতে ভাল লাগে গজলের ঢঙের সুর-ফেরতার মজায়। রেওয়াজী কণ্ঠে সুরের ধারা নির্গাধ, নির্গলিত। কিন্তু কথার উচ্চারণ যদি আর একটু গোটা গোটা হত, আরও প্রাণখুলে তারিফ করা যেত তাঁর অরুণ-কান্তি কে গো যোগী, দাঁড়ালে দুয়ারে মোর গানগুলির।

অনুপ ঘোষালের গাওয়া চারখানি গান হল—বসিয়া বিজনে, আমি চিরতরে দূরে চলে যাব, চাঁদ হেরিছে চাঁদমুখ তার।

আর একখানি এল পি ডিস্কে আছে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় পরিবেশিত আটখানি ভক্তিমূলক গান। গাওয়ার আন্তরিকতায় কোনো খাদ নেই। তাছাড়া ভক্তির গানে নজরুল-মানসের গতিপ্রকৃতির একটি ছবিও পাওয়া যায়। সেই প্রেক্ষণেও এ ডিস্কের একটি মূল্য আছে। গানগুলি যথাক্রমে হল—মাগো চিন্ময়ী রূপ ধরে আয় মা, যাসনে মা ফিরে যাসনে জননী, তোর নামেরই কবচ দোলে, আমার অন্য কোনো গুণ নেই মা এবং বাঁশী বাজাবে কবে, আমি নতুন করে গড়বো ঠাকুর, হে মাধব, হে মাধব, হে মাধব, হে গোবিন্দ রাখ চরণে।

আর একটি উল্লেখযোগ্য ই পি ডিস্কে আছে আরতি মুখোপাধ্যায়ের চারখানি গান। সরলতা মধুর কণ্ঠের সুষমায় চিত্তস্পর্শী সকালবেলার সুরের ছোঁওয়া-লাগা মোর না মিটিতে সাধ। আর প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গায়কীর ইমেজ আমাদের শ্রুতিতে আজও বাজলেও আরতির গাওয়া 'পথহারা পাখী' শ্রুতিশোভন সুরের সঙ্গে ভাবসংগতির কারণে। 'বসন্তমুখর আজি' ও 'কার বাঁশরী বাজে' তাঁর গলায় মানিয়েছে। তাঁর গলার সূক্ষ্ম কাজগুলি সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়েছেন পরিচালক সমরেশ রায়।

সুকুমার মিত্রর পরিচালনায় নীতিশ দত্তরায় ও মীরা দত্তরায়ের চারখানি গান সুপরিবেশিত। গানগুলি হল যথাক্রমে : 'হংসমিথুন ওগো যাও', 'মহাকালের কোলে এসে' এবং 'তোমার বিনা-তারের গীতি' ও 'পালিয়ে তুমি বেড়াবে কি।'

কাজী সব্যসাচীর কণ্ঠের আবৃত্তির একটি ই পি ডিস্কও আছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'বার্ষিক সওগাত', তরুণ তাপস, নকীব।

একটি সুপারসেভেন ডিস্কে অনুপ ঘোষালের কণ্ঠে পরিবেশিত হয়েছে ছ'খানি গান। তাঁর কণ্ঠে কারুকৃতির অভাব অবশ্যই আছে। তবে পরিষ্কার ঝোয়ারীর গলা। উচ্চারণও ভাল। সব মিলিয়ে সুশ্রাব্য—গাঙে জোয়ার এলো ফিরে, তুমি প্রভাতের সকরুণ ভৈরবী কিংবা মেঘবিহীন খর বৈশাখে।

সন্ধ্যা সেন

তপনকুমার দে সম্পাদিত এবং
পরিকল্পিত
সাহিত্য / সিনেমা / যাত্রা / সংস্কৃতির
প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা

তুলি ৭৩।১ আলিপুর রোড
কলিকাতা-২৭, টেলিফোন।

সব প্রশ্নেরতো সমাধান সঙ্গে সঙ্গে করা যায় না রীণা। ওজন করে বোঝাবুঝির পাল্লায় হয়ত চুলচেরা বিচার করা যায় না প্রতিটি বিষয়ের। অংক না মিললে তাতে হতাশ হবার কোন্ কারণ হয়ত থাকে না, কিন্তু থাকে তাতে মিলিয়ে নেবার আকুতি। জীবনযুদ্ধে হেরে যাওয়াটা যেমন বাস্তব;.. লড়ে জীতে যাওয়াটা তেমনি স্বাভাবিক। সত্যিই ভাববার আছে, বোঝবার আছে রীণা। যে নৌকোয় পাল তুলতে চলেছ, হতে চলেছ কান্ডারী। জীবনদরিয়ায় ডুবে মরার ইচ্ছে যদি এখনই এত প্রবল থাকে, তবে সারা জীবন ডুবতে হবে যাকে নিয়ে স্বেচ্ছায়, হাসতে হাসতে, তাকেও তো ভাবতে হবে অনেক, আরো অনেক..... উপরের কথাগুলি গল্পের নায়ক সুমনের। এই সুন্দর বড় গল্পটি প্রকাশিত হচ্ছে পূজা সংখ্যার তুলিতে। লিখেছেন বাংলা সাহিত্যের তরুণ প্রতিভাবান সুসাহিত্যিক

সবপনমুখোপাধ্যায়

গল্পের নাম দিয়েছেন

বুঝাবুঝি

পূজা সংখ্যায় এই গল্পটি পাঠক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করবেই।

বিঃ দ্রঃ/ বাংলায় পারদর্শিনী সুন্দরী মহিলা আবশ্যক। ফটো পাঠান, অথবা প্রধান সম্পাদকের সংগে সকাল ৭টা হইতে ৯টার মধ্যে দেখা করুন।

এটা স্টান্ট নয় !

সত্যিই বিনোদ বিদায় নিচ্ছেন! ভাবতে অবাক লাগে। চিত্রজগতের এমন উজ্জ্বল তারকার স্বেচ্ছা নির্বাসন কেন? বোম্বাই চিত্রজগতের সুপার স্টার বিনোদ খান্না জনপ্রিয়তার আজ চূড়ান্ত শীর্ষে। অভিনেতা তার শিল্পক্ষেত্র ছেড়ে যায় তখনই যখন হ্রাস পায় তার জনপ্রিয়তা। ধর্মের কারণে অভিনেতা মঞ্চ ছাড়ছেন, এমন তুলনীয় ঘটনা মিলবে না। পৃথিবীর কোথাও ঘটে নি। যে সব ছবিতে ওর অভিনয় করার কথা, সেগুলো শেষ করবেন। এক দো তিন চার—দেব-আনন্দ, ধর্মেন্দ্র, ঋষিকাপুর, হেমা-মালিনী, রাখী, পরভীন বাবি এবং টিনা মুমিনের সঙ্গে; **রাজপুত**—ধর্মেন্দ্র, রাজেশ খান্না এবং হেমামালিনী; **দি বার্নিং ট্রেন**—ধর্মেন্দ্র, হেমা, পরভীন বাবি এবং নবীন নিশ্চল; **কুদরাত**—রাজেশ খান্না, হেমামালিনী, সঞ্জীব কুমার এবং আজাদের সঙ্গে; **বোম্বে ৩০৩ মাইলস**—শত্রুঘ্ন সিনহা এবং জিন্নত আমানের সঙ্গে; **মুকদ্দার কা সিকান্দার**—অমিতাভ বচ্চন, রাখী ও রেখার সঙ্গে; **নমক হালাল**—অমিতাভ ও পরভীন বাবির সঙ্গে ইনসান—জীতেন্দ্র শ্রীদেবীর সঙ্গে এবং পুরবাণী **কুর্বানী** ফিরোজ খান; জীনৎ আমানের সঙ্গে। এছাড়াও আছে কয়েকটি ছবি। এগুলো শেষ হবে ১৯৮০ সালের মধ্যে। প্রায় পঁচিশটি ছবি এখনও সেটে যায় নি, অথচ সেসব ছবিতে বিনোদ চুক্তিবদ্ধ। প্রযোজকদের জানিয়েছে, তাকে যেন মুক্তি দেওয়া হয়। টাকাও ফেরৎ দিয়েছেন।

শোনা যাচ্ছে বিনোদ কিছুকাল আগেই মারাত্মক ব্রঙ্কাইটিসে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাছাড়া ওর হার্টের অবস্থাও ভাল নয়। কিন্তু বিনোদের অন্তরঙ্গ মহলের সংবাদ একমাত্র স্বাস্থ্যের কারণেই ও ছবি ছাড়ছে না। বিগত বছর কয়েক ধরে আচার্য রজনীশের ধর্মীয় চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়েছে বিনোদ। ছবির জগৎ থেকে ধর্মের চিন্তায় ও এখন ব্যস্ত বেশি। বিনোদ বলেছে : 'ছবির জগত ছাড়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি অনেক হালকা বোধ করছি। আর নিজের সম্পর্কেও অনেক নিশ্চিন্ত। ইন্ডাস্ট্রিতে আমি কখনও বিরক্ত বোধ করিনি। এটা হো কিয়েটিভ ইন্ডাস্ট্রি। আমার সাফল্যের পক্ষে এই

মাধ্যমটিকে খুবই সংক্ষিপ্ত মনে হয়েছে। জীবনের আরও বৃহৎ ক্ষেত্রের সন্ধান আমি পেয়েছি।' মনে হতে পারে বিনোদ হয়ত যা খুঁজছেন তা পান নি, কিন্তু তিনি বলেছেন : 'আমি চলব। আমার পদক্ষেপ থামবে না।' তাছাড়া 'আমি কোন কিছু একেবারেই ছেড়ে যাচ্ছি না, কিন্তু ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে আমি আবার ফিরেও আসছি না।' যা দায়িত্ব আমার ওপর বর্তেছে তা আমি পালন করবই। সুখী সংসারী বিনোদ। ছয় বছরের রাহুল আর তিন বছরের অক্ষয়—দুই ছেলে। 'একজন অভিনেতা হিসাবে আমি গর্বিত। খ্যাতি, সম্পদ, সম্মান সবই পেয়েছি প্রথম থেকে। এ সবের জন্য আমি ইন্ডাস্ট্রির কাছে ঋণী। আমি জানি, আমার উপযুক্ত চরিত্র এখনও লেখা হবে ভাল ভাল চরিত্রে আমি অভিনয় করছি। কিন্তু তবু আমি ছাড়বই।'

বিনোদের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ঘটছে। অনেকের অনুমান, হয়ত অল্প কিছু ছবিতে অভিনয় চালিয়ে যাবে। কিন্তু বিনোদের অভিমত তা সম্পূর্ণ অবাস্তব। অথবা কিছুদিন আগে বিনোদ বলেছিলেন : 'আমি অন্য ধরনের ছবি করতে চাই। কম বাজেটে নতুন ভাবনায় ভরা ছবি।' মনে হয় বিনোদ এখন প্রযোজক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন।

বিনোদ জনপ্রিয় অভিনেতা। প্রযোজক ও পরিচালকরা তাকে পছন্দ করেন। ব্যবহার ভাল। সময়মত ফ্লোরে হাজির। ভয়ংকর পরিশ্রমী। তাছাড়া ফিল্ম সম্পর্কে ওর মমত্ব যথেষ্ট। বিনোদের ফিল্ম ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে অনেকে আঘাত পেয়েছেন, কিন্তু মুষড়ে পড়েছে, আরো বেশি মানুষ। কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রীর সঙ্গে দুর্ব্যবহারের একটি নমুনাও কেউ দেখাতে পারবেন না।

—এখনও অন্ধ অনুরাগীদের বিশ্বাস, বিনোদের এটা একটা স্টান্ট। আমরা বলতে পারি, বিনোদের সম্পর্কে আমরা কিন্তু আশাবাদী।

নকলনবীশ দিলীপকুমার

রূপেশকুমার ফ্যান, ভক্ত, চামচে সব রকমই। দিলীপকুমার ওর ধ্যান জ্ঞান। এই বিখ্যাত অভিনেতার বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য ও শুনলেই ক্ষেপে যায়। বৈরাগ রিলিজ হয়েছে। পাড়ার ছেলেদের কেমন লেগেছে—তা জানবার ইচ্ছা হল রূপেশের। ওদের সঙ্গে কথা বলল একদিন। একজন উত্তর দিল—'দিলীপ-কুমার কেন মনোজকুমারকে নকল করছেন, বলতে পারেন? রূপেশ নিরুত্তর।

পরভীন বাবির হাতে সামান্য কিছু হিন্দী ছবির কাজ বাকি। এর মধ্যে ওয়ার্নার ব্রাদার্সের হলিউডের ছবিতেও একটা কাজে ব্যস্ত থাকবে। হাতের বাকি ছবির কাজ শেষ হলে, আর কোন হিন্দী ছবিতে পরভীনকে দেখা যাবে না।

বরাত কাকে বলে !

তারকোজয় এক পুরোন বাংলোর মালিকের ভাগ্য ফিরে গেছে। বলা যায়, মালিকের পক্ষে এক সোনার খনির কাজ করেছে। বাংলোর অবস্থা এমন সঙ্গীন যে, দেখলেই মনে হবে এখুনি দেওয়াল ধসে পড়বে। বেশির ভাগ ছবিতে গরীব, মধ্যবিত্ত, চরিত্র দু-একটা থাকবেই। তখন এই বাংলো বাড়িকে রেডিমেড সেট হিসাবে ভাড়া দেয়া হয়। শেষ পর্যন্ত ঐ বাংলো বাড়ির চাহিদা এমন বেড়ে গেছে, তিন চার শিফটে চলছে কয়েকটি ছবির কাজ। আর বাংলোর মালিক ভাড়া খাটিয়ে কয়েক লাখ টাকার মালিক এখন। ও আরও এই ধরনের বাংলো তৈরি করে লাভের অংক বাড়াবার চিন্তা করছে।

০ নায়ক হিসাবে দেবানন্দের শততম ছবি দেশ পরদেশ। আর একবার অশোককুমারের রেকর্ড আছে একশর বেশি নায়ক হিসাবে অভিনয়ের।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

মূল্য ৭৫ পয়সা ; হিমালয় অতিরিক্ত হিমমূল মাশুল ১৫ পয়সা, ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত হিমমূল মাশুল ২০ পয়সা।

ব্রিটানিয়া দুধ বিস্কুট

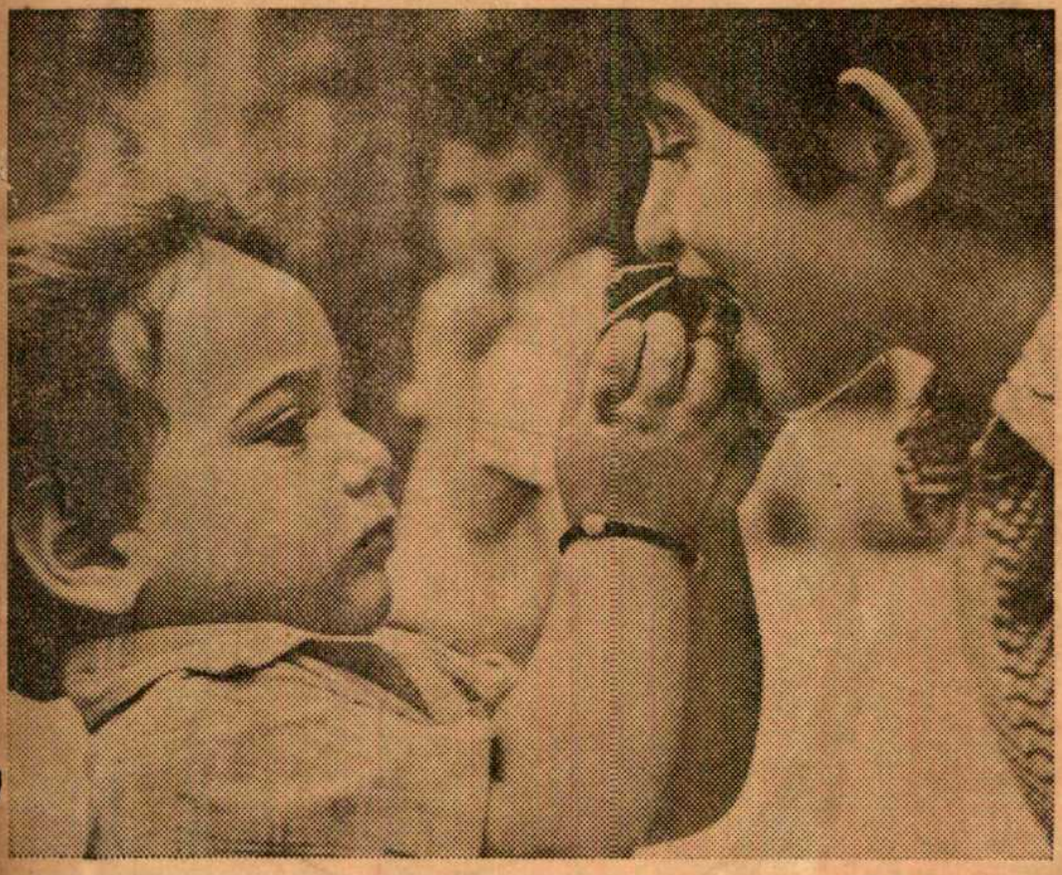

বাড়ন্ত বাচ্চার সুস্বাদু সাথী!

সুস্বাদু, পুষ্টিকর
ব্রিটানিয়া গ্লাক্সো মিল্ক বিকিস

সিনটাস-BBC.GLXMB.2-203 BG

Regd. No. WB/NC-13
Gram : AMRITA Calcutta-700003

AMRITA

Friday 22nd September, 1978
Phone 55-5231 (14 lines)

25 SEP 1978

বিশুদ্ধ 'কুকমী' গুঁড়া মশলার ক্রেতারা-

সাবধান!

'কুকমী' গুঁড়া মশলার জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে কলকাতার কয়েকটি গুঁড়া মশলা কোম্পানী তাদের নিজস্ব নিকৃষ্টমানের ব্রাণ্ডের সঙ্গে জনপ্রিয় কুকমীর নাম জুড়ে হুবহু কুকমী Cookme নামের ষ্টাইল নকল করে আসল কুকমী গুঁড়া মশলা বলে বাজারে চালাবার চেষ্টা করছে।

কেনার সময় দেখে নেবেন- 'কুকমী'র প্যাকেটে কেবল Cookme 'কুকমী' ছাপই আছে, অন্য কোন ব্রাণ্ডের নাম যুক্ত নেই

প্রস্তুতকারক :
কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
২৩৫ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা ৭০০০৭০ ● ফোন : ৩৩০৯৯৫, ৩২৬৩৩২
পোষ্ট বক্স নং : বড়বাজার ৬৮৮৫ ● আইরী : কাশীপুর

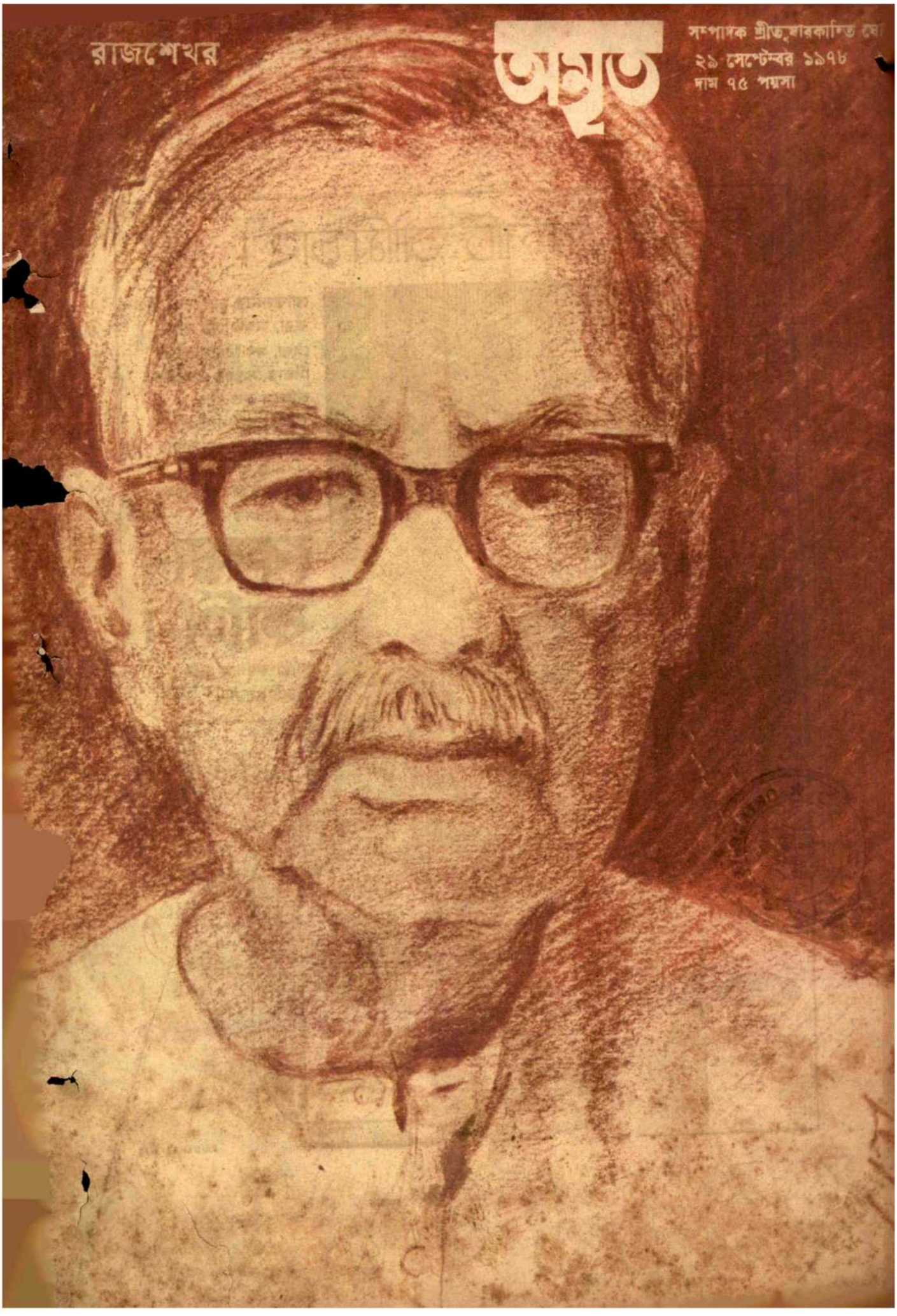

অমৃত

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘো
২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮
দাম ৭৫ পয়সা

ঠিক যে তেলটি আমি চাই !

লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা, অজস্র চিঠি পত্র লেখা, সব বিষয়ে চটপট সিদ্ধান্ত নেওয়া···সারাদিন অফিসে কত কাজ !
এত কাজের মধ্যেও মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয় আবার চুলও পরিপাটি থাকা চাই।
আর তাই আমার পছন্দ মৃদু সুবাসিত

কেয়ো-কার্পিন

কেয়ো-কার্পিনে চুল চটচটে হয় না।

Dey's
দে'জ মেডিকেলের তৈরী

PX/DM/KB-2/75

কাশীকান্ত মৈত্রের সাড়া-জাগানো গ্রন্থ

গণতন্ত্র

মুখোশ ও মুখশ্রী ২৫.

বজ্রমাধব ভট্টাচার্যের নবতম উপন্যাস

ত্রিভুবনের বাইরে ১৮.

প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলীর বিপ্লবী-জীবনের স্মৃতিচারণ

বিপ্লবীর জীবনদর্শন ২০.

বাংলাসাহিত্যে বৃহত্তম ও মহত্তম ভ্রমণকাহিনী

শঙ্কু মহারাজ-এর

মধু-বৃন্দাবনে

শ্রীধাম বৃন্দাবনের যাবতীয় মন্দির, স্থল, তীর্থ ও পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা; যাবতীয় বন, মথুরা, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড; যাবতীয় ঘাট, গোকুল, রাবেল প্রভৃতি পরিক্রমা; শ্রীমন্মহাপ্রভু ও ষড়-গোস্বামীগণের কথা— আর শ্রীকৃষ্ণের শৈশব ও কৈশোরলীলার কাহিনী। তিন শতাধিক পৃষ্ঠায় তিনটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ পর্বে সমাপ্ত। মূল্য প্রতি পর্ব মাত্র বারো টাকা।

শ্রীকৃষ্ণের যৌবনলীলা ও কৃষ্ণলীলাস্থল অবলম্বনে

এই লেখকের

মন-দ্বারকায় ১২.

শৈলেশ দে'র সার্থকতম রচনা

গান্ধীজী ও নেতাজী ২০.

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ভ্রমণকাহিনী

গোমুখীর পথ ১৬.

সুভাষ সমাজদারের নেহরু পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থ

গঙ্গা থেকে কাস্পিয়ান ১৮.

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

থৈ থৈ হাহাকার ১৮.

সম্পূর্ণ তালিকার জন্য লিখুন :—

রবীন্দ্রলাইব্রেরী ১৫।২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ ॥ ফোন : ৩৪-৪৩৫৬

শক্তিপদ রাজগুরুর উপন্যাস

অনুসন্ধান ১৫.

নিরালা পর্বত-সীমার গভীরে এক বিচিত্র পটভূমিকায় দুটি হৃদয়ের ভালবাসা—ঘর বাঁধার স্বপ্ন। এক অকল্যাণের দূত যেন সেই শান্ত জগৎকে ধ্বংস করতে উদ্যত। কিন্তু তমসার বুকে সূর্যোদয়ের মতই অভিজিৎ-এর সত্যানুসন্ধান —তার সাধনা আর স্বপ্নকে সার্থক করে তোলে। রহস্যঘন অন্তর্দ্বন্দ্বমূলক এই কাহিনী বাংলা ও হিন্দি ছায়াছবিতে রূপায়িত হচ্ছে।

এই লেখকের

অভয়ারণ্য ১৫.

গৌড়জন বধূ ১৪.

মুক্তিস্নান ৬.

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর উপন্যাস

শেষবিচার ১৮.

পিতা ও পুত্রকে নিয়ে লেখা এই উপন্যাস পাঠককে সন্ত্রস্ত করে, ভাবায়, এই উপন্যাস আজকের কাহিনী ..... আমাদের কাহিনী, যার সঙ্গে আজকের প্রতিটি মানুষ অঙ্গাঙ্গী জড়িত।

এই লেখকের

স্বাতী ও দীপ ১২.

বিশ্বাসের বাইরে ৫.

অমলেন্দু ঘোষের

বিপ্লব ও বিপ্লবী ৮.

নিখিলচন্দ্র সরকারের

সজনে নির্জনে ১২.

দুঃখে সুখে বাঁচা ১০.

আবদুল জব্বারের

পল্লীর পদাবলী ১২.

আত্মজীবনী ॥ পঙ্কজকুমার মল্লিক

রবীন্দ্রসঙ্গীত যখন রবিবাবুর...গান ছিল, সেই সময় থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত বাঙালীর সংস্কৃতি, সঙ্গীত, চলচ্চিত্র, বেতার ও রুচি পরিবর্তনের ধারাবাহিক স্মৃতিচিত্র। এবারের পুজো সাহিত্যের সেরা আকর্ষণ। সঙ্গে বহু দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র।

রবীন্দ্রনাথের অসুখবিসুখ ॥ অমিতাভ চৌধুরী

বিধান রায় বললেন, অপারেশান করতেই হবে। স্যার নীলরতন বললেন; কিছুতেই না। দুই বাঘা ডাক্তারের লড়াই ঘাঁকে নিয়ে,...সেই রবীন্দ্রনাথের অটুট স্বাস্থ্য দন্তাপহারক কীভাবে হরণ করলেন, তারই কাহিনী। বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র সদন থেকে উদ্ধার করে আনা বহু অপ্রকাশিত তথ্য ও চিত্রসহ এবার পুজোয় অভিনব উপহার।

বছরের সেরা পাঁচটি উপন্যাস ॥ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, নিমাই ভট্টাচার্য ও অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

শারদীয় যুগান্তর ১৩৮৫

পূর্বাভাষ ॥ অন্নদাশঙ্কর রায়

বিভাগপূর্বকালের পূর্ববাংলাকে নিয়ে লেখা চাঞ্চল্যকর রচনা।

এ ছাড়া কয়েকটি বিশেষ রচনা

মন-পাঠাগার ॥ লীলা মজুমদার
উমা হৈমবতীর কুলজি ॥ সুকুমার সেন
সমকালীন কয়েকজন চিত্রশিল্পী ॥ সন্দীপ সরকার
বাঙলা ছবিতে শরৎচন্দ্র ॥ আশিসতরু মুখোপাধ্যায়
ছায়াচিত্রের ছায়া দেবী ॥ মধুসূদন মজুমদার

বড় গল্প ও ভ্রমণকাহিনী

আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, বরেন গঙ্গোপাধ্যায় ও তারাপদ রায়।

ছোটগল্প ও রহস্য কাহিনী

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, শ্যামলা গঙ্গোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ, সুধাংশু ঘোষ, সমীর রক্ষিত, প্রলয় সেন, সুব্রত সেনগুপ্ত; শৈবাল মিত্র, শচীন দাশ, গৌতম রায়, কণা বসু মিশ্র; অমর মিত্র; অমল আচার্য প্রমুখ।

বিশিষ্ট কবিদের সুনির্বাচিত কবিতাগুচ্ছ ॥ সেরা শিল্পীদের আঁকা স্কেচ

দাম ঃ দশ টাকা। রেজিস্টি ডাকে অতিরিক্ত দু টাকা পঁচিশ পয়সা

আপনার কপির জন্য হকারকে বলে রাখুন, কিংবা সরাসরি যোগাযোগ করুন ঃ
সার্কুলেশন ম্যানেজার, যুগান্তর লিমিটেড; কলকাতা-৩ ফোন ঃ ৫৫-৫২৩১

অমৃত

১৮ বর্ষ
২০ সংখ্যা
১২ আশ্বিন,
১৩৮৫
29th September, 1978

সম্পাদকীয় ৩
সাহিত্য ইত্যাদি ৪ মণীন্দ্র রায়
আমি কেমন আছি ৫ দীপঙ্কর চক্রবর্তী
বাজনীতি কলকাতা স্টাইল ৬
বেদব্যাস বৈদ্য
বেবতীভূষণের কার্টুন ৬
কবিতা ৮ কবিবুল ইসলাম
উদয়ন ভট্টাচার্য, গৌতম চৌধুরী
জীবন সরকার
ভাগ্যগণনা ৯ শ্রীমাণিক্য
প্রচ্ছদ কাহিনী ১০
বাজশেখর
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য
প্রচ্ছদশিল্পী বামলাল ধর
সমবেশ সন্বর্ধনা ১৭
সমালোচনা ১৯
সোনার হরিণ নেই (উপন্যাস) ২১
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
হাওয়া গাড়ি (উপন্যাস) ২৫
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
তরণী পাহাড়ে বসন্ত (উপন্যাস) ২৯
শৈবাল মিত্র
অন্য আমি (গল্প) ৩৪
প্রদীপ আচার্য
লাবন : ৭৮/৪৪
অমর মিত্র/রমেন দাস
খেলা ৫২ শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়
লিঙ্কম্যান, দর্শক
বোম্বাই সমাচার ৫৬
জ্যোতিপ্রকাশ রায়
চিত্রধ্বনি ৫৯

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ কাহিনী
ইন্দিরার মুখোমুখি
নলিনী দাশের গল্প

'কাগুজে বাঘ'

সাক্ষরতার হার আমাদের দেশে বেশি নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে কাগজের দুর্ভিক্ষ প্রায় চিরস্থায়ী হয়ে উঠছে। আগে কিছু পরিমাণে কাগজ বিদেশ থেকে আমদানি করা হত। বছর দশেক হল সে-ব্যবস্থা বন্ধ করে দেশীয় সূত্র থেকে চাহিদা মেটানোর চেষ্টা চলে আসছে। উদ্দেশ্য ছিল যাতে উৎপাদন বাড়িয়ে কাগজ শিল্প পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে কিন্তু পরিণামে দেখা যাচ্ছে, কাগজের উৎপাদন প্রায় আগের মতোই নিচু পর্যায়ে রয়ে গেছে।

অনুমান করা গিয়েছিল, দেশে কাগজের উৎপাদন হবে বছরে ২৫ লক্ষ টন। কিন্তু গত আর্থিক বছরে প্রকৃত উৎপাদন হয়েছে মাত্র ৯ লক্ষ টন। অথচ সাক্ষরের সংখ্যা কম বলে দেশে জন-প্রতি কাগজের চাহিদা মাত্র ২ কেজি। অন্যপক্ষে, উন্নত দেশগুলোতে জন-প্রতি কাগজের ব্যবহার ২০০ কেজি। দেশের এই সামান্য চাহিদাও মেটাতে পারে না আমাদের কাগজ শিল্প। ভাবতে অবাকই লাগার কথা।

কেন্দ্রীয় সরকার আগে স্থির করেছিলেন, বেসরকারী কাগজ কলগুলো বছরে ২ লক্ষ টন কাগজ নির্ধারিত মূল্যে সরবরাহ করবে। তার মধ্যে সরকারী ব্যবহারের জন্যে ৮০ হাজার টন রেখে বাকি ১ লক্ষ ২০ হাজার টন কাগজ শিক্ষা ক্ষেত্রের (সেকটারের) জন্যে বরাদ্দ করা থাকবে। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্র থেকে প্রতি বছর অভিযোগ শোনা গেছে, কাগজের অভাবে বাজারে চাহিদা মতো এক্সারসাইজ খাতা এবং পাঠ্যপুস্তক পাওয়া যায় না। গত বছর শিক্ষাক্ষেত্রে নাকি মাত্র ৮০ হাজার টন, অর্থাৎ ৪০ হাজার টন কম কাগজ পেয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকার তাই স্থির করেছেন, সরকারী ব্যবহারের জন্যে বরাদ্দ-করা কাগজও তাঁরা শিক্ষাক্ষেত্রের জন্যে ছেড়ে দেবেন। অর্থাৎ শিক্ষাক্ষেত্রে নির্ধারিত মূল্যে সরবরাহ-করা সমস্ত কাগজ—২ লক্ষ টনই পাবে। সরকার অন্য সূত্র থেকে কাগজ সংগ্রহ করবেন।

কিন্তু কাগজের সরবরাহ এত ব্যবস্থা সত্ত্বেও সুগম হয়নি। খোলাবাজারে কাগজ ক্রমেই বেপাত্তা হতে শুরু করেছে। দামও বেড়ে চলেছে ক্রমাগত। বইপত্রেরও দাম বাড়ছে সেই অনুপাতে।

এই জটিল বহুমুখী সমস্যার সমাধান কোথায়, সদুত্তর পাওয়া শক্ত।

সাহিত্য ইত্যাদি...

সাহিত্যিকের পুত্র সাহিত্যিকের ট্র্যাজেডি

সাহিত্যিকের ছেলে কি সাহিত্যিক হন? প্রশ্নটি নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে দেখা যেতে পারে।

মধুসূদনের পুত্র-কন্যারা কেউ সাহিত্যিক হয়েছেন বলে শোনা যায়নি। বিদ্যাসাগরের ছেলে নারায়ণ বিদ্যারত্নও লেখক হননি। বংকিমচন্দ্রের বেযাই ছিলেন দামোদর মুখোপাধ্যায়, কিন্তু তাঁর মেয়েরা সাহিত্য রচনা করেননি। বংকিমের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র খ্যাতিমান সাহিত্যিক ছিলেন। এবং ভাইপো শচীশচন্দ্রেরও ঝোঁক ছিল লেখালেখির দিকে। একমাত্র অক্ষয়-কুমার দত্ত ছাড়া সেকালের আর কোনো সাহিত্যিকের বংশধারায় বড় কেনো সাহিত্যিক দেখা দেননি বলে মনে হচ্ছে। কবি সত্যেন দত্ত তাঁর পিতামহ অক্ষয় দত্তের মতোই সমধিক খ্যাতিমান হতে পেরেছিলেন, তা আমরা সকলে জানি।

রবীন্দ্রনাথের অগ্রজেরা কেউ কেউ সাহিত্য করতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ এবং স্বর্ণকুমারী দেবীর কোনো কোনো রচনা সেকালে আলোড়ন তুলে-ছিল, এখনো পাঠযোগ্যতা হারায়নি। রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ নিজে সাহিত্য রচনা করতেন, আত্মজীবনীতে তার প্রমাণ রয়েছে। তাছাড়া সাহিত্যের ব্যাপারে গুণগ্রাহিতাও ছিল যথেষ্ট। তরুণ রবীন্দ্রনাথকে তিনি একখানি গানের জন্যে (নয়ন তোমারে দেখিতে না পায়। বহুত নয়নে নয়নে) নিজের ঘড়িটি উপহার দিয়ে সমাদর জানিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে পিতৃস্মৃতি রচনা করেছেন। কিন্তু ঠিক মনে পড়ছে না, আদি বইটি ইংরেজিতে লেখা কিনা। তবে একবার অন্তত কবিতাও লিখেছেন তিনি, স্পষ্ট মনে আছে। ছাপা হয়েছিল প্রবাসীতে। সত্যিই ভালো কবিতা হয়েছিল সেটা। আরো যা উল্লেখ করার মতো, রবীন্দ্রনাথের মতো নয়। রবীন্দ্র-নাথ তখন জীবিত। কী জানি সেইজন্যেই বোধহয় সে-সব ব্যাপারে সংকোচ দেখা দিয়েছিল রথীন্দ্রনাথের, বেশি দূরে এগোননি আর।

একালের সাহিত্যিকদের মধ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা লেখার দিকে উৎসাহী ছিলেন। বালক বিভূতি-ভূষণ তাঁর পিতার এই সাহিত্যপ্রীতি এবং সাহিত্য রচনায় উৎসাহ দেখে প্রভাবিত হয়েছিলেন, সে-কথা নিজেই তিনি বলে গেছেন। তাঁর ছেলে তারাদাসও নাম করেছেন গল্প লিখে। তাছাড়া অপুর ট্রিলজির একটি উপসংহারও রচনা করেছেন তিনি 'কাজল' নামে।

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে সনৎকুমারও গল্প-উপন্যাস লিখে খ্যাতি করেছিলেন। আসলে সনৎকুমারের কথা মনে পড়েছিল বলেই আজকের এই বিশেষ প্রসঙ্গ নিয়ে এত কথা বলা।

সনৎকুমার আমার ছাত্রজীবনের বন্ধু। সম্প্রতি আমাদের মায়া ত্যাগ করে চলে গেছেন। তাঁর বিষয়ে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে একটি কাগজে লিখেছে, বিখ্যাত সাহিত্যিকের পুত্র হবার ফলে লেখক হতে গিয়ে অসুবিধে বোধ করেছেন সনৎকুমার। যদি তিনি তারাশংকরের পুত্র না হয়ে আর কোনো সাধারণ ব্যক্তির ঘরে জন্মাতেন, হয়তো আরও একটু খ্যাতি হতো তাঁর। প্রবল ব্যক্তিত্বের পাশে থেকে নিষ্প্রভ হয়ে থাকতেন না।

সনৎকুমারকে আমি প্রায় প্রথম বয়স থেকেই চিনতাম। রিপন কলেজে তিনি আমার এক ইয়ার ওপরের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু পরে যিনি তাঁর ডগিনপতি হয়েছেন, সেই শান্তিশংকর ছিলেন আমার সহপাঠী। ফলে হোস্টেলে শান্তির ঘরে সনতের সঙ্গে হামেশাই দেখা হত। আড্ডা হত। তাঁর মতো এত ভদ্র-স্বভাবের সহৃদয় বন্ধু আমাদের কম ছিল। খানিকটা মুখচোরাও ছিলেন। শান্তি সদিও তখন কবিতা লিখে মাঝে মাঝে শোনাতেন, সনৎ কখনো তার গল্প লেখার কথা উল্লেখ করেননি। বরং তাঁর বাবার কথা বলতেন। তারাশংকরবাবু তখন এখন-কার সূর্য সেন স্ট্রীট ও মহাত্মা গান্ধী রোডের কর্নার-এ একটি মেসবাড়ির দোতলার ঠিক একবারে সামনের সেই কোণাচে ঘরটিতে থাকতেন। সনৎ এবং শান্তির সঙ্গে আমিও তখন সে-ঘরে মাঝে মাঝে মাঝে গেছি। বাবাকে যে কী পরিমাণ সমীহ করতেন সনৎ, তখন থেকেই সেটা দেখেছি।

এই স্বাভাবিক শ্রদ্ধাই পরে রূপা-ন্তরিত হয়েছিল ভক্তিতে। পিতা ও পুত্রের মধ্যে বেশ একটি বোঝাপড়া ছিল, প্রায় বন্ধুত্বের মতো। অনেকদিন অনেক উপলক্ষে এটা আমি লক্ষ্য করেছি। তারা-শংকরবাবু ছিলেন কড়া মেজাজের মানুষ, রীতিমত আবেগপ্রবণও। সেজন্যে অল্পতেই উত্তেজিত হয়ে পড়তেন, রূঢ় কথাও বল-তেন। সনতের বয়স যখন প্রায় পঞ্চাশ ছুই-ছুঁই, ছেলেরা সব যুবাপুরুষ, তখনো তারাশংকরবাবু সনৎকে আড়ালে-ইঙ্গিতে ভর্ৎসনা করেছেন। কিন্তু সনৎ কখনো মাথা হারাতেন না। মুখের হাসিটি তাঁর তেমনি অম্লান থাকত। পিতার অস্বস্তির মূল কারণটি যাতে সংশোধন করা যায় তার চেষ্টা করতেন। এসব সময় তাঁকে মনে হত যেন একজন দায়িত্ববান অভিভাবক, তাঁর পুত্র বা পুত্রস্থানীয়ের সুখস্বাচ্ছন্দের দিকে নজর রাখছেন। এবং ঠিক এইজন্যেই সনতের উপর তারাশংকরবাবুর নির্ভর-শীলতা ছিল এত বেশি।

তাছাড়া ছিল সাহিত্যিক আড্ডার-স্টাণ্ডিং। সনতের সাহিত্য বোধ এবং মতা-মতের ওপর গভীর একটি আস্থাবোধ ছিল তারাশংকরবাবুর। আমি বেশ কয়েকবারই দেখেছি, একটি লেখা শেষ করেছেন, কিন্তু সনৎ হয়তো তখন আপিসে চলে গেছেন। ওদিকে কাগজের তরফ থেকে সম্পাদক এসে হাজির হয়েছেন লেখাটি নেবার জন্যে। তারাশংকরবাবু তাঁকে সন্ধ্যায় গল্প পিওন পাঠিয়ে নেবার জন্যে বলছেন, কেননা, দেবার আগে একবার সনৎকে পড়িয়ে নিতে চান। অন্যদিকে, সনতের আগ্রহও ছিল একইরকম তীব্র। একবারের কথা মনে পড়ে। পুজোর কাজে তাড়া ছিল খুব। তারাশংকরবাবুর গল্পটি কাগজের আপিসে চলে এসেছে। বিকেলে আপিস-ফেরৎ সনৎ এসে হাজির। কী ব্যাপার, না সকালে বেরোনোর আগে গল্পের অনেক অংশ পড়েছিলেন তিনি, বাকীটা না পড়ে স্বস্তি পাচ্ছেন না। স্পষ্ট মনে পড়ছে, সনতের সহাস্য কৈফিয়ৎ, এ প্রায় কচ্ছপের কামড়, বুঝলে না ভাই!

ভাই বলাটা সনতের স্বভাব ছিল— তাঁর অ্যাপ্রোচই ছিল ভ্রাতৃত্বের পথে। তাঁকে যাঁরা জানতেন, তাঁরা সকলেই জানেন, তাঁর সেই ভাই বলে কাছে এসে দাঁড়ানোর মাধুর্য। কখনোই তিনি কাউকে আঘাত করতেন না, ছাড়িয়ে ওঠার চেষ্টা করতেন না। বরং তাঁর ঝোঁকটা ছিল পিছিয়ে থাকার দিকে। যেন তিনি বলতে চাইতেন, সীমারে সামনা তার রাখি।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে, সীমা মেনে চললে সীমাকে ছাড়িয়ে ওঠাও শক্ত। সাহিত্যিক হবার ইচ্ছে যদি কারো হয়, তবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে এমনকি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও। চিৎকার করে বলে বেড়িয়ে নয় নিশ্চয়ই, মনে মনে। সনৎকুমার সে-পথ এড়িয়ে চলতেন। তাঁর বেলায় যা হয়েছিল, তাকে বলা স্বেচ্ছা-নির্বাসন। নয়তো লেখার ক্ষমতা তাঁর ছিল ভালোই, সেটা তাঁর যে-কোনো উপন্যাসের (বোধহয় পাঁচ-ছ'টি প্রকাশিত হয়েছে বই আকারে) পাতা ওল্টালেই বোঝা যাবে। তাঁর অপ্রত্যাশিত লেখা থেকে বেছে করে যদি একটি সংকলন বার করা যায়, লেখক সনৎকুমারকে বোধহয় নতুন করে পাওয়া যাবে। সঙ্গে অবশ্য একটি ভূমিকা থাকা দরকার। যাতে দেখিয়ে দেওয়া হয়, সাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে সাহিত্যিক সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আলাদা কিছু করতে পেরেছেন কিনা।

আমার মনে হয় পেরেছেন। কিন্তু সেটা দেখিয়ে দেওয়া দরকার। বিখ্যাত সাহিত্যিকের পুত্র হয়ে জন্মানোর ট্র্যাজিডি থেকে সরিয়ে এনে নিজের মর্যাদায় তাঁকে পুনর্বাসিত করা উচিত।

রণজিৎ রায়

আমি কেমন আছি ?

দীপঙ্কর চক্রবর্তী

ভাস্কর, অভিজিতের কতগুলো জন্ম-সূত্রে পেয়ে যাওয়া ক্ষমতা ছিল। আমার তা ছিল না। কোনো পার্টিতে গেলে দুইস্কির গ্লাস হাতে ঘন্টায় পর ঘন্টা ওয়েল বোর্ড, টেন্ড ইউনিয়ন কনস্পিরেসি, বোনাস পারসেন্টেজ নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী আলোচনা চালিয়ে যাবার অত সহজ ভঙ্গি আমি কখনোই আয়ত্তে আনতে পারিনি। ভ্রমন বিষয়, ফরাসী ওয়াইন, জিন ও বন্ধ্যানারীর অন্তঃ সম্পর্ক নিয়ে অতো গভীর আলোচনা যে আদৌ সম্ভব তা আমার এই বন্ধু দুটিকে না দেখলে জানা হোতো না। ভাস্করের দাদুর চিঠি আসতো মাঝে মাঝে ভূপাল থেকে। সেখানে সেন্ডার্স নেমে-এ লেখা থাকতো তাঁর নাম। নামের শেষে আই-সি-এস (রিটায়ার্ড)। ভাস্কর নানাভাবে আমাকে ওর দাদুর আই-সি-এস জীবনের গল্পো শোনানোর চেষ্টা করত। আগ্রহ পেতাম না। কোম্পানির কনফারেন্সে ভাস্কর-অভিজিৎ ত্রুটির কোনো তুলনা পাওয়া যেতো না। নীল ফাইলের উপর আলগোছা ফেলে রাখা ঝকঝকে লাগানো হাতা ও হাত, চোখের দৃষ্টি অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানের কোনো স্থির বিন্দুতে, আমন্ত্রণী মুখ, সীবিয়স চোখ, উজ্জ্বল চাউনি। কনফারেন্সের শেষে নামী হোটেলের দামী ডিজাইন্ড ঘরে ওর শুয়ে থাকা বা বসে বসে টাইপরাইটার দুহাতের ছন্দ দ্রুত ওঠানামা—এসবের কোনোটাই আমার স্বাভাবিক লাগতো না। দামী হুইস্কি জিভে লাগাতে শেখে বোকা, হাঘরের মতো মনে হোতো আমার নিজেকে। কনফারেন্সে কোনোদিনও কোনো যুক্তি-শুদ্ধ সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি। হোটেলের নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে আমার কেমন যেন অনেক পয়সা অযথা নষ্ট করার পাপবোধ হতো। অথচ টেনিং পিরিয়ডের ওই কটা মাসে নিজের ঘরে বসে তৈরী করা আমার রিভিউন প্রজেক্টগুলো ওদের থেকে অনেক বেশী ইন্টারেস্টিং হয়েছিল। কেননা ম্যানেজমেন্ট আমাকে এ ব্যাপারে ওদের থেকে বেশী ইমপরট্যান্স দেয়। কিন্তু কনফারেন্স রুমে ঢুকলেই আমার শরীর কী রকম ভয়ে সিঁটিয়ে যেত। তলপেট ব্যথা করতে শুরু করে তো। জল খেতে গিয়ে খেয়াল হোতো আঙুলের ডগাগুলো কেমন যেন কাঁপছে। গা বমি বমি করার ভয়ে অনেক দিন কনফারেন্স রুম থেকে উঠে চলে এসেছি।

এর সঙ্গে যোগ হোলো নতুন সমস্যা। মেয়ো অফিসার ও কেরানীরা কী একটা গোপন চক্রান্ত শুরু করেছিলো। পারসোনাল ম্যানেজার দীপেন বোসের বিরুদ্ধে। আমাদের তপনদা এর মধ্যে কীভাবে জড়িয়ে পড়লেন কেমন করে যেন। দীপেন বোস বাঙালীকে বাঙালী না দেখলে আর কে দেখবে এর দয়ায় তপনদাকে চাকরি না খেয়ে কয়েক মাসের জন্য সাসপেন্ড করেছিলেন। কেয়ানীকুল তাতে হৈ চৈ করে গন্ডগোল বাড়ালো, তপনদাকে পক্ষে-বিপক্ষে সিগনেচার ক্যামপেনিং শুরু হোলো ম্যানেজমেন্টের অগোচরে। তপনদার তখন কুলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ। ভেউ ভেউ করে কাঁদে আর ঘন ঘন বৌকে, বাবাকে চিঠি লেখে। ভাস্কর অভিজিৎ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকতে চাইলো। গোপনে গোপনে অনার ফ্যাক্টরের সন্ধানও করছিল বুঝতে পারছিলাম। তপনদাকে আমার বাঁচাতে ইচ্ছে হোলো। তপনদার জন্য নয়। আমার নিজের জন্য। কোনোদিনও, কোনো ঝুঁকির খেলায় নামি নি, জীবনের কোনো ক্ষমাহীন, নিষ্করুণ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হই নি। একটি বার নিজেকে পরীক্ষা করতে ইচ্ছে হল। হাবাগো কি জিতব জানতাম না, সে জন্যেই কেমন একটা গোঁ চাপলো মাথায়। আমার রক্তের চাকা বসে যাবে কুরুক্ষেত্রের মাঠে, ইন্দ্র এসে কবচ কুন্ডল চেয়ে নিয়ে যাবেন। কর্ণ ভুলিয়ে দেবেন দিব্য অস্ত্রের নাম যা আমাকে পরশুরাম দিয়েছিলেন। তবু আমি যুদ্ধ করবো। কারো জন্য নয়। নিজের জন্য। তপনদাকে আমি চিনি না। আমার যুদ্ধ তপনদার জন্য নয়।

দীপেন বোসকে চিঠি লিখলাম। তপনদাকে উপলক্ষ্য করে মিডল ম্যানেজমেন্ট, লেবার ফ্রন্ট ও সিনিয়র এবসিকিটিভদের এই চূড়ান্ত গন্ডগোলের দ্রুত সমাধানের দাবী করলাম। কয়েকটা বিশেষ নাম, বিশেষ ঘটনাকে সময় তারিখ দিয়ে লিখে পাঠালাম। দোষের বোঝা তপনদার একার নয় অনেকের এমন কী পারসোনাল ম্যানেজারও বাদ পড়ে না—এ-রকম একটা বিশ্লেষণ ছিল আমার চিঠিতে। দীপেন বোস বড়ো উত্তর দিলেন, বাবা বাবা ঢ-এ আমাকে নিজের কাজে মন দিতে বললেন। আমি সিগনেচার ক্যামপেনিং-এ তপনদার পক্ষে সই দিলাম। লিফলেটে ও পোস্টারে দীপেন বোস সে কথা জানতে পেরে আমাকে শেষ বারের মত ওয়ার্নিং দেবার জন্য ডেকে পাঠালেন। ওয়ার্নিং-এর দরকার ছিল না, আমি মন স্থির করে ফেলেছিলাম। কম্পানি কনস্পিরেসির ব্যাপার বোঝা আমার মত ছেলের সাধ্য নয়। আমি ইস্তফা দিলাম। তপনদার বিরুদ্ধে ম্যানেজমেন্ট নৈতিক ভ্রষ্টাচারের নতুন অভিযোগ আনলো এবারে। তপনদা ভয় পেয়ে আর প্রতিবাদ করলেন না। বৌয়ের কাছে ফিরে গেলেন।

ভাস্কর অভিজিৎ একদিন আমাকে ভিকটোরিয়া টার্মিনাস অবধি এগিয়ে দিয়ে এলো। ফেরার পথে আমার হাতে খরচ সামান্য কয়েকটা টাকাই অবশিষ্ট ছিল। অভিজিৎ চার প্যাকেট উইলস ফিলটার, আর এক বাক্স চীনে খাবার সস্তাকসে গুঁজে দিল। কলকাতায় ফিরে এসে উইলস ফিলটারের প্যাকেট একদিন শেষ হয়ে গেলো। আমার ঘরের ডুপ্লিকেট চাবিটা পকেটে আবিষ্কার করলাম হঠাৎ একদিন। আর একদিন অভিজিতের চিঠি এল। পৃথিবীর কোনো ঘটনাই কী কখনো নাটকীয় ভাবে শেষ করা যায় না ? খরচে হয়ে, স্তম্ভিত হয়ে শাসন করে সায় কেবল ? শরীরের শিরা উপশিরা ছিঁড়ে রক্তের গায় ঘন খানিকটা অংশ বাদ দিয়ে দিলেও কী এরা যাবে না ? তবে এদের নিয়ে কি করব আমি ? চন্দন কাঠের বাক্সে ভরে রাখবো ? শীলার চিঠিগুলোকে তো তা রাখি নি।

যেমন তেমনভাবে ফেলে রাখতে রাখতে তারা হারিয়ে গেলো। একদিন শীলা নিজেই স্বার্থায় চলে গেল।

বেহালার বাড়িতে শেষবার যখন পিকুদাকে দেখি তখন কী ভেবেছিলাম পিকুদা যুদ্ধের আগুনে পুড়ে যাবেন ? বোমাতে যেতে দিতাম তাঁকে ? নাস্কি যা হবেই, যা আগে থেকেই হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে তাকে না হওয়ানো যায় না ? সবাইকে যখন শেষে এত হারাতে হয় তবে জেতে কে ? বেঁচে থাকা মানেই যখন খালি হেরে যাওয়া মেনে নেওয়া, এত খালি হওয়া, একে অন্যকে ঘাড়ে করে শ্মশান পৌঁছে দেওয়া, তবে বেঁচে আছি কেন ? কার জন্য ? কে আমাকে ভালোবাসে ? শীলাকে তো সবাই ভুলে গেল। সেই নবম মেয়ের মতো মেয়েটা, জীবনের সঙ্গে গান, গানের সঙ্গে জীবন মেলাতে গিয়ে যাকে কখনো ক্লান্ত হতে দেখি নি সে এখন কোন্ গান গায় ? নিজের ছায়া দেখে আহ্লাদে আটখানা হয়ে যে মেয়ে শিমুলতলায় বোলপুরে, টিলা পাহাড়ের নিচে হাততালি দিয়ে উঠতো, তার ছায়া পৃথিবী থেকে কেন মুছে যায় ? অথচ গাঢ় নীল আকাশের কোণে নিজন বোলপুর, কবেকার আগেকার গাছপালা, নদী, বড় আলো তো একই রকম ব্লান্ডিহীন, অবিকার। এ সবের মধ্যে আমি বেঁচে আছি কেন ? কোন্ আনন্দের ছোঁয়ায়

কেন সেই আমলা নির্ভরতা

রাজনীতি কলকাতা স্টাইল

বেদব্যাস বৈদ্য

গড়িয়াহাটার মোড়। বৃদ্ধ ভদ্রলোক তখনও উত্তেজিত। আর তাঁর সামনে দাঁড়ানো জনাপাঁচেক যুবক-যুবতী। তাদের হাতে বন্যা ত্রাণে সাহায্যের কৌটো আর দলীয় পতাকা-ফেস্টুন ও পোস্টার। ভদ্রলোকের বক্তব্য : বন্যার্তদের জন্য সাহায্য সে তো শুভ-উদ্যম। কিন্তু এই সাহায্য সংগ্রহের সঙ্গে দলীয় পতাকার সম্পর্ক কী। এসব দলীয় পতাকা আর ফেস্টুন রেখে সঙ্গে বরং বন্যাক্লিষ্ট বিপর্যস্ত মানুষের ছবি নাও, দেখবে তাতে লোকের সহানুভূতি অনেক বেশী পাবে। যতক্ষণ না পতাকা আর প্রচার ছাড়ছ, ততক্ষণ আমি তোমাদের হাত ছাড়াবে কোন সাহায্য করব না। প্রবীণ ভদ্রলোক এবং সংগ্রাহক যুবক যুবতীদের মধ্যে যুক্তি তর্ক যখন চরমে, তখন সেখানে জমে লোকারণ্য। বলা বাহুল্য, উপস্থিত অধিকাংশ লোকই শেষ অবধি বৃদ্ধের যুক্তির সমর্থনে সোচ্চার হলেন। বন্যা-ত্রাণের পরিপ্রেক্ষিতে সামান্য হলেও এ ঘটনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নেই।

সাম্প্রতিক বন্যায় যে ক্ষয়ক্ষতি ও জীবনহানি ঘটেছে এ পর্যন্ত তার সঠিক কোন হিসাব পাওয়া যায় নি। সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিনিয়ত প্রতিবাদ হয়েছে এবং হচ্ছে। রাজ্য সরকার সংবাদপত্র এবং সংবাদদাতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বলছেন, তাঁরা দায়িত্বহীনভাবে সংবাদ প্রচার করছেন। এ অভিযোগ সত্য বলে ধরে নিলেও প্রশ্ন জাগে, সরকার কেন সঠিক তথ্য এবং হিসাব প্রকাশ করতে পারছেন না? মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু যে সব তথ্য ও সংবাদ সাংবাদিকদের কাছে বিশ্লেষ করছেন বা করেছেন তা তো সবই তিনি পেয়েছেন আমলাদের মারফৎ। আমলাদের চোখে দেখা বন্যা পরিস্থিতি এবং পরিণতির সঙ্গে সাংবাদিকদের সরেজমিনে সংগৃহীত সংবাদ ও তথ্যের যে আকাশ-জমিন ফারাক থাকবে, তা তো খুবই স্বাভাবিক। আমলারা নিজেদের দোষ-ত্রুটি এবং আচ্ছিলা গাফিলতির কথা কি মুখ্য-মন্ত্রী বা প্রশাসনের কাছে তুলে ধরেন? তাদের সেই নেপথ্য কাহিনী এবং সত্য ও সংবাদ তুলে ধরতেই তো জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাংবাদিকরা অকুস্থলে ছুটে যান। তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য হেলিকপ্টার-যোগে জলবন্দী ঘাটাল পরিদর্শনান্তে ফিরে সেদিন মহাকরণে নিজে ও জনৈক সাংবা-দিকের দুঃসাহসী অভিযানের বর্ণনা দেন। বলেন, তিনি অমন ঝুঁকি না নিলেই পারতেন। জীবন-ঝুঁকি নেওয়া এই সাংবাদিকের রিপোর্ট বিশ্বাস না করে দেশের মানুষ কি আমলাদের দেওয়া বিবরণে আস্থা রাখবে? বর্তমান মুখ্য-মন্ত্রী এবং শাসক দলের নেতারা বিরোধী ভূমিকায় থাকাকালে কিন্তু আমলাপ্রদত্ত কাহিনী অলীক এবং ভিত্তিহীন বলে অভি-যোগ করতেন। বিপর্যস্ত বাংলার এই চরম দুর্দিনে তবে তাদের কেন আবার সেই আমলা-নির্ভরতা?

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু একজন অভিজ্ঞ জননেতা এবং দক্ষ প্রশাসক। সরকারী দলের নেতা হিসাবে তাঁর দায়-দায়িত্ব অপরি-সীম। বিরোধী দলনেতারূপে তিনি নিজেও অতীতে একাধিক বিপর্যয়-পরি-স্থিতিতে সর্বদলীয় কমিটি গঠনের দাবী তুলেছেন। কিন্তু আজ যখন তিনি সরকারের নেতৃত্বে আসীন, তখনও কেন বন্যা ত্রাণের জন্য একটি সর্বদলীয় কমিটি গড়া হচ্ছে না, তা সত্যই বিস্ময়কর। জাতীয় জীবনে যখন কোনও দুর্বিপাক অথবা বিপর্যয় নেমে আসে, তখন তা মোকাবিলা করার দায়-দায়িত্ব দলমত নির্বিশেষে সকলের।

এবারের বন্যা পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই রাজ্য বিধানসভার অধিবেশন মাত্র চার দিন চলার পর

আনদিস্টবাল্লের জন্য তা মূলতুবি রাখা হয়েছে। জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে সর্বদলীয় একটি ত্রাণ কমিটি গঠন করা হলে যে বন্যা ত্রাণের ব্যাপারে জনসাধারণের মধ্যে আরও বেশী সাড়া জাগত, তাতে সন্দেহ নেই। ত্রাণ ব্যবস্থা নিয়ে ইতিমধ্যে বহু গুরুতর অভিযোগও উঠছে। কোথাও কোথাও বন্যার দশ দিন পরও ত্রাণ সামগ্রী পাঠানো হয় নি, কোথাও আবার ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ কেন্দ্রে দলীয় ঝান্ডা উঁচিয়ে রাখা হয়েছে। বন্যা ত্রাণ নিয়ে দল-বাজীর এই নোংরা দিকটা অনতিবিলম্বে বন্ধ করার দায়িত্ব সরকার পক্ষের। বেওয়ারিশ দলের পক্ষ থেকে বন্যা ত্রাণের সাহায্য সংগ্রহ সরকার বন্ধ করেছেন। রাজনৈতিক দলগুলিকেও বন্যা ত্রাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে সরকার পক্ষ বারণ করেছেন। এ ব্যাপারে অতীতে কোনও বন্যা অথবা বিপর্যয়ের মোকাবিলায় এ ধরনের কোন হুকুমনামা বেরিয়েছে বলে মনে পড়ছে না। গণ-আন্দোলনে বিশ্বাসী সরকার দেশ-বাসীর সেবাব্রতের গণ-উদ্যোগে কেন আপত্তি তুলেছেন বোঝা দুষ্কর। ত্রাণ কাজের নামে কোনও দুর্নীতি হলে প্রশাসন নিশ্চয়ই তা কঠোরভাবে দমন করবেন। কিন্তু সেবা-মূলক কাজে আগ্রহীদের বিরত রাখার অধিকার কোন দল বা জনপ্রিয় সরকারের আছে কি? এ নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যেও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

বন্যা ও ত্রাণ নিয়ে রাজনীতি করার সময় এটা নয়। তবুও প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সম্প্রতি একাধিক নেতা অভিযোগ করেছেন, দামোদর এবং কংসাবতী বাঁধের জল ছাড়াতেই এই বন্যা-বিপর্যয়। বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান প্রমোদ দাশগুপ্ত সরাসরি ডি ভি সিকে এই প্রলয়ংকরী বন্যার জন্য দায়ী করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রভাস রায় বলেছেন বন্যা নিয়ন্ত্রণ অথবা নতুন বাঁধ প্রকল্প বাবদ কেন্দ্রের মত আর্থিক সঙ্গতি রাজ্য সরকারের নেই। সরকারী নথি কিন্তু অন্য কথা বলে। দুর্গাপুরে ব্যারেজ অথবা নিম্ন দামোদর উপত্যকার নদ-নদী খাল-নালা নিয়ন্ত্রণ অথবা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে রাজ্য সরকারের হাতে। ১৯৬৪-৬৫ সালে এই গুরু দায়িত্ব রাজ্য সরকার ডি ভি সির হাত থেকে নিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু প্রায় প্রতি বছরে নদী-খালের পলি মাটি সরানো অথবা তার ব্যাপক সংস্কারের কোন ব্যবস্থা সরকার করেছেন বলে জানা যায় নি। ফলে মাইথন-পাঞ্চেত বাঁধের জল যখন দুর্গাপুর ব্যারেজ হয়ে নিম্ন দামোদরের বিস্তীর্ণ উপত্যকায় পৌঁছে ও সেচের জন্য ছাড়া হয়, তখন সামান্যভাবে তা প্রতিহত হয়। কারণ সুদীর্ঘকাল নদী ও খালগুলি অসংস্কৃত থাকায় তার বুক পলিমাটি জমে নদীর জল বহন ক্ষমতা নিদারুণভাবে কমিয়ে দিয়েছে। তার উপর ঐ জল ছাড়া না ছাড়ার সর্বশেষ দায়-দায়িত্বও দুর্গাপুর ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের। এ ছাড়াও রাজ্যের সেচ দপ্তরের বহু ইঞ্জিনিয়ার বর্তমান বর্ষাকালের পূর্বাভাস সম্পর্কে বিভিন্ন মহলে সরকার সতর্ক করেছেন। তবে তাঁরা এত বছর কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেও বন্যা রোধ করতে পারেন নি। এইসব দায়-দায়িত্ব যথাযথভাবে পর্যালোচনা করে কোন পক্ষ দায়ী তা খতিয়ে দেখে বোঝা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। কোনও বিপর্যয় অথবা বিপদ দেখা দিলে নিজেদের দায়িত্ব ও দায় ভুলে অন্যের উপর দোষ চাপানো সহজ। দায়িত্বহীন রাজনীতিতে ভিত্তি ও যুক্তিহীন বক্তব্য প্রচার সম্ভব কিন্তু দায়িত্বশীল যোনও সরকার বা দলের পক্ষে তা অমার্জনীয় অপরাধ। দল বা সরকারের জন্য দেশ নয়। দেশের লোই মানুষে দল বা সরকার চায়। এই মৌল কথা এই মুহূর্তে বিশেষভাবে স্মর্তব্য।

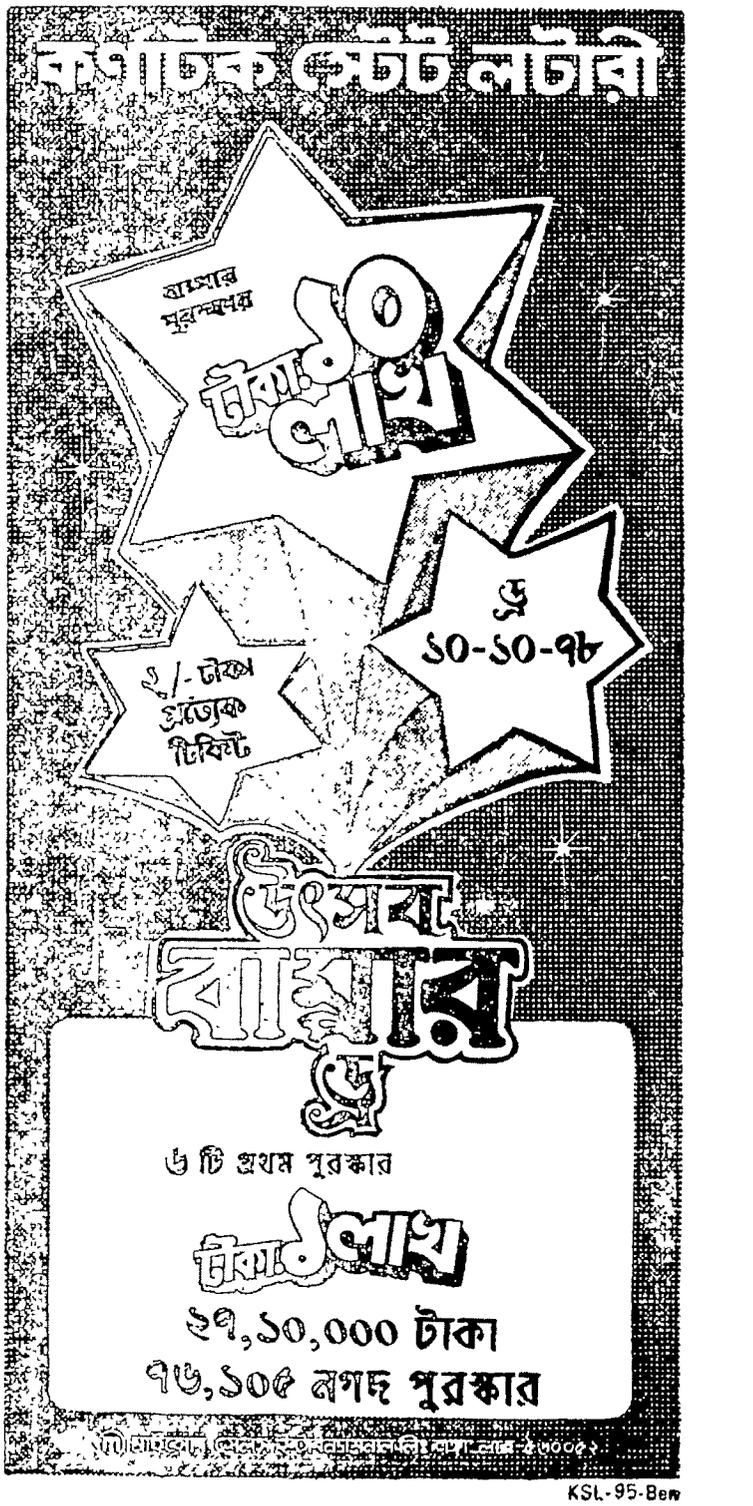

KSL-95-Beng

শস্যের সময়

কবিরুল ইসলাম

আমার উননে আঁচ বয়ে যাচ্ছে, এ বয়সে যেরকম যায় ঃ
তোমার বছর কি আঠারো মাসে বাঙালির মতো ?
এখনই তো শস্যের সময়
আমার গাঙ্গেয় ভূমি হলকর্ষণের জলে
প্রিয় পাঁকালো মাছের আবাস
বর্ষণে বর্ষণে

এই তো সময়।

আমার উননে আঁচ বয়ে যাচ্ছে। এদিকে এখনও তোমার
বাজারই হলো না। কখন বা রান্না হবে, স্নান হবে
খাওয়া হবে, দুপুরে আলস্য হবে—
তুড়ি-দেওয়া হাই উঠবে

ক্ষান্ত সমাদরে।

শোনো, এখনই তো শস্যের সময়।।

লক্ষ্য

উদয়ন ভট্টাচার্য

আমাকে সেইভাবে ডাকো
যেভাবে সমুদ্রগামী নদী জলের কল্লোলে
ডেকেছে পাহাড়
আমি সেইভাবে লজ্জিত চলে যেতে চাই
ভেসে, সেইভাবে একাগ্র বেহুলা।

আমাকে সেইভাবে ভাঙো
যেভাবে শালীন বজ্রপাতে ভেঙে যায় বোধিবৃক্ষ
আমি সেইভাবে সাধারণ ভেঙে যেতে চাই
নমনীয়, সেইভাবে ছিন্নমূল

সনাতক

গৌতম চৌধুরী

বিনা মেঘের বজ্র, আজ তোমার পায়ের নীচে নামিয়ে রাখি
আমার মিথ্যে কবচকুণ্ডল
ওরা ছিলো, ওরা আমার জন্ম থেকে ছিলো, বাঁচিয়ে রাখার ছদ্মবেশে
ভীষণ সর্বনাশের মতো ছিলো
নিরাভরণ পৌরুষের দিগন্তহীন মাঠের মধ্যে ওরা আমায়
এক মুহূর্ত দাঁড়াতে দায়নি
আজ তোমার ঝরাকুসুম অঙ্কুশের ঘাড়ে পেতে দিলাম
ধর্মহীন বর্মহীন বুক
তোমার ধ্বংস-নিষ্ঠুরতার অসহ্য আলোতে মেলে দিলাম
আমার জল আমার মহাদেশ
এই আমার স্পর্ধা হোক ভস্ম হবার প্রবল স্বাধীনতায়
জ্বলে উঠুক শরীর পরিত্রাণ
পরিবর্তে, দিনান্তের আগে
বিনা মেঘের বজ্র, আমায় একবিন্দু ভাস্বরতা দাও

কে বন্ধু

জীবন সরকার

এই তপ্ত বাতাসে
রুমাল উড়িয়ে
দেখে নেবেন
বন্ধু বলতে কি বোঝায়!
দশতলা চারতলা
রাস্তাঘাট টঙমরাস
অনেক তো দেখা হলো
এবার রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে
রুমাল উড়িয়ে জেনে নেবেন
কে বন্ধু...কে স্বজন

শনি রাহুর অশুভ আঁতাত

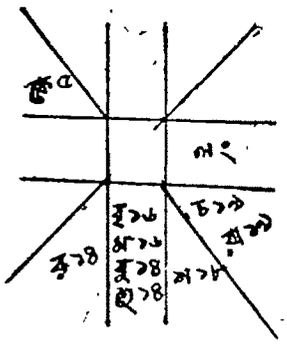

ধনুরাশি, মূলানক্ষত্রের জাতক শ্রীপাদ ভাসে, মকর লগ্নে জন্ম। রাজযোগ-কারক গ্রহ শুক্র, স্বগৃহে অবস্থিত। বোধন শক্তির কারক বুধ গ্রহ, ভাগ্যে পতি হয়ে কর্মপতির সঙ্গে সম্পর্ক করেছে, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, নিষ্ঠা শ্রমের কারক গ্রহ শনি, একাদশে বসে স্বগৃহে লগ্নকে দেখছে। দুঃস্থানপতি বৃহস্পতি, কেন্দ্র স্বনক্ষত্রে বসে যেমন নিজে বলবান হয়েছেন—তেমন সুখেশ মঙ্গল গ্রহকেও নিজের নক্ষত্রে এনে বলবান করেছেন। উপরোক্ত যোগগুলি জাতকের পক্ষে যথার্থই সহায়ক হয়েছে সন্দেহ নেই। কারণ বুধ শুক্রের যোগে জাতককে যেমন লেখক, রাজনীতিবিদ করেছে, তেমন মঙ্গল, বৃহস্পতির যোগে জাতককে করেছে জেদী, একমতবাদী নেতৃত্বের অধিকারী। কিন্তু জন্মকালীন গ্রহ, যতই শুভফলদাতা হোক না কেন, ঘূর্ণায়মান (গোচর) গ্রহের ঘাত প্রতিঘাতের ফল প্রত্যেক জাতককেই পেতে হয়। তাই, যেমন বর্তমানে অশুভ শনির (গোচরে) প্রভাবে জাতকের বিরোধীভাবাপন্ন ব্যক্তিদের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, স্বীয় দলের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হতে চলেছে, বিশেষ করে পূর্ব ভারতে—তেমন পূর্বেও জাতককে বহুবার দলের মধ্যে বিতর্কিত অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

৬৪ সালে পার্টি হলো দ্বিধাবিভক্ত। ঐ সময় জাতকের রাহুর দশা প্রায় শেষপ্রান্তে ছিল। আরম্ভ হলো বৃহস্পতির দশা, জাতক পার্টির সর্বোচ্চ চেয়ারম্যানের পদ-প্রাপ্ত হলেন বটে, কিন্তু কিছু সহযোগী-দের সঙ্গে মতবিরোধ হলো। কারণ, নবাংশ চক্রে ঐ সময় শনির অবস্থান খুবই অশুভ ছিল।

যদিও, জাতকের নবাংশ চক্রে শুক্র বুধ বর্গোত্তম। স্বগৃহগত হয়েছে বৃহস্পতি, রবি, চন্দ্র এবং শনি গ্রহ। এইগুলি জাতকের পক্ষে যেমন শুভদায়ক, তেমন দেখা যায়—গোচরে শনির পাপগ্রহের সঙ্গে সংঘাত জাতককে করে তোলে বিব্রত ব্যতিব্যস্ত। তাই, ঘূর্ণায়মান শনি ১৯৭৭ সালে যেমনি কর্কটরাশি থেকে সিংহ রাশিতে গিয়ে নবাংশের রবিকে পেল অথবা লগ্নের মারক স্থানে গেল জাতককে আবার কিছু বিরোধী বিতর্কের সম্মুখীন হতে হলো। এখন, জাতকের বৃহস্পতির দশাও

শেষ হয়েছে। '৭৮ সালের মে মাস থেকে আরম্ভ হয়েছে শনির দশা। এবার জাতকের পক্ষে রাহুর প্রভাবটাও দেখা থাক। আগে, ঘূর্ণায়মান অর্থাৎ গোচর শনির কুপ্রভাবের ফল যতবার পেয়েছি, লক্ষ্য করবার মত—ততবারই দেখা যায় শনির সঙ্গে রাহুর একটা অশুভ আঁতাত অথবা অশুভ প্রভাব। বর্তমানে শনির দশা যেমন অশুভ, তেমন লক্ষ্য করার মতো গোচরেও রাহু '৭৮ সালের নভেম্বরের মাঝামাঝি অশুভ স্থানে সিংহ রাশিতে যাচ্ছে। সেখানে এখন মহাগ্রহ শনি বসে আছে। তাছাড়া বর্তমানে তুলা রাশিতে ২৪ অকটোবর পর্যন্ত, তারপর বৃশ্চিক রাশিতে ৪ ডিসেম্বর এবং ধনু রাশিতে ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত মঙ্গলের পরিক্রমা মোটেই শুভ বলে প্রতীয়মান হয় না।

ব্যক্তিগত রাশিফল

নীচে সম্ভাব্য ব্যক্তিগত রাশিফল দেওয়া হলো। সপ্তাহটি ইংরাজি ২২ সেপ্টেম্বর শুক্রবার থেকে আরম্ভ। গ্রহ-কুলের মধ্যে বুধ গ্রহ শনিবার সিংহ রাশি থেকে কন্যা রাশিতে গিয়ে রাহু এবং রবির সঙ্গে মিলিত হবে। এ-সপ্তাহে মঙ্গল রাহুর নক্ষত্রে, আর একই ঘরে শুক্র বৃহস্পতির নক্ষত্রে দিল্লির রাজনীতিতে চাঞ্চল্যকর সংবাদের ইঙ্গিত বহন করে। আগামী দুই সপ্তাহ খুবই লক্ষ্যণীয়।

মেষ : ব্যয়ের চাপ থাকবে। শত্রুদের তৎপরতা বৃদ্ধি পেতে পারে। রবি থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ শেষ করুন। বৃহঃ অশুভ।

বৃষ : কর্মক্ষেত্রে অহেতু উপদ্রব দেখা দিলেও, ক্ষেত্রবিশেষে মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। বুধ বৃহঃ শুভ।

মিথুন : কোন ব্যাপারেই আপনার হঠাৎ উত্তেজিত হওয়া ঠিক হবে না। স্বাস্থ্য উৎপাত করতে পারে। সোম, মঙ্গল শুভ।

কর্কট : ব্যবসাতে আশানুরূপ ফললাভে বিঘ্ন। স্বাস্থ্যও উৎপাত করতে পারে। কোন বন্ধুর সহায়তা পাবেন। বুধ, বৃহঃ শুভ।

সিংহ : সময়টা এখনও কিছুদিন প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে যেতে পারে। অংশীদারমূলক ব্যবসাতে বিভ্রাট দেখা দিতে পারে। আর্থিক ব্যাপারে অনেকটা সুরাহা দেখা যায়। দূরের কোন সংবাদ আনন্দ দিতে পারে। শনিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত লক্ষ্যণীয়।

কন্যা : চাকুরীক্ষেত্রে স্বীয় মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে। উর্ধ্বতনদের সঙ্গে হৃদ্যতা বৃদ্ধি পাবে। প্রেম-প্রীতিতে আনন্দ লাভ। শুক্র, শনি ছাড়া সপ্তাহটি ভাল।

তুলা : যদিও ব্যবসাতে পসার বৃদ্ধি পাবে। অথবা কোন যোগাযোগ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করবে। কিন্তু কোন কারণে অর্থব্যয় চিন্তার কারণ হতে পারে। সোম, মঙ্গলবার অশুভ।

বৃশ্চিক : কর্মক্ষেত্রে কোন কারণে মন বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারে। ফল ফলে নতুন ভাবনার বিমর্ষ অসম্ভব নয়। বুধ, বৃহস্পতিবার অশুভ।

ধনু : কর্মস্থানে দৃঢ় মনোভাব বহুলাংশে আপনার শুভ করবে। ব্যবসাতেও আপনাকে কোন কোন ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করতে হতে পারে। বৃহঃ ছাড়া সপ্তাহটি মন্দ নয়।

মকর : কার্যকারণে মনের অবস্থা খারাপ থাকলেও, সপ্তাহের শেষভাগে কোন ব্যাপারে সম্মান পেতে পারেন। সংগঠনমূলক কোন কাজে বাধা আসতে পারে। ধারের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। এরই মধ্যে মঙ্গলবার থেকে বৃহঃবারের মধ্যে কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে।

কুম্ভ : ব্যবসাতে বিঘ্ন পড়ায় মনের চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাবে। ডাক্তার এবং বুদ্ধিজীবিদের পক্ষে সময়টা কিছু অনুকূল। পথ চলতে আঘাত পাওয়া থেকে সাবধান থাকুন। বুধ, বৃহঃ শুভ।

মীন : ন্যায্য প্রাপ্তিতে হয়তো কিছুটা বিঘ্ন থাকতে পারে। অথবা, অর্থকড়ির প্রাপ্যের ব্যাপারে পিছিয়ে যেতে পারে, কিন্তু নিজগুণে সম্মান এবং উচ্চ যোগাযোগ, বিশেষ করে লেখক, সাহিত্যিকদের পক্ষে খুবই লক্ষ্যণীয়। বৃহঃ অশুভ।

—শ্রীমাণিক্য

আগামী সংখ্যায়
চরণ সিং

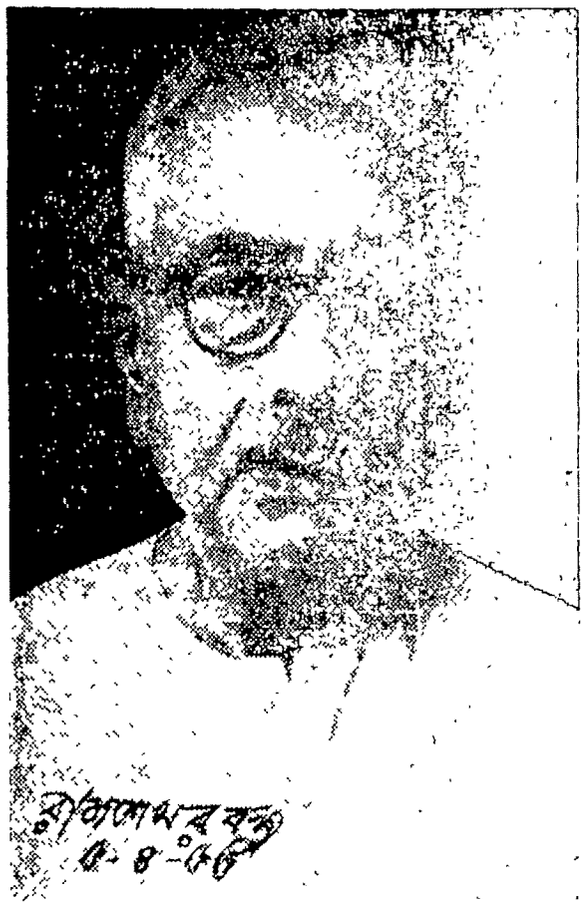

রাজশেখর

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

আশী পেরিয়েও তরুণ যুবকের মত টাল থেকে টালিগঞ্জ টহল দিয়ে বেড়ান আমাদের পাড়ার পঞ্চানন সেন মশাই। রাজশেখরের কথা উঠতেই আমার তখতে তাউস চাপড়ে হাসতে হাসতে বলেন—'বড্ড গম্ভীর ছিলেন। হাসি-গল্প লিখলে কি হয়। কিন্তু মশাই, নবেন বোস বরদাস্ত করতেন না। কালেকটারের বাঘা-ভালুকো মেজবার ছিলেন রাজশেখরবাবুর ভগ্নিপতি নবেন বোস। ওই রকম গম্ভীর লোকটার পিঠে চাপড় মেরে বলতেন, আরে ভাই একটু প্রাণ খুলে হাসো তো।' অথচ এটা আজকের দিনে বিশ্বাস করবে কে। রাজশেখরের গল্প পড়লে যে-কোন প্যাঁচামুখোরও হাসতে হাসতে দম ফেটে যাবার দাখিল। ত্রৈলোক্য মুখুয্যেকে চোখে দেখি নি কিন্তু আর যাঁরা পাঠকদের হাসির খোরাক জুগিয়ে বাংলা সাহিত্যে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন তাদের 'হাসকুটে' বলে বদনাম দেওয়া যায় না। বরং ঠিক তার বিপরীত। রাজশেখর বসু এবং বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় দুজনকেই খুব কাছাকাছি দেখেছি অনেক বার। দুজনেই বেশ গম্ভীর। রাজশেখরের হাসিটুকু গোফের কোলে আর চোখের তারায় মোমের আলোর মত মোলায়েম উজ্জ্বলতায় স্নিগ্ধ ঘন হয়েছে, বিভূতি মুখুয্যের ডায়মণ্ড কাটা মুখমণ্ডলের পাশে মিষ্টি হাসিটুকু বড়ই অল্প দীপ্তি। এই সব দেখে-শুনে এমনও ভাবা যায় যে, 'পরার্থে উৎসর্জেৎ প্রাজ্ঞ' বহু ভাবনা নিজের জন্যে কিছু মজুত না রেখে ঢেঁড়েমুড়ে হাসির ভাণ্ডারের সবটুকুই উজাড় করে দিয়ে হর্ষবর্ধন হয়ে বসে আছেন।

সে যা-ই হোক সিরিয়াস ছোট গল্প-উপন্যাসে সুরসিকের বাংলা সাহিত্যে হাসির চাষী বিরল। অবিশ্যি কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তীর লেখায় হাসি, শ্লেষ, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ মেলে। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় সিরিয়াস উপন্যাস আর হাসির গল্পে সমান সিদ্ধকাম। তাদের কারুর সঙ্গেই রাজশেখরের রচনার সাদৃশ্য নেই—না ভাষায়, না বিষয়ে: যদিও রাজশেখরের বাল্য-কৈশোর স্বভাবভাষায় কেটেছে, বিভূতি মুখুয্যেরও, তা-ই—কেউ কেউ ভাবতে পারেন হয়ত ওখানকার মাটিই হাসির পক্ষে অনুকূল। কিম্বা রাজশেখর বিভূতিবাবুকে প্রেরণা জুগিয়ে থাকবেন। না, সে রকম গবেষণার অবকাশ নেই। কেননা রাজশেখর মাত্র কয়েক বছর স্বভাষায় ছিলেন। আর অনুমানের সুযোগ কোথায়? রাজশেখরের চেয়ে বয়সে ষোল বছর ছোট হলেও সাহিত্যক্ষেত্রে বিভূতিবাবু সিনিয়র, ইং ১৯১৪।১৫ সাল থেকেই তাঁর গল্প পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, পুরস্কৃতও হয় এবং তিনি প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মত ডাকসাইটে সম্পাদক ও সাহিত্যিকের মন্ত্র পান।

সব দিক দিয়েই রাজশেখর ব্যতিক্রম। যে-বয়সে আর সকলে সাহিত্যের বাজারে আসন কায়েম করে জমিয়ে বসে তখনও তিনি ধনের তার বাঁধছেন কিনা তা-ই কেউ জানতে পারে নি। একেবারে বিয়াল্লিশ বছর বয়সে হঠাৎ আসরে নামলেন আর প্রথম গল্পেই তাঁর অনন্যসাধারণ ওস্তাদী মীড়ের টানে পাঠকের মনকে মজিয়ে একেবারে দখল করে নিলেন। আসলে সাহিত্যের আসরে নামবার কোন বাসনা আদৌ তাঁর মনের কোণে বাসা বেঁধে ছিল কিনা সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ আছে। অবিশ্যি খোদ রাজশেখরের জবানবন্দী নয়, পূর্বোক্ত পঞ্চানন সেনমশাই-এর মুখ থেকে শুনিছে। উনি তখন বেঙ্গল কেমিক্যালের ম্যানেজার। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম এবং বরাবরই সর্বময় কর্তা। একখানা জরুরি দলিল হঠাৎ দরকার পড়াতে রাজশেখরকে খোঁজ করে প্রফুল্লচন্দ্র শুনলেন রাজশেখর সেদিন অফিসে আসবেন না। দলিলখানি কোথাও পাত্তা করতে না পেরে ম্যানেজার সাহেবের দপ্তরের কাগজপত্রের মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে অপ্রত্যাশিতভাবে যে পাণ্ডুলিপিটি আবিষ্কার করেছিলেন এবং পড়তে পড়তে কাজের কথা, সময়ের হিসেব ভুলে মেরে দিয়েছিলেন চিরকুমার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, তা-ই পরে 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' নামে ভারতবর্ষে প্রকাশিত রাজশেখরের প্রথম প্রকাশিত গল্প।

এবার খোদ রাজশেখরের জবানবন্দী হাজির করি। কথা-সাহিত্য পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে লেখার জন্য বকুলবাগানের বাড়িতে সামনা-সামনি বসে কথাবার্তা বলছি। নিজের সাহিত্য-সেবার প্রসঙ্গে তিনি গম্ভীরভাবেই বললেন : 'বালোর কবিতা রচনার শখের কথা বাদ দিলে এই প্রতিষ্ঠানেই (বেঙ্গল কেমিক্যাল) আমার সাহিত্যচর্চার আরম্ভ। এখানেই তার হাতেখড়ি বলতে পারা যায়। অবশ্য মূল্য তালিকা তৈরি করা বা বিজ্ঞাপন লেখাকে যদি কেউ সাহিত্য বলে গ্রাহ্য করে। শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেডের আগে আমার যা কিছু বাংলা রচনা তা এর বাইরে কিছু নয়।'

ইংরেজি ১৮৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন রাজশেখর কিন্তু ১৯২২ সালে অর্থাৎ ৪২ বছর বয়সে তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রকাশ্য অধিবেশন শুরু হল। তাও নিজের নামটি আড়ালে রইল। কেন এই ছদ্মনাম? আর আদৌ কোন ছদ্মনামই বা কেন? উনি জবাব দিয়েছিলেন যে, সাহিত্যিক হিসেবে নাম কেনার জন্যে কলম ধরি নি। লিখতে ইচ্ছে হয়েছিল তাই লেখা। শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড লেখার পর ভারতবর্ষ পত্রিকায় দেবার আগে, নিজের নাম প্রচারে বাধছিল, তাই ছদ্মনাম ব্যবহারের কথা মাথায় এল। একটা নাম চাই। এমন সময়ে 'তারাচাঁদ পরশুরাম' নামক স্মার্তবাগীশ-বংশীয় এক প্রতিষ্ঠানের পুরোহিতের বাহনে রাজশেখরের সামনে হাজির। ব্যস, ওই নামটিই লাগিয়ে দিলেন রাজশেখর।

শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেডের পর পরশুরামের ছদ্মনামে পর পর কয়েকটি গল্প প্রকাশিত হয়ে নামটিকে রীতিমত বিখ্যাত করে তুলল। 'পরশুরাম' রচিত ও 'নারদ' বিচিত্রিত! 'নারদ' নামের আড়ালে ছিলেন চিরকুমার সভার আজীবন-সদস্য শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন। মাণিকতলায়।

তিন বছরের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ এই পরশুরাম নাম প্রসঙ্গে ১৯২৫ সালে প্রবাসীতে লিখলেন :

'পিতৃদত্ত নামের উপর তর্ক চলে না, কিন্তু স্বকৃত নামের যোগ্যতা বিচার করিবার অধিকার সমালোচকের আছে। পরশু অস্ত্রটা রূপধ্বংসকারীর, তাহা রূপসৃষ্টিকারীর নহে। পরশুরাম নামটা শুনিয়া পাঠকের সন্দেহ হইতে পারে যে, লেখক বুঝি জখম করিবার কাজেই প্রবৃত্ত। কথাটা একেবারেই সত্য নহে, মূর্তিকারের ঘরে ঢুকিলে পাথর-ভাঙার আওয়াজ শুনিয়া যদি মনে করি ভাঙাচোরাই তার কাজ। তবে সে ধারণাটা ছেলেমানুষের মত হয়,—ঠিকভাবে দেখিলে বুঝা যায়, গড়িয়া তোলাই ব্যবসা। মানুষের অবুদ্ধি বা দুর্বুদ্ধিকে লেখক তাঁহার রচনায় আঘাত করিয়াছেন কিনা, সেটা তো তেমন করিয়া আমার নজরে পড়ে নাই। আমি দেখিলাম তিনি মূর্তির পর মূর্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন। এমন করিয়া গড়িয়াছেন যে, মনে হইল ইহাদিগকে চিরকাল জানি।... লেখক বুঝি আধুনিক রুদ্র তেজের দিনে নিজেকে বীরপুরুষের দলে চালাইয়া দিবার লোভ সামলাইতে পারেন নাই। কিন্তু আমরা তাঁহাকে বসন্তসভার দলেই দাবি করি। ইহাতে বর্তমান খ্যাতির অঙ্কে তাঁহার কিছু লোকসান হয়, সুদীর্ঘ ভবীকালে তাহা পূর্ণ হইয়াও উদ্বৃত্ত থাকিবে।'

প্রথম লেখাটি প্রকাশিত হয়েই রীতিমত সাড়া জাগিয়ে ফেলল। কিন্তু রাজশেখরকে তাতে মোটেই উৎসাহিত দেখা গেল না। তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালের কাজ নিয়েই বেশ আছেন, এবং তাই থাকতে চান। কিন্তু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, প্রবাসীর তরফ থেকে ব্রজেনবাবু এবং ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে জলধর সেন প্রমুখ ব্যক্তি রাজশেখরকে থামতে দিতে নারাজ। সাঁড়াসী আক্রমণে শান্তিপ্রিয় ভদ্রলোক আবার ধরলেন কলম। দ্বিতীয় লেখা শেষ করে আবার ছদ্মনাম সমস্যা। 'পরশুরাম' তাঁর মনঃপূত নয়। ওটা পাল্টে 'উপরিচর বসু' দেবেন স্থির করলেন। কিন্তু সেটি হবার নয়। 'পরশুরাম' কায়েম। যদিও উপরিচর পরশুরামের মত মহাভারতেরই একটি চরিত্র এবং তা কাজ উঁচু থেকে দেখা তবু রাজশেখরের ভক্তবৃন্দ এই নাম খারিজে নারাজ। অতএব 'পরশুরাম'ই 'উপরিচরকে' রুখে বহাল রয়ে গেল। রাজশেখর ভাবতেন বেশি, লিখতেন কম—আসলে বৈজ্ঞানিক নজরের কষ্টিপাথরে যাচাইয়ের পর গোটা গোটা মুক্তোর ছাঁদে কথারা লেখায় রূপায়িত হত। 'পরশুরাম' নাম প্রসঙ্গে এখানে আরও কিছু বলার আছে। ১৯২৯ সালে বেণু পত্রিকায় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের একটি লেখা প্রকাশিত হয় 'পরশুরাম' ছদ্মনামে। তখন রাজশেখরের এই ছদ্মনামটি বিখ্যাত হয়েছে এবং শরৎচন্দ্র নিশ্চয়ই নিজে ওই নাম ব্যবহার করেন নি। তিনি গান্ধীজীর চরকা আন্দোলনের প্রতিবাদ হিসেবেই রচনাটি বেণু পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছিলেন গোপনে অর্থাৎ লেখকের নাম ইচ্ছে করেই দেন নি। কেন না। তার আগেই তিনি স্বনামে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। সেই বিবৃতির সমর্থনে 'বেণু' সম্পাদকের কাছে পরবর্তী লেখাটি পাঠান—নিজের বিবৃতির সমর্থক নিজে হওয়া চলে না। যে কোনও একটা নাম দিতে নির্দেশ ছিল। 'বেণু' সম্পাদক প্রসন্নকুমার পাল অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই 'পরশুরাম'-এর নামে সেটি প্রকাশ করেন। সে সময়ে এই নিয়ে বেশ বিভ্রান্তি ঘটেছিল এবং অনুসন্ধানের ফলে ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যায়।

পরশুরামের প্রথম গল্পগ্রন্থ গড্ডালিকা বাংলা ১৩৩১ সালে ছাপা হয়। রাজশেখর নিজেই খরচ করে ছাপাচ্ছিলেন। সেই সময়ে মৌচাক সম্পাদক এবং এম বি সরকার প্রকাশনালয়ের কর্তা সুধীরচন্দ্র সরকার পাশীবাগানের 'উৎকেন্দ্র সমিতি'র আড্ডায় যাতায়াত শুরু করেছেন। এখনকার দিনের 'আড্ডা' নয়, সে-আমলে আড্ডায় অনেক গুণীজ্ঞানীরা একত্র জমে রীতিমত গুরুতর-পূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলেই আড্ডার রেওয়াজ ছিল। গোলদীঘির ধারে রাজশেখরের শ্বশুরবাড়িতে গত শতকে বিদ্যাসাগর মশাই আসতেন পটলডাঙার শ্যামাচরণ দের সঙ্গে আড্ডা দিতে, তারপরের আমলে ও-বাড়িতে আশুতোষ, বাসবিহারী ঘোষও আসতেন শুনেছি। পাশীবাগানে রাজশেখর-দের বাড়ির আড্ডাও ছিল সেই পর্যায়ের।

সুধীরবাবুর কিছু কাজও থাকত সেখানে। শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেনকে দিয়ে মৌচাক পত্রিকার কভার এবং অন্যান্য অলঙ্করণও করিয়ে নিতেন। গড্ডালিকা ছাপার পর ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশক হিসেবে নিজের নাম দিলেন আর-বই বিক্রির ভার দেওয়া হল সুধীরবাবুর ওপর। সুধীরবাবু বলেন : 'সেই থেকে পরশুরামের প্রায় সমস্ত বইয়ের প্রকাশের ভার আমার উপরেই পড়েছে। প্রকাশক ও গ্রন্থকারের সম্বন্ধ যে কত মধুর ও প্রীতিপূর্ণ হতে পারে তা যাঁরা পরশুরামের কাছে এই সূত্রে তাঁর নিকটে এসেছেন তাঁরা ভাল করেই জানেন।' (কথাসাহিত্য। শ্রাবণ ১৩৬০)।

রাজশেখরের জীবনে যদি কারুর কিছু প্রভাব পড়ে থাকে তবে তা তাঁর পিতার। যাকে বলে নিজে হাতে মানুষ করা, চন্দ্র-শেখর তা-ই করতেন। শুধু লেখাপড়াই নয়, পরিচ্ছন্নতা, নিয়মানুবর্তিতা প্রতিটি বিষয়েই তিনি নিজে যেমন নিষ্ঠাবান ছিলেন ছেলেদেরও তেমনি করতে চেয়েছিলেন। এই নিয়মের ভিত এমনই পাকাপোক্ত যে, গোটা জীবনটাই সেই ছাঁদে চলে এসেছে। বাংলাদেশের ঢিলেঢালা চালচলনের ঢেউ এই চার ভাই-এর কারুর ওপরই যেন বিন্দুমাত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ ১৯০৩ খৃস্টাব্দে এবং ওই সময়ই তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালের বাসায়নিকের পদে বহাল হলেন। এই শতকের প্রথম যুগে ইংরেজদের দাপটে গোটা দেশ অস্থির। ফরাসী আর ইংরেজ কোম্পানিগুলির রাম-রাজত্ব। বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল স্বাদেশিকতার অনুপ্রেরণা। রাজশেখর যখন চাকরিতে ঢুকলেন, তখন আপার সার্কুলার রোডে ছিল বেঙ্গল কেমিক্যালের অফিস। এর অল্পদিন পরেই দপ্তর চলে আসে অ্যালবার্ট বিল্ডিংসে। সেখানে ন' বছর বেঙ্গল কেমিক্যালের অফিস ছিল। 'অ্যালবার্ট হল' পড়বার পর রাজশেখর এই কথাটি জানিয়েছিলেন আমাকে। শুনে তাঁর কুণ্ঠিত বোধ করেছিলাম কেননা তার আগে লিখিতভাবে বইটি সম্পর্কে প্রশংসাই করেছিলাম। অকারণে অন্যের ত্রুটিকে বড় করে না-দেখা তাঁর চরিত্রের উল্লেখযোগ্য দিক। আমরা বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রসঙ্গে ফিরি। অ্যালবার্ট হল থেকে চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যুতে মেডিকাল কলেজের কাছে কোম্পানির অফিস স্থানান্তরিত হয় এবং দীর্ঘকাল ওখানেই ছিল। ১৯০৩-এ কাজে যোগ দেবার এক বছরের মধ্যে তিনি কোম্পানির ম্যানেজারের পদে উন্নীত হলেন। তবে রাজশেখরকে বেশির ভাগ সময় মাণিকতলার কারখানাতেই কাটাতে হত। তিনি কোম্পানির প্রতিটি বিষয় নিজেই তত্ত্বাবধান করার পক্ষপাতী ছিলেন। একনাগাড়ে প্রায় তিরিশ বছর ধরে যুক্ত থেকে এই প্রতিষ্ঠানটিকে নিজের মনোমত করে গড়ে তুলেছিলেন রাজশেখর। কত ছোট থেকে এই স্বদেশী প্রতিষ্ঠানটি যে কী বিরাট রূপ পেয়েছিল আজ সেটা কল্পনা করা দুঃসাধ্য। রাজশেখরের স্বদেশীয়ানা এই প্রতিষ্ঠানের হিসাবপদ্ধতিতে পর্যন্ত বাদ যায়নি। যতদূর সম্ভব বেঙ্গল কেমিক্যালের খাতাপত্র তিনি বাংলায় রাখার রেওয়াজ চালু করেছিলেন। বিভিন্ন বিভাগের নামকরণেও বিদেশী ভাষাকে পাত্তা দেননি। বেঙ্গল কেমিক্যালের ওষুধপত্র ও প্রতিটি উৎপাদনের নাম-করণেও তিনি সংস্কৃত শব্দের আশ্রয় নিয়েছেন। কারুর কারুর ধারণা ছিল যে, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়-ই বেঙ্গল কেমিক্যালের

মত জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ কিন্তু তাঁর এই স্বদেশী-শিল্প প্রতিষ্ঠানটিকে যথাযথ সার্থক রূপদানের পিছনে রাজ-শেখরের মত অক্লান্ত কর্মীর দূরদৃষ্টি এবং বজ্রকঠিন সংকল্প নিঃশব্দে কাজ করে গিয়েছে। পরশুরামের গড্ডলিকা পড়ে রবীন্দ্রনাথ যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন, তাতে আচার্য প্রফুল্ল-চন্দ্র রায় যত আনন্দিতই হয়ে থাকুন না কেন, মনে মনে বোধ করি তাঁর আশংকা হয়েছিল যে, তাঁর ডান হাত হিসেবে এতকাল যে রাসায়নিক এবং সুদক্ষ পরিচালক বেঙ্গল কেমিক্যালের শ্রীবৃদ্ধি করে এসেছেন, তাঁকে সাহিত্যের আসরে টানতে চাইছেন রবীন্দ্র-নাথ। অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর একখানি চিঠিতে আমরা তা-ই দেখতে পাই। বস্তুতঃ এই দিক্‌পাল বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে কবিগুরুর কপট লড়াই উল্লেখযোগ্য ও উপভোগ্য।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

শেষ বয়সে আপনাকে লইয়া বড়ই মুস্কিলে পড়িলাম। চরকার সপক্ষে বিপক্ষে যাহাই লিখুন না কেন, তাহাতে বরং সমাজের উপকারই, এ-বিষয়ে যত বাদানুবাদ হয়, ততই ভাল।

...সম্প্রতি দেখিতেছি আপনি সত্য সত্যই আমার ক্ষতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 'গড্ডলিকা'র প্রথম সংস্করণ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যখন দেখি সাহিত্যসম্রাট স্বয়ং তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন অচিরে পর পর বারো হাজার কপি বিক্রয় হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সেদিন গল্পকল্পর পরশুরামকে আমি বলিলাম, এপ্রকার সৌভাগ্য কদাচিৎ কোনো লেখকের ঘটিয়া থাকে। এখন তাঁহার মাথা না বিগড়াইয়া যায়। তিনি আমারই হতের তৈয়ারী একজন বাসায়নিক এবং আমার নির্দিষ্ট কোনো বিশেষ কার্যে অনেকদিন যাবৎ ব্যাপৃত। কিন্তু এখন তিনি বুঝিলেন যে, সাহিত্যক্ষেত্রেও একজন 'কেস্ট-বিস্টু'। সুতরাং আমাকে অসহায় রাখিয়া ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইতে পারেন।

আর একটি কথা।—আপনি তো এগারো-বারো বৎসর বয়স হইতেই কবিতা লিখিতেছেন। শুনিয়াছি ঈশ্বর গুপ্ত তিন বৎসর বয়সেই পদ্য রচনা করিয়াছিলেন এবং পোপ নাকি কিশোর বয়সেই বলিয়াছিলেন :

ফাদার-ফাদার মার্সি টেক্‌
আই শ্যাল নো মোর ভরসেন যেক।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, চল্লিশ বৎসর বয়সের পর নূতন ধরনের কিছু কেহ রচনা করিতে পারেন না, কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাসে দেখিয়াছি, নিউটন ৪৩।৪৪ বৎসর বয়সের পূর্বেই অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন, কিন্তু গ্যালিলিও সেই বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর যুগান্তর সংঘটনকারী আবিষ্কার করেন, আবার শুমান পঞ্চাশ বৎসর বয়সের পর জড়বিজ্ঞানের নূতন আবিষ্কারের দ্বারা জগৎকে চমৎকৃত করেন। রিচার্ডসন ফাদার অফ ইংলিশ নভেলিটিস্‌ পুস্তক-বিক্রেতা ছিলেন এবং আমার যেন স্মরণ হইতেছে, যখন পঞ্চাশ বৎসরের কাছাকাছি তখন তিনি নভেল লিখিতে হাত দেন। আমাদের পরশুরামও ৪৩।৪৪ বৎসরে বয়সে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আসল কথা এই যে, আপনাকে কি অনুরোধ করিব যে, আর একটি এমন তীব্র সমালোচনা করুন যে, পরশুরামের হাত হইতে পরশুরামের কুঠার খসিয়া পড়ে? এক সময়ে পড়িয়া-ছিলাম যে, অনেক তস্কর ও শঙ্কিত গুহায় নিহিত থাকে, কিন্তু ভগবানের লীলা কে বুঝিবে, কাহাকে কখন গুপ্ত অবস্থা হইতে সুপ্রকাশ করিয়া তুলেন!

ভবদীয়
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

এই চিঠির জবাবে শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথও সমান ভাষায় কপট হুংকার দিলেন।

সুহৃদ্‌বর,

বসে বসে সায়ান্টিফিক্‌ অ্যাডভেঞ্চার পড়ছিলুম এমন সময় চিঠির খামের কোণে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-সরস্বতীর পদাঙ্ক দেখতে পেয়ে সন্দেহ হল আমার হৃৎপদ্ম থেকে কাব্য-সরস্বতীকে বিদায় করে তিনি স্বয়ং আসন নেবেন এমন একটা চক্রান্ত চলছে। খুলে দেখি যাকে ইংরেজিতে বলে টেবিল ফেরানো—আমারই পরে অভিযোগ যে, আমি রসায়নের কোঠা থেকে ভুলিয়ে ভদ্রসন্তানকে রসের রাস্তায় দাঁড় করাবার দুষ্কর্মে নিযুক্ত। কিন্তু আমার এই অজ্ঞানকৃত পাপের বিরুদ্ধে নালিশ আপনার শোভা পায় না, একদিন চিত্রগুপ্তের দরবারে তার বিচার হবে। হিসেব করে দেখবেন কত ছেলে যারা আজ পেটমোটা মাসিক-পত্রে ছোট গল্প আর মিলহারা ভাঙা ছন্দের কবিতায় সাহিত্যলোকে একেবারে কিষ্কিন্ধ্যা বাধিয়ে দিতে পারত। এমনকি লেখাদারগ্রস্ত সম্পাদকমণ্ডলীর আশীর্বাদে যারা দীপ্তশিখা সমালোচনার লংকাকাণ্ড পর্যন্ত বড় বড় লাফে ঘটিসে তুলত, তাদের আপনি কাউকে বি এস-সি। কাউকে ডি এস-সি লোকে পাব করে দিয়ে ল্যাবরেটরির নির্জন নিঃশব্দ সাধনায় সন্ন্যাসী করে তুললেন। সাহিত্যের তরফ থেকে আমি যদি তার প্রতিরোধ নিতে চেষ্টা করে থাকি, কতটুকুই বা কৃতকার্য হয়েছি। আপনার রাসায়নিক বন্ধুটিকে বলবেন মাসিকপত্র বলে যেসব জীবাত্মা হয়ত বা সাহিত্যবীর হতে পারত, ভূস্বর্গের মাঠে তাদের অঘটিত সম্ভাবনার প্রেতগুলির সঙ্গে আপনার মোকাবিলার পালা যেন তিনি রচনা করেন।

আমার কথা যদি বলেন—আপনার চিঠি পড়ে আমি অনুতপ্ত হইনি। বরঞ্চ মনের মধ্যে একটু গুমর হয়েছে। এমনকি, ভাবছি স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মতো শুদ্ধির কাজে লাগব, যেসব জন্মসাহিত্যিক গোলেমালে ল্যাবরেটরির মধ্যে ঢুকে পড়ে জাত খুইয়ে বৈজ্ঞানিকের হাটে হারিয়ে গিয়েছেন, তাঁদের স্বেচ্ছ একবার জন্মতে তুলব। আমার এক একবার সন্দেহ হয় আপনিও বা সেই দলের একজন হবেন, কিন্তু আপনার আর বোধহয় উদ্ধার নেই। যাই হোক আমি রস যাচাইয়ের নিক্ষষে আঁচড় দিয়ে দেখলেম, আপনার বেঙ্গল কেমিক্যালের এই মানুষটি একেবারেই কেমিক্যাল গোল্ড নন, ইনি খাঁটি খনিজ সোনা।

এঞ্চলে যদি আসতে সাহস করেন, তাহলে মোকাবিলায় আপনার সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করা যাবে।

ইতি ১৮ শ্রাবণ, ১৩২২

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯২২ সালেই সাহিত্যের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ রাজ-শেখরকে চিনলেও সামনাসামনি পরিচয় ঘটেছিল ১৯২৬ সালে অমল হোমের বাড়িতে এবং রবীন্দ্রনাথেরই আগ্রহাতিশয্যে। রাজশেখর বরাবরই স্বভাবকুণ্ঠিত কর্মধর্মী মানুষ, নইলে আগেই শান্তিনিকেতনে ধাওয়া করতেন বা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কলকাতাতে সাক্ষাতের সুযোগ করে নিতেন। চার বছরের মাথায় আমন্ত্রণ পেয়ে এবং সাক্ষাতের পর রাজশেখরের মনের অবস্থা কিরকম হয়েছিল তার দলিল মেলে মৈত্রেয়ী দেবী সম্পাদিত পঁচিশে বৈশাখ পত্রিকার রাজশেখরের লেখা 'প্রথম পরিচয় স্মৃতিচিত্রে'।.. প্রায় কুড়ি বছর আগের কথা। অমল হোম মশাই বলে পাঠালেন, রবীন্দ্রনাথ সন্ধ্যায় তাঁর বাড়িতে আসবেন, আমাকে দেখতে চান। ভয় হল, কারণ আমি দর্শনীয় লোক নই, বয়স হলেও অভ্যস্ত গণ্ডির বাইরে লাজুক, কুণো আর অসামাজিক হলেও আমার বদনাম আছে। কাব্যজ্ঞান কিছুমাত্র নেই, অন্য সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ও নগণ্য। কি সম্বল নিয়ে কবির সঙ্গে আলাপ করব?....

'কবি কি মনে করেছিলেন জানি না, কিন্তু আমি নিরাশ হইনি। আগন্তুকের সমস্ত সংকোচ এক মুহূর্তে দূর করবার আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁর ছিল। যার যে বিষয়ে বক্তব্য তাই বুঝে নিয়ে তিনি আলাপ করতে পারতেন। পরে দেখেছি, শিক্ষিত-অশিক্ষিত ছেলে-বুড়ো সকলেই তাঁর সঙ্গে অবাধে মিশেছে, এমনকি উপদ্রবও করেছে। তাঁর কাছে মোমটাকুলতা পুরোনো-

বধূরেও জরুরতা দূরে হয়েছে, যেমন তীর্থস্থানে ছর....' রাজশেখর বসু ।। ১৮-২-৪৬ ।।

আর সেই সাক্ষাতের পরদিনই রবীন্দ্রনাথ অজয় হোমকে পত্রে জানান : 'অমল, কাল তোমার ওখানে রাজশেখরবাবুর সঙ্গে কথা বলে ভারি খুশি হয়ে এসেছি। ওঁর হাতে কুঠার আছে কিনা জানি না, কিন্তু অন্তরে আছে পাবক যা নিঃশেষ করে চিত্তবৃদ্ধির আবর্জনা। উনি সহজ করে সব জানেন—সহজ করে সব বলতে পারেন। ওঁকে একবার শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসবার ভার রইল তোমার উপর।'

শশিশেখর ইংরেজিতে বিভিন্ন বিষয়ে পত্র-পত্রিকায় লিখতেন এবং পরে বাংলাতেও লিখেছেন। কৃষ্ণশেখর ছিলেন সমাজ-সংস্কারক। ১৪ নম্বর পাশীবাগানের বাড়িতে উৎকেন্দ্রের আড্ডার আচার্য যদুনাথ সরকার, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ আসতেন।

রাজশেখরকে কেন্দ্র করে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের মনোশীলন রবীন্দ্রনাথ ও প্রফুল্লচন্দ্রের কৌতুক-যুদ্ধ অনেকেই উপভোগ করেছিলেন, বোধ করি রাজশেখর নিজেই সবচেয়ে বেশি। বেঙ্গল কেমিক্যালের কাজকর্ম আর সাহিত্য সৃষ্টি দুইদিকই সমান কৃত্যে লালিত হয়েছিল এবং যথাসময়ে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করলেও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর হিসেবে যুক্ত থেকে সেবা ও পরামর্শ দিয়ে গিয়েছেন তিনি।

রাজশেখর চরিত্রের গঠন কি ধরনের ছিল তার একটা নমুনা দিলে বাদবাকি অনুমান করতে অসুবিধে হবে না। ডক্টর সুহৃৎচন্দ্র মিত্র গিরীন্দ্রশেখরের ছাত্র এবং বসু পরিবারের অন্তরঙ্গ মানুষ। গিরীন্দ্রশেখরের সুবাদে তিনি রাজশেখরকে মেজদা বলে ডাকতেন। তিনি লিখছেন, 'যখন তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে, সেই সময়ে একদিন আমার বেঙ্গল কেমিক্যালের অফিসে—যে অফিসের তিনি সে-সময়ে ম্যানেজার ছিলেন, কার্যবশত দেখা করতে যেতে হয়েছিল। কাজের কথা হয়ে যাবার পর আমি—যেমন আমাদের বেশির ভাগ লোকেরই অভ্যাস, তাঁকে দু-একটা বাড়ির খবরের কথা জিজ্ঞেস করেছিলুম। কিছুমাত্র দ্বিধা না করে তিনি তখনই বলে দিলেন—ওসব কথা ত অফিসের নয়—অফিসের সময় নষ্ট না করে বাড়িতে জিজ্ঞেস করবেন, এই বলে তিনি নিজের কাজে মন দিলেন।....বেঙ্গল কেমিক্যালের অতবড় কারখানাতে কোনো জায়গায় কোনরকম নোংরামির—যেমন থুতু ফেলা প্রভৃতির তিনি কখনও প্রশ্রয় দিতেন না। এ-বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট কড়া নিয়মাবলীর প্রচলন ছিল।' তার মানে এ নয় যে, তিনি নির্মম গাম্ভীর্যপূর্ণ ছিলেন। তাঁর মনের কোমল দিকের পরিচয়, যাঁরাই তাঁর কাছাকাছি পৌঁছেছেন, তাঁরা প্রত্যেকে পেয়েছেন, এমনকি পরবর্তী যুগের মানুষেরাও বঞ্চিত হয়নি, যেমন আমরা। সে-প্রসঙ্গও পরে। আপাতত সে-বৃত্তেই ফিরে যাই। সে-আমলের আরও একজন অসাধারণ ব্যক্তিকে দেখেছি এই ধরনের একটি উপন্যাসকে কেন্দ্র করে বিশ্বসাহিত্যের বিভিন্ন দিগ্‌দর্শনে ঘণ্টাখানেক ধরে কাটালেন তিনি। যতবারই অন্য প্রসঙ্গে যাবার চেষ্টা করি, তিনি হাত তুলে বাধা দিয়ে বলেন, 'ও-কথা অন্য দিন। আজ আমরা ' আমি অভ্রলেহীদের গড়ের কথা বলছি। এটা বোধহয় ই আমলের অভিভাবকসুলভ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষেরই হাত ব্যাপার ছিল।

রাজশেখর প্রথমে বেচু চাটুয্যে স্ট্রীটের ভাড়া বাড়িতে কিছুদিন বাস করেন, তারপর পাশীবাগান পৈতৃক বাড়িতে। এই পাশীবাগানের বাড়ির উৎকেন্দ্র সমিতির আড্ডার কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। ওই আড্ডার এক সদস্য শিবেন্দ্রকে লাহার বিবরণে দেখি : বেঙ্গল কেমিক্যালের ম্যানেজার হিসাবে রাজশেখরবাবুকে মাণিকতলায় থাকিতে হইত। প্রায় প্রতি রবিবার তিনি আসিতেন। বাড়িই যে শুধু তাঁহাকে পাশীবাগানে টানিয়া আনিত তা নয়, এই উৎকেন্দ্রই ছিল অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। এইখানে তিনি নিজেকে ফিরিয়া পাইতেন। 'গড্ডালিকা', 'কজ্জলী'র যে পরশুরামকে বাঙালী পাঠক অন্তরঙ্গভাবে জানে, সে এই উৎকেন্দ্রের রাজশেখর বসু।....তিনি যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে বিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলেন বলিয়া কে যেন জিজ্ঞাসা করিল 'অচ্ছা, দাড়ি কামানোর ব্লেডগুলো ফেলে দিতে হয়, ওগুলোতে কিছু হয় না?' রাজশেখরবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'পুঁতে দিলে গোলাপ গাছ হয়।' পরশুরামের লেখা বেশির ভাগ গল্পই এই আড্ডার অনেক ছবি এবং কথাই পরশুরামের লেখায় ঢুকে পড়ত। হাল্কা হাসির উড়ো হাওয়াই শুধু নয়, রীতিমত জটিল বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়েও তিনি আড্ডাতে আলোচনা করতেন। '....একদিন রাজশেখরবাবু আপেক্ষিকবাদ বুঝাইতে বসিলেন। আধুনিক ফিজিক্স থিওরি ছাড়িয়া দিলে থিওরি বিলেটিভিটির মত জটিল তত্ত্ব বোধহয় পৃথিবীর মধ্যে আর দুটি নাই। তিনি এই সুকঠিন তত্ত্বটিকে এমন সরল করিয়া, সহজবুদ্ধিগ্রাহ্য করিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন যে, আজ ভাবি, যদি তাহা তখন লিখিয়া লইতাম, তাহা হইলে একটি অপূর্ব প্রবন্ধ বৈজ্ঞানিক সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিত।'

পরিচ্ছন্নতার কথায় তাঁর পাণ্ডুলিপির উল্লেখ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি এবং হস্তাক্ষর অসাধারণ ও অনুকরণীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু রাজশেখর এ-ব্যাপারে অতুলনীয়। দু'দে সমালোচক ও ডাকসাইটে সম্পাদক সজনীকান্ত দাস একদা প্রবাসীতে চাকরি করতেন। বোধ করি সেই সময়েই পরশুরামের লেখা প্রবাসীতে ছাপা হত। সজনীকান্ত লিখছেন : 'তাঁর এক-খানা বই-এর সমস্ত পাণ্ডুলিপির মধ্যে কাটছাঁট পরিবর্তন বা পরিবর্জন একেবারেই দেখা যায় না। হয়তো সামান্য কোথাও একটা কথা কাটা হয়েছে, তাও আমরা সাধারণভাবে যেমন করে কাটি তা নয়। সেই শব্দের উপর একটা ছোট ক্রসগজ লাগিয়ে নতুন কথাটি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক গল্পের বা প্রত্যেক পাণ্ডুলিপির শেষে লেখা আছে সমগ্র পাণ্ডুলিপির শব্দ-সংখ্যা।' শুধু কি তাই, প্রত্যেক পৃষ্ঠায় কতগুলি লাইন আছে, লাইনে গড়ে কত-গুলি শব্দ ও শব্দের মাঝে কতটুকু ফাঁক থাকবে সবই তিনি হিসেব করে দিতেন এমনভাবে যে, ছাপার পর একটি লাইনও কম-বেশি হত না। এতে বইছাপাতে কি পরিমাণ কাগজ দরকার হবে প্রকাশক স্বচ্ছন্দেই জেনে যেতেন। আর 'ছাপাখানার ভূত'-দের কাছে এমন পাণ্ডুলিপি ত অকল্পনীয়। বেশির ভাগ লেখকেরই ধারণা, হাতের লেখাটা বিচার্য নয়, লেখার হ্যাতই বিবেচ্য এবং যেমন তেমন করে কাগজে লিখে দিয়েই তাঁরা প্রেসকপি পাঠান। পরে দরকার মত প্রুফের ওপর পেন্সিল পাকিয়ে সংযোজন বা বাহুল্য বর্জন করতে অনেকেই অভ্যস্ত—এটা ক্ষতিকর, এতে মুদ্রণ-ব্যয়, মুদ্রণে প্রমাদ বেড়ে যায়। রাজশেখরের প্রুফেও কাটাকুটি হত না, বেটুকু হত, তা কম্পোজের ভ্রম সংশোধন। পরিমিতি বোধের ব্যাপারে এই মানুষটি যেন যন্ত্রের মত সূক্ষ্ম ও অভ্রান্ত। কমা, সেমিকোলন ইত্যাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোথায় যেন বলেছিলেন 'কমা-কমা' এটা জটিলতা বর্জনেরই নামান্তর বলা যায়।

লেখার ব্যাপারে আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তাঁর ছিল। সারাজীবন তিনি কাগের কলম ছাড়া অন্য কোনও লেখনী ব্যবহার করেননি। আর কালিও নিজে তৈরি করে সেই কালিতেই বরাবর লিখে গিয়েছেন। বাজার থেকে কেনা কালির বড়ি নয় এই কালি তৈরির নিজস্ব ফর্মুলা ছিল। হরিতকী-হীরাকষে তৈরি খাঁটি পুরনো পদ্ধতিই স্মরণ করতেন কালির উপাদান হিসেবে।

নিজে ত লিখতেনই, একবার রবীন্দ্রনাথকেও বলে-ছিলেন—'দেখবেন ব্যবহার করে খুব সুন্দর লেখা হয়। অভিশিখ খগের কলম কাটাটা একটা আর্ট, ওর কায়দা আছে, চান তো

কেটে দিচ্ছি দু-তিনটে খাগের কলম।' রবীন্দ্রনাথ এই ব্যাপারে কোনো উৎসাহ দেখিয়েছিলেন কিনা তা আমার জানা নেই। তবে ছবি আঁকার ক্ষেত্রে অনুজোপম এই প্রিয় ব্যক্তির আগ্রহকে যথেষ্ট মর্যাদা প্রশ্রয় দিয়েছিলেন তা চাক্ষুষ করেছি।

তাঁর ঘরে রবীন্দ্রনাথের হাতে আঁকা দুখানি ছবি দেখেছি। একখানি বিদেশী রঙে আঁকা আর একটিতে দিশি রঙ ব্যবহার করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বাজারে কেনা রঙ দিয়ে ছবি আঁকেন এবং সবই বিদেশী, সেটা লক্ষ্য করে রাজশেখর একবার নিজে হাতে নানান্ রঙ তৈরি করে কবিকে উপহার দিয়েছিলেন। তাঁর দেওয়া রঙে ছবি এঁকে রবীন্দ্রনাথ উপহার দিলেন। রাজশেখরকে সে-কথা বলতে বলতে বেশ উচ্ছ্বসিত হতে দেখেছি।

বাংলা ভাষায় মুদ্রণ ব্যাপারটাই খুব জটিল। টাইপের সংখ্যাধিক্যের ফলে কম্পোজ করার ঝঞ্ঝাট ত আছেই, তাছাড়া.. আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে ইংরেজির মত বাংলা লাইনো টাইপের প্রবর্তন হবে না কেন? ধুতি-পাঞ্জাবীর মত বাংলা হরফের ঢিলেঢালা এলানো-ছড়ানো ঢং-কে ছেঁটেকেটে স্মার্ট করে তুলতেই হবে। তাঁর এই সাধু সংকল্পকে উস্কে দিতে থাকলেন আনন্দ বাজার পত্রিকার কর্ণধার সুরেশচন্দ্র মজুমদার। সুরেশবাবুর কাজ ত পরে। গোড়াতে রাজশেখরের মগজ থেকে মুক্তাক্ষরের জটা-জালমুক্ত সরল হরফের নক্‌শাগুলো বের হত। তারপর শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন হরফগুলি নিপুণ তুলির টানে সুসমঞ্জস করে এঁকে ফেলতেন। সর্বশেষ সুরেশবাবুর কাজ ছাঁচে ঢালাই করার ঝুঁকি নেওয়া। এইভাবে বাংলা ভাষায় লাইনো টাইপের জন্ম হল এবং তাতে প্রথম ছাপা বই পরশুরামের 'হনুমানের স্বপ্ন' দ্বিতীয় সংস্করণ।

আধুনিক বাংলা ভাষার জন্য আর একটি গঠনমূলক কাজ হিসেবে তাঁর 'চলন্তিকা' অভিধানের নাম করতেই হয়। চলন্তিকা সম্পাদনের মূল ইতিহাস যেটুকু রাজশেখরের মুখে শুনেছি তা সংক্ষেপে এই : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা বানানের অসামঞ্জস্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নতুন একটি অভিধান লেখার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে দুজনে কয়েক দফা আলোচনাও করেন। রাজশেখরের এই কাজে হাত দিতে যথেষ্ট আগ্রহ ছিল কিন্তু এতবড় কাজ কোনও একজন ব্যক্তির দ্বারা সুষ্ঠুভাবে হওয়া অসম্ভব না হলেও দুঃসাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তাঁকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজের সময়ে দেখা গেল যে, তিনি একা। কৃতসংকল্প হয়ে মেহনতের ভয়ে পিছিয়ে আসার মানুষ তিনি নন। অতএব অভিধান সংকলন এগিয়ে চলল।

যেসব শব্দ লেখার সময়ে বিভিন্ন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন বানান ব্যবহার করে থাকে, সেই শব্দসমূহের একটি তালিকা তৈরি করে তদানীন্তন বিদগ্ধজনের কাছে আলাদা আলাদাভাবে পাঠিয়ে দিলেন। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তির মতামত এইভাবেই তিনি সংগ্রহ করলেন। এঁরা ছাড়া আরও একজন পণ্ডিত ব্যক্তির কাছে বানানের ফর্দ পাঠিয়েছিলেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। একক ব্যক্তি হিসেবে শাস্ত্রী মশাই-এর মতামতের গুরুত্বই বোধহয় তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি। কেননা, রাজশেখরের ধারণা, এবংবিধ সংস্কারমুক্ত উদারচেতা মানুষ পৃথিবীতে খুব কম দেখা যায়।

চলন্তিকা সংকলনে যে নীতিটি তিনি অনুসরণ করেছিলেন, তাকে অনায়াসে গণতান্ত্রিক বললে ভুল হবে না। তিনি আমাকে বলেছিলেন—'আমার বরাবর লক্ষ্য, লোকের ঝোঁকটা কোন্ দিকে দেখি।'

অভিধান হিসেবে চলন্তিকা বাংলা ভাষার একটি মূল্যবান সংযোজন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

চলন্তিকা সংকলনই শুধু নয়, তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিভাষা ও বানান সমিতির পরিচালক হিসেবেও ভাষা সংস্কার ও সমৃদ্ধির জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করতেন।

পরিভাষা ও বানান সংস্কারের মহাযজ্ঞে তাঁর সহায়কদের অন্যতম বহুভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এসম্পর্কে বলেছেন : 'তিনি শব্দ পঠনের কাজে আর শব্দ প্রচলনের ব্যাপারে যে সহজ সুন্দর দৃষ্টির আর দেশ-কাল-পাত্রের সম্বন্ধে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন, তা সমগ্র ভারতে অনুকরণীয়।'

রাজশেখর নিজেও ভাষাকে বিষয়ানুগভাবে ভেঙেচুরে নতুন করে গড়তে অশ্বিতীয় ছিলেন। আবার যেখানে দরকার আরহ ও পরিমিতির মুখ চেয়ে সেখানে ধ্রুপদী পদ্ধতি অনুসরণ করতেও তাঁর দ্বিধা ছিল না। তাঁর গল্পের ভাষার সঙ্গে প্রবন্ধের ভাষা মেলানো যাবে না। তেমনি অনুবাদের ভাষার মূলের স্বাদ বজায় রাখার দিকে নজর রেখে তিনি অনায়াসেই ঢঙ পাল্টাতে পারতেন, তার কারণ পাণ্ডিত্যকে আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন তিনি। মানুষ হিসেবে কতখানি খাঁটি ছিলেন তার একটা নমুনা কোনো অটোগ্রাফের খাতায়ও মেলে :

'এই যে তোমার আছে অটোগ্রাফ বই।
হরেক রকম যাতে লেখা আর সই,
লাগবে না কোনো কাজে, একেবারে ফাঁকি
ছিঁড়ে ফালো পাতাগুলো। থাক শুধু বাকি
সাদা পাতা আছে যত। সেই নোট বুকে
এর পর বড় হয়ে রেখো তুমি টুকে
ধোবার হিসাব, দুধ, মাছ, তরকারি।
এসব হিসাব রাখা বড় দরকারী।'

।। পরশুরাম ।।

যে মেয়েটির খাতায় এই কথাগুলি লিখলেন সে ত বটেই তার সঙ্গে আরও যারা এটা দেখবে তাদের প্রত্যেকেই হাসবে কিন্তু সেই সঙ্গে একটু চিন্তা করলেই 'অটোগ্রাফ' বা ওই ধরনের ফ্যাশনকে তিনি যে বিদ্রূপ করলেন সেটুকুও বুঝবে।

সভা-সমিতি সম্বর্ধনা ইত্যাদি তিনি গড্ডালিকা প্রবাহের সামিল মনে করতেন। খুব অন্তরঙ্গ মহলও এ বিষয়ে তাঁকে টেলে আনতে পারত না। তবে সব নিয়মেরই কোথাও ব্যতিক্রম দেখা যায়। যে বছর তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার পেলেন সেবার আমাদের শনিষ্ঠ বন্ধু বিমলচন্দ্র সিংহ প্রমুখ আরও অনেকের অনুরোধে তিনি মিলচন্দ্রে লোয়ার সার্কুলার রোডের বাড়িতে এসেছিলেন। বলাই বাহুল্য যে বাংলার বিদ্বজ্জনের এই সমাবেশে বিস্তর স্তুতি ও বন্দনার বন্যা বয়ে ছিল। পরিশেষে তাঁকে কিছু বলার অনুরোধে কক্ষ হল এবং মিনিটখানেকের মধ্যে তাঁর মৃদু কণ্ঠের ধীর ভাষণ শেষ হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন : 'আমি নিজেকে সাহিত্যিক বলি না। আর আমার স্তুতি বা নিন্দা বাই করুন কিছু যায় আসবে না। কারণ আমি কানে শুনি না।' সভার সকলে স্তব্ধ। অবশ্য সে সময়ে তাঁর শ্রবণশক্তি সত্যিই দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যখন তা কানে শুনতে পেতেন যখনি নিন্দা-প্রশংসায় মানুষের অবিচল থাকার ক্ষমতা ছিল।

এরপর আর একবার তাঁর বাড়িতেই বাংলার জ্ঞানী অনুরাগীবর্গ তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়ে ছিলেন।

যদিও চল্লিশের দশকের আগেই আমরা তাঁর 'চিকি সংকট' অভিনয় করেছিলাম তাঁর সঙ্গে সামনাসামনি পরিচয় বোধহয় ১৯৫২ সালের শেষের দিকে। যাহাত্তর নম্বর বকুল বাগান রোডে বাড়িতে প্রথম যেদিন যাই বুকের ভেতরে হাতুড়ি পেটানোর চেয়ে

একটা উত্তাল অবস্থা। মোটামুটি একটা খসড়া তৈরি করে নিয়েছি কি কি প্রশ্ন করব। কাঁধে একটা ক্যামেরাও আছে যদি অনুমতি মেলে ছবি তোলার চেষ্টা করব। প্রথম সাক্ষাতেই ভয় ঘুচিয়ে দিলেন তিনি। তবু কোথায় যেন ভীরুতা ঘাপটি মেরে ছিল। নইলে ছবিটা আণ্ডার-এক্সপোজড্ হল কেন! উনি ত রীতিমত ফর্সা।

তখন সমাজ-সচেতনতা ইত্যাদি তত্ত্বের পোক্ত আমার মাথায় পাক খেত সেই তাড়নাতেই প্রশ্ন করেছিলাম—'আপনার লেখার কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য কিছু আছে?'

উনি জবাব দিলেন—'পরিহাস ছাড়া আর কিছু উদ্দেশ্য নিয়ে লিখিনি। কখনও কোন লেখককে লক্ষ্য করে আক্রমণের জন্য কিছু লিখি নি। কেদারবাবুর নামটা ব্যবহার করেছি, কিন্তু ওই পর্যন্তই। কেদারবাবুকে একবার বললুম, মশাই, আপনার নামটি ব্যবহার করছি, আপত্তি নেই ত? অবিশ্যি আমার গল্পের কেদার চাটুয্যের চেহারা বা চরিত্রের সঙ্গে আপনার কোনো মিল থাকবে না।'

এরপরই প্রশ্ন ছিল রামায়ণ, মহাভারত, মেঘদূত বা হিতোপদেশের গল্প এগুলির অনুবাদ কর্ম প্রসঙ্গে। উনি জবাব দিলেন, নিছক সময় কাটানোর জন্যই এই সমস্ত কাজ তিনি করে-ছেন। হাবেভাবে মনে হল অবসর বিনোদনের পক্ষে এর চেয়ে ভিন্ন কাজ আর হতে পারে! এতে আমাদের অবাক হবার কারণ থাকলেও তাঁর ছিল না, নিজের অভিজ্ঞতার কথায় তিনি বললেন—'জীবনে আমি খুব কম লোকের সঙ্গে মিশেছি, তাই আমার অভিজ্ঞতাও কম। কর্মক্ষেত্রে যাদের সঙ্গে মিশেছি তাদের মধ্যে বেশির ভাগ হচ্ছে ব্যবসায়ী আর দোকানদার। লিখতে গেলে অনেক বেশি দেখতে হয়। আমার যা দেখা তা ওই রামায়ণ-মহাভারত আর পুথিপত্রের মধ্যে দিয়ে দেখা।' রামায়ণের অনুবাদ প্রসঙ্গে তিনি রমাপদ মুখো-পাধ্যায় মশাইকে বলেছিলেন, 'পাশ্চাত্যানুবাদ বলতে মূলে বর্ণিত সমাজ, প্রশাসন, পারিবারিক জীবনের প্রতিচ্ছবিকেও যতটা পারা যায় হুবহু তুলে আনাই তাঁর লক্ষ্য। মেঘদূত অনুবাদের জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন তার পাল্টা দিলেন রবীন্দ্র-নাথ 'ওটা আমার চেয়ে আপনি করলেই ভাল হবে।'

প্রাচীন যুগের সাহিত্য ও বিবিধ বিজ্ঞানশাস্ত্র থেকে শুরু করে বিশ্বের অধুনাতম জীবনধারার সঙ্গে আত্মিক যোগসূত্রে তাঁর একই ছিল তবে সে দৃষ্টি দর্শকের এবং সেই দর্শক তীক্ষ্ণ, গভীর ও সহানুভূতিশীল দরদী মনের অধিকারী। জীবনকে দেখার লেন্সটা তাঁর খুবই শক্তিশালী, অখণ্ড মনোযোগে তাতে যা ধরা পড়ত তার প্রতিটি রেখা স্পষ্ট তবে মানুষের এই জীবনটাকে সংবেদনশীল অভিভাবকের উদারতা নিয়ে বিবেচনাসহকারে বিচার করার ক্ষমতাও তাঁর সমান শক্তিশালী। খুব কাছে থেকে দেখতে পাওয়ার এই সুযোগই আমার বুঝিয়ে দিল, মানুষের দুর্বলতা নিয়ে পরিহাস করতে পারার উৎসে খোঁচা মেরে সচেতন করার উন্নাসিকতার স্পর্ধা বা মালিন্য ছিল না, বিবেকের বন্ধ দরজাটা সস্নেহ আঘাতে খুলিয়ে ভেতরের সদ্‌বিবেককে জাগিয়ে দেওয়ার জন্যই এই বিচিত্র পন্থা তিনি বেছে নিয়েছিলেন।'

এখন যে-কথা বলছি সেটা তাঁকে দেখার অনেক পরের উপলব্ধি আর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া এই হয়েছিল যে, খুব অল্প দিনের মধ্যে অনেকবার একা বা সবান্ধবে তাঁর বাড়িতে হানা দিয়েছি এবং চিঠিপত্রের আদানপ্রদান ঘটেছে।

সুমথনাথ ঘোষের সঙ্গে যুগ্ম-সম্পাদনায় কথাসাহিত্য পত্রিকা বার করতাম। তবে দুই সম্পাদককে চালাতেন প্রমথনাথ বিশী ও প্রফুল্লকুমার মিত্র। ওই দুজনের একজন আমার মাস্টারমশাই অপর-

রাজশেখরের চিঠি

৫ বি,
প্রানবেশ—লাইব ৪৪১১
৭২, রসুলবাগান রোড, কলিকাতা-২৫
১-৫-৫৮

শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

প্রীতিভাজনেষু
আপনার ১ তারিখের চিঠি কাল পেয়েছি। কিছুমাত্র সন্দেহ না করে আপনি যেদিন খুশী এখানে আসবেন, আপনাকে দেখলে সুখী হব। ফটোর এমন দশা হচ্ছে, কিন্তু তার জন্যে আপনার এখানে আসা হবে না, আমার সোমবার মধ্যেই না হয় আপনার সঙ্গে দেখা করব।

নানা কারণে কোনও বইয়ের ভূমিকা লিখতে আমি নারাজ। আপনি যে আপনার নিবেদন বা মোটামুটি কথা মুখে মুখে আমাকে বলবেন, একটি চিঠিতে জানাতে পারবেন কি? তাহলে সেই চিঠি আপনি যেমন খুশী ব্যবহার করবেন, শুধু ভূমিকা বলে চালাব না। আমার কিছু পড়লে আমি ভাল বুঝতে পারি না, বক্তব্য জানাতে পারি না। বক্তব্য পারি বলি নিজেই পড়ুন। যতীনবাবুর ফটোই ভাল হবে। আমার দৃষ্টিশক্তি এতদূর ক্ষীণ হয়েছে। বেলকুড়ির সরকারের লেখা একটি নিবন্ধ পেয়েছি — গৌরকিশোর ঘোষের বিবাহ তাঁর বন্ধুরা হীরকজয়ন্তীর কর্ম সাধন করছেন।

জন কড়া গার্জেন। রাজশেখরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে তাঁর সম্পর্কিত লেখাটি শেষ হওয়ার পর গজেনদার নির্দেশেই অনুমোদনপ্রার্থী হয়ে রাজশেখরের কাছে গেলাম। সেদিন আর বাইরের বারান্দা বা অন্য কোনো ঘরে নয়, একেবারে তাঁর দোতলার শয়নকক্ষে। আমার লেখাটা পড়ে শোনাচ্ছি উনি খাটে শুয়ে শুনছেন। শরীর সেদিন ভাল ছিল না, তাছাড়া বয়স ত সত্তর পেরিয়ে গিয়েছে। সব শেষে বললেন—'সবই ঠিক আছে শুধু একটা জায়গায় কিছু বাদ দিতে হবে।'

প্রসঙ্গটা যতীন সেন মশাই-এর আঁকা সম্পর্কে। প্রেমচন্দের বহুকথিত ছবি রাজশেখরের নিজের আঁকা ছিল, এই কথাটি প্রথম সাক্ষাৎকারে উনি বলেছিলেন। আমি সেই মতই লিখেছি। এবং ইতিপূর্বে সবাই জানতো যে পরশুরাম রচিত লেখার সব ছবিই যতীনবাবুর আঁকা। সে হিসেবে এই তথ্যটা দেবার মত নতুন খবর।

আমি আপত্তি করলাম। আপনি ত ভুল ভেঙে দিচ্ছেন পাঠকের। এতে সবাই খুশি হবে। আর এটা ত আমার লেখা, দায়িত্বটা ছেড়ে দিলেই পারতেন।'

রাজশেখর পারলে আমার হাত চেপে ধরেন এমনই অনু-নয়ের সুরে বললেন—'না, না, ওটা বাদ দেওয়াই ভাল। সত্যি হলেও ওটা দেখলে যতীন হয়ত মনে দুঃখ পাবে। ওকে আমার ছোট ভাইয়ের মত দেখি। শুধু শুধু ব্যথাটা না-ই দিলাম।'

এরপর ত আর কোনো কথাই চলে না।

রাজশেখর পারলে আমার হাত চেপে ধরেন এমনই অনুনয়ের সুরে বললেন—'না, না, ওটা বাদ দেওয়াই ভাল। সত্যি হলেও ওটা দেখলে যতীন হয়ত মনে দুঃখ পাবে। ওকে আমার ছোট ভাই-এর মত দেখি। শুধু শুধু ব্যথাটা না-ই দিলাম।'

এর পর ত আর কোনো কথাই চলে না!

রাজশেখর আর যতীন সেন মশাই-এর বন্ধুত্বের কোনো তুলনা চলে না। নিজেই দেখেছি পাইকপাড়া থেকে প্রতিদিন কেলা দেডটার সঙ্গে খোঁড়া পা নিয়ে লাঠির ওপর ভর করে যতীনবাবু বাসে চড়তেন এবং বকুলবাগানে হাজিরা দিতেন। আরও মজার কথা, একতলা বা দোতলার বারান্দায় দু'জনে চুপচাপ ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন। ঠিক সন্ধ্যে ছ'টার সময়ে ঘড়ির কাঁটার মত যতীন উঠে পড়তেন। আমাদের সঙ্গে কোনো প্রসঙ্গে আলোচনার সময়ে যতীনবাবুর মুখ খোলার উপায় ছিল না।। রাজশেখর মৃদু ধমক দিতেন—'তুমি থামো যতীন।' আসল কথা, যতীনবাবু ছিলেন উচ্ছ্বাসপ্রবণ আর অগোছালো। অন্যের কাছে সেই দিকটা ধরা পড়ে এটা রাজশেখর চাইতেন না। বেঙ্গল কেমিক্যালের আদি যুগ থেকে চিরকুমার রাজশেখরের স্নেহচ্ছায়ায় কাটানো এই শিল্পী মানুষটি বাইরের জগৎ সম্পর্কে তেমন খোঁজখবর রাখতেন না। আমি যে-সময়ের কথা বলছি, তখন শিবীন্দ্রশেখরও মারা গিয়েছে। ছোট ভাই-এর মত কেন, যতীনই বোধ করি পৃথিবীতে তাঁর একমাত্র মানসিক আশ্রয়।

সেই নিবন্ধে যা-কিছু গ্রথিত হয়েছিল, তা রাজশেখরের অনুমোদন পেয়েছিল, অতএব আমি অনায়াসেই তার পুনরাবৃত্তি করতে পারি : যেমন, বিদেশী লেখকদের মধ্যে বর্ডারাড বাসেল, এইচ জি ওয়েলস্, টমাস হার্কসলে তাঁর খুব প্রিয়। টলস্টয়ের ধর্মমূলক রচনা ছাড়া আর আর সব রচনাই তাঁর ভালো লাগত। জেরোম কে জেরোম, ওডহাউসের লেখাও তিনি পেলেই পড়তেন। (প্রসঙ্গত মনে পড়ছে, যে-বছর তিনি রবীন্দ্র-পুরস্কার পান, সেই বছরেই কোনো এক বার্ষিক সংখ্যায় প্রকাশিত পরশুরামের একটি লেখা সম্পর্কে শনিবারের চিঠি মন্তব্য করল, গল্পটি মোটেই মৌলিক নয়, বিদেশী গল্প মেরে দিয়েছেন রাজশেখর। এতে তাঁর অনুরাগী মহল ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেও, রাজশেখর হননি, সবিনয়ে তিনি স্বীকার করেছিলেন বহুদিন আগে পড়া কোনো গল্পের ছায়া অনবধানবশতঃ এসেও থাকতে পারে।)

সেই নিবন্ধে শেষ লিখেছিলাম : 'রাজশেখর বসু এবং পরশুরামের মধ্যে কে বড় অথবা এঁরা দুজনেই একই ব্যক্তির প্রতিভার দ্বিধাবিচিত্র প্রকাশরূপ কিনা। এ নিয়ে গবেষণার সময় এখনও আসেনি। কিন্তু যেদিন এ-প্রশ্ন উঠবে, সেদিন পণ্ডিতেরা স্বচ্ছন্দে রায় দেবেন—রাজশেখর বসুর সঙ্গে পরশুরামের রচনার কোথাও কোনও মিল নেই। অতএব, এঁরা যে দুজনে আলাদা মানুষ এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই। এরকম বিপরীতমুখী প্রতিভার জুড়িদার বাংলা সাহিত্যে ত নেই-ই, বিশ্বসাহিত্যেও বিরল।'

যথার্থ আধুনিক বলতে যা বোঝায় রাজশেখর বসু মনপ্রাণ যাচা তা-ই ছিলেন। মুখে আর মনে দ্বিমত কদাচিৎ দেখা যেত। ঊনবিংশ শতকের মানুষ হয়েও তিনি এই শতকের তথা-কথিত মানুষের চেয়েও একাধিকবার প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলছি একথা। কেওড়া-তলা শ্মশানঘাটে যখন শবদাহের জন্য ইলেকট্রিক চুল্লি স্থাপনের পাকাপাকি ব্যবস্থা হল, তখন তিনি এর সমর্থনে পয়লা নম্বরের স্বাক্ষরকারী হয়েছিলেন। মৃত্যুর পর তাঁকে যেন ওখানেই দাহ করা হয়। আর একটা ঘটনা আমাদের বন্ধু গৌরকিশোরের বিয়েকে ঘিরে ঘটেছিল। কলকাতায় সেই প্রথম একটি বিবাহে পাত্রের কর্তৃপক্ষদের কাছে চাঁদার হার উল্লেখ করে নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছিল। বিয়েতে বর-কনে কোনো পক্ষেরই যাতে বাড়াবাড়ি না হয় এবং নিমন্ত্রিতদেরও উপহারের বাবদে চাপ না পড়ে, আমাদের লক্ষ্য ছিল সেই দিকে। গৌরের নিকট-আত্মীয়-দের অনেকেই এটা সমর্থন করেননি, কেউ কেউ বাড়ি বয়ে গালিগালাজও করেছিলেন উদ্যোক্তাদের কাউকে। কিন্তু রাজ-রোষের কাছ থেকে সম্বর্ধিত হয়েছিলেন উদ্যোক্তারা। এই প্রসঙ্গে ৩-৫-১৯৫৬ তারিখে আমাকে লেখা একটি চিঠির অংশ উদ্ধৃত করলাম : 'অরুণকুমার সরকারের লেখা একটি নিমন্ত্রণ পেয়েছি—গৌরকিশোরবাবুর বিবাহ, তাঁর বন্ধুরা অভিনন্দনের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করছেন। এই ব্যবস্থাটি খুব ভাল মনে করি। এই সঙ্গে দশ টাকা পাঠাচ্ছি, আপনি দয়া করে যথাস্থানে পৌঁছিয়ে দেবেন।

আপনার
রাজশেখর বসু

অবশ্য একটি নিয়ম এক্ষেত্রে তিনি লংঘন করেছিলেন, আমাদের চাঁদা ধার্য করা হয়েছিল মাথাপিছু ২-৫০ টাকা (আপ্যায়ন ও উপহার এর মধ্যেই ধরা ছিল)।

এটা ত দূরের ব্যাপার। তাঁর একমাত্র দৌহিত্রী 'আশা'র প্রচলিত সামাজিক সমর্থন বিরুদ্ধ বিবাহ নিয়ে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে একটা প্রবল আলোড়ন হয়েছিল। রাজশেখরের পাশে তাঁর আর এক ভাষরভাই নরেন্দ্রনাথ বসু দাঁড়িয়ে সে-বিয়েকে সমর্থিত করেছিলেন, অবশ্য এ-কথাও পঞ্চানন সেন মশাইয়ের মুখ থেকে শুনেছি।

শান্ত নিঝুম বাড়িখানা যেন এখনও চোখের সামনে দেখতে পাই। একতলার সেই ঘর যেখানে কয়েক আলমারি বই সাজানো রয়েছে এবং সুস্পষ্ট অক্ষরে লেখা 'এইসব বই বাইরে যাবে না।' অর্থাৎ ওখানে বসে যদি কেউ পড়েন, তবে আপত্তি নেই। আর সেই খোঁড়া কুকুরটা। নেহাতই পথের কুকুর, কোনো একদিন এ-বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল, তারপর এমন নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে যায়নি। কেউ বাধ্যও করেনি তাকে। অতিথি এলে সে দুমিতে লেজ নেড়ে অভ্যর্থনা জানায়।

একবার বিশেষ বৈকালিক আমন্ত্রণে গৌর আর আমি গিয়েছিলাম। বৈঠকে নানা গল্প শুনিয়েছিলেন। প্রথমে অবশ্য বললেন : 'চলুন জলখাবার খেতে খেতে গল্প করা যাবে।'

উনি আমার জন্যে কফি আনিয়ে রেখেছেন, বললেন : 'নিজে আমি খাই না, তবে আপনি ভালবাসেন ভাই।'

তখনকার আধুনিক কবিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন : আপনারা ত একালের ছেলে। আমি অনেক চেষ্টা করেও একটা কবিতার মানে বুঝিনি। একটু বুঝিয়ে দেবেন?

মাথা চুলকে প্রসঙ্গ এড়াবার চেষ্টা করেও ফল হল না। ভদ্রি ড্রয়ার থেকে বার করে, সামনে ধরলেন। এছাড়া সাহিত্যে অশ্লীলতার স্থান সম্পর্কেও আলোচনা করেছিলেন।

আর একবার অমিয়নাথ সান্যাল মশাইকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়েছিল। সান্যাল মশাইয়ের কাছেই প্রথম জেনেছিলাম যে, রাজশেখর সঙ্গীতের উঁচুদরের সমঝদার।

কথায় কথায় অ্যালবার্ট হল প্রসঙ্গে একবার বলেছিলেন, আপনি ড্যাশ (—) দিয়ে খুব ভালো ম্যানেজ করতে পারেন ত মশাই!'

প্রথমে ঠিক ধরতে পারিনি ওঁর কথার তাৎপর্য। একটু ভাবতেই মনে পড়ে গেল সেই স্ল্যাং ছড়াটি :

গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে নেইক্সে কারো কথাতে
হুলোম— ভুলোয় মাবে দাঁড়িয়ে দেখি তফাতে।

তখন যদি ওইসব বৈঠকে আলোচিত বিষয়গুলির বিশদ বিবরণ লিখে রাখতাম তাহলে নিজে ত লাভবান হতামই অন্যেরাও সুখ পেতেন। চল্লিশ বছর ব্যবধান কি এক জাদুর কৌশলে তিনি ঘুচিয়ে ফেলতেন ওই আপাতগম্ভীর মানুষটি তা আজও ভেবে অবাক হয়ে যাই।' একেই বোধহয় চিরকালের মানুষ বলে।

সমরেশ সম্বর্ধনা

দেশেবিদেশে এমন সাহিত্যিকের সংখ্যা খুব কমই থাকে, যাঁদের লেখা পাঠক তথা মানুষের নিভৃত চেতনার ঝাঁটি ধরে প্রচণ্ড নাড়া দেয়। সমরেশ বসু সেই অল্পসংখ্যক সাহিত্যিকদের একজন।

উত্তর শহরতলির মফঃস্বল শহর নৈহাটির নাগরিকবৃন্দ গত ১৩ আগষ্ট সকালবেলায় নৈহাটি সিনেমা হলে তাঁকে সম্বর্ধনা জানান। আজ থেকে সাতাশ বছর আগে নৈহাটিরই গরিফা অঞ্চলের কেশব পাঠাগারে তিনি সর্বপ্রথম সম্বর্ধিত হন তাঁর প্রথম উপন্যাস 'উত্তরঙ্গ' প্রকাশিত হবার পর, ভবিষ্যতে সার্থক কথাশিল্পী হবেন এই বলে,—যে উপন্যাসটি পড়ে চিন্মোহন সেহানবীশ আনেন অশ্লীলতার অভিযোগ এবং কবি বিষ্ণু দে লেখেন,—'গঙ্গার পাড়ের যে কথা আপনি লিখেছেন, আপনাকে দেখতে চাই তার সাগর সঙ্গমে....।'

সাতাশ বছর আগে যাঁরা তাঁকে সম্বর্ধনা জানান,—তাঁদের দৃষ্টি যে ছিল সুদূরপ্রসারিত একথা অনস্বীকার্য, —তাঁদের মধ্যে কয়েকজন সেদিন সকালে উপস্থিত ছিলেন, যেমন সুধেন্দু পাঁজা। স্মৃতিরোমন্থন করে তিনি জানান, বজবজ গঙ্গার পাড় থেকে নৈহাটির গঙ্গার পাড়ে ১৯৩৮ সালে সুরথ বসু নামে যিনি আসেন, পরবর্তী কালে তিনিই হন সমরেশ বসু।

সম্বর্ধনার দিন তাঁর বেশ কিছু গল্পের পটভূমি ধরে রাখা হয়েছিল মঞ্চের পিছনের কালো পর্দায় টাঙানো রঙিন ছবিতে। কাজটি প্রশংসনীয়।

সম্বর্জনা সমিতি ঐ দিন 'প্রসঙ্গ সমরেশ বসু' নামে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করেন, যা অতীব মূল্যবান। বিশেষত সত্যজিৎ চৌধুরী, উমাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের লেখা থাকায়, যাঁরা তাঁকে জানেন তাঁর লেখক জীবন শুরু করার সময় থেকে। কেউ কেউ তারও আগে থেকে।

মানিকলাল গোস্বামীর সম্পাদনায় সংবাদ সাপ্তাহিক 'উপনগর' সমরেশ বসু সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হয়। অন্যান্য মূল্যবান লেখার সঙ্গে 'আদাব' কাহিনীটি পুনর্মুদ্রিত। নৈহাটি সিনেমার কর্মচারি-বৃন্দ তাঁকে উত্তরীয় সম্বর্ধনা সমিতির পক্ষ থেকে অসিত ভট্টাচার্য স্বর্ণপদক প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সন্তোষ ঘোষ। তিনি বলেন, অনেক লেখক আসে না। সমরেশ তা পাবে। সমরেশ সেই বিরল লেখকদের একজন যাঁরা বদলায়, সময় বদলাতে পারে। ও ক্ষণকালের বন্ধুর ওকে সম্বর্ধনা দিয়ে আমরা হর্ষিত

প্রধান অতিথি সাগরময় ঘোষ সমরেশ সঙ্গে আলাপের প্রথম দিনটির উল্লেখ

করে বলেন, মানুষ হিসেবে সমরেশ বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত হয়নি। সেদিন যা দেখেছি, আজও তাই আছে। এই মানুষ সমরেশকেই আমি আমার অন্তরের শ্রদ্ধা ভালবাসা জ্ঞাপন করলাম। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে সমরেশবাবুর তিনটি বিশেষ দিক তুলে ধরেন। একঃ যৌবনের বিশ্বাস ঘিরে যখন অবিশ্বাস দানা বাঁধে, তখন তিনি ঐ ঘুনলাগা বিশ্বাস আঁকড়ে থাকেন না। বস্তুত বেরিয়ে আসতে পারেন। যা অনেকেই পারেন না।

দুইঃ আগেকার দিনের সাহিত্যিকগণ দিনে ঘুমোতেন। মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতেন পশ্চিম। তাঁরা চাকরি করতেন না। এখনকার সাহিত্যিকগণ চাকরিজীবী। কিন্তু তিনি চাকরি করেন না। লেখার মধ্য দিয়েই বেঁচে আছেন।

তিনঃ যতদিন যাচ্ছে তাঁর লেখার উন্মোচন ঘটছে।

শ্যামলবাবু উল্লিখিত এক নম্বর বিষয়টি অত্যন্ত জোরালো। যিনি যৌবনে 'বিশ্বাসের ভূতগ্রস্ত' হয়ে রাজনীতি করার সময়ে গান্ধীবাদকে অস্বীকার করেন 'বলসা' গল্পে, পরবর্তীকালে তিনিই গান্ধীকে আনেন, আনতে পারেন সম্পূর্ণ অন্যভাবে। সশ্রদ্ধায়। তিনিই লেখেন গল্প 'স্বীকারোক্তি'। আত্মানুসন্ধানের এক নৈতিক ও মানসিক আর্তিতে। এবং প্রকাশ মাত্রই চিহ্নিত হয়ে যান শ্রমজীবীদের অনুচর হিসাবে। তাঁর আপন কথায় 'অভূতপূর্ব ধ্যানধারণা'।

কবিদের পক্ষ থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় জানালেন, কবিরা কল্পনাপ্রবণ এবং আবেগপ্রবণ,—তাই তাঁরা কালকূটকেই পছন্দ করেন বেশী।

বিমল কর বলেন, সমরেশবাবু এই সময়ের প্রধান লেখক। আজ তাঁকে যতই অবজ্ঞা করা হোক না কেন, বাংলা সাহিত্যে একদিন তাঁর সঠিক মূল্যায়ন হবে।

এছাড়া আলোচনা করেন গৌরকিশোর ঘোষ, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, ডঃ কমলা বসু।

যাঁকে নিয়ে এই অনুষ্ঠান, তিনি এই সম্বর্ধনার জবাবে বললেন,—'নৈহাটির মত সৃষ্টিশীল প্রতিভা তাঁদের মধ্যে যেন আমি চিহ্নিত দাগ হিসেবে থেকে যেতে পারি,—এই আমার আশা।'

পারবেন, নিশ্চয়ই পারবেন আপনি। শুধু সার্থক কথাশিল্পীই নন,—এই সময়ের আপনি একজন প্রধান লেখক।

নির্মলকুমার দাস

প্রসঙ্গ সমরেশ

সমরেশ বসু সম্বর্ধনা সমিতি নৈহাটিতে গত তেরোই আগস্ট সমরেশ বসুকে সম্বর্ধনা জানালেন। সেই উপলক্ষে লেখকের গুণমুগ্ধ প্রিয়জন, বন্ধু ও সমকালীন লেখকদের বিভিন্ন রচনা নিয়ে বর্তমান সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছে। বেশীরভাগ লেখাই অনুষ্ঠানোচিত অভিনন্দন বাণী; কিছু স্মৃতিচারণ, ব্যক্তি সমরেশের লেখক জীবনের প্রথম পর্যায়, মানুষ হিসেবে তিনি কি রকম, তাঁর পরিচয়, একটি সাক্ষাৎকার এবং লেখকের একশো উনচল্লিশটা গ্রন্থের তালিকা।

গল্পকার, ঔপন্যাসিক সমরেশ বসুর, সমগ্র পরিচয় এই সংকলনে নেই। সম্পাদকেরা সে চেষ্টা বা দাবীও করেন নি। সে দায় সাহিত্যের ইতিহাসপ্রণেতা এবং সমালোচকদের। তবু এই সংকলন থেকে সমরেশ বসুর একটা আবছা অবয়বমূর্তি গড়ে উঠেছে।

পূর্ব বাংলা ছেড়ে এক সময়ে নৈহাটির বাসিন্দা হলেন। ইছাপুরে বন্দুক তৈরির কারখানায় চাকরী। প্রথম গল্প 'আদাব' প্রকাশিত হয় ১৯৪৬-এর পরিচয় কাগজে। কমিউনিস্ট পার্টির শ্রমিক আন্দোলনে জড়িত হয়ে ১৯৪৯-এ কারাবাস, চাকরি থেকে ছাঁটাই, বেকার জীবন। তারপর থেকে ফুল টাইম রাইটার, পুরো সময়ের লেখক। জীবনের ক্ষেত্রে এতো ঘটনা এক নিশ্বাসে ঘটেনি। অনেক টানা পোড়েন, মার, ধাক্কার সুতোয় জীবনের মূল নকসাটা তৈরি হয়। সমরেশ বসুর ক্ষেত্রেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি।

অসংখ্য সুখ দুঃখ নিন্দা প্রশংসার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সমরেশ বসু লড়েছেন। এই লড়াই-এর স্ট্র্যাটেজি এবং ট্যাকটিক্স, লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধিতে তৈরি, বাম বা দক্ষিণ লেবেল দাগবার উপায় নেই। ছাঁটাই চাকরি ফেরৎ পাওয়ার জন্যে মুচলেকা না দেওয়ার সিদ্ধান্তে তিনি একরোখা, আপোসহীন, জীবনের বাস্তবাকাঙ্ক্ষি অথচ ধুরন্ধর নাগরিক, বিটি রোডের ধারে, শ্রীমতী কাফে, গঙ্গার পাশাপাশি লেখেন, পিঞ্জর, পাতক, প্রজাপতি—সব মিলিয়ে একটা ঘূর্ণিঝড়। ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে বয়ে আনেন ধুলো মহলা, ফুটো পাতা এবং আরো হাজারো আবর্জনা। তিনিয়ে।

গত ত্রিশ বছর বাংলা সাহিত্যে তিনি উপস্থিত এবং এখনো তাঁর দাপট অব্যাহত। তাঁর সমকালীন লেখকেরা অনেকেই কি জীবনে, কি লেখায় বুড়িয়ে গেছেন। অথচ 'টুম্পার দাদু' 'বয়েস চোর' এই মানুষটি নব্যযুবক সেজে প্রায়শই এমন ঝাঁকুনি দিচ্ছেন যে তাঁর সঙ্গে তাল মেলানো কষ্টকর। তবু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই বর্তমান সময়ের তিনিই সবচেয়ে ক্ষমতাবান, সৃজনশীল লেখক। তাঁর লেখায় পিছটান নেই, ফেনিয়ে অতীত চারণায় তিনি অবিশ্বাসী। বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিকে নিয়মিত অভিনব ঘটিয়ে তিনি খেলে যাচ্ছেন। বড়ো অসাধ্য, দুর্বিনীত এই খেলা। বর্তমান সংকলনটি সম্ভবতঃ সমরেশ বসু সংক্রান্ত প্রথম গ্রন্থ। চমৎকারভাবে সাজানো এবং ছাপা এই বইটি এই অর্থে অমূল্য যে বইয়ের কোথাও মূল্যের উল্লেখ নেই। সাধারণ পাঠকদের দুর্ভাগ্য যে এমন সুন্দর এই সংখ্যাটি ক্ষোভ থাকলেও সংগ্রহ করার হয়তো কোনো উপায় নেই।

শৈবাল মিত্র

প্রসঙ্গ : সমরেশ বসু ।। সংকলক সমরেশ বসু সম্বর্ধনা সমিতি। নৈহাটি। সম্পাদক—অতনু চট্টোপাধ্যায়।

বিশ্বকোষ

আধুনিক বিশ্বকোষ প্রকাশ উপলক্ষে গত ৭ সেপ্টেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী প্রেক্ষাগৃহে এক সুষ্ঠু অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, প্রধান অতিথি ছিলেন প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র এবং প্রদীপ জ্বালিয়ে আধুনিক বিশ্বকোষ প্রকাশনার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত ভাষণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সুশীল মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আধুনিক বিশ্বকোষের প্রথমখণ্ড আজ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। গত দশ বছরের ফসল। এর পরে আশা করি কম অনেক সহজ এবং তরান্বিত হবে।' সভাপতির সংক্ষিপ্ত মূল্যবান ভাষণে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষও তাড়াতাড়ি এবং নির্ভুলভাবে বিশ্বকোষের বাকি সবকয়টি খণ্ড প্রকাশের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীঘোষ স্মরণ করেন একশ বছর পূর্বে প্রকাশিত শ্রীনগেন বসু সম্পাদিত 'বিশ্বকোষ'-এর কথা। কিন্তু আজকের দিনে সমস্ত ঘটনাবলী সহযোগে এক আধুনিক বিশ্বকোষের বড় প্রয়োজন। তিনি আশা প্রকাশ করেন অনেক বেশী সম্ভব বিষয় নিয়ে এই 'আধুনিক বিশ্বকোষ' প্রকাশিত হবে যা উত্তরকালে এক অভাবনীয় জাতীয় মূল্যবান সম্পদে পরিগণিত হতে পারে।

ফিতে কেটে প্রথম বইটি, ভট্টাচার্যমশাই হাতে তুলে দেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। এরপর অন্যতম সম্পাদক অধ্যাপক সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী শ্রীশম্ভু ঘোষ এবং প্রধান অতিথি শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রকে এক একটি খণ্ড উপহার দেন।

শ্রীচন্দ্র তাঁর ভাষণে প্রথমে নগেনবাবুর বিশ্বকোষকে স্মরণ করেন যা মূলতঃ বাংলা ভাষাতে হলেও পরে হিন্দীতেও দু-একটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গক্রমে তিনি ইংরাজীকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং 'আধুনিক বিশ্বকোষ' রচনের যথেষ্ট পুস্তক মাতৃভাষায় প্রকাশিত হতে থাকে তাহলে আমাদের ঐতিহ্যসম্পন্ন মাতৃভাষা আরও সমৃদ্ধ হবে এই আশা প্রকাশ করেন। তিনি দাবী করেন সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ধীরে ধীরে মাতৃভাষা অথবা স্থানীয় ভাষার বদলে পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে। বর্তমানে ভারতে ষোলশ বাহান্নটি মাতৃভাষা রয়েছে এবং তার উপযুক্ত উন্নতি নির্ভর করে 'আধুনিক বিশ্বকোষ' জাতীয় বই-এর উপর। সম্পাদকের ভাষণে শ্রীসুধাংশু শেখর ভট্টাচার্য উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে সবিনয়ে জানান কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সাহায্য ব্যতীত 'বিশ্বকোষ'-এর প্রকাশনা সর্বাঙ্গসুন্দর করা অসম্ভব। এরপরে শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীশম্ভু ঘোষ, ডঃ শ্রীমতী রমা চৌধুরী এবং শ্রীউষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় স্বল্পকথায় তাদের বক্তব্য উপস্থাপিত করেন। শ্রীমিত্র বলেন, 'আধুনিক বিশ্বকোষ আমাদের সর্বাঙ্গীণ জ্ঞানের ভাণ্ডার।' শ্রীঘোষ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর প্রস্তাবের সূত্র ধরে জানান যে 'বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে এম-এ এবং থিসিস পর্যন্ত বাংলা ভাষায় পরিচালনা করার জন্য তিনি সচেষ্ট হবেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিতদের মধ্যে ছিলেন শ্রীঅসিত বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীআশুতোষ নিয়োগী শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র, ডঃ ভক্তিভূষণ মণ্ডল প্রভৃতি।

সবশেষে শুভাবতার রামকৃষ্ণ' অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠান সাঙ্গ হয়।

প্রদীপ দাশগুপ্ত

সমালোচনা

রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সম্প্রতিকাল পর্যন্ত বাংলা ভাষায় ছন্দ নিয়ে যত বই লেখা হয়েছে তার সবগুলিরই মূল বিষয় বাংলা ছন্দ। প্রসঙ্গত এসেছে ইংরাজি ও সংস্কৃত ছন্দের কথা। কিন্তু দুই বা ততোধিক ভাষার ছন্দের গতি-প্রকৃতি নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা হয়নি। এই অভাব পূরণ করলেন, বরং বলা ভাল, এই ধারার প্রবর্তন করলেন রামবহাল তেওয়ারি তাঁর 'আধুনিক বাংলা ও হিন্দি ছন্দ' গবেষণামূলক গ্রন্থটিতে। এ-বিষয়ে তিনিই বাংলাভাষায় পথিকৃৎ। তাঁকে ধন্যবাদ। আরও ভাল লাগল এই কারণে যে, তেওয়ারিজীর মাতৃভাষা হিন্দি এবং তিনিই বাংলাভাষার ছন্দ নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা প্রথম করলেন। বাংলা ও হিন্দি—দুইয়েরই ভাষা-জননী সংস্কৃত। একই সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট থেকে উদ্ভূত বলে এই দুই ভাষার ছন্দ-প্রকৃতিতে যেমন আছে সাদৃশ্য, তেমনি উচ্চারণরীতির ভিন্নতা হেতু বৈসাদৃশ্যও বড় কম নয়। রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে দুই ভাষার মধ্যেই রয়েছে একদিকে স্বাতন্ত্র্যলাভের প্রয়াস ও অন্যদিকে সংহতি রক্ষার প্রবণতা। এই পরিপ্রেক্ষিত থেকে বাংলা ও হিন্দি ছন্দের আলোচনায় লেখক দেখিয়েছেন কীভাবে গ্রহণ ও বর্জনের মধ্য দিয়ে দুটি ভাষারই ছন্দতত্ত্ব রূপপরিণতির দিকে এগিয়ে গিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলা ভাষায় হিন্দি ও বাংলা ছন্দের তুলনামূলক আলোচনা রামবহাল তেওয়ারি প্রথম করলেন, কিন্তু হিন্দি ভাষায় বাংলা ও হিন্দি ছন্দের তুলনামূলক আলোচনা এর আগেই হয়েছে। করেছেন ডঃ পুত্তুলালাল শুক্ল। তাঁর বইয়ের নাম: 'আধুনিক হিন্দি কাব্য মেঁ ছন্দ-যোজনা।'

হিন্দি কাব্য বাংলা কাব্যের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে উনিশ শতকের শেষ ভাগে। সেই সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয় রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পর। কাজেই এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের বিস্তৃতি বিশেষভাবে নির্ধারিত হয়েছে রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র-উত্তর যুগে। অবশ্য প্রাক-রবীন্দ্র যুগের তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা তুলনায় সংক্ষিপ্ত হলেও ওজনে হালকা নয়।

বাংলা ও হিন্দি ছন্দের মূল সূত্রগুলি লেখক বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। পরিগত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে তিনি দৃষ্টান্ত দিয়ে যুক্তি পরম্পরায় দেখিয়েছেন দুয়ের মধ্যে কিছু মিল, কিছু অমিলও আছে। যেমন, বাংলা ছন্দের মাত্রা দুই রকম—কলামাত্রা, বর্ণমাত্রা। হিন্দি ছন্দেও দুই প্রকারের—কলামাত্রা, বর্ণমাত্রা। আবার বাংলা ছন্দে যতির প্রকারভেদ পূর্ণযতি, অর্ধযতি পদান্তযতি উপহিন্দি ছন্দে পূর্ণযতি সুস্পষ্টভাবে

সুচিন্তিত, সুবিন্যস্ত ও সংহত

স্বীকৃত হলেও অন্যান্য যতি ব্যবহারে কবিদের আগ্রহ নেই।

এইখানে আর একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। দুটি ভিন্ন ভাষার ছন্দের তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে একটি বড় অন্তরায় হল—দু পক্ষেই গ্রহণযোগ্য পরিভাষার অভাব। এক্ষেত্রে রামবহাল তেওয়ারি অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেনকৃত পরিভাষাকে কাজে লাগিয়েছেন। এক্ষেত্রেও তিনি এমন এক আদর্শ স্থাপন করলেন যা উত্তরকালের গবেষকদের পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক হবে। এও তাঁর এক অসামান্য কৃতিত্ব।

লেখকের সিদ্ধান্ত : 'মধ্যযুগে বাঙালীরা হিন্দি সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট

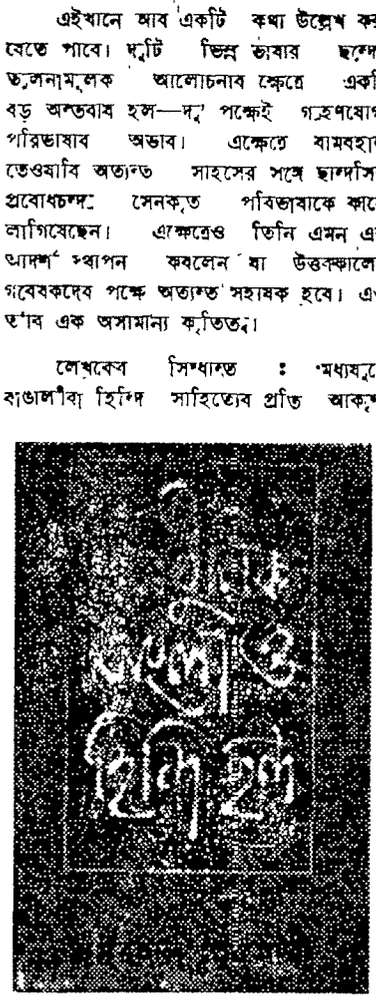

হয়েছেন কিন্তু হিন্দিভাষীরা বাংলা সাহিত্যের প্রতি কোন আকর্ষণ অনুভব করেননি।' আবার, বিদ্যাপতি প্রমুখ কবিরা বাংলা সাহিত্যে সমাদরে গৃহীত হলেও বাংলায় হিন্দি ছন্দের প্রয়োগ মধ্যযুগে অদৃষ্টপ্রায়। বাংলায় হিন্দি ছন্দের প্রয়োগ প্রথম দেখা যায় ভারতচন্দ্রের কাব্যে। হিন্দিতে বাংলা ছন্দের প্রয়োগ কিন্তু আরও পরে উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত হিন্দি কবিরা বাংলাভাষা বা ছন্দ নিয়ে কোন চর্চাই করেননি। হিন্দিতে বাংলা ছন্দের প্রথম প্রয়োগ দেখা যায় ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের রচনায়। মধুসূদন দত্তের সনেট ও অমিত্রাক্ষর বাংলা আধুনিক কাব্য জগতে যে আলোড়ন তুলেছিল, তার প্রভাব হিন্দি কাব্যজগতের অন্দরমহলে পৌঁছতে বিলম্ব হয় নি। ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্যিকগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, তাঁরা সকলেই এসেছিলেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে। হিন্দিতে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম প্রয়োগকর্তা অম্বিকা দত্ত ব্যাস। প্রথম সনেট রচয়িতা লোচনদাস পাণ্ডেয়। তিনি মধুসূদনের মতোই সনেট বোঝাতে 'চতুর্দশপদী' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের প্রভাব, অন্যান্য ভারতীয় ভাষার কাব্যজগতের মতই হিন্দি কাব্যেও ব্যাপক ও গভীর। ছন্দের ক্ষেত্রেও এই কথা সমান প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথের মুক্তক ও গদ্যছন্দের প্রভাব খুবই স্পষ্ট। রবীন্দ্র-অনুসরণে হিন্দিতে মুক্তক ও গদ্যছন্দের প্রথম প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায় সূর্যকান্ত ত্রিপাঠীর রচনায়। পরে অবশ্য একাধিক কবি এইসব ছন্দের ব্যবহারে অসামান্য পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে হিন্দি ও বাংলা সাহিত্যের মধ্যে যে নৈকট্য স্থাপিত হল, তারই ধারাবাহিকতায় রবীন্দ্র পরবর্তী যুগের বাংলা কবিতার ছন্দের নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার সন্ধান মেলে, হিন্দি কবিতাতেও তা দুর্লক্ষ্য নয়। বস্তুত, এই পর্বেও স্বাতন্ত্র্য লাভের অতীপ্সা ও সমতা রক্ষার আকাঙ্ক্ষার মৌল ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে দুই ভাষার কাব্যজগতেই চলেছে নতুন নতুন প্রয়াস। লেখক রামবহাল তেওয়ারি এই ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণটির সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন। যার ফল, তুলনামূলক ছন্দতত্ত্বের আলোচনায় পরিচ্ছন্ন রাখতে পেরেছেন। 'গ্রন্থখানি সুচিন্তিত, সুবিন্যস্ত ও সংহত।' ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেনের সঙ্গে আমিও একমত : 'তাঁর এই প্রয়াসের ফলে আমাদের ছন্দ-আলোচনার ক্ষেত্রও নূতন দিগন্তের দিকে সম্প্রসারিত হল।'

অমিতাভ চক্রবর্তী

আধুনিক বাংলা ও হিন্দি ছন্দ। রামবহাল তেওয়ারি। করুণা প্রকাশনী। কলকাতা ৯। মূল্য : ১৮ টাকা।

কবিতা এবং পদ্য এক নয়

সংকলন নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। যিনি সম্পাদনা করেন তাঁর নিজস্ব রুচিবোধ এবং প্রিয়কবি না হলেও গুরুত্ব আছে বিশেষ সময়ে এরকম কবির কবিতা নির্বাচন করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ থাকবে, ইতিহাসের ধারায় ভূমিকা বিচার করতে হবে। এসব খুব সঠিকভাবে যতটাই করা যাক না, অনেক প্রশ্ন শেষপর্যন্ত থেকেই যায়, কোনো পাঠক সেসব প্রশ্ন তুলতে পারেন, উত্তর শুনে খুশী হতে নাও পারেন তিনি। আবার, যতটাই দায়িত্ব নিয়ে সম্পাদনা করা যাক, নিজেকে বিশেষ কেউ ভেবে গায়ে পড়ে শ্লেষ কটূক্তি করতে আসেন কেউ কেউ। এসব নিয়ে ভাবতে বসলে দায়িত্ব কোনোদিনই নেওয়া হয় না।

শিশির ভট্টাচার্য কোনো বিশেষ সময়ের কবি নির্বাচন করেন নি, বিশেষ সময়ের বেশ কিছু কবিতা লেখকের রচনা সংকলন

ক্ষেবেছেন। সম্পাদনার প্রশ্ন ওঠে না এখানে, অতএব নির্বাচনও নেই। পাঠকমাত্রই যেসব ক্ষমতাবান তরুণ কবির কবিতার সঙ্গে পরিচিত তাদের অধিকাংশ অনুপস্থিত। অথচ, আছেন এমন এমন পদ্যলেখক যাদের সংকলিত লেখাটি খুবই দুর্বল, লেখক হিসেবেও কোনো মৌলিকত্ব নেই। শিশির ভট্টাচার্য কবিতা লেখেন, এব্যাপারে তিনি মতামান হলে ভালো হতো।

শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের ভূমিকাটি বেশ ভালো। তবে কবিতা এবং পদ্য যে আলাদা, অন্তত চরিত্রগতভাবেই—তা তিনি গুলিয়ে ফেলেছেন। মুদ্রণ পারিপাট্য, প্রচ্ছদ অসম্ভবরকম সুন্দর।

অন্যদিনের কবিতা : শিশির ভট্টাচার্য সম্পাদিত। অন্যদিন। দাম : ৭-৫০।

বর্ণমালার মানিক স্মরণ

সম্পাদকীয়টিতে— বাংলা সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা প্রবর্তনের পথিকৃত হলেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সাহিত্যে অল্প আলোচিত ও অবহেলিত—এরকমটা সভা ভিত্তিক আক্ষেপ দেখেই বর্ণমালার মানিক সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগী হওয়ায় কারণটা স্পষ্টই বোঝা গেছে। এমন উদ্যোগের জন্যে প্রথমেই তাঁরা ধন্যবাদ পাবেন।

কবি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠক সমাজে স্বল্প বা অল্পস্বল্প পরিচিত। এই সংখ্যায় প্রথমেই কবি মানিককে স্বল্প পরিসরের মধ্যে যতটা সম্ভব হাজির করতে পারা গেছে 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতার অসমাপ্ত অন্বেষণ' প্রবন্ধটিতে। তাঁর কবিতায় তাঁর গদ্যের মতই যে একটি স্বাচ্ছ পুরুষ কণ্ঠস্বর শোনা যায়—এই বক্তব্যটির সঙ্গে নিঃসন্দেহেই মাণিকের কবিতা পড়া পাঠকরা একমত হবেন।

মানিকের সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি'র আলোচনা প্রসঙ্গে অরুণ বসু, আঙ্গিকগতভাবে বিচারে কিছুটা ভূমিকার কথা স্বীকার করেও উপন্যাসটির কিছু অসংগতির দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। বিশেষ করে উপন্যাসটির অন্যতম প্রধান চরিত্র হোসেন মিয়ার চরিত্রটি নিয়ে। এই চরিত্রটিতে মানিকের মানসিক স্থিরতার অভাবের ব্যাপারটা নাকি লক্ষ্য করা যায়। প্রবন্ধের বিষয় এবং যুক্তি আকর্ষণীয় হলেও, জোরালো বিরোধী বক্তব্য সৃষ্টির সুযোগ রয়ে গেছে এ ব্যাপারে।

'মানিকের সেজদার সঙ্গে সাক্ষাৎকার'টিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাক্তিগত জীবনের অনেক মজার মজার দিকের ওপর আলোকসম্পাত করা হয়েছে।—এই কারণেই এটি আকর্ষণীয়।

একই রকম আকর্ষণীয় রচনা হয়ে উঠতে পেরেছে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : কবিতার চোখে' প্রবন্ধটি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা পঞ্জীটি বিশেষ মূল্য বলে করবে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে নিবেদিত কিছু কবিতা আছে যার মধ্যে আছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত 'পাথরের ফুলটির' পুনর্মুদ্রণও করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কবিরা হলেন—বিষ্ণু দে, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সামসুল হক, বাণী দত্ত, শঙ্খ ঘোষ প্রমুখ...। পেপারব্যাক সাইজে এই পত্রিকাটির সুমুদ্রিত ছাপা চোখ কাড়ে।

গৌতম ভট্টাচার্য

বর্ণমালা—(মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণ সংখ্যা) সম্পাদক—শ্রীশীতল ঘোষ, অরুণকুমার রায়। ৪৫বি, আঞ্জুমান আরা বেগম রো, কলকাতা থেকে প্রকাশিত। আড়াই টাকা।

প্রদর্শনী

গত বাইশে থেকে সাতাশে আগস্ট অবধি, বিড়লা আকাদমিতে শ্যামসুন্দর সরকারের ছবির প্রদর্শনী হয়ে গেলো। এই শিল্পী মুখাবয়বের দিকে বেশি আকৃষ্ট, মানুষের অন্যান্য শরীরাংশে তাঁকে কম ভাবিয়েছে। তাঁর এই চিন্তা অবশ্যই আংশিক, তাঁর সফলতাও এই একই কারণে আংশিক। মনের প্রতিফলনকে রঙরেখায় ধরিয়ে দেবার জন্যে, মুখাবয়বগুলিকে একটা নাটকীয়তা দেবার চেষ্টাও করেছে—যদিও সেই নাটকীয়তা মাত্রাশোভন। এবং স্মরণ শ্যামসুন্দর সরকার বঙের বুচির তাৎপর্যটির সূত্র বিস্মৃত হননি। এর আরো কারণ, মনোমুহূর্তগুলিকে বিশেষভাবে নির্বাচন করা হয়েছে—এবং অতি সরল ব্যাখ্যার চেষ্টা তিনি করেননি।

কিন্তু তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি ছবির গঠনগত নৈপুণ্য, রঙের রুচিময়তা আর ছবিগুলির রঙময়তার দিক মনে রেখেও বলছি, দ্বিতীয় দর্শনে ততোটা ভালো লাগলো না। মানে, ছবিগুলি দেখা শেষ করে আবার নজর বুলোতে গিয়ে একটু অভ্যস্ত লাগলো। অনেকগুলি আঁকা মুখ থেকে রাগ-বস্তুপুঞ্জ-উদ্বেগ উঠে এসেছে; মনে হলো, সেগুলি আসলে কোনো কাহিনী বলছে। [illegible] পরিবেশের কাহিনী। মুখগুলির চরিত্র এক্তোদূর যেতে পারেনি—যে তারা নিজের ভিতর থেকে উৎপন্ন হওয়া কোনো দুর্ভাগ্যের কাহিনী হয়ে উঠতে পারে। কাজেই, আমার মনে হলো, ছবিতে একটি বা অনেকগুলি মুখ নিয়ে যে নাট্য-মুহূর্ত রচিত হচ্ছে বারবারই, তা যতোটা সাহিত্যিক চিন্তার ফল, ততোটা বর্ণবেখা-বিদের কল্পনার নয়। একটা সরলীকরণ তো প্রথম থেকেই আছে, মুখ মানুষের মনের দর্পণ—এই কথাটার মধ্যে বিশ্বাস্যতা খুবই অল্প। যাই হোক, শ্যামসুন্দর সরকারের পরবর্তী প্রদর্শনীর জন্যে অপেক্ষা করাই সব থেকে ভালো।

বিড়লা আকাদমিতে আর একটি প্রদর্শনী হচ্ছিলো সমীর দত্তগুপ্তের ছবির। শ্যামসুন্দরের ড্রইংগুলি তাঁর ছবির থেকে বক্তব্যে আলাদা নয়। বা, হয়ে ওঠায় আলাদা নয়। সমীর দত্তগুপ্তের ড্রইংগুলি কিন্তু পেইন্টিং-এর থেকে অনেকটা আলাদা। ড্রইং, এখনকার প্রায় সব শিল্পীই জটিলতা ভালোবাসেন, অলংকরণের পক্ষপাতী হতে থাকেন, আতিশয্যকেও একটা ফর্ম করে তোলার চেষ্টা করেন—সমীর নিঃসন্দেহে এই দলভুক্ত। ফিগারকে, এর ফলে, একটা রূপকথার স্বাদ দেওয়া যায়—আর একটা রূপকধর্মিতা, প্রাঞ্জল হোক বা না হোক, ইশারা রাখতে রাখতে পারে। আমরা, যারা ছবি দেখতে পছন্দ করি কিন্তু ছবি সম্পর্কে খুব একটা সেন্টিমেন্টাল নই—এসব ছবির সামনে এসে একটু বাদেই তারা বলে ফেলি, ফর্মালিটি! মানে, এতোটার দরকার ছিলো না। ঠিকই যে সমীর তাঁর ড্রইংএ, বিপুল রেখাজাল ও জ্যামিতিকতার ঠাসবুনোন বিন্যাস দেখিয়ে শিল্পকর্মগুলিকে একটু অরনেট করে তুলেছেন—অন্যভাবে বলা যায়, একটু বেশি বেটরিক্যাল হয়েছে। কারণ, তাঁর ছবিগুলি এর পাশাপাশি আছে। সেই ছবির গঠনপ্রণালী এক হলেও, ষড়ের বিলিফের জন্যে অন্য আবেদন বহন করছে—যা অনেক বেশি তৃপ্তির। তৃপ্তিটা এই কারণে নয় যে বড় দেওয়া বাঙালী মনে বেশি ধরে। ড্রইং মূর্তির আভাস পাওয়া যাচ্ছে আবেদন ও প্রকাশমানতা সত্ত্বেও দত্তগুপ্তের হাতে তারা একটু বেশি অবজেক্ট হয়ে গিয়েছে: পেইন্টিং এ মূর্তি পাওয়া গেলো, তারা এমন ওঠেনি—টুকরো জ্যামিতিকতার অ সত্ত্বেও।

পার্থপ্রতিম কাজি

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সোনার হরিণ নেই

।।সাতাশ।।

নিজের অভিনয় ঘটক খুলে ভিতরে পা দিয়েই বাপী অবাক একেবারে। উঠোনে মেহেদী গাছের পার্টিশন ঘেঁসে আবু বরযানী দাঁড়িয়ে। ওকে দেখামাত্র কেন যেন বাপীর মনে হল, গাছ ফাঁক করে ও-দিকের বাংলোর দিকে লক্ষ্য রেখেছিল। ওকে উঠতে দেখে ফিরেছে। নইলে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে যাবে কেন।

—কি ব্যাপার?

আবু বরযানী একটা আঙুল মুখে তুলল। অর্থাৎ অত জোরে কথা নয়। বাপী আরো অবাক। কারণ আবুর মুখে সত্যি উৎকণ্ঠার ছাপ। আজই দুপুরে যখন খুশি ওকে বাংলোয় আসতে বলেছিল বাপী। কিন্তু সেই আমন্ত্রণে আসেনি দেখেই বুঝেছে। আর দিনের আলোয় সদর দিয়ে অর্থাৎ ওদের মেমসাহেবের নাকের ডগা দিয়ে আসেনি, বলাই বাহুল্য। জংলা পথ ভেঙে পিছন দিক দিয়ে এসেছে। এত লুকোচুরি করে আসার তাগিদ কেন বা আবুর হঠাৎ এমন শুকনো মুখ কেন বাপী ভেবে পেল না।

আবু গলা খাটো করে জিগেস করল, তুমি মেমসাহেবের সঙ্গে কথা কইছিলে বাপী-ভাই না তার মেয়ের সঙ্গে?

—দুজনার সঙ্গেই। কেন?

এই জবাবেই আবু যেন নিশ্চিন্ত একটু। তবু আমতা আমতা করে আবার জিগেস করলো, বেশমার সম্পর্কে কোনো কথা হয়নি তাহলে?

ভিতরে কৌতূহলের আঁচড় পড়ল এবারে বাইরে অবাক। —বেশমার সম্পর্কে কি কথা হবে?

—যাক, আবু হাসিমুখে সত্যি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল একটা, আমি তো দুলারিকে কতবার করে বললাম, বাপীভাই যা-ই জানুক, বুঝুক ফস করে মেমসাহেবকে কিছু বলে বসে থাকার মতো কাঁচা ছেলে নয়। তবু ভয় ভাবনায় জোর করেই আমাকে ঠেলে পাঠালো। তুমি একবারটি চলো না আমার ওখানে, দুলারি বার বার বলে দিয়েছিল, বেশমাও সেখানে আছে—

বাপী মাথা নাড়ল। —এখন যেতে পারছি না, তোমাদের মেমসাহেবের মেয়ে এক্ষুনি আসবে।

আবু ব্যস্ত হয়ে উঠল, তাহলে আমি চলি, তুমি তার পরে না-হয় এসো—

বাপী মিথ্যে বলেনি। ঊর্মিলাকে সুখবর দেবার টোপ ফেলে এসেছে। যে-কোন মুহূর্তে এসে হাজির হতে পারে। আবুর সঙ্গে সে-ও বেরিয়ে এলো। তারপর বাড়ির পিছনে এসে ওকে দাঁড় করালো। —কি ব্যাপার খোলাখুলি বলো তো?

আবু হাসতেই চেষ্টা করল, কিন্তু ভিতরের উদ্‌বেগটুকু গোপন থাকল না। —কি আর বলব, তোমার কর্তাদিকে কটা করে চোখ আর কান, আর মগজে কি-যে আছে ভেবে তাজ্জব বনে যাই—

কথাগুলোর মধ্যে কৃত্রিমতা নেই। বাপী হাসল। —আচ্ছা, এবার বলো।

আবু যা বলবে এতক্ষণে সেটা মোটা-মুটি আঁচ করা গেছল। অনেকটা তাই। আজ একটা মাত্র নির্বিষ সাপ ধরে দুলারিকে দেখিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিল বেশমা। হয়তো ঘরে ফেরার তাড়া ছিল তাই আগে চলে এসেছে। আবুকে পেয়ে কথায় কথায় বলেছিল, বাপীভাই আজ আপিসে না বসে জঙ্গল দেখে বেড়াচ্ছিল, তার সঙ্গে দেখা হয়েছে। আবু জানিয়েছে দেখা তার সঙ্গেও হয়েছে। আর বাপীভাই চলে যাবার পর সারাক্ষণ যে-কথাটা মাথায় ঘুরছিল তাও বলেছে। মেম-সায়েবের মেয়ের প্রেমের ব্যাপারটা তিনজনেই জানে, নিজেদের মধ্যে মাঝে-সাঝে কথাও হয় তা নিয়ে। দুলারির সামনেই আবু বেশমাকে বলেছে, তোর মেমদিদিকে বলে দিস তার প্রেমিকটিকে যেন একটু সাবধান করে দেয়—বাপীভাইয়ের কাছে ধরা পড়েছে তাই রক্ষে, মেমসায়েব বা তার ম্যানেজারের কাছে ধরা পড়লে খেল খতম হয়ে যাবে।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে বেশমার ছাইবর্ণ মুখ একেবারে। হাঁসফাঁস করে জিগেস করল, বাপীভাইয়ের কাছে কবে ধরা পড়ল? কি করে ধরা পড়ল?

আবু বা দুলারি তখনো কিছু বুঝতে পারেনি। আবুর সঙ্গে বাপীভাইয়ের যি কথা হয়েছে শোনার পর বেশমা বলেছে, বাপীভাই জঙ্গলে আজ ওর সঙ্গেই বিজয় মেহরাকে কথা কইতে দেখেছে।

শুনে আবু আর দুলারির মাথায় বজ্রাঘাত। মেমসায়েব জানতে পারলে বেশমার তো হয়েই গেল, ওদেরও গিলে খাবে। সাত-পাঁচ না ভেবে বাপীভাই যদি কথায় কথায় বলে ফেলে সেই ভয়েই আবু ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসেছে।

বাপী হাসছে।—তোমারও এত ভয়!

আঁতে লাগল। —ভয়ের নিকুচি করেছে। শুনলে মেমসায়েব আমারও নিমক-হারাম ভাববে, বুঝলে?

—বুঝলাম। ঊর্মিলার সঙ্গে বিজয় মেহরার যোগাযোগটা বেশমার মারফতে চলছে ঐ তুমি আগে বোঝোনি?

—আল্লার কসম বাপীভাই আমার সত্যি বকবার মাথা হয়েছে আজকাল, বেশমার এত বুকের পাটা আমি ভাবতেও পারিনি, কিন্তু তোমার কি বিজয় মেহরাকে ওর সঙ্গে দেখার আগেও সন্দেহ হয়েছিল নাকি?

বাপী হেসেই জবাব দিল, অমন ডাক-সাইটে মেমসায়েবের মেয়ের সঙ্গে জঙ্গলের সাপ-ধরা মেয়ের এত গলায় গলায় ভাব যার সাদা চোখে দেখার মতো কি-ই বা মতলব বাড়ানোর জন্য ঊর্মিলাই সব থেকে বেশি

তাগিদ দিয়েছিল। . যাক, এখন রেশমা কি বলে ?

—কি আর বলবে। ঘাবড়েছে ঠিকই কিন্তু মচকাবার মেয়ে নয়। দুলাবি বকা-ঝকা করতে ফোঁস করে উঠেছে, জানলে মেম-সায়েব মাথা কাটবে নাকি—না-হয় আগের মতো কষ্ট করে দিন কাটবে—তার বেশি কি হবে ? তোমার কাছে ধরা পড়েছে বলে এখন তোমার ওপরেই বেশি রাগ।

হাত ঘড়িতে সময় দেখল বাপী। পাঁচটা বাজে। বলল, ঠিক আছে, তুমি চলে যাও—

—তুমি পরে আসছ ?

—না। গিয়ে রেশমাকে তার ঘরে পাঠিয়ে দাও। তার মেমদিদি শিগগিরই ওর খোঁজে যাবে।

আবু ভেবাচাকা খেয়ে গেল। —কেন বাপীভাই ?

—জানি না। মনে হচ্ছে। বেশি কথা বলার সময় নেই, তুমি তাড়াতাড়ি যাও।

বাপী নিজেই তাড়াতাড়ি চলে এলো। ঘরের কাছে বা বারান্দায় কেউ নেই। উর্মি-লার এত ধৈর্য আশা করেনি। ধীরে সুস্থে বারান্দাতেই চেয়ার টেনে বসল।

আর দু মিনিটের মধ্যে উর্মিলা বাঁশের ফটকের সামনে এসে দাঁড়াল। আবু কাঁচকে ওখান থেকেই দেখে নিল একদফা। তারপর গেট ঠেলে ভিতরে ঢুকল। বাপীর মনে হল, না এসে পারা গেল না বলেই অমন অসহিষ্ণু হয়েছিল।

বারান্দায় ওঠার আগেই তপ্ত প্রশ্ন।—ঘরদোর খোলা রেখে কোথায় হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলে ? আনন্দ বুঝি আর ধরে না ?

একই মধ্যে এসে ফিরে গেছে তাহলে। অগের প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে জিগেস করল, স্বপ্নানন্দ কেন ?

মুখোমুখি বসল। ছেলেই আছে। গলার স্বরে বক্রহাস। —ঢাকরি পাকা হল, আর আংকল চালিহারও ঝামেলা বাজতে খুব দেরি নেই বোঝা গেল—আনন্দ হবে না !

—তোমার দুঃখ হচ্ছে ?

—নাঃ, তোমার কেরামতি দেখে হাত-তালি দিতে ইচ্ছে করছে ! কি বলবে বলো—

বাপীর অবাক মুখ। —কি বলব ?

—দেখো, চালাকি কোরো না। সুখবর দেবে বলে তুমি আসতে বলোনি ?

—ও । মনে পড়ল যেন। হাসছে অল্প অল্প। —তুমি কি সুখবর আশা করেছিলে ?

—তোমার মতো ধরিবাজকে বিশ্বাস কি যে আশা করতে যাব ?

—তাহলে এলে কেন ?

—তুমি বলবে না চলে যাব ?

—বলব। বাপী গম্ভীর। —চিঠি এসেছে। নিজের হাতে দিয়ে গেছে। বেশমার সঙ্গে দেখা হলে পাবে।

মাথার ওপর আচমকা ঘা পড়ার মতো মুখ। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল খানিক। তারপর শরীরের রক্তকণাগুলো সব মুখের দিকে ধাওয়া করল। চেয়ার ছেড়ে ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বেলা ছোট হয়ে আসছে। বিকেলের আলোয় টান ধরেছে। পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে বাপীর দু-কান সজাগ। পাশের বাংলো থেকে ভ্যানটা বেরুলো।

তারপর থেকে বাপী অপেক্ষা করছে। বড় রকমের কিছু বোঝাপড়া করার তাগিদে উর্মিলা বাই আজই আবার আসবে। আসবেই। বাপীর নিজের বুকের তলায় একটা দিক আঁকড়া। কারো প্রেম-ভাঁড়ির ব্যাপারে নাক গলানোর ইচ্ছে ছিল না—এখনো নেই। গায়ত্রী রুইকে যতটা চিনেছে, এই মেয়ে সহায় হলেই ভাগ্যের দরজা খুলে যাবে ভাবে না। কিন্তু মেয়ে এরপর সহায় না হোক, শত্রুতা অন্তত করবে না। অস্ত্র হাতে নিয়ে শুধু এটুকু আপোসের দিকেই এগোনোর ইচ্ছে বাপীর।

বাপী বই নিয়ে শুয়ে ছিল। এক পাতাও পড়ছিল না। ঝড়ের জন্য প্রস্তুত। তারপর বানধনু দেখার জন্যও।

ঘণ্টা দেড়েক বাদে উর্মিলা বাই এলো। তপতপে লাল মুখ। চাউনিতে বাগ ভয় অবিশ্বাস।

বই হাতে বাপী হাসি মুখে উঠে বসল। জিগেস করল, খুব সুখবর কি না ?

—খুব। খাতির পাবার জন্য বেশমাই বলেছে ভেবে আমি তার টুঁটি চেপে ধরতে গেছলাম। পরে বুঝলাম সে নয়। তাহলে আবু ববরানী বোধহয় ?

বাপীর হাস্যগোধ্ব মুখ। —আবুকে নিজের গোপন কথা তুমি বলেছিলে নাকি !

সামনের চেয়ারটা পা দিয়ে ধাক্কা মেরে সরিয়ে উর্মিলা ঝলসে উঠল। —কে বলেছে তাও আমার বলতে বাকি নেই—মদের নেশায় বাগড়ু তাকে বলেছে—দাঁত্ত রাব করছি আমি, ওদের কারো গায়ে আর ছাল-চামড়া থাকবে না তুমি জেনে রেখো।

খুব নির্লিপ্ত গলায় বাপী বলল, ঝগড়ুকে আমি এখন পর্যন্ত দেখিনি। ওদের দুজনের ঝগড়া গায়ে আঁচড় পড়লে সেটা আমার গায়েও এসে লাগবে।

প্রকারান্তরে সতর্ক করার ইঙ্গীতটুকু স্পষ্ট। অর্থাৎ আঁচড় পড়ার কারণ জানলে মা ওদের ওপর অবিচার কথা দূরে থাক, উল্টে আগলে রাখবে। ঘাঁচায় পোরা বাঘিনীর মুখ। ফাক পেলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকেই ফালা ফালা করার হিংস্র আক্রোশ। সে-চেষ্টা করার আগেই বাপী আবার বলল, আমারই ভুল হয়েছে, তুমি গেস্ট বলে-ছিলে, সেটাই সত্যি ভেবেছিলাম। সত্যিকারের বন্ধু দরকারে অদরকারে পাশে থাকে, তুমি তা চাও না বুঝিনি। উল্টে আশা করেছিলাম গোপনতা ফাঁস হয়ে গেছে দেখলে তোমার আমার সম্পর্কটা আরো সহজ হবে, সুবি-ধেরও হতে পারে ।

ওই মুখে রংবদলের সুন্দর একটু কারুকার্য দেখল বাপী। যা শুনল তার অর্থ না বোঝার মতো বোকা নয় এই মেয়ে। তবু এতটা বিশ্বাস করবে কি করবে না সেই সংশয়। দেখছে আর বিশ্বাসের দিকেই ঝুঁকছে। কাছে এসে প্রায় ঘেঁষে খাটের ওপর বসে পড়ল। দু-হাতে বাপীর দু-গাল ধরে মুখটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে বলে উঠল, তুমি কক্ষনো কোনো কারণে মা-কে কিছু বলছ না, কিচ্ছু জানতে দিচ্ছ না—ঠিক ? ঠিক ?

—তুমি বাধ্য না করলে এরকম আশং-কার কোনো কারণ নেই।

গাল ছেড়ে খপ করে দু-হাতে মাথার চুলের মুঠি ধরে দারুণ ঝাঁকিয়ে দিল, মুখে খুশির জেল্লা। —তুমি একটা স্কাউনড্রেল, তুমি একটা শয়তান।

—কান জুড়লো।

—দরকার পড়লে তুমি আমাকে সাহায্যও করবে। করবে না ?

চুলের মুঠি এখনো ওর হাতে ধরা গায়ে গা ঠেকিয়ে বসে আছে, ওর গরম নিঃশ্বাস নাকেমুখে লাগছে। বাপী অস্বস্তি বোধ করছে। —ছাড়ো, তুমি কি চুলের বাটি ধরে কথা আদায় করবে নাকি।

—আগে বলো, সাহায্য করবে ?

—নিজেকে নিরাপদ রেখে যতটা সম্ভব।

হেসে আরারও গোটা দুই ঝাঁকুনি। —সত্যিকারের বন্ধু নিজের কথা ভাবে ? ইউ আর মাই ফ্রেন্ড অ্যান্ড এ ফ্রেম অফ এ ফ্রেন্ড ! আনন্দের আবেগে এবারে মাথাটা টেনে বাপীর গালের সঙ্গে নিজের গাল ঘষে দিল। তারপর ছেড়ে দিয়ে হাসতে লাগল।

বাপী গম্ভীর। —সরে বোসো। বিজয় মেহেরা কেমন লোক আমি জানি না। কিন্তু আমি একেবারে চোড়া জাতের নই, এতটা প্রশ্রয় সহ্য হবে না।

উঠে চট করে সামনের চেয়ারে বসল। চোখে কোপ, মুখে হাসি। —তুমি একটা হাড় পাজি আমি গোড়া থেকে জানি। নইলে মা এ-ভাবে ঘায়েল হয়—আজ তো একেবারে ট্রাম্প কার্ড ছেড়ে দিয়ে এসেছ।

প্রেমের আবেগে এই মেয়ে কতটা ডুবে আছে বাপী সেটা সহজেই আঁচ করছে। বিজয় মেহেরার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। গলার দড়ি দিতে হলে দেবে, তবু আর কাউকে বিয়ে করবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাপীর সঙ্গে এবার তার আলাপ করিয়ে দেবে। বাপীরও ভালো না লেগে পারে না।

তেমনি রাগ আংকল চালিহার ওপর। বিজয় মেহেরার সম্পর্কে মায়ের মেজাজ সে-ই আরো বিগড়ে দিয়েছে। কি তার মতলব কে জানে। বাবা মারা যাবার পর মা-কে বিয়ে করে সব হাত করার আশায় ছিল। আর দায়ে পড়ে মা-ও তখন যেভাবে প্রশ্রয় দিয়েছিল সেই লোককে, উর্মিলা ধরেই নিয়েছিল বউকে ডিভোর্স করে আংকল সব-কিছুর ওপর দখল নিয়ে বসল বলে। তখন দুজনের এক-জনকেও দেখতে পাবে না উর্মিলা। কিন্তু মা কত ঝানু সেটা পরে বুঝেছে। এদিক থেকে মায়ের ওপর আর রাগ নেই মেয়ের, রাগ অন্য কারণে। নিজেকে ছাড়া আর সকলকে বোকা ভাবে মা। তার ধারণা, মেয়ে মেয়ে বাজে লোকের খপ্পরে পড়ে সর্বনাশ ডেকে আনছে। মেয়ের মতিগতি দেখে বিজয় মেহেরা সম্পর্কে আংকলকে খবর নিতে বলেছে। আংকল আর সম্পর্কে যাচ্ছেতাই রিপোর্ট করেছে। মিরিকের এক রিপোর্টে

তাকে দেদার মদ খেতে দেখেছে বলছে। বিজয় উর্মিলার কাছে সত্যি কথাই বলেছে। অল্প-স্বল্প মদ খেয়েছিল সত্যি কথাই। একলা থাকে, কিছু ভালো না লাগলে একটু-আধটু খায়ও। তাও ছেড়ে দেবে কথা দিয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে মায়ের আবার আংকলের কথাতেই ধ্রুব বিশ্বাস। এ-নিয়ে মায়ের সঙ্গে কম ঝগড়া করেনি উর্মিলা। বলেছে, বাবা তো এতোর মদ খেত—কিন্তু বাবা কি খারাপ লোক ছিল?

—বয়েস আর কারো চোদ্দ বছর কম হলেও ওই আংকল মা-কে ছেড়ে আমাকেই বিয়ে করার জন্য উঠে-পড়ে লাগত—বুঝলে? এখনো নিজের তালের লোকের কাঁধে আমাকে ঝোলানোর মতলবে মা-কে ফুসলে বেড়াচ্ছে, খুব ভালো ভালো ছেলের খবর দিচ্ছে। ভালো না হাতি—এরাবত মা জোর-জার করে আমাকে পাহাড়ে ধরে নিয়ে গেছল তার খবরের এক ছেলেকে দেখার জন্য। মায়েরই পছন্দ হয়নি বলে বাঁচোয়া।

এবারে আর একটা গোপন খবর ফাঁস করল উর্মিলা। বিজয় মেহেরার সঙ্গে আর যে যোগাযোগ আছে এটা বাপীর মতো আংকলও জেনে ফেলেছে। পাহাড়ের রাস্তার এই বানরজুলির জঙ্গল থেকেই দুজনকে একসঙ্গে দেখে জিপ থামিয়ে দাঁড়িয়ে গেছল। সে প্রায় আট মাস আগের কথা। কলে পড়ে তাকে খুশি করার জন্য উর্মিলা রেশমার মারফৎ তাকে এক বোতল ভালো মদ পাঠিয়ে দিয়েছিল। যে-রাতে বাপী আংকলের মন পাবার জন্য তার ঝাড়ি গেছল, সেই রাতে বাপী টের পেয়ে ওর সম্পর্কে যা-তা ভেবেছে, কিন্তু মেমদিদিকে বেশমা দারুণ ভালবাসে—তাই গেছে। আংকল যদি টের পেত এ-ব্যাপারে বেশমার সঙ্গেও যোগসাজশ আছে, মওকা পেয়ে সে তাহলে ভিতরের ঘরে ছেড়ে বেশমাকে বিছানাতেই টেনে নিয়ে যেত—এমন চরিত্র তার। জেরার জবাবে বেশমা শুধু বলেছে, কাগজের বাক্সটা মেমদিদি তার কাছে পৌঁছে দিতে হুকুম করেছে তাই নিয়ে এসেছে, আর কি-চ্ছু জানে না। ভালো মদের বোতল ভেট দেবার অর্থ আংকল ঠিকই বুঝেছে। মা-কে এখন পর্যন্ত কিছু বলেনি অবশ্য, কিন্তু সেই থেকে উর্মিলার ওপরেও তার একটু সর্দারি বেড়েছে। ফাঁক পেলে ভালো মুখ করে বিজয় মেহেরাকে বাতিল করার উপদেশ দেয়, আর মায়ের প্রতি তার নিজের কর্তব্যের কথা বলে ওকে হাতের মুঠোয় রাখতে চায়। আবার ওদের দুজনকে হাতে-নাতে ধরার জন্যে ওত পেতে আছে। বেশমাকে ধরে মেরে বসে, শাসায়। উর্মিলার তাই নিজের জন্যে চিন্তা, বেশমার জন্যেও চিন্তা। এ অবস্থায় ফ্রেন্ড অর্থাৎ বাপীই একমাত্র সহায় তার।

বুকের তলার চেনা যন্ত্রণাটা থেকে থেকে মোচড় দিয়ে ওঠে। এর নাম ঈর্ষা কি হতাশা বাপী জানে না। নিজের ওপরেই বিরক্ত। কেন সেধে এর মধ্যে নিজেকে জড়াতে গেল। তার সুমনের কাজ। কাজে শুদ্ধি। কাজে মুক্তি। এর থেকে ভ্রষ্ট হলে ওই হতাশার

প্রায়ই আপনি মিষ্টি আর শ্বেতসারপদার্থ খান তাতে আপনার দাঁতে দন্তক্ষয় রোগের ভয় থাকে আর আপনি দাঁতের যন্ত্রণায় কষ্ট পান।
এর হাত থেকে বাঁচার একটিই উপায়—বিনাকা ফ্লোরাইড* ব্যবহার ক'রে দাঁত সুরক্ষিত রাখা।

পৃথিবীময় পরীক্ষা ক'রে দেখা গিয়েছে যে, টুথপেস্টে ফ্লোরাইডই হল একমাত্র উপাদান যা দাঁতের এনামেলের সঙ্গে ঠিক ঠিক মিশে দাঁত মজবুত বানায় আর ক্ষয় হতে দেয় না। বিনাকা ফ্লোরাইডের স্থায়ী গুণ দন্তক্ষয়ের জীবাণু জন্মাতে দেয় না আর দাঁতে যন্ত্রণাদায়ক গর্ত হতে দেয় না।

* এতে আছে সবচেয়ে কার্যকর ফ্লোরাইড কম্পাউণ্ড সোডিয়াম-মোনোফ্লোরোফস্‌ফেট।

বেশী মজবুত দাঁতের জন্যে, দন্তক্ষয় বন্ধ করার জন্যে—

বিনাকা ফ্লোরাইড

ভারতের সর্বপ্রথম ও সর্বোত্তম ফ্লোরাইড টুথপেস্ট।

দেখলে মাথা ঘোঁড়াই সময় হবে এ-সব ও জানে না ?

গায়ত্রী রাই নিয়ে সঙ্গে করে বাপীকে তার পাহাড়ের বাংলোয় রেখে গেছে। আর ঝগড়ুকে ধা-বলার বলে গেছে নিশ্চয়। সমস্ত ব্যবস্থা আর সর্তব্য বুঝিয়ে দিয়ে সুলক্ষণ চলে যাবার পর লোকটা অনুগত ছায়ার মতোই তার সঙ্গে লেগে আছে।

ঝগড়ু বাড়িয়ে বলেনি। পাহাড়ের ওপর সত্যি ছবির মতো বাংলো। এ তল্লাটে এমন আর দুটি নেই। পাহাড়টাকে পেঁচিয়ে লাল কাঁকরের রাস্তা বাংলোর মুখে এসে থেমেছে। থাকে থাকে পাহাড় কেটে প্ল্যাটফর্মের মতো করা হয়েছে। সব থেকে উঁচু প্লাটফর্মে তিনটে বড় ঘর। তাতে কাঁচের দরজা জানালা। সামনে প্রশস্ত বারান্দা। ঢোকার পথে দিশি ফুলের বাগান। পিছনে দরকারি এবং দামি গাছ-গাছড়ার বাগান। একদিকে কাঠের মস্ত স্টোর হাউস। তার পরেই এক সারি শিরীষ গাছ। স্টোর হাউসের পাশে স্বল্প ঘর। ছোট-বড় গ্লাসকেসে নানা রকমের সাপ। ঝগড়ু প্রথমে সাপের বিষ বার করে। বাংলোর আর একদিকে একটু তফাতে কিচেন। তার পাশে ছোট ছোট দুটো ঘরে চাকর-আর মালি থাকে। পরের ঘরটা ঝগড়ুর। কর্ত্রী বা অন্য লোকজন এলে সে ওই ঘর দখল করে, নয়তো বাংলোতেই থাকে। সবটা জুড়ে চারদিকে কাঁটা তারের বেড়া—তাতে বুনোফুলে আর লতাপাতা লাগিয়ে সৌন্দর্য বাড়ানো হয়েছে।

পরপর তিনটে ঘরের একটা মেয়ের মাঝেরটা গায়ত্রী রাইয়ের। শেষেরটা অতিথি অভ্যাগতর জন্য। ভিতরে ডাইনিং স্পেস। সামনের বারান্দায় বসার ব্যবস্থা।

গায়ত্রী রাই চলে যাবার পর বাপীর প্রথম কাজ ঝগড়ুর সঙ্গে ভাব করা। ও তাকে অন্তত হোমরা-চোমরা কেউ ভেবে বসে আছে। বয়েস শুনেছে সত্তরের কাছাকাছি, কিন্তু জরা এখনো সত্যি দূরে সরে আছে। শক্ত-পোক্ত পাকানো চেহারা। লালচে চোখ। প্রথম দিনই বিকেলে পাহাড় থেকে নেমে ওর জন্য এক বোতল দামী মদ কিনেছে। ওর হাঁপফাঁস দশা দেখে বলেছে, যতদিন আমি এখানে আছি তুমি ভালো জিনিস খাবে—কুরোলে আবার কিনে দেব। আর ঝবখানীর কাছে আমি তোমার অনেক গল্প শুনেছি, আমাকেও তার মতো কাছের একজন ভাববে।

প্রথম সন্ধ্যে থেকেই ওই পাথরে মুখ ঘুমিয়ে টসটসে সর্বদা। প্রথম পাঁচ ছদিন বাপী আর বাংলো ছেড়ে বেরোয়নি। নেশার জিনিস সব এখানেই তৈরি হয়। এর জন্য অভিজ্ঞতক বাঁধা কর্মচারী আছে। মস্ত স্টোর হাউসের মধ্যেই যাবতীয় ব্যবস্থা। ঝগড়ুকে সঙ্গে নিয়ে বাপী সব খুঁটিয়ে দেখেছে, বুঝে নিয়েছে। পিছনের বাগানের প্রতিটি গাছ-গাছড়া চিনেছে। সাপ ঘরে গিয়ে ঝগড়ুর সাপের বিষ বার করা দেখেছে। এও গা ছমছম করার মতো ব্যাপার। গ্লাস কেন একটু ফাঁক করলেই বিষধর বেরিয়ে আসার জন্য গলা বাড়ায়। ঝগড়ু সেই গলা সাঁড়াশির মধ্যে এক হাতে চেপে ধরে একটা ছোট টেবিলের সামনে নিয়ে আসে। টেবিলে রাবারের ক্যাপ আঁটা কাঁচের গেলাস। সাপের মুখ সেখানে ধরার সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ সাপ তার ওপরেই দাঁত বসায়—ফলে রাবার ক্যাপে দাঁত আটকে যায়। ঝগড়ু তখন সাপের চোয়ালের দুদিকে নির্মমভাবে টিপতে থাকে—গেলাসের মধ্যে তখন টস-টস করে বিষ পড়ে।

বিষ বার করা হয়ে গেলে অতি বিষাক্ত সাপের রক্তাও নিস্তেজ, কাহিল। মাটিতে ছেড়ে দিলেও কোনরকমে এঁকেবেঁকে পালাবার পথ খোঁজে। তেড়ে আসে না।

দুপুরে আর সন্ধ্যার পরে অনেক রাত পর্যন্ত তন্ময় হয়ে বই পড়ে। সত্যি অনেক রকমের বইয়ের সংগ্রহ ছিল বীরেশ্বর রাই-এর। প্রথম রাতে ভালো জিনিস খেয়ে একটু নেশা জমার পর ওকে বই পড়তে দেখে ঝগড়ুর হাপুস কান্না। নাওয়া-খাওয়া ভুলে সায়েব ওই-রকম করে বই পড়ত। সে চলে যাবার পর ও বইয়ে আর কারো হাত পড়েনি।

এরপর ঝগড়ুকে সঙ্গে করে পাহাড়ে আর জঙ্গলে ঘোরার পর্ব। এ-কাজেও ঝগড়ুর ভারী উৎসাহ। ঘন্টার পর ঘন্টা ঘুরে ঘুরে তাদের দরকারের গাছ-গাছড়া ফুল-ফল লতা-পাতা চিনিয়েছে। কোনটার কি কাজ আর কত কদর বুঝিয়েছে। কখনো বা বাপী এ-সব সংগ্রহের বাঁধা লোকদের সঙ্গে সকালে বেরিয়ে সন্ধ্যায় ফিরেছে। খাওয়া-দাওয়া হয়নি বলে ঝগড়ুর সখেদ অনুযোগ আবার একই মুখে প্রশংসাও। সায়েবও ওইরকম করত। খাওয়া-দাওয়া ভুলে যেত। ঝগড়ুর মতে সায়েবের অনেক কিছুই বাপীবাবুর মতো। কিন্তু কাজ শেষ হলে দিলদরিয়া সায়েব গেলাস নিয়ে বসত—বাপীবাবু এ-সব ছোঁয় না এটুকুই তফাৎ।

পনের দিনের মধ্যে বাপী অনেক ঘুরেছে অনেক দেখেছে অনেক চিনেছে। এই ঘোরা দেখা আর চেনাটা নেশার মতো হয়ে উঠেছে। এরপর একলাই বেরুতে শুরু করল। সঙ্গে একটা দুটো বই। ঘোরে দেখে আর বইয়ের সঙ্গে মেলায়। এক-একদিন এত দূরে চলে গেছে, বাংলোয় আর ফেরাই হয়নি। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পথের ধারের ছাপরা ঘরের সরাইখানায় যা জোটে তাই খেয়েছে, আর অক্টোবরের পাহাড়ী শীতের রাত সেখানেই মোটা মুড়ি দিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে। সকালে আবার পাহাড় আবার জঙ্গল।

এর মধ্যে দুবার গায়ত্রী রাই পাহাড়ের বাংলোয় এসেছে। কিন্তু বাপীর সঙ্গে একবারও দেখা হয়নি। থাকতে আসা নয়, রাজে আসা। দ্বিতীয় দফায় চালিহা সাহেবও সঙ্গে ছিল শুনেছে। আর, প্রায় বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল মালকান। ঝগড়ু তাকে কি কথা বলেছে সেটা তার উদ্ভাসিত মুখ দেখেই বোঝা গেছে। বাপীবাবুর সম্পর্কে বলতে গিয়ে খুব সম্ভব ওর স্বর্গত সায়েব-এর কথাই টেনে এনেছে ও। মালকান নাকি ওকে এবার থেকে বেরুনোর সময় সঙ্গে শুকনো খাবার দিতে হুকুম করে গেছে। দ্বিতীয় দফায় অনেকক্ষণ ছিল বলে ও বাপীবাবুর সংগ্রহের গাছ-গাছড়া লতা-পাতাও মালকানকে দেখিয়ে ছেড়েছে।

মনে মনে বাপী এই ঝগড়ুর কাছেও কৃতজ্ঞ।

সেদিন চেপে শীত পড়েছিল। আগের রাতে অসময়ে বৃষ্টি হবার ফলে সকাল থেকে কনকনে ঠাণ্ডা। সেই সঙ্গে ঝড়ো বাতাস চলেছে বিকেল পর্যন্ত। জঙ্গলের মধ্যে মাথা কান আলোয়ানে মুড়ি দিয়েও বাপীর কাঁপুনি ধরেছে। তবু পাহাড়ের ধার ঘেঁসে এগিয়েই চলেছে। আর খানিকটা এগোলে যদি আরো নতুন কিছু চোখে পড়ে। এ-দিকটা নতুন। আগে আসেনি।

হঠাৎ এক জায়গায় পা থেমে গেল। অদূরে একটা মস্ত দেবদারু গাছের নীচে কে একজন বসে। বাপী চমকেই উঠেছিল। পাহাড় থেকে বুনো আদিবাসী নেমে এসেছে কোনো। এই ঠাণ্ডায়ও সম্পূর্ণ উলঙ্গ। বুক আর পিঠ পর্যন্ত ঝাঁকড়া কাঁচাপাকা চুল-দাড়ির জট। সর্বাঙ্গে ভস্ম-প্রলেপ। কপালেও। সামনে মাটিতে একটা লম্বা ত্রিশূল পড়ে আছে। নিজেও মাটিতেই বসে আছে, কোনো আসন নেই। হয়তো জনমানবশূন্য জায়গাটা বেছে নিয়ে সাময়িক বিশ্রামে বসেছে।

ঝাড় গুল্মে লতাপাতা গাছগাছড়া দেখতে দেখতে আসছিল। মুখ তুলে হঠাৎ দেখেছে মানুষটাকে। সে বোধহয় দূর থেকেই লক্ষ্য করছিল তাকে। চোখাচোখি হতে বাপী স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে গেছে।

পায়ে পায়ে সেদিকে এগিয়ে চলল। নিজের ইচ্ছের যাচ্ছে কি ওই দুটো অপলক চোখ ওকে টানছে, জানে না। সামনে পাঁচ হাতের মধ্যে এসে দাঁড়াল। ওই দুটো চোখে হাসি ঠিকরোচ্ছে কি আলো বাপী ঠাওর করতে পারছে না। সেই হাসি বা আলো যেন তার চুল-দাড়ির ফাঁকে ফাঁকেও লুকোচুরি খেলে গেল।

—আগে বাঢ়ু। মিল জায়গা।

বাপী চমকেই উঠল। কোনো সাধু-সন্তের ধার কাছে ঘেঁষেনি কোনদিন। ভকতি বিশ্বাসের ছিটে-ফোঁটাও নেই। কিন্তু ওই গমগমে গলার স্বর আর কথাগুলো এক বোমাপতন কাণ্ড ঘটিয়ে দিল। স্নায়ুতে স্নায়ুতে এক অদ্ভুত ঝংকারের মতো বেজে চলল।

ত্রিশূল হাতে মানুষটা উঠে দাঁড়াল। তারপর পলকে জঙ্গলের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল।

তার পরেও ওই গলার স্বর আর ঝংকারের রেশ বাপীর কানের পর্দায় ঘা দিতে থাকল।

আগে বাঢ়। মিল্ জায়গা।
সামনে এগোও। পেয়ে যাবে।

বাপী কি পেতে চায় ? সামনে এগোলে কি পাবে ? পাহাড়ের বাংলোয় ফিরতে ঘুমের মধ্যেও ওই কথাগুলো এক শব্দ তরঙ্গের মতো বাজতে লাগল। বার বার ঘুমের বারোটা বাজালো।

সামনে এগোও। পেয়ে যাবে।
আগে বাঢ়ু। মিল জায়গা।

(চলবে)

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

হাওয়া গাড়ি

।।তেত্রিশ।।

তোমায় আজ পেটাবো কালুদা। বলে দিলীপ বেসমেন্টে গাড়িটা রাখলো। গাড়ি থেকে নেমে এসো। একবার ফুটে ওঠো শুধু। তোমার দফা আজ শেষ করবো।

বেসমেন্টের আধো অন্ধকারে অস্টিন-ট্যুয়ারের সিটগুলো তখনো ফাঁকাই দেখাচ্ছিলো। সেখান থেকে কালু ঘোষের নিরুপায় গলা ভেসে এলো। কেন? আমি কি করলাম তোমার?

কি করো নি? এতবার বললাম—ফুটে ওঠো। ফুটে ওঠো। তা শুনলে কথা।

আমি কি তোমার চাকর দিলীপ? যা বলবে তাই করবো?

শুধু একটু ফুটে উঠতে পারলে না? ঋষি আমার কমপ্লিটলি ম্যাড ভাবলো। তোমার জন্যে এটা হোল কালুদা—

ওকে চমকে দিয়ে তুমি কি জিততে?

হারজিতের ব্যাপার নয় কালুদা। আমি নাকি প্যারানইয়াক। আমি নাকি ইগনোর করতে জানি না। যা কিছু বাজে—আমি তাই। সেখানটায় তুমি ফুটে উঠলে—আমার কথাটা একটু থাকতো।

তোমার বন্ধু ঋষি তো দিব্যি পরিষ্কার লোক। সে তো একটুও প্রফেশনালে করছে না। স্বাভাবিক। অফিস যাচ্ছে সময় মত। যাচ্ছে সময় মত।

ঋষি তো আমার চেয়ে ভালো লোক। ও একজন ঠিক লোক। তাই বলে তুমি ফুটে উঠবে না কেন?

ঋষির কাছে তোমার ইমেজটা তুলে ধরতে আমি কেন কষ্ট পাবো দিলীপ?

শীত চলে গিয়ে যাচ্ছে গরম। মাল্টিস্টোরিড বাড়ির চাতালের বাইরেই পিচ রাস্তার ফাঁকে ফাঁকে সবুজ দুর্বাদল ছোপ। এখানে ছায়া। ওখানে ইলেকট্রিক আলোয় ঘাসের মাথাগুলো অনধিকারী প্রকৃতির একমাত্র প্রতিনিধি।

কালু ঘোষ আবার মুখ খুললো। তুমি অফিসে যাও না কেন?

ওখানে আর আমার কোন টান নেই।

অফিসে আবার টান কিসের। লোকে অফিসে যায় টাকার জন্যে। সে-টাকায় বাড়ির ভাড়া দেয় লোকে।

আমরা কালুদা সেভাবে কোন ইন্ডিয়ায় কাজ করতে যাই নি। অল্প বয়সে ঢুকেছিলাম। তখন অফিসটাকে একটু একটু করে ভালবাসতে শিখি। সেটাই তো কাল হোল।

তোমার তো চাকরি থাকবে না দিলীপ। এ রকম লম্বা ডুব তো কোন অফিস বরদাস্ত করবে না।

সেটা অফিসের ব্যাপার। ওসব নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। তুমি ঘামাচ্ছো কেন কালুদা?

আমি? আমি তো ঘামাচ্ছি না। আমার তো মাথাই নেই। আমি ভাবছি তোমার কথা। তোমার তো সংসার আছে দিলীপ।

কোথায় সংসার। কুটুন বিয়ে হয়ে গেলে আমি আর রানী—দুই প্রাণী।

আরেও একজন আছে।

হ্যাঁ। ঋষির ছেলেটা। ও তো এখনো হিসেবের ভেতর পড়ে না। কুটুর বিয়েটা আগে দিয়ে দেওয়া দরকার। তারপর আমরা কোথাও চলে যাবো। চলো কালুদা। ওপরে চলো। তোমার সঙ্গে রানীর পরিচয় করিয়ে দেব।

আবার সেই তো ফুটে উঠতে বলবে। ওর ভেতরে আমি নেই দিলীপ। আমি যেমন আছি—আমায় তেমন থাকতে দাও।

লিফ্‌ট দিয়ে উঠে সদরে বেল টিপলো দিলীপ। ডোর বেলটা বাজলো না। কদিনই বাজছে না। খুলে নিয়ে সারাতে দিতে হবে। কড়া নাড়তেই দেখলো—দরজা ভেজানো ছিলো। আপনা-আপনি খুলে গেল। লিভিংরুমের টানা লম্বা মোজাইক মেঝেতে বুট পায়ে দুখানা পা চোখে পড়লো দিলীপের। পাঁড়েজী? কি মনে করে?

পাঁড়ের পেটুল পাম্প এ-পাড়ার সবারই জানা। অনেকের মতই দিলীপও ওখান থেকেই পেটুল নেয়। পাঁড়েজীর হাতের খাতাখানা পাখার হাওয়ায় ফর ফর করে উড়ছিলো। মাথা নিচু করে বললো, সাড়ে৯ লিটারের দাম বাকি পড়ে আছে। বোস সাব।

গলা পেয়ে রানী বেরিয়ে এলো। পেটুলের জন্যে এতগুলো টাকা বাকি ফেলেছো? আর এদিকে প্রবোধের দু' মাসের মাইনে দিতে পারো না। কি লোক বলো তো তুমি?

সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনি আসুন পাঁড়েজী। দু'-চার দিনের ভেতর সব শোধ করে দেব।

পাঁড়েজী উঠছিলো। রানী তাকে ধমকে থামালো। বসুন আপনি। আমি শুনতে চাই সেপ্টেম্বর থেকে আপনার টাকা শোধ করবে?

সন্ধ্যেবেলায় ইদানীং প্রায়ই ভোল্টেজ ফ্লাকচুয়েট করে। আলো কমে গিয়ে ঘরটা মেঘলা হয়ে যাচ্ছিলো। তাতে ঘুলঘুলি পাখার বোডের শেলা ছায়া। পাঁড়েজী উঠে দাঁড়িয়ে বললো, বোস সাব তো কোনদিন বাকি ফেলেন নি আগে। নিশ্চয়ই শোধ করে দেবেন।

পাঁড়ে চলে যেতে রানী বললো, অফিস থেকে আজও যেন এসেছিলো। কতদিন অফিসে যাও না বলো তো? কেন যাও না?

ও অফিসে যাওয়ার কোন মানে হয় না।

ব্যাংকের টাকা তো সব সময় ভেঙে চলে যায় না।

উডোনচণ্ডী দৃষ্টি তুলে দিলীপ রানীর দিকে তাকালো। আর ক'টা টাকা আছে ব্যাংকে।

হাজার দুই হবে।

তারপর রানী?

বাঃ! তোমার তো জমা ছুটি রয়েছে। সে-মাইনে তো পাবেই।

তা একদিন পাবো। তবে এখন নয় রানী।

কখোন?

ওরা তিতিবিরক্ত হয়ে যেদিন ডিস-মিস করবে—তারপরই সব বকেয়া মিটিয়ে দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলবে।

বরখাস্ত করবে কেন? তুমি আবার অফিসে যাও।

তুমিও একথা বলছো রানী? যেখানে আমি ক্ষমা চাই নি—সেখানে আটঘাট বেঁধে আমার ক্ষমা করে কি করে? আর সেখানেই বা আমি আবার যাই কি করে?

রানী আর কোন কথা বললো না।

রাতে অনেক দিন পর রানী আর দিলীপ মুখোমুখি খেতে বসলো। গরমকালে হাত বাড়ালে এ ফ্ল্যাটে সম্ভবত ডাসমন্ড-হারবারের গাদা থেকে ঠান্ডা হাওয়া আসে। খাবার জিনিসটা যে চিবিয়ে খেতে হয়—আর তা যে ভয়ংকর বিরক্তিকর ব্যাপার—তা দুজনেই টের পাচ্ছিলো। দিলীপ বললো, অনেকদিন আমি আর একা একা খেতে বসতে পারি নে।

কখোন ফিরবে জানতুম না তো। ও তো ওর পিসির সঙ্গে বেরুলো।

এই বয়স থেকেই বিশ্বনাথ-কুটুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ালে মাথা তো ঝুনো হবে যাবে খোকোনের।

তুমি নিয়ে বেরোলে পারো ওকে।

আমি কোথায় কোথায় ঘুরি—তার কি কোন ঠিক আছে রানী।

এরপর অনেকক্ষণ আর কথা এগোলো না। দিলীপ খেতে খেতেই দেখলো, রানীর নাকের দুপাশ দিয়ে ঘাম ভাঙবার বেয়ে গড়েছে।

রানী বললো, কোয়াপারেটিভ থেকে লাম্প বিমাইন্ডার এসেছে। বাকি কিস্তির টাকা না দিলে ফ্ল্যাট ছাড়তে হবে।

দেবো ছেড়ে।

এমন সাজানো ফ্ল্যাট আর পাবে না।

আমাদের জীবনটাই তো আর গোছানো নেই রানী। ফ্ল্যাট দিলে কি করবো বলতে পারো?

কথা আর এগোলো না। প্রবোধ আর গান শেখাতে এসে ফিরে গেছে। তখন রানী একা ছিলো বাড়িতে। বিকেল পাঁচটা সাড়ে চারটা। বাড়িতে কেউ নেই দেখে প্রবোধ বলেছিলো, না হয় তুমি শিখলে আজ। আমি তো তোমার পুরনো মাস্টারমশাই।

রানী কোনো অমল দেয় নি। শুধু বলেছে—ভুলে যেও না—তুমি আমার মেয়েকে গান শেখাবে বলে এখানে এসেছো।

তারপর প্রবোধ আর কোন কথা বলে নি। একবার খোকোনের খোঁজ করে-ছিলো। তারপর বসে থেকে থেকে এক কাপ চা খেয়ে উঠে গিয়েছে। যাবার সময় জানতে চেয়েছিলো, আজকাল বোস সাহেবকে একদম দেখি না—

কাজে থাকে।

এমন উদাসীন জবাবের পর বসে থাকা যায় না। প্রবোধ তারপরই চলে যায়। রানী খাবার টেবিলে বসেই ভাবছিলো, মধ্যজীবনে এসে এমন একটা অনিশ্চিত অবস্থায় পৌঁছাবো ভাবতে পারি নি। এ-বাড়িতে এখন সম্পর্কগুলো সব ঢিলে-ঢালা। রবি যে কবে ফিরবে কেউ জানে না। আমাদের বউমাটি একটি একেশ নম্বরের শয়তানী। বিয়ের পর আবার ধিঙ্গি হয়ে দৌড়োবার কি দরকার? কুটুর এখন অনেকটাই বিশ্বনাথ। রবির বাবা নিজের ভেতরেই বুঁদ হয়ে আছে। এখন আর আমার দিকে তাকাবার সময় পায় না। অথচ—এক সময়...। শুধু খোকোন আমাকে চায়। আমাকে না হলে ওর চলে না। আমি ওর মা, ঠাকুমা, বন্ধু—সব আমি।

খাওয়া দাওয়ার পর দুজনে গিয়ে ব্যালকনিতে দাঁড়ালো। এত তাড়াতাড়ি কোনদিন খাওয়া হয় না। নিচে অনেকগুলো গাড়ি আলো জ্বালিয়ে বাবডোয়ানা রোডে গিয়ে পড়েছিলো। দূরে মাঝেরহাট পুলের নিচে নিশ্চয় মাল গাড়ির ইস্কিন খাল থেকে উঠে আসা মোষের পাল দেখে,ঘন ঘন বাঁশী দিচ্ছে।

তুমি তো অনেক দিন এভাবে আছো। এ-বাড়ি—এ চাকরি—এই বন্ধু-বান্ধব ছেড়ে দিয়ে থাকতে পারবে?

কেন পারবো না রানী। রবি জন্ম থেকে আমাদের দেখে আসছে। আমাদের কাছেই বড় হয়েছে। অথচ দ্যাখো কেমন আচমকা দূরে সরে গ্যালো। ওর তো কোন অসুবিধে হয় নি। মালবিকা মা হয়েও দিব্যি দূরে সরে গেল। কোথায় থাকলো ভালবাসা। স্বামী। ছেলে। আমাদের কথা বাদই দাও।

আমরা যে তোমার সঙ্গে সঙ্গে এ জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

আবার আমার সঙ্গে আরেক জীবনে অভ্যস্ত হবে রানী।

রানী কোন কথা বললো না। তারা খোবলানো আকাশে তাকিয়ে মনে মনে হাসলো। মনে মনেই বললো, তা কি করে সম্ভব? শেষে পরিষ্কার বললো, তোমার এই অফিস না যাওয়া আমি বুঝি না। চাকরি না করা বুঝি না। তুমি কি করবে ভেবেছো?

আমি জানি না—আমি কি করবো রানী। অফিস না যাওয়ার ভেতর না বুঝতে পারার কিছু নেই। আমি যখন ভৌমিক খাদান করতে গিয়ে কমিশন পেয়েছি—বেশি বেশি আয় করেছি—তা তো বুঝতে তোমার অসুবিধে হয় নি। চাকরি না করাই বা না বোঝার কি আছে?

বাঃ! তুমি একজন গৃহস্থ। তোমার বউ আছে। সংসার আছে। ফ্ল্যাটের ইনস্টলমেন্ট আছে। ইলেকট্রিক বিল—গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম আছে। এ-সব আসবে কোত্থেকে? আমাদের রেশনের টাকা?

যেমন পারবো তেমন আনবো। একজন মানুষ তো একবার তার নিজের মুখোমুখি দাঁড়াতে চাইতে পারে। সে তো তখন নিজেকে দেখতে পেয়ে চিনবার চেষ্টা করতে পারে। তখন ফ্ল্যাট, বেশান—এসব খুব বড় কথা নয় রানী।

কি জানি। আমি যেমন বুঝি—তেমন বললাম তোমাকে। তুমি আমার স্বামী। তুমি যা ভালো বুঝবে আমাদের জন্যে—তাই করবে। তবে এটাও বুঝি না—কী এমন হোল—যে জন্যে তুমি যাচ্ছিলে উত্তরে—আচমকা গোত্তা খেয়ে ধরলে দক্ষিণের পথ?

দিলীপ সোজাসুজি একটা অন্ধকার পেয়ে গেল তাকানোর জন্যে। সেদিকে মুখ করে বললো, অনেক জিনিস জানতাম না রানী। অনেক জিনিস ভুল জানতাম।

সে জন্যে নিজে ভুগবে কেন?

বলো—আমরা কেন ভুগবো!

তা বলবো কেন? তুমি তো কষ্ট পাচ্ছো। আমি তোমার বউ। কিসের ওপর তোমার এত অভিমান? কার ওপর এত অভিমান? তুমি তো স্যার লেজলিস ওখানেও জয়েন করতে পারো। ওরা তোমায় আদর করেই নেবেন—

এরাও আমায় তাড়িয়ে দেয় নি। চলে যেতেও বলে নি। বরং চায়—আমি থাকি। কিন্তু না। জানো, রানী—স্যার লেজলিস ওখানে এখন জয়েন করলে আমার জীবনে খাবি, অনাথদা, সাধন গুপ্ত—তেমন কেউ আর আসবে না। কেননা, আমি তো এখন মধ্যজীবনে। এখন আর কারও জন্যে নতুন করে আমার মনে জায়গা হবার কথা নয়। তবু আমি আর এই জীবন রিপিট করতে চাই না রানী।

কোন্ জীবন?

—এই যে—সেলস্। টারগেট। আগামী তিন মাসে বিজনেস প্রোমোশনের আগাম প্রোজেকশন। এর বাইরে আমি থাকতে চাই রানী। টারগেট মানেই তো টেনশন। সে টেনশন কাটিয়ে উঠতে ডিংকস্। কম তো হয় নি। একজনের সঙ্গে সম্পর্ক আরেকজন রাখে না। মধ্যবয়সে এসে জানলাম—আমি এতকাল যে জেনে এসেছি—তা সবই ভুল। আমার জন্যে কেউ বসে নেই। আমি কারও পক্ষেই ইন-এভিটেবল্ নই। আমার আশপাশের মানুষ

আমার খালি জায়গাটা আর কেউ দিলীপ বা ফিলিপ দিয়ে ভরাট করে নেবে। আমার পাশের লোকজনকে আমি তো কোনদিন ফিলিপ বা নিখিল দিয়ে রিপ্লেস করার কথা ভাবি নি। অনেককেই মনে হয়েছে—ইনএক্সচেঞ্জেবল্। ঘুমোতে যাওয়ার আগে ভাবতাম—কখোন কালকের ভোরটা আসবে—তখন আবার দেখা হবে।

তুমি তো আমাদের কাছে চনএক্সচেঞ্জেবল্।

সবটা নয় রানী। রবি তার হিসেবের খাতায় আমার নামটা কেটে দিয়েছে। তাব জন্যে তাকে আমি দোষ দিতে পারি নে। সে এখন আলাদা একজন মানুষ। সে আমাদের কাছে থেকে শরীর পেয়েছে। সেই দাবিতে আমরা রবির পথ ঠিক করে দিতে পারি নে। সে তার পথ নিজেই খুঁজে নিক।

কুটু?

সে তো নিজের রাস্তা নিজেই বেছে নিয়েছে। বিশ্বনাথ বার-এ গায়। সে বিশ্বনাথকে বেছে নিলো। যেমন রবি নিয়েছিলো মালবিকাকে। অথচ দ্যাখো রানী—আমি আর তুমি ওদের দু'জনের জন্যে অন্য রকম ভেবেছিলাম।

তা সত্যি। আচ্ছা আমি?

তুমি আর আমি—আমরা দু'জন—দু' জায়গা থেকে শরীর পেয়ে জীবনের এক জায়গা থেকে দু'জনে এক সঙ্গে শুরু করেছিলাম। আমরা মনকে পোষ মানিয়ে একজন—আরেকজনের। অনেক দিন ধরে অভ্যেস করে তবে আমরা মেড্ ফর ইচ্ আদার। তাই না? অনেক দিন তো অন্যের জন্যে জীবন করলাম। এবার নিজের জন্যে একবার জীবন করবো। সেখানে কোন মায়াদয়াকে জায়গা দেব না। আমি কিছুকাল তোমার মত হয়েছি। কিছুকাল অফিসের মত। কিছুদিন ভৌমিক খাদানের মত। আবার ছেলেমেয়ের মতও তো হয়ে দেখেছি। সবার সুখ-সুবিধে বুঝতে চেয়েছি। এবার আমি আমার মত হয়ে দেখতে চাই রানী।

আমি তাহলে কি করবো? কোথায় যাবো? তুমি এসব কী কথা বলছো—আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি নে।

তুমি এবার আমার মতো হয়ে ওঠার চেষ্টা করে দেখতে পারো। তবে এ-ব্যাপারে আমার দিক থেকে কোন চাহিদা নেই। নো কমপালশন রানী।

আমি যদি আমার মত হতে চাই?

হয়ে দ্যাখো। কোন কম্প্রোমাইজে যেয়ো না। তুমি তোমার মত জীবন করে দ্যাখো রানী।

কিছু বুঝতে পারছি না ওগো। ওদিকে কুটুও ফিরলো না। সঙ্গে বসেছে খোকোন। সে তো এতক্ষণে খিদেয় অস্থির হয়ে আছে—। বলতে বলতে রানী সদর দরজার দিকে গেল।

দিলীপ বুঝলো, এইমাত্র সে রানীকে জীবনের সবচেয়ে কঠিন কথাগুলো বলেছে। কিন্তু রানী কোনো কথাই খুব সিরিয়াসলি নেয় নি। ভেবেছে—এ-সব হোল গিয়ে বাতকে বাৎ। কিন্তু তা তো নয়।

পরদিন সকালে শিবব্রু এসে হাজির। গোপালের গাড়ির ব্যবসার পার্টনার। দিলীপ বইয়ের র‍্যাক থেকে ইনস্টলমেন্টে কেনা বইগুলো নামাচ্ছিলো। কত বই যে না পড়ে এতকাল তাকে গুছিয়ে রেখেছে। চব্বিশখানা বইয়ের এনসাইক্লোপিডিয়া। রবি ছোট থাকতে কিস্তিতে কিনেছিলো। ভেবেছিলাম—রবি বড় হয়ে পড়বে। আশ্চর্য। আমিও পড়ি নি। রবিও পড়ে নি।

কি খবর? বোসো। বাড়ি চিনে এলে কি করে?

আপনি চিনতে পারবেন ভাবি নি।

না চেনার তো কিছুই নেই। মানিক-জোড় এক সঙ্গে গাড়ি কেনা-বেচা করতে। গোপালের কোন খবর রাখো?

মাস ছয়েক আগে চিঠি পেয়েছিলাম—ইন্দোর থেকে। কি বানা না কি ধরণার খেয়ালের তালিম নিচ্ছে।

দিলীপ মেঝেতে ছড়ানো বইগুলোর ভেতর টুলে বসে বললো, চিনে আসতে কষ্ট হয় নি?

স্লিপে লেখা ছিলো—ডি বোস। তাই বুঝতে পারি নি। আপনি অ্যামবাসাডর বেচবেন—তা মল্লিক বাজারের গুলাব সিংয়ের কাছে গেছেন কেন? আমায় খবর দিলে পারতেন—

ঠিকানা তো জানতাম না শিবব্রু। গাড়িটা পড়ে থেকে থেকে নষ্ট হয়ে গেল। তাই গুলাব সিংয়ের গদিতে গিয়ে খবরটা দিয়েছিলাম।

কিন্তু ও তো স্ক্র্যাপ ভ্যালুর ওপর হিসেব করবে।

যা পাওয়া যায় শিবব্রু।

গাড়িটা ফেলে ফেলে নষ্ট করলেন কেন? আগেই তো বেচে দিতে পারতেন।

সময় পাই নি তখন।

এখন চলাফেরা করবেন কিসে?

কেন? গাড়ি নিয়ে তো ধরাধামে আসি নি ভাই।

তবু। একবার অভ্যেস হয়ে গেলে কি আর বাসে ট্রামে ওঠা যায়।

একটা অস্টিন ট্যুয়ার আছে।

চালু?

রীতিমত চালু। তেল খরচ কম। সারাবার বিশেষ ঝামেলা নেই।

তাহলে ভালো। আচ্ছা—অ্যামবাসাডরের ইঞ্জিনটা খুলে নিয়ে তো বেচতে পারতেন।

আর কি হবে ভাই।

কটা টাকা বেশি আসতো। টায়ার ভালো থাকলে তারও আলাদা দাম পেতেন।

কে ওসব করবে বসে বসে। গুলাব সিংয়ের হয়ে তুমি এসেছো। সেই মতো করো। শিবব্রু বা দিলীপ—কেউই অ্যামবাসাডরটা চালু করতে পারলো না। স্টার্ট দিলেই সেলফ্ ফেঁসে যাওয়ার আওয়াজ। লোক দিয়ে ঠেলে ঠেলে গাড়িটা পিচ রাস্তার বের করলো। ওপরের ব্যালকনি থেকে গাড়িটা দেখতে পেয়ে রানী লিফটে নেমে এলো। বেচে দিচ্ছো?

হুঁ। ফেলে রেখে রেখে তো নষ্ট হবে গেল।

অনেক কষ্টে কিনেছিলে কিন্তু—

মায়া বাড়িয়ে লাভ নেই। তাছাড়া অস্টিন ট্যুয়ার তো ভালোই চলছে। তেল খরচ কম।

ওই বিটকেল গাড়িটা আসবার পর থেকেই তো যত অমঙ্গল।

সে তুমি যেভাবেই ভাবো।

গাড়িটা বিক্রি কোরো না। সারিয়ে নাও।

অনেক টাকা লাগবে। দরকার হলে তুমি তো অস্টিন ট্যুয়ারে চড়তে পারবে।

ও গাড়িতে আমি মরলেও উঠছি নে—

দিলীপ কোন জবাব দিলো না। রানী তখন দিলীপ বসুর বউ যতটা উতলা হতে পারে—সেই ভঙ্গীতে বেসমেন্টে দাঁড়িয়ে থাকলো। তার চোখের সামনে শিবব্রু জনা-চারেক ঠেলার লোক ধরে এনে গাড়ি ঠেলতে তাদের লাগিয়ে দিলো।

নিউ পেড্ পার হবে গাড়িটা জাজেস্ কোর্ট রোডে পড়তেই ওদের আর দেখা গেল না। কোর্টের বটতলার পেছনে সব ঢাকা পড়ে গেল।

লিফটে ওপরে ওঠার সময় দিলীপ রানীকে বললো, এবার বইগুলো বেচতে হবে।

না।

কে পড়বে ও-সব বই। রবির জন্যে কিনেছিলাম একদিন। কিস্তিতে টাকা দিয়ে। পড়ে থেকে থেকে নষ্ট হচ্ছে।

আমি বেচতে দেবো না। রবির ছেলে বড় হয়ে পড়বে।

আগে বড় হতে দাও। তখন মতিগতি দেখে বই কেনা যাবে। আগে থেকে প্ল্যান করে কোন লাভ নেই।

সেদিনই বেলা বাড়তে গরমকালের পয়লা বৃষ্টি কলকাতার দক্ষিণ দিকটা ঠাণ্ডা করিয়ে দিলো। গা মাথা ভিজে শহরটা যখন ঘরে ঘরে গেরস্থরা তখন ঘুমোচ্ছিলো। ফাঁকা ট্যাকসি প্যাসেঞ্জার খুঁজছিলো।

দিলীপ মাহুতের চোরা গলি দিয়ে চিড়িয়াখানায় ঢুকে পড়লো। গাছপালা ধোয়া প্রথম বৃষ্টির জল হুড খোলা গাড়ির ওপর পড়ে কটাং কটাং আওয়াজ করছিলো।

কালু ঘোষ বললো, এখন আবার চিড়িয়াখানায় কেন? বেশ তো ঘুমিয়েছিলে। কি দরকার পড়লো এখন গাড়ি বের করার?

দ্যাখোই না কালুদা। আজ আমি কি করি।

সরু মত এক চিলতে পিচের রাস্তা। গাছও আবার ভিজে। কিন্তু দেখা যাচ্ছিলো না। সিংহের ডেরা থেকে একবার হুঙ্কার

গোঙানী শোনা গেল। দিলীপ বললো, এদিকটায় লোড শেডিং মনে হচ্ছে।

এখন এলে কেন?

দ্যাখোই না কালুদা। ক'দিন ধরেই দেখছি—সেই হরিণটা নকল পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকে। বাড়ি ফিরছি—দেখি ও তখন কচি শিং তুলে দেওয়ালের এপারে আমায় দেখছে—

ওর সঙ্গে এখন দেখা করবে বুঝি!

নিশ্চয়ই। যদি পারি বন্ধু করে নেবো ওকে।

কিন্তু দিলীপের পক্ষে ব্যাপারটা অত সহজ হোল না। আলোর খুঁটিগুলো অন্ধকার। জাগিয়ে নাইট গার্ডরা ঘুমোচ্ছিলো। প্রায় হাতড়াতে হাতড়াতে হরিণদের বড় ডেরাটার সামনে যখন হাজির হোল দিলীপ—তখন আলো বলতে একটা ফিকে চাঁদের জ্যোৎস্না গোলা মেঘের খানিক চিক্ চিক্। তাতেই দিলীপ চিনতে পারলো। গাড়ি থেকে নেমে একটা নাম-না-জানা গাছের ঝুলে পড়া ডাল ভেঙে পাতাসুদ্ধ ওর দিকে এগিয়ে দিলো। এসো—

হরিণটা যেন সবই ঠিক করা ছিলো—এইভাবে এগিয়ে এলো।

কালু ঘোষ বললো, একাজ তো কাল দুপুরেও করতে পারতে—

কাল তো সবার চোখের সামনে ওকে নিয়ে যেতে পারতুম না।

নিয়ে যাবে নাকি? কি কাণ্ড!!

দ্যাখোই না—

নিয়ে কোথায় রাখবে?

কেন? বেসমেন্টে—। আর কথা বোলো না কালুদা। অবলা জীব। ঘাবড়ে যাবে—

ধরা পড়লে হ্যাপা তোমাকেই পোহাতে হবে দিলীপ।

তুমিই তো এ রাস্তা চিনিয়েছিলে কালুদা। এখন মাহুত যতক্ষণ না ফেরে তার আগেই বেরিয়ে পড়তে হবে—

তারের বেঁটে জাল টপকে দিলীপ ভেতরে গিয়ে পড়লো। দুটো ঘুমন্ত হরিণ জেগে উঠেই একদম কড়াক-পিন্। অন্ধকারের ভেতর একদম বিদ্যুতের ঝিলিক হয়ে মিলিয়ে গেল। এই কচি হরিণটা কিন্তু অন্ধকারে ভীষণ বিশ্বস্তভাবে কালো পাতাগুলো খেয়ে যাচ্ছিলো। দিলীপ ওকে পাঁজাকোলে তুলে নিলো। তারপর আগে ওকে একা জালের বাইরে নামালো। শেষে নিজে।

কালু ঘোষ বললো, আর কিছু ডাল-পালা গাড়িতে নাও।

দিলীপ আরেকটা কচি ডাল ভাঙলো। গাড়ি তখন মোমিনপুরের মোড়ে—দিলীপ এক হাতে হরিণটাকে গায়ের সঙ্গে চেপে ধরে আরেক হাত স্টিয়ারিংয়ে রাখলো। এত সহজে যে ব্যাপারটা পাবো—তা কিন্তু ভাবি নি কালুদা।

কিন্তু ওকে নিয়ে এখন করবে কি?

বৃষ্টির পরেকার ভিজে বাতাসে ভাঙা ডালের কচি পাতাগুলো চলন্ত গাড়িতে কাঁপছিলো। হরিণটা খুব মন দিয়ে তাদের নিকাশ করতে লাগলো।

লোড শেডিংয়ের অন্ধকার পেরিয়ে আবার আলোর কলকাতা। বাড়ি ঘরগুলো অন্ধকার। কিন্তু রাস্তায় রাস্তায় নতুন মার্কারি ল্যাম্প খানিক খানিক জায়গা একদম কেচকে করে ফেলেছে। দিলীপ গাড়ি ঘোরালো।

কি হোল? বাড়ি ফিরবে না?

ওকে একটু কলকাতা দেখাই!

কাল দিনের বেলাতেও দেখাতে পারবে দিলীপ।

তখন গাড়ি ঘোড়ার ভিড়ে ঘাবড়ে গিয়ে গাড়ি থেকে লাফ দিতে পারে।

এখনো তো পারে!

এখন কলকাতা কত নির্জন! চলো কালুদা—ওকে একটু ভিক্টোরিয়ার দিকটা ঘুরিয়ে আনি। ফাঁকা ফাঁকা বেশ।

কালু ঘোষ চুপ করে গেল। বিবেকানন্দ স্ট্যাচুর কাছাকাছি এসে সে আর চুপ করে থাকতে পারলো না। পরিষ্কার বললো, সকালে গাড়িটা বেচবে। বিকেলে বইগুলো। এ-সব তো কোন দরকার ছিলো না দিলীপ। দিব্যি অফিসে যেতে—গাড়িটা সারাতে—

হরিণটা এবার মুখ তুলে তাকালো। গাড়ির পেছনের সিটটা দেখলো। কেন সোজা হয়ে গেছে।

দিলীপ বললো, কথা বোলো না কালুদা। ও তোমার গলার স্বর শুনতে পায়—

সত্যি! আশ্চর্য তো।

হরিণটা আবার পেছনের সিটে তাকালো। দিলীপ বললো, একদম কথা বোলো না কালুদা। আমার পরেই ও তোমার গলা শুনতে পায়। কিন্তু লোক না দেখতে পেয়ে ঘাবড়ে যাচ্ছে।

কালু ঘোষ চুপ করে গেল। হরিণটা এক লাফে মাঠে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে দিলীপও। হরিণ খানিক ছুটে দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দিলীপ সেটুকু ছুটে কাছাকাছি হলেই আবার হরিণটা খানিক দৌড়ে আরেক জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায়।

কালু ঘোষ দেখলো, হরিণটা বিবেকানন্দ স্ট্যাচুর ফিকে আলোর বাইরে চলে গেছে। ওদিকটা বোধহয় রেস কোর্স। দিলীপকে তখনো দেখা যাচ্ছে। দৌড়তে গিয়ে ভিজে মাঠে হুমড়ি খেয়ে পড়লো যেন।

দিলীপ—। বলেই একদম কাছে গিয়ে পড়লো কালু ঘোষ। ভিজে ঘাস। এদিকটায় আলো নেই। হরিণটা দূরে দাঁড়িয়ে। অথচ তাকিয়ে আছে দিলীপেরই দিকে। পি ডি হাসপাতালের একটা নতুন অ্যানেকসে পেছনের ঘরে—বোধহয় তেতলায়—আলো জ্বলছে।

কি হোল দিলীপ? উঠতে পারবে?

সেই অবস্থাতেই অন্ধকারে মাথা নিচু করে দিলীপ প্রায় ফিস ফিস করে বললো, তোমার গায়ের গন্ধ চলে যাও কালুদা। তোমার গলা পেলে কিন্তু আরও দূরে সটকাবে—

ধরতে পারবে কি? ওরা তো হরিণ।

আমি ধরবোই। তুমি গাড়িতে গিয়ে বোসো কালুদা।

কালু ঘোষ গাড়িতে ফিরে এসে দেখলো—হরিণ বা দিলীপ—কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। রেস কোর্সের গায়ের রাস্তা দিয়ে একটা লরি চলে গেল।

কোথাও কিছু নেই। বিবেকানন্দর মূর্তি ঘিরে বাদুলে পোকা। আবার অন্ধকার মাঠে দিলীপকে দেখা গেল। সে একা একা ডাকছিলো। আয়। আয় আয়—আ-য়-য়—

হরিণটার কোন দেখাই নেই। এ-রকম একটা রাত্তিরে শেফালীর মা একদিন বারান্দা দিয়ে নেমে মাঠে চলে গিয়েছিলো।

ভোর হবার মত আলো ফুটে ওঠার আগে রাত্তিরটা শেষ বারের জন্যে যখন নিরেট অন্ধকার হয়ে এলো—তখনই দিলীপ ফিরে এলো হরিণটা তার পাঁজাকোলে। মাথায় চুল কপালে। গায়ের জামায় কাদা। গাড়িতে উঠতে উঠতে বললো, দয়া করে কোন কথা বোলো না কালুদা। অনেক কষ্টে ফের ধরেছি। ও যে কি করে তোমার গলা শুনতে পায় বুঝে উঠতে পারছি না।

কালু ঘোষ নিজের মনে মনে বললো, তাহলে এবারে আমায় ফুটে উঠতে বলো। তারপর বললো—কালুদা ফাইন্ডলি একটু কোলে নেবে হরিণটাকে।

সেসব অবশ্য কিছুই হোল না।

এবার হরিণ নিজেই নেতিয়ে এসেছে। ক্ষম দৌড়োয়নি এতক্ষণ। ঘোষবকুঠির প্রাইমারি ইস্কুলে কালু ঘোষ প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে—ওয়ার্ড বুক থেকে মুখস্ত করেছিলো। দি চিবাপিং বার্ড। দি বার্কিং ডিয়ার। তখন দিয়াড়ার বিচে কলা দিয়ে শনিবার ঠাকুমা সত্যনারায়ণের সিন্নি মাগতো। মানুষের এই জীবনে আমার আর ফেরা হবে না কোনদিন।

ভোররাতে বেসমেন্টে গাড়ি ঢুকতেই হরিণটা একদম অবাক। যে জন্তুটার পিঠে চড়ে সে এখানে এলো—সেরকম অনেক-গুলো জন্তু এখন এখানে দাঁড়ানো।

দিলীপ গাড়ি থেকে নেমেই মিটার গব থেকে একটা বড় দড়ি খুঁজে পেতে বের করলো। বেলা হলে চামড়ার বগলস আনাবে দিলীপ। এখনকার মত দড়িটা দিয়েই পেছনের একটা পা বাঁধলো। তারপর—হরিণটা যাতে পালাতে না পারে সেজন্যে দড়ির মাথাটা ট্যুবারের বনেটে বেঁধে ফেললো।

এখানে কিন্তু সারা দিনরাত তোমার হরিণ খুটখাট করবে।

হরিণটা আবার চমকে তাকালো। একদম ফড়াক-পিন দৌড়ের পোজে।

আস্তে কথা বলো কালুদা। মাহুত একটু শব্দ করলেই—

তাহলে আমি ঘুমোবো কি করে?

তোমার আবার ঘুমের দরকার হয় নাকি!

বাঃ! ঘুমোবো না?

আমি তো একদম ঘুমোই না কালুদা—

(ক্রমশঃ)

শৈবাল মিত্র

তরণী পাহাড়ে বসন্ত

ভ্যানের ভেতর নিকষ অন্ধকার। এক-জন বিড়ি ধরায়। দেশলাইয়ের আলোয় তার নাকের ডগা ঝলসে ওঠে। রাস্তায় দু-একটা পোস্টে ফ্যাকাশে আলো। ছুটন্ত গাড়ীতে ভাঙ্গচোরা আলোর যাতায়াত। লুসি আর গেঙিংতেই পুণ্যকে গাড়ীতে উঠতে হয়েছে। জামা-প্যান্ট পরার সুযোগ হয় নি। এক ঝলক বিদ্যুৎ চমকায়। বাজের শব্দ। আকাশে তারা নেই, মেঘ নেই। আবহাওয়া যে কোথায় তাও বোঝা যায় না।

লর্ড সিনহা রোডের বাড়ীতে ব্যাপারটা খুব সংক্ষেপে চুকে গেল। একটা বড় ঘরে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক কাটল। পাশা-পাশি দুটো চেয়ার। কথা বলার উপায় নেই। জনাদুয়েক লোক লেগে রয়েছে।

পুণ্যর দু চোখ ঘোলাটে। প্রিয়নাথ তাকাতে পারে না। গোটা ব্যাপারটার চমক জীবনটা বদলেছে। থানা পুলিশের ব্যাপার এখনও কাটে নি। বহুকাল পরে আবার পুলিশের হেফাজতে আসতে হল। এখন নেই। তবু এটা হল। প্রিয়নাথ ঘাবড়ায় না। হামরা-চোমরা অনেক মাতব্বর ওর বন্ধু। তদ্বির-তদারক শুরু হয়েছে। মধ্য যুদ্ধি করে খবরটা সীতেশকে জানাল। শ প্রিয়নাথের একমাত্র ভাগনে, আই এ-তবে সময়টা খারাপ। সারা দেশ রক্তে ছে। মৃত্যুর হিসেব নেই। প্রমাণ কঠিন। পুরো দিন ধকল গেছে। নাথের মাথার মধ্যে চিন্তা-ভাবনা জমাট ধে যায়। অফিসার ফেরে। সঙ্গে আরও তুলার এক অফিসার। সে প্রিয়নাথকে , বাড়ী ফিরে যান।

প্রিয়নাথ চমকে ওঠে। কিন্তু চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ায় না। পুণ্য তাকিয়ে আছে। আমার শ্বশুরমশাই—প্রিয়নাথ জিজ্ঞেস করে। অফিসার হাসে। বলে ওকে আমরা পৌঁছে দিচ্ছি। উত্তরপাড়ায় ওনার বাড়ী। হাওড়া স্টেশনে ছেড়ে দেব। অফিসার ঘড়ি দেখে। যোগ করে—এখন পর পর ট্রেন।

প্রিয়নাথের শরীরে ঝিমুনি। এতক্ষণ বসে আছে। আত্মীয় বন্ধু কেউ এল না। সারা রাত বসে কাটবে নাকি। প্রিয়নাথ দাঁড়ায়। বলে—ওর জামা-কাপড় রয়েছে আমার বাড়ীতে। তাছাড়া রাত হয়েছে অত না ফেরাই ভাল। অফিসার তাকিয়ে থাকে। মুখে হাসি নেই। উপরওলা লোকটা বলে—আপনি ভাববেন না। সব ব্যবস্থা হবে।

প্রিয়নাথকে উঠতে হয়। একটা খিঁচ থাকে এটা বোধহয় ঠিক হল না। অন্ধকার রাস্তা। মানুষজন নেই। কদাচিত দু-একটা গাড়ী। সাদা পোশাকের একজন ট্যাক্সি ধরে দেয়। ট্যাক্সি ছাড়ার আগে সে বলে—আজকের সন্ধ্যেটা ভুলে যাবেন। কাউকে বললেন না। প্রিয়নাথ অবাক। ট্যাক্সি তখন চলছে।

অফিসাররা নিজেদের মধ্যে গুজ-গাজ করে। একজন বলে—মাই গড। একে বলে ভাগ্য। হেলে ধরতে কেউটে।

ঘরের মধ্যে জোরাল আলো। পুণ্যর সামনে চেয়ারে তিন অফিসার। একজন জিজ্ঞেস করে—নাম কি?

পুণ্য বলে—মুকুর্জি চক্রবর্তী।

অফিসার হা হা হাসে। ছদ্মনাম ঘোষাল নয়—জানতে চায়।

পুণ্য সাড়া দেয় না।

অনেক রাতে দুই মাতালের ঘুম ভাঙে। মাথার মধ্যে ভোঁ-ভোঁ চক্কর। দূরে তারা যেন কথা বলছে। খগেন বলে—ডাকাত। সৌরভ বলে—বাঘ। দুজনে কাদার মুখ গুঁজে শুয়ে থাকে। হঠাৎ গুলির শব্দ। আগুনের ঝলক। মানুষের গলার আবছা কাতরানি হাওয়ার মিশে যায়। অন্ধকারে একটা গাড়ী স্টার্ট নেয়। সৌরভ ঘামছে। খগেনের পেটে ধারাল ব্যথা। ওরা হামা দিয়ে রাস্তায় নামে। তারপর দৌড় দেয়। খালি পা। আদুল শরীর। জামা-কাপড় মাঠে পড়ে থাকে। নেশা ছুটে গেছে। ধর্মতলায় এসে ওরা হাঁপায়। খগেনের দম বন্ধ হওয়ার অবস্থা।

সৌরভকে বলে—আমার পেট ছিঁড়ে যাচ্ছে। জাঙ্গিয়ায় কবিতা করে ফেলেছি। সৌরভ দেখে—ওর জাঙ্গিয়া হলদে। দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ঘূর্ণি ঝড় বইছে।

ভিয়েৎনাম, কম্বোডিয়া, লাওস আমেরিকার বিরুদ্ধে বানিয়েছে যুক্ত-ফ্রন্ট। তিন ফ্রন্টেই আমেরিকান বাহিনী বেধড়ক মার খাচ্ছে। আমেরিকান সাম্রাজ্য-বাদের অবস্থা কাহিল। নতুন এক সাম্রাজ্য-বাদ মাথা তুলেছে। ভারতীয় উপমহাদেশ সে লণ্ডভণ্ড করতে চায়। মহাজালাক আর নিষ্ঠুর এই উঠতি সাম্রাজ্যবাদীরা। প্রতি-বিপ্লব আর রাষ্ট্র বিস্তারে সাধারণ মানুষকে তারা সামনে রাখে। জনগণের নাম করে যত নোংরা আর ওঁচা কাজগুলো হাসিল করে। সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেয়।

ভারতবর্ষ পাকিস্তানে যুদ্ধ বাধায়। বিষয় পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা, ইয়া-হিয়ার অত্যাচার, অগুণতি উদ্বাস্তু। উনিশশো একাত্তরের প্রথম ছ' মাস দ্রুত ঘটে গেল অনেক কিছু। ছয়ই ডিসেম্বর ভারতবর্ষের সরকার স্বীকৃতি দিল বাংলাদেশকে। সাতই ডিসেম্বর ভারতীয় সৈন্য বাহিনী যশোরে ঢুকল। দেশে জরুরী অবস্থা। সীমানার অজু-হাতে ভারতীয় সরকার প্রতিবেশী দেশে সৈন্য ঢোকাল। বলল—পাকিস্তানের পরি-স্থিতিকে পুরোপুরি সে দেশের আভ্যন্ত-রীণ ব্যাপার বলে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। সি পি এম স্বতন্ত্র, জনসংঘ এক জোট্টা কংগ্রেস, সি পি আই সকলে মদত দিল। বোঝাল—এটাই ন্যায়সঙ্গত। বাংলাদেশের মানুষের ওপর বাংলাদেশের মানুষের স্বাভাবিক সহানুভূতি। আন্তর্জাতিক নিয়ম নীতি, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ভৌগোলিক অখণ্ডতা শব্দগুলো রাতারাতি ফাঁকো আওরাজ হয়ে গেল।

পার্টি লাইনও গড়িয়ে গেল। দেশ-ব্রতী জিন্দাবাদ এটা দুই দালালের স্বপ্ন।

হালুয়ার রুটির ভাগাভাগি নিয়ে লড়াই। আক্রমণকারী আর আক্রান্তের মধ্যে কোন ফারাক রইল না। ন্যায় আর অন্যায় যুদ্ধকে একই কাঠগড়ায় দাঁড় করান হল। পার্টির মধ্যে জমে ওঠা অনেক ক্ষোভ, অসন্তোষ এই সুযোগে ফেটে পড়ল। চোখা চোখা গালাগাল উড়তে থাকল। দেশব্রতীর কিশোর মার্চের সম্পাদকীয় নিয়ে আঞ্চলিক কমিটিতেও তুমুল তর্ক লাগল। প্রায় এক বছর হল পার্টি কমিটিতে কোন সভা হয় নি। পুলিশ, মিলিটারির হামলা চলছে। সকলকে খবর দিয়ে বসার মত অবস্থা নেই। নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখাও মুস্কিল। গোটা এলাকা জুড়ে কয়েকশো ক্যাম্প বসেছে। অনেকে ধরা পড়েছে। গুলি খেয়ে মরেছে। তবু বিতর্ক থেমে হয়। পার্টি লাইনকে অনেকে চ্যালেঞ্জ করতে থাকে। দুই বাংলা জোড়া লাগানোর কথা পার্টির কাগজে কেউ আশা করে নি। তারা ধমকে যায়। বাঙ্গালীর জাতীয় মুক্তির সঙ্গে জুড়ে বাংলা শ্লোগানকে জুড়তে অনেকেই রাজি হয় না।

বজ্রদা ঘামছিল। রোগা, শুকনো শিরাজাগা শরীর। কালচে শিরা। মনে হয় রক্তসেক্তাত বন্ধ। কাল রাত থেকে বজ্র চেষ্টা করছে কিশোরকে বোঝাতে। পার্টি লাইন ঠিক। পার্টির শ্লোগানও ঠিক। আমরা কোনমতেই ইয়াহিয়া খাঁকে মদত দিতে পারি না—বজ্র বলে—

কিশোর চুপচাপ বসে থাকে। অনেক কথা সে বলেছে। কথা শেষ। আর কিছু বলবে না। সব যুদ্ধেই দুটো পক্ষ থাকে। আক্রমণকারী আর আক্রান্ত। ন্যায় আর অন্যায়। কম্যুনিস্টরা ন্যায় যুদ্ধের পাশে দাঁড়াবে। ন্যায় যুদ্ধ হলো আত্মরক্ষার লড়াই। স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব মুক্তির লড়াই। দেশ দখলের যুদ্ধ হলো অন্যায় যুদ্ধ। অন্য দেশের ব্যাপারে যে কোনো অজুহাতে নাক গলানো এই অন্যায় যুদ্ধের প্রস্তুতি।

এ-সবই আলোচনা হয়েছে। কিশোর বোঝাতে পারে নি। ওর মাঝে মাঝে মনে হয় যুদ্ধ জিনিসটা একটা কিবাট কণ্টি-পাথর। যুদ্ধের মধ্যে একটা দেশ বা জাতিকে পরিষ্কার চেনা যায়। যুক্তি ও প্রজ্ঞার আলোয় পক্ষপাতহীনভাবে যুদ্ধকে দেখার নামই সভ্যতা। যুদ্ধের সময় অনেক পণ্ডিতেরও মাথা ঘুরে যায়। যুক্তি, ইতিহাস মাথা পড়ে। ভয়ে অথবা ভক্তিতে অনেকে হানাদারি যুক্তি গিলে নেয়।

পার্টি লাইন কিশোর কিছুতেই মানতে পারে না। একটা দেশকে দু টুকরো করার অধিকার কারো নেই। ইংরেজরা ভারতবর্ষকে দু ভাগ করেছিলো। তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণার পাহাড় জমে আছে। পাকিস্তান দু টুকরো হলেও সেই ব্যাপার হবে। পাকিস্তানের মানুষ যদি হাতে অস্ত্র নিয়ে দেশটাকে আশি বাটি তে কোটে, হাজার টুকরো করে, সেটা তাদের ব্যাপার। নিজেদের ভাগ্য তারা নিজেরাই ঠিক করবে। কিন্তু প্রতি-বেশী দেশে সৈন্য পাঠিয়ে সেই দেশের যুক্তি যুদ্ধকে মদত দেওয়া ডাকাতের সমান। আর এটা কি সত্যি যুক্তি যুদ্ধ? অথবা নয়া সাম্রাজ্যবাদীদের দেশ দখলের নয়া কৌশল? সাহায্য আর সৈন্য পাঠিয়ে রাজ্য বিস্তারের যুগ শেষ হয়েছে। এখন জনসাধারণকে সামনে রেখে রাজ্য বিস্তার চলবে। সাধারণ মানুষ প্রাণ দেবে। রক্তে দেশ ভেসে যাবে। সেই রক্তের পুঁজিতে নতুনবাজার কায়েম হাসিল করবে। পাশাপাশি ও দেখছে হাজার লক্ষ উদ্বাস্তু। পুব বাংলার ভেতরে সংখ্যাহীন নৃশংস খুন। সাধারণ নিরীহ মানুষের রক্তে মাটি ভিজছে। অনেককাল আগে ছেড়ে আসা সেই সবুজ মাতৃভূমি ওর বুকে দুলতে থাকে। হৃৎপিণ্ডে দু-একটা অতিরিক্ত স্পন্দন নেচে বেড়ায়। বাংলাদেশ শব্দটা ও নিজের মনে বিড়বিড় করে। এক ভাবী আবেগে গলা ভারী হয়ে আসে। ও নিজেকে সামলায়। যুদ্ধ ব্যাপারটা অতো সোজা নয়। চোখ কান খুলে ইতিহাস রাজনীতি মাপতে হয়। বড়ো গভীর জল। বজ্রদা চুপচাপ বসে আছে। অজিত খৈনি ডলছে। পুখনি বুড়ি লাঠি ঠুকে হাজির হলো। হাঁপানিতে হাঁপাচ্ছে। দু চোখে জল। ই বেটা দাবাই দে—সে হাত পাতে।

অজিত মুস্কিলে পড়ে। বহুদিন ওষুধের বাক্স শেষ। আনা হয় নি।

বুড়ি ফের তাগাদা দেয়—দাবাই দে। মরে যাচ্ছি।

অজিত বলে—বুড়ি গো দাবাই নাই।

পুখনি বুড়ি বিশ্বাস করে না। বলে—আছে। তু যা হোক কিছু দে। অজিতের কষ্ট হয়। এই বুড়িকে ওষুধ খাওয়াতে একদিন সাম ছুটেছিলো। কিছুতেই রাজী হয় না। দু হাতে বুক চেপে বুড়ি কাঁদছে। অজিতের গায়ের কাছে হঠাৎ ও হুমড়ি খেয়ে পড়ে। ঘরের মধ্যে পেকেকে অজিতের ফতুয়া ঝুলছিল। ফতুয়ার পকেট থেকে ও একটা এনটেরো-কুইনল বার করে। কিশোরের জন্যে এটা ও এনেছিল। গতকাল ডাঁতিপাড়া হরে ফেরার সময় কিনেছিল। কিশোর পেটের ব্যামোয় ভুগছে। বাস ভাড়ার পয়সায় ওষুধটা নিয়ে ছিল। হাঁটতে হলো দশ মাইল। মোড়ক ছিঁড়ে একটা ট্যাবলেট ও পুখনিকে দেয়। বলে—বুড়ি গো ঘরকে যা। এখুনি খেয়ে নে।

পুখনি বুড়ীর ফোকলা মুখে খুশির হাসি ফোটে। লাঠি ঠুকে ও চলে যায়। বজ্রদা আর কিশোর অবাক চোখে দেখে। অজিত জানে এনটেরোকুইনলেই দু চার-দিনের মতো ওর হাঁপানি কমবে। পেছনের ফাঁকা মাঠে প্রচণ্ড শব্দে ধামসা বাজে।

ওরা উঠে দাঁড়ায়। জঙ্গলের বাইরে আসে। হাওয়ায় মোলফুলের সুবাস। আজ বুধনের তিলকচুরি। মেয়ের বাড়ীর লোকজন এসেছে। পাকা দেখা। ওরা বুধনদের বাড়ীতে আসে। বুধনদের বাড়ী নতুন করে নিকোনো হয়েছে। মাটির দেওয়ালে ঢ্যাঁকা আলপনা, ঘট আর বেঁটে বেঁটে কলাগাছের নকসা। আশ্চর্য জীবন্ত। সাঁওতাল মেয়ে-দের হাতে যাদুমন্ত্র রয়েছে। হাঁড়িয়ার গন্ধে বাড়ীর ভেতরটা ভুরভুর করছে। উঠোনের এক কোণে পাঁচটা হাঁড়ি ভর্তি ভাত পচছে। হাঁড়ি ভর্তি ভাত আর জল। বাথানের গুঁড়ো মেশানো। সামনে গোটা দুই মুড়ো ঝাঁটা। ছাঁকনির কাজে লাগে। বোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম হাঁড়ি খোলা হয়েছে। উঠোনের মাঝখানে বুড়োরা বসেছে। মাঝখানে বুধনের বাবা ও গাঁয়ের মাঝিহাবাম, মোড়ল। সকলের সামনে ঝকঝকে পেতলের বাটি। চোখে লালচে রঙ। কুলিতে কোরাকুরির ভীড়। নাচ গান চলছে। বাঁশি, বেহালা, মাদলের শব্দ। মাঠের কাজ শেষ। সকলের হাতেই দু চার পয়সা আছে। ঘরে খোরাকির ধান চাল। মাঝিপাড়ায় এখন দিন-রাত বাঁশি আর মাদল বাজে। গানের সুর ভেসে আকাশে। ঘরে খাবার থাকলে এখানে জীবনের চেহারা বদলে যায়। শাল মহুয়ার সবুজ জঙ্গলে এখন বসন্তকাল দিন-রাত। ওরাওঁ পাহাড়ের বুক চিরে মহুয়া ফুলের গন্ধ। আদিগন্ত পৃথিবীর ওপর জেগে থাকে ঘন নীল আকাশ।

মাঠের মধ্যে আগুন জ্বলছে। গাঁয়ের বৌয়েরা জাল ছাড়ানো একটা গোটা শুয়োর আগুনে ঝলসাচ্ছে। শুয়োরের ভাজা পাটা আলাদা রাখা হয়েছে। ওটা মেয়ের বাড়ী যাবে।

মাঝ মাঠে লাল ধুলোর পরী নাচে। পরিষ্কার, টইটম্বুর আকাশ। এক ছিটে মেঘ নেই। লালমুনি ওকে ভুরু বেঁকিয়ে দেখে। আগুনের তাপে মেয়েটার কালো মুখ ঝকঝক করছে। অজিতের বুকের মধ্যে কি যেন উথলে ওঠে। মনে হয় এ যেন অনেক জন্মের যোগাযোগ। এই মাদলের [illegible] শালবনে উথাল-পাথাল হাওয়া, [illegible] আগুনে ঝলসানো শুয়োরের মাংসের গন্ধ সাঁওতাল ইতিহাস, ভূগোলের বকুত সেতারে মিশে আছে।

মেঠো রাস্তার গা ঘেঁসে কয়েকটা ভেলা গাছ। একটা পিঙ্গই পাখী শিস দিচ্ছে। মিষ্টি গলা, হলুদ রঙ। পাখীটা এক ডাল থেকে অন্য ডালে পিড়িং পিড়িং নেচে বেড়ায়। পিঙ্গই পাখী ডাকা শুভ লক্ষণ। আসলে ও তো পাখী নয়। ও সেই সাঁওতাল বহু। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি আসার পথে ঘন জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল। তার নওজোয়ান মরদ ত খুঁজে পায় নি। কাঁদতে কাঁদতে তার চ অন্ধ হয়ে গেছে। নতুন বহুও কেঁদে তারপর পাখী হয়ে মরদের নাম ধরে বেড়ায়।

কিশোরদের দেখে বুধনের [illegible] এগিয়ে আসে। উঠোনে পাবকয় পেতে দে অজিতকে পাশে ডেকে নেয়। অজিতের জ লালমুনি একটা পেতলের বাটি আ ধামায় চলে জঙ্গলে। কিশোর ভাবছে পা

কাছে তার বিরুদ্ধে রিপোর্ট হবে। বজ্রদা বলবে, কিশোর পার্টি লাইন মানে না। পার্টি হয়তো এলাকা থেকে তাকে বার করে দেবে। বজ্রদা লোকটা খারাপ নয়। গান নিয়ে লড়ছে, কিন্তু মাথা খাটায় না। পুরোনো পার্টির লোক। পার্টি নির্দেশের বাইরে এক চুল নড়বে না। এটা ঠিক নয়। পার্টিও ভুল করতে পারে। সেটা দেখানো পার্টি সদস্যদের দায়িত্ব। বজ্রদাকে এ-সব বলে লাভ নেই। ভুল বুঝবে। বলবে, পুরোনো পার্টি থেকে আমিও বিদ্রোহ করে বেরিয়ে এসেছি। কারো চেলে আমার কিম্মত কম নয়। বজ্রদার শুকনো কপালে চিন্তার রেখা। বজ্রদাও ভাবছে। এ গাঁয়ে আসার সময় ও মিলিটারির হাতে ধরা পড়েছিল। কপাল জোরে বেঁচেছে। গাঁয়ের মাঠ-ঘাটে যে কোনো লোককেই জেরা করা হচ্ছে। সকলেই মারডাবেন পার্টির আদমী। বজ্রদার সঙ্গে গাঁয়ের দু-চারজন সাঁওতালকে নিয়ে জোয়ানেরা মেজরের সামনে গেলো। জোয়ানদের ধারণা মেজর খুব বুদ্ধিমান। মারডাবেন পার্টির লোক চিনতে ভুল হবে না। সকলের শরীরেই লুঙ্গি বা গামছা; খালি গা। সারি দিয়ে ওদের দাঁড় করানো হলো। গম্ভীর মুখে মেজর সকলকে দেখলো। তারপর বললো—ইসকা অন্দরমে মারডারেন পার্টিকা কোই আদমী নেহি হ্যায়। ইবে সব নাঙ্গা আদমী হ্যয়। বজ্রর বুক ধড়ফড় করছিল। ছাড়া পেয়ে জোরে ছাড়লো। পুলিশে ধরলে ওকে গুলি করতো। বুড়োরা ওর গল্প শুনে হাসলো। বজ্রদার মুখেও ভয়ের দীপ্তি। তখন কোনো চাপ নেই। সহজ, স্বাভাবিক হাসি। বজ্রদাও শহরের ছেলে। ইংরিজির এম-এ। কলকাতার স্কুলে পড়াতো। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের দরুণ গলা। কচ্চো বার কিশোর শুনেছে ওর গান।

অজিত চাল ভাজা চিবোচ্ছে। পাড়িয়ার বাটিতে মুখ দিয়ে গলা ভেজাচ্ছে। ওর চোখ লাল। হঠাৎ ও বজ্রদাকে বলে—একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত গান। বজ্রদা লজ্জা পায়। বলে—ভুলে গেছি। অজিত ছাড়ে না।

অন্য একদিন শোনাবো—বজ্রদা কথা দেয়। ওর চোখ দুটো শিশুর মতো নরম হয়ে ওঠে।

বুধনের বাবা গল্প শুরু করে—উদের ভয় লাগছে। এখন উরা দিন রাত মারডারেন পার্টির আদমি দেখবে। হাতি আর দুটো পিঁপড়ের কাহিনী শোনায়। একবার দুটো পিঁপড়ের সঙ্গে একটা হাতির ঝগড়া হলো। হাতি বললো, আমি তোদের পিষে মারবো। পিঁপড়ে দুটো প্রস্তাব দিলো—আমাদের সঙ্গে দৌড়োও। যদি জেতো, তাহলে আমাকে রাজা মানবো।

হাতী রাজী হলো। বনবাদাড় ভেঙে হাতী দৌড়চ্ছে। যেখানেই নামে দেখতে পায় সামনে দুটো পিঁপড়ে। রাগে রক্ত ওঠে তার মাথায়। পাগলের মতো ও ছুটতে থাকে। তারপর ছুটতে ছুটতেই মরে যায়।

গল্পটা শুনে কিশোর মজা পায়। বজ্রদার কপালে আবার ভাঁজ পড়েছে। কে একজন এসে বললো—মেয়েরা বাড়ীর লোকেরা আসছে। মাঝের পাড়ায় তাদের মাদলের শব্দ পাওয়া গেছে। এ-গাঁয়ে বেশ কয়েকবার পুলিশ এসেছে। একটা থমথমে ভাব। পুলিশ লখাইকে পায়নি। অজিদেরও নয়, গাঁয়ের কৃষকরা তাদের অদ্ভুত গল্প বলে ধোঁকা দেয়। প্যান্ট, জামা টুপি পরা, কিছু লোক বাইরে থেকে এসে মেরে গেছে। কখনো বলে কুড়ি পঁচিশটা বন্দুক আর এক বস্তা বোমা নিয়ে ওরা এসেছিলো। ভূত প্রেত দৈত্য দানোর বদলে এখন মুখে মুখে লড়াইয়ের কাহিনী।

লখাই-এর মাথায় লিট ধরেছে। সে বললো—বৃন্দাবনীতে মাও সে তুং এসে ছিলো। সঙ্গে চারু মজুমদার। তারা বললো —হুলে লাগাও। লখাই দুজন মানুষের চেহারার বর্ণনা দেয়। তারপর চেঁচায়, ঝুমুর তু খাড়া থাক। দুমকায় গিয়েছিলো ওর বাবাকে ছাড়াতে। বাবা ফিরেছে। মেয়ে ফেরেনি। শোনা গেছে, ভগতরাম মহাজনের ঘরে সে বাসন মাজে। মাঝের-পাড়া থেকে কন্যাপক্ষরা এসে যায়। ছেলে-ছোকরা মিলিয়ে প্রায় জনা পঁচিশ লোক। হাতেদের হাতে হুলুদে ছোপানো মাকিন দাপড়। বুধনের বাবা অতিথিদের পা ধুয়ে দেয়। ছেলেরা হাতের তিরিও, তিরিও বাসান নামিয়ে রাখে। রাচায় আর দিষে বসে। শাল-পাতার চোলায় মুড়ি আর গুড় দেওয়া হয়

ছুলের যত্নে আমি কোন ঝুঁকি নিতে পারি না
পুরোপুরি নির্ভর করি বেঙ্গল কেমিক্যালের
ক্যান্থারাইডিনের উপর

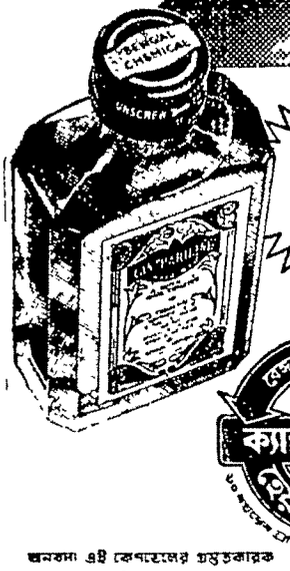

ভারতে এই তেলের বিক্রি সর্বাধিক

৬০ বছরের বেশি সময় ধরে একান্ত বিশ্বস্ত

গত ৬০ বছরের বেশি সময় ধরে যাঁরাই চুলের ব্যাপারে একটু যত্নশীল, তাঁরা প্রত্যেকেই ক্যান্থারাইডিন ব্যবহার করেছেন। তাঁদের এই বিশ্বাসই আমাকে এতো আস্থা যুগিয়েছে। চুলের ব্যাপারে আমি যেমনটি চাই, ক্যান্থারাইডিন আমাকে ঠিক সেগুলিই যোগান দেয় — এতে চুলের বাড়-বৃদ্ধি হয় দেখার মতো, চন্দনের মিষ্টি সুবাস থাকায় সারাদিন মনটা সতেজ থাকে এবং চুল এতটুকু চটচটে না হয়ে জেল্লা দেয় অনেক বেশি। চুলের পরিচর্যায় এর চেয়ে বেশি আর কি চাইতে পারি বলুন। আমি তো দেখেই সবার পছন্দসই তেলটিই বেছে নিয়েছি।

বেঙ্গল কেমিক্যাল ক্যান্থারাইডিন কেয়ার অয়েল

ASIL/BC/5/78 BEN

বেঙ্গল কেমিক্যাল (ভারত সরকার পরিচালিত)

সকলকে। হাঁড়ির মুখে মুড়ো ঝাঁটা লাগিয়ে মদ ছাঁকা হয়। এখন প্রত্যেকের হাতে বাটি ভর্তি মদ। শালপাতার কুরিয়ায় শুয়োরের মাংস। গন্ধে চারপাশ ম-ম করে। অজিত কন্যাযাত্রীদের সঙ্গে সমানে পাল্লা দেয়। সকলেই ওর চেনা। কমবয়েসীরা ওর ফুটবল খেলার সঙ্গী। বুধন দাওয়ায় বসে আছে। লজ্জা লজ্জা মুখ। দারুন ছেলে উঠে দাঁড়ায়। একজন তিরিওতে ফুঁ দেয়। তিরিও বাসায়ে ছড ঘসে আর একজন। সুর চলবে ওঠে।

মেয়ের বাড়ী যখন্তেরা একে একে হলুদ কাপড়ের টুকরো বুধনের মাথায় জড়িয়ে দেয়। মাথায় পাগড়ী ক্রমশঃ বাড়তে থাকে।

মাথার ওপর নীল আকাশ। ঠান্ডা হাওয়া। পাড়ার সব মানুষ এখন বুধনদের। হৈচৈ, ব্যস্ততা। বাইরের গাছে পিঅই পাখীটা আবার ডাকে। মেয়েপক্ষের যাজিসেরা গান ধরে।

কাতি খোনা কুলিছুবিবে খিলো
তেলাম এপমাকান
দিন দিনতে দুলেস্বর গডওলে
হো মাবরি

ছেলেবেলায় কুলিতে খেলার সময় ভালোবাসা এলো। গানের সুরে চাপা বিষাদ। এদের প্রায় সব গানই এইরকম। দুঃখ, হতাশা। কোনো সাধ মেটে না। শেষ বয়সে হেরে থেমে যায়। অদৃশ্য, শক্তিশালী নিয়তিকে এরা মেনে নিয়েছে। হাওয়ায় গানের ধুয়ো গলে যায়—হো মাবরি।

বজ্রদা মুড়ি গুড় খাচ্ছে। কিশোর বাড়ির বাইরে আসে। কুলির মুড়োর দিকে লাল। বাঁদিকে লাল আটাল ফুল ফুটেছে। মশাফুলের মতো দেখতে। একটু ছোটো, কিন্তু গন্ধ। এখন মেয়েদের খোঁপায় আটাল বাহার তোড়া।

আরো এগিয়ে মঙ্গল। একটু দূরে সিধু নদী। এখন জল কম। সেতারের শব্দ নেই। কিন্টো মাল কথা বলছিল কাজেম আলির সঙ্গে। ওর হালের একটা বলদ মরে গেছে, কিনতে পারেনি।

দেশে গরুবলদের বড়ো অভাব—কিন্টো বলে—আজ দশ বছর এই হাল। চাঁদসদাগরের রাজত্বে মোচরমানরা জিতে নিয়েছে। সব গরু বাছুর বাবর রাজা মেরে দিয়েছে। ব্যস—সেই থেকে গরীব মানুষের প্রাণান্ত। হালের বলদ নেই। দুধেল গরু নেই। চাঁদ বাজার ছেলে লখাই রাজা মরলো সাপের কামড়ে।

দুশো বছর আগেকার সুখের দিন গুলোর চিন্তায় কিন্টো মাজা বিভোর হয়। হায়। কাজেম আলি ঘাড় নাড়ে। বাবর রাজা তার জেতের লোক। নিজেকে তার অপরাধী লাগে। তারও ছেলে গরু নেই।

কিশোর অসাম্য তাদের গল্পে ছেদ পড়ে। একঝোড় চিত্রি পাখী মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায়। গানবাজনার শব্দ ভেসে আসে।

আজ তিনাবুনিতে মেয়েদের সেকোয়াড এ্যাকশান করবে। এতোক্ষণে শেষ হওয়ার কথা। কিশোরের মনে সেই চিন্তাই ঘুরছিল। বাবা আর বরুণ ওখানে থাকবে। নির্মলা মেয়েদের কম্যান্ডার। অদ্ভুত তেজী মেয়ে। সম্পর্কে ও বাঘার বৌদি। বাঘার জ্যাঠতুতো দাদার বৌ। দাদার নাম ভানুচাঁদ। একটা ছোটো লটকনের দোকান আছে ওর। লোকটার কুষ্ঠ হয়েছে। প্রথমদিকে লড়াইয়ের সঙ্গে ছিলো। নির্মলা ওর সেবা করতো। ভানুচাঁদ আজকাল বিগড়েছে। লটকনের দোকানটাকে বাড়াবার জন্যে মহাজনের সঙ্গে ষড় করছে। নির্মলার সঙ্গে একদিন খুনসুটির ঝগড়া। আজকাল নির্মলা ওর সেবা যত্ন করে না। ডান হাতের ঘায়ে আগে রোজ ভিলা বীজের গরম তেল লাগিয়ে দিতো। এখন বন্ধ। নির্মলার কোনো নাম ছিলো না। নির্মলা নামটা কিশোর দিয়েছে।

ইটার মতলব কি—ও জানতে চেয়েছিল।

কিশোর ওকে শুনিয়েছিল নির্মলার কাহিনী। নির্মলা কুরুমূর্তি। অধের মেয়ে। স্বামীর নাম পঞ্চাদিতু। চার সন্তানের জননী। দেশের জন্যে পঞ্চাদিতু জীবন দিয়েছে। তবুও নির্মলা দমেনি। শেষপর্যন্ত নিজেও শহীদ হয়েছে। পুলিশের গুলিতে নির্মলা মারা যায়। ওর চারটে ছেলেমেয়ে এখন কোথায় কে জানে।

সাঁওতাল মেয়েটার দু চোখে জল, আগুন খেলা করে। ও নির্মলা হয়ে যায়। চটপট সবকিছু বুঝতে পারে। এই এলাকায় এতো বুদ্ধিমতী মেয়ে কিশোর আগে দেখে নি। ওর ইচ্ছে ছিলো নির্মলাকে গাঁয়ে গাঁয়ে মেয়েদের সংগঠন গড়তে পাঠানো হয়নি। ভিন গাঁয়ের মেয়ে এভাবে ঘুরলে পার্টির বদনাম হবে। গাঁয়ের মেয়ে বৌরাও ভালো চোখে দেখে না। নির্মলা একদিন গিয়েছিলো রবির বাড়ী। আরো কয়েকজন মেয়ে এসেছিলো। রবির বৌ রেগেছিলো। রবিকে ঘরে ঢুকতে দেয় নি। নির্মলার চোখ দেখে ভয় পেয়েছিলো। ঊর চোখে তুক আছে। উ ডান বটেক। পাইশা বলেছিলো। তবু মিটিং হলো। চারদিকে এ্যাকশানের ঢেউ। মেয়েদের মনেও তাপ লেগেছে। তারা পিছিয়ে থাকতে রাজী নয়। নির্মলাকে কম্যান্ডার করে স্কোয়াড তৈরী হলো। ওরা এ্যাকশান করবে।

দুটো এ্যাকশানে নির্মলা পুরুষ স্কোয়াডের সঙ্গী ছিলো। বিলকাদির মহেশ মন্ডলের বাড়ীতে সেই দুশটা কিশোর ভোলেনি। মহেশ মন্ডল থানায় বন্দুক জমা দিয়েছিলো। বন্দুক জমার রসিদ হাতে ওর বৌ। হল্লা শ্লোগান চলছে। তখনও অন্ধকার ঘন হয় নি। মাটির পাঁচিল দেওয়া বিশাল বাড়ীর উঠোনে অনেক মানুষ। মহেশ মন্ডল কোথায় যেন লুকিয়েছে। মন্ডলের বৌ চিৎকার পেলোগানি। ছিপছিপে শরীরে মাজা রঙ। শহরের মেয়ে। সে বললো—আমি কলেজের ছেলের সঙ্গে কথা বলবো। তাদের একজনকে ডেকে দাও। গলায় কর্তৃত্বের সুর। মহিলা একটুও ঘাবড়ায়নি। গরীব মানুষেরা এরকম চরিত্র আগে দেখেনি। তারা ধরে মেরে খায়। কোথায়? তোমাদের নেতা কোথায়—মহিলা আবার খেঁচা দেয়।

ভিড়ের ভেতর থেকে হঠাৎ নির্মলা এগিয়ে আসে। হাতে ঝকঝকে ছুরি। দাওয়ায় লাফিয়ে ওঠে। মহেশের বৌ-এর চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকায়। বুকে ছুরি ঠেকিয়ে বলে—আমাদের পছন্দ হচ্ছে না? কলেজের ছেলে চাই। রণবঙ্গিনী চেহারা। মহেশের স্ত্রীকে ধাক্কা দেখায়। স্লোগানের লোকেরা জেগে ওঠে। কাঠের গুঁড়ি দিয়ে বন্ধ দরজা ভাঙে।

নির্মলা ভালোবাসে বাঘাকে। দুলহার চলছে। গাঁয়ের কমবয়েসী ছেলেমেয়েরা জানে। নির্মলা বেপরোয়া। ভানুচাঁদের সঙ্গে সে আর থাকবে না। যে লোক সুদখোরের এঁটো পাতা চাটে তার সঙ্গে সে নাযায়। এই লড়াই-এর হাওয়াতেই ওদের দুলহার জমাট বাঁধে। এখানেও ঝুট পাকিয়েছে। নানাকথা চাপা মন্তব্য। তাড়াতাড়ি ফয়সালা হওয়া দরকার। অজিতকে জানিয়েছিলো। অজিত বললো, সাজ্জা লাগিয়ে দে।

গাঁয়ে গাঁয়ে কারা যেন একটা সাম্প্রদায়িকতার হাওয়া তুলেছে। পাকুর জেলায় এটা সাঁওতাল আর সাজ্জালীদের লড়াই। সাঁওতাল পরগণা থেকে আদিবাসীরা বাঙালী আর বিহারীদের উচ্ছেদ করবে। তাই বাঙ্গালী আর বিহারী জোতদারদের কাটছে। তাদের বন্দুক কেড়ে নিচ্ছে। পয়সাওলা সাঁওতালদের গায়ে হাত পড়েনি। রাতে পাশবালিশের মতো নিজেদের বন্দুক জড়িয়ে তারা ঘুমোয়।

প্রচারে কাজ হয়েছে। নিজেদের মধ্যে একটা চাপা অবিশ্বাস জমছে। মোতি সিংহিতল তাঁতিপাড়ায়। সে খবর আনলো: জোতদার, মহাজনদের প্রতিরোধ বাহিনীর শক্তি বেড়েছে। আমাদের অনেকে বসে গেছে। গুনীন মুর্মুর বাড়ীতে এ্যাকশন হোক। ও প্রস্তাব দেয়।

অজিত আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে ছিল।

গুনীন মুর্মুর খামারে ধান মাপা হচ্ছে। গান মেজেন সন্তরো, টিল মেজেন অন্তরো। কিশোর তাকায়। গুনীন মুর্মু এই এলাকার বর্ষিষ্ণু সাঁওতাল। জমি জমা, টাকাকড়ি আছে। বাড়ীতে বন্দুক। কিন্তু গুনীন ওদের বিরোধী নয়। শত্রুতা করেনি।

কিশোরের দু চোখ লাল। ও বলে—এতে কোনো কাজ হবে না। গণফৌজ বানাতে হবে। আমাদের হাতে দুশোর বেশী বন্দুক জমেছে। সেগুলো কাজে লাগানো দরকার। আদিবাসী ভাইদের ওপর পুলিশ, মিলিটারি, ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আমরা বুঝতে পারছি না। তাই এতো ঝামেলা। বদলোকেরা ঘোঁট পাকাচ্ছে। গইফৌজ এগোলে এসব উড়ে যাবে।

কিশোরও সেকথা জানে। কিন্তু পার্টি ছোট ছোট গ্রুপে লড়তে বলেছে। এখনো কেন্দ্রীয় বাহিনী গড়ার ডাক দেয় নি। এ নিয়েও বজ্রদার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। মতে মেলেনি।

অজিত নিজের মনে বিড়বিড় করে—তোরা আমার ওপর ছেড়ে দে। আমি এই হল্লাটের মানুষের চিন্তা চেতনা লাল করে দেবো। আরো বছর দুই সময় চাই।

মোতি ঠাট্টা করে—তুমি নিজেই সাঁওতাল হয়ে গেছো অজিতদা।

অজিত হাসে। বলে—হতেই হবে। ওদের রক্ত মাংস, চোখের ইশারার সঙ্গে মিশে যেতে হবে। তা না হলে ওরা জাগবে না।

মোতি বলে—কিন্তু ওদের যে কম্যুনিস্ট বানাতে হবে। ওদের চেতনার মান বাড়াতে এসে তুমি নিজেই যদি ডাউন হয়ে যাও, তাহলে ওরা জাগবে না।

অজিত তাকায়। এক মুখ দাড়ি-গোঁফের আড়ালে ওর দুটো চোখ জ্বলে জ্বলে করে। আমি বোঝাতে পারবো না—ও ফিসফিস করে—তোদের লাইন ঠিক নয়। ওরা কম্যুনিস্ট হচ্ছে না। দু একজন হয়তো কম্যুনিস্ট হওয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু সকলে নয়। সময়ে বুঝবি। আমি এখানে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত থাকবো। লাইনটা পেয়েছি। পার্টির সঙ্গে হুবহু মিলবে না। কিন্তু আমি ওদের বানাবো। কাটাকাটা ইঙ্গিতময় কথা। কিশোর দেখে অজিতকে। মোতিও তাকায়। নেশা করলে অদ্ভুত সব কথা বলে অজিত। সাঁওতালদের মতো বারে বারে অনেক ইঙ্গিত দেয়। মনে হয়, খুব গোপন কিছু একটা ও বলতে চায়। জীবন রাজনীতি ওর কাছে একাকার। আলাদা করে চেনা যায় না। গুনীন মুমূর্ষু খামারে ধানের পালা গোনার একঘেঁয়ে সুর। আন্ সেজেন মিতেসি। ঠিল সেজেন মিতেসি।

সামনে শাল বন। ফুল ফুটেছে। সাদা রঙ শাল ফুলে শারজস বাহা। কড়া মিষ্টি গন্ধ। কয়েকটা ছেলে জঙ্গলে বসে হাসি ঠাট্টা করছে। ওরা এসেছে বুধনের পাকা দেখায়। গাঁয়ের মেয়েরা কাঠের থোঁয়ে জঙ্গলে ঘুরছে। ছেলেগুলো চেঁচাচ্ছে। বাঁশি বাজাচ্ছে একজন। কে যেন বললো—পেডাহর হিজুমে মিতঘরি আলেঠে দুড়ুপেমে। ফুটুম আমাদের এখানে একটু বসুন। মেয়েরা গলা কি যেন জবাব দিলো। খিলখিল হাসি।

দুপুরের রোদ ঘন হয়েছে। বিয়ে বাড়ীতে গান বাজনা থামে নি। একটানা বিরিশ ঘন্টা নাচ গান এদের কাছে কিছু না। মেয়রা উৎসবে আনন্দের শেষ কণাটুকু না খেয়ে নিতে চায়। কালকের দিনটার শানাকড়ি দাম নেই ওদের কাছে।

অজিত কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছে।

হঠাৎ এক ঝলক ঝড়ের মতো তিনটে মেয়ে হাজির হয়। নির্মলা, আন্দা আর মেঘনা। সামনে নির্মলা। ঝুঁটো চুল হাওয়ায় উড়ছে। ফর্সা রঙ রোদে তামাটে। কিশোরকে দেখে ও কেঁদে ফেলে। কিশোর হকচকিয়ে যায়। বরুণ এসে ওর পাশে বসে। বাঘা অসহায় চোখে নির্মলাকে দেখে।

আমার মরদ বেইমানী করেছে—নির্মলা বলে। ঊষ সাথে আমি আর ঘর করবেক না। নির্মলা অনেক কথা বলে। কিশোর সব বুঝতে পারে না। বরুণ পরিষ্কার করে। লটকনওলা ফুলপুরবলাল দোকানেই ছিলো। পাঁচজন মেয়েকে আসতে দেখে দোকান বন্ধ করে পেছনের দরজা দিয়ে পালায়। মেয়েরা গিয়ে হতাশ হয়। দোকানের পাশে ভানুচাঁদ দাঁড়িয়েছিলো। সে বলে—আমি সুদাবাবকে বলে দিয়েছি। নির্মলা ভানুচাঁদকে কোতল করতো। মেয়েরা আটকেছে।

নির্মলা তখনও কোঁপাচ্ছে। খোঁপা ভেঙে কালো চুলের ঢল নেমেছে। ওর খেয়াল নেই।

আর মেয়েরা কোথায়—কিশোর জিজ্ঞেস করে।

বিরার ঘরকে গেছে—বাঘা বলে।

ঘুমের মধ্যে অজিত কি যেন বিড়বিড় করে।

বুধনের ঘরে আজ সবার নেমন্তন্ন। ওরা দল বেঁধে এসেছে। অনেক চেষ্টায় অজিতের ঘুম ভাঙ্গে।

মাথায় হলুদ কাপড়ের বিরাট পাগড়ী জড়িয়ে বুধন বসে আছে। ওদের দেখে লজ্জা চোখে তাকায়। সামনে হপ্তায় ওর বিয়ে। এখনো পাঁচ দিন বাকী। বুধনের মা হলুদ সুতোর লবন বানাচ্ছে। পর পর পাঁচটা গিঁট। আত্মীয় কুটুমের বাড়ী বাড়ী এই হলুদ সুতোর টুকরো যাবে। এটাই বিয়ের নেমন্তন্নের চিঠি। গিঁট গুনে ঠিক দিনে সকলে হাজির হবে। শুয়োরের মাংস দিয়ে খিচুড়ি। সামনে শালপাতা নিয়ে ওরা বসে যায়।

অজিত বসলো না। ওর নাকি পেট খোঁয়াই। চোখের ইশারায় লালমুনি ওকে বাইরে ডেকে নেয়।

আজ রাতটা ওরা বাহেসার থাকবে। বড়দা বললো আরেক এক দফা আলোচনা হোক। একমত হওয়া দরকার পার্টিকে রিপোর্ট দিতে হবে।

(চলবে)

NEW IN Rupa PAPERBACKS

Classics :

JONATHAN SWIFT
Gulliver's Travels 9.00

W. M. THACKERAY
Vanity Fair 16.00

CHARLES DICKENS
David Copperfield 18.00
Great Expectations 10.00

CHARLOTTE BRONTE
Jane Eyre 12.00

D. H. LAWRENCE
Sons and Lovers 10.00

EMILY BRONTE
Wuthering Heights 9.00

GEORGE ELIOT
Silas Marner 8.00
The Mill on The Floss 12.00

GOETHE
Kindred By Choice 4.00

JANE AUSTEN
Emma 9.00
Pride and Prejudice 9.00

Novels by Nobel Prize Winners :

IVO ANDRIC
The Vizier's Elephant : 3 novels in 1 Volume 6.00

JOHN GALSWORTHY
Jocelyn 9.00

Crime, Detection and Mystery :

ALISTAIR MACLEAN
The Golden Gate 8.00
Goodbye California 9.50
The Guns of Navarone 8.00
Seawitch 9.00
Where Eagles Dare 8.00

List of other books on application

Rupa & Co

15 Bankim Chatterjee Street
Calcutta 700 073

Also at
Allahabad · Bombay :
New Delhi

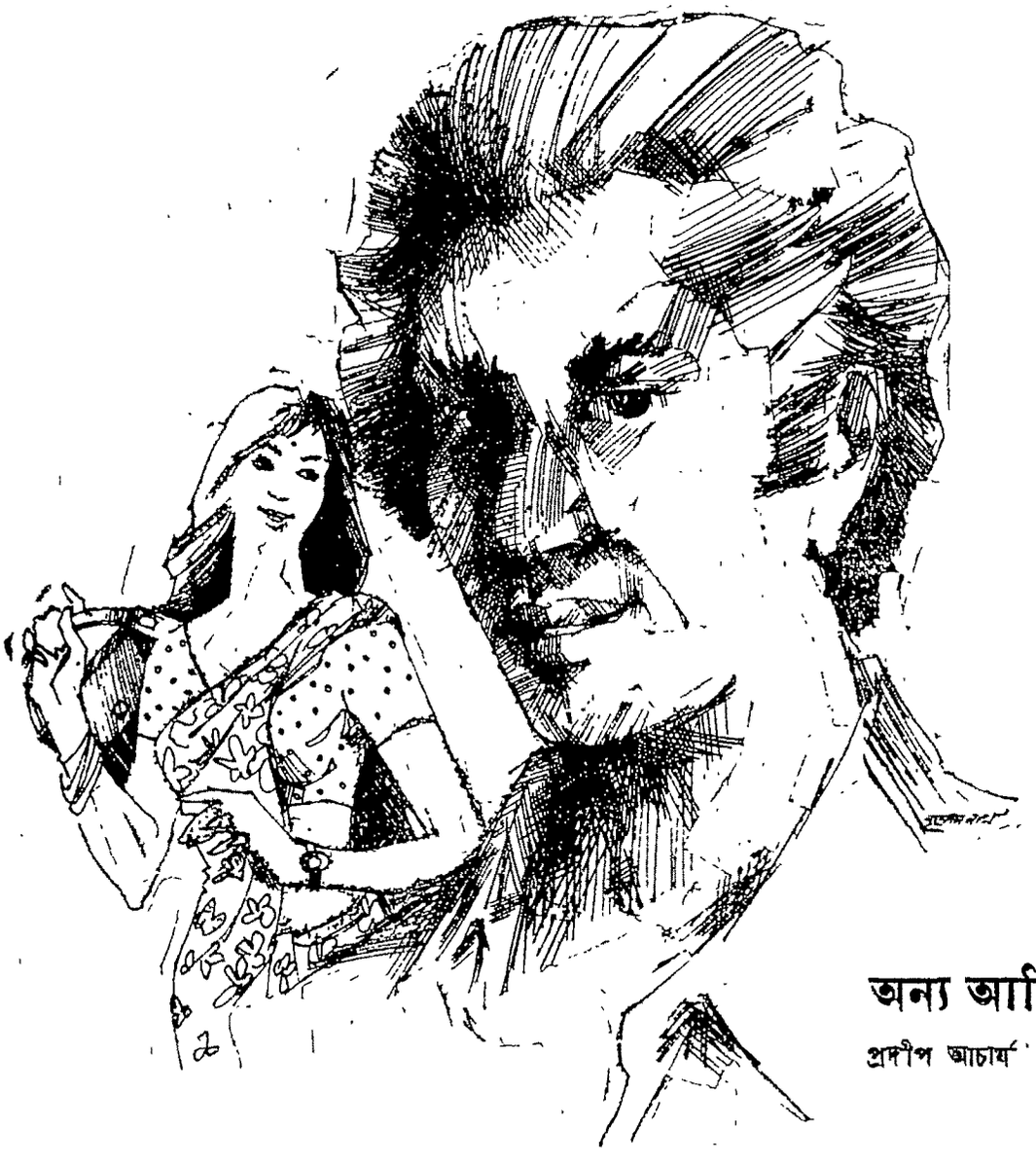

অন্য আমি

প্রদীপ আচার্য

'চ নৌকোয় চড়ি' দীপা উঠে দাঁড়িয়ে শাড়ির পাটে খানিক আঙুল খেলিয়ে নিয়ে ফের বলল 'নে ওঠ' 'নৌকো চড়বি কিরে?' প্রশান্ত আসবে না? সত্যিই যেন ব্যাপারটা আমার অবাক লাগল। আসলে এর চেয়ে সুখের আর কি হতে পারে? না ঠিক সুখ বলা যায় কি? একটা খুশীর হাওয়ার ভেতরটা দুলে উঠেছিল, নৌকো চড়ার কথা শুনে মাত্র। সন্তার সুখ আমি চাইনে। বড় কথা যখন জানিই দীপার প্রেমিক আছে।

দুপুর দুপুর ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে আউট্রামের জল পুলিশ অফিসের কাছাকাছি গঙ্গামুখি কাঠের বেঞ্চিতে বসে আছি, আমি আর দীপা। প্রশান্ত এল না। তার জন্যে দীপার খুব একটা এল-গেল বলে মনে হোল না। কেন কে জানে? কথা দিয়েও নির্দিষ্ট সময়ের দু-দুটো ঘন্টা পরেও ওর প্রেমিক এল না। তা নিয়ে দীপার উদ্বিগ্নতা তো ছাড়, সামান্য ভাবনা হল বলেও বোঝা যায়নি। তার ওপর নৌকো চড়তে চায় শুনে সত্যিই অবাক লাগল আমার।

কথার ফাঁকে আমিই বলেছি কি হল তের প্রশান্তর? এটুকু নেহাৎই সৌজন্য। যার অনাবে আসা, সেই-ই এল না। এ নিয়ে আমার যেন বড় একটা আফসোস হচ্ছিল। বুকে হাত দিয়ে বলতে গেলেই তো আসল ফাঁস হয়ে যাবে। পরব সত্যিটাকে ঢেকে দিতে? আসলে প্রশান্ত না আসুক, মনে-প্রাণে আমি সেটাই কে চাই, দীপাকে বুঝতে দেয়া যায়?

দীপার সঙ্গে আজকের এই মুহূর্তে-গুলোর পুরোপুরি আনকোরা স্বাদ আমার। এর আগে কি কোন দিন ভাবতে পেরেছি যে, এমন একটা দিনও আসতে পারে? দীপা আমার এত কাছাকাছি ঘন্টা দুয়েক বসার পরও একান্ত নিভৃতে নৌকোয়ও না জানি আরও কতক্ষণ থাকবে। তবে? বোকার মত আমি এটা কি করে চাই যে, প্রশান্ত এসে এই অনন্য মুহূর্তগুলোর কেড়ে নিক? আর আমি বাঁয়ে চলে যাই?! দীপা না জানলেও এটা তো ঠিক যে, দীপার কাছে থাকলে আমি সব ভুলে যাই। স্মৃতি, বিস্মৃতি কিছুই মনে আসে না। তাছাড়া কোন পুরুষই বা না চায়, দীপার মত ষোলকলা পূর্ণ নারীর সঙ্গে দিনের চার-পাঁচ ঘন্টার আপোস সান্নিধ্য? উপরি পাওনার মোহ যখন মানুষের সহজাত, তখন তো কোন কোন প্রশ্নই আসে না। অনেকে আদর্শের কথা বললেও, আমি অত আদর্শবান হতে পারিনে।

আদর্শকে মাথায় করে রাখলে মানুষের জীবনে পাপ-পুণ্য বলে কিছু থাকত না। অথচ পাপ-পুণ্য ছাড়া কোন মানুষ ভাবাই যায় না। যে আদর্শবান বলে নিজেকে ঘোষণা করে, বা আমরা জানি, হয়ত বা একদিন সে পুরোপুরি আদর্শ-চ্যুত ছিল বলেই এখন বাঁচার জন্যে অগত্যা আদর্শকে বেছে নিয়েছে। অন্যের বাঁচার

জন্যেই মানুষকে আদর্শচ্যুত হতে হয়। আমি দেখেছি।

সমবের মুখে শুনেছিলাম কথাটা প্রথম। বিশ্বাস হয়নি। তারপর এর-ওর মুখে গোপন মূল্যবান খবরের মত ছড়াতে দেখে সেদিন দুপুরের দিকে সোজা চলে গেলুম বুবুনদিদের বাড়ি। বুবুনদির বাবা নেই। তবে বাবার পৈতৃক ভিটে বাড়ি অর্থাৎ ঠাকুরদার আমলের মোটা মোটা থাম্বা দেয়া অদ্ভুত বাড়িতে অনেকগুলি ঘর। এখন সব ভাড়া দেয়া আছে। তবু বুবুনদির নিজস্ব একটা আলাদা ঘর। সে ঘরে সচরাচর কেউ আসে না। বুবুনদির ছোট ভাই-বা বোনেরা মাসীমা কেউ-ই।

মোমের আদলে ছিপছিপে গড়নের বুবুনদি। বিলুদার সঙ্গে বুবুনদির সম্পর্কের কথা কারুরই যেমন অজানা ছিল না, তেমনি কারুরই জানতে বাকী নেই, সে সম্পর্ক আজ আর সত্যি নেই। ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। কেন? জানতে চেয়েছি। বুবুনদি বলে নি কিছুই। তবে সমবের মুখে যা শুনেছি, তার সত্যি-মিথ্যে আমাকে জানতে হবে।

গিয়ে দেখি বুবুনদি বাড়ি নেই। খানিক আগেই বেরিয়েছে কোথায়। মাসীমা বললেন। জানিনে। কথা না বাড়িয়ে গিয়ে বুবুনদির ঘরে বিছানায় টানটান শুয়ে থাকলাম। বুবুনদির ঘরের সব আসবাবে, বিছানায় একটা বহু ব্যবহারের পুরনো ছাপ। সারা সংসারেই একটা অস্বচ্ছলতার অনাবিল ছবি ফুটে ওঠে। বাবা বেঁচে থাকতে বুবুনদিদেরই এ চত্বরের সবচেয়ে অবস্থাপন্ন বলে মনে হয়েছে। একটা বিদেশী ফার্মের স্টেনো ছিলেন বুবুনদির বাবা। আমি ইংরেজি নিয়ে আসতুম এ বাড়ি।

কেউ জানত না তখন, আমার মনে হয়েছে বুবুনদির মধ্যে একটা অলক্ষ্য মাতৃত্ব আছে। বুবুনদির কাছে এলে নিরাপদ মনে হয়েছে, সে যাই ঘটুক না কেন। সেই আমারই মধ্যে কখনই যে ধীরে ধীরে কামনার রক্ত গরম হয়ে উঠেছিল বুঝলাম সেদিন, যেদিন অনাবশ্যকভাবে বুবুনদিকে জড়িয়ে ধরে গলার কাঁঠার চুমু খেয়ে বসলাম। কিছু বলে নি সেদিন বুবুনদি আমায়। আর তার জন্যেই পাপবোধ আমার ভেতরে ভেতরে কুরেই দানা বেঁধে উঠতে লাগল। বুবুনদির কাছে গেলেই শুধু একই ভাবনা দুবেলার বুকের ভেতর কেঁপে উঠত। সে রকম একদিন আরও। আমার মধ্যে বিধ্বংসক অস্বাভাবিকতা নিজের কাছেই ধরা পড়ে গেল। হুট করে জাপটে জড়িয়ে ধরেই বুবুনদির বুকের বোঁটায় অনবরত চুমু খেতে গেলুম। এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে রূঢ়ভাবে বুবুনদি বলে দিয়েছিল অসভ্য কোথাকার, এভাবে কেউ দিদিকে আদর করে? একটা ক্ষীণ কান্নার স্বর আঁচ করে ছিলাম সেদিন বুবুনদির গলায়। লজ্জায় অপমানে বিপন্ন ফেরারীর মত পালিয়ে এসেছি। সেই থেকে কদিন গিয়েছি ও বাড়ি গুণে বলা যাবে।

ছোট বোন শীলুকে দিয়ে খবর পাঠালেও বুবুনদির সামনে গিয়ে দাঁড়াবার সাহস হয়নি প্রাণ খুলে সেই থেকে বুবুনদি আর ডাকতে পারি নি। ভাবলে নিজের ওপর ঘৃণায় গা শিরশির করে ওঠে। বলজে চাইবে অনবরত ঘৃণার জল নেমে আসে।

সেই বুবুনদিকে নিয়ে এমন একটা ভয়ংকর কথা এ-মুখ সে-মুখ হচ্ছে। যখনই হোক বুবুনদির কাছেই খোলাখুলি জেনে নিতে হবে। বুবুনদির বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে আচ্ছন্নের মত ঘুম এসে যাচ্ছিল। সন্ধ্যের পরে বুবুনদি এল। আলোর সুইচ দিয়েই আমায় দেখে বলল, কখন এসেছিস? আমি চট করে সিদ্ধান্ত করলাম তোমায় নিয়ে কি কথা উঠেছে খবর রাখ? ভাবলেশহীন বুবুনদি উত্তর দিল আমি জানি। যা শুনেছিস সব সত্যি, তার মানে? আচমকা আর কোন কথা বেরুল না আমার মুখ থেকে। বুবুনদিই বলল, আবার তুই জানতে চেয়েছিলি না, তোর বিলুদা কেন আসে না? এ জন্যেই আসে না। তারপর স্বগতোক্তির মত বলল, ইডিওলজি ধুয়ে জল খাই আর এত বড় সংসারটা ডুবে যাক। তাই বলে তুমি ছবি আঁকিয়েদের সামনে ওভাবে চুপ কর, হাল্কা ধমকে উঠেছিল বুবুনদি। দেহ ভাঙতে বাস্তায় বেরুলে সুখী হতিস?

বাঁচার জন্যে বুবুনদির আদর্শ বিকিয়ে গেছে। নিবারণ দাঁড়াতে হয়, ছবি আঁকিয়েদের সামনে।

দীপার কাছে এলে অন্তত আমার সেই আদর্শ শব্দটা নিয়ে কিছুমাত্র ভাবনা হয় না। প্ল্যান প্রোগ্রেস করে বাড়ি-ঘর ইত্যাদি তৈরী করা যায়। কিন্তু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখা যায় কি? অথবা শান্তি পাওয়া যায়? কেউ পেয়েছে? পাওয়া যায় না বলেই তো অন্যের প্রেমিকা জেনেও নিছক আদর্শের জন্যে দীপার সঙ্গে একই মন নিয়ে মেলামেশায় পিছু পা হই না। স্বপ্ন সাধাও নেই আমার। কেবলই দীপার চোখ দুটো যেন এক আশ্চর্য শাসনে বেঁধে রাখে আমার সম্পূর্ণ সত্তাকে। কেন? তা জানিনে।

কি হোল ওঠ, নৌকোয় চড়ার জন্যে এবারে তাড়া দেখিয়ে আমার হাতে হেঁচকা টান দিয়ে আমায় দাঁড় করাল। আমি বললাম, হঠাৎ ক্ষেপে গেলি কেন। নৌকোয় চড়ায় জন্যে? তুই আয় তো বলেই দীপা খেয়াঘাটের দিকে সিঁড়ি ভাঙতে লাগল। আমিও পিছু নিলুম। আরেকও বললাম, তোর প্রশান্ত তাহলে এলই না, ধুর ছাড় তো ওর কথা। নিজের প্রেমিক সম্পর্কে এত নিস্পৃহতা, উদাসীনতা থাকতে পারে কারুর? দীপাকে না দেখলে বিশ্বাস হত না আমার।

আরও অনেক কিছুই বিশ্বাস করতুম না যদি কিনা স্বচক্ষে না দেখতুম বা জলজ্যান্ত প্রমাণ না পেতুম। সংসারে আইপ-রাস বলে যেমন চমকে ওঠার মত কিছু নেই, তেমন ধুর আমার বিশেষ হয় না বলার মত অবিশ্বাস্যও কিছু নেই।

একেবারে হুটহাট ঘটে গেল ঘটনা গুলো। যেন ঠিক নিয়ম অনুযায়ী এ রকমই ঘটার কথা। ঘটেছেও তাই। অথচ সব কিছুই কি আর নিয়মমাফিক হয়? অনিয়ম বলে একটা কথা আছে তো। মাঝে মাঝে সেই অনিয়মই নিয়ম হয়ে আসে। আবার নিয়ম, অনিয়মের ঘাড়ে হাত রেখে আপোস করে।

এমন ত অনেকেই আছে যারা শুধু ঝামেলা-ঝক্কি এড়াবার জন্যেই সব কিছুর সঙ্গে নির্বিবাদে আপোস করে। সাত জন্মের শত্রুকেও হাতের কাছে পেলে আপোসে ছেড়ে দেয়। অবশ্য ভালবাসা থাকলে সব হয়। শ্যামলকে দেখেই সে নিয়ে আমার স্পষ্ট ধারণা হয়েছে। শুধু মাত্র আলোকে ভালবাসে বলেই শ্যামল আলোর সব দোষ আপোসে মেনে নিয়েছে।

একটা ক্ল্যাসিকাল মিউজিক কন্সার্ট ফারেন্সের সারা রাত থাকার পর ভোরের দিকে চা খেতে ক্যান্টিনে গিয়ে আলোর সঙ্গে শ্যামলের পরিচয়, সেই থেকে টুকটাক ইঙ্গিতময়তার কথাবার্তা, যা কানে এলে ধরে ফেলা যায় দুজনেরই দুজনকে পছন্দ। শ্যামলের সঙ্গে আমি নিজেও ছিলুম। আমিও পারতুম শ্যামলের আগে আলাপ জমিয়ে নিতে। অবশ্য পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার আছে। আমি এত জোর দিয়ে কি করে বলি আমাকে তার পছন্দ হোতই। তবু ভাল লেগেছিল আলোকে আমারও।

আলো চলে গেলে সেদিন ছেলে-মানুষী খুশীতে হাসি মারি এটা-ওটা খাইয়ে দিল শ্যামল। বলল, সাকসেস গুরু দারুণ পছন্দ আমার। পছন্দইসেই প্রেম হলে মানুষ তো খুশীতে পাগলই হয়ে যেতে পারে। শ্যামল যা শুরু করেছিল সেদিন আমার মনে হয়েছে একটা তারাবাজি জ্বালিয়ে ওর হাতে দিলে ও জ্বালিয়ে শেষ করে দেবে শিশুর মত। এত সহজেই প্রেম এ্যাভিলেবল হলে আমার আবার খাপছাড় লাগে। জানলুম না চিনলুম না পর্যন্ত দুজন দুজনকে ভালভাবে, বাস দুম-দাড়াক্কা প্রেম।

কোন কষ্টই পেতে হল না। বুকের ভেতর আচমকা ধড়ফড়ানি। অনর্থক গলা শুকোন ঘন ঘন অহেতুক ঘাম ঝরল না। দীপাকে দেখলেই ভেতরে ভেতরে আমার যেমন হয়। বিশেষ করে প্রথম দেখার দিন যেমন মারাত্মকভাবে এসব হয়েছিল। তবেই না প্রেম। সত্যিকারের টানটা তো আসে সে থেকেই। এসব অবশ্য আমার ধারণা। অন্যের সঙ্গে মতের অমিলও হতে পারে। তাই এ নিয়ে শ্যামলকে কিছুই বলিনি। পাছে আমার ওয়াইল্ড নিয়ে নেয়।

আলো নিয়মিত আসতে লাগল শ্যামলের বাড়ে। সন্ধ্যে সন্ধ্যে হয়ে করত ওরা। ফ্ল্যাট মফস্বলের এক্সটেনশনের হাসপাতালের দিকটা নিরিবিলি নিরু।

অন্ধকারে হসপিটালের বারান্দায় রোজ সন্ধ্যেতেই ওদের বিশ্বাস উভয়েরই, একসময় চূড়ান্ত গরম হয়ে উঠত। দু-চার দিন শ্যামলের সহযোগী হয়ে আমিও দূরে বসে শুধু সিগারেট টেনেছি আর আঁচ করেছি। এসব। আর একটাই কথা মনে হয়েছে শুধু শ্যামল আসলে দুজনেই তোরা একটা মোহের শিকার হয়ে গেছিস রে। কেউ কাউকে তেমনভাবে ফিল করিসনি। তাহলে এভাবে অন্ধকারে এসে বসতিস না বোজা' পরে মনে হয়েছে আমার এসব ভাবা, সাজে না।

সেই আলো বেশীদিন থাকল না শ্যামলের কাছে। হঠাৎ করে আসা বন্ধ করে দিল। আর আসেই নি, শেষ পর্যন্ত। আলোর বাড়িতে শ্যামলের অবাধ যাতায়াত তৈরি হয়ে গিয়েছিল। অল্পেতেই বাড়ির সবাই মেনে নিয়েছে। পর পর দিন দশেক আলো না আসাতে শ্যামল একদিন সন্ধ্যেতে আলোকে বাড়িতে ধরল। সঙ্গে আমিও ছিলুম। আলোর দিকে সরাসরি তাকাতে পারছিলুম না। শ্যামলকে দেখে আলোর কোন ভাববিকার ঘটল না। আলাদা ঘরে গিয়ে বসলুম আমরা তিনজনে। 'দেখা করা না কেন?' জিগ্যেস করতেই শ্যামলের মুখের ওপর আলোক জবাব ছিল 'দেখা করার প্রয়োজন এখনও বাকী আছে?' 'তার মানে? তুমি কি বলতে চাও?' আলো যেন অবাক হল, বলল, তুমি কি বলতে চাও পরিস্কার করে বল। সেদিন শ্যামল ভালবাসার জন্যেই আলোকে কিছু বলতে পারেনি। দুঃসাহসিক ভাবে কিছু একটা করে বসেনি।

আলো কলকাতা মাঠে ভলিবল, কবাডি এসব খেলতে আসে। শ্যামল ভাল ফেডারেশন থেকে কবাডি ফেডারেশন করে প্রায়ই গিয়ে লুকিয়ে চুরিয়ে আলোকে দেখেছে তারপরেও। আলোর পিছু নিয়ে কলকাতা অব্দি ছুটে এসেছে, কেন আলো এভাবে পাল্টে গেল? যদি কিছু জানা যায়।

সেভাবেই একদিন আকাশবাণীর কাছে শ্যামল দেখেছে আলোর সঙ্গে বেমানান একজন বয়স্ক লোক আলোর কোমর পেঁচিয়ে একটা ফিয়েটে ড্রাইভিং শেখাচ্ছে আলোকে। চোখে দেখেই শ্যামলের বিশ্বাস হচ্ছিল না এসব। বিশ্বাস হয়? সেই আলো একটা বয়স্ক লোকের কাছে খেলা-ধুলোর ভাল সুযোগের জন্যে সব ভুলে যাবে, ভাবা যায়?

মাঝে মাঝে শ্যামলের চোখে তাকিয়ে ভয় হয় আমার। অপরাধীর মত চোখ নামিয়ে নিই আমি। আসলে শ্যামলের কাছ থেকে আলোর দূরে সরে যাবার পেছনে আরেকটা অবিশ্বাস্য ঘটনাও কারণ হতে পারে। যেটা নাকি আমি ছাড়া আর কেউই জানে না। শ্যামল তুই জানিস না। তুই সেদিন ছিলি না, তোর খোঁজ নিতে আলো এসেছিল সন্ধ্যের দিকে। হসপিটালের নির্জন অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে অসহায়ভাবে আলোকে পেয়ে আমিই ওর বুকের মাংস লাল করে দিয়েছিলাম। তুই আমায় ক্ষমা করিস। আমি আমূল শুধুরে গেছিরে।'

দীপার পেছন পেছন আমি খেয়াঘাটের সিঁড়ি ভাঙছিলাম। পেছনে ঘাড় ঘুরিয়ে দীপা জিগ্যেস করল 'এর আগে চড়েছিস নৌকো কোনদিন?' 'কেন চড়িনি বা যে আমরা তো নর্থবেঙ্গলেই ছিলুম বেশী।' সিঁড়ি শেষ হতেই পাঁচপ্যাঁচে কাঁদার ওপর জোড়া-কবে ইঁট পাতা, একহাত দেড়হাত ফাঁরাক মাপে। সন্তর্পণে পা ফেলতে গিয়ে দীপা বলল 'আমার হাতটা একটু ধর।' আমি চট্ করে ধরে ফেললুম হাতটা। সাবধানে পায়ে পায়ে এগুতে থাকলাম।

দীপাকে আজ আমি নতুনভাবে উপলব্ধি করতে পারছি। আবিষ্কার করতে পারছি। মাঝে মাঝেই দীপা আমার শূন্যবুক ভরে দিয়ে তাকিয়েছে। দীপা এত অদ্ভুত তাকাতে পারে? ছেলেমানুষের মত আমার মনে হয়েছে দীপা পাকাপাকিভাবে আমার চোখে এভাবে তাকালে, হয়ত আমার সাতজন্ম ক্ষিদেই পাবে না। এখন পর্যন্ত খুব একটা হৈ-চৈ কথার ফুলঝুরি উড়িয়েছে, তা না। অল্প-স্বল্প যে দু-চার কথা বলেছে আর ছেলেমানুষী হেসেছে, তাতে আমার শুধুই মনে হয়েছে, অনেক শকুন্ত কথাও ইচ্ছে করলেই বলে দিয়ে নিরাপদ থাকতে পারব। শকুন্ত কথা বলতে তো ওই একটাই কথা আমার মনে আসে, দীপা আমার মধ্যেই প্রশান্তকে খুঁজে নিক্ না।'

এসব ভাবা অন্যায়। দীপা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলে কেচ্ছার শেষ থাকবে না। 'তলে তলে তুই এতটা প্রদীপ! এতটার কি আছে? তোকে ভাল লাগে আমি তোকে ভালবাসি ব্যস্ আর জানিনে কিছুই। জানিনে কিছুই। আবদার আর কি! 'কুমীর তোমার জলকে নেমেছি' হেকেখেলা যেন।

কোন কিছুই ছেলেখেলা না। বস্তুতঃ দীপার প্রেমিক আছে, ভেবে নিজেকে সচেতন করা বা গুটিয়ে নেয়ার আগেই তো ডুবাডুবি হয়ে গেছে।' ছেলেখেলা তো দীপাই করেছে গোড়া থেকে। নইলে প্রথম দিন বসিডোরে অপরিচিতের দিকে ওভাবে কেউ তাকায়? প্রাণান্ত ইশারা করে কেউ ওভাবে হাসে? অন্ততঃ নিজের একজন প্রেমিক থাকতে' আমার বুকে কার্তিকের হিম জমাট বেঁধে আছে সেই থেকে। দীপার জন্যেই তো। দীপা ছাড়া অন্য কারুর তাপে কি সে হিম ছাড়বে বুক থেকে?

মেয়েদের মধ্যে সুমিতার সঙ্গেই প্রথম আলাপ হয়েছিল। সুমিতাই দীপাকে ডেকে পরিচয় করিয়েছিল আমার সঙ্গে। দুচার কথা বিনিময় হয়েছে সব মিলিয়ে, তখনিই অসীম এসে সুমিতাকে ডেকে নিল। সুমিতা চলে গেলেও দীপা যাওয়ার কোন লক্ষণই দেখাল না যখন, হুট্ করে আমিও কি করে চলে আসি? দীপার মত মেয়ের সামনে দাঁড়ালে অনেক আচ্ছা আচ্ছা কলিজাও শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে। তবু সেই মুহূর্তে যেন কথা তো অন্ততঃ বলে বেহুঁশ পেতে হবে। সহসা ওর দিকে তাকিয়ে সামান্য হেসে বলতে গেলাম 'আপনাকে আগেই দেখেছি।' কিন্তু কথা শেষ হবার আগেই সে হাসি বিপন্ন 'ম্লান হয়ে ঠোঁটের বাইরে ঝুলতে থাকল। দীপা দমকে হঠাই এমনভাবে হেসে উঠল মনে হল, কাঁচের জার মেঝেয় পড়ে ভেঙে চৌচির হয়েছে। আমার অস্বাভাবিক ভেতরটা কি ও বুঝতে পারল? এভাবে হেসে উঠল!

দীপার দুধে-ফরসা নিখুঁত দু-পাটি দাঁত এক হতেই বলল 'আমাকে আপনি কেন?' সংকোচের কাঁটা সরে গেল অনেকটা। বললাম 'এখানে সবাই তুই তুকারি করে। আমি চট্ করে কারুকে তুই বলতে পারিনে। আমার আসে না।' দীপা বলল 'আমাকে তুমি, তুমিই বোলো।' তার মানে? তুমি বলবে—আর আমি বাধ্যশিশুর মত তোমার কথায় তুমি তুমি করে, তোমার ওপর আমার দুর্বলতাকে সাড়ম্বরে জানান দিই আরকি। আমার ভেতরে কেন জানি এসব মনে হতেই আমি বলে বসলাম 'এখানে সবাই যখন তুই বলতে পারে, তখন আমাকেও তো চেষ্টা করে পারতে হবে।' কথাগুলোকে এমন ধীরে-সুস্থে বললাম, যেন দীপার মত আলাদা-গোছের একটা সুন্দরী মেয়ে, আমার চোখে কই, তেমন তো কিছু দেখলাম না? এমনই উদাসিকভাবে তাকাতে গেলাম ওর দিকে। কিন্তু সত্যিকারের আগুনে কি আর শিশির ভেবে হাত বাখা যায়? আমার দিকে দীপার অদ্ভুত প্রগলভ চাউনি দেখে একটা তীব্র সুখ যন্ত্রণার আকারে বুকের বক্তে আঘাত করতেই সমস্ত রক্ত নুয়ে পড়ছিল। তখনও কি জানতুম এই দীপার একজন প্রেমিক আছে?

মেয়েদের চোখে আমি নাকি মুখচোরা গোছের। একথা আমার কানে এসেছে বহুবার। সুমিতা দীপা এরাও তাই ভেবেছে নিশ্চয়ই। তবে যে অর্থে ওরা আমায় মুখচোরা ভাবে, সেদিক দিয়ে কারুর চাইতে আমি কম যাইনে। তবু চট করে কারুর সঙ্গে তেমনভাবে জমিয়ে নিতে পারিনে।'

সেই আমার সঙ্গে, দীপার মতো সপ্রতিভ চরিত্রের মেয়ের পরিচয় হওয়াটা নিতান্তই দৈবাৎ। আরও বেশি দৈবাৎ ঘটনা ঘটে গেল ফেব্রুয়ারি ওয়েলকামের দিন।

কাউকেই জানাইনি কথাটা। আগের দিন ঠিক করে ফেললুম মনে মনে। বলেও ফেলতে পারতুম। কিন্তু তুষার, অসীম, সুমিতার সঙ্গে দীপাও ছিল। বহস্যসম্ভাবে কথাটা তাই চেপে গেলুম বেমালুম। এখানে আমার এ বিষয়ে কেউ জানে না কিছু।' তাই সামান্যও ধারণা বা আঁচ করারো পারেনি অথবা সে-নিয়ে আমাদের মধ্যে কথাও ওঠেনি। তলে তলে ব্যবস্থা পাকা করেছি আমি একা। দীপা না থাকলে শেষপর্যন্ত হয়ত বলেই ফেলতুম কথাটা। প্রথমদিন আলাপের পর দীপার সঙ্গে আমার আর কোন কথাই হয়নি বলতে গেলে। ইউনিভার্সিটিতে সবার সামনে মাঝে মধ্যে আমার সুপ্ত বাক্‌পটুতার আত্মপ্রকাশ ঘটলেও দীপা এসে গেলেই আমার কু বর্ণ কথাও নিতান্তই মূল্যহীন মনে হয়েছে। কেবলই মনে হয়েছে যা বলছি সে তো হাজার

হাজার লোকের মুখের বহু ব্যবহৃত কথা। দীপাকে আমি এমন কোন কথা শোনাই, যা শুনে দীপার মনে হবে যেন, সম্পূর্ণ আলাদা গোছের, সম্পূর্ণ অনকোরা, দারুণ মূল্যবান, অথচ সহজ হৃদয়গ্রাহী। যে কথা এর আগে কেউ বলেনি। এসব ভেবে বাক্‌হীন জড়ের মত সবার কথার মধ্যে বসে থেকেছি। মাঝে মধ্যে দু-চার কথায় সায় দিয়েছি। দীপার সঙ্গে সরাসরি কোন কথাই হয়নি। ও-ও বলেনি। আমিও সহসা পারিনি কিছু বলতে।

পরদিন ফেসার্স ওয়েলকামে এসেছি অনেক আগে থেকেই। তখনও কাউকে বলিনি কিছু। কাউকে বলে ফেললে হয়ত ভেতরের ভয়টা অনেক হাল্কা হয়ে যেত। তবু সবাইকে চমকে দেয়ার একটা তীব্র স্পৃহা কাজ করল মনে মনে। ভয়টা তার জন্যেই বাড়ছিল আরও বেশী। যতই সময় এগিয়ে আসতে লাগল, ততই কি হয় কি হয় ভয়ে গলা শুকিয়ে আসছিল।

তখন অনেকেই এসে পড়েছে। দীপাও এই এল। হালকা আকাশ রঙের ফিনফিনে জাওয়ার মত পাতলা গোছের শাড়িটার কালচে বুটি। এই শাড়িটার জন্যে দীপার শরীরের দ্যুতিটা আরও বেশী ফুটেছে নাকি? দু-একটা বিশেষ তারা যেমন আকাশে কখনো-সখনো দেখা যায়। সুমিতা সোনালী, তুষার, বিমল ওদের সঙ্গে এদিক-ওদিক যাচ্ছে, আসছে, হাসছে, কথা কইছে। আমিই কেবল ওদের কাছ থেকে কখনই খাপছাড়া হয়ে একা একা হয়ে যাচ্ছি। কেবলই মনে হচ্ছে শরীরের রক্তও চলাচল স্বাভাবিক হচ্ছে না। সুমিতার 'কখন এলি?'র উত্তর দিতে গিয়ে তখন অস্পষ্ট গলা ক্ষীণ কেঁপে গিয়েছিল। এখন হাত নেড়ে ইঙ্গিতে বোঝানোর চেষ্টা করা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না।

দীপাকে সারপ্রাইজ দেব। ওর পছন্দসই হবে কিনা, সে নিয়েই কিন্তু আসলে ভয়টা আরও বেশী ছিল। আমি বেটাকে সারপ্রাইজ ভাবছি, দীপার কাছে তা সারপ্রাইজ নাও হতে পারে। একজনের গান আরেকজনের কাছে কান্না হতে পারে, আবার কারুর কান্না কারুর কাছে গানের মতও হতে পারে।

এক সময় এমন ছিল আমার বুবুনদিকে যখন তখন সারপ্রাইজ দিতে ইচ্ছে করত। শুধু মনে হয়েছে নতুন আরো নতুনভাবে চমকে দি বুবুনদিকে। তখন আমি জানতুম না যে পৃথিবীতে নতুন করে চমকে উঠার মত কোন চাঁটকা ঘটনা আর নেই। সব ঘটনার রঙই বিবর্ণ ফকে হয়ে গেছে। নতুন করে বং চড়ালেও ই যাবার বীভৎস ভয় আছে।

'বুবুনদি তুমি জান না। তোমাকে ক দেবার জন্য তোমার ঘরে খাটের নিচে গিয়ে লুকিয়ে ছিলুম। বিলুদা সেছিল তোমার ঘরে। তোমার সঙ্গে বিলুদাকে সেদিন ভাল দেখিনি আমি। তখন ব্যাপারটাকে সঠিক উপলব্ধি করতে ন পারলেও আজ পারছি। লোকটা গোড়া থেকেই ভাল ছিল না। তুমি ভাল থেকো। ভালবাসা নিও।'

অডিটোরিয়ামে সবাই ঢুকে পড়েছে প্রায় অল্প কয়েকজন মৃদু গুঞ্জন ছড়াচ্ছে, এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে, বাইরে করিডোরে। আমি অডিটোরিয়ামে ঢোকার মুখে গেটের পাশে দাঁড়িয়ে সিগ্রেট টানছিলুম। আমাদের বাংলার কাউকেই চোখে পড়ছে না। সুমিতা, দীপা, বিমল তুষার ওরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে অডিটোরিয়ামের মধ্যে জায়গা জুড়ে বসে পড়েছে। ওদের সঙ্গে বসার জন্যে ওরা আমাকে খোঁজেনি? খুঁজলেও পাওয়ার কথা না। কারণ আমি তো নিজেই জানি আমি অডিটোরিয়ামে বসছিনে। তাই ওদের সবার চোখের আড়ালে থেকেছি। ওদের দেখেছি। ওরা দেখেনি আমাকে। সময় বলতে গেলে আর নেই-ই। দীপা তুমি কোনদিনই জানতে পারে না। তোমাকে ছোট্ট একটা সারপ্রাইজ দেবার জন্যে আমার ভেতরে এখন কি ভয়ংকরভাবে ভূমিকম্পে ধ্বস পেয়ে যাচ্ছে সব।' সিগ্রেটটা মেঝেয় ফেলে পায়ে পিষিয়ে দিলাম। এবার ভেতরে যাব। চোখ তুলতেই দীপাকে দেখলাম। তন্ত্রীতে কোথায় আকস্মিক বাধাপ্রাপ্ত রক্তের বেগ যেন বিমুখী ছুটতে শুরু করেছে।

দীপার থেকে চোখ ফেরালুম না। দীপা সেই অদ্ভুত প্রগলভ চাউনিতে হাসির ছোঁয়াচ রেখে সাবলীলতা নিয়ে দ্রুত এগিয়ে এল আমার দিকে। এসেই বললে 'একা এখানে কি করছিস? তুই নাকি গান গাইছিস? কাউকে বলিসনি তো তুই গান জানিস, আজ গাইবি? কি অদ্ভুত স্বাভাবিক দীপার কথাগুলো। যেন কত-কালের নিবিড় সম্পর্ক দীপা বয়ে এনেছে এতটা। আমি বললুম 'কে বললো?' ইউনিয়নের শ্যামসুন্দরদা বললো, তোমাদের বাংলা প্রদীপ গান গাইছে। সত্যি?' আমি হ্যাঁর মত করে মাথা নাড়লুম। ভেতরটা কখনই আমার নিস্তরঙ্গ স্বাভাবিক, আরও স্বাভাবিক হয়ে গেল। দীপা বলল 'চ ভেতরে আয়' আমি দীপার সঙ্গে ভেতরে গেলুম।

।।২।।

যেমন দৈবাৎ পরিচয় হয়েছিল, তেমনই দৈবাৎ ঘনিষ্ঠতাও হয়ে গেল দীপার সঙ্গে সেই ফেসার্সওয়েলকামের দিন থেকে দীপা সেখানে সেখানে আমি, আমি যেখানে দীপা সেখানে। বাংলোর প্রায় সবাই আমাদের নিয়ে নানান কথা ছুঁড়তে লাগল, সমালোচনা করত নিজেদের মধ্যে। দীপা ভ্রুক্ষেপ করত না। আমি মাঝে মাঝেই রাগ দেখাতুম। এমন ভাব দেখাতুম, যেন এক্ষুনি একটা বিভালবার পেলে, ঘুষরোড়া করেই এক-একটার বুকে সিঁধিয়ে দিতুম। সেটা শুধুই

রচনাবলী গ্রন্থমালা

তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ

অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত। তিন খণ্ডে সমগ্র ছোটগল্প। [প্রতি খণ্ড ৪০.০০]

গিরিশ রচনাবলী

পাঁচ খণ্ডে সমগ্র রচনা। ডঃ রথীন রায় ও ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত। কয়েকটি বিশেষ প্রবন্ধ সংযোজিত। [প্রতি খণ্ড ২৫.০০]

মধুসূদন রচনাবলী

এক খণ্ডে ইংরেজিসহ সমগ্র রচনা।
ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত। [২২.৫০]

বঙ্কিম রচনাবলী

যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত। দুই খণ্ডে সমগ্র রচনা।
প্রথম খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস (১৪টি) একত্রে [২০.০০]।
দ্বিতীয় খণ্ডে সমগ্র সাহিত্য-অংশ একত্রে [২২.০০]।

প্রতি রচনাবলীতে জীবনী ও সাহিত্য কীর্তি আলোচিত

সাহিত্য সংসদ

৩২-এ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

আলগা, বাইরের। ভেতরে ভেতরে দারুণ ইচ্ছে করতে গিয়ে সবার পিঠ চাপড়ে বলে দিই 'সাবাস বাচ্চা আউর বোলো। চিলহা চিলহা কব বোলো। সারি দুনিয়াকো মালুম করবা দো।'

একটা ছোট্ট কথাই শুধু বলে ফেলা হয়নি দীপাকে। কিভাবে বলব, কি কথা দিয়ে শুরু করে, সে কথায় গিয়ে দাঁড়াব, কিভাবে সাজিয়ে বললে দীপার সবচে বেশী পছন্দ হবে, ভেতরে ভেতরে এসব দ্বন্দ্ব নিয়েই বলা হয়নি। দীপার মত মেয়ে, আগ বাড়িয়ে একথা বলতে পারে? আমার ধারনা নেই। আমাকেই বলতে হবে। আবার মনে হয়েছে, সব শুনে দীপা যদি বলে বসে 'নাবে প্রদীপ এ আমি চাইনি, আমি বন্ধুত্ব চেয়েছি। তুই আমাকে ভুল বুঝিস না!' এসব নেহাৎই ভয়। দীপা আমাকেই ভাল-বাসে। একথা আমি চোখ বুজে বা হাতে লিখে গেলেও, একটা অক্ষরও হেরফের হবে না। আমি হলফ করে বলতে পারি।

কত কথা মনে হয়েছে বলব। দীপার কাছে যেতেই আবার মনে হয়েছে, কথা নেই কোন। কোন কথা থাকে না, সেইটেই স্বাভাবিক মনে হয়েছে বার বার। রবী-ঠাকুরের গান পছন্দ করে দীপা, কেবলই ইচ্ছে হয়েছে দীপাকে একটা রেয়ার গান শোনাই। দীপার সঙ্গে আমার যেন সবদিক দিয়েই একটা আদ্যন্ত মিল বয়ে গেছে। কোন কবিতা ভাল লেগে গেলেই সেটাকে মুখস্থ করে ফেলেছি। দীপাকে শুনিয়েছি। ও খুশী হয়েছে। খুব সহজে খুশী না হওয়াটাই যেন দীপার বিশেষত্ব। কিন্তু যখন মনে হয়েছে, দীপা সত্যিই খুশী হয়েছে, তখন সুখী মানুষের মত সুরের যন্ত্রণায় বুকের ভেতরটা ভরে গেছে।

দীপা আমার খুচ্‌খাচ্‌ সব ব্যাপারেই তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে। একটুতেই ডাক দিয়েছে। চোখ পাকিয়ে শাসনের ধরণ নিয়েছে। তখন আরও বেশী করে মনে হয়েছে দীপা তুই আমার। একচেটিয়া সুখের আধিপত্য নিয়ে বিশ্ব সংসারে আমি একটাই এসেছি। তার মূলে তুই।'

কিন্তু বায়েন্দ্রসুন্দরের ওপরে বইটা যেদিন হারিয়ে ফেললুম। দীপা সেদিন আমায় 'তুই একটা যা তা, ইয়েসপনসিবল্‌ কোথাকার' এসব মুখের ওপর বলে দিয়েছে। কার কাছ থেকে চেয়ে এনেছিল বইটা, তারপর ক্লাসে আমার কাছে দিয়ে বলেছিল 'তোর কাছে রাখ।' রেখেও ছিলুম। তার ভাবতে পারিনি বইটা হারিয়ে যাবে। আমার সঙ্গে করে দীপা এ রুম ও রুম ক্যান্টিন, করিডোর, লাইব্রেরী করে খুঁজেছে। যেচে আগ বাড়িয়ে একে ওকে জিগ্যেস্‌ করেছে। আর ততই বেশী করে বেগে গেছে আমার ওপর। বার বারই বলেছে একই কথা 'তোর মত ইয়েসপন্‌সিবল্‌ ছেলে আমি দুটো দেখিনি। তুই একটা বিবেক সামান্য একটা বই দায়িত্বে রাখতে পারলি না?' লজ্জার অপমানে আমার কর্ণমূল আরক্তিম হয়ে উঠেছিল। নিজেকে একটা নিরেট অপদার্থ মনে হয়েছে। দীপাকে কোন মুখে কি বলব? কিছু বলার থাকে আর? দীপা আমাকে আর কোনদিন কিছু রাখতে দেবে না। কোন ব্যাপারে দায়িত্ব দেবে না। নির্ভর করবে না। এর চেয়ে দুঃখ আর আমার কি থাকতে পারে? সত্যিকারের বইটা আমি কোথায় ফেললুম কিছুতেই মনে করতে পারলুম না। মনেই ছিল না। দীপা, চাইতেই তখন পড়ল।

অন্যান্য দিন দীপার যাবার সময় আমি ওর সঙ্গে বাস-স্টপ অব্দি যাই। ও বাসে না উঠে যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়াই। একথা ওকথা বলতে বলতে বাস আসলে, দীপা উঠে যায়। আমি আমার বাসে উঠি।

কিন্তু আজ যাবার সময় দীপা আমায় ডাকল না। সবদিন ডাকতে হয় না, আমি নিজেই থেকেই যাই বা সঙ্গে থাকি, যাই। কিন্তু আজ না ডাকলে যেতে পারি? কি বলব নিয়ে যে, 'আমি কীর্তিমান পুরুষ এলুম তোমায় এগিয়ে দিতে বাস-স্টপে?' নিজের ওপর একটা মিহি ঘৃণা, একটা তাচ্ছিল্য। শরীরময় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল। ততই নিজেকে আরও দায়িত্বজ্ঞানহীন চরম নগণ্য মনে হয়েছে। সামান্য যেখেয়ালের জন্যে মস্ত একটা ইতি হয়ে যাবে দীপার, ভাবতেই আমার শিরদাড়া বেয়ে ঘাম নেমে আসছিল। দীপার কাছে আমি ছোট হয়ে যাই, দীপা আমাকে অপদার্থ ভাবুক মনের ভুলেও কোনদিন ভেবেছি? বরং উল্টোটাই চেয়েছি। সাবলীল সুপুরুষের সব কটা গুণ খুঁজে পাক আমার মধ্যে দীপা। আবিষ্কার করুক এক অনন্য নরনীকে।

দীপার কি দোষ? ওকে তো বইটার জন্যে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। জবাবদিহি করতে হবে অন্যের কাছে। সে তো আমারই জন্যে। শুধুমাত্র আমার জন্য। দীপা করুর কাছে সহজে ছোট হওয়ার মেয়ে না। সহজে মাথা নোয়ায় না কারুর কাছে। কাউকে সেরকম সুযোগ দেয় না। সেখানে যদি, যার বই সে দুকথা বলার সুযোগ পেয়ে যায়, আর দীপাকে শুনতে হয়, তবে কল্পনাতীত কেলেঙ্কারী ঘটে যাবে। দীপা আমাকে আরও যা তা বলে দেবে। কথা বন্ধ করে দেবে। না দীপা কথা বন্ধ করে দিস্‌ না। আমার কথা তোর ছোঁয়াচেই তো সজীবতা পায়, আরও বেশী প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। তুই বুঝতে পারিস না?'

পরদিন ইউনিভার্সিটি এসেছি। ভয়ে ভয়ে গা আড়াল করে থাকতে ইচ্ছে করছিল, দীপার চোখ থেকে। পারা গেল না। দীপা আমার কাছে এসে বসল। বই নিয়ে কোন কথা তুলল না। আমিও বললুম না কোন কথা। দীপার মুখোমুখি অপরাধীর মত বসেছিলুম। তাকাচ্ছিলুম না ওর দিকে। 'বাড়ি ফেরার পথে কাল কলেজ স্ট্রীটেও তোর বইটা অনেক খুঁজেছি রে পাইনি। দীপা ওর ডান হাতের তর্জনি দিয়ে আমার গ্রীবা ঘুরিয়ে, আমার চোখ ওর চোখের মাপে করে নিয়ে মিহি গলায় বলল 'আমার ওপর তুই রাগ করেছিস্‌ নারে? আমি অপলক তাকিয়েছিলুম দীপার চোখে। পর্যন্ত অভিমানে করুণে দুচোখ জলে ভার হয়ে এল আমার। আমি অস্পষ্ট কাঁপা গলায় বললুম 'কই না তো।' তারপর দীপা ঝুঁকে এল আমার কানের কাছে। পরম গোপনীয়তার সতর্কতায় ফিসফিস করে বলল 'কাল মেট্রোতে ম্যাটিনির দুটো টিকিট কেটে রাখিস। আমি সময় মত চলে যাব।'

পরদিন ছুটির দিন। ইউনিভার্সিটি যাবার তাড়া নেই। তারপে দশগুণ তাড়া আমার মেট্রোতে সময়মত পৌঁছে টিকিট করে নিশ্চিন্ত হওয়ার। সকাল থেকেই তাড়া-হুড়ো করে এটা সেটা ঠিকমত গুছিয়ে গাছিয়ে নিতে গিয়েই কত সময় চলে যাচ্ছে। কেবল মনে হচ্ছে, কি যেন বাকি থেকে গেল। আমার হাতার ইস্ত্রির ভাজটা উল্টো হল নাকি? টাকা পয়সা ঠিকমত নেয়া হল তো। কম পড়ে যাবে না তো? কলকাতার রাস্তায় বেরুলে টাকা পয়সার মা বাপ থাকে? কোথেকে কি বিপদ হাজির হয়। বেশী টাকা থাকলে সবদিক দিয়ে একটা মোটামুটি নিশ্চিন্ত থাকা যায়। হুট্‌ করে ঝুট্‌ ঝামেলা বাধতে কতক্ষণ। গেলেই তো হল।

দীপা সঙ্গে থাকবে। এটা সেটা যদি হঠাৎ খেতে চেয়ে বসে? কোনদিন অবশ্য তেমনভাবে চায়নি কিছু খেতে। একদিন শুধু ইউনিভার্সিটিতে ফুচ্‌কা খেতে চেয়ে ছিল। বলেছিল 'খাওয়াবি মাইরি' খাওয়ানোর মত পয়সা ছিল না আমার পকেটে। অগত্যা আমাকে বলতে হয়েছে 'ধুর ফুচ্‌কা আবার কেউ খায় নাকি?' সামান্য কয়েকটা পয়সার জন্যে দীপাকে ফুচ্‌কা খাওয়াতে পারিনি। দীপা যদি বলত 'ঠিক আছে ফুচ্‌কা না খাওয়াস ভেলপুরি খাওয়া তবে' তখন? তখন কি বলতুম? তখন কি বলা যেত যে, ভেলপুরি ছোটলোকি খাবার?

দীপার সঙ্গে একদিন যাচ্ছিলাম এভারেস্ট বিল্ডিং-এ আনিতার জন্যে কোম্পানী সেক্রেটারি শিপের প্রস্‌পেকটাস আনতে। বাসে অত্যধিক ভিড় ছিল। ভদ্রভাবে আবরু বাঁচিয়ে কোন মেয়ের পক্ষে সম্ভব না, ওই বাসের ভীড় ঠেলে ওঠানামা করা। কেউ করলেও, আমি চোখের সামনে কি করে সহ্য করি যে, দীপা ভিড়ের মধ্যে অস্বস্তি বোধ করছে, আর সেইসব রোগগ্রস্ত মানুষরা তাদের যার যার সামরিক পাওনা বেপরোয়া বুঝে নিচ্ছে?

বেশী পয়সা পকেটে ছিল না বলে আমি সেদিন দীপার সামনে পৌরুষ জাহির করতে পারিনি। সম্রাট অথবা বাদশার মত চেঁচিয়ে বলতে পারিনি 'হেই ট্যাক্সি দাঁড়া।' নিদেন পক্ষে একটা মিনিবাস বা কোন ডিলাক্স বাসের কথা মনে এল দীপার কথা কানে তুলিনি। শেষ পর্যন্ত ভীড় বাসেই উঠতে হয়েছিল।

আরও কতদিন সামান্য কুড়ি পয়সার জন্যে ইউনিভার্সিটি থেকে শিয়ালদা অব্দি হেঁটে এসেছি। ইচ্ছে হলেও একটা সিগারেট কিনে ধরাতে পারিনি। এসব কি দীপা জানে

কোনদিন? জানতে দেয়া যায়? আরও কত কথা দীপা জানবে না আমার। আমিও জানতে পারব না, দীপার অনেক কথাই। গভীর গোপন বলে মানুষের মধ্যে যে জিনিসটা, সেটাকে নিজে নিজেই বুঝতে হবে, মীমাংসা করে নিতে হবে।

পয়সাকড়ির জন্যে এতশত বিপদের কথা ভেবেই পর্যাপ্ত পয়সা যোগাড় করে ফেলেছি খুব অল্প সময়ের মধ্যে। বাক্সের জমানো পুরোনো পত্রপত্রিকা সব ওজন দরে দিয়ে দিয়েছি। দীপার সঙ্গে একটানা তিন ঘন্টা সিনেমা হলের স্থাবী অন্ধকারে পাশাপাশি বসে, দীপার গা থেকে সন্তর্পণে মেয়েলী গন্ধ নাকে নিয়ে সমস্ত কোষে কোষে ছড়িয়ে দেবার বিপুল কৌতূহলে, আমি সর্বস্ব বেচে দিতে পারি। ত্যাগ করতে পারি অনেক দামী জিনিসও।

সকাল থেকেই বাড়িতে এমন হুলুস্থুলু হুড়োপাটা শুরু করে দিলাম। যে কেউ হঠাৎ এসে গেলে, ভাববে বুঝি কোথাও চাকরির জন্যে ইন্টারভিউ আছে আমার! শ্যামলের থেকে ওর কালো প্যান্টটা চেয়ে নিয়ে এলুম। ভ্যাবলের থেকে চোস্ত সানগ্লাসটা। নিজে হাতে তড়িঘড়ি শেভারেটে কালি করে ফেললুম। জামাটা গায়ে গলাতে গিয়ে দেখলুম নিচের দিকে একটা বোতাম নেই। বেধড়ক খিঁচড়ে গেল মেজাজটা। হাতের কাছে সুতো খুঁজে পেলুম না। বত্যা একটা পুরোনো জামা থেকে সাদা বোতাম কেটে এনে দিতে গেল। রগের চোটে কি বলতে গিয়ে বলে ফেললুম 'গলা না হলে ওই ট্যাবলেট কি চিবিয়ে খাব?' ভস্ম পেয়েও কথা শুনে বত্যা হেসে দিল। খানিক গম্ভীর থাকার চেষ্টা করে আমিও হেসে ফেললুম।

তাড়াহুড়ো করে ভাত খেতে গিয়ে মনে হচ্ছিল ভাজা মাছের কাঁটা খেয়ে যাওয়া কি অসম্ভব দুরূহ। নাকি কাঁটা বেছে খেতেই শিখিনি? 'আস্তে খা গলায় ভাত ঠেকবে।' মার কথায় মনে হয়েছে বলে দি 'তুমি কি বুঝবে মা? দীপার সঙ্গে সিনেমায় যেতে হলে তুমিও বুঝতে। একটু দেরী হলেই ওকি অসম্ভব রেগে যায়!' ট্রেনে ভীড়ের মধ্য দাঁড়িয়ে থেকে এসব মনে করে ফিক্ করে আপনা আপনি হেসে উঠেছি। মুহূর্তে সে হাসি সকরুণ ছাপ ফেলেছে মুখে। কেউ দেখলে ভালই বুঝতে পারত। টিকিট পাব তো?

দীপা বলেছে স্টুডিওটার সামনে দাঁড়াতে। 'এদিক ওদিক যাস্ না কিন্তু কোথাও।' শেষে খুঁজতে গিয়ে আমি হয়রান হই। তবে কিন্তু কপালে দুঃখ আছে তোর।'

অন্য কোথাও যাই নি আমি। পয়লা দুটো টিকিট দু'টো কেটে নিয়েছি। শীতের ঝিমিয়া রোদ মুখের ওপর পড়ছিল এসে। তবু স্টুডিওর সামনে থেকে এক পাও সরে গিয়ে ছায়া খুঁজিনি। অনেক আগেই আমি ঘেমে পড়েছি। দীপার আসার এখনো অনেক দেরী।

ধারাবাহী জনস্রোত, ফুটপাথে হকারদের বিজৃম্ভিত চেঁচামেচি, ভবলডেকারের পেছন থেকে কালো ধুঁয়ো ছেড়ে মোড় নেয়া, অনন্তকাল ধরে বয়ে যাওয়া দ্রুতগতি যানগুলোকে আমার তীক্ষ্ণ নজর ছেঁকে ধরছিল। হাতের কব্জিতে সময় আমার কমেই এগুতে থাকল।

আনমনা গালে হাতের প্রলেপ দিতেই মনে পড়ল এই যা দাঁড়ি কামানো হয়নি'। তাড়াতাড়িতে বলতে গেলে আসল কাজটাই বাদ পড়ে গেছে। গালভরা খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি রয়ে গেছে। কালো মুখে এই দাঁড়ি দীপার কাছে মোটেই নয়ন সুখকর হবে না।

এক দুপুরে সুমিতা আমাকে পাকড়াও করল ইউনিভার্সিটিতে।' বলল 'তুইও চল।' আমি বললুম 'কোথায়?'

'কোথাও না তুই চল্ তো।'

'আগে বলবি তো কোথায় যাব?'

'যাচ্ছি এক জায়গায় তুই চল না, সবাই যাচ্ছি আমরা'।

'সবাই কে কে?'

'আমি, সোনালী, মালা, কণা, বিমল, তুষার সবাই।'

'দীপা?'

'হ্যাঁ দীপা তো যাচ্ছেই।'

'কিন্তু কোথায় বলবি তো?'

'দীপাদের বাড়িতেই যাচ্ছি।'

'হঠাৎ দীপাদের বাড়ি?'

'বলছি যেতে চল্ না।'

'আমায় বলেছে কোথায়?'

তাই তো আমায় বলে দিল, তুই গিয়ে বল প্রদীপকে, এর পরেও আর বাড়ি না হয়ে পারলুম না। দীপা বলেছে আমার কথা? তখনও দীপার সঙ্গে আলাপই হয়েছে মাত্র। তার বেশী কিছু না।

দলে ভারী হয়ে দীপাদের বাড়ি রওনা হলুম আমি। কিন্তু বেরুনোর মুখে দীপা, সুমিতা, কণা ওরা হাসাহাসি শুরু করে দিল নিজেদের মধ্যে। আর ইঙ্গিতে আমাকে বোঝাতে চাইল 'হ্যাঁ হ্যাঁ তোকে দেখেই হাসছি।' কিন্তু কেন? আমার অসম্ভব অপমান লাগল। মেয়েরা আমায় নিয়ে ওভাবে হাসবে, অথচ হাসির কারণ বলবে না, এর চাইতে আর অপমান কিছু আছে? খানিক দেখে 'দোর আমি যাব না' বলে গোঁ ধরে ভেতরে চলে গেছি। আর যাওয়া হয়নি দীপাদের বাড়ি। ভেবেছি, সত্যিই তো নিজে মুখে যখন বলেনি, তখন না গেলেও খুব একটা খারাপ দেখায় না। তার ওপর ওভাবে দন্তবিকশিত বেঢপ হাসবে, আমি কি ফালতু পার্টি নাকি?

তুষার, বিমল ওরাও বলতে পারেনি। ওদের হাসির কারণটা কি ছিল? পরে আমি জেনেছি সুমিতা বলেছে, ওদের হাসির কারণ, আমার চাচাছোলা গোঁফ। সেদিন গোঁফটা পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়েছিলুম। আর সেদিনই মনে মনে ঠিক করে ফেলেছি তোমরাও হাসো, আমিও আর গোঁফটা রাখছিনে। কিন্তু একই জিনিস নিয়ে মানুষ কদিনই বা হাসে। আর হাসেনি পরে।

সুমিতা বলছিল 'তুই সেদিন গেলি না। দীপাও খুব খারাপ লেগেছে।' ও দুঃখ করছিল তোর জন্যে।'

'কি কথক, না ভরত নাট্যম?'

'মানে?'

'মানে কোনটা নাচব? তোদের দীপা দুঃখ পেয়েছে বললি না?'

'ভাবছিস ইয়ার্কী?'

'না ইয়ার্কী কোথায়? তোমাদের দীপাকে বলোগে আমার চাঁচা গোঁফ নিয়ে হাসতে। আর ওর হাসির তালে তালে আমি কথক নাচবখন' বলেই ভেবেছি এসব বলা ঠিক হল না। খুব রেগে গেলে আমি যে, কি বলি না বলি। মাথার ঠিক থাকে না। আসলে সেদিন ভীষণ অপমান লেগেছে আমার। পরে

দীপার সঙ্গে যখন ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে, তখন একদিন বলেছে 'যদ্দুর দেখি রাত্রিদিন না কেন্দরে? কেমন বোকা বোকা লাগে?'

সেই দীপার কথায়ই আবার দোষ দেখেছি। দোষটাও একটু মেকআপ দিয়ে এলে হত। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা একবারও মনে আসেনি সকাল থেকে।

দীপার আসার সময় হয়ে গেছে। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি তখনও। রোদটা এক-আধবেই চোখে লাগছে। তবু সানগ্লাসটা চোখে ঢোকাইনি। ওতে অস্বস্তি বাড়ছিল আরো বেশী। খালি চোখেই দীপাকে দূর থেকে লক্ষ্য করতে সুবিধে হবে। বাইরে দর্শকের ভীড় যতটা ছিল এখন কমে গেছে অনেক।

শো আরম্ভ হয়ে যাবার পরও ঘন্টা দেড়েক মেটেরর সারা চত্বর ঘুরে ঘুরে খুঁজে দেখেছি। আর পরের পর সিগারেট খেয়েছি। দীপা আসেনি।

চোখের শিরা বুক থেকে রক্ত টেনে ছেঁকে করছিল। একটুতেই ঘরে পড়বে বুঝতে পেরে, পরের পর সন্তর্পণে ঢোক গিলে বুকের রক্ত বুকে ফেরাতে চেয়েছি।

দীপা এল না কেন? কি এমন ঘটতে পারে, যার জন্যে এল না? সিনেমা দেখার কথা তো দীপাই বলেছে! আমি তো বলতে যাইনি। খোশামোদ করতে যাইনি। 'তোকে যেতেই হবে' বলে মাথার দিব্যি দিয়ে তো জারী করাইনি।

মাঝি বই হারিয়ে ফেলার মতো পড়ে, আজকে একটা নিরেট গবেট ভেবে পুরোটাই কৌতুক করে মজা পেতে চাইল। দীপার শরীরে কি মহম্মদ বিন তুঘলকের রক্ত আছে? এসব, সবই আমার বই হারিয়ে ফেলার দুর্বলতার মনে আসছে। খানিকটা ছাড়া তার চাইতেও দীপার প্রতি চরম অভিমানে। যাকে ভালবাসা যায় তাকে অনাবশ্যক রূঢ় কথা বলা, ও মাঝে-মধ্যে তাকেই চরম নরম প্রতিপন্ন করার পেছনে একটা সূক্ষ্ম তৃপ্তি আছে। আর কারুর না থাক, আমার আছে। মুহূর্তে এসব মনে এসেছিল এই যা। আসলে দীপাকে আমি খুব ভাল চিনি। এত নীচু মন ওর না, ওর ওপর প্রবল আত্ম-বিশ্বাস নিয়ে আমি একথা বোকার মত বলেও দিতে পারি। পারতপক্ষে আসার চেষ্টা করেছে নির্ঘাত। দীপা আবার ভুলে যায়নি তো?

ভুলতো মানুষেরই হয়। সেইটেই স্বাভাবিক। দীপারও ভুল হতে পারে। হয়েছেও এর আগে নিশ্চয়ই। কোনদিন ভুল হয়নি, আর হবেও না কোনদিন, কেউ জোর দিয়ে একথা বলতে পারে? কেউ কেউ বললেও আমার কাছে সেইটে নিতান্তই হাস্যাস্পদ ছাড়া আর কিই বা বলব?

ভুল সবার হয়েছে একবার না একবার জীবনে। হয়েও কম-বেশী প্রত্যেকেরই। অনেক জরুরী কাজেও ভুল হয়ে যায়। পরে মনে হয়, 'ইস্ ভুল হয়ে গেছে বড়।'

তখন আমি কলেজে। কলেজে সেসময় ছিল সেদিন। আর্টিস্ট কলকাতার দর্শকদের আনা-নেয়া পৌঁছে দেয়ার সব ভার আমারই ছিল। করেছিও তাই। সকাল থেকে সে নিয়েই ছুটোছুটি, এখানে ওখানে যাওয়া। হৈ-হুল্লোড়ে কাটিয়েছি।

বিকেল থেকেই মেঘ মেঘ করছিল আকাশটা। সন্ধ্যে সন্ধ্যে গাড়ি নিয়ে কলকাতায় গিয়েছি শিল্পীদের নিয়ে আসতে। গিয়ে বৃষ্টির কবলে পড়ে গেছি। বিকেলের আগে থেকেই ওখানে কম-বেশী বৃষ্টি, তখনও বেশ জোরে হচ্ছিল দেখে এসেছি। খালি গাড়ি নিয়ে ফিরতে হল অগত্যা। শিল্পীরা কেউই আসতে রাজী না। সোস্যাল পন্ড হয়ে গেছে। আটটা রাতেই তাই মন খারাপ নিয়ে বাড়ি বসেছিলাম। এখানেও তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে সন্ধ্যের পর থেকেই।

কলকাতায় যখন অত বৃষ্টি দেখে এসেছি, তখন বুবুনদির কাক-ভেজা ভিজে ফেরাটাই খুব স্বাভাবিক। ফিরেছেও তাই। শুধু তাই না, কলকাতা থেকে সোজা আমাদের বাড়ি এসে উঠেছে। অসময়ে বৃষ্টি-মাথায় কবে আচমকা আমাদের বাড়ি এসে ওঠাটা সবার কাছে খুবই অবাক লাগলেও আমার লাগেনি।

একটা চরম আপসোস আর বুবুনদির জন্যে যথেষ্ট কষ্ট নিয়ে কেবলই আমি চেয়েছি লোডশেডিং হয়ে যাক। আলোতে বুবুনদির সঙ্গে আমি কোন কথা বলতে পারব না। কোন উত্তর তো না-ই। বুবুনদির চোখেই তাকাতে পারব না। আমার ইচ্ছেমত লোডশেডিং হয়নি। আলোতেই বুবুনদির মুখোমুখি হতে হয়েছে। বেশীক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজেছে বুবুনদি, বোঝা গেছে। খুব ফরসা মুখ-চোখ তাই বিবর্ণ ফ্যাকাশে, রক্তশূন্য মনে হয়েছে। একটা বিশ্রী রাগ আর বিষণ্ণতার ছাপও ছিল বুবুনদির মুখে। বুবুনদিকে দেখে প্রথমেই আমার মনে হয়েছে 'ইস্ ভুল হয়ে গেছে বড়।' শীলুকে দিয়ে ডাকিয়ে কাল যাতে চিঠিটা দিয়ে বুবুনদি বলেছিল 'খুব জরুরী। কাল সকালে, তোর বিলুদাকে অবশ্যই দিয়ে আসবি। আর বলবি আমি ওর অপেক্ষায় থাকব, ও-যেন যায় অবশ্য করে।' সেই চিঠি সকাল থেকে কলেজ সোসাল নিয়ে ভুলেই গেছি দিতে।

'কিরে দিয়েছিলি চিঠিটা?' নিতান্ত নির্বোধ আর নির্লজ্জের মত আমি বলেছি 'একদম ভুলে গেছি, মানে...' বুবুনদি কথা শেষ করতে দেয়নি। চলে গেছে। পরে চিঠিটা আমি পড়ে জরুরী দরকারটা জেনেছি।

জরুরী কাজের কথা বুবুনদি আমায় বলেছে, আমি ভুলে গেছি। আমি বললে নিশ্চয়ই আমি ভুলে যেতুম না। যদিও কেউ কেউ নিজে কি বলেছে, নিজেই ভুলে যায়, তবে সেটা নেহাতই কথার কথা বা খেয়ালে বলা কথা।

সিনেমার কথা দীপা যখন খেয়ালে বা কথার কথায় বলেনি, তখন ভুলে যায় কি করে? বড় কথা, নিজে থেকে ওভাবে কথাটা বলে কেউ ভুলে যেতে পারে? আমার ধারণার বাইরে। সদ্য সদ্য কালকের বলা কথা আমার ভুলে যাবার মত ভুলোমন দীপার না। আমি জানি। তবু নিশ্চয়ই তেমন কোন কারণে দীপা আসতে পারেনি নইলে ও আসতই, এ ভেবেও সান্ত্বনা পেতে ইচ্ছে করল না। কেবলই দীপার ওপর তীব্র রাগ ফুঁসলে উঠছিল, ভেতরে ভেতরে।

কাল ইউনিভার্সিটিতে দীপা নিশ্চয়ই এমন একটা মোক্ষম কারণ দেখাবে যে, আমার আর কিছুই বলার থাকবে না। 'মেয়েদের কত অসুবিধে, কত রকম ট্যাবলু ফেস্ করতে হয় তুই তার কি বুঝবি?' হেন তেন অনেক কথাই বলবে, বোঝাতে চাইবে। যত যাই বলুক আর বোঝাতে চাক আমি কোন কিছুই বিশ্বেস করিনে মুখের ওপর বলে দেব।

নিজেই সিনেমা দেখার কথা বলে, আমাকে উস্কে দিয়ে না আসার জন্যে, দরকার হলে দীপার মুখের ওপর আরও রূঢ় কথা অনায়াসে বলে দিতে আমার বাধবে না একটুও। আমি তোকে চিনিনে, কোনদিন তোর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি। যার কথার দাম নেই তার সব কিছুই মূল্যহীন। আমি কি তোকে বলতে গিয়েছিলুম? তুইতো নিজেই গদ গদ হয়ে বললি। তবে এলি না কেন? একবারও ভেবেছিস, যে একটা ছেলে তোর জন্যে অতদূরে থেকে তাড়াহুড়ো করে এসে টিকিট কেটে দাঁড়িয়ে থাকবে? নাকি ভুলেই মেরেছিস? যাঃ বেশ অন্যের শিক্ষে দিলি ভাই ইত্যাদি আর যা মুখে আসবে তাই বলে দেব। অত ছাড়াছাড়ি নেই। অবশ্য দীপা এ-নিয়ে কিছু বলতে এলে তবেই। নিজে থেকে ঘটা করে এসব বলতে যাবার কোন ঠেকা নেই আমার।

আর চেয়ে, দীপা আসেনি, তার জন্যে আমার কষ্ট হয়েছে খুব, আমি ভীষণ রেগে গেছি, সাড়ম্বরে এসব জানান দেয়াটাই বেশী যোক্তিক হবে। বরং পারতপক্ষে ভাবসাব এমন দেখাব যে, তাই আসিসনি আয়ে তাতে কি হয়েছে? আমি একজন ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ান সুন্দরীকে নিয়ে দিব্যি দেখেছি। সবই এই হাতের মুঠোয় আমার।

দীপার সঙ্গে চোখাচোখি হলে প্রথমদিকে এমন ভাব দেখাতে হবে যেন এই প্রথম দেখছি আগে তো দেখিনি কোনদিন? তারপর ও তেমন উৎসাহ দেখালে, দেখবে নিশ্চয়ই, তখনই সেই ভাব আনতে হবে, আরে এতো আমাদের বাংলারই সেই মেয়েটা। ব্যাস্ তার বেশী কিছু না। ভেতরে ভেতরে এমনই একটা সতর্কীকরণ নিয়ে পরদিন ইউনিভার্সিটিতে ঢুকলুম।

আমি জানতুম দেখা হলে দীপা প্রথমেই বলবে 'এই এই কারণে কাল সিনেমায় যেতে পারিনি রে। তুই নিশ্চয়ই এসেছিস্? শুধু শুধু তোকে কষ্ট দিলাম।' আমিও সেয়ানা ঘুঘুর মত চরম নির্লিপ্ততায় ভ্রূ-কুঁচ্ছি নিগোস করব কি ব্যাপার বলত? কিসে কষ্ট! দীপা তখন নিশ্চয়ই বলবে 'ওই কাল সিনেমা দেখার কথা আমি বলেছি নিজে অথচ যেতে পারলুম না।' 'আরে হ্যাঁ সত্যি তো তুই তো বলেছিলি। কি কাণ্ড আমি তো ভুলেই গেছিলাম। ভাগ্যিস তুই যাসনি। গেলে কি বেলেল্লাপনা হত বলত? মুহূর্তে ভাবলুম বন্ধু এইটেই বলে দেব॥

কি ব্যাপার দীপ্সা কি আসেনি নাকি? তাকে যে দেখছিনে? তবে কি দীপা বুঝতে পেরেছে কালকের জন্যে আমি রেগে আছি? আর সে জন্যেই কি ও এলো না? ইউনিভার্সিটিতে এসে পর্যন্ত পর পর তিনটে ক্লাসেই ওকে দেখলুম না.

একবার ভাবলুম জিগ্যেস করি সুমিতাকে। কিন্তু সঙ্গে মালা কণা ওরাও আছে। এমনি দীপাকে নিয়ে সুমিতা আমার তেমন কোন টিপ্পনি কাটেনি তবু দলে পড়ে কাটতেও কতক্ষণ? মালা, কণাও তো টুক করে সুযোগ বুঝে কোন টোনা দেয়া কথা বলে দিতে পারে।

তুষার, বিমল ওদের সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারিনে আজকাল: দীপার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার পর থেকে কেমনই একটা ছাড়ছাড়া ভাবসাব। নিতান্ত ডেকে কিছু না বললে, পারতপক্ষে কথা না বলে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। দীপার সঙ্গে থেকে দেখেছি, ওদের আলোচনায় তার ফাঁকে ফাঁকে আমাদের দিকে চাউনি, ভাবসাবে একটা আলগা শত্রুতার ধরণ আছে। কেনরে বাবা? আমি কি এমন তোদের পাকা ধানে মই দিলুম? তোদেরও তো কম দেখিনে। আর হ্যাঁ তুষার, তুই কোন মুখে বলিস? তোর নিজের গন্ধটা কম পেলি কোথায়? কণাকে নিয়ে তোর বেলেল্লাপনারও তো শেষ নেই রে। আমার কি অত চোখে পড়ে না? কানে আসে না কিছু? চোখ কান আমার খোলাই থাকেরে। নিজের গন্ধটা একটু শুঁকে দেখিস, কতটা মন্দা। নাড়িভুঁড়ি একেবারে উগলে বেরিয়ে আসবে। শালা লোম ওঠা কুত্তা কোথাকার। কেনরে মনে নেই? সানফ্রান্সিস্কোর দেখতে গিয়ে সারা ছবি জুড়ে কণাকে কম চষেছিস? আমি ছিলুম না তাদের সঙ্গে? কিছু বুঝিনি বলতে চাস? আর কণাটাও জুটেছে ভালোই। শালার যেমনি বলি তার তেমনি খাঁড়া। খালি সতীপনা দেখবে। আর আছে বিমলটা খালি একান ওকান করে বেড়াবে। কিছু আছে না পুরুষালী মেয়ে আর কিছু মেয়েলি পুরুষ? বিমলটা তাদের দলে। শালাকে দেখলে আমার পিত্তি পর্যন্ত জ্বলে যায়। সত্যিই তো বিমল তুইও কম যাস কিসে? নেহাত পাত্তা পাস না, নইলে সোনালীর পেছনে তোকে তো আকছারই ঘুরঘুর করতে দেখি।

এসব ভাবিই শুধু বলতে পারিনে ওদের। আমার জন্যে ভাবিনে। দীপার জন্যেই। আমার সঙ্গেই দীপার মেলামেশার কথা অন্যভাবে চারদিক ছড়াবে ভাবা যায়?

সুমিতাকে আলাদা ডেকে দীপার কথা জিজ্ঞেস করা যায় না? কিছু জানে নাকি ও। অ্যাঁ হয় না। সুমিতা ভাববে 'তা একথা আলাদা ডেকে বলার কি আছে?' আবার ফিরে গেলে মালা, কণা ওরাও কি বললো রে?' জিজ্ঞেস করবেই। আমিতো আর সুমিতাকে বলতে পারিনে যে, কাউকে বলিস না এমনি জিজ্ঞেস করলুম।' ওরা তো পাশে মুখ ফিরে চলে যাবে। আমার পরাণ [illegible]

অথচ সবার অগোচরে যে স্বাভাবিক কথার কথায় জিজ্ঞেস করব 'দীপার খবর কিরে আসেনি আজ?' তারও উপায় নেই। একেই তো এক পায়ে খাড়া। তার ওপর সাড়ম্বরে সুযোগ করে দেয়া।

দীপার সঙ্গে মেলামেশা করি বলে বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে থেকেও সবার অলক্ষ্যে কখন একা হয়ে গেছি, আজ খুব সত্যির মত বুঝতে পারলুম। আরও চরমভাবে বুঝে গেলুম এই ইউনিভার্সিটির জগতে সবার চাইতে দীপার চোখে আমি সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু কাল সিনেমায় না হয় না এল আজ ইউনিভার্সিটিতে কেন এল না? সেটা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিনে। কেবলই মনে হচ্ছে দীপা আসেনি, আজ ছুটির দিন, তবু আমরা না জেনে সবাই এসে পড়েছি।

নিজেকে আমার প্রচণ্ডরকম একা আর নিঃসঙ্গ অসহায় মনে হচ্ছে। দীপা আমার এক কপর্দকও ধরে ফেলেছে। 'আমি তোর কাছে ধরা পড়ে গেছিরে দীপা, সে-কথা নতুন করে আর আমায় বুঝতে হবে না কোনদিন, তুই এসে দেখে যা।'

সিনেমায় না আসার জন্যে, দীপার ওপর আমার সমস্ত ক্ষোভ, অনুযোগ আর অভিমান গলে জল হয়ে, কঠিন কষ্ট হয়ে বুকের বক্তে মিশে গেছে। কাল ইউনিভার্সিটিতে এসে দীপাকে না দেখা পর্যন্ত আমি একটাও স্বাভাবিক নিঃশ্বাস নিতে পারব কিনা সে-নিয়ে ভয়তো ছিলই, আবার সম্ভবপর আতংকে আঁতকেও উঠেছি, কালও যদি দীপা না আসে?

আজ সাতদিন হয়ে গেল দীপা আসেনি আজও। দীপা আসছে না সাতদিন। সাতদিন দেখি না ওকে। মনে হচ্ছে কত যুগ! দীপার মুখটা অচেনা হয়ে যাবে না তো? পেছন থেকে ইতিহাসের সেই মেয়েটাকে দেখে 'দীপা না?' চমকে উঠেছি। মুহূর্তে মনে হয়েছিল, সবাই কি আর দীপা হয়? না সব দীপার জন্যে আমি সাতদিন শুধু একই অস্থিরতায় কষ্ট পাচ্ছি? ট্রামে, বাসে, ট্রেনে, রাস্তা-ঘাটে বিপুল জনস্রোতে তো কত হাজার হাজার দীপাই নিত্য হারিয়ে যাচ্ছে প্রতিক্ষণে। সেই দীপাদের দলে ইউনিভার্সিটির বাংলার দীপা নেই। আমি সতর্ক চোখ রেখেছি ওদের দলে। খুঁজে পাইনি।

সত্যিকারের দীপার সঙ্গে এই সাতদিনের একদিন অন্ততঃ অল্প সময়ের জন্যও তো দেখা হতে পারত। দীপাও তো রাস্তায় বেরোয়। ইউনিভার্সিটি ছাড়াও এদিক ওদিক দরকারে ওতো যায় আসে। ওষুধের দোকানে, নয় স্টেশনারী দোকানে, নয় নিদেন পক্ষে একটা শাড়ি কিনব বলেও তো বেরুতে পারত। আর রাস্তার মধ্যে পেছন থেকে আচমকা 'প্রদীপা' বলে ডেকে, তাড়া-হুড়ো করে কাছে এসে প্রচণ্ড ব্যস্ততায়ও তো বলতে পারত 'এই অসুবিধের জন্যে ক্লাসে যাচ্ছি না। তুই খুব একা হয়ে গেছিস নারে।' একা রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কেবলই আঁতকে পেছন ফিরে তাকিয়েছি 'দীপা ডাকল না?' দীপা ডাকে না। আজ সাতদিন দীপার ডাক শুনিনি।

অনেক রাত পর্যন্ত শুয়ে শুয়ে দীপকেই ভেবেছি শুধু। 'দীপাকে যেন ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখি ভগবান।' রোজ রোজ ভেবেছি 'দীপাকে স্বপ্নে দেখব।'

।। শুধু চোখে দেখা নয়—
হৃদয় দিয়ে অনুভব করা ।।

অমরনাথ

তীর্থপথের মানুষ

রুচিরা মুখোপাধ্যায়
পূর্বপল্লী / শান্তিনিকেতন
ভ্রমণসাহিত্যে অনবদ্য সংযোজন
প্রকাশনা : আনন্দভবন, কলি-৫৬
পরিবেশনা—
বোলপুর পুস্তকালয়

বি।৭৮৭১

পূজায়

বঙ্গশ্রী
হাওড়া
৪১/১, জি, টি, রোড, হাওড়া

• বেনারসী
• জর্জেট • সিল্ক
• তাঁত • মিল
• প্রোমাক
• সাটিং • সুটিং
• এছাড়া কাপড়

দীপাকে স্বপ্নে দেখিনি। একদিন একটা কালো মেঘ স্বপ্নে দেখেছি শুধু।

ঘোর নিশুতি রাতে ঘুম ভাঙতেই যেন শুনতে পেলাম দীপা ডাকছে। জ্ঞান-হীনের মত বাইরে বেরিয়ে এসেছি। ভূপেন নারোগা নেশা করে বাড়ি ফিরছে হেঁটে। আর চেঁচিয়ে বলছে 'দরজা খোলো।' পরে আমার নিজেরই মনে হয়েছে এত রাতে দীপা আসবে কোত্থেকে?

দীপা আসার সময় চলে গেছে জেনেও ইউনিভার্সিটিতে দীপাকে না দেখে দীপার বাস-স্টপে দাঁড়িয়ে থেকেছি। ফেরার পথেও দীপার বাস-স্টপে এসে দাঁড়িয়েছি বোজ। দীপার বাস এলেই উঠে পড়েছি। গিয়ে নেমেছি সুখীয়া স্ট্রীটে। সুখীয়া স্ট্রীটে দীপাদের বাড়ি শুনেছি। বাড়ির নম্বর জানিনে। তাই সাহসে ভর করে সোজা বাড়ি চলে যেতে পারিনি। শুধু সারা সুখীয়া স্ট্রীট চতুর অহেতুক ঘুরেছি। বাড়ির জানালা দিয়ে অথবা ঝুলে বারান্দা থেকেও তো দীপা আমাকে দেখে ফেলতে পারে। প্রদীপ বলে ডাক দিয়েও তো বলতে পারে কিরে তুই এখানে? এইটে আমাদের বাড়ি, নিচে ডানদিকের দরজার পর সিঁড়ি আছে। আয় ওপরে উঠে আয়।'

কখন খাওয়া হয়ে গেছে, তবু আনমনা আঙুল দিয়ে ভাতের থালায় লিখে যাচ্ছি, দীপা দীপা দীপা.. পরে খেয়াল হতেই গ্লাসের জল ঢেলে দিয়েছি হাতবাস।

ইউনিভার্সিটি ঢুকছি। ফুচকাওয়ালাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লুম। দীপা একদিন ফুচকা খেতে চেয়েছিল। দীপার প্রিয় যা কিছু, আমার কাছে প্রিয়। ক্লাসে থেকে থেকেই মনে হয়েছে, এইতো আমি বসে আছি, এই বুঝি পেছন থেকে নিঃশব্দে দীপা এসে আচমকা পিঠে হাত রাখল। এই বুঝি এসে মায়াবী চোখ পাকিয়ে বলল, 'এখনও রাগ পড়েনি? একি! তুই কাঁদছিস?'

ক্লাসের ভেতর সুমিতা, মালা কণা, সোনালী, তুষার, বিমল সবার সঙ্গে আমিও ঝুঁকেছিলুম। সুমিতা গাইছিল, তুষার বেঞ্চ ঠুকে তাল রাখছিল। আমি আস্তে উঠে বাইরে বেরিয়ে এলুম। তারপর নেহাতই পায়চারির ঢঙে অন্য একটা ফাঁকা ক্লাসে ঢুকে পড়লুম। বুক কাঁপতে লাগল অনর্থক ভয়ে। কেউ লক্ষ্য করছে না তো? এদিক ওদিক তটস্থ চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে ব্ল্যাক বোর্ডের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। তারপর পকেট থেকে একটা চক বার করলুম। হাত কাঁপছিল তবু লিখলুম 'দীপা তুই আসছিস না কেন রে?' লিখেই মুছে ফেললুম। ক্লাস থেকে বেরিয়ে এসে মুখের, গলার অহেতুক ঘামও মুছে ফেললুম।

অস্বাভাবিক মাথার, কপালের শিরায় যন্ত্রণা টিপ টিপ করতে লাগল। চোখে জ্বালা জ্বালা ভাব। কান্না ছাড়াও এক ধরনের জল বেরিয়ে আসছিল চোখ থেকে। কাউকে কিছু না বলে রাস্তায় নেমে এলুম। দীপার বাস-স্টপ হয়ে আর সুখীয়া স্ট্রীটে যাবার সাহস হল না। আচ্ছন্নের মত এক অন্য মাদকতায় বেধড়ক মাতালের মত সোজা বাড়ি চলে এলুম।

সকালের দিকে অরুণ ডাক্তার এসে দেখে প্রেসক্রিপশন করে গেছে। চিনদা গাদা খানেক ট্যাবলেট, ক্যাপসোল নিয়ে এসেছে। ডান হাতের ফাঁড়া সকালেই আজকের মত কেটে গেছে। বিকেলে টান্নদা এসে বাঁহাতে ইনজেকশন করে যাবে। আসতে তের দিনেও দাঁড়াতে পারিনে সোজা। পা কাঁপে। বুক কাঁপে। বাইরে গেছি যখনই চিনদা নয়ত মা ধরে নিয়ে গেছে। জানালা দিয়ে যখন দু-একসময় বাইরেটা দেখি মনে হয় হাঃ পাল্টে গেছে সব কিছু। বাইরের জল, হাওয়া আলো সব পাল্টে গেছে। অনেক দেখা পুরোনো জিনিসও নতুন আঃ কি সুন্দর!

দীপাকে নতুন মনে হবে দেখলে 'দীপা তোকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করে। তোকে কতদিন দেখিনিরে! তুই সাতদিন এলি না কেন? তোকে অনেক খুঁজেছি। এখন আমার অসুখ।'

সেদিন দুপুরের পরে দীপাকে স্বপ্ন দেখলাম। ভুরুকে ঘোরে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। দেখলাম দীপার সারা শরীর সজল। সারা গায়ে নক্ষত্র ফুটে আছে। সবুজে নক্ষত্র। আকাশ থেকে মেঘ সরিয়ে দীপা নেমে আসছে। বৃষ্টিতে ভিজলে যেমন শরীর থেকে টপ টপ করে বৃষ্টির ফোঁটা ঝরে পড়ে, তেমনই দীপার সবুজ শরীর থেকে টপ টপ করে নক্ষত্র ঝরে পড়ছে। আমি চেঁচিয়ে বললাম 'দীপা আমি এখানে, এই এখানে আমাকে দেখতে পাচ্ছিস?' দীপা নেমে এসে আমার কপালে, গলার কাছে হাত রাখল। বলল, 'তোকেই তো দেখতে এলাম। কেমন আছিস?' 'ভাল, এখন ভাল আছি। তুই এতদিন কোথায় ছিলি? বোজ আসবি তো?' 'আসব রোজ আসব।'

ঘুম ভেঙে যেতে দেখি সত্যিই দীপা এসেছে। তবে ওর শরীর সবুজ না। যেমন ছিল তেমনই। সঙ্গে সুমিতাও এসেছে। আমার বিছানার কাছে ওরা বসে আছে। আমি চোখ খুলতেই দীপা বলল, কেমন সারপ্রাইজ দিলাম? দেখলি তো চলে এলাম সোজা। স্টেশনে নেমে জিজ্ঞেস করতে করতেই বাড়ি পেয়ে গেলাম। কলেজের পাশে তাতো জানতামই। সুমিতা বলল, 'আমরা তো অবাক এতদিন তোর কোন পাত্তাই নেই। তাই আসব আসব করে চলেই এলাম।' দীপা সোজা আমার বাড়ি চলে আসতে পারে? বিস্ময়ে মুখ ফুটল না সহসা আমার। দীপা কাছে এসে আমার রোগা বুকে হাত রাখল। তারপর কপালে। এত ঘাম হচ্ছিল তখন। দীপা বলল, 'এই তো ঘাম দিয়েছে জ্বর নেই আর।' আমি অসহায় হাসলাম শুধু। মা এঘরে ওদের জন্যে চা জলখাবার এনে দিল। চা খেতে খেতে দীপা বলল, 'আমরা আসছে সপ্তাহে বাংলার দশজন শান্তিনিকেতন যাচ্ছি তোর নামও দিয়ে দিয়েছি।' আসছে সপ্তাহ আগেই আমি ভাল মতো সেরে উঠলুম।

(৩)

বিকেল বিকেল পৌঁছুলাম শান্তি-নিকেতনে। স্টেশনে নেমে রিকশো নিলুম। বেশ শীত পড়ে গেছে। সোয়েটারটা তখনও গায়ে চাপাইনি। আমি আর বিমল উঠলুম এক রিকশোয়। তুষারটা ঠিক ঝোপঝাড়ে ঘেরা পাশে বসেছে গিয়ে। প্রোফেসর দুজন একটায়। সোনালী, মালা, মিত্রা, অসীম, চঞ্চল ওরাও সুবিধে মত ভাগাভাগি রিকশো চেপেছে। দীপা, সুমিতার একটা রিকশো।

মিনিট দশ বারোর পথ স্টেশন থেকে ট্যুরিস্ট লজ। এটুকু পথেই রিকশাওয়ালারা নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করে দিল। দীপার রিকশো আমাদের আগে যাচ্ছিল। আমি দু-চার হিচকি দিতেই সব রসেসী আমাদের রিকশো দীপাদের ছাড়িয়ে সবার আগে আগে যাচ্ছিল। ঢালাও পিচের রাস্তা মোড় নিল। ট্যুরিস্ট লজে গিয়ে উঠলুম সবাই।

জানালা খুললেই দূরে পর্যন্ত বিস্তৃত মাঠ চোখে পড়ে। ধান কাটা হয়ে গেছে। পাকা ধান গাছের গোড়াগুলো শুধু রয়ে গেছে। নানান গাছ-গাছালি খেজুর গাছের মাথায় সন্ধ্যের অন্ধকার লটকে রাখছে। শীতের ফিনফিনে হাওয়া আসছিল তাই জানালার পর্দা টেনে দিলুম।

হাত মুখ ধুয়ে ঘরে এসে চা নিয়ে বিছানায় গা ছেড়ে আধশোয়া বসলুম। এঘরে আমার তুষার বিমলের বিছানা। দীপা, সুমিতা ওদের জন্য আমাদের পাশের ঘরটা। মেয়েরা সবাই ওই এক ঘরে। অসীম চঞ্চল ওদের অন্য ঘর। প্রোফেসর দুজন অন্য ঘরে।

মেয়েরা এসে প্রথম তাড়া লাগাল বেড়াতে বেরুনোর জন্যে। ওরা এর মধ্যে সেক্লেগুজে তৈরি হয়ে নিয়েছে। দীপা এসে বলল, কিরে তুই বেরুবি না? চ সবাই মিলে একটু বেড়িয়ে আসি।' একটা সবুজে অদ্ভুত সুন্দর ছাপা শাড়ি পড়েছে দীপা। তুষার, বিমল ওরাও ঝটপট তৈরি হবেই বলল, 'নে নে ওঠ তো রাত হয়ে যাবে।' টেন জার্নি গেছে, তার জন্যে আলিস্যি লাগছিল। শুধুই শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছিল। তবু আজ বেরুতেই হল। প্রফেসর দুজন ওদের ঘরে বসে কি কথা নিয়ে হাসছে। আমরা বললুম 'আমরা সাব একটু ঘুরে আসছি।' বলেই বেরিয়ে পড়লুম।

পিচঢালা রাস্তা ছেড়ে আমরা উঠলুম লাল কাঁকুরে মাটির পথে। দু পাশে বিস্তৃত মাঠ। রাস্তার পাশে প্রায়ই উঁচু ঢিবিগুলির মতন। বাড়িঘরগুলো অন্যরকম সাজানো নানান ফুলগাছ আছে প্রায় বাড়িতেই। আলাদা রুচির ছাপ।

আমরা সবাই হাত ধরাধরি করে, লাইন বেঁধে হাঁটতে লাগলুম। দীপার এক হাত সুমিতার ডান হাতে। দীপা ডান হাত আমার দিকে বাড়িয়ে বলল 'প্রদীপ ধরবি তো ধর নয়ত কাউকেই দেব না ধরতে।' মুহূর্তে এত শীঘ্র ওর হাতটা ধরে ফেললুম যেন তৈরি ছিলুম। নরম মাংসের পেলব সঠাম হাতটা দীপার ধরতেই মনে হল, দীপা আমায় বোন কষ্টই দেয় নি। যেটুকু কষ্ট মনে হয়েছে, সেটুকু এই সুখ, আনন্দের অংকুর ছিল। আমি তখনও জানতুম না, দীপার প্রেমিক আছে।

জানলুম তখন, যখন তুষার পাশ থেকে টিপ্পনি কাটল, 'একেবারে হাত ধরে গদগদ, আর কত ঝোলাবি ব্যাটাকে?' দীপা রেগে গেল। বলল 'আর যাই বল, প্রদীপকে নিয়ে এসব আমি সহ্য করব না। সে রকম মন নিয়ে ওর সঙ্গে আমি মিশি না। ও শুধুই আমার বন্ধু। তার চেয়ে বড় কথা অনেক আগে থেকেই আমি প্রেম করি। আমার প্রেমিক আছে।' কথাটা শোনামাত্র আমার বুকের রক্ত ছলাৎ করে পিছলে গেল বীভৎস যন্ত্রণায়। কাউকে বুঝতে দিলুম না। দীপার হাত থেকে আমার হাত কখনই আলগা ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। বুক হাত চাপা দিলুম। ভেতরটা অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। কাকে পীঠে বুবুনদি নেই। বুবুনদি এখান থেকে বহু দূরে আছে এখন। তবু চিৎকার দিয়ে বুবুনদিকে বলতে ইচ্ছে করল 'বুবুনদি তোমায় এখন একটা সারপ্রাইজ দিতে পারি। আমি যে মেয়েটাকে ভালবেসেছি, তার অন্য একজন প্রেমিক আছে।'

মন্টা হিসেবে নৌকো চক্কর দিল দুবার। বেলা পড়ে এসেছে। নিরুত্তাপ রোদের জন্যে ভাল লাগছিল। দূরে কোথাও নীলের গম্ভীরগম্ভীর 'ভোঁ' শব্দটা যেন জল সাঁতরে এদিকে ভেসে আসছিল। হাওয়া এসে জলের বুক ছুঁয়ে পাই পাই ঘুরপাক খাচ্ছে। নৌকো ছেড়ে যেতেই সিগারেট ধরালাম একটা। স্বপ্নের ঘোরের মত তারই দৃশ্যপট ছেয়ে থাকল চোখের সামনে আমার। তৃপ্তিদায়ক সিগারেটের ধোঁয়া মুখ ছাড়া হয়ে বাতাসে মিশেই যেন নাচের মুদ্রায় ঘুরে যাচ্ছিল।

কাল ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে দীপার সঙ্গে বাস-স্টপ অব্দি যেতে গিয়ে দীপা বলেছিল 'কাল একবার আসবি তুই?'

'কেন কাল কেন! কাল তো রোববার?'

'বলছি তো সে জন্যেই।'

'মানে?'

'মানে কাল প্রশান্ত আসবে'

'এ তোর ইয়ে তাতে আমি কেন?'

'তোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব, ভাল হবে।'

'আসছে কোথায়?'

'আউটরামে ডিনটের মধ্যে আসবে। তুই দু'টোর সময় কফি হাউসের সামনে থাকবি। আমি ওখানেই তোকে খুঁজব, তারপর যাবখন' তা তোর প্রশান্ত আসছে তাতে আমার কি? ওর সঙ্গে পরিচয় না হলেই বা আমার কি আসবে যাবে? এসব মনেই এসেছিল শুধু, ওর ওপর এখন অনীহা ভাব দেখালে ধরা পড়ে যাব আরও বেশী করে।

দীপা উঠে দাঁড়াতে গেলেই নৌকো এপাশ ওপাশ দুলে উঠল মোক্ষম। বেসামাল হচ্ছিল দীপা। এক পাশে কাত হতেই হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললুম ওকে। হাঃ দীপা এখন আমার বুকে পরম নির্ভরতায় মুখ রেখে, চোখ বুঁজে ভারী নিশ্বাস নিচ্ছে 'যদি পড়ে যেতাম জলে?' বাঃ রে আমি তো ছিলুমই, সাঁতারও আছে' এমনভাবে দীপাকে ব্যাপারটা বোঝাতে চাইলুম যেন তুই পড়ে গেলে জলের তলা থেকেও তোকে তুলে আনতে পারি। আসলে আমি সাঁতারই জানি নে, সেকথা দীপার সঙ্গে এমন একটা চরম মুহূর্তে মনে না আসাই ভাল।

সূর্যটা অস্ত যাবে এক্ষুণি। পশ্চিম আকাশটা যেন রক্ত রঙের আবির মেখে হাসছে। দীপার চোখ সেদিকে।

দীপা বলল, 'কি চার্মিং তাই না রে?' 'তোর চেয়ে আর বেশি কোথায়? এর বেশি বললে বাড়াবাড়ি হবে। দীপা বন্ধু ভাবে আমায়। সে জন্যেই প্রশান্তর সঙ্গে পরিচয় করাবে ভেবেছে। কিন্তু আশ্চর্য প্রশান্ত এল না! জানি তো এখন আর প্রশান্ত আসছেই না। নির্ভয়ে আরও একবার দীপাকে প্রশান্তর কথা জিজ্ঞেস করা যায়। মাঝে মধ্যে একটু আধটু আপসোস না দেখালে দীপা যদি নির্লজ্জ ভাবে? যদি ধরতে পারে আমার ভেতরটা?

কি রে তোর প্রশান্ত যে শেষ পর্যন্ত এলই না। ঠিকমত বলেছিলি তো দীপা?' সূর্যটা কখন চান্দিকে অন্ধকার নিঃশব্দে নেমে গেছে। জ্যোৎস্না তখনও পরিষ্কার হয় নি। দীপা আমার কানের কাছে মুখ একই রকমভাবে ঝুঁকে এল, তারপর মুখ একই রকমভাবে পরম গোপনীয়তার সতর্কতায় বলল 'তুই অতি বোকা যেন! আমার প্রশান্ত বলে কেউ নেই রে। আমি তো তোকেই.' সাঁই সাঁই সুখের বিদ্যুৎ খেলে গেল আমার মধ্যে। দীপা এবার স্বাভাবিক মুখোমুখি বলল 'তোকে একসপেরিমেন্ট করছিলাম। আসলে তুই যে আমাকে ভীষণ ভালবাসিস, আমি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছি। তাই দেখলাম, প্রশান্তর কথা বললেও তুই আসিস কিনা। আমি জানতামই যে তুই না করবি না।' তার মানে? দীপা আমার সবকিছু ধরে ফেলেছে? এত সহজেই আমার ভেতরটা ও খাঁচা করতে পেরেছে? আমার চালাকি সব ধরে ফেলেছে নাকি? নইলে আমার ওপর এমন অন্ধ ধারণা হয় কি করে? মুহূর্তে ভেবে ফেললুম, আমি তোর সব ধারণা পাল্টে দেব রে দীপা। আমি তোকে ভালবাসি। তোর জন্যে আমার কষ্ট হয়েছে, তবু সে সব এখন আমি উপেক্ষাও করতে পারি। বলি সহসা বলেই ফেললুম 'তোর ধারণাটা সম্পূর্ণই ভুল রে দীপা। তুই আমার শুধুই বন্ধু। আসলে আমার একজন প্রেমিকা আছে। তোকে বলি নি কোনদিন।...'

প্লাবন : ৭৮

অমর মিত্র

আকাশ ভেঙে পড়ছিলো। ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টিও সমানে। এটা ৩১ আগস্ট বৃহস্পতিবার দুপুরের কথা। শুক্রবার ১ সেপ্টেম্বর সারাদিন নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টিপাত, খবর পেলাম কাছের ছোট্ট নদীটা বাড়ছে। নদীর নাম ডলুং, সুবর্ণরেখায় মিলেছে মেদিনীপুর জেলার সাকরাইল থানার বোহিনী গ্রামের কাছে। এটা গোপীবল্লভপুর থানার ছোট্ট একটা গ্রাম, দুই নদীর বাঁকে পড়েছে। বেলিয়াবেড়া থেকে সুবর্ণরেখাও দূরে নয়, ডলুং তো শিয়রে। শুনলাম সুবর্ণরেখাও বাড়ছে। সেপ্টেম্বরের ২ তারিখে বিকেলেও ডলুং-এর জল বিপদ-সীমার নিচে। সেরাত ভয়ঙ্কর।

রাতে বৃষ্টি সমানে চলেছে। তবে এই বৃষ্টিতে ভয়ের কিছু নেই। সারা বছর তো নদীটা শীর্ণ দুর্বল হয়ে পড়ে থাকে। পরের দিন ভোরবেলা চিৎকার শুনলাম। সেপ্টেম্বরের দুই তারিখ শনিবার :

আমার আশ্রয় এই বেলিয়াবেড়ার সবচেয়ে উঁচু জায়গায়, আমার ভয় নেই। চিৎকার ক্রমশঃ বাড়ছে। দৌড়ে বাইরে চলে এলাম। কয়েক পা এগিয়েই চোখে ধোঁয়া লাগে। সব সাদা। শুধু জল আর জল। নদী আর নদীর তীরের মাঠ-ঘাট শস্যক্ষেত্র সব একাকার। কোন্‌টা নদী আর কোন্‌টাই বা জমি !! জল প্রবল গতিতে ফুলে ফুলে এগোচ্ছে। পাকিয়ে উঠছে আষাঢ় শ্রাবণের সাপের মত।

গত রাত ছিল কাল রাত্রি। বিস্তীর্ণ এলাকা ডুবে গেছে অন্ধকারে। বেলিয়াবেড়া থেকে সুবর্ণরেখার তীর কাঁঠিঘাট যাওয়ার পাকা সড়কে পৌঁছতে যে মোরাম ফেলা রাস্তা, তা নদীর থেকে অনেকটা দূরে এবং বেশ উঁচুতে। সেই রাস্তায় ডলুং-এর জল উঠেছে বুক সমান। রাস্তার ধারে একটু নিচু জমির ঘরগুলোর চাল জেগে আছে। একটা ঘর পুরো ডুবে গেছে। সকলে রাতে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে ব্যাঙ্ক অফিসের উঁচু চত্বরে। ওপাশে সোনাকুড়, রামপুরা ধরে ডলুং-এর দুই তীরের সব মৌজা জলের তলায়। কলকাতা থেকে সড়ক পথে ১৯০ কিঃ মিঃ দূরের কথা বলছি।

খবর পাচ্ছি সুবর্ণরেখা বাড়ছে। গ্রামের ছেলেরা রাজনৈতিক দলের কর্মীরা সকলে নেমে গেছে কাজে। মানুষে উদ্ধার এক্ষুনি জরুরী। শুনলাম ঝাড়গ্রামে মেসেজ পাঠান হয়েছে ত্রাণের ব্যবস্থার জন্য। বেলিয়াবেড়ার সরকারী কর্মচারীরা চাঁদা তুলতে আরম্ভ করেছেন, সাহসী যুবকেরা ভেলা ভ্যান ভাসিয়ে মানুষকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করছেন। জলবন্দী অনেক মানুষ। খবর পাচ্ছি দূরে বালিপাল, সুডিয়াম মৌজা ভেসে গেছে। একটাও ঘর নেই।

পাহাড়ী নদী তাই ডলুং-এ জল আসে হিংস্র জানোয়ারের মত তেজে, আবার দ্রুত সরেও যায়। বেলায় শুনলাম সুবর্ণরেখা বেশ খানিকটা নেমে গেছে। জল দুপুরের পর সরতে আরম্ভ করেছে আস্তে আস্তে। অন্য কোন জায়গার খবর জানি না। এখানে বিপদ কম, জল সরে গেলে মানুষ জীবনে বাঁচবে, ক্ষয়ক্ষতি যা হবে তার জন্য চিন্তায় লাভ নেই।

কে যেন বুক জল ঠেলে কাঁঠিঘাটের পাকা সড়ক থেকে বেলিয়াবেড়ায় চুকলি। জল শুধু বেলিয়াবেড়া ঢোকার মুখে। খবর পাচ্ছি, মেদিনীপুরের বাস বন্ধ। বন্ধের বোডের উপর জল জমেছে। ভিতরে কেমন যেন হচ্ছে। মেদিনীপুরে যেতে হবে। বুক জল ঠেলে বিপদমুক্ত হয়ে মাইল পাঁচেক হেঁটে তপসিয়া। উত্তরে পাকা সড়ক গেছে বন্ধের বোডের দিকে যেকোঘাট-এ, দক্ষিণে সুবর্ণরেখার তীরে কাঁঠিঘাটে। ঝাড়গ্রাম থেকে বাস এল, বাসের মাথায় মানুষ। লাইন করে সাইকেল যাচ্ছে কাঁঠিঘাটের দিকে। কি ব্যাপার। বন্যা দেখতে যাচ্ছে মানুষ।

ঝাড়গ্রাম যাওয়ার প্রয়োজন। সেখান থেকে ট্রেনে যদি খড়গপুর যাওয়া যায়, তারপর দেখা যাবে। এইবার সঠিক খবর পেলাম। বাস সত্যিই বন্ধ। মেদিনীপুর শহর বিচ্ছিন্ন। এখানে ডলুং সুবর্ণরেখা গতবারে অনেক গ্রাম ভাসিয়েছে, তবু বাস বন্ধ হবে কেন? হাইওয়ে তো অনেক উঁচু। কাঁসাবতী কি এমন করবে? থৈ পাচ্ছি না।

বাস ঝাড়গ্রামের পথে বন্ধের বোডে এসে উঠল। কন্ডাক্টর-এর মুখে হাসি। অনেক প্যাসেঞ্জার হয়েছে। বন্যা দেখে

ফিরছে সবাই সুবর্ণরেখার তীর থেকে। বাস ডান দিকে ঘুরল, পিছনে পড়ে থাকল বিহার, বহড়া গোড়া রাঁচি যাওয়ার রাস্তা। এটা ফেকোঘাট। কলকাতা থেকে ১৮০ কিঃ মিঃ দূরে। এখানে ডুলং নদীর উপরে সেতু। নিচে জল ফুঁসছে। নদীর দুই তীর প্লাবিত। গাছ-গাছালির ডাল জেগে আছে, কুটিরের চালার অংশবিশেষ। জাতীয় মহাসড়ক বেয়ে পান চিবুতে চিবুতে ছেলে বউ নিয়ে লোক হাঁটছে ডুলং-এর উপরের সেতুর দিকে। দেখছি জলে ভাসা মানুষ ছিন্নমূল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অলৌকিক জীবের মত। আশ্রয় সহায় নেই। এদের দেখতে বম্বে রোডের উপরে মেলা বসেছে।

লোধাশুলি থেকে সড়ক পথে কলকাতা ১৬৭ কিঃ মিঃ। এখানে এসে শুনছি বাস একেবারেই বন্ধ। মেদিনীপুর বিচ্ছিন্ন। শহরে কুড়ি ফুট জল, কেউ বললেন ৩০ ফুট তো হবেই। বুকের ভিতরে আতংক জেগে উঠছে।

ঝাড়গ্রামে পৌঁছতে খবর আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল। কংসাবতীর এপারে ঝাড়গ্রাম মহকুমার বিনপুর থানার বিস্তীর্ণ এলাকা ডুবে গেছে। পলাশী, বৈতা মৌজাগুলিতে ঘর-দুয়ার জলের নিচে। বড় বড় গাছ আর দু-একটা পাকা বাড়ি আশ্রয় হয়েছে মানুষের। কংসাবতী মেদিনীপুরকে গিলে ফেলেছে। কংসাবতী প্রজেক্টের বিজার্ভার থেকে বেহিসাবী জল ছাড়া হয়েছে। বাস নেই, সন্ধেয় যদি ইস্পাত একসপ্রেস আসে তো খড়গপুর যাওয়া যেতে পারে।

সন্ধেয় ইস্পাত একসপ্রেস ঠিক সময়ে ঝাড়গ্রামে এল। ইস্পাতে করে খড়গপুর মিনিট চল্লিশের পথ। রাত সাড়ে আটটা বাজল। টেনে কোন খবর ছিল না। খড়গপুরে নামতেই সব সন্দেহের অবসান হয়ে গেল। ইস্পাত একসপ্রেস আর যাবে না। সব টেন বাতিল। গোমো প্যাসেঞ্জার হাওড়া যেতে গিয়ে খড়গপুরের পর দুটো স্টেশনের বেশী এগোতে না পেরে ফিরে এসেছে। খাদপুর এবং শ্যামচক স্টেশনের মধ্যকার রেল লাইন জলে ডুবে গেছে, বালিচক এবং রাধামোহনপুরের ভিতরের রেলপথে জল-স্রোত বয়ে যাচ্ছে। সব টেন অনির্দিষ্ট-কালের জন্য বাতিল।

স্টেশনে উদ্বিগ্ন মানুষের ব্যস্ত চলা-ফেরা। ফিসফাস কথাবার্তা। বুঝতে পারছি বড় কিছু হয়ে গেছে। বাস বন্ধ, মেদিনী-পুরে যেতে হবেই। একজন বললেন, সমস্ত শহর জলে ডুবে, এই রাতে যাবেন কোথায়? চুপ করে থাকি। একটু পরে নিজের প্রয়োজনেই কাউকে কাউকে বোঝাতে থাকি সারা শহর নিশ্চয়ই ডোবে নি।

জগন্নাথ মন্দিরের সামনে কুড়ি ফুট জল, কে যেন বললেন। জগন্নাথ মন্দির সড়ক পথে মেদিনীপুর শহরে প্রবেশের মুখে। একেবারে কংসাবতীর ধারে। কিন্তু ওখানে তো উঁচু বাঁধ আছে। নদী কি অতটা বেড়ে উঠেছে। মেলাতে পারছি না কিছুতেই।

আমাকে যেতেই হবে, ঘরের লোক-জনের কি হলো। এক শীর্ণকায় বৃদ্ধ প্ল্যাটফর্মে ছটফট করে বেড়াচ্ছেন।

—কাঁথির থেকে অনেক কষ্ট করে এসেছি, বাস অনেক ঘুরে এল, এদিকে ঘর-বাড়ি বোধহয় সব গেল, ছেলেমেয়ে।

কাতর কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি এক গ্রাম্য মানুষের।

—বাড়ি কোথায়?

—জগন্নাথ মন্দিরের কাছে।

শুনলাম একটা রিলিফ ট্রেন মেদিনী-পুর যাবে। কংসাবতীর উপরে রেলওয়ে ব্রীজটা ঠিক আছে। ট্রেন ছাড়ল সাড়ে দশটায়। কয়লার ইঞ্জিন, কয়েক কামরার গাড়ি, কোন কামরায় আলো নেই। সহযাত্রী-দের মুখ দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের কামরাটা একেবারে ইঞ্জিনের পিছনে। ইঞ্জিনের গায়ের আলো পড়েছে দু' ধারে। খড়গপুরের পর অন্ধেরা গেট ছাড়িয়ে গোকুলপুর স্টেশনে গাড়ি অনেকক্ষণ দাঁড়াল। তারপর গাড়ি চলতেই সব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অন্তহীন নৈঃশব্দ্যে ডুবে আছে দু' ধারের গ্রাম। একেবারে রেল লাইনের কাছাকাছি বড় গাছগুলোকে দেখছি সামান্য মাথা জাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু জল আর জল। জলের শব্দে দু' ধারে ভয়াবহ সমুদ্রের চিহ্ন। সব মৌজা ডুবে গেছে। অন্য দিন এখান দিয়ে রাতে যাওয়ার সময় দেখেছি দূরের বসতিগুলোয় তারার মত আলো জ্বলছে। আজ কোন বসতিতে আলো জ্বলে নি। বসতিই নেই কোন। অথচ আকাশ পরিষ্কার, নক্ষত্র খচিত। আকাশ দেখলে মনে হয় না মাটির পৃথিবীতে জীবনের চিহ্ন শেষ হয়ে আসছে।

—ঘরে বুড়িমা, আর ভাই আছে, কি হল!

—আমার বাড়ি ঘাটালে, যাওয়ার কোন পথ নেই, দেখি মেদিনীপুরে গিয়ে যদি কিছু হয়।

—সব ধান শেষ।

যাত্রীদের মুখ দেখছি না। বিপন্ন সংলাপ কানে আসছে। অন্ধকারে কেউ কাউকে দেখছে না, কথায় কথায় পরিচয় হচ্ছে।

ট্রেন হুইসিল দিয়ে থেমেছে, কংসা-বতীর ব্রীজে উঠছি। ট্রেন আবার চলতে শুরু করেছে। গুম গুম শব্দে সমস্ত নিঃশব্দ ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। বুকের ভিতরে কোন অসতর্কতায় ভয় ঢুকে যাচ্ছে। নিচে মযাল সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে। ব্রীজের লোহার রড ধরে ঝুলে পড়লে পায়ে জল লাগবে হয়ত। জলের পরিমাণ হিসেব করা যায় না। গর্জন করে উঠেছে সুপ্ত কংসাবতী।

ব্রীজটা কাঁপছে মনে হচ্ছে। ট্রেন হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েছে ব্রীজের উপরে। কয়েক হাজার টন ওজনের জলরাশি ধাক্কা মারছে ব্রীজটা টলমল করছে নাকি। একজন বিপন্ন মানুষ কাঁকিয়ে উঠেছেন ট্রেনের কামরার ভিতরে, কথা অসংলগ্ন।

—শালাহ শুয়োরের বাচ্চার দল, বাঁধ বাঁধতে কে কইছিলো?

কথায় একেবারে পূর্ববঙ্গীয় টান।

এক সময় কংসাবতীর ব্রীজ পার হয়ে গেছি, মেদিনীপুর শহরে ট্রেন ঢুকে পড়ল। হাত এগারোটা কুড়ি। একজন স্বস্তির নিঃশ্বাস পেলেন, নাহ্ স্কুল বাজারে জল ঢোকে নি, রিক্সা হাঁকছে সওয়ারি। তবে জগন্নাথ মন্দিরের কাছে যাওয়া যাবে না। তীব্র স্রোত বয়ে যাচ্ছে, ফুট সাতেক জল হবেই। শহরের এদিকের প্রবেশ পথে কংসাবতীর বাঁধ ভেঙে গেছে শুনলাম। রামকৃষ্ণ মন্দির জলে থৈ থৈ। উদ্ধার করতে গিয়েছিল পাঁচটি ছেলে, চারজন ফিরেছে একজন ফেরে নি....। এই রকম অনেক কথা শুনছি।

স্টেশন সংলগ্ন রাস্তাঘাট ঘটখটে। দেখলে মনে হয় না খুব কাছেই প্রলয়ংকর

সাম্প্রতিক বিধ্বংসী বন্যায়
লক্ষাধিক মানুষ বিপন্ন,
অসহায়।

তাঁদের সাহায্য দরকার
উদারহস্তে দান করুন

অনুগ্রহ করে সাহায্য পাঠান।

ঠিকানা : প্রাইম মিনিস্টার্স ন্যাশনাল রিলিফ ফাণ্ড সাউথ ব্লক,
নিউদিল্লী - ১১০০০১

কিছু ঘটে যাচ্ছে। হোটেলওয়ালা বিনয় জানালেন, চালের দাম বেড়ে গেছে, আলু এবং অন্যান্য আনাজপাতির দামও বেড়েছে।

পরের দিন সকালে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম যে মেদিনীপুর শহর বিচ্ছিন্ন। পোস্ট অফিস টেলিগ্রাম নিচ্ছে না, চিঠি-পত্তর যাওয়া আসা বন্ধ। খবরের কাগজ আসছে না। সব দিকের বাস বন্ধ। গড়বেতা, কেশপুর ডেবরা ঘাটাল দাসপুর সব জলের তলায়। মেদিনীপুর থেকে কোন জায়গায় যোগাযোগ করা যাচ্ছে না, শুধু মেদিনীপুর খড়গপুর ট্রেন চালু আছে। সকালে বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে খড়গপুর থেকে অসংখ্য মানুষ ফিরলেন। যাওয়ার কোন উপায় নেই। জগন্নাথ একসপ্রেস হাওড়া থেকে আসানসোল আদ্রা হয়ে খড়গপুর এসেছে। এই রকম টুকরো খবর আসছে।

একবার চেষ্টা করা যাক জগন্নাথ মন্দিরের দিকে যাওয়ার, সম্ভব হয় না। মানুষ গিলে ফেলছে কংসাবতী। জল বয়ে যাচ্ছে পাটনা বাজার হয়ে সজ কোর্টের দিকে। কংসাবতীর ধার ঘেঁষে নদীর অবরাহিকা অঞ্চল ছাড়িয়ে দূর গ্রামগুলোয় প্লাবিত হয়ে সমুদ্দুরের রূপ নিয়েছে।

মানুষ উদ্ধারের ব্যবস্থা নেই কোথা। সকলে অসহায় হয়ে দেখছে শুনছে, অথচ কিছু করার নেই। আমরা নাকি বিশ শতক পার করে এলাম! প্রশাসন যতটা সক্রিয় হওয়ার, হয় নি। শুনলাম দুটো ডাকোটা দুটো হেলিক্যাপ্টার কলাইকুণ্ডা থেকে উড়েছে। সামরিক বাহিনীকে ডাকা হয়েছে। ঘাটাল মহকুমা শীলাবতী কংসাবতী আর রূপনারায়ণের কাছে মার খাচ্ছে খুব বেশী। সারা জেলার বিস্তীর্ণ অংশ মাটি ধরে নেই।

পর পর ডাম বেঁধে তা ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তরুণ যুবকেরা। মেদিনীপুরের একটি ক্লাব এবং শহরের অন্যান্য যুবকেরা প্রাণের মায়া ছেড়ে দিয়ে উদ্ধারে নেমে পড়েছে।

রেডিওর সংবাদ, মেদিনীপুর শহরের তিন চতুর্থাংশ জলের তলায়। কই? মেদিনীপুর শহরের একটা অংশ, তাও এক-

চতুর্থাংশেরও কম এবং শহরের আশপাশের সমস্ত গ্রাম ডুবে গেছে। কালেক্টরি ঠিক আছে, লাইব্রেরী ঠিক আছে, কলেজ, দোকানপাট, সিনেমা হল সব ঠিক আছে। কংসাবতীর ধারে ওয়াটার ওয়ার্কস অবশ্য জলের নিচে তবে আজ রবিবার, সেপ্টেম্বরের তিন তারিখ, বিদ্যুতের অভাব দেখছি না। রেডিওর সংবাদ শুনে মানুষজন উদ্বিগ্ন।

—অন্তত খবরটা ঠিক করে জানাক, নইলে বাইরে যে সব আত্মীয় স্বজন আছে তারা চিন্তায় পড়বে।

হ্যাঁ আকাশবাণী সারাক্ষণ বলেছে শহরের সব জলমগ্ন, আমি দেখি নি। এই লেখা লেখার সময় ওরা সেপ্টেম্বরের একটা পুরনো দৈনিক (যুগান্তর নয়) মেদিনীপুর শহর বিচ্ছিন্ন, জলস্রোত নাকি বয়ে যাচ্ছে কংসাবতীর উপরের দুই সেতু দিয়ে, রেল চলাচল বন্ধ খড়গপুর — মেদিনীপুরের ভিতরে। একেবারে ডাহা মিথ্যে কথা। বানানো খবর। কংসাবতীর উপরে মেদিনীপুর শহরে প্রবেশের দুই সেতু অক্ষত ছিল, জল বয়ে যায় নি। তবে সড়ক পথ বন্ধ হয়ে গেছে কেননা বাঁধের আপ্রোচে নদীর বাঁধ ভেঙ্গে গেছে, হাইওয়ে দিয়ে জল বইছে প্রবল স্রোতে। কংসাবতীর উপরে অপর রেলসেতু (রেলওয়ে ব্রীজ) অক্ষত।

সাধারণ মানুষের ভিতরে ভয়, চাপা উত্তেজনা দেখছি। কাছে দূরের গ্রামে, ঘাটালে গড়বেতায় কেশপুরে স্বজন পরিজন আছে, তাদের খবর কি!

জগন্নাথ মন্দিরের দিকে যাওয়া গেল না। কলেজ এবং ক্লাবের স্বেচ্ছাসেবকেরা অবিরাম চেষ্টা করছে মানুষজনকে উদ্ধার করতে, পারছে না। সরকারী ব্যবস্থা তেমন জোরদার নয়। শুধু আকাশে হেলিকাপ্টার হাঁটতে হাঁটতে মেদিনীপুর স্টেশনের কাছে ডাকবাংলো রোড ধরে নদীর দিকে যাই। এদিকটায় নদীর জন্য ভয় নেই। লাল পাথুরে মাটির উঁচু ডাঙি জমি, এ জমি ভাঙবে না সহজে।

জল কমছে। এপারে স্রোত কম। দূরে নদী এখনো ফুঁসছে ওপারে। গ্রাম দেখা যায় না। সব জল, জলের ভিতরে ডুবুডুবু গাছ-গাছালি। নদীর কোন সীমানা নেই ওধারে। দেখছি দূরে এক টুকরো অংশে জল কমেছে, হয়ত উঁচু জমি গাছ থেকে মানুষ নেমে কোমর জলে এদিক যাচ্ছে সেদিক যাচ্ছে কিন্তু মাটির কাছাকাছি হতে পারছে না। মাটি নেই কোথাও। সামনে গহীন জল, তা পার হওয়া যাবে না। একটা বড়সড় গাছের উপর গুঁড়ি মেরে মানুষ বসে আছে। সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আমরা বিপদের ভিতরে নেই। অনেক দূরে জলমগ্ন গ্রামে কংসাবতীর তীরে পুরুষ মহিলা শিশুরা কুঁকড়ে আছে গাছ-গাছালির মাথায়। আকাশ মেঘ মুক্ত। রোদে তেজ হয়েছে। খাওয়ার জল নেই, খাদ্য নেই, জলের ভয়ে মানুষ নিরালম্ব। এখন জলের অপর নাম মৃত্যু। হেলিকাপ্টার নেমে আসছে জলের কাছাকাছি, খাদ্যের প্যাকেট ছুঁড়ে দিচ্ছে মানুষের কাছে। ঐ গাছের উপর সাদাটে মানুষটার ধারকাছ দিয়ে গেল না। মানুষটা নড়ছে বোধহয়, পড়ে যাবে নাকি! পুরো আড়াই দিন ঐভাবে জীবনের প্রতীক্ষায়।

অন্ধ করে দাও দু' চোখ। আমরা অনেক ভাল আছি। ছুটছি নদীর তীর বেয়ে। ধরেছি একজন যুবককে। ঐ গাছের উপর গোকুলপুরের গ্রামগুলোর অনেক মানুষ মৃত্যুর সময় গুনছে, উদ্ধার করতে হবে। জল না পেয়ে খাদ্য না পেয়ে সব পড়ে যাবে কংসাবতীর হাঁ-এর ভিতরে। স্রোতের মুখোমুখি যেতে পারছে না যুবকেরা। নৌকো নেই, আর নৌকোও এই স্রোতে টিকবে বলে মনে হয় না।

তবুও যা করছে এই যুবকেরা। প্রশাসন নিয়মমাফিক, আন্তরিকতা দেখছি না বড় বড় সাহেব সুবোদের। জিপ যাচ্ছে নদীর দিক, সরকারি জিপে বউ ছেলেমেয়ে ট্যুর হচ্ছে আজ রবিবারে। অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে।

মানুষ গাছে বসে আছে মৃত্যু ভয়ে। স্বামীস্ত্রী বাচ্চা নিয়ে উঠে পড়েছে গাছে, কখন অসাবধানতায় বাচ্চাটা পড়ে গেছে গ্রজমান স্রোতের ভিতর। গাছের উপরও

হাওড়ার সুপ্রসিদ্ধ বস্ত্র প্রতিষ্ঠান!
সুতী · জামদানী · ছাপা শাড়ী · বিভিন্ন প্রকার বস্ত্রের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
শ্রী বিহারিজী
শাড়ী ষ্টোর্স
৭৩১, জি. টি. রোড, হাওড়া · মল্লিকফটক (কাঠগোলার পাশে)

শারদীয়া অমৃত

সেপ্টেম্বরেই বেরোবে

শ্রীদুর্গা ও শ্রীগৌরাঙ্গের
রঙিন অফসেট ছবি

সুখের স্মৃতি দুঃখের স্মৃতি

রাণী চন্দ

গুরুশিষ্য ছবিতে যুগল-বন্দী। অবনীন্দ্রনাথ আর রাণী চন্দ। দু'জনে মিলে এক সঙ্গে এঁকেছিলেন শান্তিনিকেতনের অনেকগুলো রঙিন ছবি। সেই ছবি আঁকার অসাধারণ কাহিনী এই প্রথম লিখলেন অসামান্যা লেখিকা রাণী চন্দ। এই ধরণের পুজো সংখ্যায় তাঁর লেখাও এই প্রথম।

রবিঠাকুরের পাগলা ফাইল

অমিতাভ চৌধুরী

অন্ধ উন্মাদ, পাগল ও ছিট গ্রস্তদের রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠি। কেউ চাইছে পেঁপের বিচি, কেউ চাইছে সোবেল প্রাইজ পাওয়ার সোজা রাস্তা, কেউ পাঠাচ্ছে সোনালী চুলের গোছা। শত শত চিঠি। রবীন্দ্রনাথ কী করেছেন সেই চিঠির ভাড়া নিয়ে?

এবার পুজোয় সব চেয়ে বড় আকর্ষণ শান্তিনিকেতনের মানুষের থেকে অমৃতের জন্য বিশেষভাবে আনা অমিতাভ চৌধুরীর এই সুদীর্ঘ সচিত্র রচনা।

লেখক যখন প্রেমিক

যখন ডায়রির পাতায় এক একটি লম্ফ মানে স্মৃতির পুকুরে ঝুপ্। একজন বিশিষ্ট বাঙালী লেখক মধ্য বয়সে নিতান্ত সামান্য বালিকার প্রেমে পড়েছিলেন। লেখকের নামটি পরে পড়ুন। অনাতম শারদীয়া চমক।

উল্লম্বনারী

ভবেশ সান্যাল

আসামের ছেলে ভবেশ সান্যাল চৌরঙ্গীর আর্ট স্কুলে ছবি আঁকতে এসে রঙ্গলেরে খোঁয়াড়ে ছুটলেন নিছক পলাশীতে। তখন ছবির জগতে রয়েছেন অবন ঠাকুর আর যামিনী রায়। গল্পকে হার মানান ভাষায়, সেই সব মানুষ ও সময়ের কথা।

নরবলি এখনও আছে

অবিশ্বাস্য হলেও বিশ্বাস করতে হবে। ও ওড়িশার গাঁয়ে ঘরে নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন সংকর্ষণ রায়—ছবি সহ ইতিহাসে নিপুণ ধারাবিবরণী।

শিশির ও বিশ্বনাথ

মধুসূদন মজুমদার

প্রখ্যাত নট শিশির ভাদুড়ীর ভাই বিশ্বনাথ ভাদুড়ীও কম যেতেন না। তাই নিয়ে শিশিরবাবুর মধ্যে একটু ঈর্ষাও ছিল সম্ভবত। দুই ভাদুড়ীর ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব ফুটেছে এই লেখাটিতে।

উপন্যাস

আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, শচীন দাস।

বড় গল্প

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, লীলা মজুমদার, নবনীতা দেব সেন শৈবাল মিত্র

গল্প

মনোজ বসু, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, পরিতোষ সেন, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ অমর মিত্র ও আরও অনেকে।

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের প্রবন্ধ
সুমথনাথ ঘোষের 'সাহিত্যিক আড্ডা'

কবিতা

প্রণব মিত্র, মনীন্দ্র রায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, কৃষ্ণ ধর, আলোক সরকার, প্রণবেন্দ দাশগুপ্ত, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, সুনীল নন্দী এবং আরও অনেকে।

দাম : দশ টাকা। রেজিস্ট্রি ডাকে দু টাকা পঁচিশ পয়সা অতিরিক্ত

সার্কুলেশন ম্যানেজার; অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কলি-৩।

অমৃত

CENTRAL LIBRARY

রেহাই নেই। সাপ ছোবল মেরেছে, বিষ পিঁপড়ে কিলবিলিয়ে উঠেছে সারা গায়ে। কোন গাছে শুধু কাপড়ের চিহ্ন পতাকার মত উড়ছে, মানুষটা কোথায় তলিয়ে গেছে।

প্রশাসনের হাতে পর্যাপ্ত ত্রাণসামগ্রী বা ত্রাণের বন্দোবস্ত না থাকলেও আন্তরিকতা এবং প্রচেষ্টার চিহ্নতেও মানুষ স্বস্তি পায়। বিশ্বাস করে সরকারীবাবুদের। ভয় রূপান্তরিত হয় বিশ্বাসে। কিন্তু এটা এই ৩১ বছরেও হয়নি। সরকার অলীক-বস্তু। সরকারি অফিসার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তাঁদের দেখা পাওয়া, তাঁদের মুখে হাসি দেখা ভাগ্যের ব্যাপার।

তাই যখন সারা জেলা ধ্বংসের মুখে, সভ্যতা এবং উন্নতির অহঙ্কার যখন জঁলে ডুবে নিশ্চিহ্ন, তখন মেদিনীপুর শহরে কালেক্টরির কাছে, অফিসার্স ক্লাবের লাগোয়া জায়গায় মেলা বসেছে। শিল্প-মেলা। মেলা আরম্ভ হলো ৩রা সেপ্টেম্বর রবিবার থেকে। জোর কদমে হিন্দীগান এবং আলোর রোশনাই শুরু হয়েছে। দেড় কিলোমিটার দূরে নদীর ধারে মানুষ গাছে বসে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় রয়েছে। নদীর বুকে মৃত গরু ছাগলের সঙ্গে দেবী ভাসান শুরু হয়েছে। পচাগলা নারী পুরুষের দেহ ভেসে যাচ্ছে। শহরে ব্যবসায়ীরা রাতারাতি জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। এটা বিশ শতকের শেষ ভাগ; সম্রাট নীরোর বেহালাও হয়ত এই শহরে এসে স্তব্ধ হয়ে যেত।

খবর আসছে। ঘাটাল দাশপুর সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত। কংসাবতী, শীলাবতি, রূপ-নারাণ, পারাং আরো সব অসংখ্য নদীনালা গর্জে উঠেছে। কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। ঘাটালে যাব, যেতে পারছি না।

কেন যাবেন? কেশপুর থেকে ফেরা একজন বললেন, কি দেবেন মানুষকে, গিয়ে কি হবে? মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে, খালি হাতে জামাকাপড় পরা বাবুদের ছেড়ে দেবে না।

সেপ্টেম্বরের চার তারিখ, জল কমেছে। ত্রাস ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে মূল প্রবেশপথ থেকে। ধর্মার মোড় (মেদিনীপুর রাণীগঞ্জ রোডের সংযোগস্থল) দিয়ে ঘুরে বাস যাচ্ছে খড়গপুর। বাসে উঠলাম, দুপাশের জমির জল কমেছে, বিপর্যস্ত গ্রামগুলো জেগে উঠেছে। ক্রমশঃ নদীর দিকে এগোতে থাকি। বাসের গতি কমে গেছে। ভূমিকম্প দেখিনি, পম্পেই নগরীর শেষ অবস্থা জেনেছিলাম ছাপার অক্ষরে। এইরকম নাকি!

রাস্তার উপরের পিচের চাদরকে সরিয়ে দিয়েছে। কঙ্কালসার অবস্থা। ঘূর্ণীর মুখে দুখানা বিশাল খাদ তৈরি হয়েছে চওড়া রাস্তা ভেঙে দিয়ে। ডানে নিচের দিকে তাকাই। শহরের মূল প্রবেশপথ দেখা যাচ্ছে। কংসাবতীর উঁচু বাঁধের একাংশ মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। ঘরবাড়ি এলোপাথাড়ি পড়ে আছে। জল সরেছে। কলীন অ্যাপ্রোচের ডানদিকের দোতলা বিল্ডিংটার একতলা জলে ডুবে ছিল এ কয়দিন, এখন সকলে মুক্ত হচ্ছে। জল ঢোকার সময়ে গোয়ালে সব গরুগুলোতে চেন দিয়ে বেঁধে লোকজন ছাদে উঠে গিয়েছিল, জল সরার পর দেখা গেছে সবকটা গরু মরে গেছে।

আঁতকে উঠলাম। একজন আঙুল দিয়ে বাড়িটা দেখাল।

আজকের নদী অনেক শান্ত। ঘূর্ণীর লোকারণ্য। ব্রীজ ছাড়িয়ে এগোতেই বাস থেকে নেমে পড়েছি।

—এখানে একটা পুকুর ছিল, পলি এসে পুকুরটাকে ভরাট করে দিয়েছে দেখলাম স্তূপ হয়ে পলি জমে আছে ঘরটার সামনে। রাস্তাঘাট নেই গ্রামের। পচাগন্ধ উঠছে। মহামারি শুরু হয়ে যাবে। ত্রাণের চিহ্ন নেই। হাঁটতে হাঁটতে বোম্বাই রোডের চৌরঙ্গীতে যাই। এখান থেকে খড়্গগ্রাম মেদিনীপুর খড়্গপুর এবং কলকাতায় রাস্তাভাগ হয়ে গেছে। কাল এটা জলে ডোবাছিল। দুপাশের মাঠে এখন

গভীর জল। আক্রান্ত মানুষ এসে উঠেছে হাইওয়েতে। সারিবদ্ধ ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে।

খড়্গপুর থেকে ট্রেন ধরে এগোতে থাকি কলকাতার দিকে। বালিচক শ্যামচক হাউর রাধামোহনপুর ক্ষীরাই স্টেশনগুলো দুপাশের মাঠে সমুদ্রের মত জল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্ল্যাটফর্মে ছিন্নমূল মানুষ। রাতে শুয়ে আছি, মনে হলো তক্তপোষ নড়ছে, গায়ে জল লাগল, ভাবলাম বাচ্চাটা পেচ্ছাপ করল নাকি, বাচ্চাটাকে ধমকালাম, তারপরেই সব বুঝতে পারলাম। তখন ঘোর অন্ধকার। হুড়-মুড়িয়ে বেরিয়ে পড়েছি, ঘরের চালে উঠেছি; জল আসছে তখন, বাচ্চাটা মোর থাকলোনি গো...।

হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছেন সদা সন্তানহারা মা।

চেতনায় ঘা লাগছে। এসব জিজ্ঞাসা করা পাপ। শত মানুষের অভিশাপে বাতাস দুর্গন্ধময় ভারি হয়ে উঠেছে। বিলিফ এসেছিল সামান্য। শেষ হয়ে গেছে। আবার আসবে সেই আশায় মানুষ দিন গুণছে।

আকাশবাণী বলছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খড়্গপুর স্টেশনে ঘোষণা করছে অমুক অমুক ট্রেন প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য বাতিল হয়েছে। এটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, মানুষের অপদার্থতা। সীমাহীন হলে এইভাবে লক্ষ মানুষ ছিন্নমূল হয়ে যায়। ঘাটাল দাশপুরে আবার ডি-ভি-সির জল আসছে। কংসাবতী প্রকল্পের হাতে দামোদর পরিকল্পনার হাতে সভ্যতার ভাসান হয়ে গেছে।

আবার ফিরবো গোপীবল্লভপুরের বেলিয়াবেড়া গ্রামে। মানুষের দুর্দশা নিরাসক্তভাবে দেখা যায় না। পথে ঘাটালের কথা শুনছি, দাশপুরের কথা। শীলাবতির ধারে একটা আয়রণ চেস্ট ভেসে এসেছে, নদীতে গরু ছাগল ভাসছে, মানুষের মৃতদেহ ঝোপজঙ্গলে আটকে আছে।

—কিভাবে খবর এল? সব তো বিচ্ছিন্ন।

—চারদিনেও যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে তখন আরো ভয়ংকর কিছু হয়েছে, প্রস্তুত থাকুন। এক বৃদ্ধ বলতে থাকেন।

আবার গোপীবল্লভপুরে ফিরছি। এবার সুবর্ণরেখা তেমন ক্ষতি করেনি তুলনামূলকভাবে। ডুলং-এর জলতো শনিবার দুপুর থেকেই কমছিল। বম্বে রোডের উপরে নেমে মাইল পাঁচেক হেঁটে সবাসরি ডুলং-এর তীরে পৌঁছলাম। নদী স্থির, জল নেমে গেছে অনেক। দুদিকের পাড় খাড়াভাবে ভেঙেছে। যেখানে নদী বেঁকেছে, সেখানে ভাঙন আরো বিপজ্জনক। রিভার লিফ্‌ট্‌ ইরিগেসনের পাম্পিং হাউসটা এক চুলের জন্য রক্ষা পেয়েছে। রোদ প্রখর হয়েছে। তবু এদিকে মানুষ মরার খবর নেই, শুধু সুবর্ণরেখায় একজন ভেসে গেছে। নদী পার হলাম নৌকায়। তারপর নদী পেরিয়ে রাস্তায় উঠতেই দুচোখে ঘোর লাগে। কোথায় এলাম!

এখানে সবুজ শস্যক্ষেত্র ছিল, সেসব কোথায়? বিস্তীর্ণ সবুজ শস্যক্ষেতের চিহ্ন নেই। শুধু বালিয়াড়ি। বালি আর বালি। মানুষ মরেনি, শস্যক্ষেত্র শেষ হয়ে গেছে। ধু-ধু বালিয়াড়ির দিকে তাকিয়ে চোখমুখ-শরীর চেতনা ঝলসে যাচ্ছে!

এসব পেরিয়ে এগিয়ে দেখি ছিন্নমূল মানুষেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। বালিয়াড়ির উপরে একজন চাষী হাঁটছে, বালি দেখছে। আমার মাথার ভিতরে কি রকম হচ্ছে। কিলাই হাউর ঘাটাল দাশপুর গোকুলপুর মেদিনীপুরের সব মানুষ মাথার ভিতরে ঢুকে পড়েছে। অভিযোগের আঙুল বাড়িয়ে দিয়েছে আমার চোখের দিকে।

যাদের জন্য এত মানুষের দুঃখ; শত সহস্র মানুষের অভিশাপ তাদের উপর ঝরে পড়ুক।

কেন এই বন্যা

রমেন দাস

দামোদর বাঁধ দেখে মুগ্ধ ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন, শুধুমাত্র গর্বের নয়, এই বাঁধ প্রকল্পের রূপায়ণ পরম বিস্ময়করও বটে। ডি-ভি-সি ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জীবন্ত প্রতীক। আমাদের দেশের কল্যাণমুখী প্রকল্পসমূহের মধ্যে এটা একটা অন্যতম নিদর্শন। এর আশীর্বাদ যুগ যুগ ধরে জাতিকে সঞ্জীবিত ও সম্পদশালী করবে।....

জওহরলাল নেহরুর এই আশা আর স্বপ্ন কতখানি সফল হয়েছে? ডি-ভি-সি কি সত্যিই আমাদের জীবনকে সঞ্জীবিত করছে, না তার অভিশাপে বন্যা প্লাবিত পশ্চিম বাংলার এই বিধ্বস্ত হাল? সাম্প্রতিক হুগলী-মেদিনীপুরের প্রলংকরী বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে এই জটিল প্রশ্নটা আবার নতুন করে মাথা চাড়া দিয়েছে।

সেটা ১৯৪৩ সালের কথা। সে বছর দামোদরের অশান্ত জলস্রোত এই বাংলার ওপর এমন প্রচণ্ড আঘাত নিয়ে নেমে আসে যে, তার ফলে নিম্ন দামোদর উপত্যকার নিদারুণ ক্ষয়ক্ষতি হয়। ধনজন এবং সম্পত্তিই শুধুমাত্র নষ্ট হয় না, মহানগরী কলকাতার অস্তিত্ব পর্যন্ত সে বছর বিপন্ন হয়ে পড়ে। দামোদরের বন্যার তোড়ে বিদেশী বৃটিশ শাসক শ্রেণীও ভীতত্রস্ত হয়ে ওঠেন। আতঙ্কিত বিদেশী সরকার নিজেদের স্বার্থেই সেবার বন্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি বসাতে বাধ্য হন। কমিটির সভাপতি হলেন বর্ধমানের মহারাজা। এবং অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ মেঘনাদ সাহা। কমিটির উদ্দেশ্য, ঐ বন্যার হেতু খতিয়ে দেখা। এবং চিরস্থায়ীভাবে দামোদরের রুদ্রমূর্তি এবং মাতন বন্ধ করে তার অশান্ত শক্তিকে ধরে রেখে কীভাবে উন্নয়নমুখী কাজে ব্যবহার করা সম্ভব, তার উপায় নির্ধারণ করা।

শুধু ১৯৪৩ সালের প্রলয়ংকরী বন্যাই নয়—তার আগে গত এক শতকে কম করেও দুঃখের নদ দামোদর কমপক্ষে কুড়িটি প্রলয়ংকরী বন্যা উপহার দিয়েছে। তার বিনিময়ে কেড়ে নিয়েছে শত শত জীবন, কোটি কোটি টাকার ধনসম্পত্তি। আর হাজার হাজার মানুষকে করেছে গৃহহীন। বাংলা ও বিহারের মোট দশটি জেলার জনজীবন অসহায়ভাবে বছরের পর বছর দামোদরের মেজাজ-খেয়ালীর উপর নির্ভর করে থেকেছে।

যে দুঃখের নদ দামোদরের প্রচণ্ড প্রতাপে বাংলা-বিহারের মানুষ আতংকিত, তার জন্ম বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চলে। কামারপেট নামক একটি অখ্যাত পাহাড়ের চরণ চিরে বেরিয়ে এসেছে ছোট্ট একটি

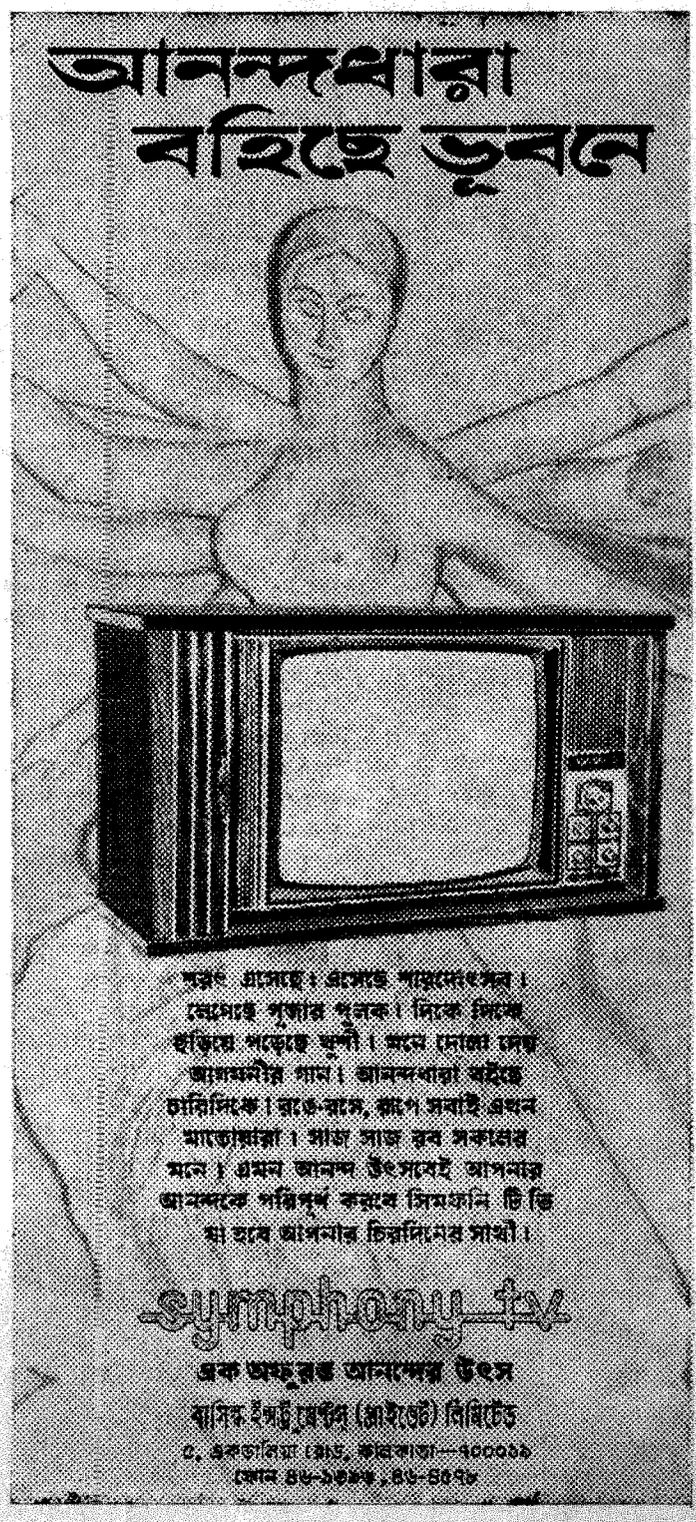

পাহাড়ী নদী। তার নাম দেওনদ। পাহাড়ী নদ দেওনদ বোধহয় স্বনামে বেশীদূর তুষ্ট থাকতে পারেনি। বেশীকিছু পথ পার হয়ে এসে সে দামোদর নামে পরিচিত। শীত গ্রীষ্ম বসন্তে দামোদরের রূপ শান্ত-সমাহিত। কিন্তু আকাশের মেঘ আর বর্ষার জল তাকে করে তোলে ভয়াল এবং ভয়ংকর। ৫৪১ কিলোমিটার গতি পথের প্রায় ২৫ হাজার কিলোমিটার অববাহিকা জুড়ে ছিল দামোদরের প্রচন্ড তান্ডব। বিশাল জনপথ আর ধন সম্পত্তির নিরাপত্তার পথ বের করতে বিশেষজ্ঞ কমিটি সরেজমিনে তদন্ত ও বৈঠক করে নানাদিক খতিয়ে দেখলেন। তারপর যুক্তরাষ্ট্রের বহুল পরিচিত টি.ভি. এ ধাঁচে একটি বাঁধ প্রকল্পের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করলেন। তদানীন্তন ভারত সরকার দামোদরের রুদ্রমূর্তি সংযত করার জন্য দারুণভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ পাওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের টি.ভি.এ ইঞ্জিনীয়ার ডব্লিউ. এল. জেরডুইনের শরণাপন্ন হয়ে একটি প্রকল্প রচনার দায়িত্ব দিলেন। দামোদর নদের স্রোতধারা নিয়ন্ত্রণ করে বন্যা রোধের এটাই সরকারী উদ্যোগে প্রথম প্রয়াস বলা চলে।

দেখতে দেখতে দেশ স্বাধীন। বিদেশী শাসক বিদায় নিল। স্বাধীন সরকার পূর্বতন বিশেষজ্ঞ কমিটি এবং বিদেশী ইঞ্জিনিয়ার মিঃ জেরডুইনের সুপারিশ অনুযায়ী দামোদর প্রকল্পের প্রস্তাব খতিয়ে দেখলেন। ১৯৪৮ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী লোকসভায় ডি.ভি.সি বিল পাশ করা হল। এবং তার প্রায় পাঁচ মাস পর ৭ জুলাই ডি.ভি.সি বা দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের জন্ম। কিন্তু ডি.ভি.সি তার উপত্যকার বন্যারোধে কতখানি সমর্থ হয়েছে?

প্রথমে ডি.ভি.সি প্রকল্পে আটটি বাঁধ তৈরির সুপারিশ ছিল। প্রস্তাবিত আটটি বাঁধ তৈরি করে বরাকর এবং দামোদর নদের জলধারা নিয়ন্ত্রণ এবং প্রয়োজনে সেচ কৃষি বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদি কাজে তার ব্যবহারের প্রস্তুতি চলে। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে মূল প্রকল্পের সুপারিশ মত শেষ অবধি আর আটটি বাঁধ তৈরি হয়না। তার মধ্যে তিলাইয়া, কোণার, মাইথন এবং পাঞ্চেতে এই চারটি বাঁধের কাজ শেষ হয়। বোকারো, বনপাহাড়ি, বেরমো এবং আইয়ার এই চারটি বাঁধ তৈরির আর কোন উদ্যোগ-উদ্যম নেওয়া হয় না। সেই থেকে এই চারটি বাঁধের খসড়া প্রস্তাব ফাইলবন্দী।

প্রথমে যে আটটি বাঁধের সুপারিশ হয়, হিসাব অনুযায়ী তা করা হলে প্রতিদিন দশ লক্ষ কিউসেক জল নিয়ন্ত্রিত করে তা থেকে মাত্র দুই হাজার কিউসেক জল ছাড়া সম্ভব হত। তার ফলে নিম্ন দামোদর উপত্যকায় কোনরকম প্লাবন আশংকা থাকত না। কারণ, বৈজ্ঞানিক ধারণা পরীক্ষা করে বলা হয়, দামোদর নদের গভীরতা এবং জল বহনের যে ক্ষমতা, তাতে প্রতিদিন দুই হাজার কিউসেক জল ছাড়া হলে তার ফলে নিম্ন উপত্যকায় কোনরকম প্লাবনের আশংকা থাকবে না। বরং খুব স্বাভাবিক গতিতে ঐ জল দামোদর নদ ধরে নিম্ন উপত্যকায় শান্তভাবে ছড়িয়ে পড়বে। এবং রূপনারায়ণ নদীর সঙ্গে মিলে তার দুর্বার গতি আরও প্রশমিত হবে।

বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা, বিজ্ঞানীদের সুপারিশ মত বাদবাকি চারটি বাঁধ তৈরি না হওয়ায় বর্তমান মাত্র চারটি বাঁধের পক্ষে বরাকর এবং দামোদর নদের বিপুল ও বিশাল জলরাশি ঠিকমত নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না। বিহারের উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল থেকে নেমে আসা বৃষ্টি ও বন্যার জলস্রোত যখন ঐ দুই নদীর জলধারাকে আরও জোরদার করে, তখন তার শেষ চাপ এসে মাইথন ও পাঞ্চেত বাঁধের ওপর আছড়ে পড়ে। এবং শেষ শেষ প্রান্তের এই দুটি বাঁধের জলাধারও ফুলেফেঁপে কানাকানায় ভরে ওঠে। পাঞ্চেত ও মাইথন বাঁধের একত্রে মাত্র সাড়ে দশ হাজার ঘন মিটার জল ধারণের ক্ষমতা আছে। তাই তার ওপর যখন অধিক মাত্রায় চাপ পড়ে, তখন ঐ দুই বাঁধের চাপ হাল্কা করার জন্য জল ছাড়ার প্রয়োজন হয়। তা না করলে যে বাঁধ ভেঙে বিস্তীর্ণ জনপদ মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে, তা বলা বাহুল্য।

যখন দামোদর প্রকল্পের অনুমোদন হয়, তখন হিসাব করে দেখা যায়, প্রস্তাবিত আটটি বাঁধ প্রতিদিন গড়পড়তা দশ লক্ষ কিউসেক জলের অবিরাম স্রোতধারাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে; এবং তা থেকে মাত্র দু' লক্ষ কিউসেক জল ছেড়ে বাকী আট লক্ষ কিউসেক জলের চাপ ঠেকাতে পারবে। ফলে মাত্র দুই লক্ষ কিউসেক জল ছাড়ায় নিম্ন দামোদর উপত্যকার বিস্তীর্ণ এলাকার বন্যা প্লাবনতো প্রতিহত হবেই, সঙ্গে সঙ্গে দামোদরের ঐ নিয়ন্ত্রিত জলধারার সাহায্যে কৃষি সেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদি উন্নয়নমুখী বহু কাজ করাও সম্ভব হবে। পুরোপুরি কিন্তু দুর্ভাগ্য, বিজ্ঞানীদের সুপারিশ কার্যকরী না করে তা আংশিকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে মাত্র। অর্থাৎ আটটি বাঁধের মধ্যে তৈরি করা হয়েছে চারটি বাঁধ। এর ফলে বরাকর-দামোদর নদের শক্তিশালী স্রোতধারা আশানুরূপভাবে সংযত-সংহত করা সম্ভব হয়নি। সুতরাং বিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যখন অতি বর্ষণ অথবা প্লাবন দেখা দেয়, তার সেই প্লাবিত জল শেষ অবধি বরাকর-দামোদরের মাঝখান পথ ধরে হাজার গুণ শক্তিশালী হয়ে ধেয়ে নেমে আসে নীচের দিকে, পশ্চিম বাঙলার নিম্ন ভূমিতে। সেই স্রোতধারা রোধ করা চারটি মাত্র বাঁধের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম পর্যায়ে তিলাইয়া এবং কোনার বাঁধ দুটি ঐ বিপুল স্রোতধারার বেগ কিছুটা সামলে দিতে পারলেও, শেষ অবধি পাঞ্চেত আর মাইথন বাঁধ তাঁর চাপ আগলাতে পারে না।

মাইথন এবং পাঞ্চেত বাঁধের জল ধারণের ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। আগেই বলা হয়েছে এই দুটি বাঁধের জল ধরার ক্ষমতা মাত্র সাড়ে দশ হাজার ঘন মিটার। মাইথন-পাঞ্চেত কোণার আর তিলাইয়া—এই চারটি মাত্র বাঁধ প্রথম পর্যায়ে তৈরির যখন সিদ্ধান্ত হয়, তখন হিসাব অবশ্য বলা হয়েছিল, শেষ প্রান্তের দুটি বাঁধ পাঞ্চেত এবং মাইথন সাড়ে ছয় লক্ষ কিউসেক জলকে সংযত করে প্রতিদিন আড়াই লক্ষ কিউসেক পর্যন্ত জল ছাড়তে পারবে। জল ছাড়ার এই হিসাব অবশ্যই উপত্যকার সংশ্লিষ্ট নদনদী খাল-নালার গভীরতা, প্রস্থ ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে করা হয়েছিল। কিন্তু প্রায় কুড়ি বছরের ব্যবধানে এখন ঐসব নদনদী, খাল-নালাগুলির সেই প্রস্থ-গভীরতা অক্ষত আছে কি? সম্ভবত নেই। এবং তা নেই বলেই বিজ্ঞানীদের হিসাবমত পাঞ্চেত-মাইথন বাঁধ থেকে গড়পড়তা মাত্র এক লক্ষ বার হাজার কিউসেকের মত জল ছাড়া সম্ভব হচ্ছে। এর বেশী জল ছাড়লেই বন্যার লাল সংকেত দিতে হয়।

সম্প্রতি অর্থাৎ ১ সেপ্টেম্বর (১৯৭৮) নিম্ন দামোদর উপত্যকার হুগলী-মেদিনীপুর অঞ্চলে যেদিন বন্যা নেমে আসে, সেদিন মাইথন-পঞ্চায়েত বাঁধ থেকে জল ছাড়ার হিসাব অন্যদিনের তুলনায় মোটেই বেশি নয়। সরকারী নথি থেকে জানা গেছে, ঐদিন প্রথমে মাত্র এক লক্ষ চল্লিশ হাজার কিউসেক ছাড়া হলেও পরে তা ক্রমে এক লক্ষ এক হাজার কিউসেকে নামিয়ে আনা হয়। অর্থাৎ বিজ্ঞানীদের মূল হিসাবের চেয়েও প্রায় দেড় লক্ষ কিউসেক কম জল ছাড়া হয়। তা সত্ত্বেও কেন এই বন্যা? এবং এই বন্যার জন্য তবে মূলতঃ দায়ী কে বা কারা?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে অদূর অতীতের কিছু ইতিহাস টানা দরকার। দামোদর বাঁধ তৈরির জন্মলগ্নে স্থির হয়েছিল, বাঁধের বিপুল জল সম্পদকে উন্নয়নমুখী কাজে লাগানো হবে। তাই বিদ্যুৎ-সেচ-কৃষি ইত্যাদি কাজে লাগানোর জন্য উদ্যম নেওয়া হয়। সেদিকে লক্ষ্য রেখে ১৯৫৫ সালে দুর্গাপুর ব্যারেজ বা আঁড় বাঁধের সৃষ্টি। দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে দুটি মূল খাল কাটা হয়। বাঁধের বামতীর ধরে কাটা খালটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১৩৭ কিলোমিটার এবং দক্ষিণ তীরবর্তী খালের দৈর্ঘ্যও ৮৯ কিলোমিটারের মত। এছাড়া ছোট ছোট খাল এবং নদী-নালার দৈর্ঘ্য কম করেও প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার এলাকায় বিস্তৃত। ঐ বিস্তৃত খাল-নালা দিয়ে সাড়ে তিন লক্ষ হেকটর চাষের জমিতে সেচের জল দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। আর স্বল্প দৈর্ঘ্যের যে মূল খালটি কাটা হয়, তাকে নৌ চলাচলের উপযোগী করে দুর্গাপুরের সঙ্গে কলকাতা ও অন্যান্য সহর-বন্দরের যোগসূত্র স্থাপনের প্রস্তাব নেওয়া হয়। উদ্দেশ্য, শিল্পনগরী দুর্গাপুরের গুরুত্ব বাড়িয়ে তাকে আরও সমৃদ্ধিশালী এবং সম্পদশালী করে তোলা। দুর্ভাগ্য, মূল বাঁধ থেকে কেটে আনা ঐ দুটি খালের প্রতি প্রথম থেকেই আর জোরো সতর্ক দৃষ্টি

নেই। তার সংস্কার, রক্ষণাবেক্ষণ অথবা ভাঙন বা ভূমিক্ষয় থেকে তাকে রক্ষা করার কোন প্রচেষ্টা হয়েছে বলে জানা যায়নি। বরং সেচের জন্য জল নিয়ে নদী-নালাগুলির জল বহনের ক্ষমতা দ্রুতহারে নষ্ট করা হয়েছে।

১৯৫৫ সালে দুর্গাপুর ব্যারেজ সৃষ্টি করে ডি-ভিসি যখন এক বৈপ্লবিক কর্মযজ্ঞে উদ্যোগী তখন তদানীন্তন পশ্চিম বাংলা সরকারের দৃষ্টি পড়ে তার উপর। হয়তো বা নিত্য নতুন পরিকল্পনা যুক্ত করে ডি-ভি-সি নিয়ন্ত্রিত দুর্গাপুর ব্যারেজের কর্মকাণ্ডকে আরও ব্যাপকতর করার কোনও উদ্দেশ্য রাজ্য সরকারের ছিল। তাই অনেক লেখালেখির পর ১৯৬৪-৬৫ সালে পশ্চিম বাংলা সরকার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দুর্গাপুর ব্যারেজ এবং নিম্ন-দামোদর এলাকার নদনদী খাল-বিলের সব দায়-দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নেন। তারপর থেকে দুর্গাপুর ব্যারেজ অথবা নিম্ন দামোদর উপত্যকার নদনদী-খাল-নালা সংস্কার এবং দেখাশুনোর পুরো কর্তৃত্ব রাজ্য সরকারের।

তথাভিজ্ঞ মহলের খবর, রাজ্য সরকার ডি-ভি-সির হাত থেকে ঐ গুরু দায়িত্বভার নিজের হাতে নিলেও গত চৌদ্দ পনের বছরে নিম্ন দামোদর উপত্যকার কোনও নদনদী অথবা খালের সংস্কার করাননি। রাজ্য সেচ দপ্তরের বিরাট এক বাহিনীর উপর সংশ্লিষ্ট নদী খালপথ দেখার দায়িত্ব বর্তানো আছে। তার জন্য ফি বছর পাণ্ডুয়া-সহ বর্ধমান-মেদিনীপুরের ঐ শিবিরগুলির জন্য কোটি কোটি টাকা বরাদ্দও হয়। অথচ কাজের কাজ কতটুকু হয়েছে সেটাই আজ বড় জিজ্ঞাসা হয়ে দেখা দিয়েছে। নদী-বিশারদের সুপারিশ উপেক্ষা করে সেচ দপ্তরের বিরাট ঐ বাহিনী বছরের পর বছর নির্মমভাবে নিষ্ক্রিয় থেকেছে বলে অভিযোগ। ফলে নদীনালা খালবিলের জল বহনের ক্ষমতা দারুণভাবে কমে গেছে। আড়াই লক্ষ কিউসেকের পরিবর্তে মাত্র দেড় লক্ষ কিউসেক জলেই নদ-নদীর কূল ছাপিয়ে তা নিম্ন উপত্যকায় বন্যা প্লাবন সৃষ্টি করছে। নদীর এই জল বহনক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার হিসাব-নিকাশ রাখার দায়-দায়িত্ব কার? গত ষোল বছরে কী হারে এবং কেমন করে নদনদীগুলির জল বহনের ক্ষমতা কমল, সে খবরটুকু যাদের রাখবার কথা, তাঁরা তা রেখেছেন কি? রাজ্য সরকার এবং ডি-ভি-সি উভয় পক্ষেরই এবিষয় পরিষ্কার বক্তব্য তুলে ধরা দরকার। সম্প্রতি বন্যার অন্যতম কারণ নিম্ন দামোদর উপত্যকায় নদনদী খাল-নালাগুলির সংস্কারহীনতা বলে নদী বিজ্ঞানীরা মনে করছেন।

দামোদর বাঁধের ছাড়া জলের সঙ্গে বয়ে-আসা পলি মাটি জমে বছরের পর বছর নদ-নদী এবং খালগুলির গভীরতা কমে গিয়েছে। ভূমিক্ষয় রোধের জন্য নদী বা খালের পাড়ে বনসম্পদ বাড়ানোর তেমন কোন ব্যবস্থা হয়নি। ফলে পাড় ভেঙে অথবা ভূমিক্ষয় হয়ে তা নদীর বুকে চড়া সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে। খরার অথবা গ্রীষ্মকালে দামোদর নদ অথবা সংশ্লিষ্ট খাল-নদী যখন শুকিয়ে যায় তখন বেআইনীভাবে তার উপর চলেছে চাষআবাদ গ্রামের মানুষ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট খাল থেকে নালা কেটে নিয়েছে। বাঁধ কাটা সেই সব অঞ্চল সহজেই ভাঙনের মুখোমুখি হয়েছে। এবং এতসব বেআইনী কাজ চলেছে সরকারী অফিসার ও কর্মীদের নাকের ডগায়। এসব দেখার জন্য রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের লোকজনও মোতায়েন আছে। কিন্তু কোন কাজ হয়নি।

ডি-ভি-সি সূত্রে জানা গেছে বিজ্ঞানীদের সুপারিশ অনুযায়ী রাজ্য সরকার তার দায়-দায়িত্ব এবং কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করেন নি। দামোদর বাঁধের জল ছাড়া এবং তার গতি স্বাভাবিক ও অব্যাহত রাখার জন্য উপত্যকার নদী-খালগুলি সুদীর্ঘকাল সংস্কার করা হয়নি। সরকারের এই অবহেলায় সম্ভাব্য বিপদের কথা বহুবার জানিয়েও নাকি কোন ফল হয়নি। শেষ অবধি ডি ভি সি কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে নিম্ন উপত্যকার নদী নালা খাল এবং দামোদর ব্যারেজ নিজেদের হাতে ফিরিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব নেন। কিন্তু রাজ্য সরকার নাকি সেবিষয়ে উদাসীন রয়েছেন। ডি ভি সি-র জনৈক মুখপাত্র মনে করেন, সাম্প্রতিক বন্যার জন্য মূল দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। নদনদী সংস্কার অথবা নিম্ন দামোদর এলাকায় বাঁধগুলি সারানোর তেমন কোন ব্যবস্থাই তারা সুদীর্ঘকাল করাননি। ফলে অবিরাম বৃষ্টির জলে নদ-নদীগুলি আগে থেকেই ভরে ছিল। তাই পাঞ্চেত-মাইথন বাঁধের জলাধার থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণের অনেক কম জল ছাড়া সত্ত্বেও নদনদী খাল নালা গুলি প্লাবিত হয়। তাদের দাবী, যে সামান্য পরিমাণ জল তারা ছাড়েন, তা ধরে রাখার কোনও উপায় ছিল না। বরং সেই চেষ্টা করা হলে জলের চাপ মাইথন-পাঞ্চেত বাঁধ ভেঙে অকল্পনীয় এক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করত— শিল্পনগরী দুর্গাপুরের অস্তিত্ব বিপন্ন হত।

নিজেদের বক্তব্য ও যুক্তির সমর্থনে উক্ত মুখপাত্র এক তথ্য প্রকাশ করে জানান, ১৯৭১ এবং ১৯৭৩ সালের ভরা বর্ষাতেও তারা যথাক্রমে এক লক্ষ আশি হাজার এবং এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার কিউসেক জল ছেড়েছেন। তাতেও তখন বন্যা হয়নি। আর এ বছর মাত্র এক লক্ষ চল্লিশ থেকে নামিয়ে সবশেষ এক লক্ষ এক হাজার কিউসেক জল ছাড়া হল, তখন কেন সেই জলে বন্যা হবে? আসলে নদ নদী ও খাল-নালাগুলির সংস্কার করে জলের বহতা শক্তিকে অব্যাহত রাখার উপযোগী কোন ব্যবস্থা রাজ্য সরকার করেন নি। এবং তা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব চেয়েও ডি-ভি-সি তা পারেনি। রাজ্য সরকারের এই ঔদাসীন্য না ঘটলে হয়তো এই বন্যা এমন গুরুতর আকার ধারণ করতে পারত না।

দামোদর বাঁধ মূল দামোদর এবং বরাকর নদীর জলের প্লাবন রোধ করতে সক্ষম হলেও, নিম্ন দামোদর উপত্যকার জন্য স্থানীয় উদ্যোগে একটি চিরস্থায়ী বাঁধ পরিকল্পনা নেওয়া দরকার। শুধু মাত্র মূল দামোদর বাঁধ নিম্ন উপত্যকাতে সব সময় বন্যার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না বলেও নদী এবং বন্যা বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। মূল দামোদর পরিকল্পনার সময়ও এই মর্মে বক্তব্য রাখা হয়ে ছিল। দ্বারকেশ্বর, কোশী এবং শিলাই নদীও যে কোন সময় নিম্ন দামোদর উপত্যকার বন্যা প্লাবন সৃষ্টের কারণ হয়ে উঠতে পারে। প্রসঙ্গত ১৯৫৯ সালের বন্যার কথা উল্লেখ্য। ঐ বছর দ্বারকেশ্বর এবং শিলাই নদী অতি বর্ষণে ফুলে ফেঁপে ওঠে। তার জল নিম্ন দামোদর এলাকায় প্লাবিত হয়। এবং রূপ-নারায়ণ থেকে জোয়ারের জল নেমে এসে তার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় ব্যাপক বন্যার রূপ নেয়। সে সময় যদি দামোদরের মূল বাঁধগুলি সক্রিয় না থাকত, তবে হয়তো আরও ব্যাপক এবং বিরাট বন্যার মুখে পড়ে এই অঞ্চল নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হত।

রাজ্যের সেচমন্ত্রী প্রভাস রায় বলেছেন, তাঁদের এমন আর্থিক ক্ষমতা নেই যা দিয়ে বন্যারোধক কোন পরিকল্পনা নেওয়া যায়। তার জন্য তাঁরা কেন্দ্রের কাছে অর্থ দাবী করবেন। তাঁর এই বক্তব্যের পেছনে নিশ্চয়ই যুক্তি আছে। কিন্তু নিম্ন দামোদর উপত্যকায় তাঁর দপ্তরের যেসব ইঞ্জিনিয়ার-কারিগর এবং কর্মীরা আছেন, তাঁরা তাঁদের কর্তব্য কতখানি পালন করেছেন, অবিলম্বে তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। শুধু অর্থাভাবই নয়, মনে হয় আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার অভাব এবং নির্মম গাফিলতিও এই বন্যার অন্যতম কারণ। তা ছাড়া নদী বিজ্ঞানীদের মতে, মূল দামোদরের জলাধারের সঙ্গে নিম্ন দামোদরের একটা সুসংহত যোগসূত্র থাকা প্রয়োজন। মূল দামোদরের সঙ্গে নিম্ন দামোদর উপত্যকার সমন্বয়হীনতা যে কোন সময় আরও বিরাট এবং ব্যাপক বন্যা ডেকে আনতে পারে। তা রোধ করার জন্য প্রয়োজন নিম্ন দামোদরের পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত করা।

খেলা

কলকাতার খেলোয়াড়রাও স্কিলফুল

ইদানীং আই এফ এ শীল্ডে খেলতে বাইরের দলগুলো কলকাতায় আসতে চায় না। তাদের ধারণা, এই ভরা বর্ষার মরশুমে জল-কাদার মাঠে তারা কিছুতেই স্থানীয় দলগুলোর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না। কথাটা নেহাৎ মিথ্যে নয়। ভারতীয় ফুটবলের 'সুপ্ত রিবন' এই শীল্ডের খেলার সময় বদলাবার দাবী তাই অনেকদিন ধরেই চলছে। তবে একথাটাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে ভিন্ন রাজ্যের আর একটি অভিযোগের পেছনে তেমন যুক্তি নেই। তাদের বক্তব্য, শীল্ড তো কলকাতাতেই থাকবে—সুতরাং গিয়ে কি লাভ। অর্থাৎ কলকাতার ফুটবলকে তাঁরা কটাক্ষ করলেন। অভিযোগ আনলেন পক্ষপাতিত্বের। কিন্তু তাঁদের কাছে আমাদের একটাই জিজ্ঞাসা, একটাই প্রশ্ন—কলকাতার বাইরে দিল্লির ডুরাণ্ড কাপে, বোম্বাইয়ে রোভার্স কাপে কিম্বা ফেডারেশন কাপে—কোথায় তাঁরা কলকাতার দুই প্রধান—মোহনবাগান কিম্বা ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেন? তাঁদের হারিয়েই তো কলকাতার দলগুলো বারবার এ সব ট্রফিগুলো জিতে আসেন। কলকাতার মাঠে না হয় তাঁরা স্থানীয় মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলকে হারাতে পারেন না, কিন্তু বোম্বাই-দিল্লির মাঠেও তো তাঁদের একই হাল দেখা যায়।

যাই হোক এবারের শীল্ডে সোভিয়েৎ ইউনিয়নের আরারাৎ যোগ দেওয়ায় আই, এফ,এ শীল্ডের কৌলিন্য কিছুটা বেড়েছিল। আরারাৎ দলটা নেহাৎ ফেলনা নয়। এক সময় তারা রীতিমত নাম করা দল ছিল, সোভিয়েৎ ফুটবলের সুপার লীগে তাদের স্থান ছিল ওপরের দিকে। কিন্তু হালে তাদের অবস্থা খুব একটা ভালো যাচ্ছেনা। নামতে নামতে তাদের স্থান এখন বেশ নীচের দিকে। সোভিয়েৎ ফুটবলের ১৪ নম্বর তারা। এর এক ধাপ পদস্খলন হলেই তাদের সুপার লীগ থেকে নেমে যেতে হবে।

তবে একথা ঠিক যে দলগত শক্তির দিক দিয়ে ওরা আমাদের চেয়ে যথেষ্ট উন্নত। ব্যক্তিগত ক্রীড়া নৈপুণ্যের কথা তুললে তো ওঁদের কয়েকজনের ধারেকাছেও ভারতের সামনের সারির খেলোয়াড়দের মধ্যে কেউই পৌঁছতে পারবেন না। সোভিয়েৎ ওলিম্পিক দলের খেলোয়াড় আরব্বাদি আন্দেসোসিয়ান (৬নং) ছিলেন আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। সত্যিকারের লিংকম্যান বা মাঝ মাঠের খেলোয়াড় বলতে কি বোঝায়, কি হওয়া উচিৎ তা তিনি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। দম দেওয়া কলের পুতুলের মত তাঁর অফুরান প্রাণশক্তি। এগিয়ে পেছিয়ে, নড়ে-চড়ে সারা মাঠ তিনি বলকে তাড়া করে বেড়িয়েছেন। যেমন তাঁর বল আয়ত্তে রাখার ক্ষমতা, তেমনি পায়ের কাজ, পায়ের ধোকায়, শরীরের ঝাঁকুনিতে কত সহজেই না তিনি প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়দের ফাঁকি দিয়েছেন। তার সঙ্গে মিশেছে গতি। এই গতিই আধুনিক ফুটবলের আসল বস্তু। টোটাল ফুটবলের প্রাণ। আন্দেসোসিয়ান যে জাত খেলোয়াড় তার প্রমাণ তিনি চারটি খেলাতেই দিয়েছেন। রক্ষণে-আক্রমণে দলের হাল ধরতে তাঁর মত আর কেউ ছিলেন না। পুরো একটি দলের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে তিনি যে কি খেলা খেলে গেলেন কলকাতার মানুষ তা চট করে ভুলতে পারবেন না।

তাঁর পাশে আক্রমণ ভাগে খোরেন আগনেজিয়ান (১০) ও আন্দ্রানিক খাচাতুনিক (১৫) ওঁতপাতা শিকারীর মত অপেক্ষা করতেন। সুযোগের সদ্ব্যবহারে তাঁরা ছিলেন তৎপর। আধুনিক ফুটবলের কলা-কৌশল প্রয়োগ ও তাৎক্ষণিক চিন্তা-ধারায় পুষ্ট তাঁরা। তাঁদের পায়ে আছে জোরাল সট, আছে অব্যর্থ নিশানা, আছে বল আয়ত্তে রাখার অসাধারণ ক্ষমতা, আছে পায়ের কাজ।

সেদিক দিয়ে কিন্তু সোভিয়েট জাতীয় দলের আর এক খেলোয়াড় আর্মেনীয় দল আরারাতের অধিনায়ক সাগেই বন্দরাঞ্চেকা (৭) নিজের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করে তুলতে পারেন নি। আসলে তাঁর খেলায় তেমন 'শো' নেই। মাঝ মাঠে তিনি দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়তে ওস্তাদ সেই সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে যেমন দলের আক্রমণের হাল ধরেন, তেমনি পিছিয়ে এসে আত্মরক্ষার নিয়ন্ত্রণ হন।

কলকাতার আরারাৎ চারটি ম্যাচ খেলেছে। প্রাক্ কোয়ার্টার ফাইনালে তারা দুর্বল প্রতিদ্বন্দ্বী এরিয়ান্সকে দু গোলে হারায়। কোয়ার্টার ফাইনালে মহামেডান স্পোর্টিং খেলতে নামার আগেই হার খেয়ে বসেছিল। ফলে হার মানা দলের বিরুদ্ধে বীরত্ব ফলাতে বেশী দেরী হয় নি আর্মেনীয় খেলোয়াড়দের। গুণে গুণে সেদিন তারা চারটি গোল দিয়েছিল। আরো কতগুলো যে হতে পারত তার কোন স্থিরতা ছিল না। অবশ্য প্রথম দিনের অর্থাৎ এরিয়ান্সের বিরুদ্ধে খেলার তুলনায় আরারৎ সেদিন অনেক ভালো খেলেছিল। কিন্তু যাদের বিরুদ্ধে খেলেছিল তারা কোন সময়ই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে নি।

কিন্তু তার উল্টো চেহারা দেখা গেল সেমিফাইনালে ইস্টবেঙ্গল-আরারাতের খেলায়। চাপের মুখে দিশাহারা অবস্থা সেদিন তাদের। কিন্তু বেশী গোল দিতে দেবো না, বুঝবো বিদেশী দলকে এই মনোভাব নিয়ে মাঠে নামার ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়রা সেদিন আত্মরক্ষার দিকেই নজর দিয়েছিলেন বেশী। পাল্টা আক্রান্ত হানার চেয়ে অনেক বেশী চেষ্টা ছিল আরারাৎকে রোখার। তাই আরারাতের খেলোয়াড়দের পায়ে বল এলেই সাতজন এগিয়ে এসে নিজেদের পেনাল্টি সীমানার সংখ্যাটা আগলাবার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিচ্ছিলেন।

ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণভাগ এই মরশুমে তেমন শক্ত সমর্থ নয়। ভালো খেলছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। কিন্তু বড়দলে টক্কিতে খেলতে গিয়ে তিনি হাঁপ ভেঙ্গে ফিরে এসেছিলেন। তবু ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণভাগের

মোহনবাগানের দ্বিতীয় গোল। মানস মাটিতে, পিছনে প্রসূন ও সুব্রত।

খেলোয়াড়রা আরারাতের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে লড়েছেন। জমে জমে জলো খেলেছেন। আক্রমণভাগের খেলোয়াড়রাও নেমে এসে আত্মরক্ষায় সামিল হয়েছেন। তাঁদের সেই প্রচেষ্টা সফল হয়েছে নিশ্চয়ই। নব্বুই মিনিটের খেলার পঁচাশি মিনিট পর্যন্ত তাঁরা রুখতে পেরেছিলেন আরারাৎকে। শেষ পর্যন্ত অন্তিম লগ্নে আন্দ্রানিক খাচাত্রিয়ানের দেওয়া গোলে ইস্টবেঙ্গলকে নতিস্বীকার করতে হল। হার মানলেও ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়রা সেদিন প্রতি মুহূর্তে মাঠে নিজেদের উপস্থিতি আর্মেনীয় খেলোয়াড়দের উপলব্ধি করিয়ে ছেড়েছিলেন।

ইস্টবেঙ্গল যে ভুলটা করেছিল মোহনবাগান তা করে নি। আত্মরক্ষার সঙ্গে পাল্টা আঘাত হানার অস্ত্রে তারা শান দিয়ে খেলার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লড়েছে। প্রথমার্ধের গোড়ার দিকে গোল খেয়ে তারা পিছিয়ে পড়েছিল ঠিকই। কিন্তু সেই গোল খাওয়াটাই একদিক দিয়ে শাপে বর হল। আঘাত খাওয়া বাঘের মত রুখে দাঁড়ালেন মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা। তখন শ্যামল ব্যানার্জি, প্রদীপ চৌধুরী, সুব্রত ভট্টাচার্য, প্রসূন ব্যানার্জি, গৌতম সরকার, হাবিব আর মানস ভট্টাচার্যের অন্য-রূপ। দুরন্ত ভঙ্গী। তাকে আরো জোরদার করে তুলল বদলী খেলোয়াড় হিসেবে বিদেশ বসুর আগমন। বিদেশের গতির সঙ্গে তাল দেওয়া আরারাতের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। পাঁকাল মাছের মত পিছলে বিদেশ সেন ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। বিদেশের পায়ে বল পড়লেই বিপদ সৃষ্টি হয়েছে আরা-রাতের রক্ষণভাগে। মধ্যিখানে বর্বীয়ান হাবিব ছিলেন অনন্য। তাঁর অভিজ্ঞতা, তাঁর ফুটবল জ্ঞান, তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি পুরোন হাবিবকে আবার নতুন করে চিনিয়ে দিল। হাবিবের মেজাজ একটু চড়া ছিল ঠিকই, কিন্তু খেলার ঢং ছিল অনবদ্য।

মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা জমে ক্ষণে ভালো খেলেছেন। গোলে শিবাজী ব্যানার্জিও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন, যদিও প্রথম গোলটির জন্যে তাঁকে দায়ী করা যায়। খেলা তখন সবে মিনিট আটেক গড়িয়েছে। শিবাজী বল ধরে গৌতম সর-কারকে ছুঁড়ে দিতে গেলেন। কিন্তু ব্যাপারটা আগেভাগেই আঁচ করে ছুটে এসে গৌতমের আগেই বলটা ধরে নিলেন [illegible]। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলটা বাড়িয়ে দিলেন গোলের মুখে দাঁড়ানো সাকি-রকো আঁদ্রেয়ো বছরের ছাত্র সাকিসান এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে ডানদিককার কোণে বলটা মারলেন। শিবাজী ঝাঁপিয়ে পড়েও নাগাল পেলেন না বলটার। জালে পড়ল মোহনবাগান।

সেই গোলে মোহনবাগান শোধ করল প্রথমার্ধের খেলা শেষ হবার ন মিনিট আগে। বিদেশ তখন সবে মাঠে নেমেছেন। [illegible] করে বিদেশ দ্রুত গতিতে ছুটে এসে

খেলার আগে দুই অধিনায়ক : মোহনবাগানের প্রসূন ব্যানার্জি ও আরারাতের সার্গেই বাদ্দারাংকো।

সেন্টার করলেন। শ্যাম বলটা ধরেই হাবিবকে ঠেলে দিতেই—তাঁর চকিত সট হার মানাল আরারাতের গোলরক্ষককে।

লগ্নে শোধ করার পাঁচ মিনিটের মধ্যে দ্বিতীয় গোলটি করে মোহনবাগান এগিয়ে গেল। এবারও গোল করার মধ্যমণি বিদেশ। বল নিয়ে এগিয়ে এসে তিনি হাবিবকে দিলেন। হাবিব বাড়িয়ে দিলেন মানস ভট্টাচার্যকে। মানস একজনকে কাটিয়ে বুদ্ধিমানের মত বলটা আরারাতের আগুয়ান গোলরক্ষকের পাশ দিয়ে গোলে ফেললেন। এগিয়ে গেল মোহনবাগান।

দ্বিতীয়ার্ধের পনের মিনিটের আগে সেই গোল শোধ করতে পারল না আরারাৎ। তবে আরারাতের দ্বিতীয় গোলটি মানে রাখার মত। দিনের সেরা গোলও বটে। আন্দ্রেয়াসিয়ান বল তুলে দিলে বাঁককেন সেটা থোরেনের দিকে এগিয়ে দেন। পায় বুক সমান উঁচু হয়ে বলটা এল। থোরেন মুহূর্তে মধ্যে পা তুলে জালি করলেন। চকিতে বল চলে গেল গোলের মধ্যে। চোখ জুড়োন গোল। মনে রাখার মত। গোল শোধ করে দিল আরারাৎ।

খেলার বাকী সময়ে গোল করার সুযোগ পেয়েছিল দু দলই। তবে সহজ সুযোগ ছিল মোহনবাগানের। অন্তত শ্যাম থাপার একটি গোল করা উচিত ছিল। তবে একথা ঠিক যে তাঁরা পরি-স্থিতিবিদ্যুতাপূর্ণ দু দলের ফাইনাল খেলাটিতে যে কেউই জিততে পারত। জিততে পারত মোহনবাগান, জিততে পারত আরারাৎ।

অনেকেই বলছেন যে কলকাতার গরম ও বৃষ্টির মাঠে আর্মেনীয় খেলো-য়াড়দের খেলতে খুব অসুবিধে হয়েছে। কথা অস্বীকার না করেও বলব, পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে যে দল খেলতে পারে তারাই তো আসল সমর্থ দল। আমাদেরও শীতের দেশে গিয়ে খেলতে হয়—তখন শীত কোন অজুহাত হয়ে দাঁড়াতে পারে না। বিশ্ব কাপের খেলাও জল-কাদার মাঠে হয়েছে, বৃষ্টির মধ্যে হয়েছে—তার জন্যে প্রতিবাদ জানান নি কেউ। সোভিয়েত ইউনিয়নের আরারাৎ এখানকার পরিবেশ পরিস্থিতি জেনেই খেলতে এসেছিল। সুতরাং গরম, বৃষ্টি কিম্বা জলকাদার পিচ ছিল মাঠের অজুহাত তোলাও তাদের পক্ষে সঙ্গত নয়।

তারা অবশ্য তা তোলেও নি। খেলার শেষে আরারাতের অধিনায়ক ও ম্যানেজার বলেছেন যে, জল কাদার মাঠে খেলতে তাঁদের বিশেষ কোন অসুবিধে হয়নি। মোহনবাগানের খেলার প্রসঙ্গে তাঁরা বলে-ছেন যে কলকাতায় এসে যে চারটি দলের বিরুদ্ধে তাঁরা খেলেছেন তাদের মধ্যে এই দলটি সবদিক দিয়েই শ্রেষ্ঠ। খেলার কলা-কৌশল এবং প্রয়োগ প্রকরণের দিক দিয়ে তারা কোন অংশেই কম নয়, গতিও তাদের যথেষ্ট।

কলকাতার দর্শকদের সম্বন্ধে আরা-রাতের খেলোয়াড়রা উচ্ছ্বসিত। তারা বলেছেন, দারুণ স্পোর্টিং দর্শকরা। তাঁরা নিজেদের দল ছেড়েও আরারাতের প্রশংসা করেছে। ভালো সট কিম্বা দর্শনীয় কিছু করলেই হাততালি মিলেছে। তবে এখনকার খেলার ধারা, ছক ইত্যাদি দেখে তাঁরা খুশী হননি। বলেছেন, ষাটের দশকের মাঝামাঝি ভারতীয় ফুটবলে যা দেখেছিলেন আজো সেই ট্র্যাডিশনই সমানে বয়ে চলেছে। আজো ভারতীয় দলগুলো ৪-২-৪ প্রথায় খেলছে। কিন্তু এই প্রথা এখন একরকম বাতিল হয়ে গেছে। ধরতে গেলে পৃথিবীর আর কোন দেশই এখন আর এই ছকে খেলে না। এখন সময় এসেছে আধুনিক ফুটবলের অনুসরণে খেলার ধারা বদলাবার। তাদের মতে কলকাতায় এমন কয়েকজন খেলোয়াড় আছেন যাঁরা সত্যিই স্কিলফুল।

আই এফ এ শিল্ড

১৯৭৮ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি। খেলা ২-২ গোলে অমীমাংসিত থাকায় সোভিয়েত ইউনিয়নের আরারাত এবং মোহনবাগানকে যুগ্ম-বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। মোহনবাগান যুগ্ম-বিজয়ী হলেও নৈতিক জয় তাদেরই। তারা প্রথম গোল খেয়ে পাঁচ মিনিটের খেলায় দুটো গোল দিয়ে ২-১ গোলে এগিয়ে যায়। মোহনবাগান একাধিকবার সুসংহত শক্তিশালী আরারাত দলের রক্ষণভাগকে যেমন নাস্তানাবুদ করেছে তেমনি আত্মরক্ষার খেলায় যথেষ্ট দৃঢ়তা এবং দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। মোহনবাগান দেশের মান রেখেছে। দুই দলই আক্রমণ এবং আত্মরক্ষায় যেভাবে খেলাটি প্রাণবন্ত করে তুলেছিল তা দীর্ঘকাল দর্শকদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বৃষ্টি ও জল-কাদার মধ্যে এমন প্রাণবন্ত ফুটবল খেলার সংখ্যা কলকাতার মাঠে খুবই কম। দর্শকরা প্রাণভরে এই জমাটি খেলার প্রতিটি মুহূর্ত দারুণ উত্তেজনা, গভীর আগ্রহ এবং আবেগের সঙ্গে উপভোগ করেছেন। এর জন্যে খেলোয়াড়দের কাছে দর্শকরা নিঃসন্দেহে ঋণী।

এই দিনের ফাইনাল খেলায় আরারাত দলের পক্ষে প্রথম গোলটি করেন শাকিয়ান এবং ভলি মেরে দর্শনীয় দ্বিতীয় গোলটি দেন আগানেশিয়ান। মোহনবাগানের পক্ষে গোল করেন হাবিব এবং মানস। প্রথমার্ধের খেলার ৮ মিনিটের মাথায় এই দিনের খেলার প্রথম গোলটি দেন শাকিয়ান। শিবাজীর ভুল খেলার দরুণ এই গোল হয়। খেলার ৩২ মিনিটে কম্পটন দত্তের বদলী হিসাবে মাঠে খেলতে নেমেই বিদেশ বসু খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন। খেলার ৩৬ মিনিটে বিদেশ বসুর সেন্টার থেকে শ্যাম বল ধরেন এবং শ্যামের কাছ থেকে বল পেয়ে হবিব গোলটি শোধ দেন (১-১)। এর চার মিনিট পর আবার বিদেশ বসু আরারাত দলের গোলমুখে হাবিবকে বল পাশ করেন। এবার হাবিবের কাছ থেকে বল পেয়ে মানস গোল দিলে মোহনবাগান ২-১ গোলে এগিয়ে যায়। বিরতির সময় মোহনবাগান ২-১ গোলে এগিয়ে ছিল। দ্বিতীয়ার্ধের খেলার ১৫ মিনিটে খোরেন আগানেশিয়ান দর্শনীয় ভলি মেরে দলের দ্বিতীয় গোল দিলে খেলার ফলাফল সমান ২-২ দাঁড়ায়। খেলার শেষ দিকে দু দলেরই কাছে পুনরায় গোল করার সুযোগ এসেছিল। তুলনায় সহজ সুযোগ হাতছাড়া করেন শ্যাম এবং মানস। হাতের কাছে আরারাত দলের অসহায় গোলরক্ষককে পেয়েও শ্যাম গোল দেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করেন।

আরারাত দলের খেলা থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার এবং গ্রহণ করার আছে। প্রথমেই চোখে পড়ে ফুটবল খেলার উপযোগী তাদের খেলোয়াড়দের শরীরের গঠন ও দৈহিক পটুতা, উন্নতমানের পাসিং ও ট্যাকলিং, মাপা খাটো ও লম্বা সট, বল আদান-প্রদানে নিখুঁত বুঝাপড়া, নিজের আয়ত্তে বল রাখার কৌশল, জায়গা বদল করে খেলার দক্ষতা ইত্যাদি। তবুও বলবো খেলার মানের বিচারে তারা আমাদের থেকে খুব বেশী শক্তিশালী নয়। সেমি-ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের কাছে তারা নামমাত্র ১-০ গোলে জিতেছিল এবং মোহনবাগানের কাছে তারা প্রচন্ড বাধা পেয়ে কোনরকমে খেলা ড্র করে মুখরক্ষা করেছে।

এখানে উল্লেখ্য, এই নিয়ে মোহনবাগান ২৬বার আই এফ এ শীল্ডের ফাইনালে উঠে শীল্ড জয়ী হল ১২বার এবং রানার্স-আপ ১০ বার। তাদের ফাইনাল খেলা পরিত্যক্ত হয়েছে ৪ বার (রাজস্থানের বিপক্ষে একবার এবং ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে তিনবার)। ১৯৭৮ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ এবং আই এফ এ শীল্ড জয়ের সূত্রে মোহনবাগান এইভাবে—একই বছরে 'ডাবল খেতাব' জয়ী হল এই নিয়ে সাতবার।

১৯৭৮ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল না থাকাতে খুবই ফাঁকা লেগেছে। কারণ ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ সাল—এই একটানা ৬ বছর ইস্টবেঙ্গল আই এফ এ শীল্ডের ফাইনালে খেলে জিতেছিল ৫ বার। ইস্টবেঙ্গলের এই অসাধারণ সাফল্য আই এফ এ শীল্ডের ইতিহাসে একটা বিশেষ রেকর্ড হয়ে আছে—একনাগাড়ে সর্বাধিকবার শীল্ডের ফাইনাল খেলা (৬বার) এবং একটানা সর্বাধিকবার আই এফ এ শীল্ড জয় (৫ বার)।

আমেরিকান টেনিস

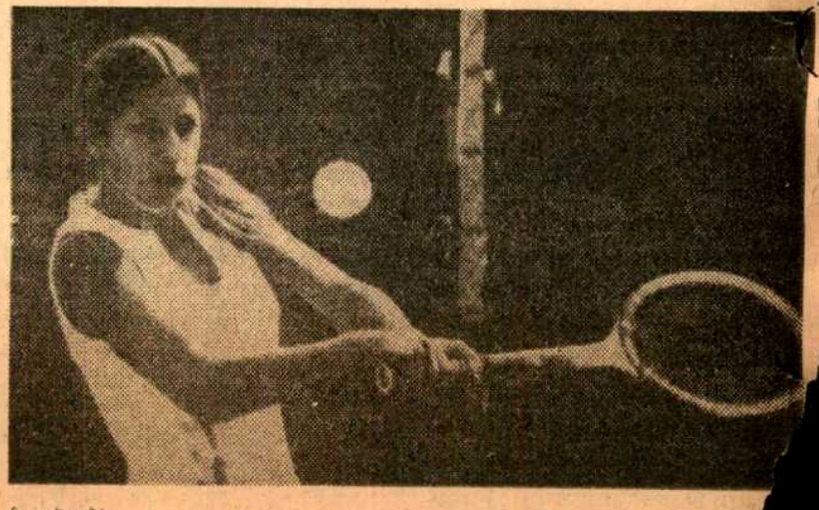

ক্রিস ইভার্ট

১৯৭৮ সালের আমেরিকার মুক্ত টেনিস প্রতিযোগিতার আসরে সিঙ্গলস খেতাব জয় করেছেন আমেরিকারই দুজন বিশ্ববিশ্রুত টেনিস খেলোয়াড়—পুরুষ বিভাগে জিমি কোনর্স এবং মেয়েদের বিভাগে ক্রিস ইভার্ট। এই খেতাব জয়ের দৌলতে এঁরা আজ আমেরিকার টেনিস আসরে 'রাজা রাণী' আখ্যা লাভ করেছেন। একই বছরে এবং একই বড় টেনিস আসরে কোনর্স এবং ইভার্টের পক্ষে এইভাবে সিঙ্গলস খেতাব জয় নতুন কিছু নয়। এঁরা এইভাবে একই বছরে এবং একই বড় আসরে সিঙ্গলস খেতাব প্রথম জয় করেছিলেন ১৯৭৪ সালের উইম্বলেডনে। তখন কোনর্সের বয়স ছিল ২১ বছর এবং ইভার্টের ১৯। টেনিস আসরে তাঁরা শুধু খেতাব জয়ই করেন নি। এক সময় পরস্পরের হৃদয়ও জয় করেছিলেন। তাঁরা 'বাকদত্তা' ঘোষণা করাও হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের এই ভালবাসা শেষ পর্যন্ত বিয়োগান্ত নাটকে পরিণত হয়। বিয়ে শেষ পর্যন্ত হয় নি। ইভার্ট আজও কুমারী। আমেরিকার মুক্ত টেনিস খেলার আসরে কোনর্স এই নিয়ে তিনবার সিঙ্গলস খেতাব পেলেন। পেয়েছেন ১৯৭৪ ও ১৯৭৬ সালে। দিকে কুমারী ক্রিস ইভার্ট এই মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব পেলেন উপর্যু বার বার (১৯৭৫-৭৮)। উল্লেখ্য, ১৯

লালের পর উপর্যুপরি চার বার মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন একমাত্র কুমারী ইভার্ট। তাঁর ঠিক আগে উপর্যুপরি চার বার মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছিলেন হেলেন জাকবস (১৯৩২-৩৫)।

এ বছর পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে ২নং বাছাই জিমি কোনর্স ৬-৪, ৬-২ ও ৬-২ গেমে ১নং বাছাই সুইডেনের বিয়রন বর্গকে হারিয়ে পূর্ব পরাজয়ের বদলা নিয়েছেন। এ বছরের জুলাই মাসে উইম্বলে-ন টেনিস ফাইনালে বর্গের কাছে কোনর্স হেরেছিলেন। একটা লক্ষ্য করার বিষয়, এ বছরের পুরুষ ও মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব বিজয়ী কোনর্স এবং ইভার্ট দুজনেই খেলোয়াড়দের বাছাই তালিকায় ২নং স্থান পান। বাছাই তালিকার পুরুষ বিভাগে ১নং স্থান পেয়েছিলেন বিয়রন বর্গ (সুইডেন) এবং মেয়েদের বিভাগে ১নং স্থান অধিকার করেছিলেন মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা (আমেরিকা)। এঁরা দুজনেই ১৯৭৮ সালের উইম্বলেডন সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান।

আমেরিকার মুক্ত টেনিস আসরে বর্গের পরাজয়ের ফলে তাঁর আর ১৯৭৮ সালে 'গ্র্যান্ড স্ল্যাম' খেতাব জয় হল না। ফাইনালে তিনি তাঁর খ্যাতি অনুযায়ী খেলতে পারেন নি। তার প্রধান কারণ তাঁকে বিরাট আকারের ফোস্কা এবং ফুলো আঙুল নিয়ে খেলতে হয়েছিল।

মেয়েদের সিঙ্গলস ফাইনালে ২৩ বছরের কিম ইভার্ট স্বদেশের ১৬ বছরের স্কুল ছাত্রী পাম শ্রিভারকে ৭-৫ ও ৬-৩ গেমে পরাজিত করেন। উল্লেখ্য, আমেরিকার জাতীয় টেনিস খেলার ইতিহাসে পাম শ্রিভারের থেকে কম বয়সের অথবা সমান বয়সের মেয়ে এর আগে সেমি-ফাইনাল বা ফাইনালে খেলেন নি।

পুরুষদের সিঙ্গলস সেমি-ফাইনালে চারজন খেলোয়াড়ের মধ্যে তিনজন ছিলেন আমেরিকার— জিমি কোনর্স ভিটাস গেরুলাইটিস এবং জন স্যাকএনরো। তাছাড়া সুইডেনের একজন—বিয়রন বর্গ। মেয়েদের সেমি-ফাইনালেও আমেরিকার খেলোয়াড় ছিলেন তিনজন এবং অস্ট্রেলিয়ার একজন (ওয়েন্ডি টার্নবুল) আমেরিকার পক্ষে সেমি-ফাইনালে খেলেছিলেন কিম ইভার্ট, পাম শ্রিভার এবং মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা।

১৯৭৮ সালের এই টেনিস আসরে দারুণ অঘটন ঘটিয়েছিলেন পুরুষদের কোয়ার্টার-ফাইনালে অবাছাই খেলোয়াড় বুচ ওয়াল্টস (আমেরিকা) এবং মেয়েদের সেমি-ফাইনালে ১৬ নং বাছাই ১৬-বছরের স্কুল-ছাত্রী কুমারী পাম শ্রীভার (আমেরিকা)। ওয়াল্টস দীর্ঘ ৪ ঘন্টা ১১ মিনিট খেলে ৩ নং বাছাই এবং গত বছরের চ্যাম্পিয়ান গিলারমো ভিলাসকে (আর্জেন্টিনা) পরাজিত করেন ৬-৪, ৭-৬ ৪-৬, ৬-৭ ও ৬ ২ গেমে। অপরদিকে কুমারী শ্রীভার পরাজিত করেন ৭-৬ ও ৭-৬ গেমে ১নং বাছাই এবং ১৯৭৮ সালের উইম্বলেডন সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান মার্টিনা নাভ্রাতিলোভাকে।

১৯৭৮ সালের আমেরিকার মুক্ত টেনিস খেলার আসরে ভারতীয় খেলোয়াড়রা যথারীতি শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেন। ভারতের ১নং খেলোয়াড় বিজয় অমৃতরাজ রাউন্ডেই আমেরিকার ডিক স্টকটনের কাছে হেরে যান।

দর্শক

সদস্য পদে ইস্তফা

খ্যাতনামা ফুটবল খেলোয়াড় বলরাম সম্প্রতি জানিয়েছেন তিনি আর নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্য নেই। গত বছরই তিনি ঐ পদে ইস্তফা দিয়ে রেখেছেন। ফেডারেশনের কাগজপত্রে কিন্তু বলরামের অস্তিত্ব এখনও নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্য হিসাবেই। বলরাম সাফ জানিয়েছেন নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের গোলমেলে কাণ্ড-কারখানা তার পছন্দ হয়নি। উদাহরণ হিসেবে তিনি জানিয়েছেন, গত বছর ভারতীয় দল তিনবার বিদেশ সফরে গেছে—অথচ দল নির্বাচনে বেমালুম নির্বাচকদের উপেক্ষা করা হয়েছে। নির্বাচন হয়েছে তাঁদের অগোচরেই। ভারতীয় দল যখন বিদেশে খেলতে যাওয়ার জন্যে প্রায় ওড়ার মুখে তখন স্রেফ নিয়ম রাখতে নির্বাচিত খেলোয়াড়দের একটা তালিকা ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলরামের হাতে। ব্যাপারটা মোটেই মানতে পারেন নি— সঙ্গে জবাব পাঠিয়েছিলেন পদত্যাগের চিঠি দিয়ে। আর তাজ্জব ব্যাপার আজও সে চিঠির জবাব আসেনি তাঁর কাছে। বলরাম শীঘ্রই যাচ্ছেন সর্বভারতীয় রেল দলের কোচ হিসাবে। এ প্রসঙ্গে জানানো যেতে পারে, এবারের জাতীয় ফুটবলে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের খেলা দেখেই আগামী এশিয়ান গেমস-এ ভারতীয় দলের প্রাথমিক নির্বাচন করা হবে। নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের নির্বাচকমণ্ডলীর অন্য দুই সদস্য হলেন আমেদ হোসেন এবং আজিজ। এঁরাও এক সময়কার খ্যাতনামা খেলোয়াড়।

রবীন্দ্র সরোবরে ক্রীড়া শিক্ষায়তন

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, কলকাতার রবীন্দ্র সরোবরে একটি আঞ্চলিক ক্রীড়া শিক্ষায়তন গড়ে তোলার কাজ শীঘ্রই শুরু হতে পারে। এটি গড়ে উঠবে পাতিয়ালায় নেতাজী সুভাষ ক্রীড়া শিক্ষায়তনের আদলে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এই প্রসঙ্গে আরও জানিয়েছেন, এই শিক্ষায়তন গড়ে তোলার কাজ সম্পূর্ণ হলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের খেলাধূলায় প্রগতি আসবে। পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলি নতুন উদ্যমে খেলাধূলায় এগিয়ে যাওয়ায় উৎসাহী হয়ে উঠবে। তিনি আরও জানিয়েছেন, এ শিক্ষায়তন গড়ে তোলার ব্যাপারটা প্রচুর ব্যয় সাপেক্ষ। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু যথেষ্ট আগ্রহ এবং উৎসাহ দেখিয়েছেন এ বিষয়ে। পাতিয়ালাকে জানানো হয়ে গেছে। তাদের বলা হয়েছে কলকাতায় এই কেন্দ্রটির জন্য তারা কত টাকা দিতে পারে তা খতিয়ে দেখতে।

অলিম্পিক সমাচার

১৯৪০-র মস্কো অলিম্পিকে ফুটবলের আসর বসার কথা কিয়েভে। দামী খেলাগুলো হবে সেন্ট্রাল স্টেডিয়ামে। বিশেষ ধরনের জল নিষ্কাশী আর তাপ-বিকীরণ ব্যবস্থা থাকায় আবহাওয়ার আচরণের ওপর অলিম্পিক ফুটবলের খেলাগুলিকে নির্ভর করতে হবে না। শক্তিশালী ফ্লাড লাইট ৪২ মিটার উঁচু টাওয়ার থেকে ১২০০ থেকে ১৫০০ লাক্স আলো ছুঁড়ে দেবে। কাছাকাছি চেরোপানজু পাহাড়ে হাসপাতাল তৈরি হচ্ছে। এখানে ফুটবল খেলোয়াড়দের চিকিৎসার আয়োজন থাকবে।

মস্কো অলিম্পিকের ভারোত্তোলন-কারীরা এবার রঙীন বারবেল ব্যবহার করছেন। একটি বিশেষ সংস্থা এটি তৈরি করেছেন। বারবেলের রঙ সবুজ, কমলা আর লাল। এটা প্রতিযোগীদের ক্ষেত্রে খানিকটা চোখের আরাম হবে বলে মনে হচ্ছে—কেন না তাঁরা চিরাচরিত সেই কালো বারবেলই দেখে আসছেন। আর দেখলেই মনে হয় কালো বারবেল অনেক ভারী। সোভিয়েত ক্রীড়া বিজ্ঞানীরা এটি প্রচুর গবেষণা করে উদ্ভাবন করেছেন। এই বারবেলে স্থিতি স্থাপকতার গুণ থাকায় আন্তর্জাতিক ভারোত্তোলন ফেডারেশনের নিয়মকর্তাদের চারি পছন্দ হয়েছে। এই রঙীন বারবেল তাঁরা বিভিন্ন জাতীয় ভারো-ত্তোলন ফেডারেশনের কাছে পাঠানোর অনুরোধ জানিয়েছেন। নিজস্ব

বোম্বাই সমাচার

যোগেশ্বর কৃষ্ণ ও মোরারজী দেশাই

পঁচিশে আগস্ট, পুণ্য জন্মাষ্টমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন। স্বর্গ বা পাতালের কোনো উৎসবের খবর আমার জানা নেই তবুও মর্তোর দেবদূতদের এক আস্থানায় বিরাট হৈ চৈ হয়ে গেল সেদিন। ঘোড়ায় টানা রথের উপরে দাঁড়িয়ে এক হাতে চক্র ও অন্য হাতে ঘোড়ার লাগাম ধরে ময়ূরপুচ্ছশোভিত মুকুট মাথায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন বিশুদ্ধ হিন্দীতে : অর্জুন তুমনে মেরা দিব্য আউর আসলী রূপ নেহী দেখা, অব দেখোগে।

সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাততালিতে মুখরিত হয়ে উঠলো চারদিক। বাস্ ঐটুকুই, শুভ মহরৎ অনুষ্ঠানের জন্যে ঐটুকুই যথেষ্ট। ভক্তবৃন্দ খুশী, গীতার শুরু তো ওখান থেকেই।

পার্লামেন্টে অস্বীকার করেছেন প্রধান মন্ত্রী। জনৈক সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে যোগেশ্বর কৃষ্ণের চিত্রনাট্য রচনায় তাঁর অবদান খুবই সামান্য বলে উড়িয়ে দিলেও মেনে নিতে পারছি না। প্রযোজক জে সি মোহলার এই ছবির সম্বন্ধে বাজারে পাঁচ-মিশেলী গুজব ছিল। রামানন্দ সাগরের ক্ষমতা আছে স্বীকার করতেই হবে তা না হলে রাজধানী থেকে হাওয়াই জাহাজে করে শুধুমাত্র মহরৎ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য তথা ও বেতারমন্ত্রী শ্রীএল কে আদবানী বোম্বেতে ছুটে এলেন কি করে?

মহরৎ-এর কয়েকদিন আগে বিপুলাকার বহু রংয়ে চিত্রিত আমন্ত্রণলিপি দেখে তো

অনুসন্ধান ছবিতে
অমিতাভ আর রাখী

মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। না হলেও বেশ কয়েক হাজার টাকা খরচা করেছেন প্রযোজক শুধু ঐ কার্ড ছাপানোর জন্যে। এক ঝাঁক উজ্জ্বল নক্ষত্রের সমাবেশ মহাভারতের উজ্জ্বল চরিত্রগুলোকে পর্দায় ফুটিয়ে তুলবেন বলে। প্রশস্ত ক্যানভাস। 'যোগেশ্বর কৃষ্ণ'র ভূমিকায় শশী কাপুর, অর্জুন ধর্মেন্দ্র, যুধিষ্ঠির রাজেন্দ্রকুমার, দ্রৌপদী— হেমা মালিনী, রুক্মিনী— সুলক্ষণা পন্ডিত, কর্ণ বিনোদ খান্না, অভিমন্যু ঋষি কাপুর, দুর্যোধন—আমজাদ খান এবং দুঃশাসনের ভূমিকায় প্রেম চোপড়া। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে পরিক্ষীৎ সাহানী, নিরুপা রায়, রাকেশ পান্ডে, তমন্না, রণজিৎ, জয়রাজ, অশোক শর্মা, পায়ল, জানকী দাস ও ওম প্রকাশ থাকবেন বলে মহরৎ কার্ডে উল্লেখ করা হয়েছে। আমন্ত্রণ-লিপি অনুসারে জানা গেল যে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের লেখা 'গীতা ইন মাই ভিউ'-এর পটভূমিকায় এ ছবির চিত্রনাট্য লেখার দায়িত্ব নিয়েছেন ডাক্তার ধরমবীর ভারতী, মনুভাই পাঞ্চোলী হরিন্দ্র দাভে, অমৃতলাল নাগর এবং পরিচালক রামানন্দ সাগর স্বয়ং। এছাড়াও বিভিন্নভাবে যুক্ত থাকছেন বোম্বে চলচ্চিত্র জগতের দিকপাল লেখক কে কে শুক্লা, রাজেন্দ্র কৃষাণ, সুহৃদকর ও সি এল কড়ীশ।

আমন্ত্রণলিপির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী প্রেরিত শুভেচ্ছাবাণী এ ছবির সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগকে আরও বেশী সুদৃঢ় করেছে।

প্রধানমন্ত্রীর প্যাডে লেখা চিঠির হুবহু নকল মহরৎ কার্ডে ছেপে দিয়ে প্রযোজক সন্দেহমুক্ত হতে চেয়েছেন। অনেকে তো ভাবছিলেনই যে মহরৎ অনু-ষ্ঠানে যোগ দিতে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী আসছেন। না প্রধানমন্ত্রী না এলেও কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রচারমন্ত্রী আদবানী সাহেব এসে-ছিলেন। ভীড়ে উপচে পড়ছিলো নটরাজ স্টুডিও। মহরৎ অনুষ্ঠানের আগে ভারতীয় সংস্কৃতি, ধর্ম ও জাতীয় সংহতির স্বার্থে পৌরাণিক গাল গল্পের উপযোগিতা সম্বন্ধে ভাষণ দিলেন মন্ত্রী। সামাজিক ও অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের ছবির পাশাপাশি যাতে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ছবির প্রয়োজনীয়তা বাড়ে সে ব্যাপারে সারগর্ভ ভাষণ দিলেন মন্ত্রী।

ছবির মহরৎ এর আগে পরিচালক রামানন্দ সাগরের অফিস ঘরে একবার সাংবাদিকেরা মন্ত্রী মহোদয়কে ঘিরে নানা ধরনের প্রশ্ন করছিলেন কিন্তু ছোট্টো জায়গার সীমিত পরিসরে অসংখ্য সাংবা-দিককে নিয়ে (বিশেষ করে চলচ্চিত্র সাংবাদিক!) প্রেস কনফারেন্স করার বিরোধিতা করলেন তিনি। তাছাড়া তাঁর অন্যান্য ব্যস্ততাও ছিলো।

সাড়ম্বরে মহরৎ অনুষ্ঠান হয়ে যাওয়ার পর প্রযোজক অনুষ্ঠানে যোগদানকারী সবাইকে প্রধানমন্ত্রী লিখিত 'গীতা ইন মাই ভিউ' বিলিয়ে দিলেন। আট টাকা দামের এই সুচিন্তিত বইটি ঘুরতে থাকলো সবার হাতে। স্টুডিও ক্যান্টিনের ছেলেটার হাত থেকে শুরু করে মন্ত্রী মহোদয়ের হাতেও টকটকে বইখানি দেখলাম। দু' হাজার বই এইভাবে বিনামূল্যে বিতরণ করা হল।

এ ছবি দ্বিভাষিক, হিন্দী এবং ইংরেজীতে তোলা হবে। এ ছবির মহরৎ অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে অন্ততঃ একটা খবরে

ক্যালিক্স® স্যানিটারী ট্যাম্পুন

প্রতিমাসের অস্বস্তিকর পাঁচদিন
আপনাকে সহজ ও নিরিবিলি রাখবে।

বৈশিষ্ট্য :
★ অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের উপযোগী করে প্রস্তুত।
★ ব্যবহারের-পদ্ধতি খুবই সহজ, বেল্ট বা পিন লাগে না।
★ অভ্যন্তরে থাকাকালীন কোন অস্বস্তিকর অনুভূতি থাকে না।
★ প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কোন স্বাভাবিক কারণে পরিবর্তন অনাবশ্যক।
★ অথচ সাধারণ ন্যাপকিনের মতই কার্যকর।
টিউবে এবং বিনা টিউবে পাওয়া যায়।

এজেন্ট চাই

ফেয়ারওয়ে ট্রেডিং কোং
৩৯, শীতলাতলা লেন, কলিকাতা-৭০০০১৯
ফোন : ৩৫-৪১৪৫

নতুন ছবি

ভি শান্তারামের পরবর্তী হিন্দী ছবির নাম 'খাজুরাহো কা স্বপ্নে'। ভি শান্তারাম এ ছবি নিজেই পরিচালনা করবেন। 'ঘরোন্দা'র লেখক ডাক্তার শংকর শেষ এর নাটক অবলম্বনে মধ্য-প্রদেশের প্রসিদ্ধ ও পুরোনো বহু শিল্প শোভামন্ডিত 'খাজুরাহো'র পটভূমিকায় এ ছবির স্যুটিং শীগগীরই শুরু হবে।

পরিচালক শক্তি সামন্ত তাঁর পরবর্তী ছবির জন্যে মিঠুন চক্রবর্তী ও রঞ্জিতাকে চুক্তিবদ্ধ করেছেন। শক্তি ফিল্মসের ব্যানারে এ ছবির কাজ সম্ভবতঃ নভেম্বরে শুরু হবে। আর ডি বর্মণ হবেন এই নতুন ছবির সুরকার।

সেন্চুরী ফিল্মস তাদের 'শিকারী' ছবির নাম বদলে নোতুন নাম রেখেছেন 'মগরুর'। আর সি কুমার প্রযোজিত এ ছবির পরিচালক বাবুজি।

ছবির বিভিন্ন চরিত্রে আছেন শত্রুঘ্ন সিনহা, বিদ্যা সিনহা, প্রেমনাথ, হেলেন, ডাক্তার শ্রীরামলাগু, পেইন্টাল দেবেন বর্মা এবং অন্যান্য আরও অনেকে। এ ছবির সুরকার লক্ষ্মীকান্ত, প্যারেলাল, চিত্রনাট্যকার কে কে শুক্লা এবং সংলাপ লিখেছেন জগদীশ কানওয়াল। আলোকচিত্রশিল্পী আনওয়ার সিরাজ।

একের পর এক পৌরাণিক ছবি হিট হচ্ছে। প্রথমে জয় সন্তোষী মা, তারপর বাবা তারকনাথ (বাংলা) ও এখন অশীষকুমার প্রযোজিত পরিচালিত এবং অভিনীত 'গঙ্গাসাগর'। বোম্বেতে খুব ভালো চলছে ছবিটি।

একদিকে টেস্ট টিউবে নবজাতকের জন্মের খবরে বাজার সরগরম অন্য দিকে পৌরাণিক ছবি দেখবার জন্যে সিনেমা হলের কাউন্টারে সুদীর্ঘ কিউ। সত্যিই অবাক হতে হয়।

কলকাতা থেকে বোম্বেতে হিন্দী ছবি করতে অসছেন অনেকেই। দিন কয়েক আগে বসন্ত স্টুডিওতে কলকাতার নবাগতা প্রযোজিকা শ্রীমতী মহুয়া দের প্রযোজনায় ইন্দ্রনীল প্রোডাকশনের ব্যানারে এক নতুন পৌরাণিক ছবির মহরৎ হয়ে গেল। ছবির নাম ছট মইয়া কী কাহানী (ছট পুজো)। এ ছবির পরিচালক বি এম ব্যাস। মহরৎ অনুষ্ঠানে ক্ল্যাপস্টিক দিলেন পরিচালক প্রযোজক শ্রীআত্মারাম। ভূপেন হাজারিকার সঙ্গীত পরিচালনায় এ ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন মণীশকুমার, গায়ত্রী, পদ্মা খান্না, জীবন, মহীপাল, সাহু মোদক মহুয়া দে ও অন্যান্য আরও অনেকে। চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন জয় সন্তোষী মা খ্যাত পন্ডিত প্রিয়দর্শী, গীতিকার প্রদীপ। আলোকচিত্র শিল্পী পিন্টু দাশগুপ্ত। এই রঙীন হিন্দী ছবিটির মহরৎ-এর পর একটানা পনের দিন স্যুটিং এ সব বিশিষ্ট শিল্পীরাই অংশ নিয়েছিলেন।

খুশী হলাম যে শেষ পর্যন্ত অনেক টানা-পোড়েনের পর বিনোদ খান্না এ ছবিতে পুরোনো শর্ত অনুযায়ী কাজ করবেন বলে জানিয়েছেন। নিঃসন্দেহে ভালো খবর।

আরো একটি মহরৎ—ধরমক'াটা

শুভ মহরৎ অনুষ্ঠানে ক্ল্যাপস্টিক দেওয়ার জন্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অনুরোধ করা হয় অর্থাৎ শুরু থেকেই শো বিজনেস বজায় রাখা। ইদানীং ঐ ক্ল্যাপস্টিক দেওয়াবার জন্যে সকলেই অমিতাভ বচ্চনের কাছে ধর্ণা দিচ্ছেন। শশব্যস্ত অমিতাভ কিন্তু কাউকেই নিরাশ করছেন না, সময় বাঁচিয়ে সব মহরৎয়েই সময় মতো পৌঁছে যান তা সে বড়ো ছবিই হোক আর ছোটো ছবিই হোক, বড়ো অভিনেতা অভিনেত্রী বা ছোটো অভিনেতা অভিনেত্রী যেই হোক না কেন।

সেদিন বাইশে আগস্ট সুলতান আহমেদের ধরম ক'াটার মহরৎ অনুষ্ঠানে হাজির হওয়ার জন্য জি পি সিপ্পীর পরবর্তী ছবি 'শান'-এর স্যুটিং শেষে ক্লান্ত অমিতাভ গাড়ি চালিয়ে সোজা কে আসিফ স্টুডিওতে এসে রাজেশ খান্নার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন কারণ রাজেশকে দিয়েই প্রথম শট নেওয়া হবে। ছবির অন্যান্য শিল্পী রাজকুমার, সুলক্ষণা পন্ডিত রীণা রায় ওয়াহিদা রেহমান ও অন্যান্য সবাই অনেক আগেই স্টুডিওতে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

রাজপ্রাসাদের মতো বিরাট বাংলো। ভিতর একটা সুন্দর ঘরের মাঝখানে প্রতীকি একটা সোনার তুলাদন্ড বা দাড়ি-পাল্লা। সাইলেন্স, মুহূর্তের নীরবতা ভেঙে পরিচালক সুলতান আহমেদের নির্দেশে সুনীল দত্ত ক্যামেরা অন করতেই ক্যামেরাম্যান আর ডি মাথুর সতর্ক হলেন। ক্ল্যাপার বয় অমিতাভ বচ্চন ইউনিটের উদ্দেশ্যে চিরাচরিত প্রথানুযায়ী 'বেস্ট অফ লাক' বলে বললেন 'জয় গঙ্গা মাইয়া' তারপর আস্তে আস্তে ফ্রেমের বাইরে চলে গেলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে সুলতান আহমেদের আগের হিট ছবি 'গঙ্গা কী সৌগন্ধ'-এর নায়ক ছিলেন অমিতাভ বচ্চন।

রাজেশ খান্না আস্তে আস্তে সেই তুলাদন্ডের দিকে এগিয়ে গেলে তার এক-প্রান্তে এক থোকা গোপাল ফুল চাপিয়ে দেওয়ার পর হেলে দুলে ওজন দন্ডটি স্থির হল। তুলাদন্ডের অন্য প্রান্তে রাখা ছিলো একটা ধারালো ছোরা ও কিছু বুলেট। রাজেশ তার সংলাপ আওড়ে গেলেন—শংকর মেরা নাম হ্যাঁয় আউর শংকর কে হম্ কাঁটা মে উঁচ আউর নীচ কুছ নহী হোতা। পরিচালকের 'কাট' শব্দে করতালিতে মুখর হয়ে উঠলো সারা ফ্লোর। মহরৎ-এর পর ঐ স্টুডিওতেই একটানা পনেরো দিনের স্যুটিংও হল। ভারত বি, ভাস্কর লেখা এই গল্পের চিত্রনাট্য লিখেছেন কে বি, পাঠক। সংলাপ লিখেছেন কাদের খান। মজরু সুলতানপুরীর লেখা গানের সুরকার নৌশাদ। এ ছবির দ্বিতীয় ক্যামেরাম্যান সুধীন মজুমদার।

দেবব্রত দত্ত প্রণীত

সঙ্গীত সহায়িকা

১ম ও ২য় খন্ড ৮-৫০ ও ১২-০০ (উচ্চাঙ্গ) ৩য় খন্ড ৭-০০ (রবীন্দ্র প্রসঙ্গ) সঙ্গীত প্রভাকর, সঙ্গীত বিশারদ, সঙ্গীত সুধাকর, প্রাচীন কলাকেন্দ্র ও অন্যান্য উচ্চাঙ্গ এবং রবীন্দ্র সঙ্গীত পরীক্ষার্থী-দের প্রশ্ন-উত্তর সম্বলিত সহায়ক পুস্তক

সঙ্গীত তত্ত্ব—(রবীন্দ্র প্রসঙ্গ) ১ম থেকে ৬ষ্ঠ বর্ষ পর্যন্ত নব পাঠক্রম অনুসারে সমস্ত রাগ ও রবীন্দ্র আলোচনাসহ পুস্তক।

দে বুক ষ্টোর ফোন : ৩৪-৫০৩৫
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক : **ব্রতী প্রকাশনী**
ফোন : ৩৬-২৫৮১
৪৯।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৯

উৎসবে · উপহারে · নিত্যপ্রয়োজনে
বেনারসী · সিল্ক · তাঁত · মিল · ফ্যান্সী শাড়ি
সুটিং · শার্টিং ও পোষাক
শ্রীরাম টেক্সটাইল এম্পোরিয়াম
২৭/২, জি. টি. রোড (সেন্ট্রাল) হাওড়া-১

চলবে না চলবে না

সিনে আর্ট ডিরেকটারস এবং ইন্ডিয়ান মোশান পিকচার এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের এক প্রতিনিধি দল খুব শীগগিরই বোম্বের নগরপালের সঙ্গে দেখা করবেন বলে ঠিক হয়েছে। তারা তাকে শহরের বিভিন্ন বাংলো বাড়িতে স্যুটিং করবার অনুমতি দানে বিরত করতে চান। এই সমস্ত মূল্যবান সুসজ্জিত বাংলো বাড়িগুলোকে বাড়ির মালিকেরা স্টুডিওতে রূপান্তরিত করছেন। এরা এই অভিযোগ মহারাষ্ট্র সরকারের কর্ণগোচরেও আনতে চান।

খ্যাতনাম্না শিল্প নির্দেশক বংশীচন্দ্র গুপ্তের পরিচালনায় গত উনিশে আগস্ট বোম্বের রণজিৎ স্টুডিওতে এই সিদ্ধান্ত নিলেন টেড্ড ইউনিয়নের অ্যাকশন কমিটি।

কমিটির একজন মুখপাত্র কর্মকর্তা জানালেন যে বিগত বহু বছর ধরে বোম্বেতে কম করেও সাতাশটা বাড়ি স্যুটিং-এর জন্যে এক হাজার থেকে চার হাজার টাকায় আর্ট রেন্টা হিসেবে ভাড়া দেওয়া হয়। জুহু ও জীলে পার্লে স্কীমের অন্তর্ভুক্ত এইসব রকমারি বাড়ীগুলো তৈরী হয়েছে সমবায় সমিতির জমিতে। বাংলোগুলো বসবাস করবার জন্যেই তৈরী অথচ অবৈধভাবে বিরাট মুনাফা লুটে চলেছেন কতিপয় ব্যবসায়ী। কমিটি সভ্যরা আরও জানালেন যে জরুরী অবস্থা চলাকালীন আচমকা ইনকামট্যাক্স অফিসাররা ঐ সমস্ত বাড়ীগুলোর আয় ব্যয়ের হিসাব চাইলে কিছু দিনের জন্যে স্যুটিং-এর হিসেব প্রায় শূন্যের ঘরে নেমে এসেছিলো কিন্তু দ্বিতীয় স্বাধীনতায় এদের দৌরাত্ম্য আবার নোতুন করে শুরু হয়েছে। বাংলোতে এইভাবে স্যুটিং চলার জন্য বোম্বের স্টুডিওগুলোর দৈনন্দিন বেতনভোগী সাড়ে চার হাজার শ্রমিক (যার মধ্যে সেট তৈরীতে নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা তিন হাজার) প্রায় বেকার হতে চলেছেন। আর্ট ডিরেকটারদের কাজ বেশ কমে গেছে এবং তার ফলে যারা আর্ট ডিরেকটারদের সঙ্গে কাজ করেন যেমন

মগরুর ছবিতে
শত্রুঘ্ন সিনহা ও বিদ্যা সিনহা

সহকারী আর্ট ডিরেকটার, মোল্ডার কার্পেন্টার এবং ব্যাক-গ্রাউন্ড পেইনটাররাও দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। আর্ট ডিরেকটারদের অন্যান্য বক্তব্যের মধ্যে আরও দুটো বক্তব্য বেশ গ্রহণযোগ্য। (এক) সমস্ত ছবিতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন চাহিদা মেটাতে ঐ একই ঘরগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করার ফলে শিল্পের মান বেশ কমে যাচ্ছে কারণ ব্যবসায়ী বাড়ির মালিকেরা স্মাগলার্স ডেন, কোর্টরুম ইত্যাদি সাধারণ প্রয়োজনীয় সেটগুলোকে পৃথক পৃথকভাবে সাজিয়ে রেখেছেন এবং প্রত্যেক ছবিতেই সেই একই সেট ব্যবহার হচ্ছে। (দুই) অভিনেতা অভিনেত্রীরা স্টুডিওতে অনেক বেশী নো-অপরেটিভ কারণ প্রযোজকের বিরাট ব্যয়ভার সম্বন্ধে সবাই কমবেশী সচেতন তাই সেখানে শিফ্‌ট-এর হিসেবে সবাই কাজ করেন কিন্তু যখন ঐ বাংলো বাড়িগুলোতে স্যুটিং করেন তখন বেশ গাছাড়াভাবে কাজ করেন এবং তা স্টুডিওর ঘন্টার হিসাবে কারণ তাঁরা জানেন বাইরে বাড়ীগুলোতে প্রযোজক যখন খুশী ইচ্ছে মতো স্যুটিং করতে পারবেন কিন্তু স্টুডিওতে তা সম্ভব নয়।

* * *

পঞ্চমদা অর্থাৎ আর ডি বর্মণ সম্প্রতি শক্তি সামন্ত প্রযোজিত ও পরিচালিত জুয়েল থীফ ছবির জন্য ভার্সান 'অনুসন্ধানের' একটা গান রেকর্ড করালেন। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা এ গানে কণ্ঠ দিলেন কিশোর কুমার। দারুণ মজার গানটা। ছবির নায়ক অমিতাভ বচ্চন গানটি গাইবেন এমন এক সিচুয়েশনে যেখানে তার প্রতিদ্বন্দ্বী খল নায়ক আমজাদ খাঁ দুর্গাপুজোর প্যান্ডেলে ঢোল বাজানোর প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে মুখ কালো করে ফিরে যাচ্ছেন রাগ, ঈর্ষায়।

গানের প্রথম দুটো লাইন লিখে জানিয়ে দিচ্ছি—এক কথায় কিশোরদার জবাব নেই।

——বল হরি, হরিবোল,
আরে টেসে গ্যালো,
ফেঁসে গ্যালো কালিরামের ঢোল।

শোনা যাচ্ছে

প্রেমনাথ পাগল হয়ে গেছেন। কিছু দিন আগে তিনি একজন গোল্টম্যানকে জবাব খোলাই দিয়েছেন এবং পরে পুলিশ হাজ বাস করে এখন নাকি কোনো এক নাম হোমে চিকিৎসাধীন। সাধু প্রেমনাথ সত্যি কি এবারে শিব হতে চেয়েছিলেন ?

সুনীল-নার্গিস পুত্র সঞ্জয় দত্ত দেবানন্দের 'দেশ পরদেশ' খ্যাত টিনা মুনিমের সঙ্গে অবাধে প্রেম প্রেম খেলায় মেতেছেন।

বেঞ্জামিন গিলানী ও প্রেমনারায়ণের প্রেমে নাকি ভাটা পড়েছে তৃতীয় ব্যক্তির আগমনে। তৃতীয় ব্যক্তি কি কলকাতার সাতারু নাহিদা আলি যিনি শশী কাপুর প্রযোজিত ও শ্যাম বেনেগলের পরিচালনাধী 'জুনুন' এর নায়িকা ?

বাঃ বেঞ্জামিন তোমার জবাব নে সাঁতার শেখাটাই কি বাকী ছিলো তো শিখে নাও। আরব সাগর পেরোতে তো! চিৎ সাঁতারে না থাক সাঁ দুটো গুলিয়ে ফেলো না কিন্তু।

'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম' দেখবার নাকি দেবানন্দ খুব দুঃখ পেয়েছেন জানি নগ্ন চেহারা পর্দায় দেখে। খুবই স্ব বিক—'তোমার সৃষ্টির চেয়ে তুমি মহৎ।'

জ্যোতিপ্রকাশ

অবিস্মরণীয় নাটকের অসামান্য জনপ্রিয়তা !
৬০০ রজনীর দ্বারপ্রান্তে ০ প্রতি বৃহঃ ও শনি—৬॥টায়/রবিবার—৩ ও ৬॥টায়
তরুণ থিয়েটারে
নাটক-পরিচালনা-সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রেঃ বিকাশ, সত্য, প্রদীপ, সান্তনা, গিরীশ, রবীন, মিহির, সুনীল, নিখিল, শংকর, অরুণ, দীপংকর, উশীনর, শৈলেন, মধু, গণেশ, স্বপন, অলোক, তিমির, পাপিয়া, মিঠু এবং রত্না ঘোষাল ও তরুণকুমার

চিত্রধ্বনি

ম্ভু নিশম্ভু

প্রসাদবাবু, আমি জয় বিজয় ছবির প্রযোজক-পরিচালক এল ভি প্রসাদের কথা বলছি, ভারি সিরিয়াস মেজাজের লোক। ছবির শুরুতেই তিনি আমাদের ধ্যানের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে অবহিত করেন। ইংরেজিতে বর্ণনা করেন তাঁর ইতিহাস চেতনা। সমস্ত হলে তখন রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা, সকলের মনে কি হয়, কি হয় ভাব। এরই মধ্যে ভাবগম্ভীরভাবে প্রসাদবাবু আসল খাপটি খোলেন।

তিনটি রাজ্যের রাজারা কোনকালে তাঁদের সম্পদ সুরক্ষিত রাখবার জন্য মিলিতভাবে তা একটি গুপ্তস্থানে রেখে-ছিলেন। কি করে হেঁয়ালি ভিড়িয়ে সেই লুকোনো মণিমাণিক্য উদ্ধার করা হল, তাই নিয়েই গল্প। ঠিক আছে, রাজারা তো গুপ্তধন পেলেন, প্রসাদবাবুও কামিয়ে নিলেন বেশ কিছু, কিন্তু আমরা কি পেলাম ?

সবুর করুন। বলছি। তার আগে আপনাকে সরল পাটিগণিতের একটি প্রশ্ন : সবশুদ্ধ তিনটি রাজ্য আছে। এক রাজ্যের রাজার দুই ছেলে। তাহলে অন্য দুই রাজার সন্তান সংখ্যা কত এবং তারা ছেলে না মেয়ে ? পারলেন না তো। এই সব জটিলতা হিন্দী সিনেমা না দেখার কুফল। উত্তর আছে দুজন এবং দুজনেই মেয়ে।

এসব অনেকদিন আগের কথা। তখন ইস্কুল কলেজ ছিল না আর এখনকার জ্যোতিষবাবুর মতন তখনকার মুখ্যমন্ত্রীরা অত গুণ্ডা দমন নিয়ে ভাবতেনও না সুতরাং বড় ভাই বয় (জীতেন্দ্র) অক্লেশে ডাকাত হয়ে গেলেন। নায়ক ডাকাত হলে কারুর ভালো লাগে ? অগত্যা মঞ্চে এলেন দ্বিতীয় রাজ্যের মহারাণী রীনা রায়। ইনি থাকেন নৈতিকভাবে সম্ভবত ইউটোপিয়ান সোসালিস্ট। সেইজন্যে অসুর মর্দনে কোন সহজ পন্থা নিলেন না; খালি একটু প্রেম দিলেন। প্রেমের সময় তিনি অবশ্য রাণী হওয়া সত্ত্বেও শিস দিয়েছেন ও মেরেছেন। সেটা কিন্তু দোষের নয়, সঙ্গে বাবা মারা গেলে মেয়েরা ওরকম করে থাকেই।

কাশীর বেগুনের মতো ফর্সা মুখ নিয়ে ছোট বিজয় ও (প্রেমকিষণ) ততক্ষণে নেমে পড়েছেন। তিনি বড় ভাইয়ের মাজমারিতে চোট পেয়ে তৃতীয় রাজকন্যার (বিন্দিয়া গোস্বামী) সুস্থ হলেন। এখানে প্রসাদবাবু সিচুয়েশনের একটি বড় ত্রুটি সংশোধন

বাঁণা বাব

করেছেন। দুর্গেশ নন্দিনীতে এস্থলে জগৎ সিংহ আয়েষাকে দেখে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। প্রেমকিষণ কিন্তু মোটেই আনস্মার্ট হন নি। উপরন্তু রাজকুমার জগৎ সিংহের দোষ যে তিনি নাচতে জানতেন না। রাজকুমার প্রেমকিষণ এখানে একটি অপরূপ নৃত্য দেখিয়েছেন। হায় ! বঙ্কিম-বাবু আজ বেঁচে নেই থাকলে প্রসাদবাবুকে কত না আদর করতেন।

এই সিনেমার সঙ্গীত পরিচালকের নাম রাজেশ রোশন। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সুজিতকুমার, রূপেশকুমার, ঊর্মিলা ভাট, জয়শ্রী টি প্রভৃতি।

মঞ্জুর মুখোপাধ্যায়

স্টুডিও খবর

জয়পুর - দিল্লী - আগ্রা - ঝুন-পুর ঘুরে তনুশ্রীশংকর হয়ত আজ ফিরে এসেছেন হিন্দুস্থান পার্কের বাড়িতে। ঘর গোছানোর কাজে ব্যস্ত বুঝিবা। গেরস্থালির কাজ সামাল এখনও কিন্তু তিনি নিয়মিত নাচছেন। স্বামী আনন্দ শংকরের সঙ্গে নাচ-গান দুটোই চলছে। কলামন্দির-রবীন্দ্রসদন-বিদ্যামন্দিরে অনুষ্ঠান তো লেগেই আছে।

ওঁদের অডিও-ভিস্যুয়াল অনু-ষ্ঠানটিতে আনন্দশংকরের সঙ্গীত যেমন শোনার মত তনুশ্রীর নাচও তেমন দর্শনীয়।

'স্বাতী' ছবির পর আর তাঁকে দেখা যাচ্ছে না। কোন ছবিতে তিনি অভিনয় করবেন এমন খবরও নেই। অথচ 'স্বাতী'তে ভালো কাজ করেছেন। প্রযোজকদের এগিয়ে আসা উচিত ওঁর কাছে। ব্যাপারটা কি?

প্রশ্ন করায় জানতে পারলাম তনুশ্রী নিজেই নাকি ছবিতে কাজ করতে তেমন ইচ্ছুক নন। ভালো ছবি আর ভালো পরি-চালক না পেলে তিনি কাজ করবেন না। এটা তাঁর 'ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা'। বেশ কয়েকজন প্রযোজক এসে তাই ফিরেও গেছেন।

তনুশ্রীর প্রথম ভালবাসা হল নাচ। এখন সেকেজেই ব্যস্ত তিনি। সুতরাং ছবিতে কাজ না করলেও উনি বললেন—'আজেবাজে ছবিতে কাজ করে নিজের সুনামটুকু নষ্ট করে লাভ বলুন? তার চাইতে কাজ করবো না। সেই-ই ভালো।'

•

লোডশেডিং-এর অত্যাচারে তিতি-বিরক্ত হয়ে দেবদাস এখন চলে গেছেন বীরভূমে। লাল মাটি আর খোয়াইয়ের তেপান্তরে পার্বতী আর দেবদাস চিত্র-নাট্যের সংলাপ বলে যাচ্ছেন। চলনে ভঙ্গিতে তাঁদের পরিচালক দিলীপ রায়ের কথা মেনে চলতে হচ্ছে।

মাছধরা ছিপের বঁড়শিটা দিয়ে পার্বতীর কপালে প্রেমের সেই চিহ্নটুকু এঁকে দেওয়া তখনও হয়ত হয়ে ওঠেনি, কিন্তু দেবদাসের নৃত্য দৃশ্যটি নাকি অলরেডি সেলুলয়েডে তুলে নিয়েছেন।

দৃশ্যটা এইরকম—

দেবদাস অচেতন অবস্থায় একটি গাছের তলায় শুয়ে। মৃত্যু হতে আর বেশি বাকি নেই। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে গ্রামের উৎসুক কিছু মানুষ। নানা মন্তব্য চলছে।

পরিচালক দিলীপ রায় গলায় ঝোলানো শোমাটা বারবার চোখে লাগিয়ে ক্যামেরা দিয়ে দেখছেন কম্পোজিশন ঠিক আছে কিনা।

সৌমিত্র চ্যাটার্জি মানে দেবদাস গাছ-তলায় শুয়ে অভিনয়ের রিহার্সাল দিলেন দু-তিনবার।

শুরু হল টেকিং।

এবার দেবদাসের কিঞ্চিৎ জ্ঞান ফিরেছে। হাত বাড়িয়ে জল চাইছে সে। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে বলছে জল.....একটু জল। ভিড়ে দাঁড়ানো একটা ছোট্ট ছেলে বাবার হাতে টান দিয়ে বলল—'বাবা, লোকটা জল চাইছে এনে দেবো।'

বাবা অমনি ধমকে ওঠেন ছেলেকে। 'দেখছিস না বামুনের ছেলে, আমরা জল দেব কি করে।' শেষ সময়ে এক ফোঁটা জলও পায় না দেবদাস। অপরাধ সে ব্রাহ্মণ।

পার্বতীরও অসার উপায় নেই। খিড়কির দরজায় এসে দাঁড়িয়েও সে বাইরে বেরোতে পারেনি। পরিচালক তাঁকে ফিরে করে আটকে দিয়েছেন।

দিলীপ রায় জানিয়েছেন—'অল্পের সময়ের উপযোগী করেই তিনি 'দেবদাস' করছেন। ফিল্মের ভাষা এবং দর্শকের মান-সিক বদলের দিকে লক্ষ্য রেখেই কাজ করে যাচ্ছেন। দেখা যাক।

০ ০ ০

ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল সম্ভবতঃ আসাম ভবনের এক অনুষ্ঠানে। তাও ক্ষণিকের পরিচয়। হয়তোবা তিনিও ভুলে গেছেন।

কিছুদিন ধরেই শুনছিলাম প্রমথেশ বড়ুয়ার ছেলে দেবকুমার বড়ুয়া বাংলায় ছবি করবেন। সেদিন সাক্ষাতে আর জিজ্ঞাসা করা হয়নি। সম্প্রতি খবর পেলাম সত্যিই তিনি ছবি করতে চলেছেন।

গত ৮ সেপ্টেম্বর টেকনিসিয়ানস স্টুডিওর স্কোরিংয়ে গান রেকর্ডিং-এর অনুষ্ঠান ছিল। প্রায় সারাদিন ধরে দুটি গান রেকর্ড করা হয় সেদিন। দিলীপ গাঙ্গুলীর সুরে গান দুটি গাইলেন অরুন্ধতী হোম চৌধুরী, গোরাচাঁদ মুখার্জি ও জলি বিশ্বাস।

জানা গেল পদ্ম নামে এক বন্ধ্যা নারী এই ছবির কেন্দ্র-চরিত্র। দেশের প্রতীক। শহুরে প্রলোভনের খাঁচায় গ্রাম্য সরলতা কিভাবে আটকে পড়েছে সেই কথা বলার জন্যই দেববাবু এই ছবি করছেন। এবং এই খাঁচা ভাঙার শপথও সোচ্চারিত হবে ছবিতে। স্বভাবতঃই ছবির নাম রাখা হয়েছে 'খাঁচা'।

প্রধান দুটি চরিত্র নতুন দুজন শিল্পী করবেন—তনুশ্রী ঘোষাল ও সরণ চ্যাটার্জি। স্যুটিং এ মাসে নয়, সম্ভবতঃ আগামী মাসে শুরু হবে।

দেববাবুর এটা প্রথম ছবি নয়, দ্বিতীয় ছবি। প্রথম ছবিটি তিনি করেছিলেন ডাবল ডার্সানে বাংলা এবং অসমিয়ায়—নাম: 'নিশি কাঁদে'। জানি না ছবিটা আমরা দেখতে পাব কিনা!

প্রমথেশ বড়ুয়া বাংলা ছবির প্রাণভোমরা একটি লিজেন্ড। সে চল্লিশের দশকে বাংলা ছবি তাঁর পায়েই ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমন প্রতিভার বংশধর আমাদের নিশ্চয়ই নিরাশ করবেন না।

—নির্মল ধর

ইউ টি জি'র—যুদ্ধ জাহাজ

বোতলের লেবেল কাউকে মাতাল করে না, তেমনি ঝাগজের বিজ্ঞাপনও। বরং বিপরীত ঘটবার সম্ভাবনা বর্তমানে বেশী। গত কয়েক বছর ধরে কলকাতার থিয়েটারে যে অবাস্তব বিপ্লব দৃশ্য সকলকে দেখতে হচ্ছে তাতে বিপ্লবী পোস্টার বা নাম থিয়েটারের ক্ষেত্রে কারও আশা জাগায় না। বরং ভয় হয়। এইরকম আশংকা নিয়েই দেখতে গিয়েছিলাম 'ইউ টি জি'র প্রয়োজনায় 'যুদ্ধ জাহাজ'। কিন্তু নাটক শুরু হওয়ার দশ মিনিট টের মধ্যে মনে হল কিছু একটা ঘটছে, কিছু একটা ঘটতে পারে। এরপর গা-এলানো ছেড়ে চেয়ারে সোজা হয়ে বসে থাকতে হয়েছে বাকি সবটা সময়। বিরতিহীন এই নাটকে অন্যমনস্ক হওয়ার আর সুযোগ পাওয়া যায় নি।

'যুদ্ধ জাহাজ'এর মূল কাহিনী রচনা ভ্রিসু ল্যাভরেনিয়াভ'এর। বাংলায় নাটকটি লিখেছেন 'অমল মজুমদার'। এঁরা দুজনেই দর্শকের কাছে বহুদিন ধন্যবাদার্হ হয়ে থাকবেন এমন একটি সংবেদনশীল নাট্য-কর্মের জন্য। অমলবাবু অনুবাদের সময় সূক্ষ্ম দিকগুলোতেও নজর রেখেছিলেন যা সচরাচর বিরল। যেমন সৈনিকরা যখন ক্যাপ্টেনকে একযোগে প্রতিবাদ জানায় তখন তাদের মুখে বসান হয় শুদ্ধ বাংলা ঈষৎ গুরুগম্ভীর আর ক্যাপ্টেন তখন বিস্মিত হওয়ার জন্য করে বলেন 'একি আমার সৈন্যরা এতো ভালো রুশভাষা শিখল কবে থেকে'। এরকম অনুপুঙ্খ কাজ ছড়িয়ে আছে প্রায় সমস্ত নাটকেই।

নির্দেশনায় তেমনি সজাগ ছিলেন 'অরুণ চট্টোপাধ্যায়'। প্লাতো এবং এ্যালেক্সএর কথোপকথনের মধ্যে যখন মেশিনগান চালিয়ে প্রথম খুনী হওয়ার দৃশ্যের স্মৃতি আসে সেই মুহূর্তটির পরিকল্পনা, ক্যাপ্টেনের 'দেশ বিপন্ন' কথা-গুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার বা 'গুলি খেয়ে পড়ে যাওয়ার সময় ব্যাসেলির হাতের টানে যুদ্ধজাহাজের পতাকা নেমে আসা এরকম অনেক অংশই একজন সম্ভাবনাময় নির্দেশকের প্রমাণ। এবং অরুণবাবুর যথেষ্ট সংযম যে তিনি শেষ দৃশ্যে একেবারে বিপ্লব ঘটিয়ে দেন নি। প্রাথমিক পর্বে সৈনিকদের বা ইঞ্জিনিয়ারের এই মধ্যবিত্ত প্রতিবাদ যে শেষ পর্যন্ত শুধু দু-একটি অচিহ্নিত মৃত্যুতেই সীমায়িত হয়ে থাকে সে বোধ তাঁর ছিল। সামগ্রিক বিপ্লব নয়, এ নাটকের ক্যানভাসে শুধু আসন্ন চেতনার ইঙ্গিত সম্ভব যা পরবর্তী মানুষদের মনে দেশলাই কাঠির কাজ করবে আর সেইটুকুই তিনি দেখিয়েছেন, দিমিত্রি সেখানে যুদ্ধ জাহাজ-এর চিমনি সাফে তার অনিচ্ছার কারণ জানাতে গিয়ে এক যুদ্ধ জাহাদের ক্যাপ্টেনের আচরণের কথা বলতে বলতে বিবর্ণ মুখে মাঝপথে থেমে যায় সেখানেও নির্দেশকের সংযত রুচিবোধের নির্দশন পাই আমরা। কেবল 'দিমিত্রি'র নাচের অংশটা অতিরিক্ত মনে হয়েছে যা স্বচ্ছন্দে বাদ দেওয়া যায়।

তবু একটি নাটকের প্রধান ভর

সুনয়নী ছবিতে রাঙ্কম ঘোষ

রাখতে হয় তার অভিনয় সম্পদে। ইউ জির অভিনেতারা অনভিজ্ঞত বিচ্ছিন্নভাবে ভালো অভিনয় করেছেন কিন্তু কেউই প্রায় একটি সংহত চরিত্র নির্মাণ করতে পারেন নি। অবশ্য নাটকের দাবীতে স্বাভাবিকভাবেই অনেকটা মানি গেছে 'শ্যামল দাস'এর জুকভ'। 'দেবাঞ্জ সুর'এর প্লাতো এবং 'প্রবীর এ্যালেক্স'ও সুন্দর, কিন্তু দাসশর্মা শত চেষ্টা করেও তাঁর সুলভ চালচলন লোপন করতে পারেন নি ফলে এমনিতে চলনসই অভিনয় সত্ত্বেও কিশোর বালক 'দিমিত্রি' হিসেবে তাঁকে মানায় নি বহু সময়। সুশান্ত দাঁ 'আয়ান' চরিত্র সামান্য বাড়াবাড়ি করলেও তাঁর উপর ততটা রাগ হয় না। কারণ সবচেয়ে ভয়ের জায়গা অন্যত্র। কাঠের হাতওয়ালা নৃশংস যুদ্ধবাজ ক্যাপ্টেন 'তপন মজুমদার' ঘোরাফেরায় বিশ্বস্ততা আনলেও অভিনয়ে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। বিশেষত গলা বাজখাঁই করতে গেলে তাঁর কথা বোঝাই যায় না। আশাকরি আগামী দু'একটি অভিনয়ের মধ্যেই ইউ টি জি এইসব ত্রুটি সংশোধনের আপ্রাণ চেষ্টা করবেন।

নাটকের নেপথ্যাস্থিত কুশীলবদের মধ্যে নাট্যকারও নির্দেশকের কথা আগেই বলেছি। তবু আরো দু-একজনের কথা না বললে এ লেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। প্রদীপ দাশগুপ্ত কৃত সঙ্গীত এবং মৈনা চৌধুরীর আলো দুইই নিখুঁত। শুধু প্রথম খণ্ডে দৃশ্যাংশের পরেই মঞ্চে যে উপকরণ সংস্থাপনের কিয়া অন্ধকারে সারার সঙ্গত চেষ্টা হয়, তা মঞ্চের ডানদিকের দ্বিতীয় উইংস-এর ধার ঘেঁসে আস সম্ভবত প্রম্পটারে হাতের আলোয় বিঘ্নিত হয়েছিল। অবশ্য তার কিছু পরেই গভীরে যখন দেখা গেল। শু পরিকল্পিত বিশাল যুদ্ধ জাহাজ'এর রূপ তখন সে সামান্য ত্রুটি নির্দেশ কেটে গিয়েছিলেন।

সুরজিৎ ঘো

যাত্রা সংবাদ

সত্যান্বর অপেরা

শৈলেশ গুহ নিয়োগী রচিত ও প চালিত 'পাহাড়ী ফুল' নিয়ে দলের উ হয়ে গেছে। অন্য পালা 'সংগ্রাম' ও চরিত্রে থাকবেন—সিরাজ মুখার্জি, ভট্টাচার্য, মাখন সমাদ্দার, মন্ত্র রাজেন ভট্টাচার্য ও কুমার শঙ্ক ২৩৮৪তে অভিনীত সাড়া জাগানে ঝুমুরও আসরস্থ হবে বলে শোন

শ্রীনাথ নট্ট কোম্পানী

সুদর্শন ও প্রখ্যাত নট স্বিজ এবং স্বনামধন্যা অভিনেত্রী কল্যাণী জোট বেঁধে অভিনয় করবেন মুখার্জি নির্দেশিত ঝিনের বন্দী ও

শিশিরকুমারের অমিয় নিমাই চরিত। দুটি পালার রিয়াসাল ও বায়না টুটিয়ে চলছে। বিভিন্ন বিশিষ্ট চরিত্রে দেখা যাবে তাপস কুমার, সুখরঞ্জন সরকার, বন্দনা দেবী ক্ষমা ভট্টাচার্য ও ইন্দিরা দে এবং শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

আজব নগরীতে জনতার সরকার

'আজবনগরীতে স্বৈরতন্ত্রের পতনের পর প্রতিষ্ঠিত হল জনতার সরকার, কেমন-ভাবে তাই দেখানো হল পিপলস থিয়েটার প্রযোজিত 'অবতার' নাটকে; যদিও নাটকের অধিকাংশ সময়ই ছিল নাচগান আর হাসির সংলাপে ভরা। এবং এইসব ক্ষেত্রে নাট্যকার ও প্রয়োগপ্রধান ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সফল। কিন্তু যখনই এসেছে নাটকে রাজনৈতিক সংলাপ, তখনই নাটামঞ্চ মুহূর্তে রূপান্তরিত হয়েছে রাজনৈতিক মঞ্চে। শিল্প রাজনীতি তথা সমাজ বহির্ভূত নয় যেমন, তেমনই সজাগ থাকা প্রয়োজন যে, কোনো বক্তব্য উপস্থাপিত করা সত্ত্বেও গোটা ব্যাপারটি যেন শিল্পিত হয়ে ওঠে—অন্যথায় শিল্পীর সঙ্গে রাজনৈতিক নেতার কোনো ফারাক থাকে না। ধীরেনবাবু এই বিশেষ দিকটা সম্পর্কে দেখলাম উদাসীন।। তাই এই নাটকের 'অবতার' নামক মুখ্য চরিত্রটির সংলাপ হয়ে উঠেছে পুরোপুরি বক্তব্যধর্মী এবং এই কারণেই এই চরিত্রের অভিনেতা সুনীল মালাকার চিহ্নিত হয়ে গান নেতা হিসেবে। কিন্তু এই নাটকে যে অসংখ্য ছোট ছোট চরিত্র আছে, যাদের মুখে আছে উপভোগ্য সংলাপ,—সেক্ষেত্রে নাট্যকার সিদ্ধহস্ত। তাঁর সৃষ্ট 'মহারাজা' চরিত্রটিকে ইতিপূর্বে আমরা অসংখ্য নাটকে। যাত্রায় দেখেছি এবং এই চরিত্রের অভিনেতা শৈবাল গুপ্ত অভিনয়ের যে টাইপটি বেছে নিয়েছেন তাও অতি পরিচিত এবং কঠিন। কিন্তু এই কঠিন বিষয়টি দেখলাম শৈবালবাবুর আয়ত্তাধীন। প্রশংসনীয়ভাবে তিনি আমাদের সিরিও-কমিক অভিনয় উপহার দিয়েছেন। অন্যান্য চরিত্রসমূহের মধ্যে সজল পাল, অরবিন্দ দাস, উৎপল চক্রবর্তী ও রতনকুমার চক্রবর্তীর অভিনয় উল্লেখ-যোগ্য। মরনা ও মোক্ষদার ভূমিকাভিনেত্রী যথাক্রমে লক্ষ্মী হালদার ও বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম জনের অভিনয়ে যথেষ্ট দুর্বলতা ছিল।

এই নাটকের মূল্যবান সম্পদ হল নৃত্য সহযোগে গান। বাবলু গুহ ও শংকর চক্রবর্তী দুজনেই মন মাতানো গানে ও নাচে সকলকে আবিষ্ট করে রাখেন। উভয়েই প্রশংসার্হ। রঙীন আলোর ব্যবহার সামগ্রিক প্রয়োজনার সঙ্গে মানিয়ে যায়।

নির্মলকুমার দাস

রাধিকানন্দ সম্প্রদায়ের নাট্যার্ঘ

গত ২৩শে এপ্রিল মঞ্চে থিয়েটারে রাধিকানন্দ সম্প্রদায়ের সাড়ম্বর উদ্বোধন

মেরা রক্ষক ছবিতে রামেশ্বরী এবং অভি ভট্টাচার্য

সুসম্পন্ন করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত। সর্বশ্রী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, দেব-নারায়ণ গুপ্ত, কানু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ফালকে পুরস্কার বিজয়ী প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক নীতিন বসুকে ঐদিন সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর রঙনায় রাধিকানন্দ সম্প্রদায়ের প্রাথমিক প্রচেষ্টায় অভিনীত হবে রসরাজ অমৃত-লালের প্রখ্যাত নাটক বিবাহ বিভ্রাট। নাটকটি ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের রচনা। এই নাট্যানুষ্ঠানটি শহরের বিভিন্ন নাট্যমঞ্চে তাঁরা প্রদর্শনের আশা রাখেন।

ভুলি কেমনে আজও যে মনে

বাংলা রাগপ্রধান গানের ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছেন যাঁরা কাজী নজরুল তাঁদের একজন। আঞ্চলিক গানের সুরকেও নজরুল অনায়াসে গ্রহণ করেছিলেন। নজরুলের গান তাই অনেক ব্যাপক, অনেকটা স্বাধীন। নজরুলের গানের জনপ্রিয়তা দীর্ঘদিনের। এবং মাঝে একটু ভাটা পড়েছিল। সম্প্রতি নজরুল গীতির চর্চা আবার বেড়েছে। রবীন্দ্রনাথের গানের মোট সংখ্যার শ্বিগুণ গান নজরুল রচনা করেছেন। তাঁর প্রায় সাড়ে তিন হাজার গানের মধ্যে কয়েকটি মাত্র গানের সুর দিয়েছেন অন্যরা। নজরুলের গানের কাব্যগুণ নিয়ে 'মার্জিত রুচির' বাঙালীর মধ্যে বিতর্ক আছে। তবু নজরুল-গীতির জনপ্রিয়তা অস্বীকার করা যায় না। নজরুল নিজেই ছিলেন গায়ক। প্রাণখোলা খেয়ালী কবি-গায়ক-সুরকার নজরুল নানা তাগিদ আর চাহিদা মেটাতে অবিরাম গান করেছেন। সুর বৈচিত্র্য আর গায়কদের কণ্ঠকে প্রচুর চলাফেরা করার সুযোগ তিনি রেখে-ছেন তাঁর গানে।

এবারের নজরুল জয়ন্তীতে পঞ্চাশটি গানের রেকর্ড প্রকাশ করেছেন ইনরেকো রেকর্ড কোম্পানী। এর মধ্যে বারোটি পুরনো গানের রেকর্ড সংকলিত হয়েছে 'দি বেস্ট অফ নজরুল' নামে এল-পি ডিস্কে। অপর একটি এল-পি ডিস্কে দশটি গান গেয়েছেন ফিরোজা বেগম। আর পৃথক সাতটি ই-পি ডিস্কে গেয়েছেন ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, সুপ্রভা সরকার, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, পূরবী দত্ত, সুকুমার মিত্র, ধীরেন বসু ও সনৎ সিংহ।

বাংলা গানের জগতে নজরুলগীতির একটি সুনির্দিষ্ট স্থান আছে। সম্প্রতি নজ-

প্রিয়তাও বেড়েছে। তার প্রমাণ এবারের নজরুল জয়ন্তীতে একটি রেকর্ড কোম্পানীই ৫০টি গান উপহার দিয়েছেন নজরুলগীতি প্রেমিকদের।

দি বেস্ট অফ নজরুল এল-পি ডিস্কের বারোখানি গানই সকলের শোনা। শচীনদেব বর্মনের চারটি অনবদ্য গান, 'চোখ গেল', 'মেঘলা নিশিভোরে', 'কুহু কুহু কোয়েলিয়া' আর 'পলাশ ঢেউরে' এই রেকর্ডের অন্যতম আকর্ষণ। আর আছে দেবব্রত বিশ্বাস, সুপ্রভা সরকার, ধীরেন বসু ও পূরবী দত্তের ছটি করে গান। সুপ্রভা সরকারের 'ভুলি কেমনে' আর 'কাবেরী নদীজলে কে গো' পুরনো দিনের কথা মনে করিয়ে মনে করিয়ে দেয়।

অপর এল পি ডিস্কটির 'অপরূপা ফিরোজা বেগম। সব কটি গানই নতুন করে রেকর্ড করা হয়েছে। ওঁকে বহু পুরস্কৃত দু-একটি গানও এতে স্থান পেয়েছে। 'মদির স্বপ্নে মম মনবনে', 'ভীরু এ নয়ন করি' পথ চলিতে যদি হঠাৎ', 'আমি তার নূপুরের ছন্দ' এবং অন্যান্য গানগুলিতে ফিরোজা বেগম তাঁর স্বভাবসিদ্ধ দক্ষতায় নজরুলগীতির পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। ফিরোজা বেগমের গানে যে একটি খোলা ও সহজ ভঙ্গী আছে তা এই গানগুলিতেও প্রকাশিত। গানের রেকর্ডিং প্রশংসনীয়।

ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের চারটি গান—ফুলের জলসার নীরব কেন কবি, কথা কও কও কথা—পুরনো গান যেন নতুন রূপে প্রকাশিত।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে নজরুলগীতি শোনার সুযোগ করে দিয়েছেন ইনরেকো কোম্পানী। কেন মেঘের ছায়া, মধুর নূপুর রুনঝুনু বাজে, কেঁদে যায় দখিন হাওয়া, বোলো না বোলো না ওলো সই চারটি গানেই প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রোতাদের তৃপ্তি দিতে পারবেন।

সুপ্রভা সরকারের কণ্ঠে নজরুলগীতি সহজেই প্রাণ পায় তার প্রমাণ 'আসিবে তুমি জানি', 'ছল ছল নয়নে', 'কাণ্ডারী গো কব কব পার' আর 'খেলা শেষ হোলো' গান-চারটি।

পূরবী দত্ত চারটি গান সমান দরদ দিয়ে গেয়েছেন। 'পলাশ মঞ্জরী', 'প্রিয় সাই যাই', 'আধো রাতে যদি' আর 'আজো ফাগুনে' চারটি গানই নজরুলগীতির রীতির বিচারে প্রশংসনীয়।

সুকুমার মিত্র আর ধীরেন বসু দুজনেই প্রতিষ্ঠিত গায়ক। সুকুমার মিত্রের চারটি গান—'কেন উচাটন মন পরাণ', 'বকুল চাঁপার বনে', 'পেয়ে কেন নাহি পাই', 'এল ঐ বনান্তে'—খোলা গলায় দাপটে গাওয়ার ফলে সুখশ্রাব্য। ধীরেন বসুর মিষ্টি ও দরদী গলায় গেয়েছেন 'আরো কতদিন বাকি' 'চেয়ো না সুনয়না', 'জানি জানি প্রিয়', 'পদ্মহারা পাখী'।

সনৎ সিংহ চারটি হাসির গান গেয়ে প্রমাণ করেছেন যে তিনি একজন যথার্থ শিল্পী। 'ওরে হুলোরে তুই', 'উল্টা বুঝলি রাম', 'আমার খোকার মাসি', 'আমার হরিনামে রুচি'—সকলেরই ভাল লাগবে।

সুবোধ বসু

সুর মূর্ছনা

সুর মূর্ছনার প্রযোজনায় প্রতিধ্বনি এবং সংবর্ত গোষ্ঠী যৌথভাবে কলামন্দিরে বাইশ আগষ্টের সন্ধ্যায় এক রমরমা অনুষ্ঠান করলেন। উদীয়মান সঙ্গীত শিল্পী, নৃত্য-শিল্পী এবং অভিনেতা - অভিনেত্রীদের ব্যাপকভাবে পরিচিত করে তোলাই হল সুর-মূর্ছনার প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠানটির আয়োজন হয়েছিল। 'প্রতিধ্বনি' গোষ্ঠী সলিল চৌধুরী এবং ভূপেন হাজারিকার গান গাইলেন ছটি আটজনের সম্মিলিত কণ্ঠে, কখনো দ্বৈত কণ্ঠে। সমবেত সঙ্গীতে অংশ নেন অশোক দত্ত, নন্দন দাশগুপ্ত, পার্থ সেনগুপ্ত, মধুশ্রী দত্ত, মধুরিতা দত্ত, অমৃতা দত্ত, কবিতা নন্দী প্রভৃতি এঁদের মধ্যে অশোক দত্তর গলায় ভূপেন হাজারিকার দুটো গান অসাধারণ লাগল। সংবর্তর অনুষ্ঠান ছিল 'আলোর পাখি'—নৃত্যালেখ্য। রচনা ও নির্দেশনায় সুনীল দাশ। রূপকধর্মী আলেখ্যর বিষয়বস্তুগত বক্তব্যে বক্তব্যবর্জীর আভাস কখনো সখনো ছায়াপাত ঘটায়। কিন্তু পরিকল্পনা ও প্রয়োগরীতি অভিনব। মুখ্য বালকের ভূমিকায় ছিলেন রুমকি রায়। অনবদ্য তাঁর নৃত্যকৌশল। দর্শকদের মন ভরিয়েছেন তিনি। আর ভাল লাগল পাখিবিক্রেতার ভূমিকায় সুভাশিস ভট্টাচার্যর নাচ। বেশ মানিয়েছেন তাঁকে। এছাড়া সম্মিলিত নৃত্যে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের কাজও ভাল হয়েছে।

অমল আচার্য

এক আসরে তিন গীতিকার

রবিবার ১০ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ কলকাতার বিড়লা আকাদেমীর প্রেক্ষাগৃহে একটি অভিনব গানের আসরের ব্যবস্থা, পরিচালনা ও অংশগ্রহণ করেন স্বনামধন্য সঙ্গীতশিল্পী সশিষ্য শ্রীমতী মঞ্জু গুপ্ত। সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় সুরু মোট তেইশটি গানের—তার মধ্যে শেষ তিনটি মঞ্জু দেবীর গাওয়া অনুষ্ঠানটি দু'ঘন্টা ধরে শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল। অনুষ্ঠানের শুরুতে মঞ্জু দেবীর পক্ষ থেকে শ্রোতাদের স্বাগত জানিয়ে তাঁর স্বামী শ্রীঅসিত গুপ্ত বলেন যে ছোটবেলা থেকে মঞ্জু দেবী স্বয়ং দিলীপ রায়ের অর্থাৎ কবিপুত্রের কাছে দ্বিজেন্দ্রগীতি, অতুলগীতি ও দৈলিপী গান শিখেছেন এবং তাঁর নিজের ছোট পিসিমা বিখ্যাত সঙ্গীত বুলবুল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও অতুলপ্রসাদের স্নেহধন্যা ইন্দুবালা দেবীর কাছে এইসব রচয়িতাদের গান শিখেছেন, গেয়েছেন ও শিখিয়েছেন। তবে তাঁর শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একই আসরে বসে এবং তিনজন বিখ্যাত গীতিকারদের গান একই আকারে পরিবেশন করার পরিকল্পনা তাঁর এই প্রথম বলা যায়।

মঞ্জু দেবী ছাড়া একক ও সম্মেলক সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন শিখা বসু, শ্যামলী সেন, তন্দ্রা পাল, রেবা মজুমদার, ঝর্ণা দত্তরায়, অমিয়াংশু মুখার্জি এবং অর্ঘ্য সেন।

'পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে' গানটি দ্বিজেন্দ্রগীতি পর্যায়ে সম্মেলক কণ্ঠে গীত হবার পর একক কণ্ঠে পরপর দ্বিজেন্দ্রগীতি পরিবেশন অমিয়াংশু মুখার্জির কণ্ঠে 'সে কেন দেখা দিল,' রেবা মজুমদারের কণ্ঠে 'আজি আমার কাছে,' তন্দ্রা পালের গাওয়া দুটি গানের মধ্যে 'তোমারে ভালবেসেছি,' গানটি শিখা বসুর গলায় 'নীল আকাশে অসীম ছেয়ে' এবং অর্ঘ্য সেনের কণ্ঠে 'ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে' গানগুলি প্রশংসার দাবী রাখে। তবে অর্ঘ্য সেনের গানে ভাবের কিন্তু অভাব ঘটেছিল যেটি তিনি সুরের কাজে ভরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলেন। ছটি অতুলগীতির অনুষ্ঠানে অর্ঘ্যবাবুর গাওয়া 'যদি তোর হৃদয়যমুনা' গানটি অনবদ্য হয়েছিল নিঃসন্দেহে। ঝর্ণা দত্তরায়ের গাওয়া 'ভাঙা দেউলে মোর,' শিখা বসুর কণ্ঠে 'শ্রাবণ ঝুলাতে' ও শ্যামলী সেনের গাওয়া 'কত গান তো হোল'—এই গানগুলি অতুলগীতি পর্যায়ের অন্যতম সুগীত অনুষ্ঠান দৈলিপী গানের পর্যায়ে সর্বত্রই প্রশংসার দাবী রাখেন তন্দ্রা পাল তাঁর গাওয়া 'প্রভু জীবন মরণে এস' গানটির জন্য। এই নতুন শিল্পীটির উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বাক্ষর তিনি সেদিন দিয়েছেন—হয়তো একদিন দ্বিতীয় 'উমা বসু (হাসি) রূপে তিনি সঙ্গীত জগতে বন্দিত হবেন। শ্যামলী সেনের কণ্ঠে 'এই গহন রজনী অন্তে' এবং শিক্ষা বসুর গাওয়া 'ওরে উধাও আমার মন'—এক কথায় অপূর্ব—তেমনি ভাল লেগেছে অর্ঘ্য সেনের কণ্ঠে 'আমার কৃষ্ণ রাতের ভাঙলো যে ঘুম শুক্লা রাতের তীরে' গানটি।

মধুরেণ সমাপয়েৎ করলেন মঞ্জু গুপ্ত পরপর দুটি অতুলগীতি—কেন যে গাহিতে বলে জানে না জানে না তারা' ও 'আমায় বোলো না গাহিতে' এবং শেষেরটি দিলীপকুমারের রচিত 'তুমি আমায় করলে গ্রহণ।' মঞ্জু গুপ্ত প্রথম সারির গায়িকা এবং দ্বিজেন্দ্রগীতি, অতুলগীতি, দৈলিপী গান প্রভৃতিতে তাঁর কৃতিত্ব শুধু সর্বজন স্বীকৃতই নয়, এতাবৎকাল অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলা যায়। কিছুকাল যাবৎ শারীরিক অসুস্থতার জন্য তাঁর গান শুনে শ্রোতাদের মন খারাপ হয়েছে। কিন্তু এই দিন তিনি আরেকবার প্রমাণ দিলেন যে তাঁর সুরেলা কণ্ঠে সেই অদ্ভুত ভাবের ব্যঞ্জনা আজও অম্লান—যদিও গলার স্বরটি পূর্বাপেক্ষা কিছুটা ভারী ও মোটা মনে হোল।

শুধু বিজ্ঞাপনই নয় বিজ্ঞানও বটে

'আয়ুর্বেদোহমৃতানাম'— আয়ুর্বেদ অমৃতের শ্রেষ্ঠ। আয়ুর্বেদিক ঔষধের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতে আয়ুর্বেদীয় ঔষধগুলির চাহিদা দিনে দিনে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। সম্পূর্ণ দেশজ সম্পদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের নির্দেশে এখন যে সমস্ত ঔষধগুলি প্রস্তুত হচ্ছে তা জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধনের ব্রত পালন করে চলেছে। প্রাচীনকাল থেকে বহু মুনি ঋষিরা এবং আয়ুর্বেদাচার্যগণ বহু গবেষণা করে এই সব বনজ, খনিজ প্রাণীজ এবং সাধারণ লতাপাতা থেকে যে সমস্ত ঔষধ আবিষ্কার করে গেছেন সেগুলো এখন আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে পরম সমাদর লাভ করছে। আয়ুর্বেদের প্রামানিক গ্রন্থসমূহ যেমন আয়ুর্বেদ সংগ্রহ, দ্রব্যগুণ নির্ঘন্টম, ভৈষজ্যরত্নাবলী, চরক ও সুশ্রুত সংহিতা প্রভৃতি বহু প্রাচীন পুস্তকে আয়ুর্বেদীয় ঔষধের গুণ-সমূহ উল্লেখ করা আছে। তাঁদের সেই প্রজ্ঞালব্ধ জ্ঞানামৃতের পরম্পরা রক্ষা করে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের সমীকরণে এস, সি, কেমিক্যালস আয়ুর্বেদীয় ঔষধের জগতে যে সাম্প্রতিকতম ঔষধটি সংযোজন করেছেন তার নাম **'লিউকোনেক্স'** ট্যাবলেট। **'লিউকোনেক্স'** ট্যাবলেট লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগের আশু ফলপ্রদ ঔষধ। এই অসুখ মেয়েদের রূপলাবণ্য হরণ করে। অসহ্য যন্ত্রণায় ও কষ্টে মহিলারা ক্রম নৈরাশ্যের অন্ধকারে প্রবিষ্ট হন। স্বাস্থ্যের পক্ষে পরম হানিকর এই লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগটি যখন ক্রমান্বয়ে অধিক পরিমাণে প্রকাশ পায় তখন রোগীর গলাবুক জ্বালা, হাতে পায়ে জ্বালা হয় এবং পরে উহা সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। অঁলবোধ, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, ক্ষুধামান্দ্য, আমাশা, খুঁতখুতে স্বভাব, সন্দিগ্ধচিত্ততা, আত্মবিশ্বাস নষ্ট, আহারে অরুচি, কর্মে অনুৎসাহ, জীবনে হতাশা ও বিতৃষ্ণা, নিদ্রানাশ, নিতান্ত আপনজন স্বামীপুত্রের প্রতি স্নেহ ভালবাসাটুকুও হ্রাস পায় সুতরাং এই লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগকে সম্পূর্ণরূপে নিরাময়ের জন্য এস, সি, কেমিক্যালস নিরলস প্রচেষ্টায় প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্র নির্দেশিত পথে উন্নত পরীক্ষাগারে প্রস্তুত করেছেন **'লিউকোনেক্স'** ট্যাবলেট, তাই রোগ যত পুরানো ও কঠিন হোক না কেন **'লিউকোনেক্স'** ট্যাবলেটই লিউকোরিয়ার (সাদাস্রাবের) বিশ্বাসযোগ্য প্রতিকার, এই ঔষধ সেবনের পরে দেহে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না। দ্রুত আরোগ্যলাভ করতে হলে **'লিউকোনেক্স'** ট্যাবলেট ব্যবহারের সঙ্গে বাহ্যিক চিকিৎসা হিসাবে আক্রান্ত স্থানে **'ফেকটিন'** লোশনটির ব্যবহার অপরিহার্য। সুতরাং আর দেরী না করে আয়ুর্বেদের বিশুদ্ধ ঔষধ **'লিউ-কোনেক্স'** ট্যাবলেট সেবন করুন এবং **'ফেকটিন'** লাগান। লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগে আক্রান্ত রোগীদের বিশেষভাবে জানান যাচ্ছে যে, যাঁরা প্রচণ্ড অম্বল অজীর্ণ বুকজ্বালা প্রভৃতি রোগে ভুগছেন তাঁরা **'এসিনা'** ব্যবহার করুন। লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগের সঙ্গে যাঁরা পুরাতন ও নতুন আমাশয়ে ভুগছে তাঁরা **'এসিবেল'** ব্যবহার করুন। লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগের সঙ্গে যাঁরা কোষ্ঠকাঠিন্য, অরুচি, ক্ষুধামান্দ্য ও লিভার জনিত যে-কোন অসুখে কষ্ট পাচ্ছেন তাঁরা **'এসিনেক্স'** ব্যবহার করুন, লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগের সঙ্গে যাঁরা ব্যথা ও গাঁটের বাতজনিত রোগে ভুগছেন তাঁরা **'আরথিন'** ব্যবহার করুন। লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগের সঙ্গে যাঁরা কৃমিতে ভুগছেন তাঁরা **'ভারনেক্স'** ব্যবহার করুন। লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগের সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত ভদ্রমহিলারা এই সব উপসর্গে ভোগেন তাঁরা **'লিউকোনেক্স'** ট্যাবলেট ব্যবহারকালে ঐ সব উপসর্গের জন্য উল্লিখিত ঔষধগুলো ব্যবহার করলে রোগের আরোগ্য আরও ত্বরান্বিত হবে। আজই আপনার নিকটবর্তী দোকানে খোঁজ করুন অথবা সরাসরি আমাদের কবিরাজমণ্ডলীর সুপরামর্শ গ্রহণ করুন। **এস, সি, কেমিক্যালস,** (আয়ুর্বেদ বিভাগ), ২৭নং শোভাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৫।

Release through Calcutta Filmlet Advertising.

জীনৎ - কাপুর

প্রায় সব কাপুরের সঙ্গে জীনতের অভিনয় শেষ। শাম্মির সঙ্গে মনোরঞ্জন, শশীর সঙ্গে চোরনী মেরা কাম, দেওআনন্দ, রণধীরের সঙ্গে চোরকে ঘর চোর এবং হীরালাল পান্নালাল, ঋষির সঙ্গে হাম কিসিসে কম নেহী এবং রাজ কাপুরের সঙ্গে সত্যম শিবম্ সুন্দরম্।

*

৭৮ ফিল্মে ফিরে আসার বছর। অনেকেই ছেড়ে গিয়ে আবার ফিরে আসছে ইন্ডাস্ট্রিতে। ওয়াহিদা রহমান প্রায় ছ'টি ছবিতে অভিনয় করছে। আর শর্মিলা দু শিফটে শুটিং চালিয়ে যাচ্ছে।

*

হেমা পছন্দ করে নৃত্যরতা আশা পারেখকে। কিন্তু আশা চায় না হেমা নাচুক।

৮০ বছরের মা হতে চাই

একটি মেয়ে নিয়ে বিধবা হলেন মহিলা। মেয়েও বড় হচ্ছে। মহিলা প্রেমে পড়লেন এক ভদ্রলোকের। ভাবলেন, ওকে বিয়ে করবেন। মেয়েটি সহ্য করতে পারে না লোকটিকে। সে তার মৃত পিতাকে ভুলতে পারে না। মায়ের সঙ্গে এই নিয়ে তার বিবাদ। অনেক ঝড়ঝাপটার পর বিধবা মহিলা বুঝতে পারেন, কেন হিন্দু মহিলাই তার মৃত স্বামীকে ভুলতে পারেনা। প্রথম আনন্দের দিনগুলো হারিয়ে যায় না। তাছাড়া সমাজ তো আছেই। বাধা উঠবে সেখান থেকে। তাই মৃত স্বামীর কথা মনে রেখেই মহিলা নতুনকে ভুলে যান। আশ্চর্য এই চরিত্র নিয়ে ১৯৭১ সালে মুক্তি পেয়েছিল ফিরভি। বিধবা মহিলার চরিত্রে রূপ দিয়েছিলেন গুজরাটী নায়িকা ঊর্মিলা ভাট। যাঁকে আজ হিন্দী ছবির যুবতী মায়ের চরিত্রে দেখা যায় হামেসাই। ফিরভির আগে ঊর্মিলা বি আর চোপরার হামরাজ ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। এখন নিরুপা রায়, নাদিরা, বীণা, সুলোচনা এদের সঙ্গে, ঊর্মিলা সমান তালে অভিনয় করেছেন। পার্থক্য ওদের সঙ্গে, ঊর্মিলা সব সময় যুবতী-মা। ওর মাথায় [illegible] বছরের একশরও বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন। আর হিন্দী ছবির প্রযোজক-পরিচালকরা যুবতী মায়ের জন্যে আজ বেছে নিয়েছেন ঊর্মিলাকে। মায়ের চরিত্রে অভিনয়ে আমার সংকোচ নেই। রোলটি আমার খুবই পছন্দ। হিন্দী ছবির প্রায় সব নায়ক নায়িকার মায়ের চরিত্রে অভিনয় করেছি। এটা নিশ্চয় আমার কৃতিত্ব— অবশ্য রাজেশখান্না আর দেবানন্দের মায়ের চরিত্রে অভিনয় করা এখনও হয়ে ওঠেনি। রানীমাতার চরিত্র অভিনয় করছেন এলভি প্রসাদের জয় বিজয়ে। জীতেন্দ্র আর প্রেম কিষেণ ওর দুই ছেলে। আর স্বামী ওম শিবপুরী। ঘটনা কুড়ি বছরের। রাণী মাতার অল্প বয়স ও বেশী বয়সের চরিত্রে ওকে অভিনয় করতে হয়েছে। এই ছবিতে দরকার হয়েছে মেক আপের। অরবিন্দ সেনের অতিথিতেও ঊর্মিলা মা সেজেছেন। ওঁর সন্তানেরা হল সাবানাআজমী, শত্রুঘ্ন সিনহা, গায়ত্রী আর জুনিয়র মেহমুদ। স্বামী ভারত-ভূষণ। বি আর চোপরার দি বার্নিং ট্রেনে ড্যানির মা ঊর্মিলা। আজ ঊর্মিলার স্বপ্ন আশি বছরের মায়ের চরিত্র ও রূপ দেবে। সেই দিনের অপেক্ষা করছে। মায়ের চরিত্রে ঊর্মিলার অভিনয় এমন বাস্তব যে আজ মুগ্ধ দর্শকের কাছ থেকে চিঠি আসে : 'আমি আপনাকে মায়ের মত পেতে চাই।' ঊর্মিলার মেয়ে রচনা বোম্বাই ফিল্মে উঠতি নায়িকা।

হাতের মুঠোয় ডিস্ক

রাজপুত- রাজকুমারীর সাজে দারুন মানিয়েছে হেমাকে। প্রেমজীর মীরা ছবিতে হেমাই হল মীরা। পরিচালক গুলজার। রাজপুত রাজ-কুমারী, কবির পবিত্র চরিত্র নিয়ে কাহিনী। আর্ট ডিরেকটার দেশ মুখার্জি সেট বানিয়েছেন অপূর্ব। উদয়পুরের রাজপ্রাসাদের বৈশিষ্ট্যময় রাজপুত শিল্পকলার নিদর্শন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ছবিতে সুর দিয়েছেন পন্ডিত রবিশংকর। গান গেয়েছেন বাণী জয় রাম। মোট চোদ্দটি গান। সাতটি বড় আর সাতটি ছোট-মীরার ভজন। মজার ব্যাপার হল, ছবির গান গুলি এর মধ্যে সুপার হিট করেছে। ৯৫,০০০ এল পি ডিস্ক বিক্রি হয়ে গেছে। প্রযোজক ও সংগীত পরিচালক আশা করছেন তাদের হাতের মুঠোয় এখন গোল্ডেন ডিস্ক। কোন ফিল্মের এক লক্ষ রেকর্ড বিক্রি হলে রেকর্ড কোম্পানি এই গোল্ডেন ডিস্ক দেয়।

পয়মন্ত জুলাই

অভিনেতা সঞ্জীবকুমারের কাছে জুলাই-এ দ্বিতীয় সপ্তাহটা বেশ পয়া। বিশেষ করে ১০ জুলাই। চোদ্দ বছর আগে এই দিনে তিনি বসন্তের নিশান ছবির জন্য চুক্তিতে সই করেছিলেন। ১৯৬৫তে ছবি মুক্তি পায়। সত্যজিৎ রায়ের সতরঞ্জ কে খিলাড়ির জন্য সঞ্জীব-কুমার চুক্তি স্বাক্ষর করেন জুলাই-এর দ্বিতীয় সপ্তাহে। এগার বছর আগে প্রথম গাড়ি কেনেন ৩ জুলাই—সঞ্জীব-কুমারের জন্মদিন।

০ সব টপ হিরের সঙ্গে অভিনয় করলেও, জীনৎ আমন এখনও জীতেন্দ্রর সঙ্গে জুটি বাঁধে নি।

সোনিয়া হল নিতু সিং

দুলহান এক রাতকী ছবির আউটডোর শুটিং। নূতন একটি নাচের দৃশ্য অভিনয় করছিল। কিন্তু বার বার ভুল হতে থাকে। একটি ছোট্ট মেয়ে সোনিয়া পাশে দাঁড়িয়ে মজার সঙ্গে ব্যাপারটা দেখছিল। হঠাৎ ও বলল, 'আন্টি, তুমি নাচতে পারছ না। দেখ, এমনি করে নাচ।' বলেই নাচতে শুরু করে সোনিয়া। ছবির পরিচালকও চমকে গেল। জানতে চাইলে ও ছবিতে অভিনয় করবে কি না। সেই থেকে সোনিয়া হয়ে গেল অভিনেত্রী নিতু সিং।

০ জারিন ওয়াব এক আশ্চর্য কান্ড করেছে। একটি তামিল ছবিতে অভিনয় করছিল। চুক্তি অনুসারে প্রাপ্য সমস্ত টাকাই ফেরৎ দিয়েছে প্রযোজককে। এমন কি তাকে জানিয়েও দিয়েছে ছবির জন্য ও বিনা দক্ষিণায় কাজ করবে।

০ ঋষি কাপুর বুধবার মদের ধার ঘেঁষেও যায় না। কারণ কি জানতে চাইলে চিন্টু বলেছে : 'সপ্তাহে একদিন সকলেই মদ থেকে দূরে থাকে। বুধবার কেউ কোন কারণেই উপোসী থাকে না। সে কারণেই ঐদিন আমি মদ ছুঁই না।'

০ সিম্পল কাপাডিয়া সপ্তাহে দুদিন উপোস করে। সোমবার করে শিবাজী মহারাজকে তুষ্ট করে মনের বল বাড়াতে। আর বৃহস্পতিবার সাই বাবার জন্য—তাহলে অনেক নতুন কন্ট্রাক্ট হবে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পাইকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

মূল্য ৭৫ পয়সা। ত্রিপুরার অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

পুড়ে যাওয়া ক্ষতের চিকিৎসা অন্য রকম ক্ষত থেকে আলাদা।

পুড়ে যাওয়া ক্ষতের জ্বালা-যন্ত্রনা অন্য ধরনের ক্ষত থেকে একেবারে আলাদা—জ্বলুনী—বেদনা—ফোস্‌কা পড়া প্রভৃতি। এই পুড়ে যাওয়া ক্ষতের জন্য আপনার এমন অ্যান্টিসেপ্টিক চাই যা সব রকম জ্বালা-যন্ত্রনা থেকে চট্‌পট্‌ আরাম এনে দেয়। আর তা এমনই অ্যান্টিসেপ্টিক যা আপনাদের সবারই সুপরিচিত—তা'হল বার্নল। চট্‌পট্‌ ঠাণ্ডা আরাম এনে দিতে বার্নল অদ্বিতীয়। বার্নল অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীমেতে এর সবকটি গুণই রয়েছে যা পুড়ে যাওয়া ক্ষত জলদি উপশম করে। সবসময়ে ঘরেতে বার্নল মজুত রাখুন, এটি পুড়ে যাওয়া ক্ষত উপশমের আসল চিকিৎসা।

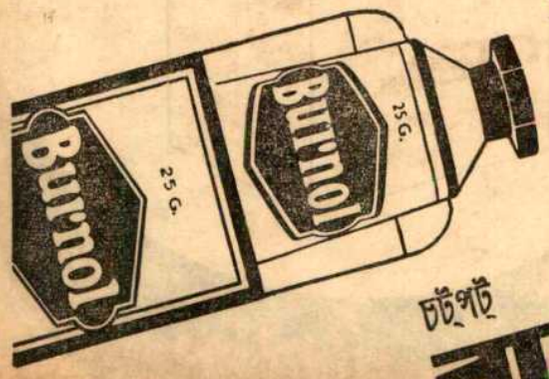

চট্‌পট্‌ **বার্নল** লাগান

পুড়ে যাওয়া ক্ষত উপশমের আসল চিকিৎসা

Boots

Regd. No. [illegible] L-13
Gram : AMRITA Calcutta-700003
AMRITA
Friday 29th September, 1978
Phone 55-5231 (14 lines)

5 OCT 1978

বিশুদ্ধ 'কুকমী' গুঁড়া মশলার ঐতিহ্য

সাবধান!

'কুকমী' গুঁড়া মশলার জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে কলকাতার কয়েকটি গুঁড়া মশলা কোম্পানী তাদের নিজস্ব নিকৃষ্টমানের ব্রাণ্ডের সঙ্গে জনপ্রিয় কুকমীর নাম জুড়ে হুবহু কুকমী Cookme নামের স্টাইল নকল করে আসল কুকমী গুঁড়া মশলা বলে বাজারে চালাবার চেষ্টা করছে।

কেনার সময় দেখে নেবেন- 'কুকমী'র প্যাকেটে কেবল Cookme 'কুকমী' ছাপই আছে, অন্য কোন ব্রাণ্ডের নাম যুক্ত নেই

প্রস্তুতকারক :

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ

২৩৫ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা ৭০০০৭০ ● ফোন : ৩৩০৯৯৫, ৩২৬৬৩২

পোষ্ট বক্স নং : বড়বাজার ৬৮৮৫ ● ফ্যাক্টরী : কাশীপুর

কপি-অফসেট : এম, কে, প্রোসেস এণ্ড কো: প্রাইভেট লিমিটেড

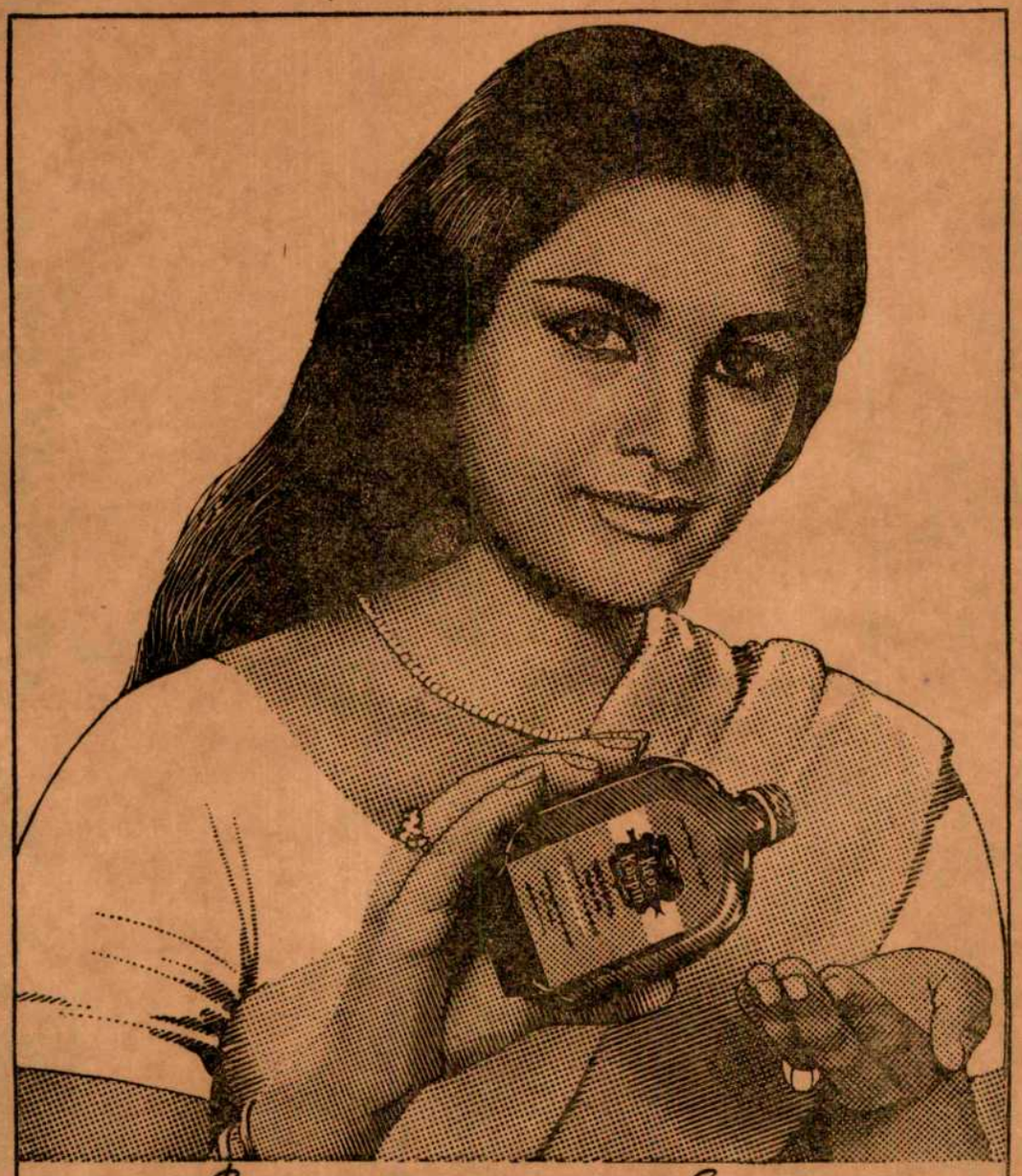

কেয়ো-কার্পিন আপনার সুন্দর কেশরাশি
আরও সুন্দর আরও মসৃণ ক'রে তুলবে

কেয়ো-কার্পিন

কেশ তৈল

Dey's

দে'জ মেডিকেলের
তৈরী

PX/DM/KB-5/78

দিব্যেন্দু গুহর নবতম পূর্ণাঙ্গ নাটক

ল্যাঙ্গুয়েজ ৫.

এক সেটে অভিনয়যোগ্য তিনটি নারী চরিত্র সম্বলিত এই নাটক সম্বন্ধে "আনন্দবাজার" পত্রিকার মতামত— ".. স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পরেও যাঁরা ইংরেজীয়ানাকে প্রশ্রয় দিয়ে গৌরববোধ করতে চান, বাঙালী হয়েও যাঁরা নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল নন— সেই ভ্রান্ত স্নবদের ওপর তীব্র কটাক্ষের এই নাটকটি বহির্বঙ্গে এবং কলকাতায় ব্যাপকভাবে অভিনীত হওয়া উচিত ...."

মনোজ মিত্রের সার্থক নাটক

নরক গুলজার ৫.

(এক সেট ॥ একটি নারী) এক এক বছরের মধ্যে দ্বিতীয় মুদ্রণের গৌরবে ভূষিত এই নাটক সম্বন্ধে "আনন্দবাজার পত্রিকা" বলেন—

"পলিটিক্যাল ড্রামা বলতে প্রকৃতপক্ষে যা বোঝায় তা এই প্রথম মঞ্চস্থ হল। নেতা নয়, মস্তান নয়, সংকল্পে অটল থাকলে পাচনবাড়ি হাতে নিয়ে তুমিই তাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারবে ত্রিভুবনের সমস্ত গো-সম্পদকে। নাট্যকারের কলম ও ভাবনা এবং রেখা চিত্রাঙ্কন, পরন্তু বক্তব্য সমস্বরে একটি কথাই বলেছে— হয়তো একদিন ক্ষমতার রাজদণ্ড শ্রমিকের হাতেই শোভা পাবে।"

এই লেখকের

পরবাস (১ নারী) ৫.০০

নেকড়ে (২ নারী) ৪.০০

রতনকুমার ঘোষের কয়েকটি সাড়া-জাগানো পূর্ণাঙ্গ নাটক

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ৫.

এক সেটে অভিনয়োপযোগী * ১টি নারী-চরিত্র

এ নাটকের মূল বিষয় ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্র-ব্যবস্থার লজ্জাহীন ভীরুতা আর বিবেকহীন নিষ্ঠুরতা। ব্যক্তি-জীবনে, সমাজ-জীবনে, রাষ্ট্র-জীবনে আমরা অহরহ যে-ভুল করে থাকি, যে-অন্যায়কে প্রশ্রয় দিই, যে-অবিচার আর অত্যাচার নীরবে সহ্য করি—একটু খেয়াল করলেই দেখি, আমরা প্রত্যেকেই সেই ভুল, অন্যায়, অবিচার আর অত্যাচারের মুখোমুখি দাঁড়ানো।

জম্বুদ্বীপের ইতিকথা ৫.

এক সেটে অভিনয়যোগ্য, নারী-চরিত্র বর্জিত।

জরুরী অবস্থায় একদা সেন্সর-বন্দী এই নাটক তথাকথিত ভুয়ো রাজনৈতিক, দেশপ্রেমিক ও জনদরদী বহু নেতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের এক অনবদ্য হাতিয়ার। প্রসঙ্গত বলে রাখি এই জম্বুদ্বীপই আমাদের সাধের, স্বপ্নের ও ধ্যানের দেবী— **জননী** জন্মভূমি।

সময়ের রূপকথা (৩ নারী) ৫.

সময় বয়ে চলেছে। নিরন্তর, বিরামহীন সেই সময়স্রোতে আমরা ভেসে চলেছি—কখনো উথাল-পাথাল—কখনো স্বচ্ছন্দ বেগ। সময়ের স্বভাব, আবেগ, গতি মানুষের জাতীয় ঘাত-প্রতিঘাতে নিয়ন্ত্রিত। বিগত দশকের অস্থির, চঞ্চল, উন্মাদ, আবেগময় সময়ের স্রোতে ভাসমান এক করুণ মধুর নাট্য-বিন্যাস।

এই নাট্যকারের অন্যান্য নাটক

সীতাহরণ (২ নারী) ৫. এই দশকের মঞ্চে (২ নারী) ৫.
ভূমিকম্পের আগে (১ নারী) ৩. **সিঁড়ি** (১ নারী) ৫.
ফেরা (১ নারী) ৩-৫০ **ভূমিকম্পের পরে** (১ নারী) ৫.
সকালের জন্য (১ নারী) ৫. ভোরের মিছিল (১ নারী) ৫.

অগ্নি মিত্রের নতুন নাটক

নেপো-নটবর কথা ৫.

বিষয়বস্তু রাজনৈতিক, কিন্তু নাট্যকারের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার নয় একটি রাজনৈতিক ভণ্ডামোর স্বরূপ প্রদর্শন। —যুগান্তর।

সম্পূর্ণ তালিকার জন্য লিখুন :

রবীন্দ্র লাইব্রেরী

১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩
ফোন : ৩৪-৮৩৫৬

পুড়ে যাওয়া ক্ষতের চিকিৎসা অন্য রকম ক্ষত থেকে আলাদা।

পুড়ে যাওয়া ক্ষতের জ্বালা-যন্ত্রণা অন্য ধরনের ক্ষত থেকে একেবারে আলাদা—জলুনী—বেদনা—কোস্কা পড়া প্রভৃতি। এই পুড়ে যাওয়া ক্ষতের জন্য আপনার এমন অ্যান্টিসেপ্টিক চাই যা সব রকম জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে চট্‌পট্ আরাম এনে দেয়। আর তা এমনই অ্যান্টিসেপ্টিক যা আপনাদের বরাবরই ব্যবহার করে এসেছেন—তা'হল বার্নল। চট্‌পট্ ঠাণ্ডা আরাম এনে দিতে বার্নল অদ্বিতীয়। বার্নল অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীমেতে এর সবকটি গুণই রয়েছে যা পুড়ে যাওয়া ক্ষত তাড়াতাড়ি উপশম করে। 'সবসময়ে ঘরেতে বার্নল রাখুন, এটি পুড়ে যাওয়া ক্ষত উপশমের আসল চিকিৎসা।

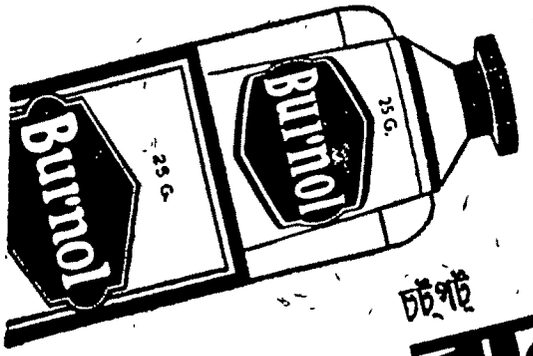

চট্‌পট্

বার্নল লাগান

পুড়ে যাওয়া ক্ষত উপশমের আসল চিকিৎসা

Boots

অমৃত

১৮ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা
৯ কার্তিক, ১৩৮৫
27, October, 1978

সম্পাদকীয় ৩
সাহিত্য ইত্যাদি ৪ মণীন্দ্র রায়
রাজনীতি কলকাতা স্টাইল ৬
বেদব্যাস বৈদ্য
লাল বাড়িতে সেদিন যারা যাবা
গরহাজির ছিলেন ৬ শ্যাম মল্লিক
রাজধানীর ইনসাইড স্টোরি ৮
পর্যবেক্ষক
কবিতা ৯ বন্দেশ্বর হাজরা, অতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী মুখোপাধ্যায়, শংকর দে, সুবোধচন্দ্র সরকার
প্রচ্ছদ কাহিনী ১০
জীবনানন্দ
কল্যাণকুমার বসু
প্রচ্ছদ শিল্পী শৈবাল ঘোষ
খোয়াই (গল্প) ১৭
নবকুমার বসু
বাবুর জমি (গল্প) ২৪
সোমনাথ ভট্টাচার্য
সমালোচনা ২৯
শ্রীমান ভগবান ভাষিত ৩৩
শিবপ্রসাদ সমাদ্দার
তরণী পাহাড়ে বসন্ত (উপন্যাস) ৩৯
শৈবাল মিত্র
হাওয়া গাড়ি (উপন্যাস) ৪৪
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
সোনার হরিণ নেই (উপন্যাস) ৪৮
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
ভাগ্য গণনা ৫৩ শ্রীয়াণিক্য
খেলা ৫৫ শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়
তপনকুমার দাস, পিনাকী চট্টোপাধ্যায়, দর্শক লিফ্‌ম্যান
যাত্রা ৫৯
চিত্রধ্বনি ৬০

আগামী সংখ্যায়
প্রচ্ছদ কাহিনী
রবীন্দ্রনাথ বনাম সরলা দেবী
লিখেছেন নিত্যপ্রিয় ঘোষ
বিজয় পালের গল্প

শিক্ষার হেরফের

শিক্ষাবিস্তার খুবই জরুরী ব্যাপার সন্দেহ নেই। দেশকে যদি আধুনিক জীবনের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হয়, তাহলে বয়স্কশিক্ষার প্রসঙ্গকেও এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। কাজেই ইদানীং শিক্ষাসংক্রান্ত নানাধরনের আলাপ-আলোচনা এবং প্রকল্প চালু করার ব্যবস্থায় উৎসাহবোধ করাই স্বাভাবিক। কিন্তু শিক্ষানীতির মূল কাঠামোটিকে শক্ত ভিত্তিতে দাঁড় করাতে না পারলে কেবল সদিচ্ছা দিয়েই কার্য উদ্ধার করা কঠিন। গত কয়েক বছর ধরে শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে এত বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পরিবর্তন চলছে যে সন্দেহ হয়, যাঁরা শিক্ষাবিদ বলে পরিচিত তাঁরাও বোধহয় স্পষ্ট জানেন না, কী তাঁদের লক্ষ্য।

একটি কথা প্রায়ই শোনা যায় যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হল দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জীবনযুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত করে তোলা। কিন্তু জীবনযুদ্ধ বলতে ঠিক কী বোঝায়, তা অনেকের কাছেই বোধহয় স্পষ্ট নয়।

শিক্ষিত যুবকরা বাস্তবের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে টিঁকে থাকতে পারে কোন্ উপায়ে? অবশ্যই মাত্র দুটি পথে—চাকরি এবং ব্যবসা। কিন্তু চাকরির সংখ্যা যেহেতু কম, সেজন্যে জীবনসংগ্রামের পক্ষে উপযুক্তভাবে শিক্ষিত হয়েও লক্ষ লক্ষ যুবককে বেকার থাকতে হয়। কেবল যে আর্টস বা কমার্স পাশ করা যুবকরাই বেকার হন তা নয়, ইঞ্জিনীয়ার এবং মেকানিকরাও বাদ যান না। স্বভাবতই এর ফলে, কর্তাব্যক্তিদের মনে প্রশ্ন জাগে, কেন এমন ঘটছে। এবং পরমুহূর্তেই তাঁরা ভেবে বসেন যে চাকরি চাইছে বলেই এমনটা ঘটছে। কিন্তু আসল ঘটনাটি বোধহয় এত সরল নয়। কেননা, চাকরির চেষ্টা না করে দ্বিতীয় পথ, অর্থাৎ ব্যবসার চেষ্টা করলে সে পথটিও কুসুমাস্তীর্ণ হত না। মূলধন সংগ্রহ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, বিপণন ব্যবস্থা—প্রতিটি পর্বে পর্বতপ্রমাণ বাধা। সারা দেশে বস্ত্রশিল্প, চিনিশিল্প, ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প ইত্যাদির রুগ্ন হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি থেকে এটাই বোঝা যায় যে ছোটো মাপের ব্যবসা শুরু করে তাকে টিকিয়ে রাখা দুঃসাধ্য।

আসলে আমাদের শিক্ষানীতির ব্যাপারে ঘন ঘন পরিবর্তন এবং অস্থিরতাও দেখা দিচ্ছে ঠিক এই কারণেই। যাঁরা নীতি স্থির করে দিচ্ছেন, তাঁরা তার ফলাফল দেখে শঙ্কিত হচ্ছেন এবং ক্রমাগত পথ পাল্টাচ্ছেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁরা মূল সমস্যাটির কেন্দ্রে গিয়ে তার সমাধান করতে পারছেন না। সেই সমস্যাটি হল দেশের অতি প্রাচীন ভূমিব্যবস্থাকে নতুন বনিয়াদে বিন্যস্ত করা। এবং সেইভাবে পণ্য বিক্রির বাজারে রূপান্তর ঘটিয়ে নতুন নতুন ব্যবসাবাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি করা। তাতে বেকার সমস্যার সমাধান হবে এবং শিক্ষাসমস্যাও গবেষকের টেবল থেকে নেমে কর্মজগতের চাপে তার প্রকৃত সমাধানের রাস্তা খুঁজে নিতে পারবে।

সাহিত্য ইত্যাদি...

কি করে লেখা হয়?

সব মানুষ কবিতা লেখেন না। সাহিত্যও করেন না। কেউ কেউ কবিতা এবং গল্প-উপন্যাস ইত্যাদির দিকে ঝোঁকেন।

বিশেষ ধরনের মানুষের এইসব ঝোঁক বা ইচ্ছে কেন হয়, তা নিয়ে চিন্তা করেছেন অনেকে। কেউ কেউ বলেছেন, এটা হল এক বিশেষ ধরনের প্রতিভা। কেউবা আবার জানিয়েছেন, এ হল ঐশী উন্মাদনা—যা এক ধরনের পাগলামি আরকি।

কবিরা পাগল বা আধ-পাগলা মানুষ, কথাটা শুনতে বিশ্রী, মানা আরো শক্ত। রবীন্দ্রনাথকে আমরা জানি, বিন্দুমাত্র কোনো পাগলামির লক্ষণ ছিল না কোথাও। বরং অন্য অনেকের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে স্থিরমস্তিষ্ক মানুষ ছিলেন তিনি। তাঁর পিতা মহর্ষিদেব তাই অতোজন বড় বড় ছেলে থাকতে এই কবি-পুত্রকেই পাঠিয়েছিলেন জমিদারীর দেখাশোনা করার কাজে। এবং একাজে যে রবীন্দ্রনাথ অনেক প্রফেশনাল জমিদারের চেয়ে ভালোভাবেই সম্পন্ন করেছেন তা আমরা জানি।

বিদেশে গেলেও একই দৃশ্য চোখে পড়ে।

মহাকবি শেকসপীয়ার কর্মজীবনে ছিলেন গ্লোব থিয়েটারের সত্বাধিকারী। তাদের প্রোডাকশনের জন্যেই নাকি লিখতেন তিনি। সে নাটক স্টেজে অভিনয় করাতেন। দরকার হলে বাড়িভাড়ি গিয়েও মঞ্চস্থ করতেন নাটক। এবং এইসব ব্যবসায়ী কাজ-কর্ম এত চমৎকারভাবে পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি যে শেষ জীবনে স্বচ্ছলতারও মুখ দেখেন। গ্লোব থিয়েটার ছেড়ে দিয়ে গ্রামের বাড়িতে এসে, সম্পন্ন গৃহস্থের মতো জীবন কাটাতে শুরু করেন।

তারপর গোটে। তিনি যে একজন বিরাট কবি তা তো আমরা সকলেই জানি। আধুনিক যুগ যখন শুরু হচ্ছে সেই সময়কার শ্রেষ্ঠ কবি। শেকসপীয়ারের মতো একজন বিশ্বজয়ী প্রতিভা। এবং শেকসপীয়ারের মতোই বাস্তববুদ্ধির মানুষ। জীবনের বেশ কয়েকটা বছর হবাইমারের ডিউক মহোদয়ের মন্ত্রী ছিলেন তিনি। রাজকার্যে বেশ সুনামও ছিল তাঁর। শতকরা একশ ভাগ প্রকৃতিস্থ না হলে একাজ সম্ভবই হত না তাঁর পক্ষে।

কিন্তু উল্টো দিকের সাক্ষীও কম নেই।

আগেকার দিনে, মানে আধুনিক-পূর্ব যুগে, প্রায় সব কবিই তাঁদের কাব্য শুরু করার আগে একটা গাওনা গেয়ে নিয়েছেন। তাতে কোনো-না-কোনো অপ্রাকৃত ঘটনা এবং স্বপ্ন ইত্যাদির মারফৎ কোনো দেব-দেবী বা প্রয়াত কোনো প্রিয় মানুষের প্রেরণার কথা বলেছেন। অর্থাৎ তাঁরা বলতে চেয়েছেন, এটা কোনো স্বাভাবিক ব্যাপার নয়; নিজের ইচ্ছেতেও এ-কাজে হাত দেননি তিনি। নেহাতই বাধ্য হয়ে, উপায় ছিল না বলেই একাজে হাত দেওয়া। প্রায় অন্য-চালিত হয়ে (ভর ওঠার মতো করে আর কি!) পরবর্তী লাইনগুলো লিখতে হচ্ছে তাঁকে। বলাই বাহুল্য, কবিতাকে যদি এর পরও না ভাবা হত ঐশী উন্মাদনার ফসল তবে কবিদের প্রতিই অনাদর প্রকাশ পেত। কেননা, তাঁরাই চাইছিলেন লোকে ভাবুক, তাঁরা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী।

কিন্তু এ তো সেকালের কথা। একালে? আজকের দিনেও কি কবিরা মনে করেন, কবিতা একটা অপ্রকৃতিস্থ ব্যাপার! মনে করেন বৈ কি! কেউ কেউ নিশ্চয়ই করেন।

যেমন র‍্যাঁবো। গত শতকের এই বিখ্যাত কবি সবিস্তারেই বলে গেছেন, কবিতা লেখার পূর্বশর্ত। তাঁর মতে, সচেতন মনোভাবকে সম্পূর্ণভাবে এলোমেলো করে না দিতে পারলে কবিতা লেখাই সম্ভব নয়। তাঁর 'ড্রাঙ্কেন বোট' (মাতাল তরণী) এই প্রক্রিয়াতেই লেখা। এবং সত্যিই সেটি হয়েছে সর্বকালের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। ফলে বছরে বছরে তাঁর অনুসারকের সংখ্যা বেড়েছে। এবং এইভাবেই শুরু হয়েছে সুররিয়ালিস্ট কবিদের যাত্রা।

কাজেই কবিতা লেখা (বা অন্য কোনো সাহিত্যকর্ম) সচেতন, না 'অচেতন' প্রক্রিয়ার ফসল তা নিয়ে তর্ক থেকে গেল। কবিরা তাঁদের বুদ্ধি এবং প্রবণতা অনুসারে কেউ কেউ এ-মতের কেউ ও-মতের সমর্থক।

এবার দেখা যাক, আসল ব্যাপারটা কী দাঁড়ায়।

আমি এ আলোচনায় কবিতা আর গল্প-উপন্যাসকে আলাদাভাবে দেখব না। যদিও কবিতা প্রধানত আবেগের আর গদ্য প্রধানত যুক্তির হাত ধরে চলে, তবু লিখনকর্মের একটা পর্যায়ে দুটোই এক। কল্পনা না হলে দুটো কমই অচল।

রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়েই শুরু করা যাক। তাঁর কবিতা এবং গল্প-উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি, অর্থাৎ তাঁর ফ্যাকসিমিলি অনেকই দেখেছি। বিস্তর কাটাকুটি রয়েছে তাতে। আর কাটাকুটিকে ঢাকতেই তো এসেছে তাঁর কাছে ছবির ফর্ম। এক হিসেবে সে হল তাঁর কাটাকুটির শিল্প। শব্দের পর শব্দ পালটেছেন তিনি। এক লাইন বদলে অন্য লাইন লিখেছেন। একেক সময় প্যারাকে প্যারা বা স্ট্যানজা-কে স্ট্যানজা বদল দিয়েছেন। একবারও মনে হয় না অচেতন ব্যাপার বা ভূতাবিষ্ট হয়ে লেখা। বরং দেখা যায়, অত্যন্ত একজন যত্নবান সচেতন শিল্পীকে, যিনি শব্দগুলো নিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখছেন, ওজন করছেন, কানে শুনে তাঁর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছেন। হৃদয়ের কাজ সেখানে যথেষ্ট আছে, কিন্তু মাথার কাজও কম নেই। (আগেকার অনেক কবিতায় এটাই মনে হয় মাঝে মাঝে, মাথার কাজ আরো একটু কম নিয়ে, আবেগকে শাসন করলে কোনো ক্ষেত্রে কবিতা অকারণে দীর্ঘ হয়ে এলিয়ে পড়ত না।) রবীন্দ্রনাথ, মোটের ওপর বলতে গেলে রোমান্টিক কবি হলেও ভাবের ঘোরে

প্রকাশিত হইল প্রভাত মুখোপাধ্যায় রচিত

তুষার তীর্থ অমরনাথ

১৪.০০

কথিত আছে দেবতা অমরনাথের তীর্থযাত্রার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়, তাহাই বিস্ময়কর এবং রোমাঞ্চকর কাহিনী। রঙিন ছায়াচিত্রে দেখিবার পূর্বে পড়ুন। চৌদ্দ টাকা অগ্রিম পাঠালে ডাকমাশুল ফ্রি— লাগিবে না।

এই লেখকের অনবদ্য রচনায়—

কন্দসী কাশ্মীর ১৪·০০

কলিকাতা পুস্তকালয়, ৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিঃ-৭৩

তারপর ধরুন জীবনানন্দ দাশ। অনেকের ধারণা, বিশেষ করে তাঁর 'ধূসর পাণ্ডুলিপির' কবিতা পড়েই এ ধারণা হয়েছিল বোধহয় অনেকের, জীবনানন্দ বুঝি দশাপাওয়া মানুষের মতো লেখেন। একেবারে তা নয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কবিতার পাণ্ডুলিপি ছাপা হয়েছে ফ্যাকসিমিলি ব্লক করে। তা দেখলে বোঝা যায়, কী অপরিসীম যত্ন নিয়ে, কতো কাটাকুটি করে তিনি একেকটি কবিতার খসড়া তৈরি করেছেন। একেকটা কবিতাকে তিনি কতোবার কতোভাবে লেখবার চেষ্টা করেছেন। কিছুতেই যেন তাঁর মনের মতো হচ্ছে না। ভেবেচিন্তে বারবার করে তিনি নতুনভাবে লেখবার ফর্ম খুঁজছেন। একি অচেতন বা দশা-পাওয়া কবির কাজ? নাকি অত্যন্ত সচেতন এবং বিবেচনাশীল মানুষের কাজ? অথচ তিনিই তো বাংলাসাহিত্যে প্রথম লিখেছেন সুররিয়ালিস্ট কবিতা। এবং লিখে উৎরেও দিয়েছেন।

জীবনানন্দ দাশ নিজেই এ সমস্যার সমাধান দিয়েছেন তাঁর এক গদ্য লেখায়। বলেছেন, কবিতা আবেগেরই ব্যাপার বটে, কিন্তু বুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত আবেগ।

এটাই হল খাঁটি কথা।

একথা কবিতার বেলায় যেমন সত্যি, কম-বেশি অন্য লেখার ক্ষেত্রেও তাই। কল্পনা না হলে লেখা হয় না। কিন্তু মোটামুটি একটা যুক্তির কাঠামোয় বাঁধতে না পারলেও লেখা হয় না। এ দুয়ের গাঁটছড়া বাঁধাই হল আসল কাজ।

সাধে কি আর মহাকবি মধুসূদন বলেছেন, 'শবদে শবদে বিরাট'। সে বড় কঠিন ঘটকালি।

মণীন্দ্র রায়

ইংরাজী কথা শেখার প্রভাবদায়ী সহজ পদ্ধতি

"র‍্যাপিডেক্স" ইংলিশ স্পীকিং কোর্স ®

RAPIDEX ENGLISH SPEAKING COURSE

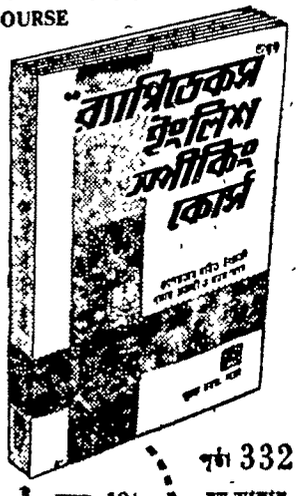

মূল্য 18/- ডাক খরচ 2/-

পৃষ্ঠা 332 বড় আকার (19 ×25) প্লাস্টিকের আস্তরণের মলাট

র‍্যাপিডেক্স শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্য—

- সঠিক উচ্চারণের জন্য অসম্পূর্ণ শিক্ষাক্রমের ইংরাজী বাক্য এবং শব্দ বঙ্গলিপিতেও উপস্থিত।
- কোনো ভাষা শিখতে হলে এ-পর্যন্ত জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যবহার নির্ভর করা এক অভিনব পদ্ধতিতে প্রস্তুত সর্বাধুনিক শিক্ষাক্রম।
- আনুমানিক ১০০০ নির্বাচিত, সর্বদা কথায় প্রয়োগযোগ্য সেইসব ইংরাজী শব্দাবলী, যা আপনার চিন্তা ও সংকোচকে একেবারে নির্মূল ক'রে দেবে।
- প্রায় ২৫০০ সরল কথা বলার সেইসব ছোট ছোট প্রভাবদায়ী বাক্য, যা—
  - ✖ বাড়ী অথবা কর্মক্ষেত্রে, কলেজ কিম্বা ক্লাবে, উৎসব কিম্বা খেলায়
  - ✖ প্রেমিক-প্রেমিকা, পতি-পত্নী, কর্তা-মনিব দোকানী-গ্রাহক ছোট-বড় সবার।
  - ✖ প্রেমালাপ, শিষ্টাচার, অভিবাদন, অভিনন্দন, নিমন্ত্রণ প্রশংসা অথবা সান্ত্বনায়।
  - ✖ আমোদ-প্রমোদ স্বাস্থ্য, খানা-পিনা, বেশ-ভূষা, সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রসঙ্গে।
  - ✖ সার্বজনিক টেলিফোন ঘর সামনা-সামনি সাক্ষাৎ, সভা সমিতি অথবা কোনো বিশেষ সমাবেশ—

  —অর্থাৎ যে কোনো বিষয়ে.....যে কোনো বর্ণের স্ত্রী- পুরুষের সাথে বেশ জোরালোভাবে কথাবার্তায় নিমিত্ত প্রস্তুত।

সেই সব যুবক-যুবতী স্ত্রী-পুরুষের নিমিত্ত—

- যে অ স্নাতক হয়েও ইংরাজী বলতে সংকোচ বোধ করে।
- সাক্ষাৎকারে অসফল হয় আর চাকরী পায় না।
- কলেজ, সমাজ, সমিতিতে আধুনিক ছেলেমেয়েদের সাথে মিশতে অক্ষম হয়।
- শিক্ষিত গৃহিণীদের, প্রতিবেশীদের, অতিথিদের ও অন্য আধুনিক পরিবারবর্গের সাথে স্বচ্ছন্দে খোলখুলিভাবে মিশতে পারে না, এমন কি মিশনারী স্কুলে পাঠরত নিজেদের সন্তানদেরও পড়িয়ে বুঝোনো ও সফলকাম হ'তে সাহায্য ক'রতে অপারগ।
- ব্যবসায়ী অথবা দোকানী, না তো কোন আধিকারিকের সাথে সোজাসুজি কথা বলতে পারে, না লেখাপড়া জানা কর্মচারী রেখে তাকে ঠকুর দিয়ে কাজ আদায় করতে পারে। সুতরাং ব্যবসাকে জাগাতে সক্ষম হয় না।

—অতএব জীবনযাত্রার প্রত্যেক প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে।

র‍্যাপিডেক্স পদ্ধতি :—

নিত্য ব্যবহারের সরল কথাবার্তার ভাষা ক্রমানুসারে পাঠ-অভ্যাসে শিখতে ও বুঝতে হলে, এটাই হ'ল সহজ সুগম ও নতুন পদ্ধতি।... যে প্রকারে ছোট শিশুকে, পড়ানো, শেখানো ছাড়াই শুনে-শুনে কথা বলা শেখে। সম্পূর্ণ শিক্ষাক্রম বার্তালাপ শৈলীতে—যেন মুখোমুখি কথাবার্তা হ'চ্ছে।

ফিরিয়ে দিলে টাকা ফেরৎ

যদি র‍্যাপিডেক্স কোর্স আপনার পছন্দ না হয় তাহলে ফিরিয়ে দিন। ডাকমাশুল বাদে সমস্ত মূল্য ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

'র‍্যাপিডেক্স ইংলিশ স্পীকিং কোর্স' সফলতার গ্যারান্টিযুক্ত

৩০ লাক্ষের বেশী পাঠকদ্বারা গৃহীত ও উচ্চ প্রশংসিত, সকলের সমাদৃত শিক্ষাক্রম :

বইখানি ভি. পি. পি-যোগে পেতে হ'লে—ঠিকানা :

প্রকাশক : **পুস্তক মহল, খারী বাওলী দিল্লী-১১০০০৬**

"র‍্যাপিডেক্স কোর্স" প্রতিটি পুস্তক বিক্রেতা, রেলষ্টেশন, বাস ষ্টপে অবস্থিত বইয়ের ষ্টলে পাওয়া যায়।

কলকাতার স্টকিস্ট : কলেজ স্ট্রীট, হিন্দুস্থান লাইব্রেরি, ইন্টারন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, বিশ্বাস বুক ষ্টল, চক্রবর্তী চ্যাটার্জী অ্যান্ড কোং লিঃ, আনভারতী, ১৭১এ, এম, জি, রোড, রাজেন্দ্র লাইব্রেরি, ১৩২, ক্যানিং স্ট্রীট।

পুলিশ প্রশাসনে নিরপেক্ষতা চাই

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই-এর সঙ্গে একমত হয়ে পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেছেন, পুলিশ-প্রশাসনকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখা উচিত। ব্যক্তিগত অথবা দলগত কারণে পুলিশ-প্রশাসনের ব্যবহার আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটায়। পুলিশের মূল কর্তব্য ও দায়িত্ব নিরপেক্ষভাবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জনসেবা করা।

মুখ্যমন্ত্রীর এই মনোভাব অভিনন্দনযোগ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসন কতখানি কর্তব্যপরায়ণ এবং নিরপেক্ষ তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি মহাকরণে সহকর্মীর হাতে জনৈক সরকারী কর্মচারী খুন হলেন। খুনের আসামী অবশ্য পলাতক ছিল না। ছিল মহাকরণের চত্বরেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার

রাজনীতি কলকাতা স্টাইল

করতে পুলিশের ছয়ঘন্টার মত সময় লাগে। সংশ্লিষ্ট থানা-অফিসারকে ঐ সময় মহাকরণে অসহায়ভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। মন্ত্রীরা অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে অথবা বিপক্ষে কতটা উৎসাহী, তা যাচাই করে দেখে নেওয়াই ছিল সেদিন পুলিশের মূল লক্ষ্য। খোদ মহাকরণে এই ঘটনা পুলিশের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে সেদিন অনেকের মনেই সন্দেহ জাগায়। দিনদুপুরে খোদ মহাকরণে জলজ্যান্ত একটি খুনের ঘটনা ঘটলেও পুলিশ, কেন খুনীকে গ্রেপ্তার করতে এতটা সময় নিল, মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোতি বসু সে বিষয় সংশ্লিষ্ট অফিসারের কাছে কোনও কৈফিয়ৎ তলব করেছেন বলে জানা যায়নি।

আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে বামফ্রন্ট সরকারের প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই বিরোধীরা সমালোচনামুখর। সম্প্রতি বিরোধীপক্ষের সঙ্গে বামফ্রন্টের শরিক দলের কোন কোন মহলও সুর মিলিয়েছেন। তাদের মূল অভিযোগ, সি পি আই (এম) দলের বিরুদ্ধে। ২৪-পরগণা জেলার বাসন্তী-ক্যানিং-মথুরাপুর অঞ্চলের আর, এস, পি নেতৃত্ব পুলিশ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছেন। মুর্শিদাবাদ - বাঁকুড়া - জলপাইগুড়ি-কুচবিহারের আর-এস-পি ও ফরোয়ার্ড ব্লকের জেলা নেতৃত্বও বামফ্রন্টের বড় শরিক সি, পি, আই (এম)-এর বিরুদ্ধে অজস্র অভিযোগ তুলেছেন। তাদেরও মূল-অভিযোগ, পুলিশ-প্রশাসন স্থানীয় সি, পি, আই (এম) নেতৃত্বের কথায় কাজ করছে—ন্যায়বিচার অথবা আইন তাদের কাছে অবান্তর। বামফ্রন্টের শীর্ষনেতারা অবশ্য জেলা নেতৃত্বের ঐসব অভিযোগের বিরুদ্ধে পাল্টা বিবৃতি প্রচার করেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ তবুও বুঝতে পারছে না, অভিযোগকারী বামফ্রন্টের জেলা নেতৃত্বের উপর ছোট শরিক দল আর এস পি-

লালবাড়িতে সেদিন যারা যারা গরহাজির ছিলেন

এই বন্যাকে মহাকরণও ঠেকাতে পারেনি, বুরোক্র্যাটরাও আটকাতে পারেনি। পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে ছিল ভয়াবহ। তবে তার মোকাবিলার জন্য যে মানসিকতা এবং দৃঢ়তার একান্ত প্রয়োজন ছিল তার বেশ অভাব দেখলাম। জলভাসি কলকাতা এবং বানভাসি যখন বঙ্গ তখন বি বি দি বাগের মস্ত ঐ লাল বাড়িটা কেমন যেন নিশ্চল-নিশ্চুপ। আমি ২৭ সেপ্টেম্বরের কথা বলছি। সেদিন বুধবার। কারণিক নেই, এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী নেই, নেই ডেপুটি সেক্রেটারী। প্রায় ২৫ জন সেক্রেটারীর মধ্যে হাজির মাত্র পাঁচজন। জল সিঁড়ি পার হয়ে সাত সমুদ্র তের নদী ঠেঙিয়ে লেক টাউন থেকে পুলিশের গাড়িতে হাজির হয়েছেন মুখ্যসচিব অমিয়কুমার সেন। বাড়ি থেকে ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি চেপে মহাকরণের সামনে এসে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু হাঁটু জল ভেঙে ঢুকলেন ঐ বাড়িটায়। সঙ্গে পৌরমন্ত্রী প্রশান্ত শূর। পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী এলেন পুলিশের গাড়িতে। শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী কানাই ভট্টাচার্য। উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী শম্ভু ঘোষ। ত্রাণমন্ত্রী রাধিকা ব্যানার্জি। আইনমন্ত্রী আবদুল হাসিম হালিম আর তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। বুদ্ধদেববাবু সি-এ একটা লরিতে মহাকরণে এসে মন্ত্রীর বাড়িতে একটা জিপ পাঠিয়ে দেন। চেয়ারে বসতে না বসতেই মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে ঘন ঘন টেলিফোন বেজে উঠছে। দুরভাষিণী বয়ে আনছে একরাশ অমঙ্গলের খবর। গম্ভীর মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রীদের মুখ চুন।

কিন্তু আমলারা সব কোথায়? কলকাতার অনেক 'জলঙ্গী' নদীর জলে তাঁরা আটক। 'পস্ এরিয়াতে' তাঁদের বাস। সেখানেও জল। এই অবস্থার মধ্যে হাফপ্যান্ট পরে কাঁধে কাপড়ের ব্যাগ নিয়ে হাজির দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। অর্থ দপ্তরের সেক্রেটারী মানগাজি গোবিন্দন কুট্টি এসেছেন কাপড়কে লুঙ্গিমত ভাঁজ করে। একে একে এলেন, কৃষি দপ্তরের সেক্রেটারী সুবোধ ঘোষ, ত্রাণ দপ্তরের সেক্রেটারী গৌরীশংকর ব্যানার্জি এবং তথ্য দপ্তরের সেক্রেটারী নীতিশ সেনগুপ্ত। মুখ্যমন্ত্রীর সেক্রেটারিয়েট প্রায় ফাঁকা। তাঁর সেক্রেটারী এসেছিলেন। একজন স্টেনো। একজন সি-এ এবং তিনজন বেয়ারা।

মহাকরণে হাজিরার খবর নিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হতবাক। প্রায় ২৫ জন সেক্রেটারীর মধ্যে এসেছেন মাত্র পাঁচজন। দেড়শো ডেপুটি সেক্রেটারীর মধ্যে তিনজন। গন্ডা গন্ডা এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারীর মধ্যে এক গন্ডাও নয়। ৯ হাজার কার্বনিকের মধ্যে মেরে কেটে শ' আড়াই। খালি পা হলেও বেশ কিছু পুলিশ কনস্টেবল। গোটা কয়েক সার্জেন্ট সেন্ট্রাল গেটে। প্রায় পঞ্চাশজন টেলিফোন অপারেটারের মধ্যে মাত্র তিনজন। জয়েন্ট সেক্রেটারীর মধ্যে একজনও নয়।

পরের দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী এলেন জীপে। শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী আসতে পারেন নি। ওঁর বাড়িতে জল ঢুকেছে। আগের দিনের পাঁচ মন্ত্রী এসেছেন। বিনয় চৌধুরী এসেছেন। দ্বিতীয় দিনেও পাত্তা নেই স্বরাষ্ট্র সচিব রথীন সেনগুপ্তের। গড়িয়াহাটে তাঁর এক তলার কোয়ার্টারে বুক জল। বাড়ির টেলিফোন লাইন ডেড্। পরে খবর এল রথীনবাবু অসুস্থ। তাঁর সর্দি-টর্দির ধাত আছে। পাঞ্জাবী পাজামা পরে হাজির হয়েছেন মুস্তাক মুর্শেদ। লুঙ্গি পরে বুক জল ভেঙে রাস্তা দিয়ে আসছিলেন একজন সেক্রেটারী। পেছনে ছাতি মাথায় বেয়ারার হাতে সাহেবের স্টেচলনের ট্রাউজার। পোর্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান এস আর দাস আসছিলেন উঁচু এ্যাম্বুলেন্স ভ্যানে। ঐ সেক্রেটারী এবং তার বেয়ারাকে তিনি ঐ ভ্যানে তুলে নিয়ে এলেন মহাকরণে। দ্বিতীয় দিনে স্মার্ট আটজন সেক্রেটারী হাজির ছিলেন।

অফিসারদের এই ব্যাপক অনুপস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী কিছুটা বিস্মিত। অধিকাংশ অফিসার থাকেন গড়িয়াহাট রোড ও আইবন সাইড রোডে সরকারী কোয়ার্টারে। দুটো জায়গাতেই প্লাবন। তার মধ্যেও তো কয়েকজন ঐ দুদিন

ফরোয়ার্ড ব্লকের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কোন কর্তৃত্ব আছে কিনা। যদি থাকত, তবে তারা কি শুধুমাত্র জেলা-নেতৃত্বের অভিযোগগুলি সেফ অস্বীকার করে একটিমাত্র বিবৃতি ছেপেই তুষ্ট থাকতে পারতেন? না, দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে অভিযোগকারী নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতেন। ঘটনা পরম্পরায় মনে করার সঙ্গত কারণ আছে যে, বামফ্রন্টের ছোট শরিক দলগুলির জেলা নেতৃত্বের উপর কেন্দ্রীয় নেতাদের কোনও কর্তৃত্ব নেই। সুতরাং কেউ কাউকে মানছেন না, অথচ সকলেই সকলকে ভাঙ্গিয়ে চলছেন।

বামফ্রন্টের শরিকদলগুলির আভ্যন্তরীণ কোন্দলের কথা বাদ দিলেও বলা চলে, বিরোধীপক্ষ সরকারের সমালোচনায় নিছক যুক্তিহীন নন। সাম্প্রতিক এক সরকারী তথ্য তাদের বক্তব্যকে আরও জোরদার করেছে। নয়াদিল্লীর ব্যুরো অব পুলিশ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট থেকে প্রকাশিত 'ক্রাইম অব ইণ্ডিয়া' বইটি থেকে জানা গেছে, চলতি বছরের সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত এ রাজ্যে খুনের সংখ্যা প্রায় সাড়ে সাতশ। ঐ সময় কলকাতা বাদে পনেরোটি জেলায় মোট খুনের সংখ্যা ছয়শ একচল্লিশ। বাকী প্রায় একশ নয়টি খুনের ঘটনা ঘটে খোদ কলকাতা ও শহরতলী এলাকায়। এবং এই খুনের অধিকাংশই রাজনৈতিক। চলতি বছরের সাড়ে আট মাসের হিসাব মাত্র দেওয়া হল। এখনও সাড়ে তিন মাসের হিসাব বাকী। এর আগের বছর অর্থাৎ ১৯৭৭ সালে সর্বমোট খুনের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে সাতশ উনপঞ্চাশ আর সাতশ নয়। অর্থাৎ সরকারী পরিসংখ্যানই প্রমাণ দেয় গত তিন বছর ধরে এ রাজ্যে খুনের সংখ্যা উর্ধ্বমুখী।

অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসাররা মনে করেন, জোতদার-বর্গাদারদের লড়াইয়ে দলীয় রাজনীতির প্রবেশ, পাড়া ও অঞ্চল দখলে গুণ্ডা ও সমাজবিরোধীদের প্রশ্রয় দান, এবং রাজনৈতিক দলগুলির অন্তর্দ্বন্দ্বই সংঘর্ষ ও খুনের সংখ্যা বাড়ার অন্যতম কারণ। দুই দশক আগে পর্যন্ত মস্তানরা দৈহিক বলের উপর নির্ভরশীল ছিল। ১৯৬৭ সাল থেকে শুরু হয় বোমা-পাইপ-গানের রাজনীতি—সংঘাত—সংঘর্ষ। তারপর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যুদ্ধের সুযোগে এ রাজ্যে বিদেশী আগ্নেয়াস্ত্র অর্থাৎ পিস্তল, স্টেনগান, রাইফেলের প্রচুর অবৈধ আমদানি ঘটে। তা এখন প্রায় সব দলেরই তথাকথিত কর্মীদের হেফাজতে, অথবা আশ্রিত গুণ্ডা-সমাজবিরোধীদের হাতে। আশ্রিত মস্তানরা নেতা ও দলের কিছু সুযোগ করে দিয়ে তা যে খুন-রাহাজানি-ডাকাতির কাজে ব্যবহার করে, পুলিশের তা অজানা নয়। কিন্তু সব জেনেশুনেও রাজনৈতিক নেতাদের ভয়ে বা চাপে পুলিশকে নিষ্ক্রিয় থাকতে হয়।

গুণ্ডা-মস্তান এবং সমাজবিরোধীরা ক্ষমতাসীন দলের নামাবলী যতদিন ব্যবহারের সুযোগ পাবে, ততদিন নিরপেক্ষ প্রশাসনের কথা বলা হাস্যকর। মুখ্যমন্ত্রী যদি কঠোর হাতে গুণ্ডা-মস্তানদের রাজনৈতিক নামাবলী পরাটা বন্ধ করাতে পারেন, তবে পুলিশ-প্রশাসন অনেকাংশে নিরপেক্ষ হতে পারবে। তাতে জনসাধারণের আস্থাও অনেক বাড়বে এবং আইন-শৃঙ্খলারও কমোন্নতি ঘটবে। **বেদব্যাস বৈদ্য**

এসেছেন যাঁরা আসতে পারেন নি তাঁরাও সব একতলার বাসিন্দা নন। সাপ সাপ করে একজন ডেপুটি সেক্রেটারীর সে কি চিৎকার। লাল-বাজারে টেলিফোন সাপ মারতে হবে। জলভাসি আইরন সাইড রোডের কোয়ার্টারে চারতলায় বসে ডিভিসির জন্য নিয়ে কোন ইঞ্জিনীয়ারের গল্প শুনতে খুব খারাপ লাগে না। তামাম, পশ্চিম-বঙ্গ যখন এই প্রলয়ের মধ্যে তখন লাল-বাজার থেকে কয়েকজন অফিসারের বাড়িতে খাবার দাবার পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। রাস্তাপাশের বাড়িগুলোতে তখন অরন্ধন। প্রচণ্ড এক অবস্থার মধ্যে পড়ে মুখ্যমন্ত্রী দ্বিতীয়দিন বাড়িই ফিরতে পারেন নি। প্রশাসনিক যন্ত্র যাদের হাতে তাদের একটা বিরাট অংশের এই অনুপস্থিতি সমালোচনার ঝড় তুলেছে। শহরের পূর্বদিকে জলবন্দী একজন মন্ত্রীকে ঠেলার ওপর চেয়ারে বসিয়ে পুলিশ উদ্ধার করেন।

তৃতীয়দিন অর্থাৎ শুক্রবার অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটেছে। মোট ১৪ জন সেক্রেটারী হাজির। তার সঙ্গে পাঁচিশজন ডেপুটি সেক্রেটারী। শ' পাঁচেক কারণিক। তিনটে বাজতে না বাজতেই অনেকে পগার পার। এই প্রচণ্ড প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে অবশ্য কয়েকজন তরুণ অফিসার ত্রাণ সামগ্রী পাঠাবার জন্য যে পরিশ্রম করেছেন তা প্রশংসার করার মত। মুখ্যসচিব ও কৃষি সচিব দুজনেই হার্টের রোগী। রোগকে তুচ্ছ করে বয়সকে অগ্রাহ্য করে তাঁরা কয়েকজন জুনিয়র অফিসারকে নিয়ে এত বড় একটা বিপর্যয়ের মোকাবিলায় যে চেষ্টা করেছেন তা উল্লেখ করার মত।

একদিন জেলা প্রশাসনও মনে হল ভেঙে পড়েছিল। আঙুলে গুণে বলছি নদীয়ার জেলাশাসক রাণু ঘোষ জেলার সদর দপ্তর কৃষ্ণনগরে আটক। হাওড়ার জেলাশাসক হাওড়া শহরে আটক। বীরভূমের জেলাশাসক তুষারকান্তি দাস সিউড়িতে আটক। মেদিনীপুরের জেলাশাসক আটক মেদিনীপুর শহরে। বর্ধমান ও হুগলির জেলাশাসক প্রসাদ রায় এবং দিলীপ বিশ্বাস কয়েকটা জায়গায় অবশ্য ছুটে গেছেন। দুর্গত নরনারীর পাশে দাঁড়াবার চেষ্টাটুকুর অনেক মূল্য আছে। হাওড়া জেলায় এত বড় একটা বিপর্যয়। কন্ট্রোলরুম ছাড়া ১৪দিনে জেলাশাসককে কোথাও দেখা গেল না। বীরভূমের জেলাশাসকের বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন কৃষিমন্ত্রী কমল গুহ। ১৯৭০ সালের বন্যায় হাওড়া দেখেছি জেলাশাসক দীপক রুদ্র, পুলিশ সুপার নিরুপম সেন এবং ডিভিসনাল কমিশনার তালুকদার সাহেবকে ওয়াকি টকি সেট নিয়ে উদ্ধার কার্য পরিচালনা করতে।

তখন তেমন মন্ত্রিসভা ছিল না। এই বুরোক্র্যাটরাই জান প্রাণ কবুল করে ১৯৬৮ সালে জলপাইগুড়ির ভয়াবহ বন্যার পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছিলেন। এখন অবশ্য অনেকে 'ম্যাগনিটিউডের' কথা বলছেন। ১৯৬৮ সাল থেকে পেরিয়ে আমরা উনিশশো আটাত্তরের শেষ গুণতে বসেছি। এই এক দশকে আমরা কি আর একটু গতিশীল হইনি? এ প্রশ্ন অনেকের। লক্ষ লক্ষ নরনারী এখনও জলবন্দী। শেষে শেষে মানুষ নিখোঁজ। মৃত শত শত। এখনও মহাকরণে শুনি মহাপ্লাবনের ঐ চারদিন জলবন্দী কোন অফিসার তেতলার ফ্ল্যাটে কিভাবে ডিম সেদ্ধ আলুভাতে দিয়ে ভাত খেয়েছেন।

পর পর তিনদিন তাঁদের সেক্রেটারী না আসায় দুই মন্ত্রীতো ভয়ানক ক্ষুব্ধ। খোঁজ খবর করতে গিয়ে শুনেছি কয়েকজন অফিসার অবশ্য প্রচণ্ড প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়েছিলেন। তবে অনেকে একটু চেষ্টা করলে আসতে পারতেন কিন্তু আসেন নি। তবে এই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে জেলাগুলোতে একশ্রেণীর অফিসার এবং পুলিশ কর্মচারী প্রাণপাত করে মানুষের জন্য খেটেছেন। কয়েকজন মন্ত্রীসহ মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে রোজ মহাকরণ এসেছেন। দশমীর দিনও এদিনও দেখলাম সেই জুনিয়র অফিসারদের। মুখ্যসচিব, কৃষিসচিব আজ আছেনই।

২৭ তারিখের পর ৬দিন বাদে মহাকরণে একজন পুলিশ সার্জেন্টকে দেখলাম। ঘাটালে বাড়ি। কাঁধের ওপর মা বাবা ভাইবোনকে বসিয়ে রেখে মাইলে নিতে এসেছেন। চোখ দুটোয় জল টস্ টস্ করছে। বন্যার জলের চেয়ে এ জল আরো বেদনা মিশ্রিত। **শ্যাম মল্লিক**

ঈশ্বরের সঙ্গে হটলাইন

রাজধানীর ইনসাইড স্টোরি

পর্যবেক্ষক

রাগে-বিবক্তিতে গদি ছাড়ছি নয়। সংসদের জনতা পার্টির সদস্যদের কাছে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইয়ের এমন উক্তি দলের বর্তমান আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে খুব অপ্রাসংগিক নয়। প্রধানমন্ত্রিত্বের কুরসিতে বছর দেড়েক আটিয়ে প্রায় উনিশ মাসের মাথায় গদি ছাড়ছি না বলতে বাধ্য হয়েছেন মোরারজী দেশাই। সাধ করে কেউ এমন কথা বলে না। মোরারজী দেশাই গত আঠারো-উনিশ মাসের মধ্যে প্রায় বহুবার অনেক সর্বসম্মতিক্রমে জনতা পার্টির সব গোষ্ঠীর পূর্ণ সমর্থনে প্রধানমন্ত্রীর কুরসিতে ছিলেন। তারপর গজগোলের টুকরো টুকরো মেঘের উদয় হয়েছে আবার সরেও গিয়েছে। কিন্তু ক্রমশঃ গোষ্ঠী-বিবাদ ভালোমত দানা পাকিয়ে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে বি-এল-ডি, সোসালিস্ট, জনসংঘ, বিদ্রোহী কংগ্রেস, সি এফ ডি এবং এমন কি মোরারজী দেশাই-এর দল সংগঠন কংগ্রেসের লোকজন পর্যন্ত সমসময় নানা ভাবমূর্তি নিতে থাকেন। পার্টির মধ্যে এই ধারা ইদানীং বেশ বেড়েছে। এর ফলে প্রধানমন্ত্রী কোন সময়েই ধরে নিতে পারছেন না কার এবং কতজন কোন ব্যাপারে তাঁকে কতদূর সমর্থন করবে। তিনি স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন না কারা সব সময় তাঁর সমর্থনে হাত তুলবে। নির্দিধায় তিনি এটা বলতে পারতেন অতীতে। আজ নয়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সব গোষ্ঠীর সমর্থন লাভের পিছনে ছিল জনতা পার্টির এক ধরনের আভ্যন্তরীণ ইতস্তত বোধ। প্রধানমন্ত্রীর পদে মোরারজী দেশাই-এর বিকল্প প্রার্থী মনোনয়ন বা নির্বাচনের ঝামেলা ও গোলমাল অনেকে এড়াতে চাইতেন। তাদের এই ইতস্তত বোধটাই ছিল মোরারজী দেশাইয়ের পক্ষে মস্তবড় সাংগঠনিক প্রটেকশন। আর সেটা সর্বসমক্ষে দেখাবার জন্য মোরারজীর কয়েকজন বড় সমর্থক সংসদ সদস্যদের তলবী সভা ডেকেছিলেন। দলের অনেক ব্যাপার এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা বেষারেষি ছেড়ে আদর্শ ও নীতি সম্পর্কে আলোচনা হবে এমন সব অনেক গালভরা কথা শোনা গেলেও প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সমর্থন আদায় এটা প্রমাণ করাই ছিল এই সভার পরোক্ষ উদ্দেশ্য। এই সভায় প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের প্রবল ইচ্ছা ছিল, একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা। প্রস্তাবটির বক্তব্য ছিল : প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইকে কেবল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার কাজকর্মই নয়, সেই সঙ্গে জনতা পার্টিকেও পরিচালনা করবার সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হোক। এই কথাটি ছড়িয়ে পড়ার জনতা পার্টির বিভিন্ন গোষ্ঠী যেমন জনসংঘ, বি-এল-ডি, সোসালিস্ট এবং বিদ্রোহী কংগ্রেসের লোকজনরা রীতিমত ক্ষেপে ওঠেন। জনতা পার্টির একজন সংসদ সদস্য বলেন : মোরারজী দেশাইয়ের সমর্থকরা এমন প্রস্তাব উত্থাপন করলে হাস্যাস্পদ হয়ে যাবে। ভীষণ ক্ষুব্ধ হন, জনতা পার্টির প্রেসিডেন্ট এবং লোকসভার সদস্য চন্দ্রশেখর। চন্দ্রশেখর মন্তব্য করেন : ব্যাপার কি? পার্টির প্রেসিডেন্ট কে? প্রধানমন্ত্রীর তাঁবে পার্টি প্রেসিডেন্ট থাকবে? এমন ভূমিকা আমি কোনদিন পালন করব না। এরপর তাড়াতাড়ি একটি গোপন বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়। এই বৈঠকটিতে মোরারজীর সমালোচনা ও বিরোধিতার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মিলিত প্রথম জমায়েত বলা যায়। ইতিপূর্বে পৃথক পৃথকভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকজন নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করেছেন। তবে নানা গোষ্ঠীর সদস্যদের নিয়ে কোন বৈঠক আগে হয়নি। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জর্জ ফার্নাণ্ডেজ, মধু লিমায়া, চন্দ্রশেখর, আদবানী এবং অটলবিহারী বাজপেয়ী। এখানে স্থির হয় মোরারজী এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ লোকজনরা পার্টির ব্যাপারে দখল নেবার চেষ্টা করলে এঁরা এবার প্রকাশ্যে রুখে দাঁড়াবেন। এমন কি প্রয়োজন হলে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা যায় কিনা সে সম্বন্ধেও এই বৈঠকে বিস্তৃত আলোচনা হয়। হাওয়া অন্য রকম অনুমান করে মোরারজীর দলবল প্রস্তাবটিকে অবশেষে ধামাচাপা দেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রতি সমর্থন আছে এটা আপাততঃ প্রমাণিত হলেও এইটুকু প্রমাণ করতে কে বেগ পেতে হবে কিংবা অনায়াসে হবে না সেটা প্রধানমন্ত্রীর সমর্থকরা ভাবতে পারেননি।

ঘটনার ব্যাপক বিবর্তন শুরু হয়েছে জনতা পার্টির অন্দর মহলে। পরোক্ষে মোরারজীর বিরোধিতায় অন্তিম গোটাচ্ছেন লোকজন। এই অন্তিম গোটাবার দলে সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে চন্দ্রশেখরকে। মাস চারেক আগেও মোরারজী দেশাই-চরণ সিং মনোমালিন্যে এই চন্দ্রশেখরকে দেখা গিয়েছিল জনতা পার্টির প্রেসিডেন্ট হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক দক্ষিণ হস্তরূপে। এখন তিনি ভিন্ন পথ নিয়েছেন। মধু লিমায়ার কট্টর মোরারজী বিরোধিতার একজন বড় সমর্থক ইদানীং চন্দ্রশেখর। এঁদের পারস্পরিক রাজনৈতিক হৃদ্যতা আপাততঃ অত্যন্ত গাঢ়। পার্টি প্রেসিডেন্ট এবং লোকসভার সদস্য হয়েও মোরারজী দেশাইয়ের সমর্থকদের উদ্যোগে জনতা পার্টির সংসদ সদস্যদের তলবী সভা চন্দ্রশেখর বয়কট তো করেছেনই উপরন্তু তিনি নাকি মন্তব্য করেছেন : আই হ্যাভ বেটার থিংস টু ডু। মোরারজী দেশাইয়ের প্রায়ই ঈশ্বরের কথা উল্লেখ করা প্রসঙ্গে চন্দ্রশেখরের সাম্প্রতিক মন্তব্য হল : জনতা পার্টির সব কিছু ঠিক আছে কেবল ঈশ্বরের সঙ্গে 'হট লাইনটা' বন্ধ করা দরকার। এমন উক্তির রাজনৈতিক তাৎপর্য লক্ষ্য করবার মত। চরণ সিং-রাজ নারায়ণ অনেকদিন হল আর মোরারজীর সমর্থক নন। মধু লিমায়া তত্ত্বপর দূরে সরতে আরম্ভ করেন। আর সম্প্রতি যাঁদের মোরারজীর কাছের লোক আর বলা যায় না, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নামগুলি হল : জগজীবন রাম, অটলবিহারী বাজপেয়ী, আদবানী ও জর্জ ফার্নাণ্ডেজ। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে জনসংঘ, বি এল ডি, সি এফ ডি, সোসালিস্টদের দুই গোষ্ঠী এবং বিদ্রোহী কংগ্রেসের বেশ কয়েকজন নেতা মোরারজীর প্রতি এখন নারাজ। যদি ধরে নেওয়া যায় যে সংগঠন কংগ্রেসের সদস্যরা তাঁকে সব সময় সব ব্যাপারে পুরো সমর্থন দিয়ে যাবে তাহলেও কেবলমাত্র সেই জোরে মোরারজী দেশাই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নেতৃত্বের পদটি বাঁচাতে পারবেন না। সুতরাং কুরসি বাঁচাতে হলে তাঁকে নতুন সমর্থকদের সন্ধান করতে হবে কিংবা জনতা পার্টির মধ্যে যাঁরা এখন নারাজ, তাঁদের সঙ্গে একটা রফা করতে হবে। মিটমাট না করলে প্রধানমন্ত্রী নতুন সমর্থকদের কোথায় খুঁজবেন এখন? জনতা পার্টির মধ্যে নারাজ ব্যক্তিদের সংখ্যা বাড়তে থাকলে পার্টির বাইরে তাকাতে হয়। এটা কি সম্ভব এখন?

বন্যা ১৯৭৮ : ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

শুভেন্দু গুহ

আমার মাথার উপর বসে পড়ে হচ্ছো প্লাবনের জল
তোমার ছোট্ট ছোট্ট পা দুটি ডুবিয়ে দেবার জন্য
এলোমেলো হচ্ছে ঢেউ—
তোমার আট মাস বয়সে এমন অভিজ্ঞতা এই প্রথম
বন্যা অর্থে প্রকৃতির কোন্ মূর্তি
তুমি কিন্তু দেখেও চিনতে পারছ না।
তোমার দাঁত ওঠেনি এখনো। ঐ দন্তহীন মুখে
খট্‌খট্ করে হেসে উঠছ একেকবার—
তোমার হাসি দেখে দোতলায় দাঁড়িয়ে
এই দুর্দিনেও হাসছে মানুষ—
সবার একতলার ঘরে এখন নাভি-ডোবানো জল।
গাড়ির চাকার টিউবে চাপিয়ে তোমার মা-কে
উদ্ধার করছে দু'জন মানুষ
তুমি কি কিছু বুঝতে পারছ এই প্রকৃতির!
আমার বাবুই পাখির বাসা থেকে রাস্তা খুব দূরে নয়
তবু এই দূরত্ব যে এমন দীর্ঘ তা-কি কেউ জানত পরশুও?
অন্ত যাত কাটলে তে-রাত্তির বাস হবে আমার ঘরে
ঐ নাভি-ডোবানো জলের
আমার শিশু! ঐ দ্যাখো, এক অহংকারী বাতাস
সারা দেশে মাটির ঘর ভেঙে পড়ার শব্দ
বহন করছে দরজা থেকে দরজায়।
ঘরের আলমারীতে এখন বোধহয় ডুবে যাচ্ছে
রবীন্দ্র রচনাবলী—
আমি আট মাস বয়সী একজন মানুষকে মাথায় নিয়ে
গলা ডুবিয়ে হেঁটে চলেছি আশ্রয়ের জন্য—

সময়, তুমি যচ্ছো যেমন

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

১. আমি তাকে বলিনি কিছুই, হয়নি সে আমারও মতন।
নিজের স্বরূপে তার গঠন বেড়েছে, খোলা হাওয়ায়—অতলে
আমি তাকে এইমত্র বুঝিয়েছিলাম বারু, হঠাৎ অনলে
জ্বলে ওঠে কতখানি—খোলশেষ মত যায় নির্বিচারে জ্বলে

২. এমনি আমার হাঁটা
ভুলতে ভুলতে কাঁটা
বনস্থলীর ঘর-দুয়ারে দিতে দিতেই ঝাঁটা
এমনি আমার চাওয়া
পড়ন্ত সেই শীতের দিনে পঁচিশটিবার যাওয়া
ইস্কাবনের ছবি এবং পানের মৌরি-বাটা
এইরকমই হাঁটা

৩. সময়, তুমি যাচ্ছো যেমন যাও
আমায় যদি সঙ্গে পারো নিতে
তোমায় আমি পেরিয়ে যাবো ঈশানের নৈঋত
বনস্থলী, চোখের কিনার, তোমার পাহারাও।

রোজ ভাবি

তুলসী মুখোপাধ্যায়

রোজ ভাবি
রাস্তার দুধারে প্রতিটি দরজায় দাঁড়িয়ে ডেকে নেবে বলি—
সুখে থাকো, ভাইসব সুখে থাকো
প্রতিটি শিশুর হাতে
তুলে দিই একশো শরতের পরমায়ু,
রোজ ভাবি
কাশফুল ক্ষেতের গলায় বকফুলের পরিয়ে
আদেশ করি ঈশ্বরের মতো—
যাও, শীতের বস্তিতে দ্রুত চলে যাও
রোগীর শিয়রে গিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকি—
নিরাময়, নিরাময় এখানে আসুন।
রোজ ভাবি, রোজ.....
তবুও কী নিবেট বোবার মতো
বন্যা-ভ্রমণ করছি কলুর ঘামারে!

সেই পথে

শংকর দে

আর কোনো ভয় নেই
পালিয়ে এসেছি বাড়ি থেকে।
ঘর থেকে, সিঁড়ি দিয়ে নেমে
রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখি
কাটাচোখ, গলাভর্তি, শিসের আঁচড়
এইভাবে অন্ধ হয়ে আমি
একা একা এখানে এসেছি।
আর কোনো দুঃখ নেই অভিমান নেই।
মাথা থেকে সব চুল মুছে ফেলে দেখেছি
মাটি হয়ে গাছ হবে ফুল হবে
আমাকে চেয়েছি আমি ভালোবেসে, কাঁটা
সেই পথে, ফিরে যেতে কোনো ইচ্ছে নেই।

বিপ্লব

বুদ্ধদেব সরকার

একটি হাত উঠে গেছে শূন্যে
সেখানে অতিকায়
কোনো গ্রীক সাহিত্যের পাথরকে সেই হাত চিপে মেরে ফেলছে
এপাশে, গহন জলের মধ্যে নেমে গেছে পা,—
যাদু খেলে বেড়াচ্ছে অবিরাম
আর বাকী একটি হাত
বাকী একটি পা
নিরুদ্যম করছে পূর্ণ মনুষ্যটিকে।

এখানে সারাদিন উটু কাউকে খেলা করে
হলুদ বুক লাল রং তার বুকে
কার্তিকের ঘোর রৌদ্রের;
শুধু সাদা কাদের নদীর এপারে

মানুষেরা থাকে কেন
আজ এত শতাব্দীর সভ্যতার
ফিরে আসবার ঝোঁকে যদি চলে যায়
তবুও সম্পূর্ণ হয়ে থাকে অন্ধকার।

নতুন যুগের জন্য তবুও এখানে করা ভালো।
চিতল হরিণ এই ঘিরে তুলে কিংবা জ্যোৎস্নায়
হরিণীকে খুঁজে তবু পায় না কখনও;
ব্যাঘ্রযুগে শুধু মৃত হরিণীর মাংস খাওয়া ছাড়া।

জীবনানন্দ

কল্যাণকুমার বসু

আজ তাঁর মন খারাপ। হবারই কথা। সিটি কলেজের অধ্যাপকের চাকরি চলে গেল। তাহলে কলকাতায় থাকার কোন মানেই নেই। জীবনানন্দ ভাবলেন। কিন্তু কলকাতায় যে প্রাণ। কল্লোল-কালিকলমের দিনেশদা অচিন্ত্যকুমার প্রেমেন্দ্র মিত্র পবিত্র নৃপেন শৈলজা নজরুল মুরলিধর আরো অনেকে। কলকাতা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হয় না। কাজ কি একটা হবে না। না হয় কয়েকটা প্রাইভেট টিউশানি। সকল শিক্ষিত পুরুষের অগতির গতি যা।

পত্রিকার পাতায় কর্মখালির বিজ্ঞাপন উল্টিয়ে চলেন। চেষ্টার ত্রুটি নেই।

দিন চলে যায়।

চাকরি? —নেই। কয়েকটি টিউশানি? সম্বল। কবিতা লিখছি বৈকি। কবিতা না লিখে পারি। কবিতা আমার প্রাণের ...

কেমন আছো?

বেশ ভালো। খুব ভালো। এর থেকে ভালো থাকা যায় না। খুব কবিতা লিখছি, কি যে তৃপ্তি....আমার একার জীবন বেশ চলে যাচ্ছে আর কি চাই।

তবু মাঝে মাঝে কি জানো, বড় মন খারাপ হয়। বাড়িতে যে টাকা পাঠাতে পারি না, আমিই বড়... আমার যে অনেক কর্তব্য। অফিসপাড়ায় ঘোরাফেরা, কলেজে কলেজে ঘোরাঘুরি। কিন্তু সব জায়গায় নো ভেকেন্সি।

কয়েকমাস পরে বাগেরহাট কলেজে চাকরি পেলেন জীবনানন্দ।

কিন্তু বাগেরহাট কলেজ জীবনানন্দর মনকে শান্তি দিতে পারেনি। পরিবেশ তাঁর ভালো লাগেনি। চাকরি ছেড়ে দিয়ে আবার ফিরে এলেন কলকাতায়। কলকাতায় এসে শান্তি।

এবার আমরা কবিকে দেখতে পাই রামজশ কলেজে যোগ দিতে। রামজশ কলেজ দিল্লিতে কালাপাহাড়—আনন্দ-পর্বতে সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত। আর্য সমাজের একজন সভ্য লালা কেদারনাথ তাঁর পিতা 'রামজশ'-এর নাম অনুসারে কলেজ প্রতিষ্ঠা করে নাম রাখেন 'রামজশ কলেজ'। দিল্লিতে এ-চাকরি অস্থায়ী, তবে চাকরি পাকা হতে পারে এই আশ্বাসটুকু আছে।

এপ্লিকেশন, ইণ্টারভিউ, অবশেষে চাকরি।

অনেকে বলেন অধ্যাপক সুকুমার দত্তের জন্যেই জীবনানন্দ দিল্লিতে অধ্যাপকের পদ পেয়েছিলেন। অসম্ভব নয়। ডাঃ সুকুমার দত্ত বরিশালের মানুষ এবং মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তর ভ্রাতুষ্পুত্র। জীবনানন্দর পরিবারের অনেকের সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন। তিনি রামজশ কলেজের ইংরিজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক —প্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক। কাজেই কোন এক সময়ে বরিশালে বা অন্য কোথাও জীবনানন্দর সঙ্গে দেখা হলে জীবনানন্দ তাঁকে রামজশ কলেজে চাকরিটির কথা বলেছিলেন কিনা এখন জানার উপায় নেই* তবে রামজশ কলেজের ইংরিজির অপর একজন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রভাস ঘোষ বলেন,—জীবনানন্দ ১৯২৯

*লেখকের রচনাকালে দিল্লির সুপ্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক ডঃ সুকুমার দত্ত পরলোকগমন করেন। লেখকের চিঠির উত্তর সেই কারণে তিনি দিয়ে যেতে পারেননি।

খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেছিলেন এবং চারমাস পরে অর্থাৎ মার্চ মাসে কলেজের চাকরি যায়। অস্থায়ী চাকরি ছিল, তবে চাকরি স্থায়ী হলেও হতে পারত।

গ্রীষ্মের ছুটির আগে ছুটি নিয়ে মাত্র কয়েকদিনের জন্যে জীবনানন্দ চলে এলেন বরিশালে। কয়েকদিন থেকেই ফিরে আসবেন রামজশ কলেজে। কলেজের জমির মধ্যে তাঁর সুন্দর কোয়ার্টার। দিল্লির রামজশ কলেজ তাঁর বেশ ভালোই লাগছিল। ছাত্ররাও মনোযোগী। এই তো সেদিন মাসতুতো ভাই দিল্লি এসে কয়েকটা দিন আনন্দেই কাটিয়ে গেলেন। বরিশালে আসার আগে ইংরিজির প্রধান অধ্যাপক ডাঃ সুকুমার দত্তর সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার। ডঃ দত্ত বললেন—'তাড়াতাড়ি ফিরবেন, ছুটি বাড়াবেন না যেন; মনে রাখবেন আপনার এখনও অস্থায়ী চাকরি।

ফিরবো শিঘ্রই সুকুমারবাবু, তবু যদি দু'-একদিন দেরি হয়ে যায় আমার যেন কোন অসুবিধে না হয়। আপনার হাতেই সব, আপনি এখানকার সিনিয়র অধ্যাপক। আপনার কথা সকলে মানে আমি জানি।

দিল্লি থেকে আসবার আগে জীবনানন্দ সুকুমারবাবুকে অনেক করে অনুরোধ করে এলেন যেন অধ্যাপনার চাকরিটি থেকে যায়।*

বরিশাল চলেছেন কবি। বিয়ের কথা চলছে। বরিশালে এলেন। দিল্লি ফেরা হল না মে-জুন মাসে দিল্লিতে গরমের ছুটি। কিন্তু ছুটির আগেও দিল্লিতে ফেরা হল না, ছুটির পরেও না। জরুরি কত কাজ এসে পড়তে পারে। অসুখ-বিসুখ হতে পারে। নিজের বা আত্মীয়স্বজনদের। আরও আছে বিয়ের কথা। জানা যায় না কেন তিনি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দিল্লি ফিরতে পারলেন না।

রামজশ কলেজের ইংরিজির অধ্যাপক প্রভাস ঘোষ বলেছেন—'টেম্পোরারি চাকরির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে ডঃ সুকুমার দত্ত অনেক চেষ্টা করলেন যাতে কবি জীবনানন্দর চাকরিটি থাকে। কিন্তু জীবনানন্দ ছুটির মেয়াদ ফুরিয়ে গেলেও চাকরিতে ফিরলেন না। কলেজ কর্তৃপক্ষও (কলেজের প্রেসিডেন্ট কেদারনাথ) টেম্পোরারি চাকরির মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে তাঁকে আর কলেজে রাখতে ইচ্ছুক হলেন না। ছুটির মধ্যেই জীবনানন্দের রামজশ কলেজের চাকরি গেল।

ঢাকায় এলেন জীবনানন্দ। বুদ্ধদেব বসুর বাড়িতে। সেখানে বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, অমলেন্দু বসু—প্রগতির বন্ধুরা।

লাজুক কবি ধীরে ধীরে জানালেন আপনাদের সকলের আমাদের বরিশালের বাড়িতে নিমন্ত্রণ।

বিয়ে বুঝি? কোথাকার মেয়ে?'

ঢাকার, পছন্দ হয়েছে। বিয়ের দিন আপনাদের উপস্থিত থাকতে হবে।

তা বেশ। ব্রাহ্ম বিয়ে কোনদিন দেখা হয়নি। এবার না হয় দেখা যাবে বন্ধুরা বললেন।

বিয়ের সময়ে জীবনানন্দর সঙ্গে বরযাত্রী হয়ে বুদ্ধদেব বসু অজিত দত্ত, অমলেন্দু বসুরা এলেন।

বিয়ে হয়ে গেল। জীবনানন্দ নববধূর সাথে বরিশাল এলেন। মস্ত সংসার। অনেকখানি ছড়ানো জমি। তার মধ্যে বড় বড় ঘর। কিন্তু মাটির ভিত, খড়ের আস্তরণ। শহর থেকে গিয়ে লাবণ্যর অনেকটা অবাক লাগে। নতুন পরিবেশ নতুন জীবন কি তাদের কবির জীবনে? আনন্দ না জ্বালা?'

কি ভাবছ মিলু?

কিছু না, এমনি বসে আছি।

না, বল কি ভাবছ।

একটি কবিচিত্ত ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকে। প্রকৃতির বিচিত্র রং-এর ছোঁয়ায় মনের আকাশে রং ধরায়। একটি বেড়াল বা একটি কমলালেবুর হিমকরণ শরীর বা অসময়ে ঝরে-যাওয়া ম্লান কচি নষ্ট শশা কিংবা মাঠে-পথে ছড়িয়ে থাকা ঝাউপাতা, চোরকাঁটা, লাল তারার মত বটফল—এমনি সব ছোট ছোটখাটো ছবির উপকরণও মনে গাঁথা হয়ে যায়, সৌন্দর্যে বাপ্পনায় অনন্য হয়ে ওঠে, যে কারোর সামগ্রী বসন্তের বুকে গৈরিক গ্রীষ্ম কঠোর সন্ন্যাসী দীপ্ত পায়ে হেঁটে চলে আসে। যদিও অগ্নিবরণ কৃষ্ণচূড়ার সমারোহ শেষ হয়নি তখনও, বাগানের সবুজ মেহেদি গাছের বেড়ার কিনারে যদিও আলো ছড়াচ্ছে, তখনও এক্সাসিা ইঁট-রঙের লিলিফুল, তবু আকাশে যেন তরল আগুন ছড়িয়ে গেছে, বাতাসে অগ্নিকণা। ইস্পাতের মত উজ্জ্বল আকাশের দিকে তাকিয়ে মিলু। কি অপূর্ব বৃন্ত এই দীপ্তি, কি ভয়াবহ তীব্রতাও। কি আশ্চর্য ঔজ্জ্বল্য, মাঝে মাঝে নিতান্ত 'নীলোৎপল পত্রকান্তিভিঃ কচিৎ প্রভিন্নাঞ্জনবারিসন্নিভৈঃ' মেঘমালা দূরদিগন্ত ভরে ফেলে, চোখের তাতকে দু-দণ্ড তৃপ্তি দিয়ে যায়। তারপরই আবার ডাকপাখির ডাক। গাংচিল আর শালিখের পাখার ঝটপট, মৌমাছি-গুঞ্জরন-উদাস অলস নিরালা দুপুর। সবুজ বনশ্রী, মাথার উপর শ্যেন মেঘের শান্তি, বালপাখির চক্কোর আর বাংলা। মনে হচ্ছে যেন মরুভূমির সবজিবাগের ভিতরে বসে আছি, দূরে দূরে তাতার দস্যুর হুল্লোড়। আমার তরুণী-প্রিয়াকে কখন যে কখন যে কোথায় হারিয়ে ফেলেছি। আসে ধানের আর শিশিরের মাস হেমন্ত। পাতায় ফুলে ধানের গুচ্ছে আকাশের স্নেহ শিশির হয়ে লেগে থাকে। গাছে গাছে পাতারা হলুদ হয়, ধানে জাগে গেরুয়া রং, বন্দুকের রং নিভৃ নিভৃ নরম হয়ে আসে। শিশিরের গন্ধ মেখে অশ্বত্থের জানালায় উঁকি দেয় পাখিরা নীড়ের সন্ধানে। স্বর্ণশস্যের সফলতায়, শিশিরের ক্যান্তিতে শান্ত প্রকৃতির সব ঐশ্বর্যে নিভন্ত ম্লানতায় এই ঋতুটি বড় বিশিষ্ট জীবনানন্দের মনে।'

সেদিন আকাশময় সোনালি রঙের ভেজা ভেজা রোদ গড়িয়ে যাচ্ছে। হালকা হাওয়া দিচ্ছে বেশমের স্নায়ুমণ্ডল স্পর্শের মত। ইজিচেয়ারে বসে জীবনানন্দ লিখছেন। প্রগাঢ় তন্ময়তায় আচ্ছন্ন। সামনেই কৃষ্ণচূড়া গাছে হাজার বঙ্কিম পুষ্পস্তবক। লাল আগুন জ্বলছে, গাছের তলার সজল মাটিতে অনেক সবুজ ঘাস আর প্রাণস্পন্দনের মখমল। তার ওপর আলো-আঁধারের সচল ছায়াছবি, নিপুণ আলপনা। এই তো লিখছিলেন। কখন যেন আনমনা রৌদ্রছায়ার সেই চন্দভঙ্গি দেখে, ঘাসের নিবিড় ঘাস-ফড়িং-এর নৃত্যপরায়ণতায় অভিনিবিষ্ট হয়ে গেলেন। একটা বেড়াল কখন থেকে ঘোরাঘুরি করছে। আসছে-যাচ্ছে—অন্ধকারের মতো নরম পায়ে, লাফালাফি করছে আলোছায়ার চঞ্চলার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে। ঘাসের বুকে আঁচড় দিচ্ছে, মাটির বুকে, কখনও বা ছুটে গিয়ে কৃষ্ণচূড়া গাছের গায়ে নোখের জোর পরীক্ষা করছে। রোদের সঙ্গে প্রকৃতির নরম হৃদয়ের সঙ্গে এই কলহ দেখে কেমন যেন কৌতুকবোধ হচ্ছিল কিংবা ব্যথিত হচ্ছিলেন। কবিতা লিখলেন। —'বিড়াল'।

সারাদিন একটি বিড়ালের সঙ্গে ঘুরেফিরে কেবলই আমার দেখা হয়:
গাছের ছায়ায়, রোদের ভিতরে, বাতাসী পাতার ভিড়ে;
কোথাও কয়েক টুকরো মাছের কাঁটার সফলতার পর
তারপর শাদা মাটির কঙ্কালের ভিতর
নিজের হৃদয়কে নিয়ে মৌমাছির মতো নিমগ্ন চলে আছে দেখি,
কিন্তু তবুও তারপর কৃষ্ণচূড়ার গায়ে নখ আঁচড়চ্ছে,
সারাদিন সূর্যের পিছনে পিছনে চলেছে সে।
একবার তাকে দেখা যায়,
একবার হারিয়ে যায় কোথায়।

---

*জীবনানন্দর রামজশ কলেজের ইংরিজি বিভাগের সহকর্মী অধ্যাপক প্রভাস ঘোষ বলেছেন এ-কথা।

হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান-রঙের সূর্যের নরম শরীরে
শাদা থাব বুলিয়ে-বুলিয়ে খেলা করতে দেখলাম তাকেঃ
তারপর অন্ধকারকে ছোট-ছোট বলের মতো থাবা দিয়ে
লুফে আনলো সে,
সমস্ত পৃথিবীর ভিতর ছড়িয়ে দিলো।

এমনি করে আরও অনেক কবিতাই লেখা হয়েছে। অনেক কবিতার জন্ম-লগ্নের কিছু কিছু ইতিহাস এলোমেলো করে জানা আছে হয়তো, কিন্তু কেন জানি না এই একটি দিনের স্মৃতি আজো শিশিরবিন্দুর মতো টলটল করছে মনে।' ছোট বোন সুচরিতা লিখেছেন, 'দাদা বোজ ইজিচেয়ারে বসে কবিতা লিখতেন। তখন তাঁর ছবি আঁকার নেশা ছিল। অলতো পেন্সিলের মৃদু চঞ্চলতায় অস্ফুট আলোছায়াময় কতই না কবিতা ফুটতো। কখনো কখনো দু' চোখ মেলে দিয়ে কেমন স্তব্ধ চেতন গভীর বিলুপ্তিতে ডুবে যেতেন। অবাক হয়ে দূর থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতাম। ভাবতাম বোদে পিঠ দিয়ে ইজিচেয়ারে বসে দাদা এত কি লেখে। কখনো কলম চলে দ্রুতগতিতে। কখনো লাল ফুলের আস্তরণে মুড়ে থাকা কৃষ্ণচূড়ার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে ধ্যানস্থ কবিচিত্তে তখন মধুছন্দা ঝর্ণাধারার অমৃতময় প্রবাহ বহে চলেছে। তখন বুঝতাম না এখন বুঝি কি করেই না রূপ-রাজ্যের খোলা নীলিমার কোলে পথ হারিয়ে ফেলত একটি সুকুমার সৌন্দর্যমগ্ন চিত্ত।'

দাদার হাতের লেখা বড় ছোট ছোট আর জড়ানো। বোঝাই যায় না।' বড় রাগ হয়। উঃ দাদা, তোমার লেখা পড়া যায় না। মনে হচ্ছে যেন একসারি পিঁপড়ে ছেড়ে দিয়েছ খাতার ওপর।

দাদার সে কি হাসি। রৌদ্র-ঝিলমিল নীলিমারই মতন সে-হাসি উজ্জ্বল। কখনো কখনো পেন্সিলে লেখে দাদা, আর সে-লেখা আরো অবোধ্য হয়ে ওঠে। সুচরিতার শাসন আরো বাড়ে।

রাগ, শাসন, পরে কান্না, 'তুমি যদি ভালো করে না লেখ দাদা, তোমার সঙ্গে কথা বলব না। অন্ততঃ একটু বোঝবার মতন করে লেখ—এত ভালো কবিতা যখন লেখ তুমি। তোমার লেখা কেউ বুঝতে পারবে না, ভুল পড়বে, ভুল ছাপবে, তখন বুঝবে তুমি।'

দাদা হেসেছে উচ্চকিত। গম-গম করে বেজে ওঠা হাসি যেন কতই না আমোদের বিষয়। কিন্তু ছোট বোনের দাবি তবু দাদা রেখেছেন। সুপঠিত এবং সুস্পষ্ট হয়েছে তাঁর হাতের লেখা।

জীবনানন্দের সঙ্গে কলেজে যোগদান করলেন অধ্যাপক নবেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়। নরেন গঙ্গোপাধ্যায় ইংরিজির অধ্যাপক। ছাত্রদের প্রিয়। নবেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় ছাত্রদের মধ্যে নিজেকে প্রিয় করে তোলার আর্ট জানেন, সেদিক দিয়ে জীবনানন্দ অক্ষম, অন্তরঙ্গ ছাত্রমহলে জীবনানন্দ প্রিয়। নরেন গঙ্গোপাধ্যায় বরিশালে এসেই কিছুদিনের মধ্যেই বরিশালের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এবং সত্যানন্দ দাশের সঙ্গে পরিচিত হলেন। সকলের সঙ্গেই আলাপ-পরিচয়ে তিনি ইচ্ছুক। আলাপ-পরিচয়ে লাভ-লোকসান ত নেই। নাই বা তিনি ব্রাহ্ম হলেন, ব্রাহ্মসমাজে গেলে হয় না। প্রত্যেক রবিবার না হোক, প্রায় রবিবার ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হন। জীবনানন্দের সঙ্গে মাঝে মাঝে ব্রাহ্মসমাজে দেখা হয় নবেন্দ্রলালের। জীবনানন্দ ব্রাহ্মসমাজে খুব কমদিনই উপস্থিত হন। সেই থেকেই তাঁর সঙ্গে আলাপ এবং কিছু ঘনিষ্ঠতা। ব্রাহ্মসমাজে নবেন্দ্রলাল একটি বক্তৃতাও দিলেন।

আপনি কবিতা লেখেন না জীবনানন্দবাবু?'

কিছু কিছু লিখি বৈকি, একখানি বই আছে 'ঝরাপালক'।

নরেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় বললেন, তবে আপনার এক-খানা বই আমাকে দেবেন, পড়ে দেখবো। আপনার কবিতা আমি পড়েছি—আপনি তো ঘাইহরিণীর কবি জীবনানন্দ দাশ, নন?

জীবনানন্দ সংকুচিত হলেন।

নরেন গঙ্গোপাধ্যায় যখন বগুড়াপাড়ায় জীবনানন্দর বাড়িতে এলেন জীবনানন্দ যেন আরও সংকুচিত পরিচয়ের মধ্যে কোথায় যেন অপরিচয়ের দূরত্ব এসে দেখা দিল। নবেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন, জীবনানন্দের অভ্যর্থনা উষ্ণ নয়। অগত্যা বলতে হল শ্রদ্ধেয় সত্যানন্দ দাশ মহাশয়ের কাছে এসেছি। তখন জীবনানন্দ বললেন, আসুন। অনেক পথ ঘুরিয়ে সত্যানন্দর পাঠ-গৃহে এনে বসালেন এবং বিদায় গ্রহণ করলেন।

তবুও একখানি করে ঝরাপালক বই স্বস্বাক্ষরে উপহার দিলেন তিনজন সহকর্মী অধ্যাপক নরেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রমথনাথ দে এবং বাংলার অধ্যাপক হেরম্ব চক্রবর্তী মহাশয়কে।

অধ্যাপক হেরম্ব চক্রবর্তী রসিক। বরিশালে বাগুরা-পাড়ায় সর্বানন্দ-ভবনের পাশেই তাঁর বাসস্থান। জানলা পথে প্রায়ই দেখেন জীবনানন্দ বাগানে পায়চারীরত। আপনমনে কিছু কবিতা আবৃত্তি। সর্বানন্দ-ভবন থেকে বেরিয়ে জীবনানন্দের কলেজে যাওয়ার পথখানি এগিয়েছিল অধ্যাপক হেরম্ব চক্রবর্তীর বাড়ির পাশ দিয়ে। হেরম্ববাবু অনেকদিন বলেছেন, আপনার যাওয়ার রাস্তা যখন আমাদের বাড়ির পাশ দিয়েই, তখন কলেজে যাওয়ার পথে আমাকে একবার ডাক দেবেন। গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।

ডাকবো বৈকি।

কিন্তু ওই পর্যন্তই। রোজই জীবনানন্দ কলেজের পথ ধরেন হেরম্ব চক্রবর্তীর বাড়িটুকু খুব তাড়াতাড়ি পার হয়ে। কি কথা রোজ বলা যায়। কি-ই বা গল্প আছে যা রোজই হয়। হয়তো চাকরি জীবনের নানান রাজনীতি, সাংসারিক গল্প, নয়তো দেশের রাজনীতি, কিছু সাহিত্যের গল্প—দৈনন্দিন জীবনে এর বাইরে আর কি গল্প থাকতে পারে। কিন্তু কবি যখন মৌন মানসলোকে, তখন তাঁর গল্প তো অঢেল।

—জীবনানন্দবাবু, ও জীবনানন্দবাবু!

কোন কোনদিন হেরম্ব চক্রবর্তী জানান জীবনানন্দকে দেখে ফেলেন, পিছু পিছু ছোটেন—কি মশাই, আমাকে ডাকলেন না কেন, আরে মশাই আপনার জন্যে খানাটানা খেয়ে রেডি হয়ে বসে আছি। কখন আপনি এসে ডাকবেন। তারপর দুজনে একসঙ্গে কলেজে যাব। আপনি তো বেশ লোক মশাই। আমাকে না ডেকেই

---

*অধ্যাপক হেরম্ব চক্রবর্তী লেখকের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন—অধ্যাপক নরেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় কবি জীবনানন্দকে ঘাইহরিণী বলে সম্বোধন করে ব্যঙ্গ করতেন।

চলে যাচ্ছেন। স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে দুঃখ করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন নাকি? মুখটা এমন ম্লান-গম্ভীর লাগছে কেন?

কই কিছু তো নয়।

কি হয়েছে বলুন, সত্যি করে বলুন। রাগ করে আপনার স্ত্রী কবিতা ছিঁড়ে দিয়েছেন, কবিতার খাতা তুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।

জীবনানন্দ হাসলেন খুক-খুক করে, তারপর জীবনানন্দীয় সেই দময়া হাসি। তারপর চুপ। শান্ত। কোনদিন তিনি হেসেছেন বা হাসেন সে-কথা মনে হয় না। আস্তে আস্তে বললেন—'সংসারের নিয়ম সব স্ত্রী চায় তাদের সংসার সচ্ছল হোক, আর্থিক সঙ্গতিতে শ্রেষ্ঠ হোক—তাদের জীবন ভরে উঠুক। তার স্বামী যেন অন্য সকলের থেকে শ্রেষ্ঠ হয়। এখানে শ্রেষ্ঠ বলতে সাংসারিক নিয়মে সমাজের প্রতিপত্তি।'

কথাটি সত্যি বলেছেন জীবনানন্দবাবু।

জীবনানন্দ তখন তাড়াতাড়ি হাঁটতে শুরু করে দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে কে কতটা হাঁটলেন, কে পিছিয়ে পড়লেন দেখার দরকার নেই। লম্বা লম্বা পা ফেলে জীবনানন্দ এগিয়ে চলেছেন। কবি মিশুক নন। বরিশাল শহরে কারো সঙ্গেই তাঁকে

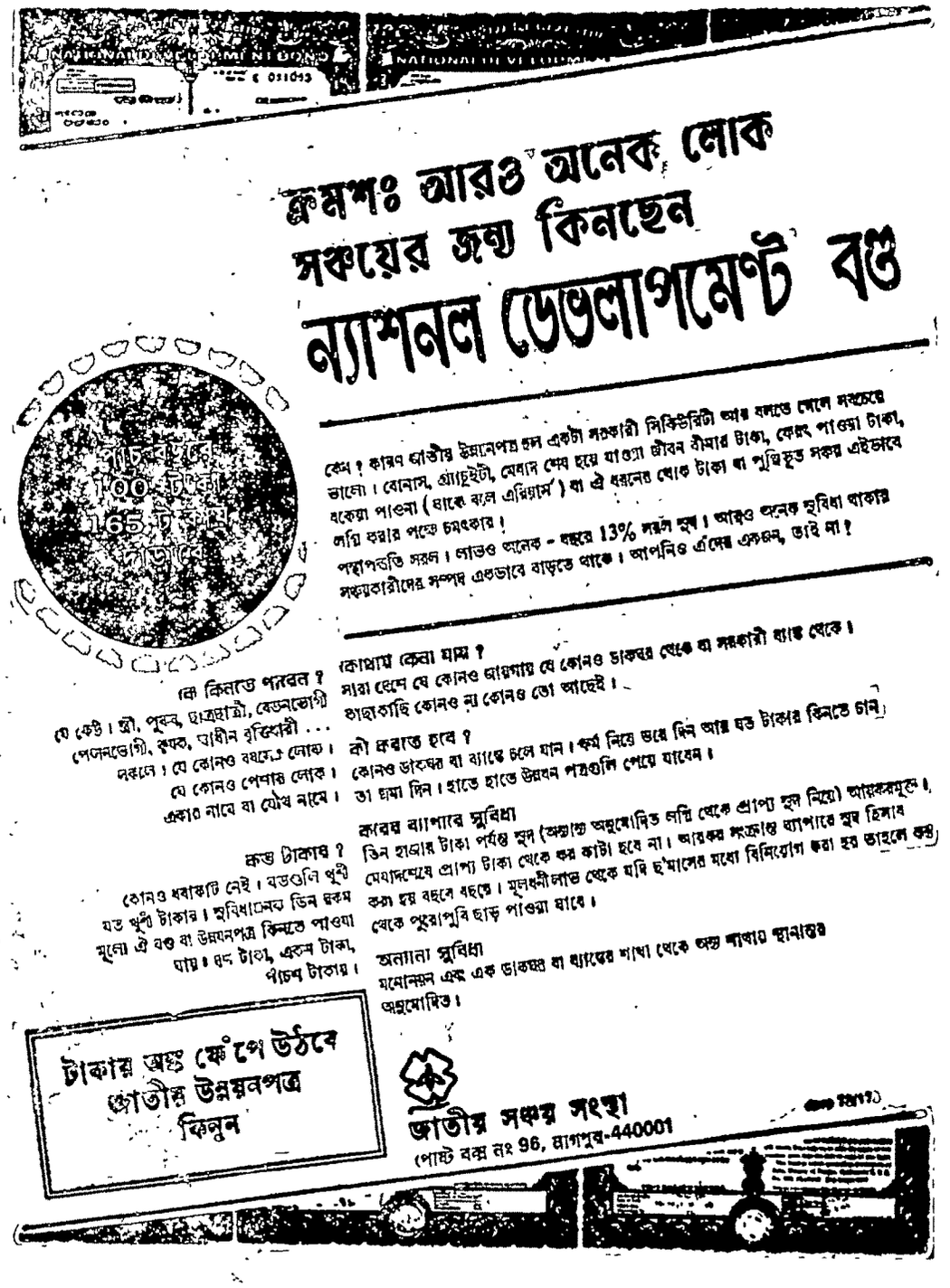

ঘনিষ্ঠ হতে দেখিনি। নিজেদের ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানেও তিনি এড়িয়ে চলতেন। অধ্যাপক এবং শিল্প-রসিকদের কোন আড্ডায় তাঁকে কখনো দেখা যেত না, ধর্মসভাগুলি তিনি সযত্নে পরিহার করতেন। কবি নিজেকেও যবনিকার আড়ালে ঢেকে রেখেছিলেন। মাঠের পাশের বাঁকা পথ কলেজের পিছন দিক দিয়ে কলেজে যেতেন। ক্লাশে শান্ত গম্ভীর ভঙ্গিতে পড়াতেন, অবসরকালে কষ্টিপাথরের মূর্তির মত বিশ্রামকক্ষের কোণে বসে থাকতেন। তারপর সেই নিরালা পথটি ধরে ফিরতেন নিজের নির্জন গৃহে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ডুরাণ্ড-ঘেরা দূর্বাশ্যামল প্রাঙ্গণে আনন্তদৃষ্টিতে দ্রুত পরিক্রমণ ছিল তাঁর নিত্যকর্ম। এমন অনুত্তাপ নিস্তরঙ্গ জীবন আমি কম দেখেছি। ভাবের হাওয়ায় হৃদয়-সমুদ্রে ঝড় উঠত বলেই দেহসীমায় এমন থমথমে ভাব—যেন অগ্নিগর্ভ শান্ত সৌম্য পর্বত, হাসলে মনে হত লাভা-স্রোতের আবশ্যিকতা কবি-প্রাণটির প্রকাশ বড়ই নিগূঢ়। বড়ই দুর্নিরীক্ষ্য। তাই সুলভ জনপ্রিয়তা জীবনানন্দর ভাগ্যে জোটেনি। অধ্যাপক হেরম্ব চক্রবর্তী আরো বলেছেন—কবি জীবনানন্দকে নিকট প্রতিবেশীরূপে পেয়েছিলাম, সহৃদয় সহকর্মীরূপে পেয়েছিলাম। কিন্তু তাঁর সঙ্গে কখনো অন্তরঙ্গতা গড়ে তুলতে পারিনি। তিনি কবিতের যে স্বপন-স্বর্গে স্বেচ্ছা-বিহার করতেন, তার আশেপাশে যাবার যোগ্যতা আমাদের ছিল না। মনে আছে নীল জলে সিঙি মাছ নামে একখানি ব্যঙ্গ কবিতা প্রকাশ করে তাঁকে আক্রমণ করেছিলাম। প্রথমে তাঁর চোখে ফুটে উঠল একটা সলজ্জ অপ্রতিভ কাতর ভাব। তার পরমুহূর্তেই উৎকট হাস্যের একটা দমকা এসে উড়িয়ে নিয়ে গেল বিদ্রূপের ধূম্র রাশি। জীবনানন্দ তাঁর কবিতার বিরূপ সমালোচনায় বড় ব্যথিত হতেন। কিন্তু মৌখিক প্রতিবাদ নয়, বিরুদ্ধবাদীদের তিনি নিরস্ত করতেন বেত্রাহত বালকের মুখের করুণ অসহায়তা দিয়ে।

বরিশালের নতুন ডেপুটি হয়ে এলেন শ্রীঅবনীমোহন কুশারী। কাব্যরসিক সমঝদার এবং সেই সঙ্গে খুব ফূর্তিবাজ। অধ্যাপক হেরম্ব চক্রবর্তীর বন্ধুমানুষ।

অবনীমোহন কুশারী হেরম্ব চক্রবর্তীর মুখে শুনলেন কবি জীবনানন্দ তাঁর সঙ্গে একই কলেজে অর্থাৎ বি এম কলেজের ইংরিজির অধ্যাপক।

সত্যি আপনাদের কলেজের অধ্যাপক। আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিন।

তিনি কি আপনার খুব প্রিয় কবি?

হ্যাঁ, তাঁর নাম আমি ঢাকায় থাকতেই শুনেছি। তাঁর কবিতাও পড়েছি। আমার ভালো লাগে। বুদ্ধদেব বসুর প্রগতি-তে তিনি অনেক কবিতা লিখেছেন। কল্লোলেও কবিতা পড়েছি, আমার ভালো লাগে তাঁর কবিতা। তাঁর একখানি বই বেরিয়েছে ঝরাপালক। নয়? তিনিই তিনিই আপনাদের কলেজের অধ্যাপক—যাঃ!

হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই জীবনানন্দ। শনিবারের চিঠির জীবানন্দ নয় জীবনানন্দ, জিহ্বানন্দ অধ্যাপক নরেনবাবুর ঘাইহরিণী।

এরকম করে তাঁকে আপনারা ঠাট্টা করেন নাকি। তিনি কিছু বলেন না?

তাঁর সঙ্গে আলাপ করে দেখবেন তিনি কি রকম লোক। তাঁর মত এত সাদাসিধে এত ঠাণ্ডা মানুষ দেখা যায় না। কারো সঙ্গেই তাঁর পরিচয় যেন নেই, দীর্ঘদিন আলাপ সত্ত্বেও ঘনিষ্ঠতা নেই। কোন কিছুতেই থাকেন না। দল রাজনীতির ঊর্ধ্বে। নিরিবিলিতে থাকতে ভালোবাসেন।

আমার সঙ্গে একদিন আলাপ করিয়ে দিন। তাঁর ঝরা-পালক বইখানি আমি পড়েছি, আমার বড় ভালো লেগেছে। কবে আলাপ করিয়ে দিচ্ছেন।

যে-কোনদিন আলাপ করলেই হয়। তবে জীবনানন্দ যে-রকম মুডি, আপনার সঙ্গে আলাপ করবেন কিনা সন্দেহ।

মানুষের সঙ্গে মানুষের আলাপ হবে না দেখা হলে, একি কখনো হয়! আপনিও যেমন!

দেখুন আপনি কি রকম ভাগ্যবান।

জীবনানন্দর সঙ্গে পরিচিত হয়ে অবনীমোহন কুশারী খুব খুশি হলেন। অবনীমোহনকে মাঝে মাঝে সরকারী কাজে বরিশালের জেলাগুলিতে ভ্রমণ করতে হয়। বরিশাল জেলায় অসংখ্য নদীনালা শাখা-প্রশাখা। বরিশালের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় সুন্দর।

যাবেন নাকি হেরম্ববাবু আমার সঙ্গে টুরে। আপনার ভালো লাগবে। এবার যাব বরিশালের দক্ষিণ অঞ্চলে।

বেশ তো যাওয়া যায়।

জীবনানন্দকে আমাদের সঙ্গীরূপে পাই না?

সাত-আটদিন নৌকাভ্রমণ, সরকারী বোটে প্রচুর আরামের ব্যবস্থা, উন্মুক্ত প্রকৃতির উদার নির্জনতা—লোভ হয় বৈকি ভ্রমণের। তবু জীবনানন্দ কোটর ছাড়তে রাজি নন। অবশেষে অনেক অনুরোধে কবিকে রাজি করানো গেল। স্টিমার-ঘাট থেকে বজরা ছাড়া হল। বজরা চলল প্রত্যূষের অপরূপ পরিবেশের মধ্য দিয়ে। দু'ধারে গাছপালা-প্রান্তর চলতে শুরু হলো, জলকল্লোল, মৃদু বাতাস, দিগন্তবিস্তৃত আকাশ। বজরার ছাদে বসেছেন জীবনানন্দ, অবনীমোহন, হেরম্ব চক্রবর্তী।

অবনীমোহন বললেন, আজ কি সৌভাগ্য আমাদের, কবিকে পেয়েছি আমাদের যাত্রার সঙ্গী হিসেবে। কেমন লাগছে কবি আমাদের এই জলবিহার?

জীবনানন্দর মুখমণ্ডলে স্মিত হাসির রেখা।

হেরম্ব বললেন—অপূর্ব।

অবনীমোহনের সরকারী বোট জল কেটে এগিয়ে চলল। জীবনানন্দ তাকিয়ে রইলেন দূরে—বহুদূরে, জল যেখানে আকাশ-সীমানায় মিশেছে। দৃষ্টি প্রসারিত করে তিনি চলে গেছেন কোন অতীত যুগে—বিদর্ভ নগরে। কবির চিন্তামগ্ন ধ্যানমূর্তিখানি বড় ভালো লাগে। জলের কলকল শব্দ, বোটের একটানা ছপছপ শব্দ, যান্ত্রিক ধ্বনি, আর দূর নদীতে মাঝির ভেসে-আসা প্রাণের গানে এক অদ্ভুত তরঙ্গ তোলে হৃদয়ের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে। অদ্ভুত এক আনন্দ অব্যক্ত, অপ্রকাশিত কিংবা যার প্রকাশ জীবনানন্দের কাব্যে ছড়ানো।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অবনীমোহন বললেন—আপনার একটা কবিতা আবৃত্তি করুন জীবনানন্দবাবু। আপনার কবিতা আমার বড় ভালো লাগে। বিশেষত ওই যে কবিতাখানি যার একখানি পংক্তি দেখনি কি উড়ে গেল প্রান্তরের কাক। অবনীমোহনবাবু কবিতাখানি আবৃত্তি করে চললেন। কবি বড় কুণ্ঠিত। নিজের কবিতা আবৃত্তিতে জীবনানন্দের লজ্জা। লাজুক কবি বলেন :—

আমার কবিতা থাক। বিদেশী কবিদের কবিতা বরং আবৃত্তি করি। কিম্বা রবীন্দ্রনাথ থেকে।

রবীন্দ্রনাথ এবং বিদেশী কবিদের কাব্য শুনবো, সে তো ঠিকই, তবু আপনার কবিতা আপনার মুখ থেকে শুনবো বলেই তো আপনার সঙ্গী হয়েছি। এ-সুযোগ কখনো দূরে রাখা যায়?

আপনি কবিতা আবৃত্তি করুন। অবনীবাবু তখনও তন্ময় হয়ে আবৃত্তি করে চলেছেন—

দেখনি কি উড়ে গেল প্রান্তরের কাক

অধ্যাপক হেরম্ব চক্রবর্তী একবার অবনীবাবুকে দেখলেন, তারপর কবি জীবনানন্দর দিকে চেয়ে হাসলেন। জীবনানন্দ লজ্জিত কুণ্ঠিত হয়ে এদিকে-ওদিকে চাইছেন। জীবনানন্দকে যে বরিশালের কুলায় থেকে বাইরে আনতে পারবেন বিশ্বাস ছিল না। এই তো জীবনানন্দ কেমন শান্তভাবে বোটের ছাদে সকলের মধ্যে হাসিমুখে বসে আছেন। হেরম্ব হাসলেন, একটু ঠাট্টা করলেন—রসিক হেরম্ব চক্রবর্তী, হালকাভাবে বললেন, 'কোটরের নির্জন প্যাঁচা এবার প্রান্তরের উড়ুক্কীয়মান কাক হয়ে পড়েছে।'

অবনীমোহন হেসে উঠলেও জীবনানন্দ হাসলেন না দেখে অবনীমোহনের হাসি বন্ধ হল। জীবনানন্দ অধ্যাপক হেরম্ব চক্রবর্তীর চোখে চোখ তুলে তাকালেন। অবনীবাবুকেও দেখলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বোটের ছাত থেকে নেমে নিচে নিজের ঘরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

অবনীবাবু বললেন, হেরম্ববাবু, একি হল। কবি যে রাগ করে নিচে নেমে গেলেন। আপনার ঠাট্টা বুঝলেন না। উনি কি ঠাট্টা ভালোবাসেন না।'

হেরম্ববাবু বললেন, উনি যে এতটা মনে করবেন সে-কথা ধারণা হয়নি। ওঁকে আজো আমরা বুঝতে পারি না।

অবনীবাবু বললেন, কবিতা নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ আমার মনে হয় তিনি পছন্দ করেন না।

তাই হয়তো হবে। চলুন আমরা কবির মানভঞ্জন করি।

কবি বসেছেন বোটের জানালার ধারে, জলের ধারে উদাস নয়নে, বড় শান্ত, বড় গাম্ভীর্যপূর্ণ মুখ তাঁর। তাঁর কাছে এখন এগিয়ে কথা বলা যায় না। দূরের মানুষ অন্য জগতে। নির্জনতার কবির এখন নির্জনতাই কাম্য। বোট এগিয়ে চলেছে, জল ছুটে চলেছে বোটের দুধারে। বোট কি উজানে যায়, না প্রতিকূল বাতাসে। জীবনানন্দ বোটের জানালায় হাত রেখে জল স্পর্শ করলেন। স্রোতধারা বহে গেল—জল শুধু জল—নদীমাতৃক বাংলাদেশ আর বরিশালের অসংখ্য শাখাপ্রশাখা নদী—যে নদী নেমেছে কোন দূর হিমালয়ের বরফ গলে, বৃষ্টির জলে—মেঘ আর সাগরের স্নেহে, আঁকাবাঁকা পাহাড়-পথে উপল বাধিত গতিতে প্রান্তর পার হয়ে, কখনো মন্থর, কখনো তীব্র স্রোত-ধারায় তার যাত্রা, ঘন বন—আকাশ যেখানে পত্রপল্লবে ছাওয়া, পাতায় পাতায় ঘসা, শিরশির আওয়াজ। স্রোতধারা নেমে এলো মাঠে ধানক্ষেতে গমে গঞ্জে নগরে জনপদে। তুমি কেন নদী? তুমি?

আমরা মাথাভাঙা নদীতে এসে পড়লাম—অধ্যাপক হেরম্ব চক্রবর্তী বললেন। পাশেই কয়েকটি গ্রাম। আমাদের সেখানে বোট থামাতে হবে। কাজ আছে কিছু, বললেন অবনীমোহন কুশারী—কুশারী সাহেব।

ছোট্ট একটি খাঁড়ির মধ্যে বোট প্রবেশ করলো। ছোট ছোট গ্রাম খাঁড়ির পাশে। গ্রামবাসীরা ছুটে এলো ডেপুটি সাহেবের বোট এসেছে। রঙিন পানশীর রূপ দেখে ছোট ছেলেমেয়েরা হাত-

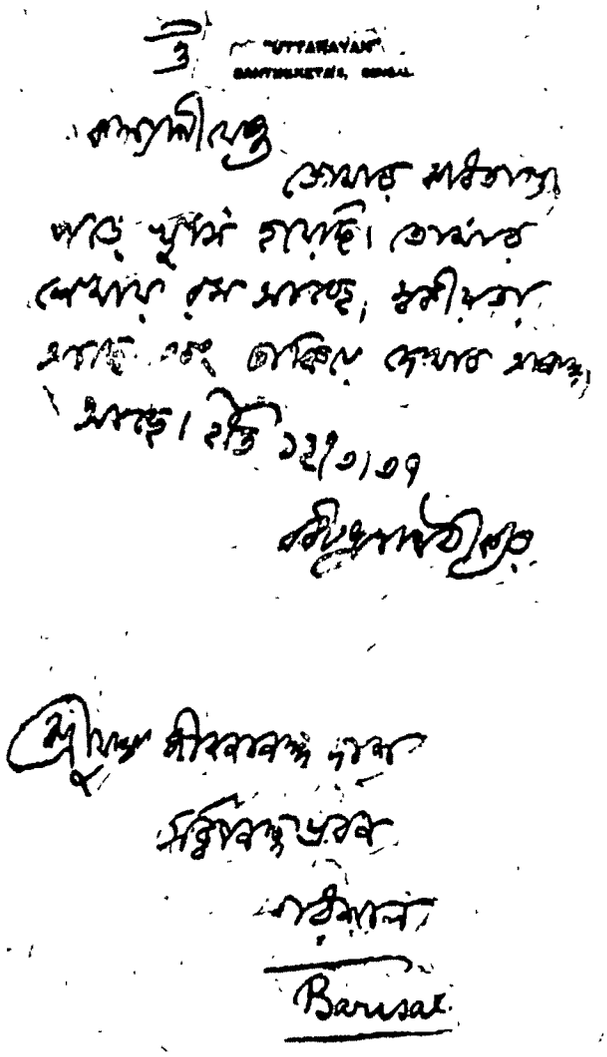

তালি দিয়ে ভিড় করল। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, মেম্বাররা এসে ডেপুটি সাহেবকে সেলাম ঠুকলো। কথাবার্তা হল। রঙিন পানশী আবার চলল গ্রাম ছাড়িয়ে, মাঠ ছাড়িয়ে, উজান স্রোত পাল তুলে, কখনো প্রতিকূল বাতাসে দাঁড় টেনে, গুন টেনে। চলল রঙিন পানশী দেশান্তরে।

এখন হেমন্তকাল। হেমন্তকালের মাধুর্য যেন কবি জীবনানন্দকে অতীত স্মৃতির রহস্যসাগরে নিয়ে যায়। নিজের বাস্তি-সীমাকে প্রলম্বিত দীর্ঘায়িত করে নিয়ে তিনি চলেছেন দেশকালের সীমা ছাড়িয়ে, হাজার হাজার বছর আগের আদি মানবদের সঙ্গে। তিনি একাত্মতা বোধ করতে পারছেন—এই অনুভূতি জাগবণের সোনার রুচি জাতিক-অবয়বের শান্ত-সুন্দর প্রকৃতি। বোটের ছাদের ওপর বসে কবি আগ্রহকেন দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছেন হৈমন্তী পৃথিবীর দিকে।

কি দেখছেন জীবনানন্দবাবু?

কথা নয়, শুধু মিষ্টি হাসির প্রত্যুত্তর।

পানশী ভেসে যায়। শর-কাশ, হোগলা-ঘেরা চরের নদীর তীর বেয়ে সন্ধ্যার কাক ঘরে ফেরে। পড়ন্ত রোদে সোনালী

চিত্রের চলমান ভাষা বুঝি থেমে পড়ে ক্ষণিক। আকাশে রং, মেঘে রং, আকাশ কেন সমুদ্র, মেঘেরা যেন সমুদ্রসফেন। আড়ষ্ট, অভিভূত কবি।

জীবনানন্দবাবু....আপনি একটি কবিতা আবৃত্তি করুন আপনারই রচিত, আমরা শুনতে ইচ্ছা করি।

আমার থাক।

কেন জীবনানন্দবাবু?

ঝরাপালকের কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করুন না।

না, না।

আমরা শুনবো না আপনার কথা।

আমার পক্ষে এখন সম্ভব নয়।

কিন্তু কেন কবির আপত্তি। কেন এ লজ্জা। অধ্যাপক হেরম্ব চক্রবর্তী লিখেছেন, আমরা আমাদের যাত্রায় কবিকে দিয়ে তাঁর একটি কবিতাও আবৃত্তি করাতে পারিনি। ইলিয়ট, লরেন্সের কবিতার ব্যাখ্যা শোনাতেন, কারো রোমান্টিকতার তাৎপর্য দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাতেন। কিন্তু নিজের কবিতার প্রসঙ্গ উঠলেই বোটের ছাদ থেকে নেমে নিজের কক্ষের দরজা বন্ধ করতেন। আর আমরা ঝরাপালকের এক-একটি পালক আলতো হাতে তুলে কোমল স্পর্শের রোমাঞ্চ অনুভব করতাম।

আমাদের নৌকাযাত্রায় জীবনানন্দবাবু বেশি দিন থাকতে পারেননি। সরকারী কাজে বোটখানা গ্রামের পাশে থামতো। গ্রামবাসী কৌতূহলী জনতার ভিড় হত। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মেম্বার এসে সেলাম ঠুকতো। ডেপুটিবাবু পরিচয় করিয়ে দিতেন দিগ্‌গজ অধ্যাপকদের কবিকে। বিশেষ করে কবিকে। যিনি কেতাব লেখেন। সরকারের কৃপাভিখারী একজন প্রেসিডেন্ট সাহেব ও ডেপুটি হুজুরকে বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে তুলনা করে আরও সাতটি রত্নের সন্ধান চাইলেন। এই ঘটনা কবির কাছে অসহ্য হয়ে দাঁড়ালো। কৌতুকের পরিবর্তে বিরক্তিতে কবির মন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে রইল।

কেন এঁরা আমাকে কবি বলে সকলের মাঝে পরিচয় দেন....যারা কবিতার কোন ধারেকাছেও নেই, মন বিষণ্ণ হয়, বিরক্তি আসে—স্থূল কৌতুক জীবনানন্দর ধাতে নেই। আর এক মুহূর্ত থাকতে ইচ্ছে করে না।

—হেরম্ববাবু, অবনীবাবু, আমাকে এবার বিদায় দিন। আমার আর ভ্রমণ ভালো লাগছে না। আমি বরিশালে ফিরে যেতে চাই।

—একদিন যাবেন? আর অল্প কটিদিনের মধ্যেই আমরা ফিরবো, ফিরতে চাই, কাজ আছে বরিশালে। আমাকে ফিরতেই হবে।

ছোট একখানি গ্রাম। গলাচাপা নাম। অদূরে স্টিমার-ঘাট। বরিশাল যাওয়ার স্টিমার দাঁড়িয়ে সেখানে।

কিছু মনে করবেন না, কেমন.. বড় কাজ বরিশালে। চলি। একবার পিছন ফিরলেন জীবনানন্দ পানশী থেকে নেমে প্রায় পালিয়ে স্টিমারে উঠলেন বরিশালে ফেরার জন্যে।

জীবনানন্দ বরিশালে ফিরে এলেন। বরিশালের দিন আবার এগিয়ে চলে। রোজ সকালে উঠে মুখ হাত পা ধুয়ে লেখার টেবিলে লেখা নিয়ে বসেন—কবিতা লেখা জীবনানন্দর সাধনা। কবিতা ছাড়া কবির জীবন ব্যর্থ। তার আগে হয় পাতঃভ্রমণ, মাথা নত করে আপনমনে সবুজ ঘাসে পা রেখে জীবনানন্দর পদচারণা সুরু হয়। তখন মনে মনে চলে কবিতা রচনা কিংবা তার প্রস্তুতি। ছবি প্রাতরাশে সকলে একসঙ্গে। মেয়েটির বয়স বছর পাঁচেক হল। খুব কথা বলতে শিখেছে। বড় মিষ্টি কথা বলে—বড় আদরের। মেয়েকে ঠিক তোমারই মতো দেখতে হয়েছে, অনেকে বলেন। জবাব দেননি। জীবনানন্দ কোন কথা বললেন না। মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন, অল্প আদর করলেন কোলে তুলে নিয়ে। 'পড়াশোনা করতে হবে না'—আস্তে আস্তে বললেন ভরাট গলায়।

ঠাকুমার কাছে নাতনির বড় আদর। ঠাকুমাকে ছাড়া নাতনির যেমন চলে না, ঠাকুরমারও ছোট্ট নাতনিটি ছাড়া চলে না। ঠাকুমার কাছে কত গল্প, কত কবিতা। মঞ্জু তুমি কবিতা লিখবে? ঠাকুমা নিজে কবি, তাই নাতনিটিকেও কবি করে তুলবেন।

কবিজায়া তাঁর মেয়েকে তার ঠাকুমার হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত। 'আমি কি করতে পারি, ও যে ঠাকুমার বড় আদরের, বড় ভক্ত। তারপর আমার তো কলেজ আছে। ক্লাস আছে—পড়াশোনা আছে। সাংসারিক কাজ—তার থেকেও তো দূরে থাকতে পারি না।....কই তুমি কি এখনও কবিতা লিখবে। এবার লেখা বন্ধ করো। চান-খাওয়া করে নাও, কলেজে যেতে হবে না?'

—আজ না গেলে কেমন হয়? রোজই তো কলেজ যাচ্ছি ...দেখ, আমাকে এখন বিরক্ত করো না। লিখতে দাও।

—নাও উঠে পড়, অনেক বেলা হয়ে গেছে। অনেক লেখা হয়েছে।

—আজ থাক্।

ওই এক লেখা তোমার। লেখা লিখে কি হবে শুনি? লেখা লিখে কি বাংলাদেশের সাহিত্যিক কবিদের পেট ভরবে?

চাকরি না হলেই নয়, অথচ জীবনানন্দর ভালো লাগে না। পুরো সময়ের জন্যে কি কবি হওয়া যায় না? কবিতা লিখে উপার্জন সম্ভব নয়? এদেশে বোধহয় সাহিত্যিক কবিদের পাশাপাশি আরও কিছু করা দরকার।

পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেন জীবনানন্দ কলেজের পথে। মাথা নিচু করে পথ হাঁটেন। পথে কেউ ডাকুন কিংবা কথা বলুন তা তিনি চান না। জীবনানন্দ যে জগতে বাস করেন, সে-জগৎ তাঁর আপন কাব্য-জগৎ। সেখানে কারো প্রবেশাধিকার নেই। মানব-জগতে, কাব্যজগতে অনবরত ভাঙাগড়ার কাজ চলছে।

বরিশাল জন্মভূমিতে বড় শান্তি। অধ্যাপনা এবং কবিতা—আর ভাবনা নেই—দায়-দায়িত্ব নেই ...আর কোন কাজ নেই।

'সংসারের কোন কথা, কোন কাজের কথা ভাবতে হবে না মিলু? কবিতা লিখলেই হবে?'—মা যদিবা বলেন, কবি বলেন—'কেন, তুমি তো আছো, আর শাল্মলী বৃক্ষের ছায়াঘন শান্তি যে আমার সর্বশরীরে, আমার আবার ভাবনা কিসের, আমাকে বাদ দাও মা।'

বাড়িতে চুরি হল। খবর পেয়ে দারোগা এলেন। মা বললেন, দারোগা এসে বসে আছেন, ও মিলু, তুই একবার যা না রে।

—কেন লাবণ্য কোথায়?' লিখতে লিখতে কবির জবাব।

সেকি? বাড়ির বৌ দারোগার সামনে যাবে কথা বলতে?

যাক না।—দেখছি লেখাপড়া জানা মেয়ে বিয়ে করা ঠিক হয়নি, তাদের কোন সাহায্যই তোমাদের দেশে পাবার উপায় নেই। লাবণ্য সব পারবে। আমাকে কাজ করতে দাও। না হলে তুমি যাও।

লেখা শুধু লেখা। এক মুহূর্ত সময়ের অপব্যয় নয়। কত যে লেখার আছে এ-জীবনে, কতটুকু আর লেখা হল। আরো কিছু সময় দাও হে ঈশ্বর, নয়তো কেড়ে নাও ঘুম সব সময়ের জন্যে।

এই লেখার পরবর্তী অংশ আগামী সংখ্যা থেকে কয়েকটি কিস্তিতে বেরোবে।

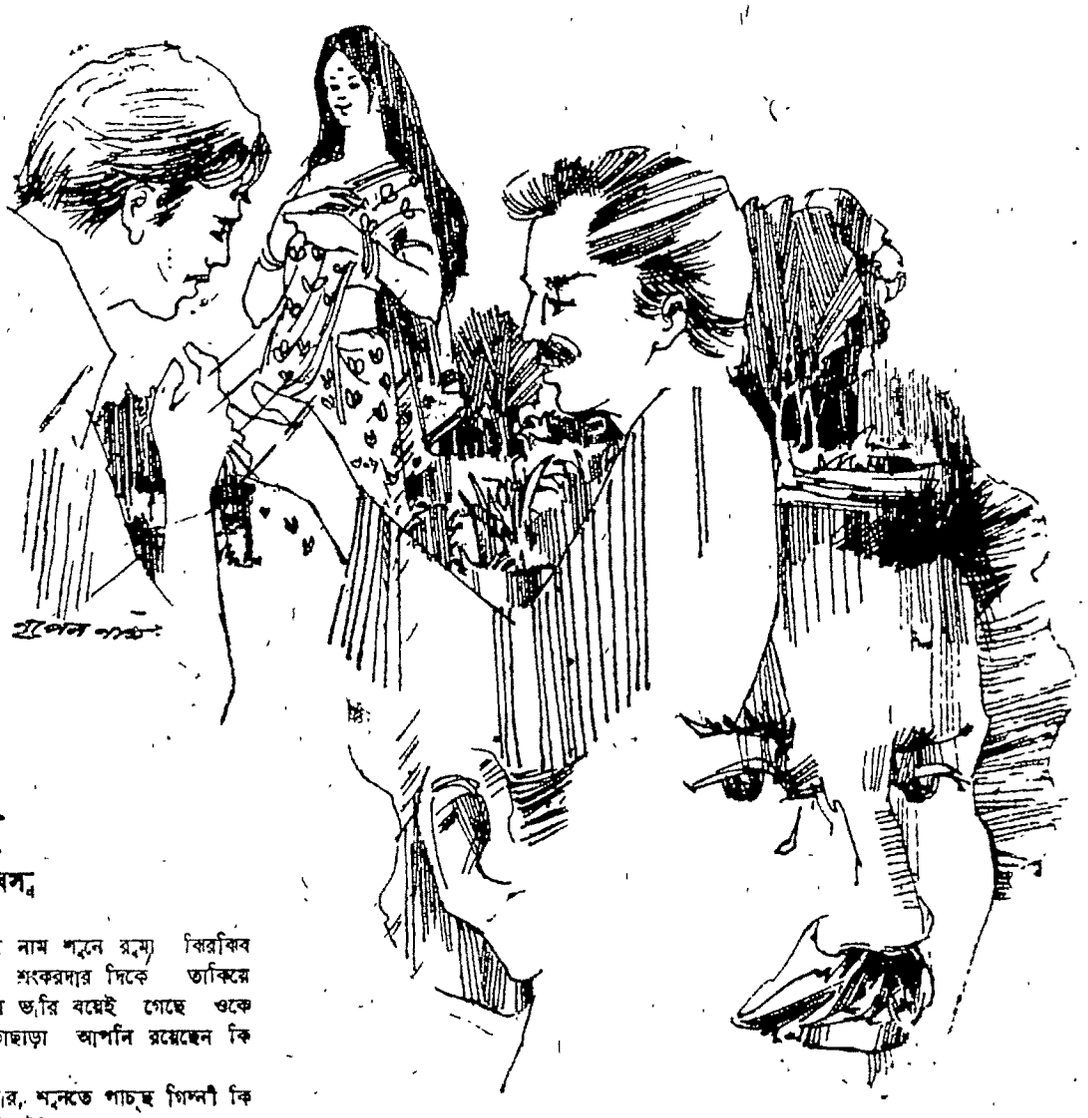

খোয়াই

নবকুমার বসু

ফুলমণির নাম শুনে রুমা খিলখিল করে হাসল। শংকরদার দিকে তাকিয়ে বললো—আমার ভারি বয়েই গেছে ওকে আটকাতে। তাছাড়া আপনি রয়েছেন কি করতে?

—ডাক্তার, শুনতে পাচ্ছ গিন্নী কি বলছে? একটু উঁচু গলায় শংকরদা বললেন।—এমন পরিবেশে রুমা আর তোমার পরোয়া করছে না। বক্তোটা পায়ে এগিয়ে যাও।

শংকরদার শেষ কথাটার কি যেন একটু ছিল। আমি যে সত্যিই একটু বিচ-ছিন্ন হয়ে এগিয়ে যেতে চাইছিলাম এ কথা ওঁর জানা হয়ে গেছে। কখন, কিভাবে! ঘুরে তাকালাম। শংকরদার মাথার কাঁচাপাকা অবিন্যস্ত ঝাঁকড়া চুল, আধময়লা ইস্ত্রী-বিহীন পাজামা পাঞ্জাবি, মোটা মাইওপিক কাঁচের মধ্যে ঝাপসা দুটো চোখ। স্থির-দৃষ্টি সোজাসুজি আমার দিকে। বললাম—হ্যাঁ শুনতে তো পাচ্ছিই। কিন্তু এগিয়ে আর যেতে পারছি কই? তাছাড়া আপনিই তো আমাকে আগে ডাকলেন।

—চেষ্টা করছিলাম তোমাকে। মুক্ত জায়গায় মুক্ত হতে পেরেছ কি না দেখছিলাম।—মিটিমিট হাসলেন শংকরদা।

—শুধু মুক্ত, না মুক্ত খন্ড! রুমা চেপে হাসলো।

মনে হল অনেকক্ষণ পরে খুব স্বাভাবিকভাবে রুমাকে হাসতে দেখলাম। সেই-মুহূর্তে চোখে পড়ল ওর মুখের চমৎকার প্রসাধন, ঠোঁটের উজ্জ্বল চড়া রং, চোখের পাতায় কাজলের গভীর রেখা। সব মিলিয়ে কেমন অচেনা লাগলো। দুপুরে যখন এসে পৌঁছোলাম, ওর চেহারা চোখ মুখ সব এমন কি মন মেজাজে ক্লান্তি আর বিরক্তির স্পষ্ট ছাপ পড়ে গিয়েছিল। মনে আছে ওকে বকুল ফুলের গন্ধের কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম, একটা বাসন্তি রঙের ফুল দেখাতে চেয়েছিলাম। ও কিছুই গেতে কিংবা দেখতে চায়নি। বিরক্ত হয়েছিল আমার ওপর। অথচ আমার তখন থেকে ঐ উত্তপ্ত নিঝুম দুপুরের বাতাসে কি এক অদৃশ্য রঙীণ ছোট ছোট ঢেউ বইতে আরম্ভ করেছিল ভেতরে। ধূ-ধূ মাঠ, বিশাল অজস্র লম্বা গাছ, পাতায় বাতাসের কিরকির শব্দ—আমার মধ্যে মিষ্টি বাজনার সুর তুলছিল। কিছুই আমি রুমাকে বলতে কিংবা বোঝাতে পারি নি। ও তখন ইঁট কাঠ সিমেন্টের একটা আস্তরের জন্য অস্থির হয়েছিল। অপেক্ষা করেছিল একটা দেয়ালের সীমাবদ্ধ নিরাপত্তার জন্য।

কিছুদিন ধরেই হাঁপিয়ে উঠেছিলাম প্রকাশ করিনি। তাগিদ বেশি ছিল রুমার হয়তো সেইজন্যেই বেরিয়ে পড়তে পেরেছিলাম একঘন্টার কম সময়ের প্রস্তুতিতে শংকরদার ডাক ত ছিলই—যে কোনো দিন যে কোনো সময়। তবু হাওড়া স্টেশন গাড়ির ভিড় মারামারি ঠেলাঠেলি দেখে মনে হয়েছিল উৎসাহে কেউ কেরোসিন ঢেলে দিয়েছে। লেডিজ বগিতে রুমার জন্য হয়েছিল। কিন্তু মালপত্তর ঠাসা বাঙ্কের একোনটুকু আমি পেয়েছিলাম, গাড়ি ছাড়ার আগে বুঝতেই পারি নি যে সেবার সহযাত্রী হিসাবে একটি নিরীহ ষাঁ—ডাকে চতুষ্পদ প্রাণীকেও পাবো। তার সঙ্গে উপ-পাওনার মত যে বস্তুটির খোঁটকা ব সারাক্ষণ সহ্য করতে হয়েছিল, নবকুমার তুলনায় তা কোনো অংশে কম কি না আ

জানি না। অগুনতি নারী পুরুষের ঘাড় মাথা পিঠ টপকে এরকম ডিগবাজী খেয়ে বোলপুর প্ল্যাটফরমে ছিটকে পড়েছিলাম। রাগ দুঃখ ঘাম গরম ক্লান্তিতে বিপর্যস্ত আধমরা হয়েও দেখলাম আর একটু রসিকতা বাকী ছিল। ব্যাটিস্টাট হাটে ধুতি খালি গা কক্ষচ্যুত বিহরী যুবক, গুলদোক্তায় ছোপানো নতুন গুড়ের মুড়কির মতো দাঁত বের করে নির্মল হেসেছিল। চলন্ত গাড়ির জানালায় মুখ রেখে বলেছিল—'বাবুকো বহুত তকলিফ হুয়া।' বিকাশ উঠেও খানিকক্ষণ ফুঁসেছিলাম। ভ্রূ জোড়া থেকে গিয়েছিল।

কিন্তু কতক্ষণ, কতটুকু সময়!

দোকানপাট হাটবাজার সিনেমা ফুরিয়ে গিয়েছিল একটু পরেই। মাটির রং যাচ্ছিল পালটে। বসতি কমে জেগে উঠেছিল উঁচু গাছের মাথা। অজস্র ফুলের পসরা নিয়ে তারা উৎসবের সাজে সেজেছে। ধু-ধু প্রান্তরের মাঝখানে রাস্তা। বাতাসে আগুনের হলকা, তবু তারা উধাও হয়ে যায় গাছের পাতায় শব্দ তুলে। স্তব্ধ ক্লান্ত নির্জন দুপুর। স্তব্ধতার মধ্যে একমাত্র প্রাণের স্পন্দন কানে আসছিল ঝোপের আড়াল থেকে। ঝিমানো ঘুঘুর ডাক। বিকাশ চাকায় প্যাডেল-এ আওয়াজ।

গায়ে আমার কাঁটা দিয়েছিল। কোথায় এলাম, আরও আগে আসি নি কেন। ভুলে গিয়েছিলাম টেনের দুর্ভোগ, কষ্ট। আরও অনেক কিছু। আমার দেড়খানা ঘরের ফ্ল্যাট, সাইলেন্সার ফাটা ডবল ডেকারের আওয়াজ শংকরদার কথা মনে পড়েছিল। 'জমে যেতে পারো ডাক্তার বেশি মরে যেও না। তাহলে এই আমার মতো জগদ্দল পাথর হয়ে যাবে। নড়তে পারবে না হয়তো'। পাশের মানুষটাকেও বোধহয় ভুলতে বসেছিলাম। হল না। হঠাৎ আঁতকে উঠে রুমা বলেছিল—এই, আলমারির চাবিটা নেওয়া হয়েছিল বেরুবার সময়?

—কি জানি, মনে নেই। মাথা গলিয়ে দিয়েছিলাম বিকাশের ঢাকনার বাইরে। নিবহংকারী টগর বাগানবাড়ির বেড়া টপকে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল। পাশেই বোগেনভিলার লাল আবির। সামলাতে পারলাম না। রুমার হাত ধরে টানলাম।

—দ্যাখো, দ্যাখো কি রং!

—ওহ্ বাবা, গরমে জীবন বেরিয়ে গেল!

—ওই যে, ওটা বকুল গাছ। নিচে ঝরে পড়ে আছে, গন্ধ পাচ্ছো ফুলের?

—এই বিকাশ, বাঁদিকের রাস্তাটা দিয়ে চলো। তুমি ঠিকানাটা জানো নাকি?

—পূর্বপল্লির শেষ বাড়ি। ও রকাশওলা চেনে। এই, রাধাচূড়া গাছটা দ্যাখো। হলুদ রঙের জাপানী ছাতার মতো। ওই ত, ঝাউগাছের পাশেরটা। দেখতে পাচ্ছো না!

একটা বড় শ্বাস ফেলে নড়েচড়ে বসল রুমা। শুকনো পাতা ঝরিয়ে এক ঝলক বাতাস বয়ে গেল আমার চোখের সামনে। রুমা কি দেখছিল, কি ভাবছিল এতক্ষণ। হয়তো ও ক্লান্ত, গরমে পরিশ্রান্ত। খিদে পেয়েছিল। তবু মাটির রং যখন লাল হয়েছে, দেবদারু ইউক্যালিপটাসের পাতায় বাতাস যখন শব্দ তুলেছে, এলিয়ে থাকা দুপুরের নির্জনতাকে ঘুঘুর ডাক যখন নির্জনতর করেছে—তখনও কি ও কিছু পায় নি, দেখে নি! কিছু ভোলে নি! আমার পাশে বসেছিল। আমার বুকের নিঃশব্দ হাহাকার ও টের পায়নি। তখনও চোখ খোলা ছিল, আমি কিছু দেখছিলাম না। রুমার দিকে তাকাতে চাইলাম, পারলাম না। আমার হাড়মাস পুড়ে গেছে মিথ্যে সভ্যতার আগুনে, চামড়ায় ডুগডুগি বাজিয়েছে কৃত্রিম স্বাভাবিকতা, বিবর্ণ পরাধীন উচ্চাশা। আমি কিছু পাই নি, কি পেতে চেয়েছি তাও জানি না। কেন এলাম, কেন আসতে চেয়েছিলাম। ভয় আর আশংকায় সিঁটিয়ে গিয়েছিলাম। অনুভব করেছিলাম বুকের মধ্যে রক্তের বলের ডাস খাওয়া, হৃদপিণ্ডের সচেতন ধুকপুক।

রিক্সা এসে দাঁড়িয়েছিল শংকরদার বাড়ির সামনে। পূর্বপল্লীর শেষ সীমায়, খোয়াইয়ের ধারে। রুমা সময় নষ্ট করেনি। নিজেকে তাজা, ঝরঝরে করার জন্য স্নান খাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছিল। শংকরদার বাড়ির আতিথেয়তা আর আয়োজনের অভাব ছিল না। থাকবে না জানতাম। আমি শুতে পারি নি। বিশ্রামের প্রয়োজন অনুভব করি নি। বেতের চেয়ার নিয়ে বসেছিলাম খোলা বারান্দায়। সামনে ধু-ধু প্রান্তর, পাথুরে মাটির চড়াই উৎরাই। খোয়াই। নির্জন দুপুর, কটকটে সূর্যের সাদা আলো। দূরের ঘরা জমিতে পাঁশুটে বিক্ষিপ্ত ঘাসের গোছা বাতাসী আগুনে জ্বলছে, ফুরফুর নড়ছে। স্তব্ধ প্রহরী—কয়েকটা ঘাড় ছাঁটা একপেয়ে তালগাছ। শংকরদা নিঃশব্দে এসে বসেছিলেন পাশে।

—কি—ডাক্তার, কেমন লাগছে, কি বলেছিলাম? ঘুম পাচ্ছে?

চমকে উঠেছিলাম। বোধহয় বন্দ হয়ে বসেছিলাম। শংকরদার দিকে তাকাতেই শব্দ করে হেসে উঠলেন। একটু সংকুচিত হয়েছিলাম। যেন নিজের আচ্ছন্নতার কাছেই ধরা পড়ে গেছি। বললাম—অপূর্ব, দারুণ। কিন্তু বড্ড ভাবিয়ে তোলে। এতোবড় আয়নায় নিজেকে দেখা যায় না।

—বেশ বলেছ। শংকরদা সিগ্রেট ধরিয়েছিলেন।—তবে দেখা যায় না, তা নয়। তুমিও জানো, এতো বেশি দেখা যায় যে ভয় করে। তাছাড়া সময়সাপেক্ষ।

—এই জায়গায় এতোবড় বাড়িতে আপনি একা থাকেন কি করে?

—কে বললো তোমায় একা থাকি? শংকরদার দৃষ্টি বহুদূরে। অনুসরণ করতে পারলাম না। বললেন—ফুলমণি আর ওর বর ভজনকে তো দেখলে। আর ওই যে—আমগাছের নিচে শুয়ে আছে। শংকরদা হাত তুলে বিশদভাবে চতুষ্পদটিকে দেখিয়েছিলেন। —ওর নাম লাট্টু। একেবারে প্রথম থেকেই আছে। ওর দু-একটি বংশধরও ইদানীং যাতায়াত আরম্ভ করেছে। একটু থেমে শংকরদা আবার বলেছিলেন—তাছাড়া এই যে, এই আমি। আমিই কি একজন মাত্র!

শংকরদা নিজের আবরণের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন। আমি কখনই নিজে সেখান থেকে ওঁকে টেনে আনতে চাই না। চাই নি। সূর্যের তেজ কমে আসছিল। বাতাসের তীব্রতা বেড়ে আছড়ে পড়ছিল তালগাছের মাথায়, পাতায়। চোখে পড়ছিল উঁচুনিচু মাটিতে গেরুয়া রং, রোদে পুড়ে যাওয়া হলুদ ঘাসের মধ্যে কিছু অবশিষ্ট সবুজের অস্তিত্ব।

রুমা উঠে পড়েছিল। হাতমুখ ধুয়ে সাজগোজ প্রসাধন সারছিল ঘরে। কিছুই ও ফেলে আসে নি। ইতিমধ্যেই আমাকে জানিয়ে গেছে, ওর বটুয়ার মধ্যে আলমারির চাবি পেয়েছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়েছিলাম শংকরদার বাড়ির গেট ছেড়ে।

খোয়াইয়ের ধারে এসে পড়েছিলাম। শংকরদার গলা পেয়ে পিছন ফিরলাম। রুমাকে দেখে মনে হল হোঁচট খেয়েছি। কি বলতে যাচ্ছিলাম, পারলাম না। বিশেষ তাগিদ অনুভব করলাম না। শুধু এখানে, এই নির্জন খোয়াইয়ের চারপাশ ঘিরে যখন সন্ধ্যা নামার প্রস্তুতি চলছে, পাখির ঝাঁক ফিরে যাচ্ছে, সেই আলো-আঁধারি সন্ধিক্ষণে রুমাকে সব মিলিয়ে আমার ভীষণ কৃত্রিম মনে হল। ওর নিখুঁত চড়া প্রসাধন টকটকে লাল শিল্ক শাড়ি হাতে দোলানো ভেলভেটের ব্যাগ, কথাবার্তা হাসি ঠাট্টা—এই উন্মুক্ত প্রান্তরের স্বল্পালোকিত পরিবেশে ঝোড়ো হাওয়ায় বড় বেমানান ঠেকল। ও খুব স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক প্রাণোচ্ছল। হাসছে কথা বলছে ঠাট্টা করছে।

শংকরদা আর একবার চেঁচিয়ে বললেন—এগিয়ে যাও, ডাকতার। সামনে ময়ূরাক্ষীর খাল। আমরা আসছি।

শংকরদা হাত ভেঙে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। বুঝতে পারিনি নিঃশব্দে একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠার প্রস্তুতি চলছিল। সব দিক দিয়েই শংকরদা আমার চেয়ে অনেক বড, তবু কি এক আকর্ষণ অনুভূত হয়েছিল যা আমাকে বারবার টেনে নিয়ে যেত আঠারো নম্বর কেবিনে। অনেক কিছু থেকেও কি যেন নেই, অনেক কথা বলেও কি যেন বলতেন না। অসমাপ্ত সেই অংশটুকু জানাই যেন আমার প্রাত্যহিক যাতায়াতের আসল কারণ।

কেন। বিশেষ কোনো রোগীর প্রতি আমার এ-টান (যা আপাতদৃষ্টিতে হাসপাতালের অন্য অনেকের কাছে পক্ষপাতিত্ব হিসবে চিহ্নিত) অনুচিত। অথচ এটাই সত্য। সোজাসুজি কখনই শংকরদাকে একথা জিগ্যেস করতে পারি নি। মাঝপথে থেমে যাওয়া ওর মুখের দিকে তাকিয়েছি, প্রশ্ন করতে চেয়েছি। পারি নি। বলা যখন না হয়তো না জেনে ওর জীবনের কোনো গভীর গোপন জায়গা ছুঁয়ে ফেলব। আমার পক্ষে সেটা হবে অনধিকার চর্চা।

অমৃতাঞ্জন

ব্যথা বেদনা, ঠাণ্ডা লাগা ও মচকানির জন্য একটি বহুমুখী ঘরোয়া দাওয়াই

আপনার ব্যথাস্থানে, ঠাণ্ডা-লাগা ও মচকানো জায়গায় সামান্য পরিমাণ আরামদায়ক অমৃতাঞ্জন লাগিয়ে মালিশ করুন। কয়েক মিনিটের মধ্যে এর দশটি ভেষজের কার্যকারিতা অনুভব করবেন এবং আপনি অনেক আরাম বোধ করবেন।

অমৃতাঞ্জন—জার, শিশি ও ছিমছাম কমদামী টিনের কৌটোয় পাওয়া যায়।

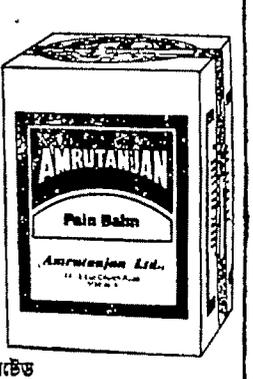

অমৃতাঞ্জন—
৮০ বছরেরও বেশি
সময় ধরে বিশ্বস্ত ঘরোয়া
রোগ প্রতিষেধক

AM 1912

অমৃতাঞ্জন লিমিটেড

শেষবারের মতো ওয়ার্ড বাউন্ড দিয়ে ফিরে আসছিলাম। রাত তখন সাড়ে এগারোটা। করিডোর অন্ধকার। ওয়ার্ডবয় জমাদার টুলি কিংবা মেঝেয় শুয়ে ঘুমুচ্ছে। বেডালগুলোর ছোটাছুটি কমে গেছে। আঠারো নম্বর কেবিনে অপারেশন হয়েছে তিনদিন আগে। ঘর অন্ধকার। নক করে আর ডাকব না। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়েই ফিরে আসছিলাম। দরজার কাঁচ, পাতলা পর্দা ভেদ করে সিগেটের আগুন দেখে ফেললাম। কি করে সম্ভব। দু-ঘন্টা আগে ঘুমের ওষুধ পেয়েছে। ঠুকঠুক শব্দ করে ডাকলাম।

—মিস্টার চৌধুরী, জেগে আছেন? আমি ডকটর বাসু।

কেবিনের ছোট্ট আলো জ্বলে উঠল। অল্প শব্দে দরজা খুলে দাঁড়ালেন মিস্টার চৌধুরী। শংকর চৌধুরী। তামাটের রং দীর্ঘদেহী মধ্যবয়স্ক। বাঁহাতে বিরাট মোটা ব্যান্ডেজ, ওপরে প্লাস্টার জড়ান। ভাঁজ-করা হাত গলায় বাঁধা। সাদা পাজামা আর গেঞ্জির রঙ্গে হতের রং মিশে গেছে।

—আসুন। এখনও ফেরেন নি' সংকোচ আর লজ্জার মেশান হাসি দিয়ে যেন অপরাধকে আড়াল করতে চাইলেন। ভেবে-ছিলাম মৃদু ধমক দেব। মুখের দিকে তাকিয়ে-পারলাম না। বরং একটু আপন হয়ে আস্তে বলি—কি ব্যাপার, ঘুম আসছে না? হাতে ব্যথা করছে? বিছানায় বসুন।

মিস্টার চৌধুরীকে বসতে বলে নিজেও হেলে পড়ি সোফায়। ক্লান্ত লাগছিল।

—না, হাতে আমার বিশেষ ব্যথা নেই ডাকতার। ওষুধও খেয়েছি। মিস্টার চৌধুরী বিছানায় বসলেন।

—তবে? ভাল লাগছে না হাস-পাতালে?

অজান্তেই একটা হাই উঠে আসে। মিস্টার চৌধুরী সোজা তাকিয়ে থাকেন আমার চোখের দিকে। আস্তে আস্তে বলেন — এরকম বন্ধ জায়গায় বন্দী-জীবন কার ভাল লাগে? আপনার লাগে?

মিস্টার চৌধুরীর কথায় যেন অন্য কি এক সুর। এড়িয়ে গিয়ে বলি—আমাদের কথা আলাদা। ভাল না লাগলে চলবে কেন?

—তার মানে লাগাতে হয়। মিস্টার চৌধুরী সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দেন। আবার বলেন—রাতে আমার এমনিতেই ঘুম আসে না, ডাকতার। চেষ্টা করি। করছি। কিন্তু আবার উঠে পড়ি। সিগেট্ট ধরাই। অন্ধ-কারে তাকিয়ে থাকি।

—আপনি অন্য কোনো জায়গায় ভালো হাসপাতাল কিংবা নার্সিংহোমে যাবেন? আমি তাহলে ডকটর মুখার্জিকে বলব।

—না, না তার দরকার নেই। তাছাড়া যেখানে আমার সত্যিই ভাল লাগে—মিস্টার চৌধুরী আবার কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে আমার চোখে—সেখান শুধু ভাল হাস-পাতাল কেন, কিছুই নেই। একেবারে শূন্য শুধু ফাঁকা।

তাকালাম মিস্টার চৌধুরীর দিকে। আমাদের দু-জোড়া চোখ দুটো নিশ্চুপ সরল রেখা রচনা করলো। থেমে থেমে বলি — কোথায় মিস্টার চৌধুরী, কোন জায়গার কথা বলছেন?

—খোয়াই ডাকতার, খোয়াই। মিস্টার চৌধুরী মুখ ঘুরিয়ে জানালার বাইরে অন্ধ-কারে চোখ রাখলেন।

—আপনি বোধহয় চিনবেন না। দ্যাখেন নি। রোলপুরের কাছে।

ঠিক ধরতে পারছিলাম না। একসঙ্গে অনেক প্রশ্ন মাথার মধ্যে ভিড় করে আসছিল। মিস্টার চৌধুরী অন্ধকারে তাকিয়েই আবার বললেন—ওখানে শুকনো মাটির চড়াই-উৎরাইয়ে, বোদ-জল-ঝড় বৃষ্টি আর বাতাসে আমি, আমার জীবন, বাঁধা পড়ে গ্যাছে। শুধু নির্জন শূন্যতা, এক নিদারুণ স্তব্ধতা মিস্টার চৌধুরী থেমে গেলেন। মুখ ঘুরিয়ে অস্বস্তি আর লজ্জার হাসি মেখে বললেন—ছি ছি, আপনাকে কি বিশ্রী বোর করছি। আপনার এখনও খাওয়াদাওয়া হয়নি। আমি শুয়ে পড়ছি ডাকতার। আরাম টুইং টু স্লিপ।

—বলুন না। আমার খারাপ লাগছে না। আমাদের রাত জাগা অভ্যাস আছে।

—আমার খুব লজ্জা করছে। আপনাকে এতো রাত অব্দি—

মিস্টার চৌধুরী উঠে দাঁড়ালেন। —আপনি যান ডাকতার। আমি শোব, ঘুমোব। কাল দ্যাখা হবে, তখন গল্প করব যদি আপনার সময় থাকে।

দেরি না করে উঠে পড়লাম। ভদ্র-লোকের অন্য কোনো ব্যাপার থাকতে পারে। আমার আর কৌতূহল প্রকাশ করা ঠিক হবে না। কেবিনের দরজায় দাঁড়িয়ে বলি—মিস্টার চৌধুরী, আপনার অপারেশনটা নেহাত ছোট না। আপনি ত জানেন প্লেট আর স্ক্রু দিয়ে আপনার হাড় জোড়া লাগান হয়েছে, স্নেনারেল এ্যান্টেসেথেসিয়া দেওয়া হয়েছে। কয়েকটা দিন রেস্ট খুব দরকার। একটু থেমে আবার বলি — আমার সার্ব মিস্টার চৌধুরী, বাট যা নো দিস ইজ মাই ডিউটি টু সাজেস্ট এ্যান্ড রিমাইন্ড য়্যু।

আর না দাঁড়িয়ে সোজা হেঁটে চলে এসেছিলাম। লিফটের সামনে থেকে একবার পিছন ফিরেছিলাম। আবছা অন্ধকারে মিস্টার চৌধুরী তখনও দাঁড়িয়েছিলেন। একটু অসহায় লাগলো। ডান হাত তুলে নাড়-লেন। আমি হাত নেড়ে নেমে গেলাম।

আমার কোনো প্রয়োজন ছিল না। অথচ কি বলব, রাত্রে যথেষ্ট ক্লান্তি থাকা সত্ত্বেও আমার ঘুম হয়নি।

কয়েকটা কথা খুব মনে আসছিল। এমন কি ঘটনা একটা মানুষের জীবনে থাকে যে সে রাতের পর রাত জেগে কাটায়, বন্ধুর তোষাইয়ের শূন্যতায় নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলে। নাকি আবদ্ধ করা নয়, বিশাল পাহাড়ের সামনে নিজেকেই পুরোপুরি উন্মুক্ত করা। করে দেখা, নিজেকে চেনা। আর সে যাই হোক না কেন, আমার কি মাথাব্যথা যে একটি রোগীর অন্তর্নিহিত কিছু ব্যাপারের জন্য রাতের ঘুম বিসর্জন দিতে হবে। এমন কি কথা তার সঙ্গে হয়েছে যে আমিও যেন দু-একবার নিজেকে একটা বিরাট নির্লিপ্ততার সামনে কল্পনা করে ফেলেছি।

আমার ত নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ শান্তি-পূর্ণ পরিশ্রমী জীবন। ইনডোর আউট-ডোরে রোগী দেখি, অপারেশনে যাই, এমার্জেন্সি সামলাই। খাইদাই সিনেমা দেখি ঘুমোই। বাড়ি থেকে বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে। হয়েও যাবে কিছুদিন পরে। কি মজা। একটি শিক্ষিতা সুন্দরী যুবতীকে নিজের করে পাব। বিলেত যাব, গাড়ি কিনব। বেডরুম লাগানো গাড়ি চড়ে আমার ফুটফুটে বাচ্চা ইংরেজী স্কুলে পড়তে যাবে। আমি টাইস্যুট পরে হাসপাতাল থেকে ফেরার পথে বাচ্চাকে তুলে আনব। ডানহাতে ঘড়ি পরা ঘরের মধ্যে স্লিপার পায়ে আমার সুন্দরী স্ত্রী ফ্রিজ থেকে চিলড বিয়ার বার করে দেবে। সন্ধ্যাবেলা চেম্বার শেষ করে আমরা ব্যালকনিতে বসে বিদেশী ছবি দেখব কিংবা পার্কস্ট্রীটের চীনা রেস্তোরাঁয় খেতে যাব অথবা বাড়িতে বসে পাইপ হাতে টিভি দেখব।

এই আমার জীবন। এই আমার উচ্চাশা। আমার স্বপ্ন সাধনা। নিঃশব্দ এই মানসিক প্রস্তুতি ধাপে ধাপে আমার মধ্যে ঠিক তার নিজস্ব গতি সঞ্চয় করে নিচ্ছিল। আমার ভাবনাচিন্তা, বোধ এসবের মধ্যে আর কোনো বিশেষ জিজ্ঞাসা বা দৃষ্টি ছিল না। থাকার কথাও না। সবই খুব স্বচ্ছ স্বতঃ স্ফূর্ত সবল এবং সাবলীল। মাঝে মধ্যে দু একটা দুঃখ বা ঝামেলার কাঁচ ঢেউ আমার জীবনে আসে। কারই বা না আসে। একটু ঢালমাটাল করে দিয়ে দুদিন পরে আবার তারা ফিরে যায়। আমি স্থির হয়ে যাই।

অথচ মিস্টার চৌধুরী, ওই আঠারো নম্বর কেবিন আমার মধ্যে অন্য কি এক আকর্ষণ সঞ্চার করলো। ছোট ছোট অন্য জীবনের বুদ্বুদ তৈরী হতে লাগলো। মিস্টার চৌধুরী থেকে শংকরদা হলেন। হাত সেরে গেল। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে চলে গেলেন। আমার আকর্ষণ গেল না। ওঁর জীবনের বিশেষ কোনো কথা আমি জানতে পারিনি। শুধু অনুভব করেছি মানুষটার ওপরের শুকনো উদাসীন আবরণের মধ্যে ঢাকা একটা কিছু তরল আন্তরিক ব্যাপার আছে, যা বলা যায় না। সেই সঙ্গে আমার ভেতরেও সংক্রামিত হয়েছে কিছু নতুন চিন্তা। মনে হয়েছে, আমারও জীবনের আপাত সমতল ভূমির নিচে ক্রমাগত বন্ধুর ডুবো পাহাড়েরা বিস্তৃত হয়ে চলেছে। আমার শৈশব বাল্যকাল কৈশোর থেকে আরম্ভ করে আজ এ মুহূর্ত পর্যন্ত বহু অব-চেতন অস্তিত্বের চূড়া আমার মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে। আমি তাদের পুরোপুরি দাবিয়ে রাখতে পারছি না।

শংকরদার স্ত্রীকে আমি দেখিনি।

শুনেছি আমেরিকায় থাকেন; মেয়ে কাছে ছিল। দেখেছিও দু-একবার। প্রেসিডেন্সিতে পড়তো। আমেরিকা চলে গেল। শংকরদার ফোন পেয়ে দেখা করলাম।

বুঝলে ডাক্তার, কুমার আর নেটিভ বাপকে ভাল লাগছে না। নিজেই পাসপোর্ট-টাসপোর্ট করে ব্যবস্থা করে ফেলেছে। সামনের সপ্তাহে চলে যাবে।

—আপনি যাচ্ছেন না?

—কোথায় যাব। একটা ফার্স্টক্লাস কানটির মেনটেনেন্স সিটিজেন হয়ে কতদিন থাকা যায়—একটু হেসে যেন নিজেকেই সমালোচনা করে আবার বললেন—নাকি, কথাটা উল্টে করে বলব! তাছাড়া একটানা আট বছর ত ছিলাম।

—কিন্তু এখানে আপনি একা থাকবেন কি করে?

—থাকব না। চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে এবার পাকাপাকি খোয়াইয়ের ধারে থেকে যাব। তোমায় কি বলব ডাক্তার, ওখানকার ওই নির্জন গম্ভীর পরিবেশে....নাহ্, আমার কাউকে ভাল লাগে না, কিছু ভাল লাগে না। আমি চাই না কেউ আমাকে ডিস্টার্ব করুক, অস্বস্তি করুক। বছরের পর বছর আমি ওখানে থাকব। একটানা পর একটা ঋতুর জন্য হাপিত্যেশ করে বসে থাকব। গ্রীষ্মের দুপুরের পর কালবৈশাখীর রুদ্র দেখব, বর্ষায় গাছের পাতা থেকে টুপিয়ে পড়া বৃষ্টির শব্দ শুনব, শরতের ভোরে শিউলি ফুল কুড়োব, হেমন্তের আকাশে....

হো হো শব্দে হেসে উঠলেন শংকরদা। কান খাড়া করে ছিলাম। তবু চমকে উঠলাম। হাসিটা স্বাভাবিক। আরও কিছু ভাবতে যাচ্ছিলাম তার আগেই শংকরদা নিজেই বলে উঠলেন—এ্যাই, এ্যাই ডাক্তার, আরে ঘাবড়াচ্ছ কেন! কি ভাবছ কি, আমি পাগল হয়ে উঠলাম কিনা! ওরে বাপুনা। মেয়ে বড় হয়েছে তার ব্যক্তিস্বাধীনতায় কেন হস্তক্ষেপ করব বল? তাছাড়া ওখানে আমার ফুলমনি আছে না? এবার গিয়ে ওর বরকেও বলে দেব আমার ওখানে থাকার জন্য। একটা ঘর করে দেব দুজনকে। থাকবে খাবে ঘরদোর দ্যাখাশুনো করবে। আমার মনও দুবেলা রাঁধবে, জামাকাপড় কাচবে। অসুবিধেটা কোথায়?

একটু পরে শংকরদা আবার বললেন—তাছাড়া এবার আমার হাত তো তোমরা সারিয়ে দিয়েছ। গিয়ে চাষ করব। ছোটকু জমি পড়ে আছে, ওখানেই তরিতরকারির গাছ লাগাব। কিউ বেগুন ঢ্যাঙশ লংকার চারা পুতব। ছাঁচি কুমড়ো আর লাউয়ের মাচা তুলে। কিছু বুঝেছো ডাক্তার, এবার প্ল্যানটা কিরকম করেছি?

খানিকটা তো নিশ্চয়ই পারছি। পুরোটা পারছি কিনা কি করে বলব!

—তুমি যে আবার কাব্যি করে কথা বলছ ডাক্তার। আর কিছু বুঝতে হবে না। হাসপাতাল থেকে ছুটি নিয়ে বৌকে সঙ্গে করে চলে এসো কয়েকদিনের জন্য।

—ভাবছি ত অনেকদিন থেকেই। তুমিও বলেছ অনেকবার। পারছি কই?

—পারতে তোমাকে হবেই।—শংকরদার স্থিরদৃষ্টি যেন কাঁচের মধ্যে দিয়ে বিঁধে গেল আমার মধ্যে। আস্তে বললেন—আমার ওখানে তোমরা যাবে থাকবে বেড়াবে। তোমাকে ডাক্তার, ঐ নিস্তব্ধ খোয়াইয়ের পাথরে গিয়েও দাঁড়াতে হবে। সন্ধ্যেবেলা খোলা হাওয়ার ঐ ধুধু প্রান্তরে দাঁড়িয়ে তোমাকেও একবার ভাবতে হবে—আমি কি, আমি কে! তোমার মধ্যেও আমি সেই নীরব নিঃস্বতা দেখেছি। বলতে পারো আবিষ্কার করেছি। না গিয়ে তুমি পারবে না।

শংকরদার ভরাট গলায়, কথার মধ্যে কি ছিল জানি না। বুকের মধ্যে গুরগুর করেছিল। আমার খোলা দুচোখের ওপর দিয়ে সবসর শব্দে বাতাস বয়ে গেল। তার স্পর্শে শিরশির করে উঠত আমার গায়ের প্রতিটি রোমকূপ। মনে মনে যেন স্থির করেই ফেলতাম—যাব। যেতে হবে।

পূর্ণিমার দেরি আছে আরও কয়েক-দিন। ফুলমণিদের গ্রাম দেখে ফিরে আসছিলাম। খোয়াইয়ের উত্তর সীমানায় ময়ূরাক্ষীর খাল। পূব থেকে পশ্চিমে বেঁকে নিয়ে গেছে অনেকদূর। দুপাশে উঁচু করা সরু খালের পাড়, হাঁটাপথের রাস্তা। খোলা মল এখন অনেক নিচে। যাওয়ার সময় দিনের আলোয় পাড়ের দেবালে খাঁজ কাটা লাল মাটির গা দেখে মনে হয়েছিল কোনো প্রাগৈতিহাসিক জীবের মেরুদণ্ডের ছাপ। শিহরণ লেগেছিল। বর্ষার পাগল জলের দ্রুত স্রোতের চিহ্ন রেখে গেছে লালমাটির রেখায়। অন্ধকার নেমেছে অনেক আগেই। নীলচে ফিকে আলোয় রাস্তা দেখা যায়। শাঁচা কুমড়ো ফালির এক টুকরো চাঁদ ঝুলেছিল। আগাছাহীন চকচকে কালো আকাশের বাগানে অজস্র ঝুঁইফুল তারা ফুটেছিল। বাতাসের তীব্র কাপটায় আমাদের জামাকাপড় উড়ছিল।

সাব বেঁধে হাঁটছি। এখন শংকরদার গান শুনে মনে হচ্ছে না, কিছু আগে ওঁর জীবনের যে কঠিন করুণ পরিস্থিতির ব্যাপার জেনে ফেলেছি, তা ওঁকে বিশেষ বিচলিত করেছে। অনুভব করছি আমার বুকের মধ্যে তোলপাড় করে চলেছে। বুমা দিকে তাকাতে ইচ্ছে না। রেডিও বন্ধ করার পর থেকে ওর সঙ্গে আমি আর কথা বলতে পারছি না। ও ইতিমধ্যে আবার দিব্যি ফুলমণির সঙ্গে নানা গল্প জুড়ে দিয়েছে। মাঝে মাঝে হেসে উঠছে। একবার বললো—ইশ্, কি বিচ্ছিরি হাওয়া আর অন্ধকার! বড় টর্চটা নিয়ে এলে কাজ লাগত। শংকরদা ভরাট গলায় গাইছেন—পুষ্প বনে পুষ্প নাহি....।

ফুলমণির ভাষা বেশ মিষ্টি লাগছিল। মোটামুটি বাংলাও জানে। ওদের ঘরদোর উঠোন গোয়াল টুকি হাঁড়িয়া তৈরী করার উনুন সব ঘুরিয়ে দেখছিল। নিখুঁত পরিচ্ছন্নতা দেখে অবাক হচ্ছিলাম। ঘরের দেয়াল উঠোন থেকে আরম্ভ করে গাছতলা পর্যন্ত মাটি দিয়ে নিকোন। ঝকঝকে তক-তকে। গাছ-পালার মধ্যে স্থল যেটুকু পরিষ্কার করা খানিকটা জায়গা। কয়েকখানা ঘর, কয়েকটি পরিবার। মাটির দেয়াল, খড়ের ছাউনি। মসৃণ দেয়ালে আঁকিবুকি, চিত্র-বিচিত্র।

মাঝরাস্তা থেকে আমাদের সঙ্গী হয়েছিলেন সুমন্তবাবু, ওঁর স্ত্রী বেলা। উঠোনে চাটাই পেতে ওরা সবাই বসেছিল। আলো ছিল না কোনো ঘরে। জ্বলজ্বলে চোখে কৌতূহল নিয়ে এদিক-ওদিক কয়েকটি উলঙ্গ শিশু দাঁড়িয়েছিল। আমগাছের ফাঁক দিয়ে তেলা চকচকে কাঁঠাল পাতার গা চুঁইয়ে ছোপ ছোপ জলকা চাঁদের আলো পড়েছিল নিকোন উঠোনে। গাছের পাতায় বাতাসের ঝিরঝির শব্দ। শংকরদার এখানে একটা আলাদা পরিচিতি আছে আগেই বুঝে-ছিলাম। নিঃসংকোচে যার তার ঘরে ঢুকে পড়ছিলেন। বাচ্চাগুলোকে কোলে নিয়ে আদর করছিলেন।

ফুলমণি আমাকে একটা ঘর দেখাবার জন্য ভেতরে ডাকল। শংকরদা সঙ্গে এলেন। পিছন থেকে আস্তে বললেন—দ্যাখো ডাক্তার, মাটির ঘরে দোতালা!

ছোট্ট নীচু দরজা। মাথা নামিয়ে ঢুকলাম। ঘুটঘুটে অন্ধকার। বাইরের হাওয়া বাতাস থেকে হঠাৎ যেন এক অন্য জগতে প্রবেশ করলাম। শ্বাস নিতে গিয়েই দম আটকাল। গোবর আর মলমূত্রের সঙ্গে হাঁড়িয়ার গা গোলান উগ্র গন্ধ। পায়ের নিচে শুকনো খড়ের আঁটি। সরসর শব্দে এদিক-ওদিক কিসব দু-একটা ছুটে পালালো। সিঁটিয়ে গেলাম। চটির মধ্যে পায়ের আঙুলগুলো আপনা থেকে গুটিয়ে গেল।

—ও কিছু না ডাক্তার, ইঁদুর। ফুস করে দেশলাই জ্বালালেন শংকরদা। ফুলমণি হেসে উঠল খিলখিল করে। হয়তো আমার অবস্থা অনুমান করতে পেরেছে। বললে,—ভয় পাচ্ছিস বাবু? ইখানে ময়না লাই। সাপ বিছা কাটবে লাই। আয় ভিতরে আয়। ওই দেখ্ সিঁড়ি। ফুলমণির হাতে ছোট্ট কেরোসিন লম্ফ। চোখ সয়ে গেলে আবছা অন্ধকারে কোণের দিকে একটি বাচ্চার দেখ লাম। আপনমনে বসে জাবর কাটছে। বাঁ-দিকে দেয়াল ঘেঁসে দাঁড় করানো বাঁশের মই। ছাদের কোণে ফাটল দিয়ে ওপরে উঠেছে। ফুলমণি একহাতে লম্ফ নিয়ে স্বচ্ছন্দে মই বেয়ে ওপরে উঠল। মুখ নিচু করে ডাকল—আয় বাবু। বিছু ভয় লাই।

মইয়ে পা রাখতে মচমচ শব্দ হল। শংকরদা আস্তে বললেন—ওঠো ডাক্তার, ভয় নেই। ও সিঁড়ি ভাঙবে না। ওপরটা দ্যাখো।

ফাটলের মধ্যে মাথা গলিয়ে উঠে গেলাম। পিছনে শংকরদা। ভয় লাগছিল। নরম মাটির ছাদ, যদি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে! না, ওপরটা নিচের তুলনায় ঢের পরিচ্ছন্ন। মাটির দেয়াল আর ঘরের চালের মাঝখানে খানিকটা ফাঁক। বাতাস চলাচল করতে পারে। এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলাম।

মসৃণ পেলব দেয়ালে বিচিত্র সব নকসা, মূর্তি লতাপাতার ছবি আঁকা। কুলুঙ্গীর ওপর একটা ভাঙ্গা আর্শি। কোণে একটা চামড়া ছেঁড়া মাদল আর বোঙ্গা (কাঠের মধ্যে খাঁজ কেটে শুয়োরের নাড়ি জড়ান—একতারার মতো)। ফুলমণির লম্ফ থেকে টিমটিমে একফালি হলুদ শিখা কোনো মতে জ্বলছিল। বললো—ইটো আমার মায়ের ঘর। দিয়ালে মা ছবি এঁকছে।

একটা স্তিমিতে তকতপোশের দিকে ঝুঁকে আঙুল তুলে বললো—বৌদিদিমণি যেদিন আসছিলেন, ইখানটা বস্যেছিল। পানের সাথে মিশায়ে কিসব বড়ি খেয়ে ঘুমায়ে পড়ছিল। ইখানে এট্টা বড় আর্শি—

নিজের চোখে এরকম একটা পরিবেশ ঘর দেখতে পাবো কল্পনা করিনি। ব্যাপসা আলোর দৃষ্টি ঘুরিয়ে যতটা সম্ভব দেখে নিচ্ছিলাম। কয়েকটা শব্দ কানে ঠেকল। হঠাৎ যেন ঘোর কেটে গেল। জিগ্যেস করলাম—বৌদিদিমণি? কে, কোন বৌদিদিমণি!

—উ মরে গ্যাছে।—ফুলমণি চট করে মুখ বন্ধ করল যেন।

নড়বড়ে মাটির ঘরের দোতালায় আলো-ছায়ার রহস্য। দেয়ালে আমাদের কিম্ভূত ছায়াগুলো হঠাৎ কখন স্থির হয়ে গেছে। আমার পা শিরশির করল। বাইরের উঠোনে ওদের দু-একটা কথার টুকরো কিংবা রুমার হাসি এতোক্ষণ কানে আসছিল। হঠাৎ সব থেমে গেছে। মাথায় ঝনঝন করে ঘুরছে 'উ মরে গ্যাছে'। ও কে, কোন বৌদিদিমণি। অজানা আশংকা আর অস্বস্তিতে আমার কপাল ভুরু কুঁচকে উঠল। একটা ধোঁয়াটে ধারণার মধ্যে থেকে চকিতে বিদ্যুত চমকের মতো কি যেন দেখে ফেললাম। অস্থির গলায় জিগ্যেস করি—চুপ করে আছিস কেন, এই ফুলমণি? কে মরে গ্যাছে? বৌদিদিমণি কে?

—সি আমার মনে নাই। তখুন আমি এত্তোটুকুন।

ফুলমণি এড়িয়ে যাচ্ছে আমাকে। শংকরদাকে ডাকতে যাচ্ছিলাম। সোঁ সোঁ শব্দে ঝড়ের চালের ওপর দিয়ে এক ঝলক হাওয়া বয়ে গেল। দেয়ালের ফাঁক ফোকর দিয়ে ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে। ফুলমণির হাতে লম্ফর শিখাটা কয়েকবার কেঁপেই দপ করে নিভে গেল। নিশ্ছিদ্র কালো অন্ধকারে ডুবে গেল ঘরটা। শংকরদার গলা পেলাম পেছন থেকে। গম্ভীর গলাটা কাঁপছিল। নিঃশব্দে অনেকটা ছুটে এসে যেন থুকছিল কথা বলতে।

—মিথ্যে কথা, ডাকতার! স্বাতী মরেনি। তুমি বিশ্বাস করো—ও বাঁচতে চায়নি।

—শংকরদা, আপনি কি—

—শোনো ডাক্তার,—শংকরদার গলা গলা থরথর করছিল, বুজে আসছিল। একটু দম নিয়ে আবার বললেন—ওর জীবনে এ্যাম্বিশান ছিল। কোয়ালিটি ছিল। কিন্তু বলব বোধ হয় সেই গভীরতার অভাব ছিল যা ওকে পূর্ণতা দেয়নি। ও কখনও নিজেকে নিজের মতো করে জানতে, বুঝতে চায় নি। কিসে ওর স্যাটিসফেকশন ও জানতো না। ইমোশন কনট্রোল করতে পারতো না। আমি যখনই একটু আত্মস্থ হতে চেয়েছি নিজেকে খোঁজার সামান্য চেষ্টা করেছি, তখনই ও ক্ষিপ্ত হয়েছে। ওর প্রতি অবহেলা মনে করেছে, স্বার্থপর বলেছে আমাকে। ঘৃণার প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে। নিয়েছে, ডাক্তার। স্বাতী চরম প্রতিশোধ নিয়েছে।

ফুলমণি টিমটিমে লম্ফটা জ্বালালো। কুলুঙ্গীর ওপর রেখে নিচে নেমে গেল। শংকরদার দিকে তাকাতে পারলাম না। থেমে থেমে আসতে বললেন—সে রাত্রে বোধহয় আমারই ভুল হয়েছিল। ওর ব্যাগ খুঁজে দেখিনি। কয়েক দিন ধরেই আমাদের মধ্যে এক নিঃশব্দ যুদ্ধ চলছিল। স্বাতী আমেরিকা ফিরে যেতে চায়। এখানকার ক্লামজি ওয়েদার ডার্টি সিটি বোরিং লাইফ সব নিয়ে ও হাঁপিয়ে উঠেছিল। ও ফাস্ট, হাই লাইফ লিড করতে চায়। আমার দুর্ভাগ্য ডাকতার, ঠিক তখনই আমার মধ্যে অন্য কি এক সৌন্দর্যের জাল নিঃশব্দে বোনা হচ্ছিল। অনেক দিন বাইরে কাটিয়ে এসেছি বলেই শব্দ পাচ্ছিলাম। একটু নির্জনতার মধ্যে নিজেকে খুঁজে দেখতে চাইছিলাম। প্রথম প্রথম ফুলমণিদের গ্রামে এসে 'সানথাল্স অব ওয়েস্টবেঙ্গল' নাম দিয়ে একটা ডকুমেন্টারি ছবির কথাও ভাবছিলাম। স্বাতী সবকিছুর অন্য মানে করেছিল।

শংকরদা থামলেন। অনুভব করলাম কপালে বিন্দু বিন্দু ঘামের ফোঁটা জমছে। পা দুটো পেরেক ঠুকে কেউ যেন আটকে দিয়েছে। ভারি গলায় শংকরদা বললেন—ও ফুলমনির মায়ের সঙ্গে গল্প করছিল এই ঘরে। আমি কিছুক্ষণের জন্য নিচে নেমেছিলাম ওদের পাতকুয়ো দেখার জন্য। কতটুকু সময়। এর মধ্যেই অন্তত কুড়িটা ঘুমের বড়ি ও পানের সঙ্গে খেয়েছিল। কিছু চিবিয়ে, কিছু গিলে। আমি ফিরে এসেও দেখেছি—ও হাতে মাটির ছোট্ট ঘটি নিয়ে জল খাচ্ছে। কিন্তু সোজা হয়ে বসতে পারছে না, এলিয়ে পড়ছে। দেরি করিনি, ডাকতার। ফুলমনির বাবাকে ডেকে ওকে নামিয়ে তক্ষুনি ছুটেছিলাম একলাই। কিন্তু এতো কুইক ওর রিয়্যাকশন হয়েছিল যে কয়েক মিনিটের মধ্যেই সবকটা ভাইটাল সেন্টারস ফেল করে গিয়েছিল। একবার বমি করারও সুযোগ পায় নি। পেট একদম খালি ছিল বলেই হয়তো। শর্টকাটে খালের পাড় পেরিয়ে যখন খোয়াইয়ের ওপর পৌঁছেছি, হঠাৎ আমার কেমন সন্দেহ হল—স্বাতীর গরীবটা সিফ হয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি শুকনো পাথরে শুকে নামালাম। হাত দুটো টেনে পালস দেখলাম। নেই। বুকের বাঁদিকে কান চেপে শুনলাম। স্তব্ধ, নিথর। ওকে জড়িয়ে ধরে এদিক ওদিক ওলোট পালোট করলাম। যদি একবার বমি করে। মুখে মুখ লাগিয়ে টানলাম ছাড়লাম—

কখন ঘুরে তাকিয়েছিলাম শংকরদার দিকে। চোখ টলটল করছিল। ডিলে হাতের মুঠো কাঁপছিল, হঠাৎ থেমে মাটির দেয়ালে ঠেস দিয়ে শ্বাস ফেললেন।

—পাগলামি করেছিলাম, ডাকতার। তার অনেক আগেই ও—। অন্ধকারে ওর হলুদ সিনথেটিক শাড়ি হাওয়ায় উড়ছিল। শব্দ উঠেছিল তালগাছের পাতায়। খোয়াইয়ের চড়াইয়ে সারারাত ওকে নিয়ে বসেছিলাম একলা। অসহায়ভাবে ওর প্রতিশোধকে আপন করে নিয়েছিলাম। কি আশ্চর্য, সে রাতে এক অদ্ভুত আচ্ছন্নতার মধ্যে এক সময় আমার মনে হয়েছিল—স্বাতী কখনও এই নীরব প্রকৃতির আসল রূপ দেখেনি। দেখতে চায় নি। আজকে অনেক সময়। আমরা একসঙ্গে যতটা পারি দেখে নিচ্ছি।

লম্ফ নিতে গিয়েছিল। ঘন অন্ধকারে আরও কতক্ষণ কেটেছিল জানি না। নিচে থেকে রুমার ডাকে চমক ভাঙল। সঙ্গে চলতি হিন্দী গানের শস্তা সুর।

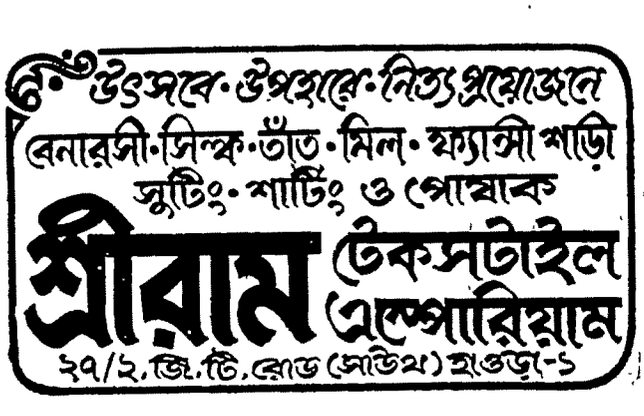

—এই ভোমবা ওপরেই জমে গেছ মনে হচ্ছে যে! গ্লাস বোতলের ব্যবস্থা হয়েছে নাকি? —রুমা খিলখিল করে হেসে উঠল। —সুমন্তবাবুরা চলে গেছেন। নিচে এসো।

শংকরদা সামলে নিয়েছিলেন নিজেকে। একসঙ্গে কয়েকটা দেশলাই কাঠি জ্বালালেন। শান্ত স্বরে বললেন—ওঠো ডাক্তার। যাওয়া যাক। সাবধানে এসো।

বাতাসে ভাসা ট্রানজিস্টারের হিন্দী-গান কানে ফুটছিল। আমরা ঘাড় শক্ত হয়ে উঠছিল। মনে হল, একটা রুদ্ধশ্বাস ছন্দ-পতন ঘটেছে। এই থমথমে জংলী পরিবেশ, আলো আঁধারি রাত্রির স্তব্ধ বিহ্বল প্রভৃতি আর কোমলতাকে কেউ কালা কালা করে কেটে ছিঁড়ে রক্তাক্ত করে দিয়েছে। সেইসঙ্গে আমাকেও।

মই মেয়ে নেমে এলাম। যেন স্বপ্ন ভেঙে জেগে ওঠা ঘোর আমার চোখে। ঘামে ভিজেছে সারা শরীর, জামা কাপড়। ফাঁকা চাওয়াস বুক ভর একটা শ্বাস নিতে গিয়ে থমকে গেলাম। রুমার হাতে ট্রানজিস্টার। ঝড়ের বেগে একরকম ছিনিয়ে নিলাম বেডিওটা ওর হাত থেকে। নব্ ঘুরিয়ে যেন চিরকালের জন্য বন্ধ করে দিলাম। হঠাৎ স্তব্ধতা। বুকের মধ্যে ধুকধুক করছিল। গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াই। তারাফোটা কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি। বুকে মোচড় দিচ্ছিল। নীরব নিঃস্ব উন্মত্ততা টগবগিয়ে ফুটছিল—আমার কিছু নেই, আমি কিছু পাই নি।

রুমার মুখ আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। বুঝতে পারছিলাম, ওর ভ্রূ এখন বাঁকা, মুখে বিরক্তি আশংকা অভিমান অপমানের ছাপ স্পষ্ট। ছোট্ট কপালে হয়তো অনেক-গুলো ঘৃণার রেখা; ঠোঁট অশ্রুধায় বন্ধ। শংকরদা আলতো হাত রাখলেন কাঁধে।

—চলো ডাক্তার, রাত হয়ে যাচ্ছে।

খালের পাড় পেরিয়ে খোয়াইয়ের ওপর এসে পড়েছিলাম। শংকরদার বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। আলো জ্বলছিল। উন্মত্ত বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ আসছিল কানে। কাছাকাছি পাশাপাশি হাঁটছিলাম সবাই। একটা জায়গায় এসে শংকরদা দাঁড়ালেন।

—একটু বসবে নাকি?

—না বাবা, আমার আর সখ নেই। রুমা সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিল। —খিদেয় আমার পেট চুঁইচুঁই করছে।

—আচ্ছা তোমরা এগোও। আমি আসছি। —শংকরদা খোয়াইয়ের মাটিতে বসলেন।

ফুলমনি ভজনের সঙ্গে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। আমিও। শংকরদার সঙ্গে দুচার মিনিট বসতে পারতাম। হয়তো চেয়েওছিলাম। পারলাম না।

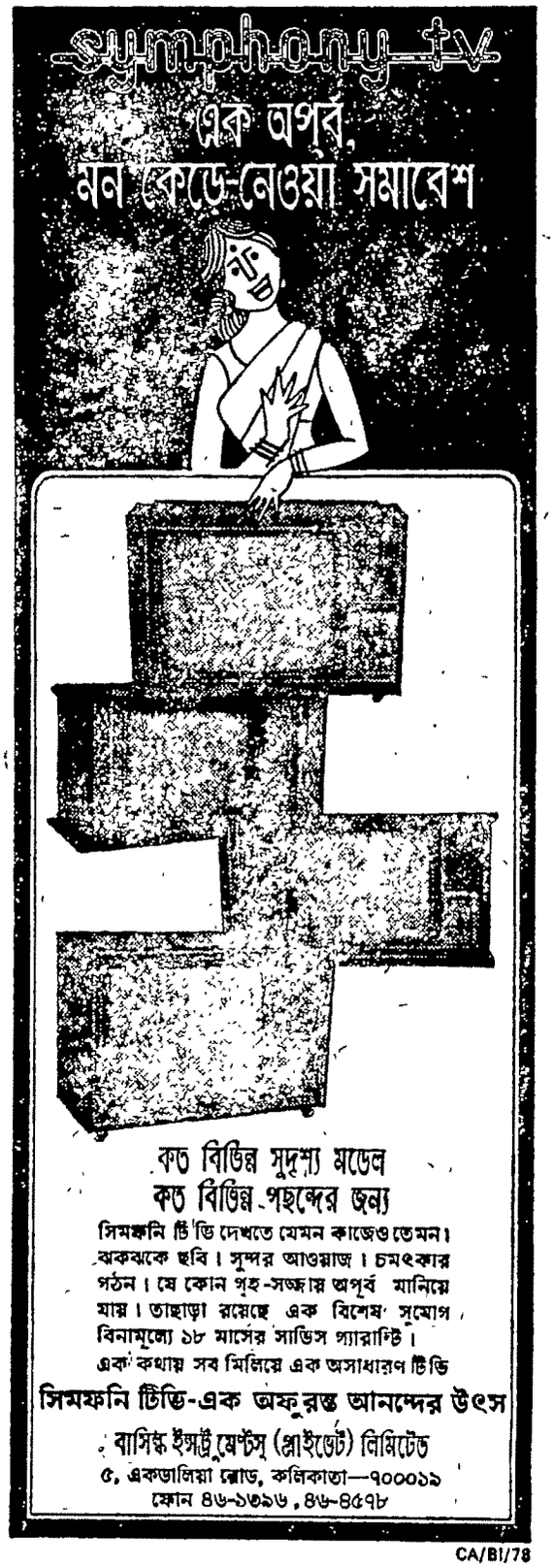

CA/BI/78

বাবুর জমি

সোমনাথ ভট্টাচার্য

আজ বাবু আসবেন।

চিঠি দিয়েছেন। এ বছর পাটের সঙ্গে ভাগের যে পাট বাবুর পাওনা হয়েছে,—সেই পাট যেন বিক্রি করে রাখে। আজ এসে টাকা নিয়ে যাবেন। কোলকাতা থেকে বছরে বাবু দুবার গ্রামে আসেন। একবার শীতে। —আমন ধান উঠলে নিজের জমির ভাগের ধান, খড় বুঝে নিয়ে বিক্রি করে টাকা-পয়সা গুছিয়ে নিয়ে যেতেন।

দুখীরাম ধানের জমির কাদা ঘেঁটে দিচ্ছিল। যদিও আজ এই ধানঘাটার ব্যাপারটা মনঃপূত ছিল না। আগেই সময় মত ধানের খেত নিড়িয়ে, ঘেঁটে দুখীরাম ঝকঝকে করে রেখেছিল। কিন্তু বাবু চিঠি দিয়েছেন, —আজ আসবেন। দুখীরামকে দেখতে হবে, বাবুর জমির জন্য দুখীরাম ঘাটেঘোটে। ভাগের জমি বলে অবহেলা করে না। আলের ওপর একটা থালি ধামাও রেখে দিয়েছে। রাস্তার ধারেই বাবুর জমি। এই রাস্তা দিয়েই বাবু দুখীরামের বাড়ি যাবেন। পেছন পেছন যাবার সময় এক ফাঁকে শুনিয়ে দেবে দুটো ইউরিয়া দে ঘেঁটে দেলাম।— ভাগচাষী হলেও দুখীরাম পেছপা নয়, এটা বুঝিয়ে দেওয়া।

বাবু সময়-সময় টিকটিক করেন, কি রে দুখে—? বছর বছর খুব ভাল ধান হলেও সেই বিঘেতুঁই আট-দশ মণ ধান? —এর কি আর গুছু রাড়ন্ত নেই বাপ। খবরের কাগজ রেডিওতে এতো চেঁচামেচি....বিঘেতে বিশ মণ, তিরিশ মণ ধান ফলছে,—তোর তো সেই ঠাকুর্দার আমলের হিসেব?.... একটু সারটার দে বাপ · সারটার দে। বেশি হলে তোর ভাগ থেকে তো আমি কেড়ে নিয়ে যাব না। শুধু নিজেরটা হলেই হবে। —দেশের দিকে একটু তাকাটাক্ক।

বাবু আসছেন।

দূরে রাস্তা দিয়ে সাদা ধুতি জামা পরা ছাতা মাথায় একটা লোককে গ্রামের দিকে আসতে দেখতে পাচ্ছিল দুখীরাম। এই সময়, এই রকম পোশাকেই আসেন

বাবু। বাবু কোলকাতায় অফিসে কাজ করেন। অফিসে দশটায় হাজিরা দিয়েই ওখানে আসার গাড়ি ধরেন। তাড়াতাড়ি না করলে আবার ঠিক ছুটি হবার মধ্যে অফিসে পৌঁছোনো যায় না। এতো বছর এই যাতায়াত দেখতে দেখতে সময়টা প্রায় মুখস্থই। বেলা আনন্দাজ করে মনে হল, সাড়ে বারোটা হবে। সন্দেহ হচ্ছিল, দূরে থেকে সঙ্গে আর একজনকে একই সঙ্গে আসতে দেখে। পরনে, প্যান্ট-শার্ট—মাথার ওপর ছাতা নেই। ছাতামাথায় লোকটার পেছন পেছন আসছে। —মাঝে মাঝে পেছিয়ে পড়ছে কাদা রাস্তায়। ছাতামাথায় লোকটা দাঁড়িয়ে পড়ে অপেক্ষা করছে। ও যাবৎকাল বাবুকে একাই আসতে দেখেছে দুখীরাম। বাবুকে অনেকবার বলেওছে এনিয়ে, শীতের দিকে মাকে ছেলেমেয়েদের একবার নে আসেন গেরামে—। বাবু এক কথায় উড়িয়ে দেন, দূ-উ-স বলে সাপে কামড়াবে, জোঁক ধরবে কতো বলেছি।

আরও খানিকটা কাছে আসতে দুখী রামের সন্দেহ ঘুচলো।—বাবুই আসছেন। দুখীরাম আড়চোখে রাস্তার দিকে নজর রেখে ধানক্ষেতের মাটি ঘাঁটা আরও দ্রুত করে দিল।

বাবু এলেন।

রাস্তা থেকে হাঁক শুনল দুখীরাম, এই—কে রে ওটা? দুখে নাকি রে ..?

দুখীরাম এবার ধানচারার ওপর দিয়ে সটান উঠে দাঁড়াল। পরনের কাদায় মাখা লুঙ্গির মত গামছাটা একটু টেনেটুনে নামাবার ভঙ্গি করে সম্ভ্রম দেখাবার চেষ্টা করল।

নয়ানজুলির ওপারে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে বাবু। পান চিবোচ্ছেন। ফর্সা গোলগাল মুখের মধ্যে ঠোঁট দুটি পানের রসে টুকটুকে লাল। পরনের ধুতির কোঁচাটা পাকিয়ে পুটলী করে একহাতে সামনে আঁকড়ে ধরা। অন্য হাতে ছাতা। ঘামে পাতলা পাঞ্জাবি গায়ের সঙ্গে পেঁয়াজের খোসার মত সেঁটে রয়েছে। হাঁটু পর্যন্ত কাদা। পেছন থেকে দেখলে মনে হয়, তাড়াহুড়োতে বাবু শুতি পরতে কথা ভুলে গিয়ে শুধু পাঞ্জাবি গায়ে দিয়েই বেরিয়ে পড়েছেন। কাঁধ থেকে কাপড়ের ব্যাগ ঝুলছে। দুখীরাম জানে, ব্যাগের মধ্যে বাবুর জুতো তোলা রয়েছে। বাবুর সঙ্গের জনের হাঁটুর ওপর পর্যন্ত তোলা প্যান্ট। সার্টের বুকের সামনের প্রায় সবকটা বোতামই খোলা। ঘাড়ের নীচে পর্যন্ত ঝাবরি চুল। গালের মাঝখান পর্যন্ত নেমে এসেছে মোটা জুলপি। ঘন গোঁফ ঠোঁটের দু পাশে ঝুলে রয়েছে। ফর্সা মুখ বোদে ঘামে আংরার মত গনগনে। খোলা বুক হাপরের মত উঠছে-নামছে।

মাথায় খালি ধামাটা নিয়ে নয়ানজুলির একবুক জল ভেঙে রাস্তায় উঠে দুখীরাম বাবুকে নমস্কার করল।

—একেও একটা পেন্নাম ঠোক নে দুখে। তোর বাবুর গলার দড়ির দাম যার হাতে ধরা ইনি তাঁরই সাক্ষাৎ সহোদর বাবু, বুঝিয়ে বললেন, আমার শালাবাবু। গ্রাম দেখতে এসেছে।

ধার সম্বন্ধে কথা সে তৎক্ষণাৎ রাস্তার পাশে একটা খেজুর গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাবু মাঠ দেখতে দেখতে বললেন, তারপর কেমন আছিস?

দুখীরাম গলে ধারার মত করে বলল, আপনাদের আশিব্বাদে চলে যাচ্ছে কোনো-রকম।

—আমাদের আশীর্বাদের এখনও জোর আছে বল।

বাবুর কথাবার্তাই ওই রকম। সব তাতেই বস-রসিকতা।

—কি যে বলেন, দুখীরাম বলল, না থাকলে কিসের জোরে আর বেঁচে-বর্তে আছি।

—সাধু, সাধু—বাবু পান চিবোতে চিবোতে এবার শালার দিকে তাকালেন, দেখবে শালা, তোর ভগ্নিপতির জমিদারি দেখ। পূর্ব দিকে সরকারি রাস্তা। দক্ষিণ দিকে আল বরাবর—খেজুর গাছ পর্যন্ত। উত্তরে, দক্ষিণ সীমার ঐ খেজুর গাছ থেকে সোজা বাবলা গাছ। আর পশ্চিমে বাবলা গাছ থেকে রাস্তা। একেবারে স্কোয়ার প্লট। লাগনং, পাঁচশো। তারপর মৌজা-তালপুকুর—গ্রাম দেখাবেন। মোট সাত এক একর সাতাশি শতক। বার্ষিক খাজনা তিন টাকা সাতাশ পয়সা। এখন সরকারী নিয়মে খাজনা ছাড়। জমিদার শ্রীল শ্রী স্বয়ং ভোগ সামনে দাঁড়িয়ে।

যাকে বলা তিনি শুনছেন কিনা বলা কঠিন। গলগল করে ঘামছেন। আধবোজা চোখ। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে।

—দুখে? বাবুর গলার স্বরে আতঙ্ক। চোখের দৃষ্টি খেজুর গাছটার দিকে।

—আজ্ঞে— দুখীরাম ভয়ে ভয়ে বাবুর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল।

—দক্ষিণ সীমার খেজুর গাছটা বে হেলে পড়েছে।

দুখীরাম আশ্বস্ত হল. তা পড়বে না বাবু, —কতকালকার গাছ। গোড়া উই পড়েছে দাখছেন না। —আশ্বিনে ভরি হাওয়া ছিল এবার মনে হয় মেহবোরকম্মা করবেন।

—দেহরক্ষা করবে কি রে, বাবু হাহাকার করে উঠলেন, কালই গাছটা ভুলে ফেলে তুই আর একটা গাছ পোঁত! শুনছে তুই কি ব্যাটা আমাকে সীমানাহারা করে ছাড়বি।

জমির চৌহদ্দির দিকে বাবুর কড়া নজর। দলিল-পত্রচার বয়ান বাবু গড়গড় করে মুখস্থ বলে যেতে পারেন। দুখীরামের কাছে এসব কুণ্ডলি পাকানো ধোঁয়া। দুখীরাম জমির ভেতরটা বোঝে। এই লগ নম্বরের জমির ভেতরে টুকরো টুকরো

Institute of Banking Services

Announces one-year correspondence course for

Bank Clerkship Examination.
(Clerk, Typist, Cashier, Steno, Godown-keeper etc.)
Qualification . Matric/S.F /H.S /S.S.C./equiv with good result
Age, 18-25 (18-30 for SC/ST)

Probationary Officers'/ Trainee Officers' Exam.
(State Bank of India and 14 Nationalised Banks)
Qualification Graduate with 50%(mere pass graduate for SC/ST)
Age : 20-25 (20-30 for SC/ST)

For Prospectus and Admission Form send a self-addressed 40 paise stamped envelope (12 cms × 24 cms) stating the exam (Bank Clerkship Exam or Probationary Officers' Exam) in which you are interested to the Programme Director,

Institute of Banking Services
7, Old Court House Street, Calcutta-700001
Please correspond in English only

Standard/78

আলে ভাগ করা বন্দোগুলোর কোনটায় ধান ভাল হয়, কোনটায় পাট। কোনটায় ছোলার চেয়ে মুসুরিই ভাল মেলে। কোনখানার মাটি কাটিয়ে চারা বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে শ্যামাঘাসও ফুটে বেরোয়। কোন জায়গায় মুথোঘাসের গোড়া হাজার নিড়িয়েও শেষ করা যায় না। কোন জমির কোনখানটায় মাটি বেশি তোলে কেঁচো। কোনখানটায় নোনা-সাঁটের মাটি। কোন জমির কোন কোনটার ধানের চারা এতো চড়বড়িয়ে বেড়ে ওঠে যে, আশ্বিনের গোড়ায় একহাত মাথা ছেঁটে না না দিলে কার্তিকে শিষের ভারে গাছ শুয়ে পড়ে জলে লেপটে গোবেবে হয়ে যায়।

—কি রে? কথা বলছিস না কেন, বাবু তখনও আতংকিত দৃষ্টিতে গাছটার দিকে তাকিয়ে, কালই কাজটা করে রাখবি তো?

দুখীরাম বাবুর রকম-সকম দেখে হেসে ফেলল, দেবো দেবো—আপনি নিশ্চিন্ত হোন। বরবাটা গেলেই এট্টা কিচু নাপ্পো দেবো।

—আবার কিছু কেন বাপ—একটা বেশ শক্তপোক্ত.. হাত দিয়ে দেখাতে গিয়ে কাপড়ের ওপর বাবুর কোঁচা লুটিয়ে পড়ল, গেল গেল ধুতিটা বাবু তাড়াতাড়ি কোঁচা সামলে তুলে দেখলেন কাদাটাদা লেগেছে কিনা।

—জামাইবাবু, তুমি কি এখানে দাঁড়িয়ে বকবক করবে না কোথাও গিয়ে বসবে, শালাবাবু এতক্ষণে খেজুর গাছের ঠেসান ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। দরদর করে ঘামছেন এখনও। সামলে নিয়েছেন একটু, আমি কিন্তু মাইরি আর পারছি না।

বাবু বড় বড় চোখ করে তাকালেন, গ্রাম দেখবি না। —টলটলে দিঘির জলে শাপলা-শালুক, কাশের গুচ্ছ, ধানের থেকে হাওয়ার নাচন, কলসি কাঁখে পল্লীবালা, বাবু থামলেন, সবি এসব তো ব্যাকডেটেড ব্যাপার। তোরা তো আবার বিপ্লবের ঢেউ খুঁজতে গ্রামে আসিস—।

—আসিই তো, শালাবাবু ফুঁসে উঠলেন, একটা মিশন নিয়ে আসি। এভাবে ভাগচাষীর মাথার ঘাম পায়ে ফেলা পরিশ্রমের ভাগ নিতে আসার মত আসি না—।

দুখীরামের বুকের মধ্যে ছাৎ করে উঠল। গা শিরশির করে উঠল। কবছর আগে এ ধরনের কথাবার্তা ছিটকে-ছিটকে কানে এসে লাগত হাওয়ায়। শালাবাবুর মুখের দিকে তাকাতে দুখীরামের মনে হল জুলপি আর গোঁফের ভেতর থেকে যে মুখটা বেরিয়ে রয়েছে তার খানিকটা আদল যেন নিজের বড়ছেলের সঙ্গে মেলে।

বাবু চুকচুক করে জিভে শব্দ করলেন। কি একটা বাংলা সিনেমা দেখে দাড়ি রাখা। তারপর গ্রামে যাবার পরিকল্পনা। শান্তি ঠাকুরুন পুরুতমশাইয়ের পকেট মেরে জমানো আটশো টাকা দিয়ে কাশ্মীর বেড়াতে না পাঠালে হয়ত এতদিনে গ্রামেই চলে যেতিস—। বাবু নস্যি নিলেন। নস্যির ঝাঁকে চোখমুখ লাল। বোঁয়াবোঁয়া গলায় রুমালে নাক মুছতে মুছতে বললেন, তারপর পরীক্ষার বেঞ্চিতে ছুরি গেঁথে রেখে গ্র্যাজুয়েট। জামাইবাবুর সুপারিশ ক্লেম ডিপার্টমেন্টে চাকরি। —বুদ্ধি পরামর্শ মত কাজ করলে সরকারী ফ্ল্যাট কিনতে পাঁচ বছরও লাগার মত কথা নয়। এবার শুভদিনটিন দেখে একটা কম বয়সি বউ। দশ মাসেই বিপ্লব ভূমিষ্ঠ হয়ে যাবার কথা। —এখন নবম্যান ডেলিভারি না সিজারিয়ান হবে এটাই শুধু বলা যাচ্ছে না। মেয়েদের আজকাল যা ডেলিকেট স্বাস্থ্য।

দুখীরাম এসব কিছুই বুঝতে পারছিল না। মোটামুটি বুঝেছিল, চাকরি, বিয়ে এসব আলোচনা হচ্ছে। মনে মনে বলল, আহা তাই হোক। বেঁচেবর্তে থাকুক সব। সুখে ঘরকন্না করুক।

শালাবাবুর এবার ভেঙে পড়ার অবস্থা, মাইরি জামাইবাবু এই রোদে এসব আর ভাল্লাগছে না। চলুন বসি কোথাও। এবার মাইরি আমি কোলাপ্স করব।

—এককেবে হেদিয়ে গেছেন দুখীরাম তাড়া দিল, চলতি দেন, চলতি দেন। বাড়ি গে এট্টু সুস্থির হবেন চলেন। ভাদোর-মাসের এই গুমসুনিতি বলে আমরাই মাঠে থাকতি পারি না।

বাবু যেতে যেতে সব খবরা-খবর নিতে লাগলেন। চালের দাম, পাটের দাম। ছেলে-মেয়েরা কেমন আছে। দেশ গাঁয়ের খবর। খুব খুশি হলেন শুনে যে, দুখীরাম জমিতে ইউরিয়া-টিউরিয়া দিচ্ছে। বললেন, তুই তাহলে বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ আবাদ শুরু করে দিয়েছিস বল?

—ওটা কি রে?

বাবু রাস্তার ওপর থমকে দাঁড়ালেন।

দুখীরাম বাবুর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল। ব্যাপারটা বুঝে বুকটা নিজের অজ্ঞাতেই একটু চওড়া করে ফেলল, এট্টা ইস্কুল করে ফেলা হোলো গেরামে। বি ডি ও দেলে হাপ ধরচা—গাঁয়ে চাঁদা তুলে বাকি অন্দেক।...গত ফাগুন মাসেই তো পেথম খোললো।

—খুব ভালো, খুব ভালো, বাবু বললেন, এই তো চাই। গাঁয়ে শিক্ষার প্রসার না হলে দেশের উন্নতি হবে কি করে? খুব ভালো, খুব ভালো।

দুখীরাম ভেতরে ভেতরে ফুলে উঠল।

রাস্তা দিয়ে আসতে দেখে ছানাপোনার মা আগেই দাওয়ার ওপর মাদুর বিছিয়ে রেখেছিল। হাতের কাছে দুটো তালপাতার পাখা। দাওয়া, উঠোন ঝকঝকে। শালাবাবু দাওয়ার ওপর বসতে-না-বসতে চিৎ হয়ে শুয়ে পাখা নাড়তে লাগলেন। হাঁটু থেকে কাদামাখা পা-দুখানা দাওয়ার নীচে নারকেল-গাছের মরা বোগলোর মত ঝুলছে।

বাবু বললেন, হ্যারে দুখে, পা ধুতে আবার ডোবায় যেতে হবে না কি?

দুখীরাম বলল চরণখানির যা অবস্থা তোলা জলে কুলোবেনি।

ডোবার ধারে মাচায় লাউগাছটা এবার ভাল ফল দিয়েছে। খাওয়া-দাওয়ার পরও খান পনেরো বিকি হয়েছে। বড় ছোটর এখনও ঝুলছে বেশ কখানা।

বাবু বললেন, খাসা লাউ হয়েছে তো।

দুখীরাম ঠিক করল, একখানা যাবার সময় বাবুর সঙ্গে দিতে হবে। ছানাপোনার মার সহবৎ জ্ঞান খুব। বাবু বসতে না বসতে মুখকাটা দুটো ডাব পেঠিয়ে দিয়েছে। বাবু ভাবলেন, ওঠো হে শ্যালক, হাত-পা ধুয়ে ডাব খাও।

শালাবাবু ততক্ষণে অনেকখানি সুস্থ হয়েছেন। উঠতে উঠতে বললেন, পা ধুয়ে আর কি হবে? আবার তো ওই দু মাইল রাস্তা ঠ্যাঙাতে হবে।

বাবু ডাব খাচ্ছেন।

দুখীরাম দাওয়ার একধারে বসে।

হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ার মত বাবু বললেন, হ্যাঁরে, তোদের ওদিকে যে একটা হেলথ্ সেন্টার হবার কথা হচ্ছিল, সেটার কী হল? খবর-টবর রাখিস?

—হ্যাঁ, সবই তো হোলো, দুখীরাম রাস্তাঘাটে যেমন শোনে, সেই রকম একটা লম্বা বক্তৃতা দেবার মত তৈরি হয়ে বলল, রাস্তার ওপর সাঁকোটাই হল না, এই ওষুদি। —বাপ-ঠাকুদ্দার আমল থেকেই দেকে আসছি—একই রকম। বর্ষার সময় গাঁয়ের লোক দুখানা খেজুর গাছ ফেলে দেলে। তাই দে-এ-ই হাঁটাচলা। বরষার শেষ —খেজুর গাছও পচেধসে শেষ।—উনুনে গোঁ সোঁধোর। তারপর সাঁতারটা বছোর নেপিয়ে-ঝেপিয়ে পার হওয়া...।

—না রে, বাবু বাধা দিলেন, নতুন সরকার এসব দিকে নজর দিচ্ছে এখন।

—হলি তো ভালোই হয়, দুখীরাম খুব দামি একটা অভিমত ব্যক্ত করার মত বলল, বড়-বাদলার বেতে কারো অসুখ-বিসুখ হলি আর দশ মাইল কুপোতি হয় না। মাপজোক তো করবাই হোল।

—আমার জমির দিকে যাবিনতো রে?

দুখীরাম হাসল, আপনার তো ওই একদাগ জমি। মাপের বাবুরা ইদিকে চেনা ছেলে দু-চার পাঁচশো বিঘে মেপে হেঁদিয়ে গেল বলে—।

শালাবাবু এতক্ষণে শুয়ে শুয়ে বলল, ধরো, তোমার জমিটাই যদি সরকার এ্যাকোয়ার করে?

—করুক না, বাবু ফুঁসে উঠলেন, ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। প্রথমটায় যা-দেয়

আপনি কি দৈনন্দিন কাজ-কর্ম শুরু করার জন্যে বিশেষ উদ্‌গ্রীব?

গ্ল্যাক্সোজ-ডি®

নিমেষে শক্তি যুগিয়ে আপনার সব ক্লান্তি দূর করবে!

গ্ল্যাক্সোজ-ডি খেয়ে আপনি ঘরের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম করার জন্য পুরোপুরি তৈরী হয়ে যান। গ্ল্যাক্সোজ-ডি আপনার ক্লান্ত শরীরে সেই ভরপুর শক্তি যোগায় যা ফের চাঙ্গা হবার জন্যে আপনার অবশ্যই দরকার। ডাক্তারদের সুপারিশ করা গ্ল্যাক্সোজ-ডি'তে রয়েছে উচ্চমানের গ্লুকোজ যা' ভিটামিন ডি, ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফরাসের গুণে সমৃদ্ধ। গ্ল্যাক্সোজ-ডি আপনার সব ক্লান্তি দূর করে যার দরুন আপনি ঘরের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম খুব ফূর্তির সঙ্গে করতে পারেন।

গ্ল্যাক্সোজ-ডি®
আপনার পরিবারের নিমেষে শক্তি যোগানদার

dCA/GL/54 BEN

তুলে নিয়ে বিভিশান কেস ফাইল করব। এ্যাট প্রেসেন্ট জমির যা দাম তার ডবল আদায় করে ছাড়ব। গভর্মেন্ট তো কি? দেশে আইন নেই নাকি।

ছোট মেয়ে দুখীরামকে ডাকল। দুখীরাম বুঝল। ভেতর বাড়ির দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারা করল।

প্রায় একগলা ঘোমটা টেনে ছানাপোনার মা এসে দাঁড়াল। বড় কাঁসার সানকিতে চুড়োকরা মুড়ি। দুটো বাটিতে নারকেল কোরা, আখের গুড়। আর একটা থালার তালের বড়া।

—এ যে ভুরিভোজের ব্যবস্থা? করেছিস কি রে?

—ওই এটু জলখাবার মত, দুখীরাম ভবিষ্যৎকে ভবিষ্যৎ হবার চেষ্টা করল। হাত কচলাল, গরিবির ঘরে যা জোটে।

—কই হে ভায়া, গরম আছে, হাত চালাও। মেঘ করে আসছে। উঠতে হবে। বাবু গরম একটা তালের বড়া মুখে দিয়ে উ-আ করতে করতে বললেন।

সামনে খাবার দেখে দুখীরামের পেট মোচড়াতে শুরু করেছে। খিদেতে পেট জ্বলে উঠল। বেলা আন্দাজ করল, দুটো হবে। বলল, আপনারা সেবা করেন, আমি এটুস ভেতর থেকে আলাম।

একটাই ঘর। আটচালা। চারধারে দাওয়া। পেছনে দাওয়ার নীচে রান্নাঘর। উনুনের পাশে এসে উবু হয়ে বসে দুখীরাম বলল, তাড়াতাড়ি দুটো মুড়ি আর বড়া দাও দিনি। খিদেয় নাড়িভুড়ি চিবোতে লেগেছে। বাবুরা না-গেলি তো আর কিছু হচ্ছে না।

খেতে খেতে মনে পড়ে যাওয়াতে দুখীরাম বলল, বাবুকে এট্টা নাউ কেটে দিতে হবে—।

—সেসব ব্যবস্থা কি আর করে রাকিনি ভেবেচো, ছানাপোনার মা দুখীরামের মুখের দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারায় ঘরের কোণা দেখতে বলল।

খানিকক্ষণের জন্য দুখীরামের মুড়ি চিবোনো থমকে গেল। ঘরের কোণে লাউ তো রয়েছেই, সঙ্গে চারটে খাসা ছাড়ানো নারকেল, দশ পনেরোটা পাতিলেবু, গাছের দুটো শশা, দুটো পাকা তাল একপাশে পরিপাটি সাজান।

দুখীরাম মুখ ব্যাজার করল, নারকেল দুটো দিলিই হোতো—দিব্যি কেপ্পোনি কোরোনি। মানুষটা জমিটা ভাগে চাষ করতে দেচ্ছে বলেই তো চলচে—। গাছের ফল। কেনা হলিও বোঝতাম।

দুখীরাম মফিয়ার মত বলল, নারকেল ছোড়ার দাম জানিস কতো?

—তোমায় আর বলে দিতি হবে না, ছানাপোনার মা ঝামরে উঠল, বুকে হাত দে বলো দিনি, বাবুর প্যাটের ভাগ, ঠিক দেছে?, বিশ ত্রিশ কেজি কুম দ্যাওনি....

দুখীরাম চুপসে গেল। চাপাগলায় বলল, মর মাগি—। তোকে আর সালিশি কত্তি হবেনি।

ভেবে দেখল, নিজের ঘরেই যার শত্রু সে আর কি করবে। নিঃশব্দে মুড়ি চিবোতে লাগল।

—ওঃ, আবার এত্তোখানি রাস্তা ভাঙতে হবে। তারপর বৃষ্টি এলেই তো হয়েছে—।

শালাবাবুর গলা শুনতে পেল দুখীরাম।

—জমিতে সে কি সুখ জামাইবাবু তোমার। বিক্রি করে দাও। টাকাটা ব্যাংকে রাখ। ঘরে বসে বসে সুদ পাবে।

—সেও কি আর ভাবিনি ভায়া—, বাবু বাবা পঞ্চাশ টাকা বিঘে দরে জমিটা কিনেছিলেন থার্টিতে। এখন দর চার হাজার টাকা বিঘে। প্রতি বছরই দর বাড়ছে। জমিও ওই ব্যাংকে গচ্ছিত রাখা টাকার মতই। হিসেব করলে বছরে যা-পাই তা ব্যাংকের সুদের চেয়ে বেশিই হয়। পরিশ্রম শুধু বছরে বার-দুয়েক আসা। তাও আউটিং এর মতন।

রওনা দিতে হয়। আকাশ মেঘে অন্ধকার হয়ে এসেছে।

বাবু হিসেব-পত্তর বুঝে খাতায় লিখে নিলেন। টাকা গুনতে গুনতে বললেন, হ্যাঁরে ফাঁকিটাকি দিলি না তো? বিশ্বাসই সব, বুঝলি। মানুষকে মানুষ যদি বিশ্বাসই করতে না পারে—

ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠে দুখীরাম বলল, কি যে বলেন—। আপনেদের সঙ্গে দু-পুরুষির লেন-দেন....

একটা বস্তার সব তুলে মাথায় করে স্টেশন পর্যন্ত এসে দুখীরাম বাবুকে ট্রেনে তুলে দিল।

বাবু চলে গেলেন।

এক বাণ্ডিল বিড়ি কিনে গ্রামের পথ ধরতে বৃষ্টি শুরু হল। পুবে মেঘের বৃষ্টি। ইলশে গুড়ি—সঙ্গে পুবে হাওয়ার সাপ্টা। বেলা রয়েছে কিন্তু চারিদিকে সন্ধ্যার ঘোর। এখন, বাড়ি গিয়ে মাঠ থেকে গরু আনা, জাব-জল করা। তারপর খাওয়া-দাওয়া।

সুখীরাম আগে। পেছন গাঁয়ের ভুজেন এসে পেছন ধরল, চলো একসঙ্গে গপ্পো কত্তি কত্তি যাই—।

দুখীরাম আগে। পেছন-পেছন ভুজেন। পায়ের তলায় দইয়ের মত কাদায় হড়কানি।

—খপোর শুনেচো, ভুজেন বলল, গাঁয়ে হাসপাতালটা তাহলি হোলো শেষতক্।

—এমেলে চৌকিদার পাট্টে সংবাদটা তোকেই পেথম দেলে তালি, দুখীরাম রসিকতা করে বলল।

—আ-গো খুড়ো—, ভুজেন উৎসাহে পা-হড়কে এগিয়ে এল, প্রেধানের বাড়ি এন দিতি গিয়েলাম। প্রেধান বললে। লুটিশ নেক্কা হয়ে গেচে। গাঁয়ে ঢোকার মুখি নয়ান-জুলির ধারে ক্ষদাগ জমির ওপর লুটিশ হয়েচে।

দুখীরামের বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল। দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে ভুজেনের দিকে তাকাল, ঠিক শুনেছিলি?

—নিজ্জল।

—দাগ নম্বর শুধিয়েছিলি?

—অতো কে খপোর করে, ভুজেন অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, লুটিশ হলিই ঢোলে কাঁটি পড়বে।

পেছন পেছন ভুজেন বকতে বকতে আসছে, হাসপাতালটা হলি কেমনে কেমনে সাঁকোটাও হবে, রাস্তাটাও পাক হতি পারে, কেমনে কেমনে ইলেকটিরি খাম্বা বসবে। ভুজেন থামল, হ্যাঁ খুড়ো, তাখন কি সোন্দোর দেকতে হবে বলো দিনি....

—ভালই দেখতি হবে, দুখীরাম দায়-সারা উত্তর দিল।

ভুজেনের সঙ্গ আর ভাল লাগছিল না। মাথার মধ্যে কি'ম ডাকছে। দুখীরাম বলল, তুই এগো—। আমি একবার মাঠে বসবো।

—ল্যাও, এই বাদলায় মাঠের মধ্যি তোমার একোন ইবে চাপলো।

ভুজেন এগিয়ে গেল।

মাথার ওপর উপুড় করা বিশাল গামলার মত আকাশ। মেঘে মেঘে অন্ধকার। মাঠের মাঝখানে, রাস্তার ওপর দুখীরাম এখন একা।

নয়ানজুলির ওপারে বাড়ন্ত ধানের চারাগুলো কোমর জলে দাঁড়িয়ে হাওয়ার সঙ্গে খেলায় মত্ত। দুখীরামের দৃষ্টি বাবুর জমি ক-দাগের ওপর থেকে সরে সরে সারা মাঠ ঘুরে এল। সারা মাঠের গাঢ় সবুজ এখন আস্তে আস্তে কালো হয়ে যাচ্ছে।

এইখানে, নয়ানজুলির ধারে ক-দাগ জমির ওপর নোটিশ হয়েছে।—হাসপাতালের বাড়ি উঠবে। ক্রমে ক্রমে বাঁধানো সাঁকো পিচের রাস্তা, ইলেকট্রিক....। গ্রাম বেশ-বদলের লোক ত্রাক দেখাবে, আমাদের গেরামে কি লেই বলো দিনি।

বাবুর জমির ওপর নোটিশ হলে বাবু ক্ষতিপূরণ পাবে। বেশি টাকার জন্যে মামলা লড়বে। গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হবে। বাবু আর আসবে না।

দুখীরাম এই গ্রামেই ছানাপোনা, ছানাপোনাদের মাকে নিয়ে থাকবে। জমিটা চলে গেলে, আ-জন্ম ভাগচাষী দুখীরামের ক্ষতি পূরণ হবে কি দিয়ে।

হাসপাতাল, সাঁকো, রাস্তা, ইলেকট্রিকের আলো দিয়ে সাজানো স্বপ্নের চেয়ে অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখার দুর্ভাবনাটাই দুখীরামের সামনে করাল হয়ে উঠল।

সমালোচনা

চাঁদ বণিকের পালা

সকলেই জানেন, কবিতা কথাসাহিত্য ইত্যাদির তুলনায় বাংলা নাট্যসাহিত্য আজো অত্যন্ত দীন। যাকে যথার্থ নাটক বলতে বাধা হয় না, যা একই সঙ্গে নাট্যগুণ এবং সাহিত্যগুণ দুয়েরই অধিকারী, এমন নাটকের সংখ্যা বাংলাসাহিত্যে দুঃখজনকভাবে কম। নাট্যসাহিত্যের এই দিগন্তজোড়া অসাফল্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি নাটক—তার সংখ্যাই বা কতো—নিতান্তই যেন ব্যতিক্রমের মতো। শম্ভু মিত্রের সম্প্রতি-প্রকাশিত 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকটি সেই রকম একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।

নাট্যসাহিত্যের ভালো-মন্দ গণনার সময় অনেকেই অবশ্য রবীন্দ্রনাথের নাটককে হিসেবের মধ্যে ধরতে অনিচ্ছুক হবেন। হয়তো তাঁরা বলবেন, সোফোক্লেসের 'রাজা অয়দিপাউস', শেক্‌স্‌পীয়রের 'ম্যাকবেথ' কি 'ওথেলো' কিংবা ইবসেনের 'হেড্‌ডা গ্যাব্‌লার' যে অর্থে নাটক, সত্যিই কি রবীন্দ্রনাথের 'রাজা', কি 'ডাকঘর' কি 'রক্তকরবী' ঠিক সেই অর্থেই নাটক? বুঝতে পারি, রবীন্দ্রনাটকের সম্পর্কে এই ধারণার পেছনে আমাদের ইংরেজি-পড়া বিশেষ ধরনের নাট্যসংস্কার অনেকখানি কাজ করেছে। মানতেই হবে, রবীন্দ্রনাটক অস্বস্তিকর রকমের স্বতন্ত্র স্বভাবের জিনিস। আমাদের পশ্চিমাস্য রুচির পক্ষে তা বড়োই ভাবতীয় ব্যাপার। বাইরের দ্বন্দ্বের তুলনায় সেখানে ভাবদ্বন্দ্বের প্রাধান্য, ঘটনার তুলনায় সেখানে তত্ত্বের গৌরব, সমস্ত নাট্যব্যাপার সেখানে এক অখণ্ড অক্ষুণ্ণ সংগীতের মেজাজিতে বিগলিত। রবীন্দ্রনাটককে সৎসাহিত্য বলতে হয়তো দ্বিধা না হতে পারে, কিন্তু যথার্থ নাটক বলতে দ্বিধা হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

এই দ্বিধা কতোদূর যুক্তিযুক্ত সে আলোচনায় এখানে আমাদের প্রয়োজন নেই। রবীন্দ্রনাথের নাটক এখানে আমাদের লক্ষ্য নয়, আমাদের লক্ষ্য শম্ভু মিত্রের 'চাঁদ বণিকের পালা'। যতোই ভাবতন্ত্রি হোক, তবু নাটক বলতে যাকে, কারোই কোন দ্বিধার কারণ নেই। ঘটনা এ নাটকে ধর-স্রোতা, ভাবের সংঘর্ষ আর কর্মের সংঘর্ষ এখানে অভিন্ন, ক্রিয়া এবং তত্ত্ব এখানে অবিচ্ছেদ্য এবং নাট্যগুণ তর্কাতীত। এদিক থেকে 'চাঁদ বণিকের পালা' বাংলা নাট্যসাহিত্যে নিঃসন্দেহে এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম।

পুরান কথাটাকে একটু বিস্তৃত অর্থে ধরলে বলা যায়, 'চাঁদ বণিকের পালার' কাহিনী আমাদের পুরাণ থেকে নেওয়া। বলা বাহুল্য, সংস্কৃত পুরাণ থেকে নয় অনভিজাত লৌকিক পুরাণ থেকে, বাঙালির খাঁটি দেশজ পুরাণ থেকে, যে কাহিনী আমাদের মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যের উপজীব্য, এমন এক কাহিনী যার ভয়াবহ প্রভাব আমাদের রক্তের অন্ধকারে, মজ্জার গভীরে সঞ্চারিত।

কেবল ভারতীয় বা কেবল বাঙালি, এইটেই 'চাঁদ বণিকের পালার' আসল পরিচয় নয়। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, ভাবতের নাটককে ভারতীয় হতেই হবে, তার শিকড়কে দেশের মাটির গভীরে চালাতেই হবে। দেশের সমাজজীবন থেকে, দেশের সংস্কৃতি থেকে যদি সে তার প্রাণরস আহরণ না করে থাকে, তাহলে তার রূপ মিথ্যা, রস অপাচ্য, সত্য অর্থহীন, মেসেজ ব্যর্থ। কিন্তু এ-ও অবশ্যমান্য কথা যে, স্বজাতীয়তের কোনো সহজ অভিজ্ঞান নেই এবং নিছক স্বজাতীয়তর কোনো সাহিত্যের সাহিত্য-গুণের বা কোনো নাটকের নাট্যগুণের মাপ-কাঠিও নয়। প্রত্যেক নাটককে একদিকে যেমন স্বজাতীয় হতে হয়, অন্যদিকে তেমনি সকালীনও হতে হয়। আরো বড়ো কথা, অন্তত আপেক্ষিক অর্থে তাকে সকল

মানুষের এবং চিরকালেরও হতে হয়। কথাটা 'চাঁদ বণিকের পালার' পক্ষেও খাটবে।

ধরা যাক কাহিনীর কথা। ঘটনা তো সকলেরই সুপরিচিত—শিবভক্ত চাঁদের মনসাপূজোয় ঘোর অপ্রবৃত্তি, তাই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মতান্তর, চাঁদের বাণিজ্যযাত্রা সপ্তডিঙ্গা মধুকরের সলিল সমাধি, ছয় পুত্রের মৃত্যু, বেহুলা-লখিন্দর, লোহার বাসরঘর ইত্যাদি ইত্যাদি এবং অবশেষে চাঁদের বামহস্তের পূজো।—সেদিনের অন্ধ-কার ইতিহাসের অনেক দুঃস্বপ্ন, অনেক বিভীষিকা লোকমানসে ঘনীভূত হয়ে এই শ্বাসরোধী লোককথার রূপ নিয়ে আত্ম-প্রকাশ করেছিল। এইটা মধ্যযুগের লৌকিক মঙ্গলগানকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'অধর্মের জয়গান', অর্থ জন্ম অন্নহীন বস্ত্রহীন আশ্রয়হীন হতভাগ্যদের স্বপ্নে, যে 'স্বপ্নের মূল ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমের মধ্যে'।

'চাঁদ বণিকের পালা' কি অবিকল সেই কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি? এ-ও কি সেই রকমই একটি অধর্মের জয়গান? বলা নিষ্প্রয়োজন, এমন মনে করলে খুবই ভুল হবে।

অধর্মের জয় অবশ্য সাধ্য নাটকে আদিগন্ত পরিব্যাপ্ত, 'অধর্ম শিরায় শিরায়, মজ্জায় মজ্জায়, অধর্ম নাড়ীর মধ্যে, অণুতে অণুতে, অধর্ম নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে। কিন্তু নাট্যকার তার জয়গান রচনা করেন নি। গান যদি রচনা করেই থাকেন তো সে মানুষের গান, দুর্ভাগ্য-তাড়িত, বিধ্বস্ত, সর্ব-স্বান্ত, কিন্তু অপরাজিত মানুষের গান। অপরাজিত? না, তা-ও বলা যায় না। তার জয়ও নেই, পরাজয়ও নেই, শান্তিও নেই, সান্ত্বনাও নেই, আছে শুধু চলা—'আছে শুধু পাখা আছে মহানভ-অঙ্গন' এই যে অভিনব কাহিনী, এ কি অতি সূক্ষ্ম অর্থেও কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ বা বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের কাহিনীর সমধর্মী?

শুধু নবীকরণ বললে কম বলা হবে। এ হল মিথ্-এর জন্মান্তর। শুধু কাহিনীর কাঠামো নয়, পাত্রপাত্রী, জীবন পরিবেশ, ভাবপরিমণ্ডল, নাটকের মর্মকথা সবকিছুই জন্মান্তর। 'চাঁদ বণিকের পালা'য় এই যে ট্র্যাজিক চন্দ্রধর আর তার পাশাপাশি বঞ্চিত নিরুপায় নিষ্ঠুর সনকা, চাঁদ আর সনকার কঠিন বিষাক্ত ক্ষত-বিক্ষত দাম্পত্য, এই যে একজনের ঘর-বাঁধার আর অন্যজনের পাড়ি-দেওয়ার সমাধানহীন বৈপরীত্য, নিঃসঙ্গ পুরুষ আর প্রতিকূল প্রকৃতির বিষম যোগবিয়োগ, এই যে বিরুদ্ধ বিভ্রান্ত আত্মপরিচয়-সন্ধানী বাসর সখিন্দর, জীবনানন্দের রূপসী বাংলার সেই ছিন্ন খড়নার মতো, কীটদষ্ট কুসুমের মতো, দলিত মালার মতো কবুল বেহুলা—এরা কোন্ দেশের, অথবা কোন্ দেশের নয়? এরা কোন্ কালের, অথবা কোন্ কালের নয়?

সমস্ত সার্থক সৃষ্টির মতোই 'চাঁদ বণিকের পালা' তার শিল্পস্বভাবে একই সঙ্গে দেশকালের দ্বারা চিহ্নিত এবং অচিহ্নিত। যেখানেই মানুষ অজ্ঞানের প্রতিরোধ করে, অশুভের বিরোধিতা করে, স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু রাখে, সেখানে এ পালা সত্য। যেখানেই মানুষ আত্মপরিচয়ের সন্ধানে যাত্রা করে, সেখানেই মানুষ মনুষ্যত্বের মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকে, যেখানেই মানুষ জানে 'আত্মতত্ত্বে দুঃসহ তপস্যা এ জীবন'—এই কথা জেনেও সেই

কঠিনকেই মানুষ গ্রহণ করে, সেইখানেই এই পালা সত্য।

যখন লক্ষ্যটা নিছক অতীত নয়, নিছক বর্তমানও নয়, তখনই লেখকেরা মিথ্ বা পুরাণকথার অবলম্বন খোঁজেন। বস্তুত বিশেষের ফ্রেম ভাঙতে পারে বলেই মিথ্ এত মূল্যবান। গুণীর হাতে চেনা-রূপ অলক্ষ্যে রূপকে পরিণত হয়, পরিচিত বিশেষ সীমানা-ভাঙা প্রতীক হয়ে ওঠে। শম্ভু মিত্র এ নাটকে তাই করেছেন। মনসা আর চাঁদেন, চাঁদ আর সনকার বিশিষ্ট একটা কাহিনীকে ব্যাপক জীবনসত্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া—দিতে পারা, এইখানেই শম্ভু মিত্রের কৃতিত্ব।

আমাদের দেশের প্রাচীন পুরাণকথা ঐশ্বর্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার। কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ সকলেই সেই জাতীয় ভাণ্ডার থেকে সানন্দে গ্রহণ করেছেন, তাকে নিজের কালের মতো করে নবীকৃত করেছেন, নবীন-কালের বিশেষ সত্য, চিরকালের ব্যাপ্তি পেয়েছে। বাংলা সাহিত্যের নাট্যকারেরাও এ চেষ্টা কম করেন নি। দুঃখের কথা, অধিকাংশ সময়ই এখানে আমরা যথার্থ গুণীর সন্ধান পাই নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দিকে যদি তাকাই, তাঁর পূর্ণাঙ্গ নাটক না হোক, চিত্রাঙ্গদা, বিদায় অভিশাপ, গান্ধারীর আবেদন ইত্যাদির ব্যাপ্তির দিকটা যদি লক্ষ্য করি, তাহলে সহজেই বুঝতে পারব, কেমন করে পুরাণের বাহনে একটি বিশেষ কালের কথা সকল কালকে স্পর্শ করতে পারে। এইখানেই পুরাণের মহত্ত্ব।

বাংলার লৌকিক পুরাণগুলি, বাঙালির ধর্মমঙ্গল মনসামঙ্গল চণ্ডীমঙ্গল, এরা সাধারণত এইভাবে ব্যবহৃত হয় নি। চাঁদ সদাগর, কালকেতু বা ধনপতিকে নিয়ে কয়েকটি লক্ষ্যানুগতিক পালা রচিত হয়েছে বটে, কিন্তু কোনটিই পুরাণকে বাহন করে অগ্রসর হতে পারেনি, কোনটি নতুন ব্যাপ্তি অর্জন করতে পারেনি। চলতি পালাগুলির প্রায় প্রত্যেকটিই পুরাতনের পুনরাবৃত্তি। সে-ক্ষেত্রের নারায়ণ দেব তাঁর মনসামঙ্গল যতোটুকু স্বাধীনতা নিয়েছেন, একালের এই নাট্যকারেরা তা-ও নিতে পারেন নি। পুরাণের জন্মান্তরে বাংলা সাহিত্যে যার সিদ্ধি সর্বজনস্বীকৃত সেই রবীন্দ্রনাথ—স্বর্গীয় প্রহসন, জাতীয় বস্তুকে বাদ দিচ্ছি —কোনো লৌকিক পুরাণকে কখনো স্পর্শ করেন নি। বাংলার মঙ্গলকাব্যাদির প্রতি তাঁর অনাগ্রহের কথা তিনি কখনোই গোপন রাখেন নি।

বিজন ভট্টাচার্যের জীয়নকন্যার নাম এবং অল্প দু-একখানি কাব্য বা কবিতার নাম এই জন্মান্তরের প্রসঙ্গে ইচ্ছা করলে স্মরণ করতে পারি, কিন্তু সার্থকতার দিক থেকে যদি দেখি, সিদ্ধির নিরিখে যদি বিচার করি, তাহলে অনায়াসে বলতে পারি, এ কাজে শম্ভু মিত্র এখন পর্যন্ত একেবারে একক।

বিষয় নির্বাচন যে শম্ভু মিত্রের অত্যন্ত অনুমোদনযোগ্য তাতে সন্দেহ নেই, কেননা মঙ্গলমঙ্গল — বিশেষ করে চন্দ্রধর—মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে সত্যিই তুলনারহিত। তবু বলব, মঙ্গলকাব্যের চাঁদ বলিষ্ঠ, একনিষ্ঠ তার মধ্যে একটা ট্র্যাজিক অনমনীয়তাও আছে—কিন্তু তার বেশি নয়, এর অতিরিক্ত কোনো মহিমা, জীবনবোধের কোনো অভাবিত গভীরতা, দুর্লভ কোনো উদার প্রসাদ, চৈতন্যের কোনো দুর্লভ দীপ্তিভাব নেই, মধ্যযুগের সাম্প্রদায়িক ধর্মদ্বন্দ্বকে অতিক্রম করতে পারে এমন কোনো মন্ত্র তার চরিত্রে নেই। 'চাঁদ বণিকের পালা'র চাঁদে সেই মহিমা, সেই দীপ্তি আছে। শম্ভু মিত্র তাঁর কাহিনীতে এমন একটি মাত্রা সংযোজিত করে দিয়েছেন, নায়কের চরিত্রে এমন একটি গভীরতা এনে দিয়েছেন যে, তারই কারণে এই নাটক একটি অবিস্মরণীয় ব্যতিক্রম হয়ে উঠেছে।

অথচ মধ্যযুগ কী আশ্চর্যভাবে, কী বিশ্বাসযোগ্যভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বিশেষ যে নির্বিশেষের মধ্যে একটুও হারিয়ে যায় নি, এই ইন্দ্রজালে, বলা বাহুল্য, ভাষাই তাঁর অন্যতম প্রধান অবলম্বন। এ ভাষা একই সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের কালের—বিশ্বাসযোগ্যভাবে মধ্যযুগের, আবার কান পাতলেই আধুনিক কালের, বস্তুত অসামান্য স্থিতিস্থাপকতার গুণে অনায়াসে সর্বকালের। এ-ভাষা অবাক হবার মতো লৌকিক এবং স্তম্ভিত হবার মতো আবেগগতিময়, বিশুদ্ধ ও নাটকীয়।

ভাষা এখানে গদ্য ও কবিতার ব্যবধানকে সম্পূর্ণ ঘুচিয়ে দিয়েছে। একে কাব্যনাট্য বলা যাবে কি না জানি না, তবে এর ভাষার কাব্যগুণ স্বতঃস্ফূর্ত, পদ্যকল্পে যোজিত নয়। অর্থাৎ এইটেই কাব্যনাট্যের বা (নাট্য-কাব্যের) ভাষার আদর্শ। এই কাব্যভাষাই সেন নাটকের প্রথম আর্তিকে, তার সতীক্ষ্ণ টেনশনকে স্পর্শযোগ্যভাবে প্রত্যক্ষ করে তুলেছে। নাটকের এমন কাব্যগুণ রবীন্দ্র-নাট্যের বাইরে আর কোথাও মিলবে বলে মনে হয় না।

এ-নাটকের গঠনটা সরল। অংক-দৃশ্য কিছু নেই, আছে তিনটে মাত্র পর্ব—তিনটে ধাপ।

'.....অতীত বাংলার গাঙ্গুড় নদীর তীরের চম্পক নগরী। তারই যৌবনের প্রতীক সব লোকজন। উচ্ছল কোলাহল।.....'

এইভাবে প্রথম পর্বের শুরু হয়, চাঁদের অনুগামীদের বলিষ্ঠ কণ্ঠের ঘোষণা দিয়ে, 'ভাইরে, —আমরা সমুদ্দুরের বুকে পাড়ি দিবই দিব —.....ভাইরে, আমাদের পিতৃপুরুষেরা নাও ভাসায়া হুই দুরান্তরের পথ পাড়ি দিয়া গেছে। সেই পূর্বপুরুষের মর্যাদা আমরা ফিরেফির জয় করে নিবই নিব—।'

কাহিনী এই শুরু থেকেই নতুন পথ ধরেছে। সেই পথের সংকেত পাই দলপতি চাঁদের প্রত্যয়-দৃঢ় উচ্চারণে, '. . . দিনে-রেতে বুকে ভরসা রেখো, আমাদের জয় হবেই হবে—'।

জটিলতার শুরুও প্রায় প্রথম থেকেই। রাজশক্তি এই বাণিজ্যযাত্রার প্রতিকূল। এই প্রতিকূলতার মূলে ঈর্ষা, ষড়যন্ত্র, নীচতা, পরিব্যাপ্ত অজ্ঞানের অন্ধকার, অশুভ শক্তির গুপ্তসর্প গূঢ়ফণা। চাঁদ তারই মধ্যে স্থির, অটল, কৃতসংকল্প। চাঁদের এক সময়ের গুরু, বর্তমানে উচ্চ রাজকর্মচারী, মহামাণ্ডলিক বল্লভাচার্য চাঁদকে বলে, 'চন্দ্রধর, এই অভিযান তুমি পরিত্যাগ করো।' চাঁদ প্রশ্ন করে, 'কেন প্রভু? বেনীনন্দনের ভয়ে?' মাথা নেড়ে কাতর বন্ধু বলে, 'বেণী নয় চন্দ্রধর, ঘটনার ভয়ে। জগতে এ যেন এক অন্ধকার আকাশ নেমেছে, তারই ভয়ে। দেখো না, জ্ঞানের সম্মান নাই, বিদ্যার মর্যাদা নাই, সুভদ্র আচার নাই, সুভাষণ নাই, মাংসসুখ ছাড়া অন্য কোনো সুখ-চিন্তা নাই,—ভুলে যাও, চন্দ্রধর, মহৎ কার্যের কথা ভুলে যাও। শুধু কোনোমতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখো। আদর্শের পাছে ছুটো কোনো লাভ নাই।'

জীবিকা ও জীবনের চাপে আদর্শ-ভ্রষ্ট আত্মদ্বন্দ্ব-জর্জরিত এই গুরু আমাদের সুপরিচিত। চাঁদের মুখের সাহসের বাক্যে, আশার কথায় গুরু প্রায় হাহাকার করে ওঠে, '...সহস্র আশার কথা আর কোরোনাক চন্দ্রধর। এ জীবন অর্থহীন। অর্থহীন জীবনের এই কালদহে শুধু সেন ঘূর্ণিপাক ঘোরে। সত্য শুধু অন্ধকার। মনসার সর্পিল আধার। এই অভিযান তুমি ছেড়ো দেও চন্দ্রধর, আদর্শের পাছে ছুটো কোনো লাভ নাই।'

চাঁদের অভিযান কল্যাণমুখী। চাঁদের আদর্শ শিব যিনি জ্ঞানের প্রতীক, কল্যাণের প্রতীক। প্রতিপক্ষ মনসা, অজ্ঞানের প্রতীক, অশুভের প্রতীক, অন্ধকারের প্রতিমূর্তি। সনকা প্রকৃতির কন্যা, প্রকৃতির প্রতিনিধি। তার মনে বহু স্তরের বিবিধ অন্ধকার, বিবিধ জৈবতা। এই জৈবতার ভূমিতেই চাঁদের সঙ্গে সনকার বহুস্তরব্যাপ্তি বিরোধ। এ ছল আদর্শ-পাগল পুরুষ আর সংসারমুখী নারীর নিত্য-বিরোধ।

পর্বের মধ্যভাগে এসে ঘটনার গতি দ্রুত হয়, অন্ধকারের শক্তি অকস্মাৎ দুদিক থেকে বাহুবিস্তার করে। একদিকে সমুদ্রযাত্রার বিরুদ্ধে রাজশক্তির কঠিন নিষেধাজ্ঞা, অন্যদিকে সর্পবিষে চাঁদের ছয় পুত্রের জীবননাশ।

যাত্রা বন্ধ হল না।... কতো শ্রম, কতো ক্লান্তি, কতো আশা, কতো প্রাপ্তি, কতো সন্দেহ। অবশেষে ভরাডুবি। একটু এগিয়েই পর্ব শেষ।

দ্বিতীয় পর্বের আরম্ভ অনেক বছরের ব্যবধানে। পর্বের সূচনায় সঙ্গীদের হাহাকারে বিধ্বস্ত বজ্রাহত চাঁদের চোরের মতন প্রত্যাবর্তন। এর মধ্যে অনেক বদল ঘটে গিয়েছে, তবে অশুভের আসন সমানই সুপ্রতিষ্ঠিত। চাঁদকে মাঝে রেখে দুই রাজনৈতিক দলের নির্লজ্জ টানাটানি—দাবিকল যেন আজকের দিনের ছবি। তারই প্রেক্ষাপটে বিচিত্র সম্পর্কজাল—সনকা-

শ্রীমান ভগবান ভাষিত

শিবপ্রসাদ সমাদ্দার

এঁকে যদি কেউ মনে করে হত্যাকারী কিংবা কেউ হত, দুজনেই ভুল করবে। ইনি কাকেও মারেন না, কেউ এঁকে মারতে পারে না। এঁর জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, পুনর্জন্ম নাই। ইনি জন্মহীন, নিত্য, শাশ্বত এবং

২০

অশেষ। শরীরনাশে এঁর নাশ নাই। হে পার্থ, যে এঁকে জন্মরহিত, অব্যয় ও অবিনাশী বলে জানে, সেই পুরুষ কেমন করে কাউকে বধ করবে বা করাবে? জীর্ণ বস্ত্র ছেড়ে মানুষ যেমন নতুন বস্ত্র পরে, দেহী তেমনি জীর্ণ দেহ ছাড়ে নতুন দেহে যাবে বলে। শাস্ত্র এঁকে ছিন্ন করে না অগ্নি দহন করে না, জল সিক্ত করে না কিংবা বায়ু শুষ্ক করে না। অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য এবং অশোষ্য এই আত্মা নিত্য, সর্বগত, স্থাণু অচল এবং সনাতনও বটে। ইনি যখন ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অনুমানের অতীত এবং বিক্রিয়ার ঊর্ধ্বে এমনটি জানার পর তোমার তো আর শোক সাজে না। কেউ শোনে কেউ বা শুনেও জানে না।

২৫

আর এঁকে যদি নিত্য নূতন জাত এবং নিত্য মরণশীল মনে কর, হে মহাবাহু, তবুও তুমি শোক করতে পার না। কারণ জাতের মরণ এবং মৃতের জন্ম দুইই নিশ্চিত। নিশ্চিতের শোক তো শোভা পায় না। জীব যখন আদিতে এবং পরিণামে অব্যক্ত কেবল মধ্য দশায় ব্যক্ত, কেন তবে বিলাপ কর, হে ভারত? আত্মাকে আশ্চর্যবৎ কেউ দেখে, কেউ বর্ণনা করে, কেউ শোনে, কেউ বা শুনেও জানে না।

অর্জুন, অবধ্য এই আত্মা সর্বদা সর্বদেহে বিরাজিত আছেন। অতএব কোন

৩০

প্রাণীর জন্যই তোমার শোক করা অনুচিত। আর স্বধর্মের কথা বিবেচনা করেও তোমার বিচলিত হওয়া উচিত নয়, কারণ ধর্মযুদ্ধের চেয়ে শ্রেয় ক্ষত্রিয়ের আর কিছু নেই। পার্থ আপনি উদ্ভূত এবং অনর্গল স্বর্গদ্বারের মত এই রকম যুদ্ধ কেবল ভাগ্যবান ক্ষত্রিয়রাই লাভ করেন। তাও যদি তুমি ধর্মসঙ্গত এই যুদ্ধ এড়িয়ে যাও তবে তোমার স্বধর্ম ও কীর্তিবিচ্যুতির পাপ হবে। লোকে অনন্তকাল তোমার অকীর্তি ঘোষণা করবে। মানীর মানহানি মরণেরও বাড়া। মহারথীরা মনে করবে তুমি ভয়ে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হয়েছ। তাদের কাছে তোমার সম্মান

৩৫

মুছে তুচ্ছতার ফুটে উঠবে। অহিতাকাংক্ষীরা তোমার সামর্থ্যের নিন্দাসূচক অনেক অকথ্য কথা বলবে; তার চেয়ে দুঃখের আর কি হতে পারে? কৌন্তেয়, হত হলে স্বর্গপ্রাপ্তি, বিজয়ে বসুন্ধরা ভোগ; সুতরাং যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হও, ওঠো। সুখ দুঃখ লাভ ক্ষতি জয়-পরাজয় সমান জ্ঞানে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও—তোমার কোন পাপ হবে না।

পার্থ, এ যাবত তোমাকে সাংখ্য জ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দিলাম। এখন যোগ সম্বন্ধে শোনো; যার সঙ্গে বুদ্ধির বন্ধন তোমায় কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি দেবে। এতে প্রারম্ভ কর্মের নাশ নেই বোন পাতক নেই।

৪০

এই ধর্মের সামান্যতম মাত্রাও মহৎ ভয় থেকে ত্রাণ করে। হে কুরুনন্দন, এই কর্মযোগে নিশ্চয় স্বভাব বুদ্ধি একনিষ্ঠ থাকে। পরন্তু অনিশ্চিত বুদ্ধি হয় বহুশাখাবিভক্ত ও অসংখ্য। পার্থ, যারা বেদবাক্যের তাৎপর্য গ্রহণে অসমর্থ, এছাড়া আর কিছু নেই এমন কথা বলে, যারা কামাত্মা, কেবল স্বর্গপ্রাপ্তিই যাদের অভিলাষ, সেইসব মূঢ়রা জন্মরূপে কর্মফল পেতে এবং ভোগ ও ঐশ্বর্য লাভের উপায়স্বরূপ ক্রিয়াবিশেষের বাহুল্যে ফুলের মত শুধু কথার বাহার দেখায়। এই রকম অবিবেকী ভোগৈশ্বর্যে আসক্ত ব্যক্তিদের বুদ্ধি নিশ্চয়স্বভাব হয়ে সমাধির উপযুক্ত হয় না।

হে অর্জুন, বেদ ত্রিগুণ থেকে উদ্ভূত, কিন্তু তুমি এই তিন গুণ এবং দ্বন্দ্বের অতীত হও, নিত্য সত্ত্বগুণে থেকো, যা পাওনি তাই পাই চাওয়াতে এবং যা পেয়েছ তাই গোছানোতে আসক্ত হয়ো না এবং

৪৫

আত্মাকে লাভ করার চেষ্টা করো। সব জায়গা জলে ভাসলে ক্ষুদ্র জলাশয়ে যতটুকু প্রয়োজন, জ্ঞানবান ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির নিকট বেদগুলিরও ততটুকু। কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে কখনই নয়। কর্মফল প্রয়াস

প্রবৃত্ত হয়ো না, কর্মবিমুখতায়ও যেন তোমাকে না পায়। ধনঞ্জয়, আসক্তি ছেড়ে সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সম্ভাবনায় যোগস্থ অবস্থায় কাজ করো, এই সমত্ব বোধকেই বলে যোগ। বুদ্ধিযোগের তুলনায় কর্ম অতি হীন। ধনঞ্জয়, সেই বুদ্ধিযোগের আশ্রয় নিও, ফলের আকাঙ্ক্ষা যে করে সে হয় কৃপার পাত্র। বুদ্ধিযুক্তরা ইহলোকে সুকৃত ও দুষ্কৃত উভয়ই ত্যাগ করেন।

৫০

সুতরাং যোগে প্রবৃত্ত হও, যোগই কর্মের কৌশল। যোগযুক্ত জ্ঞানীরা কর্মজ ফল ত্যাগ করে সংসারবন্ধন থেকে মুক্তি এবং সেই শান্তিময় পরম পদ প্রাপ্ত হন। যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপে কলুষ পেরিয়ে যাবে তখন শ্রবণযোগ্য ও শ্রুত বিষয়ে তোমার আসবে বৈরাগ্য। শ্রুতির সম্বন্ধে এক গাদা পড়াশুনা করে যদি তোমার মাথা ঘুরে যায় তখন সমাধিতে নিশ্চল হয়ে থেকো, তবেই পাবে যোগের সন্ধান।

অর্জুন জিজ্ঞেস করলেন, হে কেশব, সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের কি ভাষা, স্থিতধী ব্যক্তি কি বলেন, কেমন থাকেন ও কি ভাবে চলেন? শ্রীভগবান বললেন, পার্থ, যখন

৫৫

সকল মনোগত কামনা পরিত্যাগ করে আপনাতে আপনি তুষ্ট থাকেন তখনই তাঁকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়। যে মুনি দুঃখে অনুদ্বিগ্ন মন, সুখে বিগতস্পৃহ, যিনি অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধশূন্য, তিনিই স্থিতধী বলে পরিচিত হন। যিনি সর্বত্র মমতাশূন্য, যেমন যেমন শুভ বা অশুভ ঘটল তেমনই যিনি আনন্দ বা বিরক্তি দেখান না তাঁর প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জেনো। কচ্ছপ যেমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুটিয়ে রাখে তেমনি যিনি সর্বপ্রকারে সকল বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়কে ফিরিয়ে আনেন, তাঁকেই জেনো প্রতিষ্ঠিত-প্রজ্ঞ। উপবাস পালনের জন্য কেউ সেই সময়টুকু বিষয়ভোগে নিবৃত্ত হয়, কিন্তু ভোগবাসনা থেকেই যায়, কিন্তু এই ধরনের লোক পরমেশ্বরের দেখা পান বলে তাঁর সকল বাসনার বিনাশ হয়। হে কৌন্তেয়, প্রবল ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় যত্নশীল বিবেকী

৬০

পুরুষেরও মন চুরি যেতে পারে। সেই সব ইন্দ্রিয়কে সংযত করে যে যোগী আমাতে নিবিষ্টচিত্ত হয়ে থাকবেন, যাঁর ইন্দ্রিয়-সকল বশে এসেছে তাঁরই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অনবরত বিষয়ের চিন্তায় পুরুষের আসক্তি জন্মে; আসক্তি থেকে উৎপত্তি হয় কামনা, কামনা থেকে ক্রোধ, ক্রোধ থেকে মোহ, মোহ থেকে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতি-ভ্রংশ থেকে বুদ্ধিবিনাশ এবং বুদ্ধিবিনাশে বিনাশ। চিত্ত যার বশীভূত এরূপ ব্যক্তি রাগদ্বেষহীন, নিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়-ভোগ করলেও প্রসন্নতা প্রাপ্ত হন। প্রসন্নের সকল দুঃখের অবসান হয়, কারণ

৬৫

যিনি প্রসন্নচিত্ত তাঁর বুদ্ধি হয় দ্রুত-প্রতিষ্ঠিত। যার চিত্ত স্থির হয় নাই তার বুদ্ধি নাই, তার ধ্যান নাই। যার ধ্যান নাই তার শান্তি নাই। যার শান্তি নাই তার সুখ কোথায়? বাতাস যেমন জলের মধ্যে নৌকাকে বিচলিত করে, মনও তেমন বিষয়রত ইন্দ্রিয়গণের যেটির পিছু নেয়, সেটিই বুদ্ধিকে বিপথগামী করে। অতএব, হে মহাবাহু, যাঁর ইন্দ্রিয়সকল ইন্দ্রিয়ভোগ্য থেকে সর্বপ্রকারে সংযত হয়েছে তাঁর প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সকল জীবের কাছে যেটি রাত্রি, সংযমী তখন জেগে থাকেন, জীবেরা যখন জেগে থাকে, তত্ত্বদর্শী মুনির কাছে সেটি রাত্রি। যেমন নানান জলধারায় পরি-পূর্ণ অচঞ্চল সমুদ্রে জলরাশি প্রবেশ করে তেমনি ভাবে যার কাছে সব কামনা এসে মিলায়, তিনি শান্তি পান; যিনি কামনা করেন তিনি পান না। যে পুরুষ সকল কামনা ত্যাগ করে নিঃস্পৃহ, নিরহংকারও মমতাশূন্য হয়ে বিষয় ভোগ করেন তিনিই শান্তির সন্ধান পান। হে পার্থ, এই হল ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা, এর প্রাপ্তিতে হয় মোহ-

৭২

মুক্তি। মৃত্যুর সময়ও যদি কেউ এর আশ্রয় নেয় তবে সে পায় ব্রহ্মনির্বাণ।

কর্মযোগ—কর্তব্যের মত পথ

অর্জুন জিজ্ঞেস করলেন, হে জনার্দন, কর্মের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেয় এই যদি তোমার মত হয় তবে, হে কেশব, কেন আমাকে ঘোর কর্মে নিযুক্ত কর? পাঁচমিশালী কথায় আমার বুদ্ধিকে যেন মোহিত করছ—সেই একটি নিশ্চয় আমাকে বল যা দ্বারা আমি শ্রেয়কে পাই।

শ্রীভগবান বললেন, হে নিষ্পাপ, ইহ-লোকে দ্বিবিধ নিষ্ঠার কথা আমি ইতিপূর্বে বলেছি—জ্ঞানযোগ সাংখ্যদের জন্য, কর্মযোগ যোগীদের জন্য। কর্মের অনুষ্ঠান ভিন্ন কোনও পুরুষ, কর্মশূন্যতার ভাবে পৌঁছতে পারে না, আর খালি সন্ন্যাস দ্বারাই সিদ্ধি-প্রাপ্ত হয় না। কখনও কেউ ক্ষণকাল বিনা

৫

কাজে থাকতে পারে না। স্বভাবধর্ম অনুসারে অবশ হয়ে সবাই কাজ করে থাকে। কর্মে-ন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে যে মূঢ়চিত্ত মনে মনে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের কথা ভাবতে থাকে তাকে মিথ্যাচারী বলতে পার। হে অর্জুন, মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়নিচয়কে নিয়ন্ত্রিত করে, যাঁর কিন্তু অনাসক্তিতে ও কর্মেন্দ্রিয়-গুলির সহায়তায় কর্মযোগে আবদ্ধ তিনিই হন বিশিষ্ট। নিরন্তর তুমি কাজ কোরো। কর্মহীনতার চেয়ে কর্ম ভালো, অকর্মী হলে তোমার শরীরযাত্রাও সিদ্ধ হবে না। যজ্ঞার্থ ছাড়া অন্য কাজে ইহলোক বাঁধা পড়ে কর্মে, হে কৌন্তেয়, আসক্তিমুক্তিতে তুমি তার জন্য কাজ করে যাও। পুরাকালে প্রজাপতি যজ্ঞসহযোগে প্রজাসৃষ্টি করে বলে-

১০

ছিলেন, এতেই তোমাদের বৃদ্ধি হোক, তোমাদের অভীষ্টের জন্য হোক কাম্য। এর দ্বারা দেবতাদের আপ্যায়ন কর, দেবতারাও তোমাদের আপ্যায়িত করুন। পরস্পরের এই তৃপ্তায়নে পরম শ্রেয় প্রাপ্ত হত। যজ্ঞতৃপ্ত দেবতারা তোমাদের ইষ্ট ভোগসমূহ দেবেন। এঁদের না দিয়ে দেবতাদের দান যে ভোগ করে সে অবশ্যই চোর। যজ্ঞের অবশিষ্ট ভোজন করেন যে সন্ত, সকল পাপ থেকে তিনি মুক্তি পান, যারা কেবল নিজের জন্য রাঁধে সে পাপীদের হয় পাপভোজন।

অন্ন থেকে জীবের উৎপত্তি, বৃষ্টি অন্নকে সম্ভব করে, যজ্ঞ থেকে বৃষ্টির সৃষ্টি, যজ্ঞ হয় কর্ম হতে উৎপন্ন। কর্মের উদ্ভব ব্রহ্ম থেকে জেনো, ব্রহ্ম অক্ষর হতে

১৫

সমুৎপন্ন, তাই সর্বব্যাপী ব্রহ্ম নিয়ত যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত। ইহলোকে এই প্রকার প্রবর্তিত চক্র যে অনুসরণ করে না, হে পার্থ, সেই পাপায়ুঃ ইন্দ্রিয়পরায়ণ বৃথাই বাঁচে। কিন্তু যে মানব কেবল আত্মরতিতে রত, আত্মাতেই তৃপ্ত এবং আপনাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, তার আর করণীয় নেই। ইহলোকে তার কিছু করা নিরর্থক, না করলেও কিছু হবে না। প্রয়োজনার্থ তার কোন আশ্রয়ও লাগবে না সর্বভূতে। অতএব অনাসক্তিতে সতত করণীয় কর্মের আচরণ কর। কেন না, অনাসক্ত কর্মের আচরণে পুরুষের হয় পরম প্রাপ্তি। জনক এবং আরো অনেকে কর্মের

২০

দ্বারাই সম্যক সিদ্ধিতে সংসিদ্ধ হয়েছিলেন। লোকসংরক্ষণের দিকে দৃষ্টি রেখে তোমার কাজ করা উচিত।

শ্রেষ্ঠ যে যে আচরণ করেন ইতরজনও তাই করে। তিনি যে মান স্থাপন করেন, লোকেরা তারই অনুবর্তী হয়। হে পার্থ, তিন লোকের মধ্যে আমার কিছুমাত্র কর্তব্য নাই, অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তিযোগ্য নাই। তবুও আছি অতন্দ্রিত কর্মে বৃত। হে পার্থ, আমি যদি কখনও তন্দ্রাহারা কর্মে প্রবৃত্ত না থাকতাম, মানুষেরা তো তাহলে আমার পথ ধরত সর্বতোভাবে। যদি আমি কাজ না করি, এই লোককুল উৎসন্নে যাবে; আমার জন্যই বিশৃঙ্খলা তৈরী হত, প্রজাপুঞ্জ হত ধ্বংস। হে ভারত, কর্মে আসক্ত বিদ্যাহীনরা যে কাজ করে, বিদ্বানরা আসক্তিহীনতায়

২৫

লোকরক্ষার ইচ্ছায় তেমনি করে যান। কর্মলোভী ব্যক্তিদের বুদ্ধিভেদ বিধি তৈরীতে লাভ নেই; বিদ্বান যোগযুক্ত হ সর্ব কর্মের সম্যক আচরণে মিলিত থাকে প্রাকৃতিক গুণাবলীর দ্বারা সর্বতোভা সকল কাজ নিষ্পন্ন হয়, অহঙ্কারের মো

ভারতে সবচেয়ে বেশী বিক্রীর সাইকেল চেন

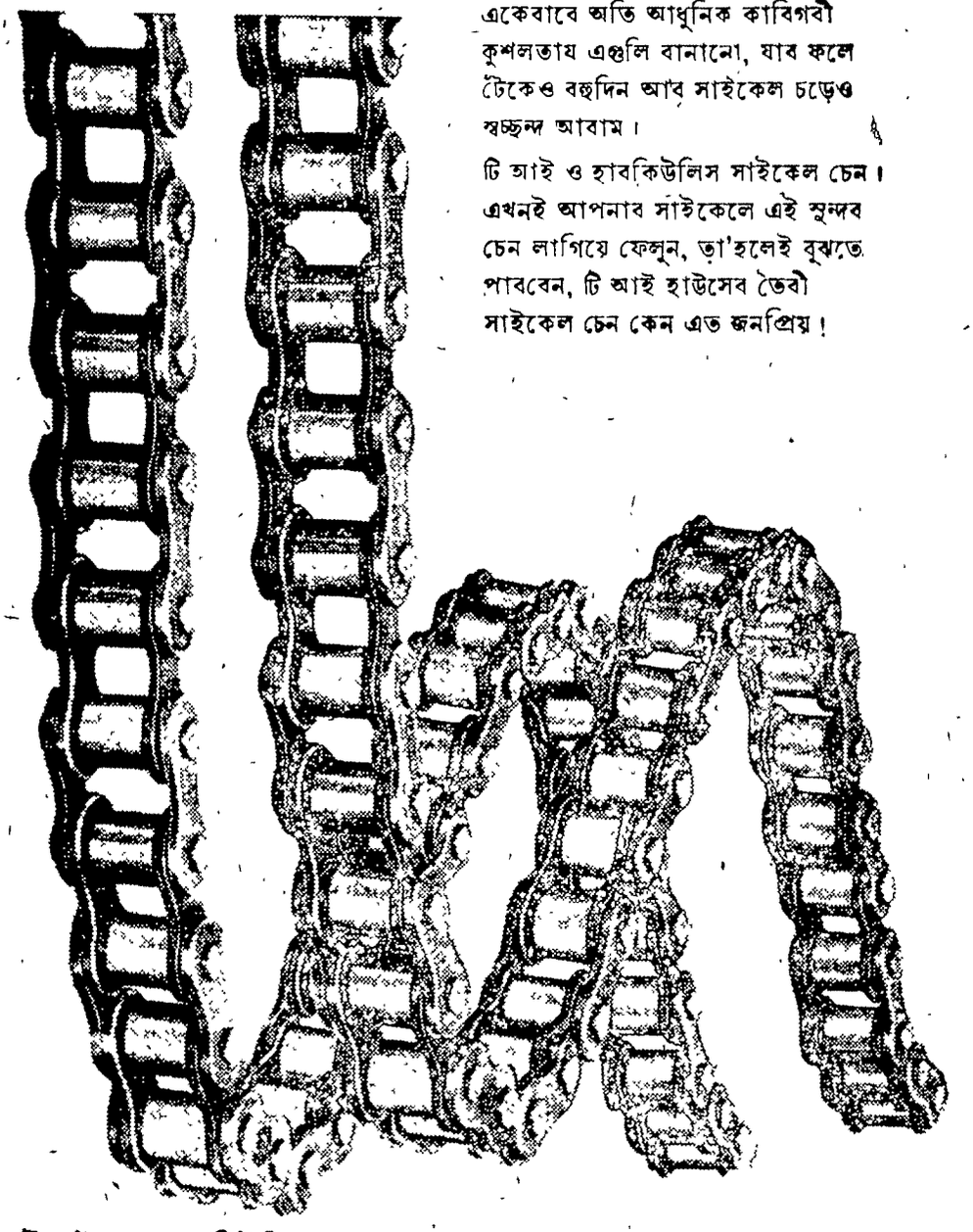

একেবারে অতি আধুনিক কারিগরী কুশলতায় এগুলি বানানো, যার ফলে টেকেও বহুদিন আর সাইকেল চড়েও স্বচ্ছন্দ আরাম।

টি আই ও হারকিউলিস সাইকেল চেন। এখনই আপনার সাইকেলে এই সুন্দর চেন লাগিয়ে ফেলুন, তা'হলেই বুঝতে পারবেন, টি আই হাউসের তৈরী সাইকেল চেন কেন এত জনপ্রিয়!

টি আই অ্যাণ্ড হারকিউলিস

TI & Hercules

টি আই ডাইমণ্ড চেন লিমিটেড, মাদ্রাজ ৬০০ ০৫৩

(টিউব ইনভেস্টমেণ্টস্ অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের এক পরিপূরক সংস্থা)

IDS TID 2708 A BEN

মন ভাবে আমিই কর্তা। কিন্তু ওহে মহাবাহু, গুণ ও কর্মের বিভাগে যিনি তত্ত্ববিদ তিনি জানেন যে গুণ গুণের উপরই কর্তাত্ব, তাই তার অসক্তি আসে না। প্রাকৃতিক গুণে মোহাচ্ছন্নগণ গুণজ কর্মে আসক্ত হয়। পূর্ণ জ্ঞানী যেন সেই অল্পজ্ঞানী মন্দদের বিচলিত না করেন.

অত্যধিক চেতনায় আমায় সর্বকর্ম

৩০

ন্যস্ত করে এবং নিষ্কাম মমতাহীন ও বিগত শোক হয়ে যুদ্ধ কর। যে সব মানব শ্রদ্ধাবান ও অনসূয়ায় আমার এই মতের নিত্য অনুষ্ঠান করেন তাঁদেরও হয় কর্ম থেকে মোচন। আর যারা দোষান্বেষণে আমার এই মতের অনুবর্তী হয় না সেই সব সর্বজ্ঞান-বিমূঢ় চিত্তশূন্যদের বিনাশপ্রাপ্ত বলে জেনো। জ্ঞানবানও আপন প্রকৃতির অনুরূপ চেষ্টা করেন। সকল জীব প্রকৃতির পথে যায়, নিগ্রহ করে কি করবে? প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের আওতায় আকর্ষণ ও বিকর্ষণের ব্যবস্থা আছে, তাদের বশে এসো না, কারণ তারা তো এর (আমার মতের) পরিপন্থী। স্বধর্ম গুণে খাটো হলেও সুঅনুষ্ঠিত

৩৫

পরধর্মের চেয়ে শ্রেয়। স্বধর্মে নিধনও শ্রেয়, পরধর্ম ভয়াবহ।

অর্জুন বললেন, হে বৃষ্ণিবংশজ, তাহলে কার প্রেরণায় এই শরীর অনিচ্ছা-সত্ত্বেও, যেন বাধ্যতামূলকভাবে, পাপে লিপ্ত হয়? শ্রীভগবান উত্তর দিলেন, রজো-গুণ জন্ম দিয়েছে এই কাম, এই ক্রোধকে। এরা সর্বগ্রাসী ও মহাপাপের মূল। ইহ-জগতে এদের শত্রু বলে চিনো। আগুন যেমন ধোঁয়ার দ্বারা আবৃত হয়, ময়লা দ্বারা আরশি এবং জরায়ু দ্বারা গর্ভ, তেমনই এরা একে (জীবকে জ্ঞানকে) আবৃত রাখে। হে কৌন্তেয় জ্ঞানীর চিরশত্রু পূর্ণতাপ্রাপ্তিতে কঠিন এই কামরূপী আগুনে জ্ঞান হয় আচ্ছন্ন। বলা হয়, ইন্দ্রিয়নিচয়, মন, এবং বুদ্ধিতে এর

৪০

স্থিতি। এদের দ্বারাই এটি জ্ঞানকে ঢেকে দিয়ে দেহীকে মোহাচ্ছন্ন করে। হে ভারত-বংশের সেরা, সেই কারণে তুমি আদিতই ইন্দ্রিয়দের নিয়ন্ত্রিত করে জ্ঞান ও বিজ্ঞান-বিনাশকারী এই পাপরূপকে নাশ করো। বলা হয় সবার উপরে ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের উপরে মন, মনের উপরে বুদ্ধি,

৪৩

আবার বুদ্ধির উপরে সেই। ওহে মহাবাহু এভাবে বুদ্ধির চেয়ে বড় সেটিকে বুঝে আত্মার দ্বারা আত্মাকে শান্ত করে কামরূপ দুর্ধর্ষ শত্রুকে বধ কর।

অভ্যাস যোগ বা ধ্যান যোগ : আপন অনুশাসন

শ্রীভগবান বললেন, কর্মফল-আশ্রয়

না করে যিনি করণীয় কর্ম করেন তিনি সন্ন্যাসী এবং যোগীও অগ্নি বস্তুবিমুখ নন, ক্রিয়াত্যাগীও নন। হে পাণ্ডব সন্ন্যাস এটি যাকে বলা যায় তাকেই যোগ জেনো। কারণ সংকল্পত্যাগী না হলে কেউই যোগী হয় না। যোগারোহন ইচ্ছুক মুনির পক্ষেই কর্মকেই উপায় বলা হয়, সেই যোগ আরোহন করলে শান্তিই কারণ বলে কথিত হয়। যখন সংকল্পত্যাগী ইন্দ্রিয়যোগ্য বিষয়ে আসক্ত হন না, কর্মসমূহেও না, তখন তাঁকে বলা হয় যোগারূঢ়। আত্মা দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করো, আত্মাকে অবসন্ন করো না,

৫

কারণ আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার শত্রু। যে আত্মার দ্বারা আত্মাই জয় হয়েছে, আত্মা সেই আত্মার বন্ধু, কিন্তু আত্মাকে জয় করতে না পারলে আত্মাই শত্রুর ন্যায় শত্রুতের প্রবৃত্ত হয়। জিতাত্মা ও প্রশান্ত ব্যক্তির পরমাত্মা শীতে উষ্ণতায়, সুখে-দুঃখে, মান অপমানে সমাহিত থাকে। যিনি জ্ঞান ও বিজ্ঞান দ্বারা পরিতৃপ্তচিত্তরূপ নির্বিকার, জিতেন্দ্রিয় এবং মাটি পাথর ও সোনায় সমদর্শী সেই যোগীকে মুক্ত বলা যায়। সুহৃত, মিত্র, নিরপেক্ষ, মধ্যস্থ, অপ্রিয় বন্ধু, সাধু ও পাপীর প্রতি সমজ্ঞবাপন্ন তিনিই বিশিষ্ট।

যোগী সতত নির্জনে থেকে একাকী চিত্ত ও দেহকে সংযত করে আশা ও ভোগ

১০

ত্যাগে আত্মাকে সমাহিত করবেন। শুদ্ধ স্থানে নিজের জন্য স্থির আসন স্থাপন করে—যেন খুব উঁচু বা খুব নীচু না হয় এমনভাবে কুশ, চর্ম ও বস্ত্র উপর্যুপরি বিছিয়ে—তাতে উপবিষ্ট হয়ে মনকে একাগ্র করে চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযত করে আত্মশুদ্ধির জন্য যোগ অভ্যাস করবেন। শরীর, শির ও গ্রীবা সরল ও নিশ্চলভাবে রেখে স্থির হয়ে নিজ নাসিকাগ্রে দৃষ্টি রেখে চতুর্দিক না দেখে প্রশান্তচিত্ত, ভয়-শূন্য, ব্রহ্মচর্যব্রতে স্থির হয়ে মনঃসংযম করে আমাতে মন দিয়ে ও আমাপরায়ণ হয়ে যোগাসীন হবেন। যোগী এভাবে আমাকে

১৫

সদাযুক্ত করে সংযত-মনে আমাতে স্থিত নির্বাণরূপী পরমা শান্তি পান।

হে অর্জুন, অতিভোজীর এবং একান্ত অনাহারীর যোগ হয় না, অতিনিদ্রাপরায়ণ বা অধিক জাগ্রতেরও নয়। যার আহার ও বিহার উপযুক্ত, যিনি কর্মসমূহে উপযুক্ত চেষ্টাকারী, যার নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিত, যোগে তার দুঃখহরণ হয়। যখন সংযতচিত্ত আত্মাতেই স্থির হন এবং সকল কামনার নিস্পৃহ হন, তখন তাঁকে যুক্ত বলা যায়। যেমন বায়ুহীন স্থানে প্রদীপ হয় নিষ্কম্প, আত্মাকে যোগযুক্ত সংযতচিত্ত যোগীর

বেলা সেই উপমা শোনা যায়। যখন যোগা-ভ্যাস দ্বারা বিশুদ্ধ চিত্ত নিবৃত্ত হয়, যখন

২০

আপনা দ্বারা আত্মাকে দেখে তুষ্ট হয়, যখন এই যোগী বুদ্ধিগ্রাহ্য ইন্দ্রিয়াতীত যে সুখ সেটি অনুভব করেন এবং ঐ অবস্থায় তত্ত্বজ্ঞান থেকে বিচলিত হন না। যেটিকে লাভ করলে অপর লাভকে তার চেয়ে বড় মনে হয় না, যেটিতে স্থিত হলে দারুণ দুঃখেও অবিচলিত থাকা যায়, ছোঁয়া দিয়েই যেখানে দুঃখের অবসান হয় সেটিকে যোগ নাম জানবে, নিশ্চয়ই অবসাদহীন চিত্তে সেই যোগে যুক্ত হবে। সংকল্পজাত সমস্ত কামনা নিঃশেষে ত্যাগ করে মনের দ্বারাই ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত করবে, ধৈর্যের দ্বারা যে বুদ্ধি বশ করেই তার সাহায্যে ধীরে ধীরে নিরুদ্ধ করে মনকে আত্মায় স্থাপন করবে,

২৫

কিঞ্চিৎ মাত্র চিন্তা করা না। চঞ্চল এবং অস্থির মন যে যে দিকে ছুটতে চায় সেখান থেকে টেনে এনে আত্মাতেই একে বশীভূত করা।

প্রশান্তমনা এই যোগীকেই উত্তম সুখ আশ্রয় করে—তিনি রজোগুণের ঊর্ধ্বে ব্রহ্মভূত এবং নিষ্কলুষ। এভাবে আত্মাকে সদাসংযুক্ত রেখে বিগতপাপ যোগী অনায়াসে ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ অত্যন্ত সুখের সন্ধান পান। যাঁর আত্মা যোগযুক্ত তাঁর সর্বত্র সমদৃষ্টি, তিনি আপনাকে সর্বভূতে ও আপনার মাঝে সকল জীবকে দেখেন। যিনি সর্বত্র আমায় দেখেন এবং আমার মধ্যে সকলকে দেখেন তিনি আমাকে হারান না,

৩০

আমি তাঁকে হারাই নাই যিনি একত্ব আশ্রয় করে সর্বভূতে অবস্থিত আমাকে ভজেন সেই যোগী সর্বব্যাপারে থাকলেও আমাতেই থাকেন। হে অর্জুন, যিনি আপনার মত করে সকলকে সমান দেখেন—সে সুখই হোক বা দুঃখ—তিনি আমার মতে তিনি পরম যোগী।

অর্জুন বললেন, হে মধুসূদন, তুমি এই যে সাম্যরূপ যোগের কথা বললে, আমার অস্থিরতায় এর অচল স্থিতি তো দেখছি না। শ্রীভগবান বললেন, হে মহাবাহু, মন নিশ্চয়ই চঞ্চল ও কষ্ট শাসনযোগ্য, কিন্তু হে

৩৫

কৌন্তেয়, ওটিকে শাসনে রাখতে চাই অভ্যাস ও বৈরাগ্য। অসংযতচিত্তের পক্ষে যোগ দুষ্প্রাপ্য এই আমার মত, যিনি আপনাকে বশে এনেছেন এবং যথোপায়ে যত্নশীল তিনি পেতে পারেন। অর্জুন বললেন, কে কৃ শ্রদ্ধার যে লেগেছে কিন্তু উদ্যোগে ম যোগ থেকে বিচলিত যার মন এমন লো যোগসিদ্ধি না পেলে কোন পথে যাবে? মহাবাহু ব্রহ্মপথে বিমূঢ় হয়ে নিরাশ্র উভয়তঃ ব্যাহত সে কি ছেঁড়া মেঘের ম নিরালম্ব হয়ে যাবে না? কৃষ্ণ, আমার এই

সংস্কার নিশ্চয়ে ছিন্ন করতে পার, তোমা ছাড়া এই সংশয় ছিঁড়তে উপযোগী কেউ

শ্রীভগবান বললেন, পার্থ, তাঁর ইহ-লোকে বিনাশ নেই. পরলোকেও নেই কেন

৪০

না, হে বন্ধু, কোন কল্যাণকারীরই দুর্গতিতে গতি নয়। যোগভ্রষ্টের হয় পুণ্যকর্মীর উপযুক্ত লোকপ্রাপ্তি, তথায় অনন্ত কাল বাসানন্তে শুচিস্বভাব শ্রীমানদের ঘরে জন্ম নেয়। অথবা ধীমান যোগীদের কুলে আসে—এই রকম যে জন্ম ইহলোকে সেটি অবশ্যই অতি-দুর্লভ। সেখানে পূর্বজন্মের সেই বুদ্ধি-সংযোগ লাভ করে, হে কুরুনন্দন, তারপর সম্যক সিদ্ধির জন্য করে প্রচুর চেষ্টা। সে যেন ইচ্ছাশক্তি স্বাধীন পূর্বাভ্যাস স্বাধীন চালিত হয়, যোগ সম্বন্ধে কেবল খোঁজ নিতে চাইলেই শব্দব্রহ্মকেও ছাড়িয়ে যান। আবার সযত্ন প্রচেষ্টায় কল্মষধৌত যোগী বহু জন্মে সিদ্ধি লাভ করে পরমা গতি-প্রাপ্ত হন। আমার মতে যোগী তপস্বীদের চেয়ে বড়, জ্ঞানীদের চেয়ে বড়, কর্মীদের চেয়েও বড় অতএব হে অর্জুন তুমি যোগী হও। সকল যোগীদের মধ্যে যিনি আমাতে

৪৭

সমর্পিত, অন্তরাত্মা স্বারা শ্রদ্ধার আমার ভজনা করেন, তিনিই সর্বাধিক যোগযুক্ত এই আমার মত।

একাদশ অধ্যায়
বিশ্বরূপ দর্শন যোগ :
মহাবিশ্বের ছায়াছবি

অর্জুন বললেন, আমার প্রতি করুণায় যে পরম গোপনীয় অধ্যাত্মতত্ত্বের কথা তুমি বললে তাতে আমার মোহ কেটে গেছে। পদ্মপত্র আঁখি, তোমার কাছে প্রাণীদের উৎপত্তি ও বিনাশ বিস্তারিত শুনলাম, সেই সাথে তোমার অক্ষয় মাহাত্ম্যও। হে পরমেশ্বর, নিজের সম্বন্ধে তুমি যা কিছু বললে সবই সত্য, হে পুরুষোত্তম, তোমার ঐশ্বরিক রূপ আমি দেখতে চাই। প্রভু, আমার যদি সেই রূপ দেখার যোগ্য মনে কর তবে, হে যোগেশ্বর, তোমার সেই অবিনাশী স্বরূপ দেখাও।

শ্রীভগবান বললেন : পার্থ, আমার লোকাকীক দেখ—নানা ভাবে, নানা বর্ণে

ও রূপে শত ভাবে এবং সহস্র ভাবে। বসুগণ, আদিত্যদেব, বসুদের, রুদ্রদেব, অশ্বিনীকুমারকে এবং বায়ু সকলকে অনেক কিছু দেখ যা অদৃষ্টপূর্ব । হেমিতশিল্প আমার এই দেহে এক দেখ—চরাচরসহিত সমগ্র জগৎ, আরও আমার দেখার ইচ্ছা। কিন্তু তোমার এই চোখে আমায় দেখতে পাবে না, তোমায় চক্ষু দিচ্ছি, আমার অসাধারণ যোগ

সঞ্জয় কৃতকৃতা করছেন : রাজা, মহা-

যোগেশ্বর হরি এই বলে তারপর পার্থকে পরম ঐশিক রূপ দেখালেন—অনেক মুখ ও

১০

চোখ, দর্শনে বহু বিচিত্র নানা দিব্য আভরণ ও উদ্যত অনেক দিব্য অস্ত্র সমন্বিত। দিব্য মালা ও বস্ত্র পরিহিত, দিব্য গন্ধে প্রলিপ্ত অত্যাশ্চর্য জ্যোতির্ময়, অনন্ত ও সর্বতো-মুখী। আকাশে সহস্র সূর্যের প্রভা যদি যুগপত উত্থিত হয়, সেটি সেই মহান কান্তির সমান হতে পারে। তখন পাণ্ডব সেই দেবাদিদেবের দেহে বহুবিভক্ত সমুদয় জগৎ এক স্থান দেখতে পেলেন। তারপর সেই ধনঞ্জয় বিস্ময়াবেশে ও রোমাঞ্চে দেবতাকে নত-নতশিরে ও করজোড়ে বললেন।

অর্জুন বললেন, দেব, তোমার দেহে

১৫

সর্বদেব তথা প্রাণীকুল, দেবর্ষিদেব সর্প সর্পজাতি এবং পদ্মাসনে প্রভু ব্রহ্মাকেও দেখছি। হে বিশ্বপতি, হে বিশ্বের প্রকাশ, আমি তোমায় সর্বত্র দেখছি অনন্ত রূপে—বহু বাহুতে পেটে, মুখে ও চোখে। তবে তোমার অন্ত, মধ্য বা আদি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। মুকুট, গদা ও চক্রধারী, সর্বত্র দেদীপ্যমান তেজোময় তোমাকে দেখছি দুঃসাধ্যদর্শন সর্ত্তেও প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় দ্যুতিতে তোমার পরিমাণ করা কঠিন হলেও তোমায় সব দিকেই দেখি। তোমায় পরম অক্ষয় হিসাবে জানি, তুমি এই বিশ্বের চরম আশ্রয়, আমার মতে তুমি অধ্যয় শাশ্বত ধর্মের পালক, তুমি সনাতন পুরুষ। আদি মধ্য ও অন্তহীন, অমিতবীর্য, বহুবাহুবিশিষ্ট তোমায় দেখছি—চন্দ্র-সূর্য

তোমার চক্ষু উজ্জ্বল অগ্নির মত তোমার মুখ, আপন তেজে এই বিশ্বকে তুমি তপ্ত কর। স্বর্গ-মর্তের এই অন্তরাল এবং সকল

২০

দিক এক তোমাতেই ব্যাপ্ত। মহাত্মা তোমার এই অদ্ভুত রূপের দর্শনে ত্রিলোক হয় অতিশয় ব্যথিত। এই দেবতারা তোমাতেই প্রবেশ করছেন, কেউ কেউ ভয়ে করজোড়ে স্তব করছেন। মহর্ষি ও সিদ্ধগণ স্বস্তি এই উচ্চারণে নানা স্তুতিতে তোমায় স্তব কর-ছেন। রুদ্ররা, আদিত্যরা, বসুসব এবং যাদের বলে সাধ্য, বিশ্ব অশ্বিনীদ্বয় বায়ু-গণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধ সকলেই বিস্ময় ভরে তোমায় দেখছেন।

হে মহাবাহু, তোমার অসংখ্য মুখ, চোখ, বহু বাহু, উরু ও পা, অনেক উদর, অনেক দাঁতে বিকট তোমার এই বিশাল আকৃতি দেখে অনেক লোক ও আমি খুব ভয় পেয়েছি। হে বিষ্ণু, আকাশছোঁয়া তোমার নানা রঙের হাঁ করা মুখ, জ্বলন্ত বিশাল চোখ—এই দেখে আমার অন্তরাত্মা পীড়িত, ধৈর্য ও শান্তি গেছে ছুটে। দন্তুর ভীষণ তথা প্রলয়কালের আগুনের মত তোমার মুখগুলি দেখে আমি দিশাহারা

২৫

হয়েছি, সুখও পাচ্ছি না। হে দেবেশ, হে বিশ্বের আশ্রয়, তুমি প্রসন্ন হও। ধৃত-রাষ্ট্রের ছেলেরা সকলে, দেশপালদের সঙ্গে ভীষ্ম দ্রোণ এবং সূতপুত্র, আমাদেরও মুখ্য যোদ্ধাদের নিয়ে দ্রুত তোমার দংষ্ট্রাকরাল ভয়ানক মুখমধ্যে প্রবেশ করছে; কারুর বা চূর্ণিত মাথা তোমার দাঁতের পাটিতে লেগে

আছে দেখছি। নদীদের বহু জলধারা যেমন সমুদ্রসম্মুখী ধায়, তেমনি নরলোকের এইসব বীর তোমায় ঘিরে যে সব জ্বলন্ত মুখ সেগুলিতে ঢুকছে। যেমন প্রচণ্ড বেগে ধাবমান পতঙ্গেরা বিনাশের জন্য জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করে, সেই ভাবে লোকেরাও নাশের নিমিত্ত মহাবেগে তোমার মুখগুলির মধ্যে আসে। জলন্ত মুখগুলিতে তুমি সমগ্র লোক গ্রাস করতে উদ্যত, সর্বদিকে তুমি লেলিহান। হে বিষ্ণু, তেজে তুমি

৩০

সারা বিশ্ব ভরাচ্ছ, তীব্র কিরণে. তাপন্ত। আমায় বল, কে তুমি এই উগ্ররূপ? তোমায় প্রণাম করি : দেববর, প্রসন্ন হও। আদি-পুরুষ তোমাকে আমি জানতে চাই : তোমার বৃত্তি তো আমি বুঝতে পারছি না।

শ্রীভগবান বললেন : লোকক্ষয়কারী আমি মহাকাল; অধুনা লোকসমূহের সংহারে প্রবৃত্ত। প্রতিপক্ষের সেনানীতে যে সব যোদ্ধা আছে তুমি ছাড়লেও কেউ থাকবে না। তুমি তাই ওঠো, যশ লাভ কর, শত্রুজয়ে সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর। আমাদ্বারা পূর্বেই এরা নিহত হয়ে আছে, হে সব্যসাচী, তুমি নিমিত্তমাত্র হও। আমার দ্বারা হত দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ ও অন্যান্য বীর যোদ্ধা-দের তুমি বধ কর। ব্যথা পেও না, রণে শত্রুজয় হবেই, তুমি যুদ্ধ কর।

সঞ্জয় বলে চলেছেন : কেশবের একথা শুনে কম্পমান কিরীটী কৃতাঞ্জলিপুটে

৩৫

কৃষ্ণ নমস্কার করলেন; ভয়ে ভয়ে গদগদ স্বরে পুনরায় তিনি প্রশ্ন করলেন প্রণতিতে।

অর্জুনের কথা : হে হৃষীকেশ, তোমার মাহাত্ম্যকীর্তনে জগৎ হৃষ্ট এবং অনুরক্ত হয়, রাক্ষসরা ভয়ে নানান দিকে পালায় এবং সিদ্ধ পুরুষেরা তোমায় প্রণাম করেন এ সবই সত্য। হে মহাত্মা, ব্রহ্মার চেয়েও বড়ীয়ান আদি কর্তা কেনই বা তুমি প্রণাম পাবে না? হে অনন্ত, দেবেশ, জগতের আশ্রয়; তুমি প্রকৃত সত্য ও অসত্য জগৎ এবং তাকে ছাপিয়ে যা অক্ষর ব্রহ্ম তাও তুমি। তুমি আদিদেব, পুরাণ পুরুষ, তুমিই এই বিশ্বে শেষ আধার; তুমি অভিজ্ঞ, আবার তুমি জ্ঞাতব্য এবং পরম আশ্রয়; হে অনন্তরূপ, তোমাতেই বিশ্ব পরিব্যাপ্ত। তুমি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, শশাঙ্ক, প্রজাপতি এবং প্রপিতামহ। তোমাকে সহস্র বার নমস্কার, পুনশ্চ নমস্কার, বারংবার নমস্কার। হে সর্ব, তোমার সামনে

৪০

পিছনে, সব দিকে নমস্কার করি। হে অনন্ত-বীর্য, অমিতবিক্রম তুমি সকল ব্যেপে আছ বলেই সকল হয়েছে। তোমার এই মহিমা না জেনে প্রমাদে বা প্রণয়ে আমি সখা হিসাবে, হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা ইত্যাদি যা হঠাৎ বলে ফেলেছি এবং, হে অচ্যুত, বিহারে শয়ন, আসন, বা ভোজনে, একান্তে বা প্রত্যক্ষে পরিহাসের জন্য তোমায় যে অশ্রদ্ধা করেছি তার জন্য, হে প্রমাণাতীত, তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। হে অমিতপ্রভাব, তুমি এই চরাচরে লোকের পিতা, পূজ্য, গুরুর চেয়েও গরীয়ান। ত্রিভুবনে তোমার সমান নেই, তোমার চেয়ে বড় কাউকে কোথায় পাব? তাই আমি শরীর নুইয়ে প্রণাম করছি আরাধ্য ঈশ্বর তোমায় যেন প্রসন্ন করি। হে দেব, পিতা যেমন পুত্রকে, সখা যেমন সখাকে, প্রিয় যেমন প্রিয়াকে তেমনি তুমিও আমায় সহ্য করো। যা পূর্বে দেখিনি তাই হর্ষান্বিত হচ্ছি, আবার ভয়ে মন বিচলিত হচ্ছে। হে দেব, তোমার সেই রূপ আমায় দেখাও। হে দেবেশ, জগন্নিবাস সদয় হও। আমি সেই রূপেই তোমাকে কিরীটী, গদা ও চক্রধারী দেখতে চাই। হে

৪৫

সহস্রবাহু বিশ্বমূর্তি, তোমার সেই চতু র্ভুজ রূপে এসো।

শ্রীভগবান বললেন : হে অর্জুন আমার প্রসন্নতায় আত্মযোগবলে আমার এই তেজোময়, বিশ্বাত্মক, অনন্ত আদ্য, পরম রূপ তোমায় দেখালাম; যেটি তুমি ছাড়া আগে কেউ দেখেনি। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, বিনা বেদযজ্ঞ-অধ্যয়নে, বিনাদানে, বিনা প্রক্রিয়ায় বা উগ্র তপস্যায় আমার এই রূপ তুমি ছাড়া নরলোকে অপরের দর্শনাতীত। আমার এই ঘোর রূপ দেখে তোমার যেন ব্যথা না হয়, বিমূঢ় ভাবও যেন না আসে। তুমি নির্ভয়ে হৃষ্ট মনে পুনর্বার আমার সেই রূপই দেখ।

সঞ্জয় বলে চলেছেন : বাসুদেব অর্জুনকে এই বলে আবার সেই স্বকীয় রূপ দেখালেন এবং সৌম্যশরীরী হয়ে মহাত্মা

৫০

পুনর্বার সেই ভয়ার্তকে আশ্বাস দিলেন। অর্জুন তখন বললেন : হে জনার্দন, তোমার এই সৌম্য মানুষী রূপ দেখে ইদানীং আমি সুস্থির চেতনা পেলাম, প্রকৃতিস্থ হলাম।

শ্রীভগবান বললেন : আমার যে দুর্লভ-দর্শন রূপ দেখলে, দেবতারাও নিত্য এই রূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষী। আমাকে যে ভাবে দেখলে না বেদ, না তপস্যায়, না দানে এবং না যজ্ঞদ্বারা এবংবিধ আমাকে দেখা সম্ভব-পর নয়। হে পরন্তপ অর্জুন, কেবল এক-নিষ্ঠ ভক্তবিদ্বাই এই ভাবে আমায় যথার্থ জানতে, দেখতে ও মিশতে পারা সম্ভব। হে পাণ্ডব, যিনি আমার কর্ম করেন, আমিই

৫৫

যার অবলম্বন, আমাতে যাঁর ভক্তি এবং যিনি নিরাসক্তিতে সর্বভূতে বিদ্বেষ-বিহীন তিনিই আমায় পান।

শ্রীভগবান বললেন, ঊর্ধ্বদেশে মূল নীচে শাখা সেই অশ্বত্থকে অবিনাশী বলা যায়, এবং বেদসকল তার পত্রস্বরূপ এমন যাঁর উপলব্ধি হয়েছে তিনিই বেদজ্ঞ। সেই বৃক্ষ পুষ্টি পায় গুণের দ্বারা, পল্লবিত হয় বিষয়ের দ্বারা, বিস্তৃত হয় ঊর্ধ্বে ও নিম্নাগে, এবং কর্মে বাঁধা মূল চালনায় মনুষ্যলোকে হয় আধাগামী। ইহলোকে এর রূপ কেউ বুঝতে পারে না, তেমনি পারে না আদি, স্থিতি বা শেষ। এই দৃঢ়মূল অশ্বত্থকে অনাসক্তির হাতিয়ারে ছিন্ন করে সেই চরণের সন্ধান করতে হবে—যেখানে

পৌঁছলে কেউ আর ফিরে আসে না, যেথা থেকে এই পুরাতনী সংসারপ্রবৃত্তির বিস্তার হয়েছে সেই আদি পুরুষকে আশ্রয় নি[illegible] এই কথা বলে।

যাঁদের অভিমান ও মোহ দূর হ[illegible], যাঁরা আসক্তিরূপ দোষকে জয় করেছেন আত্মজ্ঞানে স্থির যাঁদের কামনা প্রশমিত

৫

হয়েছে ও সুখ-দুঃখ দ্বন্দ্বভাব থেকে হয়েছে মুক্তি সেই সব মোহজয়ীরাই এই [illegible] পদে পৌঁছতে পারেন। যেখানে পৌঁ[illegible] তাঁদের প্রত্যাবর্তন নেই, যাঁকে সূর্য প্রকাশ করতে পারে না, পারে না চন্দ্র কিংবা অগ্নি, সেই আমার পরম ধাম। আমারই সনাতন অংশ জীবস্বরূপ হয়ে প্রকৃতিতে স্থিতি পায়, মন এবং পঞ্চেন্দ্রিয় তাই জীব-লোকে টেনে নেয়। ঈশ্বরের অংশ যেমন শরীরী হল তেমনি আবার শরীর ত্যাগ করেন, মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে সাথে সাথে নিয়ে—ঠিক যেমন আধার থেকে গন্ধ গ্রহণ করে বায়ু গতায়ত। এই শরীরী চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক এবং মনকে আশ্রয় করে বিষয় ভোগ করে। দেহান্তরগামী হোক বা দেহেই স্থিতি, ভোগী হোক বা গুণা-

১০

ন্বিত, মোহগ্রস্তরা এঁর দেখা পায় না; জ্ঞান যাঁরা জ্ঞানচক্ষু দিয়ে দেখতে পারেন। যত্নশীল যোগীরা নিজ দেহে অবস্থিত একে দেখেন, অশুদ্ধচিত্ত ক্ষুদ্রচেতারা চেষ্টা করলেও এর দেখা পাবে না।

সূর্যগত যে তেজ অখিল জগৎকে উদ্ভাসিত করে, এবং চন্দ্রে ও অগ্নিতে যা আছে সেই তেজ আমার বলে জেনো। আমি পৃথিবীতে প্রবেশ করি নিজ বলে জীবকে ধারণ করবার জন্য; আমিই রসময় চন্দ্র হই সব ওষধিকে পোষণ করবার জন্য। প্রাণিদেহ আশ্রয় করে আমি জঠরাগ্নি হই—প্রাণ ও অপান বায়ুর সংযোগে চার ধরনের খাদ্য করি পরিপাক। সকল হৃদয়ে আমার আসন, আমার থেকেই স্মৃতি ও জ্ঞান উৎপন্ন হয় অথবা উভয়ের বিলোপ। সকল বেদের দ্বারা

১৫

আমাকে বুঝতে হবে, আমিই বেদান্ত সম্প্রদায়ের প্রবর্তক এবং বেদবিশেষজ্ঞ। সংসারে ক্ষর ও অক্ষর এই দুই পুরুষের প্রসিদ্ধি। দৃশ্যমান সব কিছু বিনাশশীল। আর অন্তরাত্মাকেই কহে অবিনাশী। এদের থেকে আলাদা আছেন এক উত্তম পুরুষ যাঁকে বলে পরমাত্মা, যিনি অব্যয় ঈশ্বর, তিন লোকে যাঁর প্রবেশ ও পালন। যেহেতু আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষরের চেয়ে উত্তমতর সেই জন্য লৌকিক শাস্ত্র তথা বেদে পুরুষোত্তম নামে প্রখ্যাত। হে ভারত, এই ভাবে হয় মোহমোচন এবং পুরুষো[illegible] রূপে আমাতে জ্ঞান, তিনিই হন সর্বজ্ঞ সর্বভাবে করেন আমার ভজনা। হে [illegible] বিহীন ভারত, আমার কর্তব্য হল এই গোপনীয় শাস্ত্র; এটি বুঝলে আসে স[illegible]

২০

বুদ্ধি ও কৃতকর্মপালন।

শৈবাল মিত্র

তরণী পাহাড়ে বসন্ত

কাল সাতজনকে মরতে দেখেছে। বড়োবাবু দুজনকে গুলি করলো। লাঠিপেটা করে পাঁচজনকে মারা হলো। দিবাকর আড়ালে পালিয়েছিলো। চারপাশে শুধু কান্না, গোঙানি। জঙ্গলের মধ্যে গিয়েও রেহাই নেই। জনা দশেক সি আর পি গাঁয়ের দুটো মেয়েকে উদোম ল্যাংটো করে ধমকাচ্ছে। দিবাকর দিশেহারা হয়ে যায়। মাঝে মাঝে মনে হয় সে কোনো বিদেশ বিভুঁয়ে আছে। এটা তার জন্মস্থান নয়। যেই চেনাজানা দেশ-গাঁ যেখানে সে বড়ো হয়েছে ডুংডাঙুটি খেলা করেছে, তার সঙ্গে এই পরিবেশ, প্রকৃতির কোনো মিল নেই। কে যেন তাকে এক লগিতে বসাতলে ফেলে দিয়েছে।

সন্ধ্যেবেলায় কুম্বিং শেষ হয়। লরী-ভর্তি লুঠের মাল, সাতটা মৃতদেহ, বিশ-পঞ্চাশ, একশোজন আধমরা মানুষ নিয়ে গোটা বাহিনী ফিরে আসে। চারপাশের ঘরবাড়ী গাঁ তখন লন্ডভন্ড, শান্তশীল মানুষজনের সাড়া নেই। ফাঁকা মাঠে, অসাড় সাড়া অন্ধকার। দিবাকরের বুকের মধ্যে কি এক কষ্ট দলা পাকায়। বুকে ধরালো চাপ। অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কাকেই বা বলবে? তার কথা কে বুঝবে। আর সব কথা কি বলা যায়। মনের কথা গুছিয়ে বলার সভ্যতাও তার নেই।

দিন কয়েক আগে পারুল গ্রামে ঘেরাও এর কথা মনে পড়ে। একটা চেনা মুখ সামনে পড়েছিলো। কোথায় যেন দেখেছে। অথচ নাম জানে না। হয়তো তাঁতিপাড়ায় বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতো। গাঁয়ের শেষদিকে এই বাড়ী। নদী পেরিয়ে আসতে হয়। আটদশজন পুলিশ ছিলো সঙ্গে। বাকীরা ওপর পাড়ায় ধড়পাকড়, লুঠ আর ধর্ষণে ব্যস্ত। রাত থেকে ঘেরাও শুরু হয়েছে। বেলা দশটাতেও শেষ হয়নি। ছেলেটার পকেটে একটা লাল বই হাত দু-চারটে বক্তৃতামাখা জামাকাপড়। জিনিষগুলো সে লুকোতে চাইছিলো। গরীবের ঘরে আড়াল বা আলমারি নেই। ঘরের মধ্যে হাঁচাপাঁচা করছিলো। তবে ফ্যাকাসে মুখ। দিবাকর ঘরে ঢুকতেই তার গোটা শরীর কেঁপে ওঠে। ধান ছিলো এক বস্তা। ছেলেটার হাতের লালবই, বক্তৃতামাখা জামা দিবাকর নিজে ধানের মধ্যে লুকিয়ে দেয়। বাইরে তখন পুলিশের গলা পাওয়া শব্দ। দিবাকর ছেলেটার মুখের দিকে তাকাতে পারে না। কি নরম, আর কচি চেহারা। বুকের মধ্যে কান্নার মতো কি যেন ছলছল করে। সাধু স্বাধীন আরো কতো তাজা ছেলেমেয়ে চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। বাইরে শেষ সকালের কড়া রোদ। দিবাকর ছেলেটাকে বলে—এখানে খাড়া থাকে। ডর করো না।

দরজার মুখে দাঁড়িয়ে ও বলে এখানে কেউ নাই গো। সব শালা ভাগছে। দিবাকর দাওয়া থেকে একলাফে উঠোনে নামে। পুলিশের দল রাতভোর জেগেছে। দুচোখে ঘুম, ক্লান্তি। মেজাজ খিঁচড়ে আছে। তারা কলকাতার সাহেবকে গালমন্দ করে। বেকার এই নদী পারাপার আর কয়েক মাইল হাঁটার ধকল। মিলিটারিরা সরকারের জামাই। তারা একজন কেউ আসেনি। সাঁইথিয়ার গোকুল নন্দী, কনস্টেবল, ও কিছুদিন রাজনগর থানায় ছিলো। দিবাকরের সঙ্গে সঙ্গে খুব খাতির। তাঁতিপাড়ায় দিবাকরের বাড়ীতে বেশ কয়েকবার এসেছে। কি মিষ্টি বাঁশি বাজায়। নদীর পারে দাঁড়িয়ে চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিলো। দিবাকর ছিলো দলের পেছনে। গোকুল নীচু গলায় বললো—দাঁড়াও দিবাকরদা।

দিবাকর দাঁড়ায়। গোকুলকে দেখে। গামছা দিয়ে গোকুল হাত মুখ মোছে। ওর দু-চোখের আগায় কালি, চোয়াল জেগে উঠেছে। আর পারা যায় না—ভাঙা গলায় বলে—এবার পাগল হয়ে যাচ্ছি।

দিবাকরের গলায় কিম ধরেছিলো। কোনো ভাবনা চিন্তা কাজ করছিলো না। গোকুলের কথায়, মাথার কাঁপা ভাবটা কেটে যায়। ভীষণ কষ্টে বুক পুড়তে থাকে। বলে—আমিও রোজ মরে যাচ্ছি গোকুল ভাই।

গোকুল ফ্যাকাসে চোখে দিবাকরকে দেখে। এটা আমার মামাদের গাঁ। ও বিড়-বিড় করে। তুমি গাঁয়ের একজনকে বাঁচিয়েছো। আমি দেখেছি—গোকুল বলে। দিবাকর চমকে ওঠে। দলের সকলে নদী পেরিয়ে ওপারে উঠলো। একটা মাছরাঙা পাখী ঝুপ করে জলে গোঁত খায়। হাওয়ার নদীর গন্ধ ভাসে।

গোকুল বলে—তোমাকে দেখে আমার বুকে বল ফিরে এসেছে। আমি এ চাকরী ছেড়ে দেবো।

দিবাকরের মনে হয় গোকুল কাঁদছে। ওরা দুজন পাশাপাশি নদী পেরোয়। দিবাকর বলে—আমিও আর পারছি না।

আমার ছেলের কি খবর—গোকুল জানতে চায়।

এখনও জেলে। কথাটা বলতে গিয়ে দিবাকর কেঁপে ফেলে। ধুলো উড়িয়ে মিলিটারি কনভয় ছুটছে। পেছনে সি আর পি র লরি। তার পেছনে বাজা পুলিশ। দুপুরের খর স্বাদে লাল মাটিতে আগুনের হলকা। চারপাশ নির্জন, চুপচাপ।

গাঁয়ের পর গাঁ খালি, জনমানবহীন।

দিবাকরের মনে হয় চারপাশে কি যেন এক মহামারী লেগেছে। তার নিঃশ্বাসেও মড়কের বীজ। দেশ গাঁ উজাড় হয়ে যাবে।

বাইরে বিকেলের পাখিচপাখ আওয়াজ। সাধু উঠে দাঁড়ায়। ঘরের মধ্যে ফ্যাকাসে আলো। বসুনোর মাথার কাছে দিবাকর চুপ হয়ে বসে থাকে। তার কানে কোনো শব্দ ঢোকে না। দরজার ফিকে আলোর দিকে তাকিয়ে সে যেন ঘুমোচ্ছে।

সাধু বলে—রিক্সা এসেছে।

দিবাকর সম্রাগ হয়। যমুনাকে আজ সিউড়ির হাসপাতালে রেখে আসবে। মালোপাড়ার গুপি গিয়েছিলো রিক্সা ডাকতে। গুপি সম্পর্কে দিবাকরের ভাইপো হয় আটারো বছর বয়েস।

একটা চটের থলিতে সাধু মায়ের দুটো পুরোনো শাড়ী আর একটা গামছা ঢুকিয়ে দেয়। কাগজে মোড়া সামান্য সিঁদুর, লেটা করে বেপাতি আলতা জোগায় মায়ের পায়ে।

বাইরে মানুষের কথা, চলাফেরা। দুচারজন পড়সী এসেছে। যমুনাকে প্রায় পাঁজাকোলা করে দিবাকর রিক্সায় তোলে। মোলাটে চোখে যমুনা সাধুর দিকে তাকায়।

সাধু ডুকরে কেঁদে ওঠে। দিবাকরের বুকটা কে যেন নিংড়ে নেয়। দু-মাসের ছেলেটা ওলাউঠোয় মরার পর সাধু এভাবে কেঁদেছিলো। মৃত শিশুকে পুরোনো কাপড় জড়িয়ে দিবাকর ময়রাখালির চড়ায় পুঁতে এসেছিলো। সাধুর কান্না শুনে তার মনে হয়, যমুনা আর ফিরবে না। বোধ ঝলমলে আকাশ। বনকলমীর ঝোপ থেকে কি একটা পাখি ডেকে আসে। যমুনা জোরে শ্বাস টানে। রিক্সা এগোয়। গুপি বলে—আমি মাঠ করে এগোচ্ছি। দিবাকরের সঙ্গে সেও হাসপাতালে যাবে।

চন্ডীমন্ডপের মাঠের পাশ দিয়ে রিক্সা চলে। চারপাশে ঠকাস ঠং শব্দ। অনেক তাঁত চলছে। খোলা মাঠে টানা হাটার কাজ হচ্ছে। গোটা গাঁ কাজে ব্যস্ত। সকলের মুখেই খুশী উপচে পড়ছে। কয়েক-দিন আগে এই মাঠেই এক সন্ধ্যেতে উৎসব হয়েছে। কতো মানুষ, গান, ধর্মের বক্তৃতা। হ্যাজাকের আলোয় খুশীর হল্লা। বন্দুক কাঁধে ছেলেরা লেফট রাইট করছিলো। আড়াল থেকে দিবাকর দেখেছে। নিজেকে তার ভীষন ছোটো অসহায় মনে হয়। এই গাঁয়ের একজন হয়েও সে এখানকার মানুষের থেকে অনেকদূরে একা দাঁড়িয়ে আছে। লেফট রাইট করা ছেলেগুলোর একে-বারে সামনে দাঁড়িয়ে তার বলতে ইচ্ছে করে —আমিও তোদের একজন। আমার নাম দিবাকর মাল। আমার শরীরে অনেকগুলো তোজালি আর ডান্ডার দাগ আছে। তোদের বাঁচাতে গিয়েই আমি ঠেঙ্গানি খেয়েছি। তোরা আমায় ভুল বুঝিস না। কিন্তু মনতে পারে না। অন্ধকারে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বুকের মধ্যে রক্ত তোলপাড় করে। অন্ধকার মাঠ ধরে কিছু পথ দর-মুখো এগোয়। সদর পথে বাড়ী ফিরতেও আজকাল লজ্জা হয়। শাওড়া আর ভায়েরেন্ডার ঝোপ পেরোতেই বাতাস অন্ধকার দাওয়ায় দিবাকর দুজনকে দেখতে পায়, আবছা ছায়ার শরীর। ও থমকে দাঁড়ায়। আলতো পায়ে গুটি গুটি এগোয়। এবার ধরতে পারে। সাধুর মুখোমুখি মোতি দাঁড়িয়ে আছে। নীচু গলায় কথা বলছে। কথাগুলো দিবাকর স্পষ্ট বুঝতে পারে না। দিবাকর আর এগোয় না। অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। চারপাশে ঘন অন্ধকার। আকাশে কালো মেঘ। ঠান্ডা হাওয়া বইছিল। লাল মাটির শক্ত বুকে কি যেন এক ফুলের সুবাস আছে। অন্ধকার রাতে একা একা ঘোরার সময় দিবাকর প্রায়ই এই গন্ধটা পায়। আজ হঠাৎ তার নিজেকে বড়ো দোষী লাগে। সাধুর আর মোতির বিয়েটা দেওয়া উচিত ছিলো। কেন যে তখন একটা বাজে ব্রিদ চেপে ধরলো তাকে? আর কি সম্ভব। যমুনা তো বলে—এখনও হয়। দিবাকর ভাবে—তবে হোক না। অন্ধকার দাওয়া এখন ফাঁকা। মোতি চলে গেছে। সাধু ঘরে। চন্ডীমন্ডপের মাঠ থেকে অনেক গলার গান ভেসে আসে—আমাদের মুক্তি মিছিলে সিন্ধু চলমান।

বড়ো রাস্তার মোড়ে চায়ের দোকানে যমুনাকে বসিয়ে দিবাকর বাসের জন্যে অপেক্ষা করে। গুপি এসে যায়। দোকানের ভেতরে দুজন ছেলে বসে আছে। দিবাকর ওদের মুখ চেনে। ওপর পাড়ার বাড়ী। দক্ষিণের পীচের রাস্তার ধারে স্টেডলাম জন-তিনেক ছেলে গুলতানি করছে। দিবা-করের চেনা। সবাই মোতি, রঞ্জনদের দলের ছেলে। খেপে খেপে আড্ডা দেয়। পুলিশ, মিলিটারি আসছে কিনা নজর রাখে। অজগরও ওদের চোখ এড়াতে পারে না। দিবাকরকে দেখেও ওদের মুখ চোখ শক্ত, শরালো হয়ে ওঠে। দেওয়ালের বাঁশের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে যমুনা কেমন বেহুঁশের মতো বসে আছে। মোলাটে চোখ। ফ্যাকাসে মুখে শুকনো ঠোঁট। তাকিয়ে থাকার শক্তিটুকুও উবে গেছে।

চায়ের দোকানের পেছনে একটুকরো জমি। বুনো ঝোপ, সামান্য টিবি। কয়েকটা শালিখ হৈ-চৈ করছে। দুবরাজপুর থেকে বাসটা এসে গেলো। বেজায় ভিড়। কোনো-মতে দাঁড়ানো যায়। দু-চারজন লোক তাঁতি-পাড়ায় নেমে যায়। যমুনাকে বাসে তুলতে গিয়েই দিবাকরের দম বেরিয়ে যায়। সে হাসফাস করে। গুপি হাত লাগায়। দোকানের ভেতর থেকে দুটো ছেলে বেরিয়ে আসে। তারাও সাহায্য করে। একজন বাসের মধ্যে ঢুকে যায়। সামনের গেটের ছোকরা কন্ডাকটর এগিয়ে আসে। দুজনে কি কথা হয়। কন্ডাকটর সিট থেকে একজনকে তুলে যমুনাকে বসার জায়গা করে দেয়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই দিবাকর ঝাড়া হাত-পা। ছেলেদুটো আবার চায়ের দোকানে ঢুকেছে। দিবাকর তাদের দেখার চেষ্টা করে। ওর যেন কিছু বলার ছিলো। নরম মোলায়েম কয়েকটা কৃতজ্ঞতার কথা। কিন্তু শব্দ-গুলো ও সাজাতে পারে না। শুধু, ওর বুক ভারী হয়। ও ভাবে—মুখ্যু হওয়ার বড়ো শাস্তি। প্রাণের কথাগুলো পর্যন্ত গুছিয়ে বলতে পারে না। বাসটা চলতে শুরু করে। অনেক বলেকয়ে আরও ও দুটি পেয়েছে। তা না হলে কোথায় যে ঠেঙ্গে পাঠাতো কে জানে। শরীর মন একেবারে ভেঙ্গে পড়ছে। দিবাকর জানে, এভাবে মানুষের বেশীদিন চলে না। পিছনে বিশাল মাঠ। অনেক দূরে গাছপালার আড়ালে তাঁতিপাড়া ঝাপসা হয়ে যায়। বাসটা চন্দনপুরা ছাড়াতেই দিবাকর দেখে পরপর কয়েকটা মিলিটারি কনভয়, সি আর পি-র গাড়ি পুলিশ ভ্যান যাচ্ছে বকেশ্বরের দিকে। নিশ্চয়ই কোথাও কুম্বিং আছে। দিবাকর জায়গাটা জানে না। বারোটা থানার ও-সি বদলি হওয়ার পর থেকে সকলের মুখে কুলুপ পড়েছে। কোনো খবর আগে-ভাগে বেরোয় না। দিবাকর ভাবে, ফিরেই মোতির সঙ্গে দেখা করবে। ওর অনেক কথা জানার আছে। মোতি নিশ্চয়ই তাকে বিশ্বাস করবে। মোতির সঙ্গে দেখা করানোর ভার নিয়েছে শিবেন। বলেছে—কোনো চিন্তা নেই দিবাকরদা, কেউ জানবে না। শিবেন ছেলেটা বড়ো ভালো।

সারা জেলায় প্রায় দুশো বন্দুক দখল হয়েছিলো। কোম্বিং, ধরপাকড়ে গোটা চল্লিশ বন্দুক হাতছাড়া হলো। বন্দুক-গুলো কোনো কাজে লাগে না। লুকিয়ে রাখতে ঘাম বেরিয়ে যায়। ভাল গাছের মাথায় পুকুরের জলের তলায়, পুরনো খড়ের গাদায়, মাটির নীচে শ' দেড়েক হাতিয়ার লুকোনো আছে। পুলিশ গোপন জায়গাগুলোর হদিস জেনে গেছে। যেখানেই ওরা হানা দেয় আঁতিপাতি তল্লাসী চালায়। পুকুরের জল ঘুলিয়ে ওঠে, খড়ের গাদায় আগুন জ্বলে। দু-চারজন গেছো থাকে সঙ্গে। তারা গাছের মাথা থেকে বন্দুক নামায়। রক্ত আর জীবন দিয়ে সংগ্রহ করা দামী জিনিষগুলো জোর হাতছাড়া হয়ে যায়।

খোলা হাওয়ার, বোদে জলে অকেজো পড়ে থাকার জন্যে নষ্টও হয়ে গেছে অনেক-গুলো। টিগ্গার চলে না, নলের মধ্যে জমাট ধুলো কাদা, কুঁদো খুলে গেছে। কার্তুজ-গুলোতেও প্রাণ নেই।

কিশোরদের এলাকায় তখনো ত্রিশটা বন্দুক রয়েছে। গোটা তিন-চার পুলিশ নিয়ে গেছে। গণফৌজ তৈরীর সিদ্ধান্ত পাকা হলো। পার্টির নেতৃত্বে অন্ততঃ ত্রিশজন পেশাদার সৈনিক দিনরাত লড়ায়ের জন্যে প্রস্তুত থাকবে। শত্রুর মোকাবেলা করবে। গেরিলা বাহিনী আর নিয়মিত বাহিনী পার্টির দুটো হাত। কিশোর, নবি আর মোতিকে নিয়ে কম্যান্ড গড়া হলো। তরণী পাহাড় থেকে বাজনগর পর্যন্ত আপাততঃ গণফৌজ কাজ করবে। ক্রমশঃ এলাকা বাড়াতে হবে। বৃন্দাবনী, টোরাং, বাঁশফুলি, তাঁতলুই, মাদারপুর, পাহেরা, মুরদগঞ্জ, কালিকাপুর, পবাশিয়া, গরুলে-পাহির গেরিলা স্কোয়াডের কম্যান্ডারদের সভা হলো। উদ্যোগ নিয়েছিলো বা হাঁসদা। বাগজোড়া, দিঘুলি, আমজোড় থেকে কেউ এলো না। রিজিওনাল কমিটি পক্ষে বরুণ একটা যতোয়া পাঠালো। সব বন্ধ রাখো। পার্টির নির্দেশ ছাড়া বিচ্ছিন্ন ভাবে গণফৌজ গড়ার চেষ্টা পার্টিবিরোধী কাজ। সবকটা বন্দুক রিজিওনাল কমিটির

[illegible] হয় দাও। তিমন মুর্মু চিঠিটা নিয়ে [illegible]। সভা শুরু হতে তখন আধঘণ্টা বাকী।

অজিত চিঠিটা পড়লো। কিশোর কথা বলছিলো বুধনের বাবার সঙ্গে। লালমুনির সঙ্গে অজিতের বিয়ের প্রস্তাবটা ও এই সঙ্গে দিয়েছে। লালমুনির মা অবশ্যই নয়। মেয়েটার কথাটা আগেই জানাজানি হয়েছে। বুধনের মাও জানে। সন্ধ্যার আবছা আলোয় উঠোনের ওপর একটা খাটিয়ায় কিশোর আর বুধনের বাবা বসে আছে। কিছুটা দূরে দাওয়ার ওপর মাটিতে বসেছে বুধনের মা। সে এখনও মুখ খোলেনি। ঘাড় খাড়া করে পরের কথা শুনছে। মাঝেমধ্যে অস্বস্তিতে পাশ পরিবর্তন করছে। শেষপর্যন্ত রাজী হয়। তবে এখন নয়। হাতে টাকাপয়সা নেই। ধানচালও ফুরিয়ে আসছে। আলো কিছুদিন যাক। একটা সুন্দর বিয়ে দেবার। মেয়ের হবে বড়োঘর বাড়ীটি। বিয়েতে খুশী হয়। হাতে চিঠি নিয়ে অজিত দাঁড়িয়ে আছে। এখনই সভা বসবে। ও ঘড়িটা ছেড়ে ওঠে। লালমুনির বাপের সঙ্গে কিছু কথা বলছে। কিশোর চিঠিটা পড়ে। ওর মাথের মধ্যে দপদপ করে। অজিত বলে—চিঠি হলো।

চিঠিটা ভাঁজ করে অজিত পকেটে রাখে। ওরা তিনজন ফুলিয়ে এসে দাঁড়ায়। [illegible] ছাড়াবে পাখী বুলিমুরমুর তখনো [illegible]। পুনাই বাস্কের বাড়ি [illegible] সভা শুরু হয়।

লুকোনো হিশটা ফলকে উঠোনে সাদা কিয়ে রাখা হয়েছে। গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের নিয়ে আজ সারাদিন অজিত ওগুলো পরিষ্কার করেছে। ধুলো, মাটি ঝেড়ে ফেলেছে। কিশোর গণমৌর প্রথমে প্রস্তাব দেয়। বুধি সমর্থন করে। ই ছাড়া পথ নাই। আমরা [illegible] হয়ে যাবো।

[illegible] সকলে সায় দেয়, গণফৌজে ঢুকি। আলোচনার মধ্যেই গণফৌজের কাজ ঠিক হয়ে যায়। শত্রুর মোকাবেলা করার সঙ্গে সঙ্গে জনগণকে জাগাতে হবে। তার জন্যে চাই ঝোরালো প্রচার। চাষ আবাদের কাজে গাঁয়ের গরীব মানুষকে সাহায্য করতে হবে। যোদ্ধাদের পরিবারের দায়িত্ব নেবে গরীব মানুষের কমিটি।

চারপাশে অন্ধকার ঘন হয়। পুনাই বুধের পেতলের বাটি ভর্তি হাড়িয়া নিয়ে আসে। তরণী পাহাড়ের আকাশে দু-একটা নক্ষত্র জ্বলছে। তরণী পাহাড়ের বুকেই গড়ে তোলার ঠিক হয়। এখন সব বৈঠক পাহাড়ে বসবে। আপাততঃ কোনো খতম নয়।

সকলে বেশ ঘন হয়ে বসে। হারানো [illegible] ফিরে আসছে যেন। গত তিরিশ-[illegible] বেধড়ক তাড়ব চলছে। [illegible] আর জল বাঁচানো ছাড়া পার্টি [illegible] দিতে পারেনি। এলাকা [illegible] সবল হোগড়ে। গাঁয়ের মানুষ [illegible], মরেছে, ভাগতে পড়েছে। [illegible] ভেঙে পড়া অবস্থা। সবলের মনেই অধিকন্তু কষ্টের কারণ। আত্মবিশ্বাস হিম্মত না থাকলে আত্মত্যাগ ব্যর্থ হয়ে যায়। এই কথাগুলো সবাইকে এতোদিন খোঁচাচ্ছিল। সেই চাপা অনুভূতিগুলোকে কিশোর উস্কে দেয়। লাভ কতো। কুলিতে মাদল আর বাঁশী নিয়ে ছেলেমেয়েরা নেমেছে। গণসংগীত গেয়েছে।

মাও সে তুং যুদ্ধির গেরিলা পাঁচের ভাবনা
হই হই এযাবোন ত্রিলাবাদ। জিন্দাবাদ
নাবা বাহিত ভাতাবরে।

ভিটই তখন চলা প্রস্তুত করতে হতাশা।

মাও সে-তুং-এর যুদ্ধির গেরিলা সংগঠন করবো। লালঝাণ্ডার নীচে দাঁড়িয়ে জিন্দাবাদ ধ্বনি দেবো। জীবন গেলেও ছাড়বো না। গাইয়ের দল সভার দিকে এগিয়ে আসছে। কিশোর পকেট থেকে বন্ধুদের চিঠিটা বার করে। বলে—পার্টির পক্ষ থেকে কমরেড বরুণ একটা চিঠি পাঠিয়েছে। সবলে সোজা হয়ে বসে। অন্ধকারে চিঠির হরফগুলো দেখা হয় না। দেখার দরকারও নয়। চিঠির প্রতিটা শব্দ কিশোরের মাথায় গেঁথে গেছে। ও চিঠিটা পড়ে। গোটা সভা পাথর হয়ে যায়। কিশোর চিঠিটা পড়ে। বাঘা লাফিয়ে ওঠে—ইটা কি কথা বটে। ই আমরা মানতে লারবো।

মুরুদগড়ের মানসিং মাঝি বলে—কিন্তু পার্টির হুকুম কি তু উড়াতে পারবি?

একটা চাপা উশখুশ অবস্থা। রবি ভাঙা গলায় কিশোরকে বলে—তু ইটা কি করলি কামারেড। চিঠিঠি পাল্টালি জানে? উটা তুর চিঠিঠি।

রবির কাঁধে কিশোর হাত রাখে। নরম গলায় বলে—লুকিয়ে লাভ কি? সবকিছু খোলাখুলি আলোচনা হওয়া ভালো।

মোতি হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে—আমি ও সিদ্ধান্ত মানি না। আরো দু-একজন মেতিয় কথায় সায় দেয়। কিন্তু বাকীরা চুপ। কিশোর জানে সভায় দোনামনা চলছে। মানসিং বলে—ই কথাটা পাটি কিখলো জানে বটো কোনো ব্যাপার আছে লিচ্চয়।

কিশোর জানে শ্রেণীশত্রু যতক্ষণ সোজা রাস্তা ছেড়ে অনেক ঘুরেফিরে নবাজ। রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর ঘা মারার কথায় তারা পিছিয়ে যাচ্ছে।

রাষ্ট্রের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই তারা বিরোধী। এই ধরনের চিন্তা কেন জন্মায়, কিশোর জানে। তাদের পড়াবে এই রাষ্ট্রকে ভাঙা এবং নতুন রাষ্ট্র গড়ার ব্যাপারটা খুব বেশী আসেনি। শ্রেণীশত্রু খতমের অভ্যাসটাই সবলের মনে দাগ কেটেছে। অথচ শ্রেণী ঘৃণার মূল কথা রাষ্ট্রযন্ত্রের চৈতন্যদ। সে দিকটার কোনো ফয়সালা হয়নি। গেরিলা স্কোয়াডগুলো তাই জমিদার জোতদার বেটে খুশী। গাঁয়ের কাস্তার গরীব মানুষ এখন বুক ফুলিয়ে হাঁটে। আদিগন্ত ভূমি, ফসল, নদীস্রোতের তারা মালিক, কস্তায় ঘটে তাদের দেখে জমিদার মহাজনেরা ভয়ে কোঁচো। এর চেয়ে বড়ো আনন্দ আর কি আছে। তারা ভাবছে এইভাবেই চলবে। এই স্বাধীনতা ইস্তক দীর্ঘস্থায়ী। কিন্তু এই ধারণা যে কতো বড়ো ভুল সেটা বোঝানো দরকার। শত্রুরা জোট বাঁধছে। পিটিয়ে লাশ বানাবে। শুরুও হয়েছে। কিশোর জানে অর্থনীতিবাদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে আরো জোরালো, ব্রহ্মী অর্থনীতিবাদ তারা করেছে। বিপ্লবের কথা না বুঝে গণীর মুখেক রক্ত মেখেছে। এ রক্তমাখাও তাই সাময়িক। নিছক স্বার্থের ব্যাপার। রাজনীতির সবচেয়ে ওপরের ধাপ যুদ্ধ, রক্তপাত। বিপ্লব বাদ দিয়ে খোকোকা রক্ত বরানোর মানে কি? আরো অনেকটা সময় ধরে কিশোর রাজনীতি ব্যাখ্যা করে। এতোগুলো শ্রেণীশত্রু খতম হলো, তবু আমাদের গেরিলা দলে ভূমিহীন, দরিদ্র কৃষক সংখ্যায় বাড়েনি। প্রথমদিকে যারা চেউয়ের মতো এগিয়ে এসেছিলেন, এখন তারা নিষ্ক্রিয়, বসে গেছেন। সব গাঁয়েই

শুধু এগিয়ে থাকা দু-চারজন টিকে আছেন। সংসারী, দায়দায়িত্বওলা মানুষরা বেশীর ভাগ সরে গেছেন। আমরা বিচ্ছিন্ন। শহরের ছাত্র যুব, মধ্যবিত্ত, ডাকাত লুম্পেনরা এখন এ লাইন আঁকড়ে আছে। এ লাইন তাদের মন এবং চিন্তার সঙ্গে খাপ খায়। শহর এবং গঞ্জে এ-লাইন চলছে। গরীব গাঁয়ে মার খাচ্ছে। সারা ভারত জুড়ে এই ছবি।

কিশোরের বক্তৃতার মাঝখানে অজিত আর মোতি চুপচাপ উঠে যায়। কিছু পরে বাঘা এসে জোটে। অন্ধকার তুলিমুড়ো ধরে ওরা এগোয়। সামনের মাঠে অন্ধকারে কোরাতুসিদের নাচ গান জমে উঠেছে—

সিদু কানু চাঁদ ভৈরো হুল দোকিন জনামলে
হুল দইকো জমান না টোকাং
জায় শহীদ মায়াং চিন্‌হো পাজাএয়াবোনে
বৈহাকো।

সিদু কানু চাঁদ ভৈরবের আরব্ধ লড়াই শেষ করতে হবে, শহীদের রক্তমাখা পথে আমাদের এগোতে হবে।

শুকনো কাঠ, পাতার ধিকধিক আগুন জ্বলছে। ফিকে আলোয় অজিত নাচিয়েদের দেখতে পায়। লালমুনি আগুনে কাঠ গুঁজছে। নাচের দলে দাঁড়ায়নি। অজিত জানে, তার জন্যেই অপেক্ষা করছে মেয়েটা। অজিত মাদলে কাঠি ছোঁয়ালেই লালমুনির শরীরে নাচের ঢেউ উঠবে। অজিতের রক্তে মাদলের শব্দ, গানের সুর, ফিকে আলো লাফালাফি করে। নাচ গানের আসরে ঢুকে যেতে ইচ্ছে করে। আজকাল এমন হয়। নাচ গানের শব্দ শুনলেই বুকের কোন গভীর শেকড়ে টান পড়ে। এক অদ্ভুত সুখে দু-চোখ বুজে আসে। কলকাতায় অনেক গান শুনেছে। নাচের অনুষ্ঠান দেখেছে। এরকম হয়নি কখনো। আসরের উত্তেজনা আসরেই শেষ। এখন মনে হয়, আলো-হাওয়ার মতো নাচ-গান বাজনার শব্দে রক্তের মধ্যে কি যেন উথলে উঠে। মোতি বলে, দাঁড়িও না অজিতদা। গাঁয়ের কুলি ছেড়ে ওরা মাঠের মধ্যে নামে। অন্ধকারে লালমাটির পৃথিবী ডুবে আছে। একটু এগোলেই জঙ্গলের শুরু। সিধ নদীর কালো জলের দাগ। কচি ঢেউ-এর ফিকে শব্দ ওঠে।

খবরটা এনেছিলো মংলু সোরেন। বৃন্দাবনী ছাড়িয়ে পাহাড়ের মাঝখানে ওর বাড়ী। গাঁয়ের নাম তরণী। পাহাড়ের নামে নাম। ওর ঘরে কিশোর প্রথম উঠেছিলো। টোংবাষ আজ সদানন্দ সাহাব বাড়ীতে ডাকাতি হবে। কাপল তার দলবল নিয়ে জঙ্গলে ওৎ পেতে আছে। রাত বাড়লে গাঁয়ে ঢুকবে। এলাকায় ডাকাতি বেড়েছে। বাংলা আর বিহারের তিন-চারটে দুর্ধর্ষ দল প্রায় নিয়মিত হামলা চালাচ্ছে। ডাকাতি করার সময় তারা পার্টির নামে শ্লোগান দেয়। বেমকা লাঠিতরাও করে। পরশু দিন দুমকায় মাধো সিংএর দল বাঁশফুলিতে দুটো বাড়ী লুটেছে। গাঁয়ের মুখেই পুলিশ ক্যাম্প। কিন্তু কেউ আসেনি। পার্টির নামে ডাকাতি করা আটকাতে হবে। গত এক বছর এলাকায় একটিও ডাকাতি হয়নি। অবস্থা বেগতিক দেখে ডাকাতরা অঞ্চল ছেড়ে ভেগে-ছিলো। গত দু-তিন মাস আবার শুরু হয়েছে। পার্টি এখন দুর্বল। মাবের ধাক্কায় বেসামাল। জান বাঁচাতে সকাল সন্ধ্যে কমরেডরা জায়গা বদলাচ্ছে। ডাকাতরা সে খবর জানে। তারা ফিরে এসেছে।

কপিল ডোমের ছেলে। কিন্তু ওর দলের মধ্যে জাত-ধর্ম নেই। বাউড়ি, বাগ্দী, মুন্ডুলি, পাহাড়িয়া সব রকম গোষ্ঠির লোক আছে। বেবরোয়া হার্মাদ বাহিনী। ডাকাতির সঙ্গে দুএকটা খুন লেগেই আছে। সবচেয়ে বড়ো কথা পার্টির দুর্নাম হচ্ছে। শত্রুরা পার্টিকে ছোটো করার সুযোগ পাচ্ছে। ঘটনাগুলো সম্পর্কে পুলিশও রা কাড়ছে না। কলকাতার খবরের কাগজগুলো সোজাসুজি ডাকাতির সব দায় পার্টির ঘাড়ে চাপিয়েছে।

তাতলাইতে আজ হাট ছিলো। মংলু সোরেন গিয়েছিলো হাটে। তখন শেষ বিকেল। সারা দিনের জমজমাট কেনাবেচার পর হাট ভাঙার সময় হয়েছে। জিলিপি, ফুলুরির দর কমে গেছে। হাঁড়িয়ার গন্ধে হাওয়া ভারী। একজন চেনা মানুষ মংলুকে হাঁড়িয়া খেতে ডাকলো। মানুষটা পাহাড়িয়া। মংলুর সঙ্গে পুরনো জান-পয়চান। একটা বড়ো বটগাছের তলায় ওরা দুজন বসেছিলো। সেখানটায় মানুষজন নেই। গাছ-তলায় ছায়া। সূর্য উঠছে। গাছের মাথায় পাখির হট্টগোল। পাহাড়িয়াটার জমজমাট নেশা হয়েছিলো। ডাকাতির খবরটা তার মুখেই শুনেছে। লোকটা সিধনদীর ধার দিয়ে গভীর জঙ্গলে ঢুকে গেলো। খবরটা শুনিয়ে মংলু প্রায় এক ছুটে রবির বাড়ী এসেছে। রবির দরজায় পৌঁছে ও ঠকঠক করে কাঁপছিলো। রবি ঘরে ছিলো না। গাঁয়ের একজন ওকে বললো, বাহেসায় বাস্কের বাড়ী যাও। মংলু আবার দৌড়ায়। তখনও সন্ধ্যা নামেনি। খুব কথা মংলু গুছিয়ে বলতে পারে না। একটু ভয়ও পেয়েছে। কপিলের নামে গোটা চত্তর কাঁপে। জানাজানি হলে মংলু মারা পড়বে। রবি আর কিশোর ছাড়া তখন কেউ ছিলো না। একটু বাদে অজিত এলো। ওর পেছনে বাঘা আর মোতি। কিশোর খবরটা ওদের জানায়। ঘন্টাখানেক পরেই কম্যাণ্ডার-দের সভা হবে। কিশোর ধাঁধায় পড়ে যায়। বাঘা বলে—ভয় ভাবিস না। আমরা ঠ কপিলের গুষ্টির তুষ্টি করবো। ভাদু চোঁড়ে সায় দেয়—হ, হ।

মংলুকে জঙ্গলের মধ্যে একটা কুঁড়ির কাছে ওরা তুলে দিয়ে আসে। ওখান থেকে সে কপিলদের দলের ওপর নজর রাখবে। দ্বিতীয় দফায় অজিত, মোতি আর বাঘা এসে মিলবে। সভা শেষ হলে কিশোর, রবি এবং আরো জনচারেক আসবে। গোটা এলাকা ঘিরে ওরা এ্যামবুশ করবে। সবকটাকে জ্যান্ত ধরতে হবে। কিশোর বলেছে, আমরা ওদের বুঝিয়ে ছেড়ে দেবো।

যদি না বোঝে?—মোতি জিজ্ঞেস করেছে।

নিশ্চয়ই করবো—বাঘা জবাব দেয়।

ওদের তিনজনের কাঁধেই বন্দুক। আজ সারা দিন অজিত যন্ত্রগুলোর সেবা করেছে। অন্ধকারে কেউ কারো মুখ দেখে না। পায়ে শব্দ নেই। অনেক দূরে গান-বাজনার আওয়াজ। সিধনদীর পাড় ধরে ওরা জঙ্গলের মুখটায় ঘাঁটি আগলে বসবে। বারোটার আগে কপিল কাজে বেরোবে না। শরীরে তেল আর, মুখে কালি মাখবে। দু-দশ কলসি হাঁড়িয়া টানবে। ভয়, জড়তা কেটে এক একটা দৈত্য জেগে উঠবে। মশাল জ্বেলে বীরদর্পে ওরা এগোবে। ওদের সঙ্গেও বন্দুক আর বোম আছে। পাকা হাতে সতর্ক হয়ে লড়তে হবে। একদফা আলোচনা হয়েছে। ওরা জঙ্গলের শেষ দিকটা এলেই আক্রমণ করা হবে। এ্যামবুশের কৌশল কাজে লাগানো হবে। মুখোমুখি হঠাৎ একটা বিকট বোমার শব্দে ওদের চমকে দিয়ে পেছন থেকে মোক্ষম ঘা মারা হবে। এই লড়াইয়ে সামনে থাকবে দু-তিনজন। মূল শক্তি থাকবে পেছনে।

অজিত ভাবছিলো মিটিংএ এখন কি হচ্ছে! গণফৌজের সিদ্ধান্ত কি নাকচ হয়ে যাবে! পার্টির মধ্যে বিরাট ফাটল। ঘাঁটি এলাকা, গণফৌজের কথা সকলেই প্রায় ভুলে গেছে। কি এক গলাকাটার নেশায় পেয়ে বসেছে সকলকে। এর শেষ কোথায়? ও জানে আরো বড়ো বিপদ ঘনিয়ে আসছে। গণফৌজ গড়ার কথা নেতৃত্বের কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা পার্টি থেকে ছাঁটাই হবে। এলাকা ছেড়ে যাওয়ার হুকুম আসবে। ইতিমধ্যে আশপাশের গাঁয়ে পার্টি দুএকজন কর্মী বসাচ্ছে। অধিকাংশই শহরের নতুন ছেলে। জেল পালিয়েছে। পুলিশ খুঁজছে। এদের নাম অজিত আগে শোনেনি। ওদের গাঁয়ে ঢোকার পর দুমদাম এ্যাকশন হচ্ছে। নরহরিকে একদিন পুলিশের লোক সন্দেহে লাউবেড়ের বাস্তায় কয়েকজন ধরেছিলো। অনেক কষ্টে প্রাণে বেঁচেছে। আটঘাট বেঁধে বক্তব্য এগোচ্ছে। বিশোরদের তাড়ানোর পর এলাকা যাতে খালি না থাকে এসব তারই প্রস্তুতি। অজিতকে নিয়ে ওরা মাথা ঘামায় না। ভাবে মাথামোটা, কিশোরের ন্যাংবোট। কিশোর চলে গেলে ঠুঁটো জগন্নাথ। হয়তো সে কারণে তাকে তাড়াবে না। এলাকায় থাকতে দেবে। কিন্তু তারপর কি হবে অজিত জানে, কিশোর চলে গেলে এখানে পার্টি উঠে যাবে। কেউ থাকবে না। অজিত নিজেও কি করবে, কে জানে। ওর বুকের মধ্যে কি একটা উদ্বেগ দলা পাকায়। কিশোর কি এসব ভাবছে না? আজো অজিত বুঝতে পারে না কিশোরকে। কি আশ্চর্য ঠোঁট-টেপা ছেলে।

(চলবে)

ব্যক্তিগতভাবে দেখা যাক!

আসুন। আমাদের বিশেষ সঞ্চয় উপদেষ্টাদের সঙ্গে দেখা করুন। ওঁরা শুধু আপনাকে সাহায্য করার প্রতীক্ষায় আছেন।

আই ও বি-র যে কোনো শাখায় চলে আসুন। আজকেই, নইলে অন্য যেকোনোদিন। আমাদের সঞ্চয় উপদেষ্টারা আপনার জন্যে অপেক্ষা করে আছেন। যতক্ষণ ব্যাঙ্ক খোলা থাকে ততক্ষণ আপনাদের সাহায্য করাই ওঁদের কাজ।

ওঁদের জিজ্ঞাসা করুন। কি জানতে চান? সহজ কিছু? যেমন, চিরস্থায়ী আয় যোজনা আর দীর্ঘস্থায়ী জমা প্রকল্পের মধ্যে তফাৎ কি?

কঠিন কিছু? যেমন, কিকরে আপনার মূলধন দ্বিগুণ করা যায়। কিম্বা করছাড়ের সর্বাধিক সুযোগ কিকরে পাওয়া যায়।

ব্যক্তিগত কিছু? যেমন, আপনার নির্দিষ্ট প্রয়োজনের জন্যে সঞ্চয় পরিকল্পনা।

আপনার যা কিছু প্রশ্ন আছে, সব নিয়ে দেখা করুন আমাদের সঞ্চয় উপদেষ্টাদের সঙ্গে। আপনার সব প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে ওঁরা পুরো সময় দেবেন।

আই ও বি-তে আসুন। আপনার জন্যে আমাদের চমৎকার সব প্রকল্প আছে।

আমাদের সকল শাখাতেই ব্যক্তিগত আগ্রহ সুস্পষ্ট। এই আগ্রহই 1969 থেকে আজ পর্য্যন্ত আই ও বি-কে দিয়েছে, জাতীয়কৃত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশী বৃদ্ধি অর্থাৎ 771%।

ইণ্ডিয়ান ওভারসীজ ব্যাঙ্ক
আপনার প্রগতির পথে সত্যিকার সাথী

Sista's-IOB/52A Ben 78

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

হাওয়া গাড়ি

।। ছত্রিশ ।।

ঘন্টাগুলো বড়ই বিশ্বাসঘাতক। দিলীপ ওপরে উঠতে লক্ষ্য করলো, মইয়ের মাথা লোহার আংটায় শকত করে লটকানো। অত উঁচুতেও বাতাস ঢুকে পড়ে ঘন্টায় দোলা দিচ্ছে। দিলীপ দিলীপ অনেকদিন পরে যেন তার স্বপ্নের তাবা হাতে পেলো। এই ঘন্টাগুলোই তার ঘুমের ভেতর অন্ধকার আকাশে ফুটে থাকে। একটা দুটো তারায় হাতের আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে দেখতেই দিলীপের কানে গোটা তিনেক ঘন্টা একসঙ্গে সুরেলা হয়ে বেজে উঠলো।

কালু ঘোষ তটস্থ। ফায়ার ব্রিগেডের ফাঁকা চাতাল ঘন্টা ধ্বনিতে গমগম করছে তখন। দিলীপের কিন্তু কোন খেয়ালই নেই।

সেই উর্দিপরা তিনজন তাদেরছোটো খুপরির খোলা দরজায় এসে দাঁড়ালো।

কালু ঘোষ ওপরের দিকে তাকিয়ে ডাকলো। নেমে এসো তাড়াতাড়ি। দিলীপ—

ওপর থেকে দিলীপের জবাব ভেসে এলো। তখন তার হাতে মাঝারি সাইজের একটা ঘন্টা। নামতে নামতেই দিলীপ বললো, কী মিউচিকাল! তাই না কালুদা—

কালু ঘোষের তখন কথার পিঠে কথা বলারও অবস্থা নেই। তারই সামনে মইয়ের গোড়ায় সেই তিনজন দাঁড়িয়ে। পায়ে হাঁটু অব্দি গামবুট। দিলীপ বোঁচা থুসা ফলের ধারাল এখুনি নিচে বসানো ঝুড়িতে এসে পড়বে।

পড়লোও তাই। ঘড়িতে রাত একটা। ওরা ঘন্টাটা আগে কেড়ে নিলো দিলীপের হাত থেকে। গায়ে তিন দিনের বাসি দাড়ি। নদীতে চান করা উসকোখুসকো মাথা। তবু ওরা তিনজন দিলীপকে অভিনারি চোর ভাবতে পারলো না।

ওখানে কি করছিলেন?

দিলীপ সমঝদারের ভঙ্গিতে বললো, আপনাদের ঘন্টাগুলো কিন্তু সুন্দর—

একজন ছোঁ মেরে ঘন্টাটা কেড়ে নিয়ে বললো, এটা প্রহিবিটেড এরিয়া।

এত সুন্দর জিনিস পাবলিকের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার মানে হয় কোন!

ঘন্টা চুরি করতে এত রাতে—আপনি তো চুরির দায়ে এখুনি পুলিশের হাতে হ্যান্ডওভার হতে পারেন।

দিলীপ এবার সত্যিই ওদের চটি দিলো। এতো চুরি করারই জিনিস। দেখলে কার না লোভ হয়?

ওরা তিনজন নিজেদের ভেতর কি কথা বলে নিল। তারপর একজন এগিয়ে গিয়ে একটা জিপের স্টিয়ারিংয়ে বসলো। চালিয়ে দিলীপের গায়ের কাছে দাঁড়ালো। উঠুন—

কোথায়?

কোথায় আবার! থানায়। আর একজন টেম্পোয়—

যাবো না। বলে দিলীপ ছুটতে গেল। বাকি দুজন বেশ তাগড়াই। তারা স্বচ্ছন্দে দিলীপকে চ্যাংদোলা করে জিপে তুলে দিলো। তারপর আরেকজন দিলীপকে জাপটে ধরে স্টিয়ারিংয়ের পাশে বসলো।

জিপ স্টার্ট নিতেই পেছনে লাফিয়ে উঠলো কালু ঘোষ। স্পিডে জিপটা এগোতেই ঘন্টাটা বেজে উঠলো। ফাঁকা সেন্ট্রাল অ্যাভিনুতে কালু ঘোষ বুঝলো, যে ঘন্টাটা কেড়ে নিয়েছিলো—সেই ঘন্টা-সুদ্ধ দিলীপকে নিয়ে জিপে উঠেছে।

জাপটানো অবস্থায় দিলীপ নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করলো। কোথায় যাচ্ছি আমরা?

দমকলের দুজন কোন কথা বলছে না। দিলীপ আরেক ঝটকা দিতেই ফাঁকা সেন্ট্রাল অ্যাভিনুতে ঘন্টাটা ঢং ঢং করে বেজে উঠলো। এবার লাইসেন্স পেছনের গলিতে জিপটা ঢোকে ঢুকে পড়েই বেঁকে কষলো। সামনে একটা লাল বাড়ি।

এ কোথায়?

থানা। বলে স্টিয়ারিংয়ের লোকটি হ্যাচকা টানে দিলীপকে থানার সিঁড়িতে নামালো।

দিলীপ সেখানে বসে পড়লো। আমি যাবো না।

ঘন্টাটা বগলে চেপে ধরে স্টিয়ারিংয়ের পাশের লোকটি ঝুঁকে পড়ে দিলীপের কোমরটা এক প্যাঁচে জড়িয়ে ধরলো। চুরি করলে থানায় যেতে হয়। চলুন। ঝামেলা করবেন না।

আমি উঠবো না।

স্টিয়ারিংয়ের লোকটি আগুনের কে উদ্ধারের কায়দায় দিলীপের দুই হাঁটুর ফাঁকে হাত গলিয়ে তাকে দাঁড় করিয়ে দিলো। বেয়াড়াপনায় কোন লাভ হবে না।

থানার ঘরে কালু ঘোষ ওদের সঙ্গে ঢুকে পড়লো।

মেজোবাবু ডাইরি নিলো। বললো, ঘন্টাটা রেখে যান।

দমকলের একজন বললো, তাতো যেতে পারবো না।

তবে কেস লেখালেন কেন?

এটা তো আমাদের সরসময় লাগে।

তাহলে এই পাগলকে ধরে আনলেন কেন? কেনই বা ডায়েরি করালেন? [illegible] না থাকলে তো কেস দাঁড়ায় না।

দিলীপ একটা চেয়ারে চুপ করে বসে ছিলো।

সেই ন্যাপটানোর লোকটি হেসে বললো, শুধু পাগল নয়। সেয়ানা পাগল।

মেজোবাবু বললো, আপনারাও তো পাগল মশাই। এত রাতে কেউ রাস্তার পাগল ধরে আনে। আমাদের আর কাজ নেই?

সুন্দর সুন্দর কথা বলে কিন্তু।

ধমকে উঠলো মেজোবাবু। থামুন মশাই। ঘন্টাসুদ্ধ পাগলটা রেখে যান।

সে উপায় নেই স্যার আমাদের। এটা আমাদের বড় জলের ভ্যানের ঘন্টা। স্টেশন সুপারের পারমিশন ছাড়া তো ফেলে রেখে যেতে পারবো না।

তবে আনলেন কেন পাগলকে? রাস্তায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিন। ঘন্টা তো পেয়েই গেছেন—

কালু ঘোষ দিলীপের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, তুমি লাকি দিলীপ। আর খানিকক্ষণ চুপ করে থাকো।

দিলীপের ঘুম পাচ্ছিলো। সে একটা কথাও বললো না প্রথমে। তারপর হাসতে হাসতেই কালু ঘোষের কথার পিঠে কথা বললো। ভাগ্যিই বটে। বলেই আবার চুপ করে গেল।

থানার মেজোবাবু বললো, বাঃ! এ তো দেখছি নিজে নিজেও কথাও বলে। কি বললে? আবার বলো।

দিলীপ কোন রা কাটলো না।

মেজোবাবু বলল, নাম কি?

দিলীপের পাশে দাঁড়িয়ে কালু ঘোষ দিলীপকে বললো, যে কোন একটা নাম বলে দাও।

দিলীপ বললো কেন? নিজের নাম বলে দিই?

মেজোবাবু হো হো করে হেসে উঠলো। তবে কি তোমার বাপের নাম জানতে চেয়েছি?

দিলীপ কালু ঘোষের কথার জবাব দিচ্ছিলো। সে মেজোবাবুর কথায় কোন ভ্রুক্ষেপ করলো না। বাইরে থেকে দেখুন থানার কড়া আলোয় এই মাঝরাতে মনে হবে—সে আপন মনে কথা বলে যাচ্ছে। দিলীপ তখন বললো, তুমিই তো থানায় বলেছিলে কালুদা—

একজন এ এস আই বললো, কে?

দিলীপ এবার ধাতস্থ হোল। আমিই দা—

কালুদা?

হ্যাঁ। আমার নাম কালু ঘোষ।

দমকলের দুজনও বেশ অস্থির হয়ে উঠছিল। তারা ঘন্টা হাতে বেরিয়ে আবার বললো, তবে ছেড়ে দিন—

মেজোবাবুও বললো, হ্যাঁ হ্যাঁ। তাই ভালো। আমাদের লক-আপেও তিনটে পাগল রয়েছে। আর বাড়িয়ে লাভ নেই।

কালু ঘোষ দিলীপের কানের পাশে আস্তে বললো, এই বেলা দমকলের লোকের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি চলো।

কেন? রাতটা এখানে কাটাই না—

মেজোবাবু ওকে বললো, এ্যালালে এই কে আছো? পাগলটাকে বের করে দাও।

রাস্তায় নেমে ঠান্ডা বাতাস পেলো দিলীপ। দু-একটা হু-হু লরি। লেকের বাতাসের ঝাপটা। ফুটপাথ ধরে দমকল বাড়ির উল্টোদিকেই যেতে হবে। গাড়িটা সেখানে পড়ে আছে। দুজনে এযার লাইন্স অফিসের সামনে দিয়ে এগোচ্ছিলো। দিলীপ বললো, আমার সবই বানচাল হয়ে গেল কালুদা। একটা হরিণ চেয়েছিলাম। সেটা গেল। একটা ঘন্টা পছন্দ হোল। সেটাও হাতছাড়া হয়ে গেল।

আবার সব হবে তোমার দিলীপ।

আর কবে! এর চেয়ে তোমার কথামত থানায় সারেন্ডার করাই ভালো ছিলো।

চুরির দায়ে পেটি কেসে সারেন্ডার ভালো নয় দিলীপ। বরং কাল সকালে থানায় গিয়ে তুমি বলতে পারো—দরবারীলালকে আমি খুন করিনি। আত্মরক্ষার জন্যে স্টার্টারটা—

তাতেই বা কি লাভ হবে। খবরের কাগজের দৌলতে আমি তো এখন পাবলিকের চোখে একজন অ্যান্টিসোসাল মাত্র।

তবু তোমাকেই তো সব কেস করতে হবে দিলীপ।

আমি তো খুন করিনি। মানে—করতে চাইনি।

এমনি করেই তো হয়ে যায় দিলীপ।

উল্টোদিকেই দমকল বাড়ি। এদিকটা অন্ধকার। অস্টিন্টুবার এখন কলকাতার সব রাস্তা চেনে। দিলীপ পেছনের সিটে উঠে পড়ে বললো, তুমি চালাও কালুদা।

না না দিলীপ। বিটের পুলিশ দেখলে ভয় পেয়ে যাবে। তাছাড়া এ হোল গিয়ে শহর কলকাতা। সারারাতই লোক চলে রাস্তায়। কেউ দেখলে ভিরমি খাবে। চেঁচিয়ে লোক জড়ো করবে।

সরো। তুমি একটি গুড ফর নাথিং। শুধু আমার কানের পাশে বসে বিবেকের বাণী কপচানোই শিখেছো।

রাত তিনটে নাগাদ গাড়ি এসে নিউ বোডে পড়লো।

কালু ঘোষ বললো, গাড়ি ঘোরাও। এখন তোমার ফ্ল্যাটের ওপর পুলিশের নজর আছে।

তুমিই তো সারেন্ডার করতে বলেছিলে কালুদা—

এ তো সারেন্ডার নয়। এ তো ধরা পড়া।

একবার রাণীর সঙ্গে দেখা করতাম।

দেখা হোত না। তার আগেই ধরা পড়বে। তাছাড়া—

কি? চুপ করে আছো কেন কালুদা?

গাড়ি ঘোরাও—তারপর বলছি। এখন যদি রাণী তোমাকে ফেস ভ্যালুতে না নেয়, তাহলে এই শেষরাতে তুমি কোথায় দাঁড়াবে?

খানিক বাদে স্বাতীদের বাড়ির সামনে এসে গাড়িটা পার্ক করলো দিলীপ। অলস ইঞ্জিন। তেল ফুরোবার নাম নেই।

শেষ রাতে টরম গুমটির গায়ে রাস্তার চায়ের দোকানে ভিড়। দু খুরি এনে একাই খেল দিলীপ।

চা খেতে খেতে দিলীপের মনে হচ্ছিলো কালু ঘোষ এখনো বকৃত মাংসের মানুষ। অথচ তার জানাশোনা লোকগুলো আর বকৃত মাংসের নয়। একদম দেওয়াল। কোন চোখ নেই তাদের। মুখ নেই। ভাব নেই। আবেগ নেই। ভোর রাতের বাতাসে কলকাতার গন্ধ। এই কলকাতা কত সুন্দর ছিল আমার কাছে। এইতো সেদিনও। আমি আর ঝুমি। আমি আর গোকুলদা। অনন্ত। বৃষ্টি ভেজা রাতে ফুটপাথের বকুল গাছে নিয়োন আলো। মানুষের কত সুন্দর সুন্দর সব মুখ। ফুটপাথের বুলেনস বন্ধুত্বের গাঁটছড়া ছড়ানো।

এখানে গাড়ি থামালে?

স্বাতীদের বাড়িটা ভুলে গেলে!

এই ভোর রাতে যাবে?

আলো ফুটুক। কোথাও তো একটু ঢিরোনো দরকার।

এর চেয়ে আমাদের ঘোষবাড়িতে চলো।

তোমাদের কোথায় কালুদা? তুমি তো ঘোষবাড়ির কিছুই জানো না। তোমার চেহারাও লোকে ভুলে গেছে। মনে নেই? আমি কালু সেখ হয়ে তুমি সেজে বকৃতৃতা দিয়ে এলাম—

এভাবে একগাল দাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়ালে সবার চোখ পড়বে।

সে আমি আলো ফুটলেই কামিয়ে নেব।

জ্যোতির্ময় সবকার ভোর পাঁচটায় বেরিয়ে অন্তত তিন মাইল হাঁটে। ফিরে আসে ছটা সাতটার ভেতর। স্বাতীর নবাব এই সময়টা খোলা থাকে। ভোর রাতে বিছানা থেকে নেমে স্বাতীই সদর দরজা খুলে আলগোছে ভেজিয়ে রাখে। জ্যোতি মর্ণিংওয়াকে বেরিয়ে পড়লে স্বাতী ঘন্টা-খানেক টানা ঘুমোয়। বিশেষ করে ছেলেটা পাকাপাকি হস্টেলবাসী হওয়ার পর থেকেই এর এ অভ্যেস। তখন নবাব একা একা খোলা ব্যালকনিতে গিয়ে সামান্য ঘেউ ঘেউ করলো—নয়তো কোন পুরনো ভূতের ছিল কামড়ালো। এক জায়গায় বসে।

ভেজানো দরজায় সামান্য চাপ দিতেই খুলে গেল। দিলীপ বুঝতে পারছিলো না কি করবে। ঠিক তখনই অন্ধকার ঘরের ভেতর থেকে একটা বড় সাইজের রবার-বল

দিলীপের নাক বরাবর ঝাঁপিয়ে এলো। সঙ্গে কান ফাটানো ঘেউ ঘেউ শব্দ।

অন্ধ মানুষও আক্রমণের গন্ধ পায়। দিলীপ দু' হাত বাড়িয়ে লাফানো বলটাকে আটকালো। নয়তো দিলীপের নাক-মুখ-চোখ যেতো।

এমন সময় নাইটি গায়ে স্বাতী এসে দাঁড়ালো। নবাব। এই নবাব—

কুকুর তখনো চেঁচাচ্ছিলো। স্বাতী এগিয়ে এসে নবাবকে থামিয়ে সামনে তাকালো। কে?

ভয় পেয়ো না। আমি—

স্বাতীর চোখে তখনো ঘুমের ঘোর। আরো পিছিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো। কে আপনি?

আমি। আমি দিলীপ—বলে আর দাঁড়াতে পারলো না। দরজার পাশে মোড়া ছিল একটা। তাতে বসে দেওয়ালে হেলান দিল দিলীপ। মাথাটা ঠুকে গেল।

স্বাতী ছুটে এলো। তুমি? কি হয়েছে দিলীপদা? পিঠে হাত রাখলো দিলীপের। অনেক দিন পরে দিলীপ তার দুই চোখ বুজে স্বাতীর গায়ে নিজের মুখটা চেপে ধরলো।

বাইরে আলো পরিষ্কার হয়ে আসছিলো। তার খানিকটা ঘরে এলো। স্বাতী এগিয়ে গিয়ে জানলা খুলে দিলো দুটো। তাড়াতাড়িতে এক গ্লাস লেমনবার্লি জল মিশিয়ে দিলীপের সামনে ধরলো। গত তিন দিনে সে চোখ বুজতে পারেনি। নদীতে সেই স্নান। অমর সিংয়ের গ্যারেজ। বাস্তায় ধুলো। থানা। খুরির চা।

গ্লাসটা স্বাতীর হাতে এগিয়ে দিয়ে দিলীপ বললো, খবরের কাগজ আসেনি?

স্বাতী একটু অবাকই হলো। একমুখ দাড়ি, চোখের নিচে কালি। ভেতরটা জ্বালছে। মাথাটা আঠা আঠা। জামা-কাপড় ধুলো মাখায় কালচে। স্বাতী এগিয়ে এসে দিলীপের মাথায় হাত রাখলো। কি হয়েছে তোমার দিলীপদা? তারপর বললো, একটু পরেই কাগজ দিয়ে যাবে—

রোজ কাগজ পড়ো?

অরও অবাক হলো স্বাতী। একথা বলছো কেন? ক'দিন অবশ্য পড়া হয়নি। ওর এক পরিচিত ভদ্রলোকের লঞ্চে আমরা ক'দিন গঙ্গায় ভেসে বেড়ালাম। রেডিও শোনা হয়নি। কাগজও দেখা হয়নি ক'দিন। কালই রাতে আমরা ফিরেছি। খোকন তো এখন পাকাপাকি হস্টেলে—

অ। কাগজ পড়লে জানতে—আমি কি করে বসে আছি!

স্বাতী কোন কথা বলতে পারলো না। অবাক হয়ে তাকালো। এ দিলীপ তার কাছে একদম অপরিচিত। কি দিলীপদা - চা খাবে তো নিশ্চয়—করে আনি। কাজের মেয়েটা এখুনি এসে পড়বে।

দিলীপ মোড়ায়-বসা অবস্থাতেই দাঁড়ানো স্বাতীর কোমরটা জড়িয়ে ধরলো। বাইরে চা খেয়ে এসেছি। তুমি যেও না কোথাও। একটু দাঁড়াও না স্বাতী। বলতে বলতে দিলীপ আবার স্বাতীর কোমরের নিচে চোখ বুজে নিজের মুখটা চেপে ধরলো।

ছাড়ো। জ্যোতি মর্ণিংওয়াকে সেরেই এখুনি ফিরে আসবে। ছাড়ো দিলীপদা। আমিও তো চা খাবো। করে আনি দু' পেয়ালা—

জ্যোতি ফিরলে একবারে কোরো তিন পেয়ালা। দাঁড়াও না—। বলতে বলতে দিলীপ আরও জোরে চেপে ধরলো স্বাতীকে। কোথাও যেও না এখন—। কাইন্ডলি যেও না এখন—

স্বাতী হাসলো। দাঁড়াও। শাড়িটা পরে আসি। জ্যোতি এখুনি ফিরে এসে এ-অবস্থায় আমাদের দেখলে ভুল বুঝতে পারে। ছাড়ো। এখুনি আসছি—বলতে বলতে দিলীপের আঠা আঠা মাথায় আবার হাত বোলালো। মুখও ধোওয়া হয়নি—

পরে যেও—

তুমিও তো চান করে নিতে পারো। বাথরুম তো খালি। ছাড়ো দিলীপদা—

এ ক'দিনের কাগজ পড়লে জানতে পারতে—আমি খুনী।

স্বাতী ছিটকে সরে গিয়েও যেতে পারলো না। তা কি করে হবে?, তুমি কখনো খুন করতে পারো না।

হ্যাঁ। সত্যি স্বাতী। কাগজেও তাই লিখেছে—

এসে শুনছি সব। ছাড়ো বলছি—বলে স্বাতী নিজেকে এবার ছাড়িয়ে নিতে পারলো। দিলীপের জড়ানো হাত দুখানা ধরে নিজেই দুই হাঁটুর ওপর একদম বসে পড়লো।

ক' মিনিটও যায়নি। স্বাতী চোখে মুখে জল দিয়ে শাড়ি পরে মাথা আঁচড়ে এ-ঘরে এলো। এরই ভেতর চায়ের জল চাপিয়ে দিয়েছে। হাসতে হাসতে বললো, কাকে খুন করলে!

দিলীপ বুঝলো স্বাতী একদম বিশ্বাস করেনি। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য হলেই ভালো ছিলো। কিন্তু যা হবার তাই হয়ে গেছে। এখন আর ফেরার পথ নেই। খবরের কাগজের ভাষায় সে নিজেই এখন একজন ফেরার। স্বাতীর দিকে ভালো করে তাকালো। কাঁচাপাকা পুরোনো কাঁঠাল পাতা। একদম। কোথাও কোন পোড় নেই। অথচ সে নিজে এখন ধলোবালি মাখানো। সারা শরীর-মন কেমন ঘেন্নায়। প্যাতলানো। তোবড়ানো। কুড়ি এক সময় তোমার মতই ছিলাম স্বাতী। তোমার মতই। তখন তোমাকে দামি করা আমায় মানাতো। এখন!

দিলীপ একদম অন্য স্বরে দিয়ে বসলো। আমাকেই খুন করেছি বলতে পারো।

তা তো বুঝেইছি। দাড়ি কামাওনি কেন দিলীপদা?

কানে খুব বিচ্ছিরি লাগলো দিলীপের। পরিষ্কার বাংলা সিনেমা হয়ে যাচ্ছে। দিলীপ বললো, সত্যি আমি খুন করেছি স্বাতী। আমার খোঁজে পুলিশ জাল ফেলতে পারে।

একথা যখন বলছিল দিলীপ—তখন সে জানেও না—তাকে ধরতেই পুলিশ সত্যি সত্যি জাল ফেলেছে, গোটানোও শুরু হয়ে গেছে।

তুমি তো দিলীপদা আমার অনেক দিনের বন্দী। পুলিশ এসে আবার নতুন কি দাবি করবে!

দিলীপ বুঝলো, মেয়েটা অনেকদিন পরে একটা স্বামী পেয়ে সুখেই আছে।

স্বাতী খুব কলকল করছিলো। বললো, জ্যোতি তোমার কথা প্রায়ই বলে। আজ দেখা হলে খুব খুশি হবে। কিন্তু এমি বেশে তুমি এলে দিলীপদা? কি হয়েছে তোমার?

এই সময় ঝড়ির বাইরে ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড় করানো অস্টিন ট্যুরারের পাশে একটা পুলিশ পেট্রল এসে থামলো। তার পেছন পেছন খানিকবাদে একটা কালো ভ্যান। ভ্যানের পেছনের দরজা দিয়ে নামলো সুধীর। সুধীর এক সময় ফিল্ম ডিভিশনের ক্যামেরাম্যান ছিলো। সে এ গাড়িটা চেনে। গাড়ি-স্টিয়ারিংয়ে সে দিলীপকে অনেকবার দেখেছে কলকাতার রাস্তায়। আজ বছর দুই সে ইনফরমার। সরকারী চাকরিটা যাওয়ার পর এ এক ভালো কাজ জুটেছে তার। অল্প পরিশ্রমে খারাপ আসে না। পৈতৃক বাড়ি। একা লোক। স্বাতী যে ছেলেটাকে নিয়ে কোথায় পালালো—আজও তা খুঁজে বের করতে পারেনি।

খানিক বাদে পুলিশের সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময়েও সুধীর একবারের জন্যেও ভাবতে পারেনি—ফেরার দিলীপের খোঁজে বেরিয়ে একদম আসামী সমেত স্বাতীর মুখোমুখি হয়ে যাবে। বেশি রাতে মালফাল খেয়ে সে কলকাতার রাস্তায় একা একা ঘুরে বেড়ায় অনেক দিন। এখন এটাই তার কাজ। ঘুরতে বেরিয়ে নিশাচর কলকাতার অনেক কিছু তার চোখে পড়ে। সেগুলোই তাকে জানাতে হয় পুলিশকে। যেমন আজই মাঝরাতে সে এই ক্ষ্যাপা গাড়িটাকে সেন্ট্রাল এভিনিউতে দেখেছে। দেখেই জানিয়েছে। তারপর থেকেই পু... ভানে এ রাস্তা—সে রাস্তা—

তখন দিলীপ বলতে যাচ্ছি... দ্বিতীয়বারেও তোমার সঙ্গে আমার এ... জন্যে হোল না। নয়তো আজ আমারই তোমার স্বামী হওয়ার কথা। কে জো... দাড়ি থাকলেই বা আমার গালে! ... আমায় চান করিয়ে পরিষ্কার করতে চাইছে...

কিন্তু এর কোন কথাই বলা হোল...

দিল্লীপব। সিঁড়িতে কযেক জোড়া ভারি [illegible] শব্দ। ভোর না হতেই কাবা এলো? [illegible]ব স্বাতী সদব দরজা খুলে বাইবে তাকাতে যাবে—এখন সময় একদম সুধীরের মুখোমুখী। দেখেই চিনতে পেরেছে স্বাতী। তুমি?

সুধীন প্রথমবাব পাবে নি। গলার স্বব স্বাতীকে চিনিযে দিলো। তুমি?

[illegible] পুলিশ তিনজন তখন ছুটে ঘবে ঢুকে [illegible]লীপকে ধবে ফেলেছে। দিলীপ হাত ছাড়িয়ে বেরোনার চেষ্টা করলো। সুবিধে হোল না। বরং বড মত একজন পুলিশেব ভারি হাতের একটা থাবড়া খেল— সিধে নাকের ওপর। ততক্ষণে। ঘবেব মেঝেতে ভোব বেলাকাব ফিকে রোদ। সে আলোয দিলীপেব নাক দিযে লালচে আলতা পাটার্নেব রক্ত এসে কালো খড়খড়ে দাড়ি চিজযে দিলো। সিঁড়ি দিযে পুলিশবা [illegible]কে ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলো। দিলীপ ওব ভেতবও বলতে চাইলো, বলেছিলাম না স্বাতী—আমি খুনী!

কিন্তু তার কোন কথাই কেউ বুঝতে পারলো না। স্বাতী তো দূরেব কথা। সে আব সুধীব তখন একদম মুখোমুখী। সদব দবজাব ঠিক বাইরে। সুধীবের চোখ জ্বলছিলো। তাকে এখুনি পুলিশেব সঙ্গে চলে যেতে হবে। তবু এর ভেতবেই সে জানতে চাইলো—কতদিন এখানে?

স্বাতী চুপ কবে থাকলো। জ্যোতির্ময় যদি এক্ষুনি চলে আসতো তাহলে ভালো হোত।

কাব সঙ্গে আছো? বেশ তো ভালো ফ্ল্যাট! স্বামী বাগিযেছো ভালো নিশ্চয। কি চাকবি কবে? ব্যবসা?

ভালোই উপায কবে। কিন্তু সেসব জেনে তোমার কি হবে? খবদার। এখানে [illegible]ন দিন আসবে না।

আমি কাউকে ডবাই না। ইচ্ছে হলেই যা।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি। পুলিশে কবে খবব দিলে?

সুধীব কোন ভ্রূক্ষেপ না কবে সোজা স্বাতীব কাঁধ ধবলো। স্বামী? না শ্যালো বেখে লোক ধবেছো—তা আমার জানাব কোন ইচ্ছে নেই এতটুও। কিন্তু আমাব ছেলে কোথায়?

এখানে নেই। আমাব গা থেকে তোমাব হাত সরাও।

তোমাকে ছুঁতে আমাব ঘেন্না করে। আমার ছেলে কোথায়? আমি আবাব ছেলের খোঁজে।

[illegible] কোন লাভ নেই। কোথায় বেখেছি [illegible]মরে গেলেও বলবো না তোমাকে।

সুধীরেব মুখখানা বেঁকেচুরে গেল। পরক্ষণেব পাওয়ায় স্বাতীব কাঁধের মাংস খামচে ধবে বললো, তুমি মবে গেলেও [illegible]কিছু যায় আসে না। ছেলেব জন্যে [illegible]কাব হলে তোমায় খুন করতেও [illegible]ও হবো না।

[illegible]ড়ো। জবন্য কোথাকাব—!

স্বাতীব গলা চিরে গেল। এ-গলা নবাবের কানে যেতেই সে ছুটে এলো। এসেই সে এবার সুধীবের গায়ের ওপর বিনা বাক্যব্যয় ঝাঁপিয়ে পড়লো; সুধীর তখন স্বাতীকে ছেড়ে নিজেকে সামলাতে গেল সামলাবে কি। নবাব নিজেই একটি অস্ত্র। সুধীবের কাছাকোছা খুলে যাওয়াব জোগাড়। সিঁড়ির নিচের ধাপ থেকে নবাবকে ফিবিয়ে আনতে স্বাতীব বেশ বেগ পেতে হোল। ততক্ষণে বুকের জামা কালকালা অবস্থায় সুধীবকে গলিপথ দিয়ে বড় রাস্তায় ছুটতে হয়েছে।

স্বাতী ঘরে ফিবে কি একটা পোড়া-গন্ধ পেয়েই রান্না ঘরে ছুটে গেল। ইস্! গ্যাস জ্বালানো দিলো। সে-জল ফুলে ফেঁপে সাবা বাবনাবের ওপব ছড়িয়ে পড়েছে। সাবধানে সাঁড়াশি দিযে কেটলিটা নামালো স্বাতী। তাবপর কেন যে তাব নিজের ভোল দিযে জল পডতে লাগলো—এই ভোরবেলায় —তা বুঝতে না পেরে এই মুহূর্তেব বান্নাঘব একদম ভুলে গিযে খোলা ঝুল-বাবান্দায দাঁড়ালো। ফাঁকা বাস্তা। একটা বিকলস কিছু কুমড়ো নিযে এক বুড়ো ব্যাপাবী ঝজ্রাবেব দিকে চলেছে। জ্যোতি যে কেন আজ এত দেবি কবছে ফিরতে—

জ্যোতি যখন ফিবলো—তখন বড ঝুল বাবান্দাব শ্যাওলাপড়া ইঁটের বেলিংযে মুখ বেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলো স্বাতী। চোখেব সামনে সারা কলকাতা অন্ধকাব। সে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলো না। গালেব বাঁ দিকটায় এবডোখেবডো বেলিংয়েব গুঁড়ো সিমেন্ট কুচি বসে গিযে ব্যথা লাগছিলো। জ্যোতির্ময়ের ফিবে আসা পায়েব শব্দ স্বাতীব কানেও গেল না।

জ্যোতির্ময় সদব খোলা পেযে অবাক। তারপর সরাসরি তাকিয়ে স্বাতীব পিঠটা দেখতে পেল। ছুটে কাছে এসে অবাক হোল। স্বাতী তো বাস্তা দেখছে না। পিঠে হাত বাখলে। তুমি এখানে?

কে?

সদব খোলা? বলে আব বলতে পাবলো না জ্যোতি। স্বাতী ঘুরে দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরলো। তাবপব ভিজে দু-চোখসুদ্ধ মুখখানা জ্যোতিব বুকে চেপে ধবে একটানা কাঁদতে লাগলো। আচমকা এবকম হয়ে যাওয়ায় জ্যোতির হাত থেকে খববেব কাগজখানা পড়ে গেল।

কি হয়েছে? কাঁদছো কেন?

স্বাতী কোন জবাব দিলো না।

আহা! বলবে তো। এই ভোরবেলায —আমি তো কিছুই বুঝতে পাবছি না— কোন খাবাপ টেলিফোন এসেছিলো?

না।

তোমাদের বাড়ির সবাই ভালো?

হুঁ।

ওব হসটেল থেকে—

না। খোকন ভালো আছে। বলতে বলতে মুখ তুললো স্বাতী।

সে মুখ দেখে জ্যোতির্ময় চমকে উঠলো। সাবা বাত ঘুমোনোর পবেও কবও মুখ কি এতটা ফ্যাকাসে মেবে যায়।

কি হয়েছে। ঘবে যাবে চলো।

না। এখানে একটু দাঁড়াও। তুমি আজ এ্যাতো দেরি কবলে কেন?

চোখ মোছো আগে।

স্বাতী তাব আঁচলে চোখ মুছে হাসতে চাইলো। পুবোপুবি পাবলো না। তুমি কেন এত দেরি করলে? আমি কি যে অপেক্ষা কবেছি তোমার জন্যে—

কি এমন হোল এইটুকু সময়ে? খববের কাগজটা কিনে পার্কে বসে পড়ছিলাম। তিনদিন কাগজ পড়িনি। কে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক—কীরিটি পালিত না কি নাম বাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে মামলা জিতে এক কোটি টাকার ডিগ্রি পেয়েছেন—সেই খববটা পড়তে পড়তেই তো দেবি হয়ে গেল।

আবেকটু যদি আগে আসতে। বোসো। চা করে আনি।

পবে আনবে। আগে তুমি বোসো। কী হয়েছে তোমাব আজ? অ্যাতো কাঁপছ কেন?

কোথায়!

এই তো! আমাব হাতের ভেতর তুমি এখনো কাঁপছো। কি হয়েছে স্বাতী? আমায় বলো—

কিছু না। বলেই আচমকা বলে উঠলো, দিলীপদা এসেছিলো—

কোথায়? চলে গেলেন?

হ্যাঁ। বলতে বলতে স্বাতী আবাব কেঁদে ফেললো। এবাব তাকে আব থামাতে এগোলো না জ্যোতির্ময়। সে তিনহাত দূরের সোফাটায় চুপ করেই বসে ছিলো। স্বাতী কান্নাব ভেতর গুলিয়ে গিয়ে যা বললো—তা অনেকটা একরকম—তোমাব জন্যে বসিয়ে রেখেছিলাম—কয়েকদিন যাযনি মনে হোল—

যেতে দিলে কেন?

পুলিশ এসে নিযে গেল।

পুলিশ?

হ্যাঁ। পুলিশ নিযে এসেছিলো আবেকজন—

কেন? হেঁযালি কবছো। খুলে বলো।

স্বাতী ধরক খেযে গল গল করে বলতে লাগলো। সুধীন এসেছিলো। সঙ্গে পুলিশ। তিনজন। দিলীপদার এরকম চেহারা আমি কোনদিন দেখিনি। একগাল দাড়ি—। পুলিশ এসে প্রায় তুলে নিযে গেল। চোর-ছোলা করেই এরকম।

জ্যোতির্ময় একদম চুপ করে গেল। সে উঠে গিয়ে স্বাতীব মাথায় হাত বাখলো। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে। সুধীরের সঙ্গে পুলিশ কেন? তাও আবাব দিলীপকে ধবতে—

খানিক বাদে জ্যোতির্ময় নিজেই বললো, ভালো করে চা করো তো দেখি। আগে মাথা সাফ করি। কি হোল? এখনো কাঁপছো!

দিলীপদার কি হবে?

আগে চা করে আনো তো।

(চলবে)

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সোনার হরিণ নেই

।।তিরিশ।।

হাত দশেকের মধ্যে এসে বাপী কি করবে বা কি বলবে ভেবে না পেয়ে দুহাত কপালে তুলে একটা নমস্কার সেরে ফেলল। কিন্তু সুফল কিছু হল না। জবাবে গায়ত্রী বাই সামান্য মাথাও নাড়ল না। উল্টে অবলগা তোরামোদের চেষ্টা ভাবল বোধহয়। আর দুপা এগোতে ওই সাদা পাথরে মুখ ধোয়া ঠান্ডা চাবুকের মতো কথা ঝরল।—এক ঘন্টা ধরে আড্ডা দেবার জন্য গাড়ি পাঠিয়ে এখানে ডেকে আনা হয়েছে তোমাকে?

বাপী কি জবাব দেবে। বিপন্ন মুখে ভাব মেয়ের দিকে তাকালো শুধু। মায়ের সঙ্গে কথা বন্ধ বলেছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে চোখে মুখে আগুন ছুটলো এক পশলা।—তুমি কি আশা করেছিলে, আমি আটকাতে চাইলে তোমায় তাঁবের এই বিশ্বাসী মানুষ আমাকে ধাক্কা মেরে পাহাড় থেকে ফেলে দিয়ে তোমার কাছে ছুটে চলে আসবে?

এক ঝটকায় মায়ের পাশ কাটালো। দুহাতের ধাক্কায় লোহার গেট দুটো দুদিকে ছিটকে খুলে গেল। পায়ের তলার লাল কাঁকরের মাটি আছড়ে-আছড়ে বাংলোর দিকে চলল।

বাপীর মনে হল, পাহাড় থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে চলে আসার কাঁঝালো উক্তিটা যেন মহিলার মুখের ওপর ঠাস করে গিয়ে লাগল। পলকের মধ্যে আবার যে-কে সেই। ঘুরে মেয়েকেই দেখছে। কঠিন, অপলক।

ভিতরে পা বাড়ালো। পাশে দুহাত ফারাকে বাপী। বাগানের ভেতর দিয়ে বাংলো পর্যন্ত লাল কাঁকরের পথটুকু খুব সুগম নয়। আধা-আধি এসে সামনের দিকে চোখ রেখেই গায়ত্রী বাই জিজ্ঞেস করল, আগের ভাগে তোমাকে কি বলার জন্য নেমে গেছল?

গুরুতর না দেবার মতো করে বাপী জবাব ছিল, বিশেষ কিছু না হঠাৎ আমাকে দেখে ড্যান থেকে টেনে নামিয়েছে মনে হল

গায়ত্রী বাই এবারও তাকালো না তার দিকে। কিন্তু গলার স্বর আরো ঠান্ডা কঠিন।—হঠাৎ নয়। ও জানত তুমি আসছ; কি বলে.. আমাকে গোপন করার মতো কিছু?

অধৈর্যের আঁচ পেয়েই বাপী তাড়াতাড়ি জানান দিল, তা না....বেশভূষা বা আর কারবারীর কোনো শাস্তি হয়েছে কিনা জিগ্যেস করল আর ওদের সে কোনো দোষ নেই সেটাই বোঝাতে চেষ্টা করল।

—তুমি বুঝলে কি হবে, তোমার কথা করছে ওরা?

এই প্রসঙ্গের ফয়সলাই বাপীর কাছে সব থেকে বড় ব্যাপার। তবু হালকা করেই জবাব দিল, আপনার মেয়েকে বলেছি যে আমি ওদের দন্ডমুন্ডের মালিক নই।

চুপচাপ একটু। তারপর আবার প্রশ্ন।

—শুধু এই জন্যেই নেমে গেছল, আরো কিছু আছে?

—ওর বিয়ের জন্য পাত্রের খোঁজে আপনি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, কিরকম পাত্রের খোঁজ করছেন—এইসব বলছিল।.... এই জন্যেই খুব রাগ মনে হল।

—রাগ করে কি করবে। বিয়ে ঠিক হলে বিয়ে করবে না?

—আমাকে বলতে বলেছে, আপনি এই চেষ্টায় এগোলে তাকে আর ঘরে রাখতে পারবেন না।

বাপী লক্ষ্য করল, রাগে সাদাটে মুখ আরো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। এবারে ওর দিকে চোখ।—তোমাকে বলতে বলেছে? কেন বলেছে তুমি তাহলে জানো?

বাপী মাথা নেড়ে স্বীকার করল জানে। ভিতরে ভিতরে শংকিত। মিথ্যের মধ্যে যেতে চায় না, কিন্তু কেমন করে জানে জিগ্যেস করলে আবার নাম মুখেও আনা চলবে না। জিগ্যেস করল না। বানারহাটের স্টেশনমাস্টার জানাজানি হয়ে গেছে ধরে নিল হয়তো। হয়তো বা ভাবল মেয়ে নিজেই বলেছে।

সিঁড়িতে পা রেখে থামল।—বেশ, তুমিও তাহলে ওকে জানিয়ে দিও আমি বলেছি, আমার অবাধ্য হলে বা আমার অমতে বিয়ে করলেও ওকে ঘরে রাখতে পারব না। মা নেই ধরে নিয়ে যা করতে চায় করুক।

দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে বারান্দায় গেল। বাপী পিছনে। ভাবছে, রত্নমালিহার কান বিষয়ের কলা-কর্ম এই নিখুঁত যে অবাধ্য হলে একমাত্র মেয়েকেও মহিলা ত্যাগ করতে বাধ্য। খেলার মোড় হঠাৎ এভাবে ঘুরবে জানলে ভদ্রলোক নিশ্চয় কান-বিষয়ের ব্যাপারে এতটা তৎপর হতে না।

গায়ত্রী বাই বারান্দার চেয়ারে বসল। একটু যেন হাঁপাচ্ছে মনে হল। রাগ অসহিষ্ণুতার কারণেও হতে পারে। ইশারায় সামনের চেয়ারটায় বাপীকে বসতে বলল।

বাপী জিজ্ঞাসা করল, আপনার শ তেমন সুস্থ নেই শুনলাম?

সঙ্গে সঙ্গে একটু টান হয়ে গায়ত্রী বাই। গলার স্বরও চড়ল বলেছে আমার শরীর সুস্থ নেই?

বাপীর ভেলোচকা মুখ।

—আমি অসুস্থ হলে কার কি যায়? আমি মরে গেলেও কারো ক্ষতি না লাভ বেশি?

সামনের দরজা দিয়ে পিছনের কাউকে দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু নিশ্চিত ধারণা তাদের চোখের আড়ালে

জন্যে পদার্পণ ঘটেছে। আর, মহিলাও সেটা জানে।

মিনিট খানেক বাদে গায়ত্রী বাই সংযম হারিয়ে ফেলেছে।—ওসিকের ডাক্তারকর্মের খবর কি?

—চলছে।..তবে আমার একটু অসুবিধে হচ্ছে। আমি বেদ্দিকটা অর্গানাইজ করেছি, জান না থাকাতে সেসব ডাবগুলো মসের চালান এখনো যায়নি।

মুখের দিক চেয়ে ভদ্রলোক কুঁচকে ভাবল একটু।—তুমি ড্রাইভিং জানো?

বাপী বুদ্ধিমানের মতোই জবাব দিল, না...আপনি বললে শিখে নিতে সময় লাগবে না।

—বাদলা ভালো ড্রাইভার- সবরকম গাড়ি চালাতে জানে আমরা ফিরে গেলে সে সেখানোর ব্যবস্থা করে দেবে।

বাপী মাথা নাড়ল শুধু। তেমন উৎফুল্ল হবার কারণ নেই। কথা এখনো অনিশ্চয়তার গহ্বরে। সেই ফয়সালার দিকেই এবারে এগলো গায়ত্রী বাই। বলল, রেলমাকে এখানকার কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, শুনেছ?

মুখ দেখলে বোঝা যাবে না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বাপী প্রস্তুত হয়েই এসেছে। —শুনেছি।.. তবে আমার বিশ্বাস ব্যাপারটা আপনি আর একবার বিবেচনা করবেন।

ঠান্ডা সাদাটে মুখে মেজাজের আঁচড় পড়ুক। —কেন? ওর কোনো দোষ নেই ওলি বলেছে বাদল? আর একবারও ওই রকম ধরা পড়েছিল বলে মিস্টার চালিহার মুখ বন্ধ করার জন্য ও মদের বোতল ভেট নিয়ে গেছল—সে-খবর রাখো?

খুব নরম গলায় বাপী বলল, বাবি। ও যায়নি, ওকে পাঠানো হয়েছিল। এতে ওর নিজের ভো কোনো স্বার্থ নেই, আদর দিয়ে আপনার মেয়েই ওকে বাধ্য করেছে।

মুখের ওপর অসহিষ্ণু ঝাপটা মারার মতো করে গায়ত্রী বাই বলে উঠল, আমি কোনো কথা শুনতে চাইনে। এত বাধা হবার সুযোগ আমি কাউকে দিতে চাইনে। আমি ওকে তাড়িয়েই দিতে চেয়েছিলাম চালিহা বলল আসামে কাদের মেয়ে দরকার আছে—আমি আপত্তি করিনি। সেখানে গেলে টাকাও বেশি পাবে তোমার আপত্তি কেন?

প্রায় আবেদনের সুরে বাপী জবাব দিল, আপনি আমার ওপর অসন্তুষ্ট হচ্ছেন বুঝতে পারছি ..আসামে মেয়ের অভাব নেই, তবু এত দূর থেকে রেলমার অজানা-অচেনা একটা জায়গায় তাকে নিয়ে যেতে চাইছেন, আপনাকে সেটা বলার দরকার হবে ভাবিনি।

ব্যাগার মুখেই ভদ্রমহিলা স্তব্ধতে স্থির একটু। একটা অনাবৃত সত্য যেন তার মুখের ওপর ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে। তবু ঝাঁঝালো গলায় বললে ডক্টর কাছ থেকে ওকে সরিয়ে দেবার জন্যেই এই ব্যবস্থা করছ।

—এভাবে বলতে চাইলে ও কথার কিনা জানি না। তার আপনার চলেরা ভাবছে, মেয়েকে সামলাতে না পেরে নিজের স্বার্থে মিস্টার চালিহাকে খুশি করার জন্য একটা অসহায় দুর্বলের মেয়েকে আপনি বলি দিতে চাচ্ছেন।

গায়ত্রী বাইয়ের মুখে কথা নেই। গুম হয়ে বসে রইল। তেমনি মরম আবেদনের সুরে বাপী আবার বলল, মেয়েদের কাছে বলতে এতদিনে আমি যতটুকু বুঝেছি, এই পাহাড়ী এলাকাতেই তার বেশি বেশি—এদিকে দেখেই ওকে দূরে সরানো বেছে পারে।

প্রস্তাব অনুমোদন করল কিনা মুখ দেখে বোঝা গেল না। ফো-টানায় একটু পড়েছে বোঝা গেল। নইলে আরো মূর্তি দেখা যেত।

খানিক চুপ করে থেকে তীক্ষ্ণ রুক্ষ-স্বরেই জিজ্ঞাসা করল, বানারহাটের গেস্ট অফিসারের সঙ্গে দেখা করেছ?

এইটেই ফয়সলার প্রসঙ্গ। শান্ত মুখে বাপী জবাব দিল, না। তার আগে এই ব্যাপারে আমার কিছু কথা ছিল।

শোনার আগের মতো উগ্র মূর্তি।—কোনো কথা আমার শোনার দরকার নেই—মিস্টার চালিহা তোমাকে যা বলেছেন সেটাই আমার কথা—আমার ডিসিসন। বেন দেখা করোনি?

এখনো বাপী বিনীত, কিন্তু জবাবে কোনো জড়তা বা দ্বিধা নেই।—তাহলে আমাকে আপনার ছেড়ে দিতে আপত্তি নেই বুঝতে হবে।

হঠাৎ যেন বড়রকমের একটা ধাক্কা খেল মহিলা। প্রথমে চোখ, পরে গলা দিয়ে সাদা আগুন ঠিকরলো। —তার মানে সব-কিছুর কন্ট্রোল নিতে আর রবরানীকে সবাতে চাইছ তুমি আমার সঙ্গে থাকবে না?

—থাকব না নয়, মিস্টার চালিহা আমাকে থাকতে দেবেন না, তাই সময় থাকতে নিজের ব্যবস্থার তাগিদে আমাকে আগেই সরে যেতে হবে। তাঁর লক্ষ্য আর রবরানী নয় তার টারগেট আপনি।

অপলক স্থির দু-চোখ ওর মুখের ওপর স্থির কয়েক মুহূর্ত। —কি বলতে চাও খোলাখুলি বলো।

চাইনি আর গলার স্বর কঠিন।

—আপনার মন-মেজাজ ভালো থাকলে কিছু বলার দরকার হত না। মিস্টার চালিহা সেই সুযোগই নিচ্ছেন। আর রবরানী আমার ভাল হাতের মতো কাজ করছে, গোড়াতেই তাই তাকে ছাঁটাই করা দরকার তাঁর। বিশেষ মহলা সম্পর্কে আপনাকে তিনি বিশ্বাস করেছেন, ওদের মেলামেশা দুজনের হাতে-নাতে ধরেছেন, কিন্তু এখন তিনি চাইছেন আপনার বিশ্বাসের অনুযায়ী কোনো ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হলে তাঁর প্রস্তাব ক্ষতি—এগ্রিমেন্টের ছেলে আর ছাই ছেকে এই বাবস্থা নিয়ে তাকে পড়ে থাকতে না, তাই বিয়ে দেবার তাঁর তাঁর অত্যন্ত অপছন্দ নয় তাই আপনার মেয়েকে তিনি চুলচেরা ভরসা দিয়েছেন একটু, ঠান্ডা হলে সাধ্যমতো আপনাকে বোঝাতে চেষ্টা করবেন। সত্যি কি মিথ্যে আপনার মেয়েকে ডেকে জিজ্ঞেস করুন—

মহিলার স্তব্ধ রুক্ষ মুখের দিকে চেয়ে বাপী আবার বলে গেল, মিস্টার চালিহা মানেন, মেয়ে যদি ওখানে বিয়ে করেই ওদের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলাই ভালো, আপনি এদের শেষপর্যন্ত ফেলে দেবেন না—তবে দিলেও তাঁর লাভ ছাড়া লোকসান কিছু নেই, তাই সবার আগে আমাদের ব্যাপারে তিনি উঠে পড়ে লেগেছেন। আপনার মনের এই অবস্থায় এত সব আমি বলতাম না—কিন্তু তিনি এই সুযোগটাই বেছে নিয়েছেন।....এখন আপনি বিবেচনা করুন।

গায়ত্রী বাই পাথরের মূর্তির মতো বসে। মিনিট দুই চুপচাপ। মুখের দিকে চেয়ে আছেন। তারপর গলার স্বর তেমনি অরুণ। বললেন, বিবেচনা করব। না বললে, সবই আমার ভ্রান্ত বিশ্বাসের মনে হচ্ছে তোমারও এমন ভাবার দরকার নেই। তুমি বরং মনে রেখো এক ছত্রও হয়নি তুমি আমার কাছে এসে—তার আগে পর্যন্ত তোমাদের ভালোই ভাবা চলছে—তাই ছেড়ে যাবারও কোনো বাধা দেবার দরকার নেই—সে-ভাবে আমার বিবেচনার দরকার হবে না।

কথাগুলো কানের পর্দায় ঘা দিয়ে ভিতর থেকে একটা অসহিষ্ণু ক্ষোভ ঠেলে উঠল। কথা শেষ। মহিলা এবার চেয়ার ছেড়ে উঠবে মনে হচ্ছে।

ফয়সলা চেয়ে ছিল। নিষ্পত্তি যা হবার হোক। বাপী তিক্ত বেড়ে ফেলতে চেষ্টা করে বলল আমাকে কি আপনি শুভার্থী মনে করেন তো একটু বসুন, ব্যাপারে দুই একটা কথা বলব।

মুখের দিকে চেয়ে থেকে তেমন কঠিন সুরে গায়ত্রী বাই জবাব দিল, বলার কথা ছেড়ে যা, বলবার পরে।

অর্থাৎ শুভার্থী ভাবটা বাতিল করা। এটুকুও হজম করে বাপী মুখের ওপর বলল, সামনের চারমাসের মধ্যে ওর দুই তিন বছরের মতো মেয়াদ আছে। এখানে আর দুশ্চিন্তা করার দরকার হবে না, তবে আমরা চলে আসার আগে আপনার কাছে ঘরেই থাকবে। তার ওপর নজর রাখতেও হবে না—চন্দ্রকুমার স্টাডিজএর জন্য বিভিন্ন মেয়েদের ইন্টারভিউ নিচ্ছে—সেখানকার একটা ফর্ম ও পেয়েছে।

এই প্রসঙ্গে কথা হল মহিলার কল্পনাও করেনি। কপাল কুঁচকে ভ্রূ প্রায় জড়ো হয়ে এসেছে। সন্দিগ্ধ চোখে তাকে অনেকখানি পর্যবেক্ষণ করে নিল। তারপর —তুমি জানলে কি করে, ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে?

—না, ওর মুখেই শুনেছি। ওকে কিছু বলা হয়নি।

—কবে?

—মিটিংয়ে।

আরো অবাক। —তুমি সেখানে গেছলে?

—হ্যাঁ।

—কবে?

দিন-সাতেক আগে।

—কেন গেছলে? এবারে সন্দিগ্ধ।

—যাকে নিয়ে এত ব্যাপার তাকে একটু ভালো করে জানা বা চেনা দরকার ভেবেছিলাম। তার সম্পর্কে আপনার ধারণার সঙ্গে আমার ধারণা মিললে তাকে হটানোর রাস্তা বার করা যায় কিনা সে চিন্তাও মাথায় ছিল।

রমণীর মুখের আগ্রহ আরো স্পষ্ট এবার।—কি বুঝলে?

—বোঝাবুঝির কথা থাক, প্রায় তিন বছরের জন্য সে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে এটাই বড় কথা। যাওয়ার আগে ওর বিয়ে করে যাবার ইচ্ছে ছিল, আপনার মেয়ে রাজি হয়নি। বিজয় মেহেরা আমাকেও জিজ্ঞাসা করেছিল, আমি বলেছি সে-চেষ্টা করতে গেলে ডালিরই সব থেকে ক্ষতি করা হবে।

—স্কাউনড্রেল!

—আমি?

থতমতো খেল। কিন্তু তেমনি উষ্ণ। —তোমাকে কে বলেছে? তিন বছরের জন্য তার যাওয়া একেবারে ঠিক?

ঠিক।

মুখের দিকে চেয়ে বাপী অনুভব করতে পারে মহিলার অনেক দিনের টান-ধরা স্নায়ুগুলো আস্তে আস্তে শিথিল হচ্ছে। মুখের লাদাটে ভাবও যেন এরই মধ্যে একটু কম।

—বুঝলাম। তোমার কি বক্তব্য?

নিরুত্তাপ গলায় বাপী জবাব দিল, শুভার্থীও ভাবেন না যখন, বলে কি লাভ হবে জানি না। তবু নিজেকে আমি শুভার্থী ভাবি বলেই বলছি।..... তিনটে বছর অনেক সময়। ছেলে মেয়ে দুদিকেরই মত বা মন বদলাবার পক্ষে যথেষ্ট সময়। যেখানে যাচ্ছে ছেলের পক্ষে তো বটেই। এর মধ্যে মেয়ের মনের দিকে না তাকিয়ে আর যথেষ্ট সময় হাতে পেয়েও সে সুযোগ না নিয়ে আপনি যদি এমনি ঝোঁকের মাথায় ওর বিয়ের তোড়জোড় করেন—আমার ধারণা সব থেকে বড় ভুলটা সেইখানে হবে। শুধু এই ব্যাপারই নয়, সব দিকেই যেমন চলছে চলতে দিলে আপনার খুব অশান্তির কারণ থাকবে না।

গায়ত্রী বাই বেশ মন দিয়েই শুনল কথাগুলো। আর রুক্ষ নয়, উগ্র নয়। অশান্তি অনেকটা কমেই গেছে বোঝা যায়। এখন শুধু গম্ভীর।—ঠিক আছে, ভাবব। আর দেরি না করে তুমি ভ্যান নিয়ে চলে যাও। আজ আর কালকের মধ্যে যেখানে যেখানে মাল চালান দেওয়ার দরকার কালকের মধ্যে দিয়ে পরশু গাড়িটা পাঠিয়ে দিও।

বাপী উঠে দাঁড়াতে গায়ত্রী বাই ঈষৎ নিরস সুরে আবার বলল, আর একটা কথা, একসপ্যানসনের জন্যও ফরেস্ট বেড অফিসারের সঙ্গে আমাদের ডাইরেক্ট যোগাযোগ করা দরকার।

নিরুত্তাপ গলায় বাপী জবাব দিল, আপনার বিবেচনা শেষ হলে বলবেন....করব।

অদূরে ভ্যানটা দাঁড়িয়েই আছে। আর অপেক্ষা না করে সিঁড়ির দিকে এগলো।

—বাপী। হন্তদন্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাধা দিল উর্মিলা।—ওয়েট, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

বাপী ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল তাকে। এই মুখে খুশী যেমন রাগও তেমনি। বলল, তোমার মায়ের বিশ্বাস বা বিবেচনা বোঝা গেলে তখন কথা। এখন থাক।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে সোজা ভ্যানে।

জঙ্গলের পাশ ঘেঁষা পাহাড়ী রাস্তা ধরে ভ্যান ছুটছে। বাপী প্রথমে গুম খানিকক্ষণ। আগে বাড়ল, কি আপাতত কিছুটা পিছে হটল জানে না। এতক্ষণের সব কথা আবার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। মন বলছে, পিছনে নয়, সামনেই পা ফেলেছো। দেখা যাক। হাসিই পেল হঠাৎ। বেলা সাড়ে নটা এখন। নিজে রান্না করে খায়। এরপর বাড়ি পৌঁছে আজ সে পাটের সময় থাকবে না। কিন্তু এমনি মেজাজের হাল এখন ভদ্রমহিলার যে মনেই পড়ল না। বাপীর ছেলেমানুষের মতো ভাবতে ভালো লাগছে নিজে যখন লাঞ্চে বসবে তখন মনে পড়বে ঘর খারাপ লাগবে।

সমস্ত দিন ব্যস্ত ছিল। বিকেলের দিকে আবুর খোঁজে জঙ্গলের পথ ধরল। এবারে ওর সঙ্গে কথা বলা আর পরামর্শ করার দরকার হয়েছে। গায়ত্রী বাইয়ের বিবেচনার মোড় কোন্ দিকে ফেরে বলা যায় না। রণজিৎ চালিহা অপরিহার্য ব্যাধির মতো তার স্নায়ুর ওপর চেপে আছে—থাকতে চাইবেও।

এ সময় চন্দ্রার বেডের কাছেই আবুকে পাবে ভেবেছিল। নেই। কেউ নেই। অনিশ্চয়তার দারুন উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে হয়তো। ওর ডেরার দিকে চলল। সেখানে পেল। সামনের দাওয়ায় বসে বিড়ি টানছে। আশপাশ দিয়ে ছেলে দুটো ছোটাছুটি করছে।

ওকে অসময়ে দেখে আবু হাসল বটে, কিন্তু হাসিটা বুক ছুঁয়ে আবার মতো নয়। ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে দুলারিকে ডাকল।

কাছে এসে বাপী আবুর পাশে দাওয়ার ওপরেই বসে পড়ল।—কি খবর?

বিড়িটা দূরে ছুড়ে ফেলে নির্লিপ্ত গলায় আবু বলল, তোমার কাছে খবর পাব বলে তো দিন গুনছি।

দুলারি এসে ছেলে দুটোকে ঘরে পাঠিয়ে পাশের থাম ধরে দাঁড়িয়ে রইল। আবু ওর মাথায়ও অবাঞ্ছিত কিছু ঢুকিয়েছে মনে হয়।

—চন্দ্রার বেডে কাজ হচ্ছে না কেন?

—আর একটা বিড়ি ধরিয়ে আবু জবাব দিল, তোমাদের বিচার শেষ হোক।

—ওটা যে তোমাদের মেমসায়েবের কাজেই লাগবে তোমাকে কে বলল? নষ্ট কোরো না, যেমন বাড়িয়ে ধাচ্ছ বাড়িয়ে যাও।

আবু ঠিক বুঝল না। চেয়ে আছে।

বাপী বলল, মেমসায়েব এখন পাহাড়ের ওপরে। আজ সকালে গাড়ি পাঠিয়ে আমাকে ডেকে নিয়ে গেছলেন।

আবুর ছোট চোখ জোড়া চিকচিক করে উঠল। আমার ওরপ হুকুম হয়েছে কিছু?

—ম্যানেজার আর মেমসায়েবের হুকুম, জঙ্গলের বড়সাহেবের সঙ্গে সবাসাঁর কথা-বার্তা বলে তোমাদের বাদ দিয়ে নতুন টিম-ওয়ার্ক করতে হবে।

—স দোষ তাহলে আমার আর রেশমার?

মোলায়েম গম্ভীর্যে বাপী জবাব দিল, রেশমার কথা ছাড়ো।....সত্যি কথা বলো দেখি, আগে থাকতে বলে রেখে ছুটির দিনে লম্বা সময়ের জন্য তোমার মেমসায়েবের মেয়ে বনমালাকে নিয়ে গেল—তোমার এতটুকু সন্দেহ পর্যন্ত হয়নি?

আবুর ছোট দুই চোখ থেকে জল ঠিকরে বেরুচ্ছে। দাঁতে দাঁত চেপে জবাব দিল, সন্দেহ হয়েছিল। আর সে-কথা রেশমাকে বলেও ছিলাম।...এবার তোমার কর্তব্য করতে সুবিধে হবে?

হাসি মুখে বাপী এবার দুলারির দিকে তাকালো। বলল, আবার কর্তব্যজ্ঞান সাংঘাতিক। নতুন বাঁটম্যান হবার পর জঙ্গলের বড়সাহেবের হুকুম আমাকে জঙ্গল থেকে ধরে নিয়ে গেছল। ওর চোখের সামনে তারপর কি হয়েছিল ওর মুখেই শুনো।

দুলারির শোনা আছে বোধহয়। দুজনেই হতচকিত হঠাৎ। আবুর দিকে ফিরে ঠাণ্ডা মুখে এবার বাপী বলল, আমার কর্তব্যজ্ঞান-টানগুলো একটু অন্যরকমের।.... মেমসায়েবকে বলে এসেছি, তোমাকে ছেড়ে দিলে আমাকেও ছেঁটে দেবার কথা ভাবতে হবে। কেন ভাবতে হবে তাও বলেছি। আমি আশা করছি অতদূর গড়াবে না, যেমন চলছে তেমনি চলবে। তা যদি না হয়, আমার বিশ্বাস আমি তুমি দুলারি আর রেশমা একত্র হয়ে ওষুধ আর সাপের ব্যবসা গোড়াতেই অত বড় করে না হোক ছোট করে অন্তত চালাতে পারব। টাকারও অভাব হবে না বাড়ি বিক্রি করতে চাইলে মিসেস রায় কিনতে বাধ্য। কিন্তু আমার ওপর তোমার বিশ্বাসের এত উন্নতি দেখে ঘাবড়ে যাচ্ছি—

বিড়ি ফেলে আবু তার মুখটা বাপীর কোলে গুঁজে দিল।—বাপী—বাপীভাই, তুমি আমাকে ধরে মারো—আমার মুখটা মাটিতে থেঁতলে দাও। না বাপী ভাই, আমার জন্য তোমাকে কাজ ছাড়তে হবে না—আল্লার দিব্যি বলছি মেমসায়েব আমাকে ঝাঁটা মেরে তাড়ালেও আর আমি তোমাকে অবিশ্বাস করব না।

বাপী ওকে ঠেলে তুলল। ওর চোখে সত্যি সত্যি জল। দুলারি হাসছে। বাপীর সঙ্গে চোখোচোখি হতে বলল, আর অবিশ্বাস করলে আমি চ্যালা-কাঠ নিয়ে কুকুর তাড়া করব।

—বেশ কপট গাম্ভীর্যে বাপী উঠে দাঁড়াল।—আমি চলে গেলে এই বড়ো খোকাকে একটু আদর-টাদর কোরো। আবুকে

বলল, আমার বিশ্বাস আর গণ্ডগোল কিছু হবে না। কিন্তু যাই হোক, আপাতত তুমি বা বেশমা ওই ম্যানেজারকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা কোরো।

পরের পনেরটা দিনের মধ্যেও পাহাড় থেকে কোনরকম নির্দেশ এলো না। এলো না বলেই বাপীর ধারণা বিবেচনার ফল অনুকূল। নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ এটা। ডিসেম্বরের শীতের কামড়ে পাহাড়ে থাকা সম্ভব হবে না। মেয়েসহ এই নভেম্বরের শেষেই মিসেস রাই নেমে আসবে আশা করছে। শুধু আশা করছে না, তাদের আমার অপেক্ষায় ভিতরে ভিতরে উৎসুক হয়ে আছে।

এখনো বাপী রণজিৎ চালিহাকে পাশ কাটিয়ে চলেছে। কাজের অছিলায় তাড়াতাড়ির মধ্যে বাইরে বাইরে ঘুরছে দিন-কতক। আর এখানে থাকলে চালিহা আপিস থেকে চলে যাবার পরে আসে। পর পর দুদিন তাকে অ্যাকাউনটেন্ট খবর দিল, চিফ একজিকিউটিভের মেজাজ গরম। আপিসে এসেই বাপীর খোঁজ করেছে। না পেয়ে রেগেই গেছে।

সেই দিনই সন্ধ্যার পর রণজিৎ চালিহার স্লিপ তার বাংলোয় হাজির। ড্রাইভার জানালো সাহেব এক্ষুণি যেতে বলেছেন।

গেল। বাংলোর ভিতরের ঘরে ডাক পড়ল। সামনের টেবিলে মদের গেলাস, মদের বোতল। লাল মুখ আর ঘোলাটে চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে জঠর ইতিমধ্যে অনেকটাই রসস্থ হয়েছে। ওকে দেখামাত্র গর্জন করে উঠল, হোয়াট্ দ্য হেল্ আর ইউ ডুইং অল দা টাইম? অ্যান্ড হাউ ডেয়ার ইউ ডিসওবে মি?

একটু দূরে চেয়ার টেনে বসল বাপী। —কি হয়েছে বলুন।

—বেঙ্গ অফিসারের সঙ্গে দেখা করেছ?

—না।

—ফেশ স্কিম করার কথা বলেছিলাম —করেছ?

—না।

ফেটে পড়ল। —কেন করোনি? আমি তোমাকে স্পেয়ার করব ভেবেছ? সাবমিট ইওর রিটন এক্সপ্লানেশন টুমরো।

ধীর গম্ভীর গলায় বাপী জবাব দিল, মিসেস রাই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। এ-ব্যাপারে কিছু বলার তিনি ভেবে বলবেন জানিয়েছেন।

—হু ইজ্ সি? আই অ্যাম ইওর বস্। ইউ ইনসাবরডিনেট লাউজি ফুল।

চেয়ার ঠেলে উঠে বাপী সোজা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। যে-রকম মত্ত অবস্থা, কিছুই এখন মাথায় ঢুকবে না।

পরের সন্ধ্যায় ফটকের সামনে আবার চালিহার স্লিপ। একই খবর। সাহেব ডাকছে।

বাপী ড্রাইভারকে বলল, আজ যেতে পারছি না। কাল আপিসে দেখা করব বলোগে।

কিন্তু ড্রাইভার এবারে নিজে থেকেই জানান দিল, মেমসায়েবের ভ্যান এসেছে পাহাড় থেকে, বোধহয় জরুরি দরকারেই সাহেব ডাকছেন।

অগত্যা। স্লিপে উঠতে হল। ভ্যানটা সত্যি চালিহার বাংলোর সামনে দাঁড়িয়ে। ভিতরের ঘরে আজ সবুজ আলো জ্বলছে। ভিতরে পা দিয়েই বাপীর মনে হল আজ আরো মত্ত অবস্থা। গেলাস ভরতি। বোতল প্রায় খালি। ওকে দেখেই জড়ানো গলায় হাঁক দিল, কাম্ অন্ ইউ চিনির বলদ—একবস্তা চিনি তোমাকে এক্ষুণি পাহাড়ে টেনে নিয়ে যেতে হবে। ফ্যাক-ফ্যাক করে হাসতে লাগল। —নিজেকে একটি মহাবাণী ভেবে বসে আছেন তোমাদের লেডি বাট আই অ্যাম নট দ্যাট ব্লাডি সোয়াইন অফ এ সারভেন্ট—আই হ্যাভ নো টাইম, আই অ্যাম ওয়েটিং ফর এ গেস্ট। গো অ্যান্ড টেল হার দ্যাট অ্যান্ড ডাম্প অল দি মানি অন হার ল্যাপ। আবার হাসি।—বুঝতে পারছ না? আজ সন্ধ্যার মধ্যেই টাকা নিয়ে যাবার কথা ছিল, দেরি দেখে লোক পাঠিয়েছে। এবারের হাসি আরো তির্যক, আই ওয়ান্ডার হোয়াট সি উইল ডু উইথ ইট অ্যাট্ দিস আওয়ার অফ দি নাইট!

গেলাসের অর্ধেক এক চুমুকে সাবাড় করে দিল। তারপর উঠে টলতে টলতে খাটের ওপর ধুপ করে বসে পড়ল। এক টানে বালিশটা সরাতেই বাপীর চক্ষু স্থির।

মস্ত দুই বান্ডিল একশ টাকার নোট। নম্বর করা নতুন নোটের বান্ডিল নয়। তার থেকে ঢের বড়। গাদা করে ফিতের বাঁধা।

বান্ডিল দুটো টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিল।—দেখে নাও একশ হাজার সাতশ টাকা আছে এখানে। হার হাইনেসকে দিয়ে এসো অল্রাইট দেন গো টু হেল!

বাপী নির্বাক দাঁড়িয়ে।

এক চুমুকে গেলাসের বাকিটুকু শেষ করে রণজিৎ চালিহা গর্জে উঠল, ডোন্ট ওয়েস্ট মাই টাইম—হাবি আপ।

বাপী এগিয়ে এসে চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। নোটের বান্ডিল দুটো সামনে টেনে নিল।

রণজিৎ চালিহাও উঠল। ইংরেজি গান ধরে বোতলের বাকি মদ গেলাসে ঢেলে জল মেশালো। তারপর খোশমেজাজে দুলে দুলে ঘরের মধ্যে হাঁটতে লাগল। বাপী টাকা গুণছে তো গুণছেই। আর যত এগোচ্ছে মুখে ততো বিস্ময়ের আঁচড় পড়ছে।

রণজিৎ টলতে টলতে বেরিয়ে গেছল। চাকরের সঙ্গে তার চেঁচামেচি কানে আসছে। ডিনার সার্ভ করতে দেরি হচ্ছে তার গর্দান নেবে বলে ধমকাচ্ছে। এদিকে বাপীর কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। প্রথম বান্ডিলেই চোদ্দ হাজার সাতাশ টাকা। এখন দ্বিতীয় বান্ডিলের মাঝামাঝি এসেছে।

ফিরে এসেই রণজিৎ চালিহা হুংকার দিয়ে উঠল, আর বেশি দেরি করলে আমি তোমাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দেব বলে দিলাম।

গেলাসটা তুলে নিয়ে থলথলে মুখ করে হাসছে। ঘড়ি দেখছে। বাঞ্ছিত কারো আসার প্রতীক্ষায় সময় দেখছে হয়তো।

দ্বিতীয় বান্ডিল গোনা হল। এতে পনের হাজার একশ। দুটো মিলিয়ে উনত্রিশ হাজার আটশ। চালিহা মুখে বলেছে, একুশ হাজার সাতশ।

—ফিনিসড্?

বাপী মাথা নাড়ল।

কোণের ছোট টেবিলটার সামনে বসে প্যাড টেনে রণজিৎ চালিহা খসখস করে লিখল কি। তারপর নাম সই করে সেটা সামনে ছুঁড়ে মারল। ইংরেজিতে লেখা আছে, শরীর অসুস্থ। এই ঠাণ্ডায় যেতে পারছি না। বাপী তবফদারের হাত দিয়ে একুশ হাজার আটশ টাকা পাঠানো হল।

এবারে দুই বান্ডিলের শেষের সাতশ আর একশ জুড়ে আটশ হয়েছে। বাপীর হাতে কড়কড়ে আট হাজার বেশি। এরই মধ্যে দ্রুত চিন্তা সারা তার। গর হিসেবের এই আট হাজার টাকা হয়তো আর নিজের গায়ের কবার সংকল্প ছিল। নেশার ঘোঁকে সেটা আর মনে নেই।

টলতে টলতে এগিয়ে এসে চালিহা একটা কালো থলে ছুঁড়ে দিল। অর্থাৎ টাকাগুলো ওতে ভরে নিতে হবে।

—হার হাইনেসকে বলবে, সতের জায়গায় ঘুরে যা মোটানো গেছে সব দিয়ে দিলাম—সি এক্সপেকটেড মোর। কোথা থেকে কত পাওয়া গেছে আই ডোন্ট রিমেম্বার নাও—অ্যান্ড আই ডোন্ট কেয়ার টু। পরে দেখা যাবে। এ কোনো হিসেবের টাকা নয়, স্টিল অ্যাম আই এ থিফ? একটা রাত এ-টাকা আমার কাছে থাকলে আমি মেরে দিতাম? নাও গেট আউট।

বাইরের অন্ধকার ফুঁড়ে ভ্যান ছুটেছে। ঠাণ্ডা বেশ। গায়ে গরম জামা যা

উত্তরসূরি ৯৯ তম সংখ্যা

কবি অমিয় চক্রবর্তীকে নিবেদিত

সব স্টলে পাওয়া যাচ্ছে

১০০ শততম সংখ্যা

প্রস্তুতির পথে। যোগাযোগ করুন :

সম্পাদক : উত্তরসূরী

৯বি-৮, কালিচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা-৫০

আছে খুব যথেষ্ট নয়। তবু বাপীর খুব একটা শীত করছে না। স্থাণুর মতো বসে আছে। টাকার থলে কোলের ওপর শক্ত মুঠোয় ধরা।

পাহাড়ের কাছে পৌঁছুল। বাংলোর জোরালো আলোগুলো দেখা যাচ্ছে। নিচের থেকে সুন্দর ল্যাণ্ডস্কেপ পাহাড়ে পেঁচিয়ে চড়তে লাগল। আধা-আধি ওঠার পর পাশের জানলা দিয়ে বাপী নিচের দিকে তাকালো। শুধু জমাট-বাঁধা অন্ধকার। আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। কেন যেন উর্মিলার বাবা বীরেশ্বর রাইয়ের কথা মনে পড়ল বাপীর। মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাতে গিয়ে নিচে পড়ে সব শেষ। ওই খোলা দিকটায় তখন কাঁটাতারের বেড়া ছিল না। গায়ত্রী রাই সবটা জুড়ে পরে লাগিয়েছে।

ভ্যান গেট দিয়ে ঢুকল। সিঁড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

টাকার থলে হাতে বাপী সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। ভ্যান থামিয়ে ড্রাইভার খানসামা দুজনে হর্ণ বাজিয়েছে। সেই কারণেই হয়তো বারান্দার পিসনের কাঁচের দরজা দুটো খুলে গেল। গায়ত্রী রাই দাঁড়িয়ে। মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত গরম চাদরে মোড়া। বাইরের বারান্দায় হ্যাসাক জ্বলছে। ভিতরেও জোরালো আলো।

স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্যে রাই ওকে ভালো করে দেখে নিল এক দফা। তারপর ডাকল। ভিতরে এসো।

—বাপী সামনের ঘরে ঢুকল। ভিতরের অন্য দরজা দিয়ে উর্মিলা গলা বাড়ালো। তারপরেই খুশিতে আর বিস্ময়ে উদ্ভাসিত মুখ। বাপী! তুমি এ সময়ে কি ব্যাপার?

মুখ দেখে মনে হল মায়ের সঙ্গে কিছু বোঝা-পড়া হয়েছে। বাপী জবাব দিল না। গায়ত্রী রাইয়ের মুখোমুখি একটা সোফায় বসল। অবাক মুখে উর্মিলা মায়ের পাশের সোফাটা দখল করল।

গায়ত্রী রাই হাতের কালো থলেটা একবার দেখে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ওতে টাকা?

—হ্যাঁ।

—মিস্টার চালিহা কি করছেন?

—ঘরে সবুজ আলো জেলে ডিঙ্ক করছেন। একজন গেস্টএর জন্য অপেক্ষাও করছেন।

বলার ধরণে সাদাটে ভুরু জোড়া একটু কোঁচকাতে দেখা গেল।—ইজ হি ড্রাংক?

—ঠিক বলতে পারবে না। দেখলে তাই মনে হবে। উঠে টাকার থলে আর চিঠি আর সামনের সেন্টার টেবিলে রেখে আবার সোফায় ফিরে এলো।

চিঠিটা তুলে নিতে নিতে গায়ত্রী রাই জিজ্ঞাসা করল, কত টাকা পাঠিয়েছে?

—উনি মুখে বলেছেন একুশ হাজার সতেরশ টাকা। চিঠিতে লিখেছেন একুশ হাজার আটশ টাকা।

—এখানে কত আছে তুমি গুনে আনোনি?

—এনেছি। আছে উনত্রিশ হাজার আটশ টাকা।

উর্মিলা লাফিয়ে উঠল।—মাই গড! হি ওয়জ ড্রেড ড্রাংক দেন!

ওর দিকে না তাকিয়ে বাপী বলল, টাকাটা গুণে নিন। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে—এরপর আরো ঠাণ্ডা পড়বে।

উর্মিলা উদ্বিগ্ন মুখে মায়ের দিকে তাকালো। গায়ত্রী রাইও এ-রকম শুনবে আশা করেনি যেন। বলল, এই ঠাণ্ডায় আর তোমাকে যেতে হবে না। কাল সকালে যাবে।

সোজা মুখের দিকে চেয়ে বাপী বলল, কিন্তু আমার ফিরতে পারলে ভালো হয়.... কিছু চিন্তা করার আছে।

শুধু ঘেরে নয়, মায়ের মুখেও বিস্ময়ের আঁচড় পড়েছে।—কি চিন্তা?

—আপনার কাছে অরু আঙ্কর থাকা নিরাপদ হবে কিনা সেই চিন্তা।

মেয়ের ভেবাচাকা মূর্তি। মায়ের সাদাটে ভুরুতে ভাঁজ পড়ল আবার। —হোয়াট ডু ইউ মিন?

বাপীর মুখে কোন রকম আবেগের লেশমাত্র নেই। জবাব দিল, একটু পিছন থেকে বলতে হবে তাহলে।....সাত মাস আগে আপনি আমার সঙ্গে কবে নিয়ে গিয়ে শিলিগুড়ি আর মালদহের দুজন বড় পাই-কিরি খদ্দেরের সঙ্গে বিজিনেস্যাল ম্যানেজার হিসেবে আমার পরিচয় করে দিয়েছিলেন। ওই দুজনেই আপনার অনেক দিনের ক্লায়েন্ট, আপনাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করে দেখেছি।

গায়ত্রী রাই অসহিষ্ণু ইঙ্গিত।—সো হোয়াট, তাঁদের কথা কেন?

—তার কারণ দ্বিতীয় বার তাঁদের কাছে যেতেই দুজনেই তাঁরা ব্যক্তিগত লাভের টোপ ফেলে কিছু প্রস্তাব দিয়েছিলেন।... আমার ধারণা, আমার সততা পরীক্ষা করার জন্য আপনি এই টোপ ফেলতে তাঁদের বলে দিয়েছিলেন।

উর্মিলার দু চোখ বিস্ফারিত। একবার মা-কে দেখছে একবার বাপীকে। এই প্রথম বোধ হয় বিড়ম্বনার ছায়া দেখা যাচ্ছে গায়ত্রী রাইয়ের মুখে।

স্পষ্ট ঠাণ্ডা গলায় বলে গেল, কিন্তু মিস্টার চালিহার মতো মানুষকে দলে আবার সেই পরীক্ষার টোপ ফেলে আপনি আমাকে তার দশগুণ রিস্ক-এর মধ্যে ফেলে-ছিলেন। আমার ধারণা, আপনি জানতেন টাকা নিয়ে মিস্টার চালিহা আসবেন না, আমি আসব। আমার ধারণা কত টাকা আমি গুণে পাব— আপনি আর মিস্টার চালিহা দুজনেই তা জানতেন। দেদার মাতাল হয়ে মিস্টার চালিহা আপনাকে গালাগাল পর্যন্ত করছিলেন।.. আমার ধারণা, করবেন যে, তাও তিনি আপনাকে বলেই রেখেছিলেন। কাউকেই বিশ্বাস করার আপনার ধাতে নেই, তাই এত বড় রিস্ক-এর মধ্যে আপনি আমাকে ঠেলে দিতে পেরেছেন।

গায়ত্রী রাইয়ের চোখে মুখে ঠোঁটে হাসি ছড়াচ্ছে। এমন একটা ব্যতিক্রম দেখে উর্মিলা আপো হতভম্ব।

গায়ত্রী রাই দেখছে। হাসছে। দু চোখে প্রশংসা উপচে পড়ছে।—রিস্ক কেন?

—অত মদ না খেলে আর আরো একটু মাথা খাটালে মিস্টার চালিহা আট হাজার টাকা কম দিয়েই আমাকে আপনার কাছে পাঠাতেন। তখন আপনি কি করতেন? কাকে বিশ্বাস করতেন? তিনি তো জোর দিয়ে বলতেন, প্ল্যান-মতো উনত্রিশ হাজার আটশ টাকাই আপনাকে পাঠিয়েছেন!

সাদা মুখ বিস্ময় আর উত্তেজনায় ভরাট হতে লাগল। অস্ফুট স্বরে বলল, আমি অতটা ভাবিনি....সত্যি তো সর্বনাশ হত অহলে!

বাপীর গলার স্বর এবারে শুধু ঠাণ্ডা নয়, কঠিনও।—আপনার কিছু হত না, আমার হত। চোর নাম নিয়ে আমাকে এখান থেকে যেতে হত। মুখের ওপর দু চোখ বিঁধিয়ে থামল একটু। অনেক দিনের মোক্ষম গোপন অস্ত্রটা ছুঁড়ে দেবার এই বুঝি সময়। গলার স্বর আরো নির্দয়। এবারে আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করি?

গায়ত্রী রাই চেয়ে আছে। ভালো লাগছে। অবাক লাগছে। নিজের অগোচরে সামান্য মাথা নেড়েছে।

আঙুল তুলে উর্মিলাকে দেখিয়ে বাপী বলল, চার বছর আগে ওর বাবার সেই অ্যাকসিডেন্টের রাত থেকে যে লোককে আপনি সব থেকে বেশি সন্দেহ করেন আর ঘৃণা করেন—সব দিক বজায় রাখার তাগিদে আপনি তাকে আরো কত প্রশ্রয় দেবেন?

মুখের ওপর কেউ যেন আচমকা আঘাত করল। গায়ত্রী রাই নির্বাক নিস্পন্দ বিমূঢ় খানিকক্ষণ। একটা বন্ধনার স্মৃতি ভেতর থেকে ঠেলে উঠতে লাগল। বিড়বিড় করে বলল, অ্যাকসিডেন্টের সেই রাত থেকে আমি সব থেকে বেশি সন্দেহ করি ঘৃণা করি....কাকে?

—আপনার চিফ একসিকিউটিভ রণজিৎ চালিহাকে।

—তোমাকে কে বলল?

—কেউ বলেনি। আমার এই রকমই ধারণা।.. বড় কাজ শেষ করার আনন্দে দুজনে প্রচুর ড্রিঙ্ক করে বৃষ্টির রাতে বন্ধুকে পাশে নিয়ে মিস্টার রাই জিপ ড্রাইভ করে ফিরছিলেন....বন্ধুরও সেই রাতে আপনার এখানেই থাকা খাওয়ার কথা ....কিন্তু পাহাড়ে ওঠার আগেই কিছু কাজ সেরে আসার জন্য তিনি নেমে গেলেন আর দু ঘণ্টা বাদে অ্যাকসিডেন্টের খবর শুন-লেন। সেই অ্যাকসিডেন্ট যে কারণেই হোক তাঁর প্রত্যাশিত ছিল কিনা আর সেই জন্যেই কাজের অজুহাতে তিনি নেমে গেছলেন কিনা —সেই সন্দেহ আপনার মনে আসা স্বাভা-বিক....আর মিস্টার চালিহা তাঁর কাজ সেরে ফিরে আসার পর সত্যি কতটা মত্ত অবস্থায় তাঁকে দেখা গেছে তা-ও আপনিই সব থেকে ভালো জানেন।

ঘরের বাতাসও বুঝি স্তব্ধ হয়ে থেমে আছে। গায়ত্রী রাইয়ের মুখ কাগজের মতো সাদা। স্মৃতির নিঃশব্দ যন্ত্রণায় নিঃশ্বাস নিতে ফেলতেও কষ্ট হচ্ছে মনে হয়।

উর্মিলা পুতুলের মতো বসে।

(চলবে)

পঞ্চম মহাদশায় চেন্না রেড্ডি

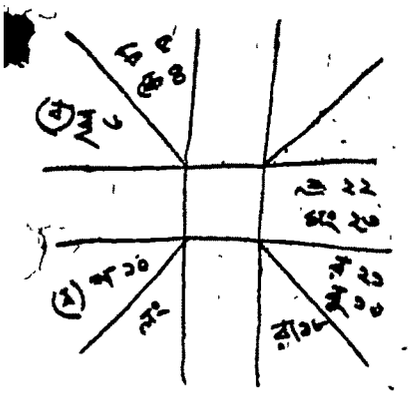

বৃষ রাশি, কন্যা লগ্নের জাতক, ডঃ এম্ চেন্না রেড্ডী। যদিও তিনি বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি নন; কিন্তু ভারতের রাজনীতিতে তিনি একজন দক্ষ রাজনীতিবিদ্ হিসাবেই পরিচিত। তিনি শুধু রাজনীতিতে অভিজ্ঞ, অথবা শুধু ভাল একজন প্রশাসনিক বলে খ্যাত, তাই নয়—তিনি চিকিৎসা বিদ্যাতেও পারদর্শী।

আমরা যদি ওপরের রাশিচক্রটির দিকে তাকাই, দেখতে পাবো, রাশিচক্রটিতে বৃহস্পতির দৃষ্ট হয়ে, বুধ এবং রবি গ্রহ বৃহস্পতির ঘরেই বুধাদিত্য যোগ সৃষ্টি করেছে। রবি বর্গোত্তম। কাজেই বিদ্যাস্থানে এই শুভ যোগ জাতকের ছাত্রজীবনে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। বিদ্যার বিকাশ পঞ্চম ঘর থেকে, পঞ্চম ঘরে শুক্র চন্দ্রের নক্ষত্র প্রাপ্ত হয়েছে, আর মঙ্গল তুঙ্গ হয়ে বিকাশ পতি শনিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখছে। ফলে, জাতক রাহুর দশায় চন্দ্রের অন্তর্দশায়, ডাক্তারী বিদ্যা পাশ করেন। আগেই বলেছি বিদ্যার বিকাশ পঞ্চম ঘর থেকে। পঞ্চম স্থানে শুক্রের সঙ্গে অশুভ ভাব পতি মঙ্গলের সমন্বয়, জাতককে ডাক্তারী বিদ্যাতে অভিজ্ঞ করালেও প্রফেশনে বিঘ্ন ঘটায়, মতে পরিবর্তন করে। জাতক ডাক্তার, জাতক করেন চিকিৎসা বিদ্যার দ্বারা দেশের সেবা। কিন্তু আমরা দেখতে পাই, জাতকের বিকাশ হয়েছে রাজনীতি ক্ষেত্রে। জাতকের সাফল্য এসেছে রাজনীতিতে, প্রশাসনিকে।

জাতকের তেইশ বছর বয়স থেকে আরম্ভ হয়েছে বৃহস্পতির মহাদশা। বৃহস্পতি দশম স্থানে কেন্দ্রী। রবি এবং বুধের সঙ্গে সম্পর্ক করেছে; তাই বৃহস্পতির দশাতে জাতককে রাজনীতিতে গড়িয়ে ফেলল। শুক্রের অন্তর্দশা আসতেই জাতক মাত্র ২৯-৩০ বছর বয়সে রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত হলেন। হয়তো বৃহস্পতির দ্বিকেন্দ্রী দোষ আছে, কিন্তু রবির সঙ্গে সম্পর্ক থাকায়, জাতক রাজনীতিতে তার মত এগিয়ে যেতে লাগলেন। অন্ধ্র-প্রদেশের আইনসভাতে এলেন, মন্ত্রী হলেন, বাদপত্রের শিরোনামায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত বলেন; কিন্তু নিষ্কণ্টক নয়। কারণ, আগেই বলেছি বৃহস্পতি জাতকের পক্ষে নির্ভেজাল শুভ ফলদাতা নয়। তা ছাড়া রাশিচক্রে কয়েকটা জিনিষ লক্ষ্য করবার মতো আছে। যেমন, শত্রুপতি শনি গ্রহ, শত্রু স্থানকে পূর্ণ দৃষ্টি করছে। তাতে শনি গ্রহ আবার বক্রী। তুঙ্গ চন্দ্র থেকে চতুর্থে বক্রী শনির অবস্থান, জাতককে প্রায়ই বিভ্রান্ত করেছে। প্রবল শত্রুতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তবুও তৃতীয় স্থানে রাহুর অবস্থান, জাতককে যথেষ্ট-ভাবে পরাক্রমশীলতায় সাহায্য করেছে। জাতকের ভাগ্যপতি শুক্র, ভাগ্যস্থান থেকে ভাগ্যস্থানে বসে আছে। তাই জাতকও ভাগ্যের ইঙ্গিত বুঝতে পেরে, ভাগ্যের অপেক্ষায় রইলেন। রাশি থেকে শনি গ্রহ জাতকের পক্ষে রাজযোগকারক গ্রহ। বৃহস্পতির পর এল শনির মহাদশা। ৫৮ সালের মাঝামাঝির পর জাতক দুর্দান্ত প্রতাপে, নির্বাচনে তৎকালীন প্রবল পরাক্রম-শীল শত্রুদের সম্মুখীন হলেন। জাতক বুধের অন্তর্দশাও পেলেন; জাতক অন্ধ্রপ্রদেশের রাজনীতিতে যোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেন। এই শনির মহাদশা, (যা '৫৮ সাল থেকে '৭৭ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত ছিল) জাতক রাশি থেকে ভাগ্যপতির মহাদশা সম্যকভাবে ফলভোগ করেছেন। তিনি রাজ্য মন্ত্রিসভা থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায়, এমন কি রাজনীতির সার্থক ফল স্বরূপ, ভারতের বৃহৎ রাজ্য উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল রূপেও ভূষিত হয়েছিলেন। অবিশ্যি, গোচরেও শনি এবং বৃহস্পতির অবস্থান তখন উল্লেখ-যোগ্য।

এল বুধের মহাদশা। '৭৭ সালের মাঝামাঝির পর থেকে ১৭ বৎসরের জন্য। জাতক পেল গোচরে ও গ্রহকুলের সহায়তা। বুধের দশাতে প্রথমেই বুধের অন্তর্দশা ২ বৎসর ৫ মাসের মতো; জাতক রাজনীতিতে আবার দক্ষতা দেখিয়ে ছিল রাজ্যবাসীকে, দেশবাসীকে। জাতক প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যেও '৭৮-এর রাজ্য নির্বাচনে বিপুল ভোটে নিজের দলকে জয়ী করে—প্রতিষ্ঠিত করলেন, অন্ধ্রপ্রদেশের রাজনীতিতে। নিজে ধরলেন রাজ্যের হাল, হলেন মুখ্যমন্ত্রী।

জাতকের, বর্তমানে চলছে পঞ্চম মহাদশা। সে দশা জাতকের পক্ষে শ্রেষ্ঠ দশা বলে গণ্য হবে। জ্যোতিষী দৃষ্টিতে আগামী '৮১ সাল জাতকের পক্ষে একটি

আমরা বলেছিলাম

২ জুন ১৯৭৮ ।। ইন্দিরা গান্ধী
আগস্ট মাস থেকে বৃহস্পতি সহায়।

৯ জুন ১৯৭৮ ।। মোরারজী দেশাই
....সিংহরাশিতে শনি মঙ্গলের মিলন জুন জুলাই মাসে। আগস্টে মঙ্গল রাহুর মিলন কন্যারাশিতে....অশুভের ইঙ্গিত বহন করে।

১৪ জুলাই ১৯৭৮ ।। প্রফুল্ল সেন
জুন মাসের পর প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। ....১৮ জুলাই থেকে গ্রহের এমনই পরিস্থিতি সপ্তাহের মাঝামাঝি এবং কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে চাঞ্চল্য....

২৮ জুলাই ।। জগজীবন রাম
....ভাগ্যস্থান এবং ভাগ্যবতীকে বৃহস্পতি দৃষ্টি করবে, কিন্তু আগস্ট থেকে আগামী মার্চ পর্যন্ত স্বাস্থ্য সম্পর্কে সতর্কতা এবং কোন সন্তান সম্পর্কে উদ্বেগ....প্রাকৃতিক ও আইনশৃঙ্খলা বিপর্যয়....।

২৫ আগস্ট ।। ১৯৭৮
গ্রহ সন্নিবেশ এমনই যে ভারতের রাজনীতি চাঞ্চল্যের দিকে ঘড়ির মত এগিয়ে যাবে.. ।

দক্ষিণ শহরতলীর অভিজাত
সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্র।
কণ্ঠ - যন্ত্র - নৃত্য
সর্বশ্রী চিন্ময় লাহিড়ী, অখিল-বন্ধু ঘোষ, সবীর খাঁ, ডলি চ্যাটার্জী এবং রবীন্দ্র সঙ্গীতের সকল বিভাগ অমল নাগ, হেনা সেন ও কানুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত।
মেট্রোপলিটন কলেজ
২৪১।১, ডায়মণ্ডহারবার রোড, বেহালা, কলিকাতা—৩৪। ফোন : ৪৫-০৯৩৯
IDEAL ADVTG

উল্লেখযোগ্য বৎসর বলে পরিগণিত হবে বলে অনুমিত হয়। কারণ, তখন জাতক বুধের দশাতে, ভাগ্যপতি শুক্রের অন্তর্দশা ভোগ করবেন। তারপরই পাবেন আষাঢ় বর্গোত্তম রবির অন্তর্দশা। সেও লক্ষণীয়ভাবে ফল দান করবে। জাতকের পক্ষে '৮১—৮৩ সাল অত্যন্ত শুভ ফলদাতা হবে।

ব্যক্তিগত রাশিফল

নীচে সম্ভাব্য ব্যক্তিগত রাশিফল বলছি। সপ্তাহটি ইংরাজী ২২শে অক্টোবর থেকে আরম্ভ।

মেষ :—কর্মস্থানের আবহাওয়া আপনার অনুকূলে যাবে। বিরোধীভাবাপন্ন শক্তিরা বশে আসবে। হঠাৎ প্রাপ্তি-যোগের ইঙ্গিত। ভ্রাতৃ-বিরোধ এড়িয়ে চলুন। রবি, সোমবার শুভ।

বৃষ :—নিজের বৈশিষ্ট্যে কর্মস্থানে প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকবে। সন্তানের জন্য উৎকণ্ঠা দেখা যায়। পুরনো কোন সমস্যা দেখা দিতে পারে। বুধবার কার্যসিদ্ধি।

মিথুন :—অহেতুক দুশ্চিন্তা থাকবে। অধস্তন কর্মচারীর মতিগতি অবাঞ্ছনীয় হয়ে উঠবে। আর্থিক অবস্থা গতানুগতিক। সোম, শুক্র, শনি, শুভ।

কর্কট :—নিজ গুণের স্বীকৃতি পাবেন। কোন সন্তানের ব্যাপারে আনন্দ পাবেন অহেতুক ব্যয় সংকোচ বাঞ্ছনীয়। বুকের ব্যথা-বেদনা থেকে সাবধান। মঙ্গল, বুধ শুভ।

সিংহ :—আর্থিক ক্ষেত্রে জবনার ফেলতে পারে। কোন নিকট জনের সঙ্গে বিরোধ দেখা যায়। কিন্তু কর্মস্থানে প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ থাকবে। শুক্র, শনি শুভ।

কন্যা :—নির্ধারিত প্রাপ্তিতে বিঘ্ন হতে পারে। কর্মস্থানেও কিছু অশান্তি অসম্ভব নয়। কিন্তু পুরনো কোন আমেলার সুরাহা হতে পারে। মঙ্গল, বুধ শুভ।

তুলা :—ব্যয়াধিক্যের চাপে জর্জরিত। গৃহ-বাড়ী অশান্তি দেখা দিতে পারে। এমন যোগও আছে। বুধ, বৃহস্পতি-বার লক্ষণীয়।

বৃশ্চিক :—কর্মস্থানে, সমাজে নিজ গুণের মর্যাদা পাবেন। গোপন সূত্রে আয়-বৃদ্ধি। দূরের কোন সংবাদ বিচলিত করতে পারে। মঙ্গল, বুধ অশুভ।

ধনু :—দুশ্চিন্তা থাকবে। স্বাস্থ্যও উৎপাত করবে। কর্মস্থানে নতুন মুখ থেকে সাবধান। আয়, ব্যয় সমতা রক্ষা করা মুস্কিল। বৃহঃ শুক্রবার অশুভ।

মকর :—যাহাই ঘটুক না কেন ধৈর্য হারাবেন না। নিকট ভবিষ্যতের শুভ ইঙ্গিত পাবেন। স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখুন। ঘরে কারোর অসুখ বিসুখও হতে পারে। এরই মধ্যে মঙ্গল, বুধবার শুভ।

কুম্ভ :—অর্থকড়ির ব্যাপারে বিরোধ বিভ্রাট এড়িয়ে চলুন। সপ্তাহের মাঝামাঝি কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে।

মীন :—মানসিক অশান্তি থাকবে। ভ্রাতৃ-সূত্রে অর্থকড়ির সমাধা হতে পারে। দূরের সংবাদে কৌতূহল বৃদ্ধি পাবে। বুধবার কোন কারণে অশান্তি

শ্রীমা

ক্যালিক্স® স্যানিটারী ট্যাম্পুন
প্রতিমাসের অস্বস্তিকর পাঁচদিন আপনাকে সহজ ও নিরিঘ্ন রাখবে।
বৈশিষ্ট্য :
★ অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের উপযোগী করে প্রস্তুত।
★ ব্যবহারের-পদ্ধতি খুবই সহজ, বেল্ট বা পিন লাগে না।
★ অভ্যন্তরে থাকাকালীন কোন অস্বস্তিকর অনুভূতি থাকে না।
★ প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কোন স্বাভাবিক কারণে পরিবর্তন অনাবশ্যক।
★ অথচ সাধারণ ন্যাপকিনের মতই কার্যকর।
ষ্টিউবে এবং বিনা ষ্টিউবে পাওয়া যায়।

এজেন্ট চাই
ফেয়ারওয়ে ট্রেডিং কোং
৩৯, শীতলাতলা লেন, কলিকাতা-৭০০০১৯
ফোন : ৩৫-৪১৪৫

চিক্‌মাগালুর
নির্বাচন ও
ইন্দিরা গান্ধী

বাংলা আবার চ্যাম্পিয়ন

গৌতম সরকারের ভাগ্য ভাল। এবারও জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে বাংলা সন্তোষ ট্রফি ঘরে তুলতে পেরেছে।

কিন্তু এই কৃতিত্ব অর্জন করার জন্যে বাংলাকে যথেষ্ট কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। অনেক ঝামেলা এড়িয়ে, ষড়যন্ত্রের জাল ছিঁড়ে তবেই গৌতমের নেতৃত্বে বাংলা এবারও সন্তোষ ট্রফি কলকাতায় বয়ে আনতে পেরেছে। গৌতম বলেছেন বাংলার এই সাফল্যের জন্যে দলের প্রতিটি খেলোয়াড় কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন। সকলের সমবেত প্রচেষ্টাতেই বাংলা সব চক্রান্তের যোগ্য জবাব দিয়েছে।

বাংলাকে হারাবার জন্যে, বাংলার কাছ থেকে সন্তোষ ট্রফি ছিনিয়ে নেবার জন্যে এবার চক্রান্তই হয়েছিল। তার পরিচয় বাংলার খেলোয়াড় ও কর্মকর্তারা মাঠে এবং মাঠের বাইরে প্রতি পদে পদে পেয়েছেন। আর তারপরই সেই চক্রান্তের জাল ছিন্নভিন্ন করার জন্যে বাংলার খেলোয়াড়রা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে খেলতে নেমেছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন, খেলেই তাঁরা জবাব দিতে। তা তাঁরা দিয়েছেন। আর এমনভাবে দিয়েছেন, যার কথা কাশ্মীরের মানুষ কোনদিন ভুলতেই পারবেন না। খেলার মত খেলেছেন বাংলার প্রতিটি খেলোয়াড়।

এবার বাংলার সামনে মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন রেফারিরা। তারপর অন্য রাজ্য দলগুলির মধ্যে গোয়া আর মহারাষ্ট্র। বেশ মনে আছে গত ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতার আসরে রানার্স আপ হয়ে ফিরে যাবার সময় পাঞ্জাবের খেলোয়াড়রা জোর গলায় বলে গিয়েছিলেন যে কলকাতার ঐ পরাজয়ের প্রতিশোধ তাঁরা ৬ মাস পরে শ্রীনগরে নেবেন। বাংলাকে তাঁরা সেখানে হারাবেনই। পাঞ্জাবের অধিনায়ক ইন্দর সিং হাওড়া স্টেশনে জোর দিয়ে একথা বলেছিলেন।

তাঁরা কিন্তু তখন স্বপ্নেও ভাবেন নি যে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে পাঞ্জাব দলের এমন অবস্থা হবে যে তারা প্রতিযোগিতার প্রাথমিক গন্ডীই ডিঙোতে পারবে না। তার অবশ্য কারণও আছে। লালাজী তাঁর লিডার্স ক্লাব ভেঙ্গে দিয়েছেন। সেই দলের খেলোয়াড়রা এখানে ওখানে চলে গেছেন। পাঞ্জাবের সামনের সারির দুই খেলোয়াড় হরজিন্দার সিং ও গুরদেব সিং কলকাতায় খেলবেন। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষে খেলার জন্যে আন্তঃ রাজ্য ছাড়পত্রে সই করেছেন তাঁরা। তাঁদের সঙ্গে আছেন মনজিৎ সিংও। এই তিনজনকে বাদ দিয়ে পাঞ্জাব দলের অবস্থা শোচনীয় হবে পড়ে। হরজিন্দর আর গুরদেবের অভাব তারা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করেছেন। ফলে সেই ভাঙ্গা দল নিয়ে ইন্দর সিং কিছুতেই সাফল্যের কুড়ি ছুঁতে পারেন নি। হাওড়া স্টেশনের সেই প্রতিজ্ঞা তাঁদের কথার কথা হয়েই রয়ে গেল।

ভাঙ্গা দল ছিল গতবারের আর এক সেমিফাইনালিস্ট কেরলেরও। তাদেরও সামনের সারির খেলোয়াড়রা রাজ্য ছেড়ে কলকাতায় খেলতে আসার জন্যে আবেদন করেছেন। তাই তারাও পাবে নি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে। তবে সব থেকে হতাশ করেছে রেলওয়ে। জাতীয় ফুটবলের কলকাতার আসরে রেল দল দারুণ খেলেছিল। সেমিফাইনালে উঠেছিল তারা। বাংলার সামনে ছুঁড়ে দিয়েছিল জোর চ্যালেঞ্জ। সেই রেল দলই শ্রীনগরে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে এল। গ্রুপের দিকেই তারা হেরে হেবে পাঞ্জাবের মত বিদায় নিয়ে এসেছিল এবারের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর থেকে। পাঞ্জাব ও রেল সবে যাবার পর বাংলার সামনে শক্ত বাধা হয়ে দাঁড়াল গোয়া ও তারপর মহারাষ্ট্র।

গোয়ার দলগত শক্তি যত না ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী ছিল গা-জোয়ারি মনোভাব। গোয়ার খেলোয়াড়রা তেড়ে ফুঁড়ে, মেরে ধরে খেলেছেন। তবে বাংলা এগিয়ে যাবার পর যদি আত্মরক্ষার দিকে বেশী নজর না দিত তাহলে গোয়ার পক্ষে কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ের লীগের খেলায় ফলাফল সমান সমান করা কিছুতেই সম্ভব হত না। তবে গোয়ার সেই খেলাটি ২-২ গোলে অমীমাংসিতভাবে শেষ হওয়ায় কিছু আসে যায় নি। তবে সেমিফাইনালের প্রথম পর্বে মহারাষ্ট্রের কাছে বাংলার হেরে যাওয়া রীতিমত অপ্রত্যাশিত ছিল। মহারাষ্ট্র এমন কিছু দল নয়। অন্তত বাংলাকে হারাবার মত তো নয়ই। তবু সেই মহারাষ্ট্রের কাছেই বাংলাকে হার স্বীকার করতে হল। কিন্তু কেউই তাতে হাল ছেড়ে দেয় নি। সকলেই ধরে নিয়েছিলেন, সকলেই মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে সেমিফাইনালের দ্বিতীয় পর্বের খেলায় বাংলা প্রয়োজনীয় গোল করে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র সংগ্রহ করে নিতে পারবে। দ্বিতীয় পর্বের খেলায় বাংলার কম করেও দু গোলের ব্যবধান গড়ে তোলার দরকার ছিল। বাংলা করলও তাই। কিন্তু সেই এগিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষামূলক খেলার দিকে বেশী নজর দেওয়ার জন্যে খেলা শেষের বাঁশী বাজার ঠিক আগের মুহূর্তে মহারাষ্ট্র একটি গোল শোধ করে দিল। বাংলা তখন ২-১ গোলে এগিয়ে। দু খেলা মিলিয়ে দু দলেরই তখন সমান সমান অবস্থা। তাই খেলা গড়াল অতিরিক্ত সময়ে। এবং সেই সময়ে বাংলা আরো একটি গোল করে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়ে গেল।

কিন্তু এই সেমিফাইনাল খেলা পর্যন্ত বাংলাকে নানাভাবে ভুগতে হয়েছে। সব থেকে বিশ্রী ব্যাপার হয়েছে রেফারিদের পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ। সব সময়ই তারা বাংলার খেলোয়াড়দের ওপর খড়্গহস্ত ছিলেন।

সেমিফাইনাল খেলায় বাংলার দিলীপ পালিত এমন কিছু অন্যায় করেন নি যাতে তাঁকে লাল কার্ড দেখিয়ে মাঠ থেকে বের করে দিতে হল। ফলে দীর্ঘ সময় বাংলাকে যেমন দশজনে খেলতে হয়েছিল, তেমনি ফাইনাল খেলায় বাংলাকে বঞ্চিত হতে হয়েছিল দিলীপের মত নির্ভরযোগ্য একজন খেলোয়াড়ের সহযোগিতা থেকে। অথচ রেফারিকে গালাগাল করেছেন বলে দিলীপের নামে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা মনে হয় আদৌ সত্য নয়। অন্তত বাংলার খেলোয়াড়রা তো তাই বলছেন। শুধু তাই নয় প্রায় প্রত্যেক খেলাতেই বাংলার খেলোয়াড়দের অহেতুকভাবে সতর্ক করে দেওয়া হত। দেখানো হত হলুদ কার্ড, আর উদের পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর অভিযোগ তো গাদা গাদা আছে। প্রতিযোগিতার শুরু থেকে সেমিফাইনাল খেলা পর্যন্ত বাংলাকে এইভাবে রেফারিদের অসহযোগিতার মোকাবিলা করতে হয়েছে।

তবে গোয়া বাংলার ফাইনাল খেলাটির বিরুদ্ধে বাংলার খেলোয়াড়দের কোন অভিযোগ নেই। বরং দিল্লি, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানের কয়েকটি কাগজ সেই সম্বন্ধে লিখেছে যে বাংলার বিরুদ্ধে রেফারিরা যে মনোভাব এতোদিন দেখিয়েছিলেন, ফাইনাল খেলায় তা সুদে আসলে উশুল করে দিয়েছেন ফাইনাল খেলার পরিচালক।

ফাইনাল খেলায় বাংলার পক্ষে গোলটি করেছিলেন মানস ভট্টাচার্য। সেই খেলায় বাংলা আরো বেশী গোল করার সুযোগ পেয়েছিল। খেলাটিও হয়েছিল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। বাংলার রক্ষণভাগে শ্যামল ব্যানার্জি, চিন্ময় চ্যাটার্জি দারুণ খেলেছিলেন। কিন্তু মাঝ মাঠে গৌতম আর প্রসূন ছিলেন অনন্য। দলের আক্রমণ এবং রক্ষণকার্যে তাঁরা সমানভাবে সামিল হয়েছিলেন। আক্রমণভাগকে বলের পর বল জুগিয়ে যেমন দলের আক্রমণ চালা করে তুলছিলেন, তেমনি দরকারের মুহূর্তে পিছিয়ে এসে হাল ধরেছিলেন দলের আত্মরক্ষার। বাংলার খেলাও খুলে গিয়েছিল। তাঁরা বার বার দুই লিঙ্কম্যান ভাল খেলার আক্রমণভাগের হানা দিয়েছিলেন গোয়ার রক্ষণভাগে। এবং তারই পুরস্কার মানস ভট্টাচার্যের ঐ গোল।

বাংলা এখন এক ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি। প্রলয়ঙ্কর বন্যা রাজ্যের বারোটি জেলাকে গ্রাস করেছে। চারদিকে আজ হতাশা, চারদিকে আজ সব হারানোর প্রশ্ন। তারই মধ্যে শ্রীনগরে বাংলার এই জয় সমস্যাজর্জরিত মানুষকে মুহূর্তের জন্যে এনে দিয়েছিল একটু স্বস্তি। তাই বাংলার খেলোয়াড়দের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

সুভাষ ঘুষ খায় না

আমি বলা করাতে অবেই মাকি সুভাষের 'লাকি ডে' হয়। খেলোয়াড়দের এসব কুসংস্কার থাকে।

দু বছর আগে আই এফ এ আমায় তাদের স্পোর্টস মেডিসিন-এর অ্যাডভাইসারি বোর্ড থেকে সরিয়েছে সত্যি কথা বলার অপরাধে।

কিন্তু এবছর আমায় খেলার মাঠে আস্তে আস্তে সুভাষকে দিয়ে শুরু করে টেনে নিলো।

খেলার জগতের অলিগলি দেখেছি—তা বলতে এবং প্রমাণ করা বড় শক্ত।

তবে বলতে গেলে প্রথম গল্পটা বলব ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগানের খেলার গল্প। এই গল্পটা সম্বন্ধে নানা মুনি নানা কথা লিখেছেন। কিন্তু একটা ফাঁক থেকে গেছে। ভেতরের কথা, মানে কেউ না জানলেও বলতে পারবে না।

দুটো বড় ক্লাবেরই আছে নিজস্ব কিছু পকেট টীম যারা ইস্ট আর ওয়েস্ট-এর কথায় ওঠে বসে। এদের ভালবাসার মূল কারণ যদি এদের দিয়ে কোনরকমে বিরুদ্ধ দলকে ভয় করাতে পারে।

আই এফ এ যখন উন্নতি করে গেলো এবং ইস্ট খেলা করতে বাধ্য হলো।

এইভাবেই একদিন যখন নিশ্চিহ্ন হবার আর সেই দিন বোধহয় বিশ্বযুদ্ধের মতই। বাজারে গুজব : সুভাষ ১০,০০০ টাকা নিয়েছে গোল করবে ইস্ট-এর বিরুদ্ধে। ও নিজেও বলে কেন জানি না ইস্ট-এর এগেইনস্টে এ আমি খেলতে পারি না।

খেলা করতে চলেছি ইস্ট আর ওয়েস্ট-এর সকলের সঙ্গে। অরুণ ঘোষকে পেলাম না। পেলাম ওয়েস্ট-এর ক্যাম্পে। কালীঘাটে জোড়া পাঁঠা দিয়ে সুভাষের বাল্যবন্ধু শমিত ভঞ্জও আমার সঙ্গ নিয়েছে।

শেষে গেলাম সুভাষের কাছে, জানতে ওর কানে ওর ঘুষ নেবার কথা উঠেছে কিনা—হাসলো, জানে। জিজ্ঞাসা করলাম একটু, পরে এক ডাকতারকে সুভাষের বাড়ী থেকে বেরিয়ে একটা ডেক্সিড্রিন বা ডোপ তিনি সরবরাহ করেছেন। শুনলাম অনেকখানি।

বৃষ্টি নেমেছে। ওয়েস্ট-এর সাপোর্টাররা নাচছে। ইস্ট-এর সমর্থকরা কড় ভয়ে আছে কি হয়। পয়েন্টে যদিও পিছিয়ে—যা ১০০ বছরের ইতিহাসে হয়নি, জিতেও লাভ নেই তবু এতো ইসরাইল আর আরব মার্কা ব্যাপার। ভীড়ের রাস্তা। সঙ্গে সুভাষ আর শমিত ভঞ্জ।

মাঠে ঢুকতেই কানে এলো ঝড়ের খবর। মাঠে আগে কে নামবে তাই নিয়ে। বলে গেলো পাগলরা। এক অদ্ভুত চরিত্র। সারাদিন মাঠে পড়ে থাকে। দু টাকা বখশিস—এই ওর জীবিকা। ওয়েস্ট-এর ক্যাম্পে ওর নাম পাগলা।

ঢুকেই মালনাদা একটু বিচলিত, তবু জানালো। ফুটবল সেক্রেটারি তেওয়ারি হাসতেও পারল না। পি সমখেল বলে গেলো মারপিট হবেই হবে।

দুতে গেছে ইস্ট-এর ক্যাম্পে জানতে কখন আসবে? সাফ জবাব এসেছে 'হোম টিম না নামলে নামবে না।

পি, কে-র দাবি লাস্ট ইয়ার আমাদের মাঠে নামিয়ে ২০ মিনিট দাঁড় করিয়ে ছেলেদের ক্লান্ত করেছে। ও নামবে না।

হাবিব অন্য পথ নিয়েছে। লাস্ট ইয়ার আগে নেমে হেরেছে। এবার তা হবে না।

পাবলিক ক্ষেপে গেছে। পুলিশ হতভম্ব। একবার চেষ্টা করলাম ইস্ট-এর ক্যাম্পে যেতে সেখানে শুধু ফুসছে পিস্টু, কিছুতেই নয় আগে ওদের নামতে হবে।

সকলে জেনে, তাই সাঁতার কাটতে আসছে লোকের ওপর দিয়ে, নাটক চলেছে।

কানে এলো সুভাষ চেঁচিয়ে ডি, সি, ডি ডি রসীদ খানকে বলছে এ ব্যাপারে একবার কোনো কথা বল না, এটা আমাদের নিজেদের ব্যাপার। রসীদ আর সুভাষ ঘনিষ্ঠ বন্ধু, কিন্তু অন্য কেউ কাউকে চেনে না।

হঠাৎ মনে হোলো মাত্র পড়লো বুঝি—না—সুরজিৎ আর প্রসূনকে নিয়ে মাঠে ঢুকছে। পি, কে রাজি হয়েছেন। ফিফা-র নিয়ম মানতে। একসঙ্গে ওরা ঢুকলো।

খেলা শুরু হোলো, খেলা শেষ হোলো, আমার বলার কিছু নেই। শুধু একটা কথা। সকালে যার নামে ঘুষের অভিযোগ ছিলো তা কি তৈরি করা বলে শ্যাম থাপা গোল দিয়ে জেতালো।

খেলা চলছে। কার কতটা চোট দেখার পর দেখি সুভাষ বসে আছে। কাঁদছে। বল্গণার ইনজেকশন নিয়ে খেলতে বাধ্য হয়েছিলো। লিগামেন্ট ছিঁড়েছে। পেইন কিলার খেয়ে কাঁধে নিয়ে সকলকে হাত নেড়ে বাইবে বেবুলাম। যখন ওয়েস্ট-এর ক্যাম্পে বাজি ফাটছে তখন আজকের নায়ক চলেছে কাতরাতে কাতরাতে। তার কানে ঐ আওয়াজের আজ কোনো মানে নেই।

ওর বড় প্রিয় সুরজিৎ তাকে একবার দেখবে গাড়ীতে উঠে বললো। না, পেলাম না কোথাও খুঁজে।

তখন অনেক রাত। চারধারে থকথকে পিন্ড। আমি কেটে পড়েছি। শমিত ভঞ্জ নাচছে। আজ ওরা মাতাল। ওর বন্ধু সুভাষ ভুলিয়ে দিয়েছে। সুভাষ এখন অনেকটা শান্ত। যন্ত্রণা কম।

আমার বাইরে ছাড়তে এলো। জানতে চায় আমিও কি বিশ্বাস করি ও ঘুষ খায়?

উত্তর ছিলো না কিছু। শুধু জড়িয়ে ধরা ছাড়া।

পিনাকী চট্টোপাধ্যায়

চক্রান্ত আমাদের দমাতে পারেনি

শ্রীনগরের মত শৈলশহরে আমরা এবারই প্রথম খেললাম। শ্রীনগর ভীষণ ভ্রাই জায়গা। ছ হাজার ফুট ওপরে। জলপমাত্রা দারুণ ওঠানামা করে। এইরকম জায়গায় উন্নত মানের ফুটবল খেলব তা কোন দিন ভাবি নি। তবে আমরা যা খেলেছি কাশ্মীরের দর্শকরা অনেক দিন সেই খেলার কথা মনে রাখবেন।

আমার স্মার্ভিসেস অব গোরাকেই ভাল লেগেছে। ওরা অনেক উন্নত মানের ফুটবল খেলেছে। মহারাষ্ট্রকে তেমন কিছু মনে হয়নি। রেফারিং অধমতম হয়েছে। রেফারির যদি দায়িত্বশীল না হন এবং পক্ষপাতশূন্য না হন তাহলে খেলার সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। আমার মতে পৃথিবীর কোথাও এই ধরনের অধম রেফারিং হয়নি। আমার মতে দ্বিজেন পালিতকে লাল কার্ড দেখানো যুক্তিযুক্ত ছিল। এই সময় আমার দলের অন্য চেঙ্গাপ্পাকেও রেফারীকে লাল কার্ড না

দেখানোর যে অনুরোধ করবে সেটাই তো স্বাভাবিক। রেফারীর রিপোর্ট অনুযায়ী সুকবিৎ তার কাছ থেকে কার্ড ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিল এবং আমিও নাকি খেলার শেষে অশোভন আচরণ করেছিলাম (যা আদৌ সত্য নয়) এবং সেই অনুসারে টুর্নামেন্টের ডিসিপ্লিন কমিটির কাছে আমাদের হাজির হতে হয়েছিল। এইতো আমাদের বেফারীর পরিচালনার চেহারা। এ রকম নানান ধরনের চক্রান্ত আমাদের দমাতে পারেনি। আমরা খুব দ্রুতলয়ে খেলেছি। আমাদের কখনো মনে হয়নি যে আমরা ভিন্ন দলের ভিন্ন জাতিক। আমাদের মনে হয়েছে আমরা একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদলের কোচ শ্রদ্ধেয় অচ্যুতদা (অচ্যুত বানার্জি) এবং ম্যানেজার অশোক মিত্র দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন। আর একজনের কথা না বললে অন্যায় হবে। তিনি হচ্ছেন যে হোটেলে আমরা ছিলাম তার মালিক শ্রীলোকেশ বানার্জি।

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য গেলে নিশ্চয়ই আমাদের দল আরও একটু ভারী হোত। এশীয় ক্রীড়ার প্রশিক্ষণ শিবিরে যদি ইন্দর সিং ডাক পেতে পারে তাহলে আমাদের শ্যাম সুধীর হাবিব কি অন্যায় করল?

শ্রীনগরের খেলা দেখে যখন এশীয় ক্রীড়ার জন্যে খেলোয়াড়দের শিবিরে ডাকা হল তখন আমি বাংলার দলনায়ক হিসাবে আরো খুশী হতাম যদি মিহির, মানস, শিবাজী, প্রশান্তকে এশিয়ান গেমস্ টুর্নামেন্টে ডাকা হত।

তপনকুমার দাস

সন্তোষ ট্রফি

শ্রীনগরে ৩৫তম জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে বাংলা ১—০ গোলে গোয়াকে হারিয়ে এই নিয়ে ২৭ বার ফাইনালে খেলে ১৮ বার সন্তোষ ট্রফি জয়ী হল। তাছাড়া এবার নিয়ে বাংলা সন্তোষ ট্রফি পেল উপর্যুপরি চারবার (১৯৭৫-৭৮)। এর আগেও একবার বাংলা এইভাবে উপর্যুপরি চার বছর সন্তোষ ট্রফি জয় করেছিল (১৯৪৭, ১৯৪৯-৫১)। ১৯৪২ সালে প্রতিযোগিতার আসর বসেনি। বাংলা ছাড়া অপর কোন দলের পক্ষে উপর্যুপরি তিনবারও সন্তোষ ট্রফি জয় সম্ভব হয়নি। গোয়ার পক্ষে সন্তোষ ট্রফির ফাইনালে খেলা এই প্রথম। এর আগে গোয়া তিনবার সেমি-ফাইনালে খেলে প্রতিবারই হারের মুখে পড়তে হয়েছিল।

ফাইনালে গোয়ার বিপক্ষে বাংলার জয়সূচক গোলটি করেন মানস ভট্টাচার্য, দ্বিতীয়ার্ধের খেলার ২৪ মিনিটের মাথায়। প্রথমার্ধের খেলাতেই বাংলার একাধিক সুযোগ এসেছিল। বিশেষ করে মধ্যমাঠ থেকে সুবল গোস্বামী বল দেওয়ার সুযোগে সদ্ব্যবহার করতে পারেনি। এই নিঃসন্দেহে তাদের খেলার একটা বিশেষ ত্রুটি। এ বছরের কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলা একদম শেষের খেলা ২—২ গোলে ড্র যায়। খেলার ৭৬ মিনিট পর্যন্ত বাংলা ২—০ গোলে এগিয়ে ছিল। কিন্তু শেষের পাঁচ মিনিটে মধ্যে দুটো গোল দিয়ে শেষ পর্যন্ত খেলা ড্র করে। ফাইনালে বাংলা কোনও ভুল করেনি।

১৯৪২ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল—এই ৩৬ বছরে জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হয়েছিল ৩৫ বার। যুদ্ধের দরুন তিনবার (১৯৪২-৪৩ ও ১৯৪৮ সালে) বাদ পড়া ৩২ বারের মধ্যে ফুটবল প্রতিযোগিতায় বাংলা ২৭ বার ফাইনালে খেলে ১৮ বার সন্তোষ ট্রফি জয়ী হয়েছে। জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় ইতিহাসে বাংলার এই তিনটি রেকর্ড অটুট অক্ষুণ্ণ আছে—(১) সর্বাধিকবার ফাইনালে খেলা (২৭ বার), (২) সর্বাধিকবার সন্তোষ ট্রফি জয় (১৮ বার) এবং (৩) উপর্যুপরি চার বছর সন্তোষ ট্রফি জয় (৩ বার)।

এ পর্যন্ত ১৩টি দল সন্তোষ ট্রফির ফাইনালে খেলেছে এবং মহীশূর ও মহারাষ্ট্র বাদে বাকি ১১টি দল এইভাবে সন্তোষ ট্রফি জয়ী হয়েছে : বাংলা ১৮ বার, হায়দরাবাদ (বর্তমানে কর্ণাটক) ৪ বার, রেলওয়ে ৩ বার, পাঞ্জাব ২ বার, হায়দরাবাদ ২ বার এবং একবার করে কেরল, দিল্লী, বোম্বাই, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র এবং সার্ভিসেস।

ফাইনালে বাংলা

বাংলা এ পর্যন্ত ২৭ বার ফাইনালে খেলে কিভাবে ১৮ বার সন্তোষ ট্রফি পেয়েছে এবং ৯ বার রানার্স-আপ হয়েছে তার হিসাব :

জয় ১৮ বার : বাংলা ফাইনালে বোম্বাইকে ৪বার, মহীশূরকে ৩ বার, হায়দরাবাদকে ২ বার, সার্ভিসেসকে ২ বার এবং একবার করে দিল্লী, রেলওয়ে, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব এবং গোয়াকে হারিয়ে মোট ১৮বার সন্তোষ ট্রফি জয়ের গৌরব লাভ করেছে।

রানার্স-আপ ৯ বার : বাংলা ফাইনালে মহীশূরের কাছে ৪ বার এবং একবার করে দিল্লী, রেলওয়ে, অন্ধ্র, পঞ্জাব এবং সার্ভিসেস দলের কাছে হেরে মোট ৯ বার রানার্স-আপ হয়েছে।

সদ্যসমাপ্ত ৩৫তম জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় চূড়ান্ত খেলোয়াড়দের তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করেছেন গোয়ার ফরোয়ার্ড ভি সুক্ত এবং সার্ভিসেস দলের চন্দ্রবীর থাপা। দুজনেই ৭টি করে গোল করেছেন। ৬টি করে গোল করার সুবাদে তালিকায় দ্বিতীয় স্থান পান পি কে কালচন্দন (কেরল) এবং প্রকাশেশ্বরণ (কর্ণাটক)। ৫টি করে গোল করে তৃতীয় স্থান পেয়েছেন এই চারজন—মহম্মদ হাবিবুর (বাংলা), জয়ন্নয়া (কর্ণাটক), সুধীর সরকার (সার্ভিসেস) এবং বর্নার্ড পেরেরা (মহারাষ্ট্র)।

ডেভিস কাপ

১৯৭৮ সালের আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠেছে আমেরিকা এবং বৃটেন। আমেরিকা ৭৯ বার ফাইনালে খেলে ডেভিস কাপ জয়ী হয়েছে ২৪ বার। অপরদিকে বৃটেন ১৬ বার ফাইনালে খেলে ডেভিস কাপ পেয়েছে মাত্র ৯ বার। সর্বাধিকবার ডেভিস কাপের ফাইনালে খেলার রেকর্ড আমেরিকার। আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়া ২৭ বার করে ডেভিস কাপ জয়ের সূত্রে যৌথভাবে সর্বাধিকবার ডেভিস কাপ জয়ের রেকর্ড রয়েছে। বৃটেনের শেষ ডেভিস কাপ জয় ১৯৩৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৩—২ খেলায়। বৃটেন শেষ ডেভিস কাপের ফাইনালে খেলেছে ১৯৩৭ সালে। এই শেষ ফাইনাল খেলায় তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ১—৪ খেলায় আমেরিকার কাছে হেরেছিল। আমেরিকা শেষ ডেভিস কাপ পেয়েছে ১৯৭২ সালে, রুমানিয়াকে ৩—২ খেলায় হারিয়ে। ডেভিস কাপের ফাইনালে আমেরিকা শেষ খেলে ১৯৭৩ সালে। এই খেলায় আমেরিকার প্রতিপক্ষ ছিল অস্ট্রেলিয়ার কাছে ০—৫ ম্যাচে।

১৯৭৮ সালের সেমি-ফাইনালে বৃটেন অপ্রত্যাশিতভাবে ৩—২ খেলায় গত বছরের ডেভিস কাপ বিজয়ী অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে। অপরদিকের সেমি-ফাইনালে আমেরিকা ৩—২ খেলায় পরাজিত করে সুইডেনকে।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বৃটেনের হেস্টার মেটাম এবং জন লয়েড সিঙ্গলসের খেলায় জিতে স্বদেশকে ২—০ খেলায় প্রথমদিনেই এগিয়ে দেন। দ্বিতীয়দিনের ডাবলসে জন কলস এবং ডেভিড লয়েড অপ্রত্যাশিতভাবে ১৯৭৭ সালের উইম্বলডন ডাবলস চ্যাম্পিয়ান মোয়া কেস এবং ক্রিওফ মার্কসকে হারিয়ে বৃটেনকে ফাইনালে তুলে দেন। তৃতীয়দিনের বাকি দুটি সিঙ্গলসের খেলায় বৃটেন হেরে যায়।

আমেরিকা বনাম সুইডেনের প্রথম দিনের খেলার ফলাফল সমান ১—১। ১৯৭৮ সালের উইম্বলডন সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান বিয়র্ন বর্গ (সুইডেন) পরিচিত বর্বন আমেরিকার আর্থার অ্যাশকে; অপর দিকে ভিটাস গেরুলাইটিস সুইডেনের জনসনকে হারিয়ে খেলার ফলাফল সমান ১—১ করেন। দ্বিতীয় দিনে আমেরিকান জুটি ডাবলসের খেলায় তিক্ত স্বদেশকে ২—১ খেলায় এগিয়ে দেন। তৃতীয় দিন অর্থাৎ অ্যাশ সুইডেনের জনসনকে হারিয়ে আমেরিকা ৩—১ খেলায় ডেভিস কাপ ফাইনালে উঠে যায়। শেষ সিঙ্গলসে গেরুলাইটিসকে পরাজিত করেন বিয়র্ন বর্গ।

ভারতীয় ক্রিকেট দল

পাকিস্তান সফরকারী ভারতীয় ক্রিকেট দল ৪০ ওভারে-সীমিত একদিনের আন্তর্জাতিক খেলায় পাকিস্তানকে ৪ রানে পরাজিত করেছে। টসে জিতে ভারতীয় দল ৭ উইকেটের বিনিময়ে ৪০ ওভারে ২৭০ রান সংগ্রহ করেছিল। মহিন্দর অমরনাথ দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৫১ রান করেন। পাকিস্তান ৮ উইকেটের বিনিময়ে ২৬৬ রান সংগ্রহ করেছিল। মজিদ খান এবং জহির আব্বাস দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে দলের ৬২ রান সংগ্রহ করেছিলেন। পাকিস্তান ইনিংসের দেরগোড়ায় পৌঁছে শেষ পর্যন্ত অল্পের জন্য পরাস্ত হবার গৌরব অর্জন করেন মহিন্দর অমরনাথ।

সম্মিলিত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বালুচিস্তান দলের বিপক্ষে তিন দিনের খেলাটি ভারতীয় দল কোনরকমে ড্র করে।

প্রথম দিনে সম্মিলিত একাদশ দল ৯ উইকেটে ২৬৮ রান তুলে খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। সম্মিলিত একাদশ দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৭৫ রান করেন জহির আব্বাস। চন্দ্রশেখর তিনটে উইকেট পান। প্রথমদিনের বাকি সময়ের খেলায় ভারতীয় দল একটি উইকেট খুইয়ে ৫ রান সংগ্রহ করেছিল।

দ্বিতীয় দিনে টা-পানের সময় ভারতীয় দল ৩০৩ রানের মাথায় (৭ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। ভারতীয় দল ৩৫ রানে এগিয়ে যায়। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৭১ রান করেন মহিন্দর অমরনাথ। দ্বিতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় সম্মিলিত একাদশ দল ৭ উইকেট খুইয়ে ৯৩ রান সংগ্রহ করেছিল।

তৃতীয় দিন [illegible]

দলের দ্বিতীয় ইনিংস ২০১ রানের মাথায় শেষ হলে খেলার বাকি ২০২ মিনিটে ভারতীয় দলের জয়লাভের জন্যে ১৬৭ রান সংগ্রহের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ভারতীয় দল জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৬৭ রান সংগ্রহ করতে পারেনি। ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংসের ১৩০ রানের মাথায় (৮ উইকেটে) খেলাটি শেষ হয়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

সম্মিলিত একাদশ ঃ ২৬৮ রান (৯ উইকেটে ডিক্লেঃ জাহির আব্বাস ৭৫ রান ও ২০১ রান (ওয়াশিম রাজা ৪৫ রান। বেদী ৬০ রানে ৩ এবং প্রসন্ন ৫১ রানে ৩ উইকেট)

ভারতীয় দল ঃ ৩০৩ রান (৭ উইকেটে ডিক্লেঃ, সুরেন্দর অমরনাথ ৭১, গাভাস্কর ৫২, কপিলদেব ৪৮ ও গায়কোয়াড় ৪৭ রান) ও ১৩০ রান (৮ উইকেটে। গাভাস্কার ৪৪ রান। আনওয়ার খান ৪২ রানে ৬ উইকেট)

মেয়েদের বিশ্বকাপ হকি

স্পেনের মাদ্রিদে আয়োজিত মেয়েদের তৃতীয় বিশ্বকাপ হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে হল্যান্ড ১—০ গোলে দ্বিতীয় বিশ্ব হকি কাপ জয়ী পশ্চিম জার্মানীকে হারিয়ে এই নিয়ে দু বার মেয়েদের বিশ্ব হকি কাপ জয়ী হল। হল্যান্ড প্রথম জয়ী হয়েছিল ১৯৭৪ সালে, প্রতিযোগিতার উদ্বোধন বছরে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে।

এ বছরের প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ১০টি দেশ দুটি গ্রুপে সমান ভাগ হয়ে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলেছিল। এবং প্রতি গ্রুপের লীগ চাম্পিয়ান এবং রাণার্স-আপ দেশ মূল প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে উঠেছিল এ গ্রুপ থেকে পশ্চিম জার্মাণী ও বেলজিয়াম এবং বি গ্রুপ থেকে হল্যান্ড ও আর্জেন্টিনা। সেমি-ফাইনালে হল্যান্ড হারিয়েছিল বেলজিয়ামকে এবং আর্জেন্টিনা হেরেছিল পশ্চিম জার্মাণীর কাছে। তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান নির্ণয়ের জন্য আর্জেন্টিনা এবং বেলজিয়ামের মধ্যে যে খেলা হয়েছিল তা গোলশূন্যভাবে শেষ হয়। ফলে এই দুই দেশকেই ব্রোঞ্জ পদক দেওয়া হয়।

কানাডা ৪—০ গোলে জাপানকে হারিয়ে ৫ম স্থান, ভারত ১—০ গোলে স্পেনকে হারিয়ে ৭ম স্থান এবং চেকোশ্লোভাকিয়া ৪—০ গোলে নাইজেরিয়াকে হারিয়ে ৯ম স্থান লাভ করে।

প্রাথমিক লীগ পর্যায়ে ভারতের খেলা পড়েছিল 'বি' গ্রুপে। ভারতের খেলার ফলাফল দাঁড়ায় জয় ১, ড্র ১ ও হার ২। ভারত ১—৪ গোলে হল্যান্ড এবং ১—২ গোলে আর্জেন্টিনার কাছে হেরেছিল। কানাডার সঙ্গে ১—১ গোলে তাদের খেলা ড্র ছিল। ভারতের একমাত্র জয় ১—০ গোলে চেকোশ্লোভাকিয়ার বিপক্ষে।

দর্শক

মৈনুদ্দিন চলে গেলেন

অল্প কিছু দিনের ব্যবধানে ভারতীয় ফুটবলের অতীত দিনের দুই দিকপাল খেলোয়াড় চলে গেলেন। প্রথম বিদায় নিয়েছিলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ রাইট আউট পুন্নোত্তম ভেংকটেশ, পরে খ্যাতিমান আপ্পারাও। এঁদের বিচ্ছেদের দুঃখ কাটতে না কাটতেই মৃত্যুর নির্মম হাত ছিনিয়ে নিল মৈনুদ্দিনকে। হৃদরোগে আকস্মিক আক্রমণ মৈনুদ্দিনকে আচমকাই দাঁড় করিয়ে দিল পরমায়ুর ছাপ্পান্ন নম্বর মাইল স্টোনটির সামনে।

সৈয়দ মৈনুদ্দিন পঞ্চাশের দশকের একজন নামী খেলোয়াড়। সমকালে রাজ্য দলের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর নির্বাচন ছিল অনিবার্য। ভারতের সেরা ফুটবল প্রশিক্ষক রহিম সাহেবের কাছে ফুটবলের তালিম নেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর। চাকুরী সূত্রে যোগ দেন হায়দ্রাবাদ সিটি পুলিশে। সেই সূত্রে খেলাধুলাও সিটি পুলিশ দলে। ১৯৫২-র হেলসিংকি অলিম্পিকে ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করার ডাক পান মৈনুদ্দিন। ১৯৫৪-র ম্যানিলায় এশীয় ক্রীড়ার আসরে ভারতীয় দলেও ছিলেন মৈনুদ্দিন। প্রাথমিক পর্বের খেলায় জাপানের বিরুদ্ধে ভারত জিতেছিল ৩—২ গোলে। আর তিনটি গোলের মধ্যে দুটি গোলই দিয়েছিলেন রাইট উইং মৈনুদ্দিন। ১৯৫১ এবং '৫৩ সালে দুবে প্রাচ্য সফরেও তিনি ছিলেন ভারতীয় দলের প্রতিনিধি। ১৯৫২ এবং ১৯৫৪-র এশিয়ান কোয়ালালামপুর-এ ভারতীয় দলেও ছিলেন মৈনুদ্দিন। বিদেশী দলের সঙ্গে ভারতীয় দলের একাধিক প্রদর্শনী খেলায় তিনি অধিনায়কত্বও করেছেন।

আর্ণেল জীবনী লিখছেন

কলকাতা ফুটবলে এক সময় কামাল করা নাম আর্ণেল সিং। এই দুরন্ত শিখ কলকাতা মাঠে তাবড় তাবড় লড়াইয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছেন অসংখ্যবার। ময়দানে বক্ষণসীমায় খাঁটি আগলে দাঁড়ানো তাঁর সেই বিরাট অস্তিত্বের কাছে প্রায়ই হিম হয়ে যেত বিপক্ষ আক্রমণের তেজী ধারুদ। সমস্ত মাঠ জুড়ে এক বিরাট মহিমা নিয়ে প্রায়ই উজ্জ্বল হতেন আর্ণেল সিং—লয়ালপুরের আর্ণেল সিং ধীলন। উনিশশো সাতান্নয় কলকাতায় এসে আর্ণেল রাজস্থান দলে নাম লেখান। পরের বছরই আর্মি পাল্টে চলে আসেন মোহনবাগানে। গায়ে জোলেন সবুজ-মেরুণের জামা। খেলোয়াড় জীবনে সে জামা তিনি আর পাল্টান নি। ছেষট্টি থেকে আটষট্টি পর্যন্ত আর্ণেল ছিলেন মোহনবাগানের দলনায়ক। জাতীয় দলেও একাধিকবার বাংলার নেতৃত্ব করেছেন। ৬৫-৬৬ এবং সাতষট্টিতে মারডেকা ফুটবলে ভারতীয় দলের দলনায়ক ছিলেন আর্ণেল সিং। ব্যাংককে অনুষ্ঠিত ছেষট্টি এশীয় ক্রীড়াতেও ভারতীয় দলের দায়িত্ব ছিল আর্ণেলের ওপর। জাকার্তার এশিয়া ক্রীড়ায় অনভ্যস্ত জায়গায় সেন্টার ফরোয়ার্ডে খেলে দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে জয়নির্দেশক গোলটি ছিল আর্ণেলেরই। উনিশশো পঁয়ষট্টিতে এশিয়ায় সেরা খেলোয়াড়ও নির্বাচিত হওয়ার সুবাদে ফিফার সভাপতি স্যার স্ট্যানলি রাউসের কাছ থেকে বিশেষ পুরস্কার নিয়েছিলেন। উনিশশো ষাটের রোম অলিম্পিকে ভারতীয় দলের স্টপার নির্বাচিত হয়েছিলেন আর্ণেল সিং। এমনই অসংখ্য সফল ক্রীড়াকৃতিতে আর্ণেলের জীবন উজ্জ্বল।

পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সী ভারতীয় ফুটবলের সেই খ্যাতকীর্তি খেলোয়াড় আর্ণেল সিং ধীলন এখন পাঞ্জাবের খেলাধুলোর জয়েন্ট ডাইরেকটর।

সম্প্রতি জানা গেছে আর্ণেল সিং তাঁর আত্মজীবনী লিখছেন। নিজের জীবন এবং সেই সঙ্গে তাঁর সমকালের খেলাধুলোয় রাজ্যের একটি ছবি আঁকবেন। আমরা আশা করব সে ছবিতে ধরা পড়বে তাঁর বিচিত্র খেলোয়াড় জীবনের নানা ঘটনা, সেই সঙ্গে সমকালীন ফুটবল জগতের অনেক অজানা ঘটনা।

বোম্বাইয়ে রোহন কানহাই

সম্প্রতি বোম্বাই শহরে ক্রিকেট দুনিয়ার এক প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় আটচল্লিশ ঘন্টা মেয়াদী সফর সেরে গেলেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের এককালের সেই দুর্দে ব্যাটসম্যান রোহন কানহাই এখন আটচল্লিশে পা দিয়েছেন। চুলে রুপোর রং ধরেছে। একদা ক্যারাবিয়ান ক্রিকেটের মধ্যমণি আজ পেশায় 'স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড' নামে এক ক্রীড়াসরঞ্জাম প্রস্তুতকারী সংস্থার বাণিজ্যিক তত্ত্বা বধায়ক। কানহাই বোম্বাই এসেছিলেন 'মেসার্স মদকার্নি অ্যান্ড কোম্পানী'র স কিছু ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রস্তুতের বরাত নি ক্রিকেট অনুরাগীদের কাছে কি আকর্ষণীয় বিষয় রোহন কানহাই একটি ছোট্ট উক্তি। তিনি বলে আসন্ন আরব সফরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ দুর্বল ভাবলে ভুল করা হবে। ত খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া দলটি যথে শক্তিশালী।

লিফ্‌কম্যান

যাত্রা

নিউ প্রভাস অপেরা
সমীর লাহিড়ী

যাত্রালোক
মহুয়া ব্যানার্জী

মঞ্জুরী অপেরার দস্যু লালবাবা

বাইরে তখন প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছে। রাস্তা দিয়ে একটু জোরে হেঁটে গেলে, পথচারীরা কোথায় লুকিয়ে পড়েছেন দেখা যায় না। চীৎপুর পাড়ার ছোট্ট একটা সাজানো অফিস ঘর। একজন অল্পবয়সী যুবক টেবিলের উল্টোদিকে বসে, একটু অন্যমনস্ক হবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা 'মার্ক থ্রী' অ্যামব্যাসাডারটা অতি আপন মনে দেখে চলেছে। আমি যখন রাস্তা পার হয়ে অফিসের সিঁড়িতে উঠছি, হয়তো তখনও পর্যন্ত আমি যুবকের চোখে পড়ি নি। কারণ সেদিন আকাশের অঝোর ধারা বৃষ্টি আবছা করে দিয়েছিলো, কচের মানুষের পরিচিত মুখ। অনেক কাছে গিয়ে আমি জিগ্যেস করলাম—ভাই এটা কোন অপেরা? মঞ্জুরী অপেরা—উল্টোদিক থেকে ছোট্ট উত্তর।

এই দলের জন্ম বাঙলার ১৩৮১ সালে। হিসেব করলে যদিও খুব একটা বেশী দিনের নয়, তবুও এই কয়েক বছরেই অপেরা-সমাজে মঞ্জুরী অপেরা যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছে। 'অভিশপ্ত ফুলশয্যা', 'সে যে ছিলো কন্যা', 'সূর্যমুখীর সংসার' 'সংসার সীমান্তে' এই কয়েকটা পালা এরা আগে করেছেন। সামাজিক পালা 'সংসার সীমান্তে' গত বছর স্বর্ণপদক পেয়েছে। তা ছাড়া চলছে পৌরাণিক নাটক 'সতী সরমা'।

এরই ফাঁকে ফাঁকে এরা প্রস্তুতি নিচ্ছেন ভক্তিমূলক ঐতিহাসিক পালা 'দস্যু লালবাবা'র। মোটামুটিভাবে এই পালার গল্পটা সংক্ষেপে এভাবে বলা যেতে পারে—দিল্লীর সম্রাট ঔরংজেবের অত্যাচারে, কাশ্মীরে ব্রাহ্মণ হত্যার প্রতিবাদে যে অগ্নি জ্বলেছিলো, জৌনপুরের চারণকবি কেশব হাজারীর কণ্ঠে জ্বলে উঠেছিলো যে আগুন, সেই আগুন নেভাতে বাদশা আলমগীর কাশ্মীরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যে ব্রাহ্মণ হত্যা করেছিলেন তার যোগ্যসূত্রের ওজন হয়েছিলো ৭৪½ মণ বদশাহী তুলাদণ্ডে। এতে বাজোয়ারার বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের, ঠাকুর লালমোহন হেলে দস্যু লালবাবা। তাঁর চোখের সামনে তাঁর মা'র মৃত্যু, একমাত্র কন্যার বিয়োগ যন্ত্রণা, পাগল করে তোলে দুরন্ত দুর্বার। তাই তিনি বেছে নেন দস্যুবৃত্তি।

হাজারীবাগের ভবন সিং তার আগে তাদের অত্যাচারে সর্বশান্ত হয়ে, তার ভাই ও স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে যান বাঙলায় আশ্রয়ের সন্ধানে। আশ্রয় করবেন নিকট আত্মীয় ভেতমপুরের মালিক মহাবীর শোভা সিংয়ের। ইতিমধ্যে ত্রিবেণীর ঘাটের কাছে পড়েন ঠগী দস্যু লালবাবার হাতে। দস্যু চালান তাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার। শেষ পর্যন্ত তাতে ক্ষান্ত না হয়ে, তাঁর প্রতিষ্ঠিত বাসুলী মন্দিরে নরবলি দেবার জন্যে উদ্যত হয় লালবাবার হাতের খড়্গ। সেই খড়্গ থামিয়ে দিতে দেবতার অসীম করুণায় জেগে ওঠেন ভক্তের ভগবান স্বয়ম্ভু শিব। গড়ে ওঠে এক ক্ষুদ্র রাজ্য রামনগর, সেই রাজ্যের রাজা হন ভরম সিং, রাও ভাবামল্ল উপাধি নিয়ে। এদিকে বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচাঁদ আর বালীগড়ের দেওয়ান নাবায়ণ রায়ের কূটনীতির পাশা খেলায়, স্থির টলায়মান থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ মহত্ত্বের আসনে বসলেন নবাব মুরশিদকুলি খাঁর পুত্র শাহজাদা ফরিদ খাঁ। এরই এক অধ্যায় 'দস্যু লালবাবা'।

এ বছর এই অপেরা দলের হয়ে যাঁরা অভিনয় করছেন তাঁদের মধ্যে আছেন পান্নালাল নস্কর, রাজকুমার, শৈবাল কুমার, রূপেশ কুমার, জয়ন্ত চৌধুরী ইত্যাদি পুরুষরা। স্ত্রী চরিত্রে আছেন বীণা বিশ্বাস, স্বপ্না বিশ্বাস, গীতা চৌধুরী, সবিতা চৌধুরী প্রমুখ। এ বছর দলের সম্পূর্ণ ভার নিয়েছেন রাধাবল্লভ সাহারায় ও তারক রায়। দস্যু লালবাবা পালার নির্দেশনায় আছেন সনৎ গাঙ্গুলী। রচনা—তুষার গাঙ্গুলী, সুর—সুরশ্রী ফাল্গুনী রায়।

মঞ্জুরী অপেরা সাধারণতঃ পশ্চিমবঙ্গে সব জায়গাতেই পালা করে থাকেন, তবে তার মধ্যে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান, চব্বিশ পরগণা প্রধান। এঁরা জানালেন গত বছর অব্দি অপেরা দলের অবস্থা বেশ ভালোই ছিলো। তবে এ বছর বাজার একটু মন্দা।

এই দলে ৫০-৬০ জন লোক কাজ করেন। ফলে অন্ততঃ এই দল খোলার জন্যে, অন্নসমস্যার সমাধান অনেকটা হয়েছে কিছু লোকের, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

যাত্রা আজ মানুষ এতো কেন নিচ্ছে এ প্রশ্নের উত্তরে ওঁরা জানালেন, ভালো সিনেমার অভাব। গ্রামের লোক আজ বিশেষ একটা সিনেমা দেখতে চান না, যদিও যাত্রার টিকিটের প্রায় অর্ধেক সিনেমার টিকিট। তবুও গ্রামে যাত্রা গেলে দলে দলে মানুষ আসে যাত্রা দেখতে। আসলে ওদের জীবনবোধের পাশাপাশি তা'রা রেখে পালাগুলো তৈরি হয়। ওরা সেইজন্যে যাত্রাকে নিজের মনে করে।

নির্মলেন্দু ঘোষাল

অবিস্মরণীয় নাটকের অসামান্য জনপ্রিয়তা।
৬০০ রজনীর দ্বারপ্রান্তে ০ প্রতি বৃহঃ ও শনি—৬½টায়/রবিবার—৩ ও ৬½টায়
তপন থিয়েটারে
নাটক ও পরিচালনা—সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়
শেখ বিকাশ, সত্য, প্রদীপ, সান্ত্বনা, গিরীশ, রবীন, মিহির, সুনীল, নিখিল, শংকর, অরুণ, দীপংকর, উপীনর শৈলেন, মধু, গণেশ, স্বপন, অলোক, তিমির, পাপিয়া, মিঠু এবং রত্না ঘোষাল ও তরুণকুমার

CALCU... DENTAL LIBRARY

চিত্রধ্বনি

সিংহদুয়ার পেরিয়ে মান অভিমান

'সিংহদুয়ার' বন্ধ হবার আগেই সুখেন দাস হাজির হলেন 'মান-অভিমান' নিয়ে। এ ছবিরও তিনি কাহিনীকার। চিত্রনাট্যকার এবং পরিচালক। ব্যতিক্রম হিসেবে তিনি অভিনয় করেননি। সুখেনবাবুর আর সব ছবির মত এখানেও আছে মান অভিমানের ঢালাও কারবার। সেদিক থেকে এ ছবির নামকরণ যথাযথ।

'সিংহদুয়ার'-এ আছে সৎ-ভাইয়ের আত্মত্যাগ। এখানে সন্তু মুখার্জি অনেকটা ওইরকম। ছেলেবেলায় সে শিল্পপতি অনিল চ্যাটার্জির (গাড়িতে ধাক্কা খাবার পর) পালিত পুত্র হিসেবে বড় হতে থাকে। ওদিকে অনিলবাবুর আসল ছেলে রাজকুমার ঠাকুমার আদরে আদরে পুরো বখে যায়। ওকে বাঁচাবার জন্য সন্তু যথারীতি স্বার্থ-ত্যাগ করে চলে। কোনো একটি ঘটনায় রাজ-কুমার সন্তুকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। কিন্তু খুন হয় জনৈক বাইজী। এরপর আচমকা অনেক কিছু ঘটতে থাকে। শেষে এক চরম নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে রাজ-কুমার নিজের মার হাতে গুলি খেয়ে মরে। আদালতে মা সুমিত্রা মুখার্জি অবশ্যই ছাড়া পান। এবং সন্তুকেই নিজের ছেলে হিসেবে গ্রহণ করেন।

অতএব দেখা যাচ্ছে সুখেনবাবু এ-ছবিতেও চড়া সুরের মেলোড্রামাকে মূলধন করেছেন। সেই সঙ্গে আছে বাইজী, ক্যাবারে এবং মারদাঙ্গা হিন্দী ছবির ঢঙও আরও কিছু। ছবির টেকনিক্যাল কাজ অনুন্নত। ভিটেলের ব্যাপারেও গলদ আছে। বেশ কিছু জায়গায় ধারাবাহিকত্বের অভাব চোখে পড়ে। যেমন গাড়িতে শিশির বটব্যালের হাতে যে টাকা ছিল, পরের শটে তা দেখা গেল না। অন্য এক জায়গায় সুমিত্রার গা ভর্তি গয়না। পরের শটে সেসব উধাও। অভিনয়ের ক্ষেত্রে অনিল সুমিত্রা এবং সন্তু ভালই করেছেন। ছায়া দেবী মোটামুটি। অজয় দাসের সঙ্গীত তেমন জমেনি।

এ ছবি বকস্-অফিসে কি রকম দাঁড়াবে বলা শক্ত। যদিও ছবি হিসেবে এ নড়বড়ে। তবে 'সিংহদুয়ার' যাদের ভাল লেগেছে, 'মান-অভিমান' তাদের ভাল লাগলেও লাগতে পারে।

করুণাময়ী

করুণাময়ী হয়েছেন সন্ধ্যা রায়। শুরুতে তাকে মাদার টেরেসার আশীর্বাদ পেতে দেখা গেছে। এরপর ছবি জুড়ে তিনি অনেককে করুণা করেছেন তাঁর সেবা দিয়ে। প্রথমে গ্রামবাসীদের, যাদের মধ্যে মুসলমানও

করুণাময়ী ছবিতে সন্ধ্যা রায়

আছে। এরপর স্বামী বিশ্বজিৎ, যাকে তিনি নতুন জীবন দিয়েছেন। এক আশ্রমের অনাথ শিশুদের তিনি মায়ের অভাব ঘুচিয়েছেন। গেছেন অন্ধ্রের বন্যাবিধ্বস্ত এলাকায় সেবা করতে। উদ্ধার করেছেন জনৈকা মৃতা পতিতার সন্তানকে। অন্ধ বালিকাকে আলো দিয়েছেন। এমনি করে আরও অনেকের পর শেষে করুণা করেছেন নিজের শাশুড়ীকে।

ছবিতে মাদার টেরেসার সেবার আদর্শই প্রাধান্য পেয়েছে। 'যা বুঝবে সাবে না, তা সেবায় সারে'—এই হল মূলমন্ত্র। সেবা করতে করতে কি করে এক সাধারণ গৃহবধূ মেয়ে করুণাময়ী হয়ে গেলেন, ছবিতে তা দেখতে খারাপ লাগে না। করুণাময়ীর একটা দিক বড় ভালভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তা হল, দুঃখে বা বিপদে তিনি কখনও ভেঙ্গে পড়েন নি। দেবীর কাছে তিনি সাহস চেয়ে-ছেন। 'বিপদ আমি না যেন করি ভয়'—এই হল করুণাময়ীর প্রার্থনা। এইসবের সঙ্গে কাহিনীকার একটি পারিবারিক চিত্রও তুলে ধরেছেন। যা অবশ্যই যুক্তি-তর্কের ধার ধারেনি। এই ধরনের ছবিতে যেটা দরকার বিশ্বাস করা। অর্থাৎ ভয় সবকিছু বিশ্বাস কর, নয়ত মর। তবে সব মিলিয়ে ছবি দর্শকদের ভাল লাগবে। ইতিমধ্যেই দর্শকেরা 'করুণা-ময়ী'কে করুণা করেছেন। বিশেষ করে মা-দারদের। কতবার যে তাঁরা চোখের জল মুছেছেন তার হিসাব রাখা শক্ত। ছবিতে অনেক দৃশ্য বা ঘটনা আছে যেখানে ভাবাবেগ পুরোমাত্রায় কাজ করেছে।

পরিচালক অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায় ছবির গতিকে বজায় রেখেছেন। কালার এবং ক্যামেরার কাজ ভাল। ছবিতে পাহাড়ী জায়গা থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত অনেক কিছু দেখানো হয়েছে। কিছু টিপিক্যাল ফেস্টোগ্রাফীও উল্লেখযোগ্য।

সবচেয়ে ভাল সন্ধ্যা রায়। আর এক-বার তিনি প্রমাণ করলেন যে এই ধরনের ছবিতে তাঁর জুড়ি নেই। অভিনয় যে আছেই, সেই সঙ্গে সন্ধ্যাকে মানিয়েছে সুন্দর। বিশ্বজিৎকেও ভাল লাগবে। এছাড়া ভাল অভিনয় করেছেন ভারা দেবী এবং বিশেষ করে বিপিন গুপ্ত।

অসিতবরণ মিত্র

স্টুডিও থেকে

নবদিগন্ত ছবির ফ্লোরে

তরুণ পরিচালক পলাশ ব্যানার্জি বেশ কিছুদিন বিরতির পর আবার ছবি শুরু করেছেন। এবারেও তাঁর ছবির কাঠামোটি গড়ে উঠেছে তারাশংকরের জনপ্রিয় উপন্যাস 'নব দিগন্ত'কে ঘিরে। নামও বদলাচ্ছে না।

কদিন আগে টকনিশিয়ানস্ স্টুডিওর 'দু' দফায় দুটি সেট ফেলেছিলেন। উত্তম-কুমার আর মৃণাল মুখার্জি ছিলেন প্রধান দুই শিল্পী।

আমি যেদিন গেছি সেদিন উত্তম-কুমারের জেলারের বেশ। তাঁর অফিসঘরে তিনি বসে আছেন। ঘরের আসবাব টেলি-ফোন দেখে মনে হল সময়টা স্বাধীনতা-পূর্ব।

উত্তমকুমারের সামনে বসে আছেন মৃণাল মুখার্জি। তাঁকে ঘিরে এক সিপাইরা। ওঁদের দুজনের পোশাকে সময়ের পরিচয়। ক্যামেরাম্যান দীপক দাস ডান দিকে রেখেছেন ক্যামেরাটিকে। এখন পিকচারাইজ করা হবে দুজনের কথোপ-কথনের দৃশ্য। সুতরাং একটানা কোন শট নেওয়া হচ্ছে না। কাট কাটাভাবে দুজনেরই সংলাপ ফলো করে ক্যামেরা ডাইনে বাঁয়ে ঘুরবে।

মৃণাল এখন তাঁর অতীতের বলছে। ছোটবেলায় তাঁর ডাকাতির কথা, হাসপাতালে গোরা সৈনিকের ঘৃণায় সে কিভাবে বিঅ্যাক্ট করতে সেই-সব রোমন্থন চলছে। উত্তমকুমার মৃণালের ইতিহাস শুনে কখনও চমকে উঠছেন, কখনও বা আরও উৎসুক। পলাশ ব্যানার্জির নির্দেশ মত ক্যামেরা দুজনেরই বিঅ্যাক্-শনস্ গিলে যাচ্ছে, পরে উগরে দেবে পর্দায়।

জানা গেল এই পর্যায়ের শুটিংয়ের পর আবার পলাশবাবু শিল্পীদের বাকিটা ক্যামেরার সামনে হাজির করবেন আগামী মাসে। এবং তখনই নাকি শুটিং শেষ হবে। উপরোক্ত দুজন ছাড়া অভিনয় করছে নবাগতা পূর্ণিমা রায়, তপতী ভট্টা-রমেশ মুখার্জি, নীহার চক্রবর্তী ও সু মুখার্জি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য এই নবদি ছবির প্রযোজক হচ্ছেন প্রবীণ প্রচারস শৈলেশ মুখোপাধ্যায়।

বর্ষাঙ্গনের বৈদ্যগ্রামে

দীপংকর-মিঠু বিয়ের পর এসে তাঁদের শ্বশুরের বাড়িতে। একদিনে

মিঠু কিছুতেই রাজি ছিল না। অনেক করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে এনেছে তাকে দীপংকর। বাপের একমাত্র মেয়ে, আদরে আদরে সে তাই আটখানা, ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাবার মত। প্রথমটায় গাঁয়ের এই এ'টেল পরিবেশ তার একদম ভালো লাগেনি। হাঁপিয়ে উঠেছিল।

কিন্তু কতদিন আর? দুজনার মধ্যে ভালবাসার কুঁড়িটা যখন জ্যান্ত তখন এক-দিন-না-একদিন সেটি ফুটবেই। শুধু অপেক্ষা দীর্ঘ সময়ের। তারপর সন্ধি হবেই হবে।

পরিচালক অমল দত্ত সেই কুঁড়িটি ফোটানোর উদ্দেশ্যেই নিয়ে এসেছেন ওঁদের দুজনকে বর্ধমানের বসুলপুরে। তাঁদের স্বপ্নে দেখা ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়-টিতে।

কিন্তু শান্তিতে সুটিং করতে পারলেন না। কাজ অর্ধেক ফেলে চলে আসতে হল কলকাতায়। কারণ দুর্যোগ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ওঁদের ভালবাসার কুঁড়িটি এখনও আফোটাই ঝরে গেল।

যোগাড়যন্ত্র সব বেঁড়িই ছিল। পাল্লা বোড়ের আশেপাশে, দামোদরের আড়ে, তুলসীতলায় সর্বত্র সুটিং করেছেন তিনি।

এমনকি অসময়ে গাজনের রেকর্ড করা গান নিয়েও হাজির ছিলেন তিনি। নাচের থেনা ছিল শিব আর দুর্গা (কানাই-শ্যামতী মজুমদার)। ক্যামেরাম্যান কৃষ্ণ চক্রবর্তী শুধু নয়,ইউনিটের প্রায় সবাই-ই কাদার মাখামাখি হয়ে নেমে পড়েছিলেন সুটিং স্পটে। শুধু দীপংকর-মিঠু আর ওঁদের মা সন্ধ্যারাণী ছিলেন ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে।

তরুণ ব্যানার্জি আর হৈমন্তী শুক্লার গলায় শিব-দুর্গা ছাই মেখে নৃত্যরত। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভালবাসার কুঁড়ি দুটি ফুটি ফুটি করতে লাগল। একটু দূরে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যারাণী ছেলে-বৌমার উচ্ছ্বাস দেখে মুখ টিপে হাসি চাপছেন।

কিন্তু তারপর?

প্যাক-আপ। বন্যার জলে ভেসে গেল সব, রীতিমত অ্যাডভেঞ্চার অভিজ্ঞতা আর প্রাণটুকু নিয়ে ফিরলেন সবাই।

নায়েন তরফদারের নতুন ছবি

ঘটনাটি প্রায় অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। নায়েন তরফদার নতুন ছবি করবেন করবেন শুধু শোনাই যাচ্ছিল। সত্যিই এবার সুটিং আরম্ভ হল। গত বিজয়া দশমীর দিন সুন্দরবনের কাছে হিঙ্গলগঞ্জে একটি নৌকা-বাইচের দৃশ্য গ্রহণ করলেন তিনি।

সুটিং-এর জন্য নৌকা বাইচ হয়নি, দশমীর দিন ঐ অঞ্চলে নৌকা দৌড় হয়। নায়েন বাবু সেই বিয়াল নৌকা দৌড় তুলে রাখলেন ক্যামেরায়। সুন্দরবন, নৌকা বাইচ ইত্যাদির পরে নিশ্চয়ই বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না ছবিটির নাম 'নাগপাশ'। তাঁর বহু দিনের সাধ ছিল এই গল্পটি নিয়ে ছবি করবার। গঙ্গার নায়েন তরফদারকে আবার সবাই দেখতে চান স্বমহিমায় এই ছবিতে। আনন্দের কথা—রাজ্য সরকার এই ছবির প্রযোজক। [illegible] ছবির সুর হাত উপুড় করলেন তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর।

নির্মল ধর

বাজলো তোমার আলোর বেণু

এবার গ্রামোফোন কোম্পানীর পুজো সিরিজের সব রেকর্ডকে ছাপিয়ে উঠেছে সেই কালজয়ী মহিষাসুরমর্দিনী—যা আজ বাঙ্গালীর ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

গত চার দশকেরও বেশী সময় ধরে মহালয়ার পুণ্য প্রভাতে আকাশবাণীর প্রভাতী অনুষ্ঠান মহিষাসুরমর্দিনীর সঙ্গে পংকজ মল্লিক, বাণীকুমার, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের নাম বাঙ্গালীর স্মৃতি, শ্রুতি, মনন, কল্পনার সঙ্গে এমনভাবে মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে, যে এ নাম কটির বিকল্পে আর কোন নাম ভাবা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। নাম কটি আমাদের আত্মিক সম্পদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘটনায়, বেদনায়, সুরে, ব্যঞ্জনায়—এই মহিষাসুর-মর্দিনী আমাদের মধ্যে চেতনার সেই আলো জেবলে দেয় যার বরে চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এক আশ্চর্য ধ্যানলোক। মহিষাসুরমর্দিনী আজ শুধু বাঙ্গালী বা হিন্দুর নয়, সারা ভারতের অতি আদরের ত্রিনিস।

মহাদেবীর বোধন লগ্নে আকাশবাণীর এই অনুষ্ঠান এক তুলনাবিহীন সৃষ্টি হয়ে উঠেছে যে তিনটি কালজয়ী প্রতিভার সার্থক সহযোগিতায় তাঁরা হলেন বাণীকুমার, পংকজকুমার মল্লিক ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। এই মহান সৃষ্টিতে প্রত্যেকের ভূমিকাই সমান। অন্যভাবে বলা যায় এঁরা একে অন্যকে আশ্রয় দিয়েছেন। এই ত্রয়ীর কোনো একজনকে বাদ দিয়ে 'মহিষাসুরমর্দিনী' কল্পনাও করা যায় না। এই প্রসঙ্গে একথা বললেও অত্যুক্তি হবে না এই এক মহিষাসুরমর্দিনীই এই ত্রয়ী প্রতিভাকে অমর করে রাখার পক্ষে যথেষ্ট।

বাণীকুমারের রচনা, পংকজকুমার মল্লিকের সঙ্গীত, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের গ্রন্থনা ও শ্লোকপাঠের সঙ্গে মিশেছে পশ্চিমবাংলার জনপ্রিয় শিল্পীদের কণ্ঠ এবং যন্ত্র।

দর্শনভিত্তিক হিন্দুধর্ম, কাব্যসৌন্দর্য ও কল্পনাসমৃদ্ধ সঙ্গীতের ঐশ্বর্য সব মিলে মহিষাসুরমর্দিনী এক আশ্চর্য আত্ম-উন্মোচন। শুধু এর স্রষ্টাদের নয়। শ্রোতা-দেরও।

প্রথমেই সমবেতকণ্ঠে 'যা চণ্ডী' স্তোত্র দিয়ে মালকোষ রাগের উদ্দীপনাবিভাবে যেন দেবীকে যুদ্ধে উদ্দীপ্ত করবার আহ্বান জানানো হল। তারপরই ভৈরবের ধ্যানগম্ভীর সুরে 'সিংহস্তা শশিশেখরা' স্তবসঙ্গীতের উদাত্ত আকুলতায় শক্তিবন্দনা। পরের পর্যায়ে সুপ্রীতি ঘোষের কণ্ঠে 'জাগো দুর্গা দশপ্রহরণ-ধারিণী' [illegible] নয়নী কণ্ঠের মিনতি ও পুরুষকণ্ঠের বলিষ্ঠ আবাহনে দেবীর জলিত কঠিন ভাবটি মূর্ত হয়ে ওঠে। তার-পর একে একে 'ওগো আমার আগমনীর আলো (শিপ্রা বসু), 'অখিলবিমানে তব জয় গানে' (কৃষ্ণা দাসগুপ্ত) 'শুভ্র শংখ-রবে (শ্যামল মিত্র, অসীমা ভট্টাচার্য, আরতি মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য), 'নম চণ্ডী' (বিমলভূষণ), 'আগো তব বীণে সঙ্গীত (সুমিত্রা সেন) বিমানে বিমানে আলোকের গানে(সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়) 'হে চিন্ময়ী (তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়), 'অমল-কিরণে ত্রিভুবন মনোহারিণী' (প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়) যেন পূজামণ্ডপের এক-একটি

সুস্থ সমাজ ও সংস্কৃতির স্বার্থে নৈতিক জাগরণ প্রয়াসে দৃঢ়সংকল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ধর্ম সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা

মরমিয়া

২য় বর্ষ ত্রয়োদশ সংখ্যা

নভেম্বরে বেরোচ্ছে

এতে থাকে : গল্প, উপন্যাস, কবিতা, রম্যরচনা, রাজনৈতিক ভাষ্য, সাংস্কৃতিক সংবাদ, প্রবন্ধ, ভৌতিক ও রহস্যকাহিনী, গ্রন্থ সমালোচনা এবং অন্যান্য মনোগ্রাহী ফিচার। গ্রাহকমূল্য সডাক বার্ষিক ১৮ টাকা ও মাসিক ১-৫০ টাকা। লেখক/গ্রাহক/এজেন্ট যোগাযোগ করুন :

সম্পাদক—রামশরণ মুখোপাধ্যায়

২১, গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন, কলিঃ—৯

[পত্রিকার সমুদয় লভ্যাংশ সমাজসেবায় ব্যয়িত হয়]

দেবব্রত দত্ত প্রণীত

প্রকাশিত হয়েছে

সঙ্গীত তত্ত্ব— (রবীন্দ্র প্রসঙ্গ)

১ম থেকে ৬ষ্ঠ বর্ষ পর্যন্ত নব পাঠ্যক্রম অনুসারে সমস্ত রাগ ও রবীন্দ্র আলোচনাসহ পুস্তক। দাম : ১২-০০

সঙ্গীত সহায়িকা

১ম ও ২য় খণ্ড ৮-৫০ ও ১২-০০ (উচ্চাঙ্গ) ৩য় খণ্ড ৭-০০ (রবীন্দ্র প্রসঙ্গ) সঙ্গীত প্রভাকর, সঙ্গীত বিশারদ, সঙ্গীত সুধাকর, প্রাচীন কলাকেন্দ্র ও অন্যান্য উচ্চাঙ্গ এবং রবীন্দ্র সঙ্গীত পরীক্ষার্থী-দের প্রশ্ন-উত্তর সম্বলিত সহায়ক পুস্তক

দে বুক স্টোর ফোন : ৩৪-৫০৩৫

১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক : ব্রতী প্রকাশনী

ফোন : ৩৬-২৫৮১

৪৯।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড়, কলিকাতা-৯

দীপ জ্বালিয়ে দেয়। তারপরই শোনা যায় বাংলা গানের যুগপুরুষ পংকজ মল্লিকের সেই পৌরুষদৃপ্ত তুলনাবিহীন কণ্ঠ, সমুদ্রগর্ভের অতল গভীরের ধ্যানবিভোর মর্যাদায় 'জয়ন্তী মঙ্গলা কালী'। এ ধ্বনিতে সারা মৃত্যুর মৌন বেদনার নিবিড় আকৃতি যেন আকাশের বুক চিরে সেই জ্যোতির্ময়ীকে নামিয়ে আনে পৃথিবীর বুকে। আর তাঁর চরণতলে ক্লিষ্ট মানুষের আর্তি আছড়ে পড়ে রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি' সুরের রেখায় রেখায় কোরাসে মূর্ত হয় একটি ছবি যেখানে করুণাময়ীর করুণার ঢল নেমেছে অসহায় মানুষের যন্ত্রণার ওপর। আর এ ছবি আঁকতে পারতেন একমাত্র পংকজ মল্লিকই যাঁর অন্তরে রয়েছিল প্রেম, ভক্তি ও দর্শনের ত্রিবেণীধারা, বিপুল গৌরবে, অনন্ত প্রবাহে।

শেষের গানটি শোনা গেল উৎপলা সেনের কণ্ঠে শান্তি দিল ভরি'। শিল্পীর কণ্ঠে উপসংহারের এই শান্তিভরা সুরে অতীতের অনেক আনন্দবেদনার কলধ্বনি শোনা গেল। উৎপলা সেন কত দিনের শিল্পী। আকাশবাণীর মহালয়া অনুষ্ঠানের প্রথম থেকেই তিনি এর সঙ্গে জড়িত। পুরোনো স্মৃতির আবেশ তাঁর কণ্ঠে যেন কথা বলে। গানগুলির মাঝে মাঝে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের সংস্কৃত স্তোত্র পাঠ এবং বাংলা ভাষ্য নাট্যরসকে ঘনীভূত করেছে। এই প্রসঙ্গেই অপরূপ সৃষ্টির স্রষ্টাত্রয়ের ভূমিকার ওপর আলোকপাত না করলে এ আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

বাণীকুমার ঃ এই মহিম্ন স্তোত্র-গীতির কবি ও গীতিকার। ১৯৩০ সালে চৈত্রের শুক্লা অষ্টমীর প্রাতে শ্রীশ্রীমার্কণ্ডেয় চণ্ডীর বিষয়বস্তুকে ভিত্তি করে 'বাসন্তেশ্বরী' নামে একটি চম্পূ প্রচারিত হয়েছিল। মনপ্রিয় হওয়ায় সংস্কৃত রূপকের অনুসরণে রচিত মহিষাসুরমর্দিনীর সৃষ্টি। যার জনপ্রিয়ত্ব বাঙ্গালীর সংস্কৃতিতে একটি ইতিহাস রচনা করেছে। বাণীকুমারের ধ্যান ধারণার সার্থকতা লাভ করেছে এইখানেই। সংস্কৃত শ্লোকের ভাববৈভবের সঙ্গে সংগতি রেখেই উৎসারিত হয়েছে বাংলা সংলাপ যার মধ্যে মহাদেবীর আবির্ভাবের প্রস্তুমিকা প্রতিটি পর্যায়ে জাগায় নতুন উদ্ভাস। গানগুলি এসেছে মহাসমুদ্রের এক একটি তরঙ্গ হয়ে। আর এ সৃষ্টি হয়ে উঠেছে সর্বকালের আবেদনসমৃদ্ধ এক জীবনবেদ।

দুঃসাধ্য রোগ

একজিমা, সোরাইসিস, দুষ্ট ক্ষত, রক্তদোষ, বাতরক্ত, ফুলা, শ্বেতদাগসহ আরও অনেক কঠিন চর্মরোগ হইতে স্থায়ী মুক্তিলাভের জন্য ৪৪ বৎসরের চিকিৎসাকেন্দ্র চিকিৎসিত হউন।

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া-১, ফোন : ৬৭-২৩৫৯; শাখা : ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড (হ্যারিসন রোড), কলিকাতা-৯

মহিষাসুরমর্দিনী

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ঃ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠ, উচ্চারণ, আবৃত্তি একনিষ্ঠ উপাসককে স্মরণ করিয়ে দেয়। বাংলা স্তবের মধ্যে যে সুর এনে তিনি প্রতিটি কথাকে জীবন্ত করে তুলেছেন সে সুর একান্তভাবে তাঁরই সৃষ্টি। ছন্দ, লয়, ধ্বনি—সব মিলিয়ে এ স্তব গানের পর্যায়ে পড়ে। দেবীর অসুর সংহার সাজের বর্ণনায় যখন তিনি উচ্চগ্রামী স্বরে বলছেন তাঁকে ন্যায়রণ দিলেন চক্র, মহাদেব দিলেন শূল ... সারা শরীরে যেন কাঁটা দিয়ে ওঠে। এ শিহরণ আমাদের মধ্যে অন্য একটা চেতনার আভাস জাগায়।

আবৃত্তির এই অভিনব শৈলীর মধ্যে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র বেঁচে থাকবেন।

পংকজ মল্লিক ঃ বাংলা গানে নতুন প্রাণস্পন্দন আর তালের জোয়ার এনেছেন যে পংকজ মল্লিক এখানে তাঁর ডাইমেনশনাল সঙ্গীতব্যক্তিত্বের এক নতুন দিক ঝলমলিয়ে উঠেছে। প্রভাতী আলোর জ্যোতির্ময় রূপোন্মেষ মতই যেন তার দীপ্তি। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ওপর তাঁর অসাধারণ মুন্সিয়ানার এক জাজ্বল্য রূপ এই মহিষাসুরমর্দিনী। আরম্ভে যা চণ্ডী স্তোত্রটি তিনি শুরু করেছেন 'মালকোশ' রাগ দিয়ে যার মধ্যে আছে বীর, বৈরাগ্য, উদ্দীপনার শক্তিদৃপ্ত রূপ। পরের স্তোত্রটি (সিংহস্তাশশিশেখরা) ভৈরব রাগে। আরাধনার শান্ত, গম্ভীর প্রার্থনা যেন সংযত ধ্যানে স্থির হয়ে আছে। তারপরের গানগুলিতে ভৈরবী, রামকেলী দেশী তোড়ি আর সকালবেলার অন্যান্য সুরগুলির প্রয়োগ নৈপুণ্যে তাঁর পাণ্ডিত্য ও আবেগের আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে। এর মধ্যে একটি গানে 'তব অচিন্ত্য রূপচরিত' তিনি দাক্ষিণ ভারতীয় রাগের ছোঁওয়াও লাগিয়েছেন। এ সুর মিলেছে গানের দর্শনের সংগে। আর সকালবেলার এই সুরের মেলার মাঝখানে তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া গানটি প্রথম চরণটিতে হে চিন্ময়ী হঠাৎ মাধবী বৈরাগের ছোঁওয়া যে একটুও বেমানান হয়নি তার কারণ তিনি ভাবের দিকে চেয়ে সুর লাগিয়েছেন। হে চিন্ময়ীর ক্লান্তবতা ঐ ভাবে মূর্ত হয়ে উঠতে পারত একমাত্র ঐ সুরের মূর্ছনাতেই। অনুভবের এই দিব্যদৃষ্টিই তাঁর মত স্রষ্টার সঙ্গীত-চরিত্রের সম্পদ।

যে গানটি যার কণ্ঠে মানায় তাকে দিয়ে তাই-ই গাইয়েছেন। এর মধ্যে এমন শিল্পীও আছেন যাঁর উচ্চারণ অন্যত্র বড় কানে লাগে। কিন্তু এখানে সে উচ্চারণও অনেক পরিশীলিত। তিনি যে কত বড় সঙ্গীত পরিচালক ও শিক্ষক আরেকটি প্রমাণ এটা।

লক্ষণীয় আর একটি বিষয় হল যে ওয়েস্টার্ণ মিউজিকের সুর বাংলা গানে আনবার জন্য সম্প্রতিকালে এত মাতামাতি দেখা দিয়েছে সেই ওয়েস্টার্ণ স্টাইলকে তিনি এই ধরনের অধ্যাত্ম সঙ্গীতেও কাজে লাগিয়েছেন ভারতীয় সঙ্গীতের চরিত্রকে এতটুকুও ক্ষুণ্ণ না করে। জয় জয় জগদ্ধাত্রী ও জয়ন্তী মঙ্গলা কালী' গান দুটির প্রসঙ্গে এ কথা বলছি। জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনী প্রথম চরণটি যে লয়ে গাওয়া হয়েছে তার দ্বিগুণ চতুর্গুণ লয়ে (যেন এক একটি তানের মত) অন্য এক একটি চরণ কোরাসে গাওয়ার পর আবার সেই আগের লয়ে ফিরে আসায় নাট্যরস কি দারুণভাবে জমে উঠেছে। জয়ন্তী মঙ্গলাকালীতে পংকজ মল্লিকের কণ্ঠে তূর্যধ্বনির মত জয়ন্তী মঙ্গলাকালীর পর কোরাসে রূপং দেহি' ইত্যাদি একটা অর্কেস্ট্রা এফেকট সৃষ্টি করেছে। সে ধ্বনি তরঙ্গ যেন সমুদ্রকল্লোল।

চল্লিশ বছর আগে এসব কল্পনায় এসেছিল তাঁর সুর সৃষ্টিতে। কিন্তু মুহূর্তের জন্যও তিনি পাশ্চাত্য সঙ্গীতের বশ হননি। তাঁর কল্পনাকে অনুসরণ করেছে অর্কেস্ট্রার ছাঁচ। এইখানেই তিনি পংকজ মল্লিক যিনি কখনও ভোলেননি যে তিনি বাঙ্গালী এবং ভারতীয়।

মহিষাসুরমর্দিনীর অমোঘ শক্তিকে প্রত্যক্ষ করা গেছে দু বছর আগে যখন এই পৌরাণিক কাহিনীকে নব্যরূপ দেবার চেষ্টা হয়েছিল। বাঙ্গালী সহ্য করেনি দুর্গা সহ এই অমর রূপের অমর্যাদা। আর প্রতিবাদ গর্জে উঠেছিল দৈনিক মুখান্তরের প্রথম পাতায়। এই মহিষাসুরমর্দিনীর সঙ্গে পত্রিকাগোষ্ঠীর রয়েছে আত্মিক যোগ। তাই বিশেষ নিবন্ধটি প্রকাশ করা হল তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ্যরূপে।

মনে পড়ে কি অসম্মানের মধ্যে তাঁকে কর্মক্ষেত্র থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। কিন্তু স-মিত্র তাঁর মহিষাসুরমর্দিনী জনচিত্তে এমনই আসন নিয়েছে যে কোন শকতি তাঁকে টলাতে পারেনি। তাঁর দুঃখলগ্নে এই ঘটনাটি এসেছিল দেবতার বরদান হয়ে। পুরোনো মহিষাসুরমর্দিনী যখন আবার সম্প্রচারিত হল তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম 'আজ কেমন লাগছে?' গুণগুণ করে গেয়ে উঠেছিলেন 'অসম্মানে আনো টেনে পায়ে তব, ভেঙোনা চরণ ধূলায় ধূলায় ধূসর হব।

সেইসব কথা মনে পড়ে চোখে জল আসছে। গ্রামোফোন কোম্পানীকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি মহান এক জাতীয় কর্তব্য পালন করার জন্য।

সন্ধ্যা সেন

শুধু বিজ্ঞাপনই নয় বিজ্ঞানও বটে

'আয়ুর্বেদোহমৃতানাম'— আয়ুর্বেদ অমৃতের শ্রেষ্ঠ। আয়ুর্বেদিক ঔষধের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতে আয়ুর্বেদীয় ঔষধগুলির চাহিদা দিনে দিনে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। সম্পূর্ণ দেশজ সম্পদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের নির্দেশে এখন যে সমস্ত ঔষধগুলি প্রস্তুত হচ্ছে তা জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধনের ব্রত পালন করে চলেছে। প্রাচীনকাল থেকে বহু মুনি ঋষিরা এবং আয়ুর্বেদাচার্যগণ বহু গবেষণা করে এই সব বনজ, খনিজ প্রাণীজ এবং সাধারণ লতাপাতা থেকে যে সমস্ত ঔষধ আবিষ্কার করে গেছেন সেগুলো এখন আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে পরম সমাদর লাভ করছে। আয়ুর্বেদের প্রামানিক গ্রন্থসমূহ যেমন আয়ুর্বেদ সংগ্রহ, দ্রব্যগুণ নির্ঘন্টম, ভৈষজ্যরত্নাবলী, চরক ও সুশ্রুত সংহিতা প্রভৃতি বহু প্রাচীন পুস্তকে আয়ুর্বেদীয় ঔষুধের গুণ-সমূহ উল্লেখ করা আছে। তাঁদের সেই প্রজ্ঞালব্ধ জ্ঞানামৃতের পরম্পরা রক্ষা করে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের সমীকরণে এস, সি, কেমিক্যালস আয়ুর্বেদীয় ঔষধের জগতে যে সাম্প্রতিকতম ঔষধটি সংযোজন করেছেন তার নাম **'লিউকোনেক্স'** ট্যাবলেট। **'লিউকোনেক্স'** ট্যাবলেট লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগের আশু ফলপ্রদ ঔষধ। এই অসুখ মেয়েদের রূপলাবণ্য হরণ করে। অসহ্য যন্ত্রণায় ও কষ্টে মহিলারা ক্রম নৈরাশ্যের অন্ধকারে প্রবিষ্ট হন। স্বাস্থ্যের পক্ষে পরম হানিকর এই লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগটি যখন ক্রমান্বয়ে অধিক পরিমাণে প্রকাশ পায় তখন রোগীর গলাবুক জ্বালা, হাতে পায়ে জ্বালা হয় এবং পরে উহা সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। অম্লবোধ, কোষ্ঠ কাঠিন্য, ক্ষুধামান্দ্য, আমাশা, খুঁতখুতে স্বভাব, সন্দিগ্ধচিত্ততা, আত্মবিশ্বাস নষ্ট, আহারে অরুচি, কর্মে অনুৎসাহ, জীবনে হতাশা ও বিতৃষ্ণা, নিদ্রানাশ, নিতান্ত আপনজন স্বামীপুত্রের প্রতি স্নেহ ভালবাসাটুকুও হ্রাস পায় সুতরাং এই লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগকে সম্পূর্ণরূপে নিরাময়ের জন্য এস, সি, কেমিক্যালস নিরলস প্রচেষ্টায় প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্র নির্দেশিত পথে উন্নত পরীক্ষাগারে প্রস্তুত করেছেন **'লিউকোনেক্স'** ট্যাবলেট, তাই রোগ যত পুরানো ও কঠিন হোক না কেন **'লিউকোনেক্স'** ট্যাবলেটই লিউকোরিয়ার (সাদাস্রাবের) বিশ্বাসযোগ্য প্রতিকার, এই ঔষধ সেবনের পরে দেহে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না। দ্রুত আরোগ্যলাভ করতে হলে 'লিউকোনেক্স' ট্যাবলেট ব্যবহারের সঙ্গে বাহ্যিক চিকিৎসা হিসাবে আক্রান্ত স্থানে **'ফেকটিন** লোশনটির ব্যবহার অপরিহার্য। সুতরাং আর দেরী না করে আয়ুর্বেদের বিশুদ্ধ ঔষধ **'লিউ-কোনেক্স'** ট্যাবলেট সেবন করুন এবং **'ফেকনিট'** লাগান। লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগে আক্রান্ত রোগীদের বিশেষভাবে জানান যাচ্ছে যে, যাঁরা প্রচণ্ড অম্বল অজীর্ণ বুকজ্বালা প্রভৃতি রোগে ভুগছেন তাঁরা **'এসিনা'** ব্যবহার করুন। লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগের সঙ্গে যাঁরা পুরাতন ও নতুন আমাশয়ে ভুগছে তাঁরা **'এসিবেল'** ব্যবহার করুন। লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগের সঙ্গে যাঁরা কোষ্ঠকাঠিন্য, অরুচি, ক্ষুধামান্দ্য ও লিভার জনিত যে-কোন অসুখে কষ্ট পাচ্ছেন তাঁরা **'এসিনেক্স'** ব্যবহার করুন, লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগের সঙ্গে যাঁরা ব্যথা ও গাঁটের বাতজনিত রোগে ভুগছেন তাঁরা **'আরথিন'** ব্যবহার করুন। লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগের সঙ্গে যাঁরা কৃমিতে ভুগছেন তাঁরা **'ভারনেক্স'** ব্যবহার করুন। লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগের সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত ভদ্রমহিলারা এই সব উপসর্গে ভোগেন তাঁরা **'লিউকোনেক্স'** ট্যাবলেট ব্যবহারকালে ঐ সব উপসর্গের জন্য উল্লিখিত ঔষধগুলো ব্যবহার করলে রোগের আরোগ্য আরও ত্বরান্বিত হবে। আজই আপনার নিকটবর্তী দোকানে খোঁজ করুন অথবা সরাসরি আমাদের কবিরাজমণ্ডলীর সুপরামর্শ গ্রহণ করুন। **এস, সি, কেমিক্যালস**, (আয়ুর্বেদ বিভাগ), ২৭নং শোভাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৫।

Release through Calcutta Filmlet Advertising.

কেকের দাম কুড়ি হাজার

• পশ্চিম বাঙলার অধিকাংশ জেলায় বন্যার তাণ্ডব। অনাহার, আতঙ্ক মৃত্যু মিলে এক সংকটময় সন্ধিক্ষণ। আর বোম্বাই-এ পেট পুজো ছবির মহরতে একটি কেক কাটা হয়েছে, যার দাম কুড়ি হাজার টাকা। সাবিকা, নবীন নিশ্চল, যোগীতাবালীকে নিয়ে এই ছবি। মহরতে ছিলেন সাবিকা আর রাজেন্দ্রনাথ। কেক কাটে সাবিকা।

• অমিতাভ বচ্চন আর ঋষি কাপুরের ডিসেম্বর। ডাক্তার ওদের পরামর্শ দিয়েছেন, তিন সপ্তাহ বিশ্রামের। অবশ্য বাণিজ্যিক স্বার্থে সুনয়না ছবির শ্যুটিং চলছিল। ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন রামেশ্বরী। চোট বেশি লাগেনি। কিন্তু ওকে বিশ্রাম নিতে বলা হয়েছে। মনোমোহন দেশাই-এর সুহাগ ছবির শ্যুটিং-এ লন্ডন গিয়ে শশী কাপুর অসুস্থ হয়ে পড়ে। ফলে শ্যুটিংও বন্ধ ছিল। শশী এখন বোম্বে ফিরে এসেছে। মনোজকুমারের কল্পিত ছবির কাজ চলছে তাকে নিয়ে পুরোদমে। সঞ্জীবকুমারের কিডনি ট্রাবেল। এক সপ্তাহ নানাবতী হাসপাতালে ছিলেন। এখন ছাড়া পেয়েছেন। এই সময়ে ওঁর বাড়িতলবের একটি ছবির শ্যুটিং-এ গোয়া যাওয়ার কথা ছিল। সঞ্জীবকুমার না যাওয়ায় ইউনিট গোয়া থেকে ফিরে এসেছে শ্যুটিং না করেই।

খ্যাতি যখন তুঙ্গে

তখন ওদের খ্যাতি তুঙ্গে। পঞ্চাশের দশকে সুরাইয়াকে দেখবার জন্য ফ্যানদের হুড়োহুড়ি থেকে দাঙ্গা পর্যন্ত হয়ে যেত। এখন আর ওকে বিশেষ দেখা যায় না। তখনকার কথা। একটি ছবি মুক্তি পাচ্ছে। সুরাইয়া আসবেন খবর পেয়ে হলের সামনে অগণিত ফ্যানের ভিড়। ভিড় সামলাতে পুলিশ হিমসিম খাচ্ছে। হঠাৎ এল সুরাইয়ার গাড়ি। জনতা প্রায় ভেঙ্গে ফেলে পুলিশ বেষ্টনী। কিন্তু তাদের হতাশ করে বোরখা পরা সুরাইয়া চলে গেলেন হলে। জনতা ক্ষেপে আগুন। তারা প্রিয় নায়িকাকে দেখবেই। পুলিশ সামলাতে পারে না তাদের এমন চরম মুহূর্তে গেটের সামনে সুরাইয়া হাজির। ভক্তদের উল্লাসে ভেঙ্গে পড়ে চারদিক।

ঠিক এ রকম ঘটেছিল আন্দাজ ছবির রিলিজের সময়। ছবিতে ছিল তখনকার রাজকপুর, দিলীপকুমার আর

অশোককুমার / সুরাইয়া

নার্গিস। বোম্বাইয়ের একটি হলে প্রথম দিনের ঘটনা। নার্গিস হলের পিছন দরজা দিয়ে কোনরকমে ঢুকে পড়েছেন। কিন্তু সামনে জনসমুদ্র। তাদের সমবেত চিৎকারে চারদিক ফেটে পড়ছে। আমরা নার্গিসকে দেখতে চাই। এমন সময় সময় ব্যালকনিতে এসে দেখা দিলেন দিলীপকুমার আর মেহবুব খান (পরলোকগত)। জনতা ওদের দেখে আরও ক্ষেপে গেল। টিটকিরি আর গালাগালি শুনে ওরা সবে পড়লেন। অবশেষে আসতে হল নার্গিসকে। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ভক্তদের দেখা দিতেই ওরা শান্ত।

রাজকপুর/নার্গিস

পরীক্ষিৎ শিবাজী হচ্ছেন

শিবাজী গণেশন আসল নাম নয়। 'শিবাজী' ওর নামের সঙ্গে জুড়ে গেছে। গণেশন শিবাজী চরিত্রকে এমন সফলোর সঙ্গে দীর্ঘদিন মঞ্চে ধরে রেখেছিলেন যে, মধ্যে দর্শক ওর নামের সঙ্গে জুড়ে দেয় শিবাজী।

পরীক্ষিৎ সাহানীও সম্ভবত শিবাজীযুক্ত হবেন। বলরাজ সাহনীর ছেলে পরীক্ষিৎ শিবাজী চরিত্র রূপায়িত করছেন। মহারাষ্ট্র সরকারের এই তিনটী ও ইংরেজি ছবির পরিচালক রমন গাবালে। ছবির নাম ছত্রপতি শিবাজী। ছেলেবেলা থেকেই শিবাজীর অন্ধভক্ত পরীক্ষিৎ। তার ব্যক্তিত্ব ও কর্মজীবন ওকে অনুপ্রাণিত করে। তবেই চরিত্র রূপায়ণ করতে গিয়ে পরীক্ষিৎও চূড়ান্ত পরীক্ষার মুখোমুখি। শিবাজী সম্পর্কে লেখা গ্রন্থ সব পড়েছে। ঐতিহাসিকদের সঙ্গে শিবাজী সম্পর্কে আলোচনা করেছে। মানসিক দিক থেকে চরিত্রাভিনয়ের সবরকম প্রস্তুতি চালিয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। প্রতাপগড় দুর্গে শ্যুটিং করতে গিয়ে বাণী ভলানীর একটি মূর্তি পায়। সেটি নিজের বাড়িতে এনেছে। বাবা বলরাজ সাহনীর ছবির পাশেই রেখেছে বাণী ভলানীকে। শিবাজীর প্রেরণা জাগত বাণী ভলানীর সাধনার মধ্য দিয়ে। পরীক্ষিৎও শিবাজী চরিত্র রূপায়ণে সেই বাণী ভলানীরই স্মরণ নিয়েছে।

মস্কোয় চিত্রপরিচালনা শিখে এসে এখনও নকল ছবি পরিচালনা করেনি পরীক্ষিৎ। বরং দক্ষ অভিনেতা হিসাবে বোম্বাই ফিল্মে ও আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। বলরাজ সাহনীর অভিনয়ের ছাপ বর্তাচ্ছে পরীক্ষিতের ওপর। পাঁচ বছরের ছেলে পরীক্ষিৎ প্রথম অভিনয় করে কে এ আব্বাসের ধরতী কী লাল ছবিতে। পূর্ণবয়সে ওর প্রথম ছবি এল নি লক্ষণের জানেখী বাত। এই ছবিতে সঞ্জীব ছিল ডাকাত—আর পরীক্ষিৎ একজন শিল্পী। হিন্দী ফিল্মে ওর প্রবেশের পথ খুলে যায় এই ছবির সাফল্যে। তারপরের ছবি পরিণয় পাপী আর জেমিনির সমাজ কো বদল ডালো। তপস্যা, মমতা, মনোজের ছবির সাফল্যে পরীক্ষিৎ যথেষ্ট প্রশংসিত। সুনীল, বিন্দ্য সিনহা, সঞ্জীবকুমার, শশী কপুর রেখা, আমজাদ খানের সঙ্গে এসব ছবিতে কাজ করেছে। ধর্ম চোপড়ার দুশারা আদমিতে ধর্মী, গুলজার, ঋষী কপুর, নিতু সিং, দেবেন ভর্মা-র সঙ্গে পরীক্ষিৎও প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠেছে। ওর হাতে এখন কুড়িটি ছবি। ছত্রপতি শিবাজীতে পরীক্ষিতের বিপরীতে আছে শ্রীদেবী আজমী।

• ঋষি তার বড় ভাই রণধীরের সঙ্গে আর কে ফিল্মসের নতুন ছবিতে কাজ করছে। ছবির চরিত্রটি রণধীর কপুর।

—বঙ্গাক্ষর

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও ৪২ কৈলাস বোস স্ট্রীট কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

মূল্য ৭৫ পয়সা। ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা, ভারতের অন্যান্য অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

মহাত্মা
শিশিরকুমার ঘোষ

প্রণীত

কয়েকটি অমূল্য লোক-চরিত
ও কাব্য-গাঁথা

এই অপূর্ব রচনাগুলি পাঠক-পাঠিকাদের
দেবে অমৃত পানের আনন্দ। তৃষিত শোকসন্তপ্ত
হৃদয়ে আনবে পরম শান্তি।

শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত ১ম—৬ষ্ঠ খণ্ড ২৮·৫০

শ্রীনরোত্তম চরিত ৩.৫০ পঃ

শ্রীকালাচাঁদ গীতা ৩.০০

Lord Gouranga (Eng. Vol. 1) ৩.০০

গ্রন্থগুলি সদ্যপ্রকাশিত হলেও এর মূল্য বৃদ্ধি করা হয়নি।
অবিলম্বে সংগ্রহ করুন।

প্রাপ্তিস্থান :
পত্রিকা হাউস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৭০০০০৩।

দে বুক স্টোর্স; ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট; কলিকাতা ও
নাথ ব্রাদার্স, ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট; কলিকাতা।

AMRITA ... Phone 55-5231 (14 lines)

বিশুদ্ধ 'কুকমী' গুঁড়া মশলার ক্রেতারা সাবধান!

'কুকমী' গুঁড়া মশলার জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে কলকাতার কয়েকটি গুঁড়া মশলা কোম্পানী তাদের নিজস্ব নিকৃষ্টমানের ব্রাণ্ডের সঙ্গে জনপ্রিয় কুকমীর নাম জুড়ে হুবহু কুকমী Cookme নামের স্টাইল নকল করে আসল কুকমী গুঁড়া মশলা বলে বাজারে চালাবার চেষ্টা করছে।

কেনার সময় দেখে নেবেন- 'কুকমী'র প্যাকেটে কেবল Cookme 'কুকমী' ছাপই আছে, অন্য কোন ব্রাণ্ডের নাম যুক্ত নেই

প্রস্তুতকারক :
কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
২৩৫ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা ৭০০০৭০ ● ফোন : ৩৩০৯৯৫, ৩২৬৬৩২
পোষ্ট বক্স নং ১, বড়বাজার ৩৮৮০ ● ফ্যাক্টরী : কল্যাণপুর

রবীন্দ্রনাথ বনাম সরলাদেবী

অমৃত

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
৩ নভেম্বর ১৯৭৮
দাম ৭৫ পয়সা

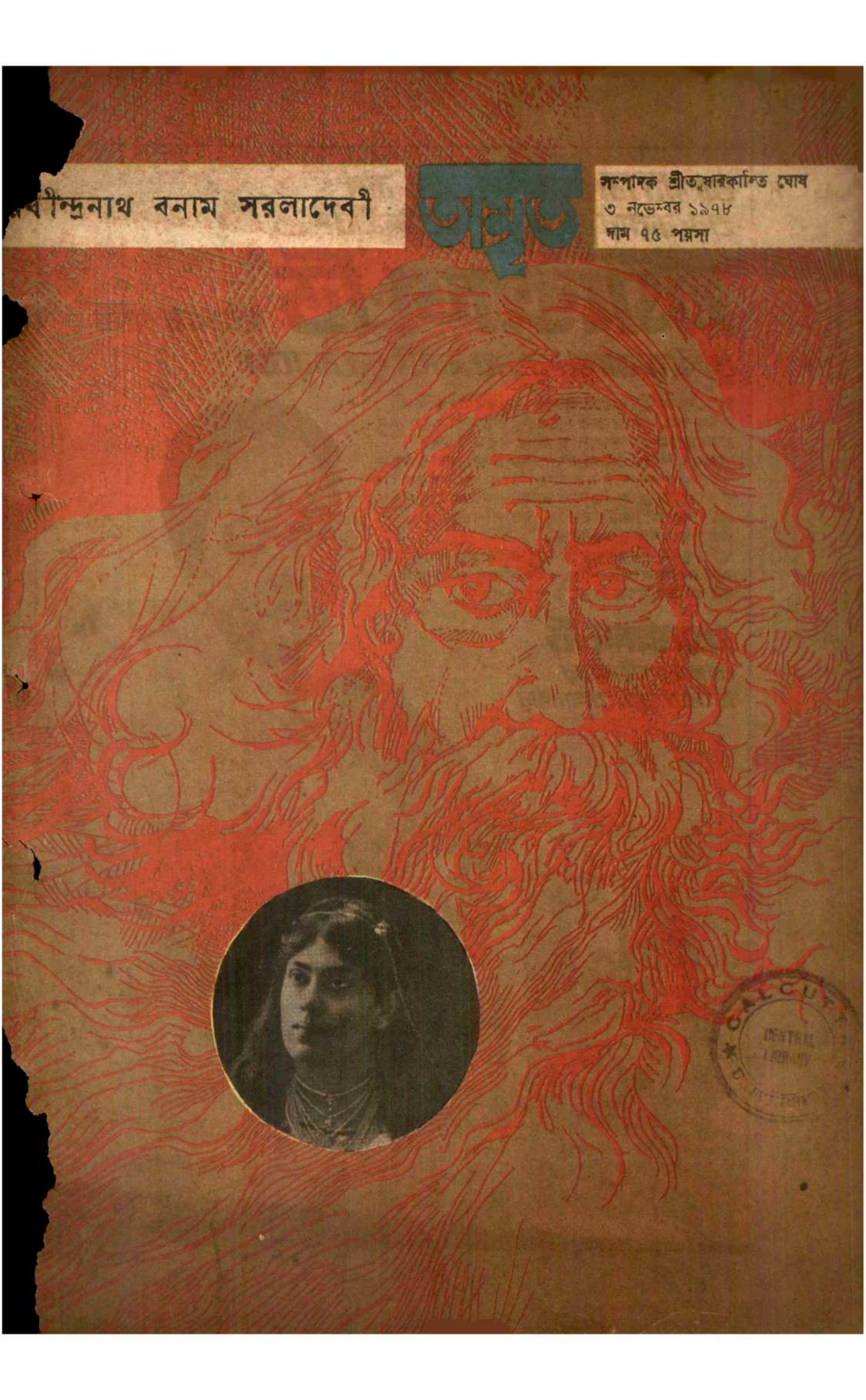

CALCUTTA
CENTRAL
LIBRARY

আপনি কি দৈনন্দিন কাজ-কর্ম শুরু করার জন্যে বিশেষ উদ্‌গ্রীব?

গ্ল্যাক্সোজ-ডি®

নিমেষে শক্তি যুগিয়ে আপনার সব ক্লান্তি দূর করবে!

গ্ল্যাক্সোজ-ডি খেয়ে আপনি ঘরের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম করার জন্য পুরোপুরি তৈরী হয়ে যান। গ্ল্যাক্সোজ-ডি আপনার ক্লান্ত শরীরে সেই ভরপুর শক্তি যোগায় যা ফের চাঙ্গা হবার জন্যে আপনার অবশ্যই দরকার। ডাক্তারদের সুপারিশ করা গ্ল্যাক্সোজ-ডি'তে রয়েছে উচ্চমানের গ্লুকোজ যা' ভিটামিন ডি, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের গুণে সমৃদ্ধ।
গ্ল্যাক্সোজ-ডি আপনার সব ক্লান্তি দূর করে যার দরুন আপনি ঘরের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম খুব স্ফূর্তির সঙ্গে করতে পারেন।

গ্ল্যাক্সোজ-ডি®
আপনার পরিবারের
নিমেষে শক্তি যোগানদার

dCA/GL/54 BEN

রবীন্দ্র-চর্চার এক খানি মূল্যবান গ্রন্থ
প্রবোধচন্দ্র সেনের

ইচ্ছামন্ত্রে দীক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ

ইচ্ছাই জীবজগতের আদ্যাশক্তি আর এই ইচ্ছাই মানুষের ও সমাজজীবনের পরম চালিকাশক্তি। প্রত্যেক মানুষের অন্তর্নিহিত এই ইচ্ছাশক্তিকে যদি সক্রিয় ও সম্মিলিত করে কোন অভীষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে চালনা করা যায় তবে মর্ত্যলোকেও স্বর্গ রচনা করা যায়। আমাদের দেশে এই সত্য সচেতনভাবে উপলব্ধি করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ। তাঁরাই জাতীয় ইচ্ছাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ ও সঙ্ঘবদ্ধ করে সমস্ত দেশকে সামগ্রিক সার্থকতার অভিমুখে চালনার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কিভাবে কিশোর-বয়সেই মুক্ত ইচ্ছার মহামন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে অসিযোগে বুকের রক্ত দিয়ে স্বদেশ-সাধনায় দেহপ্রাণ সমর্পণের পণ গ্রহণ করেছিলেন এবং জীবনের শেষ পর্ব পর্যন্ত কিভাবে স্বজাতিকে ইচ্ছাহীনতার জড়তা ও প্রথাসিদ্ধ নিরর্থক ক্রিয়াকর্মের বন্ধন-জাল থেকে মুক্ত করে সম্মিলিত ইচ্ছার শক্তিতে মহৎ লক্ষ্যলাভের প্রেরণা দিয়ে গিয়েছেন, এই গ্রন্থ প্রবোধচন্দ্র সেন তারই ঔৎসুক্য-জনক বিবরণ দিয়েছেন। গ্রন্থটি রবীন্দ্র-চর্চার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি নূতন ধরনের মূল্যবান সংযোজন। মূল্য সাত টাকা

॥নতুন বই॥

সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের
বিভ্রান্ত ৮.

প্রমথনাথ বিশীর
পনোরোই আগস্ট ২৫.

বিমল মিত্রের
জন গণ মন ১৬.

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
দিনান্তে নিশান্তে ১৫.

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের
অর্জুনের অজ্ঞাতবাস ১৫.

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
মঙ্গলসূত্র ৭.

পেপার ব্যাক ক্লাসিক্স-এ বিশেষ সুবিধা

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
'রাণু' পর্যায়ের বিখ্যাত চারখানি গ্রন্থ একত্রে একখণ্ডে প্রকাশিত

রাণু ১২-৫০

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
আমি কান পেতে রই ১২-৫০

বিমল মিত্রের
সাহেব বিবি গোলাম ১২-৫০

প্রমথনাথ বিশীর
লালকেল্লা ১২-৫০

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
গণদেবতা ৭-৫০

সাধারণ ক্রেতারা এই পাঁচখানি গ্রন্থ একত্রে সংগ্রহ করলে
মোট মূল্য ৫৭.৫০ পয়সার পরিবর্তে মাত্র ৫০ টাকায় পাবেন।

বিভূতি রচনাবলী সুলভ সংস্করণ

চতুর্থ খণ্ড বেরিয়েছে

গ্রাহকগণ অবিলম্বে তাঁদের প্রাপ্য খণ্ড সংগ্রহ করুন।

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০, শ্যামচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩
৮৬।১ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ৯

গা-ব্যথা করছে? এক গ্লাস জল খান

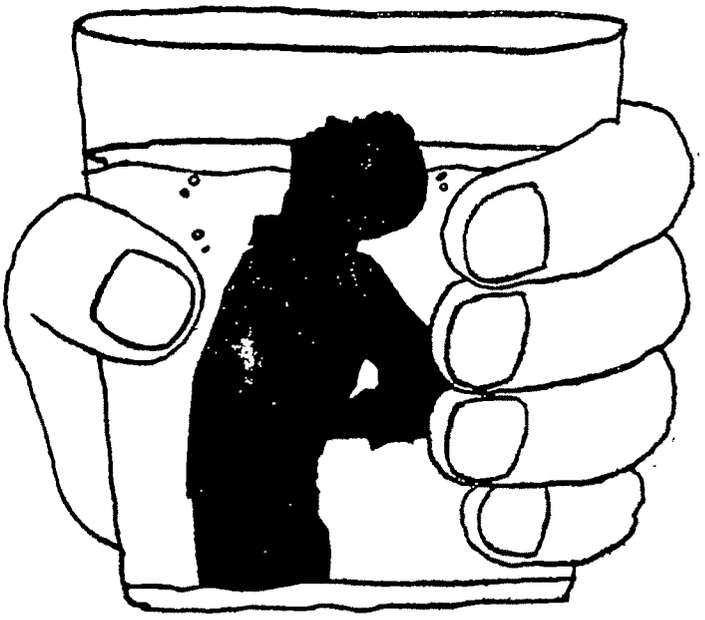

Saridon

আর কেবল একটি

সারিডন

অমৃত

১৮ বর্ষ, ২৪ সংখ্যা
১৬ কার্তিক, ১৩৮৫
3 November, 1978.

সম্পাদকীয় ৩
সাহিত্য ইত্যাদি ৪ মণীন্দ্র রায়
রাজধানীর ইনসাইড স্টোরি ৫ পর্যবেক্ষক
রণক্ষেত্র : চিকমগলুর ৬ বমেন দাশ
বেবতীভূষণের কার্টুন ৯
রাজনীতি কলকাতা স্টাইল ১০
বেদব্যাস বৈদ্য
চিঠিপত্র ১০
ভাগ্য গণনা ১২ শ্রীমণিকা

প্রচ্ছদ কাহিনী ১৪
রবীন্দ্রনাথ বনাম সবলা দেবী
নিত্যপ্রিয় ঘোষ
প্রচ্ছদশিল্পী সুবোধ দাশগুপ্ত

দাগ (গল্প) দীপঙ্কর দাশ ২০
বলি শোনো (গল্প) বিজয় পাল ২৬
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : বিপ্লবী ও
দার্শনিক ২৯ সূর্য বন্দ্যোপাধ্যায়
গৌতম সরকার কেন বাদ গেলেন ? ৩২
সুভাষ ভৌমিক
জীবনানন্দ ৩৪ কল্যাণকুমার বসু
তরুণী পাহাড়ে বসন্ত (উপন্যাস) ৪০
শৈবাল মিত্র
সোনার হরিণ নেই (উপন্যাস) ৪৫
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
হত্যে (গল্প) ৫২ সতীশ জমাদার
শতরঞ্জ কে খিলাড়ি ৫৭
বিশ্বজিৎ রায়
ডোপিং ৫৮ পিনাকী চট্টোপাধ্যায়
ফৈজুল্লাবাদে ফসলাল হল না ৫৯
শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, দর্শক
চিত্রধ্বনি ৬১

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ কাহিনী
আমার বাবা, যতীন্দ্রমোহন বাগচী
লিখছেন ঊর্মি সান্যাল
পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলালের গল্প
সমীর চট্টোপাধ্যায়ের
কাছাকাছি মানুষ চাই

টেস্ট টিউব শিশুতীর্থ কলকাতা

তিনজন চিকিৎসা-বিজ্ঞানী—ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ এস কে ভট্টাচার্য এবং ডাঃ সুমিত মুখোপাধ্যায়ের অসামান্য বৈজ্ঞানিক প্রতিভার ফলে পৃথিবীর দ্বিতীয় টেস্ট-টিউব শিশু কলকাতায় জন্মলাভ করেছে এবং সুস্থই আছে। বিজ্ঞানীত্রয়ের এই সাফল্যে বাঙালি তো বটেই, ভারতের সমস্ত মানুষই গর্বিত।

আমাদের দেশের পুরাণ ও মহাকাব্যে নানা অলৌকিক এবং অ-স্বাভাবিক উপায়ে গর্ভসঞ্চারের কথা আছে। এমন কি স্ত্রী-পুরুষের শারীরিক সংযোগ ছাড়াও যে জরায়ুতে পুংবীজ প্রবেশ করিয়ে সন্তান উৎপাদন সম্ভব, তাও অজ্ঞাত নয়। কিন্তু স্ত্রী-ডিম্ব মাতৃজঠর থেকে বাইরে এনে তাতে পুংবীজ প্রবিষ্ট করে ভ্রূণসঞ্চার করা, এবং ভ্রূণকে ৫৩ দিন ধরে হিমশীতল আধারে জীবন্মৃত অবস্থায় রাখার ঘটনা ইতিপূর্বে আর কখনো শোনা যায় নি। লণ্ডনের সেই প্রথম টেস্ট-টিউব শিশুও কলকাতার তুলনায় অনেক সাদা মাঠা পথে জন্মগ্রহণ করেছে। সেখানে ভ্রূণসঞ্চারের পর ডিম্বটিকে জীবন্মৃত (সাসপেণ্ডেড অ্যানিমেশান ?) অবস্থায় রাখা হয় নি। কলকাতার এই শিশুটির জন্ম-প্রক্রিয়া তাই অভূতপূর্ব এবং এর বৈজ্ঞানিক তাৎপর্যও সুদূরপ্রসারী।

বিজ্ঞানের দিক দিয়ে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল—ডিম্বাণুর সঙ্গে যখন শুক্রকীটের সংযোগ ঘটান হল তখন থেকেই তার ভেতর জীবন্ত প্রাণীর লক্ষণ দেখা দিয়েছে; তার দেহকোষও ভ্রূণের স্বাভাবিক নিয়মে বেড়ে চলতে শুরু করেছে। বিজ্ঞানীত্রয় যখন সেই ভ্রূণকে ৫৩ দিন ধরে হিমশীতল আধারে (ডীপ-ফ্রিজ করে ?) রাখেন তখন কী প্রক্রিয়ায় তার কোষবৃদ্ধি রুদ্ধ হল, কিন্তু জীবন্ত রইল ? এবং কী প্রক্রিয়াতেই বা সেই ভ্রূণকে ৫৩ দিন পর জরায়ুতে প্রবিষ্ট করিয়ে তাতে কোষবৃদ্ধির প্রক্রিয়া সচল করা হল ?

এই প্রশ্ন দুটির সঠিক বিজ্ঞানসম্মত উত্তর বিজ্ঞানের দিক থেকে অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এর ফলে জীবন-রহস্যের একটি দিকের এক অজ্ঞতাপূর্ণ সমাধানের দরজা উন্মুক্ত হয়ে যাবে সারা পৃথিবীর বিজ্ঞান-সমাজের সামনে।

একথা অবিশ্যি মনে করার কোনই কারণ নেই যে, বিজ্ঞানীত্রয় এই মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর বিষয়ে সচেতন নন। নিশ্চয়ই তাঁরা সঠিক উত্তর জানেন এবং যথাযোগ্য স্থানে জানাবেনও। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশন এবং অবস্টেট্রিকস এণ্ড গাইনিকোলজি সোসাইটি কর্তৃক প্রস্তাবিত আলোচনাসভা—যেখানে কলকাতার বিজ্ঞানীত্রয় তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা তথ্যসহ উপস্থিত করবেন তার গুরুত্ব অপরিসীম।

সাহিত্য ইত্যাদি...

সাহিত্য ও গুণগ্রাহিতা

আজকাল ভালো লেখা হয় না বলে আক্ষেপ করেন অনেকে। কিন্তু কেন হয় না, অনেকেই বোধহয় তা ভেবে দেখেন নি।

অবিশ্যি একটা কথা গোড়াতেই বলে নেওয়া ভালো। লেখা নিয়ে মাথা ঘামান ক'জন, বেশির ভাগই তাঁরা কিনে বই পড়েন না। কেননা অনেক বইয়েরই এডিশন শেষ হয় আজকাল। কোনো কোনো বই বেস্ট সেলারও হয়। অনেকেই বই কেনেন এবং পড়ে আনন্দ পান বলেই হয় নিশ্চয় এসব।

তবু, কিনেই পড়ুন আর উপহার পেয়ে পড়ুন, লেখা পড়ে যাঁরা খুঁৎ খুঁৎ করেন তাঁদের কথাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না একেবারে। ভালো লেখা সত্যিই এখন কম।

কেন কম, তার অনেক রকম কারণ। আজকাল ভালো লেখা হয় না বললে একপেশেভাবে বলা হয়। মনে হয় যেন, লেখার জগৎটাই শুধু ম্যাড়মেড়ে হয়ে গেছে, কিন্তু গানের জগৎ ছবি আঁকার জগৎ সিনেমার জগৎ একেবারে ঝকমক করছে নতুন নতুন জ্যোতিষ্কের আনাগোনায়। তাতো নয়, শিল্প-সংস্কৃতির সবগুলো শাখাতেই তো পাতাঝরার পালা চলছে; সব মাঘগাতেই তো মাঝারিপণার ভিড়। শুধু সাহিত্য নিয়ে হায়-হায় করে লাভ কী।

আমি অবিশ্যি নিজে একথা বিশ্বাস করি না যে এখনকার সব লেখকই মিডিওক্রার। মোটেই তা নয়। সত্যিকার শক্তিমান লেখকও আছেন অনেকে। কিন্তু ভাগ্যান্বেষীর ভিড় এত বেশি যে, অনেক ভালো লেখকই চাপা পড়ে যাচ্ছেন তার মধ্যে। আবার কেউ যে তাঁদের হাত ধরে সামনে নিয়ে আসবেন, এমন ঘটনাও ঘটছে না। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে।

অনেকদিন আগের কথা। রবীন্দ্র-পুরস্কার তখন চালু হয়েছে সবে। একদিন অতুলচন্দ্র গুপ্ত মশায়ের বাড়িতে বসে আছি, রাধামোহনবাবু এলেন। হাতে তাঁর একখানা বই। যাঁরা অতুলবাবুর বাড়ি গেছেন তাঁরা জানেন, অতুলবাবু সন্ধ্যার-দিকে সভাসমিতির কাজ না থাকলে দক্ষিণ-মুখো একতলার বারান্দায় বসতেন। তাঁর আসন ছিল কুশন-পাতা একটি বেতের ডেক চেয়ার। বাঁদিকে থাকত একটি কি দুটি চেয়ার, যাঁরা দেখা করতে যেতেন বসবেন তাঁরা তাতে। তাঁদের পাশ দিয়েই ছিল বারান্দায় ওঠার প্রবেশ পথ।

রাধামোহনবাবু তখন সিনেমার নামকরা অভিনেতা। কিন্তু আমরা যাঁরা তাঁকে চিনতাম তাদের জানা ছিল, তিনি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র এবং ইংরাজী ফরাসী সংস্কৃত ইত্যাদি অনেক-গুলো ভাষা-সাহিত্যের অধিকারী ব্যক্তি। অতুলবাবুর এক ছেলে বোধহয় রাম-মোহনবাবুর বন্ধু। তিনি বসতেন দোতলায়। রাধামোহনবাবু সেদিন বারান্দায় উঠে দোতলায় যাবার আগে অতুলবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে জানালেন—চমৎকার একটি বাংলা উপন্যাস পড়েছেন তিনি। নতুন বেরিয়েছে বইখানা। লেখকও নতুন। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর লেখক সন্দেহ নেই। বলে তাঁর হাতে-ধরা বইটি হাওয়ায় আন্দোলিত করে নেড়ে দিলেন, টেকনিকও একেবারে নতুন। অতুলবাবু নাম জিজ্ঞাসা করায় নাম বললেন লেখকের রাধামোহনবাবু। এবং ওপরে চলে গেলেন।

কয়েকমাস পরে খবর পড়লাম কাগজে, রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন সতীনাথ ভাদুড়ী, তাঁর জাগরী বইটির জন্যে। তৎক্ষণাৎ মনে পড়ল আমার, ইনিই হচ্ছেন সেই লেখক যাঁর কথা সেদিন বলছিলেন রাধামোহনবাবু। এবং আমার আরো মনে পড়ল, অতুলবাবু ছিলেন রবীন্দ্র পুরস্কার কমিটির চেয়ারম্যান।

ব্যাপারটা তখন জলের মতোই স্পষ্ট হয়ে গেল। বইটির কথা শুনে অতুল-বাবু তা পড়েছেন এবং অনেক বড় বড় সাহিত্যিককে পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা বাকী রয়ে গেছে জেনেও অচেনা এই নতুন লেখককে তাঁর প্রথম বইটির জন্যেই পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

অনিবার্য কারণে বর্তমান সংখ্যায় 'হাওয়া গাড়ি' বেরোল না। আগামী সংখ্যা থেকে নিয়মিত বেরোবে।

ফলে কী দাঁড়াল? বাংলা সাহিত্য পেল একজন প্রথম শ্রেণীর লেখক। হয়তো পুরস্কার না পেলে লেখককে আরো অনেক-দিন নাম-কেনার বাজারে ধাক্কা ধকি করতে হত। হয়তো এসব ঝক্কি তাঁর ধাতে পোষাত না। হয়তো নিরুৎসাহ হয়ে তিনি লেখার কাজেই দিতেন ইস্তফা। কলম লেখা হয়তো চালিয়েও যেতেন তিনি, কিন্তু তাতে আর প্রাণ থাকত না, থাকত না উদ্ভাসন। নিষ্প্রভ হতে হতে মিলিয়ে যেতেন তিনি মিডিওক্রারের দলে।

এমন তো কতোই হয়। হয় না কি?

ঠিক সময়ে একটু গুণগ্রাহিতা, একটু উৎসাহ, একটু স্বীকৃতি লেখককে যে কতোটা সাহায্য করে তা বলে শেষ করা যায় না। শুনেছি, বার্নার্ড শ তাঁর নোবেল পুরস্কার পাওয়ার খবর শুনে নাকি মন্তব্য করেছিলেন, এ হল এমন একজন ব্যক্তির দিকে লাইফ বেল্ট ছুঁড়ে দেওয়া যে নিজেই ইতিমধ্যে ডাঙায় পৌঁছে গেছে। (অর্থাৎ আমি যখন মাঝদরিয়ায় হাবুডুবু খাচ্ছিলাম তখন মহাশয়দের পাত্তা মেলেনি। এখন এসেছেন তেলা মাথায় তেল ঢালতে। বগড় আর কাকে বলে।)

এখনকার লেখকদের এই এক অসুবিধে হয়েছে, প্রেমেন্দ্র মিত্র বলছিলেন একদিন ভালো লিখলেও সাড়া জাগে না তেমন।

কথা হচ্ছিল প্রেমেনবাবুরই বাইরের ঘরে বসে। অবিশ্যি বাইরের ঘর আর ভেতরের ঘরে তফাৎ ছিল না তেমন কিছু। সকলের জন্যেই অবারিত দ্বার। খোলামেলা মিশুক স্বভাবের মানুষ। চোখে মুখে বুদ্ধির দীপ্তি যেন ঝকমক করছে। আর তেমনি তাঁর হৃদয়। সামনে গিয়ে বসলেই মনটা আপনা থেকেই স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে।

প্রেমেনদা বলতে লাগলেন, আমাদের সময়ে কিন্তু এমন ছিল না। প্রবাসীতে তখন সবে গল্প (প্রেমেনদা বলেন, গপ্পো!) বেরিয়েছে। লক্ষ্ণৌয়ে গেছি সেবার। ইউনিভার্সিটির নামজাদা প্রফেসর—রাধা-কমল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় হল। উনি বললেন, তুমিই প্রেমেন মিত্তির? কী করে লিখলে এমন গল্প? প্রথম শ্রেণীর লেখা। চল চল, একবার ইউনি-ভার্সিটিতে চল। তারপর যেমন কথা তেমনি কাজ। সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন ইউনিভার্সিটির প্রফেসারস্ রুমে। আর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ—সকলের সঙ্গেই আলাপ করিয়ে দিলেন টেবিলে টেবিলে ঘুরে—এই হচ্ছে প্রেমেন মিত্তির, প্রথম শ্রেণীর গল্প লিখে। ভাবতেও পারবে না তোমরা আজকাল সকলের কাছ থেকে কী পরিমাণ সেই সমাদর। অথচ কতোই বা বয়স তখন? একুশ-বাইশ বছরের বেশি নয়। এ-ধরনের স্বীকৃতির কথা ভাবতেও পারবে না এখনকার লেখকরা। দুঃখই হয় তাদের জন্যে।

প্রেমেনদার সঙ্গে এসব কথা হয়েছিল এক যুগ আগে। দুরবস্থার মাত্রা তারপর থেকে বেড়েছে বই কমেনি। এখন যদি কেউ নতুন কোনো লেখকের গল্প বা কবিতার প্রশংসা করেন, তৎক্ষণাৎ শ্রোতারা অন্য-মনস্কভাবে ভাবতে শুরু করেন—ছেলেটি কি ওঁর কোনো আত্মীয়, নাকি স্ত্রীর আত্মীয়? অথবা সে কি তার বস্-এর কেউ, কিম্বা এক সানকির ইয়ারদের কেউ? অর্থাৎ গুণগ্রাহিতাকে কেউ আর এখন শাদা মনে মেনে নিতে পারেন না।

পারেন নয়, কারণ তাঁরা নিজেরাও বঞ্চিত।

ভুখা মানুষ কি আর অন্যকে খাবার দিতে পারে।

অশীন্দ্র রায়

রাজধানীর ইনসাইড স্টোরি

রায়বেরিলি থেকে চিকমাগালুর

চিকমাগালুর ভোট যুদ্ধের ফলাফলের রাজনৈতিক ইমপ্যাক্ট সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা এখুনি শুরু হয়েছে। একাজে ব্যস্ত জনতা পার্টি। ব্যস্ত ইন্দিরা কংগ্রেস এবং চ্যবন কংগ্রেস। আবার দুটি দলের তুলনায় জনতা পার্টির উপর চিকমাগালুরের প্রতিক্রিয়া হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। তবে ইন্দিরা গান্ধী কিংবা বীরেন্দ্র পাতিল যিনি হাসতে হাসতে লোকসভায় প্রবেশ করুন না কেন তার ফলে জনতা পার্টির অন্দর মহলে রাজনৈতিক দাবার চাল চলবে নতুন স্টাইলে। চিকমাগালুরে শেষ পর্যন্ত কে জয়ী হল তার উপর নির্ভর করবে চাল আর পাল্টা চালের ধরণ-ধারণ। সংক্ষেপে তিনটি রাজনৈতিক দলের লোকজনদের দৃষ্টি নিবদ্ধ কর্ণাটকের চিকমাগালুরের দিকে।

ইন্দিরা গান্ধী জিতলে দিল্লির জনতা মসনদ যেমন টলমল করে উঠবে না তেমনি আবার বীরেন্দ্র পাতিল জয়ী হলে জনতা পার্টির বুনিয়াদ নতুন করে পাকা হবে না। তবে কে জিতল আর কে হারল তার দ্বারা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হবে জনতা পার্টির শরিকদের পারস্পরিক সম্পর্ক কিংবা ঝগড়াঝাঁটির তীব্রতা। কোন শরিক কোন্‌ দিকে কাদের সংগে নিয়ে চূড়ান্ত ফয়সালার জন্য কতদূর এগোবেন তাও সম্ভবত নির্দিষ্ট করবে চিকমাগালুরের আসন্ন নির্বাচনের ফলাফল।

রাজনৈতিক বিশ্লেষণের দিক থেকে চিকমাগালুরের নির্বাচন এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি করবে বলে অনেকেই অনুমান করছেন। নতুন অবস্থাটা হল রীতিমত প্যারাডকসিকাল। আর এই অবস্থার মধ্যে পড়ছে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন জনতা পার্টি। যে ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে লড়াই করে জনতা পার্টি কেন্দ্রে ক্ষমতায় বসল সেই ইন্দিরা গান্ধী লোকসভায় বিরোধী দলের নেতা হিসাবে দেখা দিলে জনতা পার্টির মধ্যে শরিকদের থেকেথেকির বর্তমান তীব্রতা অনেক ভোঁতা হয়ে আসবে। বাকি কেন্দ্রিক লড়াই আর নানা মারপ্যাচ থেকে অবসর নিয়ে আবার একসঙ্গে কাজ করবার বাতাবরণ তৈরি হবে। জনতা পার্টি আবার দানা বাঁধবে। জনতা পার্টির এক সদস্যের মতে: তেমন হলে মোরারজী দেশাই এবং চরণ সিং নতুন পরিস্থিতিতে আবার কবমর্দন করতে বাধ্য হবেন। মোরারজী ও জনতা পার্টির প্রেসিডেন্ট চন্দ্রশেখর আবার কাছের মানুষ হবেন।

চিকমাগালুর থেকে লোকসভায় পাকতন প্রধানমন্ত্রীর আবির্ভাবে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইয়ের অবস্থা কি হবে? এই প্রশ্ন এখন নানা মহলে। প্রধানমন্ত্রীর গদি তাহলে শকত হবে। ইদানীং মোরারজী দেশাইয়ের সমালোচনা দলের মধ্যে দানা বাঁধছে। এমন সব সমালোচনার লক্ষণীয় পদের জন্য মোরারজী দেশাইয়ের বিকল্প নাম সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করছেন। ইন্দিরা গান্ধী নির্বাচনে জয়ী হলে এইসব চিন্তাভাবনায় নিঃসন্দেহে ভাটা পড়বে। নতুন পরিস্থিতিতে জনতা পার্টির যে সব শরিকরা মোরারজীর সমালোচনায় ব্যস্ত আছেন তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের বর্তমান ধারার পরিবর্তন চাইবেন না। মোরারজীকে যাকে বলে কেউ ডিসটার্ব করবেন না। অর্থাৎ মোরারজীকে প্রধানমন্ত্রীর পদে রেখে ইন্দিরা কংগ্রেসের নতুন রোলের পরিপ্রেক্ষিতে জনতা পার্টির শরিকরা নিজেদের পুনরায় কনসলিডেশন-এর চেষ্টা করবেন।

বীরেন্দ্র পাতিল জিতলে এই দৃশ্যপট যাবে বদলে। জনতা পার্টির শরিকদের মনোমালিন্য আরও বাড়বে। চরণ সিং তাঁর কিষান সম্মেলন নিয়ে বিরাটভাবে চাপ সৃষ্টি করবেন। তখন চরণ সিংয়ের প্রধান চেষ্টা হবে জনতা পার্টিতে মোরারজী বিরোধী লোকজনদের এককাঠা করা। জনসংঘ, সোসালিস্ট, সি এফ ডি এবং অন্যরা চরণ সিংয়ের নেতৃত্বে এককাঠা হতে উৎসাহ যদি নাও প্রকাশ করে তবু এর অর্থ এই দাঁড়াবে না যে তারা মোরারজীকে সমর্থন করবে। তারা মোরারজীর সমালোচনা চালিয়ে যাবে। ঐভাবে ক্রমশঃ মোরারজীর সমালোচকদের সংখ্যা বাড়বে এবং প্রধানমন্ত্রীর অবস্থা এর ফলে দুর্বল হবে। ইন্দিরা গান্ধী নির্বাচনে পরাজিত হলে ঘটনাবলীর নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইকেও নিজের দলের মধ্যে রীতিমত কৌশল পূর্ণ লড়াইয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠতে হবে।

পার্লামেন্টারিয়ান হিসাবে ইন্দিরা গান্ধীর ব্যক্তিত্ব তেমন জবরদস্ত নয়, পার্লামেন্টের বাইরেই উনি বেশী মুখর। বেশী সক্রিয়। কিন্তু উনিশ মাস বাইরের রাজনীতির গতিবিধি পর্যালোচনা করে উনি সার কথাটি বুঝেছেন যে অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতা যে পর্যায়েই উঠুক না কেন জনতা পার্টি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে না। কেন্দ্রে ক্ষমতার আসনে জনতা পার্টি থাকছে। একথা কিছুদিন হল ইন্দিরা গান্ধী নিজেও বহুবার বলেছেন। এই অবস্থার সংসদে প্রবেশ করে তাঁর প্রধান কাজ হবে নিজের দলকে তৈরি করা এবং ১৯৮২ সালে সংসদীয় নির্বাচনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা। কংগ্রেস এবং অন্যান্য দল থেকে লোকজনদের তাঁর দলে যোগ দেবার সম্ভাবনা ক্রমশঃ বাড়বে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে চিকমাগালুরের নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী যদি জয়ী হন তাহলে সাংঘাতিক রাজনৈতিক প্যাকে পড়বে চ্যবন কংগ্রেস। ইতিমধ্যেই এঁদের অনেক সদস্যের মুখে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবের ছাপটা প্রকট হয়ে উঠেছে। তেমন পরিস্থিতিতে কংগ্রেস দলে আবার ভাঙ্গন দেখা দেবে। কংগ্রেস ছেড়ে লোকজন ধীরে ধীরে ইন্দিরা কংগ্রেসে এবং জনতা পার্টিতে যোগ দেবে। যাঁরা কোথাও যাবেন না তাঁরা অবশেষে হয়ে পড়বেন পলিটিক্যালি ইনএফেকটিভ।

ইন্দিরা গান্ধী জিতলে ইন্দিরা কংগ্রেসের যাকে বলে রমরমা অবস্থা। দলের শকতি বাড়বে। আর ইন্দিরা গান্ধী চিকমাগালুরে পরাজিত হলে দলের নেতার সংগে সংগে দলেরও ঘটবে শোচনীয় রাজনৈতিক বিপর্যয়। সেই বিপর্যয়ের মোকাবিলা করবার মত শকতি নেই ইন্দিরা কংগ্রেসের।

চিকমাগালুরের লোকসভা নির্বাচন তাই দেশের রাজনীতিতে বহু প্রশ্ন ও বহু ঘটনার উৎস হিসাবে বার বেরিলির মতই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। নতুন প্রশ্ন ও নতুন ঘটনার মোকাবিলা কোন দল কিভাবে করবে সেইটেই আগামী কয়েক মাসের বড় জিজ্ঞাসা।

পর্যবেক্ষক

রণক্ষেত্র ঃ চিকমাগালুর

রমেন দাশ

সুদূর পশ্চিমঘাট উপত্যকার ঢেউয়ে সারা ভারতের সঙ্গে পশ্চিম বাংলার গায়ের অববাহিকাও এখন প্লাবিত। কর্ণাটকের অখ্যাত শহর চিকমাগালুর রাতারাতি বিখ্যাত। চিকমাগালুরের এই খ্যাতির পেছনে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর অবদান বোধহয় বর্তমান পর্যায়ে সবচেয়ে বেশী। যদি তিনি নিজের রাজ্য উত্তরপ্রদেশের বায়রেবিলি কেন্দ্র ছেড়ে কর্ণাটকের জেলা-শহর চিকমাগালুরে নির্বাচনপ্রার্থী না হতেন, তবে হয়তো চিকমাগালুর সারা দেশের কাছে অজ্ঞাত-অখ্যাতই থেকে যেত। কারণ, জেলা-শহর চিকমাগালুরের সঙ্গে কোন বেল যোগা-যোগ নেই; নেই টেলিগ্রাম-টেলিগ্রাফের তেমন সুবিধাজনক কোন ব্যবস্থা। আটটি বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে চিকমাগালুর লোক-সভা কেন্দ্রের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের গড়পড়তা দূরত্বও একশ মাইলের মত।

অখ্যাত চিকমাগালুর নির্বাচন কেন্দ্রের দিকে তবুও কেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর দৃষ্টি গেল? তার পেছনে অবশ্য এক তাৎপর্য আছে। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী অনুন্নত চিকমাগালুর নির্বাচনী এলাকার মধ্যে প্রায় ৬০০ কোটি টাকার চন্দ্রদ্রুম্বখ প্রকল্পের কাজ শুরু করেন। তেলের দেশ ইরানের টাকায় বিরাট এই প্রকল্পটির প্রতিষ্ঠা করার পর থেকেই শ্রীমতী গান্ধী কর্ণাটকবাসীর কাছে ভিন্নরূপে পরিচিত। শ্রীইন্দিরার উদ্যোগে ইরানের টাকায় প্রতিষ্ঠিত এই প্রকল্পটির কাজ এখনও চলছে। চিকমাগালুরের লৌহ-আকর ইরানে পাঠানো হবে। আধুনিক যন্ত্র-নির্ভর চন্দ্রদ্রুম্বখ প্রকল্পে ইতিমধ্যে স্থানীয় অজস্র কর্মী নিযুক্ত। কেন্দ্রদ্রুম্বখ প্রকল্পের দৌলতে চিকমাগালুরের অর্থনীতি এখন অনেক বেশী চাঙ্গা।

চন্দ্রদ্রুম্বখ প্রকল্পের মুখ দেখার আগে অবশ্য চিকমাগালুরের শ্রমজীবী মানুষ আরও একটি ইস্পাত কারখানার সূচনা দেখেছিলেন। ১৯৭১ সালে শ্রীমতী গান্ধী প্রধানমন্ত্রীরূপে এই অঞ্চলে বিজয়নগর ইস্পাত কারখানার ভিত্তি স্থাপন করেন। বিজয়নগর ইস্পাত কারখানার কর্মযজ্ঞ সমানে এগিয়ে চলেছে। চন্দ্রদ্রুম্বখ প্রকল্প আর বিজয়নগর ইস্পাত কারখানার কর্মযজ্ঞের নিত্যছবি এখনও স্থানীয় মানুষের মনে চমক লাগায়। এছাড়া শ্রীমতী গান্ধীর অনুগামী কংগ্রেস দল পরিচালিত বর্তমান কর্ণাটক সরকারও অতি-সম্প্রতি ৫০ লক্ষ টাকার আরও একটি প্রকল্পের কাজে হাত দিয়েছেন, ফলে চিকমাগালুরের সাদাসিধে ধর্মভীরু মানুষ বাইরের প্রচারের চাইতে ঘরের কাজকেই বেশী গুরুত্ব দিচ্ছে।

১৯৭৭-এর লোকসভার অসাধারণ সাধারণ নির্বাচনে শ্রীমতী গান্ধীর প্রিয় নির্বাচনকেন্দ্র রায়বেরিলি তাঁকে বিমুখ করে। রায়বেরিলির ঐতিহাসিক রায়মাল্য তখন বর্তমান জনতা নেতা ও প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজনারায়ণের অহংকার হয়। বহু ভোটের ব্যবধানে তিনি শ্রীমতী গান্ধীকে পরাজিত করেন। তার প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রথম সোপান তিনি অভাবিতভাবে ভেঙে চুরমার করেন।' পতন ঘটে ইন্দিরা গান্ধী ও তার সরকারের। সেই থেকে ইন্দিরা অসহায়। একের পর এক ঝড়-ঝাপটা আর রাজনৈতিক কলহে তিনি ক্লান্ত শ্রান্ত।

শ্রীমতী গান্ধী পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে প্রায় দেড় বছর চুপচাপ বসেছিলেন। হয়তো সুযোগ আর সম্ভাবনার অপেক্ষায় ছিলেন। তাঁর পায়ের তলার মাটি এখনও কতটা শক্ত বলা দুষ্কর। তবে জনতা দলের আভ্যন্তরীণ কলহ আর খেয়োখেয়ি, দেশের সংকট-সমস্যা সমাধানে জনতা সরকারের ব্যর্থতা শ্রীমতী গান্ধীর মনে দুঃসাহস এনে দিয়েছে। তাই লোকসভায় প্রবেশের জন্য তাঁর এই উদ্যোগ-আকাঙ্ক্ষা। অতিপ্রিয় রায়বেরিলির প্রতি হয়তো তাঁর আর বিশ্বাস নেই। 'স্বদেশ-স্বক্ষেত্র' ছেড়ে তাই তাঁর বিদেশ-বিভূঁই যাত্রা।'

রায়বেরিলি ছেড়ে চিকমাগালুরে শ্রীমতী ইন্দিরার উপস্থিতিকে জনতা দলের নেতারা তাঁর নৈতিক পরাজয় বলে অভিহিত করেছেন। কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজ বলেছেন, চিকমাগালুর হবে ইন্দিরার ওয়াটারলু। বিজ্ঞ রাজনীতিক জর্জের এই মন্তব্যে আবেগের সুর ধ্বনিত হলেও তাতে বাস্তবের স্পর্শ আছে বলে মনে হয় না। ব্যক্তিগত জীবনে জর্জ নিজেও তো স্বরাজ্য ছেড়ে বিহারে গিয়ে নির্বাচন প্রার্থী হয়েছিলেন। মাত্র দেড় বছর আগের কথা। গোয়ানিজ জর্জ ফার্নান্ডেজ স্বরাজ্যবাসীর সমর্থন না চেয়ে বিহারের মজঃফরপুরের ভোটে লোকসভায় নির্বাচিত হওয়ায় মনে হয় তাঁর কৌলিন্যই বেড়েছে। নির্বাচন অন্তত প্রমাণ করেছেন, তিনি আঞ্চলিক নন, সর্ব-ভারতীয় তো। তাঁর এই 'স্বদেশ বা স্বরাজ্য' পরিবর্তনে যদি নৈতিক পরাজয় না থাকে, তবে শ্রীমতী ইন্দিরার বেলায় ঐ অনুযোগ কেন? মনে হয়, সারা দেশের মানুষের কাছে নেতৃত্বের দাবী করার মত নেতা কমছে বলেই এদেশে দুর্দিন আর দুর্দশা বাড়ছে।

ইন্দিরা গান্ধী

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর রায়বেরিলি ত্যাগের মধ্যে যদি তার নৈতিক পরাজয়, অথবা ভয় থাকে, তবে সুদূর প্রান্তের নিতান্ত অপরিচিত কেন্দ্র চিকমাগালুরে নির্বাচন প্রার্থী হওয়ার মধ্যে কি শ্রীমতী গান্ধীর দুঃসাহস, আর সর্বভারতীয় নেতৃত্বের অহংকার ফুটে ওঠেনি? দুঃসাহসী নেতৃত্ব-এর অহংকারেই শ্রীমতী ইন্দিরা এবার কর্ণাটকের চিকমাগালুরে উপস্থিত।

বীরেন্দ্র পাতিল

আসন্ন উপনির্বাচনে সর্বমোট প্রার্থী ২৮। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বাদে আরও একজন নির্দল মহিলা প্রার্থী আছেন। প্রার্থী সংখ্যা যদিও অপ্রত্যাশিত, তবুও নিঃসন্দেহে বলা চলে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে শ্রীমতী গান্ধী এবং শ্রীবীরেন্দ্র পাতিলের মধ্যে। অর্থাৎ ইন্দিরা কংগ্রেস আর জনতা দলের সরাসরি ভোটযুদ্ধ। ক্ষমতাসীন হয়ে এর আগে আর কোনও প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন-প্রার্থী হননি। সুতরাং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবীরেন্দ্র পাতিলের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা এক নতুন ইতিহাসও বটে।

শ্রীবীরেন্দ্র পাতিল একজন প্রবীণ রাজ-

নৈতিক নেতা। গুলবার্গা জেলার বাসিন্দা শ্রীপাতিল ১৯৬৮ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তিন বছর কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তারপর অবশ্য আর রাজ্যের কোন নির্বাচনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেননি। পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ১৯৭২ থেকে এ বছরের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তিনি রাজ্যসভায় মনোনীত সদস্যরূপে যুক্ত ছিলেন। অর্থাৎ সম্প্রতিকালে রাজ্যের জনগণের দরবারে নেতারূপে তাঁর সাম্প্রতিক জনপ্রিয়তার যাচাই হয়নি। তবে শ্রীপাতিল তাঁর স্ববাজ্যে প্রার্থী। ভাষা-সংস্কৃতি ও রাজনীতির সঙ্গে তিনি জন্মগতসূত্রে অবদ্ধ। এটা তাঁর একটা অতিরিক্ত সুবিধা।

কেন্দ্রে জনতা সরকার প্রতিষ্ঠিত। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় সব মন্ত্রী নেতারা ইতিমধ্যে শ্রীপাতিলের পক্ষে সোচ্চার। খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রকারান্তে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাব এই নির্বাচনের ফলকে প্রভাবান্বিত করবে। লোকনায়ক জয়প্রকাশ, আচার্য কৃপালনী সহ শ্রীমতী গান্ধীর পিতৃ-পিতামহের সহকর্মীরাও তাঁর বিরুদ্ধে। শ্রীমতীর প্রধানমন্ত্রিত্বের কালো দিক তুলে ধরে তাঁকে গণতন্ত্র হত্যার অপরাধে অপরাধী করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-নেতারা নির্বাচনী প্রচারে মুখর। সঙ্গে তাঁরা দোসর হিসাবে সি পি আই (এম), ডি এম কে দলকেও পেয়েছেন।

অপরপক্ষে পরাভূত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে দাঁড়িয়েছেন এ ডি এম কে দল। পাশের রাজ্যের শাসন ক্ষমতা তাদের হাতে। কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেবরাজ উরসতো সদলবলে শ্রীমতী গান্ধীর পাশে স্তম্ভের মত আছেনই। শ্রীমতী গান্ধীর একদা সুহৃদ এবং অন্তর্ভুক্ত সি পি আই অবশ্য এই মহাযজ্ঞে ভঙ্গ দিয়েছেন। এই দল বলেছেন, তাঁরা পাতিল বা শ্রীমতী গান্ধী কাউকেই সমর্থন করবেন না। একজন উপযুক্ত প্রার্থীকে বেছে নিয়ে ভোট দেবেন। আর কর্ণাটকের চবন-কংগ্রেসের শিবির তো ইতিমধ্যে ভেঙ্গে চৌচির। ঐক্যপন্থী কংগ্রেস ফোরামের অন্যতম এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এস এম কৃষ্ণান ও সংসদ সদস্য কে, লাক্কাপ্পা চবন-কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, জনতা দলের লেজুড় হওয়ার আশায় কয়েকজন নেতা শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধাচরণ করে হিরো হতে চাইছেন। নীট-ফল, পাতিল-ইন্দিরা প্রশ্নে কর্ণাটক কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত।

নির্বাচনী প্রচারের বৈচিত্র্যও চিকমাগালুরে কম নেই। শিল্পমন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজ খাঁটি দক্ষিণ কানাড়ার পোশাকে সেজে হাতে বালতি নিয়ে নির্বাচনী এলাকায় অর্থ সংগ্রহ করেছেন আর বলেছেন : ইন্দিরা একজন বহিরাগত। স্থানীয় ভাষা-সংস্কৃতি সম্পর্কে কোনও জ্ঞান নেই জনতার অন্যান্য মন্ত্রী-নেতারাও দোসরদের সঙ্গে সমস্বরে অভিযোগ তুলেছেন : দেশের শত্রু গণতন্ত্রহন্ত্রী কায়েমী স্বার্থের পক্ষীয় স্বৈরাচারী ইন্দিরাকে একটি ভোটও নয়।

শ্রীমতী গান্ধী অবশ্য একাই একশ। ২০ অক্টোবর থেকে তিনি একটানা প্রচারাভিযান করে চলেছেন। পাশে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেবরাজ উরস। শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন, ছয় মাসের মধ্যে তিনি 'কানাড়া' ভাষা শিখে নেবেন। দেশসেবার পক্ষে ভাষা কেন অন্তরায় নয়। আমরা সকলেই ভারতবাসী। ভারত আমাদের দেশ। তাঁর অভিযোগ, পাঁচমিশালি জনতা দলের তথাকথিত গণতন্ত্র কেবল নগরকেন্দ্রীক ধনী ও ভদ্রজনের মধ্যে সীমিত। তাঁর দল গণতন্ত্রকে অর্থবহ করে তুলতে চায়, বিশেষত, নির্যাতিত, নিপীড়িতের কাছে। সঙ্গে অবশ্য তিনি জরুরী অবস্থার সমর্থনেও জোরালো বক্তব্য রেখেছেন।

কে স্বৈরাচারী আর কারা পাঁচমিশালি আর বিচার-বিবেচনার দায়-দায়িত্ব এবার চিকমাগালুরের সাধারণ নির্বাচকদের—কোনও দল বা নেতাদের নয়। সুতরাং শ্রীমতী ইন্দিরা আর শ্রীপাতিলের পক্ষে-বিপক্ষে যত বড় প্রচারের বানই ডাকুক না কেন, নেতাদের চমকপ্রদ ভাষা আর মিষ্টি কথার প্রতিশ্রুতিতে নির্বাচকদের মন গলবে কিনা সন্দেহ। নির্বাচকদের মতিগতি বুঝবার আগে সেখানকার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা একবার খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

১৯৭৭ সালের অসাধারণ সাধারণ নির্বাচনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর দলের যখন সারা ভারতে অভাবনীয় বিপর্যয় ঘটে, তখনও কর্ণাটকের চিকমাগালুর কিন্তু শ্রীমতী ইন্দিরার অনুগামী। তাঁর সমর্থিত প্রার্থী ডি বি চান্দ্রেগৌড়া ২০৮২৩৯ ভোটে জনতা প্রার্থীকে পরাজিত করে লোকসভায় নির্বাচিত হন। তারপর সারা ভারতে অনিবার্যভাবে জনতা হাওয়া বয়ে যায়। সর্বত্র জনতা দলের জয়-জয়কার। কেন্দ্রে এবং রাজ্যে রাজ্যে জনতাশাসন। প্রায় এক বছরের মাথার চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে যখন কর্ণাটক রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন হয়, জনতা জোয়ারের মুখে তখনও সেখানে ইন্দিরাসেন্যরা। সাগরের জোয়ার সেদিনও সেই খবরেরাতকে বুঝতে পারেনি। বিধানসভা নির্বাচনে কর্ণাটকে ইন্দিরা কংগ্রেস শ্রীদেবরাজ উরসের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠন করে এবং এখনও সেই মন্ত্রিসভা বহাল।

চলতি বছরের গোড়ায় কর্ণাটকের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। চিকমাগালুর লোকসভা কেন্দ্রের অধীন আটটি বিধানসভা নির্বাচনকেন্দ্র। তার মধ্যে একমাত্র কাদুর কেন্দ্র জনতা প্রার্থীকে জয়ী করে। বাদবাকী কয়কল, শ্রীঙ্গেরি, মুড়িগেরি, বেলথাঙ্গাড়ি, বিরুর, তারিকেরে ও চিকমাগালুর এই সাতটি কেন্দ্র থেকে অনায়াসে এবং অনেক ভোটের ব্যবধানে ইন্দিরা কংগ্রেসের প্রার্থীরা বিজয়ী হন। যে একটি মাত্র কেন্দ্রে জনতা প্রার্থী জয়ী হন, সর্বমোট প্রদত্ত ভোটের মাত্র ছত্রিশ ভাগ

মনিপ্রকাশনীর নিবেদন

কবিতা উল্লেখ্য '৭৮'

যুগ্ম সম্পাদক : মৃণাল চট্টোপাধ্যায় ও শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়

'৭২ ও '৭৬ এর পর '৭৮ সালের উল্লেখযোগ্য কবিতার সংকলন ডিসেম্বরেই প্রকাশিত হচ্ছে।

অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিমলচন্দ্র ঘোষ, জগদীশ ভট্টাচার্য, দিনেশ দাস, মনীশ ঘটক, পবমানন্দ সরস্বতী, অজিত দত্ত, মণীন্দ্র রায়, অশোকবিজয় রাহা, অরুণ ভট্টাচার্য, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অমূল্য চক্রবর্তী, নচিকেতা ভরদ্বাজ, সন্তোষকুমার ঘোষ, দক্ষিণা রঞ্জন বসু, শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু পত্রী, সন্তোষকুমার অধিকারী, পুষ্পেন্দু চক্রবর্তী, অসিত রায়, তুষার আদক, প্রদীপ রায় চৌধুরী, বমেন্দ্র দেশমুখ্য, কবিরুল ইসলাম, কবিতা সিংহ, তরুণ সান্যাল, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শান্তনু দাস, শিশির ভট্টাচার্য, সাধনা মুখোপাধ্যায়, বিজয়া মুখোপাধ্যায়, নবনীতা দেবসেন, শৈলেশ ভট্টাচার্য, বীতোসক ভট্টাচার্য, সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্যামলকান্তি দাস, যুগান্তর চক্রবর্তী, সুনীলকুমার গুপ্ত, তারাপদ রায়, গোপাল ভৌমিক, মনোজিৎ বসু, সামসুল হক, রবীন্দ্র গুহ, মৃণাল বণিক, মলয়শংকর দাশগুপ্ত, সুনীল বসু, অমিয় সিংহ, কমল ভট্টাচার্য, অমলকান্তি দাস, স্নেহাকর ভট্টাচার্য, শিশির বন্দ্যোপাধ্যায়, বাম বসু, নির্মল আচার্য, জগত লাহা, জগন্নাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ, দিব্যেন্দু পালিত, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, অলোক সরকার, দেবারতি মিত্র, ইন্দ্র মিত্র, রাজলক্ষ্মী দেবী, অরুণকুমার সরকার, আনন্দ বাগচী, কেতকী কুশারী ডাইসন, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, হরপ্রসাদ মিত্র, অরুণ মিত্র, বন্যেশ্বর হাজরা, মানস রায় চৌধুরী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল, বাসুদেব, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, শংকর চট্টোপাধ্যায়, শুদ্ধেন্দু মল্লিক।

সুশীল রায় ও মৃণাল চট্টোপাধ্যায়।

দাম—৮ টাকা মাত্র

* শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাড়াজাগানো

"শব্দ তুমি বলো"—চার টাকা

* কানাই ঘোষের (বাংলা রূপ)

রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম ৩

* মৃণাল চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

'প্রগতি' মাসিক—এক টাকা

নিয়মিত স্টলে দেখুন

মনি প্রকাশনী

কেঃ অঃ শৈবাল আর্ট প্রেস

৮, সনাতন শীল লেন, কলি-১২

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY

ভোট পান। অর্থাৎ একাধিক প্রার্থী থাকায় কম ভোট পেয়ে তিনি নির্বাচনের জয়মাল্য বরণ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বর্তমান চিক-মাগালুর নির্বাচন কেন্দ্র প্রায় ষোল বছর বছর আগে হামান লোকসভা কেন্দ্র নামে পরিচিত ছিল। এবং নির্বাচনী ফলাফলের বিশ্লেষণে মনে হয়, চিকমাগালুর অথবা হামান যে নামেই যখন ঐ কেন্দ্রটির পরিচয় থাকুক না কেন, বরাবরই সেখানে কংগ্রেসী হাওয়া। ১৯৬২ সালের লোকসভা নির্বা-চনেও কংগ্রেস প্রার্থী জনৈক তদানীন্তন প্রজাসোসালিস্ট প্রার্থীকে পরাভূত করে লোকসভার আসন দখল করেন।

চলতি বছরের গোড়ায় অনুষ্ঠিত চিকমাগালুর কেন্দ্রের আটটি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা হিসাবেও দেখা যায়, ১৯৭৭-এর তুলনায় ইন্দিরা কংগ্রেসের পক্ষে ভোটের হার বহুলাংশে বেড়েছে। অর্থাৎ শ্রীমতী ইন্দিরার সমর্থন সেখানে ঊর্ধ্বমুখী।

চিকমাগালুর কেন্দ্রের ভাষা, সংস্কৃতি, পেশা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যেও বৈচিত্র্য বর্তমান। শৃঙ্গেরি এবং মুড়িগেরি চা কফি ও দারুচিনির বাগিচার কর্মরত শ্রমিকদের অধিকাংশই তামিলনাড়ু, কেরল ও দক্ষিণ কর্নাটকের অধিবাসী। মালামদের পাহাড়ী অঞ্চলের মোট ৪টি নির্বাচন কেন্দ্রের অর্থাৎ শ্রীঙ্গেরি, মুড়িগেরি, বেলথাঙ্গাড়ি ও করকলের প্রচলিত ভাষা কন্নাড়ী, তামিল এবং মালা-য়ালম। মোট ৫ লক্ষ ৮৬ হাজার ভোটারের মধ্যে হরিজন ও মধ্যবর্ণের ভোটারের সংখ্যা শতকরা ৩৫ ভাগ। লিঙ্গায়েত সম্প্রদায়ের ভোট সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার। লিঙ্গায়েত বিরোধী ভোক্কালিঙ্গম সম্প্রদায়ের ভোটের সংখ্যাও প্রায় ৯০ হাজার। বাগিচা শ্রমিকদের মধ্যে শ্রীমতী ইন্দিরা ও তাঁর দলের প্রভাব ক্রমবর্ধমান। পূর্ববর্তী নির্বাচনী ফলাফল তার প্রমাণ দিয়েছে। তারপরই এ ডি এম কে

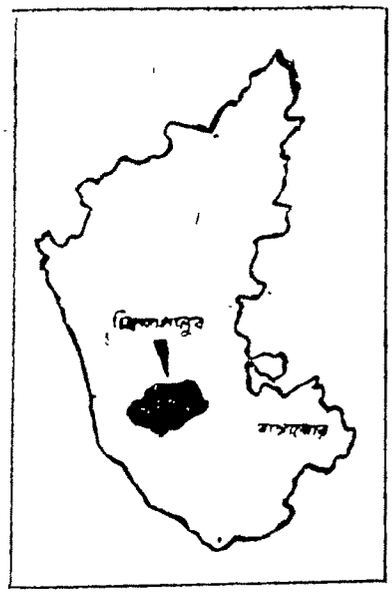

দলের প্রস্তাব। ঐ দলও এবার শ্রীমতী ইন্দিরার সমর্থনে দাঁড়িয়েছেন।

জনতা প্রার্থী শ্রীবীরেন্দ্র পাতিল লিঙ্গা-য়েত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্মণ। শ্রীমতী গান্ধীর মূল পরিচয়ও কাশ্মীরী ব্রাহ্মণরূপে। আসলে চিকমাগালুর নির্বাচনী লড়াই দুই ব্রাহ্মণের লড়াই।

কেন্দ্রীয় সরকার জনতা দলের হাতে থাকলেও, রাজ্য সরকার ইন্দিরা কংগ্রেসের হাতে। সুতরাং প্রশাসনিক প্রভাব যে শ্রীমতী গান্ধীর শিবিরকে শক্তিশালী করবে, তা সহজেই অনুমেয়। ইতিমধ্যে জনতাদল অভি-যোগ তুলেছেন, চিকমাগালুরের পুলিশ সুপারকে অন্যত্র বদলী করার জন্য। তাদের বক্তব্য, প্রশাসনকে নির্বাচনী কাজে ব্যবহার-এর সুযোগ নিতে মনোমত পুলিশ সুপার চিকমাগালুরে বসানো হয়েছে। ইন্দিরা কংগ্রেস অবশ্য পাল্টা অভিযোগ তুলেছেন; কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রীকে চিকমাগালুরে সাময়িকভাবে বসানোর সিদ্ধান্ত পক্ষপাত আমলাদের উপর প্রভাব বিস্তারেরই নাকি এক নতুন পন্থা। অভি-যোগ পালটা অভিযোগের সীমা নেই, শেষ নেই।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কানাড়ী ভাষায় কথা বলতে পারেন না এটা তাঁর নির্বাচন-এর পক্ষে যেমন অসুবিধাজনক, তেমনি শ্রীবীরেন্দ্র পাতিলও আবার রাজ্যের নির্বা-চনী আসর থেকে বহুদিন যাবৎ নির্বাসিত বলা চলে। ১৯৭১ সালের পর কর্ণাটকে চার-বার যে লোকসভা অথবা বিধানসভা নির্বাচন হয়েছে, তার একটিতেও তিনি প্রার্থী হননি।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জরুরী অবস্থার অভিশাপে যখন সারা ভারতে ক্ষোভ আর বিক্ষোভের ঢেউ, তখন কিন্তু কর্ণাটক ছিল সেই অভিশাপমুক্ত। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেবরাজ উরস কখনও জরুরী অবস্থার সুযোগ নিয়ে নিসার অপপ্রয়োগ করেননি, প্রশাসনকে অন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের মত জনবিরোধী কাজে ব্যবহার করেননি। বরং গণমুখী অনেক প্রকল্পের কাজে হাত দেন। সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ পূরণের চেষ্টা করেন। তাই বোধহয়, জরুরী অবস্থার বিরোধী বক্তৃতার উত্তাপ চিকমাগালুরের ভোটারদের গরম করতে পারছে না। শ্রীমতী গান্ধী এতসব দিক বিচার বিবেচনা করেই বোধহয় দুঃসাহসী পদক্ষেপ চিকমাগালুরের পাহাড়ী মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মনোনয়ন পেশ করার আগে শংকরাচার্য প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেরি মঠের আচার্যদেবের আশীর্বাদ লাভ করেন। মনোনয়নপত্র পেশ করার পর এক নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণকন্যার মতই দক্ষিণ ভারতের জাগ্রত বিগ্রহ মল্লিনাথেশ্বরের মন্দিরে গিয়ে পূজা দেন। ইন্দিরার ধর্মকর্মের এই সমন্বয় দক্ষিণ ভারতের ধর্মভীরু মানুষের মনে দারুণ সাড়া জাগিয়েছে সন্দেহ নেই। রাজনীতিবিদদের বহুগুণের মধ্যে নাটকীয়তা ও আবেগ অন্যতম। শ্রীমতী গান্ধীর জনপ্রিয়তার পেছনে এ দুটি গুণের মূল্য যে অনেকখানি, তা তাঁর জীবনেতিহাসই সাক্ষ্য দেয়।

ভৌগোলিক সীমানা ভেঙে চৌচির করে ঘায়েবেরিলির প্রার্থী আসন্ন উপনির্বাচনে চিকমাগালুরে উপস্থিত। ভূগোল-ভাঙা নেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরাকে চিকমাগালুর অতীত ইতিহাস দিগন্তীর পথপরিক্রমায় কতখানি সাহায্য করবে, এই মুহূর্তে তা বলা দায়। দেশ-বিদেশের মানুষ বোধহয় সেই কারণেই উত্তেজনায় উন্মুখ। কারণ, শ্রীমতী ইন্দিরার গান্ধীর পরাজয় শুধু তাঁর ব্যক্তিগত নয়, একটি দলের ইতিহাসের ইতি টানার সূচনা করবে। আর শ্রীমতী গান্ধীর বিজয় জনতা দলের সর্বভারতীয় নেতৃত্বকে যেমন বিপদ্ন বিষণ্ণ করবে, তেমনি দেশের সংসদীয় গণ-তন্ত্রের ভবিষ্যত রূপরেখায় আরেক নতুন নিশানা এনে দেবে। নেতৃত্বের অহংকার ইন্দিরাকে তাই দুঃসাহসী অভিযানে উৎসাহ জুগিয়েছে।

'খেলার ছলে
ষষ্ঠীচরণ—'
চীন-গোষ্ঠী
রুশ-গোষ্ঠী
ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠী
গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ তৃতীয় বিশ্ব

চিকমাগালুর হাওয়ায়

পশ্চিমঘাট উপত্যকার ঢেউ পশ্চিম বাংলার গাঙ্গেয় অববাহিকার এসে আছড়ে পড়েছে। এ রাজ্যের দুই-কংগ্রেস এবং জনতা দলের মধ্যে ইতিমধ্যে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। চিকমাগালুরের আসন্ন উপ-নির্বাচনের ফলাফলের প্রতীক্ষায় এই তিন দলের শীর্ষ নেতারা এখন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও উত্তেজনা নিয়ে পরবর্তী কৌশলের অপেক্ষায় থমকে দাঁড়িয়ে।

অক্টোবরের মাঝামাঝি কেন্দ্রীয় কমিটি রাজ্য জনতা দলের কাছে এক জরুরী বার্তা পাঠিয়ে চিকমাগালুর নির্বাচনের জন্য অর্থ সাহায্য ও কয়েকজন ভাল বক্তা-নেতা পাঠাতে অনুরোধ করেন। বার্তা পেয়ে জনতার কর্মকর্তারা যথারীতি বৈঠক করেন। অর্থ সাহায্যের ব্যাপারে তারা কোনও ব্যবস্থা করতে পারেননি। কারণ সুস্পষ্ট। না আছে রাজ্য জনতা দলের সংগঠন, না প্রশাসনিক ক্ষমতা। তাই কর্মী বলে অথবা প্রশাসনিক প্রভাব খাটিয়ে অর্থ সংগ্রহ তাদের পক্ষে

রাজনীতি কলকাতা স্টাইল

সম্ভব হয়নি। আসলে রাজ্য জনতা দলের সংগঠন কাগজে-কলমে যে তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে, চিকমাগালুরের উপ-নির্বাচনের প্রশ্নে নেতারা তা আর একবার অনুভব করলেন। তাই বন্যাত্রাণের দোহাই পেড়ে অর্থ সাহায্য পাঠানোর দায় থেকে এবার তারা রেহাই পেয়েছেন। কিন্তু নেতা বা বক্তা পাঠানোর প্রশ্নে রাজ্য জনতা দল কম জল ঘোলা হয়নি। প্রথমত প্রথম শ্রেণীর একাধিক নেতা এই রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণে প্রকাশ্যে ইন্দিরা বিরোধী হাওয়ার গা ভাসাতে আর তেমন উৎসাহী নন। তারা দেখে নিতে চান চিকমাগালুর রাজনীতির খরস্রোত শেষ পর্যন্ত কোন খাতে গড়ায়। তারপর তারা ভেবেচিন্তে পরবর্তী পদক্ষেপে স্থির করতে আগ্রহী। এঁদের মধ্যে একাধিক নেতা আবার নিজেদের জাতীয়তাবাদী বলে জাহির করে বিজয়ার কোলাকুলি জানাতে ইন্দিরা কংগ্রেসের এক শীর্ষ নেতার সঙ্গেও দেখা করেছেন। মিষ্টি-মুখের সংবাদে তারা রাজনৈতিক রুচি পাল্টাতে চান কিনা—তা নিয়ে ওয়াকিবহাল মহলে যথেষ্ট কৌতূহল দেখা দিয়েছে।

অনেক বাক-বিতন্ডার পর রাজ্য জনতা দলের একাংশ সহ-সভাপতি অরবিন্দ বসুকে চিকমাগালুর নির্বাচনে বক্তা হিসাবে পাঠানোর সুপারিশ করেন। কিন্তু তা নিয়েও বেশ কোন্দল দেখা দেয়। ইন্দিরা বিরোধী বক্তব্য রাখতে অধিকাংশ নেতা নির্বাচনী প্রচারে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেও ইচ্ছুক অরবিন্দবাবুকে সেখানে পাঠাতে নানা মুনির নানা মত দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত নেতাদের কোন্দল এতই চরমে ওঠে যে বক্তার নাম চূড়ান্ত করার দায়িত্ব দিল্লির নেতাদের উপর ছেড়ে দিতে হয়।

জনতা দলের নেতাদের মধ্যে চিক-মাগালুর নির্বাচনে বীরেন্দ্র পাতিলের সমর্থনে বক্তা পাঠানো নিয়ে যখন দারুন

চিঠিপত্র

উদ্দেশ্যপ্রণোদিত

গণতন্ত্রে অবশ্যই যে কোন লোকের যা খুশি তাই লেখার ও তা ছাপাবার অধিকার আছে। অমৃত পত্রিকার ফিচার লেখক শ্রীরমেন দাস, 'ইন্দিরার মুখোমুখী' (অমৃত ৬ই অক্টোবর, ১৯৭৮) ফিচারে এমন অনেক কিছু লিখেছেন, যা পড়ে আমারও অনুরূপ অধিকার প্রয়োগ করতে হচ্ছে, কারণ তার প্রয়োজন ঘটেছে তাঁর লেখাতেই।

প্রথম প্যারাগ্রাফটি পড়তে শুরু করলেই বোঝা যায় যে লেখাটি উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। প্রথম উদ্দেশ্যটি হল পশ্চিমবঙ্গের ধ্বংসোন্মুখ সরকারকে খিস্তি করা। আবার এটি শ্রীমতী গান্ধীর বয়ানে করতে পারলে তো তা সোনায় সোহাগা। যথা, 'রাজনীতির খেলা আমরা চলতে দেব না।' 'সংগ্রাম করে সর্ব-হারাদের হাতে নেতৃত্ব দিতে তারা ভীত কেন?' ইত্যাদি...। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আরো পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়, অন্য প্যারাগ্রাফে রমেনবাবু কি প্রশ্ন রেখেছিলেন', তার বিস্তৃত বিবরণ দেয়া আছে। কিন্তু এখানে ওই বিরোধাভাসগুলি দৈববাণীর মত হঠাৎ ছেড়ে দেয়া হয়েছে। কোন প্রশ্নের উত্তর তা জানানো হয়নি।

উদ্দেশ্যপ্রণোদিত লেখা বলে আরো বোঝা যায়, যখন দেখি প্রশ্নকর্তা নেতাজীর কথা নিয়ে এসে শ্রীমতী গান্ধীর মুখ দিয়ে বলিয়ে নিচ্ছেন, 'সেই দলই তো চল্লিশের দশকে নেতাজীকে কুইসলিং বলে অভিহিত করেছিল।' চল্লিশ দশকের সেই বহুপ্রচারিত কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে আজও অনেকেই চালিয়ে যাচ্ছেন; যদিও কম্যুনিস্টরা নেতাজীর সঠিক মূল্যায়ণ বেশ কিছুদিন আগেই করেছে।' কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী, তাঁর মন্ত্রিত্বের শেষ দিন পর্যন্ত নেতাজীর একখানি ছবি পর্যন্ত লোকসভায় টাঙিয়ে রেখে আসতে পারেননি। আর তাঁর টাইগার কেপসুল থেকে নেতাজীকে বাদ দিতেও শ্রীমতী গান্ধীর আটকায়নি। তবু তিনি শ্রীরমন দাসের মারফৎ জানালেন তিনি নেতাজীর কত বড় ভক্ত।

ব্যাপারটা বোধহয় একটু বেশী গরম হয়ে যাচ্ছে বলেই, রমেনবাবু প্রায় পাতা দুয়েক, রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতন, এন্ড্রুজ এইরকম সুখকর আলোচনাই করলেন। কিন্তু বোধহয় উদ্দেশ্যগুলো আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। তাই তিনি এমন এক প্রশ্ন করে বসলেন, যার উত্তরে শ্রীমতী গান্ধীকে বলতে হল, 'এতক্ষণ তো বেশ ভাল আলোচনা চল-ছিল, হঠাৎ আবার রাজনীতি প্রসঙ্গ টানছ কেন?' তবে কি আমাদের মনে করতে হবে, শ্রীমতী গান্ধী এতক্ষণ গীতা পাঠ কর-ছিলেন?

কিন্তু ক্লাইম্যাকস্ করলেন রমেনবাবু নিজে। তিনি বেমালুম ভুলে গেলেন অবশ্য অবস্থায় শ্রীমতী গান্ধী কত সাংবাদিককে ডলে পরেছিলেন। 'বুদ্ধাঙ্গের মালা গলায়' ইন্দিরাকে তিনি যা বললেন, তা একেবারে যাচ্ছেতাই। 'আউট ইউ আর নট ইণ্ডিয়া, বাট ইউ কুড বি মাদার অব ইণ্ডিয়া।' সাবাস রমেনবাবু।

—চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, ৮৪, রসা রোড সাউথ (ইস্ট সেকেন্ড লেন), কলি-৩৩

ইতিহাস অতি নির্দয়

'ইন্দিরার মুখোমুখি' নামে যে সাক্ষাৎ-কার আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তার কিছু অংশের বিরুদ্ধে আমার কটি কথা বলার আছে। যদিও শ্রীমতী গান্ধীর মতা-মতের প্রায় সবটুকুরই সমালোচনা ও সমা-লোচকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিশ্লেষণ যোগ্য, তবু এর একটি বিশেষ অংশ সম্বন্ধে আমাকে প্রতিবাদ জানাতেই হবে।

যে ব্যক্তি শিশুর হাতে নিষ্ক্রিয় নীরেট লোহার চুম্বিকাঠি তুলে দেয় আর মন্দ জিনিস দিচ্ছে বলে নালিশ জানানো চলে। কিন্তু রূপোর জল করা লোহার চুম্বিকাঠির বেলায় যে ব্যক্তিকে ঠগ বলা ছাড়া আমা-দের উপায় থাকে না। এবং যে শিশু এ-হেন উপহার [illegible] তার ভবিষ্যত নৈতিক জীবন সম্বন্ধে [illegible] চিন্তা করার প্রয়োজন আছে। এ [illegible] জ্বলছে আমাদের গোটা সমাজজীবন।

এত কথা বললাম [illegible] শ্রীমতী ইন্দিরার কিছু উক্তি প্র[illegible] ঠিক যে চল্লিশের দশকে জ্যোতিবাসু [illegible] করেন তাঁর নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে কুইসলিং আখ্যা দিয়াছিলেন। একথাও ঠি[illegible] যে নেতাজী যখন জীবনপণ করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত তখন তাঁরা বৃটিশের সঙ্গে হাত মেলান নেতাজীর

সমস্যা দেখা দেয়, রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেসে তখন ভিন্ন রূপ। কম করে দশজন নেতা কয়েকশ কর্মী এবং অর্থ সাহায্য নিয়ে চিকমাগালুর পথে যাত্রা প্রায় স্থির করে ফেলেন। আর ঠিক সেই মুহূর্তে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী তথা ইন্দিরার নির্বাচনের মূল স্তম্ভ দেবরাজ উরসের এক বার্তা উৎসাহী নেতা ও কর্মীদের নিদারুণভাবে হতাশ করে। তিনি প্রদেশ কর্তৃপক্ষকে সেখানে কোন নেতা বা কর্মী পাঠাতে বারন করেন। বলেন, কর্ণাটক রাজ্য কংগ্রেসই ইন্দিরার নির্বাচনে কাজের পক্ষে যথেষ্ট। এবং ভিন্ন রাজ্যের নেতা ও কর্মীর জমায়েত হলে বিপক্ষ দল বিরূপ প্রচার এবং বিশৃংখলা সৃষ্টির সুযোগ পাবে।

এদিকে রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেসের সভাপতি বরকত গনি খান চৌধুরী ইন্দিরা গান্ধীর উপ-নির্বাচনের তহবিলে কম পক্ষে পঞ্চাশ হাজার টাকার একটি চেক দেওয়ার কথা ভাবেন। এ বিষয় ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি অর্থ সংগ্রহের কাজে প্রায় নেমেও পড়েছিলেন। এই সংবাদ জানতে পেরে শ্রীমতী গান্ধী তাঁর ঘনিষ্ঠ সূত্র মারফৎ বিবৃতি প্রকাশ করে জানান, চিকমাগালুর নির্বাচনের জন্য অর্থ সংগ্রহ না করে পশ্চিম বাংলার বন্যাক্লিষ্ট মানুষের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়ুন। তাদের পাশে দাঁড়ান।

চিকমাগালুরের ঢেউয়ে রাজ্য রেড্ডি কংগ্রেসের শিবিরও উদ্বিগ্ন। রেড্ডি কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারা বিষণ্ন দৃষ্টিতে চিকমাগালুরের দিকে তাকিয়ে। ইন্দিরা পরাজয়ী হন, তবে তাদের দল যে তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়বে, তা তারা অনুমান করতে পারছেন। এর মধ্যে তাদের একদল সহকর্মী যে বরকত-প্রণব-সুব্রত-নরসিমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপনে সক্রিয়, সে খবরও তাদের অজানা নেই। দলের অধিকাংশ কর্মী ইতিমধ্যে গরহাজির। তাদের ইন্দিরা কংগ্রেসের কাছাকাছি ঘুর ঘুর করতে দেখা যাচ্ছে। রেড্ডি কংগ্রেসের নেতারা বেশ বুঝতে পারছেন, ইন্দিরার অভ্যুত্থানে তাদের দলের অধিকাংশ নেতা কর্মী তাঁর পেছনে আবার ছুটবেন, আর অবশিষ্ট অংশ জনতার বিলীন হবে।

ক্ষমতাসীন ইন্দিরার একদা ভক্ত ও অনুগামী যারা ক্ষমতাহীন ইন্দিরাকে নিঃসংকোচে ত্যাগ করেছিলেন এবং পরবর্তী-কালে আবার ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য গোপন অভিসার করেছিলেন, ব্যর্থকাম সেই নেতাদের মধ্যে সম্প্রতি আবার নতুন করে তৎপরতা শুরু হয়েছে। শ্রীমতী গান্ধীর সম্ভাব্য অভ্যুত্থানের আশংকায় দেবীপ্রসাদ, প্রফুল্লকান্তি, প্রিয়-লক্ষ্মী-প্রদীপরা প্রবীণ জননেতা প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে সামনে রেখে নতুন এক রাজনৈতিক মঞ্চ তৈরির কথা ভাবছেন। চিকমাগালুর নির্বাচনের উত্তাপ যত বাড়ছে, এই নেতাদের ঘন ঘন আলোচনা শলা-পরামর্শের মাত্রাও ততই বাড়ছে। পার্বত্য উপত্যকা চিকমাগালুরের নির্বাচনী হাওয়ায় ধন্য-ক্লিষ্ট পশ্চিম বাংলার রাজনীতি জয়ে যেমন জনতা এবং রেড্ডি কংগ্রেসের বহু নেতা-কর্মী তাঁর দলে ভিড়ের লাইন দেবেন, তেমনি তাঁর পরাজয়ের মধ্য দিয়েও এ রাজ্যে গড়ে উঠবে জাতীয়তাবাদী গণ-আন্দোলন অশান্ত। শ্রীমতী ইন্দিরার তান্ত্রিক শক্তিগুলির এক সার্বিক মোর্চা। তাই চিকমাগালুর নির্বাচনী ফলাফল বাম-ফ্রন্ট কবলিত এই রাজ্যের পক্ষেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

১৮।১০।৭৮ **বেদব্যাস বৈদ্য**

বিরুদ্ধাচরণ করে। এবং একথাও গভীর দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক সত্য যে তাঁদের বর্তমান নেতাজী প্রীতিরও বিশেষ কারণ আছে। এ পর্যন্ত শ্রীমতী গান্ধী সত্য ও নির্ভুল কথাই বলেছেন, কারণ তিনি জানেন ইতিহাস অতি নির্দয়, নির্মম ও সরব। কিন্তু তার পরই অবাক বিস্ময় ও অতীব দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করতে বাধ্য হচ্ছি যে, দেশের জাতীয়তাবাদী নেতা ও দল সম্বন্ধে তিনি যে উক্তি করেছেন তখন ইতিহাসের চরিত্রগত গুণগুলোর কথা তিনি একেবারেই ভুলে গেছেন। সত্যিই ইতিহাস অত্যন্ত নির্দয়, নির্মম ও সরব। কংগ্রেস ও তৎ-কালীন বড় বড় কংগ্রেস নেতাদের নেতাজী সুভাষের প্রতি আচরণ ও মনোভাব আজ কারুরই অজানা নেই। ত্রিপুরী কংগ্রেস তার অনেকের মধ্যে একটা উদাহরণ। কিন্তু এব-

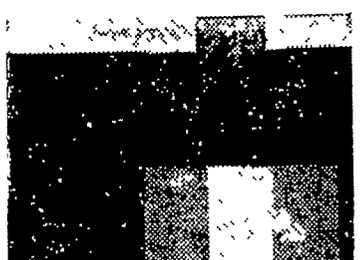

প্রয়োজন নেই। নেতাজীকে অবমূল্যায়ণ ও তাঁর বিরুদ্ধাচরণের অত্যন্ত বিরাট ও দুঃখ জনক একটি প্রমাণ আমাদের সবার চোখের সামনে আছে যাকে আমরা কখনো কেউ ভুলতে পারবো না বা ভুল চেহারায় দেখানোর চেষ্টা করতে সাহসও পাবো না—তা হল বর্তমান দ্বিখণ্ডিত ভারত। দেশের সবচেয়ে শুভাকাংক্ষী ব্যক্তির প্রতি সারা দেশের উদাসীনতার জন্য এত বড় দণ্ডভোগের উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও বোধকরি দেখা যায় না।'

শ্রীমতী গান্ধী জানেন ইতিহাস অত্যন্ত নির্দয়, নির্মম ও করব। তাই কালাধার প্রোথিত করার সময় কয়েক হাজার শব্দের মধ্যে একটি, মাত্র একটি শব্দও তিনি নেতাজীর জন্য খরচ করেননি। নেতাজীর প্রতি দায়িত্ব পালনের ভার তিনি ইতিহাসের ওপরই ছেড়ে দিয়েছিলেন। সত্যিই, ইতিহাস আমাদের বার বার শিক্ষা দেয় যে ইতিহাস পড়ে আমরা কিছুই শিখি না।

তবে একথা আমাদের নিশ্চয়ই মানতে হবে যে তাঁর আলোচনার সবটুকুই একে-বারে অসত্য ও ভুল নয়। তিনি যেখানে বলেছেন যে নীতিগত দিক থেকে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে নেতাজীর কিছু মত-পার্থক্য ঘটলেও তাঁরা দুজনেই দুজনের প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থাশীল ছিলেন তখন আমি তাঁকে একথা বলতে বাধ্য হবো যে তাঁর এই উক্তি নেতাজী সম্বন্ধে যতখানি সত্য গান্ধীজী সম্বন্ধে ঠিক ততখানিই অসত্য। পূর্ব রণ-ক্ষণে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ শুরু করার আগে জাতির পিতার নিকট নেতাজীর আশীর্বাদ ভিক্ষার কথা যাঁরা জানেন তাঁরা গান্ধীজীর 'পট্টভীর হার আমারই হার' এ উক্তিও নিশ্চয় ভোলেননি।

যাঁরা ইতিহাস ঠিকভাবে পড়েন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ ও বিচার করেন তাদের নিয়ে চিন্তার কারণ নেই।' কিন্তু যাঁরা তা করেন না তাঁদের কিছু একটা বলে ভোলান সহজ এবং সে চেষ্টা কিছু লোক প্রতিনিয়তই করে আসছেন যেজন্য আজ প্রায়ই বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও নেতাজী সম্বন্ধে হঠাৎ উক্তি ও তাঁদের এক-একটি বিশেষ পথের পথিক প্রমাণিত করার প্রবণতা দেখতে পাই। এ বস্তুত নৈতিক ও মানবিক দিক থেকে এক জঘন্যতম অপরাধ। এরকম প্রচেষ্টা চালাবার আগে সকলের মনে রাখতে হবে—'হোয়াট ইজ মরালি রং ক্যান নেভার বি লিগ্যালি জাস্ট অব পলিটিক্যালি রাইট।' সূর্যকে ঢাকা দেবার চেষ্টা করতে গেলে বেরল আপন করতলে নিজ চক্ষু দুটিই ঢাকা পড়ে।

ইতিহাস সত্যই অতি নির্মম, নির্দয় ও সরব। তাই আর একবার বলি যাঁরা বিবেকা-নন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও নেতাজীকে তাঁদের হাতের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে চান তাঁরা যেন না ভোলেন যে এমন একদিন আসবে সেদিন ইতিহাস বা জনগণ যাকেই তাঁরা 'ট্রাসক মাস্টার' ভাবেন তাঁকে স্মরণ করেই মনে মনে 'ঈশ ঘর বলতে হবে আর কাঁপতে হবে।

ইতিহাস বা জনগণ যেই সেই 'গড' হোন না কেন, প্রতারিদিহির দিন আগত ঐ।'

সান্ত্বনা সেন; ১নং পিতাখানা লেন বর্ধমান।

সময় ইন্দিরার অনুকূলে

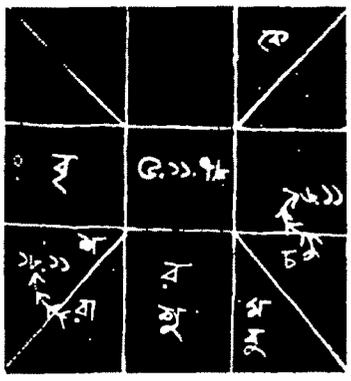

সমস্ত ভারত তথা বিশ্ববাসীর দৃষ্টি এখন দক্ষিণ ভারতের অনুন্নত, অপরিচিত একটি ছোট্ট শহর চিকমাগালুরে। ৫ নভেম্বর এখানে এক ঐতিহাসিক উপ-নির্বাচন।

৫ তারিখে নির্বাচন। ৭ তারিখে ফলাফল। ঐ দিন কটিই উভয়ের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ, গুরুত্বপূর্ণ। উপরের রাশিচক্রে আমরা সেই দিনের গ্রহাবস্থান দিলাম।

বীরেন্দ্র পাতিলের জন্ম ২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯২৪ সাল। বর্তমানে রাহুর দশা ভোগ করছেন। শ্রীপাতিলের জন্মকালীন রাহু সিংহরাশিতে, কেতুর নক্ষত্রে অবস্থিত। সেই সিংহরাশিতেই এখন ঘূর্ণায়মান (গোচর) শনির অবস্থান, এবং উপরের চক্রটিতে লক্ষ্য করলে দেখা যায়—১৮ নভেম্বর গোচর রাহু ঐ সিংহরাশিতে গিয়ে মিলিত হচ্ছে। অর্থাৎ শ্রীপাতিলের পক্ষে সিংহরাশিতে এই পাপ গ্রহদের সমন্বয় একটা বিভ্রান্তিকর, উদ্বেগের কারণ। কারণ শ্রীপাতিলের জন্মকালীন চক্রে বর্গোত্তম রবি এবং রাশি থেকে বিচার করলে, উপরোক্ত সমন্বয় একটি খলক্ষেত্র সৃষ্টি করছে। বিশেষ করে দশাপতি পাপ গ্রহ রাহু পীড়িতমুখী। আর একটি ধ্বংসাত্মক পাপগ্রহ মঙ্গল, তবা অবস্থান যদিও সে নিজগৃহে, কিন্তু সেও জন্মকালীন রবি থেকে দশমে কেন্দ্র সম্পর্ক করেছে। অর্থাৎ রাহু, শনি এবং মঙ্গল কেউ শুভদায়ক নয়। এমন কি দশা বিচারেও তাই।

শ্রীমতী গান্ধীর জন্ম ১৯ নভেম্বর ১৯১৭ সাল। তাঁর রাশিচক্রানুযায়ীও উপরোক্ত শনি, রাহু এবং মঙ্গল এই পাপ গ্রহত্রয় মোটেই নিষ্কণ্টক নয়। তাঁরও জন্মকালীন সিংহরাশিস্থ মঙ্গলের সঙ্গে গোচর শনির সহাবস্থান এবং ১৮ নভেম্বর গোচর রাহুর সেখানে গমন মোটেই শুভজনক নয়। পার্থক্য, শ্রীপাতিলের দশাপতি পাপগ্রহ রাহু, জন্মকালীন রাহুর সঙ্গে মিলিত হতে চলেছে। আর শ্রীমতী গান্ধীর দশাপতি পাপ গ্রহ শনি, জন্মকালীন শনির সঙ্গে আগেই কর্কটে মিলিত হয়েছিল এবং তখন তাঁর অভাবনীয় পতনও হয়েছিল। আর মঙ্গলগ্রহ, পাতিলের চাইতে শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষে বেশী অনুকূলে এবং মঙ্গল-গ্রহ শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষে রাজযোগকারক গ্রহ। তাছাড়া দশাতেও পাতিলের চাইতে শ্রীমতী গান্ধীর অন্তর্দশা শুক্রের অত্যন্ত সহায়ক। শুক্র শ্রীমতী গান্ধীর রাশিচক্রে স্বনক্ষত্রাশ্রিত।

আমরা, আমাদের এই পত্রিকায় গত ২ জুনের সংখ্যায় শ্রীমতী গান্ধীর রাশিচক্র বিচারকালে বলেছিলাম, আগষ্ট মাস থেকে বৃহস্পতি তাঁর অনুকূলে আসবে। শুভ-ফলদাতা হবে। হয়েছেও তাই। মোটামুটি আগষ্ট থেকেই শ্রীমতী গান্ধীর সময়টা অনুকূলের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই বৃহস্পতি শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষে একটি মোক্ষম যোগ বলা যেতে পারে। লগ্ন থেকে ভাগ্যপতি হয়ে বৃহস্পতি আগষ্ট মাস থেকে লগ্নে বসে ভাগ্যস্থানকে পূর্ণ দৃষ্টি করছে। রাশি থেকে কেন্দ্রে এবং জন্মকালীন রবি থেকে ভাগ্যস্থানে বৃহস্পতি শ্রীমতী গান্ধীকে জয়ের এবং প্রতিষ্ঠাকে নিশ্চিত করতে সাহায্য করছে। আর এক শুভগ্রহ শুক্র, যে শ্রীমতী গান্ধীর অন্তর্দশাপতি এবং রাশি থেকে রাজযোগকারক গ্রহ। উপরের রাশি-চক্রে দেখুন, সেই শুক্রের অবস্থান অত্যন্ত শুভভাবে আছে। পক্ষান্তরে শ্রীপাতিলের পক্ষে এই শুভযোগের অভাব আছে। যার ফলে শ্রীমতী গান্ধীর জয়কে সুনিশ্চিত করেছে।

সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকেও শ্রীমতী গান্ধী প্রায় লক্ষাধিত সংখ্যা অনুকূলে পাচ্ছেন। এমন কি, লক্ষের সঙ্গে ত্রিশ হাজার যোগ দিলেও আশ্চর্যের নয়। তবে, তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

ব্যক্তিগত রাশিফল

গ্রহকূলের কোন হের-ফের নেই। তুলা রাশিতে বক্রী শুক্র এবং রবির সহা-বস্থান—ঝড়ঝঞ্ঝার ইঙ্গিত বহন করে।

মেষ : হাতের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি সপ্তাহের প্রথম ভাগেই শেষ করতে সচেষ্ট হন। কারণ সপ্তাহের শেষ-দিকে কার্য-কারণে মানসিক ক্লেশ পাবার সম্ভাবনা। রবি থেকে মঙ্গলবার লক্ষ্যণীয়।

বৃষ : বহু দিনের প্রচেষ্টার সফলতা এখন পাবেন। বিশেষ করে ব্যবসায়ীরা এবং সমাজসেবীরা। দূর ভ্রমণে না যাওয়াই ভাল। রবি, সোমবার এড়িয়ে চলুন।

মিথুন : আর্থিক উন্নতি হবে। বুধ, বৃহস্পতিবার ঝোঁকের মাথায় কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত হবে না। স্বাস্থ্যহানি যোগ আছে। কর্মস্থানে গুপ্তশত্রুর তৎপরতা বৃদ্ধি পাবে। শুক্র, শনি শুভ।

কর্কট : যদিও মানসিক উদ্বিগ্নতা থাকবে। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে যোগাযোগগুলি মেজাজকে হাল্কা রাখতে চেষ্ট করবে। গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি সপ্তাহের প্রথম ভাগে সেরে নিন। শুক্র, শনি অশুভ।

সিংহ : আয়ের চাইতে ব্যয় বেশী হবে। কোন নিকট জনের সাথে ভুল বোঝা-বুঝি হতে পারে। চাকুরেদের পক্ষে শুভ ইঙ্গিত থাকবে। মঙ্গল থেকে বৃহস্পতিবার লক্ষ্যণীয়।

কন্যা : হাতে কিছু অর্থ কড়ি আসবে। ভ্রাতৃপ্রীতি বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু সন্তান স্থানীয় কারও জন্য দুর্ভাবনা হতে পারে। শুক্র, শনি শুভ।

তুলা : চলার পথে গুরুত্বপূর্ণ কোন জিনিস হারিয়ে যেতে পারে। কর্ম-স্থানে ধীর মস্তিষ্কে এগোন ভাল। যে কোন প্রকার ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন। মঙ্গল থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত শুভ।

বৃশ্চিক : যদিও ন্যায্য প্রাপ্তিতে বাধা থাকবে। কিন্তু শুক্রবার যার সাথে যোগাযোগ হওয়ার কথা, তা নিকট ভবিষ্যতে শুভ ফল দিতে পারে। বুধবার অশুভ।

ধনু : আর্থিক ব্যাপারে নতুন কোন সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। কর্ম-স্থানেও কিছুটা অশান্তি থাকবে। উৎসবাদিতে ব্যয় হবে। শুক্র, শনি অশুভ।

মকর : আয় বৃদ্ধি পাবে। ব্যস্তবাগীশ মকর, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ইঙ্গিত এবং আস্থা বৃদ্ধি পাবে। রবি, সোম অশুভ।

কুম্ভ : ব্যয় বৃদ্ধি, ফলে মানসিক চাপ, কিন্তু কর্মস্থান শুভ। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে নতুন কর্মযোগ। বৃহস্পতিবার অশুভ।

মীন : প্রেম-প্রীতিতে সপ্তাহটি ভালই যাবে। কোন ব্যাপারে দায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে। সপ্তাহের প্রথম দিকেই আর্থিক সুরাহার ইঙ্গিত থাকবে। শনিবার অশুভ।

শ্রীমাণিক্য

আগামী সপ্তাহে
সঞ্জয় গান্ধী

আপনার পরিবারের সকলের জন্যে এখন পাবেন সর্ব্বাধুনিক শ্যাম্পু- যা সবকটি গুনে সমৃদ্ধ, অথচ কমদামী-

নতুন পামলিভ ফ্যামিলি শ্যাম্পু

আজকের শ্যাম্পু হবে গুণে সমৃদ্ধ-এবং ঘনঃ যেমন নতুন পামলিভ ফ্যামিলি শ্যাম্পু। যা খুব বেশী ঘন বা খুব বেশী পাতলা নয়। জল যাই হোক, নরম বা খর—প্রচুর ফেনা হয় এই শ্যাম্পুতে।

প্রত্যেকের চুলের যত্নের জন্যেঃ নতুন পামলিভ ফ্যামিলি শ্যাম্পু আপনার পরিবারের সবার জন্যে বিশেষভাবে তৈরি। বাচ্চাদের নরম চুলের জন্যেও উপযুক্ত। আপনার চুলকে শুধু পরিষ্কার করা নয়—নরমও ঝকঝকে করে তোলে। কিন্তু রুক্ষভাব এনে দেয় না। বাড়ীর কর্তার জন্যেও ঠিক মনের মতো।

দামে কতো কমঃ নতুন পামলিভ ফ্যামিলি শ্যাম্পু আপনার সারা পরিবারকে যোগ্যভাবে সবকটি গুণে সমৃদ্ধ ভালো শ্যাম্পুর বিলাস—অথচ এই ধরণের যে কোন শ্যাম্পুর চেয়ে এর দাম অনেক কম।

পামলিভ ফ্যামিলি শ্যাম্পু—আপনার পরিবারের জন্যে সবকটি গুণে সমৃদ্ধ একটি ভালো শ্যাম্পু।

রবীন্দ্রনাথ বনাম সরলাদেবী

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

'জীবনের ঝরাপাতা' গ্রন্থে বর্ণিত সরলা-রবীন্দ্রনাথ সম্পর্ক অনুসরণ করলে স্পষ্ট বোঝা যায়, এই সম্পর্ক সহজ ছিল না। কিন্তু যেটা স্পষ্ট হয় না, তাহল রবীন্দ্রনাথ-সরলা সম্পর্ক কেন প্রায়শই তিক্ত হয়ে উঠত। এই তিক্ততা রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিঠিপত্রে স্পষ্টই ব্যক্ত করেছেন কয়েকবার। তৎসত্ত্বেও, সরলা দেবীর শেষ বয়সে লেখা আত্মচরিতে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সশ্রদ্ধ এবং সসম্ভ্রম ভাব ক্ষুণ্ণ হয় নি, এটা সরলা দেবীর সংযমের পরিচয়, স্বীকার করতেই হবে।

সরলা দেবীর জন্ম ১৮৭২ সালে, রবীন্দ্রনাথের ১১ বছর পর। মৃত্যু ১৯৪৫ সালে, রবীন্দ্রনাথের চার বছর পরে। 'জীবনের ঝরাপাতা' প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায়, ১৩৫১-৫২ বঙ্গাব্দে। লেখা হয় ১৯৩৭-এর কাছাকাছি সময়ে।

এই আত্মকথায় রবীন্দ্র প্রসঙ্গ আসে গোড়াতেই, পানিহাটি বাগানবাড়িতে একটি অনাথাশ্রমের দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষ্যে, যে উৎসবে রবীন্দ্রনাথ এবং সরলাদেবী দুজনে একসঙ্গে নিমন্ত্রিত। দুজনেরই শৈশবস্মৃতি জেগে উঠল, পেনেটির বাগানবাড়ির। রবীন্দ্রনাথের মনে ভবে ওঠা সেদিনের সব কথার একমাত্র দরদী শ্রোতা হলেন সরলা দেবী—'দ্বারোদ্ঘাটন-উৎসব দূরে পড়ে থাকল।' এই নিমন্ত্রণ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে।

কালানুক্রমে রবীন্দ্রনাথের এর আগের শেষ উল্লেখ ঘটেছে ১৯০৫ সালে, পানিহাটির ঘটনার বহু আগে, যখন সরলা দেবীর বিবাহ হয় পাঞ্জাবের রামভজ দত্তচৌধুরীর সঙ্গে, এক বিচিত্র অবস্থার মধ্যে। বৈদ্যনাথে বিবাহবাসরে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯০৫ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত বিস্তৃতভাবেও রবীন্দ্রনাথের কোন উল্লেখ ঘটে নি সরলা দেবীর আত্মচরিতে। অবশ্য, এই আত্মচরিতে সরলা দেবী ১৯০৫-এর পর, অর্থাৎ বিবাহের পর, আর এগোন নি। রবীন্দ্রনাথ-সরলা সম্পর্কের তিক্ততা শুরু হয় ১৯০৫-এর পরেই। তবুও মনে রাখা দরকার, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর 'জীবনের ঝরাপাতা' লেখা, এবং পরবর্তী তিক্ততা সরলা দেবীর পূর্বস্মৃতিকে প্রভাবিত করে নি। তবে এই স্মৃতি অবিমিশ্র শ্রদ্ধাঞ্জলি নয়।

এবার আমরা 'জীবনের ঝরাপাতা'র ধারাবাহিক রবীন্দ্র-স্মৃতি অনুসরণ করতে পারি। স্বর্ণকুমারী দেবীর 'বসন্তোৎসব' গীতিনাট্যের অভিনয় প্রসঙ্গে সরলা দেবী লিখছেন, 'বসন্তোৎসব' বাস্তবিকই ছিল একখানি অপূর্ব জিনিস। কিন্তু 'বন্ধুদের যে আনুকূল্যে রবীন্দ্রনাথের কৈশোর থেকে দোসর হয়েছিল, সেই আনুকূল্যের অভাবে এটা দেশে ছড়িয়ে পড়ে নি।'

সরলার প্রথম রবীন্দ্রস্মৃতি, যখন রবীন্দ্রনাথ (১৭) তাঁর প্রথম বিলাত প্রবাস থেকে ফিরে এসে জোড়াসাঁকোর গান-বজনার নেতৃত্ব নিলেন। 'আমরা ছোটরা গানের ভিতর দিয়ে তাঁর সঙ্গে সম্পর্কে এলাম।' বড়রা নাটক করেন, সরলারা তাঁদের অনুকরণ করে নিজেরা অভিনয় করতেন। সরলাদের দলের নেতা দ্বিজেন্দ্রনাথের ছেলে সুধীন্দ্রনাথ (৯) তখনই রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা নকল করেন। ১১ই মাঘের উৎসবের নেতা তখন রবীন্দ্রনাথ, নতুন নতুন ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করা, ওস্তাদদের কাছ থেকে সুর নিয়ে সুরভাঙ্গা, নিজের মৌলিক ধারার সুর তৈরি করা ও শেখানো, এই নিয়ে তিনি ব্যস্ত।

'আগেকার ব্রহ্মসঙ্গীতগুলির ভাব অদ্বৈতমূলক, উপ-নিষদের শ্লোকাবলীর প্রায় অনুবৃত্তি, আমাদের পক্ষে তার মর্মে প্রবেশ দুরূহ ছিল। কিন্তু রবিমামার আমলের সঙ্গীত গাম্ভীর্য ও মাধুর্য মিশিয়ে শিশুচিত্তেও একটা অব্যক্ত আলোড়ন আনতে লাগল। কিছু বুঝি, কিছু বুঝি না, কিন্তু হৃদয় যেন কোন্ সুদূরের আনন্দের আঁচল ছুঁয়ে আসে।'

সরলার যখন বয়স দশ-বার, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে টাঙ্ক দিলেন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ পিয়ানোতে প্রকাশ করার। 'মনে পড়ে কি গভীরভাবে কাব্যের অর্থবোধ ও সঙ্গে সঙ্গে সুরে ও তালে তাকে দেহদান করার অপূর্ব গহন আনন্দরূপ আমায় ডুব দেওয়ালেন।' সরলার বার বছর বয়সের জন্মদিন রবীন্দ্রনাথ দিলেন তাকে একটা য়ুরোপীয় মিউজিক লেখার ম্যানাসস্ক্রিপ্ট খাতা। তাতে সরলা রবীন্দ্রনাথের 'সকাতরে ঐ কাঁদিছে সকলে' ব্রহ্মসঙ্গীত ইংরেজি পিস-এ পরিণত করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে সরলা দেবী একটি অসম্পূর্ণ তালিকা দিয়েছেন, কোন্ কোন্ রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর তাঁর সংগৃহীত গানের সুর থেকে নেওয়া হয়েছিল :

(১) আমি চিনি গো চিনি তোমারে (১৮৯৫) (য়ুরোপীয় গান)
(২) কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ (১৯০৯) (মাঝির গান)
(৩) যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে (১৯০৫) (মাঝির গান)
(৪) আমার সোনার বাংলা (১৯০৫) (মাঝির গান)
(৫) আমন্দলোকে মঙ্গলালোকে (১৮৯৩) (মহীশূরী গান)
(৭) এসো হে গৃহদেবতা (১৮৯৪))(মহীশূরী গান
(৭) এ কি লাবণ্যে পূর্ণপ্রাণ (১৮৯৩))(মহীশূরী গান)
(৮) চিরবন্ধু চিরনির্ভর (১৮৯৩) (মহীশূরী গান)

এই সব গানের সুর সম্পর্কে সরলা লিখেছেন : প্রাণের গভীরে আমার যে সুরদেবতা অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁকে নিত্য হবিঃ দানে তাঁর পুষ্টিসাধনা করে তাঁর দ্বারা আমারও পুষ্টিবিধানের হোতা হলেন রবিমামা....যা কিছু শিখতুম তাই রবিমামাকে শোনাবার জন্যে প্রাণ ব্যস্ত থাকত—তাঁর মত সমজদার আর কেউ ছিল না....রবিমামার পায়ের তলায় সে গানের সাজিখানি খালি না করা পর্যন্ত, মনে বিরাম নেই।....আমার সব সঙ্গীত সঞ্চয়ের মূলে তাকে নিবেদনে আগ্রহ লুকিয়ে বাস করত। দিতে তাকেই চায় প্রাণ, যে নিতে জানে। বাড়ির মধ্যে শ্রেষ্ঠ গ্রহীতা ছিলেন রবিমামা। তাই আমার ছাত্রীত্ব পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল তাঁতে।

এর পর সরলার স্মৃতিতে এসেছেন দার্জিলিংয়ের রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ (২৬) ব্রাউনিঙ পড়ে শোনাচ্ছেন আত্মীয়দের, তাঁদের মধ্যে সরলাও (১৫) আছেন। 'ম্যাথু আর্ণল্ড, ব্রাউনিং, কীটস, শেলি প্রভৃতির রসভাণ্ডার যিনি আমার চিত্তে খুলে দেন—সে রবিমামা।'

সাহিত্যে সঙ্গীতে দীক্ষা দেওয়া ছাড়া সভা-সমিতিতে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারেও সরলার হাতেখড়ি হয় রবীন্দ্রনাথের কাছে। রবীন্দ্র-বঙ্কিম বিখ্যাত বিতর্কে এই সভা। 'বড় হয়ে যখন বিচার-বিবেচনা-শক্তি খানিকটা উদ্বুদ্ধ হল, তখন বঙ্কিমকে পড়ে দেখে অনুভব করলুম। বঙ্কিমের প্রতি সুবিচার করি নি আমরা, সেদিন মাতুলভক্তিতে অযথা বঙ্কিম-মতদ্বেষী হয়ে পড়েছিলুম।' এটা ১৮৮৪ সালের কথা, যখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ২৩, সরলার ১২ এবং বঙ্কিমের ৪৬।

বন্দে মাতরম গানের প্রথম দুটি পদে রবীন্দ্রনাথ সুর দিয়েছিলেন। সেই সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সরলা বাকি অংশে সুর দিলেন, রবীন্দ্রনাথ সে সুর অনুমোদন করলেন। দার্জিলিংয়ে থাকার সময় ফোড়ায় শয্যাশায়ী রবীন্দ্রনাথ 'মাধার খেলা' রচনা আরম্ভ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সরলাকে শিখিয়ে দিতেন।

পরে সরলার আঠার-উনিশ বছর বয়সে লেখা 'রতি-বিলাপ' ও 'মালবিকাগ্নিমিত্র' পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথও দিয়েছিলেন। 'যদিও রবিমামার চিঠিতে তাঁরও অ্যাপ্রিসিয়েশন ব্যক্ত হয়েছিল। কিন্তু তার চেয়েও সেদিন সাহিত্যসম্রাট ও সাহিত্যের ন্যায়াধীশ বঙ্কিমের রায়ে নিজেকে বেশি চরিতার্থ মনে করলুম।

বঙ্কিমের প্রশংসাধন্য হলেও সরলার জীবনে এখনও রবীন্দ্রনাথই একমাত্র গুরু। বন্দে মাতরমে সুর দিয়েছেন বটে, তবে সে গান বঙ্কিমভক্তিতে ডোবা আমার প্রাণে প্রথম ফোটে নি। তার ফোটানোতে ছিল রবীন্দ্রের হাত' তাঁদের কাশিয়াবাগানের পুকুরে রবীন্দ্রনাথ সাঁতার কাটতেন ও ঘাটে উঠে কল্পনার বীণার ঝঙ্কারে নতুন নতুন কবিতা ও গান ফোটা, সরলা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁকে দেখেন। এই কাশিয়াবাগান বাড়িতে সরলা ১৮৮৯ পর্যন্ত ছিলেন

রবীন্দ্রনাথের প্রথম জন্মোৎসব করেন সরলা দেবীই। সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী প্রথম জন্মদিন উৎসব প্রচলন করেন বাঙালী সমাজে, তাঁদের বিলেত প্রত্যাবর্তনের পর। সাহেবদের অনুকরণে। প্রথম প্রথম অবশ্য ছোটদেরই জন্মদিন হত। প্রথম রবীন্দ্রজন্মোৎসবের বিবরণ সরলা এইভাবে দিয়েছেন :

'তখন মেজমামা ও নতুনমামার (অর্থাৎ সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ) সঙ্গে তিনি ৪৯নং পার্ক স্ট্রীটে থাকেন (১৮৮৭ খৃস্টাব্দে)। অতি ভোরে উল্টোডিঙির কাশিয়াবাগান বাড়ি থেকে পার্ক স্ট্রীটে নিঃশব্দে তার ঘরে বিছানার কাছে গিয়ে বাড়ির বকুল ফুলের নিজের হাতে গাঁথা মালা ও বাজার থেকে আনান বেলফুলের মালার সঙ্গে অন্যান্য ফুল ও এক জোড়া ধুতি-চাদর তাঁর পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করে তাঁকে জাগিয়ে দিলুম। তখন আর সবাই জেগে উঠলেন—পাশেই নতুনমামার ঘর। 'কবির জন্মদিন' বলে একটা সাড়া পড়ে গেল। সেই বছর থেকে পরিজনদের মধ্যে তার জন্মদিনের উৎসব আরম্ভ হল।' এই সময় সরলার বয়স পনেরো, রবীন্দ্রনাথের ছাব্বিশ।

এই পর্যন্ত আত্মচরিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি অবিমিশ্র শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমই ফুটে উঠেছে সরলার লেখায়। কাশিয়ার গানের চৌদ্দ-পনেরো বছরের দিদি হিরন্ময়ী এবং দশ-এগার বছর বয়সের সরলা পাড়ার মেয়েদের জন্য ইস্কুল খুলেছিলেন বিকেলবেলা ঘণ্টা দুয়েকের জন্য নিজেদের বাগানে। গোটা কুড়ি ছাত্রী হয়েছিল, কুমারী, বালবিধবা। সেই স্কুলের প্রাইজ দেওয়ার অনুষ্ঠানও হয়েছিল, দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

কিন্তু উৎসবের প্রসঙ্গেই সরলা দেবীর অভিমান প্রকাশ হল রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে। ব্রহ্ম জোড়াসাঁকোর বছরের একমাত্র অনুষ্ঠান ১১ই মাঘ। এই ১১ই মাঘ জমে উঠল যখন রবীন্দ্রনাথ গানের নেতা হলেন। 'বিশেষত রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর ভ্রাতাদের-সহ ১১ই মাঘের সঙ্গীতের আসরে নামলেন তখন ব্রহ্মের উপাসনায় হৃদয়ের কোণে কোণে যেখানে যত নদী খাল বিল শুকনো ছিল সব ভরে উঠল।' নির্গুণ ব্রহ্ম, নিরাকার ব্রহ্ম রবীন্দ্রনাথের হাতে মসৃণ, সাকার হয়ে উঠলেন। 'অথচ ভাবের চৌকাঠ পেরিয়ে গেলেই—মাটি-খড়, ধাতু-প্রস্তরে, বর্ণে-চিত্রে ভাবের উপলক্ষ্য ভগবানকে পূর্ণ লক্ষ্য করে মূর্ত করে আঁকড়ে ধরলেই রবীন্দ্রনাথ উত্যক্ত বিচলিত হয়ে উঠতেন।' কাশীতে বিশ্বেশ্বর মন্দিরে দেবতা প্রণাম করার জন্য সরলা অন্যান্যদের সঙ্গে ধমক খেলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে, সেটা ১৮৯৯ সাল। এই সাকার-নিরাকারের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ সরলার বোধগম্য ছিলেন না, কিন্তু তার চাইতেও বেশি অভিমানের কারণ ঘটল।

'একেই জোড়াসাঁকোর ছেলে-মেয়েরা উৎসব-আনন্দে পরিক্ষীণ ছিল। ১১ই মাঘ ছাড়া কোন বড় উৎসব তাদের ছিল না—তার উপর লাহোর (১৯০৫-এর পর) থেকে একবার ফিরে দেখি সেটিও তাদের প্রায় চলে গেছে। শান্তিনিকেতনে রবিমামার আশ্রম জমে উঠবার পর থেকে তিনি বাড়ির ছেলে-মেয়েদের ত্যাজ্য করে তাঁর আশ্রমের ছেলে-মেয়েদের প্রাধান্য দিতে লাগলেন। ১১ই মাঘের উৎসবের জন্যে গান ও বাজনার প্র্যাকটিস বাড়ির ছেলে-মেয়েদের আর যোগ রইল না। বোলপুর আশ্রমের ছেলে-মেয়েরাই একেবারে সেখান থেকে তৈরি হয়ে এসে লাইনে বসে যায়। আগেকার সঙ্গীতের অংশবহনে প্রতিভাদিদির যে বোনেরাও যুক্ত ছিলেন—তাঁদের কাছে অনুযোগ শুনলুম—আমরা এ বাড়ির মেয়েরা কোথায় যাই? আমাদের আর পালা-পার্বন নেই, ঐ একটি ১১ই মাঘ। হিন্দু বাড়িতে দুর্গা পূজার উৎসবে বাড়ির সব ছেলে-মেয়েদের কি আহ্লাদ। লোকজনের আনাগোনা, আদর-অভ্যর্থনা, খাওয়া-দাওয়া, নতুন কাপড় পরে ঘুরে ঘুরে বেড়ান—তাদের কত রকম আনন্দ। আমাদের ১১ই মাঘে পারিবারিক খাওয়া-দাওয়াও করে থেকে উঠে গেছে। বাকী ছিল ঐ গান-বাজনায় যোগটুকু। রবিকাকা তা থেকেও আমাদের বঞ্চিত করে দিলেন। সারা বছরের এই একটিমাত্র পারিবারিক উৎসব আমাদের—তাও রইল না। আমরা কি সাধারণ সমাজের দলে ঢুকব, না নববিধানের? আমরা যদি হিন্দু সমাজের বক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ি, তাতেও গঞ্জনা দেন। আমাদের ভাগ্যে তাঁর ঠাট্টা বিদ্রূপ অবজ্ঞা ঔদাসীন্য—পরের বাড়ির মেয়েদের ভাগ্যে ১১ই মাঘের উৎসব।'

সরলা দেবী তাঁর অভিমান, রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোকে অবহেলা করে শান্তিনিকেতনকে গড়ে তোলায়, অন্যত্রও তীব্রভাবে প্রকাশ করেছেন :

'যে সকল উৎসব অনুষ্ঠান জোড়াসাঁকোতে ছিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরিবারগত, তাঁর মৃত্যুর পর থেকে ক্রমশ হয়ে গেল তাঁর কীর্তিমান কনিষ্ঠ পুত্রের প্রতিষ্ঠাগত। জোড়াসাঁকোর কীর্তিকলাপ (তেমনি) পাশ কাটিয়ে গেছে চলে শান্তি-

নিকেতনে—যার ছাতিমতলার বুনিয়াদের উপর গড়ে উঠেছে অভ্রভেদী রবীন্দ্র অজমহল।'

সরলা দেবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবল তর্ক ওঠে এবং সেই তর্ক সমানে সমানে, প্রতাপাদিত্য-উৎসব উপলক্ষে ১৯০৩ সালের এপ্রিল মাসে সরলা তিলকের শিবাজী-উৎসব অনুকরণে প্রতাপাদিত্য উৎসব আরম্ভ করেন কলকাতায়। রবীন্দ্রনাথের চোখে, প্রতাপাদিত্য খুনী, মনুষ্যত্বহীন, ঘৃণ্য চরিত্র। এই উৎসব আরম্ভ হওয়ার পর, নানা রকম টিপ্পনীর পর, সরলা দেবী লিখছেন :

'তীর এসে বিঁধল আমার বুকে রবীন্দ্রনাথের হাত থেকে—সাক্ষাতে নয়, দীনেশ সেনের মারফত। দীনেশ সেন একদিন তাঁর দূত হয়ে এসে আমায় বললেন,—'আপনার মামা ভীষণ চটে গেছেন আপনার উপর।'

'কেন?'

'আপনি তাঁর বৌঠাকুরাণীর হাটে চিত্রিত প্রতাপাদিত্যের ঘৃণ্যতা অপলাপ করে আর এক প্রতাপাদিত্যকে দেশের মনে আধিপত্য করাচ্ছেন। তাঁর মতে, প্রতাপাদিত্য কখনও কোন জাতির হিরো-ওরাবশিপের যোগ্য হতে পারে না।'

'আমি দীনেশবাবুকে বললুম—'আপনি তাঁকে বলবেন, আমি তো প্রতাপাদিত্যকে মরাল মানুষের আদর্শ বলে খাড়া করতে যাই নি—তাঁর পিতৃব্যহনন প্রভৃতির সমর্থন করি নি। তিনি যে পলিটিক্যালি গ্রেট ছিলেন, বাঙলার শিবাজী ছিলেন, মোগল বাদশার বিরুদ্ধে একলা এক হিন্দু জমিদার খাড়া হয়ে বাঙলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, নিজের নামে সিক্কা চালিয়েছিলেন—সেই পৌরুষ, সেই সাহসিকতার হিসেবে তিনি গৌরবার্হ। তাই প্রতিষ্ঠা করেছি। এতে যদি ইতিহাসগত কোন ভুল থাকে তিনি সংশোধন করে দিন, আমি মাফ পেতে স্বীকৃত করে নেব।' এর উত্তর নিয়ে দীনেশ সেন আর পুনরাগমন করেন নি।'

এই বিতর্কের আগে পর্যন্ত সরলা দেবী রবীন্দ্রনাথের স্নেহের পাত্রীই ছিলেন। সরলাকে লেখা রবীন্দ্রনাথের গোটা পঞ্চাশেক চিঠি ছিল, সেই চিঠি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সরলার দুঃখের সীমা ছিল না।

১৯০১ সালের জানুয়ারীতে রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে স্ত্রীকে চিঠি লিখছেন, কলকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজে মাঘোৎসবের প্রস্তুতি সম্পর্কে।

"ওখান থেকে সরলার সন্ধানে গেলুম—সরলা বাড়িতে নেই—তারকবাবু (তারকনাথ পালিত) আর নদিদি (স্বর্ণকুমারী দেবী) অনেকক্ষণ সরলার জন্য অপেক্ষা করা গেল এল না—নদিদি বল্লেন কাল সকালে এসে খেয়ো সেই সঙ্গে সরলাকে গান শিখিয়ে নিয়ো—তাতেই রাজি...."

১৯শে জানুয়ারি আবার লিখছেন,

"এখনি সঙ্গীতসমাজওয়ালারা তাদের বিহার্সালের জন্যে আমাকে ধরতে আসবে—সেখানে ৪টে পর্যন্ত চেঁচামিচি করে সুরেনকে দেখতে কালিগঞ্জ যাব—সেখান থেকে সরলাকে ভুলে নিয়ে এসে গান শেখানর ব্যাপারে রাত নটা বেজে যাবে—"

এর এক বছর আগে রবীন্দ্রনাথ প্রজাপতির নির্বন্ধ প্রহসন লিখেছেন। সেই প্রহসন ভারতী পত্রিকার পড়তে পড়তে প্রিয়নাথ সেন ধরেই ফেলেছিলেন, নির্মলা চরিত্রে সরলা দেবীই ফুটে উঠছেন। রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করেছেন তাঁর প্রিয়নাথ সেনকে ২১ সেপ্টেম্বর ১৯০০-এর চিঠিতে, "নির্মলাকে সরলার কল্পনাপ্রবণ উদ্দীপ্ত কর্মোৎসাহ আছে।"

এই প্রহসনটি রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'র তাগিদেই লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন। ভারতীর সম্পাদিকা তখন সরলা দেবী। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের এক চিঠিতে জানা যাচ্ছে (দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৫), "চৈত্রের ভারতীর বিজ্ঞাপনে ব্যাপারটা এইরূপে অনানউন্স

হিরন্ময় দেবী। সরলা দেবী

করা হইতেছে : বৈশাখে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (' ') শীর্ষক একটি ধারাবাহিক গল্প আরম্ভ করিবেন। উহা উপন্যাস ও প্রহসনের মধ্যজাতীয়। বঙ্গ সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন সামগ্রী হইবে।' রবীন্দ্রনাথের মত না নিয়েই এই বিজ্ঞাপন বেরিয়ে যায় ভারতীতে। বুদ্ধিটা কার, সরলা দেবীর অথবা প্রভাতকুমারের, এবিষয়ে অবশ্য সন্দেহ হতে পারে। ভারতীর সম্পাদক সরলা দেবী হলেও, প্রভাতকুমারও এর পশ্চাতে আছেন, তা বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের ২৪শে শ্রাবণ-এর চিঠি থেকে (প্রিয়নাথ সেনকে) : প্রভাতকুমারের কাছ থেকে অশ্বিনের চিরকুমার সভার আগিদ এসেছে—তাদেরটা পাঠিয়ে দিয়েছি।

সম্পাদক হিসেবে সরলা দেবী তাঁর আত্মচরিতে দাবি করেছেন, বাংলা সাময়িক পত্রিকাজগতে তিনি দুটো নতুন জিনিস আমদানি করেছিলেন, এক, ঠিক সময়ে পত্রিকা বার করা, দুই, লেখককে অর্থমূল্য দেওয়া। রবীন্দ্রনাথ ১৯০৫ সালে 'ভারতী'র সম্পাদক করে তাল সামলাতে না পেরে সরলা দেবীর হাতেই ছেড়ে দেন 'ভারতী'কে। ১৩০৫-এর আগেও সরলা দেবী ছিলেন ভারতীর সম্পাদক (১৩০২—১৩০৪) এবং পরেও (১৩০৬—১৩১৪, ১৩০১—১৩৩৩)। সম্পাদক হিসেবে সরলা দেবী বরাবরই নিয়মনিষ্ঠ। "ভারতীর সম্পাদক তাগিদ করিতেছেন" (প্রিয়নাথকে চিঠি, আগস্ট ১৮৯৯)। ভারতীর ঘোষণায় বাধ্য হয়ে বৈশাখ ১৩০৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮ পর্যন্ত প্রজাপতির নির্বন্ধ উপন্যাস রবীন্দ্রনাথ ভারতীতে লেখেন। এবং তারপরেই 'নষ্টনীড়' লিখতে শুরু করেন, অর্থপ্রাপ্তির আশায়। 'খুব শক্ত তাগিদ এবং প্রলোভন এসেছে' (প্রিয়নাথকে চিঠি, মার্চ, ১৯০১)।

চিরকুমার সভাও ভারতীতে নিয়মমতো বেরিয়েছিল, কেবল ১৩০৮-এর অগ্রহায়ণ সংখ্যায় বাদ পড়ে। এর পিছনেও ভারতীর অধিষ্ঠাম তাগিদ ছিল। বন্ধু নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁর প্রভাত পত্রিকার জন্য রবীন্দ্রনাথের গল্প চাইছেন, কিন্তু ধরবের কাগজে গল্প লিখতে তাঁর মন চায় না, তাছাড়া "গল্পগুলো ভারতী সম্পাদক সম্পূর্ণ আদায় করে নিয়ে বসে আছেন।" (প্রিয়নাথকে, ২২ জুন, ১৯০০)। "ওদিকে ভারতী বৈশাখে একটা মাঙ্গলিক চান—কিন্তু ফরমাসমতো আমার কলম কিছুতেই আসতে না। ইতিমধ্যে চিরকুমারটা বৈশাখেই নিশ্চয়ই শেষ করতে হবে।" (৫ চৈত্র, ১৩০৭)। "চিরকুমার সভাটা,

স্বর্ণকুমারী দেবী

মনে করচি, আজই লিখে একেবারে ইতি করে দেব। তাহলে একটা বড় ভূত আমার কাঁধ থেকে নেবে যায়।" (মার্চ ১৯০১)। "কাল চিরকুমার সভা শেষ করিয়া ফেলিব। হাড়ে বাতাস লাগাইতেছি।" (২৪ মার্চ, ১৯০১)। "চিরকুমার সভার শেষ দিকটায় একেবারে ফুলস্টপ লাগানো গিয়েছিল—কুমাগত তাড়া খেয়ে খেয়ে নিষ্কৃত হবে উঠেছিলুম—যেমন করে হোক শেষ করে দিয়ে অব্যাহতি হবার জন্য মনটা নিতান্তই ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। তার পরে যখন তোমার কাছে শুনলুম শেষ দিকটা কমেই ঢিলে হয়ে আসছে—তখন কলমের পশ্চাতে খুব একটা কড়া চাবুক লাগিয়ে একদমে শেষ করে দেওয়া গেছে। সকল সময় মেজাজ কি ঠিক থাকে। চৈতালি সমালোচনা সম্বন্ধে তুমি যা লিখেছ সেটা ঠিক। তোমার পরামর্শমতো ভবিষ্যতে ওটা পরিবর্তন করে দেবার চেষ্টা করব। নৈবেদ্যের কল্পনাসভাব উপসংহারটা পড়ে তোমাদের কিরকম লাগে জানবার খুব কৌতূহল আছে। যথেষ্ট আশঙ্কাও আছে। নিতান্ত অনিচ্ছা এবং নিরুদ্যমের মধ্যে কেবলমাত্র প্রতিজ্ঞার জোরে ওটা শেষ করেছি—মনের সে অবস্থায় কখনো রস নিঃসরণ হয় না। যেখানে থামা উচিত এবং যেরকমভাবে থামা উচিত তা হয়েছে কি না নিজে বুঝতে পারচি নে। একেবারে সমস্ত লিনিয়ট; একসঙ্গে ধরে দেখতে পারলে তবে ওর পরিমাণ-সামঞ্জস্য বিচার করা যায়—সেইজন্যে বৈশাখের ভারতীর অপেক্ষায় আছি। যখন বই বেরোবে তখন অনেকটা বদল হয়ে বেরোবে। (মার্চ, ১৯০১)। ভারতীও তাড়া লাগিয়েছে—সুতরাং আমাকে দুটো কলে একসঙ্গে দম লাগাতে হয়েছে। ভারতীর জন্যেও একটা লিখচি (নষ্টনীড়)—বিনোদিনীকেও অবহেলা করতে পারচি নে। আজকাল বেশ একটু গরম পড়ে এসেছে বলে আমার মাথার এঞ্জিনটা বেশ সহজে চলচে, সেই জন্যে এখন আমি ভাবি নে। কিন্তু যা বসন্তের সময় আরম্ভ করা গেল তা শীতের সময় পর্যন্ত যদি চলে তাহলেই মুস্কিলে পড়তে হয়—বর্ষার স্রোতে দুটো নৌকো ভাসানো গেল প্রবাহের বেগে আপনি ছুটে যাবে আমাকে লগি ঠেলতে হবে না—কিন্তু ঘাটে পৌঁছনোর পূর্বেই যদি জল শুকিয়ে যায় তাহলেই ঠেলাঠেলি করতে করতে প্রাণ ফাটে। চিরকুমার গল্পের সময় আরম্ভ করেছিলুম ভেবেছিলুম এইভাবেই চোখের সুখে লিখে যাব—কিন্তু ক্রমে যখন হেমন্তের হিম এবং শীতের কুয়াশা আমাকে অভিভূত করে ধরল তখন কল্পনার ডানা প্রতিদিনই জড়িয়ে আসতে লাগল—তখন নিজের উপর এবং লেখার উপর নিতান্তই জুলুম চালাতে হল। কি বাবেই অনিচ্ছা এবং জড়তের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই করতে করতে লেখা সারতে হল। আমার কল্পনা গ্রীষ্ম ঋতুতে ফোটে, বর্ষা এবং শরৎ পর্যন্ত থাকে তারপর করতে থাকে। সেইজন্য সম্বৎসর নিয়মিত যোগান দেবার কোন ভার গ্রহণ করা আমার পক্ষে অসঙ্গত—সেই জন্যেই সম্পাদক হওয়াটা আমার লাইনে নয়—কারণ পত্রিকার মাস আমার কল্পনাবিকাশের জন্যে অপেক্ষা করবে না এবং স্টীপিড মাসিক পত্র পত্রিকার মাস অনুসারেই চলতে চায় সম্পাদকের সুযোগের দিকে দৃষ্টিপাত করে না। (৩ এপ্রিল ১৯০১)। এটা (চোখের বালি) যদি শৈলেশকে দিতে হয় তবে সেই সঙ্গে আরেকটা গল্প ভারতীকে দিতেই হইবে—সে আমার একটা উদ্বেগের কারণ রহিয়াছে। (১৯০১)। ভারতীতে সেই নষ্টনীড়কে একটুখানি বাড়িয়ে পাঠান যাচ্ছে। (১৯০১)।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতৃস্মৃতিতে এই সময়কার কথা লিখেছেন। খেতে গেলে অনেক সময় নষ্ট হয়, তাই রবীন্দ্রনাথ খাওয়াদাওয়া ছেড়ে সমস্ত দিন ধরে লিখতে লাগলেন। গ্রন্থসমের মুদ্রিত বিশদ পাঠাবার সময় নাওয়া-খাওয়া বন্ধ হবে যেত। খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম তাঁর উপর অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমের ফলে চিরকুমার সভা শেষ করে কলকাতা গিয়ে বাড়ির তেতালার ঘরে উঠতে সিঁড়িতেই অজ্ঞান হয়ে পড়েন. যে অবস্থাটি মৃণালিনী দেবী আগেই আশঙ্কা করেছিলেন।

ভারতী ইত্যাদি মাসিকপত্রের ভাগ্যাকাশে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা এবং মন বিপর্যস্ত হলেও রচনাগুলো তৈরি হয়ে যেত এবং সেজন্য রবীন্দ্রনাথ মাসিকপত্রের উপর অপ্রসন্ন বিশেষ ছিলেন না। সম্পাদক হিসেবে ছাড়াও সরলা দেবীকে তিনি যে শ্রদ্ধা এবং স্নেহ করতেন এই সময়, তা তিনি নিজেই বলেছেন কল্পনাপ্রবণ উদ্দীপক কর্মোদ্যমের প্রসঙ্গে। সরলা দেবীরও আদর্শ তাঁর রবি মামা। বলি মামার বাঁশি হাতে নিয়ে তিনি তাকে রুদ্রবীণ করে তুললেন ভারতী পত্রিকায়. এসময় তার পরিচয় পাওয়া যাবে তিনি কী করতে চান তা জানতে গেলে। বাঙালীকে তিনি বলছেন : 'মুক্তাকে বেঁধে বরণ করতে শেখ, অগত্যা তার কবলিত হচ্ছে না। জড়কে সর্বদা জড়ো, তার সম্মুখীন হও—খেলাধূলায়, আমোদে প্রমোদে, শিকারে বিহারে, বিজ্ঞানে সঙ্কল্পে, লেগে জলসেবায়, আগুনে লোহা উদ্ধারে, প্রলোভে আত্মপ্রাণপণে পরপ্রাণ রক্ষায়।" এই কল্পনাপ্রবণ উদ্দীপক কর্মোদ্যমই যে রবীন্দ্রনাথের মনঃপূত তা বলাই বাহুল্য। চিরকুমার সভা লেখার সময় সরলার বয়স আঠাশ, তখনো বিয়ে করেননি : বাল্যবিবাহে অভ্যস্ত রবীন্দ্রনাথের কাছে এটা নিশ্চয়ই অনুকূল নয়। দেশের কাজে নিয়োজিত নির্মলা চরিত্রে। এই সময়েই সরলা-প্রভাতকুমারের প্রেমের সম্পর্ক সম্বন্ধেও নিশ্চয়ই তিনি অবহিত ছিলেন।

সরলার জীবনের নানা ঘটনা রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিতে থাকাই স্বাভাবিক। সখা পত্রিকায় লেখা পড়ে পড়ে সরলার রচনায় উৎসাহ সঞ্চার. তিনি লিখছেন তাঁর বাল্যস্মৃতি : 'দুপুরে বেলা করে ভিতর বিশ্রাম করতে করতে তার সব রচনা পড়ে পড়ে আমার রচনা চাপড়া। দু'-তিনদিন ধরে তাদের লুকিয়ে দু-একটা ছোট গল্প লিখলুম। সরোজাদিদি একদিন ধরে ফেললেন। আমার খাতা কেড়ে নিয়ে সকলকে দেখিয়ে ঠাট্টা করে বলতে লাগলেন—'লেখিকা হবেন সরলা। গল্প লেখা হচ্ছে। কাগজে বেরবে নাকি? বড়দের ঠাট্টাবিদ্রূপ ছোটদের মর্মবিদারক হয়, তার ঠাট্টায় আমার লেখবার প্রবৃত্তি বন্ধ হয়ে গেল।' রবীন্দ্রনাথের ১৩০০ সালে লেখা কথা গল্পের সঙ্গে সরলার এই অভিজ্ঞতার মিল আছে।

১৯৩৪ সালে লেখা চার অধ্যায়-এ অতীন সরলাকে ডাকতের সম্পর্কে বলছে, 'সেদিন আমাদের সব অন্যথা বিকল্প

সর্বস্ব লুঠ করে এনেছে। মন্মথ ছিল বুড়ির গ্রামসম্পর্কে চেনা লোক—খবর দিয়ে পথ দেখিয়ে সে-ই এনেছে দলকে। ছদ্মবেশের মধ্যেও বিধবা তাকে চিনতে পেরে বলে উঠল, মনু, বাবা, তুই এমন কাজ করতে পারলি? তারপরে বুড়িকে আর বাঁচতে দিলে না।'

অরবিন্দের চিঠি নিয়ে যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় সরলা দেবীর কাছে এসেছিলেন ১৯০২ সালে। ব্রিটিশবিরোধী স্বদেশী দলের নেতা যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে সরলা দেবী লিখছেন :

'একদিন বললে—কাল ভোররাত্রে একদল লোক ডায়মণ্ড-হার্বারের কাছে একটা বুড়ির বাড়ি গিয়ে তাকে মেরে মাটির নীচে পোঁতা তার অগাধ ধন নিয়ে আসবে। বুড়ির কেউ নেই।'

আমি শুনে বললুম—'অতি চমৎকার কথা! এক অসহায় বুড়িকে মেরে তার ধন নেবে তোমরা! বাহবা! কত পৌরুষ! এ-রক্ত-কলুষিত ধন নিয়ে করবে কি তোমরা?'

'দেশের কাজ করব।'

'দেশমাতা কি তোমাদের এই মলিন হাতের কাজ গ্রহণ করবেন? তাঁর একটি নিঃসহায় নিরপরাধিনী বৃদ্ধা সন্তানের হনন তাঁর সইবে?'

'নিশ্চয়ই। তিলক মহারাজের এই আদেশ।'

সরলা দেবী বিশ্বাস করেননি তিলকের এই আদেশ এবং দু-একদিনের মধ্যেই কলকাতা থেকে পুণায় গিয়ে তিলকের সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং জেনেছিলেন এই বিধবা হননে তিলকের সম্মতি নেই।

সরলা দেবীর জীবনের এই ঘটনার ছাপ রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায়-এ থাকতেও পারে।

কিশোরী সরলা, তরুণী সরলার গুরুস্থানীয় রবিমামার মতামত তখন সরলার পক্ষে অত্যাবশ্যক। বার বছরের সরলার কবিতা এবং অন্যবিধ রচনা সখা আর বালক পত্রিকায় বেরুচ্ছে। রবিমামার বন্ধু গোবিন্দ দত্ত লিখলেন—'একদিন এই নবীন লেখনী বঙ্গ সাহিত্যে প্রবীণতায় নিজের স্থান করে নেবে।' রবি-মামাই তাঁর চিঠি আমায় পড়ে শোনালেন একটু হাসতে হাসতে। সে-হাসি ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর অনুমোদনে বা সন্দিহানে জানিনে।

এরপর ১২৯৮ আষাঢ়ের ভারতীতে প্রেমিকসভা বলে সরলা একটি অস্বাক্ষরিত রচনা প্রকাশ করেন এবং চারদিক থেকে প্রশংসা বর্ষিত হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'নাম দিসনি বলে তোর এ-লেখার ঠিক যাচাই হল। নতুন হাতের লেখার মত নয়। এ যেন পাকা প্রতিষ্ঠ লেখকের লেখা। এ যদি আমারই লেখা লোকে ভাবত, আমি লজ্জিত হতুম না।' সরলা দেবী লিখছেন, 'এত বড় সমাদরে আমি আহ্লাদে লজ্জায় মৌন হয়ে গেলুম।' লক্ষ্য করবার বিষয়, তিরিশ বৎসরের রবীন্দ্রনাথ এই সময় নিজেকে পাকা প্রতিষ্ঠ লেখক বলে মনে করছেন।

রবীন্দ্রনাথের আদর্শে সরলা বড় হচ্ছেন, রবিমামার কবিতা পড়ে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন, গান শুনে অনুপ্রাণিত হচ্ছেন, তেমনি নানারূপ বিপ্লবাত্মক কাজে নেমে পড়ছেন।

'আজকাল ঘরে ঘরে, স্কুলে স্কুলে, সভায় সভায় মেয়েদের নাচ। সেকালে তাল রেখে বেখে স্টেজের উপর দু-পা চলাও গর্হিতাত্মক ছিল। একবার 'আয় তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি ধরি নাচিব ঘিরি ঘিরি গাহিব গান' রবীন্দ্রনাথের এই গানের সঙ্গে ছোট মেয়েদের একটু নাচের ধাঁচ ঢুকিয়ে দিলুম কত ভয়ে ভয়ে।'

রবীন্দ্রনাথও গ্রহণ করেছেন সরলা দেবীর কাছ থেকে। সরলা তৈরি করেছিলেন তার রাখি-বাঁধার দল। মাতৃভূমির সেবাগ্রহণের জন্য বিপদ বরণের স্বীকৃতি ছিল এই রাখি গ্রহণ, হুমায়ুন যেমন এক রাজপুত-কন্যার রাখি গ্রহণ করে তার হয়ে বিপদ বরণ স্বীকার করেছিলেন। সরলার এই লাল সুতোর রাখি পুলিশের কানেও পৌঁছেছিল। কয়েক বছর পর ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ রাখিবন্ধন দেশময় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

সরলা দেবীর প্রতাপাদিত্য উৎসবে রবীন্দ্রনাথের ঘোরতর আপত্তি ছিল। কিন্তু এর আগে সরলা দেবীর স্বদেশী গান তিনি উপেক্ষা করেননি। ১৯০১ সালে বিডন স্ট্রীটে কংগ্রেসের অধি-বেশনের সময় সরলা দেবী গান লিখেছিলেন 'অতীত গৌরব-বাহিনী মম বাণী/গাও আজি হিন্দুস্থান।' এই গান ছাপ্পান্নটি সমবেত কণ্ঠে কংগ্রেসে গাওয়া হল, 'রবীন্দ্রনাথ নিজে এর সমজদার হয়ে গাওয়ানোর ভার নিলেন।'

ছেলেবেলা থেকে রবীন্দ্রনাথের 'এ কি অন্ধকার এ ভারতভূমি' গানে উদ্বুদ্ধ সরলা দেবী ১৯০২-এর পর থেকে ক্রমশই উগ্রপন্থী হয়ে উঠলেন, প্রতাপাদিত্য উৎসব, বীরাষ্টমী উৎসব ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ক্রমশই রবীন্দ্রনাথের আদর্শ থেকে দূরে সরে যেতে লাগলেন। রবীন্দ্রনাথের নিরাকার ব্রহ্ম তাঁকে আর আবেদন করছে না, সিস্টার নিবেদিতা তাঁকে নিয়ে যাচ্ছেন বিবেকানন্দর কাছে, ব্রহ্ম সরলা কালীভক্ত হয়ে উঠছেন। ১৯০৫ সালে তাঁর বিবাহ পর্যন্ত সরলা দেবী তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন, তারপরে রবীন্দ্র-সরলা সম্পর্ক তাঁর জবানীতে পাওয়া যাবে না। এই সম্পর্কের তিক্ততা ফুটে উঠেছে রবীন্দ্রনাথেরই চিঠিতে, বিশেষ করে দুবার—১৯২১ এবং ১৯২৬-এ।

*

১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষে। গান্ধী সরলা দেবীর সমবয়সী। দুজনের পরিচয় হয় ১৮৯৬-এর কলকাতা কংগ্রেসের সময়। গান্ধী সরলাদেবী বাড়িতে এলেন, সরলাকে দেখছেন সসম্ভ্রমে, কারণ, সরলা কংগ্রেসের একজন জেনারেল সেক্রেটারি, জানকী ঘোষালের কন্যা। সরলারও একমাত্র কৌতূহল দক্ষিণ আফ্রিকার সিংহ গান্ধীকে দেখা এবং গান্ধীকে দিয়ে ভারতী পত্রিকায় লেখানো। পরবর্তী কালে দুজনে রাজনৈতিক কর্মসূত্রে ঘনিষ্ঠ হলেন। সরলার প্রাণভরা হাসিতে মুগ্ধ গান্ধী বলেছিলেন, গভীর রাজনৈতিক বিপদের দিনেও — ইওর লাফটার ইজ এ ন্যাশানাল অ্যাসেট। লাফ অ্যাওয়ে। সরলার পুত্র দীপক (১৯০৭-এ জন্ম) ১৯১৮-১৯ শান্তিনিকেতনে অধ্যয়ন করেন, তারপর গান্ধী তাঁকে নিয়ে যান সবরমতী আশ্রমে। উগ্রপন্থী সরলা দেবী গান্ধীর সংস্পর্শে এসে অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। যোগেশ বাগল সংক্ষেপে লিখছেন, জীবনের ঝরাপাতার উপসংহারে দৈহিক মৃত্যু না ঘটলেও কোন বিশেষ আদর্শ বা মতবাদের জন্য যিনি আত্মবলি দেন, তাঁহাকেও শহীদ বলা যায়। ঠিক এই অর্থেই সরলা দেবী চৌধুরানী মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অহিংস আন্দোলনের প্রথম মহিলা শহীদ। তিনি মনপ্রাণ দিয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। চরখা-খদ্দরের প্রবর্তনে তিনি মহাত্মা গান্ধীর দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। অসহযোগ প্রচেষ্টার প্রথম দিকে তিনি ছিলেন গান্ধীজীর একান্তই সমর্থক। পণ্ডিত রামভজ (সরলার স্বামী) ছিলেন ক্ষুর-তেজোদ্দীপ্ত। তিনি অহিংসা তথা অহিংস আন্দোলনের তেমন পক্ষপাতী ছিলেন না, হয়ত এই কারণে উভয়ের মধ্যে খানিক মতানৈক্য উপস্থিত হইয়াছিল।'

রবীন্দ্রনাথের অসহযোগ আন্দোলনের সশব্দ বিরোধিতা সুবিদিত। এই আন্দোলন প্রসঙ্গেই ক্ষিপ্তপ্রায় রবীন্দ্রনাথ সরলা সম্পর্কে কটূক্তি করেছেন প্রথম চৌধুরীকে ১৮ কার্তিক ১৩২৮-এ : 'কিছুদিন শান্তিনিকেতনে ঘোরতর মিশনারিগিরি করে গেছে। নারী মিশনারীরা কি পদার্থ তা তো জানই, তারপর আবার যে-সে নারী নয়। এখানকার মেয়েদের খুব ধিক্কার দিয়ে গেছে। আমাকে জানিয়েছে দেশে যখন আগুন লেগেছে তখন বর্ষমঙ্গলের গান করা অকর্তব্য এবং যে মেয়েরা সেদিন গানের সভায় সেজে এসেছিল, তারা এই অগ্নিকাণ্ডে আহুতি দিয়েছে।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নিজে চরকা কাটে না—সে মনে করে তার পক্ষে ওটা জরুরি নয়। চরকা যদি না-ও কাটে, তাহলে অন্তত ওর উচিত প্রতিদিন চরকা কেটে যে আয় হয় তাতেই জীবিকা-নির্বাহ করে তার বেশি সমস্তই দেশকে দান করা।'

মিশনারিগিরি বলতে রবীন্দ্রনাথ কী বুঝিয়েছিলেন? মা স্বর্ণকুমারী দেবী শুরু করেছিলেন সখিসমিতি যার নামকরণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথই। সখিসমিতির উদ্দেশ্য কুমারী ও বিপন্না বিধবাদের বৃত্তি দিয়ে পড়ান, পড়া সাঙ্গ হলে তাদের শিক্ষয়িত্রীরূপে বেতন দিয়ে অন্তঃপুর মহিলাদের শিক্ষার জন্য নিযুক্ত করা, মফঃস্বলে ধর্ষিতা নারীদের জন্য প্রয়োজন হলে উকিল-ব্যারিস্টার নিযুক্ত করে মোকদ্দমা চালান, বাংলার বিভিন্ন মেলা থেকে শিল্প সংগ্রহ করে মেলা করা, তাতে মেয়েদের দিয়ে অভিনয় করান। জ্ঞানদা খেলার প্রথম অভিনয় হয় এই সখি-সমিতিতে, অর্জিত অর্থও দান করা হয় সমিতিতে। সখিসমিতির পরবর্তী সংস্করণ দিদি হিরন্ময়ীর মহিলা শিল্পাশ্রম। এই দুয়ের অদর্শে সরলা দেবীর ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল। ১৯১০ সালে তাঁর প্রতিষ্ঠিতা মণ্ডলের উদ্দেশ্য ছিল, পর্দানশীন নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা। লাহোরে প্রথম এর শাখা হয়, যেখানে সরলা দেবী বিবাহিতা জীবনযাপন করছেন। ক্রমে অমৃতসর, দিল্লি, করাচী, হায়দরাবাদ, কানপুর, বাঁকীপুর, হাজারীবাগ, মেদিনীপুর, কলকাতা প্রভৃতি স্থানে মণ্ডলের শাখা বিস্তার হয়। কলকাতার মণ্ডলের শাখার উদ্যোক্তা হলেন কৃষ্ণভামিনী দাস। অন্তঃপুরে বিধবা, কুমারী, অনাথা নারীর সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-শিক্ষাও চালু হয়। ১৯১১-এ কৃষ্ণভামিনীর মৃত্যুর পর দায়িত্ব নেন কবি প্রিয়ংবদা দেবী। সরলা দেবী ১৯২৩ সালে রামভজের মৃত্যুর পর কলকাতায় ফিরে এসে মণ্ডলের দায়িত্ব নেন।

লাহোরে থাকার সময় সরলা প্রায় পঞ্চাশটি পল্লীতে নারীশিক্ষা কেন্দ্র চালু করেছিলেন। নারীদের সমাজসেবায় উদ্বুদ্ধ করায় লাহোরে তিনি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন এবং তাঁর কার্যকলাপ পাঞ্জাবের অন্যান্য মফঃস্বল শহরেও অনুসৃত হতে থাকে। আর্য-সমাজী রামভজ অনুন্নতদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে অগ্রণী ছিলেন, সরলা দেবীও স্বামীর কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

স্বামী ছিলেন উগ্রপন্থী, সরলা দেবীও উগ্রপন্থী, ফলে রামভজের উগ্রপন্থী উর্দু সাপ্তাহিক হিন্দুস্থানে সরলা দেবী বিশেষভাবেই সহযোগী হলেন। আদালত ভয় দেখালেন, রামভজ হিন্দুস্থানের সম্পাদক থাকলে তাঁর ব্যবহারজীবীর অনুমতিপত্র বাতিল করে দেওয়া হবে। তখন সরলা দেবী হলেন হিন্দুস্থানের সম্পাদক এবং স্বত্বাধিকারী। তিনি এর ইংরেজি সংস্করণও বার করেন। অতীতে হিন্দুস্থান বিভিন্নমুখে তিনি রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখে যশস্বিনী হয়েছিলেন। ১৯০১-এ তিনি মহারাষ্ট্র সোসাইটির জার্নালে লিখিত স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ক পরিকল্পনা পুস্তিকাকারেও বের করেছিলেন।

প্রাক্‌বিবাহ যুগে ভারতী পত্রিকায় সরলা দেবী বঙ্গ-সন্তানদের শারীরিক শক্তি ও মানসিক বল উদ্বোধনের জন্য সভা-সমিতি ও উৎসবের প্রচলন করেছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বাঙালিদের সৈন্যদলে প্রবেশের বাধা তিরোহিত হলে বাঙালি যুবকদের সৈন্যদলে ভর্তি হবার আবেদন জানানর জন্য হুগলি, চুঁচুড়া, চন্দননগর, উত্তরপাড়া সফর করে সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দিতে এবং গান লিখতে থাকেন। ভারতীতে তাঁর বক্তৃতা ও যুদ্ধসঙ্গীত প্রকাশ হয় ১৩২৪-২৫ সালে।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর হিন্দুস্থান-এর উর্দু ও ইংরেজি দুই সংস্করণই সরকারের নির্দেশে বন্ধ হল এবং হিন্দুস্থান প্রেসও বাজেয়াপ্ত হল। রামভজ অনির্দিষ্ট কালের জন্য পাঞ্জাব থেকে নির্বাসিত হলেন। নেহাৎ নারী বলে সরলা দেবীকে সরকার জেলে ঢোকাননি।

১৯২১ সালে সরলা দেবীর এই পরিচয়।

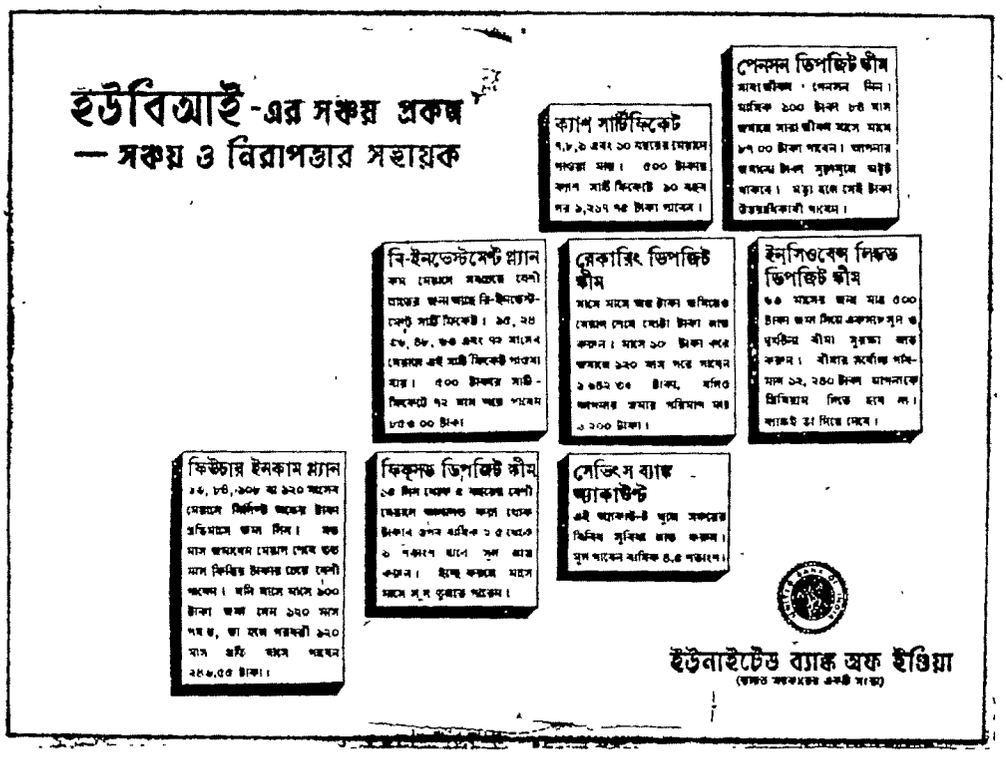

দীপঙ্কর দাস

ব্রিজের ওপর ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে সেই তখন থেকে। ঘন ঘন হর্ন দিয়েও সিগনাল পাচ্ছে না। সকাল থেকে এই লাইনে এরকম হাল চলছে। আগের ট্রেনটাও প্রায় মিনিট চল্লিশেক দাঁড়িয়ে ছিল। এই কিছুক্ষণ আগে ছেড়েছে।

ব্রিজের নিচে কাঁচা রাস্তা। সরাসরি সামনের দিকে গিয়ে খাল পারে স্টেশন রোডের পাকা সড়কে এসে মিশেছে। বাস আসে ঐ পর্যন্ত। তার ডাইনে বোসপুকুর। তারপর জনবসতির শুরু।

শেষ বৈশাখের বেলা সকাল ন'টা বাজতে না বাজতেই গরম চাটুর মত তেতে উঠেছে। 'হরিমাতা রকমারি' স্টোর্স-এর শেডের নিচে বেঞ্চি পেতে বসেছিল সুখেন আর তারক। সুখেনের হাত এক ভাঁড় চা। তারিয়ে তারিয়ে চুমুক দিচ্ছিল চায়ে আর মাঝে মধ্যে ঘাড় ঘুড়িয়ে চোখ ফেরাচ্ছিল থেমে থাকা ট্রেনটার দিকে।

—আজ ট্রেনের হল কি বলত? সুখেন ভাঁড়ের শেষ তলানিটুকু এক নিশ্বাসে শেষ করে কানে গোঁজা আধপোড়া সিগারেটটা ধরাল। দর দর করে ঘাম ঝরছে শরীর দিয়ে। দোকান ঘরের সামনে ওপাশের নিমগাছটার ছায়া এসে পড়েছে। তারকের দিক থেকে কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে আবার জিজ্ঞেস করল সুখেন আজ ট্রেনের হল কি বলত?

তারক সকালের দৈনিক কাগজের ওপর মুখ গুঁজে বসেছিল। বাড়িতে কাগজ আসে না। তাই 'হরিমাতা রকমারি' স্টোর্স-এ এসে সকলের আগে তারক কাগজটা দেখে নেয়। দশটায় কাগজে দোকানের মালিক, হাবলুর বাবা অজিত পালের লোহার আড়তে চলে যাবে। কিন্তু কাগজের ওপর চোখ রেখেও তারক বিশেষ কিছু পড়ছিল না। আবার সুখেনের কথাও তার কানে যাচ্ছিল না। সাত সকালে বাড়িতে একহাত হয়ে গেছে। 'এবেলা আর বাড়ির ভাত মুখে তোলা যাবে না। বাড়িটা দিন দিন অসহ্য হয়ে উঠছে তারকের কাছে। বৌদির মুখের ঝাঁঝ যেন গোখরা সাপের ছোবল। বাবা রিটায়ার করার পর থেকে বৌদির মুখের বিষ আরো বেড়ে গেছে। যখন তখন মাকে ঠেস দিয়ে কথা বলছে। পান থেকে চুন খসলেই তারককে শুনিয়ে দিচ্ছে,—দাদার অন্ন ধ্বংস করবে আবার বাবুগিরী ফাটাবে, দুটো জিনিষ এক সঙ্গে চলতে পারে না ঠাকুরপো। এবার নিজের পথটা দেখে নাওতে'। তোমার দাদা যে গলা দিয়ে রক্ত তুলতে বসেছেন।'

বৌদিটাকে তারক কোনদিনই ভাল চোখে দেখে না। দাদার যখন সর্বস্ব এসেছিল এই সেনদের ধুমসী মেয়েটার সঙ্গে তারকও এখন মাটির নিচে কথা বলছে। বাড়িতে তার মতামত কে আর শুনছে। তাই সে সুখেনদের বলেছিল—দেখিস তোরা, বেলাল্ট ভাল হবে না। ওরকম ধুমসীরা সব কিছু গিলে খেতে না পারলে শান্তি পায়

না। তারক শুনেছে, মারও নাকি মত ছিল না ওখানে। কিন্তু বিয়ে হয়ে গেল। সেনরা শুধু মেয়ে দেয়নি, টাকা পয়সা দিয়েছিল বেশ। তাতেই বাবা দাদার মন গলেছিল। আজকাল মা প্রায়ই বৌদির আড়ালে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসে। কপালে চাপড় মেরে ইনিয়ে বিনিয়ে বাবাকে উদ্দেশ্য করে বলে,—সেনরা তোমাদের টাকা দিয়ে কিনে ফেলল গো....! শেষমেষ একটা কালসাপ ঘরে আনলে গো.....!

কালসাপ! একা বৌদিটাকেই বা দোষ দিয়ে লাভ কি! দাদাটাও কম যায় নাকি! পেপার মিলের বয়লারে বেলচামারা মিস্ত্রী, আর ফুটানি মারার বেলায় সুলতান। ফি শনিবার বউ নিয়ে 'শ্রীদুর্গা টকিজ'-এ পিকচার দেখতে না গেলে 'ওয়াইফ-হাসবেন্ড'-এর ভাত হজম হয় না। বাবার পেনশন আর প্রভিডেন্ট-ফান্ডের টাকা ভাঙ্গিয়ে সংসার চলছে, তার ওপর আবার বাতেলা,—দাদা তোমার গলা দিয়ে রক্ত তুলতে বসেছেন! .....শালা। তারক অস্ফুট নিশ্বাসে দাঁত দিয়ে শব্দটাকে কাটল। তারকও জানে, এটা একটা ষড়যন্ত্র। যেমনতেন করে হোক, তারককে বাড়িছাড়া করতে পারলে গোটা বাড়িটার ভাগিদার আর কেউ থাকবে না। বাবার ভালমন্দ একটা কিছু হয়ে গেলেই বুড়ি-মাটাকে গাছতলায় এসে বসিয়ে দিলেই হবে।

ভাবতে ভাবতে তারকের চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠল। এসব আর ভাল লাগে না। একটা কমার্টাজের আশা ভরসাও দেখছে না কোথাও। এই অবস্থায় কপালে কি নাচ আছে। নিজের জন্য ততটা ভাবনা হয় না। একলা ফকির বাবা ঠকের জল খেয়ে গুজরে দেবে। কিন্তু মা।....এখানে এসেই তারক হোঁচট খায়। মাটা'ত সম্পূর্ণ ইনোসেন্ট। তবু কেন যে তাকে এর ফলভোগ করতে হবে,—শালাদুনিয়ার দুর্লঙ্ঘ্য বিচার দেখলে তারকের আর মাথার ঠিক থাকে না।

—এই তারক, তোর হল কি বলত? সুখেন হাঁক দিয়ে জিজ্ঞেস করল।

—কি হবে?....তারকের কপাল পড়া হয়ে গিয়েছিল। কাগজটা ভাঁজ করতে করতে মুখ তুলে সাড়া দিল।—যোল যা হয়, তাই হয়েছে।

—হেড অফিসে বাঁশিয়েছিস?

—শালা ঐ সেনদের মেয়েটা সংসার-টাকে ঝালিয়ে দিল মাইরি। তারক মুখ বিকৃত করল। যেন কিছু একটা গিলে ফেলেছে। তারপর আবার বলল — আজ শালা সাতসকালেই বাপ তুলে গাল দিল। আমিও ছেড়ে দিইনি। কেচ্ছা সব ফাঁস করে দিয়েছি। একদুখ বলে তারক সুখেনের হাত থেকে পোড়া সিগারেটের প্রায় শেষ অংশটুকু নিয়ে ঘন ঘন কটা টান দিয়ে দোকানের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর অনেকটা স্বগতোক্তির মত বলল—একটা চাকরি বাকরি হলে মাইরি ঐ মাগীর বিষ দাঁত ভেঙ্গে দিতাম।

—শান্তিদা কি বলছে।....জিজ্ঞেস করল সুখেন।

—কি আর বলবে,....আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছে।

'আরাম ভবনের' নতুন ভাড়াটেদের মেয়েটা বিস্কুট করে সামনে দিয়ে স্টেশনের দিকে চলে গেল। আজ যেন কি হয়েছে তারকের। অন্যদিনের মত আর সেই উপলক্ষে গলায় ফিলমি গান ফুটল না। কোন মানে হয় না। এতগুলি বছর শান্তিদার পেছনে লেগে থেকে ফলাফলটা কি হ'ল? শান্তিদা'ত গলায় পা দিয়ে নিজের কাজ আদায় করে নিল, অথচ এখন চিনতেই পারছে না। চাকরি বাকরির কথা উঠলেই এমন মুখভঙ্গি করবে যেন শালা সতীনের মুখ দেখছে। তারপর বাণী উচ্চারণের মত করে বলবে।—'তোমরা কেউ নিস্বার্থ হয়ে পার্টিকে ভালবাসতে পারলে না তারক। নিঃস্বার্থ না হতে পারলে বিপ্লবকে ভালবাসা যায় না।' তারক একদলা থুথু ছিটিয়ে দিল বাতাসের ওপর। তার বিশ্লেষণ করল,—'নিঃস্বার্থ কলুপাড়ের। আর ঐ শালা এই দু চার বছরের একতরফা বক্তৃতায় তিন-তলা করলে। বউ এখন নামে এখন মনসাতলার বস্তিতে তোমার দুটো ঘর নিয়ে দেওঘরিয়া পেপার মিলের প্রপাইটর হরি সিং, চালিহা ব্লাশ ওয়ার্কসের মালিক জিতেন মুখুজ্যে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অফিসার বিনোদ সান্যাল,—এখন এরা তোমার ইয়ার দোস্ত। আর আমরা যেন খালি আমড়ার আঁটি চুষতে-ই এসেছি। দেখি শালা এবারের ইলেকশন তোমায় কারা পার করায়।

বিস্তির ওপর টেনটা বোধহয় সিগনাল পেয়েছে। কর্কশ শব্দে বাঁশি বাজিয়ে টেন ছেড়ে দিল। বিস্তির ওপারে ধু-ধু বাদা,—এখন শেষ বৈশাখের রোদে ফেটে চৌচির। বাদার শেষে জিতেন বাবুর ইঁটখোলা। তারপর বাঁশতলার শ্মশান।

এসময় হাবলু দোকানে এসে ঢুকল। এতক্ষণ সে দোকানে ছিল না। বাংপর গলিতে গিয়েছিল জরুরী তলব পেয়ে। দোকানে ঢুকেই হাঁক দিয়ে বলল।—ওদিককার খবর শুনেছিস তোরা?

তারক আর সুখেন হাবলুর দিকে তাকাল। হাবলু তখন-ও হাঁপাচ্ছে। কপাল থেকে ঘাম চুইয়ে পড়ছে।

—কোন খবর? তারক নিস্পৃহ গলায় জিজ্ঞেস করল।

—শুনিস নি তবে!..হাবলু একটা টুল নিয়ে বসল। তারপর লম্বা নিশ্বাস ছেড়ে বলল।—আমি'ত বাবার দোকান থেকে বেরিয়েছি। ভাবলাম মনসাতলাটা ঘুরে যাই। বাসস্ট্যান্ডে পুলিনদের সঙ্গে দেখা। পুলিনদা মির্জাপাড়ায় যাচ্ছে তার শ্বশুরের বাড়ি। সেই পুলিনদা-ই বলল....।

হাবলুর এই এক দোষ। বুড়ি পিসী মাসীদের মত বড় বেশী কথা ফ্যালায়। সুখেন আর ধৈর্য্য না রাখতে পেরে গর্জে উঠল— ন্যাকড়াবাজি বন্ধ কর হাবলু। কি শুনেছিস, তাই বল।

—তড়িৎ আবার ফিরে এসেছে।

—তড়িৎ।....কোন তড়িৎ।

—বোসদের।....পুরপল্লির।

বহুদিনের থিতিয়ে পড়া মজা পুকুরে একসঙ্গে কটা ঢিল পড়ল। সুখেন আর তারকের চোখ মুহূর্তের জন্য দপ্ করে জ্বলে উঠে নিভে গেল আবার। আর বলার কোন প্রয়োজন নেই। বোঝার কোন অবকাশ নেই। যেন একটা আয়না। ওপিঠে কার মুখ দ্বিতীয় বার তাকিয়ে দেখার দরকার পড়ে না।

—কবে ফিরেছে। নিশ্বাস চাপতে চাপতে জিজ্ঞেস করল তারক।

—বলতে পারল না। হাবলু সাড়া দিল।

—শান্তিদা জানে?

—বোধহয় না।

আবার স্তব্ধ হয়ে বসে পড়ল সুখেন আর তারক। কে যেন ভাবল কিছুক্ষণ। পরমুহূর্তে উঠে দাঁড়াল।—তুই বস হাবলু, আমরা আসছি।

দোকান থেকে বেরিয়ে পড়ল সুখেন আর তারক।

(২)

স্টেশন রোডের পাকা রাস্তা কানুন-গোদের পোড়ো বাড়িটাকে বাঁ হাতে রেখে পশ্চিমদিকে বাঁক ফিরেছে। বাঁকের মুখে মালির বাগান। একদিন নাকি কানুনগোদের বাগান ছিল এখানে। এখন সে সব কিছুই নেই। কেবল দক্ষিণপারে গোটাকয়েক বান্দা অশ্বত্থ দাঁড়িয়ে আছে এখন-ও। মালির বাগান ছাড়িয়ে দেওঘরিয়া পেপার মিলের শুরু।

মিলের বস্তির প্রায় শেষ দিকে একটা মজা পুকুর। পেপার মিলের রঙ্গলাল এবং পানায় জলে ঘন বেগুনি রঙ ধরেছে। পারের মাটি প্রায় অদৃশ্য। কলমি আর হেলেঞ্চার দামে ছাওয়া চাষপাশ।

সেই পুকুরের উত্তর কোনে একটা ভাঙ্গা শিবমন্দির। মন্দিরের একদিকে দু-চারঘর পশ্চিমের বাস। সবাই ঐ পেপার মিলের দিন মজুর। আর একদিকে রতন সাউর চোলাই মদের আখড়া। তার পেছনে কিছুটা তফাতে আর একটা ভাঙ্গা চালাঘর। মেঝের ইঁট বিছান। দরজার পাল্লা নেই অনেকদিন। জানলা একটাই, তার-ও হাল ঐ দরজার মত-ই।

এক টুকরো কাগজ হাতে নিয়ে কিসের যেন হিসাব কষছিল নহর। যেন কোন জটিল গাণিতিক সমস্যা, রহস্য ভেদ করতে ব্যস্ত। নহরের মুখ চোখের অবস্থা প্রায় সেই রকম। কপালে ভুরু সন্নিকটে

কোঁচকান চামড়াটুকু ছোট একটা মাছির মত স্থির হয়ে আছে।

—ওপেন পাততি দুশ্পি পাল্লা সাড়ে। আজকে চারঘরেব খেলা। জুড়ি চৌকা বিন্দি, বিন্দির কাঠঘর পাল্লা-ও হতে পাবে খেলায় পাতভা। —এই বলে রাখলাম গুপী। না বাঁধলে আমাব নামে কুত্তা পুষিস।'..... জহর কাগজটাকে ভাজ করে পাঞ্জাবির পেছন পকেটে রাখল। তারপর সামনের খোলা বোতল তুলে লম্বা একটা চুমুক দিয়ে চিন্তিত মুখে গুপীর দিকে চোখ ফেরাল।

গুপীর সামনেও আর একটা বোতল। প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। গুপী জহরের কথায় সাড়া দিল না। দেয়ালে পিঠ রেখে দু-পা সামনের দিকে ছড়িয়ে বসেছিল। চোখ দুটো শূন্য। খোলা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে উধাও।

—কি বে শালা, ধরে গেল এত সকাল সকাল। জহর গুপীর ছড়ান পায়ে পা দিয়ে ঠেলা দিল। বলল।— আর একটা পাইট আনতে বলি। গুপী এবারও কোন সাড়া শব্দ করল না। যেমন বসেছিল তেমনি বসে রইল।

ঘরের ভেতর চাপা গরম। বাইরে একটু-ও বাতাস বইছে না। শিবমন্দিরের উঠোনে ছাতিম গাছটার সব পাতা ছবির মত স্থির হয়ে আছে। মজা পুকুরের দূষিত জল থেকে উঠে আসা ভ্যাপসা গন্ধের সাথে ঘরের ভেতরের ঝাঁঝাল দিশি মদের গন্ধ মিলে মিশে একাকার হয়ে আছে।

—এই শালা গুপী। জহর জোরে হাঁক দিল।— মাস্টারের কাছে যাবি, না যাবি না। গুপী ঘাড় নাড়ল।—যাবে না।

—কেন রে?... অন্য খবর আছে?

—না।

—এবে?'

গুপী আবার নীরব হয়ে বসে রইল। সাড়া দিল না।

আজকে গুপীর এখন উদভ্রান্ত অবস্থা। কালকের দাগটা শুকোতে কতদিন লাগবে কে জানে। শুকোলে-ও এখনকার যন্ত্রনাটা হজম করা তার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। কালকে-ও খবর ছিল। জোর খবর, স্বয়ং মাস্টার হিসাব কষে ভাবনা চিন্তা করে গুপীকে জানিয়েছিল। —দেখ গুপী, মওকা বার বার আসে না। বোম্বাই বাবুরা শেয়ালদা পাবলিক। রমজানি মারতে দেশ জুড়ে কারবার ফেঁদে বসেনি। তাদের হাত থেকে মাল খসিয়ে আনা দু-চারটে হিসাবের আমলা নয়। তবে মনে হচ্ছে আজ শালা একটে চান্স।' কোন বাপের বেটা আছে আজকে ফাঁকি দেয় তোদেব এই মাস্টারকে। এই সে নম্বর, যা পাবিস খেলে দে। কালকে পেমেন্ট গুণতে গুণতে বলিস, —মাস্টার শালা বাপের দুধ খেয়েছিল।'

গুপী চিবকালই একটু গরম খাওয়া প্রকৃতির। নিজের ওপর নাজাম নেই বললেই চলে। এমনিতে-ই গত কাল ধরে 'ঝড়' যাচ্ছিল। তাই রোখ-ও চেপে বসছিল ক্রমশ। তার ওপর মাস্টারের কথাবার্তা শুনে মাথায় আগুন জ্বলে গিয়েছিল গুপীর। জহরকে না বলে নিজেই বাড়ি থেকে মার শেষ সম্বল দু গাছা সোনার বালা হাতিয়ে এনে লাগিয়ে দিয়েছিল দেবেনের প্যান্ডে। কিন্তু লাগল না। শুনে মাস্টার বলল।— ইস্, একেবারে নাকের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলরে গুপী। যাকগে, কাল আসিস। শিওর সট্।

প্রথমটায় গুপী-ও বুঝতে পারেনি ঘটনার প্রতি কিয়া তাকে এতখানি বেসামাল করবে। গভীর রাতে বাড়ি ফিরে ঘুমোবার চেষ্টা করতে গিয়ে টের পেল গুপী তার বুকের অনেক নিচে একটা সরীসৃপ নড়চড়া শুরু করেছে। মার শেষ সম্বল দু-গাছা সোনার বালা. গুপী জানত—ঐ সোনাটুকু মা কি করে এখন-ও আগলে রেখেছে। সেই সোনার বালা বাঁধা রেখে সাট্টা খেলার পেছনে যে পরিচিত অপরাধ বোধ আছে, তার ধার গুপীর কাছে অনেকদিন হল ক্ষয়ে গেছে। এই বোধের চেয়ে-ও বেশী কিছু, তীব্র কোন পাপ-অনুভূতি, এখন তার মাথার ভেতর সাপের ছোবলের মত ফুঁসে উঠতে শুরু করল। মা এখন-ও টের পায় নি পেতে পেতে বেশ কদিন লাগবে। এর মধ্যে গুপী কি পারবে দেবেনের কাছ থেকে বালা দুটো ছাড়িয়ে আনতে?

—জহরের ...আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে।' দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ গর্জিয়ে উঠল গুপী।—আমার মার সোনার বালা শেষ সোনার বালা দুটো। গুপী শেষ করতে পারল না। গলা থেকে ঘড় ঘড় শব্দ বেরিয়ে এল।

—কি কিলা করছিসরে গুপী।'... দুপুরের গলায় বিরক্তির ঝাঁঝ ফুটে উঠল—যা বলছিস সাফ সাফ বাত্‌লা না।'

গুপী মুখ তুলল। একবার চকিতে জহরের মুখের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আবার মরা কান্নার সুর তুলে বলল।— 'আমার মার সোনার বালা. হো.. হো. .। আমি শালা কাল পাত্‌তি সে নম্বর.. হো.. হো....। দেবেনের ঠেকে আমার মার সোনার বালা .।' বলতে বলতে গুপীর নাক বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। নিচু হয়ে জাঙ্গিয়ার পাড়ে নাক মুছে নিল।

—তুই শালা মাসীমার সোনার বালা হফিস করেছিস? জহরের চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

—খবর জেনুইন ছিল।....মাস্টার শালা উল্লু দিল।

—তাই বলে সোনার বালা..। কত ধরেছিলি?

—তিনশ।

—গুপী। জহর হঠাৎ হিংস্র কোন জন্তুর মত গুপীর ওপর লাফিয়ে পড়ল। প্রচণ্ড আক্রোশে গুপীর পেছনে এক লাথি বসিয়ে গর্জে উঠল।—শালা বাদ্‌শা হবি....শলা শাহেনসা হবি... এই কার আঁটি চোষ!

রোদ চড়েছে জোর। শিবমন্দিরের মথার ওপরকার আকাশে ছাই পোড়া রঙ। দেওয়ারিয়া পেপার মিলের চিমনি দেখা যাচ্ছে। এখন ডিউটির সময়, ধোঁয়া উড়ছে। চিমনির মুখ ঠেলে।

মেঝেয় শরীর এলিয়ে শুয়েছিল জহর। দরজায় চোখ রেখে দেখছিল চিমনির ধোঁয়া মেঘের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। আরো দূরে একটা চিল পাক খাচ্ছে।

একটু আগে কি যেন হয়ে গিয়েছিল জহরের। এমনি হয় আজকাল। হঠাৎ হঠাৎ মাথার ভেতর রক্ত লাফিয়ে ওঠে। যেন মনে হয় নাক মুখ দিয়ে রক্ত লাভা স্রোতের মত বেরিয়ে আসছে। এখন জহরের কী যে করতে ইচ্ছে হয়। মনে হয় পৃথিবীটাকে দু-হাতে তুলে আছাড় দিয়ে ভেঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলতে। মনে হয় মিলের গোটা বস্তিটায় আগুন দিয়ে শিব-মন্দিরের চূড়ায় দাঁড়িয়ে ধা-ধা করে হেসে উঠতে। কিন্তু কিছুই পারে না সে। আজকাল সে বড় বেশী জেনে গেছে, তার ক্ষমতার সীমা কতটুকু। শান্তিদার সঙ্গে এই নিয়ে সেদিন একহাত হয়ে গেছে জহরের। হাত টানছে আজকাল। সাট্টায় পয়সাপাতি আসে না। হাত খালি হলে তার চলবে কেমন করে। ঘরবাড়ি ফিরে যাবার কথা ওঠে না। রবীন্দ্রনগরে বাড়ির দরজা আজ আর তার জন্য খোলা নেই। এখন শান্তিদাও যদি বেইমানি করে তবে জহর যাবে কোথায়? সেদিন তাই একটা বোঝাপড়া করতে চেয়েছিল জহর। বলেছিল। —এ হয় না শান্তিদা। এই ফান্ড নিয়ে কারবার চালাতে আমি পারব না।

—তবে আর কি করা। তুই ছেড়ে দে, আমি অন্য কাউকে দেখি! ঠাণ্ডা নামল গলায় উত্তর করেছিল শান্তিদা।

জহর এরকম উত্তরের জন্য তৈরি ছিল না। তাই ধাক্কাটা সামলাতে একটু সময় লেগেছিল। তারপর পূর্বাবস্থায় ফিরে এসে বলেছিল। —যেইমানি কর না শান্তিদা। জহর মিত্তির তোমার হবে এতদিন সার্ভিস দিয়ে এসেছে। কোন দুনম্বরী কাজ কারবার আমি এ্যালাউ করব না।

—ভয় দেখাচ্ছিস, এ্যাঁ? শান্তিদা ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করেছিল।

—ভয় ভয় মানি না। সাফ কথা জানিয়ে গেলাম।

—ভুল করছিস জহর। মাথা গরম করা বড় সোজা। কিন্তু সামলান....হেঁ হেঁ হেঁ...।

দাঁত ছড়িয়ে হেসে উঠেছিল শান্তিদা। তারপর সিগারেট ধরিয়ে আর একটা জহরের দিকে এগিয়ে দিয়ে চোখ ছোট ছোট করে

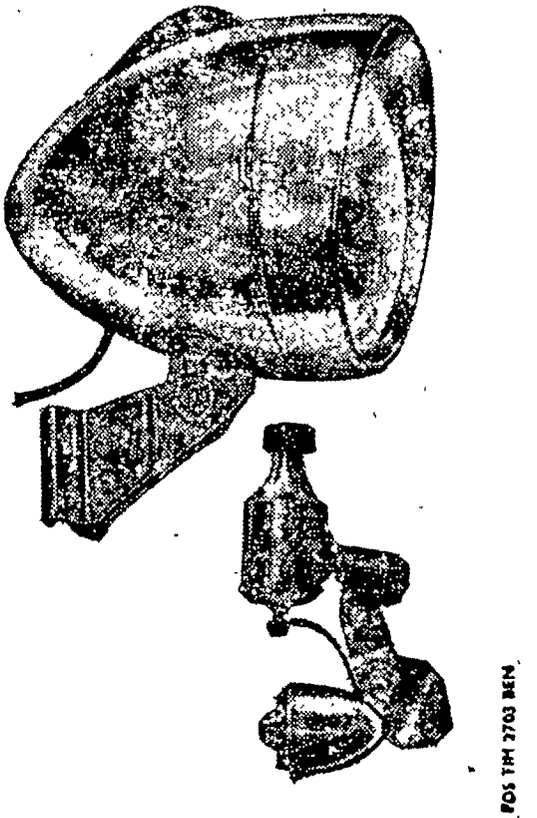

টি আই মিলার ডায়নামো

* যেকোনো মেঘলা আবছা আবহাওয়াতেও... সোজা তীব্র আলোর রেখা।
* আপন শক্তিতেই আলো জ্বলে— কোনো ব্যাটারী সেলের দরকার নেই— তার মানেই আর কোন খরচ নেই।
* ছিমছাম সুন্দর গড়ন, সম্পূর্ণ ক্রোম করা, আর চুরি হবার সম্ভাবনাও নেই।

আজই মিলার ডায়নামো কিনুন। এটি হল সব আবহাওয়াতেই আলো জ্বালানোর ল্যাম্প, যা' আপনার জীবনভোর কাজে আসবে।

মিলার—অন্ধকার পথে আলোর রশ্মী

MILLER

টি আই মিলার লিমিটেড মাদ্রাজ ৬০০ ০৫৩ (টিউব ইনভেস্টমেন্টস্ অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের একটি পরিপূরক সংস্থা)

FOS TIM 2703 BEN

বলেছিল। —জহর মিত্তিরকে শান্তি ঘোষালের ছায়ায় এসে না দাঁড়ালে সে জাগলেও মুড়িয়ে যাবে, সে কথা জানিস নিশ্চয়।....সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া গিলে ফেলে আবার বলেছিল শান্তিদা। —দুটো মার্ডার, মিল্লাপাড়ায় মহাশ্তিদের গুদামে ডাকাতি, সেবারে পোস্ট অফিসের ক্যাশ, লুট,... সব যে 'রিভাইভ' করতে কতক্ষণ লাগবে জহর?

জহরের বুকের হিমপ্রবাহ নেমেছিল। মুখ দিয়ে কথা সরে নি। একটু পর শান্তিদাই বলেছিল। —ঘাবড়াস না জহর। শান্তি ঘোষাল বিট্রে করবে না তোদের সাথে। একবার যখন শেল্টার দিয়েছি, তখন দেখেই। তবে কিনা, মাথাটা ঠান্ডা রাখিস শুধু।.... আচ্ছা যা, বিকালে মনসাতলায় এসে ক্যাশ তুলে নিস।

বুকের ভেতর বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল। শব্দ করে লম্বা নিশ্বাস ফেলল জহর। গুপীটা মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। খুব মেরেছে জহর। একটু আগে গর্জন্ত গোঙাচ্ছিল। জহরের সমস্ত ক্রোধ, ক্ষোভ, ব্যর্থতা, অক্ষমতার গ্লানি—সব এক সঙ্গে আছড়ে পড়েছিল গুপীর ওপর। জহর যেন বলতে চাইল। —দেখ শান্তিদা, তুমি দেখে রাখ। ঠিক এরকম ঠ্যাঙাতে ইচ্ছে করে তোমার। তোমরা শালা আমাকে দিয়ে খুন করালে, আউট লঠে করালে, ক্যাশ ভাসাল আবার শাসা-তলে তলে থানায় গিয়ে ডাইরি করে এলে আমার নাড়ি হাতের মুঠোয় ধরে রাখার জন্য।....শান্তিদা মনে রেখ সব। জমানা ফিরবে একদিন, মনে রেখ।

চিমনির ওপরকার আকাশ এখন ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার। পুকুরের ওপরের পশ্চিমদের চালাঘরগুলি থেকে একসঙ্গে হল্লা ভেসে এল। বোধহয় ঝগড়া বেধেছে। এতদূর থেকে প্রায় আর্তনাদের মত শোনাল।

ঠিক এমন সময় সুখেন আর তারক হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ঢুকল ঘরের ভেতর। —জহর, খবর শুনেছিস! তড়িৎ আবার ফিরে এসেছে।

জহর মেঝের শোয়া অবস্থা থেকে প্রায় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।—তড়িৎ! কোন তড়িৎ!

—নবাসদের পুরন্দরীর।

—সেকি!

চিৎকারে গুপীর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সে-ও উঠে দাঁড়াল। নিচু চালার সংকীর্ণ ঘর। অপ্রশস্ত মেঝে। বাইরে শেষ বৈশাখের ভরা বেলায় যেন কী কী করছে। কাক ডাকছে শিবমন্দিরের মাথায়। আর সেই নির্জন নীরবতায় গুপী, জহর, সুখেন আর তারক চারমূর্তি পরস্পরের দিকে চোখ রেখে স্তব্ধ পাষাণবৎ। পরস্পরের মনের অন্তরালে তখন একটাই প্রশ্ন,—তড়িৎ ফিরল কেন? ... জমানাই বা কোথায়?

কলমমস, একবার ভেবে দেখুন তত কাবহরে এই অঞ্চলের অগ্রগতির কথা। এখানে বাস চলত না, এখন বাস চলছে। এখানে....।' রথতলার মাঠে ভরাট নাটকীয় গলায় বক্তৃতা দিচ্ছিল পঞ্চাশ উত্তীর্ণ যুব-নেতা শান্তি ঘোষাল। লোকজনের ভিড় নেই। আসতে যেতে পথচারিদের কেউ কেউ ক্ষণিকের জন্য দাঁড়িয়ে দু-চার কথা শুনছে। আবার চলে যাচ্ছে। দূরে বাসরাস্তা। একটু আগেই শান্তি ঘোষালের স্ত্রীর নামের বাস দুটোর একটা যাত্রী বোঝাই করে চলে গেছে মথুরাপুরের দিকে। বোদ তেতে উঠেছে। চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে দর দর করে ঘামছিল শান্তি ঘোষাল। এমনিতে তার গলা একটু কাঁসাল। যুবক বয়সে রামধন অধিকারীর অপেরায় অনেকদিন কাজ করেছে। একবার সোঁদরবনে কোথায় যেন পালা গাইতেও গিয়েছিল। তার গলায় ইন্দ্রজিতের বোলটা দারুণ খেলেছিল। তারপর ইদানীং সামান্য এ্যাজমার লক্ষণ ধরা পড়েছে। তাতে গলায় ঘড়ঘড়ে শব্দটা বরং বক্তৃতার ঢেউ খেলাতে সাহায্যই করছে।

পাশে দেওঘরিয়া পেপার মিলের প্রপাইটার হরি সিং এবং চালিহা গ্লাস ওয়ার্কসের জিতেন মুখুজ্জে হাতামাথার বসে-ছিলেন। আর থেকে থেকে শান্তি ঘোষালের গলার নাটকীয় 'জার্ক' সামলাতে না পেরে কেঁপে কেঁপে উঠছিলেন .....'তাই বল-ছিলাম এই ফিরিয়ে আনা শান্তি, ফিরিয়ে আনা গতি, ফিরিয়ে আনা.....।' ঠিক এখানেই কথা আটকাল শান্তি ঘোষালের। কে যেন কানের কাছে ফিসফিস করে উঠল—'শান্তিদা, তড়িৎ আবার ফিরে এসেছে।' কো..... শান্তি ঘোষাল চমকে চোখ ফেরাল।—ও জহর!....তাই বলবে ত! এমনভাবে গলা নামিয়ে ফিসফিস করতে হয় নাকি। বুকটা কেমন ছমছম করে উঠেছিল না।

শান্তি ঘোষাল জহরকে উদ্দেশ করে হাতের ইশারায় থামতে বললেন। অতঃপর আবার ছন্দ কেটে যাওয়া সুরের সন্ধানে গলা মেলালেন।

—'দেশকে ধনশালী করতে, দেশের সম্পদকে বাড়িয়ে তুলতে আগামী নির্বা-চনে...।' ধুৎ! আর ভাল লাগছে না শান্তি ঘোষাল ঠিক স্মরণে আনতে পারল না এমন কেন নামের কাউকে জানত কিনা। তবু তড়িৎ ফিরে এসেছে শুনে বুকের ভেতর যে হ্যাচকা টান পড়েছিল সেই ব্যথাটা এখনও মেলাচ্ছে না কেন

দূরের রাস্তা দিয়ে আর একটা বাস ফিরে এল। টেনের গোলমাল, তাই যাত্রী হচ্ছে খুব। বাসের আয়ও দ্বিগুণ তিনগুণ হয়ে গেছে। শান্তি ঘোষাল একবার তন্দ্রাচ্ছন্ন দৃষ্টি মেলে তাকাল সামনের দিকে। মনসাতলার বাস স্ট্যান্ডের গুমটি ঘরের মাথায় তার দলের পতাকাটা খোলা হাওয়ায় পতপত করে উড়ছে। ওদিকের ঘটর ঘাবাজে এয়ারফিলফায়ার বাজছে। সামনে ধু-ধু চায় সারি সারি হা-ভাতার দল এসে ভিড় করেছে শুধু। যেমন একটা মজার কিছু হচ্ছে, এরকম চোখমুখের অবস্থা তাদের। এবারে পাব-লিকের কি যে হয়েছে, হাওয়াটা টের পাওয়া যাচ্ছে না মোটেই। তাহলেও দমলে চলবে কেন?

—শান্তিদা আমরা সন্ধ্যায় আসছি। কথা আছে অনেক। সুখেন গলা তুলে জানাল। তারপর রথতলার মাঠ পেছন অদৃশ্য হয়ে গেল।

বুকের ভেতর শব্দ হয়। যেন প্রাচীন শ্যাওলাজমা কোন টানেলের ভেতর দিয়ে ট্রেন যাচ্ছে। কিরকম অসহায় লাগে নিজেকে। ভয়ে গা ছমছম করে ওঠে। রাতে ইদানীং ভাল ঘুম হচ্ছে না শান্তি ঘোষালের। অনেক বাঁকানো সিঁড়ি টপকে এসে আজকাল মাঝে মাঝেই চোখ ফিরে যাচ্ছে ফেলে আসা পেছনের দিকে। কারা কারা যেন স্থির চোখ মেলে জেগে আছে ঐ মাঠে; যেখান থেকে হাঁটা শুরু করেছিল শান্তি ঘোষাল। ডাক্তার ইদানীং বলছে—এ্যাংজাইটি দূর করুন শান্তিবাবু। এসব হাইপার টেনশনের সিমটম।

তার ওপর ওরা আবার কি বলে গেল? —তড়িৎ আবার ফিরে এসেছে? আবার ফিরে আসা কেন? যা গেছে তা একেবারেই চলে যাক না! ....ফিরে আসা মানেই ত' হিসাব-নিকাশ। ফিরে আসা মানেই ত' ঝোঝাপড়া। ...এসব ভাবতে গেলেই যে 'হাইপার টেনশন' মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

সভার কাজ ফুরিয়েছে। বেলা হয়ে গেছে অনেক। দুপুরে হরি সিং তার ফ্যাক-টারিতে 'লাঞ্চ'-এর আয়োজন করেছেন। শান্তি ঘোষাল হরি সিং-এর পেপার মিলের প্রোডাকশন লাইসেন্স দ্বিগুণ করে দিয়েছেন। হরি সিং বিনিময়ে এবারের খরচাপাতির অর্ধেক অংশ বহন করবেন, কথা দিয়েছেন। শান্তি ঘোষাল উঠল। পা দুটো ভারী ভারী লাগছে। শ্বাসের কষ্টও হচ্ছে। 'তড়িৎ' শব্দটা তাকে নিয়ে এত খেলছে কেন? বক্ত-তলার মাঠ এখন ধু-ধু করছে। মনসা-তলার বাস স্ট্যান্ডেও লোকজন পাতলা হয়ে এসেছে। ওদিকের মটর গ্যারাজের এয়ার-ফিলফায়ারটাও কখন থেমে গেছে। শান্তি ঘোষালের চোখের পাতা বুজে আসতে চাইছে। তড়িৎ আবার ফিরে এল কেন? এত কাল ছিলই বা কোথায়? কিছুই বুঝতে পারছে না শান্তি ঘোষাল। তবু বুকের ভেতর সেই টানেল দিয়ে ট্রেন যাবার শব্দ হয়।

শুক্লা পক্ষের রাত। বৈশাখী পূর্ণিমা আর কদিন বাকি। চাঁদ উঠেছে। এবারে বৈশাখ মাসটা নির্জলা কাটল। আকাশে কালবৈশাখীর মেঘ দেখা দিল না একদিনও।

আগে আগে শান্তি ঘোষাল, তারপর জহর, সুখেন আর গুপী। পেছনে তারক। সন্ধ্যায় মিল্লাপাড়ায় মিটিং সেরে পায়ে হেঁটে

ফিরছে সবাই। ডাক্তার শান্তি ঘোষালকে বলেছেন, সকাল সন্ধ্যায় একটু হাঁটাহাঁটি করতে। ব্লাড সারকুলেশন ভাল হবে।

কারো মুখে কথা নেই। সারাটা দিন গুমোট কাটার পর সন্ধ্যার মুখে বাতাস ছেড়েছে। জ্যোৎস্না গড়িয়ে পড়ছে। অজানা শেষ বৈশাখের পোড়া মাটির গন্ধ।

সহর, সুখেন, তারক আর গুপী চারজনই মনের অন্তরালে ডুবুরির মত ডুব দিয়ে কি যেন একটা সন্ধান করছিল। শান্তিদার সেই দম নেই। ডুব দেয়া তার সাধ্য নয়। তাই কেবল ভেসে ভেসে হাত-পা ছুঁড়ে জল ঘোলা করছিল। তড়িৎ আবার ফিরে আসার অর্থ কি? ফিরে যখন এলই তখন দেখা দিচ্ছে না কেন? কোথায় লুকিয়ে থাকতে পারে একটা মরমরাহত মানুষ? এরকম সব প্রশ্ন প্রতি প্রশ্ন অসংখ্য তীরের মত জোঁকে ধরেছিল এদের। তথচ কোন উত্তর নেই।

—আমরা কেউ কেউ বুঝতে পারছি না তড়িৎ আবার কেন ফিরে এল?.... শান্তিদা ভারী গলায় বলল। সহর হাতার খোয়ায় হোঁচট খেল। টাল খেয়ে পড়ে যেতে যেতে সামলে নিল নিজেকে।

মির্জাপাড়া থেকে রবীন্দ্রনগর। তার পরে শ্রীরামপুরের মাঠ। ওরা মাঠের ওপর নেমে পড়ল। শ্রীরামপুরের মাঠে ফুটবল নেমেছে। গোল পোস্টে নারকেল ঝড়ির জাল। অন্ধকারে মাকড়সার জালের মত দেখাচ্ছে।

জ্যোৎস্নার পথ দেখে হাঁটছিল ওরা। আবার শান্তিদা কথা বলে উঠল—তবে এখনও কেউ দেখনি বলছো?

পেছন থেকে তারক সাড়া দিল।—হাবুল বলছিল পুলিনদা নাকি দেখেছে।

—তাই ত। পুলিন ত বাজে কথা বলার ছেলে নয়। শান্তিদা পথের ওপর পড়ে থাকা একটা ভাঙ্গা ডাল পা দিয়ে সরিয়ে দিল।

মাঠ ডিঙিয়ে বাতাস ঘরে এল। দূরে দূরে জোনাকি উড়ছে। মাঠের বেপরোয়া ঝিঁঝি ডাকছে। গাটা কেমন শির শির করে উঠল।

—কি মতলবে ফিরে আসতে পারে ছেলেটা? ...তোমাদের কি মনে হয়? শান্তিদা আবার জিজ্ঞেস করল।

—বোঝা পড়া করতে চায় হয়ত। কে যেন সাড়া দিল।

—বোঝাপড়া? ... কার সঙ্গে? ম্লান গলায় নিশ্বাস টেনে নিল সহর।

—সবার সঙ্গে।

—একা পারবে কেন? ...

—ওরা সব পারে। ...ভয়ার্ত সুর ফুটল গুপীর গলায়।

রাত প্রায় ফুরিয়ে এল। ট্রেন স্টেশনটার কিছু কিছু আলো নজরে আসছে। ওরা ডান হাতের রাস্তা ধরার জন্য মাঠের এপারে চলে এল।

শান্তিদা—আ?.... এই সেই পুকুর। এই সেই কদমগাছ আর ঐ সেই লাইট পোস্টটা।

এতক্ষণ অন্যমনস্কতার হাঁটতে হাঁটতে কারোর খেয়াল হয়নি কখন ওরা শ্রীরামপুরের মাঠ পেরিয়ে রাস্তা ডিঙিয়ে কানুগোদের পোড়ো বাড়িটার ভেতর ঢুকে পড়েছে। সহরের অর্তস্বর শুনে সবাই থমকে দাঁড়াল।

—মনে পড়ছে, শান্তিদা মনে পড়ছে। সহরের গলা তখনও কাঁপছে। বীতিমত শ্মশানচিক শোনাচ্ছে ঐ গলার স্বর।—সেদিনও এমনি রাত ছিল। এমনি জ্যোৎস্না ছিল। আর আমরা....!

—থাম সহর, তুই থাম। শান্তিদা দুহাতে কান চেপে চিৎকার করে উঠল।

যেন একটা বজ্রপাত ঘটল। নাকি বিস্ফোরণ, —সুপ্ত বোধ চেতনা জুড়ে। কারো মুখে আর কোন কথা নেই। শব্দ নেই চরাচরে। ঘুমিয়ে থাকা স্মৃতি আবার জেগেছে।

জেগেছে বড় স্পষ্ট হয়ে। এই বৈশাখী জ্যোৎস্নার চেয়েও স্পষ্ট। এই অন্নাপতিক মুহূর্তটার চেয়েও স্পষ্ট। হ্যাঁ এই ত সেই কদম গাছটা। এইত সেই লাইট পোস্ট আর নজা পুকুরটা। সেদিনও পুকুরের ঐ কোণটায় এখন ঘুটঘুটে অন্ধকার ছিল। জোনাকি উড়ছিল। আর শেয়ালের পাল ডেকে উঠছিল থেকে থেকে।

—মনে পড়ছে,....তোর হাতে ছিল ভোজালিটা। নিশ্বাসের শব্দ শুনে হিসহিস করে উঠল সুখেন।

—তুই প্রথম গুপ্তীটাকে পেটে বসিয়েছিলি।— তারকের গলায় ভূত-দেখার আতংক।

—তুই মুখ চাপা দিয়ে ধরেছিলি।.... কার গলা স্পষ্ট বোঝা গেল না।

—আর শান্তিদা তুমি, ঠিক এখানে হ্যাঁ, এখানেই দাঁড়িয়ে বলেছিলে,—একদম ফিনিস করে দিস। আর যেন কোনদিন টুঁ শব্দ করতে না পারে।

এবং হাঁপাচ্ছিল। ওদের চোখ আতংকে বিস্ফারিত এবং সাদা। ওদের কপাল থেকে ঘাম ঝরে পড়ছিল যেমটা ফোটা করে। শেষ বৈশাখের বাতাস রাত্রির শুদ্ধতার কদম গাছটার ডালে দোল দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল। মজাপুকুরের জলে চাঁদ ভাসছিল নীরবতা নিয়ে।

—আমরা যে সবাই মিলে তড়িৎকে মেরে ফেলেছি। ও ফিরবে কেমন করে।.... বুক ফাটা কান্নার মত রাঙ্গিয়ে উঠল সহর।

সহরের উচ্চারণের দোষেই, স্নেহ কিংবা পরিবেশের আকস্মিক অলৌকিকতার জন্যই হোক, ওরা সবাই যেন শুনল—আমরা যে সবাই মিলে বিবেককে ফেলে ফেলেছি। ও ফিরবে কেমন করে?

প্রথমে চমকাল শান্তিদা। তারপর আর সবাই। সহর কি বলল? ওরা কি শুনল? কিন্তু এখন আর তাদের শরীরে চমকের প্রকাশ ফুটে ওঠার মত শকতি নেই। যেন অনেক দূরে থেকে হেঁটে এসেছে ওরা শবযাহকের দায়িত্ব ওরা নিবে। সামনে শ্মশান, হরি ধ্বনি দিয়ে চিতার বুকের পাষাণ ভার চড়িয়ে দিলেই হয়।

—আমরা এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখানে মাটিতে রক্ত ঝরে পড়েছিল।

—লাল হয়ে গিয়েছিল মাটি।

—এখনও ভেজা নাকি?

—সেকি!....আরে তাই ত!.... কেমন করে হয়?

ঝিঁঝিঁ ডাকছে কানুগোদের পোড়ো বাড়ির বাগানে। পুকুর পাড়ে একটা অশ্বত্থ গাছের ঘন পাতার আড়ালে শব্দ করে কোন নিশাচর পাখি বড় অদ্ভুত গলায় ডেকে উঠল। জ্যোৎস্না ঢেউ তুলল মজা পুকুরের জলে।

ওরা ফিরতে চাইল। পা ফেলল। তবু পায়ে আঠার মত কি যেন একটা লেগে আছে বলে মনে হচ্ছে। সান্ধ্যস্নানে কিছু একটা, পায়ের পাতার নিচে জড়িয়ে গেছে। রক্ত নাকি?....বাসী রক্ত!.... ওদের সবার শরীরে কাঁটা দিল। কিন্তু কেউ মুখে কিছু বলল না।

কিন্তু পা ঘষতাতে ক্ষণিক ছুটে এসে থমকে দাঁড়াল সবাই। কত রাত এখন? চাঁদটা গড়িয়ে পড়েছে দূরের আকাশে। কথাটা গুপীই প্রথম বলল—আমার পায়ে কি যেন লেগে আছে।

—আমারও।

—আঠার মত।

—পা ভারী হয়ে গেছে।

—চল, পা ধুয়ে আসি।....

মজাপুকুরে ঘাট নেই। পানার জন্যে ওরা। জলে সবুজ সর। ওরা পারের মাটিতে বসে পুকুরের জলে পা ডুবিয়ে পা ঘষতে লাগল। কিন্তু কি যে হল,—যতই ঘষে চিটচিটে ভাবটা ততই স্পষ্ট হতে থাকে। আবার ঘষে। পায়ের ছাল মাটি তুলে ফেলতে থাকে পায়ের তালু। তবু পিছল ভাবটা কাটে না। ওদের হাঁপ ধরে যায়। শরীর শিথিল হয়ে পড়ে। হাত অসাড় হয়ে আসে। তবু পা পরিষ্কার হয় না। দাগ ওঠে না....।

বলি শোনো

বিজয় পাল

দরজাটা হাঁ-খোলা। ভেতরে কেউ নেই। ফাঁক পেয়ে পাকুকা একশ' ওয়াটের আলোর ঝকমকে জ্বলন্ত বর্শাটা সিধে চোখে এসে বিঁধল। চোখ বেয়ে মাথায়, সেখান থেকে বুকে—আমার সারা শরীরে আগুন ছড়িয়ে যাচ্ছিল।

বাথরুমে বেশি আলো না থাকলে রেণু ম্যান ঘ্যান করে। পুরনো বাড়িতে আরশোলা টিকটিকির অভাব নেই। তার ওপরে বিছে! ফলে পাঁচিশের জায়গায় একশর দাম মেনে নেওয়া গেলেও এই আকাশগঙ্গার দিনে বাজে বাজে আলো জ্বালিয়ে রাখা কেন? বুকের ভেতর থেকে কে যেন হেঁকে বলল, ফায়ার—। শুনে মাগালে সুইচ-বোর্ড থাকা সত্ত্বেও হাত দুটো যেমন তেমনি রইল। জেগে উঠছিল মুখ। রেণুকে ডেকে সত্যি সত্যি আগুন উগরে বললাম, তোমরা কি শুধু করেছ বলত? কোনদিকে হুঁশ নেই; রেণু কিছু বুঝতে না পেরে বিভ্রান্ত চোখে আমাকে দেখছিল। জিজ্ঞেস করলাম, বাথরুমের লাইটটা কখন থেকে জ্বলছে?

—কতক্ষণ আর—এইতো.....। জেন কিছুই নয় এমনি ঢিলেঢালা মন্থর ভঙ্গি রেণুর। হাত বাড়িয়ে আলো নিভিয়ে বলল, তুমি ঘরে গিয়ে অফিসের জামাকাপড় ছাড়। মুখেচোখে জল দাও। আমি চা জলখাবার নিয়ে আসছি।

সহজ ব্যাপার সহজেই শেষ হতে পারত। সেটাই নিয়ম। কিন্তু রেণু আমাকে জামাকাপড় পাল্টাতে না বলে ছাড়তে বলল কেন? অফিস থেকে ফিরে মুখেচোখে জলতো রোজই দিই। বেশি গরম পড়লে স্নানও করি। আলাদা করে বলার অর্থ কি? খিদে পেয়েছে। খাব। এবং চা জলখাবার রেণুই দেয়। আজও দেবে। সেজন্য এত কথার মানে? ভেতরের সেই লোকটা—আতঙ্ক-টাতঙ্ক হবে, খেপেছ, ফের গর্জে উঠল।

চা নিয়ে এলে রেণুকে বললাম, এখনও সাবধান হও। খরচ এভাবে বাড়তে থাকলে শেষে পেটে টান ধরবে, তখন বুঝবে আমার কথা।

রেণু চায়ের কাপটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, শুধু কথায়তো আর খরচ কমানো যায় না।

রেণুর ধারণা, খরচ জিনিষটা ছুঁড়ে দেওয়া ঢিলের মত। ইচ্ছে করলেই থামানো যায় না। বরং নিয়মিত অভ্যাসে দূরত্ব বাড়তেই থাকে। অর্থাৎ ব্যাপারটা হল গিয়ে অনেকটা স্পোর্টস, যেমন ডিসকাস বা বল্লম ছোঁড়ার মত আর কি! আমি একটি আস্ত গাড়ল। আয়-ব্যয় সংক্রান্ত রেণুর একান্ত নিজস্ব এই আবিষ্কারের কথা আমি জানি। কিন্তু ঠিক সময়ে ঠিক কথাটি ভুলে মেরে দিয়ে শুধোই, কেন?

—নিজে হাতেতো কুটোটি নাড়তে

হয় না, তাতেই এত! বলতে বলতে রেণুর চোখমুখ লাল হয়ে উঠছিল। ও রেগে যাচ্ছে। রেণুর খরচের ঢিল, আমার ছুঁড়ে দেওয়া প্রশ্ন—দুটো কোনটাই আর ফিরবে না। মাঝখান থেকে একচোট কথা কাটাকাটি শুধু অর্থহীন নয়—বিচ্ছিরিও বটে। তাই নির্ভার হতে চেয়ে বললাম, একটু বুঝিয়ে বল দিদি রেণু, মাথায় ঠিক ঢুকছে না।

—এতে বোঝাবুঝির কি আছে? খরচের কথা বলছিলে না! কটা দিন থাক... তারপর বাজু স্কুলে—

রেণু কথার মধ্যে ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করে খুব কম। করলেও সঙ্গে সঙ্গে তর্জমা করে দেয়। ওকে থামিয়ে দিয়ে তাই বললাম, মানে বিদ্যালয়ে—

রেণু ঝেঁঝে উঠল, হ্যাঁ, স্কুলে মানে বিদ্যালয়ে...বাজু ভর্তি হলেই বুঝবে। আমাকে আর কষ্ট করে বোঝাতে হবে না।

—কি বুঝব, খরচের ঢিল কিভাবে কতখানি ওড়ে? কোন্‌দিকে যায়?

—ঠিক তাই। বাজুকে আমি কিছুতেই ফরেন স্কুলে দেব না।

—অপরাধ?

—অতশত জানি না। রেণু মাথা দোলাতে দোলাতে বলল, বাংলা স্কুলে দেব না বলেছি—দেব না। তুমি বললেও না।

কী আমার লক্ষ্মী বউরে! ভাবখানা এমন যেন এছাড়া বাদবাকি আর সব বিষয়ে ও আমাকে শোনে মানে। জল উঁচু—উঁচু, নিচুতো নিচু। অথচ এইতো সেদিন সামান্য একটা আনাজ নিয়ে কী কাণ্ডটাইনা হল! কোথায় যেন গিয়েছিল রেণু। ফিরে এসে দেখে ঠাকুরের পাশে গোটা একটা পিঁয়াজ। পিঁয়াজতো নয়, সাক্ষাত নারায়ণশিলা! সুতরাং চক্ষু স্থির, শরীর কাঠ, নিঃশ্বাস বন্ধ। অবসমাধির লক্ষণ মিলিয়ে অতঃপর পতন এবং মূর্ছাই স্বাভাবিক ছিল।

কিন্তু কোথায় কি। রেণু জোর সামলে গেল। তলব পড়ল বাজুর। রেণু যত বলে, এটা কে রেখেছে? ওর সেই এক রা, জানতে পারছি না। মানে জানি না। বাজুই যে রেখেছে সে ব্যাপারে কি আমি কি রেণু দুজনেই কিন্তু নিঃসন্দেহ।

রেণু বলল, দেখছতো কেমন মিথ্যে বলতে শিখেছে!

বাজু মিথ্যে বলছে ভাবা যায় না। আড়াই বছরের ছেলে সত্যি মিথ্যের কি জানে? সে সব বেশি বয়সের বালাই। বুঝিব উপসর্গ। বাজু নিশ্চয়ই ভুলে গেছে। বললাম, পিঁয়াজটা আমি তুলে নিচ্ছি, তুমি গঙ্গাজল ছিটিয়ে দাও—তাহলেই হবে।

—তুমি! রেণু আঁতকে উঠলো। —কালকেশ বাসি জামাকাপড় ছেড়েছ?

বললাম, নাতো।

সুতরাং রেণুই সব করল। গঙ্গাজলনি চলছিল সমানে। আজ পিঁয়াজ রেখেছে। কাল রশুন রাখবে। তার পরদিন হয়তো মাছই এনে তুলবে। এসব ভালো নয়। এভাবেই বাচ্চারা খারাপ হয়ে যায়। মিথ্যে বলতে শেখে। এখন না সামলালে পরে আর কিছু করা যাবে না।

এতে গেল শিশুপালনবিধির অ আ ক খ। ঝুলি থেকে চিরকালের অদৃশ্য সেই হতকুচ্ছিৎ বেড়ালটা লাফিয়ে বেরোল সব শেষে। রেণু বলছিল, তোমার জন্যই বাজুটা দিন দিন এমন হয়ে যাচ্ছে।

আমার জন্য কেন? না, আমি পরিচ্ছন্নতাকে নিয়ম করিনি। এ'টোকাঁটার বিচার নেই। ঠাকুরদেবতায় শ্রদ্ধা ভক্তি নেই। আমি অবিশ্বাসী, নাস্তিক। নোংরা ঘরদোর একাকার। ছোট ছোট ছেলেপুলেরা তাদের বাপ মাকে দেখেই বড় হয়ে ওঠে। ভালোর চাইতে খারাপগুলো শেখে তাড়াতাড়ি। এক কথায়, বাজুর ভবিষ্যৎ আমিই নষ্ট করছি। আমি বাজুর মূর্তিমান সর্বনাশ।

এর একটাও নতুন নয়। অনেকবার অনেকভাবে রেণু আমাকে শুনিয়েছে; আমি শুনে গেছি। বুঝেছি, রেণু বাজুর জন্য বড় বেশি ভাবে। দুটো ঘর, একটুকরো বারান্দা, আমি আর বাজু—এই ছিল রেণুর পৃথিবী। ইদানীং সেই পৃথিবী ছোট হতে হতে শুধু বাজুতে গিয়ে ঠেকেছে। আমি ওর শাঁখাসিঁদুর আছি! সিঁদুরে আছি! যেমন ভগবান থাকেন তেমনি একটেরে হয়ে!

বললাম, তুমি শুধু আমার দোষটাই বড় করে দেখ। এদিকে যে বাজু আকাশ দেখতে শিখেছে, চাঁদ দেখে বলে, কি ভালো, তা জানো?

রেণু ছিটকে ওঠে, থাক থাক, ঢের হয়েছে, আর জ্ঞানে কাজ নেই। বাজু মুদির দোকান খুলুক সেও ভালো, কিন্তু বাপের মত হতে দেব না কিছুতে।

রেণুর বিশ্বাস, আকাশ দেখা চাঁদ দেখা পুরুষমানুষদের পক্ষে ভারি অন্যায়। তাদের বিয়ে করা পাপ। আমি উভয় অপরাধে অপরাধী। বিবাহিতা স্ত্রীর জন্য নিখিল স্বামীসমাজ যা যা করে থাকেন তার কোনটাই আমি করি না। সংসারী হওয়ার কোন যোগ্যতা নেই আমার। বুঝিবা পিতাও!

—আর পুরুষ?

—আহা-হা-আ, কি আমার পুরুষরে। বেণুর হাসি লজ্জায় নরম। বলেছিল, তুমি একটি আস্ত বাক্সস।

মনে পড়তে আমারও হাসি পেল। বেণু জিজ্ঞেস করে, হাসছ যে!

বলি, হাসতেও পারব না?

—তা কেন, কিন্তু আমিতো কোন হাসির কথা বলিনি!

রেণু তীব্র দৃষ্টিতে আমাকে বিঁধে রেখেছে। ওর ফর্সা নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম। খুব বেশি রেগে গেলে রেণুর হাত কাঁপে। কথা খুঁজে পেতে এবং বলতে সময় নেয়। কয়েকটি স্তব্ধ মুহূর্ত কাটিয়ে রেণু বলল, বাজুকে ইংরেজী স্কুলে ভর্তি করতে চাওয়াটা হাসির কথা?

রেণুর গলায় শব্দগুলো টগবগিয়ে ফুটছিল। এক্ষেত্রে 'পিঁয়াজ-মঙ্গল' কি 'পুরুষ-বাক্সস উপাখ্যান' নিতান্তই সেকেলে। চোখ বুজে গম্ভীর ভাস বললাম, আসলে আমি বাজুকে কোন্ স্কুলে ভর্তি করলে ভালো হয়, ইংরেজী না বাংলা ভাবছিলাম। ভাবতে ভাবতে অমলার কথা মনে পড়ে গেল। তাই আর কি।

—এর মধ্যে অমলা আসে কোত্থেকে?

—বাহ্। আমি অসহিষ্ণু হয়ে বলি, অমলার মেয়ে ইংরেজী স্কুলে পড়ে যে। ওর অফিসে ফোন করেছিলাম একদিন।

—কি কথা হল?

—কি আর! অমলা বলছিল বাংলার চাইতে ইংরেজীটাই নাকি সহজ। বাচ্চারা তাড়াতাড়ি শিখে নিতে পারে।

বেণু নড়েচড়ে বসল। খুশি খুশি ভাব। বলল, অমলা তোমার মত নিরেট নয়।

—তাতো নয়ই। সেন্ট্ পারসেন্ট বি-এ হনস্, তাও আবার বাংলায়। বেণু আমার কথা গায়ে মাখল না। —আর কি বলল?

—বলল, ইংরেজীতে সংখ্যা গুণতে হয় টোয়েন্টি ওয়ান, টোয়েন্টি টু, টোয়েন্টি থ্রি করে। বাংলায় বলি একুশ বাইশ তেইশ—

প্রকাশিত হইল প্রভাত মুখোপাধ্যায় রচিত

তুষার তীর্থ অমরনাথ

১৪.০০

কথিত আছে দেবতা অমরনাথের তীর্থ-যাত্রায় মনস্কামনা সিদ্ধ হয়, তারই বিস্ময়কর এবং রোমাঞ্চকর কাহিনী। রঙিন ছায়াচিত্রে দেখিবার পূর্বে পড়ুন। চৌদ্দ টাকা অগ্রিম পাঠালে ডাকমাশুল ফ্রি— লাগিবে না।

এই লেখকের অনবদ্য রচনায়—

কুন্দসী কাশ্মীর ১৪·০০

কলিকাতা পুস্তকালয়, ৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিঃ-৭৩

ইন্দুভূষণ মণ্ডল-এর প্রকাশনায়

একালের স্বপ্ন

৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা **দেয়ালী**

লিখেছেন :— সায়র নাইয়া, ব্র, না, ম, ডঃ গিরীন্দ্রনাথ দাস, প্রবীর দাস, সরল বিশ্বাস, সমীরণ রুদ্র, ডম্বরুধারী, গোপাল ব্যানার্জী, বাসুদেব দত্ত, সুখরঞ্জন মৈত্র, হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র, বাজী-রাও সেন এবং আরও অনেকে।

সম্পাদক—বীরেন হালদার

ইন্দা, গড়গপুর

জেলা—মেদিনীপুর।

—তাতে কি ?

—তাতেই তো সব।....ধর, কেউ যদি টোরেন্টি আর ওয়ান টু থ্রি জানে তাহলেই হল। অথচ একুশের সঙ্গে না আছে কুড়ি, না আছে এক।, এবারে তুমিই বল, কোনটা সহজ ?'

রেণু হেসে বলল, সব তোমার জানানো। অমলা এসব বলতেই পারে না।

—কেন পারবে না ? ভাজা মৌবী দাঁতে কাটার মত করে বলি, সেতো আমার মত নিরেট নয়, যাকে বলে বুদ্ধিমতী তাই। শেষদিকে আমার গলা মৃদু হয়ে আসছিল—প্রায় বাতাসী। —ঠিক তোমার মত।

—ঠাট্টা করছ ?'

—পাগল।

—কে ?'

বেণু সময় সময় বাজু হয়ে যায়। কি কে কেন কবে কোথায়—বাজুর পেটেন্ট্ নেওয়া জিজ্ঞাসাগুলো ওকেও পেয়ে বসে, বিশেষত রেগে গেলে। স্ত্রীজাতির ক্রোধ আর শিশুর বায়না সমান অবুঝ—কথাটা আমিও জানি।

কি বলব ভাবছি। তখনই মনে পড়ল। বললাম, তোমার বাবা কাল রাত্তিরে ফিরেছেন।

—সে কি! —

রেণুর অনুচ্চারিত প্রশ্নের জবাবে বলি, তখন থেকেতো খালি ঝগড়াই করছ, বলার সময়টা দিলে কই?

বেণু আমার ধারণা অদৃশ্য পায়ে ডিঙিয়ে গেল। নিজের মনেই যেন বলছিল, হঠাৎ ফিরে এলেন যে! সাতদিন থাকার কথা শরীর টরীর ঠিক আছেতো ?

আমার কিছু বলা উচিত, তাই বলতে যাচ্ছি, ঠিক তক্ষুণি বাজুও কিছু বলতে চেয়েছে। পাশের ঘরে হারুর সঙ্গে খেলছিল। হঠাৎ আমাদের কাছে ছুটে এল—যেন ঝড়।

—বলি শোনো—

বাজুবাবু কিছু বলবেন, আমরা শুনব না এর চেয়ে বড় অন্যায় আর কি হতে পারে। উনি কিছু বলছেন সেতো শোনারই জন্য। তবু রেণু ওকে থামাতে চাইল, এখন আমি তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলছি। তুমি ওঘরে—

—বলি শোনো।

—আগে আমারটা শোনো।

বাজু চেঁচিয়ে উঠল, বলি, আগে শোনো।

আমি আর থাকতে না পেরে বললাম, শোনোই না কি বলছে।

—বলবে আবার কি ? রেণু রীতিমত অসন্তুষ্ট।

—কেন, ওর কি কিছুই বলার থাকতে পারে না ?

—থাকবে মাতো বলিনি। হাজারটা লক্ষটা আছে। এক্ষুণি বলবে, হয় ক্যাডবেরি পাপিনস্ দাও, নয়তো আলমারী থেকে ওটা আনো ওটা আনো, বল্ কোথায় গেল—এইসব। এর বাইরে আর কিছু কি কখনো বলে ?

—বলি শোনো।

রেণু অনুমতি দিল, বল।

বাজু একবার আমার একবার রেণুর দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল। পাতলা গোলাপী ঠোঁট দুটো নড়ছে। চোখে জল। পুষি বাপকু এমনি করেকটা আদরের নামে ডাকতে ভোলে তুলে নিলাম। বাজু তার ছোট্ট ছোট্ট নরম হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরল। —আবার বলো।

আমি জানতে চাইলাম, কেনটা ?

—পুষি।

বয়স যখন মাস পাঁচ ছয় তখন থেকেই বাজু আদর খেয়ে চোখ পিট্ পিট্ করে। গাল গলা ফুলিয়ে নানা শব্দে খুশি জানায়। তা দেখে বেণু একদিন বলেছিল, দ্যাখো, ঠিক যেন একটা সাদা বেড়াল।

আমি বলেছি, পুষি বেড়াল।'

—বেড়াল নয়। বেণু আদর করতে করতে বলে, শুধু পুষি।

সেই থেকে বাজু পুষি বলে ডাকলে মিষ্টি মিষ্টি হাসে। আজকাল গালে কষে কামড়ে দিয়ে শুধোয়, আমি কি কামড়ালুম ? এক্ষেত্রে উত্তরটা না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শুনে কী যে খুশি! বলে, আমিতো চুমু দিলুম।

বেণুর মেজাজ কিন্তু তখনও পড়েনি। বলল, আদর দিয়ে দিয়ে একেবারে নষ্ট করে দিচ্ছ ছেলেটাকে।' অথচ পরে আমাকেই দুষবে।

আমি বাজুকে বললাম, 'পুষি, আর কথা বলোনা কেমন। ও কি বুঝল সে ওই জানে। ঠোঁট টিপে আমার কোলে বসে রইল। রেণুকে বললাম, তাড়াতাড়ি কাজ শেষ হয়ে যাওয়াতে চলে এসেছেন, আর কিছু নয়।...অন্তত ফোনেতো তাই বললেন। পারলে আজ বাত্তিরের দিকে বাজুর দিদুনকে নিয়ে একবার আসবেন।

রেণু নিঃশব্দে উঠে চলে গেল। মা বাবা আসবেন। এখন ওর কত কাজ! ঝগড়াঝাঁটি তার কাছে নেহাতই তুচ্ছ।

বাজুর দাদু দিদুন বেশ দেরি করেই এলেন। উঠলেনও তাড়াতাড়ি। বরানগর থেকে টালিগঞ্জ—মাঝখানে অনেকটা পথ। অনেক সময় লাগে যেতে। এদিকে রাত বাড়ছে। দিনকাল ভালো নয়। রেণু বাধা দিল না। বলল, সাবধানে এসো। বাজু একটু ঝামেলা বাধতে যাচ্ছিল। তা বেণুর এক চোখ পাকানোতে বেচারা পালিয়ে বাঁচল।

রাত বলেই ট্যাক্সি পাওয়া গেল সহজে। তুলে দিয়ে ফিরে আসছি, ঘরে ঢুকেছি কি ঢুকিনি, আক্রমণ এলো সম্পূর্ণ অরক্ষিত এলাকা দিয়ে। রেণু বলল, প্রণাম করা উচিত ছিল তোমার। এতক্ষণ ধরে ভেবে রাখা তাবৎ যুক্তিবুদ্ধির প্রয়োজন ফুরিয়ে যেতেই দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেল আমার।

বললাম, কেন ?

বাজু পাশ দিয়ে গুটি গুটি পায়ে হেঁটে যাচ্ছিল। আমার কথা শুনে থমকে দাঁড়াল। ও আমাকে দেখছে। চিনতে না পারলে লোকে যেমন করে দেখে তেমনি—শুধু আমাকেই। অস্বস্তিতে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। রেণু বাজুকে হারুর কাছে রেখে এসে বলল, বুড়ো মানুষ দুটোর কথা না হয় বাদ দিলাম। ও'রা আজ আছেন কাল নেই। কিন্তু বাজুর মুখ চেয়েও কি তুমি এটুকু করতে পার না ? বলতে বলতে রেণুর গলা ধরে আসছিল। —ও তোমার মত একশ'তে আর নেবী হোক তুমি কি তাই চাও ?

মেঘে মেঘে বেলা বড় কম হল না। পৃথিবীতে এসেছি সে ঢের দিনকার কথা। সেই থেকে কত কি দেখলাম। কত লোক! কত রকমের মুখ! কেউ কারো মত নয়। কেউ বুঝি মানুষের মত নয়। রেণু বলে, রোগ পুষে রাখা ভালো কথা নয়। ডাক্তার দেখাও।

আমার দেখবার চোখ নেই। হতে পারে, আমার কোমর মেরুদন্ড ও ঘাড়ের জোড়গুলো স্বাভাবিক নয়। নিচু হয়ে কাউকে প্রণাম করতে গেলে সারা শরীরের রক্ত যে গলগলিয়ে মাথায় উঠে আসে, যন্ত্রণা হয় তার কারণ নিছকই ব্লাডপ্রেসারের গোলমাল। হয়তো রেণুর কথাই ঠিক। আজ হোক কাল হোক ডাক্তারের কাছেও যাব হয়তো। কিন্তু সারবেই যে তার গ্যারান্টি কোথায় ?'

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে রেণু আবার বলল, বড় হয়ে বাজু যদি তোমাকে প্রণাম না করে, খারাপ লাগবে না তোমার ?

তাও কি মুখে বলতে হবে! তাছাড়া কাউকে প্রণাম করতে না পারার দুঃখ আমি জানি। বাজুও সে দুঃখ পাক, বাবা হয়ে কি করে তা চাই? বললাম, যাতে করে সে চেষ্টাই তো করছি।

—ওহ্! রেণু চেঁচিয়ে উঠল, বাজু। আমি কিছু বুঝে উঠবার আগেই বাজু হৈ হৈ করে এসে পড়ল। রেণু বলল, বাবাকে প্রণাম কর।

বাজু দু'পা এগিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

আমি ধমকে উঠলাম, রেণু, কি হচ্ছে!

রেণু আমার কণ্ঠ যেন শুনতেই পেল না। বাজুর দিকে ঈষৎ ঝুঁকে অস্বাভাবিক তীব্র স্বরে বলল, দাঁড়িয়ে পড়লে যে! বাবাকে প্রণাম কর।

বাজু হুবহু আমারই গলায় প্রশ্ন করল, কেন ?

অনেকদিন বৃষ্টি হয়নি। জুনের কোলকাতা রোদে ঘামে নুনে একেবারে যাচ্ছেতাই। তার ওপর লোডশেডিং। কি যে অবস্থা! তবু মনে হল আমি শীতে কাঁপছি। রেণুর মুখের রং রেখা দ্রুত বদলে যাচ্ছিল। কেমন হতাশ ক্লান্ত ফ্যাকাসে গলায় রেণু বলল, বাজু, কি বললাম শুনতে পাচ্ছ না ?

—বলি শোনো—

যে কথা বাজু বড় হয়ে অনেকবার বলবে, বাংলা ইংরেজী হিন্দী যাতেই বলুক না কেন——চাই বা না চাই শুনতেই হবে আমাকে—আজ এই মুহূর্তে তার জন্য কেন কৌতূহল বোধ করলাম না।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্তঃ বিপ্লবী ও দার্শনিক

সূর্য বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে যে সমস্ত মানুষ জ্ঞানচর্চার সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামকে এক অবিচ্ছিন্ন অংশ হিসেবে মনে করতেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সেই সমস্ত মানুষদের মধ্যে ছিলেন এক অন্যতম পুরোধা ব্যক্তি। আজকের বাঙালীর কাছে ভূপেন্দ্রনাথ বিশেষ পরিচিত নন। কেননা এই মানুষটি ছিলেন মূলতঃ প্রচারবিমুখ অথচ সংগ্রামী জীবনদর্শনে গভীর আস্থাশীল। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ভূপেন্দ্রনাথের জীবনে এবং চিন্তাভাবনায় যে কুশীলবেরা মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁরা হচ্ছেন ভারতবর্ষের অসংখ্য শ্রমজীবী মানুষ। অনেকের কাছেই সেই কারণে ভূপেন্দ্রনাথের জীবনজিজ্ঞাসা পরিচিতির অপেক্ষা রাখে। আপাততঃ তাঁর পরিচয়লিপি পেশ করা প্রয়োজন। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত হচ্ছেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত ওরফে স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠতম ভ্রাতা। মধ্যম ভ্রাতা হলেন মহাপণ্ডিত ও সাধক মহেন্দ্রনাথ দত্ত। ভূপেন্দ্রনাথের জন্ম হয় ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে। জন্ম হয়েছিলো এই কলকাতারই সিমুলিয়া পাড়ায়। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ও মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী। বলা নিষ্প্রয়োজন যে ভুবনেশ্বরীর তিন সন্তানই ছিলেন বিপুল পাণ্ডিত্যের অধিকারী, বিদ্রোহী ও আপোষহীন সংগ্রামী চেতনার প্রতীক। নরেন্দ্রনাথের মতো মহেন্দ্রনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথও বিদ্যা ও জ্ঞানচর্চায় কিছুমাত্র কম পারদর্শী ছিলেন না। ভূপেন্দ্রনাথ মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও পরবর্তীকালে নিউইয়র্কে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন ও ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লাভ করেন এম. এ ডিগ্রি। এই হোল মোটামুটিভাবে ভূপেন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত পরিচয়লিপি। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়লিপি পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে একথাও জেনে রাখা ভালো যে জীবনের বিভিন্ন শরিকাপ্রশাখায় ভূপেন্দ্রনাথের মেজাজ ও চরিত্র নরেন্দ্রনাথ ও মহেন্দ্রনাথের থেকে স্বতন্ত্র ছিলো। যে স্বাতন্ত্র্যবোধ ও স্বাধীনতাস্পৃহা বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে ধর্মীয় চেতনার পুনরুজ্জীবনের প্রশ্ন রেখেছিলো, সেই একই চেতনা ও মূল্যবোধ মহেন্দ্রনাথকে করেছিলো এক জীবনসন্ধানী দার্শনিক আর ভূপেন্দ্রনাথকে করেছিলো এক নিখাদ বিপ্লবী। ভুবনেশ্বরীর তিন সন্তানই ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে সার্বিক বিপ্লব সুসম্পন্ন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, পথ ছিল ভিন্ন।

প্রসঙ্গতঃ বলা প্রয়োজন যে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় যে নবজাগরণ ঘটেছিলো সেই নবজাগরণের উৎস ভারতবর্ষের সমাজ ও শ্রমজীবী মানুষ ছিল না। কেননা বিজ্ঞানে, সাহিত্যে ও দর্শনে যে চিন্তাভাবনার বর্ণচ্ছটা আমরা লক্ষ্য করেছি সেই চিন্তাভাবনাগুলি মূলত ইউরোপের রেনেসাঁসের ফসলমাত্র। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষে তার পুঁজি বিনিয়োগ করেছিলো বিস্তর মুনাফা লাভের জন্য। আর এই পুঁজির ব্যাপক অনুপ্রবেশ ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থাকে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষার সহায়ক এক মাধ্যমে পরিণত করেছিলো। কিন্তু এই পুঁজির অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে এসেছিলো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের উদারপন্থী সংস্কৃতি। মিল্, বেন্থাম্, রুশো ভারতবর্ষের বেশ কিছু মানুষকে স্বাধীনতার মৌল সর্ত সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছিলেন। অর্থাৎ অন্তত কিছু মানুষ অনুভব করেছিলেন যে, ভারতবর্ষের মানুষেরা পরাধীন। আর তাঁদের স্বাধীনতা হরণ করে নিয়েছে এক বিদেশী শক্তি। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে শুধুমাত্র এই অনুভূতিটুকু যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন ছিল এক ব্যাপক সংগঠিত রাজনৈতিক দর্শনের যা কি না ভারতবর্ষের সর্বস্তরের মানুষকে সমানভাবে স্বাধীনতাচেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে পারবে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য তা হয় নি। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও অথবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মূলত যা করতে চেয়েছিলেন তা হোল সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সংস্কার সাধন। কেননা উপরোক্ত পণ্ডিতেরা এটা অনুভব করতে পেরেছিলেন যে ভারতবর্ষের সামাজিক কাঠামো দীর্ঘদিনের সামাজিক কুসংস্কারগুলির আক্রমণে জরাজীর্ণ ও দুর্বল। তার পক্ষে বিদেশী শক্তির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভবপর নয়। আর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা ভারতবর্ষের যে অংশটির সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে তার বাজারকে সম্প্রসারিত করবে বলে মনে করেছিলো সেই অংশটি ধর্মীয় সংস্কারে ও সাংস্কৃতিক চেতনায় ছিল রক্ষণশীল ও প্রগতিবিরোধী। এককথায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের মধ্যে মিত্রতা ভারতবর্ষের সমাজজীবনে জাতিভেদপ্রথা ও অন্যান্য ধর্মীয় কুসংস্কারগুলির সামাজিক মূলকে আরও সুদৃঢ় করতে সাহায্য করেছিলো। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও বিস্তর বক্তব্য পেশ করলেন বাংলা তথা ভারতবর্ষের মানুষের কাছে। কিন্তু তাতে ভারতবর্ষের সমাজজীবনে কোন গুণগত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হোল না। কেননা সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোর মূলোৎপাটন করা এই উচ্চশিক্ষিত ও সংস্কারধর্মী সুপণ্ডিত মানুষদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারাও সম্ভবপর ছিল না। আজকের সাধারণ মানুষের কাছে একটা তথ্য পরিষ্কার যে ১৮৫০ সালের পর বাংলাদেশ ও তার নিকটবর্তী যে সমস্ত অঞ্চলে বহু গণবিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিলো সেই সমস্ত বিদ্রোহগুলির মূলস্রোত থেকে আমাদের পরিচিত সমাজ-সংস্কারকেরা সামগ্রিকভাবেই বিচ্ছিন্ন ছিলেন। বেনেসাঁসের প্রভাব ছিল শুধুমাত্র নগর কলকাতা ও তার চারপাশের কিছু অংশের মধ্যে। তাই মিল্, বেন্থাম্ ও রুশোর সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করেছিলো মনু, পরাশর ও যাজ্ঞবল্ক্য।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

ভূপেন্দ্রনাথ যখন বিলাত যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন তখন ভারতবর্ষের পরাধীনতা বহু দেশপ্রেমিক মানুষের মনে গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। অনেকেই তখন সমাজ সংস্কারের আন্দোলনকে জনজীবনের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখছেন না। অর্থাৎ বেঙ্গলরেনেসাঁস কৃষ্ণমোহন, শিবনাথ শাস্ত্রী, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ও আরো অনেক পণ্ডিতেরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ভারতবর্ষের সামাজিক মূল্যবোধগুলিকে আক্রমণ করতে লাগলেন। আবার কখনও আমরা দেখতে পাই যে কিছু মানুষ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাকেও পরোক্ষভাবে অর্থাৎ আদর্শগতভাবে আক্রমণ করছেন। কবি হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল, নবীনচন্দ্র তাঁদের কাব্যে ও ছড়ায় দেশাত্মবোধক মূল্যবোধকে সোচ্চারে আহ্বান জানালেন। সারা বাংলা তথা ভারতবর্ষের এক বিরাট অংশ তখন নতুন রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার পাঠ গ্রহণ করছেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ, বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব ও সমাজচেতনা, ব্রাহ্ম সমাজের অভ্যুদয় ও সনাতনপন্থী হিন্দুদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন আচারবিচার ভূপেন্দ্রনাথের

অনুসন্ধিৎসু মনকে আরও জিজ্ঞাসু করে তুলেছিলো। শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে পরিচিতির ফলে ভূপেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজের কার্যাবলীর সঙ্গে কিছুটা পরিচিত হয়ে যান। বলা বাহুল্য ভূপেন্দ্রনাথের যৌবনে ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন অস্থির এবং জাতীয় আন্দোলন তখনও পর্যন্ত কোন সুস্পষ্ট রাজনৈতিক দর্শন ও কর্মসূচী অনুসারে চলতে আরম্ভ করেনি। কিন্তু ইতিমধ্যে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়েছে এবং ভূপেন্দ্রনাথের যৌবনকালে কংগ্রেস মোটামুটিভাবে নরমপন্থাকেই বেছে নিয়েছিলো জাতীয় আন্দোলনের কার্যক্রম হিসেবে। বাংলাদেশে তখন নরমপন্থী কংগ্রেস নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মূলত আলাপ আলোচনা ও নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত আন্দোলনগুলি আসলে ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশের সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষকে আকর্ষণ করতে পারে নি। কেননা ইতিপূর্বে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমস্ত গণবিদ্রোহগুলি সংঘটিত হয়েছিলো —যেমন সাঁওতাল বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ ও সেই বিরাট ঐতিহাসিক সিপাহী বিদ্রোহ—সেগুলি বাংলাদেশের পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে বিশেষভাবে সমর্থিত হয় নি। এই অন্তর্বিরোধটি ছিল ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রধানতম সমস্যা। আর এই অন্তর্বিরোধের চূড়ান্ত সমাধান নরমপন্থী কংগ্রেসের নেতা সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।

সেই কারণে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কার্যকলাপ ভূপেন্দ্রনাথকে কোন বৃহত্তর অর্থে আকৃষ্ট করতে পারে নি। নরমপন্থার মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা অর্জন ভূপেন্দনাথের জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল না। ভূপেন্দ্রনাথের কাছে আদর্শ ছিলেন ম্যাৎসিনি, গ্যারিবল্ডি ও অন্যান্য স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী যোদ্ধারা। কংগ্রেসের আদর্শের মধ্যে কোন বলিষ্ঠ রূপ না থাকায় ভূপেন্দ্রনাথ কংগ্রেসের রাজনৈতিক কর্মসূচীকে স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল অস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করলেন না। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও পরবর্তীকালে কংগ্রেসের একাংশের দ্বারা পরিচালিত আন্দোলনগুলির নবমূল্যায়ন করেছেন ভূপেন্দ্রনাথ। এই মূল্যায়নের ফলে আন্দোলনগুলির কিছু কিছু নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ভূপেন্দ্রনাথের কাছে বেশ পরিষ্কার হয়ে ওঠে। তাই ভূপেন্দ্রনাথের কাছে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রশ্নটি সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে এক আদর্শগত সংগ্রামের অবিচ্ছিন্ন অংশ হিসেবেই হিসেবেই স্বীকৃত হয়েছে। কংগ্রেসের কর্মসূচীর মধ্যে যেহেতু কোন বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাভাবনার ছাপ ছিল না সেহেতু ভূপেন্দ্রনাথের কাছে বিকল্প কর্মসূচীগুলি অনেক বেশী গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হোল। এবং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতায় তিনি সন্ত্রাসবাদকে শ্রেয়তর পথ হিসেবে মনে করেছিলেন। তিনি কিছু সময় 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এই সময় তিনি 'ভষ ভাসা' ও 'লাঠৌষধি' নামে দুটি প্রবন্ধও বার করেন। আর তার ফলে তিনি কারারুদ্ধ হন। ১৯০৭ সালের ৬ই জুলাই তাঁকে বন্দী করা হয়। বিচারচলাকালীন তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে যে জবানবন্দী পেশ করেছিলেন তা যে কোন সৎ দেশপ্রেমিকের পক্ষে ঈর্ষার বস্তু।

বিবৃতিটির মধ্যে ভূপেন্দ্রনাথের চরিত্রের কঠোর বিপ্লবী মনের চেহারা আমাদের কাছে অসাধারণ হয়ে ওঠে। ভূপেন্দ্রনাথের চরিত্রের এই মহান দিকটিকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। নিবেদিতা ভূপেন্দ্রনাথকে অন্তরীণ হবার আগে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। এককথায় ভূপেন্দ্রনাথ তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে কোন পার্থক্যকে আমল দিতেন না। তাই তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন আবার মূল্যায়ন করতে সচেষ্ট হোল ভারতবর্ষের শ্রেণীবিভক্ত সমাজের। ফলে দেখা গেলো যে তিনি সন্ত্রাসবাদের বিকল্প হিসেবে মার্কসবাদী জীবনাদর্শকে স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম তত্ত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পর দেখা গেলো যে ভূপেন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনায়, রাজনৈতিক দর্শনে ও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে মার্কসবাদী ভাবধারা বেশ গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। কেননা ইতিমধ্যে ১৯২১ সালে ভূপেন্দ্রনাথ তৃতীয় আন্তর্জাতিকের আহ্বানে মস্কোতে যান ও সেখানে লেনিনের সাথে পরিচিত হন। বলা নিষ্প্রয়োজন যে এই সাক্ষাৎকার ভূপেন্দ্রনাথের জীবনে এক গভীর আদর্শগত স্বন্দ্বের সূত্রপাত করে এবং তিনি ক্রমশঃ মার্কসবাদী আদর্শের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে পড়েন।

ফলে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পরিবর্তে সমষ্টিগত আন্দোলনকে সমর্থন জানালেন ভূপেন্দ্রনাথ। পরবর্তীকালে আমরা লক্ষ্য করি যে ভূপেন্দ্রনাথ শ্রমিক, কৃষক ও যুবসমাজের স্বার্থরক্ষার প্রশ্নে এক অন্যতম সহযোদ্ধা হয়ে পড়েন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সে জন্য তাঁকে ক্ষমা করে নি। বারংবার তাঁকে রাজরোষের শিকার হতে হয়েছে। আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি দুবার কারারুদ্ধও হয়েছিলেন। কিন্তু তাতে ভূপেন্দ্রনাথের সংগ্রামী মন এতটুকু দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেয় নি। শত অত্যাচারের মধ্যেও ভূপেন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ বা ইনডিভিজুয়াল টেরোরিজমকে কখনোই রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চান নি। যেমন মানবেন্দ্রনাথ রায়, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ মার্কসবাদী বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে ভূপেন্দ্রনাথ মার্কসবাদী দর্শনের প্রতি আস্থা স্থাপন করেছিলেন, ঠিক তেমনি নীতিগত কারণে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠার অবকাশ না রেখে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সমালোচনা করতেও তিনি পিছিয়ে যান নি। লেনিন একবার ভূপেন্দ্রনাথকে ভারতবর্ষের কৃষক-সমিতিগুলি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে বলেছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ সেই অনুরোধ উপেক্ষা করেননি। বাংলার গ্রামে গ্রামে গিয়ে তিনি বাংলার কৃষকদের জীবন ও জীবিকার এক দলিলচিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর ডায়ালেকটিকস অফ ল্যান্ড ইকোনমিকস ইন ইন্ডিয়া

বঙ্গশ্রী
হাওড়া
৪১/১, জি, টি, রোড, হাওড়া
• বেনারসী
• জেড • সিল্ক
• তাঁত • মিল
• গোষাক
• সার্টিং • সুটিং
ও ছিট কাপড়

উৎসবে • উপহারে • নিত্য প্রয়োজনে
বেনারসী • সিল্ক • তাঁত • মিল • ফ্যান্সী শাড়ী
সুটিং • শার্টিং ও পোষাক
শ্রীরাম টেকসটাইল এম্পোরিয়াম
২৭/২, জি. টি. রোড (সেউথ) হাওড়া-১

নায়ক গ্রন্থে। শুধু তাই নয়, সমাধানের প্রশ্নে ভূপেন্দ্রনাথ সুস্পষ্টভাবে সমাজ-তান্ত্রিক সমাজ গঠনের কথা বলেছেন। ভূপেন্দ্রনাথের বিপ্লবী চিন্তায় কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষ এক বিরাট অংশ অধিকার করে ছিলো। তাই শুধুমাত্র সংস্কারবাদী আন্দোলনের মধ্যে ভারতবর্ষের মুক্তির কথা ভূপেন্দ্রনাথ চিন্তা করতে পারেন নি। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবকে যেমন বিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের মিলিত শক্তির প্রয়োজনে সৃষ্ট বলে মনে হয়েছে, অনুরূপভাবে ভূপেন্দ্রনাথ আধুনিক বাম-পন্থী সঙ্কীর্ণতার শিকার না হয়ে বলেছেন : 'শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী এনে দিল এক নতুন অধ্যায়—জাতীয়তাবাদের অধ্যায়। সংস্কার ও প্রতিসংস্কার আন্দোলনের উত্তেজনার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে রূপগ্রহণ করলো জাতীয়তাবাদ।' তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলতে ভোলেন নি যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভারতবর্ষে মূলত সাম্রাজ্য-বাদের সহযোগিতায় পরিপুষ্ট হয়েছিলো।

ভারতবর্ষ তথা এশিয়ার মুক্তির প্রশ্নে ভূপেন্দ্রনাথ ভূমি-সংস্কারকে মূল সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা বলে মনে করেছেন। অন্যান্য সব দেশের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে এক নবজাগ্রত গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র ক্রমশঃ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী চিন্তভাবনগুলিকে বিপন্ন করে তুলছে। এই মৌলসত্যটিও ভূপেন্দ্রনাথ তাঁর চিন্তাভাবনায়, আলো-চনায় সদাসর্বদা প্রকাশ করে তুলেছেন। এশিয়ার কৃষক শ্রেণী সম্পর্কে ভূপেন্দ্রনাথ বলছেন :

এই জাতীয় ধ্যানধারণা যে জীবনের প্রান্তিক সীমায় এসে তিনি করেছিলেন তা নয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়েছিলো নাগপুরে, সেই অধিবেশনে ভূপেন্দ্রনাথ কংগ্রেসকে সুস্পষ্টভাবে আহ্বান জানিয়েছিলেন শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর সমস্যাবলীকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করার জন্য। সালটা ছিল ১৯২১। এবং শুধু তাই নয়। ১৯২৬ সালের পর থেকে ভূপেন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের সংগঠনের মধ্যে থেকে তিনি শ্রমিক শ্রেণী ও সে সূত্রে সর্বশ্রেণীর শ্রমজীবি মানুষদের স্বার্থরক্ষা করার জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করেছেন। কেননা ভূপেন্দ্রনাথের কাছে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন আসলে সর্বশ্রেণীর শ্রমজীবী মানুষের স্বাধিকার অর্জনের এক অনলস প্রয়াসমাত্র। ভূপেন্দ্রনাথের জীবন ও দর্শন কখনোই আপোষের সর্ত মেনে সমাজের অন্যায়গুলির কাছে মাথা নত করে নি। ভূপেন্দ্রনাথের কাছে দ্বন্দ্বই জীবন। কেননা অসম ও খণ্ডিত সমাজে দ্বন্দ্ব অনিবার্য। এই কারণে অন্যান্য ভারতবর্ষে সামন্ত-তান্ত্রিক মূল্যবোধের আধিপত্য ও দেশের পুঁজিবাদ ভূপেন্দ্রনাথের কাছে তীব্র ঘৃণার পাত্র ছিল। সামাজিক অগ্রগতির পথে উভয়েই বস্তুতঃ সমভাবে ঘৃণ্য ও সেহেতু বর্জনীয়। রুশ বিপ্লবের গৌরবোজ্জ্বল ইতি-হাস ও অন্যান্য দেশের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের অভিজ্ঞতাগুলি ভূপেন্দ্রনাথের জীবনবোধের প্রকাশগুলিকে এমন এক স্বাতন্ত্র্যবোধ এনে দিয়েছিলো যে তাঁর পক্ষে পরাধীনতা ও সামাজিক জীবনে শ্রেণিভেদ-প্রথাকে সামাজিক সত্য হিসেবে মেনে নেওয়া সম্ভবপর ছিল না। ভগিনী নিবেদিতা বোধ হয় ভূপেন্দ্রনাথের সঠিক মূল্যায়নই করে-ছিলেন। একবার ১৯১১ সালে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে ভূপেনবাবুর দেখা হয়। সেখানে আলোচনার মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে নিবে-দিতা ভূপেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন : ভূপেন্দ্র আই কনসিডার ইউ কনসিকেটেড্, ডোন্ট ম্যারি। নিবেদিতা ভূপেন্দ্রনাথকে বিবাহ করতে নিষেধ করেছিলেন। নিবেদিতা বুঝেছিলেন যে এক চিরবিদ্রোহী সত্তা ভূপেন্দ্রনাথের মনের গভীরে আত্মগোপন করে আছে। তার সম্যক প্রকাশের প্রয়োজন। সুতরাং ভূপেন্দ্র-নাথের জীবনকে পারিবারিক জীবনের গতানুগতিকতার মধ্যে নিবেদিতা আবদ্ধ রাখতে চান নি। তাই ভূপেন্দ্রনাথের জীবনে কোনরকম পারিবারিক জীবনের মধ্য দিয়ে সংগ্রামী হয়ে ওঠা বাস্তবসম্মত পরিণতি ছিল না। বোধহয় এটাও ইতিহাসের লিখন যে ভুবনেশ্বরীর তিন সন্তানই ছিলেন অকৃতদার।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত আসলে সেই সমস্ত খাঁটি মানুষদের মধ্যে একজন যিনি স্বাধী-নতোত্তর ভারতবর্ষে নিজেকে প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করেন নি। পড়াশুনো করেছেন নির্জনে, নিভৃতে। মদনমোহন পাঠাগারে ছিল নিত্য আনাগোনা। আর ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে আলোচনা করেছেন ভারত-বর্ষকে নিয়ে, ভারতবর্ষের ভবিষ্যত নিয়ে। কাদের সঙ্গে? নবীনদের সঙ্গে। বিখ্যাত আন্তর্জাতিক বিপ্লবী মহিলা আগ্নেস স্মেডলী সম্পর্কে ভূপেন্দ্রনাথ বলেছিলেন : তিনি ধর্ম বা অলৌকিক গল্প দ্বারা ভারতের প্রতি আকৃষ্ট হন নাই। তিনি বস্তুতান্ত্রিক ভারতের জনগণের দুঃখ দারিদ্র্য মোচনের জন্য ভারতের স্বাধীনতা যে একমাত্র উপায়, তা স্থির জানিয়া ভারতীয় বিপ্লবান্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন।' অর্থাৎ কোনও অলৌকিক শক্তি নয়, ভারতবর্ষের মুক্তি আনবে ভারতবর্ষের সর্বশ্রেণীর সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ। এই বিশ্বাস ও মানসিক দৃঢ়তা নিয়ে বেঁচেছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ। ১৯৬১ সালের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে ৮২ বছর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন। পরিণত বয়সেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিলো। কিন্তু যে চারিত্রিক গুণাবলী তাঁকে মহনীয় করে তুলেছে সেই মূল্যবোধগুলি আজকের দিনে প্রায় বিধ্বস্ত। কেননা এই মহান জীবন ছিল ত্যাগের, বেদনার ও প্রতিরোধের অসামান্য দলিল। আজকের নগরসর্বস্ব, পলায়নবাদী ও প্রচারসর্বস্ব জীবনবোধের মধ্যে ভূপেন্দ্র-নাথকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কলেজ পাঠ্য পুস্তক

দর্শন (Philosophy)

অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত প্রণীত

ভারতীয় দর্শন—(১ম) ৯ম সং ১২-০০
ভারতীয় দর্শন—(২য়) ৩য় সং ৭-০০
ভারতীয় দর্শন—৩য় খণ্ড (বেদ ও উপনিষদ) ৭-০০
পাশ্চাত্ত্য দর্শন—১১শ সংস্করণ ১২-০০
নীতিবিজ্ঞান—১০ম সংস্করণ ১২-০০
সমাজদর্শন—১০ম সংস্করণ ১২-০০
মনোবিদ্যা—৮ম সংস্করণ ২২-০০
পাশ্চাত্ত্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—(আধুনিক যুগ) ৩য় সংস্করণ ১২-০০
পাশ্চাত্ত্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—কান্ট ১৬-০০
ধর্মদর্শন (Phil. of Religion) ২২-০০
সমাজ মনোবিজ্ঞান—২য় সংস্করণ ১০-০০
অধিবিদ্যার কয়েকটি সমস্যা—(For B.U) ৩য় সংস্করণ ৬-০০

শিক্ষা (Education)

অধ্যাপক সেনগুপ্ত ও রায় প্রণীত

শিক্ষাতত্ত্ব—৩য় সংস্করণ ১৪-০০
ভারতের শিক্ষা সমস্যা—(পরিমার্জিত) ৪র্থ সংস্করণ ১৬-০০
শিক্ষা মনোবিজ্ঞান—৪র্থ সংস্করণ ২২-০০

বাংলা সাহিত্য

ডঃ সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত প্রণীত

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সমালোচনার ধারা—দ্বিতীয় সংস্করণ ১০-০০

ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী প্রণীত

কুলীন কুলসর্বস্ব— ১০-০০

শিক্ষক-শিক্ষণ (B Ed and Basic)

অধ্যাপক গোবিন্দাস হালদার প্রণীত

শিক্ষণ প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ—(পরিবর্তিত) ২য় সংস্করণ ১৬-০০
শিক্ষণ প্রসঙ্গে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান ১৪-০০
শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষার ইতিহাস—১৬-০০
ভারতের শিক্ষা সমস্যা—(প্রাচীন ও মধ্যযুগ) ৪-০০

অধ্যাপক সেনগুপ্ত, রায় ও ঘোষ প্রণীত

শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান—৩য় সংস্করণ ২৫-০০
শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষাতত্ত্ব— ১৬-০০

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য

অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত প্রণীত

Higher Secondary Philosophy (English edition)

উচ্চ-মাধ্যমিক দর্শন (সংশোধিত ও পরিবর্তিত)—৪র্থ সংস্করণ ১৫-০০

অধ্যাপক সেনগুপ্ত ও গীতা সেন প্রণীত

উচ্চ মাধ্যমিক মনোবিজ্ঞান— ২২-০০

অধ্যাপক সেনগুপ্ত ঘোষ ও হালদার প্রণীত

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা— ২২-০০

অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় ও সেনগুপ্ত প্রণীত

উচ্চ মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা— ১৮-০০

BP

ব্যানার্জী পাবলিশার্স
৫/১এ কলেজ রো,
পিন-৭০০০০৯
ফোন : ৩৪-৭২৩৪

হাবিব

প্রদীপ চৌধুরী

মানস ভট্টাচার্য

গৌতম সরকার

গৌতম সরকার কেন

গৌতম সরকার আমাদের ফুটবলের সেরা লিংকম্যান। আগামী ডিসেম্বরের ব্যাংককে এশিয়ান গেমস। সেখানে তিনি ভারতের হয়ে খেলছেন না। নির্বাচকরা ওঁকে কেন বাদ দিলেন জানি না। নির্বাচকদের কেউ ব্যক্তিগত কারণে ওঁর বিরুদ্ধে এই রাজ্যের প্রতিশোধ নিয়ে থাকলে ভারতের ফুটবলের ভাগ্য অন্ধকার। সব ই মানবেন গৌতমেরই সর্বাগ্রে নির্বাচিত হওয়া উচিত ছিল।

১৯৬৮ সাল থেকে গৌতমের সঙ্গে আমি খেলে আসছি। প্রতি বছরই ওর খেলায় উন্নতি লক্ষ্য করছি। আমি ১৭ বছর বয়স থেকে ফার্স্ট ডিভিসন ফুটবল খেলে আছি। বহু মধুর ও তিক্ত অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। এবার কিন্তু তিক্ততার কথা না বলে আর থাকা যাচ্ছে না। সেবা সেবা ফুটবলারকে বাদ দিয়ে আমাদের ফুটবলের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলার এমন ঘটনা অন্য কোথাও শুনা যায় না। যুক্তি দলে হাবিব নেই, অর্থাৎ তার এশিয়ান গেমস যাওয়া হচ্ছে না। যাওয়া হচ্ছে না মানসের—প্রদীপেরও। এটা অন্যায়। এঁরা না গেলে কারা যাবে?

নির্বাচকরা আসল ক্ষমতার অধিকারী নন। কোচ জানেন না আসল কারা নির্বাচিত হবেন। ম্যানেজারও জানেন না। যেখানে ইরাক, ইরান ওরা চার বছর ধরে খেলোয়াড় তৈরী করছে, সেখানে কোচ আমাদের খেলোয়াড়দের হাতে পাবেন বড়জোর দেড় মাস। তারপর ছোরে ফিরে এসে তিনি যেসব অভিযোগ তুলবেন তা এখনই তোলা যায়। কোচ অবশ্য এখনই এসব কথা বলতে পারেন।

১৯৭৫-এর সন্তোষ ট্রফি থেকে প্রাক্-অলিম্পিকের খেলোয়াড় নির্বাচনের সময় যেমন বাদ দেওয়া হয়েছিল—সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত খেয়ালে—তেমনি এবার গৌতম বাদ গেল। তবে সেবারে দর্শকদের চাপে পড়ে আমরা টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি নিতে নির্বাচকরা বাধ্য হন। গৌতমের সান্ত্বনা সারা দেশের ফুটবল প্রেমিকরা গৌতমকে দু-হাত তুলে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। কিন্তু একজন খেলোয়াড়ের পক্ষে এই কি যথেষ্ট?

হাবিব ফার্স্ট ক্লাস ফুটবল খেলছেন তেরো বছর। অথচ সে বাংলা দল থেকে বাদ। 'গতবার যারা আমায় বাদ দিয়েছিল তারাই এবার আমায় মাথায় নিয়ে নাচছে।' ১৩ বছর ধরে হাবিব খেলছে—এই তার অপরাধ! শ্যামকে তো নেওয়া হয়েছে। এবার নির্বাচকদের নির্বাচন করছেন না আমিন, বিপ্লব রহমান, খলিল ইত্যাদি। মান ফুটবল ফেডারেশনের একাই ক নিয়েও তেমন খেলোয়াড় এঁরা ছিলেন না।

একবার মস্কোতে খেলতে নবুজ বললেন এশিয়ান ব্যাং টিকিট পেয়েছি মোট নয়জন। সবার

দি গেলেন ?

সুভাষ ভৌমিক

হবে না। শুধু বড়দা যাবে, আমি বলেছিলাম —আপনিই তো বলেছেন, ফুটবল মানে একটা পরিশ্রম। তাহলে এভাবে আমি শুধু ম'লনকে বালে দেখতে যেব না।। ওদের সেদিন বালে দেব হল না। এই আমার ওপর নুরুলে সেদিন প্রথম রাগলেন।

আর একটি ঘটনা—পাশে চোট নিয়ে এবার ইণ্ডিয়ান বিমানে ইকনমী ক্লাসে ফিরছি। পাশে ভীষণ ব্যথা, কুড়ি মিনিট পেছনের ছেভেল দাঁড়িয়ে আছি সিট পাইনি। এয়ার হোস্টেস এসে আমায় ফার্স্ট ক্লাসে যেতে অনুরোধ করে দিতে চাইলেন। নুরুলে বললেন আমি ফার্স্ট ক্লাসে যাব। তুমি আমার জায়গায় বসো। আমি বললাম—তা হয় না। এতক্ষণ তো, আপনি জায়গা ছেড়ে দেননি আমাকে।

ফার্স্ট ক্লাসে যাওয়া সাওকটা অনেক ডাম। সেই থেকে আমার ওপর মোক্ষম রাগের শুরু। পরিণাম,—আমি হয়ে গেলাম নাম কাটা সেপাই।

এমন আকচার ঘটছে। কর্তাদের খেয়াল খুশিতে ভারতের ফুটবল গোল্লায় যাচ্ছে। নির্বাচকরা পুরনো খেলোয়ার। কোন ব্যক্তিত্ব নেই, শুধু বলবার মর্যাদাসম্পন্ন। তিনি চাপিয়ে দেওয়া নির্বাচন মেনে নেননি। চিঠিতে খেলোয়াড়দের নাম পাঠিয়ে বলা হয়, এদের নাম অনুমোদন করুন। ১৯৭০-এ এশিয়ান গেমস থেকে বেরিয়ে এসেছিল। সেবার কুড়িজনকে নিয়ে দশ সপ্তাহ ট্রেনিং দেন পি কে ব্যানার্জি এবং বাসা। সেবার প্রস্তুতি খানিকটা ভাল ছিল। সেবার কুড়িজনই জানতেন তাঁরা খেলতে যাবেন। এবার চল্লিশ থেকে কুড়িজনকে বাদ দিতেই সময় চলে যাবে। এতো পাগলামি।

ইন্দ্রাণী সিংকে ডাকা হয়েছে। তিনি খেলার মান নেই বলে খেলতে চাননি। ইন্দ্রাণীকে জানলে হাবিবকে ডাকা হবে না কেন ? কিন্তু ওঁরা ডাকতে পারেন না। কারণ আই এফ এ চটবে।' ব্যাংকক ও তেহরানে এশিয়ান গেমসে খেলেছে। আমি এটা বুঝি যে এম দরকার অন্তত ভারতের খেলার স্বার্থটা দেখতেন। তাদের দরুণ খানিকটা সুফল পাওয়া গিয়েছে। এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না।

মানসের ট্রায়াল নেওয়া উচিত ছিল। অকবরকে নেওয়ার আগে হাবিবকে নেওয়া উচিত ছিল। আমি টিম গড়লে গৌতম, প্রদীপ, হাবিব, মানসকে নিতামই। নাগমণ্ডলে মানসের খেলা খুব ভাল। তাকে বাদ দেওয়া অন্যায়। প্রদীপের লডাকু গুণ ও গতি—দুই-ই আছে। ব্যক্তিগত রাগের জায় মেটাতে গিয়ে ভারতীয় ফুটবলকে গোল্লায় পাঠানো আর কতদিন চলবে ?

(গৌতম সরকারকে পরে অবশ্য শিক্ষানবিশে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু পায়ে চোট থাকায় জন্যে তিনি যাচ্ছেন না।)

আরো জীবনানন্দ

কল্যাণকুমার বসু

দীর্ঘ ন'বছর পরে জীবনানন্দর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ধূসর পাণ্ডুলিপি প্রকাশ হচ্ছে। জীবনানন্দ বড় ব্যস্ত। পুরোনো পত্র-পত্রিকার পাণ্ডুলিপি থেকে কবিতার নির্বাচন করলেন। কবিতা-বইয়ের নাম দিলেন ধূসর পাণ্ডুলিপি। কবিতাগুলির রচনাও অনেক কালের হল। পাণ্ডুলিপি আজ তাদের ধূসরবর্ণ। মনও, কি জানি—হয়তো আজকের কবিতা সেদিনের কবিতার পথ অতিক্রম করে এসেছে। যে পত্রিকায় কবিতাগুলি প্রকাশ হয়েছে, তারাও কোন অতীতের—কল্লোল, ধূপছায়া প্রগতি। প্রগতিতে বুদ্ধদেব কবি জীবনানন্দ এবং তাঁর কবিতাকে ভালোবেসে তাঁর বিরুদ্ধে কোন কথা ও কোন সমালোচনাকে বরদাস্ত করেননি। শনিবারের চিঠির সজনীকান্তর বিরুদ্ধেও লেখনী চালিয়েছিলেন। সজনীকান্ত কিভাবে কলম চালনা করছিলেন একটু লেখা যাক।—

'শনিবারের চিঠির সম্পাদক সজনীকান্ত দাশ বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, গোকুল নাগ এবং আরও অনেককে এবং জীবনানন্দ দাশকেও অনেক ব্যঙ্গ সমালোচনা করেছেন। প্রথম দিকে জীবনানন্দর প্রতি সমালোচনা অন্যান্যদের তুলনায় কম ছিল। সজনীকান্ত শনিবারের চিঠিতে জীবনানন্দকে জিহ্বানন্দ জীবনানন্দ (জীবানন্দ নয়) এই বলে ব্যঙ্গ করতেন। জিহ্বানন্দ বলার কারণ কবি জীবনানন্দর নাকি একটি মুদ্রাদোষ ছিল কলেজে পড়বার সময়ে, বারবার জিহ্বায় ঠোঁট বুলিয়ে নিতেন। ছাত্ররা জিহ্বানন্দ নামকরণ করে। শনিবারের চিঠির সম্পাদক নামটি গ্রহণ করেন। জীবনানন্দ (জীবানন্দ নয়) বলার কারণ, শনিবারের চিঠিতে কোন একটি সমালোচায় জীবনানন্দ জীবানন্দ পরিণত হওয়াতে প্রগতিতে বুদ্ধদেব বসু শুধরে দেওয়াতে সজনীকান্ত ওই শব্দটিও গ্রহণ করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে জীবনানন্দ (জিহ্বানন্দ নয়) এ-কথাও লিখে ব্যঙ্গ করেছেন।।।

আশ্বিন সংখ্যা কবিতা পত্রিকায় (বুদ্ধদেব ব[illegible]দিত ১৩৪৪) ও হৈমন্তিক নামে জীবনানন্দের একটি ক[illegible]শ হয়। পরে জীবনানন্দ যখন তাঁর সপ্তর্ষি তারার তি[illegible] বইখানি প্রকাশ করেন, তখন কবিতার নাম প[illegible] রাখেন আকাশলীনা, হৈমন্তিকা হয় সুরঞ্জনা। কবি[illegible]কায় ও হৈমন্তিকা প্রকাশ হলে ১৩৪৪ অগ্রহায়ণ মাসে [illegible]বের চিঠিতে সজনী দাশ লিখলেন ও কবি জীবনানন্দ [illegible] আর ঠেকাইয়া রাখা গেল না। রসের যে তুরীয়লোকে তিনি [illegible]ওরোত্তর উত্তীর্ণ হইতেছেন, বুদ্ধদেব বসু অথবা সমর সেনের প্রশংসা সেখানে আর পৌঁছিবে না। জলসিঁড়ি নদীর ধরে যেখানে ধান-সিঁড়ি ক্ষেত, তাহারই পাশে জাম-হিজলের বনে তাঁহার মন এত-কাল পড়িয়াছিল। নাটোরের বনলতা সেন সেখান হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া ফাঁচাগোল্লা খাওয়াইয়া অনেকটা দুরস্ত করিয়া আনিয়াছিল। কিন্তু জাল ছিঁড়িয়া তিনি আবার ভাসিয়াছেন—চিতাবাঘিনীর ঘ্রাণে ব্যাকুল ঘাই-হরিণের মত। আর তাহাকে ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না। হৈমন্তিকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

আকাশের আড়ালে আকাশ
মৃত্তিকার মত তুমি আজ:
তার প্রেম ঘাস হয়ে আসে।
হে হৈমন্তিকী,
তোমার হৃদয় আজ ঘাস।

প্রেয়সীকে এতকাল আমরা হৃদয়ে লইতাম, ভালোবাসিতাম। এবার প্রেয়সীর হৃদয়ে চরিবার দিন আসিল। একসঙ্গে দেহের আহার ও মনের ঔষধ এ-সম্ভবনার কথা কে কল্পনা করিতে পারিয়াছিল?

কি হৃদয় কি অকারণে ঘাস হইয়াছে?
একদিন নীল ডিম করেছ বুনন;
আজো তারা শিশিরে নীরব।

প্রেয়সী নীল ডিম বুনিয়াছেন, ঘাসের মাঝখানে শিশিরে পড়িয়া তারা নীরব আছে। কবি প্রতীক্ষা করিতেছেন—

পাখির ঝর্ণা হয়ে কবে
আমারে করিবে অনুভব।

কবিতা পত্রিকার সুদিন আসিতেছে মনে হইতেছে। (সংবাদ সাহিত্য, শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪)

চতুরঙ্গ পত্রিকায় জীবনানন্দের 'ফুটপাত' কবিতা প্রকাশিত হলে সজনীকান্ত তাঁর শনিবারের চিঠিতে লিখেছিলেন

কবি জীবনানন্দ (জীবানন্দ নহে) চতুরঙ্গ (চৌরঙ্গীর?) ফুটপাতে বসিয়া পড়িয়াছেন—

অনেক রাত হয়েছে—অনেক গভীর রাত হয়েছে:
কলকাতার ফুটপাত থেকে ফুটপাতে—
ফুটপাত থেকে ফুটপাতে
কয়েকটি আদিম সর্পিণী সহদরার মতো
এই ট্রামের লাইন ছড়িয়ে আছে
পায়ের তলে, সমস্ত শরীরের রক্তে
এদের বিষাক্ত বিস্বাদ স্পর্শ
অনুভব করে হাঁটছি আমি।

কলকাতার ফুটপাতে আমরাও চুলাফের: করি এবং অনেক গভীর রাতে যে না কবি হজপ কবিয়া তা বলিতে পারিব না। কিন্তু ফুটপাতে সর্পিণী সহদরার মতো বিষাক্ত ট্রামের লাইন দেখা কখোনো ভাগ্যে ঘটে নাই। আমাদের বরাবরই সন্দেহ ছিল, হোটেলগুলি পয়সা দাম লইয়া আমাদের ঠকায়। এইবারে তাহা প্রমাণ হইয়া গেল। জীবনানন্দবাবুর (জীবানন্দ নহে) বরাত

ভালো খাঁটি জায়গার সন্ধান তিনি পাইয়াছেন। লক্ষণ সব ঠিক ঠিক মিলিয়া যাইতেছে কবির। নির্জলা সত্যি বলিতেছেন—

পায়ের তলে লিকলিকে ট্রামের লাইন, মাথার ওপরে
অসংখ্য জটিল তারের জাল
শাসন করছে আমাকে।....
সবুজ ঘাসের ভেতর অসংখ্য দেয়ালি পোকা মরে রয়েছে
দেখতে পাবে না তুমি এখানে

শেষ পরিণতিতে আমরা সরিষাফুল দেখিয়া থাকি। দেয়ালি পোকা সম্পূর্ণ অভিনব। জীবনানন্দের (জীবনন্দ নহে) অরিজিনালিটি অবে অস্বীকার করা চলবে না। (সংবাদ সাহিত্য শনিবারের চিঠি কার্তিক ১৩৪৫)

ধবল কুষ্ঠ জানিতাম। কিন্তু কবি জীবনানন্দ দাশ (জিহ্বানন্দ নহে) সম্প্রতি ধবল শব্দ শুনিতেছেন। কবিরাজ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি শাস্ত্র ঘাটিয়া বিশেষ সংকোচের সহিত বলিলেন, ফেবজ রোগপর্যায়ে এ একটি কঠিন ব্যাধি। বক্ত গোধিকার লালের সহিত 'কৃষ্ণ কর্দমর্দনে'র নিয়মিত প্রয়োগ ব্যতিরেকে এই ব্যাধি সারিবার নহে। ব্যাধি নিশ্চয়ই না হলে এরূপ প্রলাপ কেন?

মোদের প্রদীপ বড় ধীরে জ্বলে—
ধীরে জ্বলে—ধীরে জ্বলে—আমার টেবিলে
মণীষার বইগুলো আরো স্থির—শান্ত আরাধনাশীল;
পৃথিবীতে চরি সমস্বরে—রক্তগোধিকার মত লাল;
দণ্ডী সত্যাগ্রহে আমি বিকশিত জীবনের করুণ আভাস

অনুভব কবি, কোন প্ল্যাসিয়ার—
হিমস্তব্ধ কর্মোবেণ্ট—পাল
বুঝিবে আমার কথা, জীবনের বিদ্যুত কম্পাস অবসানে
তুষার ধূসর ঘুম ঘিরে,
তারা মেরু সমুদ্রের মত অনন্ত ব্যসনে।

অইপো ন্যাপলা পাশে দাঁড়াইয়া কবিতাটি শুনিতেছিল, হঠাৎ 'হয়েছে' 'হয়েছে' বলিয়া লাফাইয়া উঠিল। বিরক্ত হইয়া শুধাম কবিলাম কি হয়েছে? —আমার বিরক্তিপ্ত ন্যাপলা টের পাইয়াছিল মাথা চুলকাইয়া বলিল—ধূসর।

তাহার হাতে শব্দ প্রতিযোগিতার একটা কাগজ। বুঝলাম 'ধূসরে' আটকাইয়াছিল। (সংবাদ সাহিত্য, শনিবারের চিঠি মাঘ ১৩৪৫)

পরিচয় পত্রিকার 'গোধূলি সন্ধ্যার নৃত্য' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। শনিবারের চিঠিতে 'সংবাদ সাহিত্যে' সজনীকান্ত লিখেছেন:—

'গোধূলি সন্ধ্যার নৃত্য' দেখিয়াছেন? চৈত্রের পরিচয়ে দেখিতে পাইবেন। নাটবের বনলতা সেনকে বিস্মৃত হইয়া কবি জীবনানন্দের (জিহ্বানন্দ নহে) এই টানানটোনা নাচ। হায়রে যদি নাচ না হইয়া সোয়ান সঙ হইত।

পিপুলে গাছে বসে পেঁচা শুধু একা
পায়ের ভঙ্গির নীচে হড়্কেডের তৃণ।
সেইখানে যূথচারী কয়েকটা লাবী
তুলোর বালিশে মাথা রেখে আর মানবীয় ঘুমে
স্বাদ নেই—

গোপালদা এবার আর্তকণ্ঠ। বলিলেন ঘাম। তিনি ই, বি, আর, ও, বি, এন, আর-এর টাইম টেবিল ঘাঁটিতে লাগলেন। বরিশাল হইতে রাঁচি। খানিক পরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—দেখছি দুর্ভোগ বড় কম হবে না।

(সংবাদ সাহিত্য, শনিবারের চিঠি চৈত্র ১৩৪৫)

১৯৩৮ সালে সমরানন্দর * জন্ম বরিশাল। এক মেয়ে, এক ছেলে। মঞ্জুর এখন বয়স সাত বছর। লাবণ্য তুমি কি আরও পড়াশোনা করতে চাও নাকি? পড়তে পার আপত্তি কি, পড়াশোনায় আপত্তি আমার কোনদিনই নেই। চাকরীর ইচ্ছে! এসব ইচ্ছে মনের মধ্যে আছে নাকি....ওসব ভাবনা চিন্তা মনেও এনো না আমি তো আছি। তুমি আছো এখন বরিশালের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে। বরিশাল বড় মিষ্টি নাম নয় লাবণ্য। আমার যে জন্মভূমি। তাই এত টান....আমাদের বিয়ে ক' বছর হলো বলতো আট বছর....আট ন' বছর কোনদিক দিয়ে পার হয়ে গেল সুখে-দুখে! তুমি সুখী তো। তোমাকে সুখী করতে পেরেছি তো! বল লাবণ্য। তুমি যদি সুখী বোধ কর আমি আনন্দবোধ করব। আনন্দ সকলেই চায় কিন্তু আনন্দ পাওয়া দিতে পারা বড় মুস্কিল। আনন্দ পাই কোথায়? ....আনন্দ বা সুখ এ' পৃথিবীতে কোথায়! সকলেই আনন্দ-সুখের পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছি! শান্তি পাব বলে ছুটছি, কি মুস্কিল, সেই কবে থেকে সুখের পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছি শান্তির জন্যে ছুটছি, ছুটছি আর ছুটছি কিন্তু শান্তি কোথায় পাচ্ছি না। শান্তি জিনিষটা কেমন যেন—কোথাও কিছুর অভাব নেই, তবু শান্তি নেই। সব পাওয়াটাই অশান্তি—চাকরী করছি টিউশানি করছি টাকার অভাব সে তো দূর হয়েছে তারপর তুমি আছো লাবণ্য, সংসার আমার ভরা তবু মনে হয় যেন আমার কিছুই নেই—কিছু নেই। সব শূন্য আমার অভাব অপর্যাপ্ত। অভাব কি আমার স্বভাব হয়ে দাঁড়াচ্ছে! একি ভয়ের কথা! সারা পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধ লেগে গেল প্রায়। দেখছ শরীরের সঙ্গে মনের যুদ্ধ....কোথাও আপস নেই।

চারদিকে বড় নৈরাশ্য। কোথাও আশার আলো দেখতে কি তুমি পাও। কোথাও এক টুকরো আশা আছে এ পৃথিবীতে, যা আমি কিছু দাম দিয়ে কিনতে পার। কোথাও দেখতে পাই না। সকলেই নৈরাশ্যের কালো অন্ধকারে ডুবে রয়েছে—চারদিকে বড় নৈরাশ্য, চারদিকে বড় হতাশার ছবি আঁকা কালো আর ছাই—অন্ধকারের যুগ কি এখনও শেষ হয়নি। আলো এসে ছবির ফ্রেমে সেই কবে দেখা দিয়েছিল—কোথায় আলো?...বড় আদিম সব ছবি—গাঁয়ের ছবির মত। বড় বিভৎস সব ছবি বদলে গেছে রূপ কাঁচের ফাটা গ্লাসে। ফুল ফল পাতা দুদিনে শুকিয়ে যায়, মনে হেজে যায় শীতের অন্ধকারে, অথচ এত সুন্দর তারা, এত অদ্ভুত তারা, নিটোল তারা। বড় কৃত্তিমতা। সবল গ্রামের মনকে আজ কোথাও দেখিনি। কিছুই ভালো লাগে না আজকাল। কিছুই ভাবতে পারি না কোন স্বপ্নই দেখি না। লাবণ্য আমি জানি এসব কথা তুমি কোনদিনও শুনবে না বুঝবে না, তোমাকে বলতে পারবো না বলবো না....

তবু খোকন এলো। টলতে টলতে চলে, হাসে। খুকু দুহাতে গলা জড়িয়ে ধরে আদর করে ডাকে—বড় আদরের ডাক। লেখার টেবিলের ধারে দাঁড়ায়। —বাবার কোলে উঠে বসার জন্যে বায়না। বাবার কলম বাবার লেখার কাগজ সে সব যে তার। তার চাই-ই। খোকন হাঁটি হাঁটি পা পা করে হাঁটে, হাসে। মায়া।

সেই একপথে সকলে এগিয়ে চলেছে জন্ম ষোলকলার বৃদ্ধি, ক্ষয় এবং মৃত্যু। মৃত্যুই কি সব শেষ কথা।

মিলু দেখছ তোমার ছেলে, তোমার মেয়ে, তোমার স্ত্রী—তোমার পরিবার পরিজন তোমার ঘর দুয়ার—সব তোমার ..তোমার.. !

বসিকপ্রবর চন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বাড়িতে যখন আসেন

---

* সমরানন্দ—জীবনানন্দর পুত্র। এখানে বরিশালের ব্রহ্মবাদী পত্রিকায় একটি সংবাদ আছে (ব্রহ্মবাদী অগ্রান ১৩৪৩, ইংরিজি ১৯৩৬ খৃ, পৃষ্ঠা ২১৬) জীবনানন্দ দাশের একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে। নবজাত শিশুর জাতকর্ম অনুষ্ঠানে শ্রীমতী সুখলতা রাও সঙ্গীত করেন।

বাড়ির রূপ পালটে যায়। গৈলার চন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত জীবনানন্দর, দাদামশাই। হাসির গান, হাসির কবিতা এবং হাসির জন্যে বিখ্যাত যিনি—সেই চন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এলেন।

মা কবি মায়ের বাবা তিনিও কবি। হাসির গান রচনায় অদ্বিতীয়। দাদামশাইয়ের আসার সঙ্গে সঙ্গেই সর্বানন্দ জীবনের গাম্ভীর্য কোথায় পালিয়ে যায়।

হাস মিলু হাস। জীবন তো দুদিনের। হেসে খেলে কাটিয়ে দাও।

কি এত ভাবছ সত্যানন্দ। কি লিখছ? সব সময়েই তোমার মাথায় সাত রাজ্যের এত কি চিন্তা বলত? ভাবনার মুখে আগুন।

সত্যানন্দ হাসেন

জীবনটা কি রকম জান চন্দ্রনাথ বলেন....

সত্যানন্দ বলেন আপনিই বলুন

চন্দ্রনাথ বলেন, জীবনটা হচ্ছে কতকগুলো উলটোমুখি ধারণা ও কাগজের বান্ডিল। ফলটা তার বড় বিচিত্র। ফল চাইলেই ফল পাওয়া যায় না বাবা, তার চাইতে ফল চাইতে নেই। হাসি মুখে জীবনটা পার করে দিলেই জীবনটা বেশ সহজ বলে মনে হয়।

তার মনে এই বলুন, জীবনে পরিকল্পনা করে কিছু হয় না। ঈশ্বরই সমস্ত পরিকল্পনার মালিক। তিনি যন্ত্র আমরা যন্ত্রী। তাইতো, তুমি অনেক জ্ঞানী বাবা। আমি অতশত বুঝি না। যা মুখে এল বলে এলাম। হাসতে জানি হাসাতে জানি। হাসিমুখেই যেন বিদায় নিতে পারি এ জগৎ থেকে। ভগবানের কাছে এই প্রার্থনাই করি।

দাদামশাই চন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বাড়িতে এলে সকলেই আনন্দে মশগুল।

লাবণ্য, লাবণ্যমা .

স্নান করে এসেছেন দাদাশ্বশুর, লাবণ্য এগিয়ে দিলেন তাঁর হাতে একখানি শাড়ি।

শাড়ি কেন?

হাসিতে খুশিতে ভরপুর চন্দ্রনাথ খুশি হয়ে শাড়ি লুঙ্গির মতো পরে ডাক দিলেন—মিলু মিলু মিলে—

মিলু এগিয়ে এলো হাসতে হাসতে, বলল ঃ শাড়িতে লুঙ্গি পছন্দ হইছে চন্দরনাথ?. চুল আঁচড়ানোর কাকই পাইছো? পুরুষমানুষে আর কি দেওন যায় কও।,

দাদামশাই একহাতে লাবণ্যকে অন্য হাতে মিলুকে জড়িয়ে ধরে গান ধরলেন।

'বান্ধুর হুন্দা কিণ্যা আইন্যা চাইলা
দিছি পা'য়
তোমার লগে কামতে পারুম হইয়া
উঠছে দায়।
আবশি দিছি, কাকই দিছি, চুল
বাঁধনের ফিতা দিছি
ব্যালয়ারী চুড়ি দিছি, আর কি
দ্যাওন যায়?
বুড়া-বুড়া কইয়া ক্যাবল, ক্ষ্যাপাইছা
ক্যান কর পাগোল?
যহন বিয়া করছ ক্যালবা কেমতে কইয়া
দ্যাও আমায়।'

মিলু বললে, বা-বা! চন্দরনাথ চমৎকার—চমৎকার!

'বুদ্ধদেব বসুর কবিতা পত্রিকায় প্রথম জীবনানন্দ দাশের

কোলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর করুন... দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন

প্রতিবার খাওয়ার পর কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। আপনার দাঁতকে সুরক্ষিত করার জন্যে সারা পৃথিবীতে দাঁতের ডাক্তাররা এই উপদেশই দেন।

দাঁতের ফাঁকে খাবারের টুকরো থেকে গেলে রোগ-জীবাণুর সৃষ্টি হয়। ফলে, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ আসে, পরে দাঁতে যন্ত্রনাদায়ক ক্ষয়রোগ শুরু হয়।

প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। দাঁতকে সাদা ঝকঝকে করে তুলে, নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয় রোধে কোলগেটের অসাধারণ ক্ষমতা বহুবার প্রমানিত হয়ে গেছে।

জীবাণুমুক্ত নির্মল শ্বাসপ্রশ্বাস ও ঝক্‌ঝকে সাদা দাঁতের জন্যে সারা পৃথিবীতে লোকে সবচাইতে বেশি কেনে কোলগেট টুথপেস্ট।

কোলগেটের নির্ভরযোগ্য ক্ষমতা কিভাবে কাজ করে:

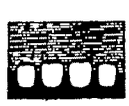
নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয়ের জীবাণু জন্মায় দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের টুকরো থেকে।

কোলগেটের প্রচুর ফেনা দাঁতের ভেতরে গিয়ে আটকে থাকার টুকরো ও রোগজীবাণু দুইই দূর করে।

ফলাফল: সাদা ঝকঝকে দাঁত, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধের ভয় থাকে না, দন্তক্ষয় রোগের প্রতিরোধ।

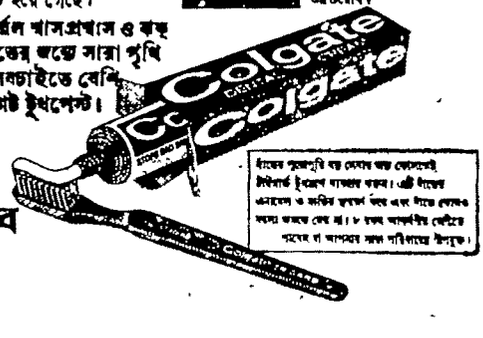

দাঁতের সুরক্ষার জন্য কোলগেট ডেন্টাল ক্রীম ব্যবহার করুন।

কেবল দাঁতের ডাক্তারই এরচেয়েও ভালোভাবে আপনার দাঁতের পরিচর্যা করতে পারেন

কবিতা পড়েছিলাম, তারপর কলকাতায় কবিতার পুরোনো সংখ্যা-গুলো কেনার জন্যে একদিন 'কবিতা ভবনে' যাই। তখন বুদ্ধদেব বসুই প্রথম তাঁর আশ্চর্য কবিতা শক্তির কথা বারংবার উল্লেখ করেছিলেন। স্কুলে পড়ি তখন ম্যাট্রিক দেবো সেইকালেই আমরা দুই বন্ধু—তাঁর অনুকরণে কবিতা লেখার প্রয়াস করেছিলাম।

তারপর তাঁকে প্রথম দেখি যখন আমরা বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের আই-এর ছাত্র। তিনি সেই কলেজেরই ইংরিজির অধ্যাপক। শ্যামবর্ণের স্বাস্থ্যবান মানুষ। চল্লিশোত্তর বয়স তখন। পরনে ধুতি পাঞ্জাবী। পাম্প-সু, কাঁধে পাট করে রাখা একখানা চাদর, হাতে একটি কি দুটি বই। মুখ তাঁর সর্বদাই ভারী গম্ভীর, চোখে আশ্চর্য চাঞ্চল্য এবং তীক্ষ্ণতা। লম্বা লম্বা পা ফেলে চলেন। আমি ও আমার বন্ধু নির্মল চট্টোপাধ্যায় তাঁকে অবাক হয়ে দেখতাম, কখনো ক্লাসের অবকাশে মাঠের ধারে শুয়ে শুয়ে পড়তাম তাঁর কবিতা। তখনও পর্যন্ত তাঁর শেষতম কাব্যগ্রন্থ ধূসর পাণ্ডুলিপি। কিছুদিন পরে কবিতা ভবন থেকে 'এক পয়সায় একটি সিরিজে' প্রকাশিত হল তাঁর 'বনলতা সেন'। আমাদের মধ্যে রীতিমতো সাড়া পড়ে গিয়েছিল। নতুন বয়েসের অনভিজ্ঞ মনের কাছে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' যে সাড়া জাগাতে পারেনি, 'বনলতা সেনের দ্বারাই তা সম্ভব হয়েছিল। বনলতা সেন কবিতাটি আমরা যত্রতত্র মুখে মুখে আবৃত্তি করে বেড়াই। কলেজের এক অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করলাম একদিন। একদিন তাঁর বাড়িতে গেলাম। কলেজে তাঁর প্রখর গাম্ভীর্যের জন্যে এগোতো না কেউ। সবাইকের ধারণা জীবনানন্দ ভীষণ রাসভারী লোক। আমরাও অবকাশ পেতাম না তাঁর সঙ্গে কথা বলবার। বাড়ি তাঁর একটি মেয়ে-স্কুলের কম্পাউন্ড-এর মধ্যে। খুব সম্ভবতঃ সে ইস্কুলটা তাঁর পিতারই প্রতিষ্ঠিত ছিল।' বাংলো ধরনের বাড়ি—ওপরে শনের চাল, বেড়া, অর্ধেক ইঁট অর্ধেক বাঁশের। কিন্তু ভিতরে সাহিত্যপাঠকের কাছে এক আশ্চর্য জগৎ।' বই বই আর—বই। ইংরিজি, বাংলা, বাংলার বাইরের অসংখ্য পত্রিকা। সবই সযত্নে গুছিয়ে রাখা, দেখলেই মনে হয় বারংবার পড়া। এক-ধারে একটা ছোট লেখার টেবিল। হয়তো তাঁর লেখার। অন্দরে ছিলেন তাঁর স্ত্রী, বালিকা কন্যা মঞ্জু দাশ।' সেকালে মঞ্জু দাশের বয়স বোধহয় দশ কি বারো। কুঁড়েমী পত্রিকায় একটি কবিতা প্রকাশ হয়েছিল।'

সেদিন তাঁর বাড়িতে না গেলে জীবনানন্দ 'অসামাজিক মানুষ' এই ধারণা কবেই চিরদিন দূরে থেকে যেতাম। সে ধারণা অচিরে ভেঙে গেল। অমন রাসভারী চেহারার ভিতরে একটি সহজ সরল শিশুমন খুঁজে পেয়ে আমরা চমৎকৃত হয়ে গেলাম।'

ওপরের কথাগুলি বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক আবুল কালাম শামসুদ্দীন সাহেবের। আবুলকালাম শামসুদ্দীন কবি জীবনানন্দ দাশের ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম। আর ছিলেন স্বর্গত নরনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও নির্মল চট্টোপাধ্যায়। সকলেই বরিশাল কলেজের জীবনানন্দর প্রিয় ছাত্র।

আমার কবিতা তোমরা পড় বুঝি, ভালো লাগে?'

ভালো লাগে বৈকি, আপনার কবিতা আমরা বড় ভালোবাসি স্যার।

কেন ভালো লাগে? বুঝতে পার সব?'

অনেক দিনই জানতে চেয়েছেন 'বাস্তবিকই তোমরা বুঝতে পার কি? কেন পার না, কোথায় বুঝতে অসুবিধে তোমাদের? ধূসর পাণ্ডুলিপির পরবর্তী কবিতাগুলিতে 'সুররিয়্যালিস্ট' প্রভাব যত বেশী প্রকট হয়ে উঠতে লাগলো তত বেশি দুর্বোধ্য হতে লাগলো তাঁর কবিতা। সেই অনুপাতে হতে লাগলো অভিযোগ। সত্যি কথা বলতে কি, অনেক কবিতারই রসোদ্ধার সম্ভব হতো না।' কিন্তু ছাত্রের জন্যে বুঝতো বৈকি।'

তোমরা বুঝতে পারছ না আমার কোন কবিতা আবুল কালাম? তুমি বল নির্মল, তারকনাথ।

'কবিতার পক্ষে তাঁর পরীক্ষানিরীক্ষার শেষ ছিল না। আঙ্গিক এবং উপমায় তাঁর মত পরীক্ষা অনেকেই করেননি। কয়েকটি কবিতার ব্যাখ্যা করলেন। সে কবিতার ব্যাখ্যা শুনে এবং পরে সে কবিতাগুলি পাঠ করে তাঁর প্রিয় ছাত্রদল মুগ্ধ।

আচ্ছা স্যার, একটা কবিতা আমরা বুঝতে পারছি না, ওই যে কবিতা আপনি লিখেছেন—

অবাক হয়ে ভাবি, আজ রাতে কোথায় তুমি?
রূপ কেন নির্জন দেবদারু-দ্বীপের নক্ষত্রের ছায়া চেনে না—
পৃথিবীর সেই মানুষীর রূপ?
স্থূল হাতে ব্যবহৃত হয়ে—ব্যবহৃত-ব্যবহৃত-ব্যবহৃত-ব্যবহৃত হয়ে
ব্যবহৃত-ব্যবহৃত—
আগুন বাতাস জল : আদিম দেবতারা হো-হো করে হেসে উঠল;
'ব্যবহৃত-ব্যবহৃত হয়ে শুয়োরের মাংস হয়ে যায়?'

এই কবিতায় এতগুলো 'ব্যবহৃত' কেন লিখেছেন?

জীবনানন্দ বুঝিয়ে বললেন, কেন জান তোমরা বিষয়টার বহু বিষয়ের একত্বেয়েমীকে প্রকট করার জন্যে এই শব্দ রচনা।

শুধু কি বাড়িতে, কলেজের ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকেও তাঁর প্রিয় ছাত্ররা এসে উপস্থিত হয়। সাহিত্য আলোচনার আসর বসে—একান্ত ঘরোয়া।' সেখানে আলোচনা করেন জীবনানন্দ বিদেশী সাহিত্যিক-কবিদের কথা; এদেশী ওদেশী কবি-সাহিত্যিকদের রচনার তুলনামূলক আলোচনা।' কবি ইয়েটসের কাছে বাংলার আধুনিক কবিকুল যে কতটা উপকৃত সে কথা বলেন।

একদিন।'

স্যার! ... কি বল? .... একটা কথা বলব স্যার?....বল .. বনলতা সেন কবিতাটি আমাদের বড় প্রিয় কাব্য। একদিন আপনার মুখ থেকে এর আবৃত্তি শুনতে চাই।

আমাকে কেন, তোমরাই কেউ আবৃত্তি করো না, আমিও শুনি। ঈষৎ লজ্জিত কি কবি!

না স্যার, আপনিই আবৃত্তি করুন, আমরা শিখতে চাই।

সেদিন জীবনানন্দ তাঁর প্রিয় ছাত্রদের অনুরোধ রাখলেন, আবৃত্তি করলেন—

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;
পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে নোনাজলে ডুব দিয়েছিলাম;
সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন;
থাকে শুধু অন্ধকার। মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

মন্ত্রমুগ্ধ ছাত্রদল। কিছু পরে একজন বলে, একটা প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে স্যার।

---

* 'বনলতা সেন' কবিতাটি সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। যেমন কোন একসময়ে জীবনানন্দ বরিশাল থেকে কলকাতায় আসছিলেন। স্টিমারে (কেউ কেউ বলেন ট্রেনে) একটি সুটকেসের ওপরে 'বনলতা সেন, নাটোর' এই কথাটি লেখা দেখে কবিমনে এক প্রেরণা জাগে। কবি-বন্ধু শ্রীসুবোধ রায় বলেছেন কবি 'বনলতা সেন' কবিতা লিখেছেন একই দিনে তাঁর প্রিয় কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে ঘাসের সবুজ গালিচায় বসে। একথা কবি সুবোধবাবুকে নিজে বলেছেন। আরও এক সূত্রে জানা যায়, 'বনলতা চক্রবর্তী' নামে একজন মহিলা তিনিই এই কবিতা লেখার প্রেরণা।

বল।

কিছু ইতস্তত, পরে বলে ছাত্রটি,—এ মহৎ কবিতার সৃষ্টি যে মুহূর্তে, এর উৎসকথা জানতে বড় ইচ্ছে করে আমাদের।

কি হবে শুনে ?

কৌতূহল.....

জীবনানন্দর গালে টোল খেলে গেল। হাসি সংবরণ করলেন। বললেন, শিল্পী ও কবি মাত্রেই জীবনপ্রেমিক। প্রেম ছাড়া সৃষ্টি হয় ? প্রকৃতি পুরুষকে সেই আবহমানকাল মুড়ে রঙে রূপে, গন্ধে, স্পর্শে, মোহে মুগ্ধ করে রেখেছেন। প্রকৃতিরই প্রেমে ঘর বেঁধেছে পুরুষ আবার প্রকৃতির প্রেমেই ঘর ছেড়েছে সে সবই শান্তি পাওয়ার কামনায়। কিন্তু শান্তি কি সে পেয়েছে ! অতৃপ্তিই শিল্পীর রূপ। অন্য কি বলবো তোমাদের বল, অতৃপ্তিই আমার সকল কবিতার প্রেরণা।*

কোন কথা সত্যি, আমাদের এখন জানবার উপায় নেই। তবু এক-একটা ঘটনা যাকে বলতে পারা যায়, এক-একটি ছবি যা আমরা ভুলতে পারি না সারাজীবনেও। কেবলই কত মানুষের মুখ দেখি, প্রতিমুহূর্তে মানুষের মুখের মিছিল। তবু তো ভুলি না দুএকটি মুখ, একটি কণ্ঠস্বর, একটি রং আলোর রেখা, দু-দণ্ডের শান্তি। এত অপরিচিতের ভিড়ে এদের সঙ্গে কোথায় আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের পরিচয়। কোনদিন হয়তো আমাদের পরম আত্মীয় ছিলেন। অবিস্মরণীয় মুহূর্তই হয়তো সৃষ্টির মূলে, কে জানে ? একদিন আবুল কালাম শামসুদ্দিন এবং অন্য বন্ধুরা কবির সাথে কথা বলছেন এমন সময়ে একজন প্রগতিশীল ছাত্র কবি হঠাৎ তাদের কথার মাঝখানে কবিকে প্রশ্ন করল 'আপনি জনগণের কবিতা লেখেন না কেন ?'

জীবনানন্দ ছাত্র কবিটির প্রশ্নের জন্যে যেন প্রস্তুত ছিলেন মা কয়েকবার ছেলেটির এবং আবুল কালামের মুখের দিকে দেখে আস্তে প্রশ্ন করলেন : তুমি প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের মধ্যে আছো বুঝি ?

হ্যাঁ অবশ্যই। আমরা এ সমাজ ব্যবস্থাকে বদলাতে চাই; কায়েম করতে চাই শোষণহীন সমাজব্যবস্থা। সেখানে কবি সাহিত্যিকরাও আমাদের সঙ্গে আসবেন তাঁদের বুর্জোয়া, পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী পরিত্যাগ করে মার্কসবাদ যে নতুন পথ দেখিয়েছে —

কথার মাঝখানে জীবনানন্দ হঠাৎ প্রশ্ন করলেন : তুমি কার্লমার্কস পড়েছ ? ডস কাপিটাল ?

ছাত্রটি থতমত খেয়ে বললে, না।

জীবনানন্দ একটু কাল তার দিকে তাকিয়ে হাসি গোপনের বহু চেষ্টা করেও অকস্মাৎ উচ্চহাসিতে ফেটে পড়লেন। হঠাৎ সে হাসি এমন অচিন্তিতে বেরিয়ে আসা যে অবাক হয়ে দেখতে হয় তাঁকে। সঙ্গে হাসা যায় না। ছাত্রটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে পালিয়ে বাঁচল।

রবিশালের বাড়ি থেকে একে একে সকলে চলে যায়। বিরাট একান্নবর্তী পরিবারের সভ্যরা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছে বাংলাদেশে। তাই বা কেন ? সারা ভারতবর্ষেই। কাকারা বাইরে, খুড়তুতো ভাইবোন সকলে নানাস্থানে, বোনেরা তাদের সংসারে— গৃহস্থালীতে।

ছোট বোন খুকু সেও চাকরী নিয়ে চলে গেল তমলুকে। ছোট ভাই অশোকানন্দ কলকাতায়। রবিশালে বাবা, মা, পিসিমার স্নেহলতা। আছে লাবণ্য মঞ্জু রঞ্জু। সত্যানন্দর শরীর কিছুদিন থেকে ভালো যায় না। কবির কত কবিতা লেখা হল কত পত্রিকার সম্পাদক লেখার জন্য তাগাদা করলেন কত পত্রিকা গেল উঠে— শরৎকালে শারদীয় মরশুমে নানান পত্রিকা থেকে কবির কবিতার জন্যে টানাটানি। চেনা-অচেনা পরিচিত—স্বল্প পরিচিত সকলেরই অনুরোধ-উপরোধ। সকলেরই কবিতা চাই। সুচরিতার বন্ধু নলিনী চক্রবর্তী ও লেখিকা কল্যাণী রায়। জীবনানন্দ তাঁদের সঙ্গে পরিচিত। নলিনী চক্রবর্তী কল্যাণী সেন সম্পাদিত কাগজ 'মেয়েদের কথা' মাসিক কাগজের জন্যে কবিতা চেয়েছেন। বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'এক পয়সার সিরিজের' থেকে একখানি কবিতার বই প্রকাশ করবেন ছোট্ট চটি বই হবে। চলছে অধ্যাপনা, চলছে কবিতা রচনা, চলছে সংসার—জীবনতরী চলছে হেলেদুলে।

অধ্যাপিকা নলিনী চক্রবর্তী চিঠি দিয়েছেন উত্তর দেয়া হয়নি। উত্তর দিলেন সেদিন :

প্রীতিভাজনেষু

যথাসময়ে আপনার চিঠি পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। একবার ভেবেছিলাম লক্ষ্মী পূর্ণিমার পর কলকাতায় যাব। কিন্তু যাওয়া হল না। আপনার বাবা-মার অসুস্থতার কথা শুনে চিন্তিত হয়েছি, আশা করি তাঁরা এখন ভালো আছেন। খুকু হয়তো সপ্তাহ-খানিকের মধ্যেই কলকাতায় যাবে। তমলুকে এবার খুব বনযন্ত্র হয়েছে। আরো নানান রকম গোলমাল, খুকুর মুখেই শুনতে পাবেন। খুকু আপনার কাছ থেকে একখানা বই এনেছে তা পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছি; ইচ্ছা ছিল বইগুলি অবশ্য কয়েক দিন রাখি; কিন্তু খুকুর সঙ্গেই বিদায় দেব। 'মাই বেস্ট ফ্রেন্ড' বইখানা হয়তো রাখতে পারি। যদি রাখি কিসমাসের সময় ফিরিয়ে দেব। কলকাতায় গেলে আপনাদের লাইব্রেরী দেখবার খুব ইচ্ছা; আমি বইয়ের খুব ভক্ত অর্থাৎ মনের মত বইয়ের। তাবলে শুধু কবিতার হবে এমন কোন কথা নেই। কিন্তু হোয়েন ইট কামস্ টু বিডিং।' প্রায়ই নেড়েচেড়ে রেখে দিই কাজেই জ্ঞান বিজ্ঞানে আপনাদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে পড়ে আছি তবু বই-এর নেশা কাটানো মুস্কিল।

আপনাকে আমি বলেছি কবিতা পাঠাবো। নানা রকমের শরদীয়া সংখ্যার লেখা ছড়িয়ে এখন একটু রীতিশুদ্ধ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি; আবার যখন লেখার দিকে টান ফিরে আসবে আপনাকে পাঠাবো। কিন্তু তাই বলে মনে হচ্ছে না।

বনলতা যেন করে বেবুবে এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না। বুদ্ধদেবকে এখনও মিস ত পাঠাতে পারিনি। 'ধূসর পাণ্ডুলিপির' নতুন এডিশন এখন বের করা সম্ভব হবে না। এদেশের প্রকাশকরা কেউ নিজের খরচে বড় একটা কবিতার বই ছাপাতে চান না। আমাদের পক্ষেও ছাপানো কঠিন। যা হোক আমার ইচ্ছে আছে পরিস্থিতির উন্নতি হলে এ সম্বন্ধে একটা কিছু ব্যবস্থা করব।

অধ্যাপনা ক্রিনিসটা আমার কোনদিনই তেমন ভালো লাগেনি। যেসব ক্রিনিস যাদের কাছে যে রকমভাবে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে তাতে আমার বিশেষ আস্থা নেই। একাজে মন তেমন জাগে না। তবু সময় বিশেষে অন্য কোন কোন প্রেরণার চেয়ে বেশী জাগে তা স্বীকার করি। আমরা ভালোই আছি। আপনাদের কুশল প্রার্থনীয়। ইতি জীবনানন্দ দাশ।

সুপার৭৭৭

ময়লার বিরোধী, শুভ্রতার শক্তি

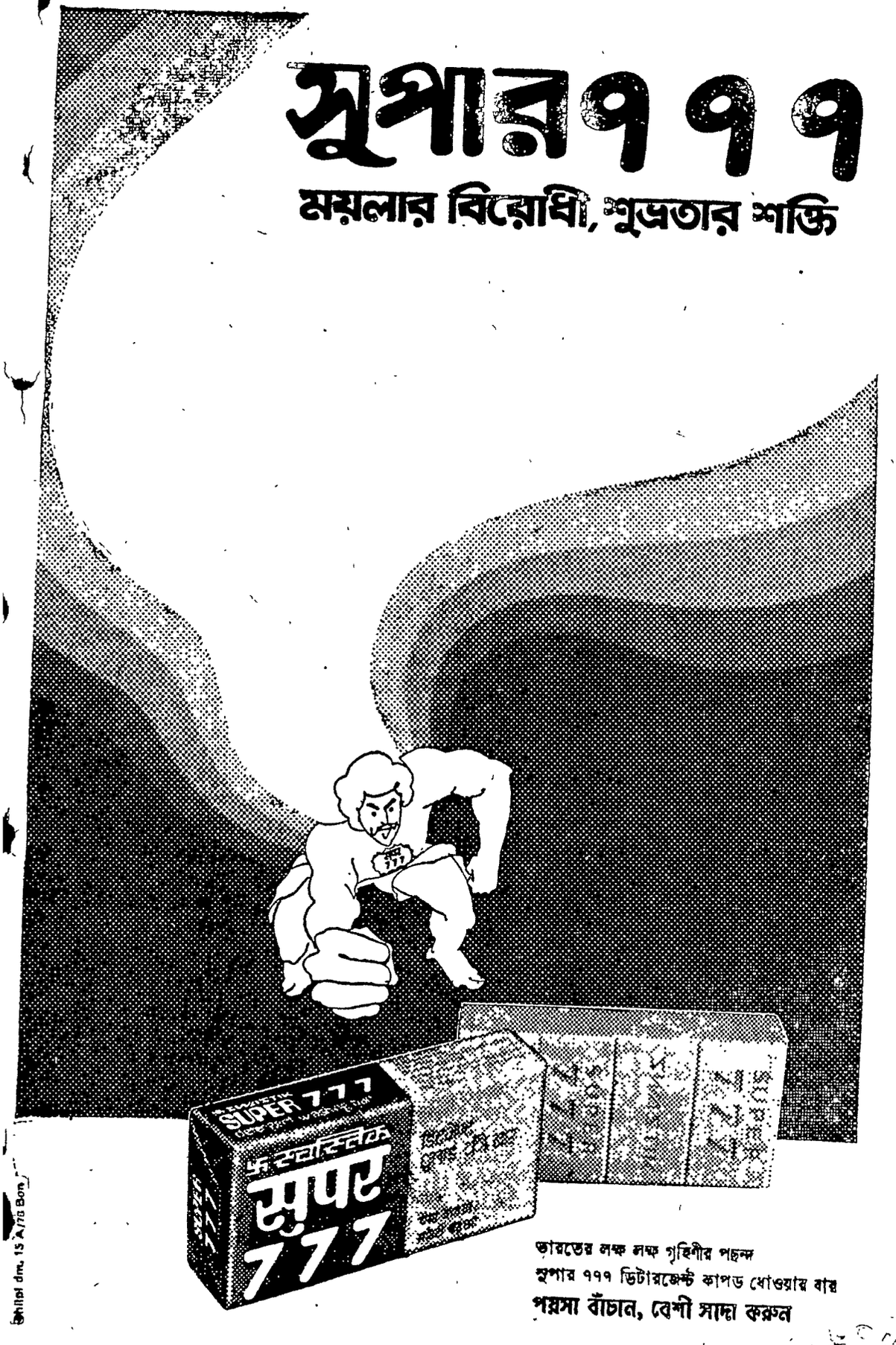

ভারতের লক্ষ লক্ষ গৃহিণীর পছন্দ
সুপার ৭৭৭ ডিটারজেন্ট কাপড় ধোওয়ার বার
পয়সা বাঁচান, বেশী সাদা করুন

Shilpi dm, 15 A/78 Bom

শৈবাল মিত্র

তরণী পাহাড়ে বসন্ত

অজিতের কাছে ও চিরকাল একটা ধাঁধা থেকে গেলো। একদিনও রেবার নাম কিশোরের মুখে ও শোনেনি। অথচ রেবাকে কিশোর বিয়ে করবে। রেবার মুখটা অজিতের হঠাৎ মনে পড়ে। রেবা এখন কি করছে? কিশোর কি এখনো রেবার কথা ভাবছে? হঠাৎ ওর কিশোরের ওপর দারুণ রাগ হয়। কিশোর একেবারেই মানুষের মতো ব্যবহার করে না। এতো বেশী মহত্ত্ব, মহত্তা অজিত সহ্য করতে পারে না।

হাল্কা হাওয়ায় গাছপালার ঘুমো গন্ধ আসে ওরা জঙ্গলের মধ্যে ঢোকে। চাপ চাপ অন্ধকার। কাঁধের ওপর বন্দুকের টিগারে আঙ্গুল হাত রাখে। ওদের সাড়া পেয়ে অন্ধকারে পোকামাকড়েরা জেগে ওঠে। তাদের মজাচড়ার শব্দ ওঠে। একটানা ঝিঁঝির ডাক। কয়েক পা এগোতেই একটা অন্ধকার ঝাঁকড়া গাছ থেকে ঝুপ করে মংলু নেমে আসে। ওরা থমকে যায়। মংলু সামনে এসে দাঁড়ায়।

ওরা ক্ষুধা ভাষা জিজ্ঞেস করে।

আছে। গলার সাড় পেঁইচি—মংলু বলে।

মংলু একেবারে খালি হাতে এসেছে। বাঁদিকে ঘাস, সেগুনের গভীর জঙ্গল। ওরা সেখানেই ঘাঁটি আগলে বসে। মংলু থাকে মোতির সঙ্গে।

চারপাশ নিঝুম। শুধু ঝিঁঝির ডাক আর স্টীট পাহাড়ের হাঁটাচলার শব্দ। শালের ঘন পাতায় আকাশ ঢেকে গেছে। হাওয়া নেই। পায়ের তলায় ঠাণ্ডা ভিজে ঘাস। লতাগুল্মের শিশির ঠিকরে ওঠে। অনেক দূরে মানুষের আবছা গলা। কাঁপিলের দল অভিযানের জন্যে তৈরী হচ্ছে।

ওরা কতোজন আছে—মোতি জিজ্ঞেস করে।

উঁচু জমিতে এখন মকাই পেকেছে। আখের শরীরে থৈ থৈ রস। এই সময়ে বুনো শুয়োরের হামলা হয়। মশানজোড়, দুমকুর জঙ্গল থেকে ওরা দল বেঁধে ভোজ খেতে আসে। মোতি ভাবে বুনো শুয়োরের পাল্লায় না পড়ে।

সেই রাতে মাধুর সঙ্গে কথা বলার পর থেকে ওর বুকের মধ্যে অস্থিরতা কি যেন পুড়ছে।

মাধুর ভয়, ওর বাবা যে কোনো দিন মারা পড়বে। কথাটা বলার সময়ে ওর গলা বুজে গিয়েছিলো। অনেকটা সময়ে চুপচাপ বসেছিলো।

—মতি জবাব খুঁজে পায় না। বড়ো অদ্ভুত সময় চলেছে। সরল সাদা কথাও কেউ বুঝতে পারে না। বুঝলে, ভুল বোঝে। দিবাকর কাকার বিষয়ে কিছু বলতে যাওয়া আরো বিপদ। সে চৌকিদার, শাল্টসল্টের নাট-বল্টু। ওর সম্পর্কে মোতির আগ্রহ দেখলে দুর্নামে ভোরবার হবে। তাছাড়া এলাকার যে কোনো এ্যাক্সিডেন্টের দায়-দায়িত্ব লোকাল স্কোয়াডের। এ-ব্যাপারে তার নাক গলাবার কোনো অধিকার নেই। ফিকে আলোয় অন্ধকার দাওয়ার ওপর মাধুর সামনে ও অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। ঘরের ভেতরে মাধুর মা শুনছে। চণ্ডীমণ্ডপের মাঠে অনেক মানুষের গলা, হৈচৈ। আকাশে ঘন মেঘ। মেঘ সরলে একটুকরো চাঁদ হঠাৎ উঁকি দেয়। যেমন একটা নীলচে আলো গাছপালায় চাঁদে মাঠে ছড়িয়ে পড়ে।

মাধু কাঁদছিলো বিশ্বাস করো, আমরা বাবা তোমাদের কোনো ক্ষতি করবে না।

মোতির বলতে ইচ্ছে হয় আমি জানি, আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না।

বাবা এখন, দিন-রাত কি কেন ভাবে। নিজের মনে বকে—মাধু চোখ মোছে—কাল হয়তো পাগল হয়ে যাবে।

ঘরের ভেতর যমুনা গোঙায়। কেরোসিন কুপির আলোয় ভেতরটা কাঁপসা।

মোতি শোন, কালই মাধুর মা সিউড়ির হাসপাতালে ভর্তি হবে। আর হয়তো ফিরবে না।

এই পুরোনো ভাঙ্গা ভিটে, দরমার কাঁপ লাগানো দরজা নিকোনো উঠোন আর একরাশ অন্ধকারের মধ্যে এর পর মাধু একা থাকবে। হয়তো একদিন স্বাধীন আসবে। ইচ্ছে করলে মাধুকে উৎপাতও করতে পারে। কে আটকাবে। আজকের দু-পাঁচ বছর বাদে হয়তো একদম বদলে যাবে।

মোতি বলে—ভেবো না। আমি দেখছি, কি করা যায়। নিজের কথা তার নিজের কানেই কেমন ফাঁকা শোনায়।

অন্ধকারে শরীর ঘেরে পিঁপড়ের মতো কি যেন ওঠে। মোতি দু হাতে ঝেড়ে ফেলে। লুঙ্গিটা কসে বাঁধে। খালি গায়ের ওপর মশাদের উৎসব লেগে গেছে। রাংলা মশা। সোঁ সোঁ রক্তত টানে।

তখন ভয়ানক চুলকোয়।

মংলু বলে—একটা বিড়ি দে। মোতি নীচু গলায় জানায় এখন নয়।

বাড়ীর কথা মোতির মনে পড়ে। বাবারও এখন তখন অবস্থা। সংসারের লক্ষ্মীছাড়া চেহারা। মা ইন্দুর মুখে উপোসের কালি। ময়লা উলিঝুলি ইজের পরা ভাই-বোনগুলো ডাগর চোখে দাদার দিকে তাকিয়ে থাকে। এসব কারণে মোতি আজকাল ঘরে ঢুকতে চায় না। রাজনগর থেকে ডাকতারদা একটু আধটু সাহায্য পাঠায়। সেটাও নিয়মিত নয়। চারপাশে এখন দারুণ ভয় আর আতঙ্ক। ডাকতারদাও হয়তো ভয় পেয়েছে। দু-চার মিনিট বাড়িতে থেকেই মোতি বেরিয়ে আসে। আজকাল কোথাও একটানা ঘন্টাখানেক বসতে পারে না। ছটফট করে। বিপদের গন্ধ পায়। ঘরে বাইরে এখন বিপদ ওৎ পেতে বসে আছে।

ডানদিকে একটুকরো ফাঁকা জমি। লতাগুল্মে ঢাকা। ঝোপের ওপর কোথা থেকে যেন পাতলা আলো এসে পড়েছে। মোতি দেখে এতোক্ষণে আকাশে চাঁদ উঠেছে। ওদিকটায় গাছপালার ভিড় নেই।

ধোঁয়া ধোঁয়া কিছু আলো সিধ নদীর দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে। দুটো বাদুড় আলো থেকে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো।

মিটিং শেষ হতে রাত হলো। গণফৌজের ব্যাপারে একমত হওয়া গেলো না। যবুণের চিঠিতে অনেকে দমে গেছে। মানসিং বললো—তবু ডরিস না কমোরেট। আমি পার্টির সঙ্গে বাতচিত চালাবো। ই লড়াই থাকবে না। সৈন্য চাই। তবে পার্টির মত না লিয়ে তো ইটা করতে লারবো।

আকাশ ভাঙ্গা চাঁদ। হাল্কা নীল আলোয় মানসিং-এর মুখটা আপসা দেখা যায়। সে কিশোরের খুব কাছের লোক।

সিসেল ফার্মে চাকরী করে বিশ বছর ব্যাজুয়াল লেবার। কারখানার পেছনে ঢাকা গাঁয়ে ওর ঘর। রাজনীতি করা মস্ত লোক। ডাকাত ধরায় সেও কিশোরদের সঙ্গী হয়।

কুলিতে নাচ-গান শেষ হয়েছে।

[illegible] জোনাকি অন্ধকারে উড়ে [illegible] আকাশে লক্ষ কোটি নক্ষত্র। [illegible] আলো পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছোনো [illegible]

[illegible]টে বন্দুক রেখে বাকীগুলো [illegible]লো হয়। পুণাই এর হাতে সড়কি। [illegible] ধরতে নারাজ।

[illegible]তিজনের দলটা অন্ধকার জঙ্গলের এগোয়। আজকাল পার্টির কাগজ [illegible]ত বেরোয় না। লড়ায়ের খবর নেতা-[illegible]রফৎ কিছু কিছু আসে। শ্রীকাকুলাম বিপ্লবীদের পুরো মার খেয়েছে। উত্তর বাংলা [illegible]প। সামনের সারির বেশিরভাগ কমরেড হয় শহীদ হয়েছেন, কিংবা ধরা পড়েছেন। পার্টির সেই বরবরা আর নেই। কেন এমন হলো? এসব লড়াইগুলোর পার্টি কি মূল্যায়ন করেছে, কিশোরের জানতে ইচ্ছে করে। অভিজ্ঞতার আলোয় নিজেদের ভুল-ভ্রান্তিগুলো শুধরে নেওয়া যায়।

পার্টির কাজই তো অভিজ্ঞতার সার সংকলন। হারজিতের মধ্যে দিয়েই সঠিক পার্টি লাইন বেরিয়ে আসে। শুধু নিজেদের অভিজ্ঞতায় লড়া যায় না। দেশ আর ইতিহাসের সেতাতের বাইরে একটা বিশেষ এলাকার বিচ্ছিন্ন লড়াই বেশীদিন টেঁকে না। বিপ্লবী লড়াইকে তাই বিপ্লবী দুনিয়া আর ইতিহাসের সাহায্য নিতে হয়। এটা সৈখিন জ্ঞানচর্চা নয় লড়ায়ের ময়দানে সামান্য ভুল বকতের ভাষায় অনুদিত হয়। এখানেও হচ্ছে। ভুলের দায়িত্ব চাপছে এলাকার নেতৃত্বের ওপর। বলা হচ্ছে পার্টি লাইন ঠিক শুধু প্রয়োগ গণ্ডগোল। গোটা দেশ জুড়ে প্রয়োগে কেন ভুল হচ্ছে, এটাও একটা ভাবার বিষয়। কিন্তু এসব নিয়ে এখন ও কোথায় আলোচনা করবে। গতকাল পার্টির একটা পুরোনো সার্কুলার হাতে এসেছে। সেটা পড়ে কিশোর তাজ্জব। অন্ধ্রের লড়াই-এর ব্যর্থতার জন্যে এই লেখায় সেখানকার কমরেডদের দায়ী করা হয়েছে। অন্ধ্রের কমরেডদের কি কোন ভুল হয়নি? হতে পারে এবং সংগ্রাম করতে গেলে অনেক ভুলই হবে। ভুলের অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের শিখতে হবে। খুব ভালো কথা। কিন্তু সেই অভিজ্ঞতার হদিশ কিশোর কোথায় পাবে? কিশোরের ধারণা ভুল শুধু অন্ধ্রের কমরেডদের নয়। মূল রাজনীতিতে গণ্ডগোল আছে। তা না হলে অন্ধ্র, মেদিনীপুর, বীরভূম সব জায়গাতে একই ভুল কেন হয়? কিশোর জানে এখানকার সব ব্যর্থতা পরাজয়ের দায়-দায়িত্ব পার্টি তাদের ঘাড়ে চাপাবে। বলবে, সঠিক পার্টি লাইনের বিকৃত প্রয়োগের জন্যেই বীরভূমের লড়াই মার খেয়েছে।

শত শত সঙ্গীদের আত্মদান, সহযোদ্ধাদের রক্তপাতের জন্যে পার্টি তাদের দোষ দেবে। মতপার্থক্য তুঙ্গে উঠলে, দালাল, বেইমান বলতেও আটকাবে না। এক অদ্ভুত হতাশা আর কষ্ট ওর বুকের মধ্যে দুলতে থাকে। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে অনেক মৃত বন্ধুর মুখ মনে পড়ে। কাঁধের ওপর বন্দুকটা ভীষণ ভারী লাগে। ঘন ঘন শ্বাস পড়ে। কপালে ঘাম। কিশোর বোঝে, শরীর বড়ো দুর্বল। শক্তি ফুরিয়ে আসছে। একটানা দু চার মাইল রাস্তা হাঁটলে আজকাল মাথা ঘোরে। চোখের সামনে হঠাৎ হঠাৎ অন্ধকার হয়ে যায়। প্রায় সাত দিন ভাতের মুখ দেখে নি। মুড়ি, ছোলা ভাজা, খুদ, ব্যাঙের ছাতার ওপর চলছে। সিধ নদীর চেট্টায় চাঁদের আলো মাখামাখি। কিশোরের হঠাৎ এক থালা গরম ভাত খেতে ইচ্ছে করে।

জঙ্গলে দু পা ঢুকতেই ফ্যাসফেসে প্যাঁচার ডাক। রবি পাল্টা শব্দ করে। অন্ধকার ফুঁড়ে বাঘা ছেগে ওঠে। অজিত, মোতি আর কালু একে একে হাজির হলো। ঘুমাট ঘন অন্ধকার। নিজের হাত পর্যন্ত দেখা যায় না। নীচু গলায় চটপট কথা হয়ে গেলো। সামনে থাকবে অজিত রবি পুনাই, মোতি আর ভাদু। পেছনে দলের বাকীরা। সামনের দল আক্রমন শুরু করবে। তারপর পেছনের স্কোয়াড ঝাঁপিয়ে পড়বে। সাবধান এলোপাথাড়ি গুলি নয়। ঘরের লোক যেন মারা না পড়ে। কিশোর বলে। পুনাই দুটো মশাল আগে করে দেবে। কপিল আর তার দলবলকে ধরার পর মশাল জেলে বিচার হবে।

অজিত তার স্কোয়াডের তিন চার জনকে জায়গা মতো দাঁড় করায়। বুলেট ঘরে এক সঙ্গে দাঁড়ায়। অজিত একা থাকে। প্রথম ফায়ার সে করবে। কিশোরদের কোনো সাড়া নেই। ওরা জঙ্গলের ভেতরে মিলিয়ে গেছে। চার পাশ নিঝুম, চুপচাপ ঝিঁঝিঁর ডাক, পাতার শব্দও নেই। এতো অন্ধকার আর নীরবতার বুকে চাপ করে। মানুষ পাগল হয়ে যায়।

রবি ভাবছিলো পুঁইশার কথা। ভুল শুধু হয়েছে। ইটা তার বহু গোড়ায় বিশ্বাস করতো। এখন কেন কেন সে বিশ্বাস ভেঙে গেছে। পেটে বাচ্চার নড়াচড়া শুরু হতেই ইটা হয়েছে। তার উপর ঘরে ভাত নাই,

প্রকাশিত হল

শ্রেষ্ঠ রহস্য কাহিনীকার

জেমস হেডলি চেজ্-এর

আরেকটি দুরন্ত রহস্যোপন্যাসের

আশ্চর্য বঙ্গানুবাদ

নিয়তি দুর্বার

অনুবাদ :

প্রশান্ত চৌধুরী ১৪·০০

জেমস হেডলী চেজ্-এর অন্যান্য বই :

মত্ত মৃগয়া অনুবাদ : মহাশ্বেতা দেবী ১২.০০

ভেনিসে মৃত্যুর হাওয়া ১০·০০

ছায়া ছায়া ছবি ৯·০০ মৃত্যু তিমির ১২·০০

বিষণ্ণ নিষাদ ১২·০০ বিপন্ন নায়ক ১৫·০০

আলেয়ার আলো ১০·০০ নিশি সঙ্গিনী ১০·০০

বিহঙ্গী পিঞ্জরে ৬·০০ নখদন্তের নামে পদ্মফুল ১২.০০

মৃত্যু অভিসার ১০·০০ উর্বশীর মৃত্যু ১০·০০

প্রাপ্তিস্থান : দে বুক ষ্টোর * ডি এম * নাথ ব্রাদার্স

ব্লু-বেল পাবলিশার্স

১২৩, শ্যামপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলকাতা-২৬

শরনে কাছা নাই, মাইয়াটা আজকাল থিকে থিকে কেমন ক্ষেপে উঠে। দু-চার বার রবিকে বলেছে কিষাণ ছড়দের ঘর থিকে একটা কাপড় বা এই বিজ ধান আনলে ক্ষতি কি। কথাটা ঠিক এ্যাকশনের সময় দুপদাপে আনছে জানবেই। কিন্তু বস্তি পারে নন্তু। সে সাঁওতালদের নেতা। সিদু আনু চাঁদ ভৈরবের ছেলে। সে জানে, ইটা উচিত লয়। আর সে নিজেই যদি ধুতি, শাড়ী আর ধানের ধান্দায় থাকে, তবে আর পাঁচজনকে সে অটকাবে কি করে। কিন্তু মনে যে বড়ো অভাব। টোটার পিছায় কাপড়া নাই, পেটে ভাত নাই। ইদিকে একটা জীব পেটে লড়াচড়া শুরু করে দেইচে। আগের সনে ই সময় ধান চালের আকড়া হয় নি। লড়ায়ের সাথে চাষ আবাদের কাজ চলেছে। এবার যেন সব কিছু কেমন বদলে গেলো। বিজয় মন্ডল আর তার দলবল তো আবার শাঁতলাইতে ফিরে এসেছে। সঙ্গে আছে পুলিশ, মিলিটারি, গ্রামরক্ষীরা। এখন ওদের জোর কোধ। গত সনে বিজয় বলেছিলো রবি তু এসব করিস না। তুদের কাঁধে বন্দুক রেখে নেতারা কাজ হাসিল করে সরে পড়বে। মাঝখান থেকে তুরা মরবি। রবি হেসেছিলো আমাদের জন্যে তবে এতো দরদ ক্যানে? বেইমানী করলে নেতাদেরও কাটবো। ফাঁকা মাঠের মধ্যে বুঝি সেদিন বিজয়কে ধরেছিলো। কিশোর ছিলো পাশে। তখনও এ-বেলা ও-বেলা কাটাকাটি শুরু হয় নি। গাঁয়ে গাঁয়ে আলোচনা বৈঠক, ফসল আর জমি দখল হচ্ছে। মুখে মুখে মুক্তাঞ্চল আর গনফৌজের কথা। মৃত গরম বার মুখটা রবি ভুলতে পারে না। লোকটা প্রাণ না খেয়েই মরলো। দূরে অনেকগুলো মানুষের গলা। কারা যেন কথা বলছে। তাদের ভাষা বোঝা যায় না। হঠাৎ অনেকগুলো মশাল জ্বলে ওঠে। জমাট অন্ধকারের মধ্যে দাউ-দাউ আগুনের বল ঘুমন্ত অসমাকে চমকে দেয়। গাছপালায় পাখীরা জেগে উঠে ডানা ঝাপটায়, চেঁচামিচি শুরু করে। লতাগুল্মের কীটপতঙ্গ গর্ত খোঁজে, জায়গা বদলায়। মাঝরাতে নীরব নির্জন শাল সেগুন মহুয়ার জঙ্গল হৈচৈ ওঠে। দালাল নিয়ে কপিল আসছে। অজিত বন্দুক বাগিয়ে বসে। গাছের আড়ালে ও লেপ্টে যায়। দূরে মশালের লালচে শিখা ছলকে আলো ছড়ায়। ঠাস বুনুনি গাছপালার মাঝে মাঝে আলোর ঢেউ। পরমুহূর্তেই অন্ধকার। কাতোরানের দল অজিত আন্দাজ করার চেষ্টা করে। ওদের সঙ্গে মালমশলা কি আছে, তাই বা কে জানে। বন্দুক, গাদা বন্দুক দু চারটে থাকবে। আজকাল ওরা বোমাও আনে। তবে বোমে ওদের ভয় খুব। বোমা বানাতেও জানে না। বোম তৈরী শেখার জন্যে পার্টির দুএকজনকে ওরা ধরতে চেয়েছিলো। কিন্তু পেরে ওঠেনি। মোতি আর ভাদরু কাছে বোম আছে। মংলু আবার একটা গাছের মগডালে চড়েছে। আগুনের টুকরোগুলো ক্রমশঃ বড়ো হয়। আলোর তেজ বাড়তে থাকে। ওরা নিশ্চয়ই কিশোরদের পেছনে ফেলে এসেছে। কিছুই বুঝতে পারে নি। অন্ধকারে বুনো প্রাণীদের দৌড়ঝাঁপের শব্দ। অজিতের গা ঘেঁষে একটা মেটে খরগোস ছুটে গেল।

দলটা বেশ বড়ো। পনেরো বিশজন তো হবেই। এখন ওদের পায়ের শব্দ পরিস্কার শোনা যায়। শুকনো লতাপাতা ভেঙ্গে পড়ে। শাল সেগুনের গুঁড়িতে আলোর ঝলক। অজিত জানে, জঙ্গলের বাইরে মশাল নিভিয়ে ওরা চুপিসাড়ে গাঁয়ে ঢুকবে। আজকাল গাঁয়ের বড়োলোকেরা খুব চালাক চতুর হয়ে গেছে। বাড়ীতে বন্দুক আছে। কোলাপসিবল্ গেট ছাড়াও দোতলায় ওঠার সিঁড়ির শেষে কপাট বসিয়েছে। শক্ত পুরো দু ইঞ্চি পাত মাটির সঙ্গে উল্লোউল্লি লাগানো। ধাক্কা দিয়ে ভাঙ্গা যায় না; মাথার ওপর দরজা। একমাত্র মাথা দিয়েই ধাক্কা মারা যায়। তাতে মাথা ফাটবে। লোহার পাত একচুল নড়বে না। এলাকার প্রায় মাতব্বরের বাড়ীতেই এই ব্যবস্থা। দোতলার দরজা একবার বন্ধ করতে পারলে সে বেঁচে গেলো। সোনামনি, মালকড়ি ওপরতলায় থাকে। কপাট ভেঙ্গে সেখানে পৌঁছোতে দুচারটে হাতি লেগে যাবে। মুশাবনি গ্রামের জোতদার হরনাথ পালের দোতলার দরজা না ভাঙ্গতে পেরে রাখা আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলো। কাটাখড় মাটিতে তৈরী বাড়ীটা গালার মতো জ্বলতে লাগলো। দোতলায় হরনাথ তার বৌ, চার ছেলেমেয়ে দুই বোন। উফ্ সে কি চিৎকার। দোতলার বন্ধ কপাট খোলার জন্যে সে কি আকুলি বিকুলি।

কিন্তু দু ইঞ্চি লোহার পাত ভেদে এক তরুন মানুষের চীৎকার, গোঙানি। লাল। ছোঁয়া কার সাধ্য। দোতলায় প্রায় বুকের বরাবর জল হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত দোতলার ছাদের টালি ভেঙ্গে বাঁচানো হয়েছিলো ওদের। হরনাথের বাবা জন্ম হার্টফেল করেছিলো। একটা শিশুর শরীর ঝলসে গিয়েছিলো। তবে সে মরে নি। সেই রাতটার কথা ভাবলে আজও অজিতের মন খারাপ করে।

মশালের আলোয় এখন ঝলমল করছে সামনেটা। মানুষগুলোর শরীর পরিস্কার দেখা যায়। মাথায় ফেট্টি। তেলকুচকুচে শরীর। মুখে চুনকালি। খালি গা কোমরের নীচে লেংটি, গামছা কিংবা ইজের। সকলের হাতেই সড়কি, হেঁসে, ভোজালি। গোটা চারেক বন্দুক। পাশ পনেরো বিশজনের দল। গোঁফওলা, ধুতি পরা তাগড়াই চেহারার লোকটা বোধহয় কপিল। কাঁধের ওপর বিদেশী রাইফেল দেখে অন্ততঃ তাই মনে হয়। অজিতের থেকে ওরা এখন একশো গজও দূরে নয়। ওদের বড়চড়ে মুখে চোখ দুটো শুধু নড়াচড়া করে। নীচু গলায় কথা বলছে কেউ কেউ। নিরুদ্বিগ্ন, মেজাজি হাঁটা। কোনো ভয়ডরের ব্যাপার নেই। মাঝে মাঝে গুঁড়ির আড়ালে হারিয়ে পরক্ষণেই ভেসে উঠছে কপিলের শরীর। অজিত পলকহীন দেখছে লোকটাকে। লতাপাতার ফাঁক দিয়ে ওর বন্দুকের নলটা ধীরে ধীরে ঘুরছে। ট্রিগারে আঙুল ঘন হয়। ঘন গাছপালার জন্যে লক্ষ্য ঠিক করা মুস্কিল। সুযোগ বুঝে অজিত এক সময় ট্রিগারে চাপ দেয়। ধবালো আলোর সঙ্গে ফাঁকা অন্ধকারে পয়েন্ট টু-টু রাইফেলের ভীষণ শব্দ ফেটে পড়ে। তখনি শুরু হয় বোমার বৃষ্টি। নিষ্পন্ন অন্ধকার, অরণ্য পৃথিবী কেঁপে ওঠে। ওরা পিছু হটে। ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কিশোররা ওদের ঘিরে ফেলে। গোটা চারেক মশাল ছিটকে ঘাস পাতার ওপর পড়ে দাউ দাউ জ্বলে। অন্ধকারে অনেক লোক ছুটোছুটি, দাপাদাপি। সাতজন ধরা পড়ে। তিনটে বন্দুক পাওয়া যায়। কপিল তার বিদেশী যন্ত্র নিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে।

এখন একটা মশাল জ্বলছে। বাকী গুলো পুনাই নিভিয়ে দিয়েছে। ওগুলো গাঁয়ে থাকলে তিন রাত কুলিমুজোর উৎসব হবে। সারা জঙ্গল জেগে গেছে। গাছে গাছে পাখীদের হল্লা। এই অরণ্যে এ ধরনের উৎপাত তারা আগে দেখে নি। হাজার গলায় কিচিরমিচির আলোচনা। বোমা বন্দুকের শব্দ জঙ্গল, মাঠ ঘাট পেরিয়ে অনেক দূরে ছড়িয়ে গেছে। আশপাশের গাঁয়ের মানুষও জেগেছে। তাদের কোনো সাড়া নেই। মাইল দুই তিন দূরে সি আর পির ক্যাম্প। তারাও হয়তো আওয়াজ পেয়েছে। যে কোনো মুহূর্তে এই জঙ্গল ঘেরাও হবে।

কিশোর বলে—চটপট পা চালাও। এই অন্ধকারে, অপরিচিত এলাকায় পুলিশ আসতে ভয় পায়। এতোদিন তারা দিনের বেলা হানা দিয়েছে। কিন্তু আজকাল রাতেও ঘিরছে। গাঁয়ের জোতদার যার রক্ষণ বাহিনী পথ দেখাচ্ছে, মনে হচ্ছে। কিশোরের কোনো সন্দেহ নেই যে কাল তাঁতলাই ঘেরাও হবে। তার আগেই ওরা ডেরা পালটাবে। অন্ধকারে বন্দী সাতজন মানুষকে মাঝখানে রেখে ওরা গাঁয়ের দিকে এগোয়। জঙ্গলের বাইরে আসতেই শরীরে নদীর হাওয়া লাগে।

পাশে রবিকে দেখে কিশোর বলে—তু বরুর সাথে দেখা করিস না ক্যানে?

রবি সাড়া দেয় না। অন্ধকারে তার মুখটাও আবছা। কালই তু একবার ঘরকে যা—কিশোর বলে।

রবির বুকের মধ্যে কি এক কষ্ট চিনচিন করে। ঘরে যাবার ইচ্ছে তারও কম নয়। কিন্তু যাবে কি করে? পুঁইশার শরীরে কাপড় নেই। উলিঝুলি, পুরোনো একটা টানা জড়িয়ে ও দিন কাটাচ্ছে। তার ওপর নির্মলার সঙ্গে গাঁয়ে গাঁয়ে বাঘা ঘোষার ও চটেছে। উটা একটা ডান বটে, তুকে খাবে। বাঘা বোঝাতে চেয়েছে—পার্টির বারণ, বুঝা মানিস না। পুঁইশা বোঝে নি। রাগে গরগর করেছে। বুড়ো গরমরা মরার পর পুঁইশা একদম খুস মেরে

পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভে একমাত্র সহায়ক ৩০০০ বৎসরের পুরাতন প্রকরণ

ডাবরের চ্যবনপ্রাশ চার প্রকারে পরিবারকে স্বাস্থ্যসম্পন্ন রাখে

ভিটামিন 'সী' ভরপুর অম্লমধুর স্বাদে ভরা একটি অকৃত্রিম সংমিশ্রণ

১ দেহস্থ কোষগুলি সতেজ রাখে
ডাবরের চ্যবনপ্রাশ দেহস্থ কোষগুলির ক্ষয়ক্ষতি বেশি হতে দেয় না।

২ দেহে রোগ প্রতিরোধের শক্তি বাড়ায়
ডাবরের চ্যবনপ্রাশ সেবন করলে দেহ স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা লাভ করে। সর্দি-কাশির রোগীও এই সেবন করার বিধি দেওয়া হয়।

৩ স্ফূর্তি জোগায়
ডাবরের চ্যবনপ্রাশ শিশুদের চঞ্চলতা আনে স্ফূর্তি জোগায়। বয়স্কদেরও মানসিক আর শারীরিক ক্ষমতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

৪ এতে আছে দেহস্থ কলাপুষ্টির গুণ
ডাবরের চ্যবনপ্রাশ দেহকে পূর্ণতঃ গঠন করার শক্তি রাখে।

দৈব প্রকরণ—
কথিত আছে ৩০০০ বছর পূর্বে চ্যবন ঋষিকে নবযৌবন দানের জন্য দেব বৈদ্যগণ এই সংমিশ্রণ তৈরী করেন। পৃথিবীর প্রাচীনতম ঔষধ হইলেও অধুনা ডাবর দ্বারা স্বাস্থ্যপূর্ণ ও আধুনিক উপায়ে এবং চালিত যন্ত্রে ঐ ঔষধ তৈয়ারী করা হয়।

এক কেজি প্যাকের সঙ্গে বিনামূল্যে একটি চামচ।

একটি আয়ুর্বৈদিক স্বাস্থ্য বর্ধক টনিক

ডাবরের চ্যবনপ্রাশ

কেমিস্ট আর ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়।

গেলো। বাবা বাড়ী ছিলো না। সিধ নদীর চড়ায় শ্মশানে গাঁয়ের লোকেরা গরমবাব আধ পোড়া দেহটা পুঁতে দিয়েছিলো। পুলিশ দাঁড়িয়ে দেখেছে সব। এখন ও পার্টিকে পর্যন্ত যেন্না করতে শুরু করেছে।

বন্দী সাতজন জাক্সতের পাঁচজন শেষ আর বাউড়ি। দুজন পহাড়িয়া। ওরা মুখ নীচু করে হাঁটছিলো। জীবনের শেষ রাতটা যে এমন নিঃসাড়ে সামনে এসে দাঁড়াবে এটা ওরা ভাবেনি। নিজেদের ঘর বাড়ী। বেটা বেটির কথা দু একজনের মনে পড়েছিল।

অন্ধকারে হঠাৎ হুসহাস শব্দ তুলে মংলু ছুটে আসে। জল ঝপঝপে শরীর। নাকের ফুটো দিয়ে যন কালো রক্ত বুক ভেসে যাচ্ছে। তেকোনা শক্ত কালো মুখে চাকচাকা লাল দাগ। ভেতরে লোমের মত পাকানো কালো চুল মাথায় লেপটে আছে। খাটো ধুতি বেয়ে জল ঝরছে। ওকে দেখে ভীড়টা থমকে দাঁড়ায়।

তোর কি হয়েছে কিশোর ওর কাঁধে হাত রাখে।

মংলু তখনও কাঁপছে। আমি কপিসের পিছা করছিলুম—মংলু বলে জড়িয়ে পক-ছিলাম কি মাল্লটাই মারলে বাপ। আমে উব করে ছাড়াষ নিইচি। মংলু হঠাৎ নিজের টাঁক থেকে কি যেন বার করে। কিশোর দেখে একটা কান। রক্ত মাখা লাল একটা মাংসের টুকরো। ওর শরীর শিউরে ওঠে। মংলু বলে যায় উ রমা কাঁদড়ে ঝাঁপ ছিলো। আমেও ঝাঁপালেম। কিন্তুক আঁধারে কিছু ধাত্তর হল না বটে। কুথায় যে হুশ করে ছুপিয়ে গেলো। মশালটা নিভে এসেছে। চ্যালাকাঠের টুকরো আগুন ছড়িয়ে পড়ছে রুবি বলে জলদি পা চালাও হে।

রাজনগর হাসপাতালের পুব দিকের উঁচু জমিটায় সি আর পির ক্যাম্পটা হয়েছে। আসবেস্টসের ছাত। পাকাপোক্ত স্থায়ী গাঁথুনির অফিস হলেত। সেটাকে ঘিরে পঞ্চাশ ষাটটা ত্রিপলের তাঁবু। দেখে মনে হয় মিলিটারি ব্যারাক। মাঠটা লম্বায় চওড়ায় পাঁচ সাত একরের কম নয়। মাঝখানে একটা বড়ো বাঁওড়। খুব গভীর। সারাবছর জল থাকে। বিলিফের টাকায় কাটা হয়েছিলো বাঁওড় এবং চারপাশের মাঠ ও নাবাল জমির মালিক ঈশ্বর মন্ডল। সরকারী জলকর সে ভোলদখল করছে। বাঁওড়ের জল চাষের কাজে লাগায়। বর্ষায় মাছ ফেলে। চৌকিদার পাহারা দেয়। আশপাশের গাঁয়ের মানুষ গরু এখানে নাইতে যায়। ব্যস ওই পর্যন্ত। মাছ ধাওয়া বা সেচের কাজে পাবলিকের অধিকার নেই। মাঝে মাঝে গাঁয়ের মানুষের রাগ চনিয়ে ওঠে। গাঁগাঁই শুরু হয়ই তখন ঈশ্বর মন্ডলের ভাই, সিংহ মার্কা পার্টির এম এল এ ভগবান মন্ডল হস্তক্ষেপ করে। কিছু ভেস্টে জমি বা কংগ্রেসী বদমাশদের জমি দখল হয়। ধুনিতে জল পড়ে। এইভাবে সাতান্ন সাল থেকে চলছে। ঈশ্বর আর ভগবান গলা জড়াজড়ি করে [illegible]। ভোরে আমরা সি চালাক। গরীব গেঁয়ো মানুষগুলো জানে ভগবান ছাড়া তাদের গতি নেই। জান আর মান বাঁচাতে তাদের জমির লড়াইয়ে ভগবান মদত দেবে।

সি আর পি ক্যাম্প বসায় ঈশ্বর মন্ডল খুশী। পাথুরে বাঁজা মাটি। ফসল দেয় না। ওখানে পুলিস থাকলে তার থেকে অনেক সুবিধে। তার চাষে এই মরশুমে কোনো শালা হাত দিতে পারবে না। পুকুরের মাছগুলোও বাড়বে। সি আর পি আসার সময় ভগবান মন্ডল রাজনগর থেকে সাতমাইল দূরে বিলকান্দিয় বাড়ীতে ছিলো। বিলকান্দি বিহারের গাঁ। ওখানে ভগবানের দুজন মেয়েমানুষ আছে। বাউড়ী মেয়েটার বয়স একুশ হবে। মালের জানের পদ্মরাণী। ভগবানের সমবয়েসী, বাহান্ন পেরিয়েছে। সাতদিন পরে ভগবান রাজনগর ফিরলো। জেলার কাগজে কড়া বিবৃতি দিলো বাম গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশী আক্রমণ সহ্য করা হবে না। ঈশ্বরকে বললো জমিটা সি আর পিকে দিয়ে খুব ভাল কাজ করেছো। এবার শালারা পেছনে যাবে।

হেমন্তের শেষ বিকেল। আবছা লাল অন্ধকার বাদামী মাটি, গাছলতা অরণ্যের দেহ জড়িয়ে আছে। মুছে যাওয়ার আগে শেষবার পৃথিবীকে আদর করছে। পাকা ধানে হাওয়ার নাচানাচি। ভগবান মন্ডলের বৈঠকখানায় অন্ধকার একটু গাঢ় লাগে। অন্দর থেকে এখনো হ্যারিকেন দেয় নি। এক পাল মশা মাথার চারপাশে ভ্যান ভ্যান করছে।

সামনে মাদুরের ওপর ভগবানের দু-চারজন চেলা। এতোক্ষণ তাদের আবছা দেখা যাচ্ছিলো। অন্ধকার ঘন হওয়ায় এখন তারা অদৃশ্য। নিঃশ্বাস আর নড়াচড়ার শব্দ শোনা যায়।

নগেন্দ্র বললো, পাঁচশো বছর আগে রাজা বীর সিংহের আমল। গুজরাট পর্যন্ত বাঁকড়ুমের সীমানা ছিলো। তুর্কী রাজা বাবরের আক্রমণে ধ্বংস হয়। সেই থেকে এবার গাঁয়ের গরীবদের দুঃখ অনটনের শুরু, এখানে হিন্দু প্রজাদের দুর্দশা। নগেন্দ্র এবার গাঁয়ের গরীবদের দুঃখ অনটনের কাহিনী শুরু করলো। গলায়, নাকে কান্না আটকে সে কি ফোঁসফোঁসানি। অন্ধকারে কেউ তার মুখ দেখে না। কিন্তু দরদের গভীরতা টের পায়। নগেনের আদিখ্যেতায় ভগবান মন্ডলের গা জ্বলে। মহা কুচুটে পেটপাতলা লোক। নেহাত ওর হাতে শ পাঁচেক ভোট আছে তাই ভগবান ওকে খাতির করে। বাড়ীতে ঢুকতে দেয়। তার ওপর স্বজাতি। লজ্জায় পাতায় কি একটা আত্মহিত্যা আছে। বাড়ীর ভেতর থেকে একটা টিমটিমে হ্যারিকেন দুলতে দুলতে এগিয়ে এলো। কলকাতার সাংবাদিক সোজা হয়ে বসে। রাজনগর থানার হালদা হুজুত নিয়ে সে এতোক্ষণ ভগবানের সঙ্গে কথা বলছিলো। ফ্যাকাসে আলোর দিকে তাকিয়ে সাংবাদিক জিজ্ঞেস করে আপনার এলাকায় ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা নেই?

চেষ্টার শেষ রাখি নি ভাই—ভগবান বলে—স্কীম পাশ হয়েছে। এবার হয়ে যাবে। নগেন্দ্র সায় দেয়। মনে মনে বলে—ইলেকট্রিক এলে তোমার কেরোসিনের ব্যবসা লাটে উঠবে।' দরজার সামনে একটা সাইকেল এসে দাঁড়ায়। কিংকিং বেল বাজে। একজন অচেনা লোক বাড়ীর কুকুর এক পা লাগিয়ে ভগবানকে ডাকে। ভগবান লোকটার মুখে টর্চ মারে। অন্ধকার চিরে লোকটার মুখ ঝলসে ওঠে, ইনস্পেকটর কুণ্ডু। আপনাকে সি-আই সাহেব এখুনি একবার ডাকছেন—কুণ্ডু বলে।

আমকে কেন—ভগবান বিরক্ত হয়।

জানি না। খুব দরকার।'

সাহেব কোথায় ?

ক্যাম্প অফিসে।

টর্চ নিভে যায়। আবার থৈ থৈ অন্ধকার। সাইকেলের ঘন্টি বাজিয়ে কুণ্ডু চলে যায়।

নগেন্দ্র যাবে নাকি—ভগবান জিজ্ঞেস করে।

আমার যে বাড়ীতে একটু কাজ আছে দাদা, নগেন্দ্র কাটাতে চায়, বকনা গরুটা হয়তো এখুনি বিয়োবে। বাগালটা আনাড়ী। আমি না থাকলে উল্টোপাল্টা কি করে বসবে, কে জানে।

ভগবান চটে যায়। মুখে কিছু বলে না। ওপক্ষ পাড়ার ভূষণকে বলে—তবে তুই চল। ভূষণ এই ভয় পাচ্ছিলো। কিন্তু না বলতে পারে না। আজকাল থানায় যাওয়ার নাম শুনলে সকলের বুক কাঁপে। কে কোথায় দেখে ফেলবে। তখন জান নিয়ে টানাটানি।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ভগবানের বাড়ীর বৈঠকখানা খালি হয়ে যায়।

ভূষণকে পাশে নিয়ে ভগবান অন্ধকার মেটে পথ পেরিয়ে বড়ো রাস্তায় আসে। রাস্তার দুধারে দোকানগুলোর ঝাপসা অন্ধকার। দু একটাতে টেমি জ্বলছে। দালাল এন্ড সন্সের কাপড়ের দোকানে হ্যাজাকের আলো। বেশ বড়ো দোকান। দিনের আলো থাকলে ভগবান শালবনের মধ্যে দিয়ে পায়ে হাঁটা রাস্তা ধরতো। ওটা সার্টকাট। সময় এবং খাটুনি বাঁচে। আজ-কাল সন্ধ্যের পর আর ও রাস্তায় হাঁটতে সাহস হয় না।

সি-আর-পি ক্যাম্পের আগে রাস্তার বাঁদিকে বারেনগর থানা। অন্ধকার থমথম করছে। গেটের মুখে রাইফেল হাতে সেন্ট্রি।

সে ভগবানকে সেলাম করে।

বড়োবাবু কোথায় ভগবান জিজ্ঞেস করে।

[illegible] সি-আই সাহেবের ঘরে।

(চলবে)

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সোনার হরিণ নেই

।। একত্রিশ ।।

খুব সকালে ঘুম ভেঙে গেল। পায়ের পুরু কম্বল সরে গেছল। সেটা টেনে নিয়ে আবার ঘুমোতে চেষ্টা করল। এত শীতে গায়ত্রী রাইয়ের সাড়ে সাতটার আগে ঘুম ভাঙে না। মেয়ে আরো দেরিতে ওঠে। কিন্তু কি মনে পড়তে গরম আরামের তলায় ঘুমের চটকা ভেঙে গেল। কম্বলটা মুখ থেকে গলা পর্যন্ত নামিয়ে চোখ মেলে তাকালো।

পাহাড়ের বাংলোয় নয়, বানারজুলিতে নিজের বাংলোয় নিজের বিছানায় শুয়ে। পাঁচ দিন বাদে গত সন্ধ্যায় সকলকে নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে এসেছে। নভেম্বরের শেষ দিন গেছে সেটা। আজ ডিসেম্বরের পয়লা। ওই পাঁচ দিনে প্রত্যাশার বাইরে মহিলার অনেক পরিবর্তন দেখেছে বাপী।

...সেই রাতে মা ছেড়ে মেয়ের মধ্যেও এমন কিছু নাড়াচাড়া পড়েছিল যে কারো মুখে একটি কথা সরেনি। নিঃশব্দে ডিনারের পাট শেষ হয়েছে। আগের রাত যে কোণের ঘরটায় থাকত ঝগড়ু, সেই ঘরেই বাপীর শোবার ব্যবস্থা করেছে। বাড়ির হাওয়া দেখেই হয়তো তারও মুখ শেলাই। সঙ্গে করে শোবার ঘরে নিয়ে আসার পর ফিসফিস করে না জিজ্ঞাসা করে পারেনি।—কি হয়েছে বাপীভাই? ভয়ের কিছু?

সেই রাতে আর কথা বলার মেজাজ বাপীরও ছিল না। টান-ধরা স্নায়ুগুলো সব শিথিল হয়ে গেছল। ক্লান্ত লাগছিল। মাথা নেড়েছিল শুধু, ভয়ের কিছু না।

ঘরের কাঁচের জানলাগুলো সব বন্ধ। তবু বেশ শীত। বিছানায় পায়ের কাছে গায়ে দেবার কম্বল ভাঁজ করা। তবু গায়ের সোয়েটারটা খুলবে না সবসুদ্ধই কম্বলের নিচে ঢুকে পড়বে ভাবছিল।

ঝগড়ুর চকিত মুখ দেখেই বাপী ঘুরে তাকিয়েছিল। ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে গায়ত্রী বাই। সেই রকমই ফ্যাকাশে সাদা মুখ। তেমনি নির্বাক। চোখাচোখি হতে এগিয়ে এলো। ঘরের চারদিকে চেয়ে দেখল একবার। বিছানা দেখল। কম্বলটাও। তারপর ঝগড়ুর তটস্থ মূর্তির দিকে একবার তাকিয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ওই তাকানোর অর্থ সঙ্গে আসার ইশারা বুঝে ঝগড়ুও পিছনে চলল। বাপী খোলা দরজার দিকে চেয়ে রইল খানিক। তারপর বিছানায় বসল। মিনিট পাঁচ-সাতের মধ্যেই ঝগড়ু ফিরে এলো আবার। তার হাতে ভাঁজ-করা একটা মোটা সাদাটে কম্বল। মুখে চাপা উত্তেজনা। যেন প্রায় অসম্ভব কিছু ঘটে গেছে। হাতের কম্বল বিছানায় ফেলে আগের কম্বলটা তুলে নিল।

এই কম্বলে হাত দিয়েই বাপী বুঝল খুব দামী জিনিস। ওপরের দিকটা খড়খড়ে। নিচের দিকটা পশমের মতো নরম। আর তেমনি গরম যে বোঝাই যায়। বাপী বলেছিল যেটা ছিল তাতেই তো হয়ে যেত.....

জবাব ঝগড়ুর চাপা বিস্ময় আর চাপা খুশি। —মালকান যে নিজে হাতে এটা বার করে সেখাকে দিয়ে যেতে হুকুম করল! এটা সাহেবের কম্বল ছিল বাপীভাই, সাহেব চলে যেতে মালকান এটা যত্ন করে তুলে রেখে-ছিল—এই প্রথম নজরানো হল।

বাপী আজ নিজের ঘরে নিজের বিছানায় শুয়ে। কিন্তু গায়ে সেই কম্বল। গায়ত্রী বাই এটাও সঙ্গে নিয়ে এসেছে জানত না। কাল সন্ধ্যার পরেই পাঠিয়ে দিয়েছে।

শুধু এটাই নয়। বিগত বীরেশ্বর রাইয়ের আরো কিছু সযত্নে তোলা দামী জিনিস এখন বাপীর দখলে। ওই দেয়ালের হ্যাঙ্গারে ঝুলছে। গলা থেকে পা পর্যন্ত পশমের ড্রেসিং গাউন। তাতে কাশ্মীরি কাজ করা। চোখে পড়ার মতো জিনিস। কোথায় কি-ভাবে যত্নে রাখবে ওটা বাপীর এখন সেই সমস্যা।

পাহাড়ের বাংলোয় পরদিন সকালে চায়ের পাট শেষ হতে বানারজুলি ফেরার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। গায়ত্রী বাই নিজের মনে ভাবছিল কিছু। মেয়ে ফস করে বলে উঠল, বাপীর সঙ্গে আমরাও নেমে যাই চলো না মা, এ জাইয়ের জায়গা আর ভালো লাগে না—আর কত শীতের জন্য অপেক্ষা করবে?

গায়ত্রী রাই মেয়ের দিকে চেয়ে রইল একটু। তারপর বাপীর দিকে। বলল, তোমার এখন যাওয়ার দরকার নেই, দিন কয়েক বাদে একসঙ্গেই যাওয়া যাবে।

ঊর্মিলা মায়ের সুবিবেচনা দেখে খুশি। কর্ত্রী এরকম হুকুম করতে পারে বাপীর কল্পনার মধ্যে ছিল না। মেয়েকে সঙ্গ দেবার জন্য এই নির্দেশ, একবারও মনে হয়নি। দ্বিধাগ্রস্ত মুখে বাপী বলেছিল, জামা-কাপড় কিছু সঙ্গে আনা হয়নি...

পাছে মা আবার ওকে যেতে বলে, ঊর্মিলা আগ বাড়িয়ে বাধা দিল, তোমার অমন বাজ-সস্তা ভুটান শহরে পাওয়া যাবে না নাকি! সঙ্গে সঙ্গে হাসি। —আর না পাওয়া গেলেই বা, আমার আর মায়ের শাড়ি পরেই কটা দিন কাটিয়ে দিও।

মেয়ের বাচালতায় মা হালকা ভ্রূকুটি করে একবার তার দিকে তাকালো শুধু। তারপর বাপীর দিকে। সোয়েটারের ওপর আলোয়ান চড়িয়েও সকালের শীত মানছে না, বুঝল যেন। কিছু না বলে উঠে চলে গেল। একটু বাদে ফিরল যখন হাতে ওই কাশ্মীরি কাজ-করা পশমের ড্রেসিং গাউন।

—এটা পরে দেখো তো।

জিনিসটা জানা আর কত যত্নে ছিল বাপী দেখেই বুঝেছে। মায়ের বদলাতার

মেয়ে অবাক যেমন খুশিও তেমনি। বাবার এসব জিনিস মা হাতে ধরে কাউকে তুলে দিতে পরে ভাবা শক্ত যেন। গত রাতে বাবার কম্বল ঝর করে দেবার কথাও ঝগড়ুর মারফৎ ওর কানে গেছে, বাপী সেটা পরে বুঝেছে। ফাঁপরে পড়ার দাখিল। বলেছে, না, না, এর কিছু দরকার নেই—আমার কষ্ট হচ্ছে না।

কোনো কিছুতে বাধা পড়লেই বিরক্ত মুখ। —আঃ! পরে দেখতে বলছি না!

মেয়ে তাড়াহুড়ি উঠে এসে মায়ের হাত থেকে গাউনটা নিল। আলোয়ান খুলিয়ে নিজের হাতে ওটা পরালো তাকে। অস্বস্তির একশেষ। সামনে এসে নিজের হাতে কর্ডের বেল্টও লাগিয়ে দিল। তারপর সকৌতুকে আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে বলে উঠল, ফার্স্ট ক্লাস!

বড় জানলাটার সামনে টেনে নিয়ে গেল ওকে। কিন্তু আয়নায় বাপী নিজেকে দেখবে কি। আয়নার পরনারী রাইয়ের দিকে চোখ পড়তে সে যেন অভাবনীয় কিছুই দেখল। রুক্ষ মুখে কমনীয়তার এমন ঢল নামতে পরে স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না। দেখেই বুকের ভলায় আর ৫ মুখ আঁতিপাতি করে খুঁজতে ইচ্ছে করে যেন। প্রায় অদেখা মায়ের মুখ। ওর দিকেই চেয়ে আছে। আয়নার ভিতর দিয়ে চোখাচোখি হতে বাপী সরে এসেছিল।

বেডফোর্ডের অছিলায় ঊর্মিলা আরপর ওকে বাগানে টেনে এনেছে। তারপর হাসিমুখে টেনে টেনে বলেছে, কাল বাবার কম্বল পেয়েছ, আজ গরম গাউন পেলে, আরো কত কি পাবে ঠিক নেই—আমারই কপাল মন্দ!

—কেন?

—কেন আবার কি, এসব কি তোমার ভোগের কথা নাকি!

—বিজয় মেহেরার পাবার কথা?

—না তো কি?

—তা হলে শেষ পর্যন্ত এসব তার কাছেই যাবে।

—আর যেছে। মা-কে তুমি যা করে ফেলেছ..

ফোঁস করে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলতে গিয়েও খিলখিল করে হেসে উঠল।—তোমার বয়েস আর দশটা বছরও বেশি হলে মা মায়ের কম বলে কি-যে হত ভেবেই পাচ্ছে।

ঘাড় ফিরিয়ে বাপী বাংলোর দিকে তাকিয়েছে একবার। মহিলা বারান্দায় বসে। দূর থেকেও মনে হয়েছে ওদেরই দেখছে। মেজাজে থাকলে মেয়েটার জিভে লাগাম নেই। মা-কে নিয়ে এরকম রসিকতা একবার ঝনার-দুলিতেও করেছিল, ভোলেনি।

ঊর্মিলা হাসিমুখেই আবার বলেছে, বাবাকে আমি কত ভালবাসতাম জানো মা—আজ তার এসব জিনিস মা তোমাকে নামিয়ে দিল দেখে কি-যে ভালো লাগছে!

বাপীর মুখে দুটো আবেগের কথাই এসে গেছল এরপর। —নিজের মা করে চলে গেছে মনেও নেই, আর তোমার মাকে ছেলে মনে হচ্ছিল আমার মায়ের মুখখানাও বুঝি ওই রকমই ছিল। এমন আর ও'কে আগে দেখিনি।

খুশি মুখে মাথা ঝাঁকিয়ে ঊর্মিলা বলেছে, বাবার তুলনায় মা বরাববই গম্ভীর ছিল একটু, কিন্তু ভারী মিষ্টি ছিল। অনেক দিন বাদে আজ আমিও প্রায় আগের মতো দেখলাম। বাবা চলে যাবার পর থেকে একেবারে যাচ্ছেতাইভাবে বদলে গেল। কাল রাতে তোমার কথা শোনার পর বুঝলাম এতটা কেন হল। আশ্চর্য, বড় হবার পরেও আমাকে কিচ্ছু বলেনি।

পাঁচটা দিন বড় ভালো কেটেছে বাপীর। তার স্বাদ এখনো ভিতরে লেগে আছে। সর্বদা মনে হয়েছে বাইরে গুরুগম্ভীর কিন্তু ভিতরে স্নেহের আধার নিজের মাকেই যেন সামনে দেখছে। মহিলার অগোচরে তাকে দেখার জন্য থেকে থেকে দু চোখ লালায়িত হয়ে উঠেছে। আর মেয়েটাকেও বুদ্ধি খুব, অথচ সরল বটে। এই বন্ধুর কাছে আর যেন রেখে-ঢেকে চলার কিছু নেই। তাকে সব বলা চলে, সর্বরকমে বিশ্বাস করা চলে। মায়ের কথায় সায় দিয়ে যাগিয়ে দিলে গলা ছেড়ে ঝগড়া করেছে, মহিলার সামনেই তাকে তেল দেওয়ার খোঁটা দিয়েছে, আর বাপী রাগলে উঠে চুলের ঝুঁটি ধরে ঝাঁকাতে এসেছে। কিন্তু ফাঁক পেলেই বাপীকে নিয়ে পাহাড় থেকে লেমে এসেছে সমতলে মিরিবিলি কোথাও গিয়ে বসেছে। তখন কলকাতাকেও বরদাস্ত করতে রাজি নয়। যা শুনতে চায় যা বলতে চায়, তাতে তৃতীয় মানুষ ঠাঁই নেই।

শোনা আর বলার প্রসঙ্গ একটাই। বিজয় মেহেরা। তার চিঠি পেয়েছে। চিঠির লেনদেন এখনো কি করে চলছে ও আর সেটা প্রকাশ করতে রাজি নয়। না, একবার ধরা পড়ে কলকাতাকে আর এর মধ্যে টানেনি। তার থেকে চের সহজ ব্যবস্থা করেছে। একসঙ্গে চিঠি পেতে বিজয়ের দশ-বারো দিন খরচ হয়ে যায় শুনেই পাকা ব্যবস্থাটা কি করে করা আঁচ করতে অসুবিধে হয়নি। তবে তখন চিঠি পাবে ছেলে ও পাহাড় থেকে নেমে আসে, বিজয় মেহেরা লোক মারফৎ সিকিম থেকে চিঠি পাঠায়। ঊর্মিলার দিক থেকে কোনো অসুবিধে থাকার কথা নয়, তাকে চিঠি দিলেই হল। বিজয়ের চিঠির জন্য সবর কখন পাহাড় থেকে নামবে সেটা নিশ্চয় ঊর্মিলাই জানিয়ে দেয়।

বিজয় লিখেছে, ছবির কথা বাপী তারকদাকে আর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল—আলাপ চলেছে আর ভালোই লেগেছে। খুবে ফিরে ঊর্মিলার উদগ্রীব জিজ্ঞাসা, বিজয়কে বাপীর কেমন লেগেছে—তার সঙ্গে কথা বলে কি মনে হয়েছে। নাক মুখ কুঁচকে বাপী প্রথমে জবাব দিয়েছিল, থার্ডক্লাস।

সঙ্গে সঙ্গে গাট্টা উঁচিয়ে ঊর্মিলা চোখ পাকিয়েছে। —এই, খবরদার! তারপরেই আবেগে উন্মুখ। —ওর মতো ছেলেকে ভালো না লেগে পারে—খুব ভালো ছেলে—তুমি না!

—তুমি জোর করে বলালে, তাই।

—আঃ, বলো না!

বাপী স্বীকার করেছে ভালো লেগেছে।

সঙ্গে সঙ্গে খিগুণ আগ্রহে। —মাকে বলবে তাহলে?

—সর্বনাশ! আমার এ-কূল ও-কূল দু-কূল যাবে।

—এখন কে বলতে বলেছে, ও বিলেত থেকে ফিরে এলে মওকা বুঝে বলবে। বেশি আনন্দ হলে ওর হাত দুটো বাপীর মাথার ওপর চড়াও হয়। চুলের ঝুঁটি ধরে মাথাটা সামনে-পিছনে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলেছিল, তুমি দলে আছ যখন আমাদের ফিরে আর কেউ ঠেকাতে পারবে না—এ আমি খুব ভালো করে বুঝে নিয়েছি—বুঝলে বন্ধু? মা-ও মা—

বোকা মুখ করে বাপী বলেছিল, আমাদের বিয়ে মানে তোমার আর কার?

আবারে মাথায় ঠাস করে একটা থাপ্পড়।

পিকনিকে গিয়ে কি করে ওদের প্রথম দেখা হল আর সেদিনও ছেলে কি করে গুটি গুটি এতটা এগিয়ে এলো মনের আনন্দে গলগল করে মেয়ে সেই গল্পও করেছে।—গোড়ায় গোড়ার আমি ওকে বিশ্বাস করেছি না কাছে ঘেঁষতে দিতে চেয়েছি! নিজের মা-কে কি আমি চিনি না? কিন্তু এমন নাছোড়বান্দা কি বলব—লেগেই থাকল। আর কি সুন্দর সুন্দর চিঠি—জেনো এনজিনিয়ার ছেলে এত ভালো চিঠি লিখতে পারে তুমি ভাবতে পারবে না। অসভ্যতা থাকা, কিন্তু চিঠিতে একটা বদি খারাপ কথা থাকত।

বাপীর মনে হয়েছিল দেখতে চাইলে সে-সব চিঠিই অনায়াসে এই মেয়ে সামনে ফেলে দিতে পারে। কারণ আরো যে বলেছে তা বোধহয় এই বেপরোয়া মেয়ের স্বপ্নেরও সম্ভব। শেলাখারে বানারহাটে দুজনের ঝগড়ার কথা। ও ছেলে যেমন গোঁয়ার তেমনি অবুঝ। চুপচাপ বিয়েটা করে রেখে তারপর বিলেত যাবে। তা যে হয় না ওকে কিছুতেই বোঝানো যায় না। ফলে সত্যি সত্যি ঝগড়া দুজনের।—কি পাগলী আর কত অসভ্য জেনো, যদি বা বোঝানো গেল, পাঁচ-পাঁচটা ভালো করে চুমু খাবার আগে কিছুতেই রাজি হবে না।

মুখ লাল করে মেয়ে হেসে গড়াগড়ি।

বাপীর কান গরম। বুকের তলায় স্নেহচক্র। ওকে বুকে না দিয়ে নিজেকে যে নিলেম ভিজেড়ালে ভিখিরিটাকে চাবুকের মুখে রেখেছে। বেপরোয়া মেয়ের এমন সরল বিশ্বাসের মর্যাদা দেবার জন্য ওর মায়ের মন সত্যি মেয়াতে পারবে কে জানে। কিন্তু চেষ্টা যে করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ওই পাঁচ দিনের মধ্যে দুদিন সকালে জ্ঞান নিয়ে পারনারী রাই অলাসরদীপ থেকে ঘুরে এসেছে। কেন যা কি সবস্তরে বাঙলা কিছুই বলে যায়নি। সকাল আটটায় বেরিয়ে এগারোটার মধ্যে ফিরে এসেছে। স্নেহবশত দিন-কয়েক আরামে কাটিয়ে যাবার জন্য মহিলা বাপীকে এখানে বসিয়ে রেখেছে, এ [illegible]

অনুপস্থিতিতে ওকে এখন চিফ-একসিকিউটিভের মুখোমুখি হতে দিতে চায় না। তার সঙ্গে কথা বলার জন্যেই নিজে দৌড়ুবার গেছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু কি কথা হতে পারে বাপী মাথা ঘামিয়েও অনুমান করতে পারেনি।

বিছানায় আর ভালো লাগল না। উঠে মুখ হাত ধুয়ে এলো। বাইরে পাহাড়ের দিকটা ধূসর কুয়াশায় ছাওয়া। ঘড়িতে সাড়ে ছ'টা। পশমের ড্রেসিং গাউনটা পরে চটিয়ে বেরিয়ে এলো। সুমনের দিকটায় কুয়াশার সঙ্গে কাঁচা রোদের যেন রোঝাবুঝি চলেছে। কুয়াশার চাদর ফুঁড়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা। বাপী বারান্দা থেকে নেমে এলো। ঘাসের মাথায় আর মেহেদীর পার্টিশনে শিশিরের ফোঁটাগুলো রোদের ছোঁয়া পেয়ে মুক্তোর মতো ঝলমল করছে। শীত পছন্দ নয় বাপীর, কিন্তু আজ অন্তত অদ্ভুত ভালো লাগছে।

গেট খুলে এগলো। পাশের গেটে এসে দাঁড়ালো। এই বাংলো নিঝুম এখনো। ঘুম ভাঙিয়ে উর্মিলাকে রাদি হিড়হিড় করে টেনে বার করে আনা যেত, বেশ হত। কিন্তু বাপী জানে এই ভালো-লাগা সকালে যে-মুখখানা একঝলক দেখার লোভে সে-মুখ উর্মিলার নয়। তার মায়ের। ওর ভিতরে যে আর এক কাঙাল সেঁধিয়ে আছে কাঁদন আগেও জানত না। স্নেহের কাঙাল। বাপীকে আরো সাবধান হতে হবে। মহিলা বুঝে ফেললে কোন মূর্তি ধরবে কে জানে। ভালোর কাঙালিও ভালো। যেটুকু আপনি আসবে সেটুকুই ভালো।

গেট ছেড়ে বেশ অনেকটা পথ এগিয়ে গেল। তারপর রাস্তার পাশে এসে জঙ্গল দেখতে লাগল। থেকে থেকে পাতার ফাঁক দিয়ে জঙ্গলের বাতাস ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাসের মতো বেরিয়ে আসছে। সামনের গাছগুলোর বিবর্ণ পাতা থেকে টুপটাপ শিশির পড়ছে। একটা নীলকণ্ঠ পাখি অদূরের বাবলার ডালে তপস্বীর মতো বসে। এক জোড়া ফিঙে সকালের আলোয় হাবুডুবু খেয়ে নেচে বেড়াচ্ছে। বাপী চোখ চেয়ে দেখছে আর ভালো-লাগার স্বাদটুকু যেন চোখের ভিতর দিয়ে আরো গভীরে ছড়াচ্ছে।

জঙ্গলেই ঢুকে পড়ত হয়তো। অদূরে জিপের শব্দ কানে আসতে ফিরে তাকালো। তারপরই সচকিত। রণজিৎ চালিহার জিপ। নিজেই চালিয়ে আসছে। বাপীকে দেখেছে। কিন্তু লোকটার হঠাৎ অমন হাঁ হয়ে যাওয়ার কারণ কি বাপী চট করে ঠাওর করে উঠতে পারল না। জিপটা সামনে দাঁড়িয়ে গেল। বিস্ময়ের ধাক্কা লোকটার দু'চোখে লেগে আছে এখনো।

তক্ষুনি বাপীর খেয়াল হল, কি দেখে এত অবাক। গায়ের গরম ড্রেসিং গাউনটা। খুবই চেনা নিশ্চয়। এটা শেষ পর্যন্ত এই গাস এসে উঠতে পারে ভাবাও শক্ত বোধহয়। সামলে নিতে সময় লাগল না তা বলে।

—হ্যালো! গলার স্বরও অন্যরকম।—

জঙ্গলের শোভা দেখছ? আমি তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম আর ঘুম থেকে উঠেছ কিনা ভাবছিলাম।

এ বলে কি। গায়ত্রী রাই এরই মধ্যে এমন কি দাওয়াই দিয়ে গেল যে এই লোকের হাসি হাসি মুখে এমন কথা!

—কাম অন্ বয়। কাজের আহ্বানে—তোমার সঙ্গে কথা শেষ করেই আবার আমাকে ছোটাছুটির মধ্যে পড়তে হবে।

চুপচাপ জিপে উঠে বাপী তার পাশে বসল, স্টার্ট দিয়ে রণজিৎ চালিহা ঘাড় ফিরিয়ে আর একবার দেখে নিল ওকে। বিশ তিরিশ গজ এগিয়ে সামনের দিকে চোখ রেখে হালকা গলায় জিজ্ঞাসা করল, এই পোশাক তোমাকে মিসেস রাই প্রেজেন্ট করেছেন নিশ্চয়?

সকালের ভালো লাগার সুর অল মান সব একসঙ্গে কেটে গেল। বাপী ছোট জবাব দিল, হ্যাঁ।

—আই অ্যাম সো গ্ল্যাড। ইউ ডিজারভড ইট। ওটা যে পরত সে আমার কত কাছের মানুষ ছিল তুমি জানো না বোধহয়।

ঘাড় ফিরিয়ে ভালো করে মুখখানা দেখতে ইচ্ছে করছিল বাপীর। তিন-চার মিনিটের মধ্যে জিপ তার গেটের সামনে। তার আগে চালিহা আর সেই সঙ্গে বাপীও আগের বাংলোর দিকে চোখ ফিরিয়েছে, সকাল তখন সাতটা বেজে মিনিট কতক। বারান্দা মুখো দরজাই খোলা হয়নি এখনো।

বাপী আগে, চালিহা পিছনে। বারান্দায় উঠে চেয়ার এগিয়ে দিতে তেমনি সপ্রতিভ অন্তরঙ্গ সুরে চালিহা বলল, দাঁড়াও তোমার কোয়ার্টার্সটা দেখি আগে, এখন পর্যন্ত দেখাই হয়নি।

বাপীর সঙ্গে ভিতরটা দেখে বাইরে এসে বসল—ফর সিঙ্গল ইট্স ফাইন। বোসো—

—একটু চা খাবেন?

—চা খাই না। তোমার খাওয়া হয়েছে?

—পরে হবে, চেয়ারটা এবার টেনে বাপী মুখোমুখি বসল।

রণজিৎ চালিহা এবারে ঘটা করেছেযে রইল একটু। চোখে কৌতুক, ঠোঁটে হাসি। মজার কিছু ঘটে যাবার পর বসিয়ে দেখার মতো। বলল, মিসেস রাইয়ের সঙ্গে দুদিন আমার অনেক কথা হয়েছে, সবটাই তোমার কথা বলতে পারো। তুমি অত্যন্ত হার্ট হয়ে কাজ ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছ ও শুনছি, বাট নাও উই আর বিসেলি প্রাউড অফ ইউ। এ্যাক্ম যাচাইয়ের যেন দরকার হয়েছিল, হাতে কলমে এবার থেকে যে কাজ তুমি করবে, তাই থেকে নিজেই বুঝে নিতে পারবে। ....তাছাড়া যেইট এর সেই আট হাজার টাকা ব্যাংকে তোমার অ্যাকাউন্টেই জমা পড়েছে যখন বুঝতেই পারছ যাচাইয়ের ব্যাপারে কুয়েল হ্যালও হাউ জেনারাস আওয়ার লেডি কান্ বি।

বাপী হতভম্ব। আট হাজার টাকা

Rupa PAPERBACKS

Education :

CHARLES and MARY LAMB
Tales From Shakespeare 7.50

Prof. DUNCAN
How To Spell Correctly 8.00

H.J.C. GRIERSON edited
Shakespeare's Macbeth 12.00

HUGH JARRETT
How to Write English 5.00

IVAN ILLICH
Energy and Equity 6.00

IVAN ILLICH and Others
Education without Schools 10.00

Reference :

ALAN and VERONICA PALMER
Quotations in History 16.00

COLLINS Everybody's Family Dictionary 15.00

COLLINS Gem English Dictionary 8.00

TOWER
Tower's International Transistor Selector 60.00

Cooking :

PREMILA LAL
Indian Recipes 12.00

SIPRA DAS GUPTA
The Home Book of Indian Cookery 8.00

List of other books on application

Rupa & Co

15 Bankim Chatterjee Street
Calcutta 700 073

Also at :
Allahabad : Bombay :
New Delhi

ব্যাঙ্কে তার নামে জমা পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক। ও কিছুই জানে না বুঝলে এই লোক আবার অবাক হবে। দেখছে। কর্সা মুখে মোলায়েম হাসি। ভদ্র অন্তরঙ্গ। তবু ভিতরের মানুষটাকে বুঝতে বাপীর খুব অসুবিধে হচ্ছে না। সুন্দর আর নরম খোপের ভিতরের তীক্ষ্ণ ছোরা চোখে দেখা না গেলেই যা। অত মদ নয়। খেলে আর একটু মাথা খাটাতে পারলেই যে গায়ত্রী বাইয়ের জীবনের খাতা থেকে বাপী তরফদারের নামটা রবারবকার মতো মুছে দেওয়া যেত—সেই খেদ ভদ্রলোকের হাসিমাখা চেহারা আবার ভিতর দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে।

—সো বাপী, নো হার্ড ফিলিং—ফর মাই অন্ড উই আর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ইকোয়ালস—আই অ্যাম জাস্ট সিনিয়র—সেট্ মি ?

বাপী এবার হেসে মাথা নাড়তে বলল চালিহা দরজা হাত বাড়িয়ে ওর হাত ঝাঁকালো। তারপর চটপট কিছু কাজের কথা। আমরী পরশু সে আসাম চলে যাচ্ছে। এবারে মাস তিনেকের আগে হয়তো ফেরা সম্ভব হবে না। এবারকার একসপ্যানশন প্রোগ্রাম সব ওদিকে। শিলঙে নতুন ঘাঁটি করার ইচ্ছে আছে। মণিপুরেরও বাজার ভালো করার আছে, কিন্তু একলা আর কত দিক সামলানো সম্ভব ? এবারে এদিকের সব দায়িত্ব কাঁধে নেবার মতো একজন তাদের মধ্যে এসে গেছে যখন—চালিহার এখানে সমস্ত অপারেশন ফিল্ড দেখে শুনে বুঝে আসার ইচ্ছে। তার বিশ্বাস ওটাই একদিন এই ব্যবসার মেইন সেন্টার হবে। এদিকের কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে মিসেস বসু সবই জানেন। তবু অন্তত আজ কাল বাপী তার সঙ্গে ঘন্টা দুতিন করে বসে সব বুঝে নিতে পারে।

হাত ঘড়ি দেখল। আটটা বাজে। এবারে ওঠার তাড়া। বাপী জিজ্ঞাসা করল, মিসেস বসুর সঙ্গে দেখা করে যাবেন না ?

মুখের দিকে না চেয়ে শব্দ না করে হাসল। তার অর্থ, তোমার অনেক কিছু এখনো জানতে বুঝতে বাকি রয়ে। কিন্তু আজ আমায়িক। —এ দুদিন আমাকে কম করে চার পাঁচ ঘন্টা করে বসতে হবে তার সঙ্গে—আমার লাঞ্চ করে তিনজনেও এ দুদিন তার সঙ্গেই।

বাপীকে সঙ্গে আসার সুযোগ না দিয়ে হলঘরে গিয়ে ঢুকে পড়ল। ওর উদ্দেশ্যে হাতটা নেড়ে দিয়ে ঝিপ ছুটিয়ে বেরিয়ে গেল।

বাপী বারান্দায় এসে দাঁড়াল। পাহাড়ে গিয়ে এক দুপুরে উর্মিলার চোখে ধুলো দিয়ে এবারেও বাপী সেই জঙ্গলে গিয়ে ঢুকেছিল আর সেই গাছটার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল যেখানে বসে এক সাধুবাবা তাকে আগে বাড়তে বলেছিল, আর বলেছিল পেয়ে যাবে। কেবল তার দেখা পাবে আশা করেনি। পায়ওনি। তবু গেছল।

এগিয়েই চলেছে বটে। এমন দড়দাড় এগনোর জন্যেই নিজের কাছেই জবাবদিহি।

মনে মনে যা আঁচ করেছিল, তাই। ড্রাইভার বারান্দায় এসে খবর দিল, ব্রেকফাস্ট রেডি, মেমসাহেব ডাকছেন। ঘরে এসে বাপী গায়ের গাউনটা খুলে ফেলল। তার এগনোটা বাইরে চট করে বেশি প্রকট না হওয়াই ভালো। একটা সোফেটারের ওপর, আলোয়ান চড়িয়ে নেমে এলো।

তখন পর্যন্ত বারান্দায় গায়ত্রী বাই একাই বসে। নাকে সোনালি ফ্রেমের চশমা এঁটে খবরের কাগজ পড়ছে। পাশে আরো গোটা-কতক পুরনো খবরের কাগজ। এ কদিন কাগজের সঙ্গে যোগ ছিল না, তাই আট দশ দিনের কাগজ এক সঙ্গে নিয়ে বসেছে। টেবিলে তিনজনের তৈরি ব্রেকফাস্ট বেয়ারা সাজিয়ে দিয়ে গিয়ে থাকবে।

—বোসো। চালিহা এসেছিল ? খবরের কাগজে চোখ।

এমন একখানা খবর কি-ভাবে পেশ করবে ভাবছিল বাপী। প্রশ্ন শুনেই বোঝা গেল চিফ একসিকিউটিভের সাত সকালে নিজে ড্রাইভ করে আসার পিছনেও মহিলার কৌতূহল কিছু আছেই। আসবে যে সেটা তার জানাই ছিল যেন। আরো একটু ব্যতিক্রম বাপীর কান এড়ালো না। এ-ব্যাপারে এর কাছে চিফ একসিকিউটিভের নামের সঙ্গে 'মিস্টার' জুড়ে তার মর্যাদা উঁচিয়ে রাখা হত সর্বদা। এই প্রথম তার মুখে শুধু চালিহা শোনা গেল।

—এসেছিলেন। আপনি ডাকে আসতে বলেছিলেন ?

এখনো খবরের কাগজের ওপরেই চোখ। —আসতে বলিনি। যা বলেছি, বোকা না হলে আসার কথা। বোকা নয় জানলেই তো। পাতলা ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস স্পষ্ট হল। —তোমার বেশ সকালে ওঠার অভ্যাস তাও তাকে জানিয়ে দিয়েছিলাম, খবর পেয়ে কাল রাত ন'টায় এসেছিল, তখন আর তোমাকে ডাকিনি।

বাপী চুপচাপ চেয়ে রইল তার দিকে। খবরের কাগজ থেকে মুখ না তুললে এই মুখের দিকে এমনি ঠায় বসে থাকতে পারে। পাহাড়ে বাংলোর বাগানে বেড়াতে বেড়াতে উর্মিলা বলেছিল, তার মা যতবারই গম্ভীর দিল, কিন্তু ভারী মিষ্টি ছিল। হালকা গাম্ভীর্যের আড়ালের এই মিষ্টি দিকটাই দেখার চেষ্টা বাপীর। লোভও।

খবরের কাগজ সরিয়ে রাখল। টেবিলে কি দেওয়া হয়েছে একবার দেখে নিয়ে নিজের মুখ তার কনফেকশন-এর বাটি সামনে টেনে নিয়ে বলল, আরম্ভ করো, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

—ডলি কোথায় ? খুব সহজে আজ এই নামটাই মুখে এসে গেল, বন্ধুত্বের সে ভিতের ওপর তলা দাঁড়িয়ে তাতে কোনো দুর্বলতার ফাটল আর যেন ধরতেই পারে না।

—তৈরি তোলা হবেছে। মুখ হাত ধুয়ে আসছে। এই মেয়ের শরম পাওয়া স্বভাবে নেই, তুমি শুরু করো। আমো শীত চললে বাটার আগে ঘুম ভাঙবে না দেখবে।

এখানে নয়, পাহাড়ের বাংলোতেও উর্মিলা বেলা ন'টার মধ্যেই আসত। তারপর তার সঙ্গে ধনার তাড়া।

চামচে করে বাটির কনফ্লেক্স নাড়তে নাড়তে নিস্পৃহ মুখে গায়ত্রী বাই আবার জিজ্ঞাসা করল, চালিহা কি বলল ?

—বললেন, নো হার্ড ফিলিং এখন থেকে দুজনেই বন্ধু, সমান সমান, তবে তার মধ্যে উনি সিনিয়র। ... আমার অ্যাকাউন্টে ব্যাংকে আপনি লাখ হাজার টাকা জমা করে দিয়েছেন ?

গায়ত্রী বাইয়ের ঠোঁটে আলগা একটু হাসি ঝুলেছিল। টাকার কথা শুনেই পিছন ঘুরে দেখলেন একবার। —হ্যাঁ-হ্যাঁ। কিপ ইট, হোয়েন নিডেড মোর আই উইল অলসো ডিপোজিট। এমনিতেই খুব ইমারজি দিচ্ছে এখন।

—কিন্তু আমার খরচা লাগছে খুব—

আরো কিছু বলার ইচ্ছে ছিল। বাধা পড়ল।

—গুড মর্নিং মা। উর্মিলা। লম্বা ঘুমের দারুণ ফোলা ফোলা মুখ। মুখে আসা সত্ত্বেও ভেজা-ভেজা লাগছে। শুকনো পাকড়া চুলে মুকুটের মতো কটা জলের ফোঁটা বসে আছে। গায়ে পা পর্যন্ত ঢাকা ঢিলা হাউস কোট। বাপীর সামনে এসে দু হাত কোমরে তুলে দাঁড়ালো।—ঠিক জানি তুমি এসে জুটবে। আসবামা পেয়ে একবার মাথায় ওঠার মতলব—কেমন ?

নিরীহ মুখে বাপী ফিরে জিজ্ঞেস করল, কার মাথায় ?

—কি ? আমার মাথার দিকে এগোলে তোমার মাথা আস্ত থাকবে ? চেয়ার টেনে নিয়ে একটা টোস্টের আধখানা কামড়ে ছোট মেয়ের মতোই চিবুতে বসল।

বাপী বলল মায়ের তো মাথার দিকে এগনো যায় না, পায়ের দিকে ঝুঁকতে হয়।

সঙ্গে সঙ্গে ওর দিকে একটা আঙুল তুলে আর মায়ের দিকে তাকিয়ে জোড়া প্রতিবাদের চেষ্টা। কিন্তু রুটির সঙ্গে মুখ আধখানা ওমলেট গুঁজে দেবার ফলে কথার বদলে গলা দিয়ে গোঁ-গোঁ শব্দ বেরুলো শুধু। গায়ত্রী বাই ধমকে উঠল, এই ছেলে—গলায় আটকাবে।

মুখের জিনিস গো-গ্রাসে গলা করে ঢেঁচিয়ে বলে উঠল, ফ্যাটাটিথি মা, সে হচ্ছে ফ্যাটাটিথি—এই করেই তোমাকে যাবেলা করেছে।

—মা অত সহজে খালেস হয় না, তাই তাড়াতাড়ি খেয়ে চাটা লাল। জুড়িগেই গেল।

কিন্তু মেজাজ কোনো তাতা নেই। এই সকালে বাপীকে পাশে বাখার সমস্যাও যেন। আর এক দফা ডিম মুটি জল করে কাঁচালো গলায় বলল। —এই ছেলে, কাল

রাতে কোয়েলা তোমার ডিনার নিয়ে গেছল ?

—গেছল।

—আজ আর কাল যাতেও যাবে, পরশু থেকে যাতে তুমি এখানে খেতে আসবে। তোমার সকালে আপিস বলে কোয়েলা শুধু রোজ লাঞ্চটা দিয়ে আসবে। কাল রাতেই কোয়েলার ওপর মায়ের এই হুকুম হয়ে গেছে।....আর মনে হয় তোমাকে খরচ-টরচও কিছু ধরে দিতে হবে না।

এই গোছের প্রস্তাব আগেও এসেছে। বাপী নাকচ করেছে। শোনার পর এখনো বিব্রত বোধ করছে না এমন নয়। কিন্তু আর আপত্তি করাটা যেন আরো বেশি বেমানান।

গম্ভীর টিপ্পনীর সুরে গায়ত্রী বাই বলল, আর ওর বেঁধে খাওয়া নিয়ে তুই কি বলেছিলি ?

—বলবই তো। বাপী রান্নায় বসেছে দেখলে আমার মেয়েছেলের মতো লাগে।

তারপরেই খিলখিল হাসি। হাসির দমকে টেবিলের ডিশ ওলটানোর দাখিল। —সত্যি ! সবই হল, একটু কেবল বাকি বেচারী কোয়েলা ...

মেয়ের দিকে চেয়ে অল্প অল্প হাসছে ডক্টর মাও। কাকে ছেড়ে কাকে দেখবে বাপী। গায়ত্রী বাইয়ের মুখের ওপরেই হঠাৎ দুচোখ হোঁচট খেল একপ্রস্থ। মেয়েকে জব্দ করার মতোই কিছু যেন বলতে পারে, কিন্তু বলছে না। কি কি কি ? বাপীর মন অনেক

নিয়মিত কিছু কিছু জমিয়ে যান—
দেখবেন, আপনার যত সাধের জিনিস একদিন আপনার হাতের মুঠোয় এসে গেছে।

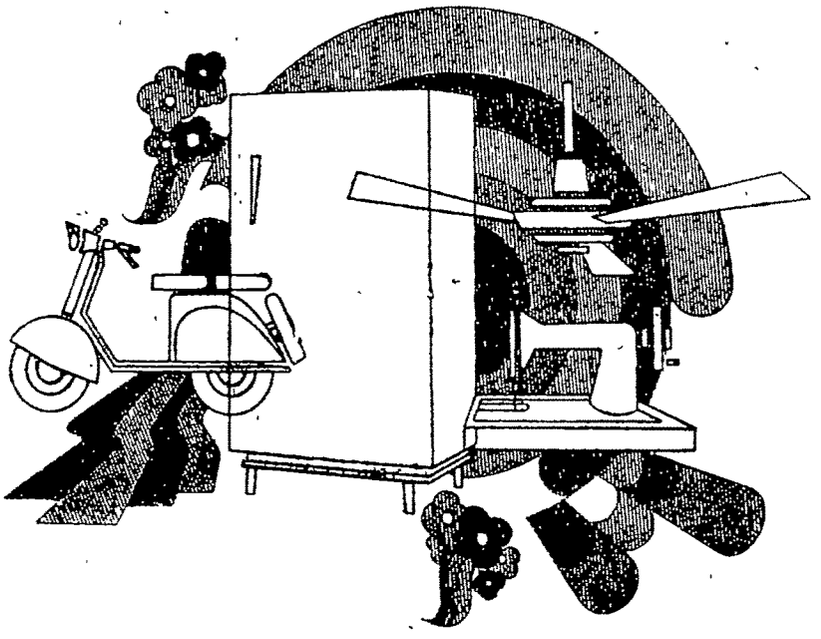

হ্যাঁ, এই আশাকে সাধ্যের কাজই করে এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের রেকারিং ডিপোজিট স্কীম

সঞ্চয়ের এই পরিকল্পনাটির সবচেয়ে বড়ো সুবিধে হচ্ছে, মাসে মাসে কতো জমাবেন সেটা আপনার পছন্দমতো আপনিই ঠিক ক'রে নিতে পারেন। কমসে-কম ১০ টাকা থেকে সর্বাধিক ১,০০০ টাকা অবধি, আর তা-ও ১ বছর থেকে ১০ বছরের মেয়াদে—যা আপনার খুশি।

এতে সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে সহজেই একটা আয়ও দাঁড়িয়ে যায়। ফলে, মেয়াদ শেষ হলে মোট যা পাবেন তা আপনার জমা টাকা থেকে ৫০ শতাংশ বেশী তো হবেই....তার চেয়েও বেশী হতে পারে। এমনি করেই তখন ইচ্ছেমতো কেনাকাটার সুযোগ আসে, বহুকালের সাধ ও স্বপ্ন সফল হয়।

বিস্তারিত জানতে হলে আপনার কাছাকাছি এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের শাখায় আসুন।

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক

আপনার নিজস্ব ব্যাঙ্ক

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

সময় অনেক কিছু তাকে আগাম বলে দেয়। সেই মনের দিকে তাকাবে ?

না। এমন প্রশ্নয় দেবে না। তাছাড়া গায়ত্রী রাইয়ের মুখের দিকে বা চোখের দিকে চেয়ে চকিতে যা মনে হয়েছে তা সত্যি হোক মিথ্যে হোক, বাপীর কাছে তার কানাকড়িও দাম নেই। যত সব আজগুবী কল্পনা।

কোয়েলা খাবারের ডিশগুলো নিতে আসতে গায়ত্রী রাই চিরাচরিত গাম্ভীর্যের খোলসে ঢুকে গেল। বাপীকে জিজ্ঞাসা করল, চালিহা আর কি বলল ?

জবাব দেবার আগেই উর্মিলার আর এক দফা খাদ্য খাবার দাখিল। —এর মধ্যে আংকল-এর সঙ্গে কখন দেখা হল আবার ?

গায়ত্রী রাইয়ের পাতলা ঠোঁটে হাসির দাগ পড়ল আবার। বেয়েলা চলে যেতে জবাব দিল, আজ ভোরেই বাপীর বাংলোয় এসে ওর সঙ্গে দেখা করে গেছে।

উর্মিলা একবার বাপীর দিকে তাকালো, তারপর বড় বড় চোখ করে মায়ের দিকে। —সত্যি মা, তুমি একখানা মেয়ে বটে !

বাপী জানালো, আজ আর কাল এদিকের সব কাজ বুঝিয়ে দেবেন বললেন। আর আসামের একসপ্যানশন প্রোগ্রামের আভাস দিলেন....তাঁর ধারণা, কালে দিনে আসামই আমাদের বিজনেসের মেইন সেন্টার হবে।

খুব ধীর ঠাণ্ডা গলায় গায়ত্রী রাই বলল, কালে দিনে আমরা অসামকে সারেণ্ডার করব ধরে নিয়ে তুমি এদিকের অর্গানিজেশন কতটা মবিলাইজ করতে পারো দেখো। তাকে মুখে কিছু বলার দরকার নেই। একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, মাস তিনেকের আগে সে ফিরছে না, এসময় পর্যন্ত জিপটা তুমি ব্যবহার করতে পারো। এর মধ্যে ড্রাইভিংটাও শিখে নাও।

গায়ত্রী রাই খবরের কাগজ টেনে নিল। উর্মিলার মুখে চাপা আনন্দের ছটা, চোখে চকিত চপল ইশারা। বাপী জিপের দখল পেলে আর ড্রাইভিং শিখলে ওরই যেন সমস্ত সুবিধে।

উঠে পড়ল। —মা তুমি তো এখন বেরুচ্ছ না, আপাতত আমি তোমার ভ্যানটা একটু ব্যবহার করছি—একটু ঘুরে আসব বেশি দেরি করব না।

অনুমতির অপেক্ষা না রেখে ভেতরে চলে গেল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফুলের ওপর গরম জামা চাপিয়ে বেরিয়ে এলো। ভালো করে মাথা আঁচড়ানোরও সময় নেই। বাপীর উদ্দেশ্যে একটু হাত নেড়ে দিয়ে মায়ের চোখ এড়িয়ে টক-টক করে নেমে গেল।

ভ্যানটা চোখের আড়াল হতে গায়ত্রী রাইয়ের ঠাণ্ডা দু চোখ বাপীর মুখের ওপর। —কোথায় গেল বুঝতে পারছ ?

বাপীরই ফ্যাসাদ। ঢোঁক গিলে জবাব দিল, বোধহয় রেশমার ওখানে....

রাগ না বিরক্তি না, আরো একটু গম্ভীর শুধু। —ও নেই, ভালোই হল। তোমার সঙ্গে কিছু কথা ছিল। ...মিরিকে বিত্তর মেহেরবান সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে কথা হয়েছে বলেছিলে, তার সম্পর্কে তোমার নিজের কি ধারণা ?

বিপাকে পড়লেও বাপী সত্যি জবাবই দিল।—ধারণা ভালই।

—ডালিব মুখ চেয়ে কিছু বলার দরকার নেই, তুমি আমার সঙ্গে কথা কইছ। এই মুখ সদয় নয় একটুও। —কতটা সময় দেখেছ তাকে যে এক কথায় সার্টিফিকেট দিয়ে দিলে ?

আবারও আমতা আমতা করে বাপী জবাব দিল, আমি তো ধারণার কথা বললাম....কথাও অবশ্য বেশ খানিকক্ষণ হয়েছে।

—কি কথা ?

—নিজের প্ল্যান প্রোগ্রামের কথা বলছিল।

—কি প্ল্যান প্রোগ্রাম, আরো ডিগ্রি পকেটে নিয়ে এলেও আমি চাইলে এই ব্যবসায় ভিড়বে ?

—ভিড়বে নাই বলল।

গায়ত্রী রাইয়ের চাউনি স্থির, তীক্ষ্ণ। এভাবে এই জবাবই আশা করেছিল। একটু চুপ করে থেকে আবার জিগ্যেস করল, দেখে কি মনে হল, ড্রিংক-টিংক বেশি করে ?

—সিগারেট একটু বেশি খায় দেখলাম। ড্রিংক-এর কথা অবশ্যই তুলে-ছিলাম। মাত্রা ছাড়িয়ে খায় না বলল।

ওই মুখের যে কঠিন রেখাগুলো খুব চেনা বাপীর সেগুলোই দাগ কেটে বসতে লাগল। —গোড়ার কাণ্ডো মাত্রা ছাড়ে না, শেষে কেউ মাত্রার মধ্যে থাকেও না। শোনো, তোমার কথায় আপাতত আমি চুপ করে আছি—ট্রাই টু গেট হার অফ দ্যা হুক এনিহাউ, যে নেশা আমার স্বামী কেড়ে নিয়েছে সে নেশা যে ছোঁবে তাকে আমি ত্রিসীমার মেয়ের ধারে কাছে ঘেঁষতে দেব না পাতাড়ে তুমি আমাকে বলেছিলে, সেই ছেলেকে হটানোর রাস্তা বার করা যায় কিনা তার সঙ্গে দেখা করার পিছনে সে চিন্তাও তোমার মাথায় ছিল। ...তিন বছরে আপনি যদি সব মিটে যায়, ভালো—নয়তো মাথায় রেখো।

মহিলার মুখখানা আবারও খুব ভালো করে দেখে নেবে বাপী ? যা বলল তার পিছনে আর কোনো ইংগীত খুঁজবে ?

চিন্তাটা মন থেকে ঝেঁটিয়ে সরালো বাপী।

ঘন্টা দুই কাজ বোঝালো রণজিৎ চালিহা। সবই যে সড়ক পথের কারবার এমন নয়। অনেক রকম মাদক জিনিস লেন-দেনের বৈধ পরোয়ানাও আছে। সব বড় পাইকারি খদ্দেরেরই লাইসেন্স আছে। হোলসেল ডিলার হিসাবে তাদের প্রাপ্য মাল সরবরাহের ব্যাপারে কোনো বাধা নেই। আবার কারচুপির বড় ফাঁকটাও সেইখানেই। প্রাপ্যর দ্বিগুণ নিচ্ছে কেউ কেউ তিন গুণ, কেউ পাঁচ গুণ। বাড়তি সাপ্লাইয়ের এই বিশাল ব্যাপারটা চলছে মুখের কথায় কাগজ-কলমের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। ফলে টাকা গুণে নিয়ে মাল দেবার পরে রাই অ্যান্ড রাই ডিলারের দায় শেষ। পাইকারি খদ্দেররা এই বাড়তি মাল কোন পথে কিভাবে পাচার করছে তা নিয়ে রাই অ্যান্ড রাইয়ের মাথা ব্যথা নেই। এই বাড়তি মাল বাঁধা দামের কিছু কমে ছেড়ে কড়কড়ে নগদ টাকা গুণে নিয়ে আসতে হবে নেপাল, সিকিম, ভুটান, দার্জিলিং, শিলি-গুড়ি, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ, কুচবিহার আর বিহারের বাবতাঙ্গার সমস্ত রকম মাল চালানের বড় ঘাঁটি। ব্যবসায়ের তারাই আসল পাইকারি খদ্দের, সব লেন-দেন এখন থেকে বিজিনেস্যাল ম্যানেজার বাপী তবফদারের মারফৎ হবে সকলের কাছে এই মর্মে অফিসিয়াল চিঠিও চলে গেছে।

সেই সব অফিসিয়াল চিঠির কপি দেখাবার সময় বাপীর মনে হল কুয়ার খেদে রণজিৎ চালিহার দু চোখ ছুরির ফলার মতো চিকচিক করছে। আশ্চর্য কিছু নয়। এই বাঁকা পথে যে পরিমাণ টাকা আমদানির আভাস পেল, বাপীরই কান-মাথা গরম হবার দাখিল।

সাড়ে বারোটার একটু আগে রণজিৎ চালিহা বেরিয়ে গেল। মিসেস রাইয়ের ওখানে স্নান আর আলোচনা। বাপীও

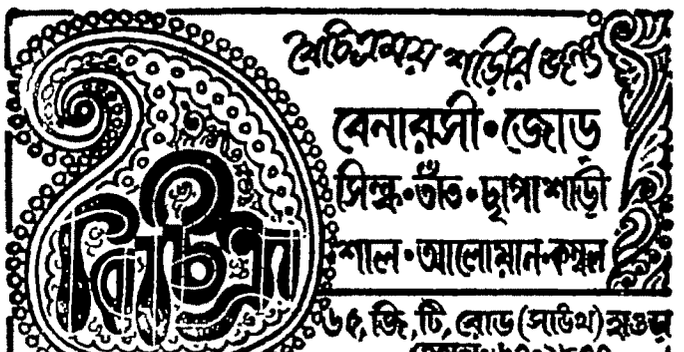

সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। পকেটে চেকবই আর পাশ বই। মানুষ বশ করার একটাই তুরুপের তাসের ওপর তার বিশ্বাস। চা-বাগান এলাকার ব্যাংক। খোঁজ নিয়ে দেখল, যদিন আগে তার সেভিংস অ্যাকাউন্টে আট হাজার টাকা জমা পড়েছে। চেক কেটে নগদ এক হাজার টাকা তুলল তার থেকে।

বিকেলে আপিস ফেরতা সোজা ববরানীর ডেরায়। এই কটা দিন বাপীর অপেক্ষায় ওরা বোধহয় উন্মুখ হয়েছিল। খাবার আর তর সয় না।—কি ফয়সলা হল—ভালো কি মন্দ ?

দুলারিও শোনার আশায় উদগ্রীব। বাপী জবাব দিল আমি তো বলেই গেছলাম, যে ফয়সলা হোক ভালো হবে। পকেট থেকে হাজার টাকার বান্ডিলটা বার করে দুলারির হাতে ধরিয়ে দিল। —এ টাকাটা সাবধানে তুলে রাখো, হাজার টাকা আছে এখানে।

টাকার ধাক্কা দেখার নিশিনসই বটে। দুজনেই ওরা হাঁ। আবুরই প্রথম বিস্ময়ের বাঁধ ভাঙল।—এ কিসের টাকা ? কার টাকা ?

—তোমাদের আর রেশমার। এর থেকেই বুঝতে পারছ ফয়সলাটা কেমন হল। ফয়সলার পর ম্যানেজারকে অন্ধ করার জন্যেই বোধহয় আমাকে কিছু থোক টাকা দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের সকলের ওপর দিয়েই চিন্তা-ভাবনার দুর্ভোগ গেছে, তাই সব আর একলা ভোগ করি কেন, তোমাদেরও কিছু ভাগ দিলাম। এরপর মেজাজ সাফ রেখে আমরা কোমর বেঁধে কাজে না নামলে অন্যায় হবে। ..এর থেকে শ আড়াই টাকা রেশমাকে দিও আর তাকেও এই কথা বোলো। কিন্তু মেমসাহেবের মেয়েকে যেন এসব কিছু না বলে সাবধান করে দিও, সেই মেয়ে তাহলে মওকা বুঝে আবার ওকে নিয়ে কোন রাস্তায় হাঁটবে ঠিক নেই—কক্ষনো যেন না বলে। আমি বারণ করেছি জানিয়ে দিও।

আবু হঠাৎ কোমর বেড়িয়ে বুকের সঙ্গে জাপটে ধরে বাপীকে শূন্যে তুলে দু-তিনটে পাক খেয়ে নিল। আনন্দ আর খুশি ধরে না। —তোমার দিল বটে এক-খানা বাপীভাই। বাপীভাই তুমি কি জাদু জানো আমাকে বলো—শিগগীর বলো।

দুলারির হাসি উপচানো মুখখানাও বেশ সুন্দর দেখছে বাপী।

ঘরের কাছে পৌঁছুতে শীতের সন্ধ্যা পার। গায়ত্রী বাইরের বারান্দার সব আলো জ্বলছে। রাস্তার অন্ধকার দিকটা ঘেঁষে পাশ কাটানোর ফাঁকে বাপী একবার দেখে নিল। গায়ত্রী রাই আর রণজিৎ চালিহা খুশি মেজাজে কথা কইছে। উর্মিলা হয়তো ভিতরে।

নিজের বারান্দা আর ঘরের আলো জেবলে গায়ের গরম জামাটা খুলে বাপী সোজা কম্বলের নিচে ঢুকে গেল। রাতে রান্নার তাড়া নেই। ওবাড়ি থেকে ডিনার আসবে। পরশু চালিহা চলে যাবে রাতে তখন ওকেই যেতে হবে।

বাপীর ধারণা এই রাতে শুধু ডিনার নয়, সেই সঙ্গে হয়তো উর্মিলাও আসবে। হাসিই পেল। মেয়ে ওকে একজনের কাছে এগিয়ে দেবার মানুষ ভাবছে। আর তার মা ওকে সেই একজনকে দূরে হটাবার মানুষ ভাবছে।

ডিনারের সঙ্গে নয়, বারান্দা আর ঘরের আলো দেখে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই দুপদাপ পা ফেলে উর্মিলা এসে হাজির।

—মিষ্টি মিষ্টি মিষ্টি—মিষ্টি কোথা মিষ্টি ? কত মিষ্টি ?

আচমকা প্রচণ্ড একটা ঘা খেয়েই যেন আস্তে আস্তে উঠে বসল বাপী। উর্মিলার মুখে দুষ্টু হাসি চুয়ে চুয়ে পড়ছে।

—কি ব্যাপার ?

—কি ব্যাপার ? তেড়ে সামনে এগিয়ে এলো উর্মিলা। —সেই বাচ্চা বয়েস থেকে ডুবে ডুবে জল খাচ্ছ এখন ধরা পড়ে কি ব্যাপার ?

বাতাস টানতেও বুকে লাগছে বাপীর।—তোমাকে কে বলল ?

—রেশমা। অনেক দিন আগে আবুর মুখে জন্সন সাহেবের মেয়ের সঙ্গে তোমার হেলেবেলার জমাটি প্রেমের কাণ্ড-মাণ্ড শুনেছিলাম। আবুটাকে ধরতে পারলে বেশ হত তার নাকি ধারণা এখনো তুমি সেই মেয়েকে প্রেমে মজে আছ। সেটা যে সত্যি আমিও হলপ করে বলতে পারি—নইলে তিন কুলে তোমার কেউ নেই বলো অথচ আমাদের বাংলোয় এসে কাগজে কলকাতার হেলেগের খবর পড়ে মুর্ছা যেতে বসেছিলে কার ভাবনায় মশাই ? আমাকে সব বলবে কি বলবে না, জানতে চাই—না বললে মাকে দিয়ে জিগেস করাবো।

আবুর দোষ নেই ছেলে বেলার গল্প করতেই পারে। তবু মনে মনে বিষম বিব্রত বাপী। —কি বলব..যদি শোনো এ কবছরের ফাঁকে সেই মেয়ের কাছে আর কেউ এসে গেছে, আর আমি দূরে সরে গেছি—তাহলে ?

বাপীর মুখ দেখে হোক বা কথা শুনে হোক উর্মিলা ভেবাচাকা খেল একটু। তারপরেই ঝলসে উঠল। —যদি হয় সেই ছেলে বা মেয়ের একটাকে তুমি গলা টিপে মারবে।

—তুমি তাই করবে ঠিক করেছ ?

খতমতো খেল। —তার মানে ?

—মানে ঘরে গিয়ে ভাবোগে যাও। আমি বেজায় ক্লান্ত এখন।

আবার শুয়ে পড়ার ফাঁকে হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে ঘরের আলো নিভিয়ে দিল। বারান্দার আলো জ্বলছে। বেগতিক দেখে উর্মিলা পায়ে পায়ে প্রস্থান করল।

সংগোপনের ক্ষতটা কেউ সজোরে আঁচড়ে দিয়ে গেল। বুকে দিক যা না হুকে দিক, রক্তপাত হবেই। দিনের শুরু থেকে আজ খুশির পথে পাড়ি জমিয়েছিল বাপী। শেষটুকু এমন হবে এ কি ভাবতে পেরেছে ?

বন্যা — শহর — গ্রাম

এবার বন্যা আর দুর্যোগে বেশ কয়েকটি ছবি ফুটে উঠলো। কেবল খবরের কাগজের বন্যাক্লিষ্ট ছবিগুলোর কথাই বলছি না। কর্পোরেশন, সি-এম-ডি-এ এবং অন্যান্য সংস্থার ট্রাকে করে চলেছে জল। হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগণা, নদীয়ার গ্রামগুলিতে তিনদিন ধরে পানীয় জল নেই একফোঁটা। সেই সব গ্রামের আকুল আবেদনে সাড়া দিল কলকাতা।

আবার অন্য চিত্রটা মনে আসে। কলকাতা শহরে রাস্তার কলে বা বাড়ির চৌবাচ্চায় হুড়হুড় করে জল বেরিয়ে নষ্ট হচ্ছে। এখনও কি আমরা জলের অপচয় সম্বন্ধে সচেতন হব না ?

আবার অন্য ছবি। গ্রামকে গ্রাম আজ কয়েক সপ্তাহ জলবন্দী। কলকাতার মানুষও হয়েছে জলবন্দী। এবার কি শহরের লোক গ্রামের লোকের কষ্টটা—বন্যার দুর্গতির পরিমাণটা বুঝতে পারবে না ? কলকাতার তবু তো ভেড়ি আছে, নর্দমা আছে। সি-এম-ডি-এ অনেকগুলি বসিয়েছে আর কর্পোরেশনের সঙ্গে একসঙ্গে অনেকগুলি পরিস্কারও করেছে। তাই হয়তো জলটা নেমে গেল তাড়াতাড়ি অনেক জায়গায়, কিন্তু এর থেকে কলকাতার লোক কি বুঝতে পারবে না, নর্দমার গুরুত্ব কি ? এখনও কি জঞ্জাল দিয়ে ভরে ফেলবে নর্দমার ভেতরটা আর মুখগুলি ?

আর একটা ছবি। ট্রাম-বাস বন্ধ। এপাড়া ওপাড়া যাওয়া বন্ধ। অফিস-কাছারী বন্ধ। সেই সঙ্গে ঘরে বসেই মনে আসছে গ্রাম গ্রামান্তরের ছবিগুলি। গাছের ওপর ডালে বসে কাটছে, দিন-রাত্রি—সপ্তাহ। দুশ্চিন্তা। ঘুম নেই। জীবনের আশা নেই।

এইসব ছবি থেকে একটা পূর্ণাঙ্গ ছায়াচিত্র তৈরী হয়। কলকাতা আর গ্রাম বাংলা আলাদা নয়। দুঃখের দিনে সব একাকার হয়ে গেছে। এখন শুধু সেই ছবিগুলির স্মৃতি একটু আপ-সেট হয়ে গেছে।

হয়তো বা শহরে আছে চওড়া রাস্তা, ফ্লাইওভার, পানীয় জল প্রকল্প আর সি-এম-ডি-এর অন্যান্য শহর উন্নয়ন প্রকল্প। গ্রামে গ্রামে সেসব নেই। তাঁদের অভাব আরও বেশী। কলকাতা বড় হয়েছে। গ্রাম সাহায্য করেছে। আবার গ্রাম বাংলা যখন বিপদে, তখন কলকাতা কি নীরব থাকবে ?

শহর গ্রামের বিরোধে যাচ্ছি না। শুধু চাইছি, পশ্চিম বাংলার এই দুর্যোগে—এই দুঃসময়ে আমরা যেন সবাই একসঙ্গে থাকি।

কলকাতার দায়িত্ব আজ একটু বেশী। কারণ কলকাতার ছবিতে দুঃখের দিনগুলি মাত্র কয়েকদিনের। কিন্তু গ্রামে গঞ্জে দুর্যোগ কাটতে সময় নেবে। কলকাতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, গড়ে উঠেছে অনেক সংগ্রাম। এই সংগ্রামী শহর যেন গ্রামের মানুষের বাঁচার সংগ্রামে শরিক হয়। চ্যালেঞ্জ ?

চলতি দুনিয়ায় 'সাথী' কথাটি আরও সার্থক। সি-এম-ডি-এ অক্টোবর, ১৯৭৮

প্রফুল্ল শূর

হাতো

সতীশ জমালী

শীতের প্রথম বর্ষণ শুরু হতেই গোটা-কাশ্মীর ফাঁকা হতে শুরু করে। বড় বড় ব্যবসায়ী, গেজেটেড অফিসার এবং ধনী সম্প্রদায়ের লোকেরা সোজা দিল্লী চলে যায়, কেউ কেউ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আরও অগ্রসর হয়ে বোম্বাই-কলকাতার দিকে যায়। কাশ্মীর এসেম্বলীর দুটো গ্রুপ জম্মুতে তাঁবু খাটায় এবং সেখানেই এক-অপরের সঙ্গে রঙ্গ-তামাশা করে কাটায়। আর, কাশ্মীরী শ্রমিক! তারা প্রথমে পাঠানকোটে যায়, সেখানে কাশ্মীরী হোটেলে তারা নিজেদের কিছু সঞ্চিত অর্থ ওড়ায়, অতঃপর ধীরে ধীরে তারা সমগ্র পাঞ্জাবে ছড়িয়ে পড়ে। দু-একজন দিল্লী ঘুরে যায়।

প্রতি বছর এমন হয়ে থাকে।

এই কাশ্মীরী শ্রমিকদের কয়েকজনের সঙ্গে তাদের বিবি এবং যুবতী মেয়েরাও থাকে। তাদের বাচ্চা-কাচ্চাদের গোটা শহরে ভিক্ষে করতে দেখা যায়—ষ্টেশনে, বাস-স্ট্যাণ্ডে, রেস্তোরাঁর বাইরে, বাজারে। তারা নিজেরা খেটে বেড়ায়—বাজারে, কাঠগোদামে, কয়লা ডিপোয়। কেউ কেউ শুধু ঠেলা চালায় অথবা কুলীর কাজ করে।

প্রতি বছর এমনই হয়ে থাকে।

শীত শুরু হতেই পাঞ্জাবী শ্রমিকদের বলতে শোনা যায়, "এক্ষুণি হাতো আসতে শুরু করবে, আর আমরা মরা পড়বো।"

আর মাস কয়েকদিন, হাতো এলে পড়বে।" শহরের ব্যবসায়ীরাও যায় যায় একথা বলে।

হাতো। কাশ্মীরী শ্রমিকদের পাঞ্জাবী-করণ। কেউ এদের 'মজদুর' বলে না। বরং হাতো বলে। এই নামকরণ কেন এবং কিভাবে ঘটেছে এর ইতিহাস আমার বিন্দুমাত্র জানা নেই।

'খুশ—আমদীদ।'

পাঞ্জাবের ব্যবসায়ী ও স্টকহোল্ডাররা কাশ্মীরী শ্রমিকরা এলে পরে এইসব বলে।

'ও তোর বোনের....'

পাঞ্জাবী শ্রমিকরা, কাশ্মীরী শ্রমিকরা এলে পরে এদের মা-বোনের নামে শত-সহস্র গালাগাল দেয়। তারা মূলতঃ এই

সতীশ জমালী

সতীশ জমালীর (১৯৪০) আবির্ভাব কবিতা-আন্দোলনে। 'এক আদমী আউর' নামে একটি অ-কবিতা সংকলন ষাটের মধ্যভাগে প্রকাশিত হতে নানান ধরণের সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়। অবশ্য এখন আর সেই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত নন, কবিতা সৃষ্টিও স্তিমিত। বরং, গদ্য রচনায় উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন। অদ্যাবধি দুটি কাহিনী সংগ্রহ 'প্রথম পুরুষ' এবং 'থকে-হারে' (ক্লান্ত-পরাজিত) এবং একটি উপন্যাস 'প্রতিবন্ধ' প্রকাশিত। সতীশের লেখায় একটি সহজ আন্তরিকতার সুর পাওয়া যায়, যা সহজেই মন-কে স্পর্শ করে এবং সেই সঙ্গে সমস্যা ও জটিলতা নিয়ে পাঠককে ভাবতে বাধ্য করে। 'হাতোবা' কাহিনী প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকেরা তাঁকে অভিনন্দন জানান।

কাশ্মীরী শ্রমিকদের সঙ্গে। শত্রুতার সম্পর্ক রাখে। এবং এদের সঙ্গে মারদাঙ্গা করার জন্য সর্বদা মুখিয়ে থাকে। কিন্তু এই কাশ্মীরী শ্রমিকরা, যদিও নিজেদের মেয়ে, বিবি ও ছেলেদের দিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করায়, কিন্তু কারো প্রতি অভদ্র আচরণ বা কটুভাষা প্রয়োগ করে না, কখনও কারো সঙ্গে ঝগড়া করে না, কখনও কাউকে গালাগাল দেয় না, কখনও চুরি বা এমন কোন দুর্ব্যবহার করে না।

আসলে, কাশ্মীরী শ্রমিকদের এদিকে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মজুরীর রেট অনেক হ্রাস পায়। পাঞ্জাবী শ্রমিকরা তিন টাকার নীচে কাজ রাজী হয় না, কিন্তু এই হাতোরা পাঁচসিকে বা দেড় টাকা রোজ দরে সানন্দে কাজ করতে রাজী হয়ে পড়ে। পাঞ্জাবের ব্যবসায়ী ও বড় বড় আড়তদাররা এইসব হাতোদের সঙ্গে সঙ্গে লুফে নেয়, কেন না এই হাতোরা পাঞ্জাবী শ্রমিকদের চেয়ে কাজ করে বেশী। তাদের মত এরা ক্লান্তি ভাঙে না।

হাতোরা এলে এদিকের লোকেদের একটা সমূহ ক্ষতি দেখা দেয়, বহু সংখ্যক স্থানীয় শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। হয় তখন এইসব শ্রমিকদের বিকসা টানতে হয়, নয় চুরি চামারি করে কাটাতে হয়।

প্রতি বছর এমনই ঘটে থাকে। স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং আড়তদারদের খুশী করে, স্থানীয় শ্রমিকদের গালাগাল সহ্য করে এই সকল কাশ্মীরী শ্রমিকরা শীত শেষ হবার হবার পরে আবার ফিরে যায় কাশ্মীরে।'

এ বছরেও ঠিক এমনই ঘটে।

কাশ্মীরী শ্রমিকদের দল, ভরঘরের মত কিংবা শরণার্থীদের মত ষ্টেশনে, বাস-স্ট্যান্ডে, কাশ্মীরী হোটেলে, অন্যান্য জায়গায় স্তূপীকৃত পড়ে থাকে। এদের মাঝ থেকে অনেকে অন্য শহরে চলে যাবে। কিছুসংখ্যক এখানেই রয়ে যাবে।

মামদুও এবার এসেছে ট্রেনের মতই।

পাঠক লক্ষ্য করুন, এই কাহিনী-বক্তা মামদুর সঙ্গে পূর্বপরিচিত। মামদু পূর্বেও এই শহরে এসেছে এবং কাহিনী-বক্তাও এখানকার স্থানীয় বাসিন্দা। মামদুর সঙ্গে তার একটা ছোট ছেলেও রয়েছে। মামদুর সঙ্গে দলে আরও জন পনেরো-কুড়ি আছে, তিন-চারটে ছোট ছেলে আছে কিন্তু কোন স্ত্রীলোক নেই। মামদুর দলে এবার কয়েকটা নতুন মুখ আছে। বেশ কয়েকজন পরিচিত মুখও নজরে পড়ছে না। হয়তো তারা অন্য দলের সঙ্গে মিশে গেছে।

মামদুর প্রকৃত নাম মোহম্মদ লতীফ, কিন্তু সকলেই তাকে মামদু বলে ডাকে এবং এই নাম-পরিবর্তনে তার কোন আপত্তি নেই।

এই দল আসার সঙ্গে সঙ্গে আগের মত ঘিঞ্জি-বাজারে একটি ছোট দোকানঘর ভাড়া নেয়। মাকড়শার জাল, ধুলো-ময়লা ও ভ্যাপসা গন্ধ ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলে। চটের থলেতে ভরা তাদের নিজের-নিজের মালপত্র এক কোনে স্তূপীকৃত করে রাখে। এখন উনুন এক সঙ্গেই ধরবে।

টাঙা-এজেন্সীতে শহরের বড় বড় আড়তদারদের দোকান।

টাঙা এজেন্সী। এই শহরের জনসংখ্যা যখন সব মিলিয়ে সাত-আট হাজারের মত, তখন এটা টাঙ্গা-স্ট্যান্ড ছিল। পার্টিশানের পর এই শহরের জনসংখ্যা সওয়া লক্ষ ওদ্দি বৃদ্ধি পায়, তখন এই টাঙা-স্ট্যান্ডকে আড়তদাররা ঘিরে ফেলে বহু সংখ্যক দোকান তৈরী করে। কিন্তু নাম এখনও সেটাই— টাঙ্গা এজেন্সী।

টাঙা-এজেন্সীতে আলুর এক পাইকারী ব্যবসায়ীর দোকানের নাম, বুলকরাম-শোরীলাল। কাশ্মীর থেকে এসে মামদু এই আড়তে কাজ করত, তিন-চার বছর ধরে ক্রমাগত। কাশ্মীর থেকে আসত, এসেই সোজা এই দোকানে হাজির হত। এবং কাজ পেয়ে যেত। দোকানের মুনিব মামদুর সততা ও পরিশ্রমে বেশ খুশী।

এবার মামদু সোজা এই দোকানে হাজির হয়।

'সেলাম বাবুজী।'

'এসে পড়েছিস মামদু,' আড়তদার আনন্দে বলে ওঠে, 'আয়, এই ছালাটা বিছিয়ে নিয়ে বস। ভাল আছিস তো?'

'আল্লার ফজলে ভালই বাবুজী।'

'মামদু, তুই এবার এত দেরী করে এসেছিস কেন?'

'দু-একদিনের দেরী কি আর দেরী নাকি, বাবুজী।'

'আচ্ছা মামদু, আমার এবার অনেক কাজ করতে হবে, শোন, তুই আড়াতাড়ি এসি না দেখে ভাবলাম হয়তো তুই এবার আসবি না, তাই আমি অন্য হাজেকে নিয়ে ফেলেছি।'

'বাবুজী, আমার ইমানদারীতে আপনার কোন সন্দেহ নেই তো, নাকি আপনি এমনিই বলছেন?'

'বেওকুফ কোথাকার, যা তুই গোদামে গিয়ে নিজের চোখে দেখে আয়। তুই তো ঘিঞ্জি বাজারে উঠেছিস, ঠিক আছে, এই মরশুমের মধ্যে কেউ চলে গেলে বা কেউ রোগে পড়লে আমি তোকে নিজেই ডেকে নেবো। ততদিনে অন্য কোথাও ব্যবস্থা করে নে।' এরপর আড়তদার তাকে পনেরো পয়সা দিয়ে বলে, যা চা খেয়ে নিস, বড্ড শীত পড়েছে।

আড়তদার তার লাল-ইমলির পুরু কম্বল চারপাশে ভাল করে জড়িয়ে নেয়।

মামদু এবার সামান্য দেরী করে কাশ্মীর থেকে এসেছে, এবং তার ফল তাকে ভোগ করতে হচ্ছে, চারিদিক থেকে সে চাঁচাছোলা জবাব পায়।

মামদু এই শহর ছেড়ে যেতে চায় না, কেন জানি! বহু জায়গায় সে কাজের জন্য চেষ্টা করতে থাকে।

পরিণাম স্বরূপ, তিনদিন বেকারীর পর একটা নতুন তেতলা নির্মীয়মাণ বাড়িতে ইঁট বইবার কাজ পেয়ে যায় সে।

এরপর শীতে এই কাহিনীর কথক সকাল নটা পর্যন্ত শুয়ে থাকে। মামদু এবং তার

সঙ্গীরা সকাল ছটায় উঠে পড়ে। উনুন ধরায়। সৌচাদি করতে চলে যায় কেউ কেউ অন্যরা হুঁকো টানে। রুটি ভাজা হয়, চা তৈরী হয়। এবং স্নান না করে, হাতমুখ না ধুয়ে সকলেই, নোনতা চায়ে মোটাভাবি রুটি ডুবিয়ে তাবিয়ে তাবিয়ে খায়, দ্রুত খায়, গল্প করতে করতে খায়, এক-অপরের সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করে খায়। আটটার মধ্যে তাদের দোকান বন্ধ হয়ে পড়ে। সকলেই তারা নিজের কাজে বেরিয়ে পড়ে। মামদুর বালক-ছেলে শরীফা (শরীফ মোহম্মদ), কেউ কেউ তাকে খলীফা বলে, ভিক্ষে করতে বেরিয়ে পড়ে, নগ্ন পায়ে, ঠাণ্ডা-ময়লা কাপড় পড়ে। মামদু নিজে নব-নির্মীয়মাণ বাড়ীর দিকে চলে যায়, ঠাণ্ডা-ময়লা কাপড় গায়ে, পায়ে মোটা দড়ির তৈরী জুতো পড়নে, মুখ দিয়ে ভাপ বার করতে করতে।

মামদুর কাজ হল, দোতলা থেকে তেতলায় ইঁট ছুঁড়ে দেয়া, সেখানে বসে থাকা জনমজুর ওটা ধরে। দুজনে ক্লান্ত হয়ে পড়লে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়। তারপর আবার সেই ইঁট ছুঁড়ে দেয়। ইঁট ধরা। সাড়ে বারোটা ওব্দি নাগাড়ে এই কাজ।

তারপর আধ ঘন্টার জন্য ছুটি।

রাজমিস্ত্রী জোগানদারেরা রুটি খেতে বসে পড়ত। তারপর চা খেত। তারপর সিগারেট খেত। সেই সঙ্গে হাসি, সেই মতো গপ্পো।

এ সময়ে মামদুর রুটি খাওয়ার অভ্যেস নেই, সে একআনা পয়সার গরম ছোলা ভাজা কিংবা গরম চানাচুর কিনত, চিবোত শেষে জল খেত। ছোলা খাবার পরেই সে জল খেত। তারপর একটা ছোট হুকো নিয়ে টানত, এবং একা বসে থাকত। বেশী কথা নয়, বেশী গল্পও নয়। একা একা কাশ্মীরী লোকগীত মৃদুকণ্ঠে গুণগুণ করত আপন মনে, সুখে।

আবার কাজ শুরু। ইঁট ছুঁড়ে দেয়া, ইঁট ধরা। বিকেল পাঁচটা ওব্দি এই কাজ চলত।

তারপর দোকান—নিজের বাসায়।

কেউ ছটায় আসে, কেউ সাতটায়, কেউ আটটায়।

যে প্রথম আসে, সে পাশের পাউরুটির দোকানে থেকে চাবি আনে, ঘর খুলে উনুন ধরায়, পেতলের বাটিতে জল রাখে, তারপর ভাত ফোটায়।

রাত্রে সকলেই বসে একত্রে খায়। খাবার পর দুধ মেশানো নোনতা চা আরও একবার চলে। হুঁকো ফুড়ুক ফুড়ুক শব্দ তোলে। পনেরো-কুড়িটা কণ্ঠস্বর সম্মিলিত এক স্বর হয়ে কাশ্মীরের কোন লোকগীত উঁচু স্বরে গেয়ে ওঠে। অন্য গীত।

তারপর অন্য গীত। এক দেড় ঘন্টা ধরে এসব চলে।

এই কাহিনীর বক্তা কাশ্মিরী ভাষা কিছু না, এজন্য তার পক্ষে বলা শক্ত যে তাদের উচ্চগ্রামে গাওয়া লোকগীতের অর্থ কি। অবশ্য, তাদের ভাব ও চোখমুখের ভঙ্গিতে প্রকট হয় যে তারা আনন্দের গান কিংবা উৎসাহের গান গাইছে।

রাত দশটা-সাড়ে দশটার ভেতরে তারা সকলেই ঐ ছোট্ট দোকানের ভেতর একত্রে শুয়ে পড়ে। কারো মাথা কারো পায়ের ওপর টিকে থাকে, কারো ঠ্যাং কারো বা পেটের ওপর থাকে, কারো হাত কারো উরুর ওপর থাকে কেউ বা উপুড় হয়ে পড়ে থাকে, কেউ একপাশে কাৎ হয়ে পড়ে থাকে। তারা সকলেই আপসে গাদাগাদি করে এমনভাবে পড়ে থাকে, শীততাপের কাছে ঘেঁষতে পারে না। সকাল ছটা ওব্দি সকলেই একরকম গুম গুম অবস্থায় থাকে, যেন কোন নোংরা, যন্দে বেওয়ারিশ লাশ এক-অপরের ওপর ফেলে রাখা হয়েছে এবং তারা স্থির, চুপ।

এই কাহিনীর বক্তা, যেখানে মামদুর দোকান তার সামনের বাড়ীতে থাকে।

একদিন মামদু ভোর বেলায় তার কাছে আসে এবং তাকে ঘুম থেকে তোলে।

মামদুর মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা, তাতে রক্ত জমাট। মামদুর মুখখানি হলুদ-ফ্যাকাসে, কিছুটা ঠাণ্ডার ফলে, কিছু রক্ত বেরোনোর ফলে।

'মামদু একি? মাথায় ব্যান্ডেজ কেন?'

'বাবুজী আমার কোন ব্যাপার নয় শরীফার জন্য এসেছি।'

'শরীফার আবার কি হলো?'

'শরীফা কাল সকালে বেরিয়েছে, এখনও ফেরেনি। বদমাশটা বাড়িও ফেরেনি। কে জানে, এই শীতে কোথায় মরে পড়ে আছে। চিন্তা হচ্ছে বাবুজী।'

'তা, চিন্তার ব্যাপার বটে। ঠিক আছে, আমি দেখছি। কিন্তু, তোমার এ কি দশা।'

মামদু সেখানেই ঠাণ্ডা মেঝের ওপর বসে পড়ে।

'একটা নতুন বাড়ী তৈরী হচ্ছে তাতেই আমি কাজ করছি আজকাল। ইঁট ওপরে ছুঁড়ে ফেলার কাজটা আমার। তিন দিন আগে, আমি ইঁট ওপরে ছুঁড়ে দিয়েছি, ওপরের লোকটার মন সামান্য অন্য-দিকে সরে ছিল, অমনি ইঁটটা আমার মাথার উপর এসে পড়েছে। দু-দিন একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম, বাবুজী। সবাই বলছিল, অনেক রক্ত নাকি বেরিয়েছে; হাসপাতালে পড়েছিলাম। আর এদিকে বদমাশ শরীফা, কে জানে কোথায় গায়েব হয়ে আছে।'

আমাদের গল্পকার সন্ধ্যায় বাড়ী থেকে বেরোয়, তারপর খোঁজ করতে করতে রাত্রে নাগাদ বদমাশ শরীফার খোঁজ পায়। সে সেলওয়ে পুলিশ-স্টেশনে বন্ধ ছিল। আট-ন বছরের বালক শরীফা বদমাশ। ফর্সা, আপেলের মত টুকটুকে শরীরের রঙ, মাথার থাকি চুল এবং নীল মার্জার-চক্ষু।

বদমাশ।

জামিন দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে আনা হয়। পরে সে বয়ান দেয়, আপনি তো জানেন বাবুজী, আমি ভিক্ষে চেয়ে বেড়াই। কাল এক সাহেবের কাছে ভিক্ষে চাইতে গিয়ে, সে রেগে আমায় বকুনি দেয়। বলে, তুমি এত্তা বাচ্চাছেলে, বাচ্চা ছেলেরা ভিক্ষে করে না, যদি ভিক্ষে করার অভ্যেশ দাঁড়িয়ে পড়ে তাহলে মানুষ নিজের অধিকার হারিয়ে ফেলে। আমি যখন বলি ভিক্ষে না করলে কি করবো, জবাবে বলে, কেন খাটবে। খাটুনি, কেমন করে, কিভাবে? বলে, আর কিছুও যদি না পারো, রেলওয়ে ইয়ার্ড থেকে কয়লা কুড়িয়ে বিক্রী করতে পারো। অনেকে এই কাজ করে। বাবুজী, তারপর আমি ইয়ার্ডে যাই। কয়লা কুড়োচ্ছিলাম, অমনি পুলিশ আমাকে ধরে নিয়ে যায়।'

বাড়ীতে ফিরে আসার পর আমি জানতে পারি, মামদু জ্বরে ভুগছে এবং দোকানে একা-একা শুয়ে ধুঁকছে।

শরীফাকে দেখে মামদু ওকে মারতে ওঠে, কিন্তু জ্বর তাকে একেবারে কাহিল করে ফেলেছিল।

বাড়ীর মালিক মামদুর বদলিতে আর হাতোকে ইঁট ছুঁড়ে দেয়ার কাজে রাখে। মামদু দুদিন জ্বরে পড়ে থাকে সাতদিনের মাথায় যখন কাজে যায়, তখন এই পরিবর্তনের ব্যাপারটা জানতে পারে।

আবার সেই বেকার।

চাংগুস রোডে একটা নতুন কয়লা ডিপো খুলেছে। আধ-বেজ কাজের পর মামদু জানতে পারে। সেখানে যায়, এবং কাজ ও পায়।

এখন তার কাজ হল থলেতে কয়লা ভর্তি করা তারপর পিঠে বয়ে সেটা দাঁড়িপাল্লায় চাপানো, আবার পিঠে বয়ে ঠেলার ওপর রাখা, ঠেলা কয়লা-ক্রেতাদের বাড়ী পৌঁছে দেয়া। সেখানে আবার থলে পিঠে বয়ে ক্রেতাদের বাড়ীর ভেতরে রেখে আসা।

শরীফা আবার আগের মত ভিক্ষে করতে বেরোয়, ভোর বেলায়। এখন সে আর খাটুনি-পরিশ্রম করার চেষ্টা করেনা, পুলিশের ভয়ে।

মামদু এই কয়লার ডিপোয় মাত্র এক সপ্তাহ কাজ করে। বালকবাহ্য-শোবা লাজ ফার্মের মালিক লালা তাকে ডেকে পাঠায়। তার গুদামের দু-তিনজন হাতো আর দলে ভিড়ে গিয়ে অন্য শহরে চলে গেছে।

এখন আবার গতিবিধি আগের মতই হয়ে পড়ে।

মামদু ভোরবেলায় উঠে গুদামের দিকে চলে যায়। দৌড়-ঝাঁপ, শীতে ঘাম, থলে

মেয়ে যাবে শ্বশুর ঘরে, ছেলের মন কারবারে।
ভবিষ্যতের সুখ-সুবিধের জন্যে,
ব্যাঙ্ক অফ বরোদার আর.আই.আর.ডি. যোজনা।

রামনাথের দুটি ফুলের মত বাচ্চা, বাবলু ও মিনি। রামনাথের কিন্তু এদের দুজনের ভবিষ্যতের জন্যে কোনোরকম চিন্তা নেই। কারণ সে ব্যাঙ্ক অফ বরোদার আর. আই. আর. ডি. যোজনায় ওদের দুজনের নামে খাতা খুলে দিয়েছে।

বাচ্চারা বড় হ'তে হ'তে ঐ টাকার অঙ্কও বেশ বেড়ে যাবে। ওদের পড়াশুনো, বিয়ে আর বাবলুর ব্যবসা ··· সবকিছু কত সহজে হতে পারবে!

রামনাথ তার বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ সুখময় ক'রে তোলার জন্যে ব্যাঙ্ক অফ বরোদার আর. আই. আর. ডি. যোজনার সাহায্য নিয়েছে।

আপনিও তো তাই করতে পারেন?

৫০০ টা. তার বেশী (১০০ টাকার গুণক-এ) থেকে, ১২ মাস থেকে ১২০ মাস পর্য্যন্ত ঐ খাতা খুলে নিন। সুদ জমা হ'তে থাকবে আর টাকার অঙ্কও বাড়তে থাকবে।

আরো বিশদভাবে জানতে হলে ব্যাঙ্ক অফ বরোদার আপনার নিকটতম শাখায় পদার্পণ করুন।

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

(ভারত সরকারের অধীনস্থ সংস্থা)

ভারতে ও বিদেশে ১৩০০ টিরও বেশী শাখার জাল বিস্তৃত।
৭০ বছর ধরে ব্যাঙ্কিং-এর সুবিধে,
২৫ বছর ধরে বিদেশে প্রসার।

U-BOB-RIRD-1/8 Ben

পিঠের ওপর বওয়া, ট্রাকে তুলে রাখা, ট্রাক থেকে নামানো। দোকান সাড়ে সাতটা রাতে বন্ধ হয়। মামদু আটটায় গুদাম থেকে ফিরে আসে। তারপর সাড়ে আট নটায় চাল-ডাল, তারপর নোনা চা ও হুঁকো, উচ্চস্বরে সমবেত কাশ্মিরী লোকগীত তারপর গালগল্প। আবার সেই খদ্দে লাশের মত সকলেই একে—অপরের সঙ্গে গাদাগাদি গা-ঘেঁষে শুয়ে পড়া।

ডিসেম্বরের ঘটনা।

এই কাহিনীর বক্তা, নরেশ সাক্সেনা, কাজের ব্যাপারে বাইরে গিয়েছিল। ফিরে এসে রাত্রে শোয়ার সময় হাতোদের লোকগীত এবং হাসি-তামাশার প্রতীক্ষা করে কিন্তু কোথাও কিছু নেই, কোন আওয়াজটুকুও নেই। একদিন দুদিন, গোটা সপ্তাহ। কি ব্যাপার! কোন আওয়াজ নেই।

মামদু রয়েছে। অন্যান্যরাও। তবে?

সে মামদুকে ডেকে পাঠায়।

এলে পরে জিজ্ঞেস করে, কি ভাই ব্যাপার কি কোন আওয়াজ নেই, গান-টানও শুনি না—

মামদু বলে—'বাবুজী আপনি এখানে ছিলেন না, আপনার পেছনের দিকে পাশের গাড়ীতে এক নতুন ভাড়াটে এসেছে। আমাদের গান, হাসি-তামাশায় তিনি আপত্তি জানান, বলেন, আমাদের কাজে অসুবিধে হয়। তা বাবুজী, তাঁর মর্জি, তাঁরা বড়লোক—তাই আমরা ওসব বন্ধ করে দিয়েছি।

পরদিন সকালে আমাদের গল্পকার নতুন ভাড়াটের সঙ্গে দেখা করে। ভদ্রলোক স্থানীয় কলেজের প্রফেসার নিযুক্ত হয়েছেন।

তিনি বলেন, 'আপনি কাশ্মীরীদের সাইড নিয়ে এসেছেন। এই কাশ্মিরীরা বড় তোষামুদে এবং অকৃতজ্ঞ। খানোখা লোকে জোরে হাত নেড়ে উঁচু গলায় কথা বলে। আঁশ এদের প্রচণ্ড হেট করি। রাত্রে গান গাওয়া হৈ-হল্লার কি কোন যুক্তি আছে। এটা ভদ্রলোকদের পাড়া। তাছাড়া আমাদের কাজকর্মেও বেশ...'

আমাদের গল্পকার জানায়, 'কাশ্মিরীরা কেমন হয়, ভাল বা মন্দ, তার সঙ্গে আমার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। অবশ্য আপনার কথা ঠিক, গান-বাজনার সময়টা, বিশেষ করে পাড়ায়, তাদের পক্ষে উচিত নয়। তবে, এত সাংঘাতিক পরিশ্রমের পর এই গরীব শ্রমিকরা যদি দু-একঘণ্টা মনোরঞ্জনের জন্য...'

'না মশাই। তাদের অন্য জায়গা দেখা উচিত।

আমাদের গল্পকার আর কথা বাড়ায় না।

কিন্তু পরে জানা যায় প্রফেসার মহাশয় রাত্রে কোন কাজকর্ম করেন না। উনি ঐ সময় বিবিধ ভরতীয় গান শোনেন, এবং এই কাজে তিনি কোন রকমের বিঘ্ন বরদাস্ত করতে প্রস্তুত নন।

'মামদু, তোমরা আগের মত গান-বাজনা শুরু করো। নতুন ভাড়াটে যদি আপত্তি জানায় তার সঙ্গে কথা বলবো।

আমাদের গল্পকার ভাবে কেন সে অযথা এই হাতোদের স্বপক্ষে কথা বলছে। তাদের উঁচু নীচু কণ্ঠস্বরে তার নিজের কাজকর্মেও কয়েকবার বিঘ্ন হয়েছে। তাছাড়া তারা কাশ্মিরী ভাষায় কথা বলে, যার অ-আ-ক-খ তার জানা নেই। তবুও, সে ভাবে তাদের স্বর তাদের কথা বলার বিচিত্র ভঙ্গিমা, কাশ্মিরী লোকগীতির বৈচিত্র্যময় সুর—এই সব কি তার খুব ভাল লাগে?

লোকগীত, হাসি-তামাশা, গালগল্প সব পুনরায় শুরু হয়।

পরদিনই সকালে পাড়ায় কলহ বাঁধে। মুখ্য বিরোধী আমাদের গল্পকার এবং প্রফেসার। অনেকক্ষণ টানা-হেঁচড়া চলে, বহু তর্কাতর্কি হয়, এমন কি গালাগালের পর্যায় এসে দাঁড়ায়।

আমাদের গল্পকারের একটাই জেদ ছিল, যদি আপনার রেডিয়োর উচ্চগ্রাম গলিতে, অপরের বাড়ী যেতে পারে, তাহলে এই হাতোরাও তাদের ঘরে বসে গান গাইতে পারে, তাদের গলার স্বর যতদূর যাক না কেন।

দিন করেক বাদে প্রফেসার বাড়ী পাল্টায়।

ডিসেম্বরে শীত চূড়ান্ত অবস্থায়। তার ওপর, জানুয়ারীর শীতের আগমনের টের পাওয়া যাচ্ছে। ঝিরঝিরে বৃষ্টিপাত। মাঝে মাঝে তুষার পড়ে। শরীফা এখনও ভিস্তে করতে বেরিয়ে পড়ে। নগ্ন পা, উন্মুক্ত মস্তক, বোতাম ছেঁড়া শার্ট, এবং মুখ দিয়ে ভাপ বার করতে করতে।

মামদুর অবস্থাও ঐরকম। পা-রে মোটা দড়ির পাহাড়ী জুতো, নগ্ন বক্ষ, উন্মুক্ত মস্তক এবং মুখ দিয়ে ভাপ বার করতে-করতে।

ঠাণ্ডা লেগে একদিন মামদুর পায়ে সাংঘাতিক টান ধরে। যন্ত্রণায় হাঁটাচলা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তিনদিন নাগাড়ে সে অন্ধকার ঘরে পড়ে থাকে। দোকানের মালিক অবশ্য এতটা দয়া করে, যখন সে কাজে যায়, তাকে আর জবাব দেয় না, যদিও তার তিন-দিনের মজুরি কেটে নেয়।

দুদিন একনাগাড়ে বৃষ্টি আজ থেমেছে। হৃদয় অবারিত বৌদ্রে ছড়িয়ে পড়েছে। শরীফা সকালেই কাজে বেরিয়ে পড়েছে।

আজ রোববার, অর্থাৎ দোকানের কাজ বন্ধ। মামদু তার ঘরে বসে ছেঁড়া জামা থেকে পোকা বাছছিল। অন্যান্য হাতোরা বসে-ছিল, কেউ লেপ থেকে পোকা বার করছিল, কেউ লেংটি থেকে, কেউ বা পাজামা থেকে।

বেকারীর বাইরে গলিতে চেয়ার বিছিয়ে নরেশ আজকের খবরের কাগজ দেখছিল।

প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ একজন হাতো ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসে।

'মামদু, ও মামদু!'

'কি?'

'শরীফা ট্রাকের তলায় চাপা পড়েছে!' সে হাঁফাতে থাকে।

'অ্যা?'

'মারা গেছে!'

'ও মরতোই,' মামদুর উদ্বেলিত হাত স্থির হয়ে পড়ে, সে পাথরের প্রতিমূর্তি হয়ে পড়ে, জন্মাবার পর থেকেই ওর এমন নিয়তি বাঁধা। প্রথমে বোনকে খেয়েছে, তারপর মাকে, এখন নিজেই মরে গেছে। ওর মরণ ছিলই...' মামদু ভয়ংকর জোরে চেঁচিয়ে ওঠে। তার আর্তনাদ চেতনা কাঁপিয়ে দেয়ার মত।

'ও মরতোই,' তার দ্বিতীয়বার আর্তনাদ আরও ভয়ংকর। ততক্ষণে সকলেই তার কাছে জড়ো হয়ে পড়েছে।

ও মরতোই আমাদের গল্পকার খবরের কাগজ দেখতে থাকে। ভালই হয়েছে। ও মরতোই, ঠিক আছে। বেঁচে থেকেই বা কি করবে? ভিক্ষে না করলে গতরে খাটতো। পিঠে বোঝা বইতো কাঠ কাটতো, কয়লা তুলতো ঠেলা চালালো, ইঁট ছুঁড়ে দিত, মাথা ফাটাতো, পায়ে জখম করতো, প্রফেসারের হুমকি শুনতো। অ্যাই শালা হাতো সম্বোধন করতো সকলে। গ্রীষ্মে ফিরে যেত কাশ্মীরে, সেখানেও পিঠের চামড়া তুলতো, শীতে আবার এখানে আসতো, এখানেও পিঠ বেঁকিয়ে ফেলত। স্থানীয় শ্রমিক-মজদুরদের কাছ থেকে গালাগাল শুনতো—অ্যাই হাতো, তোর মার...যাক্, ভালই হয়েছে, মরে গেছে। প্রতি বছর এখানে আসা থেকে রক্ষে পেয়েছে। কেননা প্রতি বছর এখানে কাশ্মীরী শ্রমিকরা আসে, একেবারে উদ্বাস্তুর মত। প্রতি বছরই এমন হয়। শীতের প্রথম বৃষ্টিপাত শুরু হলেই গোটা কাশ্মীর ফাঁকা হতে শুরু করে।

অনুবাদ : সুবিমল বসাক

শতরঞ্জ কে খিলাড়ি

আনাতোলি কারপোভ একার সত্যি সত্যি দাবা-সম্রাট হলেন। ১৯৭৫ সালে এই মুকুট তিনি নিজের অধিকার প্রমাণ করে ধারণ করার সুযোগ পাননি। সেবার বরিস ফিশার আন্তর্জাতিক দাবা ফেডারেশনের সঙ্গে বিবাদের জন্য তাঁর বিশ্ব-বিজয়ী খেতাব রক্ষা করার লড়াই-এ অবতীর্ণ হননি, না খেলেই ওটি তিনি হারান কারপোভের কাছে। কিন্তু এবার এই সাতাশ বছরের সোভিয়েত যুবক তিন মাস ধরে বত্রিশটি গেম খেলে দাবা চ্যাম্পিয়ন উপাধির দাবীদার ভিক্টরোর কর্চনোয়ের প্রচণ্ড প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করেছেন আগে ৬টি গেম জিতে।

কর্চনোয়-ও নেহাৎ ফেলনার খেলোয়াড় নয়। এবারের ম্যাচের আগে অবধি কারপোভ-কর্চনোয় দ্বৈরথের ফলাফল ছিল কারপোভের জিৎ ৬ বার, কর্চনোয়ের ৫ বার আর ২৩ বার অমীমাংসিত। দুজনেই সোভিয়েত দেশের উচ্চমানের দাবার ঐতিহ্য লালিত। বয়সে বিশ বছরের বড় হলেও, কর্চনোয় একদা কারপোভের এক আন্তর্জাতিক ম্যাচের পূর্বে তাঁর তালিম-দেওয়া খেলার সঙ্গী হয়েছিলেন সানন্দে। কিন্তু তাঁদের সেবারকার মিত্রতামূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা আজ বিস্মৃত ইতিহাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবারে ঘৃণা এবং অসূয়া তাঁদের সমগ্র ক্রীড়ানুষ্ঠানটির আবহাওয়াকে একেবারে তিক্ত করে তুলেছিল।

এর কারণ প্রধানত কারপোভ এবং কর্চনোয় উভয়ের জন্মভূমিই সোভিয়েত ইউনিয়ন—এবং রাশিয়া—হওয়া সত্ত্বেও, কিছুদিন হলো কর্চনোয় দেশত্যাগ করে এসে সুইটজারল্যান্ডে এসে বসবাস করছেন। ফলে এবারের খেলায় লাগল ঠান্ডা লড়াই-এর কলুষ স্পর্শ। আজকাল প্রায় সবরকমের আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রেই অবশ্য চোখে পড়ে এই মনোভাব যে-কোন খেলার সাফল্যের ওপরেই একটা জাতির বা দেশের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে। উক্তি অশিক্ষিত বা আরেকটু কোমল ভাষায় বলতে গেলে অপরিণত শিশুসুলভ মনোভঙ্গীর বিচারে কারপোভ-কর্চনোয়ের দাবা-যুদ্ধকে আখ্যা দেখবার এবং দেখাবার চেষ্টা হয়েছে দুই ভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার উৎকর্ষ প্রমাণের লড়াই হিসেবে। ফলে ক্যাগিও সিটিতে আয়োজিত এবারকার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন খেতাব জয়ের ব্যাপারটি আর খেলা ছিল না। এমন সমস্ত উপাদান একে দূষিত করেছে যার হাত থেকে মানুষ রেহাই পাবার জন্যই বাজে খেলার আসরে।

প্রথম গণ্ডগোল হলো পতাকা নিয়ে। কারপোভ সোভিয়েত পতাকা ব্যবহারের অধিকারী, কিন্তু কর্চনোয় এখনো কোন রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেননি। কাজেই শেষপর্যন্ত তিনি কোন দেশের পতাকা ব্যবহার করতে পারলেন না। এরপর আরো নানা অভিযোগ উঠতে লাগল—প্রধানত কর্চনোয়ের তরফ থেকেই। কারপোভ একটি গেমের মধ্যে টক দই আনিয়ে খেয়েছিলেন। কর্চনোয় বক তুললেন, ঐ দইয়ের মধ্যে দিয়ে কারপোভ তার দলের লোকেদের কাছ থেকে খুব মূল্যবান নিশানা পেয়ে গেছেন। খেলার সময়ও নাকি কর্চনোয় কারপোভের উদ্দেশ্যে নানান দুর্বাক্য প্রয়োগ করেন। এছাড়া কর্চনোয়ের বক্তব্য—কয়েকটি গেমস হারার পর—যে দর্শকদের মধ্যে দ্বিতীয় সারিতে আসীন এক সোভিয়েত প্যারাসাইকোলজিস্ট তাঁকে যাকে বলে গুণ করার চেষ্টা করে যচ্ছেন এবং তাঁর মনসংযোগে সাংঘাতিক বাধা দিচ্ছেন। অতএব তাঁকে অনেক পেছনে বসিয়ে দেওয়া হোক। সঙ্গে সঙ্গে কর্চনোয়কে সহায়তা করার লোকও জুটে গেল। কয়েকটি ফিলিপিনো মনোবিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী খেলার আসরে গিয়ে বসলেন উক্ত সোভিয়েত প্যারাসাইকোলজিস্টের অপচেষ্টায় বাধা দিতে। সমস্ত ব্যাপারটা চরমে উঠল যখন, ম্যাচ-স্কোর কারপোভের পক্ষে ৫—২ হয়ে দাঁড়াল। এবার আবির্ভূত হলেন দুই আনন্দমার্গী। তাঁদের বিরুদ্ধে রয়েছে হত্যার অভিযোগ। বিচার এজলাসে ওঠার কিছু দেরি আছে। তাঁরা সম্ভবত ভাবলেন, অবসর সময়টা সোভিয়েত চ্যাম্পিয়নকে হেনস্তা করে যাপন করাটাই সবচেয়ে উত্তম হবে। তাঁরা নাকি কর্চনোয়কে যোগ শিক্ষা দিতে লাগলেন। এদিকে যে-কোন কারণেই হোক পর পর তিনটে গেম কর্চনোয় গেলেন জিতে, স্কোর হলো ৫—৫। এবার সোভিয়েত পক্ষ থেকে উক্ত আনন্দমার্গীদের হঠাবার ব্যবস্থা হলো। অবশেষে যখন কারপোভ ৩২শ গেমে জিতলেন, তখন কর্চনোয় শুধু যে স্কোর-শীটে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করলেন তা নয়, এমনকি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পর্যন্ত যোগ দিলেন না। অশোভন এবং অ-খেলোয়াড়ী আচরণের দৃষ্টান্ত তৈরি করলেন কর্চনোয় এই ঘোষণা করে যে তাঁর পরাজয়ের পেছনে আছে সোভিয়েত স্বরাষ্ট্রবিভাগীয় এবং ফিলিপিনো পুলিশের ষোলসাজস। বলা বাহুল্য, এইসব উক্তি করা সত্ত্বেও বিজিতের প্রাপ্য দক্ষিণা—কিঞ্চিদধিক ২ লক্ষ ৬৩ হাজার ডলার (বিজেতা কারপোভ পেয়েছেন ৪ লক্ষ ৩২ হাজার ডলারের কিছু বেশি) গ্রহণ করতে কর্চনোয় আপত্তি করেননি।

এই গ্লানিকর প্রতিযোগিতার সূত্রে মনে পড়ছে আরেকবার দাবার বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা—যা দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। তার মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাব ছিল না—কিন্তু সে ছিল উপভোগযোগ্য খেলাই। ১৯৬১ সালের গোড়ার দিকে। চ্যাম্পিয়ন মিখাইল তালকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করেছেন আগে বহুকাল ধরে দাবার মুকুটের অধিকারী যিনি ছিলেন সেই বটভিনিক। মস্কোর একটি বর্ষীয়সদনের মস্ত প্রেক্ষাগৃহে দুই বিখ্যাত সোভিয়েত খেলোয়াড়ের খেলা চলছিল। আলো রুশ নন, লাটভিয়ান। বটভিনিক রুশ এবং বয়সে অনেক বড়। আমার পক্ষপাত ছিল তালের প্রতি। দেখে মনে হচ্ছিল, চশমা চোখে বয়স্ক বটভিনিক প্রোফেসর-সুলভ অটল গাম্ভীর্যসহকারে ছয় তালকে শক্ত শক্ত অঙ্ক কষতে দিচ্ছেন আর সিগারেটে টান দিতে দিতে নানা বই দেখে খাতা ঘেঁটে তাল তার উত্তর খোঁজায় চেষ্টা করছেন। বটভিনিক পরপর কয়েকটা গেম জিতে যখন এগিয়ে গেলেন, তখন সোভিয়েত দেশের খেলোয়াড় মহলে পরিচিত এক তুক প্রয়োগ করা হলো তালের জন্য। কিছু কিছু লোকের এমন বিশ্বাস আছে যে, যদি কোন অপ্রতিদ্বন্দ্বী কোন দল বা খেলোয়াড়ে

CALCUTTA

পক্ষ নিয়ে খেলার মাঠে বা আসরে উপস্থিত হন, তবে উক্ত দল বা খেলোয়াড়ের জয় অবশ্যম্ভাবী। তাই রিগা থেকে জানা হলো তালল স্ত্রীকে—তিনি আগে আসতে পারেন নি, কারণ তিনি তখন সন্তানসম্ভবা। আশ্চর্য, স্ত্রী আসার পরের গেমটিই জিতে গেলেন তাল, যদিও শেষরক্ষা করতে পারলেন না। খেতাব খোয়ালেন বর্ণভিস্নিকের কাছে। তবে যেটা মনে পড়ছে, তা হচ্ছে এই যে, উভয় প্রতিপক্ষের মধ্যে সম্ভ্রাবের অভাব ছিল না। এবারে যে করমর্দন পর্যন্ত বন্ধ হয়েছিল, সে-রকম হীনভাব কেন আজও সম্পূর্ণ পাওয়া যায়নি সেকারকার চ্যাম্পিয়ন আর চ্যালেঞ্জারের সম্পর্কে বা ব্যবহারে।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা বলি। যখন এই দুবার সংগ্রাম নিয়ে মস্কো শহর মথিত, সেই সময়ে দেশে চলছে ভারত-পাকিস্তানের টেস্ট পর্যায় যার সবক'টি খেলাই হয়েছিল অমীমাংসিত। বিরিওজকা নামে লোকনৃত্যদলের অনুষ্ঠানে তখন আলাপ হলো পাকিস্তানের তৎকালীন তৈলমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুত্তোর সঙ্গে। তাঁকে বললাম যে, দেশের খবর পেতে দেরি হচ্ছে, ভারত-পাকিস্তান তৃতীয় টেস্টের ফলাফল জানতে পারিনি এবং তার জন্য অত্যন্ত অস্বস্তিতে আছি, মিঃ ভুত্তো নিশ্চয়ই খবর পেয়েছেন। ভুত্তো সাহেব নিতান্ত তাচ্ছিল্যসহকারে উত্তর দিলেন—ওই খেলার রেজাল্ট জানতে কারো আগ্রহ হয় নাকি। ও কি ক্রিকেট। ক্রিকেট খেলতেন নাইডু-ওয়াজির আলী-মুস্তাক-আব্বাস খান। আর এরা কী করছে—ঠুকে-ঠুকে করে কোনমতে শামুকের গতিতে এক-একটা রান তুলছে, খেলায় না আছে স্ট্রোক, না আছে বেগ, না আছে বর্ণ। আমার এই টেস্ট সিরিজের প্রতি বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য নেই। আমি স্মরণ দিলাম তাঁর কথায়।

পরের দিন দুপুরে তাল-বর্ণভিস্নিকের খেলা দেখছি। তাল খস্‌খস্‌ করে খাতার নোট লিখে চাল দিয়ে স্টপওয়াচের মাথায় টোকা মেরে টেবিল ছেড়ে উঠে গিয়ে স্টেজের এক প্রান্ত পায়চারি শুরু করলেন। বর্ণভিস্নিক আস্তে আস্তে এসে তাঁর চেয়ারে বসলেন। এবার চলবে চিন্তা। এই সময়টা একটু ক্যান্তিকর। হঠাৎ পিঠে কার হাত পড়ল। ঘুরে দেখি স্বয়ং ভুত্তো। বাইরে গিয়ে সিগারেট খাবার আমন্ত্রণ জানালেন। বাইরে এলাম। একটি পাপিরসি এগিয়ে দিয়ে মিঃ ভুত্তো খবর দিলেন তৃতীয় টেস্ট ড্র হয়েছে 'অবশ্যম্ভাবীরূপে'। তাঁর মুখে ফুটে উঠল ব্যঙ্গদীপ্ত হাসি। বললেন—জানেন, যতদূর বুঝতে পারছি, ভারত-পাকিস্তানের ক্রিকেটের চেয়ে এই বর্ণভিস্নিক-তালের দাবার গতি দ্রুততর। জানি না, ফয়জলাবাদে এবারের ভারত-পাকিস্তানের টেস্ট দেখবার সুযোগ পেলে ভুত্তোসাহেব তার সঙ্গে কারপোভ-কর্চনোয় প্রতিযোগিতার তুলনা করতেন কিনা।

কারপোভ আর কর্চনোয় খেলার দিক থেকে তুলামূল্য। কিন্তু কারপোভের শ্রেষ্ঠত্ব হলো তার সুশৃংখল, ধীর চং-এ—যা কর্চনোয়ের অধিগত নয়। আজকের নামী সোভিয়েত খেলোয়াড়—স্পাসকি, পেত্রোসিয়ান বা তাল এবং কর্চনোয়, কেউই একটা ক্রোনক্লাস অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির প্রমাণ ততটা দিতে পারেননি, যতটা একাধিকবার দিয়েছেন কারপোভ। তবে তাঁর প্রবণতা আত্মরক্ষামূলক খেলায় আর কর্চনোয়ের আক্রমণে। কর্চনোয়ের ক্রীড়াভঙ্গীকে কারপোভ বলেছেন বৈম্যাস্টিক এবং মনে হয় এই বর্ণনা যথার্থ। কর্চনোয় যেভাবে ৫—২-এর স্কোরকে ৫—৫-এ পরিণত করেছিলেন, তাকে প্রায় অলৌকিক ক্ষমতার প্রকাশ বলা চলে। কিন্তু কারপোভ শেষ খেলায় বিজয়ী হলেন যে-ভীম আক্রমণে কর্চনোয়ের পিচ ডিফেন্সকে ছত্রখান করে তা বোঝার ক্ষমতা কর্চনোয়ের ছিল না। তবে এটা মানতেই হবে যে, দুজনেই আরো ভালো খেলতে পারতেন এবং ভুল কম করতেন যদি তাঁদের ওপর রাজনৈতিক এবং অন্যান্য চাপ কম থাকতো। অনিবার্য পরাজয়ের মুখ থেকে বেরিয়ে এসে খেলা চটিয়ে দিয়েছেন দুজনেই একাধিকবার। তবে দাবা বদলে খেলতে মনে হয় বেশি সুবিধে পেয়েছেন কারপোভ। কর্চনোয়ের সময়জ্ঞানের অভাব তাঁকে না ভেবে চাল দিতে বাধ্য করেছে বহুবার কিন্তু শান্ত অথচ সময়ের দিকে সচেতন কারপোভ সাধারণত তাঁর খেলার ছন্দকে কখনো বেসামাল হতে দেননি। কারপোভের স্নায়ুর ওপরে নিয়ন্ত্রণ কর্চনোয়ের তুলনায় অধিকতর। তার প্রমাণ আবার তাঁকে দিতে হবে দাবার মুকুট মাথায় রাখার জন্য তাঁর ভবিষ্যতের সংগ্রামে—হয়তো বরিস স্পাসকি কিম্বা আরো কর্চনোয়ের বিরুদ্ধে।

রায়

ডোপিং

পিনাকী চট্টোপাধ্যায়

ডোপিং কি? এবং কেন একে বাধা দেওয়া উচিত, তা নিয়ে অনেক কথা আমরা বলে বেড়াই রটে, কিন্তু তার আসল চেহারা ভাল করে মাঠের দিকে অকালেই বোঝা যাবে।

যদিও ডোপিং কথাটা বা এই পাপ চালু হয়েছে পাশ্চাত্যে, তবে এর বর্তমান ধারক এবং বাহক আমরাই। তার কারণ পাশ্চাত্য এর বিরুদ্ধে অনেক সজাগ হয়েছে। এখন তা শুধু বসে গেছে কথার কথা হয়ে।

একটা ছোট্ট দৃষ্টান্ত। মাত্র কয়েক বছর আগের ঘটনা। একটা বড় হিন্দু টিমের সঙ্গে একটা মুসলিম টিমের খেলা। সেদিনও আমি মাঠের পাশে বসে আছি, আর জেনে কোথায় কে কে ডোপড্ খেলা শুরু—মরপিট কুমাগত ঢিল-ইটপাটকেলের ছোঁড়াছুড়ি, শেষ অবধি হিন্দু টিমটি এক গোলে হারালো মুসলিম টিমটিকে। তারপর ভিড় ঠেলে যাওয়ার মুখে হিন্দু টিমের এক কর্মকর্তা পাকড়াও করলেন। এই ভদ্রলোক ছাড়া অন্য সব কর্মকর্তা আনন্দে মত্ত। হিন্দু টিমটির এক মুসলিম প্লেয়ার বড় অসুস্থ, যদি একবার দেখতে যান। ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেলাম। কারণ, এর বিরুদ্ধে বার বার বলেও কোনো ফল পাইনি।

তবু যেতে হয়। কেউ বালী নিয়ে, কেউ মিষ্টি নিয়ে ছুটোছুটি করছেন। কারো খেয়াল নেই একটা প্রাণবন্ত ছেলেকে আজ ডোপ করানোর ফল। সে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে পাশের ঘরে। কোচ্ আমায় দেখে চোখ নামিয়ে নিয়ে চলে গেলেন।

কি করা যায়? হসপিটাল, গ্যাস, স্যালাইন ছাড়া আর পথ কি খোলা আছে? কর্মকর্তাটি বিচক্ষণ মানুষ। অবস্থা দেখে আমার কথা কানে তুললেন। অ্যাম্বুলেন্স এলো। পেছনের দরজা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছি নার্সকে। অন্যান্য খেলোয়াড়রা বিমর্ষ। তখন দর্শকের দল জানেও না এ-কথা, তারা আপনমনে কেউ যাচ্ছে, কেউ গান, কেউ বাজনা নিয়ে দুধারা দিয়ে রাস্তার উপরে চলেছে। অ্যাম্বুলেন্সের পাশ কাটিয়ে হাজির হোলো হাসপাতালে। বৃষ্টি পড়ছে অনেকক্ষণ ধরে। বাজ পড়েছে শুনলাম। লোক মারাও গেছে।

হসপিটাল এমারজেন্সিতে এক করুণ দৃশ্য! অনেক মৃতের মাঝে এসে শুলো এক বাচ্চা—সে আল্লার নামে শপথ খেয়ে অনেকগুলো ডোপ খেয়ে নেমেছিলো গোল দেবেই। দিয়েছে—আর তার প্রয়োজন নেই। ইতিহাস বোধহয় এইভাবেই রচে। আমার কাজ দ্রুত করলাম। জানলাম ডক্টর ইন-চার্জকে ফিসফিস করে। চোখ গোল করে ডক্টর জানতে চাইলেন স্টেজ কি? বললাম। এখান থেকে সরান হলো একটা ভালো কেবিনে। অনেক বন্ধু এসে গেছে। আমার কাজ শেষ। সেই স্নেহময় কর্মকর্তাটি আমায় চলে যেতে দেখে ছুটে এসে জানতে চাইলেন অবস্থা। বড় ডাক্তারের দল এলো—কত ওষুধ গেল। আমি চলছি বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ট্রাম-রুট বন্ধ—এক হাঁটু জল হরিশ মুখার্জি রোডে। পাশ দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেলেন ক্লাবের আর এক কর্মকর্তা। তিনিও এতক্ষণ হাসপাতালে ছিলেন, আর চিনতে চেষ্টা করলেন না, যদি কাড়ি পৌঁছে দিতে হয়। হাসি পেলো—মানুষ এই? পরের দিন এক সাংবাদিক বন্ধুকে ক্যাজুয়ালি বলছিলাম। কথাটা বুঝতেও দেয়নি কি করবে। এবং সে বুঝতেও পারেনি এই সংবাদ বড় শক্ত, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লেখা বড় শক্ত। তাকে ভুগতে হল। সেই রাতে যখন সে নিউজ করলো হসপাতালের খাতার খেলোয়াড়টিকে কি অসুস্থতা ঘোষণা করা হয়েছে তা বলে। খবর যাবে বিরাট বড় হয়ে, হঠাৎ বাজ পড়লো। এক বড় কর্তা কোথা থেকে এসে হাজির, কিছুতেই এ-খবর যাবে না। এ-পাপের কথা শহরকে বলা যাবে না। অনেক ধাক্কাধাক্কি সব বিফল। ছাপা হল না নিউজ।

ফৈজলাবাদে ফয়সালা হলনা

ফৈজলাবাদেও ফয়সালা হল না। দীর্ঘ আঠারো বছর পরে ফৈজলাবাদে বসেছিল ভারত-পাকিস্তান টেস্ট ক্রিকেটের আসর। কিন্তু সেখানে ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। ১৯৫২ সাল থেকে যে ইতিহাস দাঁড়িয়ে আছে অমীমাংসার ওপর ভিত্তি করেই।

১৯৫২ সালে ভারত-পাকিস্তান টেস্ট ক্রিকেট শুরু হয়। এবং তিন মরশুমে মোট পনেরোটি টেস্ট খেলা হয়েছিল দুই দেশের মধ্যে। এর মধ্যে ১৯৫২ সালের প্রথম তিনটি টেস্টের মীমাংসা হয়েছিল। দিল্লির প্রথম টেস্টে ভারত এক ইনিংস ও ৭০ রানে পাকিস্তানকে হারিয়েছিল। কিন্তু লক্ষ্ণৌর দ্বিতীয় টেস্টে উল্টে গেল ফলটা। ভারতকে পাকিস্তানের কাছে এক ইনিংস ও ৪৩ রানে লজ্জাকর হার স্বীকার করতে হল। কিন্তু কোয়াইরের তৃতীয় টেস্টে ভারত আবার জিতল। এবার জিতল দশ উইকেটে। এবং সেবার ২-১ টেস্টে জিতে ভারত যে বাবার লাভ করেছিল আজো তা আছে ভারতেরই হাতে।

কারণ তারপর থেকে ফৈজলাবাদের টেস্টের আগে পর্যন্ত দু দেশের মধ্যে যে কুড়িটি টেস্ট খেলা হয়েছিল, তার সবকটিই শেষ হয়েছিল অমীমাংসিতভাবে। কোন দলই মীমাংসার চেষ্টা করেনি। আসলে এই দুটি আত্মঘ্ন দেশের মধ্যে খেলার সময় স্নায়ুর চাপ এত প্রবল হয়ে ওঠে যে কেউ কারো বিরুদ্ধে হারতে চায় না। চায় না এতটুকুও ঝুঁকি নিয়ে খেলতে। দু দেশের খেলোয়াড়রাই সবার আগে চেষ্টা করেন নিজেদের স্থান সুরক্ষিত করে তুলতে। ফলে আর যাই হোক, হেরে যাবার ভয় যেন এতটুকুও না থাকে। ফলে গত ১২টি টেস্টের একটিরও মীমাংসা হয়নি।

তবে এবারের ব্যাপারটা একটু অন্যরকম ছিল। পাকিস্তানের সামনের সারির খেলোয়াড়রা যোগ দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার টেলিভিসন মহারথী কেরি প্যাকারের দলে। টাকার লোভে তাঁরা দেশের কথা ভুলেছেন কোন দেশই তাঁদের জাতীয় দলে নিচ্ছেন না। এর জন্যে পুরো অস্ট্রেলিয়া আর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল দুটি নতুন করে গড়তে হয়েছে। ইংলণ্ড হারিয়েছে তাদের নির্ভরযোগ্য বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়কে। কেরি প্যাকারের দলে যে সব খেলোয়াড়রা যোগ দিয়েছেন তাঁরা আর টেস্ট ক্রিকেট খেলতে পারছিলেন না। অন্য দেশগুলোর মত পাকিস্তানও সেই পথ ধরেছিল। তারাও কেরি প্যাকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ খেলোয়াড়দের দলে নেয়নি। গত বছর একবার ঐ সব খেলোয়াড়দের জাতীয় দলে খেলানোর কথা উঠেছিল। কিন্তু পাকিস্তানের অন্য খেলোয়াড়রা তখন বেঁকে বসেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, কেরি প্যাকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ খেলোয়াড়দের খেলানো হলে তাঁরা খেলবেন না। তাঁরা আরো বলেছিলেন, কেরি প্যাকারের দলের খেলোয়াড়রা গাছেরও খাবেন আবার তলারও কুড়োবেন, এ তো হতে পারে না। যা হোক, একটা কিছু তাঁদের বেছে নিতে হবে। হয় প্যাকারের সার্কাস পার্টিতে খেলবেন তাঁরা—না-হয় তো জাতীয় দলে।

তাই এই বছরের গোড়ার দিকে প্যাকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ খেলোয়াড়দের বাদ দিয়েই পাকিস্তান গেল ইংলণ্ড সফরে। সেখানে প্রথম দুটি টেস্টে পাকিস্তান গোহারা হারল। তৃতীয় টেস্টে পাকিস্তান ঠিক করেছিল যে প্যাকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ খেলোয়াড়দের খেলাবে। কিন্তু এবার বেঁকে বসলেন ইংলণ্ডের খেলোয়াড়রা। তাঁরা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে প্যাকারের দলের খেলোয়াবরা যদি পাক দলে খেলেন তাহলে তাঁরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলবেন না। ফলে পাকিস্তানকে সেই আশা ছাড়তে হল।

কিন্তু, ভারতের সঙ্গে খেলার কথা উঠলে পুরো ব্যাপারটাই উল্টে যায়। কারণ তখন যে মর্যাদার লড়াইয়ের প্রশ্নটি দু দেশের খেলোয়াড়দের সামনে মস্ত হয়ে দাঁড়ায়। তাই ভারত-পাকিস্তানের টেস্ট লড়াইয়ে পাকিস্তান কিছুতেই হারবে না এই প্রতিজ্ঞায় অটল থেকে পাক ক্রিকেটের কর্তারা অনেকদিন আগে থেকেই পরিকল্পনা এঁটেছিলেন। তাঁরা ঠিক করেছিলেন, এমনভাবে পিচ বানাবেন যাতে স্পিন বোলাররা কিছুতেই হুল ফোটাতে না পারেন। কারণ স্পিনাররা বিন্দুমাত্র সুবিধে পেলেই চন্দ্রশেখর, বেদী, প্রসন্ন আর ভেঙ্কটরাঘবন পাকিস্তানের ব্যাটিং শক্তিকে তছনছ করে দেবেন। তাই পাকিস্তানের ক্রিকেট কর্তারা এমন পিচ বানালেন যা থেকে কেউই সুবিধে পেলেন না। সিমেন্টের মত শক্ত সেই পিচ হয়ে দাঁড়ালো ব্যাটসম্যানদের স্বর্গ। সেই স্বর্গে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেছেন দু দলের ব্যাটসম্যানরা। তাই রান উঠেছে গাদা গাদা। কিন্তু উইকেট পড়েনি সেই অনুপাতে।

ভারতকে রোখার জন্যে পাক ক্রিকেটএর কর্তারা ঠিক করলেন যে তাঁরা প্যাকারএর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ খেলোয়াড়দের খেলাবেন। বেশ কয়েক মাস আগে ভারতের দুই প্রাক্তন খেলোয়াড় জয়সীমা আর আব্বাস আলি বেগের সাহায্যে অনুষ্ঠিত খেলায় কেরি প্যাকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ পাক খেলোয়াড়রা খেলতে এসেছিলেন। তাঁরা শুধু প্রদর্শনী খেলাতে খেলেই যাননি, সেই সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেটের ধাঁচ এবং খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে সব কিছু জেনে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ বেশ কয়েক মাস আগে থেকেই আঁটঘাঁট বেঁধে তবেই পাকিস্তান খেলতে নেমেছে।

শুধু তাই নয়, কেরি প্যাকারের দলের মুস্তাক মহম্মদের হাতে তুলে দিয়েছে পাকিস্তান দল পরিচালনার ভার। প্যাকারের খেলোয়াড়দের পাক দলে খেলানোর জন্যে এবার আর কোন প্রতিবাদ, কোন অভিযোগ শোনা গেল না। পাকিস্তানের অন্য খেলোয়াড়রা সব কিছু দেখেশুনে চুপ করে গেলেন। কারণ খেলা এবার ভারতের বিরুদ্ধে। আর যার কাছে হারা যাক না কেন ভারতের কাছে কিছুতেই নয়।

তাই ব্যাটসম্যানদের স্বর্গে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে জহির আব্বাস প্রথম ইনিংসে ১৭৬ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৯৬ রান করলেন। মুদ্দাসর মিয়াদাদ প্রথম ইনিংসে ১৫৪ রান করে অপরাজিত রয়ে গেলেন। আসিফ ইকবাল দ্বিতীয় ইনিংসে করলেন ১০৪ রান। পাকিস্তান প্রথম ইনিংসে ৮ উইকেটে ৫০৩ রান করে প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে দিল। এই ইনিংসে ভারতের বোলাররা মন্থর পিচ থেকে বিন্দুমাত্রও সুবিধে আদায় করতে পারলেন না। দেদার রান তুলতে লাগলেন ব্যাটসম্যানরা। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে চন্দ্রশেখর চারটি ও বেদী তিনটি উইকেট দখল করলেন।

ভারতও পাল্টা জবাব দিল। গাভাস্কার আউট হয়ে গেলেন ৮৯ রান করে। বিশ্বনাথ টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর জীবনের সর্বোচ্চ শতরান করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভারতের একমাত্র খেলোয়াড় হিসেবে সব দেশের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করার কৃতিত্ব অর্জন করলেন। তিনি এর আগে অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ইংলণ্ড ও নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে শতরান করেছিলেন। এবার করলে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। ভারতের আর এক তরুণ ব্যাটসম্যান দিলীপ ভেঙ্গসরকার সেঞ্চুরির দোরগোড়ায় পৌঁছেও আউট হয়ে গেলেন। তাই ভারত নয় উইকেটে ৪৬২ রান করে তাদের প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে দিল।

তখন আর খেলার কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। তাই সেই সুযোগে পাকিস্তানের খেলোয়াড়রা বেশ খানিকটা ব্যাটিং প্রাকটিশ করে নিলেন। চার উইকেটে ২৬৪ রান করে তাঁরা ইনিংসের সমাপ্তি করে দিলেন। শেষ দিনে মাত্র ৯০ মিনিট ব্যাট করার সুযোগ পেয়েছিল ভারত। সেই সময়ে ভারত কোন উইকেট না হারিয়ে ৪৩ রান করল। এবং সেই সঙ্গে ফৈজলাবাদের প্রথম টেস্ট ম্যাচ শেষ হল অমীমাংসিতভাবে। অর্থাৎ টানা ১৩টি টেস্ট ড্র হল। পৃথিবীর ক্রিকেটের ইতিহাসে দু দেশের এইরকম মরশুমের পর মরশুম অমীমাংসিতভাবে করতে বোধহয় আর কোন দেশ পারেনি।

ফৈজলাবাদের প্রথম টেস্টম্যাচ শেষ হয়ে

খেলা।' প্রত্যাশিত ফলই হয়েছে অর্থাৎ ফয়সালা হয়নি। এই লেখা যখন পাঠক-পাঠিকাদের হাতে পৌঁছুবে ততদিনে লাহোরের দ্বিতীয় টেস্টম্যাচও শেষ হয়ে যাবে। সে খেলার কি মিমাংসা হবে? মনে তো হয় না। কারণ অনিশ্চয়তার খেলা ক্রিকেট হলেও লাহোরেও কেউ যে কোন-রকম ঝুঁকি নিয়ে খেলবে না। তবে দু দেশের শেষ টেস্টম্যাচটি চলবে ছয় দিন ধরে। সেই খেলার কি মীমাংসা হবে? তা অবশ্য হবার সম্ভাবনা আছে। কারণ ছদিন অঢেল সময়।'

তবে পিচ যদি ঐ রকম প্রাণহীন হয়, তাহলে সেই মরা পিচে খেলোয়াড়দের কাছে আর কিই আমরা আশা করতে পারি? তবে একথা ঠিক যে শেষ টেস্টে ফয়সালার প্রশ্নটি পুরোপুরি নির্ভর করবে পিচের চরিত্রের ওপর। এবং খেলার ফয়সালা হলে তা পাকিস্তানের অনুকূলে গড়াবার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ, কি ব্যাটিং, কি বোলিং, কি ফিল্ডিং সব দিক দিয়েই পাকিস্তানের খেলোয়াড়রা অনেক বেশি পরিণত। ভারতীয়রা পেস বোলিং, মারকুটে ব্যাটিং ও নিপুন ফিল্ডিং-এর দিক দিয়ে পাকিস্তানের ধারে-কাছে পৌঁছুতে পারেননি। তাই জেতার সম্ভাবনা এলে তা যে ভারতের অনুকূলে খুব একটা বেশি আসবে না—সে কথা বলাই বাহুল্য। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়।'

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ড্র—১৩

ফৈজলাবাদে ভারত বনাম পাকিস্তানের প্রথম টেস্ট খেলার ফয়সালা হয়নি। খেলা ড্র গেছে। এই নিয়ে ভারত বনাম পাকিস্তানের পর পর তেরটা টেস্ট খেলা ড্র গেল —১৯৫২-৫৩ সালের টেস্ট সিরিজের ৪র্থ ও ৫ম টেস্ট, ১৯৫৪-৫৫ সালের টেস্ট সিরিজের পাঁচটা টেস্ট, ১৯৬০-৬১ সালের টেস্ট সিরিজের পাঁচটা টেস্ট এবং ১৯৭৮ সালের টেস্ট সিরিজের ১ম টেস্ট। পাকিস্তানের মাটিতে বেশীর ভাগ টেস্ট ক্রিকেট খেলা ড্র গেছে। ৪০টা টেস্ট খেলার মধ্যে ২৬টা খেলা ড্র।

পাকিস্তানের অধিনায়ক মুস্তাক মহম্মদ টসে জিতে প্রথম ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। মন্থর পিচে ব্যাটসম্যানরা মনের সুখে রান তুলেছিলেন। প্রথম দিনের খেলায় পাকিস্তান ৩ উইকেট খুইয়ে ২৮৩ রান সংগ্রহ করেছিল। জাহির আব্বাস ১২৮ এবং জাভেদ মিয়াদাদ ৫৩ রান করে অপরাজিত ছিলেন। অসমাপ্ত চতুর্থ উইকেটের জুটিতে জাহির আব্বাস এবং জাভেদ মিয়াদাদ ১৭৩ রান তুলে ভারতের বিপক্ষে ৪র্থ উইকেট জুটিতে নতুন রেকর্ড রান করেন।

দ্বিতীয় দিনের চা-পানের সময় পাকিস্তান তাদের ৫০৩ রানের মাথায় (৮ উইকেটে) প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। এরপর ভারত কোন উইকেট না-খুইয়ে ৬৪ রান সংগ্রহ করেছিল। জহির আব্বাস ৩১৯ মিনিট খেলে ১৭৬ রান করে আউট হন। তাঁর এই ১৭৬ রানে ছিল ২৩টা বাউণ্ডারী এবং ২টো ছক্কা। অপরদিকে জাভেদ মিয়াদাদ ৭ ঘন্টা খেলে ১৫৪ রান করে নট-আউট থেকে যান। তিনি ১৩টা বাউণ্ডারী এবং ৩টে ছক্কা মেরেছিলেন। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে জাহির আব্বাস এবং জাভেদ মিয়াদাদ ২৫৫ রান তুলেছিলেন। এই ২৫৫ রান ভারত বনাম পাকিস্তানের টেস্ট খেলায় উভয় দেশের পক্ষে ৪র্থ উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড রানে পরিণত হয়েছে।

তৃতীয় দিনে ভারতের প্রথম ইনিংসের খেলার রান দাঁড়ায় ২৯১ (৩ উইকেটে)। গাভাস্কার ৩৪৬ মিনিট খেলে ৮৯ রান করে আউট হন। এইদিন খেলায় অপরাজিত থাকেন বিশ্বনাথ (৭৭ রান) এবং বেঙ্গসরকার (১৮ রান)। রানের হিসাব নিয়ে দেখা গেল পুরো তিনদিনের খেলায় ১১টা উইকেট পড়ে ৭৯৪ রান উঠেছে। পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসের বিরাট ৫০৩ রানের সামনে দাঁড়িয়ে গাভাস্কার এবং বিশ্বনাথ দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে ভারতকে নিরাপদ অবস্থায় এনে দিয়েছিলেন।

চতুর্থ দিনে ভারত ৪৬২ রানের (৯ উইকেটে) মাথায় প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। তখনও পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসের ৫০৩ রানের থেকে ভারত ৪১ রানে পিছিয়ে ছিল। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে বিশ্বনাথ এবং বেঙ্গসরকার অতি মূল্যবান ১৬৬ রান যোগ করে ভারতকে বিপদমুক্ত করেন। বেঙ্গসরকার ৮৩ রান করেন। বিশ্বনাথ তাঁর ১৪৫ রানে ১৬টা বাউণ্ডারী করেন। এটা তাঁর ৬ষ্ঠ সেঞ্চুরী। পাকিস্তানের বিপক্ষে এই সেঞ্চুরী করার ফলে বিশ্বনাথ প্রতিটি দেশের বিপক্ষে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় সেঞ্চুরী করলেন। অপর কোন ভারতীয় খেলোয়াড়ের ভাগ্যে এই গৌরব জোটেনি।

চতুর্থ দিনের বাকি সবটের খেলায় পাকিস্তান দ্বিতীয় ইনিংসের কোন উইকেট না খুইয়ে ৩৪ রান করেছিল।

খেলার শেষ পঞ্চম দিনে পাকিস্তান দ্বিতীয় ইনিংসের ২৬৪ রানের মাথায় (৪ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করলে ভারত নিয়মরক্ষার জন্য দ্বিতীয় দফায় ব্যাট করতে নেমে বিনা উইকেটে ৪৩ রান করেছিল।

পঞ্চম দিনে পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংসে জাহির আব্বাস এবং আসিফ ইকবাল ৩য় উইকেটের জুটিতে ১৬৬ রান তুলেছিলেন। আসিফ ইকবাল ১০৪ রান করেন। জাহির আব্বাস তাঁর ব্যক্তিগত ৯৬ রানের মাথায় অনিয়মিত বোলার গাভাস্কারের বল মনের সুখে পিটিয়ে বাউণ্ডারী করতে গিয়ে আউট হন। ফলে চার রানের জন্যে টেস্টের উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করার দুর্লভ গৌরব থেকে তিনি বঞ্চিত হন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পাকিস্তান : ৫০৩ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেঃ জাহির আব্বাস ১৭৬ ও জাভেদ মিয়াদাদ ১৫৪ অপরাজিত। বেদী ১২৪ রানে ৩, প্রসন্ন ১২৩ রানে ১ এবং চন্দ্রশেখর ১৩০ রানে ৪ উইকেট)

ও ২৬৪ রান (৪ উইকেটে ডিক্লেঃ জাহির আব্বাস ৯৬ এবং আসিফ ইকবাল ১০৪ রান)

ভারত : ৪৬২ রান (৯ উইকেটে ডিক্লেঃ সুনীল ন্যাভাস্কার ৮৯, বিশ্বনাথ ১৪৫ এবং বেঙ্গসরকার ৮৩ রান। মুস্তাক মহম্মদ ৫৫ রানে ৩ এবং সরফরাজ ১০৫ রানে ২ উইকেট)

ও ৪৩ রান (বিনা উইকেটে)

বিশ্ব দাবার লড়াই

ফিলিপাইনের বাগুইও সিটিতে আয়োজিত ১৯৭৮ সালের বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতার ৩২তম খেলায় ভিক্টর কর্চনয় শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করে নেওয়াতে বাশিয়ার আনাতোলি কারপভ ৬—৫ গেমে বিশ্ব খেতাব লাভ করেছেন। এই নিয়ে কারপভ বিশ্ব দাবার লড়াইয়ে উপর্যুপরি দুবার খেতাব জয়ী হলেন। ১৯৭৫ সালের লড়াইয়ের আসরে আমেরিকার বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়ান ববি ফিসার যোগ দিতে অস্বীকার করার ফলে আন্তর্জাতিক আইনমত রাশিয়ার আনাতোলি কারপভ বিশ্ব খেতাব লাভ করেছিলেন।

১৯৭৮ সালের কারপভ বনাম কর্চনয়ের এই বিশ্ব দাবার লড়াইটি খুবই উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। খেলার মধ্যে নানা বাক্-বিতণ্ডা এবং প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। এক সময় কারপভ ৪—১ ও ৫—২ গেমে এগিয়ে-ছিলেন। খেলার এই অবস্থায় কারপভ আর একটা গেম জিতলেই তাঁরই হাতে খেতাব থেকে যেত। কিন্তু কর্চনয় সহজে হার, ছাড়ার পাত্র নন। তিনি পরপর ২৮তম, ২৯তম ও ৩১তম খেলায় জিতে খেলার ফলাফল সীমা ৫—৫ দাঁড় করান। পরপর তিনটা খেলায় জিতে খেলা সমান করাতে উত্তেজনা তুঙ্গে উঠে যায়। বিশ্ব খেতাব জয়ের ফলে আনাতোলি কারপভ পেয়েছেন নগদ ৩,৫০,০০০ মার্কিন ডলার। অপরদিকে পরা-জয়ের ফলে ভিক্টর কর্চনয় পেয়েছেন নগদ ২,০০,০০০ মার্কিন ডলার।

সদ্য-সমাপ্ত বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত মীমাংসা হতে লেগেছে পাক্কা তিন মাস। খেলা আরম্ভ হয়েছিল জুলাই ১৮ তারিখে এবং খেলা শেষ হয় অক্টোবরের ১৮ তারিখে। আগের ১২টি বিশ্ব দাবার লড়াই এতদিন গড়ায়নি। ১৯৭৮ সালের বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতার মীমাংসা হতে লেগেছে ৩২টি গেম। সব থেকে বেশী গেম খেলার বিশ্ব রেকর্ড ৩৪টি—১৯২৭ সালে রাশিয়ার আলেখিনে কিউবার ক্যাপাব্লাঙ্কাকে ৩৪তম খেলায় হারিয়ে বিশ্ব খেতাব জয় করেছিলেন।

দর্শক

চিত্রধ্বনি

ধনরাজ তামাং

'ধনরাজ তামাং'-এ উত্তমকুমার কি ফিরে এলেন? এমন প্রশ্নের কারণ অবশ্যই 'বন্দী,' 'নিশান' প্রমুখ ছবির উত্তমকুমার। সত্যিই যেন হারিয়ে যাচ্ছিলেন। সেদিক থেকে বলা চলে, এ ছবিতে তিনি পুরোপুরি না হলেও, কিছুটা ফিরে এসেছেন। এখানে তিনি নামভূমিকার শিল্পী। চা-বাগানের কুলিদের এক সামান্য সর্দার (মানিয়েছে কতটা সেকথা আর নাই বা তোলা গেল)। ভয় নেই, লোভ নেই, সবল, পরোপকারী, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বুখে দাঁড়ায়—এমন একজন। সব মিলিয়ে কিছুটা মহাপুরুষের মতো। নায়িকা সন্ধ্যা রায়কে নিয়েই ওর জীবনে যত গণ্ডগোল। গুন্ডাদের হাত থেকে বাঁচাতে ধনরাজ তাকে স্ত্রীর স্বীকৃতি দেয়। ভালই চলছিল। বাদ সাধে চা-বাগানের লম্পট সাহেব উৎপল দত্ত। ফলস্বরূপ নায়িকা পাগল হয়। ধনরাজও জেলে যায়। জেল থেকে পালিয়ে সে অবশ্যই সাহেবের ওপর বদলা নেয়। তখন নায়িকা পুরোপুরি পাগল। শেষে মনের দুঃখে ধনরাজও পাগল হয়।

ফ্ল্যাশব্যাকে দেখানো ছবির কাহিনী করুণ হলেও অতি নাটকীয়। সেই সঙ্গে পরিচালক পীযূষ বসু যুক্তির দিকটাও এড়িয়ে গেছেন। কোনোরকমে ছবির গতি বজায় রাখারই চেষ্টা করেছেন। ফলে সব-কিছু তালগোল পাকিয়ে গেছে। এর সঙ্গে আবার নাচগান-মারপিটের ব্যবস্থা আছে। অনেকটা হিন্দী ছবির ঢঙে। আবেগ নিয়েও বাড়াবাড়ি হয়েছে। শুরুর গানটাই ধরা যাক। যাতে আছে—যতদিন হিমালয় থাকবে ততদিন ধনরাজের নামও উচ্চারিত হবে গোছের কিছু লাইন। চা-বাগানের পট-ভূমিকায় ছবির রঙিন বহির্দৃশ্য অবশ্য দেখতে খারাপ লাগে না। কিন্তু ওখানকার লোকেদের কাজকর্ম, কথাবার্তা, জামাকাপড়—সবের ওপর পরিবেশকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে পীযূষবাবু অনেক কাঁচা কাজ করেছেন। বিশেষ করে ডিটেলের ক্ষেত্রে।

উত্তমকুমার ছাড়া সন্ধ্যা রায়, উৎপল দত্ত, অনিল চ্যাটার্জি, দিলীপ রায়, তরুণ-কুমার, ছায়া দেবী, শম্ভু ভট্টাচার্য, অরুণ রায়, সুবলের শ্যামল মিত্র—এরা সবাই মোটামুটি। ছবিও সেইরকম।

অসিতবরণ মিত্র

স্টুডিও থেকে

কলকাতার অন্যতম হিন্দী নাট্যসংস্থা অনামিকার সভ্যরা এখন ছবি করছেন, প্রযোজনা নয়, অভিনয়। ভারতী প্রোডাক-সনের নতুন ছবি 'লালকা ফাগুয়ে অনামিকা গোষ্ঠীর শিল্পীরা অভিনয় করবেন। ছবিটির ভাষা অবশ্য বাংলা নয়, হিন্দীও ঠিক নয়, মৈথিলি।

এখানকার স্টুডিওগুলো বাংলা ছবির দুর্দশায় হতাশার শিকার। কলাকুশলীরা দিশেহারা। ভারতী প্রোডাকসনের বিশ্বাস লো-বাজেটের সৎ হিন্দী বা অ-বাংলা ছবি এই কলকাতায় তৈরী করলে ব্যবসায়িক সাফল্য অসম্ভব নয়। এবং সেই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই মৈথিলি ভাষায় ছবিটি করছেন ওঁরা।

বাঙালী দর্শকের কথা মনে রেখে 'লালকা ফাগুয়ে'র বাংলা ভার্সনও হচ্ছে। নাম—'অগ্নিসাক্ষী'। ভারতী প্রোডাকসনই করছে। সুনীল কুমারের পরিচালনায় কদিন আগে কয়েকটা গানও রেকর্ড করা হল বাংলা সংস্করণের জন্য। গানগুলি গাইলেন পিন্টু ভট্টাচার্য, অরুন্ধতী বোসচৌধুরী, অনিতা মজুমদার আর শকুন্তি ঠাকুর।

'অগ্নিসাক্ষী'তে অবশ্য অনামিকার সব শিল্পীরাই অভিনয় করবেন না। কিছু নতুন মুখের খোঁজও চলছে।

সরকারী অনুদান প্রসঙ্গ

স্টুডিওর কর্মচারীরা শুধু নয়, ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রির প্রায় প্রতিটি লোকের মুখে এখন একটিই প্রশ্ন—সরকারী অনুদানের কি হল? সেই আগস্ট মাস থেকেই জোর গুজব তিরিশজন পরিচালক-প্রযোজককে ছবি তৈরির জন্য টাকা দেবেন সরকার। সেজন্য কয়েকশ দরখাস্ত নিলেন, কমিটি হল, বেশ কয়েকবার কমিটির মিটিংও বসেছে।

কিন্তু এখনও পর্যন্ত ভাগ্যবানদের নাম জানা গেল না! কারণটা কি?

বাজেট ওপর দিয়ে অসখানেক ধরে বন্যার তাণ্ডব সব উল্টে-পাল্টে দিয়েছে বটে, কিন্তু সেকারণে মঞ্জুরকৃত নামগুলো জানানোয় বাধা কোথায়? বহু পরিচালক-প্রযোজক আশা-নিরাশার দোলায় দুলছেন। দু-একজন কাজও শুরু করে দিয়েছেন অনুদানের ভরসায়। কিন্তু সরকারী সবুজ সংকেতের কোন চিহ্ন নেই।

রাজ্যের তথ্য ও জনসংযোগ মন্ত্রী আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে বলেছিলেন সেপ্টেম্বরে প্রথম সপ্তাহেই অন্ততঃ পনের-জনের একটি তালিকা প্রকাশ করা হবে। প্রায় নভেম্বরের কাছাকাছি এখন, কিন্তু খবর কই?

অনুদানের সংবাদ যে টালিগঞ্জ পল্লীর করেক মাস আগে কাজের জোয়ার এনেছিল, আজ সেখানে ভাঁটার টান। অনুদানের দাবি ও তালিকা প্রকাশের দেরীই এই হতাশার অন্যতম কারণ।

যদিও একথা সত্য—অনুদান দিলেই বাংলা ছবির ব্যবসা ভালো হবে না, অ্যাভারেজ ছবির কোয়ালিটি বদলে যাবে না, কিন্তু বকতে নতুন চাপ আসবেতো! অনুদান যাঁরা পাবেন আর যাঁরা পাবেন না, তাঁদের মধ্যে সুস্থ সৎ ছবি তৈরির প্রতি-যোগিতা অন্ততঃ হবে! সেটাই এখন দরকার সবার আগে। বাংলা ছবির গুণগত মান উন্নত করতে হলেও অনুদান-টনিক এখনি দরকার। নইলে ভিড় বাড়বে ব্যবসায়িক ছবির নামে অপসংস্কৃতির, বাড়তেই থাকবে।

বাজে ছবি

স্টুডিও পাড়ায় এখন অনেকের মুখেই এই শব্দ তিনটে শোনা যায়। ওটা নাকি একটা ছবির নাম। প্রথম যেদিন একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট পরিচালক এই ছবির নামটি আমায় বললেন বুঝতে পারিনি তিনি রাজকাপুরের 'সত্যম-শিবম সুন্দরম'এর কথাই বলছেন।

সদ্য মুক্তি পাওয়া এই ছবিটিতে নাকি সত্য-শিব কিংবা সুন্দরের দেখা কেউই পাননি. বলছিলেন সেই পরিচালক। সবাই দেখেছেন শুধু সেক্স, জিনতের সেক্স। পরিচালক রাজকাপুরের নির্দেশে ক্যামেরা-

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নয়—এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাটক

তপন থিয়েটার ৪২৫৪৩৯

সহযাত্রী

নাটক/পরিচালনা: সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

বৃহস্পতি ও শনি ৬।।টায়; ছুটির দিন ও রবিবার ৩ ও ৬।।টায়

শ্রেঃ—বিকাশ রায়, সত্য বন্দ্যোঃ, প্রদীপ মুখোঃ, ছন্দা দেবী, সান্ত্বনা, গিরীশ, রবীন, মিহির, সুনীল, নিখিল, কেষ্ট, অরুণ, দীপঙ্কর, উশীনর, শৈলেন, বধূ, গণেশ, স্বপন, অলোক, তিমির এবং রত্না ঘোষাল ও তরুণকুমার

প্রয়োগ প্রধান / মন্টু বন্দ্যোপাধ্যায়

এ নাটক ৬০০ রজনীর পথে

ম্যান বাধ্য কর্মকার খোলা জিনতের ছবি তুলেছেন।

এসব অভিযোগ শোনার পর চোখ কানের ঝগড়া মেটাতে ঢুকেছিলাম সত্য-শিব-সুন্দরের খোঁজে একটি শহরতলীর ছবি ঘরে, সত্যি কথা বলতে কি, সত্য-শিবের কোন খোঁজ আমি সতের বীলের ছবিটিতে একটিবারও পাইনি। সুন্দরের নামে ভরি নিতম্ব আর ভারি বুকের কিছু মহিলার শরীর দেখেছি। আর নজর কেড়েছে জিনতের অশ্লীল চলন পোষাকের নামে বেহায়ামি, চোখে মুখে শরীরে সেক্স-এর চূড়ান্ত সুড়সুড়ি তোলা অভিব্যক্তি। দুটি চুম্বন দৃশ্যকে 'মাপ' করা গেলেও বাজ-কাপুরের বেনিয়া মনোভাবকে মাফ করা যায় না।

আর সব চাইতে বিস্ময়ের বিষয়—সত্যজিৎ ঋষের 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ি' এবং এই সত্যম-শিবম-সুন্দরম নামধারী বেনে ছবির প্রতি রাজ্য সরকারের দৃষ্টি, কিন্তু সমানভাবে নিক্ষিপ্ত। ব্যবসায়িক ফর্মুলার ছকে নয় বলে 'শতরঞ্জ' হয়ত আর কদিন বাদে পরিবেশকের বন্ধ ঘরে ধুলো জমাবে আর জিনতের সৌন্দর্য দেখতে পকেট ভারি করবে ব্ল্যাকাপুর।

উপরন্তু এই ধরনের অশ্লীল ছবি তরুণ মনস্ক দর্শকদের মানসিকভাবে দুর্বল ও বিকার করে তোলে নাকি? রাজ্যের বামপন্থী প্রকৃতিশীল সরকার এরপরে কি নীরব দর্শক হয়েই থাকবেন?

নির্মল ধর

অজিতেশ-এর প্রতিচ্ছায়া

'রঙ্গকর্মী' যখন তাঁদের নাটক 'পরিচয়'-এর আমন্ত্রণপত্রে লেখেন 'আর্নল্ড ওয়েস্কার'এর 'রুটস্', অবলম্বনে বুদ্ধদেব সেনগুপ্তকৃত 'যখন একা' হিন্দী রূপান্তর এই নাটক এবং নির্দেশনার দায়িত্বে নাম থাকে বুদ্ধদেবের তখন স্বভাবতই নান্দী-কার প্রযোজিত ঐ 'যখন একা' নাটকটির সঙ্গে বর্তমান 'পরিচয়' প্রযোজনার একটা তুলনা টানার প্রবণতা পূর্বাহ্নেই মনে এসে যায়। এবং বাস্তবে নাটকটি দেখতে গিয়ে বোঝা যায় যে, নাটকটি কেবলমাত্র বুদ্ধদেবকৃত 'যখন একা'র হিন্দী রূপান্তর নয়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'যখন একা'র পুরোপুরি হিন্দী রূপও বটে। বস্তুত মঞ্চ, মঞ্চসজ্জা, সংস্থাপন, আলো, অভিনয়ের লোক ও ভঙ্গী, নির্দেশনার যাবতীয় এইসব খুঁটিনাটিতে শ্রীসেনগুপ্ত হুবহু অজিতেশ-বাবুকে অনুসরণ করে গেছেন। ফলত আমরা একটি বাংলা নাটকের সর্ব অর্থে হিন্দী অনুবাদ দেখেছি 'রঙ্গকর্মী'র পরিচয় প্রযোজনায়। অবশ্য 'যখন একা' নান্দীকার-এর এপর্যন্ত শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা আমার মতে। তাই তার হুবহু হিন্দী অনুসরণ আমাকে দুঃখিত করেনি।

হিন্দী রূপান্তরে ভাষা ছাড়া আর যে স্থানীয় পরিবর্তন করা হয়েছে তা হল একটি চরিত্রের প্রদেশ বদল। বাংলা নাটকে বৌদিকে যেখানে হিন্দীভাষী দেখানো হয়েছিল, স্বভাবতই এই রূপান্তরে সেখানে সে বাঙালী হয়ে গেছে। এই বদলটুকুও অবশ্য মূলেরই সংহতিকে ধারণ করার জন্য। তেমনি ভালো লেগেছে 'স্মরনে যো চাহা' গীতটির প্রয়োগ সেই দৃশ্যে, বাংলায় যেখানে রবীন্দ্রসঙ্গীতে গাওয়া হতো 'না চাহিলে যারে পাওয়া যায়।' মা-র মুখে গানটির লাইন ভুল করা পর্যন্ত অবিকৃত রাখা হয়েছে।

তফাৎ একটাই। দলগত অভিনয়। 'নান্দীকার'-এর নিবিড় সংহত অভিনয়ের মেজাজ এখানে অনুপস্থিত। অবশ্য বকুল ঘোষ'-এর মত এক কথায় অনবদ্য; তেমনি 'উষা গাঙ্গুলীর বীণা। বাংলায় 'শেলী পাল'-এর আন্তরিক অভিনয়ের মধ্যেও যে বুদ্ধিগত ও শারীরিক পরিশ্রম অবাঞ্ছিতভাবে প্রকট হয়ে পড়ত, উষা গাঙ্গুলীর ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। 'বাজুর ভূমিকায় অশোক সিংহকেও মন্দ লাগে না। কিন্তু 'গোকুল,' কমলা,' 'ভোলা কাকা,' 'বাবু' প্রভৃতির অভিনয় এতই ভালো যে, নাটকটি কোন সংহতিতেই পৌঁছয় না। বিশেষত প্রায় এক যুগ হয়ে যাওয়ার পরেও এখনও যখন চোখে ভাসে 'অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়' বা 'বরুণবাবুর অভিনয়।

আদ্যন্ত তুলনাই করে যেতে হলো। আমাদের জন্য সেরকম পরিবেশই সৃষ্টি করা হয়েছিলো এই প্রয়োজনায়। অথচ, আমি অন্ততঃ কিছু নতুন উপস্থাপনা দেখবার আশায় গিয়েছিলাম। নাটক এক হলেও নির্দেশনায় তো অজিতেশবাবুর নাম ছিল না, ছিল বুদ্ধদেব সেনগুপ্তর নাম।

কবিতা পাঠ ও আবৃত্তির অনুষ্ঠান

কবিতা কিংবা সুললিত গদ্য অংশের পাঠ বা আবৃত্তিকে একটা স্বতন্ত্র শিল্পের মর্যাদা দেওয়া যায় কিনা সে বিষয়ে অনেকেরই মতো আমারও সন্দেহ আছে। কিন্তু যেহেতু যে কোন রচনাই লিখিত হয় পড়া এবং শোনার জন্য। ফলে সেই পাঠ যদি শ্রুতি মধুর, সঠিক অর্থ ও ধ্বনিবহ এবং সুপ্রযুক্ত হয় তবে তার আবেদন নিশ্চয়ই অস্বীকার করা যায় না। ৪র্থা সেপ্টেম্বর, শিশির মঞ্চে 'আপরেম' আয়োজিত আলোচনা চক্র এবং পাঠ ও আবৃত্তির অনুষ্ঠান শুনে মনে হল তাঁরা এই কলাকৃতিকে চিরাচরিত ও শিথিল করে তুলবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।

অনুষ্ঠান শুরুতে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় সংবাদপত্র ও জনসংযোগ উপদেষ্টা শ্রীঅধীর চক্রবর্তীর ভাষণটি ছিল প্রামাণিক তথ্যবহুল ও মূল্যবান। 'কবিতা আবৃত্তি বিষয়ে শ্রীদেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট্ট আলোচনাটি অন্তরঙ্গতার গুণে উপভোগ্য হয়ে ওঠে। দীপংকর মজুমদারের ভাষণ কিন্তু তুলনায় উদ্দীপ্ত হলেও অস্পষ্ট।

মূল পাঠ শুরু হয় রবীন্দ্রনাথের লিপিকা থেকে নির্বাচিত গদ্যাংশ নিয়ে। তারপরে আরও বহু উল্লেখযোগ্য কবির কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি হয়। তবে মনে হয় আসরের বিশেষত্ব ছিল সুনীল গঙ্গো-পাধ্যায় ও পবিত্র মুখোপাধ্যায় এই দুই বিশিষ্ট আধুনিক কবির দুটি দীর্ঘ কবিতাকে সুর, ধ্বনি, বাদ্যযন্ত্র, পাঠ ও আবৃত্তির মাধ্যমে উপস্থাপন। পবিত্র মুখো-পাধ্যায়ের কবিতায় ধ্বনিগুণ বেশী থাকায় এই রীতির উপস্থাপনে প্রতি মধুরতায় বিঘ্ন ঘটেনি। কিন্তু সুনীলবাবুর কবিতার সহজ স্বাভাবিক কথ্য রীতি এতে একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া সাধারণভাবে এই রীতিতে কবিতা উপস্থাপিত হলে কবিতার বক্তব্য বা ভাব আবেদন লিখিত হতে বাধ্য। প্রসঙ্গত এঁদের দুজনের কবিতা শুরু হওয়ার আগে এঁদের বিষয়ে যে নাতিদীর্ঘ পরিচিতি হয়েছে তা এক কথায় হাস্যকর এবং নিতান্তই ছেলেমানুষী।

অবশ্য অনুষ্ঠানটির প্রশংসনীয় দিক এর পরিকল্পনার বিশালতা। আর প্রথিত-যশাদের সঙ্গে সঙ্গে তরুণ কবিদেরও উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে উপস্থিত করা। ঘোষণায় কবির নাম বলতে একবার ভুল ঘটে যাওয়া তেমন কোন অমার্জনীয় অপরাধ নয় তাই। সব মিলিয়ে একরকম একটি অনুষ্ঠানের জন্য দীপংকর মজুমদার ও তাঁর সঙ্গী বীরানাথ মণ্ডল, সুতপন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ধন্য-বাদার্হ। কিন্তু অনুষ্ঠানে উপস্থিতদের সংখ্যা দৃষ্টিকটুভাবে কম হওয়ায় আশংকা হচ্ছে যে বিভিন্ন আবৃত্তির আসরে যে ভিড় হয় তা জনপ্রিয় শিল্পীদের জন্য, আবৃত্তির জনপ্রিয়তার কারণে নয়।

শেষে আর একটা কথা না বলে পারছি না। আধুনিক কবিতা আবৃত্তিকে সকলের অবধানের কথাই বারবার বলা হল যেমন শ্রীশম্ভু মিত্র, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপ ঘোষ, পংকজ সাহা ইত্যাদি। অথচ একবারও উচ্চারিত হলো না সুধীন্দ্রনাথ দত্তের নাম। তাঁর রেকর্ডও কি উদ্যোক্তারা শোনেনি কেউ? সুব্রতিৎ ঘোষ।

পূর্ণাঙ্গ বাংলা নাটক

আগামী ৯ই ডিসেম্বর ১৯৮৩ শনিবার থেকে বেঙ্গলী ক্লাব ও যুবক সমিতি লখনউ কর্তৃক ষোড়শ বর্ষ সর্বভারতীয় পূর্ণাঙ্গ বাংলা নাটক প্রতিযোগিতা। সমিতির 'অতুল সিংহ' নাট্যমঞ্চে শুরু হবে। যোগদানের জন্য নাম পাঠাইবার শেষদিন ১০।১১।১৯৮৩। শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার পুরস্কার নগদ ৫০১ টাকা, ২য় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার জন্য পুরস্কার নগদ ২০১ টাকা এবং ৩য় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার জন্য পুরস্কার নগদ ১০১ টাকা। বিস্তারিত সংবাদের জন্য ২০নং শিবাজী মার্গ লখনউ, ফোন : ৪৭৯২০, ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

শুধু বিজ্ঞাপনই নয় বিজ্ঞানও বটে

'আয়ুর্বেদোহমৃতানাম'— আয়ুর্বেদ অমৃতের শ্রেষ্ঠ। আয়ুর্বেদিক ঔষধের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতে আয়ুর্বেদীয় ঔষধগুলির চাহিদা দিনে দিনে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। সম্পূর্ণ দেশজ সম্পদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের নির্দেশে এখন যে সমস্ত ঔষধগুলি প্রস্তুত হচ্ছে তা জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধনের ব্রত পালন করে চলেছে। প্রাচীনকাল থেকে বহু মুনি ঋষিরা এবং আয়ুর্বেদাচার্যগণ বহু গবেষণা করে এই সব বনজ, খনিজ প্রাণীজ এবং সাধারণ লতাপাতা থেকে যে সমস্ত ঔষধ আবিষ্কার করে গেছেন সেগুলো এখন আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে পরম সমাদর লাভ করছে। আয়ুর্বেদের প্রামানিক গ্রন্থসমূহ যেমন আয়ুর্বেদ সংগ্রহ, দ্রব্যগুণ নির্ঘন্টম, ভৈষজ্যরত্নাবলী, চরক ও সুশ্রুত সংহিতা প্রভৃতি বহু প্রাচীন পুস্তকে আয়ুর্বেদীয় ঔষধের গুণ-সমূহ উল্লেখ করা আছে। তাঁদের সেই প্রজ্ঞালব্ধ জ্ঞানামৃতের পরম্পরা রক্ষা করে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের সমীকরণে এস, সি, কেমিক্যালস আয়ুর্বেদীয় ঔষধের জগতে যে সাম্প্রতিকতম ঔষধটি সংযোজন করেছেন তার নাম **'লিউকোনেক্স'** ট্যাবলেট। **'লিউকোনেক্স'** ট্যাবলেট লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগের আশু ফলপ্রদ ঔষধ। এই অসুখ মেয়েদের রূপলাবণ্য হরণ করে। অসহ্য যন্ত্রণায় ও কষ্টে মহিলারা ক্রম নৈরাশ্যের অন্ধকারে প্রবিষ্ট হন। স্বাস্থ্যের পক্ষে পরম হানিকর এই লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগটি যখন ক্রমান্বয়ে অধিক পরিমাণে প্রকাশ পায় তখন রোগীর গলাবুক জ্বালা, হাতে পায়ে জ্বালা হয় এবং পরে উহা সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। অম্লবোধ, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, ক্ষুধামান্দ্য, আমাশা, খুঁতখুতে স্বভাব, সন্ধিগতচিত্ততা, আত্মবিশ্বাস নষ্ট, আহারে অরুচি, কর্মে অনুৎসাহ, জীবনে হতাশা ও বিতৃষ্ণা, নিদ্রানাশ, নিতান্ত আপনজন স্বামীপুত্রের প্রতি স্নেহ ভালবাসাটুকুও হ্রাস পায় সুতরাং এই লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগকে সম্পূর্ণরূপে নিরাময়ের জন্য এস, সি, কেমিক্যালস নিরলস প্রচেষ্টায় প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্র নির্দেশিত পথে উন্নত পরীক্ষাগারে প্রস্তুত করেছেন **'লিউকোনেক্স'** ট্যাবলেট, তাই রোগ যত পুরানো ও কঠিন হোক না কেন **'লিউকোনেক্স'** ট্যাবলেটই লিউকোরিয়ার (সাদাস্রাবের) বিশ্বাসযোগ্য প্রতিকার, এই ঔষধ সেবনের পরে দেহে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না। দ্রুত আরোগ্যলাভ করতে হলে **'লিউকোনেক্স'** ট্যাবলেট ব্যবহারের সঙ্গে বাহ্যিক চিকিৎসা হিসাবে আক্রান্ত স্থানে **'ফেকটিন'** লোশনটির ব্যবহার অপরিহার্য। সুতরাং আর দেরী না করে আয়ুর্বেদের বিশুদ্ধ ঔষধ **'লিউ-কোনেক্স'** ট্যাবলেট সেবন করুন এবং **'ফেকনিট'** লাগান। লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগে আক্রান্ত রোগীদের বিশেষভাবে জানান যাচ্ছে যে, যাঁরা প্রচণ্ড অম্বল অজীর্ণ বুকজ্বালা প্রভৃতি রোগে ভুগছেন তাঁরা **'এসিনা'** ব্যবহার করুন। লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগের সঙ্গে যাঁরা পুরাতন ও নতুন আমাশয়ে ভুগছে তাঁরা **'এসিবেল'** ব্যবহার করুন। লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগের সঙ্গে যাঁরা কোষ্ঠকাঠিন্য, অরুচি, ক্ষুধামান্দ্য ও লিভার জনিত যে-কোন অসুখে কষ্ট পাচ্ছেন তাঁরা **'এসিনেক্স'** ব্যবহার করুন, লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগের সঙ্গে যাঁরা ব্যথা ও গাঁটের বাতজনিত রোগে ভুগছেন তাঁরা **'আরথিন'** ব্যবহার করুন। লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগের সঙ্গে যাঁরা কৃমিতে ভুগছেন তাঁরা **'ভারনেক্স'** ব্যবহার করুন। লিউকোরিয়া (সাদাস্রাব) রোগের সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত ভদ্রমহিলারা এই সব উপসর্গে ভোগেন তাঁরা **'লিউকোনেক্স'** ট্যাবলেট ব্যবহারকালে ঐ সব উপসর্গের জন্য উল্লিখিত ঔষধগুলো ব্যবহার করলে রোগের আরোগ্য আরও ত্বরান্বিত হবে। আজই আপনার নিকটবর্তী দোকানে খোঁজ করুন অথবা সরাসরি আমাদের কবিরাজমণ্ডলীর সুপরামর্শ গ্রহণ করুন। **এস, সি, কেমিক্যালস,** (আয়ুর্বেদ বিভাগ), ২৭নং শোভাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৫।

Release through Calcutt a Filmlet Advertising.

দাদামণির রাগ

দাদামণি অর্থাৎ অশোককুমার বোম্বে ফিল্মের সব থেকে শত্রুশেষ মানুষ। শখ ভাল খাওয়া। সে খাবার আবার ভালভাবে পরিবেশন করা চাই। একদিন খেতে বসেছেন। ভাবীজী মাছের ঝোল দিতেই দাদামণি খেপে গেলেন। ঝোল ঠাণ্ডা বরফের মত। ভাবীজি ভেবেছেন চাকর গরম করেছে। আর চাকর ভেবেছে ভাবীজী গরম করেছে। কিন্তু কেউ করেনি। দাদামণি রেগে, ঝোলের পাত্রটি ঢেলে দিলেন চাকরের মাথায়। সে বেচারির ব্যবস্থা করিল। পাঁচদিন ধরে মাথার শ্যাম্পু আর তেল ঘসেও সেই মাছের ঝোলের গন্ধ দূর করা যায় নি। সংবাদটি দিয়েছেন ভাবীজী।

০ সেইসব নিন্দুকদের সঙ্গে একমত হতে পারছি না। যারা বলছেন দেবের যৌবন বিগত। তাদের বোধ হয় স্মরণ নেই, দেবের যৌবন টিনা মুমিন।

হেমার গায়ে পায়ে ফ্যান

ফ্যানদের হাত থেকে বক্ষা পাওয়াই হেমার কঠিন হয়ে উঠেছে। এক ফ্যানের আকস্মিক আবির্ভাবে হেমার বাবা মারা গেলেন কিছুদিন আগে। এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল বছর কয়েক আগে। ১৯৭৪ সালের অগাস্ট। মহালক্ষ্মী স্টুডিওতে হেমা মেকআপ রুমে ছিল। ইমারুর হাজান বিজ্ঞাপিত নাচ ডাঁই সংলাপের স্যুটিং চলছিল। হেমার নৃত্য দৃশ্য গ্রহণ করার কথা সেদিন। জনৈক ফ্যান কোন ফাঁকে ঢুকে পড়েছে মেকআপ রুমে। হেমাকে বলল, তুমি কোন সাহসে অন্য কাউকে বিয়ের কথা ভাবছ? কয়েক জন্মে তুমি আমার স্ত্রী ছিলে, এখনও তুমি আমার এবং একমাত্র আমারই থাকবে। আমি তোমার কোষ্ঠী দেখেছি। এ জন্মে বিয়ের সময় এখনও আসেনি। ১৯৭৫ সালের মার্চের আগে তুমি বিয়ে করতে পারবে না। মনে রেখো গত কয়েক জন্মে তুমি আমার স্ত্রী ছিলে।' হেমার তখন কাহিল অবস্থা। চারদিকে প্যানিক। কয়েকজন ছুটে গেল হেমাকে রেস্ত করে আনতে। কোনক্রমে হেমা সরে পড়ে সেখান থেকে।

০ বিগ স্টার সিস্টেম বোম্বে ফিল্মের ইজ্জত। বেশির ভাগ ছবিই হচ্ছে ৭০ মিঃ মিঃ। স্যুটিং-এর সময় জনৈক ব্যবসায়ী প্রোডিউসারের অ্যাসিস্ট্যান্টকে জিজ্ঞেস করল ছবিটি ৭০ মিঃ মিঃ কিনা। ভদ্রলোক উত্তরে বললেন, অবশ্যই। আপনি কি করে ভাবলেন এতগুলি স্টারকে ৩৫ মিঃ মিঃ-এ জায়গা দেওয়া যাবে।

অন্ধেরী এলাকায় বলরাজ সাহানী যে রাস্তায় থাকতেন, সেই রাস্তাটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে বলরাজ সাহানী রোড।

০ নীতু সিং আর ঋষি হেমার-ডেসোজা শালি হচ্ছে কুসংস্কারাচ্ছন্ন। কোন রকম প্রশংসা শুনলেই ওরা ভাবে নজর লাগ জন্যেগী। তাই সঙ্গে সঙ্গে ওরা বাম কাঁধে থুথু ছিটিয়ে শয়তানকে তাড়ায়। শ্রীমা সিংহের এটা আদপেই পছন্দ নয়। ওর নতুন বাড়িতে বিদেশী আর দামি দামি সাজসজ্জার মধ্যে এই বিদঘুটেও বরদাস্ত করতে পারে না। সম্প্রতি লন্ডন গিয়ে ওরা একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করে। শ্রীমা সিং ওদের বলল এখানে যত খুশি তোমরা থুথু ছিটোও। চারদিকে তখন নিত্য-শালির থু-থু আওয়াজ।

মেহমুদের ইচ্ছা

মেহমুদের বাবা মমতাজ আলি। বোম্বাই টকির নামকরা নৃত্যশিল্পী। জনপ্রিয়তাও ছিল অসীম। ভদ্রলোক মারা যাওয়ার সময় এক আশ্চর্য দলিল করে যান। দলিলে ছিল, তিনি যখন যেখানে মারা যাবেন সেখানেই যেন তাঁকে কবর দেওয়া হয়। কারণ মেহমুদ তখন ফিল্মের পয়সা দামী স্টার হয়ে উঠতে পারেন নি। যাবার মৃতদেহ বোম্বাই-এ নিয়ে যাওয়া তার আর্থিক সামর্থ্যে নাও কুলোতে পারে। ভদ্রলোক মারা গেলেন ব্যাঙ্গালোরে। মেহমুদ পিতৃইচ্ছা পূরণ করলেন তাঁকে সেখানেই সমাধি দিয়ে। পরে অনায়াসে মেহমুদ তিন বছর পরে তার ওপর একটি কবর তৈরি করে দেন। কবরের একধারে বানিয়ে দেন হিন্দুদের জন্য একটি শিবমন্দির। আর মেহমুদের ইচ্ছা, যেখানেই তার মৃত্যু হোক না কেন, পিতার সমাধির পাশে ব্যাঙ্গালোরেই যেন তাকে সমাধি দেওয়া হয়। মমতাজ আলি পরের আর্থিক ক্ষমতার সন্দীহান থাকলেও মেহমুদ জানেন, তার ইচ্ছা পূরণে কোন বাধা সৃষ্টি হবে না।

মেহমুদ দেখতে ক্লাউন আর অভিনয়েও ক্লাউন। কিন্তু এর মত সিরিয়াস মানুষ বোম্বে ফিল্মে দুর্লভ। অনেকেই জানেন না ৪০টি অবধ্বের ছেলেমেয়ের ও গডফাদার। সম্প্রতি এইসব ছেলেমেয়েদের দত্তক নিয়েছে। এরা আছে চিলড্রেন এইড সোসাইটির ভেতিত দর্শন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্কুলে। মেহমুদ প্রায়ই স্কুলে গিয়ে ঐসব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সময় কাটান। তাদের রক্ষণাবেক্ষণের খরচখরচা তো আছেই। এস এস ভি থেকে শুরু করে সবরকম বদনেশায় মেহমুদ ছিল শিবঠাকুর। কিন্তু ঐসব ছেলেমেয়ের গডফাদার হয়ে গিয়ে মেহমুদ নেশার জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছে। ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিতে ভাল লোক সংখ্যায় কম। মেহমুদ অতুলনীয় মানবিক চরিত্রের পরিচয় দিয়েছেন, অবধ্বের ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে। কিন্তু নিজের সম্পর্কে ও অত্যন্ত উদাসী।

ফিল্মি নেশা মারাত্মক। মুতাল মদ ছাড়তে পারে। পান বিড়ি সিগারেট ছাড়া সম্ভব। কিন্তু ফিল্মিনেশা কখনই নয়। যেমন, প্রায় দু দশ পরে সুন্দরী নলিনী সরন্ত আবার ফিরে এলেন। নাস্তিককে একটি পার্শ্ব চরিত্রে ওকে দেখা যাবে।

দিল্লী থেকে ফিরে গোবিন্দ অবাক। ওর বোম্বে ফ্ল্যাটের দরজা খোলা। চাকর খুন, রিপোর্ট করতে ২০০০ টাকা ঘুষি হয়েছে।

—কিন্তু প্রকৃত ক্ষতি কত? জানা কঠিন। সম্ভবত লাখখানেক (কালো?)।

এরকম একটা ঘটনা ঘটে বছর কয়েক আগে। এক নামজাদা সঙ্গীত-পরিচালকের ফ্ল্যাটে এসে হাজির কয়েকজন। নিজেদের পরিচয় দেয় ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট থেকে এসেছে। ফ্ল্যাট সার্চ করবে। সব জিনিস তছনছ করে, ওরা ক্যাশ ও সোনায় মিলে পায় দেড় লাখ টাকার মত জিনিস। সব কিছু ওরা সঙ্গে নিয়ে যায়। আর বলে যায় সঙ্গীত পরিচালককে ইনকাম ট্যাক্স কমিশনার অফিসে সাতে দশটার মধ্যে রিপোর্ট করে।

আইনজীবীর পরামর্শে সঙ্গীত পরিচালক রিপোর্ট করতে গিয়ে শোনে লোকও পাঠায় নি। গৃহ তল্লাশীর জন্য। তিনি বুঝলেন এটা স্রেফ ডাকাতি। পুলিশে রিপোর্ট করতে চাইলেন। আইনজীবী বললেন, তা সম্ভব নয়। তাহলে ২নম্বরী পথে উপার্জনের ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যাবে।

—দেন, আভি চুপ হো যা!

সত্যকাম

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ এর পক্ষে ইন্দ্রজিৎ সরকার কর্তৃক পাকৃত প্রেস ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা ৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

মূল্য ৭৫ পয়সা। ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

মহাত্মা
শিশিরকুমার ঘোষ

প্রণীত

কয়েকটি অমূল্য লোক-চরিত
ও কাব্য-গাঁথা

এই অপূর্ব রচনাগুলি পাঠক-পাঠিকাদের
দেবে অমৃত পানের আনন্দ। তৃষিত শোকসন্তপ্ত
হৃদয়ে আনবে পরম শান্তি।

শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত ১ম—৬ষ্ঠ খণ্ড ২৮·৫০

শ্রীনরোত্তম চরিত ৩·৫০ পঃ

শ্রীকালাচাঁদ গীতা ৩·০০

Lord Gouranga (Eng. Vol. 1) ৩·০০

গ্রন্থগুলি জনপ্রিয় হলেও এর মূল্য বৃদ্ধি করা হয়নি।
অবিলম্বে সংগ্রহ করুন।

প্রাপ্তিস্থান :
পত্রিকা হাউস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৭০০০০৩।

দে বুক স্টোর্স; ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট; কলিকাতা ও
নাথ ব্রাদার্স, ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট; কলিকাতা।

Regd. No. WB/NC-13
AMRITA Calcutta-700003
AMRITA
Phone 55-5231 (14 lin

বিশুদ্ধ 'কুকমী' গুঁড়া মশলার ঠেকা

সাবধান!

'কুকমী' গুঁড়া মশলার
জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে
কলকাতার কয়েকটি গুঁড়া
মশলা কোম্পানী তাদের নিজস্ব
নিকৃষ্টমানের ব্রাণ্ডের সঙ্গে
জনপ্রিয় কুকমীর নাম জুড়ে
হুবহু কুকমী Cookme
নামের স্টাইল নকল করে
আসল কুকমী গুঁড়া মশলা
বলে বাজারে চালাবার
চেষ্টা করছে।

কেনার সময়
দেখে নেবেন-
'কুকমী'র
প্যাকেটে কেবল
Cookme
'কুকমী' ছাপই
আছে, অন্য কোন
ব্রাণ্ডের নাম
যুক্ত নেই

প্রস্তুতকারক :
কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
২৩৫ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা ৭০০০৭০ ● ফোন : ৩৩০৯৯৫, ৩২৬৬৩২
পোষ্ট বক্স নং : বড়বাজার ৬৮৮৫ ● ফ্যাক্টরী : কাশীপুর

10 NOV 1979

আমার বাবা যতীন্দ্রমোহন বাগচী

অমৃত
সম্পাদক শ্রীতুষারকান্ত ঘোষ
১০ নভেম্বর ১৯৭৮
দাম ৭৫ পয়সা

আমাদের বাবা কবি যতীন্দ্র মোহন বাগচীর আগামী বাংলা অগ্রহায়ণের ১২ তারিখে, ১০০ বছর পূর্ণ হত।

বাংলা দেশে সাধারণতঃ কবিদেরে যা ঘটে তাঁর তিরোধানের পরেও তাই হয়েছে। সকলেই তা আর রবীন্দ্রনাথ নন্। বাবা লিখে গেছেন

"সমস্ত মহিমে তোমারে ঘিরিবে যেবা
তখো তখন"

তাঁর খ্যাতি ছিল সারা বিশ্ব ছড়ানো অনুবাদের মাধ্যমে। আর তা ছড়া- আসে, যান বাবাদের

রে আমাদের
তা বলব'।
ছোট অবস্থার
রে আমাদের
ত' চর্চা মানে
এখন সন্ধ্য
আমরা
কবিতার বই-

ই- সমস্ত
ধ্য পুস্তকের
রিত- যেখা
যাচ্ছে'। এমনকি ম্যাট্রিক, F. A B. A সব ক্লাসেই যাচ্ছে'। আমি যেবার (তখনকার) ম্যাট্রিক দিই; তখন আমাদের 'সিংহাসন' বা কবিতাটি ছিল। B. A. বাংলা অনার্সে- মহাভারতী নামে একখানি বই ছিল, পাশে আর্য্যগাথা নামে বইখানিও পাঠ্য হয়েছিল। কিন্তু বেশ কিছুদিন থেকেই দেখছি, অনেক পাঠ্য পুস্তকে তাঁর লেখা আদৌ নেওয়া হচ্ছে না। B. A ক্লাসেও বন্ধ হয়ে গেছে।

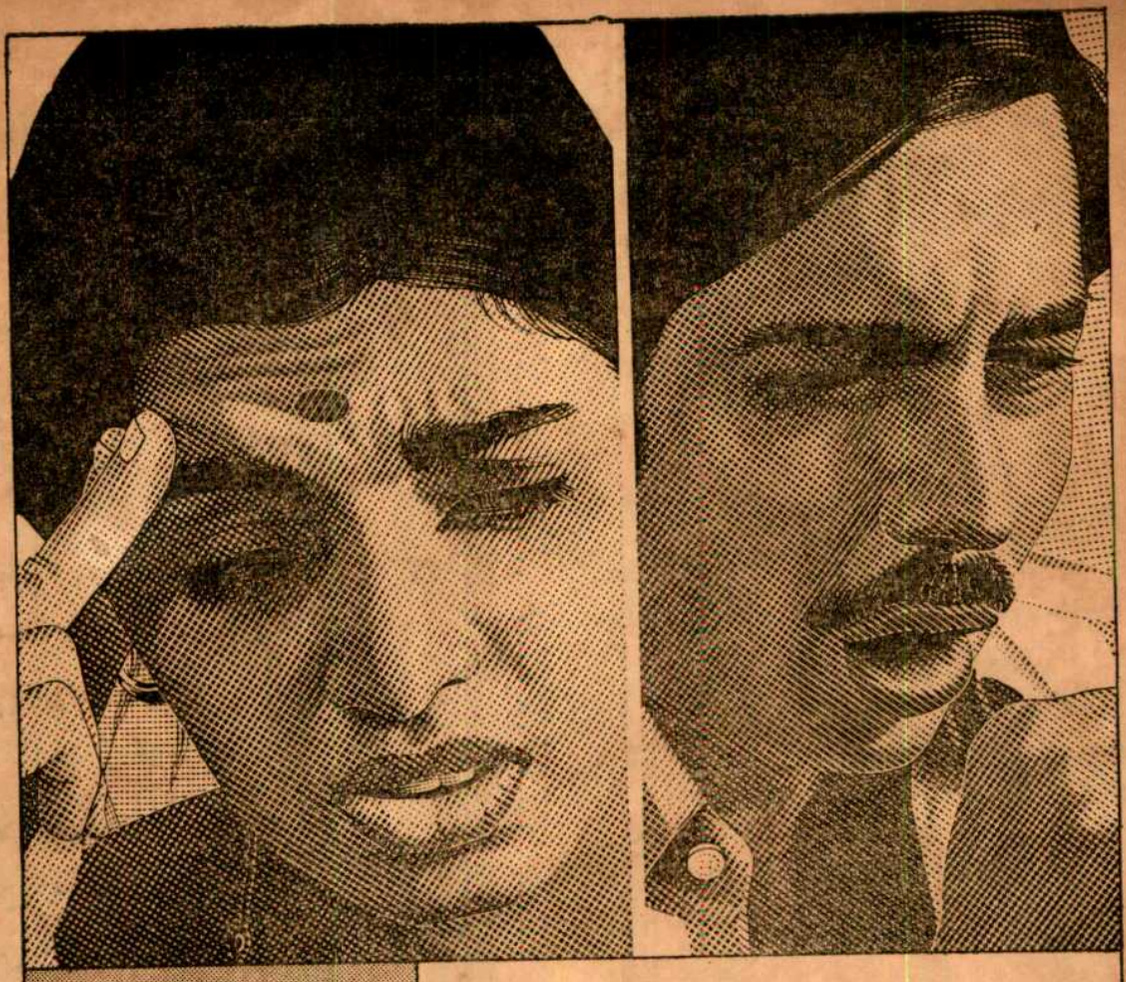

অমৃতাঞ্জন

ব্যথা বেদনা, ঠাণ্ডা লাগা ও মচকানির জন্য একটি বহুমুখী ঘরোয়া দাওয়াই

আপনার ব্যথাস্থানে, ঠাণ্ডা-লাগা ও মচকানো জায়গায় সামান্য পরিমাণ আরামদায়ক অমৃতাঞ্জন লাগিয়ে মালিশ করুন। কয়েক মিনিটের মধ্যে এর দশটি ভেষজের কার্যকারিতা অনুভব করবেন এবং আপনি অনেক আরাম বোধ করবেন।

অমৃতাঞ্জন—জার, শিশি ও ছিমছাম কমদামী টিনের কৌটোয় পাওয়া যায়।

অমৃতাঞ্জন—
৮০ বছরেরও বেশি
সময় ধরে বিশ্বস্ত ঘরোয়া
রোগ প্রতিষেধক

AM 1912

অমৃতাঞ্জন লিমিটেড

নটরাজন-এর শ্রেষ্ঠ রচনা

লালবাজার ২০·০০

স্বাধীনতা-সংগ্রামের পটভূমিকায় কুখ্যাত কিংবা বিখ্যাত ভয়ঙ্কর লালবাজারকে কেন্দ্র করে তৎকালীন পুলিশী কর্ম-চাঞ্চল্যের উপন্যাস-বর্ণনা। বাংলা ভাষায় এধরনের বই এই প্রথম প্রকাশিত হল। পুলিশী সাহিত্যের সার্থক রূপকার নটরাজনের এ এক অনবদ্য সৃষ্টি। দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র শোভিত, বাংলা তথা কোন ভারতীয় ভাষায় এধরনের কোন বই আজও প্রকাশিত হয়নি।

শক্তিপদ রাজগুরুর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

অনুসন্ধান ১৫·০০

নিবালা পর্বত-সীমার গভীরে দুটি হৃদয়ের ভালবাসা—ঘর বাঁধার স্বপ্ন। এক অকল্যাণের কালো হাত যেন সেই স্বপ্নসৌধকে ধ্বংস করতে উদ্যত। কিন্তু তমসার বুকে সূর্যোদয়ের মতই অভিজিৎ-এর সত্যানুসন্ধান সেই স্বপ্নকে সার্থক করে তোলে। রহস্যঘন এই অন্তর্দ্বন্দ্বমূলক কাহিনী একসঙ্গে বাংলা ও হিন্দি ছবিতে রূপায়িত হচ্ছে।

ভ্রমণ-সাহিত্য অনন্য শঙ্কুমহারাজের সার্থক সৃষ্টি

মধু-বৃন্দাবনে [তিন পর্বে সম্পূর্ণ]

শ্রীধাম বৃন্দাবনের যাবতীয় মন্দির, স্থল, তীর্থ ও পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা; যাবতীয় বন, মধুবা, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, যাবতীয় ঘাট, গোকুল, বাবেল প্রভৃতি পরিক্রমা, শ্রীমনমহাপ্রভু ও ষড়গোস্বামিগণের কথা—আর শ্রীকৃষ্ণের শৈশব ও কৈশোরলীলা। তিন শতাধিক পৃষ্ঠার প্রতিটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ পর্বে সমাপ্ত। মূল্য প্রতি পর্ব বারো টাকা।

এই লেখকের আর দুখানি গ্রন্থ

চতুরঙ্গীর অঙ্গনে ১৫·০০ মন-দ্বারকায় ১২·০০

কাশীকান্ত মৈত্রের সাড়াজাগানো গ্রন্থ

গণতন্ত্র ঃ মুখোশ ও মুখশ্রী ২৫·০০

ব্রজমাধব ভট্টাচার্যের উপন্যাস

ত্রিভুবনের বাইরে ১৮·০০

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ভ্রমণকাহিনী

গোমুখীর পথ ১৬·০০

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর উপন্যাস

শেষ বিচার ১৮·০০

উপন্যাস রচনায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সাফল্য শুধু বিষয়-ভাবনায় নয়। মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে স্ব-সৃষ্ট চরিত্রগুলির কর্মিক আত্ম-উন্মোচনে তিনি যে কতবড় শিল্পী তার সম্প্রতি লেখা এই উপন্যাস আর একবার প্রমাণ করল। বাবা ও ছেলেকে নিয়ে বিষাদ ভাবনার এ এক বিস্ময়কর সৃষ্টি।

নারায়ণ সান্যালের উপন্যাস

গজমুক্তা ১০·০০

হাতীর মাথায় 'গজমুক্তা' থাকতে পারে একথা বিশ্বাস করেন? মনতে রাজী আছেন এই ভারতবর্ষের এক গভীর অরণ্যে ফাঁস দিয়ে একটি উপজাতি হাতী ধরে? চান কিংবা ছয় গজদন্তওয়ালা গজরাজের অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন? রূপকথার কোন গল্প নয়। সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-ভিত্তিক গবেষণার ফলশ্রুতি এই উপন্যাস।

রবীন্দ্র লাইব্রেরী ১৫/২; শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩
ফোন ঃ ৩৪-৮৩৫৬

প্রবন্ধ সাহিত্য

রবীন্দ্রচর্চার অভিনবত্বের পথিকৃত

অমিতাভ চৌধুরীর

কবি সন্ন্যাসী ৮·০০

কবি রবীন্দ্রনাথ ও সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের ব্যক্তিগত সম্পর্কে এপর্যন্ত অপ্রকাশিত নানা তথ্যে সমৃদ্ধ গ্রন্থটির দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল।

অন্নদাশংকর রায়ের

লালন ও তাঁর গান

লালন ফকিরের দ্বিশত জন্ম-বার্ষিকীতে প্রকাশিত লালন ও তাঁর গান।.. লালনের পুঁথি, রবীন্দ্র সাহিত্যে লালনের প্রভাব ও লালনের জীবনেতিহাসের নানা তথ্যে সমৃদ্ধ গ্রন্থটি অন্নদাশংকর রায়ের সাম্প্রতিক গ্রন্থ দাম দশ টাকা মাত্র।

ডঃ অজিতকুমার ঘোষের

নাটকের কথা ১৮·০০

বহু প্রকাশিত নাট্যতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থটির দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল।

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

পুরাতন বাংলা গদ্য গ্রন্থ সংকলন

দাম : ৩৫-০০

আপনার বইয়ের দোকান

নতুন উপন্যাস

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

সেই দিন সেই রাত্রি ।। ৭·০০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

কোনে মনে বনে ।। ৭·০০

প্রফুল্ল রায়ের

অন্ধকারে ফুলের গন্ধ ।। ৮·০০

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের

নিলয় না জানি ।। ১০·০০

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের

স্বর্গের পাশে বাড়ি ।। ১০·০০

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ধ্বনি প্রতিধ্বনি ।। ১০·০০

বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের

জামাই ষষ্ঠী ।। ১০·০০

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

থমকে কেন দাঁড়িয়ে ।। ১০·০০

প্রফুল্ল রায়ের

মানুষের জন্য ।। ৭·০০

শকিত চট্টোপাধ্যায়ের

আমি চলে যাচ্ছি ।। ৫·০০

বিমল করের

প্রথম ও শেষ অঙ্ক ।। ৭·০০

শৈব্যা পুস্তকালয়ে সব বই পাওয়া যায়। যে বই আজ বেরিয়েছে সেই বইও পাবেনই যে বই পঁচিশ বছর আগে বেরিয়েছে —তা-ও!

ছোটদের বই

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অপুর ছেলেবেলা ।। ৬·০০

ছোটদের অপরাজিত ।। ৬·০০

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ছোদের কাজল ।। ৬·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

টেনিদার অভিযান ।। ১০·০০

চার মূর্তি ।। ৫·০০

ঝাউ বাংলার রহস্য ।। ৫·০০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

ঘনাদার জুড়ি নেই ।। ৫·০০

মঙ্গল গ্রহে ঘনাদা ।। ৫·০০

বিশু মুখোপাধ্যায়ের

বিখ্যাত দস্যু কাহিনী ।। ৬·০০

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের

বাংলার ডাকাত ১।২।৩।৪

প্রতি খণ্ড ।। ৬·০০

দক্ষিণারঞ্জন বসুর

কায়াহীনের কবলে ।। ৫·০০

হট যাও হামিদ ।। ৫·০০

দীনেন্দ্রকুমার রায়ের

মখের আসন ।। ৬·০০

আর্থার কোনান ডয়েলের

কিশোর রহস্য গল্প গোয়েন্দা ৭

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সুন্দরবনে সাত বছর ।। ৬·০০

শিশির ঘোষের

লাঙ্গল সিংহের সন্ধানে ।। ৬·০০

শৈব্যা পুস্তকালয় ৮।১-সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, ৩৪-৪৩৫৬

অমৃত

১৮ বর্ষ, ২৫ সংখ্যা
২৩ কার্তিক, ১৩৮৫
10th November 1978

সম্পাদকীয় ৩

সাহিত্য ইত্যাদি ৪ মণীন্দ্র রায়

কাছাকাছি মানুষ চাই ৫
সমীর চট্টোপাধ্যায়

রাজনীতি কলকাতা স্টাইল ৬

বেদব্যাস বৈদ্য

রেবতীভূষণের কার্টুন ৭

প্রচ্ছদ কাহিনী ১০

আমার বাবা যতীন্দ্রমোহন বাগচী
ঊর্মি সান্যাল

শিব ঠাকুরের আপন দেশে (গল্প) ১৭
পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

কবিতা ২১ মানস রায়চৌধুরী, সুবাজিৎ ঘোষ, দেবী রায়, শান্ত রায়, রণজিৎ দাশ

রবীন্দ্রনাথ বনাম সরলা দেবী ১২
নিত্যপ্রিয় ঘোষ

হাওয়াগাড়ি (উপন্যাস) ৩২
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

সোনার হরিণ নেই (উপন্যাস) ৩৬
অশ্রুতোষ মুখোপাধ্যায়

তরণী পাহাড়ে বসন্ত (উপন্যাস) ৪১
শৈবাল মিত্র

আরো জীবনানন্দ ৪৬
কল্যাণকুমার বসু

সমালোচনা ৫১

খেলা ৫১ পিনাকী চট্টোপাধ্যায়
লিম্বকম্যান, দর্শক

আমরা নাকি ফি বছর মোটা টাক
পাই ৫৪ সুভাষ ভৌমিক

বোম্বাই সমাচার ৫৭

নাটমঞ্চ ৫৮

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ কাহিনী
গরিলার মুখোমুখি
লিখেছেন রতনলাল ব্রহ্মচারী
অভীক রায়ের গল্প
গৌতম ভট্টাচার্যের গল্প
সমীর চট্টোপাধ্যায়ের
লেখা ওরফে যন্ত্র

বাজারদরের ঊর্ধ্বগতি

বন্যার বিপদ এখনো পুরোপুরি কাটেনি, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের কাজও শুরু করা যায় নি পূর্ণোদ্যমে—কিন্তু ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে নতুন বিপদ।

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস এবং কাঁচা বাজারের দর ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখী হতে শুরু করেছে। গত বছর এই সময় যা দাম ছিল তার তুলনায় কোনো কোনো জিনিসের দাম এমন কি চারগুণও বেড়ে গেছে। এবং এখনকার দামই যে চূড়ান্ত, তাও মনে হচ্ছে না বৃদ্ধির ঝোঁক পূর্ণ মাত্রাতেই বজায় রয়েছে।

বন্যার দিনগুলোতে এবং তার পরেও কিছু দিন ধরে মনে করা যাচ্ছিল, হয়তো ক্রমাগত বৃষ্টি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার বিভ্রাটের জন্যেই দাম বাড়ছে। কিন্তু সে অনুমান যে ঠিক নয় তা বুঝতেও সময় লাগে নি। প্রথম কদিন কেরোসিন, পরে কয়লা নিয়ে কালোবাজারী চলল অবাধে। তারপর শুরু হল ডাল ও মশলাপাতি নিয়ে দাঁও কষার ব্যবস্থা। অন্যদিকে চিনি এখন র‍্যাশানে পাওয়া যায় না, কিনতে হয় খোলা বাজারে। এবং বিভিন্ন দোকানে তার দামও নানা ধরনের। কিন্তু সেটাও কথা নয়, আসল কৌতুক হল, চিনির চেয়ে গুড়ের দাম বেশি। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া যায় চিনির চেয়ে গুড় তৈরিতে খরচ বেশি, কিন্তু তা সত্ত্বেও চিনির নচয়ে গুড়ের চাহিদা বেশি, তাহলে তো সমস্যা দাঁড়ায়—চিনি-কলগুলো টিঁকিয়ে রাখা হবে কিনা। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি কি সত্যিই এই রকমই? অবশ্যই নয়। অর্থনীতির দিক দিয়ে এই যে একটি আজগুবি পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে, অর্থাৎ চিনির চেয়ে গুড়ের দাম বেশি, তাতেই বোঝা যাচ্ছে—চলতি বাজারের এই সব দর-দামের কোনো বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি নেই, পুরোটাই চলছে লোভ ও সুবিধাবাদের খেলা।

সরকারের তরফ থেকে একটি আবেদন ও হুঁশিয়ারী ঘোষিত হয়েছিল বন্যার পর—যাতে জিনিসপত্রের দাম না বাড়ান হয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, বহু ব্যবসায়ীই তাতে কর্ণপাত করা দরকার বোধ করছেন না। তাঁদের কর্ণগোচর করানোর মত ব্যবস্থা অবশ্যই আইনের বইয়ে আছে। মানুষের দুর্দশার সুযোগ নিয়ে অকারণে দর বৃদ্ধি ঘটায় যারা তাদের সংযত করর জন্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা এখন অবশ্য-প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাহিত্য ইত্যাদি...

গদ্য কেন অস্পষ্ট হয় ?

রাজনীতিতে কিরণশংকর রায়ের খ্যাতি ছিল। কিছুকাল তিনি মন্ত্রীত্বও করেছেন। অনেকেই সেজন্যে ভুলে গেছেন হয়তো, সাহিত্যও করেছেন তিনি এককালে। প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত সবুজপত্রকে ঘিরে নতুন মতের একটি লেখকগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। তিনি ছিলেন তাঁদেরই একজন। যেমন ছিলেন তাঁর ভাগ্নিপতি অতুলচন্দ্র গুপ্ত মশায়।

অনেক কাল পরের কথা। আমি তখন কলেজে পড়ি, কী একটা কাজে আমার দাদামশায় পাঠিয়েছিলেন আমাকে কিরণশংকরের বাড়িতে। তাঁর সেই ইউরোপীয়ান আসাইলাম লেনের বাড়িতে গেট দিয়ে ঢুকে বাঁদিকের একটা ঘরে বসতেন তখন কিরণশংকরবাবু।

দাদামশায়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল কিরণশংকরবাবুর। তাই অল্পবয়সী হওয়া সত্ত্বেও একটু খাতিরই করলেন আমাকে তিনি। তারপর কথায় কথায় বললেন, পবিত্রকে, লেখাই ভালো কথা। কিন্তু সুধীনের মতো পড়াশোনা ছেড়ো না। একটা অ্যাকাডেমিক ট্রেনিং না পেলে চিন্তা ডিসঅর্ডারলি হয়।

কথাটা বুঝতে না পেরে আমি হাঁ করে চেয়ে রইলাম। কারণ আমার ধারণা ছিল সুধীনবাবু দুর্ধর্ষ রকম পণ্ডিত মানুষ।

কিরণশংকরবাবু আমার বিহ্বল ভাবটা লক্ষ্য করলেন বোধহয়। বললেন, সুধীন যে পড়াশোনা করেনি তা বলছি না। পড়েছে ও বিস্তর। কিন্তু সিস্টেমেটিকভাবে নয়। মাঝে মাঝে ফাঁকও থেকে গেছে। সেজন্যে লেখাতেও দেখা দিয়েছে ধোঁয়াটে ভাব।

ধোঁয়াটে কথাটির দ্বারা কিরণশংকরবাবু ঠিক কী বুঝিয়েছিলেন বলতে পারব না। ধোঁয়াটে হতে পারে লেখা দুই কারণে: এক, বক্তব্যটি যদি আত্মগতভাবে, অর্থাৎ সাবজেকটিকভাবে উপস্থিত করা যায়। যেমন মাঝে মাঝে দেখা যায় জীবনানন্দ দাশের গদ্য রচনায়। আর দ্বিতীয় কারণ হল চিন্তার অপরিচ্ছন্নতা। যে অভিযোগ সুধীনবাবুর বেলায় তুললে থমকে দাঁড়াতে হবে।

কারণ সুধীনবাবুর সমস্ত অধ্যবসায়ই ছিল যুক্তিচর্চার দিকে। পরিচয় কাগজটি যে তিনি বন্ধ করেছিলেন তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আমাদের রবীন্দ্রালোকিত ভাববন্দী মনকে মস্তিষ্কচর্চার দিকে চালিত করা।

তাছাড়া আরো একটা কথা। সুধীনবাবুর সঙ্গে তখন সামান্য কয়েক বছরের পরিচয়। আমার ঠিক জানা ছিল না তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়িক পড়াশোনা কতোদূর। কিন্তু পরে জেনেছি স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি-এ পাশ করেছিলেন তিনি। এবং এম-এ ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন। তারপর কোনো এক অধ্যাপকের রোষদৃষ্টিতে পড়ে সেই যে একদিন ক্লাস থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন আর কখনো ঢোকেননি।

একে কি পড়াশোনা না করা বলে? এম-এ পাশ করলেই কি তাঁর পাণ্ডিত্যের গোত্রান্তর ঘটত? বি-এ ডিগ্রি কি তাহলে কিছুই নয়? অথচ আমার কিন্তু কিরণশংকরবাবুর কথা শুনে মনে হয়েছিল সুধীনবাবু ম্যাট্রিক পাশ করেছেন কিনা সন্দেহ।

তা সে যাক।

সুধীনবাবুর গদ্য লেখা যে কিঞ্চিৎ ঘোরানো-প্যাঁচানো তা অবিশ্যি ঠিকই, শব্দগুলো আভিধানিক। অনেক বাক্যই বুঝতে গেলে বারবার পড়তে হয়। কিন্তু কিছু বাক্য অনেকবার পড়েও সমান অবোধ্য থাকে। কিন্তু আমার এই অক্ষমতাকে মনে করতাম নিজস্ব ত্রুটি। কখনো ভাবিনি ওটা লেখকেরও ত্রুটির জন্যে হতে পারে। কিরণশংকরবাবুর কথা শুনে মনে হল, অসুবিধে কেবল আমারই হচ্ছে তা নয়, অন্যদেরও হচ্ছে।

অনেকদিন পরের কথা। আমাদের কালের একজন পণ্ডিত কবি হলেন বিষ্ণু দে। তাঁর বাড়িতে আসা-যাওয়া করে তারই মনীষার দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়ে তরুণতর লেখকরা কেউ কেউ পড়াশোনার দিকে ঝোঁকেন। পড়াশোনা মানে ইস্কুল-কলেজের পড়াশোনা নয়, গভীরতর অধ্যয়নের কথা বলছি। এঁদের মধ্যে একজন হলেন কবি চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়। বিস্তীর্ণ বিষয়ে তাঁর পড়াশোনা। সাহিত্য তো বটেই, সঙ্গীতেও তিনি একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। সঙ্গীত মানে অবিশ্যি পাশ্চাত্য সঙ্গীত। সে বিষয়ে বইও লিখেছেন তিনি। তারপর সাহিত্যেরও নানাদিকে নানা ভাষায় তাঁর আগ্রহ। ইংরেজি ছাড়া ফরাসীও শিখেছেন তিনি। প্যারিসে বছর পাঁচ-ছয় পড়াশোনা করে বিবলিওগ্রাফীতে ডিগ্রিও পেয়েছেন। তারপর শিখেছেন ইটালীয় ভাষা। না ল্যাটিন নয়, ইটালীয়ান। উদ্দেশ্য—দান্তে পড়বেন। শিখলেন সে ভাষা। এবং মূল ভাষায় দান্তে পড়ে বইও লিখলেন।

তা এহেন চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় যে শুধু বিষ্ণুবাবু নয়, সুধীনবাবুরও খুব অনুরাগী হবেন তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু অবাক হলাম একদিন চঞ্চলবাবুর মন্তব্য শুনে।

তিনি বললেন, সুধীনবাবুর লেখায় আভিধানিক শব্দ থাকে বা সিনট্যাকস জটিল সেটা না হয় মানা গেল, কিন্তু চিন্তার দিক থেকেও ধোঁয়াটে মুশকিল হল সেইটেই।

হঠাৎ আমার মনে পড়ল কিরণশংকর রায়ের অনুযোগের কথা। বুঝতে পারলাম—পড়াশোনার কমতি আছে বলেই যে সুধীনবাবুকে অস্পষ্ট বা খণ্ডিত লাগে অনেক সময় তা নয়, অন্য কারণও হয়তো আছে। কেননা পড়াশোনা চঞ্চলবাবুর যথেষ্টই আছে। তাঁর তাহলে অতৃপ্তি থেকে যাচ্ছে কেন?

এই নিয়ে মাঝে মাঝে চিন্তা করেছি আমি। প্রশ্ন করেছি নিজেকে, এতো পড়াশোনা করেও সুধীনবাবু বা তাঁরই পথিক যাঁরা তাঁদের বক্তব্যকে স্পষ্ট করে তুলতে পারেন না? কেন মাঝে মাঝে তাঁদের লেখা পড়লে মনে পড়ে ভলতেয়ারের সেই বিখ্যাত বক্তোক্তি মানুষকে ভাষা দেওয়া হয়েছিল তার চিন্তাকে লুকিয়ে রাখার জন্যে। (লাঙ্গুয়েজ ওয়াজ গিভন টু ম্যান টু কনসিল হিজ থটস)।

অন্য প্রসঙ্গে সুধীনবাবুর সঙ্গে একবার ভাষা নিয়ে কথা হয়েছিল। তখন তিনি থাকতেন হাজরা রোডের বাড়িতে।

আমি বলছিলাম বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ এবং তারপর প্রমথ চৌধুরী পর্যন্ত বাংলা ভাষায় ডেভেলপমেন্ট-এর একটা ধারা চলছিল। আপনার ভাষা একেবারে অন্যদিকে মোড় নিয়েছে।

উনি একটু চুপ করে থেকে সিগারেটে একটা টান দিয়ে বললেন, ঠিকই। প্রমথ চৌধুরী বলছিলেন বাংলা সিমপল সেনটেনসই লেখা উচিত। আমার তা মনে হয় না। আজকের চিন্তা এত জটিল যে কমপ্লেকস সেনটেনস না হলে সব কথা মনের মতো করে বলা যায় না।

তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল কী? লেখক তাঁর বলবার কথাকে স্পষ্ট করতে গিয়ে যা লিখছেন, পাঠক সব সময় তার মর্ম বুঝতে পারছেন না। কেন এমন ঘটছে।

আমার মনে হয়, এর মধ্যে আসল ত্রুটি রয়ে গেছে ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে। কেননা আমি বিশ্বাস করি বাংলা ভাষা এখন এতটাই উন্নত, যে মানুষের সমস্ত রকম জটিল চিন্তাই তাতে বোধগম্যভাবে প্রকাশ করা সম্ভব।

আমাদের বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে যাঁরা ইনটেলেকচুয়াল বলে খ্যাত তাঁরা অনেকেই হয়তো ইংরেজি এবং অন্যান্য ভাষা যতো যত্ন নিয়ে শিখেছেন, বাংলার দিকে ততোটা নজর দেননি।

এছাড়া আর অন্য কী কারণ থাকতে পারে—গদ্য লেখা দুর্বোধ্য হওয়ার, আমি তো জানিনে।

অমীন্দ্র রায়

কাছাকাছি মানুষ চাই

সমীর চট্টোপাধ্যায়

এক নম্বর বাড়ির চার নম্বর ফ্ল্যাটে পল্লবেরা। ঢুকতেই কোলাপ্সিবল গেট, মাঝখান দিয়ে উঠে গেছে সিঁড়ি। চারতলা বাড়িতে মোট আটটি ফ্ল্যাট। এরকম কত-গুলো বাড়ি আর ফ্ল্যাট নিয়ে একটা এস্টেট। সবক্ষব বানিয়েছিল। বিলি-বন্দোবস্তের দায়িত্বও তাদের। শুধুমাত্র সরকারী সিভিল ইঞ্জিনীয়ার ছাড়া আর কারুরই কোনো পছন্দ-অপছন্দ কাজ করে নি। ক্যাগজে বিজ্ঞাপন, দরখাস্ত সাবমিট, লটারী—কয়েকজনের লাক্ ফেভার করেছিলো। একদিন তারা নিজের নিজের অপছন্দের জায়গা ছেড়ে দিয়ে এখানে এসে বসবাস শুরু করে দিল। যেভাবে আগে গ্রাম তৈরি হতো, ঠিক তার উল্টো পথে হঠাৎ একটা ফাঁকা অঞ্চল জমাটি হয়ে গেল। মানুষের চিৎকারে, নিঃশ্বাসে, কলহে, সখ্যতায় ভরে গেল যা-কিছু ফাঁক-ফোকর। হেটারোজেনাস মিক্সিং যাকে বলে, ঠিক তাই।

অথচ পল্লবের কৈশোর কেটেছে গ্রামে। হাওড়া থেকে এক ঘন্টা ট্রেনে, তারপর হেঁটে মিনিট তিরিশ। নদীর কাছাকাছি। তখনা নদী অনেক প্রশস্ত ছিল, একটু বড়োসড়ো বান ডাকলে জল উঠে আসতো খেলার মাঠে। দিন দুয়েক বাদে জল নেমে গেলে পড়ে থাকতো শুধু কাদা আর কচুরিপানা। সারা শরীরে কাদা মেখে ফুটবল খেলতে কী যে ভালো লাগতো। খেলার শেষে নদীতে সাঁতার। লাইন করে নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে প্যান্টুল খুলে গা মুছে বাড়ি ফেরা। সন্ধ্যা নেমে আসতো ডকতারবাবুর আমবাগানের মাথা ছুঁয়ে। ইলেকট্রিসিটি ছিল না, হ্যারিকেনের আলোতে রাত গভীর হতো তাড়াতাড়ি। যে গ্রামে পল্লবদের বাড়ি, সে অঞ্চল তখন জন-বহুল হচ্ছিল ধীরে ধীরে। পূর্ব-বাংলা থেকে চলে আসা মানুষ-জন বসতি গড়ছিল কম টাকার জমি কিনে। পল্লবের মায়ের ঘরের উত্তরে জানলা খুললে শুরু হতো গাছ-গাছালির বাজত্ব। তখন অনেক শিয়াল ছিল, অনেক জোনাকি। একেবারে জানালার কাছে হঠাৎ ডেকে উঠতো শিয়াল। একটু চান্স পেলেই জিজ্ঞাসা-চিহ্নের স্টাইলে বেড়ে ওঠা আমগাছ ঘিরে জোনাকি এসে বসতো। কলেজ পড়ার সময় বাড়িতে ঝগড়া করে যখন কলকাতায় চলে এলো পল্লব, তখনই দুই-তৃতীয়াংশ গ্রাম দখল করে নিয়েছে মানুষ। ফাঁকা মাঠ, বনতুলসীর ঝোপ, আম-লিচু-জামবুল গাছ কেটে কোঠা-বাড়ি হয়েছে। দুপুরে ছাদের দড়িতে পরিবারের পোষাক ওড়ে হাওয়ায়। মেঠো পথে সবে খোয়া পড়েছে। অল্পবয়সী মেয়েরা হাওয়াই চপ্পল, হাঁটু-পর্যন্ত ফ্রক, মুখে পাউডার মেখে বেড়াতে বেরোয় বিকেলে। তবু মানুষে মানুষে সম্প্রীতি ছিল। পাড়ার নতুন লোক এলে, নতুন পরিবার ঘুরে এলে সবাই তার খোঁজ-খবর নিত। রাত্রে কোনো বাড়িতে চোর পড়লে সবাই লাঠি-সোটা নিয়ে একডাকে বেরোত। পল্লবের পিতামহ একাশি বছর বয়েসে ইজি-চেয়ার নিয়ে বসতেন বাড়ির সামনে মাঠে। রাস্তা দিয়ে লোকজন গেলে ডেকে আলাপ জমাতেন। তারাও বসে পড়তো। বাড়ির ভেতর থেকে আসতো জল-চৌকি আর মুড়ি-নারকেল। কেউ কিছু মাইণ্ড করতো না।

কলকাতায় এসে পল্লব উঠেছিল মেসে। বৌবাজারে। কাকা থাকতেন সেখানে, তিনিই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। নিজের সিঙ্গল সীটের ঘর ছেড়ে দিয়েছিলেন পল্লবের জন্য। মেসের জীবন মন্দ লাগেনি, নতুনত্বের স্বাদ পেয়েছিল সে। বিভিন্ন নাম, বিভিন্ন পদবী, বিভিন্ন পেশা, বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা জনা তিরিশেক মানুষ একটা জরাজীর্ণ হাঁটুভাঙা বাড়িতে বসবাস করে। তাদের সবার জন্য একটা বড় বাথরুম, একটা ছোট বাথরুম, স্নানের জন্য উঠোনের মাঝখানে হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর মাপে বিশাল চৌবাচ্চা। এদের এজ-ইন্টারভ্যাল পনেরো থেকে সাতান্ন, হাইট-ইন্টারভ্যাল চার ফুট এগারো থেকে ছ' ফুট দুই। ওয়েট-ইন্টার-ভ্যাল ছত্রিশ থেকে পঁচাশী কেজি। কেউ বাক্যবাগীশ, কেউ একেবারেই নীরব। কেউ অফিস থেকে ফেরে পাঁচটা, পঁয়ত্রিশে কেউ মাদের দোকান-টোকান হয়ে পৌনে একটায়। শতকরা সত্তরজন শনিবার আর ছুটির দিন দু হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে সাত-তাড়াতাড়ি বাড়ি যায়। জনা তিনেক ছিল, কোন দিনই তাদের মিল অফ হতো না। খড়ম পরতেন দুজন, নিমের ডাল দাঁতন করতেন প্রায় সবাই। পল্লবের মনে হতো, মেসের বোর্ডারেরা সব ডবল-ভার্সান সিনেমা। এক কাত কাকা পরপর চারবার বমি করলেন, দুদিন বাদে সমস্ত শরীর হলুদ হয়ে গেল। ডাকতার বললো, ফুলডিস। প্রায় তিন মাস গ্রামের বাড়িতে রেস্ট নিয়ে কলকাতায় এসে ঘোষণা করলেন আর মেসে থাকবেন না তিনি। কাকার সত্তরো বছরের মেস-জীবনের ছেদ পড়লো। জন মাসের এক ভ্যাপসা বিকেলে। অবিবাহিত কাকা, তার বন্ধুর মতো মিশেছেন এতকাল সামান্য গার্ট-বহরের সঙ্গে জরাগ্রস্ত চেহারা এই ফ্ল্যাটে এসে উঠল পল্লবের। তাও তো দেখতে দেখতে বছর দুয়েক হয়ে গেল।

বি ব্লকের এক নম্বর বাড়িকে বেমার স্পেশিমেন মনে হয় পল্লবের। পিকটিলিয়ার মানুষ বোধহয় একটা বাড়ির প্রতিটি ফ্ল্যাটে এক সঙ্গে মেলেনি। পল্লব দেখেছে, ছাব্বিশ বছরের জীবনে এই পিকুই-লিয়ারিটি তাকে সর্বদাই বিলিফ দিয়েছে। এক ধরনের মজা পায় সে এতে। এক নম্বর ফ্ল্যাটে কোনো রোগা মানুষ নেই। হেড অফ দ্য ফ্যামিলি থেকে শুরু করে নিউ কলিং বেবি পর্যন্ত। এমনকি যে ঠিকে ঝি আসে, সেও। এরই মাঝে মেইনটেইন করতে হয় বছর আটাশের এক হৃষ্টপুষ্ট হাবা-গোবাকে। এমন স্বাস্থ্যবান সুখী প্রকৃতির পাগল পল্লব দেখেনি কখনো। পাগল সম্পর্কিত চিরাচরিত ইলাসন ভেঙে গেছে তার। দুই নম্বর ফ্ল্যাটে সাতটি পুত্র-সন্তান নিয়ে থাকে এক দম্পতি। মেয়ে না হওয়ার আনন্দে ভদ্রমহিলা ঠোঁটে লিপস্টিক, স্লিভলেস পরে রোজ বিকেলে বেড়াতে যান নিউমার্কেটে। ওদের একটা অস্টিন আছে। দাঁড়িয়েই থাকে। মাঝে মাঝে ঠেলাঠেলি করে চালানোর চেষ্টা করে হোল ফ্যামিলি। লাভ হয় না। তিন নম্বর ফ্ল্যাটে এক দম্পতির থাকার কথা। কখনো সখনো তাদের এক সাথে দেখতে পাওয়া যায়। ভদ্রমহিলা আর যি করেন ডাকতার, ভদ্রলোক হিন্দু-মোটরের শ্রমিক। প্রেমের বিবাহ। কিন্তু এখন আর ভালো লাগছে না ভদ্রমহিলার। ভদ্রলোক তাই একা একা গভীর রাতে ফিরে এসে ফার্নিচার পাহারা দেয়। পাঁচ নম্বর ফ্ল্যাটে থাকে এক এয়ারহোস্টেস। ইন্ডিয়ান এয়ার-লাইন্সসের গাড়ি এসে নিয়ে যায়। পল্লব বিমানের রহস্য বুঝবে বলে একদিন যেচে আলাপ করতে গিয়েছিল, মহিলা ভুল বুঝে খারাপ ব্যবহার করে। ছ' নম্বরে যিনি থাকেন, তাঁর কোড্-নেম সাহা-গিন্নী। এস্টেটের পরনিন্দা মধুচক্রের তিনি প্রেসিডেন্ট। দজ্জাল এবং ডাকাবুকো বলে তিনি শনি-বারের মর্যাদা পান। পতি পরম গুরু লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কের মতো টিটমেন্ট পেয়ে কেঁচো হয়ে থাকেন। মাঝে মাঝে হঠাৎ কি কারণে রাত দেড়টার সময়ও বাড়ি মাথায় তোলেন তিনি। সাত নম্বরে বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা। লোকটি বেঁটে, লোগা, মাথায় টাক, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। তার স্ত্রী ঠিক এর বিপরীত। পাশাপাশি রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে লোকে মুচকি হাসে। আটনম্বরে কেন যে আজ পর্যন্ত কেউ এলো না, পল্লবের মাথায় ঢোকে না। তবু সব ফ্ল্যাটের মিলে একটা পরিবার নয় কিছুতেই, পুরো এস্টেট একটা পাড়া নয়। পল্লবের ঠিক ভালো লাগে না। যদি জীবনের বিকৃততম অভিজ্ঞতা থেকে রস-আস্বাদনের মানসিকতা তার আছে, তবু ঠিক ঠিক মেলাতে পারে না যেমন মিলে যায় কৈশোরের স্মৃতি কিংবা নিদেনপক্ষে মেস, তাই শরীর খুব ক্লান্ত না-হলে অথবা কোনো নতুন বই পড়ার তাৎক্ষণিক উত্তেজনা না থাকলে, ফিরতে ইচ্ছে করে না পল্লবের। সবই সন্দেহের চোখে দেখে, ভাবে ছেলেটা গোল্লায় গেছে। কিন্তু পল্লব কাউকে বোঝাতে পারে না, এতো কাছাকাছি থেকেও যদি কারুর হৃদয়ের সম্বাদটি না পেলাম, তবে নির্বাসনে যাওয়া কেন বারণ? নির্বাসন তবু ভালো যদি পাহাড় অথবা সমুদ্র থাকে। পল্লব জানে পাহাড় অথবা সমুদ্রও একঘেয়ে ক্লান্তিকর যদি কাছাকাছি প্রিয় মানুষ না থাকে।

সি পি আই (এম) চীনের দিকে!

রাজনীতি কলকাতা স্টাইল

বেদব্যাস বৈদ্য

প্রায় ষোল বছর পর ভারত-চীনের মধ্যে আবার সুসম্পর্ক স্থাপনের একটা সক্রিয় উদ্যোগ দেখা দিয়েছে। চীনের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে সংসদ কয়েক আগে বিদেশ বিভুঁইয়ে বসে আমাদের বিদেশ-মন্ত্রীর এক আচমকা বৈঠকের পর এই উদ্যোগটা আরও বেশী গুরুত্ব পায়। তার-পরই বিদেশমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর চীনা নেতাদের আমন্ত্রণে পিকিং যাত্রার সিদ্ধান্ত।

অটলবিহারী বর্তমানে জনতা সরকারের একজন বিশিষ্ট সদস্য। ১৯৬২ সালের ভারত-চীন সংঘর্ষের পর সংসদের বিরোধী নেতারূপে এক সময় তিনি তীব্র ভাষায় চীনের আগ্রাসী নীতির নিন্দা করেন। জনসংঘের এই একদা নেতার মুখে চীনপ্রেম আর ভারত-চীন সখ্যতার কথা অনেকের কাছেই এখন বিস্ময়কর বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। বলা বাহুল্য, ক্ষমতায় থাকা আর না থাকার মধ্যে এদেশের নেতাদের যুক্তি আর বক্তব্যে অনেক হেরফের ঘটে। ক্ষমতাসীন হওয়ার পর অনেক বেশী যুক্তি আর তথ্য নির্ভর হতে হয়।

বিদেশমন্ত্রী অটলবিহারী চীনের সঙ্গে বৈঠকের আগে ঘোষণা করেন, বেদখলী জমি ছেড়ে দেওয়ার জন্য তিনি চীনা নেতাদের কাছে সুনির্দিষ্ট এবং সরাসরি প্রস্তাব রাখবেন। বিদেশমন্ত্রীর এই আশ্বাসে দুই কংগ্রেস, সি পি আই এবং তাঁর নিজের দল জনতার একাংশ যে মোটেই আপ্লুতাশীল অথবা খুশী নন—তাদের সাম্প্রতিক কার্য-কলাপ এবং শলাপরামর্শ তার প্রমাণ দেয়। এই তিনটি দলের মধ্যে দুই রকমের মানসিকতা কাজ করছে। দুই কংগ্রেসের নেতাদের বিশ্বাস, আমেরিকার চাপে অটল চীন সখ্যতায় তৎপর। কারণ আমেরিকা আর চীনের মধ্যে যে হৃদ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছে নিরপেক্ষ ভারতকে তার সামিল করে ভারসাম্য নষ্ট করতে আমেরিকা এক নতুন খেলায় মেতেছে। সি পি আই এই মনোভাবের সঙ্গে একমত তো বটেই। তারা আরও মনে করছেন রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্ক ছিন্ন অথবা তিক্ত করতে চীন-আমেরিকার এটা একটা রাজনৈতিক চাল। তাই তারা এই উদ্যোগে মোটেই খুশী নন। আর জনতা দলের যে অংশ জনসংঘ এবং পি এস পি থেকে এসেছেন, তাদের একাংশ অন্ধ কমিউ-নিস্ট বিরোধী। এরা একদা 'টিবেত কনভেনশন' করে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলালকেও কম নাজেহাল করেন নি। চীনের সঙ্গে 'হিন্দি চিনি' ভাই ভাই সম্পর্কের পরিণতিকে তারা খুব সহজে ভুলতে পারেন নি। এবং চীনা হাসির আড়ালে ছুরি লুকানো—এ প্রবাদে তারা এখনও বিশ্বাসী। তাই সারা দেশের সঙ্গে পশ্চিম বাংলার রাজনীতিতে চীন বিরোধী নেতারা এখন অনেক কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছেন।

অপরদিকে সি পি আই (এম), আর এস পি, এস ইউ সি সহ অন্যান্য মার্কসবাদী দলগুলি ভারত-চীন সুসম্পর্কের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানালেও তাদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্লেষণে অনেক তফাৎ বর্তমান। সি পি আই (এম), এস ইউ সি দল ভারত-চীন সংঘর্ষের পর প্রকাশ্যে চীনের পক্ষে প্রচারে নামেন। তারা মনে করতেন, সমাজবাদী দেশ যেমন পরভূমি বেদখল অথবা আক্রমণ করতে পারে না। পরবর্তী-কালে সি পি আই (এম) অবশ্য চীন প্রসঙ্গে তাদের মনোভাব পরিবর্তন করেন। চীনের হঠকারি রাজনীতির সমালোচনায় তারা এই সেদিনও বিবৃতি প্রচার করেছেন। আসলে ১৯৬৯ সালের এ রাজ্যে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের আমল থেকেই চীন রাজ-নীতির বিরুদ্ধে সি পি আই (এম) নেতাদের মানসিকতা তৈরি হয়। দলের র‍্যাডিকেল বহু ক্যাডার তখন সি পি আই (এম) দল ত্যাগ করে উগ্রপন্থী রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়ে। এ রাজ্যের ক্ষমতাসীন যুক্ত-ফ্রন্টের সি পি আই (এম) নেতাদের আচার আচরণ এবং রাজনৈতিক বক্তব্যে আস্থাহীন হয়ে দলে দলে তারা উগ্র রাজনীতিতে মেতে ওঠে। তারপর থেকে, বিশেষ করে সপ্তম লোকের গোড়ায়, পিকিং যাত্রার দিনের পর দিন উগ্রপন্থী নেতাদের প্রশংসায় মুখর হয়। তাদের খুঁটিনাটি খবর পর্যন্ত চীনা ভাষ্যকাররা বিপ্লবী ভাষা-বিশ্লেষক প্রচার করে। সেই থেকে চীনা রাজনীতির সঙ্গে সি পি আই (এম) দলের ছাড়াছাড়ি বলা চলে। তারপর আন্তর্জাতিক রাজনীতির খর-স্রোতে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সি পি আই (এম)-এর সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ততায় পরিণত হয়।

এ বছরের গোড়ায় যখন পাঞ্জাবের জলন্ধরে সি পি আই (এম) দলের জাতীয় সম্মেলন হয় পাশাপাশি ভাতিন্ডাতেও তখন সি পি আই দলের জাতীয় সম্মেলন বসে। দুই শিবির থেকে কমিউনিস্ট ঐক্যের শ্লোগান ওঠে। দুই শিবিরে এই প্রশ্নে প্রস্তাবও নেওয়া হয়। কিন্তু সি পি আই (এম) নেতারা তখন দাবী তোলেন, সি পি আই দলকে ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে বাম গণতান্ত্রিক আন্দো-লনের সামিল হতে হবে। আর সি পি আই দাবী করেন, প্রতিক্রিয়াশীল জনতা সরকারের সমর্থক সি পি আই (এম) দলকে সুযোগ সন্ধানী এবং দুমুখো নীতি ছাড়তে হবে। এক কথায় বলা চলে, শেষ অবধি এই দুই দলের আদর্শগত ব্যবধানের চেয়েও ব্যক্তিগত ও নেতৃত্বগত দ্বন্দ্বই বড় হয়ে ওঠে।

ভারতের সঙ্গে চীনের বৈঠকের আগে চীনা নেতারা ভারতের আভ্যন্তরীণ কমিউনিস্ট এই দুই দলের মতিগতি নিশ্চয়ই বিচার বিশ্লেষণ করে থাকবেন। এক সময় ভারতের উগ্রপন্থীদের সমর্থন করে চীনা নেতারা সি পি আই (এম) দলের বিরাগ ভাজন হন। কিন্তু পরবর্তী-কালে লক্ষ্য করেছেন, উগ্রপন্থী রাজনীতির স্রোত এদেশে বেশীদিন বহতা থাকেনি। বরং সেই স্রোত এখন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর।

অপর পক্ষে সি পি আই (এম) দলও আগের তুলনায় নানা কারণে সি পি আই-এর অনেক কাছাকাছি। ফারাক শুধু নেতৃত্বের দ্বন্দ্বে। এই দুই দলের নিবিড় সম্পর্ক যে ভারতের আভ্যন্তরীণ রাজ-নীতিতে বাশিয়ার প্রভাব আরও বাড়ার, চীনা নেতারা তা বোঝেন। সেদিকে লক্ষ্য রেখে তাঁরা সি পি এম দলের তিন নেতাকে নভেম্বরে তাদের দেশে আমন্ত্রণ জানান। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে ভাঙনের পর ষোল বছরে সি পি আই (এম) নেতারা এই প্রথম আমন্ত্রিত। পলিটব্যুরোর সদস্য শ্রী পি রামমূর্তি, শ্রীএন বালনন্দন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যা শ্রীমতী গোদিবরী পানিক্কারের এই আমন্ত্রণ গ্রহণ রাজনৈতিক পণ্ডিতদের কাছে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। সি পি আই (এম) যে চীনের দিকে আবার ঝুঁকছে—এটা তার একটা সুস্পষ্ট লক্ষণ। রাশিয়ার বন্ধু এবং সহায়ক শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ঘোর বিরোধী জনতা সরকার ও সি পি আই (এম) দলকে চীনা নেতারা কাছে টেনে রাশিয়ার প্রভাবমুক্ত রাখতে আগ্রহী।

জনতা-সি পি আই (এম)-এর এই চীন-মুখী মানসিকতায় ক্ষুব্ধ এবং কট্টর কমিউনিস্ট বিরোধী দুই কংগ্রেস, জনতার একাংশ এবং সি পি আই দল অনেক কাছাকাছি। পশ্চিম বাংলায় তাদের নেপথ্য তৎপরতা দেখা দিয়েছে। তিব্বত প্রশ্ন ইতি-মধ্যে উচ্চারিত। এর পেছনে বৃহৎ এক সমাজতান্ত্রিক দেশের সূক্ষ্ম রাজনীতি নেই, তা বলা দুষ্কর। তাই ভারত-চীন সম্পর্ক যত ঘনিষ্ঠ হবে, এ রাজ্যের তিনমুখী তিনটি রাজনৈতিক দল ততই একমুখী হয়ে সি পি আই (এম) পরিচালিত বামফ্রন্ট সরকারের বিরোধীতায় সক্রিয় হবেন।

এবার
স্বনির্ভর?
চিত্রগুপ্ত

চিঠিপত্র

আপনাদের বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা অমৃতের ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ তারিখের সংখ্যায় জনৈক বিমলানন্দ শাসমলের—'ভারত কি করে ভাগ হলো' প্রবন্ধে পাকিস্থানী জঙ্গী শাসকের অত্যাচার, হত্যা, নারী ধর্ষণের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনসাধারণ বুকে দাঁড়িয়ে ভারতের সহযোগিতায় জঙ্গী শাসকদের পর্যুদস্ত করে বাংলাদেশকে স্বাধীন ভাবে যে গৌরবময় ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, লেখক তাঁর বিচক্ষণ লেখনীর দ্বারা তাকে ম্লান করবার চেষ্টা না করলেই পারতেন।

'১৯৭১ সালে আমরা যখন বললাম যে পাকিস্থান জবরদস্তি করে পূর্ব বাংলা দখল করে বসে আছে তখন আমরা সর্বতোভাবে অসত্য কথা বলেছিলাম—লেখকের এই উক্তিই সর্বতোভাবে অসত্য। ইহার কোন ভিত্তি নেই। ভারতের কোন নেতা বা লোক কখনও বলেন নি যে পাকিস্থান জবরদস্তি করে পূর্ব বাংলা দখল করে বসে আছে।

সুতরাং সারা ভারতের বড় বড় নেতাদের অনুসরণে কলিকাতা হাইকোর্টের বহু বহু অনেক জজ, ব্যারিষ্টার, সিটিং করে এই অসত্যটি চালু করেন—লেখক তাঁর এই উক্তির দ্বারা নিজ দেশের মুখ কালিমালিপ্ত না করলেই শোভন হোত।

'পূর্ব বাংলার মুসলমানরা ১৯৪৭-এ স্বেচ্ছায় পাকিস্থানে যোগ দিয়ে পাকিস্থানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে নিজেদের ভাগ্য রচনা করেছিলেন। তারপর হঠাৎ একদিন সকালে উঠে আমরা স্বাধীন বলা মাত্র পাকিস্থান যদি সেটা স্বীকার করতে বাধ্য না হয়, তাহলে আইনের দিক থেকে পাকিস্থান অন্যায় কিছু করে নি।' তবে পূর্ব বাংলা

সদ্য প্রকাশিত

শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের

একখানি মহৎ গ্রন্থ

১। কাছের মানুষ অবনীন্দ্রনাথ

শিল্পগুরুর জীবন সান্নিধ্যের নিত্য সখী লেখক তাঁর রচনায় শিল্পগুরুর হৃদয়ের এক অপ্রকাশিত দিগন্ত উন্মোচিত করে মানুষ অবনীন্দ্রনাথকে ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ করে দিয়েছেন।

মূল্য—১৫

২। সিন্ধুপারের পাখী

কয়েকবার বিশ্বপরিক্রমণে সুদূর বিদেশ নানা স্থানে বসে রচিত—এক ঝাঁক নতুন স্বাদের কবিতা উপহার দিয়েছেন বাংলা পত্রিকা ভারতবর্ষের বাইরে।

মূল্য—১৫

প্রকাশক : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ বিধান সরণি : কলিকাতা-৬

দেশের মুখে কালি মাখানো ঠিক নয়

মুসলমানেরা পাকিস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চেয়েছিলেন এবং তার জন্য লড়াই করতে চেয়েছিলেন।....

বাংলাদেশকে স্বাধীন করে দেবার জন্য আমরা ভারতীয়রা কৃতিত্বের দাবি করি এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে সেই জন্য এই সময়ে এশিয়ার মুক্তির সূর্য বলেও অভিহিত করা হোতো। কিন্তু বিনীতভাবে বলতে চাই যে, লোকটির জন্য বাংলাদেশ স্বাধীন হতে পারলো তাঁর নাম মহম্মদ আলি জিন্না।'—লেখকের এই উক্তিগুলি থেকেই প্রমাণ হয় যে লেখক বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামের কোনও সঠিক খবর রাখেন না।

হঠাৎ একদিন সকালে উঠে বাংলাদেশ কখনও বলেনি, 'আমরা স্বাধীন'। এবং পাকিস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে বা বিচ্ছিন্ন হবার জন্য লড়াই করতে বাংলাদেশ কখনও চায় নি। পাকিস্থানের জঙ্গী শাসক আয়ুব খাঁর নিকট ১৯৬৬ সালের ২৩শে মার্চ বাংলাদেশ করেছিল শুধু নিম্নলিখিত ছয় দফা দাবী।

১। লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পাকিস্থানের বিভিন্ন প্রদেশ নিয়ে একটি ফেডারেশন গঠন, প্রাপ্তবয়স্ক ভোটে নির্বাচিত সংসদীয় শাসন।

২। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে শুধু প্রতিরক্ষা এবং পররাষ্ট্র দপ্তর, অন্যান্য সমস্ত দপ্তর থাকবে অঙ্গ রাজ্যগুলির হাতে।

৩। হয় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের জন্য পৃথক মুদ্রা ব্যবস্থা, নয়তো সমগ্র দেশের জন্য একই মুদ্রা ব্যবস্থা কিন্তু পূর্ব পাকিস্থান থেকে পশ্চিম পাকিস্থানে অর্থ পাচার বন্ধের বিধিসম্মত ব্যবস্থা।

৪। কর ধার্য এবং আদায়ের ভার থাকবে অঙ্গ রাজ্যগুলির ওপর। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার খরচের জন্য সেই করের নির্দিষ্ট অংশ লাভ করবে।

৫। দুই অঙ্গে বিদেশী মুদ্রা অর্জনের পৃথক হিসাব থাকবে এবং দুই অঙ্গই নিজের নিজের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ করবে। দুই অঙ্গ রাজ্য থেকে বিদেশে পৃথক পৃথক ট্রেড মিশন রাখতে পারবে। দুই অঙ্গ রাজ্যের মধ্যে বিনা শুল্কে অবাধ কারবার করা যাবে।

৬। পূর্ব পাকিস্থানে আঞ্চলিক সামরিক বাহিনী গঠন।

কিন্তু জঙ্গী শাসক আয়ুব খাঁ বাংলাদেশের এই দাবী মানলেন না।

২৫ মার্চ ১৯৬৯ সালে আগা মোহম্মদ ইয়াহিয়া খাঁ পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট হবার পর ২৬ মার্চের তাঁর প্রথম বেতার ভাষণে বললেন যে, তিনি জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে শাসনভার দিয়ে দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চান। ২৮ নভেম্বরের বেতার ভাষণে তিনি ঘোষণা করলেন যে, এক ইউনিট প্রথা বন্ধ করে আবার দেশকে আগের মতো প্রদেশে ভাগ করা হবে এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারে নির্বাচন হবে।

১৯৭০ সালের ৩০ মার্চ ইয়াহিয়া খাঁ নির্বাচনের মূল সূত্র 'লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক আদেশ' ঘোষণা করলেন। এই আদেশ অনুযায়ী একটি জাতীয় পরিষদ এবং প্রত্যেক প্রাদেশিক পরিষদ গঠিত হলো। ৫ই অক্টোবর ১৯৭০ নির্বাচনের দিন ধার্য হলো।

৭ জুন ১৯৭০-এর এক বিরাট জনসভায় শেখ মুজিবর রহমান। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচার সভায়, পাকিস্থানের সব কয়টি সরকার পর পর কি ভাবে পূর্ব পাকিস্থানকে শোষণ করেছে তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে বলেন যে, তাঁদের ছয় দফা দাবী আদায় করা হবেই এবং পাকিস্থানও ধ্বংস হবে না। ১৪ জুনের আর এক জনসভায় তিনি ঘোষণা করেন : আমরা পশ্চিম পাকিস্থানীদের ভাই হয়ে থাকতে চাই, ক্রীতদাস হয়ে নয়।

অতঃপর পূর্ব পাকিস্থানের প্রবল বন্যার জন্য নির্বাচনের দিন ৫ অক্টোবর থেকে ৭ই ডিসেম্বর নিয়ে যাওয়া হয়। এই নির্বাচনে জাতীয় পরিষদ এবং পূর্ব পাকিস্থানের প্রাদেশিক পরিষদে শেখ মুজিবর রহমানের আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে গণতন্ত্রের মাধ্যমে শেখ মুজিবর রহমান সমগ্র পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী হবার অধিকারী হলেন। কিন্তু ভুট্টোর কারসাজিতে ইয়াহিয়া খাঁ মুজিবর রহমানকে পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী করার পরিবর্তে করলো বন্দী। চালালো পূর্ববঙ্গের সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর উপর অকথ্য অত্যাচার এবং সেই অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্য ভারতে পালিয়ে আসলো শরণার্থী হয়ে অসংখ্য পূর্ব বাংলার অধিবাসী। ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বিশ্বের দরবারে জানালেন পাকিস্থানীদের এই অকথ্য অত্যাচার ও ভারতে অগত শরণার্থীদের সমস্যার কথা। বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিনিধি ভারতে শরণার্থীদের দেখতে আসতে শুরু করলো। সকলেই ভারতের প্রচেষ্টায় সাধুবাদ জানালেন।

যে সমস্ত বাঙ্গালী মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে বাংলাদেশে রয়ে গেল তাদের দ্বারা গড়ে উঠলো মুক্তি ফৌজ ও মুক্তি বাহিনী। এই মুক্তি ফৌজ ও মুক্তি বাহিনীকে জঙ্গী শাসকদের অত্যাচারের

শান্তিদেবের পত্রাংশ নিশ্চয় বুঝতে পারতেন

ভাতার হাই স্কুলের হেড মাস্টার মশাই, শ্রীযুক্ত বাবু নকুলচন্দ্র দত্ত, অনুমান করি বঙ্গ ভাষার শিক্ষক নন, নইলে শান্তিদেব ঘোষের পত্রাংশের অর্থ নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেন। অশালীন উক্তিটি কার? সুবোধ মিত্রের, না শান্তিদেব ঘোষের? যে কোন পাঠকই বুঝতে পারবেন যে, শান্তিদেব ঘোষ মশাই বলতে চেয়েছেন মিথ্যাচারণের স্বভাব পংকজবাবুর আচরণে যা কখনোই ছিল না। পংকজবাবু শত্রুশ্রেণীর নিশ্চয়ই, তবে শান্তিদেববাবুও কম শত্রুশ্রেণীর নন। তাছাড়া হেড মাস্টারের অশালীন মন্তব্য অনুযায়ী তিনি ভাষায় দীনও নন, স্বভাবে উদ্ধতও নন। বরং উল্টো বলি, একটি সহজ বাক্যের অপব্যাখ্যা করার ঔদ্ধত্য নকুলবাবু পেলেন কী করে?

অমিতাভ চৌধুরী, কলকাতা-৪০।

২

অমৃত পত্রিকায় (২১।৭।৭৮ এবং ২৫।৮।৭৮ সংখ্যায়) সুবোধ মিত্র-শান্তিদেব ঘোষ বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে গোটাকয়েক কথা বলতে চাই। 'পরিচয়' ছবির পুরস্কার ছিলেন রাইচাঁদ বড়াল, পংকজ মল্লিক নয়। সুতরাং সেই ছবির গান নির্বাচনের জন্য কেন পংকজ শান্তিনিকেতনে যাবেন? পংকজের মত রাইচাঁদেরও গুরুদেবের কাছে অবারিতদ্বার ছিল। দ্বিতীয়তঃ, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর 'প্রতিবাদ' ছবিটি তৈরী হওয়ার সময় রবীন্দ্রনাথ কোথায়? সুতরাং ঐ ছবিতে রবীন্দ্রসংগীত সংযোজনের জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে যাবার কথাই ওঠে না। 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ' কবিতায় হয়ত শান্তিদেব ঘোষই সুর দিয়েছিলেন। কিন্তু আইনের চোখে পংকজ মল্লিকই ঐ গানের সুরস্রষ্টা হয়ে গেছেন, কেননা 'প্রতিবাদ' ছবিতে রবীন্দ্রনাথের নিজের সুর দেওয়া গানগুলি ছাড়া অন্যান্য গানের সুরকার হিসাবে ছবির সংগীত পরিচালক পংকজ মল্লিকই চিহ্নিত হয়েছেন ছবির পরিচয় লিপিতে। ইতি।

অরুণ দত্তগুপ্ত

অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কলি-১২

বিরুদ্ধে সাহায্য করে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভারতীয় সৈন্যবাহিনী পাকিস্থানী সৈন্যবাহিনীকে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করলো। বাংলাদেশ হোল স্বাধীন এবং জন্ম নিল একটি নতুন স্বার্বভৌম 'বাংলাদেশ'।

এই হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এতে কি বাংলাদেশকে স্বাধীন করে দেবার জন্য আমরা ভারতীয়রা কৃতিত্বের দাবি করতে পারি না? এতে কি প্রমাণ হয় যে, বাংলাদেশ হঠাৎ একদিন সকালে উঠে 'আমরা স্বাধীন'—বলেছিল? এতে কি প্রমাণ হয় যে, পূর্ব বাংলার মুসলমানেরা পাকিস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে বা বিচ্ছিন্ন হবার জন্য লড়াই করতে চেয়েছিল? এতে কি লেখক এখনও আইনের দিক থেকে পাকিস্থানের অন্যায় কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না?

বিনীতভাবে বলতে চাই যে, নিজের ভুল ধারনা বশতঃ কাহারও গৌরবকে ম্লান করা এবং নিজ দেশের মুখে কালিমা লেপন ঠিক নয়।

(মদনলাল আগরওয়াল)
মেদিনীপুর

ভালো লেগেছে

আমি সাপ্তাহিক অমৃতের নিয়মিত পাঠক। কিছুদিন আগে অমৃত পত্রিকায় প্রকাশিত একটি লেখা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। লেখাটির নাম 'হীরকের দিনগুলি।' লেখক বিমলকুমার ঘোষ। বর্তমান সমস্যা জটিল জীবনে লেখাটি আমাদের অনেকেরই আশ্রয়। তাঁর পরবর্তী লেখার রসাস্বাদন করার জন্য আমি আগ্রহী। আশা করছি, তাঁর লেখা অমৃতে আরও দেখতে পাব।

অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
জেলা ২৪ পরগণা

অমৃত'কে ধন্যবাদ

সম্প্রতি প্রকাশিত অমল মুখোপাধ্যায়ের 'জগদীশ গুপ্তের প্রত্যাবর্তন' প্রবন্ধটির জন্য অমৃতকে ধন্যবাদ। গত ৩০ জুন সংখ্যার প্রভাতকুমার দাসের লেখা 'মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়' শীর্ষক প্রবন্ধটির পর জগদীশ গুপ্ত সম্পর্কে মনোজ্ঞ রচনাটি নানা কারণে বিশেষ ইঙ্গিতবাহী। বলতে গেলে এক অপূর্ব সাধুতা রক্ষিত হয়েছে। কারণ এই দুই সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যে নতুন পথপ্রদর্শক। উপন্যাসে জগদীশ গুপ্ত যে নির্মোহ বিজ্ঞান দৃষ্টির প্রবর্তনা করেছেন, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার সার্থক শিল্পী। লেখক শ্রীমুখোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে একটু আলোকপাত করলে আমরা একটি সর্বাঙ্গসুন্দর প্রবন্ধ পেতে পারতাম।

শম্পা মিশ্র
৩৪ কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৩৭

Rupa Paperbacks

Anthropology :

MILES BURKITT
The Old Stone Age ₹12.00

Business & Management :

How to Conduct Meetings—Company, Club, Political and Social 8.00

J. B. DURYEA
How To Solicit — A must for all Insurance selling agents and salesmen ₹10.00

P. K. GHOSH (Vice Chancellor : North Bengal University)
Government and Industry ₹12.00

Criticism :

TARAKNATH SEN
Three Essays on Shakespeare 12.00

Drama :

OSCAR WILDE
Complete Plays ₹12.00

Memoirs :

MAITRAYE DEVI
Tagore By Fireside 6.00

Poetry :

HELEN GARDNER edited
The Metaphysical Poets ₹10.00

Philosophy & Religion :

L. S. S. O'MALLEY
Indian Caste Customs 8.00

W. J. WILKINS
Hindu Mythology 20.00
Modern Hinduism 16.00

List of other books on application.

Rupa & Co

15 Bankim Chatterjee Street
Calcutta 700 073

Also at :
Allahabad : Bombay
New Delhi

আমার বাবা যতীন্দ্রমোহন বাগচী

ঊর্মি সান্যাল

আমাদের বাবা কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর আগামী বাংলা অগ্রহায়ণের ১২ তারিখে জন্ম থেকে ১০০ বছর পূর্ণ হবে।

বাংলাদেশে সাধারণতঃ কবি-ভাগ্যে যা ঘটে, তার তিরোধানের পরেও তাই হয়েছে। সকলেই ত' আর রবীন্দ্রনাথ নন। বাবা লিখে গেছেন—

'গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা
ওগো তপন'

তাঁর খ্যাতি ছিল সারা বিশ্বে ছড়ানো অনুবাদের সাহায্যে। কিন্তু তাছাড়া আগে, বাবাদের সময়ে, কাব্যচর্চা অনেক বেশি ছিল। যা আমরা আমাদের ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছি। এখন আমরা পারিপার্শ্বিক এমন একটা অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলছি, যাতে কাব্যচর্চার আমাদের সময়ও নেই, উৎসাহও নেই। সাহিত্যচর্চা মানে আমাদের সাধারণ মানুষের কাছে এখন গল্প-উপন্যাসে এসে দাঁড়িয়েছে। ক'জন আমরা কবিতার বই পড়ি? প্রকাশকেরাও কবিতার বই ছাপাতে ভয় পান, কারণ চলে না।

আমরা ছোটবেলা থেকেই সমস্ত বড় বড় লেখকের লেখা পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে পড়েছি। তার মধ্যে কবারও লেখা থাকত। এমনকি ম্যাট্রিক, আই-এ, বি-এ সব কোর্সেই থাকত। আমি যেবার (তখনকার) ম্যাট্রিক দিই, তখন আমাদের "সিংহগড়" কবিতাটি ছিল। বি-এ বাংলা অনার্সে মহাভারতী নামে একখানি বই ছিল। পরে কাব্যমালঞ্চ নামে বইখানিও পাঠ্য হয়েছিল। কিন্তু বেশ কিছুদিন থেকেই দেখছি, অনেক পাঠ্যপুস্তকে তাঁর লেখা আগের মতন থাকছে না। বি-এ ক্লাসেও বন্ধ হয়ে গেছে।

মনে মনে খুব আঘাত পেয়েছি। ভেবেছি, তবে কি বাবার কবিতার মান এখনকার যুগের তুলনায় নেমে গেছে, কিন্তু আগে যে শুনেছি, রবীন্দ্রানুগামী শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম আমাদের বাবা।

১৯৩৮ সনে ৬ই ভাদ্র কবিশেখর কালিদাস রায় প্রতিষ্ঠিত রসচক্রের আহ্বানে বাবাকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। এই সম্বর্ধনা উপলক্ষে বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বলে সানন্দে সম্বর্ধিত করে, আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি বাঙলা সাহিত্যের প্রায় যাবতীয় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। পরে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্তৃক বাবাকে আর একবার সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। তারও আগে কাশীতে মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন কর্তৃক বাবাকে কবি-কুলেশ্বর উপাধি দেওয়া হয়। বাবা অবশ্য নিজের নামের সঙ্গে ঐ উপাধি কখনও ব্যবহার করেননি।

রবীন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্যমণ্ডলীর ছবি আমাদের বাড়িতে (৫২, হিন্দুস্থান পার্ক, ইলাবাস) এখনও আছে। তার মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, দিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মধ্যেখানে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। রবীন্দ্রনাথের ঠিক পাশের কাছে বাবা। এই ছবিখানির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। কারণ, তখন এই ছবিটি সপ্তাশ্ববাহিত সূর্য নামে খ্যাত ছিল।

দুর্ভাগ্যের কথা, বাবা মারা যাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই আমার দুই দাদাও চলে যান। আর আমরাও দুই বোনে বাইরে স্বামীর কর্মক্ষেত্রে। সেজন্য আমরা কেউ এই যে তাঁর লেখা মুছে যেতে চলেছে, তার জন্য চেষ্টাও কিছু করতে পারিনি। দেশে যাঁদের ওপরে এগুলি রক্ষার দায়িত্ব, তাঁদের ওপরে অভিমানে বুক ভরে উঠেছে। বাবার কবিতার ভক্ত অনেকে বাবার বই দোকানে খুঁজে পাননি। তখন হয়ত ঘটনাচক্রে জানতে পেরে আমাদের কাছে যে এক-আধ কপি আছে, তাঁরাই নিজ হাতে লেখা স্নেহোপহার তাই দিয়েছি। তাঁরা পড়ে আবার ফেরৎ দিয়েছেন। বাবার বই পুনঃ প্রকাশের অনুরোধ জানিয়েছেন। কিন্তু সে-সাহিত্যানুরাগী আর ক'জন? মুষ্টিমেয় ক'টি সাহিত্যানুরাগীর জন্য ত আর প্রকাশকেরা বই ছাপতে পারেন না।

যাক্ এতদিনে তাঁর জন্মের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে যদি সাহিত্যিক এবং সাহিত্যানুরাগীরা তাঁকে স্মরণ করেন, তাহলেও আমার যাঁরা তাঁর একান্ত প্রিয়জন, সত্যি খুবই আনন্দিত হব। মনে হবে, বাঙলার কবি ছিলেন যতীন্দ্রমোহন, তাঁকে তাঁর দেশবাসী ভোলেনি। আর আমরাও নিজের ঢাক নিজে পেটানোর লজ্জা থেকে মুক্তি পাব।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বঙ্গীয় সাহিত্য আকাডেমী, জাতীয় গ্রন্থাগার এবং নানা সাহিত্য প্রতিষ্ঠান উৎসাহী হয়ে ইতি-মধ্যেই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। সকলেই আমাদের বাবার সম্বন্ধে যা জানি, যথেষ্ট আগ্রহসহকারেই জানতে চেয়েছেন।

আমাদের বাবা আগেকার যুগের হলেও খুব উদারপন্থী ছিলেন। তিনি বলতেন, যত লোকের সঙ্গে মিশবে, তত মনে

প্রসরতা বাড়বে। সেইজন্য আমরা দশজনের সঙ্গে মিশতে সুযোগ পেয়েছি প্রচুর। আর তাই তাঁর সম্বন্ধে আজ দু' কথা লিখতে সাহসী হয়েছি।

নদীয়া জেলার জামশেরপুর গ্রামে অভিজাত জমিদার বংশে কবি যতীন্দ্রমোহনের জন্ম। আমাদের ঠাকুর্দা শ্রীহরিমোহন বাগচীর চার ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলেদের মধ্যে বাবাই কনিষ্ঠ। তাঁর শিশু-বয়স থেকেই লেখাপড়ার ঝোঁক ছিল। যে-বই হাতের কাছে পেতেন পড়তেন, বুঝুন আর না বুঝুন। কিছুদিন পরেই বাবা পড়াশুনার সুবিধের জন্য কলকাতায় এলেন। আমাদের ঠাকুর্দা ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার সুবিধের জন্য প্রথমে বাড়ি ভাড়া করেন, পরে মেডিকেল কলেজের সামনে অরপুলি লেনে একখানি তিনতলা বাড়ি করেন। বাড়ির নং ১০।১, আরপুলি লেন। সেখানি এখনও আছে। যাঁরা বাবার সমসাময়িক সাহিত্যিক এবং গায়ক ছিলেন, তাঁদের এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনারায়ণ প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য লোকের পদ-ধূলিতে সে-বাড়িখানি সাহিত্যানুরাগীদের কাছে পুণ্যতীর্থ হয়ে আছে। সেই সময়ের তাঁদের মধ্যে আজও যাঁরা জীবিত আছেন, তাঁদের সে-আনন্দের স্মৃতি আশা করি এখনও মনের স্মৃতিকোঠায় ধরা আছে।

যা বলছিলাম, বাবা যখন হেয়ার স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়েন, তখন বিদ্যাসাগরমশায় মারা গেলেন। বাবা গল্প করতেন। সেই সময় বাবা মনে খুব আঘাত পান। আর একটি কবিতা লেখেন। বাবার ক্লাসের সব বন্ধুরা চাঁদা তুলে কবিতাটি ছাপান। বাবার জীবনে পঞ্চম শ্রেণীতে প্রথম সেই কবিতা ছাপার অক্ষরে বেরোলো।

বাবা খুব বঙ্কিমবাবুর লেখার ভক্ত ছিলেন। কপাল-কুণ্ডলা, রাজসিংহ, আনন্দমঠ, বিশেষ করে পছন্দ করতেন। বঙ্কিমবাবুকে দ্যাখার খুব ইচ্ছে। কি করেন? ঐটুকু ছেলে কি করে যোগাযোগ করেন? এদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র দিব্যেন্দুসুন্দর ছিলেন স্কুলে বাবার সহপাঠী এবং বন্ধু। তিনি বাবার মনের কথা জানতে পেরে বাবাকে তাঁর দাদুর কাছে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দেন। পরে বাবা মাঝে মাঝে গিয়ে বঙ্কিম-বাবুর কাছে আনন্দ, ভীতি, সে এক অদ্ভুত ভাবাবেগে তাঁর সেই ছোট্ট বুকখানি ভরে নিয়ে বসতেন পায়ের কাছে। বাবা বলতেন, 'উনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন।' একদিন গড়ের মাঠে বেড়াতে যাওয়ার সময়ে বাবাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে গিয়ে বাবার সঙ্গে অনেক কথা, খোঁজখবর নিয়েছিলেন এবং মন দিয়ে পড়াশুনা করতে বলেছিলেন। বাবা এইসব গল্প যখন আমাদের কাছে করতেন, তাঁর হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি যে কি অপরূপ শোভাই ধরত। খুব ভাবপ্রবণ ছিলেন। খুব পরিহাসপ্রিয়ও ছিলেন।

স্মরণশক্তিও ছিল অদ্ভুত প্রখর। মাইকেল, রামগুণাকর, মুকুন্দ দাস, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি মুখে মুখে সমানে বলে যেতেন। এমনকি তাঁর ছোটবেলাতে গ্রামে পুজোর আগে যে বাউলেরা 'মায়ের আগমনী গান গাইত 'যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী, মা আমার কত কাঁদিছে, আর আমার মনে নেই, ঝরঝর করে বলে যেতেন। হয়ত বা কদিন আগে কারো কোন কবিতার কয়েক পংক্তি আমাদের দুবোনকে বলেছেন, ইচ্ছে করেই হঠাৎ একদিন দুলাইন বলে তৃতীয় লাইন কি জিজ্ঞেস করতেন, আমরা দুবোনে বলতে পারতাম না। ভয়ে ভয়ে বাবা রাগ করেছেন ভেবে তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখেছি, রাগ ত' দূরের কথা, কি স্নেহভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আমাদের দিকে।

আমাদের যা কিছু শিক্ষা, জ্ঞান ও কৃষ্টি তার দীক্ষাগুরু, আমাদের বাবা।

বাবা এণ্ট্রেন্স পাশের পরে প্রেসিডেন্সী থেকে তাঁদের সময়ের এফ, এ এবং বি, এ পাশ করেন। বি, এ পরীক্ষার পরে পুরোপুরি লেখার জগতের মানুষ।

মানসী ও মর্মবাণী, ভারতী প্রভৃতি তখনকার উচ্চ-মানের পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। আমাদের আরপুলি লেনের দোতলার হলঘরে সাহিত্য-বাসর ও গানবাজনার আসর বসত। আমার এগুলি অবশ্য খুবই আবছাভাবে মনে আছে। কারণ আমি তখন খুবই ছোট। শোনা কথাই এর মধ্যে বেশী। এখনে আমার নামের একটু ছোট্ট ইতিহাস আছে, আপনাদের জানানোর লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। আমি তখন বছর ৪।৫ এর মেয়ে। একদিন বাড়িতে সাহিত্যিক সমাবেশ হয়েছে, রবীন্দ্রনাথও হাজির। আমার মা ভাল রাঁধতে পারতেন এবং লোকজন খাওয়াতে ভালবাসতেন। (সেটাতে অবশ্য বাবারও ঝোঁক ছিল) যতদূর, মানে মার জীবিতকালের শেষদিন পর্যন্ত দেখেছি, বাড়িতে পাচক ঠাকুর থাকা সত্ত্বেও ভাত ডাল ছাড়া অন্য রান্না মা করেছেন এবং সকলকে খেতে দিয়েছেন। এমনকি বাড়ির কাজের লোকজনদের অবধি সমান স্নেহ যত্নের সঙ্গে খেতে দিতেন। মার লোকজনকে যত্ন করার প্রসঙ্গে একটা কথা লিখলে এখানে বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মা চলে যাওয়ার পরে ওরকম মাইনেকরা লোক যে অত কাঁদতে পারে তা আমার এই এত বছরের জীবনে আমি আর দ্বিতীয়বার দেখলাম না। যাই হোক, সেদিন মা নিজে হাতে যত্ন করে রান্না করে রবীন্দ্রনাথের সামনে ধরে দিয়ে বসে আছেন। আমরা ও অন্যান্য সব মেয়েরাও বসে। হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ মাকে জিজ্ঞেস করলেন, বৌমা, এই ফুটফুটে মেয়েটার তোমরা কি নাম রেখেছো? মা বললেন, ওর নাম ঊর্মিলা। তখন বাঁ হাতে আমার গাল ধরে একটু আদর করে বললেন, 'না বৌমা ঊর্মিলা বড় দুঃখের নাম, তোমার যদি আপত্তি না থাকে ত আজ থেকে ওর নামের শেষের লা-টুকু কেটে আমি ঊর্মি রাখলাম।' সেই থেকে আমার নাম ঊর্মি। ঐ নামের জন্য তখন থেকে আমার খুব গর্ব। তখনকার যাঁরা আজও আছেন, তাঁদের সকলেরই আশা করি সেই অরপুলি লেনের আনন্দের হাটের কথা মনে আছে।

বাবার কথা লিখতে গেলেই পরিবারের আমার মা ভাই বোনের কথা আপনি এসে যাচ্ছে। আমাদের বাবাকে আপনাদের সামনে ঠিক মতন তুলে ধরতে গেলে ওঁদের কাউকেই আমি বাদ দিতে পারছি না, কারণ বাবা আমাদের খুবই স্নেহপ্রবণ ছিলেন। আমাদের বাদ দিয়ে বাবা কোথাও যাওয়া বা কিছু আনন্দ করা একেবারেই ভালবাসতেন না। বাবা যেখানে যখন সভাপতি হয়ে গিয়েছেন এবং সেটা প্রায়শঃই থাকত। আমাদের বাদ দিয়ে কখনও কোথাও যাননি।

আর একটা কথা না জানালে বোধহয় বাবার চরিত্রের একটা দিক অন্ধকারে থেকে যাবে। কারণ, বাইরে তার প্রকাশে খুব আড়ম্বর ছিল না। বাবা মনে-প্রাণে অত্যন্ত স্বদেশী ছিলেন। আমাদের বাড়িতে বাবা এবং আমার দুই দাদাকে কখনও খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবী ছাড়া পরতে দেখিনি, আর না হলে গরদ কিম্বা তসরের পাঞ্জাবী বা সার্ট। আর আমরা মেয়েরা ধনেখালি তাঁত, মুর্শিদাবাদী বা বিষ্ণুপুরী সিল্ক। এমনকি আমাদের ছোটবেলায় বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়ও সব খদ্দরের ছিল। একবার, কত সন ঠিক আমার মনে নেই। কারণ তখন আমি বছর খানেকের বোধহয়। কাজেই আমার শোনা কথা আপনাদের শোনাতে বসেছি। গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। পার্কে পার্কে তিনি মিটিং করছেন, যে যা পারে সাধ্যানুযায়ী তাঁর সাহায্যের ঝুলিতে দিচ্ছে। এইরকম একটি মিটিংয়ে আমার দুই দিদি গিয়েছেন। মেজদির (ইলা) সামনে এসে দাঁড়াতেই সে তার [illegible] চুড়ি দু'গাছি খুলে দিয়ে খালি হাতে বাড়ি ফিরে এসে [illegible] বলতে মা বললেন, বেশ করেছো, কিন্তু তোমাদের বাবা যদি কিছু

জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুরের চিঠি

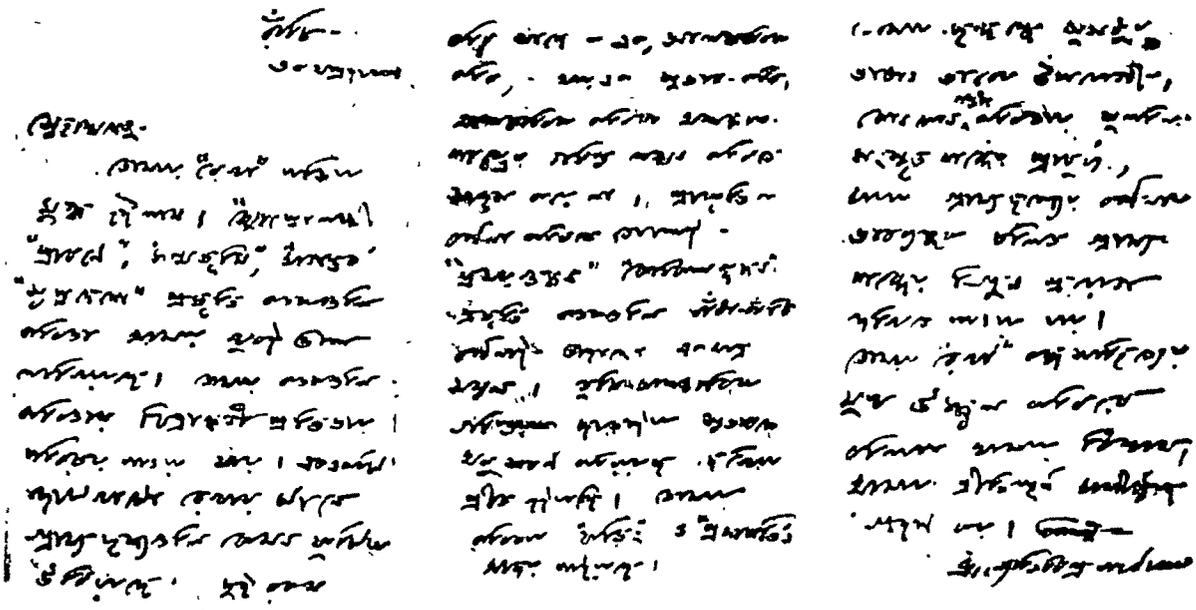

বলেন। এমন সময় বাবা সেখানে এসে কি কথা হচ্ছে জিজ্ঞেস করাতে বা সব বল্লেন। বাবা শুনে হেসে মেজদিকে জড়িয়ে ধরে বললেন, বেশ করেছো, আমি খুব খুশি হয়েছি তোমার কাজে, না হলেই বরং দুঃখ পেতাম।

'অরপুলি লেন থেকে বাবা আমাদের হিন্দুস্থান পার্কে বাড়ি করে উঠে গেলেন। বাড়িখানির নাম রাখলেন 'ইলাবাস'। ইলাবাসে এসেও সেই আনন্দের হাট। প্রায় প্রায়ই সাহিত্যিক এবং গায়কদের সমাগম হতে লাগল বাবারই স্থাপিত পূর্ণিমা সম্মিলনীতে। এ-বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ তিন-চারবারই আসতে পেরেছিলেন। একবার দেখি দুখানা ছবি বাবার নামে পার্শেল এসেছে। খোলার পরে দেখি রবীন্দ্রনাথের পেছনে হাত দিয়ে এক-খানি ও বসে একখানি নিজ হাতে নাম সই-করা ফটো এবং একখানি চিঠি। সে-ছবি দুখানি আমাদের হলঘরে টাঙানো থাকত। তখন সদাসর্বদা আমাদের বাড়িতে সব বড় বড় লোকের আসা-যাওয়া ছিল। শরৎবাবু, মিতে কাকাবাবু, মানে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কালিদাস রায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বেনারস থেকে যে উত্তরা নামে কাগজখানি বের হত, তার সম্পাদক শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী বাবার খুবই স্নেহের পাত্র ছিলেন। বহুবার কলকাতায় এলে আমাদের বাড়িতেই উঠতেন এবং খুব আমুদে ছিলেন। তাঁর বাড়িতেও আমরা একবার খুব ছোটবেলাতে গিয়েছিলাম। শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেনের সঙ্গেও খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল, চিঠিপত্রের আদানপ্রদান ছিল খুব।

বাবার আর একটা দিক দেখেছি, তিনি নন্ট্যামোদীও ছিলেন। শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও নির্মলেন্দু লাহিড়ীর সঙ্গেও খুব যাওয়া-আসা ছিল। আমরা থিয়েটার গেলে বেশ মনে আছে, ওঁরা ফাঁকে ফাঁকে এসে বাবাকে জিজ্ঞেস করে যেতেন—কি রকম হচ্ছে। আর মাকে যে কি শ্রদ্ধা-ভক্তির সঙ্গেই বৌদি বলে ডাকতেন। এখনও স্মৃতি নাড়াচাড়া করতে সে-সব কথা মনে স্পষ্ট ভেসে উঠছে যেন। হেমেন্দ্রকুমার রায়, নরেন দেব, রাধারানী দেবী, জলধর সেন, নন্দলাল সেনগুপ্ত, অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, গিরিজা চক্রবর্তী, বসন্ত চক্রবর্তী, নলিনী সরকার, পবিত্র গাঙ্গুলী, ডাঃ সুরেন দাশগুপ্ত (উনি আমাদের বাড়ির পেছনেই থাকতেন), ডাঃ রমাপ্রসাদ চন্দ, ডাঃ দীনেশ সেন, ঐতি-হাসিক যোগীন্দ্রনাথ গুপ্ত, চারুচন্দ্র দত্ত আই-সি-এস, দেবেশ-চন্দ্র দাস আই-সি-এস, কাজী নজরুল ইসলাম, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রেমেন মিত্র, প্রবোধ সান্যাল, বীরেন ভদ্র প্রভৃতি আরও কত যে আসতেন—সকলের নাম লেখা সম্ভব নয়। যদি কেউ আমাদের এ-লেখাতে তাঁদের নাম না দেখতে পান, তবে জানবেন, সেটা আমার অনিচ্ছাকৃত অপরাধ। তার জন্য আমি আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রবোধ সান্যাল, প্রেমেন মিত্র এঁরা সব আমার দাদার সঙ্গে কল্লোল কাগজের বন্ধুতা সূত্রে এসে বাবার পাশের ঘরে বসে দাদার সঙ্গে গল্প করতেন। তারপরে কখনো একটু একলা হলে বাবার কাছে যেতেন আমার স্পষ্ট মনে আছে। কারণ আমাকেই কতদিন জিজ্ঞেস করেছেন, বাবা কি করছেন? একবার হাস্যরসিক চিত্তরঞ্জন গোস্বামী কমিক করে খুব হাসিয়েছিলেন মনে আছে। আগে বোধহয় বলেছি, আমাদের বাবা খুব রহস্যপ্রিয় ছিলেন। একবার হয়েছে কি, হঠাৎ শুনি শরৎবাবু আসছেন। দু'বোনের ত খুব ইচ্ছে তার গলায় একগাছি মালা দিয়ে অভ্যর্থনা জানাই। অত অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের বাগান থেকে কিছু গাঁদা ফুল তুলে মালিকে দিয়ে সেই ফুলের মালা গেঁথে শরৎবাবুর গলায় দিলাম। তখন বোধহয় শীতকাল, না হলে আমাদের বাগানে বেল, যুঁই, রজনীগন্ধা, গোলাপ প্রভৃতি নানা-রকম ফুলই ফুটত, কিন্তু সেদিন গাঁদার মালা ছাড়া আর কিছু না দিতে পেরে এমনিতেই দু'বোনে মরমে মরে আছি, তার ওপরে মালা পরানোর সঙ্গে সঙ্গে বাবার 'তোরা গাঁদার মালার জন্য লজ্জা পাচ্ছিস ক্যান, শরৎদার গলায় জবার মালাই ঠিক মানাত' বলে ওঠাতে আমাদের সেকি অবস্থা বুঝে নিন। আর এদিকে বাবা আর শরৎবাবু দুজনেই সে কি উচ্চস্বরে হাসি।

ওঃ, আর একজনের নাম মনে হল। তিনি ডি এল রায়। তাঁর সঙ্গেও বাবার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। পরে দিলীপ রায় আমাদের বাড়ি আসতেন অবশ্যই বাবার বন্ধুপুত্রের দাবিতে। উনি আমাদের মধুপুরের বাড়িতেও গিয়েছেন। সেখানে আমাদের একখানি গ্রুপ ফটো তোলা হয়েছিল মনে আছে। অবশ্য এ-সবই দিলীপ রায়ের পণ্ডিচেরী যাওয়ার আগে।

বেশ মনে পড়ে, মাঝে মাঝেই গভীর রাতে হেমেন্দ্র-কুমার রায়, মানে আমাদের হেমেনকাকাবাবু, কাকীমাকে নিয়ে এসে দরজায় ধাক্কা। তখন দরজা খুলে এত রাতে বাবা, মা, দাদাবা সব উঠে হলঘরে একখানি জমাট আড্ডা। আমরা ঘুম থেকে উঠে

দু'বোনে জুল জুলে চোখে মায়ের পাশে বসে থাকতাম। আমরাও কাকাবাবুর বাড়িতে গেছি, তবে অত রাতে না কিন্তু। বাবা অত কাকাবাবুর আসার কারণ জিজ্ঞেস করলে, কাকাবাবুর উত্তর—ঘুম আসছিল না, ইচ্ছে হল আপনার কাছে আড্ডা দিয়ে আসি, চলে এলাম।

হঠাৎ সকালের দিকে বাবার কাছে এক ভদ্রলোক এলেন, বোধহয় বেহালার কিম্বা গোবরডাঙ্গার জমিদার ঠিক মনে নেই (হিন্দুস্থান পার্কেই থাকতেন), তিনি চলে যাওয়ার পরে বাবা ডেকে বললেন, বিকেলে একটি ত্রিপুরার ছেলে গান শোনাতে আসবে। আমাদের হলঘর প্রত্যহই মালী ফুল দিয়ে সাজিয়ে রাখত, তবুও গান-বাজনা বা কবিতা পাঠের আয়োজন হলেই আমাদের নিজের হাতে হলঘরের সব নতুন করে সাজাতে হত।

বাবা বলতেন, সাহিত্য বা সঙ্গীতের স্থান পুজোর স্থানের মতনই পবিত্র। সেখানে পুজোর আগে যেমন সব ঘষে-মেজে পরিষ্কার করে আমরা ফুল-চন্দন ও ধূপের গন্ধে জায়গাটি পবিত্র করে নিই, এও ঠিক সেইরকমই। বাবার টেবিলে শেষদিন পর্যন্ত আমাদের মালী একটা শ্বেতপাথরের বেকারীতে বিকেলে ফুল তুলে রেখে যেত। যাই হোক আমরা ত খুব কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করছি ভদ্রলোকের। বিকেলে তাঁর সঙ্গে একজন ফর্সা, লম্বা, মুখখানিও লম্বা ছেলে এলেন। বাবার সঙ্গে পরিচয়াদির পরে গান ধরলেন ভাটিয়ালী। সেরকম ভাঙ্গা গলার কাজ আর ইতিপূর্বে শুনিনি। আর তখন ঐ ভাঙ্গা গলায়ই নতুন এবং অপূর্ব লাগছিল। গায়কটিকে এতক্ষণে আশা করি আপনারা চিনতে পেরেছেন। তিনি আমাদের শচীন দেববর্মন। উনি আজ আর নেই, থাকলে নিশ্চয়ই তিনিও বাবার কথা আপনাদের কিছু জানাতেন। শচীনবাবু দেশ থেকে আসার পর পরই প্রায় বাবার সঙ্গে যোগাযোগ হয়। বাবা তাঁকে নিয়ে গ্রামোফোন কোম্পানীতে যান এবং বাবার লেখা দুখানি গান উনি রেকর্ড করেন। রেকর্ডখানি খুবই সাড়া জাগিয়েছিল। গানের একদিকে 'ঝুলনে ঝুলিছ শ্যাম-রায়, গৃহকাজে বাঁধা রাধা আসিতে না পায়', অপর দিকের কথা মনে করতে পারছি না। রেকর্ডখানি মেগাফোন কোম্পানিতে বোধ-হয় হয়েছিল। উনি যতদিন বম্বে না গিয়েছিলেন, ততদিন আমাদের বাড়িতে এসে বাবাকে গান শুনিয়েছেন।

তখনকার দিনের বিখ্যাত কীর্তনীয়া রাধারানী দেবীও বাবার লেখা গান রেকর্ড করেছিলেন। আর ইদানীং বাবা যাওয়ার পরে অবশ্য প্রতিমা ব্যানার্জি বাবার 'বাঁশবাগানের মাথার ওপর চাঁদ উঠেছে ঐ, মাগো আমার শোকবলা কাজলাদিদি কৈ' গান-খানি রেকর্ড করেন।

এখন যেটি আপনাদের জানাতে যাচ্ছি, সেটি আগেই আমার আপনাদের জানানো উচিত ছিল। বাবার কবিতা লেখার প্রেরণা ছিলেন আমাদের 'মা'।

আমরা জ্ঞান হয়ে থেকে দেখেছি, বাবা যখন কবিতা লিখতেন, মাকে তখন পাশে থাকতে হত। বাবা ত বাবার নিজের মনে লিখে যাচ্ছেন, এদিকে মা সংসারের কোন কাজে উঠে গেছেন হয়ত বা, বাবা কিন্তু ঠিক বুঝতে পারতেন এবং কিছুক্ষণ পরেই আবার ডাকাডাকি শুরু করে দিতেন। আর একটা বাবার অভ্যাস ছিল—কবিতাটা লেখা হলেই প্রথমে আমাদের শোনাতেন। পড়ে কেমন হয়েছে জিজ্ঞেস করতে যথারীতি চুপ করেই থেকেছি। তারপরে কালিদাসকাকাবাবু, সাবিত্রীকাকাবাবু, মিতেকাকাবাবু ওঁদের বা অন্য সাহিত্যিক এলে তাঁদের শোনাতেন, তারপরে ছাপা।

লিখতে বসে আজ কতজনের কথাই যে মনে হচ্ছে। যিনি এখনকার কাজী নজরুল ইসলাম, তিনি কিন্তু আমাদের শুধুই নজরুলকাকাবাবু ছিলেন। উনিও ঐরকম হেমেনকাকাবাবুর মতন যখন খুশি চলে আসতেন। আর উনি আসা মানেই আনন্দের ঢেউ ওঠা বাড়িতে। এসেই যতীনদা, বৌদি বলে চীৎকার। কি দরাজ গলা, মনে হত দিলখোলা মানুষ, মনে কোন মারপ্যাঁচ নেই। না হলে কিকেউ ঐরকম প্রাণখোলা হাঃ হাঃ করে হাসতে পারে? এসেই 'কৈ হারমোনিয়াম কৈ? যতীনদা, গান লিখেই সুর দিয়ে নিয়ে চলে এসেছি আগে আপনাকে শোনাব বলে।' বাস্ হারমোনিয়াম এসে গেল, প্রচুর পান এসে গেল (খুব পান খেতেন) সঙ্গে সঙ্গে গান আরম্ভের আগে হুকুম হয়ে গেল, লীলাকে আনতে পাঠান। লীলা মানে আমার বড়দি। আগেই বলেছি আমার সে-দিদি খুব ভাল গান গাইতে পারতেন। এক কথায় গান-পাগল ছিলেন। বাড়ির গাড়ি গিয়ে দিদিকে নিয়ে আসত। দিদিও সঙ্গে সঙ্গে এসেই হলে বসে গেলেন এবং কাকাবাবুর কাছে গান তুলে তবে তাঁর শান্তি। দুপুরে আমাদের ওখানেই সব একসঙ্গে মায়ের পরিবেশিত খাওয়া।

নজরুলকাকাবাবু ওরকম হওয়ার কিছুদিন আগে একদিন এই রাত সাড়ে সাতটা-আটটার সময়ে এসে হাজির। কিন্তু সেদিন স্বভাবানুযায়ী হৈ-চৈ না করে শুধু বন্ধুর সঙ্গেই বসে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বললেন। আমরা তখন ও-ঘরে কেউ যাইনি। সেদিন আর আমাদের সঙ্গে খেলেন না। চলে গেলেন। উনি চলে যাওয়ার পরে বাবা দাদাদের এবং মাকে বললেন, 'নজরুলের জন্য আমার খুব চিন্তা হচ্ছে। ও গুরু ছাড়াই তান্ত্রিক মতে সাধনা করছে। ও বলছিল, 'ও নাকি সিরাজদ্দৌল্লার সময়ে মোহনলাল ছিল জানতে পেরেছি।' এসব গুরু ছাড়া করা ভাল না। আমি ওকে এসব ছেড়ে দিতে বলেছি।' ছোটবেলায় বাবা-মার সঙ্গে আমরা সকলে মিলে কাকাবাবুর গ্রামের বাড়িতেও গিয়েছিলাম কি ওঁর বাড়িতে কোন উৎসব উপলক্ষে।

এর পরে মনে হচ্ছে আর একটি ঘটনা। একদিন দেখি বাবা-মার খুব খুশি ও বস্ত ভাব। কি ব্যাপার? না, নরেন দেব কাকাবাবু ও রাধারানী দেবী কাকীমা আসছেন আমাদের পড়ুয়া। তখনও কাকাবাবুদের 'ভালোবাসা' বাড়ি হয়নি। একটি ভাড়া বাড়িতে ছিলেন প্রথমে। কাকীমার তখন শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। শরীর বেশি খারাপ হলেই মা-বাবা ছুটে যেতেন এবং তাঁদের এমন চিন্তিত দেখতাম, দেখে মনে হত না যে ওঁরা শুধুই সাহিত্যিক বন্ধু। মনে হত, ওঁরা আমাদের নিজেদেরই কাকাবাবু-কাকীমা। বাবা যাওয়ার পরে কাকাবাবু-কাকীমাও ঠিক নিজের মতন করেই আমাদের সেই মহাবিপদের দিনে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

আমাদের বাড়িতে অনেকদিন পূর্ণিমা সম্মিলনীর অধিবেশন হয়েছিল। তাতে প্রবন্ধ পাঠ, সাহিত্য আলোচনা, গান-বাজনা নানারকম কত। কত জ্ঞানী-গুণীরই সমাবেশ না হত সেখানে। ভীষ্মদেব চ্যাটার্জি একবার গান করলেন, একবার রাধিকামোহন মৈত্র বাজালেন। সে-সভায় ডাঃ মেঘনাদ সাহা, ডাঃ কালিদাস নাগ, ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, ডাঃ সুনীতি চ্যাটার্জি প্রভৃতি আসতেন। আর একজন আসতেন, তাঁর নামটা কিছুতেই মনে হচ্ছে না। তিনি সাতটা ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন। এর মধ্যে সুনীতিকাকাবাবুর বাড়ি অবশ্য খুবই যাওয়া-আসা ছিল আমাদের। একদিন আমাদের এখনকার নেতাজী, তখন সুভাষ-কাকাবাবু আসবেন। আমরা বাবাকে বলাতে বাবা একখানি ৮।১০ লাইনের অভ্যর্থনা সঙ্গীত লিখে তাতে সুর বসে দিলেন। আমরা ৭।৮টি মেয়ে কাকাবাবু এলে ঐ গানটি গাইলাম। তারপরে মালা দিয়ে গলায়, প্রদীপ ধূপ দিয়ে আমার ছোট বোন গীতা বরণ করল। এই ব্যাপারে একটি ঘটনা মনে পড়ল এতদিন পরেও, আমি পাখার তলায় দেশলাই জ্বালাতে যাচ্ছিলাম আর কেবলই কাঠি নিভে যাচ্ছিল। এখনও যেন কানে বাজে তাঁর গলা, কি গম্ভীর সুরেলা গলায় বলে উঠলেন তখন, 'পাখার তলা থেকে একটু দূরে

সরিয়ে নাও।' সেই প্রশান্ত ব্যঞ্জনাময় আওয়াজ আজও আমার কানে যেন লেগে আছে। রাতে আমাদের ওখানেই খেলেন। যাওয়ার সময়ে বারান্দাতে বাবাকে হেঁট হয়ে প্রণাম করতে বাবা তাঁকে বুকের ভেতরে জড়িয়ে ধরলেন। আজও যখনই মনে হয় কি খজু, ধবধবে ফর্সা, শান্ত সমাহিত মুখটি। কৈ তখন ত তাঁর সেই অবিরহলে শান্ত চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে একবারও মনে হয়নি, তাঁর তখন মনের ভেতরে কি তুফান চলছে। দেশের জন্য বাহ্যিক এতটা প্রশান্ত ভাবের মধ্যেও কতটা কেঁদে চলেছে। বোধহয় তার কিছুদিন পরেই বাবা একদিন কাকাবাবুর বাড়ি গেলেন। মাঝে মাঝে বাবা শরৎ বোস, সুভাষ বোসের বাড়ি যেতেন। সেদিনও গিয়েছেন, আমরা দু'বোনে গাড়িতে বসে আছি। কিছুক্ষণ পরে বাবা ফিরে এলেন থমথমে মুখে। কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পেলাম না। কিছুদিন পরেই নেতাজী নিরুদ্দেশ।

তারপরে সেই যুদ্ধের সময়ে বাড়ির সমস্ত জানলা-দরজা বন্ধ করে রেডিও সাইগনে 'আমি সুভাষ বলছি' শোনার জন্য আমরা বাড়ির সবক'টি মানুষই উন্মুখ আগ্রহ নিয়ে থাকতাম। বাবা 'রেডিও সাইগন' শুনতে শুনতে কেঁদে ফেলে দিতেন। বাবার বঙ্কিমবাবুর আনন্দমঠ ও শরৎবাবুর পথের দাবী খুব প্রিয় ছিল। আমাদের বারবার পড়তে বলতেন। দেবী চৌধুরানীও বোধহয় মেয়েদের ক্ষমতা সম্বন্ধে আত্মনির্ভরতা লাভ করার জন্য পড়তে বলতেন।

বাবার মনটা ছিল কাঠাল-কোমলে মেশান। ওপরটা শক্ত, কিন্তু ভিতরটা নরম। কত লেখক এসেছেন দেখেছি তাঁদের লেখা দেখতে। ভুলভ্রান্তি থাকলে প্রফে বাবা বকবকি করেছেন, তারপরে তাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁদের লেখা ঠিক করে দিয়েছেন, শিখিয়েছেন। এ আমাদের জীবনে বহুবার দেখেছি। পরে হয়ত বাবাকে বলেছি, বাবা আপনি ওভাবে না বললেই পারতেন। তাতে বলেছেন, 'দেখ, এতে ওদের সত্যি সত্যি উপকারই হবে।' জানি না যাঁরা উপকৃত হয়েছেন, তাঁরা আজ আর সে-কথা মনে রেখেছেন কিনা।

আমাদের ইলাবাস এক অনন্দের হাট ছিল। তার চারদিক দিয়েই ঐশ্বর্য, রুচি, আনন্দ ও শান্তির যেন ঢেউ বয়ে চলত। এ-সমস্তগুলির মূল ছিলেন আমাদের মা। তিনি গৃহের যথার্থই লক্ষ্মী ছিলেন। আমাদের খুব সুন্দর, বড় বাগান ছিল। তাতে ফুল ও তরিতরকারী লাগানো হত। সামনের দিকে ফুল, সেটা বাবার, আর পাশে তরকারি, সেটা মায়ের। বহু অপরিচিত লোকও আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে গেলে দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে না দেখে যেতে পারতেন না। পরে তাঁদের মধ্যেই অনেকের কাছে থেকে শোনা। নতুন তরিতরকারী যা হত, মা প্রথমেই ভাগ ভাগ করে পাড়াতে মালীকে দিয়ে পাঠিয়ে দিতেন। তখনকার হিন্দুস্থান পার্কের চেহারা অবশ্য এরকম ছিল না। গোনাগুণতি বাড়ি ছিল।

আমার মা বাবাকে ছেড়ে কোথাও গিয়ে থাকতেন না। এমনকি মামার বাড়ির কোন উৎসব-অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েও রাতে ঠিক ফিরে আসতেন বাবার সঙ্গে। কিন্তু, বিধাতার বিধান কে রোধ করবে? ১৯৩৮-এর এপ্রিলে হরিপুরে কংগ্রেসনানের যোগ পড়েছিল। মা যে এত স্নেহপ্রবণ, আমাদের ছাড়া জীবনে কিছু জানেননি, সেই মা-ই সেবার জেদ ধরলেন যে তিনি কংগ্রেসনানে যাবেন। আর যে-বাবা মাকে ছেড়ে একদিনও থাকেননি কোথাও, তিনিও কি বুঝলেন জানি না, সম্মতি দিলেন। মায়ের আগে হাই প্রেসার ছিল, একবার স্ট্রোকও হয়ে গিয়েছিল। দাদারা এবং আমরা মাকে যাওয়াতে বাধাদিয়েছি, কত কান্নাকাটি করেছি, কিন্তু মা-ও যেন সমস্ত কিছু কি এক প্রচণ্ড প্রশান্তির পথে যাওয়ার পথে বাধাস্বরূপই, আমাদের দিক থেকে মাকে কিছুদিনের জন্য পরম শান্তির পথে যাওয়ার জন্য দৃঢ়চিত্ত হয়ে আমাদের অবহেলা হাসিমুখে বারবারই ফিরিয়ে দিতে লাগলেন। আর বাবা? তিনিও মাকে না যাওয়ার জন্য আর একটিবারও বললেন না। মাকে আমরা হাওড়াতে ট্রেনে ওঠাতে গেলাম এবং জলভরা চোখে বিদায়ও দিলাম। মা কোথাও কোনদিন একলা যাননি, তাই দাদা তাঁকে বারবার টাকা-পয়সা সাবধানে রাখার কথা, কখন কোন ওষুধ খেতে হবে বলা—এইসবের মধ্যে ট্রেন নড়ে উঠল। কিন্তু হায়, তখন কি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পেরেছি যে, আমাদের মাকে আমরা শেষ বিদায় জানালাম। তার ক'দিন পরেই মায়ের শেষ খবর নিয়ে টেলিগ্রাম এসে উপস্থিত। ভোলানন্দ গিরির আশ্রমে উঠেছিলেন, নীচেই ডাক্তার ছিলেন, কিন্তু ওপরে এসেই দেখেন সব শেষ।

আমাদের সে কি অবস্থা। যখন বাবা দেখলেন আমরা সকলেই স্নায়ের অভাবে ভেঙে পড়েছি, তখন আমাদের ঐ বাবাই নিজেকে অসীম মনোবলে শক্ত করে নিলেন, আমাদের কাছে বসিয়ে গীতার কত উপদেশ দিয়ে, কত কথা বলে আমাদের শোক সামলাতে সাহায্য করেছেন। অথচ বাবার তাঁর শোকের পরিমান, ঠাকুর কে বুঝবে? আমরা বুঝতে পারলাম ক্রমশঃ বাবার শরীর ভেঙে যাওয়া দেখে। আর এতদিনের সাথীকে হারিয়ে বাবা যে কত নিঃসঙ্গ, কত অসহায় হয়ে পড়েছেন তাও বুঝলাম। মা খুব চাঁপা ফুল ভালবাসতেন, মালীকে বলে দেওয়াতেযোজ বাতে বাবার খাটের পাশের টেবিলে বেকাবী ভর্তি চাঁপা ফুল রেখে দিত, বাবা বিছানায় নিয়ে শুতেন।

আমরা, বিশেষ করে আমরা দু বোনে ছোট বেলা থেকে বাবার সঙ্গে সঙ্গে থেকেই এত বড় হয়ে উঠেছি। আমরা বাবার শেষ জীবনে মাকে হারিয়ে কি ব্যাথা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু কি করতে পেরেছি? দুই বোনে নিজ নিজ সংসার নিয়ে ব্যস্ত। বাবার কাছে এসে দেখেছি বাবা তাঁর নিজের ঘরে টেবিলে বসে লিখছেন গভীর মনযোগে। কিন্তু সেই যে একটা ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলে কথা আছে, তাই দিয়েই বোধহয় বাবা জানতে পারতেন, আমরা লেখাতে ব্যাঘাত না পড়ে তার জন্য যত সন্তর্পণেই ঘরে ঢুকি না কেন, বাবা ঠিক বুঝতে পেরে। কে মিলু এলি? কি গীতা এলি? আয় বোস আমার কাছে। বাস তারপরেই আবার লেখাতে মন দিয়ে দিতেন। আর আমরাও বাবার লেখা শেষ হওয়ার অপেক্ষায় বাবার পাশটীতে চুপ করে বসে থাকতাম। যুদ্ধের শেষের দিকে বাবারা সব বহরমপুর খাগড়াতে আমাদের কাছারি বাড়িতে ক'মাসের জন্য যান। তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও ওখানে শিফট করে। এ ঘটনাটি আমার ছোট বোন ও দাদাদের ও বড়দির ছেলে-মেয়ের কাছে শোনা। একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক'জন অধ্যাপক এসে বলেন স্যার আশুতোষের জন্ম দিন উপলক্ষে সভা করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাবাকে বলতে এসেছেন। একজন হঠাৎ কিন্তু কিন্তু করে বললেন, আচ্ছা। আমাদের এক ঘন্টার মধ্যে একটা আশুতোষের সম্বন্ধে কবিতা লিখে দিতে পারবেন? আগে থেকে ব্যবস্থা হয়ে ওঠেনি।' বাবা তাঁদের চা খাওয়ার মধ্যে ১০ মিনিটে কবিতা লিখে দিলেন এবং শুধু তাই নয়। আমাদের বাড়ির মেয়েদের নিয়েই কবিতাটিতে সুর দিয়ে গান গাওয়ালেন। বাবা সব ব্যাপারই ঐ রকম প্রস্তুতি ছাড়াই করা ছিল।

আগেই বলেছি আমাদের মাই-ই বাবার সব ছিলেন। তাই মা যাওয়ার পরে থেকেই বাবার শরীর ধীরে ধীরে বেশ ভেঙে গেল তার পরে কলকাতায় ফিরে এসেও আবার পূর্ণিমা সম্মিলনী আরম্ভ করেন। তখন পূর্বাচল নামে একখানি মাসিক কাগজেরও সম্পাদনা করেন আমার বড়দার উৎসাহে।

১৯৫৮ সনের জানুয়ারী মাসের গোড়া থেকে বাবার শরীরটা বেশীই খারাপ হয়ে পড়ল। আমি ভবানীপুরে থাকি, সংসারে একলা। কাজেই থাকা সম্ভব হয় না, আসি যাই। ছোট বোন গীতা চুঁচুড়াতে থাকে দুটি শিশুকন্যা-সহ। কাজেই তার

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আমি তোমার উপর কিছুমাত্র রাগ করি নাই। শরীর মন এমন এত ক্লান্ত যে সামান্য কোনো লোকের প্রসঙ্গ হইলেই বেহাগ হইতে সরিয়া পড়িতে চাই। আসল কথা মনকে অনেক দিন বাহিরে বাহিরে টানিয়া টানিয়া বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, এখন সে আপনার মধ্যে স্থির হইয়া নিবিয়া গুরুতর মধ্যে হইতে রস আকর্ষণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে চায়। এখন একমাত্র সংসারের সমস্ত দাবীকে সম্পূর্ণ ঠেকাইয়া রাখিতে ইচ্ছা করে। সেই জন্য তোমার সমস্ত অনুরোধ কিছু সময় দাবিতের রেখা হইতে বাহিরে হইয়া পড়িবার জন্য এমন একটু বিশেষ আগ্রহ করিয়াছিলাম। মাফিয়া চিঠিলাম, তাই সময় তুলারই মীমাংসা হইয়া গেছে।

ইতিমধ্যে তোমার নামাবলের পাঠাইয়া দেখিলাম। দেখিলাম তোমার লেখনী তোমার প্রতিভাকে [redacted] তোমার মতো এখনো সম্পূর্ণ করিয়া লইয়া চলিয়াছে, এখনো তার [redacted] নাই, বরঞ্চ দিনের সাধনায় সে যেন আরো মাতিয়া উঠিয়াছে। তোমার নিপুণ তুলির পাশে পাশে এখনো সৃষ্টিলোকের নূতন নূতন ছবি ফুটিতেছে, আবার তোমার ছবির সঙ্গে সঙ্গে ভাষায়, ধ্বনিতে-বর্ণনায় ভঙ্গিতে বিচিত্র রসের আলো। তোমার একলব্যের [redacted] তাহার মূল ছিল, তোমার একটা পদক্ষেপের অভিঘাতে মাটি কাঁপিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু মনের লীলা তোলে নাই এবং এমন ছবির প্রতি এখনো তার পক্ষপাত রহিয়াছে। কিন্তু সবরমতীর [redacted] প্রতি তোমার প্রতিভার পক্ষপাত দেখা যাইতেছে না— মনে হইল সকল দিকেই তার লোভ— কি ছবির কি ভাষার, কি বিচিত্র বৈচিত্র্যে, কি নেপথ্যে অনুভূতির ঐশ্বর্যে বিচিত্রতার দীপ্তিতে। [redacted] ভারতের [redacted] তোমার প্রতিভা রস সম্ভোগ করিয়া [redacted]

ইতি ১৭ই ফাল্গুন ১৩২৪

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আসা যাওয়া করা চলে না, সে এসে কিছু দিন বাবার কাছে থাকল'। আমিও ব্যবস্থা করে এসে দু' চারদিন থাকলুম। পরে মনে হল বাবা একটু ভালর দিকে। দাদা বৌদিরা আমাদের সংসারের অসুবিধের কথা বলে আমাদের ফিরে যাওয়ার কথা বলাতে বাবা যেন অনিচ্ছাকৃত অনুমতি দিলেন। ইচ্ছে নয় বিশেষ যে আমরা তাঁকে ছেড়ে যাই। কিন্তু তখন আমরা নিজেদের দিকে তাকিয়ে, যিনি, মা যাওয়ার পরে আমাদের মা-বাবা দু'জনের স্নেহ ভালবাসা দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন, তাঁর মনের দিকে তাকাতে ভুলে গেলাম। সর্বনাশ হয়ে যাওয়ার ২।৩ দিন পরে মিতেকাকাবাবু, মানে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর একখানা চিঠি এল। তাতে কাকাবাবু লিখেছেন, বাবা আমরা স্বস্থানে চলে যাওয়ার পরে একখানা চিঠি দিয়েছেন, 'মিতে, আজ সিলু-গীতা নিজ নিজ পতিগৃহে ফিরে গেল। আমার ১০০০ পাওয়ারের আলো ১০০ পাওয়ার হয়ে গেল।' এর থেকেই আশা করি আমাদের প্রতি বাবার স্নেহের কিছুটা পরিমাপ করতে পারবেন। অবশ্য বাবা-মায়ের স্নেহের পরিমাপ করা সন্তানের পক্ষে বাতুলতা। তার কোন সীমা নেই। আমাদের দুই বোনের স্নেহের ভাগটা একটু বেশি পাওয়ার কারণ আমাদের আর বোনেরা অল্প বয়সেই চলে যান। আর মায়ের যাওয়ার সময়ে আমার বয়স ১৬, আর আমার ছোট বোনের বয়স ১২। এইজন্যও বোধহয় মায়ের অভাব মেটাতে

মা-বাবা দুই-ই হয়ে বসেছিলেন। হয়ত বা সেই কারণেই আমাদের অতটা জড়িয়ে ধরেছিলেন বুকের মধ্যে। বাবা যে আমাদের কতটা মায়ের স্থান নিতে চেষ্টা করেছিলেন, তার একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই। বাবা বরাবরই সাজগোছ সম্বন্ধে উদাসীন। কিন্তু, গীতা হয়ত যা বাবার কাছে, আমার ভগ্নীপতি আসার দিন হলেই বৌদিদের বলতেন হেসে, 'তোমরা ওকে সাজিয়ে-টাজিয়ে দাও ভাল করে। তোমাদের মা থাকলে কত করতেন।' বৌদিরা এমনিতেই আমাদের খুব আদর-যত্ন করতেন। কিন্তু বাবা যে আমাদের একাধারে বাবা এবং মা তখন।

বাবার ভেতরে যে কতটা স্বদেশপ্রেম ছিল, কতটা দেশের জন্য চিন্তা করতেন তিনি, তারই আর একটি ঘটনা আমাদের জীবনে অন্ধকার নামিয়ে আনল। ১৯৪৮, ৩০ জানুয়ারি বাবা রেডিও শুনছিলেন। হঠাৎ রেডিওতে সন্ধ্যেবেলায় গান্ধীজির আততায়ীর হাতে নিহত হওয়ার খবর পেয়ে দাদাদের দিকে খানিক একবার বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'দেশের আজ সত্যি সত্যিই মহাদুর্দিন। তারপরে বললেন, আমি আজ আর কিছু খাব না, শোব, ক্ষেত্রকে ডাক।' ক্ষেত্র বাবার কাজ করত। দাদারা বাবার অবস্থা দেখে তাঁর জন্যই চিন্তিতই ছিলেন। বারবার এসে বাবাকে দেখে যাচ্ছিলেন। আমার দাদাভাই বাবার ঘরেই শুয়েছিলেন। ৩১ তার রাত ১২টা আন্দাজ একটি শব্দ পেয়ে দাদাভাই উঠে বাবাকে 'বাবা, বাবা' বলে ডাকেন। কিন্তু দেখেন বাবা অজ্ঞান হয়ে গেছেন। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারে বাড়ি ভরে যায়। ভোরবেলাতেই আমি খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে আসি। আর গীতাকে চুঁচুড়া থেকে আনতে দাদারা লোক পাঠিয়ে দেন। আমি এসেই সকলের বলতে বাবা বাবা বলে কত ডাকি, কিন্তু কোন চেতনার সঞ্চার নেই। অথচ এই বাবা, যত নিশ্চুপেই ঘরে ঢুকি না কেন, লেখাতে হাজার মনোযোগ থাকলেও, ঠিক বলে উঠতেন, কে মিলু এলি? আর কাছে বোস। আর বাবা কথা বললেন না, তাকালেন না। বাবার অত আদরের ছেলেমেয়েরা যে অত বাবার পায়ের কাছে পড়ে পড়ে কাঁদল তা গ্রাহ্যই করলেন না। অথচ মিলু গীতার একফোঁটা চোখের জল পড়লে বাবা অস্থির হয়ে পড়তেন। ডাক্তারেরা কিছুই করতে পারলেন না। জ্ঞান আর ফিরল না।

আমাদের পাশের বাড়ির রেডিওতে তখন রঘুপতি রাঘব রাজারাম, পতিতপাবন সীতারাম গানটি হচ্ছিল। যখন গানটি শেষ হল, বাবার হাতটি কাঁপতে কাঁপতে উঠে কপালে স্পর্শ করে পড়ে গেল। গীতা তখনও এসে পৌঁছাতে পারেনি। ট্রেনের কি বিভ্রাট, যখন এল তখন সব শেষ। আমরা সেইদিন সত্যি করে বাবাকে হারালাম।

আমি শুধু আমাদের বাবার কথাই আপনাদের জানালাম। এতে আমার কোন সাহিত্য প্রয়াসই নেই। আমার এ-লেখা দিয়ে আমাদের বাবার ছবি যদি কিছু মাত্র ফুটিয়ে তুলে ধরতে পারি তবেই আমার এ-চেষ্টা সার্থক হয়েছে মনে করব।

শরৎচন্দ্রের চিঠি

যতীনকে আমি সত্যি ভালোবাসি। শুধু কেবল কবি বলে নয়, তাঁর ভেতরে এমনি একটি স্নেহ-সরস, বন্ধুবৎসল ভদ্র মন আছে যে, তার স্পর্শে নিজের মনটাও তৃপ্তিতে ভরে আসে। যতীন জানেন, আমি তাঁর কবিতার একান্ত অনুরাগী। যখন যেখানেই তাদের দেখা পাই, বারবার করে পড়ি। সিনিথ সকরুণ নির্ভুল ছন্দগুলি কানে-কানে কত কি বলতে থাকে। কারও সম্বন্ধেই নিজের মতামত আমি সহজে প্রকাশ করিনে,—আমার সংকোচ বোধ হয়। ভাবি, আমার মতামতের মূল্যেই বা কি, কিন্তু যদি কখনো বলতেই হয় ত' সত্য কথাই বলি। যতীনকে স্নেহ করি, কিন্তু স্নেহের অতিশয়োক্তি দিয়ে তাকেও খুশি করতে পারতাম না সত্যি না হলে।

তোমাদের অনুষ্ঠানটি ছোট, ছোট ত' হবেই। কিন্তু তাই বলে তার দাম ছোট নয়। এ ত' ঢ্যাঁড়া দিয়ে বহুলোক ডেকে এনে উচ্চ কোলাহলে জয় যতীন বাগচী কি জয়—বলার ব্যাপার নয়, এ তোমাদের ছোট্ট প্রীতি-সম্মেলন। অর্থাৎ—কোনও একটি বিশেষ দিনে ও বিশেষ স্থানে জনকয়েক সত্যিকার সাহিত্যরসিক ও সাহিত্যসেবী একসঙ্গে মিলে আর একজন সত্যিকার সাহিত্যসেবককে সাদরে আহ্বান করে এনে বলা—কবি আমরা তোমার সাহিত্যসাধনায় আনন্দলাভ করেছি। তোমার বাণী-পূজা সার্থক হয়েছে। তুমি সুখী হও, তুমি দীর্ঘায়ু হও, আমরা তোমাকে সর্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিই, তুমি আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ কর।

* রসচক্রের যতীন্দ্র সম্বর্ধনা উপলক্ষে প্রেরিত

যতীন্দ্রমোহন বাগচীর বই :

১। অপরাজিতা—১৯১৩
২। জাগরণী—১৯২২
৩। লেখা—১৯০৬
৪। নাগকেশর—১৯১৭
৫। নীহারিকা—১৯২৭
৬। পথের সাথী (উপন্যাস)—১৯২৩
৭। বেথা—১৯১০
৮। বন্ধুর দান—১৯১৮
৯। হাইনের শ্রেষ্ঠ কবিতা (অনুবাদ)
১০। কাব্যমালঞ্চ—১৯৬৬
১১। মহাভারতী—১৯৪১
১২। রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য—১৯৪৮
১৩। পাঞ্চজন্য—১৩৪৮
১৪। শিশুপাঠ (১—৪ ভাগ)
১৫। প্রাথমিকা (১—৪ ভাগ)
১৬। চরিতকথা
১৭। বিচিত্র কথা (গদ্য রচনাবলী) যন্ত্রস্থ

যতীন্দ্রমোহনের কাব্য সমালোচনা :

১। প্রমথনাথ বিশী—বাংলার কবি—১৯৫৯
২। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্রানুসারী কবি-সমাজ—১৯৫৯
৩। অলক রায়—যতীন্দ্রমোহন কবি ও কাব্য—১৯৬৪

শিব ঠাকুরের আপন দেশে

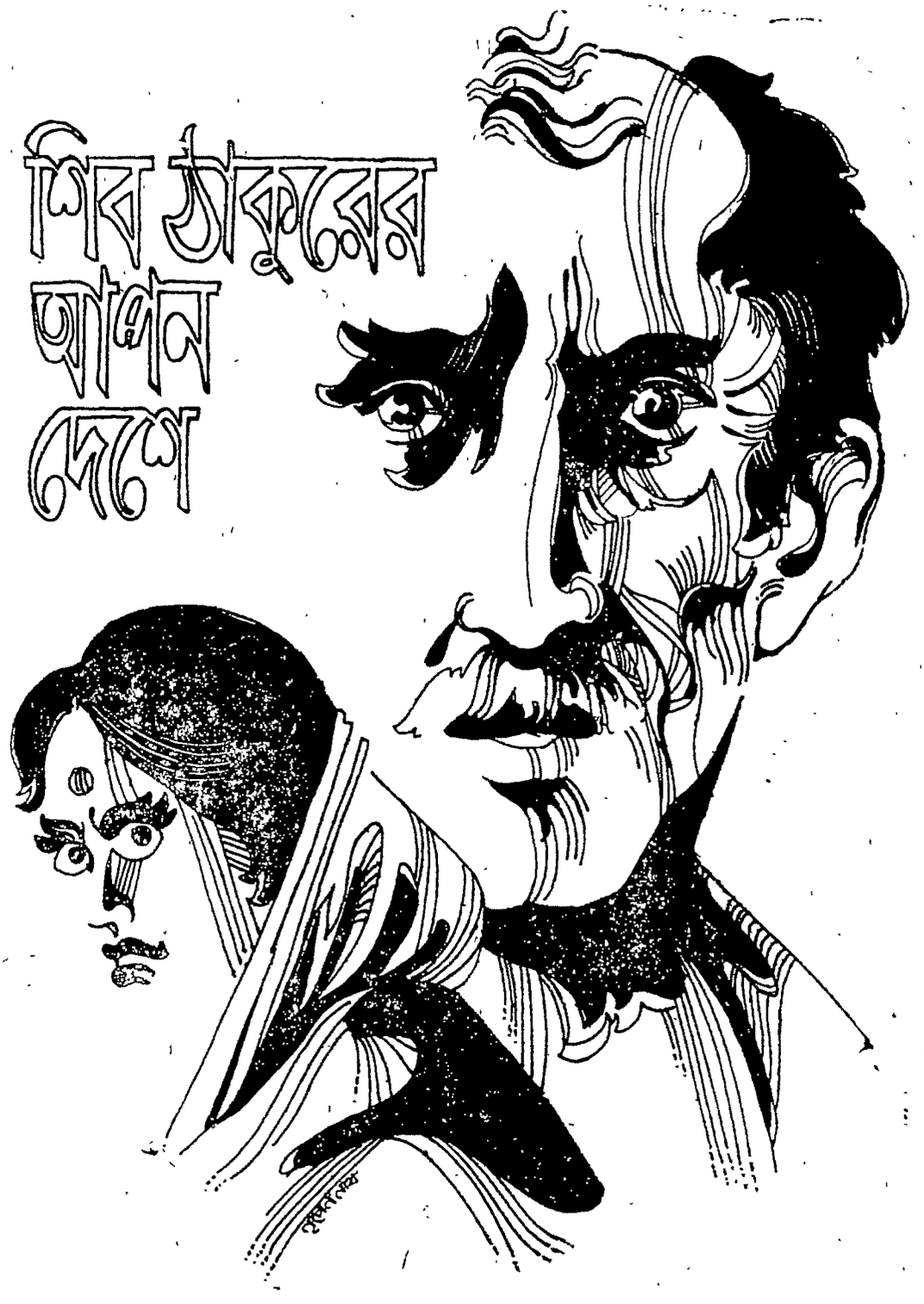

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

রোদে চারদিক ম্যাজম্যাজ করছিলো। একটু আগে জল হয়ে গেছে; রাস্তাটা নিরেনো, কিন্তু চারপাশে এ্যাফ্লুয়েন্স—রঙের তেলে ভরে যাওয়া হোর্ডিং, বেদ সেন্টার লোগো হিন্দী ফিলমের ভ্যাম্পের মতো হাসছে। প্রাইভেট বাসে, মহিলাদের রঙ্গন্ন জুয়েগার ওপর লাইফ ইজ ডিউটি—পাশের সীট, পাশে দুটো সীটে দুই অবাঙালি বন্ধুর প্রায় দাড়ি-কামানো মুখ আর আরো বাঁদিকে লাইফ ইজ বিউটি—রনজয় ইট-এর তলায় রোগা-মোটা-চৌকোনো তিন তরুণীকে শেষবার দেখে নিয়ে বাইটার্সের টপে, উৎকণ্ঠিত কোঁচা ও ক্লান্তচোখের বিনয় সান্যাল নেমে এলেন। বিদ্যাসাগর কলেজের মতো বাইটার্সের একতলার আবহাওয়া।

ফুর্তিতে তরুণ সহকর্মীর মুখ গাভোয়ানের মতো হয়ে গিয়েছে; টেবিলে একরাশ ফাইল। গল্পলেখকদের জন্যই বোধহয় একটি দুঃস্থ হেল্পলেসনেসের চিত্র বার হয়ে আছে।

বিনয় বললেন, 'এতোক্ষণ যাদের মনে পড়লো?'

ডানদিকের গাল একটু উঠিয়ে নিলে বড়ো দাঁতটা বেরোবে, এটা বিনয় জানেন, এ-ও জানেন সেটা হাসি বলে ধরে নেওয়ার ব্যবস্থাও আছে। একই সঙ্গে, কাল যে ঘটনা তিনি দেখে গেছেন, সে বস্তুটা আবার খুললেন। ড্রয়ারে ছিলো। পুলে খুব যত্ন করে ক্যাগজে মোড়া বিনয়বাবুর রেস বুক।

তাঁর সম্বন্ধীর বন্ধু অবিনাশবাবুর ছেলে আর-এ হয়েছে। তা হোক। এবার বিনয়কে অন্য ছেলেদের কথা ভাবতে হবে। পঁচিশ বছরে কন্যার জন্ম হলে, পঁয়তাল্লিশের সময় আবার পঁচিশ বছর বয়সের জন্য ছেলের কথা ভাবতে হয়। অবিনাশবাবু যেকোনো সময় এসে পড়তে পারেন, কাজেই, জিনিসটা গোপনে থাকাই ভালো। পাশের তরুণ সহকর্মীর দিকে তাকিয়ে দাঁদিকের চোয়াল শক্ত করলেন বিনয়। সোমনাথের আশা নেই। ফার্স্ট ইয়ারে উঠেই বন্ধুদের দেখাদেখি কালচর্ড হয়েছে। কালচর্ড হতে গিয়ে কিছু কেলেঙ্কারিও ঘটেছে। তার জের টানতে চাইছিলেন না বিনয়; মোটামুটি নিজেদের মধ্যে ঘরেই চেনাশোনার মধ্যে ছাঁদনাতলার কথা ভাবছিলেন। অবিনাশবাবুর ছেলেকে তাঁর দেখা ছিলো। সে শ্রীমান ঠিক বিনয়ের ছেলের মতো নয়। তিন বছর আগে তাঁর ছেলের প্যান্টের পায়ের কাছের ঘের সরু ছিলো, এখন ঢলঢলে; কিন্তু কোমর থেকে উরু ইস্তক যে তিমির সেই তিমির। অনেকটা সরকার বদলের মতো। উল্টে, পিছনে কিছু নক্সা বেড়েছে। অবিনাশবাবু কড়া বলেই বোধহয় ওঁর ছেলের এসব চাল ছিলো না। অবশ্য আর-এ হয়ে বসে আছে। কি করেছে কে জানে—ইরংস্টার্স হুইমসি। বাজী ও বারুদের কারখানা সমস্ত। দিন যাক, দিন যাক, সবই হয়ে-করে-কমবা জাওবা হবে। একপলক ভারি শান্তি পেলেন বিনয়, চা একটু খেলেই হয়। দেড়টা বাজে। একটু বাদে এদিক ওদিক গড়িয়ে বেড়ালেই চাবটে জাবার। যদিও, এখন পার্ট টুর রেজাল্ট বেরিয়েছে—হয়তো আজই বেরোলো—নানা নকডাঙ্কড়া কথা এ মরশুমে শুনতে হয়। একদম ভালো লাগে না বিনয়ের, তাঁর প্রত্যেকটি স্কুল-কলেজ পরীক্ষা বই খাতার মধ্যে কাকার কুদ্ধ গর্জন, মাস্টারমশাইদের নীচতা, মার কান্নাকাটি আর তার মুখ মিশে আছে। কিন্তু সেসব কে শুনছে। কারেন্ট টপিক বলে কথা। ভুরু চুলকিয়ে শূন্যমনে বিনয় উঠে এলেন, প্যাসেজে অবিনাশ। অবিনাশ অনবরত অঙ্ক কষতে থাকা-চোখে তাকিয়ে হাসলেন। বিনয় গাল একটু কুঁচকে নিলেন।

—বেরিয়ে পড়ছেন নাকি?

—না না, এই এলাম। অ্যাটেনডান্সটা দেখি—বিনয় হঠাৎ ভেবে নিলেন, কি বলা যায়।

—আপনি বরং তাড়াতাড়ি চলে যান। সুনিলের মিত্রের রেজাল্ট বোধহয় বেরিয়েছে—

—সে তো গেজেটের আগে আপনিই জানাবেন বলেছিলেন—

—কই আর জানাতে পারলাম। লোকটা যে কি করলো—খবরই দিলো না কোনো, বলে বিনয় হঠাৎ পকেট-খুচরোর জরিপে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। অবিনাশ ছাড়লেন না। বিনয়ের হাসি তাঁকে খুশি করেছিলো। লোকে অন্যের ছেলে পাশ করার সময় এই-রকম কপট-বেশি বা মনের ক্ষোভ না চাপতে পারার মৃদু হাসি হাসে, অবিনাশ জানেন। এ কারণে, বিনয়কে এক কোর্স চা-একটা ভালো ফিলটার খাওয়াবার ইচ্ছে মাসের চব্বিশ তারিখে তাঁকে চেপে ধরলো।

বিনয় ঘাড় পেতে মেনে নিলেন। অবিনাশ লক্ষ্য করলেন না যে বিনয় বেশ নিঃশব্দ।

(২)

মোটামুটি কমফর্টেবল এই জার্নিটা। অফিসটাইম নয়। অন্যদিন স্রেফ স্কুলে পড়তে হয়। অনেকটা পেরিয়ে আসা গেছে ডালহৌসি, অনেকটা পেরিয়ে আসা গেছে বয়েস—যে বয়েসে রেজাল্টের জন্যে আতঙ্ক থাকে। একটা চোখ কুঁচকে অবিনাশ নিজের মধ্যে ডুব দিয়ে দেখেন, মার্কস অবটেইনড জ্বলজ্বলে চিহ্ন একশোগুলো স্পষ্ট—অবশ্য, হ্যাঁ। ওরকম তাহলে তিনি কতো পেতে পারেন? এইভাবে ভাবটা একটা ছেলেমানুষি জ্যোতিষলজি, তবু যে কোনো কঠিন সময়কে ঠিক পরীক্ষার মতো মনে হয় কেন? রববার গুলোকে ঠিক সরস্বতীপুজোর সমান লাগে কেন?

একটা অসাবধান মেয়ে উঠেছে, একটি ছোকরা টুক করে জায়গা করে নিলো। এটুকুতে তিনি ঘায়েল করে দিতে পারেন, কিন্তু গা ঘেঁষাঘেঁষি হবে। অবিনাশবাবু জানেন, তাঁর এখন সেকেন্ড অ্যাডোলেসেন্স। রিস্ক নেওয়া ঠিক না। এসব অভ্যেসও তাঁর নেই—যদিও, কখনো কখনো নিরুপায় আগুন ধরেছে। তাহলেও, না। এসব খুচরো সুখের আশা ছাড়লেই, পাইকিরি সুখ উশুল হয়, হিংস্রতা বাড়ে। অবিনাশ-বাবু এও জেনে গেছেন, ভায়োলেন্স না হলে কিছু পাওয়া যায় না। আর, ভায়োলেন্সের জন্যে এমনই স্যাকিফাইস থাকা উচিত। যদিও, এই মেয়েটির গোল গলা আর কোমল চামড়ার সঙ্গে রাণীর একটা তুলনা ভেতরে ভেতরে ঘটে গিয়ে অবিনাশকে দুঃখিত করছিল। সেকসই তাঁর লাকসারি; নিচু অবস্থার অবিনাশ আর কোনো বিলাস পাননি, নাটক পাননি—দৈবাৎ একটু বয়স্ক মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। রাণী এখন প্রতি রাত্রে ছেলের ভবিষ্যৎ ও মেয়ের বিয়ে নিয়ে চিন্তিত। সময়ে সময়ে মনে হয়, এসব প্রসঙ্গ রাণী তুলছে তাঁর একসাইটমেন্টটাকে স্পয়েল করার জন্যে। না হলে, পার্ট ওয়ানে উনপঞ্চাশ পার্সেন্ট অনার্সের ছেলেকে নিয়ে এখন মোটেই ভাবতেন না তিনি।

ছোকরা অতো কায়দা করে লাইনটি ঠিক করলো, কিন্তু খারাপ উদ্দেশ্য নেই। কলার, জামা, চুল আর পোজ দেখাতে ব্যস্ত। স্নেহ হলো অবিনাশের। ছেলেটিকে ডেকে বলতে ইচ্ছে করলো, শোনো, এসব করে চিরদিন চলে না। পুরুষমানুষ, ক্যারিয়ারের দিকে নজর দাও, বিয়ে-থা করে সুস্থির হয়ে বোসো—

বেশ বড়ো ঝাঁকুনি লাগলো। কলেজ স্ট্রিট, ভিড় যথেষ্ট।

—কিসের রেজাল্ট বেরোলো যেন?

—পার্ট টুর।

—কতো পার্সেন্ট?

—কিসের কতো পার্সেন্ট? বাসের পাশে অনবরত ফুচকা খাওয়া ফুরফুরে মেয়েটির জিভ চুলবুল করলো, ব্যাক, ফেল না পাশ?

সত্যি, এও এক ফার্স! ফেল করা ছেলেকে ঠ্যাঙানো যায় না গায়ে হাত বোলানো যায়। ব্যাকছেলে, কি করা যায় এখানে, অবিনাশ জানেন না।

—ঠেলে ব্যাক দিয়েছে। তাছাড়া ইনকমপ্লিট আছে—

না, এখানেই নেমে পড়া যাক। সোমনাথ থাকতে পারে। নানক ও রবীন্দ্র-নাথের মস্তাজ করা ছবির দিকে তাকিয়ে অবিনাশ নেমে এলেন।

গেজেট কেনা যাচ্ছে। কিন্তু, সোমনাথ যদি কিনে থাকে? পয়সা নষ্ট। সামনে এক দঙ্গল রঙিন ছেলে, য়ুনিভার্সিটি সম্বন্ধে চাঁছা খিস্তি উড়ছে বাতাসে। কিরে, তোর কি হলো? যাকে জিজ্ঞাসা করা হলো সে এক হাত মুঠো করে তার মধ্যে বাকি হাত কনুই অবধি চালিয়ে দিলো। বর্ষাকালের রোদ্দুরে প্রত্যেকের মুখ লালচে কালো। অবিনাশের মনে পড়ছিলো ম্যাট্রিকের রেজাল্ট আউট হবার কথা। ফেল-করা সহপাঠীদের ঝুলে-পড়া কেঁদে-ফেলা মুখের কথা। সেসব দিন অনেক গণতান্ত্রিক হয়েছে—সমাজ বা রাষ্ট্র বুঝতে পেরেছে ফেলকরা ছাত্রদের মনোবেদনা—তাই ব্যাকএর ব্যবস্থা। এখন আর চোখে জল নেই, কচিগোঁফ ওঠা, রোগা, ঢ্যাপঢেপে মোটা ফর্সা এবং কান্তিমান মুখে অশ্লীল শব্দ। অবিনাশের হঠাৎ মনে হলো, চোখের জল আর অশ্লীলতা ছাড়া সাধারণ মানুষের জীবনে আর কিছু নেই। সামনে একজন গেজেটটা নিয়ে নানা নোংরামি করছে। এবার সে গেস্ট সিনেমার দিকে যেতে লাগলো। সোমনাথ এরকম নয়। তবু, কেমন কুলক্ষণের মতো তাঁর মনে পড়লো সোমনাথ একটা লম্বা চিঠি লিখেছিলো তার দাদুকে; তাতে বাংলা বানানই বাবোটা ভুল। ও কিছু নয়, আজকাল বাংলাটা কেউ যত্ন নিয়ে শেখে না।

গেজেট কিনে অবিনাশ কমলালয়ের

ফুটপাথে চলে গিয়ে খুব জোরে দৌড়ে একটা ট্রাম ধরতে গেলেন। একটু নার্ভাস লাগছিলো; শেষ অবধি ধরতে পেরে বেশ আত্মপ্রসাদ এলো তাঁর—ট্রামে আর গেজেটটা খুললেন না তিনি।

(৩)

চব্বিশ বছর বয়েস অবধি বেঁচে থাকে মাত্র ছটা চুমু খেতে পারার পেটি-সাকসেস সুপ্রিয়কে ভয়ংকর খোঁচাচ্ছিলো। কিন্তু কোনোভাবেই ড্রামাটিক কিছু করা যাবে না। চড় মেরে ভাগিয়ে দেওয়া যাবে না প্রেমিকাকে—নতুন একটি জোটা, উত্তর কলকাতায়, অতো সহজ নয়। অথচ, এই বয়েসে এসে আঠারো-বিশের ছেলেদের মত কারদাদি নিজেকে ঠাণ্ডা, হাল্কা করা যায় না। সুপ্রিয় রেস্তোঁরার পাশের দোকান থেকে সিগারেট কিনছিলো। আশা ভোঁসলে রেডিওয় গাইছিলেন—মুহম্মদ চিজ হ্যাজ কেয়া? বলে, একটু পজ। সেই পজেই সুপ্রিয় টার্ন নিলো। কাজেই তার মনে হতে থাকলো একটা ভালগার রসিকতা সুলভ হয়ে উঠে তার পিছনে বিদ্রূপ করতে করতে আসছে—মুহম্মদ করকে দেখেছে—

কি দেখার আছে হে আশা দেবী। সীমার দাদা সোমনাথ কলেজ সুদ্ধ আর-এ হয়েছেন—কেবিন চুম্বনে আপাতত সীমা ইনটারেস্ট পাচ্ছে না। ভাগ্যিস দাদা আর-এ হলো, না হলে সীমা নিজেকে এভাবে বেআর করে নেবার চান্স আর পেতো কি?

ঢুকতেই সীমা তুরুপের শেষ তাস ছাড়লো, অমিতাভ এসেছিলো। শুনছি খুব কথা হচ্ছে আমাকে নিয়ে—

—হবেই।

—কেন? অমিতাভ কি মিশতে পারে না আমার সঙ্গে?

সুপ্রিয় গলা ঠাণ্ডা রেখেই বললো, তা-ও, এবার একটা সিলেকশনের প্রশ্ন তো আছেই....

—বিয়ে? আমি কাউকেই বিয়ের কথা ভাবছি না আপাতত।

এতো স্পষ্ট করে সীমা আগে বলেনি। সব মিলিয়ে, সীমাকে একটা অতিপ্রিয় মার্কশীটের মতো মনে হলো সুপ্রিয়র। এই মেয়ে তাকে স্বীকার করছে না, অস্বীকার করছে না। এখানে কোনো জোর চলবে না—শুধু পুনর্বিবেচনা করতে বলা যায়, অভিযোগ করতে বলা যায়। সুপ্রিয়র মনে পড়লো, অভিযোগ করলে ভারতবর্ষের ব্যবহার কি হয়ে থাকে।

(৪)

নিশ্চয়ই অবিনাশ তাড়াতাড়ি আসবেন। সোমনাথকে অবশ্য তিনি পাব করে দিয়েছেন সকাল সকাল। মারধোর করবেন নাকি ছেলেকে? মনে মনে প্রস্তাবরত অবিনাশ আর মারখাওয়া সোমনাথের চেহারা একসঙ্গে ভেবে রাণীর মনে হলো—ছেলেরা একসঙ্গে দুটো জিনিস পায় না।

চিনির জল চাপা দিয়ে রাখতেই দরজায় আওয়াজ হলো। প্রথমে ভাবলেন হাসিমুখে যাবেন—তারপর দেখলেন ছেলে আর-এ হয়েছে, এসময় তিনি অন্যরকম থাকলে কেমন একটা খারাপ লাগবে। সব মিলিয়ে, কিংকর্তব্য অবস্থায় রাণী বেরিয়ে এলেন।

—সোমনাথ আসেনি?

—না।

—সীন?

এই তথ্য পাওয়ামাত্র অবিনাশ অন্যরকম চোখে তাকালেন। রাণী তখন সিঁড়িতে উঠছেন। ঘরে এসে অবিনাশ লেবু-চিনির জলের দিকে তাকিয়ে আরো উৎসাহ পেয়ে, গেজেটটা একধারে ফেলে দিলেন।

লাগছে। অফিস থেকে ফিরেই—নিচের দরজা খোলা—

—বন্ধ করে এসেছি—

বিছানায় পর রাণী অনিচ্ছা নিয়ে বসতে না বসতেই তাঁর মাথায় বুদ্ধি জোগালো।

—রেজাল্টটা দেখেছো?

আলগা হয়ে গেলেন অবিনাশ।

পাতা খুঁজে পাচ্ছেন না। ফেল? একেবারেই ফেল? ব্যাঙ্ক অ্যাংলাই কবার জন্যে ফিফটি পার্সেন্ট তোলবার কথা? ঠিক ধাক্কাটা পেতে আর একটু খুঁজতে হলো। ফ্যান ঘুরছে। কিন্তু বড়ো বিশ্রী কলকাতার বর্ষা। একটু চ্যাচামেচি করাটাই স্বাভাবিক হতো—রাণী ঘরে আছে। কিন্তু অবিনাশের ওসব আর ভালো লাগছে না।

—আর-এ হয়েছে।

—কি করবে?

—করার কি আছে। এসব তো আমাদের সময়ে ছিলো না। ওর যা ভালো বোঝে। চাকরি দেবার ভয়ে এসব। যাক, ও তো আর সত্যিই কিছু করেনি। বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করছিলো না। কোথায় যাওয়া যায়? অবিনাশ আর পাঁচজন বাঙালির মতোই বন্ধুবর্জিত গৃহস্থ। বন্ধু থাকলেই বা কি হতো? এক সন্ধ্যের সহানুভূতি নিয়ে কি করতেন অবিনাশ? এবার যে একটা অন্য ইউনিভার্সিটির আণ্ডারে সোমনাথকে পাঠাতে হবে।

রাণী ভাবছিলেন, দুবার চটে যাবার জন্যে অবিনাশ বোধহয় কিছু বলছেন না। কিংবা, যে কাণ্ডটা ঘটেছে, সেই কাণ্ডটার পক্ষে রাণীর বুদ্ধিতে অনুপযুক্ত ভাবছেন অবিনাশ। দ্বিতীয় চিন্তায় পৌঁছে, রাণী উসখুস করতে থাকলেন।

—শোনো—

প্রকাশিত হল

শ্রেষ্ঠ রহস্য কাহিনীকার

জেমস হেডলি চেস্ এর

আরেকটি দুরন্ত রহস্যোপন্যাসের

আশ্চর্য বঙ্গানুবাদ

নিয়তি দুর্বার

অনুবাদ :

প্রশান্ত চৌধুরী ১৪·০০

জেমস হেডলী চেস্-এর অন্যান্য বই :

মত্ত মৃগয়া অনুবাদ : মহাশ্বেতা দেবী ১২.০০

ভেনিসে মৃত্যুর হাওয়া ১০.০০

ছায়া ছায়া ছবি ৯·০০ মৃত্যু তিমির ১২·০০

বিষণ্ণ নিষাদ ১২·০০ বিপন্ন নায়ক ১৫·০০

আলেয়ার আলো ১০·০০ নিশি সঙ্গিনী ১০·০০

বিহঙ্গী পিঞ্জরে ৬·০০ নূহানের নামে পদ্মফুল ১২.০০

মৃত্যু অভিসার ১০·০০ উর্বশীর মৃত্যু ১০·০০

প্রাপ্তিস্থান : দে বুক ষ্টোর * ডি এম * নাথ ব্রাদার্স

ব্লু-বেল পাবলিশার্স

১২৩, শ্যামপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলকাতা-২৬

—কী? নর্মাল শব্দটা মনে রাখতে রাখতে অবিনাশ বললেন।

—ও বাড়ি এলে যেন বেশি কিছু ক্বোবো না—

'বেশি কিছু কোরো না'টা পোকার কামড়ের মতো গরল ছড়িয়ে দিলো। মেয়ের রাণী বসে, প্রৌঢ়া, তবু বাইশ বছর আগের আদল পাওয়া যায়। এই বাইশ বছর ধরে রাণী 'বেশি কিছু কোরো না'র শ্লোগান দিয়ে আসছেন। অবিনাশের যে কোন নির্জন মুহূর্তে, যখন অবিনাশকে মনে মনে টামবাসের মেয়েদের টুকরো-টুকরো শরীর ভাবতে হতো না, অবিনাশের যে কোনো আনন্দ—আত্মীয় বন্ধুদের খাওয়ানোয় পাছে বেশি খরচা হয়, পাছে নিজের শরীরের বেশি খরচা হয়, এই ভয়ে এই মেয়েমানুষটি অবিনাশের বংশরক্ষার জীবনে বারবার একটা কাঁটা তুলে বলছে, বেশি কিছু কোরো না।

—যা বোঝো না তার মধ্যে কথা বলো কেন?

—তোমাকে জানি বলেই বলছি।

মুখ বিকৃত করে অবিনাশ বললেন, অ্যাঃ! আর জানতে হবে না।

অবিনাশের আগুন রাণীকে ধরে গেলো। চিবিয়ে চিবিয়ে রাণী বললেন, না জানলে কি একটা একালবেড়ে কোকা লোকেরা চলতে? শ্বশুরবাড়ি ছাড়া যার কোনো স্বজন নেই, তার অবার এতো দেমাক কিসের যে বউয়ের বুদ্ধি নিতে গেলে গায়ে লাগছে? একই সময়ে অবিনাশের কড়াপড়া হাত রাণীর গালে লাগলো, অবিনাশের মাথা ঠুকে গেলো দেয়ালে। এরপর, দুটি সাপ বিদ্বেষপূর্ণ চোখে অংক করতে শুরু করলো, কে প্রথম মাথা নোয়াবে। রাণী ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, যেমন বাপ, তেমন ব্যাটা। পড়াশুনো চুলোয় দোরে দিয়ে এই একটা বছর ধরে একটা দামড়া ঢলানির সঙ্গে ঘুর ঘুর করছে.. আমি জানি না, আমি জানি না এমন হবে? বাপের যেমন খাই ছেলেরো তেমনি হবে তো?

অবিনাশ ছিটকে উঠে এলেন রাণীর কাছে। রাণী এমন বলবেনই, এবং এ মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত নেবার সময়। চাপা গর্জন করে তিনি স্ত্রীর গলা চেপে ধরলেন, একদম টুঁটি টিপে মেরে ফেলবো। বেশ করবে আমার ছেলে ঘুরবে, তোর কি? তোর কাছে পড়ে থাকছে?

রাণী গলা ছাড়িয়ে চোখে কুয়ার বিদ্যুৎ হেসে বললেন, এখন তো পড়ে থাকবেই না। মেনিমুখো আগে থোঁতা হোক পরে তো বাপের ধারা হবে।

—কালই তুই বাপের বাড়ি চলে যাবি।

—আচ্ছা?

একটা পা ঠুকে অবিনাশ গর্জে উঠলেন, হ্যাঁ।

—সে কি, তাহলে তোমার চলবে কি করে? হোটেলে না হয় খেলে—তা বলে বাজারে মেয়েমানুষের কাছে তো আর যাবে না, ভয় তো আছে?

অবিনাশ মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াবার আগে রাণী ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন।

(৫)

বিনয় এবার আর দেরি করার ঝুঁকি না নিয়ে অম্বলের ওষুধটা চিবিয়ে নিলেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত তাঁর মাথা ধরিয়েছে আটটায়। দশটায় রাঁধুনির লোহা-ওঠা ঝেঁজল। রাঁধুনিকে পাল্টানো যায়। কিন্তু ও তো রাঁধুনি নয়। রাঁধুনি! আহা, অমন একটি ফিগার। আধুনিক য়ুরোপিয়ানদের লেখা থেকে শুধু ব্ল্যাক স্কিন পরে নেমে এসেছে। শরীরের কিছু অংশ বাঙালি, কিছুটা অবাঙালি। বিধবা। অবশ্য বিনয়কে পাত্তা দেবে এমন ভরসা নেই। বিনয়ের ছেলের দিকে ঝোঁক। আরে, সে তো একটি মাকাল—বাপ চোখ বুজলেই স্বাপ্। অ্যাটেম্পটে কিনা হয়, কিন্তু বাড়িতে গলকণ্টক মেয়ে।

ছেলে সদ্য যুবক। বেশ, কিন্তু যৌবন তো বিনয়েরও ছিলো। পেস্টটিউবের মতো, এখনো আছে, মুখের কানায় উঠে এসেছে সেই মাজন—অল্প চাপেই বেশি উছলে ওঠে। শান্ত হওয়া গেলো না, প্রসন্ন হওয়া গেলো না। এমন কোনো দুঃখও পাওয়া গেলো না যাতে এ রাগ ছাড়ে। যখন বয়েস ছিলো তখন সুখও তেমন আসেনি। উইং মনে পড়তে বিনয় মনে মনে অল্প হাসলেন। রাসেল কি জানেন? রাসেলের ছিলো অঙ্ক, মানবদরদ, ফিলজফি, মহাযুদ্ধ। এতো কাজের মানুষ রাসেল উপদেশ দিচ্ছেন যে কোনো যৌনজীবনে উইং প্রয়োজন নিয়ে। একটি বাঙালি মেয়েকে নিয়ে তাঁর কাছে ফেলে দিলে হতো। আপনার কাজ ছিলো রাসেল। আমার নেই। আমি বাঁচতে পারবো না?

অবিনাশের কাজের তাড়া ছিলো না। বিষ-নামানো সাপের মতো সকাল থেকেই নিস্তেজ লাগছিলো তাঁর। রাণীর সঙ্গে একটা মিটমাট অবশ্য হয়ে গেছে; যদিও বাস্তব প্রস্তাবে রাণী অদ্ভুত শূন্য হেসে শুয়ে পড়েছিলেন। কলীগদের একটু এড়িয়ে থাকতে চাইছিলেন। ক্যান্টিনে গেলেন তিনি। মুসকিল, এখানে বিনয় সান্যাল। তাঁর টেবিলেই বসে পড়লেন অবিনাশ।

বিনয় ভুরু চুল কোঁচাচ্ছিলেন। সম্পূর্ণ চেপে যাওয়া কি উচিত? মানুষটা এতোক্ষণে সবই জানে। তিনি তো দুদিন আগে থেকেই জানেন। নিস্বার্থবন্ধু করে, দম চেপে, হাসি টেনে বিনয় কিন্তু বলে ফেললেন, গুড নিউজ?

—না। আপনি আগে জানতে পারলে একটা খোঁজ নেওয়া যেতো।

বিনয় বলে বসলেন, জেনেছি পরশু। তখন আপনি কি করতে পারতেন?

অবিনাশ এক মিনিট তাকিয়ে থাকলেন।

—বলেননি কেন।

—তাই, বলিনি কেন। কাল আমার শ্রীমানটিকে বলতে জানতে পারলাম, ওরই এক গুরু গার্ড দিচ্ছিলেন। বিনয় একটিমাত্র কুরুরেখায় হাসলেন, ওরা সবাই টুকছিলো। তা, আমার বংশধরটির গুরুদেবরা, বুঝলেন, কিছু পয়সাকড়ি চায়। ওরা দেয় না। পাল্টা মাস্তানি করে। পয়সাটা দিলে.... কজ্জে আর যেতো—

অবিনাশ দ্রুত বুঝে নিলেন, তাঁর চীৎকারে মহাকরণ ফাটবে না। একমাত্র এই আক্রোশে তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো।

পাঁচ মিনিট যাবার পর বিনয় বললেন, চোখ মুছে নিন।

—আমি উঠছি।

—বসুন। বিনয় অবিনাশের হাত ধরে ফেললেন।

গাঢ় গলায় বিনয় বললেন, আপনার কি? আপনার ছেলের স্ট্র্যাটেজির সঙ্গে আপনার কোনো মিল আছে?

কাতর গলায় অবিনাশ বললেন, আপনি কি বলছেন এসব?

বিনয় স্বাভাবিকভাবে বললেন, মিল হতে পারে? আপনি আর ষড়জের বাবোটা বছর....আপনার ছেলে তো তা নয়।

বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। বিনয় আবার বললেন, এতো ইন্‌ভলভড আপনি। কিছু মনে করবেন না, আপনাকে অনেকদিন দেখছি। আশ্চর্য, আপনি ইনভলভড। এতো কন্‌সিলড হয়ে থাকেন। এখন?

অনেকক্ষণ মুখ নামিয়ে থেকে, ঘাড় টনটন করছিলো অবিনাশের, মাথা তুললেন। একটি ছোকরা চা খেতে ক্যান্টিনে এসেছে। এই মুহূর্তে তার টান চামড়া তার ঝাঁকড়া চুল সটান ঘাড়ের পর্দা সরিয়ে অবিনাশ পরিষ্কার এক ধরনের বার্ধক্য দেখতে পেলেন। যা, তিনি কখনো দেখতে চাননি।....কিন্তু, তিনি দেখতে চাননি, এইটাই ঠিক।

—যাবেন আমার বাড়িতে? লম্বা অবিনাশ কুঁজো হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

—চলুন। বিনয় তাঁর হাতে হাত রাখলেন, সেই ভঙ্গিতে কূট বন্ধুতার নিমন্ত্রণ ছিলো।

উপরে যে যার ঘরে গিয়ে, ফের নিচে নেমে এলেন তাঁরা, আকাশ রোদ উঠেছে, মেঘের মধ্যে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। অবিনাশের মেজাজ হঠাৎ ভালো হয়ে গেলো, বেশ চমৎকার, প্রেটি আবহাওয়া; বহুক্ষণ মন খারাপ করার জন্যই বোধহয় এখন মন ভালো লাগছে, মেঘের মধ্যে এই বৃষ্টি, একে শিয়ালকুকুরের বিয়ে বলতেন না অবিনাশ? বাই দ্য ওয়ে, বিনয়কে ভুড়ো শিয়ালের মতো লাগে মাঝে মাঝে, এখনো লাগছে।

কলকাতা / ১৯৭৮

মানস রায়চৌধুরী

পথে লোক কথা বলে, ভূগর্ভ রেলের কথা, শুনি।
হাঁটাচলা বিষম দুরূহ।
লোকে হেসে হেসে খানাখন্দ পেরিয়ে চলেছে কাছে দূরে
কেন এ ব্যস্ততা আমি কিছুই বুঝি না
কোন দিক থেকে ওরা কোন দিকে যাবে?,
কি পেয়ে ওদের সব পাওয়া পূর্ণ হবে?,
জানিনা, শুধুই পথ খানাখন্দে ভরা
শুধু মুখ, মাটি তেলে ইস্পাতের হাঁ-করা গহ্বর
পথ আর পথ নেই তবু ওরা দ্রুত পায়ে চলে।

এখনই নিশান নিয়ে ওরা যাবে, মুখে জয়ধ্বনি
মস্ত বড় নিশানের লাল রঙ না বুঝে উদ্ধত
লাল রঙ পিছে ফেলে অস্ফুট গলায় কথা হয়—
এত লাল তবুও মানুষ কেন রক্তশূন্যতায়
তোমাদের রাজ্যপাট মিথ্যা করে দেয়....

এ কথা যে বলে তার গলা চেপে ধরা যায় খুব সহজেই
কিন্তু হাঁটা, দৌড়ে চলা, ভীষণ ব্যস্ততা
শ্মশানের দিকে দ্রুত প্রগতিতে হাঁটে শবদেহ
ট্রেন আসে বিমানের বেগে
সবুজ হলুদ আলো লাল আলো ভেঙে

কসাই দু হাত দিয়ে মাংস তুলে রাখে
কেতাব চোখের সামনে, শুঁড়ি ও মাতাল
বৃষ্টি জলে ভিজতে ভিজতে দ্যাখে দূরে দালাল ও গণিকা
দেওয়ালে ফেলেছে ছায়া কলকাতার রক্তশূন্য মুখ।
সময়ের কোন রঙ কতটুকু তাতে আজ পড়ে?
এ এক অদ্ভুত দিন। মানুষের স্থির চোখ
জাদুঘরে অশোকের মত
পথে-ধ্বস্ত খানাখন্দ, নিশানের অদ্ভুত ব্যাদান।

ফিরে আসার মতন

সুরজিৎ ঘোষ

ফিরে আসার মতন তুমি কি কিছু পেয়েছ?
কোন পরম দাবী কোন অনুভবের শেকড়!
আমি তো চোখ মেললেই দেখি আমার হাত
হিজিবিজি শিরায় জড়ান জটিল হাত
অসংখ্য বটগাছের রুক্ষ চামড়ায় বুলিয়ে যাচ্ছে।

আমার চোখের ওপর ঘসা কাঁচের মতো
যে পাতলা পর্দা পড়ে তার ভেতর দিয়ে দেখি
সমুদ্রের পাড়ে দাঁড়ান মুখগুলোর নিভে আসা।
হালকা কাদামী রঙ, মাথার উপর আছড়ে পড়া চুল
বুক ছুঁপিয়ে টুকটুকে রক্ত।

তোমার ত্বক এখনও মসৃণ, যেন আলো
পিছলে যায়। গালের আপেল টুসটুস করে
পড়ন্ত বেলায় সোনার ধানের মতো ঝলসে ওঠো তুমি।
তাহলে এখানে। এখন। জ্বলে যাওয়া মাঠে
নোনা বালিতে তুমি। ফিরে আসার মতন
কী পেলো

পিতৃস্মৃতি

দেবী রায়

'ওকে, ও....কে গো....ও....কে'
ধবধবে নেটের মশারীতে, ভেসে ওঠে মাঝ রাতে
স্পষ্ট কার শরীরী—অবয়ব,
দুধ-আতপ—জ্যোৎস্নার বৈধব্য, আজ ও দুটি ম্লান চোখে
ধড়ফড়িয়ে জেগে ওঠে, শাড়া পেয়ে....
তাকে ঘিরে রয় সময়ের অজস্র কলরব,

তিনি—কে? প্রকৃতপক্ষে, তিনি কে?
পার্থিব দেহের অধিকারী—না, অন্য কোন দূরগ্রহে—
অধুনা নিবাস, যে তাহার চোখ—রেখেছিল চোখে।

নিশুতি রাতের শিঁদ কেটে চুপে-চুপে, নিজস্ব রেখে
স্পষ্টত সে নেমেছিল, রাতের হাওয়ায় ভর করে
অর এখন? পোড়ে এবং ওড়ে, সুগন্ধী ধূপ, সকাল সন্ধ্যায়
আর ভক্তি মাথা নোয়ায় ঐদিকে, ঠিক ঐদিকে।

জলের উপরে হেঁটে, ঐ সে পুরান পুরুষ চলে যায়
দূর দেশে, খালি পায়।।

ইচ্ছে

শান্ত রায়

মানুষ জন্মের ফাঁকে ফাঁকে
মাঝেমধ্যে পাখি বা হরিণ
কিংবা যদি গাছ হই সবুজ-আড়ায়?

যদি আমি
মেহেদির ঘন ঝোপে আর-একটি মেহেদি বনে গিয়ে
অরণ্যের আর-সব গাছেদের কথাবার্তা শুনে
ফুরফুরে হাত-তালি দিই।

যদি জল হয়ে যাই—ধূসর, সবুজ, শাদাফেনা, নীলজল
যে-কোন সাগরে।
সমুদ্র ও আকাশের সঙ্গে আরো জানাশুনো হবে....

তারপর মেঘ,
বৃষ্টি আর বৃষ্টি হয়ে অবিরল ঝরে পড়বো চৈত্রের দুপুরে
জন্মভূমির সব রুখুশুখু জমিতে; চিতায়।

অপসংস্কৃতি

রণজিৎ দাঁশ

সেই যেবার তোমাকে নিয়ে বেড়াতে গেলুম খাজুরাহো—
আমার অপসংস্কৃতির ধরণ দেখে ছিছি করলো লোকে।

রতিপাথর দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে ভুলে গেলুম
তোমার আমার মধ্য রক্তের অনতিদূরে রতিশরীর—
আমার অপসংস্কৃতির ধরণ দেখে ছি ছি করলে তুমি।

রবীন্দ্রনাথ বনাম সরলা দেবী

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

সরলা দেবীর দেশসেবা রবীন্দ্রনাথের চোখে মিশনারিগিরি বলে মনে হয়েছিল কেন ব্যাখ্যা করা দুষ্কর। সবলার উগ্র মতামত রবীন্দ্রনাথ সমর্থন হয়ত করেননি, অরবিন্দেরও করেননি ১৯০৮ সালে, তাহলেও অরবিন্দকে নমস্কার করতে রবীন্দ্রের বাধেনি। গান্ধীর মত সরলাও প্রথম মহাযুদ্ধে ব্রিটিশ পক্ষের হয়ে যুদ্ধ করার সমর্থন করেছিলেন, দেশের স্বাধীনতালাভের আশায় এটাও রবীন্দ্রনাথের সমর্থনযোগ্য নয়, তবে বিদ্রূপের লক্ষ্যও হওয়া উচিত ছিল না। এছাড়া গান্ধী এবং সরলার চরকাপ্রীতিরও রবীন্দ্রনাথ কদর্থ করেছিলেন। চরকা কেটে জীবিকানির্বাহ করলেই স্বরাজ আসবে গান্ধীর চরকা আন্দোলনের এই বক্তব্য ছিল না। গান্ধীর মূল বক্তব্য ছিল, দেশের অগণিত দরিদ্র জনসাধারণ বেকার হয়ে বসে আছে, চরকা তাদের সামান্য জীবিকা অর্জনের উপায় হতে পারে, যারা অর্ধ-বেকার, তারা সুতো কেটে আয় বাড়াতে পারে, এবং তাদের উৎসাহ দানের জন্য প্রত্যেকেরই দিনে কিছুক্ষণ সুতো কাটা উচিত। দারিদ্র্য কারো আদর্শ হতে পারে না, কিন্তু দেশবাসী অধিকাংশই নিঃস্ব, তাদের নিঃস্ব রেখে বিলাসিতায় গ্লানি আসত বলে গান্ধী বাহুল্য সম্পূর্ণ বর্জন করেছিলেন, কিন্তু তাই বলে নির্দেশ দেননি—কাউকে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় পরতে হবে, যা গরিবদের মতো থাকতে হবে। সবলা দেবীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের উষ্মা তাই বিস্ময়কর। আর অসহযোগ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ যোগ দেননি, তাই বলে সরলা দেবী তাঁর অসহযোগ মত নিয়ে অনুযোগ করতে পারবেন না, রবীন্দ্রনাথের এই আশা অন্যায়। শান্তিনিকেতনে অ্যান্ড্রুজ, কালীমোহন ঘোষ, বিধুশেখর শাস্ত্রী, নেপাল রায়, অনেকেই এই সময়ে অসহযোগে অংশ নিয়েছিলেন।

o

সরলা দেবীকে ধিক্কার আবার দেন ১৯২৬ সালে, এবার আত্মীয়কে চিঠিতে নয়, প্রকাশ্যে। ঘটনাটি কৌতূহলোদ্দীপক।

রবীন্দ্রনাথ যখন একটি নাটক লিখছেন ১৯২৬ সালে, সম্ভবত নটরাজ, তখন সরলা দেবী সেই খবর পেয়ে একশো টাকার চেক পাঠিয়ে ভারতীতে সেই নাটক দাবী করেন। কিন্তু চার পাঁচশো টাকা আশা করে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত সেটা 'বিচিত্রা' পত্রিকাকে দেন, বিচিত্রার সেটাই প্রথম সংখ্যা। প্রমথ চৌধুরীকে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, ১৮ বৈশাখ ১৩৩৩, সরলাদেবী আত্মীয়তা খেলাপের খোঁটা দিচ্ছেন। আত্মীয়তার সম্মান রক্ষার জন্য রবীন্দ্রনাথ আর একটি লেখা দেবেন বললেন। এই সময়ে তাঁর হাতে একটিমাত্র লেখা, প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা' গল্প বিষয়ে তাঁর মতামত। এটার উদ্দেশ্য ওই বইয়ের ভূমিকাস্বরূপ ব্যবহার। রবীন্দ্রনাথ এই লেখাটি ভারতীতে দিলেন ছাপার জন্য। আবার সবুজপত্রকেও দিলেন ছাপবার জন্য, শুধু একটি পার্থক্য ছাড়া। প্রমথ চৌধুরী যেন সবুজপত্রে ব্যবহার করার সময় একটা টীকা দেন। প্রমথ চৌধুরী আষাঢ় ১৩৩৩-এর সবুজপত্রে লেখাটি ছাপলেন, তাতে টীকাটি শুধুই এই :

'আমার লেখা 'রায়তের কথা' যখন সবুজপত্রে প্রকাশিত হয় (১৩২৬ ফাল্গুন) তখন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিলেতে। এই কারণে সে প্রবন্ধটি সেকালে তাঁর চোখে পড়ে নি। সম্প্রতি তিনি আমার অনুরোধে সেটি পড়ে এবিষয়ে তাঁর মতামত সম্বলিত একখানি পত্র আমাকে লেখেন। এ পত্র অবশ্য লেখা হয়েছে ছাপবার জন্য।

'এ লেখা টীকাসমেত 'রায়তের কথার' ভূমিকাস্বরূপ প্রকাশ করবার অনুমতি রবীন্দ্রনাথ আমাকে দিয়েছেন।'

একই লেখা সবুজপত্রে বেরুচ্ছে অনুমান করা যায়, সেজন্যই সরলা দেবী রবীন্দ্রনাথের 'রায়তের কথা' প্রবন্ধটি সামান্য মার্জনা করে ভারতীতে প্রকাশ করেন। এই মার্জনাতে ক্রুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ বিলেত থেকে চিঠি লিখলেন এবং সেই চিঠি সবুজপত্রে বেরুল। সেই চিঠির উদ্দেশ্য ভারতীর সম্পাদককে তিরস্কার। প্রাথমিক অংশটুকু হলো এই :

'একটা কথা মনে রাখা উচিত। স্পৃহার কেবল একটিমাত্র রূপ নয়। ব্যক্তিগত খ্যাতি বা কীর্তিগত প্রতিপত্তির স্পৃহাও প্রবলতায় আর অনেক সময় আবিলতায়, অস্পৃহার চেয়ে কম নয়। সে ক্ষেত্রেও কর্তব্যের সীমা লঙ্ঘন করলে সেটাকে বিপু বলে ধিক্কার দিতে হবে। সেই সীমার মধ্যেও ঝগড়াঝাঁটি করা চলে। তখন সেটা কখনো কৌতুকের, কখনো বিরক্তির বিষয় হয়।

'প্রবাসী সম্পাদক মাঝে মাঝে কোনো কোনো লেখার পরে ঘোষণা বাক্যে বলে থাকেন যে, সেটা প্রবাসীরই জন্যে বিশেষভাবে লিখিত, সেটা সম্পূর্ণ অনুলিখিত না। লেখার এই নেপথ্যবিধানের ইতিহাসটুকু প্রবাসীর প্রতিপত্তি রক্ষার জন্যে করা হয়ে থাকে। লেখাটা ভালো হলে, যা তার অন্য কোনো উচ্চাসীন উপযোগিতা থাকলে। সেই প্রতিপত্তিই যথার্থ প্রতিপত্তি—তার কোনো মহাস্বরূপের প্রতিপত্তি আমার নিজের কাছে উল্লেখযোগ্য বলে মনেই হয় না। যখন আমরা কংগ্রেসে ভদ্রসভায় যাই, তখন গায়ে একখানা চাদর আছে বা সেটা ময়লা নয়, এইটুকুই ভদ্রতা রক্ষার পক্ষে দেখবার বিষয়। সেটা মুখে বলবার দরকার হয় না। কিন্তু লোকের পাশে বসে তাকে যদি বলি যে, এ চাদর আমি প্রতিবেশীর আলনা থেকে তুলে নিয়ে গায়ে দিয়ে আসি নি, তাহলে সেটা নিরতিশয় বাহুল্য কথা হয় সন্দেহ নেই। প্রবন্ধ সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। এইরূপ ব্যবহারে আমি অনেক সময়ে হেসেছি, সে কথা স্বীকার করি।

কিন্তু কৌতুকের সীমা অতিক্রম করবার হেতু কোথায় ঘটে, তার একটা উদাহরণ দিই।

শ্রীমান প্রমথ 'রায়তের কথা' বলে তাঁর একটি প্রবন্ধ সবুজপত্র থেকে উদ্ধৃত করে একটি পুস্তিকা করেছেন। সেই পুস্তিকা সম্বন্ধে আমার অভিমত তাঁকে সম্বোধন করে পত্র আকারে লিখেছিলেন। সম্পাদকীয় নির্বন্ধগত সবুজপত্রে না দিয়ে সেটা ভারতীতে পাঠানো হয়। আজ সেটা পড়তে গিয়ে দেখলেন, ছাপার ভুলে আপাদমস্তক শরশয্যাগত সেই প্রবন্ধে প্রমথর নাম আছে বটে, কিন্তু কোথাও সম্বন্ধকারকের কোনো সম্বন্ধই নেই।

এটা হল প্রতিপত্তির লোভ। অর্থাৎ এই অতি অকিঞ্চিৎকর গর্ব যে, ওটা প্রমথকে লেখা পত্র নয়, কিন্তু ভারতীর জন্যেই বিশেষ করে লেখা প্রবন্ধ। এটা হল সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া—একদিক থেকে অন্যদিকে প্রবন্ধের মুখ ফিরিয়ে দেওয়া। লেখার উপলক্ষ্য পরিবর্তন করা কেবল নয়, নিজের হাতে আর কারুর পরিবর্তন করবার ন্যায্য অধিকার সম্পাদকের আছে বলে আমি মনে করি নে। এতে কেবল আমি নই, আমার প্রবন্ধও পীড়িত হয়েছে। তাই এই উপলক্ষ্যে, সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে আমার সানুনয় নিবেদন এই যে, সরব বা নীরব পত্রিকার প্রতিপত্তি ঘোষণাকে তাঁরা যেন অগৌরবের বিষয় বলেই মনে করেন। এইরকম বাহ্য ঘোষণা থেকে ঘোষণার প্রতিযোগিতা প্রবল হয়ে ওঠে—নিজের দিকে সেই অঙ্গুলি নির্দেশের উত্তেজনা সাহিত্যক্ষেত্রে কখনোই সুদৃশ্য নয়।'

মূল অপরাধটা কিন্তু রবীন্দ্রনাথেরই। একই লেখা দুই পত্রিকায় দেওয়া রীতি-বিরুদ্ধ। তিনি লিখছেন লেখাটি তিনি সবুজপত্রে না দিয়ে ভারতীকে দিয়েছিলেন, তাহলে সবুজপত্রে সেটা ছাপা হয় কী করে? পরবর্তীকালে রবীন্দ্র রচনাবলীতে 'রায়তের কথা' প্রবন্ধের উৎস হিসেবে সবুজপত্রের নামই উল্লেখিত হয়েছে, ভারতীর নয়। আর লেখার মার্জনার অধিকার সম্পাদকের সব সময়েই আছে, সরলা দেবী অন্য লেখকের

বেলায় যেমন রবীন্দ্রনাথের লেখার বেলায়ও সেই অধিকার প্রয়োগ করে অন্যায় করেন নি। অন্যকে লেখা পত্র রবীন্দ্রনাথই দিয়েছিলেন ভারতীতে ছাপতে, যদিও সবুজপত্রে দেওয়াই ছিল সঙ্গত। কিন্তু যখন দিয়েইছেন, সম্পাদক সেটা প্রবন্ধের আকারে ছাপবেন। এটাই যুক্তিসঙ্গত। ছাপার ভুলের কথা তোলাও আক্রোশের বশে। সবলার সম্পাদনায় ভারতীতে তিনি অনেকবারই লিখে এসেছেন, হঠাৎ ছাপার ভুলের কথা বলা বিসদৃশ।'

এই কটু চিঠির কারণ অবশ্য আরও ছিল। ২১শে জুলাই ১৯২৬ তিনি প্রমথকে লিখছেন, বৈশাখের পঞ্চাশ বর্ষীয়সী ভারতী পড়ে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করেছি।....তাই নিরতিশয় ক্লান্তি ও ব্যস্ততার মধ্যেও যে লেখাটা লিখেচি (পূর্বোক্ত চিঠি) সবুজ পত্রের জন্যে পাঠাচ্চি। মনে জানি তোমার আত্মীয়তার দায়িত্ব রক্ষার জন্যে হয়তো ছাপতে কুণ্ঠিত হবে। কিন্তু সে দায়িত্ব তো আমারো আছে—কিন্তু তার চেয়েও ন্যায়-বিচারের দায়িত্ব বড়। আমার দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়েই তোমরা ছাপাচ্চ একথা জানিয়ে যদি এটা তোমাদের কাগজে স্থান দাও তাহলে খুসি হব। কিন্তু যদি নিতান্তই অনিচ্ছুক হও তাহলে এটা প্রবাসীতে নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দিয়ো—'

প্রমথ চৌধুরী ছাপতে কুণ্ঠিত হন নি. চিঠিটি ১৩৩৩ আশ্বিনের সবুজপত্রে বেরোয়।

চিঠিটির পুরো বয়ান এই :

'হঠাৎ দেখা গেল, পঞ্চাশ বছরের ভারতী পঁচিশ বছরের প্রবাসীর সঙ্গে কলহ উপলক্ষ্যে শ্লেষনৈপুণ্য দেখিয়েছেন। সমব্যবসায়ীরা যখন নিজের মর্যাদা ভোলে, তখন এরকম অশোভন ব্যাপার ঘটে থাকে। তাই ভেবেছিলাম এসম্বন্ধে সম্পাদিকাকে আড়ালে আমার মন্তব্য জানাব। কিন্তু আমার কথাটা তেমন করে চাপা দিলে আত্মীয়তা করা হবে, কর্তব্য করা হবে না।

ভারতীর গৌরবের তালিকা প্রকাশ উপলক্ষ্যে সম্পাদিকা বলেছেন : আর একটি নীতিও ভারতীর সনাতনী। অনেক সম্পাদক পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু কেহই অর্থ-লিপ্সায় ভারতীর সেবা করেন নাই। ভারতীর সেবা জীবিকার অবলম্বন করেন নাই।

এর মধ্যে তিনটি কথা বলবার আছে। প্রথম, ভারতীর যতগুলি সম্পাদক আসরে নেমেছেন, লক্ষ্মীর কোন না কোন মহলে তাঁদের আশ্রয় ছিল। ক্ষুধিত পরিবারকে অন্ন থেকে বঞ্চিত করে সরস্বতীর নৈবেদ্য তাঁদের রচনা করতে হয় নি। সুতরাং এক্ষেত্রে নিঃস্পৃহতার বড়াই শুনে লোকে যে ভক্তি-বিহ্বল হয়ে উঠবে। এমন আশা করা যায় না।

দ্বিতীয়, তৎসত্ত্বেও ভারতীর উপস্বত্ব থেকে যদি কিঞ্চিৎ আয় করতে পারতেন, তবে তাঁদের কেউ যে লজ্জিত হতেন—একথা আমি স্বীকার করতে পারি নে। অক্ষমতার পিতলকে গিল্টি করে সোনার গহনা বলে চালানো ও প্রতিবেশীর উপরে টেক্কা দিতে যাওয়া গর্বের কথা, কিন্তু গৌরবের কথা নয়।

যদি প্রশ্ন ওঠে—আমার একথার প্রমাণ কি ? তাহলে আমি দেখাতে পারি, ভারতীর সম্পাদক-পরম্পরা সকলেই গ্রন্থকার। তাঁদের গ্রন্থ তাঁরা লক্ষ্মীর হুটেই বেচে থাকেন। তাঁদের কেউই সরস্বতীর পদ্মবনের ধারে দাঁড়িয়ে বিনা পয়সায় ভাবের হার লুট দিতে চেষ্ট করেন নি। অন্তত আমি নিজের কথা বলতে পারি। বই ছাপিয়ে হয়ত হয়তো কখনো যথেষ্ট লাভ হয় নি, বা লোক-ফলে নয়, ভাগ্যের নিষ্করুণতারই ফলে। এখনো বলতে পারি আমার বই বিক্রির লাভের অঙ্ক যদি বহুগুণিত হবার লক্ষণ দেখায়, তবে হাত জোড় করে লক্ষ্মীকে টোড়ি রাগিনীতে বলব না—

যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়।

তৃতীয় কথা হচ্চে এই, প্রাণধারণে আমাদের সকলেরই প্রয়োজন আছে। যাঁরা পৈতৃক বা পরোপার্জিত সম্পত্তির অধিকারী নন, বাধ্য হয়ে তাঁদের উপার্জনের পন্থা অবলম্বন করতে হয়। মানুষের পাকযন্ত্র আছে বলে যদি সেটা লজ্জার বিষয় হয়, তবে লজ্জা সৃষ্টিকর্তার। এ স্থলে মানুষকে কেবল এই কথাই ভাবতে হবে যে, উপ-জীবিকা যাতে অপজীবিকা না হয়। জ্ঞানতঃ সত্যের অপলাপ, অন্যায়ের সমর্থন বা মানুষের কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনার দ্বারা আয়ের পথ প্রশস্ত করবার চেষ্টা কোনো সম্পাদকের মধ্যে দেখা যায়। তাহলেই বলতে পারব কর্তব্য বুদ্ধির চেয়ে বিষয়বুদ্ধিই তার প্রবল।

বারবার দেখেছি প্রবাসী-সম্পাদক সাধারণের অথবা কোনো কোনো ক্ষমতাশালী সম্প্রদায়ের অপ্রিয়তা করে নিজের ক্ষতির কারণই ঘটিয়েছেন। সকল সময়ে তাঁর উত্তেজনা আমার ভালো লাগে নি, অনেক সময়ে মনে হয়েছে অক্ষুব্ধ বিচারবুদ্ধির বিশুদ্ধতা রক্ষা হচ্চে না, কিন্তু বারবার দেখেছি। ঠিক করেই হোক্ ভুল করেই হোক্, সম্পাদক যা সত্য বলে মনে করেছেন, ভয়ে বা লোভে তার বিরুদ্ধাচরণ করেন নি।

একটা কথা মনে রাখা উচিত। স্পৃহার কেবল একটিমাত্র রূপ নয়।... নিজের দিকে সেই অঙ্গুলি নির্দেশের উত্তেজনা সাহিত্য-ক্ষেত্রে কখনোই সুদৃশ্য নয়। (এই অংশটুকু আগেই উদ্ধৃত হয়েছে।)

সবশেষে আমার নিজের একটা কৈফিয়ৎ আছে। ভারতী সম্পাদিকা টিপ্পনীর মধ্যে এক জায়গায় লিখছেন :—(প্রবাসী-সম্পাদক) বাল্মীকি প্রতিভা করিকেও সরস্বতীর বিনা পণের মহল হইতে ছুটাইয়া লক্ষ্মীর পণ্যশালায় বন্দী করিয়াছেন।'

পূর্বেই বলেছি লক্ষ্মী আমার লেখনীর উপর স্বর্ণবৃষ্টি করলে দুঃখিত হব, এতবড় উদাসীন কোনোকালেই আমি নই। এই ঔদাসীন্য যদিবা লেশমাত্রও আমার থাকত, স্বয়ং সরস্বতীই আজ তাকে দেশছাড়া করেছেন। তিনিই স্বয়ং তাঁর কবির হাতে ভিক্ষার ঝুলি দিয়ে লক্ষ্মীর দ্বারে অবমানিত করতে ত্রুটি করেন নি। অন্য অনেক হতভাগ্য ভিক্ষুর মত লক্ষ্মীমন্তের মুষ্টি আঘাত পাই নে বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে মুষ্টি-ভিক্ষাও জোটে না। পাই প্রচুর পরিমাণে হাততালি, কারণ দানের হাতে তেমন তালি বাজে না, যেমন বাজে বিকৃত হাতে। এই ব্যাপারে যে পরিমাণে শরীরটাকে জীর্ণ করে ফেলেছি তার শিকি পরিমাণেও ঝুলিটা পূর্ণ করতে পারি নি।' ক্ষুধিত শত বুভুক্ষিত দিনে পরিশ্রান্ত চিত্তে মনে মনে মালব্যজির পুণ্য নাম জপ করেচি। কিন্তু অভাগ্যের অদৃষ্টে সেই নামমন্ত্রগুণও ফলে নি। এমন অবস্থায় ভারতী সম্পাদিকার সঙ্গে প্রবাসী-সম্পাদকের প্রভেদ এই যে, পরম দুঃখের দিনে তিনি আমার প্রবন্ধকে অর্থমূল্য দিয়েছেন—এমন সময়ে দিয়েছেন, যখন দাবী করলে বিনা মূল্যেই পেতেন।

সে কথা আজ মনে আছে।' তখন আমার বিদ্যালয়ের ক্ষুধা মেটাবার জন্যে হিতবাদীর তৎকালীন ধনশালী কর্তৃপক্ষের কাছে আমার চার-পাঁচটা বইয়ের স্বত্ব বন্ধক রেখে সামান্য কিছু টাকা সংগ্রহ করেছিলেন। প্রায় পনেরো বৎসরেও তা শোধ হয় নি। আমার অন্য বইয়ের আয়ও তখন বাধাগ্রস্ত ছিল। অর্থাৎ সেদিন দান পাওয়ার পথে দয়া ছিল না, উপার্জনের পথে বুদ্ধির অভাব, সম্পত্তির উপর শনির দৃষ্টি। অথচ শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়ের নামে সরস্বতীর দাবী উত্তরোত্তর বেড়েই চলেচে।

এমন সময়ে প্রবাসী-সম্পাদক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার প্রবন্ধের মূল্য দিয়েছিলেন। মাসিকপত্র থেকে এই আমার প্রথম আর্থিক পুরস্কার। তার পরে এই ইতিহাসের ধারা আর অধিক বর্ণনা করবার প্রয়োজন নেই।

প্রবাসী সম্পাদক যদি সেদিন আমাকে অর্থমূল্য দিতে পারেন তবে তার কারণ এই নয় যে, তিনি ধনবানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন। তার কারণ এই যে, ন্যায্য উপায়ে পত্রিকা থেকে লাভ করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। তাতে কেবল যে তাঁর সুবিধা হয়েছে তা নয়, আমারও হয়েছে এবং এই সুবিধা দেশের কাজে লাগাতে পেরেছি।

কিন্তু অর্থই তো একমাত্র আনুকূল্যের উপায় নয়। প্রবাসী-সম্পাদক সর্বদা তাঁর লেখার দ্বারা, নিজের দ্বারা, পরামর্শ দ্বারা, মমত্বের বহুবিধ পরিচয়ের দ্বারা বিশ্ব-ভারতীর যথেষ্ট আনুকূল্য করেছেন। আমি নিশ্চিত জানি সেই আনুকূল্য দ্বারা তিনি অন্যায় এই অতিভার পীড়িত আমাকেই রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন। দুঃসাধ্য কর্তব্যভারে অর্থদানের চেয়েও সঙ্গদান, প্রীতিদান অনেক সময়ে মূল্যবান। সুদীর্ঘকাল আমার ব্রত-উদ্‌যাপনে আমি কেবল যে অর্থহীন ছিলেন তা নয়, সঙ্গহীন ছিলেন; ভিতরে বাইরে বিরুদ্ধতা ও অভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ একা সংগ্রাম করে এসেছি। এমন অবস্থায় যাঁরা আমার এই দুর্গম পথে ক্ষণে ক্ষণে আমার

সাহসে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁরা আমার রক্তসম্পর্কগত আত্মীয়ের চেয়ে কম আত্মীয় নন, বরঞ্চ বেশী। বস্তুত আমার জীবনের লক্ষ্যকে সাহায্য করার সঙ্গে সঙ্গেই আমার দৈনিক জীবনকেও সেই পরিমাণে আশ্রয় দান করেছেন। সেই আমার স্বল্প-সংখ্যক কর্মসুহৃদয়ের মধ্যে প্রবাসী সম্পাদক অন্যতম। আজ আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। ২১শে জুলাই, ১৯২৬। হোটেল বিস্টল, উইয়েন।

প্রকৃতির পরিহাস এই যে এই চিঠি লেখার কয়েক দিনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ একটি কুৎসিত চিঠি লেখেন এবং সে চিঠি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কেই। কবির সঙ্গে ইয়োরোপে, (রাণী মহলানবীশের গল্পে উদ্ধৃত সেই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, প্রবাসীকে সেবা করার এই কি প্রতিদান? রবীন্দ্রনাথ এবং রামানন্দ দুজনেই এসময়ে ইয়োরোপে এবং প্রবাসীতে। রবীন্দ্রনাথের চীনজাপান ভ্রমণ ব্যাপারে কিছু কটূক্তি উপলক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথের সেই চিঠি।

সরলা দেবী ভারতীর সম্পাদক হয়ে লেখকদের সম্মানমূল্য দেওয়া প্রবর্তন করেন বাংলাদেশে, এমন দাবী করেছেন জীবনের কোনো কোনো জায়গায়। তিনি ভারতীর সম্পাদক ছিলেন, হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে যুগ্মভাবে, ১৩০২-১৩০৪ সালে এবং একক্ভাবে ১৩০৬ থেকে ১৩১৪ পর্যন্ত এবং পরে ১৩৩১ থেকে ১৩৩২ পর্যন্ত।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন প্রবাসীই তাঁকে প্রথম মাসিকপত্র থেকে আর্থিক পুরস্কার দেন। এবং সেটি প্রবন্ধের জন্য। প্রবাসীর প্রথম সংখ্যায় (১৩০৮ বৈশাখ, ১৯০১ মে) রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'প্রবাসী' বের হয়। প্রবাসীতে তাঁর পরবর্তী রচনা, ১৩০৯ বৈশাখে, 'প্রবাসীর প্রেম'। প্রবাসীতে এরপর লেখেন একেবারে ১৩১৪ সালে, একটি গল্প, মাস্টারমহাশয়, আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যায়। এই রচনার ভাদ্র সংখ্যা থেকে তিনি গোরা উপন্যাস লিখতে শুরু করেন, যার জন্য অগ্রিম তিনশো টাকা নির্ধারিত হয়েছিল। ১৩১৫ প্রবাসীতে তাঁর তিনটি প্রবন্ধও বের হয়: নারী ও প্রতিকার, ধর্মভঙ্গ এবং পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীতে সভাপতির বক্তৃতা।

প্রবন্ধ বলতে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই কবিতা বোঝান নি এবং তাই যদি হয় রবীন্দ্রনাথ ১৩১৪-এর আগে প্রবাসী থেকে তাঁর রচনার জন্য কোনো আর্থিক মূল্য পান নি সরলা দেবী ১৩০২-৪ এবং ১৩০৪-১৪ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য রচনা প্রকাশ করেছেন এবং অন্য লেখকদের সম্মানমূল্য দিয়েছেন কেবল রবীন্দ্রনাথকে দেন নি একথা অবিশ্বাস্য। বিশেষ করে প্রিয়নাথ সেনকে লেখা চিঠি থেকে অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত যে তিনি ভারতী থেকে অর্থগ্রহণ করেছিলেন: 'গল্পগুলো ভারতী-সম্পাদক সম্পূর্ণ আদায় করে নিয়ে বসে আছেন' (২২শে চৈত্র ১২৯৩) এবং ভারতীর কাছ থেকে 'খুব শক্ত তাগিদ এবং প্রলোভন পেয়েছি' (মার্চ, ১৯০১)। গল্পগুলো হলো উদ্ধার (শ্রাবণ ১৩০৭), দুরাশা (ভাদ্র ১৩০৭) এবং ফেল (আশ্বিন ১৩০৭)। তাগিদ এবং প্রলোভনের ফলে তৈরি হল নষ্টনীড়'। প্রবাসী শুরু হয় ১৩০৮-এ। অতএব রবীন্দ্রনাথের প্রবাসী থেকেই প্রথম অর্থ-প্রাপ্তি হয়েছিল বলা রবীন্দ্রনাথের হয় স্মৃতিবিভ্রম অথবা ক্রোধের বশে অপলাপ।

কী করণে সরলা দেবী প্রবাসী সম্পর্কে টিপ্পনী কেটেছিলেন সে প্রশ্নে না গিয়েও এটা বলা চলে সবুজপত্রে এই তিরস্কার সবটুকুই তাঁর প্রাপ্য ছিল না। রবীন্দ্রনাথ প্রকারান্তরে সরলাকে এই সব অভিযোগে জর্জরিত করলেন এই চিঠির মারফৎ: নিজের মর্যাদা ভুলে অশোভন ব্যবহার করেছেন সরলা। ভারতী তাঁর উপজীবিকা হয় নি বটে, কিন্তু অপজীবিকা হয়েছে; জ্ঞানতঃ সত্যের অপলাপ, অন্যায়ের সমর্থন, কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনা দিয়েছেন, কর্তব্যবুদ্ধির চাইতে তাঁর বিষয়বুদ্ধি প্রবল; দুঃখের দিনে প্রবাসী রবীন্দ্রনাথকে অর্থমূল্য দিয়েছে, ভারতী দেয় নি।

সরলা দেবী স্পষ্ট না বললেও একথা বলেছেন তাঁর সম্মানমূল্য দেওয়ার রীতি অন্য পত্রিকাকে এই রীতি অবলম্বন করতে বাধ্য করেছিল। প্রবাসী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথকে টাকা দিয়েছিল অথবা ভারতীর সম্মানমূল্য দেওয়ার রীতিতে বাধ্য হয়েছিল, তা গবেষণার বিষয়। ১৩০৭-এর পৌষের প্রদীপের রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধ থেকে জানা যাচ্ছে, সাময়িক পত্রের লেখকদের অর্থমূল্য দেওয়ার কথা তিনি ভাবছেন।

*

সরলার সম্পাদনা বিষয়ে আর একবার তীব্র তিরস্কার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সেবার রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লেখা চিঠিতে। ১৪ বৈশাখ ১৩১২তে তিনি লিখছেন,

'এবারকার ভারতীতে খেয়াল খাতা নামক একটি নির্লজ্জতার সৃষ্টি হইয়াছে সেটাতে আমাদিগকে লইয়া কাতর করিয়াছে। আমাদের বাড়িতে একটি খাতা প্রচলিত ছিল তাহাতে আত্মীয়বন্ধুরা যখন যাহা খুসি লিখিতেন। বেশ বুঝিতেই পারিতেছেন তেমন লেখায় সত্যও থাকে না রচনার সৌন্দর্যও থাকিতে পারে না—সরলা হঠাৎ সেগুলিকে পাঠকসমক্ষে ভৈরবী ভেরী দামামার কোলাহল সহকারে প্রকাশ করিয়া দেওয়াতে আমি, বিশেষত বড়দাদা, অত্যন্ত ধিক্কার অনুভব করিয়াছি। ভবিষ্যতে এই সমস্ত লেখা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইয়াছি তাহা পালিত হইবে কি না জানি না কারণ আজকাল দোকানদারিই সবচেয়ে নিদারুণ হইয়া দয়াধর্ম গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে।'

সরলার সম্পাদনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বক্রোক্তি করেছেন, সরলাও মধ্যে মধ্যে তেমন বক্রোক্তি করতে ছাড়েননি। ১৩০৬ সালে ভারতীর সম্পাদনা হাতে নিয়ে তিনি বলছেন, 'নিজের লেখার প্রাচুর্য সে সময় তো ছিলই, কিন্তু নিজের লেখার আড়ম্বরেই ভারতীর সর্বাঙ্গ ভরে দেওয়ার অভিমান আমার ছিল না।' এর আগের এক বছর ভারতীর সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সেসময় ভারতীর পৃষ্ঠার অর্ধেক জুড়ে থাকত রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব রচনা। ভারতীর জন্য সরলা কীভাবে লেখক খুঁজে বেড়াতেন তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন তাঁর স্মৃতিকথায়। এর আগে সখা, বালক, ভারতী, সাধনা প্রভৃতি পত্রিকার পরিচয় ছিল ঠাকুরবাড়ির কাগজ বলে। ১৩০১ সালে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সাহিত্য এবং রবীন্দ্রনাথের সাধনা পত্রিকা সম্মিলনের প্রস্তাব সুরেশ-চন্দ্রের অসম্মতিতে নাকচ হয়ে গেলে নিত্য-কৃষ্ণ বসু তাঁর সাহিত্যপাঠকের ডায়েরিতে লিখলেন, 'আর একখানা ঠাকুরবাড়ির কাগজ বাজইয়া লাভ নাই।' সরলা দেবীই ভারতীর দিগন্ত প্রসার করে দিলেন, অবশ্য রবীন্দ্র-নাথ তাঁর সবচেয়ে বড়ো লেখক। কিন্তু সরলার অভিমান, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে প্রত্যা-খ্যান করলেন। ভারতীর ১৩২৩-এর জ্যৈষ্ঠে 'সম্পাদক' রচনায় সরলা লিখলেন, 'কোথাও কিছু নাই, অকস্মাৎ ভারতীর প্রতি স্নেহ-বিমুখ করিয়া শৈলেশ মজুমদার তাঁহাকে বঙ্গদর্শনে ভুলাইয়া। কাঁহা মুসুফ, কাঁহা জুলেখা হয়ায়। কোথায় বঙ্কিম, কোথায় তাঁহার বঙ্গদর্শন। নূতন বঙ্গদর্শন টিকিল না। শুধু আমার মামাটি পরকে আপন করে, আপনাকে পর, আমার বুকের ভিতর একটা গুপ্ত চিরা দিয়া গেলেন।' বঙ্গদর্শনের শুরু ১৩০৮, রবীন্দ্রনাথ এর সম্পাদনা ত্যাগ করেন ১৩১৩ সালে।

পারিবারিক স্মৃতিলিপি থেকে রবীন্দ্র-নাথ যে রচনাটি ১৩১২ সালে সরলা ভারতীতে ব্যবহার করেছিলেন তা হল, 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালী' প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে বাঙালী জাতি সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য ছিল, বঙ্গভঙ্গের যুগে সেই রচনা প্রকাশ্যে বের হলে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত সংকোচ বোধ করে-ছিলেন। সরলাও অনির্দেশ্য কারণে রচনা-প্রকাশে রবীন্দ্রনাথের অনুমতি নেননি। সরলার পক্ষসমর্থনে অবশ্য এটা এর আগে ১৩০৪ সালে তাঁর পারিবারিক খাতার বেশ কিছু রচনা পণ্ডভূত গল্পে ব্যবহার করে-ছিলেন। ১২৯৯ সালের শ্রাবণের 'সাধনা' পত্রিকায় ব্যবহৃত হয় তাঁর পারিবারিক খাতার সঙ্গীত সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ। 'পণ্ডভূত' গল্পের কোনো কোনো প্রবন্ধও ১২৯৯-১৩০২-এর সাধনায় প্রকাশিত হয়। ভারতী পত্রিকায় খেয়ালখাতা অংশে সরলা পারিবারিক স্মৃতি-লিপি থেকে রচনা উদ্ধার করতে শুরু করার সময় সেই অংশে যোগ দিয়েছিলেন রবীন্দ্র-নাথের স্নেহসিক্ত প্রমথ চৌধুরীও, যাঁর কাছেই পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ সরলা সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করতেন।

*

স্বামী বিবেকানন্দের উপর সরলার প্রবন্ধ বের হয় ১৩০৩ চৈত্র এবং ১৩০৯ বৈশাখের ভারতীতে। ১৩০৩এ তিনি লেখেন: 'অর্ধশতাব্দীর পূর্বে একবার বলিষ্ঠ রাম-মোহন রায় আসিয়া অনেকটা অজ্ঞান ও রামচন্দ্রর দেশ হইতে দূরীভূত করিয়া-

আপনি কি দৈনন্দিন কাজ-কর্ম শুরু করার জন্যে বিশেষ উদ্‌গ্রীব?

গ্ল্যাক্সোজ-ডি®

নিমেষে শক্তি যুগিয়ে আপনার সব ক্লান্তি দূর করবে!

গ্ল্যাক্সোজ-ডি খেয়ে আপনি ঘরের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম করার জন্য পুরোপুরি তৈরী হয়ে যান। গ্ল্যাক্সোজ-ডি আপনার ক্লান্ত শরীরে সেই ভরপুর শক্তি যোগায় যা ফের চাঙ্গা হবার জন্যে আপনার অবশ্যই দরকার। ডাক্তারদের সুপারিশ করা গ্ল্যাক্সোজ-ডি'তে রয়েছে উচ্চমানের গ্লুকোজ যা' ভিটামিন ডি, ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফরাসের গুণে সমৃদ্ধ।
গ্ল্যাক্সোজ-ডি আপনার সব ক্লান্তি দূর করে যার দরুন আপনি ঘরের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম খুব স্ফূর্তির সঙ্গে করতে পারেন।

গ্ল্যাক্সোজ-ডি®
আপনার পরিবারের নিমেষে শক্তি যোগানদার

dCA/GL'34 BEN

ছিলেন। তাহার পর কেশবচন্দ্র সেন আর একবার এদেশে স্বাস্থ্যকর পবনের হিল্লোল তুলিয়াছিলেন। এখন বিবেকানন্দ স্বামী সমাগত।' বিবেকানন্দের সংস্পর্শে এসে সবলার জীবনে আমূল পরিবর্তন এল। 'আমার আধ্যাত্মিক পিপাসা আমার শৈশবের গতানুগতিক ব্রাহ্মধর্ম থেকে অনেক দূরের পথে নিয়ে চলেছিল।' 'হিন্দুর হিন্দুত্ব জিনিসটি যে কি তা ভাল করে জানবার একটি প্রবৃত্তি জাগল। তার এক সীমায় ঔপনিষদিক বেদান্তের ব্রহ্মের উপাসনা, আর এক সীমায় পৌরাণিক প্রতিমার ধ্যানধারণা ও পূজার বিধান।' 'শুধু উপনিষদ্ নয়, হিন্দুর সকল ধর্মপুস্তক, সকল ক্রিয়াচারগুলিই আবার সকলে ভাঁজতে লাগল, সেগুলি ঘেঁটে ঘেঁটে উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল। দেখলে অমূল্য রত্নরাজিতে ভরা, বঙ্গোপসাগরে ভাসিয়ে দেওয়ার মত একেবারে নয়।' স্বামীজীর কর্মযোগ পুস্তিকা উপহার পেয়ে ভগবদ্গীতার প্রতি প্রথম দৃষ্টি আকৃষ্ট হল—তার আগে এর একটি শ্লোকও পড়িনি—আমাদের পরিবারে শ্রীতফের গরিমা ছিল না।'

প্রতিমাপূজা জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়িতে নিষিদ্ধ ছিল, দুর্গাপূজা দেখাও নিষিদ্ধ ছিল। সেই বাড়ির সবলাবালা ১৯০৩ সালে শুরু করলেন বীরাষ্টমী, দুর্গাপূজার অষ্টমীর দিন। নিজের বাড়ির ভিতরে উঠতে প্রথম ঘরেই জাপানী আর্টিস্টের হাতে আঁকা আমার ফরমাসী কালীর একটি অপূর্ব মূর্তি ছিল।'

বিবেকানন্দ এবং কালী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণার সঙ্গে সবলার ধারণার কোনোই মিল নেই। বিবেকানন্দও কালী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ রোমাঁ রোলাঁর কাছে কী বলেছিলেন, বলা তাঁর ডায়েরিতে ১৯৩০ আগস্টে লিখেছেন :

'সেখান থেকে তিনি (রবীন্দ্রনাথ) চলে এলেন হিন্দু বহুদেববাদের, এবং বিশেষ করে কালী উপাসনার, বিরুদ্ধে সোজাসুজি আক্রমণে। সে-সম্পর্কে তিনি বলে গেলেন আবেগদীপ্ত ঘৃণার এক তীব্রতা নিয়ে (এমনটি তার মধ্যে আর কখনো দেখিনি)।' 'তিনি আরও উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, এবং বললেন, এই ধরনের রক্তমাখা নিম্নস্তর থেকেই চিরকাল মানুষের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছে খুনীর হিংসেতা, যুদ্ধ ও হত্যাকারী দেশের উপাসনা, রক্তপানের রুচি। এমনকি অধিবিদ্যা বা প্রতীকের স্তরে নিয়ে গিয়েও এর সঙ্গে কোন আপস তিনি মানেন না। (এটা স্পষ্টই বোঝা গেল, তাঁর চোখের সামনে এই মুহূর্তে আছেন বিবেকানন্দ)। তিনি এমন কথা বললেন যে, কালীর উপাসনা যারা টিকিয়ে রাখে তারা সুস্থ, সঠিক ও সৎ মানসিকতার লোক হতে পারে না। এই বীভৎস দেবীকে ধ্বংস করতে চাইলেন,—(এই ভয়ংকরী মাতা সম্পর্কে নিবেদিতাকে বলা বিবেকানন্দের বিস্ময়কর কথাগুলো নতুন করে পড়া যাক!)'

১৮৮৭তে রবীন্দ্রনাথ রাজর্ষি লিখেছিলেন, ১৮৮৯তে বিসর্জন, ১৯৩০-এও সেই রাজর্ষির, বিসর্জনের রবীন্দ্রনাথই এখানে ফুটে উঠেছেন।

বিবেকানন্দ আমেরিকা থেকে ফিরে এলে ১৮৯৬-এর ফেব্রুয়ারি শোভাবাজার রাজবাড়িতে অভ্যর্থনা দেওয়া হলে, রবীন্দ্রনাথ সেই সভায় ছিলেন বলে শোনা যায়। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্র-স্মৃতিতে' লিখেছেন : সাউথ সুবার্বন স্টুডেন্টস ইউনিয়ন-এর প্রাক্তন সভ্যদের ক্লাব 'একসৃশেলসিয়র ইউনিয়ন'-এর উদ্যোগে সাবর্বন স্কুলের হলে অনুষ্ঠিত বিবেকানন্দর শোকসভায় সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও বক্তা নিবেদিতা। এর আগে বিবেকানন্দ যখন ছাত্রাবস্থায় ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী যুবক তখন তিনি ব্রাহ্মসমাজে রবীন্দ্রনাথের গান করেন, তাঁর সম্পাদিত 'সঙ্গীত কল্পতরু'তে (১৮৮৭) রবীন্দ্রনাথের গান অন্তর্ভুক্ত ছিল। নিবেদিতার চিঠি থেকে জানা যায়, ১৮৯৯ সালের ২৭ জানুয়ারি একটি চা-পানের সভায় রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ ছিলেন।

তবুও বিবেকানন্দের রবীন্দ্রবিরাগ তখন সুবিদিত ছিল। অনুমান করা হয়, 'কড়ি ও কোমলের' কবি রবীন্দ্রনাথকে মনে রেখেই বিবেকানন্দ পরিব্রাজক গ্রন্থে লিখেছিলেন, 'ঐ যে একদল দেশে উঠেছে, মেয়ে-মানুষের মত বেশভূষা, নরম-নরম বুলি কাটেন, এঁকে-বেঁকে চলেন, কারুর চোখের উপর চোখ রেখে কথা কইতে পারেন না, আর ভূমিষ্ঠ হয়ে অবধি পিরীতের কবিতা লেখেন, আর বিরহের জ্বালায় হাঁসেন-হোঁসেন করেন।'

আবার এটাও অনুমান করা হয় রবীন্দ্রনাথ চিরকুমার সভায় সন্ন্যাসী চিরকুমার বিবেকানন্দের উপর কটাক্ষ করেছেন।

এই সাকার-নিরাকার বিতর্ক এবং বিবেকানন্দ-কালীভক্তি যে সরলাকে রবীন্দ্রনাথের মানসিক সাহচর্য থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছিল এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং রবীন্দ্রনাথও যে সরলা সম্পর্কে বিরূপ হওয়া শুরু করবেন, অনুমান করা অসঙ্গত নয়। এরপর প্রতাপাদিত্য উৎসব, বীরাষ্টমী উৎসব এবং সরলার উত্তরোত্তর বর্ধমান দেশ-প্রেম সম্পর্কে উগ্র মতামত সরলাকে রবীন্দ্রনাথের কাছে অপ্রিয় করে তুলেছিল। ১৯১৯ নাগাদ গান্ধীজি সংস্পর্শে এসে অহিংসব্রত নিলেন সেই অহিংসাও রবীন্দ্র-নাথের অহিংসা নয়। অসহযোগ এবং চরকা সবলাকে রবীন্দ্রনাথের আরো দূরে নিয়ে গেল। এই সময় সরলাও তাঁর শিশুপুত্রকে শান্তিনিকেতন থেকে সরমতীতে স্থানান্তরিত করেছেন।

*

সবলা দেবীর মা স্বর্ণকুমারী রবীন্দ্রনাথের পাঁচ বছরের বড়ো। স্বর্ণকুমারীর প্রথম উপন্যাস বের হয় ১৮৭৬ সালে দীপ-নির্বাণ। তখন স্বর্ণকুমারীর বয়স ২১, রবীন্দ্রনাথের ১৬। এরপর স্বর্ণকুমারীর অন্যান্য উপন্যাসের প্রকাশকাল ছিন্নমুকুল (১৮৭১) মেবারবাজ (১৮৮৭), বিদ্রোহ (১৮৯০), হুগলীর ইমামবাড়ী (১৮৮৮), স্নেহলতা (১৮৯২), ফুলের মালা (১৮৯৫), কাহাকে ? (১৮৯৮), বিচিত্রা (১৯৮০), স্বপ্ন-বাণী (১৯২১), মিলনরাত্রি (১৯২৫)।

ছোটগল্প লিখতে শুরু করেন স্বর্ণ-কুমারী ১৮৬৭ সালের আগেই, অর্থাৎ যখন তাঁর বয়স দশ-এগারো। তাঁর গল্প প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৯ সালে ভারতীতে, মালতী। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প শুরু করার আগেই স্বর্ণকুমারীর সাতটি গল্প প্রকাশিত হয় ভারতী, সখা ও ভারতী-ও-বালক পত্রিকায়।

স্বর্ণকুমারীর প্রথম গীতিনাট্য রচিত হয় ১৮৭৯, বসন্তোৎসব। তাঁর আর একটি গীতিনাট্য, বিবাহ-উৎসব, প্রকাশিত হয় ১৮৯২ সালে। 'উর্বশী ও তুরকাবাস' কাব্য-নাট্য প্রকাশিত হয় ১৯০৪ সালে। 'রাজকন্যা' নাটক, ১৯১৩ সালে। এছাড়াও তিনি লেখেন একাঙ্কিকা নিবেদিতা (১৯১৭), 'দিব্যকমল' নাটক (১৯৩০), 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যনাটক (১৯১৮)। তাঁর হেঁয়ালি নাট্যগুলো সংকলিত হয়েছিল ১৯০১ সালে 'কৌতুক-নাট্য ও বিবিধ কথা' গ্রন্থে। প্রহসনও তিনি লিখেছিলেন, কনেবদল (১৯০৬), পাকচক্র (১৯১১)।

স্বর্ণকুমারীর কাব্যগ্রন্থের মধ্যে প্রথম প্রকাশ হয় 'গাথা' (১৮৮০)। পরবর্তী কাব্য-সংকলন, কবিতা ও গান, ১৮৯৫ সালে বের হয়। স্বর্ণকুমারী প্রচুর গদ্যও রচনা করে-ছিলেন, তাছাড়া তাঁর প্রবন্ধও উল্লেখযোগ্য, বিশেষ করে বিজ্ঞানবিষয়ক। ভারতী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন স্বর্ণকুমারী দীর্ঘকাল, ১৮৮৪ থেকে ১৮৯৪ এবং ১৯০৮ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত।

স্বর্ণকুমারীর সাহিত্য সাধনার এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় থেকে স্পষ্টই অনুমান করা যায়, রবীন্দ্রনাথের কৈশোরে এবং তরুণ বয়সে দিদি স্বর্ণকুমারী বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট নাম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, 'জীবনস্মৃতি' বা ছেলে-বেলায় স্বর্ণকুমারী অনুপস্থিত। স্বর্ণ-কুমারী দীর্ঘকাল বেঁচেছিলেন (১৮৫৬—১৯৩২), কিন্তু রবীন্দ্রজীবনে তাঁর উপস্থিতি নিতান্তই স্বল্প। স্বর্ণকুমারীর 'গাথা' গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করা হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কোন গ্রন্থই স্বর্ণকুমারীকে উৎসর্গ করা হয় নি। ১৯০০ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিত গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে আছেন কাদম্বরী দেবী (পাঁচবার), জ্যোতি-রিন্দ্রনাথ (দুবার), সৌদামিনী দেবী ইন্দিরা দেবী, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্র-নাথ ঠাকুর, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, সরলা রায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মৃণালিনী দেবী (?), লোকেন্দ্রনাথ পালিত (দুবার), অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রিয়নাথ সেন, দেবেন্দ্রনাথ সেন, বিহারীলাল গুপ্ত, আশুতোষ চৌধুরী, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদিন্দ্রনাথ রায়বাহাদুর, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, জগদীশচন্দ্র বসু, সাধ্বীকিশোর দেবমাণিক্য এবং শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। পরবর্তী আঠারো বছরে প্রকাশিত গ্রন্থ-

গুলোর উৎসর্গপত্রে আছেন।' দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, বিধুশেখর শাস্ত্রী, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথনাথ চৌধুরী, উইলিয়াম পিয়ারসন, বজেন্দ্রনাথ শীল।

স্বর্ণকুমারী দেবী যখন প্রথমবার ভারতীর সম্পাদক হন, তখন তাঁর সম্পাদনায় সহায়তা করতেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর 'সখি-সমিতি'র নাম দেন রবীন্দ্রনাথ, সমিতির আর্থিক সাচ্ছল্যের জন্য অভিনীত হয় 'পুরার খেলা' (১৮৮৮)। রবীন্দ্রনাথের দার্জিলিং ভ্রমণ (১৮৮৭) এবং গাজিপুর (১৮৮৮) ভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন স্বর্ণকুমারী।

বাল্মীকি প্রতিভার (১৮৮০) 'রিমঝিম ঘন ঘন রে বরষে' গানটির উৎস ছিন্নমুকুল উপন্যাসের (১৮৭৯) 'রিমঝিম ঘন বরিষে সখি লো' গানটি, এটা অনুমান করা অসঙ্গত নয়। সেইরকমই, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পুরুবিক্রম নাটকের গান, যেটা রবীন্দ্রনাথের লেখা, 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন' (১৮৭৯) স্বর্ণকুমারীর স্নেহলতা উপন্যাসের 'এক সূত্রে গাঁথিলাম সহস্র জীবন' (১৮৭৬) গানটির বিস্ময়কর সাদৃশ্য উল্লেখযোগ্য। বাল্মীকি প্রতিভার 'এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে' গানটির ভাব, ভাষা এবং সুরের সাদৃশ্যও লক্ষণীয়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি থেকে জানা যায় 'এখন হইতে সঙ্গীত ও সাহিত্য-চর্চাতে আমরা তিনজন হইলাম—আমি, অক্ষয় ও রবি। পরে জানকী বিলাত যাইবার সময় আমার ভগিনী এখনকার ভারতী-সম্পাদিকা আমাদের বাড়িতে বাস করিতে আমার সাহিত্যচর্চার তাহাকেও আমাদের একজন সঙ্গীরূপে পাইলাম।' 'এটা ১৮৭১ সাল নাগাদের কথা। এই প্রসঙ্গে ইন্দিরা দেবীও লিখেছেন (রবীন্দ্রস্মৃতি, বিশ্ব-ভারতী পত্রিকা, ১৩ বর্ষ ৩ সংখ্যা), 'মানময়ী নাটক জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আপনা-আপনির মধ্যে অভিনীত হয়। এটি কার রচনা সেকালে আমাদের অনুসন্ধান করবার কোনো প্রবৃত্তি হয় নি, তবে এখন মনে পড়ে রবিকাকা জ্যোতিকাকা স্বর্ণপিসিমা অনেক সময় মিলেমিশে গীতিনাট্য রচনা করতেন।' মানময়ী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ১৮৮০ সালে। এর তিন বছর পর স্বর্ণ-কুমারী তাঁর বড় মেয়ে হিরণ্ময়ীর বিবাহ উপলক্ষ্যে লেখেন বিবাহ-উৎসব গীতিনাট্য। এই নাটকে ৪৫টি গানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গান ছিল ২৮টি, অধিকাংশই পূর্বরচিত। এই বিবাহ-উৎসব গীতিনাট্যে সরলা দেবীও অভিনয় করেছিলেন, সখার ভূমিকায়, প্রেমাচ্ছন্ন নায়িকার মোহভঙ্গের উদ্দেশ্যে গান করে।

রবীন্দ্রনাথের বনফুল কাব্যের প্রথম সর্গের শিরোনাম 'দীপনির্বাণ' (১৮৭৫) এবং স্বর্ণকুমারীর প্রথম উপন্যাস দীপনির্বাণ (রচনা ১৮৭৪, প্রকাশ ১৮৭৬)-এর সাদৃশ্য লক্ষ্য করার মতো। একই কাহিনী অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ 'প্রতিশোধ' গাথা রচনা করেন ১৮৭৭ সালে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ে রচিত গাথা কাহিনীগুলো রচনার সমসময়ে প্রকাশিত হয়েছে স্বর্ণকুমারীর 'গাথা' কাব্য (১৮৮০)। রবীন্দ্রনাথের গাথা প্রকাশ হয় : প্রতিশোধ (১৮৭৮), লীলা (১৮৭৮), অসম্ভব-প্রেম (১৮৭৮), ভগ্নতরী (১৮৭৯)। স্বর্ণকুমারী 'গাথা' উৎসর্গ করেন রবীন্দ্রনাথকে :

ছোট ভাইটি আমার,

যতনের গাথা হার কাহারে পরাব আর ? স্নেহের রবিটি, তোরে আর যে পরাই,

যেন রে খেলার ভুলে ছিঁড়িয়ে ফেলো না খুলে, দুরন্ত ভাইটি তুই তাইতে ডরাই।

'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'র সংকলক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এই বিষয়ে অনুমান করেছেন, ১২৮৭ সালে তাঁহার (স্বর্ণকুমারীর) 'গাথা' প্রকাশিত হয়। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, স্বর্ণ-কুমারীই বঙ্গসাহিত্যে সর্বপ্রথম গাথা রচনা করেন। গাথা রচনায় রবীন্দ্রনাথও তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর পদানুসরণ করেছেন।' এর থেকে অনুমান হয়, স্বর্ণকুমারীর 'গাথা' ১৮৮০তে প্রকাশিত হলেও রচিত হয়েছিল আগে। তবে স্বর্ণকুমারীর আগেই অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী গাথাকাব্য রচনা করেছিলেন উদাসিনী (১৮৭৪)।

সাহিত্য সাধনায় রবীন্দ্রনাথ ও স্বর্ণ-কুমারীর সান্নিধ্যের আর একটি পরিচয় পাওয়া যায় সাবিত্রী লাইব্রেরীর সঙ্গে তাঁদের দুজনেরই ঘনিষ্ঠ সংশ্রব। এই লাইব্রেরী ছিল সমসাময়িক কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর স্বশুরালয়ে, যেখানে গড়ে উঠেছিল একটি সাহিত্যগোষ্ঠী। ১৮৮৩ সালে অক্রুর দত্ত গলির এই সাবিত্রী লাইব্রেরীর সমালোচনা সভায় রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন, 'অকাল কুষ্মাণ্ড'এবং 'হাতেকলমে' রচনা দুটো। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ছিলেন স্বর্ণ-কুমারীর অন্তরঙ্গ বন্ধু।

বিবাহ-উৎসব গীতিনাট্যে স্বর্ণকুমারী রবীন্দ্রনাথের গান যেমন নিয়েছিলেন তেমনি নিয়েছিলেন পরবর্তীকালে বিচিত্রা উপন্যাসে (১৯২০) তোমারি তরে, মা, 'সঁপিনু এ দেহ' গানটি; খড়্গপরিণয় (১৮৭৯) গাথায় 'তবে দেহো গো আনি' গানটি। আবার স্বর্ণ-কুমারীর রাজকন্যা নাটকের (১৯১৩) 'সাজাব তোমারে আজি মোরা যতনে' গানটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শাপমোচনের (১৯৩৩) 'তোমারে সাজাব যতনে কুসুমে রতনে' গানটির সাদৃশ্যও উল্লেখযোগ্য।

স্বর্ণকুমারী ভারতীর সম্পাদক ছিলেন ১৮৮৪ থেকে ১৮৯৪ পর্যন্ত এবং পরে ১৯০৮ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত। এই পত্রিকায় স্বর্ণকুমারী গানের স্বরলিপি-প্রণালী নির্ধা-রণ করার চেষ্টায় বিশেষ আগ্রহ দেখিয়ে-ছিলেন। সাংকেতিক স্বরলিপির প্রথম প্রবর্তক ছিলেন ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী এবং রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। সৌরীন্দ্রমোহন প্রবর্তন করেছিলেন দণ্ডমাত্রিক প্রথা, পরে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর করেন শূন্যমাত্রিক প্রথা। সংখ্যামাত্রিক প্রথা শুরু করেন জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ। এই সংখ্যামাত্রিক প্রথা অনুসরণ করেন প্রতিভা দেবী, সরলা দেবী। ইন্দিরা দেবী এবং আরো অনেকে। ১৯১১ এর ভারতী পত্রিকায় এই তথ্য প্রকাশিত হয়। এর আগে ১৮৮৬ এর ভারতী, ১৮৮০ এর ভারতীর 'স্বরবহস্য' প্রবন্ধে, ১৮৮৮ এর ভারতীতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বরলিপি প্রসঙ্গে রচনা বেরিয়েছিল। ১৯২৩ সালে স্বর্ণকুমারীর গীতিগুচ্ছ প্রকাশ হলে দেখা যায় স্বরলিপি রচনা করেছিলেন ওই গানগুলোর : স্বর্ণ-কুমারী, বজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়, ইন্দিরা দেবী, সরলা দেবী, প্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইত্যাদি। এই গীতিগুচ্ছে ভূমিকায় আকার-মাত্রিক স্বরলিপি-পদ্ধতির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

এই ইতিহাস থেকে অনুমান করা সহজ, গানের জগতে স্বর্ণকুমারী তাঁর সময়ে বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিলেন, কিন্তু 'জীবনস্মৃতি'র গীতচর্চা অধ্যায়ে স্বর্ণকুমারী

দুঃসাধ্য রোগ

একজিমা, সোরাইসিস্, দূষিত ক্ষত, রক্তদোষ, বাতরক্ত, ফুলা, শ্বেত-দাগসহ আরও অনেক কঠিন চর্মরোগ হইতে স্থায়ী মুক্তিলাভের জন্য ৮৪ বৎসরের চিকিৎসাকেন্দ্রে চিকিৎসিত হউন।

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া-১, ফোন : ৬৭-২৩৫৯: শাখা : ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড (হ্যারিসন রোড), কলিকাতা-৯

বঙ্গশ্রী
হাওড়া
৪১/১, জি, টি, রোড, হাওড়া
• বেনারসী
• জোড় • সিল্ক
• তাঁত • মিল
• পোষাক
• সাটিং • সুটিং
ও ছিট কাপড়

অনুপস্থিত। খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্রকথা গ্রন্থে বলেছেন রবীন্দ্রনাথের মুকুট এবং বিবিধ হেঁয়ালীনাট্য স্বর্ণকুমারীর উৎসাহে রচিত হয়েছিল।

স্বর্ণকুমারী যে রবীন্দ্রনাথকে চিরকালই বিশেষ স্নেহ করতেন, তার পরিচয় পরেও পাওয়া যায়। স্বর্ণকুমারীর মৃত্যুর পর মন্মথনাথ ঘোষ স্বর্ণস্মৃতি প্রবন্ধ লেখেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়। সেই প্রবন্ধে তিনি লেখেন, রবীন্দ্রনাথের পত্নী মৃণালিনী দেবীর ছবির জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথ বা রথীন্দ্রনাথের কাছে যান নি, গিয়েছিলেন স্বর্ণকুমারীর কাছে, ১৯৩১ সালে, বিচিত্রার রবীন্দ্রজয়ন্তী সংখ্যা উপলক্ষ্যে। ১৯৩২ সালে সাহিত্যস্রোত সংকলনের একটি প্রবন্ধে স্বর্ণকুমারী তাঁর 'পরম আদরণীয় ভাই' রবীন্দ্রনাথের বিবিধ প্রসঙ্গ নিয়ে লিখেছিলেন।

১৯০৭ সালে রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে শুরু হয় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন। এর ঊনবিংশ বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতি হওয়ার কথা ছিল রবীন্দ্রনাথের এবং সাহিত্য শাখার সভাপতি হওয়ার কথা ছিল স্বর্ণকুমারীর। ১৯৩০ সালের এই অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ অসুখের জন্য কলকাতার ভবানীপুরে আসতে পারেন নি, আমেদাবাদের রোগশয্যা থেকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর ভাষণ। সভাপতির আসন গ্রহণ করে স্বর্ণকুমারী সেই ভাষণ পাঠ করে শোনান। কিন্তু এই ভাষণ (পঞ্চাশোধর্ম্ম) বিচিত্রা পত্রিকায় ১৩৩৬ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথ তার সঙ্গে একটি চিঠিও লেখেন : সম্ভাষণটা অনেক দুঃখের লেখা। আঙুল চলতে চায় না, মৃতালের মত টলোমলো করে, হৃৎপিণ্ডের মধ্যে ভূমিকম্প হতে থাকে—উপবাসক্লান্ত দুর্বল মস্তিষ্ক করুণা ভিক্ষা করে। যমদূতকে উপেক্ষা করে কোনোমতে লিখেছি।....শুনলুম ডাক পেয়াদার মারফত না গিয়ে অবনের মারফতে লেখাটা যাওয়াতে তাঁরা অসম্মানের ক্ষোভে লেখাটার অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। রবীন্দ্রনাথের এই অভিমান সম্ভবত অজ্ঞতাপ্রসূত।

স্বর্ণকুমারীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের মাত্র তিনটি চিঠির সন্ধান পাওয়া গেছে। বিশ্বভারতী পত্রিকার ত্রয়োদশ বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত এই তিনটি চিঠির একটি থেকে জানা যায় যে স্বর্ণকুমারী (২৮ জানুয়ারি ১৯১৩) তাঁর কোনো লেখনো বই অনুবাদ করে আমেরিকা থেকে প্রকাশের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন।

১৯১০ সালে স্বর্ণকুমারীর সপ্তম উপন্যাস ফুলের মালার অনুবাদ করেন কিস্টিনা আলবার্স, মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় : দি ফ্যাটাল গারল্যান্ড।' ১৯১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে লন্ডনের টি ওয়ায়ণার লরেন্স প্রকাশ করেন স্বর্ণকুমারীর অষ্টম উপন্যাস ফাহাকে?'র ইংরেজি অনুবাদ অ্যান আনফিনিশড সঙ্গ। পরের বছরই এই একই অনুবাদের সংস্করণ বের করেন ওই প্রকাশকেরা। পাঠক ছাড়াও, সমালোচকদের কাছে সমাদর পেয়েছিল উপন্যাসটি। অনুবাদ করেন স্বর্ণকুমারী স্বয়ং।

অনুবাদ সম্পর্কে স্বর্ণকুমারীর উৎসাহ পরেও ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনী লেখক মন্মথনাথ ঘোষ তাঁর স্বর্ণ-স্মৃতি প্রবন্ধে লিখেছেন : 'তখন (১৯২৫) তাঁহার দুইখানি উপন্যাস ইংরাজিতে অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। হয়ত তাঁহার কয়েকটি সঙ্গীতেরও অনুবাদ প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা ছিল। আমাকে বলিলেন, তোমার জানা এমন কেহ আছেন, যিনি ইংরাজী পদ্যে আমার কয়েকটি গীত অনুবাদ করিয়া দিতে পারেন? অনুবাদ তাঁহার নামেই প্রকাশিত হইবে।' এর কিছুদিন আগে মন্মথনাথের পিতা ডেথলেস ডিটিস প্রকাশ করেছিলেন, যাতে চণ্ডীদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কবিদের গানের ইংরেজি অনুবাদ হয়েছিল। কয়েকদিনের মধ্যেই মন্মথনাথের পিতার স্বর্ণকুমারীর কয়েকটি বিখ্যাত গানের অনুবাদ নিয়ে গিয়েছিলেন মন্মথনাথ স্বর্ণকুমারীর কাছে।

রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর অনেক বাঙালী লেখকের ধারণা হয়েছিল, ইংরেজিতে রচনা প্রকাশ হলে তাঁদেরও আন্তর্জাতিক পুরস্কার মিলতে পারে। এই ধরণের বহু চিঠি পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁদের লেখা লন্ডনের বিশ্বৎসমাজে দেখানোর জন্য। উল্লেখিত রবীন্দ্রনাথ রোটেনস্টাইনকে চিঠি লিখেছিলেন। এঁদের সম্বন্ধে। এই লেখকদের মধ্যে তিনি স্বর্ণকুমারী দেবীরও নাম করেছিলেন অশ্রদ্ধাভরে।

এই প্রসঙ্গে ইন্দিরা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ৬ মে ১৯১৩ তারিখের চিঠিটা স্মরণযোগ্য।

নদিদি (স্বর্ণকুমারী) আমাকে তাঁর ফুলের মালার তর্জ্জমাটা পাঠিয়েছিলেন। এখানকার সাহিত্যের বাজার যদি দেখতেন তাহলে বুঝতে পারতেন এসব জিনিষ এখানে কেন কোনমতেই চলতে পারবে না। এরা যাকে রিয়েলিটি বলে সে জিনিষটা থাকা চাই। এই জিনিষের সঙ্গে আমাদের কারবার অত্যন্ত কম—সেইজন্যে এটা আমরা চিনিও নে এবং এর অভাবটা কি তা আমরা বুঝিও নে। আমার পক্ষে মুস্কিল এই যে আমি এ সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে লোকে ভুল বুঝবে কেননা আমার রচনাগুলো এরা গ্রহণ করেছে। যদি জিজ্ঞাসা করিস্ কেন করেছে তবে তার উত্তর এই যে, এই কবিতাগুলো আমি লিখব বলে লিখি নি—এ আমার জীবনের ভিতরের জিনিষ—এ আমার সত্যিকারের আত্মনিবেদন—এর মধ্যে আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখ সমস্ত সাধনা বিগলিত হয়ে আপনি আকার ধারণ করেছে। এই জীবনের জিনিষ জীবনের ক্ষেত্রে আদর পায় একথা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, কিন্তু একথা বোঝানো শক্ত। কেননা নিজের ফাঁকি মানুষ নিজে দেখতে পায় না; কেননা ফাঁকি জিনিষটাতে পরিশ্রম বেশি, চেষ্টা বেশি এবং তার প্রতি মানুষের মমতাও বোধহয় বেশি হয়ে থাকে।

মনে রাখা দরকার, যে সময়ে রবীন্দ্রনাথ এই চিঠি লিখছেন, সেই সময়ে তাঁর সঙ অফ্ দ্য রিভার্স সবে বেরিয়েছে এবং টাইমসের সাহিত্য ক্রোড়পত্রের সমালোচক পোয়েটিক পত্রিকায় এরা পাউন্ড, নেশন পত্রিকায় ইভলীন অ্যাণ্ডারহিল ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানে লাসেল অ্যাবারক্রম্বি এবং তার আগে লন্ডনের যে বিশ্বৎসভায় কবিতাগুলো পঠিত হয় সেখানে রবীন্দ্রনাথের এই কবিতা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা প্রকাশিত হয়েছে। তখনো রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পান নি। রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে মনে হওয়া স্বাভাবিক স্বর্ণকুমারীর উপন্যাস তিনি ফাঁকির জিনিষ বলেই গণ্য করছেন। এবং বিদেশের বাজারে এ একেবারেই অচল বলে মনে করছেন।' যদিও কয়েক মাসের মধ্যেই লন্ডনে অ্যান আনফিনিশড সঙের-এর দ্রুত সংস্করণ রবীন্দ্রনাথের ধারণার যাথার্থ প্রমাণ করে নি।

এর আগেই ২৮ জানুয়ারি ১৯১৩ তারিখে রবীন্দ্রনাথ স্বর্ণকুমারীকে জানিয়েছিলেন, 'আমি জানি এ বই প্রকাশ করবার চেষ্টা এখানে সফল হবে না। তাছাড়া তর্জ্জমা খুব ভালো হয়েছে তা নয়—অর্থাৎ ইংরেজি রচনার উচ্চ আদর্শে পৌঁছয় নি।' অনুবাদ করেছিলেন কিস্টিনা আলবার্স এবং সমকালীন ভারতীয় ইংরেজি পত্রপত্রিকার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জন করেছিল বছর দুয়েক আগেই।

রোটেনস্টাইনকে রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে যে চিঠি লিখেছিলেন, তার অংশবিশেষ,

> "She (Swarnakumari) is one of those unfortunate beings who has more ambition than abilities. But just enough talent to keep her mediocrity alive for a short period. Her weakness has been taken advantage of by some unscrupulous literary agents in London and she has had stories translated and published. I have given her no encouragement but I have not been successful in making her see things in their proper light."

রবীন্দ্রনাথের এই চিঠির আরিশ পাওয়া যায় না। স্বর্ণকুমারীর উপন্যাস অ্যান আনফিনিশড সঙের লন্ডনে প্রকাশিত ১৯১৩-এর ডিসেম্বরে। রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসকে স্টোরিস্ বলছেন কি না বোঝা যাচ্ছে না। এই সময়ে স্বর্ণকুমারীর কোনো ছোটগল্পের অনুবাদ লন্ডনে প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা যায় না। অ্যান আনফিনিশড সঙের দ্বিতীয় সংস্করণ এক বছরের মধ্যেই প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটির জন্য রবীন্দ্রনাথ এত লজ্জিত কেন, বোঝা যাচ্ছে না।

*

১২৯৬ সালের আশ্বিন সংখ্যার ভারতী ও বালক পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'নব্যবঙ্গের আন্দোলন' প্রবন্ধ প্রকাশ হয়। এই প্রবন্ধের সঙ্গে সম্পাদক স্বর্ণকুমারী তাঁর মন্তব্যও প্রকাশ করেন পাদটীকায়। পাদটীকাটি তাৎপর্যপূর্ণ।

লেখক আমাদের এখনকার পলিটিক্যাল আন্দোলন যেরূপ অসার মনে করেন একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখিবেন তাহা নহে। এই আন্দোলনের মধ্যেই কার্য্য করিবার একটি ইচ্ছা, জাতীয় মহত্ত্বলাভের দিকে অগ্রসর হইবার একটি উদ্যম প্রকাশ পাইতেছে; তবে লেখক একদিনেই যদি আমাদের শত শত বৎসরের অবনতির বিনাশ দেখিতে চান তাহা

কি করিয়া পাইবেন?। লেখক বলিয়াছেন, আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই আছেন যাঁহারা রাজাশসনতন্ত্র এবং রিপ্রেজেনটিটিভ গভর্ণমেন্টের মূল নিয়ম এবং আমাদের দেশে বর্তমান কালে তাহার উপযোগিতা ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু অবগত আছেন অথবা প্রকৃত পরিশ্রম করিয়া তদ্বিষয়ে কিছু জানিতে অভিলাষী আছেন। অবশ্য দেশের অধিকাংশ লোক যদি যোগ্য হইত তাহা হইলে ত সমস্ত গোল চুকিয়া যাইত, এরূপ পলিটিক্যাল আন্দোলনেরই বা তাহা হইলে আবশ্যক কোথা? কিন্তু আমাদের দেশ কোন ছার কথা, ইয়ুরোপের কোন দেশেই কি অধিকাংশ লোকে রাজ্য-শাসনতন্ত্রের মর্মগত নিয়ম বিচার করিয়া কাজ করে? এরূপ স্থলে সর্বত্রই নেতাগণ প্রধান, তাঁহাদের প্রাণগত চেষ্টা, মহত্তই জাতীয় উন্নতির কারণ। আমাদিগের পোলি-টিক্যাল নেতাগণের সকলে না হউন, যখন অনেকেই তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনে প্রাণগত চেষ্টা করিতেছেন, তখন কি এই আন্দোলনকে আমরা সারশূন্য বলিতে পারি?। চরিত্র—মাহাত্ম্য নহিলে কোন উন্নতি হয় না সত্য, কিন্তু ইহার দিকে আমাদের যে লক্ষ্য পড়িয়াছে—তাহার উক্ত রূপ অনেক প্রমাণ দেখা যাইতেছে, তাহা ছাড়া লেখকের বর্তমান প্রবন্ধই তাহার একটি প্রমাণ।

এই প্রসঙ্গে কংগ্রেসের সঙ্গে ঠাকুর-বাড়ির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক খুবই তাৎপর্যপূর্ণ

পুড়ে যাওয়া ক্ষতের চিকিৎসা
অন্য রকম ক্ষত থেকে আলাদা!

পুড়ে যাওয়া ক্ষতের জ্বালা-যন্ত্রণা অন্য ধরনের ক্ষত থেকে একেবারে আলাদা।—
জ্বলুনী—বেদনা—ফোসকা পড়া প্রভৃতি। এই পুড়ে যাওয়া ক্ষতের জন্য আপনার
এমন অ্যান্টিসেপ্টিক চাই যা সব রকম জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে চটপট আরাম এনে দেয়।
আর তা এমনই অ্যান্টিসেপ্টিক যা আপনারের সহায়ই সুপরিচিত—তা'হল বার্নল।
চটপট ঠাণ্ডা আরাম এনে দিতে বার্নল অদ্বিতীয়। বার্নল
অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীমেতে এর সবকটি গুণই রয়েছে যা পুড়ে
যাওয়া ক্ষত জন্যই উপশম করে। সবসময়ে ঘরেতে বার্নল
রাখুন, এই পুড়ে যাওয়া ক্ষত উপশমের আসল
চিকিৎসা।

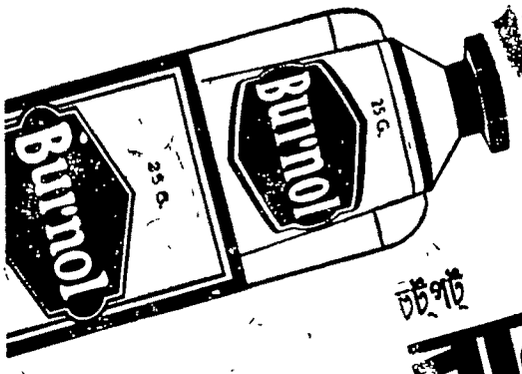

চটপট
বার্নল লাগান
পুড়ে যাওয়া ক্ষত উপশমের
আসল চিকিৎসা

Boots

মনে হতে পারে, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের।

স্বর্ণকুমারীর স্বামী জানকীনাথ ঘোষাল ছিলেন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান। কংগ্রেসের প্রথম দশকে তিনি ছিলেন কংগ্রেসের সহকারী সম্পাদক। হিউম ১৯০৬ পর্যন্ত কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন, কিন্তু ১৮৯৪-এর পর তিনি আর ভারতে আসেন নি, সম্পাদকের কাজ জানকীনাথই করতেন। হিউম এবং জানকীনাথের যুগ্ম চেষ্টায় কংগ্রেসের সূত্রপাত হয়। ১৯১৭ সাল পর্যন্ত জানকীনাথই ছিলেন একমাত্র বাঙালী যিনি কংগ্রেসের সম্পাদক বা যুগ্ম-সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। জানকীনাথের মৃত্যু হয় ১৯২৩ সালে।

কংগ্রেসের সঙ্গে অতএব ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক সম্পর্ক থাকবে, বলাই বাহুল্য। ১৮৮৯-এ বোম্বাই অধিবেশনে এবং ১৮৯০-এ কলকাতা অধিবেশনে স্বর্ণকুমারী প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন।

১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে বোম্বাইয়ে। ইংরেজ সরকারের সমালোচনার জন্য বাঙালী নেতারা এই অধিবেশনে আমন্ত্রিত হন নি। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ে অনুমান করেছেন, জাতীয় কর্মক্ষেত্রে বাঙালী স্থান না নেওয়ার ক্ষোভে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'আহ্বানগীত' কবিতা (কড়ি ও কোমল) এবং লাইব্রেরি নামক প্রবন্ধ (বিচিত্র প্রবন্ধ)। রবীন্দ্রনাথ এসময়ে ছিলেন বোম্বাইয়ের কাছে বন্দেরায়।

কংগ্রেসের ১৮৮৬ সালের অধিবেশন হল কলকাতায়, প্রতিনিধি প্রায় চারশো। রবীন্দ্রনাথ এই অধিবেশনের উদ্বোধন সঙ্গীত রচনা করে গাইলেন, 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।'

১৮৮৮ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হল কলকাতায় ২৫শে অক্টোবর। রবীন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই কংগ্রেসে বেঙ্গল ন্যাশনাল লীগের প্রতিনিধি।

১৮৮৮ সালে কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশন বসল এলাহাবাদে। সভাপতি জর্জ ইয়ুল। কলকাতার ব্যারিস্টার নর্টন কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষক। ইয়ুল এবং নর্টনের সম্মানে ঠাকুরবাড়ীর ছেলেরা পার্টি দেন, তাতে ব্যস্ত থকেন রবীন্দ্রনাথ।

১৮৯০ সালে কলকাতার এমারেল্ড থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেন 'মন্ত্রি-অভিষেক' প্রবন্ধ, ২৬শে এপ্রিল। এই প্রবন্ধে তিনি বললেন, তিনি কংগ্রেসের, কনগ্রেসের বিরোধী পক্ষে যোগ দিতে পারিব না।' এই বছর কলকাতার টিভলি ফেন্সেভেস-এ কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনে আর্ট ছাত্রের প্রতিনিধি যোগ দেন। একটি গ্রুপ ফোটোতে রবীন্দ্রনাথকে দেখা যায় পিরালী পাগড়ি পরা অবস্থায় কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে, যাদের পরনে বিলিতি পোষাক।'

১৮৯৩ সালের পুণা কংগ্রেসে মুসলমানরা যোগ দিল না, গোরক্ষণী সভা আন্দোলনের জন্য।] রবীন্দ্রনাথ এই সময় হিন্দুমুসলমান বিরোধিতা সৃষ্টি করে ইংরেজ সরকার নিজ স্বার্থ সিদ্ধি করছে। এই মর্মে প্রবন্ধ লিখে কংগ্রেসকে সতর্ক করতে চাইলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে বললেন প্রকৃত আন্দোলন হওয়া উচিত আত্মশক্তির উদ্বোধনে। এই প্রবন্ধগুলো ইংরেজের আতঙ্ক, ইংরেজ ও ভারতবাসী, সুবিচারের অধিকার, ক্ষমা ও প্রজা, রাজনীতির দ্বিধা।

১৮৯৬-এর কলকাতা কংগ্রেসে (বিডন স্কোয়ারে, ডিসেম্বর মাসে) রবীন্দ্রনাথ অধিবেশনের উদ্বোধন সঙ্গীত গাইলেন, বন্দে মাতরম্। ঠাকুরবাড়ীতে কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের জমকালো পার্টি দেওয়া হল। এই প্রীতি সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ গাইলেন, অয়ি ভুবনমন মোহিনী।

১৮৯৭-এর বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রসভা হল নাটোরে, সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ সভাপতির ইংরাজী ভাষণ পাঠের পর বাংলায় অনুবাদ করে শোনালেন। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সমর্থকরা বাঙালীবেশে অধিবেশনে গিয়েছিলেন এবং কংগ্রেসের প্রতিনিধির সাহেবি চালচলনে ক্ষুব্ধ হয়ে লিখেছিলেন, ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।

১৮৯৭-এর অমরাবতী কংগ্রেসে ব্রিটিশ সরকারের মতামত-স্বাধীনতা খর্ব করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রস্তাব গৃহীত হয়। তার অনুক্রমণে ১৮৯৮-এর ফেব্রুয়ারি মাসে রবীন্দ্রনাথ গড়লেন, কণ্ঠরোধ, কলকাতার টাউন হলে।'

১৮৯৮-এর ঢাকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রসভার সভাপতি ছিলেন বেভারেন্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর ভাষণের বঙ্গানুবাদ পাঠ করেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু এইসব সভার সঙ্গে জনসাধারণের সংযোগের অভাব লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, এর দ্বারা দেশের কোন কাজ হবে? (ভারতী, আষাঢ়, ১৩০৫)।'

এই দীর্ঘকাল রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত আছেন বটে, কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ খুব অল্প সময়েই কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের মতাদর্শ থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল। কংগ্রেসী মত সম্পর্কে অশ্রদ্ধা তিনি কখনোই গোপন করেন নি, প্রকাশ্যে, অধিবেশনে, বক্তৃতায়, প্রবন্ধে, গল্পে এবং অপ্রকাশ্যে চিঠিপত্রে এই আন্দোলন সম্পর্কে বিদ্রূপ করে এসেছেন।'

স্বর্ণকুমারী এবং সরলা দেবী এই সময়ে কংগ্রেসের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ, জানকীনাথের সূত্রেও বটে, নিজেদের স্বাদেশিকতার আদর্শের জন্যও বটে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা প্রকাশ্যে না ঘটলেও, অপ্রকাশ্যে যে চলছিল অনুমান করা সঙ্গত। ১২৯৬-এর আশ্বিনের ভারতীতে স্বর্ণকুমারীর মন্তব্য তার অন্যতম প্রমাণ।

স্বর্ণকুমারী এবং সরলা যে দেশসেবাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণভাবে নিয়েছিলেন, তার প্রমাণ স্বর্ণকুমারী ঠিক করেছিলেন, সরলার তিনি বিয়ে দেবেন না, সরলা শুধু দেশসেবা করবেন।' এমন কি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও সরলার সঙ্গে তরবারির বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যাতে সরলা যাবজ্জীবন দেশসেবা করতে পারেন। স্বর্ণকুমারীর 'ত্রয়ী' উপন্যাসত্রয়ের রাজকন্যা জ্যোতির্ময়ীর চরিত্র তৈরি হয়েছিল সরলা দেবীর স্বাদেশিকতার আদর্শে, তাঁর দেশানুরাগ, ব্যায়াম সমিতি স্থাপন প্রভৃতির ছায়ায়। এই তীব্র উগ্র দেশপ্রেমের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মানবপ্রেমের পার্থক্য দিনে দিনেই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যার শুরুতে রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ' মতাবাদ এবং পরিণতি অসহযোগ আন্দোলন বিরোধিতা।

*

সরলা দেবীর তেজস্বিতা এবং দৃঢ়তা, যা অনেকের কাছে দাম্ভিকতা এবং একগুঁয়েমি মনে হতে পারে, সম্ভবত রবীন্দ্রনাথকে বিরূপ করে থাকবে। এই প্রসঙ্গে নিবেদিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য স্মরণযোগ্য। ১৯১১ সালে লেখা 'ভগিনী নিবেদিতা' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন,

'তাঁহার প্রবল শক্তি আমি অনুভব করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বুঝিয়াছিলাম তাঁহার পথ আমার চলিবার পথ নহে। তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভা ছিল, সেই সঙ্গে তাঁহার আর একটি জিনিস ছিল। সেটি তাঁহার ঋজুত্ব। তাঁহার বল ছিল, এবং সেই বল তিনি অন্যের জীবনের উপর একান্ত বেগে প্রয়োগ করিতেন—মনকে পরাভূত করিয়া অধিকার লইবার একটা বিপুল উৎসাহ তাঁহার মধ্যে কাজ করিত। যেখানে তাঁহাকে মানিয়া চলা অসম্ভব সেখানে তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া চলা কঠিন ছিল। অন্তত আমি নিজের দিক দিয়া বলিতে পারি তাঁহার সঙ্গে আমার মিলনের নানা অবকাশ ঘটিলেও এক জায়গায় অন্তরের মধ্যে আমি গভীর বাধা অনুভব করিতাম। সে যে ঠিক মতের অনৈক্যের বাধা তাহা নহে, সে যেন একটা বলবান আক্রমণের বাধা।'

নিবেদিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে-ভাব পোষণ করতেন, সরলা দেবী সম্পর্কেও হয়ত সেই ভাবই পোষণ করতেন। তাই ১৯০৩-এর পর থেকে রবীন্দ্রনাথ সরলা দেবীকে উপেক্ষা করে এসেছেন, মধ্যে মধ্যে ভর্ৎসনা করা ছাড়া।

মেয়েদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটু অনুকম্পামিশ্রিত অবজ্ঞাও ছিল। রাণী চন্দকে তিনি বলেছিলেন (আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ) ১৭ জানুয়ারি ১৯৩৮ সালে, 'হাজার হোক এটা মানতেই হবে, পুরুষের ও মেয়েদের বিলাত সবদিক থেকেই আলাদা। পুরুষের বেলা, তার শক্তি চের বেশি মজবুত। ধর-না কেন, আমি যদি আমার ন-দিদি (স্বর্ণকুমারী দেবী) হতুম তবে কি এমনি আমার জায়গায় আমি উঠতে পারতুম? সংসারের বাধাবিঘ্ন ছেড়ে দে, তা না হলেও মেয়েদের বেলা এতটা কাজ করতেই পারে না।' আবার পরে ১৩ জানুয়ারি ১৯৪১ বলেছিলেন 'দয়া সেবা ধারণ পালন, এতেই তোদের সত্যিকার রূপ প্রকাশ পায়।'

৬২.৬৭ টা. কি করে ১০০ টা. হবে?

ব্যাঙ্ক অফ বরোদার জনতা ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনলে।

তাহলে এই তালিকাটি লক্ষ্য করুন:

জনতা ক্যাশ সার্টিফিকেটের আসল দাম টা.	বলবৎ বিভিন্ন সময় অনুসারে কেনার সময়		
	৩৬ মাস টা.	৩৯ মাস টা.	৬০ মাস টা.
১০	৮.৩৬	৭.৮৫	৬.২৭
৫০	৪১.৮২	৩৯.২৭	৩১.৩৪
১০০	৮৩.৬৪	৭৮.৫৫	৬২.৬৭
৫০০	৪১৮.১৯	৩৯২.৭৩	৩১৩.৩৬

ঠিক ঐভাবে ৭৫ টা. ২৫০ টা. আর ১০০০ টাকার জনতা ক্যাশ সার্টিফিকেটও পাওয়া যায়। যখন সুবিধে হবে, যত পরিমাণে সুবিধে হবে জনতা ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনতে থাকুন।

পেনসন, বোনাস বা মাইনে পাওয়ার দিনই হচ্ছে সঞ্চয়ের দিন—জনতা ক্যাশ সার্টিফিকেট কেনার দিন।

অল্প সঞ্চয় আনুক অপার সৌভাগ্য!

আরও বিশদভাবে জানতে হলে ব্যাঙ্ক অফ বরোদার আপনার নিকটতম শাখায় পদার্পণ করুন।

BANK OF BARODA

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

(ভারত সরকারের অধীনস্থ সংস্থা)

ভারতে ও বিদেশে ১৩০০ টিরও বেশী শাখার জাল বিস্তৃত।
৭০ বছর ধরে ব্যাঙ্কিং-এর সুবিধে,
২৫ বছর ধরে বিদেশে প্রসার।

U-BOB-JCC-1/8 Ben

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

হাওয়া গাড়ি

।।সাইত্রিশ।।

আদিগঙ্গার গায়ে চেতলার এ-রাস্তায় আগে কখনো এত গাড়ি দাঁড়ায়নি। এমনিতে এখানে হাতে টানা রিকসাই বেশি। মাঝে মধ্যে হাপানির টান ওঠা হা-ঘরে ট্যাকসি ঘনঘন করতে করতে চলে যায়। পাউরুটির কারখানা থেকে মিষ্টি একটা গন্ধ বাতাসে ভুর ভুর করছিলো। সে-গন্ধ নিঃশ্বাসের সঙ্গে বুকের ভেতরে টেনে নিতে ভালোই লাগছিলো কিরীটী পালিতের।

দেওয়ালের বাংলা ক্যালেন্ডারে ফাল্গুনের পাতাখানা আদিগঙ্গা থেকে উঠে আসা বিকেলের মিনমিনে বাতাসে সামান্য কাঁপছিলো। এখন বোধহয় বেলা তিনটে সাড়ে তিনটে হবে। শেষপাতে গায়ে কাঁথা দিতে হচ্ছে দিন তিনেক। নয়তো শীত শীত করে।

কিরীটী পালিত তার দোতলার ঘরে টেবিলে বসে আদিগঙ্গার ওপারে ভীষণ চেনা একটা টিনের চাদ দেখতে লাগলো। দেখতে দেখতে তার চোখ থেকে আলো, বাড়ি, জল, —সব মুছে গেল। কিংবা সামনে থাকলেও তার কোন ছাপ কিরীটী পালিতের মাথায় পড়লো না।

আর কদিন ধরেই শুধু লোকের পর লোক আসছে। ফিয়ারলেস, হাউসিং কো-অপারেটিভ। সেবাশ্রম। সব জায়গার লোক এসে একই কথা বলে। আপনার একটা নাম থাকা দরকার এ পৃথিবীতে। আপনার নামে —নয়তো আপনার বাবার নামে টাকা দিন। হাসপাতালের পুরো একটা ওয়ার্ডের নাম আপনাদেরই নামে হবে। আপনাদের নামেই পালিত কোঅপারেটিভ পরিচিত হোক। আপনার টাকা সুদে বাড়বে। আমাদের কাছে জমা রাখুন।

পুরো একটা কোটি টাকার ডিকি পাওয়া মস্ত এক ঝকমারি। তাও তো টাকা এখনও হাতে আসেনি। এলে না জানি কি হবে।

শীতের বাতাস এখনো কলকাতায় আসেনি। তবু তার আগম ভাবটা শহরে পৌঁছে গেছে। কিরীটী এখন সেই বাতাসকে দেখতে পাচ্ছিলো। খবরটা কাগজে পড়ে স্বয়ং পি এম জি এসেছিলেন। যাবার সময় বলে গেছেন—এখন কিছুদিন বাড়িতে রেস্ট নিন। ইচ্ছে হলে চাকরি করবেন। নয়তো পেনশনের বেনিফিট নিয়ে বিদায় করবেন

খোকনের বউ চা দিয়ে গেল। কিরীটী বললো, চিনি দাওনি তো মা—

না। মা চা করেছেন।

কিরীটীর বেশ ভালোই লাগে এই বউটিকে। খোকনের দ্বিতীয় বউ। বাচ্চা-টিকে আগলে নিয়েছে। সে তো না বলতে অজ্ঞান। এখনো বউমারা নিজের কোলে কোন বাচ্চা আসেনি। এক এক সময় সন্দেহ হয় কিরীটীর। তার গোঁবাড়গোবিন্দ মেজো ছেলেটা কোন প্রতিশোধ নিচ্ছে না তো? মানে—ভাবটা অনেকটা এইরকম—বিয়ে করেছি তো করেছি—কিন্তু আগে আমার আগের পক্ষের বাচ্চাটাকে ন্যাওটা করে নাও —তবে তোমার কোল ভরে বাচ্চা আসবে। নয়তো নয়।

নতুন গেতু ধানের খড় বোঝাই দিয়ে নৌকো যাচ্ছে গড়িয়ায়। কিরীটীর ছোট বেলায় এই আদিগঙ্গাতেই শ্রীহট্টের কমলার নৌকে আসতো। আসতো চালের নৌকো। নদী নালায় কত যোগ ছিল।

তোমার মাকে একটু ডেকে দিও তো।

স্যাকরামশাই এসেছেন। ডিজাইন দেখাচ্ছেন।

তাই নাকি। অবাক হয়ে ঘুরে তাকালো কিরীটী। ততক্ষণে তার মেজোছেলের বউ নিচে নেমে গেছে। কালই রাতে ছেলেদের মায়ের সঙ্গে বিছানায় শুয়ে অনেক কথা হয়েছে। অনেক দিন পরে। ইদানীং তো আর কথাই হয় না। উমা সারাদিনই চুপচাপ থাকার মানুষ।

আমার বউকে বাবা পছন্দ করে এনে-ছিলেন। এই স্যাকরা বাবার আমলের। বাবা শ্রীহট্টের নৌকো থেকে এক সময় হাটে দাঁড়িয়ে শাঁখ দরে কমলা কিনতেন।

উমা বলছিলো, জামাইকে এবার ফিরিয়ে আনো।

কিরীটী বলেছে, কোথেকে আনবো? জানিই না সে কোথায় আছে। তাছাড়া—

খুকু জানে।

মালবিকা মানে?

হ্যাঁ। কোথেকে যেন খোঁজ পেয়েছে। আর অন্য কি কথা বলছিলে তুমি?

খুকুর সঙ্গে কি বলবে

স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া ওরকম হয়। আবার মিটেও যায়।

এ সেরকম নয় উমা। একজন সব উড়িয়েপুড়িয়ে ছারেখারে দিতে চায়। অন্যজন দৌড়ে মেডেল আনতে যায়। এ তুমি মেলাবে কি করে।

থামো। তুমি তো লাই দিয়ে দিয়ে মেয়েটার মাথা খেলে।

না উমা। মালবিকার ভেতর মেটাল আছে। সি ইজ আ বর্ণ অ্যাথলেট। তার প্রতিভার বিকাশের পথে আমাদের বাবা হওয়া উচিত নয়।

ছাড়ো তো তোমার প্রতিভা। গেছোমি করে বেড়াচ্ছে। ছেলেটা বড় হোল। তাকে কতদিন কোলে নিই না। বেয়াইমশায়ের এই বিপদে—

বেয়াই কাকে বলছো উমা?

কেন? আমরা কণেপক্ষ হচ্ছি। এত বাড় ভালো নয়। দিলীপবাবুর কি হোল, বেয়ান—

ধমকে উঠেছিল কিরীটী মশারির ভেতর। চতুলায় ইদানীং মশা আরও বেড়েছে। খুনীর বাবা খুনীই হয়। কাগজে পড়োনি? অ্যারেস্ট হয়েছেন তো তোমার বেয়াইমশাই। এতবড় হামবাগ একদিন এসেছিলো মোটে। তখন মালবিকা ও বাড়ি ছেড়ে গেছে। আমাকে বোঝাতে এসেছিলো। তখন বেয়ান খুকুকে হট্ট করে নিয়ে গিয়েছেন।

আঃ! চুপ করো। খুকু ঘুমোচ্ছে এখনো।

ওর ঘুম ভাঙবে উমা তোমার জন্যে। এবং খুকুর সাউন্ড স্লিপ হওয়া দরকার। কদিন পরেই সিঙ্গাপুরে এশিয়ান গেমসে দৌড়বে—

মেয়েদের মন তুমি কতটুকু জানো? বলে চুপ করে গেল উমা। তারপর আপনা-আপনিই শুরু করে দিলো। একদম দম লাগানো টিমেগলার। বেয়ানের একটা খবর আমি নিজেই কাল নিতে যেতাম। সেই ফাঁকে একবার দাদুভাইকে দেখে আসতো।

ও বাড়ির কথা মুখে আনবে না উমা।

ও কি কথা বলছো তুমি? আমি চুপ করে থাকি বলে। আমার মেয়ের গর্ভের ছেলেকে আমরা একবার এবাড়ি আনতে পারবো না? তুমি তো বড় বাজে বকো।

তা তো বলবেই। এত দিন বলে এসেছো—কী ছাইপাঁশ লেখো সারাদিন। আর এখন সেই ছাইপাঁশ জিনিস থেকে টাকা আসছে দেখে স্যাকরাকে আসতে বলে পাঠিয়েছো!

বড় মুখে কথা বোলো না। ফাঁকতালে টাকা পেয়ে বড় কথা বোলো না।

এটা আমার আইডিয়ার স্বীকৃতি উমা।

আইডিয়া! নিজের মেয়ের জীবন সম্পর্কে যার কোন আইডিয়া নেই!

অন্ধকারে মশারির ভেতর কিরীটী কোন কথা বলতে পারেনি। এক সময় মনে হয়েছিলো—উমা বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু না। নিজে নিজেই ওপাশ ফিরে কথা বলে যাচ্ছিলো। টাপু যেই রোজগার শুরু করলো— আর অমনি তার পাঠানো টাকা গুলো নিজের টাকে গুঁজলে—

কে বলেছে? তার নামে আমি ফিক্সডে রাখছি। রেকারিং অ্যাকাউন্ট করেছি ব্যাংকে।

কোথায়? আমাকে তো বলোনি একবারও।

সব কথা তোমায় বলতে হবে? টাপুর টাপুনো টাকা থেকে অনেকই খরচা হয় সংসারে।

তোমাকে তো বলতে। আমি তার মা। টাপুর এখন একটা বিয়ে পাওয়া দরকার।

তার আগে খুকুর বিয়ে দেব আমি। ভিক্টরকে ফোন ফিরেই।

পাত্রজামো কোনো না। খুকুর বিয়ে হয়ে গেছে।

ও বিয়ে বিয়েই নয়। ভালো ছেলে দেখে আমি ধুমধাম করে বিয়ে দেব এবারে।

ভুলে কোরো না। খুকুর স্বামী বেঁচে আছে। ছেলে বেঁচে আছে।

স্বামী না আরও কিছু। বেঁচে আছে কিনা সন্দেহ। পুলিশ রবিকে পেলে এক গুলিতে খুলি উড়িয়ে দেবে।

মেয়ের বাবা হয়ে একথা বলতে পারলে তুমি? আজ কদিন হোল এদিক সেদিক পাঠিয়ে রবির খবর নিচ্ছে খুকু।

তাই নাকি?

কতটুকু খবর রাখো সংসারের। শুধু আইডিয়া মাথার গজগজ করছে—আজ খস-খস করে লিখে রাখছো। এখন তো তোমার অনেক টাকা।

আগে হাতে আসুক তো।

সবকারী টাকা—ও ঠিক হাতে আসবে। তোমার বাবার একটা খোঁজ নিতে পেরেছো এতদিনে? অমন গদাধর মনুষ্যটা কোথায় হারিয়ে গেল—। আর কথা বলতে পারে নি উমা। তাকে পছন্দ করে বউ করে এনেছিলো বৃন্দাবন পালিত।

কার্তিকের এই পড়ন্ত বেলায় জানলা দিয়ে নদী দেখে সেই কথাই মনে হচ্ছিলো কিরীটীর। বাতাস শুকনো হয়ে আসছে। তাতে শুকনো ধুলো। সারা দিন লোক এসেছে। এখন এদিকটা ফাঁকা। কদিনই গাড়ির পর গাড়ি এ বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থেকেছে। কত লোক। তাদের আশার শেষ নেই। প্রোপোজালের পর প্রোপোজাল নিয়ে এসেছে। থানা থেকে বড়বাবু এ এস আই পাঠিয়ে জানতে চেয়েছেন—এখন আপনি বড়লোক। মোটা টাকার মানুষ। আপনার সিকিউরিটির জন্যে আমরা দায়ী। কারও সম্পর্কে খারাপ কোন সন্দেহ হলে আমাদের জানাবেন। আমরা ওয়াচ রাখবো। দরকার হলে স্টেপ নেবো।

কিরীটী বলেছেন না মশাই। দরকার নেই। আমার কোন শত্রু নেই। পারেন তো আমার বাবাকে খুঁজে বের করুন।

ডাইরি করেছিলেন?

কটা ডাইরির কিনারা হয় আপনাদের।

ডাইরি না থাকলে আমাদের তো হাত-পা বাঁধা স্যার।

স্যার কথাটা শুনে হো হো করে হেসে উঠতে যাচ্ছিলো কিরীটী। ওই থানাতেই একবার খুকুকে রবির জন্যে ইন্টারোগেট করতে ডেকে নিয়ে কী বিচ্ছিরি ব্যবহার করেছিলো। মনে করেনি? হামবাগ দিলদার বোস একবারই এ-বাড়ি এসেছে। কথা বলার কী ছিরি! আমি একজন গেরস্থ সামান্য বলেই কি আমার দিকে উঁচু থেকে তাকিয়ে কথা বলা যায়?

কিরীটী অনেক দূরেও মানুষের বিশ্ববিদ্যার ভালো করার কোন পাকাপোক্ত আইডিয়া খাড়া করতে পারেনি। এমন আই-ডিয়া যা দিয়ে কিনা দেশশুদ্ধ হামবাগ, টায়রান্টদের নমঃ, সিমপ্যাথেটিক করে তোলা যাবে। পড়শীকে ভালোবাসতে শেখার প্রতিভার বিকাশে যা কিছু বাধা হয়ে দাঁড়ায়—তা সরিয়ে দেওয়া যায়।

কদিন আগে কাগজে একটা বিজ্ঞাপন চোখে পড়েছিলো কিরীটীর। কোন্ এক স্বাতী সরকার বিহেবিয়ার স্কুল খুলেছে। সেখানে বড়দের মেয়েদের আরও ভালো ঘরে পড়ার সহবৎ শেখানো হয়। কিন্তু দেমাক, চোখ পোড়ানো, চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলা—কী দিয়ে আটকানো যাবে। সে-জন্যে চাই একটা সলিড আইডিয়া। সেই আইডিয়াটা মাথার ভেতর এক পাক দিয়ে নিয়ে আসতে পারলেই কীবিটি লিখে ফেলবে। পাছে ভুলে যায়—তাই খসখস করে কাগজে তুলে ফেলবে। তারপর খসড়াটা তিনচারবার পালটে নিয়ে পেটেন্ট করতে দিলি পাঠাবে। এতো আর সাধু-সন্তদের সদাচার প্র্যাকটিস নয়। এ বর্ণচিত্তন ভাবে মনের ভেতরটা শাদা করে ফেলার কঠিন তালিম।

মাসখানেকের ভেতর শীত আসবে। আলোয় তারই মহড়া চলছে। দিবা দিনের বেলার একটা অদৃশ্য ছায়ার ব্যাকড্রপ গোধূলি নেমে আসবে। আজ যদি বাবা থাকতেন। কথাটা ভেবে কিরীটী পালিত মনের ভেতরে নিজেকে খানিকক্ষণ অপ-রাধী করে রাখলো। বাবা আছেন। নিশ্চিত আছেন। আমি শুধু খুঁজে পাচ্ছি না। জন্মদাতা পিতা। যেখানেই থাকুন তাঁকে খুঁজে বের করাই আমার কাজ। তাঁর জন্যেই আমার এখানে আসা। বাবা থাকলে মনে হয় মাথার ওপর কেউ আছে। নয়তো আমিই তো এ-বাড়িতে সব-চেয়ে বড়। সে এক বিচ্ছিরি ব্যাপার। যাতে কোন আনন্দ নেই। বাবা তুমি কোথায় একা একা আছো? কাদের সঙ্গে ঘরে বেড়াচ্ছো? তুমি থাকলে কী খুশিই হতে—খোকোন আবার বিয়ে করেছে। মালবিকার একটা বিয়ে হয়েছিলো। সেটা টেকেনি। কিন্তু মালবিকা আবার পুরোদস্তুর আপ-স্লেটের লাইফে ফিরে গেছে। এবারও সিঙ্গা-পুরে এশিয়ান গেমসে যোগদানের নেমন্তন্ন পাইয়ে মিটার ট্যাক্সে বেসে টুরিস্টদের রিপ্রেজেন্ট করেছে। আমি জানি হয়তো পুরুষ তোমার গলাতেই টোপা দেবে। আমি পারবো হতে পারিনি। কিন্তু তোমার বউ নাতি এখন ফিউচারিক ডিরেকটর। বাচ্চাও টাপুর সঙ্গে চলে যাবে সামনের মাসে। যারা কলিন ফিরে এসো। যেখানেই থাকো ফিরে এসো। এই সময় তোমাকে আমার ভীষণ দরকার। তোমায় কিন্তু করতে হবে না। তুমি শুধু এখানে থাকবে। ব্যাস হাতে মিনিট গোনতে যাবে। বাকি সব আমি পিক টিল করে মারবো। তুমি থাকলেই সব আপনা-আপনি হয়ে যাবে বাবা।

কিরীটী পালিতের স্বপ্নের চতুষ্পদ জন্তু কিংবা অপরূপা ছায়া আমাদের নেমে এলো। আলিঙ্গনে একই ভেতর অন্তর্হিত।

ঠিক তখন কোর্ট লক আপের লোহার শিক ধরে রবি উঠে দাঁড়ালো, না। আমার কোন উকিল লাগবে না। আর—তোমার উকিল আমি নেবোও না মালবিকা—

অন্য কেউ হলে এতক্ষণ লকআপের সামনে দাঁড়িয়ে থাকার সুযোগ পেতো না। মালবিকা বলেই এতটা। এবারে মেয়ে অ্যাথলেটসদের ভেতর এশিয়ান গেমসের সুবাদে তার ছবি সব কাগজে বেরিয়েছে। তাছাড়া সে টাকা কোটিপতি কিরীটী পালিতের একমাত্র মেয়ে—একথাও কাগজগুলো লিখিছে। আরও লিখেছে—শ্রীমতী মালবিকার স্বামী রাজনৈতিক কারণে ফেরার। এখন এভাবে লোকে কেন ফেরার হয়—সবাই তা জানে।

কোর্ট ভাঙার মুখে। রবির এখন সাধারণ কোন কোর্টে ট্রায়াল হচ্ছে না। সেকথাই রবি বললো। তুমি ফিরে যাও। যখন আমার ছেলের জন্যেও তোমাকে আমার ভীষন দরকার ছিলো—তখন তোমাকে পাওয়া যায়নি। তুমি ট্যাক টেবসের জন্যে তৈরি হয়েছো। বড় অ্যাথলেট হবে। রবি আর বলতে পারলো না।

তুমিও তো তোমার কাজ করছিলে আমার ছেলে তো তোমাকেও পায়নি রবি—। আমি তো তবু পেটে ধরেছি। কোলে নিয়েছি। তুমি?

—আমার বাবা মা বোন—ওকে দেখেছে।

সে দেখাও এখন বন্ধ।

কেন?

তোমার বাবা খুনের দায়ে অ্যারেস্ট হয়েছেন—

কী বাজে বকছো?

নির্জলা সত্যি কথা। তোমার বাবা ফেরার অবস্থায় দমকলের ঘন্টাও নাকি চুরি হতে গিয়েছিলেন।

থামো। আমার বাবা খুনী। আমার বাবা চোর। সে খবর আমি তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই না। ঠিক এইসময় প্লেন সিমেন্টের ওপর দিয়ে খটখট করে শব্দ তুলে একজন সেন্ট্রি স্পেশাল কোর্টের কাগজপত্তর নিয়ে স্পেশাল জজের ঘরের দিকে গেল। রবি আজ সারাদিন কাঠগড়ায় ছিলো। কালু ঘোষ কতক্ষণ লেভেল ক্রসিংয়ে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো? তিনি সেদিন স্টিমবিংসে বসেছিলেন? এরকম হাজারো কোশ্চেন। পুরো ব্যাপারটাই এখন সেভেন্থ ট্রাইবুনালের হতে। কালু ঘোষের মত বেসব কেস—যেখানে পুলিশ-অ্যাকুইজড সম্পর্কে সিওর—অথচ কনসিকোয়েনশিয়াল এভিডেন্সের অভাবে এগোতে পারছে না—সেরকম ব্যাপারেই এই ট্রাইবুনাল। শ্রীকাকুলমের তিনজন, কলকাতার রবি বসু ছাড়াও আরও তিনজনকে আজ সারাদিন কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। রবি সব কোশ্চেনের একটাই জবাব দিয়ে আসছে। আমি জানি না। আমি দেখিনি। আমি চিনি না। এরকম জবাব দিতে দিতেই সে ভিড়ের ভেতর মালবিকাকে দেখতে পায়। দেখে সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে নেয়।

রবি বললো, সেভেন্থ ট্রাইবুনালে আমার বিচার হচ্ছে। আমি ল. মার্ডার, তার পরিণাম জানি মালবিকা। আমার বাবা কিছুতেই খুনী নয়। চোর নয়। হতে পারে না। কোথাও কোন বড়রকমের ভুল হয়ে আছে।

কাগজে যা পড়েছি তাই বললাম। আমার ছেলেকে দেখার জন্যে এখন তোমাদের বাড়িতে কেউ নেই। কুটু তো বিশ্বনাথের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে—

মানে?

প্রেম হয়েছে। বিয়ে হবে। তাই তো তোমার মায়ের ইচ্ছে।

গান গায় যে বিশ্বনাথ? অসম্ভব! ও বিয়ে করবে কি?

না। গান গেয়ে ভালো রোজগার করে আজকাল।

ওরকম ছেলের সঙ্গে আমার খোনের বিয়ে হবে কেন? তুমি বাজে বাজে কথা বানিয়ে বলে আমার মনটা উইক করে ফেলতে চাইছো।

তাতে আমার কোন লাভ নেই রবি। আমার ছেলে—তোমার ছেলে বাস্তবে বড় হচ্ছে—তা আমরা কেউ জানি না।

আমার জানার দরকার নেই। আমার মা আছে। তাই যথেষ্ট। তোমার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি না।

ভালো কথা। কিন্তু রবি উকিল নিতে তোমার আপত্তি কোথায়?

তুমি আর আমি একদম আলাদা লোক।

আমাদের বিয়ে হয়েছিলো।

হয়নি মালবিকা। খোকন আচমকা এসে গেল—তাই মা তোমায় বরণ করে নিলো। একটা শ্লোক দেখানো ফুলশয্যা হোল। সবই আমি জানি। মায়ের দিক থেকে এরকম একটা বাটিয়ে দেওয়া দরকার ছিলো। বিশেষ করে তোমার জন্যে। বিশেষ করে আমার ছেলের জন্যে—

তবে কি সব মিথ্যে ছিলো?

না। মায়ের দিক থেকে—বাবার দিক থেকে কিছুই তো মিথ্যে ছিলো না। ছিলো—শুধু আমার দিক থেকে।

রবি এখানটায় এসে মাথা নামালো। তার শরীরটা মালবিকার চোখে আরও লম্বা লাগলো। দাড়িতে কয়েকটা পাকা রঙের কোঁকড়ানো তার। দুই ভ্রুর মাঝখান দিয়ে একটা শিরা ফুলে উঠে কালো চুলের জঙ্গলে মিশে গেছে। রবি বললো, আমরা যে সত্যি নারায়ণ সাক্ষী করে বিয়ে করিনি। কাগজের বিয়েও হয়নি আমাদের।

তবু তো আমরা স্বামী-স্ত্রী ছিলাম। এখনো থাকা যেতো। বলে রবি সিধে মালবিকার মুখে তাকালো। তুমি নিজে সব মিথ্যে করে দিলে। তোমার প্র্যাক্টিস। তোমার দম তৈরি। বাকি সব লিনিস মিথ্যে করে দিলো।

আমাদের বিয়েই হয়নি। অথচ তোমার মা ফুল দিয়ে খাট সাজিয়ে ফুলশয্যা করলেন। ফাঁকা বিছানায়। এমন মিথ্যে টেকানো খুব কঠিন ছিলো রবি।

সবই তুমি পারতে। সবই তুমি নষ্ট করেছো।

তুমি করোনি? তোমার রাজনীতি মানে তো এলিমিনেশন। যাকে অপছন্দ—তাকে সরিয়ে দাও।

পুলিশ কি তাই করছে না?

তোমরা করবেন্তো বলে তাই করছে—

এ নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলে কোন লাভ নেই।

থাকার কথা নয় রবি। তোমরা আইন হাতে নিয়ে তার পর ডেমোক্র্যাসির ছাতার নিচে দাঁড়াতে চাও।

রবি মাথা তুলে তাকালো। মানে?

একদিকে খুনখারাবি চলবে। আরেক দিকে গণতন্ত্র গেল গেল রব তুলে দেওয়া। গণতান্ত্রিক গণ-আন্দোলনের নাম দিয়ে চোরাগোপ্তা খুন। ধরা পড়লে বন্দী মুক্তির আন্দোলন। পৃথিবীর কোন্ দেশে খুন করে ধরা পড়ার পর বন্দীমুক্তির জন্যে কাঠগড়ার দাঁড়িয়ে শ্লোগান দেওয়া যায়? আহা! ওরা কিছু বোঝে না—করেছে করেছে—খুন করেছে—দেশের ভালোর জন্যেই ছেড়ে দাও—ওরা জেল থেকে বেরিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করবে।

আমি তোমার সঙ্গে আর কথা বলতে চাই না—

তা বলবে কেন।

রবি এবার সত্যিই চোখ দুটো কঠিন করে মালবিকার মুখের ওপর বিঁধিয়ে দিলো। তুমি এখন যাও। জেল হাজতে নেবার জন্যে ভ্যান আসবে এখুনি।

মালবিকার নিজের অজান্তেই চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিলো। সে তা মুছবার চেষ্টা করলো না। কোর্টের ফাঁকা বারান্দা। দেওয়ালে উঁচুতে মহাত্মা গান্ধী। সব আদালতের মতই এখানেও একটা গাছ আছে। মালবিকা আবছা আলোয় গাছটাকে চিনতে পারলো না। গাছের গায়ে চায়ের দোকান। মালবিকা বললো, তোমরা বুড়ো খোকারা আর কতকাল গণতন্ত্রের কোলেকাঁখে চড়ে বেড়াবে বলতে পারো?

রবির জবাব দেওয়ার ইচ্ছে নেই কেন। দেওয়ার সময়ও ছিলো না। জেল থেকে একটা লকঝড় মার্কা কালো ভ্যান ভীষণ বিকট শব্দ করে গাছতলায় এসে দাঁড়ালো।

এসব ক'দিন আগের কথা।

এখন মেঘের ওপর দিয়ে একখানা টি সি সেভেন ও সেভেন জেট পালাবার দিকে উড়ে যাচ্ছিল। তার পেটের ভেতর এশিয়ান গেমসের কয়েকজন কমপিটিটর। বেলা

দশটার জানলা দিয়ে মালবিকা দেখলো, তাদের প্লেনের নিচে জমাট শাদা মেঘের মাথাগুলো এক অতিকায় আইসক্রিম হয়ে পড়ে আছে। কলকাতা থেকে উঠেছে চারজন। মালবিকাকে ঘরে ইন্টার্ণ ইণ্ডিয়া থেকে এই চারজন যাবে সিঙ্গাপুর। বাকি তিনজন ছেলে। একজন রেসলিং-এর। বাকি দুজন ডেকাথেলনের।

এরও ভেতর কিরীটী পালিত একজন ডি আই পি। কারণ মামলা জেনারেল পদ রাষ্ট্রপতির সেক্রেটারি তাকে রাষ্ট্রপতি হয়ে নেমন্তন্ন জানিয়েছেন। নেমন্তন্নর চিঠিটা অনেকটা এরকম ছিলো।

প্রিয় মহাশয়,

বিবিধ বিষয়ে আইডিয়া পেটেন্ট করে আপনি এখন আমাদের দেশের একজন পুরোধা চিন্তাবিদ। দেশের কাজে আপনার আইডিয়া নিয়ত কাজে লাগবে—এই আমাদের আশা। আপনি যদি দু'দিনের জন্যে রাষ্ট্রপতি ভবনের আতিথ্য গ্রহণ করেন—তাহলে রাষ্ট্রপতি বিশেষ খুশী হবেন। দ্রুত আপনি জবাব পাঠালে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে পরামর্শ করে সময় সূচী স্থির করা হবে।

কিরীটী একটা জবাব দিয়েছিলো। সঙ্গে ছোট্ট একটা অনুরোধ। আমার মেয়েকে নিয়ে এশিয়ান গেমসে যাচ্ছি। সে অ্যাথলেট হিসেবে সিঙ্গাপুরে ভারতকে রিপ্রেজেন্ট করবে। আপনাদের অসুবিধে না হলে—আমার প্রার্থনা—আমি যেন সকণ্যা রাষ্ট্রপতি ভবনের অতিথি হিসেবে গণ্য হই।

কয়েক ঘন্টার ভেতর রাজধানী থেকে জবাব এসেছিলো। মোস্ট ওয়েলকাম।

পালামে রাষ্ট্রপতি ভবনের সেলুনকার ওদের দুজনকে তুলে নিলো। টানা সুন্দর রাস্তা। রাষ্ট্রপতির মিলিটারি অ্যাটাশে বাস্তার পাশে একটা বিরাট বাড়ি দেখিয়ে বললেন, রবীন্দ্র বসশালা।

হুঁ হাঁ জবাব দিচ্ছিলো মালবিকা। গাড়ির জানলায় বসে সে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলো না। চোখের নিচে কালচে অ্যাসফল্টের রাস্তা পিছলে যাচ্ছিলো শুধু।

কিরীটী একবার তাকিয়েই বুঝলো, খুকু একা একা কেঁদে চলেছে। মাঝে মাঝে চোখও মুছছে।

ওরা রাষ্ট্রপতি ভবনে পৌঁছলো বেলা-বেলি। তিন ঘন্টা আগেও সিকিউরিটি চেকআপের সময় দমদমে মেয়ের মুখখানা খুশী খুশী দেখেছিলো কিরীটী। এখন একদম থমথমে।

সন্ধের মুখে মুখে রাষ্ট্রপতির বিশেষ ডাইং রুমে মালবিকাকে নিয়ে কীরিটি ঢুকলো। মালবিকা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই রাষ্ট্রপতি ওকে তুলে নিলেন। কিরীটীর দিকে তাকিয়ে বললেন, মিস্টার পালিত—আপনাদের তো ইলাস্ট্রিয়াস ফ্যামিলি দেখছি। এতো বাপকা বেটি—

মালবিকা তখন ঘরের দেওয়ালের কারু কাজ দেখছিলো। ডাইং রুম না টেনিস কোর্ট—বোঝার উপায় নেই। আগাগোড়া পুরু কর্পেট উঁচু দেওয়ালেও সুদৃশ্য ম্যুরালের কাজ। এরই ভেতর একজন সাধারণ বিধবার অয়েলপেন্টিং। মালবিকা জানতে চাইলো, কার ছবি?

আমার মায়ের—

মালবিকা চোখ নামালো।

রাষ্ট্রপতি বলছিলেন, আমার মা কোনদিন ভাবেননি—আমি একদিন রাষ্ট্রপতি হবো। মায়ের বড় ইচ্ছে ছিলো—আমি যেন বড় হয়ে তহশিলদার হই। আমাদের সামান্য জমির বার্ষিক খাজনা ছিলো—আগেকার হিসেবে মাত্র তিন আনা। বাবা সেই খাজনা জমা দিতে গেলে তহসিলদার ঘুস চাইতো তিন টাকা। আমরা কিছুতেই খাজনা পরিষ্কার করতে পারতাম না।

এখন তো আপনার মায়ের কোন আফশোস নেই।

মালবিকার একথায় রাষ্ট্রপতি বললেন, নাঃ! মায়ের কোন আফশোস ছিলো না। শেষের দিনগুলো এ-বাড়িতেই কাটিয়ে গেছেন। তবে এক এক সময় মা আফশোস করতেন।

কি নিয়ে?

তোর বাবা যদি এসব দেখে যেতেন—

বাবা তো আপনাকে মিনিস্টার হতে দেখে গেছেন নিশ্চয়।

নাঃ। পরাধীন আমলে আমি তখন শোয়ালিয়র ফোর্টে বন্দী। জাঁদরেল হয়েছে। অসুখের ভেতর খবর পেলাম—বাবা আর নেই। সে নাইন্টিন থার্টি সেভেনের কথা।

মালবিকা সাহস করেই বললো, আচ্ছা। আপনি তো মানুষকে ক্ষমা করতে পারেন—

কিরকম?

ডেথ্ সেন্টেন্স হয়ে গেলেও আপনি মকুব করতে পারেন।

কনস্টিটিউশনে আছে—সেটা হোম গিয়ে ক্লিমেন্স—। এ কথা বলছো কেন?

নাঃ! এমনি।

একজন উর্দি পরা লোক এসে টি ভি চালু করে দিয়ে গেলো। রাষ্ট্রপতি বললেন, এসো একটু দেখি। টি ভি তোমার ভালো লাগে? কি মিস্টার পালিত?

নিশ্চয়। খুব ভালো লাগে—বলে বসে পড়লো কিরীটী। গদিতে ডেবে বসেও কিরীটী অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলো। খুকুর মুখে ক্লিমেন্সির কথা শুনে সে বুঝলো রবির কথা ভুলতে পারেনি। উমা তাহলে ঠিকই বলেছিলো সেদিন রাতে।

টি ভি স্ক্রিনে টাপুর মুখখানা ভেসে উঠলো। কীরিটি আর মালবিকা একই সঙ্গে ঝুঁকে বসলো। মালবিকা তো চেঁচিয়ে উঠলো। দাদা। বাবা দ্যাখোন দাদা—

রাষ্ট্রপতি বললেন, হেয়ার ইজ অ্যানাদার পালিত আই সি!

ইয়েস মিস্টার প্রেসিডেন্ট। হি ইজ নাই এলডেস্ট সন!

রিয়েলি! আপনি নিজে গুণী লোক! আপনার ছেলেমেয়েরাও গুণী। হাউ ইজ দিকেম এ মিউজিক ডিরেক্টর?

কণ্ঠে সৃষ্টি স্যার। এটুকু বলে ব্যাপারটা বোঝাবার জন্যে ট্রানস্লেশন করতে করতে কিরীটী হিমসিম খেয়ে গেল। শেষে বাংলায় বললো, বাদ্যযন্ত্রগুলো চেয়ে চিন্তে জোগাড় করতো স্যার—

সরকার তো এসব কেসে বৃত্তি দেয়!

আমরা জানতাম না স্যার—

হি কুড অ্যাপলাই। আপনি একজন আইডিয়া ম্যান। আপনার আইডিয়া নিয়ে ইণ্ডিয়ান বেলওয়েজ এখন অ্যাকসিডেন্ট ইনসিওরেন্সে একশো কোটি টাকার ওপর ফান্ড গড়ে তুলতে পেরেছে। আপনার মেয়ে অ্যাথলেট। ছেলে মিউজিক ডিরেক্টর! আই অ্যাম প্রাউড অফ ইউ কিরীটীবাবু!

আগে কিরীটী পি এম জি-র সামনেই থর থর করে কাঁপতো। এখন সে দেখলো, রাষ্ট্রপতির সামনে দিব্যি বসে আছে। কোন হেলদোল নেই তার। সবই সয়ে যায়।

আপনি গাইতে পারেন?

না স্যার। আমি এক সময় তবলা লহরা দিয়েছি।

আপনাদের ফ্যামিলিতে তাহলে মিউজিক্যাল সেন্স আছে।

বলতে পারেন স্যার—আমার বাবা থেকে এসব এসেছে।

হি কুড সিং?

ইয়েস স্যার। খুব ভালো টপ্পা গাইতেন।

বেঁচে আছেন নিশ্চয়?

আমরা জানিনা। ক' বছর হোল তিনি নিরুদ্দেশ। কোন খবর পাইনি। খুঁজেও পাইনি।

কোন মেন্টাল শক্?

আমরা জানিনা। একদিন সকালে গান গাইতে গাইতে মর্ণিং ওয়াকে সেই যে গেলেন—

(চলবে)

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সোনার হরিণ নেই

।। কল্পিশ ।।

জিপ থেকে নেমে বাপী বাংলোটার সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল খানিক। বান্যরজুলি জঙ্গলের বড় সাহেবের বাংলো। বারো বছরের এক ছেলের চোখে যেটা রূপ-কথার দেশের কোনো নিষেধের বাড়ির মতো।... রূপকথার সব নিষেধই শুধু ভাঙার জন্য। সেই ছেলেও ভেঙেছিল। তারপর দুবছর ধরে ভেঙেই চলেছিল। তারপর, পিঠের চামড়া ফালা-ফালা। জিভে রক্তের স্বাদ।

এখন নিষেধ নেই। কোনো বড়সাহেব বা মহাবরণীর কক্ষুত চক্ষু নেই। তাদের কাপুরুষ ছেলের দামাল শাসন নেই। সবার মধ্যমণি যে, এই পৃথিবীতে সেই মেয়েও নেই।....অন্তর্গত-পৃষ্ঠে আঁকড়ে ধরা স্মৃতির তবু লয়-ক্ষয় নেই।

একজন বেয়ারা ছুটে এলো। সেলাম ঠুকে গেট খুলে দিল। দেবেই। ফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল। তার ওপর জিপে এসেছে। পরনে দামী গরম প্যান্ট-কোট শার্ট, গলায় ঝকঝকে টাই, পায়ে চকচকে শু। ওদের বড় সাহেবের কাছে ছোট কেউ নেই।

বেয়ারার হাতে কার্ড দিয়ে বাপী ড্রাইভারকে বলল, ফাইল আর নমুনার প্যাকেটটা পৌঁছে দিয়ে আসতে। ফাইলে কিছু প্ল্যান, জঙ্গলের নকশা, আর একটা দরখাস্ত। প্যাকেটে দুটো দামী হুইস্কির বোতল। অবনুর কাছ থেকে জেনে নিয়েছিল তার বড় সাহেবও রসিক মানুষ।

বড় সাহেব মধ্যপ্রদেশের মানুষ। মাঝবয়সী। কার্ড হাতে বেরিয়ে এলো। জিপ, রিজিয়ন্যাল ম্যানেজারের বেশবাস আর চেহারাপত্র দেখে হেলাফেলার লোক ভাবা গেল না। তার ওপর গায়ত্রী রাইবের নাম অলোই জানে, আর রসের দোসর হিসেবে রণজিৎ চালিহাকেও খুব চেনে। উপহারের প্যাকেট দেখে মুখে খুশির বিড়ম্বনা। এ-সবের কি দরকার ছিল ইত্যাদি। দশ মিনিটের মধ্যে বাপীর কথা শেষ। সদয় বিবেচনার প্রতিশ্রুতি লাভও। রাই অ্যান্ড রাইয়ের আরজি সামান্য। এত বড় জঙ্গলের কত জায়গা অকেজো পড়ে আছে। সেখানে কোন্-কোন্ হার্বের চাষ হতে পারে আর কতরকমের প্রয়োজনে সে-সব দরকার ইত্যাদি। ব্যবসা হলেও জন-সেবারই কাজ। সুবিধে দরে লীজ পেলে আপাতত কোথায় কতটা পড়ো জমা জমি নিজেদের সাফ করিয়ে নিয়ে টেস্ট-কেস হিসেবে কাজে নামা যেতে পারে তার ফিরিস্তি। এতে জঙ্গলও কিছুটা পরিচ্ছন্ন হবে।

দরখাস্ত রেখে বড় সাহেব আশ্বাস দিল, যথাসাধ্য চেষ্টা করবে, ডি-এফ-ও'র এতে আপত্তি হবে বলে মনে হয় না।

এই লোক তুষ্ট যখন, আপত্তি হবে না জানা কথাই। হুকুম আসার আগেই বাপীর প্ল্যান মতো আবনু লোক জোগাড় করে কোমর বেঁধে কাজে লেগে গেল। তার উৎসাহ এখন দেখার মতো। জঙ্গলের বহু মেহনতী মানুষ তার হাতে মজুত। বড় সাহেবের সায় আছে যেমন, বাড়তি কিছু পেলে উপরি কাজ তারা সানন্দে করবে।

জঙ্গলের চার পাঁচ জায়গায় এমন তড়িঘড়ি কাজ শুরু হয়ে যেতে দেখে গাম্ভীর্যের তলার গায়ত্রী রাইয়ের পরিতুষ্ট মুখ। কিন্তু সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ফেল্ডএর এমন কাজ নিয়ে ডুবে থাকা তার মেয়ের পছন্দ নয়। ফাঁক পেলেই তাড়া দেয়, মা তোমাকে ড্রাইভিং শিখে নিতে বলেছে, সেটা কবে হবে? না কি ভয় ধরেছে।

জিপ এখন বাপীর জিম্মায়। কিন্তু ড্রাইভার নিয়ে উর্মিলার মিরিকে যাবার সাহস নেই। মা সকলের থেকে কথা বার করে নিতে ওস্তাদ। বিশ্বাস কেবল ফেল্ডকে।

জিপ হাতে আসার পরদিন থেকেই খুব ভোরে বাদশাকে নিয়ে ড্রাইভিং শেখা শুরু হয়ে গেছে, উর্মিলার তা জানার কথা নয়। কারণ ওর দিন শুরু তারও তিন ঘন্টা বাদে। সকালের আলো পরিষ্কার হবার সঙ্গে সঙ্গে বাদশা জিপ নিয়ে আসে। ঘন্টা দুই মহড়ার পরে চলে যায়। ফাঁকা রাস্তা, এরই মধ্যে হাত বেশ পাকা হয়েছে বাপীর। শুধু জিপ নয়, এক একদিন ভ্যান নিয়েও বেরোয়। বাদশা বলেছে এই ভ্যানের গীয়ার আর মোটর গাড়ির গীয়ারে কোনো তফাৎ নেই। তাই ভ্যানে হাত পাকা হলে মোটরও চালাতে পারবে।

ড্রাইভিং শেখার প্রসঙ্গে একটা আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছিল বাপী। দেখা-শোনার ব্যাপার তো দিব্যি চলছে, ড্রাইভিং শেখার পর দলে টেনে মাঝখান থেকে আমাকে ফাঁসাতে চাও কেন?

জলের, মাছ খপ করে ডাঙায় তোলা হয়েছে যেন। —তুমি জানলে কি করে?

বাপী স্বীকার করেছে, জানত না, এইবার জানল।

চালাকির ফাঁদে পড়ে উর্মিলা শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছে, ডিসেম্বরের এই ছাব্বিশ সাতাশ দিনের মধ্যে দুদিন মাত্র দেখা হয়েছে। ওর চিঠি পেয়ে বিজয় এসেছিল। সামনের সপ্তাহে আবার আসার কথা আছে।

—রেশমা তার ঘর ছেড়ে দেয়?

—ধেৎ! চিঠিতে আমিই এক-একদিন এক-এক জায়গায় ওকে আসতে বলে দিই।

সামনের মাসের শেষে কত দূরে চলে যাচ্ছে, দুজনেরই ওদের নাকি ভয়ংকর মন খারাপ।'

—তোমার সঙ্গে এখন তাহলে ঝগড়া করছে না ?

—না। আর ঝগড়া করে কি করবে।'

—ছেলেটা বোকা দেখছি।' বাপীর গাম্ভীর মন্তব্য।

—কেন ?'

—ঝগড়া করলে তো ওর বেশি লাভ হয়।

ইংগীত বুঝে মুখ লাল করে উর্মিলা তেড়ে এসেছে।

জানুয়ারির গোড়ায় শিলিগুড়িতে ড্রাইভিং টেস্ট দিয়ে লাইসেন্স পকেটে করে বাপী নিজেই জিপ ড্রাইভ করে গায়ত্রী রাইয়ের বাংলোয় এসে ঢুকেছে। মা মেয়ে অবাক, যেমন, খুশিও তেমনি।' বাপী উর্মিলাকে প্রস্তাব দিল চলো তোমাকে ঘুরিয়ে আনি একটু। স্বচক্ষে লাইসেন্স দেখেও উর্মিলার ভয়।' —নিয়ে গিয়ে শেষে মারবে না তো !

খানিক বাদে তরল আনন্দ। —দিব্যি পাকা হাত হয়ে গেছে দেখি যে— অ্যাঁ ?

এরপর বোজই প্রায় মিরিকে নিয়ে যাবার বায়না ওর। এই বিপাকে পড়তে হবে বাপী জানত। কাজের অজুহাতে আজ নয়, কাল নয় করে কটা দিন কাটিয়ে দিয়েছে। উর্মিলা শেষে রেগেই গেল। দুদিন বাদে কোথায় কত দূরে চলে যাচ্ছে ছেলেটা অথচ ফেরার এতটুকু গা নেই।

শেষে নিয়ে গেল একদিন। মেয়ে তার সঙ্গে বেরুলে গায়ত্রী রাই কিছু বলে না, কোথায় যাচ্ছে তাও খোঁজ করে না। তাইতেই তলায় তলায় বাপীর আরো অস্বস্তি। মহিলার হৃদভাব স্পষ্ট, দায় তোমার, তুমি বোঝো। ওদিকে উর্মিলার কথাতেই বিজয় মেহেরারও ওর ওপর অগাধ বিশ্বাস, সেও তাকে সত্যিকারের ফ্রেন্ড ভাবে।' তার সামনেই ওদের বোঝাপড়া শুনল।' মাঝে একদিন বিজয় বানারহাট আসবে।' আর তার কলকাতায় রওনা হবার আগের দিন উর্মিলা আবার মিরিকে আসবে বাপীকে নিতে।' কলকাতা থেকে লন্ডন রওনা হবার আগে এ-যাত্রার সেটাই শেষ দেখা। বাপীর সাধ না দিয়ে উপায় নেই। কথা দিল নিয়ে আসবে।

কথার খেলাপ করল না।' বাপীর রিপিসের সময় উর্মিলাও খেয়েদেয়ে প্রস্তুত।' মা-কে জানিয়েছে বাপীর সঙ্গে এক গায়গায় যাচ্ছে, ফিরতে দেরি হতে পারে।' গায়ত্রী রাই এবারও কিছু জিগেস করেনি।' বারান্দায় দাঁড়িয়ে একসঙ্গে দুজনকে রওনা হতে দেখেছে।

বাপী ওকে মিরিকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসেছে। আবার কথা-মতো বিকেলে গিয়ে নিয়ে এসেছে। মেয়ের মুখ শুকনো। চোখ লাল।' কান্নাকাটিও করেছে বোধহয়।' বিজয় মেহেরারও বিষণ্ণ মুখ। বাপীকেই জিজ্ঞাসা করল, বিলেত থেকে চিঠি, পাঠালে কোন্ ঠিকানায় পাঠাবে। বাপীর ভেতরটা কেন যেন সত্যি সদয়। ভেবে-চিন্তে বলেছে, লন্ডনের ঠিকানা দিয়ে প্রথম চিঠি আমার নামে পাঠাও।' পিছনে তোমার নাম দেখলে ওকে দিয়ে দেব। তারপর কোন ঠিকানায় লিখবে ঠিক করে চলিই তোমাকে জানাবে।'

সেই সন্ধ্যাতেই গায়ত্রী রাই ওর বাংলোয় এলো। যেমন গম্ভীর তেমনি ঠাণ্ডা।' —মিরিকে গেছলে ?

সাদা মুখ করে বাপী জবাব দিল, হ্যাঁ।

—এতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ওদের সঙ্গে ছিলে ?

এবারেও বাপী সত্যি জবাব দিল। —না, চলিকে ছেড়ে এসে আবার বিকেলে গিয়ে নিয়ে এসেছি।'

—গলার স্বর ঈষৎ কঠিন। কাজটা ভালো করলে ?'

—তা না হলে অশান্তি হত।' তিন বছর ধরেই আকেজশ পুষত।'

যুক্তি অগ্রাহ্য করতে পারল না। আবার ঠাণ্ডা। —সেই ছেলে কবে রওনা হচ্ছে ?

—কাল ভোরে।

—ঠিক আছে। এবার থেকে তোমার চেষ্টা তুমি করো।

চলে গেল। এক রাশ অস্বস্তি যেন সঙ্গে সঙ্গে ছেঁকে ধরল বাপীকে। যা বলল, তার সাদা অর্থ, মেয়ের মন থেকে এবারে আস্তে আস্তে ওই ছেলেকে হটাতে চেষ্টা করো। তবু অস্বস্তি। তবু ভিতরে অনাগত কোনো আশংকার ছায়া।

কিন্তু এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর ফুরসৎ বাপীর সত্যি নেই। সমস্ত ফেব্রুয়ারি মাসটা জলপাইগুড়ি পশ্চিম দিনাজপুর মালদহ কুচবিহার আর ধারভাঙার বড় ঘাঁটিগুলিতে ঘুরেছে। আগে রণজিৎ চালিহা আসাম সফরে বেরুলে গায়ত্রী রাই দু'পাঁচ দিনের জন্য বেরিয়ে কিছুটা ঠেকা কাজ চালিয়ে দিত। কিন্তু নগদ বিনিময়ে কালো মাল অর্থাৎ বাড়তি মাল লেন-দেনের ব্যাপারে তাকে প্রকাশ্যে দেখা যেত না। চালিহার অনুপস্থিতিতে মাল ঠিক-ঠিকই যেত, লেন-দেনের ফয়সালা সে ফিরে এলে হত। কাজে নামার পর বাপী এই দায়িত্ব হাত-ছাড়া হবার দরুন রণজিৎ চালিহার খেদের কারণ বুঝেছে। কেউ যদি মাথা খাটিয়ে এই লাভের ওপর বড়সড় থাবা বসাতে চায়, এমন মওকা আর হয় না।' গায়ত্রী রাইয়ের বিশেষ নির্দেশে সর্বত্র সব থেকে বড় হোটেলে থেকেছে, শাঁসালো মক্কেলদের ডিনার-লাঞ্চে ডেকেছে, মাটিতে পা ফেলেনি, ট্যাকসি বা মক্কেলের গাড়িতে ঘুরেছে। ফার্মের সুনাম তো বটেই, কিছুটা নিরাপত্তার কারণেও এই চালে থাকার রীতি। যদিও দেশ ভাগের এই দু বছরের মধ্যে কড়াকড়ির রক্তচক্ষু কোথাও তেমন দেখা যেত না।

একটা মাস নানা ঘাঁটিতে ঘুরে দফায় দফায় সর্বসাকুল্যে তেরো হাজার হিসেবের আর চৌত্রিশ হাজার হিসেবের বাইরের টাকা গায়ত্রী রাইয়ের হাতে তুলে দিয়েছে। মহিলা মুখে কিছু বলেনি, কিন্তু বাপী অনায়াসে আঁচ করতে পেরেছে, সুড়সপথের টাকার অংকটা এবারে বেশি। এদিকের সফর শেষে সেই চৌত্রিশ হাজার টাকা থেকে গায়ত্রী রাই হিসেব করে পাঁচ হাজার একশ টাকা বাপীর হাতে তুলে দিল। এ নাকি তার প্রাপ্য। এ-টাকার পনের পার সেন্ট চালিহা পেত। বাপীই তাই পাচ্ছে। ঠাণ্ডা মুখে সতর্কও করে দিল, বোকার মতো এর সব টাকা আবার এখানকার ব্যাঙ্কে রাখতে যেও না।

ভাগ বাঁটোয়ারার এ-দিকটা বাপীর জানা ছিল না। মাথায় হিসেব ঢুকলে তার

নিষ্পত্তির দিকে ঝুঁকবেই। সব খরচ-খরচা বাদ দিলে ওই চৌত্রিশ হাজারের অর্ধেক অন্তত ছাঁকা লাভ। সতের হাজার টাকার মধ্যে পাঁচ হাজার একশ এলো বাপীর ভাগে। মহিলার ছাঁকা লাভের ভাগ তাহলে এগারো হাজার নশ টাকা। শুধু এই নয়, ব্যবসার আরো তো কত দিক আছে। এতদিন ধরে মোটামুটি এই হারে টাকা পেয়ে এসে থাকলে মহিলার কত টাকা? ওকে সতর্ক করা হল, কিন্তু নিলে এত টাকা রাখছে কোথায়? দেশের বাইরে অর্থাৎ নেপাল ভুটান বা সিকিমে অবশ্যই তার পক্ষে মোটা টাকা সরিয়ে রাখা সম্ভব। আর এদিকেও হয়তো নানা জায়গায় ব্যাঙ্কে টাকা ছড়ানো আছে। তবু আনুমানিক হিসেবের মধ্যে ঢোকার ফলে বাপীর ধারণা, ব্যাঙ্কে ঠাঁই হয়নি এমন বহু টাকাও মহিলার কাছে মজুত আছে।

শরৎের মাসের সফর ভুটান সিকিম নেপাল। ফাঁক পেলে এসব জায়গায় গায়ত্রী রাই নিজেই গিয়ে থাকে। ব্যবসাকর্মের ব্যাপারে এসব এলাকার ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের প্রতিপত্তি বেশি। কাজের সুবিধের জন্য এর প্রতিটি জায়গায় একজন দুজন করে মেয়ে এজেন্টও বেশি। তাছাড়া এসব এলাকায় তেমন বড় ঘাঁটি বলতে কিছু নেই, খুচরো কারবারের টান প্রচুর। ছেলেদের থেকে এ-ব্যাপারে মেয়েরাই বেশি নির্ভরযোগ্য। গায়ত্রী রাই এবারে এলো না। শরীরটা খুব ভালো নেই বলল। বানারজুলির চাবাগানের ডাক্তারের আনাগোনাও দেখেছে এক আধবার। ঊর্মিলার মুখে শুনেছে, মায়ের মাঝে মাঝে কেমন শ্বাস কষ্ট হয়। তবে ডাক্তার বলেছে বিশেষ কিছু না।

কিন্তু মহিলার প্ল্যান সাফ। যে কারণ দেখিয়ে রণজিৎ চালিহা রেশমাকে আসামে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, সেই কারণেই ওকে এবারে বাপীর সঙ্গে পাঠিয়ে দিল। আবার সাপ ধরার সময় এসেছে, কিন্তু অনেক লোক আসে এজন্য, দুচার মাস ও না থাকলে সত্যি এমন অসুবিধে। আর রোজগার যখন ডবলেরও বেশি, বেশমাও নতুন কাজে জিনিসে এক পায়ে তৈরি। বাপী আর রেশমার সঙ্গে সেখানকার এজেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা ঝগড়ু করে দেবে। পাহাড়ের বাংলো থেকে তাদের কাছে খুচরো মাল চালান রেশমার মারফৎ ভালো হবে। আর ওসব জায়গা থেকে বাছাই মদ রেশমাই বাংলোয় এনে তুলবে। ঝগড়ু তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নেবে। জিপে হোক ভদনে হোক দরকার মতো রেশমাই সে-সব বানারজুলিতে নিয়ে আসবে। আবু রববাণীর মারফৎ সেসব চা-বাগানের ক্লাবে বা অন্য চালান দেওয়া হবে। বাপীর শুধু তদারকের জের।

রেশমা সঙ্গে চলল দেখে ঊর্মিলার জিভ সুড়সুড় করে উঠেছে। কপট উদ্বেগে মুখ মচকে ছুবলোতে ছাড়েনি। —ওই পাজী মেয়ের তো তোমার ওপর এত ভক্তি এখন যে সুযোগ পেলে জিভে করে পদ্ম চাটে—মা যে কি ফ্যাসাদের দিকে ঠেলে দিল তোমাকে কে জানে। ওদিক দুলারির মতো গম্ভীর মেয়ে পর্যন্ত মুখ টিপে হেসেছে। বলেছে, যাবার আনন্দে বেশমা হাত-পা তুলে নাচছে—আমি অবশ্য সাবধান করে দিয়েছি বেশি নাচানাচি করলে বাপীভাই ঠ্যাঙ ভেঙে দেবে।

ঠাট্টা ঠাট্টাই। বাপী তবু অস্বস্তিতেই বোধ করেছে। নিজেকেই সব থেকে কম বিশ্বাস করে, তাই অস্বস্তি। তাছাড়া ঊর্মিলা বাড়িয়ে বলেনি খুব। সমস্ত দুর্যোগ কাটিয়ে উঠে ভাগ্যের এই মুখ দেখার ফলে ওই সাপ-ধরা মেয়ের চোখে বাপীভাই সত্যিকারের দিলের মানুষ আর অবাক মানুষ এখন। কিন্তু তা বলে ছলনের বেপরোয়া মেয়ের স্বভাবসুলভ চৈতুলতা যাবে কোথায়? আর, চালিহার মতো ভদ্রসমাজের দাপটের পুরুষেরও দুর্বলতার খবর রাখে যে মেয়ে, তার বুকের পাটাই বা কম হবে কেন? ভক্তি শ্রদ্ধা করতে পারে কিন্তু শাসনের পরোয়া করা ওর ধাতে নেই।

পাহাড়ে পৌঁছুনোর আগেই শাসন নজর করে শুরু। বাপী জিপ চালাচ্ছে। রেশমা পিছনে। হঠাৎ ডেকে বলল, বাপীভাই, গাড়িটা থামাও তো একটু—

অল্প বেঁকে ঘুরে বাপী তাকালো। —কেন?

গম্ভীর। —না বুঝে বাপী জিপ থামাতে চোখের পলকে নেমে সামনের দরজা খুলে পাশে বসল। —চলো। তুমি দিব্যি সব দেখতে দেখতে যাবে আর আমি খুপরির মধ্যে বসে থাকব!

বাপী সত্যি বিরক্ত। —এটা ভালো দেখাবে না, নেমে যাও।

রেশমার অবাক মুখ। —তুমি তো ওই উঁচু পাহাড়ের মতো মাথা-উঁচু মানুষ তোমার আমাদের—কে কি ভাববে? তারপরেই চোখেক কোনে হাসির ছুরি। —আচ্ছা পাহাড়ের কাছে এসে নেমে যাব খন, চলো।

পাহাড়ের নিচে পৌঁছে বাপী আবার জিপ থামিয়েছে। মুখে কিছু না বলে তাকিয়েছে শুধু। গোমড়া মুখ করে রেশমা নেমে পিছনে গিয়ে বসেছে। তারপর কথা শুনিয়েছে, আবু সাহেব একবার হিসেব করেছিল, বয়সে আমি তোমার থেকে প্রায় দু বছরের বড়, বুঝলে? কেউ কিছু ভাববে না হাতি, আসলে এত বড় মুরুব্বি হয়ে তোমার মান বেড়েছে।

নতুন কাজে উৎসাহের অন্ত নেই রেশমার। এ-বেলায় কোনরকম চপলতার ছিটে ফোঁটাও নেই। মুখ বুজে উপদেশ শুনেছে, নির্দেশ মেনেছে। কোন্ মাল কোথায় কিভাবে দিয়ে আসতে হবে, আর কোন্ জিনিস ঘরে এনে তুলতে হবে—ঝগড়ু আর মেয়ে এজেন্টদের কাছ থেকে তাও বুঝে নিতে সময় লাগেনি। পনের দিনের মধ্যে ঝগড়ু ব বাপীকে আর সঙ্গেও যেতে হয়নি। এজেন্টদের কাছ থেকে বাপী টাকার হিসেব আর মালের চাহিদা বুঝে নিয়েই খালাস। ভালো মন্দের স্তোকও রেশমা সংগ্রহ করতে শিখেছে।

খুশির পরব ঝগড়ুর। দিলদার বাপীভাইয়ের কল্যাণে সায়েবসুবোদের ভোগ্য সেরা মাল পেটে পড়ছে। তাছাড়া ওর চোখে রেশমার মতো মেয়ে হয় না। একদিন এক ঘণ্টা সাপের বিষ বার করতে দেখেই, খপ করে একটা বিষাক্ত সাপের টুঁটি টিপে ধরে এনে নির্ভয়ে ওর মতো করেই গলগল করে বিষ বার করে এনেছে। সাহস দেখে ঝগড়ু যেমন তাজ্জব, তেমনি খুশি। বার বার বলেছে, তোর কথা প্রভুর মুখে শুনেছি কিন্তু এমন ডাকাত মেয়ে তুই ভাবিনি চাকর-বাকরদের আউট-হাউসে ওকে থাকতে দেয়নি, বাংলোর ভিতরেই একটা স্পেশাল-রুম

দুর্বোধ্যতার অজুহাতে আধুনিক কবিতা পাঠে যাঁদের আর রুচি নেই, তাঁদের কাছে **বাসুদেব দত্ত-র** প্রথম কাব্যগ্রন্থ

"নিহত শব্দের অন্বেষা"

এক মোক্ষম দাওয়াই বিশেষ। সুন্দর শোভন ছিমছাম প্রচ্ছদে পাওয়া যাচ্ছে—

দে বুক স্টোর
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

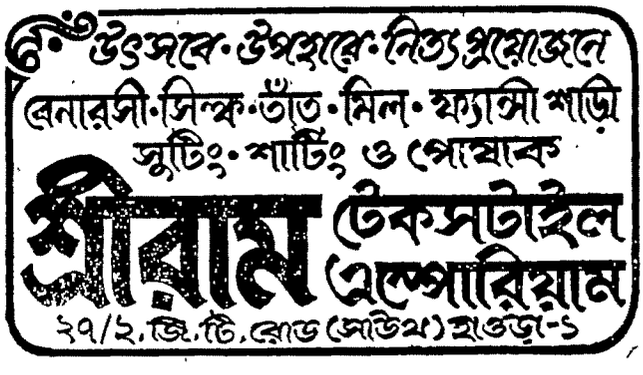

খালি করে দিয়েছে।' পাশাপাশি ওইরকম আর একটা ঘরে নিজে থাকে। বয়েস সত্তর ছাড়িয়েছে, সংকোচের বালাই নেই। বেশি-বয়সে পাওয়া নিজের আদরের ছোট-মেয়ের সঙ্গে খুশি-উপছনো সম্পর্কের মতো।

বাংলোয় অনেক রকমের লোক আসে। কাজ করে। আউটহাউসে থাকেও কেউ কেউ। এই মেয়েব দিকে চোখ পাড়বে জানা কথাই। কিন্তু বাপী নিশ্চিন্ত। ঝগড়ুর ভয়ে কেউ কখনো ধারে কাছে ঘেঁষবে না।

কিন্তু অস্বস্তি নিজেকে নিয়েই। অবসর সময় পাহাড়ে জঙ্গলে ঘোরাটা নেশার মতো। বেশমাও তখন সঙ্গ নেবেই। হাসবে, হৈ-চৈ করবে। জঙ্গল ওরও কম প্রিয় নয়। এদিকে বসন্তকাল। বনের সর্বত্র রূপের ঢেউ। রসেব ঢেউ। অশোক পলাশে রঙের বাহার। শিমুল কৃষ্ণচূড়ার মাথা লালে লাল। বাপী বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। পালিয়ে আসে। নিজেকেই ভয়। মেয়েটা তাও বুঝতে পারে কিনা কে জানে। রাতে ঝগড়ুর হাত ধরে বাগানে বেড়ায়। ফুলের গন্ধ আর বাতাসের ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে যায়। পাহাড়েব কোন্ গাছে কোকিলেব গলা চড়ে। স্বর নকল করে থেকে থেকে বেশমাও ভেঙেচে ওঠে। হাসে খিলখিল করে। বাপী নিঃশব্দে বারান্দা থেকেও সরে আসে।'

তিন সপ্তাহ বাদে বাপী একলা ফিরতে পেরে হাঁফ ফেলে বেঁচেছে। ভ্যান পাঠিয়ে মালপত্র সহ রেশমাকে আনানো হয়েছে আরো পনের দিন পরে। প্রথম বারেই কন্যার চোখে কাজেব মেয়ে হয়ে উঠতে পেরেছে এটুকু বোঝার মতো বুদ্ধি আছেই। এখানে থাকলে সাপ ধরাব কাজ, আব পাহাড়ে গেলে চার গুণ পরসার কাজ। ভাগ্যেব এমন টইটম্বুর দশায় কে না খোশ মেজাজে থাকে। কিন্তু আবুর ডেরায় বাপীভাইকে দেখে হাসেব মুখ তার। আবুকে ছেড়ে দুলারির দিকে চেয়ে বলেছে, কর্তা-মানুষ সঙ্গে থাকলে কত ঝুঞ্ঝকিল জানো না ভাবী—ভয়ে সর্বক্ষণ বুক ঢিপ-ঢিপ। পাহাড়গুলোকেও ঢের নরম মনে হয়েছে সে-সময়।

আবু মুখ টিপে হেসেছে। আর পলকা ধমকের সুরে দুলারি বলেছে, তুই যেমন পাজী, তোকে ঢিট করতে বাপীভাইই ঠিক লোক।

রেশমা ভালো মুখ করে চোখের কোণে তাকিয়েছে। এই পরিবেশেও অতটা সহজ হওয়া গেল না বলে মনে মনে বাপী নিজেব ওপরেই বিরক্ত।'

বণজিৎ চালিহা ফিরল চার মাস বাদে। দেরি হবে গায়ত্রী রাই বলেছিল। বাপীর অনুমান, এত দেরি হবার পিছনে মহিলার কারসাজি আছে। চিঠি তো হামেশাই লিখেছে। বাড়তি কাজে আটকে যাওয়া কঠিন কিছু নয়। সে ফেরার পরেও তার সতর্ক পদক্ষেপ। বুঝতে অসুবিধে হয়নি বাপীর। শরীর ভালো যাচ্ছে না বলে তার সামনেই ওকে নিজের বাংলোর অফিস ঘরটা ব্যবহার করতে হুকুম করেছে। মিস্টার চালিহার ঘর তো এখন তাকে ছেড়ে দিতেই হবে।

চালিহা ফিরে এলে তার কাজ তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে কিনা বাপী ভেবে পাচ্ছিল না। কিন্তু সে আসার পর দেখা গেল দায়িত্বের কাজ ভালোভাবে চালিয়ে যাবার জন্য এক লাফে দেড়শ টাকা মাইনে বেড়েছে তার। মালিকের ইচ্ছেয় বণজিৎ চিফ একসিকিউটিভকে এখন আরো বড় দায়িত্ব নিতে হবে। বিহার আর মধ্যপ্রদেশের বাজার দখলে আনতে হবে এবার। বাপী তরফদারের তদারকের আগের তৈরি ঘাঁটিগুলো থেকে যে টাকা আসবে তার থেকে পাঁচ পার সেন্ট কমিশন চালিহাকে দেওয়া হবে। আর মধ্য-প্রদেশ বা বিহারে যে-সব ঘাঁটি হবে তার থেকে পাবে কুড়ি পারসেন্ট। তার আসামের প্রাপ্যও পনের থেকে কুড়ি পারসেন্ট তুলে দিল গায়ত্রী রাই। এক কথায় আরো বড় দায়িত্ব, আরো বেশি স্বীকৃতি। কিন্তু লোকটা নির্বোধ নয় আদৌ। বাপী তরফদার সে-ভাবে এগিয়ে আসার আগেই সে সতর্ক হতে চেয়েছিল। বাপী নিঃসংশয়, এখন এই পরিস্থিতি দেখে সে আরো সন্দিগ্ধ, আরো সতর্ক। তার বাইরের আচরণ স্নেহভাজন সতীর্থের মতো। কিন্তু দেখতে জানলে মানুষের চোখের আয়নায় ভেতর দেখা যায়। অমায়িক হাসির ফাঁকে ওই দুটো চোখে কতুর আক্রোশের ঝিলিক দেখেছে।

এরই মধ্যে দিন দশেকের জন্য আর এক দক্ষ পাহাড়ের বাংলোয় পাঠানো হল রেশমাকে। আগের বারে বাপীর সঙ্গে গিয়ে ও কত ভালো কাজ করেছে, গায়ত্রী রাই চালিহার কাছে সেই গল্পও করেছে। খুশি মুখে চালিহা বলেছে, মেয়েটা যে চালাক দেখে খুব এতো সেই সবর আগে বুঝেছিল। কিন্তু এই খুশীর বিপরীত কিছু আঁচ করতে বাপীর অসুবিধে হয়নি। গায়ত্রী রাইয়ের সামনেই তেমনি হাসি মুখে অন্তরঙ্গ ঠাট্টা করেছে। বাপীকে বলেছে, কিন্তু তুমি ইয়ং-ম্যান একটু সাবধান, সাপ-ধরা মেয়ের জালে পড়ো না যেন। নিজের রসিকতায় নিজেই বেশি হেসেছে।

গায়ত্রী রাই কিছু বলেনি বাপীকে কিন্তু রেশমা ফিরে আসার পর আবু চুপি চুপি তাকে জানিয়েছে ম্যানেজার এব মধ্য একদিন পাহাড়ের বাংলোয় গেছল, রাতে ছিলও॥ মেমসায়েবকে নাকি জানিয়েই গেছে। ভালো মদ চেনানো আর তার ঘাঁটির সন্ধান দেবার ব্যাপারে রণজিৎ চালিহা যে একসপার্ট এক-জন এ কেউ অস্বীকার করবে না। তা ছাড়া এ-সব জিনিস সরবরাহ করার মতো চেনা-জানা লোকও আছে। রেশমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। রাতে নিজে মদের বোতল খুলে বসে গল্প করার জন্য রেশমার খোঁজও করেছিল নাকি। তাকে ডাকতে গিয়ে ফিরে এসে ঝগড়ু খবর দিয়েছে, সমস্ত দিনের পরিশ্রমে মেয়েটা এরই মধ্যে ঘুমিয়ে কাদা।'

এই একজনের সঙ্গে চূড়ান্ত ফয়সলার দিন আসবেই। কিন্তু সেটা কোন্ ভবিষ্যতে হবে বা কেমন করে হবে, বাপী ভেবে পায় না। তার ধারণা, গায়ত্রী রাইও এখন পর্যন্ত অন্ধকারে পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছে। পাচ্ছে না বলেই আপাতত যতটা সম্ভব তাকে দূরে রাখার চেষ্টা।

মহিলা হঠাৎ বেশ অসুস্থই হয়ে পড়ল। একই ব্যাপার। নিঃশ্বাস নিতে ফেলতে অসুবিধে। অসুবিধেটা বেড়ে গেল হঠাৎ। সাদা মুখ বেশি ফ্যাকাশে। কাউকে কিছু না বলে বাপী নিজেই ভ্যান হাঁকিয়ে শিলিগুড়ি চলে গেল। তিন গুণ ফি কবুল করে সেখানকার সব থেকে বড় ডাক্তার নিয়ে এলো। তার রায়, হার্টের একটা ভালব্ ড্যামেজ হয়েছে। তেমন সাংঘাতিক না হলেও ব্যাপারটা ভালো না। বিশ্রামের ওপর থাকতে

হবে, কোনো ভারী জিনিষ টানা চলবে না। নিরাপদের জন্য একসরে আর ই, সি, জি করানো হল। চা-বাগানের হাসপাতালে এসবের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু বাপী বিছানা ছেড়ে গাড়ীর রাইকে নড়তে দিল না। চার গুন খরচ করে বাড়িতে এনে সেসব করানো হল।

এত ঘটা আর টাকার শ্রাদ্ধ দেখে মহিলা রেগেই গেল বাপীর ওপর। —সামান্য ব্যাপারে এত হৈ-চৈ করার দরকার কি? টাকা কি খোলামকুচি নাকি?

মুখের ওপর বাপীর সাদাসাপটা জবাব, আপনার কিছু হলে খোলামকুচি।

একটু সুস্থ হতে কত খরচ হয়েছে জিগ্যেস করতে বাপী বলেছে, খরচ অবার কি—

—আঃ! বিরক্ত। —তোমার টাকার আমার চিকিৎসা হবে নাকি?

—তাই যদি মনে করেন অহলে আজ থেকে আমার খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাও আমি নিজেই করে নেব, আমি কার জন্যে কি করেছি বললে ভালি এরপর তেলের ঠেস মেরে।

খুশি মুখে উর্মিলা বলল, কেমন সেয়ানা দেখো মা, আগে থাকতে আমার মুখ মেরে দিলে।

মহিলার মুখে আবার সেই কমনীয় হাসি দেখল বাপী যা খুব বেশি দেখা যায় না। চেয়ে রইল খানিক। ওর দিকে। মেয়ের দিকেও। সঙ্গে সঙ্গে বাপীর বুকের তলার সেই অজানা আশঙ্কার ছায়া।

উর্মিলা পড়াশুনা শুরু করেছে বটে, কিন্তু তেমন মন বসেনি। ওর বিলেতের চিঠি এখন চা-বাগানের ক্লাবের ঠিকানায় আসছে। ভেবে-চিন্তে বাপী এর থেকে ভালো ব্যবস্থা কিছু করতে পারেনি। আপিসে ওর ঠিকানায় এলে রণজিৎ চালিহার হাতে পড়তে পারেই। ডাটাবাবু বাপীর হুকুমের মুঠোয় লোক এখন। খামের ওপর লেখা থাকে, ডলি। ডলি কে, ডাটাবাবুর জানার কথা নয়। চিঠির খবর কেউ জানবে না এও সে ডাটাবাবুকে বেশ স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছে। গোপন থাকবে বলেই বিশ্বাস। কারণ ডাটাবাবু সর্বদা খাশ মেমসাহেবা দাস। খাশ লোক যে এখন কে বুঝে ভাবে আবু প্রবাসী ডাটাবাবুকে সেটা ওপরে করেই জানিয়ে দিয়েছে।

সেই দিনই সকালে বাপী উর্মিলার ছদ্মবেশ বিলুর মেহেরার চিঠি দিয়েছিল। সন্ধ্যার দিকে আনন্দে ডগবগ মুখে সে হাজির হতে বাপী নির্লিপ্ত মুখে জিগেস করল, খুব সুখবর?

—দারুণ! তুমি শোনোনি?

—কি শুনব? বাপী অবাক একটু।

—বনমায়া পালিয়েছে। বেশমার মতে একটা বুনো হাতির ডাকে ও কি রকম একবার করে পালায়—তোমার নিশ্চয় মনে আছে। তুমি তো সব জানো, বলো না!

বাপী হেসে জবাব দিল, এটা কোনো খবর নয় এখন। সবাই জানে ও পালাবে। ফিরেও আসবে।

উর্মিলার তবু বনমায়ার গল্প শোনার লোভ। এমন দুর্বার প্রেমিকা যেন ওর কাছের কেউ। কিন্তু বাপীর ততো আগ্রহ নেই।.... একজনকে ঘটা করে বনমায়ার গল্প শোনাতো মনে আছে। আট বছর বাদেও সেই একজন ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল, বনমায়ার খবর কি?

এর দিন দশেক বাদে কাউকে কিছু না জানিয়ে বাপী সকালে ভ্যান নিয়ে শিলিগুড়ি চলে এসেছিল। ভ্যান এখন ওর হেপাজতে। আসার কারণ, আগের দিনের কাগজে খবর দেখেছে বি-এ পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে। কানারজুলিতে গেজেট পাবে কোথায়? তাই শিলিগুড়িতে। বি-এর ইতিহাসের রেজাল্ট দেখে গেজেটটাকেই আছড়ে ফেলতে ইচ্ছে করল বাপীর। ফার্স্ট ক্লাস তিনজন পেয়েছে। তার মধ্যে মালবিকা নন্দীর নাম নেই। ও সেকেন্ড ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে। মিষ্টির ওপর আর সেই সঙ্গে আর একজনের ওপরেও রাগ বাপীর। সাতাশি নম্বরের উল্টো দিকের বাড়ির সেই সোনার চশমা রাঙা-মুখো ছেলেটার ওপর। ওর নাম অসিতদা। পরীক্ষার এই রেজাল্ট হবে না তো কি, আরো প্রেম করোগে যাও!

পরে অবশ্য অত খারাপ লাগেনি। মেয়ের গুমোর কিছু কমবে।....এরই মধ্যে প্রায় দেড়টা বছর কেটে গেল। ওর সঙ্গে দেখা হবার পরের প্রতিটি খুঁটিনাটি চোখে ভাসছে। যেন সেদিনের কথা।

ফেরার সময় অন্যমনস্ক ছিল। চা-বাগানের এলাকা পেরিয়ে লছমন মাইতের ডেরার কাছে আসতে বিষম চমকে উঠল। যে গাছের গুঁড়িতে বনমায়া বাঁধা থাকত সেখানে অনেক মেয়ে পুরুষের ভিড়। সব গোল হয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছে তারা।

বিপদের গন্ধ বাতাসে ছোটে। একটা অশুভ চিন্তা বুকে হাতুড়ির ঘা বসালো। ভ্যান থামিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে এলো।

....এত লোক ঘিরে দাঁড়িয়ে বনমায়াকে দেখছে।

বনমায়া মাটিতে শুয়ে আছে কাত হয়ে। অত বড় শরীরের দুতিন জায়গায় দগদগে ঘা। দুর্গন্ধ নাকে আসছে। পাহাড়ের মতো শরীরটা নিথর। যত বড় করে সম্ভব চোখ চেয়ে আছে। জল গড়াচ্ছে। মৃত্যু যেন ওর চোখের দিকে এগিয়ে আসছে।

বাপীর বুকের ভেতরটা পাথর হঠাৎ। অবু কাঁদছে। আরো বেশি কাঁদছে লছমন। বেশমারও চোখ ছলছল। ঘিরে যারা দাঁড়িয়ে আছে, সকলের মুখ বিষাদে কালো।

কি ঘটেছে, সঠিক কেউ জানে না। কিন্তু অনুমান করা আদৌ কঠিন নয়। দল-ছুট বুনো পাগলা হাতি মারা নিষেধ নয়। তবে একটা পাগলা মরদ হাতি একটা বিশাল এলাকার সর্বনাশের কারণ হতে পারে। কিন্তু অতি দামী দাঁতের লোভে পাগল না হলে বুনো মরদ হাতি সময় সময় শয়তানের শিকার হয়ে বসে। কিন্তু দৈবাৎ দল-ছুট এরকম হাতি মারা হয়ে গেলে সেটাই ন্যায্য। অন্যায়ী পাগলা ছিল কিনা কে বলবে। তখন পাগল বললেই পাগল। এবারেও বনমায়ার সঙ্গী মরদ হাতিটাকে কেউ কেউ দেখেছে। আর অতিকায় দুটা দাঁত। লোভী শিকারীর ওটাই লক্ষ্য ছিল তাতে কারো সন্দেহ নেই। নিঃশব্দে এই শিকারের সব থেকে সহজ উপায় দলে তীর-ধনুক-অলা জুটিয়ে নেওয়া। তীরের ফলায় বিষ-দিউদ আর গন্-চং নামে গাছের শিকড়ের অমোঘ-মারাত্মক বিষ মেশানো থাকে। বিষ-ক্রিয়ার ফলে যত বিশাল দেহ হোক পচন ধরতে সময় লাগে না। তীর-ধনু-অলা লোকেরা বুনো হাতিরাও যমের মতো ভয় করে। বনমায়ার দেহে তিনটে বিষাক্ত তীরের ক্ষত মানুষের কাছে ছিল। দেহটাকে টেনে হিঁচড়ে মানুষের কাছে নিয়ে এসেছে।

আবুর বন্ধ ধারণা, লোভী শিকারীর হাত থেকে দাঁতাল মরদের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে বনমায়ার এই হাল। ও তাকে না আগলালে নিশানার এতবড় ভুল হতে পারে না। পারেই না। বনমায়ার গায়ে আঁচড় পড়ারও কথা নয়।

বাপী আস্তে আস্তে বনমায়ার মুখের সামনে এসে দাঁড়াল। ও চোখ টান করে দেখল। চিনল। জল গড়াচ্ছে। কাত হয়ে শোয়া অবস্থাতেই শুঁড়টা মাটি ঘষটে মাথার কাছে বেঁকিয়ে নিয়ে এলো। সেলাম করল।

বাপী পালিয়ে এলো।

সন্ধ্যার মধ্যে খবর পেল সব শেষ। বনমায়া ছিল। বানারজুলির বাতাসে প্রেম ছিল। বনমায়া নেই। প্রেম শরবিদ্ধ। নিহত। আবু কেঁদেছে। লছমন কেঁদেছে। বেশমা কেঁদেছে। বনমায়াকে যারা জানে তারাই কেঁদেছে। বাপী কাঁদতে পারে না। এও এক অভিশাপ। একটা শুকনো যন্ত্রণা শুধু ভিতরটাকে কুরে খাচ্ছে।

দুদিন বাদে কলকাতায় একটা টেলিগ্রাম পাঠালো। ওটা পাবে মালবিকা নন্দী। মিষ্টি নন্দী লিখেও কেটে মালবিকা নন্দী করেছে। ওতে এক শব্দে পাশের অভিনন্দন। আর, দুশব্দের একটা খবর। —'কংগ্র্যাচুলে-শনস। বনমায়া কিলড্।'

মাঝে একদিন বাদ দিয়ে টেলিগ্রামেই তিন শব্দের জবাব এসেছে। 'থ্যাঙ্কস্ সরি। —মিষ্টি।'

জবাব আশা করেনি। আরো অপ্রত্যাশিত আর কিছু। মালবিকা বাতিল। লিখেছে, মিষ্টি। বাপীর জগতে মালবিকা নামের কোনো অস্তিত্ব নেই জেনেও লিখেছে?

এর থেকে বাপী কি ভাববে? কি বুঝবে? প্রেম শরবিদ্ধ নয়? নিহত নয়?

(চলবে)

শৈবাল মিত্র

তরণী পাহাড়ে বসন্ত

ভগবানের ইচ্ছে ছিলো বড়োবাবুকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। হলো না। একেই বলে গেরো। ভূষণকে নিয়ে ভগবান ক্যাম্পের সামনে এসে দাঁড়ায়। শাল খুঁটির গায়ে কাঁটা তারের বেড়া লাগিয়ে ক্যাম্পের সীমানা তৈরী হয়েছে। সামনের দিকটা পাকা ইঁটে গাঁথা ছাউনি। দরজার মুখে পুরন সি-আর-পি ঘাঁটি আগলাচ্ছে। ভগবানকে তারা আটকায়। হ্যারিকেনের হলদে আলোয় দুই বাইসন্ধারীকে বেব্রাঞ্জের মূর্তির মতো লাগে। চারপাশে অন্ধকার ঘন হয়েছে: উঁচু গঙ্গ জমির ওপর থেকে অনেকদূরে দেখা যায়। নীচু জলা জমিতে কোথাও কোথাও ধানের ক্ষেত। কোনো জায়গাটা ফাঁকা। এখানে কোনো জমিতেই এক লঙ্গে চাষ হয় না। অন্ধকারে পাহাড় জঙ্গল আকাশ একাকার।

ভগবানের গলা শুনে ঘরের ভেতর থেকে কুণ্ডু বেরিয়ে আসে। ডাকে আসুন। ভেতরে আসুন। ভূষণের মাথা ভয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে। ও দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে অন্ধকার আকাশ দেখে। অনেক ঘা খেয়ে ও জেনেছে এস-এল-এর চেয়ে একজন সিপাই ঢের বেশী ক্ষমতা ধরে।

একটা বড়ো টেবিলের ওপর পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে। সেটা ঘিরে আট দশটা চেয়ার। সি-আই নিখিল পাল মাঝের চেয়ারটায় বসে আছে। একপাশে বড়োবাবু, ডি-আই-বির মাখন দাস। ডানদিকে একজন অপরিচিত, গম্ভীর মুখ। পাশের ঘর থেকে হঠাৎ কে যেন ডুকরে কেঁদে ওঠে। তারপর একটানা গোঙানি। কোনোটা জোরালো, কোনোটা আবছা। পাশাপাশি অনেকগুলো ঘর, তারপর লক আপ। ছ'মাসের মধ্যে এতোসব তৈরী হয়েছে। অথচ মাঝের পাড়ার রাস্তাটা গত দশ বছরে বানানো গেলো না। ভগবান এ্যাসেম্বিব্রিতে পর্যন্ত বার কয়েক বলেছে। ওর মেজাজটা তেঁতো হয়ে যায়।

সি-আই পাল খাতির করে ওকে বসায়। বসুন ভগবানবাবু। চা খাবেন নাকি?

ওয়্যারলেসের বাকস থেকে অদ্ভুত সব শব্দ বেরোয়। সি-আই কাজের কথা পাড়ে—আজ তাঁতিপাড়ায় পোস্টিং হলো। বেশ কয়েকজন মাতব্বরকে পেয়েছি। আপনাকে একটু আইডেন্টিফাই করতে হবে।

ভগবান বিব্রত হয়। আমাকে আবার কেন—ও বলে।

আপনার কনস্টিটুয়েন্সি, আপনি এম-এল-এ সি-আই বোঝায়—তাছাড়া এক মাত্র আপনিই সকলকে চেনেন। পাশের ঘরগুলো থেকে মাঝে মাঝে ডুকরে ওঠার শব্দ আসে। ভগবান বলে—ঠিক আছে, নিয়ে আসুন। সার্কেল ইনস্পেকটরের ডান পাশের লোকটাকে ওপরওলা মনে হয়। পাল তাকে কয়েকবার স্যার বললো। লোকটা কোনো কথা বলে না। সি-আই-ই বলে—কলকাতা থেকে আসছেন।

সি-আই বড়োবাবুকে বলে ওদের নিয়ে আসুন। বড়োবাবু হাঁক দেয়—ডিউটি।

জি সার—একজন উর্দিওলা ঘরে ঢুকে সেলাম বাজায়। কলকাতার অফিসার মুখ খোলে—ওদের আনতে হবে না। এনাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরিয়ে দেখুন।

ঠিক আছে স্যার—সি-আই উঠে দাঁড়ায়। ওসি আলমারি থেকে একটা ব্যাটারির টর্চ বার করে। সি-আই আর বড়োবাবুর সঙ্গে ভগবান বাইরে আসে। ভূষণ কেটে পড়েছে। ফাঁকা অন্ধকারে এক দঙ্গল জোনাকি উড়ে বেড়ায়। হাল্কা কুয়াশার চারপাশ চেকে গেছে। আবার সেই তীক্ষ্ণ কাংরানির শব্দ। ভগবানের বুকের ভেতরটা জল হয়ে যায়। বড়ো ঝামেলাতেই পড়া গেলো। এসব কাজ তার করার কথা নয়। ইচ্ছে করলেই সে চলে যেতে পারে। পুলিস তার কেশাগ্র ছুঁতে পারবে না। কিন্তু তারও যে পুলিসকে দরকার। পুলিসের সাহায্য ছাড়া সে ঠুঁটো জগন্নাথ। অতএব পুলিসকে সে চটায় কি করে। বড়োবাবু হঠাৎ সি-আই-কে বলে—ভগবানবাবুকে এইভাবে এক্সপোজ করাটা কি ঠিক হবে স্যার?

সি-আই থমকে দাঁড়ায়—ঠিক বলেছেন।

বোরখাটা নিয়ে এসো বড়োবাবু কুণ্ডুকে বলে। কুণ্ডু এক দৌড়ে ঘরে যায়। পাটকরা ছাতার কাপড়ের মতো কি একটা নিয়ে আসে। বড়োবাবু সেটা ভগবানকে পরিয়ে দেয়। মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা মুসলমানী বোরখা। চোখ দুটোয় নেটের আড়াল। একটা বোটকা মেয়ো গন্ধে ভগবানের গা গুলিয়ে ওঠে। ভগবানের মূর্তি দেখে কুণ্ডু ফিক করে হাসে। রাগে ভগবানের গা রি রি করে। কিছু বলতে পারে না। বারান্দার শেষ ঘর থেকে কে যেন ভাঙ্গা গলায় কেঁদে ওঠে।

আপনার সেফটির জন্যে—বড়োবাবু বলে।

ভগবান ভাবে ভূষণ চলে গিয়ে ভালোই হয়েছে। এসব খবর পাঁচকান হওয়া ঠিক নয়।

ছোটো ছোটো অন্ধকার ঘর। হ্যারিকেন জ্বলছে। পরলা ঘরে বাবলুকে চিনতে ভগবানের অসুবিধে হয় না। ঘরের দরজার কাছে চেয়ারে একজন পুলিস অফিসার বসে আছে। ঘরের মধ্যে একটা সরু বেঞ্চ। বাবলু বেঞ্চের পাশে মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। জাঁদরেল চেহারার ধুতিপরা দশাসই লোক অফিসারের হুকুমের জন্যে ওৎ পেতে অপেক্ষা করছে। সি-আই-আর জলবরাকে দেখে অফিসার উঠে দাঁড়ায়। ধুতিপরা লোক দুজন সেলাম করে। একজন বাবলুর ঘাড় ধরে দাঁড় করায়। বাবলুর কোমরে একটা ছেঁড়া পাজামা। পাজামার একটা দিক হাঁটু থেকে উড়ে গেছে। বাবলু সোজাসুজি তাকায়। বোরখার মধ্যে ভগবানের বুকের রক্ত কেঁপে ওঠে। বড়োবাবু বাবলুর মুখে পাঁচ ব্যাটারির জোরালো আলো মারে। ও চোখ নামায়।

চিনতে পারলেন—বড়োবাবু জিজ্ঞেস করে।

ভগবানের গলায় আওয়াজ নেই। ও ঘাড় নাড়ে। বড়োবাবু টর্চ নেভায়। দূরের একটা ঘরে চেরা গলায় মা গো বলে কে যেন চেঁচায়

ফেলে। ঝানু বাগদী, নিতাই বাউড়ী আর পলাশকেও ভগবান চিনতে পারে।

মুখে খোঁচা দাড়ি রোগা কালো ছেলে-টাকে ভগবান আগে কখনও দেখেনি। বড়ো-বাবু বলে—একটু ভেবে দেখুন।

মনে পড়ছে না ভগবান জানায়। ছেলেটার মুখে টর্চের আলো। একেবারে নাঙ্গা। ভগবানের কেমন লজ্জা করে।

এ একজন চাই—বড়োবাবু ফিসফিস করে—দু হাজার টাকা পুরস্কার আছে। নাম মোতি।

বড়োবাবু আলো নেভায়। নিমেষে ঘর অন্ধকার। হ্যারিকেনের মিটমিটে আলোয় সে অন্ধকার কাটে না। মোতির নাম শুনে ভগবান ঘাবড়ে যায়। ছেলেটার সম্পর্কে অনেক গল্প ভগবানের কানে এসেছে। ভয়ানক বিপজ্জনক ছেলে। গোটা তাঁতিপাড়া ও ডুবিয়েছে। চেহারায় মালুম হয় না। নিতাই আর কানু এক ঘরে ছিলো। মারের চোটে ধবাশায়ী। বড়োবাবুর হুকুমে উঠে দাঁড়ায়। ভগবান ভাবে এরা এক সময় আমার পার্টির লোক ছিলো। হঠাৎ ভিগবাজী দিয়েছে। বেইমান। লক আপের মধ্যে জনা কুড়ি বন্দী। তাদের অনেককেই ভগবান আগে দেখে নি। বেশীর ভাগ কমবয়েসী ছেলে। এখনও দাড়ি গোঁফ গজায় নি। ছেঁকে তুলে এনেছেন দেখছি—ভগবান একটু হাল্কা হওয়ার চেষ্টা করে। সি-আই জবাব দেয় না। ক্যাম্পের ভেতর এখন গভীর নীরবতা। দূরে বাস্তুঘু কয়েকটা কুকুর মাঝে মাঝে ডেকে উঠে। ভগবানের নিজেকে বড়ো ক্লান্ত লাগে। পদ্মমনি বলেছিলো—মাসখানেক এখেনে থেকে যাও। রাজনগরে এখন কি দরকার তুমার ?

পদ্মমনির কথাটা শুনলেই ভালো হতো। বোবখার মধ্যে ভগবানের দম বন্ধ হয়ে আসে। ক্যাম্পের গেট থেকে বাইরে পা দিতেই অন্ধকার থেকে কে যেন বেরিয়ে আসে। ভগবানের শরীর ভয়ে সিঁটকে যায়। ও সরে আসে। ছায়ামূর্তি বলে—আমি ভূষণ।

কোথায় ছিলি—ভগবান জিজ্ঞেস করে।

এখানেই। আপনার জন্যে ঘাড়ায়ে ছিনু।

ভগবান কথা বলে না। ভূষণ শুরু করে—উঃ কি শাস্তি। একটা ধুমসো বোবখা পরায়ে কতো সময় ঘুরালো আপনাকে। চারপাশের কুয়াশায় ভূষণের গলার স্বরটা কেমন অচেনা লাগে। ভগবানের শীত শীত করে। একটু করে ঠাণ্ডা পড়ছে। বরফ গলা বাতাস। ভগবান বলে—এসব কথা কাউকে বলিস নি। ক্যাম্পের ভেতরকার ধাবালো আর্তনাদ অন্ধকার চিবতে থাকে। ভূষণ বলে—দাদ চলুন। আমার বড়ো ডর লাগে। চেরা গলায় বিশ্রীভাবে ডাকতে ডাকতে একটা পেঁচা ওদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায়।

পলাশের কাতরানির শব্দ মোতির কানে বিঁধতে থাকে। একটু আগে পর্যন্ত বাবলু গোঙাচ্ছিলো। এখন চুপ। মোতির ঘরটা এখন খালি। ওকে পিটিয়ে ক্লান্ত তিনজন মানুষ এখন চা পানির খোঁজে বেরিয়েছে। দু দশ মিনিটের মধ্যেই আসবে। গাঢ় অন্ধকারেও নিজের উলঙ্গ শরীরটার দিকে তাকাতে মোতির লজ্জা করে। বাইরে কুয়াশা, ঠাণ্ডা। ওর শরীরে কিন্তু কোনো সাড় নেই। গোটা পৃথিবী মুড়ে ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। হাজার হাজার ঘুনপোকা অন্ধকার ঘুঁড়ছে। তর আওয়াজ। এবড়ো খেবড়ো মেঝের ওপর ওর শরীরটা চিৎপাত। দাঁড়াতে গিয়ে মাথা ঘুরে যায়। বাবার রুগ্ন মুখটা অন্ধকারের মধ্যে দুলতে থাকে। আজ ভোররাতে ও তাঁতিপাড়ায় এসেছিলো। প্রায় দিন পনেরো হলো বাড়ীর কোনো খবর নেই। তাঁতি-পাড়ার মাঠে জমায়েতের দিন বাড়ীতে দুদণ্ড বসার সময় পায়নি। মিছিল, সভা, আমেদপুর থানায় বন্দুক দখল; সারারাত ঠাসা কাজ। কুপির ফ্যাকাসে আলোয় বাবারে মূর্তি দেখে ও আঁতকে উঠেছিলো। মানুষটা শেষ দিন গুনছে। কি অসহায়, ভাসাচোরা চেহারা। মোতিকে প্রথমটায় চিনতেই পারে নি। ও কানের কাছে মুখ নিয়ে ডেকেছিলো—বাবা।

কেরোসিনের আলো হাতে মা পাশে এসে দাঁড়ালো। ওর মুখে হলুদ আলো। বাবা চিনতে পারে। কি যেন বলতে গিয়ে কথা জড়িয়ে যায়। গলা দিয়ে অদ্ভুত আওয়াজ বেরোয়। মরা চোখের সাদা জমি, ঘোলাটে মণি। বাবার দু চোখের কোণ দিয়ে সরু সুতোয় জল নামে। বোঝা যায় চোখের শেষ ফোঁটা জল নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। মোতির বুকের মধ্যে কি এক কষ্ট কবকব করে। দূরে ব্যান্ডে বিউগিল, স্লোগানের শব্দ। বাড়ীতে বাচ্চারা নেই। ওরা এখন চণ্ডীমণ্ডপের মাঠে। তার পাশে মা কুপি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। দরজার কাছে আবছা অন্ধকারে ইন্দু। মোতি ভেবেছিলো, সভায় যাওয়ার সময় ইন্দুকে সঙ্গে নেবে। বলবে—চল, শুনবি চল। কিন্তু ওর মুখে কোনো কথা সরে না। বাড়ীর মধ্যে মৃত্যুর হাওয়া ঢুকে পড়েছে। ও তার গন্ধ পায়। নিজেকে কেমন যেন অপরাধী লাগে।

সামনের হপ্তায় আবার আসবো—মোতি বলেছিলো মাকে। বাবার দিকে আর তাকায়নি। বাইরে এখন অনেক কাজ। মোতি ভয় পাচ্ছিলো, হয়তো তার দৃষ্টিতেই বাবার প্রাণ বেরিয়ে যাবে।

চণ্ডীমণ্ডপের মাঠে কুঞ্জন তখন বক্তৃতা করছিলো। মোতি দেখা করেছিলো সাধুর সঙ্গে। বুকের মধ্যে সেই জ্বালাটা কমেনি। বাবার মুখটা বারবার মনে পড়ছে। এসব যেন এই কালকের কথা। অথচ কি এক হাল্কা মায়ায় ওরা জড়িয়ে ধরে।

কপিলের দলের লোকজনকে নিয়ে তাঁতলুই পৌঁছোনোর মিনিট দশেক পরেই মোতি ছাড়া পেলো। বিশেষ হুঁশিয়ার করল সাবধানে যাস। অজিত বললো—এভাবে হুটহাট তাঁতিপাড়ায় না যাওয়াই ভালো। তাঁতিপাড়া নিয়ে দেশজুড়ে হৈচৈ। কড়া নজর আছে।

মোতি জানে, অজিত আটকাতে চাইছে তাকে। বাবার শরীরটা ভীষণ খারাপ—মোতি বলে—একবার যেতেই হবে। ওর গলা ভিজে ওঠে। অজিত কথা বাড়ায় না। কবে ফিরবি, কিশোর জিজ্ঞেস করে। কাল বা পরশু।

চার প্রহর অন্ধকার। আকাশে তারারা ঝিমিয়ে পড়েছে। শুধু পশ্চিম আকাশের শুকতারা উজ্জ্বল। ঘাস, লতা, শিশিরে ভিজে আছে। জিয়ন বলে—আগেও ফিরবো। সিসেল ফার্স তক একসাথ যাওয়া যাবে।

হাতে খেঁটো লাঠি, কোমরে ভোজালি নিয়ে জিয়ন উঠে দাঁড়ায়। মোতিকে ডেকে অজিত বলে—একটু চা আনার চেষ্টা করিস। সঙ্গে এক বান্ডিল বিড়ি।

তাঁতিপাড়ার মানুষ জাগার আগেই ও বাড়ী পৌঁচেছিলো। তখন পুব আকাশ লাল করে সূর্য উঠছে। একদল শালিখ ঘাসে বাগানে হৈ চৈ করছে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঢেউ তুলে মাঠে মাঠে ছড়িয়ে পড়ছে বকের ঝাঁক। সারারাত ঘুম নেই। দারুন ধকলে শরীর নুয়ে আসছে। মাথায় হাঁড়িয়ার ঘোর। মোতির মনে হয়, সে ঘুমোতে ঘুমোতে হাঁটছে। জিয়ন নীচু গলায় কথা বলছিলো—গণফৌজ বানাইচিস. কবেচিস। আমরাও বানাবো। অন্ধকার আলপথে ওদের পায়ের শব্দ ওঠে। জিয়ন সন্ধানী চোখে মাঝে মাঝে চারপাশ দেখে নেয়। এলাকায় পুলিস আর মিলিটারি ক্যাম্পের একটা তাঁতলুইতে আছে। কিশোর তৈরী করেছে। আসার আগে একবার দেখা উচিত ছিলো। এসব ভাবতে ভাবতেই দুচোখের পাতায় ঘুম উপচে ওঠে। হোঁচোট লেগে মাঠের ওপর হুড়মুড়িয়ে পড়ে। জিয়ন তোলে। বলে—তু আবার ঠ্যাং তোড়বি বটে ?

মোতি সজাগ হয়। আকাশে ভোরের লক্ষণ। ঠাণ্ডা হাওয়া বয়। গরম, ঘন হাওয়ায় দুচোখ খুলে, বুক টান টান করে ও শ্বাস নেয়। ওর কাণ্ড দেখে জিয়ন হাসে। মোতির ঘুম কিন্তু ছেড়ে যায়।

অন্ধকার রকের ওপর ভারী পায়ের আওয়াজ। লোকগুলো আসছে। অনেক দূরে আকাশের গায়ে কয়েকটা মিটমিটে তারা। কি ফ্যাকাসে চেহারা। তেল ফুরিয়ে গেছে। মোতির মনে হয় তারাগুলো হয়তো এখনি নিভে যাবে। পলাশের কান্না আর শোনা যায় না। বাবলুর ঘর থেকে কাপড় কাচার শব্দ আসে। অনেকক্ষণ এই শব্দটা মোতি শুনছে। বাবলুকে কি ওরা কষ্ট দিচ্ছে। দুটো ঘর পাশেই বাবলুকে রেখেছে। লোকগুলোর নোংরা কথা, হুমকি মোতি শুনতে পাচ্ছিলো। এখন সব চুপচাপ। শুধু পাথরের বেদীতে ভিজে কাপড় আছড়ানোর শব্দ। মোতির মনে হয় সে ঠিক শুনছে না। ঝিঁ ঝিঁ বা ঘুন-পোকার শিসোলো আওয়াজটা হাওয়ায় মিশে চেহারা বদলেছে। বাবলুর চাপা গোঙানি প্রথমদিকে ও শুনেছে। বুঝতে পেরেছে, শব্দ স্বাভাবিক জন্যে বাবলু দাঁত টিপে লড়ছে। পাশাপাশি ঘরে, কেউ কাউকে সাহায্য

আওয়াজ শোনাতে চায় না। কেউ হারবে না। তিনজনের মধ্যে কান্না গেলার একটা ঠাণ্ডা প্রতিযোগিতা চলে। প্রথম শোনা গেলো, পলাশের গলা। প্রায় আধ ঘন্টা চুপচাপ থেকে ও যেন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো। অন্ধকারে ওর ভাঙা গলা মোতির বুকে করাত চালায়। গণসঙ্গীত গাওয়া পলাশের মাঝা গলা যন্ত্রণায় দুমড়ে মুচড়ে ভস্মবহ। আরো ঘন্টাখানেক বাদে বাবলু ভেঙে পড়েছে। কিন্তু বাবলু কাঁদেনি। একটা গলা টেপা শুকনো গোঙানি, গুকরে উঠেছে। ছেঁড়া ছেঁড়া অর্থহীন আওয়াজ। বুসশার্ট আর প্যান্ট পরা একজন লম্বাটে লোক তখন মোতির নখের তলায় পিন ঢোকাচ্ছিলো। হাড় উঁচোনো ত্রিকোন চোয়াল। লোকটার হাত ঘামে ভিজে। মাঝে মাঝে সে তোয়ালেতে হাত মুচ্ছিলো। লোকটার মুখে, কপালে কোনো ঘাম নেই। শুধু দুহাতে ঘামের ফোয়ারা। অর্ধেকটা পিন সুরুৎ করে মোতির নখের তলায় সেঁধিয়ে গেলো। একদম ব্যথা নেই। মোতি ভাবে আমার আঙুলগুলো কি কাদার তৈরী। মোতির চোখের দিকে লোকটা তাকিয়ে ছিলো। পিনটা বার করতে আঙুলের ডগা থেকে রক্তের সরু স্রোত নামে। লোকটার হাতে লাগে। ঝকঝকে রুপোলি পিনের ছুঁচোলো দাঁতটা লোকটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। তোয়ালেতে আবার হাত মোছে।

কিশোর, অজিত, বরুণ এবং আরো কয়েকজনের খবর ওরা জানতে চাইছিলো। প্রায় সব খবরই জানে। কার কোন গাঁয়ে আড্ডা, কে কতোটা হাঁড়িয়া খায়, কিশোর আর বরুণের মতপার্থক্য এবং এরকম অনেক খুঁটিনাটি জিনিষ নিয়ে ওরা আলোচনা করে। মোতি দুএকটা আলগা উত্তর দেয়। কিন্তু এই ধরণের ভদ্র কথাবার্তায় বেশী সময় কাটলো না। বন্দুকের প্রসঙ্গ উঠলো। বাইরে কতোগুলো এবং আশপাশের গাঁয়ে মোট কটা বন্দুক আছে? বন্দুকগুলো কোথায় লুকোনো থাকে? রবি হাঁসদার ডান কপালে কাটার দাগটা কি আজও আছে? এসব খবর মোতি না জানার ভান করে। হাওয়া তেতে ওঠে।

বাইরে অন্ধকার রোমাঞ্চে কয়েকটা পায়ের শব্দ, নীচু গলার কথা। একটা অক্ষরও বোঝা যায় না শুধু ঠোঁট আর জিভের ফিসফিস ধ্বনি। তিনটে ঘরের অফিসাররা প্রায়ই বাইরে এসে নিজেদের মধ্যে কি যেন পরামর্শ করছে। অন্ধকার বোঝাকে তাদের পা ঘষার শব্দ। দেশলাই জ্বলে ওঠে। জিজ্ঞাসাবাদে তখনকার সময় বিশ পঁচিশ মিনিটের বিরতি।

ঘরের মধ্যে কেমন একটা ঘোলাটে আলো। মোতির চোখের সামনে কাঁচে কালিজমা হ্যারিকেনটা কেমন গলে যায়। আবার জমাট বাঁধে। খাকি হাফ প্যান্ট আর গেঞ্জি পরা একজন সিপাই গেটের কাছে বসে আছে। মাঝে মাঝে সে মোতিকে দেখছে। ফ্যাকাসে মুখ, গর্তে ঢোকা চোখ। কি যেন বলতে চায়।

মোতির ভীষন ঘুম পায়। দু চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে। ও নিজেকে চাঙ্গা রাখার চেষ্টা করে। এখনো অনেক বাকী। ভেঙে পড়লে চলবে না। শক্ত, মজবুত থাকতে হবে। সকাল থেকে দাঁত টিপে ও যুঝছে। একটুও টসকায়নি। বাড়ীটা কখন যেন ঘিরে ফেলেছিলো পুলিশ। আসলে গোটা গাঁ তখন ঘেরাও। কোশিরা শুরু হয়েছিলো। বড়ো রাস্তায় যাদের নজর রাখার কথা, তারা গাফিলতি করেনি। কিন্তু গাঁয়ে খবরটা পৌঁছোলো না। গাঁয়ের তিনদিক দিয়ে বিশাল বাহিনী তখন ঢুকে পড়েছে। বড়ো রাস্তার সামনে যারা ছিলো, তারা বেঁচেছে। বাকীরা ধরা পড়েছে। মাকের পাড়ায় খন্ডযুদ্ধে তিনজন মরেছে। সকলেই পার্টির লোক। মোতিরা লড়ার সুযোগ পায়নি। বাবলু, পলাশ, ঝানু মধুসূদনকে নিয়ে উঠোনের সেই পুরোনো ঘরে মোতি বসেছিলো। এ ঘরে সে আর তার ভাইবোনেরা জন্মেছে। কয়েকটা ছাগলও এখানে থাকতো একসময়। তাদের ছানা-পোনাও এ ঘরে হয়। মোতি চেয়েছিলো কল্যাণ অমলও থাকুক। কিন্তু ওরা দুজনেই আসেনি। বলেছে মধ্যপন্থীর সঙ্গে বৈঠক নয়। ঘৃণা করো, চিহ্নিত করো, চূর্ণ করো মধ্যপন্থা। বাবলু গম্ভীর। মতির বুকের মধ্যে তোলপাড়। সকালের আবছা আলোয় ঘর কে বিছানায় মোতি খুঁজে পাচ্ছিলো না। খালি বিছানা থেকে একটা নিঃশ্বাসের শব্দ আসছিলো। তারপর বিছানার সঙ্গে মিশে যাওয়া বাবাকে ও দেখতে পায়। বাবা জেগে না ঘুমিয়ে ধরতে পারে না। পা টিপে দাওয়ায় এসে দাঁড়ায়। কাঁশবনের ওপাশে লাল আকাশ। অন্ধকারে শুকনো পাতা খসার শব্দ। একঝাঁক হরিয়াল আকাশপথে দিন শুরু করলো। খবর দুটো ইন্দু দিলো। শিবেন খুন হয়েছে। ডাক্তারদা অল্পের জন্য বেঁচে গেছে। মোতির পায়ের নীচে মাটির দাওয়াটা দুলছিলো। বাঁশের খুঁটি ধরে চোখ বুজে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলো। সকালের আলো, হাওয়া হঠাৎ উধাও গেছে। অন্ধকার বাঁশবনে শুধু শুকনো পাতা খসার শব্দ।

শেষপর্যন্ত ইন্দুকে দিয়েই যোগাযোগ হলো বাবলুর সঙ্গে। ওরা একে একে এলো। বাবলু বললো—এটা দুলাইনের লড়াই, ওর গলায় কোনো তেজ নেই। শুধুমাত্র নিজেকে বাঁচাবার জন্যেই ও কথা বলছিলো। খবরটা শুনে ঝানু হতভম্ব। মুখ কালো করে পলাশ বসেছিলো। কিশোর, মতি, অজিতদের বাদ দিয়ে পাল্টা পার্টি কমিটি তৈরী হয়েছে। কল্যাণ সেই কমিটির কনভেনর। জেলা পার্টিও দু টুকরো। এসব খবর মোতি জানে না। পলাশের বুকের মধ্যে কি এক কষ্ট দলা পাকায়। ঝানু ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে। শব্দটা প্রায় কান্নার মতো শোনায়। মধুসূদন বলে, এভাবে চললে পার্টি টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

বাবলু বলে—বাজে কথা। পার্টি ভাঙবে না। যারা পার্টি লাইনের বিরোধিতা করছে, তাদের তাড়ানো হবে। পার্টির সিদ্ধান্ত। যারা পার্টি বিরোধী—মোতি জানতে চায়।

তোমরা—বাবলু মুখিয়ে ওঠে—কিশোরদা এবং তার সঙ্গে যারা আছে। ঝানু এবার খেঁকিয়ে ওঠে—তারা ইংরা কি শত্রু কবলি? ইভাবে লড়াই টিঁকে না। হিয়ন ভাইয়া চলে গেলে ইখান থিকে পার্টি উঠে যাবে। ঝানু কেঁদে ফেলে। ডানহাতের চাবটে আঙুলের দিকে অকিয়ে ও চুপ মেরে যায়। পরশিয়াং বন্দুক দখলের রাতে ও একটা আঙুল খুইয়েছিলো। ঠিক তখনই বিশ-পঁচিশজন সি আর পি বাড়ীটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। একটানা হুইশিল বাজছে। সকলের মাথার পেছনে ঝকঝকে নেয়োনেট দুলা। সাদা পোষাকের একজন বলে—নড়লে মাথার খুলি গুলো হয়ে যাবে। নিমেষের মধ্যে বাড়ী তছনছ হয়ে গেলো। কোমরে প্রচন্ড একটা লাথিতে মোতি মুখ থুবড়ে পড়লো। ঘরের ভেতর বাবার গোঙানি আবছা শোনা যায়। মা কাঁদছে ভাইবোনরা কাঁদছে। গোটা পাড়াতেও চীৎকার কান্না, আর্তনাদ।

বাইরে একটা পেঁচা ডাকলো। মোতির বুকের মধ্যে এখন শুধু আফশোষ, আত্মগ্লানি। এভাবে বাড়ীতে আসা ঠিক হয় নি। কিশোরদা অজিতদা দুজনেই বারণ করেছিলো। কি এক জ্বালায় বুকটা পুড়ে যায়। চোখের পলকে সবকিছু অন্যরকম হয়ে গেলো। মাধুর সঙ্গে একবার দেখা করার ইচ্ছে ছিলো। হলো না। মোতি ভাবে, হঠাৎ আজ এভাবে পুলিশ তার বাড়ীতে চড়াও হলো কেন? কে খবর দিলো? পুলিশ তার বাড়ী চেনে। এর মধ্যে পাঁচ সাতবার হানা দিয়েছে। কিন্তু আজ কে সঙ্গে ছিলো? দিবাকর কাকার নামটা মনে আসায় ওর মুখ বিস্বাদ হয়ে যায়। কিন্তু লোকটাকে সে দেখেনি। হয়তো আড়ালে কোথাও লুকিয়ে ছিলো। দুপুর দেড়টা, দুটোর মধ্যে গোটা পাড়া তছনছ হয়ে গেলো। মাঝে মাঝে কাৎরানি, গুলির শব্দ ছুটোছুটি মোতি শুনেছে। ঘাড়ে বন্দুকের কুঁদো খেয়ে ও কিছু সময় বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলো।

জ্ঞান ফিরতেই বুঝেছে, এবার নতুন পর্ব, আসল লড়াই শুরু হলো। ঘুমের মধ্যে দেখা অনেক দুঃস্বপ্ন, ভয় আতঙ্ক এখন তাকে সরাসরি জাপটে ধরেছে। পালানোর পথ নেই। দেখা মাত্রই তাদের গুলি করে মারার হুকুম আছে। অফিসার হয়তো এখনো চিনতে পারে নি। কিংবা আগে ভয়ংকর কোনো কুট মতলব ওর মাথায় আছে। মোতি নিজেকে শক্ত করে। এতোদিন, দুঃস্বপ্নে অনেক রাতে ডুকরে উঠেছে। ছটফট করেছে। অন্ধকারের দিকে অসাড় চোখে তাকিয়ে কপাল বুকে ঘাম জমেছে। আজ কিন্তু সেসব কিছুই হয় না। শরীরের সমস্ত কোষ আর পেশীতে কিভাবে যেন প্রতিরোধের এক কঠিন বর্ম এঁটে বসে। ধরা পড়ার পরে প্রথম আধ ঘন্টা বুকটা

ভীষন ধড়ফড় করছিলো। কণ্ঠনালীতে ঘন নিঃশ্বাস আটকে যাওয়ার অবস্থা। ক্রমশঃ হৃৎস্পন্দন, শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসে। রক্তসেন্সাতে দৌড়ঝাঁপ বন্ধ হয়। বন্দুকের কুঁদোর পয়লা চোটটায় ভীষন ব্যথা লাগলো। মাথা ঘুরে গিয়েছিলো। তারপর মার যত বাড়ে, কষ্ট, যন্ত্রণা কমে যায়। জুলফির চুল একটা একটা করে . উপড়ে নিচ্ছে। তখন ঘরের মধ্যে শেষরেলার আলো। বাইরে কোথাও একটা তিতির ডাকছিলো। হাওয়ায় আমন শস্যের গন্ধ। সেই মানুষটার মুখ মোতির মনে পড়লো। লিপের পেছনে বেঁধে সৈন্যবাহিনী তাকে বন্দী শিবিরে নিয়ে যাচ্ছে। উঁচুনীচু পাথুরে রাস্তায় হাজার ঘসটানিতে তার শরীর রক্তাক্ত। অথচ মুখে কোনো বিকার নেই। রোগা শীর্ণ ছোটখাটো চেহারা। মানুষটার নাম হো চি মিন। কিশোরের মুখে এরকম অনেক কাহিনী ও শুনেছে। লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরা একজন জহ্লাদ দুহাতে ওকে মাথার ওপর তুলে আছাড় মারলো। তখনও কোনো কষ্ট হয় নি। অন্ধকার দেওয়ালে ফুচিক, ডিমিট্রক, বেজেনবার্গ আর নগুয়েন ভ্যান থোর উজ্জ্বল ছবি। ব্যারাকপুরের মাঠে ভোররাতে এক-জনের মৃতদেহ ফাঁসিতে লটকে দেওয়া হয়েছিলো, আর নাম মঙ্গল পান্ডে। তার গলায় ফাঁসির দড়ি পরাতে কলকাতার কোনো ডোম রাজী হয়নি। কলকাতা থেকে লক্ষ্ণৌ পর্যন্ত রাস্তার দুধারের গাছে কয়েকশো বিদ্রোহীর মৃতদেহ ঝুলছে। শিক্ষামূলক শাস্তি। দেশের মানুষ দেখে শিউরে উঠবে। স্বপ্নেও আর বিদ্রোহের কথা ভাববে না। তবু বিদ্রোহ হয়। রাজ-প্রাসাদ ভেঙ্গে যায়। বাস্তিল দুর্গ ধুলোয় মুখ থুবড়ে পড়ে। মোতির নখের মধ্যে ধারালো পিনটা ঢুকিয়ে অফিসার খড়কের মতো পাক দেয়। কিশোর কোথায়? অজিত, বরুণ, মানব, রবি? একবার শুধু গলা শুকিয়ে যেতে ও জল চেয়েছিলো। হ্যারি-কেনের আলোয় লোকগুলো মুখ চাওয়া-চায়ি করে। তারপর লুঙ্গিপরা ওর মুখের সামনে এসে দাঁড়ায়। নাক, মুখ চোখের ওপর ছবছবিয়ে গরম জল পড়ে। লুঙ্গি পরা বলে—খা, শালা খা।

দাঁত, মুখ টিপে মোতি পড়ে থাকে। নো সারেন্ডার। পলাশের চীৎকার, বাবলুর গোঙানিতে মাঝে মাঝে ওর ঘোর কেটে যায়। কোথা থেকে যেন তিহেবাহার মিঠে গন্ধ উড়ে আসে। মোতি নিজের মনে বকে—কিশোরদা, অজিতদা তোমরা দেখে যাও মোতি হারেনি। শ্রেণীর মান রেখেছে। সে আসলে সর্বহারা। কিন্তু দোহাই তোমাদের পার্টি যেন না ভাঙ্গে। নিজেদের মধ্যে মারা-মারি খেয়োখেয়ি নয়। তোমরা কি জানো শিবেন মারা গেছে। ডাক্তারদা আধমরা।

লুঙ্গিওলা বলে—শালা। অফিসার রুমালে হাত, মুখ মোছে। এখন ওর সারা শরীরে ঘাম। মোতির দিকে তাকাতে অস্বস্তি হয়। ছেলেটা মানুষ না অপদেবতা বুঝতে পারে না। রাত বাড়ে। সারা ক্যাম্প চুপচাপ। মাঝে মাঝে গাড়ীর ইঞ্জিনের বুনো গর্জন। অনেক রাতে একসময় বাবলু, পলাশ আর মোতিকে একঘরে আনা হলো। এখন ওরা ঘুমোবে। কারো কথা বলার ক্ষমতা নেই। খরখরে মেঝেতে ওরা পাশাপাশি শোয়। মোতি জিজ্ঞেস করে—হড়গোড় ভাঙ্গেনিতো? জড়ানো গলায় বাবলু কি বলে বোঝা যায় না। পলাশ এখনো ফুঁপোচ্ছে। মোতির চেতনা ক্রমশঃ আবছা হয়ে যায়। চোখের সামনে ঘন অন্ধকারে ও একটা সোনালী রাজপথ দেখতে পায়। দশ ঘোড়ার রথ চলেছে। অনেক দূরে একটা জ্বলজ্বলে তারা। মৃত্যুর পর মানুষ নাকি আকাশে তারা হয়ে লেগে থাকে। অথচ এই জীবন্ত অবস্থাতেই মোতির মনে হয় এই নক্ষত্রটাও আঙ্গুলে ছুঁয়ে ফেলবে। ভোরবেলায় একজন সিপাই ঘরের দরজা খোলে। পেছনে একজন চা-ওলা। সে তিন ভাঁড় চা ওদের মাথার পাশে সাজিয়ে রাখে। প্রথমে বাবলু উঠে চা খায়। সারা শরীরে ব্যথা। পলাশকে ডাকে। পলাশ পাশ ফিরে শোয়। দ্বিতীয় দফার ডাকাডাকিতে সে চোখ খোলে। হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙ্গতে গিয়ে কঁকিয়ে ওঠে। কাত হয়ে চায়ের ভাঁড়ে ঠোঁট ছোঁয়ায়। মোতির চা জুড়োতে থাকে। মোতি অসাড়ে ঘুমোচ্ছে। মোতির নাম ধরে বাবলু ডাকে। মোতি সাড়া দেয় না। পলাশ বলে, ঘুমোতে দে। চাটা বরং তুই খেয়ে নে। খোলা দরজা দিয়ে ঘাসপাতা শিশিরের গন্ধ ভেসে আসে। একটা বড় কথা কও পাখী ডাকছে এক-নাগাড়ে।

বাবলু চা শেষ করে মোতিকে আলতো ধাক্কা দেয়। মোতির গোটা শরীর উল্টে যায়। বাবলু ককিয়ে ওঠে। মৃত মোতিকে পাশে নিয়ে কাল সারারাত ওরা দুজন ঘুমিয়েছে। দরজার কাছ থেকে সিপাই ছুটে আসে। ঘরের মধ্যে সকালের একটুকরো তাজা বোদ। মোতির মুখে আলোর গুঁড়ো। কাল রাতে ঘুমের মধ্যে কে যেন একগ্লাস জলের জন্যে গোঙাচ্ছিলো। আবছা কান্নার মতো সেই শব্দ বাবলু শুনেছে। গভীর ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখার অনুভূতি। বাবলু বোঝে তেষ্টায় বুক ফেটে মোতি মরেছে। ময়লা লুঙ্গি পরা, কালো, রোগা মানুষটা আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। দু চোখ আধবোজা। আর কোনোদিন জাগবে না।

হাসপাতাল ছেড়ে রাস্তায় পা দিতেই দিবাকরের বুকটা ফাঁকা হয়ে গেলো। ও জানে, যমুনা আর ফিরবে না। যমুনার মুখ, চোখ থেকে কেমন একটা মৃত্যুর গন্ধ বেরোচ্ছিলো। এ গন্ধটা তার চেনা। তিপ্পান্ন বছরের এই জীবনে কম মৃত্যু তো সে দেখেনি। মরার আগে বাপ, পিতামোর শরীরেও এই গন্ধ লেগেছিলো। পেছনে হলুদ বাড়ীটার দিকে ওর আর তাকাবার সাহস নেই। ওই বাড়ীর বারান্দার মেঝেতে যমুনার একটা ঠাঁই হয়েছে। ওখানে শুয়ে সে মরার দিন গুনবে। হাসপাতালের শরীরেও সেই মরণের গন্ধ। বেশ কড়া, কাঁঝালো বাস। দিবাকরের মাথা ঝিমঝিম করছিলো। দিবাকর জানে, মানুষ হাসপাতালে আসার আগে কাঁদে। বাড়ী ঘর সংসারের বাঁধন ছিঁড়ে মরণের জন্যে এখানে অপেক্ষা করতে হয়। ঝমঝম করে রেলগাড়ী আসে। ওয়েটিং রুম খালি করে সকলে চলে যায়। এখানে এলে কেউ ফেরে না।

দিন ফুরিয়ে আসার খবর যমুনাও টের পেয়েছে। অচেনা লালচে চোখে ও দিবাকরের দিকে তাকিয়েছিলো। এতদিনকার এই মানুষটার সঙ্গে দেখাশোনা খবরকন্না। তবু যেন সাধ মেটেনি। বাড়ী থেকে বেরোবার সময় যমুনা খুব কান্নাকাটি করেছিলো। বাসে ওঠার পর থেকে আর সাড়া করে নি। হঠাৎ অন্য এক দুনিয়ার হদিশ ও যেন পেয়ে গেছে। এই জীবনের হাসিকান্নার কোনো দাম নেই সেখানে। হাসপাতালের এনকোষারিতে দাঁড়িয়ে দিবাকরের বুক দুরু দুরু করছিলো। মাথায় অনেক কথা, হাজার প্রশ্ন। এই ব্যামোতে কি মানুষ বাঁচে না? এ যাত্রা আমার বউটারে বাঁচিয়ে দিন। সংসারে আমার আর কেউ নাই ডাক্তারবাবু। কিন্তু গলা ভার। আওয়াজ বেরোয় না। তার ওপর ডাক্তারবাবুদের কড়া মেজাজ. গটমট চালচলনে ভয়ে বুক সিঁটিয়ে গেছে। কি এমক আর তম্বি। ভদ্রলোকদের পর্যন্ত ধাতানি দেয়। কোর্টপ্যান্টালুন পরা একজনের সঙ্গে ইংরিজিতে ঝগড়া হলো। দিবাকর এক বর্ণ বুঝতে পারেনি। আতঙ্কে ডাক্তারের চোখের বাইরে সরে গেছে। কয়েকটা মাছি যমুনার মুখের চারপাশে উড়ছিলো। নাক মুখ চাটছিলো। যমুনার সাড় নেই। চোখ বুজে বসে আছে। গুপি বোধহয় বিড়ি ফুঁকতে গেছে। একা একা দিবাকরের বড়ো অসহায় লাগে। মনে হয়, কোন বিদেশ বিভূঁয়ে এসে ঠেকেছে। দিনের আলোয় পৃথিবীটা আজকাল বড়ো অচেনা লাগে।

মাকদুপুরে সিউড়ি থেকে বাস পেলো। চন্দ্রপুরার আগে রাস্তায় বাসটা বিগড়েছিলো। ঠেলাঠেলি করে স্টার্ট হলো। তাঁতিপাড়ার স্টপে যখন ও আর গুপি নামলো তখন চারপাশে বিকেলের ঘন ছায়া। মাধাইয়ের চায়ের দোকানটা খালি। কোথও একটা পাতা নড়ছে না। এ সময়ে গাছপালায় পাখীদের হাট বসে যায়। কতো গলার চুলবুল শব্দ, ডাকাডাকি। মাধাইয়ের দোকানের সামনে দু চারজন মানুষ লেগে থাকে। তারিয়ে তারিয়ে চা খায়। আজ সেসব কিছুই নেই। থমথমে নীরবতায় গোটা পাড়া, বনস্থলী ডুবে আছে। রাস্তায় পা দিয়েই দিবাকরের গা ছমছম করে। রাস্তা ভুলে ও যেন আন পাড়ায় এসে গেছে।

দিবাকরকে দেখে মাধাই দোকান থেকে বেরিয়ে আসে। মাধাইয়ের শুকনো, ফ্যাকাসে মুখ, মাথায় ধুলোর আস্তর। সকাল থেকে চা বানিয়ে জান কয়লা। পুলিশ দেখে দোকানের ছোঁড়াটা ভেগেছে। ভাঙ্গা গলায় মাধাই সকালের ঘটনা বলে। সবটা দিবাকর শোনে না। গুপি ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে

তাঁতিপাড়ার মেঠো রাস্তায় ধুলো উড়ছে। গাড়ীর চাকায় আর পায়ে পায়ে ছড়িয়ে যাওয়া ধুলো এখনো থিতোয়নি। দিবাকর রাস্তা ধরে এগোয়। ডাইনে নফর ময়রার দোকান, বাঁয়ে বটু নন্দীর কয়লার আড়ত, তারপর নরেন মাইতির মুদিখানা। সবগুলো বন্ধ। অথচ সকালে খোলা ছিলো। রাস্তায় একজনকেও চোখে পড়ে না। গাঁয়ের ভেতর থেকে আবছা শব্দ আসে। কিছু মানুষের গলার আওয়াজ। তারা কথা বলছে না কাঁদছে দিবাকর বুঝতে পারে না। বিকেলের লাল রোদ চন্ডীমন্ডপের পেছনে বড়ো হিজল গাছটার মাথায় ছড়িয়ে আছে। অর্জুন তাঁতির বাড়ীটা ছাড়িয়ে দুপা এগোতেই কান্নার শব্দ কানে এলো। কে কাঁদছে দিবাকর ধরতে পারে না। চারটে হাঁস প্যাক প্যাক আওয়াজ তুলে হেলেদুলে চলে যায়। দিবাকর জোরে একবুক হাওয়া টানে। হাওয়ায় বারুদের গন্ধ।

বাড়ীর সামনে দুচারজন চেনা মানুষকে দেখে দিবাকরের বুকটা ছলাৎ করে ওঠে। অঘটন কিছু হয়েছে, ও বুঝতে পারে। দাওয়ার ওপর গুপির মা, পাশে যোগমায়া মাসী, ইনু মালের মেয়ে বিন্তি। দিবাকরকে দেখে গুপির মা হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে। পাড়ার একটা কুকুর গা ঝেড়ে উঠে দাঁড়ায়। অনেক রাত ও দিবাকরের সঙ্গে উহুল দিয়েছে। দাওয়ার নীচে দাঁড়িয়ে দিবাকর সব শোনে। ঘরের মধ্যে মাধুর কোনো সাড়া নেই। যোগমায়া মাসী আকাশের দিকে তাকিয়ে একনাগাড়ে গাল দিচ্ছে—ওরে আঁটকুড়ির বেটারা তুদের ঘর কি মা বুন নাই। কার ইজ্জত তোরা নষ্ট করলি রে? ধারালো বিনবিনে একটা শব্দ হাওয়ায় কাঁপতে থাকে। গুপির মা ঘোমটা আর একটু টেনে ফিসফিসিয়ে বলে—মাধুকে ঘরে একা পেয়ে তিনচারটে জানোয়ার বেইজ্জত করেছে। চারপাশে তখন কি কান্নার রোল, হৈচৈ, গুলির শব্দ। আলাদা করে কারো গলার স্বর চেনা যাচ্ছিলো। দিবাকরের ঘরে এমনটা হবে, এটাও কেউ ভাবেনি। সে চৌকিদার। থানা-পুলিশের আপনজন, ঘরের মানুষ।

যোগমায়া মাসীর গালাগালি থামেনি—আবাগীর বেটা, তুদের বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না।

দিবাকর ঘরে ঢুকতে সাহস পায় না। ঘরের ভেতরটা ধোঁয়াটে, নিঃশব্দ। উঠোনের কোণে ঝিঙেলতার মাচাটা মুখ থুবড়ে পড়েছে। মাটিতে শুকনো হলুদ ঝিঙেফুল। পায়ে পায়ে দাওয়ার মাটি ঢেকে গেছে। কুডোর ম্যাচলাটা ফুটিফাটা। কলটা ঘিরে তিনটে হাঁস প্যাক প্যাক শব্দে চলেছে। গোটা বাড়ী জুড়ে দাপাদাপির ছাপ। হাসপাতাল থেকে বেরোবার আগে যমুনা ছুটো ফ্যাকাসে হাতে ওর হাঁটু দুমড়ে বলেছিলো, ঝিঙে লতায় ফুল এসেছে, এবার অনেক ঝিঙে হবে। গাছটার দিকে নজর রেখো। পোকা ধরে না যেন। হাঁসগুলোকে দুবেলা একমুঠো কুঁড়ো মেখে দিও। অবলা জীব, যেন উপোসী না থাকে। এসব শুনতে শুনতে ভীষন কান্না পাচ্ছিলো দিবাকরের। দাঁত টিপে ও জানলার দিকে তাকিয়েছিলো। বিরাট হলঘরটায় অনেক রুগী। মাঝে মাঝে কাৎরানির শব্দ। দুপুরের খাওয়া শেষ করে কেউ কেউ ঘুমোচ্ছে। নার্স এসে তাড়া লাগাতে দিবাকর উঠে দাঁড়ায়। মন্ডা আঙুলে যমুনা ওর হাঁটুটা খামচে ধরে। দিবাকর তাকায়। মাধুকে দেখো—যমুনার শুকনো দু চোখের কোণে জলের গুঁড়ো—মেয়েটা বড়ো অভাগী। যমুনার কথা আটকে যায়। বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। বাইরে রোদ ঝলসানো নিষ্ঠুর, নির্বিকার পৃথিবী। ধারালো আলোয় দিবাকরের চোখ জ্বলে যায়। দিবাকর বেরিয়ে মাধুকে নিয়ে আরো দু-একটা কথা যমুনা বলতে চেয়েছিলো। গোপন অফোটা কিছু ইচ্ছে যমুনার চোখের জলে ভেসে গেছে। গোটা তাঁতিপাড়া এখন কেমন চুপচাপ। মানুষজন আছে বোঝা যায় না। আবছা অন্ধকার নামছে। দিবাকর কেমন বোকার মতো উঠোনে বসে থাকে। ভাঙ্গা মাচা, মাটির মালসা, এলোপাথাড়ি ছড়ানো বাসনপত্র, ছেঁড়া কানি-কাপড় চারপাশে চারপাশে ছড়ানো। গুপির মা, যোগমায়া মাসি চলে গেছে। দিবাকর এখন একা। কোথায় যেন কাসর ঘন্টার কাঁই নানা, কাঁইনানা শব্দ। বলির ঘন্টা বাজছে। দিবাকরের চোখে হঠাৎ ধাঁধা লাগে। মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা মাচার নীচে মনে হয়, যমুনা দাঁড়িয়ে আছে। ফ্যাকাসে, রক্তহীন মুখ। দু চোখে কেমন ঘোলাটে দৃষ্টি। নিজের লন্ডভন্ড সংসারটাকে যেন সে চিনতে পারছে না। অথচ মুখে কথা বা রাগ নেই। ঝগড়া করছে না। বুক দিয়ে আগলে রাখা ঘরদোরের জন্যে কোনো শোক নেই। সে শুধু দিবাকরকে দেখছে। দিবাকরের গা শিরশির করে। দুহাতে মুখ ঢেকে ও গোঙাতে থাকে। একটা কুকুর ওর চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। আকাশে কয়েকটা তারা জাগে। দিবাকর চোখ তুলে যমুনাকে আর দেখতে পায় না। পশ্চিম আকাশে সন্ধ্যাতারার দিকে নজর পড়ে। মৃতার পর মানুষ নাকি আকাশের তারা হয়ে যায়। সেখান থেকে আত্মীয় বন্ধুদের দেখে। আকাশের তারাটার মধ্যে দিবাকর হঠাৎ যমুনাকে দেখে চমকে যায়। যমুনা এখন হাসছে। নরম, চিকন হাসি। বিয়ের পর এভাবেই ও হাসতো। দিবাকরের বুক কাঁপে। ও চোখ নামিয়ে অন্ধকারের দিকে তাকায়। হাঁপাতে হাঁপাতে গুপি এসে দাঁড়ায়। বলে, শিবেন খুন হয়েছে। মধুরাক্ষীর জলে ওর লাশ পাওয়া গেছে। ফুলে ঢোল, চেনা যায় না। ডুমুরটা গলা থেকে ঝুলছে।

গুপি অন্ধকারের মধ্যে ছুটে চলে যায়। দিবাকরের বুকটা পাথর। গুপির সব কথা ও বুঝতে পারে না। শিবেন খুন হয়েছে, শুধু এপর্যন্তই তার কানে ঢোকে।

অন্ধকার ঘন হয়। উত্তরের শালবনে শিয়াল ডাকে। একমুঠো নোনাকি অন্ধকারে উড়ে বেড়ায়। সারা তাঁতিপাড়া যেন গোখরের তলায় শুয়ে আছে। যোগমায়া মাসী, গুপির মা অত্যাচারের বর্ণনা দিচ্ছিলো। কতোজন মারা পড়েছে, কতোজনকে ধরে নিয়ে গেছে, সে কি দক্ষযজ্ঞ কান্ড! মেয়েরা কেঁদে কূল পায় না। তখনও আঁধার নামেনি। একটানা কাঁসর ঘন্টার শব্দ—কাঁইনানা ন্যাং ন্যাং। ওদের কথা শোনা যাচ্ছিলো না। মন্দিরে বলির সময় এভাবেই ঘন্টা বাজে। হাঁড়িকাঠে লাগানো জীবটার চেঁচানি আর শোনা যায় না। মোতি কি করে তাঁতিপাড়ায় ঢুকে পড়লো, দিবাকর ভেবে পায় না। দিনমানে সে তো এখানে আসতো না। শিবেন খুন হলো কেন? কার মারণো? ঘরের মধ্যে মাধুর কোনো সাড়া নেই। নেশাচ্ছন্নের মতো দিবাকর উঠে দাঁড়ায়। দুটো বাদুড় মাথার ওপর দিয়ে রাজনগরের দিকে উড়ে যায়। বড়ো অন্ধকার লাগে চতুর্দিক। একটা টেমি জ্বালানো দরকার। দাওয়ার ওপর উঠে বন্ধ দরজায় চাপ দেয়। দরজা খোলে না। দিবাকর ডাকে—মাধু। ফাঁকা অন্ধকারে নিজের গলার শব্দে ও চমকে ওঠে। এতোকাল সারারাত হেঁকে বেড়িয়েছে। কোনোদিন এভাবে নিজের গলার শব্দ ও শোনেনি। অন্ধকারে ওর চোখ জ্বলে। আর পাঁচজনের চেয়ে অনেক বেশী নজর যায়। আজ মনে হয় দু চোখ অন্ধ। হাতের কাছের জিনিষও দেখতে পাচ্ছে না। বন্ধ দরজায় জোরে ধাক্কা দেয়। দরজা খোলে না। মেঝেয় নাম ধরে আরো দু-তিনবার ডাকে। বুক, কপাল ঘেমে যায়। বুকের মধ্যে গুড়গুড় আওয়াজ। সমস্ত শরীর দিয়ে ও দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমকাঠের তৈরী পুরনো কপাট। হুড়মুড়িয়ে খুলে যায়। ঘরের মধ্যে নিকষ অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না।

দিবাকর ঘরে ঢোকে। আবছা অন্ধকারে ঘরের ভেতরটা পরিষ্কার দেখা যায় না। মেঝেতে চ্যাটাইয়ের ওপর মাধু শুয়ে আছে। দিবাকর মেয়ের নাম ধরে ডাকে। ভাঙ্গা শুকনো নিজের গলার স্বরটা কেমন অচেনা মনে হয়। কণ্ঠনালীতে তেঁতো জ্বালা। মাধু সাড়া দেয় না। ময়লা পুঁটলির মতো হাত-পা গুটিয়ে মাধু পড়ে আছে। দিবাকর তার পাশে বসে। খরগোশের বাচ্চার মতো মেয়ের নরম কচি পিঠের ওপর আলতো হাত রেখে ডাকে—মাধু। মাধু হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। তালপাকানো, শরীরটা সটান, সোজা হয়ে যায়। কান্নার দমকে কাঁপতে থাকে। পিঠের বোঁয়াগুলো দাঁড়িয়ে যায়, শরীরে তাপ জাগে। ওর পিঠে দিবাকর হাত বোলায়। বিড়বিড় করে—কাঁদিস না মা, আর ডর নাই। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে দিবাকর বুঝতে পারে তার তলপেট উপচে একটা বিশাল ঢেউ বুক গলায় ঠেলে উঠছে। সেই জলসেচতের টানে ও যে কোনো সময় ভেসে যাবে যেন। দিবাকরের গলা আটকে যায়। মাধুকে ধরে ও বসে থাকে।

(চলবে)

আরো জীবনানন্দ

কল্যাণকুমার বসু

১৯৪২ অক্টোবর চলে গেল, নভেম্বর গেল ডিসেম্বর যায় যায়। জীবনানন্দের পিতা সত্যানন্দের শরীর কিছু খারাপ হয়। ১৯৪২-র ২২শে ডিসেম্বর তিনি দেহত্যাগ করলেন। আঘাত পেলেন জীবনানন্দ—দিশেহারা। বরিশালে রয়েছেন মা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনেরা। ভাই-বোনেরা এসেছেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হল। তারপর বরিশাল আর ভালো লাগে না। বড় নিঃসঙ্গ মনে হয়। যদিও পরিণত বয়েসে বাবা দেহত্যাগ করেছেন তবুও বাবা। লাবণ্য আছে মঞ্জু আছে বঞ্জু (সমরানন্দ) আছে ভাই-বোনেরা সকলেই বরিশালে তবু, বরিশাল ভালো লাগে না চারদিকে বাবার স্মৃতিতে ঘের বরিশাল। তখন কলকাতা। কলকাতায় এসে কখোনো নেমেছেন অশোকানন্দের দমদম, ব্যারাকপুর, আলিপুর, বসুরোডের ভাড়াবাড়িতে। অশোক তাঁর বড় প্রিয়। কি কি নতুন কবিতা রচনা হল জানা চাই দাদার কবিতার বড় ভক্ত অশোক, যেমন সুচরিতা। সুচরিতাকে নতুন কবিতা শোনাতে হয় কবিতা সম্বন্ধে তার সঙ্গে আলোচনা না করলেই নয়। চাকরীসূত্রে অশোকানন্দকে ভারতবর্ষের নানা জায়গায় ঘুরতে হয়। ১৯৪১ থেকে অশোকানন্দ কলকাতাতেই বদলী হয়ে এসেছেন। বসু-রোডের 'মোহিনী ম্যানসনে' ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছেন।

মোহিনী ম্যানসনে জীবনানন্দের আলাপ হয়েছে কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে কয়েক বছর আগে। তখন সুসাহিত্যিক সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে অতি আপ্যায়নে ব্যস্ত জীবনানন্দ। বিব্রত কি সঞ্জয় ভট্টাচার্য।

কিন্তু এরও আগে

এল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, ১৯৪২-র রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। কবি তখন বরিশালে। কলকাতার উপর দিয়ে এল ৪৩-র মন্বন্তর। দলে দলে মানুষ গ্রাম থেকে এলো প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে শহরের আশ্রয়ে। তাদের কোথাও কোন ঠাঁই নেই খাবারনেই। দলে দলে শিশু নবনারীর মৃত-দেহ শহরের পথে পথে ছড়ানো। কবি তখন বরিশালে। কখোনো কলকাতায়। বরিশালের মাঠঘাট প্রান্তর, বরিশালের আকাশ তাঁর বড় প্রিয়। বরিশাল তাঁর শান্তি-নীড়। দেশের মধ্যে এত যে আন্দোলন-বিপ্লব, যুদ্ধ সেখানে কি কিছুই পৌঁছয় নি? কবির ভূমিকা! তাঁর মনে কি কোনই প্রভাব বিস্তার করে না?

এলো যে নতুন যুগ...

আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ সবচেয়ে নির্জন সবচেয়ে স্বতন্ত্র। বাংলাকাব্যের প্রধান ঐতিহ্য থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন এবং গেল দশবছরে যেসব আন্দোলনের ভাঙাগড়া আমাদের কাব্য-জগতে চলেছে তাতে তিনি কোন অংশ গ্রহণ করেন নি।'

জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ 'বনলতা সেন' এক পয়সার একটি সিরিজ গ্রন্থমালা (কবিতা ভবন) থেকে প্রকাশ হয়েছে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর সমালোচনা প্রসঙ্গে বললেন, তিনি কবিতা লেখেন এবং কবিতা ছাড়া অন্য কিছু লেখেন না। তার উপর তিনি স্বভাব লাজুক এবং মফঃস্বলবাসী, এই সব কারণে আমাদের সাহিত্যিক রঙ্গমঞ্চে পাদপ্রদীপ থেকে তিনি সম্প্রতি যেন খানিকটা দূরে সরে গেছেন। আধুনিক বাংলাকাব্যের অনেক আলোচনা আমার চোখে পড়েছে যাতে জীবনানন্দ দাশের উল্লেখমাত্র নেই। অথচ তাঁকে বাদ দিয়ে ১৯৩০ পরবর্তী বাংলা-কাব্যের কোন সম্পূর্ণ আলোচনা হতে পারে না। কেননা এই সময়কার তিনিই একজন প্রধান কবিকর্মী আমাদের পরিপূর্ণ অভি-নিবেশ তাঁর প্রাপ্য।

কবি জীবনের একেবারে প্রথম অধ্যায়ে জীবনানন্দর রচনা ছিল সত্যেন দত্ত নজরুল ইসলামের আমেজ লাগা। কিন্তু বছর সাতেক আগে তাঁর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' যখন প্রকাশিত হল তখনই আমরা নিঃসংশয়ে জানলাম তাঁর অনন্যতা। 'ধূসর পাণ্ডু-লিপিতে' আমরা যে কবিকে পেলাম তিনি সুদূর সমাবিষ্ট, তাঁর মনোলোক যেন একটি ধূসর কোমল পরিমণ্ডল, সেখানে যাকে বাস্তব বলি তার আভাসমাত্র নেই। কিন্তু সত্য বলে যাকে অনুভব কবি তার রঙিন ছায়া পড়েছে, সেই তাঁর নিজস্ব জগৎ—একান্তই তাঁর—দূর থেকে মনে হয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অলংকরণে অত্যন্ত বেশী আচ্ছন্ন। স্বপ্নে আত্মচালনায় অত্যন্ত বেশী মসৃণ—কিন্তু যার ভিতরে একবার প্রবেশ করলে সহজেই নিশ্বাস নেওয়া যায়, সহজেই বিশ্বাস করা যায়। রূপকথার জগতের মতোই এ কবির জগৎ আমাদের আত্মসাৎ করে নেয়, সেখান থেকে বেরোবার পথ খুঁজে পাওয়াযায় না। জীবনানন্দর কবিতার যেটি সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য বলে আমার মনে হয় সেটি একটি সুর, আর কিছু নয়।

ধূসর পাণ্ডুলিপিতে এমন একটি স্বাদ এমন একটি সৌরভ আমরা পেয়েছিলাম যা তার আগে বাংলা সাহিত্যে আমার জানা ছিল না। তা যেন অনেকটা দূর দেশের, যেন আকস্মিক ঘরোয়া কথার সঙ্গে আকাশ বিহারী কল্পনার সংমিশ্রণে তা পদে পদে অপ্রত্যাশিত। ঠিক এই সব লক্ষণ বনলতা সেনও দেখতে পাচ্ছি। যদিও চার আনা দামের চটিবই এবং ১১টি মাত্র কবিতা এতে আছে, তবু বিশেষভাবে আলোচ্য।*

---

* 'বনলতা সেন' ॥ জীবনানন্দ দাশের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। এই বইটি প্রকাশ হয় ১৩৪৯ সালের পৌষ (১৯৪২) মাসে। এই বইয়ের প্রকাশক জীবনানন্দ নিজেই প্রাপ্তি-স্থান কবিতাভবন ২০২, রাসবিহারী এভিনিউ। এই বইয়ে কবিতা ছিল মোট ১২টি। পরে বনলতা সেনের ১২টি কবিতা এবং ২৩টি নতুন কবিতা দিয়ে অর্থাৎ ৩৫টি কবিতা একত্র করে আর একটি বই করলেন নাম দিলেন মহাপৃথিবী। পরে কবিতাভবন

'বনলতা সেন' কিংবা 'হায়চিল'-এর মতো নিখুঁত গীতি কবিতা সাম্প্রতিক বাংলাকাব্যে অল্পই আছে। 'হাওয়ার রাত' 'নগ্ন নির্জন হাত' ও 'শিকার' এই তিনটি কবিতা সুস্পষ্ট আশ্চর্য স্বপ্নের মতো আমাদের মন অধিকার করে—তার জন্যে ভাবতে হয় না। ছোট্ট 'ঘাস' কবিতাটিতে যেন সমুদ্রের ঢেউ ছিটকে এসে পড়েছে—তার পিছনে দিগন্ত-ব্যাপী অসীম জলরাশির যে ইতিহাস তাকে সে ভোলেনি। 'বিড়াল' কবিতাটি অদ্ভুত রসে ভরপুর, বিস্ময়কর চরমে টেনে নিলে কী দাঁড়ায় এটি তার উদাহরণ।

জীবনানন্দ সম্বন্ধে এই কথাটাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে তিনি আজকের দিনেও কবিতত্ব করতে ভয় পান না। তার এই নির্লজ্জ ও নির্জলা কবিতত্বকে আমি অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করি। ...তাঁর কবিতেরও বিশেষ একটি প্রকৃতি আছে। ...

জীবনানন্দর জগৎ প্রায় সম্পূর্ণরূপে চোখে দেখার জগৎ। তার কাব্য বর্ণনাবহুল। তাঁর বর্ণনা চিত্রবহুল এবং তাঁর চিত্র বর্ণবহুল—এইটুকু বললেই জীবনানন্দর কবিতার জাত চিনে নেওয়া সম্ভব—বর্ণনাকে পাঠকের মনে পৌঁছে দেবার বাহন তাঁর উপমা। উপমার এমন ছড়াছড়ি আজকাল আর কোন কবিতায় দেখা যায় না। তাঁর উপমা উজ্জ্বল জটিল ও দুরন্বয়বহ। এক-একটি উপমা এক-একটি ছোট কবিতা হতে পারত। তিনিযে জাতের কবি, তাতে উপমা-বিলাসী না হয়ে উপায় নেই। অর্থাৎ উপমা তাঁর কাব্যের কারুকর্ষ মাত্র নয়, উপমাই তাঁর কাব্য। জীবনানন্দ একবার কোন এক পত্রিকায় লিখেছিলেন 'উপমাই কবিতা" কথাটা তখন থেকেই আমার মনে গেঁথে আছে।... উপমাই কবিতা এ কথাটা কিন্তু অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও মেনে নেওয়া অসম্ভব হয়নি। অবশ্য উপমা কথাটা এখানে খুব ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করতে হয়। ভাষায় কবির যেটা নিজস্ব ব্যঞ্জনা—কোন অভিনব বিশেষণ কিংবা কোন পুরোনো বিশেষণের বক্রীয় ব্যবহার, এমনকি কোন বিশেষ্যপদের প্রতীকী প্রয়োগ—এ সমস্তই কি মূলত উপমা নয়? অর্থ স্বীকার করে নিলে বলা যায় উপমা পরীক্ষা করলেই একজন কবির বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে।

জীবনানন্দ যখন বলেন—

বলেছে সে, এতদিন কোথায় ছিলেন
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে
নাটোরের বনলতা সেন

তখনই বুঝতে পারি তাঁর মন কিভাবে কাজ করছে। নাটোরের বনলতা সেনের যে চোখের সঙ্গে পাখির নীড়ের উপমা, সেই নাটোর, বনলতা এবং তার চোখ—এ-সমস্তই যে কোন সর্বদেশ সর্বকালব্যাপী ভাবের চিত্ররূপ তা অনুভব করলেই আমরা কবিতার মর্মস্থলে প্রবেশ করতে পারব।

আমি যে এত কবিতা লিখি, কবিতা কি—সে-সম্বন্ধে কোন কথা ভেবেছি কি? সেদিন সকাল থেকেই মনের মধ্যে এ-প্রশ্ন গুঞ্জরন হয়। তারপর রোজকার নিয়মে স্নান-খাওয়া। জামাকাপড় পরে চাদরখানা কাঁধে পাট করে রেখে বললেন—মা আসি। মা-কে বড় ভালোবাসেন জীবনানন্দ। লাবণ্যকে বললেন—চলি তাহলে কলেজে—ছেলে-মেয়েদের দেখছি না, কোথায় গেল।

আছে কোথাও এদিক-ওদিকে খেলা করছে—কবিজায়া উত্তর দিলেন। বললেন, আবার তুমি তাড়াতাড়ি আসবে কেমন।

জীবনানন্দ মাথা দোলালেন।

পায়ে পায়ে এগিয়ে চললেন কলেজে কবি। হাসলেন আপনমনে। সকলেই যারা কবিতা লেখে, নিজেকে বড় কবি ভাবে কিন্তু, সকলে ইকি সত্যি কবি, কেউ কেউ কবি—তাহলে কারা? যাদের হৃদয়ের মধ্যে কল্পনা আছে, যে জানে কল্পনা করতে, তার সারা-জীবনের অভিজ্ঞতা এবং ভাবনার যা সারবস্তু তা তার কল্পনার মধ্যে জমা হয়—জমা হয় কত শতব্দীর অভিজ্ঞতা, অতীত ও বর্তমান কালের ছায়া।

আজ কলেজের ছাত্রদের পড়ানোয় কেমন যেন আনমনা ভাব। ছাত্রদের মধ্যে সদা গোল অনেক সময়েই পড়নোই দায় হয়। ছেলেদের পড়াতে ভালোই লাগে। নিজে যেটুকু শিখেছেন, সবটুকুই উজাড় করে দিতে চায় মন, কৃপণতা জীবনানন্দের স্বভাব-বিরোধী। কিন্তু উজাড় করে দিতে চাওয়া হলেও নিতে চায় কে? এত আন্তরিকভাবে পড়াতে চাই তবু আমার ক্লাশে এরা পড়ে না কেন। ইংরিজির অধ্যাপক নরেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় ছাত্রদের মধ্যে খুব প্রিয়, তুমি কেন ছাত্রদের মধ্যে প্রিয় হতে পারবে না, তুমি কি তাঁর থেকে কম শিক্ষিত।* .. আজ ভালো লাগে না। ছাত্র-দের মধ্যে সোরগোল। আজ কোন কথা বললেন না, শুধু চুপ করে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন : এরা পড়বার সময় কেন এত কথা বলো, এরা কি বোঝে না এদের দায়িত্ব—কত কষ্ট করে এদের অনেককে পড়তে হচ্ছে — অভিভাবকেরা তাদের পড়াচ্ছেন। ভালো লাগে না। ক্লাশ শেষ হলে অস্তে আস্তে হেঁটে টিচারস্ কমনরুমে এলেন। সহকর্মীরা একে অপরের সঙ্গে কথা বলছেন, কেউ বইয়ের মাঝে ডুব দিয়েছেন, কেউ বিশ্রাম করছেন চেয়ারে মাথা রেখে। জীবনানন্দ ঘরের এক কোণে একখানি চেয়ারে বসলেন—কিছুক্ষণ বসে আস্তে আস্তে হেঁটে কলেজের করিডোর অতিক্রম করে বাগানে এসে দাঁড়ালেন। এখন এই মুহূর্তে কালি, কলম, মন তিনজনই অধীর। মন তার এখন নির্জন ঘরে তাঁর আপন প্রিয় লেখার টেবিলের কাছে চেয়ার টেনে বসে কিছু লিখতে। কবির মন যখন চঞ্চল, তখন তিনিও চঞ্চল। দ্রুত পদচারণা চলে।

আজ সারা সকাল থেকে মনটা কবিতার কথা নিয়ে বড় ভাবে। কাব্য কাকে বলা যায়? পৃথিবীর সমস্ত জল দূরে রেখে যদি এক নতুন জলের কল্পনা করা যায়, কিংবা পৃথিবীর সমস্ত দীপ নিভিয়ে রেখে এক প্রদীপের কল্পনা করা যায়, তাহলে পৃথিবীর এই দিন এই রাত মানুষ ও তার আকাঙ্ক্ষা এবং সৃষ্টির সমস্ত ধুলো, সমস্ত কংকাল ও সমস্ত নক্ষত্রকে ছেড়ে দিয়ে এক নতুন ব্যব-হারের কল্পনা করা যেতে পারে—তা-ই কি কবিতা—বোধহয় তাই। অথচ জীবনের সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক তো অস্বীকার করা যায় না। কবি শিল্পীর সৃষ্টির মাঝে এ-জীবনের চলার পথে মাঝে মাঝে এমন শব্দ শোনা যায়, এমন রং দেখা যায়, এমন আঘ্রাণ পাওয়া যায় এমন মানবীয় বা অমানবীয় সংঘাত এসে যায় এবং তার দুঃখ-বেদনার সঙ্গে পরিচয় হয় যে, মনে হয় এসব অনেকদিন থেকেই জীবনে জড়িয়েছিল, ভাঙচুর হয়ে নয়, একই সঙ্গে জড়ো হয়ে জড়িয়ে আরো অনেকদিন পর্যন্ত, হয়তো মানুষের সভ্যতার শেষ আলো পর্যন্ত কোথাও থেকে যাবে। এইসব অপরূপ অনুভূতি এক বিরাট অনুভূতির জন্ম দেয়। নীহারিকা যেমন নক্ষত্রের শরীর ধারণ করে থাকে, তেমনি বস্তু-সঙ্গতির প্রসব হতে থাকে যেন হৃদয়ের ভিতরে এবং সেই প্রতিফলিত অনুচ্চারিত দেশ ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে ওঠে, সুরের জন্ম হয়, এই বস্তু ও সুরের পরিণয় শুধু নয়, কোন কোন মানুষের কল্পনা-মনীষার ভিতর একাত্মতা ঘটে—কাব্য জন্মলাভ করে।

সকাল-দুপুর কোথা দিয়ে অতিক্রম করে চলে গেল।

কবিতা, শুধু কবিতা।

চা খাবে না, জল খাবে না, কি যে সকাল থেকে এত ভাবছ বুঝতে পারি না। শোন, আজ দিদি এসেছিলেন, বললেন—তোমার কাকা কাল আসবেন....শুনেছ... কলেজ থেকে এসে মুখ-হাতও ধুলে না। কি যে করো ... .

ও, হ্যাঁ দাও। খোকা কোথায়। মা কি করছেন।

ঘরের সামনে সবুজ একফালি মাঠ। ভালো লাগে ঘাস। ঘর ছেড়ে ঘাসে—এক-ফালি মাঠে সেখানে পদচারণা শুরু হয়ে যায়। কৃষ্ণচূড়া দুলে-দুলে ছাওয়া।

থেকে প্রকাশিত বনলতা সেন কবিতা বইটির সকল কবিতা মহাপৃথিবী থেকে দুটি এবং অবো ১৬টি নতুন কবিতা যোগ করে সিগনেট থেকে প্রকাশ হল বর্তমান বনলতা সেন বইটি। বনলতা সেন (পরবর্তী) বইটির সুদৃশ্য প্রচ্ছদপট করেছিলেন শ্রীসত্যজিৎ রায়। কবির কিন্তু প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনা অনুযায়ী মুখটি মনঃপূত হয়নি। অনেকের কাছেই বলেছেন, রাজকুমারী অমৃত কাউবের কথা ভেবে কি আমি বনলতা সেন কবিতাটি লিখেছিলাম।

* কবি অধ্যাপক বিষ্ণু দে কে জীবনানন্দ একবার বলেছিলেন, বিষ্ণুবাবু আপনার ক্লাশের ছাত্ররা খুব শান্তভাবে বসে পড়া-শোনা করে না? ক্লাশে কিছু ছাত্রদের অস্থিরতায় জীবনানন্দ মাঝে মাঝে তাই অসুবিধায় পড়তেন। শান্ত স্বভাবের কবির পক্ষে অধ্যাপনা মাঝে মাঝে তাই সুখকর বোধ হত না।

জীবনানন্দ মাঠের এপাশে-ওপাশে ধীরে ধীরে চলে ফিরে বেড়ান, কখনো পদচারণা দ্রুত হয়, কখনো ধীর, যেন তাঁর চিন্তা-ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে।

সন্ধ্যা হয়ে আসে।

কাব্যের সঙ্গে জীবনের কি কোন সম্বন্ধ নেই?

সম্বন্ধ রয়েছে তবে প্রকটভাবে নেই।

কবিতা কি মুখ্যত লোকশিক্ষা? কিংবা লোকশিক্ষাকে রসে মণ্ডিত করে পরিবেশন?

না—তা-ও নয়, কবির সেরকম কোন উদ্দেশ্য.. নেই।....পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ কাব্যই কবির সেরকম লক্ষ্যের প্রাধান্য নেই। কিন্তু তবুও কবিতার সঙ্গে ব্যক্তি ও সমাজের সম্বন্ধ সেরকম। শ্রীমদ্ভগবত, শ্রেষ্ঠ কবিতার ভিতর একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই যে, তথাকথিত সমাজকে বা সভ্যতাকেই শুধু নয়, এমনকি সমস্ত অমানবীয় সৃষ্টিকেও যেন তা ভাঙছে এবং নতুন করে গড়তে চাইছে, এবং এই সৃজন যেন সমস্ত অসঙ্গতির মুখ ফিরিয়ে কোন একটি সুসীম আনন্দের দিকে।

পদচারণা বন্ধ রেখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলেন কিছুক্ষণ জীবনানন্দ। কবিতা কি সকলের জন্য নয়?

যে পর্যন্ত জনসাধারণের হৃদয়ে নতুন দিগ্‌বলয় না হচ্ছে... আসল প্রশ্ন হচ্ছে—ভিতের হৃদয় পরিবর্তিত হওয়া দরকার, কিন্তু সে-পরিবর্তন আনবে কে? কবিকে কি শিক্ষার অধিনায়ক সাজতে হবে? সৌন্দর্যপ্রবাদে স্পন্দিত করে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করতে হবে? প্রোপাগ্যাণ্ডা করতে হবে? ডিক্টেটর সাজতে হবে জীবনের সঙ্গতি ও সুষমার সাধনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে? যদি কোন শেষ বৈকালিক ইন্দ্রজালে আজকের এই সভ্যতার মোড় ঘুরে যায়, তাহলে কবিকে কিছুই করতে হবে না আর, তার নিজের প্রতিভার কাছে নিজেকে বিশ্বস্ত থাকতে হবে শুধু কতিপয়ের হাতে তার কবিতার দান অর্পণ করে। যে কতিপয় হয়তো ক্রমে ক্রমে বেড়ে হেতে পারে—মানুষের হৃদয় তার প্রাচীন মন পুরোনো আপোষের ভেতর আর থাকতে পারছে না বলে। আর যদি সভ্যতার মোড় ঘুরে না যায়, তাহলে কমরেডের দল এবং সাহিত্যের হবগবিন্নেরা কারোর জন্যে একটা কিছু করবেনই নিশ্চয়ই। সাহিত্য-জগতে গায়টে বা ল্যাম কিংবা তাঁর নিজের ভাবে পেইন অথবা রবীন্দ্রনাথ অথবা ইয়েটস কিংবা নিজের সৃষ্টি এবং বেন্থনীর ভিতর এলিয়ট এঁদের মত রসবোদ্ধাদের কথা ছেড়ে দিলেও; বুর্জোয়া শ্রেণীদের ভেতরেও এমন অসংখ্য খাঁটি রসবোদ্ধা আছে যার হীন ভগ্নাংশও আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত সমাজে নেই।'

আজ ১১৩৮ এক হেমন্তে জীবনানন্দ বরিশালে তাঁর প্রিয় লেখার ঘরটিতে বসে লিখে চলেছেন একটানা একটি প্রবন্ধ—তাঁর

'সকলেই কবি নয়। বেশ্ট কেউ কবি। কবি—কেননা, তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার মধ্যে চিন্তা...' প্রবন্ধখানির শেষ অংশ লিখছেন তখন সেকি তাঁর নিজেরই কথা:—

'কিন্তু সভ্যতার মেদ ও ইন্দ্রজালস্তির যদি পুনর্যৌবন না ঘটে, তিনি তৃতীয় শ্রেণীর কবি নন, অতএব স্বখ্যাত সলিলে ধাতস্থ আমাদের দেশের সাহিত্য-কর্মীদের সহানুভূতি যাঁর জন্যে একটুও নেই, তিনি কি করবেন? তিনি প্রকৃতির সান্ত্বনার ভিতর চলে যাবেন—শহরে-বন্দরে ঘুরবেন—জনতার স্রোতের ভিতর ফিরবেন—নিরালম্ব অসঙ্গতিকে যেখানে কল্পনা মনীষার প্রতি-ক্রিয়া নিয়ে আঘাত করা দরকার, নতুন করে সৃষ্টি করার জন্যে সেই চেষ্টা করবেন। আবার চলে যাবেন হয়তো উন্মুখ পঙ্গুদের সঙ্গে করে নিয়ে প্রকৃতির সান্ত্বনার ভিতর, সেই কোন আদিম জননীর কাছে যেন, নির্জন রৌদ্রে ও গাঢ় নীলিমায় নিস্তব্ধ কোন অদিতির কাছে।

তাঁর প্রতিভার কাছে কবিকে বিশ্বস্ত থাকতে হবে হয়তো কোন একদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতার সঙ্গে তার কবিতাবৃত্ত প্রযোজন হবে সমস্ত বোচকের সমস্ত জীবের হৃদয়ে মৃত্যুহীন স্বর্ণগর্ভ ফসলের ক্ষেতে বুননের জন্যে।'

বাবা দেহরক্ষা করেছেন ১৯৪২ ২২শে ডিসেম্বর বরিশালে মায়ের মন টিঁকছিল না। বরিশালে কয়েকটা মাস কাটিয়ে ১৯৪৩এ কলেজ যখন বন্ধ হল গ্রীষ্মের ছুটিতে মে-জুন মাসে মাকে সঙ্গে নিয়ে জীবনানন্দ এলেন সপরিবারে কলকাতায়। কিংবা মাকে বোধহয় অশোকানন্দ আগেই এনে রেখে-ছিলেন তাঁর কাছে। কলকাতায় জীবনানন্দের আত্মীয় স্বজন তখন অনেকেই রয়েছেন। জ্যাঠতুত খুরতুত ভাইবোনেরা, কাকারা পিসিমা। অশোকানন্দ তখন রসা রোডের মোহিনী মানসনে এসে আছেন। কাছেই পণ্ডিতিয়া প্লেসে কাকা ব্রহ্মানন্দ কাকিমা এবং ছোটকাকা জ্ঞানানন্দ দাশ থাকেন। জীবনানন্দ কখোনো কখোনো তাদের বাড়িতে বেড়াতে এসে নেমেছেন। ব্রহ্মানন্দ জ্ঞানানন্দ তাঁকে বড় ভালোবাসেন।

অনেকদিন মফঃস্বল বরিশালে কবির বসবাস। কলকাতায় এসে একার সাহিত্যিক বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কিছু দেখা হয়। কলকাতায় কোন পত্রিকায় কি তাঁর চাকরী হতে পারে না—কলকাতা যে কবিকে আকর্ষণ করে। প্রকাশক পাড়া—বই পাড়া কলেজ স্ট্রীটে কবি পায়ে পায়ে এগিয়ে চললেন কয়েকজন প্রকাশক আশ্বাস দিলেন—সিগনেটের প্রদীপ গুপ্ত বললেন আপনার কবিতার বই আমরা প্রকাশ করবো। কবি সাহিত্যিক যাদের সঙ্গে পরিচয় আছে অনেকে তাঁরা বললেন কেন আপনি দূরে রয়েছেন কলকাতার সাহিত্য জগৎ থেকে। চলে আসুন কলকাতায়!

সত্যি তাই!

জীবনানন্দ বড় দূরে। কলকাতার সাহিত্যসমাজ-সাহিত্যজগৎ থেকে অনেক দূরে। অনেক নতুন নতুন তারকা—কবি সাহিত্যিকের আবির্ভাব হচ্ছে, তাঁদের কবিতা-কথাসাহিত্যে বাংলা সাহিত্য কত সমৃদ্ধ হচ্ছে—পরিবর্তনই হয়ে গেল কিছুই খবর রাখা হল না—কিছুই জানা হল না।

কবিতা সৃষ্টি এবং কাব্যপাঠ দুই-ই ব্যক্তিগতের ব্যাপার?

কে বলে—আমরা তা স্বীকার করি না। কবিকে সমাজ সচেতন হতে হবে। সে সমাজের দশজনের একজন যখন তখন দশ-জনের কথা ভাবতে হবে; দশজনের সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার কথা ভাবতে হবে, ব্যক্তি-মনের খেয়াল খুশিমত যদেচ্ছা বিহার করার দিন এখন চলে গেছে। প্রেম ভালো-লাগা ভালোবাসার দিন চলে গেছে শ্রমিকের কথা কৃষাণের কথা কুলিমজুরদের জীবনের গান....

দেখেননি বন্যা, দুর্ভিক্ষ যুদ্ধ?

আপনি এখনও বনলতা সেনের কবিতা লিখছেন কারা করছেন?

তোমরা কারা?

তোমরা প্রগ্রেসিভ রাইটার্স এসোসিয়েশনের কবিরা।

তোমরা কমিউনিস্ট?

হ্যাঁ শোনেননি পূর্ব বাংলা ঢাকার ছেলে সোমেন চন্দের কথা। আমাদের সমসাময়িক কমিউনিস্টদের বড় লেখক হবার উপাদান আর গুণ বোধহয় একমাত্র সোমেন চন্দেরই ছিল। কিন্তু কি দুঃখের কথা—সোমেন চন্দ ঢাকার রাস্তা দিয়ে সশস্ত্রকল শ্রমিকদের ফ্যাসিস্ট বিরোধী মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময়ে কমিউনিস্ট বিরোধী এক বাম-পন্থীদলের হাতে খুন হয়। সোমেন চন্দের স্মৃতিরক্ষা করতে গিয়ে আমরা সবাই গড়ে তুলেছি ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ। আমাদের মতামত আপনাকে জানিয়েছি কবিতা উদ্দেশ্যহীন কবিতা হতে পারে না।

তোমাদের আমি বিশ্বাস করি না তোমরা নতুন কবিরা দিব্যানুভূতিকে ঘৃণা কর, স্থূল ও চিক্কন সুরে মিশিয়ে কবিতা লেখো। পদ্য বা গদ্যো—তোমাদের কবিতা প্রধানত শ্লেষাত্মক এবং বর্তমানকালের সমগ্র পৃথিবীর সমাজ ব্যবস্থার অন্যায় ও অত্যাচারের মুখোস খুলে ফেলার জন্যে প্রযুক্ত। তোমাদের সাহিত্য কল্পনাপ্রতিভার দাবি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে অকাতর-ভাবে মননজীবী এবং কবিতার বিশুদ্ধ রসের কোনরকম অবতারণার বিরোধী। তোমরা গদ্য প্রায় পদ্যছন্দ অথবা পদ্যছন্দ অবলুপ্তির করেই চলেছ এবং বর্তমান সমাজ ও সভ্যতার শব বাহনের কাজ করে চলেছ তোমাদের কবিতায়।

তবুও আপনার কথা আমরা শুনতে চাই—কেন লেখেন কবিতা

আপনার কাছ থেকে আমরা জানতে চাই কেন ও লেখকের দায়িত্ব.

আমরা সকল লেখক কবিকে অনুরোধ

করব দাবি জানাবো এ বিষয়ে লেখবার জন্যে....

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ফ্যাশিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের পক্ষ থেকে 'কেন লিখি' এ সম্বন্ধে একটি পুস্তিকা সংকলন করবেন সেই কারণে সকলের কাছে চিঠি দিয়েছেন। জীবনানন্দকেও দিয়েছেন। জীবনানন্দ কি প্রবন্ধ লিখতে কিংবা কোন রাজনীতির মধ্যে নিজেকে জড়াতে অনিচ্ছুক? সত্যিই তাই? তিনি কোন সাহিত্যিক দলাদলি বা রাজনীতির মধ্যে নেই। তাঁর চেষ্টা সকলের থেকে নিজেকে দূরে রাখা তাঁর চিঠির মধ্যেও সে সুর যেন দেখা যায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের চিঠির উত্তর এখনি না দিয়ে দিলেন কবি বিষ্ণু দেকে।

প্রিয় বরেষু,

অনেকদিন পরে আপনার চিঠি পেয়ে খুশী হয়েছি। অনেক হারানো কথা মনে পড়ছে সুভাষেরা আমাকে কলেজের ঠিকানায় চিঠি দিয়েছিল কেন লিখি এসম্পর্কে এতো তাড়াতাড়ি আমি কি লেখা দেবো ভেবে পাচ্ছি না। সুভাষ তিন-চার প্রস্থ একটা প্রবন্ধ অবিলম্বে পাঠাতে লিখেছে। আমি আজকেই খুব তাড়াতাড়ি প্রস্থ তিনেক লিখে দিলাম। কাল থেকে আর সময় পাব না,—গোছা গোছা টেস্টের খাতা দেখতে হবে। প্রবন্ধ আপনার ঠিকানায় পাঠালাম প্রবন্ধ প্রায়ই লিখি না, সুবিধে পেলাম না। আমার হাতের লেখাও অস্পষ্ট, ভালো করে প্রুফ দেখে দেবার নির্দেশ দিলে খুশী হবো।

আমি গত গরমের ছুটিতে দুমাস কলিকাতায় ছিলাম। আপনি কি তখন কলকাতায় ছিলেন. পুজোর ছুটিতেও দিন কয়েক কলকাতায় কাটাচ্ছি, নানা কাজের ভিড়ে বসে কারু সঙ্গেই দেখা করতে পারি নি।..... সুভাষের চিঠির উত্তর দেয়া হয়নি। দু'একদিনের মধ্যেই দেব?

সুভাষের প্রবন্ধ গেল বিষ্ণু দের কাছে।

কি সে প্রবন্ধ? কেন লিখি, লেখা ও লেখকের দায়িত্ব।

'জীবন ছাড়িয়ে কোন মানবীয় অভিজ্ঞতা থাকা কি সম্ভব? কবির অভিজ্ঞতা যা আকাশ পাতাল সমস্তই উপলব্ধি করে নিতে চায়, তা-ও তো মানবীয়। অবিশ্যি এরকম কবি আছেন—যা কাব্য নিষতির পথে এমন সব মুহূর্ত মাঝে মাঝে এসে পড়ে। যখন মনে হয় কবির ভাবনা প্রতিভা এমন এক অপরূপ অপ্রশান্তির আস্বাদ পেয়েছে, যা জীবনের কোন ব্যবহারের ভিতরই ধরা পড়ে না। জীবনের প্রতিবিম্বও নয়, আমাদের এই ইতিহাস স্মৃতি জীবন ছাড়িয়ে কবি মানসের কোন অনন্য অভিজ্ঞতার দেশে চলে গিয়েছে। কোন কবি যদি এরকম মনে করেন, তাহলে বুঝতে হবে যে তিনি কালকের বা আজকের নিত্য ব্যবহার্য সমাজ পদ্ধতির বাইরে কোন কিছুর কথা ভাবছেন না। তবুও জীবনের বাইরে কোথাও চলে যেতে পারেন নি। কারণ, জীবন—এই জীবন পদ্ধতি যে-কোনো সমাজ ও সমবায় পদ্ধতির চেয়ে বড়—এরই ভিতরে মানুষের সমবায় ব্যবস্থা বারবার ভেঙে যাচ্ছে ও নতুনভাবে গড়ে উঠছে। আমাদের এই গ্রহের জীবন-সংস্কার সবচেয়ে স্মরণীয় দৃষ্টান্ত মানুষ। কোনো বিস্ময়কর প্রমত্তভাব মুহূর্তেও নিজেকে অন্যরূপ কল্পনা করা তার পক্ষে কঠিন; অথচ কল্পনা প্রতিভার চমৎকার সংহতির মুহূর্তে মানবজীবন সম্পর্কে সবচেয়ে মূল্যবান কথা আবিষ্কার করবার কিম্বা নতুনভাবে প্রচার করবার সুযোগ সে পায়। এই সব সময়ই হচ্ছে কাব্য বা শিল্প-সৃষ্টি।

কিন্তু তবুও কবিতার উপর বাস্তবিক কোন ভার নেই। কারু নির্দেশ পালন করবার রীতি নেই কবি মানসের ভিতর। কিম্বা তার সৃষ্টি কবিতায়। অথচ সৎ কবিতা খোলাখুলি-ভাবে নয়, কিন্তু নিজের স্বচ্ছন্দ সমগ্রতার উৎকর্ষে শোষিত মানবজীবনের কবিতা, সেই জীবনের বিপ্লবের ও তৎপরবর্তী শ্রেষ্ঠতর সময়ের কবিতা। মহৎ কবির ভাবনা সূক্ষ্ম, হৃদয় আন্তরিক অভিজ্ঞতা সজাগ ও চেতন-অবচেতনা ঐকান্তিকভাবে সক্রিয় থাকার দরুণ ব্যবহারিক পৃথিবীতে এরকম মানুষের কাছ থেকে জীবনের উন্নতিশীল ভাঙাগড়ার কাজে শুদ্ধ ও সার্থক আত্ম-নিয়োগ দাবি করা যেতে পারে। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় কবিতা ও শিল্পসৃষ্টির ভিতরেই তিনি ঢের বেশী স্বাভাবিক ও স্মরণীয়—এমন কি অধিকতর মহৎ,—বাস্তব কার্যক্ষেত্র তেমন নয়।

এরকম উক্তি করতে গিয়ে, আমি সত্যিই আত্মবিস্মৃত কি না, তা সমসাময়িক বন্ধুরা বিচার করে দেখবেন। আমার মনে হয়। এই সমস্ত উপরিউক্ত বিষয় অনুভব করেই আমি লিখি। কিন্তু কবিতা বা সাহিত্যই শুধু নয় সুলিপি সৃষ্টি করবার জন্যেও (এই সমস্তই ব্যক্তিগত প্রয়াস ও আকাঙ্ক্ষার কথা। সফলতার কথা নয়) লেখা প্রয়োজন মনে করি। আজকে দুর্দিনে মানুষের নিঃসহায়তার রূপ কীরকম কি করে তা কাটিয়ে উঠে জীবনের শুভ অর্থবোধ করতে পারা যায়। এবিষয় নিয়ে যে কোন প্রবীণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও তার লিপিময় প্রকাশ মূল্যবান জিনিষ। যদিও একথা স্বীকার করে নিতে হবে যে, অগণন কবি মণীষীর সৎ জীবন নির্দেশের সমুদয় আমাদের হৃদয়ের কাছে থাকতেও তা প্রায়শই আমাদের জন্যে শবসাকৃত হয়ে রয়েছে—এবং তার পাশেই ছড়িয়ে রয়েছে জীবনের অন্নপূর্ণা মরীচিকা—তবুও তাতে এ জিনিষ প্রমাণিত হয় না যে, কবিতা ও সাহিত্য ও সুলিপির ইতিহাস বিশ্বমানুষের ভাবনা ও চেতনাকে মূল্য জ্ঞানময় ও চরিত্রবান করে তোলে নি।

শোষিত মানবজীবনের সেই জীবনোৎসারিত বিপ্লবেরও সেই বিপ্লবের শেষে আশা ভরসার সমাজের কবিতা ছাড়াও আরো অনেক কিছু নিয়েই কবিতা মহৎ হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই সমস্ত কাজও সময়, দেশ, প্রকৃতি ও প্রেমের ঐকান্তিক জিনিষ হয়েও কেবলই শ্রবণমান, ধ্বেয়মান, ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের জীবন সম্পর্কে সচেতন ও অভিজ্ঞ:—ও এই অভিজ্ঞতা—এই সচেতনতার থেকেই উৎসারিত।

তবুও সমাজের বাস্তবের দিকে জীবনানন্দ সচেতন হয়েছেন—যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা দেশভাগের পটভূমিতে এই চল্লিশের যুগেই। চারদিকে জীবনের অজস্র অপচয় আর ধ্বংসের মুখে সমাজজীবন বিপর্যস্ত! সদাচার সুবিচার এইসব মৌল বিশ্বাস যার উপর মানুষের সভ্যতা তা আজ কোথায়।

বনলতা সেনের কবি শহরে এসে দেখতে পেলেন—

"গৃহ নীড় নির্দেশ সকলি
হারায়ে ফেলে ওরা
জানে না কোথায় গেলে মানুষের
সমাজের পারিশ্রমিকের
মতন নির্দিষ্ট কোন শ্রমের
বিধান পাওয়া যাবে.
জানে না কোথায় জল তেল
খাদ্য পাওয়া যাবে.
অথবা কোথায় মুক্ত পরিচ্ছন্ন
বাতাসের সিন্ধু তীর আছে।"
(এই সব দিনরাত্রি)

আরো লিখলেন:—

"স্বতই বিমর্ষ হয়ে ভদ্র সাধারণ
চেয়ে দ্যাখে তবু সেই বিষাদের চেয়ে
আরো বেশি কালো কালো ছায়া
লঙ্গরখানার অন্ন খেয়ে
মধ্যবিত্ত মানুষের বেদনার নিরাশার
হিসেব ভিতরে

নর্দমার থেকে শূন্য ওভারব্রিজ উঠে
নর্দমায় নেমে—
ফুটপাত থেকে দূরে নিরন্তর ফুটপাতে গিয়ে
নক্ষত্রের জ্যোৎস্নায় ঘুমাতে বা
মরে যেতে জানে।"
(তিমির হননের গান)

বিশ্বাস রাখেন

"....জীবনকে সকলের তরে ভালো করে
পেতে হলে এই অবসন্ন ম্লান পৃথিবীর মতো
অম্লান, অক্লান্ত হয়ে বেঁচে থাকা চাই।
একদিন স্বর্গে যেতে হতো।"
(পৃথিবীতে)

জীবনানন্দ গভীরভাবে ভাবিত হলেন। নতুন দিনকে অস্বীকার করা যায় না।

কলকাতায় দুটো মাস মে আর জুন অশোকানন্দ এবং নলিনীর সাহচর্যে পার হয়। নলিনী চক্রবর্তী কবির আত্মীয়া হয়েছেন। অশোকানন্দর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছে। তারা সুখী হয়েছে। তবু কুসুম-কুমারী দেবীর মনে চিন্তা—কবির জন্যে চিন্তা।

জীবনানন্দ কলকাতায় দুটি মাস কাটিয়ে ফিরে গেলেন বরিশাল। সেখানে ফিরে নলিনী দাশকে চিঠি লিখলেন।

কল্যাণীয়াসু,

নিনি, এবার সুদীর্ঘ গ্রীষ্মের ছুটি কলকাতায় তোমাদের সঙ্গে কাটিয়ে খুব লাভ করেছি। কলকাতায় গিয়ে এবার নানা-রকম অভিজ্ঞতা লাভ হলো। সাহিত্যিক ব্যবসায়িক ইত্যাদি নানারূপ নতুন সম্ভাবনার ইসারা পাওয়া গেল। এর আগে মাঝে মাঝে আমি ২।৪ দিনের জন্যে কলকাতায় যেতাম, কিন্তু নানাদিক দিয়ে কলকাতার সামাজিক সাহিত্যিক ও অন্যান্য ব্যাপারে যে এরূপ সজীব পরিবর্তন এসেছে তা লক্ষ করবার সুযোগ পাই নি।

বরাবরই আমার আত্মবৃত্তি ও জীবিকা নিয়ে কলকাতায় থাকবার ইচ্ছা। এবার সে ইচ্ছা আরো জোর পেয়েছে।

কিন্তু পথ কেটে নেবার জন্যে সাধনার দরকার।

কলকাতায় তোমাদের বাড়িতে অশোকের ও তোমার যত্নে ও পরিচর্যায় উদারতায় ও নিঃস্বার্থ ব্যবহারে খুব খুশি হয়েছি।

তোমার কাছ থেকে যে বইগুলো আমি এনেছি সেজন্যে আমি খুব কৃতজ্ঞ। পূজোর সময়ে ফিরিয়ে দেবো। কেনবার মত বাংলা বইয়ের একটা লিস্টি তোমাকে শিগগির পাঠাবো। আমারও পড়বার সুযোগ হবে। মার শরীর কেমন আছে? তিনি যেন আমার জন্যে কোন চিন্তা না করেন।

আমার আন্তরিক প্রীতি তোমাদের জন্যে। ইতি দাদা।

১৩৫১ অর্থাৎ ১৯৪৪-এ কলকাতার পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ পূর্বাশা লিমিটেড থেকে জীবনানন্দ দাশের চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ 'মহাপৃথিবী' প্রকাশ হয়েছে। প্রথম সংস্করণের এই মহাপৃথিবী বইয়ের মুদ্রক প্রকাশকের নাম লেখা সত্যপ্রসন্ন দত্ত।

সত্যপ্রসন্ন দত্ত জীবনানন্দর কবি বন্ধু সঞ্জয় ভট্টাচার্যর বন্ধু। কবিতা বইয়ের দাম? দেড় টাকা। বইয়ের উৎসর্গ পৃষ্ঠায় লেখা প্রেমেন্দ্র মিত্র, সঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রিয়বরেষু। কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র কল্লোল-বন্ধু, কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য জীবনানন্দ ভক্ত—যেমন বুদ্ধদেব বসু। প্রগতিতে এবং কবিতায় বুদ্ধদেব জীবনানন্দকে সমর্থন জানিয়েছেন। সজনী-কান্তর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কবিতার বিপক্ষে কলম ধরেছেন কবিতার সঙ্গে সঙ্গে কবিকে যে বড় ভালোবেসেছিলেন। সেই বুদ্ধদেবের জীবনা-নন্দর কবিতার প্রতি অ-প্রেম কেন। জীবনা-নন্দর বড় আক্ষেপ—কল্লোল কালিকলম ক্রমে বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছিল। বুদ্ধদেব বসুর প্রগতি এল নতুন সম্ভাবনা ও উৎসাহ নিয়ে। ব্যক্তিগতভাবে প্রগতি ও বুদ্ধদেব বসুর কাছে আমার কবিতা ঢের বেশি আশা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। সে কবিতাগুলি হয়তো বুদ্ধদেবের মতে আমার নিজের জগতের এবং এবং তাঁরও পরিচিত পৃথিবীর বাইরে কোথাও নয়, স্পষ্টতা সম্ভবা তারা অতএব সাহস ও সততা দেখাবার সুযোগ লাভ করে চরিতার্থ হলাম বুদ্ধদেববাবুর বিচার শক্তির ও হৃদয়বৃত্তির, আমার কবিতার জন্যে বেশ বড় স্থান দিয়েছিলেন তিনি প্রগতিতে এবং পরে 'কবিতা'র প্রথম দিকে। তারপর 'বনলতা সেন'এর পরবর্তী কাব্যে আমি তাঁর পৃথিবীর অপরিচিত, আমার নিজের ও পৃথিবীর বাইরে চলে গেছি বলে মনে করেন তিনি।'

বরিশাল থেকে কলকাতায় যখন এসে-ছেন জীবনানন্দ পুজোর ছুটিতে বা গরমের ছুটিতে বা ডিসেম্বরে বড়দিনের ছুটিতে কখোনো কখোনো দেখা হয়েছে সঞ্জয় ভট্টা-চার্যর সঙ্গে—সঞ্জয়ের সঙ্গে সৌহার্দ্য তখন থেকেই গভীরতর। সঞ্জয় কখোনো এসেছেন জীবনানন্দর বাড়িতে, জীবনানন্দ কখনো গেছেন গণেশচন্দ্র এভিনিউর পূর্বাশা অফিসে। দুজনের কত অন্তরঙ্গ মুহূর্ত পার হয়েছে গল্প, কথার আলোচনায়।

জীবনানন্দবাবু, আপনার দীর্ঘদিন-ব্যাপী এই কাব্য অভিজ্ঞতা এক অলৌকিক স্বতন্ত্র বস্তু।

জীবনানন্দ সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কথায় লজ্জা পেলেন।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য আবার বললেন, আপনার জীবনবোধ, প্রেমবোধ, ইতিহাস বোধ, সমাজ বোধ সবই স্বাতন্ত্র্যে এক একটি আলোক-মণ্ডলস্বরূপ। জীবনানন্দের হাসি হাসি মুখের দিকে চেয়ে আবার বললেন সঞ্জয়—কল্পনার আলোয় বোধগুলো উজ্জ্বল হয়েছে সত্যি, কিন্তু সে কল্পনা প্রকৃতিক বা ঐতি-হাসিক বাস্তবতার বৃন্ত ছেড়ে অলৌকিকতার পথে বিচরণশীল হয়নি। আপনাকে সেই-জন্যে ইতিহাস চেতন কবি বলা যেতে পারে।

শুধুই কি আমি ইতিহাস চেতন কবি? জীবনানন্দ একটু চুপ করে থেকে তারপর বললেন আরো দু চার রকমের চেতনা আছে, আজো যাদের কবিতায় শুদ্ধ করে নিয়ে নির্ণয় করে দেখতে ভালোবাসি। সমাজ যত বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও কল্যাণকর হোক না কেন, প্রেম প্রকৃতি, সৃষ্টি প্রভৃতি সম্পর্কে শেষ আত্মপ্রসাদ কোন ঐকান্তিক কবি বা মণীষীর জীবনে ঘটে কি? ঘটে নি তো আমার জীবনে। সমাজ ও ইতিহাস সম্পর্কেও আমার কবিতা চেতনা হয়তো দেখিয়েছে। আরও বড় চেতনায় উত্তরপ্রবেশ চেয়েছে। কিন্তু সেই জ্ঞানদৃষ্টি কি পেয়েছে যা সমাজকে নতুন পথ দেখাতে পারে? কিন্তু কোন কবি তার কবিতার সেই অমোঘ বিজ্ঞান দৃষ্টির প্রভাবে সমাজ ও পৃথিবীকে নতুন পথ দেখিয়েছে—কবি লক্ষিত সেই পথ বেয়ে মানুষ তার প্রাণের আকাংখিত সমাজে? প্রয়াণের প্রথম দিন থেকে সুরু করে আজো আমরা সে সমাজ পাই নি। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির দিব্যতা যা নতুন শুদ্ধ সমাজ মানবকে দান করতে পারে—এই দৃষ্টি দিব্যতার দিক থেকে তা হলে কি অতীতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ কবিই বিফল? কিংবা সমস্ত শ্রেষ্ঠ কবিই কি অল্পাধিক সার্থকতায় অবিচ্ছিন্ন সময়ের সমবেত চেষ্টায় বিজ্ঞান-শুদ্ধ শুভ নিঃশ্রেয়স সমাজ গড়ছে? তা হয়তো গড়ছে (এ প্রয়াসের পথে কোন শেষ কৈবল্যলোকও নেই হয়তো) যেমন সমস্ত শ্রেষ্ঠ মণীষী অর্থশাস্ত্রী ও সঠিক বিষয়ালোকিত সেবক ও সাধকেরা গড়ছে। আধিভৌতিক উপায়ে এরা যেমন করে গড়ছে সমাজ সৃষ্টা, কবিতা সে সাফল্যের দাবী করতে পারে না হয়তো—কিন্তু অন্য এক শ্রেষ্ঠ সার্থকতা রয়েছে তার—যেখানে শুদ্ধ সমাজ সৃষ্টির শুভেচ্ছা বা বৈজ্ঞানিক শুদ্ধতা (যা একক্রম সমাজ রচনা করেছে। যদিও সে সমাজ আজো পাচ্ছি না আমরা) সবকিছু হয়েও আরো কিছুর অপেক্ষা রাখে যা বিষয় ও বিষয় বিজ্ঞানের উজ্জ্বলতাকে ভাব প্রতিভার সাহায্যে কবিতার স্বাতন্ত্র্য আজ্ঞায় পরিণত করে। আমার আধুনিক কবিতা এই সব ব্যাপারের থেকেই উৎসারিত হতে চাচ্ছে।

আমার মনে হয় আপনি যতই গভীরে গিয়ে পৌঁছচ্ছেন ততই একলা হয়েছেন জীবনানন্দবাবু।

একলা থাকতে ভয় কি সঞ্জয়বাবু?

সাধারণ মানুষ একলা থাকতে ভয় পায়, একলা হলেই প্রকাশ হয় তার অসীম দৈন্য। অতল শূন্যতা অপার নিঃসঙ্গতা। তারা অবচেতনভাবে এ শূন্যতা ঢেকে রাখে রূপের, অর্থের, পদমর্য্যাদার গর্ব দিয়ে, কিন্তু এ গর্বের যা কিছু মূল্য তা তো কেবল সমাজে বসবাস করার প্রয়োজনেই জেই প্রাত্যহিকতার মধ্যে সাংসারিকতার মধ্যে তাদের একাকীত্ব ভুলে থাকে, ভাবে পাশাপাশি থাকলেই বুঝি একত্র থাকা যায়, আর একত্র থাকার অর্থ একাত্ম হওয়া। নিঃস্ব মানুষ নিঃসঙ্গ হতে ভয় পায়। প্রতিদিন কর্মাগত বাইরের হট্টোগোলে সাধারণ মানুষ অন্তরে যে ঐশ্বর্য আছে তার সন্ধান কেউ পায় না।'

(চলবে)

সমালোচনা

ম্লেচ্ছ থেকে হরিজন

১৯৭৮ সালে ৬৭ বছর বয়সের সীমায় দাঁড়িয়ে দেবব্রত বিশ্বাস যখন তাঁর জীবনের কথা ভেবেছেন তখন তাঁর দুটি অভিজ্ঞতার কথা মনে হয়েছে। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন ম্লেচ্ছ আর শেষ জীবনে তিনি হলেন হরিজন।

ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার এক ব্রাহ্মপরিবারের সন্তান তিনি। বাল্যকালে হিন্দু বাসিন্দাদের কাছে তিনি ম্লেচ্ছ বলে অভিহিত হতেন। ইস্কুলের যে বেঞ্চিতে সেই বালকটি বসত তাতে কোনো হিন্দু বালক বসত না। তার মেলামেশার বাড়ি ছিল আঙুলে গোনা। সম্ভবত সেসব বাড়িও হিন্দু অনুশাসনে ছিল ম্লেচ্ছ। বাল্যকালের অভিজ্ঞতাকে তিনি তিক্ত বলেছেন।

শেষ জীবনে শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাসের আরেকটি অভিজ্ঞতা হল। তিনি রবীন্দ্রসংগীত জগতে হয়ে গেলেন হরিজন। শেষ জীবনের অভিজ্ঞতার কোনো বিশ্লেষণ লেখক দেন নি। তার বিবরণ পেশ করেছেন মাত্র। তা পড়ে আমাদের মনে হয়, লেখকের শেষ জীবনের অভিজ্ঞতাটি ধ্বংসাত্মক। কারণ তা শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাসের সংগীতকে রুদ্ধ করেছে।

ম্লেচ্ছ থেকে হরিজন হয়ে যাওয়ার যে কাহিনী লেখক শুনিয়েছেন তা ছোট বড় হরফে মোট ১৯২ পৃষ্ঠায় ছাপা শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাসের আত্মজীবনী। আটটি ফোটোগ্রাফসহ এখানে আমরা শিল্পীর পরিবার, গ্রামের পড়শি সুহৃদ বন্ধু, কলকাতার কলেজ জীবন, কেরানি জীবন, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ের কাহিনী পেয়ে যাই, আর পাই সংগীতশিল্পী রূপে দেশ ও দেশান্তরে অগণিত শ্রোতার হৃদয়ে এবং রেকর্ডিং কোম্পানীতে প্রতিষ্ঠা পাবার কাহিনী। আত্মপ্রচারে ভয়াবহরকমে বিমুখ শিল্পীর (প্রসঙ্গ : হিন্দুস্থান রেকর্ডিং কোম্পানিকে কড়া চিঠি) সতর্ক প্রয়াসে সে কাহিনী অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইঙ্গিতবহ আবার লেখকের আদর্শে দায়বদ্ধ কলমের ঘটনা-বর্ণনে সুস্পষ্ট।

লেখক হিসাবে দেবব্রত বিশ্বাসের ক্ষমতা ঈর্ষণীয়। অনেক উপভোগ্য দৃশ্য ও ঘটনা তিনি জলের মতো করে লিখেছেন।

'খাল পার হওনের এ্যাংরাজী'র গল্পটি দারুণ। ভাষাশিক্ষকের কাজে লাগবে। জামিলসাহেবের চরিত্রটি চমৎকার ফুটেছে। মানতেই হবে ভদ্রলোক করিতকর্মা,, কি জীবন্ত একটা প্রোগ্রাম করজা করলেন। রবীন্দ্র-অনুরাগ দেখানোর তাড়নায় সমালোচক সকলের রবীন্দ্রনাথের কবিতা মুখস্থ বলা এবং কী গান শুনতে

দেবব্রত বিশ্বাস

ও'র ইচ্ছে এই সরল ও আন্তরিক প্রশ্নের উত্তরে তাঁর থতমত খেয়ে যাওয়ার দৃশ্য বেশ উপভোগ্য। 'খবরের কাগজ মাথায় করে ঝড়-বৃষ্টির ঝাপ্টা থেকে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করিনি' এ উক্তির জবাব নেই। নগেনদার টীকাসহ আবছালা শব্দটি অভিধানে গৃহীত হলে দোষ কি! ঢাকার অনুষ্ঠানগুলির, বিশেষভাবে বাফার অনুষ্ঠানের বর্ণনা রীতিমত মর্মস্পর্শী। কালোবা দোকানে গানের আসরের বর্ণনাটি শান্তিনিকেতনের গৌরবময় ইতিহাসের এক অমূল্য উপাদান। আর বহু মানুষ এখানে চিত্রিত হয়েছেন তাঁদের চারিত্রিক বিশিষ্টতায়। তাঁদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী, অনাদি দস্তিদার, পুলিনবিহারী সেন, পংকজকুমার মল্লিক, হিমাংশু দত্ত সুর-সাগর, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাধিকামোহন মৈত্র, কণক বিশ্বাস, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিনয় রায়, স্নেহাংশু আচার্য প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

শিল্পীর শেষ জীবনের যে অভিজ্ঞতাকে আমরা ধ্বংসাত্মক বলেছি তার শুরু ১৯৬৪ সালে। দেবব্রত বিশ্বাসের গাওয়া দুটি রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ডিং না-মঞ্জুর করে বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড হিন্দুস্থান রেকর্ডিং কোম্পানিকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। তাতে না-মঞ্জুর করবার যেসব কারণ দেখানো হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল তা স্বেচ্ছাচারিতারই নামান্তর। কারণ তা ধোপে টিকল না, গান মঞ্জুর হল। ১৯৬১ সালের জুলাই মাসে বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড আবার দুটি গানের রেকর্ডিং না-মঞ্জুর করলেন। বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের দু দফার ফতোয়া শিল্পীর জীবনে কি প্রতিক্রিয়া ঘটাল?

শিল্পীর নিজের কথা উল্লেখ করি: 'নিরাশ হয়ে রবীন্দ্রসংগীত আর রেকর্ড করব না বলেই মনস্থির করলাম।' সেই সূত্রে ১৯৭০-৭১এর পর থেকে আজ অবধি শিল্পী তাঁর সিদ্ধান্তে অটল রয়েছেন। তিনি রবীন্দ্রসংগীত আর রেকর্ড করেন নি।

কিন্তু শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাসের জীবনের এরকম একটা ধ্বংসাত্মক অভিজ্ঞতার ঘটনা তো একজন মানুষমাত্রের অধিকারসীমায় চাপা থাকতে পারে না। অগণিত মানুষের আনন্দ ও বেদনা তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। তাঁর বাণী ও রূপের যথাযথ অভিব্যক্তির পরিচয় পেয়ে শ্রোতার জীবন ধন্য হয়। তাঁর মতো শিল্পীকে মানুষ হারাতে চাইবে কেন? তাই বাংলার সাংস্কৃতিক দুনিয়ায় ঝড় উঠল। অনেক পত্রপত্রিকা সোচ্চার হলেন। তাদের মধ্যে কলকাতা, যুগান্তর, ও অমৃতের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। যুগান্তর ও অমৃত যে বিশ্ব-ভারতী মিউজিক বোর্ডের ভিৎ কাঁপিয়ে-ছিলেন তা টের পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বিশ্বজনেরাও ক্ষুব্ধ হয়ে-ছিলেন।

কি ছিল বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের বক্তব্য?

বইতে তাঁদের দুটো চিঠির নকল দেওয়া হয়েছে। তাঁদের ফতোয়া ও ফরমান বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। প্রথমে আসে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ। বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের মতো একটি সম্মানিত প্রতিষ্ঠানের চিঠিতে রোমান হরফের টাইপকপিতে রবীন্দ্রনাথের গানের যে বিকৃতি ঘটেছে তা লজ্জার। এরপর দেখতে হয় তাঁরা কোন কোন দোষের ওজরে গান না-মঞ্জুর করলেন। চিঠিতে সহযোগী যন্ত্রসংগীতের বাড়বাড়ির কথা বলা হয়েছে, স্বরলিপি না মেনে গাওয়ার অভিযোগ তোলা হয়েছে এবং কোনো গান সম্পর্কে বলা হয়েছে, দি টেম্পো অফ দি সঙ ইজ টু-উ কুইক (কথাটিকে যথাযথ দেখানোর প্রয়োজন আছে)।

উল্লিখিত অভিযোগগুলি বিষয়ে দেবব্রত বিশ্বাস যেসব চিঠি লিখেছেন সে-গুলি পড়ে কোনো সন্দেহ থাকে না যে তিনি তাদের অসারতা প্রমাণ করেছেন। কর্তব্য অভিযোগ তুললেন, অথচ দেখালেন না শিল্পী কোন জায়গায় স্বরলিপি লংঘন করেছেন—এ ব্যাপারটি আশ্চর্যের। দা টেম্পো অফ দা সঙ ইজ টু কুইক—এ অভিযোগের অর্থ বোঝার জন্যে আমাদের বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিতে হয়েছে। তাঁরা শুনে হেসেছেন। তাঁদের মত হল, ভরতীয় সংগীতে টেম্পো নিয়ে কোনো মাথা নেই, ওটা পাশ্চাত্য সংগীতের ব্যাপার।

আর কোন গান কি ঢঙে গাইতে হবে? এ ব্যাপারে আমাদের মতো সাধা-রণ শ্রোতার প্রতিক্রিয়া নিবেদন করা যায়। 'নে নূতন, দেখা দিক আর-বার জীবনের প্রথম শুভক্ষণ' গানটি দু ঢঙে শুনেছি। একটা ঢঙে নূতনের যে রূপ পাই তা এত

পেলব ও মুমূর্ষু যে ঝিমুনি লাগে। আবার দেববত্রত বিশ্বাস যখন এটি গান তখন নূতনের প্রচণ্ড আবির্ভাবে আমাদের বোধ ও চেতনা ঝংকৃত হয়ে ওঠে। দেখা যায় একই রকমের অভিজ্ঞতা ঘটেছিল নৃত্য-শিল্পী কেলু নায়ারের জীবনে। সেদিন দেববত্রত বিশ্বাসের 'ভাঙো, বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, ভাঙো' গানকে তিনি দুর্দমনীয় প্রাণে স্টেজের ধুলো উড়নো নাচে মূর্ত করে তুলেছিলেন। দুর্ভাগ্যের কথা, ওই গানও দেববত্রত বিশ্বাসকে পরে আর গাইতে দেওয়া হয়নি।

তাহলে শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায়? লেখকের সন্দেহই কি ঠিক? তিনি বুঝেছেন, সমস্ত ফতোয়া-ফরমানের আড়ালে প্রফেশনাল জেলাসি কাজ করছে।

বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডে এই পর্বে যাঁরা এক্সপার্ট হিসেবে ফতোয়া-ফরমান জারি করেছেন সংবিধান অনুসারে তাঁদের পরিচয় গোপন থাকার কথা থাকলেও তাঁদেরই হঠকারিতায় সবকিছু ফাঁস হয়ে পড়েছে। জানা যায় তাঁরাও রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে থাকেন, তাঁদেরও রেকর্ড আছে, তাঁরাও রয়্যালিটি পান। এবং বাজারের এ-খবরও আমরা জানি যে রবীন্দ্রসংগীত-শিল্পী হিসেবে দেববত্রত বিশ্বাসের রেকর্ডের যা বিক্রি তার তিন ভাগের প্রায় এক ভাগ বিক্রি ছিল ওই বিশেষজ্ঞমণ্ডলীর সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় শিল্পীর, অন্যদের আরো কম। তাই কি বাবীন্দ্রিকতার আপনি-মোড়লির আড়ালে স্বৈরাচারের এই চক্রান্ত? চক্রান্ত যে আছে তার আরো প্রমাণ, লেবেল হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও হিন্দুস্থান রেকর্ডিং কোম্পানির তরফ থেকে দেববত্রত বিশ্বাসের গুরুবন্দনা এবং অন্যান্য —রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড বাজারে ছাড়া হল না।

উপরোক্ত তথ্যগুলি বইয়ের বিভিন্ন চিঠিতে ছড়িয়ে রয়েছে। দেববত্রত বিশ্বাসের লেখা চিঠিগুলিতে আমরা দেখতে পাই, একজন শিল্পী কিভাবে তাঁর শিল্পাদর্শে স্থির ও অবিচল থেকে মাঝারি কর্তাদের স্বৈরাচারের মুখোস খুলেছেন, তাঁদের ফতোয়া-ফরমানের অসারতা দেখিয়েছেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের গ্রহণেই শিল্পের সার্থকতা—এই সত্যকে ধ্রুব জেনে তাদের প্রতি আজীবন শ্রদ্ধাশীল থেকেছেন, এগিয়ে যাওয়ার আনন্দে প্রয়োজনে হাজার দামী নোকোর মায়া ছেড়ে কলাগাছের ভেলায় চড়তে রাজি হয়েছেন, 'শান্তিনিকেতনী সংস্কারের ভূত কাঁধে চেপে-বসা কয়েকটা লোকের মস্তিষ্কপ্রসূত ভূত-কালের ভূতে-পাওয়া-ধারণা'কে শান্তিনিকেতনেরই স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের সংগীত-বিষয়ক উক্তির বাণে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেছেন। সত্য তাঁরই দিকে। প্রমথনাথ বিশী তাঁকে স্পষ্টই বলেছিলেন, '.....যদি দিনেন্দ্রনাথ অরাবীন্দ্রিক হন, এমনকি রবীন্দ্রনাথও অরাবীন্দ্রিক হন, তাহলে আপনিও অরাবীন্দ্রিক।'

দেববত্রত বিশ্বাসের আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তি আবহমানকালের শিল্পের যুক্তি, যা কিনা তার দেশকালের বিশেষ আধারে চিরনবীন। আত্মপক্ষ সমর্থনের খাতিরে দেববত্রত বিশ্বাস একদিকে বিচার বিশ্লেষণ ও প্রসঙ্গ কথনের অন্যদিকে শালীনতা সৌজন্য ও আত্মমর্যাদাবোধের যে নজির স্থাপন করেছেন তা সাম্প্রতিক কালের সাংস্কৃতিক দুনিয়ায় তুলনারহিত। কর্তার সুরে সুর মেলানোর প্রতিযোগিতাই যেখানে চলে সেখানে একজন শিল্পী তাঁর ভিৎ থেকে এক চুলও নড়লেন না এরকম একটা মহান দৃষ্টান্ত আমরা আমাদের দেশকালে দেখতে পেলাম তার জন্যে বক্তব্যজনের রুদ্ধসংগীতের রচয়িতা শিল্পী দেববত্রত বিশ্বাসের কাছে আমাদের ঋণ আরো বেড়ে গেল। অন্তত এই একটা কারণে বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। তাঁদের ডিকটেটরশিপের কারণেই দেববত্রত বিশ্বাস আরেক দফা হারমোনিয়াম ছেড়ে কলম ধরেছেন এবং বক্তব্যজনের রুদ্ধসংগীতের মতো একটা বইয়ের মতো বই লিখছেন।

কিন্তু ভবিষ্যৎ যখন জানতে চাইবে শিল্পী দেববত্রত বিশ্বাস ১৯৭০-৭১-এর পর থেকে ১৯৭৮ (জানি না এ সময় আরো দীর্ঘ হবে কিনা) পর্যন্ত রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড করলেন না কেন তখন বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড কি উত্তর দেবেন?

রণজিৎ সিংহ

বক্তব্যজনের রুদ্ধসংগীত। দেববত্রত বিশ্বাস। করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৯। প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৮৫। দাম ১২-০০।

আকর্ষণীয় নীহাররঞ্জন

নীহাররঞ্জন গুপ্তের হাতে যে কটি উপন্যাস পড়া গেছে, তার মধ্যে এটিকে পয়লা নম্বরে রাখতে হয়েছে আমাকে। কাহিনীর সারাতিসারাংশ হল—স্বামী অবনীশ সন্তান দানে অক্ষম জেনে, অর্চনা, স্বামীর বিজনেস পার্টনার, নারীমাংস-লোলুপ, দু-পেয়ে জানোয়ার সমরেন্দ্রর সঙ্গে পাঁচ বছরের জন্যে বিদেশ চলে যায়। সমরেন্দ্রর হাত থেকে গর্ভস্থ সন্তানকে বাঁচাতে তাকে জাপিয়ে অর্চনা কলকাতায় ফিরে আসে। সঙ্গে সমরেন্দ্র। এক বিলাশ-বহুল হোটেলের সাময়িক আস্তানায়, অবশেষে নির্যাতন সহ্যের শেষ সীমা ক্রস করে যাওয়া অর্চনার হাতে খুন হয় সমরেন্দ্র। অর্চনার প্রতি মনের গভীর প্রদেশে ভালোবাসা ছিল অবনীশের। তাই অর্চনা আশ্রয় পায় তার কাছে। শেষাংশে কোন এক জায়গায় একটি বিশেষ ব্রান্ডের সিগারেটের পোড়া অংশের টুকরোর মারফৎ লেখক পাঠকদের খুনী কে—খুনী কে এরকম একটা টেনশনে নিয়ে যান —একটা প্রচণ্ড নিশ্চয়তা থেকে ঝট করে পাঠককে ফেলে দেন—এই ব্যাপারটার মুন্সিয়ানা দারুণভাবে উল্লেখ করার মতো। শেষ দিকে বোঝা যায় নীহাররঞ্জন—প্রিয় পাঠকদের সেই সার্কাসিয়ান - [illegible] যার মুখ খুললেই কোর্টের কাঠগড়া থেকে বেনিফিট অফ ডাউটে মুক্তি পেয়ে যাবে অর্চনা। তারপর আর কি—পাঠকদের দিকে লেখক এক মুঠো সুখ ছুঁড়ে দিয়েছেন—নির্ঘাৎ অবনীশ-অর্চনাদের মিল। তবে ঝি মঙ্গলার একই পাতায় আট দশ লাইন ছেড়েই বিনা-কারণেই অন্য নাম কিংবা অবনীশ কি করে সমরেন্দ্র হয় (১০৯ পাতা)—এরকমটা সামান্য কয়েকটা ভুল আছে।—এগুলি না ধরলে অবশ্য সমকালের এই উপহারটি নিশ্চিতভাবেই পরিচ্ছন্ন ও আকর্ষণীয়ই বলা যায়।

গৌতম ভট্টাচার্য

মারীচ সংহার—নীহাররঞ্জন গুপ্ত। সমকাল প্রকাশনী। কলকাতা-১৩। সাত টাকা।

কবিতায় উপন্যাস

নচিকেতাবাবু 'অন্যরূপ রূপান্তর'-এ একটি কঠিন পরীক্ষায় হাত দিয়েছেন। তিনি একই আধারে মেলাতে চেয়েছেন কবিতা এবং উপন্যাসকে। উপন্যাসে কাব্যধর্মীতা নয়—তিনি কবিতাকে আশ্রয় করেই উপন্যাস লিখেছেন। কবিতা এবং উপন্যাসের মিলন ঘটানোর প্রয়াসী হয়েছেন তাদের দুই স্বতন্ত্র চরিত্রকে মেনে নিয়েও। তাই অন্যরূপ রূপান্তরে যেমন দেখি জীবনের প্রতিভাস তেমনি পাই তাকে ছাড়িয়ে এক অদ্ভুত রসোপলব্ধি। তাই জীবনের ঘটনাবলীর পাশাপাশি তরঙ্গায়িত হয়েছে মনোজগতের বিচিত্র আর বিস্ময়কর গতি। নচিকেতাবাবু সঠিক মুন্সিয়ানায় উপন্যাসের উপলখণ্ডগুলি কাব্যময়তার জটিল স্রোতে অনায়াসেই ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছেন।

কাব্যোপন্যাসের চরিত্রগুলিও নচিকেতাবাবু দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। উপন্যাসের নায়ক থেকে শুরু করে সুতপা, সেজদি প্রত্যেকেই নচিকেতাবাবুর দুঃসাহসী তুলির টানে বলিষ্ঠ চেহারা পেয়েছে। সে বলিষ্ঠতার মধ্যে স্থূলতা নেই—সর্বত্রই সূক্ষ্ম হাতের নিপুণ কারিগরী।

'অন্যরূপ রূপান্তর'-এ নচিকেতাবাবু রীতিমত একটা কঠিন পরীক্ষায় নেমে-ছিলেন—সার্থক হয়েছেন কৃতিত্বের সঙ্গেই। ত্রুটি-বিচ্যুতি যা এখানে ওখানে চোখে পড়েছে তা প্রথম অভিযানের পক্ষে অনিবার্যই। সে-সব ছাড়িয়েও প্রকাশিত নচিকেতাবাবুর ক্ষমতার পরিচয়। তবে একটা জিনিস বড়ো খারাপ লেগেছে, তা হল ছাপার ভুল। বড় অযত্ন লক্ষ্য করা গেল এই ক্ষেত্রে।

দিগ্বিজয় দিকপতি

অন্যরূপ [illegible]। নচিকেতা [illegible]। কলকাতা-৪। [illegible]

চার পাশে আশার আলো

আগের দুটো লেখায় মোটামুটি ভাবে কলকাতার মাঠের ভেতরের কিছু কিছু কথা বলার চেষ্টা করেছি। এবার জানাতে চেষ্টা করবো এই খেলাধুলোর মূল লোকজন যাঁরা এবং যাঁদের ওপর এই খেলার ভার দেওয়া আছে তাঁদের সম্বন্ধে। আই এফ এর কথা। আই এফ এ নামটার সঙ্গে কলকাতার মাঠের প্রায় সব দর্শকেরি একটা পরিচয় আছে।

মাঠে তাঁরা ঘোরা ফেরা করেন চোখে-মুখে কর্মকর্তার মুখোস এঁটে।

আজ থেকে অনেকদিন আগে তখন সবে স্পোর্টস সায়েন্স নিয়ে কাজ কর্মে মেতে উঠেছি, বামফ্রন্ট সরকার দ্বিতীয় দফার তখন ক্ষমতায়। এক মিটিং-এ আলাপ হল সে যুগের ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে। অনেক কথার ফাঁকে সব বললাম তাঁকে। তিনি উৎসাহ ভরে অনেকটা ঠেলে নিয়ে গেলেন স্পোর্টস সায়েন্সের একটা ইনস্টিটিউট করার কাজটা।

আলাপ হল রেলের একজন খুব বড় কর্তার সঙ্গে। তিনি আমার কথায় খুব উৎসাহ নিলেন। এর মধ্যে বাম ফ্রন্ট সরকারের পতন হয়েছে। রেলের বড় সাহেব স্কীমে খুব উৎসাহী। তিনি আমায় পরিচয় করিয়ে দিলেন অন্য এক কর্তার সঙ্গে। তিনি পয়সার কথা শুনে এবং সঙ্গে সঙ্গে পয়সা তোলার জন্যে স্পোর্টস সার্ভিসের জন্যে কলামন্দিরে এক বিরাট আসর করলেন এবং ৫০০ টাকা দিলেন সায়েন্স কলেজকে (যাতে কোনো একটা যন্ত্রের পর্টস কেনাও সম্ভব নয়) যাই হোক উৎসাহী ভদ্রলোক হাল ছাড়লেন না।

কয়েক মাস কেটে গেছে একটা নাম করা কাগজে স্পোর্টস সায়েন্সের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে নিয়মিত লিখছি (সেই কাগজ আছে তবে সেই পাতাটা আর নেই) এক শীতের সন্ধ্যে বেলের সেই বড় সাহেব বাড়ি এসে হাজির, পরিচয় করিয়ে দিলেন একজন আই এফ এ-র কর্তার সঙ্গে। অনেক কর্তা দেখেছি তাই সেই কর্তাকেও মন দিয়ে বললাম ব্যাপারটা কি। তিনি উৎসাহী হয়ে উঠলেন। রেলের সাহেব জানালেন তিনি বদলী হয়ে যাচ্ছেন।

প্রথম গেলাম, আজ থেকে অনেক দিন আগে একটা সরু গলির ভেতরে এস-প্লানেডের কাছে। আই এফ এ অফিস। ছোটোখাটো ভিমভাম। বড় সাহেবের বসেন ঠাণ্ডা ঘরে, সেখানে দেখা হল আরো এক বড় সাহেবের সঙ্গে। আবার উৎসাহ এবং টাকার অঙ্ক জানতে চাওয়া, গং বাঁধাই ছিল, কাগজ পকেটেই ছিল, রেখে চলে এলাম। কিছুদিন পরে চিঠি পেলাম। আই এফ এ-কে তাঁদের এই বিষয়ে সাহায্য করতে অনুরোধ করায়।

কাজ শুরু হোলো ভদ্রলোক সত্যই উৎসাহী, সেমিনার করতে বললেন। করলাম, ডেমনেসট্রেশন দিতে বললেন, দিলাম। অনেক পথে, ঘাটে, মাঠে। কিছু কিছু লোক হাসলো। কয়েকজন সিরিয়াসলি নিলো কাজ এগুচ্ছে শেষে স্পোর্টস স্কীমের একটা বিভাগ চালু করে কি ভাবে কলকাতার মাঠের খেলোয়াড়দের ডাপিং বন্ধ করা যায়, কি করে অল্পবয়সী ছেলেদের একটা সঠিক ট্রেনিং দেওয়া যায়। কি করে কোচদের বিজ্ঞান ভিত্তিক করা যায় এবং সবিশেষে কি করে ভারতবর্ষের জগতে একটা নতুন দিকের সূচনা করা যায়। উৎসাহের অন্ত নেই। ছুটো ছুটি লাফা-লফির শেষ নেই। স্পোর্টস সায়েন্স মরেও মরেনি, আবার বেঁচে উঠছে। বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক এবং গবেষককে এক লেখায় এনে হাজির করেছি। সকলেই মন দিয়ে কাজ করছেন এবং খেলার জগতের মারাত্মক সব ত্রুটিবিচ্যুতি দেখছেন এবং দেখাচ্ছেন। দিন গড়াচ্ছে স্পোর্টস সায়েন্সের ইনস্টিটিউট এবার আই এফ এ করবেই। মোহনবাগান ক্যাম্পের মূল কোচ জানিয়েছেন ইউনিভার্সিটি সায়েন্স কলেজের সাহায্য নিয়ে স্পোর্টস স্কীম দেব, তিনি গিয়ে কোচিং দেবেন। চারপাশে শুধু আশার আলো। আমরা এগিয়ে চলেছি।

পিনাকী চট্টোপাধ্যায়

খেলোয়াড়দের প্রতিবাদ মিছিল

সম্প্রতি ত্রিবান্দ্রমে ক্রীড়াকুশলীরা এক প্রতিবাদ মিছিলে সোচ্চার হয়েছিলেন। ক্রীড়া জগতের প্রায় পাঁচশো তারকা সমবেত হয়েছিলেন এই মিছিলে। বিক্ষোভ জানিয়ে নীরব পরিক্রমার পর মিছিল ধরণা দিয়েছিল স্টেট সেক্রেটারিয়েটের সামনে। এঁদের দাবী ছিল সাধারণের জন্য খোলা শহরের একমাত্র স্টেডিয়াম—সেন্ট্রাল স্টেডিয়ামের উন্নয়নের দায়িত্ব স্পোর্টস কাউন্সিলের উপর দেওয়া হোক।

কেরালা এ্যাথলেটিকস্ এসোসিয়েশন আয়োজিত এই মিছিলে ছিলেন ফুটবল খেলোয়াড় অ্যাথলেটস, বাস্কেট খেলোয়াড়, সাইকিস্টরা। স্টেডিয়ামের সুবিধা এবং ভাল অনুশীলনের দাবীতে এঁরা সোচ্চার হয়েছেন।

মিছিলে অংশ গ্রহণকারীদের হাতে-হাতে অধিকাংশ সোচ্চার ছিল আরও প্রতিবাদ হাতে ধরা প্লাকার্ড—পোস্টারে লেখা ছিল যোহানের দুর্ভাগ্য যেন আমাদের না হয়;' পদক পেলেই গলায় মালা, আহত হলেই পরিত্যক্ত।' এ সবই চিহ্নিত করছিল পাতিয়ালা ট্রেনিং ক্যাম্পের আহত খেলোয়াড় যোহানের ঘটনাটিকে। যোহান কমনওয়েলথ গেমসে যাওয়ার আগেই পাতিয়ালা ট্রেনিং ক্যাম্পে নির্বাচনী ট্রায়ালের সময় বাঁ পায়ের হাঁটুতে দারুণ আঘাত পেয়েছিলেন। তাঁর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা তেমন হয়নি। এই ঘটনাটিকে যে কোন খেলোয়াড়ের পক্ষে দুর্ভাগ্যজনক। পদক জয় করে আনলে যদি সমাদর হয় তবে সেই খেলোয়াড়দেরই দুর্ভাগ্যের দিনে অনাদর কেন? ভবিষ্যতে এই প্রতিবাদ মিছিলে বিক্ষোভে ক্রীড়া সংস্থা অথবা সরকার কি খেলোয়াড়দের নিরাপত্তায় কিছু মাত্র সচেতন হবেন?

সম্প্রতি প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড় অজিত ওয়াদেকার, রমাকান্ত দেশাই এবং দিলীপ সরদেশাইকে এম, সি, সি-র সদস্য পদ দেওয়া হয়েছে।

অজিত ওয়াদেকার ভারতীয় দলের সফল অধিনায়ক ছিলেন। ১৯৬৬-৬৭তে ভারত সফরকারী ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে খেলে তাঁর টেস্ট জীবন শুরু। সেই থেকেই ভারতীয় টেস্ট দলে অজিত ছিলেন অনিবার্য। ১৯৭১-এ তিনি ভারতীয় দলের অধিনায়কের দায়িত্ব নেন।

রমাকান্ত দেশাই ভারতীয় ক্রিকেটে ফাস্ট বোলার হিসেবে একটি উজ্জ্বল নাম। তিনি ভারতের একমাত্র মিডিয়াম পেস বোলার হিসেবে সবচেয়ে বেশী টেস্ট খেলেছেন। তিরিশি আটাশটি টেস্ট খেলে যাহাত্তরটি উইকেট পেয়েছিলেন। খুদে দেশাই-এর বলের ঘায়ে সেকালের অনেক দুঁধে ব্যাটসম্যানই ধরাশায়ী হয়েছিল।

দিলীপ সরদেশাই ১৯৬১তে টেস্ট খেলার সুযোগ পান। ১৯৬৫তে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে দুশো রাণের ইনিংস উপহার দেন। ১৯৭১ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে উপহার দেন দুশো বার রানের আরও একটি উজ্জ্বল ইনিংস। ১৯৭১-এর ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে তৃতীয় টেস্টে ওভালে তিনি চরম লড়িয়ে মেজাজ দেখিয়ে দুটি ইনিংসে যথাক্রমে ৫০ ও ৪০ করেন। এঁদের সম্মান প্রাপ্তিতে অভিনন্দন জানাই।

মারের পদত্যাগ

জন মারে ইংলিশ ক্রিকেট সিলেকশন কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছেন।

ইংল্যাণ্ড দলের আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য দল নির্বাচন নিয়ে অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে মতান্তরই এই পদত্যাগের কারণ। মিডলসেক্সের খেলোয়াড় মারে ইংল্যাণ্ডের একজন সেরা উইকেট রক্ষক ছিলেন। টেস্ট ক্রিকেটে ১৯৯টি উইকেট ভেঙ্গে দেওয়ার বিশ্ব রেকর্ডের সূত্রে মারের নাম উজ্জ্বল হয়ে আছে।

লিংকম্যান

আমরা নাকি ফি বছর মোটা টাকা পাই

সুভাষ ভৌমিক

আমরা কেউ প্রফেশনাল নই, অথচ নাকি ফি বছর মোটা টাকা পাই ক্লাব থেকে। কলকাতা ফুটবলের উত্তম-সুচিত্রা ত্রুটির দর নাকি এখন আশী হাজার টাকা। বাইসাইকেল কিক যার পায়ের বাঁশী সেই কৃষ্ণ ঠাকুর নাকি পান পঞ্চাশ হাজার টাকা এক সিজনে। নিজের সম্পর্কে শুনেছি ছিয়াত্তর সালে নাকি পেয়েছিলাম পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা। আমরা কে কত পাই—তা নিয়ে দর্শক, ক্লাবকর্তা থেকে শুরু করে ইনকাম ট্যাকসের কর্তাদের মাথা ব্যথার অন্ত নেই। বহু সাংবাদিক বন্ধু, যাঁরা নিজেরা আইনের বাইরে বেনামে স্বনামে ও ভূতের নামে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখে মাসে তিন চার হাজার টাকা আয় করেন, কলার ফাটা শার্ট পরে অফিস করেন এবং আয়কর দেন না তাঁরাও আমাদের উপদেশ দেন—কি কি করা উচিত।

উচিত অনুচিতের প্রশ্ন থাক, নিজের কথাই বলি। বাবা ভবেশ ভৌমিক এন এফ রেলে সুপারভাইজারি পোসটে কাজ করেন। বয়স চুয়ান্ন। সব মধ্যবিত্ত লোকের এদেশে যা হয়, আমার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। অর্থাৎ ডবল জন্মদিন। সরকারী জন্মদিন পঞ্চাশ সালের গান্ধী-জয়ন্তী আর বেসরকারী মানে যেটা আসল

কিশোরকুমারের সঙ্গে

খেলা

টেস্টে পাকিস্তানের জয়

লাহোরের গদ্দাফি স্টেডিয়ামের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় পাকিস্তান ৮ উইকেটে ভারতকে হারিয়েছে। ভারত বনাম পাকিস্তানের টেস্ট খেলায় পাকিস্তানের এটা দ্বিতীয় জয় এবং পরপর ১৩টা টেস্ট খেলা ড্র যাওয়ার পর এই দুই দেশের টেস্ট খেলার আসরে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হল। বর্তমানে ভারত বনাম পাকিস্তানের ১৭টা টেস্ট খেলার ফলাফল দাঁড়ালো—ভারতের জয় ২, পাকিস্তানের জয় ২ এবং খেলা ড্র ১৩।

সদ্য সমাপ্ত দ্বিতীয় টেস্ট খেলাটি উত্তেজনা ও উদ্দীপনায় খুবই প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে চৌহান এবং গাভাস্কারের আউট সম্পর্কে আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত নির্ভুল হয়নি। পাকিস্তানের খবরের কাগজেও এ নিয়ে সমালোচনার ঝড় বয়ে গেছে। পাকিস্তানের অধিনায়ক মুস্তাক মহম্মদ টসে জিতে ভারতকে প্রথম ব্যাট করতে পাঠান এবং পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসের ৫৩৯ রানের মাথায় (৬ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। মুস্তাকের এই দুই সিদ্ধান্ত দলের সমর্থকদের খুশি করতে পারেনি। তাঁকে এই কাজে কঠোর সমালোচনার সামনে পড়তে হয়েছিল। কাজটা ফাটকা খেলার মতই হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের জয়-লাভের ফলে এখন বলা হচ্ছে এই দুই সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন।

সবুজ উইকেটে ভারতকে প্রথম ব্যাট করতে দিয়ে পাকিস্তান প্রথম এক ঘন্টার খেলায় মাত্র ৪৯ রানের বিনিময়ে ভারতের চারটে উইকেট পেয়ে যায়। টসে জিতে ভারতকে প্রথমেই ব্যাট করতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত বেপরোয়া হয়নি প্রমাণিত হয়। প্রথম দিনেই ভারতের প্রথম ইনিংস ১৯৯ রানের মাথায় শেষ হয়। সর্বোচ্চ রান ছিল বেঙ্গসরকারের ৭৬। তারপরই অতিরিক্ত রান ২৮। ভারতের ব্যাটিংয়ের কি দৈন্যদশা, প্রথম দিনের বাকি সময়ের খেলায় পাকিস্তান একটা উইকেট খুইয়ে ২৮ রান করেছিল।

দ্বিতীয় দিনে পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৩৪৯ (৪ উইকেটে)। ওয়াসিম বারি ৮৫ রান করে আউট হন। টেস্টে তাঁর এটাই সর্বোচ্চ রান। জাহিদ আব্বাস ১২৮ রান করে অপরাজিত থাকেন। তাঁর এই ৫ম টেস্ট সেঞ্চুরী। ভারতের বিপক্ষে দ্বিতীয়।

তৃতীয় দিনে পাকিস্তান তাদের প্রথম

সেটা ঠিক এক বছর পুরোনো। এখন আমার বয়স ২৯।'

দেশ নাকি ছিল একদা পাবনায়। কোন্ পুরুষে আমরা দিনাজপুরের রায়গঞ্জে এসেছিলাম জানি না। রায়গঞ্জের মোহন-বাটিতে জ্যাঠামশাই পাঁচ কামরার এক-খানা একতলা বানিয়ে ছিলেন। সেখানেই আমার ও দাদা আশীষের শৈশব।

গোটা ছেলেবেলাটা কেটেছে বিভিন্ন স্কুলে। কখনো কাটিহারের রামকৃষ্ণ মিশনে, কখনো বহড়ার রামকৃষ্ণ মিশনে। তারপর হাজারিবাগ সেন্ট জেভিয়ার্স ও সবশেষে চেতলা হাইস্কুলে। মনে আছে আমি যখন বহড়া হাইস্কুলে পড়ি, ওটা আবাসিক স্কুল, বাবা ফি মাসে আমার খরচ হিসাবে পাঠাতেন ৮০ থেকে ১০০ টাকা। দাদা তখন কলকাতায় ডাক্তারি পড়ছে। জানতাম দুই ছেলেকে পড়াতে গিয়ে দিনের পর দিন ভবেশ ভৌমিক ও তাঁর স্ত্রী আমার দুঃখিনী মা দীপ্তিকে শাকে-ভাতে থাকতে হত।

সাতষট্টি সালে প্রথম আমি ফার্স্ট ডিভিসন ফুটবল লীগ খেলি। পরলা পার্টিং ইউনিয়ন। তারপর রাজস্থান। উনসত্তরে ইস্টবেঙ্গল। সত্তর থেকে বাহাত্তর মোহনবাগান। তেয়াত্তর থেকে পঁচাত্তর আবার ইস্টবেঙ্গল। ছিয়াত্তর থেকে আটাত্তর মোহনবাগানে। এই বারো বছরে দুবার জুনিয়র ন্যাশানাল, আটবার সন্তোষ ট্রফি, মারডেকা দুবার, এশিয়ান গেমস দুবার, সিঙ্গাপুরের পেস্তা সুকোর্নো একবার, ইন্দোনেশিয়ার মারা হালিম ট্রফি একবার এবং রাশিয়ায় একবার খেলেছি। দিশী ও আন্তর্জাতিক ফুটবলে আমার গোলের সংখ্যা আজ প্রায় পৌনে দুশো। এখন যারা ভারতীয় ফুটবলের বাজকাপুর, দেবানন্দ ও দিলীপকুমার তাদের মধ্যে আমার মত এত গোল আর সম্ভবত দিয়েছে পাঞ্জাবের ইন্দার সিং আর বাংলার শ্যাম থাপা ও হাবিব।'

ভারতীয় কিকেটের ক্যাপ্টেন বেদি আটান্নটি টেস্টে ২৪৮টি উইকেট পেয়েছে। গাভাসকারের সেঞ্চুরী তেরোটি। বি সি আই ক্লাবে বছর কয়েক আগে এক বিসেপশনে গাভাসকার ও আমি পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলাম। এক শিল্প-পতির সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দেওয়া হল। ভদ্রলোক দেখলাম গাভাসকারকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, খাঁটি নিউ আলিপুরে। দেড় লিটার দুধ রাখি। দৈনিক বাজার খরচ দশ টাকা। ইলেকট্রিকের বিল ৫০ টাকা মাসে। টেলিফোনের বিল ত্রৈমাসিক দেড়শ টাকা।

যেকোন কিকেট প্লেয়ার ফি টেস্টে পায় পাঁচ হাজার টাকা। আটটি টেস্ট থেকেই পায় চল্লিশ হাজার টাকা। প্লাস দাড়ি কামানের ব্লেড, টিভির বিজ্ঞাপন থেকে আরো প্রায় লাখ খানেক। এছাড়া বোনাস, পুরস্কার ইত্যাদি ইত্যাদি। নেশা যখন ছাড়বে তখন একটা বেনিফিট ম্যাচ পাবে। ওই এক ম্যাচ থেকে আরো প্রায় চার পাঁচ লাখ টাকা। এছাড়া চাকরি বা ব্যবসা তো আছেই। শিল্প-পতিরা আগ বাড়িয়ে নিজেদের আত্মজাদের তুলে দেন কিকেটারের হাতে।

আর আমার কি হয়েছিল? সাত বছর প্রেম করার পর যখন বিয়ে করতে চাইলাম মনে আছে আমার শ্বশুরমশাই (ভদ্রলোক একজন বিগ এগজিকিউটিভ) বলেছিলেন—শেষে একটা ফুটবলার!

শুনেছি শাশুড়ী নাকি বাড়ির কাজের লোক মাতঙ্গবালাকে বলেছিলেন, ছেলেটা যখনই আসবে তখনই বিদায় করবি।

সেই আমি জেদ ধরে বিয়ে করেছি। এখন দু বছরের একটি বাচ্চার বাবা। সেন্ট্রাল একসাইজে কাজ করি। মাইনে পাই ৯০০ টাকা। থাকি নিউ আলিপুরে। দেড় লিটার দুধ রাখি। দৈনিক বাজার খরচ দশ টাকা। ইলেকট্রিকের বিল ৫০ টাকা মাসে। টেলিফোনের বিল ত্রৈমাসিক দেড়শ টাকা।

এখন আপনাদের কাছেই প্রশ্ন রইল—গত বারো বছরে শুধু এদেশে লীগ, শীল্ড, ডুরান্ড, সব খেলা মিলিয়ে আমি যদি পাঁচ কোটি দর্শকের সামনে হাজির হয়ে থাকি, তাহলে বেদি (গাভাসকর অনেক জুনিয়র) স্বদেশে ও বিদেশে কি এত কোটি দর্শককে আজ পর্যন্ত আনন্দ দিয়েছেন? টেস্ট প্লেয়ার খেলোয়াড় জীবনের শেষেও টেস্ট প্লেয়ার থেকে যাবেন। আর সুভাষ ভৌমিক বুঝি ভেঙ্কটেশের মত না খেয়ে আত্মহত্যা করবে? তাহলে আপনারাই বলে দিন—ভারতীয় ফুটবলারদের আজ কি করণীয়?'

---

৩৯ রানের মাথায় (৬ উইকেটে) ইনিংস ঘোষণা করে। ১৯৬০-৬১ সালে ভারত যে ৫৩৯ রান (৯ উইকেটে) করেছিল সেটাই এতদিন ভারত পাকিস্তানের টেস্টে উভয় দলের পক্ষে কোন খেলায় দলগত সর্বোচ্চ রান ছিল। তারা ইচ্ছে করলে মাত্র এক সেশনেই ডেক্লেয়ার দিতে পারতো। জাহির আব্বাস ২৩৫ রান করে আউট থাকেন। টেস্টে এটা তাঁর ন সেঞ্চুরী। আগের দুটো ডাবল সেঞ্চুরীর একটি ছিল বিপক্ষে। টেস্টের এক ব সর্বোচ্চ রান ২৭৭ (বিপক্ষে ভারতের নাটিআউট ২৩৫ রান করার ধনাম পাকিস্তানের টেস্টে এক লায় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের ড আগের রেকর্ড ছিল হানিফ ঢাআউট ১৭৭ রান (মোদ্রাজ,

তৃতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় ভারত দ্বিতীয় ইনিংসের ১০টা উইকেট হাতে রেখে ৯২ রান সংগ্রহ করেছিল।'

চতুর্থ দিনে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৩০৭ (৩ উইকেটে)। গাভাস্কার ৯৭ রান এবং চৌহান ৯৩ রান করে আউট হন। গাভাস্কার এবং চৌহানের প্রথম উইকেটের জুটিতে ১৯২ রান উঠেছিল। এই ১৯২ রানই ভারত বনাম পাকিস্তানের টেস্ট খেলায় উভয় দেশের পক্ষে প্রথম উইকেট জুটির রেকর্ড রানে পরিণত হয়েছে। এই বিষয়ে আগের রেকর্ড ছিল ১৬২ রান (ইমতিয়াজ আমেদ ও হানিফ মহম্মদ, ১৯৬০-৬১)।

শেষ পঞ্চম দিনে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস ৪৬৫ রানের মাথায় শেষ হয়। লাঞ্চের ঠিক আগে পাকিস্তানের অধিনায়ক মুস্তাক মহম্মদ বোলার বদল করে সাধারণ পর্যায়ের মিডিয়াম পেস বোলার মুদ্দসার নাজারের হাতে বল দিলেন। নাজার দু রানের মধ্যে বিশ্বনাথ এবং বেঙ্গসরকারকে আউট করে পাকিস্তানের অনুকূলে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন। খেলায় জয়লাভের জন্যে পাকিস্তানের ১২৬ রানের প্রয়োজন ছিল। হাতে ছিল ৪০ মিনিট সময় এবং বাধ্যতামূলক কুড়ি ওভার। এই কুড়ি ওভারের মধ্যে ৮ ওভারের খেলা বাকি থাকতেই জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারত : ১৯৯ রান (বেঙ্গসরকার ৭৬। ইমরাণ খাঁ ৫৯ রানে ৪ এবং সরফরাজ নওয়াজ ৪৬ রানে ৪ উইকেট)
ও ৪৬৫ রান (গাভাস্কার ৯৭, চৌহান ৯৩, অমরনাথ ৬০ এবং বিশ্বনাথ ৮৩ রান। ইমরাণ খাঁ ১১০ রানে ৩, সরফরাজ ১১১ রানে ২, মুস্তাক মহম্মদ ১০৫ রানে ২ এবং মদাস্সার নাজার ৯ রানে ২ উইকেট)

পাকিস্তান : ৫৩৯ রান (৬ উইকেটে ডিক্লেঃ ওয়াসিম বারি ৮৫, জাহির

আব্বাস নটআউট ২৩৫ এবং মুস্তাক মহম্মদ নটআউট ৬৭ রান। বেদী ৩০ রানে ২ উইকেট)

ও ১২৮ রান (২ উইকেটে। মজিদ খাঁ ৩৮ এবং জাহির আব্বাস নটআউট ৩৪ রান)

লাখানির জোড়া হ্যাটট্রিক

পাকিস্তান সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দল তিনদিনের খেলায় সম্মিলিত বিশ্ব-বিদ্যালয় দলকে ২ উইকেটে পরাজিত করে। কিন্তু এই খেলায় করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০ বছরের স্পিন বোলার আমিন লাখানির অসাধারণ ব্যক্তিগত সাফল্য ভারতীয় দলের জয়লাভের গৌরব সম্পূর্ণ ম্লান করে দিয়েছে। ন্যাটা স্পিন বোলার আমিন লাখানি এই খেলায় জোড়া হ্যাট-ট্রিক করেন। প্রথম ইনিংসে তাঁর পরপর তিন বলে আউট হন—ঘাউড়ি, ভেঙ্কটরাঘবন এবং ভরত রেড্ডি। দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর পরপর তিন বলে বিদায় নেন যথাক্রমে মহিন্দর অমরনাথ, কিরমানি এবং কপিল দেব। প্রথম ইনিংসে তিনি ৫৮ রাণে ৬ উইকেট এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৮০ রাণে ৬ উইকেট পান। এখানে উল্লেখ্য, প্রথম শ্রেণীর একটি খেলায় আমিন লাখানির আগে মাত্র ৬জন বোলার জোড়া হ্যাটট্রিক করার গৌরব লাভ করেছেন। টেস্ট ক্রিকেটের একটি খেলায় জোড়া হ্যাট-ট্রিক করেছেন একমাত্র অস্ট্রেলিয়ার টি জে ম্যাথুজ (বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯১২)।

প্রথম দিনের খেলায় সম্মিলিত বিশ্ব-বিদ্যালয় দলের প্রথম ইনিংস ১৫৬ রাণের মাথায় শেষ হয়। খেলার বাকি সময়ে ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসের তিন উইকেট খুইয়ে ১০১ রাণ সংগ্রহ করেছিল।

দ্বিতীয় দিনে ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস ১৪৯ রাণের মাথায় শেষ হলে তারা ৭ রাণে পিছিয়ে পড়ে। এই দিনে ভারতীয় দল তাদের বাকি ৭ উইকেটের বিনিময়ে পূর্ব দিনের ১০১ রাণের সঙ্গে মাত্র ৪৮ রাণ যোগ করেছিল। ভারতীয় দলের ইনিংস তছনছ করে দিয়েছিলেন লাখানি এবং ইজাজ ফাকি। এই দিন লাখানি হ্যাটট্রিকসহ ২১ রাণে ৫ উইকেট এবং ফাকি ২৫ রাণে ২ উইকেট পান। দ্বিতীয় দিনের খেলার বাকি সময়ে সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিতীয় ইনিংসের ৯ উইকেট খুইয়ে ১৮১ রাণ সংগ্রহ করে ১৮৮ রাণে এগিয়েছিল।

তৃতীয় দিনে সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস ১৮৫ রাণের মাথায় শেষ হলে খেলায় জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১১৩ রাণ তুলতে ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসে খেলতে নামে এবং ৮ উইকেট খুইয়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় রাণ সংগ্রহ করে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় : ১৫৬ রান (আসরাফ আলি ৩৯ রান। বেদী ৪৭ রানে ৪ এবং ঘাউড়ি ৩২ রানে ৩ উইকেট)

জাহির আব্বাস

ও ১৮৫ রান (আসরাফ আলি ৫১ রান। ঘাউড়ি ৪৫ রানে ৫ এবং ভেঙ্কট ৬৭ রানে ৪ উইকেট)

ভারতীয় দল : ১৪৯ রান (যশপাল নটআউট ৪৭ রান। লাখানি ৫৮ রানে ৬ এবং ইজাজ ফাকি ৬৫ রানে ৪ উইকেট)

ও ১৯৩ রান (৮ উইকেটে। গাভাস্কার ৬৫ এবং এস অমরনাথ ৭২ রান। লাখানি ৮০ রানে ৬ উইকেট এবং ফাকি ৮৫ রানে ২ উইকেট)

জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতা

ভূপালে অনুষ্ঠিত ৩৫তম জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে গত বছরের রানার্স-আপ রেলওয়ে (পয়েন্ট ৬৬) এবং মহিলা বিভাগে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান মহারাষ্ট্র ৩০ পয়েন্ট সংগ্রহের সূত্রে এবারও খেতাব জয়ী হয়েছে।

পুরুষ বিভাগে ব্যক্তিগত খেতাব জয়ী হয়েছেন ১৮ বছরের কলেজ-ছাত্র অনিল গঞ্জু (রাজস্থান) তিনি চারটি স্বর্ণপদক জয় করেন এবং তিনটি বিষয়ে ভারতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেন (৪০০ মিটার ও ১৫০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল এবং ৪০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলিতে)। অপরদিকে মেয়েদের বিভাগে ব্যক্তিগত খেতাব জয় করেন ১২ বছরের স্কুল-ছাত্রী অনীতা সুদ। সেও চারটি স্বর্ণ-পদক পায়। তবে কোন জাতীয় রেকর্ড করতে পারেনি। একটা লক্ষ্য করার বিষয়, ব্যক্তিগত খেতাব জয়ের ক্ষেত্রে ছোটরা বড়দের এবার খুব টেক্কা দিয়েছে।

দলগত ফলাফল

পুরুষ বিভাগ : ১ম রেলওয়ে (৬৬ পয়েন্ট), ২য় সার্ভিসেস (৬৩), ৩য় দিল্লী (৪৬), ৪র্থ রাজস্থান (৩৫), ৫ম মধ্যপ্রদেশ (২৩), ৬ষ্ঠ কেরল (১৬), ৭ম উত্তরপ্রদেশ (১০), ৮ম তামিলনাড়ু (৭), ৯ম এন, এস এ—কলকাতা (৫), ১০ম পশ্চিম বাংলা (৪) এবং ১১শ পাঞ্জাব (১)

মহিলা বিভাগ : ১ম মহারাষ্ট্র (৮০ পয়েন্ট), ২য় পশ্চিম বাংলা (৫৩), ৩য় কেরল (৫২),

ব্যক্তিগত ফলাফল

পুরুষ বিভাগ : ১ম অনিল গঞ্জ (রাজস্থান) —৩১ পয়েন্ট, ২য় ইয়াং চিন সেন (বেলওয়ে) ১৬ পয়েন্ট এবং ৩য় আশিষ দাস সিনিয়ার (বেলওয়ে) ১৪ পয়েন্ট

মহিলা বিভাগ : ১ম অনীতা সুদ (মহারাষ্ট্র) ৩০ পয়েন্ট, ২য় রমা দেবী (কেরল) ২৮ পয়েন্ট এবং ৩য় ইলা পাল (পশ্চিম বাংলা) ১৭ পয়েন্ট

নতুন ভারতীয় রেকর্ড

পুরুষ বিভাগ (৫টি :

৪০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল : অনিল [illegible] (রাজস্থান), সময় : ৪মিঃ ৩৯-০ সেঃ

১৫০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল : অনিল [illegible] সময় : ১৮ মিঃ ৪৩-৪ সেঃ

৪০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলি : অনিল গঞ্জু, সময় : ৫ মিঃ ২৬-৭ সেকেণ্ড

১০০ মিটার বাটার ফ্লাই : আশিষ চক্রবর্তী (দিল্লী), সময় : ১ মিঃ ৪২-৮ সেঃ

৪×১০০ মিটার মেডলি রিলে : দিল্লী সময় : ৪ মিঃ ৩১-২ সেঃ

মহিলা বিভাগ (৩টি) :

১০০ মিটার বাটারফ্লাই : স্মিতা দেশাই (মহারাষ্ট্র) সময় : ১ মিঃ ১৫-১ সেঃ

৪×১০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল রিলে : মহারাষ্ট্র, সময় : ৪ মিঃ ৫৩-২ সেঃ

১০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক : ইলা পাল (বাংলা), সময় : ১ মিঃ ৩০-৯ সেঃ

ওয়াটার পোলো ফাইনাল : গত বছরের রানার্সআপ রেলওয়ে ৯—৩ গোলে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান সার্ভিসেস দলকে পরাজিত করে। রেল দলের পক্ষে তাপস দাস ৪টি এবং এম এস রানা ৩টি গোল করেন।

বিশ্ব বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা

মানিলায় আয়োজিত অপেশাদার বিশ্ব বাস্কেটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে যুগো-শ্লাভিয়া ৮২—৮১ পয়েন্টে গতবারের চ্যাম্পিয়ান রাশিয়াকে পরাজিত করেছে। যুগোশ্লাভিয়া ৮৬—৮৫ পয়েন্টে ইতালীকে হারিয়ে তৃতীয় স্থান এবং আমেরিকা ৯৬—৯৪ পয়েন্টে কানাডাকে হারিয়ে ৫ম স্থান লাভ করে।

বোম্বাই সমাচার

হিন্দী ছবির গল্প ও সুপ্রিম কোর্টের রায়

ভারতবর্ষে চলচ্চিত্র নির্মাতারা প্রায়ই বিদেশী ছবির অনুকরণ করার দায়ে সমালোচিত হন। প্রায় সমস্ত সফল বাণিজ্যিক ছবিই এই অভিযোগে অভিযুক্ত। শোলের জমি তৈরী হয়েছিল ম্যাগনিফিসেন্ট সেভেন থেকে আবার ম্যাগনিফিসেন্ট সেভেন কুরোশেয়ার সেভেন সামুরাই এর স্বল্প পরিবর্তিত চিত্ররূপ। জি. পি. সিপ্পীর সদ্যমুক্তি ছবি তৃষ্ণা ও মোমেন্ট টু মোমেন্ট বিদেশী ছবির হিন্দী চিত্ররূপ।

আজকেই এ ঘটনা নেতুনভাবে আলোচনা এ অভ্যেস বহু পুরোনো দিন থেকেই চলে আসছে। ত্রিশ এর দশকে এ. আর. কারদার অভিযুক্ত হয়েছিলেন 'বাঘি সিপাহী' ছবির জন্যে। তিনি কার্ডিনাল রিচেল্যু নামক বিদেশী ছবির গল্পকে কেন্দ্র করে বাঘি সিপাহী তৈরী করেছিলেন। পঞ্চাশের দশকে মহীপাল শাহকে আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী বেগুনাহ ছবির প্রদর্শন বন্ধ করতে হয়েছিল। বেগুনাহ ছিলো ড্যানী কয়ের ছবি নক অন দা উড ছবির কার্বন কপি।

তারপর থেকে বহু ভারতীয় ছবি বিদেশী ছবি অনুকরণের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছে। নয়াদেড়, নিউদিল্লী, সঙ্গম এবং গত বছর জিন্দেগী, এইসব ছবিগুলো অন্য ছবির অনুকরণ বলে কোর্টে কেস উঠেছিল। সম্প্রতি আশ্চর্যভাবে 'নিউ-দিল্লী' সম্বন্ধে সুপ্রীম কোর্টের রায় চলচ্চিত্র মহলে বেশ বড়ো ধরনের চমক সৃষ্টি করেছে।

'হাম হিন্দুস্থানী'র লেখক আর, জি, আনন্দের অভিযোগ ছিলো যে তাঁর লেখা এই নাটকেরই পরবর্তী চিত্ররূপ নিউদিল্লী ছবিটি দিল্লী হাইকোর্টের রায়ে হেরে যেয়ে আর, জি, আনন্দ সুপ্রীম কোর্টের দ্বারস্থ হন এই বলে যে তিনি উনিশশো তিপ্পান্ন সালে 'হাম হিন্দুস্থানী' লেখেন এবং উনিশশো চুয়ান্ন সালে মঞ্চস্থ হয়। এবং তার বেশ কিছুকাল পরে নিউদিল্লী ছবিটি তার গল্পের মূল ভাবকে ভিত্তি করে তৈরী করা হয় উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে। ছবির প্রযোজক ও পরিচালক ছিলেন মোহন সাহগল। সুপ্রীম কোর্ট আর জি আনন্দের এই আবেদন সরাসরি নাকচ করে নিউদিল্লীর পক্ষে রায় দেন।

মামলাটির নিষ্পত্তি হতে প্রায় দু যুগ লেগে গেলেও সুপ্রীম কোর্টের এই রায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে গল্প লেখক ও নির্মাতাদের কাছে। সুপ্রীম কোর্ট তার রায় একথা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছে যে কোনো ভাব, কল্পনা, বিষয়বস্তু, ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক গল্পের উপর কারও নির্দিষ্ট স্বত্ব থাকতে পারে না। সেক্ষেত্রে বরং গল্পের ফর্ম, আচরণ, ভাব বা কল্পনার গতিপ্রকৃতির উপর স্বত্ব সম্বন্ধীয় অধিকার আরোপ করা যেতে পারে। বিচারপতি ফজল আলি তাঁর বিচারে আরও বলেন, কোর্টকে একথা মেনে নিতেই হবে যে, স্বতঃগত ব্যাপারে এক গল্পের সঙ্গে আর এক গল্পের কাহিনীগত মিলই সবকিছু নয় কারণ গল্পের পটভূমিকা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মিল থাকা স্বাভাবিক। গল্পের বিষয়বস্তু এক হলেও ট্রিটমেন্টের ব্যাপারটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না এবং সেক্ষেত্রে ঐ ট্রিটমেন্ট বা গল্পকে ফুটিয়ে তোলার টেকনিকও এক মুখ্য দায়িত্বে আসীন থাকে। নিউদিল্লী নামক ছবির মূল কাহিনীর সঙ্গে হাম হিন্দুস্থানীর কিছু কাহিনীগত মিল থাকলেও একজন আর একজনকে নকল করেছে এ দায়ে অভিযুক্ত করতে পারেননি বিচারক কারণ আদর্শ ও প্রেসেন্টেশনে অনেক পার্থক্য রয়েছে।

এবার থেকে ফিল্ম রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন যাঁরা রাইটারদের ঝগড়া মেটাতেই ব্যস্ত থাকেন স্বত্ব সম্বন্ধীয় ঘটনা ও দুর্ঘটনায় তাঁরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারবেন। লেখক, প্রযোজক বা পরিচালকরাও বাড়তি স্বাধীনতা পাবেন।

কোনো অবস্থাতেই ভাব বা কল্পনার উপর কারও ব্যক্তিগত অধিকার থাকতে পারে না। আজকের লেখকেরা সবাই প্রায় কালিদাস বা সেক্সপীয়ারের কাছে পরোক্ষ অভিযুক্ত হতে পারেন কিন্তু সবাই তো নিজস্ব ক্ষমতায় নিজের মতো করে সবকিছু তুলে ধরেছেন ব্যক্তিগত চিন্তাধারা ও কল্পনা মিশিয়ে।

সুপ্রীম কোর্টের এই বলিষ্ঠ বিচারে ভবিষ্যতে যাঁরা ছবি তৈরী করবেন তাঁরা অনেক উপকৃত হবেন কারণ এই রিচার ছবি তৈরীর স্বাধীনতায় এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপের সূচনা করলো।

পি এল সন্তোষী

প্রখ্যাত লেখক, সঙ্গীতকার ও পরিচালক পি এল সন্তোষী সম্প্রতি মারা গেছেন।

গত কয়েক বছর যাবৎ প্রকাশ্য আলোয় তাঁকে আমরা না দেখলেও সন্তোষী তাঁর স্মরণীয় ছবি খিড়কী, সেহনাই এবং সরগম-এর জন্যে চলচ্চিত্র জগতের কাছে পরিচিত থাকবেন বহুদিন। তাঁর প্রথম ছবি 'হাম এক হ্যায়' যে ছবিতে নায়ক হিসাবে দেবানন্দের প্রথম আত্মপ্রকাশ।

জ্যোতিপ্রকাশ রায়

প্রেম পুজারিতে জিতেন্দ্র ও হেমা

নাটমঞ্চ

শূদ্রকের অমিতাক্ষর

নাটক অভিনয়ে সংলাপ উচ্চারণের একটা সমস্যা অবহমান চলে আসছে: ভঙ্গির সমস্যা। সে সমস্যার বীজ বোধহয় নাটকের ভাষার ভিতরেই নিহিত। বাংলা থিয়েটার-এর বয়েস একশো পেরিয়েছে। এই শতাধিক বর্ষে অন্যান্য রূপবদলের সঙ্গে সঙ্গে সংলাপ উচ্চারণের ভঙ্গিও বদলেছে। ব্যক্তিমানুষের বিভিন্নতাও এই বদল সাহায্য করেছে কমবেশি। কিন্তু কিছু কিছু সংলাপ এমনভাবে, এমন ভাষায় লেখা বা উচ্চারণ করতে গেলেই পূর্ববর্তী অন্য কোন মহৎ অভিনয়ের টানে অনিবার্য হয়ে ওঠে। অবশ্য সেই টান অতিক্রম করতে পারাটাই পরবর্তী ব্যক্তিতত্ত্ব-চিহ্নিত ক্ষমতাবান অভিনেতার আরাধ্য। তবু কখনও মনে হয় এইসব সংলাপ বোধহয় লেখাই হয়েছিল ঐ আগের মতো করে বলবার জন্য। যদিও লেখার ভেতরে তার বাক্যগঠনটুকুই শুধু থাকে, অর্থ তো পালটে যায় প্রতি মানুষের নিজস্ব অভিজ্ঞতায়। অথচ কারও ব্যক্তিগত উচ্চারণভঙ্গি কোন ধরনের সংলাপের চরিত্রে এমন এক দীর্ঘস্থায়ী সম্মোহ আরোপ করে যে তা জোর করে ভাঙতে গেলে মনে হয় কৃত্রিম, বাধো বাধো। অথচ বর্তমান অভিনেতা তার নিজস্ব স্বতন্ত্র অনুভব স্থাপন করতে পারেন না সেই পুরনো ভঙ্গিতে, যদি সেরকম কিছু থেকে থাকে। এরকম ক্ষেত্রে দুটো পথ খোলা থাকে। যদি ঐ ঝোঁকের সংলাপ একান্তই জরুরি হয় অথচ অভিনেতা মনে করেন সেটা তার অন্যভাবে বলা প্রয়োজন কারণ তিনি অন্যভাবে বুঝেছেন, (প্রচলিত পূর্ববর্তী মানেটা তাঁর নিজেরও অভিজ্ঞতা হলে অবশ্য কোন ঝামেলাই নেই) অহলে কৃত্রিম মনে হলেও তাঁকে তা অন্যভাবেই করতে হবে। অথবা যদি সেই বিশেষ ঝোঁকটি সংলাপে ততটা জরুরি না হয়, তবে ভাষার রূপবদল করে সেটা পালটে নিতে হবে। সম্ভব হলে এদের মধ্যে দ্বিতীয়টিই আমার মতে বাঞ্ছনীয়।

নতুন নাট্যগোষ্ঠী শূদ্রক-এর অমিতাক্ষর দেখতে গিয়ে এই সমস্যার কথা মনে হচ্ছিল বারবার। হতে না যদি 'অমিতাক্ষর' গড্ডলিকা প্রবাহে আরেকটি নামমাত্র হতো। নাটকটি ও তার প্রযোজনা এত ছিমছাম অথচ স্বতন্ত্র ভালোবাসায় উজ্জ্বল যে তা নিয়ে ভাবনা গভীরে যেতে চায়, এবং গভীরে গেলেই এইসব চিন্তা আসে। প্রাথমিক চিন্তা অবশ্য, যেমন বলেছি, নাটকের সংলাপ নিয়েই। নাট্যকার দেবাশিস মজুমদার তরুণদের মধ্যে প্রতিশ্রুতিবান। সামান্য গল্পকে তিনি সুন্দর নাটক করতে জানেন, অথচ বড়ো

অমিতাক্ষরে দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়

বেশি ভর করেন নস্টালজিয়া এবং স্মৃতিচারণধর্মী সংলাপ ও দৃশ্যের উপর। ফলে নাটক মাঝে মাঝেই বিধুর মন্থর হয়ে ওঠে এবং অনাবশ্যক কবিতা প্রায়ই তার ভিতর ঢুকে পড়ে তার সংহত ভাস্কর্যকে শিথিল করে দেয়। এইসব সময়েই এমন সব সংলাপ থাকে যার উচ্চারণ অবিকল শম্ভু মিত্রের মতো হয়ে যায়, যে ভয়ের কথা বলেছি শুরুতে। 'কোন লড়াইয়ে কে কী পায়, আমি বুঝি না....' প্রতীর সংলাপে তিরাম্পতিবেশী দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়'-কে সেই অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছে। 'চন্দ্রকান্ত'-র চরিত্রে 'চন্দন সেনগুপ্ত'-র সংলাপ উচ্চারণও ঐ ভাষার করণেই ৮, একবার মনে করিয়ে দেয় গঙ্গাপদ বসু বা কুমার রায়কে। কিন্তু পদের সংস্থাপন এবং শব্দব্যবহারে যদি আর একটু সতর্ক' অমসৃণতা আনা যেত তাহলে হয়তো নাটকটি কিছু অবাঞ্ছিত পেলবতা এড়াতে পারতো। এই পেলবতা আমরা অনেক পেয়েছি এর আগে; এই মুহূর্তে শ্রীমজুমদারে প্রকাশে আমাদের দাবি অন্যতর।

নাটকের প্রকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ সারাক্ষণই বুদ্ধিদীপ্ত ও সুচিন্তিত। তবু মঞ্চের সমস্ত বিশালতাটাকেই নিম্নবিত্ত তিরাম্পতির ঘরের পরিসর বলে ভাবতে দ্বিধা হয়। অমন ঘর খুব ধনী লোকেরও আজকাল বড় একটা থাকে না। তাছাড় নাটকে যখন সে মঞ্চের অনেকাংশই অব্যবহৃত থাকে। অভিনেতাদের ডানদিকে মঞ্চের সামনের দিকের জানলাটি প্রথম দৃশ্যের শুরুতে ছাড়া কোথাও তাৎপর্য পায়নি। ঘরের ভেতরের ক্ষয় বোঝাতে দেওয়ালে যে ভাঙাচোরার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে তাও একদম মাপা; মঞ্চের আকৃতি এবং সজ্জাও মনে হয় যেন ডিজাইন করা।

কিন্তু এইসব ছোটখাট ত্রুটি-বিচ্যুতির অনেক উপরে উঠে থাকে এই নাটকের সার্বিক আবেদন। সে আবেদন প্রত্যেকের পরিকল্পিত নিচু সুরের অভিনয়ে যা মধ্যবিত্তর দুর্বল প্রতিরোধ ইচ্ছার বাস্তব, সে আবেদন বেকারত্বের জ্বালা বঙ্কুর (সলিল সরকার) মুখোশের প্রতীকে নিম্নবিত্তের ঘরে উঁকিঝুঁকি মারার পরিকল্পনায়, সে আবেদন নেপথ্যে বক্তৃতা এবং দেশাত্মবোধক ধ্বনির প্রয়োগে, সে আবেদন পূর্বোল্লিখিত কয়েকটি জায়গা ছাড়া প্রায় সর্বত্র অশ্চর্য জীবন্ত সংলাপের উপস্থাপনায়, তিরাম্পতির থেকে বেরিয়ে যাওয়া এবং ফিরে আসার সময়ে একবার পেছন থেকে এবং একবার সামনে থেকে তাকে যেভাবে আলোয় ধরা হয়েছে তাতে সময়ের মাত্রা ছাড়া ভাবের মাত্রার তারতম্যও ফুটে উঠেছে নিখুঁত। কেবল ইন্দ্রাণী মৈত্র অন্যের রূপসজ্জা সুন্দরভাবে তত্ত্বাবধান করতে গিয়ে নিজেরটা 'ভালো'-ভাবে করে উঠতে পারেননি। বয়েসের এবং অভাবের বলিরেখাকে বড়ো প্রকটভাবে পেন্সিলের টান বলে বোঝা যাচ্ছিল।

নিহিত প্রতীকের ব্যঞ্জনার আড়ালে মোটামুটি স্বাভাবিকভাবে পরিবেশিত এই নাটকে অভিনয় এক প্রধান সম্পদ। তিরাম্পতিবেশী দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায় এর আগে 'থিয়েটার কমিউন'-এর দানসাগরে 'মেধা'র ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু তখনই তাকে অসামান্য বলা যায়নি। এবারে সম্পূর্ণ বিপরীত রীতির চরিত্র সমান নৈপুণ্যে ফুটিয়ে তুলে তিনি সেই বিশেষণটি অর্জন করে নিলেন। সংলাপের অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে পারলে তা অবশ্য ভালো লাগবে। শেষ দৃশ্যে শুধু কর্মব্যস্ত তিরাম্পতির সংলাপের উপরেই যখন পর্দা নেমে আসে তখন সেই দৃশ্যের বা দৃশ্যশেষের নির্মোহ নিরুত্তাপ যেন ব্যাহত হয় তাঁর ক্রমাগত গলা চড়ানোয়। মনে হয় সেই সময়ে পর্দা যদি তাঁর গলা ডুবিয়েই দিত, তাহলে ক্ষতির চেয়ে লাভই হতো বেশি।

দ্বিজেনের পরেই চোখে লেগে থাকে 'চন্দন সেনগুপ্ত'-র চন্দ্রকান্ত। বয়েস ভাঁড়িয়ে কত অনায়াস সাংবাদিকতায় তিনি ফুটিয়ে তোলেন চরিত্রটিকে; তার ক্ষুদ্রতা, রঙ্গরসিকতা, সুযোগসন্ধান, অশোভন কৌতূহল, সব নিয়ে, তেমনি বিশ্বাস্য গৌরী চৌধুরীর ঘোষঠাকুমা। তাঁর অভিনয়ে চেষ্টার ছাপ কখনও স্পষ্ট হয়ে ওঠলেও, তাঁর নিতান্ত কমবয়েসের কথা মনে করে অবাক হয়ে যেতে হয়। 'নীহার' চরিত্রে ইন্দ্রাণী মৈত্রকে এক অত্যন্ত দূরূহ স্বাভাবিকতার অভিনয়ে ঢালী হয়েছে। সেই গুরুদায়িত্ব পালনে তিনি নিষ্ঠা রেখেছেন আগাগোড়া। তবু, হয়তো ঘরের চেয়ারটি একটু বেখাপ্পা রকম সোজাসুজি দর্শকদের দিকে রাখার ফলেই, তাঁর চেয়ারে বসে অভিনয়াংশ আড়ষ্ট মনে হয়েছে। টুপুর ঘোষ-এর রিঙ্কু অবশ্য সারাক্ষণই অত্যন্ত উজ্জ্বল। বাকিরা মোটামুটি চলনসই, শুধু 'প্রবুদ্ধ মিত্র'র 'বিকাশ' চরিত্রের অভিনয়

একেবারেই বেমানান, বলা উচিত শিক্ষানবিশির পর্যায়ে।

সব মিলিয়ে নাটকটি বর্তমান প্রবাহে বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত এক 'অমিতাক্ষর' সংযোজন। নাটকটির চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য তার সম্ভাবনার ব্যাপারে আমার এতটা আশা দাবি করেছে যে তার সামান্য অসংহতির কথা সতর্কাহন করে বলতে হল।

সুরজিৎ ঘোষ

হুরফ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হুরফ' উপন্যাস অবলম্বনে মধ্য কলিকাতা সংশপ্তক শিল্পীচক্রের এই নাটক। মনে রাখা দরকার, উপন্যাসটি মাণিকের উত্তরকালের—যখন প্রগতিশীল বক্তব্যের ভারে 'পুতুল নাচের ইতিকথার' লেখক অনেক দূরে বিবর্তিত, 'কমুনিকেসন'-এর প্রশ্নে লেখা থেকে শিল্পসত্তা ছেঁটে ফেলাতেও বহুদূর পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন। এতে ফল ভালো কি মন্দ হয়েছিলো সেই বিতর্কিত আলোচনার প্রয়োজন এখানে নেই—যেহেতু তাঁর উত্তরকালের রচনাকর্ম এখানে আলোচ্য নয়, তৎকালীন একটি উপন্যাস বর্তমানে কেমন নাট্যরূপ পেলো সেটাই দেখবার।

নাটক দেখতে দেখতে মানিকের ঋদ্ধতত্ত্ব ভালো করেই অনুভব করা যাচ্ছে—বক্তব্যধর্মী ঋজু, রুক্ষ, খানিকটা যা অসংলগ্ন সেই শিল্পীকে, অসম্ভব এবং স্বাভাবিকভাবেই অসম্পন্ন সাধনাতেও যিনি যাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করেন। মানিক যে নাট্যকারের জগৎটুকুও হারিয়ে যাননি—এ থেকেই বোঝা যায়, নাট্যরূপ দেওয়ার কাজে ইন্দ্র মাইতি সফল। কিন্তু এ সাফল্য আপেক্ষিক; যেহেতু মূল উপন্যাসনটিই সুগ্রথিত নয়—মানিকের 'মাইনর' রচনাকর্মের মধ্যেই 'হুরফ'-এর স্থান নির্দিষ্ট। তবু উপন্যাস আর নাটকের ধারণক্ষমতায় নিশ্চয় খানিকটা পার্থক্য আছে: সেজন্যেই নাটক দেখতে দেখতে বারবার মনে হয়েছে, নাট্যরূপ মূল উপন্যাসের প্রতি যতো বশম্বদই থাক— এতো স্বীকৃতি, উপন্যাসিনীর চাপ—বিশেষত আজকের পরিমিতিবোধসজাত মানসিকতায়—একটি নাটক বাধহয় সহ্য করতে পারে না। নাট্যকার এ বিষয়ে চিন্তা করলে পারতেন। অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, বহুবিধ 'ক্যাম্প শট'-এর ব্যবহারে ইন্দ্রবাবু নাটকের মধ্যে গতি সঞ্চারের চেষ্টা করেছেন—আর এই প্রক্রিয়ায় বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তিনি সফল। সাফল্য যখানে আসেনি, সেখানে তাঁর ব্যর্থতার চেয়েও ব্যাপারটার অসম্ভাব্যতাই বেশি দায়ী।

কয়েকজন সাহিত্যব্রতীর আত্মানুসন্ধান, অস্তিত্ব বিচার, চারপাশের ঘটনা-দুর্ঘটনার অভিঘাতে তাদের কিংবা প্রতিক্রিয়া, উচ্ছৃঙ্খল সামাজিক শোষণ—এ সমস্ত কিছুই কিন্তু আমাদের টের পাইয়ে দেয়, নাটকে কীভাবে এর পরিণতি উপস্থাপিত হবে। সুতরাং প্রদ্যোকার খালেকের অল্পস্বল্প কাশির আওয়াজেই বুঝতে পারা গিয়েছিলো যে, যক্ষ্মা হাসপাতালে তার স্থানান্তরণ অবশ্যম্ভাবী; বোঝা গিয়েছিলো বিবেকপীড়ায় জর্জরিত সম্পাদক মহেশ তাঁর মুনাফা লোভী মালিক ধনরাজের স্বার্থবিঘ্ন ঘটিয়ে চাকরি থেকে উৎখাত হবেনই; বুঝতে পেরেছিলাম, মালিক-পুলিশ ও মাস্তানের অশুভ আঁতাতচক্রে কম্পোজিটার সাহিত্য-সেবী কালাচাঁদের হাতে হাতকড়া পড়বেই, অথবা নাটকের প্রথমার্ধে শ্রেণী-বিচ্যুত সাহিত্যিক-যুবক মানব যখন হঠাৎই তার প্রতিবেশী কালাচাঁদ কন্যা আত্তির বুকে মুখ গোঁজে—সে ক্ষেত্রে পরিশেষে তাদের মিলনের একটি ফিল্ম শট'ও আমাদের আগাম প্রত্যাশায় ছিলো নাট্যকার-পরিচালক ইন্দ্র মাইতিকে অবশ্য ধন্যবাদ, নাটকের শেষ দৃশ্যে শ্রেণীবিচ্যুত প্রেম সম্বন্ধে তাঁদের অভিজ্ঞতার অভাবের কথা স্বীকার করে মানব-আত্তির মিলনের পরিপ্রেক্ষিতে আলিঙ্গন জাতীয় কিছু না দেখিয়ে, মুখোমুখি ফিক্স করে দাঁড় করিয়ে দেওয়াই সাব্যস্ত করেছেন—এই জবাবদিহি দেবার জন্যে। যদিচ এও এক ধরনের স্টান্ট—আপাত সৎসাহসের মোড়কে।

মঞ্চের ব্যাকরণ ইন্দ্রবাবু বোঝেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'সেট' রচনায় তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। দ্বিমাত্রিক, কখনো বা ত্রি-মাত্রিক মঞ্চসজ্জাতেও তিনি সত্যিই পরদর্শিতা দেখিয়েছেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গীত পরিচালনা সব ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় হয়নি। আলো-ধ্বনি ইত্যাদি সম্বন্ধে নিন্দে করার কিছু নেই।

চশমা

উত্তেজনা উদ্রেককারী অনেক কিছু আছে—বঙ্গন নিবেদিত ও প্রণব বসু লিখিত 'চশমা' নামক নাটকটিতে। বক্তৃতার দামামা, এমন কি গুলির আওয়াজ পর্যন্ত। কিন্তু এ-সবের কতটা আমাদের বিশ্বাস-বোধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ—সে প্রশ্ন উত্থাপন না করাই ভালো, কেননা, প্রগতিশীল বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করতে সম্ভবত এক্ষেত্রে, সম্ভাব্যতার কথা চিন্তা না করে আদর্শ উপস্থাপনার ওপরই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আর এই আরোপনের ফলে আমাদের প্রতিক্রিয়া যা হয়েছে তার সঙ্গে অনিচ্ছুক ছাত্রীকে জোর করে ভুল সুরে গান শেখানোর ঘটনাই তুলনীয়। আদর্শ অতি উত্তম ব্যাপার, কিন্তু আদর্শের প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় দর্শকদের গ্রহণ শক্তির সঙ্গে ধস্তাধস্তি করা কতোখানি সঙ্গত সে সম্বন্ধে সংশয়ের দিগন্ত কি এ ধরনের নাটে উদ্যোক্তাদের চক্ষু গোচর হয় না—অন্তত শিল্পসম্মত সৎ নাটক উপস্থাপনার সূত্রে? আলোচ্য নাটকটি দেখতে দেখতে প্রশ্ন চিহ্নটাই বিপুল কলেবর ধারণ করে এবং আমরা দেখি: পথভ্রষ্ট তিন হতাশাগ্রস্ত যুবকের মধ্যে বিকাশনামা এক বিপ্লব সাধকের দীপ্ত আবির্ভাব। বস্তিবাসিনী নীলিমার সঙ্গে নায়কের ভাব-ভালোবাসার 'মাল্টি ভিটামিন' টনিক কিন্তু তার দৃষ্টি শক্তিকে স্বাভাবিক রাখতে পারে না। চশমা নিতে হয় তাকে। তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি কিছু হয় নি—সামাজিক অসাম্য-দুর্নীতির সবটাই সে দেখতে শেখে। কী সিদ্ধান্ত এ থেকে মেলে? বোধহয় এই: যথার্থ সমাজ সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার জন্যে চশমা পরার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। আরো জ্ঞাতব্য—কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ-শক্তি (এখানে বিশদ উল্লেখ করা যাচ্ছে না) পরিশেষে প্রাগতিক সংগঠনের কাছে হার মানে—বিপর্যস্ত ও পর্যুদস্ত হয়ে।

টেকনিক্যাল কাজকর্মে দর্শকদের নিরাসক্ত থাকাই বোধহয় এই নাটকে বিশেষ—অন্যথায় বেকার যুবক শংকরের মুখমণ্ডলে চোখে পড়ার মতো পাউডারের প্রলেপ, চায়ের দোকানি ভূতনাথ-কন্যা সীমার বেশভূষা, অভিনেতা - অভিনেত্রীদের আলোক সীমানার আওতায় না-থাকা, মেলোড্রামাটিক নাটকসুলভ যন্ত্রতন্ত্র গানের প্রয়োগ ইত্যাদি সম্পর্কে আপত্তি কিছুতেই এড়ানো যাবে না।

হিমালয়ের থেকেও ভারি

অংকুর আর্ট থিয়েটার-এর 'হিমালয়ের থেকেও ভারী নাটকটি দেখার সময়ে মনে হচ্ছিলো: নিরপেক্ষ মানসিকতায় এর বিচার করতে গেলে এটিকে অন্তাজ শ্রেণীভুক্তই আখ্যায় নীরব থাকাই হয়তো বিধেয় হতো—কেননা যে ঐতিহ্য আমাদের প্রকৃত স্বদেশানুভূতির মূলীভূত শিক্ষা, তাকে এতো সহজে, অতোখানি দায়ীত্বের সঙ্গে সমালোচনা করার কোনো যৌক্তিকতা শিক্ষিত বুদ্ধি কিছুতেই যেন খুঁজে পায় না। অতঃপর তো প্রশ্রয় দেবার প্রশ্ন ওঠে।

সত্তর দশকের এক বিশেষ রাজনৈতিক প্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতে অতীতের মহা-

দক্ষিণ শহরতলীর অভিজাত সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্র।
কণ্ঠ - যন্ত্র - নৃত্য
সর্বশ্রী চিন্ময় লাহিড়ী, অখিলবন্ধু ঘোষ, সবীর খাঁ, ডলি চ্যাটার্জী এবং রবীন্দ্র সঙ্গীতের সকল বিভাগ অমল নাগ, হেনা সেন ও কানুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত।
মেট্রোপলিটন কলেজ
২৪১।১, ডায়মণ্ডহারবার রোড, বেহালা, কলিকাতা—৩৪। ফোন: ৪৫-০৯০৯
IDEAL ADVIG.

পুরুষদের উদ্ভট বিচার এতে দেখানো হয়েছে; এবং তাতে এঁদের সম্বন্ধে যে হীনমন্যতা প্রকাশ পেয়েছে—তা থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে এ নাটক নাট্যকারের কিছু গোলমেলে বক্তব্য প্রকাশেরই হাতিয়ার মাত্র। তার বেশি কিছু নয়। উল্লেখ্য, এ ধরণের বক্তব্য বকের আড্ডা থেকে আরম্ভ করে শুঁড়িখানায় পর্যন্ত আকছার শোনা যায়। আপত্তিটা অবশ্যই সেখানে নয়।

সম্ভবত গান্ধীজী, বিবেকানন্দ, প্রমুখ চারজনের মূর্তির সামনে প্রহরারত দুজন পুলিশের লোক নিজেদের মধ্যে অনর্গল প্রলাপ বকে চলেছে। বিশেষ শ্রেণীর কোনো প্রতিনিধি—এক বা একাধিক—মূর্তি ভাঙতে আসতে পারে: এর জন্যে তাদের বিরক্তি-ভয়-অবজ্ঞার শেষ নেই। মধ্যে অবশ্য ফাঁকি দিয়ে চা খেতে গেলে মূর্তি চারটি জীবন্ত হয়ে বেদী থেকে নিচে নেমে নিজেদের মধ্যে অসহিষ্ণু বাক্যালাপ শুরু করলেন, মাঝে মধ্যেই কাঁচা খিস্তি—ভাবা যায় না। ক্ষণিকক্ষণ বাদে সেই পুলিশ দুজন ফিরে আসতেই চারটি মূর্তির স্বস্থান প্রত্যাবর্তন সংঘটিত হলো—অবশ্য তাড়াহুড়োতে জায়গাবদলও ঘটলো। এক পরেক্টুক্ সামান্য: মূর্তির জায়গা পরিবর্তন প্রহরী-দ্বয়ের মনে ভীতির সঞ্চার করলো, কাঁপতে কাঁপতে তারা প্রস্থান করতেই বোমাহাতে এক উগ্রপন্থী যুবকের প্রবেশ। এসেই সে শৃগালী নৃত্য শুরু করে। মূর্তিদের তরফ থেকে তাকে বোঝানোর প্রয়াস শুরু হয়, কিন্তু সেও তার মত বিশ্বাস অনুযায়ী প্রতিবাদ করতে থাকে এবং বোমা ছুঁড়ে (এভাবে কোনো মূর্তি ভাঙ্গা হয়েছে কি:) মূর্তি ভাঙাকে উড়িয়ে দেবার জন্যে আস্ফালন করে। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন অতীতের সন্ত্রাসবাদী দলের—সাহেব মেরে যিনি ফাঁসিতে চড়েছিলেন। আগন্তুক তখন পরিশেষে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আশীর্বাদ চাইলে তিনি তার বাঞ্ছিত মৃত্যু চাইলেন—যা নাকি হিমালয়ের থেকেও ভারী। বলা শেষ হতে না হতে একঝাঁক মেসিনগানের গুলি তাকেসহ মূর্তিটিকে মাটিতে শুইয়ে দিলো। কিন্তু যথারীতি বাইফেল হাতেই সেই পাহারাদারের মঞ্চে প্রবেশ করলো।

নাট্যকারের নাম অমিতাভ গুপ্ত, নির্দেশক রঞ্জন মুখোপাধ্যায়। সংলাপ উঁচু পর্দার—ফলত শ্লোগানধর্মী। শব্দ প্রয়োগ শ্রুতিকটু। হ্যাঁ, অন্যান্য প্রসঙ্গের মধ্যে অন্তত একটির উল্লেখ করি—পাহারাদার-দের মধ্যে একজনের অভিনয় ভালো লেগেছে।

পরের উপকার করিও না

মূলতঃ একটি কারণে অর্ণব ফাইন আর্টস একাডেমির 'পরের উপকার করিও না' (কাহিনী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নাট্য-রূপ—আনিরুদ্ধ চৌধুরী, গীত—অরূপ-কুমার, নৃত্য—শুক্লা দাসবর্মন, সংগীত ও সহযোগী নির্দেশনা—বিজন ভট্টাচার্য, এবং সামগ্রিক উপস্থাপনা—বিশ্বদেব দত্ত) নাটকটির প্রশংসা করতে হয়: ত্রুটি-বিচ্যুতির সম্ভাব সত্ত্বেও এই হাসির নাটকটি দর্শকদের কোনো ব্যাকরণশূন্য উদ্ভট রাজনৈতিক বোধের শিক্ষা দেয় না।

নাটকের শুরু প্যারডি ও লোকসংগীত মেশানো দুর্বল সংগীত দিয়ে। দুর্বল কণ্ঠে একজন গেয়ে নাটকের প্রধান পাত্রের সঙ্গে আংশিক পরিচয় ঘটালেন। পাত্রের নাম ভজহরি, ধোবা খোলা গ্রামের বাসিন্দা সে। কিন্তু বন্ধু-বান্ধব সমেত শহরে সে মজাতেই থাকে—গ্রামে যাবার নামও করে না। সাড়ে সাত আনা পয়সা ট্যাঁকে নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে পাড়া থেতে একদিন সে কালিঘাটে এলো। সেখানে দলসুদ্ধ পাণ্ডার হাতে হেনস্থা হবার পর সে এক ত্রিশূলধারী সন্ন্যাসীর কবলে পড়ে। সন্ন্যাসী তার পয়সা হজম করে 'পরের উপকার করো' এই বয়ানে উপদেশ শোনায়। স্বগ্রাম ধোবা-খোলায় এসে হাজির হলো ভজহরি। গ্রাম তখন ম্যালেরিয়ার মড়ক। দরিদ্র গ্রামবাসী কবিরাজের সামান্য পয়সাও ঠেকাতে পারে না। ভজহরি কিন্তু বেছে বেছে মাত্র ম্যালেরিয়া হয়নি—তাদের পাঁচন খাওয়াতে লাগে। শেষে একজনের চারটে ছাগলের পাঁচন খাইয়ে মারবার পর তাকে হাজতবাস যেতে হয়। জজের বিচারে সে দোষী সাব্যস্ত হয়, কিন্তু লাফ মেরে পালিয়ে সে আবার সন্ন্যাসীর কাছে উপস্থিত হলো। এবং উপদেশ: উপকার নয় সেবা। অতঃপর গ্রামে ফিরে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত এক প্রতিবেশীর চিকিৎসায় উদ্যোগী হলো সে—তবে পাঁচন গিলিয়ে নয়, অন্যতর উপায়ে। তাতে বিপত্তি—প্রতিবেশীটির মৃত্যু ঘটে। ভজহরির চিন্তিত পিসীমা ভাইপোর মানসিক সুবিধাজনক মনে না করে ওঝা ডেকে আনে—কিন্তু তার মঙ্গলসাধিতে অতিষ্ঠ হয়ে ভজহরি তাকে পিটিয়ে বিদায় করে, এ

উপন্যাস পাঠের আসর

'শেষের কবিতা' রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া' কাব্যপর্বের কবিতায় সমৃদ্ধ। কিন্তু 'শেষের কবিতা' ঠিক কাব্য-উপন্যাস নয়। এর নায়ক অমিত রায় একটি বস্তুব চরিত্র। কলকাতার বালিগঞ্জ বালিগঞ্জ এলাকার ইঙ্গ বঙ্গীয় সমাজের মানুষদের পালিশ করা ঝকঝকে নাগরিক ভাষা বুদ্ধিদীপ্ত জীবন একটি আশ্চর্য রম্য স্মার্ট রচনার মধ্যে ধরা দিয়েছে। কল্লোলের বুদ্ধদেব বসুরা 'শেষের কবিতায়' রবীন্দ্রনাথের অস্ত-উন্মুখ প্রতিভার হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে বিস্ময় মেনেছিলেন।

মধু বসু শেষের কবিতার চিত্ররূপ দেন। সম্প্রতি প্রখ্যাত শিল্পীরা রবীন্দ্রসদনে শেষের কবিতা উপন্যাসটিকে আগাগোড়া শুধু পাঠের মাধ্যমে যেভাবে নাটকীয় করে তুললেন তাতে তিনটি ঘন্টা যে কোথা দিয়ে কেটে গেল টের পেলাম না।

প্রশস্ত মঞ্চের কেন্দ্রেও দুই কোণায় টেবিলের ওপর ছোট আলো আর মাইকেফোন। অসিত রায়ের কণ্ঠে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। লাবণ্য লিলি চক্রবর্তী যোগমায়া নীলিমা দাশ, কে টি মিত্র, শ্রাবন্তী মজুমদার।

আবহ সুরারোপে হেমন্তবাবু খুব দাগ রাখতে পারেন নি। সিসি ঊর্মিলা বসু আর সুধীর হিসাবে বিকাশ রায়, পার্থ ও গৌরী ঘোষ। সৌমিত্র ভাল আবৃত্তিকার। এখন আবার যদি ফিল্মে শেষের কবিতায় চিত্র রূপায়ণে ওঁকে অমিত-এর ভূমিকা দেওয়া যায় তাহলে নির্মলকুমারের অনন্যতার প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রশ্ন উঠবে। অমিতের কথায় যেমন ইন্টালেকচুয়ের ধার, তেমনি আবেগের জোয়ার। সৌমিত্রর স্পষ্ট স্বরক্ষেপ চরিত্রটির দীপ্তিকে শ্রোতার কা প্রাণবন্ত করে তুলছিল। শিলঙ পাহাড়ের মোটর দুর্ঘটনা যোগমায়ার কাছে বিয়ের ঘটকালি লাবণ্যর সঙ্গে রোমান্টিক প্রণয় ও শেষ বিদায়ের মুহূর্তগুলিকে উনি কণ্ঠস্বরের মড্যুলেশন দিয়ে চমৎকারভাবে ব্যক্ত করেছেন। জড়তাহীন বুদ্ধিদীপ্ত এক নাগর নায়ক ওঁর প্রতিটি এ্যাপ্রোচে ধরা পড়েছে। লাবণ্য কণ্ঠে লিলি চক্রবর্তী নির্ঝরিণীর মত শান্ত এই চরিত্রটির প্রতি যথোচিত সুবিচার করেছেন। তবে কিছুটা একঘেয়েমিও ছিল। যোগমায়ার সংলাপে নীলিমা দাস সুকণ্ঠী তবে তিনিও একঘেয়েমির ক্লান্তি কাটাতে পারছিলেন না। ঊর্মিলা ও শ্রাবন্তীর সিসি ও কেটি ধার্ক অভিনয়ে সহস্র আমাদের চমকে দিয়ে ককেটিব চূড়ান্ত মুহূর্তগুলিকে উজ্জ্বল করে তুললেন। কেটির উদ্ধত ভঙ্গী আকোশ আর ব্যর্থতার ম্লান শ্রাবন্তীর সরস কণ্ঠে মূর্ত। তেমনই ঊর্মিলার হাসিতে সিসির অবজ্ঞা। পার্থ ও গৌরী আর একটু ধীরলয়ে পড়লে ভাল হত। বিকাশ রায়ের স্বর কিছুটা আহত থাকলেও উনি হোমসনেসটাকে বর্জন করে ওঁর দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট ছিলেন। বিরতির সময় দেখলাম উত্তম-কুমারকে।

কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়

তার অভিজ্ঞতাপ্রসূত আত্মোপলব্ধি : পরের উপকার করা ঠিক নয়।

যদিচ এই নাটকের উপজীব্য নির্মল হাস্যরস, গ্রামজীবনের দুঃখ-দুর্দশার কিছু বিশ্বাস্য চিত্রও এতে আমরা পাই—বিশেষত পানায় ডোবা আর শোষণভারাক্রান্ত গ্রাম-বাংলার দুর্বিষহ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে।

অভিনয়ের ভজহরির ভূমিকায় বিশ্বদেব দত্ত সবিশেষ মুন্সিয়ানার পরিচয় দিতে পারেননি। কবিরাজের স্বল্প পরিসর ভূমিকায় সৌমেন সুর কিন্তু অসাধারণ অভিনয় করেছেন। তাঁর সম্ভাবনা সুদূর-প্রসারী। নাটকের অন্যান্য বিভাগ ত্রুটি-মুক্ত না হলেও মোটামুটি চলনসই।

'মুখোশ'-এর দুটি একাংক

নাটক যাঁরা প্রকৃত ভালো বাসেন, তাঁদের কাছে গ্রুপ থিয়েটার বর্তমানে অপরিহার্য। নিছক আঙ্গিকের কারণ দেখালে আদর্শগত বিরোধের প্রশ্ন উঠতে পারে; বস্তুত সুস্থ ও নতুন কিছু এঁরা দিতে পারছেন—সেটাই সবচেয়ে বড়ো কথা। তাতে ছোটো বড়ো মাঝারি কিছু ত্রুটি থাকতেই পারে, কিন্তু স্বাস্থ্যের সম্ভাবনা সে-কারণে বিলুপ্ত হয় না। 'মুখোশ' নাট্যসংস্থার দুটো একাংক দেখে এ-কথাগুলোই মনে হচ্ছে।

প্রথম নাটকটির নাম 'রাজাও পাঞ্চজন্য', যার রচয়িতা সজল ভট্টাচার্য এবং নির্দেশক তিনু ভট্টাচার্য। এই নাটকের ভিতর গ্রামীন বাংলায় শোষণ-অত্যাচারের একটি বিশ্বাস-যোগ্য চিত্র পাওয়া যায়। কৃষকের চাষের জমি বেহাত হয়, টিপসই নিয়ে জোতদার তাদের ঘাড়ে মিথ্যে ঋণের বোঝা চাপায়, জমির ফসলে নেই ন্যায্য অধিকার—অনশনে-অর্ধাশনে দিন কাটে। উপায়ান্তর না দেখে তারা এক যুক্তফ্রন্ট করে, সেখানে প্রাচীন মহাকাব্যের গ্রাম্য পরিবেশন—যেমনটি হয়ে থাকে। তাতেও ফায়দা : পার্ট মুখস্থ হয় না, মাঝপথে তোতলামি। এর ওপর উদ্ভেজিত একটি একটি দৃশ্যে দুদিন অনাহারে থাকার ফলে নায়কের অজ্ঞান হয়ে যাওয়া। তখন আবার অন্য পালা ভাবতে হয়। একেবারে নিজেদের জীবন নিয়ে। জোতদার জমি কেড়ে নিচ্ছে, টিপসই-এর সাক্ষী মেনে হাজার হাজার টাকা দাবি করে বসছে, ঋণ ধরে টানাটানি, এবং এই পালা দেখাতে গিয়ে কল্পিত দর্শকাসন থেকে লোক উঠে নিরীহ এক অভিনেতার ওপর চড়াও হয়। সে নাকি অভিনয়ের ছলে বিপ্লবের বুলি আওড়াচ্ছিল। দারোগা এসে অভিযোগকারীদের পক্ষ নিয়ে নেয় ও অভিনেতাকে থানায় ধরে নিয়ে যায়। তখন এরা সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে নীতিকারের কথা ভাবে, পড়ে পড়ে আর মার খেতে চায় না। নতুন যে পালা করবে, তার নাম দেয়—রাজাও পাঞ্চজন্য। অত্যাচারিত পাণ্ডবদের পক্ষ নিয়ে স্মরণাতীতকালে কৃষ্ণ যে মহাযুদ্ধের ডাকে শেষ অবধি কণ্ঠ মিলিয়েছিলেন, মেলাতে বাধ্য হয়েছিলেন—এরা পাঞ্চজন্য হাতে তেমনি এক মহামানবের স্বপ্ন দ্যাখে, যাঁর আগমন প্রত্যাসন্ন। নাটকটির শেষ দৃশ্যে কৃষ্ণের উপদেশে অর্জুনের বিভ্রান্তি কেটেছে, ধনুকবান জানতে বেখে বিদ্রোহের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবার যেন প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি।

অধিকারী, দশরথ ও অর্জুনরূপী তিনু ভট্টাচার্যের অভিনয় এই নাটকের সম্পদ। তারপরই নামোল্লেখ করতে হয় দুর্গা-সীতারূপী মন্দিরা দাসের—দাপটের সঙ্গে তাঁর অভিনয় দীর্ঘদিন মনে থাকবে। আর সবাই নাট্যোপযোগী অভিনয় করেছেন, গ্রুপ থিয়েটারে যেমনটি করা উচিত, তবু এরই মধ্যে শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামোল্লেখ না করলে অন্যায় করা হবে। আলোক-সম্পাত এবং মঞ্চ পরিকল্পনা শিল্পবোধ-সঞ্জাত। তুলনায় সঙ্গীতাংশ নিষ্প্রভ।

পরবর্তী নাটক : রাধারমণ ঘোষের 'সূর্য নেই, স্বপ্ন আছে'। একই নাট্যসংস্থা সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী দুটি নাটক একই মঞ্চে কীভাবে অভিনয় করলেন, সেটা একটা বিস্ময়। দুটির আদর্শে তুমুল তফাৎ। তবে মঞ্চস্থ করার ক্ষেত্রে শিল্পরুচিসম্মত নিরপেক্ষতা দেখে ভালো লেগেছে। প্রথম নাটকটি যে বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শকে অনুসরণ করেছে—দ্বিতীয়টিতে যেন তারই বিকৃত রূপ দেখতে পাওয়া যায়।

এই নাটকে স্বেচ্ছাচারী এক বিরাট শক্তির অধীশ্বরকে দেখেছি—যার শাসনে ব্যক্তি-মানুষের কোনো নামগন্ধ নেই, মানুষ শুধু সংখ্যা। সর্বাধিনায়কের রুচিই তাদের রুচি, তাঁর খুশিতেই এদের খুশি, তাঁর বলাতেই এঁদের বলা, তাঁর মন খারাপ হলে, এদের মনও ভালো থাকবার জো নেই। এহেন সর্বাধিনায়কের অস্তিত্ব আমরা পল ফিশার, সলঝেনিৎসিন প্রমুখ লেখকের সাহিত্যকর্মে অনুভব করেছি বা অদূর অতীতে এই ভারতবর্ষেও একজনের সাড়ম্বর আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করেছি। সর্বাধিনায়কের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রস্তুতিই এই নাটকের প্রতিপাদ্য। নাটক হিসেবে আগেরটির চেয়ে এটি অনেক বেশি 'কম্প্যাক্ট'। শিল্পোৎকর্ষে উচ্চশ্রেণীর। আগাগোড়া মাপা সাঙ্গীতিক ব্যবহার নাটকটিকে এক বিরল শিল্পব্যঞ্জনা দিতে পেরেছে। অভিনয় বিভাগ প্রসঙ্গে বলা যায় : একক অভিনয়ের বিশেষ কোনো সুযোগ এখানে নেই, টীমওয়ার্কই মুখ্য। তবু সর্বাধিনায়ক মহাশূন্যের ভূমিকায় তিনু ভট্টাচার্যের সাফল্য টের পেতে দেরী হয় না। দুই ও তিন-এর ভূমিকায় যথাক্রমে ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত ও শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশংসনীয়। আলোকসম্পাতাদি টেকনিক্যাল কাজকর্ম ভালো। সঙ্গীতাংশের আরিফ ইতিপূর্বেই করেছি। কিন্তু সেই প্রসঙ্গেই একটি কথা : গায়ক যুগলের কণ্ঠ-স্বর আরো কিছুটা ভরাট হওয়া অত্যাবশ্যক।

শুভশঙ্কর ভট্টাচার্য

নীলাঞ্জনার আসর

নীলাঞ্জনা সংস্থা তাঁদের ষষ্ঠ অনুষ্ঠান করলেন রবীন্দ্রসদনে। বন্যাত্রাণের তহবিল অর্থ সংগ্রহ এই অনুষ্ঠানের আর একটি উদ্দেশ্য ছিলো। অনুষ্ঠানসূচীতে ছিলো, বাণী ঠাকুর ও অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান। তারপর বিরতি। বিরতির পর সুমিত্রা বসু, দিবেন মুখোপাধ্যায় ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর সামান্য রদবদল হলো; বাণী ঠাকুর, সুমিত্রা বসু ও অশোকতরুর পর, বিরতি। শেষ গায়ক ছিলেন দিবেন মুখোপাধ্যায়।

বাণী ঠাকুরের গলা ছিলো একটু ধরা। মেজাজ ছিলো না। তিনিই উদ্বোধক শিল্পী, গান নির্বাচনেও যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন। রবীন্দ্রসংগীত যাঁরা বাড়িতেও গেয়ে থাকেন, তাঁরাও জানেন, যদি এ আমার হৃদয়দুয়ার, না চাহিলে যারে পাওয়া যায়, কতো অজানারে জানাইলে তুমি এবং খেলার সাথী বিদায়রব থেমেছে—যে-কোন সময়ে টলমল গায়ককেও শ্রোতারা বন্ধ করে তুলতে পারে। তা কিন্তু হলো না। তখন একটু ভয় করতে লাগলো এই ভেবে যে, বেশ কয়েক বছর ধরে এই যে রবীন্দ্র-গানের ঘন ঘন ফাংশন হয়, সেগুলি সম্পর্কে

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নয়—এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাটক

তপন থিয়েটার ৪২৫৪৭৯

নাটক/পরিচালনা-সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

বৃহস্পতি ও শনি ৬।।টায়; ছুটির দিন ও রবিবার ৩ ও ৬।।টায়

শ্রেঃ—বিকাশ রায়, সত্য বন্দ্যোঃ, প্রদীপ মুখোঃ, ইন্দ্রা দেবী, সান্ত্বনা, গিরীশ, রবীন, মিহির, সুনীল, নিখিল, কেষ্ট, অরুণ, দীপঙ্কর, উশীনর, শৈলেন, বধূ, গণেশ, স্বপন, অলোক, তিমির এবং রত্না ঘোষাল ও তরুণকুমার

প্রয়োগ প্রধান / মন্টু বন্দ্যোপাধ্যায়

এ নাটক ৬০০ রজনীর পথে

যা শুনেছি তা বোধহয় সত্যি। কিন্তু না, তা সত্যি নয়, দ্বিতীয় শিল্পী সুমিত্রা বসু তা বুঝিয়ে দিলেন। যে ছ'টি গান তিনি বেছে নিয়েছিলেন, তাকে উদাত্ত রসের গান বলা চলে—স্বামী হে এসো আজ, অন্তরে জাগিছ অন্তরযামী, ওরে মাঝি ওরে আমার, দাও হে আমার ভয় ভেঙে দাও, সকল ভয়ের ভয় যে তরে, বইলো বলে রাখলে যারে। সুমিত্রা বসুর কণ্ঠ আপাত-উদাত্ত নয় বলে, তাঁর পক্ষে আরো সুবিধে হয়েছে—গানগুলিতে পুরোপুরি শ্রোতাদের ধরে রাখায়।

সুমিত্রা বসুর পরের শিল্পী অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রোতাদের মেজাজের একটু বদল ঘটাবার চেষ্টা করলেন অন্য রসের গান গেয়ে। শেষ শিল্পী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের মতো, তিনি আটখানি গান গাইলেন। আজি নাহি নাহি নিদ্রা আঁখি-পাতে, কিন্তু বর্ষার পরিবেশ তুলে ধরতে পরলো না। আজি ঝরঝর মুখর বাদর দিনে গানটিও তাঁর রেকর্ডে যা শুনেছি, সেই বর্ষাবিলাস রবীন্দ্রসদনের গানে ছিলো না। ওই আঁখিরে, যাই যাই ভেসে যাই—এরকম আরো দুটি ব্যর্থতা। মোর বীণা ওঠে, আমার সকল রসের ধারা—এই গানগুলো এতো-শোনা যে এতে নতুন হয়ে ওঠার মতো অবকাশ যে ওঁর এদিন নেই, সেটা আমরা সকলেই বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু একেবারে খালি হাতে ফিরিয়ে দেননি তিনি, বুঝি বেলা বহে যায়, আর, মনে সে আশা লয়ে গান দুটি গেয়ে জানতে দিয়েছেন, আসলে তিনি যে মেজাজে ছিলেন, সেখান থেকে বিহ্বল-ক্ষণের রসের গানই শুধু উঠে আসতে পারে।

বিরতির পর দেখা গেলো মঞ্চ প্রায়ান্ধকার। বহু প্রত্যাশিতা কণিকা গাইবেন। তাঁকে দেখে বোঝা গেলো, শারীরিক ক্ষমতার শেষ সীমায় তিনি পৌঁছেছেন। সুতরাং, কণিকা কেন তারসপ্তকে এমনকি দু-বছর আগের কণিকা বইলেন না, কেন সেই গন্ধর্ববিজয়ী কণ্ঠস্বরে প্রায়-চতুর্থ স্বরের মানবীয় দিব্যতা ছিলো না—তার একটা নির্মম উত্তর, আমরা, শ্রোতা-মাত্রই পাচ্ছিলাম। কণিকা গায়কীতেও নিজের পূর্ব-পরিচিত দূরত্ব ভাঙলেন: এটা গাইবো? ছটি গান গাইলেন—এবে ভিখারি সাজায়ে, মনে রয়ে গেলো মনের কথা, আমার সকল নিয়ে বসে আছি, বিরহ মধুর হলো আজি, মাটির প্রদীপখানি, চরণরেখা তব যে পথে দিলে লেখি। মাটির প্রদীপখানি আর মনে রয়ে গেলো মনের কথা এই দুটি গান এমনিতেই খুব উচ্চাকাংক্ষী গান নয়। বাকি চারটি কণিকাকণ্ঠে শোনার মানে ছিলো অনে অভিজ্ঞতা হওয়া কিন্তু এখানে নীলাঞ্জনা আয়োজিত এই আসরে, শুধুমাত্র পাওয়া গেলো এক মধুরকণ্ঠী গায়িকাকে।

শেষ শিল্পী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়। প্রথম দুটি গান—বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকারে এবং তিমির অবগুণ্ঠনে-তে তাঁর গলা ও মেজাজ ছিলো খুব চমৎকার। কিন্তু এরপর তোমরা যা বলো তাই বলো গানটি শ্রোতাদের মেজাজের ছন্দে মেলে না। তুমি রবে নীরবে কিংবা এ মণিহার আমায় নাহি সাজে-ও ঠিক করুণরসের গান নয়।

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান

সম্প্রতি থিয়েটার সেন্টারে হংস-ধ্বনির অনুষ্ঠান ছিল 'বর্ষণগীত'। বহু পরিচিত কয়েকটি গানের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত অনতিশ্রুত কয়েকটি গানও শোনা গেল সেদিন। দুয়েকজন তরুণ শিল্পীর ছোট-খাটো দুয়েকটি বিচ্যুতি বাদ দিলে সামগ্রিক বিচারে অনুষ্ঠানটি সেদিন শ্রোতাদের আগ্রহ শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে সক্ষম হয়। সমবেত সঙ্গীতের মান যথেষ্ট উন্নত হলেও দুয়েকটি গানে ধরার সময় শিল্পীরা যথেষ্ট মনোযোগী ছিলেন না। প্রায় সবকটি একক গানই সুগীত। গ্রন্থনা যথাযথ ও পাঠ বেশ কয়েকটি কণ্ঠের সমাবেশে (শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়, পার্থ লাহিড়ী, গোপাল লাহিড়ী প্রভৃতি) বৈচিত্র্যপূর্ণ। মুখ্যতঃ নবীন শিল্পীদের এই অনুষ্ঠানটিকে আঁট করে ধরে রেখেছিল মনোশ্রী লাহিড়ী, বন্যা মজুমদার, হাসি মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন রায়, লতিকা মুখোপাধ্যায়ের পরিশত অভিজ্ঞ কণ্ঠের গান। যন্ত্র অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন শিবনাথ সাহা, বাবুলাল মুখোপাধ্যায় ও সুজাতা চট্টোপাধ্যায়। মনোজ্ঞ এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনার কৃতিত্ব মনোশ্রী লাহিড়ীর।

দিবাকর

দেবব্রত দত্ত প্রণীত
প্রকাশিত হয়েছে
সঙ্গীত তত্ত্ব— (রবীন্দ্র প্রসঙ্গ)
১ম থেকে ৬ষ্ঠ বর্ষ পর্যন্ত নব পাঠ্যক্রম অনুসারে সমস্ত রাগ ও রবীন্দ্র আলোচনাসহ পুস্তক। দাম : ১২-০০
সঙ্গীত সহায়িকা
১ম ও ২য় খন্ড ৮-৫০ ও ১২-০০ (উচ্চাঙ্গ) ৩য় খন্ড ৭-০০ (রবীন্দ্র প্রসঙ্গ) সঙ্গীত প্রভাকর, সঙ্গীত বিশারদ, সঙ্গীত সুধাকর, প্রাচীন কলাকেন্দ্র ও অন্যান্য উচ্চাঙ্গ এবং রবীন্দ্র সঙ্গীত পরীক্ষার্থী-দের প্রশ্ন-উত্তর সম্বলিত সহায়ক পুস্তক
দে বুক স্টোর ফোন : ৩৪-৫০৩৫
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
প্রকাশক : বক্তা প্রকাশনী
ফোন : ৩৬-২৫৮১
৪৯।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড়,
কলিকাতা-৯

অবহেলিত সৌকৎ আলি

আমাদের দেশে অবহেলিত শিল্পীর সংখ্যা কোনদিকেই কিছু কম নয়। কি সাহিত্য, কি চিত্রশিল্পে, কি সিনেমায় এমনি হাজার হাজার মানুষ রয়েছেন, যাঁদের আমরা চিনি না, জানি না। বন্ডাইড ষ্ট্রীটের আলো-আঁধারিতে যদি কখনও গিয়ে পড়েন, কিছু সংখ্যক জমায়িত টালির ছাতের বাড়ীর পাশে হয়তো আপনাকে থমকে দাঁড়াতে হবে কোন তবলিয়ার বুলি শুনে। বন্ডাইড ষ্ট্রীটের এই জমায়িত বাড়ীর একটিতে থাকেন কাদ্রী-সাহেব—ওস্তাদ সৈকত আলি খান কাদ্রী, যিনি পেরিয়ে এসেছেন একষট্টিটা দুঃখের বর্ষা, যিনি আজ অবহেলিত, পাদপ্রদীপের উজ্জ্বল আলোয় যিনি জীবনের সায়াহ্নে পৌঁছিয়েও নিজেকে আলোকিত করে তুলতে পারলেন না।

সেই কবে উর্দু আর ফার্সীতে আলেম শেষ করে অঞ্জন খাঁ সাহেবের কাছে তবলায় হাতে খড়ি করেছিলেন, তা আজ শুধুই স্মৃতি। তিন বছর অঞ্জন খাঁর কাছে, চার বছর মসীদ খাঁর কাছে তালিম নিয়ে শেষ গুরু হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন ওস্তাদ আহমেদজান থিরকুয়াকে। থিরকুয়া সাহেবের প্রসাধনা সৌকৎ আলির প্রথম অনুষ্ঠান বোম্বাইয়ে ১৯৫২ সালে। সেখানে তাঁর সৃষ্ট সাড়ে এগারো মাত্রা পরিবেশন করে সবাইকে তিনি চমকে দিয়েছিলেন। সেই বছরেই বোম্বাই রেডিওতে ঐ সাড়ে এগারো মাত্রা বাজিয়ে শোনান। এরপর সারা ভারতের বহু জায়গায় তিনি তাঁর সৃষ্ট সাড়ে এগারো মাত্রার তাল বাজিয়ে শোনান। তাছাড়া সাড়ে পাঁচ মাত্রা, সাড়ে বারো মাত্রা, সাড়ে আঠারো মাত্রা এইসব কঠিন কঠিন তালই বেশী। এইসব তালে তিনি তালিম দিয়েছেন তাঁর তৃতীয় পুত্র আসলাম খাঁকে, ছোট ছেলে মিঞা মুসাবর আলি (সরোদ) কে, বীণা ও সেতার-শিল্পী কন্যা সমতুল্যা মায়া

মিশ্রকে। কেবল তাল জ্ঞান সেতার ও সরোদের বিভিন্ন গৎও তাঁর সৃষ্টি। তিনি তাঁর আরও অনেক ছাত্রছাত্রীকে এইসব তালে শিক্ষিত করে তুলেছেন। চার মাত্রা থেকে কুড়ি মাত্রা পর্যন্ত যতো তাল আছে এবং তার মধ্যে যতো ভাঙা তাল আছে, সব তালেই একক লহরা এই বয়সেও বাজাতে পারেন যদি অন্ততঃ চব্বিশ ঘন্টা আগে তাঁকে জানাতে হয়। লয়ের হিসাবের ব্যাপারে সৌকৎ আলি খাঁর জুড়ি ভারতবর্ষে আছে কিনা সন্দেহ। এই অবহেলিত শিল্পী জীবনের মধ্য সৌকৎ আলি খাঁর শুধু একটা বিষয়েই সান্ত্বনা যে তাঁর পরিচিত শিল্পীরা তাঁর খোঁজ করেন, তাঁকে ভালোবাসেন।

গন্ধর্বলোকের নতুন মুখ

কুমার গন্ধর্বের গান শুনছি অনেক-দিন। শেষ যেবার গন্ধর্ব-লোক দেওয়াস গিয়েছিলাম, সেখানেও কুমারজীকে দেখেছি, তাঁর গান শুনেছি। তবে তাঁর পুত্রটি যে ভিতরে ভিতরে এতোটা তৈরি হয়ে উঠছে, সেটা টের পাই নি, পেলাম সম্প্রতি ভারতীয় পরিষদ হলে। শ্রীবসন্তরঞ্জন পোদ্দার আয়োজিত এই সান্ধ্য অনুষ্ঠানের শিল্পী কুমার গন্ধর্বের সুযোগ্য পুত্র মুকুল শিবপুত্রের গান শুনে বোঝা গেল এতো অল্প বয়সেও কি সুন্দর পরিণতি এসে গেছে তাঁর কণ্ঠে। কৌলকাতায় এই প্রথম উপস্থিত করা হল তাঁকে। তবু বলতে দ্বিধা নেই, বহুদিন পরে এতো অল্পবয়সী ছেলের কাছ থেকে এতো ভাল গান শুনলাম। সঙ্গীতশিল্পীদের মধ্যে যতো তরুণ মুখ উজ্জ্বল, তুলনায় কণ্ঠসঙ্গীতে সেইরকম শিল্পী পাওয়া যাচ্ছে না। এর মধ্যে মুকুল শিবপুত্রের গান নিঃসন্দেহে আমাদের মনে আশা জাগায়।

মুকুল গান শুরু করেন মারবা দিয়ে। রাগের ছবি যেমন পরিষ্কার ছিল, কণ্ঠের বলিষ্ঠতা ও সুরবৈচিত্র্যও তেমনিই ছিল। মুকুল কল্পনাপ্রবণ শিল্পী। সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে মিশে তাঁর গানে এমন একটা পরিপূর্ণতা এনে দিয়েছে যে সেটা খুবই দুর্লভ। অতি দ্রুতলয়েও গলার আওয়াজ এতো স্পষ্ট ছিল যে প্রতিটি তান পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল। অত্যন্ত ব্যাকরণসম্মত-ভাবে গানের কাঠামোয় আবেগকে সাজানো এবং নিয়ন্ত্রিত করা অবশ্যই প্রশংসার কাজ। মারবা রাগের মতো শান্ত রাগের ওপর ম্যালোডার লোকসঙ্গীত এবং গানের প্রভাব থাকলেও কোথাও রাগের কাঠামোকে নষ্ট করে নি। বলা যেতে পারে, ভালো রাগচিন্তা ও লোকসঙ্গীতের আবেগের একটি চমৎকার মিশ্রণ ঘটেছিল সেদিনের গানে।

এরপরে মুকুল গেয়েছিলেন গৌরী। কিন্তু ওঁর গৌরীর সঙ্গে আমাদের দেশীয় গৌরীর একেবারেই মিল নেই। বরঞ্চ পূরিয়াকল্যাণের সঙ্গে এর মিল পাওয়া যায়। যাই হোক্ প্রথম থেকে শেষ রাগরূপে একই খাতে বহমান ছিল। সুতরাং রাগের নাম নিয়ে তর্ক না তুলে বরং এর কনটেন্টকে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। এখানেও তানের কাজ ছিল অপূর্ব। শ্রোরী মিশ্রার টপ্পা দিয়ে উনি বিরতি টানেন। এক স্বর থেকে আরেক স্বরে যাবার যে দক্ষতা টপ্পার ক্ষেত্রে প্রয়োজন, সেটা পূর্ণমাত্রায় ছিল বলেই মুকুলের সুরেলা গলায় তা অপূর্ব লেগেছিল।

বিরতির পর মুকুল যে রাগে আমাদের গান শোনালেন, সেটি একটি অপ্রচলিত রাগ। রাগের নাম শাওনী। এতে বেহাগ এবং কল্যাণ উভয়েরই মিলন ঘটেছে। নিখুঁত পরিবেশনে এঁর দক্ষতা অবশ্যই নন্দিত। ভৈরবী ঠুংরি দিয়ে আসরের সমাপ্তি সেদিনের অধিবেশনকে স্মরণীয় করে রাখবে বহুদিন।

তবে এই প্রসঙ্গে আমার সেদিন যেটা মনে হল যে মুকুলের একটা নিজস্ব ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠছে গানের মধ্যে যেটাতে বোঝা যায় যে মুকুল কেবল এক জায়গাতেই নিজের গানের শিক্ষাকে আবদ্ধ থাকতে চাইছেন না। অন্যান্য গুণীজনের কাছে তিনি শিখেছেন এবং শিখছেন। যাদের মধ্যে বোম্বাই-এর গিন্ডেভাট অন্যতম। বাক্-বিস্তারের জন্য মাদ্রাজে গিয়ে কর্ণাটকী গানও শিখেছেন। এই পরিশ্রমেরই ফলাফল আমরা দেখতে পেলাম সেদিনের গান। এতো রকমের গায়কীর বৈচিত্র্যের প্রভাব যে তাঁর গানকে খিচুড়ি করে নি বরং সমন্বয় করেছে, সেটাই তাঁর গানের প্রসাদগুণ। নিজস্ব গায়কীকে ছাঁচে অন্য গায়কীকে নিয়ন্ত্রণ করার বড়ো গুণ মুকুলকে আরও বড়ো করে তুলবে।

দরবার সঙ্গীত সম্মেলন

দমদম টাউন হল্-এ দরবার মিউজিক সার্কল পরিচালিত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পঞ্চম বর্ষ রাত্রিব্যাপী সম্মেলনে প্রধান আকর্ষণ ছিলেন যন্ত্রে শ্রীমতী জয়া বিশ্বাস, বাহাদুর খাঁ, সোহনলাল শর্মা ও আলী আহমেদ হোসেন এবং কণ্ঠে পণ্ডিত শম্ভুনাথ, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ও তনিমা ঠাকুর। সোহনলাল শর্মা ও আলী আহমেদ হোসেনের হারমোনিয়ম ও সানাই-এর উপভোগ্য যুগলবন্দী দিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু হয়। এঁরা পরিবেশন করেন রাগ কিরবানি ও ধুন। এঁদের এবং প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে শংখ চট্টোপাধ্যায়ের তবলা সঙ্গত মূল অনুষ্ঠানের সমগতিতে মনোরম হয়েছিল। মিষ্ট কণ্ঠস্বরের অধিকারিণী তনিমা ঠাকুর পরিবেশিত নায়কী কানাড়ার রূপায়ণ যথাযথ হয়, কিন্তু তান সুক্ষ্ম হলেও তাঁর সরগম ভালো হয় নি এবং ঠুংরিটিতেও মাধুর্যের অভাব দেখা গেছে। সারেঙ্গীতে সুন্দরভাবে তাঁকে অনুসরণ করেন রমেশ মিশ্র। এঁর এবং পণ্ডিত শম্ভুনাথের সঙ্গে প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়ের তবলা গান ছাপিয়ে যাওয়ায় কখনও কখনও মূল অনুষ্ঠানের ব্যাঘাত ঘটালেও তাঁর বেওয়াজী হাতের দাপট প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর বহন করে। সরোদে বাহাদুর খাঁর পাহাড়ী ঝিঁঝোটির নিবেদন দেখানেপনার অতিশয্যে ব্যাহত হয়। তবে সাপসঙ্গের জমাট রূপ খাঁদের কাছে আকর্ষণীয়, বাহাদুর খাঁর সরোদ এবং গোলাম সাবীর খাঁর তবলায় লড়াই তাঁদের আনন্দ দেয়। শংকর ঘোষালের কৌশিকী কানাড়া খেয়াল শ্রোতাদের হতাশ করে এবং তবলীয়া শ্যামল বসুরও করার কিছু ছিল না। শ্রীলেখা মুখোপাধ্যায়ের বোলে নানকু মহারাজের তবলা ও রমেশ মিশ্রের সারেঙ্গীর সহায়তায় সন্ধ্যা কর্মকারের কণ্ঠক মোটামুটি হয়। এরপর অপরিচিত শিল্পী পণ্ডিত শম্ভুনাথের দরবারী কানাড়া রাগে খেয়াল ও তারানাই ছিল কণ্ঠসঙ্গীতের মধ্যে অকর্ষণীয়তম অনুষ্ঠান। দ্রুত সরগম, সুক্ষ্ম তান, সাপট তান ও লয়কারীর খেলায় তাঁর সঙ্গীত জমে ওঠে। বিশেষতঃ তারানায় শিল্পীর বিরল ক্ষমতার পরিচয় মেলে। বুনের সরকারের হারমোনিয়ম সঙ্গতও বড় মিষ্ট হয়। দরজা গলায় বিলাসখানি টোড়ি এবং ভৈরবী ঠুংরি গেয়ে শোনান প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। সর্বশেষ অনুষ্ঠান জয়া বিশ্বাসের সেতারবাদন যন্ত্রসঙ্গীতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মনোরম হয়। তিনি পরিবেশন করেন নটভৈরব এবং ধুন। শ্যামল বসু তবলায় তাঁকে যথাযথভাবে সাহায্য করেন।

সুব্রত রায়চৌধুরী

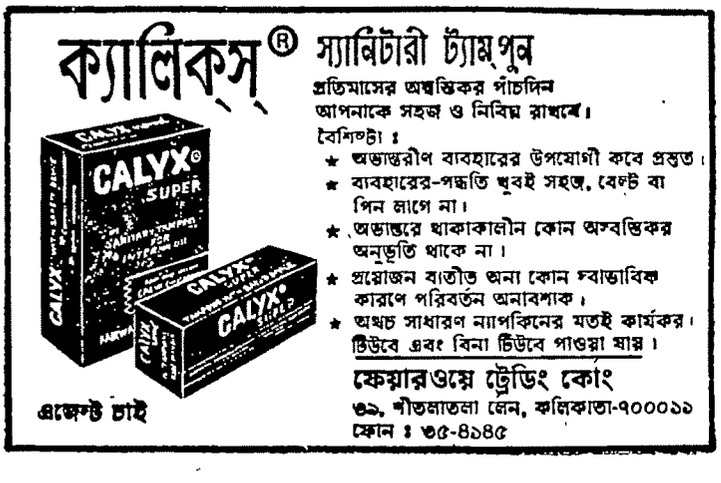

মজে কা বাত

পরভীন রবি আর কে কে শুক্লার মধ্যে একটা কিছু যেন চলছে। প্রায় সব পার্টিতেই ওদের দেখা যাচ্ছে এক সঙ্গে। কেকে-কে দেখেই রবি সাদরে ডেকে নেয়। কেকে ওকে সোহাগ জানায়। একটা পার্টিতে কেকে একগুচ্ছ গোলাপ নিয়ে ঢোকে। সলিম-জাবেদের জাবেদ জিজ্ঞাসা করল এটা কী? কে কে-র উত্তর আমার মনের মানুষের জন্য।' পরভীন এল। ফুলের গুচ্ছ তার হাতে দিল কেকে। জাবেদ রেগে গেল। পরদিন সকালে ও পরভীনের বাড়িতে পাঠিয়ে দিল এক ডজন গোলাপ। কিন্তুনের খবর হল— কেকে ব স্ত্রী ডেইজি আর জাবেদের স্ত্রী হনি। ওরা যদি জানতে পারে ওদের মরদ লাইন করছে পরভীনের সঙ্গে তাহলে রক্ষে থাকবে না। পরভীন খুন হয়ে যেতেও পারে। কারণও, হনি আর ডেইজি দুজনই পরভীন থেকে চেহারায় জাঁদরেল।

• বিদ্যা সিনহা আর বিন্দিয়া গোস্বামীর মারমুখী সম্পর্ক অনেকেরই জানা। মুক্তি বিলিজের সময় থেকেই ওদের মধ্যে তিক্ততা বাড়ছেই। কেউ কাউকে দেখতে পারে না। কিছুদিন আগে আত্মারামের একটা ছবিতে দুজনে কাজ করছিল। দর্শকরা বেশ দূরত্ব নিয়েই দাঁড়িয়েছিল। আর অপেক্ষায় ছিল কখন ওদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হবে।

• জেনিফার কাপুর সত্যিই মুশকিলে পড়ে গেছে। স্বামী শশীর ছবি ঝুননে কাজ করে আনন্দিত। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে সংসার আর বাচ্চাদের সামলিয়ে ওর মনটা বদলে গেছে। আবারও প্রিয় ছবির জগতে ফিরে এসেছে। কিন্তু ফিল্মে হাওয়া কতখানি আবার মানিয়ে নিতে পারবে এটা ওর ভয়।

রাজেন্দ্রনাথ মার খেলেন

সময় ভাল চললে, আশা বাড়ে। আরো চাই আরো চাই ভাব জাগে। এর মধ্যে অনেকে আছাড় খেয়ে পড়ে। আর উঠতে পারে না। যেমন হয়েছে রাজেন্দ্রনাথের এক সময় কমেডিয়ান হিসাবে বাজারে ওর প্রচণ্ড চাহিদা ছিল। খুব কম ছবিই ওকে বাদ দিয়ে তৈরি হত। ওর শখ হল প্রযোজক হবে। আর পরিবারের মধ্যে অভিনেতাও রয়েছে। তাই করল। তাস্বরের সঙ্গে চুক্তি হল। ভাই প্রেমনাথকে নিল। ছবির কাজ চলল জোর কদমে। এসব করতে গিয়ে অভিনয় বাদ দিল রাজেন্দ্রনাথ। সব অফার ফিরিয়ে দিল। দর্শক ভুলে গেল রাজেন্দ্রনাথকে। তারপর....ছবি এখনও শেষ হয়নি....হয়ত হবে না। ও জোর দিয়েছিল ব্যক্তিগত সম্পর্কের ওপর। কিন্তু ভুলে গেছে টাকা না থাকলে ফিল্মে বন্ধুত্ব থাকে না।

বীণার শত্রু

শত্রুর সম্পর্কে বীণার আগ্রহ বেড়েছে। বিয়ের কথাও ভাবছে। যে ছিল পার্মানেন্ট বয়-ফ্রেন্ড তাকে পতি দেবতা হিসাবে মেনে নিতে এখন আর কোন বাধা নেই ওর। একজন স্থানীয় জ্যোতিষী দুজনের কোষ্ঠি দেখে, ওদের বিয়ের পক্ষে মত দিয়েছেন। বীণা এখন শত্রুর জীবনে কমলার স্থান নিচ্ছে। এক সময় কমলা শত্রুর সঙ্গে সব প্রিমিয়ারে যেত। ওর পাবলিসিটির কাজও করত। কিন্তু বিশ্বনাথ মুক্তির পর সব বদলে গেল। দিল্লীতে বীণাই আসে শত্রুর সঙ্গে। প্রিমিয়ারে যায়। এবং একই বেডরুমে ব্যবহার করে।

কিন্তু ফিল্ম ওয়ার্ল্ডের মজা হল, একটা ছবি হিট করলেই বিয়ের পরিকল্পনা ঠিক হয়ে যায়, আর ছবি ফ্লপ হলেই এনগেজমেন্ট বানচাল হয়ে যায়।

এম জি আর কি করবেন ?

এম জি আর ছবিতে অভিনয় করতে চেয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব আর অভিনয় এক সঙ্গে চালান যায় কিনা, তা নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। রাজনীতিকরা বলছেন মুখ্যমন্ত্রী হলেন ফুলটাইমার। অন্য কাজ তিনি করতে পারেন না। ছবির জগতের মানুষরা বলছেন, মুখ্যমন্ত্রীর ছবিতে অভিনয় করলে অশোভন হবে। কেন না, ওর ট্যাক্স কাটা হবে না। আর সেন্সর বোর্ডকেও উনি প্রভাবিত করতে পারেন। এর মধ্যে আবার একজন তামিলনাড় হাইকোর্টে ধর্না দিয়েছেন। তার বক্তব্য, যে বক্তি মুখ্যমন্ত্রী তিনি অন্য কোন ব্যবসা বা কাজ করতে পারেন না। সুতরাং এম জি আরও ছবিতে অভিনয় করতে পারবেন না।

—এম জি আর তব কিয়া হোগা!

• ফিল্ম স্টারেরা দিন দিনে মডেল হয়ে যাচ্ছে (যেমন। বিনোদ মেহেরা, মৌসুমী, রেখা, হেমা); ফলে মডেলদের বাজার নষ্ট হচ্ছে। এর বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় নিয়মিত মডেলরা ঢুকে পড়ছে ফিল্মে (জীনৎ আমান, কবীর বেদী, পরভীন বাবি)।

• একটা বাংলা ছবিতে অভিনয় করে বোম্বে ফিরে গেছেন জাহেরা। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ের চরিত্র। যদিও অতিথি-শিল্পী হিসাবেই এই ছবিতে জাহেরার আবির্ভাব, কিন্তু কলকাতার আরও কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করার অনুরোধ গেছে ওর কাছে। আর বাংলা ছবির ব্যাপারে জাহেরা সমৃদ্ধ। জনৈক সাংবাদিককে বলেছেন : ওঁরা ভাল কাজ করেন। আমিও ওদের সঙ্গে কাজ করতে চাই। আরও কয়েকটি ছবিতে কাজের অফার পেয়েছি। কিন্তু প্রযোজকদের জানিয়েছি, ভাল রোল হলেই কাজ করব। কিন্তু অতিথি শিল্পী হিসেবে নয়।

মসলিম সামাজিক ছবি ধর্মীয় ছবিতে জাহেরার এখন দারুণ ডিমাণ্ড। অমিতাভ, হেমা আর আমজাদের সঙ্গে এক ঠকবাজ মেয়ের ভূমিকায় ও অভিনয় করছে। জাহেরা সম্প্রতি বৃটেন গিয়েছিল বাবা-মার কাছে। ওখানে কিছু ছবিতে কাজের অফার পেয়েছে। কিন্তু মাতৃভূমি ও ছাড়তে রাজি নয়।

কেউ বিয়ে করবে না

এই ছবি দেখার পর, কোন মেয়েই আমাকে বিয়ে করবে না। বলেছেন সঞ্জীবকুমার। ছবির নাম পতি, পত্নী অর ও। ছবি দেখে যে কেউ সঞ্জীবকে টি বি পেশেণ্ট মনে করবেন। সঞ্জীবকে আর একটি নতুন ছবিতে দেখা যাবে। ছবির নাম ঠিক হয়নি এখনও। ছবিটি হল ডঃ জেকিল্স অ্যাণ্ড মিঃ হাইডের ভারতীয় সংস্করণ। অন্য চরিত্রে থাকবেন ডঃ শ্রীরাম লাগু, রেখা, অমল পালেকর এবং সুলক্ষণা পণ্ডিত।

• ওপি রালহানের বাতের ঘুম উধাও। ভদ্রলোক ভবঘুরেভাবে চিন্তিত তার নতুন ছবি 'অশোক দি গ্রেট' নিয়ে। ছবির কাজ শুরু না হলেও, লাখ টাকার ওপর খরচ হয়ে গেছে। তিনি দশ একর জমি কিনছেন 'অশোকনগর' তৈরি করতে। সেখানেই হবে ছবির শুটিং। এখন খুঁজছেন ছবির নায়ক। যার গঠন হবে কবির বেদীর মত, দিলীপকুমারের মত প্রতিভা, আর অমিতাভর মত কণ্ঠস্বর। কিন্তু তার অবশ্যই সম্রাট অশোকের সঙ্গে মিল থাকা চাই।

নৃত্যরত

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

মূল্য ১৫ পয়সা। ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা, ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

মহাত্মা
শিশিরকুমার ঘোষ

প্রণীত

কয়েকটি অমূল্য লোক-চরিত
ও কাব্য-গাঁথা

এই অপূর্ব রচনাগুলি পাঠক-পাঠিকাদের
দেবে অমৃত পানের আনন্দ। তৃষিত শোকসন্তপ্ত
হৃদয়ে আনবে পরম শান্তি।

শ্রীশ্রীঅমিয় নিমাই চরিত	১ম—৬ষ্ঠ খণ্ড ২৮·৫০
শ্রীনরোত্তম চরিত	৩.৫০ পঃ
শ্রীকালাচাঁদ গীতা	৩.০০
Lord Gouranga (Eng. Vol. 1)	৩.০০

গ্রন্থগুলি জনপ্রিয় হলেও এর মূল্য বৃদ্ধি করা হয়নি।
অবিলম্বে সংগ্রহ করুন।

প্রাপ্তিস্থান :
পত্রিকা হাউস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৭০০০০৩।

দে বুক স্টোর্স; ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট; কলিকাতা ও
নাথ ব্রাদার্স, ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট; কলিকাতা।

n : AMRITA Calcutta-700003 AMRITA Phone 55-5231 (14 lines)

বিশুদ্ধ 'কুকমী' গুঁড়া মশলার ক্রেতারা-

সাবধান!

'কুকমী' গুঁড়া মশলার জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে কলকাতার কয়েকটি গুঁড়া মশলা কোম্পানী তাদের নিজস্ব নিকৃষ্টমানের ব্রাণ্ডের সঙ্গে জনপ্রিয় কুকমীর নাম জুড়ে হবহু কুকমী Cookme নামের স্টাইল নকল করে আসল কুকমী গুঁড়া মশলা বলে বাজারে চালাবার চেষ্টা করছে।

কেনার সময় দেখে নেবেন- 'কুকমী'র প্যাকেটে কেবল Cookme 'কুকমী' ছাপই আছে, অন্য কোন ব্রাণ্ডের নাম যুক্ত নেই

15 NOV 1978

প্রস্তুতকারক :

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ

২৩৫ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা ৭০০০৭০ ● ফোন : ৩৩০৯৯৫, ৩২৬৬৩২

পোষ্ট বক্স নং : বড়বাজার ৬৮৮৫ ● ফ্যাক্টরী : কাশীপুর

সহযোগিতায় : এস, কে, মোদক এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

অমৃত

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
১৭ নভেম্বর ১৯৭৮ দাম ৭৫ পয়সা

গরিলার মুখোমুখি

আপনি কি দৈনন্দিন কাজ-কর্ম শুরু করার জন্যে বিশেষ উদ্‌গ্রীব?

গ্ল্যাক্সোজ-ডি®

নিমেষে শক্তি যুগিয়ে আপনার সব ক্লান্তি দূর করবে!

গ্ল্যাক্সোজ-ডি খেয়ে আপনি ঘরের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম করার জন্য পুরোপুরি তৈরী হয়ে যান। গ্ল্যাক্সোজ-ডি আপনার ক্লান্ত শরীরে সেই ভরপুর শক্তি যোগায় যা ফের চাঙ্গা হবার জন্যে আপনার অবশ্যই দরকার। ডাক্তারদের সুপারিশ করা গ্ল্যাক্সোজ-ডি'তে রয়েছে উচ্চমানের গ্লুকোজ যা' ভিটামিন ডি, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের গুণে সমৃদ্ধ।
গ্ল্যাক্সোজ-ডি আপনার সব ক্লান্তি দূর করে যার দরুন আপনি ঘরের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম খুব স্ফূর্তির সঙ্গে করতে পারেন।

গ্ল্যাক্সোজ-ডি®
আপনার পরিবারের
নিমেষে শক্তি যোগানদার

dCA/GL/54 BEN

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

দিনান্তে নিশান্তে

প্রথম উপন্যাস 'ইরাবতী' লিখে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসনলাভ করার দৃষ্টান্ত বিরল। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় সেই বিরল-নজিরের একজন।

লেখকের সাম্প্রতিক উপন্যাস 'দিনান্তে নিশান্তে'র কাহিনী বর্মাদেশকে কেন্দ্র করে। এ উপন্যাসে বোমা-বিধ্বস্ত বর্মার এক রক্তাক্ত অধ্যায়ের যবনিকা উন্মোচিত হয়েছে। আগ্নেয় পরিবেশের পাশাশাশি দুটি তরুণীর প্রেম-প্রীতি বেদনা সন্তাপের বিবরণ। বর্মার বিপ্লবের তেজোদৃপ্ত প্রকাশ ও প্রকরণ, বর্মী যুবমানসে বিদ্রোহের প্রতিচ্ছায়া এই উপন্যাসে বিধৃত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সংকটলগ্নে নেতাজীর পাঞ্চজন্যের সুরে উদ্বেল বর্মার অন্তরঙ্গ চিত্র হিসাবে 'দিনান্তে নিশান্তে' রচনাসৌকর্যে, বর্ণনা বৈচিত্রে, চরিত্র-চিত্রণে তুলনা-রহিত। পনেরো টাকা।

কিশোর কিশোরীদের উপহার দেবার মত কয়েকটি বই :—
দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের

ঠাকুরমার ঝুলি ৯৲
ঠাকুরদাদার ঝুলি ৯৲
দাদামশায়ের থলে
সীতা দেবী ও শান্তাদেবীর
হিন্দুস্থানী উপকথা ১০৲
সীতা দেবীর
নিরেট গুরুর কাহিনী ও অন্যান্য গল্প ৬৲

॥ শীঘ্রই বাজারে আসছে ॥

জ্যোতিষাচার্য ভৃগুজাতকের
উল্লেখযোগ্য অবদান

১৯৭৯ কেমন যাবে ও ভৃগুজাতক পঞ্জিকা

রাশি, লগ্ন, গ্রহ অনুসারে ব্যক্তিগতভাবে নতুন বছরটি আপনার কেমন যাবে জানতে হলে এখনই দু টাকা (২৲) অগ্রিম পাঠিয়ে বইটি ভি, পি, যোগে সংগ্রহ করুন। দাম চার টাকা।

বিভূতি রচনাবলী সুলভ সংস্করণ
চতুর্থ খণ্ড

গ্রাহকরা যাঁরা এখনও তাঁদের প্রাপ্য খণ্ড সংগ্রহ করেননি, তাঁদের অবিলম্বে সংগ্রহ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিখ্যাত ভ্রমণরসিক প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
বাংলা সাহিত্যের একখানি বিখ্যাত বই

তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ

ব্যক্তিগত জীবনে লেখক নানাপ্রকার সাধু-র সংস্পর্শে এসেছেন। তাঁদের জীবনের ইতিহাস শুনেছেন। সেই সমস্ত বিখ্যাত সাধুদের জীবনবৃত্তান্ত ও অলৌকিক ঘটনা লেখক তাঁর সুনিপুণ লেখনীর সাহায্যে বিবৃত করেছেন। দুটি খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রথম খণ্ড ২০৲ দ্বিতীয় খণ্ড ২০৲।

এই গ্রন্থটির পরিপূরক আর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ

অবধূত ও যোগীসঙ্গ

॥ নতুন মুদ্রণ প্রকাশিত হল ॥
মূল্য--১৫৲

লেখকের আর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ

হরি যাকে রাখেন ৬৲

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩ ৮৬।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

ভারতে সবচেয়ে বেশী বিক্রীর সাইকেল চেন

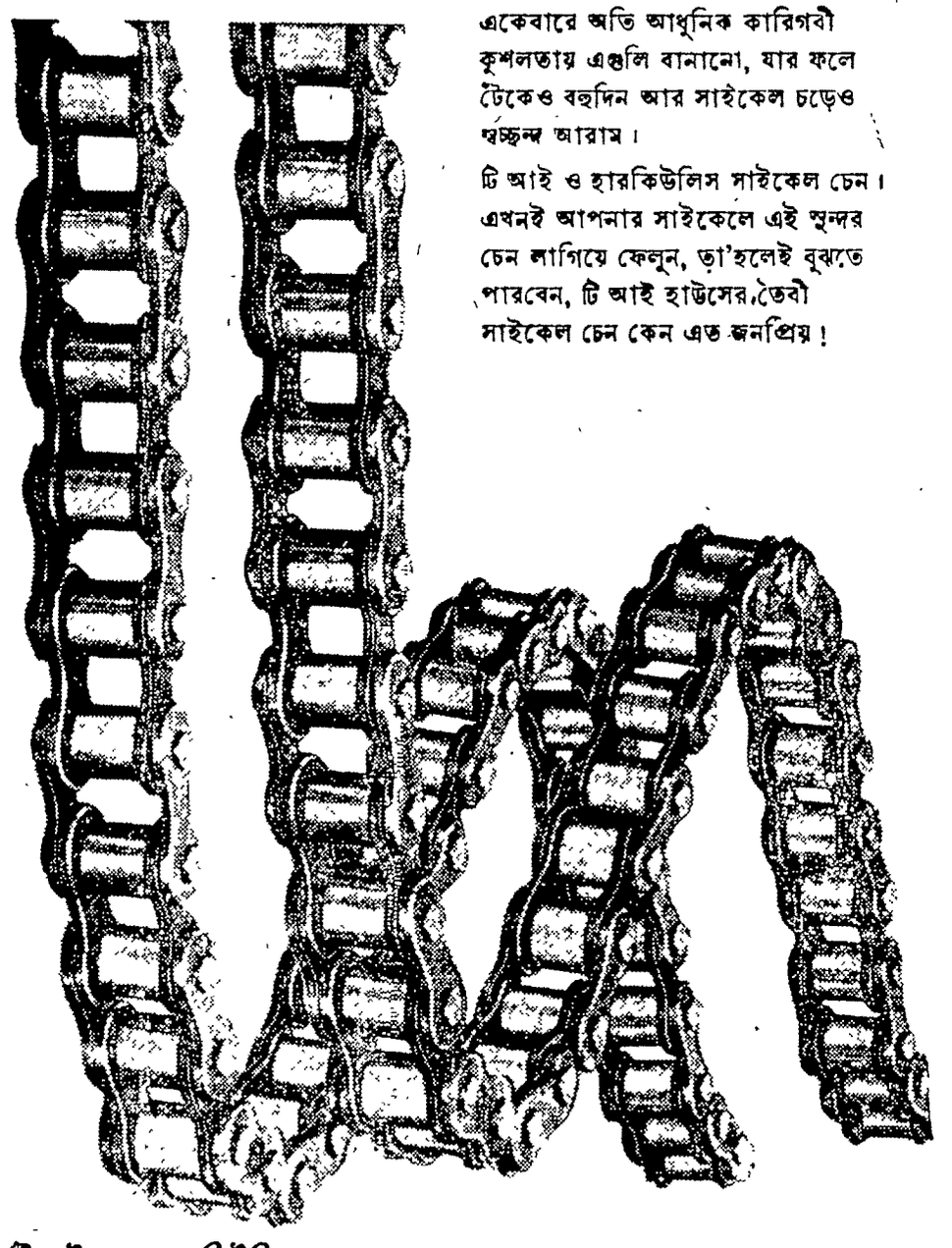

একেবারে অতি আধুনিক কারিগরী কুশলতায় এগুলি বানানো, যার ফলে টেঁকেও বহুদিন আর সাইকেল চড়েও স্বচ্ছন্দ আরাম।

টি আই ও হারকিউলিস সাইকেল চেন। এখনই আপনার সাইকেলে এই সুন্দর চেন লাগিয়ে ফেলুন, তা'হলেই বুঝতে পারবেন, টি আই হাউসের তৈরী সাইকেল চেন কেন এত জনপ্রিয়!

টি আই অ্যাণ্ড হারকিউলিস

& Hercules

টি আই ডাইমণ্ড চেন লিমিটেড, মাদ্রাজ ৬০০ ০৫৩

(টিউব ইনভেস্টমেণ্টস্ অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের এক পরিপূরক সংস্থা)

ADS TID 2706 A BEN

অমৃত

১৮ বর্ষ, ২৬ সংখ্যা
১ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫
17 November, 1978

সম্পাদকীয় ৩
সাহিত্য ইত্যাদি ৪ মণীন্দ্র রায়
লেখা ওরফে যন্ত্রণা ৫
সমীর চট্টোপাধ্যায়
ইন্দিরা আবার লোকসভায় ৬
বমেন দাশ
রাজনীতি কলকাতা স্টাইল ৭
বেদব্যাস বৈদ্য
ভাগ্যগণনা ৮ শ্রীমাণিক্য
সমালোচনা ৯
প্রোটিন (গল্প) ১৩ অভীক রায়
প্রচ্ছদ কাহিনী ১৬
গরিলার মুখোমুখি
রতনলাল ব্রহ্মচারী
প্রচ্ছদ কমল চৌধুরী
তরণী পাহাড়ে বসন্ত (উপন্যাস) ২২
শৈবাল মিত্র
বহুপোলী চকের লালপদ্ম (গল্প) ২৮
অমল আচার্য
ইতিহাস, বাস্তবতা ও দু-একটি
জিজ্ঞাসা ৩২ সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়
উপলক্ষ : শতরঞ্জ ৩৩
তুষার চৌধুরী
আরো জীবনানন্দ ৩৬
কল্যাণকুমার বসু
নৈতিক গন্ধ (গল্প) ৪৩
গৌতম ভট্টাচার্য
সোনার হরিণ নেই (উপন্যাস) ৪৮
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
হাওয়া গাড়ি (উপন্যাস) ৫৩
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
খেলা ৫৭ লিঙ্কম্যান, দর্শক
পিনাকী চট্টোপাধ্যায়
মাননীয় মানেকশ মহাশয় সমীপেষু ৫৮
সুভাষ ভৌমিক
চিত্রধ্বনি ৬১

আগামী সংখ্যায়

তলস্তয় ও একালের বাঙলা গল্প

ইন্দিরার চালাকির তদন্ত চাই

ইন্দিরা কত খারাপ—কিংবা তিনি কত ভাল এ বিচারের ভার জনসাধারণের। তিনি এগার বছর ভারতভাগ্যবিধাত্রী ছিলেন। তিনি মানুষ বলেই, কিছু ভুল করে থাকবেন। পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন নেতা ক্ষমতার আসন থেকে নেমে দাঁড়ালে, তাঁর সম্পর্কে এ রকম ভুল কিছ-না-কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে। মাও সারা চীনকে জাগিয়েছিলেন—শুধু জাগাতে পারেন নি সহধর্মিণীকে। দোষ খোঁজার ইচ্ছা থাকলে এই দায়ে দায়ভাগী মাওকেও করা যায়।

আমাদের আজ অন্য কথা। গত উনিশ মাসে একজন ভারতবাসীকে বেছে নিয়ে তিনি কত খারাপ, তা বিশদে আলোচনা করেছেন ভারতের সবকটি রাজনৈতিক দল, বেশির ভাগ বৃহৎ সংবাদপত্র, সত্তরটি বেতার কেন্দ্র এবং স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী।

চিকমাগালুরে ভোটদাতারা সম্ভবত অন্ধ এবং বধির। নয়ত, এমন একজন খারাপ লোককে তাঁরা বোকার মত কী করে জিতিয়ে দিলেন বোঝা যাচ্ছে না। নিশ্চয় এর মধ্যে কোন ষড়যন্ত্র আছে। আরও একটি প্রশ্ন মনে জাগছে। ইন্দিরা কী দিয়ে ভাত খান। নিশ্চয়, প্রতি গ্রাসে গ্রাসে ভিটামিন। নয়ত, এত বদনাম, এত নিন্দা, গ্রেপ্তার ও মুক্তি, কানাঘুষা, বার বার কাঠগড়ায় টেনে আনা সত্ত্বেও তিনি কী করে চিকমাগালুরে জেতেন? যেখানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফার্ণান্ডেজ মহাশয় তাঁর অপকীর্তিগুলো ভোটারদের সামনে তুলে ধরতে দিল্লির দপ্তর বর্জন করে একটানা অনেক দিন পড়েছিলেন? নিশ্চয় এর ভেতর কোন ষড়যন্ত্র আছে। এ বিষয়ে অবিলম্বে কমিশন বসিয়ে তদন্ত করা দরকার। একজন খারাপ ভারতীয় বিধবা—যাকে কেউ চায় না—তাঁকে চিকমাগালুর কেন চায়? কোন্ চালাকির সাহয্যে তিনি আজমগড় কব্জা করলেন? গণতন্ত্রী, স্বাধীনতাপ্রেমিক ভারতবাসীকে এখুনি সাবধান হতে হবে। কেননা, আমাদের সামনেই সমস্তিপুর।

সাহিত্য ইত্যাদি...

সাহিত্যপ্রীতি আর সাহিত্যের হুজুগ

স্টেশনে দিয়ে গেলেন তাঁরা সাতটা নাগাদ। সবে সন্ধ্যে হয়েছে। তিন রাত্তির প্রবাসে কাটানোর পর কলকাতায় ফিরছি। টাটকা অভিজ্ঞতার পোস্টমর্টেম নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। হঠাৎ কার যেন হাতে খান তিনেক পাউরুটি দেখে বাস্তব সম্বন্ধে সচেতন হলাম। বেরোবার সময় আমরা শুধুই এক-কাপ করে চা পেয়েছি এবং নৈশ আহারও শেষ করে আসার সুযোগ পাইনি। ভরসা অতএব শুধু ঐ রুটি তিনখানা। এবং সংখ্যায় আমরা দশ-বারো জন তো বটেই।

আর কিছু দেয়নি? জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

হ্যাঁ, ডিমসিদ্ধ দিয়েছে এক ওজন।

আর?

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখালেন আমার উত্তরদাতা।

দিনেশবাবু, মানে কবি দিনেশ দাস সাধাসিধে মানুষ। প্রশ্ন করলেন তাড়াতাড়ি, ফিরে যাবার টিকিট দিয়েছে তো?

না না সেসব ঠিক আছে। শান্তনু দাস বললেন, ওসব নিয়ে কোনো ঝামেলা নেই। এই ইয়ে, মানে খাওয়ার ব্যাপারটাই একটু ইয়ে হয়ে গেল।

পূর্ণেন্দু পত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, ডাইনিংকার নেই ট্রেনে?

না।

তা নাইবা থাকল, দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গিতে পূর্ণেন্দু বললেন, বড় একটা স্টেশনে ট্রেন থামলে কিছু না-হয় কিনে-টিনে নেওয়া যাবে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সিগারেট টান-ছিলেন একটু দূরে দাঁড়িয়ে। এবং সমস্ত আলোচনাটিই বোধহয় শুনছিলেন। এতক্ষণে মৌনভঙ্গ করে তাঁর স্বভাবসুলভ শান্ত গলায় উচ্চারণ করলেন, তারও কোনো সম্ভা-বনা নেই। বড় স্টেশান খড়গপুরের আগে পড়বে না। আর খড়গপুরে পৌঁছতে রাত দুটো!

ওরা, মানে বলা বাহুল্য আমাদের যাঁরা আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা। আগের দিন কবি-সম্মেলন শেষ হবার পর আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আশেপাশের পুরাতাত্ত্বিক দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। আমন্ত্রকরা তাতে আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন, সেসব করতে গেলে বেলা হয়ে যাবে। দুপুরের ট্রেনে যাওয়া যাবে না তাহলে। আর যদি না হয় রাত্তিরের ট্রেনে যেতে অনেক রকম অসুবিধে হতে পারে।

আমরা তাতে কান দিই নি। জোর করে সাইট সিইং করতে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। ওঁরাও তাই তিনটে রুটি আর কয়েটা ডিম দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, পুরাতত্ত্বের চেয়ে খাদ্যবস্তু অনেক বেশি জরুরি।

ওপরের বর্ণনায় কথাবার্তার ডিটেল রয়েছে। সেগুলো যে ঐভাবেই চালাচালি হয়েছিল তা হয়ত নয়। যেকথা যাঁর মুখে বসানো হয়েছে তিনিই যে তা বলেছিলেন সেটা না হতেও পারে। তখন-তখন তো লিখে রাখা হয়নি। তবে মোট ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল ঐরকমই।

যাঁরা নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা আদব যত্ন প্রথম-প্রথম কম করছিলেন তা নয়। কিন্তু কী কারণে যেন শেষের দিকে তাঁরা নিরুৎসাহ হয়ে উঠলেন। এবং কেবল তাই নয়, রীতিমত হোস্টাইলও বলা যায়। এখন কথাও বললেন তাঁরা আমরা যদি বিকেলের মধ্যেই বেরিয়ে না পড়ি, তাঁরা আর আমাদের সম্বন্ধে কোনো দায়িত্ব নেবেন না। রাত দশটায় একটা মেল ট্রেন ছিল, সে পর্যন্ত থাকার প্রস্তাব করলেই তুললেন না তাঁরা, বিকেলেই ঘর ছেড়ে দিতে বললেন। পাঠক, এই লেখাটির প্রথম থেকে এপর্যন্ত যে জায়গাটির নাম উল্লেখ করিনি, সে এইজন্যেই। তিক্ততা যেটুকু না হয়েছিল তা অল্প কয়েকটি লোকের সঙ্গেই। তার জন্যে গোটা শহরকে দায়ী করা ঠিক হবে না। যোগ্য হাতে দায়িত্ব থাকলে ঐ শহরেও নিশ্চয়ই আমরা অনেক বেশি যত্ন পেতাম।

যাহোক, ট্রেনে ওঠার পর আমরা তিক্ততা ভোলার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। পূর্বোক্ত লেখকরা ছাড়াও দলে ছিলেন অনন্য রায় এবং তাঁরই মতো কয়েকজন নতুন লেখক। আর ছিলেন একজন গায়িকা— শ্রীমতী গীতা ঘটক। শুরু হয়ে গেল গান। কখনো কোরাসে, কখনো শ্রীমতী গীতার একক কণ্ঠে। একটি গান গীতা এত ভালো গেয়েছিলেন যে এখনো যেন কানে লেগে আছে। —যে ফুল ঝরে সেই তো ঝরে, ফুল তো রহে ফুটিতে। —হৈ হুল্লোড়ের মধ্যে হঠাৎ যেন সে গান শুনে মনটা সকলেরই কেমন শান্ত হয়ে গেল।

সে রাতে খড়গপুরে গাড়ি পৌঁছেছিল তিনটে নাগাদ। শোনা গেল, বদল করে একটা মেল ট্রেন ধরলে তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যাবে কলকাতায়। অতএব চলো মুসাফির বাঁধো গাঁঠরি। খড়গপুরে নেমেই দেখা গেল সামনে একজন পুরীওয়ালা প্রবলদন্ত উনুন ঠেলাগাড়িতে চাপিয়ে যাধেকিউ পদ্ধতিতে দিব্যতাত ভক্ষ্যতাত চালাচ্ছে। মধুলোভী মৌমাছির মতো ঘিরে ধরলাম তাকে আমরা। এবং পরম পরিতোষ সহকারে সেই (শেয়াল কাঁটা মেশানো) সর্ষের তেলে (সোয়াস্টোন মেশানো) আটার পুরী আধা দিস্তে করে গিলে ক্ষুণ্নিবৃত্তি করলাম আমরা। এবং আশ্চর্য, কারুরই কিন্তু অসুখ করেনি পরদিন।

সে যাক, এখন আসল কথাটা বলি।

এ প্রসঙ্গ ফাঁদার উদ্দেশ্য কিন্তু এ নয় যে, কলকাতার বাইরে গেলে লেখকদের সঙ্গে সু-ব্যবহার করা হয় না, এইটে প্রমাণ করা। মোটেই তা নয়। আর যে ঘটনাটির কথা বললাম তাও যে খুব দুর্ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল তা না হতেও পারে। হয়তো তাঁদের টাকা ফুরিয়ে গিয়েছিল, হয়তো তাই নিরুপায় হয়েই গা টান দিতে হয়েছে। তবু এই ঘটনাটিও যে বললাম, তা শুধু খারাপ দৃষ্টান্ত আগে দিয়ে যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শনের অনুকরণ করার জন্যেই। এরপর আমি যা বলব, তা হবে অখণ্ড স্বর্গবাসের মতো সুখকর কয়েকটি প্রবাসের অভিজ্ঞতা।

কিন্তু একরে নয়, পরের কিস্তিতে।

মণীন্দ্র রায়

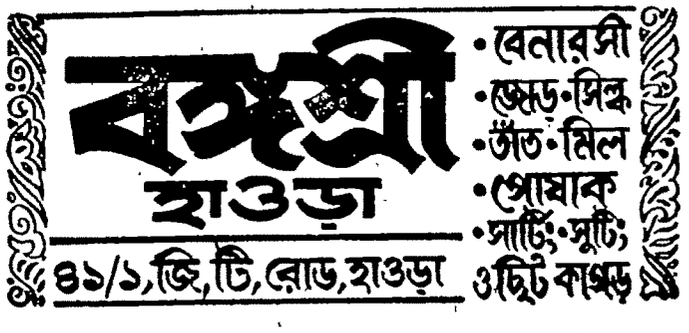

লেখা ওরফে যন্ত্রণা

সমীর চট্টোপাধ্যায়

গোলেমালে লেখার লাইনে এসে পড়েছে অসীম। কখনো ভাবেনি উদয়াস্ত লেখা নিয়ে চিন্তিত থাকতে হবে, লেখক বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে হবে, নিজের শরীরের চারপাশে একটা সীজ ফায়ার সীমানা গড়ে উঠবে। তাও যদি চলতো এক ধরণের লেখা-লেখা খেলা, মন্দ ছিল না। পরিবর্তে সর্বদাই যুদ্ধং দেহি মনোভাব, প্রতিযোগিতার চোখ পাকানো কিংবা অরেঞ্জ-রেসের অসহায়তা—পরিপূর্ণ টেনসন্। টেনসন ফেস করতে খারাপ লাগে না। অসীমের মনোভাবও অনেকটা সেই ধাচের। অসীম সেই জাতের মানুষ যে কোনো এক অভাবিতের জন্য অপেক্ষা করে, যেন 'ঈশ্বরের জন্য প্রতীক্ষা', কিন্তু সেই অভাবিত হাতের কাছে এলে তাকে নেড়েচেড়ে বিকৃত বিধ্বস্ত করে, তার যথার্থতা যাচাই করে আনন্দ পায়। অসীম দেখেছে বিস্তর। সোনারা না হোক, রুপোর চামচ মুখে করে জন্মেছিল সে। নিজের খেয়ালে তা অগ্রাহ্য করে জীবনের পিকনিকিয়ার বন্দরে বারেবারেই ও জাহাজ ভিড়িয়েছে। অথচ ছাত্রাবস্থায় খারাপ ছাত্র ছিল না। স্কুল ফাইনালে স্কলারশিপ পেয়েছিল। কলেজে ঢোকার পর হঠাৎ বাংলাদেশের চেহারা আমূল বদলে গেল। সারা দেশ জুড়ে মানুষ-পুলিশ লুকোচুরি খেলাটা একটা কমন প্র্যাকটিসে দাঁড়িয়ে গেল। মানুষের মৃত্যু যেন মাছের মৃত্যু। স্কুল-কলেজের কবিডবে সি আর পি-র আন্ডারওয়ার শুকোত। একটু ক্ষেপে গিয়েছিল অসীম। ঠিক সে অর্থে রাজনীতি করতে চায়নি আসলে বুঝতে পারছিল বিশাল গণ্ডগোল চলছে, এ মুহূর্তে তারও কিছু দায়িত্ব আছে। ফলে থেজাল্ট হলো খুব খারাপ। পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পড়ার ইচ্ছে নেই। অনেক পরিচিত বন্ধু-বান্ধব টুপটাপ মারা গেছে। সমস্ত দেশ জুড়ে এক ধরণের কবরের শান্তি। মন ভাল নেই একদম। শুধু ব্যাড হ্যাবিটের মধ্যে আছে বই পড়া পেট চালানোর কয়েকটা খুচরো ট্যুইশনি। এসময়ে দেখা হলো কৌশিকের সঙ্গে। কৌশিক তখনই বাংলা-সাহিত্যের একজন তরুণ তুর্কি কবি। বেশ পরিচিত নাম। একদিন শরতের বিকেলে রেড রোড ধরে অনেকটা হাঁটলো একসঙ্গে। ভেলপুরী খেল, রাজস্থান টেন্টের পাশে ঘাসে বসে তিন প্যাকেট চারমিনার শেষ হলো। অসীম লেখার কথা ভাবলো। দেখলো, সত্যি সত্যি অনেক কথাই এখন মস্তিষ্কের সেফ-ডিপোজিট ভল্টে জমে গেছে, যার কিছু কিছু সাজিয়ে গুছিয়ে মানুষকে শোনানো যেতে পারে। কবিতা ওকে খুব হন্ট করতো। আকস্মিকভাবে ঠিক করলো কবিতাই লিখবে। কিন্তু কবিতা লেখার কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম মেকানিজম আছে। কৌশিক এ ব্যাপারে সাহায্য করলো। ওই আলাপ করিয়ে দিল অনেকের সঙ্গে। কয়েকজন সমবয়সীর সঙ্গে পরিচয় হলো গভীর। একটা পত্রিকা সম্পাদনা করলে যেমন হয়। সম্পাদনার দায়িত্ব নিতে পারলে ইনভলভমেন্ট জোরালো হয়। পত্রিকা বেরুলো। অসীম দেখলো, কখন জ্ঞাতে অথবা অজ্ঞাতে সাহিত্যের খেলার মাঠে ও লাইফ-মেমবারশিপের কার্ড-হোলডার হয়ে গেছে।

কিছু কিছু প্রাক-ধারণা ওর ছিল। লেখা কোনো ফিট-স্টাইল কুস্তি নয়, কোনো জাদুকরের সম্মোহনী প্রদর্শনী নয়। স্মৃতি, অনুভূতি, প্রজ্ঞা ইত্যাদির ফিফটি-ফিফটি একসারসাইজ যে প্রথামতো বিশ্লেষণ-সিনথেসিস্ সিস্টেম করতে পারবে সেই লেখক। ক্ষমতার জোরে লেখক, কবজির জোরে। কেসিয়াস ক্লে নয়, এই কবজির জোরেই লোরকা কিংবা নেরুদা। ধারণা ছিল, যাঁরা লেখেন তাঁরা পড়েনও। স্বভাবসিদ্ধ লেখা-লিখির যুগ শেষ হয়ে গেছে। নিজেকে বিনয়ের সঙ্গে মেনে নিতে হয়, যুদ্ধক্ষেত্রের কোন কোন প্রান্ত অবক্ষিত আছে। নিজের কয়েকটা বন্ধুদের লেখালিখির খবরে মশগুল থাকলে চিরকাল ভবানীপুর গ্রাউন্ডের খেলাই দেখতে হবে। সাহিত্যের রথী মহারথীর মিনিমাস চুলকানির খবরও রাখা উচিত। ধারণা ছিল, সহনশীলতা এবং গোষ্ঠীহীনতা লেখকের মূল চরিত্র হওয়া জরুরী। অসীম জানতো, কোনো প্রকৃত লেখক কোনো দশকে আবদ্ধ নয়। ছ-এর দশক কিংবা সাত-এর দশকে নাম তোলাতে পারলে তবে লেখক, অন্যথায় নয়— এ একমাত্র অঙ্কুরের স্বপ্ন। প্রকৃত লেখক যুগের সীমানা অতিক্রম করে বিশাল এক কুঞ্চটিকা সৃষ্টি করে। বিদ্রোহ সম্পর্কে অসীমের ধারণা স্পষ্ট। লেখক অস্বীকার করতে না জানলে, লোভের ঊর্ধ্বে না উঠলে, সোশাল প্রোটেস্টান্ট না হলে— তাঁর লেখক সত্তা লক্ষিত হয়। দেশী-বিদেশী বহু লেখা এবং লেখকের জীবন জেনে এমন বেশ কিছু ধারণা ওর মাথায় ছিল। কৌশিক বললো—ভেঙ্গে দে সব। যা থিয়োরীতে সত্যি তা প্র্যাকটিক্যালি সব সময় থাকে না। স্পেশালি আমাদের দেশে। এখানে প্রকাশনার সমস্যা বিস্তর। যা আছে তাও কিছু মানুষের বাপের সম্পত্তি হয়ে বসে আছে। এখানে বিনয়ী খরগোশ হয়ে চুকে কিছুটা ক্ষমতা কিছুটা সত্যবক্তা এইসব ককটেল করে বিক্রমাদিত্যের আসনে বসতে হবে। অসীম বুঝেছিল, কিন্তু মেনে নিতে পারেনি। বাসে বা ট্রামে যেমন অহেতুক ভিড়। এখানেও তাই। অশিক্ষা বা অজ্ঞানতা সহ্য করা যায়, কিন্তু এরা আরও অন্য। এখানে এই সাহিত্যের জগতের লিমিটেড স্পেসে গুতোগুতি কেন! সোশাল প্রোটেস্ট তো দূরের কথা, অসীম দেখলো, বেশির ভাগই এখনো সেই হৃদয়ের কথা ঋতিতে ব্যাকুল' স্তরে হামাগুড়ি দিচ্ছে। কেউ কেউ নাকি জীবনযাপনে দারুণ বোহেমিয়ান। অসীম অবাক হলো। স্ত্রী পুত্র কন্যা, বৃদ্ধ পিতা মাতা, দয়াপরবশ শ্বশুর শাশুড়ি, ঘরজামাই, আপিসের বিশ্বস্ত কেরাণী, খবরের কাগজের সুপারী কবুতর সাংবাদিক—এত সব নিয়ে এবং হয়ে কী করে বোহেমিয়ান হওয়া সম্ভব। শুধু মদ্যপান এবং বেশ্যালয়ে গমন? সেতো অষ্টাদশ শতাব্দীর আধুনিকতা। তবু এদের সাথে মিশলো অসীম। মদ খেলো, বেশ্যালয়ে গেলো। দেখলো, চূড়ান্ত মদ্যপ বা চূড়ান্ত লাম্পট্যও এদের অনায়ত্ত। আর এ থেকে শিল্পের ফুল ফোটানো তো দূরের কথা, এরাই আমাদের গন্ধমুষিকের মতো ঘুরেফিরে আসে প্রেম ঘাস ফুল পাখি তারা হৃদয় ডাকিয়া মনিয়া ইত্যাদি গূঢ় রহস্যের কাছে। অসীম জানে, সমস্ত সভ্যতা এতো বিচ্ছিরিভাবে পালটেছে যে লেখকের আইডেনটিটি রক্ষার প্রসেসও বদলে গেছে দ্রুত। তার সাথে পা ফেলে চলা দরকার। অন্ততঃ জীবনের কিছু কিছু ক্ষেত্রে চূড়ান্ত হতে পারা প্রয়োজন।

অথচ নিজের কিছু সমস্যাও আছে। কবিতাই অসীমের কাছে এখনো অমোঘ অস্ত্র। এটা অনায়াসে চালানোর ওর একটা কনফিডেন্স জন্মে গেছে। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে অনেক ঘটে যাওয়া ঘটনা, অনুষঙ্গ, স্মৃতি, অভিজ্ঞতা পিছু হাঁটতে শুরু করে। স্বল্পভাষী হলে কতো কিছু যেন বাদ পড়ে যায়। বড়ো নিবিড়ভাবে কথকতার ভঙ্গিতে বলতে পারলে বোধহয় মানুষকে বোঝানো যেতো। বন্ধুরা বলে, 'গল্প লেখ তাহলে।' গল্প জিনিসটার প্রতি তেমন দুর্বলতা নেই অসীমের। শেষ পর্যন্ত যেন তা গল্পই। 'তাহলে উপন্যাস লেখ।' লিখিনি তো কখনো।' 'চেষ্টা কর। প্র্যাকটিস কর।' হাসি পায় অসীমের। লেখালিখি কি বীজগণিত কষা যে প্র্যাকটিস করলেই ফর্মুলা মনে থাকবে আর একশোয় একশো? অথচ পারলে ভালো হতো। লেখা তো একধরণের বিপুল যন্ত্রণা। একটা অপকর্ম ফোঁড়ার উপরে তোকমা লাগানো রয়েছে অথচ ফাটছে না, এরকম মিশ্র অনুভূতি। এক-একসময় মনে হয়, ছেড়েছুড়ে দিয়ে পালাই কিন্তু তা আর হয় না। পালানো যায় না। খাদ্য গিলে কণ্ঠনলীতে আটকে আছে, পাকস্থলীতে পৌঁছয়নি, এ অবস্থায় কোনো গেম কি হাতছাড়া করা যায়?

ইন্দিরা আবার লোকসভায়

রমেন দাশ

অবশেষে : কর্ণাটকের চিকমাগালুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী জয়ী হয়েছেন।

চিকমাগালুর লোকসভা কেন্দ্রের ভিত্তি আটটি বিধানসভা-এলাকা। এর সর্বমোট নির্বাচক সংখ্যা ৫ লক্ষ ১৫ হাজার। তার মধ্যে মোট ৪ লক্ষ ৫৩ হাজার নির্বাচক তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। গোপন ব্যালটে দক্ষিণ ভারতের এই উপনির্বাচনে নির্বাচকরা যুগপৎ শ্রীমতী গান্ধীকে যেমন তাদের প্রতিনিধিরূপে বরণ করেছেন, তেমনি মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও প্রবীণ জনতা নেতা শ্রীবীরেন্দ্র পাতিলের প্রার্থীপদ বাতিল করেছেন। শ্রীপাতিল ১৯৬৮ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন।

ভারতে এর আগে লোকসভার কোনও উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে এত উত্তেজনা কখনও দেখা যায়নি। নির্বাচনী ব্যয় এবং প্রচারেও এবার রেকর্ড সৃষ্টি হয়। এই মর্যাদার লড়াইয়ের মূল প্রচারকরূপে এক-দিকে ছিলেন স্বয়ং শ্রীমতী গান্ধী এবং কর্ণাটকের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেবরাজ উরস। অপর দিকে শ্রীজে বি কৃপালনি, শ্রীজগজীবন রাম, জর্জ ফার্নান্ডেজ সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যবৃন্দ এবং সি পি আই (এম) নেতা ই এম এস নাম্বুদিরিপাদ, ডি এম কে নেতা শ্রীকরুণানিধি, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী প্রমুখ সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ। মর্যাদার এই লড়াইয়ে শ্রীমতী গান্ধীর জয়লাভ সর্বভারতীয় রাজনীতিতে যে এক নতুন ইঙ্গিতের সূচনা করছে তা সকলেই স্বীকার করেছেন।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সর্বপ্রথম লোকসভার নির্বাচন প্রার্থী হন ১৯৬৭ সালে। উত্তরপ্রদেশের রায়বেরিলি কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে তিনি প্রথম লোকসভায় দল-নেতা নির্বাচিত হন। এবং সেই সূত্রে ভারতের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী। ১৯৭১ সালে তিনি দ্বিতীয়বার লোকসভায় নির্বাচিত হয়ে পুনরায় প্রধানমন্ত্রীর পদে বৃত হন। তারপর ১৯৭৭ সালের মার্চ মাসের অসাধারণ নির্বাচনে তিনি তাঁর পুরনো নির্বাচনকেন্দ্র রায়বেরিলি থেকে পরাজিত হন। ঐ নির্বাচনে জনতা নেতা এবং প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীরাজনারায়ণ ৫৫ হাজার ২ শত ২ ভোটের ব্যবধানে তাঁকে পরাজিত করে এক ইতিহাস সৃষ্টি করেন। শ্রীমতী গান্ধী তাঁর জীবনের তৃতীয় নির্বাচনে পরাজিত হলেন বটে, কিন্তু হতাশায় ভেঙ্গে পড়লেন না। পরাজয়ের রাজনৈতিক প্রতিশোধস্পৃহায় হয়তো নীরব রণকৌশলে মগ্ন হলেন।

১৯৭৭ সালের মার্চে তিনি অভাবিত-ভাবে পরাজিত হন। আর তার মাত্র চৌদ্দ

মাসের মাথায় এ বছর মে মাসে শ্রীমতী গান্ধী নয় দিনের সফরসূচী নিয়ে কর্ণাটক যাত্রা করলেন। তার মনের গোপন ভাব-ভাবনার কথা ঘুণাক্ষরেও কেউ জানতে পারল না। সেখানে তিনি কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেবরাজ উরসের সঙ্গে নিভৃত আলাপ-আলোচনা চালালেন। সূক্ষ্ম হিসাব-নিকাশ করে বুঝলেন, চিকমাগালুর নির্বাচনকেন্দ্রের পরিবেশ-পরিস্থিতি তাঁর প্রার্থীপদের পক্ষে অনুকূলে। পাহাড়ি আর বাগিচা প্রধান এলাকাটিতে মোট নির্বাচকমণ্ডলীর শতকরা ৫০ ভাগই মহিলা। তা ছাড়া হরিজন, তপশীল ও সংখ্যালঘু এবং অনুন্নত সমাজের ভোটদাতাও শতকরা ৪৫ ভাগ। শ্রীমতী গান্ধীর প্রত্যয় ছিল, হরিজন-তপশীলি আর সংখ্যালঘুরা তাঁর পক্ষেই দাঁড়াবেন। কেননা তিনি নিজেকে তাঁদের অকৃত্রিম সুহৃদ বলে মনে করেন।

শ্রীমতী গান্ধী রাজনৈতিক অভিসার শেষ করে দিল্লি ফিরলেন। জুন মাসে জানা গেল তাঁর দলের সংসদ সদস্য চিকমাগালুর কেন্দ্রের প্রতিনিধি শ্রীচন্দ্রগৌড় লোকসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন। এই পদত্যাগের খবরে নানা মহলে নানা গুঞ্জন আর গুঞ্জন উঠল। কিন্তু কেউ বুঝতে পারল না যে, শ্রীমতী গান্ধীর সম্ভাব্য পরিকল্পনার রূপ দিতেই এই পদত্যাগ। শ্রীমতী গান্ধী কিন্তু তখনও নীরব। এবছর আগস্টের ২১ তারিখে দিল্লিতে তাঁর বাসভবনে যখন সাক্ষাৎকার প্রার্থী হই, প্রসঙ্গত প্রশ্ন তুলেছিলাম : আসন্ন কোন নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি লোকসভায় যাওয়ার কথা ভাবছেন কিনা?

আমার কথার মোড় ঘুরিয়ে তিনি শান্তিনিকেতন আর গুরুদেবের প্রসঙ্গ টেনে-ছিলেন। কিন্তু তার প্রায় দেড় মাসের মাথায় দেখা গেল, ৬ অক্টোবর তিনি চিক-মাগালুর লোকসভা উপনির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করছেন। আর সঙ্গে সঙ্গে সাড়া জাগল সারা ভারতের রাজনৈতিক শিবিরে।

১৯৭৭-এর এই উপনির্বাচন ছিল শ্রীমতী গান্ধীর জীবনের চতুর্থ নির্বাচন। নির্বাচনী এই লড়াইয়ে তিনি যে তীব্রতা আর কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে নিজেকে প্রতি-ষ্ঠিত করলেন, আদতে তা ছিল বাঁচার লড়াই।

১৯৭৭ সালে রায়বেরিলির নির্বাচনে জনতা নেতা শ্রীরাজনারায়ণ শ্রীমতী গান্ধীকে ৫৫২০২ ভোটে পরাজিত করেন। কিন্তু মাত্র কুড়ি মাসের ব্যবধানে কর্ণাটকের চিকমাগালুর কেন্দ্রে শ্রীমতী গান্ধী জনতা প্রার্থী শ্রীবীরেন্দ্র পাতিলকে ৭৭,৩৩৩ ভোটে পরা-ভূত করে পূর্ব প্রতিশোধ নেন।

উত্তর ভারতের রায়বেরিলির পরাজিত প্রার্থী শ্রীমতী গান্ধী দক্ষিণ ভারতের চিকমা-গালুরে নির্বাচনপ্রার্থী হওয়ায় জনতা নেতারা তাঁকে তাঁর নৈতিক পরাজয় বলে অভিহিত করেছিলেন। হিন্দীভাষী শ্রীমতী ইন্দিরাকে দক্ষিণ ভারতের হিন্দী বিদ্বেষী জনতা কী ভাবে নেবেন, তা নিয়ে নানা সংশয়-সন্দেহও ছিল। তা সত্ত্বেও শ্রীমতী গান্ধীর এই ঐতিহাসিক জয় ভারতের আগামী দিনের নতুন রাজনীতির তাৎপর্য ইঙ্গিত বহন করছে। এই জয়ের মধ্য দিয়ে শ্রীমতী গান্ধী অবশ্যই প্রমাণ দিয়েছেন, কোনও অঞ্চল বা প্রদেশের তিনি প্রতিনিধি নন—ভৌগোলিক সীমানার ঊর্ধ্বে তাঁর নেতৃত্ব ও জন-প্রিয়তা প্রসারিত। নেতৃত্বের এই অহংকার শ্রীমতী গান্ধীকে আরও দুঃসাহসী ও দুর্বার করে তুলবে সন্দেহ নেই।

বলা চলে, ভারতীয় সংসদ এই সর্ব-প্রথম একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে বিরোধী নেতারূপে পাচ্ছে। এক নাগাড়ে যিনি এগার বছর প্রধানমন্ত্রিত্ব করেছেন। সদ্য ছেড়ে আসা প্রশাসনের অলিগলি নিশ্চয়ই তাঁর নখ দর্পণে। তাই শ্রীমতী গান্ধীর প্রখর ব্যক্তিত্ব, প্রশ্নসনিক অভিজ্ঞতা এবং সূক্ষ্ম কূটচাল একদিকে যেমন প্রতিমুহূর্তে বর্তমান সর-কারকে বিপন্ন বিব্রত করবে, তেমনি ক্ষমতাসীন দল ও সরকারকে ঐক্যস্থাপনেও অন্তর্বিতভাবে সহায়ক হবে। পরিশেষে বলা যায়, তাঁর উপস্থিতি দেশে ইন্দিরাপন্থী ও ইন্দিরা বিরোধী দুটি স্বচ্ছ শিবির করার পক্ষে সহায়ক হবে। এবং তা থেকেই সূত্র-পাত ঘটবে নতুন এক রাজনৈতিক ধারার।

গরু মরলেও দুধ মেলে

এবারের প্রলয়ংকারী বন্যা পশ্চিম বাংলার স্বাভাবিক অগ্রগতিকে দারুণভাবে ব্যাহত করেছে। ক্ষমতাসীন দলসহ অন্যান্য সব দলের নেতা-কর্মীরাও একথা স্বীকার করেছেন। দলমতনির্বিশেষে সকলে চির-স্থায়ী বন্যা প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে এবং সাময়িকভাবে ত্রাণ ব্যবস্থা চালু রাখতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কাছে সুপারিশ রেখেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই ইতিমধ্যে এই রাজ্যের বন্যা কবলিত অঞ্চল পরিদর্শন করেছেন। বন্যা পীড়িত বাংলার দুরবস্থা দেখে ঢালাও সাহায্যের আশ্বাসও দিয়েছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি পরিষ্কারভাবে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, ত্রাণ পুনর্বাসনের জন্য বরাদ্দ অর্থের সঠিক হিসাব-নিকাশ চাই।

প্রধানমন্ত্রীর এই উক্তি পশ্চিম বাংলা সরকারের উদ্দেশ্যে, তা রাজ্য সরকারও জানেন। তাঁর এই অপ্রিয় উক্তি অথবা পরামর্শে রাজ্য প্রশাসন নিশ্চয়ই খুশি হতে পারেন নি। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রী ত্রাণসামগ্রী নিয়ে কারচুপি এবং কালোবাজারীর কোনও সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেয়েছেন। সোজা কথার মানুষ মোরারজী দেশাই সেই সুবাদে এমন একটা অপ্রিয় প্রসঙ্গ রাজ্য নেতাদের সামনে তুলে ধরতে পেরেছেন। মুখ্যমন্ত্রী অথবা রাজ্য নেতাদের কাছে প্রধানমন্ত্রী যে মনোভাব প্রকাশ করেছেন, তাতে কিছুটা তিক্ততা আর অবিশ্বাসের সুর মেশান ছিল বলেও মনে হয়েছে।

সাম্প্রতিক বন্যায় আমাদের আর্থিক-কাঠামো বিপন্ন। এর ফল সুদূরপ্রসারী। রাজ্য সরকার এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্রিয়। স্বল্পমেয়াদী আর দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার কথাও ভাবা হচ্ছে। সার্বিক প্রচেষ্টা আর সামর্থে হয়ত বিপর্যস্ত বাংলার অর্থনীতিকে অদূর ভবিষ্যতে বহুলাংশে চাঙ্গা করা সম্ভব হবে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা আমাদের আর একবার চিনবার সুযোগ পেলাম। বন্যার আয়নায় আমরা আর একবার আমাদের মুখ নতুন করে দেখলাম। বিধানসভা বিশ্ববিদ্যালয় অথবা মাঠে-ময়দানে আমরা সততা প্রগতিশীলতা আর নিরপেক্ষতার বুলি আওড়াই। কিন্তু ব্যক্তি বা গোষ্ঠী জীবনে আমরা তার কতখানি মান্য করি তা যাচাই করতে হলে বেশী দূরে যেতেও হবে না। সাম্প্রতিক পূজা মরসুমের নেপথ্য এক্সট ঘটনাই তা প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট।

মহালয়া থেকে শুরু করে দেওয়ালী-ভাইফোঁটা পর্যন্ত গেল উৎসবের মরসুমে। বাঙালী গত দুঃখ-দুর্দশার মধ্যেও তার সামাজিক রীতিনীতি বর্জন করতে পারে নি। তাই দুঃখের দিনেও পূজার মরসুমে মিষ্টি মুখের পালা বজায় ছিল। অথচ মনে করে দেখুন, পূজার মরসুমে অন্যান্য বারের তুলনায় দই-মিষ্টির বাজার এবার বেশ জমজমাট ছিল। দই-রসগোল্লা-সন্দেশের দাম যেমন খুব একটা বাড়ে নি, তেমনি সন্দেশ রসগোল্লা ও মিনির আকার নেয় নি। তবে কি বন্যাপীড়িত বাংলার মিষ্টি ব্যবসায়ীরা বন্যার্ত মানুষের ম্লান মুখে হাসি ফোটাতে ব্যবসায়ের ক্ষতি স্বীকার করেও সস্তায় মিষ্টি বিতরণের ব্রত নিয়েছিলেন?

না, তা নয়। ব্যবসায়ী মহল সূত্রে জানা গেছে, পূজার মরসুমে বাজারে দুই বা ছানার কোনও অভাব ছিল না। কারণ, বস্তা বস্তা গুঁড়া দুধ নাকি অবিশ্বাস্যভাবে দুধের বাজার চাঙ্গা রেখে। অথচ একটা সহজ হিসাব দেখুন। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু প্রধানমন্ত্রীর কাছে রাজ্যের ক্ষয়ক্ষতির যে প্রাথমিক হিসাব দাখিল করেছেন, তাতে বলা হয়েছে—এক আটটি জেলাতেই কমপক্ষে দুই লক্ষ গবাদি পশু ভেসে গেছে। বেসরকারী হিসাবে এর সংখ্যা অবশ্য আরও বেশী মনে করা হচ্ছে। এই লক্ষ লক্ষ গবাদি পশুর মৃত্যুর ফলে দুধ বা ছানার বাজারে এতটুকু ঘাটতি পড়ল না। বরং সেই ঘাটতি পূরণ করে পূজা মরসুমেই মিষ্টির বাজারে দুধের প্লাবন বয়ে গেল! এই দুগ্ধ বন্যার উৎসের সঙ্গে ত্রাণ-শিবিরের জন্য বরাদ্দ গুঁড়া দুধের হাজার হাজার বস্তার কোন সম্পর্ক আছে কিনা, অবিলম্বে তা খতিয়ে দেখা দরকার। বন্যাত্রাণের জন্য সরকারী, বেসরকারী, দেশ-বিদেশের বহু সেবাব্রতী সংস্থা অন্যান্য সামগ্রীর সঙ্গে অঢেল গুঁড়া দুধ সরবরাহ করেন। তার সর্বমোট পরিমাণের সঠিক হিসাব নেই। কিন্তু এই ভারতীয় রেডক্রশ সংস্থাই বন্যাত্রাণের জন্য অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় ৬৭ মেট্রিক টন গুঁড়া দুধ সরবরাহ করেন। তার অর্থমূল্য প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা।

এই বিপুল পরিমাণ গুঁড়া দুধ বিতরণ নিয়ে সেবাব্রতী এই সংস্থার কর্মকর্তাদের মধ্যেও দারুণ হতাশা দেখা দেয়। বিভিন্ন সূত্রে তাঁরা গুঁড়া দুধ নিয়ে কারচুপি আর রাজনীতির অভিযোগ পান। অভিযোগ এত ব্যাপক এবং সুনির্দিষ্ট হয়, যার ফলে ভারতীয় রেডক্রশের দিল্লির কর্তারাও কলকাতা ছুটে আসতে বাধ্য হন। ১২ অক্টোবর তাঁরা উচ্চ পর্যায়ের এক গোপন বৈঠক করে সেখানে গুঁড়া দুধ এবং ত্রাণ সামগ্রীর বিলিবন্টন নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। অবশেষে ১৮ অক্টোবর এক সার্কুলার মারফৎ ত্রাণসামগ্রী রেড-ক্রশের নিজস্ব সূত্রে বিলিবন্টনের ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক সেবা সংস্থা রেডক্রশ রাজনীতি কূটনীতির ঊর্ধ্বে। তাদের এই তৎপরতার পেছনে যে সব তথ্য এবং গোপন রিপোর্ট কাজ করেছে, প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইও কি ঐ একই ধরনের অবিশ্বাস্য অথচ সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য হাতে পেয়েছিলেন। ওয়াকিবহাল মহল মনে করেন, ঐ ধরনের তথ্যের ভিত্তিতেই প্রধানমন্ত্রী রাজ্য সরকারকে সঠিক হিসাব-নিকাশ রাখার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে পরামর্শ দিয়েছেন। অপর পক্ষে এ রাজ্যের ত্রাণের জন্য নির্দিষ্ট গুঁড়া দুধের কালো-বাজারী নিয়ে বাইরের পত্র-পত্রিকায়ও ইতি-মধ্যে সংবাদ-টিপ্পনি প্রকাশিত হয়েছে।

রাজ্যের পুলিশ কর্তাদের অনেকে গুঁড়া দুধের কালোবাজারীর খবর যে রাখেন না তা নয়। কিন্তু গয়ে পড়ে তাঁরা আর এই অপ্রিয় কাজে হাত দিয়ে রাজনীতির শিকার হতে চান না। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি-বাবু সম্প্রতি পুলিশের ত্রাণ কাজের প্রশংসা করেছেন। বলেছেন, অত্যাচারীর ভূমিকায় না নামিয়ে পুলিশকে সমাজ সেবক করে তোলা প্রয়োজন। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবুর এই মনোভাব দলমতনির্বিশেষে প্রশংসার দাবী রাখে। বন্যার্ত মানুষের, বিশেষ করে দুধের শিশুর মুখের খোরাক নিয়ে যারা কালোবাজারী করছে বা করেছে, তাদের খুঁজে বার করতে মুখ্যমন্ত্রী পুলিশকে নির্দেশ এবং অভয় দিন। দেখবেন, কোঁচো খুঁড়তে কত কালসাপ বেরিয়ে আসে। সততা আর প্রগতিশীলতার নাম বলীর আড়ালে বিচিত্র সব চরিত্র শুধু আমাদের প্রতি দিন প্রতারিতই করছে না, রাজ্যবাসী তথা রাজ্য সরকারের ভাবমূর্তিও প্রতিনিয়ত ম্লান করছে।

বন্যা পীড়িত পশ্চিম বাংলার পুন-র্গঠনের কাজ নতুন উদ্যমে শুরু হবে। পুনর্বাসন আর পুনর্গঠনের জন্য ব্যয় করা হবে কোটি কোটি টাকা। আর্ত শিশুর মুখের দুধ নিয়ে যারা কালোবাজারী করে, বিরাট কর্মযজ্ঞে নামার আগে তাদের অবশ্যই খুঁজে বার করতে হবে। তার জন্য যে সৎ, নিরপেক্ষ এবং গতিশীল প্রশাসন প্রয়োজন, মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে এই মুহূর্তে সাধারণ মানুষ তাই আশা করে। প্রধান-মন্ত্রীর সাম্প্রতিক মন্তব্যে বেদনার এই সুরেরই আভাস ছিল।

রাজনীতি কলকাতা স্টাইল

বেদব্যাস বৈদ্য

সঞ্জয় এখন চন্দ্র দশায়

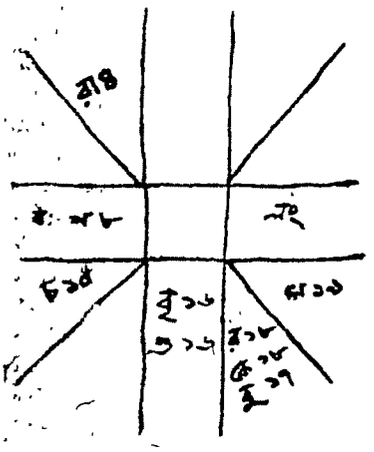

সুধী পাঠকবর্গের সামনে এবার আমরা এক বিতর্কিত জাতকের রাশিচক্র তুলে ধরতে চেষ্টা করছি।

প্রদত্ত রাশিচক্রটির জাতক, সঞ্জয় গান্ধী। জাতকের পরিচিতি দিয়ে আমরা কোথায় কলেবর বৃদ্ধির দিকে না গিয়ে সরাসরি রাশিচক্রটির বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করছি।

সিংহ রাশি, মকর লগ্নের জাতক সঞ্জয় গান্ধী। চন্দ্র আছে মঘা নক্ষত্রে, অর্থাৎ কেতুর নক্ষত্রে জন্ম। রাশিচক্রটিতে লক্ষ্যণীয় হলো, বৃহস্পতি এবং শনি প্রধান দুটি গ্রহ নিজ নিজ প্রাপ্ত হয়েছে এবং কেন্দ্রে বসে আছে। অনেকেই কেন্দ্রস্থ স্বনক্ষত্রাশ্রিত বৃহস্পতির অবস্থানকে শুভ যোগ বলে হয়তো চিন্তা করবেন—কিন্তু মকর লগ্নের পক্ষে বৃহস্পতি অশুভ গ্রহ। অশুভ বৃহস্পতি কেন্দ্রস্থ, যদিও নিজ নক্ষত্রে আছে কিন্তু ১৬ সংখ্যক নক্ষত্রটি জাতকের পক্ষে অশুভ। শনির অবস্থান বিচার করলেও দেখা যায়, লগ্নপতি শনি কেন্দ্রস্থ, এবং স্বনক্ষত্রগত। আপাতঃ-দৃষ্টিতে শুভ মনে হলেও পুষ্যা নক্ষত্রগত শনি এবং কেন্দ্রস্থ বক্রী শনি যেমন দ্রুত উত্থান ক্ষয়কর, তেমন হঠাৎ পতন কারক। রাশিচক্রে আর একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় হলো অশুভ ভাব পতি বৃহস্পতি কেন্দ্রস্থ এবং মঙ্গল গ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট বলবান শশি গ্রহ আর এক কেন্দ্রে অবস্থান হওয়াতে, যেমন উত্থান-পতনের একটি দোলা সৃষ্টি করেছে, তেমন জাতকের সম্বন্ধে কারণে-অকারণে কলঙ্ক, নিন্দা, গুপ্ত তত্ত্ব ফাঁসের কারকও হয়েছে।

এবার রাশিচক্রটিতে আত্মাকারক গ্রহ—রবির থেকে বিচার করে দেখি। রবির সঙ্গে বুধের অবস্থান যতটা শুভ ফল দিতে পারতো, প্রত্যেক ব্যাপারে জাতকের বোধশক্তিকে যতটা সচেতন রাখতে পারতো, সেখানেও রাহুর পূর্বদৃষ্টি অনেকটা হানি করেছে। রবির দশমে চন্দ্রের অবস্থান জাতককে প্রতিষ্ঠা এবং উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে, এবং রবি চন্দ্রের এই অবস্থান জাতককে রাজনীতিতে জড়িয়ে ফেলতে, সমাজ উন্নয়নে এবং সর্বদা জনগণসেবী করতে চেষ্টা করবে। মকর লগ্ন থেকে দশমে স্ব-নক্ষত্রগত বৃহস্পতি জাতককে রাজ-মন্ত্রণাদাতা করেছে। রাজকীয় ঠাটের কারক হয়েছে। এব্যাপারে বৃহস্পতির সঙ্গে শুক্রের অবস্থানও লক্ষ্যণীয়। কিন্তু শ্রীত্যেক শুভযোগের অন্তরালে প্রতিবন্ধক হলো রাহু, শনি এবং মঙ্গল। রাশিচক্রটিতে দেখুন—লগ্নপতি শনি সপ্তমে, পুষ্যা নক্ষত্রে বক্রী। রবির সপ্তমে বলবান পাপগ্রহ রাহু। আবার চন্দ্রের সপ্তমেশ শনি, দ্বাদশে বক্রী। পুষ্যা নক্ষত্রের শনিই—সাতাত্তর সালের পতনের জন্য বহুলাংশে দায়ী। একে পাপগ্রহ, অশুভ শনি। তার সঙ্গে গোচর শনির মিলন এবং সাড়ে সাতির অশুভ প্রভাবে জাতকের প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। বয়ে গেল এক ঘূর্ণি ঝড়। গোচর শনি লগ্নের অষ্টমে, চন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হওয়া মাত্র জাতক জড়িয়ে গেল বিভিন্ন আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে। যা আগামী এক বছর আরও লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠতে পারে। চন্দ্র শনির সঙ্গে ১৮ নভেম্বরের পর রাহুর মিলন—জাতকের পক্ষে প্রায় ১০ মাস অশুভের ছাপ রাখতে চেষ্টা করবে।

বর্তমানে জাতকের চন্দ্রের দশা চলছে। চন্দ্রের দশাতে, শনির অন্তর্দশা ৭৭-এর সেপ্টেম্বর থেকে আরম্ভ হয়েছে, ৩০শে '৭৯ সালের মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত। এ সময়টাই জাতকের পক্ষে অস্বস্তিকর থাকবে। তারপর চন্দ্রের সঙ্গে বুধের অন্তর্দশা আরম্ভ এবং শেষে ৮০ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। জাতকের পক্ষে এই সময়টা অত্যন্ত শুভদায়ক হবে। এর সঙ্গে বর্তমান গোচর বৃহস্পতির গতিও জাতকের পক্ষে সহায়ক। নবাংশ কুণ্ডলীতে জাতকের কর্কট রাশি, এবং সেখানে বর্তমান বৃহস্পতির প্রভাব যথেষ্ট সাহায্যকারী সন্দেহ নেই। কিন্তু স্বাস্থ্যহানির যোগ আছে। জাতকের পক্ষে চন্দ্রের দশায় রবির অন্তর্দশা অত্যন্ত শুভদায়ক হবে। রাশিচক্র এবং নবাংশ চক্রানুযায়ী জাতকের ভবিষ্যত দিন ৮১ সালের মাঝামাঝির পর থেকে উত্তাল এবং সম্ভাবনাপূর্ণের ছাপ রাখছে।

ব্যক্তিগত রাশিফল

নীচে সম্ভাব্য রাশিফল দেওয়া হলো; গ্রহ পরিস্থিতি রাজধানীতে চাঞ্চল্য আনতে পারে।

মেষ : কার্যক্ষমতা সপ্তাহটি উদ্বেগজনিত হলেও সপ্তাহের শেষদিকে বিরোধ-বিতর্কগুলি মিটে যাবে। বৃহঃ শুক্র-বার অশুভ।

বৃষ : কি চাকরীতে, কি ব্যবসাতে সপ্তাহটি অত্যন্ত সহায়ক, কিন্তু মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া থেকে সাবধান থাকুন। সোম, মঙ্গল অশুভ।

মিথুন : শত্রুদের দ্বারা উৎপীড়িত হতে পারেন। ধর্মস্থানেও মানসিক অশান্তি থাকবে এরই মধ্যে হাতে কিছু অর্থ আসবে। সোম, মঙ্গল লক্ষ্য রাখুন।

কর্কট : আয় বৃদ্ধি পাবে। কাজে কর্মে ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করুন সুফল পাবেন। কোথায়ও ভ্রমণে যেতে পারেন। কিন্তু শনি এবং রবিবার মানসিক চাপ থাকবে।

সিংহ : ভ্রাতৃস্থানীয় কারোর সঙ্গে মতভেদ হতে পারে। আর্থিক ব্যাপারে টানা-টানি থাকলেও প্রয়োজন মিটে যাবে। নতুন কর্মযোগ আসতে পারে। সোম, মঙ্গল অশুভ।

কন্যা : নিজের বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করুন। সপ্তাহের শুরুতেই কোন ব্যাপারে চরমাবস্থায় কারোর সহায়তা পাবেন। গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি শনি, রবিবার শেষ করতে চেষ্টা করুন।

তুলা : অত্যন্ত ক্রোধ এবং উত্তেজনা আপনার পক্ষে ক্ষতিকারক হতে পারে। ব্যবসায় যোগাযোগ লক্ষ্যণীয়। সপ্তাহের শেষে বন্ধুপ্রীতি নষ্ট হতে পারে।

বৃশ্চিক : কার্যসিদ্ধির পক্ষে সপ্তাহের মাঝামাঝি লক্ষ্যণীয়। কর্মস্থানে প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। এ ব্যাপারে মঙ্গল বুধবার দেখুন।

ধনু : আয়ব্যয়ে সমতা থাকা মুস্কিল হবে। কিন্তু পুরনো পাওনা আদায় হতে পারে। সোম মঙ্গল অশুভ।

মকর : কোন ব্যাপারে দুশ্চিন্তা থাকতে পারে, অথবা অহেতুক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। কিন্তু স্বীয় ব্যক্তিত্ব আপনার প্রভাব বৃদ্ধি করাবে। দূর ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন। শুক্র থেকে রবিবার পর্যন্ত লক্ষ্যণীয়।

কুম্ভ : কাজে-কর্মে উৎসাহ পাবেন। আপনার প্রতিপত্তিও বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু বাসগৃহ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত ভুল হতে পারে। সোম, মঙ্গলবার শুভ।

মীন : স্বীয় দূরদর্শিতায় জটিল সমস্যা সমাধান করতে পারবেন। কোন যোগাযোগ ভবিষ্যতের শুভ ইঙ্গিত বহন করবে। শনি, রবিবার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে সহায়ক।

শ্রীমাণিক

আগামী সংখ্যায়
নতুন কেরল মন্ত্রিসভা

সমালোচনা

এক বই : দুই চোখে

প্রকাশকের নিবেদন আছে : "বিদেশের ও ভারতবর্ষের অবাঙালী পাঠক-পাঠিকাদের কথা মনে" রেখে ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে যোগেশচন্দ্র "ইন সার্চ অব ফ্রিডম" নামে যে ইংরাজি বই লেখেন ১৯৭৭-এ এই বইখানি তারই বঙ্গানুবাদ। ইংরাজি বইটি যোগেশচন্দ্রের মৃত্যুর দু বছর আগে লেখা, বঙ্গানুবাদ হয়েছে যোগেশচন্দ্রের মৃত্যুর আট বছর পরে। মূল ইংরেজি বইখানি পড়িনি, সুতরাং, সে-রচনার উৎকর্ষের কথা বলতে পারব না, বঙ্গানুবাদ কিন্তু সর্বত্র সুখপাঠ্য ও স্বচ্ছন্দ হয়নি, পূর্ব প্রচলিত বইয়ের ভাষার সঙ্গে কথ্যভাষার মিশেল ঘটেছে এবং 'ওনার' শব্দটি নিতান্তই লৌকিক।

কিন্তু বইখানি বিরাট, বিশাল এর সময়ের ব্যাপ্তি, দুর্নিবার আকর্ষণ-এর তথ্যসম্ভারের, ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলনের বহু তরঙ্গ লীলায়িত, এবং বলা যায়, একদিক থেকে বইখানি স্বয়ং-সম্পূর্ণ। আজীবন বিপ্লবী যোগেশচন্দ্রের এমনই বই লেখবার অধিকার ছিল এবং সে অধিকার তিনি যোগ্যতার সঙ্গেই প্রয়োগ করেছেন—যে-কোন ইতিহাসবিদের কাছে এটি আহ্লাদের কথা। কেননা, বৃটিশরাজ যাঁদের নিরাপদ হতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে গেছেন তাঁদের ভারতে বিপ্লব প্রচেষ্টার ইতিহাস সম্পর্কে কিরকম অনীহা, তাচ্ছিল্য ও ঘৃণা ছিল যোগেশচন্দ্র সেখেদে সে-কথার উল্লেখ করে (পৃঃ ৪৮০) নিজেই পঞ্চাশৎ ভারতীয় বিপ্লবীর চিত্রসহ "ইন্ডিয়ান রেভোলিউশানারিজ ইন কনফারেন্স" নামে একখানি বই লিখে গেছেন, ক্ষমতাসীন নেতারা বিপ্লবীদের চিহ্নমাত্র রাখতেও উৎসাহবোধ করেননি, জওহরলাল ক্ষুদিরামের মূর্তির আবরণ উন্মোচনের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সুতরাং, এদেশে উপেক্ষিত বিপ্লবীদেরই ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহে ও ইতিহাস লিখনে আত্মনিয়োগ করতে হয়েছে। যোগেশচন্দ্র সেদিক থেকে এক মহৎ কর্তব্য সম্পন্ন করে গেছেন। একদা, অচির ভবিষ্যতেই, ডঃ পট্টাভি সীতারামায়ার একদেশদর্শী কংগ্রেসের ইতিহাস এবং বিপ্লবীদের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মদানের ইতিহাসের যথার্থ মূল্যায়ন হবে। ইতিমধ্যেই কি অবস্থায় কাদের আয়ত্তে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে তার ভূরি ভূরি বিদেশী-বিদেশী গ্রন্থ প্রকাশিত এবং ঐসব 'নেতৃবৃন্দের' প্রকৃত চরিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে, হচ্ছে। এইসব ময়না তদন্তের অন্তত এইটুকু লাভ যে, তুলনামূলকভাবে বল প্রয়োগে বিশ্বাসী বিপ্লবীদের আপোষহীন নির্ভীকতা এবং অকাতরে আত্মবলির দৃষ্টান্তগুলো যোগ্য পটভূমিকায় প্রণম্য হয়ে উঠছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অনমনীয়

যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বলিষ্ঠতার দিকে দৃষ্টিপাত করে মাথা নত করে না এমন নির্বোধ বুদ্ধিজীবী ইতিহাসবেত্তার সংখ্যা আজ বিরল। যাঁরা নেতাজীকে 'কুইসলিং' এবং বিপ্লবীদের টেররিস্ট বলতেন আজ তাঁরাও তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

যোগেশচন্দ্রের ৭৪ বছর পরমায়ুর মধ্যে ২৪ বছর কারাগারে বা বন্দীদশায় কেটেছে। অনাচার বা অবিচারের বিরুদ্ধে বাইরে যেমন ভেতরেও তেমনি সংগ্রাম চালিয়েছেন, বন্দীদশায় তিনি অনশন ধর্মঘট করেছেন কমসেকম পাঁচবার, জবরদস্তি খাওয়াবার চেষ্টায় আহত হয়েছেন এবং একাধিকবার তাঁকে মৃত্যুর প্রান্ত থেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। যোগেশচন্দ্র জন্মেছেন বাঙলায় (বিক্রমপুরের গাওদিয়ায়) ১৮৯৫এ। রাজনীতিতে কিশোর বয়সেই (১৯০৫) আকৃষ্ট হন। বরিশালের দৌলতখানে বছর দুই লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে লাঠি খেলাও শিখেছিলেন। সেখান থেকে কুমিল্লা যান এবং এইখানে তিনি প্রখ্যাত বিপ্লবী দল অনুশীলন সমিতির সংস্পর্শে আসেন। বইখানিতে অনুশীলন সমিতির গোপনচারী কার্যক্রম ও পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ আছে। কিন্তু আলিপুর বোমা মামলা নামে খ্যাত (আসলে মানিকতলা বা মুরারীপুকুর বাগানবাড়ি ষড়যন্ত্র) প্রসঙ্গটিতে তিনি একটি মারাত্মক ভুল করেছেন।

মজঃফরপুরে বোমাবিস্ফোরণ ১৯০৯-এ হয়নি, হয়েছে ৩০ এপ্রিল, ১৯০৮এ, ক্ষুদিরাম নিয়ে গাড়ী কবিরা গন বাঁধবার পর মানিকতলার সবাই এবং অরবিন্দ প্রমুখ ধর পড়েন—একথাও ঠিক নয়। ১ মে -১৯০৮) মোকামা স্টেশনে প্রফুল্ল চাকীর ধরা পড়বার উপক্রমেই আত্মহনন এবং ওয়েইনি স্টেশনে ক্ষুদিরাম ধরা পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতার নানা জায়গায় ও মেদিনীপুরেও তল্লাসী ও ধরপাকড় সুরু হয়ে যায় এবং ১৯০৮-এ এই মামলা আরম্ভ হয়ে যায়। ওদিকে ক্ষুদিরামের মামলাও চলে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট, দায়রা আদালত, হাইকোর্ট অবধি, প্রথামতো মার্সি পিটিসান ইত্যাদির পর ফাঁসি—গাড়ী কবির গান তারও পরে, এবং সে গান (যদিও অশ্লীল রেকর্ডে গাওয়া হয়) সর্বতোভাবে ভুল। 'যুগান্তর' পত্রিকা সংশ্লিষ্ট বিপ্লবীদের কথা সংক্ষেপে যোগেশচন্দ্র বলতে গিয়ে অনেক ভুল করেছেন। কিন্তু অনুশীলন সমিতিতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকার দরুন তাঁর সেসব তথ্য নির্ভরযোগ্য হয়েছে। অনুশীলন সমিতির গোপন তথ্যের দিক থেকে এই বইখানি মূল্যবান, তবে সিডিসান কমিটি রিপোর্টে ১৯১৮-তেই অনেক কিছু প্রকাশ পেয়ে গেছে।

যোগেশচন্দ্রের ওপর যে পুলিশের পীড়ন হয়েছে কথা বার করার জন্য, সেই কদর্য কাহিনী ঠান্ডা মানুষকেও উত্তেজিত করে তুলতে পারে। চড় চাপড়, কিল ঘুষি লাঠির আঘাত, কেশাকর্ষণ—এসব তো তুচ্ছ, মুখে প্রস্রাব গালাগালি করা বা কমোডে মুখ গুঁজে দেওয়া—সেও বেশ হয় তুচ্ছ, যোগেশচন্দ্র বিবরণ দিয়েছেন : "প্রস্রাবের সহিত বিষ্ঠা মিশাইয়া তাহা আমার সর্বাঙ্গে মাখাইয়া দিলেন.... তিন দিনের মধ্যে তাঁহারা আমাকে দেহ পরিষ্কার করিতেও দেন নাই।" (পৃঃ ৪৯) প্রখ্যাত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মডার্ণ রিভিয়ু'তে প্রকাশিত যোগেশবাবুরই যে আবেদনটি যোগেশচন্দ্র পুনরুদ্ধৃত করেছেন, তাতে কিন্তু আছে : "অফিসারটি আমার নাক টিপিয়া ধরিলেন এবং একজন মেথর একটি কমোড ভরতি প্রস্রাব ও বিষ্ঠা আমার মুখে ঢালিয়া দিল। তাহার পর তাহারা সেই অবস্থায় আমাকে একটি কুঠরিতে আটক করিয়া রাখিয়াছিল এবং আমাকে মুখ ধুইবারও কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই।" (পৃঃ ৫১-৫২) এত কাছাকাছি দুটি বিবরণের পার্থক্য যোগেশচন্দ্র খেয়াল করেন নি। অবশ্য এই পার্থক্যে পীড়নের দৃষ্টান্তের বিশেষ তারতম্য ঘটে না। হাতকড়া, পাড়াবেড়ি এগুলো কিছু নয়, কারণ তখনকালে এসব ছিল বন্দীদের নিত্যসঙ্গী।

বাঙলায় থাকতে তিনি প্রেসিডেন্সি, রাজশাহী, বহরমপুর জেলে, বাঙলার বাইরে হাজারিবাগ, লক্ষ্ণৌ, ফতেগড়, আগ্রা, নৈনি, এটা জেলে এবং দেওলিতেও ছিলেন এবং সর্বত্রই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে উৎপীড়িত হয়েছেন। ১৯৪৬-এর ১৭

২৪ নভেম্বরের

অমৃত

মানুষ ও শিল্পী তলস্তয়ের নামে উৎসর্গীত

তলস্তয়ের গল্প ছাড়াও একালের কয়েকটি বাঙলা গল্প থাকছে লিখছেন ঃ সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়, একরাম আলি, চণ্ডী মণ্ডল, সুরজিৎ ঘোষ, অসীম চক্রবর্তী, অমল মুখোপাধ্যায়, প্রভাত চৌধুরী ও নির্মলকুমার দাশ।

এবারের প্রচ্ছদ কাহিনী লিখেছেন
অন্নদাশঙ্কর রায়

বিষয়ঃ তলস্তয়

আর থাকছে বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ

গোর্কির চোখে তলস্তয়

এছাড়া নিয়মিত বিভাগ ঃ চিত্রধ্বনি, সাহিত্য, রাজনীতি

এবং সুভাষ ভৌমিক

এপ্রিল তিনি বন্দীদশা থেকে মুক্তিলাভ করেন।

বইখানি কাকোরী মামলা, ভগৎ সিং, আজাদ, লাহোর ষড়যন্ত্র প্রভৃতি বহু তথ্যে সমৃদ্ধ। এত অত্যাচার, এত জীবনদান সত্ত্বেও কি পেয়েছে দেশ?

যোগেশচন্দ্র নিজে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে এই উপসংহার করেছেন ঃ "পঞ্চাশ বৎসরের কঠোর স্বাধীনতা সংগ্রামের সাহায্যে দেশে যে অমরা প্রেম-মূলক ভাবধারা আনয়ন করিয়াছিলাম, তাহা যে ঊনিশ বৎসরের স্বাধীনতার ফলে সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে, একথা আমি পূর্বে স্বপ্নেও কখনও চিন্তা করিতে পারি নাই।"

মূল ইংরাজি বইখানি ১৯৬৭-তে লেখা, হিসেবে কুড়ি বছর। এই সময় তিনি বইখানি লোকান্তরিত যাঁর উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন তাঁকে লিখেছেন ঃ "এমন স্বাধীনতার জন্যই কি তুমি সংগ্রাম করিয়াছিলে এবং শেষ পর্যন্ত প্রাণও হারাইয়াছিলে?"

পুলকেশ দে সরকার

বইটি পড়তে পড়তে ভেসে ওঠে চোখের সামনে এক দল বিক্ষুব্ধ যুবকের চেহারা। শক্ত চোয়াল। অদম্য মনোবল। হাতিয়ার বলতে মাতৃভূমির প্রতি অকপট ভালবাসা। দেশকে পরাধীনতার বন্ধন থেকে মুক্ত করতে তারা বদ্ধপরিকর। ছবিটি প্রাক স্বাধীনতা যুগের ভারতবর্ষের আর আলোচ্য বইটির লেখক সেই যুবকদের একজন, যাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন এক নতুন অধ্যায় — ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস।

স্মৃতির ঝাঁপি হাতড়ে হাতড়ে যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন 'ইন সার্চ অফ ফ্রিডম', তাঁর মৃত্যুর (১৯৬৯) বছর দুই আগে। বর্তমান সংস্করণটি তারই সম্পাদিত বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ করেছেন 'যুগজ্যোতি' পত্রিকার সম্পাদক বীরেশচন্দ্র মজুমদার।

যোগেশবাবু বিপ্লবী যুগের একটি সাড়া-জাগান নাম। জন্ম ১৮৯৫ সালে ঢাকার গাভাদিয়া গ্রামে। কৈশোর কেটেছে কুমিল্লায়। ঐ জেলাতেই লেখক বিপ্লবী সংগঠন অনুশীলন সমিতির সংস্পর্শে আসলেন। সূত্রপাত হয় তাঁর বিপ্লবী জীবনের।

এই বিপ্লবী জীবনে তিনি বিভিন্ন হিংসাত্মক ও উগ্র রাজনীতিমূলক কাজে অংশ নিয়েছেন। গ্রেপ্তার হয়েছেন বহুবার। পুলিশের চোখ এড়াতে না পেরে প্রথম গ্রেপ্তার হন ১৯১৬ সালে কলকাতায়। ভাবতে অবাক লাগে, তাঁর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে লেখক ২৪।২৫ বছর কাটিয়েছেন কারাগারের অন্ধকারে। এই সময়ে বহুবার তিনি অনশন ধর্মঘট করেন পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদে। একবার (১১ জুলাই থেকে ২৯ নভেম্বর ১৯৩৪) অনশন করে তাঁর সময়ে যোগেশবাবু অনশন ধর্মঘটের বিশ্বরেকর্ড করেন (পৃঃ ৬৯, পৃঃ ৪৩৪)।

১৯২৩ সালে বিপ্লবী সংগঠনের কাজ সুসংহত করার উদ্দেশ্যে তিনি উত্তর প্রদেশে প্রেরিত হন। বারাণসী, কানপুর প্রভৃতি স্থানে তিনি বিপ্লবী কার্যকলাপের কেন্দ্র গঠন করেন। এই সময়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে ভগৎ সিং, মানবেন্দ্র রায় প্রমুখের।

রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক থেকে মানবেন্দ্র রায় ও লেখকের মধ্যে একটা ফারাক ছিল। তবে ফারাকটা কি ধরনের তা তিনি পরিষ্কারভাবে বলেন নি।.... তাহার (মানবেন্দ্র রায়) সঙ্গে সাক্ষাতের পর আমি ও অপর কয়েকজন তাহার সহিত একত্রে কাজ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলাম। তবে আমরা বেশী দিন কিন্তু তাহার সহিত থাকিতে পারি নাই ও পরিশেষে আমরা কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টিতে যোগ দিয়াছিলাম (পৃঃ ১৯২)। লেখক নিজে বিশ্বাস করতেন সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে অর্জিত সমাজতন্ত্রে.... আমাদের আন্তরিক বাসনা ছিল কার্ল-মার্কস ও লেনিনের নীতিভিত্তিক বিপ্লবের মাধ্যমে জনগণের জন্য এমন একটি মুক্ত সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি সাধন করা যেখানে মানুষের দ্বারা মানুষ কখনও শোষিত হইবে না (পৃঃ ৪৩০)। সেই কারণেই কংগ্রেসে থাকাকালীন তিনি মানেন নি গান্ধীজীর অহিংসবাদ। প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন বিপ্লবী কার্যকলাপের প্রতি জওহরলাল নেহরুর কিছু মন্তব্যের বিরুদ্ধে। এর থেকেই শুরু হয় কংগ্রেসের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ, মতাদর্শের সংঘাত। শেষে যোগেশবাবু ও আরও অনেকে কংগ্রেস পরিত্যাগ করেন, গড়ে তোলেন বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল।

কাজের মাধ্যমে বিচার করলে লেখকের মত ও পথের মধ্যে বেশ বড় ফারাক দেখা যায়। যদিও তিনি বিশ্বাস করতেন সমাজতন্ত্রে। তাঁর কিয়াকলাপে কিন্তু সন্ত্রাসবাদের চরিত্রই ফুটে ওঠে। তাত্ত্বিকবাদের মতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ অনেক স্তরে বিভক্ত। প্রাথমিক পর্যায়ে সংগঠন করতে হয় ব্যাপক গণসমর্থন, জাগাতে হয় গণচেতনাকে। গড়ে তুলতে হয় একটি শক্তিশালী 'মাস বেস' আর তা গঠনের উদ্দেশ্যে লেখক কোন নির্দিষ্ট কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিলেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। দ্বিতীয়ত ক'কোডী মামলা লেখকের জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য

ঘটনা। ১৯২৫ সালের ৯ আগষ্ট সাহারানপুর থেকে লক্ষ্ণৌগামী একটি ট্রেন কাকোড়ী ষ্টেশন ছাড়ার পর বিপ্লবীদের সশস্ত্র আক্রমণের দ্বারা লুঠ হয়। এই ঘটনায় অভিযুক্ত বিপ্লবীদের চারজনের ফাঁসি হয় এবং লেখকসহ পাঁচজন আজীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। কাকোড়ীর ঘটনা সম্পর্কে লেখকের অভিমত '. যে সকল অসীম সাহসী তরুণ বিপ্লবীরা শাসন সংস্কার সম্পর্কে আস্থাবান ছিলেন না এবং সশস্ত্র বিপ্লবের সাহায্যে ভারতকে স্বাধীন করিতে চাহিতেন, ইহা ছিল বিদেশীর শাসনের বিরুদ্ধে তাহাদেরই সশস্ত্র বিপ্লব ঘোষণা পৃঃ ২৪৪)। আক্ষরিক অর্থে উপরোক্ত ঘটনাটি কি 'সশস্ত্র বিপ্লব' ঘোষণা না সন্ত্রাসবাদের বহিঃপ্রকাশ? আর যদিও বা কাকোড়ী ঘটনাকে সশস্ত্র বিপ্লব বলে ধরা যায় তবে বিপ্লবের সঠিক চরিত্র অনুযায়ী ভারতবর্ষের অসংখ্য মানুষ শত শত কাকোড়ী ঘটনার দ্বারা দেশ ছেয়ে ফেলল না কেন?

উপরন্তু এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথা মনে করা যেতে পারে।

মার্কসের মতবাদ অনুযায়ী একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আন্দোলন কখনই ধর্মভিত্তিক হতে পারে না। কারণটা অবশ্য স্বাভাবিক। ধর্মভিত্তিক আন্দোলন কখনই সাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা পায় না, যেটা ছাড়া এই ধরণের আন্দোলনে সাফল্য অসম্ভব। লেখকের কথায়".... বিপ্লবীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক ধরনের হিন্দু জাতীয়তাবাদ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল" (পৃঃ ৪১)। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও হযত তর্কের অবকাশ থেকেই যায়। তবে আমরা এই সিদ্ধান্তেও আসতে পারি না যে, অনুশীলন সমিতি ও সংশ্লিষ্ট বিপ্লবীরা নিছক ধর্মান্ধতার বশে হিন্দু জাতীয়তাবাদকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। কারণ এটি ছিল যুগের হাওয়া। কেশব সেন মারা যাওয়ার পর বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে যে সংকট নেমে আসে তার থেকে ত্রাণ করতে এগিয়ে আসেন রাজনারায়ণ বসু ও নবগোপাল মিত্র। গড়ে তোলেন হিন্দুমেলা (১৮৬৬), উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়বাদকে সুদৃঢ় করা। কিন্তু ১৮৭২ সালে রাজনারায়ণবাবু জাতীয়তাবাদের সঙ্গে হিন্দু ধর্মের প্রচার শুরু করেন, সমর্থন পান বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের। তাঁদের যৌথ লক্ষ্য ছিল মুসলমান জাতীয়বাদী ওয়াহাবী আন্দোলনের যেটি ১৮৩৯ সাল থেকে ভারতবর্ষে দানা বাঁধতে শুরু করে, প্রতিরোধ করা। তাই অনুশীলন সমিতিতে "....কেন মুসলমান ছিল না" (পৃঃ ৪১)।

এই অনুশীলন সমিতি সম্বন্ধে লেখক বলেছেন অনেক কথা। বলেছেন, 'যুগান্তর' দলের ইতিহাস। বারীন ঘোষ, যতীন মুখার্জী প্রমুখ সেরা বিপ্লবীগণ এই দলের সভ্য ছিলেন। লেখকের মত অনুযায়ী যতীন মুখার্জীর আত্মদানের পর 'যুগান্তর' দল ভেঙ্গে যায় এবং বলিষ্ঠ

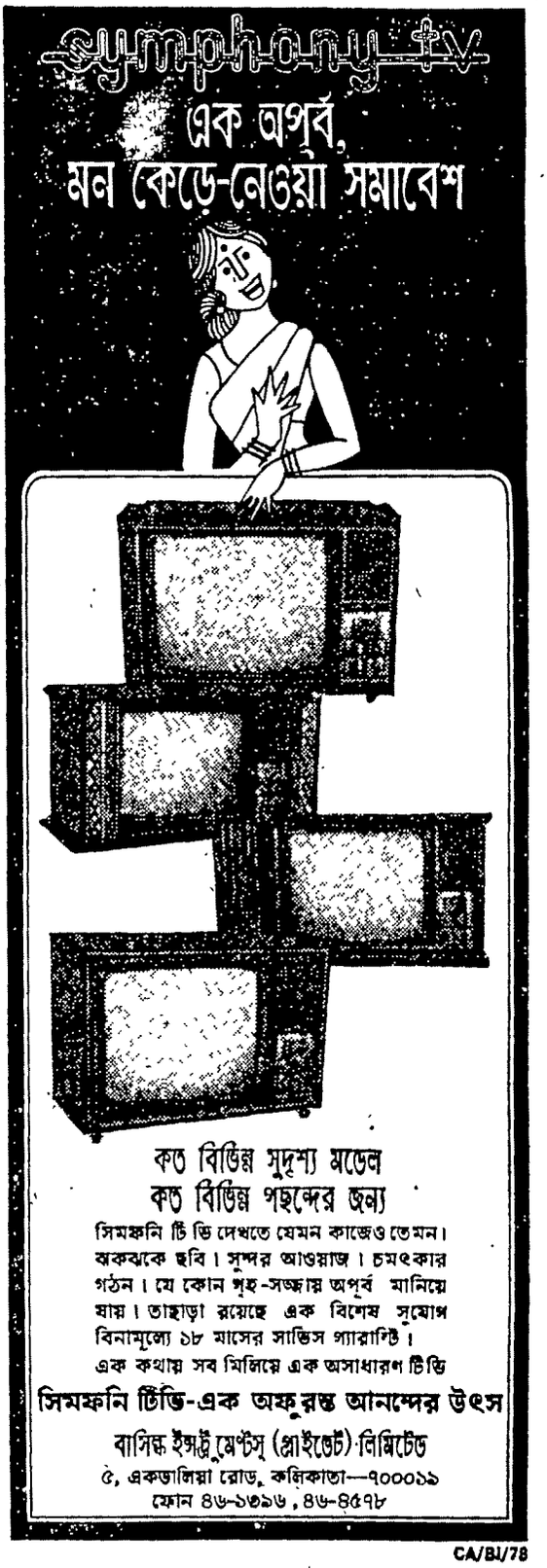

CA/BI/78

'আরণ্যক'-এর অরণ্য খুলে গেল

ব্যারাকপুরের 'আরণ্যক' ভবনে স্বর্গত কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৮৫তম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে বিভূতি স্মারক ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন হয়েছে। দ্বারোদ্ঘাটন করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার ঘোষ। তিনি তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, প্রত্যক্ষ পরিচয় তেমন ঘনিষ্ঠ না হলেও · অক্ষরে অক্ষরে বিভূতিভূষণ তাঁর নিঃশ্বাসের সঙ্গে মিশে আছেন। পথের পাঁচালী যখন ৫০ বছর অতিক্রান্ত তখনও তার বাল্য উত্তীর্ণ হয়নি। প্রথম পড়ার সেই স্মৃতি আলাদা—একেবারে অন্যরকম। তাঁর মতে বিভূতিভূষণই রবীন্দ্রনাথের যোগ্য উত্তরসূরী। রবীন্দ্রনাথ আস্তে আস্তে একদিন রবীন্দ্রনাথে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু বিভূতিভূষণ বাগানের প্রস্ফুটিত ফুল। হঠাৎই তাকে একদিন আবিষ্কার করা গেল। তিনি এসেই সাহিত্যে স্থান দখল করে নিলেন। যেভাবে রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর শেষ হয়েছে যেভাবে বিসর্জনে ইতি টানা হয়েছে সেভাবেই পথের পাঁচালী নির্দেশ দিয়েছে। বলেছে সেই অমোঘসুরে—'তবে চল যাই ...'

শ্রীযুক্ত ঘোষ ছাড়াও প্রবীণ সাহিত্যিক মনোজ বসু, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সুমথনাথ ঘোষ, হিমানীশ গোস্বামী এবং বিভূতিভূষণের সহধর্মিণী রমা বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন স্মৃতিচারণায় অংশ নেন। প্রধান অতিথির ভাষণ প্রসঙ্গে গজেন্দ্রকুমার মিত্র বলেন, টলস্টয়, চেকভ, গ্যেটে এবং ডিকেন্সের মত আজকের এই বিভূতি স্মারক ভবনও সরকারী তত্ত্বাবধানে সুন্দর ও সুরক্ষিত হয়ে থাকা উচিত। যাতে ভবিষ্যতের মানুষ, বিশেষ করে সাহিত্য-পাগল পাঠকদের কাছে এই স্মারক ভবনটি হারিয়ে না যায়। শুধু এখানে নয় এছাড়াও ৪১নং মীর্জাপুরের সেই আবাসটিও সরকারী রক্ষণাবেক্ষণে আসা উচিত। এক সময় এখানেই বিভূতিভূষণ ও দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার থাকতেন। পরে শ্রীসুকুমার মিত্র কাছের মানুষ বিভূতিভূষণ সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য পরিবেশন করেন। সুমথনাথ ঘোষও বিভূতিভূষণের অনেক অন্তরঙ্গ দিক নিয়ে আলোচনা করেন। বলেন, তাঁর জন্মদিন এই চারদেয়ালের ভেতরে প্যান্ডেলের নিচে না হয়ে অবারিত উন্মুক্ত আকাশের নিচে সবুজ ঘাসের উপরে বকুল আর ভাঁট-ফুলের জঙ্গলের ভেতরে হওয়া উচিত ছিল। আসলে বিভূতিভূষণ ছিলেন প্রকৃতই মানুষ। যে অখণ্ড সৌন্দর্য আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে বিভূতিভূষণ তাতে অনায়াসেই অবগাহন করতেন। এই সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়েছিলেন বলেই বিভূতিভূষণ আমাদের সবার লেখক ও সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কথায়, তিনি আমাদের লেখকের লেখক। আমার দুর্ভাগ্য আমি তাকে দেখিনি। কিন্তু যেদিন প্রথম চেতনা আসে, লেখককে বুঝতে শিখি সেদিন থেকেই বিভূতিভূষণের আমি ঘনিষ্ঠ পাঠক। তাঁর লেখায় আছে এগিয়ে চলার নির্দেশ। তিনি আমাদের পিতৃতুল্য। এই পিতৃতুল্য লেখকের জন্মদিবসে আমি তাকে আন্তরিক প্রণাম জানাই।

সভাপতির ভাষণে মনোজ বসুও বিভূতিভূষণের স্মৃতিচারণায় মুখর হয়ে ওঠেন। তাঁর আলোচনার প্রধান সুরই ছিল সরল ও প্রাণস্পর্শী বিভূতিভূষণ—বিভূতিভূষণের সাহিত্য। প্রসঙ্গত তিনি উল্লেখ করেন—আজও বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং বনফুল জীবিত আছেন। বিভূতিভূষণও বেঁচে থাকতে পারতেন। কিন্তু নেই। জীবিত অবস্থায় কোনদিনই তাঁর বয়স বুঝে উঠতে পারিনি। আজ এই ৮৫তম জন্মদিবসে এসে বুঝতে পারছি তিনি নেই অনেকদিন, কিন্তু বেঁচে আছেন তাঁর সাহিত্য ও মানুষ বিভূতিভূষণের মধ্য দিয়ে।

সব মিলিয়ে সেদিনের অনুষ্ঠানটি ছিল সুন্দর ও বিভূতিভূষণের স্মৃতিতে আচ্ছন্ন। প্রবল বর্ষণ সত্ত্বেও শিল্পী সাহিত্যিকরা এসে ঠিক সময়েই পৌঁছেছেন। পৌঁছেছেন তাঁর একনিষ্ঠ ঘনিষ্ঠ পাঠকেরা। সবশেষে সেই স্মারক ভবন আরণ্যকের অরণ্য খুলে দেওয়া হয়। যেখানে ঢুকে মুহূর্তেই অবাক হয়ে দেখেছিলাম, একদিকে বড় বড় বনস্পতির মত সটান মাথা তুলে দাঁড়িয়ে পথের পাঁচালী, অপরাজিত অপুর সংসার, আরণ্যক, ইছামতী, দেবযান ও অনুবর্তন। আর একদিকে নানা ব্যবহার্য জিনিসপত্রের ভেতরেই তাকিয়ে আছেন বিভূতিভূষণ—কৃষ্ণনগরের শিল্পী গণেশ পালের প্যারিস প্লাস্টারে তৈরি সেই ধবধবে শাদা মূর্তিটি।

—শচীন দাশ

কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অভাবে বিচ্ছিন্নভাবে বাঙলা দেশের বিভিন্ন জায়গায় কাজ শুরু করে। যেমন বিক্রমপুরে জীবনলাল চ্যাটার্জীর দল, মৈমনসিংহে সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের দল, ফরিদপুরে পূর্ণ দাসের দল, বরিশালে মনোরঞ্জন গুপ্ত ও অরুণ গুহের দল প্রভৃতি। কিন্তু পরবর্তীকালে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিপ্লবী সংগঠনগুলির রাজনৈতিক কার্যকলাপের বিবরণ বা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তাদের ভূমিকা সম্বন্ধে লেখক কিছু বলেন নি।

তথ্যগতদিক থেকে যোগেশবাবুর বইটি একটি অমূল্য সম্পদ। বইটিতে চমক নেই, বরং ভাবাবেগের আতিশয্যে জায়গায় জায়গায় লেখার গতি ব্যাহত হয়েছে। ক্ষুণ্ণ হয়েছে বইটি পড়ার আরাম। তবুও প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের রাজনৈতিক ও সামাজিক চরিত্রের যে ছবিটুকু পাওয়া যায় বইটি পড়ে পাঠকরা যেটুকু লাভ করতে পারেন।

রমেন্দ্র সরকার

স্বাধীনতার সন্ধানে—যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কিশোর ট্রাস্ট, ৬, মিশন রো, কলিকাতা-৭০০০০১, মূল্য—শোভন সংস্করণ ২৫, সাধারণ সংস্করণ ২০০০ টাকা।

ত্রুটিপূর্ণ সম্পাদনা

প্রথমেই বিস্মিত হতে হয়—টাইটেল পেজে সর্বস্তর সম্পাদকের নামে দেখে। সরকারী খরচায় প্রকাশিত গ্রন্থের সর্বস্তর বেসরকারী একজনের কি করে হয়? তারপর পুরো গ্রন্থটিতে সম্পাদনায় নিদারুণ আগোছালোর ছাপ আমাদের বিস্মিত করে। সম্পাদনা মানে কি একগুচ্ছের লেখা যেকোনভাবে এক করে হাজির করা?—জেলা-শাসক লীনা চক্রবর্তীর ভূমিকাটি মনোজ্ঞ হয়েছে। নির্মলকুমার খাঁয়ের শরৎচন্দ্রের জীবন আলেখ্য তাঁর জীবনও উল্লেখযোগ্য কিংবা কর্মের বর্ণনা, নিখুঁত সন-তারিখের

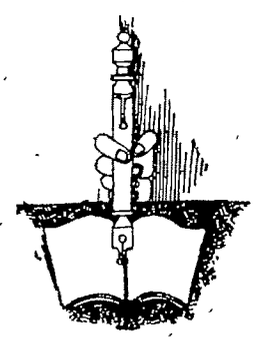

দীর্ঘ ফিরিস্তি গবেষকদের কাজে লাগতে পারে। মূল্যবান এটি। জয়ন্ত মণ্ডলের তোলা কর্মের বর্ণনা, নিখুঁত সন-তারিখের দীর্ঘ আলোকচিত্রগুলি প্রশংসা পাবে। প্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটিও। সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধের নাম দিয়েছেন "ছোটো-লোকের শরৎচন্দ্র" মোদ্দা বিষয়টা—গ্রামের গরীব নিঃসহায় মানুষদের কতটা ভালো-বাসতেন শরৎচন্দ্র তাই। কিন্তু এই ১৯৭৮-এ গ্রামের গরীব নিঃসহায় মানুষদের "ছোট-লোক" এরকম একটা অবৈজ্ঞানিক ও অমানবিক শব্দ ছাড়া চিহ্নিত করতে তিনি পারলেন না। অন্য কোন শব্দ কি তিনি পেলেন না?—আশ্চর্য। কবিতায় উল্লেখ করা যায় নির্মলেন্দু ঘোষাল, প্রদোষ দত্ত, প্রমোদ বসু, নিখিলেশ দাশ, প্রদীপ পাল, অমরনাথ বসু, সিদ্ধার্থ বসুর না। অনেকেরই দু-তিনটে করে লেখা কেন। মূল বিষয়ে—ভালো লেখকের কি এতই অভাব। বিশ্বাস হয় না।

গৌতম ভট্টাচার্য

হাওড়া জেলা ও শরৎচন্দ্র। সম্পাদক—নির্মলকুমার খাঁ। প্রকাশক—হাওড়া জেলা শরৎ জন্মশতবার্ষিকী কমিটি ও হাওড়া জেলার তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ।

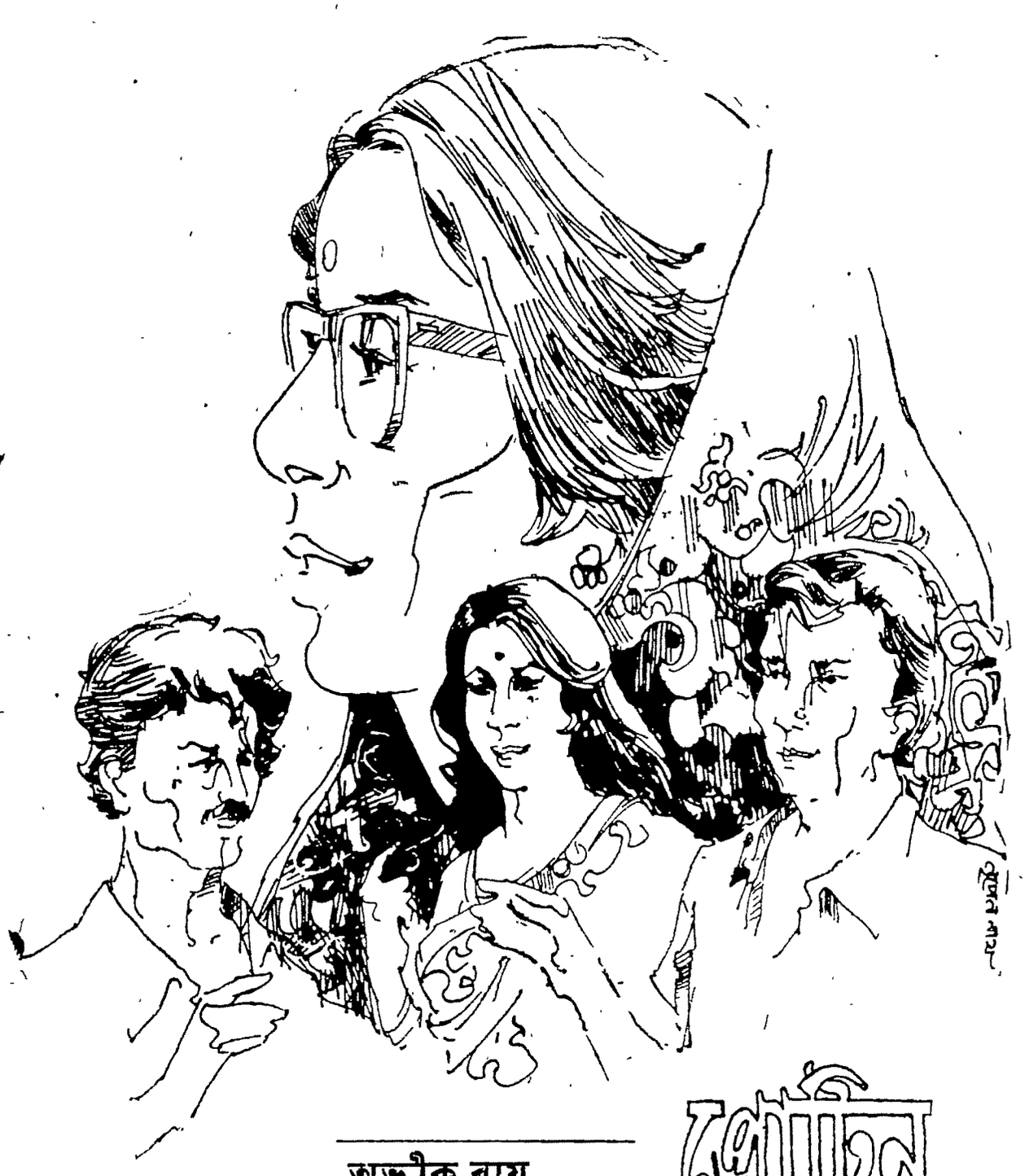

প্রাচীন

অভীক রায়

ভোরের দিকে মেঘলা ছিল। বাজার করে ফিরতে ফিরতে রোদ নেমে এল হড়হড় করে। বর্ষার মতো। সাতটাও বাজে নি—এত রোদ। গায়ে জ্বালা ধরে যায়। উঠোনে ঢুকেই ত্রিশূল দেখল, দরজার সামনে ফালু দাঁড়িয়ে আছে। ফালু আর তার বৌ। ভেতরে ঢোকে নি। দরজা ধরে পূরবী দাঁড়িয়ে। ত্রিশূলকে দেখেই ফালু বলে উঠল, 'ওই তো মেজদা এসে গেছে।'

ত্রিশূল প্রথমে শুকনো হাসল। তারপর ফিসফিস বলল, 'বাইরে কেন? ভেতরে আয়।' হাতের কেরোসিনের জারটা দেখিয়ে ফালু বলল, 'তেল আনলে বুঝি? কত করে নিল?'

—পঁয়তাল্লিশ। পূরবীর দিকে তাকাল ত্রিশূল, 'মাস্থ আর আনলাম না। ডিম এনেছি। ডিম খাও। কিরে ফালু, দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বোস্ বোস্।'

কোথায় বসবে? যদি বিছানায় বসে? ভাবতেই খারাপ লাগল পূরবীর। ত্রিশূলের দিকে তাকাল। ত্রিশূল হেসে বলল, 'জমাদার আসে নি? আজ তো রোববার।'

ফালু ততক্ষণে চোখ প্রায় কপালে তুলেছে, 'পঁয়তাল্লিশ? তুমি পঁয়তাল্লিশ করে তেল আনলে মেজদা? আমাকে বললে না কেন? কন্ট্রোল রেটে এনে দিতাম।

—কন্ট্রোল রেট কত?

—সাতাশ। একটাকা সাতাশ। কতগুলো পয়সা বেঁচে যেত। ক' লিটার আনলে?

—আমার তো পাঁচ লিটারের জার্গ।

চট করে হিসেব করে নিল ত্রিশূল। লিটারে আঠারো পয়সা বেশী মানে পাঁচ লিটারে নব্বই পয়সা বেশী। একজোড়া ডিম বেশী। এর সঙ্গে পঞ্চাশ পয়সা যোগ করলেই একশো গ্রাম মাংস। পূরবীর অ্যানিমিয়া ধরা পড়েছে—মাংসে বেশী প্রোটিন। পরশুদিন ডাক্তার বলছিল, 'প্রোটিন দেবেন। বুঝলেন প্রোটিন দেবেন।'

—প্রোটিন মানে? ফ্যাসফেসে গলায় ত্রিশূল জিগ্যেস করেছিল। বুকটা শিরশির করেছিল তার।

—প্রোটিন ইজ্ প্রোটিন। এই আপনার মাছ মাংস ডিম এইসব।

কি সুন্দর ফোল ফোল শব্দ। মাছ মাংস ডিম। পূরবীর যখন বয়স আরো কম ছিল, তাজা তাকতে টসটস করত সারা শরীর, যখন সামান্য মজাতেই পূরবী হেসে অস্থির হতো যেন গাছ ঝাড়লেই ফুল, ঝরঝর করে ফুল—সেই সময়কার মতো। তখন পূরবীই ছিল এইসব শব্দ। মাছ মাংস ডিম, ভাল ভাল ফল, দুধ—ত্রিশূলের মুখখানা শুকনো দেখে গলা ভাসিয়ে জিগ্যেস করেছিল ডাক্তার, 'মাছটাছ খান তো? মাছের যা দাম আজকাল।' সঙ্গে সঙ্গে সিগারেট ধরাতে হয়েছিল ত্রিশূলকে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ মাছ খাই। দাম তো সব জিনিসেরই। মাছ আর কি দোষ করল? বলেই স্মার্টনেসের ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছিল। বাপের বয়সী ডাক্তারকে সিগারেট অফার করে। ল্লাস্ট অ্যানিমিক পূরবী বড় বড় সাদা চোখে তাকিয়েছিল বরের দিকে। না; শাঁখ বাজে নি, উলু ফোটে নি। তবু বর ইজ্ বর। যেমন প্রেটিন ইজ্ প্রোটিন।

ফেরার সময় রিক্সায় ফিসফিস করেছিল পূরবী, 'তোমার প্রেসারটাও দেখালে হতো। মাথা তো তোমারো ঘোরে'

—তোমার বেশী ঘোরে। ত্রিশূল হেসেছিল, 'শুনলে তো কাল থেকে রেগুলার মাছ, মাংস, ডিম।'

—বয়ে গেছে আমার। ঠোঁট বেঁকিয়ে পূরবী বলেছিল, 'ওরকম রাজসিক খেতে রুচে গেছে আমার। মাছ আর চলবে না তাহলে।'

ফালু এখনো বসে নি। তার বৌ বিছানার এক কোণে বসে পড়েছে। ফালুর বাবা কাকাদের তিন জেনারেশন ধরে ত্রিশূলদের বাড়ীর চাকর ছিল। ফালুও কাজ করেছে। পিওর চাকরের কাজ। চড়-চাপড়ও খেয়েছে বিস্তর। ত্রিশূলদের ছোটবেলায় চাকরবাকরকে মারধোরের রেওয়াজ ছিল। ফালু তাই মার খেয়েছে। পাও চেটেছে। সেটাও রেওয়াজ ছিল। তারপরে তো, অনেকদিন ধরে ফালু বড় হলো। ফালুর বাবা মরে গেল। ফালু বিয়ে করল। বাড়ীর কাজ ছেড়ে কাঠের কাজ শিখল। এখন তার বাচ্চারা স্কুলে পড়ে। বৌ চশমা পরে।

বাজারের থলি থেকে জিনিসগুলো বার করে রাখছে ত্রিশূল। দুটো বেগুন, তিনটে পটল, একটুকরো আদা। টুকরিতে সাজিয়ে রাখার সময় ত্রিশূল হাসল। কৈফিয়তের সুরে বলল, 'দুজনের রান্না। এই যথেষ্ট। কি বলিস?' ফালুও হাসল।

ফালুর বৌ হাসল না। বলল, 'বৌদি—কি গাঁড়ো মশলায় রান্না করেন? পেটের পক্ষে কিন্তু ভাল না।' পূরবী উত্তর দিল না। থলি থেকে ত্রিশূল এবার আম বার করবে। একটাই আম। ভাগ করে খাওয়ার কথা। কিন্তু ফালুর বৌ কাকের চোখে তাকিয়ে আছে এদিকে। যে কারণে থলিতে হাত দিয়েই ত্রিশূল চমকে উঠল, 'একি! আরেকটা আম কোথায় গেল? দেখেছ কি কাণ্ড! কেমন সব বদমাইশ। একজোড়া কিনলাম। একটা মেরে দিল।' পূরবীও অবাক হয়েছে, 'একটা মেরে দিল মানে? আম কি তুমি নিজের হাতে নাও নি?'

—আরে দূর! আমের দর করেই আমি কাঞ্চনের সঙ্গে কথা বলছিলাম। সেই ফাঁকে লোকটা আম ঢুকিয়ে ফেলেছে, আমিও আর খেয়াল করি নি। ঠিকই দিয়েছে ভেবে দাম মিটিয়ে চলে এসেছি। এখন কি করি!'

চেহারার মতো ফালুর বৌ কথাতেও টবটবে, 'না না মেজদা আপনি যান। গিয়ে বলুন। না বললে ওদের, শিক্ষা হবে না। এ কি ব্যাপার! যা খুশী তাই করবে?'

ফালু বলল, 'কোন লোকটা বল তো? বাজারের গেটে যে মুসলমানটা—সে? আমি যাব?'

কি হবে গিয়ে? ত্রিশূল বুক খুলে হাসল, আমাকে ঠকিয়ে কি ও বড়লোক হবে? একটু আধটু না ঠকলে চলবে কেন? কি বল? দরাজ চোখে সে স্ত্রীর দিকে তাকাল।

পূরবী বোকা না, জিনিসটা বুঝে নিয়ে ততক্ষণে হেসে ফেলেছে, 'বাদ দাও। ওরকম কত লোক ঠকাবে। ও বেলা তো আম আসবেই, তখন দেখা যাবে।'

না জিগ্যেস করে পারল না ফালুর বৌ, 'মেজদা কি দুবেলা আম আনেন?'

ত্রিশূল কিছু বলার আগেই ফালু বলল, 'মেজদা দাদুন আম ভালবাসে। আমে মেজদার না নেই।'

—আমাদের বুদ্ধু যেমন। যত খুশী আম দিন, না করবে না। সোনামুখ করে খেয়ে নেবে। দেশের বাড়ীতে খুব আম খেয়েছে। এখন আমের যা দাম। একজোড়া আম কত নিল?

—দেড় টাকা। ফালু চা খাবি তো? নে নে জিলিপি খা। জিলিপি এনেছি। দাঁড়িয়ে আছিস কেন? বোস্ না!

দেয়ালে ঠেশ দিয়ে মেঝেতে বসল ফালু। ত্রিশূল তৃপ্ত হলো। এই তো বেশ সুন্দর সিন্। কি সুন্দর ফালুকে চাকর চাকর লাগছে। কিন্তু এখন কি আমি ওকে বলতে পারব, এই ফালু ঘরটা ঝাঁট দিয়ে দে তো? পারব কি? —এ্যাবসার্ড। তার চাইতে এই ভাল। বেশ চাকর স্টাইলে সামনে বসে আছে। মন্দ কি?

কিন্তু ওর বৌ বিছানায়। কোণা ঘেঁষে বসে। গাটা ঘিনঘিন করে উঠল ত্রিশূলের। ছোটবেলায় দেখেছে, দুপুর-বেলা বসার ঘরে চৌকিতে শুয়ে ফালু ঘুমোচ্ছে। তার পরে তিন চারদিন ওই চৌকিতে বসতে পারে নি সে। গা ঘিনঘিন করে উঠেছে। অথচ ওই একই চৌকিতে বাড়ীর কুকুরটা একেকদিন ঘুমোত, গান্ধা বেড়ালটা ঘুমোত—তখন শুধু 'এ্যাই ওঠ্ ওঠ্' বলে দুচারবার ঝেড়ে দেওয়া। কিছু মনে হতো না। কিন্তু ওই যে ফালুকে একদিন দেখল ঘুমোতে, তারপর থেকে চৌকিটার ওপরেই কেমন ঘেন্ন ধরে গেছিল তার। খুড়তুতো ভাই মৃদুল, পাটনা থাকত, একবার বেড়াতে এসে বলেছিল, 'দেখবি চাকরদের গায়ে একটা বিশ্রী গন্ধ হয়। কি খায় শালারা কে জানে।'

—কি আবার খাবে। আমরা যা খাই, তা-ই খায়।

মৃদুল নাক সিঁটকে বলেছিল, 'তাহলে ওদের বাথরুমে এত গন্ধ কেন? কি বিশ্রী গন্ধ। ভাবলেই বমি এসে যায়।'

তা ঠিক। বিছনের গলিতে চাকরদের বাথরুম। রাস্তায় খেলতে খেলতে গলিতে বল পড়ে গেলো, নেবার জন্য ঢুকেছে সে। তখনই মৃদুলের কথাটা ফিল্ করেছে। সত্যি কি বিশ্রী গন্ধ। ধারেকাছে যাওয়া যায় না।

বাড়ীতে সে ঘুমোতো বইএর ঘরে। ফালু শুতো নীচে। ছারপোকা মার্কা বিছানা পেতে। তেলচিটে বালিশ মাথায় সেট্ করে ফালু ঘুমোত। একেকদিন রাতে ঘুম ভেঙ্গে যেত। দেখত, বাইরে না গিয়ে ভিতরের বাথরুমেই যাচ্ছে ফালু। হয়তো ভাবত, সব্বাই ঘুমোচ্ছে। কিন্তু ত্রিশূল যে ঘাপটি মেরে জেগে আছে, সে কি করে জানবে? সে-ই ফালু এখন সামনে বসে আছে। তার বৌ বসে আছে বিছানায়। বিব্রত হলেও পূরবী কিছু বুঝতে দেয় নি। মন দিয়ে চা বানাচ্ছে রান্নাঘরে। ত্রিশূল জিগ্যেস করল, 'ও বাড়ীর সব কেমন আছে রে? গেছিলি?'

—কাল গেছিলাম। সকালবেলা। দেখি বাবু বাজারে। মা ঘুমোচ্ছে। ছোট-বাবু চা খাচ্ছে। আমাকে বলল, বোস্ চা খা।

—বড়দা ছিল না?

—ঘুমাচ্ছিল। সলিল তো বাইরে গেছে।

—তুই কতক্ষণ ছিলি?

—অনেকক্ষণ। বাড়ী তো ফাঁকা। খা খা করে।

—কেউ কিছু বলল?

—নাঃ। ফালু চুপ করে রইল একটু। তারপর বলল, 'তুমি যাও নি আর। না?'

বুকটা মুচড়ে উঠল, 'কি হবে গিয়ে? বল্!'

ফালুর বৌ বলল, 'খুব কষ্ট হচ্ছে আপনাদের। কোনোদিন তো এভাবে থাকেন নি।

এই বাড়ীটা কেন? জলটল দিচ্ছে?

—দিচ্ছে। তবে বড্ড সাপ এদিকে। দুদিন সাপ বেরিয়েছে। বোস্ একটু।

চট করে রান্নাঘরে এল ত্রিশূল। পূরবী চা ঢালছে। দুটো কাপ। দুটো গ্লাস।

—ফালুদের কিসে দিই বলতো? গ্লাসে দেব?

—গ্লাসে দেবে কি? ওই গ্লাসে আমরা জল খাই না? আমাদের বাড়ীতে চাকরদের আলাদা গ্লাস ছিল।

—আলাদা গ্লাস এখানে কোথায় পাব? তাহলে কাপে দিতে হয়।

—ওই কাপ? তোমার শখ করে কেনা কাপ। ওতে তুমি ওদের চা খেতে দেবে? বলছ কি?

—আমি আর কি বলব? ফিসফিস অবস্থাতেই রাগ করল পূরবী, 'তুমি তো একলাই বলে যাচ্ছো। গ্লাসেই দেব। গরম জলে সাবান দিয়ে ধুলেই হবে।

—গরম জলে সাবান দিয়ে ধুলেই চিমসে গন্ধ যাবে?

কিসের চিমসে গন্ধ?

ত্রিশূল ফিসফিস করেই বলল, 'বর্ন সার্ভেন্ট তো। তাই গায়ে একরকমের গন্ধ হয়।'

—আর তুমি কি? বর্ন-বাবু?

ত্রিশূল মুখ কালো করে উঠে গেল।

চা নিয়ে পূরবী ঢুকল। ফালু ব্যস্ত হয়ে বলল, 'বৌদি আমাকে ডাকলেন না কেন? আমিই নিয়ে আসতাম।'

তাতে কি হয়েছে? আমি এনেছি তো! হাসিমুখে পূরবী ফালুর বৌকে চা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'জিলিপি খেয়েছ? নাও চা খাও। দ্যাখো তো চিনি হয়েছে কিনা।'

—বৌদি আপনি চা খাবেন না?

—নিশ্চয়ই খাব। চায়ের পেয়ালা নিয়ে ফালুর বৌয়ের সামনেই বসল পূরবী। বিছানার ধার ঘেঁষে।

ত্রিশূল হেসে বলল, 'ধারে বসলে কেন? এদিকে এসো।' —হাতের চাপড় দিয়ে সে বিছানার মাঝখানটা দেখাল।

ফালুর বৌ বিছানার ধারে বসেছে সুতরাং ওই পোর্শনটা এখন ওদের। আমি পূরবীকে নিয়ে প্রপার বিছানায় বসব।

পূরবী বলল, 'বসব কি? এখনই তো রান্না চড়াব। তুমি স্নানে যাবে না।'

ফালুর বৌ চা শেষ করল। কি তাড়াতাড়ি খায় রে বাবা। পূরবীর মনে হলো। পেয়ালা রেখে ফালুর বৌ বলল, 'মেজদা বলছিলেন এ বাড়ীতে নাকি সাপ বেরোয়।'

—দুদিন বেরিয়েছে। বাচ্চা বাচ্চা। এইটুকু। আঙুল টান করে পূরবী সাইজ দেখাল। বলল, 'তোমাদের বাড়ীতে নেই?'

—নেই আবার! গাদা গাদা সাপ। পশরদিন তো একটা গোখরো বেরিয়েছিলো।

—গোখরো! পূরবী ত্রিশূল যুগপৎ স্তব্ধ হয়ে রইল।

—চার পাঁচদিন আগে দেখি একটা চন্দবোড়া। রান্নাঘরের দরজায় পেঁচিয়ে রয়েছে। শেষে পাড়ার ছেলেরা এসে মারল। এদিকটা প্রায় গ্রাম তো। ওই যে দেখছেন ধানক্ষেত। তার পাশে পুকুর মতো। পুকুরটার গায়েই আমাদের বাড়ী।

—কত ভাড়া দাও?

দেখতে তেমন সুন্দরী না হলেও ফালুর বৌয়ের শরীরটি সুন্দর। সুন্দর শরীরে অল্প ঢেউ তুলে সে গর্বিতভাবে হাসল, 'পারষট্টি। তিনটে ঘর, সামনে বারান্দা। রান্নাঘর অবশ্য নেই। তবে কি জানেন, দক্ষিণটাই না একদম খোলা। আমরা তো ওইজন্যেই ফ্যান নিই নি। রাতের দিকে কি বাতাস। হু হু করে বাতাস। এত আরাম লাগে।' চশমা নামিয়ে চোখ মুছল ফালুর বৌ। আরামের কথা বলতে বলতে চোখ জ্বালা করে উঠেছে। ত্রিশূল সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'সাউথ তো আমারো খোলা।' 'সাউথ' শব্দটার আলাদা চার্ম। ফিলটার সিগারেট ধরিয়ে 'সাউথ' উচ্চারণ করলে জিভের জড়তা কাটে। ঠোঁটের একদিকে সিগারেট চেপে সে বলল, 'আমারো ফ্যান বিশেষ দরকার হয় না। তাও নিয়েছি। শোবার ঘরে একটা ফ্যান থাকা ভাল। ভাবছি পাশের ঘরেও ফ্যান লাগাব। লোকজন বসতে পারবে।' ফালু সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'ফ্যান ছাড়া তোমরা থাকবে কি করে? আমি তো জানি, ছোটবেলা থেকে কত আরামে মানুষ হয়েছ।' —এই সিচুয়েশনে কোনো মন্তব্য চলবে না। ত্রিশূল হাসিমুখে চুপ করে থাকল। ফালুর বৌ একটু গোমড়া হয়ে পড়েছে। পূরবী বলল, 'ও তো যাদবপুরে বাড়ী দেখছে। যাদবপুরে পেলেই আমাদের পক্ষে ভাল।'

—হ্যাঁ, ওদিকটায় আমার জানাশোনা প্রফেসররা সব থাকেন। আমার কাজের সুবিধা হবে। ত্রিশূল ফিলাপ করল। ফালুর বৌকে একটু বুঝিয়ে দেওয়া ভাল —আমরা অন্য ক্যাটগরি শিক্ষিতদের সঙ্গে ডিরেক্ট লিংক আছে। এই ধাপধাড়া সাপ মার্কা গ্রামে আছি বলে ভেবো না, তোমরা আমরা সমান সমান। সিগারেট নিবিয়ে সে বলল, 'সাপের বাজে থাক সম্ভব না। মাসে মাসে দুশো টাকা ফ্ল্যাট ভাড় গুণব। আবার সাপের কামড়ও খাব? নো। নেবানো সিগারেটের টুকরো কুড়ো আঙুলের টোকায় বাইরে ফেলে দিল সে। ফ্ল্যাটে থাকে এবং তার ভাড়া দুশো টাকা —এই খবর ফালুর বৌকে জানিয়ে দেওয়া গেল। কিন্তু নিজস্ব বাথরুম চাই বলেই যে তাকে বাধ্য হয়ে দুশো টাকার ফ্ল্যাট নিতে হয়েছে,—এই খবরটা আর জানানো গেল না। হাসিমুখে ফালু একটা অপ্রাসঙ্গিক জোক্ করল, 'তোমার বাবাও তো কানপুরে ফ্ল্যাট নিয়ে থাকতেন।'

—দূর বোকা। সে তো গর্মেন্ট ফ্ল্যাট। এর চাইতে অনেক ভাল। সেখানে কি সাপ ছিল নাকি?

পূরবী সরলভাবে বলল, 'বিহারে আমার বাবাও অফিসের ফ্ল্যাটে থাকেন। বইয়ামে। তবে ওখানেও সাপ আছে। প্রচুর সাপ।'

ত্রিশূল চোখ টিপল। অর্থাৎ নো সাপের রেফারেন্স। যেহেতু সাপই এখানে কমন পয়েন্ট। দুটো ফ্যামিলিকে কাছাকাছি এনে ফেলেছে। বইয়ামে সাপ শুনে ফালুর বৌ চোখ প্রায় গোল করে ফেলেছিল, 'সত্যি।' —ত্রিশূল চট করে স্টেপ নিল, 'ওই আর কি! তেমন কিছু না। খুবই ডেভেলপড্ জায়গা।' দিন দিন উন্নতি করছে। তাছাড়া আলো বাতাসও দুর্দান্ত।'

ফালুর বৌ এবার বেল্টের নীচে মারল, 'বৌদি কি রাঁধেন নি? রেগুলার শরীরে এত কাজ করেন কি করে? আমি তো বাবা কিছু না রেখে পারি নি। বোজ সত্তর পয়সা। তিনটে ঘর ঝাড়পোছ করে দেবে বাসন মেজে দেবে জল তুলে দেবে রান্নার কাজে সাহায্য করবে। আর টুকিটাকি কয়েকটা কাজ করে দেবে।' —ফালুকে দেখিয়ে সে বলল, 'ও তো দিনরাত আমাকে খালি বিশ্রাম নিতে বলবে। কোনো কাজ করতে দেবে না। একদম কাজ না করলে ভাল লাগে? বলুন?'

কথাটা শুনে, চট করে উঠে স্নানে চলে গেল ত্রিশূল। পূরবী গেল রান্না বসাতে। বিছানা থেকে খবরের কাগজটা টেনে ফালু বানান করে পড়তে লাগল।

ফালুরা চলে যেতে ত্রিশূল বাথরুম থেকে বেরোল। পূরবী তখন উবু হয়ে বসে ভাতের মাড় গালছে। রান্নাঘরের নালি খোলা। কুচো একটা ব্যাঙ লাফাতে লাফাতে ঘরে ঢুকল। ত্রিশূল তালি দিতেই বেরিয়ে গেল। বিরক্ত হয়ে পূরবী বলল, 'এই এক যন্ত্রণা হয়েছে এ বাড়ীতে। চব্বিশঘণ্টা পোকামাকড় আর ব্যাঙ। তোমার স্নান করতে এতক্ষণ লাগল। অদ্ভুত!'

উত্তর না করে ত্রিশূল ভেতরে চলে গেল। দেয়ালের হুকে লাগানো কাচ আয়নায় চুল আঁচড়াল। বিছানার যেখানটায় ফালুর বৌ বসেছিল—তোষকটা ডুবে রয়েছে।

কতক্ষণ বসেছিল ফালুর বৌ? মনে মনে হিসাব করল সে। ঠিক ততটুকু সময় যদি পূরবী ওখানে বসে—তোষক ঠিক এতখানি ডুবে যাবে কি? তার মনে হলো। ফালুর বৌ না, প্রোটিন—বিয়ন্ট একদলা প্রোটিন রেখেছিল যেন কেউ তোষকে। কি খাওয়ায় ফালু বৌকে? প্রোটিন! শুধু প্রোটিন?

অন্যমনস্কভাবে সে জায়গাটা ঝেড়ে দিল।

গরিলার মুখোমুখি

নূতনলাল ব্রহ্মচারী

'হাতি আর গণ্ডারের চামড়া শক্ত, কিন্তু ভেতরটা নরম। তাদের মেরে ফ্যালে মানুষ, তার চামড়া নরম, কিন্তু ভেতরটা কঠিন।' —আফ্রিকান প্রবাদ

শিকারী ও চোরাশিকারীর উৎপাত এবং সভ্য মানুষের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা বন ও বন্যপ্রাণীকে দ্রুত বিলুপ্তির পথে নিয়ে যাচ্ছে। একদা অন্ধকার মহাদেশ আফ্রিকাও এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু ভারতের তুলনায় জনসংখ্যার স্বল্পতার জন্য আফ্রিকার কতগুলি ক্ষিপ্রাট অভয়-অরণ্য গড়ে উঠেছে, যেমন বিশ্ববিখ্যাত সেরেনগেটি (পাঁচ হাজার বর্গমাইল) যেখানে দু হাজার সিংহ আছে। পার্শ্ববর্তী অঞ্চল মারা ইত্যাদি নিয়ে পনের হাজার বর্গ-মাইলব্যাপী সেরেনগেটি একোসিস্টেম। ১৯৭৭ এর সুমারীতে দেখা যায় এখানে তের লক্ষ নু, দু লক্ষ জেব্রা, চুয়াত্তর হাজারের ওপরে বুনো মোষ এবং সতের হাজার জিরাফ রয়েছে।

এসব বনভূমির কতক অংশ ধনকান, প্রধানত শ্বেতাঙ্গ ট্যুরিস্টদের বিচরণক্ষেত্র। অল্পসংখ্যক শ্বেতকায় বিজ্ঞানী ট্যুরিস্টের ভীড় থেকে দূরে আদিম অরণ্যের রূপ পর্যবেক্ষণ ও উপভোগ করছেন। এ ধরনের জীবনের প্রতি একটা প্রচণ্ড আকর্ষণ বোধ করেছি কিন্তু ভারতীয় কোন প্রকৃতি-প্রেমিকের পক্ষে সে ব্যয়ভার বহন করা অসম্ভব। সাধারণত পূর্ব আফ্রিকার সব রাষ্ট্র সরকার ধরেই নিয়েছেন যে বিদেশী বিজ্ঞানীরা নিজ ব্যয়ে সেখানে কাজ করবেন, তাঁদের কোন অনুদান দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সৌভাগ্যক্রমে উগাণ্ডার বন দপ্তর, মাকেরের বিশ্ববিদ্যালয় এবং উগাণ্ডার কর্মরত দু-চারটি বাঙালী পরিবারের নানারকম সহযোগিতার ফলে ছত্রিশবার উগাণ্ডা যেতে পেরেছিলাম।

১৯৭৫ এবং ১৯৭৮ সালে আন্তর্জাতিক পরিবাহন্ট দপ্তরের মাধ্যমে জাইর (প্রাক্তন বেলজিয়ান কঙ্গো) রাজ্যের প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করে সেখান থেকে তাদের নিমন্ত্রণ পাওয়া গেল। নিজের খরচ এখানে খুবই 'সামান্য'—শুধু সাধারণ খাওয়া খরচ। কিন্তু জাইরের 'সামান্য ব্যয়' আমাদের পক্ষে খুবই অসামান্য। এ বছর সেই দাঁড়ালো এইরকম—একবেলা ভাত কিন্তু অন্যবেলা চাপাটি (রুটি) এবং মাংস খেয়ে এবং অন্য বেলা ডিম। এবং কনডেন্সড্ মিল্ক অল্প অল্প খেয়ে, মাসে প্রায় হাজার টাকার [illegible]

মধ্যেই কঠকরলা এবং কেরোসিনের দাম ধরা হয়েছে। ভারত থেকে ৫০০ ডলার অর্থাৎ সাড়ে চার হাজারের মত টাকা নিয়ে যাওয়া যায় তাই বন বিভাগের সহায়তা পেলে ২।৩ মাস মধ্য আফ্রিকার জঙ্গলে থাকা যায়। কিন্তু সমস্যাটা অন্যখানে। জাইরের রাজধানী কিনশাসাতে নেমে এয়ার-পোর্ট থেকে শহরের উপকণ্ঠে (১০।১২ মাইল) যেতে ট্যাকসীর ভাড়া চাইলো এক হাজার টাকার মত। এ ধরনের নানা কারণে মধ্য আফ্রিকায় আমার দিনগুলি ছিল চরম দুশ্চিন্তার এক দুঃস্বপ্ন।

কিন্তু সান্ধ্য-গগনে রঙমশাল জ্বালানো আগ্নেয়গিরি নীরাগংগো (অধুনা নির্বাপিত), তিরিশ হাজার হিপোপটেমাস অধ্যুষিত রুইন্দি নদী, গোরিলার হুংকার নিনাদিত কাহুজীর গহন অরণ্য,—এসবের হাতছানি কি উপেক্ষা করা যায়? সব বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যেতে হয় তাদের ডাকে।

১৯৭৫ সাল। বেলজিয়ামের ব্রুসেল্‌স্ শহরের উপকণ্ঠে বিখ্যাত কোষ-বিজ্ঞানী ব্যক্তির ল্যাবরেটরীতে আছি। টেলিফোনে কথা বললাম ব্রুসেল্‌সের মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্টরির বিজ্ঞানী ভরস্কুরেনের সঙ্গে। বহু বৎসর কঙ্গোতে কাটিয়েছিলেন তিনি। বাদুড় নিয়ে তাঁর গবেষণার আরম্ভ,—তারপর বন্যপ্রাণী নিয়ে শেষ। কঙ্গোর রাজনৈতিক আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটার সময় চরম বিপদের ঝুঁকি নিয়েও তিনি সেখানে মাটি কামড়ে রয়ে গেলেন। সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন।

'গরিলা দেখা সম্ভব হবে কি? এখন গরিলার অবস্থাই বা কি রকম?'

হ্যাঁ, গোরিলা সহজেই দেখতে পাবে যদি কাহুজী যেতে পার,—জবাব দিলেন তিনি। যথাসম্ভব তথ্য পরিবেশন করলেন টেলিফোন মারফত।

জাইরের রাজধানী কিনশাসা এসে ভারতীয় দূতাবাসের কর্মচারীদের কাছে পেলাম অসাধারণ সহায়তা। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ, সেই সাহায্য না পেলে ঐ ব্যয়বহুল শহরে কয়েকদিন থাকাও আমার পক্ষে অসম্ভব হত। তাঁদের মাধ্যমে জাইর প্রকৃতি-সংরক্ষণ বিভাগের ডাইরেকটরের সঙ্গে দেখা করলাম। আমায়িক ও প্রকৃতি সংরক্ষণে প্রকৃত আগ্রহী এই ভদ্রলোকের কাছে অনেক সাহায্যই পাওয়া গেল। শুধু আর একজন মহৎ আফ্রিকান ভদ্রলোককে পেয়েছিলাম ঠিক এইরকম—উগাণ্ডার তৎকালীন মার্চিসন

ফরেস্ট, ন্যাশন্যাল পার্কের ডাইরেক্টর। একটি পথ-দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়।

> শ্রী আর এল ব্রহ্মচারী ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৮ সালের মধ্যে আটবার আফ্রিকা গিয়েছেন। উগান্ডার মার্চিসন ফলস (অধুনা কাবালেগা), নাইবাশওয়া, টানজানিয়ার এমকোমাজি, জাইরের ভিরুংগা, কাহুজী-বীগা ইত্যাদি অঞ্চলে তিনি জিরাফ, হাতি ও গরিলা পর্যবেক্ষণ করেছেন।

জাইর প্রকৃতি সংরক্ষণ সংস্থার ডাইরেক্টরের সঙ্গে কথা বলে একটা কাজের প্রোগ্রাম তৈরি করলাম। পার্ক ন্যাসিয়নাল দ ভিরুংগায় বুনো হাতির খাদ্য নিয়ে একটু গবেষণা করা যাবে। হাতির খাদ্যে কতটা ঘাস এবং কতটা দ্বিবীজপত্র উদ্ভিদ—এটা জানা খুবই দরকার। কারণ পূর্ব আফ্রিকায় বহু বনভূমি ধ্বংস করে ফেলেছে হাতি। অল্প জমগায় বেশী হাতির বাস, কারণ সংরক্ষিত অরণ্যের বাইরে তাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ক্রমাগতই কমে আসছে। এর ফলে হাতি গাছ নষ্ট করে ফেলছে, তার বাকল তুলে ন, ঠেলে ফেলে দিয়ে। বাকল তোলা গাছগুলি দাবানলে মরে যায়। তারপর বৃক্ষবিরল বনভূমি একেবারেই তৃণভূমিতে পরিণত হয়। তখন হাতির পক্ষে প্রয়োজনীয় ছায়াবীথি এবং খাদ্যের অভাব হতে পারে। পূর্ব আফ্রিকায় এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা হয়েছে। কেনিয়া এবং টানজানিয়াতে কেউ কেউ হাতির গোবর অর্থাৎ বিষ্ঠা থেকে হজম না-হওয়া কাঠগুলির 'সেকসন' কেটে মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে সেগুলি পরীক্ষা করে দেখেছেন। এভাবে বোঝা যায় ওগুলি ঘাস না দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ। উগান্ডায় আমি নিজেও এ ধরনের কাজ একটু করেছিলাম। দেখা যাক, মধ্য আফ্রিকায় আমার সীমিত সময় ও সাধ্যের মধ্যে এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করা যায় কিনা। তারপর জাইর থেকে ফেব্রুয়ারি সময় পাওয়া পড়বে বুকাভু শহর। সেখান থেকে অল্প দূরেই গরিলার অভয় আরণ্য—কাহুজী। সেখানে একবার ঢুঁ মারতেই হবে। ১৯৭৮ সালেও এই প্রোগ্রামই বজায় রইল।

ভিরুংগা আর কাহুজী—বনা আফ্রিকার দুই রূপ। প্রথমটি দেখা যায় বর্ণ ফ্রী ইত্যাদি সিনেমায়। পরেরটা সাধারণত সিনেমায় দেখা যায় না, কারণ বর্ণ ফ্রী, কিং এলিফ্যান্ট, হাটারি, ইত্যাদি প্রায় সবই পূর্ব আফ্রিকায় তোলা হয়েছে।

প্রথম অংশে আমার দিনগুলি ছিল এ ধরনের :

ভিরুংগা থেকে

বুইন্দি, ১৭-৩-৭৮

আজ সকালবেলা ঘর থেকে বেরিয়েই দেখলাম উঁই ঢিবির ওপর শকুন এবং ম্যারাবু হাড়গিলা জাতীয় পাখি। কাল দুটি সিংহ একটা বুনো মোষ মেরেছিল। দিনের আলো ফুটতেই শকুনগুলি আবার এসে জুটেছে। একটা উঁই ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে দেখলাম—বিরাট হলুদ-সবুজ ঘাসের গালিচা বিছানো সভা, পিছনে বনরাজিনীলা মিতুম্ব, পাহাড়..... ঐ চলেছে ৭টি হাতি, ৩টি বাচ্চা, বহুদূরে বিরাট হাতির দল। অনেকটা দূরে শকুনগুলি আর একটি কেশরী সিংহ বসে আছে। তারপর সে উঠে দাঁড়ালো। আর একটা সিংহ, তার কেশর খুবই কম, কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে লেজ তুলে ধরলো। মাথায় কদম-ঝুঁটি ব্লেন্টেড ক্রেন একজোড়া এসে নামলো। কি সুন্দর! লাল-সোনালী রঙ (একরকম এ্যান্টিলোপ) এদিক ওদিক দেখতে পাচ্ছি। আরও বেলায় সিংহ দুটি ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে পড়লো। কয়েকটি শকুন আসেই আছে। কাল শেষ রাতে হায়েনা এসেছিল সিংহের খাবার ভাগ বসাতে। সিংহের গর্জন আর হায়েনার ডাক শুনেছিলাম; (স্পটেড হায়েনার ডাক কতকটা—উং-উউ-উউউ—এই রকম।) এই কথাগুলি লিখতে লিখতে দেখলাম ঘরের একেবারে সামনেই একটি হাতি যাচ্ছে। যে দুটি হাতি দিনে রাতে রোজই কয়েকবার করে এখানে এসে আমাদের ফেলে দেওয়া শাকসব্জী খেয়ে যায়,—তাদেরই একটি। এদের বেলায় অনেকটা কাছে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করা যায় এবং কি পরিমাণ ঘাস এবং দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ খাচ্ছে। ...গতকাল বুইন্দি নদীর ধারে বনের মধ্যে পুরোনো, শুকিয়ে যাওয়া হাতির বিষ্ঠার মধ্যে যেসব দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ অক্ষত অবস্থায় রয়েছে, তার অনেক নমুনা সংগ্রহ করেছি। কলকাতার ঝামে মাটি আর জল দিয়ে কতগুলিকে বাঁচিয়ে রাখছি। একটু বড় হলে চিহ্নিত করা যাবে। একটু আগেই বাসাই পাখির বাসা তৈরি করা দেখলাম এবং ফিল্ম করলাম। ...কিন্তু এসমস্তই আমার চেনা জিনিস। দুরাশার কথা এই যে, এত চেষ্টা করেও গারাম্বা প্রদেশে যেতে পারলাম না। (সুদানের বর্ডারে গাইরের এই প্রদেশ অতি দুর্গম। সেখানেই আফ্রিকার একমাত্র হাতি পোষ মানাবার কেন্দ্র। রাজা লিওপোল্ড ৫০/৭০ বছর আগে ভারতবর্ষ (বোধ হয় তৎকালীন ব্রহ্মদেশীয় কোন রাজা) থেকে মাহুত এবং হাতি নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর চেষ্টা কিছুটা ফলবতী হয়েছিল। এখন সেখানে নয়টি পোষা আফ্রিকান হাতি আছে, তার মধ্যে দুটির জন্ম ওখানেই। বন্দীদশায় আফ্রিকার হাতিদের বাচ্চা খুব কমই জন্মায়। এছাড়া গারাম্বার আদিম অরণ্যে স্কোয়ায় লিপড গন্ডার আছে। অধুনা বিরল এই গন্ডার সে অঞ্চলে এক সময় খুবই দেখা যেত।) মনে হয়, আর কোনও দিন যাওয়া যাবেও না। আফ্রিকার অবস্থা ক্রমাগত খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মানুষ ও বন্যপ্রাণী—উভয়ই দুর্দশাগ্রস্ত। এখন বৃষ্টি আসছে। কাজল-কালো মেঘের ছায়ায় বর্ষণ-সিক্ত মিতুম্বা পাহাড়ের দিকে চেয়ে মনে হল, ক্রন্দসী আফ্রিকা ব্যথাতুর লুটিয়ে পড়ছে. শুনছি তার বিলাপ সঙ্গীত—'পাসি, পসি, মোটেমা নাংগাইও, পাসি পাসি, নাকুফিনা জাইও, পসি পাসি।' (সিংগালা ভাষায় রচিত এ গানটির অর্থ—এ কি বেদনা, আমার একি ব্যথা, মরমে বেদনা, মরণ আমায় ডাক দিয়েছে, ব্যথা, ব্যথা।)

...দুপুরের পর গাইডের সঙ্গে গেলাম। একটু দূরে গিয়ে একটা পুরোনো হাতির বিষ্ঠা পরীক্ষা করছি এমন সময় গাইড বলে উঠলো, লিও, আ গ্রা মাসি (একটি বড় পুরুষ সিংহ) চট করে দাঁড়িয়ে উঠে দেখলাম অনেক দূরে একটি ঝোপের ছায়ায় বিশ্রাম করছে একটি কেশর শোভিত মস্তক। সিংহটা শুয়ে পড়লো, আবার উঠে বসলো। আমরা অনেকটা পথ ঘুরে সাভানা ছাড়িয়ে রুইন্দি নদীর ধারে এলাম। ঘন ঝোপের মধ্য দিয়ে হিপোপটেমসরা টানেলের মত রাস্তা তৈরি করেছে (অর্থাৎ, দিনের পর দিন ঐ একই পথে চলেছে)। ঐ রাস্তা ধরে ধরে এগিয়ে গেলাম। হঠাৎ একটা বিরাট হাতির আভাস পেলাম। হয়তো সেটা ছোট মাপেরই ছিল, কিন্তু ঘন বনের মধ্যে এত কাছে হঠাৎ দেখা তার পেছন দিকটা দৈত্যাকারই মনে হল। আবার একটা বাঁক ঘুরে অন্য এক জায়গায় একেবারে নদীর পাড়ে এসে দাঁড়ালাম। খরস্রোতা, সরু নদী রুইন্দি। ঠিক ওপারেই একটি বড়ো হাতি শুঁড় দিয়ে ঘাস তুলে নদীর জলে ধুয়ে তারপর খাচ্ছে। বিরাট লম্বা, তার গজদন্ত-জোড়া, প্রায় মাটিতে ঠেকেছে। গজদন্তের দৈর্ঘ্য এবং আকার অনেকটা কেনিয়ার বিশ্ববিখ্যাত হাতি 'আমেদের' মত। (মর্সার্বিট অরণ্যের আমেদকে অনেকেই দেখেছেন,—কিং এলিফ্যান্ট ফিল্মটির মাধ্যমে। ঐ ফিল্মটি তোলবার পর আমেদের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। তারপর সেখানে আর একটি অতিকায় হাতি দেখা গেছে, তার নাম দেওয়া হয়েছে অবদলে।) সতর্ক বনানীর মধ্যে দাঁড়িয়ে আফ্রিকার অতীব অরণ্য রূপ দেখতে পেলাম,—যেমন দেখেছিলেন লিভিংস্টোন, পার্ক, বার্টন, বুসে, স্পেক, এমিন পাশা, ইত্যাদি।

আর একটু এগিয়েই দেখলাম কয়েকটি হিপো,—

জলের মধ্যে কিন্তু একেবারেই কাহিল। একটা জলহস্তী জল থেকে উঠে একটি গাছের গোড়ায় মলত্যাগ করলো। সে সময় প্রচণ্ড লেজ নাড়িয়ে বিষ্ঠা চারদিকে ছিটিয়ে দিলো। এটাই হিপ্পোদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নিয়ম। (আফ্রিকান গল্পে আছে,—হিপ্পো ভগবানের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, এইভাবে সে প্রমাণ করবে যে, তার বিষ্ঠায় মাছের কাঁটা নেই, অর্থাৎ সে নদীর মাছ খেয়ে শেষ করে দিচ্ছে না।)

এরকম প্রতিজ্ঞা করে সে ভগবানের কাছে অনুমতি পেয়েছিল জলে বাস করবার। সত্যনিষ্ঠ প্রাণীটি তার কথা রেখেছে। (হিপ্পো তৃণভোজী প্রাণী। রাতেরবেলা ডাঙায় উঠে ঘাস খেয়ে যায়।) এর মধ্যে হাতিটা আমাদের গন্ধ পেয়ে কান মেলে দিয়ে আকাশ পানে শুঁড় তুলে ধরলো। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। একটা ওয়াগটেল পাখি হিপ্পোদের পিঠের ওপর লাফাতে লাফাতে পোকা খেয়ে উড়ে গেল। এ সবই ঠিকমত ফিল্মে করতে পারলাম।....এখানে আসবার সময় উর্বরা গোমা থেকে ফুলকপি আর গাজর এনেছিলাম। এই তিনদিনে তা শেষ হল। আজ থেকে কয়েকদিন শুধু ভাত নুন দিয়ে খাওয়া। তারপর ভাত আর **মাটোকে** (আফ্রিকান কাঁচকলা)) চলবে।

২৬-৩-৭৮

কাল শেষ রাতে দরজায় বলিষ্ঠ করাঘাত। এ কোন রাতের অতিথি? একটা হিপ্পো আর একটাকে তাড়া দিয়েছে, ফলে সেটা এসে দরজায় ধাক্কা খেয়েছে। একটা বড়ো আর দুটি ছোট হিপ্পোকে প্রতি রাতেই ঘরের সামনে দেখতে পাই। সবচেয়ে বড়োটা জানলার সামনে ঘাস খাচ্ছে, দেখলাম। ...

আজ সকালবেলা গাইডের সঙ্গে বেড়িয়ে একটু বাদেই দেখি দূরে দুটি সিংহ এবং একটি সিংহী। পরে দেখা গেল, আমাদের পেছনে, অনেকটা দূরে, ঘাসের মধ্যে আর একটি সিংহী বসে ছিল। অনেকদূর গিয়ে কিছু পুরোনো হাতির বিষ্ঠা পাওয়া গেল। এইসব পর্যবেক্ষণ করে হেঁটে যেতে যেতে দেখলাম একটি ছোট শেয়াল একটি খরগোসের পেছনে ছুটেছে। এই ছোট শেয়ালের নাম সাইড স্ট্রাইপড জ্যাকেল। ফেরবার পথে দারুন অ্যাডভেঞ্চার।

হঠাৎ আমাদের সামনে, বেশ কাছাকাছি, একটি সিংহী ছোট ঘাসের পেছন থেকে উঠে দাঁড়ালো, সোজা ডান দিক থেকে বাঁয়ে দৌড়ে গেল। সূর্যস্নাত সাভানার হলদে ঘাসের মধ্যে বিদ্যুতের চমকের মত তার সাবলীল গতি—বজ্রকঠিন পেশীবহুল দেহ কি লঘু ছন্দে ছুটে গেল। তারপর সে ঘুরে দাঁড়িয়ে মৃদু গর্জন করতে লাগলো। ভয়ের শিহরণ অনুভব করলাম, অতি দ্রুত লয়ে আমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন শুরু হল, যদিও জানি এ গর্জন খুবই সম্ভব আমাদের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেবার জন্য। গাইডকে বললাম,—আস্তে আস্তে পিছিয়ে যাবো নাকি? সে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে চটপট জবাব দিল—না। তখন ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সিংহী ঘাসের মধ্যে মিশে গেল যেন। একটু পরেই আবার তাকে দেখলাম। এবার এক ছুটে অনেকদূরে চলে গেল। ....এখন বিকেলবেলা। মেঘলা আকাশের তলায় ম্লান আলোতে সাভানায় একটিমাত্র প্রাণী দেখতে পাচ্ছি—একটি নিঃসঙ্গ দলছাড়া মোষ। প্রতি রাতেই সে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে,—আর ডাইনে, বাঁয়ে দুদিকেই সিংহের অস্তিত্ব। রোজ রাতেই সেদিক থেকে সিংহের গর্জন শোনা যায়।

৬-৩-৭৮

গতকাল পর্যন্ত হিসেব করে দেখলাম, হাতির বিষ্ঠা থেকে দু হাজার দিববীজপত্রী গাছের অঙ্কুর সংগ্রহ করেছি। গতকাল ম্যানিওক অর্থাৎ টাপিয়োকা পাতার শাক দিয়ে ভাত খেলাম। কাল রাতে হাতি আর হিপ্পো এসেছিল জানলার পাশে। হিপ্পো আর উঠে দেখলাম না। হিপ্পো সম্বন্ধে একটু উদাসী হয়ে গিয়েছি। কাল সন্ধ্যায় ও রাতে সিংহের ডাক আবার খুব কাছাকাছি শোনা গেল। .....গরিলার বাচ্চার করুণ কাহিনী শুনলাম। কিছুদিন আগে চোরা শিকারীরা একটা গরিলার বাচ্চা ধরেছিল। তার হদিশ পেয়ে বন বিভাগের লোকেরা বাচ্চাটাকে উদ্ধার করল। কিন্তু মানসিক 'শক' এবং পেটের রোগ ইত্যাদির জন্য বাচ্চাটা তখন খুবই কাহিল। একে বাঁচিয়ে রাখা এক মহাসমস্যা। খবরটা পেলেন পাশের রাষ্ট্র রোয়ান্ডা থেকে আমেরিকান মহিলা বিজ্ঞানী ডয়ান ফসী। তিনি অনেকদিন যাবত রোয়ান্ডার গরিলা পর্যবেক্ষণ করছেন। সবাই স্বীকার করল, যে এই মহিলাই বাচ্চাটার প্রকৃত রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবেন, চব্বিশঘণ্টা নিজের বাড়িতে চোখে চোখে রেখে। কিন্তু জাইর আর রোয়ান্ডা আলাদা রাষ্ট্র, তাই রাজধানী কিনশাসা থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি আনতে হবে বাচ্চাটাকে রোয়ান্ডা পাঠাবার জন্য। বাচ্চাটা তখন বুমাংগাবোতে। তার কাছাকাছি শহর গোমা থেকে কিনশাসাতে রেডিও-টেলিফোন মারফত সংবাদ পাঠানোর চেষ্টা হল। কিন্তু গোমা শহরে তখন চরম লোড-শেডিং,—কলকাতার থেকেও অনেক খারাপ,—কয়েকদিন ধরে চব্বিশঘণ্টাই বিদ্যুৎ বন্ধ। তখন ম্যুনিসিপালটিকে অনুরোধ করা হল, গরিলার বাচ্চার জন্য অল্পক্ষণ হলেও একটু বিদ্যুৎ দেওয়ার জন্য। ম্যুনিসিপালিটি রাজি হয়ে গেল। চটপট চেষ্টা করে একঘণ্টার জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারল। তারই মধ্যে কিনশাসা থেকে অনুমতি পাওয়া গেল। বাচ্চাটাকে রোয়ান্ডা নিয়ে যাওয়া হল। আজ খবর পেলাম, ডয়ান ফসীর কাছে পৌঁছবার অল্প পরেই বাচ্চাটা মারা গেছে।

১৯৭৬ এর জানুয়ারীতে প্রথম গরিলার দেখা পেলাম। হাতি, সিংহ, গণ্ডার, হিপ্পো ইত্যাদি আফ্রিকার অনেক অঞ্চলেই আছে। কিন্তু গরিলা—নামটাই একটা বিশেষ ধরনের রোমাঞ্চকর ভাব নিয়ে আসে। সেদিন জানুয়ারীর এক মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতে, কাহুজীর আদ্র, গহন অরণ্যে আমি আর এক গাইড এবং দুজন পিগমী জাতীয় ট্র্যাকার গরিলার সন্ধানে ঘুরছি। রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা—কখন দেখতে পাব সেই গল্পকথার প্রাণীকে তার প্রাকৃতিক পরিবেশে।

গরিলা—প্রাচীন ইউরোপের নাবিকদের সত্য-মিথ্যে

মেশানো গল্পের নায়ক, গত শতাব্দীতে দু শেলের আবিষ্কার—এতদিন পর্যন্ত ছিল রহস্য আর বানানবেদের অন্তরালে ঢাকা। মানুষের নিকটতম জ্ঞাতি যারা এ পৃথিবীতে এখনও রয়েছে, গরিলা, শিম্পাঞ্জি, ওরং উটান, গিবন (উল্লুক)—তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিতর্কিত এই গরিলা। শিকারীর গল্পে সে হিংস্র পশু, মানুষকে ছিঁড়ে ফেলে। কোন কোন গল্পে সে এক দানব, মানুষের মেয়েকে চুরি করে নিয়ে যায়।

মধ্য আফ্রিকার পাহাড়ী গরিলাই আজকের বিজ্ঞানীরা বেশী করে পর্যবেক্ষণ করছেন। এরা থাকে জাইর, রোয়ান্ডা আর উগান্ডার বর্ডারে। এছাড়া পশ্চিম আফ্রিকায় লোলান্ড গরিলারা থাকে। মাত্র ৪০।৫০ বছর আগে আকেলে সাহেব গরিলা সম্বন্ধে লিখে গিয়েছিলেন যে ওদের হিংস্রতার কথা বাড়িয়ে বলা হয়েছে। মাত্র ১৮।১৯ বছর আগে তরুণ বিজ্ঞানী জর্জ শালার (যিনি পরে মধ্যভারতে বাঘ ও হরিণের ওপর গবেষণা করেছিলেন) কোন কোন অস্ত্র না নিয়ে অসীম সাহসের সঙ্গে কংগোর জঙ্গলে গরিলার মুখোমুখি হলেন। মাসের পর মাস চেষ্টা করে তিনি গরিলার কাছাকাছি আসতে পারলেন। এক এক সময় গরিলা বিকট আওয়াজ করে বুক চাপড়ে এগিয়ে আসতো। শালার চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখলেন। একটু বাদেই গরিলাটি থেমে গেল। শেষ পর্যন্ত গরিলার সঙ্গে একই গাছে বসে খাবার খেয়েছেন শালার। আর রোয়ান্ডাতে বুনো গরিলার হাত স্পর্শ করেছিলেন ডায়ান ফসী। এর আগেই জীববিদ্যার ছাত্রী জিল ডানিশওয়ার্থ উগান্ডায় গরিলা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং তিনিও হিংস্রতার বিশেষ লক্ষণ দেখতে পাননি। ভ্রমণ হোটেলওয়ালা বাউমগার্তেল উগান্ডার কিশোরোতে বন্য পরিবেশে একটি হোটেল খুলেছিলেন। সেখানে থেকেই ডানিশওয়ার্থ এবং এক সময় শালার কিছু পর্যবেক্ষণ চালিয়েছিলেন। তারপরই কংগোর রাজনৈতিক অবস্থার প্রচণ্ড অবনতি ঘটে। ১৯৬৫ সালে যখন প্রথম উগান্ডা যাই, তার একটু আগেই বাউমগার্তেলের সঙ্গে পত্রালাপ করি। তিনি লিখলেন যে, অনেক পরিশ্রম এবং হাঁটাহাঁটি করেও উগান্ডার বর্ডারের মধ্যে গরিলার দেখা না পাওয়া যেতে পারে, কংগোর অভ্যন্তরে ঢোকার দরকার হতে পারে। কিন্তু সেটাই তখন চিন্তার কথা, কংগোর মানুষের হাতেই সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। কালের কুটিল গতিতে আজ (১৯৭৬ সাল) কংগো অর্থাৎ জাইর এখন শান্ত এবং এখানে সহজেই গরিলা দেখা যায়। যে কোনদিন কয়েকঘণ্টা হাঁটাহাঁটি করলে গরিলার দেখা পাওয়া যাবেই।

ডিস্কভাইভার নামে এক বেলজিয়ান ভদ্রলোক কাহুজীর গরিলাকে সযত্নে রক্ষা করেছেন। তারই প্রচেষ্টায় জাইর গবর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করেছেন এই অভয়-অরণ্য। আগে ওখানে পিগমী জাতীয় মানুষরা গরিলা শিকার করে তার মাংস খেত, নিজেরাও হতাহত হতে গরিলার হাতে।

'পেয়েছি,... এই যে গরিলার বাসা',—একজন ট্র্যাকার দেখিয়ে দিল। প্রতি রাতে গরিলা গাছের ডালের ওপর বসে, দু চারটি ডাল ভেঙ্গে কিশেষ কায়দায় বসে বা শুয়ে রাত কাটায়। প্রতি রাতেই নতুন বাসা। কখনও মাটিতে ঘাসের ওপর রাতের বিশ্রাম। বাসার ভিতর এবং আশেপাশে গরিলার বিষ্ঠা।

গরিলার জীবনযাত্রা সরল। এক একটি দলের মধ্যে মারামারি, কাড়াকাড়ি প্রায় নেই বললেই চলে। কাহুজীতে বন-দপ্তরের অফিস থেকে কয়েক মাইল দূরে ২০।২৫টার একটা গরিলা দল ঘুরে বেড়ায়। সাধারণত এক দিনে আধ মাইল থেকে এক মাইলের মত চলাফেরা করে। কাজেই প্রতিদিন সকালে ট্র্যাকাররা আগের দিনের জায়গার কাছাকাছি গিয়ে খুঁজতে শুরু করে। গাছের ডাল ভেঙ্গে যাবার শব্দে বা ঐ ধরনের কোন সূত্রের সাহায্যে শীঘ্রই খুঁজে বের করে। সকাল থেকে বেলা দুটো অবধি প্রায়

গরিলাদের কিছু না কিছু খেতে দেখেছি। সালারের মত দীর্ঘ-মেয়াদী পর্যবেক্ষণ যাঁরা করেছেন, তাঁরা বলেন, সকালে এবং বিকেলে গরিলারা বেশী খায়। বাকি সময়টা প্রধানত বিশ্রাম করে। এসব ভাল করে দেখে ফটো তোলা খুবই কঠিন ব্যাপার। কারণ জঙ্গল খুবই ঘন। তার ওপর মেঘলা আকাশ বৃষ্টি লেগেই আছে। মাটিতে নামলে গরিলারা ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে ডুব মারে, একটু সবুজ সমুদ্রে মাছ ডুব দিল, অবশ্য গাছ বেয়ে একটু ওপরে উঠলেই পাতার আড়ালে ঢাকা পড়ে।

গরিলার শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপন হয়তো তার খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে জড়িত। শিম্পাঞ্জি এবং বেবুন ছোট ছোট প্রাণী মেরে তাদের মাংস খায়,—এটা দেখা গেছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত গরিলার ক্ষেত্রে সে রকম কোন আচরণ লক্ষ্য করা যায়নি। ডায়ান ফসী দেখেছেন, এরা কোন কোন পোকার লার্ভা খাচ্ছে—এছাড়া তিনি এবং অন্য সবাই শুধু উদ্ভিদ খাদ্যই খেতে দেখেছেন। গরিলার বিষ্ঠার মধ্যেও আগেকার বিজ্ঞানীরা এবং আমি শুধুই নিরামিষ খাদ্যের চিহ্নই পেয়েছি। এদের খাদ্য প্রধানত গাছের পাতা, কচি ডালের বাকল, ঘাস এবং বাঁশ। ওখানে আমি কোন ফল দেখি নি। অন্যরা কোন কোন সময় বুনো কলা এবং দু এক রকম ফল খেতে দেখেছেন গরিলাকে। মানুষ কাছাকাছি এলাকায় চাষবাস না করলে, ফল গরিলার 'মেনুতে' বিশেষ থাকে না। ঘাস, পাতা এবং গাছের ডালের বাকল—এগুলি অপর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে চারদিকে। খাবার নিয়ে কোন 'কম্পিটিশান' নেই—অতি ধীরে সুস্থে গরিলার খেয়ে চলে। হয়তো এজন্যই তাদের মধ্যে আগ্রাসী মনোভাব কম। অনেকের মতে যৌন-জীবনেও গরিলাদের মধ্যে 'কম্পিটিশান' নেই।

কিন্তু দু দল গরিলা মুখোমুখি হলে কি অবস্থা হয়?

এ বছর (১৯৭৮) কাহুজীতে একটা গরিলার লড়াই হয়েছিল—দলপতি আর অন্য একটা দলছাড়া গরিলার মধ্যে। ঘটনাটা ঘটেছিল আমি যাওয়ার আগেই, তার বিবরণ ছাপা হয়েছে লাইব ইনস্টিটিউট এর ম্যাগাজিনে। এক্ষেত্রে দুজনই আহত হয়েছিল। একজন জার্মান বিজ্ঞানী লাইবিয়ান বনরক্ষক মুশেনজী মহাশয়ের সাহায্য নিয়ে দুজনকেই ঘুমপাড়ানী বন্দুকের সাহায্যে অজ্ঞান করে দিলেন। দলছাড়া গরিলাটা আর বাঁচে নি। দলপতি আগের মতই তার দল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিছুদিন সর্দি-কাশিতে ভুগে উঠলো।

গরিলার খাদ্য একশত রকম গাছের সন্ধান পেয়েছেন সালার এবং লিভারপুলের বিজ্ঞানী এ্যালান গুডল। (টানজানিয়ার বিখ্যাত মহিলা বিজ্ঞানী জেন গুডাল শিম্পাঞ্জি নিয়ে কাজ করেন।) অধিকাংশ গাছের পাতার স্বাদই তেতো। কাহুজীতে পিগমীরা ২৭ রকম গাছ গরিলাদের প্রায়ই খেতে দেখেছে। এর মধ্যে ১৪ রকমের গাছের রস আমি পরীক্ষা করে দেখেছি। মাত্র দুটির স্বাদ খুব টক (তাদের এ্যাসিডিক মান যথাক্রমে ৩ এবং ৩.৫)। এর প্রথমটির নাম মুফুম্বা। শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনের ডঃ পাণীগ্রাহী আমার নমুনাটার জাতি-প্রজাতি নির্ণয় করেছেন)। এবার (১৯৭৮ সালে) একটা প্রাথমিক রাসায়নিক পরীক্ষা করে দেখেছি—মনে হচ্ছে মুফুম্বার রসে প্রচুর ভিটামিন সি রয়েছে। গাছের পাতা, ডাঁটা, গ্রাম্য অফিসকোনরা অনেক সময় চিবিয়ে খান। আমিও খেয়ে দেখেছি। রসটা কতকটা রুবার্বের মত লাগে। রুবার্ব গাছ খাওয়ার জন্য এবং ঔষধের জন্যও পাশ্চাত্যে খুব ব্যবহার হত এবং এখনও হয়, যদিও এর উৎপত্তি হিমালয় অঞ্চলে। মুফুম্বা রুবার্বেরই দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি। মুফুম্বার মূল থেকে একরকম রঙ তৈরি করা যায়। এ ধরনের একটি গাছ এদেশে আছে, তার নাম লালবিবি। এর থেকে লাল রঙ তৈরি হয়। আর একটি এ ধরনের গাছ হচ্ছে চুকাপালং অর্থাৎ টকপালং, যার নানা রকমের ভেষজ গুণ আছে। আর একটি এ ধরনের গাছের মূল এদেশের বাজারে রেওয়ানদ্ চিনি নামে বিক্রী হয়, কোষ্ঠকাঠিন্যের ঔষধ হিসেবে। এই গাছের পাতার বোঁটা বা ডাঁটা উগান্ডার গরিলাকে খেতে দেখা গেছে।

কাহুজীর গরিলা দলের দলপতির নাম দেওয়া হয়েছে মুশমুক। এত বড় গরিলা সোজা হয়ে দাঁড়ালে প্রায় সাত ফুট লম্বা হবে (কিন্তু সেভাবে এরা দাঁড়াতে পারে না)। তার ওজন আড়াইশ কেজী (২৫০ কেজী) হতে পারে। সাধারণ গরিলারা এর চেয়ে কিছু ছোট আকারের হয়। ১০ বছর বয়স হলে পুরুষ গরিলাদের পিঠের অর্ধেকটা শাদা হয়ে যায়। এদের বলে সিলভার ব্যাক্ড্ গরিলা। মুশামুকও তাই। ১৯৭৬ সালে একবার মুশামুকের পাঁচিশ ফিটের মধ্যে যেতে পেরেছিলাম। একটা প্রচণ্ড চিৎকার করেছিল,—সেটা কতকটা বিরাট এলসেসায়িশন কুকুরের, ঘোঁ-এর মত।

চিড়িয়াখানায় গরিলারা সাধারণত ২৫ বছরের মত বাঁচে। কোন কোন চিড়িয়াখানায় তাদের মাংস সিদ্ধ খেতে দেওয়া হয়। কারণ তাদের দেহে যেসব ব্যাকটেরিয়া ঘাস পাতা খেয়ে হজম করতে সাহায্য করে, তা চিড়িয়াখানায় আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তখন সিদ্ধ মাংস হজম করাই বেশী সহজ। চিড়িয়াখানাতে এদের সর্দি কাশি, নিউমোনিয়া ইত্যাদি রোগে মরতে দেখা যায়।

বাচ্চা গরিলারা খেলা করতে ভালবাসে। অনেক উঁচু গাছের ডালে এক পায়ে, বাদুড়ের মত ঝুলে থাকতে তাদের ভাল লাগে। এভাবে অনেক সময় তাদের দেখেছি আমি। সেইভাবেই নিচের দিকে মাথা দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে এবং পাতা চিবোয়। পাঁচবার বাচ্চা গরিলাকে দু হাতে তালি দিতে দেখেছি,—মানুষের মত।

মানুষের সঙ্গে শিম্পাঞ্জির বুদ্ধিবৃত্তির যে সাদৃশ্য আছে (যেমন বুনো শিম্পাঞ্জি যন্ত্র তৈরি এবং যন্ত্রের ব্যবহার জানে, যথা গাছের ডাল ভেঙ্গে, তার পাতা খুলে, ছিঁড়ে নিয়ে লাঠির মত করে উঁই ঢিবিতে খুঁচিয়ে উঁই বের করে আনে) গরিলার মধ্যে সেরকমটি দেখা যায় না। মনে হয় শিম্পাঞ্জির তুলনায় এদের কৌতূহলও কম। কিন্তু কৌতূহল কম হলেও বুদ্ধি থাকতে পারে। ডানিশথোর্প একবার লক্ষ্য করলেন পাঁচটি গরিলা পাঁচটি বিছুটি গাছের ঝোপের ওপর বসে আছে। তারা চলে গেলে দেখা গেল প্রত্যেকেই ঝোপের একগাদা ঘাস পাতা গদির মত করে বিছুটি ঝোপের ওপর বিছিয়ে, তার ওপর বসে ছিল।

তাই মানুষের এ জ্ঞাতি শিম্পাঞ্জির চেয়ে কম বুদ্ধিমান না বেশী নির্বিকার তা এখনও ভাল বোঝা যাচ্ছে না।

এবার একটি সহজপাচ্য শিশু-দুগ্ধাহার—এঞ্জেল

ভিটামিন 'ই' সহ আটটি ভিটামিনে সমৃদ্ধ

এঞ্জেল—ভিটামিনে সমৃদ্ধ সুষম দুগ্ধাহার—এমনই মসৃণ যে হজম তাড়াতাড়ি হয়।

এখন আপনার বাচ্চাকে তার পুষ্টির চাহিদা মেটাবার জন্যে, সহজপাচ্য নতুন 'এঞ্জেল' দুগ্ধাহারটি দিন।

এটি এমন একটি দুগ্ধাহার, যা আপনার বাচ্চার পাকস্থলীতে গিয়ে মোলায়েম দই-এ পরিণত হয়; কারণ, এঞ্জেলের চর্বির গুঁড়োগুলো খুবই সূক্ষ্ম। তাই এগুলি সহজেই পরিপাকযোগ্য।

এছাড়া এঞ্জেলকে আটটি বিশিষ্ট ভিটামিন আর লৌহ দিয়ে শক্তিশালী করা হয়েছে, যা আপনার শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্যে অপরিহার্য্য। বলতে গেলে এটিই সর্বপ্রথম শিশু-দুগ্ধাহার, যাতে রয়েছে ভিটামিন ই, যা আপনার বাচ্চার কোমল ত্বক নষ্ট হতে দেয় না।

এঞ্জেল সহজেই গুলে যায়। এটি ফীডিং বোতলেই তৈরী করা যায়। ফোটানো জলে দুধের গুঁড়ো ঢেলে বোতল নাড়লেই হল।

শিশুর বাড়-বাড়ন্ত ও ঠিকানা সম্পর্কিত *বিনামূল্যের* পুস্তিকাটির জন্যে লিখুন "Progress of an Angel baby" ডাকমাশুল ও অন্য খরচের জন্য এক টাকার ডাকটিকিট পাঠাবেন। আপনার নাম ও ঠিকানা পাঠান :
কনস্যুমার সার্ভিসেস্ ডিভিশন ফোরমোস্ট ডেইরীজ লিমিটেড ৭২ জনপথ, নিউ দিল্লী-১১০০০১

ফোরমোস্ট ডেইরীজ লিমিটেড, বোম্বাই-এর একটি উৎপাদন। **এঞ্জেল শিশু-দুগ্ধাহার**

OBM/4039 Ben A

শৈবাল মিত্র

তরণী পাহাড়ে বসন্ত

মেয়ের স্পর্শ, বক্তস্রোত ওর আঙুলের মধ্যে দিয়ে গোটা শরীরে ঘন মমতায় ছড়িয়ে পড়ে। সারা দিনের টানা-পোড়েনে মাথায় জমে থাকা ঘোলাটে কুয়াশা সরে যায়। নিজের ঘরদোর, জীবন সম্পর্কে দিবাকর সজাগ হয়ে ওঠে। বুকের মধ্যে টুপ-টুপ করে শিশির পড়ে। মেয়ের কানে কানে নরম গলায় বলে—লাল্লু বাসিস না। সব ঠিক হৈ'য়ে যাবে।

বরদা সুন্দরী ধরেছিলো নরহরিকে। আমার জমিনটা তুরা ছাড়ুন দে' উ জমিন গেইলে আমি বাঁচবো কুথা থাকে।

ফসল কাটা, বেনামী অর ভেস্টেড জমি দখল নিয়ে তখন মহা হৈ-চৈ। কৃষক সমিতি প্রায় দেড়শো বিঘে চুরি করা জমি খুঁজে পেয়েছে। শুধু বেনামী জমি নয়, সরকারী খাস জমিও জোতদার, মহাজনেরা ভোগ করছিলো। দাখিলা, পরচার বালাই নেই। জে এল আর ও অফিসের বাবুরা বাণীশ্বরে বসে খায়-দায় মৌজ করে। বেনাম বা ভেস্টেড জমি খুঁজে পায় না। বর্গা লেখাতে গেলে চোখ রাঙায়। রবি হাঁসদার ডাকে সাঁওতাল, মুহুলি, পাহাড়িয়া, ঘাটোয়ালরা একজোট হয়ে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। এ সব গত সনের কথা। হাজার হাজার মানুষ ধান কাটছে। লাঠালাঠি, রক্তপাত। অনেক কেলেংকারি ফাঁস হয়ে গেলো। নারাণ কাপুরিয়া সরকারীর খাস জমির প্রায় সাত বিঘে বরদা সুন্দরীর নামে দানপত্র করে দিয়েছিলো। কানুনগো সাহেবের সামনে সে জমিতে কৃষক সমিতি ঝাণ্ডা পুঁতলো।

বর্ষার আগে কৃষক সমিতির সভায় কিশোর জমি বিলির প্রস্তাব দিলো। পাঁচ-সাত গাঁয়ের লোক হাজির।

ভাদু কোঁড়ে বললো—জমিনের দরকার নাই।

পুনাই সায় দিলো—আমরা হাল লাগাবো, ফসল তুলবো, উ জমিন কৃষক সমিতির হাতে থাকুক।

লেজ্জ কথা বটে। সকলে মেনে নিয়েছিলো। সামনে বড়ো লড়াই। দুর্দিন, দুর্যোগ ঝেঁপে পড়বে। তখন কৃষক সমিতি ছাড়া গরীব মানুষদের মাথায় ছাতা ধরার কেউ নেই। উত্তেজনায় চারপাশের মানুষ ফুটছে। হাতের মুঠোয় জমির মালিকানা পেয়েও স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিচ্ছে। তারপর সেই জমিতে লাঙ্গল পড়েছে, চাষ হয়েছে। তাতলুই, বাঁশকুলি, টোখা, বাগজোগড়া, মাদারপুরের চাষীরা হাল নামিয়েছে। লড়াই আর মেহনতে তাদের জান কবুল, নিঃস্বার্থ চেহারা।

ধানের গোছ পুরুষ্ট হতেই বরদা-সুন্দরী এসে ধরলো নরহরিকে। প্রসঙ্গটা নরহরি পাড়লো অজিতের কাছে। পেটের জ্বালায় মেয়েমানুষ মান খুয়োয়। ব্যাপারটা ভেবে দেখেছো।

তরু গাঁয়ের সব অভাবী মেয়েরা কি ইজ্জত বিকিয়েছে? বাঘা খোঁচা দেয়। নরহরি জবাব দিতে পারে নি। অজিত কথা দিয়েছিলো, বরদাসুন্দরীর জমির ফসলে কেউ হাত দেবে না। দরকার হলে কৃষক সমিতি তার ঘরে ধান তুলে দেবে। খবরটা বরদা-সুন্দরীর কানে গিয়েছিলো। নিশ্চিন্ত হয়েছিলো সে। তারপর আরো কয়েক মাস কেটে গেলো। পার্টির চেহারা আর রাজনীতি এর মধ্যে বদলেছে। কৃষক সমিতির চারপাশে সেই হাজার হাজার মানুষ আজ নেই। গেরিলা স্কোয়াড আর খতম এ্যাকশনের ঢেউয়ে গাঁ শস্য ভেসে গেছে। চাষ-আবাদের কথা কৃষক সমিতি ভুলে গেছে। ধান ক্ষেতে সোনালী রঙ ফুটতে গরীব মানুষেরা সজাগ হয়। দেখে জোতদার মহাজনেরা আবার গাঁয়ে ফিরছে। চারপাশে পুলিশ, মিলিটারির ক্যাম্প। অথচ মাথার ওপর থেকে কৃষক সমিতির সেই ছাতটা কখন যেন সরে গেছে।

কিশোর বোঝে বিরাট ভুল হয়েছে। সেই পুরোনো ভুল, পঞ্চাশ বছর ধরে পার্টির মধ্যে সিঁধ কাটছে। হয় বামপন্থী অথবা দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি পার্টির মর্মকাল পেরিয়ে ঘুরে ফিরে আসছে। জাতীয় মুক্তির সংগ্রামের নেতৃত্বে। তাই পার্টির হাতে থাকে খাঁড়া বলতে হয়, এ আজাদী ঝুটা হ্যায়। এ দেশে নাকি বুর্জোয়া বলে কিছু নেই। সকলেই কম্প্রাডোর, ঝাড়ে-বংশে লালাল আর বজ্জাত। গ্রামাঞ্চলের মাঝারি ধনী কৃষকও শত্রু হয়। বেআইনী, গোপন কাজের নামে পার্টি সংকীর্ণতাবাদের শিকার হয়। সাধারণ মানুষ থেকে দূরে সরে আসে। সন্ত্রাস মাথা চাড়া দেয়। বছর বছর ঘুরতেই নেতাদের চোখ খোলে। বলে, ভুল হয়ে গেছে। নতুন খেলা শুরু হয়। নতুন তত্ত্ব, থিসিস আসে। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবই মুক্তির একমাত্র পথ। ভারতবর্ষের বুর্জোয়ারা অতীব ভালো লোক। প্রায় সকলেই প্রগতিশীল, দেশপ্রেমিক। ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রের রাস্তায়, শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারতবর্ষের বিপ্লব হয়ে যাবে। পুঁজিবাদ দড়ি কলসী নিয়ে সমুদ্রে ডুবে মরবে। নরচগানের আসর বসে, খোঁপা প্রতিযোগিতা হয়।

পকেটে রাবার গুডস নিয়ে সন্ধ্যের পর চিন্তামুক্ত কম্যুনিস্টরা হাড়কাটা, সোনাগাছিতে ঘুরে বেড়ায়। আবার নতুন ধাক্কায় চুরুটের ছাই খসে যায়। নেতারা জেগে ওঠে। বলে ভুল হয়ে গেছে কমরেড। ভুলের মাশুল নেতাদের দিতে হয় না। বরং যে যতো বেশী ভুল করে সে [illegible] নতুন শ্লোগান আসে—জনযুদ্ধের বিপ্লব জিন্দাবাদ [illegible] বিপ্লবের এটাই একমাত্র রাস্তা। শ্রমিক কৃষকের ফ্রন্ট বানিয়ে আইনী এবং বেআইনী, দুভাবেই লড়তে হবে। কিন্তু কাজে সেটা হয় না। ধুরন্ধর নেতারা জানে, বেআইনী কাজের ঝুঁকি আছে। হ্যাপা সামলাবে কে? মুখে বিপ্লব আউড়ে ভোট বাক্সে তারা ফুলিয়ে যায়। গোপন পার্টি, গোপন কাজ শুধু দলিলেই লেখা থাকে। কেউ প্রশ্ন করে না। এদেশের কম্যুনিস্ট পার্টিতে প্রশ্ন তোলা নিষেধ। এক্সেপ্ট

আর দালালবাই শুধু ঝামেলা পাকাবার জন্যে প্রশ্ন করে তর্ক জোড়ে। অথচ প্রশ্ন থেকেই যায়। হাজার প্রশ্ন বুকে জমে পাথর হয়। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্তর্বস্তু কৃষি বিপ্লব। গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরো। সশস্ত্র বিপ্লব মুক্তির পথ। নতুন জোয়ার আসে। আইনী, সংসদীয় রাজনীতির পাশাপাশি জঙ্গী জেদী রাজনীতির পাল্লা ভারী হয়। কিন্তু সেখানেও ভুল। বেআইনী গোপন কাজের সোতে গোটা পার্টি সাধারণ মানুষ থেকে অনেক দূরে ভেসে যায়। গণ-আন্দোলন, গণসংগঠন কখন যেন হাওয়ায় উবে গেছে। শুধু অস্ত্র আর বন্দুক হাতে কিছু অসহায় মানুষ এখন এই ফাঁকা লাল মাটির পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে আছে। গোপন আর প্রকাশ্য কাজ, সশস্ত্র লড়াই আর গণ সংগ্রামকে এবারেও মেলানো গেলো না। অথচ চারপাশ ভিজে রক্তাক্ত। মাদারপুর থেকে কিশোর ভাদু গুণাই আর নবহরি তাঁতলুইতে ফিরছিলো। দু পাশের জলাজমিতে ধান পাকতে শুরু করেছে। হাওয়ায় ডাঁসা ধানের গন্ধ। কৃষি উন্নয়ন সমিতি জোট বেঁধে ধান কাটবে। মদত দেবে গ্রামরক্ষী আর পুলিশ, মিলিটারি। পুরুলিয়া বাঁকুড়া থেকে মুনিষ আনবে। এ জোলার খেটে খাওয়া মানুষগুলোকে ওরা পেটে এবং পিঠে মারবার মতলব এঁটেছে। এসব নবহরির খবর। গাঁ গঞ্জে নিরীহ মুখে ও ঘুরে বেড়ায়। খবর আনে।

এখন প্রায় মধ্যরাত। ঘন, গভীর অন্ধকারে চারপাশ ডুবে আছে। আলপথ ধরে ওরা এগোয়। সামনে উঁচু অনাবাদী পাথুরে জমি। তারপর আবার ধানক্ষেত। এখানে কোথাও একফসলে চাষ হয় না। ভর্তি মাঠের মাঝে মাঝে বাঁজা ন্যাড়া মাঠ। ফ্যাকাসে হলুদ ঘাস আর বুনোতুলোর ঝোপ বিষিয়ে সারা জীবন কাটিয়ে দিলো। ঠান্ডা হাওয়ায় গাছপাতার অবস্থা শব্দ। আকাশে এক ঝাঁক জ্বলজ্বলে তারা। হঠাৎ ওর মোতির কথা মনে পড়ে। সেদিন বলতো, তার জীবনের গল্প, দেশঘরের খবর। আকাশের তারা দেখিয়ে ছেলেবেলায় ওকে ওর মা বলতো, এগুলোন তারা নয়। পৃথিবীর মানুষ। মানুষ মরার পর আকাশে তারা হয়ে যায়। শিশুবালের সেই স্মৃতি নিয়ে ও তখন খুব খানিকটা হাসতো। একটা প্রচণ্ড মোচড়ে কিশোরের বুকটা দুলে ওঠে। অন্ধকারে কোথায় যেন একটা জলপ্রপাতের শব্দ। একটানা ছলছল আওয়াজ তুলে সেই অদৃশ্য স্রোত বয়ে যায়।

ধানকাটার কথাই আলোচনা হচ্ছিলো। এবছর ভালো ধান হয়েছে। গরীব চাষী আর মাহিন্দাররা খুশী। এখন মাঠের ধান কে কতোটা ঘরে তুলতে পারবে, সেই নিয়ে দুশ্চিন্তা। পেটে না যাওয়া পর্যন্ত ফসলের দুর্ভাবনা মেটে না। মুনিষ, খেতমজুরের সংখ্যাও এ তল্লাটে প্রচুর। এ সময়ে তাদের খুব খাতির। কিষাড়হরেরা হেসে হেসে কথা বলে। ভাত, মুড়ির ধান্দা উজাড় করে দেয়। এ বছর মুনিষ মাহিন্দারদের মুখও থমথমে। জোতদার, বাবুভায়েরা ফসল তোলার আগে গাঁয়ের মোস্তাগীরকে ডেকে পাঠায়। সেই গাঁও প্রাচীন, মুনিষদের সর্দার গাঁয়ের মজুরদের নিয়মমতো কাজ ভাগ করে দেয়। আশপাশের গাঁয়ের কোনো মোস্তাগীরের এবছর ডাক আসেনি। গতরে-খাটা মানুষগুলোকে শেষ পর্যন্ত হয়তো ঠুঁটো জগন্নাথ সেজে বসে থাকতে হবে। পেটের জ্বালায় অস্থির বিশ-পঞ্চাশ জনের এক-একটা দল বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ বা পড়শী কোনো জেলায় কাজের ধান্দায় চলে যাবে। যে কোনো মজুরিতে কাজের জন্যে হত্যে দিয়ে বড়ো জমির মালিকের দরজায় বসে থাকবে। গত কুড়ি বছরে এদেশে খেত-মজুরের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। উনিশশো একান্ন সালের আড়াই কোটি ক্ষেত-মজুর, উনিশশো একাত্তরে প্রায় পাঁচ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। এটা সরকারী হিসেব। পুরোপুরি সঠিক নয়। তবু এবছর পার্টির ডাকে হাজার হাজার গরীব মানুষকে ফসল কাটার লড়াইয়ে নামানো যাবে না। ওটা পার্টির লাইনও নয়। সবকিছু দেখে গরীব মানুষেরাও ভড়কে গেছে। তবু কিশোরের মাথায় একটা মতলব আছে। শেষ চেষ্টা করবে। মেহনতের ফসল বিনা যুদ্ধে ছাড়বে না। বিশেষ করে কৃষক সমিতির হুকের ধান তুলতেই হবে। গ্রাম গোলা বানাবে। পাশে থাকবে গণফৌজ।

রাত দশটার পর আজ মাদারপুরে একটা এ্যাকশন হলো। ধান তোলার প্রস্তুতি। গণফৌজের কাজে অজিত আর রবি গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরছে। ছড়িয়ে থাকা বন্দুকগুলো জড়ো করতে হবে। কয়েক ডজন এ্যাকশনে যে হাজার হাজার মানুষ অংশ নিয়েছে তাদেরও জাগানো দরকার। তারা নাম না লেখালে গণ-ফৌজ বাড়বে কি করে।

কিশোর শুনেছে রবির বাড়ীতে উপোস চলছে। পাঁইশার পরণে কাপড় নেই। তার ওপর রবির গরম বা মারা যাওয়ার পর থেকে পাঁইশা আরো ঝিমিয়ে গেছে। মেয়েদের স্কোয়াডে মন কসাকসি। মরদদের সঙ্গে নির্মলার গাঁয়ে গাঁয়ে ঘোরা এখানকার মেয়ে মহল ভালো চোখে দেখেনি। এই নিয়ে পাঁইশা নাকি রবিকে একদিন বাচ্ছেতাই করেছে। স্বামী, স্ত্রীতে মারদাঙ্গা হওয়ার অবস্থা। শেষতক রবি নিজেকে সামলে নেয়। রবির মুখেই কিশোর এসব শুনেছে। উষাবালী, লালমুনিরাও এ ব্যাপারে চুপচাপ। নির্মলাকে তারা খুব একটা ভালো চোখে দেখে না। কয়েক বছর আগে নির্মলা নাকি ডান হয়ে গিয়েছিল। নফর জানের দরবারে তিন-কুড়ি টাকা দাবেম হয়। টাকা দিতে না পারায় নির্মলা গাঁ ছেড়ে পালায়। তিলাবুনিতে খুব নামার ঘরে লুকিয়ে থাকে। সেখানেই ভানুচাঁদের সঙ্গে দুলহার এবং বাপলা হয়। মেয়েদের ধারণা নির্মলাকে বিয়ে করার জন্যই ভানুচাঁদ কুণ্ঠে ভুগছে। ঘরে ডান আনলে সর্বনাশের শেষ থাকে না। পুরুষদের ওরা

Rupa PAPERBACKS

Literature :

BERTRAND RUSSELL
Mortals and Others 8.00

History :

A. L. BASHAM
The Wonder That Was India 47.70

Dr. B. N PANDEY
A Book of India 15.00

DURGA DAS
India : From Curzon to Nehru and After 12.00

Medical :

JOHN W. ARMSTRONG
Water of Life 9.00

MARGERY G. BLACKIE
The Patient, Not The Cure : The Challenge of Homoeopathy 16.00

PETER DIGGORY and JOHN McEWAN
Planning or Prevention : The New Face of Family Planning 10.00

MILES BURKITT
The Old Stone Age 12.00

ARTHUR BALASKAS
Bodylife 25 00

Philosophy & Religion :

L. S. S O'MALLEY
Indian Caste Customs 8.00

W. J. WILKINS
Hindu Mythology 20.00
Modern Hinduism 16.00

Sociology :

LUCY MAIR
Marriage 12.00

List of other books on application.

Rupa & Co

15 Bankim Chatterjee Street
Calcutta 700 073

Also at :
Allahabad · Bombay : New Delhi

শুয়ে থাকা। বাঘাকে সাজা করার জন্যে এখন ও জানুচাঁদের কাছ থেকে রেপুত চাইছে। পুরনো বিষে কাটন না দিলে সাপ্পা করা বেআইনী। অজিত দায়িত্ব নিয়েছিল, লাল-মুনি আর উজানীকে বোঝাবে। কতোদূরে কি হয়েছে কে জানে। নির্মলাকে কেউ বুঝতে পারে না। একটু অন্য ধাঁচের মেয়ে। কথায়, চালচলনে আর পাঁচজন থেকে আলাদা। ওর চোখের তারায়, চোখা নাকে মধ্যবিত্ত আদল আর দীপ্তি আছে। কোথা থেকে নির্মলা এটা পেলো, কিশোর বুঝতে পারে না। ওর চেহারার এই জৌলুসই ওর কাল হয়েছে। ঘরে, বাইরে বিপদ।

মাদারপুরের ঘনশ্যাম সিং-এর বাড়ীতে প্রতিরোধ বাহিনীর লোকেরা নির্মলাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। পুলিশের হামলায় তিলা-বুনি উজাড় করে সকলে লুকিয়েছিল জঙ্গলে। বাঘা একটা মজা পাতকুয়োয় ঢুকেছিল। ওর মা শুষছে। এখন তখন অবস্থা। অনেক সাধ্যেও বাঘা মায়ের পাশ থেকে নির্মলাকে সরাতে পারেনি।

আকাশে ছাতিফাটা রোদ। খবরটা দিয়ে বাঘা ঠক্‌ঠক করে কাঁপছিল। ওর দু-চোখ লাল, শরীরে ধুলো। দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছিল। বাঘার এতো ভয় কিশোর আগে দেখেনি। পুনাই কাস্কে ওকে দাওয়ায় বসায়। পেতলের বাটি ভর্তি হাঁড়িয়া এনে দেয়। বাঘা এক-চুমুকে সেটা খেয়ে ফেলে। চারপাশ নিঝুম। কোথায় যেন একটা চিরা ডাকে। পুনাই-এর ছেলে সুগ্রেল দাঁতে করে ভ্যাবেন্ডার ছাল নিয়ে এলো। বছর বারো বয়েসের ছেলেটার দিন তিনেক ধরে বমি হচ্ছে। পেটে কিছু থাকছে না। ভ্যাবেন্ডার ছাল হাত অথবা শালপাতে বাঁধলে রোগ সারে। শ্বাস বন্ধ করে দাঁত দিয়ে এই ছাল ছিঁড়তে হয়। পুনাই-এর বৌ একটুকরো সুতোর খোঁজে ঘর-দাওয়া চষে ফেলছে।

মাদারপুর জোতদারদের ঘাঁটি। কৃষি-উন্নয়ন সমিতির হেড কোয়ার্টার। ঘনশ্যাম সিং উন্নয়ন সমিতির সভাপতি। বীরভূম জেলায় প্রতিরোধ বাহিনী গড়ার কাজে সে জান লড়িয়ে দিয়েছে। গ্রাম, শহরের যতো গুন্ডা, বদমাশ, চোর-ছ্যাঁচোর লুম্পেনদের জড়ো করেছে। টাকার অভাব নেই। ঘনশ্যাম অঢেল চাঁদা তুলছে। পুলিশও মদত দিচ্ছে। এসব খবর কিশোর আগে পেয়েছে। ঘনশ্যাম নাকি চ্যাড়া পিটিয়ে পার্টিকে চ্যালেঞ্জ করেছে—সাহস থাকে তো ওরা আসুক আমাদের গ্রামে। ঘনশ্যামের দাপটে চারপাশের গাঁয়ে এখন থমথমে সন্ত্রাস। আর সময় দেওয়া যায় না।

অজিত, রবি না থাকায় কিশোরের কেমন খালি খালি লাগে। হাতের কাছে যে কজনকে পাওয়া গেল, তাদের নিয়েই তৈরি হলো স্কোয়াড। চলো মাদারপুর।

অন্ধকার একটু ঘন হতেই সবাইকে নিয়ে কিশোর জঙ্গলে ঢোকে। অন্ধকার শাল-বনের মধ্যে দিয়ে মাইলখানেক গিয়ে তারপর মেন রোড ধরবে। ওর ইচ্ছে ছিল বুদ্ধদেবদা থেকে কেজি দুয়েক চাল জোগাড় করে আজ পুলিশের সঙ্গে দেখা করবে। রবির একটা খবরও ওকে দেওয়া দরকার। মেয়েদের স্কোয়াডকে চাঙ্গা করার জন্যে পুলিশকে বোঝাবে। অনেক কুসংস্কার আর অন্ধ-বিশ্বাস জমে আছে। আজকাল ওর মনে হয়, অজিতের কথাই ঠিক। শুধু মতমের রাজ-নীতিতে চেতনার মান বাড়ে না। দৈনন্দিন জীবনের খাওয়া, পরা, হাসি, গান সংস্কৃতির পরতে পরতে ঢুকতে না পারলে নতুন সমাজ, নতুন পৃথিবী তৈরি হবে না। দীর্ঘ-স্থায়ী, বিশাল এই কাজের কোনো শর্টকাট নেই।

বাঘার উত্তেজনা কেমন মিইয়ে গেছে। কি এক অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে ও পথ হাঁটছে। সাওতাল মেয়ের ধর্ম নষ্ট হওয়ার পুনাই খুব চটেছে। আজ ওদের নিশ্চিহ্ন করবো—বেরোবার আগে পুনাই কিরা খেয়েছে। বাঘার কানে নির্মলার চীৎকার এখনো বাজছে। কুয়োর অন্ধকারে বসে ও বুঝেছে নির্মলাকে ওরা মারছে। হয়তো কাপড় খুলে হেনস্তা করছে। ওর মাথার রক্ত টগবগ করে ফুটছিল। মানুষটাকে চিনে রাখা চাই। ওর বুক ফেড়ে দু-হাতে রক্ত মাখবে। কুয়োর ওপরে অসহ্য হল্লার শব্দ। বুড়ো বুড়ী বাচ্চাদের কান্না। পাড়ার কুকুরগুলো শুধু দূর মাঠ থেকে একনাগাড়ে চেঁচাচ্ছে।

ভাদু চৌড়ে, হঠাৎ গান ধরে—সিদু, কানু চাঁদ ভৈরো নিয়ে বকাপ কান।' নাবব স্কোয়াড গানের সুরে জেগে ওঠে। বাঘা ছাড়া সকলে গলা মেলায়।

মাদারপুরে ঢোকার মুখে শাল মহুয়ার পাতলা জঙ্গল। ঘন অন্ধকারে বড়ো গভীর মনে হয়। স্কোয়াডটা জঙ্গলে চুপচাপ অপেক্ষা করে। সুরেনা মাঝিকে ডাকতে যায় ভাদু। সুরেনা এ গাঁয়ের লোক, পার্টির কর্মী তার সঙ্গে কথা বলেই গাঁয়ে ঢুকতে হবে। এখানকার বাস্তঘাট, জোতদারদের ঘরকাড়ীর পাকা হদিশ সুরেনাই দিতে পারবে। মাদার-পুর প্রতিরোধ বাহিনীর ঘাঁটি। বেশ কিছু বন্দুক আর অস্ত্রশস্ত্র ওদের আছে। জেনে-শুনে এগোতে হবে। প্রথম কাজ নির্মলাকে খুঁজে বার করা। তারপর ঘনশ্যামের সঙ্গে বোঝাপড়া হবে।

পাথরের মূর্তির মতো বাঘা বসে আছে। অন্ধকারে ওকে পরিষ্কার দেখা যায় না। কিশোর ওর পিঠে হাত বোলায়। রোম-কূপ জেগে ওঠা খরখরে আদুল পিঠ। হয়তো ওর দারুণ শীত করছে। কাঠকুটো জড়ো করে আগুন জ্বালালে শীত মরে। কিন্তু আগুন জ্বালানোর উপায় নেই। কাল-পরশুর মধ্যেই নির্মলার সঙ্গে ওর সাপ্পা হওয়া দরকার। সাপ্পা করায় খরচ কম। ঝামেলা নেই। ঝটমট আর দেরী করে লাভ কি? নতুন ফসল না ওঠা পর্যন্ত অজিত আর লালমুনির বিয়ে হবে না। উৎসব করার অবস্থাও এখন নেই। কে কোথায় পালাবে তাই ভাবছে। গাঁয়ের গোপন ডেরাগুলো জানাজানি হয়ে গেছে। অনেক সময় গভীর রাতে পুলিশ চুপচাপ সেই জায়গাগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কেউ টের পায় না। পুরনো যে কটা শেলটার তারা তৈরী করেছিল, এতো লড়াইয়ের পরও তার সংখ্যা পড়েনি। পার্টির ভাইটাল কমরেডদেরও তাই আর আশ্রয় দেওয়া যাচ্ছে না। মুখ চুন করে তারা আত্মীয়স্বজনদের বাড়ীতে গিয়ে উঠছে। পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে হতশ্রী হয়ে বসে যাচ্ছে। অবপর জাগছে অনুতাপ, লজ্জা। জঙ্গী, সিবিয়াস কর্মীদের কেউ কেউ বিরোধী শিবিরে নাম লেখাচ্ছে। তার ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে শহরের ছেলেরা এসে এলাকায় ঢুকছে। জেল ভেঙেও আসছে কেউ কেউ। তারা বেপরোয়া, মার-মুখী। একটা জঙ্গলাধবা অনিশ্চয়তায় তারা ফুঁসছে। সামনে মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই দেখছে না। সবার আগে একটু মোক্ষম কামড় দিয়ে সবকিছু লন্ডভন্ড করে দিতে চায়। এইসব অগুনতি সমস্যাকে সামলাবার মতো পার্টির শক্তি নেই। আঞ্চলিক কমিটি, ডিস্ট্রিওনাল কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটি, কেউ কারো নাগাল পায় না।

কলকাতার অবস্থা আরো সাংঘাতিক। পার্টির কর্মীদের বলতে একটার পর একটা এলাকা ভেসে যাচ্ছে। কাশীপুর বরানগর, ডায়মন্ডহারবার, বারাসত শিবপুর কোন্নগরে কয়েকশো পার্টি কর্মী, দরদী জীবন দিয়েছে। মানবের কাছে সেদিন একটা পুরনো সপ্তাহিক কাগজ দেখলো। বরানগর, কাশী-পুরের ভয়াবহ বিবরণ পড়ে বুকটা হিম হয়ে যায়। ওখানে ঠিক কতোজন মারা গেছে পার্টি হিসেব পাচ্ছে না। তবে দেড়-দুশোর কম নয়। পরিচয় চাপা দেওয়ার জন্যে অনেক মৃতদেহের মুখে আলকাতরা মাখানো ছিল। কিছু লাশ মুন্ডুহীন। শুক্র এবং শনিবার এই দুদিনের মধ্যে একশো পঞ্চাশ জন তরুণকে খুন করা হয়। অন্যেরা যারা তরুণ নন তাদেরও মরতে হয়। কুঠিঘাট বোড়ের ওপর একটা মঞ্চ বানিয়ে নিহতের তালিকা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। ঘন্টায় ঘন্টায় সেই ফর্দে নতুন নাম উঠতে থাকে। তালিকায় গোটা থানার শুধু একটা অঞ্চলের নামগুলোই লেখা হয়। শুক্রবারেই এই ফর্দে ষাটটা নাম ওঠে। শেষে মৃতের সংখ্যা যখন গোনা সম্ভব ছিল না, তখন নাম তালিকাভুক্ত করা বন্ধ হয়।

পাওনা গন্ডা মিটিয়ে দেবার এটা এক বক্তাক্ত নিষ্ঠুর কাহিনী। সারা জাগতেই মৃতদেহ ছড়িয়ে ছিল। অধিকাংশই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গহীন, মাথা কাটা, চোখ উপড়ে নাড়ি-ভুঁড়ি বার করা। প্রকাশ্য দিবালোকে রাস্তার ওপর সেগুলো পড়েছিল। পরে বিকসা আর ঠেলায় তুলে সেগুলো হুগলী নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়। সময়মতো জোয়ারে দেহগুলো জলে ভেসে যায়। সবচেয়ে পৈশাচিক কায়দায় বীভৎসতম উপায়ে হত্যা চলে। ষাট বছরের এক বৃদ্ধ তাঁর ভাইপোর খবর দিতে না পারায় আক্ষরিক অর্থে তাঁকে পেটোলে চুবিয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। ভাই-এর খবর দিতে না পারায় পুনেরো বছরের এক ছাত্রীর হাত কেটে নুমিয়ে দেওয়া হয়।

মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায়কে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন—সারা রাত সেখানে নরহত্যা চলেছে। শান্তিপ্রিয় নাগরিকরা আক্রান্ত হলে কি পুলিশ প্রোটেকশান পাবে না?

মুখ্যমন্ত্রী—আগে দেখতে হবে, যারা মারা গেছে তারা শান্তিপ্রিয় ছিল কি না!

কাগজটা হাতে নিয়ে কিশোর হতভম্ব হয়ে বসেছিল। মানবের কথায় সম্বিত ফিরে আসে। গণহত্যার প্রতিবাদে পার্টি সিউড়ি বন্ধের ডাক দিয়েছে। মানব খবর দেয়। সিউড়ি বোলপুরের কমরেডরা নতুন ধাঁচে গণ-আন্দোলন করার কথা ভাবছে। আইনী এবং বেআইনী কাজের ধারাকে তারা মেলাতে চায়। পার্টির সঙ্গে এ-নিয়ে নাকি দারুণ মন-কষাকষি চলছে। বাংলা বিহার, উড়িষ্যা সীমান্ত কমিটি নতুন দলিল দিয়েছে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে তারা সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। নেতৃত্বের ধারণা সীমান্ত কমিটি পাল্টা হেডকোয়ার্টার চালু করেছে। পার্টিকে তারা ভাঙতে চায়। ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ থেকে এই তাত্ত্বিক লড়াইয়ের শুরু। এখন গেরিলা যুদ্ধের পদ্ধতি নিয়েও তীব্র মতবিরোধ। গেরিলা যুদ্ধ লড়াইয়ের একমাত্র রাস্তা নয়। সীমান্ত কমিটির মতে পার্টি ব্যক্তিবাদের বাস্তববাদের ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছে। ব্যক্তিবাদের মুখ্য দিকটাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে গৌন দিকটাকে নাকচ করেছে। মূল বিষয় হিসেবে সশস্ত্র সংগ্রামের ওপর জোর দিতে গিয়ে লড়াইয়ের অপ্রধান কাজকর্মগুলো বাতিল হয়ে গেছে। মানুষের শরীরে মস্তিষ্ক সবচেয়ে জরুরী এবং দামী অঙ্গ। তার মানে শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো ফেলনা নয়। দু-পক্ষে এখন গরম দলিল চালাচালি হচ্ছে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সম্পর্কে যে কোন সমালোচনাই এখন উপদলীয় চক্রান্ত। কিশোর জানে, তাকেও এই চক্রান্তের সঙ্গে জড়ানো হয়েছে। মানব বলেছিল, বুদ্ধদেব একদিন তোর সঙ্গে কথা বলতে চায়। ও নতুন লাইনে ভাবছে।

কিশোর আশা করেছিল, এর মধ্যে হয়তো একদিন বুদ্ধদেব আর মানব আসবে। কিন্তু কেউ আসেনি।

অন্ধকারে দশ-বারোজন লোক চুপচাপ বসে থাকে। একদঙ্গল মশা শরীরের রক্ত শুষে খায়। শুকনো পাতা মাড়িয়ে জঙ্গলের মধ্যে কি একটা জীব হেঁটে যায়। আকাশে এক টুকরো চাঁদ ওঠে। শরীরের মধ্যে আজকাল সবসময়ে ঝিমঝিম করে। পথেঘাটে হঠাৎ মাথা ঘুরে যায়। নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট লাগে। কিশোর বোঝে শরীরটা দারুণ রকম ভেঙেছে। বর্ষার শুরু থেকে দু-বেলা কতদিন যে পেট ভরে খায়নি। এখন রোজ একবেলাও ভরপেট জুটছে না। মাঝিপাড়ায় বাড়ী বাড়ী এই সময়ে নিয়মিত উপোস। বর্ষার শুরু থেকেই ওদের শরীর শুকিয়ে রোগা হয়ে যায়। দেহের নীল শিরাগুলো আরও ফ্যাকাসে দেখায়। কিন্তু শুকনো চোখমুখে ক্লান্তির ছাপ। আজন্ম এই চলেছে। এসব কথা এরা কাউকে বলে না। কোন অভিযোগ নেই। দুঃখতো আছে, কিন্তু চুপচাপ চেপে রাখে। রোগ, শোক, অনাহারের দিকে অবাক, অসহায় চোখে তাকিয়ে থাকে। জীবন, পৃথিবী সম্পর্কে একটা গভীর নিরাশক্তি আর উদাসীনতা জমা হয়। এখানে কারো অসুখ হলেই ধরে নেওয়া হয়, সে বাঁচবে না। জেল বা হাসপাতাল থেকে ফিরেছে এমন লোক আঙুলে গোনা যায়। এভাবেই বহুকাল চলছে। এটাই নিয়ম।

ফসল কাটা শুরু হলে এই সব মানুষের চেহারা বদলে যায়। পরবে, মেলায় গাঁগুলো সেজে ওঠে। মাদলের শব্দে খুশীর বান ডুকে যায়। দু বেলা ভাতের দৌলতে শুকনো শরীরে স্বাস্থ্যের ঢেউ ওঠে। ঘুমন্ত স্নায়ু শিরায় জীবনের দাপাদাপি। এই একটা মরশুমেই বেপরোয়া পান ভোজন, নাচ গানে ওরা মানুষের মতো হয়ে ওঠে। সারা বছরের দুঃখ, কষ্ট, অনশনের কথা ভুলে যায়। শরীরে মনে রসদ সংগ্রহ করে রাখে। এখানকার সব মানুষই আসলে উট। বছরে ন' মাস তাদের মরুভূমিতে কাটে। সবুজ গাছপালায় ঘেরা লালমাটির দেশ বছরে নমাস গোরি, সাহারার চেয়েও ভয়ংকর। ক্ষিদের চেয়ে বড়ো আঁচ পৃথিবীর আর কোন চুলোয় আছে।

আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। টুকরো চাঁদ উত্তর পশ্চিমে ভেসে যাচ্ছে। রেবার সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার। দু-চার দিনের মধ্যে একবার কলকাতায় যাওয়ার ইচ্ছে আছে। পার্টি লাইন সম্পর্কে চারপাশে নতুন ভাবনা চিন্তা শুরু হয়েছে। সেগুলো শুনে থতিয়ে দেখা উচিত। বিপ্লব কারো ব্যক্তিগত একমুখেমি আর জেদের ব্যাপার নয়। অনেক ভাবনা চিন্তা, কিয়া, প্রক্রিয়ার ইতিহাস তৈরী হয়। রেবাকে এবার এলাকায় ঢোকাবে। প্রয়োজন হলে নিজের দায়িত্বে নিয়ে আসবে। রেবার কথা মনে হলে এক অদ্ভুত লজ্জা ওকে আচ্ছন্ন করে। কথার খেলাপ করে প্রায় পালিয়ে এসেছে। অথচ রেবার কানে সে নিজেই ফুসমন্তর দিয়েছে। গাঁয়ে যাওয়ার জন্য চাপ দিয়েছে।

অন্ধকার সঙ্গে সঙ্গে সুনোমাঝি হাজির হয়। অন্ধকার ফুঁড়ে যেন দুটো ছায়ার মানুষ জেগে উঠলো। ওদের সাড়া পেয়ে ক্রমাটবাঁধা মানুষগুলো দুপদাপ উঠে দাঁড়ায়। বন্দুক হেঁসো, সড়কি, বল্লম শক্ত হাতে বাগিয়ে ধরে। সুনো গাঁয়ের খবর দেয়—উরা গেরামবক্ষী বানাইচে। বন্দুক কাঁধে বাতভোর কুলি কুলি বল দেয়। কুথা থেকে বহুৎ আদমী এইচে। কি খাওয়া দাওয়া, নাচ গান ফুর্তি। সন্ধেবার পর ফল খেইয়ে পড়ি থাকে। শেষের খবরটাই আসল। ভাদুকে কম্যাণ্ডার বানিয়ে

রচনাবলী · গ্রন্থমালা

গিরিশ রচনাবলী

সমগ্র রচনা পাঁচখণ্ডে। ১ম খণ্ডের সম্পাদনা ডঃ রথীন রায় ও ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য। অন্য খণ্ডগুলির সম্পাদনা ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য। কয়েকটি বিশেষ প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট। প্রতি খণ্ড পঁচিশ টাকা।

বঙ্কিম রচনাবলী

সমগ্র রচনা দুই খণ্ডে। যোগেশ বাগল সম্পাদিত। প্রথম খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস (১৪টি) ঃ কুড়ি টাকা। দ্বিতীয় খণ্ডে সমগ্র সাহিত্য-অংশ ঃ বাইশ টাকা।

মধুসূদন রচনাবলী

ইংরেজিসহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে। ডক্টর ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত। বাইশ টাকা।

তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ

অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত। তিনখণ্ডে সমগ্র ছোট গল্প (প্রায় ২০০)। প্রতি খণ্ড চল্লিশ টাকা।

প্রতি খণ্ডে জীবনী ও সাহিত্যকীর্তি আলোচিত। সুন্দর ছাপা, বাঁধাই, প্রচ্ছদ।

সাহিত্য-সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলিকাতা ৯

স্কোয়াড গাঁয়ের দিকে এগোয়। পয়লা কাজ নির্মলাকে খালাস করা। তারপর হবে ঘনশ্যাম সিং-এর বিচার।

মাদারপুরে ঢোকার মুখেই ফাঁকা মাঠের মধ্যে গোবর্ধন দাসের বাড়ী। এখান থেকেই গাঁয়ের রাস্তা শুরু হয়েছে। দিকচিহ্নহীন অন্ধকারে গোবর্ধনের বাড়ীটা ডুবে আছে। ঘুমন্ত পৃথিবীর কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। ধানক্ষেতে ইঁদুরেরা ঘুরে বেড়ায়। শহরে গোবর্ধনের ভুষি মাল, পাট, তামাকের আড়ত। ফলাও ব্যবসা। গাঁয়ে আসে কম। ভোজপুরী দারোয়ান বাড়ী আগলায়।

কাঠের বন্ধ কপাটে ওরা ধাক্কা দেয়। কপাট খোলে না। প্রায় পাঁচ সাতজন মিলে দরজায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। হুড়কো ভেঙ্গে যায়। গোটা দল ভেতরে ঢোকে। মাটির দাওয়াতে চারপাই-এর ওপর দারোয়ান ঘুমোচ্ছে। এত শব্দেও জাগেনি। খাটিয়ার পাশে বন্দুক, পাঁচ ব্যাটারী টর্চ। দারোয়ানকে ওরা জাগায় না। ভদু নিজেই বন্দুক আর টর্চ হাতিয়ে নেয়। গাঁয়ের কয়েকটা কুকুর উঠোনে দাঁড়িয়ে বেকসুর চেঁচাচ্ছে। দারোয়ানের নাকেও প্রচন্ড গর্জন। তার মুখের কাছে নাক লাগিয়ে ভাদু শোঁকে। বলে—খুব মহুয়া খেঁইচে। বাঘা উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে। পুনাই বলে—সকাল থেকে ঢোকলা বুড়ি নখ বাজাইচে। তখনি বুঝেছি আজ জোর লড়াই বাঁধবে।

গাঁয়ের মুখে স্কোয়াড পৌঁছোতেই প্রতিরোধ বাহিনী বুঝতে পারে। চেঁচায়—চোর, চোর। ছড়িয়ে থাকা লোকজন লাঠি, বল্লম নিয়ে ছুটে আসে। পায়ের শব্দ, হৈ-চৈ।

ভাদু চড়া গলায় বলে—আমরা চোর নয়। পার্টির কর্মী।

ভাদুর কথা ফুরোবার আগেই নবহরি শ্লোগান তোলে। স্কোয়াডের সব কটা গলা সাড়া দেয়। তারপর শ্লোগানে শ্লোগানে আগুনের ঝড় বয়ে যায়। উদ্বেগ, ভয় হতাশার জমাট বরফ গলে বসন্তের হাওয়া খেলে।

প্রতিরোধ বাহিনীর লোকজন তখনও থামেনি। কিছু দূরে তখনও তাদের গলা শোনা যায়। ওরা এগিয়ে আসতে চাইছে। অথচ সামনে থাকতে চাইছে না কেউ। একে অপরের পেছনে আড়াল খুঁজছে। ঘন অন্ধকারে ওদের হাঁকডাক, কথা কাটাকাটির শব্দ।

ভজা কোথায়—কে যেন জানতে চায়।

সন্ধ্যে থেকে মাল খেয়ে ফ্যাট।

বড্ডো যব পালা ইষের আদমী।

কিশোর হঠাৎ উঁচুগলায় হুঁশিয়ারি দেয়—যারা আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবি মনের ডগায় তাদের কলজে উপড়ে আনবো।

ঠিক তখনই সুন্দোর হাতে জোরালো টর্চ জ্বলে ওঠে। টর্চের আলো লক্ষ্য করে ভাদু বন্দুক দাগে। নিশ্ছিদ্র ফাঁকা অন্ধকারে পরপর দুটো গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজ। আলোর বেশির ভাগটা ছুটে যায়। নিস্তব্ধ রাত কেঁপে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটোছুটি আর পালানোর হিড়িক লেগে যায়। অন্ধকারে গা ঢেকে, একদল কুকুর গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে। রাস্তার দু পাশে তেঁতুল আর অশ্বত্থ গাছ। ঘুম ভাঙা পাখীরা ডাকে, ডানা ঝাপটায়। প্রতিরোধ বাহিনীকে ওরা তাড়া করে। রাস্তার ধারে ছাই-এর গাদায় পড়লো একজন। পুনাই তাকে তুলে আনে। ছেলেটা ঘনশ্যামের ভাগ্নে। ভয়ে বলির পাঁঠার মতো কাঁপছে। প্রতিরোধ বাহিনীর পেছনে ওরাই এখন চোর চোর আওয়াজ দেয়।

সামনে একটা মস্তবড় গাদা। গাঁয়ের যত্তো গোবর সেখানে ফেলা হয়। পচা গোবরের সার চাষের কাজে লাগে। টর্চের আলোয় দেখা যায় গাদাটার পচা গোবরে কে একজন পোকার মতো হাবুডুবু খাচ্ছে। পুনাই তাকে টেনে তোলে। লোকটার গোটা শরীর গোবরে মাখামাখি। তাকে চেনা যায় না। লোকটা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। হাঁড়িয়ার নেশায় চুরচুর। গা থেকে পচা গোবরের দুর্গন্ধ বেরোয়।

হঠাৎ সে ডুকরে ওঠে—আমার জেতের সঙ্গে বহুর সঙ্গে বেইমানী কইরেচি। তুরা আমার সাজা দে। দারেম কর।

গলার স্বরে চেনা যায়, কুষ্ঠরোগী ভানচাঁদ, নির্মলার মরদ। বাঘা হঠাৎ পাগলের মতো তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিল, চড় লাথি চালায়। ভানচাঁদ মাটিতে চিৎপাত মুখে কোন শব্দ নেই।

টর্চের জোরালো আলো কাঁপাতে কাঁপাতে স্কোয়াড প্রতিরোধ বাহিনীর পিছু নিয়েছে। চোর চোর চীৎকার পাড়া গরম। বিরোধী পক্ষের বেশীর ভাগ ভিনগাঁয়ের লোক। দারুণ আতংকে অন্ধকারে পথ হারিয়ে তারা কোণঠাসা। মাথার ওপর দু হাত তুলে একজন কাঁদছে—আমি চোর নয়। ভলান্টিয়ার পার্টির লোক।

একজন ল্যাংড়া লোক কিশোরের পায়ের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে—ওরা আমাদের জোর করে এর মধ্যে ঢুকিয়েছে। আমাদের মারবেন না। ঘনশ্যামের ঘর কুধা-ভাদু গর্জায়।

সেই ল্যাংড়া লোকটা ওদের সঙ্গে করে ঘনশ্যামের বাড়িতে নিয়ে যায়। সোরগোল শুনে অনেক আগেই ঘনশ্যাম দোতলায় উঠেছে। দোতলায় অনেক গলার কান্না, চীৎকার। বাচ্চা আর মেয়েরাই বেশী। উঠোনে দু তিনটে টর্চ জ্বলছে। একটা শুকনো কাঠের স্তূপে কে যেন আগুন দেয়। দপ করে আগুন জ্বলতে চারপাশ আলোয় ঝলসে ওঠে। বিরাট খামার, অনেকগুলো গোলা খামারের শেষদিকে লম্বা গোয়ালে একপাল গরু মোষ। অবাক চোখে তাকিয়ে তার জাবর কাটে। কয়েকটা হাঁস পাঁক পাঁক ডাকছে।

দোতলায় ওঠার সিঁড়ির মুখে কৌটোর নারকিন মতো অদ্ভুত রকমের দরজা। শক্ত লোহার তৈরী। মাথা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে না দিলে খুলবে না। তাতে মাথা ফেটে রক্তারক্তি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। দরজা খোলো—ভাদু হুকুম দেয়।

অনেক গলা তাল মেলায়। গাঁয়ের গরীবেরা জড়ো হয়েছে। সুন্দোরা মাঝিকে দেখে তারা পুরো ঘটনা আঁচ করেছে। পুনাই বলে—দরজা না খুললে ঘরে আগ লাগিয়ে দেবো।

গোয়ালঘরের পাশ থেকে বাঘা হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে। দুজন সেখানে ছুটে যায়। বাইরে থেকে তালা দেওয়া একটা ছোটো খুপরি ঘর। শাবল দিয়ে তালার ওপর দুমা মারতেই সেটা ভেঙ্গে যায়। দরজা খুলে নির্মলা বেরিয়ে আসে। গোবরমাখা ভানুচাঁদ হঠাৎ পাগলের মতো অন্ধকার মাঠের দিকে ছুটে পালিয়ে যায়। নির্মলার আলুথালু চেহারা। কাপড়ে খড়কুটো, কাদার ছাপ। চোখে আগুন জ্বলছে। ঘরের মধ্যে খোল, ভুষি, ভেলিগুড়, জাবনার মাল-মশলা।

দোতলা থেকে তখন টাকা পয়সা, শাড়ী গয়নার বৃষ্টি হচ্ছে। ঘনশ্যাম চেঁচাচ্ছে—তুরা অমোয় শেষবারের মতো ছেড়ে দে। মরা বাপ মায়ের কিরা, কালই এখান থিকে চইলে যাবো।

নির্মলার চোখের দিকে তাকিয়ে কিশোরের বুক ধড়ফড় করে। ভয়ংকরী প্রলয় মূর্তি। বাঘার কানে ও বলে—তু ওকে নিয়ে আপনার ঘরকে যা। দেরী করিস নারে। বাঘা চুপচাপ ঘাড় নাড়ে। একসময়ে দুজনে অন্ধকার আলপথে মিলিয়ে যায়। উঠোনের মধ্যে শ খানেক লোক। কাঠের ধিকিধিকি আগুনে তাদের আবছা দেখা দেখা যায়। উঠোনে ছড়ানো জিনিসপত্র দু একজন টুকটাক হাত সাফাই করে। হঠাৎ কে যেন বলে —পুলিস! পুলিস আসছে। অনেক দূরে মোটরের রিরি ফিকে গর্জন শোনা যায়। পুলিস শব্দটা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। দুদ্দাড় পালানো শুরু হয়। কিশোর প্রথমটা বুঝতে পারেনি। কান পেতে ও ইঞ্জিনের শব্দ শোনার চেষ্টা করে। ছোঁড়া ছোঁড়া একটা আওয়াজ যেন কানে লাগে। ভাদুকে বলে—আর নয়। উঠোন ভর্তি বাসন, টাকা পয়সা গয়না। কেউ ছোঁয় না। নিমেষের মধ্যে চারপাশ খালি হয়ে যায়। কুকুরগুলো তখনো ডাকছে। বুরুং মাঝি, কির্তা, বীরসিংকে নিয়ে সুন্দো মাঝি যাবে বাহেজার জঙ্গলে। মাদারপুরের দক্ষিণে ওরা ঘুরপথ ধরেছে। বিকেলবেলায় সকলে মিলবে। কিশোর ভাবছিলো, পুলিসের আওয়াজটা কে দিলো? এখন ওর সন্দেহ, খবরটা ফাঁকা গুলির। হয়তো ভবে কেউ গাড়ীর শব্দ শুনেছে। আবার এটা একটা কাকতালীয় বুদ্ধিও হতে পারে। ভীড় হটিয়ে স্কোয়াডের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার মতলবে হয়তো প্রতিরোধ বাহিনীই এটা করেছে। কিন্তু ঘটনার কাজ হয়েছে। গোটা ভীড় ভয়ে চুপচাপ। ভীড়ের চরিত্রও বড়ো অদ্ভুত। এক পলকে পালাতে শুরু করলে কেউ আর দাঁড়াতে ভরসা পায় না। আজ থেকে দুমাস আগে এটা হতো না। তখনো আটুট সংগঠন, অসাধারণ মনোবল। সে অবস্থা আজ নেই। জোয়ার সরে মাটি জাগছে। সামনে বড়ো

নির্মম ভাটার দিন। এভাবে পালিয়ে আসার লজ্জায় কিশোরের নিজেকে খুব ছোটো লাগে। এরকম ঘটনা আগে হয়নি। ঘনশ্যাম আর তার দলবল হয়তো হাসছে। কিশোরের নিজেকে ভীষণ দুর্বল লাগে। মাথা ঘোরা। হাত পায়ে একদম জোর নেই। বন্দুকটি বইতেও কষ্ট হয়। ঘন ঘন শ্বাস পড়ে। পুব আকাশে ঘোলাটে অন্ধকার। শাল মহুয়ার জঙ্গলে পাখীরা জাগছে। তাদের টগবগে, জীবন্ত ডাকাডাকিতে আর একটা নতুন দিনের জন্ম হচ্ছে। কুয়াশার চিক সরিয়ে তরঙ্গী পাহাড়ের সবুজ শরীর অবছা দেখা যায়। লক্ষ কোটিবার পৃথিবীতে সূর্যোদয়ের পরেও মানুষের সূর্যোদয় দেখার রোমাঞ্চ মরে না। কিশোর পুব আকাশের দিকে চোখ রেখে হাঁটতে থাকে।

দিনগুলো আজকাল তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। বিকেল চারটে বাজতে না বাজতেই সামনে ছায়া নামে। এক ঝাঁক পায়রা কার্নিসের দখল নিয়ে গলা ফুলিয়ে ঝগড়া করে। লাল দীঘির জল গভীর কালো হয়ে যায়। শুধু বিশাল ভুঁড়িওলা সাদা গম্বুজটা শেষ বেলার আলোয় লাল হয়ে থাকে। হাওয়ায় পাতলা ফ্যাকাসে ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করে। অতীন আর সন্তুর জন্যে বেরা অপেক্ষা করছিলো। চারটে নাগাদ ওদের এখানে আসার কথা। পার্টির একটা জরুরী চিঠি ওরা বেরাকে দেবে। কালিঘাটে শ্যামাবিতলায় একটা বাড়ীতে সেটা আজই পৌঁছে দিতে হবে।

বাড়ী বন্ডী টেলিফোন মুছে আর চাকরী খুঁজে বেরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। মাথার মধ্যে সবসময়ে কেমন এক ভোঁতা, অসাড় অনুভূতি। বিগত কয়েকটা মাস, বছর ক্রমশঃ ধূসর, ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। মনে হয় অনেক কাল আগের স্মৃতি। সব ঘটনা আজকাল খেয়ালও করতে পারে না। কতো চেনা মুখ হেসে মজে হারিয়ে গেলো, তার হিসেব করতে ও সাহস পায় না। ছোট্ট রুমালে ও চোখ মোছে। চোখের জ্বালা তবু কমে না।

প্রভাদির বাড়ীতেই অতীন আর সন্তুর সঙ্গে দেখা হয়েছিলো। ওরা দুজনেই দীপ্তিময়ের বন্ধু। প্রভাদির বাড়ীতে আগে থেকেই আসা যাওয়া ছিলো। এখনও যোগাযোগ রাখে। বেশ রাত করে আসে। খাওয়া দাওয়া সেরে বিশ পঞ্চাশ টাকা দিয়ে চলে যায়। দুজনেই পার্টির নেতৃস্থানীয় কর্মী। পুলিশ খুঁজছে। হুকুম আছে দেখা মাত্র গুলি করার। প্রভাদি আলাপ করিয়ে দিয়েছিলো। সন্তুর প্রশংসায় প্রভাদি পঞ্চমুখ। বড়ো খোকার টাইফয়েডের সময় কি সেবায় না করেছে। ওষুধ আনা, ডাক্তার ডাকা, রাত জাগা কিছুতেই পেছপা নয়। এই দুজনকে দেখলে প্রভাদির বুকের মধ্যে যেন বন্ডস্তরণ হয়। পাথরের মতো চোখ মুখে বন্ড চলাচল করে। সন্তুর মুখের দীনতম শক্ত চামড়াও এসব কথায় কেমন যেন নরম হয়ে ওঠে। ভেতর থেকে আর এক সন্তু বেরিয়ে আসে। কি এক প্রচন্ড দয়ার আবেগের ধাক্কায় চোখে, মুখে চাপা খুশীর কিলিক নাচে। ফেটে পড়তে গিয়েও নিজেকে ও সামলে নেয়। খোলা জানালার বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে অতীন বসে আছে। প্রভাদি একপলক তাকে দেখে বলে—অতীনও কম নয়। বাড়ীশুদ্ধ আমরা কলকাতার বাইরে গেলুম। একা একা দশদিন এই বাড়ীতে ও কাটালো। চাল, আনাজ, মুড়ি, বিস্কুট, চা, চিনি ওর জন্যে রাখা ছিলো। কিছুই ছোঁয় নি। রথাজুনিকে চুটি দিয়ে দু বেলা দোকানের চা বিস্কুট খেয়ে কাটিয়েছে। আমরা ফিরে দেখি ওর চেহারা কাঠি হয়ে গেছে। লজ্জায় মাথা কাটা যাওয়ার অবস্থা। প্রভাদির মুখের দিকে তাকিয়ে অতীন গল্প গিলছে মুখে চোখে লজ্জা। সন্তু এবার পুরোনো কাহিনী শুরু করে। সবে সন্ধ্যে হয়েছে। দীপ্তিময় সদর দরজা আগলে দাঁড়িয়েছিলো। পেছনের রাস্তা দিয়ে বন্ধুরা পালাচ্ছিলো। সকলের শেষে ও বাড়ী ছাড়বে। কিন্তু সে সুযোগ আর পায় নি। স্কুলে পড়ার সময় একদিন বাল মুড়িওলাকে পয়সা দিতে ভুলে গিয়েছিলো। বিকেল বেলায় যখন মনে পড়লো। তখন মুড়িওলা চলে গেছে। পানের দোকানী, বাদাম ভাজাওলা এবং আরো কতোজনের কছ থেকে মুড়িওলার বাড়ীর হদিশ নিয়ে রাত প্রায় আটটায় দীপ্তিময় ধরে ছিলো তাকে। চোরবাগানের বস্তির একটা অন্ধকার ঘরে মুড়িওলা তখন বোটি চিরোচ্ছে। আবছা অন্ধকার সে দীপ্তিকে খেয়াল করতে পারে না। দীপ্তিময় দশটা পয়সা এগিয়ে দেয়। লোকটা তাজ্জব চোখে তাকিয়ে থাকে। তারপর কেঁদে ফেলে। মুড়িওলার বৌ হ্যারিকেনের শিখাটা বাড়িয়ে দেয়। অংকের স্যার বিজনবাবুকে মুড়িওলা নিজে গল্পটা বলেছিলো। দম বন্ধ করে প্রভাদি শোনে। দশ বিশ বার শোনা এই গল্প কিছুতেই পুরোনো, জীর্ণ হয় না। খাওয়ার পাট চুকতে রাত হলো। চারপাশ চুমে নিকুম। রাস্তায় কখনো গাড়ীর শব্দ, দমকা কাশির আওয়াজ। অন্ধকার ছাতে অতীন আর সন্তু সিগারেট খাচ্ছিলো। লম্বা গলায় কি যেন আলোনা লছে। বেরাকে দেখেই ওরা চুপ করে যায়। কথা বন্ধ করে আকাশ দেখে। কিছু আগের গালগল্প, অন্তরঙ্গতার উজ্জ্বল দুটো ঢোল এই অন্ধকারে কেমন অচেনা হয়ে যায়। বেরার বুকের মধ্যে জমে থাকা অনেক প্রশ্ন ওদের মিন্ডা হাভভাবে নেতিয়ে পড়ে। সাংগঠনীতি, লড়াই নিয়ে আর খোলাখুলির আলোচনা হয় না। কেউ কাউকে বিশ্বাস করছ না। পার্টি ভেসে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে।

কিশোরের কি খবর সন্তু হঠাৎ জিজ্ঞেস করে। বেরা একটু এগিয়ে যায়। অতীনের সিগারেটের আগুন ধিক ধিক জ্বলে।

বেরা বলে ওর খবর তো আপনাদেরই রাখা উচিত।

আগে যাওয়া অতীন জবাব দেয়। ওর কথার ধরণটা বেরার ভালো লাগে না।

কিছু সময় চুপচাপ। সন্তু বলে আপনাকে একটা দায়িত্ব দেবো। একটা চিঠি কাল পৌঁছে দিতে হবে।

কার চিঠি নীচু গলায় বেরা জিজ্ঞেস করে।

পার্টির— সন্তু বলে—সলিলের সঙ্গে পার্টি বসতে চায়। কিন্তু ওকে ধরতে পারছে না। ভবানীপুরে শঙ্খাবিপাড়ায় ওর এক দিদি আছে। শুনেছি সলিল মাঝে মাঝে সেখানে যায়। ওখানে দিয়ে আসলেই হবে। বেরা রাজী হয়ে যায়। সন্তু আর অতীনের চোখে চোখে কি যেন খবর বিনিময় হয়। তরল অন্ধকারে বেরা সবটা পরিষ্কার দেখে। চারপাশে লোকজনের ভীড় বাড়ছে। ট্রাম বাসের মারমুখী দৌড়, প্রতিযোগিতা। আফিস, কাছারি খালি করে রাস্তায় উপচে পড়ছে মানুষ। বেরা অস্থির হয়। সন্তুর চিঠিটা পৌঁছে দেওয়ার সময় উতরে গেছে। গম্বুজের বড়ো ঘড়িটায় ছায়া ঘন হয়। পশ্চিমের লাল আলোটা কে যেন হঠাৎ গুটিয়ে নিয়েছে। বেরা রুমালে মুখ চোখ মোছে। ঠিক তখনই পেছন থেকে কে যেন তার কাঁধে আলগোছে টোকা দেয়। মুখ ফিরিয়ে বেরা দেখতে পায় সন্তুকে চোখের ইসারায় সন্তু ওকে পেছনে আসতে বলে। ক্লিপিওর নির্জন কোনে একটা ছোট্ট, সাদা খাম সন্তু বেরাকে দেয়। খামের ওপরে কোনো ঠিকানা নেই। চাপা গলায় সন্তু জিজ্ঞেস করে—বাড়ীর নম্বরটা মনে আছে তো?

বেরা ঘাড় নাড়ে। আর কোনো কথা না বলেই সন্তু চলে যায়। বেরা একপলকে চারপাশ দেখে নেয়। ক্লিপিওর ভেতরে এদিকটায় লোকজন কম। দু-চারজন যারা আছে, তারাও নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। শুধু কাউন্টার থেকে একটা ঝুলফিওলা মুখ তাকিয়ে আছে। দুটো জ্বলজ্বলে চোখ। এই দৃষ্টি তার চেনা। বাস্তাঘাটে রোজ হাজার বার এর মুখোমুখি হয়। ছোট চামড়ার ব্যাগে চিঠিটা রেখে বেরা ব্যাগটা ব্যাউজের তলায় ঢুকিয়ে দেয়। এখনই একবার বাড়ী ফেরা দরকার। মাকে আজ দেখতে যাওয়ার কথা। সেখান থেকে যাবে প্রভাদির কাছে। অফিসের ভীড় কমলে একটু রাত করেই চিঠিটা পৌঁছে দেবে। ট্রাম ধরার জন্যে ও রাস্তা পেরোয়। মনের মধ্যে বেশ খুশী খুশী ভাব। অনেক দিন পরে পার্টি তাকে একটা কাজ দিলো। অথচ এক সময়ে তাকে ছাড়া পার্টির চলতো না। রোজ সকালে ঘুম ভেঙেই মনে হয় আজ কিশোর আসবে। তাজা গোলাপী সূর্যের আলোয় ভিজে টিজে পৃথিবী তখন আড়মোড়া ভাঙছে। হাওয়ায় নরম ফিকে গন্ধ ভাব। সদ্য ঘুম ভাঙা চোখে নতুন দিনের পাশাপাশি পৃথিবীটাকেও নতুন লাগে। আলতো সুরে বকতে তখন অদ্ভুত বিস্ময়ের বাজনার ধ্বনি। চোখ বুজে অনেকটা সময় এভাবে শুয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়। তারপর নিজের মনেই হেসে ওঠে, এখনো ছেলেমানুষি কাটলো না।

(চলবে)

রুপোলী চকের লালপদ্ম

অমল আচার্য

ধারালো ছুরির টানে মরা জন্তুটার ঢাউস পেট দু ফাঁক হয়ে যাওয়া মাত্র হুড়-মুড় করে বেরিয়ে এলো দুর্গন্ধময় নাড়ি-ভুঁড়ি। চামড়ার কোষ চুঁইয়ে জলকাটা রক্ত জাপিয়ে উঠল সারা পেট এবং সেব্রত হয়ে ঝরতে লাগল অনর্গল। থলথলে কাদামাটি মুহূর্তে মাখামাখি হয়ে গেল রক্তে। রুপচাঁদ তার রোমশ হাত দুটো জন্তুটার পেটে ঢুকিয়ে দিয়ে বিপুল টানে উপড়ে আনে পাকস্থলী, যা তার আঙুলের চাপে ফেটে গিয়ে উগরে দেয় যাবতীয় ময়লা। যেন নরক ছাড়িয়ে পড়ে।

রুপোলীচক বিলের তীরঘেঁষা গভীর জঙ্গলের শরীর জুড়ে জটিল অন্ধকার তখন। আদিম রহস্যের মত দাঁড়িয়ে আছে বিশাল বিশাল গাছ, গাছের সারি। সহসা হাতে নিজেদের মধ্যে ঝাবলাঝাবলি শুরু হয়ে যায়, মাঝা ঠোকাঠুকি চলে---যখন হু-হু করে ছড় ছুটে আসে বিলের জল তোলপাড় করে। অরণ্যের অট্টহাসি মুচিপাড়ার হৃৎপিণ্ডে আতংক ছড়ায়। কারণ ঝড় উঠলে বৃক্ষদৈত্যরা গাছ থেকে নেমে আসে, মুচিপাড়ার আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায়, সুযোগ পেলেই গলার নলি কামড়ে ধরে রক্ত শুষে নেয়।' সংস্কার নয়, এটা বিশ্বাস তাদের।

রুপচাঁদের ক্ষিপ্রহাত কুক্ষ করে যাচ-ছিল নিপুণ। তার মত শিল্পী একটাও নেই এ তল্লাটে। তার হাতের কাঠি ডেলকের টান টান চামড়ায় বোল তোলে গমগমিয়ে। সে তখন অন্য মানুষ। তার দীর্ঘ খোদাইকরা তেজালো শরীর টসটস করে ঘামে। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া পিঙ্গলবর্ণা চুল তালে তালে নাচে ঘাড়ে, কপালের চওড়া পাটায় হাতের যাদু তৈরি করে সুরের সম্মোহন।' জোতদারমশাই পেল্লাই গোঁফে টুসকি মেরে তারিপ করেন, সাবাস! মেয়েদের শরীরে ভর করে উর্বশী, গভীরগোপনে তাদের শরীর দোলে, তাল ঠুকে রায় দ্যা। মন্ত্রবন্দী সাপের চোখের মত চকচক করে রুপচাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী জোয়ান জোয়ানদের চোখ। আর ভিড়ের মধ্যে গলা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে চন্দ্রকলা। তার কালো চোখে ভাসতে থাকে 'এক যে ছিল রাজার কুমার'। সাত গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়ে জোতদার বাড়ি অষ্টমী পুজোর দিন, সেদিনই আরতির বাজনা বাজায় রুপচাঁদ। রুপচাঁদের বাজনা ছাড়া পুজো হয় না জোতদার বাড়ি।

গরুটার গা থেকে ছাল ছাড়িয়ে নিয়েছে রুপচাঁদ। বিলের জলে ভাল করে ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলেছে সেটা। এখন তাল তাল মাংস কেটে ধামাতে রাখছে সে। নান্টু মহাজনের কালো গাইটা কদিন ধরেই নিখোঁজ। গা উলোটপালোট করে ফেলল ' মহাজন। খোঁয়াড় দেখে বেড়াল একটার পর একটা।' থানার মেজবাবু এসে জনে জনে শাসিয়ে গেল। গাই-এর খোঁজ মিলল না তবু। মহাজনের বুকফাটা নিশ্বাস পড়ল কত। বড় সাধের গাই তার। দিনে ছ' কেজি দুধ দিত। গাঢ় মিষ্টি দুধ। দুবেলা কেজি-দুয়েক ওই দুধ পেটে না গেলে সুখ হত না মহাজনের।' তার ওপর গ্রামের গরীব লোকদের ভয়ানক রাগ। চড়া হারে সুদ দিতে দিতে নাকাল তারা। মাথার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে আছে তার কাছে। মহাজনের স্থির বিশ্বাস গরুটা খোয়া যায়নি। বদমাইসি করে লুকিয়ে রেখেছে কেউ। তাই তক্কে তক্কে আছে মহাজন, গাঁয়ের বাইরে দুধেল গাইটা যাতে পাচার না হয়। নজর আছে মুচিপাড়ায়।' ন্যাড়াবা মরা গরুর শ্বাসে খায়। ছালচামড়া হাড়গোড় কই যায় না, বেচে পয়সা কামায়।' ওদের শকুনের চোখ। গরু মরলে কথা নেই, মচ্ছপ লেগে যায়।

রুপচাঁদের মনেও টিকটিকানি ছিল। ওর কেবলই মনে হয়েছে গরুটা নির্ঘাৎ বনে-জঙ্গলে মরে পড়ে আছে।' নান্টু মহাজনের গরু চুরি করে, কলজের এমন জোর সাত-গাঁয়ে নেই। তাই সে বনজঙ্গল যতটা পেরেছে হাটোপাটি করে বেরিয়েছে, গরুটার তল্লাস পায়নি। তার রকম দেখে চন্দ্রকলার ঠোঁটের ফাঁকে গুরগুরিয়ে উঠেছে বাঙ্গ।

বলেছে : ভাগাড়ে নজর কেবল। মাংসর জন্যে যখন এতই নালুচেপণ্যা, শিকারে যাও। রুপোলীচক বিলের বনে গোসাপ আছে অনেক। বিঁধিয়ে আনো দু-চারটে।

কথাটা ঠিকই বলেছিল চন্দ্রকলা। শিকারে রুপচাঁদের হাতের মাপ নির্ভুল। গুলতির টিপে অনেক ঘোরেল, বক, বনহাঁস খতম করেছে সে। বর্ষার ফলায় গেঁথেছে গোসাপ। ঝুরপেট্টা মাংস খেয়েছে, সঙ্গে তাড়ি। নেশার মৌতাত শুরু হয়ে যেতেই কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছে ঢোল। ঢোলে কাঠি মেরেছে। টং টং করে কথা কয়ে উঠেছে ঢোল। ঢোলের বাজনা শুনে মুচিপাড়ার মোড়ল খেলো হুঁকো টানতে টানতে স্যাঙাতদের বলেছে, রুপী হারামজাদা জোর তাড়ি গিলেছে। না হলে ঢাকে বাড়ি দেবে কেন? মা দুর্গার পুজো ছাড়া ও ঢাকে কাঠি মারে না। তারা-

চরণ কাছে দাঁড়িয়ে তার আঙুলের প্যাঁচ বুঝে নেয়ার মনোযোগী চেষ্টা চালায়। প্রেতদার বাড়ি অষ্টমী পুজোর বাজনা বাজানোর লোভ তার দীর্ঘকালের। কিছুতেই সে রূপচাঁদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না বাজনায়। নেশায় মশগুল রূপচাঁদ তারাচরণের ঠাণ্ডা মুখের দিকে তাকিয়ে জড়ানো জিভ মুচড়ে বলে : দেখছিস কি শালা? একি আমি বাজাই, আকাশের দিকে চোখ তুলে বলে : তেনারা এসে ভর করেন বলেই তো বোল্ ওঠে।

রাত ডরিয়ে উঠলে এবং তাড়ির বিষ রক্তস্রোতে গণ্ডগোল শুরু করে দিলে রূপচাঁদের অন্য নেশা চাগিয়ে ওঠে। মুচিপাড়ার শেষ মুড়োর খলমুচির বাড়ি। খলু ছিল নামকরা ওঝা। সাপে কাটলে মন্ত্র পড়ে বিষ নামাত। ভূত-প্রেত দৈত্য-দানোয় ধরলে তার সবষে পড়ায় ঝাপ-ঝাপ করে পালাত ভূত-প্রেতের দল। কপাল দেখে বলে দিতে পারত—ভবিষ্যত। তার হাঁকডাকের অন্ত ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য, ভূতের ওঝা ভূতের হাতেই মরল একদিন। খলুর উপুকা মেয়ে, চন্দ্রকলা কেঁদে ভাসাল পাড়া। পাড়ার মোড়ল থেকে শুরু করে তারাচরণ পর্যন্ত তার দাওয়ায় বসে ভরসা দিয়ে এলো : ভয় কি তোর? আমরা তো আছি?

সেই চন্দ্রকলায় ছলাকলায় বশ এখন জোয়ান-বুড়ো। তাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি দরদস্তুরের শেষ নেই। আসলে তার মনের নাগাল পাওয়া শক্ত। তার চোখের মায়ায় রূপোলীচক বিলের টলটলে জল। শরীরের জ্যামিতিক মাপে ইছামতীর বাড়বাড়ন্ত বর্ষা। হৃৎপিণ্ডে শূল ঢুকে যায় তার হাসির শব্দে। তারাচরণ তার পায়ে উপুড় হয়ে পড়ে যায় : একটু তাকা মাইরি আমার দিকে। তোর গোলাম হয়ে থাকব। পাশের গাঁ ধোল-মুণ্ডির মুচিপাড়া আর এ গাঁয়ের মুচিপাড়ার মধ্যে রূপোলীচক বিলের জঙ্গল। সেই জঙ্গল টপকে ছুটে আসে নয়নরাম। নয়নরামের চোখে সারাক্ষণ বিঁধে থাকে চন্দ্রকলা। চন্দ্রকলার শরীরের বাতাস তার রক্তস্রোতে ঘূর্ণি লাগায়। রামহরি ভটচায মুচিপাড়ার ত্রিসীমানা মাড়ান না, জাতের এমনি ভয়। তাঁকেও নাকি দেখা যায় রাতবিরেতে খলু-মুচির বাড়ির চৌহদ্দি। খলুর বাড়ির সীমানায় বকুলবাব ঝাড়। বকুলবাব মাকালী তুষ্ট। মাঘের তুষ্টির জন্যে ভটচাযকেও আসতে হয় মুচিপাড়া। চন্দ্রকলায় এমনি টান। চন্দ্রকলা রাণী—তার দেমাক দেখে রূপোলীচক বিলও বুঝি ঈর্ষা করে।

নেশা জমে গেলে রূপচাঁদ আবেকটা নেশা খোঁজে, অভ্যেস তার। তার বিশাল দেহ অন্ধকার ফুঁড়ে চন্দ্রকলার বাড়ির উঠোনে ছুস করে ভেসে ওঠে তখন। টাল-মাটাল পা ফেলে দাওয়ায় গিয়ে দাঁড়ায় রূপচাঁদ। লাথি মারে দরজায়। দরজা ঝন ঝন করে কেঁপে ওঠে। চন্দ্রকলা দরজা খুলে দাঁড়ায়। তার পিঠে কালো চুলের ঢেউ। অগোছাল শাড়ির ফাঁকে খুনী যৌবন গোখরোর ফণা তুলে তাকায়। বলে : আমি কি তোমার মাগ, তেরে দেখছ?

রূপচাঁদ বিশ্রীভাবে হাসে।

—বলে : সারা গাঁ দাপিয়ে বেড়াচ্ছিস। তোর মাজার হাড় ভেঙে দেব আমি।

—যাও, যাও অনেক মরদ দেখা আছে। ঠোঁট উল্টে বিদ্রূপ করে চন্দ্রকলা। দরজা থেকে সরে গিয়ে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। তার ঘরের কিছুটা দূরেই বেতঝাড়। বেতঝাড়ের পেছনে মেঠেল। মেঠেলের পাড়ে কবরখানা। ওখান থেকে ভেসে আসে শেয়ালের ডাক। সেদিকে তাকিয়ে থাকে চন্দ্রকলা।

চন্দ্রকলার বিদ্রূপে রূপচাঁদের পৌরুষে ঘা মারে। তার মেজাজ সপ্তমে উঠে যায়। বলে : দেখেছিস তো নয়নরাম তারাচরণের মত ভেড়ুয়ার দল, আর বুড়োহাবড়া। তোর কামড় দেখলে ঘেন্না পায়।

—মুখ সামলে কথা বলো কিন্তু। তাড়ি খেয়ে এসে মাতলামি হচ্ছে? ফুঁসে ওঠে চন্দ্রকলা।

—কোন্ ব্যাটা না তাড়ি খায়? পেটে ভাত জুটুক আর নাই জুটুক গোটা মুচিপাড়া শালা তাড়িতে ডুবে আছে। তুই কোথাকার সতীলক্ষ্মী হলি রে চন্দ্র?

রূপচাঁদ ঘরে ঢোকে।

অসম্ভব পা কাঁপছে তার। দু-একবার বমির উদ্গার নাভিমূল থেকে উঠে আসে মুখে। দাঁত চেপে সমঝে নিতে হয় তা। ঘরের এক কোনে মাচা। মাচার ওপর কাঁথা। চন্দ্রকলা শোয় ওখানে। পাশে কুলুঙ্গী। ল্যাম্প জ্বলছে। ল্যাম্পের শিস তীরের মত চোখা। ওদিকের জানলায় ঠায় দাঁড়িয়ে চন্দ্রকলা। মাথা ঠুসে রেখেছে জানলায়। আলো-অন্ধকারে মায়াবী দেখাচ্ছিল তাকে।

রূপচাঁদের রক্তে তাগুন ধরে গেল।

কিন্তু দ্রুত পাশ কাটিয়ে দুবেতের চলে গেল চন্দ্রকলা। বলল : তুমি যাবে, না লোক ডাকব?

চন্দ্রকলার কথা শুনে রূপচাঁদের সর্ব-শরীর ফুলে উঠল রাগে। কোমর থেকে বিশাল ছুরি শান্ শান্ রব করে আনে। ল্যাম্পের আলো পড়ে লোলুপ হয়ে ওঠে তার ক্ষুরধার জিভ।

—ডাক্ শালী, তোর কত মরদ আছে দেখে যাই আজ।

চন্দ্রকলা ছবির মত দাঁড়িয়ে থাকে।

—ডাক্? লাসগুলো কেমন ঝপাঝপ ফেলে দিই, দেখে নে একবার।

রূপচাঁদের ভয়ংকর মূর্তি দেখে ভয় পেয়ে যায় চন্দ্রকলা। হাত জোড় করে বলে : ওগো চেঁচিও না অমন। তোমার পায়ে পড়ি—।

—চেঁচালে কি হয়েছে, অ্যাঁ?

—লোকে ভাববে কি?

—লোকের ভাবার কি আছে।

—আমার কথাটা ভাববে না একবার? চন্দ্রকলার চোখে অনুনয় কাঁপে।

—তোর ঘরে তো হামেশাই লোক আসে। রূপচাঁদের কঠিন মুখে হাসি ঝলকায়।

—তারা এভাবে আসে না।

—কি ভাবে আসে?

—চুপি চুপি। খাটাসের মত।

নোঙরা খিস্তি দিয়ে বলে ওঠে রূপচাঁদ : কেন, আমি কি শালা চোর, যে চুপি চুপি আসব?

—তুমি কি তাহলে?

—আমি? থেমে যায় রূপচাঁদ। তার মুখে কথা ফোটে না। রূপচাঁদ তাকায় চন্দ্রকলার দিকে।

চন্দ্রকলার চোখ ঝাপসা।

—আমি তোর সোয়ামী। বিয়ে করব তোকে।

খিল খিল করে হেসে ওঠে চন্দ্রকলা। তার হাসির তোড়ে কেটে যায় রূপচাঁদের নেশা।

জিজ্ঞেস করে : হাসছিস কেন?

—কত শুনলাম।

পিত্তি জ্বলে যায় রূপচাঁদের। বলে : কারা আসে তোর ঘরে?

হাসি থামিয়ে বলে চন্দ্রকলা : কে না আসতে চায়। কিন্তু ঘরে ঢুকতে দিই না কাউকে। প্রেম-পীরিত সব দাওয়ায় বসে।

—মিথ্যে কথা। তোর ন্যাকামি দশ গাঁয়ের লোক জানে।

—করি পেটের দায়ে। কিন্তু ইজ্জত দিই নি। চন্দ্রকলার চোখ জ্বলে ওঠে।

—বিশ্বাস করি না।

—তোমার গা ছুঁয়ে বলছি। চন্দ্রকলা রূপচাঁদের হাত ছোঁয়। জানলা গলে দমকা হাওয়া আসে ঘরে। ল্যাম্প-এর শিস বার-কয়েক ছটফট করে স্থির হয়ে যায়। চন্দ্রকলার উষ্ণ নিশ্বাস রূপচাঁদের বুকে অসুখ ছড়ায়। রূপচাঁদ চন্দ্রকলাকে সাপটে ধরার জন্যে বাগ্র হাত বাড়িয়ে দেয়। সরে যায় চন্দ্রকলা।

বলে : না—।

—তোকে একটু আদর করতে দে। কোনোদিন দিসনি তো চন্দ্র। রূপচাঁদ মিনতি করে।

—না। চন্দ্রকলার ঠোঁট কাঁপতে থাকে।

—আমি তোকে সত্যিই বিয়ে করব পাগলি। রূপচাঁদ এগোয়।

চন্দ্রকলা পিছোয়। —না।

রূপচাঁদ থামে। —না কেন?

—নিষেধ আছে।

—কার?

—ভগবানের।

—ভগবানের? কে বলেছে তোকে? হা হা করে হাসে রূপচাঁদ।

—বাবা।

—কি বলেছে তোর বাবা?

—যে আমাকে বিয়ে করবে, সাতদিনের মধ্যেই মারা যাবে সে। কপালে লেখা আছে। একথা বলেই কেঁদে ফেলে চন্দ্রকলা। কাঁদতে কাঁদতে তার শরীর ভাঙচুর হয়ে যায়। তা দেখে মায়া হয় রূপচাঁদের।

বলে: তা হোক—আমি বিয়ে করব।

শিউরে ওঠে চন্দ্রকলা। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যায় তার মুখ।

—না, না, ও কথা মুখে এনো না তুমি। হাঁপাতে থাকে চন্দ্রকলা।

শান্তভাবে বলে রূপচাঁদ: বিধান নেই কোনো?

—সে আরো ভয়ংকর। খোলা জলনালার কাছে সরে যায় চন্দ্রকলা। রূপোলীচক বিলের ধারে শ্মশান। শ্মশানের ঈশান কোনে লাল পদ্ম ফোটে। আসলে ওগুলো পদ্ম নয়, মরা মানুষের নাড়ি——যা অগুনে ভস্ম হয় না, পদ্ম হয়ে ফুটে থাকে জলে। অমাবস্যার মাঝরাতে ওই পদ্ম ছিঁড়ে এনে আমার বুকে যে ছুঁইয়ে দেবে, তার সঙ্গে আমার বিয়ে হলেও সে মরবে না। কিন্তু ওই পদ্ম ছিঁড়তে দেয় না অপদেবতার দল। তারা ঘুরে বেড়ায়। কেউ গেলে ঘাড় মটকে খুসে রাখে বিলের জলে।

তাচ্ছিল্য ফুটে ওঠে রূপচাঁদের মুখে। এই বিধান? সামনের অমাবস্যাতেই যাব আমি।

—না, না। হাহাকার করে ওঠে চন্দ্রকলা। তুমি যাবে না। কিছুতেই যাবে না। আর থেকে এই ভালো। তুমি বেঁচে থাক।

গাব গাছের ছায়ায় বসে ধামা বাঁধছিল রূপচাঁদ। ধান কাটার মরশুম শেষ হয়ে গেছে। এই সময়টা বড় কষ্টে চালাতে হয় তাদের। ধামা কাঠা বুনে, লোকের বাড়ি বাড়ি চাল ছেয়ে যা কিছু আয় হয়, দুবেলা দুমুঠো মোটা আলো চালের ভাতও জোটে না তাতে। খুব ভোর থেকেই কাজে লেগেছে রূপচাঁদ। এর মধ্যে একটা ধামা বাঁধাও হয়ে গেছে তার। আরেকটা চলছে। এটা শেষ করে, রায়বাবুদের বাড়ি। রায়বাবুর ঝরনা ঘরের বেড়া বেঁধে দিতে হবে তাকে। বলে গেছেন রায়বাবু। যাওয়ার আগে ধামা দুটো পৌঁছে দেবে মিত্তির বাড়ি। মিত্তিরবাবু ফরমায়েস। পৌঁছে দিলেই হাতে নগদানগদি তিন টাকা। বেত মিত্তিরবাবুর। মুজুরি তার। মুজুরির দাম তিন টাকা—। রূপচাঁদ বিড়ি ধরায়।

মাটির কলসী কাঁখে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে মা। মা'র মুখের দিকে তাকালে বাবার কথা মনে পড়ে যায় তার। শেল সনে মারা গেছে বাবা বলেছিল। অচ্ছুত ফকিরের ধন্বন্তরি জলপড়াও ফেল মেরে গেল। বাঁচল না বাবা।

মা তাকাল তার দিকে, তাকিয়ে বেরিয়ে গেল জল আনতে। টিউবঅয়েল মাইল-খানেক পথ। খরার সময় এখন। জল ওঠে না তেমন। গোটা মুচিপাড়ায় টিউবঅয়েল মাত্র একটা। হালে বসেছে। নইলে ইছামতীর জল খেয়ে জীবন বাঁচিয়েছে তারা।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বলে গেল মা: ঘরে নেই কিছু রুপো, খেয়াল রাখিস।

রূপচাঁদ খুব একটা ঘাবড়ায় না। মিত্তিরবাবুকে আগেই বলে রেখেছে, বাবু—কাজ মিটে গেলে নগদ বিদায় করবেন। হাত টান বড়। রায়বাবুর সঙ্গেও সেই কথা বলে নিয়েছে আগেভাগে। সুতরাং ধামা নিয়ে রূপচাঁদ মিত্তিরবাড়ি গেল। মিত্তিরমশাই ফুলের বাগান তদারকিতে ব্যস্ত। শখের বাগান তাঁর। রূপচাঁদকে দেখে বললেন: ওখানে নামিয়ে রাখ। আঙুল দিয়ে জায়গা দেখিয়ে দিলেন মিত্তির। চাকরকে বললেন, গোবর জল দিয়ে ধামা দুটো ধুয়ে ফ্যাল। ধুয়ে গোয়ালঘরে নিয়ে যা।

চাকর চলে গেলে মিত্তির ঠোঁট উল্টে বললেন: ভাল কানাসনি তুই। ফাঁকি দিয়েছিস। রূপচাঁদ হাত কচলে বলল: আর দিয়েছি একটু। তাড়াতাড়ি তো?

মিত্তির কোনো কথা না বলে বাগান দেখছিলেন। কিছুক্ষণ পরে রূপচাঁদকে জিজ্ঞেস করলেন: দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

হেসে বলল রূপচাঁদ: বাবু, মুজুরিটা তো পেলাম না?

—পাবি, পাবি। ওবেলা আসিস, দিয়ে দেব।

—আমার যে খুব দরকার ছিল বাবু!

—বড় ঠ্যাটা হয়েছিস তো? বলছি, ওবেলা আসিস। দেখছিস না কাজ করছি?

রূপচাঁদ অনুরোধ করল: টাকা চাই না বাবু। চাড্ডি চালের আজ্ঞা করুন না হয়।

মিত্তির বেশ রাগত স্বরেই বললেন এবার: বিরক্ত করিস না, যা এখন।

তবু সে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ, যদি মিত্তিরের মন ভেজে। কিন্তু মিত্তির একবার পেছনে ফিরেও তাকালেন না। তখন বেরিয়ে পড়ল সে। পথ হাঁটছিল অন্যমনস্ক। পথে দেখা হয়ে গেল চন্দ্রকলার সঙ্গে। রূপচাঁদ কথা বলল না। পাশ কাটিয়ে চলে গেল। সাধারণত এরকম করে না সে। যখনি দেখা হোক, চন্দ্রকলার সঙ্গে একটু হাসি মস্করা করেই থাকে। চোখে চোখে কথা চালাচালিও করে নেয় হরেকরকম। কিন্তু তার মাথায় এখন অন্য চিন্তা। রূপচাঁদ বেইমানি সহ্য করতে পারে না। সে নিজেও করে নি। অথচ মিত্তির....।

আর রকম দেখে চন্দ্রকলা ফিক করে না হেসে পারে না।

রায়বাড়ি কাজ শেষ হতে বিকেল হয়ে গেল। এর মধ্যে একবার জলখাবার পেয়েছে —চিঁড়ে গুড়। পুরোটা খায়নি। গামছায় বেঁধে রেখেছে আধেক। মা জানে। কাজ হয়ে গেলে ফিরিয়ে নিচ্ছিল রূপচাঁদ। রায়মশাই ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন কাজ। প্রসন্ন মনে হচ্ছিল তাঁকে।

রূপচাঁদের পেটে চোঁ চোঁ খিদে। মুখে জল কাটছিল। ক্লান্তও বেশ। সারাটা দিন বোদ্দুর মাথায় করে কাজ করেছে সে। অবশ্য এরকম কাজ করেই মুখের ভাত জোটাতে হয় তাদের।

বলল: বাবু, বাড়ি যাব।

—যা। খুব সহজভাবে বললেন রায়-মশাই।

—আপনি যেতে দ্যান কই? কঠিন হয়ে ওঠে রূপচাঁদের মুখ।

—মানে? ঘুরে তাকান রায়মশাই।

—পাওনাগন্ডা মিটিয়ে দিলেই তো যেতে পারি।

—অ এই কথা? বত্রিশপাটি দাঁত বার করে হাসেন রায়মশাই। কিন্তু, আজ যে লক্ষ্মীবার বাপু। ঘরের লক্ষ্মী কি বার করতে আছে?

যেন কবে মাথা ঘুরে যায় রূপচাঁদের। বন্ধুতাভাবু গরম হয়ে ওঠে। তবু নিজেকে সংযত রেখে বলে: আমরা তো একেতেই মরা। আর কতকাল এভাবে মারবেন বাবু?

—তুই তো বেশ লম্বা চওড়া বাত শিখেছিস? গায়ে হাওয়া লেগেছে বুঝি? উত্তেজিতভাবে কথা বলতে গিয়ে রায়ের মুখ দিয়ে থুতু ছিটকায়।

—তেমন আর লাগল কই? লাগে টের পাবেন সেদিন। রূপচাঁদ আর দাঁড়ায় না একমুহূর্ত।

চন্দ্রকলা বলেছিল, রূপোলীচকে বিলের বনে গোসাপ আছে অনেক। কিন্তু চন্দ্র জানল কি করে? নির্ঘাৎ নয়ন-রাম বলেছে তাকে। পথটা নির্জন। এপথে কদাচিৎ হাঁটাচলা করে গ্রামের মানুষ। তবে নয়নরাম গোপন প্রয়োজনে ব্যবহার করে থাকে পথটা। চুপিচুপি চন্দ্রকলার বাড়ি যাওয়ার সোজা পথ। নজরে পড়ার ভয় কম। এ গাঁয়ে আসার অন্য পথ আছে, সে পথেই লোকের চলাচল। সাধারণ কাজেকর্মে এলে নয়নরামও সেই পথে আসাযাওয়া করে। তার এই চালাকি অনেকদিন আগেই ধরে ফেলেছে রূপচাঁদ। নয়নরামও জানে। তাই সে রূপচাঁদের ছায়া মাড়ায় না বড় একটা। রূপচাঁদও গায়ে পড়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে চায় না। চন্দ্রকলাকে অবিশ্বাস করে না রূপ-চাঁদ। চন্দ্রকলা যেদিন বলবে, ও সঙ্গে সঙ্গে নয়নরামের এ গাঁয়ে ঢোকা বন্ধ করে দেবে। চন্দ্রকলা রূপচাঁদের গোয়ার্তুমি জানে। ইচ্ছে করেই বলে না। নয়নরাম মোড়লের ছেলে। পয়সাকড়ি আছে। ঝামেলা বাধলে রূপচাঁদের ক্ষতি, জীবনহানির আশঙ্কা। তাই ভেবে নিয়েছে চন্দ্রকলা। বাধ্য হবে নয়নরামের জ্বালাতন সহ্য করে যাবে। তবে নিজেকে কখনো অসহায় ভাবে না সে।

রূপচাঁদ জল ঘুরল কিছুক্ষণ। শিকার পেল না কিছু। বড় তেঁতুল গাছটার পাশে বাঁশঝাড়। বাঁশঝাড়ের নিচে মেঠেল। জল নেই। কাদা। মেঠেলটার চারধারে নরম

কাটি খোঁড়া। শুয়োর কোঁচো খেয়েছে মাটি খুঁড়ে। শুয়োরের পায়ের ছাপ। পুবদিকে নোনাফলের গাছ। ফল ধরেনি তখনো। সেদিকটা আসতেই দুটো বেজি লেজ তুলে পালাল। রূপচাঁদ শিস দিল। বাঁশঝাড়ে শব্দ হল কটকট। মাদার গাছের নিচে ফুল ঝরে আছে অজস্র। একটা ফুল হাতে তুলে নিয়ে বিলের দিকে তাকাচ্ছিল রূপচাঁদ, কিন্তু সে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা মোটাসোটা বনকাঁঠালের গাছ বেয়ে উঠে গেছে মেটে আলুর লতানো গাছ। গাছে থোকা থোকা ঝুলছে মেটে আলু। রূপচাঁদের চোখ চকচক করে উঠল। গাছে উঠে পড়ল সে। মেটে আলুর থোকা ছিঁড়ে গামছায় বাঁধতে লাগল। এগুলো পাড়া হয়ে গেলে গোড়া খুঁড়বে। গোড়া খুঁড়ে বার করে আনবে বিশাল আকৃতির ফল। মেটে আলু গামছায় বেঁধে নামছিল রূপচাঁদ। নামার আগে বিলের দিকে চোখ গেল। যেতেই চোখে পড়ল বিস্তৃ। তরতর করে গাছ থেকে নামল রূপচাঁদ। ছুটে গেল বিলের দিকে। বিলের জল ছুঁয়ে কাদাতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে জন্তুটা। নান্টু মহাজনের দুধেল গাই। রূপচাঁদ আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, কি মজা!

ধামা ভরে গেল মাংসে। এখনো অনেকটা বাকি। তাছাড়া তার হাতও ধরে আসছে। লেছে না আর। রূপচাঁদ ঠিক করল পাড়ায় ফিরে যাবে। অন্যদের ডেকে এনে বাকি কাজটা সেরে ফেলবে। এই ভেবে রূপচাঁদ মাংসের ধামাতে হাত রাখল। বাধা দিল নয়নরাম। চমকে পেছন ফিরে তাকাতেই রূপচাঁদ দেখল নয়নরাম একা নয়, সঙ্গে আর গাঁয়ের আরো বহু লোক।

রূপচাঁদ খাড়া হয়ে দাঁড়াল। বুক ভরে বাতাস নিল। তার হাত-পা রক্তাক্ত। রক্তাক্ত হাতে রক্তমাখা বাঁকানো ছুরি।

বলল : কেন?

—গরুটা আমাদের এলাকায় মরেছে। ওটা আমাদের। মোড়লি ঢঙে বলল নয়নরাম।

—এটা আমাদের এলাকা বলল রূপচাঁদ।

—বেশি কথা বলতে চাই না। মাংস রেখে চলে যাও।

—কেন, তোমার হুকুম? কপালের ঘাম আঙুলে কেঁছে ঝেড়ে ফেলতে লাগল রূপচাঁদ।

—হ্যাঁ, আমার হুকুম।

—চোপ্ শালা। রূপচাঁদ রুপা এগিয়ে আসে। নিজের বাপ কোনোদিন চোখ রাঙিয়ে কথা বলতে পারল না, তুই তো তুই। ছো—।

নয়নরাম দলের লোকজনের দিকে তাকিয়ে চোখের ইসারা করে। চারজন রূপচাঁদের দিকে এগিয়ে যায়। তাদের হাতে বাঁশের পাকানো লাঠি।

রূপচাঁদ মুহূর্তে অসুর হয়ে যায়। ভীষনভাবে চেঁচিয়ে ওঠে : খবরদার! খুন করে ফেলব। তার দৈত্যের মত চেহারা দেখে নয়নরামের বুক কাঁপে। চারজন লাঠিয়াল থমকে দাঁড়ায়। এদিকে রূপচাঁদের পাড়ার লোকজন চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ছুটে এসেছে। লোকের মুখে মুখে চাউর হয়ে গেছে সংবাদ। দুই মুচিপাড়া থেকে লোক এসে জড়ো হয়। দীর্ঘকালের বেষারেষি দুপাড়ায়। বাঘুদের মত ফেটে পড়ে দুদল। লাঠালাঠি শুরু হয়ে যায়। রক্তারক্তি ঘটতে থাকে। দুপাড়ার বৃদ্ধ মোড়ল মীমাংসায় বসে। ঠিক হয় মাংস আধাআধি বখরা হোক। তবে রূপচাঁদের দাবি বেশি, কেননা মৃত জন্তুটা আগে দেখেছে ও। আর পরিশ্রমও করেছে অনেক। সুতরাং চামড়াটা ওর। দুপক্ষ শান্ত হয়।

মুচিপাড়ার ঘরে ঘরে হুলোড় পড়ে যায়। গানবাজনা হতে থাকে। তাড়ির হাঁড়ি ফাঁকা হয়। হাঁড়িতে মাংস সেদ্ধ হচ্ছে। তার ঘ্রাণ বাতাসে মম। বুভোদের ক্লিভ ভিজে যায় লালায়। শিশুরা ভুলে গেছে ঘুম। তাদের কুটকুটে চোখ মাংসের হাঁড়ি করাবর। খুশিতে টইটম্বুর মুচিপাড়া। অনেকদিন পর প্রিয় মাংস খাবে তারা।

রূপচাঁদের মা বলে : বুঝলি রূপো, মোড়লের বাড়ি থেকে দুটো চাল কর্জ করে আনি। মাংস খাবি কি দিয়ে?

রূপচাঁদ বারণ করে। অন্যদিন হলে কি করত ঠিক নেই। কিন্তু আজ সে কারো কাছে খাটো হতে চায় না।

মাকে বলে : মাংস ধামা চাপা দিয়ে রেখে দে। কাল হবে।

মার মুখে কথা ফোটে না। শুধু দুঃখে বুক ভেঙে যায় তার। হয়ত মুচিপাড়ার অনেক মায়েরই বুক ভেঙে যাচ্ছে এরকম।

রাতে ঘুম আসে না রূপচাঁদের। রূপোলীচক বিলের তীর ঘেঁষা জঙ্গলে ঝড় উঠেছে। সেই ঝড় মুচিপাড়ার বুক ধরটে ছুটে যাচ্ছে লক্ষ্যহীন। অমাবস্যা রাত্রি। ব্রহ্মদৈত্যরা নেমে এসেছে মুচিপাড়া। মুচিপাড়ার আতঙ্ক এখন ঘরের বাইরে যাবে না কেউ। গেলেই মৃত্যু নিশ্চিত। অথচ রূপোলীচক বিলের লাল পদ্ম ডাকছে তাকে। আজ সেই রাত। রূপচাঁদ উঠে দাঁড়ায়। সারাদিন অভুক্ত মা ঘুমিয়ে পড়েছে। রূপচাঁদ অপেক্ষা করে না। হাতে ছুরি নিয়ে ঘোলাটে অন্ধকারে মিশে যায়।

জনশূন্য পথ। থাকাশে ঝড়বিদ্যুৎ। তুমুল বৃষ্টির মধ্যে পথ হাঁটে রূপচাঁদ। তার আশপাশ থেকে কারা যেন সরে যায় ফিসফাস। গাছগাছালির ফাঁকে ফাঁকে আগুনের মত জ্বলে কিছু, আবার নিভে যায়। শেয়াল ছুটে পালায়। বিলের জলে বানের ডাক। উথালপাথাল বিল। শ্মশানের কাঠ ভেসে যায় জলে। শ্যাওড়া গাছের ডালে ছেঁড়া মাদুর, হওয়ায় উড়ে গিয়ে আটকে আছে যা। হুহু হাহা অট্টহাসি—কারা যেন হাসছে ভয়ংকর। শ্মশানের ঈশান কোণে লাল পদ্ম। যেন মানুষের অসংখ্য ফুসফুস বিবামহীন ভাসছে জলে। হিলহিলে বিদ্যুৎ ফালাফালা করে দেয় আকাশ। চোখ ধাঁধিয়ে যায় রূপচাঁদের। বিলের জল বরফের মত ঠান্ডা। তবু জলে নেমে পড়ে রূপচাঁদ। কাদায় ডুবে যাচ্ছে তার পা। কেউ কি টেনে নিচ্ছে তাকে? পিশাচের মত হাসে রূপচাঁদ। তার হাসি লুফে নেয় হাওয়া। লোফালুফি হয়ে চলে মহাশূন্যতায়। মহাশূন্য আকাশের নিচে বিলের জলে সাঁতার কাটে রূপচাঁদ। ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে চলে, পা ভাসিয়ে দেয়। পদ্মর নালে আটকে যায় পা। ডুব মেরে নালের গোড়া উপড়ে আনে। পাগলের মত ছিঁড়তে থাকে লাল পদ্ম। সমস্ত পদ্ম তুলে ফেলবে সে, পদ্মর মালা পরিয়ে দেবে চন্দ্রকলার গলায়।

শ্মশান ছাড়িয়ে গ্রামের পথে পা দিল যখন, তখনি টের পেল রূপচাঁদ বৃষ্টি থেমেছে, ঝড়ও নেই। ঠান্ডা হাওয়া মাঝে-মধ্যে বইছে কেবল। মুচিপাড়ায় লোকজন অবসন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে এতক্ষণে। ব্রহ্মদৈত্যরা গাছে উঠে গেছে আবার। চন্দ্রকলাও জেগে নেই আর।

এক গুচ্ছের লালপদ্ম হাতে করে চন্দ্রকলার বাড়ির উঠোনে রূপচাঁদ পা রাখা মাত্র কবরখানার জঙ্গল থেকে শেয়াল ডেকে উঠল। জানান দিল, তিনভাগ রাত খরচ হয়ে গেল। আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল রূপচাঁদ। চন্দ্রকলার ঘর থেকে একটা লোক বেরিয়ে আসছে। কাঁঠাল গাছের গুঁড়ির আড়ালে লুকিয়ে পড়ল রূপচাঁদ। লোকটা তার পাশ দিয়ে দ্রুত চলে গেল। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। তবু নান্টু মহাজনকে চিনতে ভুল হয় না রূপচাঁদের।

রূপচাঁদের চোখে আগুন জ্বলে উঠল। তার বাহুমূলের পেশী পাহাড়ের মত শক্ত হয়ে যায়। খাঁজে খাঁজে চেপে বসে দাঁত। কপালের দুপাশে শিরা ফুলে ওঠে যন্ত্রণায়। দৌড়ে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়ায়। দরজা বন্ধ করার সুযোগ পায় না চন্দ্রকলা। তাকে ঠেলে ঘরে ঢুকে পড়ে রূপচাঁদ। রূপচাঁদ চুলের মুঠি ধরে চন্দ্রকলাকে বুকের কাছে টেনে আনে। দাঁতে দাঁত চেপে বলে : বেইমান!

কিছু বলতে চেয়েছিল চন্দ্রকলা। কিন্তু তার আগেই ধারালো ছুরি চন্দ্রকলার কণ্ঠনালীতে বসে যায় নির্ভুল। রূপচাঁদের হাত কাঁপে না একটুও।

পরের দিন সকালে দুটো ঘটনা শুনে মুচিপাড়া বোবা হয়ে গেল। নান্টু মহাজনের গরু মেরে খাওয়ার অপরাধে রূপচাঁদকে থানায় ধরে নিয়ে গেছে পুলিশ। আর ব্রহ্মদৈত্য চন্দ্রকলার গলার নলি ছেঁদা করে রক্ত খেয়েছে কাল রাতে। যাওয়ার সময় তার বুকে বড় যত্নে সাজিয়ে রেখে গেছে অনেকগুলো লাল পদ্ম। যা আগে ধরেনি কখনো।

ইতিহাস, বাস্তবতা ও দু'একটি জিজ্ঞাসা

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

তিনি শ্রীযুক্ত পাল ভালেরি, আমাদের পক্ষে মান্য একজন ফরাসী কবি একদা মন্তব্য করেন—জাযাছবি শুধু বাস্তবের ওপরের আস্তরণটাকেই আঁচড়াতে পারে। উক্তিটি আপাতভাবে সরল তাচ্ছিল্য হলেও মধ্যে স্পষ্টতাই কিছু চোরাস্রোত আছে যা চলচ্চিত্র নামের শিল্প মাধ্যমটির স্থায়িত্ব বিষয়ে আর্ত হয়ে ওঠে। এবং আমি বলতে চাই সত্যজিৎ রায়ের শিল্পচেতনা সম্পর্কিত যে কোন আলোচনায় এই প্রসঙ্গটির মীমাংসা করার গুরুত্ব দাবি করে। কিন্তু এভাবে আমি শুরু করতে চাই না

ফেব্রুয়ারি— ১৮৫৬। আমাদের যাবতীয় অপমান ও নিগ্রহে গোরা পল্টন হসে লক্ষ্ণৌ শহরের দিকে হেঁটে যায়। একটি কিশোর, আমাদের শীতার্ত দিগন্তরেখার নীচে, আমাদের বৃক্ষ পান্তর ও প্রাচীরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে বিস্ময়ের মতো। এরপরে সিনেমা হলের বাইরে শুধুই মিডিপবিহিত। তন্বীন কলহাস্য, শতরঞ্জ কে খিলাড়ীকে আর আমি কোথাও খুঁজে পাই না, না বকতে না স্মৃতিতে। পুনর্বীক্ষনে আমার মনে হয় শতরঞ্জ কে খিলাড়ী এমন এক চিত্রমালা যে সেখানে ঘন, ভূমি মসৃণ ও ঘনাশ তিমির প্রবাসী।

বেশ কিছুদিন ধরেই সত্যজিৎ রায় আমাকে নত ও স্তব্ধ করেন না। এযারও কলকাতা আমার কাছে নির্জন মনে হল না। সুতরাং আমি কি পচলিত রীতি অনুযায়ী বলব প্রতিদ্বন্দ্বী উত্তর যুগে এই প্রথম সত্যজিৎ রায়ের আর একটি শিল্পের সান্নিধ্যে এলাম বিস্তৃত পরিশ্রমের চিহ্ন যার সর্বাঙ্গে লিপ্ত? অথবা এই বলেই দায় সারব যে শতরঞ্জ কে খিলাড়ী পুনর্বার এমন একটি চলচ্ছবি যার প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের ফিল্ম নির্মাণ সম্পর্কে শিক্ষিত করে? এ সমস্তই সত্য আক্ষরিক অর্থে। তবু শেষ সত্য নয়। আমাদের পিলমি সভ্যতার মাঝখানে সত্যজিৎ রায় একটু বড়ো মাপের মানুষ। পথের পাঁচালির পঁচিশ বছর পরে তাঁর অসামান্যভাবে দৃষ্টি নন্দন ক্যামেরা চালনা কিম্বা মিতমাত্রার সঙ্গীত প্রয়োগ এবং রঙের অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলা অন্য অর্থে আত্ম-অবমাননারই নামান্তর।

আরও আমার অবাক লাগে যে আমার শিক্ষিত সহযাত্রীরা প্রায় প্রত্যেকেই রাজনীতি ও ইতিহাস সংক্রান্ত নানা কূটতর্কে ব্যস্ত। অথচ শ্রীসত্যজিৎ রায় শেষবিচারে একজন চলচ্চিত্র স্রষ্টা। আর দায়বাড় একটি সিনেমা। আলোচ্য ছবিটি কি আলোক-চিত্রিত তৎকালীন ইতিহাস? মনে হয় না স্বয়ং স্রষ্টার তা অভিপ্রেত। ইতিহাস সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট ভাষণ চাই? —অধ্যাপক রমেশ মজুমদার বা পানিক্করের কাছে যাব, এমনকি অন্য অন্য মৌলিক গবেষকের কাছে., সত্যজিৎ রায়ের সমীপবর্তী না হয়ে। একজন প্রতিভা-ধৃক্ত পুরুষের কাছে আমরা যদি তাঁর শ্রেষ্ঠ দান চাই, কোন দ্বিতীয় স্তরের দান নয়, তা হলে তা পেতে পারি সেই বাক্যের পরিধির ভিতরেই শুধু যেখানে তাঁর প্রতিভার প্রণালী ও বিকাশ তর্কাতীত। ট্র্যাজেডিক। এখানেই যে অসময় সমাজ ও ইতিহাস বিষয়ে আমাদের অত্যুগ্র আগ্রহের সমাধান পেতে চাইছি কোন শিল্পীর মধ্যে ঐতিহাসিক হওয়ার প্রবণতা যার রচিতে নেই। তা হলে, আমি নিজের প্রতি খুব মূঢ় প্রশ্ন রাখি—এ ছবি সুজনের মূলে উদ্দেশ্য কি?

যা দেখলাম, বৃটিশ সিংহের কুৎসিত দন্তপ্রদর্শনী তারেই পণ্ডিতেরা অ্যানেক্সেসন অফ আউধ বলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পাঁচালকমণ্ডলী কর্তৃক বাতিল ১৮৩৭ সালে লর্ড অকল্যাণ্ডের সঙ্গে সম্পন্ন নবাবের চুক্তির সোনার পাথর বাটি সুলভ অস্তিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনাটি এতই নির্লজ্জ নীতিহীনভাব নিদর্শন যে পর-রাজ্যলোলুপ গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহাউসি পর্যন্ত নিজেই পরিস্থিতিকে 'এশ্ব্যাবাসিং' বলে মেনে নিচ্ছেন (কার্য বিবরণী, ৫ই জানুয়ারি, ১৮৫৬)। উপরন্তু স্যার জর্জ কুপারের কাছে লেখা তাঁর চিঠিতে স্বীকার করছেন যে অসোধ্যা অধিকার আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা সমর্থিত নয় (১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৫৫)। অতএব রেসিডেন্ট হার্ডিঞ্জ জেমস উটরামের অসম্বন্ধিত ক্ষতপূর্ণ বিবেক দংশনে আর কতটা আইনগত জটিলতার পঙ্কে, সেটা বিবেচ্য বিশেষতঃ তাঁর স্মৃতিতে থেকে থাকবে ১৮৩০ সালে নাগপুর পরবাষ্ট্র সচিব লর্ড পামার স্টোনের সঙ্গে সম্রাট চতুর্থ উইলিয়ামের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মনান্তর।

সত্যজিৎবাবুর বর্ণনায় আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি থাকত না যদি না আর এক বছরের মধ্যেই আর্যাবর্ত নামক বারুদের স্তূপে অগ্নি সংযোজিত হত আর আগুনের সেই বিস্তারকে, কার্ল মার্কসের নাম করলে শুদ্ধ নম্বন তাত্ত্বিকরা বিরক্ত হবেন কিন্তু, সবিস্ময়ে লক্ষ্য করছি জেমস উটরামও স্বাধীনতা যুদ্ধ বলতে প্রস্তুত হতেন এবং আর কেউ নন পরবর্তীকালে প্রধান-মন্ত্রী ও তৎকালে ডাইরেক্টর পতি ডিজরেইলি তাঁর ২৭শে জুন, ১৮৫৭-র হাউস অফ কমন্স বক্তৃতায় তথাকথিত সিপয় মিউটিনির মধ্যে খুঁজে পেতেন জাতীয় বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ।

পাঠক ভুল বুঝবেন না, শতরঞ্জ কে খিলাড়ীতে ঐতিহাসিক তথ্য বিভ্রম আছে এরকম মন্তব্য করার মতো অশিক্ষিত উদ্ধত্য আমার নেই। ১৮৫৭-র ঘটনা সিপাহী বিদ্রোহ না স্বাধীনতা যুদ্ধ তা নিয়েও আপাতত আমার আলোড়ন নেই। আমার শুধু বক্তব্য যে আমরা কোথাও বুঝতে পারলাম না প্রায়ত বৃহৎ একটি ঘটনা ঘটল যা বিস্ফোরণতীতে পরিণত ভারতীয় সাহিত্যকে বিচলিত করে এমনকি জনজীবনেও ছাপ ফেলেছিল।

পেলাম একটি নিটোল, স্বাদু ও বন্ধুবৈভবহীন গল্প, এক সুরেলা

সত্যজিৎ রায়

অবক্ষয়—মূল্যবোধের লড়াই আর মুখোশ ওড়ানো তো কাজের কথা নয়—যেখানে জনসাধারণ নেই। একদিকে মন্থর, নিষ্ক্রিয়, নপুংসক সামন্ততান্ত্রিক ভবিষ্যৎ অন্যদিকে বিদেশী রেসিডেন্ট অফিসারের কিছু কিছু পর্যবেক্ষণ, এক নিরুত্তেজ জগৎ যেখানে অপদার্থ নবাবের নীলরক্ত মুহূর্তের জন্য চলকে উঠে জঙ্গলের আহ্বানে হারিয়ে যায় আর জনিকের জন্য অবনত হয় উটক্রমের চোখ। বরং আমি এই অন্যাধির নৈতোর মধ্যে প্রাণের আভাষ পাই, মিরজা সাজ্জাদ আলির নব পরিণীতা বধূ যখন ফর্কশ চিৎকারে পরিচারিকাকে ডাকে। তার জলহীন কণ্ঠস্বরে লক্ষ্ণৌ ঘরানার ঠাঠামো লক্ষিত হতে পারে কিন্তু এই নিষ্ঠুর পরিবেশে সে, একমাত্র সেই জীবনের প্রতি অনুগত। বুঝিয়ে দিয়েছে ব্যর্থ নিশিথের বন্দনা।

নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ কোন-ক্রমেই শহীদ নন, এই পটভূমিতে প্রকাশিত স্বল্পের স্পষ্ট পক্ষপাতিত্ব দাবী করাও কষ্টকর, আমি শ্রদ্ধা করি এই সিনেমার অথেনটিসিটি। কিন্তু একজন মহৎ শিল্পীর সঙ্গে তো একজন সাধারণ ইতিহাস প্রণেতার তফাৎ থাকে। আর সেজন্যই মার্কস শেকস পীয়রের পক্ষে অতি সোজা মাইক রেমি ওয়াইডস অফ উইন্ডসরের একটি অংক খুঁজে পান এমন প্রজ্ঞান যা সমগ্র ষোড়শ শতকের ঐতিহাসিক ও সমাজ তাত্ত্বিক রচনায় ছিল না। পক্ষাবলম্বনের প্রশ্ন উঠে গেল, এ ছবি তথ্য চিরও নয় যখন, সেক্ষেত্রে, পরিচালক পাত্র-পাত্রীদের মনোস্তাত্ত্বিক অস্ত্রোপচারে অধিকতর নিবিষ্ট হতে পারতেন, ইতিহাসবেত্তাদের চোখ যেখানে পৌঁছয় না তাহলে আমরা ঘটনা থেকে সত্যে উত্তীর্ণ হওয়ার পথ খুঁজে পেতাম। তথ্য বস্তুগতভাবে অস্তিত্ববান মাত্র, সত্য তার মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী এক গোপন সুড়ঙ্গপথ যা আপেক্ষিকভাবে বিশেষ লক্ষ্যে মুকুতি পায়। সে সব কিছুই হয়নি। দাবাড়ু প্রথম স্তরের বাস্তবতায় মগ্নচৈতন্য আছে। আমরা কি তবে, মাও-সে-তুঙের বিশিষ্ট বাগ্‌বিধির প্রতি প্রণতি জানিয়ে, সবিনয়ে সিদ্ধান্ত নেব শতরঞ্জ কে খিলাড়ী বস্তুতে ঘটনার তরঙ্গ বিবল কাকাওয়াজ?

দাবার চাল পালটে যায়। সমস্ত গ্রন্থদের চরিত্র আমাদের জানা। সত্যজিৎ-বাবু নিরাবেগ দূরত্ব বজায় রেখেছেন। জন কীটস হয়ত একেই বলেছেন নেগেটিভ কেপেবিলিটি। আমাদের শিল্পবোধ ফরাসী অংগাগে শব্দটিকে সন্দেহের চোখে দেখে। আমি বলব তবু ইতিহাসে এমন বিরল কিছু পরিবেশ আসে যা উত্তর পুরুষের সংযোগ ও তাপ চায়। তখন সত্যজিৎ রায় সম্পাদিত বিষয়কৃতি ও অবজেকটিভিটি শিল্পের প্রতিমায় চক্ষুদান করতে পারে না। ১৮৫৬, একজন ভারতীয়ের পক্ষে সেই সময়। হায়! আমার আশঙ্কা, এই পরিকল্পিত নিষ্পাসকৃতি বস্তুখানি বার দান করতে পারে জাতীয় মূল্যায়নের দীপহীন সন্ধিক্ষণে?

খুবই নিচুতলে তুলনা হবে যদি বলি দ্বিতীয় পর্বের হাইনের মতো একদা লিরিক্যাল সত্যজিৎ রায়ের অধরোষ্ঠ জন-অরণ্য থেকেই অর্জন করেছে অপ্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ও ভিক্তৃতা। শতরঞ্জ কে খিলাড়ীর আশিরপদনলে একটি ঠাট্টার আবরণ যা প্রকট ও ঈষৎ সম্ভ্রমহীন আমিমেশন পর্বে। বুঝতে পারি, ক্ষমা করার অবসর তাঁর নেই। কিন্তু এই নিছক ঠাট্টার অন্তরালে যদি বরফ চলাচলে একটি বিরণ গান জন্ম নিত, নীতাবিধা থেকে ধেভাবে ধীরে ধীরে সঙ্গীতময় ও দীর্ঘজীবী নক্ষত্রের সূচনা হয়। আক্ষেপ অবশ্যই নয় তবু, হাইনের কথা উঠল বলেই মনে পড়ছে এঙ্গলস কোন সময় মার্কসকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন— ইতিহাসই শ্রেষ্ঠতম কবি, সে হাইনেকেও ঠাট্টা করতে জানে, হয়ত, আমাদেরও তব হচ্ছে, ইতিহাসই শ্রেষ্ঠতম কবি, সে একদা নীরব উত্তরা-পথে নবাব ওয়াজেদ আলি শাহকে বিদ্রূপ করেছিল, আজ প্রায় একশো কুড়ি বছর পরে দাবা খেলার ছকটির ওপরেও একটি তিক্ত কৌতুকচ্ছটা ছড়িয়ে যাবে না তো?

আসলে এরকম বিচারের তেমন অর্থ নেই। শতরঞ্জ কে খিলাড়ীর সংকটের জনবিতা সত্যজিৎ রায়ের আজীবন লালিত মানসিকতা। গোর্কির প্রাতস্মরণ সকালে তেওফিল গোতিয়ে যেমন, তাঁর ছবিও দর্শকদের স্বরাসরি জানিয়ে দেয় যে তিনি এমন একজন শিল্পী যার কাছে একমাত্র দৃষ্টিগ্রাহ্য বিশ্বই অর্থবহ। অতএব মেনে নিতে বাধ্য যে নিজস্ব সেই প্রদেশে বিহারকালে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীহীন জগতে ওঠেন স্ব-মহিম সম্রাটের প্রায় আর সঙ্গে সঙ্গে আবার লক্ষ্য করি এখান থেকে তাঁর সীমাবদ্ধতারও সূত্রপাত। শিল্প দর্শন নয় ঠিকই কিন্তু কোন না কোন প্রাতিস্বিক দার্শনিক মনোভঙ্গির দ্বারা পুনর্গঠিতও। অপবাদকে সত্যজিৎ কিছুতেই স্বীকার করবেন না শিল্পীর বাস্তবতা কখনও অভিজ্ঞতার সাদৃশ্য, গাণিতিক পরিভাষায় যাকে বলা যায় সেকেন্ড অর্ডার ইকুয়েশন। পুরুই ভিস্তোরিও ডি সিকা, রবার্তো রসেলিনি কিম্বা সত্যজিৎবাবুর ক্ষেত্রে নয়, আমার মনে হয়, পরম বাস্তবতার এই ফুটাভাস মন অন্বেষা নিওরিয়ালিজমের অস্থি মজ্জায় নিহিত। মনুষ্যত্বে বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও যেহেতু তা দর্শনশূন্য। সুতরাং শিল্পসত্তা ক্রমশ কৃশকায় হয়ে পড়ে বাস্তবের উপরিতলটুকুই আলোকিত হয়, প্রবোচিত করে না কোনভাবে।

সেজন্যই শতরঞ্জ কে খিলাড়ী সত্যজিৎ রায়ের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক এক চমৎকার ফাহিনী বিন্যাস, আদিতে এমনই মর্মান্তিকভাবে নিষ্কৃত যেন মনে হয় স্বয়ং গুস্তাভ ফ্লোবেয়ার যুগপৎ কলম ও বোধি বর্জিত ক্যামেরার আবেদনে প্রাণ পেয়েছেন।

উপলক্ষ্য : শতরঞ্জ

তুষার চৌধুরী

একটি উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র দেখার পর স্বভাবতই তা নিয়ে দশজনকে কিছু বলতে ইচ্ছে করে, মানে যা আমার প্রতিক্রিয়া। এ ব্যাপারে চলচ্চিত্র-বিশারদ হবার প্রয়োজন পড়ে কি? ছবি দেখার পরের প্রতিক্রিয়া দশজনকে

জানানোর উৎসাহ আসে ভালো ছবি দেখার অভ্যাস থেকে। এই অভ্যাসই কি যথেষ্ট? জীবনানন্দ বিষ্ণু দে সুধীন্দ্রনাথাদি কবিদের কবিতা পড়ার অভ্যাস থেকে আমরা যেমন তাদের কবিতার মূল্যায়ন করে থাকি তেমন কিছু কি করা যেতে পারে নিজ নিজ মত করে যন্ত্রধর চলচ্চিত্রকারদের শিল্পকর্ম নিয়ে? সিনেমারসিক বন্ধুরা বলেন, ফিল্ম, কবিতা নয় হে বাপু, ও নিয়ে চায়ের দোকানে বসে গলাতানি করতে পারে, লিখতে যাও কলম ভেঙে যাবে। এইসব ফিল্মপুলক বন্ধুদের কথার ভুল নেই। কবিতা চলচ্চিত্র নয়। কবিতা লিখতে চাই এক টুকরো কাগজ ১টি কলম ৩টি আঙুল ও ১টি ক্লান্ত মাথা। পাঠকের সংখ্যা ১০ থেকে ১০০০ যাই হোক কিছু এসে যায় না। অথচ ফিল্ম বলতে বোঝায় গল্প উপন্যাস, তা থেকে সাজিয়ে নেয়া চিত্রনাট্য, সেলুলয়েড, সঙ্গীত (লিরিক, কণ্ঠ, যন্ত্রসঙ্গীত), নটনটী, আসলী নকলী ঘরদোর মঠঘাট, ক্যামেরা বিজলী আলো শব্দযন্ত্র, কলাকুশলী, রসায়নাগার, ফড়ে, ভুড়িদাস, দয়ালু কুবের ইত্যাদি ইত্যাদি ও সবার ওপরে এই গোটা জিনিসকে নিজের মনের মত করে ঢেলে সাজাতে একজন স্থপতিপ্রতিম কারিগর যিনি পরিচালক। কম কথা নয়।

অতএব আপনি যিনি কবিতা পড়েন, লেখেন ও নিজের চশে মাননীয় কবিগণের মূল্যায়ন করেন, আপনি শুধু ঐই পারেন, নিজের ভাষায় শব্দ ছন্দ অলস চিন্তার মিলিত শিল্প পুনর্বিবেচনা করতে। আপনকে কখনোই খুঁজে মরতে হয় না চলচ্চিত্রের উপযুক্ত কালজয়ী বা কালোপযোগী গল্প উপন্যাস। আপনকে কখনোই সাজিয়ে নিতে হয় না একটি কাহিনীকে শব্দ ও চিত্রের নাটকের মত করে। আপনাকে মোটেই জানতে বুঝতে হয় না সঙ্গীততত্ত্ব, গীতরচনা, অভিনয়তত্ত্ব ক্যামেরা বা ধ্বনিতত্ত্ব। আপনাকে কখনো তালিম নিতে হয়েছে জীবনানন্দের টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে, ধরুন যখন তিনি লিখছেন 'বোধ' 'লঘু মুহূর্ত' ইত্যাদি কবিতা? ডাল ভাত মাছের ঝোল খেয়ে দিব্যি আছেন, সন্ধেবেলা চা সিগারেট বৈঠকখানা করেন একটু বাস্তবের দিকে মগজের উঁইঢিবিতে খোঁচাচ্ছেন। অথচ টেরই পাচ্ছেন না একজন চলচ্চিত্রস্রষ্টাকে নিরভিভাবক রমণীর মত প্রসববেদনা নিয়েই বেরিয়ে পড়তে হয়েছে সিজারিয়ানের টাকা যোগাড়ে।

অতএব এমন এক জটিল শিল্পমাধ্যমের গুণাগুণবিষয়ক প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস আপনার পক্ষে ধৃষ্টতারই নামান্তর।

কিন্তু তবু শিল্পরসিকের শিল্পজ্ঞান ও শিল্পপ্রতিভার দৈন্য সত্ত্বেও মিলিত বা বিচ্ছিন্ন সমালোচনা হয়েই চলেছে। আমরা ছোটবেলা থেকেই শুনছি সিনেমা বায়োস্কোপ মুভি। মানুষ অনেক কিছুই বলছে। ছবি। সিনেমায় তো আমরা চলমান ছবি দেখি। লোকে বলে, ফিল্ম। গোটা সিনেমাতো ফিলিমেই গোটানো থাকে। লোকে বলে, বই। কী বই দেখলেন? মানে কোন গল্প উপন্যাস আলোছায়া ধ্বনির কিয়াবিকিয়ায় শীততাপনিয়ন্ত্রিত নিরুপদ্রব কক্ষে একশ সোয়াশ মিনিটের অবসরে আপনাকে ভোজ্যবস্তু হিসেবে পরিবেশন করা হোলো। চলচ্চিত্রের এইসব অতি সংক্ষিপ্ত লৌকিক নামকরণ কি পাবলিক কিউরিসিজম নয়? চলচ্চিত্রকে সাধারণ মানুষ কখনো যন্ত্রপাতির কলাকৌশল, কখনো সাহিত্যের কখনো চিত্রের বহন হিসেবে দেখছে। কলের গান বা রেকর্ড কেনার সামর্থ্যের অভাবে মানুষ বারবার সিনেমার ঘর স্থ হয়েছে।

চলচ্চিত্র একটি শিল্প। সব শিল্পীর মতই একজন চলচ্চিত্রকারের একদিকে যেমন প্রকাশের আকুতি বা বলার বিষয় রয়েছে অন্যদিকে রয়েছে মাধ্যমটির ওপর দক্ষতা বা কারিগরিজ্ঞান। যার প্রকাশের বিষয় কারিগরি জ্ঞানের চেয়ে প্রবলতর তার সাফল্য স্বভাবতই নগণ্য, অপরজনের তুলনায় যার বলার বিষয়ের তুলনায় কারিগরিজ্ঞান অনেক বেশী। কেনা জানে যে বোধের চেয়ে বুদ্ধিই সফলতর।

নিবিষ্টমনে 'শতরঞ্জকে খিলাড়ী' দেখলাম। ছবিটি দেখতে দেখতে যার কথা মনে হয়েছে অনেক কিছুই ঘটে, ঘটে চলে. আমরা জেনে নিই ইতিহাস রাজা, উজির, উচ্চবিত্তের বিলাসসম্ভোগ, শিল্পরুচি, শখ-শৌখিনতা, বংশগরিমা, সমাজের নাস্তব অবদ্ধ সম্পর্কে ঔদাসীন্য, পলায়নী মনোবৃত্তি, যেসব কথা দেশবিদেশের নানা গ্রন্থে নানা ব্যাখ্যায় লিপিবদ্ধ হয়ে দিন। গোটা ছবিটি নবাব-রেসিডেন্ট ও মীর্জা-মীর এই দুই যথাক্রমে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কাহিনীর পরস্পরছেদী সুতো বুনতে বুনতে এক সময় সান্ধ্যরাগ হয়ে উঠেছে। তা গোড়া বৈয়াকরণসুলভ নির্লিপ্ত পর্যবেক্ষণ। দীপ্তি বলে যদি বা কিছু ধরা পড়ে সে ঐ চাপা পরিহাস। মনে পড়ছে রবের বেস্সর UNE FENNE DOUCE ছবিটিকে। চলচ্চিত্রকারের আবেগহীনতা ও নির্লিপ্ত জ্যামিতিক উপপাদ্যের মত সরল ও হৃদয়হীন ঠেকেছিল। একটি ঝুলের বারান্দা, তাতে একটি চেয়ারের নড়ে ওঠা, একটি স্কার্ফের বাতাসে ভাসতে থাকা, রাস্তায় গাড়ি থেমে যাওয়া, রাস্তায় একটি ফুটফুটে মেয়ের পড়ে থাকা, লোকজনদের এগিয়ে আসা। অথবা অন্যত্র বাগানে ফুল কাট প্রেমিক প্রেমিকা কাট, জলে হাঁস। বা নায়কের নেপথ্য কণ্ঠযোগে নায়কের জীবনের অতীত ঘটনা যার দ্বারা দেখানো হচ্ছে তার বর্তমান নেপথ্য বিবৃতির সাথে তার অতীতের সেই বিবৃত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার লক্ষ্যণীয় অমিল। বা শেষটায় একটি কফিন, কফিন ঘিরে কয়েকজন ধোপদুরস্ত মানুষ, শুধু কফিন, একটি হাত কফিনের জন্যায় বোল্ট লাগাচ্ছে, বোল্ট লাগানোর শব্দ, একটি হাত বোল্ট লাগাচ্ছে। ঘটনাগুলো দৃশ্যে দৃশ্যে খণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে হয়ে ঘরে ঘরে গেঁথে গিয়ে একটি প্রবহমান বিচ্ছিন্নতার বাতাবরণ তৈরী করছে। নবাব-রেসিডেন্ট অধ্যায় আর মীর্জা-মীর উপাখ্যান পূর্বে পর্বান্তরে যেতে যেতে কেটে গিয়ে জোড় লেগে এমন এক প্রচারের সৃষ্টি হয় যে, পরিমিতিবোধের প্রতি সজাগ উপস্থিতি টের পাই।

সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে আমাদের অনেকক্ষণ ধরে দেখানো হয় যে কোনো দৃশ্যে তার পরিবেশের নির্ভুল খুঁটিনাটি। কোথাও কোনো অসঙ্গতি খুঁজে পেলে অনায়াসেই ধরে নেয়া যায় এ চলচ্চিত্রকারের অসাবধানতা নয়, দৃশ্যটিরই মূল উপজীব্য। এই ধরনেরই তাঁর নির্মাণগত দুর্লভসুলভ সতর্কবোধ ধীরে ধীরে দৃশ্যের পর দৃশ্যে সিঁড়ি ভাঙা অঙ্কের মত সংযতভাবে আস্তৃত হতে হতে আমাদের তার উদ্দিষ্ট ভূমিতে নামিয়ে দেয়। তাঁর দৃশ্যাবলীর উন্মীলনশৈলী আমাদের ম্যাড়ম্যাড়ে স্নায়ু ও পলেস্তরামাখা চেতনকে নির্মম নাটকেপনার দ্বারা দুঃখ দিতে পারতপক্ষে রাজি নয়।

ছবির যাবতীয় ধ্বনিই শ্রী-ছাঁদ বজায় রেখে শ্রোতার প্রত্যাশার অনুকূলে বেজেছে। এমন কোনো ধ্বনি নেই বা শ্রোতৃবর্গের শ্রবণেন্দ্রিয়কে ব্যথিত করে।

কোনো ঘটনার বিবরণের আসন্নতার আভাস ইঙ্গিত আগে থেকেই দিতে দেখি খুবই চাতুর্যের সঙ্গে, যা কিনা দর্শকের অনুমানের অবতলে বসে গিয়ে আগুয়ান অপ্রত্যাশিত ঘটনার তীক্ষ্ণতাকে খানিকটা সহনীয় করে তোলে, যার ফলে গড় দর্শকের স্নায়ু কম পীড়িত হয়। বা বলা যায়, এই আভাসন একজন স্বভাবিকতাপন্থী চলচ্চিত্রকারকে গল্পের নাটকেপনাকে ফিকে করতে সাহায্য করে।

তুচ্ছাতিতুচ্ছ একটি জিনিসের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে তাকে প্রতীকী

ও তাৎপর্যপূর্ণ করে, তোলা এই ব্যাপারটা বেশ দাগ কেটে যায়। যেমন নবাবের কোলে বেড়াল। প্রায় একই জিনিস আমরা লক্ষ্য করি 'অশনি সংকেতে', থেকে থেকে বাঙা প্রজাপতির ওড়াউড়ি ও ছন্দিত ধ্বনির ব্যবহার।

অবো লক্ষণীয়, ঘটনা বা পরিস্থিতিকে তাদের নিজস্ব পার্থিব স্বাভাবিকতার স্থানকালপাত্রের যাথার্থ্য ফুটিয়ে তুলতে পেরে শিল্পীর সার্থক স্বেদমোচনের তৃপ্তি। এর ব্যতিক্রমও রয়েছে। যেমন 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ছবির গোড়াকার শেক্সপীয়র, কল্পদৃশ্যে চাকুরিপ্রার্থীদের কঙ্কাল দশা। "a cession of territory which, by the way, was it the time denounced in parliament as a downright robbery"

খুবই মজাদার ভঙ্গিতে কার্টুন এনিমেশানে বোঝানো হয়েছে। এই সোরকরোজ্জ্বল পরিহাস অমোদ কোথায় আমাদের। এই প্রসঙ্গ থেকে গুগাবাবার মনোরঞ্জন কল্পদৃশ্যগুলিকে বাদ দেওয়া যেতে পারে। কেননা, চলচ্চিত্র শিক্ষার মাধ্যম হবে, না মনোরঞ্জনের, টমাস আলভা এডিসনের এই স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গকে একেবারেই ঝগড়া করতে না দিয়ে শিশুসাহিত্যের উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করেছেন সত্যজিৎ রায় তাঁর গুগাবাবায়।

"England, by one stroke of the pen, has confiscated not only the estate†††

আমরা গোটা পর্দা জুড়ে দেখি 'লর্ড' ডালহৌসির অঙুল ও কলম।

প্রায় সোয়াশ বছর পূর্বের লক্ষ্ণৌ নগরীর রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতাকে ঐতিহাসিক সাহিত্যিক শৈল্পিক দলিল দস্তাবেজ থেকে আহরণ করে তাকে পরিচালক নিজের বোধবুদ্ধির ভেতর দিয়ে চালিয়ে ঘটনাগুলোকে অনাবেগ ও নির্লিপ্তির হাতে লাগাম টেনে কেভাবে উন্মোচিত করেন তাতে মনে হয় পরিচালক যা পছন্দ করেন তা হচ্ছে দৃশ্যে দৃশ্যান্তরে তার দৃষ্টিকে জাহির করা নয়, তাকে যথাসম্ভব লুকিয়ে রাখা।

সম্ভবত 'শতরঞ্জকে খিলাড়ী' এক সামাজিক কৈফিয়তকে আভাসিত করে, শিল্পের কৈফিয়তকে নয়।

ছবিটি আমার অভিজ্ঞতার নিরিখে অনেকটা এইরকম :

প্রথমেই দেখা যায় দাবার কোর্ট, দুটি হাত খেলছে, শোনা যায় নেপথ্য কণ্ঠে কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়, আরো দেখা যায় দুই দাবাড়ু, জানা যায় তারা যথাক্রমে মীরজা সাজ্জাদ আলি মীর রোশন আলি, ঢক্কানিনাদ শোনা যায়, নেপথ্যকণ্ঠ তখনও, খেলা চলে, আর নামলিপি ভঙ্গিতবলা সহযোগে, পরিচারক মকবুল মিয়া ঝাপসা, অতঃপর লক্ষ্ণৌয়ের সৌধচূড়া যত, উড়ন্ত পাখির ঝাঁক আকাশে, ঘুড়ি ওড়ানো, শহরের মানুষজন, মোরগ লড়াই, নৃত্যসভায় বহু উর্বশীপরিবৃতা নবাব ওয়াজিদ আলি শা, ঢক্কানিনাদ, সুন্দরীদের সঙ্গে বসে গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছেন, রাজসভায় নবাব, লর্ড ডালহৌসি, টকটক গিলে খেয়েছেন পাঞ্জাব বর্মা নাগপুর সৌরাষ্ট্র ঝাঁসি ইত্যাদি, এখনো বাকি অযোধ্যা, ঢিকে আছে ইংরেজদের ভেট দিয়ে, রেসিডেন্ট উটরাম, উর্দুজানা ইংরেজ সহকারী, পরস্পর আলোচনারত, আলোচ্য ওয়াজিদ আলি শার খেয়ালখুশি কবিস্বভাব এইসব, দূরাগত আজান, ...নবাবের নমাজ, দাবার কোর্ট, মীর্জা ও মীর, মুন্সীর প্রবেশ, দাবা খেলার গল্প, বাদশাওকা খেল খেলো কা বাদশা, মুন্সী দেখান দাবার ইংরেজী সংস্করণ, বলেন ইংরেজদের দুরভিসন্ধির কথা, মীর্জা বলেন তাঁর বাদশাগিরিমার কথা, দেখান আভিজাত্যের নিদর্শন ঢিলে তলোয়ার, লর্ড ডালহৌসির কলম, দ্রুতগতি অশ্বারোহন, নেপথ্য কণ্ঠে শোনা যায় এই পদ্মপরিক্রম মোট পাঁচদিনের কোলকাতা থেকে লক্ষ্ণৌ, একটি চমৎকার দিগন্ত ছুটন্ত ঘোড়ার আড়ালে.. একটি মেমবাতি. খুরশীদ, দাবা খেলা বলে, খুরশীদ দেখতে আসে, খুরশীদ একা, পরিচারিকা, খেলা চলে, স্ত্রীকে নিয়ে মীর্জার রাসকতা, পরিচারিকার মুখে খুরশীদের শিরঃপীড়া শুনে মির্জার অন্দর প্রবেশ. খুরশীদের অনুযোগপূর্ণ ফুটিয়ে ওঠা, মীর্জা ও খুরশীদ, শরীরের হিসেবে অন্তরঙ্গ. নেপথ্য সঙ্গীত চলে, মজাদার সতর্কতায় মীর দাবার চাল চুরি করে. টিক টক টিক টিক টক নেপথ্য ধ্বনি, খুরশীদ ক্ষুব্ধ তৃষিত অতৃপ্ত, থমথমে মুখ, পরিচারিকাকে ডেকে বলে 'কহানী শুনাও, হামে বাতভর জাগনা হ্যায়', আবার দাবা খেলা, নেপথ্যে দামামা (?) ইংরেজ পতাকা ওস্তাদ গাইছে. নবাবের জলসা ঘর, একটি সুন্দরী যুবতী নৃত্যরত, নবাবের মুগ্ধদৃষ্টি, নবাবের দূত চিন্তিত, নাচ চলে, নবাবের দূতের উদ্বিগ্ন মুখ, নৃত্য, দূতের বিষণ্ণ মুখ, নৃত্য, নবাবের পাশে বসে দূত, নৃত্য, নবাবের কোলের কালো বেড়ালের মুখ, জলসা শেষের ঘন্টা বাজে দূত ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে, নবাব হেতু জানতে চায়, ভেড়ুয়া লড়াই, জুয়ারিদের তর্কাতর্কি, মীর ও মীর্জা দেখে, মীর জুয়ায় হারে, ওখান থেকে চলে আসে দুজনে, মীর ও মীর্জা বাগানে, খুরশীদ গড়গড়ায় তামাক খায়, টমাটো, কাঁচালঙ্কা ইত্যাদিকে গুটি করে দাবা খেলার চেষ্টা, কাকের ডাক নেপথ্যে, খুরশীদের মুখ, ইত্যাদিতে বিবৃতি।

সংযত আঙ্গিক কাহিনী যুক্তাশ্রয়ে এসবের ওপর দাঁড়িয়ে আছে তাঁর চলচ্চিত্র। সত্যজিৎ রায় পর্যবেক্ষণ করেন ও করান। গ্রিফিথের ভাষায় দি টাস্ক ট, মেক ইউ সি তার শিল্পকর্মে একজন প্রেরিচিতের অস্থিরতা চোখে পড়ে না এবং তিনি কারুকে প্ররোচিত করেন বলে মনে হয় না। তাঁর ছবিগুলি দেখতে দেখতে আমাদের মস্তিষ্কের তরলে কাল্পনিক ও আপাত বাস্তবতার সর পড়ে।

'প্রতিদ্বন্দ্বী' ছবিতে নায়ক যেখানে দেখছে সেবক ক্যাসিং বরাবর এগিয়ে আসছে একটি যুবতী যে কিনা মস্তিষ্কস্নায়ুতন্ত্র গ্রন্থি শ্বাসতন্ত্র রেচনতন্ত্র সংবহনতন্ত্রের এক জটিল ও সজীব বিষয়মাত্র, যাকে অনায়াসেই হাইড্রোজেন কার্বন নাইট্রোজেন ফসফরাস ইত্যাদির পরমাণুতে বিশ্লিষ্ট বিভাজিত করা যেতে পারে এই নির্মোহ অস্তিত্ববাদী বীক্ষা আমাদের কাছে নতুন কী অভিজ্ঞতা নিয়ে আসে, আমাদের নতুন কোন চেতনার খপ্পরে নিয়ে ফেলে, প্রশ্ন হতে পারে।

ফটোগ্রাফির প্রতিবিম্ব বাস্তব কিন্তু ভাষণপর্বে আত্মপ্রতিকৃতি বিকৃত হলেও শিল্পের সত্য একথা কে না মানে।

পূজ্যপাদ মোহন ঈশ্বর নয়, কলাপাহাড়ী দুটোই জরুরী আমাদের কাছে।

আরো জীবনানন্দ

কল্যাণকুমার বসু

জীবনানন্দ বললেন আর পাঁচজনের মতো নিজেকে সমাজের মধ্যে নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে হবে, আর পাঁচজনের চোখে নিজেকে দেখার প্রয়োজন আছে। কিন্তু তার থেকেও বড় প্রয়োজন হচ্ছে নিভৃতে নির্জনে নিজের পাশে এসে বসা। নিজেকে একলা পাওয়া, একান্তে নিজের সঙ্গে আলাপ করা। জীবনের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

তখন কেবল সঞ্জয় ভট্টাচার্য। মে জুন মাসে কলকাতায়, সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে কলকাতায়, ডিসেম্বরেও সেই কলকাতায় বরিশাল বি এম কলেজে গরমের ছুটি পড়ুক কিম্বা পুজোর ছুটি বা ক্রিসমাস—অল্প কয়েকদিনের ছুটি হলেই এসো কলকাতায়—কলকাতা-মন।

সঞ্জয়বাবু এবং 'নিরুক্ত'

প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদনায় আমি ও বুদ্ধদেব ছিলাম। পরে বুদ্ধদেবের সঙ্গে আমার কিছু মতের অমিল হয়—মতান্তর থেকে মনান্তর। আমি 'কবিতা' থেকে বেরিয়ে এলাম। অনেকদিন পরে জীবনানন্দ বনলতা সেনের কবি থেকে মুক্ত হলেন, সঙ্গে সঙ্গে 'কবিতা' থেকেও। তখন থেকেই সে 'নিরুক্ত'র—আমি এবং সঞ্জয় তখন সম্পাদক। জীবনানন্দ নিরুক্ত এবং পূর্বাশায় কবিতা লেখা শুরু করল।

জীবনানন্দবাবু আপনি কেন সভাপতি-রূপে কোন সভাসমিতিতে বা সাহিত্য-সভায় যান না?

সঞ্জয়বাবু, আপনিও কেন সভা-সমিতিতে বা সাহিত্যসভায় যান না!

সঞ্জয়বাবু হাসলেন, আপনি বলুন আগে।

আমার শরীর সব সময়ে জুত থাকে না। চোখ পালটিয়ে জীবনানন্দ হাসলেন।

তুই না, অন্য কারণ—সকল সভাসমিতি থেকে সকলের থেকে নিজেকে দূরে রাখতে চান। আপনার সম্বন্ধে আরো অভিযোগ আপনি কখোনো কবো বাড়ি ভুলেও যান না।

কেন যাই না? এই জন্যে যে যাদের বাড়ি যাবো তারা তে বিরক্ত হতে পারে। আর সভাসমিতি আমার ভালো লাগে না।

তারা তো আনন্দিত হতেও পারে।

আমোদ আর আনন্দ বুঝি এক জিনিষ?

কেন আপনি ধরছেন আপনাকে নিয়ে ওরা আমোদিতই শুধু হবে আনন্দিত হবে না?

হঠাৎ গম্ভীর জীবনানন্দ। বললেন, আনন্দ পেতে গেলে যে ধরনের মনের গড়ন দরকার তা আছে কজনের? বেশীরভাগ লোকেরা তো যখন আমোদ পায় তখন আনন্দ পাচ্ছে বলে আত্মপ্রবঞ্চনা করে নিজেকে। আনন্দ নির্মল—সে আনন্দ আজ কোথায়। তাই কোথাও যাই না—যেতে ভালোও লাগে না।

তবুও ছাত্ররা তাঁর প্রাণ। বরিশালে আবুল কালাম সামশুদ্দিনের একটা ছোট্ট সাহিত্য আসর আছে—ওর সকলেই তাঁর প্রিয় ছাত্র। ওদের ডাক বড় আন্তরিক—ওদের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারা যায়। অনেকদিন আবুল কলমদের বরিশালের ছোট্ট টিনের ঘরের দোতলায় কবিকে দেখতে পাওয়া গেছে। একদিন আবুলকালামের ছোট্ট সাহিত্য আসরে অচিন্ত্যকুমারকে দেখে জীবনানন্দ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। অচিন্ত্যকুমারকে সঙ্গে নিয়ে বরিশালের পথে প্রান্তে অনেকটা ঘুরে বেড়ালেন।

*

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তখন কলেজে পড়েন। থাকেন ইডেন হোস্টেলে। কবিতা লেখেন কবিতা পড়েন কবিতা ভালোবাসেন মনেপ্রাণে। তার জগৎ বুঝি কবিতাকে ঘিরে। বয়স সতেরো। তাঁর বন্ধু নারায়ণ সাহা একদিন এলেন হাতে একখানি কবিতার বই।

কি বই?

ধূসর পাণ্ডুলিপি। কবির নাম জীবনানন্দ দাশ। দেখ্ এর কবিতায় আছে এক নতুন সুর, নতুন মেজাজ....

নীরেন চক্রবর্তী কবিতার বইখানি হাতে তুলে নিয়ে কয়েকটি কবিতা পড়তে পড়তে জীবনানন্দ ডুব দিলেন—সত্যি এ-এক নতুন সুর, নতুন মেজাজ, নতুন ভাষা, নতুন চিত্রকল্প। তখন থেকেই জীবনানন্দ তাঁর প্রিয় কবি—তাঁর সব কবিতার আগ্রহী পাঠক।

নীরেন চক্রবর্তী কবিতা লিখছেন সমালোচনা লিখছেন হঠাৎ পূর্বাশার কোন একখানি বইয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে জীবনানন্দের নাম উল্লেখ করে তাঁর কবিতা সম্বন্ধে একটি কথা লিখলেন 'আত্মঘাতিক ক্লান্তিকর'। জীবনানন্দ একথায় ক্ষুণ্ণ হয়ে সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে একখানি চিঠি লেখেন 'নীরেনবাবু আমার লেখায় নৈরাশ্যবাদ দেখেছেন কিন্তু চারিদিকে তাকিয়ে কোন আশাবাদ তো আমি দেখছি না। 'আশাবাদ' কোন দোকান থেকে কিনতে পাওয়া যায় নীরেনবাবু কি সেকথা আমাকে লিখে জানাবেন।

সমালোচনা প্রসঙ্গে জীবনানন্দ যে মনক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন নীরেনবাবু তার জন্যে দুঃখিত। নীরেন চক্রবর্তী 'শেষ টেন' নামে একখানি কাব্য-সংকলন প্রকাশ করবেন জীবনানন্দর কাছে একখানি কবিতা চেয়ে চিঠি পাঠালেন বরিশালে। জীবনানন্দর মনে সমালোচনার আর কোন বিরূপভাব নেই চিঠির উত্তর দিলেন:—

সর্বানন্দ ভবন
বরিশাল

প্রীতিভাজনেষু ২৫-১-৪৪

বড়দিনের সঙ্গে লম্বা ছুটি নিয়ে প্রায় একমাস কলকাতায় ছিলাম। এখন ফিরে এসে আপনার চিঠি পেলাম। কবিতা পাঠাতে দেরী হয়ে গেল মার্জনা করবেন।

সত্যিই কি কাব্য-সংকলন বের করে-

বেন? কবে বেরুবে? ভালো কাগজে ছাপা হলে ঠিক হয়—যদিও আজকাল তা সুসাধ্য নয়।

আমার কবিতার প্রুফ ভালো করে দেখে দেবেন। আমার হাতের লেখা অস্পষ্ট বলে।* আবার কলকাতায় গেলে জানাবো

প্রীতি নমস্কার। ইতি জীবনানন্দ দাশ এসময়ে জীবনানন্দ বরিশাল থেকেই অনেক মাসিক পত্রিকায়, পাক্ষিক পত্রিকায়, সাপ্তাহিকীতে লিখছেন। জীবনানন্দ সুপ্রতিষ্ঠিত কবি। সকল সময়েই তাঁর কবিতার কথা চিন্তা। কবিতার উদ্ভবতত্ত্ব কিভাবে উন্নত হয়, 'কবিতার ভালো এবং মন্দ কবিতার মাত্রা চেতনা', কবিতার আত্মা ও শরীর, রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কাব্য।

কবিতা-কি হিসেবে শাশ্বত। কিভাবে কবিতা পাঠ করতে হয়। দেশ ও কালের কবিতা। সত্য ও বিশ্বাসের কবিতা, রুচি বিচার অন্য কথা। বাংলা কবিতার ভবিষ্যত—মনের মধ্যে কবিতা সম্বন্ধে যখন এত প্রশ্ন সেগুলো লিখে রাখলেই তো হয়।

কি যে ছাইপাঁস এত ভাব এবং লেখ আমি কিছু বুঝি না! কবিতা, কবিতা, আর কবিতা। রবীন্দ্রনাথের পরে আর কেউ যে কবিতা লিখতে পারে আমি বিশ্বাস করি না। তোমরা আধুনিক কবিরা কবিতা লিখতে পার না স্রষ্টার অনুযোগ।

জীবনানন্দ চুপ করে থাকেন কোন কথা বলেন না।

বিশেষত তোমাদের আধুনিক কবিদের আমি কবি বলেই ধরি না, সংসার দেখ, নিজে বাঁচ আগে—অন্যকেও বাঁচাও।

আমিও তো তাই লিখেছি আমার 'কবিতার কথা' প্রবন্ধে কেউ যেন মনে না করেন আমি কবিকে কাব্য সৃষ্টি ছাড়া অন্য কোন কাজ করতে নিষেধ করছি। কবি আর ব্যবহারিক জীবনে কর্ম ও মননরাজ্যে যেখানে যে অসঙ্গতি বা অন্ধকার রয়েছে বলে মনে করেন সব কিছুর সঙ্গেই সংগ্রাম করতে সম্পূর্ণ উপযুক্ত।"

মুখে বলা এক আর কাজের বেলা অন্য। স্রষ্টার অনুযোগ।

জীবনানন্দ প্রতিবাদ করেন না। লেখার সময় তাই সকলে ঘুমিয়ে পড়লে গভীর রাতে। লিখতে যে হবে জীবনানন্দকে। আগে লেখা তারপর বাঁচা। কিংবা বাঁচার মত বাঁচতে হলে লিখতে হবে। না লিখে বাঁচা মানে নিজের মনের মৃত্যু।

কাকা ব্রহ্মানন্দর জামাতা শ্রীচিদানন্দ দাশগুপ্ত বরিশাল এসেছিলেন যাবার সময়ে মঞ্জুর একখানি কবিতা নিয়ে গেলেন তাঁর বন্ধুর কাগজে কবিতাখানি দিয়ে দিলেন। মঞ্জুর বয়স আর কত। কবিতা লেখে নাকি? ছাপা হয়ে গেল মাতৃভূমিতে। মেয়েও যেন যাবার মত, ছেলেও তাই। কারো সাথে বেশী কোন কথা বলা নেই। মঞ্জু রঞ্জু যখন হাসে তাদের গালে তাদের বাবার মতো টোল খায় তখন দেখতে বড় ভালো লাগে।

মাতৃভূমি থেকে গোপাল হালদার চিঠি দিয়েছেন আরও অনেকগুলি পত্রিকা থেকে সম্পাদকরা চিঠি দিয়েছেন—নিত্য নতুন পত্রিকা সকলে নতুন কবিতা চায়। এত কবিতা কোথায় লেখা হয়। কবিতা লেখা কি এত সহজ কাজ—একথা কবিতায় 'মনের মত কথার' অভাবে মাসের পর মাস কাটাতে হয় তবে যদি কাব্যলক্ষ্মীদেবী সন্তুষ্ট হন। এত পরিশ্রম, তবু। অনুযোগ আসে ঘরের থেকে এত যে কবিতা লেখ টাকা পাও? নিজের পয়সা খরচ করে নিজের কবিতার বই ছাপাও এমন সখও মানুষের থাকে।

কবিতা সম্বন্ধে কোন আলোচনা ভালো লাগে না। কবিতা কি কেবল পত্রিকার পাদ পূরণ করবার জন্যে। পত্র-পত্রিকার সম্পাদকরা গল্প-উপন্যাসের জন্যে টাকা পয়সা তারা দেয়, কবিতায় হাসিমুখ দেখায়। লিখে দিলেন পরপর কয়েকটা চিঠি কয়েকজনকে।

চিঠি দিলেন গোপাল ভৌমিককে:—

প্রীতি ভাজনেষু,

শারদীয়া 'কৃষক' পত্রিকা এখনও পাই নি। আমার কবিতাটি যথাসময়ে পেয়েছিলেন কিনা জানি না। কবিতাটি বেরিয়ে থাকলে উক্ত সংখ্যার 'কৃষক' ও এজন্যে যে সম্মানমূল্য ধার্য্য হয়েছিল তা আমার নিম্নোক্ত কলকাতার ঠিকানায় পাঠাবার নির্দেশ দিলে খুশি হবো। আমি আজকালই কলকাতায় যাচ্ছি। কয়েকদিন থাকবো।

আশা করি ভালো আছেন।

প্রীতি নমস্কার। ইতি

জীবনানন্দ দাশ

কেঃ অঃ এ, দাশ ১৮৩, ল্যান্সডাউন রোড ফার্স্ট ফ্লোর পোঃ বালিঘাট।

এই বছরেই জীবনানন্দ তাঁর বিখ্যাত দুটি পত্র লেখেন আপন জীবন সম্বন্ধে এবং কবিতার সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা করে।

সাল ১৯৪৬। মে জুন মাস। মে জুন মাস ইস্কুল কলেজের গ্রীষ্মের ছুটির মাস। প্রতি বছর ছুটি উপভোগ করতে জীবনানন্দ কলকাতায় উপস্থিত হয়েছেন। এবার মে-জুন মাস দুটি বরিশাল রইলেন। কেন? তাঁর মনে কি একান্ত ইচ্ছা জেগেছে বরিশালের সাথে সম্পর্ক শেষ করে কলকাতাবাসী হবেন। ... মন বড় উদাস লাগে।

জীবনানন্দর কবিতার খাতা দেখে জানতে পারি, এই দুটি মাসে বরিশালে তিনি তিরিশখানি কবিতা রচনা করেছেন। গ্রীষ্মের ছুটির পর জীবনানন্দ ৮ই জুলাই ১৯৪৬ থেকে ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ এক লম্বা সবেতন ছুটির দরখাস্ত করে বসলেন। ছুটি মঞ্জুর হল। ছুটি নিয়ে জীবনানন্দ কলকাতা যাত্রা করলেন।

জীবনানন্দর মনে মনে পরিকল্পনা কলকাতায় যদি কোন পত্রিকায়, অফিসে বা কোথাও কোন কাজ একটা জোগাড় করে নিতে পারেন তাহলে আর বরিশালে ফিরে যেতে হয় না। কলকাতায় থাকতে তাঁর অনেক সুবিধে—তাই মনে হয়। বরিশালের বাড়িতে বাবা দেহত্যাগ করায় একরকম সমস্ত দায়িত্ব তাঁরই উপর এসে পড়েছে। বড়রা সব বিদায় নিয়েছেন কনিষ্ঠরা এসে পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ব নিয়েছেন—কিন্তু তাঁরাও এখন অনেকে দূর বিদেশে অনেকে আরো দূরলোকে। সর্বানন্দ পরিবারের যখনই যে দেহত্যাগ করেছেন সত্যানন্দ তাঁর চিতাভস্মসহ স্মৃতিফলক স্থাপন করেছেন। সর্বানন্দ ভবনেরই চত্তরে স্মৃতির ফলকগুলি ঘুমিয়ে আছে।

আজও জীবনানন্দ সর্বানন্দ ভবনের চত্তরে সেই স্মৃতির ফলকগুলি ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন

পিতা সর্বানন্দ দাস জন্ম ৫ই কার্তিক
১২৪৫ ইং ১৮৩২
মৃত্যু ১৩ই পৌষ ১২৯২ ইং ১৮৮৫
মাতা প্রসন্নকুমারী দাস জন্ম—১৪ই পৌষ
১২৫২ ইং ১৮৪৫
মৃত্যু ৫ই আষাঢ় ১৩৩৭ ইং ১৯৩০
ভগিনি বিনোদা দাস জন্ম—৩রা আশ্বিন
১২৮২ ইং ১৮৭৫
মৃত্যু—১৬ই মাঘ ১৩০৪ ইং ১৯০৭
জ্যেষ্ঠভ্রাতা হরিচরণ দাস জন্ম—২২শে
ফাল্গুন ১২৬৭ (১৮৬০)
মৃত্যু—২৩শে শ্রাবণ ১৩২৫ (১৯১৮)
ভ্রাতৃবধূ সুপ্রভা দাস (প্রেমানন্দর স্ত্রী)
জন্ম—ডিসেম্বর ২ ১৮৭১
মৃত্যু ২৮ অক্টোবর ১৯১৮ পুরী
ভ্রাতুষ্পুত্র করুনানন্দ দাস জন্ম—২৫শে
ফেব্রুয়ারী ১৯১২
(অতুলানন্দ দাসের ২য় পুত্র)
মৃত্যু—৩০শে জুলাই ১৯২৬
ভ্রাতা প্রেমানন্দ দাস মৃত্যু ১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠ
ইং ১৯২৭

সর্বানন্দ ভবনের প্রাঙ্গণে নিকট আত্মীয় স্বজনদের স্মৃতিফলকগুলির ধারে জীবনানন্দ রোজই অনেকক্ষণ এসে বসেন। এরা যে পরম প্রিয়জন। আজ এঁরা কোথায় কতদূরে চলে গেছেন। একদিন যে এঁরা এ পৃথিবীতে এসেছিলেন এদের অস্তিত্ব ছিল—এর কান্না, হাসি মান অভিমান সুখ দুঃখ স্মৃতি সবের অতীত আজ এঁরা। মনে হয় না আজ, কোনদিন এঁরা এই পৃথিবীতে ছিলেন. ..

*

বরিশালে বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন স্মৃতিফলকগুলি তিনিই স্থাপন করেছিলেন। আজ বাবা নেই বাবার নামের স্মৃতিফলক স্থাপন করা হবে না সর্বানন্দ-ভবন যে এখন প্রায় শূন্য। জীবনানন্দর ইচ্ছে থাকলেও হয় না। বরিশাল ত্যাগ করে চলে যেতে হবে। —এলেন কলকাতায়। এখন কলকাতায় একটা চাকরী চাই। এসে উঠলেন ১৬৩ নম্বর ল্যান্সডাউন রোডের [illegible]

*জীবনানন্দ যখনই কোন কবিতা বা প্রবন্ধ কোন পত্রিকা বা কোথাও পাঠিয়েছেন এই কথাটি প্রায় লিখেছেন। তাঁর আপন হাতের লেখা সম্বন্ধে ভয় ছিল। এবং তিনি প্রায়ই পাণ্ডুলিপি পরিবর্তন করতেন, ছাবিত্র পরিমার্জন করতেন।

অশোকানন্দ ফ্ল্যাটবাড়িখানি ভাড়া নিয়েছিলেন।

দাদা তুমি এবার কলকাতায় থেকে যাও। বৌদিরাও থাকুক। সেই চেষ্টাই করছি কেবল (অশোকানন্দ)। একটা কাজ কোথাও যদি পেয়ে যাই অধ্যাপনা আমার আর ভালো লাগে না। অমৃতবাজার স্টেটসম্যান বা আনন্দবাজার যুগান্তর কোন জায়গায় কি আমি চাকরী পেতে পারি না। জার্নালিজিম করার আমার খুব ইচ্ছে। সমালোচক হতেও আমি খুব চেষ্টা করছি।

তুমি তো অনেক জায়গায় বইয়ের সমালোচনা করছ না?

কয়েকটি পত্রিকায় করছি বইয়ের আলোচনা।

খুশী সকলে?

খুশি কি সকলকে করা যায়। কেউ না কেউ অসন্তুষ্ট হবেই। তাদের কথা মনে রেখেতো কোন সমালোচনা করা যায় না, ভালো কথা তোমার তারাশংকরের সঙ্গে আলাপ আছে, হুমায়ুন কবিরকে কেমন চেন? ওঁদের সঙ্গে একবার আমায় ভালোভাবে আলাপ করতে হবে। ওঁরা আমার কিছু উপকার করতে পারেন?

গত বছর তারাশংকর বরিশালে তোমায় দেখতে গিয়েছিলেন শুনেছিলাম যেন।

হ্যাঁ হ্যাঁ জীবনানন্দ বললেন, তারাশংকর বরিশালে এসেছিলেন কোন এক সাহিত্য সম্মেলনীতে। আমি তখন অসুস্থ ছিলাম হঠাৎ দেখি সদলবলে তারাশংকর আমাদের সর্বানন্দ ভবনে উপস্থিত—কল্পনার অতীত। তারাশংকর আমায় দেখতে এসেছিলেন। তারাশংকর সব সময়েই আমাদের মনে করতেন বিপক্ষদল—তিরিশের যুগে আমরা ছিলাম কল্লোল দলের। তারাশংকরবাবুরা ছিলেন শনিবারের চিঠির সজনিকান্ত দাসের পতাকাতলে। তারাশংকরবাবু সেই কারণে আমাদের ওপর খুব প্রসন্ন ছিলেন না সজনিবাবু তখন আমাকে কম সমালোচনা করেছেন।

দাদা তুমি তো কোন দলাদলির মধ্যে নেই—না আছো কোন রাজনীতির মধ্যে।

তা যা বলেছ। আমার সঙ্গে কারুরই শত্রুতা নেই।

নতুন কি কবিতা লিখলে দাদা?

কবিতা—অনেক। তোকে আর খুকুকে কত কবিতা শোনাবার আছে জমা করে রেখেছি খাতায় শোনাবো। তোমার সবে কতদিন পরে দেখা অশোক, খুকুকে লিখে দাও ওকে কতদিন দেখিনি কলকাতায় আসুক। মঞ্জু কেমন তার কাছে পড়াশোনা করছে। এবার আমিও কলকাতায় চলে আসছি বঞ্জু-মঞ্জু কলকাতায় পড়াশোনা করবে। খুকুকেও বল কলকাতায় যেন চলে আসে: আমরা সকলে মিলে কলকাতায় এখন থেকে থাকবো। কলকাতাকে আমাদের বরিশাল করে তুলব।

দাদা সে বোধহয় হবে না। শুনছি আমাকে বোধহয় কলকাতা থেকে বদলে করে দেবে। —কোথায় দেবে এখন কিছু বলতে পারি না। চাকরী জীবনে যে কত জায়গায় আমাকে ঘুরতে হচ্ছে দাদা রাঁচি, মুঙ্গের ভাগলপুর পুণা এখন কলকাতায় এবার কোথায় পাঠাবে কে জানে।

মনে আছে আমার তুই যখন পুণায় আমি তোর কাছে কয়েকটা দিন কাটিয়ে এসেছিলাম। কি-যে ভালো লেগেছিল। কত কবিতাই না সেদিন লিখেছিলাম।

আমি জানি দাদা তোমার সেই বিখ্যাত কবিতাগুলি।

কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্যর সঙ্গে একদিন জীবনানন্দর দেখা হয়। একদিন কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রর হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িতে জীবনানন্দ উপস্থিত। সেদিন প্রেমেন্দ্র মিত্রর সঙ্গে কবির এলিয়ট প্রসঙ্গে অনেকক্ষণ আলোচনা চলে। একটি তরুণ সে আলোচনায় যোগ দিলেন। নাম কি?

অমল দত্ত।

নামটা যেন চেনা চেনা...

বুঝতে পারলেন না। আমাদের নিরুদ্ভিদ পত্রিকার সম্পাদনার ব্যাপারে আমার এবং সঞ্জয়ের সঙ্গে অমল আছে।

ও আমি যখন মাঝে মাঝে কলকাতায় আসি তখন এঁরা কি মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করতে কবিতা আনতে গেছেন।

অমল দত্ত বললেন, হ্যাঁ।

সঞ্জয়বাবুর সঙ্গে যখন দেখা হয়েছে জীবনানন্দ বলেছেন আমার এবার কলকাতায় থাকার একটা ব্যবস্থা করে দিন। কলকাতায় আপনারা বেশ আছেন আর আমি পড়ে আছি কিনা সুদূর মফঃস্বলে।

কি বলেন! সেতে আপনার জন্মভূমি।

জীবনানন্দ হাসলেন, বললেন বরিশাল বি-এম কলেজ থেকে দেড় মাসের ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছি সঞ্জয়বাবু। যদি কোন ভালো কাজ পেয়ে যাই আর বরিশাল

এখানে বসে কবির মনে ভাসত বরিশালের ছবি

ফিরব না; সকলকে আনিয়ে নেবো।

জীবনানন্দ প্রতিদিন স্টেটসম্যানের বিজ্ঞাপন দেখে—একদিকে চাকরীর সন্ধান অন্যদিকে কাব্য-রচনা অবিরাম চলে।

কলকাতাতে পথঘাট, ময়দান, বড়বাজার, বেন্টিঙ্ক রোড, চিৎপুর, চৌরঙ্গী দিয়ে হাঁটতে বড় ভালো লাগে। মানুষ কাতারে কাতারে মানুষ। মলতা-বিচিত্র, জনতার উল্লাস—বিচিত্র তাদের পোষাক পরিচ্ছদ, মুখশ্রী, আলোর রোশনাই, ময়দানের ওধারে অন্ধকার, বড় একাকী মনে হয়। যখন কলকাতায় তখন বরিশালকে মনে পড়ে—বরিশালের মাঠ ঘাট প্রান্তর। কবিতা প্রতিদিন কবিতা। ছোট একটি খাতা অনেক কবিতা; তাতে লেখা আগষ্ট ১৯৪৬ অর্থাৎ আগষ্ট মাসেই লেখা কবিতাগুলি :—

আজ বিকেলের ধূসর আলোয়
তোমার সাথে দেখা—
একটা দিন পথ চলেছি শেষে
কালো মেঘের কেয়া বনের।
জল হিজলের দেশে....

আরো লিখলেন কবিতা
রাতের আঁধারে নীল নীরব সাগরে
আমাদের এ জীবন জনহীন বলয়ে আকাশে
সাগরের সুদূরে গামী জাহাজের মত
কি করে কখন ভেসে আসে—

লিখলেন :—
সারাদিন আমি কোথায় ছিলাম, আলো
এই জীবনের ইতিহাসে আমি অরূপে
তোমাকে কখনো দেখিনি, তবুও দেখেছি
সূর্য্যে কখন আকাশী গ্রহণ লাগে

*

অন্ধকারের ঘুম সাগরের রাতে
দূর আকাশের তারা
নীল নিখিলের নীরবতা
সেই কিছু এ ছাড়া

*

আজ সকালের এই পৃথিবীর আলো
চকোর ঘুঘুর ঝলকানিতে অপার নীলিমা
আলোয়—গভীর আলোয় মিশে মিয়ে
উড়ো শাঁয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে
নগরীদের মিণার জ্বাললো

*

ঘুমের হাওয়া, ঘুমের আলো
ঘুমের দেশের প্রেম (কি তোমার নাম)
এইখানেতে শঙ্খনদীর তীরে তুমি দাঁড়িয়েছিলে নাকি
আমি এলাম
আমায় তুমি মেঘের গভীর থেকে ডেকেছিলে
এখনো সেই মেঘ
তোমায় আমায় জড়িয়ে আছে, তবু
এই কি জীবন? জেগে ওঠা?
ভোর? হৃদয়াবেশ?

*

কাউকে ভালোবেসেছিলাম জানি
তবু ভালোবাসা

*

ভোরের বেলায় তুমি আমি
নীল আকাশের হয়তো পাখির গানে

কবে যে এই ধূলোমাটির পৃথিবীতে
কবে জেগেছিলাম * ×

১৯৪৬ সালের আগষ্ট মাসটা জীবনানন্দ ৮৩ ল্যান্সডাউন রোডে অশোকানন্দ এবং নলিনী দাশের কাছে ছিলেন। কবিতা লিখলেন চেষ্টা করলেন মনের মত একটা কাজের কিন্তু কোথায়? এসময়ে জীবনানন্দ ১৪টি কবিতা রচনা করেছেন। কলকাতায় চলছে কুখ্যাত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা, কবি ব্যথিত হয়েছেন। মানুষ কি ভাবে মানুষকে হত্যা করে কবির অজানা। রক্তে লাল হয়েছে কলকাতার রাজপথ ঘর-দুয়ার।

১৯৪৬এর ১৬ আগষ্টের সেই কুখ্যাত দিন এবং আরো কয়েকটি দুঃসহ দিন পার হয়ে এলো সেপ্টেম্বর মাস। জীবনানন্দ কলকাতা থেকে বরিশাল যাওয়ার সময় হ'ল। ব্রজমোহন কলেজ থেকে দেড়মাসের যে ছুটি নিয়ে এসেছিলেন এখন তা ফুরিয়েছে। কলেজে যোগ দিতে হবে বৈকি। এখানে কিছুই যখন হল না মিছে এখানে থেকে লাভ কি। বরিশালেই ফিরে চল।

আবার বরিশালে জন্মভূমির কোলে। যেখানে ছেলেবেলা থেকে অনেকগুলো বছর বাস করেছেন সেখানে আছে যে রক্তের টান নাড়ীর টান শুধু জন্মভূমি নয় অন্নভূমি। তবু দেশ ছেড়ে হিন্দুদের পালানোর ধুম পড়ে যায়। দলে দলে তারা চলে যায়। সাহিত্য রসিক ছাত্ররা এবং আরো অনেকে বললে স্যার আপনি যাবেন না। আমাদের ছেড়ে দিয়ে কেন চলে যাচ্ছেন আপনারা।

কে বলে আমি বরিশাল ছেড়ে চলে যাব? থাকবো বলেই তো আবার ফিরে এসেছি।

ছুটির পর আবার ব্রজমোহন কলেজে ফিরে এলেন জীবনানন্দ। তখন সেপ্টেম্বর। পরের মাস অক্টোবর পূজোর ছুটি হবে। পূজোর কোথায় থাকবেন? জানি না এখন। —আবার বোজকার নিয়ম খাওদাও কলেজে যাও, পড়াও, সংসার—সেই চিরদিনের কান্নাহাসি এর মাঝে একটু শান্তি। কোথায়? কাব্য রচনায়।

হে পাবক অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি,
অন্ধকারে তোমার পবিত্র অগ্নিজ্বলে।

সেপ্টেম্বর ১৯৪৬এ কবি জীবনানন্দর ছোট একখানি খাতায় এই কবিতাগুলি লিখেছিলেন? প্রথম কিছু লাইন কেবল দেয়া হল)।

তোমরা কারা দাঁড়িয়ে আছো
নক্ষত্রারীর মতো স্মরণীয়
×
একবার পৃথিবীর হাত থেকে বার হয়ে আমি
চলে যাব কোথাও ধূসর মেঘলোকে

তবুও তোমার দেহে রয়ে যাব,
—রয়ে যাব নাবি
×
আমার আকাশ কালো হতে চায়
×
যখন দিনের আলো নিভে আসে আমি
ক্লান্ত—তবু উদগ্র
ধ্রুবলগ্ন তারার মত সময়ের অন্ধকার
শান্তি নীলিমার
×
এ পথে অনেকদিন এ পথে অনেকদিন থেকে
×
অনেক বছর হল সে কোথায় পৃথিবীর
মনে মিশে আছে
×
পথ দিয়ে কেউ চলে গেছে জানি
এই ঘাস
নীলাকাশ
ঐ সব শালিখ সোনালী-ধান নবান্নারীদের
×
সে কার পায়ের শব্দ শালিখের ডানার ধ্বনিতে
×
নিচে হতাহত সৈনিকদের ভিড় পেরিয়ে
×
নাও নাও সূর্যকে সরিয়ে নাও
হেদিন, নেভাও তোমার আলো
ইতিহাস পথ বেয়ে অবশেষে এই
শতাব্দীতে আমাদের কাজ
শুরু হয়েছিল—
×
দাও দাও সূর্যকে দাও দাও
সূর্যকে জাগিয়ে দাও
×
আঁধার হিমের রাতে আকাশের তলে
এখন জ্যোতিষ্ক কেউ নেই
×
তাকে জেনে হৃদয় ব'লেছে
আমাকে আঁধার দাও,
এ সূর্য সরায়ে নাও
তামাকে মরনলোক তুমি দান কর।
এই সীমা—শেষ শান্তি। তাই প্রিয়তর
কি এক গভীর মুখ দেখে
বহুকাল একান্তে আশ্চর্য কথা ভেবে
জেনেছি দ্বিতীয় কিছু নেই,
আমার দেখার মত এই
সময় বিসারী পৃথিবীতে।
×
কোথাও এ পৃথিবীর বীথি বন
হে বিজ্ঞানী মন
শাখার সংঘর্ষে রাত্রি, বাষ্প সম,
বরুণ তারার প্রজ্বলন
সারি শুধু তবু এক মহাকাল
—সাঙ্কেতিত ভয়
×
হয়তো যা পথে নদী উৎসারিত হয়ে যেতে পার
এর থেকে মনোনদী শুভ্রতর...
×
নবরাণী মল্যনাশের দিনে
আমি সূর্য প্রান্তরের নক্ষত্রের স্বপন দেখেছি
×
পাহাড় আকাশ নদীসম অনন্ত প্রান্তর

---

* কবিতাগুলি কবি জীবনানন্দ দাশের বহস্তে লিখিত একখানি গানের খাতা (১৯৪৬) থেকে শ্রীঅশোকানন্দ দাশের (কবি ভ্রাতার) সৌজন্যে প্রাপ্ত। কবিতাগুলির প্রথম লাইন কেবল তুলে দেয়া হল।

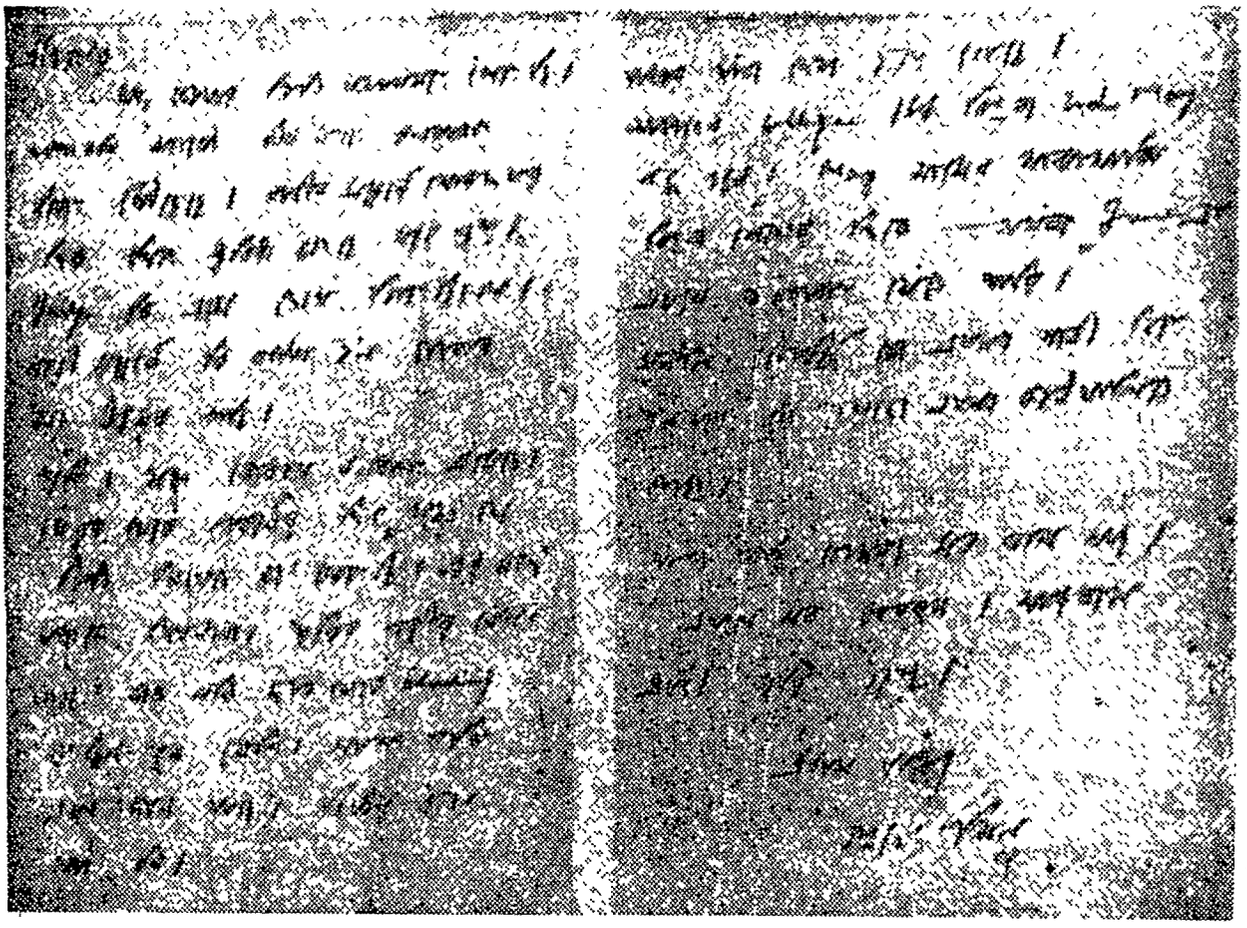

জীবনের কী ভীষণ উৎস থেকে জেগে
কেমন নীরব হয়ে রয়েছে আবেগে

×

সর্বদাই অন্ধকারে মৃত্যু এক চিন্তার মতন
আমাদের এই শতাব্দীর সাধ স্বপ্ন কাজপ্রাণ
আচ্ছাদন করে দিতে আসে।
ভোরে নিশ্চিন্তমন কেমন সাহসে অনায়াসে
আলো হয়—সূর্য হয় দেখো।

১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বরে বরিশালে জীবনানন্দের কবিতার খাতায় দীর্ঘ উনত্রিশটি কবিতার সৃষ্টি হয়েছে। জীবনানন্দ বরিশাল ফিরে ১৫ই সেপ্টেম্বর ব্রজমোহন কলেজে যোগ দিলেন। আপাততঃ কলকাতায় চাকরী বা অন্য সাহিত্যিক-জীবিকায় জীবন যাপনের ইচ্ছা দূরে রাখলেন। কিন্তু কলকাতায় থাকার ইচ্ছা কি মন থেকে দূর হয়? সাহিত্যিক বন্ধু-বান্ধবদের কাছে চিঠি লিখছেন। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে চিঠি ছেড়েছেন কত পরিকল্পনা তাঁর।

১৯৪৬ সেপ্টেম্বরে কলেজে যোগদান করবার পর পুজোর ছুটি। অক্টোবরের প্রথম থেকে নভেম্বরের ১০ তারিখ পর্যন্ত। চল কলকাতায়। চেষ্টা কর আবার চাকরীর। ঘোরো প্রকাশক পাড়ায়, দেখো স্টেটসম্যান, হিন্দুস্থান, অমৃতবাজার. প্রেমেন আছেন। অচিন্ত্য? বুদ্ধদেব, তাঁর সঙ্গে সাহিত্য-আলোচনা করা যায়। কবিতার কথা, দেশ-বিদেশের কবিদের কথা কবির ভাষা সম্পর্কেও চিঠি লেখা যায়, কিন্তু চাকরীর কথা তাঁকে বলা যায় না। তবু বলতে ইচ্ছে করে।... আসলে মফঃস্বলে থাকি যে। কলকাতার সকলেই আমার অপরিচিত একমাত্র লব্ধ প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক কবিরা ছাড়া। এঁদের কাছে যদি চাকরীর কথা না লিখি কাদের কাছে লিখবো।

অক্টোবর চলে গেল।

নভেম্বর এলো। ১০ই নভেম্বর পর্যন্ত পুজোর ছুটি শেষ হয়ে গেল। কিন্তু আর তো ছুটি পাওনা নেই। যখন তখন কলকাতায় এখন ছুটি শেষ। বিনা মাইনেতে ছুটি পাওয়া যায় না। তাই পাওয়া গেল। মাও একটি চিঠি ছেড়ে অসুস্থ সম্ভবত এই অজুহাতেই ১১ই থেকে ছুটি নেয়া হল। ১১ই নভেম্বর থেকে পরের বছর অর্থাৎ ১৯৪৭র গরমের ছুটির আগে মে'র মাঝা-মাঝি পর্যন্ত ছ'মাস। সম্ভবত. গত্তীদের ছুটির শেষ জুন পর্যন্ত তার চাকরী ছিল।

এরপর ১৯৪৭এ ১৫ই আগস্ট দেশ-বিভক্ত হয়ে পাকিস্থানের জন্ম হয়েছে। বিবৃক্ষ রাষ্ট্র। সাম্প্রদায়িকতা। দাঙ্গা, প্রতি-দাঙ্গা। উন্মত্ত স্রোতধারা অব্যাহত। সাধের বরিশাল—জন্মস্থান? দেশ এখন বিদেশ। ঠাকুর্দা জ্যাঠামশাই বাবা কাকাদের সাধের স্বপ্ন সর্বানন্দ ভবন তার শেষ পরিণতি কি আছে কেউ কি তা জানে।

স্বদেশ যে এখন বিদেশ। জীবনানন্দ আর দেশে ফিরলেন না সপরিবারে কল-কাতায় স্থায়ী হোলেন।

যখন দিনের আলো নিভে আসে আমি
ক্লান্ত—তবু উদ্ভ্রান্ত
জ্বলন্ত তারার মত সময়ের
অন্ধকার শান্ত নীলিমায়....

কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী লিখছেন, শুনলাম কবি জীবনানন্দ দাশ আমাদের স্বরাজ পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগে বরিশাল থেকে এসে শিগ্গিই যোগদান করছেন। শুনে, একজন প্রখ্যাত কবিকে আমাদের সহযোগী হিসেবে পাব একথা ভেবে খুব আনন্দ হল। সেদিন নাইট ডিউটি ছিল (তারিখ ৬ই ফেব্রুয়ারী) প্রথম জীবনানন্দকে আমাদের অফিসে দেখলাম। তাকে দেখে আমরা উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠলাম। সেটা আমাদের প্রথম তারুণ্যের উচ্ছ্বাস—আমি ছিলাম এবং শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন।

আমার কবিতা আপনাদের ভালো লাগে বুঝি?

ভালো লাগে বইকি, ভালোবাসিও।

সত্যি বলছেন!

সত্যি বলছি। শুনবেন—

নীরেন চক্রবর্তী এবং শান্তিরঞ্জন

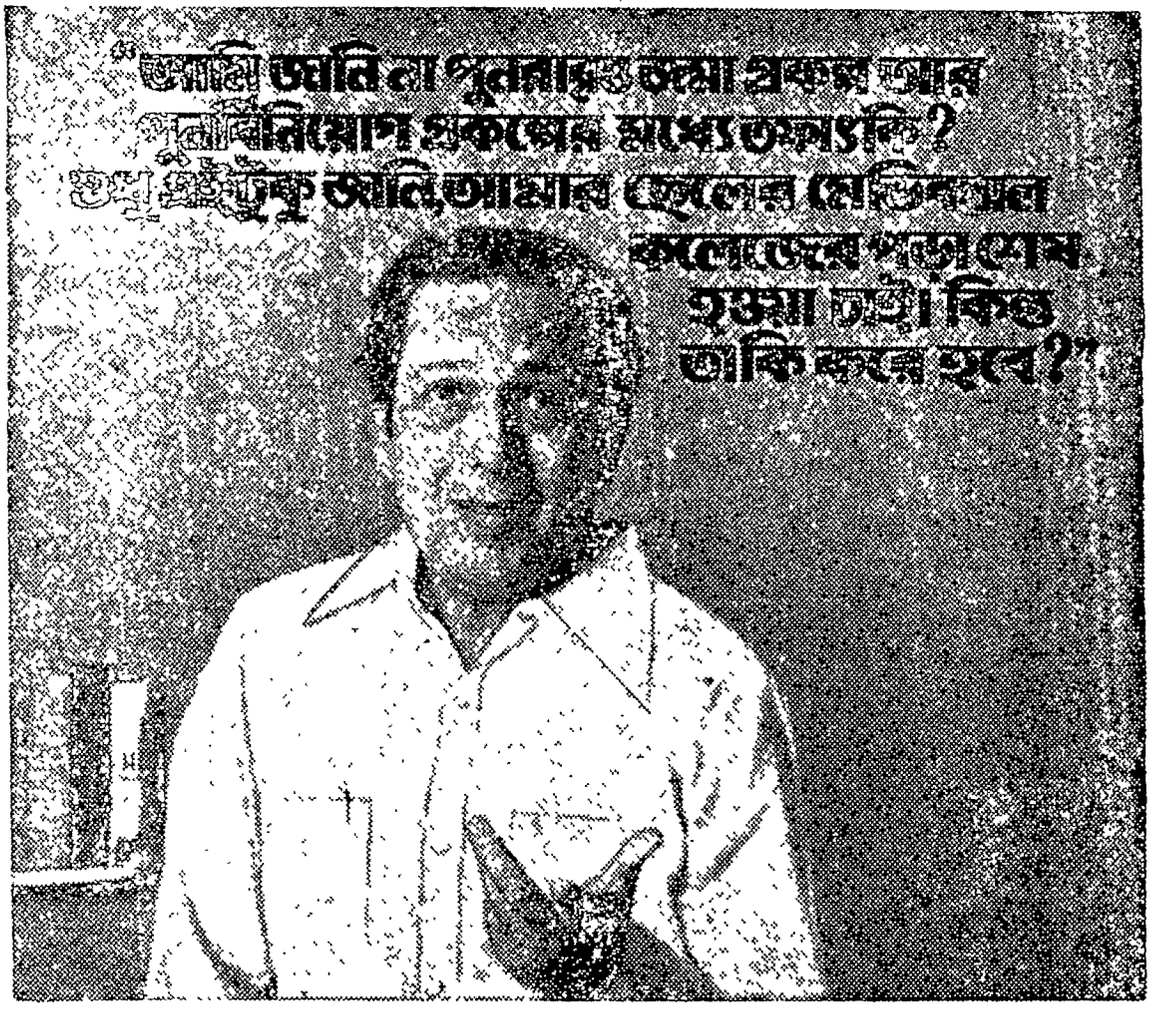

আই ও বি-র সঞ্চয় উপদেষ্টাদের সঙ্গে দেখা করুন! আপনার সকল প্রশ্নের জবাব ওঁরা দেবেন।

আপনার কি মনে হয় যে সঞ্চয় প্রকল্পগুলি কেবলমাত্র নিরিকার আর্থিক হিসাবযন্ত্র— যা আপনাকে যেন গ্রাহাই করে না ?
ব্যাঙ্কের বিভিন্ন সঞ্চয় প্রকল্পের নামগুলো কি আপনার কাছে নিতান্ত গোলমেলে ঠেকে ?
নিশ্চিন্ত হোন ! আই ও বি-র যেকোনো শাখায় চলে আসুন। আমাদের সঞ্চয় উপদেষ্টারা শুধু আপনার আসার অপেক্ষায় আছেন।
তাঁরা যোজনা, প্রকল্প নিয়ে কথা বলবেন না। তার বদলে তাঁরা আপনার স্বার্থ নিয়ে মাথা ঘামাবেন।
আপনার কি ছেলে আছে, যাকে লেখাপড়া শেখাতে হবে। মেয়ে আছে ? বিয়ে দিয়ে যাকে সুখী করতে হবে ? নিজস্ব বাড়ী কিনতে চান ? ভবিষ্যত নিরাপদ করতে চান ?

আই ও বি-র সঞ্চয় উপদেষ্টারা আপনার জন্যে বিশেষভাবে এক সঞ্চয় পরিকল্পনা ছকে দেবেন। এমন পরিকল্পনা, যাতে আপনি করদাতা লাভের সর্বাধিক সুযোগ পাবেন।
এটি একক পরিকল্পনা হতে পারে বা সংযুক্ত পরিকল্পনাও হতে পারে। এই সঞ্চয় পরিকল্পনার সঙ্গে আপনার নিয়মিত সঞ্চয় করার দৃঢ় সংকল্প থাকলে, আপনি দ্রুত আপনার লক্ষ্যে পৌঁছে যেতে পারবেন।
তাহলে চলে আসুন! আজকেই, নয়তো অন্য কোনোদিন। আমাদের সঞ্চয় উপদেষ্টারা অপেক্ষা করে আছেন। আপনাকে সাহায্য করার জন্যে ওঁরা পুরো সময় দেবেন।

আমাদের সকল শাখাতেই ব্যক্তিগত আগ্রহ সুস্পষ্ট। এই আগ্রহই 1969 থেকে আজ পর্যন্ত আই ও বি-কে দিয়েছে, জাতীয়কৃত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশী বৃদ্ধি, অর্থাৎ 771%!

প্রতিটি আই ও বি-শাখায় সঞ্চয় উপদেষ্টারা প্রতীক্ষা করছেন আপনারই জন্যে।

ইণ্ডিয়ান ওভারসীজ ব্যাঙ্ক
আপনার প্রগতির পথে সত্যিকার সাথী

বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনানন্দের কবিতার প্রশংসায় মুখর, কয়েকটি কবিতাও তাঁরা আবৃত্তি করলেন। শুনে জীবনানন্দ সংকুচিত, যেন কত লজ্জিত। কবিতা লেখা হয় নিজের মনের আনন্দে সৃষ্টির তাড়নায়, তাতে অন্যরা কি বললে না বললে কিছু এসে যায় না তবু সৎ কবির প্রশংসাতেই লজ্জা....

পরের দিন জীবনানন্দ, শ্বশুর-পাণ্ডুলিপি বইখানি এনে নীরেন চক্রবর্তীর নামে লিখে দিলেন। তারিখ লিখলেন ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭। নীরেন চক্রবর্তী বলেছেন, জীবনানন্দের সঙ্গে প্রথম যেদিন স্বরাজ পত্রিকায় আমার দেখা হয় শুনেছি তার কয়েকদিন আগে তিনি পত্রিকায় চাকরীতে যোগদান করেছেন। আমি পত্রিকা থেকে ছুটি নিয়েছিলাম।

যাই হোক জীবনানন্দ স্বরাজ পত্রিকায় চাকরি পেলেন। এ চাকরি পাওয়াতে সাহায্য করলেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য। হুমায়ুন কবির স্বরাজ পত্রিকার অন্যতম কর্ণধার। সঞ্জয় ভট্টাচার্যর সঙ্গে হুমায়ুন কবিরের আলাপ পরিচয় বহুদিনের। জীবনানন্দও পরিচিত। সেই সূত্রেই কি স্বরাজ পত্রিকার রবিবাসরীয় সম্পাদকীয় বিভাগের চাকরিখানি লাভ করেন। হয়তো হবে।

পরবর্তী দিনগুলোতে আমরা দেখেছি জীবনানন্দ স্বরাজ পত্রিকার সাময়িকী সম্পাদক। কাজের শেষে কিক রো'র অফিস থেকে বেরিয়ে হাঁটছেন কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য পূর্বাশার অফিসের দিকে। মাঝখানে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের রাস্তাটি ধরে পার হতে বড় ভালো লাগে—দুধারে পাইন গাছের মাঝে স্পষ্ট সবলরেখায় একফালি রাস্তা।

নীরেন চক্রবর্তী এবং জীবনানন্দ

কোনদিকে যাবেন জীবনানন্দবাবু— বাড়ি?, চলুন পার্ক দিয়ে সর্টকাট করি আগে আপনার এই পার্ক বড় ভালো লাগে না?

জীবনানন্দ হাসলেন মুখ টিপে। হাসলে গালে টোল খেলে যায়। পার্ক পেরিয়ে রাস্তায় এসে একটু সামনেই এগুলে পূর্বাশার অফিস। সেখানে সঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং তাঁর বন্ধু সহকর্মী সত্য-প্রসন্ন দত্ত। এবং আরও কয়েকজন সাহিত্যিক কবি বা সাহিত্যরসিক। জীবনানন্দ এখানে এই ঘরোয়া আসরে বড় অন্তরঙ্গ। নীরেন চক্রবর্তী বয়েসে তরুণ। সঞ্জয়বাবুর সঙ্গে তখনও খোলাখুলি আড্ডা হয় না, তখনও দূরত্ব। একটু পরে নীরেনবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

চললেন নীরেনবাবু, জীবনানন্দ বললেন।

হ্যাঁ আজ চলি, কাল আপনার সঙ্গে দেখা হবে। নীরেনবাবু সঞ্জয়বাবুকেও নমস্কার করে বেরিয়ে এলেন আড্ডা থেকে।

১৯৭৭র বছরেই ভাই অশোকানন্দ দিল্লী বদলী হয়ে সে বছর থেকে দিল্লী-বাসী. সুচরিতা বোনটি 'তমলুকবাসিনী। মেয়ে মঞ্জু সেই ছোটবেলা থেকেই পিসিমনির কাছেই মানুষ। পিসিমনি এবং ঠাকুমা দুজনেই মঞ্জুকে ভালোবাসে। মাটিক পর্যন্ত মঞ্জু পিসিমনির কাছেই রয়ে গেল।

কিক রো'র স্বরাজ অফিস থেকে বেরিয়ে সেদিন তরুণ কবি বিশ্ব বন্দ্যো-পাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা। কবি বিশ্ব বন্দ্যো-পাধ্যায় এগিয়ে এসে বললেন, কেমন আছেন, আমায় চিনতে পারেন?

জীবনানন্দ বললেন, কোথায় যেন দেখেছি....কোথায় যেন বলুন...দেখেছি মনে হয়।

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন 'স্বরাজ পত্রিকার অফিসে আমি আমার কবিতা নিয়ে কয়েকদিন আপনার কাছে গিয়েছিলাম কবিতা সম্বন্ধে আমাকে কত কথা বললেন?

জীবনানন্দ বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে, আর নতুন কবিতা লিখলেন? আসুন আপনারা সকলে নতুন কবিরা আমার পত্রিকায় আমরা সকলে মিলে পত্রিকাটি সুন্দর করে গড়ে তুলি। আর কোথায় কোথায় কবিতা লিখছেন আপনি? সেদিন ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সামনে অনেকক্ষণ দুজনে দাঁড়িয়ে অনেক গল্প হয়।

আবার আর এক দুপুরে জীবনানন্দ কলেজ রো ধরে এগিয়ে চলেছেন। কিছুদূরে এসে হঠাৎ দেখলেন দাঙ্গার ভয়ে সব দোকানের দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কি ব্যাপার আবার কোন গণ্ডগোল লাগল নাকি। আবার কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামা নয়তো।

জীবনানন্দ তাড়াতাড়ি হাঁটতে শুরু করলেন। এ গলি-সে গলি পথ ঘুরে যদি বড় রাস্তায় পৌঁছে বিপদ অতিক্রম করা যায়। সাম্প্রদায়িক লড়াইয়ে গলিপথ ভয়াবহ —পরিত্যাগ শ্রেয়, কিন্তু গলির মুখেই পুলিশের গাড়ি। মিলিটারী ট্রাক ছুটে এসে জীবনানন্দের সামনে দাঁড়িয়ে গেল। একজন পুলিশ অফিসার নীচে নেমে বন্দুকের নল জীবনানন্দের সামনে তুলে জিজ্ঞাসা করলে 'আর যু এ হিন্দু?'

কবি জীবনানন্দ উত্তর দিলেন ইয়েস।

অফিসারটি বন্দুক ধরা অবস্থাতেই বললে, আই থিংক যু আর দা বিং লীডার অফ দিস এরিয়া। জাস্ট গেট অন্।

জীবনানন্দ ধীর প্রকৃতির এ অবস্থায় প্রতিবাদ করা মানেই হয়তো পুলিশের হাতে মার খাওয়া। তার থেকে থানায় চল সেখানে প্রমাণ দেওয়া যাবে কে বিং লিডার। জীবনানন্দ পুলিশের গাড়িতে উঠে বসলেন। গাড়ি অনেক জায়গা ঘুরে আরও কয়েক-জনকে তুলে থানায় এল। এবার বসে থাক।

'কতক্ষণ বসে থাকতে হবে' একজন ভদ্রলোক একথা জিজ্ঞেস করতেই কয়েকজন তাঁকে অভদ্র ভাষায় গালাগালি দিল দেখে জীবনানন্দ অপমানিত হবার ভয়ে কারো সঙ্গেই কোন কথা বললেন না। সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে থাকবার পর একজন পদস্থ পুলিশ অফিসার এলেন। তাকে দেখে অধীনস্থরা উঠে দাঁড়ালেন। জীবনানন্দ দেখলেন একটি অল্পবয়সী মুসলমান ছেলে হাসতে হাসতে এগিয়ে আসছে। ছেলেটি অবাক হয়ে কবির মুখের দিকে তাকাচ্ছে। কবির কাছে এসে কবির পায়ে হাত রেখে প্রণাম করে বললে 'একী স্যার আপনি এখানে এ অবস্থায় কেন?

কবি বললেন এরা আমাকে রাস্তা থেকে তুলে এনেছে কিন্তু আমি তো তোমাকে চিনতে পারছি না বাবা!

ছেলেটি অভিমানভরে বললে আমি আপনার বি এম কলেজের ছাত্র ছিলাম আপনি আমাকে চিনতে পারলেন না স্যার!

জীবনানন্দ অপ্রস্তুত চিনতে না পেরে। অতঃপর সব ভুলে যে বললেন তুমি এখন কি করছ!

আমি এখানকার ওসি স্যার—

তাহলে দেখ তোমার লোকেরা আমাকে রাস্তা থেকে কিভাবে তুলে এনেছে। বলে সব কথা বললেন।

সমস্ত শুনে ওসি ছেলেটি দায়ী কন-স্টেবল এবং অফিসারটিকে ডাকল তারপর তাদের বলল এঁকে তোমরা কেন ধরে এনেছ! জান ইনি একজন নামকরা কবি এবং আরো তিনি আমার মাস্টারমশাই ছিলেন।

তারপর কবির দিকে তাকিয়ে বললেন আসুন স্যার আমার সঙ্গে। নানান রাস্তা ঘুরে ট্রাম স্টপেজে দাঁড়িয়ে প্রণাম করে বললে, 'স্যার আপনাকে আমরা আজ বড় অসম্মান করেছি আমাকে ক্ষমা করবেন।'

ট্রাম এল ছেলেটি ট্রাম লাইনে দাঁড়িয়ে।

জীবনানন্দ বললেন, কি যেন নাম তোমার, সরে যাও সরে যাও অ্যাকসিডেন্ট হবে যে!

ছাত্রটি হাসিমুখে ট্রাম লাইন থেকে সরে দাঁড়িয়ে ট্রাম থামালো। তারপর বললে স্যার আজ যদি আপনি সময়মত বাড়ি পৌঁছতে না পারেন তাহলে নিজেকে আমি কোন দিন ক্ষমা করব না।

অশোকানন্দ চলে গেছেন দিল্লীতে। ১৮৩ নং লাডলোডাউন রোডের বাড়িতে এখন জীবনানন্দ-পরিবার একা। তাঁর মা শ্বশুরে আছেন। মঞ্জু ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে বাবা মাসির কাছে সুবুজসপুর বেড়াতে গেছে। বড় কলকাতায় পড়াশোনা করছে বেশ ভালো। লাবণ্যরও পড়াশোনা করার ইচ্ছে। বি টি পরীক্ষা দেবার খুব ইচ্ছে। বি টি পরীক্ষা দেবে কেন? চাকরি করবে? শিক্ষিকা হতে খুব ইচ্ছা হয় বুঝি!

রতনচাঁদের ছবি

শ্যামল ভট্টাচার্য

খুউব ছোটবেলায় একই ঘরে, একটা খাটে রতনচাঁদ আর তার ভাইটা শুতো; অন্য খাটে মা-বাবা। একটু রাত হলেই ভায়ের চাঁহকার আর কাতরানি এবং বাবার ফোঁসফোঁসানি শুনতে পেত রতনচাঁদ। সে ভয় পেত, বাবার ওপর রাগ হত। প্রচণ্ড রাগ। এবং অনেক রাত অব্দি চোখে ঘুম আসত না তার, সবাই ঘুমিয়ে পড়লেও। তার চোখের সামনে, পাড়ার মাংসের দোকানে দেখা সদ্য কাটা, হাল-ছাড়ানো পাঁঠাটা তার ঈষৎ বক্রতিম হড়হড়ে মুণ্ডহীন শরীরটা নিয়ে দুলত আর দুলত। নিয়মিত-ভাবেই নিদারুণ ভয়াবহ স্বপ্নের জগতে বিচরণ করার মতোই সে এইভাবে অনেক রাত অতিবাহিত করে গেছে। —পরে একটু বড় হতেই, অন্য ঘরে তাদের ঠাঁই হওয়ার পরে, সে এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতাটার হাত থেকে রেহাই পেয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু আজকে এই মুহূর্তে, সেই হিম শীতল দৃশ্যটাই ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল।

রতনচাঁদের লেখাপড়া বেশিদূর এগোয়নি। যেটুকু তাও দু-তিন-চার দশক আগেকার মডেলের কোন গাড়ির মত ঢিকিয়ে ঢিকিয়েই। এক ডাকতারের ওখানে নগদ টাকার কম্পাউণ্ডারি করে। চা-পান আনার ঢুকিটাকিও। পুরো না হলেও মাঝে মধ্যে নেশাভাঙ করে। ডাকতারখানা থেকে ফিজিসিয়ানস স্যাম্পেলগুলো হাত সাফাই করে ঠিক করা পার্টির কাছে আধা দামে বেচে দেয়। হাতটান পড়লে। প্রায়ই ওর হাত টান পড়েও। কখনও কখনও বন্ধু-বান্ধবদের কাছে দরাজ হাত হয়ে যায়। সে ধার ও আর শোধ করে না। ফলতঃ বেশির ভাগজনই এখন ওকে আর এক-আধ টাকাও ধার দেয় না। পাড়ার কোন গরিবগুরবোর মেয়ের বিয়েতে চাঁদা তোলায় লাগে। তৃতীয় শ্রেণীর বাংলা ও হিন্দী ছবি দেখা তার বড় একটা নেশা। সুযোগ পেলেই মেয়েদের শরীর স্পর্শে নোংরামি করে। ওপর ওপর। মিথ্যে কথা বলে হর-হরদম। রাস্তায় একটুও মারদাঙ্গা দেখলেই দূরে পালায়। সে কখনও কখনও ধুলোটে পোশাকের জীর্ণ চেহারার কোন বালক বা বালিকাকে দেখলে আন্তরিক কষ্ট পায়। টোটালি কেঁচো কেঁচো টাইপের একটি অতি সাধারণ বাজে ছেলে রতনচাঁদ।

তার বাবা চিটিংবাজ মুখের প্রায় মিলে

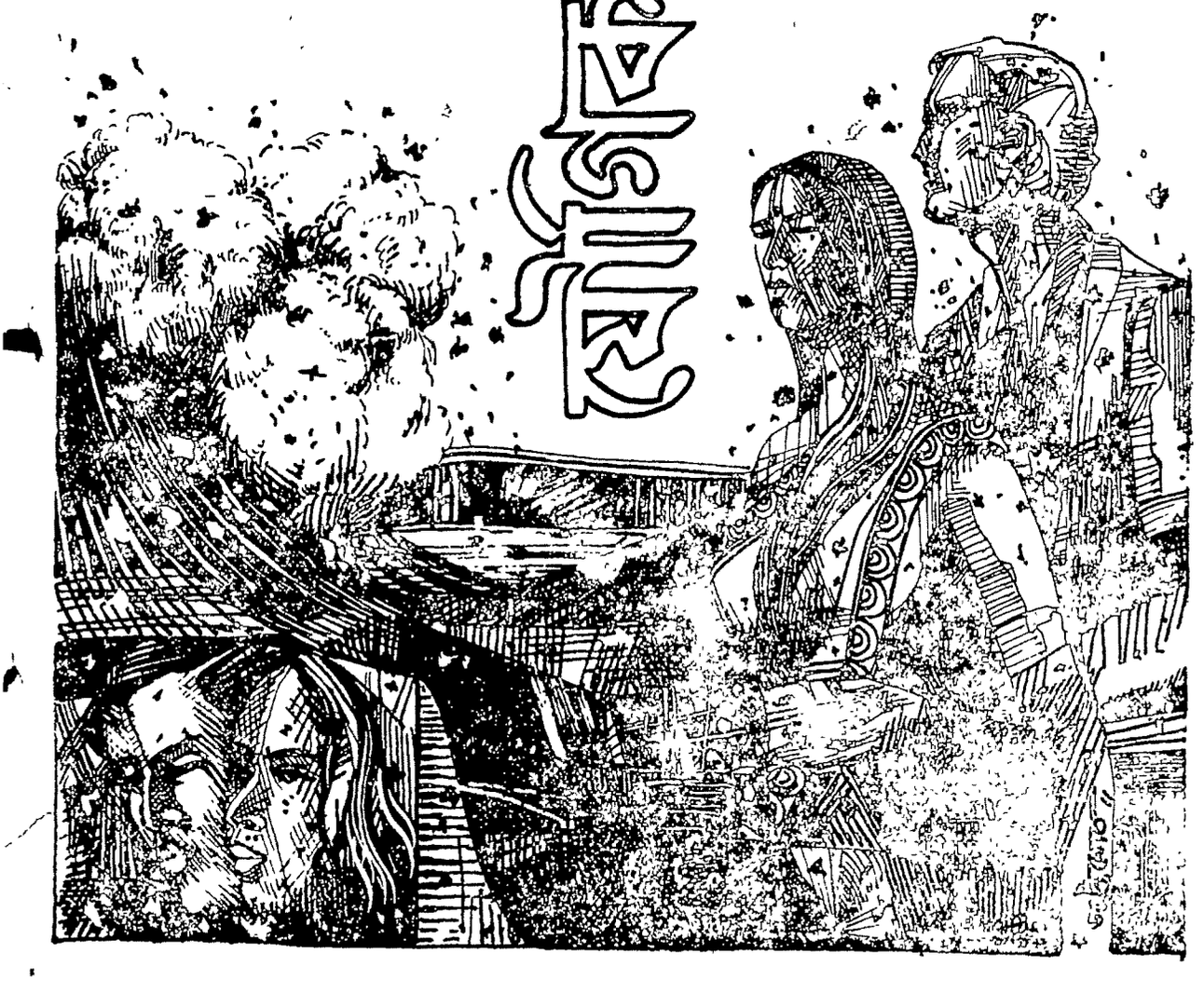

ফিল্ম চামড়ার এক প্রবীণ মানুষ ছিলেন। বেলার দিকে নির্দিষ্ট একটা সময় বাস-স্ট্যান্ডে এসে দাঁড়াতেন। হাতে থাকত একটা পেট মোটা ফোলিও ব্যাগ। তাঁর বড় ছেলের বন্ধুরা মস্করা করে ব্যাগটা দেখলেই—বের বাবা ব্যাগটায় ইন্টারেস্ট পুরে নিয়ে যায়, বলত। বাবাটি যে কি করেন তা কেউ জানত না। তবে আদৌ ভালো রোজগারপাতি যে না, এটায় সবাই নিশ্চিত ছিল। দীর্ঘদিন ধরে মদ্যপান বিশেষতঃ সস্তা দিশী গিলে এসেছিলেন, তা তাঁর নুইয়ে পড়া শরীরটার ঈষৎ ঘোলাটে চোখ দুটো দেখলেই বোঝা যেত। —সব মিলিয়ে বলা যায় মানুষটা ছিলেন—এই, এই যা তা একটা ব্যর্থ মানুষ।

ব্যর্থ মানুষটির অর্ধাঙ্গিনীর বয়স এখন সাঁয়ত্রিশ-আটত্রিশের মত। কিছুটা মেদ বহুল শরীরে এখনও কিছুটা যৌবন মিশে আছে। ছেলে দুটির প্রতি তাঁর ভালো মতই স্নেহ বাৎসল্য আছে। স্বামীর প্রতি ভালোবাসা আছে সামান্য হলেও। তার থেকেও বেশি আছে ঘেন্না, সইতে না পারা। আছে ছিল। স্বামী তাঁর কাছে বেশিরভাগ সময় অসহ্য ঠেকলেও কখনও কখনও কোনদিন তিনি স্বামীর খাওয়ার সময়, তাঁর পাতের সামনে এসে বসতেন। তাঁদের দৈবত জীবনের প্রথম দিককার দিনগুলোর কথা ভেবে চাপা রকতিম ও ঈষৎ উদ্বেলিত হয়ে উঠতেন। স্বামীর ভগ্ন শরীর স্বাস্থ্য দেখে মানুষটার মুখে কেমন যেন একটা অসহায়তার ছাপ খুঁজে পেতেন। তাঁর জন্যে মনের মধ্যে কোথায় একটা কিরকম যেন ব্যথা অনুভব করতেন। —কোন কোন মুহূর্তে তাঁর সন্তানরা তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে মা বলে ডাকলে। বা কোন নির্জন দুপুরে ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গানো ছেলেদের বাচ্চা বেলাকার দুধ দুং শরীরের, বাঁধানো ফ্রেমের ফটোগুলোর সামনে এসে দাঁড়ালে ছেলেদের প্রতি রীতিমত বাৎসল্য রসে আপ্লুত হন। শিশু সন্তান কাঁখে শতছিন্ন অস্ত পরিহিতা যুবতী ভিখারি রমণীদের দেখলে তিনি দুঃখ পান। যার অনেকটাই নিখাদ।। তিনি তাঁর রতনচাঁদের বয়সী ছেলেদের মানে বিশ বাইশের তরুণদের দেখলেই বিশেষ করে তাদের শরীর স্বাস্থ্যের ছেলেদের উথলে ওঠেন। তাদের সঙ্গে তিনি ফ্রিন্ডলিনেস করতে চান, আর করেনও প্রায়শই। মোটাদাগের ঠাট্টা ইয়ার্কি ঢলাঢলি ইত্যাদি। বয়স্ক পুরুষদেরও তিনি শিকার করেন। সেটাই সম্ভবত আসল এবং গভীর ব্যাপার। গভীর বলতে আর কি, বেশ কিছুটা তলিয়ে গিয়ে গভীর জলের খেলা। অবশ্য এরকমটা তাঁর দুটি কি তিনটি খেলার সাথী আছে। এই খেলাটা তাঁকে তেমনটা কিছু না হলেও কিছুটাও অর্থ এনে দেয়। স্বামীর মৃত্যুর পর কিছু রোজগারের জন্যে তিনি তাঁর সন্তানদের ও তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সহযোগিতায় বাড়িতে একটা গানের স্কুল খুলেছেন। একসময় তিনি নিজে গানবাজনার বেশ একটু চর্চা করতেন। তিনিই শেখান। গান বাজনার আসর বসে প্রায়ই। রবীন্দ্রসঙ্গীত তৃতীয় শ্রেণীর আধুনিক গান ও পপ টাইপের মিউজিকের দিশী জাতীয় সংস্করণের বাজনা এসব হয়। এইসব সূত্রে তাঁর বাড়িতে পাড়ার ও আশপাশের 'সদ্য ফুটিতেছে' বয়সের মেয়েরা এবং তরুণরা ভিড় জমায় এবং অল্পবিস্তর খেলাধেলি করে। এই খেলাধেলির ব্যাপারটাকেও তিনি অর্থাগমের সঙ্গে সঙ্গেই সমান ওজনে উপভোগ করেন। —মোটকথা তিনি হলেন প্রায় পুরো বিকশিতা নিছকই একটি সাধারণ মেয়ে মানুষ।

এই হল রতনচাঁদ এবং এজাতীয় পিতা-মাতার সন্তান সে। ফলতঃ তার সব-ভাবনা-চিন্তা বোধশকতি ইত্যাকার ব্যাপার গুলোর মূল চরিত্রটা সাধারণ বাঙ্গে ছেলেদের চেয়েও মোটা দাগের হবে। তবে কখনও কখনও কোন কোন স্পর্শকাতর মুহূর্তে ব্যতিক্রম ঘটতে পারে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য তেমনটা না। অন্ততঃ নিশ্চিতভাবেই কোন তিতির পাখির কোমলতম হৃদয়ের বৃত্তি তাও আবার জটিল শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে তার মনে খেলা করতে পারে না কিছুতেই। সাধারণভাবে বলা যায় কোন সময়েই না। বিশেষ করে এরকম একটা সময়ে—যখন সে মানুষের তিনটি প্রধান জৈবিক তাড়নার একটির দারুণভাবে শিকার হয়ে, তার চরম সুখকর রসাস্বাদনে ব্যস্ত আছে, তারই মধ্যবর্তী সময়ে। এটাই স্বাভাবিক। স্বাভাবিক মানে এতটা স্বাভাবিক যে এই রকম একটা ব্যতিক্রম অকল্পনীয় মাত্রায় অস্বাভাবিক বলা যায়।

কিন্তু সেই অস্বাভাবিক ব্যাপারটাই ঘটল এই মুহূর্তে। তার আগের সব ব্যাপার-গুলো বলে নিই।

মা তাদের সংসারে একটু তেমন কোন টানাটানি পড়লেই রতনচাঁদকে পাঠান তাঁর বয়স্ক খেলার সাথীদের কারো কাছে। —যা গিয়ে অমুক কাকুকে বল গিয়ে মা চেয়েছে দশটা কি পঁচিশটা টাকা, বলবি বিশেষ দরকার। রতনচাঁদ নিয়ে আসে। এটাই চলে আসছে। কাজেই তার মায়ের নাম করে রতনচাঁদ গিয়ে দাঁড়ালেই, মায়ের বয়স্ক বন্ধুরা বিশ্বাসভঙ্গেই তাকে তার চাহিদামত টাকাটা দিয়ে দেয়। —আজকেও তাই সকালে যখন তার মায়ের নাম করে দুলু কাকু নামক এক কারখানাওলা কাকার কাছে, আড়ালে ডেকে নিয়ে, ফিস-ফিসিয়ে বলেছিল এ হপ্তার রেশনটা কাকু আটকে যাবে, তাই মা তিরিশটা টাকা চেয়ে পাঠালো। আর মা একবার ডেকেছে আপনাকে। —সঙ্গে সঙ্গে দুলুকাকু পকেট থেকে তিনটে দশ টাকার নোট বার করে রতনচাঁদের হাতে গুজে দিয়েছিলেন।— ঈষৎ উল্লসিত মুখে বলেছিলেন—বড় মিস্তিটা দুপুরে এসে যাবে। এলেই ফুরসৎ পাবো, তখনই বৌদির সঙ্গে গিয়ে একবার দেখা করে আসব।

মিথ্যে কথা হলেও রতনচাঁদের জিভে ঝুলে থাকে। যখন তখন যার তার কাছেই টুপটাপ খসে পড়ে। প্রয়োজন অপ্রয়োজনেও। কিন্তু মায়ের নাম করে মিথ্যে কথা বলে টাকা নেওয়ার ব্যাপারটা এই প্রথম। —একটা দারুণ দরকারে মিথ্যেটা ঝাড়তেই হল। গত দু-তিনদিন ধরে সব কটা সোর্স থেকে হাজার চেষ্টা করেও টাকাটা না পেয়ে, শেষ অব্দি গতকাল রাতেই, মনের মধ্যে সামান্য এক চোট ফাইট দিয়েই এরকমভাবে টাকা জোগাড়ের ডিসিশনে পৌঁছোতে হয়েছিল রতনচাঁদকে।

যাই হোক এবার ওর সেই দারুণ দরকারটার কথায় আসা যাক।

রতনচাঁদের একটা মেয়েছেলে আছে। নাম ছবি। ছবি রতনচাঁদের থেকে কয়েকবছরের বড়। এবং একটি শিশু সন্তান সহ ডিভোর্সি। স্বভাব চরিত্রের ব্যাপারটা প্রচলিত অর্থে ভালো নয়। হয়ত বা নিজের মনের কাছে পবিত্র থাকার জন্যেই রতনচাঁদের মায়ের সঙ্গ পেতে চাইত। কিরকমটা একটা মানসিক আশ্রয়ের ব্যাপার। 'আমি একা নয়....'এরকমটা ভাবনা বিশ্লেষণ বা সান্ত্বনা যাই বলা যাক না কেন তা থেকে আসা মনের জোরটা পাবার জন্যেই রতন-চাঁদদের বাড়িতে প্রসাসই আসত তার মায়ের কাছে। বাড়িতে প্রথম দেখেই রতনচাঁদ ছবির প্রাবণি শরীরের প্রেমে পড়েছিল। না প্রেম নয় লোভে।

শারীরিক ক্ষেত্রের প্রেমেও তো কোথায় যেন কিছু সূক্ষ্মভাব ব্যাপার থাকে। —সুন্দর কারুকাজ—রকত-মাংস উত্তাপের মধ্যেও গভীর থেকে কিছু মায়া, আশ্রয় প্রার্থনা কি আশ্রয় দানের কামনা, মনকে ছোঁওয়ার চেষ্টা এসব অনেক কিছুই তো উঠে আসে—এবং নিছকই রকত-মাংস উত্তাপীয় জৈবিক কাণ্ডকারখানাগুলোর মধ্যে কিরকমটা অদ্ভুতভাবে যেন মিশেল [redacted] যায়।

কিন্তু ছবির শরীরে শরীর মিশিয়ে রতনচাঁদের সেসব কিছুই হত না। প্রথম দিন থেকেই রতনচাঁদ ছবির দু চোখের গভীর গভীরতর প্রদেশের চরম ফ্রাস্টেশন উদ্ভূত যন্ত্রণাবোধটার স্থায়ী ছাপটাকে লক্ষ্য করেনি। সে লক্ষ্য করেছিল, ছবির ঠোঁটের কোণের ধারালো ভাবটা ঝিলিক মারা চোখ দুটো এবং সর্বোপরি মোটামুটি সুষম গড়নের দারুন নরম দর্শনীয় শরীরটার বিশেষ দু-একটা অঙ্গ। আর ছবিকে বলা যায় রকতের আস্বাদ পাওয়া বাঘিনীর মত— তাই ডিভোর্স হওয়ার পর থেকেই সে স্বাভাবিকভাবেই জৈবিক তাগিদেই একাধিক পুরুষের সঙ্গে মিলিত হয়ে চলেছে। এসব ক্ষেত্রে সেই-ই অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে শিকার না হয়ে শিকারী হয়েছে। টোটালি সেই-ই সক্রিয়। বিস্তার করেছে। রতনচাঁদের ক্ষেত্রেও সেইটাই ঘটেছে। রতনই প্রথম এগিয়েছে ছবি না। কেননা একটুও নজর কাড়ার মতও কোন বিশেষত্বই রতনের নেই। তাই তার

দিকে ছবির চোখই পড়েনি প্রথম প্রথম। কিন্তু রতনচাঁদ এগোতে তার নজর পড়ে, এবং সেও এগিয়ে এসেছিল। সমান তালে। ও শেষ পর্যন্ত ছবিই প্রাধান্য বিস্তার করে। রতনচাঁদকে পৌঁছে দেয় গভীর জলের তলায়। আর তাছাড়া ছবি স্বেহেতু রতনচাঁদের থেকে বেশ কয়েক বছরের বড় এবং ফলে ব্যাপারটার বদলে তার বহির্স্তরে অনেক বেশিই ছিল একটা স্থূল রমণী।—এইসব কারণেই ছবির প্রতি রতনচাঁদের কোন প্রেম মায়া ইত্যাকার ব্যাপার-স্যাপার সব উদ্ভূত হয়নি আদৌ। এবং ছবির সঙ্গে তার সমস্ত ক্ষেত্রটা পুরোপুরি জুড়েই ছিল জৈবিক তাগিদ।

গভীর জলের স্টেজে আসতেই ছবি সাধারণ ভাবে সপ্তাহের নির্দিষ্ট একটা দিনই বরাদ্দ করেছিল রতনচাঁদের জন্যে। ইতিমধ্যেই কয়েকটা এরকম দিন কেটে গেছে। ফলতঃ রতনচাঁদের এখন নতুন মদ্যপায়ী তরুণের মতোই নেশার টান। সপ্তাহের বাকি কটা দিন সে নিদারুণ কষ্টের মধ্যে নিজেকে বেঁধে রাখে ঐ নির্দিষ্ট দিনটির জন্যেই। মধ্যবর্তী দিনগুলো হয়ত মজা করার জন্যে এখন পর্যন্তও ছবি কিছুতেই রতনচাঁদকে নিয়ে গভীর জলের নীচে নামেনি। নিজেকে পাথর করে রেখেছে। রতন বাধ্যত ঐ একটা দিনেই সন্তুষ্ট। এবং ঐ দিনটার জন্যেই তার কি নিদারুণ কষ্টের প্রতীক্ষা।

ছবি তার পুরুষ সঙ্গীদের কিছু খসায়ও। বশ দেখার সঙ্গে কলা বেচে নাফা করার মতোই আর কি। এটাও তার কাছে একটা বড় ব্যাপার, একই সঙ্গে। কিন্তু এতাবৎ তেমন একটুও খসাতে পারেনি সে রতনচাঁদের। তাই গত শেষ দেখার দিন সে, ছেলেটাকে চতুরা রমনীর মতই খেলি-য়েছে। তৃষ্ণা চতুর্গুণ বাড়িয়ে অবশেষে জলের পাত্রটাই সরিয়ে নিয়েছে চকিতে। এবং রতনচাঁদকে কায়দা করেই আনিয়েছে—তার ঘরে পরার শাড়িটা ছিঁড়ে খুঁড়ে গেছে—যাহোক একটা ঘরের পরার মত শাড়ি দরকার তার—আর সন্ধ্যেবেলায় চা খেতে হলে একটু ভালো টা-এর দরকার হয়—সাবান পাঁপরের একটা বড় প্যাকেট—এই তার ছিল ডিমাণ্ড। রতনচাঁদ সাফ বুঝেই গিয়েছিল আগামীদিনে ওগুলো হাতে নিয়েই ঢুকতে হবে। নাহলে . । যাই হোক সে তৃষ্ণায় ছেলেটার ছাতি ফেটে যাচ্ছিল, তাই তার ঐ দারুণ দরকারটা চাগিয়ে উঠেছিল।

আজকে সেই দারুণ দরকারটার জন্যেই দুলুকাকুর কাছে হাত পাততে হয়েছিল, মায়ের নাম করে। দুলু-কাকু লোকটাকে ও অনেকদিন ধরেই চেনে। একটা ছোট কারখানার মালিক, বাড়িতে খাসা বউ, অথচ কেন যে লোকটার এমন দোষ কে জানে। বিশেষ করে রতনচাঁদের মাকে দেখলেই ওর ঘোড়েল চোখে ঘোড়েলামির সঙ্গে সঙ্গে একটা লালা মেশানো হ্যাংলামি প্রাণ হয়ে এমন একটা যাতা মুখ হয়ে যায় যে অন্যরকম কোন দারুণ ঘেন্না রতনচাঁদের শরীরের ভেতর তখন পাক দেয়। এখন আর তেমনটা হয় না, মানে গায়ে মাখে না। বিশেষ করে নিজে-দের বাড়িতে ভরদুপুরে হঠাৎ হঠাৎ কোথাও থেকে ফিরে এক-একদিন মায়ের সঙ্গে একে-বারে ভেতরের ঘরে দুলুকাকাকে দেখেছে। তার আগে অবশ্য বন্ধ বার দরজার কড়া নাড়তে হয়েছে। মাই খানিকটা পরে খুলে দিয়েছে। রতনচাঁদের এসব বোঝার মত বয়স তখন বেশ হয়ে গেছে। ভেতর ঘরে ঢুকেই খুঁটিয়ে দেখেছে নিপাট মুখ করে বাবার পুঁজিটা কষি আলগা করে পরে দুলুকাকা চেয়ারে বসে রয়েছে। তাকে দেখেই বলেছে উঃ কি গরমটাই যে পড়েছে—জামা-কাপড় না খুলে বসে রেহাই নেই—রতনচাঁদ দুলুকাকার মুখচোখে একটা ক্ষেপে যাওয়ার ভাব দেখেছে—মুখের হাসির পলেস্তরার সঙ্গেই। মায়ের মুখচোখও একটু যেন অন্য-রকম ঠেকেছে। অন্যান্য দিনের পরিপাটী বিছানাটার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে যাওয়ার চিহ্ন, প্রথম প্রথম রতনচাঁদ কোথায় কি যেন ছুঁতে পারলেও, আসল ব্যাপারটাকে পুরো দেখতে পেত না। পরে পুরো দেখতে পেয়েছে, ধরতে পেরেছে। তখন ভেতর ঘরে ঢুকেই দুলু-কাকুর দিকে চোখ পড়ামাত্রই ওর মুখটা গনগনে হয়ে গেছে। ঠোঁটের কোণে হিংস্র ধারালো হাসি খেলে গেছে। মায়ের প্রতিও ঘেন্না এসেছে। অবশ্য এসব প্রথম প্রথমটা। তারপর সয়ে

সোভিয়েত ইউনিয়ন

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

এই জনপ্রিয় পত্রিকাটি ইংরেজী, হিন্দী ও উর্দুতেও প্রকাশিত হচ্ছে। সোভিয়েত দেশ ও জনগণের জীবনের সর্বাঙ্গীণ পরিচয় পাঠকদের সামনে উপস্থিত করবে এই পত্রিকাটি।

চাঁদার হার : ১ বৎসর ... ১২·০০, ৩ বৎসর ... ২৪·০০

সোভিয়েত নারী

সচিত্র পারিবারিক মাসিক পত্রিকা

সমগ্র পরিবারের পাঠযোগ্য এই সচিত্র মাসিক পত্রিকাটী পাঠকদের সামনে উপস্থিত করবে সোভিয়েত ইউনিয়নের মহিলাদের সর্বাঙ্গীন জীবন—তাঁদের কাজকর্ম এবং অবসর বিনোদন।

এতে থাকবে শিশুদের লালন পালন, ঘর সংসারের দেখাশোনা, পরিবারের স্বাস্থ্য রক্ষা, বোনার কাজ, শেলাই-এর কাজ, নতুন রান্না এবং বেশ ভূষার নতুন ফ্যাসান।

শিল্প, সাহিত্য; সঙ্গীত এবং ফিল্মে আধুনিক চিন্তাধারার সর্বশেষ খবরে ভরপুর থাকবে প্রতিটী সংখ্যা।

উপহার

কেবল তিন বৎসরের গ্রাহকদেরই বহুবর্ণ রঞ্জিত একখানি ক্যালেণ্ডার দেওয়া হবে।

চাঁদার হার

১ বৎসর ... ১০·০০,

৩ বৎসর ... ২০·০০

ADMARK

মুখ্য বিতরক

মণীষা গ্রন্থালয় (প্রাঃ) লিঃ, ৪।৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। ন্যাশনাল বুক এজেন্সী (প্রাঃ) লিঃ, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। বিংশ শতাব্দী, ৭৮-সি, পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬।

গেছে। সাধারণ মানুষের মহত্তের মতই তার রাগ, ঘেন্না ইত্যাদিও যেহেতু বেশিদিন লংগার করতে পারে না—তাই রতনচাঁদের সেসব রাগ, হিংস্রতা, ঘেন্নাও আস্তে আস্তে মরে গেছে। আরও বেশি করে মরে গেছে দুলুকাকুদের দেওয়া টাকায় তোলা রেশনের ভাত গিলতে গিলতে কি অন্য একরকমটা লেবে।

তাই আজকে দুলুকাকার কাছ থেকে মায়ের নাম করে মিথ্যেভাবে টাকা নেওয়ার মুহূর্তে মনের মধ্যে কোথায় যেন সামান্য একটু খোঁচা খেলেও—ব্যস ঐটুকুই। তারপর থেকেই খোস মেজাজে এসে গেছে। বাইশ টাকা ছাপ্পান্ন পয়সায় একটা শাড়ি কিনেছে। তারপর সাবুর পাঁপরের প্যাকেট কিনে হাতে চার টাকার মত ছিল। ভেবেছিল একটা পাঁইট চড়াবে। তারপর ভাবল মুখে চুল্লুর গন্ধ পেলে ছবি যদি ক্ষেপে যায়—আর তাছাড়া, তারপরই কাল একটা জরুরী ধান্দায় যেতে হবে—এটা মনে পড়তেই খেল না, টাকাটা রেখে দিয়েছিল। ফুর্তিটা জমবে ভালো এই ভেবে একটা ট্যাব চড়িয়েছিল। কিন্তু ট্যাব সবসময়েই ওর স্টকে থাকে। নেশার ট্যাব। পাঁচ-ছ রকমের। যখন দিশী গেলার বেস্তো থাকে না, তখন ট্যাব ইঞ্জেক্ট করে। আজ ওর স্টকে একটাই মাত্র ছিল। ষেটা ও জেনারেলি আদৌ ছুঁতে চায় না। কেননা ট্যাবে মস্তি ভালোই হয়, কিন্তু পার্টিকুলেরলি ওটা চড়ালেই প্যারোপুরি উল্টোপাল্টা টাইপের মস্তি হয়ে যায়। আনন্দ-টানন্দের ন্যায়গায় ভীষন কান্না-কান্না পায়। মনটা একটা বাসবীয় কালকাভাবে ভরে গিয়ে বিদঘুটে টাইপের দুঃখ আর বোধ অনুভূতিতে উথলে ওঠে: মাই হোপো-ছবির বাড়িতে ঢোকার ঠিক আগে-ওটা খত. আগে শেষ বিকেলে ঐ ট্যাবটাই চড়িয়ে দিয়েছিল।—হা—যাইহোপো এরকম একটা মনের ভাব নিয়ে।

প্রথমেই ছবির মুখোমুখি হয়েই তার হাতে শাঁড়ির আর সাবুর পাঁপরের প্যাকেট দুটো তুলে দিল। তারপর নিঃশব্দ অথচ যথেষ্ট একটা হাসি উপহার দিল। কিরকমটা যেন ধরা যায় না, ছোঁওয়া যায় না, গোছের হাসি। ছবি রতনচাঁদের দিকে বিস্মিত চোখে পরক্ষণেই ভ্রূভঙ্গি করে তাকালো। তাকানোর ঈষৎ আমন্ত্রণ ঠোঁটে রহস্যের মিশেল। ভেতর ঘরে গিয়ে দুজনে মুখোমুখি বসল। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা. কেউই কোন কথা না বলায়। তারপর ছবি হঠাৎ জানালা পথে উঠে গেল—চা-টা করিগে যাই। রতনচাঁদ সিগারেট ধরালো। সিগারেটে প্রথম টানটা দিতে দিতেই ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া ছবির শরীরটার সমগ্র পশ্চাৎভাগটা কয়েক মুহূর্তের জন্যে দৃষ্টিতে স্পর্শ করে নিল। ছবি অদৃশ্য হয়ে যাবার পর ও যেন কিরকমটা অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

সম্বিত ফিরল কিছুক্ষণ পরে ছবি ঘরে এসে আবার ঢুকতে। ঢুকেই একপলকে রতন-চাঁদের মুখটা জরিপ করেই ছবির প্রথম জিজ্ঞাসা—তোমাকে আজ যেন কিরকম অন্য-রকম লাগছে।

—কিরকম? কৌতূহলী রতনচাঁদ।—এই এই মানে, অন্যসব দিনের থেকে আলাদা। কেমন যেন দুঃখী দুঃখী। —দুঃখী, হুঁ. রতনচাঁদ মৃদু হাসল। তার-পর ছবির হাত থেকে চায়ের কাপ আর পাঁপরের প্লেটটা নিল। ছবি নিজের কাপ প্লেট দুটো ঘরের মাঝের টেবিলটার একধারেই রাখল। চেয়ারটা সরিয়ে এনে রতন চাঁদ ছবির মুখোমুখি টেবিলটার অন্যপাশে বসল। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল। ছবিও। তারপর দুজন দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। রতনচাঁদের চোখ দুটো জুড়ে লালা চুইয়ে চুইয়ে পড়তে থাকে। একটা হাত রাখে ছবির বাঁ হাতের উর্ধ্বাংশে। চাপ দেয়। ছবির চায়ে চিনিটা বোধহয় ঠিকমত মেশেনি। তাই নীচু মুখ করে কাপের মধ্যে চামচ নেড়ে যাচ্ছিল। ও চামচটা টেবিলে রেখে রতনের মুখের দিকে তাকায়। কয়েক পলক জরিপ চালায়। তারপর হেসে ওঠে। মোটা দাগের হাসি। ও টের পায় রতনচাঁদের হাত গরম। ওর হাসিতে নরম-মতোর মিশেল ঘটে যায়। রতনচাঁদ একটু ঝুঁকে আসে ওর দিকে। ছবি গলার কাছটায় তার গরম নিশ্বাসের হলকা টের পায়। পাকা খেলুড়ে মেয়েমানুষের মত সহ-খেলুড়েকে খেপিয়ে দিয়ে খেলাটা জমাতে, আসল খেলার প্রাক-পর্বের একটা কায়দা মারে। ঈষৎ শীতল স্বরে বলে ওঠে—ঠিক হয়ে সরে বসো। অসভ্যতা করবে না। বলে ও রতনচাঁদের হাতটা জোর করে ছাড়িয়ে দেয়। রতনচাঁদ বেশকিছুটা শক্ত হয়। ছবি সেটা লক্ষ্য করে। তার চোখের কোণে এবার চতুরা রমনীর উজ্জ্বলতা ফুটে ওঠে। ঠোঁটের ফাঁকে আংশিক প্রশ্রয় মেশানো হাসি। রতনচাঁদের মাথাটায় একটু ঝিম্ ধরে। গোঁয়ার্ডি একটা ভাবও প্রভাবিত হয়। এবার ও ছবির দিকে পুরো ঝুঁকে আসে। মাঝে একটা ছোট্ট গোল টেবিলের ব্যবধান। ছবি অপাঙ্গে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে — খোকামি কোরো না তর সইছে না আর, না। চা-টা আগে শেষ করে.....

প্রথম পর্ব চুকে গেছে। চুকে গেছে বলতে রতনচাঁদের দিক থেকে। ছবির দিক থেকে না। কখনও চোকে না। চুকেও ঠিক চোকে না। এমনকি শেষ পর্যন্তও না দুতিন পর্ব চুকে যাবার পরও। যখন রতনচাঁদ নিজেকে পুরো তৃপ্ত বোধ করতে থাকে। তখনও ছবির... । রতনচাঁদ এই যে কটা দিন ছবির সঙ্গে মিলিত হল, তাতে তো সে এটাই বুঝেছে। তার মনে হয় ছবির ক্ষিদেটা আসলে নেই তো নেই। বেশ কেটে যাচ্ছে সময়। উত্তপ্ত বলয়ের ঈষৎ অস্থিরতা— এটাই স্বাভাবিক অবস্থা ওর। কিন্তু কোন কারণে উস্কানি খেলে উত্তাপ-বলয়টা অনেক অনেকক্ষণ শক্তিশালী হয়ে চুর চুর হয়ে যায়। বিস্ফোরণ ঘটে যায়। যা তা একটা। ছবি নামক মেয়েমানুষটার শরীরটা হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে, উত্তাপের কি-তারও বেশি হয়ে যায়। —ছবি জাতীয় যে-কোন মেয়েমানুষের ক্ষিদেই নিদেন পক্ষে রতনজনের সমান.. ; একরকমটা মাত্রায় বেশি। তাই ছবি সাধারণতঃ কখনও তৃপ্ত হয় না হবে না।

স্বাভাবিকভাবেই একই শয্যায় পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি শুয়ে থেকেও প্রথম পর্বের বিগত কিছুটা সময়, রতনচাঁদের শরীর যেক্ষেত্রে বেশ একচোট পাওয়ায়, বেশ কিছুটা তৃপ্ত এবং ঠাণ্ডাটে অবসাদগ্রস্থ মেরে যাচ্ছিল— পাশের রমনী শরীরটিকে তার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অপ্রয়োজনীয় ঠেকছিল। কিরকম একটা আঁশটে গন্ধ পাচ্ছিল মনে হচ্ছিল রমনী-শরীর আসলে পুরুষ-শরীরের তুলনায় অসুন্দর নোংরা—ইত্যাকার সব। সেক্ষেত্রে ছবি বেশ একচোট না পাওয়ায় শারীর কাতরতর হয়ে উঠেছিল ক্রমশই। ও গনগন করছিল এবং ফাঁসছিল। পাশের শায়িত পুরুষটির ব্যাবা (যাকে তার এখন আংশিক পুরুষ মনে হচ্ছে) নিজের প্রতিটি মেদমজ্জার হলম হয়ে যাওয়ার জরুরী প্রয়োজনীয়তায় অস্থির অস্থিরতর হয়ে উঠছিল ক্রমশই।

এবার আস্তে আস্তে রতনচাঁদের শরীরটার ঈষৎ অসাড়তামিশ্রিত অবসন্নভাব ভাবটা কেটে যেতে লাগল। উত্তাপ সঞ্চারিত হতে লাগল ওর শরীরে। একটু পরে ফিরে ডান হাতটা

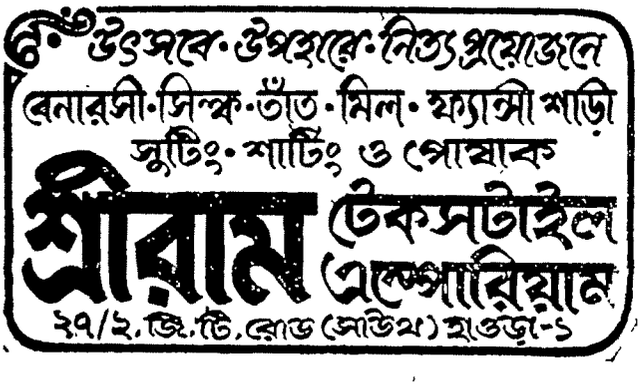

মাথাটা ছবির পিঠে। ছবি তার দিকেই মুখ করে শুয়েছিল। রতনচাঁদের হাতটা তাকে কাছে টানল।—পরমুহূর্তেই রতনচাঁদের খেয়াল হল ঘরের আলোটা জ্বলছে। বাঁদ দেওয়ালের চোখ না থাকে তা হলে ওদের কেউ দেখতে পাচ্ছে না, এটা নিশ্চিত। তবু ও একটা অস্বস্তি ও লজ্জাবোধ করে এ অবস্থায়। কিন্তু ছবির সেসব কিছুই নেই আদৌ। ছবি যখন বাথরুমে গিয়েছিল একবার ফিরে এসে ঘরের আলোটা না নিভিয়েই বিছানায় গা-গড়িয়ে দিয়েছে। রতনচাঁদ আগের দু-একদিনের মতই অস্বস্তি ও লজ্জাবোধ করল কেমন যেন। ছবিকে বলল—আলোটা নিভিয়ে দাও না। ছবি রতনচাঁদের শরীরটাকে ঘিরে পাক দিতে দিতে আলস্যে বলল—আহা ঢং! আলো জ্বললে ক্ষতিটা কি? কে আর দেখছে আমাদের! শুধু তো তুমি আর আমি, আমি আর তুমি! রতনচাঁদের মাথায় এক মুহূর্তের একটা ধোঁয়াড়ি ভাব খেলল—ও উঠে বসল আচমকা—বলল, না আলোটা নিভিয়ে দিই—বলে ও বিছানা থেকে নেমে সুইচটা অফ্ করতে গেল। আর ঠিক তখনই ওর চোখ পড়ে গেল প্যাকেটটার ওপর। ঘরের মাঝখানের ছোট্ট গোল টেবিলটার ওপর রাখা শাড়ির প্যাকেটটা। যেটা ও আজই ছবির জন্যে কিনে এনেছে। দুলুকাকুর কাছ থেকে মায়ের নাম করে নেওয়া তিরিশটা টাকা থেকে। ওকে শাড়িটার প্যাকেটটার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ছবি ঈষৎ জড়ানো গলায় বলে উঠল—কি হল। তার গলার স্বরে একই সঙ্গে বিস্ময় ও বিরক্তি। ওরকম সঙ্গমের মত দাঁড়িয়ে রইলে কেন? টেবিলটার দিকে অমনভাবে তাকিয়ে দেখার কি আছে। আলো নেভাবে বললে তো তা নিভিয়েই দাও না তাড়াতাড়ি।

রতনচাঁদের মুখ দিয়ে হঠাৎ কটি শব্দ অস্ফুটস্বরে বেরিয়ে এল—না কিছু না—এমনি এমনিই ; —ও সুইচটার ওপর হাত রাখল এবার। প্রয়োজনের তুলনায় অনেকটা বেশি চাপ দিয়েই অফ করে দিল। মন থেকে কি যেন সব এক ঝটকায় ঝেড়ে ফেলতে চাইল। একটা চোস্ত ড্রাইভ মারার মত করে বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। ছবির একটা হাতে বোধহয় একটু ঘা লাগল। কি একটা বাজে শব্দ রতনচাঁদের উদ্দেশ্য তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল। রতনচাঁদ শুনতে পেল না। ও তখন বেহুঁসের মত হামলে পড়েছে।

একটা মানুষের পুরো জীবনে দারুণ বিস্ময় মুহূর্ত খুবই কম আসে। সেরকমটা একটা মুহূর্ত এসে ভর করল এখন রতনচাঁদে।

নইলে তার মতো এক অপোক্ত তরুণ, একটা প্রচণ্ড জৈবিক তাড়নার মুহূর্তে হঠাৎ শীতল হয়ে যাবে কেন?—অন্যমনস্ক? তার মনের পর্দায় হঠাৎ পর পর কেন কতগুলো ছবি ভেসে উঠবে? আজ সকালে দুলু কাকুর কাছে রতন ফিস্‌ফিসিয়ে মা তিরিশটা টাকা চেয়ে পাঠালো। আর মা একবার ডেকেছে আপনাকে—দুলুকাকুর ঈষৎ উৎকণ্ঠিত মুখ—মায়ের মুখ—বছর কয়েক আগে দেখা দুপুরের এক দৃশ্য। ঘটে গিয়েছিল আকস্মিকভাবে। দুপুরে কে যেন কে মারা যেতে হঠাৎই স্কুল ছুটি হয়ে গিয়েছিল। অপ্রত্যাশিতভাবে ওর দুপুরে বাড়িতে ফেরা। তখনই দেখে ফেলেছিল নির্জন দুপুরের ফাঁকা গলির শেষ প্রান্তে তাদের বাড়ির দরজার সামনে মা কি রকমটা আধখোলা শরীরে যাতাভাবে দাঁড়িয়ে দুলুকাকুকে বিদায় জানাচ্ছে। দুলুকাকু মাকে লালা-ঝরানো আদর করছে, আর মা হাসি হাসি মুখ করে সেই ঘিনঘিনে আদরটা গায়ে মেখে যাচ্ছে—এই মুহূর্তে ওর মনে পড়ল দুলুকাকু বলেছিল—দুপুরে রতনচাঁদের বাড়িতে যাবে। বৌদির কাছে।

রতনচাঁদকে দেওয়া তিরিশটা টাকা উসুল করছে এখন লোকটা।

রতনচাঁদের হঠাৎ কি হল। বমি বমি পেল। মাথাটা ঘুরে গেল। ওকি হাওয়া হয়ে যাচ্ছে। পুঁতে যাচ্ছে মাটিতে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

হঠাৎই রতন ছবির শরীরটাকে আঁচড়াতে কামড়াতে আঁচড়াতে লাগল। ছবি ক্ষ্যাপা কুকুরীর মত আশ্লেষে ফুঁসে উঠল—এই কি হচ্ছে—কি—

রতনচাঁদের একটা প্রিয় গন্ধ আছে। মৌলিক নয় যৌগিক। কয়েকটা গন্ধ মিশিয়ে সেটা। ছোটবেলাকার। তখন ও রোজই বিছানা ভাসাতো। শীতকালটা বেশি করে। গায়ে দেবার বড় কাঁথাটা প্রায় পচেই

গিয়েছিল অদ্ভুত একটা ভ্যাপসা গন্ধকে আত্মসাৎ করে। যখন মায়ের কোল ঘেঁষে শুত তখন মায়ের শরীর থেকে পেত একটা দুধ দুধ গন্ধ। বেশি করে বৃষ্টি বাদলার রাতে। ভুরের একটা ঘুমঘুমানির গন্ধও পেত। —শীতকালে যখন মায়ের সঙ্গে কাঁথাটা মুড়ি দিয়ে শুত, তখন সব গন্ধ মিশে মায়ের বুকের মধ্যে ক্রমশই লেপটে যেতে যেতে রতনচাঁদ আজব সুন্দর একটা গন্ধ পেত। যেটা ওর বিছানায় একান্তই মায়ের নিজস্ব গন্ধ। বড় হবার পর বহু দিন সেই গন্ধটাকে ও ভুলেই গিয়েছিল।

এই মুহূর্তে, ছবির বুকের মধ্যে নিজের মুখটাকে ক্রমশই জোরে চেপে দিতে গিয়ে হঠাৎ সেই গন্ধটা ও টের পেল। গন্ধটা ক্রমশই ওর ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে অতিক্রম করে বিস্তার লাভ করতে লাগল। এক সুন্দর ভীষণের মত।

—উঃস রতনচাঁদ কি পাগল হয়ে গেল। নইলে হঠাৎ—

রতনচাঁদ এক ধাক্কায় মাখা ছবিকে। ছবি মস্ত খাটের অন্য ধারে মুহূর্তে ছিটকে গেল। রতনচাঁদ বিছানা থেকে এক লাফে নেমে পড়েই সুইচটা অন করে দিল। আলোয় ঘর ভর্তি।

কয়েক মুহূর্ত পরেই ছবি বিছানায় উঠে বসল। শরীর ঢেকে এলোমেলো পড়ে থাকা শাড়িটা ঠিকঠাক করে গায়ে জড়ালো। তারপর শাড়ির আঁচলটা কাঁধে তুলতে তুলতেই রতনের মুখোমুখি দাঁড়ালো। এখন রতনের সামনে পুরো উন্মাদিনী এক যুবতী। —মাথার লাঠির বাড়ি খাওয়া মেয়ে সাপের মত ফুঁসছে—হিস হিসিয়ে খিস্তি শুরু করল সেই মেয়ে-মানুষটা।

তার কপালে বৈসটস করছে ঘাম। লাবনি মুখের লাজুক পালস্তরাটা উঠে গেছে পুরোপুরি। হনু দুটো ঈষৎ প্রকট এখন। মেয়েমানুষটা দাঁতে দাঁত চেপে কথা বলে। গলার স্বরে তার স্বাভাবিক ঝিনঝিনে কোমলভাটুকু উধাও। মেয়েছেলেটা চোখ দিয়ে বিষ ঢালতে বলে ওঠে—উঃ সখ কত—ইয়ের জোর নেই মেয়েমানুষের সঙ্গে ফুর্তি মারতে এসেছে। ছবির শরীরটা থরথর করে কাঁপছে এখন। শাড়ির আঁচলটা মেঝেতে লুটোচ্ছে। রতনচাঁদকে টেবিলের দিকে মুখ করে থাকতে দেখে হঠাৎ ও ক্ষেপে যায় আরও বেশি করে। নিজের শাড়িটা এক ঝটকায় ও খুলে ফেলে। তারপর একে একে সব কিছু খুলে ফেলতে থাকে।

রতনচাঁদ কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। শুনতে পাচ্ছিল না। তার জিভটা এবং দাঁতগুলো অতি দ্রুত ক্রমশই লকলকে এবং বড় হয়ে যাচ্ছিল।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সোনার হরিণ নেই

।। তেত্রিশ ।।

বনমায়ার সেই দাঁতাল সঙ্গীকে মারার জন্য এবার সরকারি চাঁড়া পড়েছে।

প্রথম দিকে কিছু দিন ওই বুনো হাতিটা চা-বাগানের কাছাকাছি জঙ্গল থেকে তারস্বরে ডাকাডাকি করেছে। সন্ধ্যায় বা রাতে ওদিকে ঘোরার মতো কারো সাহস নেই। তারপর হঠাৎ এক চাঁদনি রাতে স্বচক্ষে পাহাড়ের মতো ওই দাঁতাল হাতিটাকে সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। একবারও ডাকেনি বা এতটুকু শব্দ করেনি। বাপীকে বলেছে, ভয়ে ওর হাত-পা পেটের ভেতর ঢুকে গেছিল। ওটা নেমে এলে ছনের ঘর ভেঙে গুঁড়িয়ে ওকে পিষে মারতে কতক্ষণ!

কিছুই করেনি। যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি চলে গেছে। তার সঙ্গিনী আর এ-তল্লাটে নেই তাও ভাবা গেল। কিন্তু কিছু দিন না যেতে ওটার উপদ্রব শুরু হল। এক-এক রাতে গাছপালা মচমচিয়ে তছনছ করে দিয়ে যাচ্ছে, জঙ্গলের শিকারিদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে। ঢোল-ঢোল টিন কানেস্তারা নিয়ে দল বেঁধে তাড়াতে পাহারা দিতে হল। পাঁচ ছমাসের মধ্যে নানা জায়গার সাত-সাতটা জঙ্গলের কুলি মজুরকে মেরে দলা পাকিয়ে রেখে গেছে। ওটা গুন্ডা হয়ে গেছে। মারার পরোয়ানা জারি করা ছাড়া আর উপায় নেই। বনবিভাগের তরফ থেকে পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়েছে। বিষ-মাখানো, ফলার কারবারী নেপালী তীরন্দাজরা ওটার খোঁজে দল বেঁধে জঙ্গল চুঁড়েছে। কিন্তু এই গুন্ডা হাতিও এখন তেমনি চতুর। উল্টে ওই তীরন্দাজদের দুজন আচমকা ওর হাতে পড়ে তালগোল পাকিয়ে গেছে।

শেষে বাইরের দুজন রাইফেলধারী পাকা শিকারী আসবে বলাতে ওটা কিছুটা নাকাল হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়েছে মনে হয়। মনে হয় কারণ, রাইফেলের গুলি ওটার কান বা ঘাড়ের কোথাও লেগে থাকবে বলে শিকারীদের বিশ্বাস। নইলে মুখ থুবড়ে পড়ে ওখানেই শেষ হয়ে যেত। কিন্তু জঙ্গল পাঁপিয়ে হুংকার ছাড়তে ছাড়তে ওটা পালিয়েছে। পরের ছমাসের মধ্যে জঙ্গলের এই এলাকায় আর তাকে দেখা যায়নি। অমন পাহাড়ের মতো দেহ নিয়ে কোথাও মরে পড়ে থাকলেও টের পাওয়া যেত। জঙ্গলের লোকেরাই নিঃশব্দে খোঁজাখুঁজি করেছে। ওটার দাঁতের প্রতি অনেকেরই লোভ। কোথাও মরে পড়ে জঙ্গলে পচে হজমের অগোচরে দাঁত দুটোর মালিক হয়ে বসতে পারলে এক ধাক্কায় বড়লোক। বাপী শুনেছে, ওই বুনো গুন্ডার বিশাল দাঁত দুটো ধনুকের মতো বেঁকে শূন্যে ঠেলে ওপরের দিকে উঠেছে।

পাগল হয়ে গেছে বখন একদিন ওটা কারো হাতে মরবে জানা কথা। গুলির ক্ষত বিষিয়ে আপনিও মরতে পারে। বন্দুক ছুঁড়তে জানলে আর ওটা সামনে পড়লে ঝুপী নিজেও মারার চেষ্টাই করত। কিন্তু ভিতর থেকে হিংস্র হয়ে উঠতে পারত কি? উল্টে ছেলেমানুষের মতোই কাল্পনিক শত্রু-নিকাশের আস্ফোশ তার। বনমায়ার ফুল যদি কোনো এক মেয়ের হত, ও নিজে কি করত? এমন কি, কিছু না হলেও শুধু যদি সভ্য দুনিয়ার বিধি-নিষেধের অস্তিত্ব না থাকত? তাহলেও কি কলকাতার এক সোনালি-চশমা-রাঙামুখ এত দিনে যমের দরজা দেখত না?

আরো একটা বছর ঘুরে গেল। বাপী তরফদার সুখে নেই এ তার কোনো শত্রুও বলবে না। মর্যাদা বেড়েছে, পুঁজিপাটা বেড়েছে। মাইনে বা বাড়ি ভাড়ার টাকা এক পয়সাও খরচ হয় না। সব সোজা ব্যাঙ্কে চলে যায়। অলিখিত কমিশন হিসেবে গড়ে তার দ্বিগুণের বেশি কাঁচা টাকা হাতে আসে। তাই সামলে দিতে ভাবতে হয়। পাওয়া খরচ নেই, বলতে-বাবুর খরচ পর্বতও না। শুধু লাঞ্চ ডিনার নয়, সকালে বিকেলের চা খাবারের সময়ও এখন পাশের জানলায় চোখ পড়ে। অফিস তো ওখানেই, তাই সাত-সকালে নাকে-মুখে গুঁজে ছোটার দরকার নেই। দু-বেলাই গাবরী যাই আর তার মেয়েদের সঙ্গে ডাইনিং টেবিলে গিয়ে বসতে হয়। তার খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও মহিলার নজর আছে বোঝা যায়। মাঝে মাঝে অনুযোগ করে, যে-মুখ করে খাও, কি পছন্দ আর কি অপছন্দ কিছুই বোঝা যায় না!

বাইরে কোনো উচ্ছ্বাস নেই বিলম্বিত হলে আগের মতোই কথা শোনায় বা ধমকে ওঠে মহিলা। তবু বাপী স্নেহের স্বাদ পায়। ওর প্রতি মনোযোগ বাড়ছে, নির্ভরতা বাড়ছে। পরোক্ষ প্রশ্রয়েও। বাপীর সঙ্গে ঊর্মিলার কথায় কথায় ঝগড়া। ঝগড়া অবশ্য এক-তরফা ঊর্মিলাই করে থাকে। দোষ বলতে গেলে বাপীরই। ফাঁক পেলেই সস্তা মুখ করে এমন কিছু মন্তব্য করবে বা ফোড়ন কাটবে যে ও-মেয়ে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠবেই। যা মুখে আসে তাই বলে তখন। গম্ভীরী রাই দেখে, শোনে। বিরক্ত হয়ে বখনো বা মেয়েকেই শাসন করে। —সর্বদা তুই ওর সঙ্গে এমন লাগতে কেন—আর যা-তা বলিস কেন?

যথেষ্ট বাগিয়ে দিতে পারলে মেয়ে মায়ের ওপর চড়াও হয়। —আমি ওর সঙ্গে লাগি—আমি বা-তা বলি? ও কতবড় বলো তো?

বাপীর সোনা মুখ যে মলিন না হয়ে পারে না এই মেয়ের অজান্তে ভয় যেন [illegible]

গায়ত্রী রাই কখনো ইচ্ছে করেই অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। কখনো বা ঠোঁটের ফাঁকে চুনেচেনা হাসির রেখা মিলিয়ে যায়। ঊর্মিলা জানে না, কিন্তু বাপী তাইতেই আরো বিপন্ন বোধ করে। মহিলা বলতে গেলে গোড়া থেকেই সদয় তার ওপর। অনেকভাবে ওকে যাচাই করছে, কিন্তু উত্তীর্ণ হোক সেটা নিজেও মনেপ্রাণে চেয়েছে। এই চাওয়াটা ভিন্ন স্বার্থের কারণে। তখন শুধু চালিহা লক্ষ্য। তেমন নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত কাউকে পেলে তাকে দূরে সরানোর সংকল্প। সেই লক্ষ্য আর সংকল্পের দিকে বাপীই তাকে এগিয়ে দিয়েছে। তার পুরস্কারও পাচ্ছে। কিন্তু সেই সঙ্গে আরো কিছু পাচ্ছে যার ফলে আনন্দের থেকে ভয় বেশি। ভিতরে সেই অনাগত আশংকার ছায়াটা ইদানীং আরো বেশি দুলছে। মহিলার স্নেহ শুধু কাম্য নয়, দুর্লভ ভাবে বাপী। এর সঙ্গে ওর ভিতরের একটা উপোসী আবেগের যোগ। কিন্তু এত স্নেহ আর প্রশ্রয়ের আড়ালে মহিলার প্রত্যাশাটুকু বাপীর কাছে দিনে দিনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভয় আর দুশ্চিন্তা সেই কারণে।

মেয়ে ওর সঙ্গে যেখানে যা যত দূরে খুশি বেড়াতে গেলে তার আপত্তি নেই। দূরের ব্যবসার কাজকর্ম একটু-আধটু দেখার জন্য মেয়েকে বাংলোর আপিস ঘরে গিয়ে বসতে বলে। কিন্তু বাপীর বিশ্বাস মেয়ে এলে সেটুকু আড্ডা দেয় আর কাজকর্ম পন্ড হয় জেনেও এই তাগিদ দেয়। বিশেষ কাজে কিছুদিন আগে এক বেলার জন্য পাহাড়ে আসার দরকার হয়েছিল। গায়ত্রী রাই মেয়েকে হুকুম করেছে, তুইও যা, ঘরে বসে থেকে কি হবে, যেটুকু পারিস শিখেটিকে নে।

ঊর্মিলা তক্ষুনি রাজি। শিখতে সাধ পড়েছে তার। বাপীর সঙ্গে বেড়ানোটুকুই লাভ। বাপীই বরং প্রস্তাব নাকচ করেছে। বলেছে, শেখার সময় ঢের পাওয়া যাবে, আপনাকে একলা রেখে দুজনের বেরুনো চলবে না।

মা সবে যেতে ঊর্মিলা ঝাঁকিয়ে উঠেছে, না গেলাম তো বয়েই গেল, কিন্তু শেখার সময় ঢের পাওয়া যাবে বলার মানে কি? আজ শেখার জন্য এখানে তোমার কাছে বসে থাকব?

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর গায়ত্রী রাই তার সময় মতো শুতে চলে যায়। মেয়ের আসার সেটাই ভালো আড্ডার সময়। প্রায়ই বাপীকে ধরে রাখে। সে-দিন বিলেতের চিঠি আসে সেদিন তো ওকে সমস্ত সমাচার নানোর জন্য এই নিরিবিলির অপেক্ষা তবু এরকম আড্ডা দেওয়াটাও গায়ত্রী রাইয়ের চোখে দৃষ্টিকটু নয়।

সম্প্রতি বাপীর একটা মোটর গাড়ি হয়েছে। গাড়ির তখন কি-বা দাম। চা-বাগানের সাহেবসুবোরা চলে যাবার সময় ভালো গাড়িও জলের দামে বেচে দিয়ে যায়। কপী ডাক্তারবাবুকে বলে রাখতে সেই একটা ভালো গাড়ির সন্ধান দিয়েছিল। কিন্তু গায়ত্রী রাই তার এখনকার গচ্ছিত সাদা টাকা দিয়ে কিনতে দেয়নি। আয় হিসেবের বাইরে উত্তর বাংলার দূর-সুদের ব্যাংকে যে টাকা জমা আছে—তার থেকে তুলে গাড়ি কিনলে ইনকাম ট্যাক্স ছাড়াও আরো সতের রকমের জবাবদিহির ফ্যাসাদে পড়তে হবে। গায়ত্রী রাইয়ের হুকুমে সেই গাড়ি ফার্মের নামে কেনা হয়েছে। ফলে খরচ সব কোম্পানীর ট্যাক্সের খাতায় উঠছে। গাড়ি বাপীর খাস দখলে।

মায়ের বদান্যতায় ঊর্মিলা অখুশি নয়। তবু বাপীকে ঠেস দিতে ছাড়েনি। — মা-যে দেখি তোমার বেলায় মিসেস দাতাকর্ণ হয়ে বসল একেবারে, যা চাও তাই মঞ্জুর! চাইলে শেষে আমাকেসুদ্ধু না দিয়ে দেয়—

বলতে বলতে খিলখিল হাসি।

বাপী সন্তর্পণে প্রসঙ্গ এড়িয়েছে। বিজয় মেহেরা বিলেত থেকে ফেরার আগে মহিলা না চাইতেই দেবার জন্য ঝুঁকবে কিনা সেই আশঙ্কা বুকে চেপে বসেছে বাপীর। ঊর্মিলা মেয়েটা বোকা নয়। নিজেকে নিয়ে বিভোর, তাই কোনরকম সন্দেহের আঁচড় পড়ছে না। উল্টে বাপী দলে আছে বলেই নিজের ব্যাপারে বাড়তি জোর পাচ্ছে। ও ধরে নিয়েছে, সততার সবগুলো সিঁড়ি টপকানো শুধু নয়, মায়ের সব থেকে ব্যথার জায়গাটি ছুঁয়ে যেতে পেরেছে বলেই এই ছেলের এখন এত খাতির কদর, তার প্রতি এত স্নেহ। তাছাড়া মায়ের অসুখটার জন্য বাপী যা করল তাও এই মেয়ে আর কোনদিন কাউকে করতে দেখেনি। একথা ঊর্মিলা নিজেই বাপীকে বলেছিল। ওর নিজের তো আগে ধারণা হয়েছিল মায়ের অসুখ-টসুখ সব বাজে। পরে এই জানোও মনে মনে লজ্জা পেয়েছে।

বাপীর এত সুখের তলায় কোন্ দুশ্চিন্তা থিতিয়ে আছে ঊর্মিলাকে তার আভাস দেওয়াও সম্ভব নয়। জানলে এই মেয়ে অবুঝের মতো ক্ষেপে যাবে। মা মেয়ের মধ্যে আবার একটা বড় রকমের অশান্তি ঘনাবে। শুধু মানসিক নয়, মহিলার জন্যে স্বাস্থ্যেরও ক্ষতির সম্ভাবনা। তাছাড়া ঊর্মিলাকে বলবেই বা কি, ওর মা তো এখন পর্যন্ত সরাসরি প্রস্তাব কিছু দেয়নি। যেটুকু বোঝার বাপী আভাসে বুঝেছে, আচমকে বুঝেছে।

বাঁচোয়া শুধু এই, মেয়ে শেষ পর্যন্ত যদি তার সংকল্প আঁকড়ে ধরে থাকে। যে-রকম অবস্থা আর মতিগতি দেখছে, মনে হয় থাকবে। এক বছরেরও ওপরে হবে, এখন থেকেই বিজয় মেহেরার ফেরার দিন গুনছে। প্রণয়ের দায়ে ইদানীং বাপী ঊর্মিলার কাছে ওই ছেলের গুণকীর্তন শুধু করেছে। ছেলে-টার ব্যক্তিত্ব আছে, পুরুষের দর্প আছে, বড় হবার মতো ইচ্ছের জোর তো আছেই, গুণও আছে।

ঊর্মিলার শুনে মধু। এক-একসময় তাগিদ দেয়, মায়ের কাছে ওর সম্পর্কে তুমি একটু একটু বলতে শুরু করো না!

বাপীর তখন পিছু হটার পালা। —এখন বললে মাঝখান থেকে উত্তেজনা বাড়বে, শরীর খারাপ হবে। সময়ে তোমার জোরটাই আসল, এখন বলে কিছু লাভ হবে না।

সেদিন ঊর্মিলা এসে একটা জরুরি খবর দিল। বিকেলে চা-বাগান কোয়ার্টার্স-এর দিকে বেড়াতে গেছল। আকাশ-এর সঙ্গে দেখা। ডাক্তারবাবুর ক্লাবে নিয়ে গিয়ে জোর-জার করে অনেক কিছু খাওয়ালো। সেই ফাঁকে বিজয় মেহেরার অনেক প্রশংসা। আকাশ নিজের একটা মস্ত ভুল শুধরে-বার সুযোগের অপেক্ষায় ছিল বলল। মিরিকের চা-বাগানের ওপরওয়ালার সঙ্গে দেখা করে বিজয় মেহেরার সম্পর্কে খোঁজ-খবরও নিয়েছে। কারণ ডাক্তার নিজের মেয়ে বললেই হয়, তার তো একটা দায়িত্ব আছে। তা সেই ওপরঅলা মেহেরার খুব প্রশংসা করেছে। বলেছে, যেমন সৎ তেমনি পরিশ্রমী। আর ভালো স্কলার তো বটেই। ছেলেটা যে খুব উন্নতি করবে তাতে তার কোনো সন্দেহ নেই। বিজয় লন্ডনে এখন কোথায় আছে, কি-রকম আছে, করে পর্যন্ত ফেরার সম্ভাবনা চিঠিপত্র লেখে কিনা, সহৃদয় আপনার জনের মতো আকাশ এসব খোঁজও নিয়েছে। চিঠির প্রসঙ্গে ঊর্মিলা চুপ করে ছিল, তার সব কথার জবাব ঠিক ঠিক দিয়েছে। তবুও ধারণা, বিজয়কে মায়ের কাছে অমন ছোট করে ফেলে আকাশ এখন পস্তাচ্ছে।

কিন্তু পস্তাবার ব্যাপারটা বাপীর থেকে ভালো আর বোধহয় কেউ আঁচ করতে পারবে না। বাপীর সঙ্গেও এই লোকের ব্যবহার এখন আরো আপনার জনের মতো। মাঝে মাঝে ওকে ডিনারেও ডাকে। গেলাসে চুমুক দিয়ে অন্তরঙ্গ খোশ মেজাজে জিজ্ঞাসা করে, কতকাল আর ব্যাচিলার থাকবে হে, দেখেশুনে মনের পড়ো খোঁজাও। নয় তো বলো আমিই ঘট-কালিতে লেগে যাই। তারপর গলা খাটো করে জিগেস করেছিল, কাউকে মনে-টনে ধরেনি তো?

নিরীহ মুখে শুধু হেসেই বাপী এসব কথার জবাব এড়াতে পারে। ঊর্মিলার সঙ্গে সহজ মেলামেশাটাই খুব সম্ভব ভদ্রলোকের বেশি দুশ্চিন্তার কারণ। আর গায়ত্রী রাই স্বভাবে এখন ওকে আগলে রেখেছে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেখছে, টাকা-পয়সা ঢালছে—তাই দেখেও এই অতি-চতুর লোকের সন্দেহের উদ্রেক হওয়াই স্বাভাবিক। মেয়ের বিয়ের পাত্রর জন্য দু-দুটো বড় কাগজে এত ঘটা করে বিজ্ঞাপন দিয়েও মহিলা একটা বছরের মধ্যে সে-সম্পর্কে একেবারে চুপ মেরে গেছে দেখেও এই লোকের সন্দিগ্ধ হবার কথা।

অনুমান মিথ্যে নয় দিন কতকের মধ্যেই বোঝা গেল। বণিকের চালিহা মানুষ ওপর পাঁড়া বলতে দেখুক। কিন্তু মানুষটার ভিতর, সেই একই খাঁড়া যে বাপীর দিকেও উঁচিয়ে আছে! মেয়েকে নিয়ে আজকাল কিছু ভার

দিকে মাঝে মাঝে ড্যানে চেপে হাওয়া খেতে বেরোয় গায়ত্রী রাই। ব্যবস্থা বাপীরই। তাকে না পেয়ে রণজিৎ চালিহা সেদিন বাপীর বাংলোয় হাজির।

ব্যবসার আলোচনার ফাঁকেই তার মনের সংকট আঁচ করা গেল। মধ্যপ্রদেশের অনেক জায়গায় ঘুরে এসেছে এর মধ্যে। ভালো ব্যবসাই হবে আশা করা যায়। কিন্তু চালিহা খোঁ-খবর নিয়ে দেখেছে পশ্চিম বাংলার কলকাতার মতো এমন বাজার আর হয় না। শুধু শুকনো হার্বের চাহিদাই সেখানে বছরে পঁচিশ তিরিশ লক্ষ টাকার মতো। আর নেশার জিনিসও ওখানেই সব থেকে বেশি চলতে পারে। চালিহার মতে এত বড় মার্কেট আর হাতছাড়া হতে দেবার কোনো মানে হয় না। ওয়েস্ট বেঙ্গল বিক্রিয়নের জন্যেই বাপীকে প্রথমে নেওয়া হয়েছিল, এখন তার সেখানেই চলে যাওয়া উচিত। সেখানে একটা গোডাউন ঠিক করে এখান থেকে মাল চালানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তারপর দেখে-শুনে ঘাঁটি ঠিক করে অন্য পাঁচ রকমের মাল পাঠানো যেতে পারে।

প্রস্তাবের শুরুতেই বাপী তার মনের কথা বুঝে নিয়েছে। সাদাসিধে জবাব দিল। মিসেস রাইয়ের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করুন, আমার তার অসুবিধে কি।

—বলেছিলাম। চালিহার মুখে চাপা বিরক্তি। —এই অসুখটার জন্যেই ভদ্রমহিলা মনের দিক থেকে বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছেন মনে হয়। অতবড় একটা মার্কেট আর হাত-ছাড়া হওয়া উচিত নয় বলে যদি মনে করো তাহলে তুমিই জোর দিয়ে তাঁকে বলো। এদিকের জন্যে তো কিছু আটকে থাকবে না, মধ্যপ্রদেশের ফিল্ড হাতে নিয়েও এদিকটা আমি দেখাশুনা করতে পারব।

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বাপী জিজ্ঞাসা করল, মিসেস রাই কি বলেন?

—কি বলেন তাই তো আমার মাথায় ভালো করে ঢুকছে না। তোমাকে নাকি এখন তাঁর খুব কাছে রাখা দরকার। ব্যবসার ইনটারেস্ট ছেড়েও তোমাকে খুব কাছে রাখা দরকার তাঁর.... ব্যাপার কি বলো তো?

ব্যাপার কি তা যে এই লোক গায়ত্রী রাইয়ের ও-কথার পরে খুব ভালো করে টের পেয়ে গেছে বাপীর তাতে একটুও সন্দেহ নেই। মনে হল, অন্তরঙ্গ খোলসের আড়ালে একটা হিংস্র জানোয়ার ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য ওৎ পেতে আছে। চোখের গভীরেও যেন একটা ধারালো ছুরি লুকনো আছে।

বাপী ভাবনায় তলিয়ে যাবার মতো করে জবাব দিল, অসুখটার জন্যেই হয়তো মন দুর্বল হয়ে আছে।

একটু আগে নিজেই এই কথা বলেছিল চালিহা। মুখে হঠাৎ অবাক হাসির খোলস চড়ালো চালিহা। বলল, তোমারও তো মন খুব সবল দেখছি না। যাক, আমার যা বলার ব্যবসার স্বার্থেই বললাম, যদি ভালো বোঝো তো মিসেস রাইয়ের সঙ্গে আলোচনা কোরো—আর কাছে থাকাটাই যদি বেশি দরকার ভাবো তা হলে আর কথা কি।

সে চলে যাবার পরেও বাপী স্থাণুর মতো বসে অনেকক্ষণ। সকলকে ছেড়ে গায়ত্রী রাই আগে এই লোকের কাছেই মনের ইচ্ছেটা প্রকারান্তরে ব্যক্ত করে ফেলল কেন মাথায় আসছে না। অসুখের জন্য বাপীর যে-টুকু উদ্বেগ আছে, মহিলার নিজের তার ছিটে-ফোঁটাও নেই। আর চরিত্রের এই ধাত বাপীর থেকে রণজিৎ চালিহা কম জানে না। অতএব ওকে কাছে রাখার একটাই অর্থ চালিহা বুঝেছে, আর, গায়ত্রী রাইও তাকে তা-ই বোঝাতে চেয়েছে। কিন্তু কেন? দূরে যাকে সরাতে চায় চালিহা, ভবিষ্যতে সে কত কাছের কোন জায়গা জুড়ে বসতে পারে সেটা বলে তাকে একটু সতর্ক করে দেবার জন্যে? বুঝিয়ে দেবার জন্যে যে আর তোমার ওই ছেলের পিছনে লেগে লাভ নেই—বরং নিজে তুমি সমঝে চলো?

কিন্তু বাপী কি করবে এরপর? মহিলার সংকল্প যে ভাবে দানা বেঁধে উঠছে, ও কোন্ পথ ধরে আত্মরক্ষা করবে?

জঙ্গলের কাজ যেমন বাড়ছে, অফিসের দায়িত্বও বাড়ছে তেমনি। কোথায় কোন্ চাষের বেড় হচ্ছে বা হবে বাপীর কাছে তার প্ল্যান ছক। দায়-দায়িত্ব আরো। আর হুকুম মতো তিরিশজন লোক সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত কাজ করে যাচ্ছে। এই গতর-খাটা লোকদের হিসেব মেটাবার জন্য আর পরামর্শ নেবার জন্য একদিন অন্তর আরুকে বাপীর কাছে আসতে হয়। হিসেব বুঝে পরচা লিখে সই করে দিলে অ্যাকাউনটেন্ট টাকা দিয়ে দেয়। মেমসাহেবের বাংলোর ত্রিসীমানার দিকে ঘেঁসে না আরু। সন্ধ্যার দিকে বাপীর বাংলোয় আসে।

পরপর চার দিনের মধ্যে আরুর দেখা নেই। লোক মারফৎ অ্যাকাউনটেন্টের কাছে হিসেবে পাঠিয়েছে—সে এসে বাপীর কাছ থেকে সই করিয়ে নিয়ে গেছে। অ্যাকাউনটেন্ট জানিয়েছে, রবিবারীর শরীরটা ভালো যাচ্ছে না।

বিকেলের দিকে বাপী সেদিন ওকে দেখার জন্যেই বেরিয়ে পড়ল। এদিক ওদিক পকস-টকস লেগেছে খবর পেয়েছে। শুধু-মুদু ঘরে বসে থাকার লোক নয় আরু রবিবারী।

দাওয়ার দিকে এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো। মুখখানা বাংলোর পাঁচিলের মতো হাঁড়ি করে হারমা বেরিয়ে আসছে। ওকে দেখল। অভ্যাসবশত একটা হাত কপালে উঠল বটে, কিন্তু মুখ তেমনি অপ্রসন্ন। গম্ভীর তো রবিবারই। একটি কথাও না বলে পাশ কাটিয়ে গেল।

ওর অসন্তোষের কারণ আঁচ করতে পারে বাপী। সাপ ধরার মৌসুম এটা। এর মধ্যে তিন দিন আগে রেশমাকে আবার পাহাড়ের বাংলোয় পাঠানো হয়েছে। এবারে গায়ত্রী রাইকে বলেই তাকে পাঠিয়েছে রণজিৎ চালিহা। বান্দরজুলি বা আশপাশের এলাকার মদ চালানের ব্যাপারটা এখন বাপীর হাতে বটে। কিন্তু অন্যত্র চালিহার পার্টিও কম নয়। একটা বড় চালানের ব্যবস্থা করে মাল সংগ্রহের জন্য রেশমাকে আগে থাকতে সেখানে পাঠানো হয়েছে। বাপীর ধারণা দু-চার দিনের মধ্যে রণজিৎ চালিহাও পাহাড়ে যাবে। অবশ্য যাওয়াই স্বাভাবিক। হাজার দুই টাকার মাল আসবে হয়তো, সে টাকা তো আর রেশমার হাতে দিয়ে দেওয়া যায় না। আগে গিয়ে সে শুধু সংগ্রহের ব্যবস্থা পাকা করে রাখবে।

চেষ্টা করেও ব্যাপারটা খুব সাদা চোখে দেখেনি বাপী। কিন্তু কর্তার সায় থাকলে সে আর বাধা দেয় কি করে? রেশমাকে আসামে চালান করতে চাওয়ার পিছনে চালিহার নিজস্ব মতলব কিছু আছে একথা তো গায়ত্রী রাইকে খোলাখুলিই বলে দিয়েছিল বাপী। হয়তো বা ভেবেছে, ঝগড়ু আছে সেখানে, মেয়েটা ঠিক থাকলে তার ওপর হামলার কোনো ভয় নেই। আবার এমনও হতে পারে ওই তুখোড় বুদ্ধিমতী মহিলার কাছে এও একটা টোপের মতো। আর সেই কারণেই প্রস্তাব আসামাত্র সায় দিয়েছে। হামলা যদি কিছু হয়ই, আর মেয়েটা যদি বুখে দাঁড়ায় বা ফুঁসে ওঠে, রণজিৎ চালিহার তাহলে মুখ পুড়বে। জঙ্গলের এইসব মেয়ে, বিশেষ করে রেশমা যে খুব সহজ মেয়ে নয় গায়ত্রী রাই সেটা ভালই জানে। বড় দরের গণ্ডগোল কিছু পাকিয়ে উঠলে চালিহার সঙ্গে মহিলার কিছু ফয়সলার সুযোগ হয়তো আপনি এগিয়ে আসবে।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে বাপীর অস্বস্তি রেশমাকে নিয়েই। তার হাল-চলনের বেশ পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে জঙ্গলের কাজ তদারকে বেরুলে ওর দেখা হয়। আবার বাংলোর দিকের রাস্তা

Joint Entrance Examination, 1979
for admission to
Engineering and Medical Colleges
For full details and prospectus of the Correspondence course to prepare students for Joint Entrance Exam., send a self-addressed 40-paise stamped envelope (12 cms x 24 cms) to the
Programme Director,
INSTITUTE OF COMPETITIVE EXAMINATIONS,
7, Old Court House Street, Calcutta-700 001.
Supersribe the envelope "JE 79"
Standard

যখন ঊর্মিলার সঙ্গে বেড়াত, তখনো দেখা হয়। রেশমা চোখের কোণে তাকায়, ঠোঁটে হাসি টিপ টিপ করে। সামনা-সামনি দেখা হয়ে গেলে দু'হাত কোমরে তুলে দাঁড়ায়। অর্থাৎ বাপী এগোলে বা থামলে দুটো কথা কইবার সাধ। কিন্তু বাপী এগোয়ও না দাঁড়ায়ও না। সোজা পাশ কাটিয়ে চলে যায়। তাতেও মেয়েটার চোখে মুখে কৌতুক ঝরে লক্ষ্য করেছে।

বাপী তরফদার এখন ওর শুধু খোদ ওপরঅলা নয়, এক কথায় দণ্ডমুণ্ডের মালিক। রেশমাও সেটা খুব-ভালো করে জানে। দেখা হলে এই মেয়ে যদি সসম্ভ্রমে তাকে সেলাম ঠুকত বা পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াত—তাও খুব অস্বাভাবিক হত না। কিন্তু এর থেকে ওর সর্ব অঙ্গে ওপরঅলার দাক্ষিণ্য যেটুকু আছে তার ওপরেই যেন নির্ভর বেশি। নিজের এই জোরের দিকটা সম্পর্কে সজাগ বলেই একটু বেশি বে-পরোয়া। এই মেয়ে যদি সসম্ভ্রমে সেলাম ঠোকে বা পথ ছেড়ে দাঁড়ায় সে-ও যেন কৌতুকের মতোই হবে। যাই হোক, বাপীর ধারণা মেয়েটার চাপা কৌতুক দিনকে দিন বাড়ছে।

...ক'দিন আগের এক বিকেলে ঊর্মিলা বাপীর বাংলোয় এসে হেসে অস্থির।—জঙ্গলে রেশমার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল?

বাপী জবাব দেয় নি। নির্লিপ্ত গম্ভীর মুখে তাকিয়েই শুধু।

—তোমাকে ক'বার করে ডেকেছিল, আর তুমি সাড়া না দিয়ে আর একদিকে চলে গেছ?

..জঙ্গলের সেই সাপ ধরার পোশাকে রেশমাকে দেখেছিল ঠিকই, সেই আঁট জামা পরা সেই মেয়েকে দেখলে দুটো চোখ আপনা থেকে অবাধ্য হয় বলেই ডাক শুনেও বাপী স্রেফ্জা প্রস্থান করেছিল, আর সত্যি কথা। জিগ্যেস করতে আরো বেশি বিবক্ত হয়ে জবাব দিয়েছিল, রেশমাকে বলে দিও আমি ওর ইয়ার্কির পাত্র নই।

ছদ্ম বিস্ময়ে ঊর্মিলার দু'চোখ বড় বড়।—রেশমা তো তাহলে ঠিকই বলেছে। সঙ্গে সঙ্গে আবার হাসি।

—কি বলেছে?

—ও একটা মস্ত শংখচুড় ধরেছে আজ, সেই আনন্দে ওটা তোমাকে দেখাবার জন্যে ডেকেছিল। ও দুঃখ করছিল, এতবড় ওপর-অলা হয়ে জ্যান্ত সাপের মতোই তুমি ওকে ভয় করো—এদিকে তোমার জন্যেই এখন ওর এত আয়-পয় যে ম্যানেজার চালিহা পর্যন্ত এখন ওকে খাতির করে, হেসে কথা কয়। তারপরেই চোখ পাকিয়েছে, নিজের মনে পাপ না থাকলে ওর মতো এতদিনের একটা চেনা-জানা মেয়েকে তোমার এত ভয় কেন মশাই? ও-মেয়ে জেল পাবলে তোমাকে পুজো করে!

বিবক্ত হয়ে বাপী চায়ের তেষ্টার কথা বলে ওদের বাংলোয় চলে এসেছিল। মেয়েলি বাস্তা ধরে রেশমা যে শয়তানি করেই চালিহার খাতির করা বা হেসে কথা কওয়ার ব্যাপারটা বাপীর কানে তুলতে চেয়েছে তাতেও কোনো সন্দেহ ছিল না।

আবু রববাণী দাওয়ায় একটা চাদর গায়ে জড়িয়ে বসে। অদূরে দুলারি দাঁড়িয়ে। দুজনেই গম্ভীর। মুখ দেখে মনে হয় দু-জনের কিছু কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। এই মাত্র হারমাকে চলে যেতে দেখেছে বাপী। কাছে আসতেই দুলারি জিগ্যেস করল, হারমাকে দেখলে?

—হ্যাঁ, কেন?

—কেন আবার কি, তোমার একটু মায়া দয়া নেই? রেশমা পাহাড়ে গেলে ওকেও সঙ্গে দিয়ে দিতে পারো না? সেখানকার জঙ্গলে সাপখোপ নেই?

এমন মুখ আর এই অভিযোগ যে আবুকে আরো উত্যক্ত করার জন্য বাপীর বুঝতে সময় লাগল না। ওর দিকে ফিরে হেসেই জিগ্যেস করল, জ্বরটর বাধিয়ে বসে আছ নাকি?

এবারে গম্ভীর চালে ঠেস দিয়ে দুলারিই আগের ভাগে জবাব দিল, বসন্তের বাতাসে রাত দুপুরে ইদারায় ঠান্ডা জলে চান না করলে গা জুড়ায়? এখন গা গরম, জ্বর থেকে মেজাজ আরো বেশি গরম। হারমার জন্য এত দরদ যে আসলকেই পাঁচ কথা শোনাচ্ছে!

বাপী দাওয়ায় বসল।—কি ব্যাপার?

গোমড়া মুখ করে আবুই ব্যাপার বোঝালো তাকে। জমন কষলা করে ফেললেও রেশমার মতো মেয়ে হারমাকে পাত্তা দেবে না, দোষের মধ্যে ঠেস দিয়ে দুলারিকে এই কথা আবু বলেছিল। তাইতেই দুলারির রাগ। রেশমার নামে কেউ কিছু বললে ও আর রদ্দাস্ত করতে পারে না। কিন্তু হারমা যে নালিশ করে গেল উল্টে সব ওই মেয়ের ওপর দুলারির রাগ হবার কথা। ম্যানেজার চালিহার সঙ্গে রেশমার এখনকার একটু ভাবসাব আবুও লক্ষ্য করেছে। কিন্তু দুলারি তা বিশ্বাসই করে না। রেশমার নালিশ শুনে ওই পাজী মেয়ে ফিরে তড়পেছে, নতুন বড় কর্তা তো সাত খুনের আসামীর মতো দেখে ওকে, পুরনো বড় কর্তা যদি হেসে-ডেকে দুটো কথা কয় তো দোষের কি, আনন্দই বা হবে না কেন? পাহাড়ে যাবার ছওকা পেয়ে খুশিতে নাচতে নাচতে চলে গেল, এদিকে হারমা বলল, এর মধ্যে এক সন্ধ্যার ওই চালিহা লোক পাঠিয়ে রেশমাকে তার বাংলোয় ডেকে নিয়ে গেছল। পাহাড়ে যেতে হবে বলার জন্যে সন্ধ্যার পর বাংলোয় ডেকে পাঠাবার দরকার কি, আপিসে ডেকে এনে বললেই হয়। অবশ্য হারমা তখন ওর সঙ্গে ছিল, আর আধ ঘন্টাটাক বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছিল। তারপর রেশমার পাহাড়ে যাবার আগের দিন বিকেলে ম্যানেজার চালিহা নিজে ওর জঙ্গলের ডেরায় এসেছে, রেশমা নাকি তাকে আদর করে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছে। কম করে ঘন্টখানেক ধরে কাজের কথা বলে তারপর চলে গেছে। হারমা ততক্ষণ সামনের উঠোনে বসে। নালিশ শুনে দুলারি নাকি উল্টে হারমাকে ধমকেছে, দুদিনই তুই কাছে ছিলি আর ঘরের দরজাও বন্ধ ছিল না—তোর এভাবে এসে লাগান-ভাঙ্গান দেবার কি হল, কাজের কথা থাকতে পারে না?

কাজ যা-ই থাক, ওই ধূর্ত লোকের সঙ্গে মাঝামাঝি আবুর একটুও ভালো লাগেনিই হারমার পক্ষ নিয়ে সে-কথা বলতে দুলারি শুনিয়েছে, নিজের চরিত্রখানা কি ছিল তাই আগে ভালো করে দেখো, রেশমার মতো মেয়েকে বুঝতে তোমার ঢের দেরি। ফাঁদ যদি পাতেও, বুকে ছুরি বসানোর জন্যে পাতবে জেনে রেখো।

সবটা শোনার পর নিরীহ মুখে বাপী জানান দিল, চালিহা সাহেবও দু-চার দিনের মধ্যে পাহাড়ে যাচ্ছেন।

—যাচ্ছেন! রাগ আর উত্তেজনায় আবু সামনে ঝুঁকল।

—যেতে তো হবেই।' রেশমা যে কাজের ভার নিয়ে গেছে তার টাকা পৌঁছে দিতে হবে না?

—শুনলে? শুনলে দোস্তএর কথা?

মুখ মচকে দুলারি জবাব দিল, দোস্তকেও তোমার মতো রোগে ধরাতে চাও তো এ-সব কথা আগে বেশি করে শোনাও।

রেশমার বিরুদ্ধে কোনো কথাই যেন দুলারির বরদাস্ত হবার নয়।

কিন্তু দুদিন না যেতে একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে ব্যাপারখানা অন্যরকম দাঁড়িয়ে গেল। হাজার আড়াই টাকা নিয়ে কন্ট্রাক্টর হুকুমে চালিহার বদলে বাপীকে ছুটতে হল পাহাড়ের বাংলোয়। জরুরি তার পেয়ে রণজিৎ বিহারে চলে গেছে। সপ্তাহ দিনের আগে তার ফেরার সম্ভাবনা নেই।

এ-রকম হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবু হাসিই পেয়েছে বাপীর। বেচারার বরাত বড় মন্দ চলেছে দেখা যাচ্ছে।

রেশমা বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। বাংলোর ফটক দিয়ে বাপীর গাড়ি ঢুকতে দেখল। চালকের আসনেও শুধু ওকেই দেখল। নিজের অগোচরে হাত দুটো কোমরে উঠল তার। একজনের বদলে অন্যজনকে দেখে অবাক কতটা ঠাওর করা গেল না। মুখে চাপা খুশির ছটা।

বাগানে মৌসুমি ফুল ছেয়ে আছে। আবার সেই বসন্তকাল। একটা মিষ্টি গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে আছে। তার মধ্যে রঙ-চঙা ঘাগড়া আর জামা-পরা ওই মেয়ে দাঁড়িয়ে। কোমরে দু-হাত জেলার ভঙ্গিটাও চোখ টানবেই। ভিতরে ভিতরে বাপীর আবার সেই পুরনো অস্বস্তি। ফলে ওপর-অলার মুখ ভার। ঠাণ্ডা-গম্ভীর।

গাড়ি থেকে নামার ফাঁকে ঝগড়ু এসে দাঁড়িয়েছে, ওকে দেখে এক-গাল হাসি। তড়বড় করে বলল, তুমি আসবে কপীভাই, ভাবিনি—খুব ভালো হল।

বারান্দায় উঠে বাপী একটা চেয়ার টেনে বসল। রেশমা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে। ওর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে শুধু। ঝগড়ুর দিকে চেয়ে গম্ভীর মুখেই বাপী জানান দিল, মিস্টার চালিহা জরুরি তার পেয়ে বিহার চলে গেলেন, তাই আমি এলাম।

কালো মুখে আর এক প্রস্থ হাসি ছড়িয়ে ঘাড় মাথা নাড়তে নাড়তে ঝগড়ু ভিতরে চলে গেল। ওই একজনের বদলে বাপীভাইকে দেখে সে-যে কত খুশি, মুখে আর সে-কথা বলল না। তাড়াতাড়ি চা-টার ব্যবস্থা করতে গেল।

সামান্য মাথা নেড়ে বাপী রেশমাকে কাছে ডাকল। কোমর থেকে হাত নামল রেশমার। ঢিমে তালে সামনে এসে দাঁড়াল। বাপী তাকে বসতে বলল না। জিগেস করল, কাজ-কর্মের কদ্দুর?

—হচ্ছে। কয়েকজন মাল মজুত করেছে, টাকা পেলেই দিয়ে দেবে। আর বাকিরা এখনো যোগাড় করছে, আরো পাঁচ-ছদিন লাগবে।

—এত সময় লাগবে কেন, তুমি তাড়া দাওনি?

—বেশি তাড়া দেবার কথা আমাকে বলা হয়নি। তোমার যেরকম তাড়া থাকলে তাড়া দিয়ে দেখতে পারি।

রেশমা সোজা চেয়ে আছে বলেই বাপীর দু-চোখ সামনের বাগানের দিকে। এরকে ওর দিকে না তাকিয়ে পারা গেল না। খুব সহজ সরল কথাকটার মধ্যেও যেন অহেতুক মেজাজ ছোঁয়া লেগে আছে। চোখাচোখি হতেই বাপী যেন ধাক্কা খেল একপ্রস্থ। এই হাসি-মাখা চাউনি বাপীর যেন অচেনা নয় খুব। কোথায় দেখেছিল....কোথায়? যে-চাউনি দেখলেই মনে হয় তার আড়ালে সর্বনাশ লুকিয়ে আছে কিছু। কমলা বণিক নয়, মণিদার বউ গৌরী বউদির চোখে এই রকম দেখেছিল কিছু। গৌরী বউদি সাত বছরের বড় ওর থেকে। রেশমা বছর দুইয়ের। কিন্তু দেখলে রেশমাকে বড় কেউ বলবে না। আরো তফাৎ কিছু আছে। গৌরী বউদি খুব অপ্রত্যাশিত পুরুষ দেখছিল। রেশমার চাউনি আদৌ অপ্রত্যাশিত কাউকে দেখার মতো নয়। ও-যেন কাউকে নাগালের মধ্যে পেয়েই বসে আছে।

বাইরে বাপী আরো ঠাণ্ডা। আরো গম্ভীর।' উঠল। ঘরে চলে গেল। নিজেই জানে কপাল ঘেমে ওঠার দাখিল। ওপরঅলার ষড়যন্ত্রটা যেন রণজিৎ চালিহাকে নিয়ে নয়—ওকে নিয়ে।

এরপর আর রেশমার সঙ্গে কোথাও বেরুলো না। ওর কাছ থেকে পার্টিদের ঠিকানা নিয়ে নিজেই বেরুলো। ওকে শুধু হুকুম করল, যোগাড়যন্ত্র তাড়াতাড়ি হয় কিনা দেখো—

একে একে চারদিন কেটে গেল। আজ পাঁচদিন। বাপী আশা করছে আজকের মধ্যে কাজ চুকিয়ে কাল সকালে বেরিয়ে পড়তে পারবে। একলাই যাবে। পরে ভ্যান এসে মালসহ রেশমাকে নিয়ে যাবে। ওর আচরণের ফলেই রেশমাও এবারে অনেকটা সমঝে চলতে বাধ্য হয়েছে বলে বিশ্বাস। সমস্ত দিন বা রাতের মধ্যে একবারও দেখা হয়নি এমন দিনও গেছে। সকাল দুপুর বিকেল রাত্রি একলা বসে খেয়েছে। ঝগড়ুকে বলেছে খাবার ঘরে দিয়ে যেতে। বাপীভাইয়ের মেজাজ দেখে এবারে ঝগড়ুও হয়তো, অবাক একটু। দুদিন মাত্র রেশমাকে ডেকে কাজের কথা বলেছে বা কাজের নির্দেশ দিয়েছে। রেশমাও অনুগত বাধ্য মেয়ের মতো কথার জবাব দিয়েছে বা নির্দেশ শুনেছে। কোনো অছিলায় কাছে ঘেঁষতে চেষ্টা করেনি। তবু বাপীর ভেতরটা যেন অস্বস্তিতে বোঝাই একেবারে।

সেদিন আর দুপুরের পর বাপীর হাতে কাজ নেই কিছু। রেশমা সকাল সকাল খেয়ে-দেয়ে তার কাজে বেরিয়েছে। বেলা থাকতে বাপী পায়ে হেঁটেই বাংলো ছেড়ে বেরুলো। আগের তুলনায় অনেক আত্মস্থ। পাহাড় থেকে নেমে জঙ্গলে ঢুকল। তারপর পাহাড়ের ধার ধরে আপন মনে এগিয়ে চলল। পাহাড়-ঘেঁষা জঙ্গলের একান্ত নির্জন পথ ধরে মাইল দুই হাঁটার পর ক্লান্ত হয়ে একটা পাথরে বসল।

ঝিকেল চারটে তখন। এত নিরিবিলি বলেই ভালো লাগছে। উঠতে ইচ্ছে করছে না। এই নির্জনতার এক ধরনের ভাষা আছে যা কান পেতে শুনতে ইচ্ছে করে। আগের বছর যেমন দেখে গেছল তেমনি। বনের সর্বত্র সেই রূপের ঢেউ। সেই রঙের ঢেউ। অশোক পলাশের সেই রঙের বাহার। শিমুল কৃষ্ণচূড়ার মাথা তেমনি লালে লাল। বাপী তন্ময় হয়ে দেখছে।

হঠাৎ বিষম চমক। কেউ ডাকেনি, কিন্তু নিজে থেকে কি করে টের পেল বাপী জানে না। ওর বাঁ পাথরটার ঠিক পিছনে কেউ দাঁড়িয়ে।

রেশমা। পরনে ঘাগরা। গায়ে রঙ-চঙা জামা। দু-হাত কোমরে। বাপীকে যেন দেখেইনি। তার মাথার ওপর দিয়ে সামনের প্রকৃতি দেখছে সেও।

—তুমি এখানে কেন? হঠাৎ কঠিন কর্কশ গলার স্বর বাপীর।

রেশমার দুচোখ যেন দূরের থেকেই কাছে এলো। তার মুখের ওপর স্থির হল। রাগত মুখ রাগত চাউনি তারও। —আমার সঙ্গে আজকাল তুমি এরকম ব্যাভার করছ কেন?

—তুমি যাবে এখান থেকে?

—কেন যাব? জঙ্গল তোমার?

হঠাৎ বাপী অত্যন্ত শান্ত। সংযত। গলার স্বর তেমনি কঠিন। —দেখো রেশমা, তুমি যার কাজ করছ আমিও তার কাজ করছি। এর মধ্যে তুমি যদি আমাকে ওই চালিহার মতো একজন কেউ ভেবে থাকো তো খুব ভুল হবে।

কৌতুক চাপার আড়নায় রেশমা আরো গম্ভীর। সাদাসাপটা জবাব দিল, চালিহার মতো ভাবলে তোমার ধারে-কাছে কে ঘেঁষত?

এবারে বেশ জোরেই ধমকে উঠল বাপী। —তুমি যাবে এখন এখান থেকে?

কোমর থেকে দু-হাত খসল। বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে সামনের দিকে তাকালো একবার। সঙ্গে সঙ্গে গলা দিয়ে অস্ফুট আর্তনাদ। কিছু বোঝার আগেই দু-হাত বাড়িয়ে আচমকা প্রচণ্ড এক হ্যাঁচকা টানে বাপীকে একেবারে নিজের গায়ের ওপর টেনে আনল। তারপরেই বলে উঠল, বনমায়ার সেই গুণ্ডা হাতি!

পলকে সামনের দিকে চোখ পড়তে বাপী বিমূঢ় হঠাৎ। রেশমা এক হাতে তাকে আঁকড়ে ধরে আছে হুঁশ নেই। দেড়শ গজ দূরে একটা বিরাট হাতি। দুপাটি বিশাল দাঁত ধনুকের মতো বেঁকে গেছে। ডান দিকের গলার কাছে প্রকাণ্ড লালচে ক্ষতর মতো। হাতিটাও বোধহয় সেই মুহূর্তেই দেখেছে ওদের। সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের মতো শরীরটাকে একটা ঝাঁকানি দিয়ে দ্রুত ধাওয়া করল এদিকে।

(চলবে)

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

হাওয়া গাড়ি

।। অষ্টত্রিংশ ।।

পেট্রলের দাম বেড়ে যাওয়ার পর বড় গাড়ির কেনাবেচা বিলকুল বন্ধ। এখন এই সুন্দর শীতকাল—অথচ ইউজড কার ডিলার বরেন তার বৈঠকখানায় বসে মাছি তাড়াচ্ছে। এ-বাড়ি — কলকাতার এমন জায়গায় গ্যারেজের মাঠ—সবই তো হাত-ফেরতা হাওয়া গাড়ি ফিরিয়ে ফিরিয়ে কেনা-বেচার কল্যাণে। কিংবা সুবাদে—

আগে শীতকালটায় বরেন টাটকা কাঁচা আনাজের গন্ধ পেতো বাতাসে। পাকা টমেটো ; কই মাছের সঙ্গে ফুলকপি দিয়ে ঝোল। নতুন গুড়ের সন্দেশ। কেননা—তখনই তো হাতে টাকা আসত। কাঁচা টাকার ঝমঝম শব্দ সকালবেলার আলোর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকে পড়ত।

ছ আনা রেজ থেকে ষোল আনার ভদ্দরলোক হয়ে ওঠার মুখে মুখে বরেন এ-পাড়ায় জমি কেনে। তখন লেক কোথায়। গোলপার্কের গায়ের জমিগা-জমি পঞ্চাশ টাকায় কাঠা কেনানোর জন্যে সকাল থেকে দালাল লেগে থাকত।

দেওয়ালে নানা মডেলের গাড়ির ছবি। আট সিলিণ্ডার স্টুডিবেকার কমাণ্ডার। এয়ার কুলার বসানো। গ্যালনে আট মাইল। এই সেদিনও অনেকে চড়তো। ডজ, কনসাল, ফোর্ট গ্যালাক্সি — নানান মেকের ভাল ভাল গাড়ি এখন মাদ্রাজের দিকে চলে যাচ্ছে। লং রুটে ডিজেল ইঞ্জিন বসিয়ে চালাচ্ছে অনেকে।

বরেন আজকাল আর অংক কষে না। যোগ দেয় না। বিয়োগ করে না। গুণ ভাগ তো এড়িয়ে চলে। অথচ আগে সে মনে মনে লম্বা অংক কষতো। রিপেয়ারিং শপ খোলার পর তখনকার বরেন ভাঙা গাড়ি কিনে আগা-পাছতলা পাল্টে ফেলত। কেনার সময়েই মনে মনে অংক হয়ে যেত। কোনটা রিপেয়ার—কোনটা পাল্টান—কোনটা লেদ-শপে গিয়ে কি বিল উঠবে—তা মনে মনেই অংক কষে বের করে ফেলত বরেন। ফোন এলো।

হ্যালো। বরেন দত্ত স্পিকিং—

ওপাশ থেকে গলা ভেসে এলো। অস্টিন ট্যুরার চাই একখানা—

সে গাড়ি তো চাইলেই পাওয়া যায় না।

আপনার তো খোঁজে থাকে। দেখুন না—

নাম বলুন। ফোন নম্বর—। বলে বরেন ওপাশ থেকে ভেসে-আসা নম্বর নাম টুকলো ডায়ারিতে। তারপর জানতে চাইল আপনার বাজেট সম্বন্ধে যদি একটা আইডিয়া দিতেন—

বাজেট ইজ নো হিণ্ডরান্স। তবে মোটামুটি চলনসই গাড়ি চাই—

দেখছি। বলে ফোন রেখে ভাবতে বসলো বরেন। কোথায় এখন অস্টিন ট্যুরার পাওয়া যায়। এ রকম মডেল আসে এক এক সময়। অন পার্টিজ অ্যাকাউন্ট গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে থাকে বাড়ির সামনে। রবিবার রবিবার। শো রুমেও রাখতে হয় মাঝে মাঝে। অস্টিন ট্যুরার তো এখন ডিসেন্টো পিস। কোথায় পাওয়া যায়?

সকালে টেনিসে যায় ঘণ্টা খানেক। সেখানেই বরেন গাড়ির খবর পায়, বেশির। খেলার শেষে ফেন্স লাইমের গ্লাস হাতে গাড়ির কথা হয়। তবে সে সব তো এখন-কার গাড়ি। দু-একটা ছুটকো-ছাটকা আগে-কার গাড়িও এসে পড়ে অবিশ্যি।

রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল বরেন। একদম মোড়ের মাথায়। যখন আর কোন পথ পায় না সে—তখন এই রাস্তা ধরে বরেন। মোড়ের মাথায় তাকিয়ে থাকতে থাকতে দরকারী গাড়ির উদয় হয়। নম্বরটা টুকে নিয়ে পরদিনই সকাল সকাল বাড়িয়ে দেখতে বেরোয় বরেন। গাড়ি কেনা শক্ত নয়। গাড়ি বিক্রিও শক্ত নয়। দরকারী গাড়ী খুঁজে বের করাই সবচেয়ে কঠিন।

আগে তো সে প্রিন্সলি স্টেটগুলো থেকে লট-কে-লট গাড়ি কিনে নিয়ে চলে আসত।

মোড়ে দাঁড়িয়ে মনে পড়ল বরেনের। বাই দি ওয়ে। দিলীপ বসুকে সে একটা অস্টিন ট্যুরার দিয়েছিল। অটোমোবিল ইণ্ডিয়ার এম ডি কালু ঘোষের গাড়ি ছিল।

তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলো বরেন। ডায়ারিতে নম্বরটা ছিল। ডায়াল করতেই ওপাশ থেকে গলা ভেসে এলো। কাকে চাই?

দিলীপবাবু আছেন

দিলীপবাবু?

হ্যাঁ। এটা এই নম্বর তো?

হ্যাঁ। ও নামে তো কেউ এখানে থাকে না।

একটু অবাকই হল বরেন। তাহলে কে থাকেন?

তা আপনাকে বলব কেন?

না। মানে আমার পরিচিত এক ভদ্র-লোক—ডি বসু ও বাড়িতে থাকতেন জানতাম।

ছিলেন হয়ত। এখন আমরা নিউ ওনার—

ওঃ! বলে ফোন রেখে দিল দিলীপ। মনে মনেই বলল, বাড়ি বেচে দিয়েছে তাহলে। গাড়িটা বিক্রি করে নি তো। এখন কোথায় পাওয়া যায় দিলীপবাবুকে। তখনই তার মনে পড়ল, কিছু দিন আগে কাগজে দেখেছিল, খুনের ঘটনায় দিলীপ-বসু ফেরার। গেপ্তারের খবরও সে দেখে-ছিল। ভাল লোক। কেন যে খুন করতে গেল।

লালবাজারে ফোন করে ডি সি ডি ডি ওয়ানকে চাইল অরেন। অল্প বয়সী ডেপুটি কমিশনার। বরেনের কাছ থেকে একখানা গাড়ি কিনেছে। ওকে ফোন করলে হয়ত দিলীপ বসুর হদিশ পাওয়া যেতে পারে।

লালবাজারের অপারেটর মেয়েটি বলল, পরে ফোন করবেন। ডি সি ওয়ান এখন ব্যস্ত আছেন।

ব্যস্ত মানে—ডি সি ডি ডি ওয়ন তখন তার চ্যাম্পিয়ন ইনফরমার সুধীর দত্তর সঙ্গে কথা বলছিলেন। সুধীর এখন অন্তত পঞ্চাশ। ডি সি ডি ডি বসিদ খানের বয়স বড়জোর পঁয়ত্রিশ। তোপচাঁচির ছেলে। বাংলা বলে ফ্লুয়েন্ট। হেসে বলল, সুধীর। তোমার আগের বউয়ের সঙ্গে লভ ছিল তাহলে দিলীপ বসুর।

ওভাবে বলবেন না স্যার। মানুষ মাত্রেই তো ভুলবাসে।

তাহলে তুমি কি জানতে এসেছো আমার কাছে?

ডি সি ডি ডি সোজাসুজি তার চেখের দিকে তাকিয়ে। ঝকঝকে চেহারা। অগেকার ডি সি ডি ডিদের ছবি সারি সারি দেওয়ালে টানান। সুধীর ঘাবড়ে গেল। তবু সাহস করে বলল, স্যার। আমি সামান্য ইনফরমার। আপনাদের বযায় বেঁচে আছি।

তুমি মোটেও সামান্য নও। কলকাতায় নিজেদের বাড়ি আছে। তাছাড়া সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের চাকরিতে ছিলে। সেখানকার পয়সা-কড়ি কিছু কি রাখো নি!

সত্যি বলছি স্যার। একটা পয়সাও জমাতে পারি নি।

তা যাগিগয়ে। বাট ভাগলো কেন তোমার?

সি ইজ আ বিচ স্যার—

তোমারও দোষ ছিল নিশ্চয়।

কপাল স্যার। বলেই খিচিয়ে উঠল সুধীর। আমায় একবার লক-আপে ঢুকতে দেবেন স্যার।

কেন?

হাতের সুখ করে নিতাম একবার।

দিলীপ বোসের ওপর তো। হেসে ফেলল বসিদ খান। কোন ইনফরমারের সঙ্গে ডি সি ডি ডি সাধারণত এতটা ঘনিষ্ঠ হয় না। কিন্তু বয়সে হিসেবে আজ ক বছর সুধীর হোমসাচোনরা পুলিশ অফিসারদের সঙ্গেই মিশে আসছে। সে এই সব অফিসারের মেজাজ মর্জি বোঝে।

হ্যাঁ স্যার। আমার জীবনটা এই লোকটাই নষ্ট করেছে স্যার।

তুমি নিজে কর নি তো।

সুধীর চুপ করে গেল।

বসিদ খান নিজের ডেসিগনেশন অনুযায়ী গম্ভীর হবার চেষ্টা করল। মাইন তোমাকে লক-আপে অ্যালাউই করব না। তাছাড়া—

কি স্যার?

দিলীপ বসুকে আমরা ধরে রাখতে পারব না। কোর্টে কেস উঠলে টিকবে না।

কেন স্যার? ঘটনাস্থলেই তো সব পাওয়া গেছে। আততের অস্ত্র সমেত।

ডাক্তারি রিপোর্ট বলছে — মৃত্যুর কারণ—ইলেকট্রনিক শক।

ডাক্তার অই রিপোর্ট দিয়েছে?

হ্যাঁ। তাছাড়া—বলতে বলতে ডি সি ডি ডি লালবাজারের বড় ঘরের চেয়ার থেকে নিচের বাঁধান চাতাল দেখতে পেল। এক গাদা ভ্যানের ভেতর অদ্যিকালের অস্টিন ট্যুরোবটা শীতের রোদে গা পোহাচ্ছে। তোমার বউ কেয়া এখন নামকরা একজিকিউটিভের বউ।

কে স্যার?

সে তুমি খুঁজে দেখো। ও বাড়ি তো দিলীপ বোসের নয় সুধীর।

সুধীর আকাশ থেকে পড়ল। সে ভেবে এসেছিল—ওটা বুঝি দিলীপেরই বাড়ি। শুকনো গলায় সে বলল, আমাদের কটান-ছাটান তো কমপ্লিট হয় নি স্যার।

কোর্টে গিয়ে বল ওসব কথা। কিন্তু অমন দামী একজিকিউটিভের সঙ্গে টাকার জোরে পারবে কি? সেটা ভেবে দেখো।

আপনারা তো ইচ্ছে করলে সবই পারেন। একটু অ্যারেস্ট করে দিন না লোকটাকে—

ওরে বাবা! তারপর ঝামেলা সামলাবে কে? ধরো সুধীর—অ্যারেস্ট করে জ্যোতির্ময় সরকারকে নিয়ে এলাম। তারপরেও কি তোমার বউ তোমার সঙ্গে যাবে? নিয়ে যেতে পারবে তুমি?

আমি কোন কুলটাকে ঘরে নিতে চাই না স্যার—

তবে আর মাথা গরম করছ কেন শুধু শুধু।

শুধু ছেলেটার জন্যে কষ্ট হয় স্যার—

ছেলেকে তো তার মা-ই দেখবে সবচেয়ে ভাল।

সুধীর আর কোন কথা বলতে পারল না। বসিদ নিজের ভেতরে ঢুকে গেল। তাকে এখুনি রাইটার্সে হোম সেকেট্রারির ওখানে যেতে হবে। আজ অপেক্ষিশন রাইটার্সের সামনে মিছিল এনে ওরা ফাটিফেরা বেক করবে। ডি সি ডি ডি মাথা তুলে দেখলো সুধীর ইনফরমার চলে গেছে। তার মনে পড়ল, সে-ও তো মায়ের কাছেই বড় হয়েছে। মা—অল্প বয়সে বিধবা হল। আমার বাবা ছিলেন আপকান্টির লোক।

খানিক বাদে পৃথিবীতে বিকেল এসে গেল। লালবাজারের উঠোনে জিপ আর ভ্যানের জঙ্গলে অস্টিন ট্যুরোবটা নিয়ে কালু ঘোষ আজ ক হপ্তা হিমসিম খাচ্ছে। মাঝে মাঝে লালবাজার লকআপে গিয়ে দিলীপকে চসা করে আসে। তোমার এত চিন্তা কিসের দিলীপ—

আমার কোন চিন্তাই নেই কালুদা। রাণী কেমন আছে জানি না। দাদুভাই। ওরা একবার একটা খোঁজও নিল না। আশ্চর্য।

এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই দিলীপ। হয়ত কাগজ পড়ে—লোকলজ্জার কথা ভেবে—

এত দিনের সম্পর্ক। কুটুও তো একদিন এল না।

সময় হলেই আসবে সবাই—। এর বেশি বলতে পারে নি কালু ঘোষ। আগে তো মামলা উঠুক কোর্টে। তখন দেখবে সবাই এসে হাজির।

ঠিক এই সময় চণ্ডীতলায় পুকুরে ঘাটে চাল ধুয়ে উঠল রাণী। সন্ধ্যেবেলা দেড়পো চাল বসাতে হয়। আজকাল আর রুটি বেলতে ইচ্ছে করে না। দুখানা তাল কাঠের ঘাটলা। জলের ভেতর পেছল মত অরেকখানা আছে। চাল ধুতে বসে জলে ভাস টোকা পানাগুলো আগে সরিয়ে নিতে হয়েছে রাণীর। ঘাটলায় দাঁড়িয়ে রেল কোয়ার্টারের ধোঁয়া নিকাশের চুঙ্গি চোখে পড়ে শুধু। বয়েকটা নারকোল গাছের মাথা। আর বাস রুটে ছুটন্ত বাসের পেছনের ধুলোর ঝড়। পুকুরের চার দিকে আমবুলি পাতার জঙ্গল। আশশ্যাওলা। মাথার ওপর ডিসট্যান্ট সিগনালের ডানা।

হাসি পাচ্ছিল রাণীর। যে-ট্রেন আর নেই তার আবার সিগন্যাল। ওপরে উঠে আসতে আসতে চমকে গেল রাণী। ওকি? হার্মোনিয়াম তো বাজছে না। কি ব্যাপার?

রেল কোয়ার্টারের বারান্দা দিয়ে সোজা সামনের ঘরে ঢুকল রাণী। মাদুরে হারমোনিয়ম। প্রবোধ ডালা খুলে রিড ঠিক করছিল। ঘরটা অন্ধকার। হারমোনিয়মের সামনে ছায়া দেখে প্রবোধ তাকাল। আলোটা জেবলে দাও তো।

জেবলে দিয়ে রাণী বলল, জেবলে নাও নি কেন? ওরা কোথায়?

কে? কুটু—

হুঁ।

কুটুর গানে একদম মন নেই। বিশ্বনাথকে নিয়ে বেড়াতে আসে শুধু। হপ্তার দুটো দিন শুধু নষ্ট করে আমার। আরও দুটো টিউশনি করতে পারতাম—

ওরা না এলেও করতে পারতে। এখন কোনদিকে গেল ওরা?

হারমোনিয়মের পেটের ভেতরকার শেষ হাওয়াটুকু বাজিয়ে শেষ করল প্রবোধ। তারপর মাদুরে বসা অবস্থাতেই বলল, চাল রেখে এসে বসো না।

না। আমার বসবার সময় নেই প্রবোধ। ভেবেছিলাম—ওদের আজ দুটো খেতে বলব।

বললে পারতে—

ভেবেছিলাম তুমি বলবে। আমার সঙ্গে দেখা না করে চলে গেল?

খোকনকে সঙ্গে নিয়ে গেছে।

তাহলে তো ফিরে আসবে।

রাণীর এই খুশী খুশী মুখখানা অন্ধকার করে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল না প্রবোধের। তবু তাকে বলতে হল, না। খোকন বায়না ধরেছিল—ওদের সঙ্গে যাবে বলে। কুটু আর বিশ্বনাথ ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে গেল।

সঙ্গে নিয়ে যাবে না তো। নিশ্চয় পেঁছে দিয়ে ফিরে আসবে—

না। যাবার সময় বলে গেল—কেষ্টর বিড়ির দোকানে বসিয়ে রেখে যাবে। আমরা যেন নিয়ে আসি খোকনকে—। আবার এতটা পথ এসে ফিরতে হবে তো। বাস থামে সেই ঝাউ গাছতলায়।

এসব শুনেও তুমি বসে আছ? যাও। খোকনকে নিয়ে এসো।

যাব ভাবছিলাম। তোমার জন্যেই বসে আছি—

কেন? আবার টাকা লাগবে।

এ কথায় প্রবোধ মাথা নিচু করল। জানোই তো আমি কোন টাকা-পয়সা অপব্যয় করিনে। চাকরি নেই। যাও বা গনের টিউশনিগুলো ছিল—তুমি এসে পড়ার পর সেগুলোও যাওয়া ছেড়েছি।

এবার বেরোতে শুরু কর। তোমার টেবিলের ড্রয়ারে দশটা টাকা আছে নিয়ে যাও। খোকনকে নিয়ে ফেরার পথে আড়াইশো তেল আনবে কিন্তু।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল প্রবোধ। ড্রয়ারে রেখেছ—বল নি তো।

তোমার তো সব সময়েই লাগে। বলতে বলতে রাণী রান্নাঘরে চলে এল। মার্টিন রেলের কোয়ার্টার। লাইন উপড়ে নিয়ে গিয়েছে। স্টেশন ঘরে এখন বর্ষা নামলে গরু এসে দাঁড়ায়। হটুরে লোক-জন এসে দাঁড়ায়। এক মাসে অনেক কিছু রাণী দেখতে শিখেছে রান্নাঘরের জানলা দিয়ে।

রাণী এখানে উঠে আসার আগে প্রবোধের রান্নাবান্নার কোন পাট ছিল না। কোনদিন রাঁধত। কোন দিন হোটেল থেকে খেয়ে আসত। যে মেয়েটি বিয়ে হয়ে এসেছিল তার কোন চিহ্ন নেই এ-বাড়িতে। প্রবোধের কপালে টেকে নি। লাইন উঠে যেতে চাকরি নেই। তবে সে স্টেশন ছেড়ে যায় নি। ব্রডগেজ লাইন বসলে সে নাকি আবার চাকরি পাবে। সন্ধ্যের আবছা আলোয় রাণী চাল বসাল উনুনে। ওপড়নো লাইনের নিচে ঘাসে ঢাকা আগেকার রেলপথ। জঙ্গল হয়ে যাচ্ছে। একখানা মালগাড়ি সারা গায়ে ঘুটের গয়না পরে দাঁড়ান। রাস্তার ওধারে সারি সারি বিড়ির দোকান। বিড়ি, কাঠি লজেন্স আর গুড়াকুর দোকান। শেষের এ জিনিসটা সে আগে দেখে নি। এখানে এসে দেখছে—গুড়াকু দিয়ে দাঁত মাজে প্রবোধ দুবেলা। ওটা নাকি একটা নেশা।

কাঠের উনুন। দুখানা চেলা কাঠ একসঙ্গে গুঁজে দিয়ে এসে চুল বাঁধতে বসল রাণী। এ কোয়ার্টারের আলোর লাইনও বিড়ি-সিগারেটের দোকান থেকে টেনে আনা। বেল লাইন উঠে যাওয়ায় কোয়ার্টারের ভাড়া লাগে না প্রবোধের। আলোর জন্যে মাস কাবারে দশ টাকা—তো এখন রাণীই দিয়ে দেয়। এখানে পেঁপেটো মুলোটা কলকাতার চেয়ে সস্তা।

শক্ত করে বেণী বেঁধে এসে বসল কোয়ার্টারের বারান্দায় রাণী। দু কামরার কোয়ার্টার। ভেতরে-বাইরে এক-খানা করে বারান্দা। রান্নাঘর। তোলা জলে চানের জন্যে বাথরুম চৌবাচ্চা সবই আছে। এখন ভরি এসে জল দিয়ে যায় সকালে। আগে প্রবোধ ওই পুকুরেই চান করত।

সব সময় রাণীর ভয়—সে যেন কী ভুলে যাচ্ছে। কোন জরুরী জিনিস। কোন জরুরী কাজ—কিংবা কথা। আজকাল প্রায়ই তার ডান চোখ চমকায়। কী না জানি অমঙ্গল তার জন্যে ওৎ পেতে বসে আছে। আর কি অমঙ্গল হতে পারে আমার। কুটুর বাবার চেকপত্তর হাওড়ায় অ্যাকাউন্ট খুলিয়ে আমার নামে ব্যাংকে জমা করিয়ে দিল প্রবোধ। ও-বাড়ির কিস্তি প্রবোধ শোধ করতে পারত না। কো-অপারেটিভ থেকেই লোক ঠিক করে দিল। তারা কিনল ফ্ল্যাটটা। সে-টাকাও হাওড়ার ব্যাংকে জমা পড়ল। ফি মাসে গোড়ার দিকে আমি আর প্রবোধ খোকনকে সঙ্গে নিয়ে হাওড়ায় টাকা তুলতে যাই। প্রবোধের বুদ্ধিতেই আমাদের এখানে চলে আসা। কুটুও তো এখানেই ছিল। একদিন রাতে—

সে-কথা মনে এলে রানী কুঁকড়ে যায়।

কুটু আর খোকোনকে নিয়ে ঘুমোচ্ছিলো। সামনের ঘরে। মাঝের দরজা খোলা। ও-ঘরে প্রবোধ একা। সারা রাত একা একা সিগারেট খায়। হুক হুক কাশে। তখনো শীত আসেনি। গানের দু'-এক কলি ভাঁজে।

ক'দিনই মাঝরাতে তার ঘুম ভেঙে যাচ্ছিলো। একদিন কি হোল—কুটু অন্ধকারে ঘরে বিছানায় উঠে বসে চেঁচিয়ে উঠলো। কে? কে ওখানে?

ঘুম ভেঙে রানীও উঠে বসলো। কোথায় কো শুয়ে পড় কুটু।

না মা। কে যেন এসেছিলো।

তুই ভুল দেখেছিস। কে আবার আসবে?

পরদিন বেলায় ঘুম থেকে উঠে কুটু প্রথম কথা বলেছিলো, একবার বাবার খোঁজটা নিলে না মা।

কী হবে নিয়ে, কোর্ট খরচা জোগাতে হবে নাকি এখন?

তবু একবার নিলে পারতে মা। আমরা কি এখানে পাকাপাকি থাকতে এসেছি মা—

কোথায় যাবো। তোর বিয়ে হয়ে গেলে তো চলে যাবি।

তার আগেই বিশ্বনাথকে বলে আমি চলে যাবো একদিন।

কোথায় যাবি পাগলা এখনো তোদের বিয়ে হয়নি।

বিয়ে না হলেও অনেকে তো একসঙ্গে থাকে মা।

কথাটার সেদিনই মানে বোঝেনি রানী। কুটু সত্যি সত্যি চলে যেতে রানী একদিন বুঝলো। রাতে নয়। দিনের বেলায়। খোকোন তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছিলো। না বুঝে কোন উপায় ছিলো না। প্রবোধের যাচ্ছেই তার হাওড়ার ব্যাংকের পাশবই—চেকবই—সবই থাকে। প্রবোধই বলেছিলো—কী করে থাকবে এখানে? এ-ফ্ল্যাটের কিস্তি। মামলা হলে তার খরচা। বরং আমার ওখানো চলো সবাই। খোলামেলা জায়গা ভাড়া লাগবে না। একখানা ঘর পুরো পাবে। বড় বারান্দা। তোমার হাতে ক'টা দিন রান্না খেয়ে সুখ করবো।

তখনো দিলীপ ফেরার। কাগজে কাগজে ফলাও কাহিনী। সব নিজস্ব প্রতিনিধির লেখা। খাবার টেবিলে তখনো কো-অপারেটিভের লাস্ট বিমাইন্ডার। এরই ভেতর কোল ইণ্ডিয়ার চেক এসে গেল।

দিলীপ অ্যারেস্ট হওয়ার পরও কোন যোগাযোগ হোল না রানীর। প্রবোধ আসতেই রানী বলেছিলো, একবার আমায় লালবাজারে নিয়ে যাবে? মুখোমুখি ক'টা কথা বলতাম—

বলে কোন লাভ নেই। তাছাড়া—

তাছাড়া কি?

ইচ্ছে করলেই তো দেখা করতে পারবে না।

কুটুও খুব নেচেছিলো। চলো সবাই মিলে চণ্ডীতলা ঘুরে আসি।

কুটু ভাবতেও পারেনি—এ-ফ্ল্যাট ছাড়লে একদম ছাড়তে হবে। কো-অপারেটিভ কোন ঝুঁকি নিতে চায় না। বিশেষতঃ যেখানে ওনার খুনের দায়ে অ্যারেস্ট হয়। কিস্তি বাকি ফেলে।

তাই রানী সব ঝেড়ে দিয়ে সটান এখানে চলে আসে। ফিরে আর কাগজ দেখা হয়নি তার। কলকাতার সঙ্গে কোল ইণ্ডিয়ার সঙ্গে সবকিছু কাটানছাটান করেই সে চলে আসে এখানে। প্রবোধের কোয়ার্টারে। প্রবোধের কথায়। তখন বিশ্বনাথ কলকাতার বাইরে গাইতে গিয়েছিল। তিন হপ্তার মেয়াদে—

মার্টিন রেলের কোয়ার্টার মানে—ছাদ আছে, জানলা আছে। কিন্তু তা যে পরিষ্কার রাখা দরকার—পরিষ্কার করা দরকার—এ জিনিস কোন দিন মাথায় ঢোকে নি প্রবোধের। হপ্তা দুই চলে গেল বাড়ির ঝুল ঝাড়তে। জঞ্জাল সাফে। তখনই রানী একটু একটু করে পাষাণ নিচের ক'টা মালুম করতে শুরু করে। প্রবোধের জন্যে মায়া হয়। আবার রাগও হয় তার।

আজ চাল কিনে রাখা দরকার। তেল নেই। তিরিশটা টাকা হবে রানী?

তাহলে কিসের ভরসায় আমরা এখানে এসেছিলাম!

তুমি তো জানো—আমি কত গরীব লোক।

তোমার নিজের কিসে চলে?

ওই টিউশনি। আর চেয়ে চিন্তে।

এমন অবস্থার ভেতর আমাদের আনলে কেন?

থাকার জায়গা নিয়ে তো তোমাদের ভাবতে হবে না। ভাড়া লাগছে না। কলকাতার চেয়ে আনাজপাতি এখানে অনেক সস্তা।

কোথায়! অন্য জিনিসের দাম তো আগুন। আর কথা বলতে পারে নি রানী। তখন তার আঙুল কামড়ানোর ইচ্ছে হচ্ছিলো। এখন আচমকা কলকাতায় ফিরে কোথায় উঠবে? সে পথও তো বন্ধ। এক এক সময় রানীর আজকাল মনে হয়—প্রবোধ কি এভাবে আমাকে শাস্তি দিচ্ছে? আমার ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে?

নয় তো কি?

সেদিন রাতে কুটু ভুল দেখে নি। ভুল হয়েছিলো রানীর। সে কিছুই দেখতে পায় নি বলে—ভেবেছিলো—এ সব কুটুর চোখের ভুল। বিয়ে হয় নি এখনো। শরীর সব সময় শেয়াকুল কাঁটা। রেঁয়া তুলেই আছে। কিন্তু কুটু যেদিন বিশ্বনাথের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে আর ফিরলো না—সন্ধ্যের দিকে সেদিন প্রবোধই বললো, বিশ্বনাথ তো পশু গায়—হাতে কাঁচা পয়সা—ফ্যাট ধুঁজে নিতে ওদের অসুবিধে হবে না—

রানী বেলের এই আধা অন্ধকার গুমটি ঘরে প্রায় কেঁদে আপত্তি করে উঠেছিলো। না না। সে কি করে হয়। ওদের তো এখনো বিয়েই হয়নি।

সে-রাত জেগেই কাটিয়েছে রানী। এই বুঝি কলকাতা থেকে বিশ্বনাথ আর কুটু টানা ট্যাকসিতে ফিরলো। দু-একবার উঠে বসেছে রানী।

ও-ঘর থেকে প্রবোধ জানতে চেয়েছে, ঘুমোও নি?

এই ঘুমোবো। ওরা বোধহয় ফিরলো।

পাগল নাকি! এখন কি করে ফিরবে?

গাড়ি থামার শব্দ পেলাম—

পেট্রল ব্ল্যাকের আওয়াজ রানী। কলকাতার আলু যাচ্ছে। কুমড়ো যাচ্ছে। শুয়ে পড়ো।

তিন দিন পরে ফিরলো কুটু। সঙ্গে হাসি হাসি মুখে বিশ্বনাথ। এবারে কুটু যেন অনেক সপ্রতিভ। তার যেন ছ' মাস হোল বিয়েই হয়ে গেছে।

বরং মা হয়ে রানীই তার মুখের দিকে তাকাতে পারে নি চোখ তুলে। কেননা—

সেদিন রাতে যখন রানী যার যার টাকসির আওয়াজ ভেবে উঠে বসছিলো আর শুয়ে পড়ছিলো—তখনই ওর ভেতর এক সময় টের পেল—কলকাতা থেকে লরি করে আনা বড় পালঙ্কে শুধু সে আর খোকন শুয়ে নেই। সেবারে ট্যুরে বেরিয়ে দিল্লীপের কেনা বন্ধে ডাইরিয়ের জোড়া ফুবলের ভেতর আরো একজন।

অন্ধকারে উঠে বসে রানী বলেছিলো, এখুনি আমি হেঁটে কলকাতায় চলে যাবো।

অন্ধকার রাস্তা। কি করে যাবে!

এই বসে রইলাম। আলো ফুটলেই রওনা হবো।

ওভাবে বসে থাকতে পারলো না রানী। প্রবোধ তার এই শরীর তার মত করে চিনতো। প্রথমে গলার কাছে অন্ধকারে প্রবোধ ঠোঁট বোলালো। তারপর বুকে মাথা রাখলো। মানুষের সবচেয়ে বড় অবাধ্য জিনিসের নাম তার নিজেরই শরীর।

রানী বুঝতে পারছিলো, সে এখন একটা বড় কাঠের বাক্সের ভেতর বন্ধ অবস্থায় রয়েছে। সারা গায়ে হাইড্রেন্টের খোলা জল। তারপর থেকে সেদিন যা যা হয়েছিলো—তাই-ই দিনে আর রাতে প্রায়ই হয়। এক এক সময় সে নিজেও প্রবোধের সঙ্গ যোগ দেয়। কখনো আবার যোগ না দিয়ে সেঁটে পড়ে থাকে। সেই পড়ে থাকাটাই প্রবোধ নিজের মত করে যোগদান ধরে নেয়।

এই অজানা চন্ডীতলায় রানীর চোখের সামনে ধরা পড়ে শুধু জল পৈঠার ঘাটলা, টেকা পানা ভর্তি পুকুর, ছায়া করে আসা শীতকালের ভেতর গাছপালার গা, ডিস্ট্যান্ট সিগনাল আর পাটি ওপড়ানো রেলপথ—বিড়ির দোকান। সারা দিনের ভেতর প্রবোধের সঙ্গে সেই সময়টা এখন তার কাছে নিদেন একটা অভ্যাস মাত্র। সারা দিনের কাজের ভেতর ওই সময়টুকুর জন্যে সে অন্যমনস্ক অবস্থাতেও আপনা-আপনিই তৈরি হয়ে যায়। মানুষ এইভাবেই বানানো।

কোন কোনদিন প্রবোধ নতুন স্বামীর মত করে। একদম বান্না ঘরে চলে আসে দিনের বেলায়। তখন তাকে ধরে টানলেও রানী কোন আপত্তি করে না। এক এক সময় মুখের ভেতরটা শুধু কষে ভরে যায়। সারা মুখ জুড়ে। তবুও কোন বাধা দেয় না সে। তার যে কোন টাকা আছে হাওড়ার ব্যাংক বাড়িতে—সে যে এই কিছুকাল আগেও মাল্টিস্টোরিড বাড়ির উঁচু তলায় ধোঁয়া ধুলোর বাইরে বাস করতো—প্রবোধের দু হাতের ভেতর ধরা পড়া রানীকে দেখে—তার মুখের দিকে তাকিয়ে তা বোঝার কোন উপায় নেই।

একদিন তো রানী ফাঁকা বারান্দায় প্রবোধের কথায় তারই শেখানো একটা পুরনো গান ফিরিয়ে ফিরিয়ে গাইলো। গানের ভেতর প্রবোধ তাকে দুবার চুমু খেলো। কোন উনিশ বিশ হোল না রানীর। সে গেয়ে গানটাকে শেষ করলো। আচমকাই বললো, কতদিন কাগজ পড়ি না।

প্রবোধ বললো, ওতে শুধু শুধু পয়সা নষ্ট।

রানী একদম অন্য কথায় চলে গেল। এক শিশি কালো মেঘ এনে দিতে পারো খোকোনের জন্যে—

দেখবো খন। এখন তো আমায় তিরিশটা টাকা দাও—

কাল যে নিলে—

কাল তো দর্জিকে দিলাম। একটা মটকার পাঞ্জাবী বানাবো ভাবছি—

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই রানী দেখলো, ভাতের হাড়ির ভেতর দিয়ে পোড়া গন্ধ উঠে আসছে। তাড়াতাড়িতে পুরো এক গ্লাস জল ঢেলে দিয়ে একখানা জ্বলন্ত কাঠ বের করে এনে উঠোনে ছুঁড়ে দিলো রানী। অন্ধকার মরা উঠোনটায় খানিকক্ষণ অন্য রকম চেহারা চলে এলো। নয়তো এ শুধু রেল কোয়ার্টার-এরই উঠোন।

জ্বলন্ত কাঠটা যখন প্রায় নিভু নিভু তখনই রানী বিড় বিড় করে বলে উঠলো, সব টাকা তো ফুরিয়ে যাবে একদিন। তখন—

এই সময় একটা আরসোলা ফর ফর করে উড়ে এসে ভাতের হাড়ির ওপর চক্কর দিয়েই আবার জানলার বাইরে অংলা জায়গায় বেরিয়ে গেল। রানী নিজেকে বললো, টাকা ফুরিয়ে গেলে কুটুর বিয়ে হবে কোত্থেকে।

এমন সময় প্রবোধের হাত ধরে খোকন ঘরে ঢুকলো। হাসি মুখ। হাতে একখানা সস্তার খেলনা মোটর গাড়ি। পিসি দিলো—

তুমি কোথায় ছিলে?

দোকানের বেঞ্চে বসে রাস্তা দেখছিলাম—

খোকোনের কথার মাঝখানে ঢুকে পড়লো প্রবোধ। আমি সময় মত না গেলে রাস্তার কারও সঙ্গে চলে যেতো। এত কল কল করে কথা বলে—

রানী অনেক দিন পরে কৃতজ্ঞ চোখে প্রবোধের দিকে তাকালো। আমরা তোমার ওপর খুব অত্যাচার করছি। তাই না—

ওসব ভালো ভালো কথা রাত পড়লে বোলো। এখন আরও দশটা টাকা দিতে পারবো। ভাবছি একখানা চাদর কিনবো। খাদির চাদর বেশ মোটা। আরাম হয় গায়ে দিলে।

রানী প্রবোধের দিকে তাকালো। তারই পয়সায় কেনা কাবলি প্রবোধের গায়ে। গায়ে বেমানান কাপড়ের পাঞ্জাবি।

(চলবে)

টমসন টেস্টে খেলবেন ?

অস্ট্রেলিয়ান পেস বোলার জেফ টমসন তাঁর মরমুখী পেস বোলিংয়ের ধাক্কায় বহু তাবড় তাবড় লড়াইয়ে ঘায়েল করেছেন অসংখ্য বাঘা ব্যাটসম্যানকে। আর সেই সূত্রেই ৩২টি টেস্ট খেলায় তাঁর সংগ্রহ ১৪৫টি উইকেট।

অস্ট্রেলীয় ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে সাম্প্রতিক মামলার লড়াইয়ে কিন্তু দুঁদে পেস বোলার টমসন বিপক্ষকে কাবু করতে পারেন নি। কাবু হয়েছেন নিজেই। মামলার রায় গড়িয়েছে বিপক্ষের অনুকূলেই। হার হয়েছে টমসনের।

কয়েক মাস আগে বিসবেনে টমসন বলেছিলেন তিনি আর্থিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত এবং টেস্ট ক্রিকেটের চাপ তাঁর অর্থনীতিক ও পারিবারিক জীবনেও চাপ সৃষ্টি করছে। অস্ট্রেলীয় ক্রিকেট বোর্ডের সীমাবদ্ধ পরিসরে খেলা চালিয়ে সে সমস্যা থেকে মুক্তি নেই। এ সব কারণেই তিনি ক্রিকেট বোর্ডের কাছে তাঁকে মুক্তি দেওয়ার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন — কেননা টেস্ট দলে থাকার প্রতিশ্রুতিতে বোর্ডের সঙ্গে ১৯৭৭-৭৮ এবং ১৯৭৮-৭৯-র মরশুমের জন্য তিনি চুক্তিবদ্ধ। টমসনের এ অনুরোধ অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট বোর্ড মানেন নি।

এদিকে টমসন ১ অক্টোবর থেকে প্যাকারের ওয়ার্ল্ড সিরিজ ক্রিকেট সংস্থার সঙ্গে তিন বছর মেয়াদী এক চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। কত টাকা দক্ষিণা পাচ্ছেন তা অবশ্য জানা যায় নি। সিডনীতে এই সংস্থার একটি প্রদর্শনী খেলাতেও তিনি অংশ নিয়েছেন।

প্যাকারের দলে তাঁর এই যোগদান সম্পর্কে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি আর্থিক অসুবিধার কথা বলেছেন। আরও বলেছেন তাঁর এ যোগদান বিশ্বের সেরা ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে খেলার তাগিদেও। বিশ্বের সেরা বোলার হওয়ার উপায়ও তিনি মনে করেছেন বিশ্বের সেরা ব্যাটসম্যানদের সঙ্গে খেলার সূত্রেই মিলবে। আর সে সূত্র সন্ধান সম্ভব একমাত্র প্যাকারের সার্কাসেই। তাই টমসন ঠিক পথই খুঁজে নিয়েছেন।

এই সব ঘটনার ফাঁকেই অস্ট্রেলীয় ক্রিকেট বোর্ডের কাছে পাঠান অনুরোধ না রক্ষিত হওয়ায় টমসন টেস্ট দুনিয়া থেকে সরে যাওয়ার কথাও ঘোষণা করেছিলেন। নাটক কিন্তু থামে নি। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট বোর্ড এবং টমসনের মধ্যে আইনের লড়াই শুরু হয়েছিল। এবং অন্তিমে সে লড়াইয়ের রায় গিয়েছে বোর্ডের অনুকূলে। বিচারক বলেছেন, বোর্ডের সঙ্গে টমসনের যে চুক্তি আছে তা বৈধ এবং যথারীতি তা বহাল থাকবে। আগামী বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত বোর্ডের পক্ষে সরকারী টেস্ট খেলতে তিনি বাধ্য থাকবেন। বিচারক আরও

টমসন

বলেছেন প্যাকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলেও টমসন ৩১ মার্চ পর্যন্ত তাদের কোন খেলায় যোগ দিতে পারবেন না।

টার্ণার খেলবেন না

প্রাক্তন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক গ্লেন টার্ণার সম্ভবত আগামী টেস্ট পর্যায়ে সফরকারী পাকিস্তান দলের বিরুদ্ধে খেলবেন না। কেননা তিনি দূরদর্শনের ধারাভাষ্যকার হচ্ছেন। টার্ণার ইংলণ্ডের বিরুদ্ধেও টেস্ট সিরিজে খেলতে পারেন নি। ঐ সময় তিনি তাঁর কাউন্টি দল ওরসেসটারশায়ার আয়োজিত নিজস্ব বেনিফিট ম্যাচ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন।

বয়কটের ভাগ্যে ভাগ্যের বয়কট

অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে আসন্ন ক্রিকেট লড়াইকে সামনে রেখে ৭৪টি টেস্ট যোদ্ধা ইয়র্কশায়ার কাউন্টি ক্লাবের জিওফ বয়কট ইংলণ্ড দলে এসেছেন তাঁর অভিজ্ঞতার পুঁজি নিয়ে। সন্দেহ নেই বয়কট সফরকারী দলের অভিজ্ঞতম পুরুষ। বিতর্কিত পুরুষও বটে।

১৯৭৪-৭৫-এর সেই ভয়ংকর অস্ট্রেলিয়া সফরেও তিনি ইংলণ্ডের দলে ছিলেন অভিজ্ঞতার পুঁজি থাকা সত্ত্বেও দলের নেতৃত্ব করার সুযোগ মেলে নি তাঁর।

বয়কট

সে সৌভাগ্য জুটেছিল মাইক ডেনেসের ভাগ্যে। ভাগ্যহত বয়কট সেদিন বয়কট করেছিলেন অস্ট্রেলিয়া সফর।

এর পর ক্রিকেট পিচে অনেক বল গড়িয়েছে। অসংখ্য উইকেট পড়েছে অনিবার্য নিয়মে। আর তার ফাঁকে ফাঁকেই গড়িয়ে গেছে সময়। এসেছে ক্যারী প্যাকারের ওয়ার্ল্ড সিরিজ ক্রিকেট। আর সে সিরিজে নাম লিখিয়েছে পৃথিবীর সেরা ক্রিকেটারা। প্রফেশন্যাল ক্রিকেটের এই সর্বনাশা হাতছানিকে বয়কট করতে এগিয়ে এলেন বিভিন্ন দেশের ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। টেস্ট প্রাঙ্গণ থেকে হটে যেতে হল প্যাকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ খেলোয়াড়দের। ইংলণ্ডের ক্রিকেট তারকারাও প্যাকারের সূত্রে সরে গেলেন এমস, গেগ, আরও কেউ কেউ টেস্ট দল থেকে। এলেন বথাম, গুচ, গাওয়ার। আর ফিরে এলেন সেই বিতর্কিত বয়কট সহ-অধিনায়ক হয়ে। সফরকারী অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে এ-দায়িত্ব তিনি পালন করেছিলেন। বিয়ারলি আহত হওয়ায় নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অধিনায়কের দায়িত্বও পালন করেছিলেন। বিগত পাকিস্তান সফরেও সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব ছিল তাঁর ওপর।

শুরু হাতে ব্যাট কব্জা করে যে বয়কট এ পর্যন্ত ৫৬৭৫ রান সংগ্রহ করে এখনও খেলা চালাচ্ছেন ৪০ ছুঁই ছুঁই বয়সে, তাঁর কাঁধেই সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব এবারও বর্তাবে, ক্রিকেটপ্রেমীদের এমনই আশা ছিল। তা হয়নি। সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব পেয়েছেন পেস বোলার বব উইলিস। বয়কটের দুর্ভাগ্য এখানেই থেমে থাকেনি। বয়কটের কাউন্টি ক্লাব ইয়র্কশায়ারও তাঁকে দলনেতার পদ থেকে খারিজ করেছেন এই মুহূর্তেই।

ভাগ্য বয়কটকে বয়কট করলেও বয়কট মুষড়ে পড়েন নি। ৭৪-৭৫-এর দগদগে ক্ষত এখনও ব্যথা দেয়। লণ্ডনে গিয়ে তিনি সম্প্রতি দল নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান এবার ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করেছেন। তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা শেষে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৭৪-এর মত বয়কট নয়। মাঠে থেকেই সার্থক লড়াই চালিয়ে জবাব দেবেন এ অবিচারের।

টিটমাসের ইস্তফা

ইংল্যাণ্ডের প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড় মিডলসেকসের অফ স্পিনার ফ্রেড টিটমাস সারের প্রশিক্ষক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। ক্লাবের নীতির সঙ্গে একমত হতে না পারার কারণেই টিটমাসের এই পদত্যাগ। সারের ক্রীড়া দক্ষতা দেখাশোনার জন্য রমন সুব্বারাওয়ের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন ঘিরেই এই মতান্তর।

লিম্বকম্যান

ডুরান্ড ফাইনালের আগে— ১৯৭০ মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল

মাননীয় মানেকশ মহাশয় সমীপেষু

ফিল্ড মারশাল মানেকশ,

এত দিন যুদ্ধের মাঠের দায়িত্বে ছিলেন আপনি, এখন নতুন কাজ নিয়েছেন — ভারতীয় খেলার মাঠ এখন আপনার হাতে। পরামর্শ বা উপদেশ দেওয়ার মত ধৃষ্টতা আমার নেই। তবে গত ১৩ বছর, যে সময়ে আপনি ম্যানেকশ থেকে এ দেশের একমেবদ্বিতীয়ম ফিল্ড মার্শাল হয়েছেন, ধরে প্রথম শ্রেণীর ফুটবল খেলতে খেলতে কিছু অভিজ্ঞতা, কিছু ঘটনা অর্জন ও দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তারই একটি গল্পো আপনাকে আজ বলছি। কারণ কাগজে দেখলাম আপনি নাকি ভারতীয় খেলার মান বাড়াতে দারুণ অগ্রণী।

১৯৭৪-এর সেপ্টেম্বর। তেহরাণে এশিয়ান গেমস খেলতে গেছি। প্রথম খেলা ইরাকের সঙ্গে পড়ল। সেই দিনই আবার অন্য মাঠে মাও সে তুংয়ের চীনের সঙ্গে নর্থ কোরিয়ার খেলা। আমাদের কোচ প্রদীপদা (পি- কে ব্যানার্জি) দলের একজন কর্মকর্তাকে অনুরোধ করলেন : যাও না ভাই দেখে এসো না, চীন কেমন খেলে। আমি তো আজ ছেলেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকব। পরের খেলাই যে হবে চীনের সঙ্গে।

কর্মকর্তা কথা রাখলেন। সন্ধ্যে বেলা ক্যাম্পে এসে বললেন : আরে একদম অর্ডিনারী টিম, জঙ্গলসে পাকড়কে লেয়া কুছ বিল্লি।

শুনে খুব ভাল লাগল। সবে ইরাকের কাছে ৩-০ গোলে হেরেছি। যাক চীনের হাতে আর ধোলাই খেতে হবে না।

আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যেই সমস্ত গ্যাড়াকল ক্লিয়ার হয়ে গেল। জঙ্গলের বিল্লিরা ৭-১ গোলে আমাদের গোহারান হারাল। মাঠে নেমে দেখি ওই বিল্লিরা এক একটা শের। যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি ফিট, তেমনি মাথার কাজ। আমাদের সেরেফ নাচিয়ে ছাড়ল।

খেলার শেষে আমরা কয়েকজন ওদের চোখের কাছে গিয়ে সবিময়ে জানতে চাইলাম, এর আগে কখনো কোন আন্তর্জাতিক খেলায় তোমরা যোগ দাও নি। এবারই প্রথম এশিয়ান গেমসে এলে। এত ভাল খেলা শেখালে কি করে?

জবাবে সেই কোচ ভদ্রলোক বললেন : চীনে খেলোয়াড় তৈরি করা হয়। গভর্ণমেন্ট থেকে বাছাই করা লোকজন সারা বছর ধরে দেশের গাঁয়ে গঞ্জে ঘুরে বেড়ায়। স্বাস্থ্যবান দম্পতিদের দেখলে অনুরোধ করে সন্তান উৎপাদনের জন্য। সেই সন্তানের দায়িত্ব গভর্ণমেন্টের। যাবতীয় খরচ খরচা সব। তিন বছর বয়স থেকে সেই শিশুর ওপর নজর দেওয়া শুরু হয়। গোড়ায় জোর দেওয়া হয় তার স্বাস্থ্যের ওপর, তার স্বাভাবিক গোত্থের ওপর। নার্সারি স্টেজ কেটে যাওয়ার পর নিয়ে যাওয়া হয় স্পেশ্যাল স্কুলে। সেখানে তার মানসিক ও শারীরিক গঠন নিয়ে চলে চুলচেরা গবেষণা। বারো বছর বয়সে যখন পড়ছে, ততদিনে গবেষণার কাল বেরিয়ে এসেছে। ছেলেটি বা মেয়েটির স্বাভাবিক প্রবণতা কোন খেলার দিকে। তখন তাকে দিয়ে চলে আসল দলই মশাই। ঝাড়া পাঁচটি বছর। সতেরো-আঠারোতে পা দিল— বেরিয়ে এল এক কমপ্লিট ফুটবলার, কি অ্যাথলেট, কি টেবল টেনিস প্লেয়ার কি সাঁতারু। তার পর বাইশ তেইশ বছর বয়স পর্যন্ত ওই ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে রাষ্ট্র দাবি জানায় এবার খেলা দেখাও। যেই খেলোয়াড় খেলতে

জীবনের শিখরে পৌঁছে গেল, তাকে খেলার মাঠ থেকে অবসর দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হল কোচিং বা নতুনে ছেলেমেয়ের সন্ধানে। বিনিময়ে আজীবন সুস্থভাবে বেঁচে বর্তে থাকার সুযোগ তাদের দেওয়া হয়।

ম্যানেকশজী এবার আমার জীবনের একটা ঘটনা বলি। সাতষট্টি সালে প্রথম কলকাতার ফারস্ট ডিভিসনে খেলি। তখন আমার বয়স আঠারো। এতদিন সত্যিকারের কোন কোচিং আমি পাই নি। কেন যে ফুটবল না খেলে কিকেট খেলি না তাও জানি না। ডিফেন্সে না খেলে কেন যে স্টাইকার হলাম তাও জানি না।

যাক গে সব সব কথা। আমি টিকে গেলাম। জ্বর হলে পারমোমিটারের পারা যেমন চড় চড় করে ঠেলে ওঠে, অবাক হয়ে দেখলাম ভারতীয় ফুটবলের মাঠে আমার দামও চড় চড় করে বাড়ছে। সন্তোষ ট্রফি থেকে এশিয়ান গেমস সব খেললাম। তেয়াত্তর সালে ইস্টবেঙ্গলে ফিরে এলাম তিন বছর মোহনবাগানে খেলার পর। আর তখনই প্রথম প্রদীপদার মুখে শুনলাম : তোর বাঁ পায়ে স্যুটিং-এর জোর নেই। যদি বাঁ পাটা ডেভলপ না করিস তাহলে শুধু ডান পা সম্বল করে কোনদিনই বেশি গোল করতে পারবি না।

সেই তেয়াত্তর সালে, যখন আমার বয়স চব্বিশ, তখন প্রদীপদার টেনিংয়ে বাঁ পায়ের কাজ তুলতে খেলা শুরু করলাম। পরের বছরই গেলাম তেহরাণে দ্বিতীয়বার এশিয়ান গেমসে। আর সেখানে গিয়ে শুনলাম চীনে কোচের ওই কথাগুলো।

স্বাধীন ভারতের একমাত্র ফিল্ড মার্শাল আপনি। আপনিই একমাত্র লোক যে সাম্রাজ্যকারের একটা যুদ্ধে এদেশকে জয় করতে পেরেছেন। বেশি কথা বলার দরকার নেই। বুঝতেই পারছেন কেন দিনের পর দিন এদেশের খেলার মান পড়ে যাচ্ছে। কেন আর আমেদ, সালে, ডেস্কটেশ, আপ্পারাও, চুনী, পি কে, বলরাম হয় না। আসলে ওরাও যে হয়েছিলেন, তা ওদের অপরিসীম প্রতিভাবলে—কেন ট্রেনিং ফ্রেনিং পান নি। কিন্তু একটা দেশে যেমন প্রতি যুগেই গণ্ডা গণ্ডা ম্যানেকশা জন্মায় না, তেমনি খেলার মাঠেও জন্মায় না গাদা গাদা পি কে, চুনী, বলরাম। তাদের তৈরি করে নিতে হয়। আপনি নিজে একজন যোদ্ধা। জানেন কি ভাবে একজন জওয়ান বা অফিসারকে তিল তিল করে তিলোত্তমা বানানো যায়। একবার চেষ্টা করে দেখবেন নাকি ডিফেনস টেনিং খেলার মাঠে ? ধন্যবাদান্তে,

সুভাষ ভৌমিক।

খেলা

জাতীয় জুনিয়ার ফুটবল

আগরতলার উমাকান্ত একাডেমি মাঠে ১৬তম জাতীয় জুনিয়ার ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে বাংলা ৩-০ গোলে অন্ধ্রপ্রদেশকে হারিয়ে মোট ৮ বার ডাঃ বি সি রায় ট্রফি জয়ের গৌরব লাভ করেছে। এই নিয়ে বাংলা ৯ বার ফাইনালে খেলল, অপর দিকে অন্ধ্র ৬ বার। অন্ধ্র ডাঃ বি সি রায় ট্রফি পেয়েছে মাত্র ২ বার। ১৯৭৬ সালের ফাইনালে অন্ধ্র ১-০ গোলে বাংলাকে হারিয়ে দ্বিতীয়বার ট্রফি জয়ী হয়েছিল। এই নিয়ে বাংলা এবং অন্ধ্র পরস্পরের সঙ্গে ফাইনালে খেলল তিনবার। বাংলা ১৯৬৮ সালে ২-০ গোলে অন্ধ্রকে হারিয়েছিল।

এবারের সেমিফাইনালে বাংলা বনাম কর্ণাটকের খেলা নির্ধারিত সময়ে ১-১ ও ০-০ গোলে ড্র যায়। শেষ পর্যন্ত টাইভাঙ্গা প্রথায় বাংলা ৪-২ গোলে কর্ণাটককে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে। এই নিয়ে তারা উপর্যুপরি ৫ বার ফাইনালে উঠল (১৯৭৪-৭৮)। অপর দিকের সেমিফাইনালে অন্ধ্র ২-১ ও ২-০ গোলে ত্রিপুরাকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল।

ফাইনালের প্রথমার্ধে বাংলা ১-০ গোলে এগিয়েছিল। বাংলার পক্ষে গোল করেন প্রথমার্ধের ১৫ মিনিটে প্রীতি ঘোষাল এবং দ্বিতীয়ার্ধের ১১ মিনিটে রথীন দাস ও ২৭ মিনিটে কাশীনাথ পাল।

১৯৭৮ সালের এগ প্রতিযোগিতায় অন্ধ্র প্রদেশের কিংস্টফার ১১টি গোল দেওয়ার সূত্রে সর্বাধিক গোলদাতার সম্মান লাভ করেন। এর পরই ত্রিপুরার অবনী গোপের ১০ গোল উল্লেখযোগ্য।

এশীয় যুব ফুটবল প্রতিযোগিতা

ঢাকায় অনুষ্ঠিত ২০তম এশীয় যুব ফুটবল প্রতিযোগিতায় ইরাক বনাম দক্ষিণ কোরিয়ার ফাইনাল খেলাটি ১-১ গোলে ড্র যায়। ফলে দুই দলকে যুগ্ম বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। দক্ষিণ কোরিয়া প্রথমার্ধে এক গোল দিয়ে ১-০ গোলে এগিয়ে যায়। খেলা ভাঙ্গার মাত্র দু মিনিট আগে ইরাক সেই গোল শোধ দিয়ে খেলার ফলাফল সমান ১-১ করে। অতিরিক্ত সময়ের খেলা গোলশূন্য ছিল। তৃতীয় স্থান নির্ধারণের খেলার ফলাফলও ১-১ ছিল। ফলে উত্তর কোরিয়া এবং কুয়ায়েত যুগ্মভাবে ৩য় স্থান লাভ করে।

সেমিফাইনালে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান ইরাক ৬-৫ গোলে (টাইভাঙ্গা প্রথায়) কুয়ায়েতকে এবং দক্ষিণ কোরিয়া ৬-৫ (টাইভাঙ্গা প্রথায়) উত্তর কোরিয়াকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল।

বিশ্ব জিমন্যাস্টিক্স প্রতিযোগিতা

ফ্রান্সের স্ট্রাসবর্গে আয়োজিত ১৩তম বিশ্ব জিমন্যাস্টিকস প্রতিযোগিতায় জাপান পুরুষদের দলগত খেতাব জয়ী হয়েছে। অপর দিকে মেয়েদের দলগত খেতাব জিতেছে রাশিয়া। পুরুষ বিভাগে জাপান এই নিয়ে ১৯৬২ সাল থেকে উপর্যুপরি ৫ বার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হল। রাশিয়া ১৯৫২ সাল থেকে মেয়েদের দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়ে আসছে। কেবল ১৯৬৬ সালে রাশিয়া ২য় স্থান পেয়েছিল। ঐ বছর চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল চেকোশ্লোভাকিয়া।

চূড়ান্ত ফলাফল

পুরুষ বিভাগ : ১ম জাপান (৫৭৯-৮৫ পয়েন্ট), ২য় রাশিয়া (৫৭৮-৯০), ৩য় পূর্ব জার্মানী (৫৭১-৭৫), ৪র্থ যুক্তরাষ্ট্র (৬৫৮-৭০) এবং ৫ম পশ্চিম জার্মানী (৫৬৬-৯০)।

মহিলা বিভাগ : ১ম রাশিয়া (৩৮৮-৯৫ পয়েন্ট), ২য় রোমানিয়া (৩৮৪-২৫) এবং ৩য় পূর্ব জার্মানী (৩৮২-২৫)।

ইংলিশ কিকেট দল

মাইক বিয়ার্লির নেতৃত্বে ইংলিশ কিকেট দল অস্ট্রেলিয়া সফরে গেছে। সফরের প্রথম শ্রেণীর প্রথম খেলায় ইংল্যান্ড ৩২ রানে হেরেছে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া দলের কাছে। অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া শেফিল্ড শীল্ডের আসরে এই দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া একটি দুর্বল দল হিসাবে চিহ্নিত।

পর পর তিনটি টেস্ট সিরিজে (১৯৭৪-৭৫, ১৯৭৫ ও ১৯৭৬-৭৭) অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে যাওয়ার পর ১৯৭৭ সালে স্বদেশের মাটিতে ইংল্যান্ড ৩-০ খেলায় (ড্র ২) অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে জিতে এ্যাসেজ খেতাব পুনরুদ্ধার করেছিল। স্বদেশের মাটিতে ১৯৭৭ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপ—

বাস্তুঘুঘুরা স্পোর্টস সায়েন্সের বিরুদ্ধে কেন?

পিনাকী চট্টোপাধ্যায়

স্পোর্টস সায়েন্স হবেই, অনেকেই ভাবছেন এই নিয়ে। আমিও। রাত নেই, দিন নেই, শুধু আছি। মাঠে-ঘাটে ঘুরে সকলে বলবে খেলার মাঠে বিজ্ঞান আমাদের প্রয়োজন। আমি মূর্খ তাই একটা কথা জানতাম না. আমার এই তাগিদ মাঠের অনেক বাস্তুঘুঘুকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করতে পারে।

প্রথম এর একটু ইঙ্গিত পেলাম যখন একটা নামী ক্যাবের ছেলেদের, নানা পরীক্ষার পর আমরা জানালাম—খেলার নামে তাদের ধীরে ধীরে মেরে ফেলা হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিযোগ এলো আমাদের বিরুদ্ধে, এদের ফিরিয়ে নাও। বলার দরকার ছিলো না। আমরা পালালাম। সত্য যা তা আপন গতিতে পথ করে নেয় কিনা জানি না? তবে আমরা মাঠ থেকে বিতাড়িত হয়েও গবেষণাগারে নানা ধরনের স্পোর্টসম্যানদের নিয়ে গবেষণা চালাতে লাগলাম।

আজও জানি না কেন এবং কি কারণে আমার আই-এফ-এ জানালো তাদের একটা সাব কমিটিতে আমায় নেওয়া হয়েছে।

উৎসাহ বেড়ে গেলো আবার ছোটাছুটির অন্ত নেই। জাতীয় এক জুনিয়র দল তৈরির কথা হচ্ছে—কানে এলো কথা। আমার ডাক পড়লো, দেখে দিতে হবে নির্বাচন যাতে ঠিক হয়। প্রতিদিন ভোরে গিয়ে যন্ত্রপাতি নিয়ে মাপযোক চালাচ্ছি। একে একে বাদ দিলাম অনেককে যারা সাধারণ ফিটনেসের আওতায়ও আসে না।

কিন্তু আশ্চর্য হলাম যখন দেখলাম, টিম তৈরি হোলে আমার দেওয়া প্রায় অর্ধেক প্লেয়ার ফিরে এসেছে টিমে।

আমি প্রতিবাদ করিনি, শুধু ক্লান্ত হয়ে প্রশ্ন করেছিলাম, যারা সত্যিকারের সক্ষম তাদের কেনো নেওয়া হোলো না?

কেউ উত্তর দিলো না। শুধু আমায় বড় এক প্ল্যানিং-এর কথা বলা হোলো—তাবৎ বাংলাদেশে যত কোচ আছে তাদের ট্রেনিং দিতে হবে। ঘরে ঘরে এই কথা পৌঁছানো দরকার বিজ্ঞানভিত্তিক প্রশিক্ষণ ছাড়া আমরা এগুতে পারবো না। সে-সব দিনের কথা আজও ছবি হয়ে আছে মনে। রাত নেই, দিন নেই সেই যে আমার সাধনা, তার ব্যর্থতার কথা দেশের কাছে, জাতির কাছে বলার সুযোগ পেয়েছি আর কি করা উচিত তা।

কিন্তু এইসবের পরিণাম টের পেলাম যখন পরের বছর আমায় সাব-কমিটি থেকে জড়িয়ে দেওয়া হোলো। জানি না কি কারণে? তবে লোকমুখে শুনলাম, মিথ্যা হতে পারে! এইভাবে যদি মাঠের লোকেদের বা আসল ঘুঘুদের অধিকার করে কিছু লোক যদি প্রয়োজনীয় দাওয়াই বাতলান তবে সমস্ত কোচরা চটে যাবেন, ক্ষমতাচ্যুত হবেন। আমি জানি না আজও কোনো কোচকে চটিয়েছি কিনা। তবে নিঃসন্দেহে একথা জানি যারা ভাবতে চায় একটা নতুন দিগন্তের কথা তাঁরা চায় বিজ্ঞান আসুক—মামা কাকাদের কব্জা থেকে ফুটবলার নির্বাচন মুক্তি পাক।

পাবে কিনা জানি না। কিন্তু একটা কথা আমায় ভরসা দিয়েছে একজন অত্যন্ত সাধারণ কোচ-এর কথা—বিগত ২০ বছরে যা চলেছে আপনি তার বিরুদ্ধে কিছু বলবার চেষ্টা করেছেন, আপনাকে তাড়ানো হয়েছে এইটাই তো স্বাভাবিক।

বুঝিনি সেদিন, কিন্তু যখন দলে দলে ছোটো কোচ আর খেলোয়াড়রা এসে ভিড় করতে লাগলো আমাদের বিজ্ঞানাগারে, তখন বুঝলাম সব ফুরিয়ে যাওয়ার ভেতরেও নতুন ডাক দিয়ে যায়।

তাই অন্য পথ নিলাম। আই-এফ-এ নয়, পঃ বঙ্গে নয়, ইউনিভার্সিটিতে নতুন ডিপার্টমেণ্ট করতে পারলে আর কিছু নয় একদল লোককে জানাতে পারবো গলদ কোথায়, কি করার চেষ্টা করা উচিত। ইউনিভার্সিটিতে শুরু হোলো কাজ। নতুন ডিপার্টমেণ্ট করার চেষ্টা।

ইংল্যাণ্ডের এই ৩-০ খেলায় জয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ নজির। কারণ এর আগে স্বদেশের মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে ইংল্যাণ্ডের ৩-০ খেলায় জয়ের নজির মাত্র একটি আছে—১৮৮৬ সালে এ জি স্টিলের নেতৃত্বে ইংল্যাণ্ডের ৩-০ খেলায় জয়।

এ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে যে ২৩০টি টেস্ট খেলা হয়েছে তার ফলাফল : অস্ট্রেলিয়া জয় ৮৪, ইংল্যাণ্ডের জয় ৭৪ এবং খেলা ড্র ৬৮।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল আলভিন কালীচরণের নেতৃত্বে ভারত সফরে এসেছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এটা ৫ম বারের ভারত সফর। তারা ১৯৭৮-৭৯ সালের ভারত সফরের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে নভেম্বর ১৭ তারিখে, সেন্ট্রাল জোনের বিপক্ষে ইন্দোরে। তাদের ১৯৭৮-৭৯ সালের ভারত সফর তালিকায় আছে ৬টা টেস্ট ম্যাচ নিয়ে মোট ১৬টা খেলা। এই প্রথম ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের একটা টেস্ট সিরিজে ৬টা টেস্ট খেলা হচ্ছে।

দলের নির্বাচিত ১৬ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে মাত্র এই তিনজন খেলোয়াড়—অধিনায়ক কালীচরণ, সহ-অধিনায়ক ভ্যানবার্ণ হোল্ডার এবং উইকেটরক্ষক ডেভিড মারে এর আগে ভারত সফরে এসেছিলেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এক ডজন নামকরা টেস্ট খেলোয়াড় কেরী প্যাকারের বিশ্ব ক্রিকেট সিরিজ দলে যোগদান করায় বেশীর ভাগ অনভিজ্ঞ খেলোয়াড় নিয়ে ভারত সফরকারী বর্তমান ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলটি গঠন করা হয়েছে। নির্বাচিত ১৬ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন এই বারজন—কালীচরণ (৪৫টি), হোল্ডার (৩৪টি), জুমাদিন (১০টি), গোমস (৫টি), প্যারী (৫টি), উইলিয়ামস (৩টি), মারে (৩টি), ফিলিপ (৩টি), শিবনারাণ (৩টি), ব্যাকহ্যুস (২টি) গিব্রনিজ (২টি) এবং ক্লার্ক (১টি)। টেস্ট ম্যাচ খেলেননি.. এই চারজন—চ্যাণ্ড, ব্রাউন, [illegible] এবং মার্শাল।

অধিনায়ক কালীচরণ তাঁর এই দুর্বল দল নিয়ে ভারতের বিপক্ষে আসন্ন ১৯৭৮-৭৯ সালের টেস্ট সিরিজে রাবার জিততে পারবেন কি? এর আগে ভারত সফরে এসে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রতি বারই রাবার জয়ী হয়েছে—১৯৪৮-৪৯ সালে জন গডার্ডের নেতৃত্বে ১-০ খেলায় (ড্র ৪), ১৯৫৮-৫৯ সালে এফ অলেকজাণ্ডারের নেতৃত্বে ৩-০ (ড্র ২), ১৯৬৬-৬৭ সালে গ্যারী সোবার্সের নেতৃত্বে ২-০ খেলায় (ড্র ১) এবং ১৯৭৪-৭৫ সালে ক্লাইভ লয়েডের নেতৃত্বে ৩-২ খেলায়।

এ পর্যন্ত ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মধ্যে যে ৩৭টি টেস্ট [illegible] তার ফলাফল : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ [illegible] ভারতের জয় ৪ [illegible]

চিত্রধ্বনি

শিশিরকুঞ্জে 'আঁচল'

লোকেশন বারাসতের শিশির কুঞ্জ। বাইরে ভেতরে কয়েক হাজার ফিল্ম পাগল দর্শক। তারকাঁটার বেড়া ভেঙে যেন ভেতরে ঢুকতে চায় তাঁরা। কয়েকশ পুলিশ তাদের আগলে দাঁড়িয়ে, দৃশ্য—মারামারি। শট নং—৪। ক্যামেরা পুকুরের পাড়ে বসান। ভিউ ফাইণ্ডারে চোখ দিয়ে বসে আছেন দিলীপরঞ্জন মুখার্জি। স্টার্ট সাউণ্ড। ক্যামেরা।

একটা লোক ক্যামেরার ডানদিক থেকে এসে সাঁ-আঁ করে ঝাঁপ দিলেন জলে। হাবুডুবু খেলেন কয়েক সেকেণ্ড।

ক্যামেরা থামল। লোকটি উঠে এলেন। দৃশ্যান্তর।

এবারের দৃশ্য—আড্ডা। শট নং—নেই। প্রেম চোপড়া, রাজেশ খান্না, দীনেশ হিঙ্গু কাছাকাছি তিনটি চেয়ারে বসে। পরিচালক অনিল গাঙ্গুলী শরীরটি রেখেছেন একটি বিরাট বাক্সের ওপর। আলোচনার মধ্যমণি অবশ্য তরুণকান্তি ঘোষ। একের পর এক প্রশ্ন করে চলেছেন তিনি।

স্টার্ট ক্যামেরা, সাউণ্ড কেউ বলেননি। সুতরাং পজিশন ঠিক রাখা কিংবা এক্সপ্রেশন দেবার কোন ব্যাপার নেই। যে যার মত কথা বলছেন। শচীন ভৌমিকের লেখা 'আঁচল' ছবির চিত্রনাট্যের কোন সংলাপ নয়। নিখাদ অবসর। সাম্প্রতিক বন্যার জের টেনে তরুণকান্তি ঘোষ বললেন, 'মোরারজী ভাইএর কাছে চিঠি লিখব ভাবছি, ভারতের প্রতিটি সিনেমা হলের একদিনের বিক্রীর টাকা রাজ্যের ত্রাণ তহবিলে দেবার বন্দোবস্ত করতে অনুরোধ করব তাঁকে।'

সায় দিলেন সবাই। রাজেশ খান্না বললেন—'কম করে দু' কোটি টাকা পাওয়া যাবে তাহলে।'

আলোচনায় উঠল বম্বের ছবির কথা, বাংলা ছবির সমস্যা, আউটডোর শুটিং-এর বাধা-নিষেধের কথা।

শুনলাম প্রথমটায় নাকি রাজেশ খান্না পশ্চিম বাংলায় আউটডোর করতে রাজি হননি। কলকাতারই কোন এক নায়ক তাঁকে সাবধান করে বলেছিলেন—'খবরদার, ওয়েস্ট বেঙ্গলের পাবলিক বড় রাফ।' প্রযোজক তপন শিকদার তাঁকে রাজি করিয়েছেন। আর দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে তিনি শিশির কুঞ্জকেই আদর্শ লোকেশন হিসাবে বেছে নিয়েছেন।

উপরন্তু তারাশঙ্কর বর্ণিত জমিদার বাড়ির আদর্শ পরিবেশ ধারে কাছে আর কোথায়। খাঁটি ঘরোয়া পরিবেশে ছিলেন সবাই ক'টা দিন। কোন বিপদ ঘটেনি। রাজেশ খান্নার ভয়ও কেটে গেছে আশাকরি।

কাট্। লোকেশন—পুকুর পাড়ের শিব মন্দির। সময়—সকাল। দৃশ্য—পুজো করছেন রাখী, শট নং—১৮। প্রায় জলের ধারে টুলের ওপর টুল সাজিয়ে রাখা হয়েছে ক্যামেরা; মন্দিরের পেছনে কয়েক হাজার লোক হৈ হৈ শব্দে বেড়া ভাঙতে চাইছে। প্রযোজক তপনবাবু সামাল দিচ্ছেন তাঁদের। রাজী পুজো সেরে বেরিয়ে এলেন। কাট্।

দৃশ্য—শম্ভু আর জগনের মারামারি। শট নং—১২। এবার ক্যামেরায় বসেছেন একজন সহকারী ঝুনু। রাজেশ আর প্রেম চোপড়া ফাইট মাস্টারের নির্দেশমত হাওয়ায় মারামারি করছেন।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে এই

অাঁচলের শুটিংএ রাখি-রাজেশ-প্রেম চোপরা

'ভয়ানক' সাজানো মারামারি শুটিং দেখছেন তরুণকান্তি ঘোষ। আর হাসছেন। কাট্।

দৃশ্য—পুকুর পাড় দিয়ে রাখী ফিরছে। শট নং—৩। রাজেশ প্রেম চোপড়াকে টানতে টানতে নিয়ে আসে রাখীর পায়ের তলায়।

পরিচালক অনিল গাঙ্গুলী সামনে এক নম্বর ক্যামেরায় পাশে দাঁড়িয়ে। বলে উঠলেন 'কাট্।' সময়-বেলা দুটো। স্থান—শিশির কুঞ্জের খাবার ঘর।

দৃশ্য—খাবার খাওয়া, শট নং—×

ক্যামেরা ধারে কাছে নেই। ক্যামেরাম্যান দিলীপরঞ্জন মুখার্জি শুটিং স্পটে গাছতলায় বসে তখন খাবার খাচ্ছেন। এখানে হাজির রাজেশ-রাখী-প্রেম চোপড়া-অনিল গাঙ্গুলী ও আরও সবাই। খাওয়া শেষ।

একটা ছোট্ট টেবিল ঘিরে দু সেট্ তাস নিয়ে বসেছেন রাখী-রাজেশ-প্রেম চোপড়া।

...ধ। বিশ্রাম চলছে। কাট্।

...কেশনে বিকেলের ছায়া পড়লো ... শুরু হবে কাজ। অনিলবাবু আর ...নবাবু এগিয়ে দিলেন আমাদের।

তরুণকান্তি ঘোষের অকৃত্রিম ভালো-বাসা আর সহযোগিতার কথা জানিয়ে বললেন—'এঁদের উপকার আমি ভুলব না।'

নির্মল ধর

যাত্রা

মহিলা যাত্রাদল

আগেরদিনে যাত্রায় কোন মহিলা পাওয়া যেত না। পুরুষদেরই মহিলা চরিত্রে অভিনয় করতে হত। কিন্তু আজ সেদিন পাল্টে গেছে। প্রমীলারা আজ পিছিয়ে নেই। যাত্রা-পাড়ায় আজ দুটো মহিলা অপেরা বর্তমান। তার মধ্যে 'ভারতীয় মহিলা যাত্রাদল' অন্যতম। এই অপেরা দলে মোট বাইশজন মহিলা অভিনয় করেন; অভিনেতা হিসেবে কোন পুরুষ নেই। পুরুষ চরিত্রে মহিলারাই করেন। এইসব মহিলাদের মধ্যে অধিকাংশই শিক্ষিত এবং বনেদী পরিবারের সন্তান। যদিও এরা অভাবের জন্যে যাত্রায় এসেছেন, তবু একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই, এরা বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের আর পাঁচটা মেয়ের চাইতে অনেক বেশী সংস্কারমুক্ত।

বাংলার '৮৩ সালের শেষের দিকে যাত্রাজগতের কয়েকজন মেয়ে সম্পূর্ণ বেকার হয়ে পড়েন, সেই বেকারদের মধ্যে ছিলেন লীলা রায়, অনিলা ভট্টাচার্য, লেখা ভট্টাচার্য, রাধারাণী বিশ্বাস, আশা গড়াই, শীলা ঘোষ প্রমুখ। এরা পরিচালক গোপাল মুখার্জির কাছে এসে তাদের অন্ন উপায়ের জন্যে কিছু ব্যবস্থা করতে বলেন। গোপালবাবু এবং তাঁর এক বন্ধু দুজনে মিলে 'মেলবোর্ণ যাত্রা ইউনিট' বলে একটা মহিলা যাত্রাদল খোলেন। তারপর গোপালবাবুর বন্ধুর মৃত্যুর পর এই দল ভেঙে যায় এবং সৃষ্টি হয় নতুন মহিলা দল 'বঙ্গীয় মহিলা যাত্রাসমাজ'। কিছুদিন পর নানা কারণে সেটাও ভেঙে যায়। তার কিছুদিন পর, আজ থেকে মাত্র দুমাস আগে আবার গোপালবাবু একটা মহিলাদের নিয়ে যাত্রার দল খোলেন। তারই নাম 'ভারতীয় মহিলা যাত্রাদল।' এই দল এখন তিনটি পালা করছেন। তার মধ্যে প্রথম নন্দগোপাল রায়-চৌধুরী রচিত ও নির্দেশিত 'সুভদ্রা হরণ।' এই পালায় সুর দিয়েছেন কৃষ্ণপদ ধাড়া। দ্বিতীয় পালা বজ্রেন দের 'সোনাই দীঘি।' সুর দিয়েছেন অমিয় ভট্টাচার্য। এছাড়া এঁরা করছেন সঞ্জিবন দাস রচিত ও নির্দেশিত 'নহবত'। এই পালায় সুর দিয়েছেন তরুণ মুখার্জি (বেতার)।

এই বছর এই অপেরা দলের হয়ে অভিনয় করছেন মিরা মুখার্জি, ঝুমা মিত্র, আশা গড়াই, শিবাণী সরকার, শংকরী মুখার্জি, মঞ্জুশ্রী ব্যানার্জি, সুধা রায়-চৌধুরী, রাখী ভট্টাচার্য, পারুল ভট্টাচার্য, রেখা গাঙ্গুলী প্রমুখ।

যাত্রালোকের গুপীগাইন বাঘাবাইন পালায় রাজা ভট্টাচার্য (বাঘা), দুলাল মণ্ডল (ভূতরাজ) এবং বিমলেন্দু ভট্টাচার্য (গুপী)।

যাত্রালোক

যাত্রাপাড়ায় সবাই বড়দা বলতে এক কথায় তিনকড়ি গুছাইতকে চেনেন। ইনি এই যাত্রাজগতে তিরিশ বছর ধরে আছেন, মাত্র এক বছর আগে। তিনকড়িবাবুই এই দলের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনকড়িবাবু বিশ্বাস করেন, লোকশিক্ষার জন্যে যাত্রা গ্রাম বাংলার দিকে বড়ো মাধ্যম। সেই কারণেই প্রথমতঃ তিনি এ ব্যবসার দিকে মন দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, আজকের দিনে যাত্রা একটা বেশ ভালো লাভজনক ব্যবসা। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কাহিনী অবলম্বনে হাসি-হুল্লোড় ভরা মজাদার লেখা 'গুপীগাইন বাঘাবাইন' যাত্রালোকের প্রথম পালা। কথা ও সুর দিয়েছেন সত্যজিৎ রায় এই পালায়। তাছাড়া সত্যজিৎবাবুর তৈরি সিনেমার পাণ্ডুলিপির কিছু অংশও এই দল ব্যবহার করেছেন। এই পালায় নাটারূপ ও নির্দেশনায় আছেন শৈলেশ গুহনিয়োগী। অতিরিক্ত গান রচনা করেছেন সমরেন্দ্র ঘোষ। আবহসঙ্গীত ও অতিরিক্ত গানে সুর দিয়েছেন ডলি চন্দ।

এছাড়া এখন এরা দেবেন্দ্রনাথ নাথের পৌরাণিক পালা 'ভগবানের মুক্তি' নিয়মিত অভিনয় করছেন। এই পালার নির্দেশনায় আছেন মনোরঞ্জন চক্রবর্তী আর সুর

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে গান্ধারী শ্রীকৃষ্ণকে অভিশাপ দিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণের চক্রান্তে কুরুবংশ যেমন ধ্বংস হয়েছে তেমনি যদুবংশও ধ্বংস হয়ে যাবে। এই ঘটনার ওপরেই ভিত্তি করে এই পালার সৃষ্টি। এবছর এই অপেরা দলের হয়ে অভিনয় করছেন মনোরঞ্জন চক্রবর্তী, সুবিমল আদক, রাজা ভট্টাচার্য, বিমলেন্দু ভট্টাচার্য, রাজকুমার, মহুয়া ব্যানার্জি, রীতা সেন, লীনা চক্রবর্তী প্রমুখ অভিনেতা অভিনেত্রী। যাত্রালোক তাঁদের পালাকে আরো প্রাণবন্ত করে তোলার জন্যে নানারকম চিন্তাভাবনা করছেন। এই জন্যেই এরা বিশেষ কারণে বেহালা, আড়বাঁশী ব্যবহারের দিকে যথেষ্ট নজর দিয়েছেন।

এই অপেরা দল সাধারণতঃ পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং বিহারেই পালা করে থাকেন। কলকাতায় এরা তেমন দর্শক পান না।

এই দলে মোট ষাটজন লোক কাজ করেন। এই ষাটজনের মধ্যে প্রায় শিক্ষিত লোক আছেন যাঁরা শুধু যাত্রাকেই ভালো-বেসেই এ পথে এসেছেন। বাৎসরিক আয়ের কথা জিগ্যেস করতেই তিনকড়িবাবু মৃদু হেসে বললেন, 'নিশ্চয় ভালো, নয়তো এ ব্যবসা করব কেন?' কিন্তু তার কিছুক্ষণ পরেই তাঁর অবচেতন মন বলে ফেলল, 'এই যা বন্যা গেল এবার কি হবে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না বেশ কয়েক বছর নেবে আগের অবস্থা।'

বিমলেন্দু ঘোষাল

কালবৈশাখী নাটকে বসন্ত চৌধুরী ও শুভেন্দু

কিছু কাঠের শিলপার এবং শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়কে কয়েক বছর আগে চলচ্চিত্রের সুদর্শন অভিনেতা হিসেবে বাঙালী দেখতে পায়। গত কয়েক বছরে তিনি শিল্পে নানা দায়িত্ব বহন করেছেন। অতিসম্প্রতি তাঁকে দেখছি ব্লেম ব্যাডন মঞ্চে 'কাল বৈশাখী' নাটকের পরিচালক হিসেবে।

বীরু মুখোপাধ্যায়ের এই নাটকটি কয়েকখানি কাঠের শিলপারের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। বসন্ত চৌধুরী এই কাঠের শিলপার দিল কোম্পানীকে সরবরাহ করেছিলেন। শমিতা বিবিসের বাবার ওপরে বসন্ত এই শিলপার বসানোর ভার দিয়েছিলেন। সময়-মত শিলপার না পেয়ে চুক্তি নির্ধারিত সময়ের ভেতর কাজ শেষ করতে গিয়ে কিছু পুরোন শিলপার রং করে বসন্ত পাঠিয়ে-ছিলেন। ঐ নতুন রেলপথে প্রথম ট্রেন চলু হলে বসন্তর বড় ছেলে তাতে উঠে বসে। ট্রেন খারাপ শিলপারের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনা ঘটল। ছেলে অনেকের সঙ্গে মারা গেল। তার মা নীলিমা লাশ এখনও জানে না ছেলে মারা গিয়েছে। মায়ের আশা ছেলে ফিরে আসবে। নীলিমার ছোট ছেলে শুভেন্দু শমিতাকে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু শমিতার বাবা না জেনে 'খারাপ' শিলপার বসানোর অপরাধে এখন জেলে। শমিতার দাদা মুকুল ঘোষ বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে এসেই মামলা আনতে চায়। সে তার বাবাকে জেল থেকে মুক্ত করবেই।

নাটকের এই জটের ভেতর মাস্টার পার্থ, একটি ছোট ছেলে। রীতিমত খুশির হাওয়া। ঋষী চিন্ময় রায় দমবন্ধ নাটকের ভেতর দর্শকের পক্ষে অকসিজেন। বিবেকপীড়িত বসন্ত চৌধুরী একজন ধনী ব্যবসায়ী হিসেবে একথোটাই প্রমাণ করতে পেরেছেন—এভরি থরচুন হ্যাজ এ সিন বিহাইন্ড। এইখানেই তাঁর অভিনয়ের কৃতিত্ব। তাঁকে বারবার ছেলে হিসেবে শুভেন্দু চ্যালেঞ্জ করেছেন। সারা হলঘর স্তব্ধ হয়ে তাঁকে লক্ষ্য করেছে। নীলিমা রীতিমত মা এবং শমিতা পুরো-পুরি নায়িকা। ডাক্তারের ভূমিকায় গৌর চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী কল্পনা ও শমিতার ভাই মুকুল—তিনটি টাইপ চরিত্র তুলে ধরেছেন। এই নাটকে একটানা মনোযোগ আকর্ষণের পুরোপুরি যোগ্যতা রয়েছে। তাপস সেনের আলো এবং সুরেশ দত্তর মঞ্চ দুই-ই ভাল। সুরেশ দত্তর আবহসঙ্গীত মাঝে মাঝে খুব চড়া।

শ' গ'

বাংলা ছবির নতুন সংকট

প্রায় বছর দুই আগে থেকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার রঙিন ছবি দেখার জন্য দর্শক-দের কাছ থেকে অতিরিক্ত দর্শনী আদায় করছেন। তখন যুক্তি দেখান হয়েছিল এই বাবদ প্রাপ্য বাড়তি টাকা ফিল্ম ব্যবসার কাজেই লাগানো হবে। চলচ্চিত্র জগতের বিভিন্ন মহলে এই ব্যবস্থাটি নিয়ে বিতর্ক উঠলেও মৃতপ্রায় বাংলা ছবির উন্নতির কথা চিন্তা করে দর্শকরা নীরবেই পকেট থেকে বাড়তি পয়সা দিয়েছেন, দিচ্ছেন।

ফিল্ম ব্যবসার উন্নতির জন্য নানা ধরনের পরিকল্পনাও স্থির করেছেন রাজ্য সরকার। যদিও অনুদান বাবদ এখনও কেউ কিছু পাননি, কিন্তু ইতিমধ্যে মৃণাল সেন, উৎপল দত্ত আর রাজেন তরফদারকে দিয়ে ছবি করাচ্ছেন সরকার।

সরকারের অর্থদপ্তরে এই অতিরিক্ত দর্শনী বাবদ আয়ের কোন পৃথক হিসাব আছে নিশ্চয়ই। সেই খাতাটি দেখলে তাঁরা বুঝতে পারবেন দর্শনী থেকে আয় মোটেই আশানুরূপ নয়। যেখানে প্রতিটি জেলাতেই ছবিঘরে মাসিক আয়ের পরিমাণ কমছে, সেখানে অতিরিক্ত দর্শনী বাবদ আয় বাড়তে পারে কি? ই-আই-এম-পি-এ'র দেওয়া একটি তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে প্রায় শত-করা ৩০-৪০ ভাগ আয় কমেছে প্রতিটি মফঃস্বল ছবিঘরে।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত টালিগঞ্জ পাড়ায় রঙিন ফিল্মে কাজ করার হিড়িক পড়েছিল, উপরন্তু কেন্দ্রীয় সরকার আমদানীকৃত ইস্টম্যান কলার ফিল্মের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার গ্যারান্টি নেওয়া বন্ধ করেছেন। তবুও আজ স্টুডিওয় স্টুডিওয় আবার সাদা-কালোয় ছবি তোলা হচ্ছে। রঙিন ছবির আর কম হতে পারে এই আশংকায় বাড়তি খরচ করতে চাইছেন না প্রযোজকরা। উপরন্তু এখানে রঙিন ফিল্মের ল্যাবরেটরিও নেই। প্রসেসিং-এর জন্য যেতে হয় ভিন্ রাজ্যে।

সুতরাং অতিরিক্ত দর্শনী বাংলা ছবির গলায় ফাঁস হয়ে আটকাবার আগে কিছু-একটা ব্যবস্থা করুন রাজ্য সরকার।

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নয়—এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাটক

তপন থিয়েটার ৪২৫৪৭৯

শতভিষা

নাটক/পরিচালনা-সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

বৃহস্পতি ও শনি ৬।টায়; ছুটির দিন ও রবিবার ৩ ও ৬।টায়

শ্রেঃ—বিকাশ রায়, সত্য বন্দ্যোঃ, প্রদীপ মুখোঃ, ছন্দা দেবী, সান্ত্বনা, গিরীশ, রবীন, মিহির, সুনীল, নিখিল, কেষ্ট, অরুণ, দীপঙ্কর, উশীনর, শৈলেন, বধূ, গণেশ, স্বপন, অলোক, তিনির এবং রত্না ঘোষাল ও তরুণকুমার

প্রয়োগ প্রধান / মন্টু বন্দ্যোপাধ্যায়

এ নাটক ৬০০ রজনী অতিক্রান্ত

...ত থেকে দুশমন

সঞ্জয়-রঞ্জিতের দোস্তি নিয়ে কারো কিছু বলার নেই। দাবা খেলা, আড্ডা দেওয়া থেকে শুরু করে রঙ মিলিয়ে জামা প্যান্ট কিনে ওরা একটা হৈচৈ ফেলে দিয়েছিল। সঞ্জয়ের বাংলোর পাশেই রঞ্জিত কিনে ফেলল ওর বাংলো। আর দুবাড়ির মাঝে একটি আনা-জানার দরজাও বসিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু হঠাৎ একদিন ঐ দরজায় পড়ল তালা। চাঁদনি শোনায় যে বন্ধুত্বের শুরু, 'আবদুল্লায়' তার পতন। চাঁদনি সোনা তৈরির সময় খান পরিবারের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড হয়ে ওঠে রঞ্জিত। খানদের এই সেবাকে ভুলল না রঞ্জিত। সঞ্জয়ের ছবির ব্যাপারে আরো মনোযোগী হয়ে অন্য ছবির শুটিং ক্যানসেল করে চলে গেল মরিশাস। চাঁদনি শোনা রিলিজ করল। সঞ্জয়ের ডুবন্ত নৌকো ছাড়ল না রঞ্জিত। বন্ধুর পাশেই থাকল। এমনকি আবদুল্লায় একটা রোল নিতেও রাজি হল। এ সময় হঠাৎ কি যেন হয়ে গেল। ছবির শুটিং নিয়ে খটাখটি শুরু দুজনে। রঞ্জিত ক্ষেপে গিয়ে ভাবল ও আমাকে অনুগ্রহ করছে। কিন্তু বিশ্বস্ত সূত্রের সংবাদ, আসল ঘটনা হল ড্যানি—যাকে ছবিতে সব থেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাতে রঞ্জিতের মেজাজ সপ্তমে। তাই দোস্ত এখন কি করে সেটাই দেখায়।

• আমি রীতার বন্ধু। তাই অনুরোধ (১) বোনের চরিত্রে অভিনয় বন্ধ করো, (২) ফিল্মে ধর্ষণ দৃশ্য বাদ দাও, (৩) ড্যানিকে গুলি করতে ছোটা বন্ধ করো।

• বন্ধু না হয়ে নীতুকে অনুরোধ : সেই সব তারকা তোমাকে ত্যাগ করার আগেই, তুমি তাদের ত্যাগ করো।

• বোম্বের অধিকাংশ নায়িকাই রাস্তায় বেরোতে সাজগোছ, দামি গাড়ি, ব্যবহার করে। আর সব থেকে বেশি সিল্ক হিরে দামী দামী জিনিসের দোকানে ওদের ভীড়। সে তুলনায় জন্মার অভাব কিছু নেই। বাড়িতে প্রায় তিনডজন চাকরবাকর। আর দোকানে গিয়ে ও কেন খ্যাণ্ডেজ, ডিটারজেন্ট পাওডার কিনে মশলা। পরনে সাধারণ সাদা শাড়ি।

কিশোর ভ্যাংকুভারে এক মজার মজায় পড়ে। বিরাট শ্রোতাদের সামনে সেদিন আসর। গান শুরুর আগে কিশোর সুন্দর সাজান ইংরেজিতে কিছু বলতে গেল। দু লাইনও শেষ হল না। তার আগেই আওয়াজ উঠল আরে হিন্দী মে বাত কর ইয়ার। কিশোর না দমে গিয়ে শুরু করল, ইয়েত জাওয়ান হ্যায়....।

সঞ্জীব কুমার কঞ্জুস নয়

সঞ্জীবকুমার যে কঞ্জুস নয়, সে খবর দিয়েছেন বাসু ভট্টাচার্য। ঘটনাটা অনেক-দিনের। তখন সঞ্জীব এখনকার আমীরের তুলনায় ছিল বৃহৎ গরীব। বাসু ভট্টাচার্যের এক বন্ধুর স্ত্রী হঠাৎ একদিন তিন হাজার টাকা ধার চাইলেন। টাকাটা ওর খুবই দরকার ছিল। কিন্তু বাসুর এমন টাকা ছিল না, যার থেকে কাউকে ধার দিতে পারে। অনেক ভেবে ওর মনে পড়ল সঞ্জীবের কথা। মনে হল, টাকাটা ওই দিতে পারে। মহিলা সঞ্জীবের খ্যাতি জগত। কিন্তু টাকা মিলেগা কী নেহী এ নিয়ে ওর সংশয় ছিল। বাসু সঞ্জীবকে জানায়। সঞ্জীব ওর তিজোরীর (সিন্দুক) চাবি দিয়ে দেয় বাসুকে। আর বলে দেয় টাকা বের করে নিতে। এখানেই ছিল সঞ্জীবের সমস্ত জীবনের সঞ্চয়!

টিনা-দেবানন্দ

সুন্দর সাজান গোছান একটা ছোট্ট প্রাসাদ। ঝাড় লণ্ঠন, রমণীয় মূর্তি, দামী পর্দা চারদিকে। সুন্দর একটি চেয়ারে বসে দেব সাহেব। সামনে পিস্তল হাতে গব্বরসিং ওরফে আমজাদ খান। গব্বর ওকে জুর প্রস্তাবে রাজি হতে বলছে। কিন্তু দেব সাহেব নারাজ। এমন সময় ১, ২, ৩, ৪ নম্বর জানলা খুলে খুলে। বন্দিনী হেমা মালিনী, রাখী, পরভীন বাবি আর টিনা মুমিন দাঁড়িয়ে। টীম কার্ড হিসাবে আমজাদ এদের ব্যবহার করছে। ভয় আমার প্রস্তাবে রাজি হও, নয় হলে এরা মরবে। হৃতচকিত দেব সাহেব। ঠিক এই মুহূর্তে দেবদূতের মত অন্য দুটি জানালা দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধর্মেন্দ্র আর শশীকাপুর। ওরা গব্বরকে বেকায়দায় ফেলে। দেব সাহেব ওর হাতের পিস্তল ফেলে দিতে ছুটে যায়।

ছবির নাম এক দো তিন চার। জন্মা চক্রবর্তীর ছবি। পরিচালক বিজয় আনন্দ। সেদিন ছিল মহরত দৃ তারকারা সকলেই বেশ সাজগোজ করে এসেছিলেন। দেবানন্দকে জমসে অনেক ছোট মনে হচ্ছিল ধর্মেন্দ্র থেকে। টিনা যেন ছোট্ট খুকী। ও নিশ্চয় আর পাইবে না, মায় কা করু রাম মুঝে বুড়া মিল গয়া।

• বোম্বে ফিল্মের চিরকুমার অপবাদ নাকচ করতে, এবার সঞ্জীবকুমার উঠে-পড়ে লেগেছেন। পাত্রী লীনা চন্দনভার-কর। সঞ্জীবের মা শ্রীমতী জারীওয়ালা পুরোহিতের কাছে শুভ অবসরের দিন জানতে চেয়েছেন।

• ধর্ম-হেমা জুটি এবার বোধহয় ভাঙল। ত্রিমূর্তি ছবি দেখে অনেকের তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু ধর্মেন্দ্র বলেছে ওরা এখনও দশ বছর একসঙ্গে জুটি হিসাবেই কাজ করবে। প্রমাণ আজাদ। যার সাফল্য 'শোলে' থেকেও কম নয়।

• কমল আমরোহীর ছবি 'রাজিয়া সুলতান'-এর মোতিমহল সেট তৈরি হয়েছে ফিল্মস্তান স্টুডিওয়। সেটটি তৈরি করতে চার মাস সময় লেগেছে। খরচ হয়েছে ১৬ লক্ষ টাকা। সেট সাজাতে বোম্বে বাজারের প্রায় সব হীরে শেষ।

• প্রোডিউসার হিসাবে স্বামী ব্যর্থ হলে, তারকা স্ত্রীর যন্ত্রণা ও পরিশ্রম বাড়ে। প্রমাণ, মৌসুমী চ্যাটার্জি।

রীতেশ মুখার্জি অর্থাৎ মৌসুমীর বাবু কিন্তু আবার নতুন ছবিতে হাত দিচ্ছে। ঘরে তারকা স্ত্রী, কিন্তু ওর ছবির নায়িকা হচ্ছে রেখা। ছবির নায়ক হচ্ছে বিনোদ মেহেরা। আর অমিতাভও থাকছে একটি বিশিষ্ট চরিত্রে।

• বার্ণিং ট্রেনের শুটিং চলছিল। হেমা-ধরম। হঠাৎ ওদের চোখে পড়ল আগুন। ভয় পেয়ে ঢুকে পড়ল পাশের বাথরুমে দুজন। পরিচালক রবি চোপরা আগুন নিভিয়ে ফেললেন। হেমা-ধরম বাথরুম থেকে বেরোচ্ছে না। বাইরে দাঁড়িয়ে রবি চোপরা।

• বহু প্রতীক্ষা ও যন্ত্রণার পর পুণা থেকে আসা বিজয়া জিনা ওরফে ডলির কপাল খুলেছে। খাজা আহম্মদ আব্বাসের নতুন ছবি নকশালে একটা কাজ পেয়েছে।

ব্রতাকর

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

মূল্য ৭৫ পয়সা। হিপুরোয় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ

প্রণীত

কয়েকটি অমূল্য লোক-চরিত ও কাব্য-গাঁথা

এই অপূর্ব রচনাগুলি পাঠক-পাঠিকাদের দেবে অমৃত পানের আনন্দ। তৃষিত শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে আনবে পরম শান্তি।

শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত	১ম—৬ষ্ঠ খণ্ড ২৮·৫০
শ্রীনরোত্তম চরিত	৩.৫০ পঃ
শ্রীকালাচাঁদ গীতা	৩.০০
Lord Gouranga (Eng. Vol. 1)	৩.০০

গ্রন্থগুলি অনাদৃত হলেও এর মূল্য বৃদ্ধি করা হয়নি। অবিলম্বে সংগ্রহ করুন।

প্রাপ্তিস্থান :
পত্রিকা হাউস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৭০০০০৩।

দে বুক স্টোর্স; ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট; কলিকাতা ও
নাথ ব্রাদার্স, ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট; কলিকাতা।

Regd. No. WB/NC-13
Telegram : AMRITA Calcutta-700003

AMRITA

Friday 17th November. 1978
Phone 55-5231 (14 lines)

বিশুদ্ধ 'কুকমী' গুঁড়া মশলার ক্রেতারা-

সাবধান!

'কুকমী' গুঁড়া মশলার জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে কলকাতার কয়েকটি গুঁড়া মশলা কোম্পানী তাদের নিজস্ব নিকৃষ্টমানের ব্রাণ্ডের সঙ্গে জনপ্রিয় কুকমীর নাম জুড়ে হুবহু কুকমী Cookme নামের প্যাকেট নকল করে আসল কুকমী গুঁড়া মশলা বলে বাজারে চালাবার চেষ্টা করছে।

কেনার সময় দেখে নেবেন- 'কুকমী'র প্যাকেটে কেবল Cookme 'কুকমী' ছাপই আছে, অন্য কোন ব্রাণ্ডের নাম যুক্ত নেই

প্রস্তুতকারক :

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ

২৩৫ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭০০০৭০ ● ফোন : ৩৬০৯৯৩, ৩৬৯৬৩৩
[illegible] ● স্যাটরী : কানপুর

দাম ৭৫ পয়সা

অমৃত

টলস্টয়

একালের

াঙলা গল্প

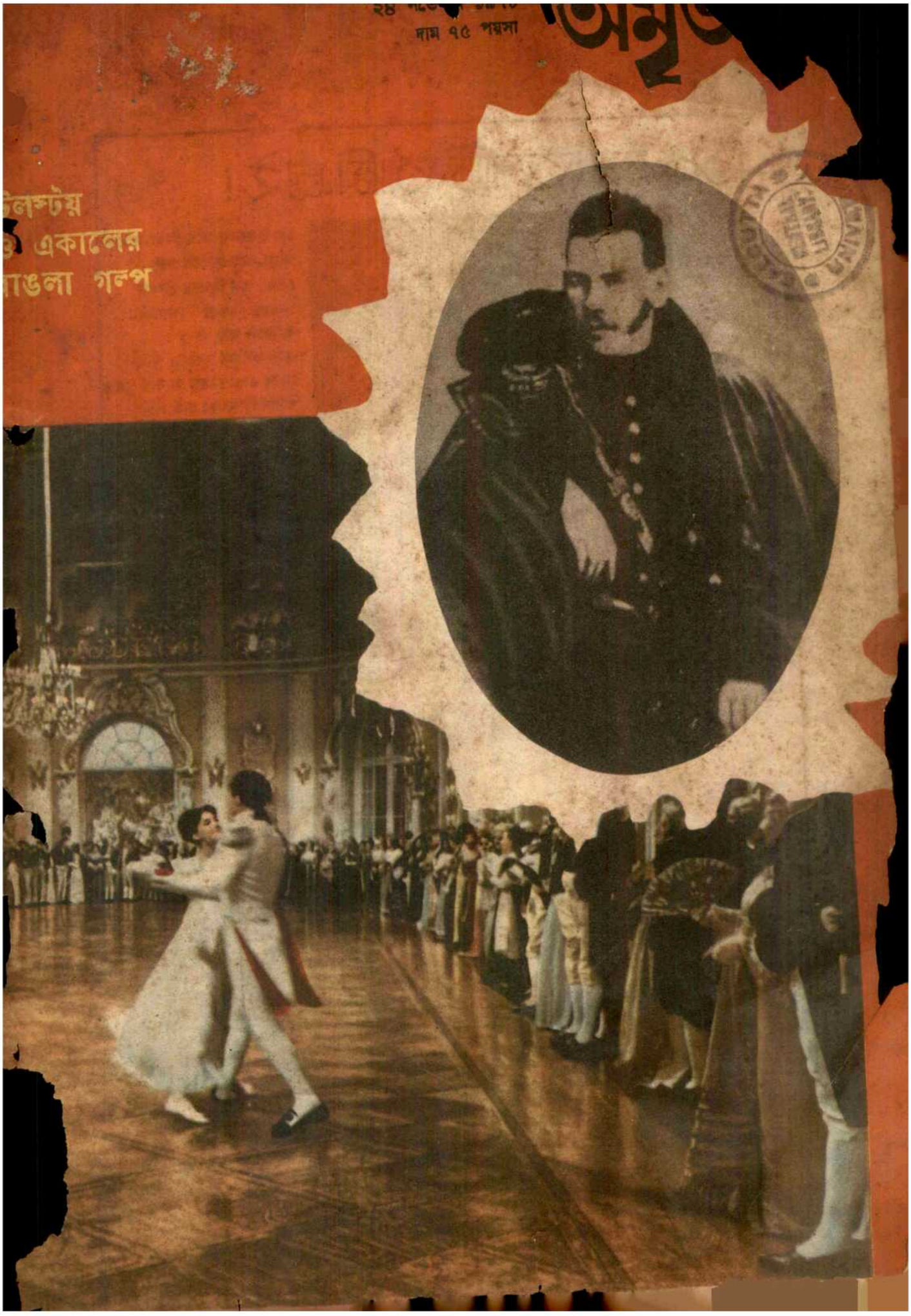

ঠিক যে তেলটি আমি চাই !

লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা, অজস্র চিঠি পত্র লেখা, সব বিষয়ে চটপট সিদ্ধান্ত নেওয়া···সারাদিন অফিসে কত কাজ !
এত কাজের মধ্যেও মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয় আবার চুলও পরিপাটি থাকা চাই ।
আর তাই আমার পছন্দ মৃদু সুবাসিত

কেয়ো-কার্পিন

কেয়ো-কার্পিনে চুল চটচটে হয় না।

Dey's
দে'জ মেডিকেলের তৈরী

PX/DM/KB-2/78

নটরাজন-এর শ্রেষ্ঠ রচনা

লালবাজার ২০·০০

স্বাধীনতা-সংগ্রামের পটভূমিকায় কুখ্যাত কিংবা বিখ্যাত ভয়ংকর লালবাজারকে কেন্দ্র করে তৎকালীন পুলিশী কর্ম-চাঞ্চল্যের উপন্যাস-রসসিক্ত বর্ণনা। বাংলা ভাষায় এধরনের বই এই প্রথম প্রকাশিত হল। পুলিশী সাহিত্যের সার্থক রূপকার নটরাজনের এ এক অনবদ্য সৃষ্টি। দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র শোভিত, বাংলা তথা কোন ভারতীয় ভাষায় এধরনের কোন বই আজও প্রকাশিত হয়নি।

শক্তিপদ রাজগুরুর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

অনুসন্ধান ১৫·০০

নিরালা পর্বত-সীমায় গভীরে দুটি হৃদয়ের ভালবাসা—ঘর বাঁধার স্বপ্ন। এক অকল্যাণের কালো হাত যেন সেই স্বপ্নসৌধকে ধ্বংস করতে উদ্যত। কিন্তু তমসার বুকে সূর্যোদয়ের মতই অভিজিৎ-এর সত্যানুসন্ধান সেই স্বপ্নকে সার্থক করে তোলে। রহস্যঘন এই অন্তর্দ্বন্দ্বমূলক কাহিনী একসঙ্গে বাংলা ও হিন্দি ছবিতে রূপায়িত হচ্ছে।

ভ্রমণ-সাহিত্যে অনন্য শঙ্কুমহারাজের সার্থক সৃষ্টি

মধু-বৃন্দাবনে [তিন পর্বে সম্পূর্ণ]

শ্রীধাম বৃন্দাবনের যাবতীয় মন্দির, স্থল, তীর্থ ও পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা; যাবতীয় বন, মথুরা, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, যাবতীয় ঘাট, গোকুল, রাঁবেল প্রভৃতি পরিক্রমা; শ্রীমনমহাপ্রভু ও ষড়গোস্বামিগণের কথা— আর শ্রীকৃষ্ণের শৈশব ও কৈশোরলীলা। তিন শতাধিক পৃষ্ঠার প্রতিটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ পর্বে সমাপ্ত। মূল্য প্রতি পর্ব বারো টাকা।

এই লেখকের আর দুখানি গ্রন্থ

চতুরঙ্গীর অঙ্গনে ১৫·০০ মন-দ্বারকায় ১২·০০

কাশীকান্ত মৈত্রের সাড়াজাগানো গ্রন্থ

গণতন্ত্র ঃ মুখোশ ও মুখশ্রী ২৫·০০

ব্রজমাধব ভট্টাচার্যের উপন্যাস

ত্রিভুবনের বাইরে ১৮·০০

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ভ্রমণকাহিনী

গোমুখীর পথ ১৬·০০

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর উপন্যাস

শেষ বিচার ১৮·০০

উপন্যাস রচনায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সাফল্য শুধু বিষয়-ভাবনায় নয়। মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে স্ব-সৃষ্ট চরিত্রগুলির ক্রমিক আত্ম-উন্মোচনে তিনি যে কতবড় শিল্পী তাঁর সম্প্রতি লেখা এই উপন্যাস আর একবার প্রমাণ করল। বাবা ও ছেলেকে নিয়ে বিষাদ ভাবনার এ এক বিস্ময়কর সৃষ্টি।

নারায়ণ সান্যালের উপন্যাস

গজমুক্তা ১০·০০

হাতীর মাথায় 'গজমুক্তা' থাকতে পারে একথা বিশ্বাস করেন? মানতে রাজী আছেন এই ভারতবর্ষের এক গভীর অরণ্যে ফাঁস দিয়ে একটি উপজাতি হাতী ধরে? চার কিংবা ছয় গজদন্তওয়ালা গজরাজের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন? রূপকথার কোন গল্প নয়। সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-ভিত্তিক গবেষণার ফলশ্রুতি এই উপন্যাস।

রবীন্দ্র লাইব্রেরী ১৫/২; শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩
ফোন ঃ ৩৪-৪৩৫৬

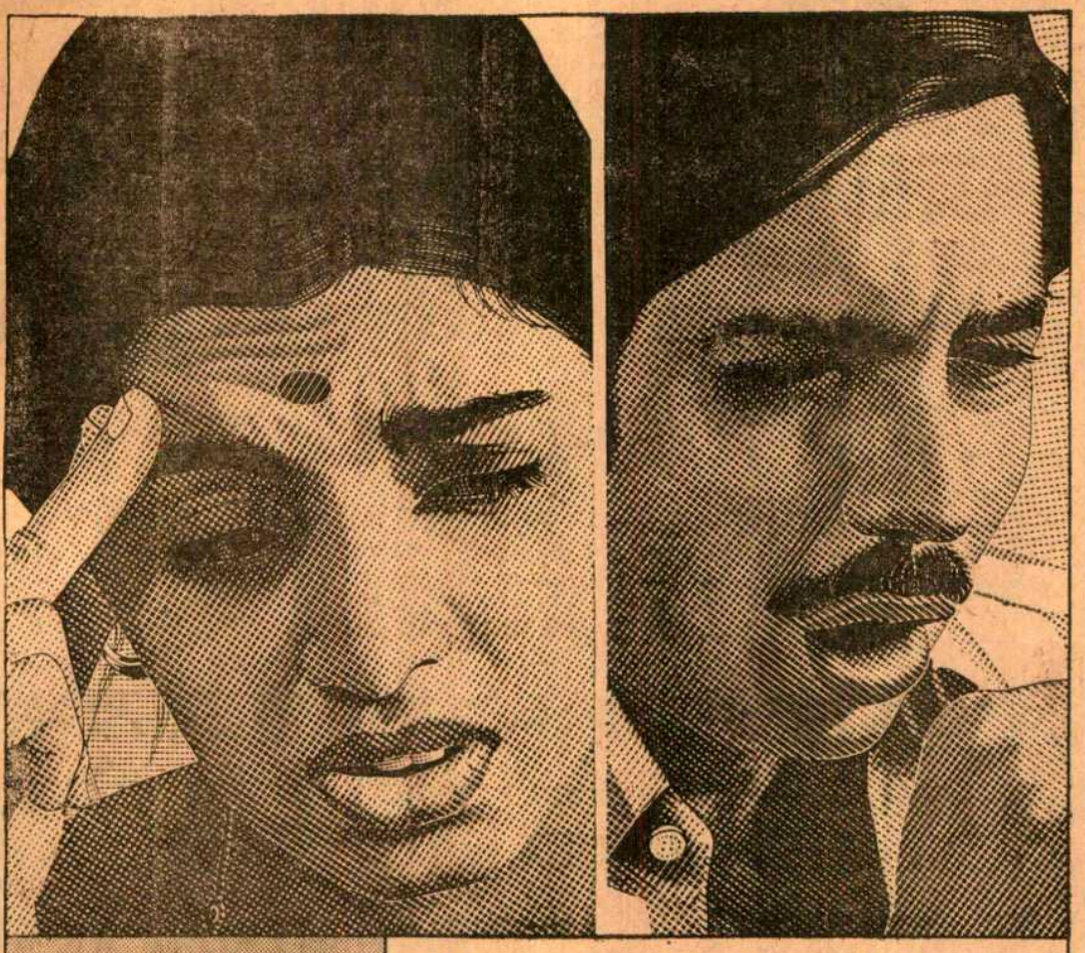

অমৃতাঞ্জন

ব্যথা বেদনা, ঠাণ্ডা লাগা ও মচকানির জন্য একটি বহুমুখী ঘরোয়া দাওয়াই

আপনার ব্যথাস্থানে, ঠাণ্ডা-লাগা ও মচকানো জায়গায় সামান্য পরিমাণ আরামদায়ক অমৃতাঞ্জন লাগিয়ে মালিশ করুন। কয়েক মিনিটের মধ্যে এর দশটি ভেষজের কার্যকারিতা অনুভব করবেন এবং আপনি অনেক আরাম বোধ করবেন।

অমৃতাঞ্জন—জার, শিশি ও ছিমছাম কমদামী টিনের কৌটোয় পাওয়া যায়।

অমৃতাঞ্জন—
৮০ বছরেরও বেশি
সময় ধরে বিশ্বস্ত ঘরোয়া
রোগ প্রতিষেধক

AM 1312

অমৃতাঞ্জন লিমিটেড

সাহিত্য ইত্যাদি...

সাহিত্য এবং মৃত্যুচিন্তা

মৃত্যু এমন একটি ঘটনা যা নিয়ে তর্ক করা চলে না। তার সঙ্গে বিবাদ করা হাস্যকর বন্ধুত্ব তো নয়ই। অবিশ্যি স্বেচ্ছায় যাঁরা মৃত্যুবরণ করেন সেই মহান ব্যক্তিদের কথা আলাদা।। সাধারণ মানুষ মৃত্যুকে রীতিমত দূরে দূরেই রাখেন। এমন একটা ভাব দেখান যেন সে নেই। কিন্তু তার এই উদাসীনতা শুধু বাইরের খোলস, ভেতরে সব সময়ই থাকে মৃত্যুচিন্তা—কখনো স্পষ্ট-ভাবে, কখনো পরোক্ষে। আসলে মৃত্যুকে সব সময় চোখে চোখে না রাখলে বাঁচাই যায় না। ঠিক যে রকম চোখে চোখে রাখতে হয়—জঙ্গলের মধ্যে বাঘের সামনে পড়লে তার প্রতিটি সামান্যতম নড়াচড়াকে পর্যন্ত চোখে চোখে রাখা।

পাঠক, মৃত্যুর ওপর লেকচার দিলাম বলে অবাক হবেন না। একটি গুরুতর সাহিত্যিক প্রশ্ন থেকে এই মৃত্যু প্রসঙ্গের উত্থাপন। —সাহিত্যের সঙ্গে মৃত্যুর সম্পর্ক কী? কিম্বা প্রশ্নটিকে এভাবেও তোলা যেতে পারে—সাহিত্যের মধ্যে মৃত্যুচিন্তা কিম্বা মৃত্যুবোধ থাকা উচিত কিনা?

আজকের ধারণা মৃত্যু যেহেতু অমোঘ ঘটনা, সে জন্যে তা নিয়ে বাগবিস্তার করা করা ছেলেমানুষী। কেউ কেউ আবার আরো এক ধাপ এগিয়ে বলেন, মৃত্যু নিয়ে বেশি মাথা ঘামানো অপ্রকৃতিস্থতার লক্ষণ। স্নায়ু-ঘটিত গোলযোগ এবং মনোবিকার থেকেই দেখা যায় এ জাতের মর্বিডিটি।

কিন্তু সেভাবে বলতে গেলে তো প্রেমের সম্বন্ধেও বলা যায় ঐ একই কথা। প্রেম নিয়ে বেশি মাথা ঘামানোও তো অন্যের কাছে মনে হতে পারে মনোবিকারের ব্যাপার। বিরহ এবং বিষাদকেও তো মনে হতে পারে মর্বিডিটি।

কাজেই এভাবে উড়িয়ে দিতে যাওয়া কোন কাজের কথা হবে না। শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে, কটূটর কেজো মানুষরা হয়তো এই সুরে সুর মিলিয়ে বলে উঠবেন—সাহিত্য নিয়ে মাথা ঘামানোও মর্বিডিটি।

অতএব এসব থাক। প্রসঙ্গে ফিরে যাই আবার।

আমার বিবেচনায় সাহিত্যের সঙ্গে মৃত্যুর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ, কারণ সাহিত্যের কাজ হল জীবন নিয়ে। আর জীবন মানেই মৃত্যু। হ্যাঁ তাই। দিন মানে যেমন দিনমান এবং রাত্রিকাল মিলিয়ে যে চব্বিশটি ঘন্টার অস্তিত্ব সেইটে, তেমনি জীবন মানেই হল জীবিতকাল এবং মৃত্যুর পূর্বচিহ্ন নিয়ে যে জীবন তারই সমগ্রতা। জীবনগ্রন্থের পাতায় তাই লেখা হয়—রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১—১৯৪১) এইভাবে। অর্থাৎ নদীর যেমন দুটি তীর উৎস এবং মোহনা, প্রতিটি জীবনের যে দুটি প্রান্ত, জন্ম এবং মৃত্যু, তারই মধ্যে বাঁধা থাকে গোটা জীবনের আয়ুষ্কাল। কাজেই জীবনের কথা বলতে গেলেই ভেবে নিতে হয় মৃত্যুর কথাও। কিম্বা মৃত্যুর কথা মনে থাকে বলেই বলতে থাকি আমরা জীবনের কথা। মৃত্যুর উপস্থিতি জীবনকে করে তোলে মূল্যবান। মৃত্যু আছে বলেই জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত এত দামী।

এই উপলব্ধি রয়েছে রবীন্দ্রনাথের অনেক অনেক রকম রচনায়—কবিতায়, গানে, চিঠিপত্রে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে তিনি নিবিড় গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন, তা থেকে রস নিঙড়ে নিতেন, সঞ্চারিত করতেন সে রস তাঁর রচনায়। এই রসের উপলব্ধি আর আস্বাদনই তাঁর আনন্দবাদের উৎস। কিন্তু এও কি টিঁকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন তাঁর শেষ বোঝাপড়ার দিনে? বোধহয় না। না হলে কেন লিখবেন তাঁর শেষ লেখায়—'আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন—সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে, মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।' এখানে 'দেনা' শব্দটি যেন ভালো করেই বুঝিয়ে দিতে চায়, জীবন আসলে একটি ঋণকরী সম্পত্তি, যার আসল মালিকানা রয়েছে মৃত্যুর হাতে।

এই ভয়াবহ মৃত্যু চেতনাই রবীন্দ্র-নাথকে করে তুলেছে জীবনরসিক, জীবন-প্রেমিক—ডেস্পারেটভাবে আশাবাদী।

শেকসপীয়ারে লেখায় মৃত্যু একটি অনিবার্য প্রসঙ্গ। বিশেষ করে তাঁর ট্যাজেডি-গুলোতে। মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁর কী ধারণা ছিল তা জানা যায় জীবন সম্পর্কে তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি থেকে। জীবন হল এমন একটি গল্পো, যা বলছে একজন হাবা-গোবা ব্যক্তি, আর তাতে হাজার রকম চিল্লাচিল্লি আর দাপাদাপি থাকলেও মানের ঘরে অঙ্ক-রম্ভা। কাজেই না বললেও চলে, এহেন অর্থহীন একটি ব্যাপারের সমাপ্তি ঘটা শোকের ব্যাপার হতে পারে না। (বরং সেই-টেই অনেক স্বাভাবিক বলে মনে হলে অবাক হবার কিছু নেই যেন।) অন্যত্র জীবনকে তুলনা করেছেন থিয়েটারের মঞ্চ হিসেবে। মানুষ সেখানে তার ভূমিকা অনুযায়ী কথাবার্তা ও কাজকর্ম শেষ করে নির্দিষ্ট সময়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়। আবার একটি সনেটে তিনি বলে-ছেন মৃত্যুও শাশ্বত নয়, তারও সমাপ্তি আছে। একবার মৃত্যু হলে যেহেতু আবার মরা যায় না, সে জন্যেই তাঁর মনে হয়েছে একটি মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সেই মানুষের জন্যে নির্দিষ্ট মৃত্যুরও মৃত্যু ঘটে। মহা-কবির যোগ্য উক্তি বটে।

রোমান্টিক কল্পনার একটি অনিবার্য উপাদান হল বিষাদ। এবং সেটি ঘটে, যা ওয়ার্ড বায়রন শেলি কীটস সকলের কবিতা-তেই দেখা যায় মৃত্যু তার ছায়াপাত ঘটিয়ে গেছে। কবিরা নানাভাবে চেষ্টা করেছেন তাকে মানিয়ে নিতে, তার কবল থেকে পরি-ত্রাণ পেতে। কখনো তাঁরা রচনা করেছেন অমরতার স্তব, কখনো প্রাচীন গ্রীসের একটি পাত্রকে বন্দনা করতে গিয়ে বন্দনা করেছেন মানুষের শিল্পচেতনার অমরতাকে, কখনো কালবৈশাখী ঝড়ের প্রশস্তি রচনা করে নিজেই একদিন উত্তাল সমুদ্রে ডিঙ্গি ভাসিয়ে আলিঙ্গন করেছেন মৃত্যুকে।

ব্রাউনিং-এর কাছে মৃত্যু এক নিশ্চিত ঘটনা যা যে কোন সময়ে ঘটতে পারে। অত-এব বেঁচে থাকার জন্যে যতটুকু সময় হাতে পাওয়া যায় তাকে পুরোমাত্রায় উজ্জ্বল করা উচিত। কে জানে, আজ রাতেই দুনিয়াটা রসাতলে যাবে কিনা।'

ইয়েটস বলেছেন আত্মার জয় ঘোষণাই হল আসল উত্তর—সমস্ত যতো অনিবার্যভাবে দেহকে ঠেলে নিয়ে যাবে জরা-মৃত্যুর দিকে ততোই আরো মুক্তকণ্ঠে গাইতে হবে আত্মার জয়গান।

এলিয়ট মৃত্যুকে নানাভাবে দেখেছেন। কখনো তাঁর সময় চেতনা তাঁকে বাঙালি সেই লৌকিক উক্তির কাছাকাছি নিয়ে গেছে—এক নদীতে কেউ দুবার ডুব দেয় না। অর্থাৎ দ্বিতীয়বার ডুব দেবার আগেই নদীর পুরোনো জল সামনে বয়ে গিয়ে তার জায়গায় ঠাঁই নিয়েছে নতুন জল। অর্থাৎ মৃত্যু একদিক দিয়ে প্রতি মুহূর্তের ব্যাপার। জীবিতকালেও আমরা অজস্রবার মরি।

বাঙালী কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর সেই বিখ্যাত কবিতায় (আট বছর আগের একদিন') মৃত্যুকে দেখেছেন একটা কুহকের মতো। জীবন তাঁর নায়কের মনে জাগিয়েছে এক বিপন্ন বিস্ময় যা তাকে তার সত্তার গভীরে কেবলি ক্লান্ত করে তুলেছে—আর মৃত্যু এসেছে সেই ক্লান্তির যন্ত্রণা থেকে উদ্ধারের মতো।

এবং আশ্চর্য এই যে জীবনানন্দের মতো এত জীবনরসিক কবি কমই আছেন বাংলা-কবিতায়। তাঁর শব্দ চয়ন, চিত্রকল্প রচনা সমস্ত কিছু মধ্যেই রয়েছে প্রবল এক ভালো-বাসা, ইন্দ্রিয়সংবেদ্য (সেন্সুয়াস) আসক্তি।

মুশকিল দেখা দেয় প্রগতিশীল কবিদের নিয়ে। বিষ্ণু দে বা সুভাষ মুখোপাধ্যায় মৃত্যু সম্বন্ধে নীরব। অথচ পৃথিবীর অন্য ভাষায় যাঁরা প্রধান প্রগতিপন্থী কবি, যেমন লোরকা মায়াকভস্কি, নেরুদা—সকলেই কোন না কোন ভাবে মৃত্যুর প্রসঙ্গে এসে-ছেন। প্রগতি আর মৃত্যু চেতনা অতএব পর-স্পর-বিরুদ্ধ নয়। বাঙালি প্রধান প্রগতিপন্থী কবিরা তাহলে মৃত্যুকে এড়িয়ে গেলেন কেন? 'মৃত্যুচেতনা ছাড়া কি জীবনবোধ

জ্যোতিবাবু এখন সতর্ক

রাজ্যের কয়েকজন আই-এ-এস এবং আই-পি-এস অফিসার সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেয়েছেন। অভিযোগ, বন্যা ও ত্রাণ পুনর্গঠনের কাজে তাদের প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার এবং একটি রাজনৈতিক দলের মান-মর্জি মাফিক কাজ করা নিয়ে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজি দেশাই বন্যা পরিস্থিতি দেখতে যখন এ-রাজ্য সফরে আসেন তখন অবশ্য রাজ্য জনতা দলের একাধিক নেতা এবং ভিন্নভাবে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে ত্রাণ নিয়ে দলবাজির অভিযোগ রাখেন। সঙ্গে কিছু সর্বভারতীয় ক্যাডারের অফিসারের বিরুদ্ধেও সুনির্দিষ্ট অভিযোগ করা হয়। তখনই প্রধানমন্ত্রী তাঁর সচিবকে পদস্থ অফিসারদের প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে নির্দেশ দেন। সেই সূত্র ধরেই অতি সম্প্রতি কয়েকজন আই-পি-এস, আই-এ-এস সম্পর্কে অবাঞ্ছিত কিছু গোপন রিপোর্ট দিল্লীর হাতে পৌঁছেছে।

প্রধানমন্ত্রী রাজ্যে নিযুক্ত এক শ্রেণীর আই-এ-এস, আই-পি-এস অফিসারের আচার-আচরণে অত্যন্ত বিরূপ। তিনি চান, অফিসাররা কোন দলের শিকার না হয়ে নিরপেক্ষভাবে সরকারী কাজ পরিচালনা করুন। কিন্তু দিল্লীর কর্তাদের কাছে এমন সব সুনির্দিষ্ট রিপোর্ট আছে, যা অফিসারদের নিরপেক্ষতা ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কেও বহুক্ষেত্রে সন্দেহ সৃষ্টি করে।

অতি সম্প্রতি জনতা দলের সভাপতি এবং বামঘেঁষা নেতা শ্রীচন্দ্রশেখর পশ্চিম বাংলার বন্যাঞ্চল সফর করেছেন। এক সময় তিনি প্রফুল্লচন্দ্র সেনের ত্রাণ নিয়ে দলবাজির অভিযোগের গুরুত্ব দিতেন না। বরং রাজ্যের বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার কাজের প্রশংসা করে রাজ্য জনতার বিমান মিত্র গোষ্ঠীর সপক্ষে রায় দিতেন। তাঁর সাম্প্রতিক সফরের পর শ্রীচন্দ্রশেখরেরও মনোভাব পরিবর্তন ঘটেছে। সাংবাদিক বৈঠকে তিনিও ত্রাণ পুনর্গঠন নিয়ে দলবাজির অভিযোগ তোলেন। এ ব্যাপারে তাঁর কণ্ঠেও তিক্ত অভিজ্ঞতার সুর ছিল। তাঁর মতে, বন্যাত্রাণের নামে রাজ্য নেতারা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে একটা মানসিকতা সৃষ্টি করে নতুন রাজনৈতিক ইস্যু তৈরির চেষ্টা করছেন।

রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার প্রায় দেড় বছর ক্ষমতাসীন। ফলে একশ্রেণীর কর্মী এবং নেতা ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে আরও ক্ষমতালোভী। অন্যদিকে কর্মী এবং নেতাদের বিরাট এক অংশ এতদিনে হতাশ। তারা ভেবেছিলেন কংগ্রেসী শাসনের সঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের মৌল পার্থক্য খুব সহজে সাধারণ মানুষ ধরতে পারবে। কিন্তু তা পারেনি। সেদিনের ক্ষমতাবান আমলারা আরও ক্ষমতার তুঙ্গে।

রাজনীতি কলকাতা স্টাইল

তিমিরে সে তিমিরেই। মনে রাখতে হবে নেতা ও কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ-ক্ষোভ ক্রমে দানা বাধছে। ধূমায়িত সেই ক্ষোভ এতদিনে বামফ্রন্টের বিধানসভা সদস্যদের অনেকেই স্পর্শ করেছে। তা বুঝতে পেরে শীতকালীন অধিবেশনের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু বিধানসভার বামফ্রন্ট সদস্যদের নিয়ে ঘরোয়া বৈঠক করে বলতে বাধ্য হয়েছেন : কারো কোন ক্ষোভ অথবা অভিযোগ থাকলে তারা যেন তা বিধানসভায় না তুলে সরাসরি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে জানান। সি পি আই(এম) দলের সদস্যরা না হয় মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ বা তাদের দলের নির্দেশ আপাতত মেনে নিলেন, কিন্তু শরিক দলের সদস্যরা তা মুখ বুজে মেনে নেবেন বলে মনে হয় না। ফরোয়ার্ড ব্লক-আর এস পির শ্রীসরল দেব এবং শ্রীতিমির ভাদুড়ীর মত বহু এম-এল-এর সঙ্গে আলোচনা করেই তা আচ করা সম্ভব। তাঁদের অভিযোগ, একশ্রেণীর আই-এ-এস, আই-পি-এস অফিসার ত্রাণ ও পুনর্গঠনের নামে একটি দলের মুখ চেয়ে কাজ করছেন। একটা বিশেষ রাজনৈতিক চক্রের সঙ্গে তাদের অশুভ আঁতাতের কথাও তাঁরা স্বীকার করেন। এ-বিষয়ে সরকারের কাছে নানা অভিযোগও নাকি তাঁরা পেশ করেছেন। অর্থাৎ দিল্লীর পাওয়া সরকারী সূত্রের গোপন রিপোর্টের সঙ্গে বামফ্রন্টের বহু

বেদব্যাস বৈদ

বিধানসভা সদস্যের অভিযোগের সুর অবিশ্বাস্যভাবে এক এবং অভিন্ন।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দিল্লীর পাওয়া গোপন রিপোর্টের সংবাদ নিশ্চয়ই পেয়ে থাকবেন। বামফ্রন্টের এম-এল-এদেরও এই একই ধরনের অভিযোগ। এই মুহূর্তে তাঁর কাছে এর গুরুত্ব যে অপরিসীম তা বলাবাহুল্য। বন্যার জল কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর অক্লান্ত জেলা সফর এবং সভা-সমাবেশ রাজনৈতিক মহলকে কৌতূহলী করে তুলেছে। তাঁদের ধারণা, মুখ্যমন্ত্রী বুঝতে পেরেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার ত্রাণ পুনর্গঠনের ব্যাপারে বেশ কড়া মনোভাব নেবেন। রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে দলবাজির অভিযোগ-সম্বলিত রিপোর্ট কেন্দ্রকে কঠোর থেকে কঠোরতর হতে বাধ্য করবে। প্রধানমন্ত্রীও একাধিকবার নিরপেক্ষ প্রশাসন এবং বন্যাত্রাণের হিসাব-নিকাশ কড়ায়-ক্রান্তিতে রাখার সুপারিশ করেছেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই রাজ্য সরকারের বৃহত্তর শরিক সি পি আই(এম) দল আগাম একটা কেন্দ্র-বিরোধী আন্দোলন খাড়া করাতে উদ্যোগী। ইতিমধ্যে কেন্দ্রের দেওয়া অর্থ-খাদ্য সাহায্যকে তাঁরা অকিঞ্চিৎকর বলেও অভিহিত করেছেন। জেলায় জেলায় কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলে সি পি আই(এম) দল একদিকে যেমন র‍্যাডিক্যাল ক্যাডার এবং নেতাদের চাঙ্গা রাখতে চায়, তেমনি যুগপৎ ত্রাণ পুনর্গঠনের সম্ভাব্য ব্যর্থতার সব রকম দায়-দায়িত্ব কেন্দ্রের ঘাড়ে চাপিয়ে রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতার দাবীকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের

তিনটি মজাদার বই

একাল ও সেকালের বিচিত্র জীবন - কাহিনী ও রসাল গল্পের ফুলঝুরি। হাসি মজা তাজ্জব চমকও শিহরণে ভরাট এই লেখাগুলি ছোট ও বড়দের কাছে সমান সুখ পাঠ্য।

বিচিত্র কাহিনী ৬.

আরও বিচিত্র কাহিনী ৬.

চিত্র বিচিত্র ৭.

সব বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়

টলস্টয় ঃ সার্ধশতবার্ষিকী

অন্নদাশঙ্কর রায়

ছাত্র টলস্টয় ১৮৭৯ খৃঃ

টলস্টয়ের জন্মের পর দেড়শো বছর অতীত হয়েছে। তাঁর জীবনকালেই তিনি দেশের সীমা অতিক্রম করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সময় দেখা গেল, স্বদেশে পূজ্যতে জার, টলস্টয় সর্বত্র পূজ্যতে। তাঁর জীবনমরণ সন্ধিক্ষণে সারা দুনিয়ার লোক উৎকণ্ঠিত। কেন এত শ্রদ্ধা, এত প্রীতি, এত মমতা? সমর ও শান্তি, গ্রন্থ কাহিনী ও রেজারেকশন—এই তিনটি মহান উপন্যাসের জন্যই কি? না তাঁর মানবদরদী জীবনদর্শনের জন্যে, জনদরদী জীবনযাপনের জন্যে? যুদ্ধবিরতি ও শোষণবিরতির জন্যে তাঁর অবিশ্রান্ত লেখনী চালনার জন্যে?

টলস্টয়ের রচনার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ষোল বছর বয়সে, যখন আমি স্কুলের ছাত্র। তাঁর কাহিনীগুচ্ছ পুরস্কার পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে তর্জমা করি গোটা দুই। একটি সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হয় প্রবাসীতে। সেই যে সম্পর্ক স্থাপিত হলো সে সম্পর্ক সারা জীবনেও ছিন্ন হলো না। জীবনদর্শনের ক্ষেত্রে আমি তাঁর অনুচরদের সঙ্গেই রয়েছি। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব কাটিয়ে উঠেছি। আর্টকে তিনি পঞ্চাশোত্তর বয়সে ধর্মপ্রচার বা নীতি প্রচারের বাহন করেছিলেন। যেখানে তাঁর সঙ্গে আমার মৌল মতভেদ। আমার মতে, এতে আর্টের স্বাধীনতা খর্ব হয়। অমিতাচারী আর্টকে সংযত হতে বলা এক জিনিস, শৃংখলার খাতিরে শৃংখল পরিয়ে দেওয়া আরেক। শিবের জন্যে সৌন্দর্যকে লাঘব করা যায় না। সত্যের জন্যেও না, তবে স্বন্দেরের দিন আমি দ্বিধান্বিত। ঠিক এই কারণেই আমি রবীন্দ্রনাথের আরো কাছাকাছি। পরবর্তী বয়সে আমি কবির প্রভাবও কাটিয়ে উঠেছি।

এ সংসারে ধনহীনরা ধনবান হতে চায়, বলহীনরা বলবান হতে চায়, অশিক্ষিতরা শিক্ষিত হতে চায়, নিম্নস্থানীয়রা উচ্চস্থানীয় হতে চায়। কিন্তু এর বিপরীত অভিলাষ কেউ কোথাও

পোষণ করে কি? যদি কেউ করে সে সরাসরি সন্ন্যাসী হয়ে যায়, মঠে যোগ দেয় কিংবা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে। টলস্টয় দীনহীনদের একজন হয়ে তাদের মতো শ্রমলব্ধ অন্নে প্রাণধারণ করতে চেয়েছিলেন, পশমলে তাঁর আস্থা ছিল না, বুদ্ধিজীবীদের উপর তাঁর অবজ্ঞা জন্মেছিল, সভ্যতার উপরে তিনি বীতরাগ। অথচ সন্ন্যাসীও হননি, মঠেও যোগ দেননি, আশ্রমও প্রতিষ্ঠা করেন নি। গান্ধীজী তবু তাঁর সহধর্মিণীকে আশ্রমিকা করতে পেরেছিলেন, টলস্টয়ের সহধর্মিণী শেষ পর্যন্ত অভিজাত ঘরণী। ঘর ছাড়তে যাওয়া মানেই ঘরণীকে ছাড়তে যাওয়া। সেই কাজটি যেদিন করতে সমর্থ হন সেদিন তিনি হন অভিজাত জীবনধারা থেকে মুক্ত পুরুষ। কিন্তু, তত্দিনে তাঁর বয়স হয়েছে বিরাশি, শরীর ভেঙ্গে গেছে, দিন কয়েকের মধ্যেই তিনি পথের ধারে এক রেল স্টেশনে অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বেঁচে থাকলে আবার তাঁকে তাঁর ঘরসংসারেই ফিরে যেতে হতো। সেটি হতো তাঁর পক্ষে পরাজয় যদি না তাঁর সহধর্মিণীর ঘটত একপ্রকার অন্তঃপরিবর্তন। যদি না সমস্ত গৃহস্থালীটাই বনে যেত ঋষি ও ঋষিপত্নী তথা ঋষিসন্ততিদের আশ্রম। একটি কি দুটি কন্যা ভিন্ন আর কোনো পুত্রকন্যার উপরে তাঁর জীবনদর্শনের উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়েনি। তাঁরা তাঁদের দেশের ও তাঁদের যুগের আর দশজন উচ্চ বংশীয়দের মতো। তাঁদের তিনি মানতে পারেন নি যে স্বেচ্ছায় ধনসম্পদ ও অলস জীবনধারা ত্যাগ না করলে বিপ্লবের দিন বাধ্য হয়েই সর্বস্ব হারাতে হবে। তখন বিদেশে গিয়ে পিতৃর গচ্ছিতধনের দৌলতেই ভদ্রতা রক্ষা করতে হবে।

ঋষি যেখানে নিজের ঘরের লোককেই সঙ্গে নিতে পারলেন না সেখানে সারা দেশের লোককেই বা সঙ্গে নিতে পারবেন কেমন করে? সে কাজের ভার পড়লো লেনিনের উপরে, ভার দিল ইতিহাস। লেনিনের নিঃস্বার্থ জীবন সাধারণের মতো জীবনযাত্রা। কিন্তু জনগণকে সঙ্গে নেবার জন্যে কি পরিমাণ রক্তপাত করতে হলো তাঁকে? পরে তাঁর পট্টশিষ্য স্টালিনকে। রক্তের স্রোতে ভেসে গেল সমর ও শান্তি তথা আনা কারেনিনা তথা রেসারেকশনের বুদ্ধিদীপ্ত বলদৃপ্ত ধনসম্পদশালী অভিজাত ও উচ্চচিত্ত শ্রেণী। কিন্তু তাতে তাদেরই বা লাভ কী হলো যাদের মধ্যে টলস্টয় ভাগ করে দিতে চেয়েছিলেন ছোট ছোট জোত। যেখানে যারা শোষণও করবে না, শোষিতও হবে না; স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে চাষ করবে, যা ফলাবে তা খাবে, যা খাবে তা ফলাবে। শিল্পের মতো কৃষিও চলে গেছে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের কর্তৃরি ইচ্ছায় কর্ম। ক্ষেত খামার করবে নিজের নয়। রাষ্ট্রের কিংবা সমষ্টির। টলস্টয় দেখলে কষ্ট পেতেন। কিছুতেই তাঁকে বোঝানো যেত না যে

স্ত্রী সোফিয়া আন্দ্রেয়েভার সঙ্গে

১৯০০ খৃঃ প্রিমিয়ার টলস্টয় আর বেখফ

এরই নাম সামাজিক ন্যায়। পশ্চিমের লোক যাকে গণতন্ত্র বলে তাতে তো তিনি বিশ্বাসই করতেন না। সুতরাং সে জিনিস গড়ে ওঠেনি দেখে তিনি কাকেই বা দোষ দিতেন? এক ডিক্টেটরশিপের বদলে আরেক ডিক্টেটরশিপ। অভিজাতদের না হয়ে শ্রমিকদের। সমাজের এক মেরুর না হয়ে অপর মেরুর। টলস্টয় প্রচারিত অহিংসার নামগন্ধ নেই। সত্যেরও আছে কিনা সন্দেহ। কাউকে তো কিছু খুলে লিখতেই বা বলতেই দেওয়া হয় না। কড়া সেনসরশিপ।

টলস্টয়ের অহিংস মতবাদ কেবল যে যুদ্ধবিরোধী ছিল তাই নয়, বিপ্লব-বিরোধীও ছিল। বিপ্লবও যে অহিংস হতে পারে এ বিশ্বাস তাঁর কিংবা কারো ছিল না। রাশিয়তে কেবল যে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলেছিল তা নয় বিপ্লবের প্রস্তুতিও চলেছিল। যেন একটা অনাটার উল্টো পিঠ। যুদ্ধবাজরা টলস্টয়কে মনে করতেন দেশের শত্রু। আর বিপ্লববাদীরা মনে করতেন শ্রেণীর শত্রু। খৃস্টীয় ধর্মসঙ্ঘও তাঁর বাইবেলের ভাষ্যকে ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ মনে করে তাঁকে সমাজচ্যুত করেছিল। জনগণ যদি তাঁরই ভাষ্য মেনে নেয় তবে প্রচলিত ধর্মের আমূল সংশোধন করতে হয়। কেবল ধর্মের বেলা নয় জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগের বেলা টলস্টয়ের চিন্তা ছিল আমূল সংশোধন বা সংস্কারের পক্ষে। কিন্তু ন্যূনতম পরিবর্তনকেও রাষ্ট্রের বা চার্চের বা ধনতন্ত্রের বা সামন্ততন্ত্রের কর্তারা বিপ্লব বলে পরিহার করতেন। বিপ্লব যখন এল তখন রাষ্ট্রকেও নিঃক্রিয় করল। চার্চকেও নির্বাক্ষণ বা নিঃসন্ন্যাসী করল। সমাজকেও নিরৈশ্য করল। শূদ্র হলো নিষ্কণ্টক। কিন্তু অস্ত্র হাতে নিয়ে সেও গড়ে তুলল রেড আর্মি। তার জয়লাভ মানে হিংসার জয়লাভ।

রাজাপ্রজা সকলেই স্বীকার করতেন যে টলস্টয়ই তাঁর দেশের পয়লা নাগরিক। ইউরোপবাসীরাও বলতেন তিনি ইউরোপের বিবেক। ওদিকে দক্ষিণ আফ্রিকায় কর্মরত গান্ধীও তাঁকে কর্মগুরু পদে বরণ করেছিলেন। একলব্যের যেমন অর্জুন। টলস্টয়ের মহাপ্রয়াণে কে না ব্যথিত হয়েছিলেন? প্রথম মহাযুদ্ধ যখন বাধে তখন টমাস মান বলেছিলেন টলস্টয় বেঁচে থাকলে কি তিনি এ যুদ্ধ বাধতে দিতেন? সমস্ত শক্তি দিয়ে রোধ করতেন। টলস্টয়ের সম্মান কেবল সাহিত্যিক হিসাবে নয়। মানবহিতৈষী হিসাবেও তিনি অগ্রগণ্য। তাঁর সাহিত্যিক কীর্তি এখনো অক্ষয়তীর্ষ। তবে পরবর্তীকালের বিচারে ডস্টয়েভস্কির উচ্চতা বাড়লে বাড়তে তাঁর সমান হয়েছে। আর মানবনিয়তি সম্বন্ধে তাঁর যে ভাবনা তার কর্মময় অভিব্যক্তি প্রধানত গান্ধীজীর জীবনেই। তিনিও স্বাধীন ভারতে কার্যত পরিত্যক্ত।

টলস্টয়ের মহাপ্রয়াণে কারো চেয়ে কম অভিভূত হন না ভিন্ন শ্রেণীর ও ভিন্ন মার্গের সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গর্কি। গর্কির

লেখার কাজে

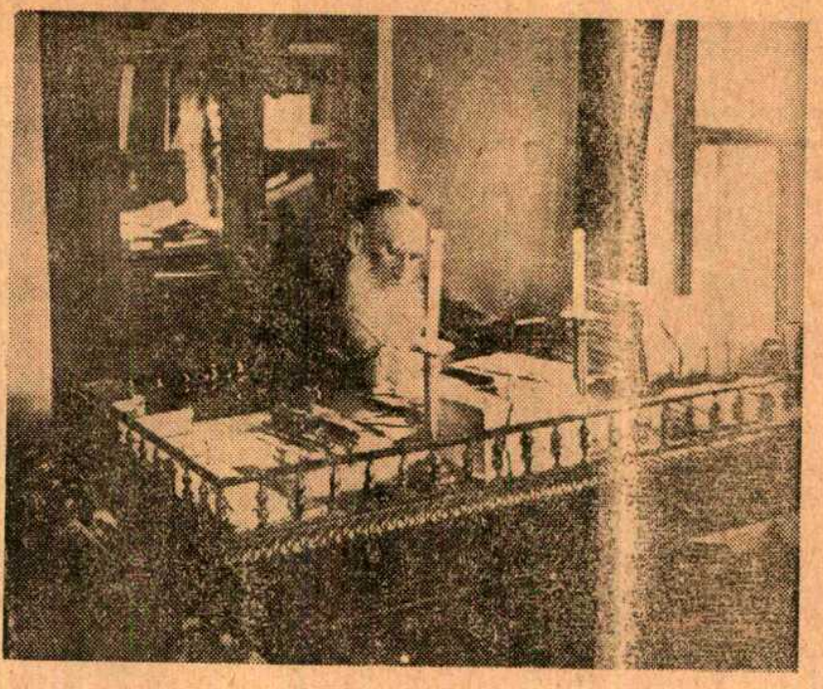

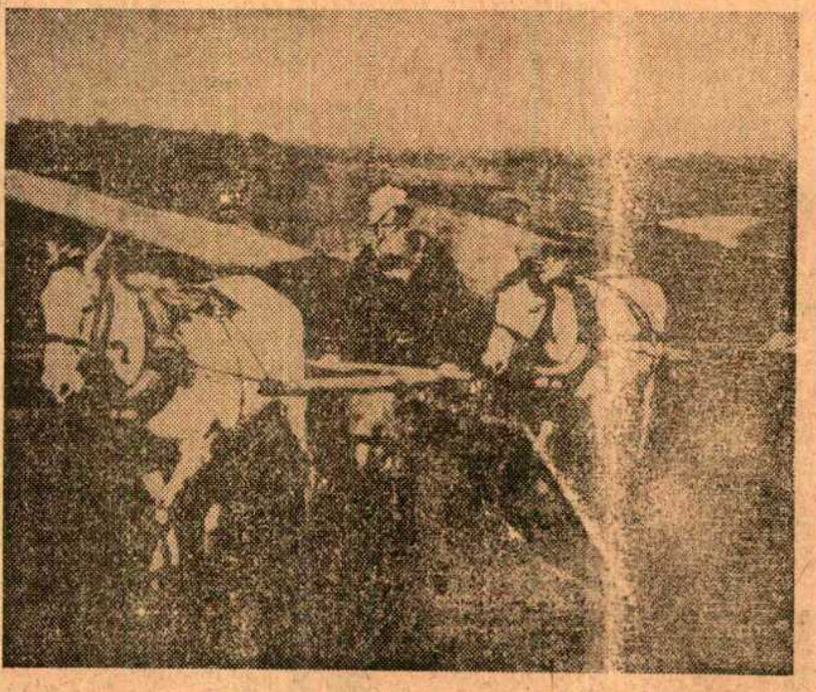

কৃষি কাজে

টলস্টয়স্মৃতি আরো অনেকের মতো আমাকেও অভিভূত করে। আমার তো মনে হয় না যে গর্কি টলস্টয়ের প্রতি সজ্ঞানে বা অজ্ঞাতসারে কোনোরূপ অবিচার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁর সেই প্রবন্ধ পড়ে ক্ষুণ্ণ হন। বলেন, 'ম্যাক্সিম গোর্কি টলস্টয়ের একটি জীবনচরিত লিখেছেন। বর্তমানকালের প্রগরবুদ্ধি পাঠকেরা বাহবা দিবে বটে। অর্থাৎ টলস্টয় দোষগুণে যেমনটি সেই ছবিকে তীক্ষ্ণরেখায় তেমনটি আঁকা হয়েছে, এর মধ্যে দয়ামায়া ভক্তিশ্রদ্ধার কোনো কুয়াশা নেই। পড়লে মনে হয়, টলস্টয় যে সর্বসাধারণের চেয়ে বিশেষ কিছু বড়ো তা নয়, এমনকি অনেক বিষয়ে হেয়।.... টলস্টয়ের কিছুই মনে ছিল না, একথা বলাই চলে না, খুঁটিনাটি বিচার করলে তিনি যে নানা বিষয়ে সাধারণ মানুষের মতোই এবং অনেক বিষয়ে তাদের চেয়েও দুর্বল, একথা স্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু যে সত্যের গুণে টলস্টয় বহুলোকের ও বহুকালের, তাঁর ক্ষণিকমূর্তি যদি সেই সত্যকে আমাদের কাছ থেকে আচ্ছন্ন করে থাকে তাহলে এই আর্টিস্টের আশ্চর্য ছবি নিয়ে আমার লাভ

হবে কী। ক্ষণকালের মাথার দ্বারা চিরকালের স্বরূপকে প্রচ্ছন্ন করে দেওয়াই আর্টিস্টের দেখা, একথা মানতে পারিনে। তাছাড়া, গোর্কির আর্টিস্ট-চিত্ত তো বৈজ্ঞানিক হিসাবে নির্বিকার নয়, তাঁর চিত্তে টলস্টয়ের যে ছায়া পড়ছে সেটা একটা ছবি হতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক হিসাবেও সেটা যে সত্য তা কেমন করে বলব? গোর্কির টলস্টয়ই কি টলস্টয়? বহুকালের ও বহুলোকের চিত্তে যদি গোর্কি নিজের চিত্তের মধ্যে সংহত করতে পারতেন তা হলেই তাঁর দ্বারা বহুকালের ও বহুলোকের টলস্টয়ের ছবি আঁকা সম্ভবপর হত। তার মধ্যে অনেক ভোলবার সামগ্রী ভুলে যাওয়া হত; আর, তবেই না যা না ভোলবার তা তা বড়ো হবে সম্পূর্ণ হয়ে দেখা হত।' (পশ্চিমযাত্রীর ডায়েরী)

রবীন্দ্রনাথের লেখায় টলস্টয় প্রসঙ্গ ওর বেশী যা আছে তা কোথাও এক লাইন, কোথাও দুলাইন। একটি প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি টলস্টয়কে ইউরোপের বিবেক বলে অভিহিত করেছেন। ইন্দিরা দেবীকে একখানি চিঠিতে লিখেছেন, 'আনা কারেনিনা পড়তে গেলুম, এমনি বিশ্রী লাগল যে পড়তে পারলুম না—এরকম সব সিক্‌লি বই পড়ে কী সুখ বুঝতে পারিনে। আমি চাই বেশ সরল সুন্দর মধুর উদার লেখা—কুটকচালে অদ্ভুত গোলমেলে কাণ্ড আমার বেশিক্ষণ পোষায় না।'

গোর্কি নিশ্চয়ই এর চেয়ে কঠোর কিছু বলেননি। আমার মনে হয় গোর্কির জীবন-স্মৃতিকে টলস্টয়ের জীবনচরিত বলে প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথের ওই ধারণা সাক্ষাৎকারের সময় গোর্কি যা শুনেছেন ও যা দেখেছেন তাই লিখেছেন, কিছুই বানাননি। রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি। এবার গর্কির লেখা থেকে দিই। ইংরেজীতে।

"Leo Tolstoy is dead..The news hit my heart. I groaned from anguish and resentment and now, in a kind of half-madness, I imagine him the way I knew him and the way he used to look, and am racked by the desire to talk about him..I recall his piercing eyes-they saw through everything—and his fingers, which seemed perpetually to be modelling something in the air, his talk, his jokes, his favourite muzhik words and his indefinable voice. I see how much life he had embraced and how superhumanly clever he was, and awesome.

..Words are powerless to convey what I fel then, felt both delighted and fearsome and it all merged in one happy though I'm not an orphan on this earth as long as this man is alive.'.. And now I feel an orphan, and I cry as I am writing. I have never wept so disconsolately and so bitterly. I don't know whether I loved him—and what does it matter whether I loved him or hated him? The sensations and emotions he aroused in me were always immense and fantastic; even the things around him that I found unpleasant and inimical somehow did not oppress me but exploded by soul, as it were, to enlarge it and make it more sensitive."

এ লেখা একজন ভক্তের লেখা, কিন্তু অন্ধ ভক্তের নয়। ভক্তির সঙ্গে সূক্ষ্ম যুক্তি। যা দিয়ে তিনি টলস্টয়ের ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণ করেছিলেন। সোনার সঙ্গে খাদ থাকলে যা হয় টলস্টয়ের ব্যক্তিত্বেও ছিল তাই। নয়তো তিনি একজন সাধুসন্ত হতেন, একজন মুনিঋষি বা প্রোফেট। তেমন মানুষের হাতে 'সমর ও শান্তি' বা 'আনা কারেনিনা' হতো না। রবীন্দ্রনাথ যাই মানে করুন। কোন্ ধাতুতে তিনি তৈরি জানতে হলে গর্কির সাক্ষ্য আমাদের সাহায্য করে। আবার তুলে দিচ্ছি। ইংরেজী থেকে। পথের হঠাৎ দেখা দুই তীর্থযাত্রী ও যাত্রিণীর বীভৎস মিলনের বর্ণনা দিয়ে টলস্টয় বলেছেন,

"You see what sometimes happens. Nature—which the Bogomils believe to have been created by the devil—torements man in a particularly cruel and mocking way: it takes away the strength but leaves the desire. This is the lot of all living souls. Only man is exposed to the shame and horror of the torment which is part of his flesh. We carry it within ourselves as an inevitable punishment, but for what sin of ours?' As he spoke his eyes were changing strangely — they were now plaintive like a child's, and now shining dryly and severely. His lips twitched and his moustache rustled. When he finished his story he took a handkerchief out of his blouse pocket and wiped his face hard, although it was dry. Then he spread

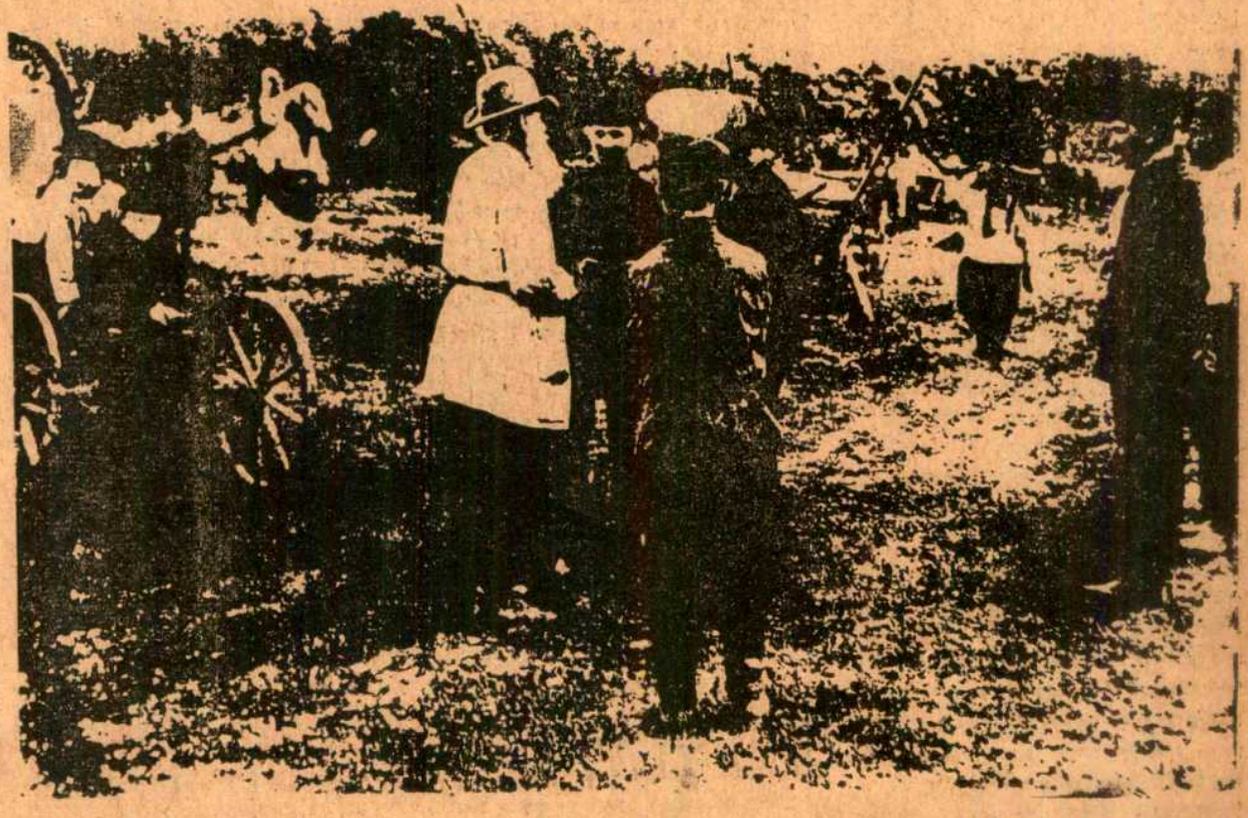

গ্রামের খেলার মাঠের সঙ্গে

টলস্টয় প্রসঙ্গে ম্যাক্সিম গোর্কি

টলস্টয়ের সঙ্গে গোর্কি

টলস্টয় তখন থাকতেন গাসপ্রায়, মাকসিম গোর্কি ওলেইজ-এ। টুকরো-টাকরা কাগজে অনাদরে কিছু মন্তব্য লিখে রেখে-ছিলেন গোর্কি। টলস্টয়ের সাথে ঘনিষ্ঠ-তার ফলশ্রুতি এ'সব। ইয়াসনায়া পলইয়ানা ত্যাগ এবং তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে একটি অসমাপ্ত দীর্ঘ চিঠিও লেখেন গোর্কি। নিম্নে সংকলিত মন্তব্যসমূহ এসবেরই সুনির্বাচিত অংশ। টলস্টয়ের প্রায় শেষ জীবনের মান-সিকতা, জীবনযাপন আলাপচারিতা তারই সম-সময়ের আরেক উল্লেখযোগ্য লেখকের মানসিকতায় কীভাবে ধরা পড়েছে, এই নির্বা-চিত অংশ তার সাক্ষ্য দেবে। আর জানাবে, আপাত অমিল থাকা সত্ত্বেও গোর্কি কী অপরিসীম শ্রদ্ধা এবং স্বীকৃতি জানাতে পেরেছেন লিখিতভাবে নির্দ্বিধায়। বিনয়ের সঙ্গে জানাই, নির্বাচন এবং সংকলনে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা এই অনুবাদক নিতে বাধ্য হয়েছেন নিরুপায় হয়ে।

তাঁর হাতদুটি অপূর্ব—কুঞ্চিত, শিরাফোলা, বিকৃত কিন্তু নিশিষ্ট, সৃজন-শীল। বোধহয় লিওনার্দো দা-ভিঞ্চির এরকম হাত ছিল। যে-কোনো কিছু এই হাত দিয়ে করা যায়। মাঝে মাঝে যখন কথা বলেন, আঙুলগুলোকে ভাঁজ করেন—খোলেন এবং যখন বিস্ময়কর চিন্তাশীল কথা বলেন, উন্মুক্ত হাত সামনে মেলে ধরেন। তিনি ঈশ্বরের মতো, কোনো বিশ্রামদিন বা অলিম্প-াসের দেবতা নন, কোনো বুশ-দেবতার মতো যিনি সোনালী জাম্বুরী গাছের নীচে মেপল-কাঠের সিংহাসনে বসে আছেন, বা হয়তো তিনি তেমন মহানই নন ,কেননা যে-কোনো ঈশ্বরের চেয়ে তিনি ধূর্ত এবং লোভী।]

'সংখ্যালঘিষ্ঠরা ঈশ্বরের প্রয়োজন অনু-ভব করে কেননা তাদের আর সবই আছে, আর সংখ্যাগরিষ্ঠরা, যেহেতু তাদের কিছুই নেই।'

অথবা আমি বলতে পারি : সংখ্যা-গরিষ্ঠরা ভীরুতা থেকে ঈশ্বর-বিশ্বাসী হয় এবং মাত্র কয়েকজন তাদের আত্মার পরি-পূর্ণতা থেকে। (ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে আমার বলা উচিত ধর্মীয় রচনাকে আমি শুদ্ধ সাহিত্য হিসেবে সম্মান করি : বুদ্ধ, খৃস্ট, মোহম্মদের জীবনকে মনে করি কল্পনাশ্রিত কাহিনী।)

তিনি চিন্তান্বিত জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি হ্যান্স এন্ডারসনের রূপকথা পছন্দ করেন? মার্কো ভচ্চচের অনুবাদে যখন তা প্রকাশিত হল আমি বুঝতে পারি নি, কিন্তু দশ বছর বাদে আমি সংগ্রহ করলাম এবং আবার পড়লাম এবং হঠাৎ আমি স্পষ্টতই অনুভব করলাম যে হ্যান্স এণ্ডারসন একজন নিঃসঙ্গ মানুষ ছিলেন। ভীষন নিঃসঙ্গ। আমি তাঁর জীবন কিছুই জানি না। আমার বিশ্বাস, তিনি নিশ্চিত দুশ্চরিত্র এবং ভবঘুরে ছিলেন এবং এটাই আমার বিশ্বাসকে দৃঢ় করল যে তিনি এক-জন নিঃসঙ্গ মানুষ। সেই জন্যই তিনি শিশুদের প্রতি মনোযোগী হলেন এই বিশ্বাসে (কিন্তু এটাই ভুল) যে, বয়স্ক-দের তুলনায় শিশুদের অন্যের প্রতি অনু-কম্পা বেশি। শিশুরা কাউকে করুণা করে না, তারা করুণা কাকে বলে জানে না।

তিনি আমাকে বৌদ্ধ-দর্শন পড়তে উপদেশ দিতেন। খৃস্ট এবং বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে কথা বলার সময়ে তিনি কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে যান—কোন উৎসাহ অথবা দুঃখ তাঁর কথায় থাকে না, অথবা হৃদয়-বহির বিচ্ছিন্ন বিচ্ছুরণ। আমার মনে হয়, তিনি খৃস্টকে সরল, করুণার যোগ্য মনে করেন এবং যদিও কোন-না-কোন ব্যাপারে তাঁর প্রশংসা করে থাকেন, কিন্তু ভাল-বাসেন কিনা সন্দেহ। এবং মনে হয়, তিনি ভীত হয়ে পড়েন, যদি খৃস্ট কোন রাশিয়ার গ্রামে আসতেন তাহলে মেয়েরা তাঁকে দেখে পরিহাস করত।

*

তাঁর অসুস্থতা তাঁকে কঠিন করে দিচ্ছিল, তাঁর ভেতরের কিছু পুড়িয়ে দিচ্ছিল এবং তিনি ক্রমশই ভাবহীন, স্বচ্ছ, অন্তর্লীন জীবন-সহিষ্ণু হয়ে উঠছিলেন। তাঁর চোখ ক্রমশ তীক্ষ্ণ, তাঁর দৃষ্টি অন্তর্ভেদী হচ্ছিল। তিনি মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং বহুদিন আগে বিস্মৃত-প্রায় কোন কিছু যেন স্মরণ করে থাকেন অথবা আজও যা অজ্ঞাতে সেই কোন নতুনের জন্য আস্থা নিয়ে অপেক্ষা করেন। ইয়াস-নায়া পলিয়ানাতে তিনি আমার কাছে সেই রকম কোন মানুষরূপে প্রতিভাত হয়ে-ছিলেন যিনি যা-কিছু জানার সব জেনেছেন, সব প্রশ্নেরই উত্তর পেয়ে গেছেন।

*

তিনি যদি মাছ হতেন, তাঁর গৃহ অবশ্যই হত সমুদ্র, খাঁড়ি-সমুদ্রে সাঁতার তিনি কাটতেন না, এমন কি নদীতেও নয়। রুপোলী মাছ ঘোরে-ফেরে; তিনি যা বলেন তা তাঁকে আগ্রহী করে না, তাঁর প্রয়োজনও নেই, তাঁর নীরবতা তাঁকে ভীত করে না অথবা কোন অর্থে প্রভাবিতও করে না। এবং তিনি জানেন, প্রকৃত ঋষির মত কেমন যথাযথ নীরব হতে হয়। সত্যিই যে

জন্য তুমি শেষপর্যন্ত লড়াই করবে।' সর্বোপরি তিনি একজন ভাবপ্রবন, অতিভাষী লেখক, খুব মহান নন। কিন্তু উপন্যাসের কাঠামো নির্মাণ করতে তিনি পারতেন, যা অনেকের পক্ষেই কষ্টকর, অবশ্যই বালজাকের তুলনায় অনেক ভালো ভাবে। কেউ কেউ বলেন : 'অনেকেই বই লেখার আবেগে অভিভূত হন, কিন্তু খুব অল্পজনই তার জন্য লক্ষিত থাকেন।' বালজাক ছিলেন না, এমনকি ডিকেন্সও নন এবং তাঁরা উভয়েই প্রচুর লিখেছেন যা নিকৃষ্ট। তথাপি বালজাক প্রতিভাবান, আমি বোঝাতে চাই তিনি এমনই যাঁকে একমাত্র প্রতিভাবান বলা যেতে পারে...'

*

'আমি মাতাল হতে পছন্দ করি না, কিন্তু জানি যারা এক অথবা দু গ্লাস পান করতে উৎসুক, তারা পানাদির পর একধরনের বাসিকতা, ভাবনার মহার্ঘতা, চাতুর্য এবং বাগ্মিতা অর্জন করে যা তাদের ভদ্রাবস্থায় থাকে না। আমি তখনই মদকে আশীর্বাদ করতে পারি।'

*

'দি লোবার ডেপথ্‌স'-এর কয়েকটি দৃশ্য আমি তাকে পড়ে শুনিয়েছিলাম। মনোযোগ দিয়ে তিনি শুনলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন—

'এটা লিখতে কী আপনাকে প্রেরণা যোগাল ?'

যতটা পারলাম, বিস্তারিত বললাম।

'আপনি মুরগীর বাচ্চার মতো কোনো একটা বিষয়ের পিছু ধাওয়া করেন। এবং আর একটা ব্যাপার—আপনি নিজের মনের কত্ত সব ভাঙাচোরা অসঙ্গতিকে মসৃণ করে দিতে চান। হ্যান্স এণ্ডারসন তাঁর একটা গল্পে বলেছিলেন, 'গিলটি উঠে যায় কিন্তু চামড়া থেকে যায়।' আমাদের কৃষকরা বলে, 'সবকিছু চলে যায়, সত্যই টিঁকে থাকে।' স্থূলভাবে বড় মাথাবেন না, ভবিষ্যতে এটা আপনার পক্ষে ক্ষতিকারক হবে। তাছাড়া আপনার ভাষাও খুব বেগবান, প্রাণবন্ত, কায়দায় ভর্তি—এটা করবেন না। আপনি অবশ্যই খুব সহজভাবে লিখবেন, কারণ মানুষ খুব সহজভাবে কথা বলে। প্রথম প্রথম কিছু অবান্তর বললেও, খুব সরলভাবেই তারা নিজেদের প্রকাশ করতে পারে। কৃষকরা কখনোই কোনো বিদুষী মহিলার মতো জিজ্ঞেস করবে না, 'এটা কেমন করে হয় যে, তিন চারের থেকে বড়ো যখন চার তিনের থেকে বড়ো ?' চতুর লেখনীর কোনো প্রয়োজন নেই।'

মূলতই তিনি অখুশী হয়েছিলেন, যা পড়েছি তা তাঁর পছন্দ হয়নি। ক্ষনিক বিরতির পর তিনি আমার দিকে সোজাসুজি না তাকিয়ে কর্কশ কণ্ঠে বললেন, 'আপনার বৃদ্ধ মানুষটি স্নেহহীন, তার ভালোতেও কেউ বিশ্বাস করবে না। অভিনেতাটি যথেষ্ট ভালো। আপনি কি 'দি ফ্যুটস্‌ অব এনটাইটেনমেন্ট' পড়েছেন। ওখানে একজন পাচক আছে আপনার অভিনেতার মতো। নাটক লেখা ভীষণ কঠিন। আপনার বেশ্যা ভাল, অবশ্য এরকম অনেকে আছে। আপনি এধরনের কাউকে দেখেছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'দেখতে পারেন। সত্যকে সবসময় অনুভব করতে হয়। লেখক হিসেবে আপনি বড্ড বেশি বলেন, আপনার চরিত্ররা আদপেই বাস্তব নয়, প্রায় সবাই একরকম। বোধ করি, আপনি মহিলাদের ঠিকমতো বোঝেন না, আপনার প্রতিটি নারীচরিত্র চিত্রণ ব্যর্থ—প্রত্যেকে। কেউ তাদের মনে রাখবে না।'

*

'আমরা কী বোঝাতে চাই যখন আমরা বলি 'আমরা জানি' ? আমি জানি, আমি তলস্তয়, একজন লেখক, স্ত্রী আছে, কয়েকটি সন্তান, ধূসর চুল, কুঞ্চিত মুখ, দাড়ি—সবই আমার পাশপোর্টে আছে। কিন্তু এরা কেউই পাশপোর্টের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। যা আমি আমার আত্মা সম্পর্কে জানি তা ক্রমশই হামাগুড়ি দিয়ে ঈশ্বরের কাছে যাচ্ছে। কিন্তু ঈশ্বর কি ? তিনি তাই যেখানে আমার আত্মা একটি বস্তু মাত্র। এইই যথেষ্ট। যারা চিন্তা করতে শিখেছে তারা বিশ্বাস করতে ভুলে গেছে, কিন্তু যে-কেউ ঈশ্বর-চিন্তায় বেঁচে থাকতে পারে যদি তার বিশ্বাস থাকে। টের্টুলিয়ান বলেছিলেন, 'জ্ঞান শত্রু'।'

*

আমি তলস্তয়কে ঋষি বলে যেতে দেখতে চাই না। তিনি পাপী থাকুন। পাপপূর্ণ পৃথিবীর হৃদয়ের কাছটিতে, সবার হৃদয়ের খুব নিকটে তিনি থাকুন। পুশকিন এবং তিনি—এঁদের চেয়ে মহত্তম এবং প্রিয়তম আমাদের কাছে কেউ নয়।

*

চিঠিতে লিখলেন :

'তাঁরা প্রভৃত হৈ-চৈ করেন, তাঁরা লেখেন এবং যখন আমি মারা যাব, বহুবছর খানেক বাদে তাঁরা বলবেন : তলস্তয় ? সেই ভদ্রলোক জুতো তৈরী করতে গিয়েছিলেন না, অথবা অন্য কিছু, অথবা সেই সেই ঘটনা তাঁর ঘটেছিল না ?'

*

যথেষ্ট সুস্পষ্ট উন্নাসিকতায়, কর্কশ, রুক্ষভাবে তিনি দস্তয়েভস্কি সম্বন্ধে আলোচনা করতেন, যেন কিছু অতিক্রম করার চেষ্টা করছেন।

'কনফুসিয়াস অথবা বৌদ্ধতন্ত্র তাঁর পড়া উচিত ছিল, এসব তাঁকে হয়তো শান্ত করতো। এটা খুব মহান জিনিস, প্রত্যেকেরই জানা উচিত। চূড়ান্ত আবেগপ্রবন তিনি—যখন ক্রুদ্ধ হন, হঠাৎ ঝাঁকুনিকে তাঁর মাথার কাঁচা অংশ স্ফীত হতে থাকে, আর কান দুমড়ে মুচড়ে যায়। তিনি অনুভব করতেন বেশি, কিন্তু কি করে ভাবতে হয় তা জানতেন না, তিনি ফুরিয়েরিষ্ট, বাটাসেভিচ এবং ঐরকম কয়েকজনের কাছ থেকে চিন্তা করতে শিখে-

ডঃ দীপক দের

বঙ্কিম মূল্যায়ন ১০-০০

(পি এইচ ডি, থিসিস)

সাম্যবাদ (উপন্যাস) ৬-০০

নকশাল বিদ্রোহ, ইন্দিরা শাসন, ফ্রন্ট

মাষ্টার মশায় ৫-৫০

(শিক্ষক জীবন নিয়ে উপন্যাস)

অবাঞ্ছিত (উপন্যাস) ৪-০০

(পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের আগমন)

কলকাতা দেখেছি ৪-০০

উদারপন্থী (উপন্যাস) ৫-০০

প্রেমিক প্রেমিকাদের বৈঠকে ৪

দে বুক স্টোর : ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট

ছিলেন। এবং তারপর সারা জীবন তিনি তাঁদের ঘৃণা করেছেন। কিন্তু ইহুদিতত্ত্ব তাঁর রক্তে ছিল। তিনি ছিলেন অবিশ্বাসী হার্ধ, বদমেজাজী এবং দুর্দশাগ্রস্ত। এটা খুবই হাস্যকর যে, অনেকেই তাঁর লেখা পড়ে—আমি বুঝতে পারি না কেন। সর্বোপরি ঐ সমস্ত ইডিয়টস হবলেডেহরস, রাসকলনিকভস এবং বাকি সব দুর্বোধ্য এবং ব্যর্থ। যেমন লেসকভ—কেন মানুষ তাকে পড়ে না? তিনি একজন যথার্থ লেখক—আপনি কি পড়েছেন?'

'হ্যাঁ। আমি ওঁকে ভালবাসি, বিশেষত ওঁর ভাষা।'

'ভাষা চমৎকার জানতেন তিনি, তা দিয়ে অনেককিছু করতে পারতেন। খুবই হাস্যকর—আপনার ওঁকে পছন্দ, আপনার মধ্যে কিছুটা অ-রুশীয় ব্যাপার রয়েছে আপনার চিন্তা-ভাবনা আপনার ওঁকে ঠিক রুশীয় চিন্তা-ভাবনা নয়।— এইসব বলার জন্য আপনি কিছু ভাববেন না, আপনি আহত হলেন না তো? আমি একজন বৃদ্ধ লোক এবং বোধহয় আধুনিক সাহিত্য বুঝতে আমি আর সক্ষম নই, কিন্তু সর্বদাই মনে হয়, এটা বেশ কিছু অ-রুশীয়। লোকজন একধরণের অদ্ভুত কবিতা লিখছেন—জানি না এসব কবিতা কিসের জন্য এঁরাই বা কাদের জন্য? আমরা অবশ্যই পুশকিন, টাউটশেভ, শেনশিকের কাছ থেকে কবিতা লেখা শিখব। আপনি—' চেখভের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি রুশীয়। হ্যাঁ, আপনি ভীষনভাবে রুশীয়।'

এবং স্নেহমিশ্রিত হাসিতে চেখভের ঘাড় জড়িয়ে তাঁর হাত রাখলেন, চেখভের যথেষ্ট অস্বস্তি সত্ত্বেও, যিনি খুব নীচু পর্দায় তাঁর বাড়ি এবং তাতার সম্পর্কে কথা বলা শুরু করলেন।

চেখভকে ভালবাসতেন তিনি, এবং যখনই তাঁর দিকে তাকাতেন মুহূর্তের মধ্যে তাঁর দৃষ্টি মমতায় ভরে উঠতো যেন চেখভের মুখমন্ডল তিনি যত্নে পরিপাটী করে দিচ্ছেন। একদিন পার্কের একটা পথ ধরে চেখভ হেঁটে বেড়াচ্ছেন, সঙ্গে আলেকসন্দ্রা লেভোভনা (তলস্তয়ের কন্যা), এবং তলস্তয় সেই সময় অসুস্থ—বারান্দায় একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে আছেন, যেন শারীরিক সমস্ত সত্তা নিয়ে চেখভের কাছে হেঁটে যেতে উৎসাহী ফিসফিসিয়ে বললেন—

'কী সুন্দর মুগ্ধকারী পুরুষ। ভদ্র, শান্ত, ঠিক একজন যুবতীর মতো। এমনকি তিনি হাঁটেন মহিলার মতো। সত্যিকারের একজন আশ্চর্য মানুষ।'

*

সুলোর, চেখভ, সাজেই এলদ্যোভিন্স এবং আরো কেউ পার্কে বসে মহিলা সম্পর্কিত আলোচনা করছিলেন; অনেকক্ষণ নীরবে তিনি শুনলেন এবং হঠাৎ বলে উঠলেন: 'মহিলা সম্পর্কে চূড়ান্ত সত্যি কথা আমি বলবো যখন এক পা আমার থাকবে কবরে। তারপর লাফ দিয়ে ঢুকে যাবো কফিনে, বন্ধ করে দেবো ডালা—তখন চেষ্টা করে দেখো আমায়!' এবং তাঁর চোখ এক দুষ্টতায় ও রোমহর্ষকভাবে দীপ্ত হয়ে উঠলো যে বেশ কিছু মুহূর্তের জন্য কেউ কোনো কথা বললো না।

খুব আকর্ষণীয় বুদ্ধিমান, সহানুভূতিশীল এবং ভদ্র তিনি, যদি তাঁর পছন্দ হয়, এবং তখন তাঁর কথাবার্তা উচ্ছ্বসিত সারল্য এবং গাম্ভীর্যে ভরপুর, কিন্তু কখনো-সখনো তাঁর কথাবার্তায় কান দেওয়া পুরোপুরি অসহ্য। যেভাবে তিনি মহিলাদের সম্পর্কে আলোচনা করেন, আমি কখনোই পছন্দ করি না—এ প্রসঙ্গে তিনি একেবারে সাধারণ মানুষের মতো কথা বলেন এবং কিছুটা অস্বাভাবিকতা তাঁর কথায় ধ্বনিত হয় কিছু নিষ্ঠাহীনতা এবং সঙ্গে সঙ্গে একান্ত ব্যক্তিগত। যেন কখনো কারুর কাছ থেকে তিনি আঘাত পেয়েছিলেন এবং কখনোই সেই ক্ষত ভুলতে বা ক্ষমা করতে পারছেন না। যে সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর পড়ার ঘরে—খামোভনিকিতে—আমাকে তাঁর সামনে বসালেন এবং 'ভেরেনকা ওলেসোভা' আর 'টুরেন্টি সিক্স মেন এন্ড এ গার্ল' সম্পর্কে আলোচনা শুরু করলেন। আমি তাঁর কথা বলার ভঙ্গীতে হতাশ হলাম, পুরোপুরি অপ্রতিভ, এবং রূঢ়-রুক্ষ ভাষায় তিনি আমাকে বোঝাতে সচেষ্ট হলেন যে, একজন স্বাস্থ্যবতী যুবতী মেয়ের কাছে লজ্জা মোটেই স্বাভাবিক নয়।

'যদি কোনো মেয়ে তার পনেরোতম জন্মদিন পেরিয়ে আসে এবং স্বাস্থ্যবতী হয়, সে চায় কেউ তাকে চুম্বন করুক, তাকে কাছে টেনে নিক। তার মন সেই দিক থেকে ভয়ে সংকুচিত হয়ে ফিরে আসে বা সে কিছুই জানে না বা বোঝে না এবং এটাকেই মানুষ বলে সতীত্ব বা লজ্জা। কিন্তু তার শরীর ইতিমধ্যে জেনে গেছে যা বোধাতীত তা অবশ্যম্ভাবী, আইনসিদ্ধ, এবং মনকে অস্বীকার করেও দাবী করে সেই নিয়মের পরিপূর্ণতায়। আপনার তেরেন্সা ওলেসোভাকে স্বাস্থ্যবতী বলা হয়েছে কিন্তু তার সমস্ত অনুভূতি বক্তব্যগুলো শ্রীরের মতো—এটা সম্পূর্ণ ভুল।' তিনি অতঃপর 'টুয়েন্টি সিক্স'-এর মেয়েটি সম্পর্কে বলতে শুরু করলেন, খুব সাধারণভাবে একের পর এক অশ্লীল মন্তব্যসহ যা আমার কাছে নির্মম এবং আমাকে পীড়িতও করেছিল। পরে আমি বুঝেছি, তিনি শুধু সেই সমস্ত 'নিষিদ্ধ' শব্দ ব্যবহার করেন এ কারণে যে, এগুলো যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত এবং নিশ্চিত কিন্তু সেই সময়ে তাঁর কথা বলার রীতি আমার অমনোনীত ছিল। আমি তাঁর প্রতিবাদ করিনি—তাছাড়া তিনি সদয় এবং সহানুভূতিশীল হলেন আমার জীবনে' আমার পড়াশুনা লেখালিখি প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন।

*

'আত্মার কাছে শরীরকে হওয়া উচিত একটা তালিম-নেওয়া কুকুরের মতো, আত্মা যেখানে পাঠাবে সেখানে সে যাবে। কিন্তু আমাদের দেখুন। শরীর দাসত্ব প্রিয় এবং অস্থির এবং চূড়ান্ত অসহায়তায় আত্মা তাকে অনুসরণ করছে।'

তিনি ঠিক তাঁর হৃদপিণ্ডের উপরের দিকে বুকে উত্তেজিতভাবে হাত ঘষলেন, চু-কুঞ্চিত করে চিন্তান্বিত বলে চললেন—

'সেটা শরৎকাল, মস্কোতে সুখারেভ স্কিনারের কাছে একবার আমি একজন মাতাল যুবতী দেখেছিলাম। সে সেখানে একটা নর্দমার মধ্যে পড়েছিল। নোংরা জলের স্রোত তার ঘাড় এবং পিঠের কাছে একটা নালীমুখ থেকে গলগলিয়ে বেরোচ্ছিল, এবং এবং সেখানে সে ঠান্ডা জলের মধ্যে শুয়ে, কাদার মধ্যে গোঙাচ্ছে এপাশ-ওপাশ করছে, পাক খাচ্ছে কিন্তু উঠতে পারছে না।'

তিনি কেঁপে উঠলেন, ক্ষণিকের জন্য চোখ বন্ধ করলেন, মাথা ঝাঁকিয়ে নীচু স্বরে বললেন—

'এখানে বসা যাক। একজন মদ্যপ মহিলার চেয়ে ভীতিকর, ক্লান্তিকর আর কিছু নেই। আমি কাছে গিয়ে তাকে উঠতে সাহায্য করবো চেয়েছিলাম কিন্তু পারিনি, আমি ছিটকে সরে এসেছি। তার সর্বাঙ্গ ভিজে এবং এঁটেল মাটির মতো, তাকে তোলার পর আপনি এক মাসের মধ্যে আপনার হাত পরিস্কার করতে পারবেন না —বীভৎস। আর কাছেই একটা পাথরের ওপরে একটি কটা চোখ, পিঙ্গল-চুলের বালক বসে, চোখের জল তার কপোল বেয়ে নামছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অসহায়ভাবে একঘেয়ে বলে যাচ্ছে—'মা-মা-আ-আ ওঠো ওঠো...।' কিছুক্ষণ বাদে বাদেই সেই মহিলাটি তার হাত দুটো নাড়াচাড়া করছে, নাক ঝাড়ছে, মাথা উঁচু করছে, আবার নোংরা কাদার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে।'

তিনি চুপ করে গেলেন, চারপাশ তাকালেন, প্রায় ফিসফিসিয়ে অস্বস্তিতে বললেন—'বীভৎস, বীভৎস। আপনি কি অনেক মদ্যপ মহিলা দেখেছেন? ও হ্যাঁ, আপনি দেখেছেন, ঈশ্বর। এসব নিয়ে লিখবেন না, অবশ্যই না।'

'কেন নয়?'

আমার চোখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন, পুনরাবৃত্তি করলেন—

'কেন নয়?'

তারপর খুব চিন্তান্বিত ধীরে ধীরে বললেন—

'আমি জানি না। শুধু এই মাত্র যে আমি—আমার কাছে এহেন পাশব আচরণ লেখা খুব লজ্জাজনক মনে হয়। কিন্তু তবুও— কেন নয়? একজন সব কিছু নিয়ে লিখবে, লেখা উচিত।'

তাঁর চোখে কান্না, মুছে নিলেন এবং অনেকক্ষণ মৃদু হাসলেন, রুমালের দিকে

তাকিয়ে রইলেন, কান্না তাঁর ভাঁজফেলা কপাল বেয়ে আবার নিঃশব্দে ঝরতে লাগলো। বললেন—'আমি কাঁদছি। আমি বৃদ্ধ, যখনই আমি ভয়ানক বা বীভৎস কিছু ভাবি, আমার হৃদয়ে তা আঘাত করতে থাকে।' তারপর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য হেসেই দিয়ে মৃদু ধাক্কা দিতে দিতে—

'আপনিও আপনার জীবনে বেঁচে থাকবেন, সব কিছু এখনো অপরিবর্তনীয় থাকবে এবং এখন আমি যে কাঁদছি, তার চেয়েও ভয়ানক আপনি কাঁদবেন, অনেক বেশি, যেমন কৃষক মহিলারা কেঁদে থাকে...। কিন্তু সব কিছুই লেখা উচিত সমস্ত না হলে সেই ছোট্ট সুন্দর পিঙ্গল কেশ বালকটি আঘাত পাবে, সে আপনাকে ভর্ৎসনা করবে—এটা সত্যি নয়, সে বলবে—সম্পূর্ণ সত্যি নয়।'

তিনি নিজেকে একটা সম্পূর্ণ ঝাঁকুনি দিলেন এবং খোশামোদের ভঙ্গীতে মিষ্টি কথায় বললেন—'আসুন, কিছু বলুন, আপনি খুব ভাল বলতে পারেন: একটি শিশু সম্পর্কে অথবা আপনার নিজের সম্পর্কে কিছু বলুন। আপনি এমন একজন অদ্ভুত মানুষ যে আপনিও যে কোনোকালে শিশু ছিলেন এটা বিশ্বাস করা কঠিন। মনে হয় আপনি বয়স্ক হয়েই জন্মেছেন। অনেক কিছু শিশুসুলভ নাবালকত্ব আপনার চিন্তা-ভাবনার আছে, তবু আপনি জীবন বিষয়ে অনেক জানেন—আর বেশি জানার প্রয়োজন আপনার নেই। আসুন আমাকে কিছু বলুন....'

*

'আপনি কখনো পড়েন না সুলোর এটা খুব অন্যায়, এটা আত্মাভিমান, আর গোর্কি অনেক পড়ে, এটাও ভুল, এটা তাঁর নিজের আস্থার অভাব। আমি প্রচুর লিখি, এটাও ঠিক নয় কেননা এটা আমি আমার বার্ধক্য-জনিত অহংকার থেকে করি, একটা ইচ্ছা থেকে যাতে সবাই আমার যে ধ্যান-ধারণা সেইমতো ভাবুক। অবশ্য আমার চিন্তা-ভাবনার রীতি আমার পক্ষে ঠিক, যদিও গোর্কি মনে করেন এটা তাঁর পক্ষে বেঠিক এবং আপনি কিছুই ভাবেন না, চোখ পিটপিট করে চারপাশ তাকিয়ে কিছু আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করেন। আপনি সেই সমস্ত জিনিস মুঠোয় ধরেন যা আপনার কোনো কাজেই লাগবে না—আপনি অনেক সময়ই এরকম করেছেন। আপনি শক্ত করে জড়িয়ে ধরেন এবং যা জড়াতে চাইছেন যখন তা ক্রমশ আপনার কাছ থেকে সরে যেতে থাকে, আপনি তাকে অবলীলায় ছেড়ে দেন। চেখভের একটি সুন্দর গল্প আছে—'দি ডার্লিং'—আপনি ঐ গল্পের মহিলাটির মতো।'

'কি রকম?' সুলোর হাসলেন।

'আপনি সর্বদাই ভালবাসতে প্রস্তুত, কিন্তু জানেন না কীভাবে নির্বাচন করতে হয়, এবং অতি তুচ্ছ বিষয়ে আপনি আপনার শক্তি নষ্ট করেন।'

'এরকম কি সবাই নয়?'

'সবাই?' প্রতিধ্বনি করলেন লেভ, 'না, না, সবাই নয়।'

এবং হঠাৎই আমাকে চাবুক চালানোর মতো প্রশ্ন করলেন—

'আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না কেন?'

'আমার কোনো আস্থা নেই, লেভ।'

'এটা সত্যি নয়। আপনি স্বভাবতঃ একজন বিশ্বাসী, ঈশ্বর ছাড়া আপনি চলতে পারবেন না। অতি শীঘ্রই এটা আপনি বুঝতে পারবেন। আপনি বিশ্বাস করেন না কারণ আপনি গোঁয়ার এবং বিরক্ত—আপনি যা চান পৃথিবী তা নিয়ে নয়, সেভাবে চলতেও পারে না। কিছু মানুষ লজ্জাবশতঃ অবিশ্বাসী। কোনো কোনো সময় অল্প বয়সী যুবকরা এই রকম। তারা কোনো নারীকে পূজা করে, কিন্তু তা প্রকাশ করার সাহস নেই, ভুল বোঝাবুঝির হাতে পড়ার ভয়ে তারা ভীত এবং সর্বোপরি তাদের কোনো সাহস নেই। বিশ্বাস, ভালবাসার মতো, সাহস বেপরোয়া ভাব দাবী করে। আপনি অবশ্যই আপনাকে বলবেন: 'আমি বিশ্বাস করি' এবং সব কিছুই তখন যথাযথ, আপনি যা চান সমস্ত সেই মতো আপনার সামনে হাজির হবে, সব কিছুই ব্যাখ্যাত হবে, আপনাকে আকর্ষণ করবে। আপনি যে ভালবাসেন তার মধ্যে যথেষ্ট কিছু আছে, দৃষ্টান্তস্বরূপ এবং ভালবাসার সহজ ঘনত্বরূপ হচ্ছে বিশ্বাস বা আস্থা, আপনি অবশ্যই আরো বেশি ভালবাসবেন এবং ভালবাসা বিশ্বাসে রূপান্তরিত হবে। সে-ই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহিলা যাকে পুরুষ ভালবাসে, এবং প্রত্যেকেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহিলাকে ভাল-বাসে, সেখানে আপনি—এটাই বিশ্বাস। একজন অবিশ্বাসী কখনো ভালবাসতে পারে না। সে একজনের সঙ্গে আর প্রেমে পড়ে এবং এক বছরের মধ্যে আরেকজনের। এইসব মানুষের হৃদয় ভরঘুরে অনুভব এবং এটা ঠিক নয়। জন্মগত বিশ্বাসী আপনি, নিজের স্বভাবের বিরুদ্ধাচারণের চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। আপনি সর্বদা বলেন—সৌন্দর্য। কিন্তু সৌন্দর্য কি? মহত্তম এবং বিশুদ্ধতম হচ্ছেন—ঈশ্বর।' তিনি এ' বিষয়ে আমার সঙ্গে ইতিপূর্বে খুব কম আলোচনাই করেছেন এবং বিষয়ের গুরুত্ব, এর আকস্মিকতা আমাকে বিচলিত, প্রায় স্পন্দিত করলো। আমি কিছু বললাম না। সোফাতে বসে, পা চলে গেছে ভেতরে, তাঁর শ্মশ্রুমন্ডিত মুখ থেকে যেন বিজয়ীর হাসি চুরি করার অনুমতি তিনি দিয়েছেন, আমার দিকে আঙুল উঁচিয়ে বললেন—

'শুধুমাত্র কিছু না' বলে আপনি এর থেকে মুক্তি পাবেন না, আপনি জেনে রাখুন।'

এবং আমি যে ঈশ্বর বিশ্বাস করি না, তাঁর দিকে সতর্ক ভীত চোখে এক দৃষ্টে তাকিয়ে মনে মনে বললাম—

'এই মানুষটিই ঈশ্বরপ্রতিম।'

অনুবাদ: **সমীর চট্টোপাধ্যায়**

লিও টলস্টয়

দুই বন্ধু

মানুষ স্বাধীনভাবে কোনটা ভাল মন্দ তা বিচার করতে পারে না, এটাই তোমাদের তর্কের বিষয়। সবটাই হল পরিবেশের ব্যাপার—আর মানুষ হল পরিবেশের দাস। কিন্তু আমার যুক্তি হল সবই ঘটনাচক্রের ব্যাপার। আর আমার নিজের বিষয়ে আমি এ কথাটাই বলতে পারি..। একটি আলোচনার শেষে আমাদের সম্মানিত বন্ধু আইভান ভাসিলিয়েভিচ বললেন কথাটা। আমাদের আলোচনাটা হচ্ছিল পরিবেশ কেমন করে বদলানো যায়, এই নিয়ে। মানুষ যে সব অবস্থার মধ্যে বেঁচে থাকে। ব্যক্তিকে কেমন করে উন্নতির পথে নিয়ে যাওয়া যায় সে সব কথা তখনও ওঠে নি। বস্তুত কেউই বলে নি যে, স্বাধীনভাবে ভাল-মন্দ বিচার করা অসম্ভব, কিন্তু আইনভান ভাসিলিয়েভিচের একটা অভ্যাস ছিল আলোচনায় উত্তেজিত হয়ে নিজেরই চিন্তা-ভাবনার উত্তর দেওয়া। আর এই সব চিন্তার থেকে মনে উদয় হত তার নিজের অভিজ্ঞতার কথা। তারই চর্বিতচর্বণ করত সে। এই সব গল্পে প্রায়ই সে এমন মশগুল হয়ে যেত যে সে এ গল্প বলার হেতুটাই যেত ভুলে। বিশেষত যেহেতু সে সব সময়েই বলত এমন একটা উৎসাহ আর নিষ্ঠা নিয়ে।

'অন্তত আমার ক্ষেত্রে আমি এটা দাবি করতে পারি। আমার নিজের জীবনটা ঠিক সেইভাবেই গড়ে উঠেছে—আর কোন-ভাবেই নয়—পরিবেশের চাপে নয়, কিন্তু 'একটা সম্পূর্ণ অন্য কিছুর দ্বারা।'

'সেটা কি?' আমরা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করি।

'সে একটা দীর্ঘ কাহিনী। যদি তোমাদের বুঝতে হয়, তাহলে তোমাদের সবাইকে আমি তা বলব।'

'তাহলে বলো।'

আইভান ভাসিলিয়েভিচ এক মুহূর্ত কি ভেবে নিল তারপর তার মাথা নাড়ল।

'হ্যাঁ,' সে বলল, 'মাত্র একটি রাতে আমার সারা জীবনটা বদলে গিয়েছিল, অথবা বলতে গেলে এক সকালে।'

'কেন? কি ঘটেছিল?'

ঘটেছিল কি জান? আমি গভীরভাবে প্রেমে পড়েছিলাম। এর আগেও ত কত ভালবেসেছি। কিন্তু এমন গভীরভাবে নয়। অনেককাল আগে সেটা ঘটেছিল—এতদিনে তার মেয়েদের হয়ত বিয়ে হয়ে গেছে। তারা সব ভদ্রমহিলা এখন। তার নাম ছিল বি, ভারেনকা বি। পঞ্চাশ বছর বয়সেও তার সৌন্দর্য চোখে পড়বার মত। তাহলে ভাবো, তার যৌবনে, যখন তার বয়স আঠারো, তখন সে ছিল একটা স্বপ্ন। দীর্ঘাঙ্গী তন্বী অপূর্ব একটা শ্রী আর তেমনি ব্যক্তিত্ব—ইংরাণীর মত ব্যক্তিত্ব। সব সময় টান টান হয়ে চলত সে যেন নিচু হতে পারে না। তার মাথাটা পিছন দিকে অল্প হেলানো। যদিও সে ছিল বেশ রোগা বলতে গেলে খুবই শীর্ণ তবু তার রূপ আর তার দীর্ঘ চেহারায় সবটাই মিলে মিশে মানানসই। বলেছি ত' তাকে দেখতে রাণীর মত। কিন্তু মনটা দমে যেত যদি না এর সঙ্গে এসে মিলত তার খুশি ওপচানো ভুবন ভোলানো হাসি, তার সেই পদ্মের মত সুডৌল মুখ আর ঝলমলে দুটি চোখ, আর তার সেই যৌবনময় লুব্ধ

করে নেওয়া একটা রূপ, সে না দেখলে বিশ্বাস হয় না।'

'আইভান ভাসিলিয়েভিচ নিশ্চয়ই একেবারে গভীরভাবে মজে গিয়েছিল!'

'মনমজানো রূপ, কিন্তু আমার তাতে ডুব না দিয়ে উপায় ছিল না যাই বলো। আমি তোমাদের বোঝাতে পারব না সত্যি সে কেমন রূপ। সেটা অবশ্য অন্য প্রসঙ্গ।' আজ মনে পড়ছে যেসব ঘটনা তা ঘটেছিল চল্লিশের দশকে।

'আমি মফঃস্বলের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আমি জানি না সেটা ভাল না মন্দ, তবে তখনকার দিনে ঐ তোমাদের সব পাঠচক্র-টক্র কিছুই ছিল না, তোমাদের তত্ত্বের কচকচি এসব আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল না।' আমরা ছিলাম তরুণ যুবা, কোন চঞ্চল বন্যায় টলমলো টলমলো।—এমনি একটা তারুণ্যের মধ্যেই আমরা বেঁচেছিলাম—লেখাপড়া আর ফুর্তিতে সময় কাটানো। আমি ছিলাম হাসিখুশি একটি তরুণ যুবা, আর ধনীর দুলাল। বেশ তেজীয়ান একটা ঘোড়ারগাড়ী। স্লেডিগাড়ী বলতে পারো।' মেয়েদের নিয়ে যেতাম তাতে চড়িয়ে বেড়াতে (তখনও স্লেজ করার শখের রেওয়াজটা হয়নি); আমার সহপাঠিনীদের নিয়ে যেতাম পানসভায় (সেকালে আমরা শ্যামপেন ছাড়া আর কিছু খেতাম না; পকেটে পয়সা না থাকলে, আমরা কিছুই খেতাম না, কেননা এখন ওরা যেমন ভদ্‌কা খায় আমরা তখন ভদকা খেতামই না); কিন্তু সবচেয়ে বেশি উপভোগ করতাম আমি পার্টি আর বলনাচ। আমি নাচিয়ে হিসেবে ভালই ছিলাম আর ঠিক কুৎসিৎ ছিলাম না।'

'যাক, আর অত বনরে কাজ নেই,' একজন শ্রোতা বলে উঠল। আমরা সবাই তোমার সেই সুরত দেখেছি। তুমি খুব সুন্দর ছিলে, সুশ্রী যুবা।'

'হয়ত ছিলাম, কিন্তু সেটা আমি তোমাদের বলতে চাইছি না। আমার প্রেম যখন তুঙ্গে আমি একটি বলনাচের আসরে গিয়ে হাজির হলাম। মার্শাল অব নোবিলিটি শ্রোবেতাইদের শেষ দিনটায় এই আসরের ব্যবস্থা করেছিলেন। রীতিমত হোমরা-চোমরাদের কাণ্ড। উনি বেশ সদাশয় ব্যক্তি।' মার্শালের কথা বলছি আর কি। বিত্তশালী। আর আদব-আপ্যায়ন করতে ।ভালবাসেন তাঁর বউও বেশ বিনয়ী। ওরই মণ্ড। আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন। মার্শালের পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। ওঁর পরনে ছিল একটি ভেলভেট গাউন। আর চুলে ছিল হীরের একটি টায়রা। আর তাঁর প্রবীণ গ্রীবা ও কাঁধ তখনও বেশ ঋজু আর শ্বেতশুভ্র। উন্মুক্ত। ঠিক যেমনটি দেখা যায় সমাজ্ঞী য়েলিজায়েভ্‌ভা পেত্রোভনার ছবিতে। বলনাচের জমকালো আসর। অদ্ভুত সুন্দর সেই নাচঘর। নামজাদা সব নিগ্রো গাইয়েরা এসেছে। এক সঙ্গীত প্রেমিকের সঙ্গীতজ্ঞ ওঁরা সব। মস্ত এক জমিদারের তেমাথানার গাইয়ে-বাজিয়ে। আর খাবার-দাবারেরও এলাহি ব্যবস্থা। শ্যামপেনের দরিয়া বইছে। শ্যামপেনে আমার অরুচি ছিল না ভাই, কিন্তু আমার তখন ভালবাসার নেশা ধরেছে। একেবারে থকে না যাওয়া পর্যন্ত আমি নেচেছিলাম। বেশ মনে আছে কোয়াড্রিলে ওয়ালজ আর পোলো নাচে নেচেছিলাম।' আর বলাই বাহুল্য যে তার অনেকগুলিই ভারেনকার সঙ্গে। ওর পরনে ছিল একটা সাদা পোশাক। ফিতে গোলাপী রেশমী সুতোর ফিতে। সাদা ছাগলের চামড়ার দস্তানা।' ওর পাতলা সরু কনুই পর্যন্ত তা পৌঁছয়নি। আর সাটিনের চমৎকার একজোড়া স্লিপার। এক হতভাগা ইঞ্জিনিয়ার—নাম আনিসিমোভ—ওর সঙ্গে মাজুরকা নাচতে গিয়ে আমাকে বড় ঠকান ঠকালে।' সেই জন্যেই ওকে আজ পর্যন্ত ভুলতে পারিনি। নাচঘরে ভারেনকা ঢুকতেই ও তাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বসল। আমার একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। আমার চুলের সাজওয়ালা তখন ভাকছিল। আমার দস্তানা-জোড়া দিতে এসেছিল।' আর তার সঙ্গে মাজুরকা নাচা হল না।' এক জার্মান মেয়ের সঙ্গে সেটা নাচলুম। একসময় ওর সঙ্গে খুব ভিড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার বড় ভয় লাগছে বলতে যে সেদিন সন্ধ্যায় ওকে আমি বড্ড হেনস্তা করেছিলাম। ওর দিকে চাইলাম না কথা বললাম না। কেননা আমার দু চোখ তখন একটি তন্বী মেয়ের দিকে।' পরনে তার শাদা পোশাক।' গোলাপী ফিতে ছুটিতে। দুই গালে লজ্জার রক্তিমাভা খেলছে। ফুলোফুলো দুটি গাল।' আর নরম শান্ত দুটি চোখ। আমি ত আর একা নই: সবাই ওকে দেখছিল আর তারিফ করছিল।' এমন কি বয়স্কা মহিলারা।' যদিও ওর রূপের কাছে সবাই ম্লান। সত্যি তাকে তারিফ না করে পারা যায় না।' অসম্ভব!

আগে আমি তার মাজুরকা নাচের জুটি ছিলাম না। কিন্তু বলতে গেলে আমি ওর সঙ্গে তা নেচেছি—তার অনেকটাই। একটুও ঘাবড়াল না ও। সারাটা ঘর আমার সঙ্গে যৌবনের ঢেউ তুলে নেচে গেল। আর আমন্ত্রণের অপেক্ষায় না থেকে আমি যখন হাত বাড়িয়ে দিলাম ওর দিকে লাফিয়ে গিয়ে ও আমাকে ধন্যবাদ জানাতে হাসল। সে কি চাইছিল সেটা অনুমান করতে পারল। যখন আমরা ওর দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম আর সে আমার মনোভাবটা অনুমান করতে পারেনি, সে শুধু একটু কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়েছিল। ওর পাতলা দুটি কাঁধ। তখন ও আর একজনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।' আমার দিকে ফিরে একটুখানি শুধু হাসল। যেন বলতে চাইল, কিন্তু মনে করবেন না, দুঃখিত।' এইটুকু আশ্বাসে আমি চুপ করে গেলাম।'

'এবার মাজুরকার মাত্রাবদল হয়ে শুরু হল ওয়ালজ। অনেকক্ষণ ধরে আমি ওর সঙ্গে ওয়ালজ নাচি। আর ও হাঁপাতে হাঁপাতে হাসে আর হাসে আর আমার কানে কানে গুন গুন করে বলে ওঠে আবার আবার। এনকোর!' আমার তখন নাচের নেশা লেগেছে।' আমি ওর সঙ্গে ওয়ালজ নাচছি। আমার নিজের শরীরের দিকে তখন হুঁশ নেই, যেন হাওয়া দিয়ে তৈরি সে শরীর।'

'একেবারে হুঁশ নেই? আমি হুলফ করে বলতে পারি, তুমি নিশ্চয়ই খুব সজাগ ছিলে যেহেতু তার কোমরে জড়ানো ছিল তোমার হাত। শুধু তোমার নয়, তার শরীরটাও তোমার চেতনার বাইরে চলে যায় নি।' একজন অতিথি বললেন। হঠাৎ আইভান ভাসিলিয়েভিচ লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেন আর প্রায় চীৎকার করে উঠলেন :

"দেখো তোমরা একালের ছেলে ছোকরা—ও কথাটা তোমাদের বেলা খাটে, ওই শরীর ছাড়া তোমরা আর কিছু ভাবতে পারো না। আমাদের কালে সব কিছু একটু আলাদা ছিল। যত গভীরভাবে আমি একটি মেয়েকে ভালবাসতুম ততই আমার কাছে সে বিদেহিনী বলে মনে হত। আজকাল তোমরা মেয়েদের পা গোড়ালি আয়ো সব নানা জিনিস নিয়ে খুব সচেতন; বেসব মহিলার প্রেমে পড়ো তোমরা তাদের বিবস্ত্রা না করে ছাড়ো না অথচ আমার কথা শুনবে, যেমন আলফোঁসে বলেছেন কার বলেছেন—আর জানো খুব ভাল লেখক ছিলেন তিনি—আমার প্রেমের লক্ষ্যবস্তুটি সব সময় যেন একটি বেগ্রেসের আচ্ছাদন দিয়ে ঢাকা। সেই আবরণ খুলে দেওয়া দূরে থাক, আমরা চেষ্টা করতুম কি করে নগ্নতাকে লুকোনো যায়। যেমন নোয়ার সুপুরুষটি করেছিলেন। কিন্তু তোমরা এটা বুঝতে পারো না।"

'যাক ওর কথায় আপনি কান দেবেন না। আপনার গল্প বলে যান, আর একজন শ্রোতা বলল।'

হ্যাঁ যা বলছিলুম। আমি যেশিরভাগই ওর সঙ্গে নাচছিলাম সময় বয়ে যাচ্ছে সেদিকে হুঁস ছিল না। বাজনদাররা সব এত থকে গেছল তোমরা ত জানো ঘলের শেষে কিরমটা হয়—ওরা কিন্তু সেই মাজুরকা বাজিয়েই চলেছে বাজিয়েই চলেছে। মা-বাবারা তাসের টেবিল ছেড়ে উঠছিলেন ড্রয়িংরুমে। ভাবছিলেন এতক্ষণে হয়ত সান্ধ্য ভোজের সময় হল। উর্দিপরা যারা ছুটোছুটি করছিল। প্রায় তিনটে বাজে চলেছে। আর কমিনিট বাকী। এই সময়-টুকুর সদ্ব্যবহার করতে হবে। আমি আবার ওকে আমন্ত্রণ জানাই। হাত বাড়িয়ে দিই। আর শত শত বার আমরা নাচঘরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত নাচের ঢেউ তুলে পারাপার করলাম।

'সান্ধ্য ভোজের পর আমি কি আপনার কোমাডিলে নাচের জুটি হবো' ওর বসবার জায়গায় ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে যেতে আমি জিজ্ঞেস করি।

'ও হ্যাঁ, যদি বাবা মামা আমার বাড়ী না নিয়ে যায়, একটুখানি হেসে ও বলল।

'আমি ওঁদের দেবোই না, আমি বললাম।

"আমার পাখাটা দিন না," সে বলল।

"এটা ফেরত দিতে হবে, আমার খুব দুঃখ হচ্ছে।"

তার শাদা সস্তা দামের পাখাটা তার হাতে ফেরত দিতে দিতে বললাম। "এই নিন, আর তাহলে দুঃখ পেতে হবে না," ও বলল। পাখাটা থেকে একটা পালক ছিঁড়ে নিয়ে আমার হাতে দিল।

"আমি পালকটা নিলাম।' আমার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ভাষায় প্রকাশ করবার শক্তি আমার ছিল না। শুধু তার সুন্দর নাচ-নিটোল মুখের ওপর কৃতজ্ঞতার চাহনি ফেলে একটুখানি হাসলাম। শুধু কি তৃপ্তি আর খুশি-রে ভাই—সে যে কী সুখ আর স্বর্গীয় আনন্দ! আমি একটা অপার লজ্জিকতার মধ্যে ছিলাম। আমার মন গান গেয়ে উঠছিল। আমাতে আমি ছিলেম না। যেন এই ধুলো মাখা পৃথিবীর জীবনই আমি। আমি যেন অন্য জগতের, যে-কোনো পাপ জানে না, আর ভাল ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না।

আমি পালকটা আমার দস্তানার আটকে রাখলাম। আর সেই জায়গাটায় তেমনি দাঁড়িয়ে রইলাম। যেন আমায় কে পেরেক দিয়ে আটকে দিয়েছে। ওর কাছ থেকে চলে যাবার শক্তি আমার ছিল না।

ওই দেখুন ওরা বাবাকে নাচতে বলছে, সে বলল, হাত তুলে দেখাল একজন লম্বা চেহারার অভিজাত ভদ্রলোককে। ওর বাবা। কর্ণেল। কাঁধে রুপোর সামরিক চাপবাস। গৃহকর্ত্রী আর জনকয়েক ভদ্রমহিলার সঙ্গে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন।

'ভাবেনকা, এদিকে শোনো', হীরের টায়রা পরা গৃহকর্ত্রী ডাকলেন। ভারেনকা দরজার দিকে এগিয়ে যায় আর আমি ওকে অনুসরণ করি।

নাও তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলো। ওঁর সঙ্গে নাবে তুমি। সেই 'মা সেবে' দয়া করে নাচুন পিয়োতোর ভ্যাসিলিচ, গৃহকর্ত্রী কর্ণেলকে বললেন।

ভাবেনকার বাবা যেন একজন ভাবিক্কি গোছের মানুষ। সংযত। দীর্ঘকায়। অভিজাত আর সম্ভ্রান্ত একটু কঠিন আদলের মুখ। শাদা গোঁফটা বেশ কায়দা করে পাকানো। যেন সেই নিকোলাস ১-এর মুখের ছবিটা আসছে। দুপাশে শাদা দুটি জুলফি। প্রায় এসে ছুঁয়েছে গোঁফজোড়াটা। কপালের ওপর নামিয়ে চুল আঁচড়ানো। আর ঠিক মেয়ের মতই হাসিটি লেগে আছে ঠোঁটের কোনে। সে হাসিতে চমকাচ্ছে দুচোখ আর উজ্জ্বল ঠোঁট দুটি। বেশ সঠাম স্বাস্থ্য। সামরিক কায়দায় চওড়া বুকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে। সেই বুকের ওপর কী যত্ন করে সাজানো সামরিক পোষাক। দুটি শক্ত কাঁধ আর লম্বা সুন্দর দুটি পা। নিকোলাস সংযোজনার সামরিক গুরুত্ব। সেকেলে ধরণের অফিসার আর কি।

আমরা দরজার কাছে এগিয়ে আসি। কর্ণেল ও কিছুতেই রাজী নন। না, কেমন করে নাচতে হয় তাই ও ভুলে গেছেন। কিন্তু হাসিটি তাঁর লেগে আছে সুখের ওপর তেমনি। তরবারিতে হাত দিলেন। খাপ থেকে টেনে বের করলেন। তারপর ডান হাতে সুয়েডের দস্তানাটি পরে নিলেন। (সব কিছু নিয়ম মাফিক হওয়া চাই ত—উনি হাসতে হাসতে বলছিলেন), উনি এবার মেয়ের হাত ধরলেন। আর সিকি ভাগ মোড় নিয়ে বিচিত্র এক অঙ্গভঙ্গীতে তাল ঠুকলেন। মানে, নাও এবার শুরু করো। ঠিক এমনি করে।

'মাজুরকার সুরটা বেজে উঠতেই উনি সোৎসাহে এক পা ঠুকে আর এক পা এগিয়ে দেন নাচের ভঙ্গীতে। আর তারপর তাঁর লম্বা ভারী শরীরটা নাচঘরের চারি-পাশে যেন পাল তোলা নৌকোর মত ভেসে বেড়ায়। একটির পর একটি ঠিক তালে তালে পা ঠুকছিলেন উনি। কখনও ধীরে, কখনও অপূর্ব সুষমায়, কখনও দ্রুত ছন্দে আবার কখনও এক নতুন উদ্যমে। উইলো বৃক্ষের মত তন্বী ভারেনকা তাঁর পাশে পাশে ভাসছিল। নির্ভুল। সমঝের গোল-মাল নেই। পা ফেলতে হবে কোথায় ছোট করে কোথায় বড় করে—ভারেনকা ঠিক সেই মত নেচে চলেছে। ছোট শাদা শার্টিন পা দুখানি মানিয়ে নিয়েছে ভারেনকা দুটি বড় মাপের পায়ের সঙ্গে।

'অতিথিরা সব নির্বাক নিশ্চল। শিল্পী যুগলের প্রতিটি ছন্দ, তাল মাত্রা মনোযোগ দিয়ে দেখছে। আর আমার অনু-ভূতিটা কেমন শুনবে? আমার মধ্যে বাহবা দেবার কোন প্রবৃত্তি জাগছিল না। এক অবিমিশ্র গভীর স্বর্গীয় আনন্দে ভরে উঠছিলাম। মনে হচ্ছিল গেয়ে উঠি, তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত ভরুক চিত্ত মম।' বিশেষ করে কর্ণেলের বুট জোড়া দেখে আমি অভিভূত হয়ে পড়ি। বেশ ভাল কারিগরের হাতের কাজ তৈরি সেগুলো। তবে তাতে হিল নেই। আর পালিশ ঝকঝকে মুখ না হয়ে ভোতা। বুড়ো আঙুলের দিকটা স্পষ্টই বোঝা যায় সেনাবাহিনীর মুচি ওগুলো বানিয়েছে। পালিশ জুতো উনি পরেন না। শাদামাঠা জুতোই বেশি পছন্দ করেন। যাতে উনি ওঁর মেয়েদের পোষাক-আসাকটা ভাল দিতে পারেন। আর তাদের নিয়ে সমাজে বেরুতে হয়ত।' আমি আপন মনে ভাবি। আর বিশেষ করে সেই জন্য আমি ওনার আঙুল ভোতা বুট জোড়াটা দেখে বেশ একটু মুগ্ধ হই। যে কেউ দেখলে বুঝবে এককালে উনি খুব সুন্দর নাচতেন। তবে এখন ভারী হয়ে গেছেন। আর পা দুটোও সে রকম হালচালু নেই। যা ইচ্ছে মত চেষ্টা করলেই চকিত গতিতে লীলাভঙ্গিময় ঘুরপাক খেতে পারেন। তবে বার দুরেক ঘরটার চারি পাশে উনি বেশ ভালভাবেই পরিক্রমা করলেন। আর সবাই বাহবা দিলে। যখন উনি দ্রুততালে পা দুটো ছড়িয়ে দিলেন। তারপর দু পা জড়ো করে শক্ত ঠুকলেন আবার আর পড়ে গেলেন, অবশ্য গুরুতরভাবেই, এক হাঁটুকে মেঝের ওপর ঠুকে। আর সে ত হেসেই খুন। তাঁর হাত দিয়ে ধরা জামাটা সে মুকুত করে দেয়, আর তাঁর চার পাশে ময়ূরের লীলা ভঙ্গিমায় ভাসতে থাকে নাচের ঢেউয়ে। আর ওদিকে তখন উনি দু পায়ে ভর দিয়ে কষ্ট করে উঠে পড়েছেন। উঠেই মেয়ের দু কাঁধে সহৃদয়ে হাত ছোঁয়ালেন আর তার কপালে চুমো খেলেন। তারপর ওকে নিয়ে এগিয়ে এলেন আমার দিকে। উনি ভাবলেন, হ্যাঁ আমিই ত তার নাচের সঙ্গি, আমি বললাম, না না তা কি করে হয়।

'আরে তাতে কি হয়েছে, তুমি নাচো না ওর সঙ্গে', উনি বলেন। বেশ মৌজ করে হাসতে থাকেন। আর খাপের ভেতর আবার ওঁর তলোয়ারটা ঠেলে পুরে ফেলেন।

ঠিক যেমন বোতল থেকে এক ফোঁটা পড়লেই তার উচ্ছ্বাসে ফুটিয়ে নামে অনায়াস ধারা, তেমনি ভারেনকার প্রতি আমার প্রেম যেন আমার হৃদয়ের উৎস মুখ খুলে অজস্র ধারায় বেরিয়ে আসতে লাগল আমি হীরের টায়রা পরা গৃহকর্ত্রীকে ভাল-বেসে ফেলি। আর তাঁর স্বামীকে, আর তাঁর অতিথিদের, তাঁর বাবুর্চি, আর এমন কি অনিসিমোভকে, যে একটু আগে আমার ওপর বেশ রেগে গিয়েছিল। আর তার বাবার কথা কি বলব। তাঁর সেই ভোঁতা আঙুল বুট আর অবিকল মেয়ের মত তাঁর স্মিতহাস্য—তাঁকে আমার ভীষণ ভাল লেগে গেল। এক উচ্ছ্বসিত মমতায় অন্তর ভরে উঠল।

'মাজুরকা শেষ হয়ে গেল। আর আমাদের আপ্যায়নকারীরা সান্ধ্যভোজের টেবিলে আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু কর্ণেল কি প্রত্যাখ্যান করেন। বললেন আজ খুব সকাল সকাল উঠতে হবে। আমার ভয় হল। পাছে ভারেনকাকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যায়। কিন্তু ভারেনকা রয়ে গেল ওর মার সঙ্গে।

'সান্ধ্যভোজের পর নাচলাম ওর সঙ্গে আমাদের সেই প্রতিশ্রুত নাচ। কোয়াড্রিল। আর তখন কি মনে হচ্ছিল জান? ভেবেছিলাম আগে, যে আমার এত সুখ বোধহয় সইবে না। কিন্তু দেখলাম তা বাড়ছে আরও বাড়ছে। আমরা কিন্তু ভালবাসার কথা ত কিছুই বলি নি, আমি তাকেও জিজ্ঞাসা করি নি। নিজেকেও জিজ্ঞাসা করি নি। সত্যি সে কি আমায় ভালবাসে। এই ত যথেষ্ট যে আমি ওকে ভালবাস-ছিলাম। একটা জিনিস তবু আমি ভয় করেছিলাম যে, কিছু একটু অলক্ষ্যে হয়ত আমার এ সুখকে তছনছ করে দেবে।

যখন বাড়ী এলাম, জামা-কাপড় ছেড়ে একটু ঘুমোব ভাবলাম, তবে আমি বেশ বুঝেছিলাম, যে ঘুমোন এখন অসম্ভব। তা আমল আসবে না। তার পাখা থেকে যে পালকটি খুলে দিয়েছিল সেটি হাতে

নিলাম। আর তার একটি দস্তানা। ওটি সে আমায় দিয়েছিল যখন আমি ওকে আর ওর মাকে ওদের গাড়ীতে তুলে দিলাম। ওই স্মারকগুলির দিকে দেখতে দেখতে আমি যেন তাকে পরিষ্কার দেখতে পেলাম। আবার। সেই মুহূর্তটি জল-ছবির মত ভেসে ওঠে। যখন দুজন জুটির একজনকে সে বেছে নিচ্ছিল সে আমার স্বভাবটি ঠিক আঁচ করতে পেরেছিল, আর বেশ মিষ্টি গলায় বলেছিল, 'খুব যে অহংকার দেখছি। তাই না কি? খুশি হয়ে আমার দিকে দু' হাত বাড়িয়ে, অথবা সেই যখন ও সান্ধ্যভোজ টেবিলে বসে শ্যামপেন অলতো করে চুমুক দিচ্ছিল। ও আমার দিকে গেলাসের আড়াল থেকে নিষ্পলক চেয়েছিল। ওর চোখে ছিল প্রেম। কিন্তু ওকে আমার দেখতে সবচেয়ে ভাল লাগছিল যখন ও ওর বাবার সঙ্গে নাচ-ছিল। তাঁর পাশে এক মনোরম ভঙ্গিমায় ভাসছিল। হালকা মেঘ যেন। বাপ-সোহাগীর চাহনি নিয়ে বাপের গৌরব আর নিজের জন্যেও গর্ববিনীর আনন্দে সে ফিরে ফিরে চাইছিল প্রশংসায় পঞ্চমুখ দর্শকদের দিকে। আর কখন যেন অজ্ঞাত-সারে ওদের দুজনে আমার মনে একাকার হয়ে মিশে গিয়েছিল। আর আমাকে এক গভীর কমনীয় অনুভবের মধ্যে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। নিশীথ রাতের সে এক অপূর্ব নিবিড় অনুভূতি। 'তুমি রবে নীরবে, হৃদয়ে মম।'

'সে-সময়টা আমার স্বর্গীয় ভ্রাতা আর আমি একা থাকি। আমার ভাইয়ের কাছে সমুদ্র-টমাজের অত দাম ছিল না আর সে কখনও বলনাচ টাচে যায়নি। সে তখন এম-এ পরীক্ষার পড়া নিয়ে খুব ব্যস্ত। আর একটা অনুকরণ করার মত জীবন কাটাচ্ছে। লেখাপড়া নিয়েই থাকে। বেচারী ঘুমিয়ে পড়েছিল। দেখে কষ্ট হল আমার। বালিশে মাথা গুঁজে শুয়ে আছে দেখলাম। আর কম্বল দিয়ে অর্ধেকটা ঢাকা। দেখে কষ্ট হল কেন জান? আহা ও ত জানত না আর আমার সুখের অর্ধেকটা ভোগ করার সৌভাগ্যও ওর হল না। পেত্রুশা, আমাদের ভূমিদাস গৃহভৃত্যটি, দোর ঠেলতেই একটা মোমবাতি নিয়ে এগিয়ে এসেছিল। বললে ও আরো খানিকক্ষণ থাকত। আমি জামাকাপড় ছাড়ব। ফাইফরমাশ করব ওকে। কিন্তু আমি ওকে ছুটি দিয়ে দিলাম। আমি ওই মানুষটার ঘুমন্ত মুখ আর এলোমেলো চুলের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকি। কেমন একটা সমবেদনা জাগে। চেষ্টা করি যেন একটুও গোলমাল না হয়। আমি আমার নিজের ঘরে চলে আসি পা টিপে-টিপে, আর বিছানার ওপর বসে পড়ি। ঘরের ভেতরটা বেশ গরম লাগছিল। আমার কোষাকটা আর খুললাম না। চুপি চুপি চলে আসি হলঘরটায়। আমার গ্রেট-কোটটা গায়ে চাপিয়ে নিই। সদর দরজাটা খুললাম। আর বাইরে বেরিয়ে এলাম।

'নাচের আসর থেকে যখন চলে আসি, তখন প্রায় পাঁচটা বেজেছিল। তখন থেকে প্রায় দু' ঘন্টা কেটেছে। তাই বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি, তখন বেশ আলো ফুটে গেছে। একেবারে ঠিক সেন্ট পিটার্সবার্গের আবহাওয়া—কুয়াশায় ঘোলাটে, ভিজে বরফ গলছে রাস্তার ওপর আর সব বাড়ির ছাদ থেকে জল পড়ছে। টুপ-টাপ। সে-সময়টা বি-রা থাকত শহরের প্রান্তে। একটা খোলা মাঠের ধারে। তার এক প্রান্তে একটা মেয়েদের স্কুল, আর অন্য প্রান্তে একটা জিম। প্রমোদভ্রমণ আর ব্যায়াম ইত্যাদি চলে সেখানটায়। আমাদের ওই শান্ত ছোট গলিটা দিয়ে বেরিয়ে চলে আসি বড় রাস্তায়। ওখানে দেখি লোকজনের আনা-গোনা শুরু হয়ে গেছে। ঠেলাওলারা চলেছে। স্লেজের ওপর কাঠ বোঝাই করে। তার রানাররা বরফ কেটে চলেছে ফুটপাথের ওপর দিয়েই। আজ সবকিছু যেন বড় ভাল লাগল। ঘোড়াগুলো মাথা নাড়ছে তালে-তালে ওদের ঝনঝনে লাগামের নিচে থেকে। ঠেলাওলারা চলেছে। কাঁধের ওপর আলগা সেলাই-করা মাদুরের সাজসরঞ্জাম। মস্ত গাবদা-গোবদা বুট পরে চলেছে স্লেজের পাশে পাশে। বরফের কাদা ভেঙ্গে। আর রাস্তার দু'ধারে ঢ্যাঙ্গা ঢ্যাঙ্গা বাড়ি-গুলো আরও লম্বা মনে হয় কুয়াশায়। ঘষা কাচের ভেতর দিয়ে দোকান যেন এক-খানা ছবি। সব, সব যেন আমার কাছে বড় প্রিয়, বড় আদরের মনে হয়। মনে হয় যেন এই সকালবেলাটির ভেতর অনেক কথা, অনেক মানে লুকিয়ে আছে।

'ওই মাঠের কাছটায় এসে পড়লাম। ওরই পাশে ওদের বাড়িটা দাঁড়িয়ে। তখন দেখতে পেলাম কি যেন, একটা কালো বড় মতন। ওই সেই প্রমোদ-প্রান্তরের দিকটায়। আর আমি শুনতে পাই ছোট বাঁশির সুর। তার সঙ্গে ড্রাম। এতক্ষণ আমার অন্তরও গান গেয়ে উঠেছিল। মাঝে মাঝে আমার মনে বাজছিল মাজুরকার সেই ছন্দ। কিন্তু এ-সুরটা অন্য রকম। একটু কর্কশ, কেমন একটা অশুভ ইশারা।

'কি হতে পারে?' মনে মনে অবাক হয়ে ভাবছি আর শব্দের দিকটা লক্ষ্য করে এগিয়ে চলেছি। মাল-বওয়া-গাড়ির পিছল রাস্তা ধরে। সে-রাস্তাটা আড়াআড়ি চলে গেছে মাঠের ওপর দিয়ে। একশো পা এগিয়েছি প্রায়, এবার যেন কুয়াশার ভেতর থেকে অল্প অল্প চিনতে পারি এক ভীড় মানুষ ওখানে জমায়েত হয়েছে। স্পষ্ট বোঝা গেল ওরা সৈনিক। কুচকাওয়াজ করছে। আমি ভাবলুম। একজন কমরেড সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছিলুম। ওর গায়ে একটা তেলচিটে এ্যাপরন আর জ্যাকেট। একটা মস্তবড় পোর্টফোলিও বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। দু'সারি সৈনিক দাঁড়িয়ে, গায়ে কালো কোট। মুখোমুখি। নিশ্চল। ওদের পাশে পাশে সব বন্দুক। পিছনে ওদের একজন বংশীর দিক। আর একটি ছোকরা। ড্রাম বাজায়। ওরা সেই তীক্ষ্ণ সুরটা বাজাচ্ছিল। বার বার সেই একই সুর। আমার পাশে দাঁড়ানো কামারটাকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'ওরা কি করছে?' একজন

NEW IN

Rupa PAPERBACKS

Classics :

HENRY FIELDING
Tom Jones 18.00

Health :

J. W. ARMSTRONG
The Water of Life : A Treatise on Urine Tharapy 9.00

Literature :

BERTRAND RUSSELL
Mortals and Others 8.00

Novels :

BERKELY MATHER
The Memsahib 12.00

DESMOND BAGLEY
Flyaway 10.00

Sociology :

LUCY MAIR
Marriage 12.00

Sports and Pastime :

ANANDJI DOSSA
Cricket Ties : India Pakistan 12.00

Dr. NAROTTAM PURI
Portrait of Indian Captains 12.00

CHECK LIST

ALAN and VERONICA PALMER
Quotations in History 16.00

MAUPASSANT
Selected Short Stories 12.00

*

মপাসাঁর
সেরা প্রেমের গল্প ২০.০০

ডঃ অশোক মিত্র
[অর্থ ও পরিকল্পনা-মন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ সরকার]
সমাজসংস্থা আশানিরাশা ১২.০০

List of other Bengali and English books available on application

Rupa & Co

15 Bankim Chatterjee Street
Calcutta 700 073
Also at :
Allahabad : Bombay : New Delhi

তাতারকে তাড়াচ্ছে এ-অঞ্চল থেকে। এ পালাবার চেষ্টা করছিল। থামকা কামারটাকে বলে উঠল। সৈনিকদের ভবল সারির শেষ মাথায় দৃষ্টি রেখে।

'আমিও ওই দিকে তাকালুম। আর দেখলুম, ভয়ানক কী একটা যেন সারির ভেতর দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। একটা লোক। কোমরটা খোলা। একজন সৈনিক আড়াআড়ি করে তাকে একটা বন্দুক দিয়ে বেঁধে ফেলেছে। তার পাশে একজন লম্বা গোছের অফিসার। গায়ে ভারি কোট চাপিয়ে আর মাথায় সামরিক টুপি পরে হেঁটে আসছিলেন। তাঁর চেহারাটা আমার কাছে খুব চেনা-চেনা লাগল। বন্দী। তার সমস্ত শরীরটা কুঁকড়ে যাচ্ছিল। গলিত তুষারের ভেতর দিয়ে তার পা দুটো সপসপে ভিজে উঠছে। দু'ধার থেকে তার মুখে গায়ে কিল-চড়ের বর্ষণ চলেছে। ও এগিয়ে আসছে মার খেতে খেতে। একবার পিছন দিকে হেলছে। সেদিকে সৈনিকরা বন্দুকের কুঁদো দিয়ে ঠেলা মেরে ওকে সামনে টেনে আনছে। আবার একবার সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। আবার সেদিকে সৈনিকরা ওকে ঝাঁকুনি দিয়ে সিধে করে দেয়। যেন পড়ে না যায়। আর তার পাশে পাশে হেঁটে আসছিলেন সেই দীর্ঘকায় অফিসারটি। দৃঢ় পদক্ষেপে। একবারও পেছিয়ে পড়ছিলেন না। ওর বাবা। রুক্ষ কঠোর সেই মুখ। শাদা গোঁফ। দু'পাশে বড় জুলফি।

'প্রতিবার ঘুষির ঘায়ে বন্দীটি যেদিক থেকে আঘাত এসে পড়ছিল, সেদিকে তার যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছিল। যেন অবাক হয়ে গেছে। আর খোলা শাদা দাঁতের ফাঁক দিয়ে যেন বার বার কী একটা বলে যাচ্ছে। বুঝতে পারছিলুম। কাছে আসতে তবে কানে এল। কথা নয়, একটা চাপা ফোঁপানো কান্না। 'দয়া করো ভাই-সব, ভাইসব দয়া করো।' কিন্তু ভাই-সবদের দয়া নেই। নির্মম ওরা। আর এই মিছিল যখন ঠিক আমার সামনাসামনি আমি দেখলুম কি জান? একজন সৈনিক দৃঢ় পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে এল আর তার চাবুকটা এমন করে তাতারটার পিঠের ওপর চালাল যে, বাতাসে একটা হিসহিস-হিস্-হিস্ শব্দ জাগল। তাতারটা সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কিন্তু সৈনিকরা ওকে হেঁচকা মেরে তুলে দাঁড় করায়, আর তার-পর থেকে এধার থেকে ওধার থেকে এলো-পাথাড়ি ঘুষি আর মর্মান্তিক আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে মানুষটা। কর্ণেল কুচকাওয়াজ করে আসছিলেন ওর পাশে পাশে। একবার তার পায়ের দিকে, আবার বন্দীর মুখের দিকে তাকান। বুকভরে নিশ্বাস নিচ্ছিলেন বাতাসে। গাল ফুলিয়ে দম ছাড়ছিলেন। আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস ফেলছিলেন বোজা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। আমি যেখানটায় দাঁড়িয়ে, সেখান দিয়ে মিছিল পেরিয়ে যায়। তখন আমি বন্দীর পিঠটা দেখতে পাই একচমক সৈনিকদের সারির ফাঁক দিয়ে। ওর সে যে কী ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। দগদগে হয়ে চাবুক বসেছে। রক্তে ভেজা। লাল দগ্-দগ্ করছে। অদ্ভুত! আমি বিশ্বাস করতে পারলুম না যে, এটা মানুষের শরীরের কোনো একটা অংশ।

'হা ভগবান, তুমি আছো!' কামারটা ফিসফিস করে বলে ওঠে আমার পাশে দাঁড়িয়ে।

মিছিল চলেছে। ওই হতভাগা জীবটার ওপর এসে পড়ছে তেমনি অঘাতের পর আঘাত। দু'ধার থেকে। কখনও সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। কখনও হোঁচট খায়। ড্রাম বাজছে তেমনি, আর বাঁশির সেই তীক্ষ্ণ সুর। আর বন্দী তাতারের পাশে পাশে বলদর্পিত পদক্ষেপে হেঁটে চলেছেন অভিজাত কর্ণেল। হঠাৎ কর্ণেল থামলেন আর চট্ করে একজন সৈনিকের কাছে চলে এলেন।

'ফস্‌কে গেল?' এসো দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি ওঁকে রুদ্ধ কণ্ঠে বলতে শুনলুম। এই নাও। এই নাও। এসো। আমি দেখি তাঁর সুয়েড-পরা শক্ত হাত ছোটখাটো দুর্বল সৈনিকটার মুখের ওপর গিয়ে পড়ছে নির্মমভাবে। কেননা, লোকটার চাবুকটা লাল দগ্‌দগে তাতারটার পিঠের ওপর বেশ করে মারা হয়নি, যতটা দরকার।

'নতুন চাবুক নিয়ে আয়।' কর্ণেল চীৎকার করে উঠলেন। কথা বলতে বলতে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াতেই উনি আমাকে দেখতে পেলেন। যেন আমাকে চিনতে পারেন নি— এরকম একটা ভান করলেন। মারাত্মক একটা ভুরুকি দিয়ে গর্জন করে দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে চলে গেলেন। আমার এত লজ্জা করতে লাগল যে, আমি কোনদিকে চোখ ফেরাব বুঝতে পারলুম না। যেন আমি মস্ত একটা নিন্দনীয় কাজ করছিলাম ধরা পড়ে গেছি। মাথাটা ঝুঁকিয়ে দ্রুত পায়ে বাড়ি ফিরি। সারাটা পথ আমার কানে বাজে ড্রামের গুম গুম শব্দ। বাঁশির কর্কশ সুর। আর সেই কথাগুলো, 'ভাইসব দয়া করো, দয়া করো।' আর রুদ্ধ আত্ম-প্রত্যয়ী কণ্ঠস্বরে কর্ণেলের চীৎকার, এই নে, এই নে। আর 'এই নে।' আমার মনের ভেতরটা এমন তীব্রভাবে ব্যথিয়ে উঠছিল যে, আমার শরীরের ভেতরটা যেন ঘৃণায় ঘুলিয়ে উঠল। বমি পেতে লাগল। এমন প্রচণ্ড সে অনুভূতি যে, পথ চলতে চলতে বার কয়েক থামলুম। মনে হল এই যে ভয়ংকর দৃশ্য আমার মনকে দারুণ এক আতংকে ভরে তুলেছে, তাকে এখনই ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে। আজ আর মনে নেই কেমন করে বাড়ি পৌঁছলাম আর বিছানায় এসে শুয়ে পড়লুম। কিন্তু চোখের ওপর ঘুম নামতেই আমি দেখতে পেলুম আর শুনতে পেলুম সেইসব। আমি লাফিয়ে উঠি।

'এমন একটা কিছু আছে যা সে জানে অথচ আমি জানি।' আমি নিজের মনে বলি, কর্ণেলের কথাটা ভেবে। আমি যদি জানতুম সে জানে, তাহলে ত আমি বুঝতুম, আর যা আমি দেখেছি তাতে আমার এতটা কষ্ট হত না। কিন্তু মাথা খুঁড়ে ফেলেও আমি বুঝলুম না, কর্ণেল কী জানে। সন্ধ্যা হতে তবে ঘুমোতে পারলাম। তারপর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সেখানে একটু শ্যামপেন খেলাম। এবার যেন সবকিছু একটু একটু ভুলতে পারলুম।

'তোমরা কি মনে করো আমি যা দেখেছি, সব খারাপ—এইটুকু বলে আমি এ-গল্পে ছেদ টানব? না, তেমন কিছু নয়। যদি আমি যা দেখেছি, তা একটা প্রত্যয়ের সঙ্গে করা হয়ে থাকে, আর সবাই এটাকে মেনে নিয়ে বলে যে, এর প্রয়োজন আছে, তাহলে তার মানে তারা এমন কিছু জানে যা আমি জানি না, এই উপসংহারটাই আমি টানতে চাই। এটাই আমার সিদ্ধান্ত। আমি চেষ্টা করেছি সেটা কি। কিন্তু কোনোদিন জানতে পারিনি। আর জানতে পারিনি বলেই মিলিটারি সার্ভিসে আমাকে আর ডাকা হয়নি, আমার ইচ্ছে ছিল একটু-আধটু। আর শুধু যুদ্ধের চাকরি নয়, যে-কোনো চাকরিতে, আর তাই দেখছ ত আমি একটা অকেজো অপদার্থ হয়েই রইলাম। 'কোনো কর্মের নও।'

আমরা ভাল করেই জানি, তুমি কত বড় একজন 'কোনো কর্মের নও' হয়েছ, মানেক অতিথি মন্তব্য করলেন। এটা বললে অবশ্য যথার্থ হয় যে, তুমি যদি না হতে, তাহলে আর ক'জন লোক কোনো কর্মের নও হত?

'দেখো সে-কথাটা বলা বোকামি', এবার আইভান ভাসিলিয়েভিচ সত্যি সত্যি বিরক্ত হয়ে গিয়ে বললেন,

'যাক তা তোমার প্রেমের কি হল?' আমরা জিজ্ঞাসা করলাম।

'আমার প্রেম? সেদিন থেকে আমার প্রেম নেতিয়ে পড়ল। যখনই আমরা বেড়াতে বেরুতাম আর ভাবেনকার মুখে ফুটত সেই বিষণ্ণ হাসি। আমি সেই কুয়াশা ঢাকা মাঠে কর্ণেলের কথাটা মনে না করে থাকতে পারতুম না, আর এতেই আমার কেমন যে একটা অস্বস্তি হত। মনটা খারাপ হয়ে যেত। এমনি করে আস্তে আস্তে ওর সঙ্গে দেখাশোনাও কমিয়ে দিলেম। আমার ভালবাসা শুকিয়ে গেল। উদাসী হাওয়ার পথে পথে তার মুকুলগুলি ঝরে পড়ল।

এমনি হয় মাঝে মাঝে। আর এমনি সব ঘটনা মানুষের সারাজীবনটাকে বদলে দেয়। অন্য পথে চালিয়ে দেয়।' আর তোমরা বলছ পরিবেশ, উনি বললেন একটুখানি হেসে।

লিও তলস্তয়ের 'আফটার দি বল' গল্পের অনুবাদ। গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে। অনুবাদ করেছেন কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়।

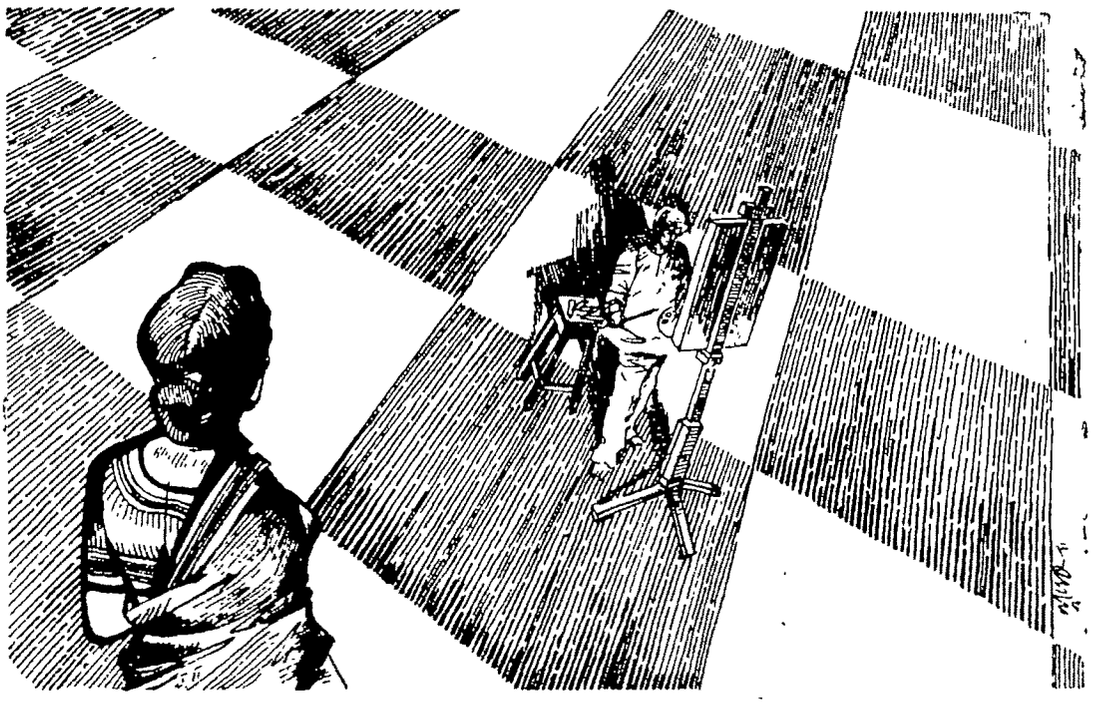

ছকের ওপর রাজামানুষ/সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়

কালো ভুরুর মধ্যে রুপোর তার হয়ে যাওয়া কয়েকটা লোম। কপালের বং পুরোন হাতির দাঁতের মত। সেখানে অজস্র বলিরেখা। চোখের সাদা অংশটা রক্তশূন্য, ফ্যাকাশে। যৌবনে হয়ত চোখের মণি ঈষৎ কটা ছিল। এখন আবছা জানিতে ধূসর।

সামনে ক্যানভাস। সমস্ত স্নায়ু তন্ত্রী টান টান করে, নিখিল, হাতে সবচেয়ে সরু তুলিটা নিয়ে গভীর একাগ্রতায় সামনে তাকিয়েছিল। সামনের ক্যানভাসে ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছে এক বৃদ্ধা বিধবার ছবি।

কড়িকাঠের আংটা থেকে, কপিকল বাঁধা, ঢাকা দেওয়া, ঝোলানো একটা আলো. ক্যানভাসের সামনে ঝুলছে। আলোটা ইচ্ছে-মত ওঠানো নামানো যায়। শেডের একদিকে খবরের কাগজের আড়াল, যাতে নিখিলের চোখে আলো না পড়ে। ঘরের মাঝখানে সিঙ্গল খাটের ওপর দাঁড় করান ক্যানভাস। সারা খাটে ছড়িয়ে আছে পেটটেপা, নতুন, অথবা একেবারে ফুরিয়ে আসা রঙের টিউব. তুলে টুলি, প্যাস্টেল, তার্পিন তেলের শিশি, একটা রঙ চাঁচবার ছুরি, এইসব টুকিটাকি জিনিস।

ঘরের দেওয়ালে, আবছা আবছা ভুতুড়ে মুখ হয়ে থাকা নানা বয়সের মানুষের ছবি। আলোটা গোল হয়ে খাট, ক্যানভাস আর খানিকটা মেঝের ওপর ছড়িয়ে আছে।' দেওয়ালের রঙ বোঝা যায় না। বছর পনের রঙই হয়নি। ঘরের এক কোনে ঝাঁসা টেবিল চেয়ার, একটা মিটসেফ্। আড়াআড়ি দড়িতে প্রোপ্রোনের কাপড় চোপড় ঝুলছে। এটা নিখিলের শোয়ার, বসার, খাওয়ার ঘর কাম্ স্টুডিও।

সামনের জানলাটা রাস্তার দিকে, পরদা নেই। জল, ঝড়, আলো, বাতাস অবাধে আসে, আর আসে হট্টগোল। ট্রাম, বাস, বড় রাস্তার বিশাল হৈ চৈ, কারণ বাস্তার ওপারেই একটু বাঁ দিক ঘেঁষে শেয়ালদা স্টেশন। এই অজস্র শব্দরা মিলেমিশে ক্রমাগত অনুরণনের মধ্যে এক স্নায়ু তীক্ষ্ণ করা অদ্ভুত নিস্তব্ধতা তৈরি করে। তখনই নিখিল বাহ্যিক জগতের বাইরে চলে গিয়ে তুলি হাতে আত্মগত হয়। ...

. ছবিটা কাল সন্ধেবেলা সময় বরেন নিতে আসবে। সামনের ক্যানভাসে আস্তে আস্তে ফুটে ওঠা ঐ বৃদ্ধার, পরশুদিন শ্রাদ্ধ। ছবিটার গায়ে সেদিন রজনীগন্ধার গোড়ে মালা ঝুলবে, চৌকির ওপর পাতা সাদা টান টান করা চাদরে, সাদা ফুলের মধ্যে, সাদা তাকিয়া ঠেসান দিয়ে, নরেনের মৃতা ঠাকুমা, হাতে হরিনামের কুড়োজালি নিয়ে ফ্যাকাশে ছানিপড়া চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে নেমতন্ন খেতে আসা অসংখ্য লোকের দেঁতো হাসি আর একদল পেশাদার কেওন গাইয়ের বেঢপ গা দুলিয়ে চেঁচানি দেখবে।

এইসবের জন্যেই বছর আষ্টেক আগের ফার্স্ট হওয়া ফাইন আর্টের ছাত্র নিখিল রায়, কাল সন্ধেবেলা এই ছবিটি বরেনের হাতে তুলে দিয়ে থোক থাক কিছু পাবে।

তখন সে বাকি ঘরভাড়া দেবে। চায়ের দোকানে, পাইস হোটেলের দেনা মেটাবে, এক মাস বোতল মাল খাবে, জিনের প্যান্ট বানাবে, আর আর খুব ঘুরতে ঘুরতে কিম্বা পায়ের ওপর পা দিয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে, মাথার মধ্যে কুরে কুরে খেয়ে চলা পোকাটাকে নিয়ে মনে মনে খেলতে খেলতে বলবে, 'জানিস্, এবার এমন একটা ছবি আঁকব না! যা কোনো শালা এই পৃথিবীতে, বড় তুলিতে ক্যানভাসের ওপর সেই খেলা খেলেনি। দেখিস্ মাইরী, তখন সারা দুনিয়া বলবে 'নিখিল,' এটা নিখিলের তৈরি বাস্তা।'...

...এই নিখিলের বয়েস এখন তিরিশ।

নিখিলের অন্নপ্রাশনের দিন লালকেল্লায় তোপ ফাটিয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল। সারা বাংলাদেশ যখন ব্ল্যাকআউটে অন্ধকার, তখন সেই দাঙ্গার মধ্যে অনিশ্চিত পৃথিবীতে নিখিলকে প্রসব করেই ওর মা সাধনোচিত ধামে চলে গেলেন। ঠিক তার দিন দুয়েক আগে কলাবাগান বস্তির সামনে কে বা কারা ওর হবু বাবাকে দু ফাঁক করে কেটে খুব একটা মজা দেখবে ভেবেছিল। কিন্তু আপিস ফেরত দুর্বল বাঙালী কেরাণী প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মারা যাওয়াতে মজাটা খুব জমেনি। সেই ধাক্কাতেই এবং পেটের মধ্যে নিখিলের ধাক্কায় বোধহয় ওর মাও চোখ বুজেছিলেন।

একান্নবর্তী পরিবারে বড় জ্যাঠাইমার হাতে নিখিল মানুষ। যেদিন সে বৃত্তি নিয়ে হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করল সেদিনই সে মনে মনে আউড়েছিল, আমি এই বুড়ি পৃথিবীতে একটা দাগ রেখে যাবো। পরীক্ষার পরের ছুটিতে পড়েছিল, 'মুন এণ্ড দি সিক্স পেন্স।' পড়ে রাতের পর রাত ছটফট করেছিল। নিজের স্বভাবজাত চতুরালিতে আঁকা স্কুল জীবনের অসংখ্য

ছবি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে নিদ্রাহীন রাতে তার শরীর থেকে বেরিয়ে আসত আর এক ছায়া নিখিল। সেই বিশাল নিখিল তার ঘরে, রাত্তিরের ছাদ ফুঁড়ে আকাশে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়াতো। আর হাতের চেলোর ওপর আসল ক্ষুদে নিখিলকে বসিয়ে হো হো করে হাসতে হাসতে আকাশ ফাটিয়ে মেঘ গর্জনের মত বলত, দেখ্‌বে নিখিল! আমি তোর ভেতরেই থাকি। আমায় খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে টেনে বের কর্‌, ওই কানকাটা ভ্যানগগ, বেমেরো, গ্যগাঁর পাশে তোর ছবিও জ্বল জ্বল করবে।....

সেই থেকেই সেই পোকাটা নিখিলের মাথার মধ্যে ঢুকে পড়ল। সেদিন সারা বাড়ির লোক চুপচাপ ওর সামনে থেকে মুখ কালো করে সরে গেল, যেদিন ও প্রেসিডেন্সি কলেজ ছমাস অঙ্কের অনার্সের ক্লাস করে, ওখান থেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে আর্ট কলেজে ভর্তি হয়ে বাড়ি ফিরে এল।

আর্ট কলেজে পর পর তিন বছর ফার্স্ট হওয়া নিখিলের সামনে যখন একটু একটু করে সেই রঙ ঝলমলে জগতের বিশাল দরজাটা খুলছে, আর তার ফাঁক দিয়ে দূরের বিশাল সম্ভাবনাময় সূক্ষ্ম শিল্পের সৃষ্টি-শীল দুনিয়ার একটা ধার দেখা যাচ্ছে, ঠিক তখনই সেই ঘটনাটা ঘটল। জীবনও কখনো কখনো মেলোড্রামা দেয়।....

রাত তখন সাড়ে এগারোটা কি বারোটা হবে। নিখিল ওদের বাড়ির বাইরের দিকের একটা ঘরে স্টুডিও বানিয়েছিল। সেইখানে বসে ও তখন তুলির টানে ক্যানভাসের ওপর ফুটিয়ে তুলছিল অদ্ভুত একটা ছবি। একটা চারচৌকো দাবার ছকের এক কোনে, বাজার চেহারার একটা মানুষ, তার বড় বিপদ্ম দাবে মাত হয়ে যাচ্ছে। বিপক্ষের বল্‌ গুলোর মুখ মানুষের, তাতে ফুটে উঠেছে কাম, ক্রোধ লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্যের ছাপ।

ঠিক সেই সময় জানলায় এসে দাঁড়াল নিখিলের কলেজের এক বান্ধবী। বিবর্ণ মৃতের মত সেই বান্ধবীর গালে শুকিয়ে আছে জলের দাগ। নিখিল এবং তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবীরা জানত মেয়েটাকে অন্তসত্ত্বা অবস্থায় ফেলে তার প্রেমিকটি হাওয়া হয়ে গেছে।

—কি ব্যাপার?

মেয়েটির ঠোঁট বিড়বিড় করে নড়ে উঠল কিছু বলার চেষ্টায় কিন্তু শব্দ হল না।

নিখিল দরজা খুলে মেয়েটিকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এল।

—আজ রাত্তির, শুধু আজ রাত্তিরটুকু আমায় থাকতে দেবে?—

মেয়েটি অসহায় লজ্জায় চাপা কান্নায় গুমরে ফুঁপিয়ে উঠল। সেই মধ্যরাত্রে ছুঁচ-পড়া নিস্তব্ধতার মধ্যে মেয়েটির চাপা কান্নাও তীব্র শোনাল।

মেয়েটি ওর সামনে নিচু হয়ে বসে পিঠের জামা সরিয়ে এক বীভৎস ক্ষত দেখাল।

—মা আমায় খুন্তি পুড়িয়ে পিঠে ছ্যাঁকা দিয়েছে—আমি আর পারছি না নিখিল। আজ রাত্তির, শুধু আজ রাত্তির-টুকু....

মেয়েটি এবার হু হু করে কেঁদে উঠেছিল। জ্যাঠামশাই কখন নিঃশব্দে নেমে এসে পাথরের মত মুখে স্টুডিওর দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন। নিখিল তখন পরম্ন করছিল, ওর সামনে নতজানু, পিঠের জামা সরানো মেয়েটির মাথায় হাত রেখেছিল। জ্যাঠা-মশাইকে দেখেই চমকে ওর মাথা থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছিল নিখিল। তিনি গম্ভীরভাবে চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়েছিলেন। মেয়েটির প্রায় সাত মাসের গর্ভবতী অবস্থা তাঁর অভিজ্ঞ চোখ এড়ায়নি।

মেয়েটি হঠাৎ বোকার মত দৌড়ে এসে জ্যাঠামশাইয়ের পা জড়িয়ে ধরল। হতচকিত নিখিল ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল, কিছু বলতে পারল না। ফলে তিনি সমস্ত ব্যাপারটাই উল্টো বুঝলেন। আর জীবনে প্রথম, নিখিলকে উত্তেজিত হয়ে একটি চড় মেরেবসলেন, ইতর কোথাকার! তোমার মুখ দর্শন করাও পাপ। যাও, বেরিয়ে যাও বাড়ি থেকে।'

নিখিলের আর কিছু বলা হল না। তীব্র অভিমানী নিখিল, তার ছবি পত্তর গুটিয়ে, একবস্ত্রে মেয়েটির হাত ধরে চিবুক উঁচু করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। দুনিয়ার কোন খেলার হিসেব মেলে না। এই অদ্ভুত মেলোড্রামার পরিণতিও তাই রূপ করে মিইয়ে গেল।

মেয়েটি পরের দিনই তার দিদি জামাইবাবুর বাড়িতে কাছের মফঃস্বলে চলে গেল। তারপর নিখিল শুনেছিল, সে শরীর টবীর হাঙ্কা করিয়ে মাস দু-তিন বাদে নিজেদের বাড়ি ফিরে গিয়েছিল। এই চার হাত-পা ছড়ানো বিশাল শহরে মেয়েটির বাবা বাড়ি পাল্টে, শহরের এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে গিয়ে, মাস চার পাঁচের মধ্যেই সুপাত্রে মেয়েকে পাত্রস্থ করলেন। নিখিলের বান্ধবী, টিকটিকে কনে চন্দন চোখের জলে ভিজিয়ে একদিন শ্বশুরবাড়ি চলে গেল।

কিন্তু নিখিল আর তার নিজেদের বাড়িতে ফিরে গেল না। অদ্ভুত একগুঁয়ে কুকুর-বাচ্চার মত দাঁত মুখ খিঁচিয়ে, শেকল টানার জেদে অনড় হয়ে, হোস্টেলে, মেসে, বন্ধুদের বাড়িতে থেকে টিউশনি করে নিজের খরচ চালাতে লাগল।

এইবার পাকা বোহেমিয়ান জীবন। খাওয়া শোওয়ার ঠিক নেই। এমন দিনও গেছে যখন বাস্তবে পাঞ্জাবি-মোটর গ্যারাজে গাড়ি পাহারা দিয়ে, নাট বল্টু, গাড়ির খোলা ইঞ্জিনের পাশে তেলকালি মাখা বেঞ্চিতে শুয়ে শুয়ে, রাস্তাভোর। সেই সময়, গালে কোঁকড়ানো নবীন দাড়ি ঝুটে বাঁধা রুক্ষ চুল, তেলকালি মাখা পরের দেওয়া ঢলঢলে প্যান্ট নারকেল দড়ির বেল্ট বেঁধে, পায়ে হাওয়াই চপ্পল, চোখে সৃষ্টির স্বপ্ন মাখা সদাহাস্যময় তরুণ নিখিল, আর্ট কলেজে ফোর্থ ইয়ারের ক্লাস করতে আসত। ওর দিকে তখন সবাই তাকিয়ে থাকত।

এইরকম তাকিয়ে থাকতে থাকতেই একদিন আর চোখ ফেরাতে পারল না তপতী। সেই সদ্য সেকেন্ড ইয়ারে ওঠা ঢলঢলে, শ্যামলা, বড় বড় ফাঁদের চোখওয়ালা মেয়েটি, যে শহরতলি থেকে ট্রেনে করে এই ইঁট কাঠ পাথরের শহরে ছবি আঁকতে আসত।

সারা কলেজে নিখিল তখন হাঁরো। তার জেদের জন্যে, জীবনযাপনের জন্যে, আর সেই দাবার ছকের ওপর ষড়বিপুতে মাত হয়ে যাওয়া অসহায় বাজামানুষের ছবির জন্যে। ছবিটা দেখে একজন প্রবীণ অধ্যাপক নাকি বলেছিলেন, যে নিখিল আরো কয়েকটা এরকম ছবি আঁকলে, আমাদের বড় তুলি বাকসে বাখতে হবে।

ওই তপতীকে তখন নিখিল ভাল-বাসত না। আদপে তাকে ভাল করে চিনতই না। সেই সময়, সে কথা খুব কমই বলত। গাল ভর্তি কোঁকড়ানো দাড়ি, কপালের ওপর ঝাঁপান রুক্ষ কোঁকড়া চুল, তীক্ষ্ণ নাক, দুনিয়ার প্রতি ঈষৎ বিদ্রূপে বেঁকে থাকা চাপা দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁটের কোণে ধোঁয়ানো সিগারেট, তাকে একটা চমৎকার তীক্ষ্ণ পুরুষালী ব্যক্তিত্ব দিয়েছিল। তার দূর, মনস্ক, মর্মভেদি, শানিত দৃষ্টির মধ্যেও কিন্তু এক কৌতূহলী কিশোরের পৃথিবী চেনার মত অনাবিল আনন্দ মিলমিশ খেয়ে খেলা করে বেড়াত।

সেই সময় এক পড়ন্ত পৌষের বিকেলে, ফুলেশ্বরে, গঙ্গার ধারে, দলবেঁধে পিকনিকের

মধ্যে, হঠাৎ গঙ্গার জল ঝলসানো তপতীর চোখে চোখ পড়তেই বৈরাগী হয়ে গেল নিখিল।

নিখিল কলেজের শেষ পরীক্ষাতেও প্রথম হল। কলেজেই ওর নাম অনেক দূর অবধি ছড়িয়েছিল। পাশ করবার পর দুটো ভাল চাকরিও জুটেছিল। কিন্তু সেই জেদ, নিখিলের বুকের মধ্যে, স্বপ্নের মধ্যে, রক্তের মধ্যে ঘুরে বেড়াত। আর একটাই উত্তর দিত, 'না,' নিজেকে এভাবে বিক্রী করা যায় না। স্বাচ্ছন্দ আর আরাম আমাকে মোটাসোটা একটা ষাঁড় বানিয়ে দেবে।

নিখিল চাকরী নিল একটা স্কুলে। ড্রইং মাস্টার। দুপুরের দিকে তিন চারটে ক্লাস। আর সারা বছর অফুরন্ত ছুটি। শেয়ালদা স্টেশনের পাশে, বড় রাস্তার ধারে, এই বুড়ি কলকাতার যৌবনে বানানো একটা প্রায় ধ্বসে পড়া বাড়ির দোতলায় একটা বড ঘর ভাড়া নিল। এখানেই সে তার সৃষ্টির জগতের আলোছায়া জীবনে বাস করতে লাগল।

তপতী আর নিখিল, তাঁত বুনে যাওয়া এক দক্ষ তাঁতির হাতেরদুই রঙিন সুতোর মত মানুষ তালে তালে ফুলকাটা নকসা কুটিয়ে চলল এই শহরের শাড়ির পাড়ে পাড়ে।

পরিচিত, অর্ধ পরিচিতরা প্রায় সবাই জানে যে ওরা বিয়ে করবে। ওরাও তাই জানে, অন্তত বিশ্বাস করে। তপতীও প্রায় তিন বছর শেষ পরীক্ষা পেরিয়ে গিয়ে চাকরি করছে একটা বিজ্ঞাপন সাজানোর অফিসে। ওর একটা ভাই অন্তত চাকরি না পেলে, নিখিলকে বিয়ে করে এই ঘরে চলে আসা, স্বার্থপরতা। বাবা বছর দুই হল রিটায়ার করেছেন।

তপতী সপ্তাহে অন্তত তিন চার দিন, সন্ধ্যার পর, নিখিলের এই স্টুডিও ঘরটায় চলে আসে। দু-তিন ঘন্টার জন্যে হলেও নিজেদের তৈরি এক আশ্চর্য ছবির পৃথিবীতে বসে ওরা স্বপ্ন দেখে, গল্প করে। ক্লান্ত হয়। চলে যায়, আবার আসে। আবার স্বপ্ন দেখে....

নিখিল তার নিজেরই অজান্তেই ক্রমশ একটা সমঝোতায় চলে আসছিল। কলেজের সেই বর্ণময় পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর গত কবছরে নিখিলকে সকলে ধীরে ধীরে ভুলে যাচ্ছিল। ওরা স্কুলের চাকরির মাইনেতে, ঘর ভাড়া, খাকা খাওয়া, বড তুলি, সব একসঙ্গে হয় না। একটা ভালো ক্যানভাস বা রঙ কিনলে মাসের শেষ কদিন চা জল-খাবার বাদ। সিগারেটে টান পড়ে বিড়িতে দাঁড়ায়। জামা, কাপড, চটি, এইসব টুকি-টাকি জিনিস তপতীই প্রয়োজন বুঝে কিনে এনে চোখের সামনে রেখে দিত। নিখিলও পুরোনোটার বদলে নতুনটা পরে ফেলত, আবার সেগুলো পুরোন হত।

একবার তপতীর মায়ের অসুখে, হাসপাতাল, ডাক্তার, ওষুধে, হঠাৎ প্রায় হাজার খানেক টাকা ধার হয়ে গেল ওদের। তারপরের বিরক্তিকর তাগাদার দিনগুলোতে ওরা প্রায় অসহায় হয়ে পড়ল। আঁকার সময় সামনে পাওনাদার দাঁড়িয়ে থাকার অনুভূতি নিখিলের আগে হয় নি।

ওরা মিউজিয়মের ধারে, ফুটপাথের রেলিংএ ছবির প্রদর্শনী করল। তপতী আর নিখিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, তীব্র উৎসাহে জ্বলে উঠে, পথচলতি চিত্ররসিকদের, তুলির টান, রঙের আশ্চর্য ব্যবহার, বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক বোঝাল। তারপর রাত্তিরে ক্লান্তদেহে সব ছবি ঘাড়ে করে স্টুডিওয় ফিরে এল।

যে ছবিটা ভবিষ্যতে হাজার হাজার টাকায় বিক্রী হবে বলে তপতীর কাছে গর্ব করেছিল নিখিল, তৃতীয় দিনে ফুটপাতে তার দর উঠল পনেরো টাকা। তারপরেও চিত্ররসিক খদ্দের মশাই, 'বড্ড বেশী বেশী দাম বলছেন' বলে নাক কোঁচকালেন।

নিখিল খানিকক্ষণ গুম হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে, এক এক করে ছবিগুলো রেলিং থেকে খুলে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল। সেদিন আর তপতীর চোখের দিকে তাকাতে পারেনি নিখিল।

একদিন ওদের কলেজের সেই স্নেহ-প্রবণ প্রবীণ অধ্যাপক, লোককে জিজ্ঞেস করে করে এক মাঝবয়সী ভদ্রলোকের সঙ্গে নিখিলের স্টুডিওতে এলেন। সঙ্গের ভদ্র-লোকের গায়ে দুশ্চিকট্ দামী ঝকঝকে জামাকাপড়। হঠাৎ পয়সা কড়ি মানুষের অস্থির ছটফটে চালিয়াতি গলায় বললেন— "আমি মশাই এসব ফাইন আর্টস ফার্টস বুঝি না। তবে সেদিন মিঃ দত্তের ড্রইংরুমে দেখলুম কি সব লাল নীল হিজিবিজি টাঙিয়েছে। আরে মশাই! মেয়েমানুষের ব্যাপার জানেনতো! বাড়ি ফিরেই আমার মিসেস বায়না ধরলেন যে আমাদের ড্রইং-রুমেও ওইরকম একটা ফাইন আর্টসের ছবি চাই। বুঝুন ব্যাপার!

কথা শেষ করেই ভদ্রলোক নিখিলের দিকে তাকিয়ে বড় নাকটা দিয়ে ফোঁত্ করে একটা শব্দ করলেন। অধ্যাপক, ভদ্রলোকের আড়ালে নিখিলকে ইশারা করে বললেন, ছবি দেখাও। দরদাম করে, নিখিলের একটা প্রিয় ছবি, দুশো পঁচিশে বিক্রী হল। বাজারের সেরা ইলিশটা কানকোয় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়ার মত ছবিটা ঝুলিয়ে চলে যাবার সময়, সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক

সদ্য প্রকাশিত

শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের

একখানি মহৎ গ্রন্থ

১। কাছের মানুষ অবনীন্দ্রনাথ

শিল্পগুরুর জীবন সায়াহ্নের নিত্য সাথী লেখক তাঁর রচনায় শিল্পগুরুর হৃদয়ের এক অপ্রকাশিত দিগন্ত উন্মোচিত করে মানুষ অবনীন্দ্রনাথকে ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ করে দিয়েছেন।

মূল্য—১৫৲

২। সিন্ধুপারের পাখী

কয়েকবার বিশ্ববেষ্টনে সুদূরে বিদেশের নানা স্থানে বসে রচিত—এক ঝাঁক নতুন স্বাদের কবিতা উপহার দিয়েছেন যার পরিবেশ ভারতবর্ষের বাইরে।

মূল্য—৬৲

প্রকাশক : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ বিধান সরণি : কলিকাতা-৬

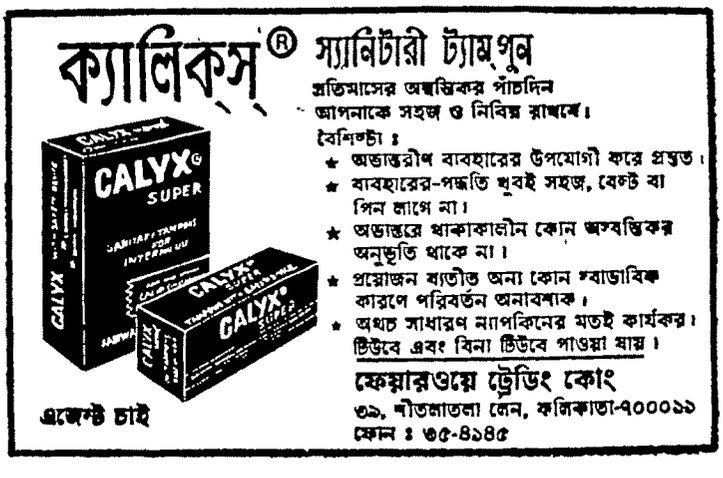

স্বোচ্চার ফিসফিসে ভঙ্গিতে প্রফেসারকে বললেন, 'দেখুন, স্যার, ঠকলাম নাতো? হেঁ...হেঁ"

ঠিক সেই সময় নিখিল পাত্র শোকে নিথর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দৌড়ে গিয়ে, এক-টানে ছবিটা ভদ্রলোকের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে, মুখের ওপর টাকা কটা ছুড়ে দিয়ে ওর বলতে ইচ্ছে করেছিল, —যা ভাগ—ভাগ্ শালা।'

বলা হয়নি। আরো প্রায় আটশো টাকার দরকার। ভদ্রলোককে এগিয়ে দিয়ে প্রফেসর ফিরে এসেছিলেন। সব শুনে বলেছিলেন, দুঃখ করো না নিখিল, এরকম হয়। সবার জীবনেই এক একবার খারাপ সময় আসে। আচ্ছা! একটা কাজ করবে? ভালো, চমৎকার একটা প্রোটেট আঁকতে পারবে? পয়সা ভালই পাবে। আমার এক বন্ধুর বাবা মারা গেছেন। ফটো দেখে একটা ভালো প্রোটেট করে দাও দিকিনি, তোমার দেনাটেনা শোধ হয়ে যাবে।

সেই থেকে শুরু হল। সেদিন রাত্রে লেনার দরুণ টাকা শুধে দিয়ে বাকি পাঁচশ টাকায় ভ্রমরমাট ফুর্তি উড়িয়েছিল নিখিল। পরের দিন সন্ধেয় তপতী এসে দাঁড়াতেই, নিখিল বলেছিল, —তুতি! পেটের দায়ে একটা ছেলে বেঁচে গিলাম।

তখন ওর ঠোঁটে মরা হাসি আর চোখ চকচক করছিল।'

—একটা প্রোটেট আঁকার অফার পেয়েছি।

—তুমি প্রোটেট আঁকবে, নীল?

—হুঁ। উপায় নেই।

—আর তোমার সৃষ্টির ছবিরা।

—তারাতো আছেই. আগে বাঁচার জন্যে এটা..সামনে পাওনাদার দাঁড়িয়ে থাকলে ভালাগে না।

—কিন্তু—

—আমি এখনও মরে যাইনি তুতি। অনেক সময় আছে।'

নিখিলের প্রত্যয় সেদিন দৃঢ় ছিল। আর তপতী ওর বুকে মুখ গুঁজে ঝড়ের মত থর থর করে কেঁপে উঠেছিল।

*

আজ নিখিলের সামনে রবেনের মতো টাকুমা সাদা লোমওয়ালা কাপড়ে ঢেকে নিচে, জানিতে ধূসর দুই চোখ মেলে, হাতে ছবি-নমের কড়োজালি নিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। কাল সন্ধেবেলা রবেন ছবিটা নিতে আসবে।

এখন মৃত লোকের প্রোটেট আঁকার নিখিলের খুব নাম। এই মুহূর্তে ওর চোখের সামনে বৃদ্ধার তোবড়ানো গাল, নাকের তলায় ফাটাফুটি দাগ ও বাসি মাংসের মত ঠোঁট। যে ফোটোগ্রাফটা দেখে আঁকছে তাতে বৃদ্ধার গোঁফের রেখাও বেশ স্পষ্ট। ঘুতনিতে চোখে পড়ার মত দু-চারটে সাদা লোম।

রবেন ওগুলো বাদ দিয়ে দিতে বলেছে। উনি নাকি যৌবনে খুব রাশভারী মহিলা ছিলেন। ছবিতে সাদা মোটা থান পরে আছেন। রবেন কিন্তু সার বার বলে গেছে ওটা বেশ ফাইন থান কাপড় করে দিতে।' তাতে নাকি বংশের ইজ্জত বাড়বে। আর আর মুখের ওই দুঃখী দুঃখী ভাবটা সরিয়ে হাসি হাসি করে দিলে ভাল হয়।

এসব কাজ নিখিল এখন ভালই পারে। সার্ট পরা ছবি দেখে, কাশ্মীরী শাল জড়ানো খানদানী বাঙালী বানায়। সারা জীবন অম্ল-রোগে ভুগে মরে যাওয়া লোকের মুখে ব্যক্তিত্বের বজ্রকঠিন্য আনে। অবহেলায় শেষ হয়ে যাওয়া বড়লোকের বৌ-এর শরীরে ফরমায়েসী জড়োয়া গয়না আঁকে নিখিল।...

কিন্তু আজ ছবিটা শেষ করে ফেলতেই হবে। কাল সকালে ফাইন থান কাপড় পরিয়ে দিয়ে শেষ করে ফেলতে হবে ফেমিং।' নিখিল আবার তুলি তুলে নেয়।

হঠাৎ দরজাটা নিঃশব্দে খুলে গেল। তপতী আস্তে পা টিপে টিপে ঘরের মধ্যে এসে পিঠ দিয়ে দরজা ভেজিয়ে দেয়। নিখিল একাগ্র সরু তুলিতে কী চোখের নিচের পাতায় রঙ দিচ্ছে। কোনদিকে নজর নেই।

আবছা অন্ধকারে দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ওই তপতীর বয়স এখন নাতাশ। ঠিক রাত আটটা পঞ্চাশের গাড়ি ধরতে হবে। ওর গায়ে ঘোর মেরুন রঙের একটা শাড়ি, তাতে সাদা বড় বড় ডালাই কাজ এই আবছা অন্ধকারের মধ্যেও জ্বল জ্বল করছে।

ও নিঃশব্দ পায়ে এসে নিখিলের পেছনে দাঁড়ায়। হাতে একটা প্যাকেট। হাত পেছনে করে, ঝুঁকে ফটোর সঙ্গে প্রোটেটটা মেলাতে থাকে। নাকটা একটু কুঁচকে, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে।

চমকে ওঠে নিখিল. তারপর বলে, 'তুমি কতক্ষণ?' তপতী মৃদু হাসে। কোন উত্তর দেয় না। নিখিল দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটা কামড়ে আবার ঘাড় গুঁজে তুলির টান দিতে দিতে বলে, —দাড়াও, এক মিনিট। প্রায় হয়ে গেছে।

তপতী একটা বড় নিঃশ্বাস চাপল। কাল বড়দিন। কিনে নিয়ে আসা কেকটা, দেওয়ালের ধাবের ছায়া ছায়া অন্ধকারে রাখল। ওখানে টেবিল। মিটসেফটা থেকে বের কবল ছুরি, চামচ আর দুটো ডিশ। আর মাত্র এক ঘন্টা, রাত আটটা পঞ্চাশের গাড়ি ধরতে হবে। ছোট ভাইটার চাকরির কথা প্রায় পাকা হয়ে এল। ছোট বোনটা কিরকম যেন হয়ে যাচ্ছে। দুপুর দুপুর কলকাতায় চলে আসে। সারাদিন, বিকেল, ওড়াউড়ি করে সন্ধের পর বাসায় ফেরে। কি করে কে জানে?

তপতী কেকটা কাটতে কাটতে আবার নিখিলের দিকে তাকায়। 'ওই আমার পুরুষ।' সাদা ক্যানভাস থেকে প্রতিফলিত বিচ্ছুরিত আলো পড়েছে তার পুরুষের জ্বলজ্বলে চোখের ওপর। কপালে। সেই লোকডাকা দাড়িওয়ালা নিখিলের কপালে এখন একটা, দুটো, তিনটে. সমান্তরাল রেখা, গায়ে আবছা খালো খদ্দরের ধবধবে ওঠা মোটা চাদর।

সেই মুহূর্তে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তপতীর মনে হয় যেন ওরা বহু বছর বিবাহিত। শুধু রাত্রে পাশাপাশি শোয় না। কেবলমাত্র সেটুকুর জন্যেই কি ওরা বিয়ে করবে! আলো, শাঁখ, সানাই, উলু, জোড়, চেলি, কনেচন্দন, বাসর, ফুলশয্যা..

বছর দুই আগের এক ট্রেন বন্ধ থাকা রাত্রিরে, এগারোটা পর্যন্ত শেয়ালদার প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে থেকে, পা ঘসতে ঘসতে মাথা নিচু করে এ বাড়িতেই ফিরে আসা, আবার কিছু দ্বিধাজড়িত সময় কাটিয়ে তালতলায় এক দূর সম্পর্কের পিসিমার বাড়িতে রাত কাটানো. তবু এই ঘরে সেদিন রাত্রে থাকতে সঙ্কোচ বোধ করেছিল তপতী।

এখনও একা একা কোন গাঢ় গুঢ় মুহূর্তে নিজেকেই প্রশ্ন করে তপতী. 'সেদিন রাত্রে তুমি তোমার কি বাঁচিয়েছিলে. তপতী?'

কোন উত্তর পায় না। একটা বিপর্যস্ত, মাথা নিচু. ঠোঁট কামড়ানো কুণ্ঠিত তপতী, তপতীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে।....

নিখিল হাসি হাসি মুখে তুলি নামিয়ে, উঠে, দূর থেকে চোখ সরু করে ছবিটা এগিয়ে পেছিয়ে দেখতে দেখতে বলে, —বলো! কি খবর তুতি? কি ভাবছো একমনে—

তপতী কোন উত্তর দেয় না। স্থির একাগ্র দৃষ্টিতে ছবির দিকে তাকিয়ে থাকা নিখিলের ধাবালো মুখের একটা ধারের দিকে তাকায়। দীর্ঘ নিখিল. একটু কুঁজো হয়ে গায়ের চাদর সামলে কোনের টেবিলটার সামনে গিয়ে হঠাৎ উল্লাসে, অথচ বিস্ময়ে গলায় বলে,

—যাঃ বাবা! কি ব্যাপার মেমসাহেব? আজকে একেবারে বেক! ভালই হল, যা খিদে পেয়েছে না, সারাদিন কাজ করতে করতে—

তপতী কোন উত্তর দেয় না। 'এই ওর

পুরুষ? এরই সঙ্গে আজ প্রায় পাঁচ বছর, সন্ধেবেলাটুকু এই ঘরে ধব করছে। শুধু রাত্তিরে থাকে না। রাত্রে আটটা পঞ্চাশের পর ওর জন্যে অপেক্ষা করে, দীর্ঘ, রাতের রেললাইন। কুয়াশা। লাল, সবুজ, হলুদ, সিগন্যালের আলো। চিৎকার। আধ্ ঘুমন্ত যাত্রী। আর এক প্রায় অন্ধকার শহরতলীর প্ল্যাটফর্ম। সাইকেল রিক্সা। তারপর তাদের খুপরি বাড়ি, প্রাপ্ত কেরাণি বাবার রুক্ষতাপূর্ণ ভোগা মরা মাছের মত অবিশ্বাসী চোখ, অসুস্থ মায়ের গোঙানি, বোনের বিশ বসন্ত পেরুনো ছলকান শরীরে ক্রমবর্ধমান স্বেচ্ছাচারিতার ছাপ, ভাইটার রাজনৈতিক পোস্টারের ব্রাড়ো কথা হ্যান্ডবিল, ঢাকা চাপা ঠাণ্ডা ভাত, আর রাতজাগা কুকুরের চিৎকার। ..

—আঃ! চমৎকার কেকটাভো! কোত্থেকে কিনলে তৃপ্তি? আরে, তুমি তো খাচ্ছ না, কথাও বলছ না, কি হয়েছে তোমার?

—নাঃ কই কিছু হয়নি তো। তুমি খাও। আমি খাবোখন—

নিখিল এবার সচেতনভাবে চোখ তুলে তপতীর দিকে তাকায়। তারপর নিখিল দেখে তপতীর চোখ কি গভীর কালো আর অতলান্ত। আগে আগে ঠাট্টা করে বলত, ঠিক যেন জোড়া ভোমরা. বসেছে তোমার ভুরুর তলায়, দেখো তৃপ্তি, যেন উড়ে না যায়।

আজ দেখল, তপতীর চোখ টল টল করছে।

—আজ তোমার কি হয়েছে তপতী? আমায় বলবে না?

তপতী বড় অদ্ভুত একটা হাসি হাসে। তারপর বলে, —বলছিতো, আমার কিছু হয়নি। আজ তোমায় একটু দেখছি।

তপতী একটা নিঃশ্বাস চাপে, তারপর মনে মনে বলে, 'হায়রে! এই কি আমার সেই পুরুষ?' ওর মুখে এক আশ্চর্য হাসি ছুঁয়ে থাকে। তারপর হাত দিয়ে একটুকরো কেক তুলে মাথা নিচু করে মুখে দেয়। নিখিল হাতঘড়ি দেখে, আটটা। আর মিনিট পনেরোর আধ ঘণ্টা তপতী থাকবে। তারপরই ছবিটা—

নিখিল চোখ তুলে দেখে তপতী ঘাড় গুঁজে একটু একটু করে ঠুকরে ওর ভাগের কেকটা খাচ্ছে। ওর দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকবার পর হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত জেগে ওঠা এক অনুভূতির যন্ত্রণায় ছিঁড়ে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যায় নিখিল। তপতীর হাত আগের চেয়ে কত শীর্ণ! কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে এসেছে. সরু সোনার চেনটা খাওয়ার সময় গলার কাছে উঠছে নামছে। তপতীর বয়েস প্রায় সাতাশ হল। হঠাৎ মনে পড়ে, আজ নতো চব্বিশে ডিসেম্বর, তপতীর জন্মদিন। নিখিল ভুলে গেছে। ওর একদম মনে ছিল না। ওর সামনে ঘাড় মুখ গুঁজে ভাঁজ হয়ে বসে থাকা তপতীর মুখে সারাদিনের পরিশ্রম আর ক্লান্তির ছাপ। একপাশে উবু হয়ে বসে আছে ওর অন্ধকার দাবা। নিখিল আজকাল কত কি ভুলে যায়! সেই ঢলঢলে লাজুক মেয়েটা কোথায়? এ কোন তপতী? ওর বেণী ভেঙে গেছে। চুল কমে গেছে মেয়েটার। আগে কোমর ছাড়িয়ে ঢাল হয়ে থাকত। আগে কখনই কাজলই পরত না, এখন আগের দৃষ্টিকে বজায় রাখার জন্যে কাজলও পরে তপতী। নিখিলের বুকের মধ্যে, বাঁজা মাঠের ওপর চৈত্রের পাতা ওড়ানো হু হু হাওয়ার শব্দ হয়। ও আস্তে হাত বাড়িয়ে আলোটা নিভিয়ে দিল।

তপতী চমকে ওঠে। থর থর করে কেঁপে ওঠে শরীর। —কি হল?

ধীরে ধীরে খাট থেকে উঠে জানলার ধারের চেয়ারটায় বসতে বসতে অনেকদিনের পুরোন গলায় নিখিল বলে, —তৃপ্তি.. আমার কাছে একটু আসবে?

সেই অদ্ভুত অন্ধকারে নিখিলের গলার শব্দ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে তরঙ্গের মাঝে দিয়ে তপতীর শরীরে প্রবেশ করে। সেই অন্ধকারে তপতী একটু সময় নেয়। সন্তর্পণে সেই জানলার ধারে অন্ধকারে নিখিলের পাশে এসে দাঁড়ায়। অস্ফুটে বলে, —কি?

'ওর পুরুষ' কোন উত্তর দেয় না। আস্তে, অন্ধকারে চোখ সরে আসে। জানলা দিয়ে। বাইরের রাস্তা থেকে আসা আবছা আলোয় সারা ঘর ভরে গেছে। নিখিল, তপতীর কোমরে হাত দিয়ে কাছে টানে।

তপতী কোন কথা বলে না। আস্তে চেয়ারের হাতলের ওপর বসে। নিঃশব্দে দু-তিন মিনিট কেটে যায়। নিখিল গাঢ় গলায় বলে, —তপতী তুমি কিছু বলো—

তপতী অন্ধকারের গলায় বলে, —জানো! আজ আমার একটা স্পেশাল ইনকিউমেন্ট হয়েছে কাজের জন্যে—

নিখিল অসহায় কুকুরের মত চিৎকার করে বলতে চেষ্টা করে, তৃপ্তিরে—এসব কথা নয়. আমরা আমাদের জীবনের সোনালী দিনগুলো এই অন্তহীন অপেক্ষায় শেষ করে ফেললাম কিন্তু ওর গলা দিয়ে কোন শব্দ বেরোয় না।

তপতী আবার ফিসফিস করে বলে, —নীল, তোমার নতুন ছবির কথা কিছু ভাবলে? অনেকদিন কোন সীতাকারের ছবি আঁকোনি।

কেউ কারো মুখ স্পষ্ট দেখতে পায় না। মাঝখানে এক অলৌকিক অন্ধকার পর্দাকে দাঁড়িয়ে আছে। ধীরে ধীরে নিখিলের চোখের সামনে ভেসে ওঠে বরেনের মৃতা, বৃদ্ধা ঠাকুমার মুখ। সেই খোসা ছাড়ান আঁসফলের মত চোখ মেলে, থুতনির সাদা সাদা লোম নিয়ে, খুনখুনে গলায় হাঁসছে। আর সেই বৃদ্ধার পাশে দাঁড়িয়ে, দাবার বিশাল ছকের ওপর রাজার পোষাক পরা নিখিল, হাতে একটা সরু তুলি নিয়ে, তার মৌলিক আদিম বিপদের কাছে মাত্ হয়ে যাচ্ছে।

আবার তার চোখের সামনে থেকে সবকিছু মুছে গিয়ে ভেসে ওঠে নতুন ছবি। এক দীর্ঘ ঘোড়সওয়ার, পিছনের দীর্ঘ ছায়া নিয়ে, পার্বত্য অরণ্যানীর মধ্যে তীব্রগতিতে ছুটে চলেছে। পথে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য ঝরা পাতা মরুপাক খেয়ে উড়ে, কিংধে থাকা সোনালী বল্লমের মত রোদ্দুরে ঝলসাচ্ছে। ...

—আচ্ছা তপতী! বলতে পারো, সকলেই কেন অর্জুন হয় না? বল না?

কেন! ঠিক আসল যুদ্ধের সময় কর্ণের রথের চাকা মাটিতে বসে যায়?

তপতী কোন উত্তর দেয় না। আস্তে হেলে, সরে আসে ওর পুরুষের বুকের ওপর। ওদের দুজনের দীর্ঘ ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যায়। শীতের রাত্তিরে, বাইরের রাস্তায় বেশী সাড়া নেই। আবছা চাদরের মত হিম কুয়াশায় বাইরেটা ঢেকে গেছে। একফোঁটা গরম জল তপতীর চোখ ছাপিয়ে, গাল, চিবুক বেয়ে গড়িয়ে টুপ করে নিখিলের বুকের ডান পাশে এসে পড়ে। ঝিড় ঝিড় করে বুক নিংড়োনো গলায় তপতী বলে, —নীল! আমি আর এভাবে পারছি না। আর কতদিন! আরো কতদিন?

দূরে রাস্তার ওপারে একটা বিজ্ঞাপনের আলো, লাল, সবুজ, হলুদ, বর্ণালী রঙ ছড়িয়ে পাল্টাচ্ছে পাল্টাচ্ছে আর মরছে। জানলা দিয়ে আবছাভাবে ভেসে এসে, তপতী ও নিখিলের শরীরের ওপর নিজেকে ছড়িয়ে নিয়ে মাচ্ছে কামনা বাসনা, যৌবন পরিণতি।

আস্তে তপতীর হাত নিজের মুঠোয় তুলে নেয় নিখিল তারপর কিছু সময় দূরে গলায় ওর কানে কানে বলে,—তৃপ্তিরে, আর আমাদের হাতে সময় নেই। হাতে পেয়ে ছেড়ে এমনকি হিসেব এখান থেকে আর কোথাও নয়।

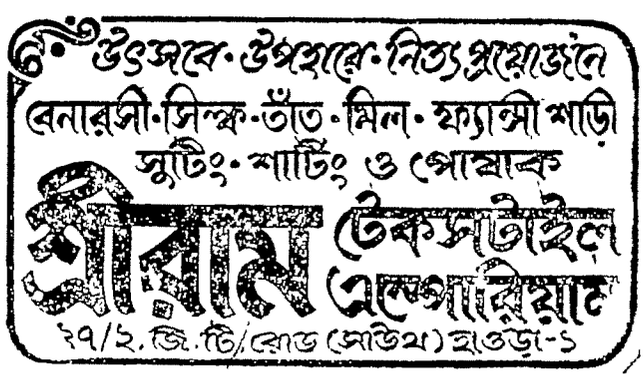

অন্তর্গত পিপাসা

অমল মুখোপাধ্যায়

বর্তমান আলোচনাচক্রের উদ্যোক্তা আমার তরুণ বন্ধুগণ এবং সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়বৃন্দ।

আপনাদের এই ছোট্ট ও পরিচ্ছন্ন সাহিত্যসভায় আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ করে আপনারা আমাকে যে সম্মান দেখিয়েছেন, প্রথমেই বলে রাখি, আমি তার যোগ্য নই। গত দশকে আমি কিছু গল্প ও কয়েকটি উপন্যাস রচনা করেছিলাম এবং কিছু সুনাম অর্জন করেছিলাম। এই আমার পরিচয়পত্র। তারপর অনেকদিন আমি কিছু লিখিনি। লিখতে পারিনি বললেই ভাল হয়। চল্লিশে পা দিতে দিতেই আমি ফুরিয়ে গেছি

বলে আমার যে সমালোচনা করা হয় আমার মতে তা যথার্থ। এখন অভ্যাস-বশতঃ এবং অর্থের লোভে কিছু কিছু লিখি বটে, কিন্তু সে লেখার গুণের জোরে আমাকে এখানে আনা হয়েছে বলে আমি মনে করি না। আপনাদের উদারতার কারণে আপনারা কনসোলেশান প্রাইজ বলে একটা জিনিসের ব্যবস্থা রেখেছেন। আলোচনার শেষ দিনে, সে ব্যবস্থায় আমার ডাক পড়লেও আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

আপনারা আপনাদের কাজ করেছেন। কিন্তু আমার কাজটা আপনাদের চেয়ে অনেক কঠিন। বক্তৃতা দেওয়া। এমন বিষয়ের উপর বক্তৃতা দেওয়া—সাহিত্য তত্ত্ব—যার উপর আমার কোনই এক্তিয়ার নেই। তার উপর আলোচনার জন্য কোনই স্বাধীনতা দেননি—এমন সব কঠিন প্রশ্নমালা তৈরি করেছেন—আমি কেন লিখি, কবে কি পরিস্থিতির মধ্যে লিখতে শুরু করলাম, কোন আদর্শে বিশ্বাস করি, সাহিত্য আমার জীবিকা না উপজীবিকা, আমি রোমান্টিক না রিয়ালিষ্ট, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে শিল্পীর কোনো সামাজিক দায়িত্ব আছে কিনা—যার উত্তর আমি জীবনেও দিতে পারবো না। এ সব প্রশ্নের উত্তরই যদি দিতে পারবো তাহলে এত-দিনে ক্যাতাক্সার এ্যামবাসেডর হয়ে যেতাম। এ সবের জন্য চলতি কথায় যাকে বলে বেশ মাল থাকা চাই। অর্থাৎ যাকে বলে বেশ লেখাপড়া থাকা চাই।

আপনারা সম্ভবতঃ অনেকেই জানেন না, ও জিনিষটা আমার একদম নেই। শৃংখলাবদ্ধভাবে আমি কিছুই শিখিনি বললেই হয়। আমার সংগ্রহে যা কথা আছে তা সবই আমার চলার পথে পাওয়া। আপনাদের কাছে তার মূল্য হয়তো এক কানাকড়িও হবে না। তবু যদি আপনাদের ধৈর্যের উপর অত্যাচার না-হয়ে যায়, তাহলে দিল খুলে তার কয়েকটা কথা বলতে পারি, তা যদি আপনাদের প্রশ্নের উত্তর হোল, তো হোল। না হলে এটাকে বকবকানির আসর মনে করে আমাকে মাফ করে দেবেন।

সত্য কথা স্বীকার করতে আমার কোন লজ্জা নেই। ঐ যে লেখাপড়ার কথা বললাম, ওটা আমি করিনি মানে এই নয়, আমার হয়নি। অর্থাৎ আমার মস্তিষ্কের বা মেধার অক্ষমতার কারণে হয়নি, এমন নয়। আমি করিনি—করিনি মানে করার সময় পাইনি। বাড়ির অবস্থা খুব ভাল ছিল না। আর পেটে ছিল অসম্ভব খিদে। এই খিদেটা আমার জীবনে অনেক ক্ষতি করেছে। বেঁচে থাকার কারণে আমাকে ছোটবেলায় এত চুরি জোচ্চুরি এবং তঞ্চকতা করতে হয়েছে, আপনাদের কি বলবো। ক্লাস থ্রি-ফোর থেকেই আমি সৎ কাজ করার খুব কম সময় পেয়েছি, এবং সত্য কথা আমার বলার উপায় ছিল না। মিথ্যার চেইন দিয়ে সত্যটাকে আমি এত নিখুঁতভাবে গোপন করে রেখেছিলাম যে, একটা সত্য বললে গোটা চেইনটা খুলে যায়।

ফলে গোটা ছোট বেলাটাই আমি দৈহিক ও মানসিক হেনস্থার মধ্যে কাটিয়েছি। বাবার জুতোর বাড়ি থেকে আরম্ভ করে ভূগোলের মাস্টারমশায় পটু-বাবুর বেতের বাড়ি, মাঝখানে কিল চড ঘুসি—একটা না একটা আমার ভাগ্যে প্রতিদিনই জুটতো। স্কুলে তিন মাস্টার মশায় ছিলেন রেবতীবাবু, হরিদাসবাবু আর ঐ পটুবাবু। আমাকে এবং ক্লাসের আরো দু-তিনটি দুর্বল ছেলেকে দেখে যেন তাঁদের উল্লাস বেড়ে যেত। আত্ম-রক্ষার আদিম তাগিদে, মাস্টারমশায়রা যতই শাস্তির নূতন নূতন পথ উদ্ভাবন করতেন—আমিও শাস্তি থেকে অব্যা-হতির নব নব কৌশল আবিষ্কার করতাম। বাড়িতে কোন আনন্দ ছিল না। গরীবের বাড়িতে আনন্দ বলতে বোঝায় ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া। তাও সব সময় জুটতো না। একদিকে নিরানন্দ বাস-নিকেতন, অন্য দিকে স্কুলে শাস্তির ভয়ে প্রতিদিন গুরুর সঙ্গে দাঁড়িয়া বাধা খেলা—একদিন ভাল লাগল না। ক্লাস টেনের টেস্ট পরীক্ষার মুখে বাবার জন্য একটি চিবকুট রেখে আমি বেরিয়ে পড়লাম। আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উপস্থিত করা হয়েছিল, আমার সংস্কৃতজ্ঞ মাতামহের ভাষায় তার নাম হল ইন্দ্রিয় পরবশতা। তখন কথাটার মানে বুঝিনি। কিন্তু আজ বুঝতে পারছি, অনেকেই সেটার মানে বুঝতে ভুল করেছিলেন। লোভই আমার পতনের মূলে বলে ধরেছিলেন। এবং শাস্তি-গুলোও সেই অনুপাতেই হয়েছিল। কিন্তু আজ আমি স্পষ্ট মনে করতে পারছি—লোভ নয়, ক্ষুৎপিপাসা নয় চৌর্যবৃত্তি নয়—আরো এক বিস্ময় আমার রক্তের মধ্যে খেলা করতো। আমি দিগ্‌দিগন্ত থেকে আহ্বান পেতাম। আমি জানতাম, গাঁয়ের জমিদার কেদার চক্রবর্তীর বাড়ির বিশাল জামগাছটার জাম কবে বসনিটোল হয়ে উঠবে। অথবা কিংবদন্তী গাংগুলীর শশা ক্ষেতের শসা-গুলির তিতো ভাব চলে গিয়ে কবে মিঠে ভাব আসবে। কান্দার মার জলডুবি আনারসের কয়েকটি আনারস শ্রাবণ মাসের কত তারিখ নাগাদ সুমিষ্ট ও রসাল হয়ে উঠতে পারে সে সম্পর্কে আন্দাজ করবার একটি বিধিদত্ত শক্তি আমার ছিল। এবং সেই অনুসারে আমি এই প্রাকৃতিক সম্পদগুলির মহত্তম ব্যবহার করেছিলাম। প্রথম দিকটি দলের ছোটদের যারা পক্ষীশাবকের মত নিয়তই ক্ষুধার্ত থাকতো। তারপর দ্বিতীয়টি সেই সব ছেলেদের যারা দলে না থাকলেও বিবিধ উপহারে আসতো। এবং অন্তে কিছু থাকলে আমি ও আমার প্রধান সাগরেদ তাতিৎ স্বাদ পেতাম। অথচ লোভী এবং চোর এই অপবাদেই আমাকে অধিকাংশ শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।

ভদ্রমহোদয়গণ, আজ যখন সচেতন চেষ্টায় অনেক কিছুতেই লোভ তৈরি করেছি, অনুপার্জিত টাকা, বিদেশী পানীয় এবং ভিন্ন জাতীয় খাদ্য-সামগ্রী—তখন বুঝতে পারি, শৈশব ও কৈশোরে চুরি, অপহরণ ও অপকৌশলে যা অর্জন করেছিলাম, তাকে আর যাই হোক লোভ বলা চলে না। অপরাধবোধ ছিল না বলে, শাস্তি, অপমান ও অব-হেলার ব্যথাগুলি বড় ওস্তাদের হাতে সেতারের টানের মত বাজতো। কিন্তু সে দুঃখ জানাবার জায়গা ছিল না।

তবে একথা সত্য, খিদেটা আমার বরাবরই অত্যন্ত বেশী। বাড়তি বয়সে আমার অনবরত খিদে পেতো। মুড়ি চিড়া খৈ ছাতুর মধ্যে মানুষ হয়েও এইগুলিতে আমার ঠিক শান্তি হতো না। ভেতর থেকে একটা অন্য কিছুর চাহিদা অনুভব করতাম। একমাত্র বিবাহ কি উৎসবের বাড়িতে যেখানে ছানাঘোত দ্রব্য এবং মাছ ও মাংসের পেটচুকতি ব্যবস্থা থাকতো, সেখানে খেয়েই আমি যথার্থ তৃপ্তি পেতাম। মনে হোত, আমার আসল জায়গাটা পেয়ে গেছি। হলে হবে কি, প্রতি দিন তো আর নেমন্তন্ন পাওয়া যায় না। বাড়ির শাক ডালের মধ্যে আবার ফিরে আসতে হয়। এমনি করে পরিপূর্ণ যৌবনের জন্য দেহ-কোষ ও মেধাকোষ তৈরি হয়ে উঠছিল। কিন্তু একটি অন্তর্গত হাঁ আমি কোনদিন বোজাতে পারিনি। কৈশোর ও যৌবনের কথা ছেড়েই দিলাম, আপ-নাদের কি বলবো, এখনো আমার এত খিদে পায় না। যে জন্য সাহিত্য করা আজো ছাড়তে পারলাম না। ছেড়ে দিতে পারলে বুদ্ধিমানের কাজ করতাম। কিন্তু কি করবো, ঐ যে বললাম, একটা ভেতর থেকে খিদে টের পাই। কোম্পানীর চাকরীতে টাকাটা খারাপ পাই না সত্যি, তবে সে আর কত হবে। চাকরীতো বটে। এখন বলতে গেলে সাহিত্যই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে—নানান ফাই-ফরমাসের কাজ করি। চুকটাক যা পাই, তা দিয়ে খাই। মাছ আঠের টাকা কিলো। মাংস, ডালও ষোল টাকা। তেল গণেশ দু' কিলোর টিন ছাব্বিশ টাকা ষাট নয়া। অর্থাৎ প্রতিদিন বাজারের জন্যই একটা সেপারেট পে স্কেল চাই। তা না হলে খেতে পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ যথার্থ-ভাবে খিদে দাবাবে থাওয়া হবে না। তুষের আগুনের মত ধিকি ধিকি পেটে একটা চিনচিনে ভাব থাকবেই। এই ভাব-টাকেই আমাদের ছোটবেলায় আমাশার ভাব বলা হয়েছিল। বাবা বলতেন, যাও, বাথরুম থেকে এসো। বাথরুম

বলতে গাঁয়ের রাখলুম। মুহূর্তে মুখ ব্যাজার করে ফিরে আসতাম। বাবা বলতেন, কেমন হল? বলতাম, হল না। জিজ্ঞেস করতেন, ব্যাথা বাথনি? আমি চোখের জলে মাথা নেড়ে বলতাম না।

আসলে পিতৃদেব জানতেন না, ওটা স্টমাকের আর্তনাদ। মাংস চায়, মাংস, ছানা জাত দ্রব্য, নিদেন পক্ষে পাকা মাছ। আমরা গরীব ছিলাম। বাবার টাকা পয়সা ছিল না। গরীব জজমানরা যা দিতেন তাই দিয়েই আমাদের সংসার চলতো। জজমানী আমাদের তিন পুরুষের পেশা। আমরা ভাইবোন ছিলাম অনেকগুলো। বিধবা পিসিমা ছিলেন। বাদলের মা ছিল। আমাদের কাজ করার লোক। সব মিলে একটা রাক্ষুসে হাঁ। আমরা অজ পাড়াগাঁয়ে থাকতাম। সেখানে মাংসের দোকান ছিল না। মাংস একমাত্র আমরা দুর্গাপুজো, কালীপুজো এবং বাস্তুপুজোয় খেতাম। কিনতে হোত না। প্রসাদ হিসেবেই পেতাম। মাছটা অবশ্য মাঝে মধ্যে ভালই জুটতো। কিন্তু বর্ষাকালে জল বাড়তো আর মাছ উধাও হোত। শেষে সারাটা বর্ষা আমাদের নির্ভর করতে হোত, নানা রকমের শাক, কাটোয়ার ডাঁটা ছাঁচি কুমড়ো, খুব হাল্কা খেসারির ডাল, দুই এক অনুপাতে মুদির দোকান বদলে দিলে মুসুরির ডাল (ছোট দানা)।

কাজেই বুঝতে পারছেন একটি অ্যাসিড প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সির মধ্যে মানুষ হয়েছি। পরীক্ষায় লাস্ট। অংকে ফেল। প্রমোশানে থার্ড লিস্টের পর পায়ে ধরে পাশ। কী হীনতায় জীবন গেছে মশাই, কী বলবো। আপনারা এসব বুঝবেন না। আপনারা সব নবীন যুগের মানুষ (অডিয়েন্সের একজনের দিকে তাকিয়ে, জন্ম কত সালে? ভিড়ের ভেতর থেকে উত্তর, ফিফটি এইট)।

তার মানে সিক্সাবিধান বেবী? কি, ঠিক বলেছি না? (শ্রোতাদের হাস্য)। মাঝে মাঝে চেকআপ সকালে দুধে ভেজানো কর্নফ্লেকস। বিকেলের দুধে কোকো মল্ট। খাওয়ার আগে পলিবিয়ান। পরে ভিডালিন। মুসাম্বি, লেবু, আপেল। এবং ইংলিশ মিডিয়াম।

এখনকার ছেলেরা, অর্থাৎ শহরের ছেলেরা, খুব ব্রাইট। আই কিউ খুব হাই। বার বছরে মাইনর এ্যাকাউন্ট। ষোল বছর থেকে নিজেই অপারেট করতে পারে।

আমার বাবা জজমানী করতেন। এখনকার মত তখনকার দিনে, ধরুন ফর্টিজে, পুরোহিতের দক্ষিণা তেমন ছিল না। সামান্য যা পাওয়া যেত, চাল ডাল তরিতরকারী। ফলমূল লাদানা। কালেভদ্রে ধুতি কি শাড়ি। জজমানরা কেউ তেমন বড়লোক ছিলেন না। গরীবই বেশী।

একবার এক ধনী জজমানের মদ্যপ পুত্রের জীবন রক্ষা করতে, আমার বাবাকে একটি কঠিন শান্তি স্বস্ত্যয়ন করতে হয়। এই স্বস্ত্যয়নে ধ্যানের অংশটাই প্রধান। আমার আসন্ন প্রসবা মা একা বাড়িতে পড়ে রইলেন। বাবা গেলেন সাতগ্রাম উজিয়ে, অন্য লোককে বাঁচাবার কঠিন শান্তি স্বস্ত্যয়ন করতে। উপবাসী বাবা সকাল নটার ধ্যানে বসেছিলেন। দুপুর একটায় আমার মায়ের সপ্তম সন্তান, অর্থাৎ আমার চতুর্থ সহোদর ভ্রাতার জন্মের প্রসব বেদনার উদ্রেক হয়। মায়ের নিষেধ অমান্য করে, পাঁচ মাইল অতিক্রম করে, যদুপুর গ্রামে পৌঁছে জমিদার নবীন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি খুঁজে বার করি। বিরাট বড়লোকের বাড়ি। প্রধান ফটকের পথে আমি দেখতে পাই, আমার বাবা চণ্ডীমন্ডপের স্বর্ণসিংহাসনস্থ নারায়ণ শিলার সামনে বসে ধ্যানমগ্ন। পথশ্রমে আমি ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম। মায়ের জন্য একটি অজানা আশংকায় আমার মুহুর্মুহু কান্না পাচ্ছিল। আমি ধ্যানস্থ বাবাকে দেখে, দূর ফটকের কাছ থেকেই চীৎকার করে উঠি—বাবা—।

নিরব বাড়িটা চমকে ওঠে। করেকটা কবুতরের আবগা পরিবর্তনের শব্দ আমার কানে আসে। পিছে ফেরার আদেশ পেয়ে একজন অনুগত সৈনিক যেভাবে পেছনে ফেরে, আমার বাবা বসা অবস্থায় সেইরকম তৎপরতায় পিছে ফিরলেন। ছুটতে শুরু করলাম। একটা উঠান পেরিয়ে যখন বাবার কাছে পৌঁছলাম, দেখি বাবার চোখ লাল এবং সূর্যের মত আলো ঠিকরে পড়ছে।

খুব মমতায় জিজ্ঞেস করলেন—কি রে

আমি হাঁফাতে হাঁফাতে বাবার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, মা ব্যথায় কাতরাচ্ছে। বাবা চমকে উঠলেন। বললেন, হায় হায়—কাউকেই রাখতে পারলাম না।

সামনে একজন বয়স্ক লোক বসেছিলেন। পট্ট বস্ত্র পরে। চীৎকার করে উঠলেন, ভট্চায মশায়, আমাদের কি হবে? আমাদের যে সব শেষ হয়ে যাবে ভট্চায মশায়। আমার বংশের কি হবে ভট্চায মশায়। আকুলি বিকুলি কাঁদতে লাগলেন।

বাবা উঠে দাঁড়ালেন। খড়ম পরলেন। থমথমে মুখ নিয়ে বললেন, চল।

একজন কে এগিয়ে এসে বললেন, পুরুতঠাকুর আপনার নৈবদ্য, রচনা, জিনিসপত্র, দক্ষিণা কিছুই তো নিলেন না?, আমরা কি দিয়ে আসবো?

বাবা গুরুগম্ভীরভাবে বললেন, না।

বৃদ্ধ বললেন, সে কি? তাহলে যে পুজোর ফল হবে না।

বাবা বললেন, পুজো হয়নি। বিঘ্ন ঘটেছে। আমার যা ফল হবে, আপনারও তাই।

মুহূর্তের মধ্যে তিন-চারজন নরনারী নারায়ণ শিলার কাছে আছড়ে পড়লেন। চীৎকার করতে থাকলেন, রক্ষা কর। রক্ষা কর। হে ঠাকুর বাঁচাও।

আমি, বাবা সেই আর্তনাদের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

রাত নটা নাগাদ আমার মা মারা গেলেন। কাছেপিঠে ডাকতার ছিল না। দুই গ্রাম পরে রাধিকা নামে এক ডাক্তার ছিলেন। তাকে আগ্রিম টাকা দিতে হোত। এবং রাতবিরেতে তিনি অন্য গ্রামে যেতে রাজি হতেন না। বাদলের মা-ই চিরকাল নাড়ি কাটতো। সেই প্রথমা বধি ছিল আঁতুর ঘরে। অনেক কসরৎ, টোটকা টাট্‌কি করার পর বলল, পেটে মরা ছেলে। বাঁচাতে হলে এখুনি শহরে নিয়ে যান। যার সামনের গাঁয়ের ডাক্তার ডাকার মত সঙ্গতি নেই, দু' টাকার,—সে নিয়ে যাবে শহরে? আমার মা মারা গেল দাপাতে দাপাতে।

মায়ের মৃত্যুর দুবছরের মধ্যে আমার একটি ছোট ভাই ও দুটি বোন মারা যায়। একজন বিশূচিকায় অন্য দুজন রক্ত অতিসারে। আমি ষোল বছর বয়সে নিজের হাতে তাদের দাহ করেছি। তারা আমাকে বড় ভালবাসতো। আমার ওপর খুব আস্থা ছিল। ডাক্তার ডেকে, অষুধ দিয়ে তাদের ভাল করে তুলবো। পরিবর্তে বন্ধুদের নিয়ে নিপুণ চিতাশয্যা রচনা করে আমি তাদের দাহ করেছিলাম।

আমি খারাপ হতে শুরু করি কলাশ নাইনে। এই সময় থেকে আমি নারী দেহের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে থাকি। কলাশ টেনে আমি মায়ের কাঠের সিন্দুকের তালা ভেঙে ছোটখ বড়খ মিলিয়ে আটখানা খাগড়াই কাঁসার বাসন স্থানীয় হাটে বিক্রি করে দিয়ে উধাও হয়ে যাই। পালিয়ে বাড়ি থেকে সাত মাইল পায়ে হাঁটার পথ অতিক্রম করে সিরাজদীঘার বন্দরে আসি। সেখানে তিন রাত অজ্ঞাত বাস করি। তৃতীয়দিনে এক রূপবতী মহিলার ঘরে, আমার সার্টের পকেট থেকে সমস্ত টাকা উধাও হয়ে যায়। মহিলা সহাস্য মুখে আমাকে ভাল হওয়ার পরামর্শ দিয়ে স্বাদরে বাড়ি পাঠিয়ে দেন। বাড়ি ফিরে প্রতিবেশীদের কাছে জানতে পারি, বাবা শয্যা নিয়েছেন। সম্ভবত মৃত্যুশয্যা। হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেয়ে দৌড়ে যাই এবং সন্তর্পণে বাবার শিয়রে গিয়ে দাঁড়াই।

পিসিমা বাবার মাথায় জলপটি লাগিয়ে তাল পাখার হাওয়া করছিলেন। ছোট ভাইবোনগুলি বাবার বিছানায় বসে অর্ধ নিদ্রামগ্ন বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বসেছিল।

আমাকে দেখে পিসিমা বাবাকে ডাকলেন, বিলু ও বিলু চেয়ে দেখ জীবন ফিরে এসেছে।

আমার বাবার ডাকনাম ছিল বিলু। আমি তার প্রথম সন্তান। আদর করে তিনি আমাকে জীবন বলে ডাকতেন।

চোখ খুলে আমার দিকে তাকালেন। ধরা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় গিয়েছিলি ?

আমি অপরাধীর মত মাথা হেঁট করে থাকলাম।

কিছুক্ষণ পরে আরো স্তিমিত গলায় বললেন, আমার আর এই শিশু-গুলির গলা টিপে মেরে রেখে যেখানে খুসি চলে যাও।

অনেক রাতে অনেক কাঁদলাম। স্থির করলাম পড়াশুনা করবো।

ঐ বছরই আমি ম্যাট্রিক পাশ করি। এই পর্যন্তই আমার বিদ্যা। আরো ধাড়াতে চেষ্টা করেছিলাম। বাবা শহরে পাঠিয়েছিলেন এক অবস্থাপন্ন জ্যাঠার কাছে। অনেক কাকুতি মিনতি মাখা চিঠি দিয়ে। তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, খেতে দিতে তো কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু থাকার জায়গা কি করে দেব ? ওঁরা স্বামী স্ত্রী ও একটি কন্যা। ঘর ছিল দু'খানা।

ভাষণ দিলেন না, কিন্তু সহৃদয়তা ছাড়লেন না। বললেন, অবিনাশবাবুর কাছে যাও। উনিতো সম্পর্কে তোমাদের মামা হন। পুরান পল্টনে ওদের বড় বাড়ি। উনি নিশ্চয় তোমাকে রাখতে রাজি হবেন।

গেলাম সেখানে। অবিনাশবাবু ইজিচেয়ারে আধশোয়া অবস্থায়, বাবার চিঠি ও জ্যাঠার দু লাইনের একটা চিরকুট পড়লেন। ওঁর স্ত্রী এক হাতে ক্ষীরের বাটি অন্য হাতে খৈ-এর মোয়া নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। সম্ভবত অফিসফেরা স্বামীকে সন্ধ্যা-কালীন জলখাবার দিতে এসেছিলেন। বললেন, থাকতে দিতে তো আমার কোন অসুবিধে নেই। সুস্থ মানুষের খাবার আমাদের বাড়িতে হয় না। আমি ব্লাড-প্রেসারের রোগী, উনি ডায়বেটিসের। ছেলে দুটো ছোটবেলা থেকেই পেট-রোগা। তিতো আর সুকতোর ঝোল ছাড়া কিছু খায় না।

একজন রাজি হলেন। ছোট কাকার বন্ধু। প্রথমেই সাফ বলে নিলেন, বাড়ির সব কাজ করে যদি পড়াশুনা করতে পার আমি রাজি আছি। আমি রাজি হলাম। কলেজে ভর্তিও হয়ে গেলাম। সকাল থেকে দশটা পর্যন্ত কাজের পর কাজের ফরমাস দিতেন। দুধ আনো। বাজারে যাও। র‍্যাশন আনো। ইঁদারা থেকে জল তোলো। রাস্তা থেকে খাবার জল নিয়ে এসো। কলেজ থেকে ফিরলে ছেলেকে একটু বেড়িয়ে নিয়ে এসো। উনানের জন্য কাঠ কেটে দাও। অনেক কষ্ট করেও কোন রকমে টিঁকে থাকার চেষ্টা করছিলাম। পড়ার একটু সময় পেতাম না। রাত ন'টা নাগাদ খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে আমি লম্বাটে বাড়িটার শেষ প্রান্তে ভাঁড়ার ঘরের চৌকিতে হারিকেনের আলোতে বসে চিঠি কবিতা ও ডায়রীতে দুঃখের কথা লিখতাম এবং পড়াশুনা করতাম।

মাসখানেক কেটে গেল। যদিও নতুন কাকু ও কাকিমা কলেজের কথা কখনো জিজ্ঞেস করতেন না, আমার মনে হল, বোধহয় টিঁকে গেলাম। যেদিন এসব কথা মনে হল, সেদিন রাত দশটায় শুয়ে শুয়ে ডায়রী লিখছিলাম। দেয়ালে বড় ছায়া দেখে চমকে উঠলাম। দেখি দরজায় নতুনকাকু দাঁড়ানো। ভারি গলায় বললেন, আমরা বাড়িতে একটা শৃংখলা মেনে চলি। ন'টার পর সবাই শুয়ে পড়ি। তুমি দামী তেল পুড়িয়ে রোজ রোজ শৃংখলা ভঙ্গ করবে, তা আমি বরদাস্ত করব না। তুমি অন্য জায়গা দেখ। বলে রাগতভাবে ফিরে গেলেন। আমি আকাশ থেকে পড়লাম।

অত রাতে কোথাও যাওয়া যায় না। পরদিনই আমি বাড়ি ফিরে গেলাম।

কেমন করে লেখার লাইনে এলাম কোন ভক্তি আর আদর্শের ঘোড়ার পিঠে চেপে তা বলতে পারব না। তবে এইটুকু মনে আছে একটা বয়স পর্যন্ত আত্মীয় পরিজন, মাস্টমশায় গুরুজনদের কাছে খেলোয়াড়দের কাছে ফুটবলের কদরের চেয়ে অধিক কদর পাইনি। ফলে আঠের উনিশ বছর বয়স পর্যন্ত অকথা কাহার, অসহ্য অপমান এবং মরুভূমির মত হৃদয়হীনতার মধ্যে আমি ঢাকা শহরে দুয়ার থেকে দুয়ারে একটি চাকরী অথবা একটু আশ্রয় ভিক্ষা করে ফিরি। এই সময়ে প্রথম আমার মধ্যে কিছু কিছু কথা জমতে থাকে।

১৯৪৭ সালের জুন জুলাই মাসে, আমি উদারনগরী কলকাতার সন্ধান পাই। এক রাত্তিরের আশ্রয়দাতা জনৈক এ্যাসিসটেন্ট স্টেশানমাস্টারের কাছে জানতে পাই, কলকাতা নাকি অগতির গতি। আমি মরিয়ার মত, এই কথাটুকুর ওপর ভরসা করে, শিয়ালদহে এসে পৌঁছাই।

প্রথম কয়েকদিন শিয়ালদহ স্টেশানেই কাটাই। সংলগ্ন রাস্তা দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে অকস্মাৎ আমার হাতি-বাগান নামটি মনে পড়ে এবং আমার সহপাঠী সজল নামে একটি ছেলের মজুমদারের কথা মনে এসে যায়। এঁরা বংশপরম্পরা আমাদের পরিবারের মজমান ছিলেন। পরে কলকাতা প্রবাসী হয়ে যান। এদিকে হাতের পয়সা শেষ হয়ে আসছে। কুলির কাজে কেউ নিতে চায় না। চাকর থাকতে চাইলে দোকানের লোকরা সন্দেহ করে। নিজের চেহারাটাই নিজের বৈরী হয়ে দাঁড়ালো। দুঃখে এবং অভিমানে একটা গোটা দিন জল খেয়ে থাকলাম। উপায়ান্তর না দেখে হাতি-বাগান অঞ্চলে গিয়ে সহপাঠীর মজুমদারের খোঁজ করি। এক মুদি দোকানের দয়া-পরবশ মালিক, শোভাবাজার অঞ্চলে সে বাড়ির সন্ধান দেয়।

আমার বিখ্যাত পিতা অনাথবন্ধু ভট্টাচার্য তস্য পিতা সুপন্ডিত দীননাথ ভট্টাচার্য এবং তদীয় পিতৃদেব কালি-কিংকর তর্কপঞ্চানন বাগীশ শাস্ত্রীর পরিচয় পেয়ে সেই রাত্রির মত আমাকে আশ্রয় দেওয়া হয়। অত বড় পন্ডিত পরিবারের ছেলে, আমি নিশ্চয় নিয়মিত সন্ধ্যাআহ্নিক ও একাদশী পালন করে থাকি এই বিশ্বাসে মজুর বিরাট বাড়ির এক কোণে তার স্বামী-পরিত্যক্তা অপুত্রক কন্যার ঘরে আমার জলযোগের আয়োজন হয়। এ বাড়িতে তিনিই একা একাদশী পালন করেন।

ভদ্রমহিলা আমাকে একটি ফুল-কাটা কাজের আসনে বসতে দেন। ডান-দিকে রাখেন একটি শ্বেত পাথরের গেলাস। আমি লজ্জায় নত মস্তকে গ্লাসের জল দিয়ে কপট আচমন করে চোখ তুলে দেখি, একটি নিকষ কালো গড়ের পাথরের থালায় অম্বুবিম্বের আকারে ফোলা অন্তত দশটি ফটফটে সাদা লুচি এবং গোটা চারেক ভারি অর্ধচন্দ্রা-কৃতি বেগুনভাজা। দেখে আমার মনে হল, আমি নিশ্চয় মরে গেছি। কৃপা-পরবশ ঈশ্বর সম্ভবত একবেলার জন্য স্বর্গে দেবতাদের অন্নসত্রে আমাকে খাবার অধিকার দিয়েছেন।

আমি পঞ্চদেবতার খাদ্য ও জলের অগ্রভাগ বন্টন করে দিয়ে, একটি ধূমায়িত লুচি ভেঙ্গে, গরম বেগুনভাজা পুরে মুখে দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ি। মায়ের মৃত্যুর বছর তিনেক আগে আমরা শেষ ময়মন ছাড়া আটার লুচি খেয়েছিলাম। গত দুই রাত্রি আমি কিছুই খাইনি বললেই চলে। হঠাৎ জীবনে একটা অপ্রত্যাশিত আদরের খাওয়া পেয়ে সঞ্চিত অপমানের ও লাঞ্ছনার স্মৃতি পাঁজরের তলা থেকে ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো।

ভদ্রমহিলা হতবাক হয়ে, আমাকে সান্ত্বনা জানালেন। আমি কিছু কিছু কথা তাঁকে বললাম। চলে আসার পথে, তিনি আমার হাত ধরে বললেন, যখন খিদে পাবে তুমি আমার এখানে চলে এসো। তোমার খাওয়ার কোন অভাব হবে না।

মজুমদারের আনুকূল্যে হ্যারিসান রোড অঞ্চলে একটি হোটেলের বাজার

সরকার ও খাতা লেখার কাজ পাই। বিনাময়ে খাওয়া থাকা ও দশ টাকা হাত-খরচ জোটে।

এই সময়ে ধীরে ধীরে আমার, বাবা ও ভাইবোনগুলির কথা মনে পড়তে থাকে। না-জানি ওরা কত কষ্টে আছে ভেবে আমার চোখে জল আসে। আমি গ্রাম্য যুবকের সমস্ত সংকোচ কাটিয়ে হোটেলের ম্যানেজারের কাছে দশটা টাকা ধার চাই। বাড়ি পাঠাবো বলে। ম্যানেজার বিকট মুখভঙ্গী করে বলেন উনি দানসত্র খোলেন নি। তাছাড়া গত চল্লিশ বছর উনি কলকাতায় আছেন, সমস্ত রকম চালাকির অলিগলি ওঁর চেনা। অতএব।

জন্সাহেব ভিন্ন কলকাতায় আমার পরিচিত কেউ নেই। অগত্যা সেখানেই টাকার জন্য গেলাম। তিনি নম্র ও স্বল্প ভাষায় আমার ও আমার চাকরীর কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। বাড়ি ও বাবার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁদের দুর্দশার কথা বর্ণনা করলাম, কিন্তু দশটা টাকার কথা মুখ দিয়ে বার করতে পারলাম না।

আমি এসেছি শুনে, দোতলার কোণার ঘর থেকে বকুলদি আমাকে দেখতে এলেন। একতলার বসার ঘরে আমাকে দেখে বিস্ময়সূচক মুখভঙ্গি করলেন। বললেন, কিরে ছেলে সেই যে তুই গেলি এতদিনের মধ্যে আর এ-মুখো হওয়ার কথা মনে হল না? আমরা তো ভেবে ভেবে মরছি, এই বিদেশে না-জানি ছেলেটা কেমন করে আছে। জন্সাহেব সায় দিয়ে বললেন, হ্যাঁ বকুল তোমার কথা কয়েকবার আমাকে জিজ্ঞেস করেছে। অঘের প্রতি সপ্তাহেই আসে। এ সপ্তাহে আসে নি। তাই আর তোমার খবর নিতে পারিনি। অঘোর আমার হোটেল মালিকের নাম।

বকুলদি উঠলেন। যেতে যেতে বললেন, আমার ঘরে এসো। চা খেয়ে যেও।

ঘরে যেতেই—অনুযোগ অভিযোগের পাহাড় চাপিয়ে দিলেন। কপট অভিমানের ভাব করলেন। তারপর কিছুক্ষণ ঘরবার করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার খাওয়া থাকার কথা জিজ্ঞেস করলেন। অনেকটা পরে একটি চাকর আমার সামনে একটি টুল দিয়ে গেল। তারও অনেকটা পরে একটা বিরাট কাঁসার বেকাবে এক-থালা খাবার এল। একসঙ্গে এত বিচিত্র ধরনের খাদ্যসামগ্রী আমি আগে কখনো দেখিনি।

বললাম, এত খাবার আমার দরকার নেই। দশটা টাকা দরকার, বাড়িতে পাঠাবো।

বকুলদি হেসে ফেললেন। বললেন, খাও—টাকাও পাবে।

বকুলদির কাছ থেকে টাকা নিয়ে পরদিনই বাবাকে পাঠিয়ে দিলাম। একটা বিরাট বোঝা বুকের ওপর থেকে নেমে গেল।

তারপর থেকে মাঝে মাঝেই জন্সাহেবের ওখানে যাই। বকুলদির ঘরে গিয়ে ভাল মন্দ খাই। ক্রমে আমি জানতে পারি, বকুলদির বর্তমান বয়স আনুমানিক তেত্রিশ চৌত্রিশ। কিঞ্চিত স্থূলতার কারণে সামান্য বেশী মনে হয়। ওই রূপবতী মহিলা বছর সাতেক আগে এক ভিন্ন সম্প্রদায়ের যুবকের প্রণয়াসক্ত হয়ে বেরিয়ে যান। এক বছরের মধ্যে সমস্ত অলংকার, বিস্তর টাকা এবং নিটোল যৌবন খুইয়ে, বাড়ি ফিরে আসেন। তদবধি শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ ও সংযম পালন পূর্ণিমা ও একাদশী পালন করে জীবনে সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছেন।

প্রথম যৌবনের সমস্ত উত্তাপ তখন আমার দেহে। বকুলদি মাঝে মাঝে টুকরো-টাকরা কাহিনী বলেন। আর চোখ ছাপানো জল লুকাতে আঁচল চাপা দেন।

একদিন রসিকতা করে বললেন, তুমিই আমার কৃষ্ণ। আমি হেসে বললাম, সব হতে রাজি আছি কিন্তু কৃষ্ণ কিছুতেই না। ভ্রূ কুঁচকে বললেন, তাই যদি না হবে সাতসমুদ্র তের নদী পার হয়ে তুমি আমাদের এখানে এলে কেন? তুমি কি আমাদের ঠিকানা জানতে? তুমি আমার বাবার নাম জানতে? কলকাতার শহরে জন্স তো আরো কত আছে?

কথাটা অসত্য নয়। বিশ্বাসের ব্যাপার। আমি চুপ করে থাকলাম।

ঐ বছরই শ্রাবণ মাসে জন্মাষ্টমীর দিন, বকুলদির ওখানে আমার বহুক্ষণ ভোজনের নেমন্তন্ন হয়। দুপুরে পরম তৃপ্তি সহকারে খেয়ে বকুলদির খাটে শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছিলাম। দুনিয়ার সমস্ত ঘনকালো মেঘ আকাশে জড়ো হয়েছিল। যখন ঘুমিয়ে পড়েছি, তারপর বর্ষণ শুরু হয়েছিল। গোটা পৃথিবী অন্ধকার করে দিয়ে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। দেখি বকুলদির নরম পেলব হাত আমার কপাল ছুঁয়ে আছে। মুখ ফেরানো জানলার দিকে। দৃষ্টি দূরে বর্ষণসিক্ত গাছগুলোর মাথার দিকে। মুখ ফেরালে, আমি ওঁর চোখের ভাষা পড়তে চেষ্টা করি। হঠাৎ বকুলদি আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, তুমি আমার মন নিয়েছ। তুমি আমার দেহ নাও। যেন পাথরের কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করছে। আমি আমার শেষবিন্দু উত্তাপ দিয়ে ওঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই। বলি, তুমি ছাড়া এই কঠিন শহরে আমার কেউ নেই।

অতি অল্পকালের মধ্যেই বুঝতে পারি, আমি ক্রমশ একটি বিবরের মধ্যে প্রবেশ করে যাচ্ছি। একটি অবৈধ সম্পর্ক দিন দিন ঘন ও গাঢ় হয়ে উঠছে —শ্রেষ্ঠ শেষতঃ যার মধ্যে আনন্দ নাই।

একটি ভারী অপরাধের বোঝা বুকের ওপর সব সময় চেপে ছিল। দুই হাতে তাকে ঠেলে দিই সেই শক্তিও ছিল না। পালিয়ে বাঁচার পথও বন্ধ।

এই সময়ে আমাদের হোটেলে রায়পুর থেকে এক প্রবাসী বাঙালী পরিবার আসে। বাবা মা ও একটি কন্যা। মা মরণাপন্ন হয়ে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য এসেছেন। মেয়েটি শুধু রূপসীই নয় —এত সহজ ও হৃদয়খোলা যে সংসারে থাকতে পারে, তাকে না দেখলে কোনো দিন বিশ্বাস করতাম না। ছেলেমানুষী হাসা চলে। কারণ বয়সও সতের আঠারোর উপরে হবে না।

খুব ধীরে ধীরে আলাপ হচ্ছিল। ম্যানেজারের কাউন্টারে, সিঁড়িতে, খোলা ছাতে। আমাকে ওরা সবাই ভেবেছিল মালিকের ছেলে। তাই নানান অভাব অভিযোগের কথা আমাকেই বলতো। আমি সাধ্যমত সাহায্য করতাম। যেদিন মেয়েটি ও তার বাবা আমার যথার্থ পরিচয় জানলো, সেদিন খুব লজ্জিত হল। এবং হোটেলে কি পাই, কেমন আছি, জেনে দুঃখিত এবং বেদনার্ত হল।

প্রথম প্রথম কিছুদিন মেয়েটি বাবার সঙ্গে সকাল বিকাল হাসপাতালে যেত আসতো। মাসখানেক পরে বাবা ও মেয়ে পালা করে যেত। সন্ধ্যাবেলায় মেয়েটি ঘরে থাকলেই, আমার ডাক পড়তো। আমি অষুধ পথ্য ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত কম দামে কিনতে সাহায্য করতাম। যে অষুধ কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না, আমিই তা জোগাড় করে দিতাম। ফলে, আমার ডাকপড়া মানে সাহায্যের ডাক। মালিক তাড়া দিতেন যান যান তিন মাসের খদ্দের, একটু সাহায্য করুন। নইলে করে আবার ঐ তাঁদাড়াটার পাল্লায় পড়ে। সামনেই একটা ছোট হোটেল ছিল। খদ্দের ভাগানোই ছিল তাদের কাজ। সেইদিকে ইঙ্গিত করে, রূপাদের সাহায্যের মাত্রা বাড়াতে বললেন। দরকার হলে দু-একদিন হাসপাতালে গিয়ে তদ্বির তদারক করতে বললেন।

রূপা আমাকে একদিন জিজ্ঞেস করলো, প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলায় কোথায় যান?

আমি বললাম, প্রতিদিন তো যাই না; মাঝে মধ্যে।

কোথায়?

হাতিবাগানে।

কে থাকে?

দিদি।

সে কি, আপনি যে বলেছিলেন, আপনিই বাবা মার প্রথম সন্তান।

মাসতুতো দিদি।

কয়েকদিন পরে একদিন বললো, কী ব্যাপার, আপনার চোখের নীচে কালি। মুখ ফ্যাকাশে। দিদি বুঝি বকেছে ?

আমি আঁৎকে চোখ নামাতেই বুঝল, মোটেও দিদি নয়। হাসি হাসি মুখে গম্ভীর করার মত করে বলল, আমি বুঝেছি কে। মান অভিমান চলছে বুঝি ?

আরো একদিন বলল, যাই বলুন, আপনার মুখ দেখেই আমি বলতে পারি, যাকে আপনি ভালবাসেন হয় সে আপনাকে ভালবাসে না, নয়তো আপনি তাকে ভালবাসেন না।

কথাগুলো আমার চাবুকের মত লাগে। হেসে বলি, দূর ওসব কিছু নয়। সত্যি দিদি।

সে বলে, ভালবাসা হলে চোখ-মুখের রংই হবে অন্যরকম। আপনার একি পাঁশুটে, চোখমুখ।

রূপার কথা শুনে আমার মনে হত, কে যেন আমার সমস্ত শরীরে সূচ ফুটিয়ে দিচ্ছে।

প্রতিদিন বেরিয়ে আসার প্রাণপণ চেষ্টা করছি। পারছি না। আর রূপাকে দেখে মনে মনে বলি, যদি তোমার ভালবাসা পেতাম, তাহলে আত্মহত্যা করে সকল পাপের স্খালন ঘটাতাম।

হাতিবাগানে যাওয়া বন্ধ করলাম। রূপাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে হাসপাতালে যেতাম। ওর মা ভালর দিকে। আমাকে দেখে হাজার কৃতজ্ঞতা জানালেন। হাজার আশীর্বাদ করলেন।

রূপা মিটিমিটি হাসতো। হাসপাতালে সন্দেশ বেশী হলে আমাকে খেতে অনুরোধ করতেন। আমি রাজি হতাম না। রূপা অমনি হাসতে হাসতে বলতো, খান-খান। না-হয় ও-বাড়িতে দুটো কম খাবেন। আমি গম্ভীর হয়ে খেতাম। রূপার এ রসিকতা আমাকে একদম সুখ দিত না।

একদিন অনুকূল পরিস্থিতিতে, রূপাকে বললাম, রূপা, তুমি আমাকে বাঁচাও।

রূপা ধনুকের মত সুন্দর ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত করে বলল, আপনি কোন ধায়গায় আবার মরলেন, যে আপনাকে বাঁচাবো। বেশ তো আছেন।

আমার শেষ বিন্দু পবিত্রতা সংহত করে আমি আমার দৃষ্টিতে নিয়ে এলাম। সজল চোখ প্রসারিত করে রূপার দিকে তাকালাম। রূপা আমার চোখের দিকে পূর্ণনেত্রে তাকালে, আমি স্বীকারোক্তির মত অস্ফুট স্বরে বললাম, রূপা আমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছি, প্রতিদিন। আমাকে তুমি বাঁচাও।

আমি মোড়ায় বসেছিলাম। ও সুসজ্জিত চৌকির বিছানাতে। আমি

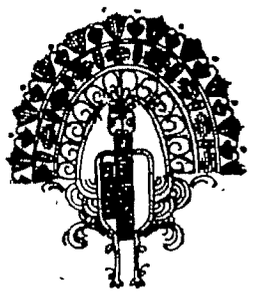

মোড়া ছেড়ে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে, ওর দুই নিতম্ব স্পর্শ করে, কোলে মাথা রেখে কাঁদলাম। ও নিস্পন্দের মত একটা হাত আমার মাথায় রাখলো। কোন কথা সেদিন আর হোল না।

আমি কিঞ্চিত সান্ত্বনা পেলাম। বুকের ভেতরকার বিরাট বোঝার কিছুটা নেমে গেল।

প্রতিদিন অপেক্ষা করি। রূপা নিজে মুখে, যদি কিছু বলে। প্রতিদিন মনে-প্রাণে নিজেকে রূপার উপযুক্ত হয়ে ওঠার চেষ্টায় নিযুক্ত রাখি। ডাকলে যাই। প্রসঙ্গের বাইরে কথা কইনা। এ আমূল পরিবর্তন রূপাকে দেখাবার চেষ্টা করি।

একদিন রূপার বাবা ডাকলেন। বুকটা ধকধক করে উঠলো। রূপাদের তেতলার ঘরে গেলাম। বললেন, এই সপ্তাহেই আমরা চলে যাব। প্রায় তিন মাস হয়ে এল। ডাক্তার বললেন, আর থাকার দরকার নেই। রূপার দিকে না-তাকিয়ে বললাম, ঠিকানাটা দিয়ে যাবেন। সামনের পূজোতেই আপনাদের ওখানে বেড়াতে যাব। রূপার বাবা উদাত্ত কণ্ঠে হেসে ওঠেন, নিশ্চয় নিশ্চয়। তুমি যা করেছ, পরমাত্মীয়ও তা করে না।

রূপা ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আনিতম্ব কোঁকড়ানো ঘন কালো চুলের অর্ধাংশের পরিপাটি করছিলো চিরুণী দিয়ে। অবিনাশবাবু রূপার দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, সে ঋণ শুধবার সুযোগ কি আমরা পাব ?

যেদিন চলে যাবে, সেদিন সারা দুপুর রূপাদের ঘরের কাছে বারান্দার ঘুর ঘুর করলাম। ওর মাকে হাসপাতাল থেকে একদিন আগে আনা হয়েছে। দরজা ভেতর থেকে ভেজানো। কোনো সাড়া নেই।

আমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে চিরকুট দিয়ে নেবে যাচ্ছি, ডাক শুনলাম, শুনুন।

ফিরে দেখি রূপা। মুগ্ধ চোখে আগের সেই উজ্জ্বল ঠিকরে পড়া আলো নেই। কেমন বিমর্ষ। মনকে জিজ্ঞাসা করলাম, চলে যাওয়ার আগে রূপার এই বিমর্ষ ভাব কিসের জন্য হতে পারে ?

মন বলল, বিচ্ছেদ ও অপ্রকাশের বেদনাই সম্ভব।

রূপা বলল, এই চিঠিটা রাখুন। একটা আটকানো খাম দিল। ভাবলাম, হয়তো ঠিকানা হবে।

বলল, একটা অনুরোধ আছে। আমরা চলে গেলে খুলবেন।

কোনো কথা না বলে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লাম। মনে মনে বললাম, এর চেয়ে অনেক কঠিন অনুরোধ রক্ষা করেছি। জীবনে একটি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তির আশায় আমার হৃৎপিণ্ডের কাজ অনেক দ্রুত হচ্ছিল। তবু আমি সংকল্পে অটুট ছিলাম।

সন্ধ্যেবেলায় ট্যাকসিতে মালপত্র তোলা হচ্ছিল, অনেকক্ষণই লক্ষ্য করেছি। কিন্তু ওদিকে আর যাইনি। রূপার মাকে নিয়ে যখন ট্যাকসিতে তোলা হল, তখন অনেকেই সেখানে জড় হয়েছিলেন—ম্যানেজারবাবু, বয়, বেয়ারা, ঠাকুর, জমাদার, তিন-চারজন সস্ত্রীক বোর্ডার। প্রীতি ও শুভেচ্ছা বিনিময় হোল।

ভিড়ের ভেতর থেকে আমার ডাক পড়লো। রূপার বাবা মা অনেক করে অনুরোধ করলেন বায়পুর যেতে। যে কোন সময় যখন খুসি। অজানা আনন্দে মন ভরে গেল। বললাম, পুজোয় যাবই। রূপা আমার দিকে তাকাতে পারছিল না। আমার মুখে ভাষা এল না। আমি ভিক্ষুকের মত ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ট্যাকসি চলতে শুরু করলো। হাত তুলে ও বলল, যাই।

আমি ছুটতে ছুটতে হোটেলের চিলে কোঠায় উঠে গেলাম। আমার মনে হল, বুকের মেশিনটা বন্ধ হয়ে যাবে। পকেট থেকে খামটা বার করলাম। ছিঁড়ে একটা সাদা কাগজ পেলাম। ঠিক মাঝখানে দুটি লাইন লেখা—ভালবাসা মিথ্যাচার সয় না। বুক দিয়েই তার পরীক্ষা। তোমার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবো।

কাগজটা বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলাম। কোথাও ঠিকানা লেখা নেই।

সেইদিন প্রথম টের পেলাম, বুকের তলা দিয়ে একটা নদী বয়ে যাচ্ছে। সেই বোধোদয়ের কাল থেকে অনাহূত অনিদ্রা লজ্জা ঘৃণা অপমান ব্যর্থতা—সমুদ্রের জন্ম দিয়েছে। এ বোঝা বইতে পারি এমন শকতি আমার নেই।

সেই রাতে হোটেল নিস্তব্ধ হয়ে গেলে ম্যানেজারের পরিত্যক্ত টেবিলে বসে যা লিখি—তাই দিয়েই আমার সাহিত্য জীবনের শুরু।

একরাম আলি

মাঝরাতের পর

বাস থেকে নেমেই বোঝা গেল, সমুদ্রটা আসা ঠিক হয়নি। কিছুই জানা নেই। কোথায় হোটেল, ট্যুরিস্ট লজ, এমন কি খোদ সমুদ্রটাই যে কোন্‌দিকে—কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। বাস স্ট্যান্ড থেকে সোজা চলে গেছে একটি মাত্র পিচ রাস্তা। আনাড়ীর চোখে সেটা ধরেই এগোচ্ছিলাম আমরা। আমি, অশোক আর মায়া।

কথা ছিল অশোক ও আমার আসার। আমি কলকাতায় তিন বছর আছি, মেসে। আর অশোকরা জন্ম থেকেই। ও আঙুলে নেড়ে করা বলে। কথায় কথায় 'ডেঞ্জ বেঙ্গ', 'হাউ ফানি' বলা ওর অভ্যেস। সেই যে ইউনিভার্সিটিতে আচমকা আলাপ হয়েছিল, তারপর থেকে আর কখনো দ্বিতীয়বার আমাদের মনে হয়নি যে, আলাপটা আনুষ্ঠানিকভাবে করা উচিত। এই তিন বছরের বন্ধুত্বে এখন নানাদিকে শাখা-প্রশাখা ছড়িয়েছে। তবু শেষ কথা বলা যায় যে,

আমি গ্রাম থেকে এসেছি, আর অশোক আপাদমস্তক শহুরে। এ কারণে আলোকের চাতুর্যে আমার কিছুটা বিশ্বাস আছে। এতে আমার হীনমন্যতা প্রমাণ হয় কিনা, জানি না। মোট কথা অশোকের ব্যাপারে আমি বেশ আকর্ষণ বোধ করি। আবার তার চাতুর্যের প্রতি আমার একটু ভয়ার্ত দৃষ্টিও আছে।

গত রোববার সকালে যখন সবে চা নিয়ে বসেছি, অশোক টগবগ করে হাজির, 'একরাম শিগগীর চা বল। অনেক কথা আছে।'

যে দেয়ালের গায়ে আমার একফালি তক্তাটা থাকে, সেটা ছিল কাঠের। অনেক দিনের পুরোনো, ফাটা-ফাটা ময়লাটে কালো। শুধু মাত্র ঐ দেয়ালটিই ছিল আমার অবস্থা বোঝার পক্ষে যথেষ্ট। মেসের আর্থিক অবস্থা কিছুটা ভালো হওয়ার জন্যে এখন সেটা নেই। তার বদলে হয়েছে সিমেন্টের সাদা দেয়াল। অশোক এটা সহ্য করতে পারে না। প্রায় অসভ্যতা। বলে না, বলেও বাদি চেহারার সঙ্গে ঐ দেয়ালটা একেবারেই খাপ খায় না। ভাবে বাঙ্গায় বিদ্রূপ।

সেই দেয়ালের দিকে পিঠ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অশোক বলল, 'বকখালি যাবি?'

সমুদ্র আমি কোনোদিন দেখিনি। চায়ে লম্বা চুমুক দিয়ে বললাম, 'পয়সা কোথায়।'

'কেন তোর প্রেসের চাকরিটা তো আগামী মাসে হয়ে যাচ্ছে। অতুলদার সঙ্গে তো কথা হল।'

'সে তো আগামী মাসে। এখন?'

'দ্যাখ, আজ আগস্টের ন তারিখ। তোর টিউশ্যনির টাকা নিশ্চয়ই এখনো শেষ হয়নি। ওসব বাজে কথা ছাড়। যাবি কিনা বল।'

'আর কে কে যাচ্ছে?'

অশোক সিগারেট ধরিয়ে লম্বা ধোঁয়া ছাড়ল, 'কাল সমীরের বাড়িতে কথা হচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউ যেতে পারছে না দেখলাম। আলোকের প্রেস্ক্রিপ্শন,

সমীরের দাঁতের গোড়ায় স্টোন হয়েছে। ডাক্তার ডেট দিয়েছে পর পর তিনদিন। যেতে পারবে না। তুই-ই এখন শেষ ভরসা।'

ওর কাছ থেকে সিগারেটটা টেনে নিয়ে বললাম, 'ডাগ কাউকে না পেয়ে এখানে এসেছিস। যাবো না।' বলে হেসে ফেললাম।

অশোকও ব্যাপারটাকে হাল্কা করার চেষ্টায় আমাকে এক লাথি কষাল। এবং এভাবেই বকখালি যাওয়ার আমার পরিকল্পনা মুহূর্তের মধ্যে স্থির হয়ে যায়।

অশোকের মাস কয়েকের প্রেমিকা মায়া যখন প্ল্যানটা শোনে, আসার জন্য যথারীতি তার আগ্রহ ফুটে বেরিয়েছিল। কিন্তু টাকাপয়সার কথা ভেবে রাজী হওয়ার উপায় নেই—এ রকম একটা যুক্তি হাততালি সহযোগে প্রতিষ্ঠা পেলেও আমো অস্বস্তি ছিল। এক, সেইদিন আমার মেসেই বুঝে-ছিলাম যে, এবাবেষ সমুদ্রদর্শন শুধু আমাদের দুজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। দুই, ওরা এলে আমার আসাটা অর্থহীন হয়ে যায় এ কারণে যে, আমার উপস্থিতি ওদের অস্বস্তির কারণ হতে পারে।

তবুও মায়া সঙ্গেই এল। আমাদের সব প্ল্যানই সে জানত। ভাষমণ্ডহারবারে হঠাৎ সে আমাদের স্টেট বাসে উঠে নাটকীয়-ভবে এগিয়ে আসে। আমি চেঁচিয়ে ওকে ডাকি। অশোক প্রথমে চুপ থেকে পরে হেসে বলেছিল, 'ওরে বাবা, এ যে ছিনে জোঁক। ছাড়বে না দেখছি।'

আমরা দুজন বাসে পাশাপাশি জায়গা পেয়েছিলাম। জানলার ধারে। সামনের সিটে একটা জায়গা খালি ছিল। মায়াকে দেখে প্রাথমিক প্রশ্নোত্তর শেষ হয়ে যাবার পর অশোক বলল, 'তোরা এখানে বোস। আমি সামনেরটায় বসছি।'

খুব ক্যাজুয়ালি কথাটা বলেছিল সে। মায়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছে। তৎক্ষণি আমি উঠে গিয়ে বললাম, 'তা হয় না, তোরাই এখানে বোস।' বলে সামনের সিটে বসে পেছন ফিরে ওদের দেখলাম। অশোককে কোনো রকম সুযোগ দেওয়া উচিত হবে না। কেননা, ওর ঔদার্যে কোনো মহিমা থাকার কথা নয়। তা ছিল চাতুর্য-পূর্ণ।

বাসের মধ্যে একটু পরেই আমাদের ভুলে গিয়েছিল। মায়া আমাদের ব্যাগে লুকোনো বোতলের খবর পেয়েছিল। তার পাশেই রাখা হয়েছিল ওর নিজের ব্যাগটা। সারাটা রাস্তা ওরা মাঝে মাঝেই এমন ধরনের ঝগড়া করেছে যাকে খুনসুটি বলাই যুক্তিযুক্ত। এই ধরনের কথা কাটাকাটি এলোকেশীই তৈরী করে। এতে করে যে কোনো জায়গাতেই ওরা চাঞ্চাত্ত কথাবার্তা বলতে পারে। বাসেই আমি ভুলে গিয়ে-ছিলাম যে, মায়া মাঝপথে উঠেছে। অলোকও এ ব্যাপারে আর কথা তোলে নি। গান গেয়ে বাসের ভদ্রলোকটা ওদের তিমির বেরিয়েছিল। ওদের এক ভদ্রলোক প্রথম থেকেই নানা-খানার গল্প করছিলেন। ওখানে নাকি মাছ খুব সস্তা। ফেরার দিন বেশ কিছু মাছ কিনবেন, এ রকম ইচ্ছাও ব্যক্ত করে-ছিলেন বারবার। তাঁর চোখেমুখে ছিল, 'আপনারা মশাই কোনো কিছুরই খোঁজখবর রাখেন না। এই তো, কলকাতার এতো কাছে.....।' মায়ার গান শুনে তাঁর কথা একেবারেই বন্ধ। বাস্তবিক, অনেক ব্যাপারেই মায়া উপযুক্তা। সে থাড়া হয়ে হাঁটে। তার অল্প ফর্সা নাকের ডগায় সব সময় দু-এক ফোঁটা ঘাম চিকচিক করে। এ মুহূর্তে অন্ধকার বলে তা দেখা যাচ্ছে না।

একটু আগে আগে হাঁটছে মায়া। অশোক ও আমি ব্যাগ কাঁধে পাশাপাশি। অন্ধকার। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা। দুদিকে নিচু জমি বোধহয়। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কোথা থেকে যে এক টানা সমুদ্র গর্জন ভেসে আসছে, কে জানে। হাওয়ার গতি পথ বড়ড এলোমেলো। বোঝা যায় না। কখন ভোর হবে, সমুদ্র দেখবো— এ-রকম একটা কৌতূহল একেবারে ভার হয়ে নেমে আসছে মাথায়। গাঁয়ের সেই পাঠশালায় পড়া বঙ্গোপসাগর। বাঙালীরা কতোদিক হাবিয়ে বসে আছে। আমাদের মুখে মাঝে মাঝে সিগারেটের ক্ষণিক অস্তিত্ব উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

হঠাৎ মায়া ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'উঃ, দারুণ জায়গা, না? কী শব্দ! আমার কিন্তু ভয় ভয় করছে।'

ওর হাতে একটা ছোট্ট ব্যাগ। চির রহস্যাবৃত। স্নো-স্নোরায় আড়ড়া দিতে দিতে অনেক দিন ওটা খুলে দেখার লোভ হয়েছে। প্রতিবারই কী করে যে মায়া ঠিক সময়ে টের পেয়ে যায়! তাড়াতাড়ি ব্যাগ খুলতে খুলতে বলে, 'আজ কিন্তু শুধু দামের দামটা দেব। বেশি পয়সা নেই।' বেয়ারা এলে, দিয়ে-ও দেয়।

আমরা কাছাকাছি বেতেই বলল, 'এই, আমাকে একটা সিগ্রেট দেবে?'

কী বলা উচিত আমার? অশোকের ভদ্রতা বোধ টনটনে। সে কিছুতেই 'না' বলবে না। কেননা তাতে, আমার সামনে মায়াকে এতোটুকু অন্য রকম হতে দিতে সে চায় না—এ-রকম আমি ভেবে ফেলতে পারি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 'বলছিলে না, ঠান্ডা লেগেছে? সিগ্রেট খেলে বেড়ে যাবে কিন্তু। বাব্বা, বকখালি এটা। মবে গেলে-ও বোধহয় এ্যানাসিন পর্যন্ত পাবে না এখানে।'

অশোকের দিকে একটু তাকিয়ে মায়া হাঁটতে লাগল। আর কিছু বলল না। হয়তো কিছু-একটা বলবে-বলবে করছে, 'সেই সময় অলোক বলল, 'গাঁজা খাবে? সিগারেটে পুরে রেখেছি।'

মায়া ঘুরে একটু গলা তুলে বলল, 'এ্যা-ই, একদোম ভালো হবে না। একটু দিলেটা-পালটা করেছো কি, মজা টের পাবে। হুঁ, মোটেই নেই। শুধু বাংলা মদ আর গাঁজা, এ-রকম খাস না।'

অশোকের সঙ্গে একটা টর্চ এনেছে। ছোট্ট, বাড়িতে ওটা পড়েই ছিল। দিন দুয়েক আগে, হঠাৎ, আমার মেসে ও টর্চটা নিয়ে হাজির। ব্যাটারি কেনার জন্য বেরিয়েছে। বকখালিতে যেতে গেলে টর্চ ছাড়া যাওয়া অসম্ভব—এই ছিল তার অভিমত এমনিতেই টাকা পয়সা কুলোচ্ছিল না। দুটো বোতল কিনতেই কুড়ি টাকার মতো বেরিয়ে যাবে। এছাড়া, নানান খরচ। তবু, ব্যাটারি কিনতে হয়েছিল। আগস্ট মাস। বলা যায় না, সাপ-খোপ থাকতে পারে।

টর্চটা তার হাতেই ছিল। মিনিট পনেরো হাঁটার পর বাঁ-দিকে ঝোপ-ঝাড়ের মতো দেখা গেল। একটু পরেই হ্যারিকেনের আলো। অশোক টর্চের সুইচ টিপতেই অন্ধকার কেটে একটা গেট বেরিয়ে এল। মার্বেল টালিতে লেখা। কী-একটা আশ্রমের নাম। পড়েই অশোক বলে উঠল, 'উরে বাব্বা, পালা পালা।'

একটানা সমুদ্রের গর্জন আর উড়ো-চুলের উড়নচণ্ডী হাওয়ায় ছেয়ে রয়েছে চারদিক অন্ধকার। শুধু একটানা শোঁ-শোঁ শব্দ। সমুদ্রের ওপারে কোথাও আন্দামান ঝিমোচ্ছে। নামখানায় যাসে অজই একটা ভেতো বাঙালী দেখা গেছে, যার চুল একেবারে বাদামী। উদোম গা, হাঁটুর ওপর ময়লা ধুতি। কয়েক আঁটি ধানের বীজ নিয়ে বাসে উঠেছিল। জানলার ধারে বসে যখন সে টিনের কৌটো থেকে বিড়ি ধরাল, তখন তার মাথার পরিষ্কার পর্তুগীজ হাওয়া। এখন আমরা হয়তো ফেজার সায়েবের গলফ খেলার মাঠের ওপর দিয়েই হেঁটে যাচ্ছি। সামনেই একটা খেজুর গাছ পড়ল। রাস্তার ধারে হেলে দাঁড়িয়ে আছে। টর্চটা ঠায় গাছের ওপর ফেলে অশোক বলল, 'এতো দাগ কেন রে একরাম? গুঁড়িতে গর্ত মতো রয়েছে না? ও আচ্ছা, রস বের করার জন্যে চাঁছা হয়েছিল বোধ হয়?'

মায়া ফাঁকা জায়গা মনে করে গেয়ে উঠল, 'নাইয়া, ধীরে চালাও তরণী....'

অশোক সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'ভুল হচ্ছে, তরণীটা হল না।' বলে নিজেই মাঝখান থেকে গাইতে শুরু করল।

আরো একটু এগিয়ে রাস্তার দুধারে গোটা কয়েক মাটির বাড়ি দেখা গেল। তার মধ্যে তিন-চারটে ছোট ছোট হোটেল। আমাদের দরকার পৃথিবীর সবচেয়ে সস্তা জায়গা। সঙ্গে আবার মায়া আছে। এতোক্ষণে মনে হল, কেন যে মেয়েটা এল। কম পয়সায় নিরাপত্তা চাওয়ার বোকামি দেখাতেই হবে। উপায় নেই। রাস্তার ওপর একটা ছোট্ট পান-গুমটি। গেঞ্জি গায়ে লুঙ্গি পরে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। দেখেই জিজ্ঞেস করল, 'কলকাতা থেকে আসছেন?'

অলোক বলল, 'এখানে কোথায় থাকার জায়গা পাওয়া যাবে বলুন তো?'

ছেলেটা হাসল একটু। নিশ্চয়ই অনেক খেয়ে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে সিগারেট

টানছে। বলল, 'আমরাও মশাই কলকাতা থেকেই এসেছি। দুপুরে। এখন তো রাত প্রায় দশটা। ট্যুরিস্ট লজ, হোটেল—সব প্যাকেট আপ। যা খালি ছিল, দুপুরেই সব ভর্তি হয়ে গেছে। উইক-এন্ড তো। ট্যুরিস্ট লজে যাবেন না। কোনো লাভ নেই। এই বলাকা হোটেলে দেখুন, যদি পাওয়া যায়। বেশ সস্তা।'

ছেলেটি মায়াকে লক্ষ্য করছে। মায়া থাকার জন্য আমার কোনো সুবিধে নেই। তবু মনে মনে ছেলেটিকে একটু কৃতার্থ করতে ইচ্ছে হল। বললাম, 'আচ্ছা, দেখি। ধন্যবাদ। এসো মায়া।'

সমস্ত হোটেল খুঁজে বলাকাতে একটা মাত্র ঘর পাওয়া গেল। দুটো তক্তা। বিছানা নেই। পছন্দ-অপছন্দেরও কোনো সুযোগ নেই। মায়ার নীরবতার পরও ঘরটা নিতেই হল। বলা যেতে পারে, আমি নিলাম। অশোক ও মায়াকে ঘরটা দেখতে পাঠিয়ে আমি ম্যানেজারের ঘরে ঢুকলাম। টাকা দিয়ে, খাতায় সই করে ঘরটাতে এসে দেখি, মায়া গোঁজ হয়ে তক্তায় বসে আছে। আর অশোক ঐ একফালি ঘরেই পায়চারি করছে। যেতেই জিজ্ঞেস করল, 'নিয়ে নিলি?'

'হ্যাঁ', কি আর করা যাবে। অন্য কোথাও আর একটা জায়গা পাওয়া যায় কিনা দেখছি। এ সম্বন্ধে আমাদের আসাটাই উচিত হয় নি।'

অশোক চুপ করে রইল। ওর মুখটা বোঝার চেষ্টা করাই এখন আমার কর্তব্য। ওর মুখে অল্প একটু হাসি। চোখ স্থির। অথচ সব মিলিয়ে কিছুই বোঝা যায় না। সেই চঞ্চল, ধারালো মুখটাই যেন রয়েছে। মায়াকে বললাম, 'কি মায়া, যদি আর জায়গা না-পাই, অসুবিধে হবে? একটাতে তুমি, আর একটাতে অশোক আর আমি শুয়ে রাতটা কাটিয়ে কাল আবার খোঁজা যাবে।'

ইস্, যদি বলতে পারতাম, 'কেন তুই তো সারা জীবনই মায়ার সঙ্গে শুবি, একদিন না শুলেই বা কি হয়।' এ রকম হলে ব্যাপারটা সহজ হত। মায়া কিছু বলার আগেই অশোক ওকে চেপে দিল। বলল, 'আরে বাবা, তা নয়। এক সঙ্গেই তো এসেছি, নাকি? নে, যথেষ্ট হয়েছে। সিগ্রেট আছে তো? না থাকলে এক্ষুণি নিয়ে নিতে হবে। দোকান বোধহয় খোলা থাকবে না।'

কাঁধ থেকে গলফ কিটটা নামিয়ে বললাম, 'তোরা তৈরী হয়ে নে, আনছি।'

ঘর থেকে বেরিয়ে টানা বারান্দা। নিচু এবং অপরিসর। একটা লোক পাশের ঘর থেকে বেরোতেই জিজ্ঞেস করলাম, 'দাদা, সমুদ্দুরটা কোন্ দিকে?"

চলে যেতে যেতে লোকটা বলল, 'হোটেলের পেছন দিকে। কাছেই।'

কাছাকাছি কোথাও আছে, বুঝতে পারছি না। সেতারের মতো যে রকম এক-টানা গুরুগুরু শব্দ ভেসে আসছে, তাতে ঢেউয়ের গতিদিব্যতা না দেখা পর্যন্ত অস্বস্তিটা যে ঠিক কোথায়—বোঝা যাচ্ছে না।

সিগারেট কিনতে কিনতে দোকানের ছেলেটাকে বললাম, 'ভাই, এখানে আর থাকার জায়গা-টায়গা নেই?'

ছেলেটা বসে বসে বিড়ি টানছিল। প্রবল হাওয়ার মাঝে ছোট উনুন যে রকম মাঝে মাঝে স্ফুলিঙ্গ ছুঁড়ে দিয়ে গুরগুর করে, দোকানটা ছিল সেই রকমভাবে জেগে। সিগারেট দিতে দিতে ছেলেটা বলল, 'কোথাও পেলেন না? তাহলে তো মুশকিল।' বলে থেমে গেল।

একটানা সরু, দুর্বল রাস্তাটা প্রবল সমুদ্দুর হওয়ার তিরতির করে কাঁপছে। একটু শীত শীত করছিল। যেন জামা-কাপড় ভিজে গেছে।

ছেলেটা হঠাৎ বলল, 'আপনি কি যেতে পারবেন? ঝাউবনের ওপারে। একেবারে বাঁধের গায়ে। আগে ওখানে কয়েকটা মাটির বাড়ি ছিল। থাকা যেত। সব তো বানে ভেসে গেল। এখন দেখবেন, না-বলে করে মস্ত বালির ঢিবি সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। আর সামান্য গাঙের জল বাঁধা পড়েছে বালিয়াড়িতে। নেমে যেতে পারেনি। ওখানে শংকরদা দুটো ঘর নিয়ে একাই থাকে। যেতে পারলে জায়গা পাবেন। বলবেন, গোপাল পাঠিয়েছে। পয়সা নেবে, ছাড়বে না।' ছেলেটা হাসল।

এতটা আশা করিনি। কিন্তু ঘড়িতে এখন প্রায় এগারোটা। অন্ধকারে অচেনা বনের মধ্যে বাড়ি খুঁজে পাওয়া কি সম্ভব? একটু হেসে ছেলেটাকে 'দ্যাখা যাক' বলে সিগারেট-দেশলাই হাতে নিলাম।

ঘরে ঢুকেই বোঝা গেল, অশোক ও মায়া কিছু একটা বলছিল। আমাকে দেখেই চুপ করেছে। ঘরে একটাও আরশি নেই। নিজের মুখভঙ্গিটা দেখলেই বুঝতে পারতাম যে, সেখানে একটা কিছু থমকে আছে। আমাদের সঙ্গে মায়ার আসার কারণগুলো কি কি হতে পারে? ওরা দুজনে এর আগে বাইরে কোথাও যায়নি। অর্থাভাব-ছাড়া পারিবারিক বাধাই এ-ব্যাপারে প্রধান। মায়ার বাবা না-থাকলেও ব্যবসাদার দাদা ও মা আছেন। এসবের মাঝে..। তাছাড়া সঙ্গে যখন আমি রয়েছি, তখন সে কেন বেরোলো? সে কি জানতো না, পাওয়া গেলে-ও দুটো ঘর আলাদা নিতে দ্বিগুণ পয়সা বেশি লাগবে? এর ফলে অশোক ও আমার বেড়ানোটাও নষ্ট হতে পারে।

অন্ধকারে কতটা হাঁটতে হবে ঝাউবনে বোঝা যাচ্ছে না। সমুদ্দুরতীরে ঝাউবন কিছু আপনা-আপনি হয়নি। মাটিকে রক্ষা আর ট্যুরিস্টদের ছলনা সৃষ্টি জন্যে এসব লাগানো হয়েছিল। আজ আর এসব বোঝার উপায় নেই।

প্যাকেট তিনেক সিগারেট ও দেশলাই অশোকের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললাম, 'বাব্বাঃ, এতক্ষণে একটু নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আর একটা জায়গা পেয়েছি।'

ঘরে জানলা নেই। একটাই দরজা। সেকারণে অশোকের সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘরটা ভারী হয়ে আছে। পার্থ বলল, 'তাই নাকি? কোথায়?'

'সে আছে ওদিকে। বাঁধের গায়ে।'

অশোক উঠে দাঁড়াল, 'সত্যি? ইস্, মায়াটা যে কেন এল। এই, তুমি একা এখানে থাক। আমি আর একরাম চলে যাচ্ছি ওখানে।'

মায়া বলল, 'থাক্, হয়েছে। ন্যাকামো কর না।'

অশোক বলল, 'ন্যালিখে দিলে, ওঃ। আচ্ছা, এখন বসে পড় তো। খাবার দিতে আরও একটু দেরী আছে। ততক্ষণে গাঁজাটা শেষ করা যাক্।'

খাওয়া-দাওয়ার একটু পর যখন আমরা বোতল খুলি, তখন সমুদ্দুরগর্জনের ভেতর রাত ভারী হয়ে উঠেছে। ঠিক করলাম, বেশি খাবো না। বাস্তা চিনে শংকরবাবুর বাড়িটা খুঁজে বের করতে হবে। বালির বাঁধের গায়ে। সমুদ্দুরের এতো কাছে, পিঠের ওপর, একটুখানি জল কি করে এতোদিন পড়ে আছে। নিশ্চয়ই জলটা এতোদিনে কালো হয়েছে। পুকুরের ভঙ্গিতে ঢেউ দেয়। ছোট, ছোট।

পাশাপাশি দুটো তক্তা। মাঝখানে একটুখানি সরু জায়গা। অশোক ও আমি মুখোমুখি বসলাম সেখানে। আমার ডান ও অশোকের বাঁ-দিকের তক্তায় মায়া অর্ধেক শুয়ে থেকে আমাদের দিকে চেয়ে আছে। এসময় তাকে অভিনেত্রীর মতো দেখায়। তার মেয়েলি আপত্তি শেষপর্যন্ত প্রায় বিনা চেষ্টাতেই অগ্রাহ্য করে যখন আমরা বোতল প্রায় শেষ করে এনেছি, অশোক একটু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। খুব অপরিচিত-চোখ দুলিয়ে বলল, 'কীরকম লাগছে, একরাম?'

তার মুখে হাসির সার্থক বাষ্পরেখা—চাপা, অলঙ্কারময়।

প্লাস কিছু না-ভেবেই বললাম, 'চমৎকার।'

সে আবার হাসলো। তার হাসির ফুটু উজ্জ্বলতা বোধহয় আমার মাথার পেছনে গিয়ে পড়েছে। ধরা পড়ার মতো অস্বস্তিতে ঢকঢক্ করে শেষ গ্লাসটা খেয়ে সিগারেট ধরালাম।

হঠাৎ বলে উঠলাম, 'ওরকম তাকাচ্ছিস কেন?' এবং তারপর আর কি বলা যায়—খুঁজে পেলাম না।

মায়া একটা আকাশী চাদর বুক অব্দি টেনে বলল, 'এই বকবক করো না। এবার শুয়ে পড়। ভোরে উঠে সূর্যোদয় দেখতে হবে।'

অশোকের পেছনে একটা মরফতে টেবিল। তার ওপর ধোঁয়া-ভরা এ্যাশট্রে।

আলো এতো কম যে, তাতে হ্যারিকেন রাখার সার্থকতা বোঝা যায় না। সেই আলোর বিপরীতে অশোকের মুখটা লাগানো বামন ক্যাকটাসের এইটুকু ছা চেহারা নিয়ে একটু একটু দুলছিল। তার একফাঁকে সরু ও তীক্ষ্ণ একটু হাসি।

ধাঁ করে মায়ার দিকে চোখ গেল। শুয়ে পড়েছে। অশোক চুপচাপ স্থিতধী বোতলটা হাতে নিয়ে বসে আছে। বসে বসেই বললাম, 'মায়া, একটু খাবে এস।' বলে অশোকের দিকে চেয়ে বললাম, 'ও একটু খাক।'

আসলে বুঝতে পারছিলাম যে, ক্রমাগত আমি বিপদে পড়ছি। কিন্তু বিপদটা যে কি টের পাচ্ছিলাম না। সেই কারণে হঠাৎ মায়াকে ডেকে ফেললাম।

অশোক আমাকে কিছু বলল না। মায়াকে বলল, 'খাবে?'

একধার মায়া ন্যাকামি-ভরা মাথা তুলল, 'প্রথমে ডাকলে না তো? এখন তোমাদের সঙ্গে পারবো কি করে? বাংলার যা গন্ধ, বাবাঃ!'

অশোক বলল, 'খাবে তো এস।' বলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সিগারেটের প্যাকেটটা দে।'

এরপরই মায়ার 'আর গ্লাশ কোথায়' গোছের ঠুনকো যুক্তি দেখানোর চেষ্টা।

ভাঁজকরা ডানহাতের ওপর মাথাটা তুলে ধরে তখন অধশোয়া মায়া আমাদের দুজনকেই দেখছে। ভাঁজ-করার চাপে ফুলে ওঠা হাতের ওপর-নিচের পেশীর আর সুডৌল কনুইয়ের রক্তোচ্ছ্বাসে তার নগ্নতা ফুট করে আলো হয়ে জ্বলে উঠল। সোজা দাঁড়িয়ে একটু ঝুঁকে পড়ে মায়ার হাত ধরে একটানে বসিয়ে দিয়ে বললাম, 'এসো তো।'

মায়া অশোকের দিকে একটু চাইল। অশোক হেসে 'বসে পড়' বলে দুটো গ্লাসেই মদ ঢেলে দিল। কোনো নজাচড়া না-দেখে কি করব ভাবছি। নিচে পা ঝুলিয়ে টান্ টান হয়ে বসে আছে মায়া। অনেকক্ষণ অশোকের দিকে চেয়ে রইল একটানা। তারপর ঘরটা দেখল। আমাকে দেখল। তারপর ঝট্ করে মেঝেয় বসে পড়ে বলল, 'দাও।'

গায়ের মোটা চাদরের একটা দিক বিছানার পাশের দিকে, আর একটা দিক নিচে বসে-থাকা মায়ার কোলে একটা প্রকাণ্ড নীলচে সাপের খোলস হয়ে পড়ে রয়েছে। চারিদিকে বনবাদাড়। এখানে ট্যুরিস্ট লজের চীপ ক্যান্টিনে নাকি একটা হরিণ থাকে। চাদরটা কোল থেকে নামিয়ে গ্লাশটা নিয়ে মায়া এক নিঃশ্বাসে ঢক্‌ঢক্ করে খেতে গিয়ে গলায় লেগে কাশতে শুরু করল।

সিগারেটে লম্বা টান দিতে গিয়ে আমি থমকে গেলাম। বাইরের বারান্দা দিয়ে কে যেন হেঁটে গেল। তার পায়ের শব্দে, এই প্রথম গোপনরীতির সন্দেহপূর্ণ হাওয়া, আমাদের শরীর স্পর্শ করল। বসে পড়ে মায়ার হাত থেকে গ্লাশ নিয়ে বাকিটুকু খেয়ে ফেললাম।

বোতলটা যতোই শেষের দিকে যাচ্ছে, মায়ার স্থিরতা ততোই কমে হচ্ছে। কখন যে সে তন্তায় ঠেস দিয়ে মাথা পেছনদিকে এলিয়ে দিয়েছে, লক্ষ্য করিনি। অস্ফুট-গলায় সে যখন মাংসলভাবে বলল, 'জল খাবো', তখনই প্রথম টের পেলাম যে, সে আমাদের কোনো-একজনকে উদ্দেশ করে কথাটা বলে নি। এবং তার উপস্থিতি-ছাড়া এখন আর লক্ষ্যণীয় কিছুই আমাদের সামনে নেই।

আমি কিছু করার আগেই অশোক উঠে দরজা খুলে জল আনতে গেল। এই চাঁটা-চলাটুকুতেই তার শরীর প্রবলভাবে দুলে উঠেছিল। দরজা খুলতেই একটা চেঁচামেচি হল্লা ভেসে এল। দূর থেকে 'মার শালাকে' ভেসে আসছে। মায়া মুখের সামনে থেকে টলানো হাতে চুল সরিয়ে বলল, 'জল ..।'

যখন ওকে সান্ত্বনা দিচ্ছি, অশোক জল হাতে ঢুকে দরজা বন্ধ করে হেসে বলল, 'কেল্লা হয়েছে। পাশের হোস্টেলে একটি ঘরের সব মাল হাপিস। ঠিক সময়ে জেগে উঠেছিল। চোর শালার বরাত খারাপ।'

অর্ধেকটা জল খেয়ে মায়া হিহি করে উঠল। তার হাসির মধ্যে আঁচল উড়ে যাওয়ার ভরভরে শব্দ ছিল।

চোরটা নিশ্চয়ই খুব মার খাচ্ছে। শংকরবাবু কি এখনো জেগে আছে? ঝাউ-গাছের কালো গুঁড়ির ফাঁক দিয়ে যেতে হবে বাঁধের কাছে। মায়ার হাসি শুনে অশোক আমার দিকে ভ্রু তুলে একবার চাইল। তারপর ওকে ধরে তুলতে তুলতে বলল, 'একবার, গ্লাশ বোতল সরিয়ে দে।'

মায়াকে শোয়াতে শোয়াতে অশোকও জড়াজড়ি করে বিছানার মধ্যে পড়ে গেল। আমার হাতে হ্যারিকেন। এ-ঘরে আগে নিশ্চয়ই কোনো স্কুলের ছেলেমেয়েরা এসে-ছিল। মায়ার মাথার দিকের দেয়ালে শক্ত কিছু দিয়ে আঁকা বসেছে ভারতবর্ষের ভুল ম্যাপ। নিচের দিকটাও সিংহল আন্দাজ করে বুঝে নিতে হবে, ম্যাপটা ভারতের। বিছানা থেকে উঠে অশোক বেশ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইল। বলল, 'তোকে আর যেতে হবে না, এখানেই শুয়ে পড়।'

অর্থাৎ, মায়া সে টের পাবে না। অত দূরে কষ্ট করে আর যাবি কেন।

অনেকগুলো পাথর গড়াতে গড়াতে আমার পৌরুষ-তরু মূলে এসে আছড়ে পড়ল। বিছানায় এলানো মায়াকে দেখানো গিয়ে পরস্ত্রী দেখার সম্ভাব্যতা কিছুতেই দূর করা গেল না। এই দৃষ্টির মধ্যে গ্রাম্য আড়ষ্টতা ছিল কি? অথবা, পরস্ত্রী দেখার হীনমন্যতা?

ঠিকভাবে মায়াকে চাদর ঢাকা দিয়ে অশোক নাটকীয়ভাবে ঘুরে বলল 'চমৎকার শ্রীমতী এবার ব্রহ্ম। নে, বিছানাটা করতে হবে।'

তার এইসমস্ত আপাত-আন্তরিক কথার মধ্যে একধরনের দূরত্ব ছিল, সেটা অশোক বরাবরই রাখার চেষ্টা করে। সে আমার দিকে চেয়ে তেলতেলে মুখে একটু হাসল।

আবার সে বলল, 'কেমন ইভিলি ম্যানেজ করা গেল, বল্ তো।' বলতে বলতে আটকে গেল তার কথা। অল্প টলতে টলতে একটু ঝুঁকে খুব তীক্ষ্ণচোখে কিছু একটা দেখার চেষ্টা করল, 'কী হল একরাম? দাঁড়িয়ে রয়েছিস ওরকমভাবে? ভর পাইয়ে দিচ্ছিস।'

আমার ছায়ার জায়গায় শক্ত একটা খেজুর গাছের ছায়া দাঁড়িয়ে আছে। টেবিল থেকে প্যাকেটটা নিয়ে একটা সিগারেট ধরালাম। টেবিলের নিচেই ছিল বোতল-গ্লাশ। বালিশের এইদিকে মায়ার মুখ। চোখ দুটো বোজা। এলোমেলো চুলের ছোঁয়াতে আক্রমণে যা যা হবার, তাই হয়েছিল আমার। অশোক আমার সরলতা বেয়ে কতদূর যেতে পারে? সেকি এতোটাই গাম্ভীর্য ভেবেছে আমাকে?

বললাম 'আর একটিও কথা না-বলে দরজা খুলে বাইরে যা অশোক। টেবিলের নিচেই খালি বোতল আছে। এ-ঘরে শুধু আমি আর মায়া থাকব।'

অশোক প্রথমে কীরকম হতচকিতের মতো দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ভ্রূভাঙা গলায় বলল, 'তোর হল কী? তুই যে কোথায় যাবি বলছিলি? না-ও যেতে পারিস। এই তক্তায় দুজনে স্বচ্ছন্দে শোয়া যায়। কিন্তু এরকম করছিস কেন?'

এক ঝটকায় উবু হয়ে বোতলটা তুলে নিলাম। এই তোলার পেছনের ইতিহাস এ-মুহূর্তে আমি যতটুকু জানি, তার চেয়ে না-জানাটুকু অনেক বেশি।

বললাম, 'কোনো কথা নয়। মায়া আমার কাছে থাকবে। শিগগীর বেরো এখান থেকে।'

অশোক সঙ্গে সঙ্গে আমার পায়ে একটা ঘুষি দিয়ে বলল 'শালা, একসঙ্গে আসিনি, পার্টার্ড কোথাকার?'

বলে সেই আবার ঘুসি দিতে যাবে, আমি বোতলটা রেখে দুমদাম করে অসংখ্য কিল চড় লাথি ঘুসি দিতে দিতে ওকে বার দরজার ওপর ফেলে দিলাম। ওরও শক্তিও তত কেমন ছিল না। দরজা খুলতেই সমুদ্রের পুবাবাতাসটা একঝলক ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ওকে টানতে টানতে ঘরের বাইরে ফেলে-দেবার সময় ও বিড়বিড় করে কিছু বলার, এলোমেলো 'এসেছিলাম শালা' বলে যাচ্ছিল। বাইরে ফেলে ওর মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে এতোই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে-ছিলাম যে যে কোনো মুহূর্তে দরজা পাড়াতেই খানখান্ হয়ে আমি ভেঙে পড়তে পারি।

কিন্তু পড়িনি। তার কারণ মায়ার পাশে-থাকার ভঙ্গিতে একটি অনির্বচনীয় উদ্দেশ্যহীনতা অনেক আগে থেকেই এলিয়ে ছিল।

সুধা

চণ্ডী মণ্ডল

দশ তলার ফ্ল্যাটটা কিনেছে অনন্ত এক লাখ ষাট হাজার টাকায়।

টাকাটা একটু বেশী—সুধও অবশ্য অনেক বেশী!

পাহাড়ের মতো না হলেও দশতলা অনেক উঁচু!

—চাকরীতে বড় লিফ্‌ট পেয়েছে অনন্ত! শিল্প সাহিত্যের বড় রসিক বলে বিখ্যাত হয়েছে! —আর একটা সুবিধা হয়েছে, মশারী লাগে না—মশারী টাঙানোর

কুকি পোয়াতে হয় না আরতিকে!

মশা মাছির চিহ্ন চোখে পড়ে নি গত দেড় বছর! লিফ্‌ট-এ চড়ে অবাঞ্ছিত পোকা-মাকড় দশতলায় উঠে আসে না!

যারা আসে তারা সকলেই অনন্তর ভক্ত। অনন্ত তাদের পছন্দ করে, প্রশ্রয় দেয়। বিশেষ করে রবিবার সন্ধেয় আসে বিশেষ তিনজন!

তেজেসকে যারা চেনে না তারা মাস্তান ছাড়া কিছু ভাববে না তাকে! ছ'ফুট লম্বা, সেই অনুপাতে চওড়া। চওড়া বেল্ট, বেল-বট্‌স্ প্যান্ট, লাল কালো চেকের কিংবা টকটকে লাল টেরিকটের হাওয়াই শার্ট। কেমিস্ট্রির লেকচারার তেজেস। আসল পরিচয় কবি। অনিন্দ্যও খুব লম্বা; লোহার মত শক্ত, বিয়াল্লিশ ইঞ্চি ছাতি। হাতের বাইসেপ দেখে মনে হবে বক্সার! যখনই দেখা হবে, দেখে মনে হবে রিং থেকে নেমে এল এইমাত্র দুর্দান্ত কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে নক আউট করে। ব্যাঙ্কের কেরাণী অনিন্দ্য। আসল পরিচয়, এস্‌ট্যাব্‌লিশমেন্ট বিরোধী এক নাট্যগোষ্ঠীর সদস্য, অভিনেতা। হিরণকে দেখে মনে হবে একজন স্পোর্টস-ম্যান। মুখে সব সময় এমন একটা আত্ম-বিশ্বাসের ছাপ, মনে হবে টেনিসের এবছরের অবধারিত জাতীয় চ্যাম্পিয়ন! ভালো টেনিস খেলে হিরণ। ভালো চাকরী করে। আসল পরিচয়, খুব ভালো সেতার বাজায়।

তিন জোড়া শক্ত পা এসে দাঁড়ায় দরজার বাইরে।

আরতি তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেয়।

অনন্তদা নেই! —কোথায় গেছেন?

মিটিং।

ফিরবেন কখন?

আপনাদের বসতে বলেছে—।

তারা ততক্ষণে যে যার জায়গায় বসে গেছে।

—বৌদি, আপনি কেন মিটিং-এ যান না!

আপনারা ফিরে যাবেন—।

আপনি বসুন—।

হ্যাঁ—। তাদের সকলের থেকে সমান দূরত্বের সামনের দেয়ালে টাঙানো চূড়া বরফে ঢাকা কোন পাহাড়ের পেন্টিং-এর নীচে তার নির্দিষ্ট জায়গায় বসে আরতি।

অনন্ত ফিরে এলে—অনন্ত বাড়ী থাকলেও, তিনজনের কারো পাশে বা পিছনে একটা চেয়ার নিয়ে বসবে, আরতি যেখানে বসে, বসে থাকবে রাত দশটা সাড়ে দশটা পর্যন্ত—মাঝে মাঝে কথা বলার সময় হয়তো বসার ভঙ্গিটা বদলাবে। মাঝখানে একবার কফির প্রথমবার কফির সঙ্গে কিছু হাল্কা খাবার—ডিমের বড়া, পেঁয়াজ পকোড়া, সিঙ্গাড়ার ব্যবস্থা করতে হয়। ঠাকুর সব তৈরী করে, আরতি পরিবেশন করে। যেদিন কফির জায়গায় অন্য পানীয়ের আয়োজন হয়, আরতিকে পরিবেশন করতে হয় না। তেজেস বা অনিন্দ্য বা হিরণ করে—আরতিকে কিছু চাখতে হয়। আরতির কোন সংস্কার নেই! বরং অনন্ত সেদিক থেকে সেকেলে। আরতির মুখের দিকে দুটো ঠাণ্ডা চোখে চেয়ে বলবে—খাও! মানে খেও না। খেতে ভালো লাগে না ঠিকই, আরতি খেতে ঠিক চায়ও না, কিন্তু তেজেসরা এমন জোর করে যে না খেয়ে পারে না। তবে খাদ্য বলা চলে না—জিভটা ভেজায়। তাতেই আরতি টের পায়, বুঝতে পারে, অনন্তর বুক কত জ্বলে। মনে মনে একটা জবাব সানিয়ে রাখে আরতি। তাকে একা পেয়ে এগারটার পর বেডরুমে অনন্ত যখন আক্রমণ করবে, তখন আরতি ছুঁড়বে অস্ত্রটা। একেবারে বুকে আমূল বিঁধিয়ে দেবে!—তোমার জন্যেই তো, যদি বেশী খাও—তোমাকে পাহারা দেবার জন্যেই ও ঘরে থাকতে হয় আমাকে! আমার তো আর হার্ট খারাপ নয়!

অনন্তর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা তার হার্ট খারাপ। যে কোন দিন—। আরতির অমোঘ আঘাতে একেবারে অন্য মানুষ হয়ে যায় অনন্ত! মুখ চোখ যেন নিভে যায়। বলে—যে কদিন আছি, এই ভাবে চোখে চোখে—আমাকে একটু দেখো! সন্ধে সাতটা থেকে দশটা—তিন ঘন্টায় বড়জোর যার তিন বার দেখেছো আমাকে—কোনবার দু-তিন সেকেন্ডের বেশী নয়! বলতে গেলে পুরো তিনটে ঘন্টা তোমার চোখ দুটো ওদের—। ওরা তোমার টানেই—। না হলে শালারা শিল্প সাহিত্যের কিছু—শুধু উত্তেজনা—। আমিই হলে ওদের আসল—। শালারা আগুন পোয়াতে আসে!

আরতি শাড়ি ছেড়ে নাইটি পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গালে গলায় লোশন লাগিয়ে তুলো দিয়ে চামড়ার লুকোনো মধলা তুলছিল। শুনে লাল হয়ে উঠল। বলল—জান যদি তাহলে আসতে দাও কেন!—এক-দিন না এলে কেন অস্বস্তি হও।

তোমার—তোমার মুখের দিকে চেয়ে। অনন্ত আয়নায় দেখে গোলাপী বেশমী রাত্রিবাসে আরতিকে কিশোরী দেখাচ্ছে। কিশোরী অবশ্য নয়, আরতি—না হলেও চৌত্রিশে এমন চমৎকার চেহারা, খাঁজ ভাঁজ-গুলো যেন ছেনি দিয়ে কাটা! অনন্ত এগিয়ে এগিয়ে পিঠে হাত রাখে।—আমাকে তো তুমি পেলে না, আমার অর্ধেক খাচ্ছে অফিস, শিল্পসাহিত্য বাকী অর্ধেক—তোমার ভাগে খারাপ হার্টটা!

আদিখ্যেতা করো না!—অনেক রাত হয়েছে, আলোটা নিবোও! আরতি বিছানায় উঠে যায়।

অনন্ত বলে—আলো আজ রাতে নিববে না।—আর কটা রাত আমার জীবনে আসবে বল, কে বলতে পারে—। আজ রাতেই সব বলে নিতে চাই!
এসো—পাগলামো করো না।

না—। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে অনন্ত। জেদী ছেলের মতো চেয়ে থাকে বিছানার দিকে।

আরতির গলায় স্নেহ—যত বয়েস হচ্ছে তুমি কী রকম ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছো জানো।

বুড়ো হয়ে যাচ্ছি—আমি জানি! বুঝতে পারি আমি—।

সকলেই তাই হয়।—এসো—।

তুমি তো হচ্ছো না! তুমি ঠিক উল্টোটা হচ্ছো!

কী হচ্ছি—শুনি? আরতির মুখে হাসি।

অনন্ত বিজ্ঞের মতো হাসে।—শুনতে খুব ইচ্ছা হচ্ছে।

না।

জানি জানি মেয়েদের না মানে—।

আরতির গলায় মজা—কতগুলো মেয়ের সঙ্গে মিশেছো যে এত জান মেয়েদের!

অনন্ত পায়ে পায়ে বিছানার কাছে চলে যায়। শরীরটা ধীরে ধীরে বিছানায় তোলে। মাথার বালিশের ওপর দুটো হাত পেতে তার ওপর মাথাটা রেখে একটা পায়ের ওপর একটা পা তুলে টান টান হয়ে শুয়ে থাকে।

আরতি বালিশ থেকে মাথাটা তুলে ডান পাশ ফিরে বিছানার ওপর ডান হাতের কনুই চেপে হাতের মুঠোয় মাথা ঠেস দিয়ে দেখতে লাগল অনন্তকে।—কী, আর যে কথা বলছ না—কত মেয়ের সঙ্গে মিশেছো বললে না!

অনন্ত একবার ঘাড় ঘুরিয়ে আরতিকে দেখল।—একটা মেয়ের সঙ্গেই ভালো করে—। আর একবার যদি বয়েসটা ফিরে পাওয়া যেত—তেজেস হিরণদের একজন যদি—।

আরতি বলে উঠল—তুমি ওদের ঈর্ষা কর না!—কেন কর!

অনন্ত আরতির মুখের দিকে চেয়ে বলল—অন্যের ঘরে বসে, তার ঘরের খাবার খেয়ে তারই যুবতী বউ-এর সঙ্গে—।

আরতি মুখ ফিরিয়ে নেয়।—তোমার মুখ আর মাথা দুই-ই দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে!

মাথা আরো ভালো হচ্ছে—শুধু হার্টটা!

তাহলে এবার চোখ বন্ধ কর—।

করলে তোমার সুবিধে—। জানি, আমি যত তাড়াতাড়ি চোখ বন্ধ করব তত তোমার সুবিধে!

এইসব যদি বল—বলতে থাকো, আরতির গলা আবেগে ধরে আসে,—আমাকে কিন্তু মরতে হবে তাহলে!

আমি তাহলে এক মুহূর্ত বাঁচবো না! অনন্ত হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠে।—অফিস শালা টাকা দিচ্ছে বলে আমার অর্ধেকটা খেয়ে শেষ করছে, শিল্পসাহিত্য খাতি দিচ্ছে—অর্ধেকটা খাচ্ছে! তুমিই যে আমার কাছ থেকে কিছুই পাচ্ছো না তবু দিয়ে যাচ্ছো—তাই নিয়ে বেঁচে আছি।

আরতি আবার মুখ ফেরায়। বলে, কেন, তুমি আমাকে অনেক দাও—কত দিয়েছো!—এত প্রাচুর্য!

অনন্ত গভীর আবেগে বলে—এর চেয়ে অনেক অনেক বেশী পাওয়ার যোগ্য তুমি!

আরতি বলে—বোলো না, এসব শুনতে ভালো লাগে না!

অনন্ত বলে—আমাকে তবু বলতে হবে যা সত্যি—।

না, তুমি বলবে না এমন করে—আমার সত্যি ভালো লাগে না!

তোমার ভালো লাগে না, আমি জানি! তুমি জান না। তুমি জান না!—তুমি—।

আমি জানি!

কীজান—কী জান বল!

বেডরুম আর ড্রইংরুম-এ তোমার বিতৃষ্ণা!—

তুমি অনেক বছর কাটিয়ে দিলে—তোমার আর ভালো লাগে না!

একথা কেন বলছ, আমাকে তুমি তোমার অফিসের পার্টিতে নিয়ে যাও তোমার বন্ধুদের বাড়ীতে বেড়াতে নিয়ে যাও।

সেও তো একটা ড্রইংরুম থেকে আর একটা ড্রইংরুম-এ!

দূরেও বেড়াতে নিয়ে গেছো।

সে কত বছর আগে!

আরতি বলে, অনেক দিন আমরা দূরে কোথাও যাইনি।

অনন্ত বলে—যাবে?

আরতি উঠে বসে অস্বাভাবিক আবেগে। তার চোখে মুখে বক্তের উচ্ছ্বাস। বলল—যাবে—সত্যি যাবে!

ধরা পড়ে গেছো তুমি বোকা মেয়ে। তোমার মুখ দেখে যে কেউ বলবে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা তোমার মনে আগেই তৈরী হয়ে আছে! অনন্ত নগ্ন কৌতূহলে উঠে বসে। —এখন সত্যি কথাটা বল—প্ল্যানটা কার—তোমার না? তেজেস হিবর-দের!

আরতি তার চাপা আনন্দ লুকোতে পারে না। —ওরা বলছিল, সকলে একসঙ্গে কোথাও বেড়াতে গেলে বেশ হয়—হৈ হৈ করে বেড়ানো যাবে, কদিন খুব মজা হবে!—তোমার শরীরের কথাতেই উঠল বেড়াতে যাওয়ার কথাটা। —তোমার শরীর তো অনেক দিন থেকে ভালো নেই।

অনন্ত নিজের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যেতে যেতে বলে, খুব ভালো! —কিন্তু আমি খারাপ শরীর নিয়ে কেমন করে মজা করব হৈ হৈ করে—আমাকে নিয়ে কোন পরিকল্পনা হয়েছে তোমাদের।

ওরা বলেছে, তুমি বিশ্রাম করবে।

তাহলে অবশ্যই খুব মজা হবে! আমি সারাদিন শুয়ে শুয়ে—তোমরা সারাদিন হৈ হৈ করে—।

হৈ হৈ মানে ঠিক হৈ হৈ!—হৈ হৈ মানে আনন্দ!—তোমারও আনন্দ হবে! ভেতরের উগ্র আনন্দ মুখে নিয়ে আরতি অনন্তর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

অনন্তর মুখের খাঁজগুলো যন্ত্রণায় ক্ষত হয়ে যায়। গলার স্বর চাপা গোঙানীর মতো শোনায়। —তোমাদের পরিকল্পনা—প্রোগ্রাম সব—আমাকে না জানিয়েই—কবে, কতদিন থেকে—? আরতি হাসতে হাসতে বলল—তোমাকে সারপ্রাইজ দেব বলে—।

আই অ্যাম রিঅ্যালি সারপ্রাইজড্!—আমি—আমি—। আবেগে ভেঙ্গে পড়ে অনন্ত। —আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি ভেবে—। আমি ভাবতেই পারছি না!

কী ভাবতে পারছ না—কী ভাবছ বলো! আরতির দুটো ঠোঁটে জমাট কৌতুক।

অনন্তর মুখ আরো শীর্ণ, রুগ্ন দেখায়। —ওদের সাহসের কথা ভাবছি!

কেন ওরা কী করেছে!

ওরা কী করতে চায়! অনন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যায়। —কেউ নিশ্চয়ই ওদের—। তুমি—তুমিই—!

হ্যাঁ, আমিই ওদের বলেছি! —আমার ইচ্ছাতেই—।

জানি! তুমিই ওদের তাতিয়েছো! অনন্ত অস্বাভাবিক জোরে প্রায় চীৎকার করে কথাটা বলে।

আরতি প্রতিবাদ করে—কী বলতে চাও তুমি! তাতিয়েছি মানে কী!

অনন্ত ফুঁসতে থাকে রাগে। —মজা বোঝো, আনন্দ বোঝো, আর এটা বোঝো না!

না বুঝি না—বুঝতে চাই না! আরতির কণ্ঠে গভীর বিতৃষ্ণা! —তুমি এমন জানলে আমি কিছুতেই ওদের কথা দিতাম না!

কথা দিয়েছ? —কথা দিয়েছ ওদের সঙ্গে—।

না—কথা দিয়েছি তোমাকে রাজী করাব।

কেন কথা দিয়েছো! অনন্ত অসম্ভব অস্থির হয়ে পড়ে। —কেন তুমি এমন কথা দিলে!

আরতি বলে, আমার বিশ্বাস ছিল তোমাকে রাজী করাতে পারব। তোমার বেড়াতে যাওয়া দরকার তোমাকে বোঝাতে পারব।

অনন্ত দৃঢ় স্বরে বলে—আমার বেড়াতে যাওয়া দরকার কিনা আমি নিজেই বুঝব!

অভিমানে ধরা গলায় আরতি ধীরে ধীরে বলে—বেশ! এখন জানলাম, তোমার ভালোমন্দ বোঝার কোন অধিকার নেই আমার। আমি তোমার কেউ নয়।

চমৎকার! দারুণ। অনন্তর গলায় তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ।—এমন দারুণ অভিনয় করতে পার আগে জানতাম না!

অভিনয়! —কী বলছ! আরতির কণ্ঠ অভিমানে ভেঙ্গে পড়ে। —তুমি বলছ আমি অভিনয় করেছি! এতদিন আমি যা করেছি সব অভিনয়! আমি—আমি অভিনয় করি! তুমি বলছ—তুমি বলছ—।

অনন্ত হেসে ওঠে হা হা করে—হা হা হা হা হা—।

কী হল—এত হাসির কী হল! আরতির মুখে মেঘ, চোখে বিদ্যুৎ।

অনন্তর দুটো চোখ তখনো হাসছে।—তুমি—সত্যি! একটুও বয়েস বাড়ে নি তোমার! বোকা মেয়ে!

বোকাই তো! আরতির ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে কাঁপতে থাকে।

অনন্ত দেখতে দেখতে বলে—বোকা বলেই এত সুন্দর! —সবচেয়ে সুন্দর ঠোঁট দুটো!

নাঃ! দুহাত দিয়ে বাধা দেয় আরতি।

অনন্তর গলায় অনুনয়—কথা দিচ্ছি, যাব—।

নিজের ইচ্ছার তো আর যাবে না! আরতির সজল কণ্ঠস্বর।

অনন্ত বলে—তোমার ইচ্ছাতেই যাব! যেতে হবে না!

রাগ করো না! আমি এমনিই বলছিলাম দেখতে তুমি কত রাগ করতে পার। —বল কোথায় যাবে?

আরতির তবু অবিশ্বাস, বলে—যাবে সত্যি!

তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না আমাকে! অনন্ত একেবারে অন্য মানুষ।

না তা নয়—। সত্যি যাবে? আরতির চোখের মণি দুটো চকচক করে। —আমি কিন্তু এমনিই বলেছি—।

অনন্ত অবাক! কী বলছ!

আরতি হাসতে হাসতে বলে, আমি না একটু আগে যা বলেছি সব ভুলিয়ে।

মানে অনন্তর অসীম বিস্ময়। আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না!

আরতির দুটো ঠোঁটে জমাট রহস্য! হাসতে হাসতে বলে—বেড়াতে যাওয়ার কোন কথাই হয় নি ওদের সঙ্গে।

অনন্ত দু হাতে নিজের মাথাটা চেপে ধরে। —তুমি—তুমি আমার মাথা—।

আরতির কোন বিকার নেই। হাসে—।

অনন্ত একবার গভীর শ্বাস নেয়, তারপর আরতির পায়ের কাছে মাথা রেখে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে। আঃ! কী যে ভালো লাগছে!

বেড়াতে যেতে হবে না, তাই!

বেড়াতে যাব ভাবতে। অনন্তর গলায় অদ্ভুত আবেগ—কতদিন থেকে ভাবছি—আজই ভাবছিলাম তোমাকে বলব।

নদীর মতো উচ্ছল হয়ে ওঠে আরতি। দু'হাতে অনন্তকে তুলে ধরে বলে, ওঠো—ওঠো, বল কবে যাব, কোথায় যাব—বল বল—?

এক মাসের মধ্যেই—জুলাই-এর শুরুতেই।

জুলাই-এ তো বৃষ্টি নেমে যাবে!

বৃষ্টিতেই তো সমুদ্র সুন্দর!

সমুদ্রে যাব না—পাহাড়ে—। পাহাড়ে যাব—। বল পাহাড়ে যাবে!

পাহাড়ে একবার গেছি আমরা আগে!

আবার যাব! আমার ভালো লাগে!

অনন্ত বোঝাতে চায় সমুদ্রও ভালো—পাহাড়ের চেয়ে—।

না! না—। আরতির গলায় পাহাড়ী নদীর টান। না পাহাড়ে—পাহাড়ে—।

অনন্ত আরতির জোরে ভেসে যায়। বেশ! কিন্তু শুধু তুমি আর আমি যাব তো!

আরতি খল খল করে হেসে ওঠে। হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ তুমি আর আমি আর কেউ নয়! পাহাড়ের কোলে কোন বাংলোয় উঠব—। ওপরে আকাশ ছোঁয়া পাহাড়—নীচে জঙ্গল ঘন। —যাবে বল?

যাব। —এবার কিন্তু ঘুমোও! অনেক রাত হবে গেছে।

আমার ঘুম আসছে না। আরতির চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে। —তোমার মনে আছে, সেবারই প্রথম আমরা পাহাড়ে গিয়েছিলাম—। কী নাম বলত জায়গাটার?

পাহাড়ের না জঙ্গলের?

আরতি উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে।—পাহাড়ের কোলে ছিল জঙ্গল। জঙ্গলের মধ্যে একটা বাংলোয় আমরা ছিলাম। সারারাত আমি ঘুমতে পারিনি—।

আমাকেও ঘুমতে দাও নি!

আরতি বলে—তুমিই আমাকে ঘুমতে দাও নি!

তাই? আমার মনে নেই।

মনে নেই—সারারাত একটা জন্তুর ডাক। মনে হচ্ছিল যেন বাংলোর বারান্দায়—দরজায় গোড়ায়—বিছানায়!

অনন্ত আচমকা যেন নিজের ভেতর থেকে জেগে ওঠে।—মনে আছে কী জন্তু ছিল সেটা!

বাঘ!

অনন্তর দুটো চোখ জ্বলে উঠল, মুখে ফুটে উঠল জান্তব উল্লাস! —মনে আছে, বাঘটা কী করল! —হরিণটাকে এইভাবে মুখে তুলে নিয়ে—।

আঃ! আঃ! —উঃ! —বাঘ নয়—ভাল্লুক একটা!

হা হা হাসে অনন্ত: —তোমার মনে আছে, সারারাত সেই ঝর্ণার শব্দ!

আঃ হাঃ! আরতির গলা থেকে তরল আনন্দ গলে গলে পড়ে। —তোমার এত মনে আছে! —ভোরবেলা আমরা সেই ঝর্ণা দেখতে গিয়েছিলাম। কী অপূর্ব!

তোমার মতো! অনন্ত বলে—তুমি সেই ঝর্ণার মতো ছিলে—।

আর তুমি। আরতি অনন্তর বুকে হাত রাখে। —তুমি পাথরের মতো শক্ত ছিলে!

অনন্ত বলে—তুমি আজো ঝর্ণার মতো আছো—না, আরো পরিপূর্ণ হয়েছ তুমি, নদীর মতো—পাহাড়ী নদী!

তোমার কিন্তু এত বয়েস হয় নি!

না—আমি বুড়ো হয়ে গেছি!

না না—শুধু তোমার মনটা—।

না, শরীরটাও! একটু পরিশ্রম হলে, একটু বেশী উত্তেজনা হলে—আমি টের পাই!

তোমার রোজ একটু ব্যায়াম করা উচিত। —ডাক্তার বলেছে—কর না কেন!

অনন্ত কোন উত্তর দেয় না। ঠোঁট দুটো ফেকাসে হয়ে গেছে।

আরতি লক্ষ্য করে না। ব্লাউসটা গা থেকে নিমেষে খুলে ফেলে অনন্তর দিকে পিঠ ফেরায়। —তুমি খোলো!

জিনিসটা নতুন। টেনে হুকটা খুলতে বাড়তি যে জোর চাই, হৃদপিণ্ড থেকে সেটা পায় না। আঙুল কাঁপে।

আরতির গলার স্বরে চাপা বিরক্তি আর ব্যঙ্গ! —এত দেরি হচ্ছে! —আগে হলে কখন তুমি টেনে ছিঁড়ে ফেলতে!

অনন্ত খুলেছে—।

আরতি সবেগে সামনে ফিরে অনন্তর কাঁধের নরম মাংসে নখ বসিয়ে বলে—পার না, আবার তেমন করে ছিঁড়ে ফেলতে! পার না! —আমার ভীষণ ইচ্ছা করে—ভীষণ! ঝর্ণার মতো, পাহাড়ী নদীর মতো আছড়ে পড়ে।

ক্ষয়ে, অবক্ষয়ে জীর্ণ অনন্ত তীব্র সোহাগে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেতে থাকে।

উদ্দাম ফেনিল আবেগে, না এক গুঁড়ে অতৃপ্তির উচ্ছ্বাসে ফুঁসতে ফুঁসতে আঘাতে আঘাতে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে দিতে, নিজেই ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে থাকে আরতি। তারপর এক সঘন গভীর শোকে যেমন হয়, অদ্ভুত শান্ত হয়ে যায়।

অদ্ভুত স্তব্ধতা ঘনিয়ে আসে বিছানায়।

তারা ঘুমিয়ে পড়ছিল, হঠাৎ একটা উড়ো জাহাজ কোন দিক থেকে উঠে আসে, যেন আকাশ ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে একটা প্রাগৈতিহাসিক জন্তু, সারা গায়ে অসংখ্য আগুন চক্ষু, অমানুষিক গর্জন করতে করতে তাদের দশতলার দেয়াল ছুঁয়ে বিছানা কাঁপিয়ে দিয়ে যায়।

অনন্ত আতঙ্কে বিছানাতেই গুঁড়িয়ে গিয়েছিল।

গরগর শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার পরেও বুকের মধ্যে শব্দটা বাজতে থাকে—বাজতেই থাকে। অনেকক্ষণ কেটে যায় অনন্ত ঘুমতে পারে না: শেষে আরতিকে ঠেলা জাগায়।

আরতি ঘুমোয় নি। —কী হল!

অনন্ত বলল—তুমি সত্যি কি ওদের সঙ্গে পাহাড়ে যাওয়ার কল্পনা কর না!

তোমার কী মনে হয়?

তুমি বল!

পাহাড়ীনদী চিরকাল পাহাড় থেকে পাহাড়ে ছুটে যায়! —একদিন তো মাটিতে নেমে আসে।

অনন্ত শোনে—বিশ্বাস করে না। বলতে চায়—নদী তো, পাহাড়ের চূর্ণমি রহস্যে তোমার জন্ম!

প্রথম প্রধান

সমরেশ বসু

এখন রাত এগারটা তিরিশ মিনিট। আমি হীরেনদার সঙ্গে দেখা করার জন্য প্রস্তুত হই। শহর কলকাতা ক্রমশ নিস্তব্ধ ও নীরব হয়ে আসছে। এই সময়ই আমি সিদ্ধান্ত নিই এবং তা কাজে পরিণত করার জন্য বেরিয়ে পড়তে চাই। চার্লি চ্যাপলিনের ফটো ফ্রেমের নীচে হ্যাঙ্গারে ঝোলান প্যান্ট-শার্ট টেনে নিই। না, আর দেরি করা যায় না। কেননা, হীরেনদাকে আমার সর্বশেষ সিদ্ধান্ত পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চাই। সাহিত্যের ভাষায় যাকে বলা যায় দ্বিধাবিহীন সোচ্চার কণ্ঠে, জানাতে চাই। আর অপেক্ষা করা যায় না মিঃ চ্যাপলিন।

হীরেনদার উচিত হয়নি এভাবে আমার অস্তিত্বকে শিকড়সমেত নাড়া দেওয়া। ভাবা উচিত ছিল, তার আগে যখন বিশাল টেবিলের বিপরীত দিক থেকে চায়ের কাপ পার হয়ে ভেসে এসেছিল হীরেনদার সেই বিখ্যাত কণ্ঠস্বর, নতুন স্ক্রিপ্টে তোমাকে একটা ডাকাতের রোল দেব অহীন। মনে হয় তোমাকে দিয়ে ভালই হবে।

বস্তুত, আমার ঘরবারান্দা কেঁপে উঠেছিল এরকম প্রস্তাবে। নিজের সম্বন্ধে কতগুলো ধারণা নিয়ে নিজের চারদিকে যে দেওয়াল দাঁড় করিয়েছিলুম, তাতে যেন চিড় ধরতে চায় তখনই যখন হীরেনদা আমাকে একজন ডাকাতের ভূমিকায় নির্বাচিত করতে চান। অর্থাৎ ভাবতে পারেন যে, আমাকে দিয়ে সেই সব ভয়াবহ কাজগুলি সম্ভব।

সুতরাং হীরেনদার কাছে যা একটি সম্ভাবনার বীজ, (মনে হয় তোমাকে দিয়ে ভালই হবে), তা আমার কাছে বিপরীত চিন্তার এক সুবিশাল গাছ হয়ে দাঁড়ায় এবং যা অর্থাৎ তাঁর ধারণা, যেনবা শাখা-প্রশাখাসমেত সমূলে উৎপাটিত হয়ে সেই সুবিশাল চাপে আমাকেই ভূপাতিত ও নিপাতিত করতে চায় সেই চায়ের দোকানের টেবিলে রাখা খবরের কাগজের প্রথম পাতায় প্রধানমন্ত্রীর চিন্তিত মুখের ওপরে।

না, আমি আর দেরি করিনি। ছুটে গিয়েছিলুম নিত্যরঞ্জনের বিডন স্ট্রীটের ছাদে, যাকে আমি সেই ছেলেবেলা থেকেই চিনি। যে নিত্যরঞ্জন জীবনের প্রথম পর্ব থেকেই আমার কাছে সাফল্যের প্রতীক বা নিদর্শন।

সেই স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার পর থেকেই নিত্যরঞ্জন তার বাবার অফিসে যাতায়াত শুরু করে। ফলত সে এখন ঘাড়ে-গর্দানে এক হয়ে গিয়ে তার পরলোকগত অথবা গঙ্গাপ্রাপ্ত বাবার চেয়ারে। এবং অবশ্যই পার্মানেন্ট।

নিত্যরঞ্জন চাকরির প্রথম দিকেই বেশ নিয়েটিয়ে বিয়ে করে ফেলেছে। যেহেতু তার ব্যক্তিগত যুবতী অথবা রমণীটি যথেষ্ট সুন্দরী, সেহেতু তার ছোট ছেলেটি এখন ছুটির দিনে ক্রিকেটের ব্যাট হাতে ছাদে বাপের মুখোমুখি।

বল করছে নিত্যরঞ্জন তার বর্তমান থেকে তারই ভবিষ্যতের দিকে সাম্প্রতিক অনভ্যস্ত হাতে। সে কি তার প্রিয় সন্তানের উইকেটটি অর্জন করার মহান গৌরব লাভ করতে চায়? আমি ভাবি। কারণ, তার মুখে এই মুহূর্তে নামী ক্রীড়া সাপ্তাহিকের বিজ্ঞ প্রচ্ছদের প্রাক্তন ক্রিকেটারের মত ক্যামেরাবদ্ধ হাসি।

বল করে নিত্যরঞ্জন। আমি চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে প্রশ্ন করি—আচ্ছা নিত্য, তোর কি মনে হয় আমি কোনদিন ডাকাতি করতে পারব? আমার এই প্রশ্নে সে একবার থমকে দাঁড়ায়। তার হাতের বল হাতেই থেকে যায়। আমার দিকে একবার, সাহিত্যের ভাষায়, অপাঙ্গে, তাকিয়ে ছেলের হাতে বল দিয়ে নিজে ব্যাট হাতে নিয়ে ছাদের কোণে দাঁড়ায় প্রস্তুত হয়ে। অনায়াসে সে এবার তার একমাত্র প্রিয় ভবিষ্যৎ ছুটে-আসা বলগুলি ফিরিয়ে দিতে থাকে এবং বলতে থাকে একই সঙ্গে, আজকাল এরকম আকছার হচ্ছে রে অহীন। টেলি ছাড়ামাত্র দেখা যায়, ডাকাতি শুরু করেছে একদল সশস্ত্র যুবক। তাদের প্রত্যেকের চেহারাই বেশ ভদ্রলোকের ছেলেদের মত। খবরের কাগজে লেখে, এরা বেশ লেখাপড়াও জানে।

একটু থেমে নিত্যরঞ্জন পরের বলটি হুক করে তার সীমাবদ্ধ ছাদে। —তবে তোকে দিয়ে এসব হবে নারে। তুই বড়-

জোর দু-একটা দুর্বোধ্য গল্প-কবিতা লিখতে পারিস।

ওভার শেষ হলে আমার দিকে তাকিয়ে হতাশ হাসি হেসে সে এই সিদ্ধান্ত জানায়। ওর ছাদের ওপর দিয়ে প্লেন উড়ে যায় দমদমের দিকে। আমি নীচে নামি। আবার রাস্তায়।

হীরেনদার দ্বিতীয়বার প্রস্তাবের দৃশ্য আবার আমার মনে পড়ে যায়। ভিড় বাসে এক ঝাঁক মোটা ও রোগা বিভিন্ন আকৃতির পুরুষ ও মহিলার পেছন দিক দিয়ে প্রায় সাঁতার কেটে তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন পঁয়তাল্লিশ নম্বর বাসের মাঝখানে দাঁড়ানো দুর্বল আমার কাছে।

হীরেনদার মুখে ফুটে উঠেছিল সেই মুহূর্তে একজন মঞ্চ-পরিচালকের বিশিষ্ট ও বিখ্যাত হাসি। যেমনি তিনি নাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক বিরাট সাফল্য অর্জন করেছেন সেই বাসের মাঝখানে আমাকে পেয়ে। অবশ্য ভিড় বাসে হীরেনদার ওরকম আমার দিকে সাঁতার দেওয়ার চেষ্টা দেখে আমারও সেরকম মনে হয়েছিল। তারপরই যেন কোন জটিল গোপন রাজনৈতিক সংবাদ পরিবেশন করছেন এরকম মৃদু অথচ গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন, আগামী শনিবার সন্ধ্যা সাতটায় বাঘা যতীন স্কুলে রিহার্সাল। তুমি কিন্তু ডাকাতের রোলটা.....।

ওঃ আর পারি না।

অতুলের তুলনা হয় না। কেননা, একমাত্র অতুলই অতুল হতে পারে। আমাকে তাদের বন্ধ দরজা খুলে দিয়ে সে, আর অহীন বলে নিয়ে যায় তাদের শূন্য ফ্ল্যাটের রঙিন কিচেনের প্যাসেজে। যেরকমটা ইস্টম্যান কলর ফিল্মে দেখা যায়।

সেখানে দাঁড়িয়ে সে তার ফ্রিজ খোলার স্বাভাবিক হাত দিয়ে খুলে ফেলে তাদের ওয়েস্টিংহাউস। আমার দিকে তাকিয়ে অতুল এবার বলে ওঠে, আমেরিকান ভুয়েল টেম্পারেচার রেফ্রিজারেটর। ওপরটা ডিপ্ ফ্রিজ।

আমি দেখি। না, এর আগে আমি কখনো অতুলদের এতটা ভেতরে ঢুকিনি। যদিও সে আমাকে তার বন্ধু মনে করে। ইতিমধ্যে অর্থাৎ আমার সেই অবাক চোখে দেখার মুহূর্তগুলিতে সে আরো যোগ করে, কম্প্রেসর টরবল দিচ্ছিল। সিঙ্গাপুর থেকে আনিয়ে বদলে নিয়েছি। সিঙ্গাপুর থেকে কম্প্রেসর আনাক কিংবা হংকং থেকে আনাক তাতে আমার কিছুই আসে-যায় না। কিন্তু যাতে আসে-যায়, তাই সে এবার বের করে আনে সেই বরফের ঘর থেকে। হ্যাঁ, সেই বিশেষ বোতল।

সেই বোতলের লেবেলের দিকে তাকিয়ে এবার আমার ছেলেবেলার ইতিহাস বই থেকে পর পর মনে পড়ে যায় আহমদনগর, বিজাপুর এবং অবশ্যই গোলকুণ্ডা। সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই ইতিহাস বই থেকেই আমার চোখে ভেসে ওঠে সাতচল্লিশ পৃষ্ঠায় ছাপানো মারঠা নায়ক বীর শিবাজীর পাশপোর্ট সাইজের ছবি।

ফ্ল্যাটে কেউ নেই নাকি। সব ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে। আমি চারদিকে তাকাই. অতুল আমার সংশয় নিরসন নিরসন করে বলে ওঠে, বাবা টাটানগর। মা দক্ষিণেশ্বর। মিলি বম্বের সঙ্গে সিনেমায়। আরো সে যোগ করে অসমসাহসী যুবকের মত, এই আজকেই চান্স। খালি ফ্ল্যাটে বাপের বোতল খুলে মেরে দেওয়া। তুই এসেছিস ভালই হয়েছে। ড্রিংক করার সময় একজন কম্প্যানিয়ন থাকলে ভাল লাগে। অবশ্য শান্তি আছে।

অতুল ওদের ঝি শান্তির কথা উল্লেখ করায় আমি চমকে উঠি।

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল কফি হাউসে। —কিন্তু একদিনও ফ্ল্যাট খালি পাইনা রে।

সে আরো যোগ করেছিল হতাশভাবে। আমার বেশ মনে আছে। তবে কি অতুল কোন গোপন বন্দোবস্ত করে ফেলেছে নাকি শান্তির সঙ্গে। কোন অলিখিত অন্ধকার চুক্তি কি সই হয়ে গেছে নাকি ওদের মধ্যে এরকম কোন নিস্তব্ধ নির্জন দুপুরে। আমি ভাবি।

ঘরের ওয়ান টন আরকো এয়ার-কন্ডিশানের নব ঘুরিয়ে হাই ফুল করে দেয় অতুল। তারপর সোফায় বসে বোতল থেকে গ্লাসে ঢালে। রংটা বেশ সোনালি। হ্যাঁ, এইভাবেই সে এপ্রিলের, টি এস এলিয়টের ভাষায়, দি ক্রুয়েলেস্ট মান্থ-এর দুপুরে গোলকুণ্ডাকে নতজানু করায় সামান্য কাঁচের গ্লাসের কাছে। এই সময়ই তার দিকে সেই ভয়াবহ প্রশ্ন ছুঁড়ে দিই, আচ্ছা অতুল, আমাকে দিয়ে কি ডাকাতি হবে? কোনদিন সম্ভব?

গলা দিয়ে সেই তরল আগুনটুকু পুরো নামিয়ে দিয়ে অতুল কিছুটা সময় আমার দিকে তাকিয়ে থাকে নীরবে। ওর এই নীরবতা আমার কেমন অস্বাভাবিক মনে হয়। এরপর সে দ্বিতীয় গ্লাসটি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে খুব কোমল সুরে বলে ওঠে, নে খা এটুকু।

—প্লিজ, অতুল তুই তো জানিস আমি স্ট্যান্ড করতে পারি না।

আমার এই স্বাভাবিক প্রত্যাখানে জ্বলে ওঠে অতুল। ফ্ল্যাটের নিস্তব্ধ নীরবতাকে চুরমার করে দিয়ে সে চীৎকার করে ওঠে, এখন বেলা দুটো পঁয়ত্রিশ মিনিট সতের সেকেণ্ডে তুই একটু মাল খেতে পারছিস না। এই তুই করবি ডাকাতি।

এই কথা বলে সে উচ্চকিত হাসিতে ভেঙ্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তে থাকে ঘরময়। যেমনি সে স্বয়ং উঁচু টেবিল থেকে পড়ে যাওয়া কোন কাটলারির মূল্যবান নিদর্শন।

চেয়ে থাকে তার দিকে আলমারির ওপর থেকে বাঁকুড়ার ঘোড়া। এ্যাকোরিয়ামে মাছেদের স্বচ্ছন্দ চলাফেরা বন্ধ হয়ে যেতে চায়। মাছেরা কি মানুষের ঘর-বাড়ি রীতিমত ও তৎসহ জটিল সম্পর্ক সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল।

উত্তাল হাসিতে মুখর সেই একটু মাতাল অতুলকে তাদের এগারোশ স্কোয়ার ফুটের রঙিন ফ্ল্যাটে, অন্য ঘরে প্রতীক্ষিতা শান্তি নামের অশান্ত যুবতী সমুদ্রে বিসর্জন দিয়ে পথে নামি। ওরা এখন চুমু খাক অথবা আরো গভীরে যাক, তাতে আমার আর বাধা দেওয়ার ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু ওর ঘরে বইয়ের আলমারিতে পেরী মেশনের সঙ্গে সুকান্তর ছাড়পত্র কেন?

রাস্তায় দাঁড়িয়ে আবার আমার হীরেনদার কথা মনে পড়ে যায়। তৃতীয় সাক্ষাৎকারে যার মুখ সেদিন বাল্মবিহীন লাইটপোস্টের নীচে জেগে উঠেছিল পথে। —আসছো তো শনিবার সন্ধ্যায় রিহার্সালে। আমি কিন্তু সবাইকে বলে রেখেছি ডাকাতের রোলে লোক সিলেক্টেড হয়ে গেছে।

অন্ধকারেই সেই সন্ধ্যায় বিশদভাবে বিকশিত হতে চেয়েছিলেন হীরেনদা। হায়, নির্বোধতম আমি শেষ পর্যন্ত সিলেক্টেড হয়ে গেছি এবং এই নির্বাচনের বিরুদ্ধে আমার আর কিছু করার নেই। বস্তুত এই নতুন নির্বাচিত সত্তা নিয়ে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া।

বেচুমামা তখন তার তিনদিনের অবাধ্যভাবে বেড়ে ওঠা সর্বনাশা দাড়ির ওপর দ্বিতীয়বার সেফটি রেজার চালাচ্ছিলেন ফেটমে বন্দী ভাঙা আয়নার সামনে তার বিকেলের বারান্দায় বসে। আমরা বেচুমামাকে আড়ালে আবডালে অটলমামা বলে ডাকতুম। যে-কোন বিষয়ে তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তিনি অচল অনড় এবং অটল। না, তাঁকে নামিয়ে আনা যায় না সেই চূড়া থেকে, যে ঈপ্সিত পর্বতশীর্ষে তিনি বসে আছেন, তার সেই তরুণ বয়স থেকে। দেখছি তো আমাদের ছেলেবেলা থেকেই। সেই চূড়ায় দাঁড়িয়েই তিনি অবলীলায় পূর্ববঙ্গীয় বাক্যের সাহায্যে ঘোষণা করে থাকেন তাঁর মহান চিন্তাধারার ফসল, অর্থাৎ তার সিদ্ধান্তগুলি। যেমন, প্রমথেশ বড়ুয়ার পরে বাংলা ফিল্মে আর উন্নতি কিছু হইছে নাকি? শরৎচন্দ্রের পরে বাংলা সাহিত্যে আর কেউ কিছু লেখছে নাকি? লেখতে পারে নাকি আধুনিক লেখকরা।

বেচুমামার কথা থেকে মাঝে মাঝে এরকমও মনে হয় যে, যারা চুল দাড়ি কেটে থাকে, সেই সম্প্রদায়ের কারো পক্ষে ডাক্তার বা লেখক হওয়া যেন সংবিধান-বিরোধী অন্তর্ঘাতমূলক কাজ। এইভাবেই তিনি সাম্প্রতিক লেখককুলের উদ্দেশ্যে তাঁর ব্যক্তিগত এল এম জি-র ট্রিগার অফ্ করেন।

বেচুমামা তাঁর সেফটি রেজার প্লাস্টিকের মগে ডুবিয়ে একবার গালে হাত বুলিয়ে প্রথমে আয়নার দিকে, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, কি ব্যাপার। তোর দেখি খুব চিন্তান্বিত দেখাইতাছে। এত কি ভাবছ কি হইছে? আমি আর দেরি করি না। জিজ্ঞেস করি.

আচ্ছা বেচুমামা, আমাকে দিয়ে ডাকাতি সম্ভব? আমি কি পারব?'

সঙ্গে সঙ্গে সামনের আয়না যেন ভেঙে আরো চুরমার হয়ে যেতে চায়। ছিটকে পড়ে মেঝেতে বেচুমামার সকল কাচের টুকরো।

—তুই করবি ডাকাতি! যে ত্যালা-চোরা দেখলে ডড়াইত। হালার পোলাপানের কারবার দ্যাখ। স্বপন দ্যাখস্ নাকি?

বেচুমামা এইভাবে আমাকে তার বিকেলের প্রাচীন বারান্দায় বসে আমন্ত্রণ করেন নির্মমভাবে। কেন আমি কি এতই.....? উঠে পড়ি আমি। —আরে যাস্ কই? চা খাইয়া যা।

না, বেচুমামার এই তরল আহ্বান বা ডাকাডাকিও আমাকে ফেরাতে পারে না।

আমাকে অপেক্ষা করতে হয় ততক্ষণই যতক্ষণ শ্যামলের হাতের ইলেকট্রিক ড্রিল চলতে থাকে সেই বিদেশী দূতাবাসের সাদা রঙের এয়ার-কন্ডিশন্ড ফ্যালকন গাড়ির বনেটের ওপর। একটি নিটোল ছিদ্র তৈরি করে তার পেশীবহুল শ্রমিকসুলভ হাত কাজ শেষ করে তুলে আনে ড্রিল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, কনস্যুলেটের গাড়ি সিলভার ফ্ল্যাগপোল লাগাতে হবে। হেল্পারের হাতে ড্রিল ধরিয়ে দিয়ে সেই মোটর বিপেয়ারিং-এর কারখানায় দাঁড়িয়ে যে ডান পকেট থেকে পার্ক সার্কাসের আঞ্চলিক লম্বা বিড়ি একটি আমাকে দেয় এবং আরেকটি নিজে ধরায়। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে সে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আবার আমার দিকে তাকায়। আমি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিই,—আচ্ছা শ্যামল আমার দ্বারা ডাকাতি কি কোনদিনই সম্ভব নয়?

শ্যামলের দৃষ্টি এবার সুচের মতো পরানোর মত তীক্ষ্ম হয়ে ওঠে। তারপরই যেন সে উত্তর খুঁজে পেয়ে যায়। সতেজ টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে সে এবার শ্রমিক-সুলভ দৃঢ় গলায় উচ্চারণ করে,—তুই জীবনে কোনদিন কোন সাহসের কাজ করতে পারবি না এটাই তোর সম্বন্ধে আমার ধারণা ও বিশ্বাস। ভেবে দ্যাখ, তুই এর আগে কলেজ লাইফে প্রত্যেকবার দূরে পুলিশ দেখলেই ছাত্রদের মিছিল থেকে পালিয়েছিস্। প্রত্যেকটি আন্দোলনের সময় তুই ঘরের দরজা বন্ধ করে রেকর্ড প্লেয়ার লং প্লেয়িং শুনেছিস্। সেই তুই করবি ডাকাতি। অসম্ভব।

শ্যামল তার সিদ্ধান্ত এইভাবেই জানিয়ে দেয় তার বিশ্বাসের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে দিনের আলো মুখে নিয়ে। যেন সেই আলোতে তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত। আমি তো ছায়ায় দাঁড়িয়েছিলুম।

আবার আমি রাস্তায়। কেননা, শর্মিষ্ঠা বাকি থেকে যায়। সে আমার ব্যক্তগত গ্যালারিতে আধুনিক চিত্রকলার নিদর্শন যা ভালবাসা নামক অনুভূতিমালার ফ্রেমে জেগে থাকে। সুতরাং সন্ধ্যায় ঢাকুরিয়ার তীরে বসতে হয়। আলোগুলি দূরে দূরে জ্বলে উঠছে। আমরা গাছের নীচেই বসেছিলুম। মাঝে মাঝে শুধু বিভিন্ন মডেলের গাড়িগুলির হেডলাইট মুখের অন্তরাল থেকে তাপস সেনের আলোক-সম্পাতের মত আমাদের দুজনের মুখে এসে পড়ছিল। বস্তুত, যে আলোর ছটাকে ব্যক্তিগত জমিতে বীজ বোনা অথবা ফসল তোলার সেই বিশেষ সময়ে অবাঞ্ছিত মনে হচ্ছিল।

অসম্ভব ভালবাসাবাসির পর হঠাৎই আমি মুখ তুলে শর্মিষ্ঠাকে প্রশ্ন করি,—আচ্ছা শর্মিষ্ঠা, একটা কথা বলব?

—কি গো?

'কি গো' এই শব্দ প্রয়োগের সময় ওকে আমার খুব আন্তরিক মনে হয়। যেন সর্বস্ব নিয়ে এগিয়ে আসে শর্মিষ্ঠা আমার খুব কাছে। কেননা, সে মুখ তুলে আমার দিকে তাকায় এবং সেই মুহূর্তে তার মুখে স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড অথবা ফিল্মটের আলো পিছলে যায়। অসীম অধ্যবসায়ের ব্যর্থতা-ময় ফলের মত শেষ বাদামটির খোসা থেকে বালি ঝরে পড়ে। ফেলে দিয়ে আমি প্রশ্ন করি, আচ্ছা শর্মিষ্ঠা, আমি কি ডাকাতি করতে পারব বলে তোমার মনে হয়?

শর্মিষ্ঠা এখন অন্ধকারে নীরব প্রচ্ছদ-পটের মত। তার পাতা ওল্টানো যাচ্ছে না। আমি স্তব্ধতাকে ভাঙতে চাই।

—কি চুপ করে রইলে যে। উত্তর দাও শর্মিষ্ঠা।

অন্ধকারে শর্মিষ্ঠার শাখা-প্রশাখা থেকে হতাশা ঝড়ে পড়ে। অথচ ওর চোখে তো জল ছিল না। তবে কি একেই সাহিত্যের ভাষায় অশ্রুবিহীন হতাশা বলে? না আমি প্রথম শর্মিষ্ঠার মধ্যে দেখেছিলুম। যা আমার মানসিক এবং সুন্দরী একটি মেয়ের কাছে থেকেও দৈহিক দূরত্বের অবনন ঘটায়। সেই প্রথম বিভিন্ন ঋতু পর্যায়ে নানা রকমভাবে প্রকাশিত শর্মিষ্ঠার ভালবাসা অথবা ভাললাগা নামক সকল ধারণার অন্তর্গত ঘনশূন্যতা আমি সহজেই বুঝে নিই। আমি বুঝতে পারি ওর বুকের খাঁচায় কোন পার্থিশালা নেই, পাতকুয়া নেই শুধু শরীরের কাছে যাওয়ার জন্য গণতন্ত্রমাফিক কিছু নমস্ত স্বাধীনতা আছে। আছে পাশপোর্ট। প্রকৃত প্রস্তাবে কুয়াশাময় সেই মলিন সন্ধ্যায় আমি শর্মিষ্ঠা নামের সেই মেয়েটির অভ্যন্তর ও তলদেশ পর্যন্ত দেখতে পাই। ও আমার জন্য কি একটুও অপেক্ষা করতে পারে না?

উঠে এসেছিলুম। বড় গভীর ও নীরব ছিল আমার সেই উত্থান বা জাগরণ।

ঘরের দরজা আমি দৃঢ় হাতেই খুলে ফেলি। সাহসের গভীরতার পথে নামি। হীরেনদার বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকি। একটি কুকুর আমার পাশে সাথে সাথে চলতে থাকে। লেজ নাড়ে। ডেকে ওঠে আমার দিকে তাকিয়ে। আমার ভয় করে। আমিও কি ক্রমশ কুকুরে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছি নাকি? আমি গলায় হাত দিয়ে অনুভব করতে চাই কোথাও শিকলের দাগ বা অস্তিত্ব বোঝা যায় কিনা!

মধ্যরাতে এই পথ চলার সময়ই আমার নিত্যরঞ্জন, অতুল, বেচুমামা ও শ্যামলের কথা মনে পড়ে। পথের ধারে একটি ফ্ল্যাটে কাঁচের জানালায় ভালবাসার ছায়াছবি দেখা যায়। কেউ কাউকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে।

শর্মিষ্ঠার কথা মনে পড়ে যায়। এই প্রথম আমি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠি। আমার পায়ের গতি দ্রুত হয়।

এখন প্রধানমন্ত্রী হয়তো গুরুত্বপূর্ণ ফাইল দেখছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী রুশ চীন দ্বন্দ্ব নিয়ে ভাবছেন। খবরের কাগজে এডিটোরিয়াল পেজের পেজ মেকআপ দেখা হচ্ছে। কোন কোন ব্যবসায়ী তাঁদের গোপন আয় গুলে গুণে গোপন সিন্দুকে রাখছেন। কিন্তু আমার যে কোন গোপন আয় নেই। নেই কোন ব্যক্তিগত সঞ্চয়। শুধুমাত্র আমার সুবিশাল ব্যর্থতার স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে আছে আমার দুশো ছখানা হাড় (ভেতরে কোন কীট ঢুকে পড়েনি তো এতদিনে?) কয়েক কিলো মাংস, কয়েক বোতল রক্ত এবং কয়েক মিটার চামড়া। কিছুই আমার আর পড়ে নেই উল্টোপাল্টা ভালবাসার অনুভূতি ছাড়া। যা শর্মিষ্ঠার গোপন অন্ধকারে মরে যাব। না, ভুল স্বপন পুনরুদ্ধারের ইচ্ছে আমার নেই। শর্মিষ্ঠার বিষাক্ত তীর ভেতরে জ্বলুক। শর্মিষ্ঠার আকাশের মেঘেরা জটিল। বৃষ্টির প্রস্তাব ছিল না।

হ্যাঁ, এই সিদ্ধান্তে আমি এখন খুব সহজেই আসতে পারি। ফলে আমার পায়ের তলার মাটি এতদিন খুব কোমল কাঁচা এবং নমনীয় মনে হয়েছে তা এখন কঠিন ও শক্ত মনে হয়। এবং এই নির্মম ও কঠিন বোধই চালিয়ে নিয়ে যায় আমাকে হীরেনদার বাড়ির দিকে।

হাঁটতে হাঁটতে আমি হীরেনদার বাড়ির সামনে পৌঁছে যাই। বাল্ববিহীন লাইটপোস্টের কাছে হীরেনদার দরজায় ফ্রেমে। দেখা যাচ্ছে অস্পষ্ট। মিঃ চার্লি চ্যাপলিন আপনার কফিন আবার খুঁজে পাওয়া গেছে। একটু সাহস দিন।

এই প্রথম আমি সকল ভয় ঝেড়ে ফেলে দ্বিধাহীন গলায় ডেকে উঠি, হীরেনদা, বলে। মধ্যরাতে আমার এই ডাকে কি কলকাতার মানুষ সচকিত হয়। মহিলারা কি তাদের পুরুষদের জড়িয়ে ধরে আরো নিবিড়ভাবে কোন ভয়ের স্তর থেকে? বাচ্চারা কি মায়ের বুকে মুখ রাখে আমার এই জাগরণে। অন্ধকারে এই প্রশ্ন আমার মনে জাগে।

হীরেনদার দরজা খুলে যায়।

—কে?

—আমি অহীন।

—কি ব্যাপার অহীন এত রাতে...।

—হীরেনদা, আমি আর এভাবে বাঁচতে চাই না। স্টেজের সব আলো মুখে নিয়ে জেগে উঠতে চাই। আমি ডাকাতের রোলটা করব। এখন থেকে এটাও হবে আমার প্রথম ও প্রধান ভূমিকা।

অন্ধকারে হীরেনদার সাড়ে সাত সেন্টিমিটার হাসি দেখা যায়। যা তার সাফল্যের দীপ্তি। দরজার সুইচ অন করেন তিনি। আলোয় আলোময় হয়ে ওঠে তাঁর প্রয়োগপ্রধানসুলভ বিশিষ্ট অবয়ব। সশব্দ একজন সর্বহারার চূড়ান্ত স্বীকারোক্তির মত শোনায় কণ্ঠস্বর।

বিনোদন **অমৃত** ১৩৮৫

আমার স্বামীর প্রেম অভিযান ও বিষাদ

গরুমারার প্রাগৈতিহাসিক জঙ্গলে ভালবাসা ও অবিশ্বাসের কাহিনী লিখেছেন তাপস গঙ্গোপাধ্যায়

হেমন্ত ও হেমন্তকুমার

জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোর রঙীন ও সচিত্র মুহূর্ত তুলে ধরেছেন সমীর চট্টোপাধ্যায়

বড় খেলার টেনশন গ্ল্যামার ও ধিক্কার

প্রচণ্ড টেনশনে ও গ্লামারে মুগ্ধ দর্শক যে খেলোয়াড়কে জয়মাল্য তুলে দেয়, তাকেই একদিন ধিক্কার দিয়ে বিদায় করে খেলার মাঠ থেকে—খেলা মনোমত না হলে। লিখেছেন সুভাষ ভৌমিক

খুকুর সঙ্গে দেখা হবে শনিবার

প্রেমিক লেখকের নিমগ্ন দিনলিপি
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে

বিজন ভট্টাচার্য

নবান্ন থেকে মরাচাঁদ—অবিস্মরণীয় বিজন ভট্টাচার্য মঞ্চ আর ব্যক্তিত্ব নিয়ে আশ্চর্য কাহিনী লিখেছেন সুরজিৎ ঘোষ

বাঙলা সিনেমা, যাত্রা ও রবীন্দ্রসঙ্গীত এই তিন জগতের তিন বিতর্কিত পুরুষের কথাও থাকছে। নাম পরে প্রকাশ্য

অস্তাচলের আগে শান্তিনিকেতন

লিখেছেন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী অরুণা সেন

ভারত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট টেস্ট

প্রসঙ্গে নানা রোমাঞ্চকর ঘটনা, পরিসংখ্যান আর ছবি
লিখেছেন শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়
বেরোবে ডিসেম্বরের শেষে

দাম পাঁচ টাকা

ধৃষ্টদ্যুম্নের তীর ও ধনুক

সুরজিৎ ঘোষ

ধরণীদের গোটা ফ্যামিলিতে ধৃষ্টদ্যুম্ন একটা ফেনোমেনন। শুধু ধরণীদের ফ্যামিলিতে কেন, সমস্ত ধরণীতেই তিনি একজন বিরল মানুষ। মাত্র সওয়া সাত বছর বয়সেই তিনি একবার প্রমাণ করেছিলেন যে তিনি গল্পের জগৎ থেকে নেমে এসেছেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন বসুর বাবা, ধরণীর মেশোমশাই বাচস্পতি বসু ছিলেন কোম্পানী অ্যাক্টের দারুণ ব্যারিস্টার। দিন-রাত বাড়ীতে লোক লেগেই থাকতো। তার মধ্যে অবাঞ্ছিত লোকও আসতো প্রচুর। বাংলায় যাকে বলে আন ওয়ান্টেড পার্সন। তা ধৃষ্টদ্যুম্ন বাবার মেজ ছেলে। সওয়া সাত বছরে তখন তিনি সেন্ট-জেভিয়ার্সে পড়েন, এক সকাল-বেলা দোতলার বারান্দায় ফুটবল খেলছিলেন। দূর থেকে ওই রকম একজন অবাঞ্ছিত লোককে আসতে দেখে তাঁর বাবা বললেন, 'ঐ ভদ্রলোককে গিয়ে বল্ চলে যেতে। বাড়ী নেই।' ধৃষ্টদ্যুম্ন ভয় ভয় করে নীচে নেমে এলেন। ভদ্রলোককে প্রকৃত স্মার্টনেসের সঙ্গে জানিয়ে দিলেন, 'বাবা বললেন, বাবা বাড়ী নেই।'

আমরা সবাই জীবনে অন্তত একবার করে এই গল্পটা আলাদা আলাদাভাবে বলবার এবং শোনবার সুযোগ পাই। ধরণীরা পায় নি। ছোটবেলা থেকেই প্রথম পাণিপথের যুদ্ধ, শের শাহ, গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড, ঘোড়ার ডাক এবং এই গল্পটা তারা ঐতিহাসিক গুরুত্ব জেনে এসেছে, বাবর, শের শাহকে চোখে দেখে নি। কিন্তু এই ঘটনার ইতিহাস প্রসিদ্ধ মানুষকে প্রতিদিন বিকেল বেলা তাদের বাড়ী দেখেছে ৮২ কেজি ওজন, ভি আই পি সুটকেস, গোটা ছয়েক পেন এবং হাতে চায়ের কাপ নিয়ে।

ধরণীরা চার ভাই। তার মায়েরা পাঁচ বোন। ধরণীর বাবারা দুই ভাই, সাত বোন। ধরণীর ঠাকুর্দা প্রাক্তিভত্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন, পিসীরা কাঠ মুখোমির জন্য এবং বাবা-কাকা খেলার জন্য। সেই সুবাদে নানা রকম বিখ্যাত কুখ্যাত লোকের সান্নিধ্যে এসেছে ওরা। তাছাড়া ধরণীর কাকা খেলার জন্য পয়সা নিতেন না, বই নিতেন। শরৎচন্দ্রের ফার্স্ট এডিশন থেকে আরম্ভ করে সমরেশ বসুর প্রথম দিক অবধি বইয়ে বাড়ী বোঝাই। এখন আর কেনা হয় না। লাইব্রেরী থেকে আসে। ফি-হপ্তায় গোটা চার-পাঁচ। কাকা খেলা ছেড়ে দিয়েছেন বয়েসে আর ভাড়া বাসায় বই রাখার জায়গা হয় না তাই। তো সব মিলিয়ে গল্পের বই ও ধরণী কম পড়ে নি কিন্তু ধৃষ্টদ্যুম্ন বসু একটিও দেখে নি জীবনে। ধৃষ্টদা। ধৃষ্টদ্যুম্নকে দাদা ডাকতে পারার গৌরবটা মাঝে মাঝেই মনে আস্বাদ করে নেয় ধরণী। তার মাস-তুতো দাদা। মেজ মেসোর মেজ ছেলে।

মেজো মেসো বাচস্পতি বসু বার অ্যাট্ ল ইকনমিক্সে দেশে ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট হয়েছিলেন। ঘরে বাইরে দু' জায়গাতেই সোনার মেডেল। নিজের ভাইদের সবাইকে বিলেত ঘুরিয়ে এনেছেন। ছেলেই শুধু বান নি, বাচস্পতির দুনিধারবা কেউ মন্ত্রী হয়েছেন কেউ বিরাট প্রভাবশালী অ্যাডভোকেট। ধৃষ্টদ্যুম্নের কাকারা দাদার নাম করে সব জায়গায় গুছিয়ে নিয়েছেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন পারেন নি। কেউ বলে বড় ছেলে তিন মাস বয়েসে টিপ-পিবিয়ায় মারা যাওয়ায় বাচস্পতি মেজ ছেলেকে বড্ড বেশী আদর দিয়েছিলেন, ফলে ও একটা গোবর গণেশ হয়েছে। কেউ বলে বাচস্পতি যদি ধৃষ্টদ্যুম্নের একুশ বছরে ঘটা করে মারা না যেতেন তাহলে তাঁর ছেলের বিদেশ যাওয়া কোন যেত না, সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল। আবার কেউ বলে কাকারা সব স্বার্থপর, নইলে তাঁরা কি আর দাদার ছেলেকে ডাক্তারবর করে তুলতে পারতেন না। তবে সবাই বলে বাবা মারা যাবার পর পরই ইনকাম-ট্যাক্সের চাবিটা পেন্সে যাওয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের পক্ষে কাল হয়েছে। একটা সচ্ছল জীবন পেসে গেল, ব্যাস অ্যাম্বিশন ট্যাম্বিশন চুলোয় গেল। গদাই-লস্কর ছোকরার। আসল কারণটা অবশ্য জানে ধরণীরা দু-একজন শুধু।

আসলে ধরণীর বাবা-কাকা দুজনেই খুব ভালো খেলতেন। ফুটবল, হকি, ক্রিকেট তিনটাই। এখন অবিশ্যি তাস ছাড়া আর কিছু খেলতে দেখা যায় না ধরণীর বাবাকে, তবে কাকার একটা অদ্ভুত নিজস্ব খেলা আছে। প্রত্যেক মাসের গোড়ায় তিনি পেন্সনের টাকা থেকে ৫ টাকা ৩৬ পঃ দিয়ে ১০টা পয়সা রাখার ভাঁড় কেনেন। তারপর সারা মাস ধরে কোনটায় সিকি, কোনটায় আধুলি, টাকা, দশ পয়সা, পাঁচ পয়সা এইসব রেখে যান, পরের মাসে আবার ১৪টা ভাঁড় কেনেন। আগের ভাঁড়গুলোকে ভেঙে ওগুলোকে ১০ বলেন, সিকিগুলোকে আধুলি, আধুলিকে টাকা। আবার ভরতে থাকেন নতুন ভাঁড়গুলো। এইভাবে এক জটিল প্রক্রিয়া, আসলে খেলাটা খুবই শক্ত। কাকার বাদবাকী সারা জীবনেও এ খেলা শেষ হবে কিনা কে জানে? ধরণী মাঝে মাঝে ভাবে যদি আরো আগে শুরু হত এই খেলা। মোট কথা তাস কিম্বা এই খেলাটা, যোনটাই যৌবনে ধরণীর বাপ-কাকার প্যাসন ছিল না। সবচেয়ে প্যাসন ছিল তখন তাঁদের ফুটবল। ঢাকা, মানিকগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ, ইদিলপুর, বানরী-পাড়া, গৈলা, কাঁচা বেলিয়া বহু যোগীনী সব চন মন করে উঠত শ্রীমন্ত-সুমন্তর নাম। আর ঐ ফুটবলে কৃষ্ণায়ত্বে হেড় করে যাওয়ার দরুণই হোক, আর বংশগত অন্য কোন কারণেই হোক, সেই বিশ-বাইশ বছর বয়েস থেকে দু ভায়ের মাথাই একেবারে গড়ের মাঠ। এর মধ্যে ১৯৪০-৪১ সাল নাগাদ দু ভাই খেলতে এলেন গড়ের মাঠে, আই এফ এ শীল্ডে।

ধৃষ্টদ্যুম্নের বয়েস হবে তখন তের কি চৌদ্দ। জীবনে দুটি বই আনন্দ নেই। ঢাকায় বেড়াতে গিয়ে বিকেলে মেসোদের খেলা দেখা আর সকালে গার্লস স্কুলের দরজায় দাঁড়ানো। প্রকৃতপক্ষে পরবর্তী-কালের পরিণত ধৃষ্টদ্যুম্নের মানসিক পরিণতি আঁচ করতে গেলে এই দুটো ব্যাপারকেই সবচেয়ে আগে ঘটিয়ে দেখতে হয়। ইস্টবেঙ্গল হেরে গেলে এই উত্তর প্রৌঢ় জীবনেও তিনি তিন দিন অশৌচ পালন করেন। চা সিগারেট আর ডিমের পরোটা ছাড়া কিছুই খান না। হ্যাঁ ধৃষ্টদ্যুম্ন পরোটাকে পরোটা বলেন। অমন অনেক কিছুই বলেন যা দিয়ে বাংলা ভাষায় একটা নতুন ডিক্সনারী করা যায়। কিন্তু সেটা ভাষাতাত্ত্বিকদের ব্যাপার বোধহয়, নৃতাত্ত্বিকদেরও হতে পারে। ধরণীর সঠিক ধারণা নেই। তাই এগুলোকে নিয়ে সে বড় একটা মাথা ঘামানোর চেষ্টা করে না, জীবনের এক একটা অভিজ্ঞতা হিসেবেই মেনে নেয়। মাঝে মাঝে শুধু দু-একটা নতুন কথায় চমকে চমকে ওঠে। পরশু যেমন একটা শব্দ শিখল 'পচাকরা' এর আগে শিখেছিল 'বগলিং'। এই রকম আর কি। প্রথম প্রথম শব্দগুলো বিস্ফোরণের মতো আসে। চায়ের কাপ হাতে থাকলে চলকে দিয়ে। বুঝিয়ে দিলেই জলের মত সোজা। পরেরটা তো সেদিক দিয়ে একদম নিখাদ সহজ। তো ঐ ইস্টবেঙ্গল ছাড়া ধৃষ্টদ্যুম্ন জীবনে আর যা ভালোবাসেন তা হল মেয়ে-মানুষ। বিয়ে করেন নি, কিন্তু সেই বালক বয়েস থেকেই তিনি মেয়েদের ভালো-বাসেন। তিনি বলেন, মেয়েদের ভালো-বাসলে বাতে ভালো ঘুম হয়, পাখখানা পরিষ্কার হয় এবং রসবোধ উন্নত হয়। গার্লস স্কুলের দরজায় একদিন সকালে তিনি এক খালুই জ্যান্ত কই মাছ নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। স্কুলের বাস এসে দাঁড়াতেই মেয়েরা টপাটপ নেমে পড়ছিল সবাই। বারো থেকে পনেরো সব ডানায় আগুন লাগা কিশোরী মেয়ে। তার মধ্যেই খালুই-এর মুখ খুলে দিয়েছিলেন তিনি। জ্যান্ত কই মাছগুলো তড়াক তড়াক লাফিয়ে পড়ছিল আর মেয়েদের চেঁচামেচি লাফা-লাফির মধ্যে খুব শান্ত ভর্ৎসনায় কই মাছগুলোকে বকতে বকতে খালুইতে পুরছিলেন তিনি আবার। 'হালা, মাইয়া দেখলেই ফাল পাবো, না! ক্যান অত কিসের ...!' এই ঘটনার পরে শোনা যায় ধরণীর বাবা তাকে খড়ম পেটা করে-ছিলেন। ধরণীর দাদুর খড়ম, কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। ধৃষ্টদ্যুম্নের বাধো-গাছকীতে তাঁর উন্নত রসবোধের একটা নোটেবল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে এই ঘটনা। আর এর থেকে ভাইসি-ভার্সা এও বোঝা যাবে যে মেয়েদের তিনি কী ভালোবাসতেন।

ধরণীর বাবাদের কলকাতায় খেলতে আসা প্রসঙ্গে এই যে সব কথাগুলো চুকে গেল প্রথমে আমি তা লিখতে চাই নি, তিনশ বছর পরে আমার সাহিত্য নিয়ে যে গবেষণা হবে তখন শ্যামবাজার বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার রিসার্চ স্কলার অমরকান্ত গুপ্ত নিশ্চয়ই প্রমাণ করে দেবেন যে এটা প্রক্ষিপ্ত অংশ, মূল লোকের লেখাই নয়, হলেও অবান্তর। তাতে তাঁর ডক্টরেট হবে, ডাই কি পুরস্কার-টুরস্কারও হতে পারে, কিন্তু আমি অত্যন্ত ব্যথা পাবো। একথা ধরণীকে বলেওছিলাম। তাতে ও বলল এটা শ্রীমন্ত সুমন্তর খেলার গল্প নয়, ধৃষ্টদ্যুম্নের জীবন চরিত। কাজেই একথা অবান্তর বলাই অবান্তর। দ্বিতীয়ত অয়স্কান্ত যদি সে কথা প্রমাণ করেই, তাহলে তোর নিশ্চয়ই ব্যথা লাগবে, কিন্তু ব্যথা পাওয়ার জন্য তুই আর তখন থাকবি না। কাজে কাজেই...' আমার চরিত্রে বরাবরই দেখেছি কনভিন্সড্ হবার একটা ঝোঁক আছে। বিশেষত যদি কেউ হাত-পা নেড়ে খুব জোর দিয়ে কোন কথা বলে। শুধু এই কারণেই একবার কংগ্রেস, একবার এস ইউ সি আর একবার সি পি এমকে ভোট দিয়েছি। ধরণী সে কথা জানতো। ফলে কথাগুলো সে যথেষ্ট হাত-পা নেড়ে জোর দিয়েই বলেছিল, আমিও ধৃষ্টদ্যুম্ন সংক্রান্ত কথা-গুলো গুছিয়ে লিখে দিয়েছি।

আসলে যে কথা বলছিলাম। ধৃষ্টদ্যুম্ন কেন বিদেশ গেলেন না? মানে ধরণীর বাবা-কাকা সেই যে খেলতে এলেন গড়ের মাঠে। 'আমি তখন বালক বললেই হয়, বুঝলি গিন্না ধৃষ্টদ্যুম্ন বলেছিলেন। 'কলকাতার থাকি, কিন্তু কাঠ-বাঙাল, মেসোরা কল-কাতায় খেলতে আসছে। আমার কী উৎসাহ। তারপরে আবার কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে গেল ঢাকা টীম। এবারে দারুণ এক সাহেব টীমের সঙ্গে খেলা। সকাল থেকে মেসোরা গরমজলে পা সেঁকছে আর আমি গলা। মাঠে চেঁচাতে হবে না! তারপর তো মাঠে পৌঁছলাম, কি হৈচৈ, কি ভীড়! বাবা বসেছেন আমার পাশে। ডাইনে বাঁয়ে বাঙাল ঘটা সব গায়ে গা লাগিয়ে। সাহেব টীমের সঙ্গে খেলা, কাজেই আজ সব ভাই ভাই, একেবারে জাতীয় প্রেস্টিজ-এর প্রশ্ন যাকে বলে।

তিন নম্বর চা-এর কাপে চার নম্বর চুমুকে হুস্ করে শেষ করলেন ধৃষ্টদ্যুম্ন। সাহেব টীমের সবাই মাঠে নেমে গেছে। দু' ফুটের চাইতে বেঁটে হবে না কেউ। এক এক-জন লাফাচ্ছে যেন মনে হচ্ছে মাটি থেকে দশ ফুট উঁচুতে। সাহেবদের সাপোর্টাররা চীৎকার আর সিটিতে মাঠ ভরিয়ে দিচ্ছে। আমরা কেবল মনে মনে বলছি নামুক না আমাদের টীম। দেখিয়ে দেব চীৎকার কাকে বলে। গলায় কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর উলুর ঝাঁক বেবর্ড করে এনেছি, দেখবে তখন। কোজাগরী টোজাগরী শুনে খুব কোমল ব্যাপার মনে করছিস বুঝি ধনা। মোটেই তা নয়। মোটামাসি মানে তোর মা, আমার পিসতুতো দিদি আর ঠাকুমা যখন একসাথে উলু দিত না তখন সে একটা বীভৎস ব্যাপার মনে হত হয় বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে, নয়তো একশটা লুকুর-এর একসঙ্গে ফুড-পয়জন হয়েছে আর তারা পেটব্যথায় দল বেঁধে চেল্লাচ্ছে। কায়ট-এর সময় ঢাকার

ডাডীর সামনের দিক পাহারা দিত মেসোর বাঘের মত কুকুরেরা আর পেছনদিক পাহারা দেওয়ায় মোটামাসীকে হেল্প করবার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ঠাকুমা আর আমার পিসতুতো দিদিকে। সমস্ত বাস্ট-এর পিরিয়ডটাতেই ঢাকার লোকেদের কাছে মণি-ননী-রানী একটা উব্‌র হয়েছিল। তো সেই ডাক গলায় শানিয়ে বসে আছি। অথচ ঢাকা-টীম আর নামেই না। গ্যালারিতে ফিস-ফাস্, বিশ্বস্তসূত্রে ঘোড়ার মুখের খবর পাওয়া গেল ঢাকা টীমে এগারোজন হচ্ছে না। মানে ছ ফুট-সওয়া ছ' ফুট সব সাহেব দেখেই তিনজনের পেট খারাপ হয়েছে আর রাইট হাফ্ বিখ্যাত খেলোয়াড় প্রবোধ দত্ত ড্রেসিং রুমে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে গোঙাচ্ছে পিল্টু (ধরণীর কাকা সুমন্তর ডাক নাম) মাষেরে খবর দে, আমি আর খাঁচুম না। আমার পক্ষাঘাত হইছে।'

এইসব খবর পেয়ে গ্যালারিতে আমরা মুখ শুকিয়ে। খেলার টাইমের আর তিন মিনিট বাকি। এমন সময় দেখি গুটি গুটি ঢাকা টীম মাঠে নামছে। সবচেয়ে আগে মেসো, ক্যাপ্টেন তো, সঙ্গে তিনখানা ফুটবল। একটা মাথায়, একটা পেটে, একটা বগলে। বগলেরটা ড্রপ দিতে দিতে মেসো এগোলো। পেছনে? ন-জন। হাঁ ন-জন। প্রবোধ দত্ত মাঠে নামেনি। টম-ঠম হয়ে গ্যালো। সাহেব টীমের ক্যাপ্টেন খ্যাচোর খ্যাচোর করে হেসে মেসোর হাত খিমচে দিলো। খেলা শুরুর বাঁশি বাজলা পেঁ করে আর হঠাৎ দেখি একটুটে ন্যালা ক্যাবলার মতো কখন প্রবোধ দত্ত মাঠে ঢুকে হাঁপাচ্ছে। শার্টটা গোঁজেনি। প্যান্টের উপর দিয়ে হাঁটু পর্যন্ত এসে এমন ঝুলকালি করছে যে মনে হচ্ছে নীচে কিচ্ছু নেই।

এদিকে খেলা শুরু হয়ে গেছে। সাহেব-টীম দারুণ খেলছে। ধাঁই করে মারছে, সাঁই করে ছুটছে আর গ্যালারিময় দরদর বক্ষে জল্পনা চলছে যে এই টীম নাকি হারেই না, এমন সময় খেলা আরম্ভ হয়ে মাত্র মিনিট বারো কেটেছে, তখন ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি রাইট হাফ প্রবোধ দত্ত হঠাৎ ছুটে গিয়ে ওদের ৬' ফুট লেফট্ ব্যাককে মেরেছে এক লেক্সি। আর যাবে কোথায়। বল ছেড়ে দিয়ে সবকটা সাহেব তখন প্রবোধ দত্তকে ঠ্যাঙাতে চায়। কিন্তু তাকে ধরা ভীষন শক্ত। উচ্চিংড়ের মত লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে কই মাছের মতো সুড়ৎ করে গলে গিয়ে একেবারে রীতিমতো বগলিং যাকে বলে, বগলিং মানে জানিস তো, লোককে পাজল্ করে দেওয়া। আর এদিকে সেই ফাঁকে ঢাকা টীম শুরু করে দিল তাদের কসরৎ। লম্বা লম্বা, ছোট ছোট পাসের সব নানারকম ভেলকি। ওরই মধ্যে দু-একটা সাহেব যাও মাথা ঠান্ডা করে বলটা নিয়ে এগোচ্ছিল ঢাকার গোলের দিকে, মেসো টপাটপ্ ট্যাঁকল করে দিচ্ছিলো সেসব বল। মানে ক্যাপ্টেন ওয়াজ প্লেয়িং এ ক্যাপ্টেনস্ গেম্ আর কি। হঠাৎ এক ফাঁকে সুমন্তকাকু মাঝমাঠে একটুখানি ফাঁকায় একবার বল পেয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে লাইন ধরে একেবারে রেসের ঘোড়ার মত ছুটে। একদম ফোরফার্টি ফিনিশিং। কর্নার ফ্ল্যাগের কাছ এসেই বাঁ পায়ে সেন্টার। সাহেব-টীমের গোলকীপার নিখুঁত ঝাঁপ দিয়েছে ফার্স্ট বারে, বলটা শুন্যে সোসার্ব করে সেকেন্ড বার দিয়ে গোলে ঢুকে গেল।

শেষাল-কুকুরের ডাকটা ছাড়তে দু-তিন সেকেন্ড দেরী হয়ে গিয়েছিল। রেডী ছিলো না তো কেউ। কিন্তু যখন শুরু হল, তখন পাক্কা পাঁচ মিনিট ধরে বুঝতে পারলাম বিশ্বযুদ্ধের সময় কীরকম আওয়াজ হয়। হৈচৈ ঠান্ডা হতে যখন একটু গুছিয়ে বসেছি, তখন আমার গলা ভেঙে গেছে, সামনের সীটের দাদু ল্যাংচাচ্ছে আর সাথ্য গ্যালারির ফাঁক দিয়ে ছাতাটা কোথায় পড়েছে তা দেখবার চেষ্টা করছেন, হঠাৎ পুলকিত হয়ে শুনলাম, দু-সীট্ পেছনের জানবুদ্ধিটি চারপাশের লোকদের বলছেন, 'আবে অইবো না ক্যান্, আউজ্‌গা না হয় বুড়া হইছে, টাক পড়ছে। তবু, মরা হাতী লাখ টাকা। দৌড়ানোর স্পীডটা একবার দেখলা। সেই নাইনটিন ইলেভেন এ যেমন দৌড়াইত, একেই রকম।'

আমি আর থাকতে পারলুম নারে ধনা। বলে ফেললাম 'কী সাতা বকছেন দাদু, পাগলের মতো। পিল্টুকাকা নাইনটিন ইলেভেনে জন্মানি। আর ওঁর ঐ / টাক্ আমি আমার জন্মইস্তক দেখে আসছি, কে জানে কাকা নিজেই অই দেখেছেন কিনা। ওঁর ঐ ছেলেমানুষ টাক দেখেই আপনি ওঁকে নাইনটিন ইলেভেনে পাঠিয়ে দিলেন।

বিশ্বাস কর, ভদ্রলোক পুরো বক্তৃতাটা হাসি হাসি মুখে শুনে গেলেন। তারপর স্নেহের ভঙ্গীতে হেসে বললেন 'পাগল। ঐ দৌড়, ঐ ঠ্যাং, ঐ টাক আমি দেইখ্যা আসতাছি উনিশশো এগারো থিক্যা. আর হে কয় কিনা তখনো জন্মায় নাই। বাড়ী যাও খোকা, গিয়া মধ্যমনারায়ণ মালিশ কর। উপকার পাইবা। আপনারা কী কন্?' চারদিক থেকে এমন প্রবল ঘাড়নাড়া আর সমর্থন শুরু হল যে আমি প্রতিবাদ করবার চান্সই পাই না. তারই মধ্যে একবার চ্যাঁ করে উঠতে যাচ্ছিলাম. বাবা এক ঝাপটায় থামিয়ে দিয়ে জোড়হাতে বলে উঠলেন, কিছু মনে করবেন না দাদারা। পোলাপান, ওরা এইসব উচ্চ-মার্গের কী বোঝে।' ঢাকা টীমের গোল-কীপারের হাইকিক দেখতে দেখতে উদাসকণ্ঠে দাদু বললেন তা তো ঠিকোই, তবে ছোকরার এহনও লেহস্তেরি বোধ হয় নাই, এই যা . . . .'

গ্যালারিতে দাদুর বয়সী লোকদের সঙ্গে সন-তারিখ নিয়ে তর্ক করার অপরাধে বাবা সেদিন প্রায় মাবতে মাবতে বাড়ী এনে-ছিলেন। কিন্তু তোকে কী বলব ধনা, মারা-মারি, ফুটবল, বাড়ী ফেরার পথে পার্ক স্ট্রীটের কেকের গন্ধ, আলো কোনকিছুই তখন আর আমার চোখে পড়ছিল না।

'কেন ধৃষ্টদা?'

'আমি শুধু ভাবছিলাম, তুচ্ছ আমার এতদিনের টেবলটেনিস, ব্রুনিয়র ইন্ডিয়া চ্যাম্পিয়নশিপ। মিথ্যে এতদিনের গোলের পছনে ফুটবল প্র্যাকটিস আর মেসোদের মত বড় খেলোয়াড় হওয়ার স্বপ্ন দেখা। আমি তো জানতুমই না তাঁরা কত বড়ো। ভেবে দ্যাখ্, ধনা, সেই বিখ্যাত নাইনটিন ইলেভেনের ম্যাচে খেলেছে মেসোরা, তাও তাঁরা জন্মানোর আগে। অথচ কী উদাস। নিজেদের এতবড়ো কৃতিত্বের কথা গল্প-চ্ছলেও কোনদিন বলেনি আমাদের। একে-বারে সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী নয় তো কী আর। আর এহেন লোকের ভায়রা ভাই-এর ছেলে আমি, তুচ্ছ বিলেত যাওয়ার প্ল্যান নিয়ে মাথা ঘামাব। আর বুঝলি যোগাযোগ। যোগাযোগের ফলে মানুষ যে কোথা থেকে কোথায় চলে যায়। এই উপলব্ধির কয়েকদিন বাদেই বাবা, মারা গেলেন হার্ট অ্যাটাকে। হঠাৎই। হঠাৎই কাকারাও সব অদ্ভুত হয়ে গেলেন। মার শুচিবায়ু হল। বারুইপুর থেকে এক সাধু এসে আবার গ্যামোথা মাকে বলে গেল ছেলেকে একটু সাবধানে রাখিস, ওর মধ্যে সন্ন্যাসযোগ প্রবল।'

আমার সেদিন মনে হল সবই যোগা-যোগ। অলক্ষ্যে কোথায় যেন কার ইঙ্গিত পাচ্ছি। সাধু তো সওয়া পাঁচটাকা পণামী আর একটা নতুন ধুতি ম্যানেজ করে চলে গেল। আমিও অমনি পাসপোর্ট, টাসপোর্ট ছিঁড়ে প্যাসেজমানির সবকটা টাকা নিয়ে একেবারে দেওঘরে। আমাদের বম্পাস-টাউনে।'

যতবার বলেছে ধৃষ্টদার এইখানে শেষ। একেবারে ডবল দাঁড়ি। আকুল প্রশ্ন করের বম্পাস টাউনের খুঁটিনাটি রং জানতে পারেনি ধরণীরা। শুধু জেনেছে সেখানে তখন মুরগী, দুধ, ডিম, তরকারী সব খুব সস্তা ছিল। দিশী মদ পাওয়া যেত প্রচুর আর দিশী মেয়ে-পুরুষ বন্ধু। মানে তারা খুব সহজেই বন্ধু হয়ে যেতো, এক কথায় সন্ন্যাসী হওয়ার উপযুক্ত পরিবেশ। কিন্তু সেখানে থাকা হয়নি ধৃষ্টদাদুদের। হয়নি কয়েকজন মাথায় ছোটো হবের বড়ো বাঙালী সন্তান-এর গোঁয়ার্তুমিতে। যেমন তাঁর মা, এবং ধরণীর বাবা। হ্যাঁ, ধরণীর সেই সন্ন্যাসীর মতো আত্মপ্রচারবিমুখ উদাস বাবাই ধৃষ্টদাকে এই হট্টগোলের সংসারে ফিরিয়ে আনলেন।

ধৃষ্টদার মার কাছে ধরণীর বাবা যখন শুনলেন ধৃষ্ট সন্ন্যাসী হয়ে বম্পাসটাউনে গ্যাছে—তখন তিনি প্রথমে অতো ভয় পাননি। কিন্তু সেখানে পৌঁছে তাঁর কী বোমহর্ষক অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেকথা ধরণীরা বহুবার শুনেছে মায়ের কাছ থেকে: যতবার শুনেছে একটু একটু করে বদলে গ্যাছে ব্যাপারটা। ফলে পুরো ব্যাপারটা গুছিয়ে বলা খুব শক্ত। তবু স্যাটামুটি সেটা এইরকম।

উনি যখন প্রথম গিয়া পৌঁছাইলেন, রাস্তার সামনে সে এক ভীষন অবস্থা।

উল্টাদিকের বাড়ীর দারোয়ান যশওয়ান্ত সিং (প্রথমে ছিল ধ্যান সিং, পরে মানসিং) চিৎকার পড়তাছে 'হাম্ রাজপুত হ্যায়। দেখ্ লেয়া ধঙ্গালকা বাচ্চাকা হিম্মৎ কেত্না।' আর এই-দিকে একসার দুধের বালতির মধ্যে খাড়াইয়া তগো ধৃষ্টদা। পরণে বাঘছালের হাফ-প্যান্ট, হাতে তীরধনুক। সমান গলায় ওতোব গাইত্যাছে। লাগাও একখান বালতিতে হাত, দেখি তোমার খায়্মতা। এইসব দুধ আমার রেজাব্, আমার বন্ধুগো লাইগ্যা। বাজপুইত! তোমরে এইখানে পুইতা দিম্যা তবে যামু।' মাঝখানে হতভম্ব হইয়া ব্যাচন গয়লা আর চারপাশে একদঙ্গল লোক। তগো বাবা ভাবতাছে আগাইব কিনা, এমৎকালে অইছে কি হঠাৎ একখান তীর ছুইটা গ্যাছে ধৃষ্টর হাত ধিক্যা। আর যাওনের সময় আলগা ছুঁইয়া গ্যাছে গাছের ডালে একটা কাঠবেরালীর গাও। তাইতেই কাঠবেরালীটা গাছ ধিক্যা পইড়্যা মইর‍্যা কাঠ। আর তা দেখনমাত্রই বিষকাঁড়, বিষকাঁড়ে কইতে কইতে সব লোক চক্ষের নিমিষে উধাও। তগো বাবা একলাফে মুদির দোকানের পিছে আর যশওয়ান্ত সিং সদর দরজা, ভিতর দরজার খিল দিয়া একেবারে বাথরুমে। একটুক্ষন পরে, সব শুনসান্ ধৃষ্ট তীরধনুক মাটিত্ ফেইল্যা একটা একটা দুধের বালতি ভিতর রাখতাছে, তগো বাবা একছুটে গিয়্যা ধরছে কি, না তীর ধনুকটা নিজের জিম্মা লইয়া লইছে। বাস্ আর পায় কে। কী সাহস তখন তগো বাবার গলায়। ডাকে 'ধৃষ্ট'। ধৃষ্ট তো বাইর হইয়্যা অবাক। এমনিতে তো অবে খুব ভক্তি করে। তা কয় আসেন আসেন। ভিতর ঢুইক্যা তগোর বাবায় দ্যাখে কি—একপাল জোয়ান জোয়ান. । থাউক্ তোমাগো আর সেইসব শুইন্যা কাম নাই। যাও, সব নিজেগো কামে যাও।'

জোয়ান জোয়ান কী, তা অবশ্য ধরণীরা সবই জেনেছে। তারা ছিল সব সাঁওতাল মেয়ে। ধৃষ্টদার বান্ধবী সব। পুরুষ ছিল দু চারজন। হাঁড়িয়া খেয়ে সব মাঁড়ায়ে গড়িয়ে ঘুমোচ্ছিল। আর ভোরে উঠে তাদেরই দুধের জোগাড় করছিল ধৃষ্টদা। সেই জোগাড় তেমনি রইল। নেশার মধ্যে, ঘুমের মধ্যে পড়ে রইল ধৃষ্টদ্যুম্নের রুপাস-টাউনের রাজরাজত্ব, সেপাইলস্কর, মন্ত্রী-পুত্র, কোটালপুত্র, দুয়োরানী, সুয়োরানী, বুধনি, শুকরি, শনিচরী, মংলু, মোরব্, শকরু। সেই সকালে ঝকঝকে দিনের আলোয় ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিয়ে টেনে চাপলেন ধরণীর বাবা। ধৃষ্টদ্যুম্নর পরণে তখন বাঘছালের হাফপ্যান্ট চোখ হাঁড়িয়ার স্মৃতিতে লাল, পিঠে তীরধনুক। সেই অবস্থায়ই তাঁরা শহরে এসে পৌঁছলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নকে ঘিরে ছিল ভয়ে গিয়েছিল। তিনি কিছুই বলেননি, ফেলে আসা রাজপাটের জন্য একবার একটা দীর্ঘশ্বাসও পড়েনি পর্যন্ত। কেন পড়েনি? রাগে? অভিমানে? বর্তমান ধুতি পাঞ্জাবীর আড়ালে শহুরে ধৃষ্টদ্যুম্ন গলা নামিয়ে বলেছেন 'নয়রে তা নয়। ওখানকার ঐ ভাত-জন্ম চুলোর দোরে দিয়ে জীবন, তার মধ্যে আমি কিনা বাঙালী আর রাজপুতে নিয়ে ঝগড়া শুরু দিলুম। তাই যদি করব, তো এই শহরেই তো তা অমবে ভালো, এখানেই আসি। ভাগ্যিস সেদিন বুধনি, মংলুরা সব ঘুমিয়েছিল। নইলে ওরা কিরকম. হাসত। ভাবতেও আমার লজ্জা করে। আর ...তোকে বলেই বলছি ধনা। বিষকাঁড় না ছাই। তীরটা মোটেই ছুটেও যায়নি। এমনি অর্ডিনারী তীর। আর আমি কাঠবেরালীটাকে টিপ্ করেই ছুঁড়েছিলাম। ব্যাটা দারোয়ানকে আমার হাতের কায় বোঝানোর জন্য। তা সেটা কাঠবেরালীটাকে ভালো করে ছুঁলোও না।'

হার্টফেল্। কানের পাশ দিয়ে সাঁ করে তীরটা গ্যাছে তো। শকে হার্টফেল করেছে। ঐ কাঠবেরালীটাকে আমি চিনতাম। ওর হার্ট বরাবরই দুর্বল। একটু দৌড়লেই হাঁপাত। তাছাড়া কিছুদিন আগে থেকে হাঁড়িয়াও ধরেছিল আমাদের সঙ্গে।

এরপর বিষণ্ণ হয়ে গ্যাছেন ধৃষ্টদ্যুম্ন। সেদিন হয়ত চায়ে চিনি কম বলে আর মোটা মাসীর সঙ্গে হুড় যুদ্ধ করেন নি। চিনি অবশ্য তাঁর রক্তে এত বেশী যে আর এক ফোঁটাও সেখানে বিরতুলা। আর সেই জন্যই তা নিয়ে তাঁর আগ্রহ এত বেশী।

ব্লাড সুগার যে বেশী, সেটা প্রতি মুহূর্তে মনে করে রাখার মতো বিড়ম্বনা আর নেই। আমি মানেই রাখি না। তাই এত আনন্দে চিনি খাই।

এই সবই তিনি বলেন, আর ধরণী মনে মনে ভাবে হতে পারে না। কোন দুঃখ নেই, হতেই পারে না।' কেড়ে নেওয়া সেই তীর-ধনুকের জগতের জন্য কতটা দুঃখ থাকতে পারে ধৃষ্টদ্যুম্নর সেটাই সে কেবল পরিমাপ করবার চেষ্টা করে ভেতরে ভেতরে।

(২)

ঐরকম কাটছিল সময়। রাস্তায় জমা জল, লোডশেডিং আর রেপসীডের সঙ্গে নিয়ে বয়েস বাড়ছিল ধরণীর। ধৃষ্টদ্যুম্ন রোজ বিকেলে অফিস-ফেরতা আসছিলেন ধরণী-দের বাড়ি। যতটা মোটা দেখাচ্ছিল ততটা আর ওজন বাড়ছিল না তাঁর। অনেকটাই অসুখ বিসুখে ফেলা। ডায়াবেটিস, গ্যাস্ট্রিক আলসার, বাত, একসিমা, তেইশটা বেড়াল, তিনটে কুকুর আর ছটা ঝি-চাকর দশদিক দিয়ে ঘিরে রেখেছিল তাঁকে। অসুখকে খুব একটা পরোয়া করতেন না তিনি। ওষুধ কোম্পানীদের কিছুটা সাহায্য করার সুযোগ পাচ্ছেন যেন, তাই ভাবতেন। যেটুকু বা ভাবনা চিন্তা ছিল, সে ঐ কুকুর বেড়ালদের নিয়ে। ওদের সকলের মধ্যে খুব সদ্ভাব ছিল না, তাই নিয়ে। আর ঝি-চাকরদের নিয়েও তাঁর কিছু দুর্ভাবনা ছিল। মাস গেলে তিনি হাতে পেতেন বাহোশ টাকা। একা মানুষ পাঁচটা অসুখ, কুকুর বেড়াল আর ঝি-চাকর নিয়ে সংসার। সব টাকা তুলে দিতেন মায়ের আমলের ঝি বকুলদির হাতে। পনেরো দিন না যেতেই নাকি সে টাকা নাকি শেষ হয়ে যেত। তারপর বকুলদিই আবার ওঁকে টাকা ধার দিতেন। টাকাগুলো যাচ্ছে কোথায় সে চিন্তা নয়, কী করে বকুলদির ধার শোধ করবেন এটাই ছিলো তাঁর প্রধান চিন্তা। ভাগ্যি বাড়ি ভাড়া দিতে হতো না পৈত্রিক দাক্ষিণ্যে। এইরকম ডামা-ডোলের মাঝখানে এক সন্ধেবেলা, ফুটপাতের পাতলা ট্যালটেলে আলোয় বেনেপুকুরের ঘিঞ্জি গলির ওপরে ধরণী প্রেমে পড়ল। আর সেকি পড়া। চিরকালের উদাসীন ধরণী, যার মনে মনে একমাত্র সাধ ছিল তীর-ধনুক নিয়ে একেবারে বেড়িয়ে যাবে, ধৃষ্টদা করতে পারেননি, তাই সে এবারে করবে,, সে একেবারে সাত গুষ্টির প্রেমে পড়ল। এমনিতে ধরণী টাক আর ভুঁড়ির দিক দিয়ে অনেকটাই ধৃষ্টদ্যুম্নের কাছাকাছি এসেছিল, কিন্তু যে মেয়েটির প্রেমে, বলা উচিৎ যার সঙ্গে সে প্রেমে পড়ল সে নেহাৎই একচল্লিশ কিলোর একটা বাচ্চা মেয়ে। প্রেমে পড়ে চুমো খাওয়া থেকে বিয়ে অবধি পৌঁছতে ধরণী সময় নিল মাত্র সাত মাস, আর ছেলে হতে আর সতেরো মাস। কিন্তু এই দুবছরেই কখন নিঃশব্দে বদলে গ্যালো সময়, ধরণী তাকিয়ে দেখবারও সময় পেলো না।

ধরণী যখন প্রেমে পড়ল তখন মাংসের কিলো এগারো টাকা, সিনেমার টিকিটের ভদ্রকেট দু টাকা পাঁচ, চার আনায় পাওয়া ছ'খানা ফুচকা। সেই প্রেমকে বিয়ে করে প্রথম বাচ্চা হতে না হতেই মাংসের কিলো এখন পনেরো টাকা, দু টাকা পঁয়ষট্টির নীচে সিনেমা দেখা যায় না, ফুচকা আনায় একটা মোটে, বাজার থেকে বেবীফুড উধাও। ধরণী আর তার বৌ অনীতা আবার এর আগেই বুঝে গিয়েছিল যে তুচ্ছ সংসার করবার জন্য তাদের মহৎ জীবন নয়। বাজার দর তাদের এই সিদ্ধান্তে সমর্থন করল। তবু যে তারা পিছল ঢালু মাটিতে অতি কষ্টে ভর রেখে পরস্পর হাঁচড়া হেঁচড়ি করে টিঁকে রইল, সে শুধু ঐ শুভর জন্যে।

শুভ ওদের ছেলে। নানারকম অর্থহীন হাস্যকর হাবভাব, আধো আধো কথা পার হয়ে সে যতদিনে দেড় বছরে পড়ল ততদিনে অনেক দিব্যি গেলে, অনেক মানঅভিমান পার হয় ধরণীরা তার চারদিকেই চোখধাঁধা ঘানির বলদের মত সংসারে জুড়ে গেছে। গেছে তবু ভেতরে ভেতরে দুজনেই খাপ্পা। খাপ্পা ততটা পরস্পরের উপর নয়, যতটা নিজেদের উপর। শুভকে দুজনেই ভালো-বাসে দারুণ। তার দেখাশোনা ঠিকমত হচ্ছে না এই বলে ধরণী আর অনীতা দুজনে দুজনকে খুঁড়ছে ঠিকই, কিন্তু অন্য কেউ সে কথা বলতে এলে একজন আরেকজনের হয়ে লড়ে যাচ্ছে। আসলে তাদের দশা হয়েছে ঠিক অভিমন্যুর মতো। ঢুকে গ্যাছে, কিছুতেই বেরুতে পারছে না।

ছেলে হওয়ার পর ধরণীরা আলাদা ফ্ল্যাট বাড়ীতে এসেছে। ফ্ল্যাট মানে দেশলাইয়ের বাক্সের মতো দুটো খুপরি

দুপুরি ঘর আর খেলনা বাথরুম, রান্নাঘর। তারই ভাড়া চারশ টাকা। সারাদিনে পনেরো মিনিট জল আসে, আধ ঘণ্টা আলো হাওয়া। এ বাড়ীতে সবই রাশন। তবু কেউ জিজ্ঞেস করলে বলে ও বাড়ীতে মা-বাবা, কাকা-ভাই সবাইর রয়েছে তো, ঠিক স্পেস্ পাচ্ছিলাম না। এখানে একটু হাত-পা ছড়িয়ে বসা যায়!

সে যাই হোক। ধরণীদের এই দেশলাই বাক্সের ফ্ল্যাট কিন্তু কলকাতার বাইরে নয়। যাতায়াতের অসুবিধাও নেই তেমন কিছু। তবু তাদের বাড়ীতে লোক আসে না, বিশেষত আত্মীয়। কেন কে জানে। অথচ অনীতা ভালো কফি করে, ধরণী ঝুমিরে আড্ডা মারে, অবশ্য যদি বাড়ী থাকে তবেই। তবু একজন আসেন, তিনি ধৃষ্টদ্যুম্ন। আসেন শুধু পরম ভক্তকে দেখতেই নয়, অনীতার জন্যও। শুভ একা একা বড়ো হচ্ছে, কিছুটা অকেও কম্পানী দিতে। ধৃষ্টদ্যুম্নর কোন নির্দিষ্ট বয়েস নেই, তিনি সার্বজনীন। অনীতাকেও তিনি ভালো-বাসেন খুব। সাত মাসের ঝটিকা সফরের মধ্যেই অনীতাকে যা যা দেখিয়েছিল ধরণী তার মধ্যে অন্যতম দ্রষ্টব্য ধৃষ্টদ্যুম্ন বসু। তিনিও অনীতাকে সহজেই ভালো বেসেছেন, সহজে কেন? আগেই তো বলেছি, মেয়েদের ভালোবাসলে.....। আর ছোট ভাই-এর বউ হলেও অনীতা তো মেয়েই।

ধরণীর পক্ষে ভালো হয়েছে। যদিও সে একজন পুরোদস্তুর চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট-ট্যান্ট, তবু বাজারের ঘোড়দৌড়ের সঙ্গে তার ডেইরেক্ট ক্রেডিট্ সহজে মিলছে না। একটুর টিউশনি নিতে হয়েছে খুচরো-খাচরা সাংবাদিকতা কখনো। সিনেমা যে আগে বেশী দেখতো না, এখন দেখবার সময় পায় না। হোটেলে খেতে আগে ভালোবাসত না, এখন বাসলেও উপায় নেই, পয়সা থাকে না। অথচ অনীতা এই সবগুলোই ভালোবাসে আর সেটাই স্বাভাবিক। সে তাহলে সঙ্গী পায় কোথায়? কেন ধৃষ্টদ্যুম্ন আছেন, সঙ্গ আর সঙ্গতি দুরেরই জন্য। শুভর জন্য দামী পাউডার, ভালো বিস্কুট, বেবাব সাবান কে আনে? সেও তো। মোটামুটিভাবে ধরণীর সংসারের লাক্সারী বিভাগের পরিচালক ঐ ধৃষ্টদ্যুম্ন বসু।

ধরণীর সঙ্গে কিন্তু তার খুব বেশী দেখা হয় না। সে বেরোয় সকাল আটটায়, ফেরে রাত সাড়ে সাতটা। মাঝে মাঝে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে ধৃষ্টদ্যুম্ন একগাল হেসে বলেন 'সুখে আছিস?' তাঁর সামনে সুখে একটাও দাঁত নেই। সব পোকা ধরে ফিরেছিল, ফেলে দেওয়া হয়েছে। সেই অবধি বোকাটা হাস্যময় প্রশ্নের সামনে ধরণী বিব্রত দাঁড়িয়ে থাকে। ঠিক জবাব দিতে পারে না। অনেক পরে অনিশ্চিতভাবে বলে 'আছি বোধহয় ধৃষ্টদা'। ধৃষ্টদ্যুম্ন রিক্সা টেপে চলে যান। কখনো ধরণীই তাকে বলে, 'আমাদের বোধহয় সংসার করার ঠিক ইন্সটিংক্ট নেই, কি বলো ধৃষ্টদা?'

ধৃষ্টদ্যুম্ন হা হা করে হেসে ওঠেন, 'নাহে ঠিক তা নয়। আসলে আমরা কি ফিনান-সিয়ালি কি মেন্টালি একজন একটা সংসার মাসে পনেরো দিনের বেশী সহ্য করতে পারি না। কাজেই দুজনে মিলে টানি। এই ধর, তোর কি পালিয়ে গেলে আমি কি খুঁজে দিই, তুই আবার আমি অসুখে পড়লে ডাক্তার ডেকে দিবি। কম্প্লিমেন্টারী অ্যাসেস আর কি!'

'কম্প্লিমেন্ট পেলাম না ধৃষ্টদা। তুমি তো ডাক্তার ডাকার সুযোগই দাও না।'

'আর আমি অসুস্থ হলে তবে তো। গোয়িং স্ট্রং।'

খ্যা খ্যা করে দীর্ঘস্থায়ী হাসির মিউজিক ঘরের বাতাসে খানিকটা লুটোপুটি খায়, খানিকটা আয়নার পিছনে, ক্যালেন্ডারের ভাঁজে লুকিয়ে থাকে। ঘর খালি হলে একলা একলা নিজেরা গা দুলিয়ে হাসে। চাপা হাসি গুন্ গুন্ করে বেড়ায় সারা ঘরে।

(৩)

তারপর আজ সাতদিন হল সেই খবর এসেছে। ধরণীর ছোট ভাই নবনী এসে দিয়ে গ্যাছে। ধৃষ্টদ্যুম্ন শয্যাশায়ী। ব্লাড সর্কুলেশন স্বাভাবিক ছিল না অনেক-দিনই। চিনি মেশানো রক্ত কমেই ঘন হয়ে বুকে চেপে বসেছে। রক্ত চাপ কল্পনার প্রায় শেষ সীমান্তে। নবনী বলে গ্যাছে 'দাদা দেখে আর কি করবি? তবু জানিয়ে যাওয়া।'

ধরণী প্রথমে ভাবতে চেষ্টা করছিল খবরটা তার কাছে ঠিক কিরকম। মানে কিরকম অনুভূতি হচ্ছে তার। দুঃখ, নৈরাশ্য। না ঠিক এর কোনটাই নয়। কেমন যেন একটা অস্বস্তি হচ্ছে শুধু তার, আর মনে হচ্ছে দরজা জানালা সব হা হা করে খোলা। চারদিক ধু ধু করছে সাদা জ্যোৎস্নায়। ফাঁকা।

আজ সাতদিন ধরেই এরকম মনে হচ্ছে তার। চোখের সামনেটা এত সাদা কেন? সে কি ধৃষ্টদ্যুম্নের বিছানার চাদরের মতো, যার ওপর তিনি শুয়ে আছেন। কিন্তু সে তো দেখেনি, দেখতে যায়নি তাঁকে। কেবল ভেবেছে। তার আপিস যাওয়া, ছেলে আগলানো, নতুন নাটকের মহলা, দায়িত্ব-শীল এই সব কিছুর মধ্যে একটা শূন্যতার মতো শুধু জুড়ে বসেছে সেই মানুষটার জীবনের দায়িত্বশীল পরিণতি। হয়তো এখনই পরিণতি নয়, তবু এই তার শুরু। অন্যান্য অসুখ, এমনকি বিয়োগ সংবাদও শুধু বিবর করে আজকাল, কিন্তু এ যেন চূড়ান্ত অবিশ্বাস। যেন যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে উপহাস্য তীর-ধনুকের দুনিয়ার বদলে এই সামাজিক জীবনে তাঁকে টেনে আনা। তাই তো ছিল যথেষ্ট নিষ্করুণ। তারপর প্রবাব। ধৃষ্টদ্যুম্ন শুয়ে আছেন। ধরণী ভাবতে পারে না।

যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে উপহাস। তীরধনুকের দুনিয়ার বদলে এই সামাজিক জীবনে তাঁকে টেনে আনান। তাই তো ছিল যথেষ্ট নিষ্করুণ। তারপর এবার ধৃষ্টদ্যুম্ন শুয়ে আছেন। ধরণী ভাবতে পারে না।

তবু তার যাওয়ার উপায় নেই। বড়ো কাজ। সেই সংসারের অনীতার জর চলছে এই সাতদিন। ঠিকে ঝি আসছে না গত তিন দিন ধরে। বাচচাটা সারা দিন খ্যান-খ্যান করে ঘুরে বেড়ায়। আপিসে ক্লোজিং চলছে। সারা দিন ইস্তক সন্ধে সাড়ে ছটা, সাতটা অবধি ঘাড় গুঁজে কাজ করে বাড়ী ফিরে সে প্রথমে রান্নাঘরে যায়। রোগা শরীরে কোন রকমে হেঁচড়ে অনীতা যা দুপুরে রান্না করে রেখেছে, স্টোভ জেলে সেটা গরম করে। সবদিন সলতে ঠিক থাকে না, প্রেশার কুকারে কালি পড়ে। বিষণ্ণ মুখে সে ছেলেকে খাওয়ায়। ক্লান্ত শরীরে আর সঙ্গে ইকুয়ি-মিকড়ি খ্যালে। অনীতা ওষুধ খায়। তারপর ঘড়ির পেছন পেছন ক্রাবঘরে ছোটে। নতুন নাটক নামছে। রিহার্সালের মাঝখানে যখন নিজের পার্ট থাকে না তখন ভাবতে থাকে দশটায় বাড়ী ফিরে অনীতাকে ঘুম থেকে তুলে ওষুধ খাওয়াতে হবে। আর বুঝতে পারে কেমন আস্তে আস্তে এই ফাঁকে ধৃষ্টদা সরে যাচ্ছেন।

আজ শনিবার তাই কিছু আগে বেরিয়ে যেছে। আগে মানে বিকেল পাঁচটায় রাস্তায় এসে ধরণী ভাবল যেন চুরি করে পেয়েছে এই দু ঘণ্টা। আজ দেখতে যেতেই হবে ধৃষ্টদাকে। তার আগে শুধু সামনের বাজার থেকে কিনতে হবে একটা বড় বেবীফুড, ইসাবগুলের ভুষি, পাঁচশো থিন-আরারুট বিস্কিট আর মাখন। সস্তা হলে দুটো আপেল। কিন্তু বাজারে ঢুকে খুঁজে খুঁজে জিনিস কিনতে লেগে গেল এক ঘন্টারও বেশী। বাজার যেন লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। বাজারের বাইরে এসে যখন দাঁড়াল ধরণী তখন দ্যাখে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হয়ে গ্যাছে। জলে কাদায় সারা রাস্তা পেছল। ট্রাম বাস রিকসায় গিজগিজ করছে চারদিক। কে যেন রমণী কণ্ঠে চিৎকার করে গলা ফাটাচ্ছে 'নাড়ু....ওরে না..ড়ু।' পলাতক বা অদৃশ্য সেই নাড়ুর উদ্দেশে ছুঁড়ে দেওয়া ডাককে পিছনে ফেলে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে ধরণী যখন কোনকমে মৌলালির মোড়ে পৌঁছল, তখন তার পাশের ভদ্রলোকের ঘড়িতে ছটা বাহান্ন। নিজের ঘড়ি সারাতে গেছে। একান্ত অসহায় ধরণী পরের ঘড়ির পিছনেই ছুটল। আজও ধৃষ্টদার বাসায় যাওয়া হল না। সময় নেই। তার একদম সময় নেই।

কোন ট্রামে বাসে ওঠা যাচ্ছে না। একটু একটু করে পিছনে যাচ্ছে সময়। দুজনেটা বোধ হয় না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়বে। অনীতার ওষুধের সময় বয়ে যাচ্ছে। মুহূর্তে মুহূর্তে হু-হু করে বয়স বেড়ে যাচ্ছে ধরণীর। ফেকে পরা সুন্দর স্বাস্থ্য অচেনা

মেয়েটি হঠাৎ বলল 'কাল দিয়ে যাব।' বুকটা ধক্ করে উঠল ধরণীর। কী নিয়ে যাবে? কাল কেন? কাল কি আর তার সময় হবে। একগোছা রজনীগন্ধা বুকের কাছে সাপটে ধরে মেয়েটা এমন হাসছে কেন? হঠাৎ পাশে তাকিয়ে বুড়ো ফুলওলা আহ্লাদে গাধা নাড়ছে 'হাঁ হাঁ, তাই দিবেন।' ওহ্, তাই বলো। বিবর্ণ ধরণী নিশির ডাক থেকে বাস্তবে ফিরে আসে। পাতলা হয়ে আসা চুলের সামনে কপালের বাড়তি সীমানায়, টাকে, হাত বুলোতে যার এমন সময় সমস্ত ট্রাফিকের আওয়াজ রাস্তার হৈ-হট্টগোল ছাপিয়ে রিনরিনে একটা চেনা গলা কানের পর্দায় কাঁপিয়ে পড়ে 'বা....বা।'

চমকে মুখ তুলে তাকিয়ে তাকিয়ে ধরণী দ্যাখে সামনের রিকসার হুড, অনীতার কোলে বসে। পাশে ধৃষ্টদ্যুম্ন। চোখ কচলে দ্যাখে, ভুল নয়। জলজ্যান্ত। রিকসার হুড তুলে দেওয়া হয়েছে কিন্তু সামনের পর্দা খোলা। ট্র্যাফিক কনস্টেবলের ইশারায় দাঁড়িয়ে গেছে। ঝিরঝিরে বৃষ্টির ছাঁটে ভেজা চশমার কাঁচ মুছে ফেলল মুখে উজ্জ্বল হেসে ধৃষ্টদ্যুম্ন চেঁচিয়ে বলেন, এই লটবহর দুটো নিয়ে চললাম। ওরা এখন কয়েক দিন আমার বাড়ী থাকবে। তোর রান্না বাড়ীতে ঢাকা আছে। খেয়ে নিস। কাল থেকে আমার বাড়ী খাস।'

খুশীতে ঝাপসা গলায় ধরণী চেঁচায় 'তুমি ভালো হয়ে গ্যাছো? ভালো আছ।'

'বাবাপ থাকার টাইম দিস তোরা। এ-যাত্রা কোনক্রমে সামলে উঠেছি। চলি কাল কথা হবে।'

ট্র্যাফিক কনস্টেবল হাত নামিয়ে নিয়েছে। ধৃষ্টদ্যুম্নের টা-টা করার সময় হঠাৎ তার ঘড়িতে ধরণী দ্যাখে আটটা চল্লিশ ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘুরে নাটকের ঘরের দিকে দৌড়তে যায় সে। ঘুরতেই সামনের দোকানের বড় ঘড়িটায় তাকিয়ে দ্যাখে আটটা বাজতে পাঁচ। এই ঘড়িটার টাইম একদম কাঁটায় কাঁটায় ঠিক। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফ্যালে তারপর হাত দশেক এগিয়ে যাওয়া কি পিছনে দৌড়ে গিয়ে বলে ও ধৃষ্টদা তে. ঘড়ি পঁয়তাল্লিশ মিনিট ফাস্ট'।

'কালকে এক ঘন্টা সাতাশ মিনিট স্লো থাকে—বে'। এগিয়ে যেতে যেতে খ্যাঁ খ্যাঁ করে হেসে ওঠেন ধৃষ্টদ্যুম্ন। পয়সা খরচ করে ঘড়ি কিনেছি। আমি, দম দিই আমি, আর তাই দেখে তুমি সময় ঠিক করে নেবে। মাগ্‌না আর কি! আমার ঘড়ি থেকে সময় বুঝব কেবল আমি।'

সরু মোটা কচি তিনটে গলার তিন রকম হাসির মধ্যে সামনের দিকে রিকসা ছুটে গেল। পিছনে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ধরণী।' উল্টোপাল্টা সময় নিয়ে সে এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। রিকসার ফাঁক) দিয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নের পিঠ। চওড়া পিঠের যেটুকু দেখা যাচ্ছে সেই ফাঁকে, ঝক্-ঝক্ করছে তাঁর লুকিয়ে রাখা তীর-ধনুক।

কেন বন্যা?

২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ সংখ্যা অমৃত পত্রিকায় রমেন দাস মহাশয় 'কেন এই বন্যা?' প্রবন্ধে লিখেছেন, অজ্ঞাত কারণে মূল ডি ভি সি প্রকল্পের সুপারিশ মত শেষ অবধি আর আটটি বাঁধ তৈরী হয়নি। তিলাইয়া, কোণার, মাইথন ও পাঞ্চেত এই চারটি বাঁধের কাজ শেষ হয়। বোকারো, বনপাহাড়ি বেরমো ও মাইয়ার এই চারটি বাঁধ তৈরীর আর কোন উদ্যোগ-উদ্যম নেওয়া হয় না। (পৃঃ ৫০ ১ম স্তম্ভ, ৩য় অনুচ্ছেদ)। কিন্তু পরে লিখেছেন (৪১ পৃঃ, ১ম স্তম্ভ, ২য় অনুচ্ছেদ)—স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অনেক লেখা-লেখির পর ১৯৬৪—৬৫ সালে পশ্চিম বাংলা সরকার দুর্গাপুর ব্যারেজ ও নিম্ন দামোদর এলাকার নদনদী খালবিলের সব দায়-দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নেন। তারপর থেকে..এসব দেখাশোনার পুরো দায়িত্ব বর্তায় রাজ্য সরকারের ওপর। জানি না রমেনবাবুর এ তথ্যের উৎস কি। আমার মনে হয় যে চারটি বাঁধ তৈরি হবার পর প্রস্তাবিত আর চারটি বাঁধের খসড়া প্রস্তাব যে ফাইলবন্দী হয়ে গেল কেন তার কারণ অজ্ঞাত নয়, আর ১৯৬৪—৬৫ সালে পশ্চিম বাংলা সরকার নিম্ন দামোদর এলাকার দায়-দায়িত্ব স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েও নেননি। রমেন-বাবু যদি পুরোনো কাগজপত্র একটু ঘাঁটতেন তা হলে সহজেই বুঝতে পারতেন যে নিম্ন দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয় তদানীন্তন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর অহেতুক বিরোধিতায়। তিনি হচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গ বিদ্বেষী (কেন্দ্রের কোনো মন্ত্রীই বাংলাদেশকে প্রীতির চক্ষে দেখেন না) মুখে বড় বড় বুলি কপচানেওয়ালা, কিন্তু অন্তরে ঘোরতর কম্যুন্যাল নিজ রাষ্ট্রপ্রেমী (অর্থাৎ নিজ রাষ্ট্রের কোলে ঝোল টানতে ব্যস্ত ও ব্যস্ত) মহাত্মা গুলজারিলাল নন্দ, (সংক্ষেপে জি এল নন্দা) যিনি কংগ্রেসী ভারত সরকারের যে যে মন্ত্রিত্বে ন্যস্ত হয়েছেন সেখানেই ব্যর্থতার সুস্পষ্ট ছাপ রেখে গেছেন। তাঁর বিরোধিতার কারণ পশ্চিম বাংলা প্রতি বিদ্বেষ পশ্চিম বাংলার ভালো তাঁদের সয় না। লজ্জার কথা এই যে জোর করে এ পরিকল্পনাটি কংগ্রেসী কেন্দ্রীয় সরকার কংগ্রেসী পশ্চিম বাংলা সরকারের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন, অথচ তদানীন্তন রাজ্য সরকার বা পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী এম-এল-এরা কেউই এর বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ অঙ্গুলিও উত্তোলন করেন নি। আপনাদের মনে থাকতে পারে যে ষাটের দশকে বরসাকালে একবার নিম্ন দামোদর এলাকা ভীষণ জলপ্লাবিত হলে পর দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকা সম্পাদকীয়তে জি, এল, নন্দের নির্বুদ্ধিতা ও অদূরদর্শিতার যে সমালোচনা করে, কোনো দিশী কাগজ তা করে নি, করতে সাহসও করে নি। ওই সমালোচনার সমর্থন করে আমার একটি চিঠিও সে সময় স্টেটসম্যান ছাপা হয়েছিল, সেই জন্যেই ব্যাপারটি আমার আজও মনে আছে।

রমেনবাবু অভিযোগ করেছেন যে, রাজ্য সরকার ডি-ভি-সির হাত থেকে দুর্গাপুর ব্যারেজ ও নিম্ন দামোদর উপত্যকার গুরু দায়দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে রাজ্য সেচ দপ্তরের বিরাট এক বাহিনী—যার জন্যে ফি বছরে কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ হয়,—গত চোদ্দ-পনের বছর ধরে বছরের পর বছর নির্মমভাবে নিষ্ক্রিয় থেকেছেন. উপত্যকার কোন নদনদী বা খাল-বিলের সংস্কার করেন নি। এ অভিযোগ শুধু রমেনবাবুর নয়, এ অভিযোগ ডি-ভি-সিরও. এ অভিযোগ বারোটি জেলার বন্যা-পীড়িত লক্ষ লক্ষ সর্বহারাদেরও। তাঁদের ধারণা নিম্ন দামোদর উপত্যকার পূর্ত দপ্তরের যেসব ইঞ্জিনীয়ার কারিগর ও কর্মীরা আছেন তাঁদের দায়দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার অভাব ও চরম গাফিলতির ফলেই এবছরের বন্যার তাণ্ডব লীলা সম্ভব হয়েছে। বন্যা-কবলিত অপরিসীম দুর্দশাগ্রস্ত সর্বহারা বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ আশা করে তার কৈফিয়ৎ দিতেই হবে।

পরিশেষে নিবেদন রমেনবাবু লিখেছেন (৫০ পৃঃ, ১ম স্তম্ভ, ৪ অনুচ্ছেদ) "আটটি বাঁধ করা হলে হিসাব অনুযায়ী প্রতিদিন দশ লক্ষ কিউসেক জল নিয়ন্ত্রিত করে তা থেকে মাত্র 'হাজার' কিউসেক জল ছাড়া সম্ভব হত।" এবং দামোদর নদের গভীরতা এবং জলবহনের যে ক্ষমতা তাতে প্রতিদিন দুই 'হাজার' কিউসেক জল ছাড়া হলে নিম্ন উপত্যকায় কোন রকম প্লাবনের আশঙ্কা থাকবে না।' মনে হয় তিনি অনবধানবশত দুই 'লক্ষের' বদলে দুই 'হাজার' কিউসেক লিখে ফেলেছেন। বলার অপেক্ষা রাখে না তাঁর প্রবন্ধটি খুবই সময়োপযোগী হয়েছে।' নমস্কারান্তে ইতি

অনিল সোম।
জামসেদপুর

পুঃ। পাঠকবর্গ শুনে সুখী ও কিছু আশ্বস্ত হবেন যে ২৫।১০।৭৮ তারিখের কলিকাতার দৈনিক খবরের কাগজে একটি বিবৃতিতে প্রকাশ যে বামফ্রন্ট রাজ্য সরকারের সেচ বিভাগ বাঁধ ও খালবিল-গুলির যে ভয়াবহ ক্ষতি হয়েছে তা খুঁটিয়ে দেখবার জন্যে একটি বিশেষজ্ঞ তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করেছেন। আরও প্রকাশ যে, বন্যা প্রতিরোধে সময় মতন যথাযোগ্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সেচ বিভাগের কর্মীদের গাফিলতির অদক্ষতা সম্বন্ধে বিভিন্ন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণের কাছ থেকে বহু অভিযোগ রাজ্য সরকার পেয়েছেন। কমিটিতে তিন মাসের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করতে নির্দেশ দেওয়া হবে।

কৃষিকাজ থেকে পশুপালন

প্রভাত চৌধুরী

রউফ মা-মনোসার থানে এসে দেখে ছাগলটা নেই। দড়ি খুলে পালিয়েছে। দুপুরের কিছু আগে সে প্রতিদিনই মনসা থানের সামনের মাঠটায় একটা খুঁটোর সংগে লম্বা দড়ি দিয়ে ছাগলটাকে বেঁধে রাখে। এদিকটা অপেক্ষাকৃত নির্জন। বছরের ভেতর মাত্র কটা দিন এখানটা জমজমাট। পুজো হয়। মেলা বসে। মনসাপালার [illegible] হয়। বাইরে থেকেও লোকজন আসে ধর্ম পালা দেখতে। মেলায় কেনাকাটাও করে অনেকে। স্বাদবাকী সময় সব ভোঁ-ভোঁ। গাছতলায় মা-মনসা একা থাকেন।

প্রথম প্রথম রউফ ছাগলটাকে না বেঁধে ছেড়ে রাখতো। বেখে বাঁদিকের কাঁঠাল গাছটার নিচে গামছা বিছিয়ে ঘুম লাগতো। জায়গাটা লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন বলে তার ছাগল চরানোর সঙ্গে ঘুমোনোতে কোনো ব্যাঘাত ঘটতো না। এবং যথারীতি ঘুম থেকে উঠে দেখতো ছাগলটাও গামছার পাশেই ঘাড় বেঁকিয়ে শুয়ে আছে। সে কোমরে গামছা বেঁধে ছাগলের পেছন পেছন ঘরে ফিরতো। মুরগি এবং হাঁসগুলো তার আগেই এসে জড়ো হত ঘরের উঠোনে। হাঁস মুরগির খোপ খুলে দিয়ে সে ছাগলটাকে ঘরের ভেতর তার বিছানার পাশের খুঁটোয় আবার বেঁধে দিত। ঘরটা এখন তার এবং তার ছাগলের।

অথচ প্রতি সপ্তাহেই তাকে অভিযোগ শুনতে হত আজ আমানুলের ছাগল রহমনের

জমির ঝিঙে চাষা নয় বেগুনগাছকে মুড়িয়ে খেয়ে ফেলেছে তার গুণধর ছাগল। সে প্রথম প্রথম প্রতিবাদ করতো। বলতে, আমার ছাগল তো মনসা থানের কাছাকাছি চরে বেড়ায়। তোমাদের ঝিঙের ডাঁই কিংবা বেগুনতলা তো ওইদিকে নয়। তবে ওই ছাগল গেল কি পেকাবে। উত্তর পেত সোজা, সরল। তোমার ছাগল কি বাঁধা থাকে। আমেল্লা ছাড়া থাকে তো। সেতে কতক্ষণ

কাঁহাতক আর পরের গাল শোনা যায়। তাই এই দড়ি আর খুঁটো। এতে রউফের চিন্তা কমেছে। পরিশ্রমও। এখন আর তাকে গাছতলায় গামছা বিছিয়ে ঘুমোতে হয় না। খুঁটোর সঙ্গে লম্বা দড়ি দিয়ে ছাগলটাকে বেঁধে রেখে আসে মনসা থানের মাঠটায়। ছাগলটা সারা দুপুর ওখানেই বাঁধা থাকে। সে বাড়িতে এসে তাজাই পেতে শোয়। যদিও গাছতলার মতো ফুরফুরে বাতাস বাড়িতে পাওয়া যায় না। তবু ব্যাপারটা সুখকর। এবং ঝামেলাবিহীন। সন্ধের প্রাত্যহিক গালমন্দের বালাই নেই। বিকেল বিকেল সে দড়ি খুঁটো বগলে নিয়ে ছাগলের পেছন পেছন ঘরে ফিরে আসে।

অথচ রউফ আজ তার ছাগলটাকে দেখতে পেল না। খুঁটো এবং দড়ি যথা-স্থানেই আছে। ছাগলটা নেই।

মা-মনসার থান এখন ফাঁকা। রউফ ভাবল ছাগলটা দড়ি খুললো কিভাবে। কেউ নিশ্চয়ই খুলে দিয়েছে। না হলে ছাগলের পক্ষে দড়ি খুলে পালানো অসম্ভব। ছাগলের তো আর দুটো হাত নেই। চারটেই পা। পা দিয়ে হাঁটা যায়। বড়োজোর লাথি মারা যায়। দড়ি খোলা যায় না। তাছাড়া এ ছাগলটা বেশ সভ্যভব্য। ছোটবেলায় মা হারিয়েছে। কিছুটা দুঃখীও বটে। গতহাটের আগের দিন সফিকুল চারকুড়ি টাকা দাম দিতে চেয়েছিল। রউফ দেয়নি। শুধু যে বকরীদের সময় দামটা চড়বে বলে ধরে রেখেছে তা নয়, ছাগলটা বেচে দিলে সে সারারাত একা হয়ে যাবে। বড়ো একা। এখন আবার রাতটা ক্রমশই বড় হচ্ছে। এত দীর্ঘ রাত সে কিভাবে একা থাকবে।

সূর্য এখন মধ্য গগন থেকে কেবলার দিকে ঝুঁকতে শুরু করেছে। ডাঁই ডাঁই-ডাঁই অবস্থা। কিছুক্ষণের মধ্যেই মগরেবের আজান শুরু হবে। রউফ মসজিদের দিকে হাঁটতে শুরু করে।

হানিফ সাহেবের বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় তার মনে হল এ বাড়ির ভেতরে ছোট একটা বাগান আছে। একটা পেয়ারা গাছ, খানকতক পেঁপে গাছ, একটা গন্ধ লেবু গাছ ছাড়াও লংকা সামঝিঙে আর মানকচুও লাগিয়েছে হানিফ সাহেব। ছাগলটা এখানে ঢুকে পড়েনি তো?

রউফ এক সময় এ বাড়িতে মান্দারি করতো। তখন শরিফা ছিল। তাদের সাদির সময় হানিফ সাহেবের বিবি একটা নতুন বোরখা দিয়েছিল শরিফাকে। শরিফা তখনও পুলিশ ব্যারাকে বাসন মাজার কাজ পায়নি।

রউফ হানিফ সাহেবের বাড়ির দরজা ঠেলে কিছুটা ফাঁক করে বাগানটা দেখে নেয়।

না, এখানে নেই। আর এখানে থাকলে সে বাড়িতে বসে খবর পেত।

শরিফা চলে যাবার পর রউফ মান্দারি করা ছেড়ে দেয়। হানিফ সাহেব হাজী মানুষ। বলেন, কাজ ছাড়লে খাবিডা কি? রউফ বলেছিল, ছাগল রাখবো।

হানিফ সাহেব হো-হো করে হেসে উঠে বলেছিল, কৃষিকাজ থেকে পশুপালনে ফিরে যাচ্ছিস তুই। তাজ্জব ব্যাপার। মানুষ আগে পশুপালন করতো পরে কৃষিকাজে এসেছে। আর তুই সভ্যতার চাকাকে পেছনে ঘুরিয়ে দিলি। ছাগল গেলে তো তোকে গুহায় ফিরতে হবে।

রউফ হানিফ সাহেবের কথার মারপ্যাঁচ বোঝেনি। শুধু হেসেছিল।

দরজার পাল্লা দুটো যথারীতি টেনে দেয় রউফ। সামনের ইঁট ফেলা পুকুরের পাড় ধরে হাঁটতে থাকে। ইঁটের ফাঁকে ফাঁকে বেশ লম্বা লম্বা ঘাস হয়েছে। এখানে গোরুছাগলের মুখ পড়েনি আদৌ। ছাগলটাকে একদিন এদিকে নিয়ে আসতে হবে।

রউফ ঘাটের কাছে যেতেই ঘাটের সিঁড়ি থেকে তিনটে হাঁস জলে নেমে যায়। দু-পাশের জল ঘেঁটে যাওয়ার ফলে সিঁড়ি থেকে তিনটে জলরেখা তিনদিকে এগিয়ে যায়। রউফ দাঁড়িয়ে পড়ে।

ভাবে, প্রথমে কোনদিকে যাবে।

হাঁস তিনটের ভেতর একটা বেশ সাদা। আন্ডার মতো। রউফ সেই সাদা হাঁসটার গতিপথ লক্ষ্য করে সামনের মাঠে নেমে পড়ে।

শরিফার গায়ের রং বেশ সাদা ছিল। অনেকটা চাঁদের মতো। ইদের চাঁদ। বেশ দুর্লভ সেই রং। সেন বালি জমিতে সাদা তরমুজ।

যে সব ডাঁই-এ আসাম-আউশ কাটা হয়ে গেছে কার্তিক মাসেই সে-সব ডাঁই-এ এখন আলুর গাছ বড় হচ্ছে। সর্ষের ফুল ফুটতে শুরু করেছে। এ বছর সর্ষের চাষ অনেক বেশী। ঘন সবুজ আর হলুদ রঙের এই খেলাতে প্রায় সন্ধ্যার এই সময় এক অলৌকিক বিস্ময়।

রউফ ভাবে কচি আলুপাতা ও সর্ষে ফুলের হলুদ হাতছানিতে ছাগলটার ওই মাঠের দিকে যাবার সম্ভাবনা বেশী। সে আল ধরে এগোতে থাকে। আলগুলোর মাঝে মাঝে গর্ত। ইঁদুরে মাটি থেকে ধান বের করেছে বাউইরা ইঁদুরের এই এক ধর্ম। শীষসহ ধান টেনে নিয়ে গর্তে জমা করে। ভাবে এই সময়ে তাদের শীত প্রায় পার হয়ে যাবে। পিঁপড়েরাও বর্ষার আগে খাবার বয়ে নিয়ে যায়। সব প্রাণীই সঞ্চয়ী বিশ্বাসী। তারই নিজস্ব কোনো সঞ্চয় নেই।

সামনের কটা ডাঁই ফাঁকা। দেওর আছে। গম লাগানো হবে সন্ধ্যে এবছর অনেকেই আলু বীজ কিনতে নি। দর বড়ো চড়া। আট টাকা কেজি। জন চাষী এই দরে বীজ কিনতে পারে যারা কোল্ডস্টোরে আলু রেখেছিল তারাই এ বছর লাল হয়ে গেল। শুধু বীজ বিক্রী করে।

শরিফা তার আব্বার কাছ থেকে যে ধাড়ী ছাগলটা এনেছিল এটা তারই বাচ্চা। শরিফা চলে যাবার সময় ধাড়ীটা গাভীন ছিল। বাজেই এটাকে শরিফা দেখে যেতে পারেনি। আর দেখলেই বা কি হত? সে কি যাওয়া বন্ধ রাখতো! ভাবতো কি, আহারে ছাগলটার কষ্ট হবে, আমি যাবো না।

নিশ্চয়ই নয়। তার মাথায় তখন ফুলেল তেলের বাস। গলায় রেডিওর গান। ঘর ভর্তি হাঁস মুরগির পালও থাকে ঘরে রাখতে পারেনি। পুলিশ ব্যারাকের জমাদার নাকি শরিফাকে নিজের বেটির মতো দেখতো। নতুন বেলাউজ দিয়েছিল প্রথম। পরে সাবান ফুলেল তেল আরো কত কি। রউফের সন্দেহ করার কিছু ছিল না। বয়সে শরিফার আব্বার বয়সী। মাথায় কাঁচাপাকা চুল, পেট মোটা সেই বুড়ো জমাদার তাদের বাড়িতেও এসেছে দু-এক-দিন। আন্ডা কিনতে। শরিফা পাশাপাশি বাড়ি থেকে আন্ডা এনে রাখতো। পুলিশ ব্যারাকের অনেকেই তার কাছে থেকে কিনতো সেই আন্ডা। কাজে যাবার সময় সে নিয়ে যেত। এতে আন্ডা পিছু পাঁচ পয়সা লাভ করতো শরিফা।

রউফের দু পাশেই এখন ঘন সর্ষের ডাঁই। আগাম বোনা হলে গাছগুলো লম্বায় বেশ বেড়ে উঠেছে। ফাঁকা বাতাসে যেন হলুদের ঢেউ। রউফ হাত দিয়ে একটা গাছ টেনে আনে। না, এখনো শুঁটি আসে নি। শুধুই ফুল। রউফ গাছটাকে ছেড়ে দেয়। ছাড়া পেয়ে ওটা আবার বাতাসে দুলতে থাকে। মাঝে মাঝে বড়ো ঘন বোনা হয়েছে। আবার কোনো কোনো জায়গায় ফাঁকা। হাতে এখনো আড় ভাঙেনি। বীজ ছড়ানো চাষটিখানি কথা নয়। সব জায়গায় সমান করে ফেলতে হয়। না হলে কোথাও ঘন আবার কোথাও পাতলা হয়ে যাবার সম্ভবনা বেশী। এতে ফলন ভালো হয় না। যেমন ডান পাশের এই ডাঁইটার অবস্থা। সে সর্ষের ডাঁই ফেলে আরো কিছুটা এগিয়ে যায়।

কিনে দে বেশমী চুড়ি, শরিফা একদিন হঠাৎই গাইতে শুরু করেছিল। গানটা এখন সব জায়গাতেই শোনা যায়। রউফের কানে ওই গানটা বেজে ওঠে। সে গান শুনতে শুনতে আলু জমির মাঝায় এসে পড়ে। আলু গাছগুলোর ঝাড়গুলো লম্বা হয়েছে। গোড়ায় মাটি দেওয়া হয়েছে সবে। গাছের দুদিকে নালা। এই নালা ধরে পানি দিতে হয়। পানি গাছের খাদ্য। প্রাণও।

এই নালা ধরে পুলাল অগ্রসর

জমির নালা দেখে রউফ কিছুটা অনুভব করে। এটা জলিলদের জমি। চেনে। বাঁদিকের বড় ভুঁইটা হানিফ বদেব। ওই ভুঁইয়ের মাথায় একটা কল আছে। স্যালো। কলের পাইপে পাম্পসেট লাগিয়ে দিলে ওই স্যালোর তল থেকে পানি উঠে আসে। যত ভট্‌ভট্‌ শব্দ করে পাম্পটা চলে স্যালোর মুখ থেকে ততই পানি। মাঠ ভরে যায় সেই পানিতে। শস্যের খিদেতেষ্টা দূর হয়।

রউফ কলের মুখে এসে দাঁড়ায়। হ্যান্ডেলটা খোলা। চুরি যাবার ভয়ে হ্যান্ডেলটা খুলে নিয়ে গেছে হানিফ সাহেবের নতুন মান্দার। বউফের পানি খাওয়া হয় না। সে আরো কিছুটা এগিয়ে ছাগলটার সন্ধান করে।

না, ছাগলটা এদিকে আসে নি।

রউফ যে পথে এসেছিল সেদিকে কিছুটা ফিরে এসে বাঁহাতি আলে নেমে বিবির পুকুরের দিকে হাঁটতে থাকে। বিবির পুকুরের নাম বিবির পুকুর হল কেন তা রউফের জানা নেই সঠিক। নিশ্চয়ই কোনো না কোনো বিবির মেহেরবানে এই পুকুরটা খোঁড়া হয়েছিল। এই পুকুরের পাড়ে এখন বারো মাস সব্জির চাষ হয়। চারদিকে বেড়া দেওয়া আছে।

শরিফাকে কাজটা ঠিক করে দিয়েছিল জলিলের বিবি। সেও ওখানে কাজ করতো। জলিলের বিবি বাইরের কাজ করলে যদি বে-পর্দা না হয় তাহলে তার বিবির কাজ করাতে বেপর্দা হবার কোনো কারণ নেই। ঠিক এরকম একটা বিশ্বাস থেকেই সে কাজ নেওয়াতে আপত্তি করেনি। বরং খুশিই হয়েছিল। যখন কাজ ঠিক করে ফিরে এসে শরিফা বলেছিল মাসকাবারে এক কুড়ি টাকা মাইনে দেবে। তাছাড়া দুবার দুবেলা ভাত তরকারি। যেটা বেড়ে যাবে অর্থাৎ পুলিশেরা খেতে পাবে না, সবটুকু তাদের দুজনের। তার আর জলিলের বিবির।

এহেন উপরি পাওনার মোহে না পড়লে রউফকে আজ আর ছাগল খুঁজতে বেরোতে হত না। তেষ্টার কষ্টটা আবার টের পায় সে।

এ ব্যাপারে লতেমন প্রথমেই সাবধান করে দিয়েছিল তাকে। বলেছিল, ঘরের বিবিকে বাবমুখী করিস না রউফ। ঠকতে হবে।

কথাটায় গা করেনি সে। ভেবেছিল লতেমন তাকে ঈর্ষা করছে। জলিলের বিবি লতেমনের বিবিকে না নিয়ে তার বিবিকে কাজে নিয়েছে বলেই এই রাগ। অথচ এটাই যদি উল্টো হত। তাহলে কি লতেমন এতবড় দাওটা ছেড়ে দিতো। ছেড়ে দিতে পারতো?

লতেমন বলেছিল, নতুন বিবি, ছেড়ে রাখিস না।

এটাকে ছেড়েরাখার ব্যাপার বলে মনে হয় নি রউফের। আর লতেমনের এই গায়ে পড়া ভাবটা সহ্য হয় নি তার। কোনো উত্তর না দিয়েই চলে এসেছিল সে। মানুষজন অপর কারো ভালো হোক, হাতে দুটো কাঁচা পয়সা আসুক তা চাইতে জানে না। পরের ভালোটা কিভাবে মন্দ করা যায় সব সময় শুধু সেই চিন্তা। অমঙ্গলে অলক্ষণে সব লতেমনকে মনে মনে গাল দিয়েছিল সে।

বিবির পুকুরের পানি টলমল করছে। কাঁচের মতো মসৃণ। পাড় জুড়ে লম্বা লম্বা তাল গাছগুলোর একটা মাথা আকাশের দিকে। অরপ মাথাটা পুকুরের পানির মসৃণতা ফুঁড়ে নেমে গেছে বহু নিচে। যেখানে হয়ত অন্য আরেক আকাশ আছে। পানি ঘেঁসে কলাগাছের সারি। কোনে, গাছে কাঁদি ঝুলছে। কোনোটা বা ফাঁকা। পাড়ের বাইরের দিকটা কাঁটাতারের বেড়া। লোহার রেলিং মাঝে মাঝে। কাঁটাতারের পাশেই একধরণের কাঁটাগাছের বেড়া। একমাপে সুন্দর করে ছাঁটা। ঠিক মধ্যিখানে বাঁধানো ঘাটের সিঁড়ি। সিঁড়ির মুখে দুদিকে দুটো কৃষ্ণচূড়া কিংবা রাধা-চূড়া গাছ। জৈষ্ঠি মাসে এই গাছ দুটো থেকে লাল আলো ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। এখন শ্বেতচূড়া নেই। তাই গাছ ঘন সবুজ।

রউফ সিঁড়িতে এসে দাঁড়ায়। পুকুরের চার পাশে দ্বিতীয় কোনো মানুষের দেখা পায় না সে।

পাড় ছেয়ে ফেলেছে লাউয়ের লতা। বড়ো বড় এক একটা পাতা। এই রকম পাতাতে খুব সহজেই নাস্তা করা যায়। যেমন যায় পদ্মপাতায়। বিবির পুকুরে একটাও পদ্ম নেই। পদ্ম থাকলে পুকুরটার রূপ আরো খুলতো।

রউফ লাউ পাতায় নাস্তা করার কথা এর আগে কখনো ভাবেনি। এমন কি বিবির পুকুরে পদ্ম নেই বলে অনুশোচনাও হয়নি তার। আজ তার ছাগল না হারালে এসব ভাবনাই তার আসতে না।

সে সিঁড়ি দিয়ে সোজা ঘাটে নেমে আসে। আঁচলা ভরে পানি খায়।

ঠিক তখনই রউফের কানে আসে মগরেবের আজান। মসজিদের মাইকোফোন থেকে ভেসে আসা শব্দ।

আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর। আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর।

আস্‌হাদো আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌।

আস্‌হাদো আন্না মো-হাম-মাদার রসুল উল্লাহ্‌, অসহাদো আন্না মো-হাম-মাদার রসুল উল্লাহ্‌।

গম্ভীর আজানের শব্দে চারদিকের নিস্তব্ধতা আরো গাঢ় হয়। হঠাৎ একটা রাত পাখি শব্দ করে ডেকে ওঠে উড়ে যাবার আগে। ওই শব্দে বিবির পুকুরের লাউ লতায় নিচে লুকিয়ে থাকা একপাল চড়ুই পাখি কিচকিচ করতে করতে মসজিদের দিকে উড়ে যায়।

হায় আল্লাস সালা, হায় আল্লাস সালা।

'এসো নামাজ পড়তে এসো এসো নামাজ পড়তে এসো।'

নামাজ পড়তে ডাকছে রউফকে। রউফ এখনো তার ছাগলটাকে খুঁজে পায়নি। এ অবস্থায় তার পক্ষে ছাগল খোঁজা বন্ধ রাখলে অন্ধকার আরো জমে বসে যাবে। এখনো আলো-আঁধারির খেলা চলছে চরাচরে।

সে উজু না করে মুখের তালুতে জিভ ঠেকিয়ে অদ্ভুত ধরনের একটা হুই-শেলের শব্দ করে। অনেকটা বল খেলার মাঠে যে লোকটার মুখে বাঁশি থাকে, গোল হলে লম্বা করে বাজিয়ে দেয়, অনেকটা সে-রকম শব্দ। বাঁশি ছাড়াই। শুধু জিভের কৌশল। শরিফার কাছ থেকে এ শব্দটা শিখেছে রউফ। শরিফা এই শব্দ দিয়ে পুকুরের পানি থেকে হাঁসগুলোকে ডেকে ডেকে ঘরে তুলতো। রউফ হাঁস ঘর ঢোকানোর শব্দের অনুকরণে সেই শব্দ করতে থাকে ক্রমাগত। তাবে এই শব্দ শুনে লাউ-পাতার নিচ থেকে বেরিয়ে আসবে তার ছাগল।

অথচ লাউপাতা কোথাও নড়ে না। রউফের মুখের শব্দগুলোর প্রতিধ্বনি ফিরে আসে কোথায় ধাক্কা খেয়ে। ফলত, ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি, এবং নির্জনতা, একাকীত্ব এসব মিলেমিশে রউফকে ঘাটের সিঁড়িতে বসিয়ে দেয়।

সমস্ত আসমান এবং জমিন যেন থম মেরে গেছে। বাতাস বন্ধ। কৃষ্ণচূড়া গাছ স্থির। ঝোপের আশেপাশেও কোনো শব্দ নেই। সূর্য কোলার দিকের সীমান্তে ঢুকে গেছে। দূরে মাঠের মধ্যে ধোঁয়াশা এবং কুয়াশা ক্রমশ ঘন হচ্ছে। সেই আস্তরণে ডুবে যাচ্ছে আলুর ভুঁইগুলো। সর্ষের হলুদ এখন আর হলুদ নয়। সব মেঘবর্ণ। ঘন শাদা মেঘ।

না, বিবির পুকুরে কোথাও তার ছাগল নেই। থাকলে এতক্ষণে ডাকাডাকিতে সাড়া দিত নিশ্চয়ই। শরিফার ডাকে একটা হাঁসও পুকুরের পানিতে পড়ে থাকতো না। সব সুড়সুড় করে বাড়ির পথ ধরতো।

মাঝ পুকুরে একটা মাছ হঠাৎ ঘাই মারে। বেশ জোরে শব্দ হয়। চতুর্দিকের নিস্তব্ধতার ভেতর মাছের এই ঘাইয়ের শব্দ রউফের মুখের ওই শব্দটার চিহ্ন মুছে দেয়। রউফ ভাবে পলুইটা আনলে হত। ধারে ধারে দল-চপড়াস পলুই চাপলে শোল মাগুর পাওয়া যেত।

রউফ বিবির পুকুর থেকে নেমে আসে। লোকালয়ের দিকে এগোতে এগোতে তার মন হয় মগরের নামাজ না পড়ে সে অন্যায় করেছে। তার দোজোখ স্থান হবে। এর ক্ষমা নেই। ছাগল হারিয়েছে তো কি হয়েছে। তার বিবি চলে যাবার খবর পেয়েও তো নামাজ কাজা করেনি। ছাগলটাই তার কাছে জরুরী হল।

পরের দিন থেকেই শরিফের কাজ শুরু হয়েছিল। থালি বদনা হাণ্ডি কড়া ইত্যাদি ধুয়ে শেষ করতে হবে ভোর ভোর। তা না হলে রসুই-এর দেরী হয়ে যাবে। কাজেই

লিলের বিবি যখন তাকে ডাকতে এসেছিল
খন সবে ফজর নামাজ শেষ হয়েছে। রউফ
র বিবিকে সাবধানে কাজকর্ম করতে উপ-
ণ দিয়েছিল। দরজা খুলে শরিফা বাইরে
চই তার মনে হয়েছিল এটা ভালো হল
. সে সময়ই একটা টিক্‌টিকিও ডেকে
উঠেছিল।

কাজ থেকে ফিরে এসে শরিফা বলে-
ছিল মলিলের বিবি তাকে হেড জমাদারের
সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে। হেড জমাদারের
ওপরই কিচেনের ভার। কিচেন মানে যে
বস্‌ইঘর এটা শিখেছিল রউফ। এবং জেনে-
ছিল ভোরবেলা প্রায় সকলেই ঘুমিয়ে থাকে।
হেড জমাদারের কাছে চাবি থাকে। সে নিজেই
বস্‌ইঘর খুলে দেয়। বেলা বাড়লে ব্যারাকের
প্রতিটা ঘরেই রেডিও বেজে ওঠে। গান
শুনতে শুনতে সে কাজ করেছে। ব্যারাকের
কুয়োতে কপিকল লাগানো আছে এটা শরিফা
না বললেও সে জানতো। যেমন জানে নিম-
গাছটার কথা। ব্যারাকের দরজার পাশের নিম-
গাছের নিমফুলের গন্ধের খবর তার অজানা
নয়।

এরপর থেকে শুরু হয়েছিল ব্যারাকের
গল্প। রাত্রে শুয়েও শরিফা ব্যারাকের কথা
বলতো। কথা বলতে বলতে তার চোখ দুটো
কেমন যেন জ্বলে উঠতো। রউফের প্রথম
প্রথম খুব খারাপও লাগতো না। ভাবতো,
কাজে মন দিতে পেরেছে বিবি আমার।

রউফ চমকে ওঠে। একটা সাইকেল
রিকসা একেবারে তার গায়ের ওপর এসে
পড়েছে প্রায়। আরোহী এবং চালক দুতরফই
তার চেনা। হানিফ সাহেবের ব্যাটা এনামত
আর তার বিবি কলকাতা গিয়েছিল ভোরের
ট্রেনে। এনামত হিন্দুর মেয়েকে বিয়ে
করেছে। তার হাজী সাহাবান ব্যাপারটা
হাসিমুখেই মেনে নিয়েছে। বাবার সময়ও
তার সাথে দেখা হয়েছিল। এনামতরা বেশ
আছে। অফিস বন্ধ থাকলে বেড়াতে যায়।
গোবরহাটার মুখে তার সাথে দেখা হয়েছিল।

রউফ কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে বলে
ফেলে—ছাগলটাকে খুঁজতে বেরিয়েছি, কোথায়
যে পালালো—।

যেন এনামত আর তার বিবি কলকাতা
থেকে শুনে এসেছে ছাগলটার হারিয়ে
যাওয়ার ঘটনাটা। জেনে এসেছে সন্ধানস্থল।
কিংবা রিকসাচালক গফুর বলে দিতে পারে
সঠিক নির্দেশ। সে অসহায়তা নিয়েই রাস্তার
পিচ থেকে পাশে সরে যায়। গফুর তাকে
একসময় রিকসা চালাবার পরামর্শ দিয়েছিল।
ওই পরামর্শটা না শুনে ভুল করেছে রউফ।

এনামত পেছন ফিরে কি যেন বলে।
রউফ কিছুই শুনতে পায় না। গফুরের
রিকসা ততক্ষণে পালমশাইয়ের গদিঘর
ছাড়িয়ে গেছে। গদিঘরে একটা আলো
জ্বলছে। বাকী অঞ্চলটা বেশ অন্ধকার।
দূরে কোথাও একটা বাড়িতে রেডিওতে গান
হচ্ছে। শরিফাকে একটা রেডিও কিনে দিতে
পারলে হয়ত পালাতো না।

রউফ বাঁদিকের একটা ভাঙ্গা পাঁচিলের
ফাঁকা অংশ দিয়ে সাবধানে ডিঙিয়ে ভেতরে
ঢোকে। এটা একটা বিরাট বাড়ির ভাঙ্গা
পাঁচিল। এখানে কেউ বসবাস করে না।
একেবারে ফাঁকা। দরজা বা জানলাগুলোর
একটাও পাল্লা নেই। পলেস্তারা খসে গেছে
দেওয়ালের। সিমেন্টের মেঝেরও ছালচামড়া
ওঠা। অব্যবহারে আরো জীর্ণ হয়ে পড়েছে।

বাড়িটা একসময় দোতলা ছিল। এখন
দোতলার ছাদ বলে কিছু নেই। সব ভেঙ্গে
এসে মিশেছে একতলার ছাদে। মাঝে মাঝে
দেওয়ালের ভাঙ্গা কিছু অংশ থামের মতো
দাঁড়িয়ে আছে। আর আছে বটঅশত্থের গাছ-
গাছালি বুনো লতাঝোপ। কোনটা নিচের
মাটি থেকে উঠেছে। কোনটা বা বাড়ির
দেওয়াল একতলার ছাদ বা দোতলার থামের
মতো ভাঙ্গা দেওয়ালের অংশগুলো থেকে
বেড়ে উঠেছে। এই অরণ্য প্রাসাদ ঘিরে
জ্যোৎস্না নেমেছে নিজের ইচ্ছায়। তাই
আবছাটা উজ্জ্বল স্পষ্ট। আবার তার পাশেই
নিবিড় ঘন বিস্ময়।

রউফ কোনো কোনো দুপুরে এ রাস্তার
পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখেছে কয়েকটা
ছাগল মনের সুখে বিভিন্ন গাছ থেকে পাতা
ছিঁড়ে খাচ্ছে। সেই দৃশ্য মনে পড়ে যাওয়ায়
প্রথমেই সে বাড়িটার সামনে গাছ-ঝোপ-
গুলো খুঁজে দেখতে থাকে। ঝোপ থেকে
হঠাৎ একটা শব্দ শোনা যায়। শব্দটাকে অনু-
সরণ করে রউফ পায়ে পায়ে বাড়ির ভেতরে
ঢুকে পড়ে।

ভেতরটা বেশ অন্ধকার। সে কিছুই
দেখতে পায় না। শব্দ দু-পায়ের না চার-
পায়ের সে ধরতে পারে না। অথচ শব্দটাকে
অনুসরণ না করে গত্যন্তর নেই। শব্দটা
এ ঘর থেকে সে ঘরে যায়। রউফও শব্দ-
ভেদী বানের মতো পেছন পেছন। শব্দটা
এ ঘরে তো রউফ এ-ঘরে। শব্দটা ও ঘরে
তো রউফ ও ঘরে। এক সময় একেবারে
শেষের ঘরে এসে থেমে যায় শব্দটা। রউফ
দাঁড়িয়ে পড়ে। ভাঙ্গা পাল্লাবিহীন জানলা
থেকে মৃদু চাঁদের আলো এসে পড়েছে
মেঝেতে। আলোর মুখে একটা পদ্মফুল।
পাপড়িগুলো মাঝে মাঝে খসে গেছে। পদ্মটা
অবস্থা অস্পষ্ট হলেও রউফ ঠিক ওই পদ্ম-
টার ওপর এসে দাঁড়ায়। শরিফার মাথার
ফুলেল তেলের বাস। বিবিকে কাছে টেনে
নিয়েই টের পেয়েছিল রউফ। প্রতিপক্ষও
এটা গোপন রাখতে চায়নি।

—জমাদার ত্যালটা দিয়েছে। বাসটা
ভালো লয় ?

আরো ঘন সান্নিধ্যে এসে পড়েছিল
শরিফা।

শরিফার নতুন বেলাউজ। অন্য আরেক
দিন।

আরেকদিনে শরিফার নতুন চপ্পল।
রবির কাজ করা।

বিবির আমার সবই নতুন নতুন।

রবির চপ্পল পায়ে বিবি আমার
ব্যারাকে বাসন মাজতে যায়।

হানিফ সাহেব, নয়ানতারার ম
ভাইটাতে মাঝরা পোকা নেগেছে।

—বাল ওষুধ নে যাবি।

মিসিনিপ্যাল থেকে রাস্তায় আলো
দেবে। বউয়ের ঘরের পাশে খুঁটি পুঁতেছে।

শরিফার ফিরতে আজ রাত হবে।
ব্যাবাকে ফিস্টি আছে।

—এনামত ভাই, ভ্যাসকটমি ব্যাপারডা
কি ?

একটি স্নিগ্ধ ও ছোট্ট মাসিক
পত্রিকা

শিঞ্জন

সম্পাদক ঃ ডাঃ কে, চক্রবর্তী
৮/১, বেচারাম চ্যাটার্জী রোড,
কলিকাতা-৭০০০৩৪

দুঃসাধ্য রোগ

একজিমা, সোরাইসিস্, দূষিত ক্ষত, রক্তদোষ, ধাতবকত, ফুলা, শ্বেত দাগসহ আরও অনেক কঠিন চর্মরোগ হইতে স্থায়ী মুক্তিলাভের জন্য ৮৪ বৎসরের চিকিৎসাকেন্দ্র চিকিৎসিত হউন

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট হাওড়া-১ ফোন : ৬৭-২৩৫৯; শাখা : ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড (হ্যারিসন রোড), কলিকাতা-৯

দক্ষিণ শহরতলীর অভিজাত
সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্র।
কণ্ঠ - যন্ত্র - নৃত্য

সর্বশ্রী চিন্ময় লাহিড়ী, অখিলবন্ধু ঘোষ, সবীর খাঁ, ডালিম চ্যাটার্জী এবং রবীন্দ্র সঙ্গীতের সকল বিভাগ অমল নাগ, হেনা সেন ও কানুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত।

মেট্রোপলিটন কলেজ

২৪১।১, ডায়মণ্ডহারবার রোড, বেহালা কলিকাতা—৩৪। ফোন : ৪৫-০৯৩১

এফা তো কাল সেতে যেতেবেনি। গেল বিবিটা আমার।

মাহুত্তা পোকাগুলোন তো ঝরে গেছে। ল ডালছে।

জলিলের বিবি বললো। বুড়ো জমা দারের ঠেলে ভেগেছে। কথাডা পেতায় হয় না।

খুঁটি দিয়ে তাব গেছে। কবে যে আলো জ্বলবে। রউফেব ঘরে একটা নীল আলো জ্বলবে।

এনামতভাই, ছাগলডাকে খুঁজতে লেগেছি। কুথায় যে পালালো—।

হঠাৎ চাঁদেব আলোয় বেখাটা নীল হয়ে যায়। সেই নীল জ্যোৎস্নায় কে যেন ভেসে আসে ওই বিবান বাড়িব ছালচামড়া ওঠা মেঝেতে। অনেকটা হুরীপবীব মতো। বউফ পদ্মফুল থেকে সরে আসে।

হুরী পরী সেই পদ্মে গিয়ে দাঁড়ায়।

রউফ দেখে। তাব চোখের পলক পড়ে না।

সোনালী পোশাকে ঝকমক করে সেই হুরীপরী। যেন বেহস্থ থেকে নেমে এসেছে। অনেকটা মনীবাজার পালাব সেই বাঁদী জুলেখাব মতো। বাঁদী জুলেখান চোখে মমতা। মুখে সুন্দব একটা হাসি। সেই হাসি থেকে মুক্তো ঝবছে। এতো সুন্দব বাঁদী সে কখনো দেখেনি। ওব তো বেগমসাহেবা হবার কথা। ও বাঁদী হল কেন? শবিফা, তুই বাঁদী হলি কেন?

পদ্মপাতাব ওপব বাঁদী জুমেলা নাচে ওঠে। তাব কণ্ঠ থেকে হীরামন পাখির গান শোনে রউফ।

(রউফ, তোমাব কি হারিয়েছে?)

হুরীপবী যেন তাকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন কবে।

রউফ প্রশ্নেব উত্তব দেয়।

—বাঁদী জুমেলা, আমাব ছাগলডা—।

হুরীপরী এবাব আরো জোবে হেসে ওঠে। গোটা বিরান বাড়ি সেই হাসিতে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

একটা ফাঁকা প্রান্তর। প্রান্তবের শেষ সীমায় একটা সমুদ্র। একটা ময়ূরপংখী নৌকা। পাল তুলে দাঁড়িয়ে আছে। রউফের ইচ্ছা হয় ওই নৌকোতে গিয়ে উঠবে। কিন্তু পাবে না। আবার হীরামন পাখি তাকে প্রশ্ন করে।

(শুধু ছাগলডা, আব কিছু নয়?)

সমুদ্রে একটা বিবাট ঢেউ ওঠে। ইচ্ছা হয় ওই নৌকোতে গিয়ে উঠবে। কিন্তু ময়ূরপংখী দুলে ওঠে রউফেব মনে পড়ে যায় শবিফার কথা। শরিফা এই ময়ূরপংখী নৌকা কিংবা হুরীপরীকে দেখতে পেল না।

(আর কিছু হারিয়েছে?

—শুধু ছাগলডা নয়, আমাব বিবিটাও।
(রউফ, তুমি কোনটা ফেরৎ চাও?)

প্রান্তর হারিয়ে যায়। ময়ূরপংখী নৌকাও।

রউফের চতুর্দিকে এখন মেঘ। মেঘের দেশে অন্ধকারের একটা সতরঞ্জি চেপে সে ভেসে যাচ্ছে। মেঘের গুড় গুড় হচ্ছে মাঝে মাঝে। এ অবস্থায় হুরীপরীর প্রশ্নে স বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

—দুটোই ফেরৎ চাই আমি।

রউফ আভূমি কুর্নিশ করে হুরী-পরীকে।

[একটা ফেরৎ পাবে। যে কোনো একটা।]

—ছাগলটা।

[ভালো করে ভেবে বল?]

—বিবিডা।

[আবাব ভাবো]

—ছাগলটা।

[আবার]

—বিবিডা।

হঠাৎ রউফের কানের পাশ দিবে একটা চামচিকে উড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সে মেঘের রাজ্য থেকে নেমে আসে ওই বিরান বাড়িতে পলেস্তরা খসা দেওয়ালে বসতে চেষ্টা করে চামচিকেটা। পারে না। রউফের বাঁ কাঁধের ওপর এসে বসে পড়ে।

ঠিক তখনই চাঁদের শরীর ঢেকে দেয় একদল কালো মেঘ। ঘর থেকে সব জ্যোৎস্না মুছে যায়। রউফ চিৎকার করে ওঠে।

কোথায় সেই হুরীপরী। কোথায় বা জুমেলা বিবি।

রউফ অন্ধের মতো চারপায়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎই বাইবে যাবার রাস্তাটা পেয়ে যায়।

ইতিমধ্যে রাত কিছুটা এগিয়েছে। পাশের রাস্তাটা নির্জন। রউফ বিবান বাড়ি থেকে বাইবে এসে চার পা থেকে দু পা হয়। হাত দুটো মাথার ওপবে তুলে বুঝতে পারে এ দুটো আসলে তার হাত। হাতটাকে বুকের কাছ নামায়। গালে চিমটি কাটে। নাকের সামনে এনে দেখে নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা। তারপর মাথার চুলগুলো টেনে দেখে নিশ্চিন্ত হয়। এ দুটো নিশ্চয়ই হাত। হঠাৎ তার ইচ্ছা হয় অদৃশ্য এক প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্যে সেই হাত দুটো দিয়ে ঘুঁষি মারতে।

তার পাটা যেন তার নিজস্ব নয়। অনেকদিন যে পথে তাব পা পড়েনি একটা অলৌকিক প্রতিপক্ষ তাকে সেদিকে নিয়ে যায়।

রউফ কদমাগত ঘুঁষি ছুঁড়তে থাকে। বুঝতে পারে না সে কোন্ পথে চলেছে। এক সময় রউফের ভুল ভাঙে। তার সামনে বা পেছনে কেউ নেই। সে হাওয়ায় ঘুঁষি চালিয়েছে।

রউফ সামনে তাকায়।

একটা নালা। নালাটাব পর পাড়ে পুলিশ ব্যাবাক। ওই ব্যারাকেই তার বিবি কাজ করতো। ব্যাবাকটা এখন অন্ধকার। কোনো ঘরেই আলো জ্বলছে না। জলিলের বিবিব সঙ্গে কাজে নতুন যোগ দিয়েছে সতেমনের বিবি। সতেমনকে কোনো অভিযোগ করেনি সে। কেননা সতেমনের বিবি যে কোনো জমাদাবের সঙ্গে ভেগে যাবে এটা নিশ্চিত কিভাবে জানবে রউফ! জলিলের বিবি তো ভাগেনি। মাঝে মাঝে ব্যাবাকে ফিস্টি হলে রাতে বাড়ি ফেরে না। তাতে কি হয়েছে। এটা তো আর মজলিশে আলোচনা হয় না। এটা ঘরেব আবডু। ঘরের ভেতরেই থাকে।

রউফ হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

ওইতো ছাগলডা। ব্যাবাকেব সামনের নিম গাছতলায় নিমফল খাচ্ছে। রউফ ভালো করে চিনতে চেষ্টা করে এই ছাগলটাই তার ছাগলটা কিনা। হ্যাঁ, এটাই তো। শবিফাব আম্মা যে ঝাড়িটা দিয়েছিল এটাও ঠিক একই ঢঙের একই রঙের।

শিবদাঁড়াটা টানা সাদা। সাদাব পর কিছুটা কুচকুচে কালো। তারপর পুরো গাটা সাদাব ওপর কালোব ছিটে। কানের এক পাশটা পুরো সাদা। উল্টো দিকটা কালো। লেজটা সাদা।

রউফ নিশ্চিত হয় এটা তাব ছাগল। নিশ্চিত হয়ে এগোতে যায়। আরো কিছুটা এগিয়ে দেখে শবিফা।

শবিফা ছাগলটার পাশে এসে এসে দাঁড়িয়েছে। হানিফ সাহেবেব বিবির দেওয়া সেই শাদিব বোরকাটা তাব শরীরে।

বাঁশ দিয়ে একটা সাঁকো বানানো আছে এখানে। মাঝে মাঝে খুঁটি। সেই খুঁটির ওপর লম্বালম্বি ফেলা থাকে দুটো বাঁশ। নালাটা চওড়া নয় বলেই কাঠের সাঁকো বানানো হয় নি। বাঁশের ওপর সাবধানে পা ফেলে যাতায়াত করতে হয় সকলকে। আর এদিকে যাতায়াতও কম। শরিফা ওই সাঁকো দিয়েই কাজ করতে যেত। এখন জলিলের আর সতেমনের বিবি কাজ করতে যায়।

রউফ সেই সাঁকোর পথে নালার দিকে নেমে যায়।

সাঁকোর মুখে এসে সে চমকে যায়। সাঁকোর ওপরের লম্বালম্বি বাঁশ রউফ পানির সামনে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে দুটো লম্বা বাঁশ আনতে তার কত সময় লাগবে। ততক্ষণ কি তার ছাগলটা আর বিবিটা নিমতলে তার জন্য অপেক্ষা করবে!

সাঁতরে নালা পার হবার কথা তার একবারও মনে হয় না।

ভাঙাচোরা/নির্মলকুমার দাস

ভাঁটার টানে জল নেমে গেছে অনেক-খানি। ফলে জলের নিচে ডুবে থাকা ইঁট-কাঠ-পাথর, ডাবের খোলা, মাটি খসে-যাওয়া দেবদেবীর বিচুলির কাঠামো ইত্যাদি এখন পাড়ের নরম মাটির ওপর বুক চিতিয়ে পড়ে আছে। ভরা জোয়ারের সময় জল যখন টাবু-টুবু অবস্থায় থাকে, তখন মনে হয় ঘাটের বাঁধানো সিঁড়িগুলো ধাপে ধাপে নেমে একেবারে সোজা চলে গেছে পাতালে। কিন্তু কয়েক ধাপ নেমেই যে ফুরিয়ে গেছে সিঁড়ি, এটা ভাঁটার সময়েই চোখে পড়ে। অতি সহজে তখন গোনা যায়, কটা ধাপ আছে। তাই গুনছিল মড়া পোড়াতে আসা দলের একটি ছেলে। গঙ্গার পাড়েই অনেকটা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা শ্মশান। তার পাশে চটকল। গঙ্গার পাড় ঘেঁষে এমন অনেক চটকল বংকল, জাগজকল, ইত্যাদি কলকারখানা, তাদের উঁচু চিমনি আকাশের বুকে বিঁধিয়ে যুগ যুগ ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

এই শ্মশান এবং চটকলের গায়ে বিস্তর ভাঙাচোরা জুড়ে আবর্জনার স্তূপের মতো পড়ে আছে একটি বস্তি। নানান জাতের মানুষের বাস। বেশীর ভাগই কাজ করে চটকলে। যারা করে না, তাদের কেউ বিক্রির চালায়, কেউ দাঁতের মাজন, গোপন এবং দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়ের দুষ্প্রাপ্য জড়িবুটি, কেউ সস্তা কাপড়চোপড় ইত্যাদি পণ্যসামগ্রী নিয়ে চটকল গেটের সামনে হপ্তার দিনে হাট বসায়। কেউ বা গামছা ফিরি করে নৈহাটি বাজারে। বস্তির পূর্বপ্রান্ত ঘেঁষে একটি ডাকাবুকো সড়ক চলে গেছে উত্তরে কাঁচড়া-পাড়া এবং দক্ষিণে বাবাকপুর হয়ে বি টি রোড ধরে সোজা কলকাতায়।

সড়কের গায়ের কয়েকটি ঘরের মেয়ে-বউরা অলসভঙ্গীতে একজোট হয়ে বসে আছে। দু-একজন বাদে বেশীর ভাগেরই নেই খোপাদুরস্ত-আশালতার শালীনতা। এদের মধ্যে বয়স যার বেশী, তাকেই এই বস্তির নারী-পুরুষ নির্বিশেষে লিডার বলে মানে। মানার যথেষ্ট কারণ আছে। উপবাসীকে সাধ্যমতো আটা চাল দিয়ে সাহায্য করা, চাঁদা তুলে দুস্থ আইবুড়ো মেয়ের বিয়ে দেওয়া, মিউনিসিপ্যালিটির জলবলে লেগে থাকা ঝগড়ার অবসান ঘটানো ইত্যাদি সকল কিছুই এর দ্বারা সম্পাদিত হয়ে থাকে। এইসব কারণে সকলে একে ভয় করে, শ্রদ্ধা করে,—ভালবাসে।

অনেকক্ষণ ধরেই এদের মধ্যে একটি গুলতানি চলছে। সকাল সকালই সকলের ঘরের কাজ সারা হয়ে গেছে। ঘরের মানুষ সব চলে গেছে কাজে। তাই রোজকার মতো সবাই এসে, একত্র হয়ে বসাতাক গল্পগাছায় মেতে উঠেছে এই মহিলার দুয়ারে।

একটি সাতাশ-আঠাশ বছর বয়সী দজ্জাল ঘরবতী বউ একটু অভিমানি গলায় বাঁকা চোখে ঠারেঠোরে চেয়ে বলল, 'মাইরি, সুকুদির না এক কথা। কিছু যেন করেনি। বলো না বাবা, আমরা কি পাঁচকান করে বেড়াব?' শোনামাত্রই সুকুদি, অর্থাৎ এই বয়স্কা মেয়েমানুষটি হাত দুটি সামনের দিকে মেলে, বিচিত্র ভঙ্গীমায় নেড়ে ঝংকার দিয়ে বলল, 'কথায় বলে না, নিজে যেমন জগৎ দেখি তেমন, তা তোর দশাও তাই।' কথা শেষ হতে না হতেই তার হাত নেড়ে কথা বলার ধরন এবং খোঁচা খাওয়া সাপের মতো ফোঁসফোঁসানি দেখে মেয়ে-বউরা চূড়ান্ত মজা পেয়ে উচ্চহাসিতে হাসিতে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ল। রসের কথা পাড়তে এবং শুনতে কেনা চায় জগৎ সংসারে?

এই হাসির মধ্যে থেকেই সেই বউটি আবার বলে উঠল, 'সত্যি সুকুদি, বর ছাড়া তুমি কোনোদিন কোনো ব্যাটার সঙ্গে—'

'—দ্যাখ রাধা, আমাকে চটাসনি। তোর মতো নাকি ন্যা, যে সোয়ামী গেল কাল, ওমনি পরপুরুষের সঙ্গে রংঢং শুরু করে দেব। একটু থেমে, কেউ কিছু বলে কিনা দেখে নিয়ে সে আবার বলল, 'করলে সেই কোন-কালে সোয়ামী সগ্গে গেল, তারপর আবো পেটে আসত।—এসেছে? বুঝলি সেই চরিত্তিরের মেয়েছেলে না আমি।' বলে সগর্বে বুক ফুলিয়ে, দুলদুল করে প্রত্যেকের দিকেই একবার তাকাল। অন্যরা হাসছে। নিচু স্বরে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করছে। আসরটি বেশ জমে উঠেছে দেখে কেউ কেউ চোখ ইশারায় রাধাকে উসকে দিচ্ছে। কিন্তু রাধার মাথায় সঙ্গে সঙ্গেই কিছু এল না। এরই ফাঁকে একটি আঠারো উনিশ বছর বয়সী কচি বউ ঘোমটার আড়াল থেকে রাধার কানে ফিসফিস করে কি যেন বলল। তাই শুনে রাধার দমবন্ধ হবার যোগাড়। সকলে কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে আছে। হাসিরুদ্ধ গলায় রাধা কোনক্রমে বলল 'ঐ দ্যাখো সুকুদি বিনুবৌ কি বলছে—' বলেই গলায় আটকে থাকা দম-বন্ধ করা হাসিটিকে প্রাণখুলে ছাড়তে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে সুকুদি চোখমুখ বিস্ময়দীপ্ত করে তাকাল বিনুবৌয়ের দিকে। প্রায় হুংকার দিয়ে জিজ্ঞাসা করল—'কি বললি যে বিনুবৌ?'

বিনুবৌ-এর চোখ এখন ভয়চকিত হরিণীর মতো। গলা দিয়ে স্পষ্ট স্বর স্বর বেরল না। কোনোক্রমে বলল, 'কই কিছু নাতো।' তারপর রাজাকে একটা চিমটি কেটে বলল, 'এই আমি আবার কি বললাম আঁ?'

'—নিচ্চয় বলেচিস। নইলে রাধা তোর নাম বলল কেন? এখানে তো আরো অনেকে আছে, কই তাদের নামতো বলল না?'

শুনে এবং সুকুদির চেহারা দেখে শংকায় ভরে উঠল বিনুবৌ-এর কচি মুখ। চোখ দিয়ে রাধাকে অসংখ্যবার অনুরোধ করল না বলার জন্য। কিন্তু রাধা সেই ধার দিয়ে গেলে তো

[redacted]বনুবৌ-এর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে [redacted]য় চিবিয়ে বলল, 'বিনুবৌ বলচে [redacted]ধ-বিষুধ খেয়েছিলে, পেটে আসবে কি [redacted]রে ?'

রাধার কথা শেষ হতেই আবার হাসির বন্যা বয়ে গেল। এবং বিনুবৌ বাদে, সেই বন্যায় ভেসে গেল সবাই। সুকুদি চোখ পাকিয়ে বাঁকাখাঁই গলায় বলল, 'অ্যা এতবড় কথা, আমার চরিত্তির নিয়ে এতবড় কথা। তা নিবুবৌ তোর সোয়ামী বুঝি তোরে খাওয়ায় না ? তাই বলি বড়ব ঘুরতে চলল, এখনো কিছু হল না কেন। তা ভালই আচিস। কোনো ঝঞ্ট নেই, ঝামেলা নেই মাঝে মাঝে সোয়ামীর বিকসাস ঘুরচিস ফিলিম দেখচিস—'

সবাই একযোগে তাকিয়ে আছে বিনুবৌয়ের দিকে। সে বেচারী তো লজ্জায় একেবারে কাঠ হয়ে গেছে। হেঁট মাথা কিছুতেই তুলতে পারছে না। ওকে উদ্দেশ্য করেই সকলে অশ্লীলভাবে গা টেপাটেপি করে, নানান ইঙ্গিত আদানপ্রদান করতে লাগল। এরই মধ্যে হঠাৎ পাতলা খ্যানখ্যানে গলায় একটা হাসি শোনা গেল।

সকলে চোখ তুলে সামনের দিকে চেয়ে দেখল, গোবিন্দর বউ দুলালী আলুথালু বেশে দাঁড়িয়ে আছে।

রাধা একটু অবাক হয়ে বলল, ওমা, পাগলি আবার হাসে কেন গো ?

দুলালী একটুও চটে গেল না। অদ্ভুত এক হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলল,—হু বাবা, ওষুধ খাও। কিচ্ছু হবে না। নেই হোগা।

বিস্মিত এবং বিস্ফারিত চোখে এ-ওর দিকে তাকিয়ে অতিদ্রুত অংক মিলিয়ে নিল। তারপর সবাই তাকাল ওর দিকে।

রাধা নরম গলায় বলল,—তা ডাঁইরে রইলি যে, এখানে আয়। বোস।

দুলালী সকলের দিকে একবার করে সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে, পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে ওদের মাঝখানে বসল। রাধা ওর সিঁথিতে সিঁদুর দেখে জিজ্ঞাস্য করল,—আজ কার দুয়েরে গেছিলি ?

—রামপিয়ারীর কাছে—

একেকদিন পাগলির কি খেয়াল হয়, সধবাদের কাছে গিয়ে বলে,—একটু সিঁদুর পইরে দাও না।

এরপর একে একে সকলে প্রথমে ভয়ে এবং কিছুটা সময় কেটে যাওয়ার পর নির্ভয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ওকে নানান প্রশ্ন করতে লাগল। ভালমানুষের মতো একে একে সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেল ও।

হঠাৎ এক সময় সুকুদি হুংকার দিয়ে বলল—ন, এ আর চলতে পারে না। আজাদ ভেবেচে কি ? মেয়েটা পাগল বলে কি বাজারে শরীল ভাগা দিয়েচে ? তারপর সকলের কাছ থেকে দুলালীকে নিজের একেবারে বুকের কাছে টেনে, ব্যথিত গলায় জিজ্ঞাসা করল—আজাদ তোকে ওষুধ খাওয়ায় না ?

দুলালী খুব সুর করে বলল—হুঁ।

—খাওয়াচ্ছি দাঁড়া। তো তুই হাস কেন ?

কোনো উত্তর এল না। ধীরে ধীরে কি সবমনে পড়ে যাওয়ায় জলে ভরে উঠল দুলালীর দুটি চোখ। তাই দেখে সকলেরই মনে একটি গভীর বেদনা জেগে উঠল। সুকুদি পরম আদরে ওর গায়ে-মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল—আর যাবি না, কেমন।

শুনেই খোঁচা খাওয়া সাপের মতো ফোঁস করে উঠল দুলালী। চকিতে সুকুদির বাহু বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে সোজা উঠে দাঁড়াল তারপর কোমরে হাত রেখে, খেঁকুরে কাঁটার মতো তীক্ষ্ণ চোখে সুকুদির দিকে তাকিয়ে বলল,—কেন যাব না শুনি। ওমুকে যদি যেতে পারে, আমি কেন যাব না ?

রাধা বলল,—তুই নিজের কথা ভাববি না ?

হাত মুখ খিঁচিয়ে দুলালী বলল,—না, ভাববো না। ওমুকেই যখন আমার কথা ভাবল না, তখন আমি কেন ভাববো আমার কথা ? আমি আবার যাব আজাদের কাছে, রোজ ধব, ওষুধ খাব, আর—একটা অশ্লীল শব্দ জুড়ে বাক্য শেষ করে ও চলে গেল।

সকলেই পাথর।

অনেকক্ষণ পর রাধা ধীরগলায় বলল,—কি ছিলি, আর কি হলি। গোবিন্দ তোকে কত ভালই না বাসত।—মানুষ কত সহজে বদলায় গো সুকুদি !'

এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা আরো কিছুক্ষণ হয়ত গড়াত, কিন্তু এখানেই থেমে গেল। থামতে বাধ্য হলো। এই বস্তিরই একটি দশ-এগারো বছর বয়সী ছেলে তীব্র বেগে ছুটতে ছুটতে এসে এদের সামনে থমকে দাঁড়াল। একটু দম নিল। তারপর হাঁফ ছাড়তে ছাড়তে বলল—'সুকুদি গঙ্গার পাড়ে না একটা মড়া আছে।'

গঙ্গা দিয়ে রোজই একটা না একটা মড়া ভেসে যায়। একেক দিন এক বিচিত্র দৃশ্য চোখে পড়ে। প্রবল স্রোতের টানে একটা মড়া ভেসে যাচ্ছে। আর দু-একটা কাক তার ওপর বসে খুঁটে খুঁটে মহানন্দে মাংস খাচ্ছে। ভেসে যাচ্ছে মড়াটার সঙ্গে।

রাধা জিজ্ঞাসা করল,—'কখন দেখলি ?'

—এই তো একটু আগে। আমি আর ভোলা কাঁকড়া ধরতে গেছি, তখন। বলে দম নেওয়ার জন্য একটু থেমে, ভয়-মাখানো গলায় ছেলেটি আবার বলল, —জানো সুকুদি, মড়াটার না দুটো হাত, দুটো পা একসঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা। আর গায়ে বড় বড় কাটা দাগ—।'

শুনে সুকুদির অনুসন্ধিৎসু মন হয়ে অস্থির হয়ে ওঠে। চোখ মুখের ভাষা মুহূর্তে বদলে যায়। গভীর উৎকণ্ঠায় সে জিজ্ঞাসা করল, '—বয়েস কেমন রে ?'

'—কি জানি ভোলা বলছিল মড়াটা নাকি সুবলদার মতো দেখতে। তাই তোমার কাছে ছুটে এলাম। ঐ রকম কোঁকড়ানো চুল....'

ছেলেটি পরপর বর্ণনা দিয়ে গেল। কিন্তু তার সবগুলো সুকুদির কানে ঢুকল না। যতটুকু মেলাবার তা মেলানো হয়ে গেছে। মুহূর্তকাল চেয়ে থেকে সে হঠাৎ তারস্বরে বুকফাটা কান্না জুড়ে দিল' —সুবল—সুবলরে, কারা তোকে এমন করে মারল বাবা—'

সকলেই বাকশক্তি হারিয়ে ফেলল যেন।

রাধা জিজ্ঞাসা করল—এই রবি ঠিক বলছিস তো ?'

ভয়ে ভয়ে রবি বলল,—'মা কালীর দিব্যি—'

'—না, না, ও ঠিকই বলচে, মিথ্যে বলবে কেন। একি মিথ্যে যে মিথ্যে বলবে। আমি তো জানতাম, আমি তো জানতাম একদিন না একদিন ওরা ঠিকই মারবে আমার ছেলেকে। মারবার জন্যেই তো ধরে নে গেচে গো-ও-ও—'

প্রবল কান্নায় ভেঙে পড়ল সুকুদি। রাধা, বিনুবৌ এবং অন্যান্যরা তাকে থামানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। কিন্তু থামায় তার সাধ্য।

বুকের দুধ থেকে শিশুর মুখ ছাড়িয়ে একটি মাঝবয়সী বউ বলল, '—আমেন দিদি এযে আপনার ছেলে, না দেখলে ধরবেন কি করে। সান, আগে গিয়ে দ্যাখেন—'

হাত পা ছড়িয়ে দিয়েছে সুকুদি। বলল, 'কি আর দেখব বউ দেখার কি-ই বা আছে। কিছু কি আর জানি না। কেন ধরে নে গেচে আমার ছেলেকে। খাওয়াবি কোত্থেকে,—একটা বচ্ছর তা পোর হলো এখনো রাখবে ভেবেচিস। সুবল, সুবলরে—

তার বিলাপ মেদবহুল শরীরটাকে কেউই আয়ত্তে আনতে পারছে না। তবু চেষ্টা চলছে। রাধা বিনুবৌকে বলল,—'বিনুবৌ একটু এদিকে আয়—বলে ও নিজে শূন্যে ছোড়া সুকুদির হাত দুটো চেপে ধরল। কিন্তু পারল বিনুবৌ। সে যেন এখানে নেই। সম্পূর্ণ অন্যমনস্কতায় ডুবে আছে। তাই দেখে রাধা বিদ্রূপ করে বলল,—'তুই আবার দেবতার মতো ভম্ মেরে গেলি কেন। কি বললাম তোকে। এদিকে এসে পা দুটো চেপে ধর—'

যন্ত্রচালিত পুতুলের মতো বিনুবৌ এগিয়ে এসে সুকুদির পা দুটো [redacted] ধরল। কিন্তু তার মন এখানে নেই।

এদিকে সুকুদির প্রবল চিৎকারের কান্নায় ইতিমধ্যে স্বস্তির আরো অনেক এসে এখানে জড়ো হয়েছে। প্রত্যেকের চোখ [redacted]

...খে কৌতূহলীতে জিজ্ঞাসা, কেন তাদের গিলডার' এমন হা-হুতাশ ভরা কান্নায় ভেঙে পড়েছে। উত্তর ঘুরতে লাগল মুখ থেকে মুখে। তাই শুনেই কেউ কেউ ছুটল গঙ্গার পাড়। কান্না অব্যাহত রেখে সুকুদি বলতে লাগল,—কতদিন তোকে বারণ করেছি সুবল আজনীতি করিস না। চটকল এক রণভূমি, অনেক জল্লাদ কি থেকে কখন কি হয়ে যায়, তা তুই শুনলি না। দেখলি তো বেপাটির গুন্ডারা কেমন তোকে ধরে নে গেল। সেই কোনকালে তোকে যে বাড়ী হইলাম, তারপর ভগমান একটা লিখিত করো না গো সংসারের দিকে একবার চোখ দাও না গো।'

ক্রমে থাকা নারী-পুরুষের কণ্ঠে একটিও কথা নেই। তারা যেন বোবা। যেন পাষাণ মূর্তিতে পাণ্ডবে। একসময় হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে সুকুদি উঠে দাঁড়াল। বলল—আমি যাই। আপনারা সুবলকে দেখুন। মাত্র একটা বছরের দেখিনি, আজ দেখুন—' এই বলে সে পা বাড়াল।

রাধা পিছন থেকে ডাকল, কোথায় জিজ্ঞেস, থানায়? চলো আমিও তোমার সঙ্গে যাই, দেখে আসি কারখানার তুমি কেউ—'

কথা। কোনোকমেই তাকে রোধ করা গেল না।

ঘরটা বস্তিকে ঢাকির মতো ঘিরে ফেলল। লাগলো চঞ্চল হয়ে সবাই ছুটে ছুটছে পরস্পর পাড়ে। সুবলকে দেখতে।

ডেটির কাছ থেকে বেশ কিছুটা দক্ষিণে সরে চিতিয়ে পড়ে রয়েছে মৃতদেহটি। দু-হাত দু-পা একসঙ্গে শক্তি করে বাঁধা। মাথার অংশটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। কাছে গেলেই বোঝা যায় তাতে পাথরের টুকরো দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। অনেকক্ষণ ধরে চলে থাকবে তারা। রক্তক্ষরণের আধিক্যে বড় একটা অংশ জমাট বেঁধে আছে। মুখটা অস্বাভাবিক রকমের ফোলা। থ্যাবড়ানো। কদাকার। একটা দুর্গন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। আশার ওপরে চক্রাকারে ঘুরছে একঝাঁক শকুন। জেয়ারের জল মাড়িয়ে, মৃতদেহটির কাছে আসছে।

লোভী কাক এবং মানুষের ভীড় হটিয়ে লাশকে নিয়ে সুকুদি মৃতদেহটির একেবারে কাছে গেল। হাঁটু গেড়ে বসে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি, এসেছি সুবল, একবার চোখ মেলে তাকা সব আমি এসেছি মা—'

রাধা নাকেমুখে কাপড় চাপা দিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে মৃতদেহটির খুঁটিয়ে দেখছে।

—তোর মা আমি সুশোল তোর মা, ...র যাবার পর খালি তাকিয়ে থাকি। আসিস কাল আসিস,—এত বছর বাদে এতদিন পরে এইভাবে কেন এলিরে। এ...ন না আসতিস, ভাবতাম লোকাও না ...ও বেঁচে আছিস। এসে ভালো না—এই একটু, তাকা না রে। বাপই তোর কাছে যাব, লাইনে কয়লা বাছতে যাই, আর আসব না, গাড়ীর নিচে মাথা পেতে দেব সুবল, কালই তোর কাছে যাব—'

'—সুকুদি।'

রাধার ডাকে সুকুদি ফিরে তাকাল। চোখে জল হাতের আঁজলায় মৃতদেহটির মাথা।

'—সুবলকে একবার না ছাড়ে মেরেছিলে মনে আছে?'

'—হ্যাঁ, না বলে সিনেমা দেখতে গেছিল বলে। বড় কষ্ট দিয়েছি তোকে সুবল একবার শেষ দেখা তাকা। হাসা না রে—'

রাধা জিজ্ঞাসা করল, '—সেই দাগ কোথায়?'

শুনেই সুকুদি বাঁহাতি মৃতদেহটির পায়ের দিকে তাকাল। ডান পায়ে হাঁটুর কাছে অস্বাভাবিক রকম ফুলে। কোনো দাগ নেই। অর্থাৎ এ সুবল নয়। বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত বহুলে রক্তাক্ত মুখমন্ডলে এতক্ষণ পর যেন একটু স্বস্তির আভাস দেখা গেল।

রাধা বলল, '—কি হাউমাউ করে কাঁদছ, আর আমার যেন কি মনে পড়ি পড়ি করেও মনে পড়ছে না। ভালোকে দা দেখালে কথা মনে পড়তই। খালি পায়ের চিহ্ন দেখলাম, বুঝলাম এ সুবল না। আমার শুধু মনে আছে সুকুদি বেটে গিয়ে ডানপায়ে দাগ হয়েছিল—।'

সুকুদি তবু সংশয়মুক্ত হতে পারল না। বলল, '—জলে দাগ মুছে যায় নি তো রে?'

রাধা হেসে বলল, '—একি কলমাটির গন্ধ নাকি গো যে ধুয়ে যাবে! দাখো তো ছেলেটার মুখের বয়েস—গোটার দাগ পাট দেখা যাচ্ছে। ধুলে তো ওগুলোও ধুয়ে যেত। আমি মাইরি যেমন এমনি তই মাথা ফেম করো, তেমনি একটুকেই না দেখেশুনে কাঁদছ। মুখ ধুয়ে এসো—।'

মানুষের সুখের এত মিল!

ভীষণ আশ্চর্য হয়ে সুকুদি গলা থেকে ধুয়ে এল।

এর মধ্যে কোথা থেকে দুজালী ছুটে এসে, মৃতদেহটি এক ঝলক দেখেই নাচতে শুরু করে দিল। আর বলতে লাগল, '—শান্তি, শান্তি—'

সুকুদি এবং রাধা অবাক। কিন্তু দুনালী এক মুহূর্তও এদের দিকে তাকাচ্ছে না। মৃতদেহটি ঘিরে সম্পূর্ণ ভ্রূক্ষেপহীন হয়ে নেচে চলেছে। বিশ্রী নাচ।

এক নাচ থামিয়ে ঐ মৃতদেহটির কাছে। হাঁটু গেড়ে বসে বসল। ভালোভাবে দেখল। তারপর উঠে সুকুদির কাছে এসে বলল, '—ভুল হয়েছে। তোমার—গোবিন্দ নয়। তোমার ধন গোবিন্দ—' বলেই দাত দিয়ে জিভ কাটে।

'—এমা, নাম ধরলাম যে। বোয়াল না। হুঃ, সোয়ামী কিসের সেতো এখন—' কথা অর্ধসমাপ্ত রেখে বক্রচক্ষু নিক্ষেপ করল মৃতদেহটির দিকে। তারপর বলল, '—ঠিক হয়েছে, বেশ হয়েছে—'

আবার নাচ। ঘুরপাক খাওয়া বিকৃত-হীন নাচ।

এক ফোটা যাচ্ছে রাধা এবং সুকুদির। রাধা বিড় বিড় করে, বলল, '—শান্তি আর কোথায় রে। সেতো এখন সেই দেহটি মেয়েটাকে নিয়ে পড়ে আছে। বলিহারি সুকুদি। বয়স্থা বউটাকে ফেলে পালালি, একবার খোঁজ নে—।'

'—মানুষ বুঝলি রাধা বড় বিচিত্রের। কিন্তু কার ঘরের এমন সর্বনাশ হল রে।'

সে আবার গেল মৃতদেহটির কাছে, একটি শোপানো ক্ষতচিহ্নগুলো দেখল। তারপর ঘৃণার সঙ্গে বলল '—বুঝলি রাধা মদের শালা দিনকে দিন জানোয়ার-ও অধম হয়ে যাচ্ছে।

রাধা তাড়া দিল, '—চলো তো বাপু। গন্ধে পেটের নাড়িভুড়ি একেবারে উলটে আসছে।' বলে পাগলিকে এক ধাক্কা তাড়া দিল। কিন্তু সে তখন নাচ সম্পূর্ণ বিভোর। একনাগাড়ে নাচছে আর বলছে শান্তি দুঃখু দেবার শান্তি—'

এতক্ষণ চোখে পড়েনি। দেখে রাধা এবং সুকুদির, দুজনেরই চক্ষুস্থির। কলের ফুলের মতো মানুষ আসছে। বস্তির সকলেই এদের পরিচিত। কিন্তু এরা কারা?

একটি নিবন্ধ কালো লোক ইঁদুরকলের বড় বড় পা ফেলে এসে সামনে তিনজন বসল। '—ছাওয়ালটার বয়স কেমন জন দেখি?'

সুকুদি অনুসন্ধিৎসা ভরা লোকটির সন্ধানী মুখের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে বিনয় রাধার দিকে। রাধা বলল '—কি জানি বাপু। ঘুলে যা ঢোল হয়েছে পোকা খায়। তা চব্বিশ পঁচিশ তো হবে। শান্ত প্রকাশটি পাশে তার স্ত্রীর বলল, '—আমাদের দিলীপের বয়স তো ঐরকম—' কথা অতিদ্রুত এগিয়ে গেল মৃতদেহটির কাছে। রাধা ও সুকুদি দেখল, লোকটি মৃতের ওপর একেবারে ঝুঁকে পড়ে। নিজের ছেলের কিনা দেখছে। তার স্ত্রীও পাশে পাশে এগিয়ে গেছে

পিছা পিছা করে মানুষ আসছে। ছাড়ি পাচ্ছে পাড়ে পড়ে থাকা মৃতদেহটির কাছে। নিজের ঘরের ছেলে কিনা চেহারা এবং বাদন চিহ্নের সঙ্গে মিলিয়ে দেখছে। কিন্তু কারো ঘরের ছেলের সঙ্গে মিলছে না। মিলছে না।

অবচেতনে টান পড়তেই রাধা পিছন ফিরে দেখল, বিনুবৌ।

'—কিরে?'

'—দ্যাখো তো দিদি, ছেলেটার হাতে চিনু লেখা আছে কিনা।'

CALCUTTA

রাধা মুখে কাপড় চাপা দিয়ে, ঝুঁকে দেখে এসে বলল, '—না। চিনুকে ?'

'—আমার দাদা। এক মাস্টারের কথায় পুলিশ মেরে কোথায় যে গেল। বেঁচে আছে, না মরে আছে, কিচ্ছু জানি না গো।'

বেশ কয়েকজনের এক একটি দল এদিক ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গুলতানি করছে। করছে। বার ঘরের ছেলে কিভাবে, কার কেন অপহৃত হয়েছে, নিরুদ্দেশ হয়েছে,—এই নিয়ে গুলতানি।

এমন সময় দূরে দেখা গেল বান আসছে। যেসব ছেলেরা গঙ্গার বুকে সাঁতার কাটছিল, তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে তারা ফিরতে লাগল পাড়ে।

একদৃষ্টে সকলে চেয়ে আছে মৃতদেহটির দিকে। যদিও তারা জেনে গেছে, ওদের কারো ঘরেরই ছেলে নয় এটি, তবু সংশয় কাটে না।

বান আসছে। জল বাড়বে। স্রোতের মুখে পড়ে অসংখ্য মানুষকে ঘর থেকে উজাড় করে আনা এই নিষ্প্রাণ মানুষটি ভেসে চলে যাবে দূরে,—দূরান্তরে।

সুকুদি গালে হাত দিয়ে চেয়েছিল। তারপর চোখ তুলতেই দেখল, ছুটতে ছুটতে বান একেবারে খুব কাছে এসে পড়েছে। হঠাৎ সে দিশাহারা হয়ে, সকলকে চমকে দিয়ে, হা-হুতাশ করা গলায় চিৎকার করে বলল, '—রাধা শীগগীর ওটাকে টেনে ওপরে তোল। বানের জলে ভেসে যেতে দিস্ নি।'

রাধাকে বলেই ক্ষান্ত হল না। অন্যান্যদেরও আর্ত অনুরোধ করল, '—তোমরা ডাঁইবে কেন গো, বাছাকে টেনে ওপরে তোলো না।'

রাধা খানিকটা ভড়কে গিয়ে বলল, '—ওতো সুবল না—'

'—জানিরে জানি। তবু তোল্।'

ভীড়ের মধ্যে একটা গুঞ্জন উঠল। মৃতদেহটি এ মহিলারই ছেলে। ওর বোধহয় মাথার ঠিক নেই। কিন্তু রাধা নিশ্চিত, ঐ ছেলেটি আর যেই হোক, সুবল নয়।

কিন্তু এই মুহূর্তে কোনো কিছু বলা সমীচীন হবে না জেনে ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাড়াতাড়িয়ে এগিয়ে গেল। অন্যান্যদের বলল, '—তোমরা এসো না গো, আমি একলা কি পারি।'

সুকুদিও থেমে নেই। যতশীঘ্র পারে বানের হাত থেকে মৃতদেহটি রক্ষা করার জন্য সে ভীষণ তৎপর হয়ে, সর্বাগ্রে হাত লাগল।

ভীড়ের মধ্যে থেকে কেউ কেউ পরবর্তী ঘটনার জন্য যথেষ্ট কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেল এবং কোনোদিকে বিন্দুমাত্র দৃকপাত না করে, মৃতদেহটির হাত ধরে ওপর দিকে টেনে আনতে লাগল।

তাই দেখে সুকুদি বলল, '—আস্তে, আস্তে, বাছার আমার লাগবে—'

শুনে রাধা চমকে উঠল। কামারশালার হাপরের মতো ওর বুক অতিদ্রুত ওঠানামা করতে লাগল।' দুলালীর মতো সুকুদিও বিগড়ে গেল নাকি ?

একটু ঝংকার দিয়েও বলল, '—আস্তে করলে ওদিকে সবাই ভেসে যাব।'

মৃতদেহটি ওপরের দিকে আনার ঠিক পরমুহূর্তেই পাড় ছাপিয়ে অনেকটা জল তুলে ভীষণ বেদো বান ছুটে গেল। ক্ষ্যাপা বিষধর সাপের ফনা তুলে ছোবল মারার মতো, কলকল শব্দে ঢেউগুলি পাড়ে আছাড় খাচ্ছে।

সকলে একযোগে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে আছে সুকুদির দিকে। তাই দেখে সুকুদির প্রথমে একটু অবাক হল। তারপর অশ্রুরুদ্ধ গলায় বলল, '—হ্যাগো, তোমরা এসেছিলে কেন, তোমাদের ঘরের ছেলেকে পাওয়া যাওয়া যায় কিনা, সেই জন্যেই তো। যদি এ আমাদের কারো ঘরের ছেলে হতো, তাহলে কি এমনি বানের জলে ভেসে যেতে দিতে পারতাম ?'

গলায় আটকে থাকা কান্নায় তার কথা ক্রমশই জড়িয়ে যাচ্ছে।

'—এতো আমাদেরই মতো কোনো হতভাগীর ছেলে গো। সে বেচারি তো জানতেও পারল না যে তার ছেলে এখানে পড়ে আছে। ভেসে গেলে এখন তো ওকে কাকে শকুনে খাবে, ভেসে যেতে দিতে কি মন চায় ? যদি আমাদের কারো হতো—'

সকলেই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিল। মহিলা ঠিকই বলেছে। তাদের না হলেও, তাদেরই মতো কোনো ঘরের ছেলে। এবং এই ছেলেটির মতো তাদের ছেলেও কাথাও পড়ে আছে, হয়ত পড়েছিল। ভাবতেই বুকে একটা চরম ঘোঁচা লাগল।

সুকুদি বলল, '—এক কাজ করি এসো লাগো, একে আমরা এখানে পোড়াই। ঐ তো শ্মশান।' বলে হাত দিয়ে চটকলের গায়ের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা শ্মশানটা দেখাল।

'—মানুষ যখন মানুষের হাতে পড়েছে, তখন কেন আর কাক শকুনের হাতে ছেড়ে দেব—এসো।'

সকলে প্রস্তাবটি একবাক্যে অন্তর থেকে মেনে নিল, এবং পরক্ষণেই মৃতদেহটি দাহ করার মহৎ কার্যে মেতে উঠল।

ভার হয়ে থাকা মাথার মুখেও হাসি দেখা গেল। মুহূর্তে একটি ছুটোছুটি ধুম পড়ে গেল। কেউ কেউ ছুটল আশ-পাশের ঝোপঝাড়ে। কেউবা ভবে তুলে আনল নানান জাতের বন্য ফুল। বস্তির এক দেহাতি তার একটা খাটিয়া দিয়ে দিল। চার পাঁচজনের একটি দল, চাঁদা তুলে নৈহাটি বাজার থেকে একটি নতুন কাপড় এবং এক শিশি আতর কিনে আনল। তারপর সবাই একত্র হবার পর, মৃতদেহটি ধরাধরি করে খাটিয়ায় তোলা হল। কাপড় দিয়ে ঢেকে, শিশি উপুড় করে ঢালা হল আতর। ছড়িয়ে দেওয়া হল নানা বর্ণের নানান বর্ণাঢ্য ফুল।

'—বলহরি হরিবোল—' ধ্বনি দিয়ে খাটিয়া কাঁধে তোলার সময় হঠাৎ সুকুদি খাটিয়ার পায়া ধরে, তরুণবরে ও ছেলে। তুই আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছিস বাবা—' বলে কেঁদে উঠল। সবাই স্তব্ধ।

'—একবার চোখ মেলে তাকা। একবার তাকা, তাকা না—'

তার এমন বুক খালি করা কান্না দেখে এক সময় কেউই আর স্থির থাকতে পারল না। কান্নায় ভেঙে পড়ল খাটিয়ার ওপর।

দুলালীর হাতের তালুতে জল নিয়ে সিঁথির সিঁদুর মুছছে আর কেঁদে কেঁদে বলছে, '—আমি কাকে নিয়ে বাঁচবো—গো, তোমরা বলো না আমি কাকে নিয়ে বাঁচব—' একটা বুকফাটা সমবেত কান্নার রোল ছড়িয়ে পড়ল দিগ্বিদিকে।

কে কাকে শান্ত করে।

নাম পরিচয়হীন এই অজানা যুবকটি মুহূর্তে সকলের আপন হয়ে উঠল। কারো কাছে সন্তান, কারো কাছে স্বামী। কারো কাছে বা ভাই। ভীষণ আপন, একেবারে বুকের কাছের মানুষ।

এক সময়, কান্না ফুরিয়ে যাবার অনেক-ক্ষণ পর, পড়ন্ত সূর্যের নিচে শোকার্ত এই মানুষগুলি একের পর এক কাঁধ বদল করে এগিয়ে গেল শ্মশানের দিকে।

এবার আসরে দেবরাজ

দেশের রাজনীতিতে চিকমাগালুরের এক ঘটনা যার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাবের ইঙ্গিত ইতিমধ্যেই অল্পবিস্তর পাওয়া যাচ্ছে। বিশ মাস প্রায় ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকবার পর বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর নড়েচড়ে বসবার এই নতুন অধ্যায়ের পরিণতি সম্বন্ধে এতো তাড়াতাড়ি কোন রকম আন্দাজ করা যায় না। তবে সবেমাত্র চই খুলে নতুন চাল সাধবার শুরু-কসরৎ শুরু হয়েছে বহু হুকুমতের অধিষ্ঠান এই দিল্লিতে।

চিকমাগালুরের ধাক্কা এমনি যে যার সঙ্গে ডজনখানেক সমর্থক আছে, সে-ও ভাবতে বসেছে আগামী দিনে তার স্ট্র্যাটেজি কি হবে। কিসিডর রাজনীতিতে থাকা বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকজন আপাততঃ সমস্ত টেলিফোনে সান্ধ্য চায়ের আসরে কিংবা নৈশভোজের টেবিলে লম্বা-চওড়া আলাপ-আলোচনায়। সবাই মনে করছেন, তুরুপের তাসটি তাদের হাতে। নেপথ্যে কে বা কারা হাসছে সেটা পরিষ্কার হবে অদূর ভবিষ্যতে।

দেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে একটি উপ-নির্বাচনের এমন রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া অকল্পনীয় ছিল অতীতে। মোরারজী দেশাই যাই বলুন না কেন, লালবাহাদুর বিপুল ভোটাধিক্যে ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচন জনতা পার্টির জনসংঘ, প্রাক্তনীয় লোকদল, সোসালিস্ট, সি এফ ডি-সংগঠন কংগ্রেস ও বিদ্রোহী কংগ্রেস—সব শরিকদের নতুন করে ভালোমত চিন্তার খোরাক জুটিয়েছে। জনতা পার্টির মাইনাস সি পি আই—সি পি আই এম, লক্ষণ সিং কংগ্রেস এবং এমনকি ইন্দিরা কংগ্রেসও চিন্তাভাবনায় ব্যস্ত। ইন্দিরা কংগ্রেসের ভাবনাটা অবশ্য এদের থেকে আলাদা। দল ছ'বিশ মাস পরে যে সফলতা লাভ করল এবং তার ফলে যে রাজনৈতিক গুরুত্ব পেলো, সেটা হজম করে ভবিষ্যতে আরও ব্যাপকভাবে কাজে লাগাবার জন্য ইন্দিরা সমর্থকরা প্রস্তুত হচ্ছে। ইন্দিরা গান্ধী এবং তাঁর সমর্থকদের স্ট্র্যাটেজি হল দেখাশোনা ও ধীরেসুস্থে পা ফেলা। রাজনীতির পথ যে কী সাংঘাতিক পিচ্ছিল সেটা ইন্দিরা গান্ধী খুব ভালো করে জানেন, মোরারজী দেশাইয়েরও এটা জানা কথা। তবে তিনি অতীত অভিজ্ঞতাকে গত বিশ মাসে কাজে লাগাতে পারেননি।

বিধানসভা কিংবা লোকসভার সদস্য হতে না পারলে রাজনৈতিক দলের প্রথম সারির কিছু ব্যক্তি খুশী হন না। গ্রাম থেকে দক্ষিণ সব দলের কিছু নেতাদের ক্ষেত্রে এই দুর্বলতা প্রকট। ইন্দিরা গান্ধী

রাজধানীর ইনসাইড স্টোরি

অবশেষে সদস্য হিসাবে লোকসভায় প্রবেশ করতে পেরে খুব খুশী। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, এই আনন্দকে তিনি এখনও পর্যন্ত অত্যন্ত সংযতভাবে প্রকাশ করছেন। ওঁর দলের লোকজনদের মতে সংসদে ইন্দিরা গান্ধীর উপস্থিতির পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া নাকি ব্যানযাদহীন জনতা পার্টিকে ক্রমে ক্রমে ধ্বংস করবে। অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত জনতা পার্টির সামনে বিজয়গর্বে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছে বড় মোক্ষম সময়ে। এমন উক্তির পিছনে খানিকটা অতিরঞ্জন থাকতে পারে। কিন্তু পরিমাণে যাকে বলে ওভার স্টেটমেণ্ট হয়ত। ইন্দিরা গান্ধীকে দেখেই তাদের ধরের মত হুড়মুড় করে জনতা পার্টি নিশ্চয়ই ভেঙ্গে পড়বে না। তবে এপরদিকে জনতা পার্টির সভাপতি চন্দ্রশেখরের বক্তব্য : ইন্দিরা গান্ধী সংসদে এলেন। কিন্তু তাতে এমন কি ওলোট-পালোট হবে। কয়েকদিন তাঁর দলের কল্পনাথ রাই কিংবা কমলাপতি ত্রিপাঠীর ভাষণ কাগজে বেরোবে। কয়েকটা জ্বালাময়ী বক্তৃতা হবে লোকসভার শীতকালীন অধিবেশনে। জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় দপ্তরের সাজানো বাগানে কুর্নিসিতে হেলান দিয়ে ওঁর এমন মন্তব্য খানিকটা আণ্ডার-স্টেটমেণ্ট নিশ্চয়ই। এক কথায় রাজধানীর রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া কোথাও পলিটিক্যাল অপর্টিমিজম্, কোথাও বা পলিটিক্যাল এসকেপিজম্—এই দুই বিন্দুর মধ্যে আপাততঃ ঘোরাফেরা করছে। চূড়ান্ত হিসেব-নিকেশ সময় লাগবে।

জনতা পার্টির লোকজনরা বলছেন, চিকমাগালুরে ছিল একটা উপ-নির্বাচন। সুতরাং তার ফলাফল নিয়ে এতো লাফা-লাফি-মাতামাতির কি আছে। কিন্তু চিকমাগালুরের নির্বাচনকে জাতীয় এবং এমনকি খানিকটা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বিরাট ব্যাপার করে তুলেছিল কারা? জনতা পার্টির নেতারা। এই নির্বাচনকে এমনি গুরুত্ব দিয়েছিল জনতা পার্টি যেন এটা দলের বাঁচার লড়াই, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা ছুটে গিয়েছিলেন বীরেন্দ্র পাতিলের সমর্থনে। জয়প্রকাশ নারায়ণ বাণী দিয়েছিলেন পাটনা থেকে। উত্তর-পূর্বাঞ্চল সফররত প্রধানমন্ত্রী শেষ মুহূর্তে বাণী পাঠালেন চিকমাগালুরের ভোটদাতাদের। ইন্দিরাকে হারাও বলে। জর্জ ফার্ণাণ্ডেজের পৌরোহিত্যে চিকমাগালুরকে কুরুক্ষেত্রে রূপান্তরিত করেছিলেন কারা? জনতা পার্টির কর্ণধারবা। এতো বেশি লাফালাফি-মাতামাতি জনতা পার্টি করে ফেলেছে যে, তার ফলে ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচনে জয়লাভের স্বাভাবিক গুরুত্বটা রাজনৈতিক পটভূমিকায় আরও দশ গুণ বড় হয়ে সকলের কাছে ফুটে উঠেছে। এর ফায়দা ইন্দিরা গান্ধী নিশ্চয়ই ওঠাবেন। স্ট্র্যাটেজির দিক থেকে জনতা পার্টির পক্ষে এইখানে মারাত্মক ভুল হয়েছে। তার পেসারৎ জনতা পার্টিকে দিতে হবে। ভুল শুধু একটা নয়। একাধিক। ইন্দিরা গান্ধী যে চিকমাগালুর থেকে প্রার্থী হবেন এই মোক্ষম খবরটাও জনতা পার্টি এবং কেন্দ্রীয় সরকার জানতে পারেন অনেক দেরীতে। ইন্দিরা গান্ধী নির্বাচনে দাঁড়াবেন না এমন জোর গুজব উঠেছিল রাজধানীতে। নিশ্চিন্তে সেই গুজবে কান পেতে বসেছিলেন জনতা পার্টির কর্ণধারবা। মাদ্রাজ থেকে কেন্দ্রীয় ইনটেলিজেন্স হঠাৎ প্রধানমন্ত্রীকে খবর পাঠায় ইন্দিরা গান্ধী নির্বাচনে দাঁড়াবেন। আর তখন অল্প সময়ের মধ্যে রা-রা রব পড়ে গেলো। জনতা প্রার্থী খুঁজতে এক সময়ে বেশ হিমসিম খেয়েছিলেন নেতারা।

চিকমাগালুরে নির্বাচন সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণের যদি আদিপর্ব থেকে ভোট-যুদ্ধের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত বুদ্ধি ও কৌশলের খেলায় প্রতিটি পদক্ষেপে ইন্দিরা গান্ধী জিতেছেন। আর এটা সম্ভব হয়েছে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী দেবরাজ আরসের জন্য। ইন্দিরা গান্ধীর দলে প্রকাশ্যে দেবরাজ আরসের ক্ষমতা ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তির দৌলতে। হট্টগোল-কোলাহলে আপাতত খানিকটা চাপা পড়ে গেলেও দেবরাজ আরসের নামটা ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠছে। ইন্দিরার পরেই দলে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এখন দেবরাজ আরস। চিকমাগালুরের কাহিনীর পর ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে কোনক্রমেই ভুলে যাওয়া সম্ভব হবে না যে তিনি জনতা পার্টির মহারথীদের সমর্থনপুষ্ট প্রার্থীকে পরাজিত করেছেন দেবরাজ আরসের দুর্গ থেকে। বীরেন্দ্র পাতিল জিতলে জর্জ ফার্ণাণ্ডেজের রাজনৈতিক জয় হত। এক্ষেত্রে অন্যথা না হলেও ইন্দিরা গান্ধীর সাফল্যে দেবরাজ আরসের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জাতীয় মানচিত্রে নতুন আদলে ভেসে উঠছে। ষাটের কাছাকাছি বয়সে স্বাস্থ্যবান ও তৎপর দেবরাজ আরস রাজ্য রাজনীতির বেড়া টপকে ফেলেছেন। তাঁর সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় অনেকের না থাকলেও তাঁর নাম এখন সকলের কানে পৌঁছচ্ছে। এখন দেবরাজ নিয়মিত হিন্দি শিখছেন। হিন্দিতে বক্তৃতা দিতে পারলে সুবিধা অনেক। এটা তিনি বোঝেন। ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিতে দেবরাজ আরস কি এমন নেতা হতে চলেছেন যার সম্বন্ধে বলা যায় : দি ম্যান টু বি ওয়াচড্।

পর্যবেক্ষক

ফুটবলার কি গ্ল্যাডিয়েটর?

সুভাষ ভৌমিক

পর পর সাতটা খেলা হয়ে গেল, তবু পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পাচ্ছি না। গোল দেব কি, বলই যে পাই না খুঁজে। ভয়ে বুক কাঁপে। খেলার আগে ও পরে বার বার হৃদিস্থিত সেই দেবতার পায়ে প্রণাম জানিয়ে বলি, একবার অন্তত একবার পায়ে-বলে এক করে দাও। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। অষ্টম ম্যাচ এরিয়ান্সের সঙ্গে। অসম্ভব—আমার পক্ষে আর মাঠে নামা ঠিক নয়। সাত আনা গ্যালারীর জাগ্রত দেবতারা এবার সেরেফ গলার জোরেই আমাকে মাটিতে মিশিয়ে দেবে। তাই নিরুপায় হয়ে বাবাকে লিখলাম—একবার আসুন।

ঊনসত্তর সাল। সেবারই প্রথম ময়দানের দুই বড় ক্লাবের অন্যতম ইস্টবেঙ্গলে নাম লিখিয়েছি। সাতষট্টি সালে প্রথম ফার্স্ট ডিভিসনে খেললাম—স্পোর্টিং ইউনিয়নে। পরের বছর বাজস্থানে। সুকল্যাণ আর আমি দুই স্ট্রাইকার। মতি নন্দীর ভাষায় ময়দানের জোড়া কলা। গোলে গোলে ছয়লাফ করে দিচ্ছি। এসব দেখে-শুনেই ডাক এসেছিল বড় ক্লাবে। জ্যোতিষদা অর্থাৎ জ্যোতিষ গুহ তখন ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারি। উনিই আমায় ডেকে নিলেন। বললেন—স্ট্রাইকার পজিশনে নয়, সুভাষ তুই খেল উইংয়ে। ওই তোর যথার্থ জায়গা, ঠিক সাইন করবি।

সাইন করা তো দূরের কথা, যেটুকু পালিশ নিয়ে এসেছিলাম প্রথম সাতটি খেলাতেই তা ধুয়ে-মুছে সাফ। বয়স তখন ১৯। দলে তখন ষাটের দশকের নাম-দামী খেলোয়াড়রা সব দিয়ে দাঁড়িয়ে—আংকেল (থঙ্গরাজ), কজল মুখার্জি, অশোক চ্যাটার্জি, পরিমল দে, কাল্লান, শান্ত মিত্র, সবাই তখন প্রতিষ্ঠিত, ভারতীয় ফুটবলের এক একটি গ্রহ নক্ষত্র।

বাবা ছিলেন বাটিহারে। চিঠি পেয়ে চলে এলেন কলকাতায়। সব শুনে আমায় বললেন, চল জ্যোতিষবাবুর বাড়িতেই যাই।

ধুতির ওপর গেঞ্জি পরে ছ ফুট দু ইঞ্চি মানুষটি বসার ঘরে একটি চেয়ারে বসে সেদিন সকালে কাগজ পড়ছিলেন। শুনে-টুনে বললেন : এই ব্যাপার, ঠিক আছে আজ তোকে খেলতে হবে না। তবে মাঠে আসিস।

পরম নিশ্চিন্ত হলাম। যাক আজ তাহলে খেলতে হবে না। আজ আর কেউ দুয়ো দেবে না। কেউ বলবে না, ওরে ভোম্বলটাকে (দর্শকরাই আমাকে এই নামটি উপহার দিয়েছেন)) বস্। খেলা আরম্ভ হওয়ার খানিক আগে গিয়ে দেখি প্লেয়ারস লিস্টে নাম নেই। যাক বাঁচা গেল। শেষ বললেন, যা জার্সিটা গায়ে চড়িয়ে নে। তখন খেলা শুরু হতে বাকি আর মাত্র কয়েক মিনিট।

তারপর আর সময় পেলাম না। মনের কোণে ভয় দানা বাঁধার আগেই দেখি মাঠে নেমে গেছি। একটি অসাধারণ গোলও করে বসেছি। তারপর আর সামনে-পিছনে ফিরে তাকাই নি, ভয়ও আর পাই নি। জ্যোতিষদা জানতেন একটা আনকোরা ছেলের ভয় কি করে দূর করতে হয়।

সেই বছরই শীল্ড ফাইনালে মোহনবাগানের কাছে ইস্টবেঙ্গল ৩-১ গোলে হেরে গেল। লজ্জায় মাথা হেঁট। জ্যোতিষদা কিন্তু কিছু বললেন না। শুধু বললেন, সামনে রোভার্স, রেডি হও।

সকাল ছটায় প্রাকটিস শুরু হত। শীতের সকাল, ঘুম ভাঙতে চায় না। জ্যোতিষদার ভয়ে বিছানা ছেড়ে ছুটতে হত। কিন্তু কোন দিনই মানুষটাকে হারাতে পরি নি। মাঠে গিয়ে দেখতাম গ্যালারীর এক কোণে ঠিক বসে আছেন। গেম্স টাইম ছিল ১৫ মিনিট। তারপর যত বড় খেলোয়াড়ই হও না কেন, উপযুক্ত কারণ দেখাতে না পারলে জ্যোতিষদা মাঠে নামতে দিতেন না। সেবার কামন শীল্ডের পরই দেশে চলে গেলেন। এক দিনও প্রাকটিসে এলেন না। মাস খানেক বাদে আমরা রওনা দিলাম। এবার বোম্বাইয়ের কুপারেজ মাঠ। তাজ হোটেলের কাছে শেলীজ হোটেলে আমাদের আস্তানা। মন শান্ত, মাথা ঠাণ্ডা। কলকাতার বাগী-অনুরাগী দর্শক-দেবতা দের অন্তত এখানে ফেস করতে হবে না। ঠিক মত খেলতে পারব।

কিন্তু কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত তিন-তিনটে খেলায় খেলে দেখলাম কুপারেজ মাঠের ঘাস সম্পূর্ণ অচেনা। বল ফসকে যাচ্ছে, কোন রকম রিস্ক নিতে ভয় হয়। এক বিচিত্র অবস্থা।

সেমিফাইনালে মফস্বল। প্রথম দিন ড্র হল। অশোক চ্যাটার্জির কলার বোন ভাঙল। তাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। কাল্লান নেই, অশোক চ্যাটার্জি ফেরৎ গেল। টিম তৈরি করাই মুস্কিল। দ্বিতীয় দিন মাঠে নামতে যাচ্ছি দেখি লিস্টে আমার নাম নেই। আমার বদলে নিমাই দালাল চান্স পেয়েছে। নিমাই তখন ইস্টবেঙ্গলের জুনিয়র টিমের প্লেয়ার। দমে গেলাম। চুপচাপ জার্সি-বুট পরে সাইড লাইনের ধারে বসে রইলাম। খেলার শুরুতেই মফস্বল একটা গোল ঢুকে দিল। হাফ টাইমের সময় দেখি জ্যোতিষদা নিমাইকে বলছেন, তুই ভালই খেলছিস, তবু এখন সুভাষকে নামান দরকার। নামলাম।

হঠাৎ দেখি পি দেব পা থেকে একটা বল ছিটকে ওদের পেনাল্টি বক্সের মাথা ছুঁয়ে সাইড লাইনের দিকে তীরের মত ছুটছে। রণপার মত ছুটে গেলাম। চালালাম পা। তারপরই দেখি বল জালে জড়িয়ে রয়েছে। এক্সট্রা টাইমে আমিই দিলাম আর একটা গোল। ওই গোলে ইস্টবেঙ্গল ফাইনালে উঠল। কিন্তু খেলা শেষ হওয়ার আগে মফস্বলের রঞ্জিৎ থাপার সঙ্গে আমার এক পশলা ঝগড়া হয়ে গেল। রেফারী আমাদের দুজনকে মাঠ থেকে বার করে দিলেন।

খেলার শেষে বোম্বাই অনুরাগীরা যখন আমাদের মাথায় করে নাচছেন, ঠিক তখনই কানে এল জ্যোতিষদার কঠোর মন্তব্য : এতটা দায়িত্বজ্ঞানহীন হলি কি করে? যদি ওই থাপার সঙ্গে গণ্ডগোল করার জন্য তোকে ফাইনালে খেলতে না দেয়।

কোথায় দুটি গোল করার জন্য পিঠ-চাপড়ানি পাব না গালে এসে পড়ল কথার থাপ্পড়। মন ভেঙ্গে গেল। অভিমান হলো—তার ওপর খেলার সময় ঘাড়ে প্রচন্ড ধাক্কা খেয়েছিলাম। করুন যন্ত্রনা। ডাকতার দেখলেন। ঘুমের ওষুধ দিলেন। হোটেলের ঘরে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলাম। মাঝ রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাকিয়ে দেখি মাথার কাছে দাঁড়িয়ে সেই মানুষটি, চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন ঘুমো, চেষ্টা কর, ঠিক ঘুম হবে। সব অভিমান দূর হয়ে গেল, বুঝতে পারলাম ওর অনুভূতি।

সত্তর থেকে বাহাত্তর—তিন বছর মোহনবাগানে খেললাম। আর তখনই পেলাম আমার ফুটবলের ধর্মপিতা জ্যোতিষদাকে মোহনবাগানের মাননীয় মধ্যে। সত্তর, একাত্তর পর পর দু বছর মরডেকা খেললাম। দ্বিতীয়বার মরডেকা থেকে ফিরে এলাম হাঁটুতে চোট নিয়ে। বাকি সিজনটা মাঠে নামা গেল। মনে আছে মান্নাদা রোজ আমকে নিয়ে বিভিন্ন হাড়ের ডাক্তারের কাছে যেতেন। বাঁ হাঁটুর কারটিলেজ ছিঁড়ে গিয়েছে। খুড়িয়ে খুড়িয়ে চলি। ওই পা নিয়েই বাহাত্তরে মাঠে নামলাম। আমার খেলোয়াড় জীবনের চূড়ান্ত খারাপ বছর। কিছুতেই খেলতে পারছি না। মান্নাদা কিন্তু একটুও দমেন নি। বলতেন, কারটিলেজ ছিঁড়ে যাওয়ার পর আমি নিজে যদি ১৮।১৯ বছর ফার্স্ট ক্লাস ফুটবল খেলতে পারি, তবে তুই কেন পারবি না?

ওই পা নিয়ে রোভার্স, ডুরান্ড খেলে এলাম। খেলার আগে হাঁটুর খাঁজে একটা [illegible]

সবাই অমেয় ভুলে গেলেন। কিন্তু ভোলেন নি মান্নাদা। স্নেহে মমতায় সর্বদাই উৎসাহ দিয়ে যেতেন।

কলকাতায় ফিরে এলাম। এসে শুনলাম মোহনবাগান আমাকে আর চায় না। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। যে বললে বিশ্বাস করব সেই মানুষটাকে আর কিছুতেই পাই না। ক্লাবে না, বাড়িতে না, অফিসে না। এরই মধ্যে ইস্টবেঙ্গল থেকে শান্তদা (শান্ত মিত্র) ও ফুটবল সেক্রেটারী অজয় শ্রীমানী এসে বললেন : ডাক্তার দাস (ডঃ নৃপেন দাস, ইস্টবেঙ্গলের জেনারেল সেক্রেটারী) একবার দেখা করতে বলেছেন। প্লীজ চল।

হাটটুডস্ আমাকে সত্যিই কি ওরা চায়? গেলাম ডাক্তার দাসের কাছে। বললেন : আমি সুভাষ ভৌমিককে চাই।

বললাম : আমি অকেজো।

: আমরা কেজো করে নেব।

পরের দিনই আই এফ এ অফিসে গিয়ে সই করলাম। তারপর ফোন তুলে চাইলাম ডি এস আই আফসের একটা নম্বর। ও প্রান্ত থেকে সেই পরিচিত গলা ভেসে এল : জানি তুই ইস্টবেঙ্গলে সই করবিছস। লজ্জায় এ কদিন তোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি নি। আমি জানি তুই ঠিকই খেলবি।

মান্নাদার কথার মান যে রাখতে পেরেছি তা পরের কয়েক বছরের খেলার পাতায় পাতায় খেলা রয়েছে। এই ঘটনাগুলি একটি মাত্র কারণেই আজ লিখছি। ময়দান আর ময়দান নেই, ময়দানবদেও হতে চলে গিয়েছে। গোল দিতেই হবে। পয়েন্ট পেতেই হবে। নইলে গর্দান যাবে। মাঠ এখন আর সবুজ নয়, আগুনের মত লাল। এত লাল যে সুবজিতের মত প্লেয়ার এবার লীগে ঠিক মত খেলতেই পারল না। অথচ ওর মত ট্যালেনটেড প্লেয়ার এদেশে আজ আর কটি আছে? অন্য দিকে দেবতার ভালবাসার বর্ম গায়ে এঁটে এবার অসাধ্য সাধন করেছে। আসলে ও প্লেয়ারদেরই টিকিয়ে রাখতে হলে, তাদের বড় করতে হলে সবার আগে চাই জ্যোতিষদা ও মান্নাদার মত চওড়া বুকের খাঁচাওয়ালা মানুষ। ওঁরাই পক্ষীমাতার মত আমাদের আগলে থাকেন। দিন দিন এই মানুষের সংখ্যা কলকাতার মাঠে কমে যাচ্ছে। ভয় হয়—এ রকম এমনও দিন আসতে পারে যে দিন মাঠ আর গ্যালারীর মাঝখানে গড়টাই কাটতে হবে। মিলিটারি পাহারায় সুড়ঙ্গ পথে ক্লাব থেকে মাঠে আর মাঠ থেকে ক্লাবের টেন্টে ফিরে যাবে প্লেয়াররা। হয়ত এই খেলার জন্য অদূর ভবিষ্যতে প্লেয়ারদের এক-একজন লাখ টাকা দর্শনী পাবেন, কিন্তু আমার একটাই প্রশ্ন কলকাতার ফুটবলাররা কি গ্লাডিয়েটর ফাইটারে রূপান্তরিত হতে চলেছে?

খেলা

ডি সি এম ট্রফি

দিল্লীর অম্বেদকার স্টেডিয়ামে ১৯৭৮ সালের ডি সি এম ট্রফির ফাইনালে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভালগা কালিনিন ২-০ গোলে পশ্চিম জার্মানীর মিউনিখ বেয়ারিসকে হারিয়ে সুদৃশ্য ডি সি এম ট্রফি জয়ী হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য গত বছরের ফাইনালেও সোভিয়েত ইউনিয়নের অপর এক ফুটবল দল—স্পার্টাক এই ট্রফি জিতেছিল।

এবারের ফাইনাল খেলাটা দাঁড়িয়েছিল রাশিয়া-জার্মানীর লড়াই। অতিরিক্ত দৈহিক শক্তি প্রয়োগের ফলে খেলায় প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল। এর মধ্যেও দুই দলের কয়েকজন খেলোয়াড় ঠান্ডা মাথায় উচ্চ মানের ফুটবল খেলে দর্শকদের মন ভরিয়েছিলেন। প্রথমার্ধের খেলার ২৫ মিনিটে বিজয়ী দলের গোবিয়াচভ দর্শনীয় জয়সূচক গোলটি দেন।

সেমিফাইনালে ভলগা কালিনিন ৬-০ গোলে ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সকে এবং মিউনিখের বেয়ারিসার ২-১ গোলে বোম্বাই-এর মফৎলাল সেপর্টস ক্লাবকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল।

অলিম্পিক দাবা

বুয়েনস এরারেসে অনুষ্ঠিত ২৩তম অলিম্পিক দাবা প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে হাঙ্গেরী এবং মেয়েদের বিভাগে রাশিয়া দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। এই নিয়ে হাঙ্গেরী তিনবার পুরুষ বিভাগের দলগত চ্যাম্পিয়ান হল। তারা শেষ খেতাব জয়ী হয়েছিল ১৯২৮ সালে। অলিম্পিক দাবার আসর বসে প্রতি দ্বিতীয় বছরে। অলিম্পিক দাবার আসরে রাশিয়া ১৯৫২ সালে প্রথম যোগদান করে। একটানা বার বার (১৯৫২-১৯৭৪)। পুরুষ বিভাগে দলগত চ্যাম্পিয়ান ইজরাইলে আয়োজিত অলিম্পিক দাবার আসর রাশিয়া বর্জন করে। ফলে আমেরিকা সহজেই ১৯৭৬ সালে পুরুষদের দলগত খেতাব জয়ী হয়। ১৯৭৮ সালে হাঙ্গেরীর পুরুষ বিভাগের দলগত খেতাব জয়ের ফলে অলিম্পিক দাবার আসরে রাশিয়ার দীর্ঘ-কালের একচ্ছত্র প্রাধান্যের অবসান হল। অবশ্য মেয়েদের আসরে রাশিয়ার প্রাধান্য আজও অক্ষুণ্ণ আছে। ১৯৭৮ সালের অলিম্পিক আসরে অপরাজিত অবস্থায় মেয়েদের দলগত খেতাব জয়ের সূত্রে রাশিয়া উপর্যুপরি ৫ বার খেতাব জয়ী হল।

সি এ বি-র ট্রফি জয়

এলাহাবাদে সর্বভারতীয় লালবাহাদুর শাস্ত্রী ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে কলকাতার ক্রিকেট এসোসিয়েশন অব বেঙ্গল (সি এ বি) ৫৪ রানে এলাহাবাদের জিপ ফ্ল্যাশ্যানাইট দলকে হারিয়ে শাস্ত্রী ট্রফি জয়ী হয়েছে।

সি এ বি প্রথম ইনিংসে ২২৮ রান করেছিল। অপর দিকে জিপ ফ্ল্যাশলাইট প্রথম ইনিংসে ১২২ রান করলে সি এ বি ১০৬ রানে এগিয়ে যায়। সি এ বি দ্বিতীয় ইনিংসের ৪৫ ওভারে ১৮৯ রান করেছিল। মাত্র ৭ রানের জন্যে পি চেল সেঞ্চুরী করতে পারেন নি। পলাশ নন্দী করেছিলেন ৪৮ রান। এরা দুজনে ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে দলের অতি মূল্যবান ৯২ রান সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন।

খেলায় জয়লাভের জন্যে জিপ ফ্ল্যাশ-লাইট দলের ২য় ইনিংসে ২৯৬ রানের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তারা জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান তুলতে পারে নি। তাদের ২য় ইনিংসের ২৪১ রানের মাথায় (৯ উইকেটে) খেলা শেষ হয়। ফলে সি এ বি

সংক্ষিপ্ত স্কোর

সি এ বি একাদশ : ২২৮ রান (৭ উইকেটে। প্রদীপ পাণ্ডে ৭৯ এবং কল্যাণ চৌধুরী ৭৮ রান)।

ও ১৮৯ রান (পি চেল ৯৩ ও পলাশ নন্দী ৪৮ রান। প্রদীপ দুবে ৪১ রানে ৪ এবং হাসিন আমেদ ৬০ রানে ৪ উইকেট)।

জিপ ফ্ল্যাশলাইট : ১১২ রান (সুব্রত পোড়েল ২৩ রানে এবং ফয়সাতুল্লা ৩০ রানে ৩ উইকেট)।

ও ২৪১ রান (৯ উইকেটে। বিশ্বে তেলাং ৫৫, হাসিন আমেদ ৫৩ এবং আমির মং নট-আউট ৫৫ রান। সুব্রত পোড়েল ৪৯ রানে ২ এবং অলক ভট্টাচার্য ৭৮ রানে ৪ উইকেট)।

সি কে নাইডু ট্রফি

হায়দরাবাদে সি কে নাইডু ট্রফির সেমিফাইনালে পশ্চিমাঞ্চল প্রথম ইনিংসের রানে গতবারের চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণাঞ্চলকে পরাজিত করেছে। অপর সেমিফাইনালে উত্তরাঞ্চল ৯ উইকেটে গতবারের রানার্স-আপ পূর্বাঞ্চলকে হারিয়ে ফাইনালে পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে ফেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে।

পশ্চিমাঞ্চল বনাম দক্ষিণাঞ্চলের সেমি-ফাইনাল খেলায় দক্ষিণাঞ্চল ১ম ইনিংসের রানে পিছিয়ে ছিল। দক্ষিণাঞ্চল ২য় ইনিংসের ২৬০ রানের মাথায় (৭ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে খেলার বাকী ১৮০ মিনিটে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৬০ রান তুলতে বে চ্যালেঞ্জ জানায় তা পশ্চিমাঞ্চল গ্রহণ করে নি। পশ্চিমাঞ্চলের ২য় ইনিংসের ১২৩ রানের মাথায় (৫ উইকেটে) খেলাটি শেষ হলে পশ্চিমাঞ্চল ১ম ইনিংসে ১১০ রান লেখা করার সুবাদে জয়ী হয়।

দর্শক

ডি জির আশা পূর্ণ হয়নি

[illegible] ডি জি ফিল্মস, এখানে [illegible] ডি জি [illegible] ডি জি [illegible] ডি জি

এই ছবি এক বক্ষিতা ও এক বক্ষিতকে নিয়ে, অর্থাৎ ছবিটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার ছবি।

শুরুতে দেখা যায় ভোটে হেরে যাওয়া রাজনৈতিক নেতা কোকিল রায় (অনিল চ্যাটার্জি) জনগণ কর্তৃক প্রথমে নিগৃহীত ও পরে অজ্ঞান হন এবং জ্ঞান ফেরার পর তিনি নিজেকে আবিষ্কার করেন একটি সুসজ্জিত ফ্ল্যাটে। তাঁকে পরিচর্যা করছেন একজন সুসজ্জিতা মহিলা (মাধবী চক্রবর্তী)। কোকিল রায় অবাক এবং প্রশ্নের সম্মুখীন —তিনি কেন এবং কিভাবে এই ফ্ল্যাটে এবং কে এই মহিলা? উত্তরে মহিলা জানান— দেবতোষ চক্রবর্তীই তাঁকে এখানে অজ্ঞান অবস্থায় রেখে গেছেন। ফ্ল্যাটটি দেবতোষের এবং ইনি তাঁর রক্ষিতা। দেবতোষ বিবাহিত এবং বড় ব্যবসায়ী। কোকিল তাঁকে চেনে।

কোকিল অবাক এবং আরো অবাক এই শুনে যে, এই মহিলা কোনদিন তাঁকে কোন মিছিলে, মিটিং-এ পোস্টারে দেখেনি।

সময়ে সম্পর্ক সহজ হলে একসময় কোকিল ঠাট্টাচ্ছলে মহিলাটিকে বলে—সে তাকে কারো "রক্ষিত" করে দিতে পারে কিনা। বেচারা কোকিল রায়।

মাঝে মাঝে দেবতোষের টেলিফোন আসে। মাঝে মাঝে আমরা ফ্ল্যাশব্যাকে কোকিলকে দেখি। সে সৎ কিংবা সৎ হবার ভান করে। তাঁর ভোঁতা চেতনা ও নিভন্ত বিবেকবোধকে মাঝে মাঝে উসকে দিয়ে যায় অসিত—এক তরুণ সমাজসেবী।

দেবতোষের ফোন আসে সেই ফ্ল্যাটে, যে ফ্ল্যাটে আছে খাঁচায় ভরা এক পাখি, অ্যাকোরিয়ামে রঙীন মাছ, সুন্দরী রক্ষিতা এবং একজন রাজনৈতিক নেতা। কোকিলের ভোট পুনরায় গোনা হচ্ছে।

কোকিল ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কিছু ভাবে—কিংবা ভাবার ভান করে। দেবতোষের ফোন আসে। কোকিল জিতে গেছে। সে আনন্দে আত্মহারা। ধনবানেরা তাঁকে সম্বর্ধনা জানায়। গাড়ি করে নিয়ে যায় নিজেদের মহলে। তাদের মালা তার গলায় ওঠে। তাঁকে নিয়ে যখন হৈ-হুল্লা, ঠিক তখনই এক ভিখারী শিশু দেওয়াল থেকে কোকিলের ছবিমলা পোস্টার নির্ভয়ে ছেঁড়ে দৌড়ে যায় মায়ের কাছে। আগুনের জন্যে মা ইটপাতা উনুনে পোস্টারটি ভরে দেয়। ঢাল ফুটবে। ছবিটি শেষ হয় এই ভাবে।

ছবিটির একটি ডাইরেক্ট অ্যাপ্রোচ আছে। কিন্তু এই ধরনের ছবি প্রচণ্ডগতি-সম্পন্ন হওয়া একান্তই বাঞ্ছনীয়। যা হয়নি।

অভিনয় প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয় অনিল চ্যাটার্জির কথা। নেতা সেটা ব্যবসায়ীসুলভ এক চরিত্রে মাধবী অনবদ্য। নিজের পেশা নিয়ে একটি ঘৃণা মনোভাব, মানুষ এবং এই পৃথিবীর ওপর এক চাপা অভিমান— সব চরিত্রায়নে পরিস্ফুট। কোকিল যখন চলে যায়, তখন খাঁচায় আটক পাখিটির দিকে নির্বাক চেয়ে থাকা, বজ্রপাহত চোখে

অবতার ছবিতে মাধবী

সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া—এক-কথায় সুপার্ব। অসিতের ভূমিকায় অমিত মণ্ডলের অভিনয় সাবলীল। করণীয় কিছুই নেই। তবু অভিনয়ের গুণে মনে হবনি অভিনয় করছেন। যে কথাটা কোকিলের স্ত্রীর ভূমিকাভিনেত্রী ইন্দ্রিসতা রায়ের বেলা খাটে না। একজন নবীন পরিচালক এমন নিম্নমানের অভিনয় মেনে নিলেন কেন—এই নিয়ে একটি দীর্ঘশ্বাস প্রশ্ন ওঠে। তাঁর ডাবিংও খারাপ। মনে হল তিনি অন্যের গলায় লিপ দিয়েছেন। বিমল দেবকে অবাঙালী ব্যবসায়ী চরিত্রে মানায়নি এবং অভিনয়ের যে টাইপটি তিনি বেছে নিয়েছেন, তা পুরনো। বুদ্ধদেব মিত্রের 'দেবতোষ'—মোটামুটি।

ছবিটি রাজনৈতিক। কিন্তু রাজনীতির নামে স্টান্ট নেই। বাণিজ্যিক বৎসর নেই। প্রথমেই বলেছি সাহসী ছবি যে একজন রাজনৈতিক নেতাকে এমন উলঙ্গ করে দেখানোর জন্যেই বোধহয় ছবিটি জরুরী অবস্থার একমাত্র নিষিদ্ধ বাংলা ছবি। কিন্তু কোনোক্রমেই নিখুঁত ছবি নয়। তবু 'অবতার' টালিগঞ্জের মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ফুঁড়ে নেমে আসা এক চোখ-ঝলসানো বোদ্রুরলক।

নির্মলকুমার দাস

প্রসঙ্গ নিউ প্রভাস অপেরা

দীনবন্ধু গুহাইত বাংলার ১৩৭৩ সালে এই অপেরা দলের প্রতিষ্ঠা করেন। এই অপেরা দল প্রথম বছরেই 'বাঁচতে দাও,' 'জীবন তৃষ্ণা,' 'ঠাকুর নামোত্তম,' 'ফুটপাত' প্রভৃতি পালা অভিনয় করে; মাত্র এক বছরেই যথেষ্ট সুনাম লাভ করে। সেই সময় ফুটপাত পালাটার একটা সামাজিক মূল্য ছিল। ফুটপাতের মানুষ-

CROWN-TV

A/C, D/C or Solid State

স্পষ্ট ছবি

আর মিষ্টি আওয়াজ

"ক্রাউনটিভি"

তাই "টিভি-সরতাজ"!

এছাড়া আমাদের রয়েছে রঙমাখা বেডিও, রেকর্ড প্লেয়ার, রেকর্ড, ট্রানজিস্টার বেডিও, টেপ্ রেকর্ডার, স্টিরিওগ্রাম ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেবামতের সুবন্দোবস্ত তো আছেই।

রেডিও এণ্ড ফটো স্টোরস্

৬৫নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিঃ—১৩

ফোন : ২৬-৮৫৫৩

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নয়—এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাটক

অরুণ থিয়েটার ৪২৫৪৭৯

সহত

নাটক/পরিচালনা-সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

বৃহস্পতি ও শনি ৬।।টায়; ছুটির দিন ও রবিবার ৩ ও ৬।।টায়

প্রেঃ—বিকাশ রায়, সত্য বন্দ্যোঃ, প্রদীপ মুখোঃ, ছন্দা দেবী, সান্ত্বনা, গিরীশ, রবীন, মিহির, সুনীল, নিখিল, কেষ্ট, অরুণ, দীপঙ্কর, উশীনর, শৈলেন, বধূ, গণেশ, স্বপন, অলোক, তিমির এবং রত্না ঘোষাল ও তরুণকুমার

প্রয়োগ [illegible] / মন্টু বন্দ্যোপাধ্যায়

এ ন[illegible]৬০০ রজনী অতিক্রান্ত

নিয়েই এই পালাটা লেখা বলে, কালীন দর্শকমণ্ডলীর কাছে যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিলো। সেই সময় এই অপেরা দলের হয়ে অভিনয় করতেন বিজন মুখার্জি, মধু ব্যানার্জি, বেলা সরকার, বেলা ঘোষ, ম্যাস্টা বোস প্রমুখ গুণীজন। গত ৭ অক্টোবর যশস্বী ম্যাস্টা বোস হৃদরোগে আঘাত পেয়ে পরলোকগমন করেন। ২০ বছর বয়স থেকে তিনি অভিনয় জগতে এসেছিলেন। মৃত্যুর আগে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৭২ বছর। ২০০র বেশী পালায় তিনি অভিনয় করেছেন।

এছাড়াও এরা তারপরে 'গুপ্ত রহস্য,' 'পাগল ঠাকুর,' অভিনয় করেছেন। সেই পাগল ঠাকুর দেখে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তারপরে এরা 'জলন্ত বারুদ,' রক্তে রোষা ধান'। রক্তে রোষা ধান পালা শেষ হবার পরে, বইটা বাজারে ব্যান্ড হয়ে গিয়েছিলো। বিপ্লবী ভিয়েতনাম, আমি মুজিব বলছি, মেজরবউ, ধনিমেয়ে, অমানুষ, চীনের প্রথম বিপ্লবকে নিয়ে ব্যাঙ্গাত্মক পালা চাবুক, যজ্ঞের ধারাপাত, কালের ছোবল, আবদল্লা মর্জিনা ইত্যাদি। বিখ্যাত পালাগুলো এই অপেরা দল এতোদিনে করেছেন।

এই অপেরা দলের হয়ে এতোদিন অভিনয় করেছেন পান্না চক্রবর্তী, চিত্রা মল্লিক, পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, অভয় হালদার, বীমা ঘোষ, শ্যামলী ভট্টাচার্য অরুণা গোস্বামী, গোপাল চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর দে প্রমুখ অভিনেতা অভিনেত্রী।

এই অপেরা দল বর্তমানে শৈলেশ গুহনিয়োগীর রচিত ও পরিচালিত বাদশা বেগম যথেষ্ট সুনামের সঙ্গে অভিনয় করছেন। এই পালায় গানে আছেন সমরেন্দ্র ঘোষ আর সুর দিয়েছেন রঘুনাথ দাস। বাদশার সুলতানের মাঝবয়সে দুটো-পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করলো একই দিনে একই সময়ে। একটা বেগমের পুত্র, অপরটা বাঁদী পুত্র। বেগমের পুত্র মৃত হওয়ায় বেগমের অচৈতন্য অবস্থায় বাঁদী পুত্রকে নিয়ে আসা হোল বেগমের কাছে। তাঁর পুত্র মৃত বেগম একবারও জানতেও পারলেন না। বেগম সাহেবার আদরযত্নে লালন পালন হতে লাগলো বাঁদীপুত্র গীয়াসবীন। এই সময় কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্থ সুলতান রাজ্যশাসনে অক্ষম হলেন। প্রতিশোধ নেবার জন্যে বেগম সাহেবা উজীবের চক্রান্তে সুলতানকে বন্দী করলেন। সিংহাসনের ওপর উজীর সাহেবের লোভ হোল। উজীরসাহেব শাহাজাদা গীয়াসবীনকে আদর্শ সুলতান তৈরি করার দায়িত্ব নিলেন ঠিকই কিন্তু, তার পরিবর্তে তাকে নামিয়ে দিলেন নরকের পথে। দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে চলালো ষড়যন্ত্র আর চক্রান্ত। শাহাজাদা গীয়াসবীন হয়ে উঠলো মদাপ আর লম্পট। গীয়াসবীন সাহেব মাতাল হলেও তালে কিন্তু ঠিক ছিল। সুযোগ বুঝে যেদিন সিংহাসন লোভী উজীরকে বন্দী করলো গীয়াসবীন, সেদিন সব ফাঁস করে দিলো উজীরসাহেব। বেগমসাহেবকে জানিয়ে দিল যে গীয়াসবীন বাঁদীপুত্র, বাদশার সিংহাসনে সমান দাবীর অধিকার তার নেই। এই কাহিনী নিয়েই এই পালার সৃষ্টি।

'বাদশা বেগম' পালায় অভিনয় করছেন সমীর লাহিড়ী শ্যামসুন্দর দেবকুমার, কল্পনাকুমার, প্রশান্তকুমার, রাজকুমার পাত্রালিকা কন্যা নাসগাস্ত মাস্টার্স কুলদার গীতিকা মিস অরুণা গোস্বামী, **নমিতা বিশ্বাস প্রমুখরা।**

নির্মলেন্দু ঘোষাল

৮ ডিসেম্বর যাত্রা সম্মেলন

উত্তর কলকাতার চাঁদপুর পার্ডার রবীন্দ্রভবনে পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলনের শুরু হচ্ছে ৮ ডিসেম্বর। সম্মেলনের সমাপ্তি দিন পড়ছে জানুয়ারী। পঁচিশ দিনব্যাপী এই বিরাট সম্মেলনে কলকাতার তেত্রিশটি নামী যাত্রাদল স্বরসুরের হিটপালা দর্শকদের সামনে তুলে ধরবেন। এই কদিনে এখানে মোট ৩৩টি পালা অভিনীত হবে। এছাড়া রবিবার সকালে এবং শনিবার সারা রাত্রিব্যাপী একটি বিশেষ অভিনয় করবার একটি খসড়া পরিকল্পনাও রচিত হয়েছে বলে সম্মেলন-কর্মপরিষদ জানিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলনের অন্যতম যুগ্মসম্পাদক শৈলেন মহান্ত জানিয়েছেন, এই যাত্রা সম্মেলন রাজ্য সরকারের বন্যা-ত্রাণ কমিটির উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলনের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হবে। এরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন খরচ বাদে টিকিট বিক্রির উদ্বৃত্ত সকল অর্থ বন্যার্তদের ত্রাণ তহবিলে জমা দেওয়া হবে। অবশ্য এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত বন্যার্তরা, অগ্রাধিকার পাবেন সাহায্য পাবার ব্যাপারে।

একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গত ২২ অক্টোবর ঘরোয়া বৈঠক সাহিত্য সংস্থা' তাঁদের সাহিত্য পত্রিকা 'খেয়ালী'র প্রচার, প্রসার ও উজ্জীবনের উদ্দেশ্যে রসনা মঞ্চে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। নৃত্যানুষ্ঠান ও নাটকের মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠানটি সমবেত দর্শকদের যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছে। সকলেই অনুভব করেছেন, সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রাখার আংশিক প্রচেষ্টার সঙ্গে সুস্থ প্রমোদের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরী।

লোকনৃত্যানুষ্ঠান প্রযাস অভিনন্দন-যোগ্য। গ্রাম বাংলার সরল কৃষক পরিবারের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনাই এই নৃত্যানুষ্ঠানে বিধৃত। ভাষ্য রচনায় মীরা দেবী, সঙ্গীত পরিচালনায় মঞ্জুশ্রী গুপ্ত, নৃত্য নির্দেশনায় মণিদীপা রায় এবং আলোকসম্পাতে 'রসনা' থিয়েটার নিজ-নিজ গুণপনার পরিচয় রাখতে সক্ষম হয়েছে। তারিফ করতে হয় শিশু শিল্পী-দেরও—তাদের কাজে দর্শকরা মুগ্ধ। পরিবেশ পরিস্ফুটনের ক্ষেত্রে পূর্বাচল মজুমদারের বাঁশির কথা আলাদা করে উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে।

নৃত্যানুষ্ঠানের পর প্রেমচন্দের বিখ্যাত গল্প 'কাফন' অবলম্বনে 'দান-সাগর' নাটকটি মঞ্চস্থ হলো। থিয়েটার কমিউনের এই নাটক নিয়ে বহু আলোচনা ইতিপূর্বে হয়েছে—এখানে বিশদ আলোচনায় অবকাশও নেই। নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, অসীম চক্রবর্তী প্রমুখ শিল্পীদের অনবদ্য অভিনয় সমন্বিত 'দানসাগর' বাংলা নাট্যমোদীদের কাছে একটি স্মরণযোগ্য অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রবিশেষ বলে এই প্রতিবেদক মনে করেন। এবং 'ঘরোয়া বৈঠক সাহিত্য সংস্থাকে' ধন্যবাদ —এই নাটকটি অভিনয়ের ব্যবস্থা করার জন্যে।

শুভশঙ্কর ভট্টাচার্য

সত্তর দশকের ভাস্বর্যের দুর্দান্ত কাগজ

অমৃতলোক

সম্পাদক : সমীরণ মজুমদার। বিপ্লব বক্ষা শারদ সংখ্যা নিঃশেষিত। পরবর্তী আকর্ষণ বিশেষ বন্যা সংখ্যা। বেরুচ্ছে ডিসেম্বরেই। এই সংখ্যার বিক্রয়লব্ধ অর্থ বন্যাত্রাণ তহবিলে দান করা হবে। দাম ১ টাকা ২৫ পয়সা। প্রকাশনায় : অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ। মেদিনীপুর

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পাকো প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান এস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

মূল্য ৭৫ পয়সা। ত্রিপুরায় অতিরিক্ত মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

বিভিন্ন কুকরী গুঁড়া মশলার ভেতরে

সাবধান!

"কুকমী" গুঁড়া মশলার অনন্যসাধারণ ঐতিহ্যমণ্ডিত মানে কলকাতার কয়েকটি গুঁড়া মশলা কোম্পানী তাদের নিজস্ব নিকৃষ্টমানের ব্রান্ডের সঙ্গে অবিকল কুকমীর নাম, ডিজাইন এবং কুকমী Cookme নামের পরিবর্তে সকল ক্ষেত্রে আপনার কুকমী গুঁড়া মশলা বলে বাজারে চালাবার চেষ্টা করছে।

কেনার সময় দেখে নেবেন- 'কুকম্মী'র প্যাকেটে কেবল Cookme 'কুকম্মী' ছাপই আছে, অন্য কোন ব্রাণ্ডের নাম যুক্ত নেই

প্রস্তুতকারক :

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ

২৩৭বি মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯০০০৭০ ● ফোন : ৩৩০৩৯৯, ৩৩৫৪৯৭
পোষ্ট বক্স নং ৮ বহরমপুর ৭৪২১৩ ● ফ্যাক্টরী : জলঙ্গীপুর

মুদ্রণকারক : এ. বি. প্রেস এন্ড প্রসেস প্রাইভেট লিমিটেড

বেগম আখতার
অমৃত
সম্পাদক প্রীতিকুমার ঘোষ
৮ ডিসেম্বর ১৯৭৪
দাম ৭৫ পয়সা

আপনি কি দৈনন্দিন কাজ-কর্ম শুরু করার জন্যে বিশেষ উদ্‌গ্রীব?

গ্ল্যাক্সোজ-ডি®

নিমেষে শক্তি যুগিয়ে আপনার সব ক্লান্তি দূর করবে!

গ্ল্যাক্সোজ-ডি খেয়ে আপনি ঘরের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম করার জন্য পুরোপুরি তৈরী হয়ে যান। গ্ল্যাক্সোজ-ডি আপনার ক্লান্ত শরীরে সেই ভরপুর শক্তি যোগায় যা ফের চাঙ্গা হবার জন্যে আপনার অবশ্যই দরকার। ডাক্তারদের সুপারিশ করা গ্ল্যাক্সোজ-ডি'তে রয়েছে উচ্চমানের গ্লুকোজ যা' ভিটামিন ডি, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের গুণে সমৃদ্ধ।
গ্ল্যাক্সোজ-ডি আপনার সব ক্লান্তি দূর করে যার দরুন আপনি ঘরের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম খুব স্ফূর্তির সঙ্গে করতে পারেন।

গ্ল্যাক্সোজ-ডি®
আপনার পরিবারের
নিমেষে শক্তি যোগানদার

dCA/GL/54 BEN

নাট্যকার রতনকুমার ঘোষের পূর্ণাঙ্গ নাটক

জম্বুদ্বীপের ইতিকথা (নারীবর্জিত) ৫৲

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে (১ নারী) ৫৲

সময়ের রূপকথা (১ সেট ॥ ৩ নারী) ৫৲

সীতাহরণ (১ সেট ॥ ২ নারী) ৫৲

বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সুধাংশুবালা স্মৃতি পুরস্কারপ্রাপ্ত

সকালের জন্য (১ সেট ॥ ২ নারী) ৫৲

ভোরের মিছিল (১ সেট ॥ ১ নারী) ৫৲

দোহাই হাসবেন না (১ সেট ॥ ১ নারী) ৫৲

সম্রাট (১ নারী) ৫ **ফেরা** (২ নারী) ৫৲

এই দশকের মঞ্চে (১ নারী) ৫৲

আনন্দদূতের মন-মাতানো নাটক

অন্ধকারের নীচে সূর্য (২ নারী) ৫৲

শালকুমার গুপ্তের কাব্য নাটক

সমাস্তরাল (১ সেট ॥ ২ নারী) ৫৲

মধ্যবিত্ত বাঙালির সাড়া-জাগানো নাটক

লাখ টাকার (১ সেট ॥ ৪ নারী) ৫৲

(কেবলমাত্র মেয়েরাও একইভাবে অভিনয় করতে পারেন)

বিশ্বরূপ মৈত্রের সাম্প্রতিকতম নাটক

রাতের কান্না (২ নারী) ৫৲

জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক

চিতাভস্ম (৩ নারী) ৩.৫০

ইস্তাহার (১ নারী) ৪৲

পার্থপ্রতিম চৌধুরীর নাটক

মলাটের রং মুহূর্ত (২ নারী) ৩৲

পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক

আদিম (২ নারী) ৩ **এরিণা** (৪ নারী) ৩৲

হুমায়ুন দাসের নাটক

স্বপ্নের সম্ভবা (২ নারী) ৩৲

অভিজিৎ সেনগুপ্তের

করুণার ঘর-সংসার (২ নারী) ৩.৫০

সর্বজন প্রশংসাধন্য নাট্যকার মনোজ মিত্রের

পরবাস (১ নারী) ৫৲ **নেকড়ে** (২ নারী) ৪৲

শিবের অসাধ্য (২ নারী ॥ ১ সেট) ৫৲

নরক গুলজার (১ নারী) ৫৲

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মঞ্চ-সফল নাটক

জলপদবধূ (৫ নারী ॥ ১ সেট) ৫৲

মন্মথ রায়ের সার্থক নাটক

শরৎ-বিপ্লব (৪ নারী ॥ ১ সেট) ৫৲

দিলীপ মজুমদারের

গোলাপ কাঁটার মৃত্যু (১ নারী ॥ ১ সেট) ৩৲

বৈদ্যনাথ চক্রবর্তীর নাটক

আমি ক্রীতদাস (৩ নারী ॥ ১ সেট) ৪৲

রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের নাটক

কেষ্টধনের কেরামাত (২ নারী) ৫৲

আমার জননী (২ নারী) ৫৲

এই মন সেই মন (২ নারী) ৩.৫০

অশোক মিত্রের নাটক

পটভূমি দৃশ্যমান (১ নারী) ৫৲

নিকটে ফাঁদ (১ সেট ॥ ২ নারী) ৫৲

নেপো-নটবর কথা (১ নারী) ৫৲

শ্রীপতিপদ রাজগুরুর নাটক

কুমারী মন (৩ নারী) ৩৲

রাধারমণ ঘোষের নাটক

রণ-দুন্দুভি (১ নারী) ৫৲

মনোরঞ্জন দাসের বিখ্যাত ওড়িয়া নাটক

অরণ্য ফসল (২ নারী) ৫৲

ভাষান্তর : অরবিন্দ পালিত

নাটক, গল্প, উপন্যাস ও অন্যান্য গ্রন্থের তালিকার জন্য লিখুন :

রবীন্দ্র লাইব্রেরী ১৫।১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলকাতা-৭৩ ॥ ফোন : ৩৫-৬৬৫৯

পুড়ে যাওয়া ক্ষতের চিকিৎসা অন্য রকম ক্ষত থেকে আলাদা।

পুড়ে যাওয়া ক্ষতের জ্বালা-যন্ত্রণা অন্য ধরনের ক্ষত থেকে একেবারে আলাদা—অনুনী—বেদনা—ফোসকা পড়া প্রভৃতি। এই পুড়ে যাওয়া ক্ষতের জন্য আপনার এমন অ্যান্টিসেপ্টিক চাই যা সব রকম জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে চটপট আরাম এনে দেয়। আর তা এমনই অ্যান্টিসেপ্টিক যা আপনাদের সবারই সুপরিচিত—তা'হল বার্নল। চটপট ঠাণ্ডা আরাম এনে দিতে বার্নল অদ্বিতীয়। বার্নল অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীমেতে এর সবকটি গুণই রয়েছে যা পুড়ে যাওয়া ক্ষত জলদি উপশম করে। সবসময়ে ঘরেতে বার্নল মজুত রাখুন, এটি পুড়ে যাওয়া ক্ষত উপশমের আসল চিকিৎসা।

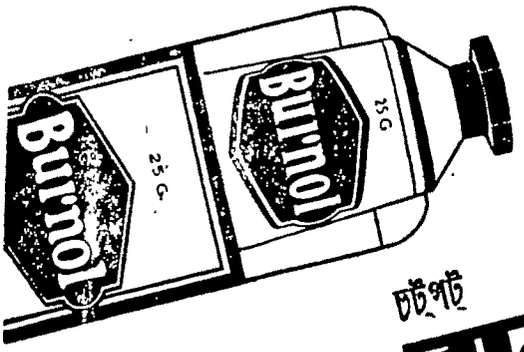

চটপট

বার্নল লাগান

পুড়ে যাওয়া ক্ষত উপশমের আসল চিকিৎসা

Boots

অমৃত

১৮ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা
২২ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫
8 December 1978

সম্পাদকীয় ৩
সাহিত্য ইত্যাদি ৪ মণীন্দ্র রায়
হাত তালিতে ভুলবেন না ৫
সমীর চট্টোপাধ্যায়
বিশেষ রচনা ৭
বঙ্গোপসাগরে সেই নতুন দ্বীপে
কল্যাণ চক্রবর্তী
প্রচ্ছদ কাহিনী ১০
বেগম আখতার
সন্ধ্যা সেন
বৃষ্টি (গল্প) ১৭ অমর মিত্র
ব্যবধান (গল্প) ২০ নির্মলেন্দু ঘোষাল
আরো জীবনানন্দ ২৩
বল্যাণকুমার বসু
চিঠিপত্র ২৭
তরণী পাহাড়ে বসন্ত (উপন্যাস) ২৮
শৈবাল মিত্র
সোনার হরিণ নেই (উপন্যাস) ৩৩
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
প্রাপ্তিযোগ (গল্প) ৩৯
বিজনকুমার ঘোষ
আজকের মেদিনীপুর ৪২
ভবদেব ভট্টাচার্য
সমালোচনা ৪৭
হাওয়া গাড়ি (উপন্যাস) ৫২
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
ভাগ্য গণনা ৫৭ শ্রীমাণিক্য
অসীম মৌলিককে মনে পড়ে ? ৫৮
সুভাষ ভৌমিক
আমর জ্ঞান পাপী ৫৯ পিনাকী চট্টোপাধ্যায়
খেলা ৬০ দর্শক
চিত্রধ্বনি ৬১

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ কাহিনী
দেবীপ্রসাদ
লিখেছেন গৌরীশংকর ভট্টাচার্য
গল্প লিখেছেন বণজিৎ দাশ
এবং কার্তিক ভদ্র

কৃষি ও 'কৃষ্টি'

ভারত এক সুপ্রাচীন দেশ। সভ্যতার বিবর্তনে যে কটি দেশ একদা শীর্ষস্থান দখল করেছিল, ভারত তার অন্যতম। পৃথিবীর সমস্ত দেশই সে জন্যে শ্রদ্ধা করে ভারতকে। আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিষয়ে শ্রদ্ধা তাদের অপরিসীম। আমরাও বলাবাহুল্য খুবই সচেতন সে বিষয়ে।

কিন্তু মুশকিল এই যে, সংস্কৃতি একটি বিমিশ্র বস্তু। ভাষা, ধর্মচেতনা এবং সর্বোপরি জীবনযাত্রার পদ্ধতি—এইগুলোর যোগ-বিয়োগের ফলশ্রুতিই হল একটি দেশের সংস্কৃতি। আর ঐ উপাদানগুলোর প্রত্যেকটিই যেহেতু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যেতে থাকে, সংস্কৃতিও সে জন্যে পরিবর্তনশীল।

মেরু অঞ্চলের কথা বাদ দিলে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই সভ্যতা বিকাশের প্রথম স্তরে ছিল কৃষিনির্ভর জীবনযাত্রা। সে জন্যে ঐ যুগের সংস্কৃতিও ছিল কৃষি সভ্যতার ফলশ্রুতি। বিজ্ঞান ও যন্ত্র যুগের অভ্যুদয়ের পর থেকে ইয়োরোপ ও আমেরিকার উত্তরাঞ্চলে গত কয়েক শতাব্দী ধরে শুরু হয়েছে শিল্পনির্ভর জীবনযাত্রা। তাদের সংস্কৃতিও সে জন্যে হয়ে দাঁড়িয়েছে যন্ত্র সভ্যতার ফলশ্রুতি।

এই সংস্কৃতির মূল্যবোধের সঙ্গে আগেকার যুগের কৃষিযুগের মূল্যবোধের যে সংঘর্ষ, তার যন্ত্রণাময় অভিব্যক্তি দেখে আমরা শিহরিত হই। একাকীত্ববোধ, ক্লান্তি এবং অবক্ষয়ের চেতনা আমাদের আতংকিত করে। আমরা যারা এখনও পুরোপুরি যন্ত্রযুগে উত্তীর্ণ হই নি, তারা তাই চেষ্টা করি কী করে এই নৈরাশ্য ও ভবিষ্যৎহীনতা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি। জীবনযাত্রার অপরিহার্য নিয়মে আমাদের দেশও তো এগিয়ে চলেছে যন্ত্রনির্ভর ভবিষ্যতের দিকেই।

সম্ভবত এই পরিস্থিতিতে একমাত্র উপায় হল শিল্পযুগের কুফলগুলোকে যথাসাধ্য পরিহার করা। এবং আমাদের দেশের নিজস্ব পটভূমির উপযোগী শিক্ষাদীক্ষার প্রসার ঘটিয়ে মানবিক মূল্যবোধগুলোর অবক্ষয় রোধ করা।

এ বিষয়ে আমাদের সব থেকে বড় সহায় হল দেশের বাস্তব অবস্থা। যন্ত্রায়ণ দ্রুত হারে ঘটলেও ভারতের ক্ষেত্রে তা একমাত্র নিয়ামক হতে পারবে না। দেশের ৭০ ভাগ মানুষ এখন প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কৃষির সঙ্গে সংযুক্ত। যন্ত্রায়ণ সম্পূর্ণ হলে সে হার হয়ত কমবে, কিন্তু ভারতের মত দেশে কিছুতেই তা কৃষির জায়গা দখল করতে পারবে না। কৃষিই সে জন্যে বহুকাল থাকবে নিয়ামক শক্তি।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীদেশাই যে সম্প্রতি এক সমাবেশে বলেছেন, ভারতে 'কৃষি' কর্মই হল একমাত্র 'কৃষ্টি'—তা সম্ভবত এই জন্যেই।

সাহিত্য ইত্যাদি...

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃত শিক্ষা

আমাদের চেনাশোনা বেশ কয়েকজন সাহিত্যিক সংস্কৃত জানতেন। বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত চর্চার যে ধারাটি সচল করেছিলেন, অনেক দিন পর্যন্ত তা জ্যান্ত ছিল।

পরশুরাম, ওরফে রাজশেখরবাবু শুধু হাসির গল্পই লেখেন নি। রামায়ণ মহাভারত ও গীতার অনুবাদ এবং চলন্তিকা নামে চমৎকার একটি বাংলা ডিকশানারীও সংকলন করেছিলেন। সংস্কৃত না জানলে এর কোনোটিই সম্ভব হত না।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত 'কাব্য জিজ্ঞাসা' লিখেছিলেন। বইটি রস তত্ত্বের বিষয়ে। কাজেই এর পাতায় পাতায় সংস্কৃত আলংকারিকদের মতামতের উদ্ধৃতি।

কল্লোল আমলের লেখকরা কন্টিনেন্টাল লেখকদের লেখা নিয়ে আকণ্ঠ মগ্ন ছিলেন। তাঁদের 'আধুনিকতা' হল সেই বিদেশী সাহিত্য চর্চার ফলশ্রুতি। কিন্তু অচিন্ত্যকুমারের ভাষা দেখলে মনে হয়, সংস্কৃত ভাষায় তাঁর বেশ কিছুটা দখল ছিল। না হলে অতো বাক্‌বিভূতি আসত না।

বুদ্ধদেব বসু ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। ইংরেজি লেখাও ছিল তাঁর স্বচ্ছন্দ। তাছাড়া বোদলেয়ার হেরাল্ডারলেন প্রমুখের কবিতা অনুবাদ করেছিলেন বলে ফরাসী সাহিত্যেও তাঁর দখল ছিল মনে হয়। যদিও ফরাসী ভাষা তাঁর জানা ছিল না বলেই জানি। জীবনের শেষ পর্বে তিনি মেঘদূতের অনুবাদ করেন। সে কাজে তাঁকে সাহায্য করতেন একজন পন্ডিত মশাই। কিন্তু নিজেও তিনি বেশ কিছুটা সংস্কৃত জানতেন। তাছাড়া নিষ্ঠাবান অনুবাদকের মতো সংস্কৃত শব্দগুলোর ব্যুৎপত্তি এবং বিভিন্ন ধরনের অর্থ ও ব্যঞ্জনাকে বোঝার জন্যে মনিয়ার উইলিয়ামস-এর ডিকশানারীও ঘাঁটতেন। ফলে ভাষাটিতে তাঁর দখল জন্মে গিয়েছিল ভালো মতোই।

কবি সুধীন্দ্র দত্ত সংস্কৃত জানতেন এবং হয়তো বাংলার চাইতেও গভীরভাবে জানতেন। আসলে বাল্য ও কৈশোর কেটেছে তাঁর বারাণসীতে, অ্যানি বেসান্টের ইস্কুলের ছাত্র হয়ে। ফলে বাংলার চাইতেও আগে তিনি শেখেন সংস্কৃত। আর শিক্ষাটা এত ভালোভাবে হয়েছিল যে পরবর্তীকালে কবিতা লেখার সময় অক্লেশে তিনি নতুন শব্দ তৈরি করতে পারতেন। তার অনেক-গুলোই টিকে গেছে ভাষার মধ্যে। এ এক পরম গৌরব সুধীনবাবুর।

আরো কোনো কোনো সাহিত্যিক সংস্কৃত জানতেন সে সময়। এবং এখনো হয়তো কেউ কেউ জানেন। কিন্তু তালিকা তৈরি করে লাভ নেই। মোট কথা হল, সাহিত্যিকদের মধ্যে সংস্কৃত চর্চার অভ্যাস বহুদিন ধরে সচল ছিল।

তার একটা কারণ বোধহয় ইশকুল পর্যন্ত সংস্কৃত শিখতে বাধ্য হওয়া। অন্য কারণ, পুরনো আমলের লেখকদের লেখা পড়তে গিয়ে নিরুপায় হয়ে কিছুটা তৎসম শব্দের অর্থ ভেদের অভ্যাস করা।

তাছাড়া আরো একটা কারণ রয়েছে। আমাদের অনেকের মনেই বদ্ধমূল ধারণা, বাংলাভাষাটা এসেছে সংস্কৃত থেকে। ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের নানা রচনা থেকেই বোধহয় এ ধারণার উৎপত্তি। যদিও বিদ্যাসাগরী গদ্যেরও অবদান রয়েছে তাতে কিছুটা।

কিন্তু আমাদের ঐ সংস্কৃত কেন্দ্রিক ধারণাটা ঠিক নয়। অন্তত শতকরা একশ ভাগ তো নয়ই। এককালে হয়তো বাংলা-ভাষা সংস্কৃত আদলেই গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তখনো দেখা যায়, সাধু গদ্যের পাশাপাশি চলিত গদ্যের অস্তিত্ব। আর তা কেবল ক্রিয়াপদের বেলাতেই নয়। অসংস্কৃত দেশজ শব্দের ব্যবহার থেকেও টের পাওয়া যায়, গদ্যের ঐ অন্য রীতির ঝোঁক ছিল খাঁটি বাংলায় লেখার দিকে। যেমন ছিল মনে করুন 'আলালে'র ভাষায় বা হুতোমের ভাষায়। কিম্বা বঙ্কিমের 'কমলাকান্তের দপ্তর' সংকলিত অনেকগুলো লেখাতে। তাছাড়া উনিশ শতক পার হয়ে বিশ শতকের প্রথম দিকেই বাংলা গদ্যে ইংরেজি ইডিয়াম ও সিনট্যাক্সের ছাপও যথেষ্টভাবেই পড়তে শুরু করেছে। সব মিলিয়ে এখন যা দাঁড়িয়েছে তাতে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় বাংলা একটি স্বতন্ত্র ভাষা। এবং তা বিকাশ ঘটছে নিজের পথে। সংস্কৃত শব্দ বলা বাহুল্য যথেষ্টভাবেই চালু থাকছে এ ভাষায়। কিন্তু বাংলা হয়ে। যেমন ইংরেজি ভাষাতে রয়েছে অনেক ল্যাটিন ও ফরাসী শব্দ। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার ইংরেজি হতে বা ইংরেজি বলে পরিচিত হতে কোনো অসুবিধে হয় নি।

অবিশ্যি দেশের পুরাণ মহাকাব্য এবং দার্শনিক চিন্তার ঐতিহ্য জানার জন্যে সংস্কৃত জানা বা অন্য উপায়ে সংস্কৃত জ্ঞান ভান্ডারের কাছাকাছি আসা আবশ্যিক তা স্বীকার করি। নাহলে ভারতের মতো বহুজাতিক দেশে ঐক্যবোধে চিড় ধরতে পারে।

কয়েক বছর আগের কথা। সত্তরের এক উদীয়মান কবির সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল এ ব্যাপারে। একদিন সে এসে বলল, আমাদের সংস্কৃত শিখতে হয় ইশকুলে, এ একটা মিনিংলেস ব্যাপার।

কেন? সংস্কৃত শিখবে না কেন? বিশেষ করে তুমি যখন লিখতে শুরু করেছ। সংস্কৃত না জানলে ভোকাবুলারিতে দখল আসবে কী করে? কী করেই বা তৈরি করবে নতুন নতুন শব্দ? —আহত বিস্ময়ের সঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন করে বসলাম আমি।

সে একটু হাসল। বলল, কিছু মনে করবেন না, আপনি যা বলছেন তা খুব ভেবে চিন্তে বলছেন বলে মনে হয় না।

কেন?

প্রথম ধরুন, বাংলাভাষা, যা শহুরে গ্রামে সাধারণ মানুষ বলে সেদিকে কান পাতলে অনায়াসেই মিলে যেতে পারে বক্তব্য অনুযায়ী শব্দটি। আর দ্বিতীয়ত, সংস্কৃত শব্দ ইতিমধ্যেই যা মিশ খেয়ে গেছে বাংলাভাষায় তার সংখ্যাও তো কম নয়। সেগুলোও তো আমার পুঁজির মধ্যেই থাকছে। তাছাড়া, কিছু মনে করবেন না, ইশকুলে যা শেখানো হয়, তাকে কি সংস্কৃত শিক্ষা বলা যায়? পুরোটাই কি মেক-রিলিফ নয়?

কিন্তু শুধুই যদি বাংলা নিয়ে পড়ে থাকো, মন কি তাহলে কূপ মন্ডুক হয়ে যাবে না?

সে এবার বেশ সশব্দে হেসে উঠল। —কেন? বাংলা নিয়ে পড়ে থাকব কেন? ইংরেজি তো শিখেছিই। আরো যদি সময় পাই, ফরাসী শিখব, স্প্যানিশ জার্মান বা রুশ ভাষা শিখব। আর সত্যি বলতে কি, তাতেই তো আমাদের বেশি উপকার। আজকের সাহিত্য তো আজকের কথাই বলবে? আজকের দুনিয়ার কী হালচাল সেটাই তো আজকের লেখকের কাছে বেশি জরুরি, তাই না?

একটু চুপ করে থেকে মাথা নেড়ে বললাম, কথাগুলো খানিকটা হয়তো সত্যি, সবটা নয়। সংস্কৃত না শিখলে এখন হয়তো চলবে, পরে অসুবিধে দেখা দেবে।

দেবে? কেন দেবে? আচ্ছা ধরুন, ওপার বাংলা, মানে বাংলাদেশে তো অনেক বাঙালি থাকেন। আমাদের চেয়ে সংখ্যায় তাঁরা অনেক বেশি। যদ্দুর জানি, তাঁরা এখন আর কমপালসারিভাবে সংস্কৃত শিখছেন না। সেখানেও কিন্তু লেখক আছেন। আরো লেখক জন্মাবেন ভবিষ্যতে। এখনকার লেখকদের চেয়ে তাঁরা আরো অনেক স্বাধীনভাবে বাংলা লিখবেন। সংস্কৃত শব্দের জন্যে মমতা অনেকটাই হয়তো ফিকে হয়ে আসবে। তাঁরা কি আর সাহিত্য করতে পারবেন না? আট-দশ কোটি শিক্ষিত মানুষ বাস করবে স্বাধীন একটা দেশে, কিন্তু কোনো দিনই কেউ ভালো কিছু লিখতে পারবেন না, ভাবা যায় সে কথা? না, না আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, বাংলাভাষাকে সংস্কৃতের মোহ থেকে বেরিয়ে আসতেই হবে। তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। বাংলা যে কী বিচ ভাষা, সেইটেই এখন নতুন করে আবিষ্কার করতে হবে। না হলে আমাদের এই হামবড়াই করা ভাষা চিরদিন থেকে যাবে অর্কিডের মতো। দেশের লোকের মনের মাটিতে তার শিকড় পৌঁছবে না।

সে বলল এইসব কথা মানে, সত্তরের সেই তরুণ কবি। ঠিক এইভাবে না হলেও মোটামুটি এইসব কথা। আপনারা কী বলেন?

রবীন্দ্র রায়

হাততালিতে ভুলবেন না

সমীর চট্টোপাধ্যায়

সেদিন একজন তরুণ ঔপন্যাসিক সখেদে জানাচ্ছিলেন, আরও যদি লেখার সুযোগ পেতেন তাহলে লেখাটি ক্লাসিকের মর্যাদা পেতো। তিনি তাঁর সদ্য-প্রকাশিত উপন্যাস সম্পর্কে মন্তব্য করছিলেন। উপন্যাসিকের বয়স ৩৮।৩৯। ইতিপূর্বে ১২।১৪টি গল্প লিখেছেন। মাঝে মাঝে নামটি ছাপা হওয়ায় সাহিত্যের গোঁষাড়-গোবিন্দ পাঠকের কাছে পরিচিত। মেলামেশা করেন অনেকের মতো একটি ষড়োসড়ো সাহিত্য সাপ্তাহিকের সম্পাদকের সাথে। আড্ডা মারেন, মিষ্টি খান, ময়দানে বসেন, মিনি বাসের ভাড়া দেন। সেই সম্পাদক তাঁর শিষ্যকুলের এক-একজনকে প্রতি বছর শারদীয়ায় একটি করে উপন্যাস লেখার সুযোগ করে দেন। টাকা পাইয়ে-দেন, দল ভারী করেন। এবার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছিল এঁর। অপেক্ষা করেছিলেন এতকাল, কবে অর্ডার আসবে মহামহোপাধ্যায়ের কাছ থেকে, তবে লিখবেন। অথচ উপন্যাস লেখা নয় কোনো বুক-রিভিয়্যু বা রেশনের দোকানে লাইন দেওয়া। অর্ডারী নির্ভর নয়। যখন আঙুল নিসপিস করে ওঠে যেমন ঠিক খুনের আগে, মস্তিষ্কের কোষে কোষে চিন্তা ভাবনা স্মৃতি স্বপ্ন নামের পর পর লোকাল ট্রেন সিগন্যাল না পেয়ে একই লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে যায়, তখনই লেখার তাগিদ। তা উপন্যাস হোক, অথবা কবিতা বা গল্প রচনাই হোক। তবু ওঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছে। বয়স যখন চল্লিশ ছুঁই ছুঁই তখন শিরোপা পেতে হলো তারুণ্যের। উনি অবশেষে লিখলেন, প্রকাশিত হলো, প্রচার পেলেন। অর্থ পেলেন। ভালোয়-মন্দয় মিলিয়ে মিশিয়ে যখন সমালোচনা কানে আসতে লাগলো, তখন মনে হলো, লেখাটা যদি আরো বড়ো করা যেত, আরো বিস্তারিত, তাহলে বোধহয় মহান কিছু ঘটে যেতে পারতো। অথচ একথা তো সাহিত্যের একজন শিক্ষানবীশও জানে যে, মহত্ব কোনো আয়তন নির্ভর নয়। পৃষ্ঠা মেপে ফর্মা মেপে কখনো কোনো সাহিত্য রচিত হয়নি। লেখকের প্রয়োজনে লেখার আয়তন নির্ভর করে। অথচ এহেন মন্তব্য নতুন নয়। প্রায়ই শোনা যায় তরুণ ঔপন্যাসিকদের কাছ থেকে। ভাবেন, লেখা বড়ো হলেই তা হতে পারে আরেকটি ওয়ার এণ্ড পীস অথবা যাদাবস কারামোজাভ। কিন্তু এটাও কি পাশাপাশি ভাবা উচিত নয় যে, উক্ত দুটি রচনার মতো বিশ্ব সাহিত্যের আরো কিছু সৃষ্টি বিরল ঘটনা—অসম্ভব মূল্যবান, শুধু সাহিত্যের ইতিহাসে নয়, পৃথিবীর ইতিহাস দর্শনের পক্ষেও জরুরী, কিন্তু শুধুমাত্র বৃহদায়তন বলেই তা দ্রুত পাঠকের ধৈর্য বা সংযমের পক্ষে অত্যাচার

জ্বালের মত ছড় ছড় কার

৩০ লক্ষের বেশী পাঠকদ্বারা গৃহীত ও উচ্চ প্রশংসিত, সকলের সমাদৃত শিক্ষাক্রম ঃ

ইংরাজী কথা শেখার প্রভাবদায়ী সহজ পদ্ধতি

"র‍্যাপিডেক্স" ইংলিশ স্পীকিং কোর্স ®

RAPIDEX ENGLISH SPEAKING COURSE

র‍্যাপিডেক্স পদ্ধতি ঃ—

নিত্য ব্যবহারের সর্বদা কথাবার্তার ভাষা ক্রমানুসারে পাঠ-অভ্যাসে শিখতে ও বুঝতে হলে এটাই হল সহজ সুগম ও নতুন পদ্ধতি। যে প্রকারে ছোট শিশুকে পড়ানো, লেখানো, ছাড়াই শুনে-শুনে কথা বলা শেখে। সম্পূর্ণ শিক্ষাক্রম বার্তালাপ শৈলীতে—যেন মুখোমুখি কথাবার্তা হচ্ছে।

পৃষ্ঠা 332 বড় আকার (19 × 25) প্লাস্টিকের আস্তরণের মলাট

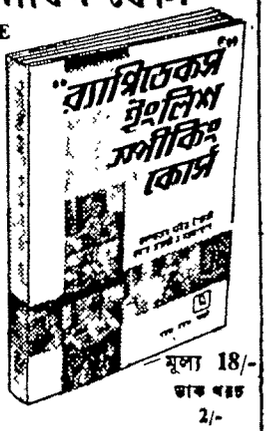

মূল্য 18/-
ডাক খরচ 2/-

র‍্যাপিডেক্স শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্য—

- সঠিক উচ্চারণের জন্য অসম্পূর্ণ শিক্ষাক্রমের ইংরাজী বাক্য এবং শব্দ বঙ্গলিপিতেও উপস্থিত।
- কোনো ভাষা শিখতে হলে এ-পর্যন্ত জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক গবেষণায় নির্ভর করা এক অভিনব পদ্ধতিতে প্রস্তুত সর্বাধুনিক শিক্ষাক্রম।
- আনুমানিক ১০০০ নির্বাচিত, সর্বদা কথায় প্রয়োগযোগ্য সেইসব ইংরাজী শব্দাবলী, যা আপনার দ্বিধা ও সংকোচকে একেবারে নির্মূল ক'রে দেবে।
- প্রায় ২৫০০ সর্বদা কথা বলার সেইসব ছোট ছোট প্রভাবদায়ী বাক্য, যা—
  - × বাড়ী অথবা কর্মক্ষেত্রে, কলেজ বিদ্যা ক্লাবে, উৎসব কিম্বা মেলায়
  - × প্রেমিক-প্রেমিকা, পতি-পত্নী, ভৃত্য-মনিব, দোকানী-গ্রাহক ছোট-বড় সর্বত্র।
  - × প্রেমালাপ, শিষ্টাচার, অভিবাদন, অভিনন্দন, নিমন্ত্রণ, প্রশংসা অথবা সান্ত্বনায়।
  - × আমোদ-প্রমোদ, স্বাস্থ্য, খানা-পিনা, বেশ-ভূষা, সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রসঙ্গে—

—অর্থাৎ যে কোনো বিষয়ে..... ....যে কোনো বর্গের স্ত্রী- পুরুষের সাথে বেশ জোরালোভাবে কথাবার্তার নিমিত্ত প্রস্তুত।

'র‍্যাপিডেক্স ইংলিশ স্পীকিং কোর্স' সফলতার গ্যারান্টিযুক্ত

বিক্রয়ে মূল্য ফেরৎ

যদি র‍্যাপিডেক্স কোর্স আপনার পছন্দ না হয় তাহলে ফিরিয়ে দিন। ডাকমাশুল বাদে সমস্ত মূল্য ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

বইখানি ভি. পি. পি-যোগে পেতে হ'লে—ঠিকানা ঃ

প্রকাশক ঃ পুস্তক মহল, খারী বাওলী দিল্লী-১১০০০৬

—র‍্যাপিডেক্স কোর্সের বই নিম্নলিখিত স্থানে পাওয়া যায়—

এ এইচ, হুইলার কোম্পানীর সমস্ত রেলওয়ে স্টল, বাস স্ট্যাণ্ডের সমস্ত বইয়ের দোকান ও স্টল। কলিকাতায় ঃ—কলেজ স্ট্রীট, ইণ্টারন্যাশনেল বুক ট্রাস্ট, বিশ্বাস বুক স্টল, চক্রবর্তী অ্যাণ্ড চ্যাটার্জী কোম্পানী, হিন্দুস্তান লাইব্রেরী, জ্ঞান ভারতী—১৭১।এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, জে এন ঘোষ অ্যাণ্ড সন্স, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। জামসেদপুর-সাকচি..ঃ—উৎকল বুক সার্ভিস, উৎকল লক্ষ্মী ভাণ্ডার, আগরওয়াল বুক স্টোর্স, সেন বুক স্টোর্স, রাজেন্দ্র নগর, জয় ভারত পুস্তকালয়, নিউ মার্কেট বার্ণপুর, কাশীপ্রসাদ বুক সেলার, খড়গপুর, দীপক-কুমার হোড়, নিউজ পেপার এজেন্ট, আলিপুরদুয়ার, জগৎকিশোর শ্রীবাস্তব, বেলওয়ে রিক্রুটিফড কলোনী, লামডিং।

SHARAD ADVTG.

হয়ে দাঁড়াচ্ছে, দ্রুত অপঠনের পথে। অপ্রিয় সত্য তবু দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায়, কতো পাঠক এইসব উপন্যাস পড়েছেন তা খুব গুণে বলা যেতে পারে, এমন কি যাঁরা এই সব রচনা নিয়ে গুরু-গম্ভীর প্রবন্ধ অথবা ভাষণ দেন তাঁদের মধ্যেও শতকরা ৭০ জন মূলে লেখা পড়েন নি। আসলে মানুষের সময় যাচ্ছে কমে। বড় বড় পাঠার কুড়ি খণ্ড বই দিয়ে কখনো বিপ্লব ঘটানো যাবে না, হাতে নিয়ে ঘোরা যায় এমন ছোট ছোট কুড়ি পয়সার বই-ই ভরের।' বলেছিলেন ভলত্যার। অষ্টাদশ শতাব্দীর লেখক তিনি। শিল্পায়ন; জটীল আধুনিকতা, অবাবস্থিত জীবনযাত্রা, দ্রুবন্ত গতিময়তা, অনিশ্চয়তা যা অধুনা বৈশিষ্ট্য তার সিকি ভাগও তখন দৃশ্যমান নয়। অথচ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। দ্রুত অপসৃয়মান সময়ের মুখোমুখি মানুষকে বুদ্ধির স্বাধীনতা, ভাববাব স্বাধীনতা দিয়ে অল্প আয়তনে আবদ্ধ রাখা দরকার। কাহিনীব নিছক সম্প্রসাবণে বিশ্বাসী না হয়ে অহেতুক অতিরঞ্জিত বর্ণনার আশ্রয় না নিয়ে বুদ্ধির দরজায় মৃদু অথচ ঋজু আঘাতই বুদ্ধিমানের কাজ। ফল ফলবে তাতে বেশি। তবে চল্লিশ ছুঁই ছুঁই এইসব তবুণ সম্প্রসাবণবাদী ঔপন্যাসিকদের সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য না করাই শ্রেয়। কেন লেখা, কীসেব জন্য লেখা, কী লেখা উচিত, কী লিখবো—এইসব ধারণা যাঁদেব কাছে দিনের আলোর মতো স্বচ্ছ তাঁদের লেখাব জগতে হাড্ডুড় খেলাব

কোনো অধিকাব নেই। কাহিনীকে আশ্রয় করে লেখা কখন মননের চৌকাঠে হুমড়ি খেয়ে পড়বে এ পিওর ক্যাসকুলেশন এঁদের জানা নেই।

কথায় কথায় একজন প্রবীণ লেখক যিনি দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর বাঙলা সাহিত্যের সেবা করে আসছেন এবং উল্লেখনীয় ব্যক্তিত্ব, অধুনা উপন্যাস লেখালিখি নিয়ে সরস মন্তব্য করলেন। উপন্যাস লেখা নাকি এখন খুব সহজ। বেশি সময় লাগে না। বেশি ভাবতে হয় না। একটি ছেলের সঙ্গে একটি মেয়ের দেখা হলো। গড়িয়াহাট অথবা দীঘাব সমুদ্রতীরে। ছেলেটির খুব রাগ, এতো রাগ যে দাড়ি কাটে না, কোবিযান কাপড়ের বেলবটস পরে, নিজেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে, বাবার পয়সায় বোহেমিয়ান অথচ সনশালু। কল্পনায় তার একটি দেশ আছে সেখানে ফুল ফোটে, পাখিরা গান গায়, সুন্দরী প্রেমিকা এসে আঙুল ছুঁয়ে যায়। মেয়েটি দুঃখী দুঃখী, কনভেন্টে পরে, নাইট গাউন পরে ঘুমোয়, গোলাপী নাইটি, বাবা ফুলের মাসীর সাথে কী সব করে, মা নেই, মর্জ হ্যারিসন শোনে, ক্যাননে ছবি তোলে, পোষা স্প্যানিয়েলের সাথে গল্প করে। দেখা হলো দুজনে। হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল স্টেজ। একদিন পরীক্ষা আগামীকাল, পড়ার টেবিলে পড়তে পড়তে ছেলেটির মেয়েটিকে মনে পড়লো খুব, আদর করতে ইচ্ছে করলো অথচ মেয়েটি তো কাছে নেই, টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে থাকা ভেনাসের ঠোঁটে চুম্বন করে মনে হলো—পরীক্ষা ইত্যাদি বন্ধন বিশেষ। তাবা অবশেষে ঠিক করলো এই শ্বাপদসংকুল মানুষের সমাজে প্রেম দীর্ঘস্থায়ী এবং মনোরম হতে পারে না, সুতরাং মানস সরোবর বা ঐ জাতীয় কোনো জায়গায় চলে যাওয়া ঢের ভালো। তাবা দুজন হাত ধরাধরি করে হাঁটতে হাঁটতে ফাঁকা ময়দান পেরিয়ে সূর্যাস্তের রঙ চুলে জড়িয়ে কোথায় দূরে, কোথায়—টুং টাং—উপন্যাস শেষ। কিন্তু এই বিষয়ই একবাব হেড একবাব টেল, একবাব টেল একবাব হেড করে গোটা তিরিশেক উপন্যাস লিখে ফেলা হয়। তিনি ঔপন্যাসিক হন। বই বিক্রীও হয়। কেননা বাঙলা সিনেমাব মতো বাঙলা উপন্যাসেব বিক্রী-বাট্টা নির্ভর করে বয়ঃসন্ধিকালের যুবক যুবতী এবং বাড়িব গিন্নীদের বদান্যতাব উপব। অথচ সাহিত্য কোনো ভেলকিবাজির আসব নয়। এখানে টিঁকে থাকতে গেলে চিবন্তনের সঙ্গে সময়ের একটা মিকসিং করে কনটেন্ট বানাতে হয়। আজকেব হাততালি আগামী দিনের নিরুত্তাপ রিজেকশন। এ প্রমাণ তো ভূরি-ভূরি। যা নিজস্ব অভিজ্ঞতালব্ধ নয়, যা আমার জীবন নয়, যে অনুভূতি আমার শিরার স্পন্দনে অনুভূত নয়, অনিদ্রার রাতে যা আমার দুঃস্বপ্ন বা আতংক আমার রক্তক্ষরণে নার্ভের ফাংগাস যে বাস্তবের মুখোমুখি আমাকে করে, তাই—একমাত্র তাই-ই লেখার বিষয় হওয়া উচিত। এব সঙ্গে স্ট্রাকচার সুপার-স্ট্রাকচাবের সম্পর্কের মতো সুপার স্ট্রাকচাব হবে সামাজিক সচেতনতা, দর্শন, বাজনীতিব অভিজ্ঞান, মানুষের আবহমান সভ্যতার ইতিহাস। লেখা তো লেখকের কোনো কিকেট খেলোয়াড়ের স্কোরিং অ্যাভারেজ নয়। গুণের চেয়ে পরিমাণে বিশ্বাস করে না। ধীবরের জাল বিস্তৃত না হলে রুপোলী মাছ ধরা পড়া দুষ্কব। উপন্যাস যেহেতু এক বিশাল একুয়ারিয়াম যেখানে অনেক চরিত্র তাদের স্ব স্ব সময়ে ইতিহাস দর্শন ভূগোল জড়িয়ে অনায়াসে ঘুরে বেড়াতে পারে, সেহেতুই ঔপন্যাসিককে বেশি সচেতন এবং দায়িত্ববান হওয়া উচিত। অন্ততঃ সেই প্রবীণ লেখকের মত এরকম আব এক্ষেত্রে একমাত্র চাণক্যের শ্লোকই স্মবণে রাখা ভালো—শত শত কুপুত্র অপেক্ষা একটি সুপুত্রই কাম্য।

বিনয় ঘোষের

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি ১ম ৪০, ২য় ৪০,

বাংলার বিদ্বৎসমাজ পবিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সং ১৫,

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চাণক্য সেনেব নতুন উপন্যাস

বলাকার মন ১০ **পুত্র, পিতাকে** ১৮,

অধ্যাপক বথীন্দ্রনাথ সেনের

হিসাব পরীক্ষা শাস্ত্র (Auditing Revised Ed.) ১৬,

অবনীন্দ্র রচনাবলী ১ম ২০, ২য় ২২-৫০, ৩য় ২৮, ৪র্থ ছাপা হচ্ছে

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পুতুল নাচের ইতিকথা ১২·৫০

PROF S. N. BASU'S

Standard Problems on Accountancy	12.00
Solutions to Standard Problems on Accountancy	25.00
Income-tax Simplified (Latest Ed.)	20.00
Standard Problems on Advanced Accountancy with Solution	8.50
Model Problems on Advanced Accountancy (for B. Com. pass course)	10.00

প্রকাশ ভবন ॥ ১৫, বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ ॥

বঙ্গোপসাগরে সেই নতুন দ্বীপে

কল্যাণ চক্রবর্তী

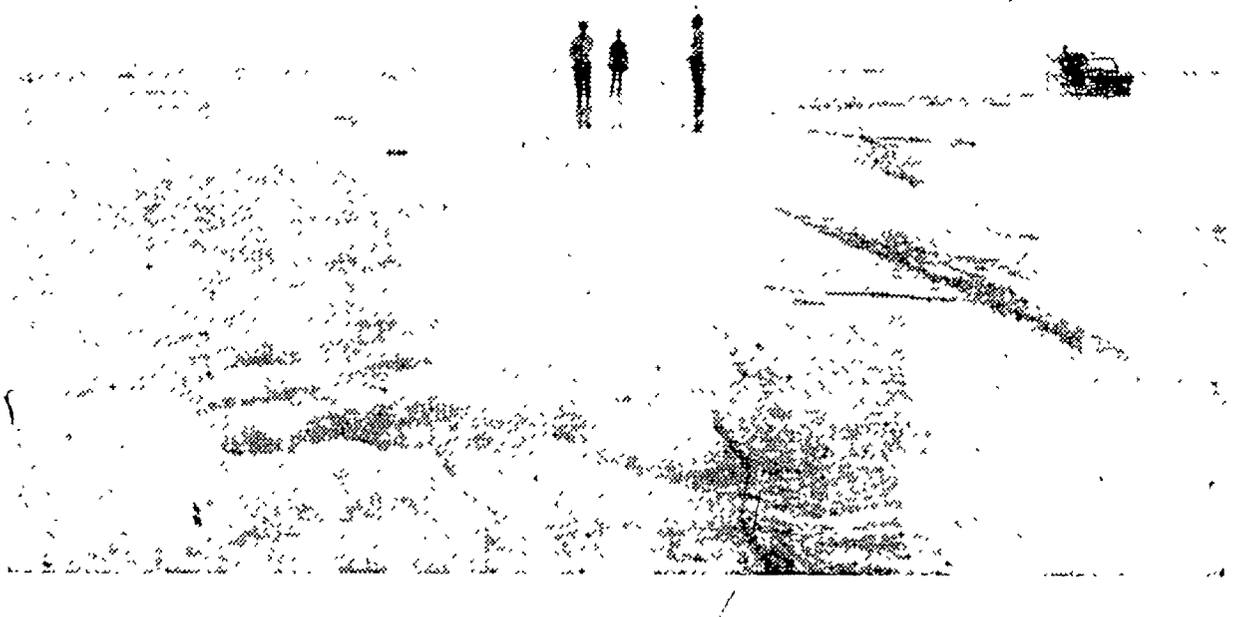

আজ মাঘমাসে নভেম্বর। এখন বেলা দুটো। দূরে দুপুরের রোদে সমুদ্র-সমান ব্রহ্মপুত্র ঝিলমিল করছে। পেছনে মোহানা ও গোমা নদীর সংগমে একটা মিনিবাসের মতো নট নড়ন চড়ন হয়ে দাঁড়িয়ে বনশোভা। আর্থাৎ মানে আমরা আধ ঘণ্টা আগে বনশোভাকে ছেড়ে নেমে এসেছি এই চিতলে। ঢেউয়ের মাথাগুলো থাঁতলাতে থাঁতলাতে হিপ্নোটাইজ চিতল আমাদের নিয়ে সোজা ঢুকে এল এই দ্বীপে। দ্বীপের নাম বাঘদ্বীপ। নামটা আমারই দেওয়া। আমিই সেই মানুষ যে প্রথম পা রাখলাম এই বালি-ঝিনুক নির্জনতায়। ট্রাউজারের পা দুটো হাঁটু অবধি গোটানো। চিতলের ঘাড়ে হাতের ভর রেখে লাফ দিয়ে নামলাম বালিতে। গোড়ালি অবধি ডুবে গেল ভিজে বালিতে। সাবধানে বাঁক ঘোরালাম, হাঁফ ফেলি।

এই সেই দ্বীপ, বাংলাদেশ ও ভারতের মাঝখানে বঙ্গোপসাগরের পয়েন্ট পাতায় বক-মস্কলের কোলে সদা গড়িয়ে উঠছে। অপর পাশে বাংলাদেশের সুন্দরবন, এপাশে আমাদের সুন্দরবন। ডান পাশ টেনে তুলে নিয়ে সামনে এগোতেই প্রথম মনে হল, এই বালি চোরাবালি নয় তো? আর এক পা এগোলাম। না, চোরাবালি নয়। আমি এগোতে পারছি। পেছনে পেছনে আসছেন আমাদের ফরেস্টার রণজিৎ রায়, চিতলের ড্রাইভার প্রভাস রায়, বনশোভা লঞ্চের লস্কর বনবিহারী মাইতি। চিতলের গর্জনে, লঞ্চের তেলপোড়ে আমাদের মাথার ওপর দিয়ে ডানা ঝাপটে উড়ে গেল এক ঝাঁক সী-গাল। পাখি তাহলে বসছে। একদিন নিশ্চয় এই দ্বীপে বাঘও থাকবে। সুন্দরবনে আর কোন দ্বীপের নাম বাঘদ্বীপ নয়। জানাতো দিন দিন ছোট হয়ে যাচ্ছে, মানুষ গিলে ফেলছে জঙ্গলটাকে—দশ বাঘের সংসার আমার। দিন রাত দুশ্চিন্তায় ভারি সংসার যদি আরো বাড়ে তাহলে জানাপোনাগুলো থাকবে কোথায়? এই প্রথম গত ছ বছরের মধ্যে একটু নিশ্চিন্ত হলাম। এবার জানোয়ার বাড়লে এই নয়া দ্বীপে চালান করে দেব। অন্তত পঞ্চাশটা বছর এই দ্বীপ এখনো নির্জন থাকবে—কেউ বিরক্ত করবে না। হাত বাড়িয়ে এক মুঠো বালি তুলে নিয়ে নাকের কাছে তুলে শুকলাম। সোঁদা গন্ধ। দক্ষিণে সমুদ্র এবং কাছে বামমঙ্গল দুপুরের রোদে, অফুরন্ত বাতাসে ভরা পোয়াতীর মতো ফুলে উঠছে। জোয়ার আসছে। দাঁড়িয়ে দেখি, এই দ্বীপের বুকটা জোয়ারের জলে ডুবে যায়। দাঁড়ানোর মতো এক টুকরো চরও জেগে থাকে কিনা? গলায় ব্যাগটা ও বাইনাকুলারটা ঝুলছে। বাইনাকুলারটা তুলে নিলাম।

দুদিন আগে ছাব্বিশ তারিখ কলকাতা থেকে রওনা দিয়েছি। টাইগার প্রজেক্টের ঠিক এক ঘণ্টা নিল ক্যানিং পৌঁছোতে। হেড অফিসে কাজ ছিল কিছু, ফাইল ঘাঁটা। আমি যে প্রজেক্টের ডিরেক্টর। কাজকর্ম চুকিয়ে বুকিয়ে উঠলাম বনশোভায়। মাতলা হালকা শীতে পাতলা একটা মুগার চাদরের মতো পড়ে রয়েছে। জল মাপতে মাপতে লঞ্চ এগোতে লাগল।

বাইনাকুলারে বঙ্গোপসাগর এখন অসম্ভব স্ফীত। বালিয়াড়ির পর বালিয়াড়ি গিলতে গিলতে এগিয়ে আসছে। বামমঙ্গলও ক্ষুধার্ত। আস্তে আস্তে বাঘদ্বীপ জলের তলায় তলিয়ে যাচ্ছে। বহুদূরে লেনসেরা ডগায় ঘাস ফুটে আছে। ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম সাধারণ ঘাস। মাটি থেকে প্রায় ঘাস সাড়ে চার ফুট উঁচু। ধানের শীষের মতো পাতা। গলায় সূর্যাস্তের মতো একগাদা সূর্য মাখানো বীচির মতো ঘাসফুল। বাঘদ্বীপের বালিতে ঘাস গজাচ্ছে। আর কয়েক বছরের মধ্যে এই ঘাস গোটা দ্বীপটা ঢেকে ফেলবে। তখন বালি ঘাসের শিকড়ে নানা রকম মাটিতে পরিণত হবে। ওই ঘাসের জঙ্গলে এক মানুষ সমান গোটা কয়েক সুন্দরী বাঁধলে আর বাইন গাছ।

বাইনের ফল পাতাস মাছ দারুণ পছন্দ করে। টুপ টুপ করে খসে খসে পড়ে জলে তার পাতাগুলো টপাটপ গিলে ফেলে। খেতে খেতে ওদের সাইজ দিন দিন বাড়ে। তাহলে পাতাসের দিন এসেছে। সুন্দরবনের বাইন বেজায় সুস্বাদু। ডালায় হরিণ, শুয়োর যা পাব খাব। আর সাঁতারে পাঁইয়াতে পাতাস, কাসমাগুরে গুম বকের গোস্তে তা দেব। বাঘেরও দিন এসেছে। এই নয়া দ্বীপে নয়া বসতি আর বসবে বছরের পর বছর। জলের ধাক্কায় একটা গাছের মরা ডাল ভেসে এল। তুলে নিলাম। ডাল নয়, লাঠি। লম্বায় প্রায় ফুট-খানেক। মত মুটিয়ে ধরে বালির ওপর বাঁকাচোরা বড় বড় হরফে লিখলাম নিউ মাইগ্রান্ড, টাইগার প্রজেক্ট। লেখা শেষ করে মুখ তুলতেই দেখি বনবিহারী ক্যামেরার ফোকাস থেকে মুখ সরিয়ে নিচ্ছে। আমি যেন ফ্রেমে বন্দী হয়ে গেলাম।

মুগার চাদরটা সরিয়ে দিয়ে বনশোভা এখন বাসন্তী খালে ঢুকল। তখন গোসা জলে পড়ন্ত সূর্য চিনুনী চালাচ্ছে। সামনে দুর্গাদোয়ানী। নামে খাল হলেও দুর্গা-দোয়ানী সাইজে আইটাম ঘাটতি গঙ্গা। জল সমান ঘোলা। ওই ঘোলা জলে বনশোভা ফিতের দিতে দিতে গিয়ে ঢুকল গোমদিতে। নদী তো নয় গোমদি ঠিক যেন খুলনা ভিলের নদ। লাভ ঘাটটায় গোমদি ছেড়ে ঢুকলাম অকূল পাথার—এই নাম বিদায়। বড় জোর সাত হাত গভীর। কিন্তু ইকোলজি খুব প্রশস্ত। বিদায়ে আধা-আধি বসে করে সমানেখালির পাখিয়ালার কোলে এসে ছিটল বনশোভা। পাড়ের ডাল-গুলো লক্ষ লক্ষ সাদা, সীগালে সাদা হয়ে আছে। বনবিহারী এসে বলল, ডিনার রেডি।

ভাত, মুশুরের ডাল, ভেটকি মাছের পাতুরি, ঝাল, ঝোল আর সেই সঙ্গে আপেল ও কলা। খাওয়ার শেষে একটা সিগারেট ধরালাম। বছর খানেক হল বিয়ে করেছি। আগে সিগারেট খেতাম না। মা কৌটো ভর্তি ধাটা সুপুরি দিতেন সঙ্গে। ঠোঁটে ক্লান্তি বা হতাশা মলমের মতো মাখো মাখো হলেই গালে সুপুরী ফেলে চাঙ্গা হতাম। বৌ পছন্দ করে না সুপুরী চিবানো। মা হেসে গেছেন। এখন ব্রেন ফ্যাংশনের কাঁটায় তুলে বিদেয়। তবু একটা নাড়ু চাই। সুপুরি এইটি কাট এটা। আট নম্বরটা আজ ঘাট কিলো পাড়ি দিয়েছি। এবার ঘুমোনো দরকার।

হাত ঘড়িতে দেখলাম দশ দশটা মিনিট কাবার। জল দ্বীপটার বারো আনা গিলে ফেলেছে। লঞ্চের খোলে বসে ম্যাপটা ঘাঁটছিলাম। দেখলাম ম্যাপে বাঘদ্বীপ দাঁড়িয়ে আছে লাটিচ্যুড ২৩ ডিগ্রি ২০ মিনিট ও লঙ্গিচ্যুড ৮১ ডিগ্রি ২০ মিনিট। অঙ্ক কষে দেখলাম লম্বায় প্রায় দশ মাইল চওড়ায় পাঁচ মাইল। অর্থাৎ পঞ্চাশ বর্গমাইল। আমাদের সুন্দরবনের বাঘমারা দ্বীপের পাঁচ নম্বর কমপার্টমেন্টের মাথে এই দ্বীপ। নাকি, বোয়াটো ঘুরে চলে গিয়েছে বাংলা-দেশের দিকে। পা বঙ্গোপসাগরে ডুবিয়ে।

ঘুম ভাঙাতে হাত ঘড়িতে দেখলাম আর সাতাশে নভেম্বর এখন রাত্রে সকাল পাঁচটা।

২০০ টাকা পুরস্কার

ডঃ দীপক দে-র 'সাম্যবাদ' উপন্যাস

যাদের উপর সমালোচনা প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হচ্ছে। শব্দ সংখ্যা দেড় হাজার। ক্যাশমেমো সহ ১০ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে পাঠাতে হবে। পাঠাবার ও বই কিনতে পাবার ঠিকানা—বুক ফ্রেন্ড, ৮/১বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা -৭৩।

দক্ষিণ শহরতলীর অভিজাত সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্র।
কণ্ঠ - যন্ত্র - নৃত্য

সর্বশ্রী চিন্ময় লাহিড়ী, অখিলবন্ধু ঘোষ, সবীর খাঁ, ডলি চ্যাটার্জী এবং রবীন্দ্র সঙ্গীতের সকল বিভাগ অমল নাগ, হেনা সেন ও কানপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত।

মেট্রোপলিটন কলেজ

১০২।১, ডায়মণ্ড হারবার রোড, যোধপুর পার্ক, কলিকাতা—৬৮। ফোন : ৪৫-০২৫১

IDEAL ADVTG.

বনশোভার পেট ডিজজল পড়েছে। ঢেঁকুর তুলে জল কাটতে শুরু করল। বিদ্যা পেরিয়ে এখন ঢুকব স্টোর খালিতে। হয়তো কোনদিন বোন সাহেব এই নদীতে এসে সাবেঙের কাছে জানতে চেয়েছিল এই নদীর নাম কি? ইংরাজি-না-জানা সাবেঙ দৃঢ় প্রত্যয়ে ধরে নিয়েছিল সাহেব নিশ্চয় নদীর জলের থেকেও বেতলের জলে বেশি ইনটারেসটেড। অথচ লঞ্চের স্টোর সাহেব আগেই সাফ করে দিয়েছে। তাই মেদিনীপুরী সাবেঙ নির্দ্বিধায় উত্তর দিয়েছিল: স্টোর-খালি।

স্টোরখালি ছেড়ে গেলাম, তারপর গোসাবা নদী। পরের নদী হলদি। সামনে নেতিধোপানী। বেহুলা কি এই নদীর ঘাটেই কলার ভেলা নিয়ে ভিড়েছিল? কে জানে? বনবিহারী খেতে দিল। সাপটে সুপটে ভাত, ডাল, আলু-কপির তরকারী, পাবদে, ডাঙ্গন আর কুচো চিংড়ি ভাজা অল্প ঝোল দিয়ে সাবলাম দুপুরের খাবার। লঞ্চের পর নেতিধোপানীর ঘাট ছেড়ে বন শোভা আবার ঢুকল গোসাবা নদীতে। সুন্দরবন বড় বিচিত্র। একই নদী বার বার ফিরে আসে। আসলে একটাই নদী। মাঝে মাঝে দ্বীপ। এই দ্বীপগুলোর জন্যই মাঝের জল নানা নামে চিহ্নিত। সবটুকু জলই সমুদ্রের। হিমালয় এখানে আসে না। এসে পড়লাম মেছুয়া খালে। পাশে মেছুয়া দ্বীপ। এখন রাত দশটা সাতেরো ঘন্টার বার করেক বেঁকে দিয়ে প্রায় সত্তর কিলোমিটার পেরিয়ে এলাম। আজ এইখানে নাইট হল্ট। দ্বিতীয় রাত। ডিনারের আয়োজন চলছে।

কলেক্টা সারস পাখি উড়ে এসে বসল সামনের উঁচু বালির ঢিবিটার দিকে। বালিতে পা চুবিয়ে একটু একটু করে এগিয়ে চললাম ওই ঢিবিটার দিকে। চারপাশে কাদামাখা জল। মনে হল শেষপর্যন্ত এই ঢিবিটাই শুধু জেগে থাকবে। ঘোলা জলে সোনালী মাছ চিক সাঁতার দিচ্ছে। এক একটার সাইজ লম্বায় ছ ইঞ্চি এক থেকে দেড় ইঞ্চি চওড়া। দারুণ শাঁটকি হয়। মা শাঁটকির ঝাল রাঁধতে পারেন।

সুন্দরবনের ব্যাঘ্র প্রকল্প সংরক্ষিত জঙ্গল। বন দফতরের অনুমতি ছাড়া এই জঙ্গলে সাবকাসের বাঘেরও প্রবেশাধিকার নেই।

আজ আঠাশ তারিখ। ভোর সাতে পাঁচটায় আমরা রওনা দিলাম। আজ যাব বাঘদ্বীপে। কত দিনের প্ল্যান। তিন বছর আগে পঁচাত্তর সালে এই মেছুয়া দ্বীপে এসেছিলাম শীতকালে। লঞ্চের সাবেঙ বক্স থাইনাকুলারে চোখ লাগিয়ে চীৎকার করে বলেছিল, স্যার চড়া, নমা চড়া। সেই প্রথম দর্শন। তারপর একদিন চিঠি পেলাম সাবেঙ অব ইন্ডিয়ার কাছ থেকে। ওরা এরিয়াল সার্ভে করে গিয়েছে। আমাকে দুটি নাম পাঠিয়ে জানতে চেয়েছে কোনটা আমার পছন্দ —নিউ মুর আইল্যান্ড আর বাঘদ্বীপ।

বাঘ নিয়ে ঘর করি। তাই তখনই মনে হল দ্বিতীয় নামটাই ঠিক, যথার্থ। গোসাবা নদীর পাড়ে কেঁদো দ্বীপ। কেঁদোর পাশ ঘুরে বনশোভা গিয়ে পড়ল গোসাবা ও গোমাদ সংগমে। আজ কভার করলাম তিন কিলো। ক্যানিং থেকে এই নয়াদ্বীপ জলপথে ১৬০ কিলোমিটার। এরপর লঞ্চ আর যাবে না। সামনে সমুদ্র। সমুদ্র সমান রাজমহল। লঞ্চ টলছে। তাই নেমে এলাম চিতলে। বনের বেঙ্গলের দৈনিক খোরাক দশ কিলো মাংস—হরিণ বা শুয়োরের। চিতল ধরলে মাস চব্বিশ লিটার নাইনটিফিফ্টি অকটেন। বনবিহারী পাঁচ হ্যারিকেন পেটরোল নিল সঙ্গে। হ্যারিকেনে নব্বই লিটার ধরে। চিতলে ছুটে চলল।

ফরেস্টার বনজিৎবাবু বললেন, স্যার আর বেশী করবেন না। ঢিবিটাও এর পর জলে ডুবে যাবে। চিতল এগিয়ে আসছে। আমরা ঢিবি থেকে নেমে আসছি। সামনে পেছনে শুধু জল আর জল। বনরাজল এখানে এই নয়াচড়ায় বনেপসাগরকে চুমু খাচ্ছে। আমরা স্পিডবোটে উঠে এলাম। দূরে বিন্দুর মত সেই মিনিবাসটা অপেক্ষা করছে। পেছনে ফেলে এলাম আমার হাতে লেখা কয়েকটা অক্ষর: নিউ আইল্যান্ড। আবার আসব এই দ্বীপে আমার পরিবারে পরিজনদের নিয়ে। দশ বাঘের সংসার। প্রতি মাসেই বাড়ছে। একটু বড়তি জায়গার বড় দরকার ছিল। তাই বাঘদ্বীপ ছেড়ে উঠলাম নদী আর সাগরের সঙ্গমে। হাতঘড়িতে বলছে এখন দুটো বেজে চল্লিশ। অর্থাৎ এই প্রথম বারটি মানুষ এই নতুন দ্বীপে চল্লিশ মিনিট কাটিয়ে গেল।

বেগম আখতার

সন্ধ্যা সেন

ফরাসী কবি ভালেরি বলেছিলেন : আলোয়-ধোওয়া রাত্রি আর তার তারার পুঞ্জ পালটে দেয় সব কিছু, আমাদের হাতের কাছে যা কিছু আছে, সবই যেন অদৃশ্য হয়ে যায় তখন।....

স্মৃতির আকাশে অজস্র তারার মধ্যে এমনই দুটি তারা : বেগম আখতার আর ভীষ্মদেব। একজন প্রাণের রসে ভরপুর, উচ্ছল, অপরজন যেন অবাস্তব কোন স্বপ্নলোকের বাসিন্দা। একজন জীবনের অসংখ্য বন্ধনের আনন্দ-বেদনায় অভিভূত, মানবিক আবেদন তাঁর সঙ্গীতের কেন্দ্রবিন্দু, কিন্তু হৃদয়ের উতলা আবেগে লেগেছে চিরায়ত বিরহ মিলন, কান্নাহাসির দোলা। অপরজন জীবন-রস রসিক হয়েও জীবনমুক্ত। বাস্তবের মাটিতে পা রেখেও সঙ্গীতময় অন্য একটা পরিমণ্ডলের আভাসে আত্মহারা।

ভিন্নস্বাদের দুটি সঙ্গীত পথিককে আমরা পেয়েছি। যে সঙ্গীতপ্রেমী সহৃদয় মানুষটির কাছে এই সুযোগে তাঁকে ঋণ-স্বীকার ও প্রণাম জানানোর দায়িত্ব পালনের বাড়তিও সম্পন্ন হওয়া উচিত। ব্যবসায় নেমেও বাণিজ্যিক লাভটাই তাঁর কাছে বড় হয়ে ওঠেনি। শিল্পপ্রেমীর দৃষ্টি দিয়েই তিনি দেখতে পেতেন অঙ্কুরের মধ্যে বনস্পতিকে। সম্ভবে এত কপি রেকর্ড বিক্রী না হলে কোনো শিল্পীর দ্বিতীয় রেকর্ড বেরোবে না এরকম কোনো শর্ত তাঁর ছিল না কোন শিল্পীর সঙ্গে। যতক্ষণ না তাঁর রেকর্ড 'হিট' রেকর্ডের মহেন্দ্রক্ষণে পৌঁছত তিনি থামতেন না,—থামতে দিতেন না শিল্পীকেও। আর প্রথম রেকর্ডই যাঁদের 'হিট' —তাঁদের ত কথাই নেই। এই জে, এন ঘোষই তার চোখ প্রথম হবার পর ফৈয়াজ খাঁ, আবদুল করিম খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ, বড়ে গোলাম আলি প্রথম রেকর্ড মেগাফোন কোম্পানির লেবেলেই পাই। এই কোম্পানির রেকর্ডেই প্রথম রেকর্ড আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের সরোদ, বেহালা, এনায়েৎ খাঁর সেতার, এই লেবেলেই ভারতবর্ষ প্রথম শুনেছে ভীষ্মদেব, বেগম আখতার, কাননদেবী, ফৈয়াজ খাঁ, জগন্ময় মল্লিক আরও কত শিল্পীকে।

জে, এন ঘোষের বেগম আখতারকে খুঁজে বার করবার ইতিহাস রীতিমত এক রোমাঞ্চকর ঘটনা। "একবার ইলিয়ট রোডে এক সাহেবের বাড়ি নৈশভোজের আমন্ত্রণ রাখতে গিয়েছিলেন জ্যাঠামশাই" এই প্রসঙ্গে বলছিলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র কমল ঘোষ, "সেই ফ্ল্যাটেরই অপর প্রান্ত থেকে ভেসে আসছিল এক নারী-কণ্ঠের অপূর্ব গানের সুর। বেওয়াজে বসা শিল্পীর সে সুর জ্যাঠার কানে লাগল। পরে খবর নিয়ে জানলেন ইনি অসামান্যা

ঠুংরী ও গজল-গায়িকা বেগম আখতার। তখন সবে সঙ্গীতদিগন্তে দেখা দিচ্ছে তাঁর নামটা।

ম্যাঠা খবর নিয়ে তাঁকে আনালেন মেগাফোন হাউসে। তখন রেকর্ডিং ম্যানেজার ছিলেন ভীষ্মবাবুর শুধু দাদা বললে ভুল হবে যেহেতু, ফিলজ্রাফার অ্যান্ড গাইড তাবাদা (তারাপ্রসন্ন চক্রবর্তী)। বেগম আখতারের প্রথম রেকর্ড হল ১৯৩৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর। সে রেকর্ডের গানদুটি ছিল : ক্যায়সি কর্‌ রাম নয়না ও যবজ ইত্যাদি মবাফিলে ইসলাম।

ঠুংরী গজলের রাজ্ঞীর প্রথম রেকর্ড কিন্তু আশাপ্রদ কোন সার্থকতা নিয়ে এলো না। তার পরের তিনখানি রেকর্ডে সেলের অঙ্ক প্রায় শূন্য। কিন্তু ম্যাঠা অটল। রেগমকে নিয়ে পরের পর রেকর্ড করিয়ে চললেন। কারো কথায় কান দেননি। কারণ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস নির্ভুল হল আটখানা কি নখানা রেকর্ডের পর।

প্রথম হিট্ রেকর্ড, ৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮ সালে। হিট্ বললে অল্পই বলা হবে। বেগমের প্রথম সুপারহিট্ রেকর্ড হল দিওয়ানা বানানা হায় তো (মে, এন, জি. ১০৪২)। সঙ্গীত জগতের প্রতিটি মানুষ সে গান যেন লুফে নিল। তারপর থেকে চলল তাঁর রেকর্ডের জয়যাত্রা। ১৯৪৪ সালের, জুন মাস অবধি তিনি প্রায় ১৫৪টি টাইটেল রেকর্ড করেছেন। "বোটি"-ফিল্মের হিরোইন বেগম আখতারের প্রতিটি গান সে যুগের হিট্ সেলের তালিকা বাড়িয়েছে।. . ...

একদিন আমাদের বাড়ী গানের আসর ছিল। শিল্পী বেগম আখতার যথাসময়েই পৌঁছলেন। কিন্তু তবলচি এসে পৌঁছয়নি। উনি বললেন : কোই বাত্ বেটা, ততক্ষণ তান-পুরোতেই গাই? হলশুদ্ধ লোক অবাক। শুধু তানপুরা নিয়েই গানের পর গান গেয়ে চলেছেন। এতবড় আর্টিস্ট। কিন্তু দেমাক নেই এতটুকু।

১৯৫৪ সালে একবার কলকাতায় এসে উনি ভীষ্মবাবুর সংগে দেখা করতে চাইলেন। নিয়ে গেলাম "আপ কামসা" বলে সৌজন্য বিনিময়ের পর উভয়েই চুপ। একটু বাদে ভীষ্মবাবু ওঁর গান শুনতে চাইতে, গেয়ে শোনালেন "মাঝি পার কর নৈয়া।" বেগম আখতারকে দেখেছি, ভীষ্মবাবুকেও দেখেছি গান গাওয়াটা ওঁদের কাছে যেন কোন ব্যাপারই নয়। যখন হোক সুরু করলেই হল। তারপরই সুরের সোতের গতি বাধাহীন।

মানুষ হিসেবেও দুজনে তুলনাহীন। বেগম আখতার ছোটোবেলা থেকে বলতে গেলে আমায় কত কোলে-পিঠে নিয়ে বেড়িয়েছেন। আমাদের কোম্পানি ছাড়বার পরও সে সম্পর্ক ভোলেননি। শেষের দিকেও যখন কলকাতা আসতেন আমায় হোটেল ইনটার ন্যাশন্যালে কত যত্ন করে বসে খাইয়েছেন। যখনই আসতেন লক্ষ্ণৌ থেকে আমার জন্য সুর্মা, আতর, পাঞ্জাবীর কাপড় আনতেন। একবার গান গাইবার আগে তামাসে আমায় বসিয়ে সবাইকে বলেছেন "এই কমল ঘোষ সেই জে. এন ঘোষের ঘরের ছেলে যাঁর ঘর থেকে তামাম হিন্দুস্থান একদিন বেগম আখতারকে শুনেছিল।

"এই বেগম আখতারই প্রথম বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেবকে নিয়ে আসেন মেগাফোনে, তথা রেকর্ডের জগতে"—বলছিলেন তাবাদা (ভীষ্মবাবুর দাদা)। "একদিন আখতারী বাঈ এসে বললেন' এক গাওয়াইয়া হ্যায়' বহুৎ আচ্ছা বেহেতরাস গানা গাতা। তানসেনকা ঘরাণা। "উনকা রেকর্ড কর দিজিয়ে। মেহের-বাণী করকে এক রোজ মেরা ঘর আনা।"

ওঁর ওখানে গিয়ে সেই প্রথম শুনলাম বড়ে গোলাম আলিকে। সে গান শুনে মুগ্ধ না হয়ে উপায় ছিল না। সঙ্গে সঙ্গেই

আনুমানিক ১৯৫২ সালে

করে ফেললাম ওঁর দুখানা গানের একটি রেকর্ড, ১৯৩৬ সালের ১ জানুয়ারী : হো সাহেব জমাল ও মেরে নয়না লাগে।"

সেই হল বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেবের প্রথম রেকর্ড এবং হয়েছিল বেগম আখতারের উদ্যোগে। .....

... ...১৯৬৮ সালে পদ্মশ্রী ভূষিত হবার পর আমিই সর্বপ্রথম একটি পত্রিকায় লিখেছিলাম একটি নিবন্ধ। গজলের বুলবুল হেসে বলেছিলেন : এতনা মহব্বত্‌সে মেরে লিয়ে এহি ভি পহলা আর্টিকেল"—

আর আজ? আমাদের সবার অলক্ষ্যে জলভরা চোখে তিনি কি অজানা লোকবাসীদের কাছে বলছেন "কলকাত্তা মুঝে বহুৎ প্যার করতা?' হায়। সে বেগম আখতারের গজল, ঠুংরী, কাজরী, চৈতি ছিল এত প্রত্যক্ষ, এত জীবন্ত—আজ তা স্মৃতি। শুধুই স্মৃতি।

... মনে পড়ে তাঁর মৃত্যুর ঠিক একবছর আগে মেগাফোন কোম্পানি থেকে তাঁর গজল-দাদরার এল, পি ডিস্ক প্রকাশিত হবার ঠিক আগে (১৯৭৩ সালের পুজো সিরিজে) আকাশবাণীর এক অনুষ্ঠানে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেবার সময় কানন দেবী বলেছিলেন "গজলের বেগম, বেগম আখতার।"

...এ ঘটনার কিছুদিন বাদে কলামন্দিরের এক সঙ্গীত-সভায় তিনি যখন গাইতে এসেছিলেন সেই কথাটিই তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম। সত্যি বেগম—বহুৎ দিনমে সেই

সে'ইয়াক দেখে'—গানটির সেই উদাসী মীড়ের সঙ্গে দীর্ঘশ্বাসের ছন্দ মিলিয়ে বলেছিলেন জ্ঞানদাও (জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ)।

"কানন গুঞ্জে বেগম বোলা? আচ্ছা? আরে উ-ও-ত বুলবুল খা"—কৌতুকে চোখ নাচিয়ে জবাব দিলেন বেগম আখতার।

লক্ষ্ণৌর ঠুংরী, গজলের রংমহলের বেগম ও বাংলার একদা বুলবুলের এই পারস্পরিক অভিবাদনের ভাষা-সৌন্দর্যে সেদিন অভিভূত হয়েছিলাম।

বেগম আর গাইবে না! নানান দিনের টুকরো, টুকরো রঙিন মুহূর্তের সুধাপাত্র থেকে গণ্ডুস ভরে নিয়ে আজ তৃষ্ণা মেটাবার পালা।

কবে প্রথম শুনলাম বেগম আখতারের গান?

"বেগম আখতারের ঠুংরী? আহা জোড়া নেই"—বলেছিলেন নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৬৪ সাল সেটা। ঝান্সীর কনফারেন্স থেকে ফিরে এসে নিখিলবাবু একদিন তাঁর ঘরে (তখন থাকতেন ৯০ নম্বর লিণ্টন স্ট্রীটে) বেওয়াজের বাজনার শেষে ঠুংরী, গজলের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন "এবার ঝান্সীতে বহুদিন বাদে আবার আখতারী বাঈএর গজল শুনলাম। আহা! এই বয়সে এখনও কি রস। ভাবাই যায় না।"

অজ্ঞতাপ্রসূতে কিঞ্চিৎ ভঙ্গিতে বলেছিলাম : সত্যি কোয়েলিয়া মৎ কুহরো না—গানটা যতবার শুনি আবার শুনতে ইচ্ছে করে। কি মেজাজ!"

"দূর! ঐ রেকর্ডের কথা কি বলছেন? ও ত সামান্য স্যাম্পল। এই বয়সেও দিওয়ানা বানানো যা যা গাইলেন!" বুঝলেন সন্ধ্যাদি, সব ভুলে হাঁ করে শুনতে হয়।"

বললাম : "একটু গেয়ে দেখান না? প্লিজ।"

সঙ্গে সঙ্গেই নিখিলবাবু তাঁর অননুকরণীয় অনুসরণ-কুশলতায় ধরলেন বেগমের একটা বিখ্যাত গান। কখনও ঘাড় দুলিয়ে, পরক্ষণেই মুচকী হাসির গমকে-যাওয়া সঙ্গতে। পরিহাসের ছন্দেই। পরিহাসের আড়ালে যা শোনা গেল সেটা কিন্তু পরিহাসের বস্তু নয়। কারণ ওরই মধ্যে ফুটে উঠল বেগম আখতারের গায়নশৈলীর এক উপভোগ্য আন্দাজ। গানের শেষে নিখিলদা আবো বিস্ময়ে বললেন : "সত্যি—এত রস থাকার কোনো মানে হয়?"

তার ঠিক দুবছর বাদে। ১৯৬৬তে। বালিগঞ্জ মিউজিক কনফারেন্সে ছিল বেগম আখতারের গান স্ব-কণ্ঠে কারো নিজের কবিতা শোনার আগে পর কৌতূহলে কবিকে দেখার মতই গ্রীন-রুমে উঁকিঝুঁকি দিয়ে আখতারী বাঈকে দেখতে গেলাম। প্রৌঢ়তের প্রান্তে তখন অবশ্যই পৌঁছেছেন। পরণে ছিল হাল্কা নীল রংএর জর্জেট। কিন্তু কাজল-পরা চোখের কৌতুক-দীপ্তি, মুখে হাসির আভা, আলাপে আলোচনায়, আনন্দে, চাঞ্চল্যে বড় প্রাণবন্ত মনে হল তাঁকে। আমার সঙ্গে উদ্যোক্তাদের একজন আলাপ করিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে সামনে আপ্যায়নে হাতের ব্যাগ থেকে একটি সুদৃশ্য সিগারেট কেস সামনে খুলে ধরলেন।

"না, না সে কি?" স-সঙ্কোচে হাত জোড় করি। মাঝখানের মত প্রসারিত আমার বাঁ-হাত পরিষ্কার নিষ্ঠুর বোধহয় আমার অজান্তেই তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকবে। "আরে উসমে কেয়া হ্যায়?"—বলে একটিতে নিজেই অগ্নিসংযোগ করলেন। চোখ অনভ্যস্ত বলেই বোধহয় সে দৃশ্য সহ্য করা গেল না। প্রায় ছুটেই চলে এলাম অডিটোরিয়ামে।

থেরেপ্যুটিক সেন্সের কোথায় যেন একটু আঘাত লেগেছিল। মনে হল আর্টিস্টদের দূর থেকে দেখাই ভাল। কাছে গেলে তাঁদের সম্বন্ধে কল্পনা-রঙিন ধারণা ঘুষে মুছে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। তাতে তাঁদের শিল্পের রসগ্রহণেও বাধা ঘটে। এইসব ভাবতে ভাবতে সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়েছিলাম।

কয়েকটি অনুষ্ঠানের পরে বেগম আখতারের নাম ঘোষিত সঙ্গে সঙ্গে করতালির উল্লাসে চমক ভাঙে। ওঃ এবার তাহলে আখতারী বাঈএর গান? কিন্তু আমার উৎসাহের উচ্ছলতা যেন মন্দীভূত। সে শ্রদ্ধার আলোর পটভূমিকায় রস নিটোল হয়ে দানা বেঁধে সেই আলো কে যেন নিভিয়ে দিয়েছে। রঙিন চেহারা। কিন্তু দুটি আঙুলের মধ্যে ধরা একটি বস্তু। ওঁদের জগতে নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু আমাদের সংস্কারগ্রস্ত মন যেন মানতেই চায় না।

হারমোনিয়মে মৃদু সুরের আভাস। তারপরই হঠাৎ কানে আসে "বরসে শ্যামসে ধারা।" খুব সোজা, হাল্কা সুর। কিন্তু প্রতিটি কথার বাঁকে সুরের সামান্যতম মীড়ের ছোঁয়াতেও রসের ফোয়ারা শিল্পীর হৃদয় থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে প্রতিটি শ্রোতার হৃদয়কে একনিমেষে যেন ভিজিয়ে দিল। কাঠিন্য, বিরূপতা মনের অজানতেই যেন ভেসে গেল ঐ সুরের ধারায়। বিস্মিত দু-চোখের দৃষ্টি কখন যে বেগম আখতারের মুখে ন্যস্ত হয়ে গেছে জানতেই পারিনি, কখনও পিলুর শৃঙ্গারকারুণ্য, কখনও কাফির ছোঁওয়া-লাগানোবভের পিচকারী, খাম্বাজের মিনতি, তাঁর আয়ত চোখের আর রঙ্গিন হাসির সঙ্গে মিশে, সুরের বর্ণনায় যেন নানারঙা আলোর প্রতিফলন লাগাচ্ছে। ভাষা বুঝিনি। কিন্তু মুখভাবের অভিব্যক্তিতেই ভাষার বক্তব্য যেন জীবন্ত হয়ে উঠছিল। বয়সের বেড়া ভেঙে চিরন্তন তরুণীর আবেগ যৌবনের শক্তিতে দুর্বার হয়ে উঠল। তারপর চলল শুধু গান আর গান। শ্রোতারা ছাড়তেই চায় না। কে একজন বলে উঠল "কোয়েলিয়া মৎ কুহুকারি যা"। একটু গুণগুণ করেই বললেন "আরে উ-ও ত ইয়াদ নেহি আতা।"

"আমরা ইয়াদ করিয়ে দিচ্ছি।" শ্রোতারা নাছোড়বন্দ।

তারপর শ্রোতারা দু-চরণ বলেন বেগম আখতার গান। আবার থামেন। আবার ওরা বলে, ইনি গান। ইনি থামেন। ওরা বলে।

এমনি করে যে কতক্ষণ চলল। এক উদ্বেল আনন্দের জোয়ার যেন আছড়ে পড়ল সারা প্যান্ডেলে। আর একবার উপলব্ধি করলাম, একাকী গায়কের নহে ত গান।

গানের শেষে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাতে গিয়ে তাঁর সিগারেট-ধরা দুটি হাত দুহাতে ধরে মাথায় ঠেকালাম। সেতারোচ্ছল নদীর মতই যেন হাসির জোয়ার বয়ে গেলো। আবার মনে হল শিল্পীর মনে বুঝি বয়সের ছাপ কোনদিনই পড়ে না। কোন সংস্কারের মালিন্য তার শিল্পী ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বলতায় ছায়াপাত করতে পারে না। একেবারে উল্টো যুক্তির তোড়ে ক্ষুব্ধ মনের মালিন্য কোথায় ভেসে গেল.....

তারপর কত আসরে বেগম আখতারের বহু গজল-ঠুংরীর রংবাহারের ঝিকিমিকিতে মনকে রাঙিয়ে নেবার সুযোগ এসেছিল।

১৯৭১ সালে গ্রামোফোন কোম্পানীর এক বিশেষ আমন্ত্রণে তাঁদের স্টুডিওতে গিয়েছিলাম। মিঃ এ সি সেন, সন্তোষ গুপ্তর আমলে। শুনলাম বেগম আখতার একটি ই. পি ডিস্ক্ করছেন চারখানি বাংলা গানের। গানের রচয়িতা ও সুরস্রষ্টা রবি গুহঠাকুরতা। প্রথম গানটি ছিল 'প্রোছনা করেছে আড়ি'। ভগ্নকণ্ঠেও বয়সের সে সমারোহ আজও এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হয়ে আছে। প্রতিটি সুরের বাঁকে বাঁকে স্বরের সেই স্বচ্ছন্দ বিহার, মীড়ের মোচড়ে মোচড়ে যৌবনবেদনাবসের উচ্ছল উচ্ছ্বাস সমস্তটা জুড়ে এক জগতের দুয়ারগুলো যেন দুমদাম করে খুলে দিল।

এ দরজা খোলবার ক্ষমতা বা অধিকার সবার থাকে না। কিন্তু 'পারে সে সে আপনি পাবে'।

আর তাঁর তুলনাবিহীন ঠুংরী-টপ্পা? গত চার-দশকেরও বেশী দিন ধরে বিভিন্ন যুগের শ্রোতারা শুনছেন তাঁর ঠুংরী, টপ্পা, কাজরী, চৈতিই শুধু নয়, কাওয়ালী। উর্দু-অনভিজ্ঞ শ্রোতারা, ভাষা অথবা গীতিকাব্যের মর্মলোকে প্রবেশের সৌভাগ্য যাঁদের ঘটেনি—তাঁরা মুগ্ধ হয়েছেন বেগমের সুরের অনাস্বাদিত মাদকতায় কিংবা বিষাদ-কারুণ্যের সূক্ষ্ম অভিব্যক্তির বেশে। আর যাঁরা বুঝেছেন তাঁরা নিজেদের হারিয়ে ফেলেছেন অবিস্মরণীয় এক অনুভবলোকে।'

ঠুংরী, গজল, কাজরী, চৈতি—অনেকেই গেয়েছেন বেগম আখতারের আগে এবং পরেও। তবু গজলের রংমহলের বেগম হয়ে হয়ে রইলেন শুধু বেগম আখতারই। এসব গান অন্যান্য কলাকারদের কণ্ঠে শুনেছি এবং ভালও লেগেছে। অন্যের কণ্ঠে যখন শুনেছি, মনে হয়েছে যেন বিরাট একটা বাগান থেকে নানা রং-এর ফুল তুলে রং মিলিয়ে সুন্দর করে মালা গেঁথেছেন অথবা পুষ্পস্তবক রচনা করেছেন সুনিপুণ মালাকার। কিন্তু বেগম আখতারের গান যতবারই শুনেছি ততবারই মনে হয়েছে গুলবাগিচার বেগম যেন তাঁর মহলে ঢুকে কখনও বেলা, কখনও চামেলী ফুলের গোপন গন্ধলোক খুলে দিলেন—আর মধুগন্ধভরা বসন্ত ছড়িয়ে পড়ল দিগদিগন্তকে রঙের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়ে।'

এ প্রকৃতি দুর্লভ এবং ঠুংরী-গজলে রং ফোটাবার এই অনায়াসদক্ষতা তাঁকে অর্জন করতে হয়েছে অনেক যন্ত্রণা সয়ে, ত্যাগ স্বীকার করে। সবার ওপর হৃদয় উজাড় করা ভালবাসা দিয়ে। গজল অথবা ঠুংরী গাইতেন বলেই যে খেয়াল, ধ্রুপদ অথবা রাগ-সঙ্গীত তাঁর জানা ছিল না, এ-কথা ভাবাও ভুল। ওস্তাদ আতা হোসেন খাঁ সাহেবের কাছে ইনি রাগসঙ্গীত, খেয়াল রীতিমত শিক্ষা করেছেন।

ভীষ্মবাবু ১৯৩৬ সালে তাঁর টেনিং-এ বেগম আখতারকে দিয়ে মেগাফোনে একটি রাগসঙ্গীত রেকর্ড করিয়েছিলেন কাফি-ভৈরবী রাগে 'মেরি বারিসি উমরিয়াদ' (ভীষ্মদেবের কণ্ঠে পরিবেশিত এই গানটির সুরেই 'নবারুণ রাগে' রেকর্ডটি কিংবদন্তী হয়ে অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে)। শুনেছি বিহার্সালের সময় বেগম আখতারের কণ্ঠে এই গানটি শুনতে শুনতে ভীষ্মদেববাবু তারিফ করে বলেছিলেন 'ইনি যদি খেয়াল বা রাগসঙ্গীত গান অনেক ওস্তাদ ওর পেরে যাবেন।'

কিন্তু না।' বেগম আখতার নিজেকে কারো ভীতির বস্তু করে তোলেননি। ধ্রুপদ, খেয়াল সবই তিনি যত্ন ও সাধনার সঙ্গে শিখেছেন। এ-সব গানের প্রতি যথাযোগ্য সম্মানও দিয়েছেন। কিন্তু হৃদয় দিয়েছেন ঠুংরী ও গজলকে। ১৯৬৮ সালে এমন্যাসী হোটেলে এক অন্তরঙ্গ এবং একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি আমায় বলেছিলেন 'ওস্তাদের কাছে খেয়াল শিখতাম; কিন্তু গজল ঠুংরীর মেরা দিলকা চীজ।' গজলের সুর কানে এলেই এক অজানা মাদকতায় মনটা যেন মেতে উঠত। —মৃদু হেসেই একটু থেমে শিল্পী গুন-গুনিয়ে উঠলেন 'কোই এহ্ কোহি যে গুলসান, গুলসান'। শেষের পর শের, তাঁর ওঠা-পড়া, মীডের মোচড়ে মোচড়ে কত না দীর্ঘশ্বাসের দোলা! —এ আলগ চীজ—গান থামিয়ে সগতমনে বলে উঠলেন,—যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছিলেন।

মনে আছে একদিন কৌতুকময়ীর সঙ্গে রঙ্গ করে বলেছিলাম 'মহিনজী কাজরী গাইবার সময় আপনার এত গদগদ হয়ে উঠবার কারণ কি?' কাজরীতে শুনেছি নায়িকা তার আপনজনের উদ্দেশে বিরহে আকুল হয়ে কান্নাকাটি শুরু করে। চোখের জলে কাজল ধুয়ে মুছে মুখে লেপে গিয়ে সে একটা যাচ্ছেতাই ব্যাপার হয়।

এ নিয়ে এত ভাবিতের কি আছে?'

বেগম ছিলেন স্বভাব-কৌতুকী। কিন্তু আমার এ পরিহাসে কৌতুকসঙ্গতের ধার দিয়েও গেলেন না। একটা ভাব-গভীরতার ছায়া যেন দু-চোখের চাউনিকে রহস্যময় করে তোলে—।'

মেয়েদের কাছে সাজ কত আদরের জান ত? এ বস্তু জড়িয়ে থাকে তাদের প্রাণের সঙ্গে। কিন্তু এ সাজকেও মেয়েরা অবহেলা করতে পারে কখন? যখন নিজেকে ভুল যায়? এতে করে কি বোঝান? একমাত্র ভালবাসার ক্ষেত্রেই আমরা নিজেদের অতিক্রম করতে পারি?'

সেদিন মনে হয়েছিল শুধু গানের বাইরের জৌলুষেই ইনি আত্মহারা হননি। প্রবেশ করেছেন তার অন্তরের অন্দর মহলে। তাই গানের রূপসৌন্দর্যই শুধু নয়—মর্মের দর্শনও তাঁর কাছে স্বচ্ছন্দে ধরা দেয়। সেই জন্যই এক লহমায় কৌতুকের উচ্ছলতাকে স্তব্ধ করে দিয়ে গভীর সুরে এমন গভীর কথা বলতে পারেন। প্রতিটি বোলের বার্তা মর্মে পশেছিল বলেই হয়ত বোলবানানোর অজস্র বাহার বেগম আখতারের কাছে এমন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতই সহজসিদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

ঠুংরী হল ভাবপ্রধান গান এই সহজ সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন বলেই অনাবশ্যক তান-অলঙ্করণ ও আঙ্গিকের অযথা বাহুল্যকে বর্জন করে শুধু সঙ্গীতের মর্মবস্তুকে মেলে ধরতেন বিপুল ভাবগৌরবে।

তাঁর চৈতীর তেমন উদাসী বিষণ্ণতা, কাজরীর চলচলমল

করুণ কাতরতা, সুরের রঙিন মায়া, বিরহ-বেদনা তাঁর গানে এমন সত্য হয়ে উঠতে পেরেছিল কেন?

এর কারণও খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের দ্বন্দ্ব, অন্তর্জ্বালা ও হৃদয়মথিত যন্ত্রণায়।

১৯৬৭ সালে এমব্যাসি হোটেলের সেই নিভৃত কক্ষে শুধু আমি আর বেগম আখতার। সেদিন ছিল ঈদ বা সম্ভবত এইরকম কোনো একটা পর্ব উপলক্ষে তাঁর উপবাসের দিন। বলেছিলাম, 'আজ কথাবার্তা থাক। আপনার কষ্ট হবে।'

'আরে কোই বাত নেহি। সুরেলা আদমীকা সাথ বাত করনেসে কেয়া তকলিফ? এ ত মেরা দিলকা আনন্দ।'

ওঁর জন্মভূমি হল ফৈজাবাদ। এই জন্যই সঙ্গীতমহলে ওঁর আর এক জনপ্রিয় নাম হল ফৈজাবাদী বেগম আখতার। পিতা ছিলেন জাস্টিস আসগার হোসেন। ৭ বছর বয়সে এক ফকীরের গান মনকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল। গানের প্রেরণা তিনিই।

'আব্বাজান গাতা হ্যায় মো দিলমে কুছ চোট লাগতা। আউর এইসে ভি মালুম হোতা—মুঝে ভি কৌশিস করকে গানা শিখেগা।'

সেই সময় থিয়েটারে চন্দ্রাবাঈ-এর গান শুনেছিলাম। ওঁর কাছেও যাতায়াত সুরু করলাম। গান শেখানোর ব্যাপারে খুব উৎসাহ দিতেন না। বলতেন 'ই বহুৎ মেহনৎকা কাম হ্যায়।' আমারও জেদ চাপল যেমন করে হোক গান শিখবই।

এ বিষয়ে পিতাজী ছিলেন একেবারেই বিমুখ। তিনি চাহেছিলেন যথারীতি শিক্ষা পেয়ে মেয়ে ঐ সমাজের বড় ঘরণীদের মতো চালচলনেই অভ্যস্ত হোক। গানের নামে বাবার ভ্রূকুঞ্চন। 'বড় ঘরের মেয়ে আবার গান শিখবে কি?'

'না, কিন্তু মেয়ের দিকে—শিখনেই হোগা। সবুর শিখেগা।'

এরই ফলে বাবা ও ভাসের সঙ্গে ঘটল মা-মেয়ের বিচ্ছেদ। দুজনেই দেশ ছেড়ে কলকাতাবাসী হলেন শুধু গান শেখাবার তাগিদে। এসে উঠলেন ২৯ নম্বর বিপন স্ট্রীটে।

প্রথম গান শেখা সুরু হয়েছিল পাতিয়ালা ঘরানার ওস্তাদ আতা মহম্মদ খাঁর কাছে। লক্ষ্ণৌর ইলিশ খাঁর আব্বা সখাবৎ খাঁ ওঁনকা দোস্ত থা।' খেয়াল শিখলেও গজলই ছিল তাঁর প্রাণ। আবার গুনগুনিয়ে উঠলেন 'কোই এহ কোহসে গুলসান, গুলসান—' কতরকম শের দিয়ে ভাববিস্তার। কখনও চমক, কখনও এগিয়ে যাওয়া। আবার পিছিয়ে আসা। যেন প্রণয়ভীরু হৃদয়ের দ্বন্দ্ব। উপরের দিকে গলাটা যেন একটু ভাঙল। কিন্তু রসভঙ্গ হোল না ত? মনে হল কোনো বন্ধ রসপাত্রের মুখ সহসা উদ্বেল রসে রসের বন্যায় চারিদিক ভাসিয়ে দিল। একটু চটুলতা। কিন্তু সেই চটুলতাই যেন রসের যোগান দিচ্ছে।

গান শেখা সুরু হল। আস্তে আস্তে গলার স্নেহ, তারিফ পেলাম। এরই মধ্যে বেগম আখতার রুস্তমদান করলেন একটি বিখ্যাত গজলের রেকর্ড 'ঊন আঁখো জাম বালা জান। শশু তক্ ভি না আকা।'

এই সময়ে ঘটল একটা রীতিমত এ্যাডভেঞ্চার। ১৯৩১ সাল সেটা। বিহারের বন্যার্তদের জন্য অর্থ-সংগ্রহার্থে আলফ্রেড থিয়েটারে একটা ভ্যারাইটি পারফরমেন্সের ব্যবস্থা হয়েছিল। উদ্যোক্তাদের অব্যবস্থায় অথবা যে কোন কারণেই হোক কোন শিল্পী এসে পৌঁছলেন না। ম্যাম একেসা পা। পাঁচ ঘণ্টার টিকিট বিক্রী হয়ে গেছে। যাকে বলে একেবারে পাকিজ হাউস। মঞ্চে আমার সোলো গাইবার ডাক এল আর শুনলাম শুধু আমাকেই গাইতে হবে, ভয়ে হাত-পা কাঁপতে লাগল। পাহেলী দফা হামকো ভেজো। ডর লাগা। মাম গা নেই শেখেগা—বলে প্রায় কেঁদে ফেলার যোগাড়। ওস্তাদ এসে ভরসা দিলেন 'ডরো মৎ বেটি, সবকুছ ঠিক হো যায়গা।'

তাঁর নির্দেশে ১৫ মিনিট ঠুমরী, তারপর গজল গাইলাম। ধীরে ধীরে সব সহজ হয়ে এলো। সব বহুত পসন্দ কিয়া তো দিল ঠিক হ্যায়।—তারপর একাই প্রায় দেড় থেকে দু-ঘণ্টা গাইলাম। শ্রোতাদের তারিফ যেন মনের মধ্যে প্রেরণার আগুন জ্বালিয়ে দিল। কতক্ষণ গাইছি হুঁশই নেই। মাথা পাচ হজার রুপেয়া বিহার ভেজা পয়লা পারফরমেন্সমে'—বলেই বেগম উজ্জ্বল চোখে চেয়ে থাকেন।

'তারপর?'

'দিল বঢ়া। যেতনা মেহনৎ কিয়া উতনা নাম ভি হুয়া। মেহনৎ করতে রহ। কিন্তু টাকারও ত প্রয়োজন। কাঁহাতক আর ঘর থেকে খরচ করে বাইরে গাওয়া যায়?

তেরো চোদ্দো বরসমে কোলম্বিয়ান থিয়েটারমে নোকরী কিয়া থা। গানকা নোকরী। ৭০০ টাকা থেকে ১৫০০ টাকা মাইনে হল। উসকা বাদ অ্যাকটিং ভি শিখা থা। কিন্তু তিন-চার, সাল বাদ ওস্তাদ বারণ করলেন 'আওয়াজ খারাপ হো যায়েগা।' নোকরী ছোড় দিয়া। ফিন ফিল্মমে কাম শুরু কর দিয়া। ইস্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানী কালী ফিল্মস, ম্যাডান থিয়েটারে—রাজাসাব, নলদময়ন্তী, জওয়ান কি নাসা, নাসীব কি চক্কর, মমতাজ বেগম। বোম্বেমে মেহবুব প্রডাকসনের রোটি, বাংলা ফিল্মের ঝালসাঘর।

এরই মধ্যে এক সময় রেডিও প্রোগ্রামও সুরু হল। কলকাতার রেডিও স্টেশনে ষোল বছর বয়সে প্রথম গিয়েছি। এখনও যেন চোখের সামনে ভাসছে ১৯৩৬ সালের সেই দিনটি। হেডফোন লাগিয়ে তখন রেডিও শুনতে হত। নার্গিসের মা জদ্দন বাঈ খুব ভালবাসতেন আমায়। কলকাতার রেডিও স্টেশনে উনিই আমায় নিয়ে যান রেডিও অফিস দেখতে। হঠাৎ একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে একটা গান গাইতে বললেন। গাইলাম একটা দাদরা।

'তুমহারা মালুম হ্যায় সারী হিন্দুস্থান শুনলিয়া তুমহারা গানা?'—গান শেষ হতে হেসে বললেন জদ্দন বাঈ। শুনে ভয় করলো।

উসকা বাদ রেডিও স্টেশন খুলা। হুঁয়া ভি গানে লাগা। সারা হিন্দুস্থান চক্কর লাগানে লাগা। জলসা, ক্লাব ইত্যাদিতে গাওয়া শুরু হল। রেওয়াজ করনে ভি টাইম নেহি মিলা। হামারা সাথ মাতাজী ভি কাশ্মীর গায় থা। এরপর বিয়ের কথা উঠতে বললেন, 'এয়রসা আদমী কো সাদী করো যায়সে ভি গানা নহি ছোড়নে হোগা।'

এই সময়েই লক্ষ্ণৌর এক গানের আসরে পরিচয় হল তরুণ ব্যারিস্টার আব্বাস সাহেবের সঙ্গে। প্রথম দর্শনেই প্রেম এবং হৃদ্দান। ব্যাপারটা পারস্পরিক।

'পয়লা গানামে মিলা। পরে প্রায়ই আসতেন লক্ষ্ণৌয়ে আমাদের বাড়ি। এই সময় লক্ষ্ণৌয়ে আইডিয়াল ফিল্ম কোম্পানীতে কনট্রাক্ট হওয়ায় ওখানেই বাসা বেঁধেছিলাম। আবার ঠিক এই সময়েই 'রামপুরহাটকা নবাব গানাকে লিয়ে বোলা গে।' রামপুর-দরবারের গায়িকা হিসাবে বেগম মাসে তিন হাজার টাকা মাসোহারা পেতেন। 'সে কঁহিন রামপুরহাট থাকতাম মনটা ছটফট করত কবে লক্ষ্ণৌ যাব। এমনই দোটানায় দিন কাটছে। একদিন আব্বাস সাহেবের সঙ্গে সাদীর কথা উঠল। সেই সময়ই গানের প্রসঙ্গ উঠতে উনি বললেন, 'হামারা ঘরমে গানা হোতা নেহি।'—শুনে বেগমের স্বপ্নের রাজ্য নেমে এল মুঠো মুঠো অন্ধকার। মা বললেন, দাঁড়াবার নেই এমন জায়গায় বিয়ে করে।

একদিকে গানের দুর্বার আকর্ষণ, অন্যদিকে যৌবনের সব-ভাসানো সদ্যতপ্রেম—কাকে বাধব, কাকে ফেলব? স্বপ্নের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত। অবশেষে কাঁচামনের কল্পনার ইন্ধনেই টানল বেশী।

এল রোজ ছুপকে সাদী কিয়া।' কেউ জানলো না। এমন কি মা-ও না।—

কিন্তু তাকে ঘিরে অন্ত স্বপ্ন, রোমাঞ্চ, রঙ্গিন উচ্ছ্বাস, সে আমার অন্তরের সবতুলালিত সাধ ও সাধনার কোনো মূল্যই দিল না। সব ছাড়লাম যার জন্য, সে আমার জন্য সংসারের এতটুকু বাধাকেও অগ্রাহ্য করতে পারল না। কোন প্রোগ্রাম অথবা মুজরো ফসকে দিত না। গানও প্রায় বন্ধ।

ছ'মাস বাদে বাধ্য হয়ে মাকে সব বললাম। আর স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে এলাম। উঃ! সে বন্ধনাকাতর দিনগুলির বেদনা ভোলার নয়। নিঃস্ব, রিক্ত, নরসাহারার জীবন। একেবারে পর্দানসিন। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা কারও সঙ্গে মিশতে দিত না। গান শুনলে হাসত। দেড় বছর রেডিও দূরের কথা, গুনগুন করে গানও করেনি সেই মেয়ে, গান যার প্রাণ। ভেবে দেখ কি অবস্থা? দিনে খাওয়া নেই। রাতে নেই ঘুম।' আমার মত সৌখীন মেয়েও সাজসজ্জা ভুলে গিয়েছিল।' একেবারে বক্কারোগীর মত চেহারা হয়ে গিয়েছিল। মা দেখে অত্যন্ত আঘাত পেলেন। বললেন 'মর গিয়া।' যে দেখে সেই বলে 'আবে উ-ও তো মর যায়েগী।'

'একটা কথা বহিনজী, যাঁকে অত ভালবেসে ঘর ছাড়লেন, তাঁর প্রেমেও কি মন ভরল না?'—স-সংকোচে প্রশ্ন করি।'

'আরে বেটী যৌবনের বেহিসেবী প্রেম যে উদ্দাম আবেগে ছুটে চলে, কোন ক্ষতিকে ক্ষতি বলে না মেনে। সে হল প্রাণের ধর্ম। কিন্তু মনের ধর্ম বলেও ত একটা জিনিস আছে? সে মন সে গানকেই দেওয়া হয়ে গেছে ক-বে, ভাল করে জানও হয়নি তখন। মর্মমূলে যার শাখাপ্রশাখার বিস্তার ক্ষণিকের ঝড়ে সে কি ভেঙ্গে যেতে পারে?' তাছাড়া জীবনের চঞ্চল লগ্নে যে মহামূল্য বস্তুটিকে অবহেলায়, শান্তলগ্নে সেই বেদনাই যে হয়ে ওঠে অন্তহীন। সে হাহাকার ঘুচবে কি দিয়ে?'

'বুঝেছি। তারপর?'

'সুনীল বোস তখন লক্ষ্ণৌর রেডিও স্টেশনে।' একদিন জবরদস্ত ধরে নিয়ে গেলেন আব্বাসকে বলে রেডিওতে। গাইবার তারিখও ঠিক। লেকিন বাইয়ে প্রোগ্রাম করা একেবারেই বারণ। ছুপকে যাবার চেষ্টা চলল। চুরি ধরা পড়ল। ওদিকে গানের বিরুদ্ধে বিধিনিষেধ,—এদিকে জিন্দেগী চাহতা গানে জিজিরে। তারই চরম পরিণাম আব্বাসের সঙ্গে ক্ল্যাশ। গান ছেড়ে ত আর বাঁচতে পারি না?'

'বুঝেছি। তারপর?'

'সুনীল বোস তখন লক্ষ্ণৌর রেডিও স্টেশনে। একদিন জবরদস্ত ধরে নিয়ে গেলেন আব্বাসকে বলে রেডিওতে। গাইবার তারিখও ঠিক। লেকিন বাইয়ে প্রোগ্রাম করা একেবারেই বারণ। ছুপকে যাবার চেষ্টা চলল। চুরি ধরা পড়ল। ওদিকে গানের বিরুদ্ধে বিধিনিষেধ,—এদিকে জিন্দেগী চাহতা গানে জিজিরে। তারই চরম পরিণাম আব্বাসের সঙ্গে ক্ল্যাশ। গান ছেড়ে ত আর বাঁচতে পারি না?'

সাতাশ ২৩ বছর বাদে আবার স্বামীর সঙ্গে মিল হল। এ দশ সাল ভোর দিল থাক হো গয়া। দুসরী কো শুনত হায় মগর ফিরকো গান ক্যায়সে শুনে?—রোমান্টিকা বেগম আপত্তার থামলেন। মুখে হাসি, কিন্তু চোখে জল টলটল করছে। আর কি? সবই ত শোনা হয়ে গেল।'

মুহূর্তের জন্য আনমনা হয়ে গেলাম।

হাস্কুবরী আখতারী বাই-এর গানের রঙ, বেদনা উদাসী কিন্তু মর্ম-ছোঁয়া সংবেদনশীলতার উৎস কি তাঁর সন্তরনা প্রেম ও বেদনার অনুভব? এই বেদনার গরলই বুঝি অমৃত হয়ে

স্বামীর সঙ্গে

ভরে দেয় তাঁর গানের পাত্র?, ব্যথার মূল্য দিয়েই যে আনন্দকে কিনতে হয়?

মনে পড়ল বড়েগোলাম আলির কাছেও ইনি ঠুমরীর তালিম নিয়েছেন। বহুৎ সৌখিন দিল ফৈজাবাদীকী, বলেছিলেন খাঁ সাহেব, সেই কথা মনে করিয়ে দিতে ডান হাত দিয়ে ডান কান ধরে বেগম বললেন 'হাঁ, হাঁ জরুর। গানের মধ্যে সব ছাড়ানোর কায়দা তো ওঁরই কাছে শেখা।' ওঁর কত রেকর্ডের গানের সঙ্গে বড়ে গোলাম আলি হারমোনিয়াম বাজিয়েছেন।

....চোখের সামনে ভেসে উঠল বহু দিন আগের স্মৃতির ছবি। মেগাফোন কোম্পানীর স্টুডিওতে আপনভোলা ভীষ্মদেব 'সে'ইয়া তু একে বারি আ'—সুর ভাঁজতে ভাঁজতে চলে গেছেন অনালোকে। তাঁর সেই আত্মভোলা মুখের দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন ফৈজাবাদী। সে দৃশ্য নজরে এসেছিল মে এন ঘোষের। অভিজ্ঞ মানুষটি হেসে বলেছিলেন, ওদিকে চেওনা আখতারী। ও হল আকাশের উড়ো পাখি। মাটির মায়ায় ও মন বাঁধা পড়বার নয়।'

যদু দীর্ঘশ্বাস ফেলে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন স্বপ্নপিপাসু আখতারী বাই।'

'জীবনের এমন কোন আনন্দ বা বেদনার স্মৃতি মনে পড়ে যার তীব্রতা অসহনীয়।'

আমার আচমকা প্রশ্নে চমকে উঠে এক লহমা ভেবে নিয়েই বেগম বললেন, 'মেরে সাদী করনেসে ১৫ দিন পহেলে কিসি কো মালুম নেহি থা হাম সাদী করেগা।'

সেই সময় কাথিয়াবেড়ে ধওয়াজী বলে একটা জায়গায় প্রোগ্রাম করতে গিয়েছিলাম। জিন্দেগী মে আচ্ছা গানা ত হুয়া। আমার সঙ্গে ওস্তাদ মুন্নে খাঁ আরও অনেকে ছিলেন। উ-ও লোক ভি নেহি জানতা মায় সাদী করনেওয়ালী। আর বিচিত্র এক অনুভূতির সুরে মন কেঁদে উঠেছিল—এই আমার শেষ গান। আর ত গাইতে পারব না? সে এক আশ্চর্য মুহূর্ত। চিরদিনের জন্য বিদায় নেবার আগে যেন প্রিয়তমকে আলিঙ্গন করা।

মাইক্রোফোন ছিল না। ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর গাইছি। আর ১৫ই অকটোবর সাদী। জীবনে এমন গান বুঝি কোনদিন গাই নি, আর গাইবওনা। গাইতে গাইতে আমি কাঁদছি। শ্রোতারাও কাঁদছে। রাত দশ বাজে গানা শুরু কিয়া সুবহ ন যাচে খতম কিয়া।

উইদাউট এনি ইন্টারভেল। ওটতাদও কাঁদছেন। এর পর তিন বছর আর যাই নি।'

বেগম আখতারের গানের বৈশিষ্ট্য কোথায়? ঠুমরীর দুটি ঘরানা বেনারস ও লক্ষ্ণৌর মধ্যে প্রথমটির প্রাধান্য নিয়ে যাঁরা দেশ জুড়ে-ছেন বসুলান বাঈ, সিদ্ধেশ্বরী দেবী ও গিরিজা দেবী। কিন্তু পূরব ও পাঞ্জাবী ঢঙের বর্ণসমৃদ্ধ সম্মেলন ঘটেছে বেগম আখতারের অভূত-পূর্ব গায়কীতে। বড়ে গোলাম আলি ও তাঁর ভাই বরকত আলির শিক্ষাও তাঁর গানকে করে রসোত্তীর্ণ। গোলাম আলি বলতেন 'কহুঁ শৈখিন দিল ফৈজাবাদীকী।' ফৈজাবাদী বেগম আখতারের এই নামেই তিনি সঙ্গীত মহলে জনপ্রিয় ছিলেন। গানের ঠুমরী, কাহেগায়কী, ভাতখণ্ডী, চৈতির গীতিকাব্যিক সৌন্দর্য যেন নানা রঙের ইন্দ্রধনুর মতই শ্রোতাদের মনের আকাশ রঙিয়ে তুলত। তার কারণ রাগের গভীরে প্রবেশ করে তার সবটুকু রস পুরোপুরি আদায় করে নেবার দুর্লভ ক্ষমতায় তিনি ছিলেন তুলনাবিহীনা। ঠুমরী সম্পর্কের সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন বলেই ঠুমরীর সম্পূর্ণ রূপটি তাঁর গানে এমন আশ্চর্যভাবে ধরা দিত। ঠুমরীর বস্তুসৃষ্টি করতে হলে যে বস্তুটির প্রয়োজন সে হল কল্পনার অজস্র বৈভব।

এ বৈভব ছিল বেগম আখতারের। আর তার সঙ্গে মিশেছিল তাঁর শিল্পীজনোচিত সংযম। তাই মাধুর্যের বর্ণা শতধারে উচ্ছলিত হলেও কখনও তরল অথবা অলংকার বাহুল্যের অসংযম তাঁর গানে রসাবচ্যুতি ঘটায় নি। অলংকরণের মিতপ্রয়োগের কারণেই তাঁর গানের এস্থেটিকস এত উজ্জ্বল হয়ে উঠত। বেগমের গানের ভারসাম্য রক্ষার রহস্য ছিল এইখানেই। তিনি শুধু ঠুমরী, দাদরা, কাহেগায়কী, চৈতীর অপূর্ব গায়নশৈলীই সৃষ্টি করেন নি। সেই গায়কীর অধীশ্বরী হবার গৌরবও অর্জন করেছেন। হায়! ঠুমরী শুনব ত কতজনের কাছেই। কিন্তু বেগম আখতার কি আর জন্মাবেন?

'আপনি ত তামাম হিন্দুস্থানকে গানে মুগ্ধ করেছেন। কিন্তু আপনাকে কোনো শিল্পী গানে মুগ্ধ করেন নি?'

'আলি আকবরের সরোদ প্রথম শোনার দিনটি মনে রাখবার মতই। বাজিয়েছিল আহির ভাঁইরো। সে বাজনা শোনবার পর সাত রোজ মেরা আঁখসে পানি গিরা। সরোদ ইসসে আচ্ছি হামনে নেহি শুনা। আর্টিস্ট মেরা খেয়ালসে একই হ্যায়। উ-ও আলি আকবর। ম্যয় নে আউর কোই আর্টিস্ট দেখাই নেহি।'

ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ কি জানতে চাইলে বলতেন, 'হ্যায় বহুৎ আচ্ছি, অথবা এতনা খারাপ যো সামবামে নেহি আতা।'

তরুণ শিল্পীদের মধ্যে নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুনন্দা পট্টনায়ক সম্বন্ধে খুব উঁচু ধারণা পোষণ করতেন। নিখিল? নিখিলের বাজনার ভবীকাল আলি আকবর, রবিশংকর, বিলায়েৎ খাঁ সকলের বাজনারই একটা আন্দাজ পাবে।'

সুনন্দা পট্টনায়কের কথা এসেছিল সেই প্রসঙ্গে। উনি খুব দুঃখ করে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন:

'১৯৫৭ থেকে ৫৮ সালেই বোধহয়। এক শিল্পীর গান সারা ভারতের সঙ্গীত সমাজকে চমকে দিয়েছিল। যে সে তার গান শুনেছে তাদের মুখে তার গানের সুখ্যাতি আর ধরে না। অথচ বোম্বে, দিল্লী, কলকাতার কোন শিল্পী অথবা সঙ্গীতজ্ঞের কাছে যেই না জানতে চাই সে কেমন গাইছে সবাই মুখ বেঁকিয়ে তাচ্ছিল্যের সুরে বলেন, 'এমন কিছু নয়। ওকে নিয়ে সবাই যে কেন এত মাতামাতি করে বুঝতে পারি না।' বোধহয় তানাটা ঝাপটে গায় বলে। ভবিষ্যতে অবশ্য ঠিক গায় না।'

একদিন জ্ঞানবাবুকে (জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ) জিজ্ঞেস করলাম: কি ব্যাপার? ওকে নিয়ে এত কনটোভার্সি কেন? ওস্তাদজীর জেলাসি? আমি কখনও ওর গান শুনিনি বলে জিজ্ঞেস করছি। জ্ঞানবাবু বললেন, 'দেখুন ও ভাল গায় কি মন্দ গায় সে বিচারের মধ্যে না গিয়েও এইটুকু বলতে পারি যে, ওর ভয়েস খুব পাওয়ার-ফুল, প্রতিভার অধিকারিণী এবং সব রকম শ্রোতাদের মুগ্ধ করার ক্ষমতা ওর আছে। দোষ-ত্রুটি থেকে কোন শিল্পীই মুক্ত নয়। ওরও থাকতে পারে। সেটা স্বতন্ত্র প্রশ্ন। কিন্তু বিশেষ একটা আর্টিস্টের কোন ত্রুটি-বিচ্যুতির কথাটা ফলাও করে বলার মধ্যে একটা উদ্দেশ্যমূলক মনোভাব থাকাটা খুব অস্বাভাবিক নয়।'

কথাটা আমার মনে লেগেছিল। কারণ জ্ঞানবাবু বাজে কথা বলবার মানুষ নন। অনেক দিন কেটে গেল। ঝাড়খণ্ডীতে প্রোগ্রাম করতে গেছি ১৯৬৪ সালে। আমি গ্রীনরুমে বসে গলাটা গরম করে নিচ্ছি। হঠাৎ দরজাটা কে খুলতেই স্টেজ থেকে গানের আওয়াজ ভেসে এল। শুনে চমকে উঠলাম। কি উদাত্তপূর্ণ কণ্ঠ। প্রতিটি স্বর কিরকম সুরেলা। আর গলায় কি রেঞ্জ। সবার ওপর প্রাণঢালা আবেগ। শুনেশুনে মুগ্ধ এ্যাসপ্ত মালয়ে হোতা মবিদমে রোই ভস্ত আরাধনামে বৈঠা: সেই দিনই বুঝেছিলাম শিল্পী ও সঙ্গীত মহলে কেন সুনন্দা পট্টনায়কের নিন্দায় মুখর? এ বস্তু যে ওদের নাগালের বাইরে।'

আমি বললাম: আপনি কি জানেন ওঁর গান কখনও কোন কনফারেন্স থেকে রিলে হয় না? ও ন্যাশনাল প্রোগ্রাম করে না? কারণ কোন রকম উঞ্ছবৃত্তিতে ও নারাজ। এমন কি গ্রামোফোন কোম্পানীও ওর প্রতি তেমন মনোযোগী নন?'

বেগম হেসে বললেন 'আরে বাপরে বাপ—রেডিও গ্রামোফোন আমার দোস্ত। ওদের নিন্দে শোনা আমার উচিত নয়। তবে ইয়ে মেরা মালুম হ্যায় সুনন্দা পট্টনায়ক জন্ম-সুযোগিনী। ওর আওয়াজই শুধু অসাধারণ নয়। অসাধারণ ওর বুকের পাটাও। পটবর্ধনজীর তেজ ও ওংকারনাথের সৌখিন লালিত্যের এক আশ্চর্য মিলন ঘটেছে ওর স্ব-সৃষ্ট গায়কীতে। তবে আমার বিশ্বাস আবদুল করিম খাঁ সাহেবের ঢংটিও ওর কণ্ঠে খুব মানাত।

শেষ প্রসঙ্গ। মেগাফোনে জে এন ঘোষ ইনাম দেনেকো লিয়ে এক জলসা কিয়া থা। উসমে এক চাঁদিকো কাপ মুঝেকো দিয়া অন্নাউদ্দিন খাঁসাব। আলাউদ্দিন খাঁ সাব আমার খুব স্নেহ করতেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় আপনা থেকেই মাথা নুয়ে আসে।

ঐ মেগাফোনেই একদিন দেখেছিলাম ভূপীন্দরজী একটি মেয়েকে গান শেখাচ্ছেন। প্রতিভায় জ্বলা জ্বলা করছে দুটি বিরাট চোখ। তেমনই অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রী। গলার আওয়াজে একবার শুনেছি কানে লেগে থাকে। শুনলাম সেই তখনকার বিখ্যাত চিত্রতারকা কাননা। আমার সঙ্গে আলাপও হল। ভারী মিষ্টি স্বভাব। তোমরা বাঙ্গালী মেয়েরা যেমন নম্র-মধুর। আমার খুব ভাল লাগে। আচ্ছা, ও আজকাল গায় না?'

না বহিনজী। ঈশ্বর তাঁকে অপরূপ কণ্ঠ দিলেও গানের প্রতি হোপ দেন নি। তাঁর একমাত্র প্রেম ঘর-সংসারের সঙ্গে। পাইস শিল্পীরা গানের জন্য সংসার ছাড়েন। আর উনি গান ছেড়ে সংসারের কাছেই আত্মসমর্পণ করেছেন। সেই প্রেমে আজও এতটুকু ভাটা পড়ে নি। পুরোদমেই চালিয়ে যাচ্ছেন।'

ভারী মজার কথা বলে তা বেগমের হাসি যেন শেষ হতেই চায় না। সেই হাসির রেশ থাকতে থাকতেই সেদিন বিদায় নিলাম।

• ফটো: রবি গুহমজুমদার এবং জয়দেব মুখার্জির সৌজন্যে।

• ভীষ্মদেবের ছবি দিয়েছেন দীপ্তিকণা চট্টোপাধ্যায়।

বৃষ্টি

অমর মিত্র

সবা আষাঢ়ে আকাশ হয়েছে ঠা-ঠা গনগনে নদী। নীলিমায় ধূসরতা। ভিজে-ভিজিয়ে আগুন নামছে মাটিতে। মেঘের আশায় চোখ রাখতে রাখতে ধাঁধা লেগে যায় মানুষের। বৃক্ষহীন মাটিতে তৃণের চিহ্ন মাত্র নেই। গরু মোষ মুখ ঘষে ঘষে সন্ধ্যায় ক্ষুধার্ত দেহে বিকট চিৎকার ছাড়ে। জলের কুয়োর সন্ধানে গিয়ে কণ্ঠ শুকিয়ে এক সন্দেহ ছটফটিয়ে পাথুরে মাটিতে আছড়ে মারা গেল। বাগড়িহা খালের জল শীর্ণতর, সামান্য ভিজে জলাবেধায় মানুষের অবগাহন হয় না, চামড়ে জল যাবে কিভাবে। বীজতলা মর মর। কুয়োর ভিতরে বালতির শব্দ রয়, জল ওঠে না।

এমন আষাঢ়ের দিনে রম্ভা গাঁয়ে বম্ভাপাট দেবীর থানে কুড়িটা মোরগের মানুষ প্রমা হয়ে উপোসী দেহে ধর্ণা দিল। মোল্লা প্রতি একটা পাঁঠা বলি হল। গভীর রাতে থানের চারপাশে বড় ধরল বীভৎস। দেহাবিব মুখে একগাল হাসি, ব্যাকড়া হয় নি। মানুষেরা চড়াই থেকে নামার পথে আর চোখ মেলে, মেঘ আসে কই। ভর হল না দেবীর তবুও .। ঘি পুড়ল এত মেঘ আসে কই। ওরা নামতে নামতে ভাবে নিশ্চিত পাপ ঢুকেছে কোথাও. দেবী অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

বাবুরা আগে আগে যান, আর সকলে পিছনে। বড়তি-পড়তি মানুষগুলো সভয়ে আকাশ দেখে, ভয় বুঝি বা তাদের পাপেই আকাশ নির্মেঘ। চার কুড়ি বয়সের সাড়ো হাড়িবন্ধু লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বলে, 'হোয় পাপই বটে, মুদের সময় দিথেছি ই ধানের চাহিমে, বলি পড়ল ঘি পুড়ল এই আশমান কুড়ে কিহ পলষ লাচন গজ বাত ভর।'

চুটায় আগুন লাগিয়ে দু কুড়ি বয়সের দৈত্যারি, লোকের কথায় দইতারি থনথনে গলায় চিৎকার করে ওঠে, 'হোয় মাঘ আর আসবেনি।'

হোয় শালেরা, দুজন ছুটে যায় যদি কি।

বস বলছিনু হোয় দিখ ম্যাঘ আসেঠে।

গোটা তিরিশেক মাথা ঝপ করে উঠে যায় উপরে, বস করঠ, আশমান খাঁ খাঁ ময়া হান্ট, দেবতিলিমা ফরস. শালেরা হায়ামি', হাত বাড়ায় একজন। হঠাৎ বিশাল এক গর্জন এই গোটা তিরিশেক মানুষ থমকে যায়, নিচের মানুষ চিৎকার করে উঠেছে—গুম গুম ধামসা বাজিয়ে দেয় বাবু-বাড়ির মুনিষ সাঁওতালটা। ইশেনে কালো মেঘ।

দইতারি হাঁ করে চেয়ে থাকে। ঘুড়ো হাড়িবন্ধু জানা বাবু সাউবুরো—। চড়াই উৎরাই ঘেরা জঙ্গল ফুটিফাটা মাঠ জঙ্গল ফুড়ে নেমে আসা বালুময় ছিন্নভিন্ন শীর্ণ খাল, সব ভেসে গেল মোষ সব স্থির দৃষ্টি ফেলেছে আকাশের দিকে। ভয় মুক্ত মাই চিৎকার করে উঠেছে জীবিত মৃত সকলে। মেঘ কাটছে না। মন্থরে মিশে যাচ্ছে শেষ বেলার আকাশ। চারদিকের উজ্জ্বল আলো নিভে আসছে। একটা দিন শেষ হল।

কাল মুদের গাঁয় বম্ভাপাট দেবীর থানে ধর্ণা দইব. কারা যেন চিৎকার করে ওঠে। পাপ ঢুকিছে মানুষের ভিতর, দেবীর সন্তুষ্টি চাই।

দইতারি দেখে, হ্যাঁ তাদের গাঁয়ের মানুষ। মোল্লা আঁধার কুলি, কোনকালে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এই মন্দা দেবীর মূর্তি নিয়ে তাঁরই নামে থান, এখন সে অশ্বত্থতলা অবহেলিত। সেখানেই ধর্ণা হবে, ফিরতি পথে বাবুরা ঘোষণা করেছেন।

টিলা থেকে সমতলে নেমে আসায় বম্ভাপাটের বিশাল বটের ঝুরিসো কালো মাথা ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ছিটকে-ছাটকে একেক দল গাঁয়ের পথ ধরেছে মুখে আবার নেমেছে হতাশা। বৃষ্টি এলো না মাই আরো বলি চাই।

নদীর নাম সুবর্ণরেখা। নদী বিচ্ছিন্ন করেছে এই বিশাল ভূখণ্ডকে মূল পশ্চিমী থেকে। অরণ্যময় এই অঞ্চলে কঠিন দুর্গমতা। নদী পার হয়ে তবে যেতে হয়। পূবের দিকে বহুক্ষণ চলার পর পাওয়া যাবে কুড়ি ঘাট। পথ আট ক্রোশ। আর নদী পেরিয়ে নাক বরাবর মাওয়া গেলে [illegible]

আঁটা রাস্তা গেছে বহুড়াগোড়া হয়ে রাঁচির দিকে সোজা পশ্চিমে আর দক্ষিণে বোম্বাই রোড গিয়ে ঢুকেছে উড়িষ্যায়। নদী গর্ভীমে হালি ভাসা। নদী পিছনে রেখে ক্রমশঃ এ-গ্রামে এগিয়ে এসে চড়াই উৎরাই-এ উঠা-নামায় শরীর হাসফাস করবে, ক্রমে অং চন্দ্রাকার ঘন অরণ্যের ভিতর হারিয়ে যাওয়া ছাড়া পথ নেই নতুন মানুষের। এই অরণ্য নির্মূল করে কোথাও কোথাও গড়ে উঠেছে ছোট ছোট গ্রাম। এখানেই আঁধারকুলি, এখন অল্প রাতে দইতারি তার গাঁয়ে এসে পৌঁছয়।

ষষ্ঠি গুনে গুনে তিন ফোঁটা। কানের ডগায় এক ফোঁটা, হাত আর নাকে শেষ দুই ফোঁটা। এর পর যেমন তেমন। বাওনাস সময় জনাকয়েক বলে যায়, বিশ্বাস না হলি দেরাতির তুষ্টি হয় কিমনে, হাবামি দইতারি মকসমা করে দেবতি লিয়া উহার পাপে মুরা মরন ডাকি—।

ঘরে ফেরার পর বুকটা হয়ে যায় পাথর চাপা। মনে মনে একশোবার গড় করে, হোন মাঈ, মু মকসবা করি নাই, শাপ দিঅনি। ভক ভক করে চুটা টানতে টানতে সে সামনের মাঠে ঘুরপাক খেতে থাকে। ফিন ফুটা জুছনায় পাবহে পাবহে তার পর দেখায় ধুমসো ভূত—অন্ধকার জড়ান চড়াই যেমন। হাত-পা বেঁকিয়ে কালো কালো মানুষ বৈশাখ চাঁদের তলায়, পিলে-পিলে খাচ্চা নিয়ে মুরগির মত।

হোর ভাগর বিটিখানি বাইর হইছে চাঁদনি তলায় সরম লাই গও। যাবু কাই?

দইতারি পায়ে পায়ে এগোয়।

ধান ভানিতে। খিলখিলে কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

উমির যাতি হবে নাই, ঘর যাহু। সে খেঁকিয়ে ওঠে।

এখন কপাল তাতলে কি হয়, সোমত্ত মেয়ে রাত-বিরেতে মানুষের ঘরে ঘরে ধান ভানতে এ-সব দইতারির সহ্য হয় না। জমি-জমা বেহাত হলেও মেজাজটা রয়ে গেছে। সুডসুড়িয়ে বছর পনেরোর মেয়েটি ঘরের ভিতর গিয়ে ঢোকে।

তার ঘর, তার বাস্তুভিটে—। প্রবল জ্বালা বোশেখিতে গাছ থেকে ফস্ করে উড়ে পড়ল এক বাবুইয়ের বাসা। ঢুকলো গিয়ে সেখানে দুই মাঠের পোকা। ভাঙাচোরা খসে পড়া ঘর, বারুই উড়ে গেছে, আলো জ্বলে না। দুই মাঠের পোকায় ভরে হল দশের, দশে দশে এক কুড়ি। আর আঁটে না। বাবুইয়ের বাসা ফেটে যায়, উড়নি বাতাসে ভেসে যায় এখানে ওখানে। বোশেখি তাতলায় পুড়ে খাক হয়ে যায়। এমনি হল সেই বাস্তুভিটে।

মাঈ মন উচন পাটন করে...। ঘরে ফেরা মানুষগুলোর কথা তার ভিতরটাকে গুড়িয়ে দিচ্ছে বন্ধ মাঈ তুর কথা বুলি নাই, পাপ। ঘর অসে পাপ নাই।

সে আস্তে আস্তে ঝুপড়ি ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ে। মৌল আর অন্ধকারে মাখামাখি কালো গন্ধ। মাথা ঝিম ঝিম করে ভোটকা অন্ধকারে। কোথে চুপ মেরে বসে আছে মেয়েটা, দেখা যায় না।

—মুড়ি আছে কি নাই?

ঘর নিঝুম, জবাব আসে না।

—ক্ষুধা হইছে বিকট, দিনভর উপাস ছিলাম।

অন্ধকারে গাঢ় নৈঃশব্দ হয়।

—কাল উপাস যাবি বন্ধা মাঈর থানে ধর্ণা হইব?

মেয়ে একথা শোনে। ঘন অন্ধকারে জড়িয়ে শরীর ঢাকে। তার এখনো কোন কথা নেই। দইতারি ঘরের বাইরে আসে, মেয়ে কোন জবাব দেয় না কেন? একটু পরে সে ভীষণ ফ্যাসফেসে গর্জনে কঠিন শব্দ হয়ে ওঠে। তার ভিতরে ভয় ঢুকেছে। দেবীর শাপের ভয় তার মাথায় খড়গ তুলেছে। ভিতর থেকে অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, থিরথির হাল্কা হাওয়ায় তাঁক্ষ্য বল্লম হয়ে আসে।

—অশুদ্ধি হইছি মায় কইছে। সদ্য ঋতুর ভারে হতচকিত মেয়ের কণ্ঠস্বর ভেঙে ভেঙে আসে। হোস বান্ধা রমনী হইছে ছাটি, অঙ্গে তাহার বমনীর বাস। দইতারির মাথায় ঘুরে লাগে। মাঈ ইমন দিবসেও মায় আসে না, ফসল ফলিবে কি করি হে পিথিমীতে। ফসলের কাল যে শেষ হয়, মাটির দিন নিস্ফলা যায়। কঠিন জ্যোৎস্নায় দইতারি ছটফটায়। স্তব্ধ আকাশের দিকে চেয়ে অন্য রকম হয়ে যায়। বুকের ভিতরটা কেমন করে যেন—তার মেয়েটার বয়স হল এখন ওর জন্য পুরুষ চাই। বিয়েতে খরচ অনেক। পেটে অন্ন আসে না আবার বাপ-মা মেয়ের সাধ আহ্লাদ।

ভাঙ্গা দাওয়ার কোণে কলস ঢং ঢং, তলানি পড়ে আছে সামান্য মহুয়ার মদ। বিড়বিড় করতে করতে কলস তুলে ধরে দইতারি। দু পা তেরচা ভেঙে মেরুদন্ড টান টান করে ঘাড় বেঁকিয়ে ফোঁটা ফোঁটা মদ জিভ দিয়ে টেনে নেওয়ার সময় দইতারি ব্যাঙ হয়ে যায়। তারপর এক সময় সেই ব্যাঙ মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে দাওয়ায়। ছেঁড়া চালের ফাঁক দিয়ে অল্পস্বল্প জ্যোৎস্না গড়ায় তার দেহের এখানে সেখানে।

এর পর সকালের কথা—

পিছনে ঢাক, দেহুরি পূর্ণ কুম্ভ আনেন মঙ্গলের ঘর্ণা থেকে। হাতে ছোট একটা মুরগি ঝুলিয়ে দইতারি খলখল হাঁটে। মাঠের ভিতর রন্ডা মাঈর থান। ভোর ভোর পাখি সাখি উড়িয়ে দিয়ে দেবী গ্যাট হয়ে বসেছেন। ওধারে পাঁচ-পাঁচটা কুচকুচে পাঁঠা বাঁধা রয়েছে। বাবুরা মানত করেছেন। সঙ্গের মুরগিটা নিয়ে দইতারির চিন্তা কম নয়। দেহুরি ঠ্যাং নেবে তো। বুকের গভীরে ঢাক বাজে। কি জানি কি হয়। তেল চুকচুকে পাঁঠার কাছে এই মর মর কুকড়া। দারোগা সাব নিলনি।

দেবতির লিয়া আনিছি, দেহুরির চোখে চোখ পড়তে বলে। দেহুরি ফিরেও তাকায় না। মুহূর্তের জন্য মুখে বিকৃতি আনে মাত্র।

মাঠের চাদমারায় জানাবাবুর জেঠেল তাকে জখম করেছিল। থানা থেকে বড়বাবু এসেছিলেন গাঁয়ে কি যেন এক কাজে। দইতারি তার পোষা মুরগিটা তাঁকে দিতে গেলে তিনি গোঁফ নাচিয়ে চিৎকার করে ওঠেন, শালাহ্ ঘুষ....। বড়বাবু তাকে ক্ষমা করেন কি করেন বাবুদের। বাবুদের বাড়িতে সেদিন নধর পাঁঠা মারা হয়েছিল।

ইখন দেহুরির দয়া, দেহুরি এই মর মর কুকড়া লিবে কি, পাঁচ পাঁচখানি পাঁঠা দিয়াছে পাঁচবাবু। মর পাপ খন্ডনের লাগি মাঈরে কুকড়া দিতা হবে।

দইতারি মানুষের ভিড়ে সিটিয়ে থাকে। উসখুস করে এক সময় বলেই ফেলে, ইটা মাঈর খসের লিষা।

হক্ক অন্ন জুটে নি বলির লিষা কুকড়া আনিছে। দেহুরি মুখ বেঁকায় মর ঘরে পাপ ঢুকিছে মানুষ বলে, সোউ জনা নাকি জল নামে নি।

রাখ বেটা ফেলে রাখ, ছিবি দিখ।

সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। কৃতজ্ঞতায় এতটুকু হয়ে যায়। নাহ্ দেহুরির দয়া আছে। মুরগিটা রেখে সে গড় হয়—মাঈ পাপ খন্ডন কর।

এখন দেবীর আরাধনা। রন্ডা গাঁয়ের রন্ডাপাট মাঈর শক্তি এখানে প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কত যুগ আগে তা কেউ বা জানে। অতঃপর দেবী নাকি শিমুল পাহাড়ে চলে গেছেন, কে যেন এমন স্বপ্নই দেখেছিল। গাঢ় আলতা রাঙা পা মেঘের মত চুল আর লোলজিহ্বা নিয়ে মন্থর পদে তিনি চলে যাচ্ছেন মৌজা ছেড়ে ঐ পশ্চিমে। মেঘ চলেছে মাথায় মাথায়, পিছনের মাঠ ফসল বোদে আছাড়িপিছাড়ি খাচ্ছে। মৌজার পর মৌজার পর মৌজা খর রৌদে দাউ দাউ করে জ্বলে যাচ্ছে। এই স্বপ্নকে দেখেছিল কেউ জানে না। পশ্চিমে শিমুল পাহাড় কোথায় কেউ জানে না। বিশ্বাস অবিশ্বাসের স্বন্দের দেবীর পূজার এখন তেমন জমক নেই। এই বছর সেই স্বপ্নদৃষ্ট দিন বোধহয়। পৃথিবীর বুকে লাঙল বসে না, অথচ ফসলের দিন এল। বীজ বপনের দিন।

নিকানো মাটিতে ছয়টা সঁদুরে ফোঁটা দেয় দেহুরি। পূজার কাজকর্ম করে। উপরে অশ্বত্থের পাতা দমকা হাওয়ায় দোলে, বৃদ্ধ শাখায় কাক ডাকে। আচমকা পাখি ডেকে যায় তীক্ষ্ণ। চাক বেজে উঠেছে।

পেট হাই হাই করছে। দইতারি স্থগীত চোখে চারপাশ দেখে। মন্ত্র বহুক্ষণ ধরে উচ্চারণ হয়। তার পেটের ভিতরে কি লাফায়, কোন জন্তু? ভিতরটা হাসফাস করছে। ফোঁটা ফোঁটা জল নামে মাটিতে, তার হাতে এক ফোঁটা। সে চমকে ওঠে। তারপর লজ্জায় মাটিতে মিশে যায়। ব্যাঙ জিভ টেনে নেয় মুখের ভিতরে। চোখ সরিয়ে নেয় পূজার উপাচার থেকে। মাইভাবি কি মই, ভিতরে মর পাপই আছে....। সে নড়ে বসে... মাঈ তু পাপ খন্ডন কর, রদ কাঁরি নাই মু। যা জমিন ছিল বিঘাটাক ইবার হালহলনি, ধারুর দলিলে উঠি গিছে জলে মর হবে কি? জমিন নাই জল পড়িয়ে কিসে। মর তো কুকড়াই তা টিন বেহার সময় হইছে গোসাই

আনার টাক নাই। তুমার কুকড়াটি লে মাই, রমিনটো ঘুরান দে।

এই অশ্বত্থের তল ছায়া ঘন। এর বাইরে পৃথিবী রুদ্রমোক্ষ। এখন এই ছায়াই আশ্রয় হয়েছে আশপাশের মৌজার মানুষের। দেবী মেঘ আনবেন। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামবে। বীজ বপন হবে, গর্ভ সঞ্চার হবে মাটির। এই বৃষ্টিই অন্ন বৃষ্টিই সম্পদ। বৃষ্টিই আশ্রয়। খরাবোদে ঋতুকাল বিফলে যায়। আকাশের ঐ মেঘেই জীবনের সূচনা।

তার মাঠে যাবুবাড়িব হাল দেখে সে লাফ দিয়ে পড়েছিল এক পাহাড় ক্রোধ নিয়ে। বল্লুক করল মাটিতে, সে উল্টে পড়ল চমিনে। বাবু শ্রীযুক্ত স্বপনেশ্বর জানাবাবু হাসলেন আরে গোষাতুমি করলে হয় আগের দলিলে তো এই দাগটাও বেজিস্ট্রি করি দিছিস।' বাবু চশমায় ফাঁক দিয়ে দেখেন, হে হে এখন তোর ঢন্ ঢন্, এখন টাকা না পড়লে কি হয় কাগজ বলছে, টাকা তো যুবান দিতে পারবিনি'। দইতারির ভিতরটা ঝিম ঝিম করে ওঠে ইটা কি মনে হয় মু জানিনি ইটা কনে ধরম, মরে শেষ-টুকু মরে জানান না দিয়া চলি যায়।

ছাগ মুন্ডে থেকে রক্ত নামছে মাটিতে। পঞ্চম ছাগ মুন্ড, বলি শেষ। তার চমক মেরে। মরে কুকড়াটি মাঈর শূন্যের লিখা। সে দেখে ছাড়া পাওয়া মুরগিটা হা হা করে পালাচ্ছে দূরের দিকে। কসাই হাসছে দেহুরির মুখ বিকৃত।

ঈমন কুকড়া মাঈর ভোগে লাগেনি। কসাই ফাক ফাক করে হাসে।

হোয় মাঈ তু কি দরোগা সাব, মর ইত কষ্টের নিবেদন...। তার বুক ফেটে জল আসে। বিশুদ্ধ চোখে অদ্র হয়ে আসে। জানা বড়ির বড় ছেলে ফনিমনসার ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে দাত দেখায়—দইতারি কাঁপে। চারপাশ ঝাপসা হয়ে আসে। ভিতরে কি কি হয়....হেয় মাঈ তোর মহিমে কথায়? মুন্ড ছাগলের চোখ তার দিকে টানটান দৃষ্টি ফেলে। বকত দেখে দেহটা গরগরিয়ে ওঠে। হাত পা টল মল করে। দু-কুড়ি বয়সের দুখে পুড়ে তার দেহটা সোনা। দইতারি থম মেরে দাঁড়িয়ে থাকে নিশচুপ বৃক্ষের মত। তার ওপর চোখ পড়েছে সকলের। বালিভাসা আকাশ চোখ মেলেছে, তাকিয়ে আছে বিশাল অশ্বত্থ, অশ্বত্থের ডালের কাক বৌদ্রদগ্ধ জঙ্গল মাটির পৃথিবী আর পৃথিবীর মানুষজন। প্রতিটি চোখে বিস্ময়। এরপরে সে হঠাৎই চলমান হয়। দ্রুত চরকির মত পাক খায়। কৃষ্ণবর্ণ দেহ ধূলিমাখা। চোখে রক্তের ছোঁয়াচ। সে দ্রুত চারদিক দেখে। সব মানুষে জোড় হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

সমস্ত দেহটা পাহাড় হয়ে গেছে। দইতারি দুচোখে শিমুল পাহাড় দেখে। আই শিওল পাহাড়। মুন্ড ছাগলের চোখ গুলি ঘুরছে ঘুরছে। মাটিতে কালচে রক্ত রেখা। সে নিজেকে হারায়। দমকা লাফ দিয়ে একটা কাটা মুন্ড তুলে নিয়ে গর্জন করে ওঠে, মু রন্ডা দেবতি।

না কুমা হইল বদকুমা। দইতারির ভিতরে ভর করেছেন দেবী। পূজায় ত্রুটি আছে নিশ্চয়। সর্বজনে থর থর করে কাপে। দে হুরি টন টান হয়ে যায় মাটিতে গ্রন্থ রন্ডা মাঈ রক্ষে কর।

তুহাদের ভিতর শাপ ঢুকেছে। রক্তাদেবী চিৎকার করে ওঠেন।

রক্ষে কর।

দইতারি সটান গিয়ে বসেছে অশ্বত্থ-তলায় দেবীর থানে। নেংটি খুলে পড়েছে মাটিতে। পাপ ঢুকিছে, ভুবিছিলা মু শিওল পাহাড় চলিগিছি, বটনা সব, যই নাই। সব দেখি, মড়ক লগাই দিব মু।

দূরে দমকা বাতাস ঘূর্ণি তোলে। শুকনো পাতা কুন্ডলী পাকিয়ে শূন্যে ওঠে। অশ্বত্থের মধ্যে বিচিত্র এক কাক ডাকে। পোড়া আকাশে পাখি নেই শুধু ডানা বিছিয়ে শকুনের দল কোথায় চলেছে। লালাসিক্ত জিভ মেলিয়ে ঘনশ্যাম নিচছে এক বোদ পোড়া কাকের ওধরে। আচমকা ডেকে যায় কোন এক তৃষ্ণার্ত পাখি। মানুষজন কাঁপতে থাকে। কুমোক্ষ বাতাসে দইতারির কণ্ঠস্বর বজ্র হয়ে উঠছে।

মানুষ নাই ভকতি নাই মু ম্যাঘ পাঠইব শিওল পাহাড়। পাহাড় গর্জন করে ওঠে। কি ভীষণ কথা। ... মাঈ রুষ্ট হইছেন, আশমান বালিভাসা নদী হই উঠিবে। তখন তপ্ত আকাশ আর নদী, নদী আর মাঠ সব একাকার। শৃগাল গৃধিনীর খদ্য হবে মানুষ। আকাশ হামলে সূর্য উঠেছে অনেকটা। বায়ু সমুদ্রে আগুন ভেসেছে। হু হু করে তপ্ত হলকা হাওয়া উড়ে আসে। রন্ডা মাইর এমন রোষে মানুষ বাচে কি করে। ভয় দুঃখী মানুষের দেহে শৈত্য নামে ঘন উষ্ণতার ভিতর।

আই উহরে উহরে মড়ক আসিবে।

মড়কের চিহ্ন ফুটে উঠছে চারদিকে। গৃধিনীর ছায়া পড়েছে বিশুষ্ক মাটিতে। সবুজের চিহ্ন নেই।

হেয় মাঈ বাচাও। রুদ্ধন কণ্ঠস্বর আছড়ে পড়েছে শূন্যতায়।

পাপ ঢুকিছে সোউকথা বুঝিনি।

পাপ। হ্যা পাপ না ঢুকলে মড়ক আসবে কেন? মেঘ আসবে না কেন। পাপই মড়ক পাপই খরা। এই পাপেই মেঘ আসে না বৃষ্টি আসে না, জন্ম জীবন বিরহ কিছু আসে না। ফসল ফলে না। রমনীর ঋতু রক্ষা দায় হয়।

এখন এখানে কণ্ঠের নৈঃশব্দ হয়। মরা আকাশে নির্জন বিশ্বাস। ভয় ভাবনা মানুষের ভিতর জট পাকায়। কি পাপ। কোন মানুষের পাপ। দশজনের পাপ অথবা একজনের। আমি সরল কথা ভাবি না সেই পাপ, আমি মায়ের থানে পূজা দিই না সেই পাপ।

গাঁ ছাড়া কর পাপীরে, জল দিব কারে?

মাঈর রোষ হইছে পর্বত সমান। তারা সমস্বরে আর্তনাদ করে ওঠে, মড়ক দি অনি মহ জল দাও জল দাও। মাটিতে শুয়ে পড়া অসংখ্য মানুষের জীর্ণ শীর্ণ হাত মুহূর্তে প্রসারিত হয়, জল দাও। চড়ই উৎরাই ঘেরা জঙ্গল মাঠ, মাঠের বিশুষ্ক তৃণ বালুকাচছন্ন শীর্ণ খাল মাটিতে মুখ ঘষটে চলা গরু, মেষ সব আকণ্ঠ তৃষ্ণায় ফালা ফালা চিৎকার কাঁপে ওঠে—জল দাও। মৃত পিতৃপুরুষ হাত বাড়ায়—জল দাও।

জল দিব? খনখনে গলায় দেবী হাসেন। এই হাসি চারদিকে ভৌতিক বিস্ময় নামায়।

রক্ষা কর মাই বিপদে চেতনা হিরেছে মানুষের। রোষ থামাও নচেৎ মৃত্যু কাছাকাছি। এই পৃথিবীতে এমন কঠোর শূন্যতা নির্মেঘ কঠিনা। বাতাসে মৃত্যুর গন্ধ। কোন মানুষে পাপী, কি সেই পাপ? অস্পষ্ট জিজ্ঞাসা ওঠে চারপাশে। দেবী এসব শোনেন। মুহূর্তে স্থির হয়ে দাঁড়ান।

এরপর সেই পোড়া বাশের মত মানুষ দইতারি সটান শুয়ে থাকা মানুষ জনের দেহ দলিত করে হাই হাই ঘুরতে থাকে। বলির রক্তে তার সমস্ত দেহটা মাখামাখি। রক্ত মাখা বৃষ্টির দেবী চিৎকার করে ওঠেন, ম্যাঘ আসিবে নাই ভূমির তরে জল দিব নাই। একের ভূমি একের, লক্ষ্মী অন্যে নিলে হয় পাপ। সেই ভূমিতে ফসল ফলানো রীতি নাই। মু রন্ডা দেবতি বাতাস দিয়াছি সব্বজনে সমান ভাগ পাস, আলো দিয়াছি সব্বজনে সমান ভাগ পাস মাটির বেলায় অই ভাগে গরমিল কিনো? এই হইছে পাপ। পাপীর তরে মড়ক আসিবে অই উহরে উহরে।

এইকথা আকাশবাণী হয়। ধনধানে সূর্যের নিচে দইতারি দাঁড়িয়ে থাকে। মৃত মানুষজন তাকিয়ে আছে ওরদিকে।

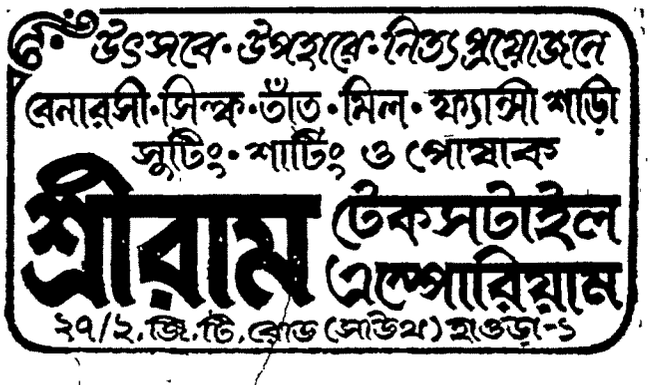

ব্যবধান

নির্মলেন্দু ঘোষাল

আজ তিতির আসবে। সেই কবে ওর আগে দেখা হয়েছে স্পষ্ট করে মনে পড়ে না অনিন্দ্যর। দুপুর তিনটের সময়, সাবওয়ের উত্তরবাদিকের গেটের সামনে তিতির দাঁড়াতে বলেছে। চিঠি দিয়ে। তিতির কি রং-এর শাড়ী পরবে অনিন্দ্য জানে না। বেল্টিক স্ট্রীটের সাতাশ টাকা দামের হাইহিল জুতো টা পরবে কিনা, কোচকানো কলো স্প্রিংয়ের মতে চুলগুলো কিভাবে বাঁধবে, ঠোঁটের আদৌ অনিন্দ্যর প্রিয় রক্তলাল লিপস্টিক পরবে কিনা—তিতির সেসব চিঠিতে কিছুই লেখেনি।

অনিন্দ্যর শ্বশুরের ফটিশ আমলের [illegible] দোকানের লোকাল সেন্ট রেডিওটা বলে দিল, অনুরোধের আসর শেষ হোল। তিতির নিশ্চয় অনেক আগে এসে দাঁড়াবে এই ভেবে অনিন্দ্যর মাথার মধ্যে কয়েক হাজার কয়েদী হাতুড়ী পেটা করতে থাকে।

তিতিরকে খুব একটা সুন্দরী দেখতে নয়, তবে একবার ওর দিকে চাইলে, চোখ অন্য কোথাও ফিরতে চায় না। অন্তত একটু শরৎকালীন লাবণ্য, ওর পাতলা ঠোঁটের পাশ দিয়ে ইষৎ ছুঁয়ে গেছে। পুরুষ প্রধান এই হ্যাংলাটে শহর, তিতিরের দিকে মধ্যরাতে ঘুমের মধ্যেও তক্কা ডেকার নন্‌স্টপ প্যাসেঞ্জার বাসের ড্রাইভার নিয়ে ছুটে আসে। তিতিরও চুরি করে পুরুষ দেখতে ভালোবাসে।

অনিন্দ্য নিম্ন মধ্যবিত্ত ষোল পরিবারের বাইশ বছরের সন্তান, সুখ বলতে ছোট থেকে জেনেছে বছরে পুজোর সময় একবার নতুন জামাপ্যান্ট আর পাড়ার কেউ হলে একটাকা সত্তরে সিনেমা দেখা। ওদের পরিবারে মাসের প্রথমদিকে অনিন্দ্যর বাবা চার শ টাকা মাইনে পেলে একবার পাঁঠার মাংস হয়। হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় অনিন্দ্য সাপ্লিমেন্টারি পেয়ে পাশ করে, নাইট কলেজে পাসকোর্সে বি-কম পড়তো। অনিন্দ্য কবিতা লিখতো, মাত্র কয়েকটা টাকার লোভে কাগজে ফিচার লিখতো। কিন্তু এসব ছিল তিতিরের চোখে শুধুই পাগলামি। হলুদ পাতা ঝরা সন্ধ্যাবেলা, ওরা যখন পাশাপাশি অউটরাম ঘাটের পাশ দিয়ে হেঁটে যেত, সেই সময় তিতিরের প্রেমকে দেখে সকলের ঈর্ষা হওয়া স্বাভাবিক। অনিন্দ্যর তুলনায় তিতির একটু বেঁটে ছিল এই যা। তা ছাড়া, তিতিরকে অনিন্দ্যর পাশে খুব সুন্দরী লাগতো। তিতিরকে একা হেঁটে গেলে এতো সুন্দরী লাগে না।

তবু তিতিরের মাথায় বিয়ে-ভবিষ্যৎ এসব কথা এলেই একটা অনিশ্চয়তা ওকে যেন ঘিরে ধরতো। তিতির অনিন্দ্যর ক্ষয়িষ্ণু জীবনকে বড়ো ভয় করত, যে জীবনে বিয়ের পরে মিষ্টি মিষ্টি প্রেমের কবিতার কোন রেশই থাকে না। তিতির জীবন বলতে চেয়েছিল মোটা টাকার মাইনে, নিদেনপক্ষে একটা স্কুটার, ছোট্ট সাজানো সংসার আর তিতিরদের ওপরের দুশো পনেরো নম্বর ফ্ল্যাটের সেনশর্মা কাকীমার মতোন বছরে বার কয়েক দেশ-ভ্রমণ।

অনিন্দ্যর সিগারেটটা শেষ হতে না হতেই, উল্টোদিকের ফুটপাত থেকে ছোঁড়া এলো কী হলো এত দেরী?

—না, এই তোমার কথা ভাবতে গিয়ে দেরী হয়ে গেল।

—ইদানীং বেশ রোমান্স শিখেছো তো।

অনিন্দ্য তিতিরের কথায় লজ্জা পেলো। এরকম সংগ্রাম তিতির তাকে প্রায়ই ফেলে। অনিন্দ্য বুঝতে পারলো অনেকক্ষণ বোদে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে তিতির রেগে গেছে। কিন্তু অনিন্দ্য আগে বোঝেনি, সাব ওয়ের মধ্যেও বোদ লাগতে পারে। তিতির রাগলে একবার রক্ষে নেই। আবার রাগতে রাগতে কাঁদতেও খুব একটা দেরী হয় না। কতোবার এর আগে, তিতিরের রাগ কমাবার জন্যে অনিন্দ্যকে ফিচার লেখার পয়সায় চাউমিনের অর্ডার দিতে হয়েছে, তার কোন হিসেব অনিন্দ্যর মতো কমার্স ফেলকরা ছেলের রাখা সম্ভব নয়।

তিতির হঠাৎ বলে উঠলো, রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবো নাকি? যা হোক একটা কিছু করো।

—কোথায় যাবে?

তিতির এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারলো না। ও অনিন্দ্যর সঙ্গে সত্যিই যা কোথায় যাবে? অনিন্দ্যই বা শেষ পর্যন্ত তিতিরকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে?

আর সেই অনিশ্চয়তা, নিরাপত্তাহীনতা, বোধটা তিতিরের মধ্যে ভেসে এলো। কিছু সময় এসব চিন্তা হবার পরেই, তিতিরের মনে পড়ে গেলো জি টি রোডের ওপর সাজানো, সহাগঞ্জের ছোট্ট টায়ার কলোনীর কথা। ঐ কলোনীতে ঢোকার আগে, বড় বড় করে লাল অক্ষরে কোম্পানীর নামের প্রথম অক্ষরটি লেখা। প্রহরীরা সব সময় উচ্চ-পদস্থ কর্মচারীকে সেলাম দিয়ে স্বাগত জানায়। তিতির যখন ওর বাবার সঙ্গে যায়, ওর চোখ থেকে এই দৃশ্যটা কোনদিন এড়ায় না। কলোনীর মধ্যে সুন্দর কালো বাঁধাই রাস্তা সবুজের পথ। কোথাও একটা খোলামকুচিও পড়ে থাকতে দেখা যায় না। পথের দুপাশে গাছের পর গাছ। এইসব গাছগুলোও কতো যত্ন পেয়ে বড়ো হয়েছে, কিন্তু অনিন্দ্য। একটু এগিয়ে গেলেই ম্যানেজমেন্ট স্টাফদের থাকার দি বাঙলোর লেখা সুবাস ভেসে আসে গায়ে। তিতিরের মনে হয় পৃথিবীর সব সম্ভবনা, সুখ, স্বপ্ন যেন এখানেই এসে একসঙ্গে বাসা বেঁধেছে। এইসব ভাবতে ভাবতে, তিতির নিজের ভেতরে নিশ্চিত ঘুম পাওয়া শিহরণ অনুভব করতে থাকে। তিতিরের মনে থাকে না অনিন্দ্য ওর পাশেই আছে।

অনেক দূর থেকে এসপ্ল্যানেড যাবার একটা ফাঁকা প্রাইভেট বাস যেন ওদের জন্যেই ছুটে আসছে, আশেপাশের মানুষ-জনদের নাকের ওপর ধুলো উড়িয়ে। তিতিরের পেছন পেছন অনিন্দ্য গিয়ে বসলো, তিতিরের ঠিক সামনের সীটে। তিতিরের সামনে এভাবে অনিন্দ্য কতো দিন বসেনি। ওর মুখের বসন্তের দাগটা অনিন্দ্যর চোখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তিতিরের দিকে অনিন্দ্য এভাবে দেখছে বলে, তিতির একটু গলাটা নরম করে জিগেস করে, কী দেখছো কি?

—তোমায়।

—নতুন কিছু দেখলে?

—তোমায় আজ বেশ মিষ্টি লাগছে।

—ধ্যাৎ, অসভ্য।

এখন তিতিরের সঙ্গে দেখা হলে অনিন্দ্যর নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে হয়। আজ থেকে দু বছর আগে, তিতিররা যখন হাওড়াতে থাকতো, অনিন্দ্যর এমন হোত না, খুব ছোটবেলায় অনিন্দ্য পাড়ার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতো, তিতিররা এক ঝাঁক ভোরের সাদা টগর ফুলের মতো পোশাক গায়ে, পিঠে ব্যাগ নিয়ে কেমন উচ্ছল মনে স্কুলে যেত। সেদিন তিতিরের কোমরে অনাবৃত মসৃণ ত্বকে, মশা কামড়ানোর দাগ দেখা যেত না, অন্তত যেটা মাঝে মধ্যে অনিন্দ্যর চোখে পড়ে।

বাসের মধ্যে কিছু সময় চুপচাপ বসে থাকার পর, অনিন্দ্য বলে উঠল, হঠাৎ তুমি হাওড়ায় এলে?

—কাল কালুমামুর বিয়ে ছিলো তাই।

তিতির ভেবেছিলো অনিন্দ্য বোধহয় জিজ্ঞেস করবে ওর কালুমামুর বউকে কেমন দেখতে হোল? কালুমামু কি কি পেলো ইত্যাদি রকমের সৌজন্যমূলক কথা। অনিন্দ্য ওসব জিগেস না করেই ফ্লাইওভারের নীচের ভিখারীদের স্বাস্থ্যবান সংসার দেখতে লাগলো। ওর মনে হোল, তিতিরের কালুমামুর মতো এদের কেউ ঘটা করে বিয়ে হয় না? এদের বিয়ে কিভাবে হয় তা অবশ্য ওর জানা নেই। অনিন্দ্য কখনও কোন ভিখারীর বিয়ে দেখেনি। এই ধুমধামের অভাবের জন্যে, ভিখারীদের কিন্তু কোন চাপা দুঃখ বোধ নেই, যা একটু সুযোগ পেলেই কপালের ঘামের সঙ্গে বেরিয়ে আসে গোপন গুহা থেকে।

অনিন্দ্যর চিন্তাকে ভেঙ্গে দেবার জন্যে তিতির হাসতে হাসতে বলে উঠল, আর শিবদুর্গা পুজো উপলক্ষ্যে সারারাত ধরে বালক সংঘর মাঠে সিনেমা হবে। আমি যাবো। খুব মজা হবে।

—কার সঙ্গে যাবে?

—আমি, তপুমামু আর পলিমাসী।

—আমি চাই না তুমি সারারাত ধরে বাড়ীর বাইরে থাকো। কোন ভদ্দরলোকের মেয়ে যায় না।

—আমার ব্যাপারে তোমায় ভাবতে হবে না।

—না, তুমি যাবে না।

—কেন?

তিতিরের কথা শুনে অনিন্দ্যর অধিকার বোধ কিছুটা ভেঙ্গে গেল। ওর মনে হতে লাগলো, আজ তিতিরের কতো

অগ্রিম কর—১৫ই ডিসেম্বর

* ১৫ই ডিসেম্বর হলো আপনার অগ্রিম করের পরবর্তী কিস্তি জমা দেবার তারিখ। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কিম্বা স্টেট ব্যাঙ্ক বা তার পরিপূরক ব্যাঙ্কগুলিতে অথবা সুনির্দিষ্ট রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে যথা-সময়ে আপনার কিস্তি জমা দিন। কোম্পানীগুলির জন্য চালান ফর্ম আই টি এন এস ৩৫এ এবং অন্যান্যদের জন্য আই টি এন এস ৩৫ ব্যবহার করতে হবে।

* মনে রাখবেন ঃ এটা হবে ঃ—

(ক) তাদের শেষ কিস্তি, যাঁদের আয়ের অন্ততপক্ষে ৭৫% এমন উৎস থেকে আসে, যেখানে হিসেব নিকেশ শেষ হয় ৩১-এ ডিসেম্বর বা তার আগে।

(খ) অন্যান্যদের জন্য দ্বিতীয় কিস্তি।

* আপনি যদি ২৮এ নং ফর্মে আপনার অগ্রিম কর সংক্রান্ত বিবৃতি বা ২৯নং ফর্মে আপনার আনুমানিক হিসেব দাখিল না করে থাকেন এবং ১৫ই জুন বা ১৫ই সেপ্টেম্বর অগ্রিম করের কিস্তি জমা না দিয়ে থাকেন, তবে এখনই তা জমা করুন।
আপনি যদি 'ক' শ্রেণীর আওতায় পড়েন, তবে ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পূর্ণ কর এক কিস্তিতে জমা দিন। আর আপনি যদি 'খ' শ্রেণীর আওতায় পড়েন, তবে ১৫ই ডিসেম্বর এবং ১৫ই মার্চ দুটি সমান কিস্তিতে উক্ত কর জমা করুন।

* আপনার আয় যদি আপনার আগেকার অনুমানের চেয়ে ৩৩⅓% বা তার বেশি বাড়ার সম্ভাবনা থাকে তবে অবশ্যই একটি সংশোধিত হিসেবে দাখিল করবেন। আপনার পূর্বের অনুমান যদি বেশি হয়, তাহলেও একটি সংশোধিত হিসেব দাখিল করে কম কর দিতে পারেন।

* মনে রাখবেন

১। এ বছর আই টি ও-র কাছ থেকে অর্ডার পাবার জন্য অপেক্ষা করবেন না;

২। আপনার অগ্রিম করের আনুমানিক হিসেব বা সংশোধিত হিসেব এখনই পাঠান এবং দেয় অর্থ জমা করুন;

৩। ঘোড় দৌড়, লটারী, অনুরূপ অন্যান্য খেলা এবং ক্রস্ ওয়ার্ড পাজল্ প্রভৃতি থেকে আয় আপনার হিসেবের অন্তর্ভুক্ত করার দরকার নেই।

মোট আয়ের সীমা—যার ওপরে আপনার আয় হলে আপনাকে অগ্রিম কর দিতে হবে ঃ

(ক) কোম্পানী বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ—— ২,০০০ টাকা
(খ) রেজিস্ট্রীকৃত সংস্থা ——৩০,০০০ টাকা
(গ) অন্যান্য ——১০,০০০ টাকা

সুদ ও জরিমানার হাত থেকে বাঁচুন। আপনার অগ্রিম কর ঠিক সময়ে জমা দিন

ডিরেক্টর অফ ইন্সপেকশান
(রিসার্চ, স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যান্ড পাবলিকেশান)
ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট
নিউ দিল্লী-১১০০০১

ডিএভিপি ৭৮।৩৩২

পরিবর্তন হয়েছে। আগে এই তিতিরই অনিন্দ্যকে জিগেস না করে কোন কাজই করত না। কিন্তু আজ কতদূরে সরে গেছে, কিছু বুঝতে চায় না।

তিতিরদের সমাজে অত্যধিক পুরুষ বন্ধু, অর্ধনগ্ন পোশাক গায়ে সুইমিং পুলে ছেলেদের সাথে একসঙ্গে সাঁতার কাটা, ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিদের বিয়ার খাওয়া দেখতে দেখতে সন্ধ্যেবেলা ক্লোনীর ক্লাবে টেবিল টেনিস খেলা, সকালবেলা ঘরেতে কিছু সম্ভাবনাময় ছেলে বন্ধু এনে লালসোফার ওপর বসে পা দোলাতে দোলাতে কফি খাওয়া—এসব কিছুই দোষনীয় নয়। অনিন্দ্য সব জেনেও তিতিরকে ভালোবাসে। অনিন্দ্যর দুঃখ হয়, তিতির যখন ওকে টায়ার কলোনীর আর পাঁচটা ছেলের থেকে অসহায় মনে করে। অনিন্দ্য কিন্তু নিজের দুঃখবোধ কোনদিন তিতিরের সামনে প্রকাশ করে না, তিতির করুণা করবে ভেবে। অনিন্দ্য খুব ভালো করেই জানে, তার কোন অনুভূতি তিতিরদের মতো মেয়েদের কঠিন মাথা তৈলাক্ত হাঁটু একবারও স্পর্শ করে না।

অনিন্দ্য কি সব চিন্তা করবার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো, তিতির তুমি এমন কোন কাজ করো না যাতে আমি কষ্ট পাই।

অনিন্দ্যর কথায় তিতির আদৌ গুরুত্ব না দিয়ে বলেই চললো আমি যাবো বলেছি, যাবোই। একটা লংপ্লেয়িং রেকর্ডের মতো দীর্ঘক্ষেপ খেলা করতে লাগলো তিতিরের মাথায়।

—তোমার তপুমামু তোমাকে একস-প্লয়েট করছে।

—আমার কে কি করবে তোমায় দেখতে হবে না। তুমি এখনও আমার স্বামী হওনি ভুলে যেও না।

অনিন্দ্য নিজেকে ঠিক রাখতে না পেরে বলে উঠল, আই বিলিভ ইট—ব্রু আর নট্ এ্যাট অল ভরজিন।

নিজের সতীত্ব সম্বন্ধে কোন মেয়েই কোন কথা শুনতে চায় না। স্বভাবতই তিতির সহ্য করতে না পেরে আগুনের মত হিসহিস হয়ে বলে উঠল, ডোন্ট টাই টু বি সো স্মার্ট। দ্যাটস নট ইওর লুকআউট।

ভারজিনিটি সম্পর্কে অনিন্দ্যর যে সামান্য জ্ঞান, সেটুকু শুধু বিদেশী কিছু সাহিত্যের দৌলতে। অনিন্দ্য বিদেশী এক বিখ্যাত লেখকের হটকেক উপন্যাস পড়ে জেনেছে, দেহ ছাড়া ও কোন মানুষ, মানসিকতার দিক থেকে ভারজিন নাও থাকতে পারে। তিতিরকে অনিন্দ্য সেটাই বোঝাতে গিয়েছিল।

অনিন্দ্য খুব ভালো করেই জানে, তিতিরের এর আগেও কিছু ছেলেকে ভালো লাগত। আগে বললে ভুল হবে, আজও তিতিরের মনের ভেতর কোন সুন্দর যুবকের ছায়া পড়লে একটা মৃদু কড়ানাড়ার শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। তিতির অবশ্য অনিন্দ্যকে বলেছে, ওই ওর প্রথম। অনিন্দ্য কোনদিন তিতিরকে এই ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করেনি, তিতিরের কষ্ট হবে বলে। তবু অনিন্দ্যর মতো স্পর্শকাতর ছেলের খুব ভালো করেই জানে, মেয়েদের এ জাতীয় পুরুষ সন্তুষ্ট করার অভ্যেস কতো জন্মগত।

অনিন্দ্য ভাবে, তিতির কেন ওর জীবনের সব ঘটনা, কেন অনিন্দ্যকে বলে না? তিতির লুকিয়ে কি আনন্দ পায়? অনিন্দ্য আসলে জানে না, তিতিরের সব আনন্দ কোথায় লুকিয়ে আছে।

ভারজিনিটি যে মনের দিক থেকেও হতে পারে তিতিরের পক্ষে সেটা জানা সম্ভব নয়, কারণ তিতির অনিন্দ্যর মতো অতো ডাই ডাই বই পড়েনি। পড়াশোনা বলতে তিতির মানে ক্লাসে প্রথম হওয়া, ব্যস্ এইটুকু, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্যে, তিতির রাত জাগে প্রশ্ন, দিনের পর দিন মুখস্থ করতে পারে। পরীক্ষা হয়ে গেলে যথারীতি সবগুলো ও ভুলে যায়।

তিতির সপ্তাহে দুবার করে হিন্দী সিনেমা দেখে জেনেছে, মেয়েদের কাছে ভারজিনিটি রক্ষা হলো মস্ত-তপস্যা। সিনেমায় হিরোয়িনের ভারজিনিটি ভাঙার জন্যে, হিরোয়িনের ছ ফুট দু ইঞ্চি উচ্চতার মায়ের দুধ খাওয়া আদর্শ ভাই, একলাফে ভিলেনের ড্যারায় দৌড়ে যাব। আর সেই কিনা তিতিরকেই শুনতে হোল, ভারজিনিটির ওপর কথা।

সামান্য কয়েকটা শব্দ বলার জন্য তিতিরের চোখ থেকে মোম জ্বলের ক্ষীণধারা নেবে নামছে দেখে অনিন্দ্যর ভীষণ কষ্ট হোল। কিন্তু ও তিতিরকে এখন কি বলবে? কি করে বলবে, বিশ্বাস করো আমি অনুতপ্ত? অনিন্দ্য কি বলবে, তিতির তুমি আমায় ক্ষমা করো? তাহলে, বাসের লোকেদের সামনে ব্যাপারটা অরো নটকীয় হয়ে যাবে। তিতির সিন-ক্রিয়েট পছন্দ করে না।

একটু পরেই তিতির বলে উঠল, তোমার সঙ্গে আমার এখানেই শেষ। এই ঘটনার পরেও কোন আত্মসম্মান আছে এমন মেয়ে সম্পর্ক রাখে না।

—তিতির প্লিজ্ একটু ভাবো, কয়েকটা কথার জন্যে আমাদের এতো বছরের সম্পর্কটা....

—তুমি কি ভেবেছিলে কথাগুলো বলার আগে?

অনিন্দ্য কিছু বলতে পারে না। বাসের অনেকগুলো লোক, ওদের দিকে কেমনভাবে চেয়ে দেখছে, অনিন্দ্য দেখে। অনিন্দ্য এই মুহূর্তে তিতিরকে কতো কিছু বলতো, একটু সুযোগ পেলেই। অনিন্দ্য বুঝতে পারে ওর গলার কাছটা কেমন আটকে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে একটা সোলার ছিপি কে যেন ঢুকিয়ে দিয়েছে। হয়তো বন্ধ হয়ে গেছে বুকের মধ্যে দিয়ে রক্ত চলাচল, মাথার ওজন এই কয়েক মিনিটে হাজার গুণ বেড়ে গেছে।

বাসটা এতক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে কার্জন পার্ক স্টপেজের সামনে। আট-দশজন অফিস পালানো লোক ফিরতি বাসে বাড়ী ফেরার জন্যে এখান থেকেই উঠতে শুরু করেছে। তাদের মুখে এক ধরনের বিজয়ের-আনন্দ। উল্টোদিকের ফুটপাত দিয়ে, লীগ ফাইনালের টিকিট কাটতে যাচ্ছে অনিন্দ্যর বয়সী কিছু নব্যোযৌবনপ্রাপ্ত যুবক। অনিন্দ্যর আনন্দ কেন্তু এতো সোজামেলা নয়, যা আপাতঃ-দৃষ্টিতে বোঝা যায়।

বাসটা ঠিক যখন কার্জন পার্ক স্টপেজ থেকে ছাড়তে যাবে এমন সময় অনিন্দ্য দেখে পঁচিশ বাওয়ের টাঙ্গাইল হাজার বুটি শাড়ী পরে, কে যেন একটা মেয়ে (পেছন থেকে আপাতঃ সুশ্রী), খুব সন্তর্পণে বাস থেকে নেমে গেলো। অনিন্দ্য মুখটা ফেরাতেই দেখে, সামনের সীট ফাঁকা। কিন্তু ও তিতিরকে ডাকার আগেই, বাসটা তখন অনেক, অনেকদূর চলে এসেছে।

পরের স্টপেজেই অনিন্দ্যকেও বাস থেকে নামতে হোল।

বর্ষার ঝিরঝিরে বৃষ্টিছোঁয়া ফাঁকা রাস্তা, এখন অনিন্দ্যকে একা করে দিচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে সে খুব অস্পষ্ট আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। অনিন্দ্যর মনে পড়ে শীতের ভোরের কুয়াশায় সংস্কৃতের বোচিং পালিয়ে ট্রাম-লাইন ধরে দীর্ঘতম হাঁটা। সেই অনিন্দ্যই আজ তিতিরের কাছে অযোগ্য হয়ে গেছে। তিতির নিরাপত্তা চেয়েছিলো কিন্তু অনিন্দ্যর নিজের কোন আশ্রয় নেই, যা দিয়ে সে আর তিতিরকে নিজের ভেতরে লুকিয়ে রাখবে।

বাড়ী ফিরে অনিন্দ্য, কারুর সঙ্গে কোন কথা না বলে আলো নিবিয়ে ঘরের—ঘুমিয়ে পড়লো। অনিন্দ্যর আকাশ থেকে রামধনু মুছে গেল। এটাই ওর জীবনের প্রথম প্রেম ব্যর্থতা।

শান্তির প্রহর ফুরিয়ে গেলে, অনিন্দ্য সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে হয়তো আবার ফিরে আসবে।

আরো জীবনানন্দ

কল্যাণকুমার বসু

বিকেল হলেই বেড়ানো চাই। এত কাছে চাকুরিয়া লেক। অমল চলো। লেক মার্কেট হয়ে সার্দান এভিনিউ ঘুরে টালিগঞ্জের দিক দিয়ে লেকে প্রবেশ করো, তারপর হাঁটো—জোরে জোরে হাঁটো। ওই যেখানে সারি সারি তালগাছ অনেকগুলো, তারই পাশ ছোট বেঞ্চখানায় বস। কি যেন আলোচনা হচ্ছিল আমাদের? —কবিতা। কি বলছিলাম তখন অমল?

মোহিতলাল প্রসঙ্গে

সত্যি বড় দুঃখ পেলাম সেদিন জান অমল। এক কাব্য সংকলনে মোহিতলালের স্থান সর্বশেষে দেখে। ব্যক্তিগতভাবে মোহিতলালের সঙ্গে আমার ভালোভাবে পরিচয় ছিল। শুধু কবি কেন মানুষটির সম্বন্ধেও কিছু লিখতে পারি—।

লিখুন না মোহিতলাল সম্পর্কে যা জানেন অন্ততঃ আমাদের তা জানান।

লিখবো ইচ্ছে হয়। আমাকে একটা মোহিতলালের গ্রন্থাবলী জোগাড় করে দিও পূর্বাশার জন্যে একটা প্রবন্ধ লিখবো। কিছু থেমে জীবনানন্দ আবার বললেন, বাংলা কাব্য সংগ্রহ

কবির মনের এই ইচ্ছাটি অপূর্ণ থেকে যায়। অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষকে কথা প্রসঙ্গে অনেকদিন একথা বলেছেন। একটা দুরূহ ব্যাপার। সম্পাদক এক দেশদর্শী হয়ে পড়েন এবং সমাজ দায়িত্ব পালন করেন না। তাছাড়া কবিতা সংকলনে কবিদের আশু জনপ্রিয়তার উপর নির্ভর করে বা চেনাশোনার দরুণ কতটা। ডাহসন বা বিচার্ডসন অল্প কয়েকটি কবিতা লিখেই ইংরিজী কবিতায় স্থায়ী চিহ্ন রেখে গেছেন—কিন্তু আমাদের দেশে প্রচুর কবিতা না লিখলে বা বই না বের করলে সম্পাদকের চোখেই পড়বে না।

জীবনানন্দ তাকিয়ে আছেন দূরে। বিকেলের দিকে বেশ বন্দর ছিল, ধীরে ধীরে গোধূলি এল আকাশ-পৃথিবী রক্তিম হল তারপর ধীরে অন্ধকার নেমে এলো। প্রকৃতির এই পটপরিবর্তন ও পরিবেশ জীবনানন্দের মনেও প্রভাব বিস্তার করল। তাঁর চোখে মুখে কণ্ঠে এই আনন্দ সুধা পানের ভাবটি স্পষ্ট। আলো সতক্ষণ ছিল জীবনানন্দ বেশী কথা বলছিলেন অন্ধকার হলে অমল দত্তের পালা এলো.

অমল আমার টাকা চাই। বাঁচার মতো টাকা চাই অমল। আমার একটা উপন্যাস আছে অপ্রকাশিত সেটার চিত্ররূপ দেওয়া কি যায় না। আমি ভেবে পাই না আমার যারা বন্ধু-বান্ধব আছে—কাহিনীকার হিসেবে চিত্রজগতে টাকা রোজগার করছেন তাঁরা কেন তাঁদের দলে আমাকে ভিড়িয়ে নিচ্ছেন না—বলতে পার!

জানি না, উত্তর জানা নেই।

না না তুমি বল তাঁরা অনেকেই কাহিনীকার চিত্রনাট্যকার, ডিরেকটর আপনার উপন্যাসের নাম কি?

'মালাবান'। পড়বে আমার পাণ্ডুলিপি, তুমি—তুমিই দেখ আমার উপন্যাসটির চিত্ররূপ দেওয়া যায় কিনা?

এত বড় মানুষটা যেন শিশুর মতো চোখে তাকিয়ে থাকেন। পূর্বাশার সম্পাদক ও প্রকাশককে অগাধ বিশ্বাস। মনে করেন এরা অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারেন।.... তারকনাথ মানে আমাদের নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সে-তো সিনেমার গল্পের চিত্ররূপ দেয়, তাকে বলব, প্রেমেন আমার বড় বন্ধু তাকে বলব!...অমল এবার আমি আত্মকথা লিখতে শুরু করব—বড় টাকার টানাটানি। কবিতা লিখে টাকা পাওয়া যায় না গদ্যরচনা না করলে বাঁচা যায় না। হঠাৎ কিছু টাকার বড় প্রয়োজন।

চিঠি লিখলেন সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে—সঞ্জয়ই ভরসা।

১৮৩ ল্যান্সডাউন রোড
কলি-২৬
১৩-৬-৫০

প্রিয় বরেষু,

আশা করি ভালো আছেন।

বেশি ঠেকে পড়েছি, সেজন্যে বিরক্ত করতে হল আপনাকে। এক্ষুণি চার পাঁচশো টাকা দরকার; দয়া করে ব্যবস্থা করুন। এই সঙ্গে পাঁচটি কবিতা পাঠাচ্ছি। পরে প্রবন্ধ ইত্যাদি (এখন কিছু লেখা নেই) পাঠাবো। আমার একটি উপন্যাস (আমার নিজের নামে নয় ছদ্মনামে) পূর্বাশায় ছাপাতে পারেন। দরকার বোধ করলে পাঠিয়ে দিতে পারি।

আমার জীবনস্মৃতি' আশ্বিন কিম্বা কার্তিক থেকে পূর্বাশায় মাসে মাসে লিখবো। সবই ভবিষ্যতে, কিন্তু টাকা এক্ষুণি চাই। আমাদের মত দুচারজন বিপদগ্রস্ত সাহিত্যিকদের এরকম দাবী গ্রাহ্য করবার মতো বিচার বিবেচনা অনেকদিন থেকেই আপনারা দেখিয়ে আসছেন—সেজন্যে গভীর ধন্যবাদ।

লেখা দিয়ে আপনার সব টাকা শোধ করে দেব,—না হয় ক্যাশে ক্যাশে শোধ করতে গেলে ছ-সাত মাস (তার বেশি নয়) দেরী হতে পারে। কবিতাগুলি সবই এক সময়ে লেখা নয়। কবিতা কিছু বেছে পাঠিয়েছি, তবু যদি কিছু অপছন্দ হয় আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারেন। কবিতা আপনার সুবিধামত পূর্বাশায় কিংবা অন্য কোন ভালো পত্রিকায় (উপযুক্ত টাকা দিলে ও মর্যাদা রাখলে) ছাপাতে পারেন। জরুরি। আজ কালই প্রত্যাশা করছি।

প্রীতি নমস্কার ইতি জীবনানন্দ দাশ।

টাকা চাই—টাকা। ভাড়া আছে, ছেলে-মেয়েরা পত্রাশোনা করছে। বি. চারুবদের মাইনে আছে, আছে সংসারের খরচ—আরো কত খরচ, শুধুই খরচ। জমা কিছু নেই। বরিশাল এখন দূর-অস্ত। কবিতা মনের ব্যাপার, মন এখন সংসারের চাকায় বাঁধা।

তার দাবি মেটাতে কবি ব্যস্ত। প্রিয় অমল দত্ত আরও এই ১৯৫০ সালটায় বড় দুঃসময়। তারও বেকারত্ব। তারও টিউশানি, কিছু টুকিটাকি কারবার। তার জন্যেও কবি বড় উদ্বিগ্ন। সে যা কি করে ঘর ভাড়ার টাকা দেবে। চারদিকে বড়ই সমস্যা। আবার পূর্ববাংলায় সম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় উদ্বাস্তু-স্রোত দলে দলে পশ্চিমবাংলায় কলকাতার প্রান্তসীমায় ঘিরে ফেলল। টালিগঞ্জ ও যাদবপুরের দক্ষিণে খালি জায়গা পেলেই ভেরা বেঁধে থাকবার ব্যবস্থা করছে। মান-সম্ভ্রম জলাঞ্জলি দিয়ে সেই সংকটে ভিক্ষা-বৃত্তি সম্বল করে আছে ছিন্নমূল নবনারীরা। তাদের দেখে কে বলবে ছবির মতো গ্রাম তাদের—আমকাঁটালের বাগান ছিল, শান্তি নীড় ছিল। —ছিল মাটির প্রতি গভীর টান।

জীবনানন্দ এবং অমল দত্ত বাস্তুহারাদের জন্য একখানা বিদ্যালয় খোলার ব্যবস্থা করলেন। তাই জীবনানন্দ ও অমল দত্ত আগ্রহভরে অনেক লোকের সঙ্গে অনেক বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করছেন। কিন্তু নিরাশ হতে হয়। বাস্তুহারা মানুষগুলো এখন এবিষয়ে মোটেই উৎসাহী নয়। পেটের মধ্যে যাদের দৈত্যের মত ক্ষুধার আগুন জ্বলছে—অন্নবস্ত্র যাদের নেই, সমস্যার ভারে যারা জর্জরিত এই মুহূর্তে তাদের জন্যে স্কুল খোলা অসম্ভব। স্কুলের আগে তাদের অন্ন-বস্ত্রের প্রয়োজন। অমল তুমি কি পারবে এদের স্কুল খুলেও সে সমস্যার ভার নিতে।

অসম্ভব আমাদের সে সামর্থ কোথায়।

তাহলে স্কুল খোলা এখানেই ইতি কি বলো?

কি আর করা যায়।

তা হলে চল ফিরেই চলি।

ফিরতি পথে বাসে অমল দত্ত জীবনানন্দকে বললেন, আজ যে ছিন্নমূল মানুষদের দেখলেন আশা কবি এদের কথা আপনার কবিতায় পাওয়া যাবে?

জীবনানন্দর চোখেমুখে কৌতুকের আভাস। তিনি অমল দত্তর দিকে ফিরে হাসতে লাগলেন—শব্দহীন হাসি।

অমল দত্ত বললেন, 'হাসছেন কেন?' পরে বুঝেছেন জীবনানন্দও কি ছিন্নমূল মানুষ নন। তাঁদের কথা কি তিনি লেখেন নি তাঁর কাব্যগ্রন্থে। অনেক আগেই ঠেলে এ-দিকে উঠে আসবে। বোসো, দেখে এসম্বন্ধে লিখে বসে আছেন।

ঊর্ধ্বাকাশে বৃষ্টি পড়ছে। এসপ্যানেডের গুমটিঘরের ছায়ায় দাঁড়িয়ে কয়েকজন তরুণ কবি সাহিত্যিক সঙ্গীতকার—আজকে তাঁরা অনেকে সুপরিচিত—সুপ্রসিদ্ধ—গৌরকিশোর ঘোষ, অরুণ সরকার, অরুণ ভট্টাচার্য, রাজেশ্বর মিত্র।

বৃষ্টি আর থামে না—সর্বনাশ বৃষ্টি।

বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে বাড়ি যাব নাকি।

একটু দাঁড়িয়ে যাও।

দাঁড়িয়ে যখন রয়েছ কিছু বল....!

জমে হাসি, চলে ঠাট্টা—গল্প স্বল্প।

গৌরকিশোর ঘোষ—যিনি রূপদর্শী নামে খ্যাতনামা—যাঁর অশেষ রূপ এবং গুণ—তিনি হঠাৎ সকলকে অবাক করে দিয়ে আবৃত্তি করলেন একটি কবিতা।

বাঃ—বেশ! সকলেই খুব উৎসাহিত।

চলেছে বৃষ্টি, চলেছে কবিতা আবৃত্তি। স্বরচিত এবং অন্যের রচিত কবিতা আবৃত্তি। শুনছে আরও অনেকে আগ্রহের সঙ্গে যারা ট্রামের গুমটিঘরের বৃষ্টির ছাট থেকে মাথা বাঁচিয়ে দাঁড়িয়ে। কেউ অবাক, কেউ বা আমোদিত, কেউ বা বিস্মিত।

জনসাধারণের মাঝে দাঁড়িয়ে এই যে কবিতা পাঠ, এ-একটা নতুন অভিজ্ঞতা। এ অভিজ্ঞতা তরুণ কবি শিল্পীদের মাঝে—তাদের মনে এক নতুন প্রেরণা আনলো। চৌরঙ্গীর গুমটিঘরে নতুন কবিদের কবিতা-পাঠ পরের দিনের কাগজে ফলাও করে প্রকাশিত হল। পরের দিন কবিরা আবার মিলিত হলেন চৌরঙ্গীর মোড়ে। আগের দিন ছিলেন অরুণ সরকার, অরুণ ভট্টাচার্য, গৌর-কিশোর ঘোষ, রাজেশ্বর মিত্র এরা ছাড়া এলেন বাণী রায়, শিবনারায়ণ রায়। ফেস্টুনে 'কবিতা পড়ুন' ইত্যাদি লিখে মিছিল করে কবিরা আন্দোলনে নামলেন। তৃতীয় দিনে কবিরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে একটি বট-গাছের নিচে সকলে মিলিত হয়ে স্বরচিত কবিতা পাঠ ছাড়াও জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দের কবিতা আবৃত্তি করলেন।

আবার সেই জীবনানন্দ। জীবনানন্দ দাশ কেবল নাম নয়, জীবনানন্দ একটি প্রতিষ্ঠান। যেমন চিত্রকলায় অবনীন্দ্রনাথ কেবল নাম নয়, একটি স্কুল ও নৃত্যশিল্পে উদয়শংকর। জীবনানন্দও রবীন্দ্র-পরবর্তী এক আধুনিক ভাবনা। ভাবতে বসো দেখবে 'জীবনানন্দ ভাবনা' এসে গেছে। চিঠি লেখো বন্ধুকে দেখবে জীবনানন্দর কবিতার ছোট অংশ কখন প্রবেশ করেছে চিঠির বয়ানে। যারা আধুনিক কবিতার কালোরাসিক তাদের চিন্তা, স্মৃতি, অনুরাগ, অভিযোগ, আক্ষেপ-এর সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে জীবনানন্দ—জীবনানন্দ ধ্বনি-প্রতিধ্বনি।

কবি নরেশ গুহ বলেন একে একে সবাই আমরা কলকাতায় এসে জুটেছি—সময়ের শাসনভাষা আমাদের ঘনিষ্ঠ আড্ডায় গোটা রাতটাই হয়তো কেটে গেছে পার্কের ঘাসে। জীবনানন্দর কত কবিতা যে পরস্পরের কাছে কবুল করেছি ভাবলে অবাক হই। মনে হয় আমাদের সেনা পৃথিবীর একটা বড় অংশই যেন জীবনানন্দ অনুবাদ করে দিয়ে গেছেন আমাদের জন্যে। অপ্রত্যাশিত সম্মোহ সেই অনুবাদে, সেই সম্মোহ মেনে স্বপ্নার কাকের আকাঙ্ক্ষায় ঘরে ফেরার কথা ভেবেছি আমরা। হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলির খেলা দেখবার জন্যে চোখ নেই যাদের তাদের নামে কড়া কেটেছি। জীবনানন্দ কখনো জানেন কি বলত। যেন যখন প্রথম ষোল পৃষ্ঠার বই হয়ে বেরিয়েছিল তখন আমাদেরই কোন বন্ধু এপ্রসঙ্গে তার ১৫।২০ কপি কিনে সব বন্ধুদের উপহার দিয়েছিল। মুগ্ধ হয়ে কবিতায় প্রেমে পড়া যায় কবিকে সেকথা জানাবার প্রয়োজন নেই।

দিনে মানুষ জীবনানন্দ সংসারী জীবনানন্দ। অর্থ উপার্জনের জন্যে চাকরির জন্যে ঘুরে ঘুরে পরিশ্রান্ত কবি। রাতে অন্য মানুষ। কবিতা লেখেন আলো জেলে, কত রাত হিসাব থাকে না কোন।

'নারায়ণ, সিটি কলেজের চাকরিটা আমার হয়ে যাবে। না?'

হাতে ইংরিজির অধ্যাপকের চাকরির জন্যে আবেদনপত্র। চুপচাপ বসে আছেন সিটি কলেজের অধ্যাপকদের জন্যে নির্দিষ্ট বিশ্রাম কক্ষে জীবনানন্দ। কতদিন ঐ কলেজে চাকরি করেছেন যে—সেই পুরনো স্মৃতিতে ঘেরা এ কলেজখানি—এ যে তাঁরই কলেজ—যেন এখনও এখানেই চাকরিরত। বাংলার অধ্যাপক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কমনরুমে এসে দেখলেন ক্লান্ত-শ্রান্ত কবি, যেন ধ্যানমগ্ন। চেয়ারে বসেছেন, অনেক পথ যেন ঘুরেছেন।

'একি স্যার। আপনি এখানে আমাদের এই সিটি কলেজে?'

'একগ্লাস জল খাওয়াতে পার নারায়ণ?'

'নিশ্চয়ই।'

নিজেই একগ্লাস জল গড়িয়ে এনে স্যারের হাতে দিলেন নারায়ণ—বড় প্রিয় ছাত্র নারায়ণ জীবনানন্দর বরিশালের বি, এম কলেজের।

'এখন বলুন স্যার, কেন এখানে এসে-ছেন আমি কি করতে পারি আপনার জন্যে?'

'এখানে ইংরিজি বিভাগের একজন অধ্যা-পক নেবে। এপ্লিকেশনটা এনেছি হাতে করে, তুমি দিয়ে দেবে নারায়ণ। আর একটু আমার জন্যে চেষ্টা করবে?'

'নিশ্চয়ই চেষ্টা করব স্যার,—আমার যথাসাধ্য।'

চাকরিটা আমার হয়ে যাবে, না? আচ্ছা নারায়ণ একটা কথা বলতে পার? আমাকে যে চাকরিতে নেয়া হবে সেই পোস্টটা কি তোমার ওপরে না নীচে?

শিশুর মত সরল প্রশ্ন কবির। কবি কি কিছুই বোঝেন না। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অবাক হয়ে শোনেন কবির আকস্মিক এই প্রশ্নের কি উত্তর দেবেন। চাকরি হওয়ার প্রশ্ন প্রথমে তারপর অন্যকথা: নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কি এখনো সেই ছেলেমানুষই আছেন জীবনানন্দর মনে। সরল কবির এ-প্রশ্নে দুঃখ বোধ করেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

বয়েসের জন্যে বা অন্য কোন কারণে 'চাকরিটা হোক আগে!'

সে চাকরি হয়নি।

দুঃখ অসীম। তবু পরাজয় নয়। নিরাশা, তবু আশার আলোক। ক্লান্তি তবু পথের শেষ নেই, চলতেই হবে, এই তো জীবনানন্দ।

কবিতা শুধু কবিতা।

তরুণ কবিদের প্রচেষ্টাকে তিনি উৎসাহিত করেছেন। সস্নেহে তাদের সঙ্গে মিশতে চেয়েছেন। কিন্তু কবিতা সম্বন্ধে তাঁর মতামত বা ধারণা উচ্চগ্রামে বাঁধা, তিনি ক্ষমা করতেন না। চল্লিশের কবিরা কবিতা সম্বন্ধে তিনি কঠোর, স্পর্ধা দেখলে তাঁর কাছে এসেছেন, এখানে ওখানে যখন দেখা হয়েছে কথা বলেছেন, কবিতার কথা—শুধু কবিতার কথা। বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশ গুহ শুদ্ধসত্ত্ব বসু এসেছেন জীবনানন্দের ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে।

কবি-অধ্যাপক শুদ্ধসত্ত্ব বসুর একক মাঝে মাঝে বেড়াতে বেড়াতে কবি এসে উপস্থিত হয়েছেন 'একলব্যর অফিসে অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ববাবুর বালিগঞ্জের বাসাবাড়িতে। অনেকক্ষণ থেকেছেন গল্প হয়েছে, হাসি, ঠাট্টা হয়েছে।

রোমান্টিক কবিই আখ্যা দেন। কিন্তু আমি তো আপনার মতো বাস্তববোধসম্পন্ন কবি দেখিনি।'

জীবনানন্দ সায় দিলেন।

লৌকিক এবং ব্যবহারিক জীবনে আপনি নির্জন একথা হয়তো সত্যি, কিন্তু কবি হিসেবেও যে আপনি নির্জন—একথার অর্থ আমি বুঝতে পারি না। কবি মাত্রেই তো নির্জন। কবির একটা সামাজিক সত্তা আছে, সে সত্তায় তিনি দৈনন্দিন জীবনের ব্যাপারগুলো সমাধান করে থাকেন। এই সত্তার দিক থেকে তিনি হয় মিশুক, নয় লাজুক, নয় নির্জন, নয় খোসগল্পে ইত্যাদি নানা ধাতুর বা ধরনের হতে পারেন। কিন্তু কবি সত্তায় তাঁকে সম্পূর্ণ একাকীত্ব বোধ করতে হবে। সুতরাং আমার মনে নির্জন বিশেষণটি অকারণ বাড়তি।' শুদ্ধসত্ত্ববাবু আবার বললেন 'তবে আপনার সম্পর্কে নির্জন বিশেষণটির অন্য এক ব্যঞ্জনা আছে। কবিতের আবেগ ও আবহাওয়ায় আপনি সব সময়েই মশগুল, ব্যবহারিক ও প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিবিম্বিত সামাজিক সত্তাই আপনার অন্তর্লোকের কবিসত্তা সর্বদা পূর্ণ। সেইজন্য মনে হয় 'নির্জন' পদটি আপনার কবিসত্তার পূর্বে বসিয়ে সংক্ষেপে অথচ সুচারুভাবে প্রকাশ করা হয়ে থাকে।'

'ওরা বলে আমি কেবলই রোমান্টিক কবি।'

'আমিও বিশ্বাস করি আপনি রোমান্টিক কবি। তবে কোন কবি না রোমান্টিক? বাস্তব ব্যাপারে বাস্তবাতীত করে পরিবেশন করাই রোমান্টিক মনের কাজ—আর তা না করলেই তো ঘটনা সাহিত্যের মানে উন্নীত হয় না। তবে কাব্যের উপজীব্য বিষয়ের ওপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই আমরা প্রধানত বিচার করি কবির মনন কোন ভাবনায় ভাবিত। এই নিরিখে দেখলে বলতে হয় যে আপনি বাস্তবধর্মী নন। কিন্তু তা ঠিক নয়। আপনি সমাজ সচেতন কবি, তার প্রমাণ ও পরিচয় যথেষ্ট আছে। আপনার গোড়ার দিকের সমস্ত কবিতার প্রকৃতি ও বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে আপনার মন প্রকৃতিমুখী এবং অতীতচারী, একথা মেনে নিয়েও বলা যায় যে এই মনেরও একটা বিবর্তন হয়েছে। আপনার প্রথম কাব্য ঝরাপালক থেকে সবশেষ প্রকাশিত রচনা পর্যন্ত সুচিন্তিতভাবে এবং ধৈর্য ধরে পাঠ করলে এইটুকু অন্তত নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে যে আপনিও সমাজ সজাগ চিত্তের অধিকারী এবং মানুষের জীবন সম্বন্ধে সচেতন।'

শুদ্ধসত্ত্ববাবু সত্যি, শুধু রোমান্টিক নই আমি, যখনলতা সেন পর্যায়ের কবিতা আমার শ্রেষ্ঠ কবিতা নয়।'

কবি অরুণ ভট্টাচার্যর পত্রিকা 'উত্তর-সূরী'। 'উত্তরসূরী' পত্রিকায় অরুণ ভট্টাচার্য জীবনানন্দর 'বনলতা সেনের পরবর্তী' অধ্যায়ের কবিতাগুলির সম্বন্ধে একটি সুন্দর আলোচনা করেছিলেন। অরুণ ভট্টাচার্য কবিকে চিঠি লিখেছিলেন তার উত্তরে খুশি হয়ে উত্তর দিলেন কবি।

প্রীতিভাজনেষু,

১৮৩, ল্যান্সডাউন রোড
কলিকাতা-২৬
২৯-৭-৫০

আপনার চিঠি ও কবিতা পেয়ে খুব আনন্দিত হয়েছি। শরীর অসুস্থ ছিল তাই উত্তর দিতে দেরী হয়ে গেল, মার্জনা করবেন। আমার কবিতা সম্পর্কে আপনি যা লিখেছেন তা পড়ে আমি নিজেকে খুব কৃতার্থ বোধ করছি। আপনার মত অল্প কয়েকজন পাঠক থাকলেও আমি নিজেকে সার্থক মনে করব। কাব্যপাঠ সম্পর্কে নিজের চেতনাকে শুদ্ধ ও সম্প্রসারিত করে একটা পরিষ্কার মতামতে পৌঁছবার আগ্রহ রয়েছে আপনার—অনুভব করে ভরসা এলো। আমার ধূসর পাণ্ডুলিপি বনলতা সেনের পরবর্তী-কালের কাব্য এক-আধ জন ছাড়া এদেশের বড় সমালোচকদের পছন্দ হয় না। সাধারণ পাঠকও সমালোচকদের প্রায় সকলেই খুব সম্ভব আমার শেষের দিকের কবিতাগুলোকে দুরূহ—নাকি দুর্বোধ্য? ভেবে ছেড়ে দেয়। এরকম ক্ষেত্রে আপনার এপ্রোচ-এর বিশেষত্ব দেখে তৃপ্তি পেলাম। আপনার কবিতাটি ভালো লাগলো। দু-একটি জায়গা বদলে দিলে ঠিক হয়। বদলাবার ভার আপনার নিজের ওপর। আশা করি ভালো আছেন। প্রীতি নমস্কার। জীবনানন্দ দাশ।

কোন কবিতাসভা বা আড্ডায় যান না জীবনানন্দ। আসলে সব সাহিত্যগোষ্ঠীতেই নিজেকে বিদেশী বলে মনে হয়। সব দলেই ছাড়া ছাড়া।'

হঠাৎ প্রখ্যাত প্রবন্ধ লেখক ও সাংবাদিক আবু সৈয়দ আইয়ুব স্টেটসম্যান

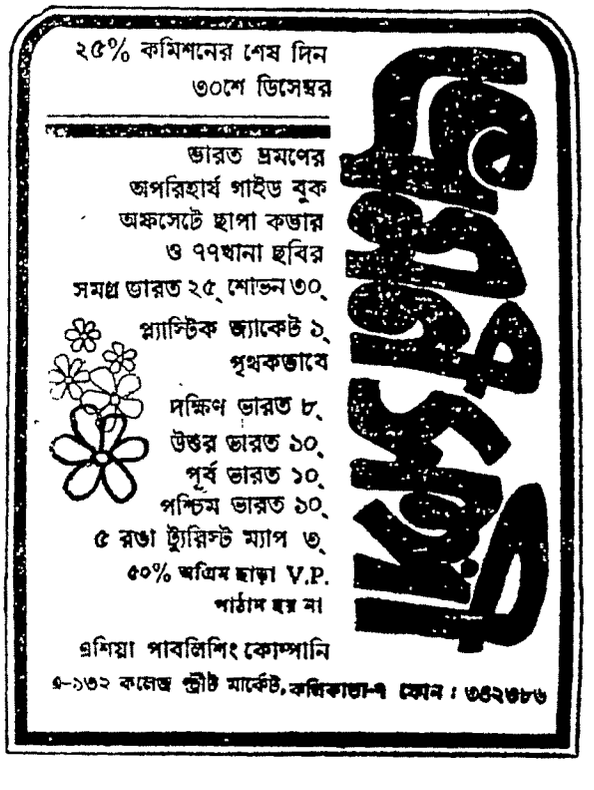

পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখলেন 'ডিবেকটিভ অফ দি এটলান্টিক প্যাকট'। লেখাটি প্রকাশ হবার পর আইয়ুব—বাড়িতে একদিন একটি বৈঠক বসে। বৈঠকে যোগদান করলেন শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, অম্লান দত্ত, সম্ভবত সোমেন ঠাকুর, নারায়ণ চৌধুরী এবং গৃহস্বামী আবু সৈয়দ আইয়ুব। জীবনানন্দ দাশকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রথম দিন যোগদান করেননি তিনি। দ্বিতীয় দিনের বৈঠকে ডাকা হয় ২৪নং চৌরঙ্গী রোডে শ্রীআনন্দগোপাল সেনগুপ্তর বাড়িতে। সংস্থাটির নাম কি হবে? নাম স্থির হয় 'সমকালীন সাহিত্য কেন্দ্র'। ২৪নং চৌরঙ্গী রোড আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত বাড়ির একখানি ঘরে সংস্থার অফিস হল।

অফিস তো হল। সাহিত্যিক কবিদের মুখপত্র একখানি পত্রিকা প্রকাশ হবে না? সকলেরই ইচ্ছা একখানি পত্রিকা। সুযোগ এসে গেল। শ্রীসুহৃদ কুন্ডু এবং বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য 'স্বন্দন' নামে একখানি পত্রিকার সম্পাদনা ও পরিচালনার কাজে যুক্ত ছিলেন। তাঁরা সমকালীন সাহিত্য কেন্দ্রের সভ্যদের হাতে কাগজটি পরিচালনার ভার দিয়ে দিলেন। পত্রিকাটি নতুন রূপে প্রকাশ হল 'সমকালীন! সাহিত্য কেন্দ্রের মুখপত্র' এই লেখাটুকু যোগ দিয়ে। সভ্যদের অনেকেরই পত্রিকার 'স্বন্দন' নামটি পালটিয়ে 'সমকালীন' রাখার ইচ্ছে ছিল কিন্তু নতুন রেজিস্ট্রেশন করা এবং অন্যান্য হাঙ্গামার ভয়ে কোন সভ্যই দ্বিরুক্তি করলেন না। 'স্বন্দন' নামই রইল। একই প্রেস থেকে ছাপাও চলতে লাগলো। সমকালীন সাহিত্য কেন্দ্রের সভ্যরা কবি জীবনানন্দ দাশকে 'স্বন্দন' পত্রিকার সম্পাদনার কাজে আহ্বান জানালেন।

কবি জীবনানন্দ দাশ সমকালীন সাহিত্য কেন্দ্রের একটি সভায় বললেন 'শুনেছি ইংল্যাণ্ডে মোটামুটি শিক্ষিত লোকেদের কাছে রাজনীতির যে গুরুত্ব, ফ্রান্সে সাহিত্যের মর্যাদা অনেকটা সেরকম—কথাটি সত্যি কিনা জানি না। খবরের কাগজ পড়ে অবশ্য মনে হয় অন্যান্য দেশের মত ফ্রান্সেও রাজনীতি-সর্বস্বতা ছাড়া বড় একটা কিছু নেই আর।

বিশিষ্ট প্রবন্ধকার শ্রীঅম্লান দত্ত কথা প্রসঙ্গে বলেছেন 'সমকালীন সাহিত্য কেন্দ্র' এবং 'স্বন্দন' পত্রিকাটি সোসালিস্ট পার্টি' পরিচালিত বা তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল না। তবে সভ্যদের মধ্যে অনেকে সেই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। শ্রীআনন্দগোপাল সেনগুপ্ত বলেছেন 'সমকালীন সাহিত্য কেন্দ্র' এবং 'স্বন্দন' পত্রিকাটি সোসালিস্ট পার্টি পরিচালিত ছিল। শ্রীসেনগুপ্ত আরো বলেছেন বর্তমানে যে 'সমকালীন' পত্রিকা তার সঙ্গে 'সমকালীন সাহিত্য কেন্দ্রের' কোন যোগ নেই।

তবে হতেও পারে সাহিত্য সেখানে সত্যিই স্থান পায়—সমসাময়িক সাহিত্যও। ফ্রান্সকে খুব ভালো বলতে হবে তাহলে।

পৃথিবীর নামকরা সভ্যদেশগুলো সাহিত্য বলতে অল্পাধিক অতীতের সাহিত্য বোঝে, কিন্তু জীবনের প্রয়োজনে কি তার মূল্য পরিষ্কার করে বুঝে দেখবার চেষ্টা নেই। সমসাময়িক সাহিত্য সম্বন্ধে কোন কথাই ভাবতে চায় না, আজকের সাহিত্যিক না খুশি ভাবুক, লিখুক স্টেটের তাতে কিছু এসে যায় না—এমনই অকিঞ্চিৎকর মান করা হয় সাহিত্যকে। এই হল এদিককার ছবি। অন্যদিকে দু-একটি বড় রাষ্ট্রের সাহিত্য সম্বন্ধে চেতনার সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। সেসব জায়গায় রাষ্ট্রই সবই চালাচ্ছে, সাহিত্যকেও; সাহিত্যিকের মনন ও ধ্যানের কিছুমাত্র স্বাধীনতা থাকলেও রাষ্ট্রের প্রভুত্ব খর্ব হয়—এই তাদের ধারণা। অসত্য এবং অন্যায় এই ধারণা।

সাহিত্যের উচিত স্বাধীনতার স্টেট বিপদগ্রস্ত হবে—আমার মনে হয় বাংলাদেশ এমনভাবে এখনও ভাবতে সুরু করেনি কিন্তু শিগগির করতে পারে। 'সমকালীন সাহিত্য কেন্দ্র' একদিকে সমাজ ও নেতার বিমূঢ় উপেক্ষা এবং অন্যদিকে রাষ্ট্র ইত্যাদির অন্যায় ও অবোধ কত নেতৃত্বের হাত থেকে যথাসম্ভব মুক্ত হওয়ার কাজে ধৈর্য স্থান ও বিশ্বাসের সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছেন বলে মনে করে আমি আনন্দিত হয়েছি। সাহিত্যের উন্নতি ও সার্থকতার আপনারা মিলিত হয়েছেন : আপনাদের পরিপূর্ণ সাফল্য কামনা করি।

সমকালীন সাহিত্য কেন্দ্রের সভ্যদের দ্বারা পরিচালিত হলে 'স্বন্দন' পত্রিকাখানি ৪র্থ বর্ষ আষাঢ় ১৩৫৭ (১৯৫০) থেকে ৬ষ্ঠ বর্ষ অগ্রহায়ণ ১৩৫৭ ছটি সংখ্যা অর্থাৎ ছটি মাস প্রকাশিত হয়েছিল।

'স্বন্দন' পত্রিকাখানির সম্পাদক হিসেবে কবি জীবনানন্দ দাশের এবং অন্যান্যদের নাম পাই আমরা এইভাবে—

সম্পাদনা পরিষদ
জীবনানন্দ দাশ
আবু সয়ীদ আইয়ুব
নরেন্দ্রনাথ মিত্র
বিভাগীয় সম্পাদক

প্রবন্ধ—অম্লান দত্ত, কথাসাহিত্য—সন্তোষকুমার ঘোষ, কবিতা—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রুতি ও দৃশ্যকলা—নারায়ণ চৌধুরী।

কার্যত সম্পাদনা পরিষদে যাঁদের নাম পাওয়া যায়, বয়েসে প্রবীন বলেই তাঁদের নাম যুক্ত করা হয়েছিল মনে হয়। বিভাগীয় সম্পাদকেরাই পত্রিকাটির পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন। জীবনানন্দ তাঁদের সকলের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ কবি।

এতদিন কলকাতায়। হঠাৎ চাকরি পেলেন খড়গপুর কলেজে। ১৯৫০ সালের ১ সেপ্টেম্বর। প্রবন্ধের সম্পাদক অম্লান দত্ত স্বন্দনের আশ্বিন সংখ্যার সম্পাদকীয়র জন্যে একখানি প্রবন্ধ চেয়ে চিঠি পাঠালেন। জীবনানন্দ 'আধুনিক কবিতা' নামে একখানি প্রবন্ধ লিখে অম্লানবাবুকে পাঠিয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে লিখে দিলেন প্রবন্ধটি যেন সম্পাদকীয় হিসেবে ব্যবহার না করে আশ্বিন সংখ্যায় প্রথম প্রবন্ধ হিসেবে তাঁর নামেই প্রকাশ করা হয়।

খড়গপুরে চাকরি, উইক এণ্ড-এ কলকাতায়। খড়গপুরেই কবিকে থাকতে হয়, সেখানেই কোয়ার্টার। ছেলেমেয়েরা থাকে কলকাতায়। পড়াশোনা করে। স্ত্রী একটি স্কুলে চাকরি করেন, তাদের খড়গপুরে যাওয়ার উপায় নেই। তাছাড়া আছে কলকাতার মায়া। খড়গপুরে থাকা যায় না। ১৯৫১ সালের ১ ফেব্রুয়ারী হঠাৎ খড়গপুরের চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন জীবনানন্দ।

আমরা দেখেছি কবি কখনো কলকাতার বাইরে চাকরি পেয়ে নিতেন না বা বেশীদিন থাকতে পারতেন না। ডায়মণ্ডহারবার ফকিরচাঁদ কলেজে গোপাল হালদার সৌজন্যে অধ্যাপনার চাকরি পেয়েও ডায়মণ্ডহারবারে থাকতে হবে শুনে যোগদান করেননি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সমলেন্দু বসু বলেছিলেন, তিনি একবার পশ্চিমের একটি কলেজে জীবনানন্দর অধ্যাপনার চাকরির ব্যবস্থা করেন। কবিরই অনুরোধে কলেজে যোগদানের জন্যে বলেন কর্তৃপক্ষ। জীবনানন্দ তখন বলেন 'বড় জোর মাসিনা কেমন করে বাইরে যাই।' অধ্যাপক বসুর চেষ্টায় অবশেষে ইনক্রিমেন্ট দিয়ে নিয়োগপত্র প্রেরণ করেন কলেজ কর্তৃপক্ষ। তবুও জীবনানন্দ শেষ পর্যন্ত কলকাতা ত্যাগ করে কলেজে যোগদান করেননি।

সমতট : 37

বিশেষ সংখ্যা : মূল্য পাঁচ টাকা

সূচী : গল্প / মহাশ্বেতা দেবী অমল আচার্য সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত উপন্যাস/অমিয়ভূষণ মজুমদার ক্রোড়পত্র : নাটক / শৈবাল চট্টোপাধ্যায় ও নোবেল বিজয়ী সল বেলোর একাঙ্ক নাটক ॥ থিয়েটারে গণ্ডগোল—নীতীশ সেন নবনাট্য আন্দোলন—মিহির সিংহ বহুরূপী প্রসঙ্গে—ধ্রুব গুপ্ত কবিতা/জীমূতবাহন রায় শিবশম্ভু পাল প্রদ্যুম্ন মিত্র গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অভী সেনগুপ্ত অমিতাভ দাশগুপ্ত সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত দাউদ হায়দার প্রবন্ধ : এম এম রায়ের বাঙলায় অপ্রকাশিত রচনা ধ্রুব গুপ্তর আফ্রিকা আফ্রিকা আমাদের টেস্টটিউব বেবি/মিহির সিংহ সেকালের উপন্যাস : এ কালের চোখ/অরুণ বসু পশ্চিম বঙ্গের বিদ্যুৎ সমস্যা/পার্থ ঘোষ আধুনিক কবিতার নয়ছয়/অকিঞ্চন সত্যজিৎ রায় : দর্শক ও পাঠকের চোখে/সুপ্রভা চৌধুরী আলোচনা : ইংরেজি ভাষার দুর্বলতা/দীপংকর রায় অফিস : ৫।১।বি, দেশপ্রিয় পার্ক ইস্ট, কলকাতা-৭০০০২৯

ফোন : ৪২-৫৫৯০ (মঙ্গল/বুধবার/সন্ধ্যা)

চাঁদা : ১।২।৩ বছর/আজীবন (পত্রিক্স) —১২।২৩।৩২।১০০৲

পরিবেশক : পাতিরাম পাবিত্রা, কলকাতা

চিঠিপত্র

কেন দূরে থাকা ?

গত ১১ আগষ্টের অমৃতে প্রকাশিত শ্রীমণীন্দ্র রায়ের মফঃস্বলের-লেখক শীর্ষক রচনাটি পড়ে ভাল লাগল। মফঃস্বলের-লেখকদের সম্পর্কে তিনি যে আগ্রহ ও সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন এ জন্য ধন্যবাদ।

যাহোক, আসল কথায় আসা যাক শ্রীরায় মফঃস্বলের-লেখক সম্বন্ধে আলোচনাকালে আগরতলায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের যে অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করেছেন—সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার এবং শ্রীরায়ের ভাষণ শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ জানাই আগরতলার তরুণ কবিদের কবিতা আমকেও বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। রীতি মতো হিংসে হয়েছিল তাদের লেখা পড়ে ও শুনে। কিন্তু তাদের অনেকে মৌখিকভাব এই অভিযোগ করেছিলেন যে, কলকাতার পত্র-পত্রিকায় তাদের লেখা প্রকাশ করা হয় না। কিন্তু শ্রীরায় কি তাদের এই অভিযোগের কথা শোনেন নি ? যদি শুনে থাকেন, তাহলে বলি, এখনও কি তাদের লেখা কলকাতার বহুল প্রচারিত পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ? এ-কথা লিখছি এই কারণে যে, আমরা যখন গ্রাম অথবা মফঃস্বল শহরে অনুষ্ঠিত সভা-সমিতিতে যোগ দিতে যাই তখন প্রশংসনীয় তরুণ-লেখকদের উৎসাহব্যঞ্জক অনেক কথা, অনেক প্রতিশ্রুতি (সাধ্যাতীত জেনেও) দিয়ে আসি। কিন্তু সেখানে থেকে ফিরে আসার পরে আর তাদের কথা মনেই রাখি না। অথচ স্থানীয় ব্যক্তিরা অতিথিদের শুধু আদর-আপ্যায়নই করেন না, খ্যাতনামা লেখকদের সান্নিধ্য লাভের কি আকাঙ্খায়ই না তারা মনে পোষণ করেন।

আগরতলার কথাই ধরা যাক। আমরা যখন পশ্চিমবঙ্গের প্রায় একশত প্রতিনিধি আগরতলা স্টেশনে ট্রেন থেকে নামলাম তখন স্থানীয় যে-সব সাহিত্য-পিপাসু তরুণ-তরুণী আমদের অভ্যর্থনা জানাতে আসে তাদের প্রায় সকলেরই প্রশ্ন করতে শুনেছি—অমুক কোথায়, তিনি কি আসেন নি, এলে কোথায় উঠেছেন ইত্যাদি। কিন্তু যেহেতু খ্যাতনামা কবি-সাহিত্যিকদের যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার পৃথক এবং বিশেষ ব্যবস্থা থাকে, তাই তাদের সঙ্গে [illegible] অনুষ্ঠানের সময় ছাড়া সকলে মেলামেশার সুযোগ পান না। আমি বলি, এই রীতি কি পরিবর্তন করা যায় না ?, তাঁরা কি দু-একদিনের জন্যে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পরিত্যাগ করে সাধারণের সঙ্গে মিশে যেতে পারেন না ? শ্রীরায় আগরতলার তরুণ কবিদের মধ্যে দিন-কয়েক কাটিয়ে আসতে না পারার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করায়—এইসব কথা আমার মনে এলো। কিন্তু আমার বক্তব্য শুধু শ্রীরায়ের উদ্দেশ্যে নয়, যাঁরাই এই ধরণের সাহিত্য-সভায় যোগ দেন তাঁদের সকলের উদ্দেশ্যেই। জানি, অনেক অসুবিধা থাকে, আছে এবং থাকবেও। তবু যখন মানুষকে নিয়েই কবি-সাহিত্যিকেরা কলম ধরেন তখন মানুষের স্পর্শ বাঁচিয়ে তাঁদের দূরে দূরে থাকাটা আমার কাছে শোভন ও সঙ্গত বলে মনে হয় না।

—অজিতকুমার দাস, ৮।২।১৭, লাল-বিহারী বসু লেন, হাওড়া-৬।

অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ান

৩ নভেম্বর সংখ্যায় 'সাহিত্য ও গুণগ্রাহিতা' লেখাটি পড়ে আমি মুগ্ধ হলাম। এ বিষয়ে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই।

মণীন্দ্রবাবু তাঁর লেখার একজায়গায় বলেছেন, 'শিল্প-সংস্কৃতির সবগুলো শাখাতেই পাতাঝরার পালা চলছে। একথাটি খুব সত্য। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমি বলব পাতাঝরার পালা চলছে বলে দুঃখ করার কোন কারণই নেই। বর্তমানে ইচ্ছা করেই অকালে কিছু পাতাঝরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কেবলমাত্র সুযোগ না দেওয়ার ফলে। যুগে যুগে, কালে কালে পাতা ঝরছে, ঝরবেই। তেমনি আবার নতুনভাবে সৃষ্টিও হচ্ছে। একদল যাচ্ছেন, আবার একদল হাল ধরছেন, আবার তাঁরা চলে গেলে আর একদল নবীন প্রতিভা তাদের জায়গা দখল করবেন। কিন্তু এটা বোধহয় স্বীকার না করে উপায় নেই যে, বর্তমান যুগে তা আর সম্ভব নয়। কেন না, আগেকার লেখকদের সময়ে অবিচারটা বোধহয় একটু কমই হত। বর্তমানে ক'টা পত্রিকার সম্পাদক বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন আমাদের দপ্তরে যা কিছু লেখা জমা পড়ে সব আমরা পড়ে দেখি, বিচার-বিশ্লেষণ করি। মুষ্টিমেয় কয়েকটি পত্রিকা আছে যাঁরা বাস্তবিকই লেখা পড়েন, বিচার করেন, ছাপান। তাহলে নবীনদের ক্ষেত্রে সুযোগটা কোথায় ? খ্যাতিমান সাহিত্যিকের হাত ধরে যে উঠবেন ক'টা নবাগতই বা এরকম ভাগ্য করেছেন। তাই দেখা যাচ্ছে, ক্রমান্বয়ে সাহিত্য নামক বস্তুটি মাটির সঙ্গে লুপ্ত হচ্ছে। স্বার্থ চূড়ামণিদের এক হাত চোখে চাপা দিয়ে অন্য হাতে নতুন পাতা ছিঁড়ে ফেলাই এ জন্য দায়ী।

মণীন্দ্রবাবু এক জায়গায় লিখেছেন, ভাগ্যান্বেষীর ভিড় এত বেশী যে অনেক ভালো লেখকই চাপা পড়ে যাচ্ছেন আর মধ্যে। আবার কেউ যে তাঁদের হাত ধরে সামনে নিয়ে আসবেন, এমন ঘটনাও ঘটছে না।' এটুকু অংশের জন্য আমি মণীন্দ্রবাবুকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।

বার্নাড শ-এর মন্তব্যটি তিনি উল্লেখ করে আমাদের চোখ তিনি আরও খুলে দিয়েছেন এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই এবং সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' উপন্যাসটির রবীন্দ্র পুরস্কারের কথা উল্লেখ করে সে যুগের সঙ্গে বর্তমান যুগের যে একটা বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে এটা তিনি বেশ ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়েছেন।

সব শেষে আমি শ্রদ্ধেয় প্রেমেন্দ্র-বাবুর কথায় আসি। প্রায় একযুগ আগে তিনি নবীন সাহিত্যিকদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। আমি এটা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না, প্রেমেনবাবু কেন দুঃখ প্রকাশ করছেন। প্রকৃত সৎ সাহিত্যিক নিজে জীবনে প্রচুর দুঃখ-কষ্ট পান, অনেক বাধা-বিপত্তি, অপমান সহ্য থাকেন, পরের দুঃখ-কষ্টও দেখেন। কিন্তু কেন সাহিত্যিকেরই হাত গুটিয়ে বসে থাকা উচিত নয়। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, সাহিত্যিক হল গুরুর মত যিনি দেশ-বাসীকে বিদ্যা দান করেন। আমি আপনাদের নিকট এই মিনতি করি, আপনারা যাঁরা এ যুগের প্রকৃতই সৎ সাহিত্যিক তাঁরা এই অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। সংস্কৃতির মল্লাটের নীচে অসৎ লেখার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দেশ ও জাতিকে ধ্বংসের মুখ থেকে রক্ষা করুন। আশা করি আপনার এই সাহিত্য ইত্যাদি...." কলমে বর্তমান যুগের সাহিত্য সম্বন্ধে আরও নতুন তথ্য জানতে পারব যা আমাদের চোখ খুলে দেবে।

—শোভন শেঠ, রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া-

শৈবাল মিত্র

তরণী পাহাড়ে বসন্ত

ট্র্যাফিক পুলিশটু হাত দেখাতে একটা বড়ো আক্সিডেন্টের ভীড়ের সঙ্গে ও রাস্তা পেরোয়। জীন দুবেক ষন্ডা লোক ওকে দুপাশ থেকে প্রায় চেপে ধরে। রেবা সন্ত্রাস হয়। তপতীকে কবে যেন বিশু বলেছে, রেবা এখন বাড়ী ফিরতে পারে। কোনো ঝামেলা নেই। মহিলা কংগ্রেসে ভিড়লে একটা ভালো চাকরীও জুটে যাবে। জ্যোৎস্না নাকি এক পা বাড়িয়ে আছে। মহিলা কংগ্রেস দপ্তরে যাতায়াত করছে। আজকাল বিশুদা বলতে সে পাগল। মাঝখানে একদিন অনেক রাত পর্যন্ত বিশু রসানগর, কাশীপুরের গল্প বলেছে। পুলিশের এক বড়োকর্তা আর একজন সান্ত্রীর সঙ্গে এক জিপেই ফিরতে ছিলো। টেম্পো ভর্তি হয়ে চেলারা গিয়েছিলো তোরাই আগন্তের বিকেলে। বিশুকে রাত দুই তিন গুলি চালাতে হয়। ওর হাতের নিখুঁত কাজ দেখে পুলিশের কর্তা দারুণ খুশী। সান্ত্রী বলেছে আমার বিকজ্ট।

কি এক খাপছাড়া কথায় রেবার বুক ভারী হয়। এই জ্যোৎস্না এক সময়ে কিশোরকে কি ভালোই না বাসতো। অন্ধকার উঠোনে কিশোরের মুখের দিকে তন্ময় দৃষ্টি মেলে সারা রাত পর্যন্ত গল্প শুনতো। কতো খুঁটিনাটি প্রশ্নের জবাবের জন্যে কিশোরকে খোঁচাতো। কোথায় যেন বিরাট ভাঙচুর হয়ে বদলে যাচ্ছে সব কিছু। রেবা বুঝতে পারে, নিজের বাড়ীতেও সে হেরে গেছে। এই পরাজয় বোধের গ্লানি মাঝে মাঝে এতো প্রবলভাবে চেপে ধরে যে রেবার মনে হয় সে মরে যাবে। বহুদিন ধরে পড়া ধ্যান ধারণা বিশ্বাস তখন থরথর করে কাঁপতে থাকে। বুকের ভেতরে অন্য রেবা, অনেকগুলো রেবা জেগে ওঠে। নানা মতলব, প্ররোচনা দেয়। বলে, তোমার কল্পনার বাগানে কোনোদিন ফুল ফুটবে না। ফালতু সময় চলে যাচ্ছে। চলতি হাওয়ার গলা জড়িয়ে ঝুলে পড়ো। জীবনটাকে এভাবে ফুঁকে দিয়ে কি লাভ। আসলে রেবাকে তারা দুয়ো দেয়, খুঁচিয়ে রক্তাক্ত করে, ধরা-শায়ী করতে চায়। তখন অন্ধকার হাতে পাঁচিলে বুক চেপে রেবা দাঁড়িয়ে থাকে। হৃৎপিন্ড শকত শানের ওপর ধাক্কা মারে। প্রতিটা ধুকপুকুনি ও শুনতে পায়। হাতের মাঝখানে অন্ধকারে মেসোমশাই পদ্মাসনে বসে আছে। আকাশের দিকে দুটো চোখ। কিশোরের মুখ রেবার মনে পড়ে। এই সময়ে মেয়ে হয়ে জন্মানোর জন্যে ওর দুঃখ হয়। জন্ম থেকেই মেয়েদের হাত পায় বেড়ী। অনেক ইচ্ছে, আকাংখা শুধু মেয়ে বলেই মেটে না। গোটা সমাজ, সংসার মেয়েদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ার জন্যে একটা ক্ষুধার্ত বাঘের মতো ওৎ পেতে বসে আছে। সারাদিনে যে কতো অশ্লীল ইঙ্গিত আর খারাপ শব্দের সঙ্গে পরিচয় হয়, তার সীমা সংখ্যা নেই। কতো নোংরা হাত যে ট্রামে বাসে, ভীড়ে পিশে দেয়, কে তার হিসের রাখে। বাড়ী ফিরতে একটু রাত হলেই ভয় করে। যে কোনো রাস্তায় দু-চারজন ধরে যদি তাকে ধর্ষণও করে, কিছু করার উপায় নেই। এখানে রাষ্ট্র নেই, সমাজ, সংসার মানুষ নেই। চারপাশে শুধু সীমাহীন নিষ্ঠুর জবরদস্তি আর ভয়। কিশোর বলতো, এদেশে রাষ্ট্র বড়ো দুর্বল, কৃপণ। ইউরোপের দেশগুলোতে মানুষের সুখ দুঃখ আপদ, বিপদে রাষ্ট্রই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ছাতা। ওখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের চেয়ে মানুষের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক অনেক গভীর এবং ব্যাপক। তাই সামাজিক, পারিবারিক জীবনের বাঁধন খুব আলগা, শিথিল এবং যান্ত্রিক। আমাদের দেশে মানুষের সঙ্গে রাষ্ট্রের শুধু চোখ রাঙানি আর পীড়নের সম্পর্ক। মানুষের ব্যক্তিগত অভাব, দুঃখ কষ্টে রাষ্ট্র এগিয়ে আসে না। রাষ্ট্রের কাছে মানুষের কোনো দাম নেই। তাই প্রতি বছর খরা, বন্যায়, সাজানো ম্যানমেড দুর্ভিক্ষে হাজার হাজার মানুষ মরে যায়। বস্তায়, গাছতলায় মৃত মানুষ পড়ে থাকে। অসহায় মানুষ সমাজ, পরিবারকে আঁকড়ে বেঁচে থাকতে চায়। সামাজিক এবং পারিবারিক শাসন, সংস্কারের চাপা তাই আজও এতে প্রবল। যৌথ সংসার থেকে ছেলেকে দূরে যেতে দেয়। তাই লাথিও মারে। অবিবাহিতা মেয়েকে পেটভাতার ক্রীতদাসীর কাজ করিয়ে সতী সাবিত্রীর গল্প শোনায়। পুরোনো, পচা গলা এই সমাজ, সংসারও আজ ভেঙ্গে পড়ছে। মিথ্যি কথার ফাঁকা আদর্শের বুলি কপচে তাকে আর বাঁচানো যাবে না। ফলে বিপদ আরও বেড়েছে। ব্যক্তি মানুষকে দেখার কেউ নেই। রাষ্ট্র, সমাজ, সংসারের সবকটা ছাতার কাপড় উড়ে গেছে। শুধু ডান্ডাটা আজও শক্ত, অটুট। চারপাশে এখন শুধু পিটুনির শব্দ, কান্না, আর্তনাদ। ভগবান ছাড়া কোনো আশ্রয় নেই। মেয়েদের অবস্থা আরও খারাপ। রাষ্ট্র, সমাজ, সংসার ছাড়াও পিতৃতান্ত্রিক এই কাঠামোয় পুরুষের ঠেঙানিও নির্বাধিত তাদের হজম করতে হয়। এ শুধু হাতে এবং ভাতে মারা নয়, গেটা পদ্ধতি ছিনে জোঁকের মতো তাদের হৃৎপিন্ডটাকে পর্যন্ত শুষে নেয়। পৃথিবী জুড়ে শুধু ভয় এবং লজ্জা ছাড়া তাদের জন্যে আর কিছুই থাকে না। কিশোরের সব কথা আজ ওর মনে পড়ে না। অনেক তত্ত্ব ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ তখন দুর্বোধ্য, জটিল লাগতো। অথচ সে সব আলোচনার বুকের মধ্যে কি একটা তুলকালাম কান্ড টের পেতো। শয়নকালে একা একা অনেক অসহায় মুহূর্তে পুরোনো সেই সব কথা, আলোচনা ওর শুনতে ইচ্ছে করে। কিশোর যদি একবার আসতো, রোজ রাতে শোয়ার সময় এই চিন্তাটা মাথায় ফুটে ওঠে।

চোখের ওপর দিয়ে ঝগবাজার, পার্ক সার্কাস, বালিগঞ্জের ট্রামগুলো পরপর চলে যায়। স্টপে ভীড় বাড়ে। ফিকে অন্ধকারে চারপাশ ভাসাভাসা। লোকজনের শরীর দেখা গেলেও চেনা যায় না। হঠাৎ একজন অচেনা লোক রেবাকে ডাকে এ দিকে শুনুন। লোকটার চেহারা সুবিধের নয়। চ্যাপ্টা নাক, টোপা ঠেপা গাল, চোখের তলায় বাড়তি মাংস। লোকটাকে আগে কখনো রেবা দেখে নি। লোকটা দ্বিতীয়বার ডাকে। রেবা কেমন

ধাবড়ে যায়। ছাউনির তলায় অনেক মানুষ। সকলেরই বাড়ী ফেরার তাড়া এসব দেখা বা খেয়াল করার সময় কারো নেই। তাছাড়া গা ঢাকা দেওয়া এই সন্ধ্যার অন্ধকারে এখানে রোজই এমন হয়। চাপা, সাংকেতিক কথাবার্তা, চোখে চোখে লাল, নীল, সিগন্যাল ঝলসে ওঠে।

নাক চ্যাপ্টা লোকটা এবার প্রায় এক-রকম ঠেলেই রেবাকে ভীড়ের বাইরে আনে। সঙ্গে সঙ্গে আরো চার-পাঁচজন সোক রেবাকে ঘিরে ধরে। একটা প্রচন্ড আতংকে রেবার হৃৎপিন্ডটা যেন ফেটে পড়তে চায়। সে অবাক চোখে লোকগুলোকে দেখে। রাস্তা পেরোবার সময় দেখা সেই দুজন মুখোশ কালো লোকও দলের মধ্যে রয়েছে। লাল দীঘির ঘন নিথর জলে আলকাতরার বড় জলের ওপর কুয়াশা আসছে। স্বপনকে একটু লালবাজারে যেতে হবে—চশমা পরা একজন মাঝবয়েসী লোক বলে। প্যান্ট, বুশ শার্ট পরা এই লোকটার চেহারায় ভদ্রতার ছাপ। রেবার কথা আটকে যায়। কেন, কি ব্যাপার, জিজ্ঞেস করার মতো শক্তিও গলায় নেই।

চশমা পরা লোকটাই বলে—আমাদের কিছু প্রশ্ন আছে।

কলের পুতুলের মতো রেবা ভীড়টার সঙ্গে এগোয়। দু চারজন কৌতুহলী মানুষ এখন জড়ো হয়েছে। নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় কথা বলছে। বাঁধানো বটগাছের নীচে একটা পুলিস ভ্যান। রেবাকে ভ্যানে তোলা হয়। ভেতরটা অন্ধকার। ইঞ্জিনের গর্জনে রেবা চমকে ওঠে। অন্ধকারে কোথায় যেন একটা ক্ষুধার্ত বাঘ ডেকে উঠলো। দুজন মেয়ে পুলিসের মাঝখানে রেবা নিঝুম হয়ে বসে থাকে। গাড়ীটা লালবাজারে ঢোকে।

তিনতলার একটা ছোটে ঘরে রেবাকে বসিয়ে মেয়ে দুজন চলে যায়। ঘরের মধ্যে টিমটিমে আলো। দুটি বেঞ্চের মাঝখানে একটা টেবিল। একজন অচেনা লোক টেবিলে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে। হলুদ দেওয়ালে কালচে ছাপ। একটা নধর টিক-টিকি সন্ধানী চোখে কি যেন দেখছে। অচেনা মানুষটার উল্টোদিকে বেঞ্চির সামনে রেবা জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকে। চিবুকে কপালে ঘাম। হাত দিয়ে মুছতে গিয়ে রেবা বোঝে হাতের পাতা হঠাৎ ভয়ংকর ঠান্ডা হয়ে গেছে। সামনের লোকটা টেবিলে মুখ গুজে ঘুমোচ্ছে না জেগে আছে ধরা মুস্কিল। দরজার বাইরে লম্বা করিডোর। ফিকে আলোয় মানুষের আবছা চেহারা, হেঁটে-চলা চোখে পড়ে। হাওয়ার মতো ফিসফিসিয়ে কারা যেন কথা বলছে। ব্র্যাকেটের নীচে চামড়ার ব্যাগে বাঁধা চিঠিটার কথা রেবার মনে পড়ে। বুকের মধ্যে রক্তের কুল-কুল শব্দ টের পায়। পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত হিম হয়ে আসে। একটু পরেই হয়তো লক-আপে পুরবে। রেবা শুনেছে লক আপে ঢোকানোর আগে খুঁটিয়ে তল্লাসী করে। এই ব্যাগ, ব্যাগের চিঠি, সব জানাজানি হয়ে যাবে। দেওয়ালের টিকটিকিটা ডেকে ওঠে। রেবা চমকে যায়। চিঠিটা গিলে নিলে কেমন হয়, ও ভাবে। সামনের লোকটাকে দেখে। এক গ্লাস জল পেলে সুবিধে হতো। চিঠিটার একটা গতি করা দরকার। পুলিস কি তাকে এ্যারেস্ট করলো না নিছক জেরা করার জন্যে এনেছে। এক ঝাঁক চিন্তা মাথার মধ্যে ডিগবাজি খায়। বাড়ীতে একটা খবর পাঠানো দরকার। অন্ততঃ প্রভাদিদিকে জানালেও এখান থেকে বেরোবার একটা উপায় হয়। ঘরের ফিকে হলুদ আলোটা ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে আসছে। দরজার বাইরে থেকে মাঝে মাঝে দু-একজন উঁকি দিয়ে ওকে দেখছে। নিজেদের মধ্যে গুজ-গুজ করছে। গোটা ব্যাপারটাই এতো অচমকা যে রেবা ধাঁধায় পড়ে যায়। প্রায় ঘন্টাদশেক লোক কোনো কথা না বলে শুধু দেখে গেলো। ওদের দৃষ্টি, চালচলনে বুকের মধ্যে জেগে ওঠা অবুঝ ভয়টা ক্রমশঃ ধারালো হয়ে ওঠে। রুক্ষ, মৃত্যু, বিভীষিকার হাজার স্মৃতি অবুঝ তরল সেন্টিমেন্টের মতো বুকে ঢুকে যায়। ঘুমিয়ে দেখা দুঃস্বপ্নগুলোর মুখোমুখি এবার দাঁড়াতে হবে। পরশু রাতেই গভীর ঘুমের মধ্যে এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্নে ও গোঙাচ্ছিলো। প্রভাদি জাগিয়ে দেয়। সারা শরীরে দরদর ঘাম। অনেকক্ষণ ঘুম আসেনি। ঘন অন্ধকারে চোখ মেলে স্বপ্নটা নিয়ে ও বারবার নাড়াচাড়া করে। একটা বিরাট পুকুর। কালো জল ক্রমশঃ গাঢ় লাল হয়ে গেলো। হাওয়ায় অতি পরিচিত আঁশটে গন্ধে ধরা পড়ে এটা একটা রক্তের পুকুর। নিথর নিস্পন্দ পুকুরের জলে হাজার হাজার রক্তপদ্ম ফুটেছে। চারপাশ ভয়ংকর চুপচাপ। সেই ফোটা পদ্মগুলোর দিকে তাকিয়ে রেবার বুক ভরে অসাড় হয়ে যায়। বুঝতে পারে, ওগুলো পদ্ম নয়, হাজার হাজার মানুষের জোড়া জোড়া পা। রক্তের পুকুরে শীর্ষাসনের ভঙ্গীতে তাদের চুবিয়ে মার হয়েছে। রক্তের স্তর ক্রমে স্বচ্ছ হয়ে আসে। রক্তের গভীরে মুখ-গুলো আবছা দেখা যায়। কেমন যেন চেনা চেনা লাগে। ভীষণ ভয়ে ও ডুকরে ওঠে। তখনই ঘুম ভেঙে যায়।

বাইরে ধোঁয়া ধোঁয়া অন্ধকার। বাস-ট্রামের মিহি শব্দ। রেবার শরীরটা কেমন সিরসির করে। নারকেলডাঙা থানায় অসীমা পোদ্দারকে কিভাবে বেইজ্জত করা হয়েছিলো তার খুঁটিনাটি খবর ও মিঠুর মুখে শুনেছে। অসীমাকে উলঙ্গ করে অমানুষিক পেটানোর পর ধর্ষণ করা হয়। পানিহাটির কল্যাণী ব্যানার্জির তলপেটে পুলিস বুটের লাথি মেরেছিলো। তারপর পুলিসের সামনে কংগ্রেসী গুন্ডারা তাকে ল্যাংটো করে রাস্তায় ঘোরায়। দু সন্তানের জননী শিপ্রা রায়কে এই লালবাজারেই জ্বলন্ত চুরুটের খোঁচায় ক্ষতবিক্ষত করে বেইজ্জত করা হয়েছিলো। রেবার মাথায় ঘটনার চক্কর, অনেক নাম, অত্যাচার নির্দয়তার ছবি। চোখের সামনে ফ্যাকাসে হলুদ দেয়াল যেন সিনেমার পর্দা। পঁয়তাল্লিশ বছরের মহিলা; পদ্মবাণী রক্ষিত, অর্চনা, মীনাক্ষী, রাজশ্রী, নন্দিতা, বিজলী কুন্ডু এবং আরো অনেক মুখ সেই পর্দায় ভেসে ওঠে। ওদের গলা; বুক; পেটে জ্বলন্ত সিগারেট; চুরুটের দাগ; শরীরের গোপনীয় নরম অঙ্গে লোহার শিকের ক্ষত। কেউ গোঙাচ্ছে, কারো জ্ঞান নেই। রেবার শরীর শিউরে ওঠে। সামনের দেওয়ালটা দুলছে। তেষ্টায় কণ্ঠনালী জ্বলে যাচ্ছে। দেয়ালের দিকে ও আর তাকাতে সাহস পায় না। দরজায় চোখ পড়তে একজন সিপাইয়ের সঙ্গে চোখাচোখি হয়। একটু জল খাবো—রেবা শুকনো গলায় বলে।

কমবয়সী উর্দিপরা একজন রোগা কন্-স্টেবল ঘরে ঢোকে। মুখচোখে নির্বীহ, গোবেচারা ভাব।

রেবা আবার কথাটা বলে।

সিপাইটা ঘরের এদিক ওদিক তাকিয়ে একটা গ্লাস খোঁজে। কোথাও গ্লাস নেই। আমার সঙ্গে আসুন—সে বলে।

রেবা দাঁড়ায়। পায়ের নীচে মাটি দুলে ওঠে।

চওড়া বারান্দা ধরে কিছুটা এগিয়ে ডানহাতে একটা সরু করিডর। রোগা লোকটা আঙুল তুলে বলে—একটু এগিয়ে বাঁ দিকে বাথরুম। কলে জল আছে। বাথরুমের দরজা নেই। ফেরালো আলো জ্বলছে। লোকজনের সাড়া পাওয়া যায় না। কল খুলে রেব অঁজলা ভরে জল খায়। মুখে, মাথায় জল ঘসে। চিঠিটার কথা মনে পড়ে। খোলা দরজার দিকে চকমনে চোখে তাকায়। ব্যাগটা বার করে। কাঁচা চামড়া ঘামে ফুলে চটচট করছে। ওর বুকের মধ্যে দুরদুর পাড়ে। ঠিক মত করে চাত কাঁপে। ও বাথরুমের প্যানের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। চিঠিটা কুটি কুটি করে ছেঁড়ে। কাগজ ছেঁড়ার শব্দে কানে ভালো লাগে। কুচো কাগজ প্যানে ফেলে। মগভর্তি জল প্যানে ঢালে। টুকরো কাগজগুলো যায় না। জলে ভেসে আবার ভেসে ওঠে দারুণ ভয়ে শরীর কাঠ হয়ে যায়। আবার জল ঢালে। তবু কাগজগুলো যায় না। নেই আগড়ার মতো তাকিয়ে থাকে। রোগা সিপাইটা তাকিয়ে আছে। রেবা ভয়ে পাথর হয়ে যায়। সিপাইটা এগিয়ে আসে। উঁকি মেরে প্যানের টুকরো কাগজগুলো দেখে। তারপর বলে—আমি জল ঢেলে দেবো। আপনি ঘরে চলুন।

লোকটারও গলায় ভয়, আতংক। রেবা বিশ্বাস করতে পারে না ওকে। অবাক চোখে সিপাইটার আপাদমস্তক দেখে। ভয় নেই—ফ্যাকাসে মুখে লোকটা হাসার চেষ্টা করে—চলুন। কেউ এসে পড়বে।

লোকটার পেছনে পেছনে রেবা ঘরে ঢোকে। সিপাইটা চলে যায়। রেবা বাথরুমে জল ঢালার শব্দ শোনে। ঘরে ও এখন একা। সামনের লোকটা কখন যেন চলে গেছে। দুর্ভাবনা ভয় ক্লান্তিতে ঝিমধরা মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে। ব্যাগ থেকে কাগজ কলম বের করে প্রভাদির ফোন নম্বরটা ও তাড়াতাড়ি লিখে রাখে। কাগজটা গুলি পাকিয়ে একটা পুরিয়া বানায়। সেটা হাতের মুঠোয় নিয়ে ও বসে থাকে।

বাইরে পৃথিবীর শব্দ ক্রমশ ঝিমিয়ে পড়ে। দু-একটা গাড়ীর আওয়াজ, মানুষের গলার ভোলা গলা খাঁকারি শোনা যায়। অনেকক্ষণ এভাবে বসে থাকতে হবে রেবা জানে না। একটা উলখুশ অধৈর্য জাগে। শরীরের কোষগুলো গরম হয়, বেগে ওঠে। অচেনা চারপাশ ফাঁকা দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে এভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা নিরর্থক সময় কাঁটানো মানে কি? সবরকম অর্থহীন কাজের মতো এটাও বড়ো একঘেয়ে, ক্লান্তিকর। হয়তো এভাবে বসিয়ে রাখাও এক ধরনের শাস্তি। জেলখানার অন্ধকার সেলে একা একা দিন-রাত, মাসের পর মাস থেকে অনেকে পাগল হয়ে যায়। বোধহয় এই একঘেয়েমি, প্রতিটি মিনিট ঘন্টা, দিন মাসের বিবর্ণ ক্লান্তিকরতা তাকে পাগল করে দেয়। আসলে মানুষ তার গোটা জীবন এবং যাবতীয় কাজকে মর্যাদামণ্ডিত, ফলবান করে তুলতে চায়। ফালতু কাজ, এলোবেলো জীবন তাকে আহত করে। তার অস্তিত্ব বিপর্যস্ত হয়। মানুষ তার জীবন এবং কাজের সঠিক মানে চায়। সেটা না পেলেই মানুষ বাগনে, বিদ্রোহ করবে, পাগল হয়ে যাবে। অবশ্য পাগল হওয়াটাও এক ধরনের বিদ্রোহ।

কনস্টেবলটা ফিরে আসে। দরজার কাছে দাঁড়ায়। তারপর বলে—দশটার আগে সাহেব আসবে না।

রেবা কথাটা বুঝতে পারে না। সিপাইটা পরিষ্কার করে, দশটার পর রেবা শুরু হবে রেবা হাতছানি দিয়ে লোকটাকে ভেতরে ডাকে। বারান্দার দুপাশে একলহমা তাকিয়ে লোকটা ভেতরে ঢোকে। কাগজের পুরিয়াটা রেবা ওর হাতে গুঁজে দেয়। একটা ফোন করে আমার বাঁচান—নীচু গলায় বলে—নম্বর ওই কাগজে আছে। লোকটা ভীষণ ভয়ে কেঁপে ওঠে। কাগজের টুকরোটা দ্রুত পকেটে ঢোকায়। দেখছি, কি করা যায়—বিড়বিড় করে।

রেবা সাহস পায়। বলে—আপনাকে খুশি করে দেবো।

লোকটা ওর কথায় কান দেয় না। আবার দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ধুতি, শার্ট পরা একজন পালোয়ান গোছের লোক ঘরে ঢোকে। রেবার দিকে সোজাসুজি তাকায়, খুঁটিয়ে দেখে। দশাসই তেল-চকচকে শরীর। চওড়া কব্জি, শক্ত চোয়াল। নির্মম, কঠিন কাঠামো। এবাই বোধহয় মারধোর, অত্যাচার করে। রেবার বুকের মধ্যে ভয়টা ফিরে আসে। ভয়ের অনুভূতিটা ভয়ের কারণের চেয়ে অনেক ধারালো আর বিপজ্জনক। অত্যাচারের আগেই সেটা একজন মানুষকে কাবু করে দেয়। ঐই বাড়ীটার হাওয়া, খুটিনাটি শব্দ, দেয়ালের রং, মানুষজনের চেহারা চোখ এই ভয়কে আরো জমাট এবং ভয়ংকর করে তোলে। রেবা জোর-জুলুম কিছু একটা শুরু হলে তবু বোঝা যায়। এক একা চুপচাপ সেই বক্তাক্ত মুহূর্তটার জন্যে সন্ধ্যে থেকে আর কতোক্ষণ বসে থাকা যায়। শরীরের সমস্ত স্নায়ু, শিরা, ধমনী সেন ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। হয়তো এভারেস্ট মানুষের আদর্শ, বিশ্বাস, প্রতিরোধের ধৈর্য ক্রমশঃ গলে যায়। মার খাওয়ার আগেই মানুষ হেরে বসে থাকে। কিশোর বলতো—জেল, পুলিস, হাসপাতাল মানুষকে ধৈর্যবান করে। এটাও একটা লড়াই। একঘেয়েমি আর অধৈর্যের বিরুদ্ধে লড়তে হলেও মনকে শক্ত করতে হয়।

পালোয়ান লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। রেবা ভাবে, ওরা কি ইন্টারোগেট করবে। কোন খবরের জন্যে ওকে ধরে এনেছে। কিশোরের ঠিকানা সে জানে না। বন্ধুদের সীমানায় সাঁওতাল গাঁয়ে গাঁয়ে সে ঘুরে বেড়ায়। রাজনগর, রানীশ্বর থানা জুড়ে কাজ করে। এসব মামুলি খবর কি পুলিস জানে না। নিশ্চয়ই জানে। কিশোরের মাথার ওপর পাঁচ হাজার টাকার পুরস্কার আছে। কলকাতায় পার্টির কেনো ডেরা রেবা চেনে না। দরকার মতো পার্টিই তার সঙ্গে যোগাযোগ করে, কাজ দেয়। একতরফা। এই ব্যাপারে রেবার কোনো হাত নেই। এ-সব কথা হয়তো পুলিস বিশ্বাস করবে না, তখনই শুরু হবে নির্যাতন, অত্যাচার। অবিশ্বাস করাই হয়তো ওদের ডিউটি। ওকে যন্ত্রণা দেবার সুযোগ মেলে। একদল মানুষকে কষ্ট দিয়ে কি মানুষের নাকি দারুণ তৃপ্তি হয়।

ভালোমানুষ সিপাইটা যদি প্রভাদিকে ফোন করে, তাহলে হয়তো ও বেঁচে যাবে। প্রভাদি বুক দিয়ে ওকে আগলাবে। কিশোরকে ও টাকার লোভ দেখিয়েছে। হঠাৎ ওর কেমন লজ্জা লাগে। ঘুষ দিয়ে ছাড়া পাওয়ার কথা কখনো ও ভাবেনি। কিন্তু খবরটা পৌঁছোনোর আর কোনো উপায় ছিলো না। তবু হয়তো এই কথাটা চিরকাল গোপন রাখতে হবে। কাউকে বলার সাহস হবে না। আর একটা সন্দেহ হঠাৎ বুকের মধ্যে চিকন দেয়। সিপাইটা কি সত্যিই ভালোমানুষ না ওকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে। সহানুভূতির ভান করে বন্দীদের ফাঁসাবার অনেক কাহিনী সে শুনেছে। এটাই পুলিশের কৌশল। ছোটোখাটো সুযোগ-সুবিধের টোপ দিয়ে একজন বন্দীকে কখন যে ওরা শক্ত জালে জড়িয়ে নেয়, বন্দী নিজেও টের পায় না। হঠাৎ দেখে সে আটকে গেছে। এভাবেই দালাল, ইনফর্মার বানানো হয়। গায়ে-পড়া দরদের পেছনে হয়তো কোনো মৎলব আছে।

রেবার দুচোখ রাগ দপদপ করে। লোকটাকে হঠাৎ এতোটা বিশ্বাস করার বোকামিতে নিজেকে ধিক্কার দেয়। চিঠি ছেঁড়ার খবরটা নিশ্চয়ই এতোক্ষণ জানাজানি হয়ে গেছে। হয়তো কাগজের টুকরোগুলো ওরা তুলে শুকিয়ে এখন পড়ার চেষ্টা করছে। ভয়ে ওর বুক কুঁকড়ে যায়। প্রভাদির ফোন নম্বরটা দেওয়াও ঠিক হয়নি। মাঝ-রাতে প্রভাদির বাড়ীতে হামলা করতে পারে। অবশ্য প্রভাদিকে সকলে চেনে। দুজন সন্তান মারা যাওয়ার পর প্রভাদির আর হারাবার কিছু নেই।

দরজার বাইরে আবছা অন্ধকারে সে লোকটাকে দেখার চেষ্টা করে। কেউ নেই। রেবা বুঝতে পারে, তার সাহস কম। বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে নিজেকে যেন পরিষ্কার চিনতে পারছে। এতো সামান্য পুঁজি নিয়ে কোনো বড়ো কাজ হয় না। তার ওপর জন্মসূত্রে মারাত্মকভাবে ঠকে বসে আছে। আসলে ওর ভয়, আতংকের সবচেয়ে সক্ষম, অনুভূতিপ্রবণ জায়গাটাই হলো ওর নারীত্ব। এরা যদি আমাকে উলঙ্গ করে, শরীরের যেখানে সেখানে জ্বলন্ত চুরুট চেপে ধরে দু-পাঁচজন মিলে ধর্ষণে ধর্ষণে শরীরটা তছনছ করে দেয়, তাহলে আমি কি করবো। বালাই হয়ে যাবো, কিশোরকে ধরিয়ে দেবার জন্যে হাত মেলাবো পুলিসের সঙ্গে। রেবা আর ভাবতে পারে না। শুধু নিজেকে বলে—

58 বছর বয়সে যখন আপনি কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করবেন – তখন কিন্তু আপনি উপার্জন করতে পারেন!

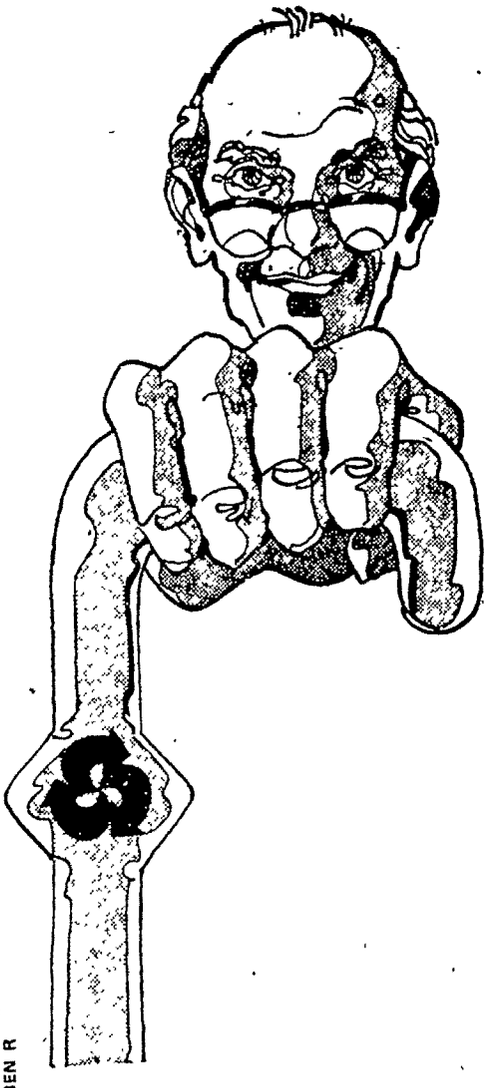

তরুণ ও কার্যক্ষম অবস্থায়ই আপনার অবসরগ্রহণের পরের কথা চিন্তা করা দরকার।

ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্কের কাছে তার জন্য এক যোগ্য যোজনা আছে—রিটায়ারমেন্ট প্ল্যান অ্যাকাউন্ট (অবসরগ্রহণ যোজনা অ্যাকাউন্ট)।

প্রতিমাসে 100 টাকা হিসাবে যদি আপনি 10 বছর ধরে আপনার এই অ্যাকাউন্টে জমা দিয়ে চলেন, তবে তারপর 10 বছর ধরে আপনি ঠিক মাইনের মত, প্রতিমাসে টা: 239 50 পাবেন। কাজ থেকে অবসর নেবার পরেও আপনার হাতে যথেষ্ট টাকা থাকবে—কারও ওপর তারজন্য নির্ভর করতে হবে না।

আপনার সুবিধা মত আপনি জমানোর মেয়াদ ঠিক করে নিতে পারেন—12 থেকে 120 মাস পর্যন্ত জমানো যায়। সেই অনুসারে আমরাও আপনাকে টাকা দেওয়ার মেয়াদ স্থির করে দেব—সঙ্গে যথেষ্ট সুদও পাবেন।

ভেবে দেখুন—এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি অ্যাকাউন্ট খুলুন। কর্মজীবনের পর নির্ভাবনায় দিন কাটাবার জন্য ইহার উপরই নির্ভর করুন।

আপনার নিকটতম ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্কের কাছ থেকে এ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ জানতে পারবেন।

ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্কে আপনার সুখ-সমৃদ্ধি গড়ে তোলার সহায়ক

রিটায়ারমেন্ট প্ল্যান

IB 2885 BEN R

ঘরবাড়িও না। নো সারেন্ডার। মুখে বুজ দুঃখ, কষ্ট, বিপদের মোকাবেলা করার নাম হাসা মনুষ্যত্ব। তুমি মানুষ। তোমার মনুষ্যত্ব, সততা আছে। তাছাড়া দুঃখ সহ্য করার ট্রেনিংও তো তোমার কম নেই। রেবা মাত্র দোক্তা কষে বসে। রুমালে কপালের ঘাম মেচে। মনটা চাসা হয়। এমনও হতে পারে, সিপাইটা খারাপ লোক নয়। কোনো বদ মতলব ওর নেই। সব পুলিসই নিষ্ঠুর, অমানুষ নয়।

কেতকীর মেসোমশাই পুলিসে। রোজ সকালে দু জন গরদের পোষাক পরে পুজো করে। কেতকী ওর বন্ধু। মেসোর প্রশংসায় সে গদ্‌গদ। বাদলের কাকা অতনু বাবুও পুলিসে চাকরী করে। পাড়া-পড়শির বিপদে অতনুবাবু সামনে এসে দাঁড়ায়। বছর-খানেক আগে পরেশের জন্যে রক্ত দিয়ে-ছিলো। পরেশ বাদলের বন্ধু। বাস্ এ্যাক-সিডেন্টে মরতে বসেছিলো। অতনু বাবুর রক্ত না পেলে বাঁচতো না। পুলিসের মধ্যেও ভালো লোক আছে। নিশ্চয়ই আছে কেতকীর মেসো, অতনুবাবুরা সব জায়গাতেই থাকে। ভুললে চলবে না ওরা আর পাঁচ-জনের মতোই মানুষ। আসলে চারপাশের পোড়ো হাওয়ায় বিশ্বাসের খুঁটিগুলো নড়-বড়ে হয়ে গেছে। এটা ঠিক নয়। ঘরে-বাইরে সকলকে অবিশ্বাস করা হীনতার পরিচয়। এ অবিশ্বাসের শেষ নেই সীমা নেই। এক সময় পায়ের নীচে এক চিলতে বিশ্বাসের জমিও অবশিষ্ট থাকে না। মানুষ তখন নিজের ওপরেও বিশ্বাস হারায়। রেখা এ ভুল করবে না। সকলে যেমন বন্ধু নয়, তেমনি সকলকে শত্রু ভাবাও বোকামি। বাচাই করা এগোতে হয়। বিশ্বাস না থাকলে বাচাই, বাচাই করা যায় না। রেবা নিজেকে বলে— বিশ্বাস হারিও না।

দুজন জাঁদরেল চেহারার মেয়ে পুলিশ ঘরে ঢোকে। সবুজ পাড়ের সাদা শাড়ী, টান-টান খোঁপা। একজন পুরুষালি গলায় বলে ওঠে।

রেবা উঠে দাঁড়ায়। পাহারার কনস্টেবলটা শঙ্কিত চোখে তাকিয়ে আছে। অবস্থা আলোয় রেবার মনে হয় লোকটা চোখে চোখে কি যেন বললো। হয়তো মনের ভুল। রেবা নিজেকে শোনায়—ভয় পেও না। বিশ্বাস রাখো।

মাদারপুরের উত্তরে তাঁতলাই। হাঁটা পথ মাইল পাঁচেক। জঙ্গল ঠেলে এগোলে একটু বেশী হাঁটতে হয়। সামনে সিধ নদী। চওড়া, বুপোলি ফোমের মতো জল। জলের নীচে চোনা টান। ভাদু আর কিশোর ভালো করে চান করলো। পুনাই পাড়ে বসে ওদের বন্দুক আগলায়। নবহরি একটু আগেই আস্তানা হয়ে গেছে। সেরে রান্নায় ও এক হাত। ওর গুণে রান্না আর নির্মলা এতোক্ষনে হয়তো পৌঁছেও গেছে।

ঠাণ্ডা জলে কিশোর টুপটাপ ডুব দেয়। পায়ের নীচে নুড়ি পাথর, বেলে মাটি। পুবদিকের বাবলা বন ছুঁয়ে সকালের আলো নদীর জলে এসে পড়েছে। বাবলা গন্ধের ভাল, পাতায় শিশির চিকমিক করে। কনকনে ঠাণ্ডা জলে শরীরের কোষগুলো অসাড় হয়ে যায়। তবু বড়ো আরাম, গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে ভিজে বসে থাকে। চুল ছিটিয়ে ভাদু সাঁতার কাটে। কিশোরের কপালে ফেটে যায়। ঘন ঘুমে দুচোখ ভারী হয়ে আসে। স্নান, শিবায় জ্বালাধরা দাপাদাপি আর নেই. পেটের মধ্যে ঘুমোনো খিদেটা চনমন করে। নবহরির বাড়ী থেকে দু পালি চাল নিয়ে পুঁইসার কাছে যাবে। আমেদপুর থেকে নবহরির শালা মাধব এসেছে। বন্দুক রাখলের পর ওর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। মাধব এলে দু-চারদিন নবহরির ঘরে খাওয়া-দাওয়ার অভাব হয় না। একটা শান্তি মোগাড় করতে পারলে জলে হতো। পুঁইসার দুটো শাড়িই ছেঁড়া, উইপোকায়। কিন্তু কোথায় পাবে। নতুন ফসল ওঠা পর্যন্ত এখন কোনোমতে বেঁচে থাকা দর-কার। খুদ, মোটা আলু, কুড়ি কড়াই, দু-একটা ডিমের বা হরিণের মাংসেই যথেষ্ট। তারপর কাপড়-চোপড়, তেল, সিঁদুর, বাহারি ফিতের দিন। সিধ নদীর দুপাশে পেকে ওঠা সোনালী শস্যক্ষেত। দু পক্ষই ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তৈরী। বিশোর জানে, এ বছর গরীব মানুষের বরাতে মাটি ভিজবে। গত বছর একতরফা তারা জিতেছে। এ সনে সেটা হবে না। বিরুদ্ধ পক্ষ সংগঠিত, সংঘবদ্ধ।

তবু কমরেডদের বাঁচাতে হবে। শহীদ কমরেডদের সংসারগুলো যেন জলে ভেসে না যায়। যারা জেলে, যারা পালিয়ে বেড়াচ্ছে পার্টির হোলটাইমার, তাদের ঘরের মানুষ-গুলোর মুখে দুবেলা দু-মুঠো ভাত তুলে দেওয়ার দায়িত্ব আছে। সে দায়িত্ব এড়ানো অপরাধ। আর রবির বৌ ভাত পাবে না, এর চেয়ে লজ্জার কি আছে। গত বছরে স্কুলের মাস্টার মন দখল করা ধান-চাল সে নিজের হাতে বিলি করেছে, গরীব মানুষের গ্রাম গোলা বানিয়েছে, তার ঘরে আজ হাঁড়ি চড়ে না। ক্ষিদের জ্বালায় পুঁইসার মতো মেয়েও ক্ষেপে যায়, বদলে যায়। রবিকে নাকি খুন করেছে গোলমাল করেছে। শেষটা দিয়েছে— এক পয়সা নাই ঝুলিতে। লাখ দিয়েছে কুলিতে। রবির মুখেই কিশোর শুনেছে এসব। মুখে কিছু না বললেও কিশোর জানে, রবি খুন হোকায়দায় পড়েছে। অনেক লড়াই ইতিহাস আর অভিজ্ঞতায় পুড়েও সে এখন থৈ পাচ্ছে না। সূর্যের দিকে মুখ করে ভাদু পরনের খাটো কাপড়ে শরীর মুছছে। কুচকুচে কালো উলঙ্গ শরীর। পেটানো ইস্পাতের চেহারা। অনেক দূরে একটা বোয়াল লাফাচ্ছে। ভিজে লেংটিটা চেপে কিশোর লাফি পরে। বাদকাটার পর গত বছর গাঁয়ে গাঁয়ে স্কুল খোলা হয়েছিলো। যে-সব গাঁয়ে পার্টির মুগিয়া আছে, তারাই উদ্যোগ নিলো বেশী। বর্ণপরিচয় অঙ্ক, ইতিহাস— বেশ সাজা পড়ে গিয়েছিলো। জলচিলিম এই এলো। চৌয়াল ছেলেমেয়েরা ভিয়েতনাম মুক্তের ওপর ছবির একজিবিশন করলো। ইংরিজী বই দেখে ছবিগুলো ওরা এঁকে-ছিলো। পোড়া মাটি, চুন, ফাটলধরানো আঁকা লাইনবন্দী ছাপ গাছে গাছে ঝুলছে। কি শ্রীবন্ত আর নিখুঁত রেখা। চোখ ফেরানো যায় না। ভীড় হয়েছিলো খুব। প্রদর্শনী উপলক্ষে মেলা বসে গেলো চৌংবায়। ভিতনাম মেলা। দুর দুর গাঁয়ের অগুনতি ছেলেমেয়ে, বুড়োবুড়ি, কেউ বাদ নেই। এমনটা আগে হয়নি। মগন ছিলো পয়লা নম্বর সংগঠক। এক একটি ছবির সামনে দাঁড়িয়ে সে বোঝাচ্ছিলো দর্শকদের।

তারপর আশপাশের সব গাঁ থেকেই ছবি-গুলোর জন্যে তাগাদা আসতে থাকলো। সব গাঁয়েই ভিতনাম মেলার তোড়জোড়। বান-কাটার পর থেকে বাদুনা পরব পর্যন্ত এক-টানা গাঁয়ে গাঁয়ে ছবি কটা ঘুরলো। হো চি মিন, সাবগন, হ্যানয়, নগুয়েন্ ভ্যান্-এর শব্দগুলো এখন আর অচেনা নয়। হো চি মিন মুখে মুখে হলো নানা হো। সিধু বানুর ভাই। আর হ্যানয় তো ঘরের পাশে একটা দেশ। দুমকা ভাগলপুর পেরোলেই তার সীমানা। কোনাকুনিদের মুখে তখন এই একটাই কথা আর আলোচনা। বুড়োরা তাদের দেখে, আর অবাক হয়। একটা নতুন প্রজন্ম তৈরী হচ্ছে। বীর সিং, দীনু, চিতা, ভাদু এই সময়েই পার্টিতে এসেছে। কারো বয়েস আঠারো কুড়ির বেশী নয়। অনেকেই হাঁড়িয়া ছোঁয় না, ছেনেধরার ফাঁদ পাতে না। চাল-চলন, চিন্তায় ছেলেপুলেরা বদ-লাতে থাকে। রবি হাঁসদার নেতৃত্বে তখন চলছে ফসল দখল, তৈরী হচ্ছে ধরম-গোলা। হাওয়ায় ঘন উত্তেজনা আর স্বপ্ন। খতমের লড়াই শুরু হতেই বদলে গেলো সব। ভিয়েতনামের সে সব ছবির আর হদিশ নেই। গাঁয়ে গাঁয়ে নিজেদের মেহনতে বানানো বেশীর ভাগ স্কুলের চালাঘর আজ প্রায় ভেঙে পড়েছে। গেরিলা যুদ্ধই একমাত্র পথ, বাদ্ বাকী ভুয়া, ফালতু, সংশোধনবাদী কাস্তে। শত্রুর রক্তে হাত ধুয়ে পার্টিতে ঢুকতে হবে। সকলে সেই কাজে ব্যস্ত। ভিয়েতনামের ছবি, অলচিকি বর্ণমালা, স্কুল দেখার কেউ নেই। চারপাশে তখন মাদলের শব্দ, গনক্ষয় পোড়ো হাওয়ায় প্রতিদিন নতুন নতুন শিকারের গন্ধ। এই নিরীহ, শান্ত ছবি আর লেখাপড়া নিয়ে কে বসে থাকবে। তদারকির ব্যাপারও কেউ নেই। কিশোর, অজিত, বরুণ, সকলেই পার্টির কাজে ডুবে আছে। মাঝে মাঝে মগন খোঁচাতো, ফের কবে মিলা হবে? একটা আলকাপের দল বানাইলে কাজ হয়।

সেই কান দেয়নি তার কথায়। অজিত শুনেছে, কিন্তু কিছু করতে পারে নি। খতমের তাৎপর্য, গেরিলা যুদ্ধের কৌশল বোঝাতে দিন রাত চলে যায়। তারপর শুরু হলো পুলিসী হামলা। প্রতিরোধ আর মুখিয়া বাহিনীর আক্রমণ। বাঁচার বরনে দম ফেলার সময় নেই। সংক্রান্তি শিকের উঠলো।

(চলবে)

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সোনার হরিণ নেই

।। পঁচিশ ।।

রাত দশটা। বানারজুলির অনেক রাত। অন্ধকার ঘরে শুয়ে বাপী এ-পাশ ও-পাশ করছে। ব্লাজের ক্লান্তি আর অবসাদ নিয়ে ঘরে ফিরেছিল। উর্মিলাকে বলে দিয়েছিল তাকে যেন রাতে খাওয়ার জন্য ডাকা না হয়। ঘরে গিয়েই ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। তাই ইচ্ছে ছিল। ঘুমের ট্যাবলেট একটা খেয়েছে। এক ঘুমে সকাল হলে হয়তো দেখবে এই দুঃস্বপ্নের রাতটাই মিথ্যে। উর্মিলা বাধা দেয় নি বা জোর করে নি। সে-শক্তিও ছিল না। তার চোখেও আতঙ্ক। ঘরে গিয়ে হয়তো মায়ের বুকে মুখ গুঁজে কাঁদবে। এবা কোঁদ বালিকা হতে পারে। বাপী পারে না।

কিন্তু ঘুম চোখের ত্রিসীমানায় নেই। চোখ বুজলেই সামনে বিভীষিকা। আদ্যন্ত-পৃষ্ঠে জড়ানো এক মেয়ের বুকের ওপর রক্তচন্দনের ফণা। ওটা সরে যাবার পর যা দেখেছে সে আরো ভয়ঙ্কর। বিষে বিষে ফর্সা অঙ্গ গাঢ় নীল কালিতে ছোপানো। চোখ বুজলেই সামনে সেই ত্রাস। অন্ধকার অসহ্য। উঠে আলো জ্বেলে দিয়েছে।

আলো দেখেই একটু আগে গায়ত্রী বাই এসেছিল। ঘরের দরজা দুটো খোলাই ছিল। মাথায় ওপর ঘন ঘন পাখা ঘুরছে। কিন্তু গায়ত্রী বাই দরজা বন্ধ করলে বাপী যদি দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে। কেউ আসছে টের পেয়েই চোখ বুজে ফেলেছে। তা সত্ত্বেও আঁচ করেছে কে এলো। বাপী চোখ মেলে তাকায় নি। কেন তাকাবে? চোখে ভয় নেই। বুকে মুখে গোঁজার মতোও কেউ নেই।

গায়ত্রী বাই আধ মিনিটের মতো দাঁড়িয়ে ওকে দেখেছিল হয়তো। তারপর ঘরের আলো নিভিয়ে নিঃশব্দে দরজা দুটো ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেছে।

মেয়ের মুখে যা শোনার শুনেছে। যা বোঝার বুঝেছে। উর্মিলার কাছেই বরং অনেক কিছু দুর্বোধ্য এখনো। কিন্তু তার যা সব শোনা মাত্র বুঝবে। বাপীকে বেশরম ভবা-ডুবি থেকে একেবারে নিরাপদ ডাঙায় তুলে দিয়ে শুধু নিজের ওপর চরম শোধ নিয়ে গেল।

.. দুলারিকে নাকি বেশরম এই দুপুরেই হেসে হেসে বলেছিল, ও অনেক দোষ করেছে, ওর গুনাহ্‌র শেষ নেই। তাহলেও বাপীভাই কখনো ওর দোষ ধরবে না, ওকে মাপ করে দেবেই। কারণ সব দোষ আর সব পাপের যুগ্যি প্রায়শ্চিত্ত ও করবে। তখন আর বাপীভাইয়ের কখনো ওর ওপর রাগ থাকতে পারে না। বাপীভাইয়ের মতো এমন মনুষ্যি আর হয় নাকি। এই মনুষ্যি মাফ করে দিলে যত দোষ আর যত পাপই করুক নরকের বদলে সোজাসুজি হয়তো বেহেস্তে গিয়েই হাজির হবে।

এই পাকী মেয়েকে হাড়ে হাড়ে চেনে দুলারি। ওর থেকে ভালো আর কেউ চেনে না। সব শোনার পরে শেষ মুহূর্তে সম্মতি হয়েছে বুঝেও হাড়পিত্তি জ্বলেছে দুলারির। কিন্তু ওকে চিনতে যে এত বাকি সে-কি তখনো বুঝেছিল।

....হাবমা পাগলের মতো ছুটে গিয়ে তার বাপ ধামন ওঝাকে ধরে নিয়ে আসতে দুলারির সেই কঠিন দু চোখ আবার বাপীর মুখের ওপর উঠে এসেছিল।—কি হবে?

বাপী মাথা নেড়েছে। কিছু হবে না। যা হবার হয়ে গেছে।

—এসো। তুমিও এসো মেমদিদি।

জঙ্গলের পথ ধরে দুলারি আগে আগে নিজের ঘরের দিকে এগিয়েছে। পিছনে বাপী আর উর্মিলা। বাপীর মনে হচ্ছিল কেউ তার গলায় একটা অদৃশ্য দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে চলেছে। না গিয়ে উপায় নেই, তাই চলেছে। উর্মিলা তার একটা হাত চেপে ধরে আছে। ও তখনো বিমূঢ়, ভয়ার্ত।

....দুলারি উর্মিলাকে সঙ্গে ডাকল কেন? ওর সামনেই চরম কিছুর ফয়সালা করে নিতে চায়? কোনো অভিযোগের বোঝা চাপিয়ে ওকে কিছু বুঝিয়ে দিতে চায়? যে আগুন দুলারির চোখে দেখেছে সেই আগুনে এবার বাপীর মুখ ঝলসে দিতে চায়?

ঘরে ঢুকে দুলারি ছেলে দুটোকে বাইরে বার করে দিয়েছে। তারপরে উর্মিলাকে বলেছে, বোসো।

ওরা দাঁড়িয়েই রইল।

আঁচলে বাঁধা একটা পুঁটলির মতো কোমর থেকে টেনে বার করল দুলারি। গিঁট খুলে মোটা সুতোয় জড়ানো কাগজের পুঁটলিটা বাড়িয়ে দিল তার দিকে। —এটা তোমার কাছে রাখো এখন।

বাপীর মুখে কথা সরল এতক্ষণে। —কি এতে?

—আমার জানার কথা নয়। ওর ঘরে থেকে ঘরে ফিরে খুলে দেখেছিলাম। দু হাজার টাকা।

বাপী অবাক হতভম্ব। —এ কিসের টাকা?

—তোমাকে যমের মুখে ঠেলে দেবার জন্য এই টাকা চালিহা ওকে ঘুষ দিয়েছিল।

বিস্ময়ে হতবাক দুজনেই। উর্মিলার পক্ষে আর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হল না। সে চৌকিতে বসে পড়ল।

দুলারি আবার বলল, এটা বেশরম তোমার হাতে দিতে বলেছিল। মেম-সায়েবকে সব বলে তার আপত্তি না হলে এটা

তুমি হাবমাকে দিয়ে দেবে। রেশমা তাই বলে গেছে।

বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করে উঠল বাপীর, নিজের ঘরের অন্ধকার শয্যায় উঠে বসল।.... একটি একটি করে দুলারির এরপর যা বলে গেছে উর্মিলাও শুনেছে। আংকল চালিহা একটা নোংরা ষড়যন্ত্রের জালে আটকে বাপীর বিরুদ্ধে মা-কে বিষিয়ে দিতে চেয়েছিল—উর্মিলা শুধু এটুকুই বুঝেছে। এর বাইরে আর বেশি কিছু ওর কাছে স্পষ্ট নয় এখনো। কিন্তু ওর মা সব শোনামাত্র রণজিৎ চালিহার উদ্দেশ্য আরো ঢের বেশি বুঝবে বাপীর তাতে একটুও সন্দেহ নেই। গায়ত্রী রাই হয়তো এর পর ওকে আরো বেশি কাছে টেনে নেবে, আর চালিহার সঙ্গেও চূড়ান্ত বোঝাপড়া কিছু করবে। কিন্তু সব শোনার পর থেকে হাড়-পাঁজরগুলো আরো বেশি দুমড়ে মুচড়ে ভাঙছে বাপীর। ভেঙেই চলেছে।

....শেষ মুহূর্তে রণজিৎ চালিহার বদলে পাহাড়ে এবারে বাপী তরফদার যাবে সেটা গায়ত্রী রাই বা উর্মিলা জানত না, আবু বা দুলারি জানত না, বাপী নিজেও জানত না। জানত শুধু চালিহা আর রেশমা। ম্যানেজারের হঠাৎ এমন দরাজ ভালো মানুষ হবার কারণটা রেশমা আগে বোঝে নি। তার নিজের লোভটাই আসল ভেবেছিল। কিন্তু পরে বুঝেছে। নিজের লোভ ছেড়ে এখন বাপীভাইকে লোভের ফাঁদে ফেলতে চায়। ফাঁক মতো অর্জুনকে দিয়ে ক'দিন সকালে ওকে ডেকে পাঠিয়েছে। ক্লাবের ডাক্তারবাবুর কাছে ওর মারফৎ বোতলের বাক্স চালান দেওয়ার জন্য বা কাছাকাছির মধ্যে কোনো খদ্দেরের জিম্মায় নেশার প্যাকেট পৌঁছে দিয়ে আসার জন্য পঁচিশ তিরিশ টাকা করেও বখশিস দিয়েছে। এ-ভাবে কাঁচা টাকা হাতে পেলে রেশমা ছাড়ার মেয়ে নয়, দিব্যি নিয়েছেও। কিন্তু গোড়া থেকেই তার মতলব সম্পর্কে হুঁশিয়ার ছিল। বাপীভাইয়ের বুকে সে কোন্ কলঙ্কের ছবি বসাতে চায় সেটা বোঝার পর তাজ্জব বলেছে। আবার মজাও পেয়েছে।

তার সঙ্গে খাতির বাড়ার পর টোপ ফেলেছে রণজিৎ চালিহা। প্রথমে কেবল বাপী তরফদারের প্রশংসা। সে আছে বলেই হাতাবাতি রেশমার এত আয় পয়। নইলে ও যে এত গুণের মেয়ে সেটা আগে কে বুঝেছিল? মালকানও বোঝে নি, ম্যানেজার নিজেও না। তারপর বলেছে, শুধু এই একজনের যদি মন বুঝে চলিস আর তাকে খুশি রাখতে পারিস তাহলে আর দেখতে হবে না। কয়েক দিনে এর দশ গুণ বরাত ফিরে যাবে।

মতলব বোঝা গেছে। কাঁচা টাকা হাতে আসছে, রেশম পরামর্শটা একেবারে বরবাদ করে দিতে পারে না। খুশি যেমন দুর্ভাবনাও তেমনি। ....খোদ ম্যানেজার সাহেব যখন বলছে তখন আর ভাবনা কি। ভাব সাধা মতো চেষ্টা করবে। কিন্তু ওই তরফদার সাহেবের মেজাজের হদিসও যে পায় না কক্ষনো, মন বুঝবে কি করে? কাছে পেলে দশ হাত দূরে দিয়ে চলে যায়। আর এমন করে তাকায় যে ভয়ে বুক ঢিপ ঢিপ করে। আগে কত সহজে মেলা-মেশা করত ওদের সঙ্গে, এতবড় মুরুব্বি হয়ে বসার পর অন্য রকম হয়ে গেছে।

চালিহা সাহস জুগিয়েছে। হেসে হেসে বলেছে, তুই একটা আস্ত বোকা। ওটা বাইরের চাল। কোথা থেকে কোথায় টেনে তুলল দেখেও তোর ভয় আর মন বুঝতে অসুবিধে। যা বললাম শোন্, চেষ্টা-চরিত্র করে লেগে থাক ওর সঙ্গে, দুহল্লে হয়ে যাবে।

এই লেগে থাকার তাগিদটাই দিনে দিনে বেড়েছে। বখশিসের অংকও। রেশমার টাকার লোভ দেখেই মুখোস খুলে শেষে মতলব ফাঁস করেছে। ওই বাপী তরফদারের মুখ লালসার আগুনে পুড়িয়ে দিতে হবে। একটা রাতের জন্যও যদি রেশমা তা পারে চালিহা ওকে নগদ দু' হাজার টাকা দেবে। আর তার পরেও বরাত ফেরানোর জন্য ওই বাপী তরফদারের মুখ চেয়ে থাকতে হবে না কোনোদিন। ওর রানীর হালে থাকার ব্যবস্থা চালিহাই করে দেবে।

ওই শয়তানের মতলব এবার আবু সাহেব আর দুলারির কাছে ফাঁস করে দেবার কথা ভেবেছিল রেশমা। বাপীভাইয়ের মুখ ওর কাছে পোড়াতে চায় রেশমা তাও মানে। মালকানের কাছে। কিন্তু যেমন বেপরোয়া তেমনি নিজের ওপর বিশ্বাস ওর, ও মানে বাপীভাইয়ের কক্ষনো কোনো ক্ষতি হবে না বা হতে পারে না। মজা কতটা গড়ায় দেখা যাক না। ফাঁক তালে নগদ আরো কিছু হাতে এলেই বা মন্দ কি। সানন্দে বাজি হয়ে দু' হাজার টাকার বদলে দশ টাকা আগাম চেয়েছে। খুব দরকার। চালিহা তক্ষুনি দিয়ে দিয়েছে। আর বলেছে, এটা আগাম ফাউ। বাপী তরফদার ধারেল হলে ফের দু' হাজারই দেবে।

খোশ মেজাজে কড়কড়ে দশ টাকা নিয়ে ঘরে ফিরেছে। ম্যানেজার শেষ পর্যন্ত কি করবে? কোন্ মতলবে দশ টাকা ওকে দিয়েছে সে-তো আর কারো কাছে ফাঁস করতে পারবে না, বোকা বনে নিজেই জ্বলবে। তার আগে আরো কিছু টাকা গাঁকে গোঁজার মওকা পাবে রেশমা। চালিহা যা চায় সেটা কল্পনা করতে গিয়ে অনেক সময় যে কান-মাথা গরম হয়েছে হেসে হেসে দুলারির কাছে রেশমা তাও স্বীকার করেছে। ও-চিন্তা মাথা থেকে ঝেঁটিয়ে তাড়িয়েছে।

বাপীভাইকে রসাতলে পাঠানোর প্ল্যান রেডি চালিহার। কাজ নিয়ে রেশমা পাহাড়ের বাংলোয় যাবে। দিনকতক বাদে তার বদলে বাপী তরফদার সেখানে টাকা নিয়ে যাবে। ওদের মেমসাহেবই তাকে যাতে পাঠায় সে-ব্যবস্থা চালিহাই করবে। ওকে জালে ফেলার মতো অমন মোক্ষম জায়গা আর নেই। সেখানে ঝগড়ু আছে, তাকে মদে ঠেসে রাখতে হবে। কিন্তু পরে যদি সে ও আঁচ করতে পারে ব্যাপারটা, খুব ভালো হয়। রেশমা যেমন চালাক মেয়ে, একটু মাথা খাটালে সে-ব্যবস্থাও ও নিশ্চয় করে আসতে পারবে।

ওই আপনা-খাকী মেয়ের মাথার তখনো কেবল মজাই নাচছে। এক কথার কাজ। খরচার নাম করে আরো দশ টাকা আগাম ফাউ নিয়েছে। পাহাড়ে পৌঁছনোর নাগালের মধ্যেই পাবে বাপীভাইকে তখন আর আবু সাহেব বা দুলারিকে মসা কেন—তার কাছেই ম্যানেজারের সব মতলব ফাঁস করে দেবে। বাপীভাইকে ও কি চোখে দেখে নিজে তো জানে—তার এক ফোঁটা ক্ষতিও কক্ষনো হতেই পারে না। সব বলে চালিহার দেওয়া চারশ টাকা বাপীভাইকে দেখাবে আর মালকানের সামনে এসেও সব কবুল করতে বাকি হবে।

পাহাড়ের বাংলোয় গিয়ে বাপীভাইয়ের অপেক্ষায় দিন গুনেছে। রেশমা হেসে হেসে তারাবও দুলারির কাছে স্বীকার করেছে, পাহাড়ে যাবার পর চালিহার মত লোকের চিন্তাটা আবারও মাথায় ঘুরপাক খেয়েছে, আর ভাবতে মজা লাগলেও জোর করেই সেটা ঝেঁটিয়ে দূর করেছে। কিন্তু বাপীভাই আসতেই ও যেন আর এক মজার খোরাক পেয়েছে। দোষ বাপীভাইয়েরই: আগেও টের পেয়েছে ওকে বিশ্বাস করে না। জঙ্গলে ওকে দেখলে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়, ডাকলেও সাড়া দেয় না। এবারে ও আরো ভালো করে বুঝেছে বাপীভাই আসলে ওকে ভয় পায়। এবারে পাহাড়ে আসতে রেশমার মনে হয়েছে সেই ভয় যেন বাপীভাইয়ের কাঁধে ভূতের মতো চেপে বসেছে। কেবল কামের কথা ছাড়া ওর সঙ্গে কথা বলে না, ওর দিকে তাকায় না, নিজের [illegible]

খায়, আর ফাঁক পেলে জঙ্গলে পালিয়ে যায়।

ক'দিন ধ'রে বেশমার মাথায় কেবলে গজা গিসগিস করেছে। বাপীভাইকে যা বলার পরে বলবে। যাবার আগে বলবে। তার আগে পর্যন্ত এইভাবেই চলুক। বেশমা নিজেকে মন ছিল, আর চালিহার মতলবের কথা ফাঁস করলেই বাপীভাইয়ের মুখখানা দেখতে কেমন হবে ভেবে ভবল মজা পাচ্ছিল।

ওখানকার কাজ শেষ করে বেশমা সেদিন আড়াল থেকে নজর রাখছিল। পাহাড়ের ধারে জঙ্গলে এসে তাকে ধরেছে, কিন্তু পথের ওপর এমন বিমনা হয়ে বসে-ছিল বাপীভাই যে একটু পিছনে দাঁড়িয়ে পাশ থেকে তাকে দেখে কিছুক্ষণ চোখ ফেরাতে পারে নি। শয়তান যে বেশমার দিকেই গুটি গুটি এগোচ্ছে বেশমা ভাবেই নি। ভাববে কি করে। ও তো এসেছে চালিহার মতলবের কথা ফাঁস করে দেবার জন্য।

কিন্তু ওর অজান্তে শয়তান ওর করেছে বলেই হয়তো খোদাতালাও নারাজ। নইলে বনমায়ার সেই পাগলা বুনো হাতি জঙ্গল ফুঁড়ে যমের মতো এসে হাজির হবে কেন! ওটাকে তেড়ে আসতে দেখেই বক্তৃত জল। ভয় পেয়ে বাপীভাই জঙ্গলের দিকে ছুটতে যাচ্ছিল। ও ধরে ফেলে পাহাড়ের দিকে টেনে নিয়ে না গেলে হয়েই গেছল। তাও প্রাণে বাঁচবে কি বাঁচবে না কে জানে। তক্ষুনি মনে হয়েছে বাপীভাইয়ের মতো এত আপনার জন আর নেই, তাকে যেমন করে হোক বাঁচাতে হবে—হবেই। না পারলে নিজের জীবনও রাখবে না। আর বাপী-ভাইয়ের সেই মুখ দেখে মনে হয়েছিল, নিজের বুকটা দু'খানা করে খুলে তাকে তার মধ্যে পুরে নিয়ে পালানো সম্ভব হলে তাই করত। তাকে আগলে নিয়ে ফাঁড়া কাটিয়েছে শেষ পর্যন্ত। ফাঁড়া সত্যি কেটেছে কিনা বাপীভাই তখনো জানে না। আর ঠিক তক্ষুনি বোধহয় শয়তানের দখলে চলে গেছে বেশমা। ফাঁড়া কেটেছে খানিকক্ষণ পর্যন্ত বাপীভাইকে সেটা বুঝতে দেয়নি। তাকে জাঁকড়ে রেখে আর আগলে রেখে এক পাথর থেকে অন্য পাথরে সরেছে।

শয়তান বেশমাকেই ফাঁদে ফেলেছে। আসমানের চাঁদের লোভ দেখিয়েছে। সেই চাঁদ যেন হঠাৎ ওর হাতের মুঠোয়। না, চালিহার মতলব হাসিলের কথা আর তার মাথায়ও ছিল না। চালিহা জানবে না। দুনিয়ার কেউ কোনদিন জানবে না।

বাংলোয় ফেরার মধ্যে বেশমার সবটাই শয়তানের দখলে। শুধু সময়ের অপেক্ষা। বাপীভাই ভয়ে ঘরে সেঁধিয়ে আছে। সেই ভয়ের খোলস ছিঁড়ে খুঁড়েই দেবে বেশমা আজ। ঝগড়ুকে মদে ডুবিয়ে দিয়ে এসে দেখে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। ক্ষিপ্ত হয়েই সেই বন্ধ দরজায় ঘা দিয়েছিল।

দরজা খুলতে নির্লজ্জ বেহায়ার মতো আসমানের চাঁদের দিকে হাত বাড়িয়েছিল বেশমা।

বাপীভাই সেই হাত দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে দিয়েছে।

বেশমার মাথায় দাউ দাউ আগুন জ্বলেছে তারপর থেকে। শয়তান সেই আগুন নিভতে দেয়নি। ওকে উল্টে পাগল করে তুলেছে। চরম প্রতিশোধ না নিতে পারা পর্যন্ত মাথার আগুন নিভবে না।

ভালো করে ফর্সা হবার আগে বেরিয়ে পড়েছে। ভোরায় তোরসটা রেখে সোজা চালিহার কাছে চলে গেছে। বলেছে, দু'হাজার টাকা দাও এবার।

চালিহা আনন্দে লাফিয়ে উঠেছে। কিন্তু বেশমার মুখ দেখে আবার খটকাও লেগেছে। —তোর এরকম মূর্তি কেন? বাপী তরফদার ফাঁদে পা দিয়েছে তো?

বেশমা বলেছে, না! কিন্তু না দিলেও তুমি এত বোকা কেন? এক ঝটকায় গায়ের জামা সমিস্রে পাহাড়ের সেই কাটা ছেঁড়ার দাগ দেখিয়েছে। —এগুলো দেখেও তোমার শত্রু কিভাবে ঘায়েল করেছে বললে মালকানা বিশ্বাস করবে? তাছাড়া জিগেস করলে ঝগড়ুও বলবে ভোর হবার আগে আমি হেঁটে পালিয়ে এসেছি।

চালিহার ফর্সা মুখেও শয়তান হাসছে। —মালকানাকে তুই নিজে গিয়ে বলবি?

—বলব। তার আগে তোমার কাছে নালিশ করেছি তাও বলব।

—কবে বলবি?

—এ পাহাড় থেকে ফিরুক, তারপর বলব।

বেশমার মুখে সেই আগুন দেখে চালিহা বিশ্বাস করেছে। আর সেই পথম নিজের দু'চোখেও গলগল করে লোভ ঠিকরেছে। ওর মাথাটা আদর করে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলেছে, তোর থেকে বেশি আপনার আর আমার কেউ না। নগদ টাকা হাতে নেই এখন, রাতে আসিস দিয়ে দেব।

বলতে এসেছে। আসবে না কেন, শয়তানের হাতে চলে গেলে আর কার পরোয়া? রাতে ডাকার অপেক্ষা তেমনও এসেছে। তারপর আর কিছুই যায় আসে না। চালিহা ওকে দারুণ খাতির করেছে। কড়কড়ে টাকা ওর হাতে গুঁজে দিয়েছে। বেশমা মদ খায় না, কিন্তু চালিহা আদর করে সেই মদও ওকে খাওয়াতে পেরেছে। তারপর নরকে ডুবেছে। নিজেকে ধ্বংস করতেই চায়। নিজেকে, সেই সঙ্গে আর একজনকে।

কিন্তু পরদিন সকালে সেই বাংলোয় বাপীভাইকে দেখে বেশমার বুকের তলায় হঠাৎ প্রচণ্ড মোচড় পড়েছে। প্রাণপণে তখন সেই শয়তানকেই আঁকড়ে ধরেছে সে। নিজেকে ছিন্নভিন্ন করে তুলতে চেয়েছে।

বাপীভাই চলে যাবার পর চালিহা ওকে মালকানের কাছে ঠেলে পাঠাতে চেয়েছে। কিন্তু বেশমা আবার যেন পঙ্গু হয়ে পড়েছে। শয়তান তাকে ছেড়ে যাচ্ছে। চেষ্টা করেও বাঘিনীটাকে আর বুকের মধ্যে ধরে রাখতে পারছে না। তবু অক্লান্ত চেষ্টা করছে। বলল, আজ না, দুলালকানের কাছে কাল যাবে।

চালিহার সবুর সয় না। —কাল কেন? আজ নয় কেন?

বেশমা বলেছে, আজ রাতেও তোমার কাছে থাকব। তাড়া দিও না। আমার মন মেজাজ এখনো ভালো না।

চালিহা লোভের টোপ গিলেছে, আর তাগিদ দিতেও সাহস করেনি।

পরদিন সকাল থেকে বেশমা আরো গুম। শয়তানও ওর সঙ্গে শয়তানি করেছে। ওকে ছেড়ে চলে গেছে। ডিভরের সেই বাঘিনীও উধাও। এদিকে চালিহারও তাগিদ বেড়েছে। ওকে মালকানের কাছে পাঠানোর জন্য ব্যস্ত।

ভেবেচিন্তে বেশমা একটা মতলব এঁটেছে। তাকেই ঢিট কথার মতলব। চালিহাকে বলেছে, সকালে নয়, দুপুরে যাবে মালকানের কাছে। তখন ওকে নিবি-বিলিতে পাবে। আর পরামর্শ দিয়েছে তুমি সাহেব, পাহাড়ের বাংলোয় চলে যাও। আমি যা-ই বলি ঝগড়ুকে মেমসায়েব জিজ্ঞাসাবাদ করবেই। আমার ব্যাপারে খোঁজ-খবর করার নাম করে তুমি আগের ভাগে গিয়ে তার মগজে যা ঢোকাবার ঢুকিয়ে দিয়ে এসো। তারপর রাতে এসে মালকানকে যা বলার বোলো।

বেশমা জানে এই লোকের কোনো নোংরা কথা ঝগড়ু বিশ্বাস করবে না। তার নজরে বাপীভাইয়ের পাহাড়ের মতো উঁচু মাথা। বেশমার মতলব হাসিল হলে

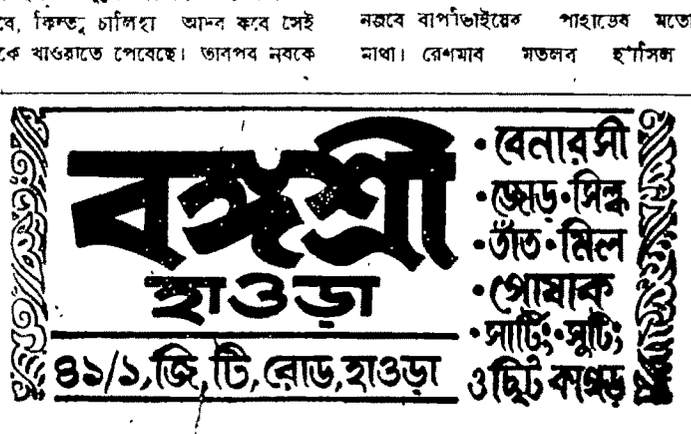

চালিহা উল্টে আরো বেশি নিজের কলে পড়বে।

দুপুরে রেশমা নিজের ডেরায় ফিরেছে। হারমা ঘরের সামনে বসে আছে দেখে বিরক্ত হতে গিয়েও ফিকফিক করে হেসেছে। কাছে এসে ওর ন্যাকড়া চুল মুঠো করে ধরে মাথাটা ঝাঁকিয়েছে আর আদুরে গলায় বলেছে, আমার ওপর তোরা সব্বাই খুব বেগে গেছিস জানি। কিন্তু আজ থেকেই বুঝবি আমি কতো ভালো মেয়ে।

এ-কথা হারমাই পরে বলেছে দুলারিকে। দুদিন ধরে রক্ত সত্যি টগবগ করে ফুটছিল তার। রেশমাকে নাগালের মধ্যে পেলে খুনই করে ফেলবে ঠিক করেছিল। কিন্তু তার কথা শুনে আর অত হাসি দেখে হারমা হকচকিয়ে গেছিল। রাগও জল।

রেশমা তক্ষুণি হারমাকে ঠেলে পাঠিয়েছে দুলারিকে ডেকে আনার জন্য। এক্ষুণি আসতে হবে, খুব দরকার।

দুরাত ওই শয়তানের বাংলোয় কাটিয়েছে জানার পর দুলারি আর ওর মুখ দেখবে ভাবেনি। কিন্তু ডাকছে শুনে না এসে পারেনি। ওই মুখপুড়ি যে কতখানি ওর, জানে বলেই ডেকেছে। তাছাড়া অনেক জানার আছে, অনেক বোঝার আছে। না এলে জানবে কি করে, বুঝবে কি করে?

এসেছে। দুলারিকে জড়িয়ে ধরে সে-কি আদরের ঘটা ওর। আর সে-কি হাসি! যেন দুনিয়া জয় করে ঘরে ফিরেছে। খুশি ধরে না। তেমনি হাসি মুখে আদ্যোপান্ত সব বলল। শুনতে শুনতে দুলারি স্তব্ধ। কিন্তু ওর ভ্রূক্ষেপ নেই। শয়তান ওকে ছেড়ে গেছে। ভিতরের বাঘিনী পালিয়েছে। আর ওর কাকে ভয়? এবারে ওই ম্যানেজারকে জব্দ করার পালা। মোক্ষম জব্দই করবে। এমন জব্দ করবে যে দুলারি আর সাহেব এমন কি বাপীভাইয়েরও ওর ওপর আর একটুও রাগ থাকবে না।

ও কি করবে বা কি মতলব এঁটেছে বার বার জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও বলল না। হেসেছে আর মাথা নেড়েছে। সে-টি হচ্ছে না। আগে থেকে জানাজানি হলে সর্বনাশ। সব ভেস্তে যাবে। এত কাণ্ডের পর মেয়েটার যাথাই খারাপ হয়ে গেল কিনা দুলারি ভেবে পায়নি। ওই চালিহাকে খুন-টুন করে বসে শেষে সব কবুল করার ফন্দি আঁটছে না তো? ও না পারে কি?

মোট কথা মেয়েটার অত হাসি দুলারির ভালো লাগেনি। তার ওপর দুহাজার টাকার পুঁটলিটা তার হাতে দিয়ে কি করতে হবে বলতে আরো খটকা লেগেছে। কিন্তু ভাবার সময় পায়নি খুব। রেশমা আবার ঠেলে তুলে দিয়েছে ওকে। বলেছে, হারমার সঙ্গে ওর দরকারি কথা আছে, পরে দেখা হবে।

দুলারির দুশ্চিন্তা বেড়েছে আরো। ওই হারমার সঙ্গে জোট বেঁধে কিছু একটা করার মতলবে আছে নাকি?

দুলারি চলে যেতে রেশমা বেরিয়ে এলো। হারমাকে বলল, তুই আর রাগে আছিস কেন, ঘরে যা। আমার দরকারি কাজ আছে, এক্ষুনি বেরুবো।

হারমা গোঁজ হয়ে বসে থেকে জবাব দিল, আমার আর ঘর কোথায়।

এ-কথা শুনে রেশমা নাকি হাসতে লাগল আর ওকে দেখতে লাগল। তারপর কাছে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, আচ্ছা আজ থেকে আমার এই ঘরই তোর ঘর। আবার ঘরে ঢুকে দুটো টাকা এনে ওর হাতে দিল। —সমস্ত দিন খাওয়া হয়নি মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। যা খেয়ে আয়—

হারমা তাও নড়ে না।

—অবাধ্য হলে রাগ করব বলে দিচ্ছি, যা চটপট খেয়ে আয়।

হারমা চলে গেল। কিন্তু আসলে কোথাও না গিয়ে একটু ঘুরে রেশমার ডেরার পিছনে এলো আবার। নিজের এত ভাগ্য বিশ্বাস করতে পারছিল না। রেশমা কোথায় বেরুবে কি তার দরকারি কাজ না দেখে থাকে কি করে। তাছাড়া ওর সেই হাসি মুখ দেখেই ক্ষুধা তৃষ্ণা গেছে।

একটু বাদে রেশমা বেরুলো। কিন্তু হারমা ভেবে পেল না কোথায় চলল ও। রাস্তার দিকে নয়, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যে-দিকে চলেছে সে-দিকে তো সাপ ঘর! ভয়ে ভয়ে হারমা অনেকটা ফারাক রেখে গাছের আড়ালে আড়ালে চলেছে। দেখে ফেললে কি মূর্তি ধরবে সেই ভয় আছে।

বেশ দূরে একটা গাছের ও ধারেই দাঁড়িয়ে গেল হারমা। সামনে আর গাছ নেই, আর এগোলে দেখে ফেলবে। কাঁশের বেড়া সরিয়ে রেশমা দাওয়ার দিকে এগুলো। তারপর সামনের বড় সাপ-ঘরটার দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে গেল।

এই ঘরে হঠাৎ কি দরকার পড়তে পারে রেশমার হারমা ভেবেই পাচ্ছে না। পাহাড়ের বাংলো থেকে সাপের বিষ বার করা শিখে এসেছে এ অনেকদিন আগে রেশমাই ওকে বলেছিল। সেই বিষ বার করতে গেল? সিন্ধের নাকি অনেক দাম। কিন্তু বিষ দিয়ে রেশমা কি করবে? চুরি করে বিক্রি করবে? না কি কাউকে সাবড়ে দেবার মতলব।

ঝুপড়ির মুখ একটু একটু ফাঁক করে খুব বিষাক্ত সাপ টেনে বার করা অভ্যেস ন্যাপার। ভয়ের কিছু নেই। হারমা নিজেও পারে। অথচ কি-যেন একটা ভয় হারমার বুকের ওপর চেপে বসছিল। রেশমা এত দেরি করছে কেন? তিন-পো ঘন্টা পার হতে চলল—বেরিয়ে আসছে না কেন?

আর পারা গেল না। পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল। পা টিপে দাওয়ায় উঠল। আস্তে আস্তে দরজাও ঠেলল। তারপর মেঝেতে ওই দৃশ্য দেখে একটা আর্তনাদ বাইরে ছুটল।

টর্চ জ্বেলে ঘড়ি দেখল বাপী। রাত এগারোটা বেজে দশ। ঘুম এই রাতে আর আসবে মনে হয় না। দুহাজার টাকার সেই পুঁটলিটা ফেরার সময় বাপী উর্মিলার হাতে দিয়েছে। তার মা-কে দিতে বলেছে। আর যা শুনেছে, সব তাকে বলতে বলেছে। রণজিৎ চালিহাকে রেশমা মোক্ষম জব্দ করে গেল বটে। পাহাড় থেকে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে অঘটনের খবর তার কানে গেছেই। তারপর সাহস করে সে আর পাশের বাংলোয় এসে গায়ত্রী বাইয়ের সঙ্গে দেখা করেনি নিশ্চয়। কথার খেলাপ করে যে মেয়ে এ-ভাবে নিজের জীবন দিয়েছে, তার আগে হাটে হাঁড়ি কতটা ভেঙে দিয়ে গেছে কে জানে? দুরাত পর পর ওই মেয়ে তার বাংলোয় কাটিয়েছে এও আর গোপন থাকবে না। ঘাতকঘাতিনী হবার ফলে ম্যানেজারের বাংলোয় রাত কাটানো নিয়েই সকলের বিকৃত জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেছে। বাংলো থেকে নড়ার সাহস এই রাতে অন্তত চালিহার হবে না।

কিন্তু বাপী কি করবে এখন। টর্চটা হাতে করে রেশমার ডেরায় ঢুকে যাবে? ওকে সেখানেই শুইয়ে রাখা হয়েছে এখন। আর বসে পাহাড়া দিচ্ছে। সংস্কার বশে হারমার বাপ ধামন ওঝা সাপে-কাটা মরাকে চব্বিশ ঘন্টার আগে মাটি চাপা দিতে নিষেধ করে গেছে। সে মুখ চোখের সামনে থেকে সরানোই যাচ্ছে না, চুপচাপ বেরিয়ে গিয়ে বাপী আবার সঙ্গে তার কাছে গিয়েই বসে থাকবে?

—বাপী সার! বাপী সার! বাপী সার!

আচমকা চিৎকারে অন্ধকার রাতের স্তব্ধতা খান-খান হয়ে গেল। সুইচটা টিপে এক লাফে বিছানা থেকে নেমে বারান্দার দরজা খুলে বাপী বেরিয়ে এলো। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কে। বারান্দার আলো জ্বালল।

রণজিৎ চালিহার কম্পাউন্ডার হ্যান্ড মজুমদার। ফ্যাকাশে মুখ। বড়চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। বেদম হাঁপাচ্ছে।

তার কথা শুনে বাপী কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল। সে ঘুমোচ্ছিল। একটু আগে তার মায়েরকে সাপে কেটেছে। চিৎকার চেঁচামেচি করে কয়েকজন লোক জুটিয়ে সে সাইকেল নিয়ে এখানে খবর দিতে ছুটে এসেছে। ডাক্তার সাহাব তাকে জলদি গাড়ি বার করে বাংলোর সামনে দাঁড়াতে। তিনিও যাবেন।

দুমিনিটের মধ্যে গাড়ি নিয়ে বাপী

দুঃসাধ্য রোগ

একজিমা, সোরাইসিস্, দূষিত ক্ষত, বকতদোষ বাতরক্ত, ফুলা শ্বেত-দাগসহ আরও অনেক কঠিন চর্মরোগ হইতে স্থায়ী মুক্তিলাভের জন্য ৮৪ বৎসরের চিকিৎসাকেন্দ্র চিকিৎসিত হউন।

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া-১, ফোন: ৬৭-২৩৫৯. শাখা: ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড (হ্যারিসন রোড), কলিকাতা-৯

শেষের বাংলোয় এলো। বাবাদাস গায়ত্রী বাই আর বিবর্ণ মুখে ঊর্মিলা দাঁড়িয়ে। গায়ত্রী বাই একাই নেমে এলো। ঊর্মিলার নড়াচড়ারও শক্তি নেই যেন। অর্জুন সাইকেল নিয়ে আগেই ছুটে বেরিয়ে গেছে।

বর্ণজিৎ চালিহার শোবার ঘরে আট দশজন লোক। প্রতিবেশী হবে। কিন্তু বাপী সব থেকে অবাক সেখানে হারমাকে দেখে। ভার মুখে বকুল। হাতে একটা ছোরা। সে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। দুমিনিটের মধ্যেই মুখ ধুয়ে ফিরে এলো।

চালিহা বিছানায় পড়ে আছে। অত ফর্সা মুখ কালছে, বিবর্ণ। সেটা ভয়ে কি বিষে বাপী ঠাওর করতে পারল না। জ্ঞান আছে কি নেই তাও বোঝা যাচ্ছে না। সম্ভবত কিংবতে হাত তুলে বাপী নাড়ি দেখল। পালস্ অস্বাভাবিক দ্রুত। হাঁটুর নিচে পায়ের পিছনে মাংসালো জায়গায় সাপে কেটেছে। হারমা কাছাকাছিই ছিল নাকি। অর্জুনের চেঁচামিচি শুনে ভিতরে ঢুকেছে। তারপর প্রাথমিক যা করার সে-ই করেছে। হাঁটুর ঠিক নিচে শক্ত বাঁধন দিয়েছে। আর হাঁটুর দুআঙুল ওপরে আর একটা। তার সঙ্গে ওই ছোরাটা ছিল। সেটা দিয়ে সাপ-কাটা জায়গা আরো বেশি করে কেটে দিয়ে রক্ত বার করে দিয়েছে। একরাশ বিষ-শালা রক্ত বেরিয়েছে গলগল করে। তারপর মুখে লাগিয়েও অনেকটা রক্ত টেনে এনেছে—বিষ রক্তটা বার করতে পেরেছে জানে না।

হারমা বিড়বিড় করে বলল সাহেব ভয়ে ভিরমি খেয়েছে—প্রাণ ভয় নেই, বেঁচে যাবে।

চা-বাগানের হাসপাতালে খবর দেওয়া হয়েছিল। তাদের গাড়ি এলো রণজিৎ চালিহাকে তুলে নিয়ে গেল।

তখন পর্যন্ত বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি বাপীর। সাপের জায়গা, বাংলোয় সাপ ঢোকা আশ্চর্য কিছু না। কিন্তু ঢুকতে দেবে না বড়। বাবণ সব জানলাতেই পাতলা তারের জাল লাগানো থাকে। বাপী তিনটে জানলাই চেয়ে চেয়ে দেখল। পাশের দিকের জানলার জাল বেশ খানিকটা ছেঁড়া আর দুমড়নো। মাথায় রক্ত ওঠার দাখিল বাপীর। ঘরে তখন কেবল গায়ত্রী বাই আর সে। অর্জুন তার সায়েবের সঙ্গে হাসপাতালে। কাছে ডেকে বাপী গায়ত্রী বাইকে ছেঁড়া জালটা দেখালো। চাপা গলায় বলল, জাল কেটে কেউ ঢুকিয়ে না দিলে এ-ঘরে সাপ ঢুকতে পারে না।

গায়ত্রী বাই একটি কথাও বলল না। সমস্ত মুখ থমথমে। তার হাবভাব দেখে চিন্তা করেই হাত ধরে বাংলো থেকে নামিয়ে গাড়িতে তুলল। সব কটা আলো জ্বালাই থাকল। বাপী বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল।

গায়ত্রী বাই গাড়িতেও নির্বাক।

হেড লাইটের আলোয় বাপী দেখল পঁচিশ তিরিশ গজ দূরে একটা লোক পথ পাশে হেঁটে চলেছে। হারমা। লাইট দেখে সে-ও ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

তার সামনে এসে বাপী গাড়ী থামালো। হেড লাইট নেভালো। গায়ত্রী বাইকে বলল, একটু বসুন, আসছি।

নেমে এসে হারমাকে গাড়ি থেকে আট দশ হাত দূরে গিয়ে ধরল। তীক্ষ্ণ চোখে ওর দিকে চেয়ে রইল খানিক। হারমার ভাবলেশশূন্য মুখে শুধু রাজ্যের ক্লান্তি। চেয়ে আছে সে-ও।

—তুমি এত রাতে এদিকে এসেছিলে কেন?

হারমা নিরুত্তর।

—কি করেছিলে?

নিরুত্তর।

বাপীর গলার স্বর কঠিন এবার। —আমাকে বিশ্বাস করে যা জিজ্ঞেস করছি জবাব দাও।

বিড়বিড় করে বলল, এদিকে এসেছিলাম।

—এত রাত্তিরে কেন এসেছিলে? তোমার সঙ্গে ওই ছোরা ছিল কেন?

ঘোলাটে চোখে হারমা চেয়ে রইল খানিক।—দুশমনকে খতম করব বলে এসেছিলাম। ওই ছোরা দিয়ে খোদা তাকে বাঁচিয়ে দিল।

আর দু'চার কথায় ব্যাপারটা বুঝে নিল বাপী। রাতে সুযোগ না পেলে ভোরে বাংলোয় ঢুকে সায়েবকে শেষ করার সংকল্প নিয়ে এসেছিল। চিৎকার চেঁচামেচি শুনে বাংলোয় ঢুকে দেখে আল্লা তাকে আগেই শাস্তি দিয়েছে। তক্ষুনি আল্লার ওপর ভয়ংকর রাগ হয়ে গেল ওর—আল্লা রেশমাকে নিয়েছে। তাই খোদা এবারে যাকে মারতে গেল হারমা তাকে বাঁচিয়ে দিল। হঠাৎ বিষম রাগে ওই কালো দেহের ছাতি ফুলে উঠল, বলল, আমি ভুল করলাম, আবার বদলা নেব।

বাপী দেখছে ওকে। এবারে ঠাণ্ডা গলায় বলল, খোদা ওই সায়েবকে শাস্তি দেয়নি, জানলার জাল কেটে কেউ তার ঘরে সাপ ছেড়ে দিয়ে গেছে। তুমি?

বিমূঢ় মুখে মাথা নাড়ল লোকটা। সে নয়। পরের মুহূর্তে কিছু মনে হতে চমকে উঠল যেন। সামলে নিয়ে আবার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল।

—তুমি দেখেছ কাউকে?

মাথা নাড়ল। দেখেনি।

—ভালো করে ভেবে দেখো। দেখেছ? কে এমন কাজ করতে পারে বলে তোমার মনে হয়?

হঠাৎ গলার স্বর গমগম করে উঠল ওর।—কিছু মনে হয় না। আমি জানি না। আমি কাউকে দেখিনি! হনহন করে হেঁটে চলল।

গাড়িতে ফিরে আসতে গায়ত্রী বাই জিজ্ঞাসা করল, লোকটা কে?

—হারমা। এক ওঝার ছেলে। রেশমাকে খুব ভালোবাসত।

—তাহলে ওরই কাজ?

বাপী জবাব দিল না। মিস্টার চালিহাকে ওই বাঁচিয়ে দিল ভেবে এখন পস্তাচ্ছে।

বাকি রাতটুকু দু চোখের পাতা আর এক করা গেল না। খুব ভোরে বাপী গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। গা-জুড়নো ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস। পাশে বসন্তের রং-ছোপানো নানারঙ্গুলির জঙ্গল। বনমায়া নেই। বেশমা নেই। এই বাতাস আর এই বসন্ত কেন বিদ্রূপে ঠাসা এখন।

সাপে কাটা রোগী হামেসাই আসে এখানকার হাসপাতালে; তাই চিকিৎসার ব্যবস্থাও ভালো। রণজিৎ চালিহাকে কেবিনে রাখা হয়েছে। এত সকালে বাপী তাকে দেখতে আসেনি। খবর নিতে এসেছে। মেট্রনের কাছ থেকে খবর পেল ভালো আছে। তবে জ্বর খুব। এমনি ছোরা দিয়ে রক্ত জায়গা কেটে দেওয়ার দরুণ অ্যান্টিটিটেনাস দিতে হয়েছে। প্রাণের ভয় নেই আর, কিন্তু প্রচণ্ড রকমের নার্ভাস শকের দরুণ পেশেন্ট খুবই কাহিল এখন। যে লোকটা রক্ত জায়গা কেটে বিষ-রক্ত বার করে দিয়েছে আর জায়গা মতো দু দুটো বাঁধন দিয়েছে তার নাম্বি খুব প্রশংসা করেছে ডাক্তারবাবু।

গাড়িতে ফিরে এলো। এক জায়গায় এসে জঙ্গলের ধারের রাস্তায় গাড়ি থামালো আবার। এখান থেকে জঙ্গলের পথে আবুর ঘর দুরে নয় খুব।

দুলারি দাওয়ায় দাঁড়িয়ে। দূর থেকে বাপীকে দেখল। চোখে একবারও পলক পড়ল না। নিশ্চল পাথর মূর্তি।

বাপী ওর কাছে দাওয়ার সামনে দাঁড়ালো। এ-ও সমস্ত রাত ঘুমোয়নি বোঝা যায়। এই চোখে গতকালের মতো আগুন ঠিকরোচ্ছে না এখন। পাথর মূর্তির মতো শুধু অপলক। অনেকটা হারমার মতো ভাবলেশশূন্য।

সাদাসাটা সুরে বাপী জিজ্ঞেস করল, আবু রাতে ঘর ফেরেনি তো?

মাথা নাড়ল। ফেরেনি।

জানা কথাই। গতকাল বিকেল থেকে বেশমার ডেরায় আছে। মাটি না দেওয়া পর্যন্ত সেখানেই থাকবে। বাপী দুলারির কাছেই এসেছে। কিছু বলতে নয়, শুধু দেখতে। দেখছেও। অনেক কাল আগের সেই দুলারিকে মনে পড়ছে। যখন বেশমাকে নিয়ে ঘরে ঘরে সাপ খেলা দেখাতো। পাশে বসে সাপের বাঁশি বাজাতো। হাঁটু মুড়ে বসে

সামনের ফণা তোলা সাপের মতোই সামনে পিছনে কোমার বুক মাথা দোলাতো আর বারবার মাটিতে হাত পেতে দিয়ে ছোবল পড়ার আগেই পলকে সে হাত টেনে নিয়ে সাপকে উত্তেজিত করত। বাপী তখন রেশমার থেকে সেই দুলারিকেই ঢের সাংঘাতিক মেয়ে ভাবত।

এতকাল বাদে আজ আবার সেই দুলারিকেই দেখছে বাপী। কিন্তু সামনে দাঁড়িয়ে শুধু দেখাটা বিসদৃশ। বলল, এ-দিকের ব্যাপার তো শুনেছ?

দুলারি চেয়েই আছে। এখনো জিজ্ঞেস করল না কি ব্যাপার বা কি শুনবে।

—কাল রাত এগারোটা নাগাদ রণজিৎ চালিহাকে খুব বিষাক্ত সাপে কেটেছে।.... ওর ড্রাইভার এসে খবর দিতে আমি আর তোমা-দের মেমসায়েব তক্ষুনি গেছলাম। চোখে চোখ রেখে কথাগুলো বলছে বাপী। জানালার জাল কেটে কেউ ঘরে সাপ ছেড়ে দিয়ে গেছে। খুব বরাত ভালো লোকটার...ওই হারমার জোরেই বড় বাঁচা বেঁচে গেল।

যা দেখার এবারে নির্ভুল দেখল বাপী। ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতো ছিটকে সোজা হয়ে দাঁড়াল দুলারি। মুহূর্তের মধ্যে চোখে সেই আগুন নেমে এলো। এই শোনার খবর-টাই যেন সর্বাঙ্গ ঝলসে দিয়ে গেল ওর।—হারমার জন্য বেঁচে গেল! হারমার জন্য? ও কি করেছে?

বাপী বলল কি করেছে।

....হারমা! হারমা এই কাজ করল। হারমা ওই শয়তানকে বাঁচিয়ে দিল!

বাপীর নির্লিপ্ত মুখ। গলার স্বরও ঠাণ্ডা। —তুমি তাহলে মনস্থ চালিহা সাহেবকে সাপে কাটবে?

সেই ছেলে-বেলা হলে এই চাউনি দেখেই বাপী হয়তো ভয়ে তিন পা সরে যেত। —হ্যাঁ জানতাম! তুমিও বুঝেছ বলেই এত সকালে এখানে ছুটে এসেছ তাও তোমাকে দেখেই আমার মনে হয়েছে। তোমার বন্ধুও সোনা-জন্তু বুঝবে। কিন্তু আমার কে কি করবে? কে ছেড়েছে বলার জন্য ওই সাপ ফিরে আসবে না তার গায়ে আমার হাতের দাগ থাকবে? ওই হারমাকে আমি দেখে নেব বুঝলে? আর রেশমাকে যে শেষ করেছে, এবার প্রাণে বাঁচলেও সেই শয়তানকে আমি আর বেশিদিন এই বনিরজুলির বাতাস টানতে দেব ভেবেছ?

এবারে চাপা ধমকের সুর বাপী বলল, এখন মাথা খারাপ করার সময় নয়—যা বলি শুনে রাখো! কটা দিন এখন মুখ শেলাই করে থাকবে। হারমাকে একটি কথাও বলবে না, আর যা বোঝার বুঝতে নিজে থেকে তুমি কিছু বলবে না। নিশ্চিন্ত থাকো, যাকে সরাতে চাও এবারে সে নিজেই সরবে—বনিরজুলির বাতাস বেশিদিন তাকে নিতে হবে না।

পরের পাঁচ ছ-দিনের মধ্যে বাপী আর একবারও হাসপাতালে যায়নি। গায়ত্রী রাই যোজ একবার করে গেছে। কিন্তু তিন মিনিটও থাকেনি। দেখেই চলে এসেছে। সেদিন ঊর্মিলা সঙ্গে ছিল। সে এসে বাপীকে খবর দিল, আংকেল তার কথা শোনার জন্য মা-কে বার বার বলছিল। পরে মায়ের মুখে শুনেছে, রোজই বলে তার নাকি অনেক কথা বলার আছে। সেদিন মা তাকে স্পষ্ট বলে দিয়েছে, তারও অনেক কথা শোনা হয়ে গেছে —কিন্তু আপাতত তার কারো কোনো কথা শোনার ইচ্ছে নেই। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেই আংকেল যেন এখন আসাম চলে যায়। পরের কথা পরে।

শুনে আংকেলের মুখ আমসি একেবারে।

বাপী হাসপাতালে তার কেবিনে এলো আরো দু-দিন বাদে। পরের দিন সকালে সে নিজের বাংলোয় আসছে শুনছে।

বেড-এর মাথার দিকে পিঠে ঠেস দিয়ে বসেছিল, ওকে দেখেই রণজিৎ চালিহা অন্যদিকে মুখ ফেরালো। অনেক দিন বাদে সেই ওপরওয়ালার গাম্ভীর্য আর বিরক্তি টেনে আনার চেষ্টা। কিন্তু মুখ দেখে বাপীর মনে হল এই কদিনে লোকটার দশ বছর বয়েস বেড়ে গেছে।

চেয়ারটা টেনে নিয়ে বাপী পাশে বসল। ভাবলেশশূন্য মুখে শুধু রাজ্যের ক্লান্তি। কাল বাংলোয় ফিরছেন শুনলাম?

চালিহা তার দিকে ফিরল। কুঞ্চন সন্দিগ্ধ চাউনি।—তোমার কি ধারণা হাস-পাতালেই থেকে যাব?

—না। তারপর আপনি আসাম যাচ্ছেন কবে?

পিত্তরবার পোরা হারনার মতো কাঁপিয়ে পড়তে চাইল রণজিৎ চালিহা।—সে খোঁজে তোমার কি দরকার? আমার ঘরের জানালার জাল কেটে সাপ ঢোকানো হয়েছে....এ-খবরটা জানা আছে?

—আজ্ঞে।

—কে করেছে এ-কাজ? এত সাহস কার?

—জানি না।

কিন্তু আমি জানব। আমি তার টুঁটি টিপে ধরব—বুঝলে?

—চেষ্টা করে দেখুন। আমার আপত্তি নেই।

সন্দিগ্ধ দুই চোখ মুখের ওপর থমকে রইল একটু। —তুমি আপত্তি করার কে?

—আপনার সঙ্গে ফয়সলা এরপর আমার হবে ভেবেছিলাম। আপনি এ-চেষ্টায় এগিয়ে এলে তার আর দরকার হবে না। বেশমা কেন নেই কারো জানতে বাকি নেই। আপনি যাদের খুঁজছেন তারা এখনো আপনার ঘরে ফেরার অপেক্ষায় আছে। আমি আপনাকে বাধা না দিলে তাদের সুবিধে।

রাগে কাঁপছে লোকটা। কিন্তু বাপী জানে আসলে ত্রাসে কাঁপছে। জালে পড়া জানোয়ারের ত্রাসে বাগের বাপটাই বড় হয়ে ওঠে।—তুমি তাহলে আমাকে ভয় দেখাতে এসেছ কেমন?

—শুনুন। এবারে ঠাণ্ডা কঠিন গলায় বাপী বলে গেল, মিসেস রাইয়ের অনেক ধৈর্য....মাত্র ছাড়িয়ে ডিরুক করে বৃষ্টির পাহাড়ী রাস্তায় তাঁর স্বামীর স্লিপ অ্যাক-সিডেন্ট করাটা আর তার আগে আপনার সেই স্লিপ থেকে নেমে যাওয়াটা তিনি খুব সাদা চোখে দেখেন নি। তবু এত ধৈর্য যে আপনাকে তিনি এ পর্যন্ত বরদাস্ত করে এসেছেন। তাঁর কাছে এতদিন থেকে আমিও কিছু ধৈর্য শিখেছি। নইলে এবারে যে ষড়যন্ত্রে আপনি নেমেছিলেন তার জবাব আমারই দেবার কথা। কিন্তু কাল আপনার ঘরে ফেরার পর থেকে আমারও ধৈর্যের মিয়াদ আর তিন দিন। হাতে গুণে তিনটি দিন।' সেই তিন দিনের জন্য আপনার জীবনের দায়িত্ব আমি নিলাম। কিন্তু তারপর আপনাকে আরে এই বানারজুলিতে দেখা গেলে আমার আর কোনো দায়িত্ব থাকবে না।

চালিহার সমস্ত মুখ এখন পাংশু বিবর্ণ।

বাপী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে এলো।

বাংলোর বারান্দায় মা-মেয়ে বসে। গেটের সামনে গাড়ি থামিয়ে বাপী নামল। বারান্দায় উঠে সামনের চেয়ার টেনে বসল। গায়ত্রী রাই জিগ্যেস করল, পাঁচটার আগেই অফিস ছেড়ে হঠাৎ কবে কোথায় চলে গেছলে?

—হাসপাতালে। চালিহার কাছে।

আজ আর মিস্টার বা সাহেব জুড়ল না ওই কানে তাও ধরা পড়ল মনে হয়। তার দিকে চেয়ে একটু অপেক্ষা করল।—কেন? কি কথা হল?

বাপী শান্ত মুখে জানালো কেন, আর কি কথা হল। কিছুই গোপন করল না।

ঊর্মিলার চোখে মুখে চাপা উত্তেজনা। কিন্তু গায়ত্রী রাই বিব্রত হঠাৎ।—কেন তুমি আগ বাড়িয়ে এ-সব বলতে গেলে? সে আসার চলে গেলে পরের ব্যবস্থা আমিই করতাম। এখন গোঁ ধরে যদি না যায়?

বাপী তেমনি নির্লিপ্ত, নির্বিকল্প। ঠাণ্ডা স্পষ্ট জবাব দিল, না যদি যায়, আপনি আমার নামে কুকুর পুষবেন।

গায়ত্রী রাই চেয়ে রইল। তার চোখেও নতুন মুখ দেখছে।

[চলবে]

প্রাপ্তিযোগ

বিজনকুমার ঘোষ

অনেক আগেই সকাল হয়ে গেছে। আজ অফ ডে। চারদিকে ঝলমল রোদ। তুষার তবু বিছানা সহজে ছাড়তে চায় না। অফ-ডে পেলেই ও রাতটাকে রবারের মত টেনে লম্বা করে ছেড়ে দেয়। এটা বিয়ের আগের অভ্যেস। বেণু অনেক গালমন্দ করেছে এ জন্যে। এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে। কি আর করবে।

তবে তুষারও আজ রাতের পরমায়ু বেশিক্ষণ মশ বাড়াতে পারল না। এর কারণ বেণু নয়, একটি ফাজিল ছোকরা। বলাই আছে খবরের কাগজ একটু বেলায় দিলেও চলবে। কিন্তু কে শোনে কথা। ফাজিল ছোকরাটি প্রথমে বিশ্রী রকম গলা খাঁকারি দেবে, তারপর জানালা গলিয়ে মশারীর চালের ওপর ছুঁড়ে দিলেই কার্যোদ্ধার করে যাবে। আজও তাই হল। আর হাতের কাছে খবরের কাগজ পেলে উঠে বসতেই হয়। এটাও বিয়ের আগের অভ্যেস।

না, তেমন কোন হৃদয় বিদারক খবর নেই। রাত দুপুরে প্রশান্ত মহাসাগরে কোন যাত্রীবাহী বিমান ডাইভ দিয়ে তলিয়ে যায় নি। তার বদলে প্রথম পাতায় সাদাগাটা লোড শেডিংয়ের ছবি। অফিসের বাবুরা তালপাতার পাখা দিয়ে হাওয়া খাচ্ছে। সামনে মোমবাতি। বাগাস। হঠাৎ চতুর্থ পাতায় নজর গেল 'আপনার আজকের দিনটি।' তুষার এ সবে একদম বিশ্বাস করে না। অতএব ফরর ফরর আওয়াজ দিয়ে চলে গেল শেষ পৃষ্ঠায়। এবার কে বেশি শক্তিশালী, [illegible] না ইষ্টবেঙ্গল—এই নিয়ে জোর গর্ভ আলোচনা। তবে এ-সব জিনিস উৎসাহ নিয়ে পড়ার মত বয়েস বহু পিছনে ফেলে এসেছে তুষার।

অতএব উঠে পড়ল। ভাগ্য ভাল বাথরুমটা খালি। পাঁচ ঘর এক উঠোনো বাড়িতে খালি পাওয়াও একটা ভাগ্যের কথা। খান চারেক টিনের আড়ালে সাধারণত মিনিট দশেক লাগে তুষারের। অনেক ভাবনা চিন্তা, জটিল রহস্যের সমাধান হয়ে যায় এই দশ মিনিটে।

হ্যাঁ, জীবনে এই প্রথম কি যেন একটা দুর্বলতা, অদ্ভুত একটা আশা আকাঙ্খা শরীরে ভর করেছে। শরীরটা কাঁপছে। মগে করে ঠান্ডা জল গায়ে ঢালতে গিয়ে তুষার সেটা স্পষ্ট টের পেল। ওর বয়েস বাড়ছে কিছুদিন আগে। বাবার ব্যবহৃত সুইসৈশ হাতড়াতে গিয়ে তুষার একটা ভোঁতা কাঁচি খুঁজে পেয়েছিল। বাবার এ-সব দিকে ঝোঁক ছিল খুব। তা তুষারের শরীরটা কেঁপে ওঠার কারণ, ও 'আজকের দিনটা' পড়ে ফেলেছে। মাত্র গুটিকয়েক কথা—'প্রাপ্তিযোগ আছে। পাওনা আদায়ের ব্যাপারে তৎপর হোন।'

ইতিমধ্যে দশ মিনিট হয়ে গেছে। বাইরে কাশির শব্দ। তুষার বেরোতে গিয়ে অমায়িকভাবে হাসল। গামছা পরা দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং হরিদাসবাবু। বাড়িওয়ালা। হাসিটা তাঁর নজরে এল না।

ঘরে অল্প কিছু কথা হল বেণুর সঙ্গে।

—এখনই চান করলে যে?

—কল আছে। একটু তাড়াতাড়ি হবে।

—বাজারে যাবে না?

—নাঃ।

—আলু আর ডিমে আছে কিন্তু।

—অনেক আছে। আলুর দম আর ডিমে পোস্ত। তোফা জমবে। শোন, আমি কিন্তু খাব না।

—তবে আর কি। খাবে না যখন তখন বাজার করার কি দরকার। —রেণু মুখ ঝামটা দিল : ছেলেটা সেদিন টাইফয়েড থেকে উঠল। একটু মাছ মাংস করা। যাক্ গে—

বক্তব্যের কথায় নরম হল তুষার। ডিমের মধ্যে কি কি ভিটামিন আছে তার ফিরিস্তি না দিয়ে বলল, টাকার ধান্ধাতেই বেরোচ্ছি গো। পেলে ওবেলায় যা হোক নিয়ে আসব।

বেণুর ভুরু আবার কুঁচকে গেল।

—দেখো ধারটার কোরো না বাপু। শোধ দিতে দিতে মাইনে ফতুর।

—আরে না না। —তুষার হেসে সন্তোষ পা দিয়ে মনে মনে বলল : তৎপরতা কাকে বলে এবার দেখিয়ে দেব।

প্রথমেই দেখা হল শচীনবাবুর সঙ্গে। ভয়ে কুঁকড়ে গেল তুষার। শচীনবাবু ইদানীং তিনটে টাকা চাইছেন। দেখা হলেই বুক পকেট থেকে নোটবই আর পাশ পকেট থেকে চশমা বের করে ফেলেন, তুমি আমার কাছে যেন কত পাও? এই যে লেখা আছে। শুধু আর তিনটে টাকা দাও তাহলে পুরো-পুরি কুড়ি হয়ে যাবে। ও মাসেই আমি দিয়ে দেব, মুখোজ্জ্বল

প্রথমে পাঁচ টাকা নিয়েছিলেন। তারপর দু টাকা। শেষে দশ টাকার নোট বানাতে আরও তিন টাকা ঢালতে হল। কিন্তু ওখানেও থেমে থাকেন নি। এটাই শচীনবাবুর টেকনিক। যাক, একটা ফাঁড়া কাটল। এখানে তৎপরতা দেখানো মানে বিপদ ডেকে আনা।

তুষার এখন বাস স্ট্যান্ডে। আরে ওই তো, কালো গগলস পরে অজিতবাবু দাঁড়িয়ে। রাস্তার এপার আর ওপার। তুষার কাগজওয়ালার মত গলা খাঁকারি দিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল। না, তিন মিনিটের মধ্যে একবারও হাসার টাইম পেলেন না অজিতবাবু। যেন চিনতেই পারছেন না। অথচ দিন কয়েক আগে এই অজিতবাবুই বাজারের মধ্যে ডেকে কথা বলেছিলেন। উনি তখন মাংসের লাইনে দাঁড়িয়ে। আসল কথায় ধারলাচ দিয়েও গেলেন না, শুধু বললেন, কি রকম গরম পড়েছে দেখেছেন।

হ্যাঁ, আরও একদিন গড়িয়াহাটার মোড়ে ওর নামটা হঠাৎ জেগে উঠেই মিলিয়ে গিয়েছিল। ট্যাক্সিটা পাশ দিয়ে চলে যেতে দেখা গেল কাঁচের ও-পিঠে অজিতবাবু হাত নাড়ছেন।

তুষারের বাস এসে গেল। অফিস কাছারির উল্টো দিকে বলে ভিড় কম। উপায় না দেখে তুষার উঠে পড়ল।

অজিতবাবুর কাছে পাওনা মাত্র পনেরো টাকা, মাস তিনেক আগে সমবায়িকায় দেখা। কি যেন কিনবেন, ওই টাকাটা গেট পড়ে গেছে। কথা ছিল, বাড়ি ফিরেই শোধ করে দেবেন। কিন্তু হায়—

পাড়ার একটি বেকার ছেলে ফি সপ্তাহে লটারির টিকিট বেচতে আসে। তুষারের কখনো মনে হয় না, একটা টাকা খরচ করে হঠাৎ বড়লোক হয়ে যাই। এই তো সেদিন কন্টুর অসুখের সময় রেণু কোথা থেকে একটা মাদুলি এনে হাতে বেঁধে দিয়েছিল। এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে তুমুল ঝগড়া। শেষে তুষার বেগেমেগে মাদুলীটা রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে। অফিসের পার্থিবজাতবাবু একবার গম্ভীরভাবে হাত দেখে সাড়ে ছয় রতি মুক্তা ধারণ করার পরামর্শ দেন। সময়টা নাকি খারাপ যাচ্ছে। একথা শুনে তুষার এক মিনিট সাতাশ সেকেন্ড ধরে হেসেছিল।

যাদবপুর। ইব্রাহিমপুর রোড ধরে বেশ খানিকটা এগিয়ে বাঁদিকে কোন পুকুর না দেখতে পেয়ে তুষার থমকে দাঁড়াল। একটি ফরসা আদুলে গা বৃদ্ধ নাতনী কোথা দাঁড়িয়েছিলেন। তুষার প্রশ্ন করতেই বৃদ্ধ হো হো করে খানিকটা হেসে বললেন, সে পুকুর ভরে ভরাট হয়ে তিন তলা বাড়ি উঠে গেল আর আপনি কি না—

তুষার বলল, পুকুরের পাশেই অরুণ বাবুর বাড়ি ছিল, আমার দাদার বন্ধু—

—অরুণ লাহিড়ী? বেটেপানা?

—হ্যাঁ হ্যাঁ—

—সোজা চলে যান। একটা মোড় পড়বে। ডান দিকে এগিয়ে তিনটে বাড়ির পরেই একতলা বাড়ি। গোলাপি রং।

একটু পরেই গোলাপি বাড়ির দরজার কড়া নড়ে উঠল। তুষার মনে মনে খুবই খুশি। এর চাইতে বেশি তৎপরতা আর হতে পারে না। এখন গোলাপি বাড়ির অন্তর থেকে যদি সুড় সুড় করে পঞ্চাশটা টাকা বেরিয়ে আসে তবেই পরিশ্রম সার্থক। তরুণদা সেই রকমই আছে একটু মোটা-সোটা আর ভাবিকর্মী।

—আরে এসো এসো, কি খবর? তা বাড়ি চিনলে কেমন করে?

তুষার বিস্ময়ের মত হাসল। অর্থাৎ সবই জানি। মুখে বলল, এদিকে একটু এসেছিলাম, তাই ভাবলাম—

—বেশ করেছ। চা খাও। —লক্ষ্মী সামলাতে সামলাতে তরুণদা ভিতরের দিকে ঢুকল।

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চাকরী করে। লাইনেও ভাল। কিন্তু খুব চাওয়া একটা স্বভাব। নানা উপসর্গও নাকি আছে অফিসের বন্ধুদের কাছে আর ধার মেটে না। তাই বন্ধুদের আত্মীয় স্বজনের কাছে যেতে হয়। তুষারের একটা দোষ, টাকা থাকলে মুখের ওপর না করতে পারে না। দাদা বন্ধু মুখ শুকনো করে যখন বলছে, ঠেকায় পড়ে গেছি, তখন কি করে ফেরায়। পরে দাদা শুনে বলেছে, কেন দিতে গেলি? ও টাকার আশা ছেড়ে দে।

তুষার অবশ্য পুকুরের পাশের বাড়িতে বার কয়েক গিয়েছিল। আশায় আশায়। সে তো অনেক দিন আগেকার কথা। তত বারই দেখা হয়েছে সেই এক কথা, এ মাসটা বড্ড টানাটানি যাচ্ছে ভাই, সামনের মাসে নিশ্চয়ই—

দেব কথাটা কখনো কমপ্লিট করে না তরুণদা। এটাও একটা টেকনিক কিনা কে জানে।

চাই তুলতে তুলতে তরুণদা এল। পেছনে একটা বাচ্চা মেয়ে, হাতে এক গ্লাস দুধ আর দুখানা বিস্কুট।

—তারপর তোমার খবর বল। ও কি, চশমা নিলে কবে? বয় ফ্রেন্ডমেয়ে? তোমার দাদার সাথে আজকাল দেখাই হয় না। অন্য সেকশনে বদলি করে দিয়েছে হা-ও-ও—

তুষার প্রত্যেকটি কথারই বিনীত গলা-চোখের ভঙ্গীতে জবাব দিল। ঘন ঘন হাই তুলছে তরুণদা। আসল কথার ধারেকাছে দিয়েও যাচ্ছে না। অভিজ্ঞতায় দেখেছে, এঁদের বড্ড ভুলো মন। হায় রে, মা লক্ষ্মী ভাণ্ডারের মদন কিম্বা হরিদাসবাবুর মনও যদি এমনি ভুলো হত। আরও একটা মতলব খেলে গেল, ধার নিয়ে এইসব লোকেরা ভাঁটে থাকে। আর যে অসময়ে ধার দেয় তাকেই হন্যে হয়ে পিছনে পিছনে ঘুরতে হয়। বাসা পাল্টালে খোঁজ নিয়ে সেখানেই যেতে হয়। বসে থাকতে হয় মুখ শুকনো করে। যেন কন্যাদায়গ্রস্ত।

হাইয়ের সঙ্গে গোটাকতক কুড়ি মেরে তরুণদা এক সময় বলে উঠল, নাইট ডিউটি দিয়ে এসেছি, ঘুম পাচ্ছে বড়। আচ্ছা, এদিকে এলে টেলে এসো—

জুন মাসের আকাশ ভর্তি রোদ। তবে দক্ষিণ থেকে দমকা বাতাস আর এক টুকরো কালো মেঘ ঘন ঘন সূর্যকে চাপা দেওয়ার গরম তেমন অসহ্য লাগছে না। এবার কোথায় যাওয়া যায়? কিন্তু তার আগে কিছু খেয়ে নিতে হবে। কালও ঘরে গিয়ে দারুন খিদে লেগেছে। তুষার যাদবপুর স্টেশনের কাছাকাছি একটা সস্তার হোটেল আবিষ্কার করে ফেলল। পকেটে মাত্র পাঁচটা টাকা। আড় মাছের ঝোল আর ভাতের অর্ডার দিতে গিয়ে আড়াই টাকা বেরিয়ে গেল।

খেয়েদেয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে স্টেশনে পায়চারি করতে লাগল। একটা টিকিটও কেনা হল, কেননা সোনারপুরের ট্রেন মাত্র দশ মিনিট পরেই। দক্ষিণের প্ল্যাটফর্মে লোকজন কম। কিছু ভিখিরী আর তরকারিওয়ালা। কলকাতার গাড়ি ধরতে ওদিকের প্ল্যাটফর্মে পরিপাটি বাবু-দের ভিড়।

তুষার এখন সবে চাকরীতে ঢুকেছে। বাবা বেঁচে। জয়েন্ট ফ্যামিলি। নতুন নতুন জামা আর প্যান্ট বানাচ্ছে তুষার। ইতিমধ্যে ঘড়ি আর আংটিও হয়ে গেছে। বাড়িতে দেবার প্রশ্ন ছিল না। ব্যাংকে নতুন পাশ-বই। সেই সময় বিভূতিবাবু একদিন হন্ত-দন্ত হয়ে এসে আড়াইশো টাকা চাইলেন। ভীষণ নাকি দরকার।

ট্রেন এসে গেল। পছন্দসই একটা কামরা বেছে নিয়ে বসল তুষার। আকাশে আলোছায়া খেলা। বিশাল ফাঁকা মাঠ পেয়ে দক্ষিণের বাতাস একনাগাড়ে ছুটোপুটি করছে। তা বিভূতিবাবুর ভীষণ দরকারী কাজটা মিটে গেল আড়াইশো টাকায়। তারপর আর তুষারের কথা মনে পড়ল না। যেমনটি হয়ে থাকে আর কি?

তুষার টাকা থাকলে না করতে পারে না যেমন, ধার দিলে তা মুখ ফুটে চাইতে পারে না। ও মনে করে, নেওয়াটা যার গরজ দেওয়াটাও তার। তুষারও হাল ছেড়ে দিয়েছিল এতদিন। তা মেঘ রাশিতে 'প্রাপ্তিযোগ' কথাটা লিখেই তো গোলমাল বাঁধাল। আচ্ছা, টাকাটা যদি ফেরৎ পাওয়া যায় তাহলে কি জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বাস করবে? চমকে উঠল তুষার। অস্বস্তিতে পড়লে সিগারেট ধরায়। ধরাল। তারপর ঘন ঘন দুটান টান দিয়ে এই সিদ্ধান্তে এল, সব কিছুতে অত গোঁড়া হয়ে কি লাভ।

বিভূতিবাবু বাড়ি করেছেন সোনার-পুর স্টেশনের কাছি। বহু দিন আগে এক-ডালিয়া লেকে হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল। খুব খুশি হয়ে বলেছিলেন, বাড়িটা কম্প-লিট করলাম ভাই। আলোবাতাস কাকে বলে একবার নিজের চোখে দেখে যেও। ওই তো, স্টেশনে নেমে যাকে আমার নাম বলবে সেই দেখিয়ে দেবে। আচ্ছা চলি ভাই, ট্রেন আছে—

পিচ রাস্তার পাশেই সাদা রঙের সুন্দর

সোনারপুর বাড়ি। দরজা জানালার বড় ঘন নীল। প্রাচীর ঘেরা মস্ত বড় বাগানও সেই সঙ্গে। গেটে শ্বেতপাথরে বিভূতিবাবুর নাম। ছাদে অ্যানটিনার কাজ বসে আছে। এমন বাড়ি থেকে কিছুতেই খালি হাতে ফিরতে পারে না। অত্যন্ত আশায় আশায় বন্ধ নাড়তেই ভিতর থেকে কুড়ি বাইশ বছরের একটি ছেলে বেরিয়ে এল। হাতে একখানা ইংরেজী ম্যাগাজিন।

—কাকে চাই?

—বিভূতিবাবু বাড়ি আছেন?

—বাবা তো নেই। আপনি কোথা থেকে আসছেন?

—কলকাতা থেকে।

ছেলেটি একটু চিন্তা করে বলল, আপনি আমার সঙ্গে আসুন। বাবা মাছ ধরছেন।

বাড়ির পিছনে বাঁশঝাড়। সরু পথ। মিনিট তিনেক আঁকাবাঁকা হাঁটার পর পুকুর পড়ল। বড় নিরিবিলি আয়গাটা। একটা ঝাঁকড়া বকুল গাছের তলায় বিভূতিবাবু হুইল ফেলে বসে আছেন। ঘাড় ফিরিয়ে হঠাৎ বিস্ময় এবং আনন্দ, আরে এসো এসো—

পুকুরের এক দিকে কলাগাছের ঝাড়, অন্য দিকে নারকেল সুপুরীর ঘন ছায়া। একটানা বোদের পর আকাশে আবার আলো-ছায়ার খেলা শুরু হয়েছে। সমস্ত পরিবেশটা এমন যে, এক মুহূর্তে ভাল লেগে গেল তুষারের। ঘাটের পাশে রুমাল বিছিয়ে বসতে বসতে বলল, আপনি আসতে বলেছিলেন, তাই চলে এলাম।

—আহা বেশ বেশ। তা খাওয়া-দাওয়া হয়েছে তো?

—হ্যাঁ হয়েছে।

ছেলেটি চলে যাচ্ছিল, তাকে দেখিয়ে বললেন, আমার ছোট ছেলে। ডাক্তারী পড়ছে।—তারপর ওর দিকে তাকিয়ে: টুনু, মাকে সময়মত চা-টা পাঠিয়ে দিতে বলিস।

তুষার দেখে গাঁয়ে থাকতে অনেক মাছটাচ ধরেছে। বড়দের দিনে আমও কুড়িয়েছে। ছোটবেলার সেই সব সোনালি দিন ভেসে ওঠায় মনে হল সকালে ঘুম থেকে উঠেই যদি এখানে চলে আসত। শুধু শুধু যাদবপুরে গিয়ে সময় নষ্ট। এখানে এই পুকুরে সাঁতার কেটে স্নান করা, তারপর বিভূতিদার বাড়িতে ভাত খাওয়া। আর সারা দুপুর ছিপ ফেলে চুপচাপ বসে থাকা। মনে পড়ছে না পৃথিবীতে এর চাইতে ভাল কোন জিনিস থাকতে পারে।

—বিভূতিদা, পুকুরটা আপনার?—অত্যন্ত খুশি হয়ে তুষার জিজ্ঞাসা করল।

—হ্যাঁ, লিজ নিয়েছি—হঠাৎ বিভূতিদার কথা বন্ধ হয়ে গেল। সাপলা ফুলের পাশে ফাতনা নড়ছে। বিভূতিদা ছিপের ওপর ঝুঁকে পড়েই দিলেন এক টান: নাঃ, ছোট মাছ লেগেছে—

—মাছ আছে তো?

—নেই আবার!—বিভূতিদা টোপ গেঁথে যথাস্থানে ছুঁড়ে দিলেন: দু হাজারে লিজ নিয়ে অন্তত শ তিনেক টাকার চারা পোনা তো ছেড়েইছি।

—তা কি রকম আয় হবে ভাবছেন?

—অন্তত দশ হাজার!—বিভূতিবাবু তুষারের দিকে তাকিয়ে গলা খাঁখারি দিলেন।

তুষারের মনে হল এই সময় আড়াইশো টাকার কথাটা তোলা ঠিক হবে কি না। বার কয়েক ঢোঁক কবল। শেষে হাল ছেড়ে দিয় ভাবল, এবিষয়ে হরিদাসবাবু, কি মদনের কাছে ট্রেনিং নিলে যেমন হয়।

তা তুষারের মনে যখন এই রকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব চলছে, ঠিক তখনই বিভূতিবাবু শুরু করলেন, খরচও আছে জায়, পাহারা রাখতে হয়। নাহলে এক রাতের ভিতর জাল ফেলে সাফা করে দেবে।

—তাই নাকি?

তবে আর বলছি কি!

হঠাৎ বিভূতিদা ইসারায় চুপ করতে বললেন। ফাতনার দিকে দৃষ্টি। তুষার ফের ছেলেবেলায় চলে গেল। বুকের মধ্যে শির-শিরানি। না না, এই সময় টাকার কথা কিছুতেই নয়। বিভূতিদা দাঁড়িয়ে উঠে দিলেন এক টান। তুষার ছুটে গেল জলের কাছে। প্রায় দেড় কিলো ওজনের একটা লাল বুই মাছ মাটির ওপর লাফাতে লাগল। বিভূতিদার মুখে গর্ব ফুটে উঠল আবার।

—ঠিক আছে, আর একটা তুলতে পারলে দেখায় দেব। এক ঘন্টা থেকে এসেছ।

তুষারের বন্টুর কথা মনে পড়ল। বেচারা মাছ খেতে চেয়েছিল। তা মন্দ হয় না একরকম একটা মাছ পেলে। খুশি হয়ে জিজ্ঞাস করল, কি চার দিয়েছেন বিভূতিদা?

—চারফার কিছু নয়। এই তেঁচার টোপ। সময়মতন পেলে ছিপখানা নিয়ে বসিস। কা তোমার বাড়ির খবর বল।

তুষার সুযোগ পেয়ে গেল।

—বড় ঝামেলা যাচ্ছে বিভূতিদা। বন্টুর টাইফয়েডে অনেক খরচ হল। বাজারে ধারদেনাও হয়েছে। কোন দিকে আর পথ দেখতে পাচ্ছি না—

বিভূতিদার মন্তব্য শোনা গেল না। পিন্টু এই সময় চা মুড়ি গরম সিঙ্গারা নিয়ে হাজির। হঠাৎ বাতাসে জলটা কাঁপতে লাগল থির থির করে। মাছের সম্ভাবনায় তুষার এখন ঘন ঘন ফাতনার দিকে তাকাচ্ছে। তা মাছও একটা প্রাপ্তিযোগ বৈকি। অন্তত মুখ বন্ধ তো হয় বেণুর কাছে। কিন্তু এত বড় পুকুরে একটাই কি রোকা মাছ ছিল। এদিকে সুপুরী আর কলাগাছের ছায়া পুকুর সাতরে এপারে চলে এসেছে। বিকেলের রঙ এখন গাঢ়। বিভূতিদা শেষ টোপটা বড়শিতে গেঁথে নিয়ে বললেন, হ্যাঁ যা বলছিলাম। দ্যাখো, একদম মুসড়ে পড়বে না। জীবন মানেই হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্র, প্রতিটি মুহূর্তে এখানে লড়তে হবে। তবে। টিকে থাকতে পারবে।

—কিন্তু বিভূতিদা—

—শোন, কলকাতায় যখন পড়তে আসি আমি, পকেটে দুটো টাকাও ছিল না। মুখে রক্ত তুলে টিউশানি করেছি। আর আজ? গত তো গেল মাসে বিশ হাজার টাকা খরচ করে মেয়ের বিয়ে দিলাম। জামাই ইঞ্জিনিয়ার।—বিভূতিদা দম নেবার জন্যে একটু থামলেন: তাই কোন ইয়ং ম্যানের মুখে হতাশার কথা শুনলে হাসি পায়!

তুষারের কান্না পেল। গোটা দিনটাই আজ বৃথা গেল। টাকা পেলে হরিদাসবাবু, মদনের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে কতক্ষণ। তুষারও ধার করে, সময় মত শোধ দিতে পারে না ঠিকই, কিন্তু ভুলে তো যায় না।

পুকুরের মাঝখানে ঝপ করে অনেকখানি অন্ধকার নেমে পড়ল। দূরের মাঠে আলো নিভে আসছে। এই তো আর একটু বাদে বিভূতিদা সুতো গোটাতে গোটাতে বলে উঠবেন, নাহে, তোমার কপালটা দেখছি একেবারেই খারাপ।

এর মিনিট কুড়ি পরে সোনারপুর স্টেশনে তুষারের শরীরটা ফের কেঁপে উঠল। ডান পায়ের দু ইঞ্চি দূরে একটা জলজ্যান্ত সিকি পড়ে আছে। সিকিটা ওপর সন্তর্পণে পা তুলে দিতেই কাঁপুনি। তুষার জানে, সিকিটা জাব, একথা বললেই দশ জন ছুটে আসবে, আমার আমার—। আসলে এটা কোন অসতর্ক প্যাসেঞ্জারের। তিনি এখন ধরাছোঁয়ার বাইরে। তাহলে সিকিটা তুষারের নয় কেন? এখন মুশকিল দেখা দিল, কিভাবে পকেটে চালান করা যায়। যে ক'বারই চেষ্টা করতে গেল, মনে হল কেউ না কেউ দেখছে। ওপার থেকে সদ্য বিয়ে হওয়া বৌটি, কিম্বা চায়ের দোকানে বসে থাকা বুড়োটা কেন যেন এদিকেই তাকিয়ে আছে। তুষার ঘেমে উঠল। পায়ের তলায় সিকিটা কুটকুট কামড়াচ্ছে।

সুযোগ এল। কলকাতার ট্রেন এসে দাঁড়াতেই নিচু হয়ে সিকিটা তুলে নিয়েই হ্যান্ডেল ধরল তুষার।

চায়ের কাপটা এগিয়ে দিয়ে বেণু জিজ্ঞাসা করল, কিছু পেলে? হরিদাসবাবু আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে অনেক কথা বলেছে গো।

তুষারের মনে পড়ল সকালে টাকার ধান্ধার কথা শুনিয়েছিল বটে। বলল, তা পেয়েছি।

—সত্যি?—তুষারের মুখটা উজ্জ্বল হল: অন্তত এক মাসের জন্যে নিশ্চিন্ত। লোকের কথা আর [illegible] তা কত পোষাতে হচ্ছে না তো?

তুষার হাসল।

বেণু হাসির আড়ালে একটা পোকা কাটা তীর্ণ হাসি দেখতে পেল।

আজকের মেদিনীপুর

তরুণদেব ভট্টাচার্য

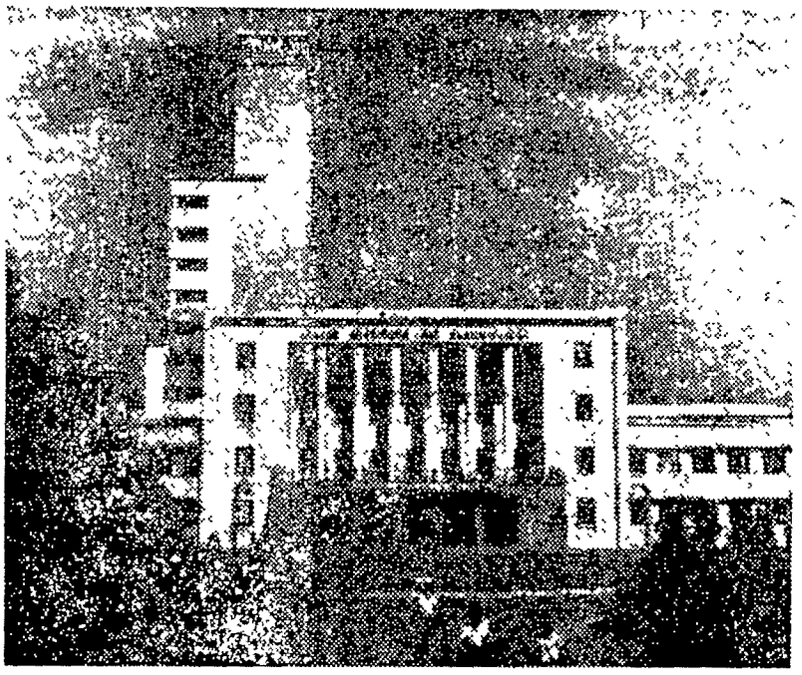

ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি

মীরকাশিম যখন বর্ধমান ও চট্টগ্রামের সাথে চাকলা মেদিনীপুর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে হস্তান্তরিত করেন, সে সময়টা ছিল ১৭৬০ সাল। জেলার বেশীর ভাগ অংশ ছিল তখন জঙ্গলে ঢাকা। পথঘাট যাতায়াতের ব্যবস্থা একেবারে যে ছিল না, তা নয়। তবে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল খুবই দুর্বল। সহরাঞ্চল একেবারে অনুপস্থিত। সমৃদ্ধ স্থান বলতে ছিল বড় বড় গ্রাম। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ছিল রাজা জমিদার ও তালুকদারদের ওপর। নিজের এলাকায় তারা ছিলেন সর্বেসর্বা। সামন্ত-তন্ত্রের নড়বড়ে কাঠামোটি তখনও পর্যন্ত বেশমতে টিকে ছিল।

প্রবল বিটিশ তরঙ্গ এ জেলার ওপর আছড়ে পড়লেই সামন্ততন্ত্রের নড়বড়ে কাঠামোটি তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়ে। এবং তখন থেকেই সূত্রপাত হয়েছিল আধুনিক মেদিনীপুরের সূত্রপাত। অবশ্য 'আধুনিক' এই কথাটি কোন কিছুই সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশ করে না। এখানে আধুনিক বলতে সহরে সুযোগ-সুবিধা কতখানি প্রসারিত হয়েছে, সেদিকেই ইঙ্গিত করেছে।

এ জেলার অঞ্চল ও এর লাগোয়া জঙ্গল মহালগুলির অধিপতি ছিলেন উপজাতি সর্দারেরা। কার্যত তারা ছিলেন স্বাধীন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে তারাই প্রথম রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে তাদের সঙ্গে বিটিশ রাজশক্তির যে পাল্লাকষা চলেছিল সে ইতিহাস এখনও পর্যন্ত উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে লিপিবদ্ধ হয়নি।

১৮০১ সালে ভারতের তখনকার গভর্ণর জেনারেল ওয়েলেসলী দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হবার উদ্দেশ্যে বড় বড় জেলার প্রধানদের কাছে চল্লিশটি প্রশ্ন করে পাঠান। মেদিনীপুর প্রশ্নমালার উত্তর দিয়েছিলেন এইচ স্টেরী। তৎকালীন জজ-ম্যাজিস্ট্রেট। ইংরেজ শাসনের গোড়ার দিকে জেলার অবস্থা কি ছিল উত্তরগুলি থেকে মোটামুটি তার আভাস পাওয়া যায়।

স্টেরী বলেছেন উনিশ শতকের গোড়ায় এ জেলায় জনসংখ্যা ছিল পনের লক্ষ। এর ছয়ভাগ হিন্দু, এক ভাগ মুসলমান। বেশীরভাগ মানুষ অল্পেতেই তুষ্ট। বছরে ছ মাস খেটে বায়তেরা একেবারে ষোল বিঘা জমি আবাদ করতে পারতেন। যে ফসল ফলত, খাজনা দিয়ে চার-পাঁচজনের সংসার সাদামাঠাভাবে বেশ চলে যেত। সৌধ বা ইমারত জেলায় তেমন কিছু ছিল না। টাকাকড়ি হলে লোকে পাকাবাড়ি বা মন্দির না বানিয়ে পুকুর কাটতেন। মনে করতেন পুণ্যের কাজ এটাই। জেলার নানা জায়গায় এ জন্যেই বড় বড় পুকুর দেখা যায়।

জনসংখ্যার চাপে জঙ্গল কেটে ক্রমশ আবাদ তৈরি হতে সুরু হয়েছিল। অত্যাচার জুলুম, নৃশংসতা এসব ছিল কম। ইংরেজ আমলে জাল জুয়াচুরির সংখ্যা বেড়েছিল। মদখাওয়া, বেশ্যাবৃত্তি আগে তত ছিল না, তবে এ সময় প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। জেলার বেশীরভাগ মানুষ আগেকার সরলতা ও নিষ্ঠা বজায় রাখার চেষ্টা করতেন। হিন্দু চরিত্রের বৈচিত্র্যই ছিল গুণগুলি। সব শ্রেণীর মানুষ ইংরেজদের বিশ্বাস করতেন। তবে এই অবিশ্বাস উচ্চ কণ্ঠে ব্যক্ত হয়ে বিদ্রোহের আকার ধারণ করত কদাচিৎ।

বর্তমান মেদিনীপুর পাঁচটি প্রশাসনিক মহকুমায় বিভক্ত। মেদিনীপুর সদর, তমলুক, কাঁথি, ঘাটাল ও ঝাড়গ্রাম। মেদিনীপুর সদর মহকুমা আয়তনে এত বড় যে তদারকির জন্য দুটি উপভাগে ভাগ করতে হয়েছে। সদর উত্তর মহকুমা ও সদর দক্ষিণ মহকুমা। দুটি মহকুমারই মহকুমা অফিস মেদিনীপুর সহরে অবস্থিত।

তমলুক মহকুমার এলাকাধীন অঞ্চলে গড়ে উঠেছে হলদিয়া সহর। এখানে প্রশাসনিক কাজকর্ম দেখাশুনার জন্য একজন অতিরিক্ত মহকুমা শাসকের পদ সৃষ্টি হয়েছে। তার অফিস হলদিয়াতেই। তমলুক, কাঁথি ও ঘাটাল মহকুমা তিনটির কাজকর্ম তদারকি করেন তমলুকের অতিরিক্ত জেলা শাসক। তার দপ্তর তমলুকে।

১৮৭২ সালে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাংলায় যে প্রথম লোকগণনা অনুষ্ঠিত হয়, সে রিপোর্টে দেখা যায় তখন মহকুমা ছিল চারটি। সদর, তমলুক, কাঁথি ও গড়বেতা।

ঘাটাল ও ঝাড়গ্রাম নামে কোন মহকুমা ছিল না। ঘাটাল ছিল গড়বেতা মহকুমায় ও ঝাড়গ্রাম থানা ছিল সদর মহকুমায়। সবটি মহকুমা মিলে থানা ছিল মোট পঁচিশটি। এখন উনচল্লিশটি। সমষ্টি উন্নয়ন সংস্থা বা ডেভলপমেণ্ট ব্লকের তখন অস্তিত্ব ছিল না। এখন ব্লকের সংখ্যা এ জেলায় বাহান্নটি। সহরাঞ্চল বলতে ছিল মেদিনীপুর, তমলুক, চন্দ্রকোণা ও ঘাটাল। বর্তমানে সহরাঞ্চলের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে উনিশটি। এদের ভেতর নটি মিউনিসিপ্যাল বা পৌর সহর। বাকি দশটি পৌর সহর নয়।

বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভের (১৭৬৫) পর সাত বছর ধরে কোম্পানী প্রশাসনিক ক্ষেত্রে চোখে পড়ার মত তেমন রদবদল করেন নি। প্রতি জেলায় একজনের বেশী ইউরোপীয় অফিসার দেওয়া তখন সম্ভব ছিল না। দরকারও ছিল না। ইউরোপীয় অফিসার শুধু কোম্পানীর অর্থনৈতিক স্বার্থ দেখতেন। মেদিনীপুরে জনসাধারণের কাছে তিনিই ছিলেন কোম্পানীর প্রতিনিধি। ফৌজদারী ও দেওয়ানি আদালতের কার্যকলাপ তদারকি করাও ছিল তার ক্ষমতার আওতাভুক্ত। তাকে বলা হত কমার্সিয়াল রেসিডেন্ট।

মাঝে কিছু কালের জন্য বর্ধমান প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিল থেকে সরাসরি পরিচালিত হতে থাকে এ জেলার প্রশাসন। ১৭৭০ সালে সৃষ্টি হয় কালেকটরের পদ। জন পিয়ার্স এ জেলার প্রথম কালেকটর। মেদিনীপুর ছাড়া জলেশ্বরও ছিল তার এলাকাধীন। কালেকটরের মূল কাজ ছিল রাজস্ব আদায়। পিয়ার্স সাহেবের মাস মাইনে যা বাপ ছিল না। বাবো শো সিক্কা টাকা ছিল মাসিক বেতন। বাড়ি ভাড়া পেতেন আরো তিন শ' সিক্কা টাকা। পরবর্তীকালে বর্ধমান প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিল উঠে যায়। এর সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত হয় কলকাতার কমিটি অব রেভেন্যুতে। এখন যার নাম বোর্ড অব রেভেন্যু।

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর, মেদিনীপুর সহর জেলার প্রধান সহর হিসাবে ঘোষিত হয়। জেলার প্রধান কার্যালয় সবই এখানে ছিল। হেড কোয়ার্টার্স হিসাবে ধীরে ধীরে এই সহরের রূপ পরিবর্তিত হতে থাকে। জনবসতিও বাড়তে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে আধুনিক মেদিনীপুর, জেলা ও সহর, গড়ে তুলেছিল ইংরাজেরা। বড় হলেও একথা সত্য। বড়বাজার নামে মেদিনীপুর সহরে ব্যবসাবাণিজ্যের যে বড় কেন্দ্র, সেটি সৃষ্টি হয়েছিল ১৭৬৩ সালে। বার্ডেট তখন রেসিডেন্ট। একটি দুর্গও সে সময় তৈরি হয়েছিল। ক' বছর পরে এক বেঙ্গল রেজিমেণ্ট সিপাহি বা সৈন্য এখানে মোতায়েন করা হয়। গড়ে ওঠে সিপাহি বাজার। ছোটবাজার যা বিবি বাজার নামেও পরিচিত, গড়ে উঠেছিল ১৭৬৩ সালে। গ্রাহাম ছিলেন রেসিডেন্ট। মিসেস গ্রাহামের প্রতি সৌজন্য প্রকাশের জন্য নাম করেছিল বিবি বাজার।

অ্যানসিটার্ট পত্তন করেছিলেন পরে গভর্নর (১৭৬৮) কর্নেলগোলা, করপোরাল বাজার, স্কবানিটোলা নামগুলিও ইংরেজ শাসনের স্মৃতিবহ। মেদিনীপুর সহরে মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হয় কোম্পানীর দেওয়ানি লাভের একশো বছর পরে। অবশ্য আইন-ই-আকবরীতে মেদিনীপুর সরকার জলেশ্বরের ভেতরে একটি বড় জায়গা বলে উল্লিখিত আছে। তখন এর চেহারা ছিল গল্পের মত।

মেদিনীপুর সহরটিকে এক কল্পিত রেখায় দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। পূর্ব ও পশ্চিম। দুই দিক মিলিয়ে মোট পৌর এলাকা সাড়ে দশ বর্গ কিলোমিটারের কাছাকাছি। লোকসংখ্যা চল্লিশ হাজারের কাছাকাছি। পশ্চিমে মাটির বড় ঢাল, প্রকৃতি পথুরে। ভূতাত্ত্বিকের ভাষায় ল্যাটেরাইট সয়েল। বড় বড় সরকারি অফিসগুলি প্রধানত এদিকেই। কালেকটরেট, জেল, হাসপাতাল, সার্কিট হাউস, ডাকবাংলো ইত্যাদি। রেল স্টেশন দক্ষিণ-পশ্চিমের প্রান্তসীমা। পূর্বদিকে ব্যবসা বাণিজ্যের বড় বড় কেন্দ্রগুলি ও মূল জনবসতি। এদিকটা ঘিঞ্জি বেশী। কুঁড়ে ও পাকা বাড়ি, সরু পথ ও গলি, কাঁচা নর্দমা পাশাপাশি। সহর পুরনো হলেও পুরনো বাড়ি, মন্দির বা উল্লেখযোগ্য সৌধ সহরে তেমন কিছু নেই। হাল আমলে তৈরি মীরবাজারে মল্লিকদের প্রাসাদটি সুন্দর। ভেতরে যে রাসমঞ্চ আছে সেখানে প্রতি বছর রাস উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। জোড়া মসজিদ বরং অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। চারশো বছর আগে এটি তৈরি হয়েছিল বলে প্রবাদ। আওরঙ্গজেব নাকি এখানে রাত্রি যাপন করেছিলেন। রাস উৎসবের সময় ভারতের নানা প্রান্ত থেকে মুসলমান ধর্মার্থীরা প্রতি বছর এখানে আসেন ও উৎসবে যোগ দেন। অধুনা বাংলাদেশ থেকে যেসব যাত্রীরা আসেন তাদের সংখ্যাও কম নয়।

জেলার নানা জায়গায় শিল্পাঞ্চল ও সহর গড়ে ওঠার ফলে জেলা সহর হিসাবে মেদিনীপুর ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। সহরের ফাঁকা জায়গাগুলি পাকা বাড়িতে ছেয়ে যাচ্ছে। এই প্রবণতা সব থেকে বেশী করে চোখে পড়ে পশ্চিম দিকে। স্টেশনের কাছাকাছি অঞ্চলে।

খড়গপুর এ জেলার ভেতর সবচেয়ে বড় সহর। ১৯৬১ সালের লোকগণনায় রাজ্য সরকার এটি নগর হিসাবে ঘোষণা করেন। মোট চারটি সহর নিয়ে এই নগরের ব্যাপ্তি। খড়গপুর রেলওয়ে সেটেলমেণ্ট, ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, খড়গপুর পৌর এলাকা ও পৌর এলাকার বহির্ভূত অঞ্চল। মোট এলাকা প্রায় সাড়ে তেত্রিশ বর্গ কিলোমিটার। লোক সংখ্যা এক লক্ষ একষট্টি হাজার। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে যখন বেঙ্গল নাগপুর রেলপথ চালু হয়, তখন থেকে। খড়গপুরের সহর হিসাবে গড়ে ওঠার সূত্রপাত। হলদিয়া যেমন এখন হলদিয়া যেমন এখন গ্রামীণ পটভূমির ওপর ধীরে ধীরে সহরের রূপ নিতে সুরু করেছে, খড়গপুরও তেমনি খুব খুব ছাসা ও গ্রামীণ পরিবেশে যাত্রা সুরু করেছিল। রুজি-রোজগারের তাগিদে ভারতের নানা রাজ্যের অধিবাসী এখানকার রেলওয়ে কারখানায় এসে ভিড় করেছেন। ফলে ভাষা ও রুচি, চাহিদা ও সংস্কৃতি, জীবনধারা ও বৈচিত্র্যে ভারতেরই একটি ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি এখানে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। জওহরলাল নেহরুর ভাষায় যাকে বলা চলে 'মিনিয়েচার ইণ্ডিয়া'।

স্বাধীনতার পরে উচ্চতর কারিগরী শিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠানটি এখানে স্থাপিত হয়েছিল। তাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল একটি উপসহর। বহুতর দুটি প্রতিষ্ঠান ও যোগাযোগ ব্যবস্থা আনুকূল্যের জনবসতি ক্রমশ ঘন হয়ে উঠছে। দশ বছর আগেও খড়গপুরের যে ছাড়া ছাড়া পরিচ্ছন্নতার ছিল, এখন তা অনেকখানি বিলুপ্ত। রেলওয়ে সেটেলমেণ্ট চারপাশে জনবসতির চাপে

দন্দী হয়ে পড়েছে। গা ঝাড়া দিয়ে বেড়ে ওঠার জায়গা নেই বললেই চলে। ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির উপসহরটি সুপরিকল্পিত। রাস্তা চওড়া, জল নিকাশের বন্দোবস্ত ভাল, এলোমেলোভাবে বাড়ি তোলার প্রচেষ্টা চোখে পড়ে কম।

রেলওয়ে কারখানার কর্মীদের অনেকেই অবসর নেবার পর খড়গপুরেই বাড়ি তুলে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে চান। সাধারণত তারা বেছে নেন। পৌর এলাকার দিকটা। পৌর সহরের রাস্তাঘাট, জল নিকাশের ব্যবস্থা সন্তোষজনক নয়। বর্ষার সময় চরম দুর্ভোগের সৃষ্টি হয়। সম্প্রতি পৌর সংস্থা মাস্টার প্ল্যান বা বড় পরিকল্পনার মাধ্যমে পৌর সহরটি ঢেলে সাজাবার কথা ভাবছেন।

বম্বে হাইওয়ে তৈরি হবার পর খড়গপুরের গুরুত্ব আরো বেড়েছে। হাইওয়ে বা জাতীয় সড়কের দুপাশে, খড়গপুরের কাছাকাছি নিমপুরায় একটি শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে। ইতিমধ্যেই দুটি মাঝারি আকারের শিল্পসংস্থা, স্কুটার কারখানা ও ডেভী এ্যাশমোর ইণ্ডিয়া প্রাঃ লিঃ স্থাপিত হয়েছে। এই শিল্পাঞ্চলের পরিকল্পনা ও বিন্যাসের দায়িত্ব ওয়েস্ট বেঙ্গল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের। আরও কয়েকটি ছোট-বড় শিল্প সংস্থা এখানে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে আগ্রহী। শিল্পাঞ্চলটি পূর্ণাঙ্গ রূপ গ্রহণ করলে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে খড়গপুর হবে দ্বিতীয় কলকাতা।

কংসাবতীর ওপর সেতুটি চালু হবার পর মেদিনীপুর ও খড়গপুর শহর দুটির ভেতর ঘনিষ্ঠ হয়েছে যোগাযোগ। কলকাতার সাথে যোগাযোগও সহজতর হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে খড়গপুর-মেদিনীপুর এই দুই সহর হায়দ্রাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদের মত দুটি যমজ শহরে পরিণত হবে বলে আশা করা যায়।

সদর দক্ষিণ মহকুমার এস ডি ও অফিস মেদিনীপুর থেকে উঠিয়ে খড়গপুরে স্থাপিত করার প্রস্তাব দীর্ঘকাল ধরে বিবেচিত হয়ে আসছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। প্রশাসনিক প্রয়োজনে এই স্থানান্তর এখন জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে।

মেদিনীপুর সহর থেকে বত্রিশ মাইল উত্তরে গড়বেতা। সদর উত্তর মহকুমার একটি পুরনো সহর। উনিশ শতকের মাঝামাঝি যখন গড়বেতা মহকুমার সৃষ্টি হয়েছিল তখন থানার সংখ্যা ছিল ৩টি। গড়বেতা, চন্দ্রকোণা ও ঘাটাল। মহকুমার সদর কার্যালয় গড়বেতাতেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রাচীন বগড়ী রাজাদের রাজধানী এই স্থানটি ছিল জেলার ভেতর স্বল্পসংখ্যক স্থানগুলির অন্যতম। দুর্গের ধ্বংসাবশেষ, মন্দির ও বড় বড় পুকুরগুলি তখনকার প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা এখনও স্মরণ করিয়ে দেয়। সর্বমঙ্গলার মন্দিরটি গঠনশৈলী ও প্রাচীনত্বের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। রাজা গজপতি

এক সময় ওয়ারেন হেস্টিংসের সাময়িক বাসভবন। এখন জেলা শাসকের বাসভবন।

সিংহ এটি তৈরি করেছিলেন বলে জনশ্রুতি। কংসেশ্বর বা কামেশ্বর শিবের মন্দিরটিও কম উল্লেখযোগ্য নয়। রাধাবল্লভের মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল ১৬৯৭ সালে। দুর্জন সিংহমল্লের রাজত্বকালে। শহর হিসেবে গড়বেতা বর্ধিষ্ণু। জনসংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এখনও পর্যন্ত এখানে পৌর সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

গড়বেতা রেল স্টেশন ঘিরে যে জনবসতি সে অঞ্চলের চেহারা নিয়েছে তার নাম আমগোড়া। গড়বেতা সহর এখান থেকে চার মাইল। কাছাকাছি অঞ্চলগুলি আলু ও ধান উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। আগে থেকেই কৃষিজাত দ্রব্য বেচা-কেনার এখানে একটি বড় কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। বিদ্যুৎ সত্বর হে প্রসারিত হবার পর অনেকগুলি কোল্ড স্টোরেজ বা হিমঘর এখানে স্থাপিত হয়েছিল। রাইস মিলও ছিল কয়েকটি সম্প্রতি ছোট আকারের একটি তেল কল ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সব মিলিয়ে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার আনুকূল্যে অঞ্চলটি জমজমাট হয়ে উঠেছে। শহরাঞ্চলের মোট এলাকা ১০-৭০ বর্গকিলোমিটার। অবস্থিতি সদর উত্তর মহকুমার গড়বেতা থানার ভেতরেই।

সদর উত্তর মহকুমার অন্তর্গত আর একটি সুপ্রতিষ্ঠিত শহর বালিচক। কয়েকবছর এটি ছিল থানা চন্দ্রের বড় আড়ত ও বন্দর। একদিকে বালিচক রেল স্টেশন অন্যদিকে বম্বে হাইওয়ে বা জাতীয় সড়ক। মাঝামাঝি একটা ৩-৬৬ বর্গকিলোমিটার জুড়ে এই সহরের বিস্তার। এখানে চালকলও আছে কয়েকটি। ভেবেরা থানার ভেতরেই বালিচক সহরের অবস্থিতি।

মেদিনীপুর জেলার পৌর সহরগুলির ভেতর তমলুক প্রাচীনতম। আগেই তমলুক মহকুমার সৃষ্টি হয়েছিল ১৭৬৯ তখন থানা ছিল ৫টি। তমলুক, পাঁশকুড়া, মহিষাদল, সুতাহাটা ও নন্দীগ্রাম। বর্তমানে থানার সংখ্যা ৮টি। মসলন্দ নামে যে মাদুরের জন্য মেদিনীপুর বিখ্যাত ছিল, তা তৈরি হত বেশীর ভাগ মসলন্দপুরে। এখন মসলন্দপুরের নামে কোন থানা নেই। মহিষাদল থানার ভেতর একটি গ্রাম মাত্র। এই মহকুমার ভেতরেই হলদিয়া নগরী গড়ে উঠেছে। মহকুমার জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান।

তমলুক সহরেই তমলুক মহকুমার সদর কার্যালয় অবস্থিত। তাছাড়া মহকুমা সহরের প্রয়োজনীয় অফিসগুলি, থানা, ফৌজদারি ও দেওয়ানি আদালত, পোষ্ট অফিস, জেল, ব্যাংক, হাসপাতাল সবই এখানে আছে। এই শহরে বর্গভীমার মন্দিরটি উল্লেখ্য। যেমন প্রাচীন তেমনি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। স্বভাবতই প্রাচীন শহরগুলির মত তমলুকও সুপরিকল্পিত সহর নয়। রাস্তা সরু, বাড়িগুলির গঠন বিন্যাস এলোমেলো, ঘিঞ্জি। ১৫ বছর আগে তমলুক মহকুমায় শহরাঞ্চল বলতে ছিল তমলুক সহর। এখন আরও ৩টি সহরাঞ্চল গড়ে উঠেছে। মহিষাদল, কোলাঘাট ও হলদিয়া।

মহিষাদল এস্টেট ছিল এক সময় এ জেলার বড় বড় এস্টেটগুলির অন্যতম। শাহ সুজার বদান্যতায় খতিয়ানে এটি ছিল সরকার মালখিটার অন্তর্ভুক্ত। মুর্শিদকুলি খাঁর সময় এটিকে তমলুক জমিদারীর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। উপাধ্যায় উপাধিধারী সাবেদীয় ব্রাহ্মণেরা দীর্ঘকাল এখানকার জমিদার ছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় বাণী জানকীর সাথে চুক্তিবদ্ধ কোম্পানীর। স্বাধীনতার পর থেকে দল সহরের রূপ নিতে শুরু করে জনবসতি হয়ে উঠেছিল ঘন। এখন সহরাঞ্চলে পরিণত। জনসংখ্যা ১০ হাজারের কাছাকাছি।

কিছু দিন আগেও ছিল খোলা মাঠ, মাথার ওপরে নীল আকাশ, পাশে রূপনারায়ণ নদী। সামনে জাতীয় সড়ক বম্বে

আধুনিক মেদিনীপুরের যোগাযোগ ব্যবস্থার হৃদপিণ্ড কেন্দ্রীয় বাসস্ট্যান্ড। মেদিনীপুর শহর।

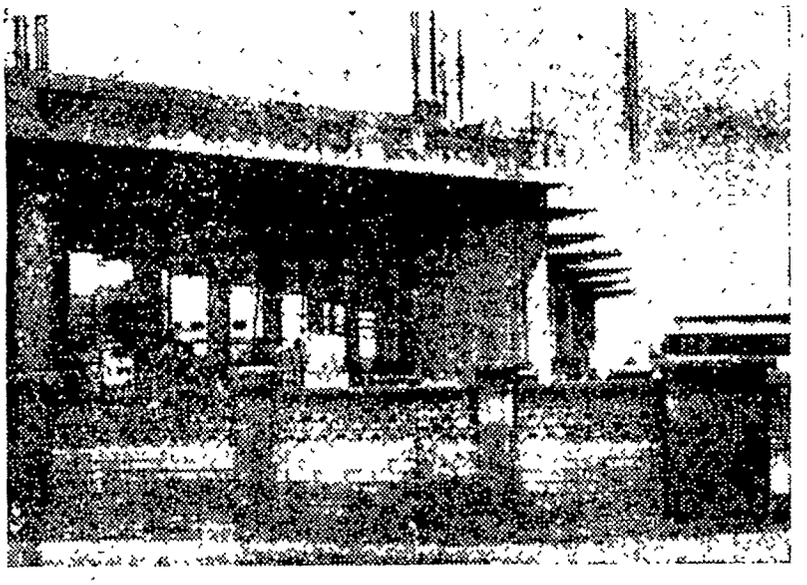

হাইওয়ে শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠার পক্ষে আদর্শ। শিল্পাঞ্চল গড়ে না উঠলেও যা গড়ে উঠছে শিল্প সংস্থাগুলির তা মেরুদণ্ড। কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র শুধু এই জেলা নয়, পশ্চিম বাংলার আর্থিক কাঠামো বিন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। প্রকল্প অনুযায়ী এখানে তিনটি দশো মেগাওয়াটের তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র বসান হবে। মোট খরচ আনুমানিক একশো সাড়ে পনের কোটি টাকা। প্রায় এক হাজার একর জমির ওপর এই প্রকল্পের একদিকে থাকবে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, কর্মীদের বসবাসের জন্য উপনগরী অন্য দিকে ছাই ফেলার জন্য বিস্তীর্ণ অঞ্চল। প্রতি দিন কয়লা পুড়িয়ে যে ছাই ভস্ম হবে পরিমাণে তা সামান্য নয়। প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। উপশহরও গড়ে উঠেছে আংশিকভাবে। এই শহরাঞ্চলের বয়স একেবারে কাঁচা। তবু জনসংখ্যা চোদ্দ হাজারের কাছাকাছি।

হলদিয়া শুধু মেদিনীপুর নয় পশ্চিম বাংলা তথা ভারতেরও ভবিষ্যৎ। পোর্ট টাউন, দুর্গাচক ও হলদি—তিনটি শহরের সমন্বয়ে গড়ে উঠছে হলদিয়া নগরী। আধুনিক নগরীর সংজ্ঞানুযায়ী পূর্ব পরিকল্পিত, সর্বাধুনিক। এখনই এর লোকসংখ্যা ৬০ হাজারের ওপর। সহায়ক বন্দর, শিল্পাঞ্চল ও পরিকল্পিত শহরাঞ্চল নিয়ে হলদিয়ার রূপায়ন।

মহকুমা হিসাবে তমলুক যেমন বর্ধিষ্ণু, ঘাটাল তেমনি ক্ষয়িষ্ণু। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে ঘাটাল মহকুমায় লোকসংখ্যা দ্রুত কমতে শুরু করেছিল। গত দশ বছরে এই ধাক্কা কিছুটা সামলে উঠলেও এখনও আগের অবস্থা ফিরে পেতে অনেক দেরী। জেলার ভেতর মহকুমাটি ক্ষুদ্রতম। যদিও জেলার ৯টি পৌর সহরের ভেতর ৫টিই এই মহকুমায় অবস্থিত। ১৮৫০ সালে সৃষ্টি হয়েছিল মহকুমার। তখন নাম ছিল গড়বেতা মহকুমা। সদর দপ্তরও ছিল গড়বেতায়। হুগলী জেলা থেকে চন্দ্রকোণা কেটে নিয়ে যখন এ জেলার সাথে জুড়ে দেওয়া হল তখন থেকেই ঘাটাল এই মহকুমার প্রধান শহর বলে গণ্য হয়। ঘাটাল ও কাছাকাছি অঞ্চলগুলি এক সময় সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। পলি গঠিত উর্বর মাটি চাষ-আবাদের পক্ষে অনুকূল তো ছিলই, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পেও উল্লেখযোগ্য ছিল জনপদগুলি। জনবসতিও ছিল ঘন ও ঐশ্বর্যশালী। পরবর্তী কালে জনসংখ্যার যে দ্রুত অবনতি ঘটে, ইংরেজরা প্রাকৃতিক দুর্দৈব ও মহামারীর প্রকোপ তার কারণ হিসাবে নির্দেশ করেছেন। এই যুক্তি কতখানি গ্রহণযোগ্য তা বিচার্য। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ আমলে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ওপর সুপরিকল্পিত আঘাতই এই বিপর্যয়ের কারণ বলে মনে হয়।

ঘাটাল মহকুমায় থানার সংখ্যা ৩টি। ঘাটাল, চন্দ্রকোণা ও দাসপুর। পৌর শহরগুলির ভেতর ঘাটাল ও চন্দ্রকোণা একই সময় পৌর সহর হিসাবে ঘোষিত হয় (১-৪-১৮৬৯)। ঘাটাল মহকুমার মহকুমা অফিস ঘাটাল সহরেই অবস্থিত। কাঁসা-পিতল, তসর, সুতী বস্ত্র ও মাটির পাত্র তৈরির জন্য এক সময় ঘাটাল সহর বিখ্যাত ছিল। নদীপথে কলকাতার সাথে যোগাযোগও ছিল নৌকা ও স্টীমারে। রূপনারায়ণের ওপর রাণীচক থেকেই ছাড়ত এই সব জলযান। বর্ষার সময় ঘাটাল থেকেই চলাচল করত ছোট ছোট স্টীমার। প্রকৃতপক্ষে ঘাটাল ও আরামবাগ মহকুমার প্রধান বন্দর ছিল ঘাটাল সহর। ঘাঁটি (চৌকি বা আউটপোস্ট) ও আল কথা দুটি থেকেই সম্ভবত ঘাটাল শব্দের উৎপত্তি। শোভাসিংহের সময় অর্থাৎ সতেরো শতকের শেষ দিকে এই স্থানের অভ্যুদয় বলে অনেক মনে করেন। বিশ শতকের শুরু থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত কম-বেশী লোকসংখ্যা ছিল মোটামুটি স্থিতিশীল। এর পর থেকে দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে।

চন্দ্রকোণা প্রাচীন সহর। সহরের নানা জায়গায় ছড়ান পুরনো সৌধ ও গড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখলে একথা আর আলাদা করে বলে দিতে হয় না। ব্যবসা-বাণিজ্যের বড় কেন্দ্র হিসাবে বাজারও ছিল অনেক। যেমন ভায়েরবাজার, খিড়কিবাজার, বড়বাজার, নতুনবাজার, সমাধি বাজার ইত্যাদি এদের অনেকগুলি এখন বিলুপ্ত শুধু নামগুলিই প্রাচীন সমৃদ্ধির স্মৃতি টেনে চলেছে। চন্দ্রকোণা নিয়ে পুরনো প্রবাদটি : 'যাহান বাজার তিপান্ন গলি। তবে জানবি চন্দ্রকোণা এলি'—এখন কথার কথা। পৌর শহরের এলাকা বেশ বড়। প্রায় সাড়ে ১৬ বর্গকিলোমিটার। এখানকার মাটি বাড়ি তৈরির পক্ষে খুবই উপযোগী। বড় বড় দোতলা বাড়ি বা কুঠিবাড়ি এই মাটিতে সহজেই তৈরি করা যায়। এ ধরনের বহু বাড়ি চোখে পড়ে এই শহরে।

সতেরো শতকের দ্বিতীয় ভাগে চন্দ্রকোণা ছিল বর্ধিষ্ণু অঞ্চল। বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল সুতী বস্ত্র ও চিনি তৈরির জন্য। বিলিতি কাপড় আমদানীর ফলে বস্ত্রশিল্প যেমন প্রায় উঠে যেতে বসে লোকসংখ্যাও তেমনি কমতে থাকে ধীরে ধীরে। বিশ শতকের গোড়ায় সহরের জনসংখ্যা যা ছিল কমতে কমতে প্রায় আধা-আধি হয়ে আসে ১৯৫১ সালে। ষাটের দশক থেকে আবার বাড়তে শুরু করেছে লোকসংখ্যা।

চন্দ্রকোণার পুরনো নাম ছিল মালা। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর উপকথায় দেখা যায় ধনপতি সদাগর

★ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল ★

তারাশঙ্কর নাট্য-সমগ্র দুই খণ্ডে প্রকাশিত হবে

সাধারণ মূল্য : পঞ্চাশ টাকা
গ্রাহক মূল্য : বত্রিশ টাকা
৮ টাকা বা এককালীন তিরিশ টাকা দিয়ে গ্রাহক হওয়া যায়।

আচার্য ক্ষেমেন্দ্র রচিত
রায় শরৎচন্দ্র দাস বাহাদুর অনূদিত
বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা দুই খণ্ডে প্রকাশিত হবে

ডঃ বিষ্ণু বসু সম্পাদিত
সাধারণ মূল্য চল্লিশ টাকা
গ্রাহক মূল্য : তিরিশ টাকা
দশ টাকা দিয়ে গ্রাহক হওয়া যায়।

লি পি কা ॥ ৩০/১-এ কলেজ রো ॥ কলকাতা ৯

ছিলেন এখানকার রাজা। খয়রা মল্লকে পরাজিত করে চন্দ্রকেতু নামে এক রাজপুত এখানে কেতু বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। সময়টা পনের শতকের গোড়ার দিক। চন্দ্রকেতুর সময়েই চন্দ্রকোণা বিশিষ্ট শহর হিসাবে গড়ে ওঠে। এখনও যে সব সৌধ, মন্দির ও গড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় তাদের বেশীর ভাগই চন্দ্রকেতুর সময়ে তৈরি।

ঘাটাল মহকুমায় বাকী তিনটি পৌর শহর—রামজীবনপুর, খড়ার ও ক্ষীরপাই। চন্দ্রকোণা থেকে নয় মাইল উত্তর-পূর্বে বর্ধমান-উড়িষ্যা রাস্তার ওপরেই অবস্থিত রামজীবনপুর। এটিও প্রাচীন শহর। সম্ভবত ভানবজা হরিনারায়ণের দেওয়ান রামজীবন মুখোপাধ্যায়ের নামে এই শহরের নামকরণ হয়েছিল। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য এই সহরটিও এক সময় বিখ্যাত ছিল। ফলে বিশ শতকে এখানকার জনসংখ্যাও হ্রাস পায়। রামজীবনপুর শহরটি চন্দ্রকোণা থানার অন্তর্গত।

খড়ার পৌরসভার সৃষ্টি হয় ১৮৮৮ সালে। ঘাটাল থানার অন্তর্গত খড়ার সহরের দূরত্ব ঘাটাল টাউন থেকে ৬ মাইল উত্তরে। চন্দ্রকোণার মত খড়ারের লোকসংখ্যাও যথেষ্ট কমে গিয়েছিল, এখন আবার বৃদ্ধির দিকে। কাঁসা-পিতল শিল্পের অবনতিই জনসংখ্যা হ্রাসের অন্যতম কারণ বলে মনে হয়।

চন্দ্রকোণা থানার অন্তর্গত ক্ষীরপাই এক সময় সমৃদ্ধ শহর ছিল। রেশম সুতী কাপড় বস্ত্রশিল্প ছিল এখানকার প্রধান শিল্প। আঠারো শতকে ইংরেজ ও ফরাসীদের রেশম ও সুতীবস্ত্র তৈরির কুঠি বা ফ্যাকটরীও ছিল এখানে। ওলন্দাজের এখান থেকে মাল কিনতেন। ফলে তৈরি বিলিতি কাপড়ের চাপে যখন থেকে দিশী কাপড় কোণঠাসা হয়ে পড়ে, এই সহরের সমৃদ্ধিও অবলুপ্ত হতে থাকে তখন থেকে। পুরনো বর্ধমান-উড়িষ্যা সড়কটি এই শহরের ভেতর দিয়েই চলে গেছে।

এ জেলার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল জুড়ে কাঁথি মহকুমা। রসুলপুর নদীর উপকূল বরাবর সীমানা অনেকখানি। বাকী অংশ হলদী ও রসুলপুর নদী দুটির অববাহিকা। এখানকার জমি উর্বর কিন্তু নিচু। ফলে বর্ষাকালে অনেক জায়গা জলে ডুবে থাকে। মহকুমার অন্যান্য অঞ্চলের প্রাকৃতিক চেহারার সঙ্গে তুলনা করলে এখানকার সমুদ্রের কাছাকাছি বালিয়াড়ি বৈচিত্র্যময়। সমুদ্রের কাছাকাছি স্থানগুলিও স্বাস্থ্যকর। প্রাকৃতিক পরিবেশ সুন্দর। এদের ভেতর কাঁথি থানার অন্তর্গত দুনোট, দোলতপুর ও দাঁতিপুর এবং রূপনগর থানার চাঁদপুর, রামকুল ও দীঘা উল্লেখযোগ্য। বীরকুলের নামডাক ছিল আগে থেকেই। ওয়ারেন হেস্টিংস যখন বাংলার গভর্নর, সমুদ্রের কাছে মনোরম এই জায়গাটিতে গরমের ছুটি কাটাতে আসতেন। দীঘার নাম হয়েছে সম্প্রতি। ১৯২৩ সালে এক ইংরেজ ব্যবসায়ী পুরনো কাগজ ঘাঁটতে গিয়ে দীঘা আবিষ্কার করেন। লেখালেখিও করেন বিস্তর যাতে স্থানটির উন্নতি হয়। কিন্তু সে উদ্যম ফলপ্রসূ হয় নি। পরে (১৯৩৪ মেদিনীপুরের জেলা শাসকও এর উন্নতির জন্য সচেষ্ট হন। নিষ্ফল হয় সে চেষ্টা। হলদিয়ার মত দীঘার রূপায়ণের জন্য প্রথম সার্থক উদ্যোগ নেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। পশ্চিম বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। দেখতে দেখতে দীঘা একটি জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। পরিকল্পনার মাধ্যমে একে আরও সুন্দর ও জনপ্রিয় করে তোলার উদ্যোগ চলছে। অদূর ভবিষ্যতে হয়ত দীঘা কাঁথি মহকুমার দ্বিতীয় শহরাঞ্চলে পরিণত হবে।

কাঁথি মহকুমায় থানার সংখ্যা ৭টি। ১৮৫২ সালে জানুয়ারী মাসের প্রথম দিনটিতে যখন কাঁথি মহকুমার সৃষ্টি হয় তখন এই মহকুমায় শহরাঞ্চল বলতে কিছু ছিল না। এমন কি মহকুমার হেড কোয়ার্টার্স কাঁথিও ছিল একটি বড় গ্রাম। আগে থেকেই সল্ট এজেন্সীর সদর দপ্তর ছিল এখানে। এখন যেটি এস ডি ও অফিস সেটিই ছিল বিজলী ডিভিসনের লবণ দপ্তরের কার্যকেন্দ্র।

ইউরোপীয় বণিকদের আনাগোনায় কাঁথি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। রসুলপুরের উপকূলবর্তী তিনটি বড় বন্দর, বালেশ্বর, পিপলি ও হিজলীর সাথে যোগাযোগ রাখা এখান থেকে ছিল সুবিধাজনক। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি অনুমান করেছেন, কাঁথির কাছে বালিয়াড়ি বা বালির কাঁথ আছে বলে এই স্থানের নাম হয়েছে কাঁথি। পৌর সহর হিসাবে কাঁথি স্বীকৃত হয়েছে স্বাধীনতার পরে (১৯৫৮)। জনসংখ্যার দিক থেকে কাঁথি সহর বর্ধিষ্ণু। মহকুমার ভেতর এটিই একমাত্র শহরাঞ্চল।

ঝাড়গ্রাম মহকুমার সৃষ্টি হয় ১৯২২ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারি। আগে ঝাড়গ্রাম ছিল সদর মহকুমার একটি থানা মাত্র। ঝাড়গ্রাম, গোপীবল্লভপুর ও বিনপুর নিয়ে যখন ঝাড়গ্রাম মহকুমা গঠিত হয়, মহকুমা হেড কোয়ার্টার্সও তখন সহরাঞ্চল ছিল না। ১৯৫১ সালে ঝাড়গ্রাম সহর হিসাবে স্বীকৃত হয়। এখন মহকুমায় থানার সংখ্যা ছটি। আগেকার তিনটি থানার সঙ্গে আরও তিনটি থানা যুক্ত হয়েছে। সাঁকরাইল, নয়াগ্রাম ও জামবনী। এই মহকুমার বেশীর ভাগ অংশই জঙ্গলাকীর্ণ। আদিবাসী, উপজাতি ও তপশীলভুক্ত লোকসংখ্যাও এখানে বেশী। পথঘাট যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত। জেলার পূর্বাঞ্চলের তুলনায় এখানকার প্রকৃতি, জল-হাওয়া, মাটি, অধিবাসী ও অধিবাসীদের জীবনধারা সবই আলাদা। উঁচু-নিচু জমি, শাল সেগুন পিয়াশাল ও কেন্দ গাছে ছাওয়া জঙ্গল। মাটি শক্ত, পাথুরে। রঙ লাল বা গেরুয়া। রুক্ষ পরিবর্তনের জন্য নানা জায়গায় মানুষ এখানকার স্বাস্থ্যকর স্থানগুলিতে আসেন। যেমন ঝাড়গ্রাম, গিধনি দাঁইজুড়ি ইত্যাদি।

অনুন্নত ঝাড়গ্রাম মহকুমার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য একটি পর্ষদ গঠিত হয়েছে সম্প্রতি। ব্যাপক পরিকল্পনার মাধ্যমে মহকুমার আভ্যন্তরীণ সম্পদের বিনিয়োগ শিল্পসংস্থা স্থাপন ও ঝাড়গ্রাম শহরাঞ্চলের সুষ্ঠু রূপায়ণ এই পর্ষদের মূল কাজ।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মেদিনীপুর জেলার পাঁচটি মহকুমার ভেতর সদর ও তমলুক মহকুমার আধুনিক রূপায়ণ পরিকল্পিতভাবে ও প্রাকৃতিক তাগিদে ঘটে চলেছে। একদা সমৃদ্ধ অঞ্চল ঘাটাল মহকুমা লুপ্ত গৌরব ও ক্ষয়িষ্ণু। অনুন্নত মহকুমা ঝাড়গ্রাম আধুনিক সাজসজ্জায় সজ্জিত হয়ে কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছে। কাঁথি মহকুমা এখনও গ্রাম্য বধূর মত লজ্জাশীলা, সামনে বিস্তীর্ণ সমুদ্র কোলে নিয়ে দিন গুনছে ভবিষ্যতের সম্ভাবনায়।

গ্রাম ঢেলে সাজাবার উদ্যোগে এ জেলার প্রচেষ্টা তুচ্ছ করার মত নয়। জেলার অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্য যা এতদিন উপেক্ষিত ছিল, এই উদ্যোগের মাধ্যমে ক্রমশঃ পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। ১৯০১ সালে শহরের সংখ্যা ছিল সাতটি, এখন হয়েছে উনিশটি। জেলার মোট আয়তন এখন ১৩,৭২৪ বর্গ-কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ৫৫,০৯,২৪৭।

খড়্গপুর-নিমপুরা, হলদিয়া ও কেন্দ ঘাট মেদিনীপুর জেলার তিন প্রতিভাধর শিশুর সন্তান। যৌবনে যাদের কর্মকাণ্ড জেলার গণ্ডী ছাড়িয়ে ভারতের নানা দিকে ছড়িয়ে পড়বে। এই জেলারই প্রাচীন সমৃদ্ধ বন্দর ও সহর। তাম্রলিপ্তের স্মৃতি তখন নতুন করে জেগে উঠবে।

সমালোচনা

নানা বৈচিত্র্য নানা অভিজ্ঞতা

লিখেছেন শিশিরকুমার দাস

ফাদার দাতিয়েন তাঁর সুন্দর, সুমিত ও পরিচ্ছন্ন গদ্য রচনার জন্য বাঙালী পাঠকের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছেন। তাঁর ডায়েরীর ছেঁড়াপাতায় অনাবিল সাবল্য, তাঁর বাক্য নির্মাণের সহজ স্বাচ্ছন্দ্য, বাংলা গদ্যের ছন্দে তাঁর নিপুণ অধিকার আমাদের মুগ্ধ করেছিল। বাংলা গদ্যের এমন কুশলী ব্যবহার এর আগে আর কেন বিদেশী করেননি। আধুনিক বাংলাগদ্যের অপরিমিত প্রগলভতা এবং অনেক ক্ষেত্রে ভঙ্গীসর্বস্বতার মধ্যে ফাদার দাতিয়েনের নিবন্ধ ও পরিমিতি বাক্যগুলি এক নতুন বাকৃতিত্ব নিয়ে দেখা দিয়েছিল। সেই ফাদার দাতিয়েন বর্তমান গ্রন্থের—বাংলা গদ্যের সংকলনের সংকলয়িতা।

আমাদের দেশে যে কোন সংকলন গ্রন্থের প্রথমেই থাকে দীর্ঘ ভূমিকা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই ভূমিকাগুলি নানা গবেষণা এবং পরিচিত তথ্যের পুনরাবৃত্তি এবং অনেক ক্ষেত্রে সংকলিত রচনার রসবিচারের ব্যর্থ প্রচেষ্টা। ফলে সেই ভূমিকাগুলি প্রায়ই সংকলন গ্রন্থগুলির অপ্রয়োজনীয় ভার। ফাদার দাতিয়েন কোন ভূমিকা লেখেননি এমনকি উদ্ধৃতিগুলির রসবিচারে বিরত থেকেছেন। সংকলয়িতার নিবেদনে তিনি বলেছেন,—গদ্যসংকলনের— বাংলা গদ্যের উৎকৃষ্ট সংকলনের—অভাব নেই : ধর্ম-বচনার, ব্যঙ্গরচনার, আলোচনা সাহিত্যের একাধিক সংকলনে বাংলা গদ্যের বিশ্রুত মহাসারথিদের সর্বাঙ্গ সুন্দর পরিচয় পাই; উপেক্ষিত সহিসদের কোনো হদিশ কোথাও মেলে না। গদ্য পরম্পরার উদ্দেশ্য অধিকতর সামগ্রিক আর— ফলত— অপেক্ষাকৃত সীমিতও : এতে সংকলিত হয়েছে ৪৮৫ জন খ্যাত-অখ্যাত পরলোকগত লেখকের রচনাবলীর এক ক্ষুদ্র পৃষ্ঠা। এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মধ্যে ফাদার দাতিয়েন তাঁর সংকলনের উদ্দেশ্য, প্রকৃতি এবং কিছুপরিমাণে সংকলনের গঠন ও পদ্ধতির পরিচয় দিয়েছেন। কোনো সংকলনই সমস্ত পাঠককে সন্তুষ্ট করতে সমর্থ নয়। বর্তমান সংকলনটিও যে সকলের রুচি অনুসারী হবে এমন আশা করি না। সংকলন গ্রন্থগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংকলকের ব্যক্তিগত রুচি ও অভিপ্রায়ের প্রতিফলন। সেজন্য সংকলন বিচারও কঠিন। বাংলাগদ্য সম্বন্ধে বা তার পরম্পরা সম্বন্ধে পাঠকদের নিজস্ব ধারণা থাকাই স্বাভাবিক এবং সেই অনুসারে তাঁদের প্রত্যাশাও বিচিত্র ও বিভিন্ন। ফাদার দাতিয়েন খ্যাত-অখ্যাত লেখক নির্বিশেষে প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন একটি পৃষ্ঠা। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ এবং অবিনাশচন্দ্র দাস বা জ্ঞানেন্দ্রচরণ ঘোষ প্রত্যেকের জন্য সংকলনের স্থান সমানভাবে বণ্টন করা হয়েছে। এই সমবণ্টন নীতি অনেক পাঠকেরই আপত্তি

তুলবে। যাঁরা বাংলাগদ্যকে বৈচিত্র্য দিয়েছেন, বিভিন্নমুখী করেছেন, তার ভাব ও অভিজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষমতাকে বিপুলভাবে প্রসারিত করেছেন, যাঁরা নানা রীতি, নানা প্রকরণভঙ্গী নিয়ে পরীক্ষা করেছেন যাঁরা বাংলা গদ্যের একটি শিল্পরূপ সৃষ্টি করেছেন, সমতা এনেছেন, তাঁরা এবং যাঁর প্রচলিত রীতির অনুবর্তন করেছেন, প্রতিষ্ঠিত লেখককে অনুকরণ করেছেন, যাঁরা গদ্য লিখেছেন কিন্তু গদ্যের বিকাশে কোন সচেতন অংশ নেননি, তাঁর স্বভাবতই এক মানদণ্ডে বিচার্য নন। অতএব এই সমবণ্টন নীতিতে কোন লেখকের প্রতিই সুবিচার হওয়া সম্ভব নয় এবং বাংলা গদ্যের বৈচিত্র্য ও বহুবিমুখতাও ধরা পড়েনা।

কঠোরভাবে স্থান-বণ্টনের সাম্যনীতির মধ্যে একটি যান্ত্রিকতা আছে। এই যান্ত্রিকতা গদ্যের পক্ষে অত্যন্ত বিরোধী। কবিতার ক্ষেত্রে দেখা যায় কবিরা অনেক ক্ষেত্রেই কতকগুলি কাঠামোর বন্ধনকে স্বেচ্ছায় মেনে নেন। কবিদের চতুষ্পদ চার লাইনে শেষ হয়, সনেট চোদ্দ লাইনে আবদ্ধ থাকে, কবিতার প্রত্যেকটি লাইনের মধ্যে মাত্রার সমতা দলের সংখ্যাগত ঐক্য থাকতে পারে। গদ্য এই সমস্ত বন্ধনকে অস্বীকার করে চলে। তার বাক্যের দৈর্ঘ্য সর্বত্র সমান নয়। কবি একটি প্রচলিত ও পরিচিত কিংবা উদ্ভাবিত কাঠামোর মধ্যে কবিতা লিখতে পারেন, একই কাঠামোর পুনরাবৃত্তি করতে পারেন। কেউ শতাধিক সনেট লিখেছেন, প্রত্যেকটিরই বাইরের গঠন এক। কেউ বহু ঘরোয়াই লিখছেন, প্রত্যেকটির বাইরের গঠন এক। কিন্তু আজ পর্যন্ত গদ্যে এই রকম গঠন কেউ অনুসরণ করেননি। প্রত্যেকটি রচনাতে একশ বাক্য থাকবে, কিংবা প্রত্যেকটি বাক্য সম-দীর্ঘ হবে, কিংবা প্রত্যেকটি [illegible] এই রকম যান্ত্রিক গঠন আজ পর্যন্ত কোন গদ্যলেখক অবলম্বন করেননি। গদ্যের চাল মুক্ত, শব্দসংখ্যা, বাক্যসংখ্যা কিংবা শব্দ-দৈর্ঘ্য ও বাক্যদৈর্ঘ্যের অসাম্যের মধ্য দিয়েই সৃষ্টি হয় গদ্যের নিজস্ব ছন্দ বা তার নিজস্ব প্রকৃতি। সেইজন্যই একটি গদ্যরচনাকে সমগ্রভাবে না দেখলে তার বৈশিষ্ট্যও ধরা পড়বে না। গদ্যের সংকলনে যদি রচনা বিশেষ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় তাতে গদ্যের কোন পরম্পরা ফুটে ওঠে এবং তাকে একটা সাহিত্যের গদ্যের ধারাবাহিকতার দলিল হিসেবেই বা কিভাবে গ্রহণ করা সম্ভব। এটি যদি কবিতার সংকলন হত প্রতি পৃষ্ঠায় স্থানসীমার মধ্যে একটি সম্পূর্ণ কবিতাকে দেখতে পেতাম এবং বাংলা কবিতার—বিশেষ আধুনিক বাংলা কবিতার —সংকলন হিসাবে তার মূল্য নির্ধারিত হত। কিন্তু বর্তমান সংকলন বাংলা গদ্যের উদ্ধৃতির সংকলন মাত্র : এতে একটিও অংশ নেই যার মধ্যে সম্পূর্ণতা আছে। গদ্য তো কতকগুলি বাক্যসমষ্টি মাত্র নয়। বাক্যগুলির গ্রন্থনের মধ্যে রীতি আছে। অনুচ্ছেদগুলি ভাব ও ন্যায়ের শৃংখলে চালিত। কিভাবে বাক্যের পর বাক্য মিলে, তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে অনুচ্ছেদ গড়ে তুলছে, একটি অনুচ্ছেদ কিভাবে আর একটি অনুচ্ছেদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে, এবং সমস্ত অনুচ্ছেদ কিভাবে একটি বক্তব্যকে একটি পরিণামে এগিয়ে দিচ্ছে—এই গঠনশৃংখলা, ভাবের ক্রম উন্মোচন, যুক্তির ধীরে ধীরে বিকাশ একটি গদ্য রচনাকে তার স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করে দেয়। গদ্যপরম্পরার প্রত্যেকটি উদ্ধৃতিই এক পৃষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার ফলে বাংলাগদ্যের সেই রূপটি পাঠকের চোখে ফুটে ওঠেনি।

আবার সংকলক ঠিক করেছেন যে এক লেখকের একাধিক উদ্ধৃতি থাকবে না। তার ফলে বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ কিংবা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি লেখকেরা যাঁরা বাংলা গদ্যের নানা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন তার পরিচয়ও পাওয়া যাবে না। এমনকি যদি কেউ আশা করেন এই গদ্যপরম্পরার মধ্যে বাংলার বিজ্ঞানের গদ্যরীতির পরম্পরাটি খুঁজে নেবেন, কিংবা ঐতিহাসিক গদ্যরীতির ধারার পরিচয় নেবেন তিনি হতাশ হবেন। অক্ষয়কুমার দত্তের কোন বৈজ্ঞানিক রচনা নেই আছে তাঁর স্বপ্নদর্শনের দুটি অনুচ্ছেদ। রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান বা দর্শন সম্বন্ধীয় রচনা নেই আছে তাঁর বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথার তিনটি অনুচ্ছেদ। যে অংশগুলি সংকলিত হয়েছে সেগুলি সুন্দর, তাতে কর, অনেকসময় অনবদ্য। কিন্তু কেন এক লেখকের একাধিক উদ্ধৃতি থাকবে না এ প্রশ্ন অনেক পাঠকের মনে উঠতে

কাধা। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অমিতাভ' গল্পের উদ্ধৃতির গদ্য সুন্দর, কিন্তু সংস্কৃত শব্দের যে দ্যুতিময় সমাহার, যে বর্ণালীভাষা, শব্দের যে ধ্বনিতরঙ্গ তাঁর গদ্যের প্রধান লক্ষণ তার পরিচয় অজ্ঞাত থাকবে। 'সন্ধ্যা ও প্রভাতের' রবীন্দ্রনাথকে স্বাগত জানিয়েও পাঠক সন্ধান করতে পারে ক্ষুধিত পাষাণের হিরণ স্বপ্ন কিংবা শেষের কবিতার চকিত উদ্ধত উজ্জ্বল প্রকাশ। বিষ-বৃক্ষের নগেন্দ্রের অন্তঃপুরের বর্ণনাকারী বঙ্কিমের পাশে কি সন্ধান পাব কমলা-কান্তের কাব্যসংগীতের কিংবা কৃষ্ণচরিত্রের সুধীর দীপ্তির? সীতার বনবাসের 'বিদ্যা-সাগরকে পাঠক পাবেন, পাবেন না আড়-ভোল্প-হইলর খুড়োর তীর্থ বাঙ্ক কিংবা সংস্কৃতভাষাভিমানশূন্য প্রাকৃত বাংলার আদিম শক্তি। এই গদ্য পরম্পরায় পাঠকের পদে পদে অতৃপ্তি, প্রাপ্ত পদ-ক্ষেপে হতাশা।

কিন্তু আগেই বলেছি কোন সংকলনই সমস্ত পাঠককে তৃপ্তি দিতে পারবে না যদি আমরা সংকলনের আংশিকতা মেনে নিই সেটা অবশ্যই কঠিন,—মনে করি এটি ৪৫জন খ্যাত-অখ্যাত পরলোকগত লেখকের রচনার এক এক পৃষ্ঠার উদ্ধৃতির সংকলন-মাত্র তাহলে পাঠক যে লাভবান হবেন না তা নয়। এর মধ্যে তিনি পাবেন নানা বিদেশীর বাংলা রচনার নমুনা, সংস্কৃত ফারসী ইংরেজি গ্রীক থেকে বাংলা অনুবাদের কিছু পরিচয়, এর মধ্যে পাবেন বিস্মৃত, প্রায় বিস্মৃত, অখ্যাত, অপরিচিত লেখকের রচনার অংশ। সংকলনের ঔদার্য যেমন অখ্যাত, অপরিচিত লেখকদের স্থান করে দিয়েছে এই সংকলনে, তেমনই সম্মান দিয়েছে অনেক লেখককে যাঁরা সচরাচর সাহিত্যের প্রাঙ্গণে অবহেলিত। বিখ্যাত দস্যু মোহনের স্রষ্টা শশধর দত্ত সম্ভবত এই প্রথম সংকলন-গ্রন্থে স্থান পেলেন। পৃষ্ঠা উল্টে যেতে যেতে পাঠকের চোখে পড়ে সত্যচরণ মিত্রের রচনা—শ্মশানের বর্ণনা—কেবল শ্মশান হরি-বোলের শব্দ, বাঁশ ফাটার শব্দ, মড়ার মাথা ফাটার শব্দ', তার পরের পৃষ্ঠায় শুনবেন অশ্বিনীকুমার দত্তের কণ্ঠস্বর 'সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় : কামদ্বারা কামদমন' আর তার পরেই শেখ আবদুর রহিমের শোকাবেগ রচনা 'মুহূর্তমধ্যে হজরতের স্বর্গারোহন সংবাদ আরবের সর্বত্র প্রচারিত হইল।' অবনীন্দ্রনাথ পাঠককে দেবেন রূপ কথার জগতের মত মোহময় ভাবনের ক্ষণিক দৃশ্য—'তাদের পাতাল কন্যার ছিল, পরণে ঘাঘরা ছিল, গোয়াল-ভরা গাই ছিল, চমৎকার বাছুর ছিল', তার পাশের পৃষ্ঠায় অতুল-কৃষ্ণ মিত্রের তাদের এনে ধরবেন ছবি—'দক্ষিণেশ্বরী প্রলাপ বকে ছোড়া কাঁথায় উপর থেকে উঠে বসে, আর ঘুরে পড়ে ভিরমী যায়।' শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কলিকাতার প্রথম পর্যের অতি বিখ্যাত শ্মশানের বাড়ির অভিজ্ঞতা—'হঠাৎ কে যেন পিছনে দাঁড়াইয়া আমার ডান কানের উপর নিঃশ্বাস ফেলিল' তার পাশেই কুলদারঞ্জনের সহাস্য কণ্ঠস্বর 'এক সময়ে কৃষ্ণ তাঁহার বাণী সত্য-ভামাকে লইয়া স্বর্গে ইন্দ্রের পুরীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন।' পৌরাণিক জগৎ মুহূর্তে হারিয়ে যায়, পরের পৃষ্ঠায় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের শুরু, কলেজ স্ট্রীটে একটি পুরনো ভাঙা বাড়ি ছিল, দীনু' প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ধমক 'বাঙালী ধর্মঘটের পথে যাইবে না কেন' ক্ষীণ হয়ে আসে বিনয়-কুমার সরকারের ফ্রান্সের গীর্জার বৈঠকী বর্ণনায়, কিন্তু বৈঠকী ভাব জমে ওঠার আগেই যোগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রশ্ন করেন 'কিসে আনন্দ যাহার সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন, আনন্দা-দ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যাদি, পাতার পর পাতা নানা বৈচিত্র্য নানা অভিজ্ঞতা, কিন্তু বড় ক্ষণস্থায়ের জন্য, কোথাও একটু বর্ণনা কোথাও একটা ঘটনা, কোথাও একটু উপদেশ, কোথাও তথ্যের প্রস্তুতি, কখনও বা একটির কিস্তি ঠিক মধ্যবর্তীস্থল—যেন বাংলা গদ্যরাত্রির চারি-দিকে অবগুণ্ঠন, মাঝে মধ্যে সেই অবগুণ্ঠন উড়ে যাচ্ছে হাওয়ায় আর হঠাৎ আমাদের চোখে পড়ছে সেই রাত্রির কোন একটি নদীর বাঁক কোন একটি গাছের ডাল কখনও একটি মানুষের মুখ কখন কারো কণ্ঠস্বর কিন্তু, তাদের দেখা হল না দেখতেই যবনিকা পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই অসংখ্য ছোট ছোট মুহূর্ত—এই যে চকিতপেক্ষণ—তাকেও তো আনন্দ আছে। যাদবকে ধন্যবাদ।

গদ্য পরম্পরা, যাদব রায়চৌধুরী, অনন্য প্রকাশন ৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলকাতা-১২, ১৯৭৭, পৃঃ ৪১৬, মূল্য ৩২-০০ টাকা।

স্বতন্ত্র মূল্য নেই

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা বিভাগের পাবলিশড, ৮ পাতার একটি পুস্তিকা থেকে কপি করেছেন অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের। '১৭৯৩ খৃস্টাব্দে দ্বিতীয় রেগুলেশনের সমকালীন বাংলা অনুবাদ এই পুস্তিকার বিষয়বস্তু' — এবং পুস্তিকাটি দ্বিতীয় রেগুলেশনের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদকের নাম জানা যায় নি এই আট পাতার বাংলা গদ্য পাঠ করলে পর বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কোন নতুন ধারণা সৃষ্টি হবে না। সমকক্ষে এডমন-স্টোন, ডানকন, ফরস্টার প্রভৃতি ইংরেজ রাজপুরুষের বিচক্ষণ আইনের অনুবাদ করেছিলেন এবং সেগুলি পুস্তক-কারে প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান অনু-বাদের ভাষা ও বচন রীতি সেই সব গ্রন্থের বচন রীতি থেকে পৃথক নয়। কাজেই বর্তমান পুস্তিকাটি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে রচিত বাংলা গদ্যের অন্য একটি নিদর্শন মাত্র। এর কোন বৈশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্র মূল্য এর নেই।

এই গ্রন্থটি কয়েক ভাগ : ভূমিকা (১—৭ পৃষ্ঠা), পুস্তিকার মুদ্রিত পাঠ (৮—২০), রেগুলেশনের ইংরেজি মূল (২১—২৯) এবং পুস্তিকার চারটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি।

ভূমিকায় অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় এই পুস্তিকার গদ্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। মুদ্রণে প্রমাদের ফলেই সম্ভবত অনেক বাক্যের অর্থ ভেদ করা সহজ নয়। ভূমিকা লেখক 'এই পুস্তিকাতে ব্যবহৃত' ফার্সী ও ইংরেজি শব্দের তালিকা দিয়েছেন। তালিকাটি অসম্পূর্ণ। যেমন পলিশ, নম্বর, আপীল ইত্যাদি শব্দ পুস্তিকাতে আছে এবং 'এই পুস্তিকাতে ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দ'-এর তালিকায় নেই। ফার্সী শব্দ বা বহুত্তর অর্থে অব্বরী ফার্সী শব্দের তালিকায় মহিনা, জমা, সামিল, জবরী, বমজন, মেহর, আইন, চাকর, মোকদ্দমা, সাহেব, মোতাবেক ইত্যাদি শব্দগুলি কেন স্থান পেল না, বোঝা গেল না অথচ যে কোন সাধারণ পাঠকের চোখে এই শব্দগুলি ধরা পড়বে।

— সম্পাদনা প্রসঙ্গে দু-একটি কথা বলা আবশ্যক। এই গ্রন্থের চার পৃষ্ঠার যে প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে তাদের সঙ্গে তাদের মুদ্রিত পাঠের তুলনা করলে অনেক ত্রুটি ধরা পড়বে। মুদ্রণ প্রমাদ হয়ত তার প্রধান কারণ হতে পারে। দু-একটি উদা-হরণ দিচ্ছি।

পঞ্চম পৃষ্ঠার ৩ ধারার দ্বিতীয় লাইনে 'সাহেবকে পূর্ব্বমতে হইবেক' মুদ্রিত হয়েছে। পুস্তিকাতে পূর্ব্বমতে ও হইবেক শব্দের মধ্যে আর একটি শব্দ আছে। ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার ৬ ধারার তৃতীয় লাইনে মুদ্রিত হয়েছে 'ব্যাপার', মূল পুস্তিকাতে আছে 'বেপার'। ৮ম পৃষ্ঠার দশম প্রকরণের শেষে মুদ্রিত পাঠে দেখছি পাঠে দেখছি 'ইতি' কিন্তু ঐ অংশের প্রতিলিপিতে শব্দটি অনুপস্থিত। বানান সম্বন্ধে ভূমিকায় বলা হয়েছে 'একই শব্দের দু রকমের বানান আছে'। কিন্তু মুদ্রিত পাঠে দেখছি 'এসিষ্টেন্স' 'এশিষ্টেন্শ' 'এসিষ্টেন্শ' 'এশিষ্টেন্স' 'এসিষ্টেন্স'। কোথাও স, কোথাও শ, কোথাও ন এবং স যুক্তাক্ষরে লেখ, কোথাও ভেঙ্গে লেখ। ভূমিকায় এই শব্দটি (ইংরেজি শব্দের তালিকায়)) 'এশিষ্টেন্স' ছাপা হয়েছে। এগুলি মুদ্রণ প্রমাদ কিনা জানি না। যদি হয় তাহলে কলের এই ক্ষুদ্র—মাত্র আট পাতার পুস্তিকার মুদ্রিত পাঠ শুদ্ধভাবে ছাপা না হওয়ার ফলে এর যদি কোন মূল্য থাকে তা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাংলা বানানের ইতিহাসে এই গ্রন্থটির মুদ্রিত রূপ কোনভাবেই নির্ভরযোগ্য নয়।

সম্পাদনার যেটুকু পরিচয় এই গ্রন্থে আছে তা প্রশংসনীয় নয়। পুস্তিকাস্থ মার্জিনে (কখনও বাঁ দিকে, কখনও ডান দিকে) মূল টেকস্টের কথা সংক্ষেপাকারে লিখিত আছে। সম্পাদক মহাশয় জানিনা কোন্ যুক্তিতে (কোন যুক্তি অবশ্য দেখান নি) ইচ্ছে মত বাঁ দিকের মার্জিনের

অংশগুলি মুদ্রিতে পাঠে ডান দিকের মার্জিনে ফেলেছেন। যেমন মূল পুঁথির ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রতিলিপিতে দেখতে পাচ্ছি বাঁ দিকের মার্জিনে লেখা। তার মুদ্রিতরূপে সেই লেখাগুলি চলে এসেছে ডান দিকের মার্জিনে। ব্যাপারটা সামান্য কিন্তু সম্পাদক কেন এই পরিবর্তন করলেন তা পাঠক জানতে চাইতে পারে।

ভূমিকায় বলা হয়েছে ফারসী বহুলতা সেকালের বাংলা গদ্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য—তা হালহেড ও ফেলর্ট উইলিয়ম গোষ্ঠীর কোনো কোনো লেখকের রচনায় অনায়াস-লক্ষণীয়। (পৃঃ ৩)

হালহেড-এর কোন বাংলা রচনায় ফারসী বহুলতা আছে?

হালহেড-এর আদৌ কোন বাংলা গদ্য রচনা আছে বাংলা গদ্যের গবেষকদের কাছে এটি নতুন সংবাদ।

দুশো বছরের পুরানো বাংলা গদ্য-পুঁথি, সম্পাদনা ও ভূমিকা তরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়, ১৯৭৮, পৃঃ ২৯, মূল্য বার টাকা।

মানুষের স্বরূপ

গ্রন্থটির উপমায় সামগ্রিক দৃষ্টিতে সমসাময়িক মানুষ। বারোজন স্বদেশী ব্যক্তি মানুষের স্বরূপ নিয়ে নানাদিক থেকে আলোচনা করেছেন।

সাত বছরে আপনার টাকা দ্বিগুণ করুন

জাতীয় সঞ্চয় পত্র---পঞ্চম পর্যায়

কিনুন

* এই বিনিয়োগ থেকে আপনার বছরে ১৪·৩ ৶° সরলসুদ আয় হবে।
* তিন বছর পর আপনি এই সার্টিফিকেট ভাঙাতে পারবেন।
* আপনি যত খুশী বিনিয়োগ করতে পারেন।

অন্যান্য সুবিধা

* আয়করের জন্য সুদের হিসেব বার্ষিক ভিত্তিতে করা হবে (সম্প্রতি এই সুবিধা দেওয়া হচ্ছে)
* সম্পদ কর থেকে রেহাই (১·৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত)
* সুদ করমুক্ত (বছরে ৩,০০০ টাকা পর্যন্ত)

বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন ঃ

* অনুমোদিত এজেন্ট অথবা
* জেলা সঞ্চয় আধিকারিক অথবা
* নিকটতম ডাকঘর অথবা
* আপনার এলাকার আঞ্চলিক অধিকর্তা (জাতীয় সঞ্চয়)

জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা

পোস্ট বক্স নং - ৯৬, নাগপুর - ৪৪০০০১

ডিএভিপি—৭৮/৩৪৩

আলোচনার বিষয়বস্তু অবশ্যই শুধু সমসাময়িক মানুষেই সীমাবদ্ধ নয় এবং মানুষ সম্বন্ধে এই আলোচনার দৃষ্টিকোনকে সামগ্রিক বলাও অতিশয়োক্তি মাত্র। মানুষ কি অথবা মানুষের স্বরূপ কি এই প্রশ্নের উত্তর নানা যুগে ধর্মবিদ, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীরা খুঁজেছেন এবং প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে গিয়ে নানা জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। মানুষকে বুঝতে এবং বিচার করতে গিয়ে একদিকে যেতে হয়েছে তার উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাসে, জীববিদ্যার ক্ষেত্রে, কখনও যেতে হয়েছে তার মনের রহস্যময় স্তরের আলোচনায়, যার থেকে উদ্ভূত হয়েছে মনোবিদ্যার বিচিত্র শাখা, আবার একদিকে মানুষকে বোঝার জন্য প্রয়োজন হয়েছে তার পরিবেশকে বোঝা—সেই পরিবেশ প্রাকৃতিক পরিবেশ মাত্র নয়, তার রচিত সমাজ, সমাজগঠনের উপযোগী কর্মপদ্ধতি, তার উৎপাদন ব্যবস্থা, তার পরিবর্তনশীল মানসিকতা। এইসব তথ্য ও বাস্তব অবস্থাকে বোঝার জন্য গড়ে উঠেছে নানা শাস্ত্র, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান এবং দর্শন। প্রাচীন ধর্মজিজ্ঞাসু এবং ধর্মতাত্ত্বিকেরা মানুষকে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে চেয়েছেন, যার মূল কথাটা সৃষ্টির আদি ও অপরিবর্তনীয় সত্যের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, সেই সম্পর্কের স্বাবাই মানুষের স্বরূপ তাঁদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও কোন নির্দিষ্ট এবং সর্বজন গ্রাহ্য চিন্তা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। হিন্দু কিংবা বৌদ্ধ, খ্রীস্টান কিংবা ইসলাম প্রত্যেক ধর্মই মানুষের স্বরূপকে ভিন্ন ভিন্ন পথে দেখেছেন এবং ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। জীববিজ্ঞানীরাও মানুষের পরিচয় সন্ধান করেছেন পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। উদ্‌বর্তন বা অভিব্যক্তির ধারাকে অনুসরণ করে। শুধু জীববিজ্ঞান নয়, অন্যান্য বিজ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কৃত নানা তথ্যের দ্বারা জাগতিক পরিবেশের মধ্যে মানুষের স্থান ও তার গুরুত্ব সম্পর্কেও আমাদের জ্ঞান বারবার পরিবর্তিত এবং পরিশীলিত হয়েছে। মানুষের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে এবং হচ্ছে তার কর্ম ও চিন্তার ইতিহাসের পর্যালোচনায়। নানা বিচিত্র শকতি, প্রকৃতির নানা তাড়না, তার মানসিকতার নানা অভিব্যকতি, তার চিন্তার নানা বিরোধিতা ও নানা মুখিতা সব মিলিয়ে মানুষের পরিচয় ক্রমশই উন্মোচিত হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। কাজেই কোন একটি দৃষ্টিভঙ্গিতে, তা যতই শকতিদীপ্ত হোক না কেন মানুষের পূর্ণ পরিচয় জানা সম্ভব নয়, সামগ্রিক দৃষ্টিতেই তার সমগ্রতার পরিচয় জানার সম্ভাবনা আছে।

বর্তমান প্রবন্ধ সঙ্কলনের বিভিন্ন প্রবন্ধে দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা আছে। সেই বিভিন্নতা মানুষের স্বরূপকে বোঝার পক্ষে যেমন উপযোগী, তেমনই উপযোগী মানুষের সম্বন্ধে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যকে বোঝার পক্ষে। উপনিষদের দৃষ্টিতে মানুষ এবং খ্রীস্টীয় দৃষ্টিতে মানুষ—দুটো স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা, সেইরকমই গান্ধীর দৃষ্টিতে মানুষ এবং মার্কসীয় দৃষ্টিতে মানুষ প্রায় দুই বিপরীত কোটিতে অবস্থিত। উপনিষদ কিংবা খ্রীস্টীয়তত্ত্ব ও অভিজ্ঞতায় মানুষের স্বরূপ সন্ধান যে ভিত্তি থেকে শুরু হয়, যুক্তিবাদী সেই ভিত্তিকে পুরোপুরি অস্বীকার করে অগ্রসর হন। এই প্রবন্ধগুলির শুধু বিষয়বস্তুই নয় এদের প্রকৃতিও ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। কতকগুলি প্রবন্ধ মানুষের চিন্তাধারার বিবর্তনের সাধারণ রূপের পরিচয় দিতে সচেষ্ট, কোনটি একটি বিশেষ কালের বিশেষ দেশের পটভূমিতে মানবচিন্তার পরিচয় (যেমন বাঙলার চিত্তজাগরণ এবং রামমোহনের চিন্তায় মানবমহত্ত্বের স্বরূপ), কোনটি ব্যক্তিবিশেষের মানব চিন্তা (যেমন গান্ধীর দৃষ্টিতে মানুষ) আবার কোনটি বিশেষ সামাজিক-দার্শনিক চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের আলোচনা (যেমন মার্কসীয় দৃষ্টিতে মানুষ)। যুক্তিশীল মানুষের অবশ্য প্রত্যেকটি দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিই শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত, কিন্তু আমরা এও জানি মানুষ নিজের যুক্তিশীলতার অহমিকায় কোন না কোন দৃষ্টিভঙ্গিকেই একমাত্র সত্য বলে মনে করে এবং ফলে অন্য দৃষ্টিভঙ্গিগুলিকে কখনও মিথ্যা, কখনও ভ্রান্ত, কখনও বা বিপজ্জনক বলে বর্জন করে। সম্পাদক গ্রন্থসূচনায় লিখেছেন যে আলোচনার মধ্য দিয়ে সমসাময়িক ব্যক্তি মানুষের একটি পুনর্মূল্যায়নের পথ সুগম হয়....বর্তমান সংকলনটি সেই জরুরি আলোচনার সূত্রপাত স্বরূপ। আশা করি এই আলোচনা অব্যাহত থাকবে।

মানুষ। সম্পাদক : মিহির সিংহ। সমতট প্রকাশনী কলিকাতা-২৯। পৃঃ ১৬০। মূল্য আট টাকা।

পাঠককে চিন্তিত করবে

বর্তমান গ্রন্থে সতেরোটি প্রবন্ধের সংকলন। প্রবন্ধগুলি নানা বিষয়ের এবং নানা সময়ে, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কতকগুলি প্রবন্ধ—যেমন বাংলা উপন্যাস, বাংলা ছোট গল্প, ভ্রমণ সাহিত্য, প্রবন্ধ সাহিত্য—মূলত সার্ভে জাতীয়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার পরিচয় ফুটে উঠেছে এই সব রচনাগুলিতে। অল্প পরিসরে বহু লেখকের এবং নানা বৈচিত্র্যের বিশদ পরিচয় দেওয়া সহজ নয়। কাজেই লেখকের বহু মন্তব্য অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং কখনও কখনও কিছুটা অব্যাপ্তও বটে। কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই লেখকের বিভিন্ন মন্তব্য ও বক্তব্য পাঠককে নানা বিষয়ে চিন্তান্বিত করবে সন্দেহ নেই। আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে লেখকের পরিচয় ব্যাপ্ত এবং গভীর, বাংলা সাহিত্যের সাধারণ মান সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা ও অনুরাগও জীবন্ত, কিন্তু তার নানা অসম্পূর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও তিনি সচেতন। বাংলা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ, পরিচয়ের গভীরতা এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ধারনা—এই তিনটিই তাঁর সমগ্র প্রবন্ধাবলীর চরিত্র স্থির করেছে এবং তাঁর সাহিত্যভাবনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

সাহিত্যভাবনা-র প্রবন্ধগুলি মূলত সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য কেন্দ্রিক। সাহিত্যের সাধারণতত্ত্ব বা সাধারণ সমস্যা নিয়ে লেখক কোন তত্ত্বাশ্রয়ী আলোচনা এখানে করেননি। তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তু আজকের কথাসাহিত্য, প্রবন্ধ সাহিত্য এবং তাকে অবলম্বন করে বাংলা সাহিত্যে শ্লীলতা ও অশ্লীলতার প্রসঙ্গ উঠেছে। লেখকের অনেক মন্তব্যই বাংলাসাহিত্যের সাম্প্রতিক কর্মকান্ড সম্বন্ধে পাঠককে ভাবিয়ে করবে সন্দেহ নেই। যেমন তিনি বাঙলা উপন্যাস সম্বন্ধে একটি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন, সমসাময়িক উপন্যাস মূলত পর্যবেক্ষণ নির্ভর, আস্তরের গভীরতর বোধের স্বাদ পাওয়া যায় না, কিংবা অন্য প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, সাহিত্যে দেহবাদের আতিশয্য বিলাসিতাময় ভোগকেন্দ্রিক বিকারী জীবনের সাহিত্যিক প্রক্ষেপ মাত্র। এই দুটি মন্তব্যেই আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যভাবনার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। বঙ্কিমচন্দ্র একদা উপন্যাস সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন যে উপন্যাস মনুষ্যজীবনের কঠিন সমস্যা সমূহের ব্যাখ্যা। আর সাহিত্য ও সমাজের সম্পর্কের ভিত্তিতে বাংলা গীতিকবিতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন এই উচ্চাভিলাষ শূন্য, অলস, নিশ্চেষ্ট, গৃহসুখপরায়ণ চরিত্রের অনুকরণে এক বিচিত্র গীতিকাব্য সৃষ্ট হইল। প্রকৃত পক্ষে আধুনিক জীবনের মূল্যবোধ এবং বর্তমান বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তার যোগ সাহিত্যভাবনা গ্রন্থের প্রবন্ধাবলীর প্রধান সূত্র।

যে সমস্যাটি নিয়ে লেখক সবচেয়ে বেশী উত্তেজিত এবং চিন্তিত তা, তাঁর ভাষায়, অপসংস্কৃতি-র সমস্যা। এই অপসংস্কৃতি একদিকে সাহিত্যে অশ্লীলতা বা দেহবাদের সঙ্গে জড়িত, অন্যদিকে আরো বৃহত্তরভাবে জড়িত সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে যা আধুনিক সমাজকে যাঁরা শাসন করেন তাঁদের স্বার্থবুদ্ধি এবং তাদের মূল্যবোধের সঙ্গে। সাহিত্যে শ্লীলতা-অশ্লীলতার প্রসঙ্গ প্রাচীন এবং অত্যন্ত জটিল। শ্লীলতা-অশ্লীলতার সীমারেখা নিয়ত বদলাচ্ছে, যুগে যুগে তার পরিবর্তন ঘটেছে এবং আজও এ বিষয়ে সামাজিকরা এবং সাহিত্য সমালোচকেরা ভিন্ন ভিন্ন মতের পরিপোষক। যে সৃষ্টিকে একদল অশ্লীল বলে ধিক্কার দিয়েছেন, সেই সৃষ্টিকেই একদল অভিনন্দন জানিয়েছেন। গত একশ বছরের বাংলা সাহিত্যেই তার উদাহরণ যথেষ্ট আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাহিত্য ও সমাজ। সাহিত্য এবং জীবনের মূল্যবোধের সম্পর্ক সম্বন্ধে যিনিই সচেতন তার কাছে এই প্রশ্ন বা

সমস্যাটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যঞ্জনা নিয়ে উপস্থিত হতে বাধ্য। সাহিত্য এবং নীতি, সাহিত্য এবং সমাজ প্রগতিকে স্বতন্ত্র মানদণ্ডে বিচার করা হবে, না সামগ্রিক ও ব্যাপক মঙ্গলবোধের আদর্শে তাদের বিচার করা হবে? এ প্রশ্ন কোন সৎ পাঠকই এড়িয়ে যেতে পারেন না। এ বিষয়ে লেখকেরা এবং সমালোচকেরা অনেক সময়েই স্পষ্টত দুই শিবিরে বিভক্ত। একদল বলে এসেছেন সাহিত্য বিচারে এবং উপভোগে শ্লীলতা-অশ্লীলতার প্রসঙ্গ অবান্তর। আর একদল বলে এসেছেন, বাংলা সাহিত্যে যাঁর অন্যতম প্রবক্তা বঙ্কিমচন্দ্র, সাহিত্য ও নীতির সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। আধুনিককালে একদল সাহিত্যে নীতির প্রসঙ্গ তোলাকে প্রগতি-বিরোধিতা বা আধুনিকতার বিরোধিতা নামে চিহ্নিত করতে চান। বর্তমান লেখক সেই দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করতে চান তীব্রভাবে। তিনি বলতে চান আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি স্রোত পংকিল ও দূষিত, তার মূল লক্ষ্য সহজে জনচিত্ততোষণ, তার পেছনে কোন সৎ সাহিত্যিক প্রেরণা নেই। যেখানে সাধারণ মানুষের জীবন দারিদ্র্য ও অত্যাচারে নিষ্পিষ্ট, সেখানে মানুষের জীবনের প্রধান সমস্যা অন্ন, সেখানে যদি সাহিত্যে শুধু তার দেহক্ষুধাকেই প্রতিফলিত হতে দেখা যায়, তখন স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ হয় সে সাহিত্যে কতটা সত্য আছে। কতটা যাথার্থ্য আছে। লেখক নির্দ্বিধায় সাম্প্রতিক সাহিত্যের এই ধারাকে ধিক্কার দিয়েছেন এবং তাকে অপসংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এইটিই সাহিত্যভাবনা-র প্রধান ভাবনা। আশাকরি পাঠক সমাজ এই গ্রন্থ পাঠ করে এই বিষয়ে সক্রিয়ভাবে চিন্তায় উদ্যোগী হবেন।

সাহিত্য ভাবনা, নারায়ণ চৌধুরী, পপুলার লাইব্রেরী, কলকাতা—৬ পৃঃ ১৭২, মূল্য দশটাকা।

কয়েকটি পত্রিকা

আন্তর্জাতিক : পশ্চিমবঙ্গ শান্তি ও সংহতি সংসদের পক্ষে সম্পাদক কমল সমাজদার। ১৪৪ লেনিন সরণি, কলকাতা।

পত্রিকার বর্তমান সংখ্যাটি আফ্রিকা সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত। আফ্রিকার বহু সমস্যা এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রবীণ সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় আফ্রিকার নবজাগরণের ইতিহাস স্বল্প পরিসরে লিখেছেন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতিভূ মার্কিন সরকারের বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গী যা কিনা চিরকালের শোষক 'শোষিতের ফারাক নির্ণয় করে এসেছে, আফ্রিকান জনগণের মুক্তি সংগ্রামে তা আজ ব্যর্থতায় পর্যবসিত। ফলতঃ শোষকের অত্যাচার তীব্রতর, তাই ভাডাটে সৈন্যের রক্তগুস্তি 'শট অ্যাট এভরিথিং দ্যাট লুকড ব্ল্যাক।' একচেটিয়া পুঁজিবাদের কুক্ষিগত আফ্রিকা নয়া শোষণবাদের শিকার অদ্ভুতভাবে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ (শঙ্কর রায়) অনুসন্ধিৎসু পাঠকের চিন্তার খোরাক যোগাবে। আফ্রিকার এই রক্তাক্তকারী মুক্তিসংগ্রামে চীনের নির্লিপ্ত (না বৈরিতা!) বিষয়ে লিখেছেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ফিদেল ও তাঁর সহযোগীদের লক্ষ্য বিষয়ে বিভিন্ন পটভূমি থেকে আলোচনা করেছেন ভাগ্যদেব দত্ত। নাজিম হিকমতের কবিতার অনুবাদ করেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। কয়েকটি ছোটগল্প বিভিন্ন আফ্রিকান লেখা থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। সব ক্ষেত্রেই অনুবাদ স্বচ্ছন্দ নয়। তবু ভালো লাগে ইরাকী গল্পের অনুবাদ 'চুলনী'। অনুবাদ নাটকগুলি তেমন প্রয়োগ।

সাহিত্য সেতু : বিশেষ সংখ্যা : বিষয় দুর্গা। সম্পাদক শুভেন্দু সেনগুপ্ত। বাঁশবেড়িয়া, হুগলী থেকে প্রকাশিত। দাম দু টাকা।

প্রতিবারের মত এবারও সাহিত্য-সেতু প্রকাশ পেয়েছে বিশেষ সংখ্যা হিসাবে। আলোচ্য সংখ্যাটি দুর্গা এবং দুর্গাপূজা কেন্দ্রিক নানা রচনার এক মূল্যবান সংকলন। বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীঅরবিন্দের দুর্গাধ্যান নিয়ে তত্ত্ব ও চিন্তামূলক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন অপূর্বকুমার সাহ। দুর্গাপূজার অবৈদিক উৎস নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন বিনোদবিহারী দে। পূজার অসামাজিকতার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন নির্মলেন্দু গৌতম। উমাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় পূজোর আমোদ-প্রমোদ নিয়ে সেকালের সঙ্গে একালের তুলনা করেছেন। কোচবিহারের দুর্গা নিয়ে এক বিশেষ রচনা লিখেছেন বার্ণিক রায়। সম্পাদক শুভেন্দু সেনগুপ্ত পূজোর শিল্পচর্চা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা রেখেছেন। এছাড়া উল্লেখযোগ্য রচনা লিখেছেন সুধীরকুমার মিত্র, রমেন্দ্রনাথ মল্লিক, মিঠু মুখোপাধ্যায়, দীপক দে, সলিল মিত্র প্রমুখ।

ভারত ও সমাজতান্ত্রিক জি ডি আর : সম্পাদক : ডঃ পঞ্চানন সাহা ২৬বি, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩। দাম তিন টাকা।

ভারত ও সমাজতান্ত্রিক জার্মানীর মৈত্রীর মেল-বন্ধন এই শারদ সংকলের সম্পাদনা করুকুকে। প্রবন্ধ, কবিতা, নাটক সবই দুই দেশের সংস্কৃতির পরিপূরক।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধে ফ্যাসিস্ট কবলিত জার্মানীর বহু বাধা অতিক্রম করে অবশেষে সমাজবাদ উত্তরণের এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস চর্চা করেছেন। রবীন্দ্র মজুমদারের তলস্তয়: আমেরিকা প্রসঙ্গে আলোচনা পড়ে তথ্যান্বেষী পাঠক নিরাশ হবেন না। শান্তি ও সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে চক্রান্ত প্রবন্ধ জার্মানীর কমিউনিস্ট আন্দোলন ও তার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের ঘৃণ্য চক্রান্ত সম্পর্কে 'ক্যামেরা রুক' রিপোর্ট পেশ করেছে।

কবিতায় কৃষ্ণধর, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অমিতাভ দাশগুপ্ত তাঁদের উপস্থিতির মূল্য দিয়েছেন। অমল দাশগুপ্তের আইনস্টাইন : শক্তি ভর ও আলোর গতির সমীকরণ সম্পর্কিত প্রবন্ধটি উল্লেখ্য। সবার উপরে পত্রিকাটিতে অকল্পনীয়ভাবে উপস্থিত আছেন ঋত্বিক, ঋত্বিক ঘটক—গ্যালিলিও গ্যালিলির বেতারীয় অনুবাদে। চিত্র-বিদ্রোহী ঋত্বিক বোধহয় এই নাটকটির অনুবাদ নিজের বক্তৃতা দিয়ে করেছিলেন, কেন না উফতা টের পাওয়া যায়।

অনুওম : সম্পাদক : সৈকত হাজরা। ৫, কে এন চ্যাটার্জী স্ট্রীট বেলুড়মঠ, হাওড়া। এক টাকা।

একটি পরিচ্ছন্ন শারদ সংকলন। প্রবন্ধের দিক অতি বলিষ্ঠ। আধুনিক নাটকে হাস্যরস আসিক নিয়ে এক মনোজ্ঞ চিন্তামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—এক শ্রেণীর কবি লেখক তথাকথিত ইনটেলেকচুয়াল হবার বাসনায় লেখাটিকে ইচ্ছাকৃত দুর্বোধ্য করে তোলেন নাটকের ক্ষেত্রেও তাই চলছে। এসবের ফল সুদূরপ্রসারী—থিয়েটার বসতটা ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে, দর্শক ছুটছে সরল সহজ যাত্রায় কিংবা মনোহরণ সিনেমায়।' প্রতাপ মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধে আমাদের প্রতিনিয়ত ওমুখো যাওয়ার ঝোঁক ও তার কুফল নিয়ে আলোচনায় আমাদের সচেতন করে দিয়েছেন। সুকান্তকে নিয়ে পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের আলোচনা মনোগ্রাহী।

প্রবন্ধের তুলনায় গল্প এবং কবিতা তেমন মন কাড়তে পারে না। ছোটগল্প এঁকেছেন পূর্ণেন্দু পত্রী।

অগ্রবন্ধু কুণ্ডু,

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

হাওয়া গাড়ি

।। চল্লিশ ।।

মাঠের ভেতর দিয়ে গুড়ের নাগরি ঝাঁকে ঝুলিয়ে ছোট ছোট দলে ব্যাপারীরা স্টেশনের পথে শর্ট কাট ধরছিলো। ধানকাটা মাঠে এখন আগুন ছুটছে। ফেব্রুয়ারির শেষ। বেলা দশটাতেই শীতের ভাল কুয়াশা রোদে থাক হয়ে উধাও। কে বলবে ঘন্টা দুয়েক আগেও চারদিকের বাদা অঞ্চল চাপ চাপ কুয়াশায় ঢাকা পড়ে ছিলো।

উঁচু চন্ডীমন্ডপের মাটির সিঁড়ি দিয়ে নেমে পড়লো রবি। বর্ষার বসানো ওল চারার শিরতোলা চিরল পাতাগুলো স্থির। এখনও হেঁটে গেলে টেনটা ধরতে পারে।

অনিল মালখন্ডী এই রায়পুরের সবচেয়ে পুরনো অঞ্চল প্রধান। সে দিব্যি রবির পেছন পেছন হেঁটে এলো। দুপুরে থেকে যান। সন্ধ্যেয় টেনেই না হয় কলকাতা যাবেন—

আগেকার দিনের চন্ডীমন্ডপটা রবি তফতকে উঠোন দিয়ে আস্তেই হাঁটছিলো। এখনো তার পা ঠিক মত পড়ে না। এবড়ো খেবড়ো জায়গায় গোড়ালি পড়লেই উরু অব্দি একটা শিরশিরানি উঠে আসে। মাথা ঘুরে যায়। শেষ দিকে বেশ অনেকদিন সে বেনডেজ বেঁধে ছিলো। পায়ে শেকল। নড়াচড়ার জায়গা নেই। পাশাপাশি কয়েকটা সেলে আরও কয়েকজন ছিলো। তাদের একজন বোধহয় ঘরদুগোড়ার। একদিন ছেলেটির মুখ দেখতে পেয়েছিলো—বড় নিষ্পাপ—পাপের কোন দাগ নেই। ওখানে কেউ কারও মুখ দেখতে পেত না। আলাদা আলাদা করে হাঁটিয়ে নিয়ে আসতো সেন্ট্রি।

সন্ধে হলে যে যার থালা বাজিয়ে সাড়া দিতো। কথা একটাই। থালা বাজিয়ে বলতো—বেঁচে আছি। এখনো বেঁচে আছি। সেভেন্থ ট্রাইব্যুনালে কেস ওঠার ক'দিন বাদেই মালবিকা ঘুরে গেল। তারপরই সেই সেল। সন্ধ্যে হলে যে যার সেল থেকে থালা বাজানো। বাজনা বাজিয়ে জানান দিতো—আমরা বেঁচে আছি। বেঁচে আছি।

অতদিন একটানা অন্ধকারের ভেতর ছোট্ট জায়গায় আটক থেকে পায়ে কোন জোরই নেই রবির। এই বোধ হয় সে জীবনে প্রথম হাঁটছে। উঠোনের এক কোণে চাষ উঠে যাওয়ার পর অনিল মালখন্ডীর বড় ছেলের ধান তুলবার কাজ ওড়াচ্ছিল। বাতাসের দিকে তাগ্ করে। যা কিছু ধান রয়েছে—তা দু' চারটে ঝরে পড়ছিল।

অনিল আবার বললো রাতের ট্রেনেই যাবেন। এতদিন পরে এসে তো মোটে তিনদিনও থাকলেন না—

রবি ঘুরে দাঁড়ালো। পায়ের এখনো তার জন্যে কোন জায়গায় কেউ বসে থাকে। আশ্চর্য! হোক না গাঁয়ের বুড়ো প্রধান। বাত ও ব্যাধিতে পুরোপুরি কাবু একদম। তবু তো তাকে থেকে যেতে বলছে।

অনিল বললো, সেবারে আপনি এসে আমার চিকিৎসা না করলে মরে পড়ে থাকতাম —বালাই! মরবে কেন।

না না। আপনি না এলে ঠিক মরে যেতাম সেবারে। তখন তো সঁচ ফোঁটানোর চিকিৎসে এদিকে কেউ দ্যাখেনি। আপনারাই করে দেখালেন—

রবির অনেক কথা এক সঙ্গে মনে পড়ছিলো। একটা কথার ভেতর আরেকটা কথা সেঁধিয়ে গিয়ে মনের ভেতর সে এক কেলেঙ্কারি। তার এখন কোনোদিকে যাবার অবস্থা নেই যেন। তার পায়ের নিচের মাটির ভেতর থেকে গুড়ের রস রসে যাচ্ছে। যে রস পাটালি ভাঙলে দুই মাড়ির মাঝখানে আঠা হয়ে থাকে। শীত ফুরোনোর আগেকার শেষ রসালো পৃথিবীর চারদিকে রবির জন্যে ছায়া ধরে বিশ্রামের আয়োজন করা হয়েছে। বুড়ো অনিল মালখন্ডী তাকে থেকে যেতে বলছে। কোন তাড়া নেই। অথচ এই চার বছর সে কোথাও দুদন্ড জিরোতে পারেনি। সব সময় পেছনে পুলিশ নিয়ে দৌড়ে বেড়াতে হয়েছে তাকে। তার আগে তো মেডিক্যাল কলেজের অ্যানাটমি ডিপার্টমেন্টে ডিসেকসনে অ্যাপ্রন গায়ে ঢুকতে হয়েছে তাকে। দলের সিনিয়র তিনজন মেম্বার তখন ওখানে হাউস স্টাফ। তারাই মানুষের শরীরের দরকারী জায়গা চিনতে তাকে সাহায্য করে। এক বছরের জন্যে এ তল্লাটে এসে তখন প্রথম যে রোগীকে সে অকুপাংচার করে চাঙ্গা করেছিলো—সে অনিল মালখন্ডী। সারাদিন চন্ডীমন্ডপে পড়ে থাকতো উপুড় হয়ে। এম বি ডাক্তার থেকে ঝাড়ফুক—সব দিককার জবাব পাবার পর প্রধানমশায় হাল ছেড়ে দিয়ে পড়েছিলো। তখনই রবি এ গাঁয়ে শশাঙ্কদার সঙ্গে ক্লাস নিতে আসে। এই চন্ডীমন্ডপেই। সারাদিন মাঠে কাজ করবার পর জনা পাঁচেক লোক ওখানটায় বসে ঝিমোতো। শশাঙ্কদা ওদের মনে বৈপ্লবিক ঘেন্না সঞ্চারিত করার জন্যে হেরিকেনের আলোয় এক এক সন্ধ্যে ঘন্টা-খানেক ধরে বকে বকে যখন ক্লান্ত—তখন আবিষ্কার করতো—সবাই ঢুলে ঢুলে ঘুমিয়ে পড়েছে। সারাদিন তো খাটাখাটনিতেই যায়। শুধু একজন চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকতো। পরে শোনা গেল—সে-ও শুনছে না। আসলে লোকটা কালা। সে রকমই এক সন্ধ্যেবেলা এই প্রধান মশায় রবির হাতে ছুঁচ ফোঁটাতে রাজি হয়ে যায়। ব্যাপার চোটে।

রবিও তখন একদম আনকোরা। রুগীর চেয়ে সে নিজেই বেশি ঘামছিলো। হেরিকেনের আলোয়। নার্ভাস হবে। সেই তার শুরু। সেই করেই সে পাশাপাশি এ গাঁয়ে থেকে যায়। তখন তার বাবার সঙ্গে দেখাই হয় না। বাবা আর মেডিক্যাল কলেজে আসছে। কাল গোবিন্দ টিটবের সঙ্গে কথা হয়েছে

বারাণ্ড অর্ডার আনছে। বাবা তখন খোঁজ য়ে দ্যাখেওনি—আমি কলেজে যাচ্ছি—
যাচ্ছি না—

না। আজ আর থাকতে পারবো না অনিল।

যেতেই হবে ?

হ্যাঁ। আবার আসবো। এখন তো আর কোন ভয় নেই। পালিয়ে পালিয়েও বেড়াচ্ছি না এখন।

কলকাতা ঘুরে ফের আবার এখানে আসবেন কিন্তু।

এখানকার শুকনো বাঁশ পাতাটাও তাকে কিছিল। রবির খুব ক্লান্ত লাগলো। এবার থাও তার কিছুদিনের জন্যে শুয়ে পড়া ব। শুয়ে থাকা দরকার। একটানা অনেক রবির চোখে জল এসে গেল। কেন তা সে জানে না। উঠোনের কোণে লেবু গাছটার একটা পাতা ছিঁড়ে চকাই মুখে দিলো। চিবিয়ে নিয়ে লো, নিশ্চয় আসবো।'

কতদিন পরে এলেন বলুন তো—

তা চার বছর হয়ে গেল। এই অব্দি বলে রবি নিজের মনে মনেই আওড়ালো চেনা জায়গাগুলো একবার করে দেখে যাচ্ছি। আর যদি এ জীবনে দেখা না হয়। কে জানে। কেই বা বলতে পারে। পরিণাম. ভবিতব্য—ইত্যাদি বাংলাগুলোর পেটের ভেতরে এত কথা চাপা থাকে। এত মানে হয় সে সব কথার—

আবার জেলে যাবেন না তো ?

দূর পাগল। ছেলেমানুষী করতে নেই অনিল। তুমি এত বড় একখানা অঞ্চলের প্রধান। যেমন বলেছি—তেমন থাকবে। কোন বে-নিয়ম কোরো না কিন্তু। আমি ঠিক ফিরে আসবো—বলেই রবি চন চন করে মাঠে গিয়ে পড়লো। ধান কাটা মাঠ। গুড়ের নাগরির কাঁক কাঁধে লোক গুলো বড় বড় মাঠ পাড়ি দিচ্ছে। সামনে স্টেশনের সেখান থেকে ট্রেনে উঠে কলকাতা। এখন সবারই ডেস্টিনেশন-রেলস্টেশন।

শীত যাবার আগে আজ অনেকদিন পরে আবার আকাশটা অন্ধকার হয়ে এলো। সেই সঙ্গে অসময়ের বৃষ্টির ছিটে।

রবি ভেন্ডার কামরায় দাঁড়ানো দুজন টেকারকে বলতে শুনলো, নিজেদের ভেতরেই গুরু কথা বলছিলো।

একজন বললো শেষ রাতে হেরে স ব্রবর যখন রেডিও থেকে বলছিলো—ই আমি দিল্লিতে। আমির লোকজনদের পাঠানো হোল। তারা রাজি নয়। তখন ি এস এফকে ডাকা হোল। তারাও বললো, না আমরা পিপিলস ভালন্টিকুটের বিরুদ্ধে দাঁড়াবো না। ওদিকে আর্মড ফোর্সেস-এর একটা অংশ বিদ্রোহ করে। তাদের লিডার এসে বললো, মিসেস্—আপনি এবারে স্টেপডাউন করুন। নয়তো আপনাকে আমরা আরেস্ট করতে বাধ্য হবো—

টেন লাইনের দুধারে কচুবন গজায় বর্ষায়। এখন শুকনো—পরিষ্কার। রবি ভাবছিলো, সিক্রেট ঘটনার সাক্ষী ওই চেব মন কি করে ?

তখন তো কত ঘটনাই ঘটেছে। বাবা মাদ্রাজ ক্যাম্পে যেতে বাধ্য হোল—তাদের অনেকেরই তো আজও কোন খবর নেই। এক জায়গায় খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো রবি। তাড়াহুড়োয় হাটলে সে পড়ে যেতে পারে। আবার পা কাঁপছে। অনেকদিন ধরে সেলের ভেতর এক ধারায় থাকতে থাকতে হাঁটা প্রায় ভুলে গিয়েছিলো রবি। আজ কদমাস সে আবার হাঁটতে শুরু করেছে।

প্রথম যেদিন ছাড়া পেলো—সেদিন তো রবি অবাক। কেন ছাড়া পেল—সে জানে না। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে শেষ রাতের ঝড়ে যেন সব ওলোট পালোট। বটগাছটা ওলটানো। ঝোড়ো হাওয়ায় পাখির বাসা ছিটকে পড়েছে। আর একটানা শো শো আওয়াজ। একটা পরিষ্কার বাতাস বয়ে যাচ্ছে। সেই বাতাসে ইলেকশন। জোর ক্যানভাসিং। রবি দেওয়াল ধরে ধরে জেল-গেটের বাইরে এসে দাঁড়ালো।

একটা ট্যাকসি ধরে প্রথমেই সে শশাঙ্কদার বাড়ি গেল। শশাঙ্কদার ছোট ছেলে বললো, শেষ দেড় বছর তারা তাদের বাবার কোন খবরই রাখে না। ওরকম ইরেসপনসিবল্ বাবা না হলেও চলে যাবে তাদের—।

রবি কোন জবাব দিলো না।

ঘুরতে ঘুরতে বিকেল নাগাদ নিউ বোডে এসে পড়লো রবি। এপাড়ার বাতাসেও এখন আলুর চপ আর ইলেকশনের গন্ধ। একটা মিছিলে বাকু শ্লোগান দিতে দিতে যাচ্ছিলো। রবি হাত ধরে টানলো।

'গোডায় বাকু অবাক হয়ে চেয়ে থাকলো। চিনতে পারেনি।'

আমি রবিদা।'

তখনো বাকু তাকিয়ে। রবি বুঝলো, লম্বা চুলদাড়ি, বেঢপ বং জ্বলা শার্ট-প্যান্টই তাকে চিনতে দিচ্ছে না। রবি দুহাতে বাকুর কাঁধ চেপে ধরে বললো, চিনতে পারছিস না ? আমি তোদের রবিদা।

তুমি ? তাই বলো! কবে বেরুলে ?

রবি ততক্ষণে বাকুর কাঁধে ভর রেখে দাঁড়িয়েছে। নয়তো পড়ে যেতো। পা কাঁপছিলো।

দশতলা ফ্ল্যাটবাড়ির দরোয়ান বেস-মেন্টে রবিকে দেখেই চিনতে পারলো। সে অনেক সময় রবির জন্যে সিগারেট এনে দিয়েছে। বেশি রাতে। উল্টো দিকের বন্ধ ঝাঁপ খুলিয়ে—দোকানীকে জাগিয়ে। সে বললো, একি রবিবাবু ? এত রোগা হলেন কি করে ?

কথা না বলে রবি শুধু হেসেছে। ফ্ল্যাটে ওঠার মুখে দরোয়ান তাকে থামালো। কুথায় যাচ্ছেন ?

কেন ?

এখন ওখানে যেয়ে কোন লাভ নেই রবিবাবু।

কি ব্যাপার ? বাজে কথা বলছো কেন ? খুবই বিরক্ত হোল রবি।

ঠিক বলছি দাদাবাবু। এখন কোন লাভ হবে না গিয়ে—

থাকো আমাদের নিজেদের বাড়িতে যাবো না।

ওখানে আর আপনাদের বাড়ি নাই।

রবি লিফ্ট থেকে বেরিয়ে এলো। কি রকম ? ফ্ল্যাটটা কি উড়ে গেছে নাকি।

ঘর আছে। লেকিন আপনার লোক নাই। মাইজী ফ্ল্যাট বেচে দিয়ে চলে গেছে—

একদম বসে পড়লো রবি। দরোয়ানের বেঞ্চে। বাবা ?

আপনি শোনেন নাই কিছু ?

তারপর রবি সব শুনলো। একটু একটু করে। বেঞ্চে বসেই।

এদিকে ডবল লাইন হয়নি এখনো। এক এক জায়গায় গাড়ি দাঁড়ায় আর ডাউন ট্রেনের জন্যে থমকে থাকতে হয়। এক ট্রেন মানুষের ভিড় চাকাগুলো ওপর। নিচেই রেলের পাতির পাশে নাম না জানা ঘাসের ওপর প্রজাপতি ওড়ে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবই চোখে পড়ে রবির। এই না হলে পৃথিবী! আমাদের সেই ওল্ড হ্যাগার্ড দুনিয়া।

শেষ অব্দি রবি দরোয়ানের বারণ না শুনেই লিফটে ঢুকে পড়েছে। তাদের এক সময়কার ফ্ল্যাটের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

তখন বিকেলবেলা। বাতাসে ঠাণ্ডা মিষ্টি পাউরুটির গন্ধ মেশানো। বেকারির চিমনিটা এদিককার সবচেয়ে টল জিনিস। রবিদের ফ্ল্যাটের সামনেটায় অন্ধকার। তার বাবার নামের জায়গায় অন্য একটা নাম প্ল্যাস্টিক দিয়ে বসানো। এ-বাড়ির ভেতর-কার সবই তার জানা। রবি চুপ করে খানিক দাঁড়িয়ে থাকলো। সে এখানে এসেছিলো—অনেকের সঙ্গে দেখা করতে —অনেককে দেখতে। যেমন—এক নম্বর হোল—মা। তার নিজের ছেলে। তার নিজের বাবা। কুটু। কারও সঙ্গে দেখা হোল না।

মা কোথায় যেতে পারে ? কেন ফ্ল্যাট বেচে দিলো ? বাবাই বা কোথায় ? খোকন কোথায় ? দরোয়ান তো বলছিলো, আপনার বহু ফিন দৌড়ঝাপ করছিলো। এ-বাড়িতে আর আসেনি। ভোর ভোর আবার এ রাস্তা দিয়ে দৌড়োচ্ছিলো বহু-রানী—

রবি ফিরে এসেছে। সিঁড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে নেমে এসেছে। শীতকালের সন্ধেবেলায়। চেতলায়।

এক শীতের শেষে নতুন সরকার এলো। তারপর আরেক শীত এসে চলে যাবার সময় হোল। এর ভেতর সে আর কলকাতায় আসেনি। যেসব জায়গায় রবি এক সময় পালিয়ে পালিয়ে গিয়ে হাজির হয়েছে—বেলদা, সোনামুখী, ঈশ্বরীতলা, বেলকিরহাট—সব জায়গায় সে খুঁজে খুঁজে গিয়ে হাজির হয়েছে। কোথাও সে এক সময় এক সন্ধে কাটিয়েছে। আবার কোথাও বা হৃদ্যভোর খড়ের গাদায় লুকিয়ে থেকে রাতের বেলায় খেতে বেরুতো রবি। ঘুরতে ঘুরতে এই চণ্ডীমণ্ডপ। শশাঙ্কদার বুড়ি হয়ে সে এখানে প্রথম এসেছিলো।

সেদিন খোকনের সঙ্গে দেখা হোত যদি। কতদিন হারামজাদাকে কোলে নেওয়া হয় না। এতদিনে কত বড় হোল। ওর মায়ের ছবি এর ভেতর একদিন কাগজে বেরিয়েছিলো। স্পোর্টসের পাতায় খবরটা আর পড়ে দেখা হয়নি রবির।

দরোয়ান বলছিলো, বিশ্বনাথবাবু এখন বড় গাইয়ে বাজিয়ে আদমি। তার সঙ্গে কুটু দিদিমণিকে দেখা যায় মাঝে মাঝে। নিউ রোডের মোড়ে দাঁড়ালেই দেখা হয়ে যাবে। বৈকালের দিকে—

কথাটা রবির ভালো লাগেনি শুনতে। একদম ভালো লাগেনি। এখন তো কুটুর পড়াশুনোর সময়। আবার এও মনে হয়েছে—আমি আর সংসারের কতটুকু। আমি বলারই বা কে?

তারপর এই দুটো শীতের মাঝখানে একটু একটু করে অনেক কথাই তার কানে এসেছে। বাবা কখনোই খুশী নয়। বাবা ছাড়া পেয়েও ফেরার। সংসার থেকে ফেরার। কোথায় গেল কে জানে? বাবা আর মা যে একসঙ্গে নেই—এটা যেন তার কাছে একদম পরিষ্কার। একসঙ্গে এক জায়গায় থাকলে ওরা তো গোড়াতেই আমার খোঁজ করতো। আমাকে খুঁজতে হোত না ওদের। আমাদের সংসারের ভেতরটা এমন করে কখোন আলগা হয়ে গেছে—আমরা কেউই তা খেয়াল করিনি। আমি তো করিইনি। আমারই জন্যে—শুধু আমারই জন্যে—

ডাউন ট্রেন উল্টোদিকে চলে যেতেই কলকাতার গাড়ি নড়ে চড়ে উঠলো। মা, বাবা, খোকন, কুটু, মালবিকা—এই পাঁচটা নাম রেলের চাকায় আর পাটিতে ঘষাঘষি খেয়ে বারবার কামরার ভেতর রবির কানে এসে বাজছিলো। মা-বাবা-খোকন-কুটু-মালবিকা—। খোকনের ওপর একস্ট্রা জোর। খোকনের নামের জায়গাটায় রেলের পাটিতে লোহার চাকাগুলো যেন বেশি ঘস্টানি খাচ্ছিলো। সেবারে মালবিকা আমার লক-আপের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলো। সন্ধ্যে-বেলা। তার একটু বাদেই আমি চালান হয়ে যাই। ভ্যান এসেছিলো গাছতলায়। সেই তো খুকুর সঙ্গে শেষ দেখা। আবার রেলের পাটিতে খোকনের নামটা লোহার চাকার নিচে ঘস্টানি খাচ্ছে। ক্রমাগত। একই ভাবে। ও খোকোন। খোকোন-রে-এ—

কয়েক দিন রবি নিউ রোডের মোড়েও দাঁড়িয়ে দেখেছে। দরোয়ানের কথা মত। বৈকালের দিকে। কোথায়। সবার সঙ্গে দেখা হয়। হয় না শুধু কুটু আর বিশ্বনাথের সঙ্গে। হায়ার পারচেজের নতুন দোকানটার গায়ে একদিন বাচচুর সঙ্গে দেখা হোল। কিন্তু কোন কথা হয়নি। কি কথা বলবে রবি। যার দিদি দৌড়োবার জন্যে নিজের সংসার থেকে দৌড়ে পালিয়ে যায়—তার সঙ্গে কোন্ সুবাদে কথা বলবে সে।

ট্রেন হাওড়ায় ইন করলো। এখন অফিস টাইমের সেই ভিড় পার হয়ে গেছে। মাঝে মধ্যে কলেজ জীবনের দু-একজনের সঙ্গে দেখা হয় তার। প্রতাপ এখন শ্রীরামপুরের কলেজে কেমিস্ট্রির লেকচারার। নতুন স্কেলে। আহিরিটোলা থেকে হেঁটে এসে রোজ ট্রেন ধরে। এরকমই একদিন কলকাতায় এসেছিলো রবি। তখন সাবওয়ের পাতালে দেখা হয়ে যায় প্রতাপের সঙ্গে। এখন ক্ল্যাশফেন্ডরা অনেকেই নিশ্চয়ই চাকরি করে। তারই শুধু কেমিস্ট্রি অনার্স নিয়ে পরীক্ষায় বসা হোল না। এখন এক এক সময় রবির মনে হয়—সে তার খুব জানাশোনা বাসরুটে দাঁড়িয়ে আছে অনেকক্ষণ। তার ঘড়িটা বলে সব বাস চলে গেছে। তবু সে দাঁড়িয়ে। কারণ, সে জানে না—তার ঘড়ি পঁয়ত্রিশ মিনিট স্লো।

ডালহৌসির মিনিবাসে উঠতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিলো। আবার রবির পা কেঁপে গিয়েছিলো। টাল খেয়ে হ্যান্ডেলটা ধরলো। শকত করে। নয়তো আবেক ঝাঁকুনিতে নির্ঘাৎ ফুটবোর্ডে। শহরের গায়ে যে এত বড একটা নদী—তাতে গাদাবোট ভাসে—কেউ লক্ষ্যই করে না—দুই শহরের কেউ দ্যাখেও না। দেখার সময় নেই কারও। আমি এইসব মানুষের ভালো করতে গিয়েছিলাম। আসলে এদের খারাপ ভালো—কোনোটাতেই আমার বিশেষ কোন হাত নেই। এখন আর আমার ভিড় ভালো লাগে না। গঙ্গায় দূরের চলন্ত নৌকো মিনির জানলায় বসলে স্থির লাগে। বছর তিনেক আগে একদিন শেষ রাতে রবিকে ওরকম একটা ডিঙ্গি এক মাঝ গঙ্গা পার করে দিয়েছিলো। পুলিশের চাপ পড়লে সে শহর পাল্টাতো। এপার থেকে ওপারে। ওপার থেকে এপারে। ধরা পড়ার আগে রবি এক বাড়িতে পালিয়ে থাকার সময় এ টেল অব টু সিটিজের রসানুবাদ পড়েছিলো। ডিকেন্স আসলে নভেলিস্ট? না, একজন সোস্যাল রিফর্মার? আসলে তিনি কে ছিলেন? সেইটেই আগে ঠিক করা দরকার। আচ্ছা—মা কোথায় যেতে পারে? ফ্ল্যাট বিক্রির টাকা হাতে নিয়ে—

কোল ইণ্ডিয়ার গেটে এসে চমকে গেল রবি। সে যখন স্কুলে পড়তো—তখন বাবা তাকে একদিন হাত ধরে অফিস দেখাতে নিয়ে এসেছিলো। তখনো কোল ন্যাশানালাইজড হয়নি। আর এত বছর পরে এই সে কোল ইণ্ডিয়ায় ঢুকছে। কত বদলে গেছে। আগেকার সেই আনাড়ি চেহারা নেই অফিসটার। চমকে যেতে হয় পাপোস দেখলে। কত বড়। তাতে নারকোলের রঙীন ছোবড়া দিয়ে লেখা—কোল ইণ্ডিয়া। তার পরেই কাচঘেরা এয়ার কণ্ডিশনড রিসেপসন। টপ বি একস লাইনের পাশে হেড-ফোন মাথায় ক্যাপড়ের অ্যাডভার্টাইজমেন্টের তন্বী একজন বসে। তাকে দেখেই বললো, ইয়েস—

রবির গালে এখন আর সে দাড়ি নেই। স্লিপে নাম লিখে দিলো।

ওপরে ফোন করে মেয়েটি বললো, ঋষি ইজ আউট অব স্টেশন।

অনাথ চক্রবর্তী?

ওয়েট এ মিনিট প্লিজ। বলে ফোন করে মেয়েটি নাম জানতে চাইলো।

বলুন রবি বসু—

ফোনে কি কথা বলে মেয়েটি পরিষ্কার বাংলায় বললো, আপনাকে লোকেট করতে পারছেন না।

বলুন—সন অব দিলীপ বসু—এ্যান একস এম'লয়ী অব কোল ইণ্ডিয়া—

মেয়েটি উঠে দাঁড়ালো। আপনি যান। ফিফথ ফ্লোর। রাইট হ্যাণ্ডে থার্ড কিউবিকল্।

দরজায় অনাথ দাঁড়িয়েছিল। রবিকে দেখে বললো, এসো। কত লম্বা হয়ে গ্যাছো। অনেক দিন তো দেখিনি তোমাকে—

রবি কোন কথা না বলে সোজা হর্স সু টেবিলের সামনে তিনটে চেয়ার মাঝেরটায় বসে পড়লো। মেঝেতে কার্পেট চেয়ারে ফোম, টেবিলে কাচ, দেওয়ালে সেই কাঠের ওপর আর্টিস্টের আঁকা টাঙানো। ঘেরাটোপ থেকে আলো পড়ছিলো। শীত না ফুরোতেই এয়ার কন্ডিশনার চালু। টেবিল ল্যাম্পের ছায়ার ওপর থেকে অনাথ চক্রবর্তীর মুখখানা দুলে উঠলো।

তুমি আসবে আমি জানতাম। তোমার বিলিজের খবর তখনকার কাগজে বেরিয়েছিল—

আমার বাবা কোথায়?

সে তো আমি জানি না। আর—আমাকে বলেও তো যায়নি। তোমরাই এখন দেশের ইয়ং রিফর্মার—। বলেই অনাথের মনে হোল—তার তো এতটা এগিয়ে গিয়ে মিশবার কোন দরকার নেই। সে-ই বা এতটা অ্যাপোলজিটিক হবে কেন?

আমার বাবা কোথায়?

বললাম তো।

না। মানে—আপনাদের সঙ্গেই তো এতকালের ওঠাবসা।

দ্যাখো রবি—আমায় যদি কোশ্চেন করো—আমিই বোধহয় সবচেয়ে গুছিয়ে বলতে পারবো। হয়তো ঋষির চেয়েও ভাল পারবো। এযার কুলারটা বন্ধ করে দেবো? তোমার শীত করছে?

না। যা বলছিলেন বলুন—

ইউ কান্ট অর্ডার মি। তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছো।

যা বলছিলেন বলুন না। আপনারা তো অনেক দিন একসঙ্গে আছেন—

তা আছি। মানে ছিলাম আর কি। তোমার বয়স কত এখন?

রবি তার বয়স বললো।

ও হরি। আমি আবার জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি কেন? আমি তো তোমার বাবার বিয়েতে বরকর্তা ছিলাম। তোমার ঠাকুর্দা তখন আউট অব স্টেশন। আমার অনুমতি নিয়ে পাত্রীপক্ষ ছেলেকে ছাদনা-তলায় নিয়ে গেল। এগজাক্টলি অ্যাট ইওর এজ দিলীপ জয়েন কোল ইণ্ডিয়া।

মানুষ বেঁচে থাকলেই বয়স বাড়ে। এ আর নতুন কি?

আমি নতুন নতুন কথা বলে তোমাকে

বিনোদন অমৃত ১৩৮৫

আমার স্বামীর প্রেম অভিযান ও বিষাদ

গরুমারার প্রাগৈতিহাসিক জঙ্গলে ভালবাসা ও অবিশ্বাসের কাহিনী লিখেছেন তাপস গঙ্গোপাধ্যায়

হেমন্ত ও হেমন্তকুমার

জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোর রঙীন ও সচিত্র মুহূর্ত তুলে ধরেছেন সমীর চট্টোপাধ্যায়

বড় খেলার টেনশন গ্ল্যামার ও ধিক্কার

প্রচণ্ড টেনশনে ও গ্ল্যামারে মুগ্ধ দর্শক যে খেলোয়াড়কে জয়মাল্য তুলে দেয়, তাকেই একদিন ধিক্কার দিয়ে বিদায় করে খেলার মাঠ থেকে—খেলা মনোমত না হলে। লিখেছেন সুভাষ ভৌমিক

খুকুর সঙ্গে দেখা হবে শনিবার

প্রেমিক লেখকের নিমগ্ন দিনলিপি
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে

বিজন ভট্টাচার্য

নবান্ন থেকে মরাচাঁদ—অবিস্মরণীয় বিজন ভট্টাচার্য মঞ্চ আর ব্যক্তিত্ব নিয়ে আশ্চর্য কাহিনী লিখেছেন সুরজিৎ ঘোষ

হেমন্ত

প্রেম অভিযান বিষাদ

বিজন ভট্টাচার্য

অস্তাচলের আগে শান্তিনিকেতন

লিখেছেন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী অরুণা সেনগুপ্ত

ভারত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট টেস্ট

প্রসঙ্গে নানা রোমাঞ্চকর ঘটনা, পরিসংখ্যান আর ছবি
লিখেছেন শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়
বেরোবে ডিসেম্বরের শেষে

দাম পাঁচ টাকা ডাকমাশুল ২·২৫

অবিলম্বে যোগাযোগ করুন ঃ সার্কুলেশন ম্যানেজার,
অমৃত পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। কলকাতা-৭০০০০৩

ইমপ্রেশ করতে বসিনি রবি। আমিই দিলীপকে রাস্তা থেকে তুলে এনে এখানে বসিয়েছিলাম।

তার দাম তো বাবা দিয়েছে—

ওভাবে সবটা দেখো না রবি। তোমার বাবাকে প্রথমবার যখন দেখি—তখনো যে সৌম্য মুখশ্রী দেখেছিলাম—শেষবারও—মানে লাস্ট যে দেখা হয় আমাদের—তখনো সেই একই মুখশ্রী। কাম, কুল অ্যান্ড কালেকটেড। অথচ ওর মন ঘিরে তখন যে কী এক মেঘ ঘনিয়ে উঠলো—তার কোন হদিশই সেদিন পাইনি আমরা। ওর রাস্তা ছিলো—মানি তো গণ্ডার—লুটি তো তো ভাণ্ডার। অথচ—

বাবার কেসটা কি ছিল?

বলবো?

বলুন না;

হি ওয়াজ সাফারিং ইনসিগনিফিকান্স। দিলীপ তার সব প্রতিভা নিয়ে অনেক দিন ধরেই বিকশিত হতে চাইছিলো। রাস্তা পাচ্ছিলো না।

রাস্তা তো আপনাদেরই।

আমার কিছু করার ছিল না রবি। সেটাই ও বিশ্বাস করেনি। আমার মনে হয়—তাই থেকেই আউটবার্স্ট। তুমি শুনেছো নিশ্চয়।

কিছু কিছু। সবটা নয়।

শুড আই রিপিট?

না। দরকার নেই। এখন শুনে কি করবো। আমি তখনো ধরা পড়েছি কি? মনে নেই। কিংবা জেলে হয়তো। তখনই বাবার কথা আমার কানে আসছিলো।

হি ওয়াজ আনপ্রেডিকটেবল। টেম্পেস্ট সেভেন হর্স পাওয়ারের এনার্জি। ওকে হ্যান্ডেল করার মত এক্সপার্টাইজ আমাদের ছিল না।

বাবার কিন্তু আপনাদের ওপর ভীষণ ঝোঁক ছিল। একদম অন্ধ ঝোঁক। যার তুলনা এখনকার পৃথিবীতে কোন যুক্তিই নেই।

সেটাই ওর মনকে আচ্ছন্ন করে রাখতো।

আপনাদের জন্যে বাবা কী না করেছেন। বন্ধু কথাটার ওপর এত স্ট্রেস দিতেন বাবা।

আমি জানি রবি। ওর নিজের ভোকাবুলারিতে মেশানোশি দিলো এক নম্বর ওয়ার্ড।

কিন্তু খাদান নিয়ে বাবা যখন ঝাঁপ দিলো—আপনারা তখন সবাই একই টিউনে ঝাঁপ দেননি। একথা কেন মনে হোল তোমার?

বাবা নিজে আমাকে কখনো কিছু বলেননি। কিন্তু বুঝতাম তো সব—

কি বুঝতে?

দেখতাম—বাবা কী একা একা পেয়ার বিকিং করে চলেছেন। তখন তার পাশে কেউ নেই।

কমিশন ওয়াজ দেয়ার।

সে তো সব জায়গাতেই থাকে। আমার বাবা কি সেফ কমিশন এজেন্ট ছিলেন? তাঁর চেয়ে বেশি কিছু কি নয়?

নিশ্চয় বেশি। কিন্তু রবি—যে যা দাম্ভ করে—তার ভেতর থেকেই তাকে অ্যাকাউন্ট ফর করতে হয়।

নিশ্চয় মিস্টার চক্রবর্তী। কিন্তু বাবা তো হিসেবের বাইরে গিয়েও বিজনেস আনতেন। আমি নিজের চোখে দেখেছি। ভোর ন-টা থেকে রাত বারোটা। বাবাকে ঝাঁপ দিতে বলে আপনারা দশটা পাঁচটা কোল ইণ্ডিয়া করে গেছেন। অথচ—

অথচ কি রবি?

বাবা আস্তে আস্তে কোল ইণ্ডিয়া থেকে সরে গেছেন তখন। তাঁর আর ফেরবার রাস্তা ছিল না। এসব কথা কোথায় শুনেছো?

বাবা কোনদিন বলেননি। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম সব।

দিলীপ তোমার বাবা ঠিকই। কিন্তু তাকে কিছুই বুঝতে পারোনি তুমি।

আপনি পেরেছিলেন। একই টেবিলে চোদ্দ বছর আপনাদের দিলীপ বসুকে আপনারা স্কুদ্র দিয়ে আটকে রেখেছিলেন। উঠতে দেননি। এগোতে দেননি। তাকে লালপাতা একটা ওড়ার আকাশ দিয়েছিলেন মাত্র। দরকার মত জালের দড়িতে টান দেওয়া হতো। আমি যে তখন মাঝে মধ্যে পালিয়ে চলে আসতাম বাড়িতে—তখনই দেখেছি—কী টেনশন—কী দুঃখ—কী অভিমান তাঁর।

ইউ লাভ ইওর ফাদার।

শাট আপ। বলে উঠে দাঁড়াল রবি। বেরোতে গিয়ে চেয়ারটা জোরে সরাতেই তা নিঃশব্দে ভারি কার্পেটের ওপর পড়লো। ঘরের আর সব কিছু অটুট। কোথাও কোন দাগ নেই। দিলীপ তখনো বলছিল, জালপাতা সেই আকাশে কমিশনের বেলুনটা উড়িয়ে দিতেন আপনারা। বাবা ভাবতো—আকাশটা কী বড়ীন। আপনারা মাঝে মাঝে জালে টান দিতেন তখন। এসব তো তখনই আমার কানে আসতো। তখন আমি অ্যাবসর্ভ করে আছি। পালিয়ে পালিয়ে আসি। সেবারই আসি—দেখি—তার আগেরবারের চেয়ে বাবা আরেকটু চিন্তিত। আরেকটু বেশি ওবিড। কিন্তু কেউ তাকে বন্ধুদের সম্পর্কে কিছু বলতে পারবে না। তাহলে খারাপ। মা নিজেই আমাদের বারণ করে দিয়েছিলেন। কুটু তো একদিন বলেই ফেলতো—

তুমি ভুল জায়গায় এসব কথা বলছো রবি।

রবি তাকালো। ওষ্টপুটা চেপে বসে আছে। অনাথ চক্রবর্তীর সিঁথি অগোছালো। মাথার একদিকে চুল ঝুলে পড়েছে। চশমাটা টেবিলে। অফিস ফাইলের তিন থাক প্লাস্টিক ট্রে।

তোমার বাবা আসলে একজন প্যারানইয়াক।

কথাটার মানে কি?

অনাথ চক্রবর্তী সরাসরি তাকালো। ছেলেটির বয়স তা তেইশ চব্বিশ তো হবেই। চোয়ালের হাড় উঁচু। কনুইতে কয়েকটা নীল শিরা। খয়েরি হাফশার্ট খাকি গ্যাবার্ডিনের ভেতর গোজা। চোখ দুটো ভাসছে। ডান হাতের আঙুলগুলো শক্ত করে চেয়ারের কাঁধ ধরে আছে। নীল নয় নীল ময়লা। কিংবা ঘরের চাপা নিওন আলোর জন্যেই হয়তো ওরকম দেখাচ্ছে।

মানে যদি বাবা হয় তাহলে হবে?

রবি নিজেকে সংযত করলো।

আর হবে! আপনি বাবার সঙ্গে অনেকদিন মিশেছেন। এটা আপনার একটা ওপিনিয়ন। এর ভেতর আমি কথা বলবো কে।

অনাথ চক্রবর্তী নিজে এগিয়ে এসে ওলটানো চেয়ারটা তুলে জায়গা মত রাখলো। তারপর নিজের মত করেই বলতে লাগলো—রবির দিকে পিঠ ফিরে—দিলীপ আমায় বিশ্বাস করেনি নিশ্চয়। আমি ওকে কোনদিন বিশ্বাস করাতেও পারবো না। আমি তো সর্বদাই চেয়েছি—ও ফুটে উঠুক—রবি পেছন থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো। বেরোবার সময় মনে হচ্ছিল, কোন বড় ডিনারের পর নিঃসঙ্গ এক বুড়ো বয় বাসি বাসনগুলো না ধুয়েই নোংরা তোয়ালে দিয়ে মুছে তুলে রাখছে। আর হেল্পার নেই বলে বাগে গজগজ করছে—দরজার দিকে পিঠ ফিরিয়ে। তার হাতে এখন অনেক কাজ। অনাথ কোথাও দিবে ডিকসনারিটা দেখতে হবে। প্যারানইয়াক কথাটার মানে কি? কি হতে পারে?

রাস্তায় নেমে রবি দেখলো, ডালহৌসির ফুটপাথ জুড়ে রকমারি টিফিনের দোকান বসে গেছে। আলু কাবলি থেকে মোগলের মোরোব্বা। সে নিজেকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলো। ভাগ্যিস এখনো তার লোভ হয়। খাবার দেখলে খাওয়ার ইচ্ছে হয়। এই ইচ্ছেটাও যদি না থাকতো তাহলে?

ওরে বাবা! ভাবা যায় না। তাহলে তো এ পৃথিবীটা শাদা কালো নেগেটিভ পজ থাকা রোলের মতো হয়ে পড়ে থাকতো রাস্তায়। বোকা কাক এসে ঠোকরাতে শুধু।

(চলবে)

বুধের মহাদশায় হেমন্ত

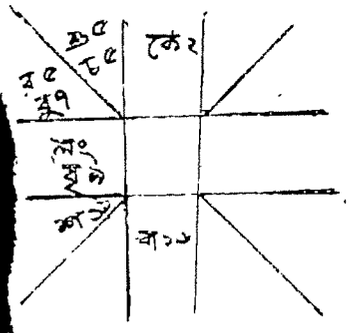

এবার আমরা পাঠকের সামনে
তরুণ সঙ্গীত শিল্পী হেমন্ত মুখো-
পাধ্যায়ের রাশিচক্রটি তুলে ধরছি।
লগ্ন বৃশ্চিক, মৃগশিরা নক্ষত্র, কর্কট

রাশিচক্রটির বিশেষত্ব: ভাগ্যাধিপতি
প্রাপ্তি, কর্মাধিপতি, কর্মপতি। আর
যোগকারক গ্রহ মঙ্গলের নক্ষত্রে চারটি
গ্রহ অবস্থান করায় রাশিচক্রটি যেমন
বল, তেমন অদ্ভুত বলবান হয়েছে।

কর্কট লগ্নের পক্ষে একমাত্র মঙ্গল
রাজযোগ কারক গ্রহ। দেখুন রাশি-
চক্রে, সেই মঙ্গল গ্রহ, তৃতীয়ে স্বীয়
ক্ষেত্রে অবস্থান করে ভাগ্যস্থানকে দৃষ্টি
দিয়ে যেমন ভাগ্যকে বলবান করেছে
তেমনি কর্মস্থানকে দৃষ্টি দেওয়ার জাতকের
কর্মকেও বলবান করেছে। কর্ম এবং
ভাগ্য উভয়েই যদি দৈবাৎ কারো রাশিচক্রে
বলী হয়, তবে সে রাশিচক্রে কিছুরই
'অভাব' অভাব হয় না। এক কথায় সে
রাশিচক্র জাতককে রাজতুল্য ফল দান করে। উপরে
'অভাব' শব্দটির ব্যবহার 'লাভ' ভাবের
বিপরীত ভাবে রাশিচক্রে দেখা যায়—তাঁর
কর্ম ভাল, ভাগ্য ভাল, অথচ লাভ স্থান
বলী; অর্থাৎ তাঁর কর্ম এবং ভাগ্যানু-
যায়ী প্রাপ্তি বা লাভ নেই; লাভ ভাবে কেন
শূন্য থাকে। কিন্তু উপরের রাশিচক্রটিতে
দেখা, ভাগ্যাধিপতি বৃহস্পতি ভাগ্যস্থানকে,
তার কর্মাধিপতি মঙ্গল গ্রহ ভাগ্য এবং
কর্মস্থানকে পূর্ণ দৃষ্টি দেওয়ায়—
একদিকে 'ভাগ্য', কর্মকে তুলে ধরেছে।
আর লাভ বা প্রাপ্তি ভাবে শুক্র এবং
বুধ উভয়ে বলবান শুভ গ্রহের নক্ষত্র
বিশাখা স্থান পাওয়ায় জাতকের প্রাপ্তি-
স্থানও বলবান করেছে। এখানে শুক্রের
অস্তে দোষ হলো না।

রাশিচক্রটিতে আর একটি বিষয়
দেখা, সখ এবং লাভপতি শুক্র,
ধনপতি চন্দ্র, ধনেশ বা ধনপতি রবি,
ব্যয়পতি কর্মপতি অর্থাৎ যোগ কারক
মঙ্গল, সবলেই ঐ যোগ কারক গ্রহ

মঙ্গলের নক্ষত্র পেয়েছে। এ যেন, যশ-মান,
খ্যাতির ঘরকে, ভাগ্য ঘরকে, কর্ম ঘরকে
এবং লাভের ঘরকে একটি বলবান স্তম্ভ
ওপরে তুলে ধরেছে।

নক্ষত্র ধরে বিচারে আরো লক্ষ্যনীয়,
নটি গ্রহের মধ্যে চারটিই পেয়েছে যোগ
কারকের নক্ষত্র; আর বাহু এবং বুধ
পেয়েছে, ভাগ্যপতি বৃহস্পতির নক্ষত্র।
ভাগ্যপতি বৃহস্পতি স্বয়ং পেয়েছে, রোহিণ
এবং অভিলাষিতার কারক গ্রহ বুধের
নক্ষত্র। আমার বলার উদ্দেশ্য, রাশিচক্রটির
সমস্ত গ্রহই শুভ নক্ষত্র পাওয়ায়, সত্যিই
রাশিচক্রটি অদ্ভুত বলশালী এবং সুন্দর
হয়েছে।

জাতকের কর্মস্থানে, আলৌকিক-
মোহজাল সৃষ্টিকারী গ্রহ কেতু, সঙ্গীত-
গন্ধর্ব গ্রহ শুক্রের নক্ষত্র পাওয়ায় জাতক
সবের জগতে মোহ-জাল সৃষ্টিতে এমন
দক্ষ এবং পারদর্শী হয়েছেন। দ্বিতীয়ে
শনির অবস্থানও এ ব্যাপারে লক্ষ্যনীয়।

জাতকের প্রথম জীবনেই প্রায় বত্রিশ
বছর বয়স থেকে শুভ ভাগ্যাধিপতির মহাদশা
পাওয়ায়, জীবনে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে খুব
সহায়ক হয়েছে।

গোচরে বৃহস্পতি এখন জাতকের
লগ্নস্থ তুঙ্গ স্থান পাওয়ায় আগামী
'৭৯ সালের জুলাই মাসের মধ্যে জাতকের
ভাগ্য অতি সুপ্রসন্ন বলে মনে হয়। সিংহ
রাশিতে, জন্মলগ্নস্থ শনির সঙ্গে গোচর
শনি এবং বাহুর মিলন জাতককে আবার
বিদেশ ভ্রমণের ইঙ্গিত দিচ্ছে। জাতকের
বর্তমানে বুধের মহাদশা চলছে বুধের
দশাও মধ্যমক্রম ফলে, এবং শুক্রের
অন্তর্দশা ও জাতকের পক্ষে শুভ ফল-
দায়ক হবে। কারণ দশাপতি বুধ, বৃহস্পতি
ষষ্ঠস্থ হয়।

সাপ্তাহিক ভবিষ্যৎ

মেষ :—ব্যয় বৃদ্ধি, মোকদ্দমায় এবং
চিকিৎসকদের, পসার বাড়বে, বিবাদী-
ভাবাপন্ন ব্যক্তিরা সমঝোতায় আসবে। বৃহস্পতিবার অশুভ।

বৃষ :—চাকুরেদের মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকবে। আপনার নতুন যোগা-যোগও লক্ষ্যনীয়। কিন্তু, পরিবেশে কোন ব্যাপারে সোমবার মানসিক চাপ থাকবে।

মিথুন :—বাসস্থানের ঝামেলা এখন এড়িয়ে চলুন। অপরের বুদ্ধিতে নিজের ক্ষতির সম্ভাবনা। লেখক, সাহিত্যিকদের পক্ষে সময়টা অনুকূল। তবু, মঙ্গল বুধবার অশুভ।

কর্কট :—সপ্তাহের শুরুতেই হাতে অর্থ আসবে।

সিংহ :—যদিও আর্থিক ক্ষেত্রে নৈরাশ্য থাকবে, কিন্তু, ইঞ্জিনীয়ারিং কাজে সফল পাবেন। সুফল আসবে প্রেম প্রীতিতেও। মঙ্গল বুধবার কিছু প্রাপ্তি আছে।

কন্যা :—ধীর স্থিরভাবে ঘটনার মোকা-বিলা করুন, প্রাক্তন স্থানীয় কারুর দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। বৃহস্পতি, শুক্রবার অনেকাংশে ভাল।

তুলা :—আয়ের থেকে ব্যয় বেশী, জমানো টাকায় হাত পড়তে পারে।

বৃশ্চিক :—আগের ঝামেলার নিষ্পত্তি হবে।

ধনু :—ব্যবসাতে পসার বাড়বে। কিন্তু, চাকুরেদের কর্মস্থানে হঠাৎ কোন ঘটনা মনের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। শুক্রবার অশুভ।

মকর :—মান, মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

কুম্ভ :—আইনগত ব্যাপার এড়িয়ে চলুন। কাজে-কর্মে উৎসাহ পাবেন।

মীন :—যদিও বৃহস্পতি এখন অত্যন্ত শুভ ফল দাতা। তবুও ব্যয় এবং কর্মস্থানের ঘটনা মনের উপর চাপ সৃষ্টি করবে। কোন বন্ধুর সঙ্গে মনোমালিন্য অসম্ভব নয়। বৃহস্পতি শুক্রবার অশুভ।

শ্রীনাগিকা

আগামী সংখ্যায়
দেবব্রত বিশ্বাস

অসীম মৌলিককে মনে পড়ে?

সুভাষ ভৌমিক

মনে পড়ে? ষাটের দশকের সেই দুর্ধর্ষ স্ট্রাইকার? পেনালটি বক্সের আশপাশের বল পেলে ষাঁড় পা ইনজিনের পিসটনকেও হার মানাত। একদা খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার জন্য মানুষটাকে রেলের ইনজিন মুছতে হোত—সেই সময়ে যখন টপ ফরমে ময়দান দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। বোজ খেলার পাতায় তখন হেড লাইন দখল করতেন। এখন তাঁর কথা কে আর মনে রাখে?

অসীমদা কিন্তু তাঁর দায়িত্ব ভোলেন নি। মাঠ থেকে অবসর নিয়েছেন আজ প্রায় এক যুগ। কিন্তু বানভাসি দক্ষিণ বঙ্গের মানুষজনকে সাহায্য করার জন্য যেই ডাক এল, সঙ্গে সঙ্গে চাকরি-বাকরি, ঘর-সংসার ভুলে এক কথায় আবার মাঠে ফিরে এলেন।

গত দশই নভেম্বর। বিকেল বেলা দার্জিলিং মেল ধরব বলে শেয়ালদা গিয়েছি। মুখ্যমন্ত্রীর বন্যাত্রাণ তহবিলের জন্য টাকাকড়ি, ওষুধপত্তর, জামা-কাপড় তোলার জন্য আমরা যাচ্ছি উত্তরবঙ্গে। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি আর মালদায় তিনটে খেলা খেলব, আর শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে হাত পেতে বেড়াব। আমরা মানে গত ত্রিশ বছরের চাবটি জেনারেশনের উনিশ জন ফুটবলার। যাদের অনেকের খেলা গ্যালারিতে বসে দেখেছি বা, কাগজে পড়েছি সেই প্রদ্যোৎ বর্মন, চুণী গোস্বামী নীলেশ সরকার, পি কে ব্যানার্জি, বিদ্যুৎ মজুমদার, বলরাম-এর মত দিক-পালের সঙ্গে পরবর্তী পিরিয়ডের সুকুমার সমাজপতি, পরিমল দে, কাজল মুখার্জি, শান্ত মিত্র, অশোক চ্যাটার্জি, সুনীল ভট্টাচার্য, অসীম মৌলিক, শ্যাম থাপা, সমরেশ চৌধুরী, শ্যামল ঘোষ, সত্যজিৎ মিত্র, মানস ভট্টাচার্য ও আমি।

কেউ বলে নি যে, কিছু করতে হবে। কিন্তু চুণীদা ও শানুদাকে (শান্ত মিত্র) যারা চেনেন, তাঁরা জানেন, এদের কিছু বলতে হয় না,—ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোই এদের স্বভাব। দুজনে মিলে ঠিক করলেন, দলবল নিয়ে উত্তরবঙ্গে যাবেন, খেলে টাকা তুলবেন। খরচ-খরচা যা লাগবে আপাতত নিজেরাই দেবেন। হিসেব করে দেখলেন সবচেয়ে কম খরচ পড়বে যদি একটা বেলের কামরা দিন চারেকের জন্য বুক করতে পারেন। তাতেও প্রায় সাত হাজার টাকা লাগবে, বেল ভাড়া ও খাই-খরচা ধরে। চুণীদা, শানুদা বিদ্যুদা ও সুনীলদা চারজনে প্রত্যেকে নিজের পকেট থেকে দিলেন এক হাজার টাকা। খেলার মাঠের নিত্যবন্ধু বপ্পিং চ্যাটার্জি নিজের থেকে দিলেন তিন হাজার টাকা। স্টেট ব্যাংক শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি ও মালদায় আমাদের থাকা খাওয়ার দায়িত্ব নিলেন। ঠিক হতেই বওনা দিলাম।

বিকেল সোয়া তিনটায় ট্রেন ছাড়বে। বাকি বড়জোর আর এক মিনিট। সবাই এসে গিয়েছে—শুধু একজন তখনো এসে পৌঁছায় নি। চুণীদা একটু উত্তে-জিত। শানুদা নার্ভাসভাবে দাঁতে নখ খুঁটছেন। এখুনি ট্রেন ছাড়বে। এমন সময় দেখা গেল যার জন্য সবাই উদগ্রীব, সেই মানুষটি আসছেন। পরনে হাফ-প্যান্টের ওপর একটা স্পোর্টস গেঞ্জি। এক প্ল্যাটফরম মানুষের ভিড়ে মৈনাক পর্বতের মত এগিয়ে আসছেন অসীম মৌলিক। ট্রেন ছেড়ে দিল।

স্পেশ্যাল বগি। ভাডার কড়ি গুনে দিয়েই চলেছি। সন্ধ্যার মুখে বোলপুরে পৌঁছে দেখি কামরার টিম-টিমে আলোগুলো সব মরে গিয়েছে। স্টেশনের কর্তাদের অনুরোধ করলাম, কোন ফল হল না। ওই অবস্থাতেই ট্রেন ছেড়ে দিল। মরীয়া হয়ে অসীমদা বললেন, সুভাষ চেন ধরে টান। টানা নয়, অসীমদা আর আমি, জয়েন্টলি প্রায় পৌনে দুশ কিলো, চেন ধরে ঝুলে পড়লাম—আর তখনই আবিষ্কার করলাম ট্রেনের কামরার চেনগুলো সুন্দরী যুবতীর কণ্ঠহারের মত কমনীয়। টানলে ছিঁড়ে যায়—ট্রেন থামে না।

রাতে জামদা চুইয়ে যেটুকু জ্যোৎস্না আসছিল তাতেই সবাই মিলে বেলের ক্যাটারারের পরিবেশনে ভাত খেলাম না ফাকর চিবোলাম জানি না। সকালবেলা চোখ মেলে দেখি শিউ জল-পাইগুড়ি স্টেশন হট্ট ফটে বোদে ঝক-ঝক করছে।

স্টেট ব্যাংকের শিলিগুড়ি যন্ত্রের বন্ধুরা এসে আমাদের নিয়ে গেলেন স্থানীয় সরকারী ইন্সপেকশন বাংলোয়। আমার বাবা থাকেন কার্টিহারে। বহুদিন আমার স্ত্রী খুকু শ্বশুরবাড়ি যায়নি বলে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। যাওয়ার আগে বাবাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলাম, আপনি দশা করে শিলিগুড়িতে এসে খুকুকে নিয়ে যাবেন, আমি নিরুপায়, দলের সঙ্গে থাকতে হবে। কিন্তু শিলি-গুড়িতে পৌঁছে দেখি বাবা তখনো এসে পৌঁছোন নি। অর্থাৎ আমার পাঠানো চিঠিটা সময় মত পান নি। অস্বস্তি বোধ করছি দেখে চুণীদা বললেন, ডোনট ওরি সুভাষ, খুকু আমাদের সঙ্গে ইন্সপেকশন বাংলোয় উঠবে। তাই উঠলাম। খানিক বাদে বাবা এসে গেলেন। আমরাও জল-খাবার খেয়ে বাস্তায় মিছিল করে বেরিয়ে পড়লাম। কারো হাতে কৌটো, কেউ নিয়েছেন মাইক, কেউ কেউ চাদরের খুঁট ধরে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘুরে সাহায্য চাইছেন।

তিনদিনে তিনটি শহরে সকালে পদযাত্রা ও বিকেলে খেলার ফলে সত্তর থেকে পঁচাত্তর হাজার টাকার মত বোধহয় তোলা গেল। শিলিগুড়িতে ফুটবলার-দের দুই বন্ধু ননী চন্দ ও শ্যামা সরকার সব রকমে আমাদের সাহায্য করলেন। সর্বত্র পেয়েছি অসংখ্য বন্ধু। কিন্তু সেই বন্ধুরাও আমাদের দুশ্চিন্তা দূর করতে পারলেন না। অসীম মৌলিক নিখোঁজ। জলপাইগুড়িতে সকাল আটটায় আমরা বেরিয়েছিলাম দান সংগ্রহে। বেলা একটা হয়ে গেল। আড়াইটায় খেলা। তবু অসীমদার পাত্তা নেই। কোথায় গেল সেই মৈনাক পর্বত। খোঁজ, খোঁজ। বন্ধু-বান্ধব সবাই ফের বেরিয়ে পড়লেন, রাস্তায়, যদি মানুষটার হদিশ মেলে। একে একে সবাই ফিরে এলেন—অসীমদার কোন হদিশ নেই। সবার মুখ চুণ। মাঠে নামব কি না, এই ভাবনাই সবার মনে। এমন সময়, খেলা শুরুর মিনিট পনেরো আগে দেখি মৈনাক পর্বত এক মাথা ঘোর নিয়ে হন হন করে আসছেন, হাতে একটা বিরাট বাজারের থলি—চটের। চুণীদা গুম মেরে ছিলেন। মুখ খোলবার সুযোগই পেলেন না। ঘরে ঢুকে থলিটা উপুড় করে দিতেই টাকা-আনা-পাইতে টই-টম্বুর টিনের কৌটো সমেত একরাশ টাকা-পয়সা মেঝেয় ছড়িয়ে পড়ল। দিলখোলা হাসিতে ঘরের গুমোট উড়িয়ে দিয়ে অসীমদা বললেন: একটু দেরী হয়ে গেল। কিন্তু কি করব। কৌটোটা ভর্তি হয়ে গেল, তবু দেখি লোকে দিতে চায়। তখন বাজার থেকে এই থলিটা কিনে নিলাম। তারপর বাড়ি বাড়ি গিয়ে বললাম, আমি অসীম মৌলিক, এক সময় তো আপনারা আমাকে চিনতেন, এখন এক কাপ চা খাওয়াবেন? কি একটা সিগারেট? যেই রাজি হয়েছেন তাকেই বলেছি, দাদা খাওয়াতে হবে না শুধু মুলোটুকু ধরে দিন। নাও চুণীদা ওই সব অমূল্য দানের বিদুরের খুদ সব ঢেলে দিলাম, এখন কুড়িয়ে কাঁচিয়ে নাও। বলেই হন হন মুখ ধুতে বাথরুমে চলে গেলেন অসীমদা। এই মানুষটাকেই আজ সবাই ভুলে গিয়েছেন। যে ভোলে ভুলুক, অসীমদা কিন্তু তাঁর দর্শকদের, গত বন্যা যাদের অনেককেই নিঃস্ব করে ছেড়েছে, ভোলেন নি।

...ান পাপী

পাধ্যায়

...বং খেলোয়াড়ী মান-
...ল স্থান বিদ্যালয়গুলি,
... গুণগত ভাবে ধরলে
...ষ আছে। উচ্চবিত্তদে-
...ব বিদ্যালয় এবং নিম্ন-
উচ্চবিত্তদেব বিদ্যালয়ে
... ছেলেরা। তাদের মন
...খলাধুলোব অছে অঢেল
...খান থেকে ভালো ফুট-
...বা অ্যাথলিট কি তৈরীব

...যে উপরোক্ত যে কোনো
... লাগে মন প্রাণ দিয়ে
...। কিন্তু উচ্চবিত্তদেব
...লমেষেব অভিভাবকদেব
...ডাতাড়ি পাশ করিয়ে বড়
...য় নিয়ে যাওয়া তাঁদেব
...ব কোনই প্রেষণা নেই।
... ছেলে বাজার খেলা
এবং যারা টেঁকে তারা
খেলে না। তাই আজ
...স্থান পাকিস্তানেব কাছে
...প নয়। কিন্তু ফুটবলার
...ত হলে যে কষ্ট এবং যে
...সে তা এই উচ্চবিত্তদেব
...ষ কারণ তাদের স্বভাবতই
...। যাব ফলে তাদেব এই
...া য় না এবং সব থেকে
...ন গলে অমল কিক্রেটাব
...ধরলে ক্রিকেটাবেরা যা
...লসিটি পায় ফুটবলাবা
...লেও বর্তে যেতো। এই-
...এর পরও আছে মোটি-
...কেন একটা উচ্চবিত্ত
...ভালো খেলোয়াড় হতো
...া এবং সামাজিক ধরনেব
...ন দেশেব যতগুলো দামী
...যিত ছেলে পড়ে তাদেব
...ধুলোব ব্যবস্থা থাক,
...লো খেলোয়াড় তৈরী
...।

...াক মধ্যবিত্তদেব কথায়।
...কেবো জটিল। সেখানে
...লোব ব্যবস্থা, আছে
...সাহ বড় খেলোয়াড়
...ছে খলি জলি ছেলে
...নিয়ব, ডাক্তাব কিংবা
...যায়। তারা ভাবেন

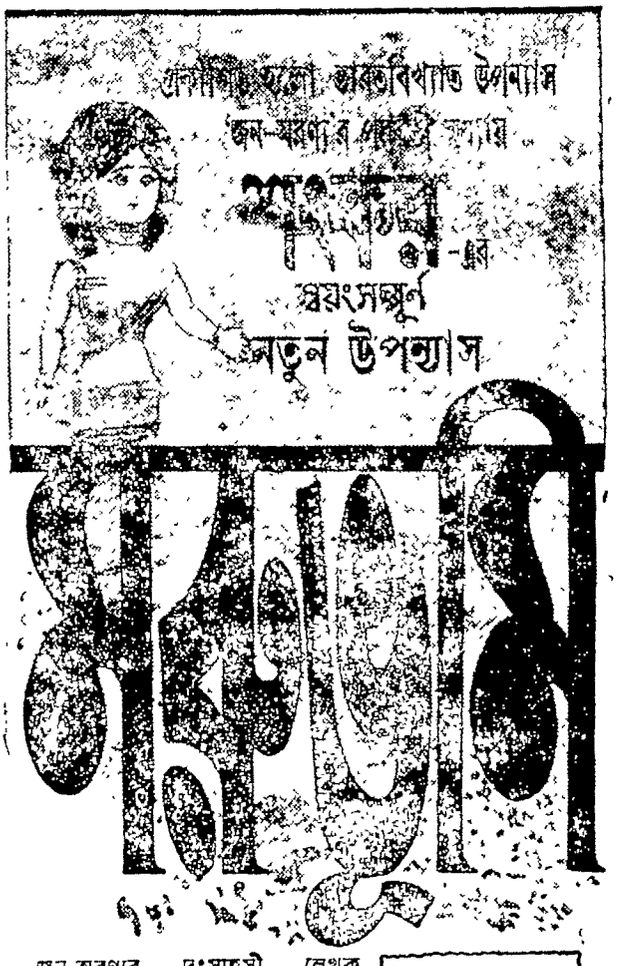

জন-অরণ্যর দুঃসাহসী লেখক একালের যুবক-যুবতীদের সুখ-দুঃখ অনুসন্ধান করতে গিয়ে যেখানে উপস্থিত হয়েছেন তাকে মরুভূমি ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। মরুভূমির মতো উপন্যাস আমাদের প্রয়োজন ছিল। মরুভূমির মতো রচনাই বাংলার ভাইবোনদের মরুভূমি থেকে বেরিয়ে আসার দুঃসাহস যোগাবে। মরুভূমি শুধুমাত্র উপন্যাস নয়—বাংলার অপমানিত যৌবনের এক অপ্রকাশিত ইতিহাস।

মূল দাম ১২৲
প্রথম প্রকাশ উপলক্ষে
বিশেষ ছাড় ২৲
নেট দাম ১০৲
নির্দিষ্ট সংখ্যক বইয়ের ওপর এই সুবিধা তারপর বিনা নোটিসে দাম ১২৲

জন-অরণ্য দাম ১০
মরুভূমির সঙ্গে কিনলে ডাকখরচা লাগে না

শংকর-এর আরও কয়েকটি বই

তনয়া
সুবৃহৎ যুগল উপন্যাস। একমাত্র স্বর্গ মর্ত পাতাল ছাড়া আর কোনো উপন্যাস এতো অল্প সময়ে বিক্রি হয়নি। ১২·৫০ ভিপি ১৬৲

রূপতাপস
রূপের তপস্যায় মগ্ন রূপসাধক ও এক রূপসীর অপরূপ উপন্যাস। বিশেষ মূল্য ৫৲ ভিপি ৭৲

এক ব্যাগ শংকর
ব্যাগ ছাড়া নেবেন না। ৯ থেকে ৯০ পর্যন্ত সকলের জন্য। ৬৲ ভিপি ৯৲

দে'জ পাবলিশিং C/O দে বুক স্টোর
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

শংকর-এর সব বই দে বুক স্টোরে পাওয়া যায় কত অজানারে ১০ টাকা এপার বাংলা ওপার বাংলা ১৫ টাকা যেখানে যেমন ১০ টাকা বিশেষ ৭ টাকা চৌরঙ্গী ২৫ টাকা মানচিত্র ১৫ টাকা স্মাগলার ও সুদেষ্ণা ১০ টাকা

খেলে কি হবে? খেতে দেবে কে? তাই খেলাধুলোয় না আছে বাবা মায়ের চাপ না আছে বিদ্যালয়গুলিতে প্রেরণা দেবার ব্যবস্থা। তাই খুব কম মধ্যবিত্ত বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসে ভালো খেলোয়াড়। সেখান থেকে বেরোয় ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তারের দল। যারা ড্রইংরুমে বসে হা-হুতাশ করা ছাড়া কিছুই করার অধিকারী নন।

একটু পেছনে তাকালে দেখা যাবে আজ থেকে ২০ বছর আগেও মধ্যবিত্ত বিদ্যালয়গুলোয় খেলা-ধুলোর তবু কিছু চেষ্টা ছিলো কিন্তু আজ? কিছুই নেই আছে শুধু ফার্স্ট ক্লাস পাশ করা ছেলে তৈরীর কারবার।

এইবার নিম্নবিত্ত বিদ্যাললয়গুলোর কথা ধরা যাক—সেখানে আসে অত্যন্ত সাধারণ ভাতে ভাত খাওয়া সমাজের ছেলেরা। এরা জন্ম থেকে লড়াই করতে অভ্যস্ত, এইটুকুই শুধু এদের পুঁজির এই সব বিদ্যালয়ে না আছে খেলার ব্যবস্থা না আছে পড়ার পরিবেশ, কিন্তু আজ ফুটবলের অ্যাথলেটিকের মাঠে যে কটা পদ্ম আছে তা সবই ফুটেছে এই পাঁকে। তাদের কেউ না দিয়েছে তালিম না দিয়েছে প্রেরণা। জন্মগত লড়াই করার মেজাজের এই ছেলেগুলো উঠে আসে ধাপে ধাপে, তার পর ধরা পড়ে জালপাতা এই সমাজের একদল দালালদের চোখে শুরু হয় এদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। দাদা, কাকা, মামারা হাতে পায় এক একটা গোলাপ তাদের নিয়ে ব্যবসা ছাড়া আর কিছুই করেন না—ভালবাসা তো অনেক দূরের কথা, আছে শুধু নিষ্ঠুর স্বার্থান্বেষী এক চক্রের খেলা। কি করে নিজের টিম তথা গোষ্ঠি বাজীকে বাঁচিয়ে রাখা যায়।

সব শেষে আছে ৮০ ভাগ মানুষ যাদের জন্য না আছে বিদ্যালয় না আছে কে, অসংখ্য প্রতিভা সেখানে প্রতিদিন মারা যাচ্ছে তা কে জানে। আমরা বুঝেও জ্ঞান-পাপী।

চারপাশের এই হ, য, ব, র, ল, র জগতেও চলছে রমরমা ব্যাপার—নানা স্পোর্টস কাউন্সিল, অসংখ্য বিশেষজ্ঞ। কিন্তু শেষ অবধি এশিয়ান গেমসেও বাম। হারাচ্ছে হেসে-খেলে। কোটি কোটি লোকের দেশে খেলোয়াড় তৈরীর পীঠস্থান বিদ্যালয়গুলো ফল দে হাতে আসে কিছু ওপর যাদের কারুকায কোচেরা যখন সিলেক থেকে ছেলে পান ত সময় থাকে না।

কোচেদের দুঃ তাঁর মন মত টীম ব তাদের হাতে সময় স্যুজি বলতে গেলে ত দেশে যে আধুনিক তার সুযোগ তাঁদের

আমাদের দেশে একটা পাঠশালা আ সেখানে গেলে দেখা যা বিজ্ঞান শিক্ষার সঠিক তাই যখন যে কোনো আসে, আমাদের তা জবাব দিতে হয, ফিজিওলজি সাইকোলা এব অনেক কথা বলতে একে একে তার উত্তর

খেলা

দেওধর ট্রফি

কলকাতায় বল্লি স্টেডিয়ামে দেওধর ট্রফির দ্বিতীয় সেমিফাইনালে পূর্বাঞ্চল ৮১ রানে গত বছরের দেওধর ট্রফি বিজয়ী উত্তরাঞ্চলের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে।

প্রথম দিনে উত্তরাঞ্চল নির্দিষ্ট ৬০ ওভার বল থেকে ৮ উইকেটের বিনিময়ে ২৩৮ রান সংগ্রহ করেছিল। উত্তরাঞ্চল দলের অধিনায়ক দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৫১ রান করেন। প্রথম দিনের বাকি সময়ে ১৮ ওভার খেলে পূর্বাঞ্চল ৪টি উইকেট খুইয়ে মাত্র ৩১ রান করেছিল। মদনলাল ১০ রানে ৩টি উইকেট নিয়ে পূর্বাঞ্চলকে এই শোচনীয় অবস্থায় ফেলেছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের ১০ মিনিট আগে পূর্বাঞ্চল দলের ইনিংস ১৫৭ রানের মাথায় শেষ হলে উত্তরাঞ্চল ৮১ রানে জিতে যায়। পূর্বাঞ্চল ৪৯-১ ওভার বল খেলেছিল। দলের শোচনীয় অবস্থায় ৫ম উইকেটের জুটিতে দুই বোলার যোধ সিং এবং রবণ বর্মন দৃঢ়তার সঙ্গে মাত্র ৫৩টি বল খেলে ৮৯ রান যোগ করেছিলেন। যোধ সিং উভয় দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৫৯ রান করেন। তার এই ৫৯ রানে ছিল সাতটি বাউন্ডারী। অপর দিকে রবণের ৪৪ রানে ছিল ৩টি বাউন্ডারী এবং একটা ওভার বাউন্ডারী।

সংক্ষিপ্ত স্কোর :

উত্তরাঞ্চল : ২৩৮ রান (৬০ ওভারে। মদনলাল ৫১ রান। যোধ দোসী ৩৪ রানে ৩ এবং যোধ সিং ৫২ রানে ২ উইকেট)

পূর্বাঞ্চল : ১৫৭ রান (৪৯-১ ওভারে সকলে আউট। যোধ সিং ৫৯ এবং রবণ বর্মন ৪৪ রান। মদনলাল ১০ রানে ৩ এবং বাকেশ শুক্লা ২৫ রানে ৩ উইকেট)।

দেওধর ট্রফির ফাইনালে খেলবে গত বছরের বিজয়ী উত্তরাঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চল। প্রথম সেমি-ফাইনালে দক্ষিণাঞ্চল ৩ উইকেটে পশ্চিমাঞ্চলকে হারিয়েছিল। এই নিয়ে দক্ষিণাঞ্চল ৬ বছরে পাঁচবার ফাইনালে উঠলো। এই প্রতিযোগিতার সূচনা ১৯৭৩-৭৪ সালে। দক্ষিণাঞ্চল পরপর চারবার ফাইনালে খেলে দেওধর ট্রফি পেয়েছে পরপর দুবার (১৯৭৩-৭৫)। তারা রানার্স-আপ হয়েছে দুবার (১৯৭৬-৭৭)।

চ্যাম্পিয়ান্স হকি ট্রফি

লাহোরে আয়োজিত প্রথম বছরের 'চ্যাম্পিয়ান্স হকি টুর্নামেন্টে' পাকিস্তান মোট চারটি খেলায় ২ পয়েন্ট সংগ্রহের সূত্রে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিল এই পাঁচটি দেশ—বিশ্ব হকিকাপ চ্যাম্পিয়ান পাকিস্তান, ১৯৭৬ সালের অলিম্পিক হকি চ্যাম্পিয়ান নিউজিল্যান্ড এবং রৌপ্যপদক বিজয়ী অস্ট্রেলিয়া, বৃটেন এবং স্পেন। আলোচ্য প্রতিযোগিতায় অলিম্পিক স্বর্ণপদক বিজয়ী নিউজিল্যান্ড শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। তারা চতুর্থ স্থান পায় ৪টি খেলায় মাত্র ২ পয়েন্ট সংগ্রহ করে (জয় স্পেনের বিপক্ষে)।

পাকিস্তান ৬-২ গোলে নিউজিল্যান্ড, ২-১ গোলে অস্ট্রেলিয়া, এবং ৩-১ গোলে স্পেন তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ অস্ট্রেলিয়া ৩-২ গোলে ৪-২ গোলে স্পেনকে প বৃটেনের সঙ্গে ১-১ গোলে তালিকায় দ্বিতীয় স্থান

চূড়ান্ত ফলাফল : (পয়েন্ট ৮), ২য় অস্ট্রেলি (৪,) ৪র্থ নিউজিল্যান্ড (১)।

গেভ্রেগ অস্ট্রেলিয়ায়

ইংলন্ডের প্রাক্তন টনি গেভ্রেগ ইংলন্ড বসব সম্প্রতি পাততাড়ি গুটি লিবায়। সিডনি বিমানবন্দ সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা ক তার অস্ট্রেলিয়া বসবা সার্থক হওয়ায় সন্তোষ প্রক সামনে এখন শুধু ওয়ার্ল্ড মরশুমের হাতছানি। আফ্রিকাজাত এই কি করেছেন ইংলন্ডের কি দিয়েছে। তাই কিকেটে সাসেক্স, বৃহত্তর অর্থে মনে রাখতে চান। তবে আলোচিত সিদ্ধান্তগুলির আস্থা প্রকাশ করেছেন।

ধ্বনি

পোর বাজিমাৎ

সম্পর্কে যদিও একজন ভাইপো, সিনেমায় খুড়ো ছেন হীরালাল, ভাইপো হয়েছেন পান্নালাল।

এবং পান্নালাল জন্ম সূত্রে । হীরালালের বাবা এবং হাতে খুন হয়, হীরা তখন পান্নালালের মায়ের খুনী ই। অনেকটা 'বড়লাটকে ারলাম ভারতবাসী'-র মতো ার জন্য।

ং পান্না অনাথ আশ্রমে জোড়ে। বড় হবার পর তারা পন্ন। আসলে জান্ত বাঘের তুলে দেয়, বিনা অস্ত্রে সব বদমাইসদের ঘায়েল করে। হাতিয়ার বাঁশের বাঁট-ছাতা—এটাও দুর্বৃত্ত থি রাইফেলের সমান য়ে ওঠে। দুজনেই সংগীতে নৃত্যে পারদর্শী।

বং পান্না 'যেখানে আক্রমণ তরোধে' এই শ্লোগানে জেই সমগ্র দেশের যেখানেই চালন, মূর্তি চুরি ইত্যাদি হীরা-পান্নাকে দেখা গেছে র বহন একটি একটি । এই গাড়ির মাত্র দুটি সামনে একটি পেছনে, ন্টা (দমকলের), মাথা এবং , গতি মন্থর।

যথেষ্ট ভক্তিমান, হীরা অন্য নৃত্য-নাট্যের স্টেজে মঞ্চের ীরা এবং পান্না আচমকা র ফলে তারা যথাক্রমে সিংকে লাভ এবং লভ এবং নীতু হস্টেলবাসিনী। র বাবা-মায়ের হত্যাকারীকে ত দিতে চায়। বাপুজীর প্রতিজ্ঞাও করে। পান্নাসহ-থ নেয়।

মূর্তি চোর এবং চোরা-সানা) একটা দলের সংগে চলেছে। এতে অবশ্য

গানের কোনো কর্মতি পড়েনি। না গানের সাহায্যে হয়েছে দুর্বৃত্ত দমন।

শেষ দৃশ্যটি বেশ দীর্ঘ এবং অলৌকিকতার শিখরে উঠে গেছে। এটি পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের যে কোনো আশ্চর্যকে করে দিতে পারে। দুর্বৃত্ত দলের ট্রেন হাইজাকিং, ট্রেনে আগুন লেগে যাওয়া, জ্বলন্ত এবং ছুটন্ত ট্রেনে মারদাঙ্গা, ট্রেনের ইঞ্জিনের অসংখ্য বাড়িঘর ব্রীজ ইত্যাদি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে শেষে গণপতি মূর্তির সামনে এস থেমে যাওয়া—সবই গণপতির অসীম কৃপায়।

জয় গণপতির জয়। এই গণপতির দৌলতে আমরা বুঝতে পারি (পান্নার গলার লকেট গণপতির মূর্তি) হীরার বাবা-মার হত্যাকারী পান্নার বাবা। শেষে অবশ্য পুলিশের গুলিতে নিহত।

পরিচালক অশোক রায়কে ধন্যবাদ। তাঁর কল্পনাশক্তি জুল ভের্ণকে হার মানায়। হয়ত কালক্রমে এইসব দেখতে দেখতে আমাদের আর এগুলোকে অবাস্তব মনে হবে না। কেন না পর্দায় দেখা তো চোখেরই দেখা। চোখ গঞ্জিকা সেবনে অভ্যস্থ হয়ে উঠবে।

ধন্যবাদ রাহুলদেব সেনকে। তার সুর সর্বত্রই সুচারু ভাবে উপস্থিত।

সর্বশেষে আবার ধন্যবাদ গণপতিকে। গণপতির জয় হোক।

প্রভাত চৌধুরী

স্টুডিও থেকে

অবশেষে রাজ্য সরকার অনুদান দিলেন, যদিও সরকারী প্রচার দপ্তর এ-ব্যাপারে নীরব। কোন ঘোষণা নেই, হয়নি কোন সাংবাদিক সম্মেলন। প্রায় চুপি-চুপিই বলা যায়, ভাগ্যবান দশ জনের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে। জানা গেল টাকার পরিমাণও নাকি কমেছে। আশি হাজার থেকে দেড় লাখ পর্যন্ত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে জনপ্রতি।

টাকার পরিমাণ কমে যাওয়ায় দু-একজন নাকি ছবি না করার কথাও ভাবছেন তা যাই হোক, টালিগঞ্জ পাড়ার মুখে মুখে এখন প্রশ্ন—অনুদানের ব্যাপারটা এমন চুপিসারে হল কেন? এবং শুরুতেই রাজ্য সরকার বলেছিলেন তরুণ প্রতিভাদের উন্মেষ ঘটাতেই এই অনুদান প্রকল্প। বাংলায় ভালো ছবি তৈরীর হাওয়া গড়ে তোলার জন্যও অনুদানের কথা চিন্তা করেছিলেন সরকার।

কিন্তু এটা কি হল? কাজে আর কথায় এত ফারাক কেন?

যাঁরা অনুদান পেলেন তাঁদের কজন তরুণ? তাঁদের মধ্যে কজন প্রযোজকের অভাবে নীরব ছিলেন? প্রতিষ্ঠা যে সকল পরিচালকের হাতে অনুদানের টাকাগুলি তুলে দেওয়া হল তাঁরা সবাই-ই কি 'ভালো' ছবি করার যোগ্য। টালিগঞ্জ পাড়ার ইতিহাস কিন্তু অন্য কথা বলে।

সুতরাং গুঞ্জন আবার জমে উঠতে শুরু করেছে। এই গুঞ্জন একদিন না অন্য চক্রান্তে বহতা হয়।

আগেও বলেছি—আবার বলছি। রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রীমশাই, ফিল্মে অনুদান দেওয়া বন্ধ করুন। অনুদান দিয়ে বাংলা ছবির কোন উন্নতি করতে পারবেন না—চারিত্রিক-শৈল্পিক মানও নয়, ব্যবসাতো নয়ই। কারণ এই ব্যবসার কোনে জোনে জমে রয়েছে অনেক অন্ধকার। সেগুলো পরিষ্কার না করে উন্নতির চেষ্টা করা বৃথা হতে বাধ্য হচ্ছেও।

আন্তরিকভাবে যদি ফিল্মের উন্নতিই করতে চান তাহলে হয় এই তিনটি কাজ করুন:—

(ক) রাজ্যের হলগুলিতে বাধ্যতামূলক বাংলা ছবির প্রদর্শনী;

(খ) সেন্সর তারিখ ভিত্তিক ছবির মুক্তির ব্যবস্থা; ও

(গ) প্রযোজক পরিবেশক প্রদর্শকের মধ্যে আয়ের সুষম বন্টন।

জনপ্রিয়তার শীর্ষে! ৬০০ রজনী অতিক্রান্ত

তপন থিয়েটার ৪২৫৪৭৯

শংকর

নাটক/পরিচালনা-সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

বৃহস্পতি ও শনি ৬।।টায়; ছুটির দিন ও রবিবার ৩ ও ৬।।টায়

শ্রেঃ—বিকাশ রায়, সত্য বন্দ্যোঃ, প্রদীপ মুখো, ছন্দা দেবী, সান্ত্বনা, গিরীশ, রঞ্জনী, মিহির, সুনীল, নিখিল, জেন্ট, অরুণ, দীপঙ্কর, উশীনর, শৈলেন, বন্ধু, গণেশ, স্বপন, অলোক, তিমির এবং রত্না ঘোষাল ও তরুণকুমার। [redacted] প্রধান [redacted] ন্দ্যোপাধ্যায়

অবশ্য এটাও জানি এই তিনটি ব্যবস্থা গ্রহণে আপততঃ রাজ্য সরকার অপারগ। স্বার্থান্বেষী মহলের কাছ থেকে প্রবল বাধা আসবে, সে বাধা ডিঙনোর সাধ্য এখন না দেখানোই ভাল।

সুতরাং তিনটি নয়, দুটি কাজ করুন। খুবই সহজ দুটি কাজ। যে কাজে কোন কমিটির প্রয়োজন হবে না। যে কাজে সরকারকে পক্ষপাতিত্বের দোষে অভিযুক্ত হতে হবে না। প্রযোজককেও চাতক পাখির মত সরকারী দাক্ষিণ্যের দিকে চেয়ে বসে থাকতে হবে না।

প্রতিটি কাজ দুটি হল—(ক) অনুদান বন্ধ করুন আর (খ) প্রতিটি বাংলা ছবির প্রযোজককে এক বছরের প্রমোদকর ফেরৎ দেবার আইন করুন। কোন অভিযোগ, কোন পাল্টা অভিযোগ করার সুযোগই থাকবে না তাহলে!

'নাবিক' ছবির স্কোরিং

টেকনিসিয়ানস স্টুডিওর স্কোরিং থিয়েটারে তখন তরুণ সংগীত পরিচালক নিখিলেশ বড়ুয়া গানের রিহার্সাল দেওয়াচ্ছেন অরুন্ধতী হোম চৌধুরীকে। সামনের টেবিলে হারমোনিয়াম আর রেঞ্জার ওয়াই. এস. মলকী মিউজিক হ্যাণ্ডসগুলো সাজাতে ব্যস্ত।

একটু বাদে ও'রা দুজন ঢুকে পড়লেন সাউণ্ডপ্রুফ কাঁচের ঘরে, এখুনি গান গাইবেন ও'রা। 'নাবিক' ছবির গান।

ছবির তরুণ পরিচালক বিকাশ রেকর্ডিংরুমে বসে গান শুনছেন। অরুন্ধতী আর নিখিলেশ আসামের দুটি লোকগীতি গাইলেন। এবং এই গান রেকর্ডিং-এর মাধ্যমেই শুভ সূচনা হল ডবল ভার্সান 'নাবিক' ছবির।

টালিগঞ্জ পাড়ায় দিনকে দিন ভালো ছবির সংখ্যা কমছে, কমেই চলেছে। দর্শকরাও বিব্রত। আমার কথা তরুণ পরিচালক বিকাশ জানলেন তিনি এই ছবির মাধ্যমে দর্শককে নতুন স্বাদ এনে দেবার চেষ্টা করছেন। ব্যবসায়ী প্রযোজক-পরিবেশকের সাহায্যে নয়, বন্ধু শুভানুধ্যায়ীদের চেষ্টায় তিনি শুরু করেছেন এই ছবি।

আসমিয়া ভার্সানের জন্য তিনি আসামের কয়েকজন কলাকুশলী ও সাংবাদিকের সাহায্য পাচ্ছেন। ছবির চিত্রগ্রাহক বিকাশ জানা। ছবির কাহিনী গড়ে উঠেছে ব্রহ্মপুত্রের পার্শ্ববর্তী বিশাল পর্বত্য এলাকার জেলে মাঝিদের সুখ দুঃখ সংগ্রাম নিয়ে।

ছবির জন্য গান লিখেছেন অমিতাভ চৌধুরী, ভাস্কর বসু, আশিষ দত্ত। ক্যামেরা চালাবেন কমল ন[illegible]

মনোজ্ঞ আসর

কলকাতার বিড়লা আকাদমি হলে এক মনোজ্ঞ সঙ্গীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন ওস্তাদ মহম্মদ আমীর খাঁন স্কুল অফ ইনস্ট্রুমেণ্টাল মিউজিক। অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিলেন দুই প্রবীণ বরণীয় শিল্পী রাধিকামোহন মৈত্র এবং জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। অতিরিক্ত আকর্ষণে ছিলেন ১৯৭০ সালে রেডিও সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় স্বরোদে পুরস্কারপ্রাপ্ত এবং তিন বছর (১৯৭৫—১৯৭৮) স্বরোদে জাতীয় বৃত্তিপ্রাপ্ত রাধিকামোহন মৈত্রের সুযোগ্য তরুণ প্রতিভাবান শিষ্য নরেন্দ্রনাথ ধর।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় রাধিকামোহন মৈত্র এবং তরুণ নরেন্দ্রনাথের দ্বৈত সরোদ বাদনের মাধ্যমে। রাগপুরিয়া ধানেশ্রীর আলাপ দিয়ে। আলাপ অঙ্গে রাগের বিস্তারিত রূপ এঁরা পরিবেশন করলেন। বিলম্বিত আলাপে দীর্ঘ মীড় ও আঁশের প্রয়োগ কৌশল শোনার মতো হয়েছিল। নি রে গম প, ম ধ প, প গ ম রে গ, ম গ রে খা প্রভৃতি সুরসমন্বয় অনৌকিক মীড়ের ব্যবহারে অত্যন্ত প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। মধ্যলয়ের আলাপে এবং আলাপের শেষে ঐ রাগেই চৌতালে তারপরণে গমক এবং জটিল বোলবাণীর কাজ শোনা গেল। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন রাধুবাবুর ডান হাতের এক দুর্লভ বৈশিষ্ট হলো ডাডা ও ডিড়ি-র এক জটিল সমন্বয় যা চিরদিন অম্লান ও অক্ষয় মহিমময় সঙ্গীতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। রাধুবাবুর বাজনায় তাঁর গুরুবংশীয় ওস্তাদ মোরদ আলী খাঁ ওস্তাদ আবদুল্লা খাঁ ও ওস্তাদ আমীর খাঁ ছাড়াও ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের বাজনারও প্রভাব পেলাম। এটা খুবই স্বাভাবিক কারণ রাধুবাবুর অন্যতম গুরু ওস্তাদ দবীর খাঁ এবং আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবে[illegible] ওয়াজির খাঁ উভয়েই ত[illegible] বাদক ওস্তাদ ছিলেন। এ[illegible] (রাধুবাবু ও নরেন্দ্রনাথ) সংক্ষিপ্ত ধামার বাজিয়ে শো[illegible] ধামারে রাধুবাবুর বাজনা ক[illegible] ছিল এবং এখনও আছে তা তি[illegible] প্রমাণ করলেন পাখোয়াজে ছিলেন অমলেশ চট্টোপাধ্যায়[illegible] অনুষ্ঠানে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ কাফী টপ্পা পরিবেশন করেন বয়সের প্রভাব তাঁর বাজ[illegible] অনুষ্ঠানটি উপভোগ্য হয়েছিল তাঁরই রচিত দুটি বাংলা গেয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন।

শেষ অনুষ্ঠানে দুই প্রবীণ (রাধুবাবু ও জ্ঞানবাবু) এক গেল। এই অনুষ্ঠানে রাধুবাবুর জ্ঞানবাবু এবং স্বরোদে নরেন্দ্র গিতা করলেন। ইমন রাগে সং[illegible] করে রাধুবাবু এবং নরেন্দ্রনা[illegible] তিনতালে বিলম্বিত ও দ্রু[illegible] শোনালেন। গৎ পর্বে বিস্[illegible] বোলবাণীর কাজ ও পটদুনি তা[illegible] নিখুঁত ভাবে পরিবেশন করলেন। সেদিনের বাজনা এত উন্নত মানে[illegible] যা সচরাচর শোনা যায় না। আজ (রাধুবাবুর) মত উচ্চস্তরের বাঙালীর ভেতর হয়নি। সারা (রাধুবাবুর) স্থান খুব উঁচুতে রবিশংকরের কোন এক বাংলা সাপ্ত[illegible] মন্তব্যটি সেদিনের বাজনায় রাধুবা[illegible] প্রমাণ করে গেলেন।

জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের তবলা [illegible] অনবদ্য তাঁর অপূর্ব বোলের প্র[illegible] ছন্দের মহিমা স[illegible] মৌলিক।

মতি[illegible]

[illegible]াশ ঘোষ (তবলা), রাধিকামোহন [illegible]

খড়ির গণ্ডী নাটকে স্বাতী, লেখা চট্টোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ এবং ছায়া ঘোষ

ড : কিছু গঠনমূলক

বেশ্‌ট-এর 'দা ককেশিয়ান
টি এই বছর পশ্চিমবঙ্গের
তদের কাছে এক অবশ্য
একই নাটক, তিনটি দল
ভিন্ন ভিন্ন কাঠামোয়
পশ্চিমবঙ্গের দর্শকদের
লই কলকাতার—শতাব্দী,
য়েটার ফ্রন্ট। বর্তমান
কার' প্রযোজিত 'খড়ির
রাখা হল। ক্রমে অন্য
লোচনা করা হবে।
নুসরণ, অনুকরণ এমনকি
বলেও বেশ্‌ট-এর নাটক-
ণ হয় না, বিপর্যস্ত হয়
তব্য। 'নান্দীকার' এই
পাশ্চাত্যে সেই বিশালতাকে
তে চেয়েছেন। যদিও
ভাবাতিশয্যে বক্তব্যের
তা কিছু নষ্ট হয়েছে,
স্বল্পপরিসরে অনাবশ্যক
পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে;
ষয়বস্তু, কিছু সপ্রতিভ
সাহসী গানের পংক্তিতে
পভোগ্য হয়ে উঠবে আশা

নুধোড়ার সামাজিক পট-
ত ট্রাকটরের ছায়ায়
ন্দর প্রস্তাবনার মূল
. ৭০ সড়ক দশকের
মাজের অবস্থার পরি-
। কিন্তু নাটকটির
যে কোন সম্পাদনার
প্রায় আদ্যন্ততত্ত্ব অর্থাৎ
র্জিত হওয়া উচিত
ও যোগাতাসূত্রে; সেই
বোধের যাথার্থ নিশ্চয়ই
নান্দীকার-এর
ালিভাষ্যে বেশ্‌ট-এর
খানি অনুসৃত হয়েছে
র প্রয়োজন নেই, তার
সেটা জতটা নাটক
ং মানবিক আবেদনের
ট-এর এই নাটকটি
ণ করেছেন, তা কত
পেরেছেন সাধারণ
ানো যেতে পারে যে,
ৌলিক মঞ্চরূপ দেখার
যেমন হয়নি আরো
সে প্রসঙ্গে আমার
ই পড়ে, ছবি দেখে,
টা।
র্গাণ্ড' দেখতে বসে
ক বেশ্‌টির তুলনায়
ক্ষান্তরে তাঁরা একটি

নৃত্যগীতিসমৃদ্ধ, ঝাঁক-ঝমকপূর্ণ অথচ বক্তব্যবর্জিত মনোগ্রাহী নাটক উপভোগ করবেন। নাটকের প্রথমার্ধ তুলনায় মন্থর থাকলেও, দ্বিতীয়ার্ধে নির্দেশক রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত সংলাপ, উপস্থাপনা এবং মুস্তাক কাজির ভূমিকাভিনয়ে স্বচ্ছন্দগতি সৃষ্টি করবেন। লুৎফা চরিত্রের অভিনেত্রী স্বাতী-লেখা চট্টোপাধ্যায় ছাড়া প্রায় সকলেই সুন্দর গান গাইবেন এবং গানের কথায় দু-একটি ব্যতিক্রম ব্যতিত গৌতম চৌধুরীর সাহসী পদ্যগন্ধী বিন্যাসও অনেকেরই ভালো লাগবে। পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাকীর্ণ সচেতন মানুষ এই নাটক দেখে প্রচুর আনন্দও পাবেন নিশ্চয়ই, তবু দু-একটা সঙ্গত প্রশ্ন হয়তো স্বাভাবিক-ভাবেই তাঁদের মনে আসবে, যেমন আমার এসেছে।

(১) শহরের অরাজক অবস্থা ও ত্রাসের পটভূমি বোঝাতে কবন্ধ ও নরমুণ্ডের খেলনা সংস্করণ ঝুলিয়ে মঞ্চকে অযথা ভারী করা হয়েছে কেন? গত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যেভাবে যত্রতত্র মৃতদেহ দেখেছে, উলঙ্গ নিষ্ঠুরতায়, তাতেই ঐ খেলনা মৃতদেহ সাজানোতে তাদের কি কোনরকম অনুভূতি জাগে? এর চেয়ে একদম ফাঁকা মঞ্চের নগ্নতায় কি অনেক বেশি নৈরাজ্যের ইঙ্গিত আনা যেতো না। মঞ্চে সবসময়ই ঠাসাঠাসি করে বহু উপকরণ থাকে, যা অনেক সময় ব্যবহৃতই হয় না। মঞ্চের মেদ ঝরিয়ে সুলভ সংস্করণ করলে নাটকের ক্ষতির চেয়ে লাভের সম্ভাবনাই কি বেশি নয়?

(২) নাটকের বঙালিকরণের উদ্দেশ্য মেনে নিতে অসুবিধা নেই, কিন্তু তা বলে বঙালিয়ানার নাম করে অকারণ যত্রতত্র বা ঢুকে যাবে কেন তার শরীরে এবং উচ্চারণে। বুড়িমা-কে কাজির আসনে বসিয়ে মুস্তাক যখন 'ঠাকুমা গো ঠাকুমা। তুমিই আমার বাংলাদেশ, তুমিই আমার বাংলা মা' জাতীয় ভড়ং কাটতে থাকে, তখন সেই অনাবশ্যক আবেগের দাপট নাটককে একেবারে শিথিল করে দেয়। তেমনি বেশি ভাবালু লাগে, মুস্তাক যখন শেষ দৃশ্যে লুৎফাকে ডাকবার সময়ে শুধু 'এ মেয়ে' বলেই ক্ষান্ত হয় না, গলা ভারি করে 'ও মা' বলেও ফুঁপিয়ে ওঠে। তারও অক্ষম ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় বিভিন্ন সময় ভাবব্যঞ্জনার অপটু প্রয়োগে, মনসুর-লুৎফার সংলাপের কোন অংশে, যেমন—'সবকিছু খণ্ডে খণ্ড' জাতীয় অসংযত শব্দ বন্ধে। নান্দীকার-এর প্রযোজনায় এরকম অসংহতি কেন?

(৩) একটি অখণ্ড বক্তব্য পরিবেশন যদি এই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তবে ঘন ঘন বিবেকরূপী সূত্রধারের গান কি খুব বাঞ্ছনীয়? এদের আবির্ভাবে বিনোদন যতটা হয়, বক্তব্য আদৌ পরিষ্কার হয় ততটা? গানের সুরে সহজ আবেদন রাখার চেষ্টা অবশ্য খুবই সঙ্গত মনে হয়েছে, তবে তাতে বৈচিত্র্যের অভাবও মনে হয়েছে প্রচুর। গানগুলি প্রায় প্রত্যেকটিই সুগীত, আবহও সুপ্রযুক্ত, তবু গানের ব্যবহার যদি এতটাই রাখতে হয়, তাহলে তার প্রয়োগেও কল্পনাসমৃদ্ধি আর একটু সম্পন্ন হওয়া উচিত নয় কি?

(৪) লুৎফা যখন হাবিলদারের জন্যে দৌড়য়, তখন হঠাৎ তাকে মঞ্চের গভীরে নিয়ে গিয়ে একটি স্পটের মধ্যে ধরে তার এক জায়গায় দৌড় দেখানো নিঃসন্দেহে গিমিক। এই দৃশ্য প্রায়ই করতালিতে ফেটেও পড়ে। যখন হাবিলদার-এর সঙ্গে তার ব্যবধান বাড়ে। কিন্তু লুৎফা চরিত্রাভিনেত্রীর দৌড় দেখে আমার কেবলই মনে হয়, তাঁর শরীর এগোনোর বদলে পেছিয়ে যাচ্ছে, ভারসাম্যের অভাবে। আমি দু রাত্রি এই নাটক দেখেছি, দু-দিনই এক ঘটনা। এই অপ্রয়োজনীয় গিমিক যদি ব্যবহার করতেই হয়, তবে নির্দেশকের উচিত নয়কি এই [illegible] শুধরে দেওয়া? তাছাড়া স্বাতী [illegible] এত অনিবার্যভাবে

দেওয়া প্রয়োজন। নয়তো এমনিতে শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের মঞ্চজগতে যথেষ্ট সম্ভাবনাময় অভিনেত্রীর দাবি রাখেন নানা কারণে।

এইসব প্রশ্ন অবশ্য উঠতেছে নান্দীকার বলেই। পেশাদারি থিয়েটারের বাইরে বলার যে অন্য থিয়েটার, তার মধ্যে নান্দীকার এক বিশেষ নাম, তাই। নয়তো এই নাটকের উপভোগ্যতা ও প্রশংসাসূচক অংশের যে-কথা আগেই বলা হয়েছে, তা বলেই থেমে যাওয়া যেত। আর বরং শুধু বলা যেতে পারতো কণিষ্ক সেন-এর আলো, বঙ্কিমের গোরুর গাড়ীর পোষাক, শঙ্কিত সেন, সুভাষ সেন-এর রূপসজ্জা যথাযথ। কুমার রায়, অতি দাস-এর মঞ্চ ভারাক্রান্ত হলেও মোটামুটি, কিংবা বুদ্ধদেব রায়-চৌধুরী, পরিমল মুখোপাধ্যায়, মমতা ঘোষ, অঞ্জলি দত্ত, রীণা দে প্রমুখের অভিনয় সুন্দর এবং পাঁচুগোপাল দে, পশুপতি বসু, নমিতা পাল চেষ্টা আরও চেষ্টা করতে হবে। বলা যেতে পারতো রঞ্জাবলী, রঞ্জিত বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিতোষ পাল-এর সুন্দর গানের গলার কথা, সাধারণভাবে ভাবনাচোর খোঁচা দিলেও মানতে হতো আলালত নিয়ে থাকে শব্দবন্দীটির অনবদ্য প্রয়োগ। কিন্তু তার বদলে লাইনগুলো বড় করে দেখানো হল, খুঁত বড় হল লেখনার দাদার অবহেলায় বিধবা শব্দের ব্যবহারের অসংযমে, কারণ, এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনার ত্রুটি নয়, চরিত্রেরও। মাত্র এবং ক্যাবরে অধ্যুষিত পেশাদারি নাটকের আক্রমণের বিরুদ্ধে গ্রুপ থিয়েটার মাত্র দেওয়ালে পিঠ দিয়ে লড়বে— এই আশায় যারা বেঁধে নান্দী নাট্য সমালোচনা লেখেন, তাঁরা নিশ্চয়ই নিষ্করুণ তাড়িয়ে দেবেন না গ্রুপ থিয়েটার-এর অপটু প্রয়াসকে। বরং দেবেন কিছু গঠনমূলক প্রস্তাব, যা কেবল তাত্ত্বিক নয়, বাস্তব এবং যার ফলে প্রয়োজনার ত্রুটি সংশোধন করে তার মান উন্নত করা যায়।

আমার বিশ্বাস নান্দীকার এই প্রকীর্ণ প্রশ্নগুলি বিচার করে দেখলে ভালো হবে।

সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস

ভারতের ইতিহাস সুখপাঠ্য, সন্দেহ নেই। 'হিস্ট্রি'। হিস্টোরি। স্টোরি। গল্প। ইতিহাসের গল্প। ইতিহাস। কিন্তু এই ইতিহাস সুখপাঠ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কত দামী তা জানবার জন্য সঠিক বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষকদের প্রয়োজন। এরকম একটি প্রয়োজনীয় বিদ্যালয় শতাব্দীর অভিনয়-কক্ষ। সেখানে পৌঁছলে শিক্ষক এবং ছাত্রদের সমবেত গান শোনা যায়—

'সাকেতের বিহ্বলতা'র সুরে।

'বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভে কতো উপকার পাই
শিক্ষা বিনা আমাদের কোন সদ্গতি নাই
আ হা হা হা হা হা হা হা॥
ফাঁকি কভু নয়
সঙ্গে থেকো, খাটিতে শেখো,
কুড়োনি ঝরো ঝয়
আ হা হা হা হা হা হা হা॥
ভারতের ইতিহাস বড়ডো দামী জেনো
ইতিবৃত্ত চর্চা করে বর্তমানকে চেনো
ফাঁকি কভু নয়
কোরো না খেলা, রোজ দুবেলা
পড়াটি চাই হয়
আ হা হা হা হা হা হা হা॥

গানটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করা গেল না। চেনা সুরের সহজ সংযোগের পিছনে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অন্তঃসারশূন্যতা, সঙ্গতিহীন পরিচয় কেমন কোন ভান না করে বেরিয়ে আসে, তা এরপর অনুমান করা কঠিন নয় না নিশ্চয়ই। সেই মানুষ এলিশিয়ম প্রার্থনার পর সুবোধ বালক গেয়ে যখন ইতিবৃত্তের আলোয় বর্তমানকে চেনে, তখন রাজা থেকে সাম্রাজ্যের সহজ ব্যাখ্যায় পৌঁছতে তার দেরি হয় না। জানতে অসুবিধা হয় না, কীভাবে আর্য, শক, হূন, পাঠান, মোগল অর্থাৎ আশ্বখনপাঠঙ্গোল শাসিত ভারতের ইতিহাসে তার গমনসমস্ত অপরিবর্তিত থেকে যায়। এরপর ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাস-এর সঙ্গে সঙ্গে যে অর্থনীতিও শেখে, অর্থাৎ শেখে ভারতের ইতিহাসের অর্থনীতি, বাণিজ্যের অর্থ, যে বাণিজ্য করে গেছে ম ব্রিটেনিয়ার দুলালরা, ব্রিটিশ বাণিজ্যের নীতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসে ভারতের নতুন পরিচয় গড়িত হয়ে যায়। ভারতবর্ষ হয়ে যায় কাঁসিধন দেশ। এই-ই ইতিহাস।

ব্রিটিশ শাসন একদিন সরে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু পুঁজি থেকেই যায়। ইচ্ছাকৃত তা রেখে যায় ব্রিটানিয়ার দুলাল। ফলে ভারতের ইতিহাসে সুখের বাধাত ঘটে না। টেস্ট ম্যাচের টিকিট, সাট, গয়না, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল-লালিত সেই সুখ আমাদের শরীরে জড়িয়ে থাকে। বাবুরা ধনবানদের পা এবং নিজেদের হৃত চাটে, জনগণেশ খিদেয় কাতরায়। ভারতের ইতিহাস মোটামুটি এই সুখপাঠ্য পটভূমিতে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে যে ঘাসীচাবি ঘাস-বিচালি করে গতিহীন চলে।

এই জন্য তত্ত্বটিই শতাব্দীর প্রয়োজনীয় সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস। ইতিহাস তথ্য ও পরিসংখ্যান-নির্ভর একটি বিজ্ঞানসম্মত দলিল। কিন্তু এই বিজ্ঞানে আপেক্ষিকবাদের প্রভাব বড়ো বেশি। তথ্য ও পরিসংখ্যানগুলোকে দেখবার যে ক দেখাবার প্রবণতার আপেক্ষিক চরিত্র বদলে যেতে পারে। হাসের সঠিক চরিত্র প বাদল সরকার এখানে পুঁজিবাদের চিরন্তন উন্মোচনে। শতাব্দীর অন্য মতো এখানেও সামাগি বিন্যাসের ভূমিকাগ্রহণ। জানা বা অর্ধ-জানা তথ্যের স্বচ্ছ প্রয়োজনার পিছনে উপস্থাপন প্রক্রিয়াতে এমন এক স্তরে উত্তীর্ণ পরিকল্পনাটি এক ঠিক যায়। বিন্যাসের এই স্তরে কোথাও সরব আত্মঘোষণা মিশে থাকে নাটকের শরী সঙ্গে সংযোগ নির্মাণের নিঃশব্দে সম্পাদিত হতে সময়বিশেষের স্তূতে জন্ম প্লাটফর্ম থেকে কথা প্রয়োজনে শিক্ষক-ছা তলে নেমে আসার মোদ একজন মাকে দিয়ে বক্ত পাশি মা বিট্রে নিয়ার তার পিঠে উল্কার দেখা সঙ্গে বারহাম বনা রাওলিন বা রবীন্দ্রজয়ী আরও সহজ হয়েছে মায়ের কোলে মাথে সংস্থাপনে ধনিগুণের লক্ষণীয়।

চিরন্তন্ত্রী সুন্দর বিটিশ সম্পর্ক ব্যা কর্ণওয়ালিশ এমন রবিন্দ্র রে

ক্লাসিক অভিনয়ের ভরসের পরিকল্পিত অন্য আবহ ওয়া অনা শতব্দী আগার রেখেছে এর দৃশ্যে কিনা প্রদর কবার সময় কিছু কিছু-ই প্রয়োজনা-নীতিতে নৈপুণ্যের যে দলি ছিলাম, তা প্রতাহ যায় যে, এই সমস্ত সম্পর্কে থাকে পরিকল্পনা বদলে সেই গোড়া দিনগুলি।

শেষ করার আগে নাটকের-প্রসঙ্গে ফিরে। হাস যে চরম প্রতিষ্ঠা ভালো হতো। ইদ এই নাটকের প্রতিশ্রু নির্ভাক সে-ইতিহ

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে সুপ্রিয় সরকার কর্তৃক ৭৮।১।১ গ্রে স্ট্রীট, প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

পশ্চিমবঙ্গে অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল